هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ

তাফহীমুল কুরআন

সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী
রহ.

খণ্ডভিত্তিক সূরা-সূচী

নং	নাম	খণ্ড	পৃষ্ঠা	পারা
১।	আল ফাতেহা	১ম	৩৯	১ম
২।	আল বাকারাহ	,,	৪৪	১ম-৩য়
৩।	আলে ইমরান	২য়	১	৩য়-৪র্থ
৪।	আন নেসা	,,		৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫।	আল মা-য়েদাহ	৩য়	১	৬ষ্ঠ-৭ম
৬।	আল আন'আম	,,	৯৫	৭ম-৮ম
৭।	আল আ'রাফ	৪র্থ	১	৮ম-৯ম
৮।	আল আনফাল	,,	১৩০	৯ম-১০ম
৯।	আত্ তাওবা	৫ম	১	১০ম-১১শ
১০।	ইউনুস	,,	১০৪	১১শ
১১।	হূদ	৬ষ্ঠ	১	১১শ-১২শ
১২।	ইউসুফ	,,	৬৬	১২শ-১৩শ
১৩।	আর্ রা'দ	,,	১৩৮	১৩শ
১৪।	ইব্রাহীম	,,	১৬৯	১৩শ
১৫।	আল হিজর	৭ম	১	১৩শ-১৪শ
১৬।	আন্ নাহ্ল	,,	২৭	১৪শ
১৭।	বনী ইসরাঈল	,,	৯৫	১৫ শ-১৬শ
১৮।	আল কাহ্ফ	,,	১৭৫	১৫শ-১৬শ
১৯।	মার্য়াম	৮ম	১	১৬শ
২০।	ত্বা-হা	,,	৩৫	১৬শ
২১।	আল আম্বিয়া	,,	১০৩	১৭শ
২২।	আল হাজ্জ	,,	১৬৪	১৭শ
২৩।	আল মু'মিনূন	৯ম	১	১৮শ
২৪।	আন নূর	,,	৫৮	১৮শ
২৫।	আল ফুরকান	১০ম	১	১৮শ-১৯শ
২৬।	আশ শু'আরা	,,	৫৩	১৯শ
২৭।	আন নাম্ল	,,	১৪৭	১৯শ-২০শ
২৮।	আল কাসাস	,,	২১৬	২০শ
২৯।	আল 'আনকাবূত	১১শ	১	২০শ-২১শ

৩০।	আর রূম	,,	৫৯	২১শ
৩১।	লুকমান	,,	১০৬	২১শ
৩২।	আস্ সাজদাহ	,,	১৩৫	২১শ
৩৩।	আল আহযাব	১২শ	১	২১শ-২২শ
৩৪।	আস সাবা	,,	১৪৯	২২শ
৩৫।	ফাতির	,,	১৯৯	২২শ
৩৬।	ইয়া-সীন	১৩শ	১	২২শ-২৩শ
৩৭।	আস্ সা-ফ্ফা-ত	,,	৩৭	২৩শ
৩৮।	সা-দ	,,	৮২	২৩শ
৩৯।	আয যুমার	,,	১২৬	২৩শ-২৪শ
৪০।	আল মু'মিন		১৬৩	২৪শ
৪১।	হা-মীম আস সাজদাহ	১৪শ	১	২৪শ-২৫শ
৪২।	আশ শূরা	,,	৪৪	২৫শ
৪৩।	আয যুখরুফ	,,	৯৬	২৫শ
৪৪।	আদ দুখান	,,	১৩৫	২৫শ
৪৫।	আল জাসিয়াহ	,,	১৫৬	২৫শ
৪৬।	আল আহক্বাফ	,,	১৭৮	২৬শ
৪৭।	মুহাম্মাদ	১৫শ	১	২৬শ
৪৮।	আল ফাতহ্	,,	৩০	২৬শ
৪৯।	আল হুজুরাত	,,	৬৫	২৬শ
৫০।	ক্বাফ	,,	১০৫	২৬শ
৫১।	আয যারিয়াত	,,	১৩০	২৬শ-২৭শ
৫২।	আত্ তূর	,,	১৬০	২৭শ
৫৩।	আন্ নাজ্ম	১৬শ	১	২৭শ
৫৪।	আল ক্বামার	,,	৪৩	২৭শ
৫৫।	আর রাহমান	,,	৬১	২৭শ
৫৬।	আল ওয়াকিয়া	,,	৯৩	২৭শ
৫৭।	আল হাদীদ	,,	১১৯	২৭শ
৫৮।	আল মুজাদালাহ	,,	১৬২	২৮শ
৫৯।	আল হাশর	১৭শ	১	২৮শ
৬০।	আল মুমতাহানা	,,	৫৫	২৮শ
৬১।	আস সফ	,,	৮৯	২৮শ
৬২।	আল জুমআ	,,	১২১	২৮শ
৬৩।	আল মুনাফিকুন	,,	১৫১	২৮শ

৬৪।	আত তাগাবুন	,,	১৬৭	২৮শ
৬৫।	আত তালাক	,,	১৯৪	২৮শ
৬৬।	আত তাহরীম	,,	২৩২	২৮শ
৬৭।	আল মুল্‌ক্‌	১৮শ	১	২৯শ
৬৮।	আল কলম	,,	১৮	২৯শ
৬৯।	আল হাক্‌কাহ	,,	৩৬	২৯শ
৭০।	আল মা'আরিজ	,,	৪৪	২৯শ
৭১।	নূহ	,,	৫৬	২৯শ
৭২।	আল জিন	,,	৬৭	২৯শ
৭৩।	আল মুয্‌যাম্মিল	,,	৮২	২৯শ
৭৪।	আল মুদ্দাস্‌সির	,,	৯৫	২৯শ
৭৫।	আল কিয়ামাহ	,,	১১৭	২৯শ
৭৬।	আদ দাহর	,,	১৩৭	২৯শ
৭৭।	আল মুরসালাত	,,	১৬৭	২৯শ
৭৮।	আন নাবা	১৯শ	১	৩০শ
৭৯।	আন নাযিয়াত	,,	১৬	৩০শ
৮০।	আবাসা	,,	৩১	৩০শ
৮১।	আত্‌ তাকবীর	,,	৪৩	৩০শ
৮২।	আল ইনফিতার	,,	৫৩	৩০শ
৮৩।	আল মুতাফ্‌ফিফীন	,,	৬০	৩০শ
৮৪।	আল ইনশিকাক	,,	৬৭	৩০শ
৮৫।	অল বুরুজ	,,	৭৪	৩০শ
৮৬।	আত তারেক	,,	৮৩	৩০শ
৮৭।	আল আ'লা	,,	৯০	৩০শ
৮৮।	আল গাশিয়া	,,	১০০	৩০শ
৮৯	আল ফজর	,,	১০৬	৩০শ
৯০।	আল বালাদ	,,	১১৭	৩০শ
৯১।	আশ শামস	,,	১৩০	৩০শ
৯২।	আল লাইল	,,	১৪১	৩০শ
৯৩।	আদ দুহা	,,	১৫০	৩০শ
৯৪।	আলাম নাশ্‌রাহ	,,	১৫৯	৩০শ
৯৫।	আত্‌তীন	,,	১৬৭	৩০শ
৯৬।	আল আলাক	,,	১৭৫	৩০শ
৯৭।	আল কাদর	,,	১৮৪	৩০শ

৯৮। আল বাইয়্যেনাহ	,,	১৯০	৩০শ
৯৯। আল যিলযাল	,,	১৯৮	৩০শ
১০০। আল আদিয়াত	,,	২০৮	৩০শ
১০১। আল কারিয়া	,,	২১৪	৩০শ
১০২। আত তাকাসুর	,,	২১৮	৩০শ
১০৩। আল আসর	,,	২২৪	৩০শ
১০৪। আল হুমাযা	,,	২৩২	৩০শ
১০৫। আল ফীল	,,	২৩৭	৩০শ
১০৬। কুরাইশ	১৯শ	২৫১	৩০শ
১০৭। আল মাউন	,,	২৫৮	৩০শ
১০৮। আল কাওসার	,,	২৬৮	৩০শ
১০৯। আল কাফেরুন	,,	২৮২	৩০শ
১১০। আন নসর	,,	২৯৫	৩০শ
১১১। আল লাহাব	,,	৩০৩	৩০শ
১১২। আল ইখলাস	,,	৩১৩	৩০শ
১১৩। আল ফালাক	,,	৩২৮	৩০শ
১১৪। আন নাস	,,	৩৫৭	৩০শ

অনুবাদকের কথা

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহমাতুল্লাহ আলাইহির তাফহীমুল কুরআন একটি অনন্য সাধারণ তাফসীর গ্রন্থ। কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা দু'টি অংশই এখানে বৈশিষ্টের অধিকারী। অনুবাদের ক্ষেত্রে গতানুগতিক শাব্দিক তরজমার পদ্ধতি পরিহার করে তিনি ভাবার্থ প্রকাশমূলক স্বচ্ছন্দ অনুবাদের পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

এ ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য সর্বজন বিদিত। ইসলামী জ্ঞান-গবেষণার সাথে সাথে উর্দূ ভাষায় ও সাহিত্যে তিনি যে উচ্চস্থানে বিরাজ করছেন তার কারণে, তাঁর এই স্বচ্ছন্দ অনুবাদ একটি সাফল্যের মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। মূলত তাঁর উচ্চপর্যায়ের ইল্‌মী যোগ্যতার কারণেই এটা সম্ভবপর হয়েছে। কুরআনের এই স্বচ্ছন্দ অনুবাদকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সময় আমরা ভাষার প্রাঞ্জলতা ও গতিশীলতার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ রেখেছি। যথাসম্ভব সহজ ভাষায় একে ঢালবার চেষ্টা করেছি। লেখক যে উদ্দেশ্যে কুরআনের এ অনুবাদ করেছেন বাংলাতেও তাঁর সে উদ্দেশ্য পূর্ণ করার দিকে আমরা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছি।

ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি অযথা পাণ্ডিত্য প্রকাশের পদ্ধতি অবলম্বন না করে পাঠকের হৃদয়ের অন্ধকার কুঠরীতে আলোক সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন। কুরআনের মূল বক্তব্য সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা এবং কুরআনকে হিদায়াতের গ্রন্থ হিসেবে উপস্থাপিত করাই তাঁর লক্ষ। আধুনিক জীবন যে জটিলতা ও অজ্ঞতার সৃষ্টি করেছে, যার ফলে কুরআনের মতো মহাগ্রন্থ মুসলমানদের কাছে থাকা সত্ত্বেও এবং হাজার হাজার লাখো লাখো মুসলমান প্রতিদিন এ গ্রন্থটি পাঠ ও এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাথে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জীবনে কোন বিপ্লব সূচিত হতে পারছে না এবং তারা কুরআনের ভিত্তিতে কোন গতিশীল, সমৃদ্ধ ও অমিতশক্তি সম্পন্ন সমাজ গঠনে আগ্রহী ও উদ্যোগী হচ্ছে না, সে ক্ষেত্রে তাফহীমুল কুরআন বিরাট সাফল্যের মাপকাঠি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তাফহীমের একজন সচেতন মুসলিম পাঠক কুরআনের দাওয়াত নিজের হৃদয়ের গভীরে অনুভব করতে পারেন। তাফহীম পাঠের সময় একজন পাঠক ইসলামী আন্দোলনের সমস্ত চড়াই-উতরাই, খাড়ি ও উপত্যকার গহীন পথ অতিক্রম করতে থাকেন, যে পথে কুরআন নাযিলের সময় নবী এবং তাঁর সাহাবীগণ অতিক্রম করেছিলেন। উপরন্তু পাঠক নিজেকে ইসলামী আন্দোলনের একজন সক্রিয় নায়কের ভূমিকায় অনুভব করতে থাকেন। তিনি মনে করতে থাকেন, কুরআন যেন এখনি এই মুহূর্তে তাঁরই জীবন সমস্যা সমাধানের জন্য নাযিল হয়েছে। কুরআনের দাওয়াতের এই প্রাণবন্ত উপস্থাপনা তাফহীমুল কুরআনের একক বৈশিষ্ট। আধুনিক মানসে কুরআনের বক্তব্য ও দাওয়াতের নক্‌শা গভীরভাবে খোদাই করার জন্য হাদীস, ফিকাহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদির নির্ভরযোগ্য ও গবেষণামূলক তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। তাফহীমের আর একটি বৈশিষ্ট হচ্ছে, কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বাইবেলের যথোপযুক্ত ও সহায়ক ব্যবহার। প্রাচীন তাফসীরকারদের কেউ কেউ কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বাইবেলের যত্রতত্র ব্যবহার করে অযথা বিড়ম্বনা ও জটিলতা সৃষ্টি করেছেন। এদিক দিয়ে

তাফহীমে বাইবেলের ব্যবহার যথেষ্ট সংযত ও যুক্তিগ্রাহ্য। আর আমাদের জীবনে যে বিষয়টির কোন প্রয়োগিক গুরুত্ব নেই তেমন কোন বিষয় নিয়ে অযথা শাব্দিক ও তাত্ত্বিক গবেষণায় তাফহীমে কালক্ষেপন করা হয়নি।

উলামায়ে মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখ্খিরীনের মধ্যে প্রচলিত কুরআন ব্যাখ্যার স্বীকৃত মূল নীতিগুলোই মাওলানা মওদূদী তাঁর এই গ্রন্থে অনুসরণ করেছেন। এর বাইরে নতুন কোন নীতি তিনি উদ্ভাবন করেননি বা কোথাও কোন মনগড়া ব্যাখ্যাও তিনি দেননি। তাফহীমের জনপ্রিয়তা অনুমান করার জন্য কেবল এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এ পর্যন্ত দুনিয়ার প্রায় অর্ধ ডজন বড় বড় ভাষায় এ গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে।

১৩৬১ হিজরীর মহররম মাসে (ফেব্রুয়ারী ১৯৪২) মাওলানা মওদূদী তাঁর এই বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীরটি লেখার কাজ শুরু করেন। দীর্ঘ তিরিশ বছর সাধনার পর ১৯৭২ সালে ছয় খণ্ডে প্রায় চার হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত এ গ্রন্থটির কাজ তিনি সমাপ্ত করেন।

বাংলায় এ পর্যন্ত প্রায় তিরিশটিরও বেশী কুরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের সংখ্যা দশটির কম নয়। এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ তাফসীর ছয়টি। এ ছয়টির মধ্যে উর্দূ থেকে অনূদিত হয়েছে তাফহীমুল কুরআন সহ তিনটি সুবিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ। এ গ্রন্থগুলো সবই বাংলায় বহুল পঠিত জনপ্রিয় গ্রন্থ। তাফহীমুল কুরআনের অনুবাদ বাংলা ভাষায় কুরআনী জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ ও প্রসারিত করেছে।

প্রসঙ্গ কথা

উলামা ও কুরআন গবেষকদের প্রয়োজন পূর্ণ করা এ তাফসীরটির উদ্দেশ্য নয়। অথবা আরবী ভাষা ও দীনী তা'লীমের পাঠ শেষ করার পর যারা কুরআন মজীদের গভীর অনুসন্ধানমূলক অধ্যয়ন করতে চান তাদের জন্যও এটি লেখা হয়নি। ইতিপূর্বে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ তাদের এ প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম। এ তাফসীরটির মাধ্যমে আমি যাদের খেদমত করতে চাই তাঁরা হচ্ছেন মাঝারি পর্যায়ের শিক্ষিত লোক। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাদের তেমন কোন দখল নেই। কুরআনী জ্ঞানের যে বিরাট ভাণ্ডার আমাদের এখানে গড়ে উঠেছে তা থেকে লাভবান হবার সামর্থ ও যোগ্যতা তাদের নেই। সর্বাগ্রে তাদের প্রয়োজনই আমার সামনে রয়েছে। এ কারণে তাফসীর সংক্রান্ত অনেক গভীর তত্ব-আলোচনায় আমি হাত দিইনি। ইল্‌মে তাফসীরের দৃষ্টিতে সেগুলো অত্যধিক গুরুত্ববহ কিন্তু এই শ্রেণীটির জন্য অপ্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমার সামনে রয়েছে সেটি হচ্ছে, একজন সাধারণ পাঠক যেন এ কিতাবটি পড়ার পর কুরআনের মূল বক্তব্য, উদ্দেশ্য ও লক্ষ দ্ব্যর্থহীনভাবে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারেন। কুরআন তার ওপর যে ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে চায় এ কিতাবটি পড়ার পর তার ওপর যেন ঠিক তেমনি প্রভাব পড়ে। কুরআন পড়তে গিয়ে যেখানে তার মনে সন্দেহ-সংশয় জাগবে এবং প্রশ্ন ভেসে উঠবে সেখানে এ কিতাবটি সাথে সাথেই তার জবাব দিয়ে যাবে এবং সকল প্রকার সন্দেহের কালিমা মুক্ত করে তার মনের আকাশকে স্বচ্ছ, সুন্দর ও নির্মল করে তুলবে। সংক্ষেপে এতটুকু বলতে পারি, এটা আমার একটা প্রচেষ্টা। এতে আমি কতটুকু সফল হয়েছি তা বিদগ্ধ পাঠকগণই বলতে পারবেন।

কুরআনের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ও ভাব প্রকাশ

কুরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি এখানে শাব্দিক অনুবাদের পদ্ধতি পরিহার করে স্বাধীন-স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ও ভাব প্রকাশের পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। এর পেছনে আমার শাব্দিক অনুবাদ পদ্ধতিকে ভুল মনে করার মত কোন ধারণা কার্যকর নেই। বরং মিল্লাতে ইসলামিয়ার বড় বড় মনীষী এবং শ্রেষ্ঠ ইসলামী জ্ঞানসম্পন্ন আলেমগণ বিভিন্ন ভাষায় এ দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন। তাই এ পথে নতুন করে অগ্রসর হবার তেমন কোন প্রয়োজন আমি দেখিনি। তবে এমন কিছু প্রয়োজন আছে যা শাব্দিক অনুবাদে পূর্ণ হয় না এবং হতে পারে না। স্বাধীন-স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ও ভাব প্রকাশের মাধ্যমে আমি সেগুলোকে পূর্ণ করার চেষ্টা করেছি। শাব্দিক অনুবাদের আসল লাভ হচ্ছে এই যে, পাঠক কুরআনের প্রতিটি শব্দের মানে জানতে পারে। প্রতিটি আয়াতের নীচে তার অনুবাদ পড়ে তার মধ্যে কি কথা বলা হয়েছে তা জানতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতিটির এই লাভজনক দিকের সাথে এর মধ্যে

এমন কিছু অভাব রয়ে গেছে যার ফলে একজন আরবী অনভিজ্ঞ পাঠক কুরআন মজীদ থেকে ভালোভাবে উপকৃত হতে পারে না।

১. শাব্দিক অনুবাদ পড়তে গিয়ে সর্বপ্রথম রচনার গতীশীলতা, বর্ণনার শক্তি, ভাষার অলংকারিত্ব ও বক্তব্যের প্রভাব বিস্তারকারী ক্ষমতার অভাব অনুভূত হয়। কুরআনের প্রতিটি ছত্রের নীচে শাব্দিক অনুবাদের আকারে পাঠক এমন একটি নিষ্প্রাণ রচনার সাথে পরিচিত হয়, যা পড়ার পর তার প্রাণ নেচে ওঠে না, গায়ের পশম খাড়া হয়ে যায় না, চোখ দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয় না এবং তার আবেগের সমুদ্রে তরংগও সৃষ্টি হয় না। কতকগুলো নিষ্প্রাণ বাক্য পড়ার পর সে মোটেও অনুভব করে না যে, কোন বস্তু তার বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তিকে জয় করে হৃদয় ও মনের গভীরে নেমে যাচ্ছে। এই ধরনের কোন প্রতিক্রিয়া হওয়া তো দূরের কথা বরং অনুবাদ পড়ার সময় অনেক সময় মানুষ ভাবতে থাকে, এটি কি সেই গ্রন্থ যার একটি বাক্যের অনুরূপ একটি বাক্য রচনা করার জন্য সারা দুনিয়াবাসীকে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিল? এর কারণ, শাব্দিক অনুবাদ সবসময় নিরস হয়। এর মাধ্যমে মূল বিষয়ের রসাস্বাদন কোনক্রমেই সম্ভব হয় না। কুরআনের মূল রচনার প্রতিটি বাক্য যে গভীর সাহিত্য রসে সমৃদ্ধ অনুবাদে তার সামান্যতম অংশও অন্তরভুক্ত হতে পারে না। অথচ কুরআনের প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে তার পবিত্র ও নিষ্কলুষ শিক্ষা এবং তার উন্নত বিষয়বস্তুর অবদান যতটুকু তার সাহিত্যের অবদানও সে তুলনায় মোটেই কম নয়। কুরআনের এ বস্তুটিই তো পাষাণ হৃদয় মানুষের দিলও মোমের মতো নরম করে দেয়। এটিই বজ্রপাতের মতো আরবের সমগ্র ভূখণ্ডকে কাঁপিয়ে তোলে। এর চরম শত্রুরাও এর প্রভাব বিস্তারের যাদুকরী ক্ষমতার স্বীকৃতি দিতো। তারা এর ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত থাকতো। কারণ তারা মনে করতো, যে ব্যক্তি একবার এই যাদুকরী বাণী শুনবে সে এই বাণীর কাছে তার হৃদয়-মন বিক্রি করে বসবে। কুরআনের মধ্যে যদি এই সাহিত্যের অলংকার না থাকতো এবং অনুবাদের ভাষার মতো নিরস ও অলংকারহীন ভাষায় তা নাযিল হতো, তাহলে কুরআনের পরশে আরববাসীদের হৃদয় কোন দিন উত্তপ্ত হতো না, কোন দিন তাদের দিল নরম হতো না।

২. শাব্দিক অনুবাদ প্রভাবহীন হবার আর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, সাধারণত এই অনুবাদ মূলের প্রতিটি লাইনের নীচে বসানো হয়। অথবা নতুন স্টাইল অনুযায়ী পাতাকে মাঝখান থেকে ডানে বামে দু'ভাগে ভাগ করে একদিকে আল্লাহর কালাম এবং অন্যদিকে তার অনুবাদ বসানো হয়। শাব্দিক অনুবাদ পড়ার ও শেখার জন্য এ ব্যবস্থা তো ভালই। কিন্তু অন্যান্য বই একনাগাড়ে পড়ে মানুষ যেমন প্রভাবিত হয় এখানে তেমনটি হওয়া সম্ভবপর হয় না। কারণ এখানে ধারাবাহিকভাবে একটি বক্তব্য পড়ার সুযোগ নেই। বার বার মাঝখানে অন্য একটি অপরিচিত ভাষা এসে যাচ্ছে। কাজেই অনুবাদের বক্তব্য বার বার হোঁচট খেয়ে যাচ্ছে। ইংরেজী অনুবাদগুলোয় এর চাইতেও বেশী প্রভাবহীনতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। কারণ সেখানে বাইবেলের অনুকরণে কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াতের অনুবাদ নম্বর ভিত্তিক করা হয়েছে। আপনি কোন একটি চমৎকার প্রবন্ধের প্রত্যেকটি বাক্য আলাদা আলাদা করে লিখুন। তারপর ওপরে নীচে তার গায়ে নম্বর লাগিয়ে পড়ুন। আপনি নিজেই অনুভব করবেন, সুবিন্যস্ত ও ধারাবাহিকভাবে লিখিত রচনাটি যেভাবে আপনাকে প্রভাবিত করতো, এই পৃথক পৃথক বাক্যগুলোর জন্য তার অর্ধেক প্রভাবও আপনার ওপর পড়েনি।

৩. শাব্দিক অনুবাদের প্রভাবহীন হবার তৃতীয় একটি বড় কারণ হচ্ছে এই যে, কুরআন একটি রচনার আকারে নয় বরং ভাষণের আকারে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই ভাষান্তরিত করার সময় রচনার ভাষাকে যদি বক্তৃতার ভাষায় রূপান্তরিত না করা হয় এবং যেখানে যেমন আছে ঠিক তেমনটি রেখে হুবহু অনুবাদ করা হয় তাহলে সমস্ত রচনাটিই অসংলগ্ন এবং বক্তব্যগুলো পারস্পরিক সম্পর্কহীন হয়ে পড়বে।

৪. সবাই জানেন, কুরআন মজীদ শুরুতে লিখিত পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়নি। বরং ইসলামী দাওয়াত প্রসংগে প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী একটি ভাষণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল করা হতো এবং তিনি ভাষণ আকারে তা লোকদের শুনিয়ে দিতেন। প্রবন্ধের ভাষা ও বক্তৃতার ভাষার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে অনেক বড় পার্থক্য থাকে। যেমন প্রবন্ধ লেখার সময় পাঠক সামনে থাকে না। তাই সেখানে কোন সংশয়ের উল্লেখ করে তার জবাব দেয়া হয়। কিন্তু বক্তৃতার সময় শ্রোতা তথা সংশয়ী নিজেই সামনে হাযির থাকে। তাই সেখানে সাধারণত এভাবে বলার প্রয়োজন হয় না যে, "লোকেরা একথা বলে থাকে।" বরং বক্তা তার বক্তৃতার মাঝখানে প্রসংগক্রমে এমন একটি কথা বলে যায় যা সন্দেহ পোষণকারীর সন্দেহ দূর করতে সাহায্য করে। প্রবন্ধের বেলায় বক্তব্যের বাইরে কিন্তু তার সাথে নিকট সম্পর্ক রাখে এমন কোন কথা বলতে হলে তাকে প্রসংগক্রমে উল্লেখ করে কোন না কোনভাবে প্রবন্ধের মূল বক্তব্য থেকে আলাদা করে লিখতে হয় যাতে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন না হয়। অন্যদিকে বক্তৃতার মধ্যে শুধুমাত্র বক্তৃতার ধরন ও ভংগী পরিবর্তন করে একজন বক্তা বিরাট বিরাট প্রাসংগিক বক্তব্য বলে যেতে পারেন। শ্রোতারা এই বক্তব্যের মধ্যে কোথাও সম্পর্কহীনতা খুঁজে পাবে না। প্রবন্ধে পরিবেশের সাথে বক্তব্যের সম্পর্ক জোড়ার জন্য শব্দের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বক্তৃতায় পরিবেশ নিজেই বক্তব্যের সাথে নিজের সম্পর্ক জুড়ে নেয়। সেখানে পরিবেশের দিকে ইংগিত না করেই যেসব কথা বলা হয় তাদের মধ্যে কোন শূন্যতা অনুভূত হয় না। বক্তৃতায় বক্তা ও শ্রোতার বারবার পরিবর্তন হয়। বক্তা নিজের শক্তিশালী বক্তব্যের মাধ্যমে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী কখনো একটি দলের উল্লেখ করে তৃতীয় পুরুষ হিসেবে। কখনো তাকে মধ্যম পুরুষ হিসেবে উপস্থাপিত করে সরাসরি সম্বোধন করে। কখনো বক্তব্য পেশ করে এক বচনে। আবার কখানো বহুবচন ব্যবহার করতে থাকে। কখনো বক্তা নিজেই সরাসরি বলতে থাকে, আবার কখনো অন্যের পক্ষ থেকে বলতে থাকে। কখনো সে উচ্চতর ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে আবার কখনো সেই উচ্চতর ক্ষমতা নিজেই তার মুখ দিয়ে বলতে থাকে। এ জিনিসটি বক্তৃতায় একটি সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রবন্ধে এসে এটি সম্পূর্ণ একটি অসম্পর্কিত বস্তুতে পরিণত হয়। এ কারণে কোন বক্তৃতাকে প্রবন্ধ আকারে লিখলে পড়ার সময় তার মধ্যে বেশ সম্পর্কহীনতা অনুভূত হতে থাকে। মূল বক্তৃতার পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে পাঠকের দূরত্ব যতই বাড়তে থাকে এই সম্পর্কহীনতার অনুভূতিও ততই বাড়তে থাকে। অজ্ঞ লোকেরা কুরআন মজীদে যে অসংলগ্নতার অভিযোগ করে তার ভিত্তিও এখানেই। সেখানে ব্যাখ্যামূলক টীকার মাধ্যমে বক্তব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্পষ্ট করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কারণ কুরআনের আসল বাক্যের মধ্যে কোন প্রকার কম-বেশী করা হারাম। কিন্তু অন্য কোন ভাষায় কুরআনের অর্থ প্রকাশ করার সময় বক্তৃতার ভাষাকে সতর্কতার সাথে প্রবন্ধের ভাষায় রূপান্তরিত করে অতি সহজে এই অসংলগ্নতা দূর করা যেতে পারে।

৫. কুরআন মজীদের সূরাগুলো আসলে ছিল এক একটি ভাষণ। ইসলামী দাওয়াতের বিশেষ একটি পর্যায়ে একটি বিশেষ সময়ে প্রতিটি সূরা নাযিল হয়েছিল। প্রতিটি সূরা নাযিলের একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট ছিল। কিছু বিশেষ অবস্থায় এই ধরনের বক্তব্যের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছিল। কিছু প্রয়োজন পূরণ করার জন্য তখন এগুলো নাযিল হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপট ও নাযিলের উপলক্ষের সাথে কুরআনের সূরাগুলো এত গভীর সম্পর্কযুক্ত যে, সেগুলো থেকে আলাদা হয়ে নিছক শাব্দিক অনুবাদ কারোর সামনে রাখা হলে অনেক কথা সে একেবারেই বুঝতে পারবে না। আবার অনেক কথার উল্টো অর্থ বুঝবে। কুরআনের পূর্ণ বক্তব্য সম্ভবত কোথাও তার আয়ত্তাধীন হবে না। আরবী কুরআনের ক্ষেত্রে এই সমস্যা দূর করার জন্য তাফসীরের সাহায্য নিতে হয়। কারণ মূল কুরআনে কোন কিছু বৃদ্ধি করা যেতে পারে না। কিন্তু অন্য ভাষায় কুরআনের ভাব প্রকাশ করার সময় আমরা আল্লাহর কালামকে তার প্রেক্ষাপট ও নাযিলের অবস্থার সাথে সম্পর্কিত করতে পারি। এভাবে পাঠক তার পরিপূর্ণ অর্থ গ্রহণ করতে পারবে।

৬. কুরআন সহজ সরল আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হলেও সেখানে একটি বিশেষ পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন প্রচলিত শব্দকে তার আভিধানিক অর্থে ব্যবহার না করে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার বিভিন্ন শব্দকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছে। শাব্দিক অনুবাদ করার সময় তার মধ্যে এই পারিভাষিক ভাবধারা ফুটিয়ে তোলা বড়ই কঠিন ব্যাপার। এই ভাবধারা ফুটিয়ে না তোলা হলে অনেক সময় পাঠকরা বিভিন্ন সংকট ও ভুল ধারণার সম্মুখীন হয়। যেমন কুরআনে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ হচ্ছে "কুফর"। কুরআনে এ শব্দটি যে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে মূল আরবী অভিধানে এবং আমাদের ফকীহ ও ন্যায় শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় ব্যবহৃত অর্থের সাথে তার কোন মিল নেই। আবার কুরআনেও সর্বত্র এটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কোথাও এর অর্থ পরিপূর্ণ ঈমানবিহীন অবস্থা। কোথাও এর অর্থ নিছক অস্বীকার। কোথাও একে অকৃতজ্ঞতা ও উপকার ভুলে যাওয়ার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কোথাও ঈমানের বিভিন্ন দাবীর মধ্য থেকে কোন দাবী পূরণ না করাকে কুফরী বলা হয়েছে। কোথাও আকীদাগত স্বীকৃতি কিন্তু কর্মগত অস্বীকৃতি বা নাফরমানী অর্থে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কোথাও বাহ্যিক আনুগত্য কিন্তু প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাসকে কুফরী বলা হয়েছে। এ ধরনের বিভিন্ন জায়গায় যদি আমরা 'কুফরী' শব্দের অর্থ 'কুফরী' লিখে যেতে থাকি বা এর কোন একটি প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে থাকি তাহলে নিসন্দেহে অনুবাদ সঠিক হবে। কিন্তু পাঠকগণ কোথাও এর সঠিক অর্থ থেকে বঞ্চিত থাকবেন, কোথাও তারা ভুল ধারণার শিকার হবেন, আবার কোথাও সন্দেহ-সংশয়ের সাগরে হাবুডুবু খাবেন।

শাব্দিক অনুবাদের পদ্ধতিতে এই ত্রুটি ও অভাবগুলো দূর করার জন্য আমি মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ও ভাবার্থ প্রকাশের পথ বেছে নিয়েছি। কুরআনের শব্দাবলীকে ভাষান্তরিত করার পরিবর্তে কুরআনের একটি বাক্য পড়ার পর তার যে অর্থ আমার মনে বাসা বেঁধেছে এবং মনের ওপর তার যে প্রভাব পড়েছে, তাকে যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে নিজের ভাষায় লেখার চেষ্টা করেছি। লেখ্য ভাষায় স্বাভাবিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন ভাষণের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরেছি। আল্লাহর কালামের অর্থ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ দ্ব্যর্থহীনভাবে সুস্পষ্ট করার সাথে সাথে তার রাজকীয় মর্যাদা ও গাম্ভীর্য এবং ভাব প্রকাশের প্রচণ্ড

শক্তিকে যথাসম্ভব উপস্থাপন করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এই ধরনের মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদের জন্য শব্দের শৃংখলে বন্দী না থেকে মূল অর্থ ও তাৎপর্য প্রকাশের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা চালানোই ছিল অপরিহার্য। কিন্তু যেহেতু আল্লাহর কালামের ব্যাপার, সে জন্য আমি অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে এ পথে পা বাড়িয়েছি। আমার পক্ষ থেকে যতদূর সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভব তা করেছি। কুরআন তার বক্তব্যকে নিজের ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যতটুকু স্বাধীনতা দেয় তার সীমা অতিক্রম করার চেষ্টা করিনি।

আবার কুরআনকে পুরোপুরি বুঝার জন্য তার প্রতিটি বাণীর পটভূমি পাঠকের সামনে থাকা প্রয়োজন। মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদ এবং ভাবার্থ প্রকাশের মাধ্যমে তা পুরোপুরি সম্ভব নয়। তাই প্রতিটি সূরার শুরুতে আমি একটি ভূমিকা সংযুক্ত করেছি। সেখানে সম্ভাব্য সকল প্রকার অনুসন্ধান চালিয়ে আমি বিভিন্ন বিষয় নির্দিষ্ট ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। যেমন, সংশ্লিষ্ট সূরাটি কোন্ সময় নাযিল হয়েছিল। তখন কি অবস্থা ছিল? ইসলামী আন্দোলন তখন কোন্ পর্যায়ে ছিল? তার প্রয়োজন ও চাহিদা কি ছিল? সে সময় কোন্ কোন্ সমস্যা দেখা দিয়েছিল? এ ছাড়াও কোথাও কোন বিশেষ আয়াতের অথবা সমষ্টির নাযিলের কোন পৃথক উপলক্ষ থাকলে সেখানেই টীকার মধ্যে তা বলে দিয়েছি।

টীকায় এমন কোন কথা আমি আলোচনা করিনি যার ফলে পাঠকের দৃষ্টি কুরআন থেকে সরে গিয়ে অন্যদিকে চলে যেতে পারে। যেখানে আমি অনুভব করেছি সাধারণ পাঠক এখানে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ চান অথবা তার মনে কোন প্রশ্ন দেখা দেবে বা তিনি কোন সন্দেহ-সংশয়ের শিকার হবেন, সেখানে আমি টীকা লিখেছি এবং ব্যাখ্যা সংযোজন করেছি। আবার যেখানে আমার মনে আশংকা জেগেছে যে, পাঠক এখানে কোন গুরুত্ব না দিয়ে সোজা এগিয়ে যাবে এবং কুরআনের বাণীর মর্মার্থ তার কাছে অস্পষ্ট থেকে যাবে সেখানে আমি টীকা ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিষয়টি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছি।

যারা এই কিতাবটি থেকে ফায়দা হাসিল করতে চান তাদেরকে আমি কয়েকটি পরামর্শ দেবো। প্রথমে সূরার শুরুতে সংযোজিত ভূমিকা তথা প্রসংগ ও পূর্ব আলোচনাটি গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ে নিন। যতক্ষণ, ঐ সূরাটি অধ্যয়ন করতে থাকেন ততক্ষণ মাঝে মাঝে ঐ ভূমিকাটি দেখতে থাকেন। তারপর প্রতিদিন নিয়মিতভাবে কুরআন মজীদের যতটুকু পড়েন তার প্রতিটি আয়াতের শাব্দিক অনুবাদ প্রথমে পড়ে নিন। এ উদ্দেশ্যে মাতৃভাষায় বা অন্য কোন ভাষায় আপনার পছন্দসই যে কোন অনুবাদের সাহায্য নিন। এটুকু হয়ে যাবার পর তাফহীমুল কুরআনের স্বচ্ছন্দ অনুবাদটি ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে যতদূর প্রয়োজন একটি ধারাবাহিক রচনার মতো পড়ে নিন। এভাবে কুরআনের ঐ অংশের বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য একই সময় আপনার মনে ভেসে উঠবে। এরপর প্রত্যেকটি আয়াতকে বিস্তারিতভাবে বুঝার জন্য টীকা ও ব্যাখ্যা পড়তে থাকুন। এভাবে পড়তে থাকলে আমি মনে করি একজন সাধারণ পাঠক কুরআন মজীদ সম্পর্কে একজন আলেমের সমপর্যায়ে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম না হলেও একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে ইনশাআল্লাহ যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

আমি ১৩৬১ হিজরীর মুহাররম (ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ খৃ.) মাসে এ গ্রন্থের কাজ শুরু করি। ৫ বছরের অধিককাল ক্রমাগত এ কাজ চালু থাকে এবং সূরা ইউসুফ-এর তরজমা ও ব্যাখ্যা পর্যন্ত হয়ে যায়। অতপর এমন কিছু পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যে পরিস্থিতিতে

আমার না কিছু লেখার সুযোগ হয়েছে আর না এমন অবকাশ হয়েছে যে, পূর্বের কাজটুকু দ্বিতীয়বার দেখে গ্রন্থাকারে প্রকাশের উপযুক্ত করে তুলতে পারি। একে সৌভাগ্যই বলুন অথবা দুর্ভাগ্যই বলুন ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে হঠাৎ এমন সুযোগ এসে গেল যে, আমাকে জননিরাপত্তা আইনে (Public Safety Act) গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হলো, আর এখানেই আমি সে অবকাশ পেয়ে গেলাম যা এ গ্রন্থকে প্রকাশের উপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিল। আমি আল্লাহর দরবারে দোয়া করি যেন আমার শ্রমের উদ্দেশ্য সফল হয় এবং আল্লাহর বান্দাদের কুরআন বুঝায় এ গ্রন্থ সহায়ক প্রমাণিত হয়।

وما توفيقى الا بالله العلى العظيم

আবুল আ'লা

নিউ সেন্ট্রাল জেল, মুলতান
১৭ যিলকদ ১৩৬৮ হিঃ
(১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ খৃ.)

ভূমিকা

শিরোনামে 'ভূমিকা' শব্দটি দেখে আমি কুরআন মজীদের ভূমিকা লিখতে বসে গেছি বলে ভুল ধারণা করার কোন কারণ নেই। এটা কুরআনের নয় বরং তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা। দু'টি উদ্দেশ্য সামনে রেখে আমি এ ভূমিকা লেখায় হাত দিয়েছি।

এক ঃ কুরআন অধ্যয়নের আগে একজন সাধারণ পাঠককে এমন কিছু কথা ভালোভাবে জেনে নিতে হবে যেগুলো শুরুতেই জেনে নিলে তার পক্ষে কুরআনের বক্তব্য অনুধাবন করা সহজ হয়ে যায়। নয়তো কুরআন অধ্যয়নের মাঝখানে বারবার একথাগুলো তার মনে সন্দেহ সঞ্চার করতে পারে। অনেক সময় শুধুমাত্র এগুলো না বুঝার কারণে মানুষ কুরআনের অন্তরনিহিত অর্থের কেবলমাত্র উপরিভাগে আসতে থাকে বছরের পর বছর ধরে। ভেতরে প্রবেশ করার আর কোন পথই খুঁজে পায় না।

দুই ঃ কুরআন বুঝার চেষ্টা করার সময় মানুষের মনে যে প্রশ্নগুলোর উদয় হয় সর্বপ্রথম সেগুলোর জবাব দিতে হবে। এ ভূমিকায় আমি কেবলমাত্র এমন প্রশ্নের জবাব দেবো যেগুলো প্রথম প্রথম আমার মনে জেগেছিল অথবা পরে আমার সামনে আসে।

কুরআন পাঠকের সংকট

সাধারণত আমরা যেসব বই পড়ে থাকি তাতে থাকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু। একটি বিশেষ রচনাশৈলীর আওতায় এ বিষয়বস্তুর ওপর ধারাবাহিকভাবে তথ্য সরবরাহ করা হয় এবং বিভিন্ন মতামত ও যুক্তির অবতারণা করা হয়। এ জন্য কুরআনের সাথে এখনো পরিচয় হয়নি এমন কোন ব্যক্তি যখন প্রথমবার এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতে যান তখন তিনি একটি চিরাচরিত আশা নিয়েই এগিয়ে যান। তিনি মনে করেন, সাধারণ গ্রন্থের মতো এ গ্রন্থেও প্রথম বিষয়বস্তু নির্ধারিত থাকবে, তারপর মূল আলোচ্য বিষয়কে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে বিন্যাসের ক্রমানুসারে এক একটি বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হবে। এভাবে জীবনের এক একটি বিভাগকে আলাদা আলাদাভাবে নিয়ে সে সম্পর্কে পূর্বোক্ত বিন্যাসের ক্রমানুসারে বিধান ও নির্দেশাবলী লিপিবদ্ধ থাকবে। কিন্তু গ্রন্থটি খুলে পড়া শুরু করার পর তিনি দেখেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক চিত্র। তিনি এখানে দেখেন এমন একটি বর্ণনাভংগী যার সাথে ইতিপূর্বে তার কোন পরিচয় ছিল না। এখানে তিনি দেখেন আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কিত বিষয়াবলী, নৈতিক বিধি-নির্দেশ, শরীয়াতের বিধান, দাওয়াত, উপদেশ, সতর্কবাণী, সমালোচনা-পর্যালোচনা, নিন্দা-তিরস্কার, ভীতি প্রদর্শন, সুসংবাদ, সান্ত্বনা, যুক্তি-প্রমাণ, সাক্ষ এবং ঐতিহাসিক কাহিনী ও প্রাচীন প্রত্নতাত্বিক নিদর্শনের প্রতি ইংগিত। এগুলো বার বার একের পর এক আসছে। একই বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন শব্দের মোড়কে পুনর্ব্যক্ত করা হচ্ছে। একটি বিষয়বস্তুর পর আর একটি এবং তারপর আকাঙ্খিতভাবে তৃতীয় আর একটি বিষয়বস্তু শুরু হয়ে যাচ্ছে। বরং

কখনো কখনো একটি বিষয়বস্তুর মাঝখানে দ্বিতীয় একটি বিষয়বস্তু অকস্মাৎ লাফিয়ে পড়ছে। বাক্যের প্রথম পুরুষ ও দ্বিতীয় পুরুষের দিক পরিবর্তন হচ্ছে বার বার এবং বক্তব্য বার বার মোড় পরিবর্তন করছে। বিষয়বস্তুগুলোকে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করার কোনো চিহ্নও কোথাও নেই। ইতিহাস লেখার পদ্ধতিতে কোথাও ইতিহাস লেখা হয়নি। দর্শন ও অতিপ্রাকৃতিক বিষয়াবলীকে ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনের ভাষায় লেখা হয়নি। মানুষ ও বিশ্ব-জাহানের বস্তু ও পদার্থের আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু জীববিদ্যা ও পদার্থ বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে করা হয়নি। সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু তাতে সমাজ বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। আইনগত বিধান ও আইনের মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে আইনবিদদের পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে। নৈতিকতার যে শিক্ষা বিবৃত হয়েছে তার বর্ণনাভংগী নৈতিক দর্শন সম্পর্কিত বইপত্রে আলোচিত বর্ণনাভংগী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। সাধারণভাবে বইপত্রে যেভাবে লেখা হয় এসব কিছুই তার বিপরীত। এ দৃশ্য একজন পাঠককে বিব্রত করে। তিনি মনে করতে থাকেন, এটি একটি অবিন্যস্ত, অসংলগ্ন ও বিক্ষিপ্ত বক্তব্যের সমষ্টি। এখানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অসংখ্য 'খণ্ড রচনা' একত্রে সংযুক্ত করা হয়েছে। তবে এগুলোকে ধারাবাহিক রচনা আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বিরোধিতার দৃষ্টিতে কুরআন অধ্যয়নকারীরা এরি ওপর রাখেন তাদের সকল আপত্তি, অভিযোগ ও সন্দেহ-সংশয়ের ভিত্। অন্যদিকে অনুকূল দৃষ্টিভংগীর অধিকারীরা কখনো অর্থের দিক থেকে চোখ বন্ধ করে সন্দেহ সংশয় থেকে বাঁচার চেষ্টা করেন। কখনো কখনো তারা এই আপাত অবিন্যস্ত উপস্থাপনার ব্যাখ্যা করে নিজেদের মনকে বুঝাতে সক্ষম হন। কখনো কৃত্রিম পদ্ধতিতে যোগসূত্র অনুসন্ধান করে অদ্ভুত ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হন। আবার কখনো 'খণ্ড রচনার' মতবাদটি গ্রহণ করে নেন, যার ফলে প্রত্যকটি আয়াত তার পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে আলাদা হয়ে বক্তার উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী অর্থ প্রকাশ করতে থাকে।

আবার একটি বইকে ভালোভাবে বুঝতে হলে পাঠককে জানতে হবে তার বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য-লক্ষ, মূল বক্তব্য ও দাবী এবং তার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। সেই সাথে তার বর্ণনা পদ্ধতির সাথেও পরিচিত হতে হবে। তার পরিভাষা ও বিশেষ বিশ্লেষণ রীতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। শব্দের উপরি কাঠামোর পেছনে তার বর্ণনাগুলো যেসব অবস্থা ও বিষয়াবলীর সাথে সম্পর্কিত সেগুলোও চোখের সামনে থাকতে হবে। সাধারণত যেসব বই আমরা পড়ে থাকি তার মধ্যে এগুলো সহজেই পাওয়া যায়। কাজেই তাদের বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করা আমাদের জন্য মোটেই কঠিন হয় না। কিন্তু অন্যান্য বইতে আমরা এগুলো যেভাবে পেতে অভ্যস্ত কুরআনে ঠিক সেভাবে পাওয়া যায় না। তাই একজন সাধারণ বই পাঠকের মানসিকতা নিয়ে যখন আমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করতে থাকেন তখন তিনি খুঁজে পান না এই কিতাবের বিষয়বস্তু, মূল বক্তব্য ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। এর বর্ণনা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিও তার কাছে নতুন ও অপরিচিত মনে হয়। অধিকাংশ জায়গায় এর বাক্য ও বক্তব্যগুলোর পটভূমিও তার চোখের আড়ালে থাকে। ফলে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন আয়াতের মধ্যে জ্ঞানের যে উজ্জ্বল মুক্তোমালা জড়িয়ে রয়েছে তা থেকে কম বেশী কিছুটা লাভবান হওয়া সত্ত্বেও পাঠক আল্লাহর কালামের যথার্থ অন্তরনিহিত প্রাণসত্তার সন্ধান পায় না। এ ক্ষেত্রে কিতাবের জ্ঞান লাভ

করার পরিবর্তে তাকে নিছক কিতাবের কতিপয় বিক্ষিপ্ত তত্ত্ব ও উপদেশাবলী লাভ করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। বরং কুরআন অধ্যয়নের পর যেসব লোকের মনে নানা কারণে সন্দেহ জাগে তাদের অধিকাংশের বিভ্রান্তির একটি কারণ হচ্ছে এই যে, কুরআনের বক্তব্য অনুধাবন করার ব্যাপারে এই মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো তাদের জানা থাকে না। এরপরও কুরআন পড়তে গিয়ে তারা দেখে তার পাতায় পাতায় বিভিন্ন বিষয়বস্তু ছড়িয়ে আছে। বহু আয়াতের গভীর অর্থ তাদের কাছে অনুদ্‌ঘাটিত থেকে গেছে। অনেকগুলো আয়াতের মধ্যে তারা জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেয়েছে কিন্তু আয়াতের পূর্বাপর আলোচনার প্রেক্ষিতে এই বক্তব্য তাদের কাছে সম্পূর্ণ বেমানান মনে হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও বর্ণনাভংগীর সাথে অপরিচিত থাকার কারণে আয়াতের আসল অর্থ থেকে তারা অন্যদিকে সরে গিয়েছে এবং অধিকাংশ স্থানে পটভূমি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে এভাবে তারা মারাত্মক ধরনের বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে।

সংকট উত্তরণের উপায়

কুরআন কোন্ ধরনের কিতাব? এটি কিভাবে অবতীর্ণ হলো? এর সংকলন ও বিন্যাসের পদ্ধতি কি ছিল? এর বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয় কি? কোন্ বক্তব্য ও লক্ষ বিন্দুকে ঘিরে এর সমস্ত আলোচনা আবর্তিত হয়েছে? কোন্ কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর সাথে এর অসংখ্য বিভিন্ন পর্যায়ের বিষয়াবলী সম্পর্কিত? নিজের বক্তব্য উপস্থাপন ও সপ্রমাণ করার জন্য এতে কোন্ ধরনের বর্ণনাধারা ও যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে? এই প্রশ্নগুলোর এবং এই ধরনের আরো কিছু প্রয়োজনীয় প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব যদি পাঠক শুরুতেই পেয়ে যান তাহলে তিনি বহুবিধ আশংকা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। তার জন্য কুরআনের অর্থ অনুধাবন ও তার মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করার পথ প্রশস্ত হয়ে যেতে পারে। যে ব্যক্তি কুরআন মজীদে প্রচলিত গ্রন্থের ন্যায় রচনা বিন্যাসের সন্ধান করেন এবং এর পাতায় তার সাক্ষাত না পেয়ে চতুর্দিকে হাতড়াতে গিয়ে অস্থির হয়ে পড়েন, কুরআন সম্পর্কিত এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর জবাব জানা না থাকাই তার মানসিক অস্থিরতার মূল কারণ। 'ধর্ম সম্পর্কিত' একটি বই পড়তে যাচ্ছেন—এই ধারণা নিয়ে তিনি কুরআন পড়তে শুরু করেন। 'ধর্ম সম্পর্কিত' এবং 'বই' এ দু'টোর ব্যাপারে তার মনে সাধারণত ধর্ম ও বই সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাই বিরাজ করতে থাকে। কিন্তু যখন সেখানে নিজের মানসিক ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি চিত্র তিনি দেখতে পান তখন তাঁর কাছে সেটি সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হতে থাকে। আলোচ্য বিষয়ের মূল কথার নাগাল না পাওয়ার কারণে প্রতিটি বাক্যের মধ্যে তিনি এমনভাবে বিভ্রান্তের মতো ঘোরাফেরা করতে থাকেন যেন মনে হয় তিনি কোন নতুন শহরের গলি পথে পথহারা এক নবাগত পথিক। এই পথ হারার বিভ্রান্তি থেকে তিনি বাঁচতে পারেন যদি তাঁকে পূর্বাহ্নেই একথা বলে দেয়া হয় যে, আপনি যে কিতাবটি পড়তে যাচ্ছেন সেটি বইপত্রের জগতে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অভিনব বই। এটির রচনাপদ্ধতিও স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্টমণ্ডিত। বিষয়বস্তু, বক্তব্য বিষয় ও আলোচনা বিন্যাসের দিক দিয়েও এখানে সম্পূর্ণ অভিনব পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে। কাজেই এতদিন পর্যন্ত নানা ধরনের বইপত্র পড়ে আপনার মনে বই সম্পর্কে যে একটি কাঠামোগত ধারণা গড়ে উঠেছে, এ কিতাবটি বুঝার ব্যাপারে তা আপনার কোন কাজে

লাগবে না। বরং উলটো এ ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। একে বুঝতে হলে নিজের মনের মধ্যে আগে থেকেই যেসব ধারণা ও কল্পনা বাসা বেঁধে আছে সেগুলোকে সরিয়ে দিতে হবে এবং এই কিতাবের অভিনব বৈশিষ্টকে নিজের মনের মধ্যে গেঁথে নিতে হবে।

এ প্রসংগে পাঠককে সর্বপ্রথম মূল কুরআনের সাথে পরিচিত হতে হবে। এর প্রতি তার বিশ্বাস থাকা না থাকার প্রশ্ন এখানে নেই। তবে এ কিতাবকে বুঝতে হলে প্রারম্ভিক সূত্র হিসেবে এ কিতাব নিজে এবং এর উপস্থাপক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মূল বিষয় বিবৃত করেছেন তা গ্রহণ করতে হবে। এ মূল বিষয় নিম্নরূপ ঃ

১. সমগ্র বিশ্ব-জাহানের প্রভু, সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও একচ্ছত্র শাসক সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ এ পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে দান করেছেন জানার, বুঝার ও চিন্তা করার ক্ষমতা। ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার, নির্বাচন, ইচ্ছা ও সংকল্প করার এবং নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করার স্বাধীনতা দান করেছেন। এক কথায় মানুষকে এক ধরনের স্বাধীনতা (Autonomy) দান করে তাকে দুনিয়ায় নিজের খলীফা বা প্রতিনিধি পদে অভিষিক্ত করেছেন।

২. মানুষকে এই পদে নিযুক্ত করার সময় বিশ্ব-জাহানের প্রভু সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষের মনে একথা দৃঢ় বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন ঃ আমিই তোমাদের এবং সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির একমাত্র মালিক, মাবুদ ও প্রভু। আমার এই সাম্রাজ্যে তোমরা স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী নও, কারোর অধীনও নও এবং আমার ছাড়া আর কারোর তোমাদের বন্দেগী, পূজা ও আনুগত্য লাভের অধিকারও নেই। দুনিয়ার এই জীবনে তোমাদেরকে কিছু স্বাধীন ক্ষমতা ইখতিয়ার দিয়ে পাঠানো হয়েছে। এটি আসলে তোমাদের জন্য পরীক্ষাকাল। এই পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে তোমাদের আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তোমাদের কাজগুলো যাঁচাই বাছাই করে আমি সিদ্ধান্ত নেবো তোমাদের মধ্য থেকে কে সফল হলো এবং কে হলো ব্যর্থ। তোমাদের জন্য সঠিক কর্মনীতি একটিই ঃ তোমরা আমাকে মেনে নেবে তোমাদের একমাত্র মাবুদ ও শাসক হিসেবে। আমি তোমাদের জন্য যে বিধান পাঠাবো সেই অনুযায়ী তোমরা দুনিয়ায় কাজ করবে। দুনিয়াকে পরীক্ষাগৃহ মনে করে এই চেতনা সহকারে জীবন যাপন করবে যেন আমার আদালতে শেষ বিচারে সফলকাম হওয়াই তোমাদের জীবনের আসল উদ্দেশ্য। বিপরীত পক্ষে এর থেকে ভিন্নতর প্রত্যেকটি কর্মনীতি তোমাদের জন্য ভুল ও বিভ্রান্তিকর। প্রথম কর্মনীতিটি গ্রহণ করলে (যেটি গ্রহণ করার স্বাধীন ক্ষমতা তোমাদের দেয়া হয়েছে) তোমরা দুনিয়ায় শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা লাভ করবে। তারপর আমার কাছে ফিরে আসলে আমি তোমাদের দান করবো চিরন্তন আরাম ও আনন্দের আবাস জান্নাত। আর দ্বিতীয় কর্মনীতিটি গ্রহণ করলে (যেটি গ্রহণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা তোমাদের দেয়া হয়েছে) তোমাদের দুনিয়ায় বিপর্যয় ও অস্থিরতার মুখোমুখি হতে হবে এবং দুনিয়ার জীবন শেষ করে আখেরাতে প্রবেশকালে সেখানে জাহান্নাম নামক চিরন্তন মর্মজ্বালা দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের গভীর গর্ভে তোমরা নিক্ষিপ্ত হবে।

৩. একথা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়ার পর বিশ্ব-জাহানের মালিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানব জাতিকে পৃথিবীতে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মানব জাতির দুই সদস্য (আদম ও হাওয়া) বিশিষ্ট প্রথম গ্রুপকে তিনি পৃথিবীতে জীবন যাপন করার জন্য বিধান দান করেন। এই বিধান অনুযায়ী তাদের ও তাদের সন্তান সন্ততিদের দুনিয়ার সমস্ত

কাজ-কারবার চালিয়ে যেতে হবে। মানুষের এই প্রাথমিক বংশধররা মূর্খতা, অজ্ঞতা, ও অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্ট হননি। আল্লাহ পৃথিবীতে তাদের জীবনের সূচনা করেন সম্পূর্ণ আলোর মধ্যে। তারা সত্যকে জানতেন। তাদেরকে জীবন বিধান দেয়া হয়েছিল। আল্লাহর আনুগত্য (অর্থাৎ ইসলাম) ছিল তাদের জীবন পদ্ধতি। তাঁরা তাঁদের সন্তানদেরও আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্ (মুসলিম) হিসেবে জীবন যাপন করার কথা শিখিয়ে গেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে শত শত বছরের জীবনাচরণে মানুষ ধীরে ধীরে এই সঠিক জীবন পদ্ধতি (অর্থাৎ দ্বীন) থেকে দূরে সরে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের ভুল কর্মনীতি অবলম্বন করেছে। গাফলতির ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে তারা এক সময় এই সঠিক জীবন পদ্ধতি হারিয়ে ফেলেছে। আবার শয়তানী প্ররোচনায় একে বিকৃতও করেছে। তারা পৃথিবী ও আকাশের মানবিক ও অমানবিক এবং কাল্পনিক ও বস্তুগত বিভিন্ন সত্তাকে আল্লাহর সাথে তাঁর কাজ-কারবারে শরীক করেছে। আল্লাহ প্রদত্ত যথার্থ জ্ঞানের (আল ইল্‌ম) মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কল্পনা, ভাববাদ, মনগড়া মতবাদ ও দর্শনের মিশ্রণ ঘটিয়ে তারা অসংখ্য ধর্মের সৃষ্টি করেছে। তারা আল্লাহর নির্ধারিত ন্যায়নিষ্ঠ ও ভারসাম্যপূর্ণ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক নীতি (শরীয়াত) পরিহার বা বিকৃত করে নিজেদের প্রবৃত্তি, স্বার্থ ও ঝোঁকপ্রবণতা অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য নিজেরাই এমন বিধান তৈরী করেছে যার ফলে আল্লাহর এই যমীন জুলুম-নিপীড়নে ভরে গেছে।

৪. আল্লাহ যদি তাঁর স্রষ্টাসুলভ ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিপথগামী মানুষদেরকে জোরপূর্বক সঠিক কর্মনীতি ও জীবনধারার দিকে ঘুরিয়ে দিতেন তাহলে তা হতো মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত সীমিত স্বাধীনতা দান নীতির পরিপন্থী। আবার এ ধরনের বিদ্রোহ দেখা দেয়ার সাথে সাথেই তিনি যদি মানুষকে ধ্বংস করে দিতেন তাহলে সেটি হতো সমগ্র মানব জাতিকে পৃথিবীতে কাজ করার জন্য তিনি যে সময় ও সুযোগ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার সাথে অসামঞ্জস্যশীল। সৃষ্টির প্রথমদিন থেকে তিনি যে দায়িত্বটি গ্রহণ করেছিলেন সেটি ছিল এই যে, মানুষের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখে কাজের মাঝখানে যেসব সুযোগ-সুবিধে দেয়া হবে তার মধ্য দিয়েই তিনি তাকে পথনির্দেশনা দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। কাজেই নিজের ওপর আরোপিত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি মানব জাতির মধ্য থেকে এমন একদল লোককে ব্যবহার করতে শুরু করেন যাঁরা তাঁর ওপর ঈমান রাখতেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে যেতেন। এঁদেরকে তিনি করেন নিজের প্রতিনিধি। এঁদের কাছে পাঠান নিজের অলংঘনীয় বাণী। যথার্থ সত্য জ্ঞান ও জীবন যাপনের সঠিক বিধান এঁদেরকে দান করে তিনি বনী আদমকে ভুল পথ থেকে এই সহজ সত্য পথের দিকে ফিরে আসার দাওয়াত দেয়ার জন্য এদেরকে নিযুক্ত করেন।

৫. এঁরা ছিলেন আল্লাহর নবী। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে আল্লাহ তাঁর নবী পাঠাতে থাকেন। হাজার হাজার বছর থেকে তাদের আগমনের এ সিলসিলা বা ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। তাঁদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার। তাঁরা সবাই একই দ্বীনের তথা জীবন পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই মানুষকে যে সঠিক কর্মনীতির সাথে পরিচিত করানো হয়েছিল তাঁরা সবাই ছিলেন তারই অনুসারী তাঁরা সবাই ছিলেন একই হেদায়াতের প্রতি অনুগত। অর্থাৎ প্রথম দিন থেকেই মানুষের জন্য নৈতিকতা ও সমাজ-সংস্কৃতির যে চিরন্তন নীতি নির্ধারণ করা হয়েছিল তাঁরা ছিলেন

তারই প্রতি অনুগত। তাঁদের সবার একই মিশন ছিল। অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের বংশধর, গোত্র ও জাতিকে এই দ্বীন ও হেদায়াতের দিকে আহবান জানান। তারপর যারা এ আহবান গ্রহণ করে তাদেরকে সংগঠিত করে এমন একটি উম্মাতে পরিণত করেন যাঁরা নিজেরা হন আল্লাহর আইনের অনুগত এবং দুনিয়ায় আল্লাহর আইনের আনুগত্য কায়েম করার এবং তাঁর আইনের বিরুদ্ধাচরণ প্রবণতা প্রতিরোধ করার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে থাকেন। এই নবীগণ প্রত্যেকেই তাঁদের নিজেদের যুগে অত্যন্ত সুচারুরূপে এ মিশনের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু সবসময় দেখা গেছে মানব গোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ তাঁদের দাওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুতই হয়নি। আর যারা এই দাওয়াত গ্রহণ করে উম্মাতে মুসিলমার অংগীভূত হয় তারাও ধীরে ধীরে নিজেরাই বিকৃতির সাগরে তলিয়ে যেতে থাকে। এমনকি তাদের কোন কোন উম্মাত আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতকে একেবারেই হারিয়ে ফেলে। আবার কেউ কেউ আল্লাহর বাণীর সাথে নিজেদের কথার মিশ্রণ ঘটিয়ে এবং তার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে তার চেহারাই বিকৃত করে দেয়।

৬. সবশেষে বিশ্ব-জাহানের প্রভু সর্বশক্তিমান আল্লাহ আরব দেশে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠান। ইতিপূর্বে বিভিন্ন নবীকে তিনি যে দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপরও সেই একই দায়িত্ব অর্পণ করেন। সাধারণ মানুষের সাথে সাথে পূর্বের নবীদের প্রথভ্রষ্ট উম্মাতদেরকেও তিনি আল্লাহর দীনের দিকে আহবান জানান। সবাইকে সঠিক কর্মনীতি ও সঠিক পথ গ্রহণের দাওয়াত দেন। সবার কাছে নতুন করে আল্লাহর হেদায়াত পৌঁছিয়ে দেয়া এবং এই দাওয়াত ও হেদায়াত গ্রহণকারীদেরকে এমন একটি উম্মাতে পরিণত করাই ছিল তাঁর কাজ যেন একদিকে আল্লাহর হেদায়াতের ওপর নিজেদের জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে এবং অন্যদিকে সমগ্র দুনিয়ার সংশোধন ও সংস্কার সাধনের জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাবে। এই দাওয়াত ও হেদায়াতের কিতাব হচ্ছে এই কুরআন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের ওপর আল্লাহ এই কিতাবটি অবতীর্ণ করেন।

কুরআনের মূল আলোচ্য

কুরআন সম্পর্কিত এই মৌলিক ও প্রাথমিক কথাগুলো জেনে নেয়ার পর পাঠকের জন্য এই কিতাবের বিষয়বস্তু, এর কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় ও লক্ষ্যবিন্দু সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা সহজ হয়ে যায়।

এর বিষয়বস্তু মানুষ। প্রকৃত ও জাজ্বল্যমান সত্যের দৃষ্টিতে মানুষের কল্যাণ কিসে—একথাই কুরআনের মূল বিষয়বস্তু।

এর কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, আপাত দৃষ্টি, আন্দাজ-অনুমান নির্ভরতা অথবা প্রবৃত্তির দাসত্ব করার কারণে মানুষ আল্লাহ, বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা, নিজের অস্তিত্ব ও নিজের পার্থিব জীবন সম্পর্কে যেসব মতবাদ গড়ে তুলেছে এবং ঐ মতবাদগুলোর ভিত্তিতে যে দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি অবলম্বন করেছে যথার্থ জাজ্বল্যমান সত্যের দৃষ্টিতে তা সবই ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ এবং পরিণতির দিক দিয়ে তা মানুষের জন্য ধ্বংসকর। আসল সত্য তাই যা মানুষকে খলীফা হিসেবে নিযুক্ত করার সময় আল্লাহ

নিজেই বলে দিয়েছিলেন। আর এই আসল সত্যের দৃষ্টিতে মানুষের জন্য ইতিপূর্বে সঠিক কর্মনীতি নামে যে দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতির আলোচনা করা হয়েছে তাই সঠিক, নির্ভুল ও শুভ পরিণতির দাবীদার।

এ চূড়ান্ত লক্ষ্য ও বক্তব্য হচ্ছে, মানুষকে সঠিক দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি অবলম্বনের প্রতি আহবান জানানো এবং আল্লাহর হেদায়াতকে দ্ব্যর্থহীনভাবে পেশ করা। মানুষ নিজের গাফলতি ও অসতর্কতার দরুন এগুলো হারিয়ে ফেলেছে এবং তার শয়তানী প্রবৃত্তির কারণে সে এগুলোকে বিভিন্ন সময় বিকৃত করার কাজই করে এসেছে।

এই তিনটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে কুরআন পাঠ করতে থাকলে দেখা যাবে এই কিতাবটি তার সমগ্র পরিসরে কোথাও তার বিষয়বস্তু, কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় এবং মূল লক্ষ্য ও বক্তব্য থেকে এক চুল পরিমাণও সরে পড়েনি। প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত তার বিভিন্ন ধরনের বিষয়াবলী তার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত আছে যেমন একটি মোতির মালার বিভিন্ন রংয়ের ছোট বড় মোতি একটি সূতোর বাঁধনে এক সাথে একত্রে একটি নিবিড় সম্পর্কে গাঁথা থাকে। কুরআনে আলোচনা করা হয় পৃথিবী ও আকাশের গঠনাকৃতির, মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া পদ্ধতি এবং বিশ্ব-জগতের নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণের ও অতীতের বিভিন্ন জাতির ঐতিহাসিকে ঘটনাবলীর। কুরআনে বিভিন্ন জাতির আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করা হয়। অতি প্রাকৃতিক বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা করা হয়। এই সাথে অন্যান্য আরো বহু জিনিসের উল্লেখও করা হয়। কিন্তু মানুষকে পদার্থ বিদ্যা, জীব বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন বা অন্য কোন বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার জন্য কুরআনে এগুলো আলোচনা করা হয়নি। বরং প্রকৃত ও জাজ্বল্যমান সত্য সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা দূর করা, যথার্থ সত্যটি মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া, যথার্থ সত্য বিরোধী কর্মনীতির ভ্রান্তি ও অশুভ পরিণতি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা এবং সত্যের অনুরূপ ও শুভ পরিণতির অধিকারী কর্মনীতির দিকে মানুষকে আহবান করাই এর উদ্দেশ্য। এ কারণেই এতে প্রতিটি বিষয়ের আলোচনা কেবলমাত্র ততটুকুই এবং সেই ভংগিমায় করা হয়েছে যতটুকু এবং যে ভংগিমায় আলোচনা করা তার মূল লক্ষ্যের জন্য প্রয়োজন। প্রয়োজন মতো এসব বিষয়ের আলোচনা করার পর কুরআন সবসময় অপ্রয়োজনীয় বিস্তারিত আলোচনা বাদ দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ের দিকে ফিরে এসেছে। একটি সুগভীর ঐক্য ও একাত্মতা সহকারে তার সমস্ত আলোচনা 'ইসলামী দাওয়াত'-এর কেন্দ্রবিন্দুতে ঘুরছে।

কুরআন নাযিলের পদ্ধতি

কিন্তু কুরআনের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি, বিন্যাস রীতি ও তার বহুতর আলোচ্য বিষয়কে পুরোপুরি হৃদয়ংগম করতে হলে তার অবতরণের রীতি-পদ্ধতি ও অবস্থা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানলাভ করতে হবে।

মহান আল্লাহ এই কুরআনটি একবারে লিখে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে দিয়ে এর বহুল প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে একটি বিশেষ জীবন ধারার দিকে আহবান জানাবার নির্দেশ দেননি। এটি আদৌ তেমন ধরনের কোন কিতাব নয়।

অনুরূপভাবে এই কিতাবে প্রচলিত রচনা পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা করা হয়নি। এ জন্য রচনা বিন্যাসের প্রচলিত পদ্ধতি এবং সাধারণভাবে যে পদ্ধতিতে বই লেখা হয় তা এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। আসলে এটি একটি অভিনব ধরনের কিতাব। মহান আল্লাহ আরব দেশের মক্কা নগরীতে তাঁর এক বান্দাকে নবী করে পাঠালেন। নিজের শহর ও গোত্র (কুরাইশ) থেকে দাওয়াতের সূচনা করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দিলেন। এ কাজ শুরু করার জন্য প্রথম দিকে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় বিধানগুলোই তাঁকে দেয়া হলো। এ বিধানগুলো ছিল প্রধানত তিনটি বিষয়বস্তু সম্বলিত।

এক ঃ নবীকে শিক্ষা দান। এই বিরাট ও মহান দায়িত্ব পালন করার জন্য তিনি নিজেকে কিভাবে তৈরি করবেন এবং কোন্ পদ্ধতিতে কাজ করবেন তা তাঁকে শিখিয়ে দেয়া হলো।

দুই ঃ যথার্থ সত্য সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যাবলী সরবরাহ এবং সত্য সম্পর্কে চারপাশের লোকদের মধ্যে যে ভুল ধারণাগুলো পাওয়া যেতো সংক্ষেপে সেগুলো খণ্ডন। এগুলোর কারণে তারা ভুল কর্মনীতি গ্রহণ করতো।

তিন ঃ সঠিক কর্মনীতির দিকে আহাবান। আল্লাহর বিধানের যেসব মৌলিক চরিত্র নীতির অনুসরণ মানুষের জন্য কল্যাণ ও সৌভাগ্যের বার্তাবহ সেগুলো বিবৃত করা হলো।

ইসলামী দাওয়াতের সূচনা পর্ব

প্রথম দিকের এ বাণীগুলো দাওয়াতের সূচনাকালের পরিপ্রেক্ষিতে কতিপয় ছোট ছোট সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো। এগুলোর ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল, মিষ্টি-মধুর, ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী এবং যে জাতিকে উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে তাদের রুচি অনুযায়ী সর্বোত্তম সাহিত্যরস সমৃদ্ধ। ফলে একথাগুলো মনে গেঁথে যেতো তীরের মতো। ভাষার ঝংকার ও সুর লালিত্যের কারণে এগুলোর দিকে কান নিজে নিজেই অতি দ্রুত আকৃষ্ট হতো। সময়োপযোগী এবং মনের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যশীল হবার কারণে জিহ্বা স্বতস্ফূর্তভাবে এগুলোর পুনরাবৃত্তি করতো। আবার এতে স্থানীয় প্রভাব ছিল অনেক বেশী। বিশ্বজনীন সত্য বর্ণনা করা হলেও সে জন্য যুক্তি, প্রমাণ ও উদাহরণ গ্রহণ করা হতো এমন নিকটতম পরিবেশ থেকে যার সাথে শ্রোতারা ভালোভাবে পরিচিত ছিল। তাদেরই ইতিহাস, ঐতিহ্য, তাদেরই প্রতিদিনের দেখা নিদর্শনসমূহ এবং তাদেরই আকীদাগত, নৈতিক ও সামাজিক ত্রুটিগুলোর ওপর ছিল সমস্ত আলোচনার ভিত্। এভাবে এর প্রভাব গ্রহণ করার জন্য উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল।

ইসলামী দাওয়াতের এ সূচনা পর্বটি প্রায় চার-পাঁচ বছর পর্যন্ত জারী ছিল। এ পর্যায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসলাম প্রচারের তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়।

১. কতিপয় সৎকর্মশীল ব্যক্তি ইসলামী দাওয়াত গ্রহণ করেন। তাঁরা 'মুসলিম উম্মাহ' নামে একটি উম্মত গড়ে তুলতে প্রস্তুত হল।

২. বিপুল সংখ্যক লোক মূর্খতা স্বার্থান্ধতা বা বাপ-দাদার রসম রেওয়াজের প্রতি অন্ধ আসক্তির কারণে এই দাওয়াতের বিরোধিতা করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

৩. মক্কা ও কুরাইশদের সীমানা পেরিয়ে এই নতুন দাওয়াতের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে অপেক্ষাকৃত বিশাল বিস্তৃত এলাকায়।

ইসলামী দাওয়াতের দ্বিতীয় অধ্যায়

এখান থেকে এই দাওয়াতের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়ে যায়। এ পর্যায়ে ইসলামের এই আন্দোলন ও পুরাতন জাহেলিয়াতের মধ্যে একটি কঠিন প্রাণান্তকর সংঘাত সৃষ্টি হয়। আট নয় বছর পর্যন্ত এ সংঘাত চলতে থাকে। কেবল মক্কার ও কুরাইশ গোত্রের লোকেরাই নয় বরং বিস্তীর্ণ আরব ভূ-খণ্ডের অধিকাংশ এলাকার যেসব লোক পুরাতন জাহেলিয়াতকে অপরিবর্তিত রাখতে চাইছিল তারা সবাই বল প্রয়োগ করে এই আন্দোলনটির কণ্ঠরোধ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। একে দাবিয়ে দেয়ার জন্য তারা সব রকমের অস্ত্র ব্যবহার করে। মিথ্যা প্রচারণা চালায়। অভিযোগ, সন্দেহ, সংশয় ও আপত্তি উত্থাপন করে অসংখ্য। সাধারণ মানুষের মনে নানান প্ররোচনার বীজ বপন করে। অপরিচিত লোকেরা যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনতে না পারে সে জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর চালায় বর্বর পাশবিক নির্যাতন। তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কট করে। তাদের ওপর এত বেশী উৎপীড়ন নির্যাতন চালায় যার ফলে তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে অনেক লোক দু'দুবার নিজেদের দেশ ত্যাগ করে আবিসিনিয়ার দিকে হিজরাত করে যেতে বাধ্য হয়, অবশেষে তাদের সবাইকে মদীনার দিকে হিজরাত করতে হয়। কিন্তু এই কঠিন ও ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এ আন্দোলনটি বিস্তার লাভ করতে থাকে। মক্কায় এমন কোন বংশ ও পরিবার ছিল না যার কোন না কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেনি। অধিকাংশ ইসলাম বিরোধী ভাই-ভাইপো, পুত্র-কন্যা, ভগ্নী-ভগ্নীপতি ইসলামী দাওয়াতের কেবল অনুসারীই ছিল না বরং প্রাণ উৎসর্গকারী কর্মীর ভূমিকা পালন করছিল এবং তাদের কলিজার টুকরা সন্তানরাই তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত হবার প্রস্তুতি নিয়েছিল—এটিই ছিল তাদের শত্রুতার তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা ও তিক্ততার কারণ। আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যারা পুরাতন জাহেলিয়াতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এই নবজাত আন্দোলনে যোগদান করছিল, তারা ইতিপূর্বেও তাদের সমাজের সর্বোত্তম লোক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছিল। অতপর এই আন্দোলনে যোগদান করে তারা এতই সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ও পূত চরিত্রের অধিকারী হয়ে উঠেছিল যে, দুনিয়াবাসীর চোখে এই আন্দোলনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য অনুভূত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। যে দাওয়াত এ ধরনের লোকদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে তাদেরকে এহেন উন্নত পর্যায়ের মানবিক গুণ সম্পন্ন করে তুলছিল তার শ্রেষ্ঠত্ব দুনিয়াবাসীর চোখে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠাই ছিল স্বাভাবিক।

এই সুদীর্ঘ ও তীব্র সংঘাতকালীন সময়ে মহান আল্লাহ পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের নবীর ওপর এমনসব আবেগময় ভাষণ অবতীর্ণ করতে থাকেন যার মধ্যে ছিল স্রোতস্বিনীর গতিময়তা, বন্যার প্রচণ্ড শক্তি এবং আগুনের তীক্ষ্ণতা ও তেজময়তার প্রভাব। এই ভাষণগুলোর মাধ্যমে একদিকে ঈমানদারদেরকে জানানো হয়েছে তাদের প্রাথমিক

দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাদের মধ্যে দলীয় চেতনা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদেরকে তাক্ওয়া, উন্নত চারিত্রিক মাহাত্ম্য ও পবিত্র-নিষ্কলুষ স্বভাব-প্রকৃতি ও আচরণবিধি শেখানো হয়েছে। আল্লাহর সত্য দ্বীন প্রচারের পদ্ধতি তাদেরকে জানানো হয়েছে। সাফল্যদানের অংগীকার ও জান্নাত লাভের সুসংবাদ দান করে তাদের হিম্মত ও মনোবল সুদৃঢ় করা হয়েছে। আল্লাহর পথে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, অবিচলতা ও উন্নত মনোবলসহকারে সংগ্রাম-সাধনা চালিয়ে যাবার জন্য তাদেরকে উদ্দীপিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রাণ উৎসর্গীতার এমন বিপুল আবেগ ও উদ্দীপনা যার ফলে তারা সব রকমের বিপদের মোকাবিলা করতে এবং বিরোধিতার উত্তুংগ তুফানের সামনে অটল-অচল পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে যেতে প্রস্তুত হয়েছিল। অন্যদিকে বিরোধিতাকারী, সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত এবং গাফলতির ঘুমে অচেতন জনসমাজকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এমন সব জাতির মর্মান্তিক ও ধ্বংসকর পরিণতির চিত্র তুলে ধরে যাদের ইতিহাসের সাথে তারা পরিচিত ছিল। যেসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের ওপর দিয়ে সফর ব্যাপদেশে দিনরাত তাদের যাওয়া-আসা করতে হতো তাদের ধ্বংসাবশেষগুলো দেখিয়ে তাদেরকে শিক্ষা ও উপদেশ দেয়া হয়েছে। পৃথিবী ও আকাশের উন্মুক্ত পরিসরে দিনরাত যেসব শত শত হাজার হাজার সুস্পষ্ট নিদর্শন তাদের চোখের সামনে বিরাজ করছিল এবং নিজেদের জীবনে যেগুলোর প্রভাব তারা হরহামেশা অনুভব করছিল, সেগুলো থেকে তাদেরকে তাওহীদ ও আখেরাতের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, শিরক ও স্বেচ্ছাচারিতা এবং পরকাল অস্বীকার ও বাপ-দাদাদের ভ্রান্ত পথের অন্ধ অনুসৃতির ভুলগুলো তুলে ধরা হয়েছে এমন সব দ্ব্যর্থহীন যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে যেগুলো সহজে মন-মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করতে পারে। তারপর তাদের প্রত্যেকটি সন্দেহ-সংশয় নিরসন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ জবাব দেয়া হয়েছে। যেসব জটিল মানসিক সমস্যায় তারা নিজেরা ভুগছিল এবং অন্যদের মনেও যেসব সমস্যার আবর্ত সৃষ্টি করতে চাইছিল সেগুলোর কুয়াশা থেকে তাদের মনকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করেছে। এভাবে সবদিক দিয়ে ঘেরাও করে এমন সুকঠিনভাবে জাহেলিয়াতকে পাকড়াও করা হয়েছে যার ফলে বুদ্ধি-চিন্তা ও মননের জগতে তার শ্বাস ফেলার জন্য এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গাও থাকেনি। এই সাথে তাদের ভয় দেখানো হয়েছে আল্লাহর ক্রোধের, কিয়ামতের বিচারের ভয়াবহতার ও জাহান্নামের শাস্তির। অসৎ চরিত্র, ভুল জীবনধারা, জাহেলী রীতিনীতি, সত্যের দুশমনি ও মুসলিম নিপীড়নের জন্য তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে। সভ্যতা, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার যেসব বড় বড় মূলনীতির ভিত্তিতে দুনিয়ায় হামেশা আল্লাহর প্রিয় ও মনোনীত সৎ ও উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্ রচিত হয়ে এসেছে সেগুলো তাদের সামনে পেশ করা হয়েছে।

এ পর্যায়টি বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। প্রতিটি স্তরে দাওয়াত অধিকতর ব্যাপক হতে চলেছে। একদিকে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম এবং অন্যদিকে বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা কঠিন থেকে কঠিনতর হতে চলেছে। বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস ও বিভিন্ন কর্মধারার অধিকারী গোত্র ও দলগুলোর মুখোমুখি হতে হয়েছে। সেই অনুযায়ী আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বাণীসমূহের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র বাড়তে থেকেছে।

এই হচ্ছে কুরআন মজীদে অংকিত মক্কী জীবনের পটভূমি।

দাওয়াতের তৃতীয় অধ্যায়

মক্কায় এই আন্দোলন তের বছর সক্রিয় থাকার পর হঠাৎ সে মদীনায় সন্ধান পেলো একটি কেন্দ্রের। সমগ্র আরব ভূখণ্ড থেকে এক এক করে নিজের সমস্ত অনুসারীদেরকে সেখানে একত্র করে নিজের সমুদয় শক্তিকে একটি কেন্দ্রে একীভূত করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ইসলামের অধিকাংশ অনুসারী হিজরাত করে মদীনা পৌঁছে গেলেন। এভাবে ইসলামী দাওয়াত তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করলো।

এই পর্যায়ে অবস্থার চিত্র সম্পূর্ণ বদলে গেলো। মুসলিম উম্মাহ একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সফল হলো। পুরাতন জাহেলিয়াতের ধারকদের সাথে শুরু হলো সশস্ত্র সংঘাত। আগের নবীদের উম্মাতের (ইহুদী ও নাসারা) সাথেও সংঘাত বাঁধলো। উম্মাতে মুসলিমার আভ্যন্তরীন ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ করলো বিভিন্ন ধরনের মুনাফিক। তাদের সাথেও লড়তে হলো। দশ বছরের কঠিন সংঘর্ষ-সংঘাতের পথ পেরিয়ে এই আন্দোলন সাফল্যের মনযিলে পৌঁছে গেলো। সমগ্র আরব ভূখণ্ডে বিস্তৃত হলো তার আধিপত্য। তার সামনে খুলে গেলো বিশ্বজনীন দাওয়াত ও সংস্কারের দুয়ার। এই পর্যায়টিও কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। প্রত্যেক স্তরে ছিল এই আন্দোলনের বিশিষ্ট প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য বিষয়গুলো। এই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এমন সব ভাষণ ও বক্তব্য অবতীর্ণ হতে থাকলো, যেগুলো কখনো হতো অনলবর্ষী বক্তৃতার মতো, কখনো হাযির হতো সেগুলো রাজকীয় ফরমান ও নির্দেশের চেহারা নিয়ে, আবার কখনো শিক্ষকের শিক্ষাদান ও অধ্যাপনা এবং সংস্কারকের উপদেশ দান ও বুঝাবার প্রচেষ্টা তার মধ্যে ফুটে উঠতো। দল ও রাষ্ট্র এবং সৎ ও সুন্দর নাগরিক জীবন কিভাবে গড়ে তুলতে হবে, জীবনের বিভিন্ন বিভাগগুলো কোন্ নীতি ও শৃংখল-বিধির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, মুনাফিকদের সাথে কোন্ ধরনের ব্যবহার করতে হবে, যিম্মী কাফের, আহ্‌লি কিতাব, যুদ্ধরত শত্রু এবং চুক্তি সূত্রে আবদ্ধ জাতিদের ব্যাপারে কোন্ ধরনের কর্মনীতি অবলম্বন করা হবে এবং সুসংগঠিত ঈমানদারদের এই দলটি দুনিয়ায় আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করার জন্য নিজেকে কিভাবে তৈরি করবে—এসব কথা সেখানে বিবৃত হতো। এই বক্তৃতাগুলোর মাধ্যমে মুসলমানদের শিক্ষা ও তরবিয়ত (ট্রেনিং) দান করা হতো, তাদের দুর্বলতাগুলো দূর করা হতো, আল্লাহর পথে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হতো, জয়-পরাজয়, আরাম-মুসিবত, দুঃখ-আনন্দ, দারিদ্র-সচ্ছলতা, নিরাপত্তা-ভীতি ইত্যাদি সব ধরনের অবস্থায় সেই অবস্থার উপযোগী নৈতিকতার শিক্ষা দেয়া হতো। তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে ইসলামী দাওয়াত ও সংস্কারের কাজ সম্পাদন করার যোগ্যতা সম্পন্ন করে তৈরি করা হতো। অন্যদিকে আহ্‌লে কিতাব, মুনাফিক, মুশরিক ও কাফের ইত্যাদি যারা ঈমানের পরিসরের বাইরে অবস্থান করছিল, তাদের সবাইকে তাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে বুঝাবার, হৃদয়গ্রাহী ভাষায় দাওয়াত দেয়ার, কঠোরভাবে তিরস্কার ও উপদেশ দান করার, আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাবার এবং শিক্ষণীয় অবস্থা ও ঘটনাবলী থেকে উপদেশ

ও শিক্ষাদান করার চেষ্টা করা হতো। এভাবে সত্যকে উপস্থাপন করার ব্যাপারে তাদের সামনে কোনো জড়তা বা অস্পষ্টতা থাকেনি।

এই হচ্ছে কুরআন মজীদের মাদানী সূরাগুলোর প্রেক্ষাপট।

কুরআনের বর্ণনাভংগী

এ বর্ণনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, একটি দাওয়াতের বাণী নিয়ে কুরআন মজীদ নাযিল হওয়া শুরু হয়। দাওয়াতটি শুরু হবার পর থেকে নিয়ে তার পূর্ণতার চূড়ান্ত মনযিলে পৌঁছা পর্যন্ত পূর্ণ তেইশ বছরে তাকে যেসব পর্যায় ও স্তর অতিক্রম করতে হয় তাদের বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে কুরআনের বিভিন্ন অংশ নাযিল হতে থাকে। কাজেই ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করার জন্য যেসব বইপত্র লেখা হয় সেগুলোর মতো রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তু বিন্যস্ত করার কায়দা এখানে অবলম্বিত হয়নি। আবার এই দাওয়াতের ক্রমোন্নতির সাথে সাথে কুরআনের ছোট বড় যে সমস্ত অংশ নাযিল হয় সেগুলোও কোন পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হতো না বরং বক্তৃতা ও বিবৃত্তির আকারে বর্ণনা করা হতো এবং সেভাবে প্রচারও করা হতো। তাই সেগুলোর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে লেখার নয়, বক্তৃতার ভংগীমা। তারপর এই বক্তৃতাও কোন অধ্যাপকের নয় বরং একজন আহবায়কের বক্তৃতার মতো ছিল। মন, মস্তিষ্ক, বুদ্ধি ও আবেগ সবার কাছেই সে আবেদন জানাতো। তাকে সব রকমের মানসিকতার মুখোমুখি হতে হতো। নিজের দাওয়াত ও প্রচার এবং কার্যকর আন্দোলনের ব্যাপারে তাকে অসংখ্য বৈচিত্রপূর্ণ অবস্থায় কাজ করতে হতো। সম্ভাব্য সকল উপায়ে নিজের কথা মনের মধ্যে বসিয়ে দেয়া, চিন্তার জগত বদলে দেয়া, আবেগের সমুদ্রে তরংগ সৃষ্টি করা, বিরোধিতার পাহাড় ভেঙ্গে ফেলা, সহযোগীদের সংশোধন করা ও প্রশিক্ষণ দান এবং তাদের মধ্যে প্রেরণা, উদ্দীপনা ও দৃঢ় সংকল্প সৃষ্টি করা, শত্রুদের বন্ধু ও অস্বীকারকারীদের স্বীকারকারীতে পরিণত করা, বিরোধীদের যুক্তি-প্রমাণ খণ্ডন করা এবং তাদের নৈতিক শক্তি ছিন্নভিন্ন করা—এভাবে তাকে এমন সব কাজ করতে হতো, যা একটি দাওয়াতের ধারক বাহক এবং একটি আন্দোলনের নেতার জন্য অপরিহার্য। এ জন্য মহান আল্লাহ এই কাজ ও দায়িত্ব প্রসঙ্গে তাঁর নবীর ওপর যে সমস্ত ভাষণ নাযিল করেছেন তার ধরন ও প্রকৃতি একটি দাওয়াতের উপযোগীই হয়েছে। সেখানে কলেজের অধ্যাপক সুলভ বক্তৃতাভংগী অনুসন্ধান করা উচিত নয়।

এখান থেকে আর একটি বিষয়ও সহজে বুঝতে পারা যায়। সেটি হচ্ছে, কুরআনে একই বিষয়ের আলোচনা বিভিন্ন স্থানে বারবার কেন এসেছে? একটি দাওয়াত ও একটি বাস্তব-সক্রিয় আন্দোলনের কতগুলো স্বাভাবিক চাহিদা ও দাবী রয়েছে। এই আন্দোলন যে সময় যে পর্যায়ে অবস্থান করে সে সময় সেই পর্যায়ের সাথে সামঞ্জশীল কথাই বলতে হবে। যতক্ষণ দাওয়াত এক পর্যায়ে অবস্থান করে ততক্ষণ পরবর্তী পর্যায়গুলোর প্রসংগ সেখানে উত্থাপিত হতে পারবে না। বরং সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের কথাই বারবার আলোচিত হতে হবে। এতে কয়েক মাস বা কয়েক বছর অতিক্রান্ত হলেও তার পরোয়া করা যাবে না। আবার একই বাক্যের মধ্যে একই ধরনের কথার একই ভংগীমায় পুনরাবৃত্তি চলতে থাকলে তা শুনতে শুনতে কান পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং মনে বিরক্তি সঞ্চার হয়। তাই

প্রতি পর্যায়ে যে কথাগুলো বারবার বলার প্রয়োজন দেখা দেবে সেগুলোকে প্রতি বার নতুন শব্দের মোড়কে, নতুন ভংগীমায় এবং রঙে সাজিয়ে, নতুন কায়দায় মার্জিত ও সুরুচিসম্পন্ন ভাষায় উপস্থাপন করতে হবে যাতে সেগুলো সুখকর ভাবাবেশে মনে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং দাওয়াতের এক একটি মনযিল সুদৃঢ় হতে থাকে। এই সাথে দাওয়াতের ভিত্তি যেসব বিশ্বাস ও মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলোকে প্রথম পদক্ষেপ থেকে নিয়ে শেষ মনযিল পর্যন্ত কোনক্রমেই দৃষ্টির আড়াল করা যাবে না। বরং দাওয়াতের প্রতি পর্যায়ে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি হতে হবে। এ কারণে দেখা যায়, ইসলামী দাওয়াতের এক পর্যায়ে কুরআন মজীদের যতগুলো সূরা নাযিল হয়েছে তার সবগুলোর মধ্যে সাধারণত একই ধরনের বিষয়বস্তু শব্দ ও বর্ণনাভংগীর খোলস পরিবর্তন করে এসেছে। তবে তাওহীদ, আল্লাহর গুণাবলী, আখেরাত, আখেরাতের জবাবদিহি, কিয়ামতে পুরস্কার ও শাস্তি, রিসালাত, কিতাবের ওপর ঈমান, তাকওয়া, সবর, তাওয়াক্কুল এবং এ ধরনের অন্যান্য মৌলিক বিষয়ের আলোচনা সারা কুরআনে সর্বত্র বার বার দেখা যায়। কারণ এই আন্দোলনের কোন পর্যায়ের এই মৌলিক বিষয়গুলো থেকে চোখ বন্ধ করে রাখাকে বরদাশত করা হয়নি। এই মৌলিক চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাগুলো সামান্য দুর্বল হয়ে পড়লে ইসলামের এই আন্দোলন কখনো তার যথার্থ প্রাণশক্তি সহকারে গতিশীল হতে পারতো না।

এহেন বিন্যাসের কারণ

যে ক্রমিকধারায় কুরআন নাযিল হয়েছিল একে গ্রন্থ আকারে বিন্যস্ত ও লিপিবদ্ধ করার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই ধারা অক্ষুণ্ন রাখেননি কেন এ প্রশ্নের জবাব একটু চিন্তা করলে আমাদের এ বর্ণনায়ই পাওয়া যাবে।

ওপরের আলোচনায় আপনারা জেনেছেন, তেইশ বছর ধরে কুরআন নাযিল হয়েছে। যে ক্রমানুসারে ইসলামী দাওয়াতের সূচনা ও অগ্রগতি হয়েছে সেই ক্রমানুসারেই কুরআন নাযিল হতে থেকেছে। এখন সহজেই অনুমান করা যায়, দাওয়াত পূর্ণতা লাভ করার পর কুরআনের নাযিলকৃত অংশগুলোর এমন ধরনের বিন্যাস যা কেবল দাওয়াতের ক্রমোন্নতির সাথে সম্পর্কিত ছিল—কোনক্রমেই সঠিক হতে পারে না। এখন তাদের জন্য দাওয়াত পূর্ণতা লাভের পর সৃষ্ট অবস্থার অধিকতর উপযোগী একটি নতুন ধরনের বিন্যাসের প্রয়োজন ছিল। কারণ শুরুতে সে এমন সব লোককে সর্বপ্রথম দাওয়াত দেয় যারা ছিল ইসলামের সাথে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত। তাই তখন একেবারে গোড়া থেকেই শিক্ষা ও উপদেশ দানের কাজ শুরু হয়। কিন্তু দাওয়াত পরিপূর্ণতা লাভ করার পর তার প্রথম লক্ষ্য হয় এমন সব লোক যারা তার ওপর ঈমান এনে একটি উম্মাতের অন্তরভুক্ত হয়েছে এবং যাদের ওপর এই কাজ জারী রাখার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দাওয়াতকে চিন্তা ও কর্মধারা উভয় দিক দিয়ে পূর্ণতা দান করার পর তাদের হাতে সোপর্দ করেছিলেন। এখন নিশ্চিতরূপে সর্বপ্রথম তাদের নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, নিজেদের জীবন যাপনের জন্য আইন-কানুন এবং পূর্ববর্তী নবীদের উম্মাতদের মধ্যে যে সমস্ত ফিত্না সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে জানার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তারপর ইসলামের সাথে অপরিচিত দুনিয়াবাসীদের কাছে আল্লাহর বিধান পেশ করার জন্য তাদের এগিয়ে যেতে হবে।

তাছাড়া কুরআন মজীদ যে ধরনের কিতাব কোন ব্যক্তি গভীর মনোযোগ সহকারে তা পাঠ করার পর একথা তার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, একই ধরনের বিষয়বস্তুকে এক জায়গায় একত্র করার বিষয়টি কুরআনের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কুরআনের প্রকৃতিই দাবী করে, তার পাঠকের সামনে মাদানী পর্যায়ের কথা মক্কী যুগের শিক্ষার মধ্যে, মক্কী পর্যায়ের কথা মাদানী যুগের বক্তৃতাবলীর মধ্যে এবং প্রাথমিক যুগের আলোচনা শেষ যুগের উপদেশাবলীর মধ্যে এবং শেষ যুগের বিধানসমূহ সূচনাকালের শিক্ষাবলীর পাশাপাশি বার বার আলোচিত হবে। এভাবে ইসলামের পূর্ণ, ব্যাপকতর ও সামগ্রিক চিত্র তার চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে। ইসলামের একটি দিক তার চোখের সামনে থাকবে এবং অন্য দিকটি থাকবে তার চোখের আড়ালে, কখনো এমনটি যেন না হয়।

তারপরও কুরআন যে ক্রমানুসারে নাযিল হয়েছিল যদি সেভাবেই তাকে বিন্যস্ত করা হতো তাহলে পরবর্তীকালে আগত লোকদের জন্য তা কেবল সেই অবস্থায় অর্থপূর্ণ হতে পারতো যখন কুরআনের সাথে সাথে তার নাযিলের ইতিহাস এবং তার এক একটি অংশের নাযিল হওয়ার অবস্থা ও পরিপ্রেক্ষিত লিখে দেয়া হতো। এ অবস্থায় তা পরিশিষ্ট আকারে কুরআনের একটি অপরিহার্য অংশে পরিণত হতো। মহান আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে তাঁর বাণী একত্র করে বিন্যস্ত ও সংরক্ষণ করেছিলেন এটি ছিল তার পরিপন্থী। আল্লাহর কালামকে নির্ভেজাল অবস্থায় অন্য কোন কালাম, বাণী বা কথার মিশ্রণ বা অন্তরভুক্ত ছাড়াই সংক্ষিপ্ত আকারে সংকলিত করাই ছিল আল্লাহর উদ্দেশ্য। এ কালাম পাঠ করবে যুবক, বৃদ্ধ, শিশু, নারী, পুরুষ, নগরবাসী, গ্রামবাসী, শিক্ষিত সুধী, পণ্ডিত, সাধারণ শিক্ষিত নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ। সর্বযুগে, সর্বকালে সকল স্থানে এবং সকল অবস্থায় তারা এ কালাম পড়বে। সর্বস্তরের বুদ্ধি-জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ কমপক্ষে এতটুকু কথা অবিশ্যি জেনে নেবে যে তাদের মহান প্রভু তাদের কাছে কি চান এবং কি চান না। বলা বাহুল্য যদি এই সমগ্র কালামের সাথে একটি সুদীর্ঘ ইতিহাসও জুড়ে দেয়া থাকতো এবং তা পাঠ করাও সবার জন্য অপরিহার্য গণ্য করা হতো তাহলে এ কালামকে সুবিন্যস্ত ও সুসংরক্ষিত করার পেছনে মহান আল্লাহর যে উদ্দেশ্য ছিল তা ব্যর্থ হয়ে যেতো।

আসলে কুরআনের বর্তমান বিন্যাসকে যারা আপত্তিকর মনে করেন তারা এই কিতাবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে কেবল অনবহিতই নন বরং তারা এই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন বলে মনে হয় যে, এ কিতাবটি কেবল মাত্র ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

কুরআনের বর্তমান বিন্যাস সম্পর্কে পাঠকদের আর একটি কথা জেনে নেয়া উচিত। এই বিন্যাস পরবর্তীকালের লোকদের হাতে সাধিত হয়নি। বরং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই কুরআনের আয়াতগুলোকে এভাবে বিন্যস্ত ও সংযোজিত করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর চিরাচরিত নিয়ম ছিল, কোন সূরা নাযিল হলে তিনি তখনই নিজের কোন কাতেবকে (কুরআন লেখক) ডেকে নিতেন এবং সূরার আয়াতগুলো যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করাতেন। এরপর নির্দেশ দিতেন, এ সূরাটি অমুক সূরার পরে বা অমুক সূরার আগে বসাও। অনুরূপভাবে কখনো কুরআনের কিছু অংশ নাযিল হতো। এটাকে একটি স্বতন্ত্র সূরায় পরিণত করার উদ্দেশ্য থাকতো না। সে ক্ষেত্রে তিনি নির্দেশ

দিতেন, একে অমুক সূরার অমুক স্থানে সন্নিবেশ করো। অতপর এই বিন্যাস অনুযায়ী তিনি নিজে নামাযেও পড়তেন। অন্যান্য সময় কুরআন মজীদ তেলাওয়াতও করতেন। এই বিন্যাস অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরাম কুরআন মজীদ কণ্ঠস্থও করতেন। কাজেই কুরআনের বিন্যাস একটি প্রমাণিত ঐতিহাসিক সত্য। যেদিন কুরআন মজীদের নাযিলের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায় সেদিন তার বিন্যাসও সম্পূর্ণ হয়ে যায়। যিনি এটি নাযিল করছিলেন তিনি এটি বিন্যস্তও করেন। যাঁর হৃদয়ের পরদায় এটি নাযিল করেছিলেন তাঁরই হাতে এটি বিন্যস্তও করান। এর মধ্যে অনুপ্রবেশ বা হস্তক্ষেপ করার অধিকার ও ক্ষমতাই কারোর ছিল না।

কুরআন কিভাবে সংকলিত হলো

যেহেতু নামায শুরু থেকেই মুসলমানদের ওপর ফরয ছিল[১] এবং কুরআন পাঠকে নামাযের একটি অপরিহার্য অংশ গণ্য করা হয়েছিল, তাই কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথেই মুসলমানদের মধ্যে কুরআন কণ্ঠস্থ করার প্রক্রিয়াও জারী হয়ে গিয়েছিল। কুরআন যতটুকু নাযিল হয়ে যেতো মুসলমানরা ততটুকু কণ্ঠস্থও করে ফেলতো। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কাতেবদের সাহায্যে খেজুর পাতা, হাঁড় ও পাথর খণ্ডের ওপর কুরআন লেখার যে ব্যবস্থা করেছিলেন কেবলমাত্র তার ওপর কুরআনের হেফাযত নির্ভরশীল ছিল না বরং নাযিল হবার সাথে সাথেই শত শত থেকে হাজার হাজার এবং হাজার হাজার থেকে লাখো লাখো হৃদয়ে তার নকশা আঁকা হয়ে যেতো। এর মধ্যে একটি শব্দেরও হেরফের করার ক্ষমতা কোন শয়তানেরও ছিল না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর আরবদেশে বেশ কিছু লোক 'মুরতাদ' হয়ে গেলো। তাদের দমন করা এবং একদল মুসলমানের ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার প্রবণতা রোধ করার জন্য সাহাবায়ে কেরামকে কয়েকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হতে হলো। এসব যুদ্ধে এমন অনেক সাহাবা শহীদ হয়ে গেলেন যাদের সমগ্র কুরআন কণ্ঠস্থ ছিল। এ ঘটনায় হযরত উমরের (রা) মনে চিন্তা জাগলো, কুরআনের হেফাযতের ব্যাপারে কেবলমাত্র একটি মাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল থাকা সংগত নয়। শুধু দিলের ওপর কুরআনের বাণী অংকিত থাকলে হবে না তাকে কাগজের পাতায়ও সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করতে হবে। তদানীন্তন খলীফা হযরত আবু বকরের (রা) কাছে তিনি বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করলেন। কিছুটা চিন্তা–ভাবনা করার পর তিনিও তাঁর সাথে একমত হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাতেব (সেক্রেটারী) হযরত যায়েদকে (রা) এ কাজে নিযুক্ত করলেন। এ জন্য যে পদ্ধতি নির্ধারণ করা হলো তা হলো এই ঃ একদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব বিচ্ছিন্ন বস্তুর ওপর কুরআন লিখে গেছেন সেগুলো সংগ্রহ করা। অন্যদিকে সাহাবীদের মধ্যে যার যার কাছে কুরআনের

১. উল্লেখ্য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের কয়েক বছর পর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়। কিন্তু সাধারণভাবে নামায ফরয ছিল প্রথম দিন থেকেই। ইসলামের জীবনের এমন একটি মুহূর্তও অতিক্রান্ত হয়নি যখন নামায ফরয হয়নি।

যেসব বিচ্ছিন্ন অংশ লিখিত আছে তাদের কাছ থেকে সেগুলোও সংগ্রহ করা।[১] এই সাথে কুরআনের হাফেযদের থেকেও সাহায্য নেয়া। এই তিনটি মাধ্যমেকে পূর্ণরূপে ব্যবহার করে নির্ভুল হবার ব্যাপারে শতকরা একশ' ভাগ নিশ্চয়তা ও নিশ্চিন্ততা লাভ করার পর কুরআনের এক একটি হরফ, শব্দ ও বাক্য গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কুরআন মজীদের একটি নির্ভুল ও প্রামাণ্য সংকলন তৈরি করে উম্মুল মু'মেনীন হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে রেখে দেয়া হলো। সবাইকে তার অনুলিপি করার অথবা তার সাথে যাচাই করে নিজের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে নেয়ার সাধারণ অনুমতি দেয়া হলো।

একই ভাষা হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশের বিভিন্ন শহর ও জেলার কথ্যভাষার মধ্যে যেমন পার্থক্য দেখা যায় আরবের বিভিন্ন এলাকার ও গোত্রের কথ্যভাষার মধ্যেও তেমনি পার্থক্য ছিল। মক্কার কুরাইশরা যে ভাষায় কথা বলতো কুরআন মজীদ সেই ভাষায় নাযিল হয়। কিন্তু প্রথম দিকে বিভিন্ন এলাকা ও গোত্রের লোকদের তাদের নিজ নিজ উচ্চারণ ও বাকভংগী অনুযায়ী তা পাঠ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কারণ এভাবে পড়ায় অর্থের মধ্যে কোন পার্থক্য হতো না। কেবলমাত্র বাক্য তাদের জন্য একটু কোমল ও মোলায়েম হয়ে যেতো। কিন্তু ধীরে ধীরে ইসলাম বিস্তার লাভ করলো। আরববাসীরা নিজেদের মরুভূমির এলাকা পেরিয়ে দুনিয়ার একটি বিশাল বিস্তীর্ণ অংশ জয় করলো। অন্যান্য দেশের ও জাতির লোকেরা ইসলামের চতুঃসীমার মধ্যে প্রবেশ করতে লাগলো। আরব ও অনারবের ব্যাপকতর মিশ্রণে আরবী ভাষা প্রভাবিত হতে থাকলো। এ সময় আশংকা দেখা দিল, এখনো যদি বিভিন্ন উচ্চারণ ও বাকরীতিতে কুরআন পড়ার অনুমতি অব্যাহত রাখা হয়, তাহলে এর ফলে নানা ধরনের ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। যেমন, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে অপরিচিত পদ্ধতিতে কুরআন পড়তে শুনে সে সেচ্ছাকৃতভাবে কুরআনে বিকৃতি সাধন করছে বলে তার সাথে বিরোধে ও সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। অথবা এই শাব্দিক পার্থক্য ধীরে ধীরে বাস্তব বিকৃতির দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে। অথবা আরব অনারবের মিশ্রণের ফলে যেসব লোকের ভাষা বিকৃত হবে তারা নিজেদের বিকৃত ভাষা অনুযায়ী কুরআনের মধ্যে হস্তক্ষেপ করে তার বাক সৌন্দর্যের বিকৃতি সাধন করবে। এ সমস্ত কারণে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামদের সাথে পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, সমগ্র ইসলামী দুনিয়ায় একমাত্র হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশে লিখিত কুরআন মজীদের নোস্‌খা (অনুলিপিই) চালু করা হবে। এ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত উচ্চারণ ও বাকরীতিতে লিখিত নোস্‌খার প্রকাশ ও পাঠ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে।

১. নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, রসূলের (সা) জীবদ্দশায়ই বিভিন্ন সাহাবী কুরআন বা তার বিভিন্ন অংশ লিখে নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা), হযরত সালেম মাওলা হুযাইফা (রা), হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা), হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) এবং হযরত আবু যায়েদ কায়েস ইবনিস সাকান রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাম পাওয়া যায়।

আজ যে কুরআন মজীদটি আমাদের হাতে আছে সেটি হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) নোস্‌খার অনুলিপি। এই অনুলিপিটি হযরত উসমান (রা) সরকারী ব্যবস্থাপনায় সারা দুনিয়ার দেশে দেশে পাঠিয়েছিলেন। বর্তমানেও দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে কুরআনের সেই প্রামাণ্য নোস্‌খাগুলো পাওয়া যায়। কুরআন মজীদ সঠিকভাবে সংরক্ষিত হবার ব্যাপারে যদি কারোর মনে সামান্যতমও সংশয় থাকে তাহলে মানসিক সংশয় দূর করার জন্য তিনি পশ্চিম আফ্রিকায় গিয়ে সেখানকার কোন বই বিক্রেতার দোকান থেকে এক খণ্ড কুরআন মজীদ কিনে নিতে পারেন। তারপর সেখান থেকে চলে আসতে পারেন ইন্দোনেশিয়ার জাভায়। জাভার কোন হাফেযের মুখে কুরআনের পাঠ শুনে পশ্চিম আফ্রিকা থেকে কেনা তাঁর হাতের নোস্‌খাটির সাথে তা মিলিয়ে দেখতে পারেন। অতপর দুনিয়ার বড় বড় গ্রন্থাগারগুলোয় হযরত উসমানের (রা) আমল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্তকার যতগুলো কুরআনের নোস্‌খা রক্ষিত আছে সবগুলোর সাথে সেটি মিলাতে পারেন। তিনি যদি তার মধ্যে কোন একটি হরফ নোক্‌তার পার্থক্য দেখতে পান তাহলে সারা দুনিয়াকে এই অভিনব আবিষ্কারের খবরটি জানানো তাঁর অবশ্যি কর্তব্য। কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহকারী সন্দেহ করতে পারেন। কিন্তু যে কুরআনটি আমাদের হাতে আছে সেটি সামান্যতম হেরফের ও পরিবর্তন ছাড়াই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যে কুরআনটি নাযিল হয়েছিল এবং যেটি তিনি দুনিয়ার সামনে পেশ করেছিলেন তারই হুবহু অনুলিপি, এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য। এমন অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণ সম্বলিত সত্য দুনিয়ার ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না। এরপরও যদি কেউ এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন তাহলে বলতে হয়, দুনিয়ায় কোন কালে রোমান সাম্রাজ্য বলে কোন সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল এবং মোগল রাজবংশ কোন দিন ভারত শাসন করেছেন অথবা দুনিয়ায় নেপোলিয়ান নামক কোন ব্যক্তি ছিলেন—এ ব্যাপারেও তিনি অবশ্যি সন্দেহ পোষণ করবেন। এ ধরনের ঐতিহাসিক সত্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা জ্ঞানের নয়, বরং অজ্ঞতারই প্রমাণ।

কুরআন অধ্যয়নের পদ্ধতি

কুরআন একটি অসাধারণ গ্রন্থ। দুনিয়ার অসংখ্য মানুষ অসংখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে কুরআনের দিকে এগিয়ে আসে। এদের সবার প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে কোন পরামর্শ দেয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এ বিপুল সংখ্যক অনুসন্ধানীদের মধ্যে যারা একে বুঝতে চান এবং এ কিতাবটি মানুষের জীবন সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের ভূমিকা পালন করে এবং তাকে কিভাবে পথ দেখায় একথা যারা জানতে চান আমি কেবল তাদের ব্যাপারেই আগ্রহী। এ ধরনের লোকদের কুরআন অধ্যয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে আমি এখানে কিছু পরামর্শ দেবো। আর এই সংগে সাধারণত লোকেরা এ ব্যাপারে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় তারও সমাধান করার চেষ্টা করবো।

কোন ব্যক্তি কুরআনের ওপর ঈমান রাখুন আর নাই রাখুন তিনি যদি এই কিতাবকে বুঝতে চান তাহলে সর্বপ্রথম তাঁকে নিজের মন-মস্তিষ্ককে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত চিন্তাধারা ও মতবাদ এবং অনুকূল-প্রতিকূল উদ্দেশ্য ও স্বার্থচিন্তা থেকে যথাসম্ভব মুক্ত করতে হবে।

এ কিতাবটি বুঝার ও হৃদয়ংগম করার নির্ভেজাল ও আন্তরিক উদ্দেশ্য নিয়ে এর অধ্যয়ন শুরু করতে হবে। যারা মনের মধ্যে বিশেষ ধরনের চিন্তাধারা পুষে রেখে এ কিতাবটি পড়েন তারা এর বিভিন্ন ছত্রের মাঝখানে নিজেদের চিন্তাধারাই পড়ে যেতে থাকেন। আসল কুরআনের সামান্য বাতাসটুকুও তাদের গায়ে লাগে না। দুনিয়ার যে কোন বই পড়ার ব্যাপারেও এ ধরনের অধ্যয়ন রীতি ঠিক নয়। আর বিশেষ করে কুরআন তো এই ধরনের পাঠকের জন্য তার অন্তরনিহিত সত্য ও গভীর তাৎপর্যময় অর্থের দুয়ার কখনোই উন্মুক্ত করে না।

তারপর যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে ভাসাভাসা জ্ঞান লাভ করতে চায় তার জন্য সম্ভবত একবার পড়ে নেয়াই যথেষ্ট। কিন্তু যে এর অর্থের গভীরে নামতে চায় তার জন্য তো দু'বার পড়ে নেয়াও যথেষ্ট হতে পারে না। অবশ্যি তাকে বার বার পড়তে হবে। প্রতি বার একটি নতুন ভংগীমায় পড়তে হবে। একজন ছাত্রের মতো পেন্সিল ও নোটবই সাথে নিয়ে বসতে হবে। জায়গা মতো প্রয়োজনীয় বিষয় নোট করতে হবে। এভাবে যারা কুরআন পড়তে প্রস্তুত হবে, কুরআন যে চিন্তা ও কর্মধারা উপস্থাপন করতে চায় তার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাটা যেন তাদের সামনে ভেসে ওঠে কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যেই তাদের অন্ততপক্ষে দু'বার এই কিতাবটি পড়তে হবে। এই প্রাথমিক অধ্যয়নের সময় তাদের কুরআনের সমগ্র বিষয়বস্তুর ওপর ব্যাপকভিত্তিক জ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করতে হবে। তাদের দেখতে হবে, এই কিতাবটি কোন্ কোন্ মৌলিক চিন্তা পেশ করে এবং সেই চিন্তাধারার ওপর কিভাবে জীবন ব্যবস্থার অট্টালিকার ভিত্ গড়ে তোলে, এ সময়–কালে কোন জায়গায় তার মনে যদি কোন প্রশ্ন জাগে বা কোন খট্‌কা লাগে, তাহলে তখনি সেখানেই সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে বরং সেটি নোট করে নিতে হবে এবং ধৈর্য সহকারে সামনের দিকে অধ্যয়ন জারী রাখতে হবে। সামনের দিকে কোথাও না কোথাও তিনি এর জবাব পেয়ে যাবেন, এরি সম্ভাবনা বেশী। জবাব পেয়ে গেলে নিজের প্রশ্নের পাশাপাশি সেটি নোট করে নেবেন। কিন্তু প্রথম অধ্যয়নের পর নিজের কোন প্রশ্নের জবাব না পেলে ধৈর্য সহকারে দ্বিতীয় বার অধ্যয়ন করতে হবে। আমি নিজের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, দ্বিতীয়বার গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করার পর কালেভদ্রে কোন প্রশ্নের জবাব অনুদঘাটিত থেকে গেছে।

এভাবে কুরআন সম্পর্কে একটি ব্যাপক দৃষ্টিভংগী লাভ করার পর এর বিস্তারিত অধ্যয়ন শুরু করতে হবে। এ প্রসংগে পাঠককে অবশ্যি কুরআনের শিক্ষার এক একটি দিক পূর্ণরূপে অনুধাবন করার পর নোট করে নিতে হবে। যেমন মানবতার কোন্ ধরনের আদর্শকে কুরআন পছন্দনীয় গণ্য করেছে অথবা মানবতার কোন্ ধরনের আদর্শ তার কাছে গৃণার্হ ও প্রত্যাখ্যাত—একথা তাকে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। এই বিষয়টিকে ভালোভাবে নিজের মনের মধ্যে গেঁথে নেয়ার জন্য তাকে নিজের নোট বইতে একদিকে লিখতে হবে 'পছন্দনীয় মানুষ' এবং অন্যদিকে লিখতে হবে 'অপছন্দনীয় মানুষ' এবং উভয়ের নীচে তাদের বৈশিষ্ট ও গুণাবলী লিখে যেতে হবে। অথবা যেমন, তাকে জানার চেষ্টা করতে হবে, কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল এবং কোন্ কোন্ জিনিসকে সে মানবতার জন্য ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক গণ্য করে—এ বিষয়টিকেও সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে জানার জন্য আগের পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ নোট বইতে কল্যাণের জন্য অপরিহার্য বিষয়সমূহ এবং ক্ষতির জন্য অনিবার্য

বিষয়সমূহ' এই শিরোনামে দু'টি পাশাপাশি লিখতে হবে। অতপর প্রতিদিন কুরআন অধ্যয়ন করার সময় সংশ্লিষ্ট বিষয় দু'টি সম্পর্কে নোট করে যেতে হবে। এ পদ্ধতিতে আকিদা-বিশ্বাস, চরিত্র-নৈতিকতা, অধিকার, কর্তব্য, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন, দলীয় সংগঠন-শৃংখলা, যুদ্ধ, সন্ধি এবং জীবনের অন্যান্য বিষয়াবলী সম্পর্কে কুরআনের বিধান নোট করতে হবে এবং এর প্রতিটি বিভাগের সামগ্রিক চেহারা কি দাঁড়ায়, তারপর এসবগুলোকে এক সাথে মিলালে কোন্ ধরনের জীবন চিত্র ফুটে ওঠে, তা অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে।

আবার জীবনের বিশেষ কোন সমস্যার ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে হলে এবং সে ব্যাপারে কুরআনের দৃষ্টিভংগী জানতে হলে সেই সমস্যা সম্পর্কিত প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। এই অধ্যয়নের মাধ্যমে তাকে সংশ্লিষ্ট সমস্যার মৌলিক বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে জেনে নিতে হবে। মানুষ আজ পর্যন্ত সে সম্পর্কে কি কি চিন্তা করেছে এবং তাকে কিভাবে অনুধাবন করেছে? কোন্ কোন্ বিষয় এখনো সেখানে সমাধানের অপেক্ষায় আছে? মানুষের চিন্তার গাড়ি কোথায় গিয়ে আটকে গেছে? এই সমাধানযোগ্য সমস্যা ও বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই কুরআন অধ্যয়ন করতে হবে। কোন বিষয় সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিভংগী জানার এটিই সবচেয়ে ভালো ও সুন্দর পথ। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, এভাবে কোন বিষয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কুরআন অধ্যয়ন করতে থাকলে এমন সব আয়াতের মধ্যে নিজের প্রশ্নের জওয়াব পাওয়া যাবে যেগুলো ইতিপূর্বে কয়েকবার পড়া হয়ে থাকলেও এই তত্ত্ব সেখানে লুকিয়ে আছে একথা ঘুণাক্ষরেও মনে জাগেনি।

কুরআনের প্রাণসত্তা অনুধাবন

কিন্তু কুরআন বুঝার এই সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যে কাজ করার বিধান ও নির্দেশ নিয়ে কুরআন এসেছে কার্যত ও বাস্তবে তা না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি কুরআনের প্রাণসত্তার সাথে পুরোপুরি পরিচিত হতে পারে না। এটা নিছক কোন মতবাদ ও চিন্তাধারার বই নয়। কাজেই আরাম কেদারায় বসে বসে এ বইটি পড়লে এর সব কথা বুঝতে পারা যাবার কথা নয়। দুনিয়ায় প্রচলিত ধর্ম চিন্তা অনুযায়ী এটি নিছক একটি ধর্মগ্রন্থও নয়। মাদরাসায় ও খানকাহে বসে এর সমস্ত রহস্য ও গভীর তত্ত্ব উদ্ধার করাও সম্ভব নয়। শুরুতে ভূমিকায় বলা হয়েছে, এটি একটি দাওয়াত ও আন্দোলনের কিতাব। সে এসেই এই নীরব প্রকৃতির সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে নির্জন ও নিঃসংগ জীবন ক্ষেত্র থেকে বের করে এনে আল্লাহ বিরোধী দুনিয়ার মোকাবিলায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তার কণ্ঠে যুগিয়েছে বাতিলের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের ধ্বনি। যুগের কুফরী, ফাসেকী ও ভ্রষ্টতার পতাকাবাহীদের বিরুদ্ধে তাকে প্রচণ্ড সংঘাতে লিপ্ত করেছে। সচ্চরিত্র সম্পন্ন সত্যনিষ্ঠ লোকদেরকে প্রতিটি গৃহাভ্যন্তর থেকে খুঁজে বের করে এনে সত্যের আহবায়কের পতাকাতলে সমবেত করেছে। দেশের প্রতিটি এলাকার ফিতনাবাজ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করে সত্যানুসারীদের সাথে তাদের যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে। এক ব্যক্তির আহবানের মাধ্যমে নিজের কাজ শুরু করে খিলাফতে ইলাহীয়ার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত পূর্ণ তেইশ বছর ধরে এই কিতাবটি এই বিরাট ও মহান ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেছে। হক ও বাতিলের এই

সুদীর্ঘ ও প্রাণান্তকর সংঘর্ষকালে প্রতিটি মনযিল ও প্রতিটি পর্যায়েই সে একদিকে ভাঙ্গার পদ্ধতি শিখিয়েছে এবং অন্যদিকে পেশ করেছে গড়ার নকশা। এখন বলুন, যদি আপনি ইসলাম ও জাহেলিয়াত এবং দীন ও কুফরীর সংগ্রামে অংশগ্রহণই না করেন, যদি এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মনযিল অতিক্রম করার সুযোগই আপনার ভাগ্যে না ঘটে, তাহলে নিছক কুরআনের শব্দগুলো পাঠ করলে তার সমুদয় তত্ত্ব আপনার কেমন করে উদঘাটিত হয়ে যাবে? কুরআনকে পুরোপুরি অনুধাবন করা তখনই সম্ভব হবে যখন আপনি নিজেই কুরআনের দাওয়াত নিয়ে উঠবেন, মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করার কাজ শুরু করবেন এবং এই কিতাব যেভাবে পথ দেখায় সেভাবেই পদক্ষেপ নিতে থাকবেন। একমাত্র তখনই কুরআন নাযিলের সময়কালীন অভিজ্ঞতাগুলো আপনি লাভ করতে সক্ষম হবেন। মক্কা, হাব্‌শা (বর্তমান ইথিয়োপিয়া) ও তায়েফের মনযিলও আপনি দেখবেন। বদর ও ওহোদ থেকে শুরু করে হুনাইন ও তাবুকের মনযিলও আপনার সামনে এসে যাবে। আপনি আবু জেহেল ও আবু লাহাবের মুখোমুখি হবেন। মুনাফিক ও ইহুদিদের সাক্ষাতও পাবেন। ইসলামের প্রথম যুগের উৎসর্গীত প্রাণ মু'মিন থেকে নিয়ে দুর্বল হৃদয়ের মু'মিন পর্যন্ত সবার সাথেই আপনার দেখা হবে। এটা এক ধরনের 'সাধনা'। একে আমি বলি "কুরআনী সাধনা।" এই সাধন পথে ফুটে ওঠে এক অভিনব দৃশ্য। এর যতগুলো মনযিল অতিক্রম করতে থাকবেন তার প্রতিটি মনযিলে কুরআনের কিছু আয়াত ও সূরা আপনা আপনি আপনার সামনে এসে যাবে। তারা আপনাকে বলতে থাকবে—এই মনযিলে তারা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং সেখানে এই বিধানগুলো এনেছিল। সে সময় অভিধান, ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রীয় কিছু তত্ত্ব সাধকের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যেতে পারে কিন্তু কুরআন নিজের প্রাণসত্তাকে তার সামনে উন্মুক্ত করতে কার্পণ্য করবে, এমনটি কখনো হতে পারে না।

আবার এই সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের বিধানসমূহ, তার নৈতিক শিক্ষাবলী, তার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিধি বিধান এবং জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে তার প্রণীত নীতি-নিয়ম ও আইনসমূহ বুঝতে পারবে না যতক্ষণ না সে বাস্তবে নিজের জীবনে এগুলো কার্যকর করে দেখবে। যে ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনে কুরআনের অনুসৃতি নেই সে তাকে বুঝতে পারবে না। আর যে জাতির সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান কুরআন বিবৃত পথ ও কর্মনীতির বিপরীত দিকে চলে তার পক্ষেও এর সাথে পরিচিত হওয়া সম্ভব নয়।

কুরআনী দাওয়াতের বিশ্বজনীনতা

কুরআন সমগ্র বিশ্ব মানবতাকে পথ দেখাবার দাবী নিয়ে এগিয়ে এসেছে, একথা সবাই জানে। কিন্তু কুরআন পড়তে বসেই কোন ব্যক্তি দেখতে পায়, সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার নাযিল হবার সমকালীন আরববাসীদেরকে লক্ষ্য করেই তার বক্তব্য পেশ করেছে। তবে কখনো কখনো মানব জাতি ও সাধারণ মানুষকেও সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে এমন সব কথা বলে যা আরববাসীদের রুচি-অভিরুচি, আরবের পারিপার্শিক পরিবেশ, ইতিহাস ও রীতিনীতির সাথেই সম্পর্কিত। এসব দেখে এক ব্যক্তি চিন্তা করতে থাকে, সমগ্র মানব জাতিকে পথ দেখাবার জন্য যে কিতাবটি অবতীর্ণ হয়েছিল তার মধ্যে

সাময়িক, স্থানীয় ও জাতীয় বিষয়বস্তু ও উপাদান এত বেশী কেন? এ বিষয়টির তাৎপর্য অনুধাবন না করার কারণে অনেকের মনে সন্দেহ জাগে। তারা মনে করেন, সম্ভবত এ কিতাবটি সমকালীন আরববাসীদের সংশোধন ও সংস্কারের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে জোরপূর্বক টানা হেঁচড়া করে তাকে চিরন্তনভাবে সমগ্র মানবজাতির জন্য জীবন বিধান গণ্য করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি নিছক অভিযোগ হিসেবে নয় বরং বাস্তবে কুরআন বুঝার জন্য এ ধরনের অভিযোগ আনেন তাকে আমি একটি পরামর্শ দেবো। প্রথমে কুরআন পড়ার সময় সেই সমস্ত স্থানগুলো একটু দাগিয়ে রাখুন যেখানে কুরআন কেবল মাত্র আরবদের জন্য এবং প্রকৃতপক্ষে স্থান-কাল ও সময় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ এমন আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা বা ভাবধারা অথবা নৈতিক বিধান বা কার্যকর নিয়ম-কানুন উপস্থাপন করেছে। কুরআন একটি বিশেষ স্থানে একটি বিশেষে যুগের লোকদেরকে সম্বোধন করে তাদের মুশরিকী বিশ্বাস ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং তাদেরই আশেপাশের জিনিসগুলোকে ভিত্তি করে তাওহীদের পক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ দাঁড় করায়—নিছক এতটুকু কথার ভিত্তিতে কুরআনের দাওয়াত ও তার আবেদন স্থানীয় ও সাময়িক, একথা বলা যথেষ্ট হবে না। এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে, শিরকের প্রতিবাদে সে যা কিছু বলে তা কি দুনিয়ার অন্যান্য প্রতিটি শিরকের ব্যাপারে ঠিক তেমনিভাবে খাপ খেয়ে যায় না যেমন আরবের মুশরিকদের শিরকের সাথে খাপ খেয়ে গিয়েছিল? সেই একই যুক্তি প্রমাণগুলোকে কি আমরা প্রতিটি যুগের ও প্রতিটি দেশের মুশরিকদের চিন্তার পরিশুদ্ধি করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি না? আর তাওহীদের প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনী প্রমাণ পদ্ধতিকে কি সামান্য রদবদল করে সবসময় ওসব জায়গায় কাজে লাগানো যেতে পারে না? জবাব যদি ইতিবাচক হয়ে থাকে, তাহলে একটি বিশ্বজনীন শিক্ষা কেবল মাত্র একটি বিশেষ কালে একটি বিশেষ জাতিকে সম্বোধন করে দান করা হয়েছিল বলেই তাকে স্থানীয় ও সাময়িক বলার কোন কারণই থাকতে পারে না। দুনিয়ায় এমন কোন দর্শন, জীবন ব্যবস্থা ও চিন্তা দর্শন নেই যার প্রথম থেকে নিয়ে শেষ অবধি সমস্ত কথাই বস্তুনিরপেক্ষ (Abstract) বর্ণনাভংগীতে পেশ করা হয়েছে। বরং কোন একটি বিশেষ অবস্থা বা পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে তার ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। এ ধরনের পূর্ণ বস্তু নিরপেক্ষতা সম্ভব নয়। আর সম্ভব হলেও তা নিছক কাজীর গরুর মতো খাতাপত্রেই থাকবে, গোয়ালে তার নামনিশানাও দেখা যাবে না। কাজেই মানুষের জীবনের সাথে সংযুক্ত হয়ে তার পক্ষে কোন বাস্তব বিধানের রূপ নেয়া কোন দিনই সম্ভব হবে না।

তাছাড়া কোন চিন্তামূলক, নৈতিক, আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্প্রসারিত করতে চাইলে তার জন্য আদৌ এর কোন প্রয়োজন নেই। বরং যথার্থই বলতে হয়, শুরু থেকেই তাকে আন্তর্জাতিক বানাবার চেষ্টা করা তার জন্য কল্যাণকরও নয়। আসলে তার জন্য সঠিক ও বাস্তবসম্মত পন্থা একটিই। এই আন্দোলনটি যেসব চিন্তাধারা, মতবাদ ও মূলনীতির ভিত্তিতে মানুষের জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাকে পূর্ণ শক্তিতে সেই দেশেই পেশ করতে হবে যেখান থেকে তার দাওয়াতের সূচনা হয়েছে। সেই দেশের লোকদের মনে এই দাওয়াতের তাৎপর্য অংকিত করে দিতে হবে, যাদের ভাষা, স্বভাব, প্রকৃতি, অভ্যাস ও আচরণের সাথে আন্দোলনের আহবায়ক নিজে

সুপরিচিত। তারপর তাঁকে নিজের দেশেই ঐ মূলনীতিগুলো বাস্তবায়িত করে তার ভিত্তিতে একটি সফল জীবন ব্যবস্থা পরিচালনার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে আদর্শ স্থাপন করতে হবে। তবেই তো দুনিয়ার অন্যান্য জাতিরা তার প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী স্বতস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসে তাকে অনুধাবন করতে ও নিজের দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হবে। কাজেই কোন চিন্তা ও কর্মব্যবস্থাকে প্রথমে শুধুমাত্র একটি জাতির সামনে পেশ করা হয়েছিল এবং কেবলমাত্র তাদেরকেই বুঝাবার ও নিশ্চিন্ত করার জন্য যুক্তি প্রদর্শনের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা হয়েছিল বলেই তা নিছক একটি জাতীয় দাওয়াত ও আন্দোলন—একথা বলার পেছনে কোন যুক্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে একটি জাতীয় ও একটি আন্তর্জাতিক এবং একটি সাময়িক ও একটি চিরন্তন ব্যবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তার বিশেষত্বগুলোকে নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে ঃ জাতীয় ব্যবস্থা হয় একটি জাতির শ্রেষ্ঠত্ব, আধিপত্য বা তার বিশেষ অধিকারসমূহের দাবীদার। অথবা তার নিজের মধ্যে এমন কিছু নীতি ও মতাদর্শ থাকে যা অন্যান্য জাতির মধ্যে ঠাঁই পেতে পারে না। বিপরীত পক্ষে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সকল মানুষের মর্যাদা হয় সমান, তাদের সমান অধিকার দিতেও সে প্রস্তুত হয় এবং তার নীতিগুলোর মধ্যেও বিশ্বজনীনতার সন্ধান পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে একটি সাময়িক ব্যবস্থা অবশ্যি এমন কিছু নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় যেগুলো কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে তার সমস্ত কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। আর এর বিপরীত পক্ষে একটি চিরন্তন ব্যবস্থার নীতিগুলো সব রকমের পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খেয়ে চলে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো দৃষ্টির সামনে রেখে যদি কোন ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করেন এবং যে বিষয়গুলোর কারণে সত্যি সত্যিই কুরআন উপস্থাপিত ব্যবস্থাকে সাময়িক বা জাতীয় হবার ধারণা পোষণ করা যেতে পারে তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেন, তাহলে তিনি পুরোপুরি ব্যর্থ হবেন, এতে সন্দেহ নেই।

পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান

কুরআন সম্পর্কে একজন সাধারণ পাঠকও শুনেছেন যেমন এটি একটি বিস্তারিত পথনির্দেশনা, জীবন বিধান ও আইন গ্রন্থ। কিন্তু কুরআন পড়ার পর সেখানে সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা ও বিধি-বিধানের সন্ধান সে পায় না। বরং সে দেখে, নামায ও যাকাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফরযও—যার ওপর কুরআন বার বার জোর দিয়েছে, তার জন্যও এখানে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিধান বিস্তারিতভাবে দান করা হয়নি। কাজেই এ কিতাবটি কোন্ অর্থে একটি পথনির্দেশনা ও জীবন বিধান তা বুঝতে মানুষ অক্ষম হয়ে পড়ে। পাঠকের মনে এ সম্পর্কে সন্দেহ জাগে।

সত্যের একটি দিক মানুষের দৃষ্টির সম্পূর্ণ আড়ালে থেকে যাওয়ার কারণেই এ ব্যাপারে যাবতীয় সমস্যা ও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ কেবল এই কিতাবটিই নাযিল করেননি, তিনি এই সাথে একজন পয়গাম্বরও পাঠিয়েছেন। আসল পরিকল্পনাটাই যদি হতো লোকদের হাতে এবং কেবলমাত্র একটি গৃহনির্মাণের নক্শা দিয়ে দেয়া এবং তারপর তারা সেই অনুযায়ী নিজেদের ইমারতটি নিজেরাই বানিয়ে নেবে, তাহলে এ অবস্থায় নিসন্দেহে গৃহনির্মাণ সংক্রান্ত ছোট বড় প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের

বিস্তারিত বিবরণ আমাদের হাতে দিয়ে দিতে হতো। কিন্তু গৃহনির্মাণের নির্দেশের সাথে সাথে যখন একজন ইঞ্জিনিয়ারও সরকারীভাবে নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি ঐ নির্দেশ অনুযায়ী একটি ইমারতও তৈরি করে ফেলেন তখন ইঞ্জিনিয়ার ও তাঁর নির্মিত ইমারতটিকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র নকশার মধ্যে সমগ্র ছোট বড় খুঁটিনাটি বিষয়ের বিস্তারিত চিত্র সন্ধান করা এবং সেখানে তা না পেয়ে নকশাটার বিরুদ্ধে অসম্পূর্ণতার অভিযোগ আনা কোনক্রমেই সঠিক হতে পারে না। কুরআন খুঁটিনাটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত কোন কিতাব নয়। বরং এই কিতাবে মূলনীতি ও মৌলিক বিষয়গুলোই উপস্থাপিত হয়েছে। এর আসল কাজ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার চিন্তাগত ও নৈতিক ভিত্তিগুলোর কেবল পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ সহকারে উপস্থাপনাই নয় বরং এই সংগে বৈজ্ঞানিক যুক্তি–প্রমাণ ও আবেগময় আবেদনের মাধ্যমে এগুলোকে প্রচণ্ড শক্তিশালী ও দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ করা। অন্যদিকে ইসলামী জীবনধারার বাস্তব কাঠামো নির্মাণের ব্যাপারে কুরআন মানুষকে জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত নীতি–নিয়ম ও আইন বিধান দান করে না বরং জীবনের প্রতিটি বিভাগের চৌহদ্দি বাতলে দেয় এবং সুস্পষ্টভাবে এর কয়েকটি কোণে নিশান ফলক গেঁড়ে দেয়। এ থেকে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর গঠন ও নির্মাণ কোন্ পথে হওয়া উচিত, তা জানা যায়। এই নির্দেশনা ও বিধান অনুযায়ী বাস্তবে ইসলামী জীবনধারার কাঠামো তৈরি করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ ছিল। দুনিয়াবাসীদের সামনে কুরআন প্রদত্ত মূলনীতির ভিত্তিতে গঠিত ব্যক্তি চরিত্র এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের বাস্তব আদর্শ উপস্থাপন করার জন্যই তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন।

বৈধ মতপার্থক্য

আর একটি প্রশ্নও এই প্রসংগে সাধারণভাবে লোকদের মনে জাগে। প্রশ্নটি হচ্ছে, একদিকে কুরআন এমন সব লোকের কঠোর নিন্দা করে যারা আল্লাহর কিতাব অবতীর্ণ হবার পরও মতবিরোধ, দলাদলি ও ফেরকাবন্দির পথে পাড়ি জমায় এবং এভাবে নিজেদের দীনকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ও খণ্ডিত করে। অথচ অন্যদিকে কুরআনের বিধানের অর্থ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পরবর্তীকালের আলেমগণই নন, প্রথম যুগের ইমামগণ, তাবেঈন ও সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যেও বিপুল মতবিরোধ পাওয়া যায়। সম্ভবত বিধান সম্বলিত এমন একটি আয়াতও পাওয়া যাবে না যার ব্যাখ্যায় সবাই একমত হয়েছেন। তাহলে কুরআনে উল্লেখিত নিন্দা কি এদের ওপর প্রযোজ্য হবে? যদি এরা ঐ নিন্দার পাত্র না হয়ে থাকেন, তাহলে কুরআন কোন্ ধরনের মতবিরোধ ও দলাদলির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে?

এটি একটি বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ বিষয়। এখানে এ ধরনের আলোচনার সুযোগ নেই। কুরআনের একজন সাধারণ পাঠক ও একজন প্রাথমিক জ্ঞানার্জনকারীর সংশয় দূর করার জন্য এখানে কেবল সামান্য একটু ইংগিত দেয়াই যথেষ্ট মনে করি। দীন ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একমত এবং ইসলামী দলীয় সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ থেকেও নিছক ইসলামী বিধান ও আইনের ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে আন্তরিক মতবিরোধের প্রকাশ ঘটে কুরআন তার বিরোধী নয়। বিপরীত পক্ষে কুরআন এমন ধরনের মতবিরোধের

নিন্দা করে, যার সূচনা হয় স্বার্থন্ধতা ও বক্র দৃষ্টির মাধ্যমে এবং অবশেষে তা দলাদলি ও পারস্পরিক বিরোধে পরিণত হয়। এই দুই ধরনের মতবিরোধ মূলত একই পর্যায়ের নয় এবং ফলাফলের দিক দিয়েও উভয়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। কাজেই একই লাঠি দিয়ে উভয়কে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া এবং উভয়ের বিরুদ্ধে একই হুকুম জারী করা উচিত নয়। প্রথম ধরনের মতবিরোধ উন্নতির প্রাণকেন্দ্র ও মানুষের জীবনে প্রাণস্পন্দন স্বরূপ। বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল লোকদের সমাজে এর অস্তিত্ব পাওয়া যাবেই। এর অস্তিত্বই জীবনের আলামত। যে সমাজে বুদ্ধির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে বরং সেখানে রক্তমাংসের মানুষের পরিবর্তে কাঠের মানুষেরা বিচরণ করছে একমাত্র সেখানেই এর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আর দ্বিতীয় ধরনের মতবিরোধটির ব্যাপারে সারা দুনিয়ার মানুষই জানে, যে দেশে ও যে সমাজে তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তাকেই ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। তার অস্তিত্ব স্বাস্থ্যের নয়, রোগের আলামত। কোন উম্মাতকে সে শুভ পরিণতির দিকে এগিয়ে দিতে পারেনি। এই উভয় ধরনের মতবিরোধের পার্থক্যের চেহারাটি নিম্নোক্তভাবে অনুধাবন করুন ঃ

এক ধরনের মতপার্থক্যে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের ক্ষেত্রে সমগ্র ইসলামী সমাজে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কুরআন ও সুন্নাহকে সর্বসম্মতিক্রমে জীবন বিধানের উৎস হিসেবে মেনে নেয়া হবে। এরপর দু'জন আলেম কোন অমৌলিক তথা খুঁটিনাটি বিষয়ের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে অথবা দু'জন বিচারক কোন মামলার সিদ্ধান্ত দানে পরস্পরের সাথে বিরোধ করবেন, কিন্তু তাদের কেউই এই বিষয়টিকে এবং এর মধ্যে প্রকাশিত নিজের মতামতকে দীনের ভিত্তিতে পরিণত করবেন না। আর এই সাথে তার সংগে মতবিরোধকারীকে দীন থেকে বিচ্যুত ও দীন বহির্ভূত গণ্য করবেন না। বরং উভয়েই নিজেদের যুক্তি ও দলিল-প্রমাণ পেশ করে নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী অনুসন্ধানের হক আদায় করে দেবেন। সাধারণ জনমত, অথবা বিচার বিভাগীয় বিষয় হলে দেশের সর্বোচ্চ আদালত অথবা সামাজিক বিষয় হলে ইসলামী সমাজ সংগঠনই উভয় মতের মধ্য থেকে যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করে নেবে অথবা চাইলে উভয়মতই গ্রহণ করে নেবে—এটা তাদের নির্বাচনের ওপর ছেড়ে দিতে হবে।

দ্বিতীয় ধরনের মতপার্থক্য করা হবে দীনের মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে। অথবা যে বিষয়টিকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল দীনের মৌলিক বিষয় বলে গণ্য করেননি এমন কোন বিষয়ে কোন আলেম, সুফী, মুফতী, নীতি শাস্ত্রবিদ বা নেতা নিজে একটি মত অবলম্বন করবেন এবং অযথা টেনে হেঁচড়ে তাকে দীনের মৌলিক বিষয়ে পরিণত করে দেবেন, তারপর তার অবলম্বিত মতের বিরোধী মত পোষণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দীন ও মিল্লাত বহির্ভূত গণ্য করবেন। এই সংগে নিজের একটি সমর্থক দল বানিয়ে এই মর্মে প্রচারণা চালাতে থাকবেন যে, আসল উম্মাতে মুসলিমা তো এই একটি দলই মাত্র, বাদবাকি সবাই হবে জাহান্নামের ভাগীদার। উচ্চকণ্ঠে তারা বলে যেতে থাকবে ঃ মুসলিম হও যদি এই দলে এসে যাও, অন্যথায় তুমি মুসলিমই নও।

কুরআনের আলোচনায় এই দ্বিতীয় ধরনের মতবিরোধ, দলাদলি ও ফেরকাবন্দির বিরোধিতা করা হয়েছে। আর প্রথম ধরনের মতবিরোধের কতিপয় ঘটনা তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের সামনেই উপস্থাপিত হয়েছিল। তিনি এটিকে

কেবল বৈধই বলেননি বরং এর প্রশংসাও করেছেন। কারণ এ মতবিরোধ প্রমাণ করছিল যে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজে চিন্তা-ভাবনা করার, অনুসন্ধান-গবেষণা চালাবার এবং সঠিকভাবে বুদ্ধি প্রয়োগ করার যোগ্যতা সম্পন্ন লোকের অস্তিত্ব রয়েছে। সমাজের বুদ্ধিমান ও মেধা সম্পন্ন লোকেরা নিজেদের দীন ও তার বিধানের ব্যাপারে আগ্রহী। তাদের বুদ্ধিবৃত্তি দীনের বাইরে নয়, তার চৌহদ্দির মধ্যেই জীবন সমস্যার সমাধান খুঁজতে তৎপর। ইসলামী সমাজ সামগ্রিকভাবে মূলনীতিতে ঐক্যবদ্ধ থেকে নিজের ঐক্য অটুট রেখে এবং নিজের জ্ঞানবান ও চিন্তাশীল লোকদেরকে সঠিক সীমারেখার মধ্যে অনুসন্ধান চালাবার ও ইজতিহাদ করার স্বাধীনতা দান করে উন্নতি ও অগ্রগতির পথ খোলা রাখার স্বর্ণোজ্জ্বল ঐতিহ্যের পতাকাবাহী।

هذا ما عندى ، والعلم عند الله ، عليه توكلت واليه انيب

[আমি যা সত্য মনে করলাম তা এখানে প্রকাশ করলাম। আর আসল সত্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে আছে। আমার সমস্ত নির্ভরতা একমাত্র তাঁরই ওপর এবং তাঁরই কাছে আমাকে ফিরে যেতে হবে।]

□☆□☆□

কুরআন অধ্যয়নকালে একজন পাঠকের মনে যতো রকমের প্রশ্নের উদয় হয় তার সবগুলোর জবাব দেয়ার জন্য আমি এ ভূমিকা ফাঁদিনি। কারণ এ প্রশ্নগুলোর মধ্যে এমন বহু প্রশ্ন রয়েছে যেগুলো কোন না কোন আয়াত বা সূরা পাঠকালে মনে জাগে। সেগুলোর জবাব তাফহীমুল কুরআনের সংশ্লিষ্ট অংশে যথাস্থানেই দেয়া হয়েছে। কাজেই এ ধরনের প্রশ্নগুলো বাদ দিয়ে আমি এখানে কেবলমাত্র এমন সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছি সামগ্রিকভাবে যা সমগ্র কুরআনের সাথে সম্পর্কিত। কাজেই পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ, শুধুমাত্র এই ভূমিকাটুকু পড়েই একে অসম্পূর্ণ হবার ধারণা নিয়ে বসে থাকবেন না। বরং সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ করুন। তারপর দেখুন আপনার মনে এমন কোন প্রশ্ন রয়েছে কি-না যার জবাব পাওয়া যায়নি অথবা জবাব যথেষ্ট বলে আপনার মনে হয়নি। এ ধরনের কোন প্রশ্ন থাকলে গ্রন্থকারকে জানাবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।*

* গ্রন্থকার অবশ্যি ১৯৭৯ সালে ইন্তেকাল করেছেন। কাজেই তাঁর কাছে প্রশ্ন করার আর কোন সুযোগই নেই। তবে আমার মনে হয় এ গ্রন্থ পাঠ করার পর পাঠকদের যদি কোথাও কোন অতৃপ্তি থেকে যায়, তাহলে গ্রন্থকারের বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডারের মধ্যে খুঁজলে তার জবাব পাওয়া যাবে। কারণ ইসলামী আন্দোলনের জন্য গ্রন্থকার যে সাহিত্য ভাণ্ডার সৃষ্টি করে গেছেন তার উৎস এই কুরআন এবং তাফহীমুল কুরআন। জীবনের সূচনা লগ্ন থেকে নিয়ে যেদিন থেকে তিনি কলম হাতে নিয়েছেন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এই কুরআনী দাওয়াতের সম্প্রসারণের কাজই করে গেছেন। কাজেই এ ক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্য ভাণ্ডার তাঁর মূর্তমান প্রতিনিধি।—অনুবাদক

আল ফাতিহা

১

নামকরণ

এ সূরার মূল বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এর এই নামকরণ করা হয়েছে। যার সাহায্যে কোন বিষয়, গ্রন্থ বা জিনিসের উদ্বোধন করা হয় তাকে 'ফাতিহা' বলা হয়। অন্য কথায় বলা যায়, এ শব্দটি ভূমিকা এবং বক্তব্য শুরু করার অর্থ প্রকাশ করে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের একেবারেই প্রথম যুগের সূরা। বরং হাদীসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায়, এটিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিলকৃত প্রথম পূর্ণাংগ সূরা। এর আগে মাত্র বিচ্ছিন্ন কিছু আয়াত নাযিল হয়েছিল। সেগুলো সূরা 'আলাক', সূরা 'মুয্যাম্মিল' ও সূরা 'মুদ্দাস্সির' ইত্যাদিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

বিষয়বস্তু

আসলে এ সূরাটি হচ্ছে একটি দোয়া। যে কোন ব্যক্তি এ গ্রন্থটি পড়তে শুরু করলে আল্লাহ প্রথমে তাকে এ দোয়াটি শিখিয়ে দেন। গ্রন্থের শুরুতে এর স্থান দেয়ার অর্থই হচ্ছে এই যে, যদি যথার্থই এ গ্রন্থ থেকে তুমি লাভবান হতে চাও, তাহলে নিখিল বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহর কাছে দোয়া এবং সাহায্য প্রার্থনা করো।

মানুষের মনে যে বস্তুটির আকাংখা ও চাহিদা থাকে স্বভাবত মানুষ সেটিই চায় এবং সে জন্য দোয়া করে। আবার এমন অবস্থায় সে এই দোয়া করে যখন অনুভব করে যে, যে সত্তার কাছে সে দোয়া করছে তার আকাংখিত বস্তুটি তারই কাছে আছে। কাজেই কুরআনের শুরুতে এই দোয়ার শিক্ষা দিয়ে যেন মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, সত্য পথের সন্ধান লাভের জন্য এ গ্রন্থটি পড়, সত্য অনুসন্ধানের মানসিকতা নিয়ে এর পাতা ওলটাও এবং নিখিল বিশ্ব-জাহানের মালিক ও প্রভু আল্লাহ হচ্ছেন জ্ঞানের একমাত্র উৎস—একথা জেনে নিয়ে একমাত্র তাঁর কাছেই পথনির্দেশনার আর্জি পেশ করেই এ গ্রন্থটি পাঠের সূচনা কর।

এ বিষয়টি অনুধাবন করার পর একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুরআন ও সূরা ফাতিহার মধ্যকার আসল সম্পর্ক কোন বই ও তার ভূমিকার সম্পর্কের পর্যায়ভুক্ত নয়। বরং এ সম্পর্কটি দোয়া ও দোয়ার জবাবের পর্যায়ভুক্ত। সূরা ফাতিহা বান্দার পক্ষ থেকে একটি দোয়া। আর কুরআন তার জবাব আল্লাহর পক্ষ থেকে। বান্দা দোয়া করে, হে মহান প্রভু! আমাকে পথ দেখাও। জবাবে মহান প্রভু এই বলে সমগ্র কুরআন তার সামনে রেখে দেন —এই নাও সেই হিদায়াত ও পথের দিশা যে জন্য তুমি আমার কাছে আবেদন জানিয়েছ।

আয়াত ৭ | সূরা আল ফাতিহা–মক্কী | রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে[১]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤

প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য[২] যিনি নিখিল বিশ্ব–জাহানের রব,[৩] পরম দয়ালু ও করুণাময়,[৪] প্রতিদান দিবসের মালিক।[৫]

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি[৬] এবং একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য চাই।[৭]

১. ইসলাম মানুষকে একটি বিশেষ সভ্যতা ও সংস্কৃতি শিক্ষা দিয়েছে। প্রত্যেকটি কাজ শুরু করার আগে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি রীতি। সচেতনতা ও আন্তরিকতার সাথে এ রীতির অনুসারী হলে অনিবার্যভাবে তিনটি সুফল লাভ করা যাবে। এক ঃ মানুষ অনেক খারাপ কাজ করা থেকে নিষ্কৃতি পাবে। কারণ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা অভ্যাস তাকে প্রত্যেকটি কাজ শুরু করার আগে একথা চিন্তা করতে বাধ্য করবে যে, যথার্থই এ কাজে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার কোন ন্যায়সংগত অধিকার তার আছে কি না? দুই ঃ বৈধ সঠিক ও সৎকাজ শুরু করতে গিয়ে আল্লাহর নাম নেয়ার কারণে মানুষের মনোভাব ও মানসিকতা সঠিক দিকে মোড় নেবে। সে সবসময় সবচেয়ে নির্ভুল বিন্দু থেকে তার কাজ শুরু করবে। তিন ঃ এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সুফল হচ্ছে এই যে, আল্লাহর নামে যখন সে কাজ শুরু করবে তখন আল্লাহর সাহায্য, সমর্থন ও সহায়তা তার সহযোগী হবে। তার প্রচেষ্টায় বরকত হবে। শয়তানের বিপর্যয় ও ধ্বংসকারিতা থেকে তাকে সংরক্ষিত রাখা হবে। বান্দা যখন আল্লাহর দিকে ফেরে তখন আল্লাহও বান্দার দিকে ফেরেন, এটাই আল্লাহর রীতি।

২. ইতিপূর্বে ভূমিকায় বলেছি, সূরা ফাতিহা আসলে একটি দোয়া। তবে যে সত্তার কাছে আমরা প্রার্থনা করতে চাচ্ছি তাঁর প্রশংসা বাণী দিয়ে দোয়া শুরু করা হচ্ছে। এভাবে যেন দোয়া চাওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ দোয়া চাইতে হলে ভদ্র ও শালীন পদ্ধতিতে দোয়া চাইতে হবে। কারো সামনে গিয়ে মুখ খুলেই প্রথমে নিজের প্রয়োজনটা পেশ করে দেয়া কোন সৌজন্য ও ভব্যতার পরিচায়ক নয়। যার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে প্রথমে তার গুণাবলী বর্ণনা করা এবং তার দান, অনুগ্রহ ও মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়াই ভদ্রতার রীতি।

আমরা দু'টি কারণে কারো প্রশংসা করে থাকি। প্রথমত তিনি প্রকৃতিগতভাবে কোন বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণ-বৈশিষ্টের অধিকারী। তাঁর ঐ শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণ-বৈশিষ্ট আমাদের ওপর কি প্রভাব ফেলে সেটা বড় কথা নয়। দ্বিতীয়ত তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহকারী এবং আমরা তাঁর অনুগ্রহের স্বীকৃতির আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়েই তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করি। মহান আল্লাহর প্রশংসা এই উভয় কারণে ও উভয় দিক দিয়েই করতে হয়। আমরা হামেসা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হব, এটি তাঁর অপরিসীম মর্যাদা ও আমাদের প্রতি তাঁর অশেষ অনুগ্রহের দাবী।

আর প্রশংসা আল্লাহর জন্য, কেবল এখানেই কথা শেষ নয় বরং সঠিকভাবে বলা যায়, "প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই" জন্য। একথাটি বলে একটি বিরাট সত্যের ওপর থেকে আবরণ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। আর এটি এমন একটি সত্য যার প্রথম আঘাতেই 'সৃষ্টি পূজা'র মূলে কুঠারাঘাত হয়। দুনিয়ায় যেখানে যে বস্তুর মধ্যে যে আকৃতিতেই কোন সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠত্ব বিরাজিত আছে আল্লাহর সত্তাই মূলত তার উৎস। কোন মানুষ, ফেরেশতা, দেবতা, গ্রহ-নক্ষত্র তথা কোন সৃষ্টির নিজস্ব কোন গুণ-বৈশিষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব নেই। বরং এসবই আল্লাহ প্রদত্ত। কাজেই যদি কেউ এ অধিকার দাবী করেন যে, আমরা তাঁর প্রশংসা কীর্তন করব, তাঁকে পূজা করব, তাঁর অনুগ্রহ স্বীকার করব ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব এবং তাঁর খেদমতগার ও সেবক হব, তাহলে তিনি হবেন সেই শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণ-বৈশিষ্টের স্রষ্টা ঐ শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণ-বৈশিষ্টের অধিকারী মানব-সত্তা নয়।

৩. 'রব' শব্দটিকে আরবী ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহার করা হয়। এক, মালিক ও প্রভু। দুই, অভিভাবক, প্রতিপালনকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সংরক্ষণকারী। তিন, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, শাসনকর্তা পরিচালক ও সংগঠক।

৪. মানুষের দৃষ্টিতে কোন জিনিস খুব বেশী বলে প্রতীয়মান হলে সেজন্য সে এমন শব্দ ব্যবহার করে যার মাধ্যমে আধিক্যের প্রকাশ ঘটে। আর একটি আধিক্যবোধক শব্দ বলার পর যখন সে অনুভব করে যে ঐ শব্দটির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জিনিসটির আধিক্যের প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি তখন সে সেই একই অর্থে আর একটি শব্দ ব্যবহার করে। এভাবে শব্দটির অন্তরনিহিত গুণের আধিক্য প্রকাশের ব্যাপারে যে কমতি রয়েছে বলে সে মনে করছে তা পূরণ করে। আল্লাহর প্রশংসায় 'রহমান' শব্দের পরে আবার 'রহীম' বলার মধ্যেও এই একই নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। আরবী ভাষায় 'রহমান' একটি বিপুল আধিক্যবোধক শব্দ। কিন্তু সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর রহমত ও মেহেরবানী এত বেশী ও ব্যাপক এবং এত সীমাসংখ্যাহীন যে, তা বয়ান করার জন্য সবচেয়ে বেশী ও বড় আধিক্যবোধক শব্দ ব্যবহার করার পরও মন ভরে না। তাই তার আধিক্য প্রকাশের হক আদায় করার জন্য আবার 'রহীম' শব্দটিও বলা হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত এভাবে দেয়া যেতে পারে, যেমন আমরা কোন ব্যক্তির দানশীলতার গুণ বর্ণনা করার জন্য 'দাতা' বলার পরও যখন অতৃপ্তি অনুভব করি তখন এর সাথে 'দানবীর' শব্দটিও লাগিয়ে দেই। রঙের প্রশংসায় 'সাদা' শব্দটি বলার পর আবার 'দুধের মতো সাদা' বলে থাকি।

৫. অর্থাৎ যেদিন মানবজাতির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত বংশধরদেরকে একত্র করে তাদের জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ডের হিসেব নেয়া হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পূর্ণ কর্মফল দেয়া হবে। তিনি সেই দিনের একচ্ছত্র অধিপতি, আল্লাহর প্রশংসায় রহমান ও রহীম শব্দ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ ۝٦ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

তুমি আমাদের সোজা পথ দেখাও,[৮] তাদের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ,[৯] যাদের ওপর গযব পড়েনি এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়নি।[১০]

ব্যবহার করার পর তিনি প্রতিদান দিবসের মালিক একথা বলায় এখান থেকে এ অর্থও প্রকাশিত হয় যে, তিনি নিছক দয়ালু ও করুণাময় নন বরং এই সংগে তিনি ন্যায় বিচারকও। আবার তিনি এমন ন্যায় বিচারক যিনি হবেন শেষ বিচার ও রায় শুনানীর দিনে পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মালিক সেদিন তিনি শাস্তি প্রদান করলে কেউ তাতে বাধা দিতে পারবে না। এবং পুরস্কার দিলেও কেউ ঠেকাতে পারবে না। কাজেই তিনি আমাদের প্রতিপালন করেন ও আমাদের প্রতি করুণা করেন এ জন্য যে আমরা তাঁকে ভালোবাসি শুধু এতটুকুই নয় বরং তিনি ইনসাফ ও ন্যায় বিচার করেন এ জন্য আমরা তাঁকে ভয়ও করি এবং এই অনুভূতিও রাখি যে, আমাদের পরিণামের ভালো মন্দ পুরোপুরি তাঁরই হাতে ন্যস্ত।

৬. ইবাদাত শব্দটিও আরবী ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (১) পূজা ও উপাসনা করা, (২) আনুগত্য ও হুকুম মেনে চলা এবং (৩) বন্দেগী ও দাসত্ব করা। এখানে একই সাথে এই তিনটি অর্থই প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ আমরা তোমার পূজা-উপাসনা করি, তোমার আনুগত্য করি এবং তোমার বন্দেগী ও দাসত্বও করি। আর আমরা তোমার সাথে এ সম্পর্কগুলো রাখি কেবল এখানেই কথা শেষ নয় বরং এ সম্পর্কগুলো আমরা একমাত্র তোমারই সাথে রাখি। এই তিনটি অর্থের মধ্যে কোন একটি অর্থেও অন্য কেউ আমাদের মাবুদ নয়।

৭. অর্থাৎ তোমার সাথে আমাদের সম্পর্ক কেবল ইবাদাতের নয় বরং আমাদের সাহায্য প্রার্থনার সম্পর্কও একমাত্র তোমারই সাথে রয়েছে। আমরা জানি তুমিই সমগ্র বিশ্ব-জাহানের রব। সমস্ত শক্তি তোমারই হাতে কেন্দ্রীভূত। তুমি একাই যাবতীয় নিয়ামত ও অনুগ্রহের অধিকারী। তাই আমাদের অভাব ও প্রয়োজন পূরণের জন্য আমরা একমাত্র তোমারই দুয়ারে ধর্ণা দেই। তোমারই সামনে নিজেদের সুপর্দ করে দেই এবং তোমারই সাহায্যের ওপর নির্ভর করি। এ জন্য আমাদের এই আবেদন নিয়ে আমরা তোমার দুয়ারে হাজির হয়েছি।

৮. অর্থাৎ জীবনের প্রত্যেকটি শাখা প্রশাখায় এবং প্রত্যেকটি বিভাগে, চিন্তা, কর্ম ও আচরণের এমন বিধি-ব্যবস্থা আমাদের শেখাও, যা হবে একেবারেই নির্ভুল, যেখানে ভুল দেখা, ভুল কাজ করা ও অশুভ পরিণামের আশংকা নেই, যে পথে চলে আমরা যথার্থ সাফল্য ও সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারি। কুরআন অধ্যয়নের প্রাক্কালে বান্দা তার প্রভু, মালিক, আল্লাহর কাছে এই আবেদনটি পেশ করে। বান্দা আর্জি পেশ করে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের পথ দেখাও। কল্পিত দর্শনের গোলকধাঁধার মধ্য থেকে যথার্থ সত্যকে

উন্মুক্ত করে আমাদের সামনে তুলে ধর। বিভিন্ন নৈতিক চিন্তা–দর্শনের মধ্য থেকে যথার্থ ও নির্ভুল নৈতিক চিন্তা–দর্শন আমাদের সামনে উপস্থাপিত কর। জীবনের অসংখ্য পথের মধ্য থেকে চিন্তা ও কর্মের সহজ, সরল ও সুস্পষ্ট রাজপথটি আমাদের দেখাও।

৯. মহান আল্লাহর কাছ থেকে আমরা যে সোজা পথটির জ্ঞান লাভ করতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে তার পরিচয়। অর্থাৎ এমন পথ যার ওপর সবসময় তোমার প্রিয়জনেরা চলেছেন। সেই নির্ভুল রাজপথটি অতি প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যে ব্যক্তি ও যে দলটিই তার ওপর চলেছে সে তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছে এবং তোমার দানে তার জীবনপাত্র পরিপূর্ণ হয়েছে।

১০. অর্থাৎ 'অনুগ্রহ' লাভকারী হিসেবে আমরা এমন সব লোককে চিহ্নিত করিনি যারা আপাতদৃষ্টিতে সাময়িকভাবে তোমার পার্থিব অনুগ্রহ লাভ করে থাকে ঠিকই কিন্তু আসলে তারা হয় তোমার গযব ও শাস্তির অধিকারী এবং এভাবে তারা নিজেদের সাফল্য ও সৌভাগ্যের পথ হারিয়ে ফেলে। এ নেতিবাচক ব্যাখ্যায় একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, 'অনুগ্রহ' বলতে আমরা যথার্থ ও স্থায়ী অনুগ্রহ বুঝাচ্ছি, যা আসলে সঠিক পথে চলা ও আল্লাহর সন্তোষ লাভের ফলে অর্জিত হয়। এমন কোন সাময়িক ও লোক দেখানো অনুগ্রহ নয়, যা ইতিপূর্বে ফেরাউন, নমরূদ ও কারূনরা লাভ করেছিল এবং আজো আমাদের চোখের সামনে বড় বড় যালেম, দুষ্কৃতিকারী ও পথভ্রষ্টরা যেগুলো লাভ করে চলেছে।

আল বাকারাহ
২

নামকরণ

বাকারাহ মানে গাভী। এ সূরার এক জায়গায় গাভীর উল্লেখ থাকার কারণে এর এই নামকরণ করা হয়েছে। কুরআন মজীদের প্রত্যেকটি সূরায় এত ব্যাপক বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে যার ফলে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তাদের জন্য কোন পরিপূর্ণ ও সার্বিক অর্থবোধক শিরোনাম উদ্ভাবন করা সম্ভব নয়। শব্দ সম্ভারের দিক দিয়ে আরবী ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলেও মূলত এটি তো মানুষেরই ভাষা আর মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভাষাগুলো খুব বেশী সংকীর্ণ ও সীমিত পরিসর সম্পন্ন। সেখানে এই ধরনের ব্যাপক বিষয়বস্তুর জন্য পরিপূর্ণ অর্থব্যাঞ্জক শিরোনাম তৈরি করার মতো শব্দ বা বাক্যের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কুরআনের অধিকাংশ সূরার জন্য শিরোনামের পরিবর্তে নিছক আলামত ভিত্তিক নাম রেখেছেন। এই সূরার নামকরণ আল বাকারাহ করার অর্থ এ নয় যে, এখানে গাভী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে বরং এর অর্থ কেবল এতটুকু যে, এখানে গাভীর কথা বলা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরার বেশীর ভাগ মদীনায় হিজরাতের পর মাদানী জীবনের একেবারে প্রথম যুগে নাযিল হয়। আর এর কম অংশ পরে নাযিল হয়। বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্যের কারণে এগুলোকে প্রথমোক্ত অংশের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এমনকি সুদ নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত যে আয়াতগুলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে নাযিল হয় সেগুলোও এখানে সংযোজিত করা হয়েছে। যে আয়াতগুলো দিয়ে সূরাটি শেষ করা হয়েছে সেগুলো হিজরাতের আগে মক্কায় নাযিল হয়। কিন্তু বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যের কারণে সেগুলোকেও এ সূরার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

নাযিলের উপলক্ষ

এ সূরাটি বুঝতে হলে প্রথমে এর ঐতিহাসিক পটভূমি ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।

(১) হিজরাতের আগে ইসলামের দাওয়াতের কাজ চলছিল কেবল মক্কায়। এ সময় পর্যন্ত সম্বোধন করা হচ্ছিল কেবলমাত্র আরবের মুশরিকদেরকে। তাদের কাছে ইসলামের বাণী ছিল সম্পূর্ণ নতুন ও অপরিচিত। এখন হিজরাতের পরে ইহুদিরা সামনে এসে গেল। তাদের জনবসতিগুলো ছিল মদীনার সাথে একেবারে লাগানো। তারা তাওহীদ, রিসালাত,

অহী, আখেরাত ও ফেরেশতার স্বীকৃতি দিত। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের নবী মূসা আলাইহিস সালামের ওপর যে শরিয়াতী বিধান নাযিল হয়েছিল তারও স্বীকৃতি দিত। নীতিগতভাবে তারাও সেই দীন ইসলামের অনুসারী ছিল যার শিক্ষা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়ে চলছিলেন। কিন্তু বহু শতাব্দী কালের ক্রমাগত পতন ও অবনতির ফলে তারা আসল দীন থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল।[১] তাদের আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে বহু অনৈসলামী বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তাওরাতে এর কোন ভিত্তি ছিল না। তাদের কর্মজীবনে এমন অসংখ্য রীতি-পদ্ধতির প্রচলন ঘটেছিল যথার্থ দীনের সাথে যেগুলোর কোন সম্পর্ক ছিল না। তাওরাতের মূল বিষয়বস্তুর সাথেও এগুলোর কোন সামঞ্জস্য ছিল না। আল্লাহর কালাম তাওরাতের মধ্যে তারা মানুষের কথা মিশিয়ে দিয়েছিল। শাব্দিক বা অর্থগত দিক দিয়ে আল্লাহর কালাম যতটুকু পরিমাণ সংরক্ষিত ছিল তাকেও তারা নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিকৃত করে দিয়েছিল। দীনের যথার্থ প্রাণবস্তু তাদের মধ্য থেকে অন্তরহিত হয়ে গিয়েছিল। লোক দেখানো ধার্মিকতার নিছক একটা নিষ্প্রাণ খোলসকে তারা বুকের সাথে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। তাদের উলামা, মাশায়েখ, জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও জনগণ—সবার আকীদা-বিশ্বাস এবং নৈতিক ও বাস্তব কর্ম জীবন বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের এই বিকৃতির প্রতি তাদের আসক্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যার ফলে কোন প্রকার সংস্কার সংশোধন গ্রহণের তারা বিরোধী হয়ে উঠেছিল। যখনই কোন আল্লাহর বান্দা তাদেরকে আল্লাহর দীনের সরল-সোজা পথের সন্ধান দিতে আসতেন তখনই তারা তাঁকে নিজেদের সবচেয়ে বড় দুশমন মনে করে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তার সংশোধন প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য উঠে পড়ে লাগতো। শত শত বছর ধরে ক্রমাগতভাবে এই একই ধারার পুনরাবৃত্তি হয়ে চলছিল। এরা ছিল আসলে বিকৃত মুসলিম। দীনের মধ্যে বিকৃতি, দীন বহির্ভূত বিষয়গুলোর দীনের মধ্যে অনুপ্রবেশ, ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি, দলাদলি, বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বাদ দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে মাতামাতি, আল্লাহকে ভুলে যাওয়া ও পার্থিব লোভ-লালসায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ার কারণে তারা পতনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। এমন কি তারা নিজেদের আসল 'মুসলিম' নামও ভুলে গিয়েছিল। নিছক 'ইহুদি' নামের মধ্যেই তারা নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আল্লাহর দীনকে তারা কেবল ইসরাঈল বংশজাতদের পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত উত্তরাধিকারে পরিণত করেছিল। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় পৌঁছার পর ইহুদিদেরকে আসল দীনের দিকে আহবান করার জন্য আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিলেন। সূরা বাকারার ১৫ ও ১৬ রুকূ' এ দাওয়াত সম্বলিত। এ দু'রুকূ'তে যেভাবে ইহুদিদের ইতিহাস এবং তাদের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার সমালোচনা করা হয়েছে এবং যেভাবে তাদের বিকৃত ধর্ম ও নৈতিকতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মোকাবিলায় যথার্থ দীনের মূলনীতিগুলো পাশাপাশি উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে আনুষ্ঠানিক ধার্মিকতার মোকাবিলায় যথার্থ ধার্মিকতা কাকে বলে, সত্য ধর্মের মূলনীতিগুলো কি এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে কোন্ কোন্ জিনিস যথার্থ গুরুত্বের অধিকারী তা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১. এ সময়ের প্রায় ১৯শ' বছর আগে হযরত মূসার (আ) যুগ অতীত হয়েছিল। ইসরাঈলী ইতিহাসের হিসেব মতে হযরত মূসা (আ) খৃ. পূ. ১২৭২ অব্দে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৬১০ খৃষ্টাব্দে নবুওয়াত লাভ করেন।

(২) মদীনায় পৌঁছার পর ইসলামী দাওয়াত একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল। মক্কায় তো কেবল দীনের মূলনীতিগুলোর প্রচার এবং দীনের দাওয়াত গ্রহণকারীদের নৈতিক প্রশিক্ষণ দানের মধ্যেই ইসলামী দাওয়াতের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু হিজরাতের পর যখন আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে চতুর্দিক থেকে মদীনায় এসে জমায়েত হতে থাকলো এবং আনসারদের সহায়তায় একটি ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্ গড়ে উঠলো তখন মহান আল্লাহ সমাজ, সংস্কৃতি, লোকাচার, অর্থনীতি ও আইন সম্পর্কিত মৌলিক বিধান দিতে থাকলেন এবং ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে ঐ নতুন জীবন ব্যবস্থাটি কিভাবে গড়ে তুলতে হবে তারও নির্দেশ দিতে থাকলেন। এ সূরার শেষ ২৩টি রুকূ'তে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ নির্দেশ ও বিধানগুলো বয়ান করা হয়েছে। এর অধিকাংশ শুরুতেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং কিছু পাঠানো হয়েছিল পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজন অনুযায়ী বিক্ষিপ্তভাবে।

(৩) হিজরাতের পর ইসলাম ও কুফরের সংঘাতও একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল। হিজরাতের আগে ইসলামের দাওয়াত কুফরের ঘরের মধ্যেই দেয়া হচ্ছিল। তখন বিভিন্ন গোত্রের যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করতো তারা নিজেদের জায়গায় দীনের প্রচার করতো। এর জবাবে তাদের নির্যাতনের শিকার হতে হতো। কিন্তু হিজরাতের পরে এ বিক্ষিপ্ত মুসলমানরা মদীনায় একত্র হয়ে একটি ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করার পর অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তখন একদিকে ছিল একটি ছোট জনপদ এবং অন্যদিকে সমগ্র আরব ভূখণ্ড তাকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। এখন এ ছোট্ট জামায়াতটির কেবল সাফল্যই নয় বরং তার অস্তিত্ব ও জীবনই নির্ভর করছিল পাঁচটি জিনিসের ওপর। এক, পূর্ণ শক্তিতে ও পরিপূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে নিজের মতবাদের প্রচার করে সর্বাধিক সংখ্যক লোককে নিজের চিন্তা ও আকীদা-বিশ্বাসের অনুসারী করার চেষ্টা করা। দুই, বিরোধীদের বাতিল ও ভ্রান্ত পথের অনুসারী বিষয়টি তাকে এমনভাবে প্রমাণ করতে হবে যেন কোন বুদ্ধি-বিবেকবান ব্যক্তির মনে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সংশয় না থাকে। তিন, গৃহহারা ও সারা দেশের মানুষের শত্রুতা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হবার কারণে অভাব-অনটন, অনাহার-অর্ধাহার এবং সার্বক্ষণিক অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতায় সে ভুগছিল। চতুর্দিক থেকে বিপদ তাকে ঘিরে নিয়েছিল এ অবস্থায় যেন সে ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে পড়ে। পূর্ণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে যেন অবস্থার মোকাবিলা করে এবং নিজের সংকল্পের মধ্যে সামান্যতম দ্বিধা সৃষ্টির সুযোগ না দেয়। চার, তার দাওয়াতকে ব্যর্থকাম করার জন্য যে কোন দিক থেকে যে কোন সশস্ত্র আক্রমণ আসবে পূর্ণ সাহসিকতার সাথে তার মোকাবিলা করার জন্য তাকে প্রস্তুত হতে হবে। বিরোধী পক্ষের সংখ্যা ও তাদের শক্তির আধিক্যের পরোয়া করা চলবে না। পাঁচ, তার মধ্যে এমন সুদৃঢ় হিম্মত সৃষ্টি করতে হবে যার ফলে আরবের লোকেরা ইসলাম যে নতুন ব্যবস্থা কায়েম করতে চায় তাকে আপসে গ্রহণ করতে না চাইলে বল প্রয়োগে জাহেলিয়াতের বাতিল ব্যবস্থাকে মিটিয়ে দিতে সে একটুও ইতস্তত করবে না। এ সূরায় আল্লাহ এ পাঁচটি বিষয়ের প্রাথমিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

(৪) ইসলামী দাওয়াতের এ পর্যায়ে একটি নতুন গোষ্ঠীও আত্মপ্রকাশ শুরু করেছিল। এটি ছিল মুনাফিক গোষ্ঠী। নবী করীমের (সা) মক্কায় অবস্থান কালের শেষের দিকেই

মুনাফিকীর প্রাথমিক আলামতগুলো সুস্পষ্ট হতে শুরু হয়েছিল। তবুও সেখানে কেবল এমন ধরনের মুনাফিক পাওয়া যেতো যারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতো এবং নিজেদের ঈমানের ঘোষণাও দিতো। কিন্তু এ সত্যের খাতিরে নিজেদের স্বার্থ বিকিয়ে দিতে নিজেদের পার্থিব সম্পর্কচ্ছেদ করতে এবং এ সত্য মতবাদটি গ্রহণ করার সাথে সাথেই যে সমস্ত বিপদ-আপদ, যন্ত্রণা-লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন-নির্যাতন নেমে আসতে থাকতো তা মাথা পেতে নিতে তারা প্রস্তুত ছিল না। মদীনায় আসার পর এ ধরনের মুনাফিকদের ছাড়াও আরো কয়েক ধরনের মুনাফিক ইসলামী দলে দেখা যেতে লাগলো। মুনাফিকদের একটি গোষ্ঠী ছিল ইসলামকে চূড়ান্তভাবে অস্বীকারকারী। তারা নিছক ফিত্না সৃষ্টি করার জন্য মুসলমানদের দলে প্রবেশ করতো। মুনাফিকদের দ্বিতীয় গোষ্ঠীটির অবস্থা ছিল এই যে, চতুর্দিক থেকে মুসলিম কর্তৃত্ব ও প্রশাসন দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যাবার কারণে তারা নিজেদের স্বার্থ-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একদিকে নিজেদেরকে মুসলমানদের অন্তরভুক্ত করতো এবং অন্যদিকে ইসলাম বিরোধীদের সাথেও সম্পর্ক রাখতো। এভাবে তারা উভয় দিকের লাভের হিস্সা ঝুলিতে রাখতো এবং উভয় দিকের বিপদের ঝাপ্টা থেকেও সংরক্ষিত থাকতো। তৃতীয় গোষ্ঠীতে এমন ধরনের মুনাফিকদের সমাবেশ ঘটেছিল যারা ছিল ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান। ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে তারা পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল না। কিন্তু যেহেতু তাদের গোত্রের বা বংশের বেশির ভাগ লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছিল তাই তারাও মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। মুনাফিকদের চতুর্থ গোষ্ঠীটিতে এমন সব লোকের সমাবেশ ঘটেছিল যারা ইসলামকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিল কিন্তু জাহেলিয়াতের আচার-আচরণ, কুসংস্কার ও বিশ্বাসগুলো ত্যাগ করতে, নৈতিক বাধ্যবাধকতার শৃংখল গলায় পরে নিতে এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা বহন করতে তাদের মন চাইতো না।

সূরা বাকারাহ নাযিলের সময় সবেমাত্র এসব বিভিন্ন ধরনের মুনাফিক গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ শুরু হয়েছিল। তাই মহান আল্লাহ এখানে তাদের প্রতি সংক্ষিপ্ত ইংগিত করেছেন মাত্র। পরবর্তীকালে তাদের চরিত্র ও গতি-প্রকৃতি যতই সুস্পষ্ট হতে থাকলো ততই বিস্তারিতভাবে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন মুনাফিক গোষ্ঠীর প্রকৃতি অনুযায়ী পরবর্তী সূরাগুলোয় তাদের সম্পর্কে আলাদা আলাদাভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

আয়াত ২৮৬ | সূরা আল বাকারাহ–মাদানী | রুকূ' ৪০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

الٓمّٓ ۝١ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٢

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣

আলিফ লাম মীম।[১] এটি আল্লাহর কিতাব, এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।[২] এটি হিদায়াত সেই 'মুত্তাকী'দের[৩] জন্য যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে,[৪] নামায কায়েম করে[৫] এবং যে রিযিক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।[৬]

১. এগুলো বিচ্ছিন্ন হরফ। কুরআন মজীদের কোন কোন সূরার শুরুতে এগুলো দেখা যায়। কুরআন মজীদ নাযিলের যুগে সমকালীন আরবী সাহিত্যে এর ব্যবহার ছিল। বক্তার বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সাধারণত এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। বক্তা ও কবি উভয় গোষ্ঠীই এ পদ্ধতির আশ্রয় নিতেন। বর্তমানে জাহেলী যুগের কবিতার যেসব নমুনা সংরক্ষিত আছে তার মধ্যেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণভাবে ব্যবহারের কারণে এ বিচ্ছিন্ন হরফগুলো কোন ধাঁধা হিসেবে চিহ্নিত হয়নি। এগুলো এমন ছিল না যে, কেবল বক্তাই এগুলোর অর্থ বুঝতো বরং শ্রোতারাও এর অর্থ বুঝতে পারতো। এ কারণে দেখা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন বিরোধীদের একজনও এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানায়নি। তাদের একজনও একথা বলেনি যে, বিভিন্ন সূরার শুরুতে আপনি যে কাটা কাটা হরফগুলো বলে যাচ্ছেন এগুলো কি? এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এগুলোর অর্থ জানতে চেয়েছেন এ মর্মে কোন হাদীসও উদ্ধৃত হতে দেখা যায়নি। পরবর্তীকালে আরবী ভাষায় এ বর্ণনা পদ্ধতি পরিত্যক্ত হতে চলেছে। ফলে কুরআন ব্যাখ্যাকারীদের জন্য এগুলোর অর্থ নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে একথা সুস্পষ্ট যে, কুরআন থেকে হিদায়াত লাভ করা এ শব্দগুলোর অর্থ বুঝার ওপর নির্ভরশীল নয়। অথবা এ হরফগুলোর মানে না বুঝলে কোন ব্যক্তির সরল সোজা পথ লাভের মধ্যে গলদ থেকে যাবে, এমন কোন কথাও নেই। কাজেই একজন সাধারণ পাঠকের জন্য এর অর্থ অনুসন্ধানে ব্যাকুল হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

২. এর একটা সরল অর্থ এভাবে করা যায় "নিসন্দেহে এটা আল্লাহর কিতাব।" কিন্তু এর একটা অর্থ এও হতে পারে যে, এটা এমন একটা কিতাব যাতে সন্দেহের কোন লেশ নেই। দুনিয়ায় যতগুলো গ্রন্থে অতিপ্রাকৃত এবং মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞান বহির্ভূত বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো সবই কল্পনা, ধারণা ও আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে লিখিত হয়েছে। তাই এ গ্রন্থগুলোর লেখকরাও নিজেদের রচনাবলীর নির্ভুলতা সম্পর্কে যতই প্রত্যয় প্রকাশ করুক না কেন তাদের নির্ভুলতা সন্দেহ-মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু এ কুরআন মজীদ এমন একটি গ্রন্থ যা আগাগোড়া নির্ভুল সত্য জ্ঞানে সমৃদ্ধ। এর রচয়িতা হচ্ছেন এমন এক মহান সত্তা যিনি সমস্ত তত্ব ও সত্যের জ্ঞান রাখেন। কাজেই এর মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। মানুষ নিজের অজ্ঞতার কারণে এর মধ্যে সন্দেহ পোষণ করলে সেটা অবশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা এবং সে জন্য এ কিতাব দায়ী নয়।

৩. অর্থাৎ এটি একেবারে একটি হিদায়াত ও পথনির্দেশনার গ্রন্থ। কিন্তু এর থেকে লাভবান হতে চাইলে মানুষের মধ্যে কয়েকটি মৌলিক গুণ থাকতে হবে। এর মধ্যে সর্বপ্রথম যে গুণটির প্রয়োজন সেটি হচ্ছে, তাকে "মুত্তাকী" হতে হবে। ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা তার মধ্যে থাকতে হবে। তার মধ্যে মন্দ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ও ভালোকে গ্রহণ করার আকাংখা এবং এ আকাংখাকে বাস্তবায়িত করার ইচ্ছা থাকতে হবে। তবে যারা দুনিয়ায় পশুর মতো জীবন যাপন করে, নিজেদের কৃতকর্ম সঠিক কি না সে ব্যাপারে কখনো চিন্তা করে না, যেদিকে সবাই চলছে বা যেদিকে প্রবৃত্তি তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে অথবা যেদিকে মন চায় সেদিকে চলতে যারা অভ্যস্ত, তাদের জন্য কুরআন মজীদে কোন পথনির্দেশনা নেই।

৪. কুরআন থেকে লাভবান হবার জন্য এটি হচ্ছে দ্বিতীয় শর্ত। 'গায়েব' বা অদৃশ্য বলতে এমন গভীর সত্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যা মানুষের ইন্দ্রিয়াতীত এবং কখনো সরাসরি সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে না। যেমন আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী, ফেরেশতা, অহী, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি। এ গভীর সত্যগুলোকে না দেখে মেনে নেয়া এবং নবী এগুলোর খবর দিয়েছেন বলে তাঁর খবরের সত্যতার প্রতি আস্থা রেখে এগুলোকে মেনে নেয়াই হচ্ছে 'ঈমান বিল গায়েব' বা অদৃশ্যে বিশ্বাস। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি অনুভব করা যায় না এমন সত্যগুলো মেনে নিতে প্রস্তুত হবে একমাত্র সে-ই কুরআনের হিদায়াত ও পথনির্দেশনা থেকে উপকৃত হতে পারবে। আর যে ব্যক্তি মেনে নেয়ার জন্য দেখার, ঘ্রাণ নেয়ার ও আস্বাদন করার শর্ত আরোপ করে এবং যে ব্যক্তি বলে, আমি এমন কোন জিনিস মেনে নিতে পারি না যা পরিমাণ করা ও ওজন করা যায় না— সে এ কিতাব থেকে হিদায়াত ও পথনির্দেশনা লাভ করতে পারবে না।

৫. এটি হচ্ছে তৃতীয় শর্ত। এর অর্থ হচ্ছে, যারা কেবল মেনে নিয়ে নীরবে বসে থাকবে তারা কুরআন থেকে উপকৃত হতে পারবে না। বরং মেনে নেয়ার পর সংগে সংগেই তার আনুগত্য করা ও তাকে কার্যকর করাই হচ্ছে এ থেকে উপকৃত হবার জন্য একান্ত অপরিহার্য প্রয়োজন। আর বাস্তব আনুগত্যের প্রধান ও স্থায়ী আলামত হচ্ছে নামায। ঈমান আনার পর কয়েক ঘন্টা অতিবাহিত হতে না হতেই মুয়াযযিন নামাযের জন্য আহবান জানায় আর ঈমানের দাবীদার ব্যক্তি বাস্তবে আনুগত্য করতে প্রস্তুত কি না তার ফায়সালা

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٤ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٥

আর যে কিতাব তোমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন) এবং তোমার আগে যেসব কিতাব নাযিল করা হয়েছিল সে সবগুলোর ওপর ঈমান আনে[৭] আর আখেরাতের ওপর একীন রাখে।[৮] এ ধরনের লোকেরা তাদের রবের পক্ষ থেকে সরল সত্য পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারা কল্যাণ লাভের অধিকারী।

তখনই হয়ে যায়। এ মুয়াযযিন আবার প্রতিদিন পাঁচবার আহবান জানাতে থাকে। যখনই এ ব্যক্তি তার আহবানে সাড়া না দেয় তখনই প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, ঈমানের দাবীদার ব্যক্তি এবার আনুগত্য থেকে বের হয়ে এসেছে। কাজেই নামায ত্যাগ করা আসলে আনুগত্য ত্যাগ করারই নামান্তর। বলা বাহুল্য কোন ব্যক্তি যখন কারোর নির্দেশ মেনে চলতে প্রস্তুত থাকে না তখন তাকে নির্দেশ দেয়া আর না দেয়া সমান।

ইকামাতে সালাত বা নামায কায়েম করা একটি ব্যাপক ও পূর্ণ অর্থবোধক পরিভাষা একথাটি অবশ্যি জেনে রাখা প্রয়োজন। এর অর্থ কেবল নিয়মিত নামায পড়া নয় বরং সামষ্টিকভাবে নামাযের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করাও এর অর্থের অন্তরভুক্ত। যদি কোন লোকালয়ে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি নিয়মিতভাবে নামায পড়ে থাকে কিন্তু জামায়াতের সাথে এ ফরযটি আদায় করার ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সেখানে নামায কায়েম আছে, একথা বলা যাবে না।

৬. কুরআনের হিদায়াত লাভ করার জন্য এটি হচ্ছে চতুর্থ শর্ত। সংকীর্ণমনা ও অর্থলোলুপ না হয়ে মানুষকে হতে হবে আল্লাহ ও বান্দার অধিকার আদায়কারী। তার সম্পদে আল্লাহ ও বান্দার যে অধিকার স্বীকৃত হয়েছে তাকে তা আদায় করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যে বিষয়ের ওপর সে ঈমান এনেছে তার জন্য অর্থনৈতিক ত্যাগ স্বীকার করার ব্যাপারে সে কোন রকম ইতস্তত করতে পারবে না।

৭. এটি হচ্ছে পঞ্চম শর্ত। অর্থাৎ আল্লাহ অহীর মাধ্যমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের ওপর বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন দেশে যেসব কিতাব নাযিল করেছিলেন সেগুলোকে সত্য বলে মেনে নিতে হবে। এ শর্তটির কারণে যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য বিধান অবতরণের প্রয়োজনীয়তাকে আদতে স্বীকারই করে না অথবা প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করলেও এ জন্য অহী ও নবুওয়াতের প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না এবং এর পরিবর্তে নিজেদের মনগড়া মতবাদকে আল্লাহর বিধান বলে ঘোষণা করে অথবা আল্লাহর কিতাবের স্বীকৃতি দিলেও কেবলমাত্র সেই কিতাবটি

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ ۝٦ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ
غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝٧

যেসব লোক (একথাগুলো মেনে নিতে) অস্বীকার করেছে,[৯] তাদের জন্য সমান—তোমরা তাদের সতর্ক করো বা না করো, তারা মেনে নেবে না। আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন।[১০] এবং তাদের চোখের ওপর আবরণ পড়ে গেছে। তারা কঠিন শাস্তি পওয়ার যোগ্য।

বা কিতাবগুলোর ওপর ঈমান আনে যেগুলোকে তাদের বাপ-দাদারা মেনে আসছে আর এ উৎস থেকে উৎসারিত অন্যান্য বিধানগুলোকে অস্বীকার করে—তাদের সবার জন্য কুরআনের হিদায়াতের দুয়ার রুদ্ধ। এ ধরনের সমস্ত লোককে আলাদা করে দিয়ে কুরআন তার অনুগ্রহ একমাত্র তাদের ওপর বর্ষণ করে যারা নিজেদেরকে আল্লাহর বিধানের মুখাপেক্ষী মনে করে এবং আল্লাহর এ বিধান আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি মানুষের কাছে না এসে বরং নবীদের ও আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমেই মানুষের কাছে আসে বলে স্বীকার করে আর এই সংগে বংশ, গোত্র বা জাতি প্রীতিতে লিপ্ত হয় না বরং নির্ভেজাল সত্যের পূজারী হয়, সত্য যেখানে যে আকৃতিতে আবির্ভূত হোক না কেন তারা তার সামনে মস্তক অবনত করে দেয়।

৮. এটি ষষ্ঠ ও সর্বশেষ শর্ত। আখেরাত একটি ব্যাপক ও পরিপূর্ণ অর্থবোধক শব্দ। আকীদা-বিশ্বাসের বিভিন্ন উপাদানের সমষ্টির ভিত্তিতে এ আখেরাতের ভাবধারা গড়ে উঠেছে। বিশ্বাসের নিম্নোক্ত উপাদানগুলো এর অন্তরভুক্ত।

এক ঃ এ দুনিয়ায় মানুষ কোন দায়িত্বহীন জীব নয়। বরং নিজের সমস্ত কাজের জন্য তাকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে।

দুই ঃ দুনিয়ার বর্তমান ব্যবস্থা চিরন্তন নয়। এক সময় এর মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে এবং সে সময়টা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

তিন ঃ এ দুনিয়া শেষ হবার পর আল্লাহ আর একটি দুনিয়া তৈরি করবেন। সৃষ্টির আদি থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মনুষের জন্ম হয়েছে সবাইকে সেখানে একই সংগে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। সবাইকে একত্র করে তাদের কর্মকাণ্ডের হিসেব নেবেন। সবাইকে তার কাজের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন।

চার ঃ আল্লাহর এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সৎলোকেরা জান্নাতে স্থান পাবে এবং অসৎলোকদেরকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ
بِمُؤْمِنِيْنَ ۝٨ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ
اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝٩ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ
مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝١٠ وَاِذَا قِيْلَ
لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ۝١١

২ রুকূ'

কিছু লোক এমনও আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহর ওপর ও আখেরাতের দিনের ওপর ঈমান এনেছি, অথচ আসলে তারা মু'মিন নয়। তারা আল্লাহর সাথে ও যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে ধোঁকাবাজি করছে। কিন্তু আসলে তারা নিজেদেরকেই প্রতারণা করছে, তবে তারা এ ব্যাপারে সচেতন নয়।[১১] তাদের হৃদয়ে আছে একটি রোগ, আল্লাহ সে রোগ আরো বেশী বাড়িয়ে দিয়েছেন,[১২] আর যে মিথ্যা তারা বলে তার বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। যখনই তাদের বলা হয়েছে, যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, তারা একথাই বলেছে, আমরা তো সংশোধনকারী।

পাঁচ ঃ বর্তমান জীবনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও অসমৃদ্ধি সাফল্য ও ব্যর্থতার আসল মানদণ্ড নয়। বরং আল্লাহর শেষ বিচারে যে ব্যক্তি উত্তরে যাবে সে–ই হচ্ছে সফলকাম আর সেখানে যে উত্তরোবে না সে ব্যর্থ।

এ সমগ্র আকীদা–বিশ্বাসগুলোকে যারা মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি তারা কুরআন থেকে কোনক্রমেই উপকৃত হতে পারবে না। কারণ এ বিষয়গুলো অস্বীকার করা তো দূরের কথা এগুলো সম্পর্কে কারো মনে যদি সামান্যতম দ্বিধা ও সন্দেহ থেকে থাকে, তাহলে মানুষের জীবনের জন্য কুরআন যে পথনির্দেশ করেছে সে পথে তারা চলতে পারবে না।

৯. অর্থাৎ ওপরে বর্ণিত ছয়টি শর্ত যারা পূর্ণ করেনি অথবা সেগুলোর মধ্য থেকে কোন একটিও গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

১০. আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছিলেন বলেই তারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল—এটা এ বক্তব্যের অর্থ নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, যখন তারা ওপরে বর্ণিত মৌলিক বিষয়গুলো প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং নিজেদের জন্য কুরআনের উপস্থাপিত পথের পরিবর্তে অন্য পথ বেছে নিয়েছিল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ও কানে মোহর মেরে

أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
آمِنُوا كَمَآ آمَنَ النَّاسُ قَالُوٓا أَنُؤْمِنُ كَمَآ آمَنَ السُّفَهَآءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ
هُمُ السُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوٓا آمَنَّا ۖ
وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمْ ۙ قَالُوٓا إِنَّا مَعَكُمْ ۙ إِنَّمَا نَحْنُ
مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾

সাবধান! এরাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী, তবে তারা এ ব্যাপারে সচেতন নয়। আর যখন তাদের বলা হয়েছে, অন্য লোকেরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আনো[১৩] তখন তারা এ জবাবই দিয়েছে—আমরা কি ঈমান আনবো নির্বোধদের মতো?[১৪] সাবধান! আসলে এরাই নির্বোধ, কিন্তু এরা জানে না। যখন এরা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয়, বলে ঃ "আমরা ঈমান এনেছি," আবার যখন নিরিবিলিতে নিজেদের শয়তানদের[১৫] সাথে মিলিত হয় তখন বলে ঃ "আমরা তো আসলে তোমাদের সাথেই আছি আর ওদের সাথে তো নিছক তামাশা করছি।"

দিয়েছিলেন। যে ব্যক্তি কখনো ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন তিনি অবশ্যি এ মোহর লাগার অবস্থার ব্যাপারে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকবেন। আপনার উপস্থাপিত পথ যাচাই করার পর কোন ব্যক্তি একবার যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করে তখন উল্টো পথে তার মন-মানস এমনভাবে দৌড়াতে থাকে যার ফলে আপনার কোন কথা আর তার বোধগম্য হয় না। আপনার দাওয়াতের জন্য তার কান হয়ে যায় বধির ও কালা। আপনার কার্যপদ্ধতির গুণাবলী দেখার ব্যাপারে তার চোখ হয়ে যায় অন্ধ। তখন সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয় যে, সত্যিই তার হৃদয়ের দুয়ারে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।

১১. অর্থাৎ তাদের মুনাফেকী কার্যকলাপ তাদের জন্য লাভজনক হবে—এ ভুল ধারণায় তারা নিমজ্জিত হয়েছে। অথচ এসব তাদেরকে দুনিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং আখেরাতেও। একজন মুনাফিক কয়েকদিনের জন্য দুনিয়ায় মানুষকে ধোঁকা দিতে পারে কিন্তু সবসময়ের জন্য তার এই ধোঁকাবাজি চলতে পারে না। অবশেষে একদিন তার মুনাফিকীর গুমোর ফাঁক হয়ে যাবেই। তখন সমাজে তার সামান্যতম মর্যাদাও খতম হয়ে যাবে। আর আখেরাতের ব্যাপারে বলা যায়, সেখানে তো ঈমানের মৌখিক দাবীর কোন মূল্যই থাকবে না যদি আমল দেখা যায় তার বিপরীত।

১২. মুনাফিকীকেই এখানে রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ এ রোগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন, একথার অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি কালবিলম্ব না করে ঘটনাস্থলেই মুনাফিকদেরকে তাদের মুনাফিকী কার্যকলাপের শাস্তি দেন না বরং তাদেরকে

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١٥﴾
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۠ فَمَا رَبِحَتْ
تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٦﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى
اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ
وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧﴾

আল্লাহ এদের সাথে তামাশা করছেন, এদের রশি দীর্ঘায়িত বা ঢিল দিয়ে যাচ্ছেন এবং এরা নিজেদের আল্লাহদ্রোহিতার মধ্যে অন্ধের মতো পথ হাতড়ে মরছে। এরাই হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী কিনে নিয়েছে, কিন্তু এ সওদাটি তাদের জন্য লাভজনক নয় এবং এরা মোটেই সঠিক পথে অবস্থান করছে না। এদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালালো এবং যখনই সেই আগুন চারপাশ আলোকিত করলো তখন আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিলেন এবং তাদের ছেড়ে দিলেন এমন অবস্থায় যখন অন্ধকারের মধ্যে তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না।[১৬]

ঢিল দিতে থাকেন। এর ফলে মুনাফিকরা নিজেদের কলা-কৌশলগুলোকে আপাত দৃষ্টিতে সফল হতে দেখে আরো বেশী ও পূর্ণ মুনাফিকী কার্যকলাপে লিপ্ত হতে থাকে।

১৩. অর্থাৎ তোমাদের এলাকার অন্যান্য লোকেরা যেমন সাচ্চা দিলে ও সরল অন্তঃকরণে মুসলমান হয়েছে তোমরাও যদি ইসলাম গ্রহণ করতে চাও তাহলে তেমনি নিষ্ঠা সহকারে সাচ্চা দিলে গ্রহণ করো।

১৪. যারা সাচ্চা দিলে নিষ্ঠা সহকারে ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদেরকে উৎপীড়ন, নির্যাতন, কষ্ট ও বিপদের মুখে নিক্ষেপ করছিল তাদেরকে তারা নির্বোধ মনে করতো। তাদের মতে নিছক সত্য ও ন্যায়ের জন্য সারা দেশের জনসমাজের শত্রুতার মুখোমুখি হওয়া নিরেট বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা মনে করতো, হক ও বাতিলের বিতর্কে না পড়ে সব ব্যাপারেই কেবলমাত্র নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

১৫. আরবী ভাষায় সীমালংঘনকারী, দাম্ভিক ও স্বৈরাচারীকে শয়তান বলা হয়। মানুষ ও জিন উভয়ের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কুরআনের অধিকাংশ জায়গায় এ শব্দটি জিনদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হলেও কোন কোন জায়গায় আবার শয়তান প্রকৃতির মানুষদের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্বাপর আলোচনার প্রেক্ষাপটে এসব ক্ষেত্রে

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٧﴾ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ
ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ
الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌۢ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ
يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ
عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

তারা কালা, বোবা, অন্ধ।[১৭] তারা আর ফিরে আসবে না। অথবা এদের দৃষ্টান্ত এমন যে, আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। তার সাথে আছে অন্ধকার মেঘমালা, বজ্রের গর্জন ও বিদ্যুৎ চমক। বজ্রপাতের আওয়াজ শুনে নিজেদের প্রাণের ভয়ে এরা কানে আঙুল ঢুকিয়ে দেয়। আল্লাহ এ সত্য অস্বীকারকারীদেরকে সবদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছেন।[১৮] বিদ্যুৎ চমকে তাদের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যেন বিদ্যুৎ শীগ্‌গির তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেবে। যখন সামান্য একটু আলো তারা অনুভব করে তখন তার মধ্যে তারা কিছুদূর চলে এবং যখন তাদের ওপর অন্ধকার ছেয়ে যায় তারা দাঁড়িয়ে পড়ে।[১৯] আল্লাহ চাইলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি একেবারেই কেড়ে নিতে পারতেন।[২০] নিসন্দেহে তিনি সবকিছুর ওপর শক্তিশালী।

কোথায় শয়তান শব্দটি জিনদের জন্য এবং কোথায় মানুষদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তা সহজেই জানা যায়। তবে আমাদের আলোচ্য স্থানে শয়তান শব্দটিকে বহুবচনে 'শায়াতীন' হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখানে "শায়াতীন' বলতে মুশরিকদের বড় বড় সরদারদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ সরদাররা তখন ইসলামের বিরোধিতার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছিল।

১৬. যখন আল্লাহর এক বান্দা আলো জ্বালালেন এবং হককে বাতিল থেকে, সত্যকে মিথ্যা থেকে ও সরল সোজা পথকে ভুল পথ থেকে ছেটে সুস্পষ্টরূপে আলাদা করে ফেললেন তখন চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের কাছে সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সুস্পষ্ট দিবালোকের মতো। কিন্তু প্রবৃত্তি পূজায় অন্ধ মুনাফিকরা এ আলোয় কিছুই দেখতে পেলো না। "আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিলেন"—বাক্যের কারণে কেউ যেন এ ভুল ধারণা পোষণ না করেন যে, তাদের অন্ধকারে হাতড়ে মরার জন্য তারা নিজেরা দায়ী নয়। যে ব্যক্তি নিজে হক ও সত্যের প্রত্যাশী নয়, নিজেই হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহীকে নিজের বুকে

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا
وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ
رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

৩ রুকূ'

হে মানব জাতি![২১] ইবাদাত করো তোমাদের রবের, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্বে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের সবার সৃষ্টিকর্তা, এভাবেই তোমরা নিষ্কৃতি লাভের আশা করতে পারো।[২২] তিনিই তোমাদের জন্য মাটির শয্যা বিছিয়েছেন, আকাশের ছাদ তৈরি করেছেন, ওপর থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে সব রকমের ফসলাদি উৎপন্ন করে তোমাদের আহার যুগিয়েছেন। কাজেই একথা জানার পর তোমরা অন্যদেরকে আল্লাহর প্রতিপক্ষে পরিণত করো না।[২৩]

আঁকড়ে ধরে এবং সত্যের আলোকোজ্জ্বল চেহারা দেখার আগ্রহ যার মোটেই নেই, আল্লাহ তারই দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেন। সত্যের আলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে নিজেই যখন বাতিলের অন্ধকারে হাতড়ে মরতে চায় তখন আল্লাহও তাকে তারই সুযোগ দেন।

১৭. হককথা শোনার ব্যাপারে বধির, হককথা বলার ক্ষেত্রে বোবা এবং হক ও সত্য দেখার প্রশ্নে অন্ধ।

১৮. কানে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে এরা ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যাবে—এ ধারণায় কিছুক্ষণের জন্য ডুবে যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এভাবে তারা বাঁচতে পারবে না। কারণ আল্লাহ তাঁর সমগ্র শক্তি দিয়ে তাদেরকে ঘিরে রেখেছেন।

১৯. প্রথম দৃষ্টান্তটি ছিল এমন সব মুনাফিকদের যারা মানসিক দিক দিয়ে ঈমান ও ইসলামকে পুরোপুরি অস্বীকার করতো কিন্তু কোন স্বার্থ ও সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। আর এ দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি হচ্ছে সন্দেহ, সংশয় ও দ্বিধার শিকার এবং দুর্বল ঈমানের অধিকারীদের। এরা কিছুটা সত্য স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু সে জন্য বিপদ-মুসিবত, কষ্ট-নির্যাতন সহ্য করতে তারা প্রস্তুত ছিল না। এ দৃষ্টান্তে বৃষ্টি বলতে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। ইসলাম বিশ্বমানবতার জন্য একটি রহমত রূপে আবির্ভূত হয়েছে। অন্ধকার মেঘমালা, বিদ্যুৎ চমক ও বজ্রের গর্জন বলে এখানে সেই ব্যাপক দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ ও সংকটের কথা বুঝানো হয়েছে ইসলামী আন্দোলনের মোকাবিলায় জাহেলী শক্তির প্রবল বিরোধিতার মুখে যেগুলো একের পর এক সামনে

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ
مِّنْ مِّثْلِهِ ۖ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

আর যে কিতাবটি আমি আমার বান্দার ওপর নাযিল করেছি সেটি আমার কিনা—এ ব্যাপারে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ করে থাকো তাহলে তার মতো একটি সূরা তৈরি করে আনো এবং নিজেদের সমস্ত সমর্থক গোষ্ঠীকে ডেকে আনো—এক আল্লাহকে ছাড়া আর যার যার চাও তার সাহায্য নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে এ কাজটি করে দেখাও।[২৪] কিন্তু যদি তোমরা এমনটি না করো আর নিসন্দেহে কখনই তোমরা এটা করতে পারবে না, তাহলে ভয় করো সেই আগুনকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর,[২৫] যা তৈরি রাখা হয়েছে সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য।

আসছিল। দৃষ্টান্তের শেষ অংশে এক অভিনব পদ্ধতিতে এ মুনাফিকদের এ অবস্থার নক্‌শা আঁকা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যাপারটি একটু সহজ হয়ে গেলে তারা চলতে থাকে আবার সমস্যা-সংকটের জট পাকিয়ে গেলে অথবা তাদের প্রবৃত্তি বিরোধী হয়ে পড়লে বা জাহেলী স্বার্থে আঘাত পড়লে তারা সটান দাঁড়িয়ে যায়।

২০. অর্থাৎ যেভাবে প্রথম ধরনের মুনাফিকদের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন সেভাবে আল্লাহ তাদেরকেও হক ও সত্যের ব্যাপারে কানা ও কালায় পরিণত করতে পারতেন। কিন্তু যে ব্যক্তি কিছুটা দেখতে ও শুনতে চায় তাকে ততটুকুও দেখতে শুনতে না দেয়া আল্লাহর রীতি নয়। যতটুকু হক দেখতে ও শুনতে তারা প্রস্তুত ছিল আল্লাহ ততটুকু শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি তাদের আয়ত্বাধীনে রেখেছিলেন।

২১. যদিও কুরআনের দাওয়াত সাধারণভাবে সমগ্র মানবজাতির জন্য তবুও এ দাওয়াত থেকে লাভবান হওয়া না হওয়া মানুষের নিজের ইচ্ছা প্রবণতার ওপর এবং সেই প্রবণতা অনুযায়ী আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগের ওপর নির্ভরশীল। তাই প্রথমে মানুষের মধ্যে পার্থক্য করে কোন্ ধরনের লোক এ কিতাবের পথনির্দেশনা থেকে লাভবান হতে পারে এবং কোন্ ধরনের লোক লাভবান হতে পারে না তা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তারপর এখন সমগ্র মানবজাতির সামনে সেই আসল কথাটিই পেশ করা হচ্ছে, যেটি পেশ করার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল।

২২. অর্থাৎ দুনিয়ায় ভুল চিন্তা-দর্শন, ভুল কাজ-কর্ম ও আখেরাতে আল্লাহর আযাব থেকে নিষ্কৃতিলাভের আশা করতে পারো।

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ
تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ
قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَا
اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥﴾

আর হে নবী, যারা এ কিতাবের ওপর ঈমান আনবে এবং (এর বিধান অনুযায়ী) নিজেদের কার্যধারা সংশোধন করে নেবে তাদেরকে এ মর্মে সুখবর দাও যে, তাদের জন্য এমন সব বাগান আছে যার নিম্নদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে ঝর্ণাধারা। সেই বাগানের ফল দেখতে দুনিয়ার ফলের মতই হবে। যখন কোন ফল তাদের দেয়া হবে খাবার জন্য, তারা বলে উঠবে ঃ এ ধরনের ফলই ইতিপূর্বে দুনিয়ায় আমাদের দেয়া হতো।[২৬] তাদের জন্য সেখানে থাকবে পাক-পবিত্র স্ত্রীগণ[২৭] এবং তারা সেখানে থাকবে চিরকাল।

২৩. অর্থাৎ যখন তোমরা নিজেরাই একথা স্বীকার করো এবং এ সমস্তই আল্লাহ করেছেন বলে তোমরা জানো তখন তোমাদের সমস্ত বন্দেগী ও দাসত্ব একমাত্র তাঁর জন্য নির্ধারিত হওয়া উচিত। আর কার বন্দেগী ও দাসত্ব তোমরা করবে? আর কে এর অধিকারী হতে পারে? অন্যদেরকে আল্লাহর প্রতিপক্ষ বানাবার অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের দাসত্ব ও বন্দেগীর মধ্য থেকে কোনটিকে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের সাথে সম্পর্কিত করা। সামনের দিকে কুরআনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে। তা থেকে জানা যাবে, কোন্ ধরনের ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, যাতে অন্যদেরকে শরীক 'শির্ক'-এর অন্তরভুক্ত এবং যার পথ রোধ করার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

২৪. ইতিপূর্বে মক্কায় কয়েকবার এ চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা হয়েছিল, যদি তোমরা এ কুরআনকে মানুষের রচনা মনে করে থাকো তাহলে এর সমমানের কোন বাণী রচনা করে আনো। এখন মদীনায় এসে আবার সেই একই চ্যালেঞ্জের পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। (দেখুন সূরা ইউনূস ৩৮ আয়াত, সূরা হুদ ১৩ আয়াত, সূরা বনী ইসরাঈল ৮৮ আয়াত এবং সূরা তূর ৩৩-৩৪ আয়াত)।

২৫. এখানে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে। অর্থাৎ সেখানে দোজখের ইন্ধন কেবল তোমরা একাই হবে না বরং তোমাদের সাথে থাকবে তোমাদের ঠাকুর ও আরাধ্য দেবতাদের সেই সব মূর্তি যাদেরকে তোমরা মাবুদ ও আরাধ্য বানিয়ে পূজা করে আসছিলে। তখন তোমরা নিজেরাই জানতে পারবে খোদায়ী করার ও উপাস্য হবার ব্যাপারে এদের অধিকার কতটুকু।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ
كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ۖ
وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ
يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ ۠ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن
يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾

অবশ্য আল্লাহ লজ্জা করেন না মশা বা তার চেয়ে তুচ্ছ কোন জিনিসের দৃষ্টান্ত দিতে।[২৮] যারা সত্য গ্রহণকারী তারা এ দৃষ্টান্ত-উপমাগুলো দেখে জানতে পারে এগুলো সত্য, এগুলো এসেছে তাদের রবেরই পক্ষ থেকে, আর যারা (সত্যকে) গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয় তারা এগুলো শুনে বলতে থাকে, এ ধরনের দৃষ্টান্ত-উপমার সাথে আল্লাহর কী সম্পর্ক? এভাবে আল্লাহ একই কথার সাহায্যে অনেককে গোমরাহীতে লিপ্ত করেন আবার অনেককে দেখান সরল সোজা পথ।[২৯] আর তিনি গোমরাহীর মধ্যে তাদেরকেই নিক্ষেপ করেন যারা ফাসেক,[৩০] যারা আল্লাহর সাথে মজবুতভাবে অংগীকার করার পর আবার তা ভেঙ্গে ফেলে,[৩১] আল্লাহ যাকে জোড়ার হুকুম দিয়েছেন তাকে কেটে ফেলে[৩২] এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে চলে।[৩৩] আসলে এরাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

২৬. অর্থাৎ এ ফলগুলো নতুন ও অপরিচিত হবে না। দুনিয়ায় যেসব ফলের সাথে তারা পরিচিত ছিল সেগুলোর সাথে এদের আকার আকৃতির মিল থাকবে। তবে হাঁ এদের স্বাদ হবে অনেক গুণ বেশী ও উন্নত পর্যায়ের। যেমন ধরুন আম, কমলা ও ডালিমের মতো হবে অনেকগুলো ফল। জান্নাতবাসীরা ফলগুলো দেখে চিনতে পারবে—এগুলো আম, এগুলো কমলা এবং এগুলো ডালিম। কিন্তু স্বাদের দিক দিয়ে দুনিয়ার আম, কমলা ও ডালিমকে এর সাথে তুলনাই করা যাবে না।

২৭. মূল আরবী বাক্যে 'আযওয়াজ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'যওজ'। এর অর্থ হচ্ছে 'জোড়া।' এ শব্দটি স্বামী ও স্ত্রী উভয় অর্থে ব্যবহার করা হয়। স্বামীর জন্য স্ত্রী হচ্ছে 'যওজ।' আবার স্ত্রীর জন্য স্বামী হচ্ছে 'যওজ।' তবে আখেরাতে 'আযওয়াজ' অর্থাৎ জোড়া হবে পবিত্রতার গুণাবলী সহকারে। যদি দুনিয়ায় কোন সৎকর্মশীল পুরুষের স্ত্রী সৎকর্মশীলা না হয় তাহলে আখেরাতে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন

হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে ঐ সৎকর্মশীল পুরুষটিকে অন্য কোন সৎকর্মশীলা স্ত্রী দান করা হবে। আর যদি দুনিয়ায় কোন স্ত্রী হয় সৎকর্মশীলা এবং তার স্বামী হয় অসৎ তাহলে আখেরাতে ঐ অসৎ স্বামী থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে কোন সৎপুরুষকে তার স্বামী হিসেবে দেয়া হবে। তবে যদি দুনিয়ায় কোন স্বামী-স্ত্রী দু'জনই সৎকর্মশীল হয় তাহলে আখেরাতে তাদের এই সম্পর্কটি চিরন্তন ও চিরস্থায়ী সম্পর্কে পরিণত হবে।

২৮. এখানে একটি আপত্তি ও প্রশ্নের উল্লেখ না করেই তার জবাব দেয়া হয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য সুস্পষ্ট করার জন্য মশা, মাছি ও মাকড়শা ইত্যাদির দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। বিরোধীরা এর ওপর আপত্তি উঠিয়েছিল, এটা কোন্ ধরনের আল্লাহর কালাম যেখানে এই ধরনের তুচ্ছ ও নগণ্য জিনিসের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে? তারা বলতো, এটা আল্লাহর কালাম হলে এর মধ্যে এসব বাজে কথা থাকতো না।

২৯. অর্থাৎ যারা কথা বুঝতে চায় না, সত্যের মর্ম অনুসন্ধান করে না, তাদের দৃষ্টি তো কেবল শব্দের বাইরের কাঠামোর ওপর নিবদ্ধ থাকে এবং ঐ জিনিসগুলো থেকে বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সত্য থেকে আরো দূরে চলে যায়। অপর দিকে যারা নিজেরাই সত্য সন্ধানী এবং সঠিক দৃষ্টিশক্তির অধিকারী তারা ঐ সব কথার মধ্যে সূক্ষ্ম জ্ঞানের আলোকচ্ছটা দেখতে পায়। এ ধরনের জ্ঞানগর্ভ কথা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হতে পারে বলে তাদের সমগ্র হৃদয় মন সাক্ষ দিয়ে ওঠে।

৩০. ফাসেক তাকে বলে যে নাফরমান এবং আল্লাহর আনুগত্যের সীমা অতিক্রম করে যায়।

৩১. বাদশাহ নিজের কর্মচারী ও প্রজাদের নামে যে ফরমান বা নির্দেশনামা জারী করেন আরবী ভাষায় প্রচলিত কথ্যরীতিতে তাকে বলা হয় 'আহদ' বা অংগীকার। কারণ এই অংগীকার মেনে চলা হয় প্রজাদের অপরিহার্য কর্তব্যের অন্তরভুক্ত। এখানে অংগীকার শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহর অংগীকার অর্থ হচ্ছে, তাঁর স্থায়ী ফরমান। এই ফরমানের দৃষ্টিতে বলা যায়, সমগ্র মানবজাতি একমাত্র তাঁরই বন্দেগী, আনুগত্য ও পূজা-উপাসনা করার জন্য আদিষ্ট ও নিযুক্ত হয়েছে। 'মজবুতভাবে অংগীকার করার পর' —কথাটি বলে আসলে হযরত আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টির সময় সমগ্র মানবাত্মার নিকট থেকে এ ফরমানটির আনুগত্য করার যে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। সূরা আরাফ-এর ১৭২ আয়াতে এই অংগীকারের ওপর তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

৩২. অর্থাৎ যেসব সম্পর্ককে শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত করার ওপর মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কল্যাণ নির্ভর করে এবং আল্লাহ যেগুলোকে ত্রুটিমুক্ত রাখার হুকুম দিয়েছেন, তার ওপর এরা অস্ত্র চালায়। এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটির মধ্যে রয়েছে অর্থের অশেষ ব্যাপকতা। ফলে দু'টি মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে শুরু করে সমগ্র বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে যে মানবিক সভ্যতা, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার বিশাল জগত তার সমগ্র অবয়বও এই অর্থের আওতাধীনে এসে যায়। সম্পর্ক কেটে ফেলার অর্থ নিছক মানবিক সম্পর্কচ্ছেদ নয় বরং সঠিক ও বৈধ সম্পর্ক ছাড়া অন্য যত প্রকারের সম্পর্ক কায়েম করা হবে তা সবই এর অন্তরভুক্ত হবে।

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ
يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۖ وَهُوَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

তোমরা আল্লাহর সাথে কেমন করে কুফরীর আচরণ করতে পারো। অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন। অতপর তিনি তোমাদের প্রাণ হরণ করবেন এবং অতপর তিনি তোমাদের জীবন দান করবেন। তারপর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের জন্য সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করলেন। তারপর ওপরের দিকে লক্ষ করলেন এবং সাত আকাশ বিন্যস্ত করলেন[৩৪] তিনি সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন।[৩৫]

কারণ অবৈধ ও ভুল সম্পর্কের পরিণতি এবং সম্পর্কচ্ছেদের পরিণতি একই। অর্থাৎ এর পরিণতিতে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক খারাপ হয় এবং নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা হয় ধ্বংসের মুখোমুখি।

৩৩. এই তিনটি বাক্যের মধ্যে ফাসেকী ও ফাসেকের চেহারা পুরোপুরি উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার সম্পর্ক এবং মানুষ ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন বা বিকৃত করার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে বিপর্যয়। আর যে ব্যক্তি এ বিপর্যয় সৃষ্টি করে সেই হচ্ছে ফাসেক।

৩৪. সাত আকাশের তাৎপর্য কি? সাত আকাশ বলতে কি বুঝায়। এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেয়া কঠিন। মানুষ প্রতি যুগে আকাশ বা অন্য কথায় পৃথিবীর বাইরের জগত সম্পর্কে নিজের পর্যবেক্ষণ ও ধারণা-বিশ্লেষণ অনুযায়ী বিভিন্ন চিন্তা ও মতবাদের অনুসারী হয়েছে। এ চিন্তা ও মতবাদগুলো বিভিন্ন সময় বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। কাজেই এর মধ্য থেকে কোন একটি মতবাদ নির্দেশ করে তার ভিত্তিতে কুরআনের এই শব্দগুলোর অর্থ নির্ণয় করা ঠিক হবে না। তবে সংক্ষেপে এতটুকু বুঝে নিতে হবে যে, সম্ভবত পৃথিবীর বাইরে যতগুলো জগত আছে সবগুলোকেই আল্লাহ সাতটি সুদৃঢ় স্তরে বিভক্ত করে রেখেছেন অথবা এই বিশ্ব-জাহানের যে স্তরে পৃথিবীর অবস্থিতি সেটি সাতটি স্তর সমন্বিত।

৩৫. এই বাক্যটিতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এক, যে আল্লাহ তোমাদের সমস্ত গতিবিধি ও কর্মকাণ্ডের খবর রাখেন এবং যার দৃষ্টি থেকে তোমাদের কোন গতিবিধিই গোপন থাকতে পারে না তাঁর মোকাবিলায় তোমরা কুফরী ও বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করার সাহস কর কেমন করে? দুই, যে আল্লাহ যাবতীয় সত্য

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ
قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۖ وَنَحْنُ
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ
أَنۢبِـُٔونِي بِأَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٣١﴾

৪ রুকূ'

আবার[৩৬] সেই সময়ের কথা একটু স্মরণ কর যখন তোমাদের রব ফেরেশতাদের[৩৭] বলেছিলেন, "আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা—প্রতিনিধি[৩৮] নিযুক্ত করতে চাই।" তারা বললো, "আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে নিযুক্ত করতে চান যে সেখানকার ব্যবস্থাপনাকে বিপর্যস্থ করবে এবং রক্তপাত করবে?[৩৯] আপনার প্রশংসা ও স্তুতিসহকারে তাসবীহ পাঠ এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা তো আমরা করেই যাচ্ছি।"[৪০] আল্লাহ বললেন, "আমি জানি যা তোমরা জানো না।"[৪১] অতপর আল্লাহ আদমকে সমস্ত জিনিসের নাম শেখালেন[৪২] তারপর সেগুলো পেশ করলেন ফেরেশতাদের সামনে এবং বললেন, "যদি তোমাদের ধারণা সঠিক হয় (অর্থাৎ কোন প্রতিনিধি নিযুক্ত করলে ব্যবস্থাপনা বিপর্যস্ত হবে) তাহলে একটু বলতো দেখি এই জিনিসগুলোর নাম?"

জ্ঞানের অধিকারী, যিনি আসলে সমস্ত জ্ঞানের উৎস তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অজ্ঞতার অন্ধকারে মাথা কুটে মরা ছাড়া তোমাদের আর কী লাভ হতে পারে! তিনি ছাড়া যখন জ্ঞানের আর কোন উৎস নেই, তোমাদের জীবনের পথ সুস্পষ্টভাবে দেখার জন্য যখন তাঁর কাছ থেকে ছাড়া আর কোথাও থেকে আলো পাওয়ার সম্ভাবনা নেই তখন তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার মধ্যে তোমরা নিজেদের জন্য এমন কি কল্যাণ দেখতে পেলে?

৩৬. ওপরের রুকূ'তে আল্লাহর বন্দেগী করার আহবান জানানো হয়েছিল। এ আহবানের ভিত্তিভূমি ছিল নিম্নরূপ ঃ আল্লাহ তোমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তাঁর হাতেই তোমাদের জীবন ও মৃত্যু। যে বিশ্ব–জগতে তোমরা বাস করছো তিনিই তার একচ্ছত্র অধিপতি ও সার্বভৌম শাসক। কাজেই তাঁর বন্দেগী ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি তোমাদের জন্য সঠিক নয়। এখন এই রুকূ'তে অন্য একটি ভিত্তিভূমির ওপর ঐ একই আহবান জানানো হয়েছে। অর্থাৎ এই দুনিয়ায় আল্লাহ তোমাদেরকে খলীফা পদে অভিষিক্ত করেছেন।

খলীফা হবার কারণে কেবল তাঁর বন্দেগী করলেই তোমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না বরং এই সংগে তাঁর পাঠানো হিদায়াত ও নির্দেশাবলী অনুযায়ী জীবন যাপনও করতে হবে। আর যদি তোমরা এমনটি না কর তোমাদের আদি শত্রু শয়তানের ইংগিতে চলতে থাকো, তাহলে তোমরা নিকৃষ্ট পর্যায়ের বিদ্রোহের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে এবং এ জন্য তোমাদের চরম পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

এ প্রসঙ্গে মানুষের স্বরূপ ও বিশ্ব-জগতে তার মর্যাদা ও ভূমিকা যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মানবজাতির ইতিহাসের এমন অধ্যায়ও উপস্থাপন করা হয়েছে যে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার দ্বিতীয় কোন মাধ্যম মানুষের করায়ত্ত নেই। এই অধ্যায়ে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লাভ করা হয়েছে তা প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যায়ে মাটির তলদেশ খুড়ে বিক্ষিপ্ত অস্থি ও কংকাল একত্র করে আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে সেগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে অনেক বেশী মূল্যবান।

৩৭. এখানে মূল আরবী শব্দ 'মালাইকা' হচ্ছে বহুবচন। একবচন 'মালাক।' মালাক-এর আসল মানে "বাণীবাহক।" এরি শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে 'যাকে পাঠানো হয়েছে' বা ফেরেশতা। ফেরেশতা নিছক কিছু কায়াহীন, অস্তিত্বহীন শক্তির নাম নয়। বরং এরা সুস্পষ্ট কায়া ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী। আল্লাহ তার এই বিশাল সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় তাদের খেদমত নিয়ে থাকেন। তাদেরকে আল্লাহর বিশাল সাম্রাজ্যের কর্মচারী বলা যায়। আল্লাহর বিধান ও নির্দেশাবলী তারা প্রবর্তন করে থাকেন। মূর্খ লোকেরা ভুলক্রমে তাদেরকে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও কাজ-কারবারে অংশীদার মনে করে। কেউ কেউ তাদেরকে মনে করে আল্লাহর আত্মীয়। এ জন্য দেবতা বানিয়ে তাদের পূজা করে।

৩৮. যে ব্যক্তি কারো অধিকারের আওতাধীনে তারই অর্পিত ক্ষমতা-ইখতিয়ার ব্যবহার করে তাকে খলীফা বলে। খলীফা নিজে মালিক নয় বরং আসল মালিকের প্রতিনিধি। সে নিজে ক্ষমতার অধিকারী নয় বরং মালিক তাকে ক্ষমতার অধিকার দান করেছেন, তাই সে ক্ষমতা ব্যবহার করে। সে নিজের ইচ্ছে মতো কাজ করার অধিকার রাখে না। বরং মালিকের ইচ্ছে পূরণ করাই হয় তার কাজ। যদি সে নিজেকে মালিক মনে করে বসে এবং তার ওপর অর্পিত ক্ষমতাকে নিজের ইচ্ছে মতো ব্যবহার করতে থাকে অথবা আসল মালিককে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মালিক বলে স্বীকার করে নিয়ে তারই ইচ্ছে পূরণ করতে এবং তার নির্দেশ পালন করতে থাকে, তাহলে এগুলো সবই বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে গণ্য হবে।

৩৯. এটা ফেরেশতাদের আপত্তি ছিল না। বরং এটা ছিল তাদের জিজ্ঞাসা। আল্লাহর কোন পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করার অধিকারই ফেরেশতাদের ছিল না। 'খলীফা' শব্দটি থেকে তারা অবশ্যি এতটুকু বুঝতে পেরেছিল যে, পরিকল্পনায় উল্লেখিত সৃষ্টিজীবকে দুনিয়ায় কিছু ক্ষমতা-ইখতিয়ার দান করা হবে। তবে বিশ্ব-জাহানের এ বিশাল সাম্রাজ্য আল্লাহর একচ্ছত্র কর্তৃত্বের আওতাধীনে কোন স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন সৃষ্টজীব কিভাবে অবস্থান করতে পারে—একথা তারা বুঝতে পারছিল না। এই সাম্রাজ্যের কোন অংশে কাউকে যদি সামান্য কিছু স্বাধীন ক্ষমতা দান করা হয় তাহলে সেখানকার ব্যবস্থাপনা বিপর্যয়ের হাত থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে, একথা তারা বুঝতে চাইছিল।

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ
الْحَكِيْمُ ۝ قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ
قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ
وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝

তারা বললো ঃ "ত্রুটিমুক্ত তো একমাত্র আপনারই সত্তা, আমরা তো মাত্র ততটুকু জ্ঞান রাখি যতটুকু আপনি আমাদের দিয়েছেন।৪৩ প্রকৃতপক্ষে আপনি ছাড়া আর এমন কোন সত্তা নেই যিনি সবকিছু জানেন ও সবকিছু বোঝেন।" তখন আল্লাহ আদমকে বললেন, "তুমি ওদেরকে এই জিনিসগুলোর নাম বলে দাও।" যখন সে তাদেরকে সেসবের নাম জানিয়ে দিল৪৪ তখন আল্লাহ বললেন ঃ "আমি না তোমাদের বলেছিলাম, আমি আকাশ ও পৃথিবীর এমন সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব জানি যা তোমাদের অগোচরে রয়ে গেছে ? যা কিছু তোমরা প্রকাশ করে থাকো তা আমি জানি এবং যা কিছু তোমরা গোপন করো তাও আমি জানি।"

৪০. এই বাক্যে ফেরেশতারা একথা বলতে চায়নি যে, খিলাফত তাদেরকে দেয়া হোক কারণ তারাই এর হকদার। বরং তাদের বক্তব্যের অর্থ ছিল ঃ হে মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ! আপনার হুকুম পালন করা হচ্ছে। আপনার বিধান কার্যকর করার জন্য আমরা সর্বাত্মকভাবে তৎপর রয়েছি। আপনার মহান ইচ্ছা অনুযায়ী সমস্ত বিশ্ব-জাহানকে আমরা পাক পবিত্র করে রাখছি। আর এই সাথে আপনার প্রশংসাগীত গাওয়া ও স্তব-স্তুতি করা হচ্ছে। আমরা আপনার খাদেমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আপনার তাসবীহ পড়ছি তাহলে এখন আর কিসের অভাব থেকে যায় ? একজন খলীফার প্রয়োজন দেখা দিল কেন ? এর কারণ আমরা বুঝতে পারছি না। (তাসবীহ শব্দটির দুই অর্থ হয়। এর একটি অর্থ যেমন পবিত্রতা বর্ণনা করা হয় তেমনি অন্য একটি অর্থ হয় তৎপরতার সাথে কাজ করা এবং মনোযোগ সহকারে প্রচেষ্টা চালানো। ঠিক এভাবেই তাকদীস শব্দটিরও দুই অর্থ হয়। এক, পবিত্রতার প্রকাশ ও বর্ণনা এবং দুই, পাক-পবিত্র করা।)

৪১. এটি হচ্ছে ফেরেশতাদের দ্বিতীয় সন্দেহের জবাব। বলা হয়েছে, খলীফা নিযুক্ত করার কারণ ও প্রয়োজন আমি জানি, তোমরা তা বুঝতে পারবে না। তোমরা নিজেদের যে সমস্ত কাজের কথা বলছো, সেগুলো যথেষ্ট নয়। বরং এর চাইতেও বেশী আরো কিছু আমি চাই। তাই পৃথিবীতে ক্ষমতা-ইখতিয়ার সম্পন্ন একটি জীব সৃষ্টি করার সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৪২. কোন বস্তুর নামের মাধ্যমে মানুষ তার সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে থাকে, এটিই হয় মানুষের জ্ঞানলাভের পদ্ধতি। কাজেই মানুষের সমস্ত তথ্যজ্ঞান মূলত বস্তুর নামের সাথে

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا إِلَّآ إِبْلِيْسَ ۖ أَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۖ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

তারপর যখন ফেরেশতাদের হুকুম দিলাম, আদমের সামনে নত হও, তখন সবাই[৪৫] অবনত হলো, কিন্তু ইবলিস[৪৬] অস্বীকার করলো। সে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মেতে উঠলো এবং নাফরমানদের অন্তরভুক্ত হলো।[৪৭]

জড়িত। তাই আদমকে সমস্ত নাম শিখিয়ে দেয়ার মানেই ছিল তাঁকে সমস্ত বস্তুর জ্ঞান দান করা হয়েছিল।

৪৩. মনে হচ্ছে প্রত্যেকটি ফেরেশতার এবং ফেরেশতাদের প্রত্যেকটি শ্রেণীর জ্ঞান তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমন বাতাসের ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত আছেন যেসব ফেরেশতা তারা বাতাস সম্পর্কে সবকিছু জানেন কিন্তু পানি সম্পর্কে কিছুই জানেন না। অন্যান্য বিভাগের ফেরেশতাদের অবস্থাও এমনি। এদের বিপরীত পক্ষে মানুষকে ব্যাপকতর জ্ঞান দান করা হয়েছে। এক একটি বিভাগ সম্পর্কে মানুষকে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভাগের ফেরেশতাদের চাইতে তা কোন অংশে কম হলেও সামগ্রিকভাবে সমস্ত বিভাগের জ্ঞান মানুষকে যেভাবে দান করা হয়েছে তা ফেরেশতারা লাভ করতে পারেননি।

৪৪. এই মহড়াটি ছিল ফেরেশতাদের প্রথম সন্দেহের জবাব। এভাবে আল্লাহ যেন জানিয়ে দিলেন, আদমকে আমি কেবল স্বাধীন ক্ষমতা-ইখতিয়ার দিচ্ছি না বরং তাকে জ্ঞানও দিচ্ছি। তার নিয়োগে তোমরা যে বিপর্যয়ের আশংকা করছো, তা এ ব্যাপারটির একটি দিক মাত্র। এর মধ্যে কল্যাণের আর একটি দিকও আছে। বিপর্যয়ের দিকটির তুলনায় এই কল্যাণের গুরুত্ব ও মূল্য অনেক বেশী। ছোটখাট ক্ষতি ও অকল্যাণের জন্য বড় রকমের লাভ ও কল্যাণকে উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

৪৫. এর অর্থ হচ্ছে, পৃথিবী ও তার সাথে সম্পর্কিত মহাবিশ্বের বিভিন্ন স্তরে যে পরিমাণ ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন তাদের সবাইকে মানুষের জন্য অনুগত ও বিজিত হয়ে যাবার হুকুম দেয়া হয়েছে। যেহেতু এই এলাকায় আল্লাহর হুকুমে মানুষকে তাঁর খলীফার পদে নিযুক্ত করা হচ্ছিল তাই ফরমান জারী হলো ঃ আমি মানুষকে যে ক্ষমতা-ইখতিয়ার দান করছি ভালো-মন্দ যে কোন কাজে মানুষ তা ব্যবহার করতে চাইলে এবং আমার বিশেষ ইচ্ছার অধীনে তাকে সেটি করার সুযোগ দেয়া হলে তোমাদের যার যার কর্মক্ষেত্রের সাথে ঐ কাজের সম্পর্ক থাকবে। তাদের নিজেদের ক্ষেত্রের পরিধি পর্যন্ত ঐ কাজে তার সাথে সহযোগিতা করা হবে তোমাদের ওপর ফরয। সে চুরি করতে বা নামায পড়তে চাইলে, ভালো কাজ বা মন্দ কাজ করার এরাদা করলে উভয় অবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে তার পছন্দ অনুযায়ী কাজ করার অনুমতি দিতে থাকবো ততক্ষণ পর্যন্ত

তোমাদের দায়িত্ব হবে তার কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা। উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন, কোন বাদশাহ যখন কোন ব্যক্তিকে নিজের রাজ্যের কোন প্রদেশের বা জেলার শাসক নিযুক্ত করেন তখন তার আনুগত্য করা সেই এলাকার সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্ব হয়ে পড়ে। তিনি কোন সঠিক বা বেঠিক কাজে তার ক্ষমতা ব্যবহার করুন না কেন যতদিন বাদশাহ চান ততদিন তাকে তার ক্ষমতা ব্যবহার করার সুযোগ দিতে হবে। তার সমস্ত কাজে সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের সাহায্য করতে হবে। তবে বাদশাহর পক্ষ থেকে যখন যে কাজটি না করতে দেয়ার ইংগিত পাওয়া যাবে তখনই সেখানেই ঐ শাসকের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব খতম হয়ে যাবে। এ সময় তিনি অনুভব করতে থাকেন যেন চারদিকের সমস্ত কর্মচারী ও কর্মকর্তরা ধর্মঘট করেছে। এমন কি বাদশাহর পক্ষ থেকে যখন ঐ শাসককে বরখাস্ত ও গ্রেফতার করার ফরমান জারী হয় তখন কাল পর্যন্ত তার অধীনে যারা কাজ করছিল এবং তার আঙুলের ইশারায় যারা ওঠা-বসা করতো তারাই আজ তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে তাকে ফাসেক তথা বিদ্রোহীদের আবাসস্থলের দিকে নিয়ে যেতে একটুও দ্বিধা করে না। ফেরেশতাদেরকে আদমের সামনে সিজদানত হবার হুকুম দেয়া হয়েছিল। এর ধরনটা কিছুটা এই রকমেরই ছিল। হতে পারে কেবল বিজিত হয়ে যাওয়াকেই হয়তো বা সিজদা শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। আবার অনুগত হয়ে যাওয়ার লক্ষণ হিসেবে তার বাহ্যিক প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এটাও সম্ভবপর। তবে এটাই বেশী সঠিক বলে মনে হয়।

৪৬. 'ইবলিস' শব্দের অর্থ হচ্ছে, "চরম হতাশ।" আর পারিভাষিক অর্থে এমন একটি জিনকে ইবলিস বলা হয় যে আল্লাহর হুকুমের নাফরমানি করে আদম ও আদম সন্তানদের অনুগত ও তাদের জন্য বিজিত হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। মানবজাতিকে পথভ্রষ্ট করার ও কিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে ভুল পথে চলার প্রেরণা দান করার জন্য সে আল্লাহর কাছে সময় ও সুযোগ প্রার্থনা করেছিল। আসলে শয়তান ও ইবলিস নিছক কোন জড় শক্তি পিণ্ডের নাম নয়। বরং সেও মানুষের মতো একটি কায়া সম্পন্ন প্রাণীসত্তা। তা ছাড়া সে ফেরেশতাদের অন্তরভুক্ত ছিল, এ ভুল ধারণাও কারো না থাকা উচিত। কারণ পরবর্তী আলোচনাগুলোয় কুরআন নিজেই তার জিনদের অন্তরভুক্ত থাকার এবং ফেরেশতাদের থেকে আলাদা একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য পরিবেশন করেছে।

৪৭. এই শব্দগুলো থেকে মনে হয় সম্ভবত শয়তান একা সিজদা করতে অস্বীকার করেনি। বরং তার সাথে জিনদের একটি দলই আল্লাহর নাফরমানি করতে প্রস্তুত হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে একমাত্র শয়তানের নাম নেয়া হয়েছে তাদের নেতা হবার এবং বিদ্রোহের ক্ষেত্রে সবার চেয়ে বেশী অগ্রসর থাকার কারণে। কিন্তু এই আয়াতটির আর একটি অনুবাদও হতে পারে। সেটি হচ্ছে ঃ 'সে ছিল কাফেরদের অন্তরভুক্ত।' এ অবস্থায় এর অর্থ হবে ঃ পূর্ব থেকেই জিনদের মধ্যে একটি বিদ্রোহী ও নাফরমান দল ছিল এবং ইবলিস এই দলের অন্তরভুক্ত ছিল। কুরআনে সাধারণভাবে 'শায়াতীন' (শয়তানরা) শব্দটি এসব জিন ও তাদের বংশধরদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আর কুরআনের যেখানে 'শায়াতীন' শব্দের অর্থ 'মানুষ' বুঝার জন্য কোন স্পষ্ট নিদর্শন ও প্রমাণ নেই সেখানে এর অর্থ হবে জিন শয়তান।

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ
شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٥﴾ فَاَزَلَّهُمَا
الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۪ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٣٦﴾

তখন আমরা আদমকে বললাম, "তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়েই জান্নাতে থাকো এবং এখানে স্বাচ্ছন্দের সাথে ইচ্ছেমতো খেতে থাকো, তবে এই গাছটির কাছে যেয়ো না।[৪৮] অন্যথায় তোমরা দু'জন যালেমদের[৪৯] অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে।" শেষ পর্যন্ত শয়তান তাদেরকে সেই গাছটির লোভ দেখিয়ে আমার হুকুমের আনুগত্য থেকে সরিয়ে দিল এবং যে অবস্থার মধ্যে তারা ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে ছাড়লো। আমি আদেশ করলাম, "এখন তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু।[৫০] তোমাদের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করতে ও জীবন অতিবাহিত করতে হবে।"

৪৮. এ থেকে জানা যায়, পৃথিবীতে অর্থাৎ নিজের কর্মস্থলে খলীফা নিযুক্ত করে পাঠাবার আগে মানসিক প্রবণতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে তাদের দু'জনকে পরীক্ষা করার জন্য জান্নাতে রাখা হয়। তাদেরকে এভাবে পরীক্ষা করার জন্য একটি গাছ বাছাই করা হয়। হুকুম দেয়া হয়, ঐ গাছটির কাছে যেয়ো না। গাছটির কাছে গেলে তার পরিণাম কি হবে তাও বলে দেয়া হয়। বলে দেয়া হয়, এমনটি করলে আমার দৃষ্টিতে তোমরা যালেম হিসেবে গণ্য হবে। সে গাছটি কি ছিল এবং তার মধ্যে এমন কি বিষয় ছিল যেজন্য তার কাছে যেতে নিষেধ করা হয়—এ বিতর্ক এখানে অবান্তর। নিষেধ করার কারণ এ ছিল না যে, গাছটি প্রকৃতিগতভাবে এমন কোন দোষদুষ্ট ছিল যার ফলে তার কাছে গেলে আদম ও হাওয়ার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিল। আসল উদ্দেশ্য ছিল আদম ও হাওয়ার পরীক্ষা। শয়তানের প্রলোভনের মোকাবিলায় তারা আল্লাহর এই হুকুমটি কতটুকু মেনে চলে তা দেখা। এই উদ্দেশ্যে কোন একটি জিনিস নির্বাচন করাই যথেষ্ট ছিল। তাই আল্লাহ কেবল একটি গাছের নাম নিয়েছেন, তার প্রকৃতি সম্পর্কে কোন কথাই বলেননি।

এই পরীক্ষার জন্য জান্নাতই ছিল সবচেয়ে উপযোগী স্থান। আসলে জান্নাতকে পরীক্ষাগৃহ করার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, মানবিক মর্যাদার প্রেক্ষিতে তোমাদের জন্য জান্নাতই উপযোগী স্থান। কিন্তু শয়তানের প্রলোভনে পড়ে যদি তোমরা আল্লাহর নাফরমানির পথে এগিয়ে যেতে থাকো তাহলে যেভাবে শুরুতে তোমরা এ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলে তেমনি শেষেও বঞ্চিত হবে। তোমাদের উপযোগী এই আবাসস্থলটি এবং এই হারানো ফিরদৌসটি লাভ করতে হলে তোমাদের অবশ্যি নিজেদের

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾

তখন আদম তার রবের কাছ থেকে কয়েকটি বাক্য শিখে নিয়ে তাওবা করলো।[৫১] তার রব তার এই তাওবা কবুল করে নিলেন। কারণ তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।[৫২]

সেই দুশমনের সফল মোকাবিলা করতে হবে, যে তোমাদেরকে আল্লাহর হুকুম মেনে চলার পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

৪৯. যালেম শব্দটি গভীর অর্থবোধক। 'যুলুম' বলা হয় অধিকার হরণকে। যে ব্যক্তি কারো অধিকার হরণ করে সে যালেম। যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম পালন করে না, তাঁর নাফরমানি করে সে আসলে তিনটি বড় বড় মৌলিক অধিকার হরণ করে। প্রথমত সে আল্লাহর অধিকার হরণ করে। কারণ আল্লাহর হুকুম পালন করতে হবে, এটা আল্লাহর অধিকার। দ্বিতীয়ত এই নাফরমানি করতে গিয়ে সে যে সমস্ত জিনিস ব্যবহার করে তাদের সবার অধিকার সে হরণ করে তার দেহের অংগ-প্রত্যংগ, স্নায়ু মণ্ডলী, তার সাথে বসবাসকারী সমাজের অন্যান্য লোক, তার ইচ্ছা ও সংকল্প পূর্ণ করার ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশতাগণ এবং যে জিনিসগুলো সে তার কাজে ব্যবহার করে—এদের সবার তার ওপর অধিকার ছিল, এদেরকে কেবলমাত্র এদের মালিকের ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু যখন তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে তাদের ওপর নিজের কর্তৃত্ব ব্যবহার করে তখন সে আসলে তাদের ওপর যুলুম করে। তৃতীয়ত তার নিজের অধিকার হরণ করে। কারণ তার ওপর তার আপন সত্তাকে ধ্বংস থেকে বাঁচবার অধিকার আছে। কিন্তু নাফরমানি করে যখন সে নিজেকে আল্লাহর শাস্তিলাভের অধিকারী করে তখন সে আসলে নিজের ব্যক্তি সত্তার ওপর যুলুম করে। এসব কারণে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে 'গোনাহ' শব্দটির জন্য যুলুম এবং 'গোনাহগার' শব্দটির জন্য যালেম পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

৫০. অর্থাৎ মানুষের শত্রু শয়তান এবং শয়তানের শত্রু মানুষ। শয়তান মানুষের শত্রু, একথা তো সুস্পষ্ট। কারণ সে মানুষকে আল্লাহর হুকুম পালনের পথ থেকে সরিয়ে রাখার এবং ধ্বংসের পথে পরিচালনা করার চেষ্টা করে। কিন্তু শয়তানের শত্রু মানুষ, একথার অর্থ কি? আসলে শয়তানের প্রতি শত্রুতার মনোভাব পোষণ করাই তো মানবতার দাবী। কিন্তু প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার সামনে সে যে সমস্ত প্রলোভন এনে হাযির করে মানুষ সেগুলোর দ্বারা প্রতারিত হয়ে তাকে নিজের বন্ধু ভেবে বসে। এই ধরনের বন্ধুত্বের অর্থ এ নয় যে, প্রকৃতপক্ষে শত্রুতা বন্ধুত্বে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, এক শত্রু আর এক শত্রুর হাতে পরাজিত হয়েছে এবং তার জালে ফেঁসে গেছে।

৫১. অর্থাৎ আদম (আ) যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন, তিনি আল্লাহর নাফরমানির পথ পরিহার করে তাঁর হুকুম মেনে চলার পথ অবলম্বন করতে চাইলেন এবং তাঁর মনে যখন নিজের রবের কাছে নিজের গোনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার আকাংখা জাগলো তখন ক্ষমা প্রার্থনা করার ভাষা তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাঁর অবস্থা দেখে আল্লাহ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনার ভাষা তাঁকে শিখিয়ে দিলেন।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٨﴾

আমরা বললাম, "তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও।[৫৩] এরপর যখন আমার পক্ষ থেকে কোন হিদায়াত তোমাদের কাছে পৌঁছবে তখন যারা আমার সেই হিদায়াতের অনুসরণ করবে তাদের জন্য থাকবে না কোন ভয় দুঃখ বেদনা।

তাওবার আসল অর্থ হচ্ছে ফিরে আসা। বান্দার পক্ষ থেকে তাওবার অর্থ হচ্ছে এই যে, সে সীমালংঘন ও বিদ্রোহের পথ পরিহার করে বন্দেগীর পথে পা বাড়িয়েছে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওবা করার অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি নিজের লজ্জিত ও অনুতপ্ত দাসের প্রতি অনুগ্রহ সহকারে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং বান্দার প্রতি তাঁর দান পুনরায় বর্ষিত হতে শুরু করেছে।

৫২. গোনাহর ফল অনিবার্য এবং মানুষকে অবশ্যি তা ভোগ করতে হবে, কুরআন এ মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। এটা মানুষের মনগড়া ভুল মতবাদগুলোর মধ্যে একটি বড়ই বিভ্রান্তিকর মতবাদ। কারণ যে ব্যক্তি একবার গোনাহে লিপ্ত হয়েছে এই মতবাদ তাকে চিরকালের জন্য হতাশার সাগরে নিক্ষেপ করে। একবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে এ ব্যক্তি যদি তার অতীতের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় এবং ভবিষ্যতে সৎ-সুন্দর জীবন যাপন করতে আগ্রহী হয়, তাহলে এই মতবাদ তাকে বলে তোমার বাঁচার কোন আশা নেই, যা কিছু তুমি করে এসেছো তার ফল অবশ্যি তোমাকে ভোগ করতে হবে। এর বিপরীত পক্ষে কুরআন বলে, সৎকাজের পুরস্কার ও অসৎকাজের শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে। তোমরা যে সৎকাজের পুরস্কার পাও সেটা তোমাদের সৎকাজের স্বাভাবিক ফল নয়। সেটা আল্লাহর দান। তিনি চাইলে দান করতে পারেন, চাইলে নাও করতে পারেন। অনুরূপভাবে তোমরা যে অসৎকাজের শাস্তি লাভ করো সেটা তোমাদের অসৎকাজের অনিবার্য ফল নয় বরং এ ব্যাপারে আল্লাহর ক্ষমতা ও ইখতিয়ার রয়েছে, তিনি চাইলে ক্ষমা করতে এবং চাইলে শাস্তি দিতে পারেন। তবে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত তাঁর জ্ঞানের সাথে গভীর সূত্রে আবদ্ধ, তিনি জ্ঞানী হবার কারণে তাঁর ক্ষমতা কর্তৃত্ব অন্ধের মতো ব্যবহার করেন না। কোন সৎকাজের পুরস্কার দেয়ার সময় বান্দা অন্তরিকতা সহকারে, সাধ্য নিয়তে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এই সৎকাজটি করেছে, এ বিষয়টি বিবেচনা করেই তিনি তাকে পুরস্কৃত করেন। আর কোন সৎকাজকে প্রত্যাখ্যান করলে এই উদ্দেশ্যে করেন যে, তার বাইরের রূপটি হয়তো ঠিক সৎকাজের মতোই কিন্তু তার ভেতরে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নির্ভেজাল প্রেরণা ও ভাবধারা কার্যকর ছিল না। অনুরূপভাবে বিদ্রোহাত্মক ধৃষ্টতা সহকারে কোন অসৎকাজ করা হলে তার পেছনে যদি লজ্জার মনোভাবের পরিবর্তে আরো বেশী অপরাধ করার প্রবণতা সক্রিয় থাকে তাহলে এ ধরনের অপরাধের তিনি শাস্তি দিয়ে থাকেন। আর যে অসৎকাজ করার পর বান্দা লজ্জিত হয় এবং ভবিষ্যতে নিজের সংশোধন প্রয়াসী হয় এই ধরনের অসৎকাজে ত্রুটি তিনি নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দেন। মারাত্মক ধরনের অপরাধী কট্টর কাফেরের জন্যও আল্লাহর

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

আর যারা একে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে এবং আমার আয়াতকে[৫৪] মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবে তারা হবে আগুনের মধ্যে প্রবেশকারী। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।[৫৫]

দরবার থেকে নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। তবে শর্ত হচ্ছে, সে যদি তার অপরাধ স্বীকার করে, নিজের নাফরমানির জন্য লজ্জিত হয় এবং বিদ্রোহের মনোভাব ত্যাগ করে আনুগত্যের পথে এগিয়ে চলতে প্রস্তুত হয়, তাহলে আল্লাহ তার গোনাহ ও ত্রুটি মাফ করে দেবেন।

৫৩. এই বাক্যটির পুনরাবৃত্তি তাৎপর্যপূর্ণ। আগের বাক্যে বলা হয়েছে আদম তাওবা করলেন এবং আল্লাহ তা কবুল করে নিলেন। এর অর্থ এই দাঁড়ালো, আদম তাঁর নাফরমানির জন্য আযাবের হকদার হলেন না। গোনাহগারীর যে দাগ তাঁর গায়ে লেগেছিল তা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। না এ দাগের কোন চিহ্ন তাঁর বা তাঁর বংশধরদের গায়ে রইলো, ফলে আর না এ প্রয়োজন হলো যে, আল্লাহর—একমাত্র পুত্রকে (মায়াযাল্লাহ) (নাউযুবিল্লাহ) বনী আদমের গোনাহর কাফফারাহ আদায় করার জন্য দুনিয়াতে পাঠিয়ে শূলে চড়াতে হলো। বিপরীত পক্ষে মহান আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামের কেবল তাওবাই কবুল করে ক্ষান্ত হননি এবং এরপর আবার তাঁকে নবুওয়াতও দান করলেন। এভাবে তিনি নিজের বংশধরদেরকে সত্য-সহজ পথ দেখিয়ে গেলেন।

এখানে আবার জান্নাত থেকে বের করে দেয়ার হুকুমের পুনরাবৃত্তি করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, আদমকে পৃথিবীতে না নামিয়ে জান্নাতে রেখে দেয়া তাওবা কবুলিয়াতের অপরিহার্য দাবী ছিল না। পৃথিবী তাঁর জন্য দারুল আযাব বা শস্তির আবাস ছিল না। শাস্তি দেয়ার জন্য তাঁকে এখানে পাঠানো হয়নি। বরং তাঁকে পৃথিবীতে খিলাফত দান করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। জান্নাত তাঁর আসল কর্মস্থল ছিল না। সেখান থেকে বের করে দেয়ার হুকুম তাঁকে শাস্তি দেয়ার পর্যায়ভুক্ত ছিল না। তাঁকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়াটাই ছিল মূল পরিকল্পনার অন্তরভুক্ত। তবে এর আগে ৪৮নং টীকায় যে পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই পরীক্ষার জন্যই তাকে জান্নাতে রাখা হয়েছিল

৫৪. আরবীতে আয়াতের আসল মানে হচ্ছে নিশানী বা আলামত। এই নিশানী কোন জিনিসের পক্ষ থেকে পথনির্দেশ দেয়। কুরআনে এই শব্দটি চারটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও এর অর্থ হয়েছে নিছক আলামত বা নিশানী। কোথাও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহকে বলা হয়েছে আল্লাহর আয়াত। কারণ এই বিশ্ব-জাহানের অসীম ক্ষমতাধর আল্লাহর সৃষ্ট প্রতিটি বস্তুই তার বাহ্যিক কাঠামোর অভ্যন্তরে নিহিত সত্যের প্রতি ইংগিত করছে। কোথাও নবী-রসূলগণ যেসব 'মু'জিযা' (অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম) দেখিয়েছেন সেগুলোকে বলা হয়েছে আল্লাহর আয়াত। কারণ এ নবী-রসূলগণ যে

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٤٠﴾

৫ রুকূ'

হে বনী ইসরাঈল![৫৬] আমার সেই নিয়ামতের কথা মনে করো, যা আমি তোমাদের দান করেছিলাম, আমার সাথে তোমাদের যে অংগীকার ছিল, তা পূর্ণ করো, তা হলে তোমাদের সাথে আমার যে অংগীকার ছিল, তা আমি পূর্ণ করবো এবং তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয় করো।

এ বিশ্ব-জাহানের সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন প্রভুর প্রতিনিধি এই মু'জিযাগুলো ছিল আসলে তারই প্রমাণ ও আলামত। কোথাও কুরআনের বাক্যগুলোকে আয়াত বলা হয়েছে। কারণ এ বাক্যগুলো কেবল সত্যের দিকে পরিচালিত করেই ক্ষান্ত নয় বরং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কোন কিতাবই এসেছে, তার কেবল বিষয়বস্তুই নয়, শব্দ, বর্ণনাভংগী ও বাক্য গঠনরীতির মধ্যেও এই গ্রন্থের মহান মহিমান্বিত রচয়িতার অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়েছে। কোথায় 'আয়াত' শব্দটির কোন্ অর্থ গ্রহণ করতে হবে তা বাক্যের পূর্বাপর আলোচনা থেকে সর্বত্র সুস্পষ্টভাবে জানা যায়।

৫৫. এটা হচ্ছে সৃষ্টির প্রথম থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির জন্য আল্লাহর স্থায়ী ফরমান। তৃতীয় রুকূ'তে এটিকেই আল্লাহর 'অংগীকার' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। নিজেই নিজের পথ তৈরি করে নেয়া মানুষের কাজ নয়। বরং একদিকে বান্দা এবং অন্যদিকে খলীফার দ্বিবিধ ভূমিকা পালনের লক্ষে তার রব-নির্ধারিত পথের অনুসরণ করার জন্যই সে নিযুক্ত হয়েছে। দু'টো উপায়ে এ পথের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এক, কোন মানুষের কাছে সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী আসতে পারে। দুই, অথবা যে মানুষটির কাছে অহী এসেছে, তার অনুসরণ করা যেতে পারে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের তৃতীয় কোন পথ নেই। এ দু'টি পথ ছাড়া বাদবাকি সমস্ত পথই মিথ্যা ও ভুল। শুধু ভুলই নয়, প্রত্যক্ষ বিদ্রোহের পথও। আর এর শাস্তি জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নয়।

কুরআন মজীদের সাতটি জায়গায় আদমের জন্ম ও মানব জাতির সূচনা কালের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। এ সাতটি জায়গার মধ্যে এটিই হচ্ছে প্রথম এবং আর ছয়টি জায়গা হচ্ছে ঃ সূরা আল আ'রাফ ২য় রুকূ', আল হিজর ৩য় রুকূ', বনী ইসরাঈল ৭ম রুকূ', আল কাহাফ ৭ম রুকূ', তা-হা ৭ম রুকূ' এবং সা'দ ৫ম রুকূ'। বাইবেলের জন্ম অধ্যায়ের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদেও এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বাইবেল ও কুরআন উভয়ের বর্ণনার তুলনা করার পর একজন বিবেকবান ও সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি নিজেই উভয় কিতাবের পার্থক্য অনুধাবন করতে পারবেন।

আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টিকালীন আল্লাহ ও ফেরেশতাদের মধ্যকার কথাবার্তার বর্ণনা তালমূদেও উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু কুরআন বর্ণিত কাহিনীতে যে গভীর অন্তরনিহিত প্রাণসত্তার সন্ধান পাওয়া যায়, সেখানে তা অনুপস্থিত। বরং সেখানে কিছু রসাত্মক

আলাপও পাওয়া যায়। যেমন, ফেরেশতারা আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মানুষকে কেন সৃষ্টি করা হচ্ছে?' জবাবে আল্লাহ বললেন, 'এ জন্য যে, তাদের মধ্যে সৎলোক জন্ম নেবে।' অসৎলোকদের কথা আল্লাহ বললেন না। অন্যথায় ফেরেশতারা মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহর পরিকল্পনার পক্ষে অনুমোদন দিতেন না। [Talmudic Miscellany, Paul Issac Herson, London 1880, P. 294-95]

৫৬. 'ইসরাঈল' শব্দের অর্থ হচ্ছে আবদুল্লাহ বা আল্লাহর বান্দা। এটি হযরত ইয়াকূব আলাইহিস সালামের উপাধি। আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি এ উপাধিটি লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত ইসহাক আলাইহিস সালামের পুত্র ও ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রপুত্র। তাঁরই বংশধরকে বলা হয় বনী ইসরাঈল। আগের চারটি রুকূ'তে যে ভাষণ পেশ করা হয়েছে তা একটি ভূমিকামূলক ভাষণ। এই ভাষণে সাধারণভাবে সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এখন এই পঞ্চম রুকূ' থেকে চৌদ্দ রুকূ' পর্যন্ত যে ভাষণ চলছে, এটি একটি ধারাবাহিক ভাষণ। এই ভাষণে মূলত বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করা হয়েছে। তবে মাঝে মধ্যে কোথাও কোথাও খৃষ্টান ও আরবের মুশরিকদের দিকে লক্ষ করেও কথা বলা হয়েছে। আবার সুবিধেমতো কোথাও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে যারা ইসলামের ওপর ঈমান এনেছিল তাদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে। এ ভাষণটি পড়ার সময় নিম্নোক্ত কথাগুলো বিশেষভাবে সামনে রাখতে হবে ঃ

এক ঃ পূর্ববর্তী নবীদের উম্মাতের মধ্যে এখনো কিছু সংখ্যক সত্যনিষ্ঠ এবং সৎবৃত্তি ও সদিচ্ছাসম্পন্ন লোক রয়ে গেছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে সত্যের আহবায়ক এবং যে আন্দোলনের মহানায়ক করে পাঠানো হয়েছে তাদেরকে তাঁর প্রতি ঈমান আনার এবং তাঁর আন্দোলনে শরীক হবার জন্য আহবান জানানোই এ ভাষণের উদ্দেশ্য। তাই তাদের বলা হচ্ছে, ইতিপূর্বে তোমাদের নবীগণ এবং তোমাদের কাছে আগত সহীফাগুলো যে দাওয়াত ও আন্দোলন নিয়ে বার বার এসেছিল এই কুরআন ও এই নবী সেই একই দাওয়াত ও আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। প্রথমে এটি তোমাদেরকেই দেয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, তোমরা নিজেরা এ পথে চলবে এবং অন্যদেরকেও এদিকে আহবান জানাবে এবং এ পথে চালাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু অন্যদেরকে পথ দেখানো তো দূরের কথা তোমরা নিজেরাই সে পথে চলছো না। তোমরা বিকৃতির পথেই এগিয়ে চলছো। তোমাদের ইতিহাস এবং তোমাদের জাতির বর্তমান নৈতিক ও দীনি অবস্থাই তোমাদের বিকৃতির সাক্ষ দিয়ে চলছে। এখন আল্লাহ সেই একই জিনিস দিয়ে তাঁর এক বান্দাকে পাঠিয়েছেন এটি কোন নতুন ও অজানা জিনিস নয়। তোমাদের নিজেদের জিনিস। কাজেই জেনে-বুঝে সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করো না। বরং তাকে মেনে নাও। যে কাজ তোমাদের করার ছিল কিন্তু তোমরা করোনি। সেই কাজ আজ অন্যেরা করার জন্য এগিয়ে এসেছে। তোমরা তাদের সাথে সহযোগিতা করো।

দুই ঃ সাধারণ ইহুদিদের কাছে চূড়ান্ত কথা বলে দেয়া এবং তাদের দীনি ও নৈতিক অবস্থাকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরাই এর উদ্দেশ্য। তোমাদের নবীগণ যে দীনের পতাকাবাহী ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে দীনেরই দাওয়াত দিচ্ছেন—একথাটিই তাদের সামনে প্রমাণ করা হয়েছে। দীনের মূলনীতির মধ্যে এমন

একটি বিষয়ও নেই যেখানে কুরআনের শিক্ষা তাওরাতের শিক্ষা থেকে আলাদা—একথাই তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। তাদের সামনে একথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, তোমাদের যে বিধান দান করা হয়েছিল তার আনুগত্য করার এবং নেতৃত্বের যে দায়িত্ব তোমাদেরকে ওপর অর্পণ করা হয়েছিল তার হক আদায় করার ব্যাপারে তোমরা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছো। এমন সব ঘটনাবলী থেকে এর সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যার প্রতিবাদ করা তাদের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর ছিল না। আবার সত্যকে জানার পরও যেভাবে তারা তার বিরোধিতায় চক্রান্ত, বিভ্রান্তি সৃষ্টি, হঠধর্মিতা, কূটতর্ক ও প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছিল এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিশনকে সফলকাম হতে না দেয়ার জন্য যেমন পদ্ধতি অবলম্বন করছিল তা সবই ফাঁস করে দেয়া হয়েছে। এ থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তাদের বাহ্যিক ধার্মিকতা নিছক একটি ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়। এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে বিশ্বস্ততা ও সত্যনিষ্ঠার পরিবর্তে হঠধর্মিতা, অজ্ঞতা ও মূর্খতাপ্রসূত বিদ্বেষ ও স্বার্থান্ধতা। আসলে সৎকর্মশীলতার কোন কাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধি তারা চায় না। এভাবে চূড়ান্ত কথা বলে দেয়ায় যে সুফল হয়েছে তা হচ্ছে এই যে একদিকে ঐ জাতির মধ্যে যেসব সৎলোক ছিল তাদের চোখ খুলে গেছে এবং অন্যদিকে মদীনার জনগণের বিশেষ করে আরবদেশের মুশরিকদের ওপর তাদের যে ধর্মীয় ও নৈতিক প্রভাব ছিল, তা খতম হয়ে গেছে। তৃতীয়ত নিজেদের আবরণহীন চেহারা দেখে তারা নিজেরাই হিম্মতহারা হয়ে পড়েছে। ফলে নিজের সত্যপন্থী হবার ব্যাপারে যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ রূপে নিশ্চিত সে যেমন সৎসাহস ও দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলায় এগিয়ে আসে তেমনটি করা তাদের পক্ষে কোনদিন সম্ভব হয়নি।

তিন ঃ আগের চারটি রুকূ'তে সমগ্র মানবজাতিকে সাধারণভাবে দাওয়াত দিয়ে যেসব কথা বলা হয়েছিল সে একই প্রসংগে যে জাতি আল্লাহ প্রেরিত বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তেমনি একটি বিশেষ জাতির বিশেষ দৃষ্টান্ত দিয়ে তার পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে বক্তব্য সুস্পষ্ট করার জন্য বনী ইসরাঈলকে বাছাই করার একটি বিশেষ কারণ রয়েছে। পৃথিবীর অসংখ্য জাতিদের মধ্যে বর্তমান বিশ্বে একমাত্র বনী ইসরাঈলই ক্রমাগত চার হাজার বছর থেকে সমগ্র মানবজাতির সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে বেঁচে আছে। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করার পথে কোন জাতির জীবনে যত চড়াই উতরাই আসতে পারে তার সবগুলোরই সন্ধান পাই আমরা এ জাতিটির মর্মান্তিক ইতিকথায়।

চার ঃ মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের শিক্ষা দেয়াই এর উদ্দেশ্য। পূর্ববর্তী নবীদের উম্মাতরা অধপতনের যে গভীর গর্তে পড়ে গিয়েছিল তা থেকে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে রক্ষা করাই এর লক্ষ। ইহুদিদের নৈতিক দুর্বলতা, ধর্মীয় বিভ্রান্তি এবং বিশ্বাস ও কর্মের গলদগুলোর মধ্য থেকে প্রতিটির দিকে অংগুলি নির্দেশ করে তার মোকাবিলায় আল্লাহর সত্য দীনের দাবীসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে মুসলমানরা পরিষ্কারভাবে নিজেদের পথ দেখে নিতে পারবে এবং ভুল পথ থেকে দূরে থাকতে সক্ষম হবে। এ প্রসংগে ইহুদি ও খৃষ্টানদের সমালোচনা করে কুরআন যা কিছু বলেছে সেগুলো পড়ার সময় মুসলমানদের অবশ্যি নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বিখ্যাত হাদীস মনে রাখা উচিত। হাদীসটিতে তিনি বলেছেন ঃ তোমরাও অবশেষে পূর্ববর্তী উম্মাতদের কর্মনীতির অনুসরণ করবেই। এমন কি তারা যদি কোন গো-সাপের গর্তে

وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍ
بِهٖ ۪ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۠ وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ﴿٤١﴾ وَلَا تَلْبِسُوا
الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾

আর আমি যে কিতাব পাঠিয়েছি তার ওপর ঈমান আন। তোমাদের কাছে আগে থেকেই যে কিতাব ছিল এটি তার সত্যতা সমর্থনকারী। কাজেই সবার আগে তোমরাই এর অস্বীকারকারী হয়ো না। সামান্য দামে আমার আয়াত বিক্রি করো না।[৫৭] আমার গযব থেকে আত্মরক্ষা করো। মিথ্যার রঙে রাঙিয়ে সত্যকে সন্দেহযুক্ত করো না এবং জেনে বুঝে সত্যকে গোপন করার চেষ্টা করো না।[৫৮]

ঢুকে থাকে, তাহলে তোমরাও তার মধ্যে ঢুকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি ইহুদি ও খৃষ্টানদের কথা বলছেন? জবাব দিলেন, তাছাড়া আর কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তিটি কেবলমাত্র একটি ভীতি প্রদর্শনই ছিল না বরং আল্লাহ প্রদত্ত গভীর অন্তরদৃষ্টির মাধ্যমে তিনি জানতে পেরেছিলেন, বিভিন্ন নবীর উম্মাতের মধ্যে বিকৃতি এসেছিল কোন্ কোন্ পথে এবং কোন্ আকৃতিতে তার প্রকাশ ঘটেছিল।

৫৭. 'সামান্য দাম' বলে দুনিয়ার স্বার্থ ও লাভের কথা বুঝানো হয়েছে। এর বিনিময়ে মানুষ আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যান করছিল। সত্যকে বিক্রি করে তার বিনিময়ে সারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ হাসিল করলেও তা আসলে সামান্য দামই গণ্য হবে। কারণ সত্য নিসন্দেহে তার চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান।

৫৮. এ আয়াতটির অর্থ বুঝার জন্য সমকালীন আরবের শিক্ষাগত অবস্থাটা সামনে থাকা দরকার। আরববাসীরা সাধারণভাবে ছিল অশিক্ষিত। তাদের তুলনায় ইহুদিদের মধ্যে এমনিতেই শিক্ষার চর্চা ছিল অনেক বেশী। তাছাড়াও ব্যক্তিগত পর্যায়ে ইহুদিদের মধ্যে এমন অনেক বড় বড় আলেম ছিলেন যাদের খ্যাতি আরবের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিশ্ব পর্যায়েও ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই আরবদের ওপর ইহুদিদের 'জ্ঞানগত' প্রতিপত্তি ছিল অনেক বেশী। এর ওপর ছিল আবার তাদের উলামা ও মাশায়েখের ধর্মীয় দরবারের বাহ্যিক শান-শওকত। এসব জাঁকালো দরবারে বসে তারা ঝাঁড়-ফুঁক, দোয়া-তাবিজ ইত্যাদির কারবার চালিয়েও জনগণের ওপর নিজেদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি গভীরতর ও ব্যাপকতর করেছিলেন। বিশেষ করে মদীনাবাসীদের ওপর তাদের প্রভাব ছিল প্রচণ্ড। কারণ তাদের আশেপাশে ছিল বড় বড় ইহুদি গোত্রের আবাস। ইহুদিদের সাথে তাদের রাতদিন ওঠাবসা ও মেলামেশা চলতো। একটি অশিক্ষিত জনবসতি যেমন তার চাইতে বেশী শিক্ষিত, বেশী সংস্কৃতিবান ও বেশী সুস্পষ্ট ধর্মীয় গুণাবলীর অধিকারী প্রতিবেশীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, এই মেলামেশায় মদীনাবাসীরাও ঠিক তেমনি ইহুদিদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল। এ অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নিজেকে নবী হিসেবে পেশ

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾
اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا
عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿٤٥﴾ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ
اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿٤٦﴾

নামায কায়েম করো, যাকাত দাও[৫৯] এবং যারা আমার সামনে অবনত হচ্ছে তাদের সাথে তোমরাও অবনত হও। তোমরা অন্যদের সৎকর্মশীলতার পথ অবলম্বন করতে বলো কিন্তু নিজেদের কথা ভুলে যাও। অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করে থাকো। তোমরা কি জ্ঞান বুদ্ধি একটুও কাজে লাগাও না? সবর ও নামায সহকারে সাহায্য নাও।[৬০] নিসন্দেহে নামায বড়ই কঠিন কাজ, কিন্তু সেসব অনুগত বান্দাদের জন্য কঠিন নয় যারা মনে করে, সবশেষে তাদের মিলতে হবে তাদের রবের সাথে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।[৬১]

করলেন এবং লোকদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে থাকলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই অশিক্ষিত আরবরা আহলে কিতাব ইহুদিদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতো, "আপনারাও তো একজন নবীর অনুসারী এবং একটি আসমানী কিতাব মেনে চলেন, আপনারাই বলুন, আমাদের মধ্যে এই যে ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করছেন তাঁর এবং তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি?" মক্কার লোকেরাও ইতিপূর্বে ইহুদিদের কাছে এ প্রশ্নটি বার বার করেছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আসার পর এখানেও বহু লোক ইহুদি আলেমদের কাছে গিয়ে একথা জিজ্ঞেস করতো। কিন্তু ইহুদি আলেমরা কখনো এর জবাবে সত্য কথা বলেনি। তাহা মিথ্যা কথা বলা তাদের জন্য কঠিন ছিল। যেমন, মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তাওহীদ পেশ করছেন তা মিথ্যা। অথবা আম্বিয়া, আসমানী গ্রন্থসমূহ, ফেরেশতা ও আখেরাত সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সঠিক নয়। অথবা তিনি যে নৈতিক মূলনীতি শিক্ষা দিচ্ছেন তার মধ্যে কোন গলদ রয়ে গেছে। তবে যা কিছু তিনি পেশ করছেন তা সঠিক ও নির্ভুল—এ ধরনের স্পষ্ট ভাষায় সত্যের স্বীকৃতি দিতেও তারা প্রস্তুত ছিল না তারা প্রকাশ্যে সত্যের প্রতিবাদ করতে পারছিল না আবার সোজাসুজি তাকে সত্য বলে মেনে নিতেও প্রস্তুত ছিল না। এ দু'টি পথের মাঝখানে তারা তৃতীয় একটি পথ অবলম্বন করলো। প্রত্যেক প্রশ্নকারীর মনে তারা নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর জামায়াত ও তাঁর মিশনের বিরুদ্ধে কোন না কোন অসঅসা-প্ররোচনা দিয়ে দিত। তাঁর বিরুদ্ধে কোন না কোন অভিযোগ আনতো, এমন

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ
فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ
شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٨﴾

৬ রুকূ'

হে বনী ইসরাঈল! আমার সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আমি তোমাদের দান করেছিলাম এবং একথাটিও যে, আমি দুনিয়ার সমস্ত জাতিদের ওপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম।[৬২] *আর ভয় করো সেই দিনকে যেদিন কেউ কারো সামান্যতমও কাজে লাগবে না, কারো পক্ষ থেকে সুপারিশ গৃহীত হবে না, বিনিময় নিয়ে কাউকে ছেড়ে দেয়া হবে না এবং অপরাধীরা কোথাও থেকে সাহায্য লাভ করতে পারবে না।*[৬৩]

কোন ইংগিতপূর্ণ কথা বলতো যার ফলে লোকেরা সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে পড়ে যেতো। এভাবে তারা মানুষের মনে সন্দেহ ও সংশয়ের বীজ বপন করে তাদেরকে তার বেড়াজালে আটকে রাখতে এবং তাদের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদেরকেও আটকাতে চাইতো। তাদের এ দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতির কারণে তাদেরকে বলা হচ্ছে ঃ সত্যের গায়ে মিথ্যার আবরণ চড়িয়ে দিয়ো না। নিজেদের মিথ্যা প্রচারণা এবং শয়তানী সন্দেহ-সংশয় আপত্তির সাহায্যে সত্যকে দাবিয়ে ও লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করো না। সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে দুনিয়াবাসীকে প্রতারিত করো না।

৫৯. নামায ও যাকাত প্রতি যুগে দীন ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। অন্যান্য সব নবীদের মতো বনী ইসরাঈলদের নবীরাও এর প্রতি কঠোর তাগিদ দিয়েছিলেন। কিন্তু ইহুদিরা এ ব্যাপারে গাফেল হয়ে পড়েছিল। তাদের সমাজে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ব্যবস্থাপনা প্রায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছেল। বেশীর ভাগ লোক ব্যক্তিগত পর্যায়েও নামায ছেড়ে দিয়েছিল। আর যাকাত দেয়ার পরিবর্তে তারা সুদ খেতো।

৬০. অর্থাৎ যদি সৎকর্মশীলতার পথে চলা তোমরা কঠিন মনে করে থাকো তাহলে সবর ও নামায এই কাঠিন্য দূর করতে পারে। এদের সহায্যে শক্তি সঞ্চয় করলে এ কঠিন পথ পাড়ি দেয়া তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে।

সবর শব্দটির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, বাধা দেয়া, বিরত রাখা ও বেঁধে রাখা। এ ক্ষেত্রে মজবুত ইচ্ছা, অবিচল সংকল্প ও প্রবৃত্তির আশা-আকাংখাকে এমনভাবে শৃংখলাবদ্ধ করা বুঝায়, যার ফলে এক ব্যক্তি প্রবৃত্তির তাড়না ও বাইরের সমস্যাবলীর মোকাবিলায় নিজের হৃদয় ও বিবেকের পছন্দনীয় পথে অনবরত এগিয়ে যেতে থাকে। এখানে আল্লাহর এ

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ
مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا
آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٠﴾

স্মরণ করো সেই সময়ের কথা[৬৪] যখন আমরা ফেরাউনী দলের[৬৫] দাসত্ব থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছিলাম। তারা তোমাদের কঠিন যন্ত্রণায় নিমজ্জিত করে রেখেছিল, তোমাদের পুত্র সন্তানদের যবেহ করতো এবং তোমাদের কন্যা সন্তানদের জীবিত রেখে দিতো। মূলত এ অবস্থায় তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য বড় কঠিন পরীক্ষা ছিল।[৬৬]

স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আমরা সাগর চিরে তোমাদের জন্য পথ করে দিয়েছিলাম, তারপর তার মধ্য দিয়ে তোমাদের নির্বিঘ্নে পার করে দিয়েছিলাম, আবার সেখানে তোমাদের চোখের সামনেই ফেরাউনী দলকে সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।

বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই নৈতিক গুণটিকে নিজের মধ্যে লালন করা এবং বাইর থেকে একে শক্তিশালী করার জন্য নিয়মিত নামায পড়া।

৬১. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগত নয় এবং আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তার জন্য নিয়মিত নামায পড়া একটি আপদের শামিল। এ ধরনের আপদে সে কখনো নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সোপর্দ করেছে এবং যে ব্যক্তি মৃত্যুর পর তার মহান প্রভুর সামনে হাযির হবার কথা চিন্তা করে, তার জন্য নামায পড়া নয়, নামায ত্যাগ করাই কঠিন।

৬২. এখানে সেই যুগের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যখন দুনিয়ার সকল জাতির মধ্যে একমাত্র বনী ইসরাঈলের কাছে আল্লাহ প্রদত্ত সত্যজ্ঞান ছিল এবং তাদেরকে বিশ্বের জাতিসমূহের নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। অন্যান্য জাতিদেরকে আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্বের পথে আহবান করাই ছিল তার দায়িত্ব।

৬৩. বনী ইসরাঈলদের আখেরাত সম্পর্কিত আকীদার মধ্যে গলদের অনুপ্রবেশ ছিল তাদের বিকৃতির অন্যতম বড় কারণ। এ ব্যাপারে তারা এক ধরনের উদ্ভট চিন্তা পোষণ করতো। তারা মনে করতো, তারা মহান মর্যাদা সম্পন্ন নবীদের সন্তান। বড় বড় আউলিয়া, সৎকর্মশীল ব্যক্তি, আবেদ ও যাহেদদের সাথে তারা সম্পর্কিত। ঐ সব মহান মনীষীদের বদৌলতে তাদের পাপ মোচন হয়ে যাবে। তাদের সাথে সম্পর্কিত হয়ে এবং তাদের

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ
وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ
الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আমরা মূসাকে চল্লিশ দিন-রাত্রির জন্য ডেকে নিয়েছিলাম,[৬৭] তখন তার অনুপস্থিতিতে তোমরা বাছুরকে নিজেদের উপাস্যে[৬৮] পরিণত করেছিলে। সে সময় তোমরা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছিলে। কিন্তু এরপরও আমরা তোমাদের মাফ করে দিয়েছিলাম এ জন্য যে, হয়তো এবার তোমরা কৃতজ্ঞ হবে।

স্মরণ করো (ঠিক যখন তোমরা এই যুলুম করছিলে সে সময়) আমরা মূসাকে কিতাব ও ফুরকান[৬৯] দিয়েছিলাম, যাতে তার মাধ্যমে তোমরা সোজা পথ পেতে পারো।

স্মরণ করো যখন মূসা (এই নিয়ামত নিয়ে ফিরে এসে) নিজের জাতিকে বললো, "হে লোকেরা! তোমরা বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে নিজেদের ওপর বড়ই যুলুম করেছো, কাজেই তোমরা নিজেদের স্রষ্টার কাছে তাওবা করো এবং নিজেদেরকে হত্যা করো,[৭০] এরি মধ্যে তোমাদের স্রষ্টার কাছে তোমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।" সে সময় তোমাদের স্রষ্টা তোমাদের তাওবা কবুল করে নিয়েছিলেন, কারণ তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

আস্তিন জড়িয়ে ধরে থাকার পরও কোন ব্যক্তি কেমন করে শান্তি লাভ করতে পারে। এসব মিথ্যা নির্ভরতা ও সান্ত্বনা তাদেরকে দীন থেকে গাফেল করে গোনাহের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছিল। তাই নিয়ামত ও আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের কথা স্মরণ করাবার সাথে সাথেই তাদের এই ভুল ধারণাগুলো দূর করা হয়েছে।

৬৪. এখান থেকে নিয়ে পরবর্তী কয়েক রুকূ' পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে যেসব ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে সেগুলো সবই বনী ইসরাঈলদের ইতিহাসের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٦﴾

স্মরণ করো, যখন তোমরা মূসাকে বলেছিলে, "আমরা কখনো তোমার কথায় বিশ্বাস করবো না, যতক্ষণ না আমরা স্বচক্ষে আল্লাহকে তোমার সাথে প্রকাশ্যে (কথা বলতে) দেখবো।" সে সময় তোমাদের চোখের সামনে তোমাদের ওপর একটি ভয়াবহ বজ্রপাত হলো, তোমরা নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে গেলে। কিন্তু আবার আমরা তোমাদের বাঁচিয়ে জীবিত করলাম, হয়তো এ অনুগ্রহের পর তোমরা কৃতজ্ঞ হবে।[৭১]

ঘটনা। ইসরাঈল জাতির যুব-বৃদ্ধ-শিশু নির্বেশেষে সবাই সেগুলো জানতো। তাই ঘটনাগুলোর বিস্তারিত আলোচনা না করে এক একটি ঘটনার প্রতি সংক্ষেপে ইংগিত করা হয়েছে মাত্র। এই ঐতিহাসিক বর্ণনার মাধ্যমে মহান আল্লাহ আসলে যে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে চান সেটি হচ্ছে এই যে, একদিকে আল্লাহ তোমাদের প্রতি এসব অনুগ্রহ করেছিলেন আর অন্যদিকে তার জবাবে এসব হচ্ছে তোমাদের কীর্তিকলাপ।

৬৫. 'আলে ফেরাউন' শব্দের অনুবাদ করেছি আমি 'ফেরাউনী দল।" এতে ফেরাউনের বংশ ও মিসরের শাসকশ্রেণী উভয়ই অন্তরভুক্ত হয়েছে।

৬৬. যে চুল্লীর মধ্যে তোমাদের নিক্ষেপ করা হয়েছিল তা থেকে তোমরা খাঁটি সোনা হয়ে বের হও, না ভেজাল হয়ে—এরি ছিল পরীক্ষা। এত বড় বিপদের মুখ থেকে অলৌকিকভাবে মুক্তি লাভ করার পরও তোমরা আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হও কি না, এ মর্মেও ছিল পরীক্ষা।

৬৭. মিসর থেকে মুক্তি লাভ করার পর বনী ইসরাঈল যখন সাইনা (সিনাই) উপদ্বীপে পৌঁছে গেলো তখন মহান আল্লাহ হযরত মূসা আলাইহিস সাল্লামকে চল্লিশ দিন-রাতের জন্য তূর পাহাড়ে ডেকে নিলেন। ফেরাউনের দাসত্ব মুক্ত হয়ে যে জাতিটি এখন মুক্ত পরিবেশে স্বাধীন জীবন যাপন করছে তার জন্য শরীয়াতের আইন এবং জীবন যাপনের বিধান দান করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। (বাইবেল, নির্গমন পুস্তক, ২৪-৩১ পরিচ্ছেদ দেখুন)

৬৮. বনী ইসরাঈলদের প্রতিবেশী জাতিদের মধ্যে গাভী ও ষাঁড় পূজার রোগ সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। মিসর ও কেনানে এর প্রচলন ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সাল্লামের পর বনী ইসরাঈল যখন অধপতনের শিকার হলো এবং ধীরে ধীরে কিবতীদের দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে পড়লো তখন অন্যান্য আরো বহু রোগের মধ্যে এ রোগটিও তারা নিজেদের শাসকদের থেকে গ্রহণ করেছিলো। (বাছুর পূজার এ ঘটনাটি বাইবেলের নির্গমন পুস্তকের ৩২ অনুচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে)

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِنْ
طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ
الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ
فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

আমরা তোমাদের ওপর মেঘমালার ছায়া দান করলাম,[৭২] তোমাদের জন্য সরবরাহ করলাম মান্না ও সালওয়ার খাদ্য[৭৩] এবং তোমাদের বললাম, যে পবিত্র দ্রব্য–সামগ্রী আমরা তোমাদের দিয়েছি তা থেকে খাও। কিন্তু তোমাদের পূর্বপুরুষরা যা কিছু করেছে তা আমাদের ওপর যুলুম ছিল না বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

আরো স্মরণ করো যখন আমরা বলেছিলাম, "তোমাদের সামনের এই জনপদে[৭৪] প্রবেশ করো এবং সেখানকার উৎপন্ন দ্রব্যাদি যেমন ইচ্ছা খাও মজা করে। কিন্তু জনপদের দুয়ারে সিজদানত হয়ে প্রবেশ করবে 'হিত্তাতুন' 'হিত্তাতুন' বলতে বলতে।[৭৫] আমরা তোমাদের ত্রুটিগুলো মাফ করে দেবো এবং সৎকর্মশীলদের প্রতি অত্যধিক অনুগ্রহ করবো।" কিন্তু যে কথা বলা হয়েছিল যালেমরা তাকে বদলে অন্য কিছু করে ফেললো। শেষ পর্যন্ত যুলুমকারীদের ওপর আমরা আকাশ থেকে আযাব নাযিল করলাম। এ ছিল তারা যে নাফরমানি করছিল তার শাস্তি।

৬৯. ফুরকান হচ্ছে এমন একটি জিনিস যার মাধ্যমে হক ও বাতিলের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট করে তোলা হয়। আমাদের ভাষায় এই অর্থটিকে সুস্পষ্ট করার জন্য সবচাইতে কাছাকাছি শব্দ হচ্ছে 'মানদণ্ড।' এখানে ফুরকানের মানে হচ্ছে দীনের এমন জ্ঞান, বোধ ও উপলব্ধি যার মাধ্যমে মানুষ হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে।

৭০. অর্থাৎ তোমাদের যেসব লোক গো–শাবককে উপাস্য বানিয়ে তার পূজা করেছে তাদেরকে হত্যা করো।

৭১. এখানে যে ঘটনাটির দিকে ইংগিত করা হয়েছে সেটি হচ্ছে ঃ চল্লিশ দিন–রাতের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হযরত মূসা আলাইহিস সাল্লাম যখন তূর পাহাড়ে চলে গেলেন, আল্লাহ তাঁকে হুকুম দিলেন বনী ইসরাঈলের সত্তরজন প্রতিনিধিকেও তাঁর সাথে নিয়ে আসার। তারপর মহান আল্লাহ মূসা আলাইহিস সাল্লামকে কিতাব ও ফুরকান দান করলেন। তিনি তা ঐ প্রতিনিধিদের সামনে পেশ করলেন। কুরআন বলছে, ঠিক তখনই তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন দুষ্ট প্রকৃতির লোক বলতে থাকলো, মহান আল্লাহ আপনার সাথে কথা বলেছেন একথাটি আমরা শুধুমাত্র আপনার কথায় কেমন করে মেনে নিতে পারি? তাদের একথায় আল্লাহর ক্রোধ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো এবং তিনি তাদেরকে শাস্তি দিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে বাইবেল বলছে ঃ

"তারা ইসরাঈলের খোদাকে দেখেছে। তাঁর চরণ তলের স্থানটি ছিল নীলকান্তমণি খচিত পাথরের চত্বরের ন্যায়। আকাশের মতো ছিল তার স্বচ্ছতা ও ঔজ্জ্বল্য। তিনি বনী ইসরাঈলের সম্মানিত ব্যক্তিদের ওপর নিজের হাত প্রসারিত করেননি। কাজেই তারা খোদাকে দেখেছে, খেয়েছে এবং পান করেছে।" (নির্গমন পুস্তক, ২৪ অনুচ্ছেদ, ১০–১১ শ্লোক)।

মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এই বাইবেলের আরো সামনের দিকে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ "যখন হযরত মূসা (আ) খোদার কাছে আরজ করলেন, আমাকে তোমার প্রতাপ ও জ্যোতি দেখাও। জবাবে তিনি বললেন, তুমি আমাকে দেখতে পারো না।" (নির্গমন পুস্তক, ৩৩ অনুচ্ছেদ, ১৮–২৩ শ্লোক)।

৭২. অর্থাৎ প্রখর রৌদ্র থেকে বাঁচার জন্য যেখানে সিনাই উপদ্বীপে তোমাদের জন্য কোন আশ্রয়স্থল ছিল না সেখানে আমরা মেঘমালার ছায়া দান করে তোমাদের বাঁচার উপায় করে দিয়েছি। এ প্রসংগে মনে রাখতে হবে, লক্ষ লক্ষ বনী ইসরাঈল মিসর থেকে বের হয়ে এসেছিল। আর সিনাই উপত্যকায় গৃহ তো দূরের কথা সামান্য একটু মাথা গোঁজার মতো তাঁবুও তাদের কাছে ছিল না। সে সময় যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ সময়ের জন্য আকাশকে মেঘাবৃত করে রাখা না হতো, তাহলে খর–রৌদ্র–তাপে বনী ইসরাঈলী জাতি সেখানেই ধ্বংস হয়ে যেতো।

৭৩. মান্না ও সালওয়া ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক প্রকার প্রাকৃতিক খাদ্য। বনী ইসরাঈলরা তাদের বাস্তুহারা জীবনের সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে এই খাদ্য লাভ করতে থেকেছে। মান্না ছিল ধনিয়ার দানার মতো ক্ষুদ্রাকৃতির এক ধরনের খাদ্য। সেগুলোর বর্ণ হতো কুয়াসার মতো। জমিতে পড়ার পর জমে যেতো। আর সালওয়া ছিল ক্ষুদ্রাকৃতির কবুতরের মতো একপ্রকার পাখি। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে এই খাদ্যের বিপুল প্রাচুর্য ছিল। বিপুল জনসংখ্যার অধিকারী একটি জাতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই খাদ্যের ওপর জীবন নির্বাহ করেছে। তাদের কাউকে কোনদিন অনাহারে থাকতে হয়নি। অথচ আজকের উন্নত বিশ্বের কোন দেশে যদি হঠাৎ কয়েক লাখ শরণার্থী প্রবেশ করে তাহলে তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করা একটি প্রাণান্তকর সমস্যায় পরিণত হয়। (মান্না ও সালওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে বাইবেলের নির্গমন পুস্তক ঃ ১৬ অনুচ্ছেদ, গণনা ঃ ১১ অনুচ্ছেদ, ৭–৯ ও ৩১–৩৬ শ্লোক এবং ঈশু ঃ ৫ অনুচ্ছেদ, ১২ শ্লোক)

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ
فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ
كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

৭ রুকূ'

স্মরণ করো, যখন মূসা তার জাতির জন্য পানির দোয়া করলো, তখন আমরা বললাম, অমুক পাথরের ওপর তোমার লাঠিটি মারো। এর ফলে সেখান থেকে বারোটি ঝর্ণাধারা উৎসারিত হলো।[৭৬] প্রত্যেক গোত্র তার পানি গ্রহণের স্থান জেনে নিল। (সে সময় এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে,) আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক খাও, পান করো এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।

৭৪. এখনো পর্যন্ত যথার্থ অনুসন্ধানের মাধ্যমে এ জনপদটিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। তবে যে ঘটনা পরম্পরায় এর উল্লেখ হয়েছে তা এমন এক যুগের সাথে সম্পর্কিত যখন বনী ইসরাঈল সাইনা উপদ্বীপেই অবস্থান করছিল। তাতেই মনে হয়, উল্লেখিত জনপদটির অবস্থান এ উপদ্বীপের কোথাও হবে। কিন্তু এ জনপদটি 'সিত্তীম'ও হতে পারে। সিত্তীম শহরটি 'ইয়ারীহো'-এর ঠিক বিপরীত দিকে জর্দান নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত ছিল। বাইবেলে উল্লেখিত হয়েছে, বনী ইসরাঈলরা মূসার (আ) জীবনের শেষ অধ্যায়ে এ শহরটি জয় করেছিল। সেখানে তারা ব্যাপক ব্যভিচার করে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে ভয়াবহ মহামারীর শিকারে পরিণত করেন এবং এতে চব্বিশ হাজার লোকের মৃত্যু হয়। (গণনা, ২৫ অনুচ্ছেদ, ১-৮ শ্লোক)

৭৫. অর্থাৎ তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, স্বেচ্ছাচারী যালেম বিজয়ীদের মতো অহংকার মদমত্ত হয়ে প্রবেশ করো না। বরং আল্লাহর প্রতি অনুগত ও তাঁর ভয়ে ভীত বান্দাদের মতো বিনম্রভাবে প্রবেশ করো। যেমন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় বিনয়াবনত হয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। 'হিত্তাতুন' শব্দটির দুই অর্থ হতে পারে। এর একটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর কাছে নিজের গোনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে প্রবেশ করো। আর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, ব্যাপক গণহত্যা ও লুটতরাজ করতে করতে প্রবেশ না করে বরং জনপদের অধিবাসীদের ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করে তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতে করতে শহরে প্রবেশ করো।

৭৬. সে পাথরটি এখনো সিনাই উপদ্বীপে রয়েছে। পর্যটকরা এখনো গিয়ে সেটি দেখেন। পাথরের গায়ে এখনো ঝর্ণার উৎস মুখের গর্তগুলো দেখা যায়। ১২টি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করার কারণ ছিল এই যে, বনী ইসরাঈলদেরও ১২টি গোত্র ছিল। প্রত্যেক গোত্রের জন্য আল্লাহ একটি করে ঝর্ণা প্রবাহিত করেন। তাদের মধ্যে পানি নিয়ে কলহ সৃষ্টি না হয়, এ জন্য এ পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছিল।

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ
يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا
وَبَصَلِهَا ؕ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ؕ
اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ؕ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۗ
وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝

স্মরণ করো, যখন তোমরা বলেছিলে, "হে মূসা! আমরা একই ধরনের খাবারের ওপর সবর করতে পারি না, তোমার রবের কাছে দোয়া করো যেন তিনি আমাদের জন্য শাক-সব্জি, গম, রসুন, পেঁয়াজ, ডাল ইত্যাদি কৃষিজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন করেন।" তখন মূসা বলেছিল, "তোমরা কি একটি উৎকৃষ্ট জিনিসের পরিবর্তে নিকৃষ্ট জিনিস নিতে চাও?[৭৭] তাহলে তোমরা কোন নগরে গিয়ে বসবাস করো, তোমরা যা কিছু চাও সেখানে পেয়ে যাবে।" অবশেষে অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছলো যার ফলে লাঞ্ছনা, অধপতন, দুরবস্থা ও অনটন তাদের ওপর চেপে বসলো এবং আল্লাহর গযব তাদেরকে ঘিরে ফেললো। এ ছিল তাদের আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফরী করার[৭৮] এবং পয়গম্বরদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার ফল।[৭৯] এটি ছিল তাদের নাফরমানির এবং শরীয়াতের সীমালংঘনের ফল।

৭৭. এর অর্থ এ নয় যে, বিনা শ্রমে লব্ধ মান্না ও সালওয়া বাদ দিয়ে তোমরা এমন জিনিস চাচ্ছো যে জন্য শারীরিক মেহনত করে কৃষি করতে হবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, যে মহান উদ্দেশ্যে তোমাদের মরুচারিতায় লিপ্ত করা হয়েছে তার মোকাবিলায় খাদ্যের স্বাদ তোমাদের কাছে বেশী প্রিয় হয়ে উঠেছে। ফলে তোমরা ঐ মহান উদ্দেশ্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছো কিন্তু সামান্য সময়ের জন্য ঐ খাদ্যের স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকতে চাও না। (তুলনামূলক পর্যালোচনার জন্য দেখুন গণনা পুস্তক ১১ অনুচ্ছেদ, ৪-৯ শ্লোক)

৭৮. আয়াতের সাথে কুফরী করা হয়েছে বিভিন্নভাবে। যেমন, এক ঃ আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষাবলীর মধ্য থেকে যে কথাটিকে নিজেদের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ও আশা-আকাংখার বিরোধী পেয়েছে তাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। দুই ঃ কোন বক্তব্যকে আল্লাহর বক্তব্য জানার পরও পূর্ণ দাম্ভিকতা, নির্লজ্জতা ও বিদ্রোহাত্মক মনোভাব সহকারে তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং আল্লাহর নির্দেশের কোন পরোয়া

করেনি। তিন ঃ আল্লাহর বাণীর অর্থ ও উদ্দেশ্য ভালোভাবে জানার ও বুঝার পরও নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী তার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করেছে।

৭৯. বনী ইসরাঈল নিজেদের এই অপরাধকে নিজেদের ইতিহাস গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বাইবেলের কয়েকটি ঘটনা এখানে উদ্ধৃত করছি।

এক ঃ হযরত সুলাইমানের পর ইসরাঈলী সাম্রাজ্য দু'টি রাষ্ট্রে (জেরুযালেমের ইহুদিয়া রাষ্ট্র এবং সামারিয়ার ইসরাঈল রাষ্ট্র) বিভক্ত হয়ে যায়। তাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ চলতে থাকে। অবশেষে ইহুদিয়া রাষ্ট্র নিজের ভাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দামেস্কের আরামী রাষ্ট্রের সাহায্য প্রার্থনা করে। এতে আল্লাহর হুকুমে হানানী নবী ইহুদিয়া রাষ্ট্রের শাসক 'আসা'-কে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেন। কিন্তু 'আসা' এই সতর্কবাণী গ্রহণ করার পরিবর্তে আল্লাহর নবীকে কারারুদ্ধ করে। (২ বংশাবলী, ১৭ অধ্যায়, ৭-১০ শ্লোক)

দুই ঃ হযরত ইলিয়াস (ইলিয়াহ—ELLIAH) আলাইহিস সাল্লাম যখন বা'ল দেবতার পূজার জন্য ইহুদিদের তিরস্কার করেন এবং নতুন করে আবার তাওহীদের দাওয়াত দিতে থাকেন তখন সামারিয়ার ইসরাঈলী রাজা 'আখিআব' নিজের মুশরিক স্ত্রীর প্ররোচনায় তাঁর প্রাণনাশের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় মেতে ওঠেন। ফলে তাঁকে সিনাই উপদ্বীপের পর্বতাঞ্চলে আশ্রয় নিতে হয়। এ সময় হযরত ইলিয়াস যে দোয়া করেন তার শব্দাবলী ছিল নিম্নরূপ ঃ

"বনী ইসরাঈল তোমার সাথে কৃত অংগীকার ভংগ করেছে.....তোমার নবীদের হত্যা করেছে তলোয়ারের সাহায্যে এবং একমাত্র আমিই বেঁচে আছি। তাই তারা আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করছে। (১ রাজাবলী, ১৭ অধ্যায়, ১-১০ শ্লোক)

তিন ঃ সত্য ভাষণের অপরাধে হযরত 'মিকাইয়াহ' নামে আর একজন নবীকেও এই ইসরাঈলী শাসক আখিআব কারারুদ্ধ করে। সে হুকুম দেয়, এই ব্যক্তিকে বিপদের খাদ্য খাওয়াও এবং বিপদের পানি পান করাও। (১ রাজাবলী, ২২ অধ্যায়, ২৬—২৭ শ্লোক)।

চার ঃ আবার যখন ইহুদিয়া রাষ্ট্রে প্রকাশ্যে মূর্তি পূজা ও ব্যভিচার চলতে থাকে এবং হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সাল্লাম এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হন তখন ইহুদি রাজা ইউআস-এর নির্দেশে তাকে মূল হাইকেলে সুলাইমানীতে 'মাকদিস' (পবিত্র স্থান) ও 'যবেহ ক্ষেত্র'-এর মাঝখানে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়। (২ বংশাবলী, ২৪ অধ্যায়, ২১ শ্লোক)।

পাঁচ ঃ অতপর আশুরিয়াদের হাতে যখন সামারিয়াদের ইসরাঈলী রাষ্ট্রের পতন হয় এবং জেরুসালেমের ইহুদি রাষ্ট্র মহাধ্বংসের সম্মুখীন হয় তখন 'ইয়ারমিয়াহ' নবী নিজের জাতির পতনে আর্তনাদ করে ওঠেন। তিনি পথে-ঘাটে, অলিতে-গলিতে নিজের জাতিকে সম্বোধন করে বলতে থাকেন, "সতর্ক হও, নিজেদেরকে সংশোধন করো, অন্যথায় তোমাদের পরিণাম সামারিয়া জাতির চাইতেও ভয়াবহ হবে।" কিন্তু জাতির পক্ষ থেকে এই সাবধান বাণীর বিরূপ জওয়াব আসে। চারদিক থেকে তাঁর ওপর প্রবল বৃষ্টিধারার মতো অভিশাপ ও গালি-গালাজ বর্ষিত হতে থাকে। তাঁকে মারধর করা হয়। কারারুদ্ধ করা হয়। ক্ষুধা ও পিপাসায় শুকিয়ে মেরে ফেলার জন্য রশি দিয়ে বেঁধে তাকে কর্দমাক্ত কূয়ার মধ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার এবং বিদেশী শত্রুর সাথে আতাত করার অভিযোগ আনা হয়। (যিরমিয়, ১৫ অধ্যায়, ১০ শ্লোক; ১৮ অধ্যায়, ২০—২৩ শ্লোক; ২০ অধ্যায়, ১—১৮ শ্লোক; ৩৬—৪০ অধ্যায়)।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ
آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

৮ রুকূ'

নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, যারা শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনে কিংবা ইহুদি, খৃষ্টান বা সাবি তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তার প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের কাছে এবং তাদের জন্য কোন ভয় ও মর্মবেদনার অবকাশ নেই।[৮০]

ছয় ঃ 'আমুস' নামক আর একজন নবী সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ যখন তিনি সামারিয়ার ইসরাঈলী রাষ্ট্রের ভ্রষ্টতা ও ব্যভিচারের সমালোচনা করেন এবং এই অসৎকাজের পরিণাম সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দেন তখন তাঁকে চরমপত্র দিয়ে বলে দেয়া হয়, এদেশ থেকে বের হয়ে যাও এবং বাইরে গিয়ে নিজের নবুওয়াত প্রচার করো। (আমুস, ৭ অধ্যায়, ১০—১৩ শ্লোক)।

সাত ঃ হযরত ইয়াহইয়া (John the Baptist) আলাইহিস সালাম যখন ইহুদি শাসক হিরোডিয়াসের দরবারে প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত ব্যভিচার ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান তখন প্রথমে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। তারপর বাদশাহ নিজের প্রেমিকার নির্দেশানুসারে জাতির এই সবচেয়ে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিটির শিরচ্ছেদ করে। কর্তিত মস্তক একটি থালায় করে নিয়ে বাদশাহ তার প্রেমিকাকে উপহার দেয়। (মার্ক, ৬ অধ্যায়, ১৭–২৯ শ্লোক)।

আট ঃ সবশেষে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে বনী ইসরাঈলের আলেম সমাজ ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের ক্রোধ উদ্দীপিত হয়। কারণ তিনি তাদের পাপ কাজ ও লোক দেখানো সৎকাজের সমালোচনা করতেন। তাদেরকে ঈমান ও সৎকাজের দিকে আহবান জানাতেন। এসব অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা তৈরি করা হয়। রোমান আদালত তাঁকে প্রাণদণ্ড দানের সিদ্ধান্ত করে। রোমান শাসক পীলাতীস যখন ইহুদিদের বললো, আজ ঈদের দিন, আমি তোমাদের স্বার্থে ঈসা ও বারাব্বা (Barabbas) ডাকাতের মধ্য থেকে একজনকে মুক্তি দিতে চাই। আমি কাকে মুক্তি দেবো? ইহুদিরা সমস্বরে বললো, আপনি বারাব্বাকে মুক্তি দিন এবং ঈসাকে ফাঁসি দিন। (মথি, ২৭ অধ্যায়, ২০–২৬ শ্লোক)।

এই হচ্ছে ইহুদি জাতির অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের একটি কলংকজনক অধ্যায়। কুরআনের উল্লেখিত আয়াতগুলোতে সংক্ষেপে এদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে জাতি নিজের ফাসেক ও দুশ্চরিত্র সম্পন্ন লোকদেরকে নেতৃত্বের আসনে বসাতে এবং

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ۖ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ
بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ
فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ
عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا
قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا
وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾

স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আমরা 'তূর'কে তোমাদের ওপর উঠিয়ে তোমাদের থেকে পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম[৮১] ঃ "যে কিতাব আমরা তোমাদেরকে দিচ্ছি তাকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং তার মধ্যে যে সমস্ত নির্দেশ ও বিধান রয়েছে সেগুলো স্মরণ রেখো। এভাবেই আশা করা যেতে পারে যে, তোমরা তাকওয়ার পথে চলতে পারবে।" কিন্তু এরপর তোমরা নিজেদের অংগীকার ভংগ করলে। তবুও আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত তোমাদের সংগ ছাড়েনি, নয়তো তোমরা কবেই ধ্বংস হয়ে যেতে।

নিজেদের জাতির সেইসব লোকের ঘটনা তো তোমাদের জানাই আছে যারা শনিবারের[৮২] বিধান ভেঙেছিল। আমরা তাদের বলে দিলাম ঃ বানর হয়ে যাও এবং এমনভাবে অবস্থান করো যাতে তোমাদের সবদিক থেকে লাঞ্ছনা গঞ্জনা সইতে হয়।[৮৩] এভাবে আমরা তাদের পরিণতিকে সমকালীন লোকদের এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্য শিক্ষণীয় এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য মহান উপদেশে পরিণত করেছি।

সৎ ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী লোকদেরকে কারাগারে স্থান দিতে চায় আল্লাহ তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ না করলে আর কাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করবেন?

৮০. বক্তব্য ও বিষয়বস্তু বর্ণনার ধারবাহিকতাকে সামনে রাখলে একথা আপনা আপনি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এখানে ঈমান ও সৎকাজের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া মূল লক্ষ নয়। কোন্ বিষয়গুলো মানতে হবে এবং কোন্ কাজগুলো করলে মানুষ আল্লাহর কাছে প্রতিদান লাভের অধিকারী হবে, এ আয়াতে সে প্রসংগ আলোচিত হয়নি। বরং যথাস্থানে এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা আসবে। ইহুদিরা যে একমাত্র ইহুদি গোষ্ঠীকেই নাজাত ও

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا
أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا
ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ
وَلَا بِكْرٌ ۖ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾

এরপর স্মরণ করো সেই ঘটনার কথা যখন মূসা তার জাতিকে বললো, আল্লাহ তোমাদের একটি গাভী যবেহ করার হুকুম দিচ্ছেন। তারা বললো, তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছো? মূসা বললো, নিরেট মূর্খদের মতো কথা বলা থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। তারা বললো, আচ্ছা তাহলে তোমার রবের কাছে আবেদন করো তিনি যেন সেই গাভীর কিছু বিস্তারিত বিবরণ আমাদের জানিয়ে দেন। মূসা জবাব দিল আল্লাহ বলছেন, সেটি অবশ্যি এমন একটি গাভী হতে হবে যে বৃদ্ধা নয়, একেবারে ছোট্ট বাছুরটিও নয় বরং হবে মাঝারি বয়সের। কাজেই যেমনটি হুকুম দেয়া হয় ঠিক তেমনটিই করো।

পরকালীন মুক্তির ইজারাদার মনে করতো সেই ভ্রান্ত ধারণাটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোই এখানে এই আয়াতটির উদ্দেশ্য। তারা এই ভুল ধারণা পোষণ করতো যে, তাদের দলের সাথে আল্লাহর কোন বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে—যা অন্য মানুষের সাথে নেই, কাজেই তাদের দলের সাথে যে-ই সম্পর্ক রাখবে, তার আকীদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাক যাই হোক না কেন, সে নির্ঘাত নাজাত লাভ করবে। আর তাদের দলের বাইরে বাদবাকি সমগ্র মানবজাতি কেবল জাহান্নামের ইন্ধন হবার জন্যই সৃষ্ট হয়েছে। এই ভুল ধারণা দূর করার জন্য বলা হচ্ছে, আল্লাহর কাছে তোমাদের এই দল ও গোত্র বিভক্তিই আসল কথা নয় বরং সেখানে একমাত্র নির্ভরযোগ্য বিষয় হচ্ছে তোমাদের ঈমান ও সৎকাজ. যে ব্যক্তি এগুলো নিয়ে আল্লাহর সামনে হাযির হবে সে তার রবের কাছ থেকে তার প্রতিদান লাভ করবে. আল্লাহর ওখানে ফায়সালা হবে মানুষের গুণাবলীর ওপর, জনসংখ্যার হিসেবের খাতাপত্রের ওপর নয়।

৮১. এ ঘটনাটিকে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, এটি বনী ইসরাঈলদের মধ্যে একটি সুবিখ্যাত ও সর্বজনবিদিত ঘটনা ছিল। কিন্তু বর্তমানে এর বিস্তারিত অবস্থা জানা কঠিন। তবে সংক্ষেপে এতটুকু বুঝে নেয়া উচিত যে, পাহাড়ের পাদদেশে অংগীকার নেয়ার সময় এমন ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছিল যার ফলে তারা মনে করছিল পাহাড় তাদের ওপর আপতিত হবে। সূরা আ'রাফের ১৭১ আয়াতে কিছুটা এ ধরনেরই একটি ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। (সূরা আ'রাফের ১৩২ নম্বর টীকাটি দেখুন)।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا
بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ ۙ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ
يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۙ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ۚ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ
وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۖ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ
بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾

আবার তারা বলতে লাগলো, তোমার রবের কাছে আরো জিজ্ঞেস করো, তার রংটি কেমন? মূসা জবাব দিল, তিনি বলছেন, গাভীটি অবশ্যি হলুদ রংয়ের হতে হবে, তার রং এতই উজ্জ্বল হবে যাতে তা দেখে মানুষের মন ভরে যাবে। আবার তারা বললো, তোমার রবের কাছ থেকে এবার পরিষ্কারভাবে জেনে নাও, তিনি কেমন ধরনের গাভী চান? গাভীটি নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমরা সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছি। আল্লাহ চাইলে আমরা অবশ্যি এটি বের করে ফেলবো। মূসা জবাব দিল আল্লাহ বলছেন, সেটি এমন একটি গাভী যাকে কোন কাজে নিযুক্ত করা হয় না, জমি চাষ বা ক্ষেতে পানি সেচ কোনটিই করে না, সুস্থ-সবল ও নিখুঁত। একথায় তারা বলে উঠলো, হাঁ, এবার তুমি ঠিক সন্ধান দিয়েছো। অতপর তারা তাকে যবেহ করলো, অন্যথায় তারা এমনটি করতো বলে মনে হচ্ছিল না।[৮৪]

৮২. বনী ইসরাঈলদের জন্য শনিবারের বিধান তৈরি করা হয়েছিল। অর্থাৎ আইনের মাধ্যমে শনিবার দিনটি তাদের বিশ্রাম ও ইবাদাত করার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এদিনে তারা পার্থিব কোন কাজ এমন কি রান্না-বান্নার কাজ নিজেরা করতে পারবে না এবং চাকর-বাকরদের দ্বারাও এ কাজ করাতে পারবে না। এ প্রসংগে কড়া নির্দেশ জারী করে বলা হয়েছিল, যে ব্যক্তি এই পবিত্র দিনের নির্দেশ অমান্য করবে তাকে হত্যা করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়বে। (যাত্রা পুস্তক, ৩১ অধ্যায়, ১২—১৭ শ্লোক)।

কিন্তু বনী ইসরাঈলরা নৈতিক ও ধর্মীয় পতনের শিকার হবার পর প্রকাশ্যে শনিবারের বিধানের অবমাননা করতে থাকে। এমনকি তাদের শহরগুলোতে প্রকাশ্যে শনিবার ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ-কারবার চলতে থাকে।

৮৩. সূরা আ'রাফের ২১ রুকূ'তে এ ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। তাদেরকে বানরে পরিণত করার ধরন সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। অনেকে মনে করেন, তাদের

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾
فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى ۙ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ
كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۗ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ
الْأَنْهٰرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا
يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

৯ রুকূ'

আর স্মরণ করো সেই ঘটনার কথা যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং একজন আর একজনের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনছিলে। আর আল্লাহ সিদ্ধান্ত করেছিলেন তোমরা যা কিছু গোপন করছো তা তিনি প্রকাশ করে দেবেন। সে সময় আমরা হুকুম দিলাম, নিহতের লাশকে তার একটি অংশ দিয়ে আঘাত করো। দেখো এভাবে আল্লাহ মৃতদের জীবন দান করেন এবং তোমাদেরকে নিজের নিশানী দেখান, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো।[৮৫] কিন্তু এ ধরনের নিশানী দেখার পরও তোমাদের দিল কঠিন হয়ে গেছে, পাথরের মত কঠিন বরং তার চেয়েও কঠিন। কারণ এমন অনেক পাথর আছে যার মধ্য দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হয় আবার অনেক পাথর ফেটে গেলে তার মধ্য থেকে পানি বের হয়ে আসে, আবার কোন কোন পাথর আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পড়েও যায়। আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বেখবর নন।

দৈহিক কাঠামো পরিবর্তন করে বানরে রূপান্তরিত করে দেয়া হয়েছিল। আবার অনেকে এর অর্থ এই গ্রহণ করে থাকে যে, তাদের মধ্যে বানরের স্বভাব ও বানরের গুণাবলী সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কুরআনের শব্দাবলী ও বর্ণনাভংগী থেকে মনে হয়, তাদের মধ্যে নৈতিক নয়, দৈহিক বিকৃতি ঘটেছিল। আমার মতে, তাদের মস্তিষ্ক ও চিন্তাশক্তিকে পূর্ববৎ অবিকৃত রেখে শারীরিক বিকৃতি ঘটিয়ে বানরে রূপান্তরিত করা হয়েছিল এটিই যুক্তিসংগত বলে মনে হয়।

৮৪. তাদের প্রতিবেশী জাতিরা গরুকে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র মনে করতো এবং গরু পূজা করতো আর প্রতিবেশীদের থেকে এ রোগ তাদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়, তাই তাদেরকে গরু যবেহ করার হুকুম দেয়া হয়। তাদের ঈমানের পরীক্ষা এভাবেই হওয়া সম্ভবপর

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ
كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَإِذَا لَقُوا
الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا
أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾

হে মুসলমানরা! তোমরা কি তাদের থেকে আশা করো তারা তোমাদের দাওয়াতের ওপর ঈমান আনবে?[৮৬] অথচ তাদের একটি দলের চিরাচরিত রীতি এই চলে আসছে যে, আল্লাহর কালাম শুনার পর খুব ভালো করে জেনে বুঝে সজ্ঞানে তার মধ্যে 'তাহরীফ' বা বিকৃতি সাধন করেছে।[৮৭] (মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহর ওপর) যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে সাক্ষাত হলে বলে, আমরাও তাঁকে মানি। আবার যখন পরস্পরের সাথে নিরিবিলিতে কথা হয় তখন বলে, তোমরা কি বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেলে? এদেরকে তোমরা এমন সব কথা বলে দিচ্ছো যা আল্লাহ তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন, ফলে এরা তোমাদের রবের কাছে তোমাদের মোকাবিলায় তোমাদের একথাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে?[৮৮]

ছিল। এখন যদি তারা যথার্থই আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে মাবুদ বলে স্বীকার না করে তাহলে এ আকীদা গ্রহণ করার পূর্বে যেসব ঠাকুর-দেবতার মূর্তিকে তারা মাবুদ মনে করে আসছিল তাদেরকে নিজের হাতে ভেঙে ফেলতে হবে। এটা অনেক বড় পরীক্ষা ছিল। তাদের দিলের মধ্যে ঈমান পুরোপুরি বাসা বাঁধতে পারেনি, তাই তারা টালবাহানা করতে থাকে এবং বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। কিন্তু যতই বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে ততই তারা নিজেরা ঘেরাও হয়ে যেতে থাকে। অবশেষে সেকালে যে বিশেষ ধরনের সোনালী গাভীর পূজা করা হতো তার প্রতি প্রায় অংগুলি নির্দেশ করে তাকেই যবেহ করতে বলা হলো। বাইবেলেও এই ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। তবে বনী ইসরাঈলরা এ নির্দেশটি উপেক্ষা করার জন্য কোন্ ধরনের টালবাহানা করেছিল, তা সেখানে বলা হয়নি। (গণনা পুস্তক, ১৯ অধ্যায়, ১—১০ শ্লোক)।

৮৫. এখানে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে, হত্যাকারীর সন্ধান বলে দেয়ার জন্য নিহত ব্যক্তির লাশের মধ্যে পুনরায় কিছুক্ষণের জন্য প্রাণস্পন্দন ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এ জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির লাশকে তার একটি অংশ দিয়ে আঘাত করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তার মধ্যে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। তবুও এর ব্যাখ্যায় প্রাচীনতম তাফসীরকারগণ যা বলেছেন তাকেই এর

নিকটতম অর্থ ধরা যায়। অর্থাৎ আগে যে গাভী যবেহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তারই গোশ্‌ত দিয়ে নিহত ব্যক্তির লাশের গায়ে আঘাত করতে বলা হয়েছিল। এভাবে এক ঢিলে দুই পাখি মারা গেলো। প্রথমত আল্লাহর কুদরাত ও অসীম ক্ষমতার একটি প্রমাণ তাদের সামনে তুলে ধরা হলো। দ্বিতীয়ত গরুর পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও তাকে উপাস্য হবার যোগ্যতার ওপরও একটি শক্তিশালী আঘাত হানা হলো। এই তথাকথিত উপাস্যটি যদি সামান্যতম ক্ষমতারও অধিকারী হতো তাহলে তাকে যবেহ করার কারণে একটি মহাবিপদ ও দুর্যোগ ঘনিয়ে আসতো। কিন্তু বিপরীত পক্ষে আমরা দেখছি তা মানুষের কল্যাণে লেগেছে।

৮৬. এখানে মদীনার নওমুসলিমদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা নিকটবর্তী কালে শেষ নবীর ওপর ঈমান এনেছিল। ইতিপূর্বে নবুওয়াত, শরীয়াত, কিতাব, ফেরেশতা, আখেরাত ইত্যাদি শব্দগুলো তাদের কানে পৌঁছেছিল। এসব তারা শুনেছিল তাদের প্রতিবেশী ইহুদিদের কাছ থেকে। তারা ইহুদিদের মুখ থেকে আরো শুনেছিল যে, দুনিয়ায় আরো একজন নবী আসবেন। যারা তাঁর সাথে সহযোগিতা করবে সারা দুনিয়ায় তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এই জানার ভিত্তিতে মদীনাবাসীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের চর্চা শুনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এখন তারা আশা করছিল, যারা আগে থেকে নবী ও আসমানী কিতাবের অনুসারী এবং যাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত খবরের বদৌলতে তারা ঈমানের মহামূল্যবান সম্পদের অধিকারী হয়েছে, তারা নিশ্চয়ই তাদের সহযোগী হবে। বরং এ পথে তারা অগ্রগামী হবে। এই বিরাট প্রত্যাশা নিয়ে মদীনার উদ্যোগী নওমুসলিমরা তাদের ইহুদি বন্ধু ও প্রতিবেশীদের কাছে যেতো এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতো। তারা এ দাওয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে মুনাফিক ও ইসলাম বিরোধীরা এ সুযোগ গ্রহণ করতো। তারা এ থেকে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করতো যে, ব্যাপারটা বেশ সন্দেহজনক ও সংশয়পূর্ণ মনে হচ্ছে, নইলে মুহাম্মাদ (সা) যদি সত্যিই নবী হতেন তাহলে 'আহলি কিতাব'দের উলামা, মাশায়েখ ও পবিত্র বুযর্গগণ কি জেনে বুঝে ঈমান আনতে অস্বীকৃতি জানাতো এবং তারা কি অনর্থক এভাবে নিজেদের পরকাল নষ্ট করতো? তাই বনী ইসরাঈলদের অতীত ইতিহাস বর্ণনা করার পর এবার সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, অতীতে যারা এ ধরনের কীর্তিকলাপ করেছে তাদের ব্যাপারে তোমরা বেশী কিছু আশা করো না। অন্যথায় তোমাদের দাওয়াত তাদের পাষাণ অন্তরে ধাক্কা খেয়ে যখন ফিরে আসবে তখন তোমাদের মন ভেঙে পড়বে। এই ইহুদিরা শত শত বছর থেকে বিকৃত হয়ে আছে। আল্লাহর যে সমস্ত আয়াত শুনে তোমাদের দিল কেঁপে ওঠে সেগুলোকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে করতে তাদের কয়েক পুরুষ কেটে গেছে। আল্লাহর সত্য দীনকে তারা নিজেদের ইচ্ছা ও চাহিদা মোতাবিক বিকৃত করেছে। এই বিকৃত দীনের মাধ্যমেই তারা পরকালীন নাজাত লাভের প্রত্যাশী। সত্যের আওয়াজ বুলন্দ হবার সাথে সাথেই তারা সেদিকে দৌড়ে যাবে, তাদের সম্পর্কে এ ধারণা রাখা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৮৭. "একটি দল" বলতে তাদের উলামা ও শরীয়াতধারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। এখানে তাওরাত, যাবুর ও অন্যান্য কিতাব, যেগুলো তারা নিজেদের নবীদের মাধ্যমে লাভ

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ
لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ
يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا
بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا
يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

এরা কি জানে না, যা কিছু এরা গোপন করছে এবং যা কিছু প্রকাশ করছে সমস্তই আল্লাহ জানেন? এদের মধ্যে দ্বিতীয় একটি দল হচ্ছে নিরক্ষরদের। তাদের কিতাবের জ্ঞান নেই, নিজেদের ভিত্তিহীন আশা-আকাংখাগুলো নিয়ে বসে আছে এবং নিছক অনুমান ও ধারণার ওপর নির্ভর করে চলছে।[৮৯] কাজেই তাদের জন্য ধ্বংস অবধারিত যারা স্বহস্তে শরীয়াতের লিখন লেখে তারপর লোকদের বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এভাবে তারা এর বিনিময়ে সামান্য স্বার্থ লাভ করে।[৯০] তাদের হাতের এই লিখন তাদের ধ্বংসের কারণ এবং তাদের এই উপার্জনও তাদের ধ্বংসের উপকরণ।

করেছিল, সেগুলোকেই বলা হয়েছে "আল্লাহর কালাম।" 'তাহরীফ' অর্থ হচ্ছে কোন কথাকে তার আসল অর্থ ও তাৎপর্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের ইচ্ছে মতো এমন কোন অর্থে ব্যবহার করা যা বক্তার উদ্দেশ্য ও লক্ষের পরিপন্থী। তাছাড়া শব্দের মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করাকেও তাহরীফ বলে। বনী ইসরাঈলী আলেমগণ আল্লাহর কালামের মধ্যে এই দু' ধরনের তাহরীফ বা বিকৃতি সাধন করেছিল।

৮৮. অর্থাৎ তারা পারস্পরিক আলাপ আলোচনায় বলতো, এই নবী সম্পর্কে তাওরাত ও অন্যান্য আসমানী গ্রন্থসমূহে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী উল্লিখিত হয়েছে অথবা আমাদের পবিত্র কিতাবসমূহে আমাদের বর্তমান মনোভাব ও কর্মনীতিকে অভিযুক্ত করার মতো যে সমস্ত আয়াত ও শিক্ষা রয়েছে, সেগুলো মুসলমানদের সামনে বিবৃত করো না। অন্যথায় তারা আল্লাহর সামনে এগুলোকে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে। আল্লাহ সম্পর্কে নাদান ইহুদিদের বিশ্বাস এভাবেই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ তারা যেন মনে করতো, দুনিয়ায় যদি তারা আল্লাহর কিতাবকে বিকৃত করে ও সত্য গোপন করে তাহলে এ জন্য আখেরাতে তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা চলবে না। তাই পরবর্তী প্রাসংগিক বাক্যে তাদেরকে এই বলে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা কি আল্লাহকে বেখবর মনে করো?

৮৯. এ ছিল তাদের জনগণের অবস্থা। আল্লাহর কিতাবের কোন জ্ঞানই তাদের ছিল না। আল্লাহ তাঁর কিতাবে দীনের কি কি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন, শরীয়াত ও নৈতিকতার কি

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ
اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾
بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

তারা বলে, জাহান্নামের আগুন আমাদের কখনো স্পর্শ করবে না, তবে কয়েক দিনের শাস্তি হলেও হয়ে যেতে পারে।[৯১] এদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে কোন অংগীকার নিয়েছো, যার বিরুদ্ধাচরণ তিনি করতে পারেন না? অথবা তোমরা আল্লাহর ওপর চাপিয়ে দিয়ে এমন কথা বলছো যে কথা তিনি নিজের ওপর চাপিয়ে নিয়েছেন বলে তোমাদের জানা নেই? আচ্ছা জাহান্নামের আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে না কেন? যে ব্যক্তিই পাপ করবে এবং পাপের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়বে সে-ই জাহান্নামী হবে এবং জাহান্নামের আগুনে পুড়তে থাকবে চিরকাল। আর যারা ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে থাকবে তারা চিরকাল।

বিধান দিয়েছেন এবং কোন কোন জিনিসের ওপর মানুষের কল্যাণ ও ক্ষতির ভিত রেখেছেন, তার কিছুই তারা জানতো না। এই জ্ঞান না থাকার কারণে তারা নিজেদের ইচ্ছা, আশা-আকাংখা ও কল্পনার অনুসারী বিভিন্ন মনগড়া কথাকে দীন মনে করতো এবং এরি ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মিথ্যা আশা বুকে নিয়ে জীনব ধারণ করতো।

৯০. তাদের আলেমদের সম্পর্কে একথাগুলো বলা হচ্ছে। তারা কেবলমাত্র আল্লাহর কালামের অর্থ নিজেদের ইচ্ছা ও পার্থিব স্বার্থ অনুযায়ী পরিবর্তন করেনি বরং এই সংগে নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা, জাতীয় ইতিহাস, কল্পনা, আন্দাজ-অনুমান, লৌকিক চিন্তাদর্শন এবং নিজেদের তৈরি করা আইন-কানুনগুলোর বাইবেলের মূল কালামের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। সাধারণ মানুষের সামনে সেগুলোকে তারা এমনভাবে পেশ করেছে যেন সেগুলো সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। বাইবেলে স্থান লাভ করেছে এমন প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক কাহিনী, ভাষ্যকারের মনগড়া ব্যাখ্যা, ধর্মতাত্ত্বিক ন্যায়শাস্ত্রবিদের আল্লাহ সম্পর্কিত আকীদা-বিশ্বাস এবং প্রত্যেক আইন শাস্ত্রবিদের উদ্ভাবিত আইন আল্লাহর বাণীর (Word of God) মর্যাদা লাভ করেছে। তার প্রতি ঈমান আনা ও বিশ্বাস স্থাপন করা একান্ত কর্তব্যে পরিণত হয়ে গেছে। তাকে প্রত্যাহার করা ধর্মকে প্রত্যাহার করার নামান্তর বিবেচিত হয়েছে।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ
حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا
مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ
دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ
تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا
مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ
وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ

১০ রুকূ'

স্মরণ করো যখন ইসরাঈল সন্তানদের থেকে আমরা এই মর্মে পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছিলাম যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ইবাদাত করবে না, মা-বাপ, আত্মীয়-পরিজন, ইয়াতিম ও মিসকিনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, লোকদেরকে ভালো কথা বলবে, নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। কিন্তু সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা সবাই অংগীকার ভংগ করেছিলে এবং এখনো ভেঙে চলছো। আবার স্মরণ করো, যখন আমরা তোমাদের থেকে মজবুত অংগীকার নিয়েছিলাম এই মর্মে যে, তোমরা পরস্পরের রক্ত প্রবাহিত করবে না এবং একে অন্যকে গৃহ থেকে উচ্ছেদ করবে না। তোমরা এর অংগীকার করেছিলে, তোমরা নিজরাই এর সাক্ষী। কিন্তু আজ সেই তোমরাই নিজেদের ভাই-বেরাদারদেরকে হত্যা করছো, নিজেদের গোত্রীয় সম্পর্কযুক্ত কিছু লোককে বাস্তভিটা ছাড়া করছো, যুলুম ও অত্যধিক বাড়াবাড়ি সহকারে তাদের বিরুদ্ধে দল গঠন করছো এবং তারা যুদ্ধবন্দী হয়ে তোমাদের কাছে এলে তাদের মুক্তির জন্য তোমরা মুক্তিপণ আদায় করছো। অথচ তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে উচ্ছেদ করাই তোমাদের জন্য হারাম ছিল।

৯১. এখানে ইহুদি সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি ভুল ধারণার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের আলেম, অ-আলেম, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ এই

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا
جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ
وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۖ
فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

তাহলে কি তোমরা কিতাবের একটি অংশের ওপর ঈমান আনছো এবং অন্য অংশের সাথে কুফরী করছো?[৯২] তারপর তোমাদের মধ্য থেকে যারাই এমনটি করবে তাদের শাস্তি এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হবে এবং আখেরাতে তাদেরকে কঠিনতম শাস্তির দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে? তোমাদের কর্মকাণ্ড থেকে আল্লাহ বেখবর নন। এই লোকেরাই আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন কিনে নিয়েছে। কাজেই তাদের শাস্তি কমানো হবে না এবং তারা কোন সাহায্যও পাবে না।

ভুল ধারণায় লিপ্ত। তারা মনে করতো, আমরা যাই কিছু করি না কেন, আমাদের সাতখুন মাফ, জাহান্নামের আগুন আমাদের ওপর হারাম। কারণ আমরা ইহুদি। আর ধরে নেয়া যাক যদি আমাদের কখনো শাস্তি দেয়াও হয় তাহলেও তা তবে মাত্র কয়েকদিনের। কয়েকদিন জাহান্নামে রেখে তারপর আমাদের জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

৯২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় আগমনের পূর্বে মদীনার আশপাশের ইহুদি গোত্রগুলো তাদের প্রতিবেশী আরব গোত্রগুলোর (আওস ও খাযরাজ) সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছিল। একটি আরব গোত্র অন্য একটি আরব গোত্রের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে উভয়ের বন্ধু ইহুদি গোত্র ও নিজেদের বন্ধুদের সাহায্য করতো এবং এভাবে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত হতো। ইহুদিদের এ কাজটি তাদের কাছে রক্ষিত আল্লাহর কিতাবের বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থি ছিল। ইহুদিরা এটা জানতো। তারা জেনে বুঝেই এভাবে আল্লাহর কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করতো। কিন্তু যুদ্ধের পর একটি ইহুদি গোত্রের লোকেরা অন্য ইহুদি গোত্রের কাছে যুদ্ধবন্দী হয়ে এলে বিজয়ী গোত্রটি মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্তি দিতো। বিজিত গোত্রের লোকেরা এই মুক্তিপণের অর্থ সরবরাহ করতো। তাদের মুক্তিপণের লেনদেনকে বৈধ গণ্য করার জন্য তারা আল্লাহর কিতাব থেকে দলীল-প্রমাণ পেশ করতো। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে উল্লেখিত মুক্তিপণের বিনিময়ে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেয়ার বিধানটি তারা সাগ্রহে মেনে চলতো কিন্তু পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ না করার বিধানটি মেনে চলতো না।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ۖ وَاٰتَيْنَا
عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۭ اَفَكُلَّمَا
جَاۗءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيْقًا
كَذَّبْتُمْ ۗ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ۝ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ۭ بَلْ لَّعَنَهُمُ
اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَلَمَّا جَاۗءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ
مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَي الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَاۗءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۚ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَي الْكٰفِرِيْنَ ۝

১১ রুকূ'

আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি। তারপর ক্রমাগতভাবে রসূল পাঠিয়েছি। অবশেষে ঈসা ইবনে মারয়ামকে পাঠিয়েছি উজ্জ্বল নিশানী দিয়ে এবং পবিত্র রূহের মাধ্যমে তাকে সাহায্য করেছি।[৯৩] এরপর তোমরা এ কেমনতর আচরণ করে চলছো, যখনই কোন রসূল তোমাদের প্রবৃত্তির কামনা বিরোধী কোন জিনিস নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে তখনই তোমরা তার বিরুদ্ধাচরণ করেছো, কাউকে মিথ্যা বলেছো এবং কাউকে হত্যা করেছো। তারা বলে, আমাদের হৃদয় সুরক্ষিত।[৯৪] না, আসলে তাদের কুফরীর কারণে তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে, তাই তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকে। আর এখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে যে একটি কিতাব এসেছে তার সাথে তারা কেমন ব্যবহার করছে? তাদের কাছে আগে থেকেই কিতাবটি ছিল যদিও এটি তার সত্যতা স্বীকার করতো এবং যদিও এর আগমনের পূর্বে তারা নিজেরাই কাফেরদের মোকাবিলায় বিজয় ও সাহায্যের দোয়া চাইতো, তবুও যখন সেই জিনিসটি এসে গেছে এবং তাকে তারা চিনতেও পেরেছে তখন তাকে মেনে নিতে তারা অস্বীকার করেছে।[৯৫] আল্লাহর লানত এই অস্বীকারকারীদের ওপর।

৯৩. 'পবিত্র রূহ' বলতে অহী-জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। অহী নিয়ে দুনিয়ায় আগমনকারী জিব্রীলকেও বুঝানো হয়েছে। আবার হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পাক রূহকেও বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ নিজেই তাঁকে পবিত্র গুণাবলীতে ভূষিত করেছিলেন। 'উজ্জ্বল

নিশানী' অর্থ সুস্পষ্ট আলামত ও চিহ্ন, যা দেখে প্রত্যেকটি সত্যপ্রিয় ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর নবী বলে চিনতে পারে।

৯৪. অর্থাৎ আমাদের আকীদা–বিশ্বাস ও চিন্তা এতই পাকাপোক্ত যে, তোমরা যাই কিছু বল না কেন আমাদের মনে তোমাদের কথা কোন রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। যেসব হঠধর্মী লোকের মন–মস্তিষ্ক অজ্ঞতা ও মূর্খতার বিদ্বেষে আচ্ছন্ন থাকে তারাই এ ধরনের কথা বলে। তারা একে মজবুত বিশ্বাস নাম দিয়ে নিজেদের একটি গুণ বলে গণ্য করে। অথচ এটা মানুষের গুণ নয় দোষ। নিজের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আকীদা–বিশ্বাস ও চিন্তার গলদ ও মিথ্যা বলিষ্ঠ যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হবার পরও তার ওপর অবিচল থাকার চাইতে বড় দোষ মানুষের আর কি হতে পারে?

৯৫. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে ইহুদিরা তাদের পূর্ববর্তী নবীগণ যে নবীর আগমন বার্তা শুনিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর জন্য প্রতীক্ষারত ছিল। তারা দোয়া করতো, তিনি যেন অবিলম্বে এসে কাফেরদের প্রাধান্য খতম করে ইহুদি জাতির উন্নতি ও পুনরুত্থানের সূচনা করেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পূর্বে মদীনাবাসীদের প্রতিবেশী ইহুদি সম্প্রদায় নবীর আগমনের আশায় জীবন ধারণ করতো, মদীনাবাসীরা নিজেরাই একথার সাক্ষ্য দেবে। যত্রতত্র যখন তখন তারা বলে বেড়াতো ঃ "ঠিক আছে, এখন প্রাণ ভরে আমাদের ওপর যুলুম করে নাও। কিন্তু যখন সেই নবী আসবেন, আমরা তখন এই যালেমদের সবাইকে দেখে নেবো।" মদীনাবাসীরা এসব কথা আগে থেকেই শুনে আসছিল। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা এবং তাঁর অবস্থা শুনে তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো ঃ দেখো, ইহুদিরা যেন তোমাদের পিছিয়ে দিয়ে এই নবীর ধর্ম গ্রহণ করে বাজী জিতে না নেয়। চলো, তাদের আগে আমরাই এ নবীর ওপর ঈমান আনবো। কিন্তু তারা অবাক হয়ে দেখলো, যে ইহুদিরা নবীর আগমন প্রতীক্ষায় দিন গুণছিল, নবীর আগমনের পর তারাই তাঁর সবচেয়ে বড় বিরোধী পক্ষে পরিণত হলো।

'এবং তারা তাকে চিনতেও পেরেছে' বলে যে কথা মূল আয়াতে বলা হয়েছে, তার স্বপক্ষে বহু তথ্য–প্রমাণ সেই যুগেই পাওয়া গিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী সাক্ষ্য পেশ করেছেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত সফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি নিজে ছিলেন একজন বড় ইহুদি আলেমের মেয়ে এবং আর একজন বড় আলেমের ভাইঝি। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় আগমনের পর আমার বাপ ও চাচা দু'জনই তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন। দীর্ঘক্ষণ তাঁর সাথে কথাবার্তা বলার পর তারা ঘরে ফিরে আসেন। এ সময় আমি নিজের কানে তাদেরকে এভাবে আলাপ করতে শুনি ঃ

চাচা ঃ আমাদের কিতাবে যে নবীর খবর দেয়া হয়েছে ইনি কি সত্যিই সেই নবী?

পিতা ঃ আল্লাহর কসম, ইনিই সেই নবী।

চাচা ঃ এ ব্যাপারে তুমি কি একেবারে নিশ্চিত?

পিতা ঃ হাঁ।

চাচা ঃ তাহলে এখন কি করতে চাও?

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ
يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ
عَلٰى غَضَبٍ ۭ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٩٠﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا
بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا
وَرَآءَهٗ ۭ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۭ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ
اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩١﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ
مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٩٢﴾

যে জিনিসের সাহায্যে তারা মনের সান্ত্বনা লাভ করে, তা কতই না নিকৃষ্ট![৯৬] সেটি হচ্ছে, আল্লাহ যে হিদায়াত নাযিল করেছেন তারা কেবল এই জিদের বশবর্তী হয়ে তাকে মেনে নিতে অস্বীকার করছে যে, আল্লাহ তাঁর যে বান্দাকে চেয়েছেন নিজের অনুগ্রহ (অহী ও রিসালাত) দান করেছেন।[৯৭] কাজেই এখন তারা উপর্যুপরি গযবের অধিকারী হয়েছে। আর এই ধরনের কাফেরদের জন্য চরম লাঞ্ছনার শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে।

যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন তার ওপর ঈমান আনো, তারা বলে, "আমরা কেবল আমাদের এখানে (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলদের মধ্যে) যা কিছু নাযিল হয়েছে তার ওপর ঈমান আনি।" এর বাইরে যা কিছু এসেছে তার প্রতি ঈমান আনতে তারা অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। অথচ তা সত্য এবং তাদের কাছে পূর্ব থেকে যে শিক্ষা ছিল তার সত্যতার স্বীকৃতিও দিচ্ছে। তাদেরকে বলে দাও ঃ যদি তোমরা তোমাদের ওখানে যে শিক্ষা নাযিল হয়েছিল তার ওপর ঈমান এনে থাকো, তাহলে ইতিপূর্বে আল্লাহর নবীদেরকে (যারা বনী ইসরাঈলদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিলেন) হত্যা করেছিলে কেন? তোমাদের কাছে মূসা এসেছিল কেমন সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে। তারপরও তোমরা এমনি যালেম হয়ে গিয়েছিলে যে, সে একটু আড়াল হতেই তোমরা বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে বসেছিলে।

পিতা ঃ যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে এর বিরোধিতা করে যাবো। একে সফলকাম হতে দেবো না। (ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ১৬৫ পৃঃ আধুনিক সংস্করণ)।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ۖ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
وَاسْمَعُوا ۖ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۖ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ
قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾ قُلْ إِنْ كَانَتْ
لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ ۚ
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ
بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

তারপর সেই অংগীকারের কথাটাও একবার স্মরণ করো, যা আমি তোমাদের থেকে নিয়েছিলাম তূর পাহাড়কে তোমাদের ওপর উঠিয়ে রেখে। আমি জোর দিয়েছিলাম, যে পথনির্দেশ আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি, দৃঢ়ভাবে তা মেনে চলো এবং মন দিয়ে শুনো। তোমাদের পূর্বসূরীরা বলেছিল, আমরা শুনেছি কিন্তু মানবো না। তাদের বাতিলপ্রিয়তা ও অন্যায় প্রবণতার কারণে তাদের হৃদয় প্রদেশে বাছুরই অবস্থান গেড়ে বসেছিল। যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো, তাহলে এ কেমন ঈমান, যা তোমাদেরকে এহেন খারাপ কাজের নির্দেশ দেয়?

তাদেরকে বলো, যদি সত্যিসত্যিই আল্লাহ সমগ্র মানবতাকে বাদ দিয়ে একমাত্র তোমাদের জন্য আখেরাতের ঘর নির্দিষ্ট করে থাকেন, তাহলে তো তোমাদের মৃত্যু কামনা করা উচিত[৯৮]—যদি তোমাদের এই ধারণায় তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, তারা কখনো এটা কামনা করবে না। কারণ তারা স্বহস্তে যা কিছু উপার্জন করে সেখানে পাঠিয়েছে তার স্বাভাবিক দাবী এটিই (অর্থাৎ তারা সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে না)। আল্লাহ ঐ সব যালেমদের অবস্থা ভালোভাবেই জানেন। বেঁচে থাকার ব্যাপারে তোমরা তাদেরকে পাবে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে লোভী।[৯৯] এমনকি এ ব্যাপারে তারা মুশরিকদের চাইতেও এগিয়ে রয়েছে। এদের প্রত্যেকে চায় কোনক্রমে সে যেন হাজার বছর বাঁচতে পারে,। অথচ দীর্ঘ জীবন কোন অবস্থায়ই তাকে আযাব থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না। যে ধরনের কাজ এরা করছে আল্লাহ তার সবই দেখছেন।

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾

১২ রুকূ

ওদেরকে বলে দাও, যে ব্যক্তি জিব্রীলের সাথে শত্রুতা করে[১০০] তার জেনে রাখা উচিত, জিব্রীল আল্লাহরই হুকুমে এই কুরআন তোমার দিলে অবতীর্ণ করেছে[১০১] এটি পূর্বে আগত কিতাবগুলোর সত্যতা স্বীকার করে ও তাদের প্রতি সমর্থন যোগায়[১০২] এবং ঈমানদারদের জন্য পথনির্দেশনা ও সাফল্যের বার্তাবাহী।[১০৩] (যদি এই কারণে তারা জিব্রীলের প্রতি শত্রুতার মনোভাব পোষণ করে থাকে তাহলে তাদেরকে বলে দাও) যে ব্যক্তি আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা, তাঁর রসূলগণ, জিব্রীল ও মীকাইলের শত্রু আল্লাহ সেই কাফেরদের শত্রু।

৯৬. এই আয়াতটির দ্বিতীয় একটি অনুবাদও হতে পারে। সেটি হচ্ছে ঃ "যতই না নিকৃষ্ট সেটি, যার জন্য তারা নিজেদের জীবন বিক্রি করে দিয়েছে। অর্থাৎ নিজেদের কল্যাণ, শুভ পরিণতি ও পরকালীন নাজাতকে কুরবানী করে দিয়েছে।"

৯৭. তারা চাচ্ছিল, ঐ নবী তাদের ইসরাঈল বংশের মধ্যে জন্ম নেবে। কিন্তু যখন তিনি বনী ইসরাঈলের বাইরে এমন এক বংশে জন্মগ্রহণ করলেন, যাদেরকে তারা নিজেদের মোকাবিলায় তুচ্ছ-জ্ঞান করতো, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করতে উদ্যত হলো। অর্থাৎ তারা যেন বলতে চাচ্ছিল, আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করে নবী পাঠালেন না কেন? যখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস না করে যাকে ইচ্ছা তাকে নবী বানিয়ে পাঠালেন তখন তারা বেঁকে বসলো।

৯৮. ইহুদিদের দুনিয়া প্রীতির প্রতি এটি সূক্ষ্ম বিদ্রূপ বিশেষ। আখেরাতের জীবন সম্পর্কে যারা সচেতন এবং আখেরাতের জীবনের সাথে যাদের সত্যিই কোন মানসিক সংযোগ থাকে তারা কখনো পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্য মরিয়া হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু ইহুদিদের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল এবং এখনো আছে।

৯৯. কুরআনের মূল শব্দে এখানে 'আলা হায়াতিন' বলা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, কোন না কোনভাবে বেঁচে থাকা, তা যে কোন ধরনের বেঁচে থাকা হোক না কেন, সম্মানের ও মর্যাদার বা হীনতার, দীনতার, লাঞ্ছনা-অবমাননার জীবনই হোক না কেন তার প্রতিই তাদের লোভ।

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾
أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا
مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ۖ كِتَابَ اللَّهِ
وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

আমি তোমার প্রতি এমন সব আয়াত নাযিল করেছি যেগুলো দ্ব্যর্থহীন সত্যের প্রকাশে সমুজ্জ্বল। একমাত্র ফাসেক গোষ্ঠী ছাড়া আর কেউ তার অনুগামিতায় অস্বীকৃতি জানায়নি। যখনই তারা কোন অংগীকার করেছে তখনই কি তাদের কোন না কোন উপদল নিশ্চিতরূপেই তার বুড়ো আঙুল দেখায়নি। বরং তাদের অধিকাংশই সাচ্চা দিলে ঈমান আনে না। আর যখনই তাদের কাছে পূর্ব থেকে রক্ষিত কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করে ও তার প্রতি সমর্থন দিয়ে কোন রসূল এসেছে তখনই এই আহলি কিতাবদের একটি উপদল আল্লাহর কিতাবকে এমনভাবে পেছনে ঠেলে দিয়েছে যেন তারা কিছু জানেই না।

১০০. ইহুদিরা কেবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর ওপর যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকেই গালাগালি দিতো না বরং তারা আল্লাহর প্রিয় মহান ফেরেশতা জিব্রীলকেও গালাগালি দিতো এবং বলতো ঃ সে আমাদের শত্রু। সে রহমতের নয়, আযাবের ফেরেশতা।

১০১. অর্থাৎ এ জন্যই তোমাদের গালমন্দ জিব্রীলের ওপর নয়, আল্লাহর মহান সত্তার ওপর আরোপিত হয়।

১০২. এর অর্থ হচ্ছে, জিব্রীল এ কুরআন মজীদ বহন করে এনেছেন বলেই তোমরা এ গালাগালি করছো। অথচ কুরআন সরাসরি তাওরাতকে সমর্থন যোগাচ্ছে। কাজেই তোমাদের গালিগালাজ তাওরাতের বিরুদ্ধেও উচ্চারিত হয়েছে।

১০৩. এখানে একটি বিশেষ বিষয়বস্তুর প্রতি সূক্ষ্ম ইংগিত করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে ঃ ওহে নির্বোধের দল! তোমাদের সমস্ত অসন্তুষ্টি হচ্ছে হিদায়াত ও সত্য-সহজ পথের বিরুদ্ধে। তোমরা লড়ছো সঠিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। অথচ এই সঠিক ও নির্ভুল নেতৃত্বকে সহজভাবে মেনে নিলে তা তোমাদের জন্য সাফল্যের সুসংবাদ বহন করে আনতো।

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ
وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ
عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۭ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى
يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۭ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ
بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۭ وَمَا هُمْ بِضَاۗرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ
وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۭ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ
مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۣ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ۭ لَوْ كَانُوْا
يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ۭ
لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٣﴾

আর এই সংগে তারা এমন সব জিনিসের অনুসরণ করাতে মেতে ওঠে, যেগুলো শয়তানরা পেশ করতো সুলাইমানী রাজত্বের নামে।[১০৪] অথচ সুলাইমান কোন দিন কুফরী করেনি। কুফরী করেছে সেই শয়তানরা, যারা লোকদেরকে যাদু শেখাতো। তারা ব্যাবিলনে দুই ফেরেশতা হারূত ও মারূতের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা আয়ত্ব করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। অথচ তারা (ফেরেশতারা) যখনই কাউকে এর শিক্ষা দিতো, তাকে পরিষ্কার ভাষায় এই বলে সতর্ক করে দিতো ঃ দেখো, আমরা নিছক একটি পরীক্ষা মাত্র, তুমি কুফরীতে লিপ্ত হয়ো না।[১০৫] এরপরও তারা তাদের থেকে এমন জিনিস শিখতো, যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এনে দিতো।[১০৬] একথা সুস্পষ্ট, আল্লাহর হুকুম ছাড়া এ উপায়ে তারা কাউকেও ক্ষতি করতে পারতো না। কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা এমন জিনিস শিখতো যা তাদের নিজেদের জন্য লাভজনক ছিল না বরং ছিল ক্ষতিকর। তারা ভালো করেই জানতো, এর ক্রেতার জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই। কতই না নিকৃষ্ট জিনিসের বিনিময়ে তারা বিকিয়ে দিল নিজেদের জীবন! হায়, যদি তারা একথা জানতো! যদি তারা ঈমান ও তাকওয়া অবলম্বন করতো, তাহলে আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান লাভ করতো এটি তাদের জন্য হোত বেশী ভালো। হায়, যদি তারা একথা জানতো।

১০৪. শয়তানরা বলতে জ্বিন জাতি ও মানবজাতি উভয়ের অন্তরভুক্ত শয়তান হতে পারে। এখানে উভয়ের কথাই বলা হয়েছে। বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যখন নৈতিক ও বস্তুগত পতন সূচিত হলো, গোলামি, মূর্খতা, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা ও হীনতা যখন তাদের সমস্ত জাতিগত উচ্চ মনোবল ও উচ্চাকাংখার বিলোপ সাধন করলো তখন যাদু-টোনা, তাবীজ-তুমার, টোটকা ইত্যাদির প্রতি তারা আকৃষ্ট হতে থাকলো বেশী করে। তারা এমন সব পন্থার অনুসন্ধান করতে লাগলো যাতে কোন প্রকার পরিশ্রম ও সংগ্রাম-সাধন ছাড়াই নিছক ঝাড়-ফুঁক তন্ত্রমন্ত্রের জোরে বাজীমাত করা যায়। তখন শয়তানরা তাদেরকে প্ররোচনা দিতে লাগলো। তাদেরকে বুঝাতে থাকলো যে, সুলাইমান আলাইহিস সালামের বিশাল রাজত্ব এবং তাঁর বিস্ময়কর ক্ষমতা তো আসলে কিছু মন্ত্র-তন্ত্র ও কয়েকটা আঁচড়, নকশা তথা তাবীজের ফল। শয়তানরা তাদেরকে সেগুলো শিখিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিল। বনী ইসরাঈলরা অপ্রত্যাশিত মহামূল্যবান সম্পদ মনে করে এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ফলে আল্লাহর কিতাবের প্রতি তাদের কোন আগ্রহ ও আকর্ষণ থাকলো না এবং কোন সত্যের আহবায়কের আওয়াজ তাদের হৃদয়তন্ত্রীতে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো না।

১০৫. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে আমি যা কিছু বুঝেছি তা হচ্ছে এই যে, সমগ্র বনী ইসরাঈল জাতি যে সময় ব্যাবিলনে বন্দী ও গোলামির জীবন যাপন করছিল, আল্লাহ তখন তাদের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে দু'জন ফেরেশতাকে মানুষের বেশে তাদের কাছে হয়তো পাঠিয়ে থাকবেন। লূত জাতির কাছে যেমন ফেরেশতারা গিয়েছিলেন সুদর্শন বালকের বেশ ধারণ করে তেমনি বনী ইসরাঈলদের কাছে তারা হয়তো পীর ও ফকীরের ছদ্মবেশে হাযির হয়ে থাকবে। সেখানে একদিকে তারা নিজেদের যাদুর দোকান সাজিয়ে বসে থাকতেন আর অন্যদিকে লোকদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দিতেন ঃ দেখো, আমরা তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। কাজেই নিজেদের পরকাল নষ্ট করো না। কিন্তু তাদের এই সতর্কবাণী ও সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও লোকেরা তাদের দেয়া ঝাড়-ফুঁক ও তাবীজ-তুমারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

ফেরেশতাদের মানুষের আকার ধারণ করে মানুষের মধ্যে কাজ করার ব্যাপারটায় অবাক হবার কিছুই নেই। তারা আল্লাহর সাম্রাজ্যের কর্মচারী। নিজেদের দায়িত্ব পালনের জন্য যে সময় যে আকৃতি ধারণ করার প্রয়োজন হয় তারা তাই করেন। এখনই এ মুহূর্তে আমাদের চারদিকে কতজন ফেরেশতা মানুষের আকার ধরে এসে কাজ করে যাচ্ছেন তার কতটুকু খবরই বা আমরা রাখি। তবে ফেরেশতাদের এমন একটা কাজ শেখাবার দায়িত্ব নেয়া, যা মূলত খারাপ, এর অর্থ কি? এটা বুঝার জন্য এ ক্ষেত্রে এমন একটি পুলিশের দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে যে পুলিশের পোশাক ছেড়ে সাধারণ নাগরিকের পোশাক পরে কোন ঘুষখোর প্রশাসকের কাছে হাযির হয় তার ঘুষখোরীর প্রমাণ সংগ্রহের জন্য। একটি নোটের গায়ে বিশেষ চিহ্ন দিয়ে সে ঘুষ হিসেবে প্রশাসককে দেয়, যাতে ঘুষ নেয়ার সময় হাতেনাতে তাকে ধরতে পারে এবং তার পক্ষে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করার কোন অবকাশই না থাকে।

১০৬. অর্থাৎ সেই বাজারে সবচেয়ে বেশী চাহিদা ছিল এমন তাবীজের যার সাহায্যে এক ব্যক্তি অন্য একজনের স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে নিজের প্রতি

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا
الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ
بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾

১৩ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ![১০৭] 'রাইনা' বলো না বরং 'উনযুরনা' বলো এবং মনোযোগ সহকারে কথা শোনো।[১০৮] এই কাফেররা তো যন্ত্রণাদায়ক আযাব লাভের উপযুক্ত।

আহলি কিতাব বা মুশরিকদের মধ্য থেকে যারা সত্যের দাওয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তারা কখনোই তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর কোন কল্যাণ নাযিল হওয়া পছন্দ করে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান নিজের রহমত দানের জন্য বাছাই করে নেন এবং তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল।

প্রেমাসক্ত করতে পারে। তাদের মধ্যে যে নৈতিক পতন দেখা দিয়েছিল এটি ছিল তার নিকৃষ্টতম পর্যায়। যে জাতির সদস্যবৃন্দ পরকীয়া প্রেমে আসক্ত হওয়া ও অন্যের বিয়ে করা বউকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়াকে নিজেদের সবচেয়ে বড় বিজয় মনে করে এবং এটিই তাদের দৈনন্দিন জীবনের সর্বাধিক আকর্ষণীয় কাজে পরিণত হয়, তার নৈতিক অধপতন যে ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে গেছে তা নিসন্দেহে বলা যেতে পারে।

আসলে দাম্পত্য সম্পর্ক হচ্ছে মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির মূল। নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সুস্থতার ওপর সমগ্র মানব সভ্যতার সুস্থতা এবং এর অসুস্থতার ওপর সমগ্র মানব সভ্যতার অসুস্থতা নির্ভরশীল। কাজেই যে বৃক্ষটির দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ থাকার ওপর ব্যক্তির ও সমগ্র সমাজের টিকে থাকা নির্ভর করে তার মূলে যে ব্যক্তি কুঠারঘাত করে তার চাইতে নিকৃষ্ট বিপর্যয় সৃষ্টিকারী আর কে হতে পারে? হাদীসে বলা হয়েছে, ইবলিস তার কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর প্রত্যেক এলাকায় নিজের এজেন্ট পাঠায়। এজেন্টরা কাজ শেষে ফিরে এসে নিজেদের কাজের নিপোর্ট শুনাতে থাকে। কেউ বলে আমি অমুক ফিতনা সৃষ্টি করেছি। কেউ বলে, আমি অমুক পাপের আয়োজন করেছি। কিন্তু ইবলিস প্রত্যেককে বলে যেতে থাকে, তুমি কিছুই করোনি। তারপর একজন এসে বলে, আমি এক জোড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এসেছি। একথা শুনে ইবলিস তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। সে বলতে থাকে, তুমি একটা কাজের মতো কাজ করে এসেছো। এ হাদীসটি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে বনী ইসরাঈলদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে ফেরেশতা পাঠানো হয়েছিল তাদের কেন যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার 'আমল'

লোকদেরকে শিখাবার হুকুম দেয়া হয়েছিল তা সুস্পষ্টরূপে অনুধাবন করা যায়। আসলে তাদের নৈতিক অধপতনের যথাযথ পরিমাপের জন্য এটিই ছিল একমাত্র মানদণ্ড।

১০৩. এ রুকূ'তে এবং পরবর্তী রুকূ'গুলোতে ইহুদিদের পক্ষ থেকে ইসলাম ও ইসলামী দলের বিরুদ্ধে যেসব অনিষ্টকর কাজ করা হচ্ছিল সে সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। তারা মুসলমানদের মনে যে সমস্ত সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিল এখানে সেগুলোর জবাব দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের সাথে ইহুদিদের আলাপ-আলোচনায় যেসব বিশেষ বিশেষ প্রসংগ উত্থাপিত হতো, সেগুলোও এখানে আলোচিত হয়েছে। এ প্রসংগে এ বিষয়টিও সামনে থাকা উচিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় আগমনের পর যখন শহরের আশপাশের এলাকায় ইসলামের দাওয়াত বিস্তার লাভ করতে থাকলো। তখন ইহুদিরা বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদেরকে ধর্মীয় বিতর্কে টেনে আনার চেষ্টা করতে থাকলো। তাদের তিলকে তাল করার, প্রতি গুরুত্বহীন বিষয়কে বিরাট গুরুত্ব দেয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের অবতারণা করার, সন্দেহ-সংশয়ের বীজ বপন করার ও প্রশ্নের মধ্য থেকে প্রশ্ন বের করার মারাত্মক রোগটি এসব সরলমনা লোকদের মনেও তারা সঞ্চারিত করতে চাচ্ছিল। এমন কি তারা নিজেরাও সশরীরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে এসে প্রতারণামূলক কথাবার্তা বলে নিজেদের নীচ মনোবৃত্তির প্রমাণ পেশ করতো।

১০৪. ইহুদিরা কখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে এলে অভিবাদন, সম্ভাষণ ও কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সম্ভাব্য সকল পদ্ধতিতে নিজেদের মনের ক্ষোভ মিটিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতো। দ্ব্যর্থবোধক শব্দ বলা, উচ্চস্বরে কিছু বলা এবং অনুচ্চস্বরে অন্য কিছু বলা, বাহ্যিক ভদ্রতা ও আদব-কায়দা মেনে চলে পর্দান্তরালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবমাননা ও অপমান করার কোন কসরতই তারা বাকি রাখতো না। পরবর্তী পর্যায়ে কুরআনে এর বহু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে মুসলমানদেরকে একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ শব্দটি বহু অর্থবোধক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আলোচনার সময় ইহুদিদের যখন একথা বলার প্রয়োজন হতো যে, থামুন বা 'কথাটি আমাদের একটু বুঝে নিতে দিন' তখন তারা 'রাইনা' বলতো। এ শব্দটির বাহ্যিক অর্থ ছিল, 'আমাদের একটু সুযোগ দিন' বা 'আমাদের কথা শুনুন।' কিন্তু এর আরো কয়েকটি সম্ভাব্য অর্থও ছিল। যেমন হিব্রু ভাষায় অনুরূপ যে শব্দটি ছিল তার অর্থ ছিল : 'শোন, তুই বধির হয়ে যা।' আরবী ভাষায়ও এর একটি অর্থ ছিল, 'মূর্খ ও নির্বোধ'। আলোচনার মাঝখানে এমন সময় শব্দটি প্রয়োগ করা হতো যখন এর অর্থ দাঁড়াতো, তোমরা আমাদের কথা শুনলে আমরাও তোমাদের কথা শুনবো। আবার মুখটাকে একটু বড় করে 'রা-ঈয়ান' (راعينا) ও বলার চেষ্টা করা হতো। এর অর্থ দাঁড়াতো 'ওহে, আমাদের রাখাল!' তাই মুসলমানদের হুকুম দেয়া হয়েছে, তোমরা এ শব্দটি ব্যবহার না করে বরং 'উনযুরনা' বলো। এর অর্থ হয়, 'আমাদের দিকে দেখুন' 'আমাদের প্রতি দৃষ্টি দিন' অথবা 'আমাদের একটু বুঝতে দিন।' এরপর আবার বলা হয়েছে, 'মনোযোগ সহকারে কথা শোনো।' অর্থাৎ ইহুদিদের একথা বার বার বলার প্রয়োজন হয়। কারণ তারা নবীর কথার প্রতি আগ্রহী হয় না এবং তাঁর

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ
اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٦﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٠٧﴾
اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ
يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٠٨﴾ وَدَّ كَثِيْرٌ
مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا
مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا
وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٩﴾

আমি যে আয়াতকে 'মানসূখ' করি বা ভুলিয়ে দেই, তার জায়গায় আনি তার চাইতে ভালো অথবা কমপক্ষে ঠিক তেমনটিই।[১০৯] তুমি কি জানো না, আল্লাহ সব জিনিসের ওপর ক্ষমতাশালী? তুমি কি জানো না, পৃথিবী ও আকাশের শাসন কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর? আর তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই।

তাহলে তোমরা কি তোমাদের রসূলের কাছে সেই ধরনের প্রশ্ন ও দাবী করতে চাও যেমন এর আগে মূসার কাছে করা হয়েছিল?[১১০] অথচ যে ব্যক্তি ঈমানী নীতিকে কুফরী নীতিতে পরিবর্তিত করেছে, সে-ই সত্য-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আহ্‌লি কিতাবদের অধিকাংশই তোমাদেরকে কোনক্রমে ঈমান থেকে আবার কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নিতে চায়। যদিও হক তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে তবুও নিজেদের হিংসাত্মক মনোবৃত্তির কারণে এটিই তাদের কামনা। এর জবাবে তোমরা ক্ষমা ও উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করো।[১১১] যতক্ষণ না আল্লাহ নিজেই এর কোন ফায়সালা করে দেন। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাশালী।

وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ
الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارٰى ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا
بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صٰدِقِينَ ﴿١١١﴾ بَلٰى ۚ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ
مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও। নিজেদের পরকালের জন্য তোমরা যা কিছু সৎকাজ করে আগে পাঠিয়ে দেবে, তা সবই আল্লাহর ওখানে মজুত পাবে। তোমরা যা কিছু করো সবই আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে।

তারা বলে, কোন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না, যে পর্যন্ত না সে ইহুদি হয় অথবা (খৃষ্টানদের ধারণামতে) খৃষ্টান হয়। এগুলো হচ্ছে তাদের আকাংখা।[১১২] তাদেরকে বলে দাও, তোমাদের প্রমাণ আনো, যদি নিজেদের দাবীর ব্যাপারে তোমরা সত্যবাদী হও। (আসলে তোমাদের বা অন্য কারোর কোন বিশেষত্ব নেই।) সত্য বলতে কি যে ব্যক্তিই নিজের সত্তাকে আল্লাহর আনুগত্যে সোপর্দ করবে এবং কার্যত সৎপথে চলবে, তার জন্য তার রবের কাছে আছে এর প্রতিদান। আর এই ধরনের লোকদের জন্য কোন ভয় বা মর্মবেদনার অবকাশ নেই।

কথা বলার মাঝখানে তারা নিজেদের চিন্তাজালে বার বার জড়িয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু তোমাদের তো মনোযোগ সহকার নবীর কথা শুনতে হবে। কাজেই এ ধরনের ব্যবহার করার প্রয়োজনই তোমাদের দেখা দেবে না।

১০৯. ইহুদিরা মুসলমানদের মনে যেসব সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা চালাতো তার মধ্য থেকে একটি বিশেষ সন্দেহের জবাব এখানে দেয়া হয়েছে। তাদের অভিযোগ ছিল, পূর্ববর্তী কিতাবগুলো যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থেকে থাকে এবং এ কুরআনও আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, তাহলে ঐ কিতাবগুলোর কতিপয় বিধানের জায়গায় এখানে ভিন্নতর বিধান দেয়া হয়েছে কেন? একই আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিধান কেমন করে হতে পারে? আবার তোমাদের কুরআন এ দাবী উত্থাপন করেছে যে, ইহুদিরা ও খৃষ্টানরা তাদেরকে প্রদত্ত এ শিক্ষার একটি অংশ ভুলে গেছে। আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষা হাফেজদের মন থেকে কেমন করে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে? সঠিক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে তারা এসব কথা বলতো না। বরং কুরআনের আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হবার ব্যাপারে মুসলমানদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তারা এগুলো বলতো। এর জবাবে আল্লাহ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۖ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ
الْيَهُودُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُونَ الْكِتٰبَ ۗ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ
لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا
كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

১৪ রুকূ'

ইহুদিরা বলে, খৃষ্টানদের কাছে কিছুই নেই। খৃষ্টানরা বলে ইহুদিদের কাছে কিছুই নেই। অথচ তারা উভয়ই কিতাব পড়ে। আর যাদের কাছে কিতাবের জ্ঞান নেই তারাও এ ধরনের কথা বলে থাকে।[১১৩] এরা যে মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ এর চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেবেন।

বলেছেন ঃ আমি মালিক। আমার ক্ষমতা সীমাহীন। আমি নিজের ইচ্ছে মতো যে কোন বিধান 'মান্‌সুখ' বা রহিত করে দেই এবং যে কোন বিধানকে হাফেজদের মন থেকে মুছে ফেলি। কিন্তু যে জিনিসটি আমি 'মান্‌সুখ' করি তার জায়গায় তার চেয়ে ভালো জিনিস আনি অথবা কমপক্ষে সেই জিনসটি নিজের জায়গায় আগেরটির মতই উপযোগী ও উপকারী হয়।

১১০. ইহুদিরা তিলকে তাল করে এবং সূক্ষ্ম বিষয়ের অবতারণা করে মুসলমানদের সামনে নানা ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করতো। তোমাদের নবীর কাছে এটা জিজ্ঞেস করো ওটা জিজ্ঞেস করো বলে তারা মুসলমানদের উস্কানী দিতো। তাই এ ব্যাপারে আল্লাহ মুসলমানদেরকে ইহুদিদের নীতি অবলম্বন করা থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করে দিচ্ছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এ ব্যাপারে মুসলমানদেকে বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলতেন, অনর্থক প্রশ্ন করা এবং তিলকে তাল করার কারণে পূর্ববর্তী উম্মাতরা ধ্বংস হয়েছে, কাজেই তোমরা এ পথে পা দিয়ো না। আল্লাহ ও তাঁর রসূল যে প্রশ্নগুলো উত্থাপন করেননি সেগুলোর পেছনে জোঁকের মতো লেগে থেকো না। তোমাকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তা মেনে চলো এবং যে বিষয়গুলো থেকে নিষেধ করা হয় সেগুলো করো না। অপ্রয়োজনীয় কথা বাদ দিয়ে কাজের কথার প্রতি মনোযোগ দাও।

১১১. অর্থাৎ ওদের হিংসা ও বিদ্বেষ দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ো না। নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলো না। এদের সাথে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া করে নিজের মূল্যবান সময় ও মর্যাদা নষ্ট করো না। ধৈর্যসহকারে দেখতে থাকো আল্লাহ কি করেন। অনর্থক আজেবাজে কাজে নিজের শক্তি ক্ষয় না করে আল্লাহর যিকির ও সৎকাজে সময় ব্যয় করো। এগুলোই আল্লাহর ওখানে কাজে লাগবে। বিপরীত পক্ষে ঐ বাজে কাজগুলোর আল্লাহর ওখানে কোন মূল্য নেই।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُّذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ
فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَّدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾ وَلِلَّهِ
الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

আর তার চাইতে বড় যালেম আর কে হবে যে আল্লাহর ঘরে তাঁর নাম স্মরণ করা থেকে মানুষকে বাধা দেয় এবং সেগুলো ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালায়? এই ধরনের লোকেরা এসব ইবাদাতগৃহে প্রবেশের যোগ্যতা রাখে না আর যদি কখনো প্রবেশ করে, তাহলে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় প্রবেশ করতে পারে।[১১৪] তাদের জন্য রয়েছে এ দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে বিরাট শাস্তি।

পূর্ব ও পশ্চিম সব আল্লাহর। তোমরা যেদিকে মুখ ফিরাবে সেদিকেই আল্লাহর চেহারা বিরাজমান।[১১৫] আল্লাহ বড়ই ব্যাপকতার অধিকারী এবং তিনি সবকিছু জ্ঞাত।[১১৬]

১১২. আসলে এটা নিছক তাদের অন্তরের বাসনা এবং আকাংখা মাত্র। কিন্তু তারা এটাকে এমনভাবে বর্ণনা করছে যেন সত্যি সত্যিই এমনটি ঘটবে।

১১৩. অর্থাৎ আরবের মুশরিকরা।

১১৪. অর্থাৎ ইবাদাতগৃহগুলো এ ধরনের যালেমদের কর্তৃত্বে ও পরিচালনাধীনে থাকার এবং তারা এর রক্ষণাবেক্ষণকারী হবার পরিবর্তে শাসন কর্তৃত্ব থাকা উচিত আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহর প্রতি অনুগত এমন সব লোকদের হাতে আর তারাই হবে ইবাদাতগৃহগুলোর রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাহলে এ দুষ্কৃতিকারীরা সেখানে গেলেও কোন দুষ্কর্ম করার সাহস করবে না। কারণ তারা জানবে, সেখানে গিয়ে কোন দুষ্কর্ম করলে শাস্তি পেতে হবে। এখানে মক্কার কাফেরদের যুলুমের প্রতিও সূক্ষ্ম ইংগিত করা হয়েছে। তাদের নিজেদের জাতির যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারা তাদেরকে আল্লাহর ঘরে ইবাদাত করতে বাধা দিয়েছিল।

১১৫. অর্থাৎ আল্লাহ পূর্বেরও নয়, পশ্চিমেরও নয়। তিনি সকল দিকের ও সকল স্থানের মালিক। কিন্তু নিজে কোন স্থানের পরিসরে সীমাবদ্ধ নেই। কাজেই তাঁর ইবাদাতের জন্য কোন দিক বা স্থান নির্দিষ্ট করার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ সেদিকে বা সে স্থানে

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ
كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿١١٦﴾ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰٓى
اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿١١٧﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا
يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ
قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿١١٨﴾ اِنَّآ
اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿١١٩﴾

তারা বলে, আল্লাহ কাউকে ছেলে হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ পবিত্র এসব কথা থেকে। আসলে পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত জিনিসই তাঁর মালিকানাধীন, সবকিছুই তাঁর নির্দেশের অনুগত। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তিনি যে বিষয়েরই সিদ্ধান্ত নেন সে সম্পর্কে কেবলমাত্র হুকুম দেন 'হও', তাহলেই তা হয়ে যায়।

অজ্ঞ লোকেরা বলে, আল্লাহ নিজে আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন অথবা কোন নিশানী আমাদের কাছে আসে না কেন?[১১৭] এদের আগের লোকেরাও এমনি ধারা কথা বলতো। এদের সবার (আগের ও পরের পথভ্রষ্টদের) মানসিকতা একই।[১১৮] দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য আমরা নিশানীসমূহ সুস্পষ্ট করে দিয়েছি।[১১৯] (এর চাইতে বড় নিশানী আর কি হতে পারে যে) আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সত্য জ্ঞান সহকারে সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে।[১২০] যারা জাহান্নামের সাথে সম্পর্ক জুড়েছে তাদের জন্য তুমি দায়ী নও এবং তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে না।

থাকেন। কাজেই ইতিপূর্বে তোমরা ওখানে বা ঐ দিকে ফিরে ইবাদাত করতে আর এখন সেই জায়গা বা দিক পরিবর্তন করলে কেন—একথা নিয়ে ঝগড়া বা বিতর্ক করার কোন অবকাশ নেই।

১১৬. অর্থাৎ মহান আল্লাহ সীমাবদ্ধ নন। তিনি সংকীর্ণ মন, সংকীর্ণ দৃষ্টি ও সংকীর্ণ হাতের অধিকারী নন। অথচ তোমরা আল্লাহকে তোমাদের মতো ভেবে এ রকম মনে করে রেখেছো। বরং তাঁর খোদায়ী কর্তৃত্ব বিশাল-বিস্তৃত এবং তাঁর দৃষ্টিকোণ ও অনুগ্রহ দানের ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। তাঁর কোন্ বান্দা কোথায় কোন্ সময় কি উদ্দেশ্যে তাঁকে স্মরণ করছে—একথাও তিনি জানেন।

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ
اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ
جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٢٠﴾ اَلَّذِيْنَ
اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ۗ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۗ
وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٢١﴾

ইহুদি ও খৃষ্টানরা তোমার প্রতি কখনোই সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের পথে চলতে থাকো।[১২১] পরিষ্কার বলে দাও, পথ মাত্র একটিই, যা আল্লাহ বাতলে দিয়েছেন। অন্যথায় তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তারপরও যদি তুমি তাদের ইচ্ছা ও বাসনা অনুযায়ী চলতে থাকো, তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষাকারী তোমার কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকবে না। যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে যথাযথভাবে পাঠ করে। তারা তার ওপর সাচ্চা দিলে ঈমান আনে। আর যারা তার সাথে কুফরীর নীতি অবলম্বন করে তারাই আসলে ক্ষতিগ্রস্ত।

১১৭. তারা বলতে চাচ্ছিল, আল্লাহ নিজে তাদের সামনে এসে বলবেন ঃ এই ধরো আমার কিতাব আর এ আমার বিধান, তোমরা এর অনুসারী হও। অথবা তাদেরকে এমন কোন নিশানী দেখানো হবে যা দেখে তারা নিশ্চিন্তভাবে বিশ্বাস করতে পারবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু বলছেন আল্লাহর পক্ষ থেকেই বলছেন।

১১৮. অর্থাৎ আজকের পথভ্রষ্টরা এমন কোন অভিযোগ ও দাবী উত্থাপন করেনি, যা এর আগে পথভ্রষ্টরা করেনি। প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত পথভ্রষ্টতার প্রকৃতি অপরিবর্তিত রয়েছে। বার বার একই ধরনের সংশয়, সন্দেহ, অভিযোগ ও প্রশ্নের পুনরাবৃত্তিই সে করে চলছে।

১১৯. "আল্লাহ নিজে এসে আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন?"—এ অভিযোগটি এতবেশী অর্থহীন ছিল যে, এর জবাব দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। আমাদের নিশানী দেখানো হয় না কেন?—শুধুমাত্র এ প্রশ্নটির জবাব দেয়া হয়েছে। এর জবাবে বলা হয়েছে, নিশানী তো রয়েছে অসংখ্য কিন্তু যে ব্যক্তি মানতেই চায় না তাকে কোন্ নিশানীটা দেখানো যায়?

১২০. অর্থাৎ অন্যান্য নিশানী আর কি দেখবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের ব্যক্তিত্বই সবচেয়ে বড় ও উজ্জ্বল নিশানী। তাঁর নবুওয়াত লাভের পূর্বের অবস্থা, যে দেশের ও জাতির মধ্যে তাঁর জন্ম হয়েছিল তার অবস্থা এবং যে অবস্থার মধ্যে তিনি লালিত-পালিত হন ও চল্লিশ বছর জীবন যাপন করেন তারপর নবুওয়াত লাভ করে

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٢﴾

১৫ রুকূ'

হে বনী[১২৩] ইসরাঈল! তোমাদের আমি যে নিয়ামত দান করেছিলাম এবং বিশ্বের জাতিদের ওপর তোমাদের যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম তার কথা স্মরণ করো।

মহান ও বিস্ময়কর কার্যাবলী সম্পাদন করেন—এসব কিছুই এমন একটি উজ্জ্বল নিশানী হিসেবে চিহ্নিত যে, এর পরে আর কোন নিশানীর প্রয়োজনই হয় না।

১২১. এর অর্থ হচ্ছে, তাদের অসন্তুষ্টির কারণ এ নয় যে, তারা যথার্থই সত্যসন্ধানী এবং তুমি সত্যকে তাদের সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরোনি। বরং তোমার প্রতি তাদের অসন্তুষ্টির কারণ হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহর নিদর্শনসমূহ ও তাঁর দীনের সাথে তাদের মতো মুনাফিকসুলভ ও প্রতারণামূলক আচরণ করছো না কেন? আল্লাহ-পূজার ছদ্মবেশে তারা যেমন আত্মপূজা করে যাচ্ছে তুমি তেমন করছো না কেন? দীনের মূলনীতি ও বিধানসমূহের নিজের চিন্তা-ধারণা-কল্পনা এবং নিজের ইচ্ছা-কামনা-বাসনা অনুযায়ী পরিবর্তিত করার ব্যাপারে তাদের মতো দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিচ্ছো না কেন? তাদের মতো প্রদর্শনীমূলক আচরণ, ছল-চাতুরী ও প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছো না কেন? কাজেই তাদেরকে সন্তুষ্ট করার চিন্তা ছেড়ে দাও। কারণ যতদিন তুমি নিজে তাদের রঙে রঞ্জিত হয়ে তাদের স্বভাব আচরণ গ্রহণ করবে না, নিজেদের ধর্মের সাথে তারা যে আচরণ করে যতদিন তুমি তোমার দীনের সাথে অনুরূপ আচরণ করবে না এবং যতদিন তুমি ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মের ব্যাপারে তাদের মতো ভ্রষ্টনীতি অবলম্বন করবে না, ততদিন পর্যন্ত তারা কোনক্রমেই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না।

১২২. এখানে আহ্‌লি কিতাবদের অন্তরগত সৎলোকদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। তারা সততা ও দায়িত্বশীলতার সাথে আল্লাহর কিতাব পড়ে। তাই আল্লাহর কিতাবের দৃষ্টিতে যা সত্য তাকেই তারা সত্য বলে মেনে নেয়।

১২৩. এখান থেকে আর একটি ধারাবাহিক ভাষণ শুরু হচ্ছে। এখানে পরিবেশিত বক্তব্য সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন।

এক ঃ হযরত নূহের পরে হযরত ইবরাহীম প্রথম বিশ্বজনীন নবী। মহান আল্লাহ তাঁকে ইসলামের বিশ্বজনীন দাওয়াত ছড়াবার দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। প্রথমে তিনি নিজে সশরীরে ইরাক থেকে মিসর পর্যন্ত এবং সিরিয়া ও ফিলিস্তীন থেকে নিয়ে আরবের মরু অঞ্চলের বিভিন্ন স্থান পর্যন্ত বছরের পর বছর সফর করে মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যের (অর্থাৎ ইসলাম) দিকে আহবান করতে থাকেন। অতপর এই মিশন সর্বত্র পৌঁছিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। পূর্ব জর্দানে নিজের ভাতিজা হযরত লূতকে

নিযুক্ত করেন। সিরিয়া ও ফিলিস্তীনে নিযুক্ত করেন নিজের ছেলে হযরত ইসহাককে এবং আরবের অভ্যন্তরে নিযুক্ত করেন নিজের বড় ছেলে হযরত ইসমাঈলকে। তারপর মহান আল্লাহর নির্দেশে মক্কায় কা'বাগৃহ নির্মাণ করেন এবং আল্লাহর নির্দেশ মতো এটিকেই এই মিশনের কেন্দ্র গণ্য করেন।

দুই ঃ হযরত ইবরাহীমের বংশধারা দু'টি বড় বড় শাখায় বিভক্ত হয়। একটি শাখা হচ্ছে, হযরত ইসমাঈলের সন্তান-সন্ততিবর্গ। এরা আরবে বসবাস করতো। কুরাইশ ও আরবের আরো কতিপয় গোত্র এরি অন্তরভুক্ত ছিল। আর যেসব আরব গোত্র বংশগত দিক দিয়ে হযরত ইসমাঈলের সন্তান ছিল না তারাও তাঁর প্রচারিত ধর্মে কমবেশী প্রভাবিত ছিল বলেই তাঁর সাথেই নিজেদের সম্পর্ক জুড়তো। দ্বিতীয় শাখাটি ছিল হযরত ইসহাকের সন্তানবর্গের। এই শাখায় হযরত ইয়াকুব, হযরত ইউসুফ, হযরত মূসা, হযরত দাউদ, হযরত সুলাইমান, হযরত ইয়াহ্‌ইয়া, হযরত ঈসা প্রমুখ অসংখ্য নবী জন্মগ্রহণ করেন। আর ইতিপূর্বে বলেছি, যেহেতু হযরত ইয়াকুবের আর এক নাম ছিল ইসরাঈল, তাই তাঁর বংশ বনী ইসরাঈল নামে পরিচিত হয়। তাঁর প্রচার অভিযানের ফলে যেসব জাতি তাঁর দীন গ্রহণ করে তারা তার মধ্যে নিজেদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বিলুপ্ত করে দেয় অথবা তারা বংশগতভাবে তাদের থেকে আলাদা থাকলেও ধর্মীয়ভাবে তাদের অনুসারী থাকে। এই শাখায় অবনতি ও অধপতন সূচিত হলে প্রথমে ইহুদিবাদ ও পরে খৃষ্টবাদের উদ্ভব হয়।

তিন ঃ হযরত ইবরাহীমের আসল কাজ ছিল সমগ্র দুনিয়াবাসীকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে আহবান জানানো এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা পরিশুদ্ধ ও সংশোধিত করে গড়ে তোলা। তিনি নিজে ছিলেন আল্লাহর অনুগত। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান অনুযায়ী নিজের জীবনের সমস্ত কাজ-কারবার পরিচালনা করতেন সারা দুনিয়ায় এই জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটাতেন এবং চেষ্টা করতেন যাতে সমস্ত মানুষ বিশ্ব-জাহানের মালিক ও প্রভুর অনুগত হয়ে এ দুনিয়ায় জীবন যাপন করে। এই মহান ও বিরাট কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে তাঁকে বিশ্বনেতার পদে অভিষিক্ত করা হয়। তারপর তাঁর বংশধারা থেকে যে শাখাটি বের হয়ে হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়াকুবের নামে অগ্রসর হয়ে বনী ইসরাঈল নাম ধারণ করে সেই শাখাটি তার এ নেতৃত্বের উত্তরাধিকার লাভ করে। এই শাখায় নবীদের জন্ম হতে থাকে এবং এদেরকেই সত্য-সঠিক পথের জ্ঞানদান করা হয়। বিশ্বের জাতিসমূহকে সত্য-সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার দায়িত্ব এদের ওপর সোপর্দ করা হয়। এটি ছিল আল্লাহর মহান অনুগ্রহ ও নিয়ামত। মহান আল্লাহ এ বংশের লোকদেরকে তাই একথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এ শাখাটি হযরত সুলাইমানের আমলে বাইতুল মাকদিসকে নিজেদের কেন্দ্র গণ্য করে। তাই যতদিন পর্যন্ত এ শাখাটি নেতৃত্বের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিল ততদিন পর্যন্ত বাইতুল মাকদিসই ছিল দাওয়াত ইলাল্লাহ—মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান জানাবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র।

চার ঃ পেছনের দশটি রুকূ'তে মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে তাদের ঐতিহাসিক অপরাধসমূহ এবং কুরআন নাযিল হবার সময়ে তাদের যে অবস্থা ছিল তা হুবহু বর্ণনা করেছেন। এ সংগে তাদেরকে একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা আমার নিয়ামতের চরম অমর্যাদা করেছো। তোমরা কেবল নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করা থেকে বিরত থাকোনি বরং নিজেরাও সত্য ও সততার পথ পরিহার করেছো। আর এখন

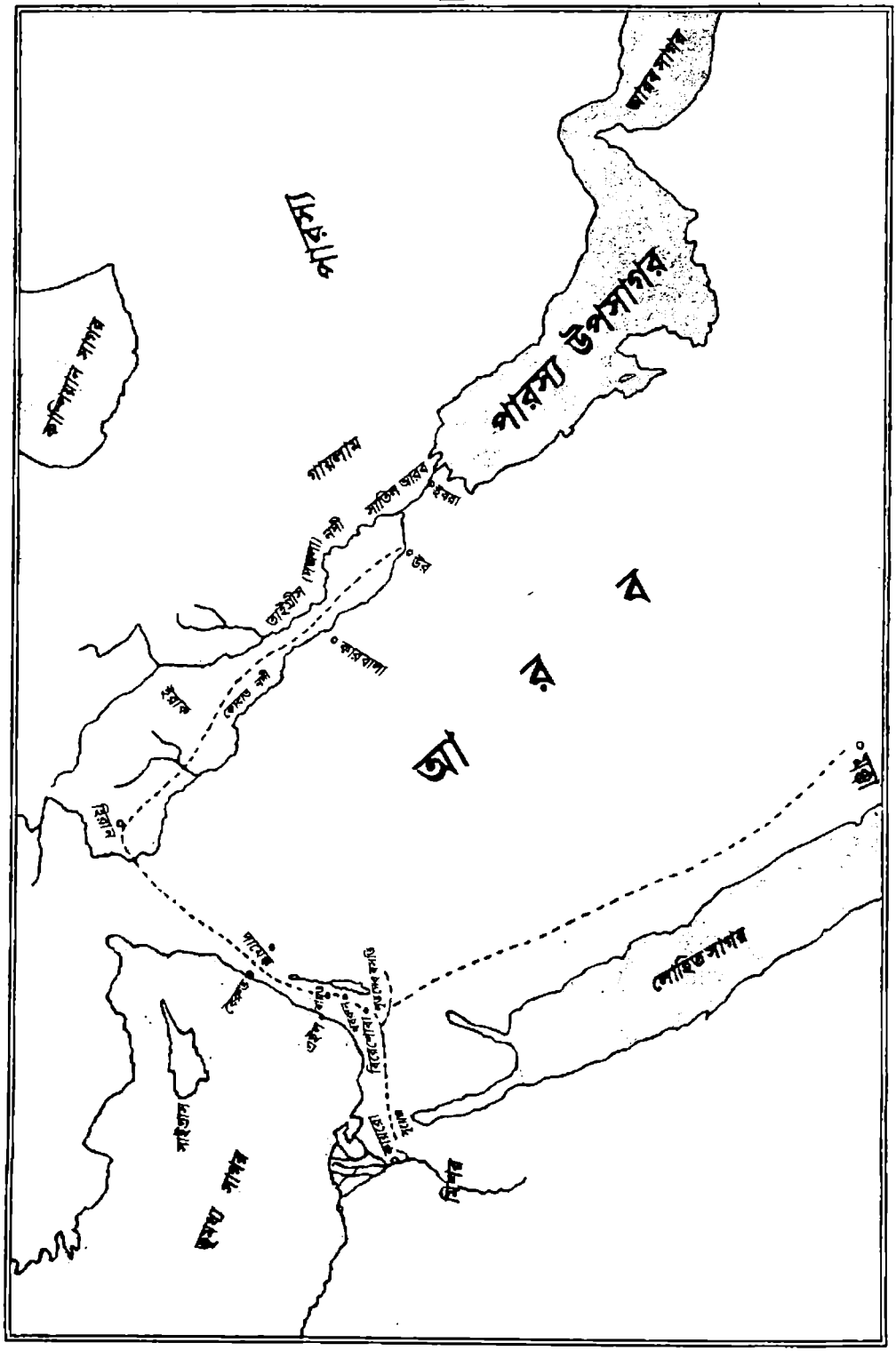

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর হিজরতের পথ

তোমাদের একটি ক্ষুদ্রতম গোষ্ঠী ছাড়া তোমাদের সমগ্র দলের মধ্যে আর কোন যোগ্যতা অবশিষ্ট নেই।

পাঁচ ঃ অতপর এখন তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, বিশ্বমানবতার নেতৃত্ব ইবরাহীমের বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার নয়। বরং নবী ইবরাহীম নিজে যে নিষ্কলুষ আনুগত্যের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে দিয়েছিলেন এটি হচ্ছে তারই ফসল। যারা ইবরাহীমের পথে নিজেরা চলে এবং সমগ্র বিশ্ববাসীকে চালাবার দায়িত্ব পালন করে একমাত্র তারাই এই নেতৃত্বের যোগ্যতা লাভ করতে পারে। যেহেতু তোমরা এ পথ থেকে সরে গেছো এবং এ দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছো তাই নেতৃত্বের পদ থেকে তোমাদের অপসারিত করা হচ্ছে।

ছয় ঃ সংগে সংগে ইশারা-ইংগিতে একথাও বলে দেয়া হচ্ছে, যেসব অইসরাঈলী জাতি মূসা ও ঈসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে নিজেদের সম্পর্ক জুড়েছিল তারাও ইবরাহীমের পথ থেকে সরে গেছে। এই সংগে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, আরবের মুশরিকরাও ইবরাহীম ও ইসমাঈলের সাথে নিজেদের সম্পর্ক রয়েছে বলে গর্ব করে বেড়ায় কিন্তু তারা আসলে নিজেদের বংশ ও গোত্রের অহংকারে মত্ত হয়ে পড়েছে। ইবরাহীম ও ইসমাঈলের পথের সাথে এখন তাদের দূরবর্তী সম্পর্কও নেই। কাজেই তাদের কেউই বিশ্বনেতৃত্বের যোগ্যতা ও অধিকার রাখে না।

সাত ঃ আবার একথাও বলা হচ্ছে, এখন আমরা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশের দ্বিতীয় শাখা বনী ইসমাঈলের মধ্যে এমন এক নবীর জন্ম দিয়েছি যার জন্য ইবরাহীম ও ইসমাঈল উভয়েই দোয়া করেছিলেন। ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও অন্যান্য সকল নবী যে পথ অবলম্বন করেছিলেন তিনিও সেই একই পথ অবলম্বন করেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ায় যত নবী ও রসূল এসেছেন তিনি ও তাঁর অনুসারীরা তাদের সবাইকে সত্যনবী বলে স্বীকার করেন। সকল নবী বিশ্ববাসীকে যে পথের দিকে আহবান জানিয়েছেন তিনি ও তাঁর অনুসারীগণও মানুষকে সেদিকে আহবান জানান। কাজেই যারা এ নবীর অনুসরণ করে এখন একমাত্র তারাই বিশ্বমানবতার নেতৃত্বের যোগ্যতা ও অধিকার রাখে।

আট ঃ নেতৃত্ব পরিবর্তনের ঘোষণার সাথে সাথেই স্বাভাবিকভাবেই কিব্‌লাহ পরিবর্তনের ঘোষণা হওয়াও জরুরী ছিল। যতদিন বনী ইসরাঈলদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল ততদিন বাইতুল মাকদিস ছিল ইসলামী দাওয়াতের কেন্দ্র এবং সেটিই ছিল সত্যপন্থীদের কিব্‌লাহ। শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসরীগণও ততদিন বাইতুল মাকদিসকেই তাঁদের কিব্‌লাহ বানিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু বনী ইসরাঈলকে এ পদ থেকে যথারীতি অপসারিত করার পর বাইতুল মাকদিসের কেন্দ্রীয় গুরত্ব আপনা-আপনি খতম হয়ে গেল। কাজেই ঘোষণা করে দেয়া হলো, যেখান থেকে এ শেষ নবীর দাওয়াতের সূচনা হয়েছে সেই স্থানটিই হবে এখন আল্লাহর দীনের কেন্দ্র। আর যেহেতু শুরুতে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দাওয়াতের কেন্দ্রও এখানে ছিল তাই আহ্‌লি কিতাব ও মুশরিকদের জন্যও এ স্থানটির অর্থাৎ কা'বার কেন্দ্র হবার সর্বাধিক অধিকারের দাবী স্বীকার করে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। অবশ্যি

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا
عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿١٢٣﴾ وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ
رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٢٤﴾

আর সেই দিনকে ভয় করো, যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না, কারোর থেকে ফিদিয়া (বিনিময়) গ্রহণ করা হবে না, কোন সুপারিশ মানুষের জন্য লাভজনক হবে না এবং অপরাধীরা কোথাও কোন সাহায্য পাবে না।

স্মরণ করো যখন ইবরাহীমকে তার রব কয়েকটি ব্যাপারে পরীক্ষা করলেন[১২৪] এবং সেসব পরীক্ষায় সে পুরোপুরি উত্তরে গেলো, তখন তিনি বললেন ঃ "আমি তোমাকে সকল মানুষের নেতার পদে অধিষ্ঠিত করবো।" ইবরাহীম বললো ঃ "আর আমার সন্তানদের সাথেও কি এই অংগীকার?" জবাব দিলেন ঃ "আমার এ অংগীকার যালেমদের ব্যাপারে নয়।"[১২৫]

হঠধর্মীদের কথা আলাদা। তারা সত্যকে সত্য জেনেও তার বিরুদ্ধে অভিযোগের পর অভিযোগ আনতে থাকে।

নয় ঃ উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার নেতৃত্ব ও কা'বার কেন্দ্র হবার কথা ঘোষণা করার পরই মহান আল্লাহ ১৯ রুকূ' থেকে সূরা বাকারার শেষ পর্যন্ত আলোচনায় ধারাবাহিক হেদায়াতের মাধ্যমে এ উম্মাতের জীনব গঠন ও জীবন পরিচালনার জন্য বিধান দান করেছেন।

১২৪. যেসব কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁকে বিশ্বমানবতার নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত করার যোগ্য প্রমাণ করেছিলেন কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। সত্যের আলো তাঁর সামনে সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হবার পর থেকে নিয়ে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সমগ্র জীবন ছিল কুরবানী ও ত্যাগের মূর্ত প্রতীক। দুনিয়ার যেসব বস্তুকে মানুষ ভালোবাসতে পারে এমন প্রতিটি বস্তুকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সত্যের জন্য কুরবানী করেছিলেন। দুনিয়ার যে সমস্ত বিপদকে মানুষ ভয় করে সত্যের খাতিরে তার প্রত্যেকটিকে তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন।

১২৫. অর্থাৎ এই অংগীকারটি তোমার সন্তানদের কেবলমাত্র সেই অংশটির সাথে সম্পর্কিত যারা সদাচারী, সত্যনিষ্ঠ ও সৎকর্মশীল। তাদের মধ্য থেকে যারা যালেম তাদের জন্য এ অংগীকার নয়। এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায়, পথভ্রষ্ট ইহুদিরা ও মুশরিক বনী ইসরাঈলরা এ অংগীকারের সাথে সম্পর্কিত নয়।

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ۖ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ
إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ
لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ
اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ
عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

আর স্মরণ করো তখনকার কথা যখন আমি এই গৃহকে (কা'বা) লোকদের জন্য কেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল গণ্য করেছিলাম এবং ইবরাহীম যেখানে ইবাদাত করার জন্য দাঁড়ায় সে স্থানটিকে স্থায়ীভাবে নামাযের স্থানে পরিণত করার হুকুম দিয়েছিলাম। আর ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তাকীদ করে বলেছিলাম, আমার এই গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকূ'-সিজদাকারীদের জন্য পাক-পবিত্র রাখো।[১২৬]

আর এও স্মরণ করো যে, ইবরাহীম দোয়া করেছিল ঃ "হে আমার রব! এই শহরকে শান্তি ও নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দাও। আর এর অধিবাসীদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ও আখেরাতকে মানবে তাদেরকে সব রকমের ফলের আহার্য দান করো।" জবাবে তার রব বললেন ঃ "আর যে মানবে না, দুনিয়ার গুটিকয় দিনের জীবনের সামগ্রী আমি তাকেও দেবো।[১২৭] *কিন্তু সব শেষে তাকে জাহান্নামের আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করবো এবং সেটি নিকৃষ্টতম আবাস।"*

১২৬. পাক-পবিত্র রাখার অর্থ কেবলমাত্র ময়লা-আবর্জনা থেকে পাক-পবিত্র রাখা নয়। আল্লাহর ঘরের আসল পবিত্রতা হচ্ছে এই যে, সেখানে আল্লাহর ছাড়া আর কারোর নাম উচ্চারিত হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরে বসে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মালিক, প্রভু, মাবুদ, অভাব পূরণকারী ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী হিসেবে ডাকে, সে আসলে তাকে নাপাক ও অপবিত্র করে দিয়েছে। এ আয়াতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে কুরাইশ মুশরিকদের অপরাধসমূহের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ এ যালেমরা ইবরাহীম ও ইসমাঈলের উত্তরাধিকারী হবার জন্য গর্ব করে বেড়ায় কিন্তু উত্তারাধিকারের হক আদায় করার পরিবর্তে এরা উল্টো সেই হককে পদদলিত করে যাচ্ছে। কাজেই ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে যে অংগীকার করা হয়েছিল তা থেকে বনী ইসরাঈলরা যেমন বাদ পড়েছে তেমনি এই ইসমাঈলী মুশরিকরাও বাদ পড়ে গেছে।

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ
ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ۖ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

আর স্মরণ করো, ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এই গৃহের প্রাচীর নির্মাণ করছিল, তারা দোয়া করে বলছিল ঃ "হে আমাদের রব! আমাদের এই খিদমত কবুল করে নাও। তুমি সবকিছু শ্রবণকারী ও সবকিছু জ্ঞাত। হে আমাদের রব! আমাদের দু'জনকে তোমার মুসলিম (নির্দেশের অনুগত) বানিয়ে দাও। আমাদের বংশ থেকে এমন একটি জাতির সৃষ্টি করো যে হবে তোমার মুসলিম। তোমার ইবাদাতের পদ্ধতি আমাদের বলে দাও এবং আমাদের ভুলচুক মাফ করে দাও। তুমি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। হে আমাদের রব! এদের মধ্যে স্বয়ং এদের জাতি পরিসর থেকে এমন একজন রসূল পাঠাও যিনি এদেরকে তোমার আয়াত পাঠ করে শুনাবেন, এদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং এদের জীবন পরিশুদ্ধ করে সুসজ্জিত করবেন।[১২৮] অবশ্যি তুমি বড়ই প্রতিপত্তিশালী ও জ্ঞানবান।[১২৯]

১২৭. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন মানব জাতির নেতৃত্ব সম্পর্কে আল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলেন জবাবে তাঁকে বলা হয়েছিল, তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে একমাত্র মু'মিন ও সত্যনিষ্ঠরাই এ পদের অধিকারী হবে। জালেমদেরকে এর অধিকারী করা হবে না। অতপর হযরত ইবরাহীম যখন রিযিকের জন্য দোয়া করতে লাগলেন তখন আগের ফরমানটিকে সামনে রেখে তিনি কেবলমাত্র নিজের মু'মিন সন্তান ও বংশধরদের জন্য দোয়া করলেন। কিন্তু মহান আল্লাহ জবাবে সংগে সংগেই তার ভুল ধারণা দূর করে দিলেন এবং তাঁকে জানিয়ে দিলেন, সত্যনিষ্ঠ নেতৃত্ব এক কথা আর রিযিক ও আহার্য দান করা অন্য কথা। সত্যনিষ্ঠ ও সৎকর্মশীল মু'মিনরাই একমাত্র সত্যনিষ্ঠ নিতৃত্বের অধিকারী হবে। কিন্তু দুনিয়ার রিযিক ও আহার্য মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাইকে দেয়া হবে। এ থেকে একথা স্বতস্ফূর্তভাবে প্রতিভাত হয় যে, কারোর অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য দেখে যেন কেউ এ ধারণা না করে বসেন যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সে-ই নেতৃত্ব-যোগ্যতারও অধিকারী।

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ
فِى الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٣٠﴾ اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ
اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٣١﴾ وَوَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ
وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ
مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٣٢﴾

১৬ রুকূ'

এখন কে ইবরাহীমের পদ্ধতিকে ঘৃণা করবে? হ্যাঁ, যে নিজেকে মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতায় আচ্ছন্ন করেছে সে ছাড়া আর কে এ কাজ করতে পারে? ইবরাহীমকে তো আমি দুনিয়ায় নিজের জন্য নির্বাচিত করেছিলাম আর আখেরাতে সে সৎকর্মশীলদের মধ্যে গণ্য হবে। তার অবস্থা এই ছিল যে, যখন তার রব তাকে বললো, "মুসলিম হয়ে যাও।"[১৩০] তখনই সে বলে উঠলো, "আমি বিশ্ব-জাহানের প্রভুর 'মুসলিম' হয়ে গেলাম।" ঐ একই পথে চলার জন্য সে তার সন্তানদের উপদেশ দিয়েছিল এবং এরি উপদেশ দিয়েছিল ইয়াকুবও তার সন্তানদেরকে।[১৩১] সে বলেছিল, "আমার সন্তানেরা! আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দীনটিই পছন্দ করেছেন।[১৩২] কাজেই আমৃত্যু তোমরা মুসলিম থেকো।"

১২৮. জীবন পরিশুদ্ধ করে সুসজ্জিত করা বলতে চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ, চরিত্র-নৈতিকতা, সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি ইত্যাকার সবকিছুকেই সুসজ্জিত করা বুঝাচ্ছে।

১২৯. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব আসলে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দোয়ার জওয়াব—একথাই এখানে বলা হয়েছে।

১৩০. মুসলিম কাকে বলে? যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগত হয়, আল্লাহকে নিজের মালিক, প্রভু ও মাবুদ হিসেবে মেনে নেয়, নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দেয় এবং দুনিয়ায় আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে সে-ই মুসলিম। এ আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতির নাম 'ইসলাম' মানব জাতির সৃষ্টিলগ্ন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে যেসব নবী এসেছেন এটিই ছিল তাঁদের সবার দীন ও জীবন বিধান।

১৩১. বনী ইসরাঈল সরাসরি হযরত ইয়াকূব আলাইহিস সালামের বংশধর হবার কারণেই সরাসরি তাঁর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ
مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَ
إِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾

তোমরা কি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুব এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছিল? মৃত্যুকালে সে তার সন্তানদের জিজ্ঞেস করলো ঃ "আমার পর তোমরা কার বন্দেগী করবে?" তারা সবাই জবাব দিল ঃ "আমরা সেই এক আল্লাহর বন্দেগী করবো, যাকে আপনি এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক ইলাহ হিসেবে মেনে এসেছেন আর আমরা তাঁরই অনুগত—মুসলিম।[১৩৩]

এরা ছিল কিছু লোক। এরা তো অতীত হয়ে গেছে। তারা যা কিছু উপার্জন করেছে, তা তাদের নিজেদের জন্যই আর তোমরা যা উপার্জন করবে, তা তোমাদের জন্য। তারা কি করতো সে কথা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না।[১৩৪]

১৩২. 'দীন' অর্থাৎ জীবন পদ্ধতি ও জীবন বিধান। মানুষ দুনিয়ায় যে আইন ও নীতিমালার ভিত্তিতে তার সমগ্র চিন্তা, দর্শন ও কর্মনীতি গড়ে তোলে তাকেই বলা হয় 'দীন'।

১৩৩. বাইবেলে হযরত ইয়াকূবের (আ) মৃত্যুকালীন অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সেখানে এই উপদেশের কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তবে তালমূদে যে বিস্তারিত উপদেশ লিপিবদ্ধ হয়েছে তার বিষয়বস্তু কুরআনের এ বর্ণনার সাথে অনেকটা সামঞ্জস্যশীল। সেখানে আমরা হযরত ইয়াকূবের (আ) একথাগুলো পাই ঃ

"সদাপ্রভু আল্লাহর বন্দেগী করতে থাকো। তিনি তোমাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে বিপদ থেকে বাঁচাবেন যেমন বাঁচিয়েছেন তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে।.....তোমাদের সন্তানদের আল্লাহকে ভালোবাসতে এবং তাঁর হুকুম পালন করতে শেখাও। এতে তাদের জীবনের অবকাশ দীর্ঘ হবে। কারণ আল্লাহ তাদেরকে হেফাযত করেন যারা সত্যনিষ্ঠ হয়ে কাজ করে এবং তাঁর পথে ঠিকমতো চলে।" জবাবে তাঁর ছেলেরা বলেন ঃ "আপনার উপদেশ মতো আমরা কাজ করবো। আল্লাহ আমাদের সাথে থাকুন।" একথা শুনে হযরত ইয়াকূব (আ) বলেন ঃ "যদি তোমরা আল্লাহর পথ থেকে ডাইনে বাঁয়ে না ঘুরে যাও, তাহলে আল্লাহ অবশ্যি তোমাদের সাথে থাকবেন।"

১৩৪. অর্থাৎ যদিও তোমরা তাদেরই সন্তান তবুও প্রকৃতপক্ষে তাদের সাথে তোমাদের কোন যোগাযোগ নেই। তোমরা তাদের পথ থেকেই যখন সরে গিয়েছো তখন তাদের নাম

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ
وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ۖ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

ইহুদিরা বলে, "ইহুদি হয়ে যাও, তাহলে সঠিক পথ পেয়ে যাবে।" খৃষ্টানরা বলে, "খৃষ্টান হয়ে যাও, তা হলে হিদায়াত লাভ করতে পারবে।" ওদেরকে বলে দাও, "না, তা নয়; বরং এ সবকিছু ছেড়ে একমাত্র ইবরাহীমের পদ্ধতি অবলম্বন করো। আর ইবরাহীম মুশরিকদের অন্তরভুক্ত ছিল না।[১৩৫] হে মুসলমানরা! তোমরা বলো, "আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, যে হিদায়াত আমাদের জন্য নাযিল হয়েছে তার প্রতি এবং যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও ইয়াকূবের সন্তানদের প্রতি নাযিল হয়েছিল তার প্রতি, আর যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য সকল নবীদেরকে তাদের রবের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল তার প্রতি। তাদের কারোর মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য করি না।[১৩৬] আমরা সবাই আল্লাহর অনুগত মুসলিম।"

নেয়ার তোমাদের কি অধিকার আছে? আল্লাহর ওখানে একথা জিজ্ঞেস করা হবে না যে, তোমাদের বাপ-দাদারা কি করতো? বরং জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কি করেছো?

আর "তারা যা কিছু উপার্জন করেছে, তা তাদের নিজেদের জন্যই আর তোমরা যা উপার্জন করবে তা তোমাদের জন্য"—এ বর্ণনাভংগীটি কুরআনের একান্ত নিজস্ব। আমরা যে জিনিসটিকে কাজ বা আমল বলি কুরআন নিজের ভাষায় তাকে বলে উপার্জন বা রোজগার। আমাদের প্রত্যেকটি আমলের একটি ভালো বা মন্দ ফলাফল আছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির আকারে এর প্রকাশ ঘটবে। এ ফলাফলই হচ্ছে আমাদের উপার্জন। যেহেতু কুরআনের দৃষ্টিতে ঐ ফলাফলই মূল গুরুত্বের অধিকারী তাই সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের কাজকে 'আমল' ও 'কাজ' শব্দ দ্বারা চিহ্নিত না করে তাকে 'উপার্জন' শব্দ দিয়ে সুস্পষ্ট করা হয়েছে।

১৩৫. এ জবাবটির রসাস্বাদন করতে হলে দু'টি বিষয় সামনে রাখতে হবে ঃ

এক ঃ ইহুদিবাদ ও খৃষ্টবাদ উভয়ই পরবর্তীকালের ফসল। ইহুদিবাদের সৃষ্টি খৃষ্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতকে। তখনই 'ইহুদিবাদ' তার এ নাম, ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ও রীতি-পদ্ধতি সহকারে আত্মপ্রকাশ করে। আর যেসব বিশেষ আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনার

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي
شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾ صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ
أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿١٣٨﴾ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ
وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾

তোমরা যেমনি ঈমান এনেছো তারাও যদি ঠিক তেমনিভাবে ঈমান আনে, তাহলে তারা হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলতে হবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে সোজা কথায় বলা যায়, তারা হঠধর্মিতার পথ অবলম্বন করেছে। কাজেই নিশ্চিন্ত হয়ে যাও, তাদের মোকাবিলায় তোমাদের সহায়তার জন্য আল্লাহ–ই যথেষ্ট। তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।

বলো ঃ "আল্লাহর রঙ ধারণ করো।[১৩৭] আর কার রঙ তার চেয়ে ভালো? আমরা তো তাঁরই ইবাদাতকারী।"

হে নবী! এদেরকে বলে দাও ঃ "তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমাদের সাথে ঝগড়া করছো? অথচ তিনিই আমাদের রব এবং তোমাদেরও।[১৩৮] আমাদের কাজ আমাদের জন্য, তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য। আর আমরা নিজেদের ইবাদাতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করেছি।[১৩৯]

সমষ্টি খৃষ্টবাদ নামে পরিচিতি লাভ করেছে তার অভ্যুদয় ঘটেছে হযরত ঈসা মসীহ আলাইহিস সালামেরও বেশ কিছুকাল পরে। এখানে স্বতস্ফূর্তভাবে একটি প্রশ্ন জেগে ওঠে। যদি ইহুদিবাদ ও খৃষ্টবাদ গ্রহণ করাই হিদায়াত লাভের ভিত্তি হয়ে থাকে, তাহলে এ ধর্মগুলোর উদ্ভবের শত শত বছর আগে জন্মগ্রহণকারী হযরত ইবরাহীম (আ), অন্যান্য নবীগণ ও সৎব্যক্তিবর্গ, যাদেরকে ইহুদি ও খৃষ্টানরা নিজেরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত বলে স্বীকার করে, তারা কোথায় থেকে হিদায়াত পেতেন? নিসন্দেহে বলা যায়, তাদের হিদায়াতের উৎস 'ইহুদিবাদ' ও 'খৃষ্টবাদ' ছিল না। কাজেই একথা সুস্পষ্ট, যেসব ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে এই ইহুদি, খৃষ্টান ইত্যাদি সম্প্রদায়গুলোর উদ্ভব হয়েছে মানুষের হিদায়াত লাভ এদের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং যে বিশ্বব্যাপী চিরন্তন সহজ–সত্য পথ গ্রহণ করে মানুষ যুগে যুগে হিদায়াত লাভ করে এসেছে তারই ওপর এটি নির্ভরশীল।

দুই ঃ ইহুদি ও খৃষ্টানদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থগুলোই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ইবাদাত–বন্দেগী, উপাসনা–আরাধনা, প্রশংসা–কীর্তন ও আনুগত্য না করার সাক্ষ প্রদান করে। আল্লাহর গুণ–বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আর কাউকে শরীক না করাই ছিল তাঁর মিশন। কাজেই নিসন্দেহে বলা যায়, হযরত

ইবরাহীম (আ) যে চিরন্তন সত্য-সরল পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ইহুদিবাদ ও খৃষ্টবাদ তা থেকে সরে গিয়েছিল। কারণ এদের উভয়ের মধ্যেই শিরকের মিশ্রণ ঘটেছিল।

১৩৬. নবীদের মধ্যে পার্থক্য না করার অর্থ হচ্ছে, কেউ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং কেউ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না অথবা কাউকে মানি এবং কাউকে মানি না—আমরা তাদের মধ্যে এভাবে পার্থক্য করি না। আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সকল নবীই একই চিরন্তন সত্য ও একই সরল-সোজা পথের দিকে আহবান জানিয়েছেন। কাজেই যথার্থ সত্যপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে সকল নবীকে সত্যপন্থী ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। যে ব্যক্তি এক নবীকে মানে এবং অন্য নবীকে অস্বীকার করে, সে আসলে যে নবীকে মানে তারও অনুগামী নয়। কারণ হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ) ও অন্যান্য নবীগণ যে বিশ্বব্যাপী চিরন্তর সহজ-সত্য পথ দেখিয়েছিলেন সে আসলে তার সন্ধান পায়নি বরং সে নিছক বাপ-দাদার অনুসরণ করে একজন নবীকে মানছে। তার আসল ধর্ম হচ্ছে, বর্ণবাদ, বংশবাদ ও বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ। কোন নবীর অনুসরণ তার ধর্ম নয়।

১৩৭. এ আয়াতটির দু'টি অনুবাদ হতে পারে। এক ঃ আমরা আল্লাহর রং ধারণ করেছি। দুই ঃ আল্লাহর রং ধারণ করো। খৃষ্ট ধর্মের আত্মপ্রকাশের পূর্বে ইহুদিদের মধ্যে একটি বিশেষ রীতির প্রচলন ছিল। কেউ তাদের ধর্ম গ্রহণ করলে তাকে গোসল করানো হতো। আর তাদের ওখানে গোসলের অর্থ ছিল, তার সমস্ত গোনাহ যেন ধুয়ে গোলো এবং তার জীবন নতুন রং ধারণ করলো। পরবর্তীকালে খৃষ্টানদের মধ্যেও এ রীতির প্রচলন হয়। তাদের ওখানে এর পারিভাষিক নাম হচ্ছে ইসতিবাগ বা রঙীন করা (ব্যাপটিজম)। তাদের ধর্মে যারা প্রবেশ করে কেবল তাদেরকেই ব্যাপটাইজড বা খৃষ্ট ধর্মে রঞ্জিত করা হয় না বরং খৃষ্টান শিশুদেরকেও ব্যাপটাইজড করা হয়। এ ব্যাপারেই কুরআন বলছে, এ লোকাচারমূলক 'রঞ্জিত' হবার যৌক্তিকতা কোথায়? বরং আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হও। যা কোন পানির দ্বারা হওয়া যায় না। বরং তাঁর বন্দেগীর পথ অবলম্বন করে এ রঙে রঞ্জিত হওয়া যায়।

১৩৮. অর্থাৎ আমরাও তো এই একই কথাই বলি, আল্লাহ আমাদের সবার রব এবং তাঁরই আনুগত্য করতে হবে। এটা কি এমন একটা বিষয়, যা নিয়ে তোমরা আমাদের সাথে ঝগড়া করতে পারো? ঝগড়া যদি করতে হয় তাহলে তা আমরা করতে পারি, তোমরা নও। কারণ তোমরাই আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করছো এবং তার বন্দেগী করছো। আমরা এ কাজ করছি না।

اتحاجوننا فى الله বাক্যটির আর একটি অনুবাদ হতে পারে ঃ "আমাদের সাথে তোমাদের ঝগড়াটি কি আল্লাহর পথে?" এর অর্থ এই হবে, যদি তোমরা সত্যিই লালসার বশবর্তী না হয়ে বরং আল্লাহর জন্য ঝগড়া করে থাকো, তাহলে অতি সহজেই এর মীমাংসা করা যেতে পারে।

১৩৯. তোমাদের কাজের জন্য তোমরা দায়ী আর আমাদের কাজের জন্য আমরা দায়ী। তোমরা যদি তোমাদের বন্দেগীকে বিভক্ত করে থাকো এবং অন্য কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক করে তার পূজা-উপাসনা ও আনুগত্য করো, তাহলে তোমাদের তা করার ক্ষমতা

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا
هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً
عِندَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

অথবা তোমরা কি এ কথা বলতে চাও যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও ইয়াকূব-সন্তানরা সবাই ইহুদি বা খৃষ্টান ছিল?" বলো, "তোমরা বেশী জানো, না আল্লাহ বেশী জানেন?[১৪০] তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সাক্ষ রয়েছে এবং সে তা গোপন করে চলে? তোমাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আল্লাহ গাফেল নন।[১৪১]

তারা ছিল কিছু লোক। তারা আজ আর নেই। তারা যা কিছু উপার্জন করেছিল তা ছিল তাদের নিজেদের জন্য। আর তোমরা যা উপার্জন করবে তা তোমাদের জন্য তাদের কাজের ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না।"

দেয়া হয়েছে। কিন্তু এর পরিণাম তোমাদের ভোগ করতে হবে। আমরা বলপূর্বক তোমাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে চাই না। কিন্তু আমরা নিজেদের বন্দেগী, আনুগত্য ও উপাসনা-আরাধনা সবকিছুই একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। যদি তোমরা একথা স্বীকার করে নাও যে, আমাদেরও এ কাজ করার ক্ষমতা ও অধিকার আছে তাহলে তো ঝগড়াই মিটে যায়।

১৪০. যেসব মূর্খ ইহুদি ও খৃষ্টান জনতা যথার্থই মনে করতো, এ বড় বড় মহান নবীদের সকলেই ইহুদি বা খৃষ্টান ছিলেন, তাদেরকে সম্বোধন করে এখানে একথা বলা হয়েছে।

১৪১. এখানে ইহুদি ও খৃষ্টান আলেমদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা নিজেরাও এ সত্যটি জানতো যে, ইহুদিবাদ ও খৃষ্টবাদ সে সময় যে বৈশিষ্ট ও চেহারাসহ বিরাজ করছিল তা অনেক পরবর্তীকালের সৃষ্টি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সত্যকে একমাত্র তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করছিল। তারা জনগণকে ভুল ধারণা দিয়ে আসছিল যে, নবীদের অতিক্রান্ত হয়ে যাবার দীর্ঘকাল পর তাদের ফকীহ, ন্যায়শাস্ত্রবিদ ও সুফীরা যে সমস্ত আকীদা-বিশ্বাস, পদ্ধতি, রীতি-নীতি ও ইজতিহাদী নিয়ম-কানুন রচনা করেছে, সেগুলোর আনুগত্যের মধ্যেই মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করা হতো, তোমাদের একথাই যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে হযরত ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব ইত্যাদি নবীগণ তোমাদের এই সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي
كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ

১৭ রুকূ'

অবশ্যি নির্বোধ লোকেরা বলবে, "এদের কি হয়েছে, প্রথমে এরা যে কিব্‌লার দিকে মুখ করে নামায পড়তো, তা থেকে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে?[১৪২] হে নবী! ওদেরকে বলে দাও, "পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর। আল্লাহ যাকে চান তাকে সোজা পথ দেখান।"[১৪৩] আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি 'মধ্যপন্থী' উম্মাতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা দুনিয়াবাসীদের ওপর সাক্ষী হতে পারো এবং রসূল হতে পারেন তোমাদের ওপর সাক্ষী।[১৪৪]

কোন্ সম্প্রদায়ের অন্তরভুক্ত ছিলেন? তারা এর জবাব এড়িয়ে যেতো। কারণ ঐ নবীগণ তাদের সম্প্রদায়ের অন্তরভুক্ত ছিলেন, নিজেদের জ্ঞান অনুযায়ী তারা একথা দাবী করতে পারতো না। কিন্তু নবীগণ ইহুদিও ছিলেন না এবং খৃষ্টানও ছিলেন না, একথা যদি তারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতো তাহলে তো তাদের সব যুক্তিই শেষ হয়ে যেতো।

১৪২. হিজরাতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা তাইয়েবায় ষোল সতের মাস পর্যন্ত বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়তে থাকেন। অতপর কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ আসে। এর বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী পর্যায়ে আসবে।

১৪৩. এটি হচ্ছে নির্বোধদের অভিযোগের প্রথম জবাব। তাদের চিন্তার পরিসর ছিল সংকীর্ণ। তাদের দৃষ্টি ছিল সীমাবদ্ধ। স্থান ও দিক তাদের কাছে ছিল গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। তাদের ধারণা ছিল আল্লাহ কোন বিশেষ দিকে সীমাবদ্ধ। তাই সর্বপ্রথম তাদের এই মূর্খতাপ্রসূত অভিযোগের জবাবে বলা হয়েছে, পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর দিক। কোন বিশেষ দিককে কিব্‌লায় পরিণত করার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ সেই দিকে আছেন। আল্লাহ যাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন তারা এ ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টির ও সংকীর্ণ মতবাদের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে এবং তাদের জন্য বিশ্বজনীন সত্য উপলব্ধির দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। (এ সম্পর্কে আরো জানার জন্য ১১৫ ও ১১৬ নম্বর টীকা দু'টিও দেখে নিন।)

১৪৪. এটি হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের নেতৃত্বের ঘোষণাবাণী। 'এভাবেই' শব্দটির সাহায্যে দু'দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এক ঃ আল্লাহর

পথপ্রদর্শনের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। যার ফলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যকারীরা সত্য-সরল পথের সন্ধান পেয়েছে এবং তারা উন্নতি করতে করতে এমন একটি মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে যেখানে তাদেরকে 'মধ্যপন্থী উম্মাত' গণ্য করা হয়েছে। দুই ঃ এ সাথে কিব্‌লাহ পরিবর্তনের দিকেও ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ নির্বোধরা একদিক থেকে আর একদিকে মুখ ফিরানো মনে করছে। অথচ বাইতুল মাকদিস থেকে কা'বার দিকে মুখ ফিরানোর অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে বিশ্ববাসীর নেতৃত্ব পদ থেকে যথানিয়মে হটিয়ে উম্মাতে মুহাম্মাদীয়াকে সে পদে বসিয়ে দিলেন।

'মধ্যপন্থী উম্মাত' শব্দটি অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক তাৎপর্যের অধিকারী। এর অর্থ হচ্ছে, এমন একটি উৎকৃষ্ট ও উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন দল, যারা নিজেরা ইনসাফ, ন্যায়-নিষ্ঠা ও ভারসাম্যের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, দুনিয়ার জাতিদের মধ্যে যারা কেন্দ্রীয় আসন লাভের যোগ্যতা রাখে, সত্য ও সততার ভিত্তিতে সবার সাথে যাদের সম্পর্ক সমান এবং কারোর সাথে যাদের কোন অবৈধ ও অন্যায় সম্পর্ক নেই।

বলা হয়েছে, তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মাতে পরিণত করার কারণ হচ্ছে এই যে, "তোমরা লোকদের ওপর সাক্ষী হবে এবং রসূল তোমাদের ওপর সাক্ষী হবেন।" এ বক্তব্যের অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে, আখেরাতে যখন সমগ্র মানবজাতিকে একত্র করে তাদের হিসেব নেয়া হবে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হিসেবে রসূল তোমাদের ব্যাপারে এ মর্মে সাক্ষ্য দেবেন যে, সুস্থ ও সঠিক চিন্তা এবং সৎকাজ ও সুবিচারের যে শিক্ষা দিয়ে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল তা তিনি তোমাদের কাছে হুবহু এবং পুরোপুরি পৌঁছিয়ে দিয়েছেন আর বাস্তবে সেই অনুযায়ী নিজে কাজ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। এরপর রসূলের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে সাধারণ মানুষদের ব্যাপারে তোমাদের এই মর্মে সাক্ষ্য দিতে হবে যে, রসূল তোমাদের কাছে যা কিছু পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন তা তোমরা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছো। আর তিনি যা কিছু কার্যকর করে দেখিয়ে ছিলেন তা তাদের কাছে কার্যকর করে দেখাবার ব্যাপারে তোমরা মোটেই গড়িমসি করোনি।

এভাবে কোন ব্যক্তি বা দলের এ দুনিয়ায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দানের দায়িত্বে নিযুক্ত হওয়াটাই মূলত তাকে নেতৃত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত করার নামান্তর। এর মধ্যে যেমন একদিকে মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধির প্রশ্ন রয়েছে তেমনি অন্যদিকে রয়েছে দায়িত্বের বিরাট বোঝা। এর সোজা অর্থ হচ্ছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে এ উম্মাতের জন্য আল্লাহভীতি, সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন, সুবিচার, ন্যায়-নিষ্ঠা ও সত্যপ্রীতির জীবন্ত সাক্ষী হয়েছেন তেমনিভাবে এ উম্মাতকেও সারা দুনিয়াবাসীদের জন্য জীবন্ত সাক্ষীতে পরিণত হতে হবে। এমন কি তাদের কথা, কর্ম, আচরণ ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয় দেখে দুনিয়াবাসী আল্লাহভীতি, সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা ও সত্যপ্রীতির শিক্ষা গ্রহণ করবে। এর আর একটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর হিদায়াত আমাদের কাছে পৌঁছাবার ব্যাপারে যেমন রসূলের দায়িত্ব ছিল বড়ই সুকঠিন, এমনকি এ ব্যাপারে সামান্য ত্রুটি বা

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ
الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا
عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

প্রথমে যে দিকে মুখ করে তুমি নামায পড়তে, তাকে তো কে রসূলের অনুসরণ করে এবং কে উল্টো দিকে ফিরে যায়, আমি শুধু তা দেখার জন্য কিব্‌লাহ নির্দিষ্ট করেছিলাম।[১৪৫] এটি ছিল অত্যন্ত কঠিন বিষয়, তবে তাদের জন্য মোটেই কঠিন প্রমাণিত হয়নি যারা আল্লাহর হিদায়াত লাভ করেছিল। আল্লাহ তোমাদের এই ঈমানকে কখনো নষ্ট করবেন না। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, তিনি মানুষের জন্য অত্যন্ত স্নেহশীল ও করুণাময়।

গাফলতি হলে আল্লাহর দরবারে তিনি পাকড়াও হতেন, অনুরূপভাবে এ হিদায়াতকে দুনিয়ার সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাবার ব্যাপারেও আমাদের ওপর কঠিন দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে। যদি আমরা আল্লাহর আদালতে যথার্থই এ মর্মে সাক্ষ্য দিতে ব্যর্থ হই যে, "তোমার রসূলের মাধ্যমে তোমার যে হিদায়াত আমরা পেয়েছিলাম তা তোমার বান্দাদের কাছে পৌঁছাবার ব্যাপারে আমরা কোন প্রকার ত্রুটি করিনি", তাহলে আমরা সেদিন মারাত্মকভাবে পাকড়াও হয়ে যাবো। সেদিন এ নেতৃত্বের অহংকার সেখানে আমাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের নেতৃত্বের যুগে আমাদের যথার্থ ত্রুটির কারণে মানুষের চিন্তায় ও কর্মে যে সমস্ত গলদ দেখা দেবে, তার ফলে দুনিয়ায় যেসব গোমরাহী ছড়িয়ে পড়বে এবং যত বিপর্যয় ও বিশৃংখলার রাজত্ব বিস্তৃত হবে—সে সবের জন্য অসৎ নেতৃবর্গ এবং মানুষ ও জিন শয়তানদের সাথে সাথে আমরাও পাকড়াও হবো। আমাদের জিজ্ঞেস করা হবে, পৃথিবীতে যখন জুলুম, নির্যাতন, অন্যায়, অত্যাচার, পাপ ও ভ্রষ্টতার রাজত্ব বিস্তৃত হয়েছিল তখন তোমরা কোথায় ছিলে?

১৪৫. অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য ছিল এটা দেখা যে, কে জাহেলী বিদ্বেষ এবং মাটি ও রক্তের গোলামিতে লিপ্ত আর কে এসব বাঁধন মুক্ত হয়ে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করেছে। একদিকে আরবরা তাদের দেশ, বংশ ও গোত্রের অহংকারে ডুবে ছিল। আরবের কা'বাকে বাদ দিয়ে বাইরের বাইতুল মাকদিসকে কিব্‌লায় পরিণত করা ছিল তাদের জাতীয়তাবাদের মূর্তির ওপর প্রচণ্ড আঘাতের শামিল। অন্যদিকে বনী ইসরাঈলরা ছিল তাদের বংশপূজার অহংকারে মত্ত। নিজেদের পৈতৃক কিব্‌লাহ ছাড়া অন্য কোন কিব্‌লাহকে বরদাসত করার ক্ষমতাই তাদের ছিল না। কাজেই একথা সুস্পষ্ট, এ ধরনের মূর্তি যাদের মনের কোণে ঠাঁই পেয়েছে, তারা কেমন করে আল্লাহর রসূল যে পথের দিকে আহবান জানাচ্ছিলেন সে

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً
تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۭ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۭ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ
الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۭ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٤﴾

আমরা তোমাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখছি। নাও, এবার তাহলে সেই কিব্‌লার দিকে তোমার মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছি, যাকে তুমি পছন্দ করো। মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। এখন তোমরা যেখানেই হও না কেন এদিকেই মুখ করে নামায পড়তে থাকো।[১৪৬]

এসব লোক, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, খুব ভালো করেই জানে, (কিব্‌লাহ পরিবর্তনের) এ হুকুমটি এদের রবের পক্ষ থেকেই এসেছে এবং এটি একটি যথার্থ সত্য হুকুম। কিন্তু এ সত্ত্বেও এরা যা কিছু করছে আল্লাহ তা থেকে গাফেল নন।

পথে চলতে পারতো। তাই মহান আল্লাহ এ মূর্তিপূজারীদের যতার্থ সত্যপন্থীদের থেকে ছেঁটে বাদ দেয়ার পরিকল্পনা নিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে বাইতুল মাকদিসকে কিব্‌লাহ নির্দিষ্ট করলেন। এর ফলে আরব জাতীয়তাবাদের দেবতার পূজারীরা তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেছে। অতপর তিনি এ কিব্‌লাহ বাদ দিয়ে কা'বাকে কিব্‌লাহ নির্দিষ্ট করেন। ফলে ইসরাঈলী জাতীয়তাবাদের পূজারীরাও তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেল। এভাবে যারা কোন মূর্তির নয় বরং নিছক আল্লাহর পূজারী ছিলেন একমাত্র তারাই রসূলের সাথে রয়ে গেলেন।

১৪৬. কিব্‌লাহ পরিবর্তন সম্পর্কিত এটি ছিল মূল নির্দেশ। এ নির্দেশটি ২য় হিজরীর রজব বা শাবান মাসে নাযিল হয়। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দাওয়াত উপলক্ষে বিশর ইবনে বারাআ ইবনে মা'রুর–এর গৃহে গিয়েছিলেন। সেখানে যোহরের সময় হয়ে গিয়েছিল। তিনি সেখানে নামাযে লোকদের ইমামতি করতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দুই রাকাত পড়া হয়ে গিয়েছিল। তৃতীয় রাকাতে হঠাৎ অহীর মাধ্যমে এ আয়াতটি নাযিল হলো। সংগে সংগেই তিনি ও তাঁর সংগে জামায়াতে শামিল সমস্ত লোক বাইতুল মাকদিসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কা'বার দিকে ঘুরে গেলেন। এরপর মদীনায় ও মদীনার আশেপাশে এ নির্দেশটি সাধারণভাবে ঘোষণা করে দেয়া হলো। বারাআ ইবনে আযিব বলেন, এক জায়গায় ঘোষকের কথা লোকদের কানে এমন অবস্তায় পৌঁছলো যখন তারা রুকূ' করছিল। নির্দেশ শোনার সাথে সাথে সবাই সেই

অবস্থাতেই কা'বার দিকে মুখ ফিরালো। আনাস ইবনে মালিক বলেন, এ খবরটি বনী সালমায় পৌঁছলো পরের দিন ফজরের নামাযের সময়। লোকেরা এক রাকায়াত নামায শেষ করেছিল এমন সময় তাদের কানে আওয়াজ পৌঁছলো ঃ "সাবধান, কিবলাহ বদলে গেছে। এখন কা'বার দিকে কিবলাহ নির্দিষ্ট হয়েছে।" একথা শোনার সাথে সাথেই সমগ্র জামায়াত কা'বার দিকে মুখ ফিরালো।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বাইতুল মাকদিস মদীনা থেকে সোজা উত্তর দিকে। আর কা'বা হচ্ছে দক্ষিণ দিকে। আর নামাযের মধ্যে কিবলাহ পরিবর্তন করার জন্য ইমামকে অবশ্যি মুকতাদিদের পেছন থেকে সামনের দিকে আসতে হয়েছে। অন্যদিকে মুকতাদিদের কেবলমাত্র দিক পরিবর্তন করতে হয়নি বরং তাদেরও কিছু কিছু চলাফেরা করে লাইন ঠিকঠাক করতে হয়েছে। কাজেই কোন কোন রেওয়ায়াতে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনাও এসেছে।

আর আয়াতে যে বলা হয়েছে, 'আমরা তোমাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখছি' এবং 'সেই কিবলার দিকে তোমার মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছি যাকে তুমি পছন্দ করো' এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, কিবলাহ পরিবর্তনের নির্দেশ আসার আগে থেকেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি নিজেই অনুভব করছিলেন, বনী ইসরাঈলের নেতৃত্বের যুগ শেষ হয়ে গেছে এবং তার সাথে সাথে বাইতুল মাকদিসের কেন্দ্রীয় মর্যাদা লাভেরও অবসান ঘটেছে। এখন আসল ইবরাহীমী কেন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাবার সময় এসে গেছে।

'মসজিদে হারাম' অর্থ সম্মান ও মর্যাদা সম্পন্ন মসজিদ। এর অর্থ হচ্ছে, এমন ইবাদাত গৃহ যার মধ্যস্থলে কা'বাগৃহ অবস্থিত।

কা'বার দিকে মুখ করার অর্থ এ নয় যে, দুনিয়ার যে কোন জায়গা থেকে সোজা নাক বরাবর কা'বার দিকে ফিরে দাঁড়াতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য প্রত্যেক জায়গায় সবসময় এটা করা কঠিন। তাই কা'বার দিকে মুখ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সোজা কা'বা বরাবর মুখ করে দাঁড়াবার নির্দেশ দেয়া হয়নি। কুরআনের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে যথাসম্ভব কা'বার নির্ভুল দিকনির্দেশ করার জন্য অনুসন্ধান আমাদের অবশ্যি চালাতে হবে। কিন্তু একেবারেই যথার্থ ও নির্ভুল দিক জেনে নেয়ার দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পণ করা হয়নি। সম্ভাব্য সকল উপায়ে অনুসন্ধান চালিয়ে যে দিকটিতে কা'বার অবস্থিতি হওয়া সম্পর্কে আমরা সবচেয়ে বেশী নিশ্চিত হতে পারি সেদিকে ফিরে নামায পড়াই নিসন্দেহে সঠিক পদ্ধতি। যদি কোথাও কিবলার দিকনির্দেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে অথবা এমন অবস্থায় থাকা হয় যার ফলে কিবলার দিকে মুখ করে থাকা সম্ভব না হয় (যেমন নৌকা বা রেলগাড়ীতে ভ্রমণকালে) তাহলে এ অবস্থায় যে দিকটার কিবলাহ হওয়া সম্পর্কে ধারণা হয় অথবা যেদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকা সম্ভব হয়, সেদিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়া যেতে পারে। তবে, হাঁ, নামাযের মধ্যেই যদি কিবলার সঠিক দিকনির্দেশনা জানা যায় অথবা সঠিক দিকে নামায পড়া সম্ভব হয়, তাহলে নামায পড়া অবস্থায়ই সেদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়া উচিত।

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ
وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ
اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ
الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ
أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾
الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾

তুমি এই আহ্‌লি কিতাবদের কাছে যে কোন নিশানীই আনো না কেন, এরা তোমার কিব্‌লার অনুসারী কখনোই হবে না। তোমাদের পক্ষেও তাদের কিব্‌লার অনুগামী হওয়া সম্ভব নয় আর এদের কোন একটি দলও অন্য দলের কিব্‌লার অনুসারী হতে প্রস্তুত নয়। তোমাদের কাছে যে জ্ঞান এসেছে তা লাভ করার পর যদি তোমরা তাদের ইচ্ছা ও বাসনার অনুসারী হও, তাহলে নিসন্দেহে তোমরা জালেমদের অন্তরভুক্ত হবে।[১৪৭] যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা এই স্থানটিকে (যাকে কিব্‌লাহ বানানো হয়েছে) এমনভাবে চেনে যেমন নিজেদের সন্তানদেরকে চেনে।[১৪৮] কিন্তু তাদের মধ্য থেকে একটি দল সত্যকে জেনে বুঝে গোপন করছে। এটি নির্দ্বিধায় তোমাদের রবের পক্ষ থেকে আগত একটি চূড়ান্ত সত্য, কাজেই এ ব্যাপারে তোমরা কখনোই কোন প্রকার সন্দেহের শিকার হয়ো না।

১৪৭. এর অর্থ হচ্ছে, কিব্‌লাহ সম্পর্কে এরা যত প্রকার বিতর্ক ও যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে, যুক্তির মাধ্যমে এদেরকে নিশ্চিত করে এর মীমাংসা করা সম্ভব নয়। কারণ এরা বিদ্বেষ পোষণ ও হঠধর্মিতায় লিপ্ত। কোন প্রকার যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে এদেরকে এদের কিব্‌লাহ থেকে সরিয়ে আনা সম্ভব নয়। নিজেদের দল প্রীতি ও গোত্রীয় বিদ্বেষের কারণে এরা এই কিব্‌লার সাথে সংযুক্ত রয়েছে। আর তোমরা এদের কিব্‌লাহ গ্রহণ করেও এই ঝগড়ার মীমাংসা করতে পারবে না। কারণ এদের কিব্‌লাহ একটি নয়। এদের সমস্ত দল একমত হয়ে কোন একটি কিব্‌লাহ গ্রহণ করেনি, যেটি গ্রহণ করে নিলে সব ঝগড়া চুকে যেতে পারে। এদের বিভিন্ন দলের বিভিন্ন কিব্‌লাহ। একটি দলের কিব্‌লাহ গ্রহণ করে কেবলমাত্র তাদেরকেই সন্তুষ্ট করা যেতে পারে। অন্যদের সাথে ঝগড়া তখনো থেকে যাবে। আর সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে এই যে, নবী হিসেবে লোকদেরকে সন্তুষ্ট করতে থাকা

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۭ اَيْنَ مَا
تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٤٨﴾ وَمِنْ
حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۭ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ
مِنْ رَّبِّكَ ۭ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٩﴾

১৮ রুকূ

প্রত্যেকের জন্য একটি দিক আছে, সে দিকেই সে ফেরে। কাজেই তোমরা ভালোর দিকে এগিয়ে যাও।[১৪৯] যেখানেই তোমরা থাকো না কেন আল্লাহ তোমাদেরকে পেয়ে যাবেন। তাঁর ক্ষমতার বাইরে কিছুই নেই।

তুমি যেখান থেকেই যাওনা কেন, সেখানেই তোমার মুখ (নামাযের সময়) মসজিদে হারামের দিকে ফেরাও। কারণ এটা তোমার রবের সম্পূর্ণ সত্য ভিত্তিক ফায়সালা। আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে বেখবর নন।

এবং দেয়া নেয়ার নীতির ভিত্তিতে তাদের সাথে আপোষ করা তোমাদের দায়িত্ব নয়। তোমাদের কাজ হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে যে জ্ঞান দান করেছি, সবকিছু থেকে বেপরোয়া হয়ে একমাত্র তারই ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো। তা থেকে সরে গিয়ে কাউকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা হলে নিজের নবুওয়াতের মর্যাদার প্রতি জুলুম করা হবে এবং দুনিয়ার নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে তোমাকে আমি যে নিয়ামত দান করেছি তার প্রতি হবে অকৃতজ্ঞতার প্রকাশ।

১৪৮. এটি আরবের একটি প্রচলিত প্রবাদ। যে জিনিসটিকে মনুষ নিশ্চিতভাবে জানে এবং যে সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ ও দ্বিধার অবকাশ থাকে না তাকে এভাবে বলা হয়ে থাকে যথা ঃ সে এ জিনিসটিকে এমনভাবে চেনে যেমন চেনে নিজের সন্তানদেরকে। অর্থাৎ নিজের ছেলে-মেয়েদেরকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে যেমন তার মধ্যে কোন প্রকার জড়তা ও সংশয়ের অবকাশ থাকে না, ঠিক তেমনি সব রকম সন্দেহের উর্ধে উঠে নিশ্চিতভাবেই সে এই জিনিসটিকে জানে ও চেনে। ইহুদি ও খৃষ্টান আলেমরা ভালোভাবেই এ সত্যটি জানতো যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কা'বা নির্মাণ করেছিলেন এবং বিপরীত পক্ষে এর ১৩ শত বছর পরে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের হাতে বাইতুল মাকদিসের নির্মাণ কাজ শেষ হয় এবং তাঁর আমলে এটি কিব্‌লাহ হিসেবে গণ্য হয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাপারে তাদের মধ্যে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

১৪৯. প্রথম বাক্য ও দ্বিতীয় বাক্যটির মাঝখানে একটু সূক্ষ্ম ফাঁক রয়েছে। শ্রোতা নিজে সামান্য একটু চিন্তা-ভাবনা করলে এই ফাঁক ভরে ফেলতে পারেন। ব্যাপার হচ্ছে এই যে,

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ
حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ
وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ
رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ فَاذْكُرُونِي
أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

আর যেখান থেকেই তুমি চল না কেন তোমার মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফেরাও এবং যেখানেই তোমরা থাকো না কেন সে দিকেই মুখ করে নামায পড়ো, যাতে লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ খাড়া করতে না পারে—[১৫০] তবে যারা যালেম, তাদের মুখ কোন অবস্থায়ই বন্ধ হবে না। কাজেই তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো—আর এ জন্য যে, আমি তোমাদের ওপর নিজের অনুগ্রহ পূর্ণ করে দেবো[১৫১] এবং এই আশায়[১৫২] যে, আমার এই নির্দেশের আনুগত্যের ফলে তোমরা ঠিক তেমনিভাবে সাফল্যের পথ লাভ করবে যেমনিভাবে (তোমরা এই জিনিসটি থেকেও সাফল্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছো যে,) আমি তোমাদের মধ্যে স্বয়ং তোমাদের থেকেই একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ করে সুসজ্জিত করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় এবং এমন সব কথা তোমাদের শেখায়, যা তোমরা জানতে না। কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ রাখো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ রাখবো আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং আমার নিয়ামত অস্বীকার করো না।

যাকে নামায পড়তে হবে তাকে অবশ্যি কোন না কোন দিকে মুখ ফেরাতে হবে। কিন্তু যেদিকে মুখ ফেরানো হয় সেটা আসল জিনিস নয়, আসল জিনিস হচ্ছে সেই নেকী ও কল্যাণগুলো যেগুলো অর্জন করার জন্য নামায পড়া হয়। কাজেই দিক ও স্থানের বিতর্কে জড়িয়ে না পড়ে নেকী ও কল্যাণ অর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ
ٱلصَّـٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢ ۚ بَلْ
أَحْيَآءٌ وَلَـٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ
وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ
ٱلصَّـٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَـٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ
رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

১৯ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ!১৫৩ সবর ও নামাযের দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করো, আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।১৫৪ আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না। এই ধরনের লোকেরা আসলে জীবিত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোন চেতনা থাকে না।১৫৫ আর নিশ্চয়ই আমরা ভীতি, অনাহার, প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতির মাধ্যমে এবং উপার্জন ও আমদানী হ্রাস করে তোমাদের পরীক্ষা করবো। এ অবস্থায় যারা সবর করে এবং যখনই কোন বিপদ আসে বলে ঃ "আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে,১৫৬—তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও।

১৫০. অর্থাৎ আমাদের এই নির্দেশটি পুরোপুরি মেনে চলো। কখনো যেন তোমাদের ভিন্নরকম আচরণ না দেখা যায়। তোমাদের কাউকে যেন নির্দিষ্ট দিকের পরিবর্তে কখনো অন্য দিকে মুখ করে নামায পড়তে দেখা না যায়। অন্যথায় শত্রুরা তোমাদের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করার সুযোগ পাবে ঃ আহা, কী চমৎকার 'মধ্যপন্থী উম্মাত'। এরাই হয়েছে আবার সত্যের সাক্ষী। এরা মুখে বলে, এই নির্দেশটি আমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে কিন্তু কাজের সময় এর বিরুদ্ধাচরণ করছে।

১৫১. এখানে অনুগ্রহ বলতে নেতৃত্ব বুঝানো হয়েছে। বনী ইসরাঈলদের থেকে কেড়ে নিয়ে এই নেতৃত্ব উম্মাতে মুসলিমাকে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ প্রণীত বিধান অনুযায়ী একটি উম্মাতকে দুনিয়ার জাতিসমূহের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করা এবং মানবজাতিকে সৎকর্মশীলতা ও আল্লাহর ইবাদাতের পথে পরিচালিত করার দায়িত্বে তাকে নিয়োজিত করা ছিল তার সত্যানুসারিতার চরম পুরস্কার। এই নেতৃত্বের দায়িত্ব যে উম্মাতকে দেয়া হয়েছে তার ওপর আসলে আল্লাহর অনুগ্রহ ও নিয়ামত পরিপূর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ

এখানে বলছেন, কিব্‌লাহ পরিবর্তনের এ নির্দেশটি আসলে এই পদে তোমাদের সমাসীন করার নিশানী। কাজেই অকৃতজ্ঞতা ও নাফরমানীর প্রকাশ ঘটলে যাতে এ পদটি তোমাদের থেকে ছিনিয়ে না নেয়া হয় সে জন্যও তোমাদের আমার এই নির্দেশ মেনে চলা দরকার। এটা মেনে চললে তোমাদের প্রতি এই নিয়ামত ও অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করে দেয়া হবে।

১৫২. অর্থাৎ এই নির্দেশ মেনে চলার সময় মনে মনে এই আশা পোষণ করতে থাকো। এটা একটা রাজকীয় বর্ণনাভংগী মাত্র। বিপুল ক্ষমতার অধিকারী বাদশাহর পক্ষ থেকে যখন তাঁর কোন চাকরকে বলে দেয়া হয়, বাদশাহর পক্ষ থেকে অমুক অমুক অনুগ্রহ ও দানের আশা করতে পারো, তখন কেবলমাত্র এতটুকু ঘোষণা শুনেই সংশ্লিষ্ট চাকর বা রাজকর্মচারী তার গৃহে আনন্দ-উল্লাস করতে পারে এবং লোকেরাও তাকে মোবারকবাদ দিতে পারে।

১৫৩. নেতৃত্ব পদে আসীন করার পর এবার এই উম্মাতকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও বিধান দেয়া হচ্ছে। কিন্তু সবার আগে যে কথাটির প্রতি এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে এই যে, তোমাদের জন্য যে বিছানা পেতে দেয়া হয়েছে সেটা কোন ফুলের বিছানা নয়। একটি বিরাট, মহান ও বিপদ সংকুল কাজের বোঝা তোমাদের মাথায় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এই বোঝা মাথায় ওঠাবার সাথে সাথেই তোমাদের ওপর চতুর্দিক থেকে বিপদ-আপদ ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকবে। কঠিন পরীক্ষার মধ্যে তোমাদের ঠেলে দেয়া হবে। অগণিত ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। সবর, দৃঢ়তা, অবিচলতা ও দ্বিধাহীন সংকল্পের মাধ্যমে সমস্ত বিপদ-আপদের মোকাবিলা করে যখন তোমরা আল্লাহর পথে এগিয়ে যেতে থাকবে তখনই তোমাদের ওপর বর্ষিত হবে তাঁর অনুগ্রহরাশি।

১৫৪. অর্থাৎ এই কঠিন দায়িত্বের বোঝা বহন করার জন্য তোমাদের দু'টো আভ্যন্তরীন শক্তির প্রয়োজন। একটি হচ্ছে, নিজের মধ্যে সবর, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার শক্তির লালন করতে হবে। আর দ্বিতীয়ত নামায পড়ার মাধ্যমে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে আরো বিভিন্ন আলোচনায় সবরের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। সেখানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণাবলীর সামগ্রিক রূপ হিসেবে সবরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর আসলে এটিই হচ্ছে সমস্ত সাফল্যের চাবিকাঠি। এর সহায়তা ছাড়া মানুষের পক্ষে কোন লক্ষ অর্জনে সফলতা লাভ সম্ভব নয়। এভাবে সামনের দিকে নামায সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। সেখানে দেখানো হয়েছে নামায কিভাবে মু'মিন ব্যক্তি ও সমাজকে এই মহান কাজের যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলে।

১৫৫. মৃত্যু শব্দটি এবং এর ধারণা মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করে। মৃত্যুর কথা শুনে সে সাহস ও শক্তি হারিয়ে ফেলে। তাই আল্লাহর পথে শহীদদেরকে মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ তাদেরকে মৃত বললে ইসলামী দলের লোকদের জিহাদ, সংঘর্ষ ও প্রাণ উৎসর্গ করার প্রেরণা স্তব্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। এর পরিবর্তে ঈমানদারদের মনে এই চিন্তা বদ্ধমূল করতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে যে ব্যক্তি প্রাণ দেয় সে আসলে চিরন্তন জীবন লাভ করে। এই চিন্তাটি প্রকৃত ব্যাপারের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীলও। এ চিন্তা পোষণের ফলে সাহস ও হিম্মত তরতাজা থাকে এবং উত্তরোত্তর বেড়ে যেতেও থাকে।

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ
أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَإِنَّ
اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের ওপর বিপুল অনুগ্রহ বর্ষিত হবে, তাঁর রহমত তাদেরকে ছায়াদান করবে এবং এই ধরনের লোকরাই হয় সত্যানুসারী।

নিসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিশানীসমূহের অন্তরভুক্ত। কাজেই যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহর হজ্জ বা উমরাহ করে[১৫৭] তার জন্য ঐ দুই পাহাড়ের মাঝখানে 'সাঈ' করায় কোন গোনাহ নেই।[১৫৮] আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে কোন সৎ ও কল্যাণের কাজ করে,[১৫৯] আল্লাহ তা জানেন এবং তার যথার্থ মর্যাদা ও মূল্য দান করবেন।

১৫৬. বলার অর্থ কেবল মুখে বলা নয় বরং মনে মনে একথা স্বীকার করে নেয়া যে, "আমরা আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন।" তাই আল্লাহর পথে আমাদের যে কোন জিনিস কুরবানী করা হয়, তা ঠিক তার সঠিক ক্ষেত্রেই ব্যয়িত হয়। যার জিনিস ছিল তার কাজেই ব্যয়িত হয়েছে। আর "আল্লাহরই দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে"—এর অর্থ হচ্ছে, চিরকাল আমাদের এ দুনিয়ায় থাকতে হবে না। অবশেষে একদিন আল্লাহরই কাছে যেতে হবে। কাজেই তাঁর পথে লড়াই করে প্রাণ দান করে তাঁর কাছে চলে যাওয়াটাই তো ভালো। এভাবে মৃত্যুবরণ করে তাঁর কাছে চলে যাওয়াটা আমাদের স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করে কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে বা রোগে ভুগে মৃত্যুবরণ করে তাঁর কাছে চলে যাওয়ার চাইতে লাখো গুণে শ্রেয়।

১৫৭. যিলহজ্জ মাসের নির্ধারিত তারিখে কা'বা শরীফ যিয়ারত করাকে হজ্জ বলে। এই তারিখগুলো ছাড়া অন্য সময় কা'বা যিয়ারত করাকে উমরাহ বলে।

১৫৮. সাফা ও মারওয়া মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী দু'টি পাহাড়। আল্লাহ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে হজ্জের যে সমস্ত অনুষ্ঠান শিখিয়েছিলেন তার মধ্যে সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঈ' করা বা দৌড়ানো ছিল অন্যতম। পরে মক্কায় ও তার আশপাশের এলাকায় মুশরিকী জাহেলীয়াত তথা পৌত্তলিক ধর্ম ছড়িয়ে পড়লে সাফার ওপর 'আসাফ' ও মারওয়ার ওপর 'নায়েলা'র পূজাবেদী নির্মাণ করা হয়। এর চারদিকে তাওয়াফ করা হতো। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আরববাসীদের কাছে ইসলামের আলো পৌঁছবার পর মুসলমানদের মনে প্রশ্ন দেখা দিল যে, সাফা ও মারওয়ার 'সাঈ' কি হজ্জের অনুষ্ঠানাদির অন্তরভুক্ত অথবা এটা নিছক জাহেলী যুগের মুশরিকদের উদ্ভূত কোন অনুষ্ঠান? কাজেই এই ধরনের একটি কর্মকে হজ্জের অনুষ্ঠানের অন্তরভুক্ত করে তারা কোন মুশরিকী কাজ করে যাচ্ছে কি না এ ব্যাপারে

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ
مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ
اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ
عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

যারা আমার অবতীর্ণ উজ্জ্বল শিক্ষাবলী ও বিধানসমূহ গোপন করে, অথচ সমগ্র মানবতাকে পথের সন্ধান দেবার জন্য আমি সেগুলো আমার কিতাবে বর্ণনা করে দিয়েছি, নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করেন এবং সকল অভিশাপ বর্ষণকারীরাও তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে।[১৬০] তবে যারা এই নীতি পরিহার করে, নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নেয় এবং যা কিছু গোপন করে যাচ্ছিল সেগুলো বিবৃত করতে থাকে, তাদেরকে আমি ক্ষমা করে দেবো আর আসলে আমি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

তাদের মনে দ্বিধার সঞ্চার হয়। তাছাড়া হযরত আয়েশার (রা) রেওয়ায়াত থেকেও জানা যায়, মদীনাবাসীদের মনে আগে থেকেই সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়ের ব্যাপারে অপছন্দ ও বিরক্তির ভাব ছিল। কারণ তারা ছিল 'মানাত'-এর ভক্ত। 'আসাফ' ও 'নায়েলা'কে তারা মানতো না। এসব কারণে মসজিদুল হারামকে কিব্‌লাহ নির্ধারিত করার সময় সাফা ও মারওয়া সম্পর্কিত প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করা এবং এই পাহাড় দু'টির মাঝখানে দৌড়ানো হজ্জের মূল অনুষ্ঠানের অংশবিশেষ বলে লোকদেরকে জানিয়ে দেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। আর এই সংগে লোকদেরকে একথা জানিয়ে দেয়াও অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল যে, এই দু'টি স্থানের পবিত্রতা জাহেলী যুগের মুশরিকদের মনগড়া নয় বরং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়েছে।

১৫৯. অর্থাৎ নির্দেশ মানার জন্য তোমাদের কাজ তো করতেই হবে, তবে ভালো হয় যদি মানসিক আগ্রহ ও আন্তরিকতার সাথে তা করো।

১৬০. ইহুদি আলেমদের বৃহত্তম অপরাধ এই ছিল যে, তারা আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান সর্বসাধারণ্যে প্রচার করার পরিবর্তে তাকে রাব্বী ও একটি সীমিত ধর্মীয় পেশাদার গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিল। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ জনমানুষ তো দূরের কথা ইহুদি জনতাকেও এই জ্ঞানের স্পর্শ থেকে দূরে রাখা হয়েছিল। সাধারণ অজ্ঞতার কারণে জনগণ যখন ব্যাপকভাবে ভ্রষ্টতার শিকার হলো তখন ইহুদি আলেমসমাজ জনগণের চিন্তা ও কর্মের সংস্কার সাধনে ব্রতী হয়নি। বরং উল্টো জনগণের মধ্যে নিজেদের জনপ্রিয়তা অব্যাহত রাখার জন্য যে ভ্রষ্টতা ও শরীয়াত বিরোধী কর্ম জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তো তাকে তারা নিজেদের কথা ও কাজের সাহায্যে অথবা নীরব সমর্থনের মাধ্যমে বৈধতার ছাড়পত্র দান করতো। এই ধরনের প্রবণতা ও কর্মনীতি অবলম্বন না করার জন্য

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ
الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا
هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

যারা কুফরীর নীতি[১৬১] অবলম্বন করেছে এবং কুফরীর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের ওপর আল্লাহর ফেরেশতাদের ও সমগ্র মানবতার লানত। এই লানত বিদ্ধ অবস্থায় তারা চিরকাল অবস্থান করবে, তাদের শাস্তি হ্রাস পাবে না এবং তাদের অন্য কোন অবকাশও দেয়া হবে না।

তোমাদের আল্লাহ এক ও একক। সেই দয়াবান ও করুণাময় আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।

মুসলমানদেরকে তাকীদ করা হচ্ছে। সমগ্র বিশ্ববাসীকে হিদায়াত করার গুরুদায়িত্ব যে উম্মাতের ওপর সোপর্দ করা হয়েছে, সেই হিদায়াতকে কৃপণের ধনের মতো আগলে না রেখে বেশী করে সম্প্রসারিত করাই হচ্ছে তার কর্তব্য।

১৬১. কুফরের আসল মানে হচ্ছে গোপন করা, লুকানো। এ থেকেই অস্বীকারের অর্থ বের হয়েছে। ঈমানের বিপরীত পক্ষে এ শব্দটি বলা হয়। ঈমান অর্থ মেনে নেয়া, কবুল করা, স্বীকার করা। এর বিপরীতে 'কুফর'-এর অর্থ না মানা, প্রত্যাখ্যান করা, অস্বীকার করা। কুরআনের বর্ণনার প্রেক্ষিতে কুফরীর মনোভাব ও আচরণ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে।

এক ঃ আল্লাহকে একেবারেই না মানা। অথবা তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা স্বীকার না করা এবং তাঁকে নিজের ও সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মালিক, প্রভু, উপাস্য ও মাবুদ হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করা। অথবা তাঁকে একমাত্র মালিক ও মাবুদ বলে না মানা।

দুই ঃ আল্লাহকে মেনে নেয়া কিন্তু তাঁর বিধান ও হিদায়াতসমূহকে জ্ঞান ও আইনের একমাত্র উৎস হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করা।

তিন ঃ নীতিগতভাবে একথা মেনে নেয়া যে, তাকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলতে হবে কিন্তু আল্লাহ তাঁর বিধান ও বাণীসমূহ যেসব নবী-রসূলের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন তাদেরকে অস্বীকার করা।

চার ঃ নবীদের মধ্যে পার্থক্য করা এবং নিজের পছন্দ ও মানসিক প্রবণতা বা গোত্রীয় ও দলীয়প্রীতির কারণে তাদের মধ্য থেকে কাউকে মেনে নেয়া এবং কাউকে না মানা।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ
اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا
مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَّتَصْرِيفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

২০ রুকূ'

(এই সত্যটি চিহ্নিত করার জন্য যদি কোন নিদর্শন বা আলামতের প্রয়োজন হয় তাহলে) যারা বুদ্ধি-বিবেক ব্যবহার করে তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর ঘটনাকৃতিতে, রাত্রদিনের অনবরত আবর্তনে, মানুষের প্রয়োজনীয় ও উপকারী সামগ্রী নিয়ে সাগর দরিয়ার চলমান জলযানসমূহে, বৃষ্টিধারার মধ্যে, যা আল্লাহ বর্ষণ করেন ওপর থেকে তারপর তার মাধ্যমে মৃত ভূমিকে জীবন দান করেন এবং নিজের এই ব্যবস্থাপনার বদৌলতে পৃথিবীতে সব রকমের প্রাণী ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেন, আর বায়ু প্রবাহে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে।[১৬২]

পাঁচ ঃ নবী ও রসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ও জীবন যাপনের বিধান সম্বলিত যেসব শিক্ষা বিবৃত করেছেন সেগুলো অথবা সেগুলোর কোন কোনটি গ্রহণ করা।

ছয় ঃ এসব কিছুকে মতবাদ হিসেবে মেনে নেয়ার পর কার্যত জেনে বুঝে আল্লাহর বিধানের নাফরমানী করা এবং এই নাফরমানীর ওপর জোর দিতে থাকা। আর এই সঙ্গে দুনিয়ার জীবনে আনুগত্যের পরিবর্তে নাফরমানীর ওপর নিজের কর্মনীতির ভিত্তি স্থাপন করা।

আল্লাহর মোকাবিলায় এসব বিভিন্ন ধরনের চিন্তা ও কাজ মূলত বিদ্রোহাত্মক। এর মধ্য থেকে প্রতিটি চিন্তা ও কর্মকে কুরআন কুফরী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ ছাড়াও কুরআনের কোন কোন জায়গায় 'কুফর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আল্লাহর দান, অনুগ্রহ ও নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার অর্থে। সেখানে শোকর বা কৃতজ্ঞতার বিপরীতে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'শোকর'-এর অর্থ হচ্ছে, যিনি অনুগ্রহ করেছেন তাঁর প্রতি অনুগৃহীত থাকা, তাঁর অনুগ্রহকে যথাযথ মূল্য ও মর্যাদা দান করা, তাঁর প্রদত্ত অনুগ্রহকে তাঁর সন্তুষ্টি ও নির্দেশ অনুসারে ব্যবহাব করা এবং অনুগৃহীত ব্যক্তির মন অনুগ্রহকারীর প্রতি বিশ্বস্ততার আবেগে পরিপূর্ণ থাকা। এর বিপরীত পক্ষে কুফর বা অনুগ্রহের প্রতি

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

কিন্তু (আল্লাহর একত্বের প্রমাণ নির্দেশক এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও) কিছু লোক আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ দাঁড় করায়[১৬৩] এবং তাদেরকে এমন ভালোবাসে যেমন আল্লাহকে ভালোবাসা উচিত—অথচ ঈমানদাররা সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে ভালোবাসে।[১৬৪] হায়! আযাব সামনে দেখে এই যালেমরা যা কিছু অনুধাবন করার তা যদি আজই অনুধাবন করতো যে, সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর অধীন এবং শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর।

অকৃজ্ঞতা হচ্ছে ঃ অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ স্বীকার না করা এবং এই অনুগ্রহকে নিজের যোগ্যতা বা অন্য কারোর দান বা সুপারিশের ফল মনে করা অথবা অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ প্রদান করা সত্ত্বেও তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ করা। এই ধরনের কুফরীকে আমরা নিজেদের ভাষায় সাধারণত কৃতঘ্নতা, অকৃতজ্ঞতা, নিমকহারামী ও বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকি।

১৬২. অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের এই যে বিশাল কারখানা মানুষের চোখের সামনে প্রতিনিয়ত সক্রিয়, মানুষ যদি তাকে নিছক নির্বোধ জন্তু-জানোয়ারের দৃষ্টিতে না দেখে বুদ্ধি-বিবেকের সাহায্যে বিচার বিশ্লেষণ করে তার সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সকল প্রকার হঠধর্মিতা পরিহার করে পক্ষপাতহীনভাবে মুক্ত মনে চিন্তা করে তাহলে চতুর্দিকে যেসব নিদর্শন সে প্রত্যক্ষ করছে সেগুলো তাকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয়ার জন্য যথেষ্ট যে, বিশ্ব-জাহানের সমগ্র ব্যবস্থাপনা একজন অসীম ক্ষমতাধর জ্ঞানবান সত্তার বিধানের অনুগত। সমস্ত ক্ষমতা-কর্তৃত্ব সেই একক সত্তার হাতে কেন্দ্রীভূত। এই ব্যবস্থাপনায় অন্য কারোর স্বাধীন হস্তক্ষেপের বা অংশীদারীত্বের সামান্যতম অবকাশই নেই। কাজেই প্রকৃতপক্ষে সমগ্র সৃষ্টিজগতের তিনিই একমাত্র প্রভু, ইলাহ ও আল্লাহ। তাঁর ছাড়া আর কোন সত্তার কোন বিষয়ে সামান্যতম ক্ষমতাও নেই। কাজেই খোদায়ী কর্তৃত্ব ও উপাস্য হবার ব্যাপারে আল্লাহর সাথে আর কারোর কোন অংশ নেই।

১৬৩. অর্থাৎ সার্বভৌম কর্তৃত্বের যে বিশেষ গুণাবলী একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত তার মধ্য থেকে কোন কোনটাকে অন্যদের সাথে সম্পর্কিত করে। আর আল্লাহ হিসেবে বান্দার ওপর তাঁর যে অধিকার রয়েছে তার মধ্য থেকে কোন কোনটা তারা তাদের এসব বানোয়াট মাবুদদের জন্যও আদায় করে। যেমন বিশ্ব-জগতের যাবতীয় কার্যকারণ পরম্পরার ওপর কর্তৃত্ব, অভাব দূর করা ও প্রয়োজন পূর্ণ করা, সংকট মোচন, অভিযোগ ও প্রার্থনা শ্রবণ, দৃশ্য-অদৃশ্য নির্বিশেষে সকল বিষয় জ্ঞাত হওয়ার—এ গুণগুলো একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত। বান্দা একমাত্র আল্লাহকেই সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পন্ন

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَ
تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً
فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ
عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

যখন তিনি শাস্তি দেবেন তখন এই সমস্ত নেতা ও প্রধান ব্যক্তিরা, দুনিয়ায় যাদের অনুসরণ করা হতো, তাদের অনুগামীদের সাথে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করতে থাকবে। কিন্তু শাস্তি তারা পাবেই এবং তাদের সমস্ত উপায়-উপকরণের ধারা ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যেসব লোক দুনিয়ায় তাদের অনুসারী ছিল তারা বলতে থাকবে, হায়! যদি আমাদের আর একবার সুযোগ দেয়া হতো, তাহলে আজ এরা যেমন আমাদের সাথে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করছে তেমনি আমরাও এদের সাথে সম্পর্কহীন হয়ে দেখিয়ে দিতাম।[১৬৫] এভাবেই দুনিয়ায় এরা যে সমস্ত কাজ করছে সেগুলো আল্লাহ তাদের সামনে এমনভাবে উপস্থিত করবেন যাতে তারা কেবল দুঃখ ও আক্ষেপই করতে থাকবে কিন্তু জাহান্নামের আগুন থেকে বের হবার কোন পথই খুঁজে পাবে না।

বলে মানবে, একমাত্র তাঁরই সামনে বন্দেগীর স্বীকৃতি সহকারে মাথা নোয়াবে, নিজের অভাব-অভিযোগ-প্রয়োজন পূরণের জন্য তাঁরই দিকে এগিয়ে যাবে, তাঁরই কাছে সাহায্যের আবেদন জানাবে, তাঁরই ওপর ভরসা ও নির্ভর করবে, তাঁরই কাছে আশা করবে এবং একমাত্র তাঁকেই ভয় করবে বাহ্যিকভাবে ও আন্তরিকভাবেও—এগুলো হচ্ছে বান্দার ওপর আল্লাহর হক। অনুরূপভাবে সমগ্র বিশ্ব-জগতের একচ্ছত্র মালিক হবার কারণে মানুষের জন্য হালাল-হারামের সীমা নির্ধারণ করার, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিরূপণের, তাদের আদেশ নিষেধের বিধান দান করার এবং তিনি মানুষকে যেসব শক্তি ও উপায় উপকরণ দান করেছেন সেগুলো তারা কিভাবে, কোন কাজে এবং কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে তা জানিয়ে দেয়ার ও নির্ধারণ করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর আছে। এ ছাড়া বান্দার ওপর আল্লাহর যে অধিকার সেই অনুযায়ী বান্দা একমাত্র আল্লাহকেই সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী বলে স্বীকার করে নেবে। তাঁর নির্দেশকে আইনের উৎস হিসেবে মেনে নেবে। তাঁকেই যে কোন কাজের আদেশ করার ও তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দান করার একচ্ছত্র অধিকারী মনে করবে। নিজের জীবনের সকল ব্যাপারেই তাঁর নির্দেশকে চূড়ান্ত গণ্য করবে। দুনিয়ায় জীবন যাপন করার জন্য বিধান ও পথনির্দেশনা লাভের ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর এই গুণাবলীর মধ্য থেকে কোন একটি গুণকেও অন্যের সাথে সম্পর্কিত করে এবং তাঁর এই অধিকারগুলোর

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا
خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾ اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ
وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦٩﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا
مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ۗ اَوَلَوْ كَانَ
اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿١٧٠﴾ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ۗ صُمٌّۢ بُكْمٌ
عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٧١﴾

২১ রুকূ'

হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যে সমস্ত হালাল ও পাক জিনিস রয়েছে সেগুলো খাও এবং শয়তানের দেখানো পথে চলো না।[১৬৬] সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তোমাদের অসৎকাজ ও অনাচারের নির্দেশ দেয় আর একথাও শেখায় যে, তোমরা আল্লাহর নামে এমন সব কথা বলো যেগুলো আল্লাহ বলেছেন বলে তোমাদের জানা নেই।[১৬৭]

তাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ যে বিধান নাযিল করেছেন তা মেনে চলো, জবাবে তারা বলে, আমাদের বাপ-দাদাদের যে পথের অনুসারী পেয়েছি আমরা তো সে পথে চলবো।[১৬৮] আচ্ছা, তাদের বাপ-দাদারা যদি একটুও বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ না করে থেকে থাকে এবং সত্য-সঠিক পথের সন্ধান না পেয়ে থাকে তাহলেও কি তারা তাদের অনুসরণ করে যেতে থাকবে? আল্লাহ প্রদর্শিত পথে চলতে যারা অস্বীকার করেছে তাদের অবস্থা ঠিক তেমনি যেমন রাখাল তার পশুদের ডাকতে থাকে কিন্তু হাঁক ডাকের আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই তাদের কানে পৌঁছে না।[১৬৯] তারা কালা, বোবা ও অন্ধ, তাই কিছুই বুঝতে পারে না।

মধ্য থেকে কোন একটি অধিকারও অন্যকে দান করে, সে আসলে নিজেকে আল্লাহর সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করায়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বা যে সংস্থা এই গুণাবলীর মধ্য থেকে কোন একটি গুণেরও দাবীদার সাজে এবং মানুষের কাজ ঐ অধিকারগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি অধিকার দাবী করে সেও মুখে খোদায়ী কর্তৃত্বের দাবী না করলেও আসলে আল্লাহর সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ সাজে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن
كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ
وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٣﴾

হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহর ইবাদাতকারী হয়ে থাকো, তাহলে যে সমস্ত পাক-পবিত্র জিনিস আমি তোমাদের দিয়েছি সেগুলো নিশ্চিন্তে খাও এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।[১৭০] আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর যদি কোন নিষেধাজ্ঞা থেকে থাকে তাহলে তা হচ্ছে এই যে, মৃতদেহ খেয়ো না, রক্ত ও শূকরের গোশত থেকে দূরে থাকো। আর এমন কোন জিনিস খেয়ো না যার ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নাম নেয়া হয়েছে।[১৭১] তবে যে ব্যক্তি অক্ষমতার মধ্যে অবস্থান করে এবং এ অবস্থায় আইন ভংগ করার কোন প্রেরণা ছাড়াই বা প্রয়োজনের সীমা না পেরিয়ে এর মধ্য থেকে কোনটা খায়, সে জন্য তার কোন গোনাহ হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[১৭২]

১৬৪. অর্থাৎ এটা ঈমানের দাবী। একজন ঈমানদারের কাছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্য সবার সন্তুষ্টির ওপর অগ্রাধিকার লাভ করবে এবং কোন জিনিসের প্রতি ভালোবাসা তার মনে এমন প্রভাব বিস্তার করবে না এবং এমন মর্যাদার আসনে সমাসীন হবে না যার ফলে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার মোকাবিলায় তাকে পরিহার করতে সে কখনো কুণ্ঠিত হবে না।

১৬৫. এখানে পথভ্রষ্টকারী নেতৃবর্গ ও তাদের নির্বোধ অনুসারীদের পরিণতির উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, পূর্ববর্তী নবীদের উম্মাতরা যে সমস্ত ভুলের শিকার হয়ে বিভ্রান্ত হয়েছিল এবং সঠিক পথ হারিয়ে ফেলেছিল মুসলমানরা যেন সে সম্পর্কে সতর্ক হয় এবং ভুল ও নির্ভুল নেতৃত্ব এবং সঠিক ও বেঠিক নেতৃত্বের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখে। ভুল ও বেঠিক নেতৃত্বের পেছনে চলা থেকে যেন তারা নিজেদেরকে বিরত রাখতে পারে।

১৬৬. অর্থাৎ পানাহারের ক্ষেত্রে কুসংস্কার ও জাহেলী রীতিনীতির ভিত্তিতে যেসব বিধি-নিষেধের প্রচলন রয়েছে সেগুলো ভেঙে ফেলো।

১৬৭. অর্থাৎ এই সমস্ত কুসংস্কার ও তথাকথিত বিধি-নিষেধকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ধর্মীয় বিষয়াবলী মনে করা আসলে শয়তানী প্ররোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ এগুলো যে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে, এ ধারণার পেছনে কোন প্রমাণ নেই।

১৬৮. অর্থাৎ বাপ–দাদাদের থেকে এভাবেই চলে আসছে এ ধরনের খোঁড়া যুক্তি পেশ করা ছাড়া তাদের কাছে এসব বিধি–নিষেধের পক্ষে পেশ করার মতো আর কোন সবল যুক্তি–প্রমাণ নেই। বোকারা মনে করে কোন পদ্ধতির অনুসরণ করার জন্য এই ধরনের যুক্তি যথেষ্ট।

১৬৯. এই উপমাটির দু'টি দিক রয়েছে। এক, তাদের অবস্থা সেই নির্বোধ প্রাণীদের মতো, যারা এক একটি পালে বিভক্ত হয়ে নিজেদের রাখালদের পেছনে চলতে থাকে এবং না জেনে বুঝেই তাদের হাঁক–ডাকের ওপর চলতে ফিরতে থাকে। দুই, এর দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে, তাদেরকে আহবান করার ও তাদের কাছে দীনের দাওয়াত প্রচারের সময় মনে হতে থাকে যেন নির্বোধ জন্তু–জানোয়ারদেরকে আহবান জানানো হচ্ছে, তারা কেবল আওয়াজ শুনতে পারে কিন্তু কি বলা হচ্ছে তা কিছুই বুঝতে পারে না। আল্লাহ এখানে এমন দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার ফলে এই দু'টি দিকই এখানে একই সাথে ফুটে উঠেছে।

১৭০. অর্থাৎ যদি তোমরা ঈমান এনে কেবলমাত্র আল্লাহর বিধানের অনুসারী হয়ে থাকো, যেমন তোমরা দাবী করছো, তাহলে জাহেলী যুগে তোমাদের ধর্মীয় পণ্ডিত, পুরোহিত, পাদরী, যাজক, যোগী ও সন্যাসীরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা যেসব অবাঞ্ছিত আচার–আচরণ ও বিধি–নিষেধের বেড়াজাল সৃষ্টি করেছিল সেগুলো ছিন্ন ভিন্ন করে দাও। আল্লাহ যা কিছু হারাম করেছেন তা থেকে অবশ্যি দূরে থাকো। কিন্তু যেগুলো আল্লাহ হালাল করেছেন কোন প্রকার ঘৃণা–সংকোচ ছাড়াই সেগুলো পানাহার করো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিম্নোক্ত হাদীসে এদিকেই ইংগিত করেছেন।

مَنْ صَلَّى صَلٰوتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذَالِكَ الْمُسْلِمُ الخ

"যে ব্যক্তি আমাদের মতো করে নামায পড়ে, আমরা যে কিব্‌লাহর দিকে মুখ করে নামায পড়ি তার দিকে মুখ করে নামায পড়ে এবং আমাদের যবেহ করা প্রাণীর গোশত খায় সে মুসলমান।"

এর অর্থ হচ্ছে, নামায পড়া ও কিব্‌লাহর দিকে মুখ করা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি ততক্ষণ ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশ করতে পারে না যতক্ষণ না সে পানাহারের ব্যাপারে অতীতের জাহেলী যুগের বিধি–নিষেধগুলো ভেঙ্গে ফেলে এবং জাহেলিয়াত পন্থীরা এ ব্যাপারে যে সমস্ত কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল সেগুলো থেকে মুক্ত হয়। কারণ এই জাহেলী বিধি–নিষেধগুলো মেনে চলাটাই একথা প্রমাণ করবে যে, জাহেলিয়াতের বিষ এখনো তার শিরা উপশিরায় গতিশীল।

১৭১. এই নিষেধাজ্ঞাটি এমন সব প্রাণীর গোশতের ওপর আরোপিত হয় যাদেরকে আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নামে যবেহ করা হয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে নজরানা হিসেবে যে খাদ্য তৈরি করা হয় তার ওপরও আরোপিত হয়। আসলে প্রাণী, শস্য, ফলমূল বা অন্য যে কোন খাদ্যের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। তিনিই ঐ জিনিসগুলো আমাদের

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا
قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ
اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى
النَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا
فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

মূলত আল্লাহ তাঁর কিতাবে যে সমস্ত বিধান অবতীর্ণ করেছেন সেগুলো যারা গোপন করে এবং সামান্য পার্থিব স্বার্থের বেদীমূলে সেগুলো বিসর্জন দেয় তারা আসলে আগুন দিয়ে নিজেদের পেট ভর্তি করছে।[১৭৩] কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথাই বলবেন না, তাদের পবিত্রতার ঘোষণাও দেবেন না[১৭৪] এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এরাই হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা কিনে নিয়েছে এবং ক্ষমার বিনিময়ে কিনেছে শাস্তি। এদের কী অদ্ভুত সাহস দেখো। জাহান্নামের আযাব বরদাস্ত করার জন্যে এরা প্রস্তুত হয়ে গেছে। এসব কিছুই ঘটার কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তো যথার্থ সত্য অনুযায়ী কিতাব নাযিল করেছিলেন কিন্তু যারা কিতাবে মতবিরোধ উদ্ভাবন করেছে তারা নিজেদের বিরোধের ক্ষেত্রে সত্য থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে।

দান করেছেন। কাজেই সেগুলোর ওপর অনুগ্রহের স্বীকৃতি, সাদকাহ বা নজরানা হিসেবে একমাত্র আল্লাহরই নাম নেয়া যেতে পারে। আর কারোর নয়। এগুলোর ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নাম নেয়ার অর্থ হবে, আল্লাহর পরিবর্তে অথবা আল্লাহর সাথে সাথে তার প্রাধান্যও স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে এবং তাকেও অনুগ্রহকারী ও নিয়ামত দানকারী মনে করা হচ্ছে।

১৭২. এই আয়াতে তিনটি শর্ত সাপেক্ষে হারাম জিনিসের ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এক, যথার্থ অক্ষমতার মুখোমুখি হলে, যেমন ক্ষুধা বা পিপাসা প্রাণ সংহারক প্রমাণিত হতে থাকলে, অথবা রোগের কারণে প্রাণনাশের আশংকা থাকলে এবং এ অবস্থায় হারাম জিনিস ছাড়া আর কিছু না পাওয়া গেলে। দুই, মনের মধ্যে আল্লাহর আইন ভংগ করার ইচ্ছা পোষণ না করলে। তিন, প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম না করলে যেমন

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۙ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

২২ রুকূ'

তোমাদের মুখ পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে ফিরাবার মধ্যে কোন পুণ্য নেই।[১৭৫] বরং সৎকাজ হচ্ছে এই যে, মানুষ আল্লাহ, কিয়ামতের দিন, ফেরেশতা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব ও নবীদেরকে মনে প্রাণে মেনে নেবে এবং আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রাণপ্রিয় ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্য প্রার্থী ও ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য ব্যয় করবে। আর নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দান করবে। যারা অংগীকার করে তা পূর্ণ করবে এবং বিপদে-অনটনে ও হক-বাতিলের সংগ্রামে সবর করবে তারাই সৎ ও সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই মুত্তাকী।

কোন হারাম পানীয়ের কয়েক ফোঁটা বা কয়েক ঢোক পান করলে অথবা হারাম খাদ্যের কয়েক মুঠো খেলে যদি প্রাণ বাঁচে তাহলে তার বেশী ব্যবহার না করা।

১৭৩. এর অর্থ হচ্ছে, সাধারণ লোকদের মধ্যে যত প্রকার বিভ্রান্তিকর কুসংস্কার প্রচলিত আছে এবং বাতিল রীতিনীতি ও অর্থহীন বিধি-নিষেধের যেসব নতুন নতুন শরীয়াত তৈরি হয়ে গেছে—এসবগুলোর জন্য দায়ী হচ্ছে সেই আলেম সমাজ, যাদের কাছে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান ছিল কিন্তু তারা সাধারণ মানুষের কাছে তা পৌঁছায়নি। তারপর অজ্ঞতার কারণে লোকদের মধ্যে যখন ভুল পদ্ধতির প্রচলন হতে থাকে তখনো ঐ জালেম গোষ্ঠী মুখ বন্ধ করে বসে থেকেছে। বরং আল্লাহর কিতাবের বিধানের ওপর আবরণ পড়ে থাকাটাই নিজেদের জন্য লাভজনক বলে তাদের অনেকেই মনে করেছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۭ اَلْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ۭ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ
شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۗءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ۭ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ
مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۭ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝١٧٨

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য হত্যার ব্যাপারে কিসাসের বিধান লিখে দেয়া হয়েছে।[১৭৬] স্বাধীন ব্যক্তি হত্যা করে থাকলে তার বদলায় ঐ স্বাধীন ব্যক্তিকেই হত্যা করা হবে, দাস হত্যাকারী হলে ঐ দাসকেই হত্যা করা হবে, আর নারী এই অপরাধ সংঘটিত করলে সেই নারীকে হত্যা করেই এর কিসাস নেয়া হবে।[১৭৭] তবে কোন হত্যাকারীর সাথে তার ভাই যদি কিছু কোমল ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয়,[১৭৮] তাহলে প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী[১৭৯] রক্তপণ দানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং সততার সঙ্গে রক্তপণ আদায় করা হত্যাকারীর জন্য অপরিহার্য। এটা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে দণ্ড হ্রাস ও অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করবে[১৮০] তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৭৪. যেসব ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ মিথ্যা দাবী করে এবং জনগণের মধ্যে নিজেদের সম্পর্কে মিথ্যা ও বানোয়াট প্রচারণা চালায় এখানে আসলে তাদের সমস্ত দাবী ও প্রচারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তারা সম্ভাব্য সকল উপায়ে নিজেদের পূত-পবিত্র সত্তার অধিকারী হবার এবং যে ব্যক্তি তাদের পেছনে চলবে কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে তার সুপারিশ করে তার গোনাহখাতা মাফ করিয়ে নেয়ার ধারণা জনগণের মনে বদ্ধমূল করার চেষ্টা করে এবং জনগণও তাদের একথায় বিশ্বাস করে। জবাবে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলছেন, আমি তাদের সাথে কথাই বলবো না এবং তাদের পবিত্রতার ঘোষণাও দেবো না।

১৭৫. পূর্ব ও পশ্চিমের দিকে মুখ করার বিষয়টিকে নিছক উপমা হিসেবে আনা হয়েছে। আসলে এখানে যে কথাটি বুঝানো হয়েছে সেটি হচ্ছে, ধর্মের কতিপয় বাহ্যিক অনুষ্ঠান পালন করা, শুধুমাত্র 'নিয়ম পালনের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত কয়েকটা ধর্মীয় কাজ করা এবং তাকওয়ার কয়েকটা পরিচিত রূপের প্রদর্শনী করা আসল সৎকাজ নয় এবং আল্লাহর কাছে এর কোন গুরুত্ব ও মূল্য নেই।

১৭৬. 'কিসাস' হচ্ছে রক্তপাতের বদলা বা প্রতিশোধ। অর্থাৎ হত্যাকারীর সাথে এমন ব্যবহার করা যেমন সে নিহত ব্যক্তির সাথে করেছে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, হত্যাকারী যেভাবে নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করেছে ঠিক সেভাবেই তাকেও হত্যা করতে হবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, সে একজনকে হত্যা করেছে, তাকেও হত্যা করা হবে।

১৭৭. জাহেলী যুগে হত্যার বদলা নেয়ার ব্যাপারে একটি পদ্ধতি প্রচলন ছিল। কোন জাতি বা গোত্রের লোকেরা তাদের নিহত ব্যক্তির রক্তকে যে পর্যায়ের মূল্যবান মনে করতো হত্যাকারীর পরিবার, গোত্র বা জাতির কাছ থেকে ঠিক সেই পরিমাণ মূল্যের রক্ত আদায় করতে চাইতো। নিহত ব্যক্তির বদলায় কেবলমাত্র হত্যাকারীর প্রাণ সংহার করেই তাদের কলিজা ঠাণ্ডা হতো না। বরং নিজেদের একজন লোক হত্যা করার প্রতিশোধ নিতে চাইতো তারা প্রতিপক্ষের শত শত লোককে হত্যা করে। তাদের কোন অভিজাত ও সম্মানী ব্যক্তি যদি অন্য গোত্রের একজন সাধারণ ও নীচু স্তরের লোকের হাতে মারা যেতো, তাহলে এ ক্ষেত্রে তারা নিছক হত্যাকারীকে হত্যা করাই যথেষ্ট মনে করতো না। বরং হত্যাকারীর গোত্রের ঠিক সমপরিমাণ অভিজাত ও মর্যাদাশীল কোন ব্যক্তির প্রাণ সংহার করতে অথবা তাদের কয়েকজনকে হত্যা করতে চাইতো। বিপরীত পক্ষে নিহত ব্যক্তি তাদের দৃষ্টিতে যদি কোন সামান্য ব্যক্তি হতো আর অন্যদিকে হত্যাকারী হতো বেশী মর্যাদাশীল ও অভিজাত, তাহলে এ ক্ষেত্রে তারা নিহত ব্যক্তির প্রাণের বদলায় হত্যাকারীর প্রাণ সংহার করতে দিতে চাইতো না। এটা কেবল প্রাচীন জাহেলী যুগের রেওয়াজ ছিল না। বর্তমান যুগেও যাদেরকে দুনিয়ার সবচেয়ে সুসভ্য জাতি মনে করা হয় তাদের সরকারী ঘোষণাবলীতেও অনেক সময় নির্লজ্জের মতো দুনিয়াবাসীকে শুনিয়ে দেয়া হয় ঃ আমাদের একজন নিহত হলে আমরা হত্যাকারীর জাতির পঞ্চাশজনকে হত্যা করবো। প্রায়ই আমরা শুনতে পাই, এক ব্যক্তিকে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য পরাজিত ও অধীনস্থ জাতির আটককৃত বহু ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। এই বিশ শতকের একটি 'সুসভ্য' জাতি নিজেদের এক ব্যক্তির হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে সমগ্র মিসরীয় জাতির ওপর। অন্যদিকে এই তথাকথিত সুসভ্য জাতিগুলোর বিধিবদ্ধ আদালতসমূহেও দেখা যায়, হত্যাকারী যদি শাসক জাতির এবং নিহত ব্যক্তি পরাজিত ও অধীনস্থ জাতির অন্তরভুক্ত হয়, তাহলে তাদের বিচারকরা প্রাণদণ্ডের সিদ্ধান্ত দিতে চায় না। এসব অন্যায় ও অবিচারের পথ বন্ধ করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নিহত ব্যক্তি ও হত্যাকারীর কোন প্রকার মর্যাদার বাছ-বিচার না করে নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য শুধুমাত্র হত্যাকারীরই প্রাণ সংহার করা হবে।

১৭৮. "ভাই" শব্দটি ব্যবহার করে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে কোমল ব্যবহার করার সুপারিশও করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের ও তার মধ্যে চরম শত্রুতার সম্পর্ক থাকলেও আসলে সে তোমাদের মানবিক ভ্রাতৃসমাজেরই একজন সদস্য। কাজেই তোমাদের একজন অপরাধী ভাইয়ের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করার পরিবর্তে নিজেদের প্রতিশোধ স্পৃহাকে যদি দমন করতে পারো তাহলে এটাই হবে তোমাদের মানবিক ব্যবহারের যথার্থ উপযোগী। এ আয়াত থেকে একথাও জানা গেলো যে, ইসলামী দণ্ডবিধিতে নরহত্যার মতো মারাত্মক বিষয়টিও উভয় পক্ষের মর্জীর ওপর নির্ভরশীল। নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা হত্যাকারীকে মাফ করে দেয়ার অধিকার রাখে এবং এ অবস্থায় হত্যাকারীর প্রাণদণ্ডের ওপর জোর দেয়া আদালতের জন্য বৈধ নয়। তবে পরবর্তী আয়াতগুলোর বর্ণনা অনুযায়ী হত্যাকারীকে মাফ করে দেয়া হলে তাকে অবশ্যি রক্তপণ আদায় করতে হবে।

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾
كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۖ الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ
بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ
فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٨٢﴾

হে বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন লোকেরা! তোমাদের জন্য কিসাসের মধ্যে জীবন রয়েছে।[১৮১] আশা করা যায়, তোমরা এই আইনের বিরুদ্ধাচরণ করার ব্যাপারে সতর্ক হবে।

তোমাদের কারোর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে ধন-সম্পত্তি ত্যাগ করে যেতে থাকলে পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনদের জন্য প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী অসিয়ত করে যাওয়াকে তার জন্য ফরয করা হয়েছে, মুত্তাকীদের জন্য এটা একটা অধিকার।[১৮২] তারপর যদি কেউ এই অসিয়ত শুনার পর তার মধ্যে পরিবর্তন করে ফেলে তাহলে ঐ পরিবর্তনকারীরাই এর সমস্ত গোনাহের ভাগী হবে। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন। তবে যদি কেউ অসিয়তকারীর পক্ষ থেকে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে পক্ষপাতিত্ব বা হক নষ্ট হবার আশংকা করে এবং সে বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তাহলে তার কোন গোনাহ হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

১৭৯. এখানে কুরআনে "মা'রুফ" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এর অর্থ হচ্ছে, এমন একটি সঠিক কর্মপদ্ধতি যার সাথে সাধারণত সবাই সুপরিচিত। প্রত্যেকটি নিরপেক্ষ ব্যক্তি যার কোন স্বার্থ এর সাথে জড়িত নেই, সে প্রথম দৃষ্টিতেই যেন এর সম্পর্কে বলে ওঠে হাঁ এটিই ভারসাম্যপূর্ণ ও উপযোগী কর্মপদ্ধতি। প্রচলিত রীতিকেও (Common Law) ইসলামী পরিভাষায় "উরফ" ও "মা'রুফ" বলা হয়। যেসব ব্যাপারে শরীয়াত কোন বিশেষ নিয়ম নির্ধারণ করেনি এমন সব ব্যাপারেই একে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়।

১৮০. যেমন হত্যাকারীর উত্তরাধিকারীরা রক্তপণ আদায় করার পরও আবার প্রতিশোধ নেয়ার প্রচেষ্টা চালায় অথবা হত্যাকারী রক্তপণ আদায় করার ব্যাপারে টালবাহানা করে

এবং নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা তার প্রতি যে উদারতা প্রদর্শন করে নিজের অকৃতজ্ঞ ব্যবহারের মাধ্যমে তার জবাব দেয়। এসবগুলোকেই বাড়াবাড়ি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৮১. এটি দ্বিতীয় একটি জাহেলী চিন্তা ও কর্মের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। আগের মতো আজো বহু মস্তিষ্কে এই চিন্তা দানা বেঁধে আছে। জাহেলিয়াত পন্থীদের একটি দল যেমন প্রতিশোধ গ্রহণের প্রশ্নে এক প্রান্তিকতায় চলে গেছে তেমনি আর একটি দল ক্ষমার প্রশ্নে আর এক প্রান্তিকতায় চলে গেছে এবং প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে তারা এমন জবরদস্ত প্রচারণা চালিয়েছে যার ফলে অনেক লোক একে একটি ঘৃণ্য ব্যাপার মনে করতে শুরু করেছে এবং দুনিয়ার বহু দেশ প্রাণদণ্ড রহিত করে দিয়েছে। কুরআন এ প্রসংগে বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্বোধন করে তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দিচ্ছে যে, কিসাস বা 'প্রাণ হত্যার শাস্তি স্বরূপ প্রাণদণ্ডাদেশের' ওপর সমাজের জীবন নির্ভর করছে। মানুষের প্রাণের প্রতি যারা মর্যাদা প্রদর্শন করে না তাদের প্রাণের প্রতি যে সমাজ মর্যাদা প্রদর্শন করে সে আসলে তার জামার আস্তিনে সাপের লালন করছে। তোমরা একজন হত্যাকারীর প্রাণ রক্ষা করে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষের প্রাণ সংকটাপন্ন করে তুলছো।

১৮২. এ বিধানটি এমন এক যুগে দেয়া হয়েছিল, যখন উত্তরাধিকার বন্টন সম্পর্কিত কোন আইন ছিলো না। সে সময় প্রত্যেক ব্যক্তিকে অসিয়তের মাধ্যমে তার উত্তরাধিকারীদের অংশ নির্ধারণ করে দিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এভাবে মৃত্যুর পরে পরিবারের মধ্যে কোন বিরোধ এবং কোন হকদারের হক নষ্ট হবারও ভয় থাকে না। পরে উত্তরাধিকার বন্টনের জন্য আল্লাহ নিজেই যখন একটি বিধান দিলেন (সূরা আন নিসায় এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওসীয়ত ও মীরাসের বিধান ব্যাখ্যা প্রসংগে নিম্নোক্ত নিয়ম দু'টি ব্যক্ত করলেন ঃ

এক ঃ এখন থেকে ওয়ারিসের জন্য কোন ব্যক্তি আর কোন অসিয়ত করতে পারবে না। অর্থাৎ যেসব আত্মীয়ের অংশ কুরআন নির্ধারিত করে দিয়েছে, অসিয়তের মাধ্যমে তাদের অংশ কম-বেশী করা যাবে না এবং কোন ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারীকে মীরাস থেকে বঞ্চিতও করা যাবে না। আর কোন ওয়ারিস আইনগতভাবে যা পায় অসিয়তের সাহায্যে তার চেয়ে বেশী কিছু তাকে দেয়াও যাবে না।

দুই ঃ সমগ্র সম্পদ ও সম্পত্তির মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ অসিয়ত করা যেতে পারে।

এ দু'টি ব্যাখ্যামূলক নির্দেশের পর এখন এই আয়াতের অর্থ দাঁড়াচ্ছে, সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ ওয়ারিসদের জন্য রেখে যেতে হবে। মৃত্যুর পর এগুলো মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের মধ্যে কুরআন নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী বন্টিত হবে। আর এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি মৃত ব্যক্তি তার মৃত্যুর আগে অসিয়ত করে যেতে পারে তার এমন সব আত্মীয়ের জন্য যারা তার উত্তরাধিকারী নয়। তার নিজের গৃহে বা পরিবারে যারা সাহায্য লাভের মুখাপেক্ষী অথবা পরিবারের বাইরে যাদেরকে সে সাহায্য লাভের যোগ্য মনে করে বা যেসব জনকল্যাণমূলক কাজে সাহায্য দান করা প্রয়োজনীয় বলে সে মনে করে—এমন সব ক্ষেত্রে সে ঐ এক-তৃতীয়াংশ থেকে অসিয়ত করে যেতে পারে। পরবর্তীকালে লোকেরা এ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن
كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى
ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ
خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

২৩ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করে দেয়া হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। এ থেকে আশা করা যায়, তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণাবলী সৃষ্টি হয়ে যাবে।[১৮৩] এ কতিপয় নির্দিষ্ট দিনের রোযা। যদি তোমাদের কেউ হয়ে থাকে রোগগ্রস্ত অথবা মুসাফির তাহলে সে যেন অন্য দিনগুলোয় এই সংখ্যা পূর্ণ করে। আর যাদের রোযা রাখার সামর্থ আছে (এরপরও রাখে না) তারা যেন ফিদিয়া দেয়। একটি রোযার ফিদিয়া একজন মিসকিনকে খাওয়ানো। আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে কিছু বেশী সৎকাজ করে, তা তার জন্য ভালো। তবে যদি তোমরা সঠিক বিষয় অনুধাবন করে থাকো[১৮৪] তাহলে তোমাদের জন্য রোযা রাখাই ভালো।[১৮৫]

অসিয়তের নির্দেশটিকে নিছক একটি সুপারিশমূলক বিধান গণ্য করে। এমনকি সাধারণভাবে অসিয়ত একটি 'মানসুখ' বা রহিত পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কুরআন মজীদে এটিকে একটি 'হক'—অধিকার গণ্য করা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে মুত্তাকীদের ওপর এই হক বর্তেছে। এই হকটি যথাযথভাবে আদায় করা হতে থাকলে মীরাসের ব্যাপারে যেসব প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এবং যেগুলো আজকের সমাজ মানসকে অনেক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছে তার মীমাংসা অতি সহজেই হয়ে যেতে পারে। যেমন দাদা ও নানার জীবদ্দশায় যেসব নাতি–নাতনীর বাপ বা মা মারা যায় তাদেরকে এই এক–তৃতীয়াংশ অসিয়ত থেকে সহজেই অংশ দান করা যায়।

১৮৩. ইসলামের অন্যান্য বিধানের মতো রোযাও পর্যায়ক্রমে ফরয হয়। শুরুতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে মাত্র প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ রোযা ফরয ছিল না। তারপর দ্বিতীয় হিজরীতে রমযান মাসের রোযার এই বিধান কুরআনে নাযিল হয়। তবে এতে এতটুকুন সুযোগ দেয়া হয়, রোযার কষ্ট বরদাশত করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যারা রোযা রাখবেন না তারা প্রত্যেক রোযার

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ
مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۭ
وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۭ يُرِيْدُ اللّٰهُ
بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۡ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا
اللّٰهَ عَلٰي مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٥﴾

রমযানের মাস, এ মাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানব জাতির জন্য পুরোপুরি হিদায়াত এবং এমন ব্যাখ্যাসহ শিক্ষা সম্বলিত, যা সত্য-সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়। কাজেই এখন থেকে যে ব্যক্তি এ মাসের সাক্ষাত পাবে তার জন্য এই সম্পূর্ণ মাসটিতে রোযা রাখা অপরিহার্য এবং যে ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হয় বা সফরে থাকে, সে যেন অন্য দিনগুলোয় রোযার সংখ্যা পূর্ণ করে।[১৮৬] আল্লাহ তোমাদের সাথে নরম নীতি অবলম্বন করতে চান, কঠোর নীতি অবলম্বন করতে চান না। তাই তোমাদেরকে এই পদ্ধতি জানানো হচ্ছে, যাতে তোমরা রোযার সংখ্যা পূর্ণ করতে পারো এবং আল্লাহ তোমাদের যে হিদায়াত দান করেছেন সে জন্য যেন তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে ও তার স্বীকৃতি দিতে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।[১৮৭]

বদলে একজন মিসকিনকে আহার করাবে। পরে দ্বিতীয় বিধানটি নাযিল হয়। এতে পূর্ব প্রদত্ত সাধারণ সুযোগ বাতিল করে দেয়া হয়। কিন্তু রোগী মুসাফির, গর্ভবতী মহিলা বা দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাতা এবং রোযা রাখার ক্ষমতা নেই এমন সব বৃদ্ধদের জন্য এ সুযোগটি আগের মতোই বহাল রাখা হয়। পরে ওদের অক্ষমতা দূর হয়ে গেলে রমযানের যে ক'টি রোযা তাদের বাদ গেছে সে ক'টি পূরণ করে দেয়ার জন্য তাদের নির্দেশ দেয়া হয়।

১৮৪. অর্থাৎ একাধিক মিসকিনকে আহার করায় অথবা রোযাও রাখে আবার মিসকিনকেও আহার করায়।

১৮৫. দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধের আগে রমযানের রোযা সম্পর্কে যে বিধান নাযিল হয়েছিল এ পর্যন্ত সেই প্রাথমিক বিধানই বর্ণিত হয়েছে। এর পরবর্তী আয়াত এর এক বছর পরে নাযিল হয় এবং বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যের কারণে এর সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়।

১৮৬. সফররত অবস্থায় রোযা না রাখা ব্যক্তির ইচ্ছা ও পছন্দের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সফরে যেতেন। তাঁদের কেউ রোযা রাখতেন আবার কেউ রাখতেন না। উভয় দলের কেউ পরস্পরের বিরুদ্ধে

আপত্তি উঠাতেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও সফরে কখনো রোযা রেখেছেন, কখনো রাখেননি। এক সফরে এক ব্যক্তি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলো। তার চারদিকে লোক জড়ো হয়ে গেলো। এ অবস্থা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করলেন। বলা হলো, এই ব্যক্তি রোযা রেখেছে। জবাব দিলেন ঃ এটা সৎকাজ নয়। যুদ্ধের সময় তিনি রোযা না রাখার নির্দেশ জারী করতেন, যাতে দুশমনের সাথে পাঞ্জা লড়বার ব্যাপারে কোন প্রকার দুর্বলতা দেখা না দেয়। হযরত উমর (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, "দু'বার আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রমযান মাসে যুদ্ধে যাই। প্রথমবার বদরে এবং শেষবার মক্কা বিজয়ের সময়। এই দু'বারই আমরা রোযা রাখিনি।" ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, মক্কা বিজয়ের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ انه يوم قتال فافطروا "এটা কাফেরদের সাথে লড়াইয়ের দিন, কাজেই রোযা রেখো না।" অন্য হাদীসে নিম্নোক্তভাবে বলা হয়েছে ঃ انكم قد دنوتم عدوكم فافطروا اقوى لكم অর্থাৎ "শত্রুর সাথে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। কাজেই রোযা রেখো না। এর ফলে তোমরা যুদ্ধ করার শক্তি অর্জন করতে পারবে।"

সাধারণ সফরের ব্যাপারে কতটুকুন দূরত্ব অতিক্রম করলে রোযা ভাঙা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন বক্তব্য থেকে তা সুস্পষ্ট হয় না। সাহাবায়ে কেরামের কাজও এ ব্যাপারে বিভিন্ন। এ ব্যাপারে সঠিক বক্তব্য হচ্ছে এই যে, যে পরিমাণ দূরত্ব সাধারণ্যে সফর হিসেবে পরিগণিত এবং যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করলে মুসাফিরী অবস্থা অনুভূত হয়, তাই রোযা ভাঙার জন্য যথেষ্ট।

যেদিন সফর শুরু করা হয় সেদিনের রোযা না রাখা ব্যক্তির নিজের ইচ্ছাধীন, এটি একটি সর্বসম্মত বিষয়। মুসাফির চাইলে ঘর থেকে খেয়ে বের হতে পারে আর চাইলে ঘর থেকে বের হয়েই খেয়ে নিতে পারে। সাহাবীদের থেকে উভয় প্রকারের কাজের প্রমাণ পাওয়া যায়।

কোন শহর শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হলে সেই শহরের অধিবাসীরা নিজেদের শহরে অবস্থান করা সত্ত্বেও জিহাদের কারণে রোযা ভাঙতে পারে কিনা এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কোন কোন আলেম এর অনুমতি দেননি। কিন্তু আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) অত্যন্ত শক্তিশালী প্রমাণের ভিত্তিতে এ অবস্থায় রোযা ভাঙাকে পুরোপুরি জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন।

১৮৭. অর্থাৎ আল্লাহ রোযা রাখার জন্য কেবল রমযান মাসের দিনগুলোকে নির্দিষ্ট করে দেননি। বরং কোন শরীয়াত সমর্থিত ওজরের কারণে যারা রমযানে রোযা রাখতে অপারগ হয় তারা অন্য দিনগুলোয় এই রোযা রাখতে পারে, এর পথও উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। মানুষকে কুরআনের যে নিয়ামত দান করা হয়েছে তার শুকরিয়া আদায় করার মূল্যবান সুযোগ থেকে যাতে কেউ বঞ্চিত না হয় তার জন্য এই ব্যবস্থা।

এ প্রসংগে একথাটি অবশ্যি অনুধাবন করতে হবে যে, রমযানের রোযাকে কেবলমাত্র তাকওয়ার অনুশীলনই গণ্য করা হয়নি বরং কুরআনের আকারে আল্লাহ যে বিরাট ও মহান নিয়ামত মানুষকে দান করেছেন রোযাকে তার শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যম হিসেবেও

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

আর হে নবী! আমার বান্দা যদি তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তাহলে তাদেরকে বলে দাও, আমি তাদের কাছেই আছি। যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং জবাব দেই, কাজেই তাদের আমার আহবানে সাড়া দেয়া এবং আমার ওপর ঈমান আনা উচিত,[১৮৮] একথা তুমি তাদের শুনিয়ে দাও, হয়তো সত্য-সরল পথের সন্ধান পাবে।[১৮৯]

গণ্য করা হয়েছে। আসলে একজন বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সুবিবেচক ব্যক্তির জন্য কোন নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের এবং কোন অনুগ্রহের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি একটিই হতে পারে। আর তা হচ্ছে, যে উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য সেই নিয়ামতটি দান করা হয়েছিল তাকে পূর্ণ করার জন্য নিজেকে সর্বাত্মকভাবে প্রস্তুত করা। কুরআন আমাদের এই উদ্দেশ্যে দান করা হয়েছে যে, আমরা এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ জেনে নিয়ে নিজেরা সে পথে চলবো এবং অন্যদেরকেও সে পথে চালাবো। এই উদ্দেশ্যে আমাদের তৈরি করার সর্বোত্মক মাধ্যম হচ্ছে রোযা। কাজেই কুরআন নাযিলের মাসে আমাদের রোযা রাখা কেবল ইবাদাত ও নৈতিক অনুশীলনই নয় বরং এই সংগে কুরআন রূপ নিয়ামতের যথার্থ শুকরিয়া আদায়ও এর মাধ্যমে সম্ভব হয়।

১৮৮. অর্থাৎ যদিও তোমরা আমাকে দেখতে পাও না এবং ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভবও করতে পারো না তবুও আমাকে তোমাদের থেকে দূরে মনে করো না। আমি আমার প্রত্যেক বান্দার অতি নিকটেই অবস্থান করছি। যখনই তারা চায় আমার কাছে আর্জি পেশ করতে পারে। এমনকি মনে মনে আমার কাছে তারা যা কিছু আবেদন করে তাও আমি শুনতে পাই। আর কেবল শুনতেই পাই না বরং সে সম্পর্কে নিজের সিদ্ধান্তও ঘোষণা করি। নিজেদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে যে সমস্ত অলীক, কাল্পনিক ও অক্ষম সত্তাদেরকে তোমরা উপাস্য ও প্রভু গণ্য করেছো তাদের কাছে তোমাদের নিজেদের দৌড়িয়ে যেতে হয় এবং তারপরও তারা তোমাদের কোন আবেদন নিবেদন শুনতে পায় না। তোমাদের আবেদনের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতাও তাদের নেই। অন্যদিকে আমি হচ্ছি এই বিশাল বিস্তৃত বিশ্ব-জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি। সমস্ত সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আমারই হাতে কেন্দ্রীভূত। তোমাদের এতো কাছে আমি অবস্থান করি যে, কোন প্রকার মাধ্যম ও সুপারিশ ছাড়াই তোমরা নিজেরাই সরাসরি সর্বত্র ও সবসময় আমার কাছে নিজেদের আবেদন নিবেদন পেশ করতে পারো। কাজেই একের পর এক অক্ষম ও বানোয়াট খোদার দ্বারে দ্বারে মাথা ঠুকে মরার অজ্ঞতা ও মূর্খতার বেড়াজাল তোমরা ছিঁড়ে ফেলো। আমি তোমাদের যে আহবান জানাচ্ছি সে আহবানে সাড়া দাও। আমার আদর্শকে আঁকড়ে ধরো। আমার দিকে ফিরে এসো। আমার ওপর নির্ভর করো। আমার বন্দেগী ও আনুগত্য করো।

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ
لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ
أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ
وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ
إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

রোযার সময় রাতের বেলা স্ত্রীদের কাছে যাওয়া তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।[১৯০] আল্লাহ জানতে পেরেছেন, তোমরা চুপি চুপি নিজেরাই নিজেদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছিলে। কিন্তু তিনি তোমাদের অপরাধ মাফ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের ক্ষমা করেছেন। এখন তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে রাত্রিবাস করো এবং যে স্বাদ আল্লাহ তোমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন তা গ্রহণ করো।[১৯১] আর পানাহার করতে থাকো[১৯২] যতক্ষণ না রাত্রির কালো রেখার বুক চিরে প্রভাতের সাদা রেখা সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।[১৯৩] তখন এসব কাজ ত্যাগ করে রাত পর্যন্ত নিজের রোযা পূর্ণ করো।[১৯৪] আর যখন তোমরা মসজিদে ই'তিকাফে বসো তখন স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো না।[১৯৫] এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, এর ধারে কাছেও যেয়ো না।[১৯৬] এভাবে আল্লাহ তাঁর বিধান লোকদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, আশা করা যায় এর ফলে তারা ভুল কর্মনীতি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে।

১৮৯. অর্থাৎ তোমার মাধ্যমে এই ধ্রুব সত্য জানার পর তাদের চোখ খুলে যাবে। তারা সঠিক ও নির্ভুল কর্মনীতি অবলম্বন করবে, যার মধ্যে তাদের নিজেদের কল্যাণ নিহিত।

১৯০. অর্থাৎ পোশাক ও শরীরের মাঝখানে যেমন কোন পরদা বা আবরণ থাকতে পারে না এবং উভয়ের সম্পর্ক ও সম্মিলন হয় অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য, ঠিক তেমনি তোমাদের ও তোমাদের স্ত্রীদের সম্পর্কও।

১৯১. শুরুতে রমযান মাসের রাত্রিকালে স্ত্রীর সাথে রাত্রিবাস করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকলেও লোকেরা এমনটি করা অবৈধ মনে করতো। তারপর এই অবৈধ বা অপছন্দনীয় হবার ধারণা মনে মনে পোষণ করে অনেক সময় তারা নিজেদের স্ত্রীদের কাছে চলে যেতো। এটা যেন নিজের বিবেকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হতো। এর ফলে তাদের মধ্যে একটি অপরাধ ও পাপ মনোবৃত্তির লালনের আশংকা দেখা দিয়েছিল। তাই মহান আল্লাহ প্রথমে তাদেরকে বিবেকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন অতপর বলেছেন, এটি তোমাদের জন্য বৈধ। কাজেই এখন তোমরা খারাপ কাজ মনে করে একে করো না বরং আল্লাহ প্রদত্ত অনুমতির সুযোগ গ্রহণ করে মন ও বিবেকের পূর্ণ পবিত্রতা সহকারে করো।

১৯২. এ ব্যাপারেও শুরুতে লোকদের ভুল ধারণা ছিল। কারোর ধারণা ছিল, এশার নামায পড়ার পর থেকে পানাহার হারাম হয়ে যায়। আবার কেউ মনে করতো, রাতে যতক্ষণ জেগে থাকা হয় ততক্ষণ পানাহার করা যেতে পারে, ঘুমিয়ে পড়ার পর আবার উঠে কিছু খাওয়া যেতে পারে না। লোকেরা মনে মনে এই বিধান কল্পনা করে রেখেছিল এর ফলে অনেক সময় তাদের বড়ই ভোগান্তি হতো। এই আয়াতে ঐ ভুল ধারণাগুলো দূর করা হয়েছে। এখানে রোযার সীমানা বর্ণনা করা হয়েছে প্রভাতের শ্বেত আভার উদয় থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। অন্যদিকে সূর্য ডুবে যাওয়ার পর থেকে নিয়ে প্রভাতের সাদা রেখা জেগে না ওঠা পর্যন্ত সারা রাত পানাহার ও স্ত্রীসম্ভোগ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এই সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেহরী খাওয়ার নিয়মের প্রচলন করেছেন, যাতে প্রভাতের উদয়ের ঠিক পূর্বেই লোকেরা ভালোভাবে পানাহার করে নিতে পারে।

১৯৩. ইসলাম তার ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য সময়ের এমন একটি মান নির্ণয় করে দিয়েছে যার ফলে দুনিয়ায় সর্বকালে সকল তামাদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে লালীত লোকেরা সব দেশে ও সব জায়গায় ইবাদাতের সময় নির্ধারণ করে নিতে সক্ষম হয়। ঘড়ির সাহায্যে সময় নির্ধারণ করার পরিবর্তে আকাশে ও দিগন্তে উদ্ভাসিত সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহের প্রেক্ষিতে সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু অজ্ঞ ও আনাড়ী লোকেরা এই সময় নির্ধারণ পদ্ধতির বিরুদ্ধে সাধারণত এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করেছে যে, উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর সন্নিকটে, যেখানে রাত ও দিন হয় কয়েক মাসের, সেখানে এই সময় নির্ধারণ পদ্ধতি কিভাবে কাজে লাগবে? অথচ অগভীর ভূগোল জ্ঞানের কারণে তাদের মনে এ প্রশ্নের উদয় হয়েছে। আসলে আমরা বিষুব রেখার আশেপাশের এলাকার লোকেরা যে অর্থে দিন ও রাত শব্দ দু'টি বলে থাকি উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু এলাকায় ঠিক সেই অর্থে ছ'মাস রাত ও ছ'মাস দিন হয় না। রাত্রির পালা বা দিনের পালা যাই হোক না কেন, মোট কথা সকাল ও সন্ধ্যার আলামত সেখানে যথারীতি দিগন্তে ফুটে ওঠে এবং তারই প্রেক্ষিতে সেখানকার লোকেরা আমাদেরই মতো নিজেদের ঘুমোবার, জাগবার, কাজকর্ম করার ও বেড়াবার আয়োজন করে থাকে। যে যুগে ঘড়ির ব্যাপক প্রচলন ছিল না সে যুগেও ফিনল্যাণ্ড, নরওয়ে, গ্রীণল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশের লোকেরা নিজেদের সময় অবশ্যি জেনে নিতো।

সে আমলে তাদের সময় জানার উপায় ছিল এই দিগন্তের আলামত। কাজেই দুনিয়ার আর সব ব্যাপারে এই আলামতগুলো যেমন তাদের সময় নির্ধারণে সাহায্য করতো তেমনিভাবে নামায, রোযা, সেহরী ও ইফতারের ব্যাপারেও তাদের সময় নির্ধারণ করতে সক্ষম।

১৯৪. রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করার অর্থ হচ্ছে, যেখানে রাতের সীমানা শুরু হচ্ছে সেখানে তোমাদের রোযার সীমানা শেষ হয়ে যাচ্ছে। সবাই জানেন, রাতের সীমানা শুরু হয় সূর্যাস্ত থেকে। কাজেই সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করা উচিত। সেহরী ও ইফতারের সঠিক আলামত হচ্ছে, রাতের শেষ ভাগে যখন পূর্ব দিগন্তে প্রভাতের শুভ্রতার সরু রেখা ভেসে উঠে ওপরের দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে তখন সেহরীর সময় শেষ হয়ে যায়। আবার যখন দিনের শেষ ভাগে পূর্ব দিগন্ত থেকে রাতের আঁধার ওপরের দিকে উঠতে থাকে তখন ইফতারের সময় হয়। আজকাল লোকেরা সেহরী ও ইফতারে উভয় ব্যাপারে অত্যধিক সতর্কতার কারণে কিছু অযথা কড়াকড়ি শুরু করেছে। কিন্তু শরীয়াত ঐ দু'টি সময়ের এমন কোন সীমানা নির্ধারণ করে দেয়নি যে তা থেকে কয়েক সেকেণ্ড বা কয়েক মিনিট এদিক ওদিক হয়ে গেলে রোযা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রভাত কালে রাত্রির কালো বুক চিরে প্রভাতের সাদা রেখা ফুটে ওঠার মধ্যে যথেষ্ট সময়ের অবকাশ রয়েছে। ঠিক প্রভাতের উদয় মুহূর্তে যদি কোন ব্যক্তির ঘুম ভেঙে যায় তাহলে সংগতভাবেই সে তাড়াতাড়ি উঠে কিছু পানাহার করে নিতে পারে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যদি তোমাদের কেউ সেহরী খাচ্ছে এমন সময় আযানের আওয়াজ কানে এসে গিয়ে থাকে তাহলে সংগে সংগেই সে যেন আহার ছেড়ে না দেয় বরং পেট ভরে পানাহর করে নেয়। অনুরূপভাবে ইফতারের সময়ও সূর্য অস্ত যাওয়ার পর অযথা দিনের আলো মিলিয়ে যাওয়ার প্রতীক্ষায় বসে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য ডোবার সাথে সাথেই বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে বলতেন, আমার শরবত আনো। বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, হে আল্লাহর রসূল! এখনো তো দিনের আলো ফুটে আছে। তিনি জবাব দিতেন, যখন রাতের আঁধার পূর্বাকাশ থেকে উঠতে শুরু করে তখনই রোযার সময় শেষ হয়ে যায়।

১৯৫. ইতিকাফে বসার মানে হচ্ছে, রমযানের শেষ দশ দিন মসজিদে অবস্থান করা এবং এই দিনগুলোকে আল্লাহর যিকিরের জন্য নির্দিষ্ট করা। এই ইতিকাফে থাকা অবস্থায় নিজের মানবিক ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য মসজিদের বাইরে যাওয়া যায় কিন্তু যৌন স্বাদ আস্বাদন করা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা একান্ত অপরিহার্য।

১৯৬. এই সীমারেখাগুলো অতিক্রম করার কথা বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে, এগুলোর ধারে কাছেও যেয়ো না। এর অর্থ হচ্ছে, যেখান থেকে গোনাহের সীমানা শুরু হচ্ছে ঠিক সেই শেষ প্রান্তে সীমানা লাইন বরাবর ঘোরাফেরা করা বিপজ্জনক। সীমান্ত থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ ব্যবস্থা। কারণ সীমান্ত বরাবর ঘোরাফেরা করলে ভুলেও কখনো সীমান্তের ওপারে পা চলে যেতে পারে। তাই এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَاِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهُ فَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ اَنْ يَّقَعَ فِيْهِ

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অবৈধ পদ্ধতিতে খেয়ো না এবং শাসকদের সামনেও এগুলোকে এমন কোন উদ্দেশ্যে পেশ করো না যার ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে তোমরা অন্যের সম্পদের কিছু অংশ খাওয়ার সুযোগ পেয়ে যাও।[১৯৭]

"প্রত্যেক বাদশাহর একটি 'হিমা' থাকে। আর আল্লাহর হিমা হচ্ছে তাঁর নির্ধারিত হারাম বিষয়গুলো। কাজেই যে ব্যক্তি হিমার চারদিকে ঘুরে বেড়ায় তার হিমার মধ্যে পড়ে যাবার আশংকাও রয়েছে।"

আরবী ভাষায় 'হিমা' বলা হয় এমন একটি চারণক্ষেত্রকে যাকে কোন নেতা বা বাদশাহ সাধারণ মানুষের মধ্যে নিষিদ্ধ করে দেন। এই উপমাটি ব্যবহার করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, প্রত্যেক বাদশাহর একটি হিমা আছে আর আল্লাহর হিমা হচ্ছে তাঁর সেই সীমানাগুলো যার মাধ্যমে তিনি হালাল ও হারাম এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতার পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। যে পশু 'হিমার' (বেড়া) চারপাশে চরতে থাকে একদিন সে হয়তো হিমার মধ্যেও ঢুকে পড়তে পারে। দুঃখের বিষয় শরীয়াতের মৌল প্রাণসত্তা সম্পর্কে অনবহিত লোকেরা সবসময় অনুমতির শেষ সীমায় চলে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে থাকে। আবার অনেক আলেম ও মাশায়েখ এই বিপজ্জনক সীমানায় তাদের ঘোরাফেরা করতে দেয়ার উদ্দেশ্যে দলীল প্রমাণ সংগ্রহ করে অনুমতির শেষ সীমা তাদেরকে জানিয়ে দেয়ার কাজ করে যেতে থাকেন। অথচ অনুমতির এই শেষ সীমায় আনুগত্য ও অবাধ্যতার মধ্যে মাত্র চুল পরিমাণ ব্যবধান থেকে যায়। এরই ফলে আজ অসংখ্য লোক গোনাহ এবং তার থেকে অগ্রসর হয়ে গোমরাহীতে লিপ্ত হয়ে চলেছে। কারণ ঐ সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সীমান্ত রেখার মধ্যে পার্থক্য করা এবং তাদের কিনারে পৌঁছে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ কথা নয়।

১৯৭. এই আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, শাসকদেরকে উৎকোচ দিয়ে অবৈধভাবে লাভবান হবার চেষ্টা করো না। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমরা নিজেরাই যখন জানো এগুলো অন্যের সম্পদ তখন শুধুমাত্র তার কাছে তার সম্পদের মালিকানার কোন প্রমাণ না থাকার কারণে অথবা একটু এদিক সেদিক করে কোন প্রকারে প্যাঁচে ফেলে তার সম্পদ তোমরা গ্রাস করতে পারো বলে তার মামলা আদালতে নিয়ে যেয়ো না। মামলার ধারা বিবরণী শোনার পর হয়তো তারই ভিত্তিতে আদালত তোমাকে ঐ সম্পদ দান করতে পারে। কিন্তু বিচারকের এ ধরনের ফায়সালা হবে আসলে সাজানো মামলার নকল দলিলপত্র দ্বারা প্রতারিত হবার ফলশ্রুতি। তাই আদালত থেকে ঐ সম্পদ বা সম্পত্তির

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ۭ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۭ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٨٩﴾

২৪ রুকূ

লোকেরা তোমাকে চাঁদ ছোট বড়ো হওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে। বলে দাও ঃ এটা হচ্ছে লোকদের জন্য তারিখ নির্ণয় ও হজ্জের আলামত।[১৯৮] তাদেরকে আরো বলে দাও ঃ তোমাদের পেছন দিক দিয়ে গৃহে প্রবেশ করার মধ্যে কোন নেকী নেই। আসলে নেকী রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার মধ্যেই, কাজেই তোমরা দরজা পথেই নিজেদের গৃহে প্রবেশ করো। তবে আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, হয়তো তোমরা সাফল্য লাভে সক্ষম হবে।[১৯৯]

বৈধ মালিকানা অধিকার লাভ করার পরও প্রকৃতপক্ষে তুমি তার বৈধ মালিক হতে পারবে না। আল্লাহর কাছে তা তোমার জন্য হারামই থাকবে। হাদীসে বিবৃত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

انما انا بشر وانتم تختصمون الى ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض فاقضى له على نحو ما اسمع منه - فمن قضيت له بشىء من حق اخيه ، فانما اقضى له قطعة من النار

"আমি তো একজন মানুষ। হতে পারে, তোমরা একটি মামলা আমার কাছে আনলে। এ ক্ষেত্রে দেখা গেলো তোমাদের একপক্ষ অন্য পক্ষের তুলনায় বেশী বাকপটু এবং তাদের যুক্তি-আলোচনা শুনে আমি তাদের পক্ষে রায় দিতে পারি। কিন্তু জেনে রাখো, তোমার ভাইয়ের অধিকারভুক্ত কোন জিনিস যদি তুমি এভাবে আমার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে লাভ করো, তাহলে আসলে তুমি দোজখের একটি টুকরা লাভ করলে।"

১৯৮. চাঁদের হ্রাস বৃদ্ধি হওয়ার দৃশ্যটি প্রতি যুগের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অতীতে দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে এ সম্পর্কে নানা ধরনের রহস্যময়তা, কাল্পনিকতা ও কুসংস্কারের প্রচলন ছিল এবং আজো রয়েছে। আরবের লোকদের মধ্যেও এ ধরনের কুসংস্কার ও অমূলক ধারণা-কল্পনার প্রচলন ছিল। চাঁদ থেকে ভালো মন্দ 'লক্ষণ' গ্রহণ করা হতো। কোন তারিখকে সৌভাগ্যের ও কোন তারিখকে দুর্ভাগ্যের প্রতীক মনে করা

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿١٩٠﴾ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ
مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ
فَاقْتُلُوْهُمْ ۭ كَذٰلِكَ جَزَاۗءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩١﴾ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ
اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩٢﴾

আর তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে,[২০০] কিন্তু বাড়াবাড়ি করো না। কারণ যারা বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না।[২০১] তাদের সাথে যেখানেই তোমাদের মোকাবিলা হয় তোমরা যুদ্ধ করো এবং তাদের উৎখাত করো সেখান থেকে যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে উৎখাত করেছে। কারণ হত্যা যদিও খারাপ, ফিতনা তার চেয়েও বেশী খারাপ।[২০২] আর মসজিদে হারামের কাছে যতক্ষণ তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে, তোমরাও যুদ্ধ করো না। কিন্তু যদি তারা সেখানে যুদ্ধ করতে সংকোচবোধ না করে, তাহলে তোমরাও নিসংকোচে তাদেরকে হত্যা করো। কারণ এটাই এই ধরনের কাফেরদের যোগ্য শাস্তি। তারপর যদি তারা বিরত হয় তাহলে জেনে রাখো আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।[২০৩]

হতো। কোন তারিখকে বিদেশ-বিভূঁইয়ে যাত্রার জন্য, কোন তারিখকে কাজ শুরু করার জন্য এবং কোন তারিখকে বিয়ে-সাদীর জন্য অপয়া বা অকল্যাণকর মনে করা হতো। আবার একথাও মনে করা হতো যে, চাঁদের উদয়াস্ত, হ্রাস-বৃদ্ধি ও আবর্তন এবং চন্দ্রগ্রহণের প্রভাব মানুষের ভাগ্যের ওপর পড়ে। দুনিয়ার অন্যান্য অজ্ঞ ও মূর্খ জাতিদের মতো আরবদের মধ্যেও এ সমস্ত ধারণা-কল্পনার প্রচলন ছিল। এ সম্পর্কিত নানা ধরনের কুসংস্কার, রীতিনীতি ও অনুষ্ঠানাদি তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসব বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। জবাবে মহান আল্লাহ বলেন, চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়ার তাৎপর্য এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, এটা একটা প্রাকৃতিক ক্যালেণ্ডার, যা আকাশের গায়ে টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রতি দিন আকাশ কিনারে উঁকি দিয়ে এ ক্যালেণ্ডারটি একই সাথে সারা দুনিয়ার মানুষকে তারিখের হিসেব জানিয়ে দিতে থাকে। এখানে হজ্জের উল্লেখ বিশেষ করে করার কারণ হচ্ছে এই যে, আরবের ধর্মীয় তামাদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এর গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি। বছরের

এক-তৃতীয়াংশ সময় অর্থাৎ চারটি মাসই ছিল হজ্জ ও উমরাহর সাথে সম্পর্কিত। এ মাসগুলোয় যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকতো, পথঘাট সংরক্ষিত ও নিরাপদ থাকতো এবং শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ বজায় থাকার কারণে ব্যবসা বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটতো।

১৯৯. আরবে যে সমস্ত কুসংস্কারমূলক প্রথার প্রচলন ছিল তার মধ্যে একটি ছিল হজ্জ সম্পর্কিত। কোন ব্যক্তি হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধার পর নিজের গৃহের দরজা দিয়ে আর ভেতরে প্রবেশ করতো না। বরং গৃহে প্রবেশ করার জন্য পেছন থেকে দেয়াল টপকাতো বা দেয়াল কেটে জানালা বানিয়ে তার মধ্য দিয়ে গৃহে প্রবেশ করতো। তাছাড়া সফর থেকে ফিরে এসেও পেছন থেকে গৃহে প্রবেশ করতো। এই আয়াতে কেবলমাত্র এই প্রথাটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদই জানানো হয়নি বরং এই বলে সকল প্রকার কুসংস্কার ও কুপ্রথার মূলে আঘাত হানা হয়েছে যে, নেকী ও সৎকর্মশীলতা হচ্ছে আসলে আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে বিরত থাকার নাম। নিছক বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণের বশবর্তী হয়ে যেসব অর্থহীন নিয়ম প্রথা পালন করা হচ্ছে এবং যেগুলোর সাথে মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের কোন সম্পর্কই নেই, সেগুলো আসলে নেকী ও সৎকর্ম নয়।

২০০. আল্লাহর কাজে যারা তোমাদের পথরোধ করে দাঁড়ায় এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান অনুযায়ী তোমরা জীবন ব্যবস্থার সংস্কার ও সংশোধন করতে চাও বলে যারা তোমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তোমাদের সংশোধন ও সংস্কার কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য জুলুম-অত্যাচার চালাচ্ছে ও শক্তি প্রয়োগ করছে, তাদের সাথে যুদ্ধ করো। এর আগে মুসলমানরা যতদিন দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ছিল, তাদেরকে কেবলমাত্র ইসলাম প্রচারের হুকুম দেয়া হয়েছিল এবং বিপক্ষের জুলুম-নির্যাতনে সবর করার তাকীদ করা হচ্ছিল। এখন মদীনায় তাদের একটি ছোট্ট স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই প্রথমবার তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যারাই এই সংস্কারমূলক দাওয়াতের পথে সশস্ত্র প্রতিরোধ সৃষ্টি করছে অস্ত্র দিয়েই তাদের অস্ত্রের জবাব দাও। এরপরই অনুষ্ঠিত হয় বদরের যুদ্ধ। তারপর একের পর এক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হতেই থাকে।

২০১. অর্থাৎ বস্তুগত স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যুদ্ধ করবে না। আল্লাহ প্রদত্ত সত্য সঠিক জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে না .তাদের ওপর তোমরা হস্তক্ষেপ করবে না। যুদ্ধের ব্যাপারে জাহেলী যুগের পদ্ধতি অবলম্বন করবে না। নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও আহতদের গায়ে হাত ওঠানো, শত্রু পক্ষের নিহতদের লাশের চেহারা বিকৃত করা, শস্যক্ষেত ও গবাদি পশু অযথা ধ্বংস করা এবং অন্যান্য যাবতীয় জুলুম ও বর্বরতামূলক কর্মকাণ্ড "বাড়াবাড়ি"-এর অন্তরভুক্ত। হাদীসে এসবগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, একমাত্র অপরিহার্য ক্ষেত্রেই শক্তির ব্যবহার করতে হবে এবং ঠিক ততটুকু পরিমাণ ব্যবহার করতে হবে যতটুকু সেখানে প্রয়োজন।

২০২. এখানে ফিতনা শব্দটি ঠিক সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যে অর্থে ইংরেজীতে Persecution শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা দল প্রচলিত চিন্তাধারা ও মতবাদের পরিবর্তে অন্য কোন চিন্তা ও মতবাদকে সত্য হিসেবে জানার কারণে তাকে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং সমালোচনা ও প্রচারের মাধ্যমে সমাজে বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থার

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ
انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩٣﴾ اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ
الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ
بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ
مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩٤﴾ وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ
اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٩٥﴾

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয়ে যায় এবং দীন একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।[২০৪] তারপর যদি তারা বিরত হয় তাহলে জেনে রাখো যালেমদের ছাড়া আর কারোর ওপর হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়।[২০৫]

হারাম মাসের বিনিময় হারাম মাসই হতে পারে এবং সমস্ত মর্যাদা সমপর্যায়ের বিনিময়ের অধিকারী হবে।[২০৬] কাজেই যে ব্যক্তি তোমার ওপর হস্তক্ষেপ করবে তুমিও তার ওপর ঠিক তেমনিভাবে হস্তক্ষেপ করো। তবে আল্লাহকে ভয় করতে থাকো এবং একথা জেনে রাখো যে, আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাঁর নির্ধারিত সীমালংঘন করা থেকে বিরত থাকে। আল্লাহর পথে ব্যয় করো এবং নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না।[২০৭] অনুগ্রহ প্রদর্শনের পথ অবলম্বন করো, কেননা আল্লাহ অনুগ্রহ প্রদর্শনকারীদেরকে ভালোবাসেন।[২০৮]

সংশোধনের প্রচেষ্টা চালিয়েছে, নিছক এ জন্য তার ওপর জুলুম-নির্যাতন চালানো। আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে ঃ নরহত্যা নিসন্দেহে একটি জঘণ্য কাজ কিন্তু কোন মানবিক গোষ্ঠী বা দল যখন জোরপূর্বক নিজের স্বৈরতান্ত্রিক ও জুলুমতান্ত্রিক চিন্তাধারা অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়, সত্য গ্রহণ থেকে লোকদেরকে জোরপূর্বক বিরত রাখে এবং যুক্তির পরিবর্তে পাশবিক শক্তি প্রয়োগে জীবন গঠন ও সংশোধনের বৈধ ও ন্যায়সংগত প্রচেষ্টার মোকাবিলা করতে শুরু করে তখন সে নরহত্যার চাইতেও জঘণ্যতম অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়। এই ধরনের গোষ্ঠী বা দলকে অস্ত্রের সাহায্যে পথ থেকে সরিয়ে দেয়া যে সম্পূর্ণ বৈধ ও ন্যায়সংগত তাতে সন্দেহ নেই।

২০৩. অর্থাৎ তোমরা যে আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছো তিনি নিকৃষ্টতম অপরাধী ও পাপীকেও মাফ করে দেন, যদি সে তার বিদ্রোহাত্মক আচরণ পরিহার করে, এটিই তাঁর

গুণ-বৈশিষ্ট। এই গুণ-বৈশিষ্ট তোমরা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করো। تخلقوا باخلاق الله আল্লাহর চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্টে নিজেদেরকে সজ্জিত করো, রসূলের এ বাণীর তাৎপর্যও এটিই। প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য তোমরা যুদ্ধ করবে না। তোমরা যুদ্ধ করবে আল্লাহর দীনের পথ পরিষ্কার ও সুগম করার জন্য। কোন দল যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ততক্ষণ তোমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে কিন্তু যখনই সে নিজের প্রতিবন্ধকতার নীতি পরিহার করবে তখনই তোমরা তার ওপর থেকে হাত গুটিয়ে নেবে।

২০৪. ইতিপূর্বে 'ফিতনা' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এখানে তার থেকে একটু স্বতন্ত্র অর্থে তার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। পূর্বাপর আলোচনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে 'ফিতনা' বলতে এমন অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে যখন 'দীন' আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং এ ক্ষেত্রে যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্যই হয় ফিতনাকে নির্মূল করে দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া। আবার 'দীন' শব্দটির তাৎপর্য অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, আরবী ভাষায় দীন অর্থ হচ্ছে "আনুগত্য" এবং এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে জীবন ব্যবস্থা। এমন একটি জীবন ব্যবস্থা যেখানে কোন সত্তাকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে মেনে নিয়ে তার প্রদত্ত বিধান ও আইনের আনুগত্য করা হয়। দীনের এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সমাজে যখন মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব ও সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন সমাজের এই অবস্থাকে ফিতনা বলা হয়। এই ফিতনার জায়গায় এমন একটি ব্যবস্থার সৃষ্টি করা ইসলামী জিহাদের লক্ষ যেখানে মানুষ একমাত্র আল্লাহর বিধানের অনুগত থাকবে।

২০৫. বিরত হওয়ার অর্থ কাফেরদের নিজেদের কুফরী ও শিরক থেকে বিরত হওয়া নয়। বরং ফিতনা সৃষ্টি করা থেকে বিরত হওয়া। কাফের, মুশরিক, নাস্তিক প্রত্যেকের নিজের ইচ্ছামতো আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করার অধিকার আছে। তারা যার ইচ্ছে তার ইবাদাত-উপাসনা করতে পারে। অথবা চাইলে কারোরও ইবাদাত নাও করতে পারে। তাদেরকে এই গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা থেকে বের করে আনার জন্য উপদেশ দিতে হবে, অনুরোধ করতে হবে। কিন্তু এ জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে না। তবে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন ছাড়া তাদের বাতিল আইন কানুন জারী করার এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহ ছাড়া আর কারোর বান্দায় পরিণত করার অধিকার তাদের নেই। এই ফিতনা নির্মূল করার জন্য প্রয়োজন ও সুযোগ মতো মৌখিক প্রচারণা ও অস্ত্র উভয়টিই ব্যবহার করা হবে। আর কাফের ও মুশরিকরা এই ফিতনা থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত মু'মিন তার সংগ্রাম থেকে নিশ্চেষ্ট ও নিবৃত্ত হবে না।

আর "যদি তারা বিরত হয় তাহলে জেনে রাখো জালেমদের ছাড়া আর কারোর ওপর হস্তক্ষেপ বৈধ হবে না"—একথা থেকে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে, বাতিল জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তে সত্য জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর সাধারণ লোকদের মাফ করে দেয়া হবে। কিন্তু নিজেদের শাসনামলে যারা সত্যের পথ রোধ করার জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ে জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছিল সত্যপন্থীরা তাদেরকে অবশ্যি শাস্তিদান করতে পারবে। যদিও এ ব্যাপারে ক্ষমা করে দেয়া এবং বিজয় লাভ করার পর জালেমদের থেকে প্রতিশোধ না নেয়াই সৎকর্মশীল মু'মিনদের জন্য শোভনীয় তবুও যাদের অপরাধের

তালিকা অনেক বেশী কালিমালিপ্ত তাদেরকে শাস্তি দান করা একান্তই বৈধ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এই সুযোগ গ্রহণ করেছেন। অথচ তাঁর চেয়ে বেশী ক্ষমা ও উদারতা আর কে প্রদর্শন করতে পারে? তাই দেখা যায়, বদরের যুদ্ধের বন্দীদের মধ্য থেকে উকবাহ ইবনে আবী মুঈত ও নযর ইবনে হারিসকে তিনি হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। মক্কা বিজয়ের পর সতের জন লোককে সাধারণ ক্ষমার বাইরে রেখেছেন এবং তাদের মধ্য থেকে চারজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। উপরোল্লিখিত অনুমতির ভিত্তিতে তিনি এই পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছেন।

২০৬. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সময় থেকে আরবদের মধ্যে যিলকাদ, যিলহজ্জ ও মুহাররম এই তিনটি মাস হজ্জের জন্য নির্ধারিত থাকার নিয়ম প্রচলিত ছিল। আর রজব মাসকে উমরাহর জন্য নির্ধারিত করা হয়েছিল। এই চার মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ, হত্যা, লুণ্ঠন ও রাহাজানি নিষিদ্ধ ছিল। কা'বা যিয়ারতকারীদেরকে নিশ্চিন্তভাবে ও নিরাপদে আল্লাহর ঘরে যাওয়ার এবং সেখান থেকে আবার নিজেদের গৃহে ফিরে যাওয়ার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ জন্য এ মাসগুলোকে হারাম মাস বলা হতো। অর্থাৎ এ মাসগুলো হলো সম্মানিত। এখানে উল্লেখিত আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, হারাম মাসগুলোর মর্যাদা রক্ষায় যদি কাফেররা তৎপর হয় তাহলে মুসলমানদেরও তৎপর হতে হবে। আর যদি কাফেররা এই মাসগুলোর মর্যাদা পরোয়া না করে কোন হারাম মাসে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে বসে তাহলে মুসলমানরাও হারাম মাসে ন্যায়-সংগতভাবে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে।

আরবদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও লুটতরাজের ক্ষেত্রে 'নাসী' প্রথা প্রচলিত থাকার কারণে এই অনুমতির প্রয়োজন বিশেষভাবে দেখা দিয়েছিল। এই প্রথা অনুযায়ী তারা কারোর ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে অথবা লুটতরাজ করার জন্য কারোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলে কোন একটি হারাম মাসে তার ওপর আকস্মিক আক্রমণ চালাতো তারপর অন্য একটি হালাল মাসকে তার জায়গায় হারাম গণ্য করে পূর্বের হারাম মাসের মর্যাদাহানির বদলা দিতো। তাই মুসলমানদের সামনে এ প্রশ্ন দেখা দিল যে, কাফেররা যদি 'নাসী'র বাহানা বানিয়ে কোন হারাম মাসে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে বসে তখন তারা কি করবে? এই প্রশ্নের জবাব এই আয়াতে দেয়া হয়েছে।

২০৭. আল্লাহর পথে ব্যয় করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানো হয় তাতে অর্থ ব্যয় করা। এখানে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যদি তোমরা আল্লাহর দীনের শির উঁচু রাখার এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজের অর্থ সম্পদ ব্যয় না করো এবং তার মোকাবিলায় নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে সবসময় প্রিয় বলে মনে করতে থাকো তাহলে এটা তোমাদের জন্য দুনিয়ায় ধ্বংসের কারণ হবে এবং আখেরাতেও। দুনিয়ায় তোমরা কাফেরদের হাতে পরাজিত ও পর্যুদস্ত এবং আখেরাতে আল্লাহর সামনে কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হবে।

২০৮. এখানে মূলে 'ইহসান' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'ইহসান' শব্দটি এসেছে 'হুসন' থেকে। এর মানে হচ্ছে, কাজ ভালোভাবে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করা। কাজ করার বিভিন্ন ধরন আছে। তার একটা ধরন হচ্ছে, যে কাজটা করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে সেটি কেবল নিয়ম-মাফিক সম্পন্ন করা। দ্বিতীয় ধরন হচ্ছে, তাকে সুচারুরূপে সম্পন্ন

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۚ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ
وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ۚ فَمَنْ كَانَ
مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ
اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ ۘ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا
رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ
الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যখন হজ্জ ও উমরাহ করার নিয়ত করো তখন তা পূর্ণ করো। আর যদি কোথাও আটকা পড়ো তাহলে যে কুরবানী তোমাদের আয়ত্বাধীন হয় তাই আল্লাহর উদ্দেশ্যে পেশ করো।[২০৯] আর কুরবানী তার নিজের জায়গায় পৌঁছে না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা নিজেদের মাথা মুণ্ডন করো না।[২১০] তবে যে ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হয় অথবা যার মাথায় কোন কষ্ট থাকে এবং সেজন্য মাথা মুণ্ডন করে তাহলে তার 'ফিদিয়া' হিসেবে রোযা রাখা বা সাদকা দেয়া অথবা কুরবানী করা উচিত।[২১১] তারপর যদি তোমাদের নিরাপত্তা অর্জিত হয়[২১২] (এবং তোমরা হজ্জের আগে মক্কায় পৌঁছে যাও) তাহলে তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত উমরাহর সুযোগ লাভ করে সে যেন সামর্থ অনুযায়ী কুরবানী করে। আর যদি কুরবানীর যোগাড় না হয়, তাহলে হজ্জের যামানায় তিনটি রোযা এবং সাতটি রোযা ঘরে ফিরে গিয়ে, এভাবে পুরো দশটি রোযা যেন রাখে। এই সুবিধে তাদের জন্য যাদের বাড়ী-ঘর মসজিদে হারামের কাছাকাছি নয়।[২১৩] আল্লাহর এ সমস্ত বিধানের বিরোধিতা করা থেকে দূরে থাকো এবং ভালোভাবে জেনে নাও আল্লাহ কঠিন শাস্তি প্রদানকারী।

করা এবং নিজের সমস্ত যোগ্যতা ও উপায় উপকরণ তার পেছনে নিয়োজিত করে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে তাকে সুসম্পন্ন করার চেষ্টা করা। প্রথম ধরনটি নিছক আনুগত্যের

পর্যায়ভুক্ত। এ জন্য তাকওয়া ও ভীতি যথেষ্ট। আর দ্বিতীয় ধরনটি হচ্ছে ইহসান। এ জন্য ভালোবাসা, প্রেম ও গভীর মনোসংযোগ প্রয়োজন হয়।

২০৯. অর্থাৎ পথে যদি এমন কোন কারণ দেখা দেয় যার ফলে সামনে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং বাধ্য হয়ে পথেই থেমে যেতে হয় তাহলে উট, গরু, ছাগলের মধ্য থেকে যে পশুটি পাওয়া সম্ভব হয় সেটি আল্লাহর জন্য কুরবানী করো।

২১০. কুরবানী তার নিজের জায়গায় পৌঁছে যাওয়ার অর্থ কি? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত প্রকাশ করা হয়েছে। হানাফী ফকীহদের মতে এর অর্থ হচ্ছে হারাম শরীফ। অর্থাৎ হজ্জযাত্রী যদি পথে থেমে যেতে বাধ্য হয় তাহলে নিজের কুরবানীর পশু বা তার মূল্য পাঠিয়ে দেবে এবং তার পক্ষ থেকে হারাম শরীফের সীমানার মধ্যে কুরবানী করতে হবে। ইমাম মালিক (র) ও ইমাম শাফেঈর (র) মতে হজ্জযাত্রী যেখানে আটক হয়ে যায় সেখানে কুরবানী করে দেয়াই হচ্ছে এর অর্থ। মাথা মুণ্ডন করার অর্থ হচ্ছে, মাথার চুল চেঁছে ফেলা। অর্থাৎ কুরবানী না হওয়া পর্যন্ত মাথার চুল চেঁছে ফেলতে পারবে না।

২১১. হাদীস থেকে জানা যায়, এ অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন দিন রোযা রাখা বা ছয়জন মিসকিনকে আহার করানো অথবা কমপক্ষে একটি ছাগল যবেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

২১২. অর্থাৎ যে কারণে পথে তোমাদের বাধ্য হয়ে থেমে যেতে হয়েছিল সে কারণ যদি দূর হয়ে যায়। যেহেতু সে যুগে ইসলাম বৈরী গোত্রদের বাধা দেয়ার ফলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে হজ্জের পথ বন্ধ হয়ে যেতো এবং হাজীদের পথে থেমে যেতে হতো, তাই আল্লাহ ওপরের আয়াতে "আটকা পড়ো" এবং তার মোকাবিলায় "নিরাপত্তা অর্জিত হয়" শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু "আটকা পড়া"র মধ্যে যেমন শত্রুর বাধা দেয়া ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার সাথে সাথে অন্যান্য যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অর্থও অন্তরভুক্ত হয় তেমনি "নিরাপত্তা অর্জিত হয়" শব্দের মধ্যেও যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যাবার অর্থ অন্তরভুক্ত হয়।

২১৩. জাহেলী যুদ্ধে আরবের লোকেরা ধারণা করতো, একই সফরে হজ্জ ও উমরাহ দু'টো সম্পন্ন করা মহাপাপ। তাদের মনগড়া শরীয়াতী বিধান অনুযায়ী হজ্জের জন্য একটি সফর এবং উমরাহর জন্য আর একটি সফর করা অপরিহার্য ছিল। মহান আল্লাহ তাদের আরোপিত এই বাধ্য-বাধকতা খতম করে দেন এবং বাইর থেকে আগমনকারীদেরকে একই সফরে হজ্জ ও উমরাহ করার সুবিধে দান করেন। তবে যারা মক্কার আশেপাশের মীকাতের (যে স্থান থেকে হজ্জযাত্রীকে ইহরাম বাঁধতে হয়) সীমার মধ্যে অবস্থান করে তাদেরকে এই সুযোগ দেয়া হয়নি। কারণ তাদের পক্ষে হজ্জ ও উমরাহর জন্য পৃথক পৃথক সফর করা মোটেই কঠিন কাজ নয়।

হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত উমরাহর সুযোগ লাভ করার অর্থ হচ্ছে, উমরাহ সম্পন্ন করে ইহরাম খুলে ফেলতে হবে এবং ইহরাম থাকা অবস্থায় যেসব বিধিনিষেধ মেনে চলতে হচ্ছিল সেগুলো থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তারপর হজ্জের সময় এলে আবার নতুন করে ইহরাম বেঁধে নেবে।

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ
اللّٰهُ ۗ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۡ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِى
الْاَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

২৫ রুকূ'

হজ্জের মাসগুলো সবার জানা। যে ব্যক্তি এই নির্দিষ্ট মাসগুলোতে হজ্জ করার নিয়ত করে, তার জেনে রাখা উচিত, হজ্জের সময়ে সে যেন যৌন সম্ভোগ,[২১৪] দুষ্কর্ম[২১৫] ও ঝগড়া-বিবাদে[২১৬] লিপ্ত না হয়। আর যা কিছু সৎকাজ তোমরা করবে আল্লাহ তা জানেন। হজ্জ সফরের জন্য পাথেয় সংগে নিয়ে যাও আর সবচেয়ে ভালো পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। কাজেই হে বুদ্ধিমানেরা! আমার নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকো।[২১৭]

২১৪. ইহরাম বাঁধা অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেবলমাত্র যৌন সম্পর্কই নিষিদ্ধ নয় বরং যৌন সম্ভোগের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে এমন কোন কথাবার্তাও তাদের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

২১৫. যদিও সাধারণ অবস্থায়ই যে কোন গোনাহের কাজ করা অবৈধ কিন্তু ইহরাম বাঁধা অবস্থায় এ কাজগুলো সংঘটিত হলে তার গোনাহের মাত্রা অনেক বেশী কঠিন হয়ে পড়ে।

২১৬. এমনকি চাকরকে ধমক দেয়াও জায়েয নয়।

২১৭. জাহেলী যুগে হজ্জের জন্য পাথেয় সংগে করে নিয়ে ঘর থেকে বের হওয়াকে দুনিয়াদারীর কাজ মনে করা হতো। একজন ধর্মীয় ব্যক্তি সম্পর্কে আশা করা হতো সে দুনিয়ার কোন সম্বল না নিয়ে আল্লাহর ঘরের দিকে রওয়ানা হবে। এ আয়াতে তাদের এ ভুল চিন্তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে, পাথেয় না নিয়ে সফর করার মধ্যে মাহাত্ম নেই। আসল মাহাত্ম হচ্ছে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হওয়া, তাঁর বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে বিরত থাকা এবং জীবনকে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও কলুষ মুক্ত করা। যে ব্যক্তি সৎচারিত্রিক গুণাবলী নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে সে অনুযায়ী নিজের চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করেনি এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত না হয়ে অসৎকাজ করতে থাকে, সে যদি পাথেয় সংগে না নিয়ে নিছক বাহ্যিক ফকীরী ও দরবেশী প্রদর্শনী করে বেড়ায়, তাহলে তাতে তার কোন লাভ নেই। আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের দৃষ্টিতে সে লাঞ্ছিত হবে। যে ধর্মীয় কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সে সফর করছে তাকেও লাঞ্ছিত করবে। কিন্তু

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُم
مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ
كَمَا هَدَاكُمْ ۚ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾ ثُمَّ
أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٩﴾

আর হজ্জের সাথে সাথে তোমরা যদি তোমাদের রবের অনুগ্রহের সন্ধান করতে থাকো তাহলে তাতে কোন দোষ নেই।[২১৮] তারপর আরাফাত থেকে অগ্রসর হয়ে 'মাশআরুল হারাম' (মুযদালিফা) এর কাছে থেমে আল্লাহকে স্মরণ করো এবং এমনভাবে স্মরণ করো যেভাবে স্মরণ করার জন্য তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। নয়তো ইতিপূর্বে তোমরা তো ছিলে পথভ্রষ্টদের অন্তরভুক্ত।[২১৯] তারপর যেখান থেকে আর সবাই ফিরে আসে তোমরাও সেখান থেকে ফিরে এসো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও।[২২০] নিসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

তার মনে যদি আল্লাহর প্রতি ভয় জাগরুক থাকে এবং তার চরিত্র নিষ্কলুষ হয় তাহলে আল্লাহর ওখানে সে মর্যাদার অধিকারী হবে এবং মানুষও তাকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখবে। তার খাবারের থলিতে খাবার ভরা থাকলেও তার এ মর্যাদার কোন কম-বেশী হবে না।

২১৮. এটিও প্রাচীন আরবের একটি জাহেলী ধারণা ছিল। হজ্জ সফর কালে অর্থ উপার্জনের জন্য কোন কাজ করা তারা খারাপ মনে করতো। কারণ তাদের মতে, অর্থ উপার্জন করা একটি দুনিয়াদারীর কাজ। কাজেই হজ্জের মতো একটি ধর্মীয় কাজের মধ্যে এ দুনিয়াদারীর কাজটি করা তাদের চোখে নিন্দনীয়ই ছিল। কুরআন এ ধারণার প্রতিবাদ করছে এবং তাদের জানিয়ে দিচ্ছে, একজন আল্লাহ বিশ্বাসী ব্যক্তি যখন আল্লাহর আইনের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করে নিজের অর্থ উপার্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালায় তখন আসলে সে আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করে। কাজেই এ ক্ষেত্রে সে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সফর করতে গিয়ে তার মাঝখানে তাঁর অনুগ্রহের সন্ধানও করে ফেরে, তাহলে তার কোন গোনাহ হবে না।

২১৯. অর্থাৎ জাহেলী যুগে আল্লাহর ইবাদাতের সাথে অন্য যে সমস্ত মুশরিকী ও জাহেলী ক্রিয়া কর্মের মিশ্রণ ঘটেছিল সেগুলো পরিহার করো এবং এখন আল্লাহ যে সমস্ত হিদায়াত তোমাদের দান করেছেন সে অনুযায়ী নির্ভেজাল আল্লাহর ইবাদাতের পথ অবলম্বন করো।

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ
آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا
فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُم مَّن
يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ
الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

অতপর যখন তোমরা নিজেদের হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করবে তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন ইতিপূর্বে তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে স্মরণ করতে[২২১] বরং তার চেয়ে অনেক বেশী করে স্মরণ করবে। (তবে আল্লাহকে স্মরণকারী লোকদের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে) তাদের মধ্যে কেউ এমন আছে যে বলে, হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়ায় সবকিছু দিয়ে দাও। এই ধরনের লোকের জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই। আবার কেউ বলে, হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়ায় কল্যাণ দাও এবং আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও। এই ধরনের লোকেরা নিজেদের উপার্জন অনুযায়ী (উভয় স্থানে) অংশ পাবে। মূলত হিসেব সম্পন্ন করতে আল্লাহর একটুও বিলম্ব হয় না।

২২০. হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর সময় আরবে হজ্জের সাধারণ প্রচলিত পদ্ধতি ছিল এই যে, ৯ই যিলহজ্জ তারা মিনা থেকে আরাফাত যেতো এবং ১০ তারিখের সকালে সেখান থেকে ফিরে এসে মুযদালিফায় অবস্থান করতো। কিন্তু পরবর্তী কালে যখন ধীরে ধীরে ভারতীয় ব্রাহ্মণদের ন্যায় আরবে কুরাইশদের ধর্মীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো তখন তারা বললো, আমরা হারাম শরীফের অধিবাসী, সাধারণ আরবদের সাথে আমরা আরাফাত পর্যন্ত যাবো, এটা আমাদের জন্য মর্যাদাহানিকর। কাজেই তারা নিজেদের জন্য পৃথক মর্যাদাজনক ব্যবস্থার প্রচলন করলো। তারা মুযদালিফা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতো এবং সাধারণ লোকদের আরাফাত পর্যন্ত যাবার জন্য ছেড়ে দিতো। পরে বনী খুযাআ ও বনী কিনানা গোত্রদ্বয় এবং কুরাইশদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য গোত্রও এই পৃথক অভিজাতমূলক ব্যবস্থার অধিকারী হলো। অবশেষে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছলো যে, কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ গোত্রগুলোর মর্যাদাও সাধারণ আরবদের তুলনায় অনেক উঁচু হয়ে গেলো। তারাও আরাফাতে যাওয়া বন্ধ করে

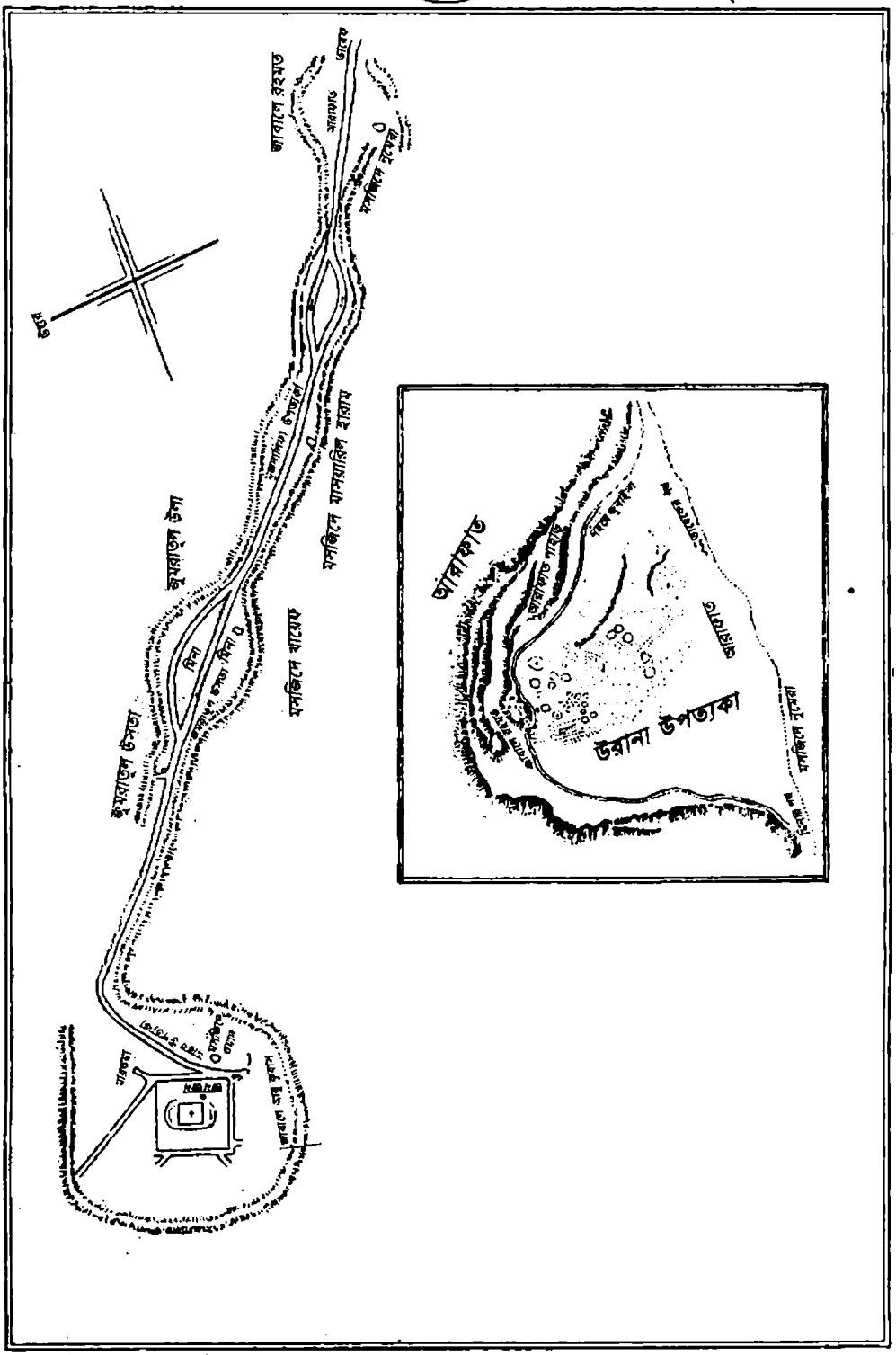

হজ্জের পবিত্র স্থানসমূহের চিত্র

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ۭ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ
فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ۭ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۲۰۳﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰي مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ
وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿۲۰۴﴾ وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا
وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿۲۰۵﴾ وَاِذَا قِيْلَ
لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ۭ وَلَبِئْسَ
الْمِهَادُ ﴿۲۰۶﴾

এই হাতেগোণা কয়েকটি দিন, এ দিন ক'টি তোমাদের আল্লাহর স্মরণে অতিবাহিত করতে হবে। যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দু'দিনে ফিরে আসে, তাতে কোন ক্ষতি নেই। আর যদি কেউ একটু বেশীক্ষণ অবস্থান করে ফিরে আসে তবে তাতেও কোন ক্ষতি নেই।[২২২] তবে শর্ত হচ্ছে, এই দিনগুলো তাকে তাকওয়ার সাথে অতিবাহিত করতে হবে। আল্লাহর নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকো এবং খুব ভালোভাবে জেনে রাখো, একদিন তাঁর দরবারে তোমাদের হাযির হতে হবে।

মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে পার্থিব জীবনে যার কথা তোমার কাছে বড়ই চমৎকার মনে হয় এবং নিজের সদিচ্ছার ব্যাপারে সে বারবার আল্লাহকে সাক্ষী মানে।[২২৩] কিন্তু আসলে সে সত্যের নিকৃষ্টতম শত্রু।[২২৪] যখন সে কর্তৃত্ব লাভ করে,[২২৫] পৃথিবীতে তার সমস্ত প্রচেষ্টা–সাধনা নিয়োজিত করে বিপর্যয় সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত ও মানব বংশ ধ্বংস করার কাজে। অথচ আল্লাহ (যাকে সে সাক্ষী মেনেছিল) বিপর্যয় মোটেই পছন্দ করেন না। আর যখন তাকে বলা হয়, আল্লাহকে ভয় করো তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপের পথে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়, এই ধরনের লোকের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট এবং সেটি নিকৃষ্টতম আবাস।

দিল। এ গর্ব ও অহংকারের পুত্তলিটিকে এ আয়াতে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এ আয়াতে বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে কুরাইশ, তাদের আত্মীয় ও চুক্তি বদ্ধ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ
رَءُوْفٌ ۢ بِالْعِبَادِ ﴿۲۰۷﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۪
وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۲۰۸﴾ فَاِنْ زَلَلْتُمْ
مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۰۹﴾
هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ
وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۲۱۰﴾

অন্যদিকে মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের অভিযানে যে নিজের প্রাণ সমর্পণ করে। এই ধরনের বান্দার ওপর আল্লাহ অত্যন্ত স্নেহশীল ও মেহেরবান। হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করো[২২৬] এবং শয়তানের অনুসারী হয়ো না, কেননা সে তোমাদের সুস্পষ্ট দুশমন। তোমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হিদায়াত এসে গেছে তা লাভ করার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে তাহলে ভালোভাবে জেনে রাখো আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।[২২৭] (এই সমস্ত উপদেশ ও হিদায়াতের পরও যদি লোকেরা সোজা পথে না চলে, তাহলে) তারা কি এখন এই অপেক্ষায় বসে আছে যে, আল্লাহ মেঘমালার ছায়া দিয়ে ফেরেশতাদের বিপুল জমায়েত সংগে নিয়ে নিজেই সামনে এসে যাবেন এবং তখন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে?[২২৮] সমস্ত ব্যাপার তো শেষ পর্যন্ত আল্লাহরই সামনে উপস্থাপিত হবে।

গোত্রগুলোকে এবং সাধারণভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এমন সব লোকদেরকে যারা আগামীতে কখনো নিজেদের জন্য এ ধরনের পৃথক ব্যবস্থা প্রচলনের আকাংখা মনে মনে পোষণ করে। তাদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, সবাই যতদূর পর্যন্ত যায় তোমরাও তাদের সাথে ততদূর যাও, তাদের সাথে অবস্থান করো, তাদের সাথে ফিরে এসো এবং এ পর্যন্ত জাহেলী অহংকার ও আত্মম্ভরিতার কারণে, তোমরা সুন্নাতে ইবরাহিমীর যে বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছো সে জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।

২২১. ইতিপূর্বে আরবের লোকেরা হজ্জ শেষ করার পর পরই মিনায় সভা করতো। সেখানে প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা তাদের বাপ-দাদাদের কৃতিত্ব আলোচনা করতো। গর্ব ও অহংকারের সাথে এবং এভাবে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করতো। তাদের এ কার্যকলাপের ভিত্তিতে বলা হচ্ছে, এসব জাহেলী কথাবার্তা বন্ধ করো, ইতিপূর্বে

আজেবাজে কথা বলে যে সময় নষ্ট করতে এখন আল্লাহর স্মরণে ও তাঁর যিকিরে তা অতিবাহিত করো। এখানে যিকির বলতে মিনায় অবস্থানরত সময়ে যিকিরের কথা বলা হয়েছে।

২২২. অর্থাৎ 'আইয়ামে তাশরীকে' মিনা থেকে মক্কার দিকে ১২ই বা ১৩ই যিলহজ্জ যেদিনেই ফিরে আসা হোক না কেন তাতে কোন ক্ষতি নেই। কতদিন অবস্থান করা হয়েছিল, এটা কোন মৌলিক গুরুত্বের বিষয় নয়। বরং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, যতদিন অবস্থান করা হয়েছিল, সেই দিনগুলোয় আল্লাহর সাথে তোমাদের সম্পর্ক কেমন ছিল? সেই দিনগুলোয় তোমরা আল্লাহর যিকিরে মশগুল ছিলে, না মেলা দেখে আর উৎসব অনুষ্ঠানে ফূর্তি করে দিন কাটিয়ে দিয়েছো?

২২৩. অর্থাৎ সে বলে, আল্লাহ সাক্ষী, আমি কেবলমাত্র শুভ কামনা করি। আমার নিজের কোন স্বার্থ নেই। শুধুমাত্র সত্য ও ন্যায়ের জন্য এবং মানুষের ভালো ও কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে আমি কাজ করে যাচ্ছি।

২২৪. এখানে কুরআনে 'আলাদ্দুল খিসাম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, এমন শত্রু যে সকল শত্রুর বড়ো। অর্থাৎ সত্যের বিরোধিতার ক্ষেত্রে সে সম্ভাব্য সব রকমের অস্ত্র ব্যবহার করে। মিথ্যা, জালিয়াতি, বেঈমানি, বিশ্বাসঘাতকতা এবং যে কোন ধরনের কপটতার অস্ত্র ব্যবহার করতে সে একটুও ইতস্তত করে না।

২২৫. 'ইযা তাওয়াল্লা' শব্দের দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ এখানে আয়াতের অনুবাদে অবলম্বন করা হয়েছে। এর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, মজার মজার হৃদয় প্রলুব্ধকারী কথা বলে 'যখন সে ফিরে আসে' তখন এসব অপকর্ম করে।

২২৬. অর্থাৎ কোন প্রকার ব্যতিক্রম ও সংরক্ষণ ছাড়াই, কিছু অংশকে বাদ না দিয়ে এবং কিছু অংশকে সংরক্ষিত না রেখে জীবনের সমগ্র পরিসরটাই ইসলামের আওতাধীন করো। তোমাদের চিন্তা-ভাবনা, আদর্শ, মতবাদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, আচরণ, ব্যবহারিক জীবন, লেনদেন এবং তোমাদের সমগ্র প্রচেষ্টা ও কর্মের পরিসরকে পুরোপুরি ইসলামের কর্তৃত্বাধীনে আনো। তোমাদের জীবনের কিছু অংশে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলবে আর কিছু অংশকে ইসলামী অনুশাসনের বাইরে রাখবে, এমনটি যেন না হয়।

২২৭. অর্থাৎ তিনি প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী এবং তিনি জানেন কিভাবে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হয়।

২২৮. এখানে উল্লেখিত শব্দগুলো যথেষ্ট চিন্তার খোরাক যোগায়। এর ফলে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ দুনিয়ায় মানুষের পরীক্ষা কেবলমাত্র একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে চলছে। সত্যকে না দেখে সে তাকে মানতে প্রস্তুত কি না? আর মেনে নেয়ার পরও তার মধ্যে সত্যকে অমান্য করার ক্ষমতা ও সামর্থ থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় তার আনুগত্য করার মতো নৈতিক শক্তি তার আছে কি না? কাজেই মহান আল্লাহ নবী প্রেরণ, আসমানী কিতাব অবতরণ এমন কি মুজিযাসমূহের ক্ষেত্রেও বুদ্ধি-বিবেকের পরীক্ষা ও নৈতিক শক্তি যাচাই করার ব্যবস্থা রেখেছেন। কখনো তিনি সত্যকে এমনভাবে আবরণমুক্ত করে দেননি যার ফলে মানুষের পক্ষে তাকে মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকেনি। কেননা এরপর তো আর পরীক্ষার কোন অর্থই থাকে না এবং পরীক্ষায়

سَلْ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَٰهُم مِّنْ ءَايَةٍۭ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَن يُبَدِّلْ
نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢١١﴾ زُيِّنَ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۘ
وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ
بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

২৬ রুকূ'

বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করো, কেমন সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো আমি তাদেরকে দেখিয়েছি। আবার তাদেরকে একথাও জিজ্ঞেস করো, আল্লাহর নিয়ামত লাভ করার পর যে জাতি তাকে দুর্ভাগ্যে পরিণত করে তাকে আল্লাহ কেমন কঠিন শাস্তিদান করেন।[২২৯]

যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য দুনিয়ার জীবন বড়ই প্রিয় ও মনোমুগ্ধকর করে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের লোকেরা ঈমানের পথ অবলম্বনকারীদেরকে বিদ্রূপ করে। কিন্তু কিয়ামতের দিন তাকওয়া অবলম্বন-কারীরাই তাদের মোকাবিলায় উন্নত মর্যাদায় আসীন হবে। আর দুনিয়ার জীবিকার ক্ষেত্রে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত দান করে থাকেন।

সাফল্য ও ব্যর্থতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই এখানে বলা হচ্ছে, সেই সময়ের অপেক্ষায় থেকো না যখন আল্লাহ ও তাঁর রাজ্যের কর্মচারী ফেরেশতাগণ সামনে এসে যাবেন। কারণ তখন তো সমস্ত ব্যাপারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। ঈমান আনার ও আনুগত্যের শির অবনত করার মূল্য ও মর্যাদা ততক্ষণই দেয়া হবে যতক্ষণ প্রকৃত সত্য মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে না কিন্তু মানুষ শুধুমাত্র যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে তাকে গ্রহণ করে নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবে এবং নিছক সত্য উপলব্ধির মাধ্যমে তার আনুগত্য করে নিজের নৈতিক শক্তির প্রমাণ দেবে। অন্যথায় যখন প্রকৃত সত্য সকল প্রকার আবরণ মুক্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে, মানুষ চর্মচক্ষে আল্লাহকে দেখবে, তাঁর মহাপ্রতাপ ও পরাক্রমের সিংহাসনে সমাসীন, সীমাহীন এ বিশ্ব সংসারের বিশাল রাজত্ব তাঁর নির্দেশে পরিচালিত হতে দেখবে, ফেরেশতাদের দেখবে আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনায় প্রতি মুহূর্তে সক্রিয় এবং মানুষের এ সত্তাকে আল্লাহর প্রচণ্ড শক্তির বাঁধনে একান্ত অসহায় দেখতে পাবে—এসব কিছু চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর যদি কেউ ঈমান আনে ও সত্যকে মেনে চলতে উদ্যত হয় তাহলে তার এ ঈমান আনার ও সত্যকে মেনে চলার আকাংখার কোন

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً ۟ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ
مُنْذِرِيْنَ ۪ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۭ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا
جَاۗءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ۭ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۗءُ اِلٰى
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

প্রথমে সব মানুষ একই পথের অনুসারী ছিল। (তারপর এ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকেনি, তাদের মধ্যে মতভেদের সূচনা হয়) তখন আল্লাহ নবী পাঠান। তারা ছিলেন সত্য সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদদাতা এবং অসত্য ও বেঠিক পথ অবলম্বনের পরিণতির ব্যাপারে ভীতিপ্রদর্শনকারী। আর তাদের সাথে সত্য কিতাব পাঠান, যাতে সত্য সম্পর্কে তাদের মধ্যে যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল তার মীমাংসা করা যায়।—(এবং প্রথমে তাদেরকে সত্য সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হয়নি বলে এ মতভেদগুলো সৃষ্টি হয়েছিল, তা নয়) মতভেদ তারাই করেছিল যাদেরকে সত্যের জ্ঞান দান করা হয়েছিল। তারা সুস্পষ্ট পথনির্দেশ লাভ করার পরও কেবলমাত্র পরস্পরের ওপর বাড়াবাড়ি করতে চাচ্ছিল বলেই সত্য পরিহার করে বিভিন্ন পথ উদ্ভাবন করে।[২৩০]—কাজেই যারা নবীদের ওপর ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ নিজের ইচ্ছাক্রমে সেই সত্যের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, যে ব্যাপারে লোকেরা মতবিরোধ করেছিল। আল্লাহ যাকে চান সত্য সঠিক পথ দেখিয়ে দেন।

দামই নেই। সে সময় কোন পাক্কা কাফের ও নিকৃষ্টতম অপরাধীও অস্বীকার ও নাফরমানি করার সাহস করবে না। আবরণ উন্মোচন করার মুহূর্ত আসার আগে পর্যন্ত ঈমান আনার ও আনুগত্য করার সুযোগ রয়েছে। আর যখন সে মুহূর্তটি এসে যায় তখন আর পরীক্ষাও নেই, সুযোগও নেই। বরং তখন চূড়ান্ত মীমাংসা ও ফায়সালার সময়।

২২৯. দু'টি কারণে এ প্রশ্নের জন্য বনী ইসরাঈলকে নির্বাচন করা হয়েছে। এক ঃ প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের নিষ্প্রাণ স্তূপের তুলনায় একটি জীবিত জাতি অনেক বেশী শিক্ষা ও উপদেশের বাহন হতে পারে। দুই ঃ বনী ইসরাঈলকে কিতাব ও নবুওয়াতের আলোকবর্তিকা দিয়ে বিশ্ববাসীর নেতৃত্বদানের আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। কিন্তু তারা বৈষয়িক প্রীতি, ভোগবাদ, মুনাফিকী এবং জ্ঞান ও কর্মের ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে এ নিয়ামত

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن
قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

তোমরা[২৩১] কি মনে করেছো, এমনিতেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে? অথচ তোমাদের আগে যারা ঈমান এনেছিল তাদের ওপর যা কিছু নেমে এসেছিল এখনও তোমাদের ওপর সেসব নেমে আসেনি। তাদের ওপর নেমে এসেছিল কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদ-মুসিবত, তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল। এমনকি সমকালীন রসূল এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা চীৎকার করে বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? তখন তাদেরকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছিল, অবশ্যিই আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।

থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছিল। কাজেই তাদের পরে যে জাতিকে বিশ্ব-নেতৃত্বের আসনে বসানো হয়েছে, তারা এ ইসরাঈলী জাতির পরিণাম থেকেই সবচেয়ে বেশী কার্যকর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

২৩০. অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ লোকেরা আন্দাজ ও অনুমানের ভিত্তিতে "ধর্মের" ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে বলে ঃ মানুষের জীবনের সূচনা হয়েছে শিরকের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে। তারপর ক্রমিক বিবর্তন ও ক্রম-উন্নতির মাধ্যমে অন্ধকার অপসৃত হতে ও আলোকমালা বাড়তে থেকেছে। এভাবে অবশেষে একদিন মানুষ তৌহীদের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। বিপরীতপক্ষে কুরআন বলছে ঃ পরিপূর্ণ আলোর মধ্যেই দুনিয়ায় মানুষের জীবন কালের সূচনা হয়েছে। মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম যে মানুষটিকে সৃষ্টি করেছিলেন তাকে প্রকৃত সত্যের জ্ঞান দান করেছিলেন এবং তার জন্য সঠিক পথ কোন্‌টি তাও বলে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত বনী আদম সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন তারা একটি উম্মাত ও একই দলভুক্ত ছিল। অতপর লোকেরা নতুন নতুন পথ ও বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে থাকে। তাদের প্রকৃত সত্যের জ্ঞান ছিল না বলে তারা এমনটি করেছিল তা নয় বরং প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত থাকার পরও তাদের কেউ কেউ নিজেদের বৈধ অধিকারের চাইতে বেশী মর্যাদা, স্বার্থ ও লাভ অর্জন করতে চাইতো। এ জন্য তারা পরস্পরের ওপর যুলুম, উৎপীড়ন ও বাড়াবাড়ি করার ইচ্ছা পোষণ করতো। এই গলদ ও অনিষ্টকারিতা দূর করার জন্য মহান আল্লাহ নবী পাঠাতে শুরু করেন। নবীদেরকে এ জন্য পাঠানো হয়নি যে, তাঁরা প্রত্যেকে একটি পৃথক ধর্মের ভিত গড়ে তুলবেন এবং প্রত্যেকের পৃথক উম্মাত গড়ে উঠবে। বরং মানুষের সামনে তদের হারানো সত্যপথ সুস্পষ্ট করে তুলে ধরে তাদেরকে পুনরায় একই উম্মাতের অন্তরভুক্ত করাই ছিল তাঁদের পাঠাবার উদ্দেশ্য।

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ
فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ
وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ
وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ
أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

লোকেরা জিজ্ঞেস করছে, আমরা কি ব্যয় করবো? জবাব দাও, যে অর্থই তোমরা ব্যয় কর না কেন তা নিজেদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করো। আর যে সৎকাজই তোমরা করবে সে সম্পর্কে আল্লাহ অবগত হবেন।

তোমাদের যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়েছে এবং তা তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর। হতে পারে কোন জিনিস তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর অথচ তা তোমাদের জন্য ভালো। আবার হতে পারে কোন জিনিস তোমরা পছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য খারাপ। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।

২৩১. ওপরের আয়াত ও এ আয়াতের মাঝখান একটি পূর্ণাংগ কাহিনী অবর্ণিত রয়ে গেছে। আয়াতে এদিকে ইংগিত করা হচ্ছে এবং কুরআনের মক্কী সূরাগুলোয় (যেগুলো সূরা বাকারার পূর্বে নাযিল হয়েছে) এ কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। দুনিয়ার যে কোন দেশে যখনই নবীদের আবির্ভাব ঘটেছে তখনই তাঁরা ও তাঁদের প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারী গোষ্ঠী আল্লাহদ্রোহী মানব সমাজের কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁরা কোন অবস্থায়ই নিজেদের প্রাণের পরোয়া করেননি। বাতিল পদ্ধতির বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করে তাঁরা আল্লাহর সত্য দীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এ দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ কখনো কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। ইসলামের প্রতি ঈমান আনার পর কেউ দু'দণ্ডের জন্য নিশ্চিন্তে আরামে বসে থাকতে পারেনি। প্রতি যুগে ইসলামের প্রতি ঈমান আনার স্বাভাবিক দাবী হিসেবে ঈমানদার গোষ্ঠীকে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। যে শয়তানী ও বিদ্রোহী শক্তি এ সংগ্রামের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে তার শক্তির দর্প চূর্ণ করার জন্য ঈমানদারদের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করতে হয়েছে।

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ
وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۙ وَإِخْرَاجُ
أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ
يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ
وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

২১ রুকূ'

লোকেরা তোমাকে হারাম মাসে যুদ্ধ করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে। বলে দাও ঃ ঐ মাসে যুদ্ধ করা অত্যন্ত খারাপ কাজ। কিন্তু আল্লাহর পথ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখা, আল্লাহর সাথে কুফরী করা, মসজিদে হারামের পথ আল্লাহ-বিশ্বাসীদের জন্য বন্ধ করে দেয়া এবং হারাম শরীফের অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর নিকট তার চাইতেও বেশী খারাপ কাজ। আর ফিত্‌না হত্যাকাণ্ডের চাইতেও গুরুতর অপরাধ।[২৩২] তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেই যাবে, এমন কি তাদের ক্ষমতায় কুলোলে তারা তোমাদেরকে এই দীন থেকেও ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। (আর একথা খুব ভালোভাবেই জেনে রাখো), তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই এই দীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফের অবস্থায় মারা যাবে, দুনিয়ায় ও আখেরাতে উভয় স্থানে তার সমস্ত কর্মকাণ্ড ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই ধরনের সমস্ত লোকই জাহান্নামের বাসিন্দা এবং তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।[২৩৩]

২৩২. এ বিষয়টি একটি ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী 'নাখ্‌লা' নামক স্থানে আটজনের একটি বাহিনী পাঠান। কুরাইশদের গতিবিধি ও তাদের ভবিষ্যত সংকল্প সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করার দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করেন। যুদ্ধ করার কোন অনুমতি তাদেরকে দেননি। কিন্তু পথে তারা কুরাইশদের একটি ছোট বাণিজ্যিক কাফেলার মুখোমুখি হয়।

কাফেলার ওপর আক্রমণ চালিয়ে তারা একজনকে হত্যা করে এবং বাদবাকি সবাইকে গ্রেফতার করে অর্থ ও পণ্য সম্ভারসহ তাদেরকে মদীনায় নিয়ে আসে। তাদের এ পদক্ষেপটি এমন এক সময় গৃহীত হয় যখন রজব শেষ হয়ে শাবান মাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাদের এ আক্রমণটি রজব মাসে (অর্থাৎ হারাম মাসে) সংঘটিত হয়েছিল কি না এ ব্যাপারটি সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। কিন্তু কুরাইশরাও পর্দান্তরালে তাদের সাথে যোগসাজশকারী ইহুদি ও মদীনার মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাবার জন্য এ ঘটনাটির কথা চারদিকে ব্যাপকভাবে ছড়াতে থাকে। তারা কঠিন আপত্তি জানিয়ে প্রচার করতে থাকে হাঁ, এরা বড়ই আল্লাওয়ালা হয়েছে। অথচ হারাম মাসেও রক্তপাত করতে কুণ্ঠিত হয় না। এ আয়াতে তাদের এ আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। জবাবের সার নির্যাস হচ্ছে ঃ হারাম মাসে লড়াই করা নিসন্দেহে বড়ই গর্হিত কাজ। কিন্তু এর বিরুদ্ধে আপত্তি উথাপন করা তাদের জন্য শোভা পায় না, যারা শুধুমাত্র এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনার কারণে তেরো বছর ধরে তাদের অসংখ্য ভাইয়ের ওপর যুলুম নির্যাতন চালিয়ে এসেছে। তাদেরকে এমনভাবে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত করেছে যে, তারা স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। তারপর এখানেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। তাদের ঐ ভাইদের মসজিদে হারামে যাবার পথও বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ মসজিদে হারাম কারোর নিজস্ব সম্পত্তি নয়। গত দু'হাজার বছর থেকে কোন দিন কাউকে এ ঘরের যিয়ারতে বাধা দেয়া হয়নি। কাজেই এ ধরনের কলংকিত চরিত্রের অধিকারী জালেমরা কোন্ মুখে সামান্য একটি সীমান্ত সংঘর্ষ নিয়ে এত বড় হৈচৈ করে বেড়াচ্ছে এবং আপত্তি ও অভিযোগ উথাপন করে চলছে? অথচ এ সংঘর্ষে নবীর অনুমতি ছাড়াই সবকিছু ঘটেছে। এ ঘটনাটিকে বড় জোর এভাবে বলা যেতে পারে, একটি ইসলামী জামায়াতের কয়েকজন লোক একটি দায়িত্বহীন কাজ করে বসেছে।

এ প্রসংগে একথা মনে রাখা দরকার যে, এ তথ্য সংগ্রাহক বাহিনীটি বন্দী ও গনীমাতের মাল নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হবার সাথে সাথেই তিনি বলেন, আমি তো তোমাদের যুদ্ধ করার অনুমতি দেইনি। তাছাড়া তারা যে গনীমাতের মাল এনেছিল তা থেকে তিনি বাইতুল মালের অংশ নিতেও অস্বীকৃতি জানান। তাদের এ লুণ্ঠন অবৈধ ছিল, এটি তারই প্রমাণ। সাধারণ মুসলমানরাও এ পদক্ষেপের কারণে এর সাথে সংশ্লিষ্ট নিজেদের লোকদেরকে কঠোরভাবে তিরস্কার করে। মদীনার একটি লোকও তাদের এ কাজের প্রশংসা করেনি।

২৩৩. সততা ও সৎপ্রবণতার ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে মুসলমানদের কোন কোন সরলমনা ব্যক্তি মক্কার কাফের ও ইহুদিদের উপরোল্লিখিত অভিযোগে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। এই আয়াতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, তোমাদের এসব কথায় তোমাদের ও তাদের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে যাবে, একথা মনে করো না। তারা বোঝাপড়ার জন্য অভিযোগ করছে না। তারা তো আসলে কাঁদা ছুঁড়তে চায়। তোমরা কেন এই দীনের প্রতি ঈমান এনেছো এবং কেন দুনিয়াবাসীর সামনে এর দাওয়াত পেশ করে চলেছো—একথা তাদের মনে কাঁটার মতো বিঁধছে। কাজেই যতদিন তারা নিজেদের কুফরীর ওপর অটল রয়েছে এবং তোমরাও এই দীন ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছো

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ
يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢١٨﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن
نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

বিপরীত পক্ষে যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে বাড়ি-ঘর ত্যাগ করেছে ও জিহাদ করেছে[২৩৪] তারা সংগতভাবেই আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদের প্রতি নিজের করুণাধারা বর্ষণ করবেন।

তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে ঃ মদ ও জুয়ার ব্যাপারে নির্দেশ কি? বলে দাওঃ ঐ দু'টির মধ্যে বিরাট ক্ষতিকর বিষয় রয়েছে যদিও লোকদের জন্য তাতে কিছুটা উপকারিতাও আছে, কিন্তু তাদের উপকারিতার চেয়ে গোনাহ অনেক বেশী।[২৩৫]

তোমাকে জিজ্ঞেস করছে ঃ আমরা আল্লাহর পথে কি ব্যয় করবো? বলে দাও ঃ যা কিছু তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট বিধান বর্ণনা করেন, হয়তো তোমরা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানের জন্য চিন্তা করবে।

জিজ্ঞেস করছে ঃ এতিমদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে? বলে দাও ঃ যে কর্মপদ্ধতি তাদের জন্য কল্যাণকর তাই অবলম্বন করা ভালো।[২৩৬] তোমারা যদি তোমাদের নিজেদের ও তাদের খরচপাতি ও থাকা-খাওয়া যৌথ ব্যবস্থাপনায় রাখো তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। তারা তো তোমাদের ভাই। অনিষ্টকারী ও হীতকারী উভয়ের অবস্থা আল্লাহ ভালো করেই জানেন। আল্লাহ চাইলে এ ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করতেন। কিন্তু তিনি ক্ষমতা ও পরাক্রমের অধিকারী হবার সাথে সাথে জ্ঞান ও হিকমতের অধিকারী।

ততদিন তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোন প্রকার বোঝাপড়া ও সমঝোতা হতে পারে না। আর এই ধরনের শত্রুদেরকে তোমরা মামুলি শত্রু মনে করো না। যারা তোমাদের অর্থ–সম্পত্তি ছিনিয়ে নিতে চায় তারা অপেক্ষাকৃত ছোট পর্যায়ের শত্রু। কিন্তু যারা তোমাদেরকে আল্লাহর সত্য দীন থেকে ফিরিয়ে নিতে চায় তারাই তোমাদের নিকৃষ্টতম শত্রু। কারণ প্রথম শত্রুটি তোমাদের বৈষয়িক ক্ষতি করতে চায় কিন্তু দ্বিতীয় শত্রুটি চায় তোমাদেরকে আখেরাতের চিরন্তন আযাবের মধ্যে ঠেলে দিতে এবং এ জন্য সে তার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২৩৪. জিহাদ অর্থ হচ্ছে, কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ অর্জনে নিজের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এটি নিছক যুদ্ধের সমার্থক কোন শব্দ নয়। যুদ্ধের জন্য আরবীতে 'কিতাল' (রক্তপাত) শব্দ ব্যবহার করা হয়। জিহাদের অর্থ তার চাইতে ব্যাপক। সব রকমের প্রচেষ্টা ও সাধনা এর অন্তরভুক্ত। মুজাহিদ এমন এক ব্যক্তিকে বলা হয়, যে সর্বক্ষণ নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাধনে নিমগ্ন, যার মস্তিষ্ক সবসময় ঐ উদ্দেশ্য সম্পাদনের উপায় ও কৌশল উদ্ভাবনে ব্যস্ত। যার কণ্ঠ ও লেখনী নিজের উদ্দেশ্যের প্রচারণায় নিয়োজিত। মুজাহিদের হাত, পা ও শরীরের প্রতিটি অংগ প্রত্যংগ জিহাদের উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য সারাক্ষণ প্রচেষ্টা, সাধনা ও পরিশ্রম করে চলছে। জিহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য সে নিজের সম্ভাব্য সমস্ত উপায়–উপকরণ নিয়োগ করে, পূর্ণ শক্তি দিয়ে এই পথের সমস্ত বাধার মোকাবিলা করে, এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন প্রাণ উৎসর্গ করার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন নির্দ্বিধায় এগিয়ে যায়। এর নাম "জিহাদ।" আর আল্লাহর পথে জিহাদ হচ্ছে ঃ এ সবকিছু একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করতে হবে। এই দুনিয়ায় একমাত্র আল্লাহর দীন তথা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আল্লাহর বাণী ও বিধান দুনিয়ার সমস্ত মতবাদ, চিন্তা ও বিধানের ওপর বিজয় লাভ করবে। মুজাহিদের সামনে এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ থাকবে না।

২৩৫. এটি হচ্ছে মদ ও জুয়া সম্পর্কে প্রথম নির্দেশ। এখানে শুধুমাত্র অপছন্দের কথা ব্যক্ত করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, যাতে মন ও মস্তিষ্ক তার হারাম হবার বিষয়টি গ্রহণ করে নিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। পরে মদ পান করে নামায পড়া নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়। তারপর সবশেষে মদ ও জুয়া এবং এই পর্যায়ের সমস্ত বস্তুকে চিরতরে হারাম ঘোষণা করা হয়। (দেখুন সূরা নিসা, ৪৩ আয়াত এবং সূরা মা–য়েদাহ, ৯০ আয়াত)।

২৩৬. এই আয়াত নাযিল হবার আগে এতিমদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে কুরআনে বারবার কঠোর নির্দেশ এসে গিয়েছিল। সে নির্দেশগুলোয় এতদূর বলে দেয়া হয়েছিল যে, "এতিমদের সম্পদের ধারে কাছেও যেয়ো না" এবং "যারা যুলুম নির্যাতন চালিয়ে এতিমদের সম্পদ খায় তারা আগুনের সাহায্যে নিজেদের পেট ভরে।" এই কঠোর নির্দেশের ভিত্তিতে এতিম ছেলেমেয়েদের লালন পালনকারীরা এতদূর ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, তারা এতিমদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা নিজেদের থেকে আলাদা করে দিয়েছিল। এই ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করার পরও তারা এতিমদের সম্পদের কিছু অংশ তাদের নিজেদের সাথে মিশে যাবার ভয় করছিল। তাই তারা এই এতিম ছেলেমেয়েদের সাথে লেনদেন ও আচরণের সঠিক পদ্ধতি কি হতে পারে সে সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۚ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى
يُؤْمِنُوْا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ
اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٢١﴾

মুশরিক নারীদেরকে কখনো বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। একটি সম্ভ্রান্ত মুশরিক নারী তোমাদের মনহরণ করলেও একটি মু'মিন দাসী তার চেয়ে ভালো। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে নিজেদের নারীদের কখনো বিয়ে দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। একজন সম্ভ্রান্ত মুশরিক পুরুষ তোমাদের মুগ্ধ করলেও একজন মুসলিম দাস তার চেয়ে ভালো। তারা তোমাদের আহবান জানাচ্ছে আগুনের দিকে[২৩৭] আর আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় তোমাদেরকে আহবান জানাচ্ছেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে। তিনি নিজের বিধান সুস্পষ্ট ভাষায় লোকদের সামনে বিবৃত করেন। আশা করা যায়, তারা শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করবে।

২৩৭. মুশরিকদের সাথে বিয়ে-শাদীর সম্পর্ক না রাখার ব্যাপারে ওপরে যে কথা বলা হয়েছে এটি হচ্ছে তার মূল কারণ ও যুক্তি। নারী ও পুরুষের মধ্যে বিয়েটা নিছক একটি যৌন সম্পর্ক মাত্র নয়। বরং এটি একটি গভীর তামাদ্দুনিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও মানসিক সম্পর্ক। মু'মিন ও মুশরিকের মধ্যে যদি মানসিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাহলে যেখানে একদিকে মু'মিন স্বামী বা স্ত্রীর প্রভাবে মুশরিক স্ত্রী বা স্বামী এবং তার পরিবার ও পরবর্তী বংশধররা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও জীবন ধারায় গভীরভাবে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হয়ে যেতে পারে, সেখানে অন্যদিকে মুশরিক স্বামী বা স্ত্রীর ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা ও আচার-ব্যবহারে কেবলমাত্র মু'মিন স্বামীর বা স্ত্রীরই নয় বরং তার সমগ্র পরিবার ও পরবর্তী বংশধরদেরও প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এই ধরনের দাম্পত্য জীবনের ফলশ্রুতিতে ইসলাম কুফর ও শিরকের এমন একটি মিশ্রিত জীবন ধারা সেই গৃহে ও পরিবারে লালিত হবার সম্ভাবনাই বেশী, যাকে অমুসলিমরা যতই পছন্দ করুক না কেন ইসলাম তাকে পছন্দ করতে এক মুহূর্তের জন্যও প্রস্তুত নয়। কোন খাঁটি ও সাচ্চা মু'মিন নিছক নিজের যৌন লালসা পরিতৃপ্তির জন্য কখনো নিজ গৃহে ও পরিবারে কাফেরী ও মুশরিকী চিন্তা-আচার-আচরণ লালিত হবার এবং নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের জীবনের কোন ক্ষেত্রে কুফর ও শিরকে প্রভাবিত হয়ে যাবার বিপদ ডেকে আনতে পারে না। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেয়া হয় যে, কোন মু'মিন কোন মুশরিকের প্রেমে পড়ে গেছে তাহলেও

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
الْمَحِيضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ
شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

২৮ রুকূ'

তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, হায়েয সম্পর্কে নির্দেশ কি? বলে দাও ঃ সেটি একটি অশুচিকর ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থা।[২৩৮] এ সময় স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো এবং তারা পাক-সাফ না হওয়া পর্যন্ত তাদের ধারে কাছেও যেয়ো না।[২৩৯] তারপর যখন তারা পাক-পবিত্র হয়ে যায়, তাদের কাছে যাও যেভাবে যাবার জন্য আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।[২৪০] আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা অসৎকাজ থেকে বিরত থাকে ও পবিত্রতা অবলম্বন করে। তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের কৃষিক্ষেত। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের কৃষিক্ষেতে যাও।[২৪১] তবে নিজেদের ভবিষ্যতের চিন্তা করো[২৪২] এবং আল্লাহর অসন্তোষ থেকে দূরে থাকো। একদিন তোমাদের অবশ্যি তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে হবে, একথা ভালোভাবেই জেনে রাখো। আর হে নবী! যারা তোমার বিধান মেনে নেয় তাদেরকে সাফল্য ও সৌভাগ্যের সুখবর শুনিয়ে দাও।

তার ঈমানের দাবী হচ্ছে এই যে, সে নিজের পরিবার, বংশধর ও নিজের দীন, নৈতিকতা ও চরিত্রের স্বার্থে নিজের ব্যক্তিগত আবেগকে কুরবানী করে দেবে।

২৩৮. মূল আয়াতে 'আযা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হয় অশুচিতা, অপরিচ্ছন্নতা আবার রোগ-ব্যধিও। হায়েয কেবলমাত্র একটি অশুচিতা ও অপরিচ্ছন্নতাই নয় বরং চিকিৎসা শাস্ত্রের দৃষ্টিতে এই অবস্থাটি সুস্থতার তুলনায় অসুস্থতারই বেশী কাছাকাছি।

২৩৯. এ ধরনের বিষয়গুলোকে কুরআন মজীদ উপমা ও রূপকের মাধ্যমে পেশ করে। তাই এখানে দূরে থাকা ও ধারে কাছে না যাওয়া শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا
وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٤﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ
اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ
قُلُوْبُكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٢٥﴾

যে শপথের উদ্দেশ্য হয় সৎকাজ, তাকওয়া ও মানব কল্যাণমূলক কাজ থেকে বিরত থাকা, তেমন ধরনের শপথবাক্য উচ্চারণ করার জন্য আল্লাহর নাম ব্যবহার করো না।[২৪৩] আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কথা শুনছেন এবং তিনি সবকিছু জানেন। তোমরা অনিচ্ছায় যেসব অর্থহীন শপথ করে ফেলো সেগুলোর জন্য আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না,[২৪৪] কিন্তু আন্তরিকতার সাথে তোমরা যেসব শপথ গ্রহণ করো সেগুলোর জন্য তিনি অবশ্যি পাকড়াও করবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু।

এই নয় যে, ঋতুবতী নারীর সাথে এক বিছানায় বসা বা এক সাথে খাওয়া-দাওয়া করা যাবে না। তাদেরকে অস্পৃশ্য-অশুচি মনে করে এক ধারে ঠেলে দিতে হবে, এমন কথা নয়। যদিও ইহুদি, হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলিম জাতিদের মধ্যে ঋতুবতী স্ত্রীদের সাথে এ ব্যবহার কোথাও কোথাও প্রচলিত দেখা যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নির্দেশটির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা থেকে বুঝা যায়, ঋতুবতী অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে কেবলমাত্র সহবাস ছাড়া বাকি সকল প্রকার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে।

২৪০. এখানে শরীয়াতের নির্দেশের কথা বলা হয়নি। বরং এমন নির্দেশের কথা বলা হয়েছে যা স্বভাব সিদ্ধ ও প্রকৃতিজাত। মানুষ ও জীবজন্তুর স্বভাব ও প্রকৃতির মধ্যে যাকে নীরবে ও সংগোপনে ক্রিয়াশীল রাখা হয়েছে এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রতিটি প্রাণী যে সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই সচেতন।

২৪১. অর্থাৎ আল্লাহ সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম নারীকে পুরুষের বিচরণক্ষেত্র হিসেবে তৈরি করেনি বরং তাদের উভয়ের মধ্যে জমি ও কৃষকের মতো একটা সম্পর্ক রয়েছে। জমিতে কৃষক নিছক বিচরণ ও ভ্রমণ করতে যায় না। জমি থেকে ফসল উৎপাদন করার জন্যই সে সেখানে যায়। মানব বংশ ধারার কৃষককেও মানবতার এই জমিতে সন্তান উৎপাদন ও বংশধারাকে সমুন্নত রাখার লক্ষেই যেতে হবে। মানুষ এই জমিতে কিভাবে ফসল উৎপাদন করবে সে সম্বন্ধে আল্লাহর শরীয়াতের কোন বক্তব্য নেই। তবে তার দাবী কেবল এতটুকুন যে, তাকে জমিতেই যেতে হবে এবং সেখান থেকে ফসল উৎপাদন করার লক্ষ্যেই যেতে হবে।

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক না রাখার কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য রয়েছে চার মাসের অবকাশ।[২৪৫] যদি তারা রুজু করে (ফিরে আসে) তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।[২৪৬] আর যদি তারা তালাক দেবার সংকল্প করে[২৪৭] তাহলে জেনে রাখো আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।[২৪৮]

২৪২. এখানে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর দু'টি অর্থ হয়। দু'টিরই গুরুত্ব সমান। এর একটি অর্থ হচ্ছে, তোমাদের বংশধারা রক্ষা করার চেষ্টা করো। তোমাদের দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার আগেই যেন তোমাদের স্থান গ্রহণকারী তৈরি হয়ে যায়। দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, যে পরবর্তী বংশধরকে তোমরা নিজেদের স্থলাভিষিক্ত করে যাচ্ছো, তাকে দীন, ঈমান, চরিত্র, নৈতিকতা ও মানবিক গুণাবলীতে ভূষিত করার চেষ্টা করো। পরবর্তী বাক্যে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, এই দু'টি দায়িত্ব পালনে তোমরা যদি স্বেচ্ছায় গাফলতি বা ত্রুটি করো তাহলে আল্লাহর কাছে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

২৪৩. সহীহ হাদীস থেকে জানা যায়, কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম খাওয়ার পর যখন কসম ভেঙে ফেলাই তার জন্য কল্যাণকর বলে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে তখন তার কসম ভেঙে ফেলা এবং তার কাফ্ফারা আদায় করা উচিত। কসম ভাঙার কাফ্ফারা হচ্ছে, দশজন মিসকিনকে আহার করানো অথবা তাদের বস্ত্রদান করা বা একটি দাস মুক্ত করে দেয়া অথবা তিন দিন রোযা রাখা। (সূরা মা–য়েদাহর ৮৯ আয়াত দেখুন)।

২৪৪. অর্থাৎ কথার কথা হিসেবে অনিচ্ছাকৃতভাবে যেসব শপথ বাক্য তোমাদের মুখ থেকে বের হয়ে যায়, সেগুলোর জন্য কোন কাফ্ফারা দিতে এবং আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে না।

২৪৫. ফিকাহর পরিভাষায় একে বলা হয় 'ঈলা'। স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে সবসময় মধুর সম্পর্ক থাকা তো সম্ভব নয়। বিভিন্ন সময় সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার বহুবিধ কারণ সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর শরীয়াত এমন ধরনের সম্পর্ক ভাঙা পছন্দ করে না যার ফলে উভয়ে আইনগতভাবে দাম্পত্য বাঁধনে আটকে থাকে কিন্তু কার্যত পরস্পর এমনভাবে আলাদা থাকে যেন তারা স্বামী–স্ত্রী নয়। এই ধরনের সম্পর্ক বিকৃতির জন্য আল্লাহ চার মাস সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই চার মাসের মধ্যে উভয়ের মধ্যে স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত করতে হবে। অন্যথায় এই সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে হবে। তারপর উভয়ে স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছামতো বিয়ে করতে পারবে।

আয়াতে যেহেতু 'কসম খেয়ে বসা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাই হানাফী ও শাফেঈ ফকীহগণ এই আয়াতের যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তা হচ্ছে এই যে, যেখানে স্বামী তার

স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক না রাখার কসম খায় একমাত্র সেখানেই এই বিধানটি কার্যকর হবে। আর কসম না খেয়ে দাম্পত্য সম্পর্ক যত দীর্ঘকালের জন্য ছিন্ন করুক না কেন এই আয়াতের নির্দেশ সেখানে প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু মালেকী ফকীহদের মত হচ্ছে, কসম থাক বা না থাক উভয় অবস্থায় এই চার মাসের অবকাশ পাবে। ইমাম আহমাদের (র) একটি বক্তব্যও এর সমর্থনে পাওয়া যায়।

হযরত আলী (রা), ইবনে আব্বাস (রা) ও হাসান বসরীর (র) মতে এই নির্দেশটি শুধুমাত্র বিকৃতির কারণে যে সম্পর্কচ্ছেদ হয় তার জন্য প্রযোজ্য। তবে কোন অসুবিধার কারণে স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক থাকা অবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্কচ্ছেদ করে তবে তার ওপর এই নির্দেশটি প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু অন্যান্য ফকীহদের মতে স্বামী–স্ত্রীর মধ্যকার দৈহিক সম্পর্ক ছিন্নকারী প্রত্যেকটি শপথই 'ঈলা'র অন্তরভুক্ত এবং সন্তুষ্টির সাথে হোক বা অসন্তুষ্টির সাথে হোক চার মাসের বেশী সময় পর্যন্ত এই ধরনের অবস্থা অব্যাহত থাকা উচিত নয়।

২৪৬. কোন কোন ফকীহ এ বাক্যের অর্থ এভাবে গ্রহণ করেছেন যে, এই নির্দিষ্ট সময়–কালের মধ্যে যদি তারা নিজেদের কসম ভেঙে ফেলে এবং তাদের স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্ক পুনঃ স্থাপন করে নেয়, তাহলে তাদের কসম ভাঙার কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না। আল্লাহ তাদেরকে এমনিতেই মাফ করে দেবেন। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহর মত হচ্ছে এই যে, কসম ভাঙার জন্য কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু বলার মানে এই নয় যে, কাফ্ফারা মাফ করে দেয়া হয়েছে। বরং এর মানে হচ্ছে, আল্লাহ তোমাদের কাফ্ফারা কবুল করে নেবেন এবং সম্পর্কচ্ছেদের সময়ে তোমরা পরস্পরের ওপর যেসব বাড়াবাড়ি করেছিলে সেগুলো মাফ করে দেবেন।

২৪৭. হযরত উসমান (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) প্রমুখ সাহাবীগণের মতে 'রুজু' করার অর্থাৎ শপথ ভাঙার ও পুনরায় স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করার সুযোগ চার মাস সময়–কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই সময়টি অতিবাহিত হয়ে যাওয়া এই অর্থ বহন করে যে, স্বামী তালাক দেয়ার সংকল্প করেছে। তাই এ অবস্থায় এই নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হবার সাথে সাথেই আপনা আপনি তালাক অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। সেটি হবে এক 'তালাকে বায়েন'। অর্থাৎ ইদ্দত পালনকালে স্বামীর আর স্ত্রীকে গ্রহণ করার অধিকার থাকবে না। তবে তারা উভয়ে চাইলে আবার নতুন করে বিয়ে করতে পারবে। হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত ইবনে উমর (রা) থেকেও এই ধরনের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। হানাফী ফকীহগণ এই মতটিই গ্রহণ করেছেন।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, মাকহুল, যুহরী প্রমুখ ফকীহগণ এই মতটির এই অংশটুকুর সাথে একমত হয়েছেন যে, চার মাস সময় অতিবাহিত হবার পর স্বতস্ফূর্তভাবে তালাক অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে, কিন্তু তাঁদের মতে সেটা হবে এক 'তালাকে রজঈ'। অর্থাৎ ইদ্দত পালন কালে স্বামী আবার স্ত্রীকে রুজু করার তথা দাম্পত্য সম্পর্কে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী হবে। আর যদি 'রুজু' না করে তাহলে ইদ্দত অতিবাহিত হবার পর দু'জন আবার চাইলে বিয়ে করতে পারবে।

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ۭ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا
اِصْلَاحًا ۭ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۠ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٨﴾

তালাক প্রাপ্তাগণ তিনবার মাসিক ঋতুস্রাব হওয়া পর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখবে। আর আল্লাহ তাদের গর্ভাশয়ে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাকে গোপন করা তাদের জন্য বৈধ নয়। তাদের কখনো এমনটি করা উচিত নয়, যদি তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়, তাদের স্বামীরা পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনে প্রস্তুত হয়, তাহলে তারা এই অবকাশ কালের মধ্যে তাদেরকে নিজের স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে নেবার অধিকারী হবে।[২৪৯]

নারীদের জন্যও ঠিক তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন পুরুষদের অধিকার আছে তাদের ওপর। তবে পুরুষদের তাদের ওপর একটি মর্যাদা আছে। আর সবার ওপরে আছেন আল্লাহ সর্বাধিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী, বিচক্ষণ ও জ্ঞানী।

২৪৮. অর্থাৎ যদি তুমি অন্যায়ভাবে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহর পাকড়াও সম্পর্কে নিশঙ্ক থেকো না। তিনি তোমার বাড়াবাড়ি ও অন্যায় সম্পর্কে অনবহিত নন।

২৪৯. এই আয়াতে প্রদত্ত বিধানটির ব্যাপারে ফকীহগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের একটি দলের মতে, স্ত্রীর তৃতীয় ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাবার পর যতক্ষণ সে গোসল করে পাক-সাফ না হয়ে যাবে ততক্ষণ তালাকে বায়েন অনুষ্ঠিত হবে না। এবং ততক্ষণ স্বামীর রুজু করার অধিকার থাকবে। হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এবং অন্যান্য বড় বড় সাহাবীগণ এই মত পোষণ করেন। হানাফী ফকীহগণও এই মত গ্রহণ করে নিয়েছেন। বিপরীত পক্ষে অন্য দলটি স্ত্রীর তৃতীয় ঋতুস্রাব শুরু হবার সাথে সাথেই স্বামীর 'রুজু' করার অধিকার খতম হয়ে যাবে। এই মত পোষণ করেন, হযরত আয়েশা (রা), হযরত ইবনে উমর (রা), হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা), শাফেঈ ও মালেকী ফকীহগণ এই মত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ
يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا
تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

২৯ রুকূ

তালাক দু'বার। তারপর সোজাসুজি স্ত্রীকে রেখে দিবে অথবা ভালোভাবে বিদায় করে দেবে।[২৫০]

আর তাদেরকে যা কিছু দিয়েছো বিদায় করার সময় তা থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়।[২৫১] *তবে এটা স্বতন্ত্র, স্বামী-স্ত্রী যদি আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না বলে আশংকা করে, তাহলে এহেন অবস্থায় যদি তোমরা আশংকা করো, তারা উভয়ে আল্লাহ নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করতে পারবে না, তাহলে স্ত্রীর কিছু বিনিময় দিয়ে তার স্বামী থেকে বিচ্ছেদ লাভ করায় কোন ক্ষতি নেই।*[২৫২] *এগুলো আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা, এগুলো অতিক্রম করো না। মূলত যারাই আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করবে তারাই জালেম।*

নির্দেশটি কেবলমাত্র যখন স্বামী তার স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক দেয় তখনকার অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। স্বামী তিন তালাক দেয়ার পর আর তার রুজূ করার অধিকার থাকবে না।

২৫০. এই ছোট্ট আয়াতটিতে জাহেলী যুগে আরবে প্রচলিত একটি বড় রকমের সামাজিক ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। তদানীন্তন আরবে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে অসংখ্য তালাক দিতে পারতো। স্বামী স্ত্রীর প্রতি বিরূপ হয়ে গেলে তাকে বারবার তালাক দিতো এবং আবার ফিরিয়ে নিতো। এভাবে বেচারী স্ত্রী না স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করতে পারতো আর না স্বাধীনভাবে আর কাউকে বিয়ে করতে পারতো। কুরআন মজীদের এই আয়াতটি এই জুলুমের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। এই আয়াতের দৃষ্টিতে স্বামী একটি বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে নিজের স্ত্রীকে বড় জোর দু'বার 'রজঈ তালাক' দিতে পারে। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দু'বার তালাক দেয়ার পর আবার তাকে ফিরিয়ে নিয়েছে সে তার

জীবনকালে যখন তাকে তৃতীয়বার তালাক দেবে তখন সেই স্ত্রী তার থেকে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

কুরআন ও হাদীস থেকে তালাকের যে সঠিক পদ্ধতি জানা যায় তা হচ্ছে এই ঃ স্ত্রীকে 'তুহর' (ঋতুকালীন রক্ত প্রবাহ থেকে পবিত্র)–এর অবস্থায় তালাক দিতে হবে। যদি এমন সময় স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয় যখন তার মাসিক ঋতুস্রাব চলছে, তাহলে তখনই তালাক দেয়া সংগত নয়। বরং ঋতুস্রাব বন্ধ হবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তারপর এক তালাক দেয়ার পর চাইলে দ্বিতীয় 'তুহরে' আর এক তালাক দিতে পারে। অন্যথায় প্রথম তালাকটি দিয়ে ক্ষান্ত হওয়াই ভালো। এ অবস্থায় ইদ্দত অতিক্রান্ত হবার আগে স্বামীর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকে। আর ইদ্দত শেষ হয়ে যাবার পরও উভয়ের জন্য পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে পুনর্বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগও থাকে। কিন্তু তৃতীয় 'তুহরে' তৃতীয়বার তালাক দেয়ার পর স্বামী আর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার বা পুনর্বার উভয়ের এক সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার কোন অধিকার থাকে না। তবে একই সময় তিন তালাক দেয়ার ব্যাপারটি যেমন অজ্ঞ লোকেরা আজকাল সাধারণভাবে করে থাকে, শরীয়াতের দৃষ্টিতে কঠিন গোনাহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোরভাবে এর নিন্দা করেছেন। এমনকি হযরত উমর (রা) থেকে এতদূর প্রমাণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি একই সময় স্ত্রীকে তিন তালাক দিতো তিনি তাকে বেত্রাঘাত করতেন।

(তবুও একই সময় তিন তালাক দিলে চার ইমামের মতে তালাক অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে কিন্তু তালাকদাতা কঠিন গোনাহের অধিকারী হবে। আর শরীয়াতের দৃষ্টিতে এটি মুগাল্লাযা বা গর্হিত তালাক হিসেবে গণ্য হবে)।

২৫১. অর্থাৎ মোহরানা, গহনাপত্র ও কাপড়–চোপড় ইত্যাদি, যেগুলো স্বামী ইতিপূর্বে স্ত্রীকে দিয়েছিল। সেগুলোর কোন একটি ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার তার নেই। এমনিতে কোন ব্যক্তিকে দান বা উপহার হিসেবে কোন জিনিস দিয়ে দেয়ার পর তার কাছ থেকে আবার তা ফিরিয়ে নিতে চাওয়া ইসলামী নৈতিকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই ঘৃণ্য কাজকে হাদীসে এমন কুকুরের কাজের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে নিজে বমি করে আবার তা খেয়ে ফেলে। কিন্তু বিশেষ করে একজন স্বামীর জন্য নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তাকে বিদায় করার সময় সে নিজে তাকে এক সময় যা কিছু দিয়েছিল সব তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে নেয়া অত্যন্ত লজ্জাকর। বিপরীতপক্ষে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বিদায় করার সময় কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় করার নৈতিক আচরণ ইসলাম শিখিয়েছে। (৩১ রুকূ'র শেষ আয়াতটি দেখুন)

২৫২. শরীয়াতের পরিভাষায় একে বলা হয় 'খুলা' তালাক। অর্থাৎ স্বামীকে কিছু দিয়ে স্ত্রী তার কাছ থেকে তালাক আদায় করে নেয়া। এ ব্যাপারে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঘরোয়াভাবেই যদি কিছু স্থিরীকৃত হয়ে যায় তাহলে তাই কার্যকর হবে। কিন্তু ব্যাপারটি যদি আদালত পর্যন্ত গড়ায়, তাহলে আদালত কেবল এতটুকু অনুসন্ধান করবে যে, এই ভদ্রমহিলা তার স্বামীর প্রতি যথার্থই এত বেশী বিরূপ হয়ে পড়েছে কিনা যার ফলে

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

অতপর যদি (দু'বার তালাক দেবার পর স্বামী তার স্ত্রীকে তৃতীয় বার) তালাক দেয়, তাহলে ঐ স্ত্রী তার জন্য আর হালাল হবে না। তবে যদি দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সাথে তার বিয়ে হয় এবং সে তাকে তালাক দেয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে প্রথম স্বামী এবং এই মহিলা যদি আল্লাহর সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করতে পারবে বলে মনে করে তাহলে তাদের উভয়ের জন্য পরস্পরের দিকে ফিরে আসায় কোন ক্ষতি নেই।[২৫৩] এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। (এগুলো ভংগ করার পরিণতি) যারা জানে তাদের হিদায়াতের জন্য এগুলো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরছেন।

তাদের দু'জনের এক সাথে ঘর সংসার করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে সঠিক অনুসন্ধান চালিয়ে নিশ্চিত হবার পর আদালত অবস্থার প্রেক্ষিতে যে কোন বিনিময় নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। এই বিনিময় গ্রহণ করে স্বামীর অবশ্যি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে। স্বামী ইতিপূর্বে যে পরিমাণ সম্পদ তার ঐ স্ত্রীকে দিয়েছিল তার চেয়ে বেশী পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বিনিময় হিসেবে তাকে ফেরত দেয়া সাধারণত ফকীহগণ পছন্দ করেননি।

'খুলা' তালাক 'রজঈ' নয়। বরং এটি 'বায়েনা' তালাক। যেহেতু স্ত্রীলোকটি মূল্য দিয়ে এক অর্থে তালাকটি যেন কিনে নিয়েছে, তাই এই তালাকের পর আবার রুজু করার তথা ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার স্বামীর থাকে না। তবে আবার যদি তারা পরস্পরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়, তাহলে এমনটি করা তাদের জন্য সম্পূর্ণ বৈধ।

অধিকাংশ ফিকাহ শাস্ত্রবিদের মতে 'খুলা' তালাকের ইদ্দতও সাধারণ তালাকের সমান। কিন্তু আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থে এমন বহুতর হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে যা থেকে জানা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ঋতুকালকে এর ইদ্দত গণ্য করেছিলেন। হযরত উসমান (রা) এই অনুযায়ী একটি মামলারও ফায়সালা দিয়েছিলেন। (ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠা)।

২৫৩. সহীহ হাদীস থেকে জানা যায়, যদি কোন ব্যক্তি নিজের তালাক দেয়া স্ত্রীকে নিছক নিজের জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে চক্রান্তমূলকভাবে কারোর সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় এবং প্রথম থেকে তার সাথে এই চুক্তি করে নেয় যে, বিয়ে করার পর সে তাকে তালাক দিয়ে দেবে, তাহলে এটা হবে একটি সম্পূর্ণ অবৈধ কাজ। এই ধরনের

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن
يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ
هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم
مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও এবং তাদের ইদ্দত পূর্ণ হবার পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন হয় সোজাসুজি তাদেরকে রেখে দাও আর নয়তো ভালোভাবে বিদায় করে দাও। নিছক কষ্ট দেবার জন্য তাদেরকে আটকে রেখো না। কারণ এটা হবে বাড়াবাড়ি। আর যে ব্যক্তি এমনটি করবে সে আসলে নিজের ওপর জুলুম করবে।[২৫৪] আল্লাহর আয়াতকে খেলা-তামাসায় পরিণত করো না। ভুলে যেয়ো না আল্লাহ তোমাদের কত বড় নিয়ামত দান করেছেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দান করছেন, যে কিতাব ও হিকমাত তিনি তোমাদের ওপর নাযিল করেছেন তাকে মর্যাদা দান করো।[২৫৫] আল্লাহকে ভয় করো এবং ভালোভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ সব কথা জানেন।

বিয়ে মোটেই বিয়ে বলে গণ্য হবে না। বরং এটি হবে নিছক একটি ব্যভিচার। আর এই ধরনের বিয়ে ও তালাকের মাধ্যমে কোন ক্রমেই কোন মহিলা তার সাবেক স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে না। হযরত আলী (রা), ইবনে মাসউদ (রা), আবু হুরাইরা (রা) ও উকবা ইবনে আমের (রা) প্রমুখ সহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একযোগে রেওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি এভাবে তালাক দেয়া স্ত্রীদের যারা হালাল করে এবং যাদের মাধ্যমে হালাল করা হয় তাদের উভয়ের ওপর লানত বর্ষণ করেছেন।

২৫৪. অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তারপর ইদ্দত শেষ হবার আগে আবার তাকে ফিরিয়ে নেয় শুধুমাত্র কষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়ার সুযোগ লাভ করার উদ্দেশ্যে, তাহলে এটা কোনক্রমেই সঠিক কাজ বলে গণ্য হবে না। আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন, ফিরিয়ে নিতে চাইলে এই উদ্দেশ্যে ফিরিয়ে নাও যে, এবার থেকে তার সাথে সদাচরণ করবে। অন্যথায় ভদ্রভাবে তাকে বিদায় দাও। (আরো জানার জন্য ২৫০নং টীকা দেখুন)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ
مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ
لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

৩০ রুকূ'

তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের তালাক দেয়ার পর যখন তারা ইদ্দত পূর্ণ করে নেয় তখন তাদের নিজেদের প্রস্তাবিত স্বামীদের সাথে বিয়ের ব্যাপারে তোমরা বাধা দিয়ো না, যখন তারা প্রচলিত পদ্ধতিতে পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে সম্মত হয়।[২৫৬] এ ধরনের পদক্ষেপ কখনো গ্রহণ না করার জন্য তোমাদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনে থাকো। এ থেকে বিরত থাকাই তোমাদের জন্য সবচেয়ে পরিমার্জিত ও সর্বাধিক পবিত্র পদ্ধতি। আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না।

২৫৫. অর্থাৎ এ সত্যটি ভুলে যেয়ো না যে, মহান আল্লাহ তোমাদের কিতাব ও হিকমত তথা জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে সারা দুনিয়ার নেতৃত্ব দানের উচ্চতর আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মাতের (উম্মাতে ওয়াসাত) মর্যাদা দান করা হয়েছে। তোমাদেরকে সত্যতা, সৎবৃত্তি, সৎকর্মশীলতা ও ন্যায়নিষ্ঠার মূর্তিমান প্রতীক হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। বাহানাবাজী করে আল্লাহর আয়াতকে খেল-তামাশায় পরিণত করা তোমাদের সাজে না। আইনের শব্দের আড়ালে আইনের মূল প্রাণসত্তার বিরুদ্ধে অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করো না। বিশ্বাসীকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার পরিবর্তে তোমরা নিজের গৃহে জালেম ও পথভ্রষ্টের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ো না।

২৫৬. অর্থাৎ কোন স্ত্রীলোককে তার স্বামী তালাক দিয়ে দেয়ার পর ইদ্দতকালের মধ্যে যদি তাকে ফিরিয়ে না নেয় এবং ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত হবার পর তারা দু'জন পারস্পরিক সম্মতিক্রমে আবার বিয়ে করতে চায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকটির আত্মীয়-স্বজনদের তাদের এই পদক্ষেপে বাধা দেয়া উচিত নয়। এ ছাড়া এ আয়াতটির এ অর্থও হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দতকাল অতিক্রম করার পর তার থেকে মুক্ত হয়ে গিয়ে নিজের পছন্দমতো অন্য কাউকে বিয়ে করতে চায়। এ ক্ষেত্রে তার পূর্ববর্তী স্বামী কোন হীন মানসিকতার বশবর্তী হয়ে যেন তার এ বিয়েতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। যে মহিলাকে সে ত্যাগ করেছে তাকে যাতে আর কেউ গ্রহণ করতে এগিয়ে না আসে এ জন্য যেন সে প্রচেষ্টা চালাতে না থাকে।

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ
اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوْفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ
فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا
اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٣﴾

যে পিতা তার সন্তানের দুধ পানের সময়-কাল পূর্ণ করতে চায়; সে ক্ষেত্রে মায়েরা পুরো দু'বছর নিজেদের সন্তানদের দুধ পান করাবে।[২৫৭] এ অবস্থায় সন্তানদের পিতাকে প্রচলিত পদ্ধতিতে মায়েদের খোরাক পোশাক দিতে হবে। কিন্তু কারোর ওপর তার সামর্থের বেশী বোঝা চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়। কোন মা'কে এ জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না যে, সন্তানটি তার। আবার কোন বাপকেও এ জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না যে, এটি তারই সন্তান। দুধ দানকারিণীর এ অধিকার যেমন সন্তানের পিতার ওপর আছে তেমনি আছে তার ওয়ারিশের ওপরও।[২৫৮] কিন্তু যদি উভয় পক্ষ পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়াতে চায়, তাহলে এমনটি করায় কোন ক্ষতি নেই। আর যদি তোমার সন্তানদের অন্য কোন মহিলার দুধ পান করাবার কথা তুমি চিন্তা করে থাকো, তাহলে তাতেও কোন ক্ষতি নেই, তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, এ জন্য যা কিছু বিনিময় নির্ধারণ করবে তা প্রচলিত পদ্ধতিতে আদায় করবে। আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু করো না কেন সবই আল্লাহর নজরে আছে।

২৫৭ এ নির্দেশটি এমন এক অবস্থার জন্য যখন স্বামী-স্ত্রী পরস্পর থেকে তালাক বা খুলা' তালাকের মাধ্যমে অথবা আদালত কর্তৃক বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং স্ত্রীর কোলে রয়েছে দুগ্ধপোষ্য শিশু।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ
بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٣٤﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ
اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ
وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۗ
وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ۗ
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا
اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٣٥﴾

তোমাদের মধ্য থেকে যারা মারা যায়, তাদের পরে যদি তাদের স্ত্রীরা জীবিত থাকে, তাহলে তাদের চার মাস দশ দিন নিজেদেরকে (বিবাহ থেকে) বিরত রাখতে হবে।[২৫৯] তারপর তাদের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেলে তারা ইচ্ছামতো নিজেদের ব্যাপারে প্রচলিত পদ্ধতিতে যা চায় করতে পারে, তোমাদের ওপর এর কোন দায়িত্ব নেই। আল্লাহ তোমাদের সবার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত। ইদ্দতকালে তোমরা এই বিধবাদেরকে বিয়ে করার ইচ্ছা ইশরা ইংগিতে প্রকাশ করলে অথবা মনের গোপন কোণে লুকিয়ে রাখলে কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ জানেন, তাদের চিন্তা তোমাদের মনে জাগবেই। কিন্তু দেখো, তাদের সাথে কোন গোপন চুক্তি করো না। যদি কোন কথা বলতে হয়, প্রচলিত ও পরিচিত পদ্ধতিতে বলো। তবে বিবাহ বন্ধনের সিদ্ধান্ত ততক্ষণ করবে না যতক্ষণ না ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। খুব ভালোভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের মনের অবস্থাও জানেন। কাজেই তাঁকে ভয় করো। এবং একথাও জেনে রাখো, আল্লাহ ধৈর্যশীল এবং ছোট খাটো ত্রুটিগুলো এমনিতেই ক্ষমা করে দেন।

২৫৮. অর্থাৎ বাপ যদি মারা গিয়ে থাকে, তাহলে তার অভিভাবককে এ অধিকার আদায় করতে হবে।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتِّعُوهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ
قَدَرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ
مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ
بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ
وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ۚ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

৩১ রুকূ'

নিজেদের স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার বা মোহরানা নির্ধারণ করার আগেই যদি তোমরা তালাক দিয়ে দাও তাহলে এতে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। এ অবস্থায় তাদেরকে অবশ্যি কিছু না কিছু দিতে হবে।[২৬০] সচ্ছল ব্যক্তি তার সাধ্যমত এবং দরিদ্র তার সংস্থান অনুযায়ী প্রচলিত পদ্ধতিতে দেবে। সৎলোকদের ওপর এটি একটি অধিকার। আর যদি তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই তোমরা তালাক দিয়ে দাও কিন্তু মোহরানা নির্ধারিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে এ অবস্থায় মোহরানার অর্ধেক তাদেরকে দিতে হবে। স্ত্রী যদি নরম নীতি অবলম্বন করে (এবং মোহরানা না নেয়) অথবা সেই ব্যক্তি নরমনীতি অবলম্বন করে, যার হাতে বিবাহ বন্ধন নিবদ্ধ (এবং সম্পূর্ণ মোহরানা দিয়ে দেয়) তাহলে সেটা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। আর তোমরা (অর্থাৎ পুরুষরা) নরম নীতি অবলম্বন করো। এ অবস্থায় এটি তাকওয়ার সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল। পারস্পরিক ব্যাপারে তোমরা উদারতা ও সহৃদয়তার নীতি ভুলে যেয়ো না।[২৬১] তোমাদের কার্যাবলী আল্লাহ দেখছেন।

তোমাদের নামাযগুলো[২৬২] সংরক্ষণ করো, বিশেষ করে এমন নামায যাতে নামাযের সমস্ত গুণের সমন্বয় ঘটেছে।[২৬৩] আল্লাহর সামনে এমনভাবে দাঁড়াও যেমন অনুগত সেবকরা দাঁড়ায়।

২৫৯. স্বামী মারা যাবার পর স্ত্রীর ইদ্দত পালনের যে সময়-কাল এখানে বর্ণিত হয়েছে এটি এমন বিধবাদেরও পালন করতে হবে যাদের সাথে তাদের স্বামীদের বিয়ের পর একান্তে বসবাস হয়নি। তবে গর্ভবতী বিধবাদের এই ইদ্দত পালন করতে হবে না। গর্ভস্থ সন্তান প্রসব হবার সাথে সাথেই তাদের উদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর পরই অথবা তার কয়েক মাস পরে সন্তান প্রসব হোক না কেন সমান কথা।

"নিজেদেরকে বিরত রাখতে হবে"—এর অর্থ কেবল এতটুকুই নয় যে, এই সময় বিয়ে করতে পারবে না বরং এই সংগে সংগে নিজেকে কোন প্রকার সাজ-সজ্জা ও অলংকারেও ভূষিত করতে পারবে না। হাদীসে সুস্পষ্টভাবে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, স্বামী মৃত্যুকালীন ইদ্দত পালনের সময় নারীরা রঙীন কাপড় ও অলংকার পরতে পারবে না, মেহেদী, সুর্মা, খুশ্‌বু ও খেজাব লাগাতে পারবে না, এমনকি কেশ বিন্যাস করতেও পারবে না। তবে এই সময় নারীরা ঘর থেকে বাইরে যেতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত ইবনে উমর (রা), হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রা), হযরত উম্মে সালমা (রা), সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, ইবরাহীম নাখঈ, মুহাম্মাদ ইবনে শীরীন এবং চার ইমামের মতে স্বামী যে ঘরে মারা গেছে ইদ্দত পালনকালে বিধবা স্ত্রীকে সেই ঘরেই থাকতে হবে। দিনের বেলা কোন প্রয়োজনে সে বাইরে যেতে পারে। কিন্তু ঐ ঘরের মধ্যেই তার অবস্থান হতে হবে। বিপরীত পক্ষে হযরত আয়েশা (রা), হযরত আলী (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা), আতা, তাউস, হাসান বসরী, উমর ইবনে আবদুল আযীয এবং সকল আহলুয যাহেরের মতে বিধবা স্ত্রী তার ইদ্দতকাল যেখানে ইচ্ছা পালন করতে পারে এবং এ সময় সে সফরও করতে পারে।

২৬০. সম্পর্ক স্থাপন করার পর এভাবে ভেঙে দেয়ার কারণে স্ত্রীলোকের অবশ্যি কিছু না কিছু ক্ষতি তো হয়ই। সাধ্যমতো এই ক্ষতি পূরণ করার জন্যই আল্লাহ এ নির্দেশ দিয়েছেন।

২৬১. অর্থাৎ মানবিক সম্পর্ককে মধুর ও প্রীতিপূর্ণ করার জন্য মানুষের পরস্পরের সাথে উদার ও সহৃদয় আচরণ অপরিহার্য। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি কেবলমাত্র তার আইনগত অধিকারটুকুই আদায় করার ওপর জোর দিতে থাকে তাহলে কখনোই সুখী সুন্দর সমাজ জীবন গড়ে উঠতে পারে না।

২৬২. সামাজিক ও তামাদ্দুনিক বিধান বর্ণনা করার পর নামাযের তাগিদ দিয়ে আল্লাহ এই ভাষণটির সমাপ্তি টানছেন। কারণ নামায এমন একটি জিনিস, যা মানুষের মধ্যে আল্লাহর ভয়, সততা, সৎকর্মশীলতা ও পবিত্রতার আবেগ এবং আল্লাহর বিধানের আনুগত্যের ভাবধারা সৃষ্টি করে। আর এই সংগে তাকে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখে। মানুষের মধ্যে এ বস্তুগুলো না থাকলে সে কখনো আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করার ক্ষেত্রে অবিচল নিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারতো না। সে ক্ষেত্রে সে ইহুদি জাতির মতো নাফরমানির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতো।

২৬৩. মূলে 'সালাতুল উস্‌তা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোন কোন মুফাস্‌সির এর অর্থ করেছেন ফজরের নামায। কেউ যোহরের, কেউ মাগরিবের। আবার কেউ এশার

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ
مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ۖ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى
الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي
مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾
وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾ كَذَٰلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾

অশান্তি বা গোলযোগের সময় হলে পায়ে হেঁটে অথবা বাহনে চড়ে যেভাবেই সম্ভব নামায পড়ো। আর যখন শান্তি স্থাপিত হয়ে যায় তখন আল্লাহকে সেই পদ্ধতিতে স্মরণ করো, যা তিনি তোমাদের শিখিয়েছেন, যে সম্পর্কে ইতিপূর্বে তোমরা অনবহিত ছিলে।

তোমাদের[২৬৪] মধ্য থেকে যারা মারা যায় এবং তাদের পরে তাদের স্ত্রীরা বেঁচে থাকে, তাদের স্ত্রীদের যাতে এক বছর পর্যন্ত ভরণপোষণ করা হয় এবং ঘর থেকে বের করে না দেয়া হয় সে জন্য স্ত্রীদের পক্ষে মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত করে যাওয়া উচিত। তবে যদি তারা নিজেরাই বের হয়ে যায় তাহলে তাদের নিজেদের ব্যাপারে প্রচলিত পদ্ধতিতে তারা যাই কিছু করুক না কেন তার কোন দায়-দায়িত্ব তোমাদের ওপর নেই। আল্লাহ সবার ওপর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাশালী এবং তিনি অতি বিজ্ঞ। অনুরূপভাবে যেসব স্ত্রীকে তালাক দেয়া হয়েছে তাদেরকেও সংগতভাবে কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় করা উচিত। এটা মুত্তাকীদের ওপর আরোপিত অধিকার।

এমনিভাবে আল্লাহ তাঁর বিধান পরিষ্কার ভাষায় তোমাদের জানিয়ে দেন। আশা করা যায়, তোমরা ভেবেচিন্তে কাজ করবে।

নামাযও মনে করেছেন। কিন্তু এর কোন একটিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য নয়। এগুলো কেবলমাত্র ব্যাখ্যা তাদের স্বকীয় উদ্ভাবন ছাড়া আর কিছুই নয়। সব চাইতে বেশী মত ব্যক্ত হয়েছে আসরের নামাযের পক্ষে। বলা হয়ে থাকে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নামাযটিকে 'সালাতুল উস্‌তা' ঘোষণা করেছেন। কিন্তু যে

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ
الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو
فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾

৩২ রুকূ'

তুমি[২৬৫] কি তাদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু চিন্তা করেছো, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়েছিল এবং তারা সংখ্যায়ও ছিল হাজার হাজার? আল্লাহ তাদের বলেছিলেন ঃ মরে যাও, তারপর তিনি তাদের পুনর্বার জীবন দান করেছিলেন।[২৬৬] আসলে আল্লাহ মানুষের ওপর বড়ই অনুগ্রহকারী কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

ঘটনাটি থেকে এই সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে তাতে কেবলমাত্র এতটুকু কথা বলা হয়েছে ঃ আহযাব যুদ্ধের সময় মুশরিকদের আক্রমণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এতদূর ব্যস্ত রেখেছিল যার ফলে বেলা গড়িয়ে একেবারে সূর্য ডুবু ডুবু হয়েছিল। অথচ তখনো তিনি আসরের নামায পড়তে পারেননি। তখন তিনি বললেন ঃ "আল্লাহ তাদের কবর ও তাদের ঘর আগুনে ভরে দিন। তারা আমাদের 'সালাতুল উসতা' পড়তে দেয়নি।" এ বক্তব্য থেকেই একথা মনে করা হয়েছে যে, রসূল (সা) আসরের নামাযকে সালাতুল উসতা বলেছেন। অথচ এই বক্তব্যের সবচেয়ে বেশী নির্ভুল অর্থ আমাদের কাছে এটাই মনে হচ্ছে যে, এই ব্যস্ততার কারণে উন্নত পর্যায়ের নামায থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। এখন অসময়ে এটি পড়তে হবে। তাড়াতাড়ি পড়তে হবে। খুশু-খুযু তথা নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে ধীরে-স্থিরে এ নামাযটি পড়া যাবে না।

'উসতা' অর্থ মধ্যবর্তী জিনিসও হয়। আবার এ শব্দটি এমন জিনিস সম্পর্কেও ব্যবহৃত হয় যা উন্নত ও উৎকৃষ্ট। 'সালাতুল উসতা' অর্থ মধ্যবর্তী নামাযও হতে পারে আবার এমন নামাযও হতে পারে, যা সঠিক সময়ে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে আল্লাহর প্রতি গভীরভাবে মন সংযোগ সহকারে পড়া হয় এবং যার মধ্যে নামাযের যাবতীয় গুণেরও সমাবেশ ঘটে। আল্লাহর সামনে অনুগত বান্দার মতো দাঁড়াও—এই পরবর্তী বাক্যটি নিজেই 'সালাতুল উসতা' শব্দটির ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে।

২৬৪. ভাষণের ধারাবাহিকতা ওপরেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। উপসংহার বা পরিশিষ্ট হিসেবে এখানে এ বক্তব্যটি উপস্থাপিত হয়েছে।

২৬৫. এখান থেকে আর একটি ধারাবাহিক ভাষণ শুরু হচ্ছে। এই ভাষণে মুসলমানদের আল্লাহর পথে জিহাদ ও অর্থ-সম্পদ দান করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যেসব দুর্বলতার কারণে বনী ইসরাঈলরা অবশেষে অবনতি ও পতনের শিকার হয় সেগুলো থেকে মুসলমানদের দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে আলোচিত বিষয়টি অনুধাবন

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٤﴾ مَنْ
ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا
كَثِيْرَةً ۭ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۠ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٤٥﴾

হে মুসলমানরা! আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো এবং ভালোভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ। তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহকে 'করযে হাসানা' দিতে প্রস্তুত,[২৬৭] যাতে আল্লাহ তা কয়েক গুণ বাড়িয়ে তাকে ফেরত দেবেন? কমাবার ক্ষমতা আল্লাহর আছে, বাড়াবারও এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

করার জন্য এ বিষয়টি সামনে রাখতে হবে যে, মুসলমানরা সে সময় মক্কা থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল, এক দেড় বছর থেকে তারা মদীনায় আশ্রয় নিয়েছিল। এবং কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নিজেরাই বারবার যুদ্ধ করার অনুমতি চাইছিল। কিন্তু যুদ্ধের অনুমতি দেয়ার পর এখন তাদের মধ্যে কিছু লোক ইতস্তত করছিল, যেমন ২৬ রুকূ'র শেষ অংশে বলা হয়েছে। তাই এখানে বনী ইসরাঈলদের ইতিহাসের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা থেকে মুসলমানদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

২৬৬. এখানে বনী ইসরাঈলদের মিসর ত্যাগের ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। সূরা মা-য়েদাহর চতুর্থ রুকূ'তে এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। বিপুল সংখ্যক বনী ইসরাঈল মিসর থেকে বের হয়ে গৃহ ও সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় বিস্তীর্ণ ধূ ধূ প্রান্তরে ঘুরে ফিরছিল। তারা একটি নির্দিষ্ট আবাস লাভের জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিল কিন্তু যখন আল্লাহর ইংগিতে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাদের জালেম কেনানীদেরকে ফিলিস্তিন থেকে উৎখাত করে ঐ এলাকাটি জয় করে নেয়ার নির্দেশ দিলেন তখন তারা কাপুরুষতার পরিচয় দিল এবং সামনে এগিয়ে যেতে অস্বীকার করলো। অবশেষে আল্লাহ তাদের চল্লিশ বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে হয়রান-পেরেশান-বিপন্ন অবস্থার মধ্যে দিন কাটাবার জন্য ছেড়ে দিলেন। এভাবে তাদের এক পুরুষ শেষ হয়ে গেলো। নতুন বংশধররা মরুভূমির কোলে লালীত হয়ে বড় হলো। এবার আল্লাহ কেনানীদের ওপর তাদের বিজয় দান করলেন। মনে হচ্ছে, এই ব্যাপারটিকেই এখানে 'মরে যাওয়া ও পুনর্বার জীবন দান করা' বলা হয়েছে।

২৬৭. 'করযে হাসানা' এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে "ভালো ঋণ"। এর অর্থ হচ্ছে ঃ এমন ঋণ, যা কেবলমাত্র সৎকর্ম অনুষ্ঠানের প্রেরণায় চালিত হয়ে নিস্বার্থভাবে কাউকে দেয়া হয়। অনুরূপভাবে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করলে আল্লাহ তাকে নিজের জন্য ঋণ বলে গণ্য করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কেবল আসলটি নয় বরং তার ওপর কয়েকগুণ বেশী দেয়ার ওয়াদা করেন। তবে এ জন্য শর্ত আরোপ করে বলেন যে, সেটি 'করযে হাসানা' অর্থাৎ এমন ঋণ হতে হবে যা দেয়ার পেছনে কোন হীন স্বার্থ বুদ্ধি থাকবে না বরং নিছক

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ
قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ
هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۖ قَالُوا
وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا
وَأَبْنَائِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا
مِّنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

আবার তোমরা কি এ ব্যাপারেও চিন্তা করেছো, যা মূসার পরে বনী ইসরাঈলের সরদারদের সাথে ঘটেছিল? তারা নিজেদের নবীকে বলেছিল ঃ আমাদের জন্য একজন বাদশাহ ঠিক করে দাও, যাতে আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করতে পারি।[২৬৮] নবী জিজ্ঞেস করলো ঃ তোমাদের লড়াই করার হুকুম দেয়ার পর তোমরা লড়তে যাবে না, এমনটি হবে না তো? তারা বলতে লাগলো ঃ এটা কেমন করে হতে পারে, আমরা আল্লাহর পথে লড়বো না, অথচ আমাদের বাড়ি-ঘর থেকে আমাদের বের করে দেয়া হয়েছে, আমাদের সন্তানদের আমাদের থেকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে? কিন্তু যখন তাদের লড়াই করার হুকুম দেয়া হলো, তাদের স্বল্পসংখ্যক লোক ছাড়া বাদবাকি সবাই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলো। আল্লাহ তাদের প্রত্যেকটি জালেমকে জানেন।

আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এ ঋণ দিতে হবে এবং তা এমন কাজে ব্যয় করতে হবে যা আল্লাহ পছন্দ করেন।

২৬৮. এটি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের প্রায় এক হাজার বছর আগের ঘটনা। সে সময় আমালিকারা বনী ইসরাঈলদের ওপর চরম নির্যাতন চালাচ্ছিল। ইসরাঈলীদের কাছ থেকে তারা ফিলিস্তিনের অধিকাংশ এলাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল সামুয়েল নবী তখন ছিলেন বনী ইসরাঈলদের শাসক। কিন্তু তিনি বার্ধক্যে জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই ইসরাঈলী সরদাররা অন্য কোন ব্যক্তিকে নিজেদের নেতা বানিয়ে তার অধীনে যুদ্ধ করার প্রয়োজন অনুভব করছিল। কিন্তু তখন বনী ইসরাঈলদের মধ্যে অজ্ঞতা এত বেশী বিস্তার লাভ করেছিল এবং তারা অমুসলিম জাতিদের নিয়ম, আচার-আচরণে এত বেশী

প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল যে, খিলাফত ও রাজতন্ত্রের মধ্যকার পার্থক্যবোধ তাদের মন-মস্তিষ্ক থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা একজন খলীফা নির্বাচনের নয় বরং বাদশাহ নিযুক্তির আবেদন করেছিল। এ প্রসংগে বাইবেলের প্রথম সামুয়েল গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে ঃ

"সামুয়েল সারা জীবন ইসরাঈলীদের মধ্যে সুবিচার করতে থাকেন।.....তখন সব ইসরাঈলী নেতা একত্র হয়ে রামা'তে সামুয়েলের কাছে আসে। তারা তাঁকে বলতে থাকে ঃ দেখো, তুমি বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়েছো এবং তোমার ছেলে তোমার পথে চলছে না। এখন তুমি কাউকে আমাদের বাদশাহ নিযুক্ত করে দাও, যে অন্য জাতিদের মতো আমাদের প্রতি সুবিচার করবে।.....একথা সামুয়েলের খারাপ লাগে। তিনি সদাপ্রভূর কাছে দোয়া করেন। সদাপ্রভূ সামুয়েলকে বলেন ঃ এই লোকেরা তোমাকে যা কিছু বলছে, তুমি তা মেনে নাও কেননা তারা তোমার নয়, আমার অবমাননা করেছে এই বলে যে, আমি তাদের বাদশাহ থাকবো না।.....সামুয়েল তাদেরকে—যারা তার কাছে বাদশাহ নিযুক্তির দাবী নিয়ে এসেছিল—সদাপ্রভূর সমস্ত কথা শুনিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ যে বাদশাহ তোমাদের ওপর রাজত্ব করবে তার নীতি এই হবে যে, সে তোমাদের পুত্রদের নিয়ে যাবে, তার রথ ও বাহিনীতে চাকর নিযুক্ত করবে এবং তারা তার রথের আগে আগে দৌড়াতে থাকবে। সে তাদেরকে সহস্রজনের ওপর সরদার ও পঞ্চাশজনের ওপর জমাদার নিযুক্ত করবে এবং কাউকে কাউকে হালের সাথে জুতে দেবে, কাউকে দিয়ে ফসল কাটাবে এবং নিজের জন্য যুদ্ধাস্ত্র ও রথের সরঞ্জাম তৈরি করাবে। আর তোমাদের কন্যাদেরকে পাচিকা বানাবে। তোমাদের ভালো ভালো শস্যক্ষেত, আংগুর ক্ষেত ও জিতবৃক্ষের বাগান নিয়ে নিজের সেবকদের দান করবে এবং তোমাদের শস্যক্ষেত ও আংগুর ক্ষেতের এক দশমাংশ নিয়ে নিজের সেনাদল ও সেবকদের দান করে দেবে। তোমাদের চাকর-বাকর, ক্রীতদাসী, সুশ্রী যুবকবৃন্দ ও গাধাগুলোকে নিজের কাজে লাগাবে এবং তোমাদের ছাগল-ভেড়াগুলোরও এক দশমাংশ নেবে। সুতরাং তোমরা তার দাসে পরিণত হবে। সেদিন তোমাদের এই বাদশাহ, যাকে তোমরা নিজেদের জন্য নির্বাচিত করবে তার কারণে তোমরা ফরিয়াদ করবে কিন্তু সেদিন সদাপ্রভূ তোমাদের কোন জবাব দেবেন না। তবুও লোকেরা সামুয়েলের কথা শোনেনি। তারা বলতে থাকে, না, আমরা বাদশাহ চাই, যে আমাদের ওপর কর্তৃত্ব করবে। তাহলে আমরাও অন্য জাতিদের মতো হবো। আমাদের বাদশাহ আমাদের মধ্যে সুবিচার করবে, আমাদের আগে আগে চলবে এবং আমাদের জন্য যুদ্ধ করবে।.....সদাপ্রভূ সামুয়েলকে বললেন ঃ তুমি ওদের কথা মেনে নাও এবং ওদের জন্য একজন বাদশাহ নির্যুক্ত করে দাও।" (৭ অধ্যায়, ১৫ শ্লোক থেকে ৮ অধ্যায় ২২ শ্লোক পর্যন্ত)।

"আবার সামুয়েল লোকদের বলতে থাকেন.....যখন তোমরা দেখলে আম্মুন সন্তানদের বাদশাহ নাহাশ তোমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে তখন তোমরা আমাকে বললে, আমাদের ওপর কোন বাদশাহ রাজত্ব করুক অথচ তোমাদের সদাপ্রভূ খোদা ছিলেন তোমাদের বাদশাহ। সুতরাং এখন সেই বাদশাহকে দেখো, যাকে তোমরা নির্বাচিত করেছো এবং যার জন্য তোমরা আবেদন করেছিলে। দেখো, সদাপ্রভূ তোমাদের ওপর বাদশাহ নিযুক্ত করেছেন। যদি তোমরা সদাপ্রভূকে ভয় করো, তাঁর উপাসনা করো, তাঁর

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ
قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ
مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ
عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ
مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

তাদের নবী তাদেরকে বললো ঃ আল্লাহ তোমাদের জন্য তালূতকে[২৬৯] বাদশাহ বানিয়ে দিয়েছেন। একথা শুনে তারা বললো ঃ "সে কেমন করে আমাদের ওপর বাদশাহ হবার অধিকার লাভ করলো? তার তুলনায় বাদশাহী লাভের অধিকার আমাদের অনেক বেশী। সে তো কোন বড় সম্পদশালী লোকও নয়।" নবী জবাব দিল ঃ "আল্লাহ তোমাদের মোকাবিলায় তাকেই নবী মনোনীত করেছেন। এবং তাকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক উভয় ধরনের যোগ্যতা ব্যাপকহারে দান করেছেন। আর আল্লাহ তাঁর রাজ্য যাকে ইচ্ছা দান করার ইখতিয়ার রাখেন। আল্লাহ অত্যন্ত ব্যাপকতার অধিকারী এবং সবকিছুই তাঁর জ্ঞান-সীমার মধ্যে রয়েছে।"

আদেশ মেনে চলো এবং সদাপ্রভূর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ না করো আর যদি তোমরা ও তোমাদের বাদশাহ, যে তোমাদের ওপর রাজত্ব করে, সবাই সদাপ্রভূ খোদার অনুগত হয়ে থাকো তাহলে তো ভালো। তবে যদি তোমরা সদাপ্রভূর কথা না মানো বরং সদাপ্রভূর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করো, তাহলে সদাপ্রভূর হাত তোমাদের বিরুদ্ধে উঠবে, যেমন তা উঠতো তোমাদের বাপ-দাদাদের বিরুদ্ধে।.....আর তোমরা জানতে পারবে এবং দেখতেও পারবে যে, তোমরা সদাপ্রভূর সমীপে নিজেদের জন্য বাদশাহ নিযুক্তির আবেদন জানিয়ে কত বড় অনিষ্ট করেছো।....এখন রইলো আমার ব্যাপার, আর খোদা না করুন, তোমাদের জন্য দোয়া না করে আমি সদাপ্রভূর কাছে পাপী না হয়ে যাই। বরং আমি সেই পথটি, যা ভালো ও সোজা, তোমাদের জানিয়ে দেবো।" (১২ অধ্যায়, ১২ থেকে ২৩ শ্লোক পর্যন্ত)।

বাইবেলে সামুয়েল গ্রন্থের এই বিস্তারিত বিবরণ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বাদশাহী তথা ব্যক্তি একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার এই দাবী আল্লাহ ও তাঁর নবী পছন্দ করেননি। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কুরআন মজীদে এ প্রসংগে বনী ইসরাঈলের সরদারদের এই দাবীর নিন্দা করা হয়নি কেন? এর জবাবে বলা যায়, এখানে আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে এ ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন তার সাথে এই দাবীটির ঠিক বেঠিক হবার বিষয়টির কোন সম্পর্ক নেই। এখানে আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা যে, বনী ইসরাঈলরা কতদূর কাপুরুষ হয়ে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে স্বার্থান্ধতা কতখানি বিস্তার

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ
سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ
تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

এই সংগে তাদের নবী তাদের একথাও জানিয়ে দিল ঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে বাদশাহ নিযুক্ত করার আলামত হচ্ছে এই যে, তার আমলে সেই সিন্দুকটি তোমরা ফিরিয়ে পাবে, যার মধ্যে রয়েছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য মানসিক প্রশান্তির সামগ্রী, যার মধ্যে রয়েছে মূসার পরিবারের ও হারুনের পরিবারের পরিত্যক্ত বরকতপূর্ণ জিনিসপত্র এবং যাকে এখন ফেরেশতারা বহন করে ফিরছে।[২৭০] যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো তাহলে এটি তোমাদের জন্য অনেক বড় নিশানী।

লাভ করেছিল এবং নৈতিক সংযমের কেমন অভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল যার ফলে অবশেষে তাদের পতন সূচিত হলো। মুসলমানরা যাতে এথেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং নিজেদের মধ্যে এই দুর্বলতাগুলোর প্রশ্রয় না দেয় সে জন্যই এর উল্লেখ করা হয়েছে।

২৬৯. বাইবেলে তাকে 'শৌল' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ছিলেন বনী ইয়ামীন গোত্রের একজন ত্রিশ বছরের যুবক। বনী ইসরাঈলদের মধ্যে তার চেয়ে সুন্দর ও সুশ্রী পুরুষ দ্বিতীয়জন ছিল না। তিনি এমনি সুঠাম ও দীর্ঘ দেহের অধিকারী ছিলেন যে, লোকদের মাথা বড়জোর তার কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছতো। নিজের বাপের হারানো গাধা খুঁজতে বের হয়েছিলেন। পথে সামুয়েল নবীর অবস্থান স্থলের কাছে পৌঁছলে আল্লাহ তাঁর নবীকে ইংগিত করে জানালেন, এই ব্যক্তিকে আমি বনী ইসরাঈলদের বাদশাহ হিসেবে মনোনীত করেছি। কাজেই সামুয়েল নবী তাকে নিজের গৃহে ডেকে আনলেন। তেলের কুপি নিয়ে তার মাথায় ঢেলে দিলেন এবং তাকে চুমো খেয়ে বললেন ঃ "খোদা তোমাকে 'মসহ' করেছেন, যাতে তুমি তার উত্তরাধিকারের অগ্রনায়ক হতে পারো।" অতপর তিনি বনী ইসরাঈলদের সাধারণ সভা ডেকে তার বাদশাহ হবার কথা ঘোষণা করে দিলেন।" (১–সামুয়েল ৯ ও ১০ অধ্যায়)।

বনী ইসরাঈলদের মধ্যে আল্লাহর নির্দেশক্রমে 'মসহ' করে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি। এর আগে হযরত হারুনকে পুরোহিত শ্রেষ্ঠ (Chief priest) হিসেবে 'মসহ' করা হয়েছিল। এরপর মসহকৃত তৃতীয় ব্যক্তি হলেন হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এবং চতুর্থ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম। কিন্তু তালূতকে নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছিল বলে কুরআনে বা হাদীসে কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। নিছক বাদশাহী করার জন্য মনোনীত করা একথা মেনে নেয়ার জন্য যথেষ্ট নয় যে, তিনি নবীও ছিলেন।

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ
فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا
مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۗ فَلَمَّا
جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ
بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ۗ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا
اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ
وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٢٤٩﴾

৩৩ রুকূ'

তারপর তালূত যখন সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে চললো, সে বললো ঃ "আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নদীতে তোমাদের পরীক্ষা হবে। যে তার পানি পান করবে সে আমার সহযোগী নয়। একমাত্র সে-ই আমার সহযোগী যে তার পানি থেকে নিজের পিপাসা নিবৃত্ত করবে না। তবে এক আধ আঁজলা কেউ পান করতে চাইলে করতে পারে। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোক ছাড়া বাকি সবাই সেই নদীর পানি আকণ্ঠ পান করলো।[২৭১]

অতপর জালূত ও তার সাথী মুসলমানরা যখন নদী পেরিয়ে সামনে এগিয়ে গেলো তখন তারা তালূতকে বলে দিল, আজ জালূত ও তার সেনাদলের মোকাবিলা করার ক্ষমতা আমাদের নেই।[২৭২] *কিন্তু যারা একথা মনে করছিল যে, তাদের একদিন আল্লাহর সাথে মোলাকাত করতে হবে, তারা বললো ঃ "অনেক বারই দেখা গেছে, স্বল্প সংখ্যক লোকের একটি দল আল্লাহর হুকুমে একটি বিরাট দলের ওপর বিজয় লাভ করেছে। আল্লাহ সবরকারীদের সাথি।"*

২৭০. এ প্রসংগে বাইবেলের বর্ণনা কুরআন থেকে বেশ কিছুটা বিভিন্ন। তবুও এ থেকে আসল ঘটনার যথেষ্ট বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এ থেকে জানা যায়, এ সিন্দুকটির জন্য বনী ইসরাঈলদের মধ্যে একটি বিশেষ পরিভাষার সৃষ্টি হয়েছিল। সেটি হচ্ছে 'অংগীকার সিন্দুক।' এক যুদ্ধে ফিলিস্তিনী মুশরিকরা বনী ইসরাঈলদের থেকে এটি ছিনিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু মুশরিকদের যে শহর ও যে জনপদে এটি রাখা হতো সেখানেই

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٥٠﴾ فَهَزَمُوْهُمْ
بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ
لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٥١﴾ تِلْكَ
اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٥٢﴾

আর যখন তারা জালুত ও তার সেনাদলের মোকাবিলায় বের হলো, তারা দোয়া করলো ঃ "হে আমাদের রব! আমাদের সবর দান করো, আমাদের অবিচলিত রাখ এবং এই কাফের দলের ওপর আমাদের বিজয় দান করো।" অবশেষে আল্লাহর হুকুমে তারা কাফেরদের পরাজিত করলো। আর দাউদ[২৭৩] জালুতকে হত্যা করলো এবং আল্লাহ তাকে রাজ্য ও প্রজ্ঞা দান করলেন আর এই সাথে যা যা তিনি চাইলেন তাকে শিখিয়ে দিলেন। এভাবে আল্লাহ যদি মানুষদের একটি দলের সাহায্যে আর একটি দলকে দমন না করতে থাকতেন, তাহলে পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা বিপর্যস্ত হতো।[২৭৪] কিন্তু দুনিয়াবাসীদের ওপর আল্লাহর অপার করুণা (যে, তিনি এভাবে বিপর্যয় রোধের ব্যবস্থা করতেন)।

এগুলো আল্লাহর আয়াত। আমি ঠিকমতো এগুলো তোমাকে শুনিয়ে যাচ্ছি। আর তুমি নিশ্চিতভাবে প্রেরিত পুরুষদের (রসূলদের) অন্তরভুক্ত।

মহামারীর প্রাদুর্ভাব হতে থাকতো ব্যাপকভাবে। অবশেষে তারা সিন্দুকটি একটি গরুর গাড়ির ওপর রেখে হাঁকিয়ে দিয়েছিল। সম্ভবত এ বিষয়টিকে কুরআন এভাবে বর্ণনা করেছে যে, সেটি তখন ফেরেশতাদের রক্ষণাধীনে ছিল। কারণ সেই গাড়িটিতে কোন চালক না বসিয়ে তাকে হাঁকিয়ে দেয়া হয়েছিল। আর আল্লাহর হুকুমে তাকে হাঁকিয়ে বনী ইসরাঈলদের দিকে নিয়ে আসা ছিল ফেরেশতাদের কাজ। আর এই সিন্দুকের "মধ্যে রয়েছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য মানসিক প্রশান্তির সামগ্রী"—একথার অর্থ বাইবেলের বর্ণনা থেকে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে, বনী ইসরাঈল এই সিন্দুকটিকে অত্যন্ত বরকতপূর্ণ এবং নিজেদের বিজয় ও সাফল্যের প্রতীক মনে করতো। এটি তাদের হাতছাড়া হবার পর সমগ্র জাতির মনোবল ভেঙে পড়ে। প্রত্যেক ইসরাঈলী মনে করতে থাকে, আমাদের ওপর থেকে আল্লাহর রহমত উঠে গেছে এবং আমাদের

দুর্ভাগ্যের দিন শুরু হয়ে গেছে। কাজেই সিন্দুকটি ফিরে আসায় সমগ্র জাতির মনোবল ব্যাপকহারে বেড়ে যায়। তাদের ভাঙা মনোবল আবার জোড়া লেগে যায়। এভাবে এটি তাদের মানসিক প্রশান্তির কারণে পরিণত হয়।

"মূসা ও হারুনের পরিবারের পরিত্যক্ত বরকতপূর্ণ জিনিসপত্র" এই সিন্দুকে রক্ষিত ছিল। এর অর্থ হচ্ছে, 'তূর-ই-সিনাই'-এ (সিনাই পাহাড়) মহান আল্লাহ হযরত মূসাকে পাথরের যে তখতিগুলো দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও হযরত মূসা নিজে লিখিয়ে তাওরাতের যে কপিটি বনী লাভীকে দিয়েছিলেন সেই মূল পাণ্ডুলিপিটিও এর মধ্যে ছিল। একটি বোতলে কিছুটা 'মান্না'ও এর মধ্যে রক্ষিত ছিল, যাতে পরবর্তী বংশধররা আল্লাহর সেই মহা অনুগ্রহের কথা স্মরণ করতে পারে, যা মহান আল্লাহ উযর মরুর বুকে তাদের বাপ-দাদাদের ওপর বর্ষণ করেছিলেন। আর সম্ভবত অসাধারণ মু'জিযা তথা মহা অলৌকিক কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু হযরত মূসার সেই বিখ্যাত 'আসা'ও এর মধ্যে ছিল।

২৭১. সম্ভবত এটি জর্দান নদী অথবা অন্য কোন নদী, উপনদী বা শাখা নদী হতে পারে। তালূত বনী ইসরাঈলের সেনাবাহিনী নিয়ে এই নদীর তীরে অবস্থান করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি জানতেন, এই জাতির নৈতিক সংযমের মাত্রা অনেক কম, তাই তিনি কর্মঠ ও অকর্মণ্য লোকদের আলাদা করার জন্য এই প্রস্তাবটি পেশ করেন। বলা বাহুল্য যারা মাত্র সামান্য ক্ষণের জন্য নিজেদের পিপাসা সংযত করতে পারে না, তাদের থেকে কেমন করে আশা করা যেতে পারে যে, তারা দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে এমন একদল শত্রুর মোকাবিলা করবে, যাদের কাছে তারা ইতিপূর্বে হেরে গিয়েছিল?

২৭২. সম্ভবত এ বাক্যটি তারাই উচ্চারণ করেছিল, যারা নদীর তীরে ইতিপূর্বেই নিজেদের ধৈর্যহীনতার প্রকাশ ঘটিয়েছিল।

২৭৩. দাউদ আলাইহিস সালাম এ সময় ছিলেন একজন কম বয়েসী যুবক। ঘটনাক্রমে তালূতের সেনাবাহিনীতে তিনি এমন এক সময় পৌঁছেছিলেন যখন ফিলিস্তিনী সেনাদলের জবরদস্ত পাহলোয়ান জালূত (জুলিয়েট) বনী ইসরাঈলী সেনাদলকে প্রত্যক্ষ মুকাবিলায় আসার জন্য আহবান জানাচ্ছিল এবং ইসরাঈলীদের মধ্য থেকে একজনও তার সাথে মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল না। এ অবস্থা দেখে হযরত দাউদ (আ) নির্ভয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং জালূতকে হত্যা করলেন। এ ঘটনায় তিনি হয়ে উঠলেন ইসরাঈলীদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তালূত নিজের মেয়ের সাথে তাঁর বিয়ে দিলেন। অবশেষে তিনিই হলেন ইসরাঈলীদের শাসক। (বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন ১ম সামুয়েল ১৭ ও ১৮ অধ্যায়)।

২৭৪. পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ যে পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন তা হচ্ছে এই যে, তিনি বিভিন্ন মানব গোষ্ঠী ও দলকে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত দুনিয়ায় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভের সুযোগ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখনই কোন দল সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে তখনই তিনি অন্য একটি দলের সাহায্যে তার শক্তির দর্প চূর্ণ করে দেন। কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা যদি চিরন্তনভাবে একটি জাতি ও একটি দলের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে রাখা হতো এবং তার ক্ষমতার দাপট ও জুলুম-নির্যাতন হতো সীমাহীন ও অশেষ, তাহলে নিসন্দেহে আল্লাহর এই রাজ্যে মহা বিপর্যয় নেমে আসতো।

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ
بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ
مَنْ كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾

এই রসূলদের (যারা আমার পক্ষ থেকে মানবতার হিদায়াতের জন্য নিযুক্ত) একজনকে আর একজনের ওপর আমি অধিক মর্যাদাশালী করেছি। তাদের কারোর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, কাউকে তিনি অন্য দিক দিয়ে উন্নত মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন, অবশেষে ঈসা ইবনে মারয়ামকে উজ্জ্বল নিশানীসমূহ দান করেছেন এবং পবিত্র রূহের মাধ্যমে তাকে সাহায্য করেছেন। যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে এই রসূলদের পর যারা উজ্জ্বল নিশানীসমূহ দেখেছিল তারা কখনো পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হতো না। কিন্তু (লোকদেরকে বলপূর্বক মতবিরোধ থেকে বিরত রাখা আল্লাহর ইচ্ছা ছিল না, তাই) তারা পরস্পর মতবিরোধ করলো, তারপর তাদের মধ্য থেকে কেউ ঈমান আনলো আর কেউ কুফরীর পথ অবলম্বন করলো। হাঁ, আল্লাহ চাইলে তারা কখনো যুদ্ধে লিপ্ত হতো না, কিন্তু আল্লাহ যা চান, তাই করেন।[২৭৫]

২৭৫. অর্থাৎ রসূলদের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করার পর মানুষের মধ্যে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে এবং মতবিরোধ থেকে আরো এগিয়ে গিয়ে ব্যাপক যুদ্ধ পর্যন্ত গড়িয়েছে, এর কারণ এ ছিল না যে, নাউযুবিল্লাহ আল্লাহ অক্ষম ছিলেন এবং এই মতবিরোধ ও যুদ্ধ থেকে মানুষকে বিরত রাখার শক্তি তাঁর ছিল না। তিনি চাইলে নবীদের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার সাধ্য কারো ছিল না। কেউ কুফরী ও বিদ্রোহের পথে চলতে পারতো না। আল্লাহর দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করার ক্ষমতা কারো থাকতো না। কিন্তু মানুষের কাছ থেকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি ও সংকল্প ছিনিয়ে নিয়ে তাকে একটি বিশেষ কর্মনীতি অবলম্বন করতে বাধ্য করা তাঁর ইচ্ছাই ছিল না। তিনি পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মানুষকে এ পৃথিবীতে পয়দা করেছেন। তাই তাকে বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে নির্বাচন ও বাছাই করার স্বাধীনতা দান করেছেন। নবীদেরকে তিনি মানুষের ওপর দারোগা বানিয়ে পাঠাননি। কাজেই জোর জবরদস্তি করে তাদেরকে ঈমান ও আনুগত্যের পথে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা তাঁরা করেননি। বরং নবীদেরকে তিনি পাঠান যুক্তি–প্রমাণের সাহায্যে মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহবান জানাবার জন্য। কাজেই যতো মতবিরোধ ও যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে তার

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ
لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ۭ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٥٤﴾ اَللّٰهُ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۭ لَهٗ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۭ
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ
عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاۗءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـــُٔـوْدُهٗ
حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾

৩৪ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদের যা কিছু ধন-সম্পদ দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো,[২৭৬] সেই দিনটি আসার আগে, যেদিন কেনাবেচা চলবে না, বন্ধুত্ব কাজে লাগবে না এবং কারো কোন সুপারিশও কাজে আসবে না। আর জালেম আসলে সেই ব্যক্তি যে কুফরী নীতি অবলম্বন করে।[২৭৭]

আল্লাহ এমন এক চিরঞ্জীব ও চিরন্তন সত্তা যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের দায়িত্বভার বহন করছেন, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।[২৭৮] তিনি ঘুমান না এবং তন্দ্রাও তাঁকে স্পর্শ করে না।[২৭৯] পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু আছে সবই তাঁর।[২৮০] কে আছে তাঁর অনুমতি চাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে?[২৮১] যা কিছু মানুষের সামনে আছে তা তিনি জানেন এবং যা কিছু তাদের অগোচরে আছে সে সম্পর্কেও তিনি অবগত। তিনি নিজে যে জিনিসের জ্ঞান মানুষকে দিতে চান সেটুকু ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারে না।[২৮২] তাঁর কর্তৃত্ব[২৮৩] আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপী। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত করে না। মূলত তিনিই এক মহান ও শ্রেষ্ঠ সত্তা।[২৮৪]

পেছনে এই একটি মাত্র কাজ করেছে যে, আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন আর তাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। এই মতবিরোধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহগুলোর কারণ এই ছিল না যে, আল্লাহ তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথে চালাতে চাইছিলেন কিন্তু নাউযুবিল্লাহ এ ব্যাপারে তিনি সফলকাম হতে পারেননি।

২৭৬. অর্থাৎ আল্লাহর পথে ব্যয় করো। বলা হচ্ছে, যারা ঈমানের পথ অবলম্বন করেছে, যে উদ্দেশ্যে তারা এই পথে পাড়ি দিয়েছে সেই উদ্দেশ্য সম্পাদনের লক্ষে তাদের আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

২৭৭. এখানে কুফরী নীতি অবলম্বনকারী বলতে এমন সব লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের তুলনায় নিজের ধন-সম্পদকে অধিক প্রিয় মনে করে অথবা যারা সেই দিনটির ওপর আস্থা রাখে না যে দিনটির আগমনের ভয় দেখানো হয়েছে। যারা এই ভিত্তিহীন ধারণা পোষণ করে যে, আখেরাতে তারা কোন না কোনভাবে নাজাত ও সাফল্য কিনে নিতে সক্ষম হবে এবং বন্ধুত্ব ও সুপরিবেশের সাহায্যে নিজেদের কার্যোদ্ধার করতে সক্ষম হবে, এখানে তাদেরকেও বুঝানো হতে পারে।

২৭৮. অর্থাৎ মূর্খতা নিজেদের কল্পনা ও ভাববাদিতার জগতে বসে যত অসংখ্য উপাস্য, ইলাহ ও মাবুদ তৈরি করুক না কেন আসলে কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও শাসন কর্তৃত্ব নিরংকুশভাবে একমাত্র সেই অবিনশ্বর সত্তার অংশীভূত, যাঁর জীবন কারো দান নয় বরং নিজস্ব জীবনী শক্তিতে যিনি স্বয়ং জীবিত এবং যাঁর শক্তির ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে এই বিশ্ব-জাহানের সমগ্র ব্যবস্থাপনা। নিজের এই বিশাল সীমাহীন রাজ্যের যাবতীয় শাসন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক তিনি একাই। তাঁর গুণাবলীতে দ্বিতীয় কোন সত্তার অংশীদারীত্ব নেই। তাঁর ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও অধিকারেও নেই দ্বিতীয় কোন শরীক। কাজেই তাঁকে বাদ দিয়ে বা তাঁর সাথে শরীক করে পৃথিবীতে বা আকাশে কোথাও আর কাউকে মাবুদ ইলাহ ও প্রভু বানানো হলে তা একটি নিরেট মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই হয় না। এভাবে আসলে সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

২৭৯. মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর সত্তাকে যারা নিজেদের দুর্বল অস্তিত্বের সদৃশ মনে করে এবং যাবতীয় মানবিক দুর্বলতাকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে, এখানে তাদের চিন্তা ও ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। যেমন বাইবেলের বিবৃতি মতে, আল্লাহ ছয় দিনে পৃথিবী ও আকাশ তৈরি করেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম নেন।

২৮০. অর্থাৎ তিনি পৃথিবী ও আকাশের এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক। তাঁর মালিকানা, কর্তৃত্ব ও শাসন পরিচালনায় কারো এক বিন্দু পরিমাণও অংশ নেই। তাঁর পরে এই বিশ্ব-জাহানের অন্য যে কোন সত্তার কথাই চিন্তা করা হবে সে অবশ্যই হবে এই বিশ্ব-জগতের একটি সৃষ্টি। আর বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি অবশ্যি হবে আল্লাহর মালিকানাধীন এবং তাঁর দাস। তাঁর অংশীদার ও সমকক্ষ হবার কোন প্রশ্নই এখানে ওঠে না।

২৮১. এখানে এক শ্রেণীর মুশরিকদের চিন্তার প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা বুযর্গ ব্যক্তিবর্গ, ফেরেশতা বা অন্যান্য সত্তা সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহর ওখানে তাদের বিরাট প্রতিপত্তি। তারা যে কথার ওপর অটল থাকে, তা তারা আদায় করেই ছাড়ে। আর আল্লাহর কাছ থেকে তারা যে কোন কার্যোদ্ধার করতে সক্ষম। এখানে তাদেরকে বলা হচ্ছে, আল্লাহর ওখানে প্রতিপত্তির তো কোন প্রশ্নই ওঠে না, এমনকি

কোন শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বর এবং কোন নিকটতম ফেরেশতাও এই পৃথিবী ও আকাশের মালিকের দরবারে বিনা অনুমতিতে একটি শব্দও উচ্চারণ করার সাহস রাখে না।

২৮২. এই সত্যটি প্রকাশের পর শিরকের ভিত্তির ওপর আর একটি আঘাত পড়লো। ওপরের বাক্যগুলোয় আল্লাহর অসীম কর্তৃত্ব ও তার সাথে সম্পর্কিত ক্ষমতাবলী সম্পর্কে একটা ধারণা পেশ করে বলা হয়েছিল, তাঁর কর্তৃত্বে স্বতন্ত্রভাবে কেউ শরীক নেই এবং কেউ নিজের সুপারিশের জোরে তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতাও রাখে না। অতপর এখানে অন্যভাবে বলা হচ্ছে, অন্য কেউ তাঁর কাজে কিভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে যখন তার কাছে এই বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা এবং এর অন্তর্নিহিত কার্যকারণ ও ফলাফল বুঝার মতো কোন জ্ঞানই নেই? মানুষ, জিন, ফেরেশতা বা অন্য কোন সৃষ্টিই হোক না কেন সবার জ্ঞান অপূর্ণ ও সীমিত। বিশ্ব-জাহানের সমগ্র সত্য ও রহস্য কারো দৃষ্টিসীমার মধ্যে নেই, তারপর কোন একটি ক্ষুদ্রতর অংশেও যদি কোন মানুষের স্বাধীন হস্তক্ষেপ অথবা জবরদস্ত সুপারিশ কার্যকর হয় তাহলে তো বিশ্ব-জগতের সমগ্র ব্যবস্থাপনাই ওলট-পালট হয়ে যবে। বিশ্ব-জগতের ব্যবস্থাপনা তো দূরের কথা মানুষ নিজের ব্যক্তিগত ভালোমন্দ বুঝারও ক্ষমতা রাখে না। বিশ্ব-জাহানের প্রভু ও পরিচালক মহান আল্লাহই এই ভালোমন্দের পুরোপুরি জ্ঞান রাখেন। কাজেই এ ক্ষেত্রে জ্ঞানের মূল উৎস মহান আল্লাহর হিদায়াত ও পথনির্দেশনার ওপর আস্থা স্থাপন করা ছাড়া মানুষের জন্য দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই।

২৮৩. কুরআনে উল্লেখিত মূল শব্দ হচ্ছে 'কুরসী'। সাধারণত এ শব্দটি কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও রাষ্ট্রশক্তি অর্থে রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। (বাংলা ভাষায় এরি সমজাতীয় শব্দ হচ্ছে 'গদি'। গদির লড়াই বললে ক্ষমতা কর্তৃত্বের লড়াই বুঝায়)।

২৮৪. এই আয়াতটি আয়াতুল কুরসী নামে খ্যাত। এখানে মহান আল্লাহর এমন পূর্ণাংগ পরিচিতি পেশ করা হয়েছে, যার নজীর আর কোথাও নেই। তাই হাদীসে একে কুরআনের শ্রেষ্ঠ আয়াত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এখানে কোন্ প্রসংগে বিশ্ব-জাহানের মালিক মহান আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী আলোচনা করা হয়েছে? এ বিষয়টি বুঝতে হলে ৩২ রুকূ' থেকে যে আলোচনাটি চলছে তার ওপর আর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিতে হবে। প্রথমে মুসলমানদের ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য ধন-প্রাণ উৎসর্গ করে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়। বনী ইসরাঈলরা যেসব দুর্বলতার শিকার হয়েছিল তা থেকে দূরে থাকার জন্য তাদের জোর তাগিদ দেয়া হয়। তারপর তাদেরকে এ সত্যটি বুঝানো হয় যে, বিজয় ও সাফল্য সংখ্যা ও যুদ্ধাস্ত্রের আধিক্যের ওপর নির্ভর করে না বরং ঈমান, সবর, সংযম, নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও সংকল্পের দৃঢ়তার ওপর নির্ভর করে। অতপর যুদ্ধের সাথে আল্লাহর যে কর্মনীতি সম্পর্কিত রয়েছে সেদিকে ইংগিত করা হয়। অর্থাৎ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তিনি সবসময় মানুষদের একটি দলের সাহায্যে আর একটি দলকে দমন করে থাকেন। নয়তো যদি শুধুমাত্র একটি দল স্থায়ীভাবে বিজয় লাভ করে কর্তৃত্ব ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতো তাহলে দুনিয়ায় অন্যদের জীবন ধারা কঠিন হয়ে পড়তো।

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ
لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا
يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ
الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

দীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।[২৮৫] ভ্রান্ত মত ও পথ থেকে সঠিক মত ও পথকে ছাঁটাই করে আলাদা করে দেয়া হয়েছে। এখন যে কেউ তাগুতকে[২৮৬] অস্বীকার করে আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, সে এমন একটি মজবুত অবলম্বন আঁকড়ে ধরে, যা কখনো ছিন্ন হয় না। আর আল্লাহ যাকে সে অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে সবকিছু শোনেন ও জানেন। যারা ঈমান আনে আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ও সহায়। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন।[২৮৭] আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করে তাদের সাহায্যকারী ও সহায় হচ্ছে তাগুত।[২৮৮] সে তাদেরকে আলোক থেকে অন্ধকারের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। এরা আগুনের অধিবাসী। সেখানে থাকবে এরা চিরকালের জন্য।

আবার এ প্রসংগে অজ্ঞ লোকদের মনে আরো যে একটি প্রশ্ন প্রায়ই জাগে তারও জবাব দেয়া হয়েছে। সে প্রশ্নটি হচ্ছে, আল্লাহ যদি তাঁর নবীদেরকে মতবিরোধ খতম করার ও ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য পাঠিয়ে থাকেন এবং তাদের আগমনের পরও মতবিরোধ ও ঝগড়া-বিবাদ খতম না হয়ে থাকে তাহলে কি আল্লাহ এতই দুর্বল যে, এই গলদগুলো দূর করতে চাইলেও তিনি দূর করতে পারেননি? এর জবাবে বলা হয়েছে, বলপূর্বক মতবিরোধ বন্ধ করা এবং মানব জাতিকে জোর করে একটি বিশেষ পথে পরিচালনা করা আল্লাহর ইচ্ছা ছিল না। যদি এটা আল্লাহর ইচ্ছা হতো তাহলে তার বিরুদ্ধাচরণ করার কোন ক্ষমতাই মানুষের থাকতো না। আবার যে মূল বিষয়বস্তুর মাধ্যমে আলোচনার সূচনা করা হয়েছিল একটি বাক্যের মধ্যে সেদিকেও ইংগিত করা হয়েছে। এর পর এখন বলা হচ্ছে, মানুষের আকীদা-বিশ্বাস, আদর্শ-মতবাদ ও ধর্ম যতই বিভিন্ন হোক না কেন আসল ও প্রকৃত সত্য যার ওপর আকাশ ও পৃথিবীর সমগ্র ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত, এই আয়াতেই বিবৃত হয়েছে। মানুষ এ সম্পর্কে ভুল ধারণা করলেই বা কি, এ জন্য মূল

সত্যের তো কোন চেহারা বদল হবে না। কিন্তু লোকদেরকে এটা মানতে বাধ্য করানো আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়।..... যে ব্যক্তি এটা মেনে নেবে সে নিজেই লাভবান হবে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২৮৫. এখানে দীন বলতে ওপরের আয়াতে বর্ণিত আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহ সম্পর্কিত আকীদা ও সেই আকীদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থা বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, 'ইসলাম' এর এই আকীদাগত এবং নৈতিক ও কর্মগত ব্যবস্থা কারো ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে না। যেমন কাউকে ধরে তার মাথায় জোর করে একটা বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়, এটা তেমন নয়।

২৮৬. আভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে 'তাগুত' বলা হবে, যে নিজের বৈধ অধিকারের সীমানা লংঘন করেছে। কুরআনের পরিভাষায় তাগুত এমন এক বান্দাকে বলা হয়, যে বন্দেগী ও দাসত্বের সীমা অতিক্রম করে নিজেই প্রভু ও খোদা হবার দাবীদার সাজে এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজের বন্দেগী ও দাসত্বে নিযুক্ত করে। আল্লাহর মোকাবিলায় বান্দার প্রভুত্বের দাবীদার সাজার এবং বিদ্রোহ করার তিনটি পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায় বান্দা নীতিগতভাবে তাঁর শাসন কর্তৃত্বকে সত্য বলে মেনে নেয় কিন্তু কার্যত তার বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে। একে বলা হয় ফাসেকী। দ্বিতীয় পর্যায়ে সে আল্লাহর শাসন কর্তৃত্বকে নীতিগতভাবে মেনে না নিয়ে নিজের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় অথবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করতে থাকে। একে বলা হয় কুফরী। তৃতীয় পর্যায়ে সে মালিক ও প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার রাজ্যে এবং তার প্রজাদের মধ্যে নিজের হুকুম চালাতে থাকে। এই শেষ পর্যায়ে যে বান্দা পৌঁছে যায় তাকেই বলা হয় "তাগুত"। কোন ব্যক্তি এই তাগুতকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত কোন দিন সঠিক অর্থে আল্লাহর মু'মিন বান্দা হতে পারে না।

২৮৭. অন্ধকার মানে মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার। যে অন্ধকারে পথ হারিয়ে মানুষ নিজের কল্যাণ ও সাফল্যের পথ থেকে দূরে সরে যায় এবং সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের সমস্ত শক্তি ও প্রচেষ্টাকে ভুল পথে পরিচালিত করে, সেই অন্ধকারের কথা এখানে বলা হয়েছে।

২৮৮. "তাগুত" শব্দটি এখানে বহুবচন (তাওয়াগীত) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মানুষ একটি তাগুতের শৃংখলে আবদ্ধ হয় না বরং বহু তাগুত তার ওপর জেঁকে বসে। শয়তান একটি তাগুত। শয়তান তার সামনে প্রতিদিন নতুন নতুন আকাশ কুসুম রচনা করে তাকে মিথ্যা প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে রাখে। দ্বিতীয় তাগুত হচ্ছে মানুষের নিজের নফস। এই নফস তাকে আবেগ ও লালসার দাস বানিয়ে জীবনের আঁকাবাঁকা পথে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। এ ছাড়া বাইরের জগতে অসংখ্য তাগুত ছড়িয়ে রয়েছে। স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, পরিবার, বংশ, গোত্র, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতজন, সমাজ, জাতি, নেতা, রাষ্ট্র, দেশ, শাসক ইত্যাকার সবকিছুই মানুষের জন্য মূর্তিমান তাগুত। এদের প্রত্যেকেই তাকে নিজের স্বার্থের দাস হিসেবে ব্যবহার করে। মানুষ তার এই অসংখ্য প্রভুর দাসত্ব করতে করতে এবং এদের মধ্য থেকে কাকে সন্তুষ্ট করবে আর কার অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করবে এই ফিকিরের চক্করে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ
إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي
وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ
فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

৩৫ রুকূ'

তুমি[২৮৯] সেই ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করোনি, যে ইবরাহীমের সাথে তর্ক করেছিল?[২৯০] তর্ক করেছিল এই কথা নিয়ে যে, ইবরাহীমের রব কে? এবং তর্ক এ জন্য করেছিল যে, আল্লাহ তাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছিলেন।[২৯১] যখন ইবরাহীম বললো ঃ যার হাতে জীবন ও মৃত্যু তিনিই আমার রব। জবাবে সে বললো ঃ জীবন ও মৃত্যু আমার হাতে। ইবরাহীম বললো ঃ তাই যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে, আল্লাহ পূর্ব দিক থেকে সূর্য উঠান, দেখি তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উঠাও। একথা শুনে সেই সত্য অস্বীকারকারী হতবুদ্ধি হয়ে গেলো[২৯২] কিন্তু আল্লাহ জালেমদের সঠিক পথ দেখান না।

২৮৯. ওপরে দাবী করা হয়েছিল, মু'মিনের সহায় ও সাহায্যকারী হচ্ছেন আল্লাহ তিনি মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর মধ্যে নিয়ে যান আর কাফেরের সাহায্যকারী হচ্ছে তাগুত, সে তাকে আলোকের বুক থেকে টেনে অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে যায়। এখানে এ বিষয়টির ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করার জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দৃষ্টান্তটি এমন এক ব্যক্তির যার সামনে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ সহকারে সত্যকে পেশ করা হয় এবং সে তার সামনে নিরুত্তর হয়ে পড়ে। কিন্তু যেহেতু সে আগে থেকেই নিজের লাগাম তাগুতের হাতে সঁপে দিয়েছিল তাই সত্যের উলংগ প্রকাশের পরও সে আলোর রাজ্যে পা দিতে পারেনি। অন্ধকারের অথৈ সমুদ্রে আগের মতোই সে হাবুডুবু খেতে থাকে। পরবর্তী দৃষ্টান্ত দু'টি এমন দুই ব্যক্তির যারা আল্লাহর সাহায্যের দিকে হাত বাড়ান। ফলে আল্লাহ তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর রাজ্যে এমনভাবে টেনে আনেন যে, অদৃশ্য গোপন সত্যের সাথে তাদের চাক্ষুষ সাক্ষাত ঘটেও যায়।

২৯০. সেই ব্যক্তিটি হচ্ছে নমরুদ। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্বদেশভূমি ইরাকের বাদশাহ ছিল এই নমরুদ। এখানে যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে বাইবেলে তার প্রতি কোন ইংগিত নেই। তবে তালমূদে এই সমগ্র ঘটনাটিই বিবৃত হয়েছে। কুরআনের

সাথে তার ব্যাপক মিলও রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ হযরত ইবরাহীমের (আ) পিতা নমরুদের দরবারে প্রধান রাষ্ট্রীয় কর্মচারীর (Chief officer of the state) পদে অধিষ্ঠিত ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) যখন প্রকাশ্যে শিরকের বিরোধিতা ও তাওহীদের প্রচার শুরু করেন এবং দেব-মন্দিরে প্রবেশ করে প্রতিমাগুলো ভেঙে দেন তখন তাঁর পিতা নিজেই বাদশাহর দরবারে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা পেশ করে তারপর বাদশাহর সাথে তাঁর যে বিতর্কালাপ হয় তাই এখানে উল্লেখিত হয়েছে।

২৯১. অর্থাৎ যে বিষয়টি নিয়ে এ বিতর্ক চলছিল সেটি ছিল এই যে ইবরাহীম (আ) কাকে নিজের রব বলে মানেন? আর এ বিতর্কটি সৃষ্টি হবার কারণ ছিল এই যে, বিতর্ককারী ব্যক্তি অর্থাৎ নমরুদকে আল্লাহ রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছিলেন। এই দু'টি বাক্যের মধ্যে বিতর্কের ধরনের প্রতি যে ইংগিত করা হয়েছে তা বুঝবার জন্য নিম্নলিখিত বাস্তব বিষয়গুলো সামনে রাখা প্রয়োজন।

এক ঃ প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মুশরিক সমাজগুলোর এই সম্মিলিত বৈশিষ্ট দেখা গেছে যে, তারা আল্লাহকে সকল খোদার প্রধান খোদা, প্রধান উপাস্য ও পরমেশ্বর হিসেবে মেনে নেয় কিন্তু একমাত্র তাঁকেই আরাধ্য, উপাস্য, মাবুদ ও খোদা হিসেবে মানতে প্রস্তুত হয় না।

দুই ঃ আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে মুশরিকরা চিরকাল দু'ভাগে বিভক্ত করে এসেছে। একটি হচ্ছে, অতি প্রাকৃতিক (Supernatural) খোদায়ী ক্ষমতা। কার্যকারণ পরম্পরার ওপর এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত এবং মুশরিকরা নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার ও সংকট উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এর দোহাই দেয়। এই খোদায়ীর ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর সাথে অতীতের পুন্যবান লোকদের আত্মা, ফেরেশতা (দেবতা), জিন, নক্ষত্র এবং আরো অসংখ্য সত্তাকে শরীক করে। তাদের কাছে প্রার্থনা করে। পূজা ও উপাসনার অনুষ্ঠানাদি তাদের সামনে সম্পাদন করে। তাদের আস্তানায় ভেট ও নজরানা দেয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের খোদায়ী (অর্থাৎ শাসন কর্তৃত্ব) ক্ষমতা। জীবন বিধান নির্ধারণ করার ও নির্দেশের আনুগত্য লাভ করার অধিকার তার আয়ত্বাধীন থাকে। পার্থিব বিষয়াবলীর ওপর শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্ণ ক্ষমতা তার থাকে। দুনিয়ার সকল মুশরিক সম্প্রদায় প্রায় প্রতি যুগে এই দ্বিতীয় প্রকারের খোদায়ী কর্তৃত্বকে আল্লাহর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অথবা তার সাথে রাজপরিবার, ধর্মীয় পুরোহিত ও সমাজের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালের মনীষীদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছে। বেশীর ভাগ রাজপরিবার এই দ্বিতীয় অর্থে খোদায়ীর দাবীদার হয়েছে। তাদের এই দাবীকে শক্তিশালী করার জন্য আবার তারা সাধারণভাবে প্রথম অর্থের খোদাদের সন্তান হবার দাবী করেছে। এ ব্যাপারে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো তাদের ষড়যন্ত্রে অংশীদার হয়েছে।

তিন ঃ নমরুদের খোদায়ী দাবীও এই দ্বিতীয় ধরনের ছিল। সে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না। নিজেকে পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা ও পরিচালক বলে সে দাবী করতো না। সে একথা বলতো না যে, বিশ্ব-জগতের সমস্ত কার্যকারণ পরম্পরার ওপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। বরং তার দাবী ছিল, আমি এই ইরাক দেশ এবং এর অধিবাসীদের একচ্ছত্র অধিপতি। আমার মুখের কথাই এ দেশের আইন। আমার ওপর আর কারো কর্তৃত্ব নেই। কারো সামনে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে না। ইরাকের যে কোন

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ
يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ
قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ
مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ
وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا
لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

অথবা দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই ব্যক্তিকে দেখো যে এমন একটি লোকালয় অতিক্রম করেছিল, যার গৃহের ছাদগুলো উপুড় হয়ে পড়েছিল।[২৯৩] সে বললো ঃ এই ধ্বংসপ্রাপ্ত জনবসতি, একে আল্লাহ আবার কিভাবে জীবিত করবেন?[২৯৪] একথায় আল্লাহ তার প্রাণ হরণ করলেন এবং সে একশো বছর পর্যন্ত মৃত পড়ে রইলো। তারপর আল্লাহ পুনর্বার তাকে জীবন দান করলেন, এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ বলো, তুমি কত বছর পড়েছিলে? জবাব দিল ঃ এই, এক দিন বা কয়েক ঘন্টা পড়েছিলাম। আল্লাহ বললেন ঃ "বরং একশোটি বছর এই অবস্থায় তোমার ওপর দিয়ে চলে গেছে। এবার নিজের খাবার ও পানীয়ের ওপর একবার নজর বুলাও, দেখো তার মধ্যে কোন সামান্য পরিবর্তনও আসেনি। অন্যদিকে তোমার গাধাটিকে দেখো (তার পাঁজরগুলোও পচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে)। আর এটা আমি এ জন্য করেছি যে, মানুষের জন্য তোমাকে আমি একটি নিদর্শন হিসেবে দাঁড় করাতে চাই।[২৯৫] তারপর দেখো, এই অস্থিপাঁজরটি, কিভাবে একে উঠিয়ে এর গায়ে গোশত ও চামড়া লাগিয়ে দিই।" এভাবে সত্য যখন তার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো তখন সে বলে উঠলো ঃ "আমি জানি, আল্লাহ সবকিছুর ওপর শক্তিশালী।"

ব্যক্তি এসব দিক দিয়ে আমাকে রব বলে মেনে নেবে না অথবা আমাকে বাদ দিয়ে আর কাউকে রব বলে মেনে নেবে, সে বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক।

চার ঃ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন বললেন, আমি একমাত্র রব্বুল আলামীনকে খোদা, মাবুদ ও রব বলে মানি, তাঁর ছাড়া আর সবার খোদায়ী, প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব অস্বীকার করি, তখন কেবল এতটুকু প্রশ্ন সেখানে দেখা দেয়নি যে, জাতীয় ধর্ম ও ধর্মীয় মাবুদদের ব্যাপারে তাঁর এই নতুন আকীদা ও বিশ্বাস কতটুকু সহনীয়, বরং এই প্রশ্নও দেখা দিয়েছে যে, জাতীয় রাষ্ট্র ও তার কেন্দ্রীয় ক্ষমতা-কর্তৃত্বের ওপর এই বিশ্বাস যে আঘাত

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ۖ قَالَ أَوَلَمْ
تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ
الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ
ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

আর সেই ঘটনাটিও সামনে রাখো, যখন ইবরাহীম বলেছিল ঃ "আমার প্রভু! আমাকে দেখিয়ে দাও কিভাবে তুমি মৃতদের পুনর্জীবিত করো।" বললেন ঃ তুমি কি বিশ্বাস করো না? ইবরাহীম জবাব দিল ঃ বিশ্বাস তো করি, তবে মানসিক নিশ্চিন্ততা লাভ করতে চাই।[২৯৬] বললেন ঃ ঠিক আছে, তুমি চারটি পাখি নাও এবং তাদেরকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও। তারপর তাদের এক একটি অংশ এক একটি পাহাড়ের ওপর রাখো। এরপর তাদেরকে ডাকো। তারা তোমার কাছে দৌড়ে চলে আসবে। ভালোভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়।[২৯৭]

হানছে তাকে উপেক্ষা করা যায় কেমন করে? এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ) বিদ্রোহের অপরাধে নমরুদের সামনে আনীত হন।

২৯২. যদিও হযরত ইবরাহীমের (আ) প্রথম বাক্যে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ রব হতে পারে না তবুও নমরুদ হঠধর্মিতার পরিচয় দিয়ে নির্লজ্জের মতো তার জবাব দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যের পর তার জন্য আবার হঠধর্মী হবার আর কোন সুযোগই ছিল না। সে নিজেও জানতো, চন্দ্র-সূর্য সেই আল্লাহরই হুকুমের অধীন যাকে ইবরাহীম রব বলে মেনে নিয়েছে। এরপর তার কাছে আর কি জবাব থাকতে পারে? কিন্তু এভাবে তার সামনে যে দ্ব্যর্থহীন সত্য আত্মপ্রকাশ করেছিল তাকে মেনে নেয়ার মানেই ছিল নিজের স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রভুত্ব ও শাসন কর্তৃত্ব পরিহার করা। আর এই কর্তৃত্ব পরিহার করতে তার নফসের তাগুত মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কাজেই তার পক্ষে নিরুত্তর ও হতবুদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। আত্মপূজার অন্ধকার ভেদ করে সত্য প্রিয়তার আলোকে প্রবেশ করা তার পক্ষে সম্ভবপর হলো না। যদি এই তাগুতের পরিবর্তে আল্লাহকে সে নিজের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মেনে নিতো, তাহলে হযরত ইবরাহীমের প্রচার ও নসিহত প্রদানের পর তার জন্য সঠিক পথের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যেতো।

তালমূদের বর্ননা মতে তারপর সেই বাদশাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহীমকে বন্দী করা হয়। দশদিন তিনি কারাগারে অবস্থান করেন। অতপর বাদশাহর কাউন্সিল তাকে জীবন্ত

পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করার যে ঘটনা ঘটে তা সূরা আম্বিয়ার ৫ম রুকূ', আনকাবূতের ২য় ও ৩য় রুকূ' এবং আস সাফ্‌ফাতের ৪র্থ রুকূ'তে বর্ণিত হয়েছে।

২৯৩. এই ব্যক্তিটি কে ছিলেন, এবং লোকালয় কোনটি ছিল এ আলোচনা এখানে অপ্রয়োজনীয়। এখানে আসল বক্তব্য কেবল এতটুকু যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে সাহায্যকারী ও অভিভাবক বানিয়েছিলেন আল্লাহ কিভাবে তাকে আলোর রাজ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। ব্যক্তি ও স্থান নির্ধারণ করার কোন মাধ্যম আমাদের কাছে নেই এবং এতে কোন লাভও নেই। তবে পরবর্তী বর্ণনা থেকে প্রকাশ হয় যে, এখানে যার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তিনি নিশ্চয়ই কোন নবীই হবেন।

২৯৪. এ প্রশ্নের অর্থ এ নয় যে, সংশ্লিষ্ট বুযর্গ মৃত্যুর পরের জীবন অস্বীকার করতেন অথবা এ ব্যাপারে তাঁর মনে কোন সন্দেহ ছিল। বরং আসলে তিনি সত্যকে চাক্ষুষ দেখতে চাচ্ছিলেন, যেমন নবীদের দেখানো হয়ে থাকে।

২৯৫. দুনিয়াবাসী যাকে মৃত বলে জেনেছিল, এমন এক ব্যক্তির জীবিত হয়ে ফিরে আসা তার নিজের সমকালীন জনসমাজে তাকে একটি জীবন্ত নিদর্শনে পরিণত করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

২৯৬. অর্থাৎ সেই নিশ্চিন্ততা, যা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে লাভ করা যায়।

২৯৭. এই ঘটনাটি ও পূর্বোক্ত ঘটনাটির অনেকে অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের ব্যাপারে আল্লাহর যে নীতি রয়েছে, তা ভালোভাবে হৃদয়ংগম করতে সক্ষম হলে এ ব্যাপারে কোন প্রকার গোঁজামিল দেয়ার প্রয়োজনই দেখা দিতে পারে না। সাধারণ ঈমানদারদের এ জীবনে যে দায়িত্ব পালন করতে হবে সে জন্য নিছক ঈমান বিল গাইবই (না দেখে মেনে নেয়া) যথেষ্ট। কিন্তু নবীদের ওপর আল্লাহ যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন এবং যে নির্জলা সত্যগুলোর প্রতি দুনিয়াবাসীকে দাওয়াত দেয়ার জন্য তাঁরা আদিষ্ট হয়েছিলেন সেগুলোকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা তাঁদের জন্য অপরিহার্য ছিল। মানুষের সামনে সর্বশক্তি দিয়ে তাঁদের একথা বলার প্রয়োজন ছিল যে, তোমরা তো নিছক আন্দাজ অনুমান করে বলছো কিন্তু আমরা নিজেদের চর্মচক্ষে দেখা বিষয় তোমাদের বলছি। তোমাদের কাছে আছে আন্দাজ, অনুমান, ধারণা, কল্পনা, কিন্তু আমাদের কাছে রয়েছে দৃঢ় বিশ্বাসের জ্ঞানভাণ্ডার। তোমরা অন্ধ আর আমরা চক্ষুষ্মান। তাই নবীদের সামনে ফেরেশতারা আসতেন প্রকাশ্যে। তাঁদেরকে পৃথিবী ও আকাশের ব্যবস্থাপনা দেখানো হয়েছে। জান্নাত ও জাহান্নাম তাদেরকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করানো হয়েছে। মৃত্যুর পরের জীবনের প্রদর্শনী করে তাঁদেরকে দেখানো হয়েছে। নবীগণ নবুওয়াতের গুরুদায়িত্ব লাভ করার অনেক আগেই ঈমান বিল গাইবের পর্যায় অতিক্রম করে থাকেন। নবী হবার পর তাঁদেরকে দান করা হয় ঈমান বিশ্ শাহাদাতের (চাক্ষুষ জ্ঞানলব্ধ বিশ্বাস) নিয়ামত। এ নিয়ামত একমাত্র নবীদের জন্য নির্দিষ্ট। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা হূদের ১৭, ১৮, ১৯ ও ৩৪ টীকা)।

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ
لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ
يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾

৩৬ রুকূ'

যারা[২৯৮] নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে[২৯৯] তাদের ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঃ যেমন একটি শস্যবীজ বপন করা হয় এবং তা থেকে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয়, যার প্রত্যেকটি শীষে থাকে একশতটি করে শস্যকণা। এভাবে আল্লাহ যাকে চান, তার কাজে প্রাচুর্য দান করেন। তিনি মুক্তহস্ত ও সর্বজ্ঞ।[৩০০] যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর নিজেদের অনুগ্রহের কথা বলে বেড়ায় না আর কাউকে কষ্টও দেয় না, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের কাছে এবং তাদের কোন দুঃখ মর্মবেদনা ও ভয় নেই।[৩০১] একটি মিষ্টি কথা এবং কোন অপ্রীতিকর ব্যাপারে সামান্য উদারতা ও ক্ষমা প্রদর্শন এমনি দানের চেয়ে ভালো, যার পেছনে আসে দুঃখ ও মর্মজ্বালা। মূলত আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সহনশীলতাই তাঁর গুণ।[৩০২]

২৯৮. ইতিপূর্বে ৩২ রুকূ'তে যে বিষয়বস্তুর ওপর আলোচনা চলেছিল এখানে আবার সেই একই প্রসংগে ফিরে আসা হয়েছে। সেখানে সূচনাপর্বেই ঈমানদারদের প্রতি আহবান জানানো হয়েছিল, যে মহান উদ্দেশ্যের প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ, তার জন্য ধন-প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কোন দলের অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে নিজের দলগত বা জাতীয় স্বার্থের উর্ধে উঠে নিছক একটি উন্নত পর্যায়ের নৈতিক উদ্দেশ্য সম্পাদনে অকাতরে অর্থ ব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে না। বৈষয়িক ও ভোগবাদী লোকেরা, যারা কেবলমাত্র অর্থ উপার্জনের জন্য জীবন ধারণ করে, এক একটি পয়সার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত হয়ে যায় এবং লাভ-লোকসানের খতিয়ানের প্রতি সবসময় শ্যেন দৃষ্টি রেখে চলে, তারা কখনো মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের জন্য কিছু করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। আপাত দৃষ্টিতে

মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের জন্য তারা কিছু অর্থ ব্যয় করে ঠিকই কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তারা নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, বংশীয় বা জাতীয় বৈষয়িক লাভের হিসেব-নিকেশটা আগেই সেরে নেয়। এই মানসিকতা নিয়ে এমন একটি দীনের পথে মানুষ এক পাও অগ্রসর হতে পারবে না, যার দাবী হচ্ছে, পার্থিব লাভ-ক্ষতির পরোয়া না করে নিছক আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে নিজের সময়, শক্তি ও অর্থ ব্যয় করতে হবে। এই ধরনের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ভিন্নতর নৈতিক বৃত্তির প্রয়োজন। এ জন্য প্রসারিত দৃষ্টি, বিপুল মনোবল ও উদার মানসিকতা বিশেষ করে আল্লাহর নির্ভেজাল সন্তুষ্টি অর্জনের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। আর এই সংগে সমাজ জীবনে এমন ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, যার ফলে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ভোগবাদী ও বস্তুবাদী নৈতিকতার পরিবর্তে উপরোল্লিখিত নৈতিক গুণাবলীর বিকাশ সাধিত হবে। তাই এখান থেকে নিয়ে পরবর্তী তিন রুকূ' পর্যন্ত এই মানসিকতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় বিধান দেয়া হয়েছে।

২৯৯. ধন-সম্পদ যদি নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ব্যয় করা হয় অথবা পরিবার-পরিজন ও সন্তান সন্ততির ভরণ-পোষণের বা আত্মীয়-স্বজনের দেখাশুনা করার জন্য অথবা অভাবীদের সাহায্যার্থে বা জনকল্যাণমূলক কাজে এবং জিহাদের উদ্দেশ্যে, যে কোনভাবেই ব্যয় করা হোক না কেন, তা যদি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে ব্যয় করা হয় তাহলে তা আল্লাহর পথে ব্যয় করার মধ্যে গণ্য হবে।

৩০০. অর্থাৎ যে পরিমাণ আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও গভীর আবেগ-উদ্দীপনা সহকারে মানুষ আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতিদানও তত বেশী ধার্য হবে। যে আল্লাহ একটি শস্যকণায় এত বিপুল পরিমাণ বরকত দান করেন যে, তা থেকে সাতশোটি শস্যকণা উৎপন্ন হতে পারে, তাঁর পক্ষে মানুষের দান-খয়রাতের মধ্যে এমনভাবে বৃদ্ধি ও ক্রমবৃদ্ধি দান করা যার ফলে এক টাকা ব্যয় করলে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে প্রতিদানে সাতশো গুণ হয়ে ফিরে আসবে, মোটেই কোন অভাবনীয় ও কঠিন ব্যাপার নয়। এই বাস্তব সত্যটি বর্ণনা করার পর আল্লাহর দু'টি গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। একটি গুণ হচ্ছে, তিনি মুক্তহস্ত। তাঁর হাত সংকীর্ণ নয়। মানুষের কাজ প্রকৃতপক্ষে যতটুকু উন্নতি, বৃদ্ধি ও প্রতিদান লাভের যোগ্য, তা তিনি দিতে অক্ষম, এমনটি হতে পারে না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তিনি সর্বজ্ঞ। অর্থাৎ তিনি কোন বিষয়ে বেখবর নন। যা কিছু মানুষ ব্যয় করে এবং যে মনোভাব, আবেগ ও প্রেরণাসহকারে ব্যয় করে, সে সম্পর্কে তিনি অনবহিত থাকবেন, ফলে মানুষ যথার্থ প্রতিদান লাভে বঞ্চিত হবে, এমনটিও হতে পারে না।

৩০১. অর্থাৎ যাদের প্রতিদান নষ্ট হবার কোন ভয় নেই এবং তারা নিজেদের এই অর্থ ব্যয়ের কারণে লজ্জিত হবে, এমন ধরনের কোন অবস্থারও সৃষ্টি হবে না।

৩০২. এই একটি বাক্যের মধ্যে দু'টি কথা বলা হয়েছে। এক, আল্লাহ তোমাদের দান-খয়রাতের মুখাপেক্ষী নন। দুই, আল্লাহ নিজেই যেহেতু সহনশীল, তাই তিনি এমন লোকদের পছন্দ করেন যারা নীচ ও সংকীর্ণমনা নন বরং বিপুল সাহস ও হিম্মতের অধিকারী এবং সহিষ্ণু। যে আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন জীবনের অগণিত উপায়-উপকরণ এবং বহুবিধ ভুল-ত্রুটি করার পরও তোমাদের বারবার মাফ করে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ
يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ
صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ۭ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰي
شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦٤﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা বলে বেড়িয়ে ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান খয়রাতকে সেই ব্যক্তির মতো নষ্ট করে দিয়ো না যে নিছক লোক দেখাবার জন্য নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, অথচ সে আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে না এবং পরকালেও বিশ্বাস করে না।[৩০৩] তার ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঃ একটি মসৃণ পাথরখণ্ডের ওপর মাটির আস্তর জমেছিল। প্রবল বর্ষণের ফলে সমস্ত মাটি ধুয়ে গেলো। এখন সেখানে রয়ে গেলো শুধু পরিষ্কার পাথর খণ্ডটি।[৩০৪] এই ধরনের লোকেরা দান-খয়রাত করে যে নেকী অর্জন করে বলে মনে করে তার কিছুই তাদের হাতে আসে না। আর কাফেরদের সোজা পথ দেখানো আল্লাহর নিয়ম নয়।[৩০৫]

দিচ্ছেন, তিনি কেমন করে এমন লোকদের পছন্দ করতে পারেন, যারা কোন গরীবকে এক মুঠো ভাত খাওয়াবার পর বারবার নিজের অনুগ্রহের কথা সাড়ম্বরে তার সামনে প্রকাশ করে তার আত্মমর্যাদাকে ধূলায় লুটিয়ে দেয়? এ জন্যই হাদীসে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না এবং তার প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না, যে মানুষকে কিছু দান করে তাকে অনুগৃহীত করা হয়েছে বলে তার কাছে প্রকাশ করে এবং একথা উল্লেখ করে মনে খোঁচা দেয়।

৩০৩. আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি তার যে বিশ্বাস নেই, তার রিয়াকারিতাই এর প্রমাণ। নিছক লোক দেখাবার জন্য সে যেসব কাজ করে সেগুলো সুস্পষ্টভাবে একথাই প্রকাশ করে যে, সৃষ্টিকেই সে আল্লাহ মনে করে এবং তার কাছ থেকেই নিজের কাজের প্রতিদান চায়। আল্লাহর কাছ থেকে সে প্রতিদানের আশা করে না। একদিন সমস্ত কাজের হিসেব-নিকেশ করা হবে এবং প্রতিদান দেয়া হবে, একথাও সে বিশ্বাস করে না।

৩০৪. এই উপমায় প্রবল বর্ষণ বলতে দান খয়রাতকে এবং পাথরখণ্ড বলতে যে নিয়ত ও প্রেরণার গলদসহ দান-খয়রাত করা হয়েছে, তাকে বুঝানো হয়েছে। মাটির আস্তর বলতে নেকী ও সৎকর্মের বাইরের কাঠামোটি বুঝানো হয়েছে, যার নীচে লুকিয়ে আছে নিয়তের গলদ। এই বিশ্লেষণের পর দৃষ্টান্তটি সহজেই বোধগম্য হতে পারে। বৃষ্টিপাতের ফলে মাটি স্বাভাবিকভাবেই সরস ও সতেজ হয় এবং তাতে চারা জন্মায়। কিন্তু যে

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاۤءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ
اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۢ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ
يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٦٥﴾ اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ
لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ
كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاۤءُ ۖ فَاَصَابَهَاۤ اِعْصَارٌ فِيْهِ
نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٦٦﴾

বিপরীত পক্ষে যারা পূর্ণ মানসিক একাগ্রতা ও অবিচলতা সহকারে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের এই ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঃ কোন উচ্চ ভূমিতে একটি বাগান, প্রবল বৃষ্টিপাত হলে সেখানে দ্বিগুণ ফলন হয়। আর প্রবল বৃষ্টিপাত না হলে সামান্য হালকা বৃষ্টিপাতই তার জন্য যথেষ্ট।[৩০৬] আর তোমরা যা কিছু করো সবই আল্লাহর দৃষ্টি সীমার মধ্যে রয়েছে।

তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে, তার একটি সবুজ শ্যামল বাগান থাকবে, সেখানে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, খেজুর, আংগুর ও সব রকম ফলে পরিপূর্ণ থাকবে এবং বাগানটি ঠিক এমন এক সময় প্রবল উষ্ণ বায়ু প্রবাহে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে যখন সে নিজে বৃদ্ধ হয়ে গেছে এবং তার সন্তানরাও তখনো যোগ্য হয়ে উঠেনি?[৩০৭] এভাবেই আল্লাহ তাঁর কথা তোমাদের সামনে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পারো।

মাটিতে সরসতা সৃষ্টি হয় তার পরিমাণ যদি হয় নামমাত্র এবং তা কেবল ওপরিভাগেই লেপটে থাকে আর তার তলায় থাকে মসৃণ পাথর, তাহলে বৃষ্টির পানি এ ক্ষেত্রে তার জন্য লাভজনক হবার পরিবর্তে বরং ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে দান-খয়রাত যদিও নেকী ও সৎকর্মকে বিকশিত করার ক্ষমতাসম্পন্ন কিন্তু তা লাভজনক হবার জন্য সদুদ্দেশ্য, সৎসংকল্প ও সৎনিয়তের শর্ত আরোপিত হয়েছে। নিয়ত সৎ না হলে করুণার বারিধারা নিছক অর্থ ও সম্পদের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩০৫. এখানে 'কাফের' শব্দটি অকৃতজ্ঞ ও অনুগ্রহ অস্বীকারকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া নেয়ামতকে তাঁর পথে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যয় করার পরিবর্তে মানুষের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ব্যয় করে অথবা আল্লাহর পথে কিছু অর্থ ব্যয় করলেও ব্যয় করার সাথে কষ্টও দিয়ে থাকে, সে আসলে অকৃতজ্ঞ এবং আল্লাহর অনুগ্রহ-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ
اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۭ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾ اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ
الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاۗءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۭ
وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦٨﴾ يُّؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاۗءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ
فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۭ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

৩৭ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! যে অর্থ তোমরা উপার্জন করেছো এবং যা কিছু আমি জমি থেকে তোমাদের জন্য বের করে দিয়েছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করো। তাঁর পথে ব্যয় করার জন্য তোমরা যেন সবচেয়ে খারাপ জিনিস বাছাই করার চেষ্টা করো না অথচ ঐ জিনিসই যদি কেউ তোমাদের দেয়, তাহলে তোমরা কখনো তা নিতে রাযী হও না, যদি না তা নেবার ব্যাপারে তোমরা চোখ বন্ধ করে থাকো। তোমাদের জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি সর্বোত্তম গুণে গুণান্বিত।[৩০৮] শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং লজ্জাকর কর্মনীতি অবলম্বন করতে প্রলুব্ধ করে কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের আশ্বাস দেন। আল্লাহ বড়ই উদারহস্ত ও মহাজ্ঞানী। তিনি যাকে চান, হিকমত দান করেন। আর যে ব্যক্তি হিকমত লাভ করে সে আসলে বিরাট সম্পদ লাভ করেছে।[৩০৯]

এসব কথা থেকে কেবলমাত্র তারাই শিক্ষা লাভ করে যারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী।

বিস্মৃত বান্দা। আর সে নিজেই যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় না তখন তাকে অযথা নিজের সন্তুষ্টির পথ দেখাবার আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।

৩০৬. প্রবল বৃষ্টিপাত বলতে এমন দান–খয়রাতকে বুঝানো হয়েছে যার পেছনে থাকে চরম কল্যাণাকাংখা ও পূর্ণ সদিচ্ছা। আর হাল্কা বৃষ্টিপাত বলতে কল্যাণাকাংখার তীব্রতা বিহীন দান–খয়রাতকে বুঝানো হয়েছে।

৩০৭. অর্থাৎ তোমাদের সারা জীবনের উপার্জনের এমন এক সংকটকালে ধ্বংস হয়ে যাওয়া তোমরা পছন্দ করো না যখন তা থেকে লাভবান হবার তোমাদের সবচেয়ে বেশী

প্রয়োজন হয় এবং নতুন করে অর্থোপার্জনের সুযোগই তোমাদের থাকে না। ঠিক তেমনি দুনিয়ায় জীবনভর কাজ করার পর আখেরাতের জীবনে প্রবেশ করে তোমরা অকস্মাৎ যদি জানতে পারো তোমাদের দুনিয়ার জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ড এখানে মূল্যহীন হয়ে গেছে, যা কিছু তোমরা দুনিয়ায় উপার্জন করেছিলে তা দুনিয়ায় রয়ে গেছে, আখেরাতের জন্য তোমরা এমন কিছু উপার্জন করে আনতে পরোনি যার ফল এখানে ভোগ করতে পারো, তাহলে তা তোমরা কেমন করে পছন্দ করতে পারবে? সেখানে তোমরা নতুন করে আখেরাতের জন্য উপার্জন করার সুযোগ পাবে না। এই দুনিয়াতেই আখেরাতের জন্য কাজ করার সবটুকু সুযোগ রয়েছে। এখানে যদি তোমরা আখেরাতের চিন্তা না করে সারা জীবন দুনিয়ার ধ্যানে মগ্ন থাকো এবং বৈষয়িক স্বার্থ লাভের পেছনে নিজের সমস্ত শক্তি ও প্রচেষ্টা নিয়োজিত করো, তাহলে জীবনসূর্য অস্তমিত হবার পর তোমাদের অবস্থা হবে ঠিক সেই বৃদ্ধের মতো করুণ, যার সারা জীবনের উপার্জন এবং জীবনের সহায় সম্বল ছিল একটি মাত্র বাগান। বৃদ্ধ বয়সে তার এই বাগানটি ঠিক এমন এক সময় পুড়ে ছাই হয়ে গেলো যখন তার নতুন করে বাগান তৈরি করার সামর্থ ছিল না। এবং তার সন্তানদের একজনও তাকে সাহায্য করার যোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি।

৩০৮. যিনি নিজে উৎকৃষ্ট গুণাবলীর অধিকারী তিনি কখনো নিকৃষ্ট গুণের অধিকারীদের পছন্দ করতে পারেন না, একথা সবাই জানে। মহান আল্লাহ নিজেই পরম দাতা এবং সর্বক্ষণ নিজের সৃষ্টির ওপর দান-দাক্ষিণ্যের ধারা প্রবাহিত করছেন। কাজেই তাঁর পক্ষে কেমন করে সংকীর্ণ দৃষ্টি, স্বল্প সাহস ও নিম্নমানের নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী লোকদেরকে ভালোবাসা সম্ভব?

৩০৯. হিকমত অর্থ হচ্ছে, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার শক্তি। এখানে একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, হিকমতের সম্পদ যে ব্যক্তির কাছে থাকবে সে কখনো শয়তানের দেখানো পথে চলতে পারবে না। বরং সে আল্লাহর দেখানো প্রশস্ত পথ অবলম্বন করবে। শয়তানের সংকীর্ণমনা অনুসারীদের দৃষ্টিতে নিজের ধন-সম্পদ আঁকড়ে ধরে রাখা এবং সবসময় সম্পদ আহরণের নতুন নতুন ফন্দি-ফিকির করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। কিন্তু যারা আল্লাহর কাছ থেকে অন্তরদৃষ্টি লাভ করেছে, তাদের মতে এটা নেহাত নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের মতে, মানুষ যা কিছু উপার্জন করবে, নিজের মাঝারী পর্যায়ের প্রয়োজন পূর্ণ করার পর সেগুলো প্রাণ খুলে সৎকাজে ব্যয় করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। দুনিয়ার এই হাতে গোণা কয়েকদিনের জীবনে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় জনের তুলনায় হয়তো অনেক বেশী প্রাচুর্যের অধিকারী হতে পারে। কিন্তু মানুষের জন্য এই দুনিয়ার জীবনটিই সম্পূর্ণ জীবন নয়। বরং এটি আসল জীবনের একটি সামান্যতম অংশ মাত্র। এই সামান্য ও ক্ষুদ্রতম অংশের সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতার বিনিময়ে যে ব্যক্তি বৃহত্তম ও সীমাহীন জীবনের অসচ্ছলতা, দারিদ্র ও দৈন্যদশা কিনে নেয় সে আসলে নিরেট বোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। যে ব্যক্তি এই সংক্ষিপ্ত জীবনকালের সুযোগ গ্রহণ করে মাত্র সামান্য পুঁজির সহায়তায় নিজের ঐ চিরন্তন জীবনের সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে সে-ই আসলে বুদ্ধিমান।

وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ ۗ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ
مِنْ أَنصَارٍ ﴿٢٧٠﴾ إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا
وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن
يَشَآءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ
وَجْهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

তোমরা যা কিছু ব্যয় করেছো এবং যা মানতও করেছো আল্লাহ তা সবই জানেন। আর জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।[৩১০] যদি তোমাদের দান-সাদ্‌কাগুলো প্রকাশ্যে করো, তাহলে তাও ভালো, তবে যদি গোপনে অভাবীদের দাও, তাহলে তোমাদের জন্য এটিই বেশী ভালো।[৩১১] এভাবে তোমাদের অনেক গোনাহ নির্মূল হয়ে যায়।[৩১২] আর তোমরা যা কিছু করে থাকো আল্লাহ অবশ্যি তা জানেন।

মানুষকে হিদায়াত দান করার দায়িত্ব তোমাদের ওপর অর্পিত হয়নি। আল্লাহ যাকে চান তাকে হিদায়াত দান করেন। তোমরা যে ধন-সম্পদ দান-খয়রাত করো, তা তোমাদের নিজেদের জন্য ভালো। তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্যই তো অর্থ ব্যয় করে থাকো। কাজেই দান-খয়রাত করে তোমরা যা কিছু অর্থ ব্যয় করবে, তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে এবং এ ক্ষেত্রে কোন ক্রমেই তোমাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হবে না।[৩১৩]

৩১০. আল্লাহর পথে ব্যয় করা হোক বা শয়তানের পথে, আল্লাহর জন্য মানত করা হোক বা গায়রুল্লাহর জন্য, উভয় অবস্থায়ই মানুষের নিয়ত ও তার কাজ সম্পর্কে আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন। যারা আল্লাহর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং তাঁর জন্যই মানত করে তারা তাদের প্রতিদান পাবে। আর যেসব জালেম শয়তানের পথে ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের জন্য মানত করে, তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার সাধ্য কারো নেই।

মানত বলা হয় নজরানাকে। কোন একটি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে মানুষ যখন নিজের ওপর এমন কোন ব্যয়ভার বা সেবাকে ফরয করে নেয়, যা তার ওপর ফরয নয় তখন তাকে মানত বলে। এই মনোবাঞ্ছা যদি কোন হালাল জিনিস সম্পর্কিত হয় এবং তা আল্লাহর

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ
بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

বিশেষ করে এমন সব গরীব লোক সাহায্য লাভের অধিকারী, যারা আল্লাহর কাজে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত অর্থোপার্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে না এবং তাদের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে সচ্ছল বলে মনে করে। তাদের চেহারা দেখেই তুমি তাদের ভেতরের অবস্থা জানতে পারো। মানুষের পেছনে লেগে থেকে কিছু চাইবে, এমন লোক তারা নয়। তাদের সাহায্যার্থে তোমরা যা কিছু অর্থ ব্যয় করবে, তা আল্লাহর দৃষ্টির অগোচরে থাকবে না।[৩১৪]

কাছে চাওয়া হয়ে থাকে আর তা পূর্ণ হবার পর যে কাজ করার অংগীকার করা হয় তা আল্লাহর জন্যই হয়ে থাকে, তাহলে এই ধরনের নজরানা ও মানত হবে আল্লাহর আনুগত্যের অধীন। এই মানত পূর্ণ করলে সওয়াব ও প্রতিদান লাভ করা যাবে। যদি এই ধরনের মানত না হয়, তাহলে তা নিজেই নিজের ওপর আরোপিত গোনাহের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং তা পূর্ণ করলে অবশ্যি আযাবের অংশীদার হতে হবে।

৩১১. যে দান-খয়রাতটি করা ফরয সেটি প্রকাশ্যে করাই উত্তম। অন্যদিকে ফরয নয় এমন দান-খয়রাত গোপনে করাই ভালো। সমস্ত কাজের ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযোজ্য। ফরযগুলো প্রকাশ্যে এবং নফলগুলো গোপনে করাই উত্তম হিসেবে বিবেচিত।

৩১২. অর্থাৎ লুকিয়ে সৎকাজ করলে মানুষের আত্মা ও নৈতিক বৃত্তির অনবরত সংশোধন হয়ে থাকে। তার সৎগুণাবলী বিকাশ লাভ করতে থাকে। তার দোষ, ত্রুটি ও অসৎবৃত্তিগুলো ধীরে ধীরে নির্মূল হতে থাকে। এই জিনিসটি তাকে আল্লাহর এমন প্রিয়ভাজন করে তোলে, যার ফলে তার আমলনামায় যে সামান্য কিছু গোনাহ লেখা থাকে, তার এই সৎগুণাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে মহান আল্লাহ সেগুলো মাফ করে দেন।

৩১৩. প্রথমদিকে মুসলমানরা নিজেদের অমুসলিম আত্মীয়-স্বজন ও সাধারণ অমুসলিম দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্য করার ব্যাপারে ইতস্তত করতো। তারা মনে করছিল কেবলমাত্র মুসলিম অভাবী ও দরিদ্রদের সাহায্য করলেই তা আল্লাহর পথে সাহায্য হিসেবে গণ্য হবে। এই আয়াতে তাদের এই ভুল ধারণার অপনোদন করা হয়েছে।

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٧٤﴾ اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ
الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ
الْمَسِّ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۭ فَمَنْ جَاۗءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ
مَا سَلَفَ ۭ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا
خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾

৩৮ রুকূ'

যারা নিজেদের ধন-সম্পদ দিনরাত গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের কাছে এবং তাদের কোন ভয় ও দুঃখ নেই। কিন্তু যারা সূদ খায়[৩১৫] তাদের অবস্থা হয় ঠিক সেই লোকটির মতো যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে।[৩১৬] তাদের এই অবস্থায় উপনীত হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা বলে ঃ "ব্যবসা তো সূদেরই মতো।[৩১৭] অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করে দিয়েছেন এবং সূদকে করেছেন হারাম।[৩১৮] কাজেই যে ব্যক্তির কাছে তার রবের পক্ষ থেকে এই নসীহত পৌঁছে যায় এবং ভবিষ্যতে সূদখোরী থেকে সে বিরত হয়, সে ক্ষেত্রে যা কিছু সে খেয়েছে তাতো খেয়ে ফেলেছেই এবং এ ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সোপর্দ হয়ে গেছে।[৩১৯] আর এই নির্দেশের পরও যে ব্যক্তি আবার এই কাজ করে, সে জাহান্নামের অধিবাসী।

এখানে আল্লাহর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, এসব লোকের মনে হিদায়াতের মর্মবাণী সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করে দেয়া তোমার দায়িত্বের অন্তরভুক্ত নয়। তোমার দায়িত্ব হচ্ছে কেবল এদের কাছে হককথা পৌঁছিয়ে দেয়া। হককথা পৌঁছিয়ে দিয়েই তুমি দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছো। এখন তাদের অন্তরদৃষ্টি দান করা বা না করা আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। আর তোমরা নিছক তাদের হিদায়াত গ্রহণ না করার কারণে পার্থিব অর্থ-সম্পদ দিয়ে তাদের অভাব মোচনের ব্যাপারে ইতস্তত করো না কারণ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যে কোন অভাবী লোকের সাহায্য করো না কেন, আল্লাহ তার প্রতিদান অবশ্যি তোমাদের দেবেন।

৩১৪. এখানে যেসব লোকের কথা বলা হয়েছে, তারা হচ্ছে এমন একদল লোক যারা আল্লাহর দীনের খেদমতে নিজেদেরকে কায়মনোবাক্যে সার্বক্ষণিকভাবে উৎসর্গ করে দিয়েছিল। তাদের সমস্ত সময় এই দীনী খেদমতে ব্যয় করার কারণে নিজেদের পেট পালার জন্য কিছু কাজকাম করার সুযোগ তাদের ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এই ধরনের স্বেচ্ছাসেবীদের একটি স্বতন্ত্র দল ছিল। ইতিহাসে তাঁরা 'আসহাবে সুফ্‌ফা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এরা ছিলেন তিন চারশো লোকের একটি দল। নিজেদের বাড়ি ঘর ছেড়ে দিয়ে এরা মদীনায় চলে এসেছিলেন। সর্বক্ষণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির থাকতেন। তাঁর সাথে সাথে থাকতেন। তিনি যখন যাকে যেখানে কোন কাজে বা অভিযানে প্রয়োজন তাদের মধ্য থেকে নিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। মদীনার বাইরে কোন কাজ না থাকলে তারা মদীনায় অবস্থান করে দীনী ইল্‌ম হাসিল করতেন এবং অন্যদেরকে তার তালিম দিতেন। যেহেতু তাঁরা ছিলেন সার্বক্ষণিক কর্মী এবং নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার মতো ব্যক্তিগত উপকরণও তাঁদের ছিল না, তাই মহান আল্লাহ সাধারণ মুসলমানদের দৃষ্টি তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে বিশেষ করে তাদেরকে সাহায্য করাকে আল্লাহর পথে ব্যয়ের সর্বোত্তম খাত বলে উল্লেখ করেছেন।

৩১৫. মূল শব্দটি হচ্ছে 'রিবা'। আরবী ভাষায় এর অর্থ বৃদ্ধি। পারিভাষিক অর্থে আরবরা এ শব্দটি ব্যবহার করে এমন এক বর্ধিত অংকের অর্থের জন্য, যা ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে একটি স্থিরীকৃত হার অনুযায়ী মূল অর্থের বাইরে আদায় করে থাকে। আমাদের ভাষায় একেই বলা হয় সুদ। কুরআন নাযিলের সময় যেসব ধরনের সুদী লেনদেনের প্রচলন ছিল সেগুলোকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়। যেমন, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির হাতে কোন জিনিস বিক্রি করতো এবং দাম আদায়ের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দিতো। সময়সীমা অতিক্রম করার পর যদি দাম আদায় না হতো, তাহলে তাকে আবার বাড়তি সময় দিতো এবং দাম বাড়িয়ে দিতো। অথবা যেমন, একজন অন্য একজনকে ঋণ দিতো। ঋণদাতার সাথে চুক্তি হতো, উমুক সময়ের মধ্যে আসল থেকে এই পরিমাণ অর্থ বেশী দিতে হবে। অথবা যেমন, ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে একটি বিশেষ সময়সীমার জন্য একটি বিশেষ হার স্থিরিকৃত হয়ে যেতো। ঐ সময়সীমার মধ্যে বর্ধিত অর্থসহ আসল অর্থ আদায় না হলে আগের থেকে বর্ধিত হারে অতিরিক্ত সময় দেয়া হতো। এই ধরনের লেনদেনের ব্যাপার এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩১৬. আরবরা পাগল ও দেওয়ানাকে বলতো, 'মজনূন' (অর্থাৎ জিন বা প্রেতগ্রস্ত)। কোন ব্যক্তি পাগল হয়ে গেছে, একথা বলার প্রয়োজন দেখা দিলে দ্বারা বলতো, উমুককে জিনে ধরেছে। এই প্রবাদটি ব্যবহার করে কুরআন সুদখোরকে এমন এক ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছে যার বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ বুদ্ধিভ্রষ্ট ব্যক্তি যেমন ভারসাম্যহীন কথা বলতে ও কাজ করতে শুরু করে, অনুরূপভাবে সুদখোরও টাকার পেছনে পাগলের মতো ছুটে ভারসাম্যহীন কথা ও কাজের মহড়া দেয়। নিজের স্বার্থপর মনোবৃত্তির চাপে পাগলের মতো সে কোন কিছুরই পরোয়া করে না। তার সুদখোরীর কারণে কোন্ কোন্ পর্যায় মানবিক প্রেম-প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতির শিকড় কেটে গেলো, সামষ্টিক কল্যাণের ওপর কোন্ ধরনের ধ্বংসকর প্রভাব পড়লো এবং কতগুলো লোকের দুরবস্থার বিনিময়ে সে নিজের প্রাচুর্যের ব্যবস্থা করলো—এসব বিষয়ে তার কোন মাথা ব্যথাই থাকে না।

দুনিয়াতে তার এই পাগলপারা অবস্থা। আর যেহেতু মানুষকে আখেরাতে সেই অবস্থায় ওঠানো হবে যে অবস্থায় সে এই দুনিয়ায় মারা গিয়েছিল, তাই কিয়ামতের দিন সুদখোর ব্যক্তি একজন পাগল ও বুদ্ধিভ্রষ্ট লোকের চেহারায় আত্মপ্রকাশ করবে।

৩১৭. অর্থাৎ তাদের মতবাদের গলদ হচ্ছে এই যে, ব্যবসায়ে যে মূলধন খাটানো হয়, তার ওপর যে মুনাফা আসে সেই মুনাফালব্ধ অর্থ ও সুদের মধ্যে তারা কোন পার্থক্য করে না। এই উভয় অর্থকে একই পর্যায়ভুক্ত মনে করে তারা যুক্তি পেশ করে থাকে যে, ব্যবসায়ে খাটানো অর্থের মুনাফা যখন বৈধ তখন এই ঋণবাবদ প্রদত্ত অর্থের মুনাফা অবৈধ হবে কেন? বর্তমান যুগের সুদখোররাও সুদের স্বপক্ষে এই একই যুক্তি পেশ করে থাকে। তারা বলে, এক ব্যক্তি যে অর্থ থেকে লাভবান হতে পারতো, তাকে সে ঋণ বাবদ দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে তুলে দিচ্ছে। আর ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি নিসন্দেহে তা থেকে লাভবানই হচ্ছে। তাহলে এ ক্ষেত্রে ঋণদাতার যে অর্থ থেকে ঋনগ্রহীতা লাভবান হচ্ছে তার একটি অংশ সে ঋণদাতাকে দেবে না কেন? কিন্তু তারা একথাটি চিন্তা করে না যে, দুনিয়ায় যত ধরনের কারবার আছে, ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প, কারিগরী, কৃষি—যাই হোক না কেন, যেখানে মানুষ কেবলমাত্র শ্রম খাটায় অথবা শ্রম ও অর্থ উভয়টিই খাটায়, সেখানে কোন একটি কারবারও এমন নেই যাতে মানুষকে ক্ষতির ঝুঁকি (Risk) নিতে হয় না। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ মুনাফা বাবদ অর্জিত হবার গ্যারান্টিও কোথাও থাকে না। তাহলে সারা দুনিয়ার সমস্ত ব্যবসায় সংগঠনের মধ্যে একমাত্র ঋণদাতা পুঁজিপতিইবা কেন ক্ষতির ঝুঁকিমুক্ত থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা লাভের হকদার হবে? অলাভজনক উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করার বিষয়টি কিছুক্ষণের জন্য না হয় দূরে সরিয়ে রাখুন এবং সুদের হারের কম বেশীর বিষয়টিও স্থগিত রাখুন। লাভজনক ও উৎপাদনশীল ঋণের ব্যাপারেই আসা যাক এবং হারও ধরা যাক কম। প্রশ্ন হচ্ছে, যারা রাতদিন নিজেদের কারবারে সময়, শ্রম, যোগ্যতা ও পুঁজি খাটিয়ে চলছে এবং যাদের প্রচেষ্টা ও সাধনার ওপরই এই কারবার ফলপ্রসূ হওয়া নির্ভর করছে তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট মুনাফার নিশ্চয়তা নেই বরং ক্ষতির সমস্ত ঝুঁকিটাই থাকছে তাদের মাথার ওপর। কিন্তু যে ব্যক্তি শুধুমাত্র নিজের টাকা তাকে ঋণ দিয়েছে সে নিশ্চিন্তে বসে বসে একটি নির্দিষ্ট অংকের মুনাফা হাসিল করতে থাকবে, এটা কোন্ ধরনের বুদ্ধিসম্মত ও যুক্তিসংগত কথা? ন্যায়, ইনসাফ ও অর্থনীতির কোন্ মানদণ্ডের বিচারে একে ন্যায়সংগত বলা যেতে পারে। আবার এক ব্যক্তি একজন কারখানাদারকে বিশ বছরের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংকের অর্থ ঋণ দিল এবং ঋণ দেয়ার সময়ই সেখানে স্থিরীকৃত হলো যে, আজ থেকেই সে বছরে শতকরা পাঁচ টাকা হিসেবে নিজের মুনাফা গ্রহণের অধিকারী হবে। অথচ কেউ জানে না, এই কারখানা যে পণ্য উৎপাদন করছে আগামী বিশ বছরে বাজারে তার দামের মধ্যে কি পরিমাণ ওঠানামা হবে? কাজেই এ পদ্ধতি কেমন করে সঠিক হতে পারে? একটি জাতির সকল শ্রেণী একটি যুদ্ধে বিপদ, ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকার করবে কিন্তু সমগ্র জাতির মধ্যে একমাত্র ঋণদাতা পুঁজিপতি গোষ্ঠীই তাদের জাতিকে প্রদত্ত যুদ্ধঋণের সুদ উসূল করতে থাকবে শত শত বছর পরও, এটাকে কেমন করে সঠিক ও ন্যায়সংগত বলা যেতে পারে?

৩১৮. ব্যবসা ও সুদের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের কারণে উভয়ের অর্থনৈতিক ও নৈতিক মর্যাদা একই পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। এই পার্থক্য নিম্নরূপ ঃ

(ক) ব্যবসায়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মুনাফার সমান বিনিময় হয়। কারণ বিক্রেতার কাছ থেকে একটি পণ্য কিনে ক্রেতা তা থেকে মুনাফা অর্জন করে। অন্যদিকে ক্রেতার জন্য ঐ পণ্যটি যোগাড় করার ব্যাপারে বিক্রেতা নিজের যে বুদ্ধি শ্রম ও সময় ব্যয় করেছিল তার মূল্য গ্রহণ করে। বিপরীতপক্ষে সুদী লেনদেনের ব্যাপারে মুনাফার সমান বিনিময় হয় না। সুদ গ্রহণকারী অর্থের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্রহণ করে। এটি তার জন্য নিশ্চিতভাবে লাভজনক। কিন্তু অন্যদিকে সুদ প্রদানকারী কেবলমাত্র 'সময়' লাভ করে, যার লাভজনক হওয়া নিশ্চিত নয়। নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য যদি সে ঐ ঋণ বাবদ অর্থ গ্রহণ করে থাকে, তাহলে নিসন্দেহে বলা যায়, ঐ 'সময়' তার জন্যে নিশ্চিতভাবে অলাভজনক ও অনুৎপাদনশীল। আর যদি সে ব্যবসায়, শিল্প প্রতিষ্ঠান, কারিগরী সংস্থা অথবা কৃষি কাজে লাগাবার জন্য ঐ অর্থ নিয়ে থাকে, তবুও 'সময়' তার জন্য যেমন লাভ আনবে তেমনি ক্ষতিও আনবে, দু'টোরই সম্ভাবনা সমান। কাজেই সুদের ব্যাপারটির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় একটি দলের লাভ ও অন্য দলের লোকসানের ওপর অথবা একটি দলের নিশ্চিত ও নির্ধারিত লাভ ও অন্য দলের অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত লাভের ওপর।

(খ) ব্যবসায়ে বিক্রেতা ক্রেতার কাছ থেকে যত বেশী লাভ গ্রহণ করুকনা কেন, সে মাত্র একবারই তা গ্রহণ করে। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানকারী নিজের অর্থের জন্য অনবরত মুনাফা নিতে থাকে। আবার সময়ের গতির সাথে সাথে তার মুনাফাও বেড়ে যেতে থাকে। ঋণগ্রহীতা তার অর্থ থেকে যতই লাভবান হোক না কেন তা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু ঋণদাতা এই লাভ থেকে যে মুনাফা অর্জন করে তার কোন সীমা নেই। এমনও হতে পারে, সে ঋণগ্রহীতার সমস্ত উপার্জন, তার সমস্ত অর্থনৈতিক উপকরণ এমনকি তার পরনের কাপড়-চোপড় ও ঘরের বাসন-কোসনও উদরস্থ করে ফেলতে পারে এবং এরপরও তার দাবী অপূর্ণ থেকে যাবে।

(গ) ব্যবসায়ে পণ্যের সাথে তার মূল্যের বিনিময় হবার সাথে সাথেই লেনদেন শেষ হয়ে যায়। এরপর ক্রেতাকে আর কোন জিনিস বিক্রেতার হাতে ফেরত দিতে হয় না। গৃহ, জমি বা মালপত্রের ভাড়ার ব্যাপারে আসল যে বস্তুটি, যার ব্যবহারের জন্য মূল্য দিতে হয়, তা ব্যয়িত হয় না বরং অবিকৃত থাকে এবং অবিকৃত অবস্থায় তা ভাড়াদানকারীর কাছে ফেরত দেয়া হয়। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা আসল পুঁজি ব্যয় করে ফেলে তারপর ব্যয়িত অর্থ পুনর্বার উৎপাদন করে বৃদ্ধি সহকারে ফেরত দেয়।

(ঘ) ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কারিগরী ও কৃষিতে মানুষ শ্রম, বুদ্ধি ও সময় ব্যয় করে তার সাহায্যে লাভবান হয়। কিন্তু সুদী কারবারে সে নিছক নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে কোন প্রকার শ্রম ও কষ্ট ছাড়াই অন্যের উপার্জনের সিংহভাগের অংশীদার হয়। পারিভাষিক অর্থে যাকে "অংশীদার" বলা হয় লাভ-লোকসান উভয় ক্ষেত্রে যে অংশীদার থাকে এবং লাভের ক্ষেত্রে লাভের হার অনুযায়ী যার অংশীদারীত্ব হয়, তেমন অংশীদারের মর্যাদা সে লাভ করে না। বরং সে এমন অংশীদার হয়, যে লাভ-লোকসান ও লাভের হারের কোন পরোয়া না করেই নিজের নির্ধারিত মুনাফার দাবীদার হয়।

এসব কারণে ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক মর্যাদা ও সুদের অর্থনৈতিক অবস্থানের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সূচিত হয়। এর ফলে ব্যবসায় মানবিক তামাদ্দুনের লালন ও পুনর্গঠনকারী

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٧٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ
وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٧٧﴾

সেখানে সে থাকবে চিরকাল। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত ও বিকশিত করেন।[৩২০] আর আল্লাহ অকৃতজ্ঞ দুষ্কৃতকারীকে পছন্দ করেন না।[৩২১] অবশ্যি যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাদের প্রতিদান নিসন্দেহে তাদের রবের কাছে আছে এবং তাদের কোন ভয় ও মর্মজ্বালাও নেই।[৩২২]

শক্তিতে পরিণত হয়। বিপরীত পক্ষে সুদ তার ধ্বংসের কারণ হয়। আবার নৈতিক দিক দিয়ে সুদের প্রকৃতিই হচ্ছে, তা ব্যক্তির মধ্যে কার্পণ্য, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা, কঠোরতা ও অর্থগৃধ্নুতা সৃষ্টি করে এবং সহানুভূতি ও পারস্পরিক সাহায্য–সহযোগিতার মনোভাব বিনষ্ট করে দেয়। তাই অর্থনৈতিক ও নৈতিক উভয় দিক দিয়েই সুদ মানবতার জন্য ধ্বংসই ডেকে আনে।

৩১৯. একথা বলা হয়নি যে, যা কিছু সে খেয়ে ফলেছে, আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন। বরং বলা হচ্ছে তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাতে থাকছে। এই বাক্য থেকে জানা যায়, "যা কিছু সে খেয়েছে তাতো খেয়ে ফেলেছেই" বাক্যের অর্থ এ নয় যে, যাকিছু ইতিপূর্বে খেয়ে ফেলেছে তা মাফ করে দেয়া হয়েছে বরং এখানে শুধুমাত্র আইনগত সুবিধের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইতিপূর্বে যে সুদ সে খেয়ে ফেলেছে আইনগতভাবে তা ফেরত দেয়ার দাবী করা হবে না। কারণ তা ফেরত দেয়ার দাবী করা হলে মামলা–মোকদ্দমার এমন একটা ধারাবাহিকতা চক্র শুরু হয়ে যাবে যা আর শেষ হবে না। তবে সূদী কারবারের মাধ্যমে যে ব্যক্তি অর্থ–সম্পদ সংগ্রহ করেছে নৈতিক দিক দিয়ে তার অপবিত্রতা পূর্ববৎ প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি তার মনে যথার্থই আল্লাহর ভীতি স্থান লাভ করে থাকে এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর তার অর্থনৈতিক ও নৈতিক দৃষ্টিভংগী যদি সত্যিই পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সে নিজেই এই হারাম পথে উপার্জিত ধন–সম্পদ নিজের জন্য ব্যয় করা থেকে বিরত থাকবে এবং যাদের অর্থ–সম্পদ তার কাছে আছে তাদের সন্ধান লাভ করার জন্য নিজস্ব পর্যায়ে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকবে। হকদারদের সন্ধান পাবার পর তাদের হক ফিরিয়ে দেবে। আর যেসব হকদারের সন্ধান পাবে না তাদের সম্পদগুলো সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার ব্যবস্থা করবে। এই কার্যক্রম তাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচাতে সাহায্য করবে। তবে যে

ব্যক্তি তার পূর্বেকার সুদলব্ধ অর্থ যথারীতি ভোগ করতে থাকে, সে যদি তার এই হারাম খাওয়ার শাস্তি লাভ করেই যায়, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

৩২০. এই আয়াতে এমন একটি অকাট্য সত্যের ঘোষণা দেয়া হয়েছে, যা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে যেমন সত্য তেমনি অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক দিক দিয়েও সত্য। যদিও আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়, সুদের মাধ্যমে অর্থ বৃদ্ধি হচ্ছে এবং দান-খয়রাতের মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ কমে যাচ্ছে তবুও আসল ব্যাপার এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান হচ্ছে এই যে, সুদ নৈতিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক উন্নতির কেবল প্রতিবন্ধকতাই নয় বরং অবনতির সহায়ক। বিপরীতপক্ষে দান-খয়রাতের (করযা-ই-হাসানা বা উত্তম ঋণ) মাধ্যমে নৈতিক ও অধ্যাত্মিক বৃত্তি এবং তামাদ্দুন ও অর্থনীতি সবকিছুই উন্নতি ও বিকাশ লাভ করে।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে বিচার করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সুদ আসলে স্বার্থপরতা, কৃপণতা, সংকীর্ণতা, নির্মমতা ইত্যাকার অসৎ গুণাবলীর ফল এবং এই গুণগুলোই সে মানুষের মধ্যে বিকশিত করে। অন্যদিকে দানশীলতা, সহানুভূতি, উদারতা ও মহানুভবতা ইত্যাকার গুণাবলীই দান-খয়রাতের জন্ম দেয় এবং দান-খয়রাতের মাধ্যমে আর নিয়মিত দান-খয়রাত করতে থাকলে এই গুণগুলো মানুষের মধ্যে লালিত ও বিকশিত হতেও থাকে। এমন কে আছে যে, এই উভয় ধরনের নৈতিক গুণাবলীর মধ্য থেকে প্রথমগুলোকে নিকৃষ্ট ও শেষেরগুলোকে উৎকৃষ্ট বলবে না?

তামাদ্দুনিক দিক দিয়ে বিচার করলে প্রত্যেক ব্যক্তি নিসন্দেহে একথা বুঝতে সক্ষম হবে যে, যে সমাজের লোকেরা পরস্পরের সাথে স্বার্থবাদী আচরণ করে, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লাভ ছাড়া নিস্বার্থভাবে অন্যের কোন কাজ করে না, একজনের প্রয়োজন ও অভাবকে অন্যজন নিজের মুনাফা লুণ্ঠনের সুযোগ মনে করে তা থেকে পুরোপুরি লাভবান হয় এবং ধনীদের স্বার্থ সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে, সে সমাজ কখনো শক্তিশালী হতে পারে না। সে সমাজের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্কের পরিবর্তে হিংসা, বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা ও অনাগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। আর বিভিন্ন অংশ হামেশা বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যের দিকে এগিয়ে যাবে। অন্যান্য কারণগুলো যদি এই অবস্থার সহায়ক হয়ে দাঁড়ায় তাহলে এহেন সমাজের বিভিন্ন অংশের পরস্পরের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে যাওয়াটাও মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। অন্যদিকে যে সমাজের সামষ্টিক ব্যবস্থাপনা পরস্পরের প্রতি সাহায্য-সহানুভূতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যার সদস্যরা পরস্পরের সাথে ঔদার্যপূর্ণ আচরণ করে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের প্রয়োজন ও অভাবের সময় আন্তরিকতার সাথে ও প্রশস্তমনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং একজন সামর্থ ও সক্ষম ব্যক্তি তার একজন অক্ষম ও অসমর্থ ভাইকে সাহায্য অথবা কমপক্ষে ন্যায়সংগত সহায়তার নীতি অবলম্বন করে, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই পারস্পরিক প্রীতি, কল্যাণাকাংখা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। এ ধরনের সমাজের অংশগুলো একটি অন্যটির সাথে সংযুক্ত ও সম্পর্কিত থাকবে। সেখানে আভ্যন্তরীণ কোন্দল, বিরোধ ও সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার কোন সুযোগই পাবে না। পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও সাহায্য সহযোগিতার কারণে সেখানে উন্নতির গতিধারা প্রথম ধরনের সমাজের তুলনায় অনেক বেশী দ্রুত হবে।

এবার অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিচার করা যাক। অর্থনীতির বিচারে সুদী লেনদেন দুই ধরনের হয়। এক, অভাবীরা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যয়ভার বহন করার জন্য বাধ্য হয়ে যে ঋণ গ্রহণ করে। দুই, পেশাদার লোকেরা নিজেদের ব্যবসায়–বাণিজ্য, শিল্প, কারিগরী, কৃষি ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করার জন্য যে ঋণ গ্রহণ করে। এর মধ্যে প্রথম ধরনের ঋণটি সম্পর্কে সবাই জানে, এর ওপর সুদ আদায় করার পদ্ধতি মারাত্মক ধ্বংসকর। দুনিয়ায় এমন কোন দেশ নেই যেখানে মহাজনরা ও মহাজনী সংস্থাগুলো এই পদ্ধতিতে গরীব শ্রমিক, মজুর, কৃষক ও স্বল্প আয়ের লোকদের রক্ত চুষে চলছে না। সুদের কারণে এই ধরনের ঋণ আদায় করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন বরং অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তারপর এক ঋণ আদায় করার জন্য দ্বিতীয় ঋণ এবং তারপর তৃতীয় ঋণ, এভাবে ঋণের পর ঋণ নিতে থাকে। ঋণের মূল অংকের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী সুদ আদায় করার পরও মূল অংক যেখানকার সেখানেই থেকে যায়। শ্রমিকদের আয়ের বৃহত্তম অংশ মহাজনের পেটে যায়। তার নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জিত অর্থ দিনান্তে তার নিজের ও সন্তান–পরিজনদের পেটের আহার যোগাতে সক্ষম হয় না। এ অবস্থায় কাজের প্রতি শ্রমিক ও কর্মচারীদের আগ্রহ ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে এবং একদিন তা শূণ্যের পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। কারণ তাদের মেহনতের ফল যদি অন্যেরা নিয়ে যেতে থাকে, তাহলে তারা কোনদিন মন দিয়ে ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে পারে না। তারপর সুদী ঋণের জালে আবদ্ধ লোকরা সর্বক্ষণ এমন দুর্ভাবনা ও পেরেশানির মধ্যে জীবন কাটায় এবং অভাবের কারণে তাদের জন্য সঠিক খাদ্য ও চিকিৎসা এমনই দুর্লভ হয়ে পড়ে, যার ফলে তাদের স্বাস্থ্য কখনো ভালো থাকে না। প্রায়ই তারা রোগ–পীড়ায় জর্জরিত থাকে। এভাবে সুদী ঋণের নীট ফল এই দাঁড়ায় ঃ গুটিকয় লোক লাখো লোকের রক্ত চুষে মোটা হতে থাকে কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমগ্র জাতির অর্থ উৎপাদন সম্ভাব্য পরিমাণ থেকে অনেক কমে যায়। পরিণামে এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ত চোষারাও নিষ্কৃতি পায় না। কারণ তাদের স্বার্থগৃধ্নুতায় সাধারণ দরিদ্র শ্রেণীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ধনিক সমাজের বিরুদ্ধে তাদের মনে ক্ষোভ, ঘৃণা ও ক্রোধ লালিত হতে থাকে। তারপর একদিন কোন বিপ্লবের তরংগাভিঘাতে ক্ষোভের আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটে। তখন এই জালেম ধনিক সমাজকে তাদের অর্থ–সম্পদের সাথে সাথে প্রাণ সম্পদও বিসর্জন দিতে হয়।

আর দ্বিতীয় ধরনের সুদী ঋণ সম্পর্কে বলা যায়, ব্যবসায় খাটাবার জন্য একটি নির্দিষ্ট সুদের হারে এই ঋণ গ্রহণ করার ফলে যে অসংখ্য ক্ষতি হয় তার মধ্যে উল্লেখ্য কয়েকটি এখানে বিবৃত করছি।

এক ঃ যে কাজটি প্রচলিত সুদের হারের সমান লাভ উৎপাদনে সক্ষম নয়, তা দেশ ও জাতির জন্য যতই প্রয়োজনীয় ও উপকারী হোক না কেন, তাতে খাটাবার জন্য অর্থ পাওয়া যায় না। আবার দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক উপকরণ একযোগে এমন সব কাজের দিকে দৌড়ে আসে, যেগুলো বাজারে প্রচলিত সুদের হারের সমান বা তার চাইতে বেশী লাভ উৎপাদন করতে পারে, সামগ্রিক দিক দিয়ে তাদের প্রয়োজন বা উপকারী ক্ষমতা অনেক কম অথবা একেবারে শূন্যের কোঠায় থাকলেও।

দুই ঃ ব্যবসায়, শিল্প বা কৃষি সংক্রান্ত যেসব কাজের জন্য সুদে টাকা পাওয়া যায়, তাদের কোন একটিতেও এ ধরনের কোন গ্যারান্টি নেই যে, সবসময় সব অবস্থায় তার মুনাফা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ যেমন শতকরা পাঁচ, ছয় বা দশ অথবা তার ওপরে থাকবে এবং এর নীচে কখনো নামবে না। মুনাফার এই হারের গ্যারান্টি তো দূরের কথা সেখানে অবশ্যি মুনাফা হবে, কখনো লোকসান হবে না, এর কোন নিশ্চয়তা নেই। কাজেই যে ব্যবসায়ে এমন ধরনের পুঁজি খাটানো হয় যাতে পুঁজিপতিকে একটি নির্ধারিত হার অনুযায়ী মুনাফা দেয়ার নিশ্চয়তা দান করা হয়ে থাকে, তা কখনো ক্ষতি ও আশংকা মুক্ত হতে পারে না।

তিন ঃ যেহেতু মূল ঋণদাতা ব্যবসায়ের লাভ লোকসানে অংশীদার হয় না, কেবলমাত্র মুনাফার অংশীদার হয় এবং তাও আবার একটি নির্দিষ্ট হারে মুনাফার নিশ্চয়তা দেয়ার ভিত্তিতে মূলধন দেয়, তাই ব্যবসায়ের ভালো-মন্দের ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ থাকে না। সে চরম স্বার্থপরতা সহকারে কেবলমাত্র নিজের মুনাফার ওপর নজর রাখে। যখনই বাজারে সামান্য মন্দাভাব দেখা দেয়ার আশংকা হয় তখনই সে সবার আগে নিজের টাকাটা টেনে নেয়ার চিন্তা করে। এভাবে কখনো কখনো নিছক তার স্বার্থপরতা সুলভ আশংকার কারণে সত্যি সত্যিই বাজারে মন্দাভাব সৃষ্টি হয়। কখনো অন্য কোন কারণে বাজারে মন্দাভাব সৃষ্টি হয়ে গেলে পুঁজিপতির স্বার্থপরতা তাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়ে চূড়ান্ত ধ্বংসের সূচনা করে।

সুদের এ তিনটি ক্ষতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অর্থনীতির সাথে সামান্যতম সম্পর্ক রাখে এমন কোন ব্যক্তি এগুলো অস্বীকার করতে পারবেন না। এরপর একথা মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, যথার্থই সুদ অর্থনৈতিক সম্পদ বাড়ায় না বরং কমায়।

এবার দান-খয়রাতের অর্থনৈতিক প্রভাব ও ফলাফলের কথায় আসা যাক। সমাজের সচ্ছল লোকেরা যদি নিজেদের অবস্থা ও মর্যাদা অনুসারে নিসংকোচে নিজের ও নিজের পরিবার পরিজনদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নেয় এরপর তাদের কাছে যে পরিমাণ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে তা গরীবদের মধ্যে বিলি করে দেয়, যাতে তারাও নিজেদের প্রয়োজনের জিনিসপত্র কিনতে পারে, তারপরও যে টাকা বাড়তি থেকে যায় তা ব্যবসায়ীদের বিনা সুদে ঋণ দেয় অথবা অংশীদারী নীতির ভিত্তিতে তাদের সাথে লাভ লোকসানে শরীক হয়ে যায় অথবা সমাজ ও সমষ্টির সেবায় বিনিয়োগ করার জন্য সরকারের হাতে সোপর্দ করে দেয়, তাহলে এহেন সমাজে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি চরম উন্নতি লাভ করবে, সমাজের সাধারন লোকদের সচ্ছলতা বেড়ে যেতে থাকবে এবং সুদী অর্থ ব্যবস্থা ভিত্তিক সমাজের তুলনায় সেখানে সামগ্রিকভাবে অর্থ উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়ে যাবে, একথা যে কেউ সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে সহজেই বুঝতে পারবে।

৩২১. অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তার মৌলিক প্রয়োজনের চাইতে বেশী অংশ পেয়েছে একমাত্র সেই ব্যক্তিই সুদে টাকা খাটাতে পারে। কোন ব্যক্তি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত এই যে অংশটা পায় কুরআনের পরিভাষায় একে বলা হয় আল্লাহর দান। আর আল্লাহর এই দানের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ যেভাবে তাঁর বান্দাকে দান করেছেন বান্দাও ঠিক সেভাবেই আল্লাহর অন্য বান্দাদেরকে তা দান করবে। যদি সে এমনটি না করে বরং এর বিপরীতপক্ষে আল্লাহর এই দানকে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ
تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾ وَاِنْ
كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۭ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۡ ثُمَّ تُوَفّٰى
كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٨١﴾

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং লোকদের কাছে তোমাদের যে সুদ বাকি রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও, যদি যথার্থই তোমরা ঈমান এনে থাকো। কিন্তু যদি তোমরা এমনটি না করো তাহলে জেনে রাখো, এটা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।[৩২৩] এখনো তাওবা করে নাও (এবং সুদ ছেড়ে দাও) তাহলে তোমরা আসল মূলধনের অধিকারী হবে। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের ওপর জুলুম করাও হবে না। তোমাদের ঋণগ্রহীতা অভাবী হলে সচ্ছলতা লাভ করা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। আর যদি সাদকা করে দাও, তাহলে এটা তোমাদের জন্য বেশী ভালো হবে, যদি তোমরা জানতে।[৩২৪] যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে সেদিনের অপমান ও বিপদ থেকে বাঁচো। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জিত সৎকর্মের ও অপকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে এবং কারো ওপর কোন জুলুম করা হবে না।

এমনভাবে ব্যবহার করে যার ফলে অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহর যেসব বান্দা প্রয়োজনের কম অংশ পেয়েছে তাদের এই কম অংশ থেকেও নিজের অর্থের জোরে এক একটি অংশ নিজের দিকে টেনে নিতে থাকে, তাহলে আসলে সে এক দিকে যেমন হবে অকৃতজ্ঞ তেমনি অন্য দিকে হবে জালেম, নিষ্ঠুর, শোষক ও দুশ্চরিত্র।

৩২২. এই রুকূ'তে মহান আল্লাহ বারবার দুই ধরনের লোকদের তুলনা করেছেন। এক ধরনের লোক হচ্ছে, স্বার্থপর, অর্থগৃধ্নু ও শাইলক প্রকৃতির, তারা আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের অধিকারের পরোয়া না করে টাকা গুণতে থাকে, প্রত্যেকটি টাকা গুণে গুণে তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে থাকে এবং সপ্তাহ ও মাসের হিসেবে তা বাড়াবার ও এই বাড়তি টাকার হিসেব রাখার মধ্যে ডুবে থাকে। দ্বিতীয় ধরনের লোক হচ্ছে, আল্লাহর অনুগত, দানশীল ও মানবতার প্রতি সহানুভূতিশীল। তারা আল্লাহ ও তার বান্দার উভয়ের

অধিকার সংরক্ষণের প্রতি নজর রাখে, নিজেদের পরিশ্রমলব্ধ অর্থ দিয়ে নিজেদের চাহিদাপূরণ করে এবং অন্যদের চাহিদা পূরণেরও ব্যবস্থা করে। আর এই সংগে নিজেদের অর্থ ব্যাপকভাবে সৎকাজে ব্যয় করে। প্রথম ধরনের লোকদেরকে আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেন না। এই ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোকদের সাহায্যে দুনিয়ায় কোন সৎ ও সুস্থ সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। আখেরাতেও তারা দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা ও বিপদ-মুসিবত ছাড়া আর কিছুই পাবে না। বিপরীতপক্ষে দ্বিতীয় ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোকদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন। তাদের সাহায্যেই দুনিয়ায় সৎ ও সুস্থ সমাজ গড়ে ওঠে এবং আখেরাতে তারাই কল্যাণ ও সাফল্যের অধিকারী হয়।

৩২৩. এ আয়াতটি মক্কা বিজয়ের পর নাযিল হয়। বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যের কারণে এটিকে এখানে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে সুদকে একটি অপছন্দনীয় বস্তু মনে করা হলেও আইনত তা রহিত করা হয়নি। এই আয়াতটি নাযিলের পর ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে সুদী কারবার একটি ফৌজদারী অপরাধে পরিণত হয়। আরবের যেসব গোত্রে সুদের প্রচলন ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের গভর্ণরের মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, এখন থেকে যদি তারা সুদের কারবার বন্ধ না করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে নাজরানের খৃষ্টানদের স্বায়ত্ত শাসনাধিকার দান করার সময় চুক্তিতে একথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়, যদি তোমরা সুদী কারবার করো তাহলে এই চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে। আয়াতের শেষের শব্দগুলোর কারণে হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হাসান বাসরী, ইবনে সীরীন ও রুবাঈ' ইবনে আনাস প্রমুখ ফকীহগণ এই মত প্রকাশ করেন যে, যে ব্যক্তি দারুল ইসলামে সুদ খাবে তাকে তাওবা করতে বাধ্য করা হবে। আর যদি সে তাতে বিরত না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। অন্য ফকীহদের মতে, এহেন ব্যক্তিকে বন্দী করে রাখাই যথেষ্ট। সুদ খাওয়া পরিত্যাগ করার অংগীকার না করা পর্যন্ত তাকে কারারুদ্ধ করে রাখতে হবে।

৩২৪. এই আয়াতটি থেকে শরীয়াতের এই বিধান গৃহীত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে ইসলামী আদালত তার ঋণদাতাদের বাধ্য করবে, যাতে তারা তাকে 'সময়' দেয় এবং কোন কোন অবস্থায় আদালত তার সমস্ত দেনা বা তার আংশিক মাফ করে দেয়ারও ব্যবস্থা করবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ এক ব্যক্তির ব্যবসায়ে লোকসান হতে থাকে। তার ওপর দেনার বোঝা অনেক বেশী বেড়ে যায়। ব্যাপারটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত গড়ায়। তিনি লোকদের কাছে ঐ ব্যক্তিকে সাহায্য করার আবেদন জানান। অনেকে তাকে আর্থিক সাহায্য দান করে কিন্তু এরপরও তার দেনা পরিশোধ হয় না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঋণদাতাদের বলেন, যা কিছু তোমরা পেয়েছো তাই নিয়ে তাকে রেহাই দাও। এর বেশী তার কাছ থেকে তোমাদের জন্য আদায় করিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। ফকীহগণ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এক ব্যক্তির থাকার ঘর, খাবার বাসনপত্র, পরার কাপড়-চোপড় এবং যেসব যন্ত্রপাতি দিয়ে সে রুজি-রোজগার করে, সেগুলো কোন অবস্থাতেই ক্রোক করা যেতে পারে না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ
وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۠ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ
يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ
بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ

৩৯ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! যখন কোন নির্ধারিত সময়ের জন্য তোমরা পরস্পরের মধ্যে ঋণের লেনদেন করো[৩২৫] তখন লিখে রাখো[৩২৬] উভয় পক্ষের মধ্যে ইনসাফ সহকারে এক ব্যক্তি দলীল লিখে দেবে। আল্লাহ যাকে লেখাপড়ার যোগ্যতা দিয়েছেন তার লিখতে অস্বীকার করা উচিত নয়। সে লিখবে এবং লেখার বিষয়বস্তু বলে দেবে সেই ব্যক্তি যার ওপর ঋণ চাপছে (অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা)। তার রব আল্লাহকে তার ভয় করা উচিত। যে বিষয় স্থিরীকৃত হয়েছে তার থেকে যেন কোন কিছুর কম বেশি না করা হয়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি বুদ্ধিহীন বা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তাহলে তার অভিভাবক ইনসাফ সহকারে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেবে। তারপর নিজেদের পুরুষদের মধ্য থেকে[৩২৭] দুই ব্যক্তিকে তার স্বাক্ষী রাখো।

৩২৫. এখান থেকে এ বিধান পাওয়া যায় যে, ঋণের ব্যাপারে সময়সীমা নির্ধারিত হওয়া উচিত।

৩২৬. সাধারণত বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ঋণের লেন-দেনের ব্যাপারে দলীল বা প্রমাণপত্র লেখাকে এবং সাক্ষী রাখাকে দূষণীয় ও আস্থাহীনতার প্রকাশ মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহর বাণী হচ্ছে এই যে, ঋণ ও ব্যবসায় সংক্রান্ত লেন-দেনের চুক্তি সাক্ষ্য প্রমাণাদিসহ লিখিত আকারে সম্পাদিত হওয়া উচিত। এর ফলে লোকদের মধ্যে লেনদেন পরিষ্কার থাকবে। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ তিন ধরনের লোক আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে কিন্তু তাদের ফরিয়াদ শোনা হয় না। এক, যার স্ত্রী অসচ্চরিত্র কিন্তু সে তাকে তালাক দেয় না। দুই, এতিমের বালেগ হবার আগে যে ব্যক্তি তার সম্পদ তার

فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدٰىهُمَا الْأُخْرٰى ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلٰى أَجَلِهِ ۚ ذٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنٰى أَلَّا
تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ
كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۚ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

আর যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায় তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষী হবে, যাতে একজন ভুলে গেলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। এসব সাক্ষী এমন লোকদের মধ্য থেকে হতে হবে যাদের সাক্ষ্য তোমাদের কাছে গ্রহণীয়।[৩২৮] সাক্ষীদেরকে সাক্ষ দেবার জন্য বললে তারা যেন অস্বীকার না করে। ব্যাপার ছোট হোক বা বড়, সময়সীমা নির্ধারণ সহকারে দলীল লেখাবার ব্যাপারে তোমরা গড়িমসি করো না। আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য এই পদ্ধতি অধিকতর ন্যায়সংগত, এর সাহায্যে সাক্ষ প্রতিষ্ঠা বেশী সহজ হয় এবং তোমাদের সন্দেহ-সংশয়ে লিপ্ত হবার সম্ভাবনা কমে যায়। তবে যেসব ব্যবসায়িক লেনদেন তোমরা পরস্পরের মধ্যে হাতে হাতে করে থাকো, সেগুলো না লিখলে কোন ক্ষতি নেই।[৩২৯] কিন্তু ব্যবসায়িক বিষয়গুলো স্থিরীকৃত করার সময় সাক্ষী রাখো। লেখক ও সাক্ষীকে কষ্ট দিয়ো না।[৩৩০] এমনটি করলে গোনাহের কাজ করবে। আল্লাহর গযব থেকে আত্মরক্ষা করো। তিনি তোমাদের সঠিক কর্মপদ্ধতি শিক্ষা দান করেন এবং তিনি সবকিছু জানেন।

হাতে সোপর্দ করে দেয়। তিন, যে ব্যক্তি কাউকে নিজের অর্থ ঋণ দেয় এবং তাতে কাউকে সাক্ষী রাখে না।

وَإِنْ كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

যদি তোমরা সফরে থাকো এবং এ অবস্থায় দলীল লেখার জন্য কোন লেখক না পাও, তাহলে বন্ধক রেখে কাজ সম্পন্ন করো।[৩৩১] যদি তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি অন্যের ওপর ভরসা করে তার সাথে কোন কাজ কারবার করে, তাহলে যার ওপর ভরসা করা হয়েছে সে যেন তার আমানত যথাযথরূপে আদায় করে এবং নিজের রব আল্লাহকে ভয় করে। আর সাক্ষ কোনক্রমেই গোপন করো না।[৩৩২] যে ব্যক্তি সাক্ষ গোপন করে তার হৃদয় গোনাহর সংস্পর্শে কলুষিত। আর আল্লাহ তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে বেখবর নন।

৩২৭. অর্থাৎ মুসলিম পুরুষদের মধ্য থেকে। এ থেকে জানা যায়, যেখানে সাক্ষী রাখা ইচ্ছাধীন সেখানে মুসলমানরা কেবলমাত্র মুসলমানদেরকে সাক্ষী বানাবে। তবে অমুসলিমদের সাক্ষী অমুসলিমরা হতে পারে।

৩২৮. এর অর্থ হচ্ছে, যে কোন ব্যক্তি সাক্ষী হবার যোগ্য নয়। বরং এমন সব লোককে সাক্ষী করতে হবে যারা নিজেদের নৈতিক চরিত্র ও বিশ্বস্ততার কারণে সাধারণভাবে লোকদের মধ্যে নির্ভরশীল বলে বিবেচিত।

৩২৯. এর অর্থ হচ্ছে, যদিও নিত্যদিনের কেনা-বেচার ক্ষেত্রে লেনদেনের বিষয়টি লিখিত থাকা ভালো, যেমন আজকাল ক্যাশমেমো লেখার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তবুও এমনটি করা অপরিহার্য নয়। অনুরূপভাবে প্রতিবেশী ব্যবসায়ীরা পরস্পরের মধ্যে রাত দিন যেসব লেনদেন করতে থাকে, সেগুলোও লিখিত আকারে না থাকলে কোন ক্ষতি নেই।

৩৩০. এর এক অর্থ এও হয় যে, কোন দলীল বা প্রমাণপত্র লেখার বা তাতে সাক্ষী থাকার জন্য কোন ব্যক্তির ওপর জোর খাটানো যাবে না এবং তাকে বাধ্য করা হবে না। আবার এ অর্থও হয় যে, কোন পক্ষ তার স্বার্থ বিরোধী সঠিক সাক্ষ্য দেয়ার কারণে যেন লেখক বা সাক্ষীকে কষ্ট না দেয়।

৩৩১. এর অর্থ এই নয় যে, বন্ধকের ব্যাপারটা কেবলমাত্র সফরেই হতে পারে। বরং এ অবস্থাটা যেহেতু বেশীর ভাগ সফরেই দেখা দেয়, তাই বিশেষ করে এর উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া বন্ধকের ব্যাপারে এ শর্তও এখানে লাগানো হয়নি যে, দলীল লেখা সম্ভব না হলে কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই বন্ধকের আশ্রয় নেয়া যায়। এ ছাড়া এর আর একটি

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ
اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۭ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ
يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤﴾ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ
اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۭ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰۗىِٕكَتِهٖ
وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۣ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۣ وَقَالُوْا سَمِعْنَا
وَاَطَعْنَا ڭ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾

৪০ রুকূ'

আকাশসমূহে[৩৩৩] ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর।[৩৩৪] তোমরা নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করো বা লুকিয়ে রাখো, আল্লাহ অবশ্যি তোমাদের কাছ থেকে তার হিসেব নেবেন।[৩৩৫] তারপর তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন, এটা তাঁর ইখতিয়ারাধীন। তিনি সব জিনিসের ওপর শক্তি খাটাবার অধিকারী।[৩৩৬]

রসূল তার রবের পক্ষ থেকে তার ওপর যে হিদায়াত নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে। আর যেসব লোক ঐ রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারাও ঐ হিদায়াতকে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছে। তারা সবাই আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাদেরকে, তাঁর কিতাবসমূহকে ও তাঁর রসূলদেরকে মানে এবং তাদের বক্তব্য হচ্ছে ঃ "আমরা আল্লাহর রসূলদের একজনকে আর একজন থেকে আলাদা করি না। আমরা নির্দেশ শুনেছি ও অনুগত হয়েছি। হে প্রভু ! আমরা তোমার কাছে গোনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা করছি। আমাদের তোমারই দিকে ফিরে যেতে হবে।[৩৩৭]

পদ্ধতিও হতে পারে। নিছক দলীলের ওপর নির্ভর করে টাকা ধার দিতে কেউ রাজী না হলে ঋণগ্রহীতা নিজের কোন জিনিস বন্ধক রেখে টাকা ধার নেবে। কিন্তু কুরআন মজীদ তার অনুসারীদের দানশীলতা ও মহানুভবতার শিক্ষা দিতে চায়। আর এক ব্যক্তি ধন-সম্পদের অধিকারী হবার পর কাউকে কোন জিনিস বন্ধক না রেখে তার প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ তাকে ধার দিতে রাজী হবে না, এটা তার উন্নত নৈতিক চরিত্রের পরিপন্থী। তাই কুরআন উদ্দেশ্যমূলকভাবেই দ্বিতীয় পদ্ধতিটির উল্লেখ করেনি।

এ প্রসংগে একথাও জেনে রাখা উচিত যে, বন্ধক রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঋণদাতা তার ঋণ ফেরত পাবার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে চায়। নিজের ঋণ বাবদ প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্ত বন্ধকী জিনিস থেকে কোন প্রকার লাভবান হবার অধিকার তার নেই। যদি কোন ব্যক্তি বন্ধকী গৃহে নিজে বাস করে বা তার ভাড়া খায়, তাহলে আসলে সে সুদ খায়। ঋণ বাবদ প্রদত্ত টাকার সরাসরি সুদ গ্রহণ করা ও বন্ধকী জিনিস থেকে লাভবান হবার মধ্যে নীতিগতভাবে কোন পার্থক্য নেই। তবে যদি কোন পশু বন্ধক রাখা হয় তাহলে তার দুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। এবং তাকে আরোহণ ও মাল পরিবহনের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ বন্ধক গ্রহণকারী পশুকে যে খাদ্য দেয়, এটা আসলে তার বিনিময়।

৩৩২. সাক্ষ দিতে না চাওয়া এবং সাক্ষে সত্য ঘটনা প্রকাশে বিরত থাকা উভয়টিই 'সাক্ষ গোপন' করার আওতায় পড়ে।

৩৩৩. এখানে ভাষণ সমাপ্ত করা হয়েছে। তাই দীনের মৌলিক শিক্ষাগুলোর বর্ণনার মাধ্যমে যেমন সূরার সূচনা করা হয়েছিল ঠিক তেমনি যে সমস্ত মৌলিক বিষয়ের ওপর দীনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত সূরার সমাপ্তি প্রসংগে সেগুলোও বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। তুলনামূলক পাঠের জন্য সূরার প্রথম রুকূ'টি সামনে রাখলে বিষয়বস্তু বুঝতে বেশী সাহায্য করবে বলে মনে করি।

৩৩৪. এটি হচ্ছে দীনের প্রথম বুনিয়াদ। আল্লাহ এই পৃথিবী ও আকাশসমূহের মালিক এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁর একক মালিকানাধীন, প্রকৃতপক্ষে এই মৌলিক সত্যের ভিত্তিতেই মানুষের জন্য আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির নত করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন কর্মপদ্ধতি বৈধ ও সঠিক হতে পারে না।

৩৩৫. এই বাক্যটিতে আরো দু'টি কথা বলা হয়েছে। এক, প্রত্যেক ব্যক্তি এককভাবে আল্লাহর কাছে দায়ি হবে এবং এককভাবে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। দুই, পৃথিবী ও আকাশের যে একচ্ছত্র অধিপতির কাছে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে তিনি অদৃশ্য ও প্রকাশ্যের জ্ঞান রাখেন। এমনকি লোকদের গোপন সংকল্প এবং তাদের মনের সংগোপনে যেসব চিন্তা জাগে সেগুলোও তাঁর কাছে অপ্রকাশ নেই।

৩৩৬. এটি আল্লাহর অবাধ ক্ষমতারই একটি বর্ণনা। তাঁর ওপর কোন আইনের বাঁধন নেই। কোন বিশেষ আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য তিনি বাধ্য নন। বরং তিনি সর্বময় ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। শাস্তি দেয়ার ও মাফ করার পূর্ণ ইখতিয়ার তাঁর রয়েছে।

৩৩৭. বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে এই আয়াতে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতির সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করা হয়েছে। এই সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে ঃ আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাদেরকে ও তার কিতাবসমূহকে মেনে নেয়া, তাঁর রসূলদের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য সূচিত না করে (অর্থাৎ কাউকে মেনে নেয়া আর কাউকে না মেনে নেয়া) তাঁদেরকে স্বীকার করে নেয়া এবং সবশেষে আমাদের তাঁর সামনে হাযির হতে হবে, এ বিষয়টি স্বীকার করে নেয়া। এ পাঁচটি বিষয় ইসলামের বুনিয়াদী আকীদার অন্তরভুক্ত। এই আকীদাগুলো মেনে নেয়ার পর একজন মুসলমানের জন্য নিম্নোক্ত কর্মপদ্ধতিই সঠিক

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا
لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ
مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

আল্লাহ কারোর ওপর তার সামর্থের অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপান না।[৩৩৮] *প্রত্যেক ব্যক্তি যে নেকী উপার্জন করেছে তার ফল তার নিজেরই জন্য এবং যে গোনাহ সে অর্জন করেছে, তার প্রতিফলও তারই ওপর বর্তাবে।*[৩৩৯]

(হে ঈমানদারগণ, তোমরা এভাবে দোয়া চাও ঃ) হে আমাদের রব! ভুল-ভ্রান্তিতে আমরা যেসব গোনাহ করে বসি, তুমি সেগুলো পাকড়াও করো না। হে প্রভু! আমাদের ওপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না, যা তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলে।[৩৪০] *হে আমাদের প্রতিপালক! যে বোঝা বহন করার সামর্থ আমাদের নেই, তা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না।*[৩৪১] *আমাদের প্রতি কোমল হও, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি করুণা করো। তুমি আমাদের অভিভাবক। কাফেরদের মোকাবিলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো।*[৩৪২]

হতে পারে ঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নির্দেশগুলো আসবে সেগুলোকে সে মাথা পেতে গ্রহণ করে নেবে, সেগুলোর আনুগত্য করবে এবং নিজের ভালো কাজের জন্য অহংকার করে বেড়াবে না বরং আল্লাহর কাছে অবনত হতে ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।

৩৩৮. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে মানুষের সামর্থ অনুযায়ী তার দায়িত্ব বিবেচিত হয়। মানুষ কোন কাজ করার ক্ষমতা রাখে না অথচ আল্লাহ তাকে সে কাজটি না করার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, এমনটি কখনো হবে না। অথবা প্রকৃতপক্ষে কোন কাজ বা জিনিস থেকে দূরে থাকার সামর্থই মানুষের ছিল না, সে ক্ষেত্রে তাতে জড়িত হয়ে পড়ার জন্য আল্লাহর কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, নিজের শক্তি-সামর্থ আছে কিনা, এ সম্পর্কে মানুষ নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে মানুষের কিসের শক্তি-সামর্থ ছিল আর কিসের ছিল না—এ সিদ্ধান্ত একমাত্র আল্লাহ গ্রহণ করতে পারেন।

৩৩৯. এটি আল্লাহ প্রদত্ত মানবিক ইখতিয়ার বিধির দ্বিতীয় মূলনীতি। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে যে কাজ করেছে তার পুরস্কার পাবে। একজনের কাজের পুরস্কার অন্যজন পাবে, এটা কখনো সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে যে দোষ করেছে সে জন্য পাকড়াও হবে। একজন দোষ করবে আর অন্যজন পাকড়াও হবে, এটা কখনো সম্ভব নয়। তবে এটা সম্ভব, এক ব্যক্তি কোন সৎকাজের ভিত্তি রাখলো এবং দুনিয়ায় হাজার বছর পর্যন্ত তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত থাকলো, এ ক্ষেত্রে এগুলো সব তার আমলনামায় লেখা হবে। আবার অন্য এক ব্যক্তি কোন খারাপ কাজের ভিত্তি রাখলো এবং শত শত বছর পর্যন্ত দুনিয়ায় তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত থাকলো। এ অবস্থায় এগুলোর গোনাহ ঐ প্রথম জালেমের আমলনামায় লেখা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে ভালো বা মন্দ যা কিছু ফল হবে, সবই হবে মানুষের প্রচেষ্টা ও সাধনার ফলশ্রুতি। মোটকথা যে ভালো বা মন্দ কাজে মানুষের নিজের ইচ্ছা, সংকল্প, প্রচেষ্টা ও সাধনার কোন অংশই নেই, তার শাস্তি বা পুরস্কার সে পাবে, এটা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কর্মফল হস্তান্তর হওয়ার মতো জিনিস নয়।

৩৪০. অর্থাৎ আমাদের পূর্ববর্তীরা তোমার পথে চলতে গিয়ে যেসব পরীক্ষা, ভয়াবহ বিপদ, দুঃখ-দুর্দশা ও সংকটের সম্মুখীন হয়, তার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো। যদিও আল্লাহর রীতি হচ্ছে, যে ব্যক্তি সত্য ও ন্যায়ের অনুসরণ করার সংকল্প করেছে, তাকেই তিনি কঠিন পরীক্ষা ও সংকটের সাগরে নিক্ষেপ করেছেন এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হলে মু'মিনের কাজই হচ্ছে, পূর্ণ ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে তার মোকাবিলা করা, তবুও মু'মিনকে আল্লাহর কাছে এই দোয়াই করতে হবে যে, তিনি যেন তার জন্য সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা সহজ করে দেন।

৩৪১. অর্থাৎ সমস্যা ও সংকটের এমন বোঝা আমাদের ওপর চাপাও, যা বহন করার ক্ষমতা আমাদের আছে। যে পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হবার ক্ষমতা আমাদের আয়ত্বাধীন তেমনি পরীক্ষায় আমাদের নিক্ষেপ করো। আমাদের সহ্য ক্ষমতার বেশী দুঃখ-কষ্ট-বিপদ আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না। তাহলে আমরা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবো।

৩৪২. এই দোয়াটির পূর্ণ প্রাণসত্তা অনুধাবন করার জন্য এর নিম্নোক্ত প্রেক্ষাপটটি সামনে রাখতে হবে। হিজরাতের প্রায় এক বছর আগে মি'রাজের সময় এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। তখন মক্কায় ইসলাম ও কুফরের লড়াই চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। মুসলমানদের মাথায় বিপদ ও সংকটের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছিল। কেবল মক্কাতেই নয়, আরব ভূ-খণ্ডের কোথাও এমন কোন জায়গা ছিল না যেখানে কোন ব্যক্তি দীন ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তার জন্য আল্লাহর যমীনে, বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়েনি। এ অবস্থায় মুসলমানদের আল্লাহর কাছে এভাবে দোয়া করার নির্দেশ দেয়া হলো। দানকারী নিজেই যখন চাওয়ার পদ্ধতি বাতলে দেন তখন তা পাওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া যায়। তাই এই দোয়া সেদিন মুসলমানদের জন্য অসাধারণ মানসিক নিশ্চন্ততার কারণ হয়। এ ছাড়াও এই দোয়ায় পরোক্ষভাবে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়, নিজেদের আবেগ অনুভূতিকে কখনো অসংগত ও অনুপযোগী ধারায় প্রবাহিত করো না বরং সেগুলোকে এই দোয়ার ছাঁচে ঢালাই করো। একদিকে নিছক সত্যানুসারিতা ও সত্যের প্রতি সমর্থন দানের

কারণে লোকদের ওপর যেসব হৃদয় বিদারক জুলুম নির্যাতন চালানো হচ্ছিল সেগুলো দেখুন এবং অন্যদিকে এই দোয়াগুলো দেখুন, যাতে শত্রুদের বিরুদ্ধে সামান্য তিক্ততার নামগন্ধও নেই। একদিকে এই সত্যানুসারীরা যেসব শারীরিক দুর্ভোগ ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছিল সেগুলো দেখুন এবং অন্যদিকে এই দোয়াগুলো দেখুন, যাতে পার্থিব স্বার্থের সামান্য প্রত্যাশাও নেই, একদিকে সত্যানুসারীদের চরম দুরবস্থা দেখুন এবং অন্যদিকে এই দোয়ায় উৎসারিত উন্নত ও পবিত্র আবেগ-উদ্দীপনা দেখুন। এই তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সে সময় ঈমানদারদের কোন্ ধরনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন দেয়া হচ্ছিল, তা সঠিক ও নির্ভুলভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

আলে ইমরান

৩

নামকরণ

এই সূরার এক জায়গায় "আলে ইমরানের" কথা বলা হয়েছে। একেই আলামত হিসেবে এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল ও বিষয়বস্তুর অংশসমূহ

প্রথম ভাষণটি সূরার প্রথম থেকে শুরু হয়ে চতুর্থ রুকূ'র প্রথম দু' আয়াত পর্যন্ত চলেছে এবং এটি সম্ভবত বদর যুদ্ধের নিকটবর্তী সময়ে নাযিল হয়।

দ্বিতীয় ভাষণটি ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

(আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদেরকে সারা দুনিয়াবাসীর ওপর প্রাধান্য দিয়ে নিজের রিসালাতের জন্য বাছাই করে নিয়েছিলেন।) আয়াত থেকে শুরু হয়ে ষষ্ঠ রুকূ'র শেষে গিয়ে শেষ হয়েছে। ৯ হিজরীতে নাজরানের প্রতিনিধি দলের আগমনকালে এটি নাযিল হয়।

তৃতীয় ভাষণটি সপ্তম রুকূ'র শুরু থেকে নিয়ে দ্বাদশ রুকূ'র শেষ অব্দি চলেছে। প্রথম ভাষণের সাথে সাথেই এটি নাযিল হয় বলে মনে হয়।

চতুর্থ ভাষণটি ত্রয়োদশ রুকূ' থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। ওহোদ যুদ্ধের পর এটি নাযিল হয়।

সম্বোধন ও আলোচ্য বিষয়াবলী

এই বিভিন্ন ভাষণকে এক সাথে মিলিয়ে যে জিনিসটি একে একটি সুগ্রথিত ধারাবাহিক প্রবন্ধে পরিণত করেছে সেটি হচ্ছে এর উদ্দেশ্য, মূল বক্তব্য ও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য ও একমুখীনতা। সূরায় বিশেষ করে দু'টি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে। একটি দল হচ্ছে, আহলি কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান) এবং দ্বিতীয় দলটিতে রয়েছে এমন সব লোক যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিল।

সূরা বাকারায় ইসলামের বাণী প্রচারের যে ধারা শুরু করা হয়েছিল প্রথম দলটির কাছে সেই একই ধারায় প্রচার আরো জোরালো করা হয়েছে। তাদের আকীদাগত ভ্রষ্টতা ও

চারিত্রিক দুষ্কৃতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে তাদেরকে জানানো হয়েছে যে, এই রসূল এবং এই কুরআন এমন এক দীনের দিকে নিয়ে আসছে প্রথম থেকে সকল নবীই যার দাওয়াত দিয়ে আসছেন এবং আল্লাহর প্রকৃতি অনুযায়ী যা একমাত্র সত্য দীন। এই দীনের সোজা পথ ছেড়ে তোমরা যে পথ ধরেছো তা যেসব কিতাবকে তোমরা আসমানী কিতাব বলে স্বীকার করো তাদের দৃষ্টিতেও সঠিক নয়। কাজেই যার সত্যতা তোমরা নিজেরাও অস্বীকার করতে পারো না তার সত্যতা স্বীকার করে নাও।

দ্বিতীয় দলটি এখন শ্রেষ্ঠতম দলের মর্যাদা লাভ করার কারণে তাকে সত্যের পতাকাবাহী ও বিশ্বমানবতার সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্ব দান করা হয়েছে। এই প্রসংগে সূরা বাকারায় যে নির্দেশ শুরু হয়েছিল এখানে আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মতদের ধর্মীয় ও চারিত্রিক অধপতনের ভয়াবহ চিত্র দেখিয়ে তাকে তাদের পদাংক অনুসরণ করা থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। একটি সংস্কারবাদী দল হিসেবে সে কিভাবে কাজ করবে এবং যেসব আহ্‌লি কিতাব ও মুনাফিক মুসলমান আল্লাহর পথে নানা প্রকার বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করছে তাদের সাথে কি আচরণ করবে, তাও তাকে জানানো হয়েছে। ওহোদ যুদ্ধে তার মধ্যে যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল তা দূর করার জন্যও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

এভাবে এ সূরাটি শুধুমাত্র নিজের অংশগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করেনি এবং নিজের অংশগুলোকে একসূত্রে গ্রথিত করেনি বরং সূরা বাকারার সাথেও এর নিকট সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। এটি একেবারেই তার পরিশিষ্ট মনে হচ্ছে। সূরা বাকারার লাগোয়া আসনই তার স্বাভাবিক আসন বলে অনুভূত হচ্ছে।

নাযিলের কার্যকারণ

সূরাটির ঐতিহাসিক পটভূমি হচ্ছে ঃ

এক ঃ এই সত্য দীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে সূরা বাকারায় পূর্বাহ্নেই যেসব পরীক্ষা, বিপদ-আপদ ও সংকট সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল তা পূর্ণ মাত্রায় সংঘটিত হয়েছিল। বদর যুদ্ধে ঈমানদারগণ বিজয় লাভ করলেও এ যুদ্ধটি যেন ছিল ভীমরুলের চাকে ঢিল মারার মতো ব্যাপার। এ প্রথম সশস্ত্র সংঘর্ষটি আরবের এমন সব শক্তিগুলোকে অকস্মাত নাড়া দিয়েছিল যারা এ নতুন আন্দোলনের সাথে শত্রুতা পোষণ করতো। সবদিকে ফুটে উঠছিল ঝড়ের আলামত। মুসলমানদের ওপর একটি নিরন্তর ভীতি ও অস্থিরতার অবস্থা বিরাজ করছিল। মনে হচ্ছিল, চারপাশের সারা দুনিয়ার আক্রমণের শিকার মদীনার এ ক্ষুদ্র জনবসতিটিকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলে দেয়া হবে। মদীনার অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর এ পরিস্থিতির অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব পড়েছিল। মদিনা ছিল তো একটি ছোট্ট মফস্বল শহর। জনবসতি কয়েক শো ঘরের বেশী ছিল না। সেখানে হঠাৎ বিপুল সংখ্যক মুহাজিরের আগমন। ফলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য তো এমনিতেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর আবার এই যুদ্ধাবস্থার কারণে বাড়তি বিপদ দেখা দিল।

দুই ঃ হিজরতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার আশপাশের ইহুদী গোত্রগুলোর সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন তারা সেই চুক্তির প্রতি সামন্যতমও

সন্মান প্রদর্শন করেনি। বদর যুদ্ধকালে এই আহ্‌লি কিতাবদের যাবতীয় সহানুভূতি তাওহীদ ও নবুয়াত এবং কিতাব ও আখেরাত বিশ্বাসী মুসলমানদের পরিবর্তে মূর্তিপূজারী মুশরিকদের সাথে ছিল। বদর যুদ্ধের পর তারা কুরাইশ ও আরবের অন্যান্য গোত্রগুলোকে প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। বিশেষ করে বনী নযীরের সরদার কা'ব ইবনে আশরাফ তো এ ব্যাপারে নিজের বিরোধমূলক প্রচেষ্টাকে অন্ধ শত্রুতা বরং নীচতার পর্যায়ে নামিয়ে আনে। মদীনাবাসীদের সাথে এই ইহুদীদের শত শত বছর থেকে যে বন্ধুত্ব ও প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক চলে আসছিল তার কোন পরোয়াই তারা করেনি। শেষে যখন তাদের দুষ্কর্ম ও চুক্তি ভংগ সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধের কয়েক মাস পরে এই ইহুদী গোত্রগুলোর সবচেয়ে বেশী দুষ্কর্মপরায়ণ 'বনী কাইনুকা' গোত্রের ওপর আক্রমণ চালান এবং তাদেরকে মদীনার শহরতলী থেকে বের করে দেন। কিন্তু এতে অন্য ইহুদী গোত্রগুলোর হিংসার আগুন আরো বেশী তীব্র হয়ে ওঠে। তারা মদীনার মুনাফিক মুসলমান ও হিজাযের মুশরিক গোত্রগুলোর সাথে চক্রান্ত করে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য চার দিকে অসংখ্য বিপদ সৃষ্টি করে। এমনকি কখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাণ নাশের জন্য তাঁর ওপর আক্রমণ চালানো হয় এই আশংকা সর্বক্ষণ দেখা দিতে থাকে। এ সময় সাহাবায়ে কেরাম সবসময় সশস্ত্র থাকতেন। নৈশ আক্রমণের ভয়ে রাতে পাহারা দেয়া হতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি কখনো সামান্য সময়ের জন্যও চোখের আড়াল হতেন তাহলে সাহাবায়ে কেরাম উদ্বেগ আকুল হয়ে তাঁকে খুঁজতে বের হতেন।

তিন ঃ বদরে পরাজয়ের পর কুরাইশদের মনে এমনিতেই প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল, ইহুদীরা তার ওপর কেরোশিন ছিটিয়ে দিল। ফলে এক বছর পরই মক্কা থেকে তিন হাজার সুসজ্জিত সৈন্যের একটি দল মদীনা আক্রমণ করলো। এ যুদ্ধটি হলো ওহোদ পাহাড়ের পাদদেশে। তাই ওহোদের যুদ্ধ নামেই এটি পরিচিত। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মদীনা থেকে এক হাজার লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হয়েছিল। কিন্তু পথে তিনশো মুনাফিক হঠাৎ আলাদা হয়ে মদীনার দিকে ফিরে এলো। নবীর (সা) সাথে যে সাতশো লোক রয়ে গিয়েছিল তার মধ্যেও মুনাফিকদের একটি ছোট দল ছিল। যুদ্ধ চলা কালে তারা মুসলমানদের মধ্যে ফিত্‌না সৃষ্টি করার সম্ভাব্য সব রকমের প্রচেষ্টা চালালো। এই প্রথমবার জানা গেলো, মুসলমানদের স্বগৃহে এত বিপুল সংখ্যক আস্তীনের সাপ লুকানো রয়েছে এবং তারা এভাবে বাইরের শত্রুদের সাথে মিলে নিজেদের ভাই-বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের ক্ষতি করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।

চার ঃ ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় যদিও মুনাফিকদের কৌশলের একটি বড় অংশ ছিল তবুও মুসলমানদের নিজেদের দুর্বলতার অংশও কম ছিল না। একটি বিশেষ চিন্তাধারা ও নৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে যে দলটি এই সবেমাত্র গঠিত হয়েছিল, যার নৈতিক প্রশিক্ষণ এখনো পূর্ণ হতে পারেনি এবং নিজের বিশ্বাস ও নীতি সমর্থনে যার লড়াই করার এই মাত্র দ্বিতীয় সুযোগ ছিল তার কাজে কিছু দুর্বলতা প্রকাশ হওয়াটা

একটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। তাই যুদ্ধের পর এই যুদ্ধের যাবতীয় ঘটনাবলীর ওপর বিস্তারিত মন্তব্য করা এবং তাতেই ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানদের মধ্যে যেসব দুর্বলতা পাওয়া গিয়েছিল তার মধ্য থেকে প্রত্যেকটির প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে তার সংশোধনের জন্য নির্দেশ দেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এ প্রসংগে একথাটি দৃষ্টি সমক্ষে রাখার উপযোগিতা রাখে যে, অন্য জেনারেলরা নিজেদের যুদ্ধের পরে তার ওপর যে মন্তব্য করেন এ যুদ্ধের ওপরে কুরআনের মন্তব্য তা থেকে কত বিভিন্ন!

আয়াত ২০০ | সূরা আলে ইমরান—মাদানী | রুকূ' ২০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

الٓمّٓ ۝١ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۝٢ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ
بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۝٣
مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝٤

আলিফ লাম-মীম। আল্লাহ এক চিরঞ্জীব ও শাশ্বত সত্তা, যিনি বিশ্ব-জাহানের সমগ্র ব্যবস্থাপনাকে ধারণ করে আছেন, আসলে তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।[১]

তিনি তোমার ওপর এই কিতাব নাযিল করেছেন, যা সত্যের বাণী বহন করে এনেছে এবং আগের কিতাবগুলোর সত্যতা প্রমাণ করছে। এর আগে তিনি মানুষের হিদায়াতের জন্য তাওরাত ও ইনজীল নাযিল করেছিলেন।[২] আর তিনি মানদণ্ড নাযিল করেছেন (যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দেয়)। এখন যারা আল্লাহর বিধানসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করবে, তারা অবশ্যি কঠিন শাস্তি পাবে। আল্লাহ অসীম ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি অন্যায়ের শাস্তি দিয়ে থাকেন।

১. এর ব্যাখা জানার জন্য সূরা আল বাকারার ২৭৮ টীকা দেখুন।

২. সাধারণভাবে লোকেরা তাওরাত বলতে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের (পুরাতন নিয়ম) প্রথম দিকের পাঁচটি পুস্তক এবং ইনজীল বলতে নিউ টেস্টামেন্টের (নুতন নিয়ম) চারটি প্রসিদ্ধ ইনজীল মনে করে থাকে। তাই এ পুস্তকগুলো সত্যিই আল্লাহর কালাম কিনা, এ প্রশ্ন দেখা দেয়। আর এই সংগে এ প্রশ্নও দেখা দেয় যে, এই পুস্তকগুলোতে যেসব কথা লেখা আছে যথার্থই কুরআন সেগুলোকে সত্য বলে কিনা। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, তাওরাত বাইবেলের প্রথম পাঁচটি পুস্তকের নাম নয় বরং এগুলোর মধ্যে তাওরাত নিহিত রয়েছে এবং ইনজীল নিউ টেস্টামেন্টের চারটি ইনজীলের নাম নয় বরং এগুলোর মধ্যে ইনজীল পাওয়া যায়।

আসলে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াত লাভের পর থেকে তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তাঁর ওপর যেসব বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল সেগুলোই তাওরাত। এর মধ্যে পাথরের তক্তার গায়ে খোদাই করে দশটি বিধান আল্লাহ তাঁকে দান করেছিলেন। অবশিষ্ট বিধানগুলো হযরত মূসা (আ) লিখিয়ে তার বারোটি অনুলিপি করে বারোটি গোত্রকে দান করেছিলেন এবং একটি কপি সংরক্ষণ করার জন্যে দান করেছিলেন বনী লাবীকে। এ কিতাবের নাম ছিল তাওরাত। বাইতুল মাকদিস প্রথমবার ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত এটি একটি স্বতন্ত্র কিতাব হিসেবে সংরক্ষিত ছিল। বনি লাবীকে যে কপিটি দেয়া হয়েছিল, পাথরের তক্তা সহকারে সেটি 'অংগীকারের সিন্দুকে'র মধ্যে রাখা হয়েছিল। বনী ইসরাঈল সেটিকে 'তাওরীত' নামেই জানতো। কিন্তু তার ব্যাপারে তাদের গাফলতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যার ফলে ইয়াহুদীয়ার বাদশাহ ইউসিয়ার আমলে যখন 'হাইকেলে সুলাইমানী' মেরামত করা হয়েছিল তখন ঘটনাক্রমে 'কাহেন' প্রধান (অর্থাৎ হাইকেল বা উপাসনা গৃহের গদীনশীন এবং জাতির প্রধান ধর্মীয় নেতা) খিলকিয়াহ একস্থানে তাওরীত সুরক্ষিত অবস্থায় পেয়ে গেলেন। তিনি একটি অদ্ভুত বস্তু হিসেবে এটি বাদশাহর প্রধান সেক্রেটারীকে দিলেন। সেক্রেটারী সেটিকে এমনভাবে বাদশাহর সামনে পেশ করেন যেন এটি একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার (২-রাজাবলী, অধ্যায় ২২, শ্লোক ৮-১৩ দেখুন)। এ কারণেই বখ্তে নসর যখন জেরুসালেম জয় করে হাইকেলসহ সারা শহর ধ্বংস করে দিল তখন বনী ইসরাঈলরা তাওরাতের যে মূল কপিটিকে বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছিল এবং যার অতি অল্প সংখ্যক অনুলিপি তাদের কাছে ছিল, সেগুলো হারিয়ে ফেললো চিরকালের জন্য। তারপর আযরা (উযাইর) কাহেনের যুগে বনী ইসরাঈলদের অবশিষ্ট লোকেরা বেবিলনের কারাগার থেকে জেরুসালেমে ফিরে এলো এবং বাইতুল মাকদিস পুনর্নির্মাণ করা হলো। এ সময় উযাইর নিজের জাতির আরো কয়েকজন মনীষীর সহায়তায় বনী ইসরাঈলদের পূর্ণ ইতিহাস লিখে ফেললেন। বর্তমান বাইবেলের প্রথম সতেরোটি পরিচ্ছেদ এ ইতিহাস সম্বলিত। এ ইতিহাসের চারটি অধ্যায় অর্থাৎ যাত্রা, লেবীয়, গণনা ও দ্বিতীয় বিবরণে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জীবনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। আযরা ও তার সহযোগীরা তাওরাতের যতগুলো আয়াত সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন এই জীবন ইতিহাসের বিভিন্ন স্থানে অবতীর্ণের সময়-কাল ও ধারাবাহিকতা অনুযায়ী ঠিক জায়গামতো সেগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে। কাজেই এখন মূসা আলাইহিস সালামের জীবন ইতিহাসের মধ্যে সেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অংশের নামই তাওরাত। এগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য আমরা কেবলমাত্র নিম্নোক্ত আলামতের ওপর নির্ভর করতে পারি। এ ঐতিহাসিক বর্ণনার মাঝখানে যেখানে লেখক বলেন, প্রভু মূসাকে একথা বললেন অথবা মূসা বলেন, সদাপ্রভু তোমাদের প্রভু একথা বললেন, সেখান থেকে তাওরাতের একটি অংশ শুরু হচ্ছে, তারপর আবার যেখান থেকে জীবনী প্রসংগ শুরু হয়ে গেছে সেখান থেকে ঐ অংশটি খতম হয়ে গেছে ধরে নিতে হবে। মাঝখানে যেখানে যেখানে বাইবেলের লেখক ব্যাখ্যা বা টীকা আকারে কিছু অংশ বৃদ্ধি করেছে, সেগুলো চিহ্নিত করে ও বাছাই করে আসল তাওরাত থেকে আলাদা করে ফেলা একজন সাধারণ পাঠকের জন্য অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তবুও যারা আসমানী কিতাবসমূহের গভীর জ্ঞান রাখেন, তারা ঐসব অংশের কোথায় কোথায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মূলক বৃদ্ধি করা হয়েছে কিছুটা নির্ভুলভাবে তা অনুধাবন করতে পারেন। এ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অংশগুলোকেই

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٥﴾ هُوَ الَّذِي
يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾

পৃথিবী ও আকাশের কোন কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নেই।[৩] তিনি মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন।[৪] এই প্রবল পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানের অধিকারী সত্তা ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।

কুরআন তাওরাত নামে আখ্যায়িত করেছে। কুরআন এগুলোকেই সত্য বলে ঘোষণা দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ অংশগুলোকে একত্র করে কুরআনের পাশাপাশি দাঁড় করালে কোন কোন স্থানে ছোট খাটো ও খুঁটিনাটি বিধানের মধ্যে কিছু বিরোধ দেখা গেলেও মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সামান্যতম পার্থক্যও পাওয়া যাবে না। আজও একজন সচেতন পাঠক সুস্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারেন যে, এ দু'টি স্রোতধারা একই উৎস থেকে উৎসারিত।

অনুরূপভাবে ইনজীল হচ্ছে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ইলহামী ভাষণ ও বাণী সমষ্টি, যা তিনি নিজের জীবনের শেষ আড়াই তিন বছরে নবী হিসেবে প্রচার করেন। এ পবিত্র বাণীসমূহ তাঁর জীবদ্দশায় লিখিত, সংকলিত ও বিন্যস্ত হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে জানার কোন উপায় আমাদের কাছে নেই। হতে পারে কিছু লোক সেগুলো নোট করে নিয়েছিলেন। আবার এমনও হতে পারে, শ্রবণকারী ভক্তবৃন্দ সেগুলো কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলেন। যাহোক দীর্ঘকাল পরে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জীবন বৃত্তান্ত সম্বলিত বিভিন্ন পুস্তিকা রচনা কালে তাতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সাথে সাথে ঐ পুস্তিকাগুলোর রচয়িতাদের কাছে মৌখিক বাণী ও লিখিত স্মৃতিকথা আকারে হযরত ঈসার (আ) যেসব বাণী ও ভাষণ পৌঁছেছিল সেগুলোও বিভিন্ন স্থানে জায়গা মতো সংযোজিত হয়েছিল। বর্তমানে মথি, মার্ক, লুক ও যোহন লিখিত যেসব পুস্তককে ইনজীল বলা হয় সেগুলো আসলে ইনজীল নয়। বরং ইনজীল হচ্ছে ঐ পুস্তকগুলোতে সংযোজিত হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বাণীসমূহ। আমাদের কাছে সেগুলো চেনার ও জীবনীকারদের নিজেদের কথা থেকে সেগুলো আলাদা করার এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন মাধ্যম নেই যে, যেখানে জীবনীকার বলেন, ঈসা বলেছেন অথবা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন—কেবলমাত্র এ স্থানগুলোই আসল ইনজীলের অংশ। কুরআন এ অংশগুলোর সমষ্টিকেই ইনজীল নামে অভিহিত করে এবং এরই সত্যতার ঘোষণা দেয়। এ বিক্ষিপ্ত অংশগুলোকে একত্র করে আজ যে কেউ কুরআনের পাশাপাশি রেখে এর সত্যতা বিচার করতে পারেন। তিনি উভয়ের মধ্যে অতি সামান্য পার্থক্যই দেখতে পাবেন। আর যে সামান্য পার্থক্য অনুভূত হবে পক্ষপাতহীন চিন্তা-ভাবনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা সহজেই দূর করা যাবে।

৩. অর্থাৎ তিনি বিশ্ব-জাহানের যাবতীয় তত্ত্ব ও বাস্তব সত্য জানেন। কাজেই যে কিতাব তিনি নাযিল করেছেন তা পরিপূর্ণ সত্যই হওয়া উচিত। বরং নির্ভেজাল সত্য একমাত্র সেই কিতাবের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে যেটি সেই সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী সত্তার পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে।

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ
الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ۭ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ
مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاۗءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاۗءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ
اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ
رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝٧

তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন। এ কিতাবে দুই ধরনের আয়াত আছে ঃ এক হচ্ছে, মুহকামাত, যেগুলো কিতাবের আসল বুনিয়াদ[৫] এবং দ্বিতীয় হচ্ছে, মুতাশাবিহাত।[৬] যাদের মনে বক্রতা আছে তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সবসময় মুতাশাবিহাতের পিছনে লেগে থাকে এবং তার অর্থ করার চেষ্টা করে থাকে। অথচ সেগুলোর আসল অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। বিপরীত পক্ষে পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারীরা বলে ঃ "আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, এসব আমাদের রবের পক্ষ থেকেই এসেছে।"[৭] আর প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবান লোকেরাই কোন বিষয় থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

৪. এখানে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এক, তোমাদের প্রকৃতিকে তাঁর মতো করে কেউ জানতে পারে না, এমনকি তোমরা নিজেরাও জানতে পারো না। কাজেই তার পথপ্রদর্শন ও পথনির্দেশনার ওপর আস্থা স্থাপন করা ছাড়া তোমাদের গত্যন্তর নেই। দুই, যিনি গর্ভাশয়ে তোমাদের উৎপত্তি থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল পর্যায়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমাদের ছোট ছোট প্রয়োজনগুলোও পূর্ণ করার ব্যবস্থা করেছেন, তিনি দুনিয়ার জীবনে তোমাদের হিদায়াত ও পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন না, এটা কেমন করে সম্ভব হতে পারে? অথচ তোমরা সবচেয়ে বেশী এ জিনিসটিরই মুখাপেক্ষী।

৫. মুহকাম পাকাপোক্ত জিনিসকে বলা হয়। এর বহুবচন 'মুহকামাত'। 'মুহকামাত আয়াত' বলতে এমন সব আয়াত বুঝায় যেগুলোর ভাষা একেবারেই সুস্পষ্ট, যেগুলোর অর্থ নির্ধারণ করার ব্যাপারে কোন প্রকার সংশয়-সন্দেহের অবকাশ থাকে না, যে শব্দগুলো দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য উপস্থাপন করে এবং যেগুলোর অর্থ বিকৃত করার সুযোগ লাভ করা বড়ই কঠিন। এ আয়াতগুলো 'কিতাবের আসল বুনিয়াদ'। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল করা হয়েছে এ আয়াতগুলো সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে দুনিয়াবাসীকে ইসলামের দিকে আহবান জানানো হয়েছে। এগুলোতেই শিক্ষা ও উপদেশের

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ
إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٩﴾

তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকে ঃ "হে আমাদের রব! যখন তুমি আমাদের সোজা পথে চালিয়েছো তখন আর আমাদের অন্তরকে বক্রতায় আচ্ছন্ন করে দিয়ো না, তোমার দান ভাণ্ডার থেকে আমাদের জন্য রহমত দান করো কেননা তুমিই আসল দাতা। হে আমাদের রব! অবশ্যি তুমি সমগ্র মানব জাতিকে একদিন একত্রে সমবেত করবে, যে দিনটির আগমনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তুমি কখনো ওয়াদা থেকে বিচ্যুত হও না।"

কথা বর্ণিত হয়েছে। ভ্রষ্টতার গলদ তুলে ধরে সত্য-সঠিক পথের চেহারা সুস্পষ্ট করা হয়েছে। দীনের মূলনীতি এবং আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদাত, চরিত্রনীতি, দায়িত্ব-কর্তব্য ও আদেশ-নিষেধের বিধান এ আয়াতগুলোতেই বর্ণিত হয়েছে। কাজেই কোন সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তি কোন্ পথে চলবে এবং কোন্ পথে চলবে না, একথা জানার জন্য যখন কুরআনের স্মরণাপন্ন হয় তখন এ 'মুহকাম' আয়াতগুলোই তার পথপ্রদর্শন করে। স্বাভাবিকভাবে এগুলোর প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং এগুলো থেকে উপকৃত হবার জন্য সে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।

৬. 'মুতাশাবিহাত' অর্থ যেসব আয়াতের অর্থ গ্রহণে সন্দেহ-সংশয়ের ও বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে দেবার অবকাশ রয়েছে।

বিশ্ব-জাহানের অন্তর্নিহিত সত্য ও তাৎপর্য, তার সূচনা ও পরিণতি, সেখানে মানুষের অবস্থান, মর্যাদা ও ভূমিকা এবং এ ধরনের আরো বিভিন্ন মৌলিক বিষয় সম্পর্কিত সর্বনিম্ন অপরিহার্য তথ্যাবলী মানুষকে সরবরাহ না করা পর্যন্ত মানুষের জীবন পথে চলার জন্য কোন পথনির্দেশ দেয়া যেতে পারে না, এটি একটি সর্বজন বিদিত সত্য। আবার একথাও সত্য, মানবিক ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরের বস্তু-বিষয়গুলো, যেগুলো মানবিক জ্ঞানের আওতায় কখনো আসেনি এবং আসতেও পারে না, যেগুলোকে সে কখনো দেখেনি, স্পর্শ করেনি এবং যেগুলোর স্বাদও গ্রহণ করেনি, সেগুলো বুঝাবার জন্য মানুষের ভাষার ভাণ্ডারে কোন শব্দও রচিত হয়নি এবং প্রত্যেক শ্রোতার মনে তাদের নির্ভুল ছবি অংকিত করার মতো কোন পরিচিত বর্ণনা পদ্ধতিও পাওয়া যায় না। কাজেই এ ধরনের বিষয় বুঝাবার জন্য এমন সব শব্দ ও বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, যেগুলো প্রকৃত সত্যের সাথে নিকটতর সাদৃশ্যের অধিকারী অনুভবযোগ্য জিনিসগুলো বুঝাবার জন্য মানুষের ভাষায় পাওয়া যায়। এ জন্য অতি প্রাকৃতিক তথা মানবিক জ্ঞানের উর্ধের ও ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়গুলো বুঝাবার জন্য কুরআন মজীদে এ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ
شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿١٠﴾ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿١١﴾ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۖ
وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ
تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ
وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾

২ রুকূ'

যারা কুফরী নীতি অবলম্বন করেছে,[৮] তাদের না ধন-সম্পদ, না সন্তান-সন্ততি আল্লাহর মোকাবিলায় কোন কাজে লাগবে। তারা দোজখের ইন্ধনে পরিণত হবেই। তাদের পরিণাম ঠিক তেমনি হবে যেমন ফেরাউনের সাথী ও তার আগের নাফরমানদের হয়ে গেছে ঃ তারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে, ফলে আল্লাহ তাদের গোনাহের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেছেন। আর যথার্থই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদানকারী। কাজেই হে মুহাম্মাদ! যারা তোমার দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো, তাদের বলে দাও, সেই সময় নিকটবর্তী যখন তোমরা পরাজিত হবে এবং তোমাদের জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, আর জাহান্নাম বড়ই খারাপ আবাস। তোমাদের জন্য সেই দু'টি দলের মধ্যে একটি শিক্ষার নিদর্শন ছিল যারা (বদরে) পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। একটি দল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছিল এবং অন্য দলটি ছিল কাফের। চোখের দেখায় লোকেরা দেখছিল, কাফেররা মু'মিনদের দ্বিগুণ।[৯] কিন্তু ফলাফল (প্রমাণ করলো যে) আল্লাহ তাঁর বিজয় ও সাহায্য দিয়ে যাকে ইচ্ছা সহায়তা দান করেন। অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য এর মধ্যে বড়ই শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।[১০]

ধরনের শব্দ ও ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। যেসব আয়াতে এ ধরনের ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোকেই 'মুতাশাবিহাত' বলা হয়।

কিন্তু এ ভাষা ব্যবহারের ফলে মানুষ বড়জোর সত্যের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে অথবা সত্যের অস্পষ্ট ধারণা তার মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে, এর বেশী নয়। এ ধরনের আয়াতের অর্থ নির্ণয়ের ও নির্দিষ্ট করনের জন্য যত বেশী চেষ্টা করা হবে তত বেশী সংশয়-সন্দেহ ও সম্ভাবনা বাড়তে থাকবে। ফলে মানুষ প্রকৃত সত্যের নিকটতর হবার চাইতে বরং তার থেকে আরো দূরে সরে যাবে। কাজেই যারা সত্যসন্ধানী এবং আজেবাজে অর্থহীন বিষয়ের চর্চা করার মানসিকতা যাদের নেই, তারা 'মুতাশাবিহাত' থেকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা লাভ করেই সন্তুষ্ট থাকে। এতটুকুন ধারণাই তাদের কাজ চালাবার জন্য যথেষ্ট হয়। তারপর তারা 'মুহকামাত' এর পেছনে নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে। কিন্তু যারা ফিত্‌নাবাজ অথবা বাজে কাজে সময় নষ্ট করতে অভ্যস্ত, তাদের কাজই হয় মুতাশাবিহাতের আলোচনায় মশগুল থাকা এবং তার সাহায্যেই তারা পেছন দিয়ে সিঁদ কাটে।

৭. এখানে এ অমূলক সন্দেহ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না যে, মুতাশাবিহাতের সঠিক অর্থ যখন তারা জানে না তখন তারা তার ওপর কেমন করে ঈমান আনে? আসলে একজন সচেতন বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তির মনে মুতাশাবিহাত আয়াতগুলোর দূরবর্তী অসংগত বিশ্লেষণ ও অস্পষ্ট বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে কুরআন আল্লাহর কিতাব হবার বিশ্বাস জন্মে না। এ বিশ্বাস জন্মে মুহকামাত আয়াতগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে। মুহকামাত আয়াতগুলোর মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করার পর যখন তার মনে কুরআন আল্লাহর কিতাব হবার ব্যাপারে পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ততা আসে তখন মুতাশাবিহাত তার মনে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব ও সংশয় সৃষ্টিতে সক্ষম হয় না। তাদের যতটুকু সরল অর্থ সে অনুধাবন করতে সক্ষম হয় ততটুকুই গ্রহণ করে নেয় আর যেখানে অর্থের জটিলতা দেখা দেয় সেখানে দূরবীণ লাগিয়ে অর্থের গভীরে প্রবেশ করার নামে উল্টা সিধা অর্থ করার পরিবর্তে সে আল্লাহর কালামের ওপর সামগ্রিকভাবে ঈমান এনে কাজের কথাগুলোর দিকে নিজে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়।

৮. এর ব্যাখ্যার জন্য সূরা বাকারার ১৬১ টীকা দেখুন।

৯. যদিও আসল পার্থক্য ছিল তিনগুণ। কিন্তু সরাসরি এক নজরে দেখে যে কেউ মনে করতে পারতো, কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুণ হবে।

১০. বদরের যুদ্ধ মাত্র কিছুদিন আগে হয়ে গেছে। তার বিভিন্ন ঘটনা তখনো মানুষের মনে তরতাজা ছিল। তাই এ যুদ্ধের ঘটনাবলী ও ফলাফলের প্রতি ইংগিত করে লোকদের উপদেশ দেয়া হয়েছে। এ যুদ্ধের তিনটি বিষয় ছিল অত্যন্ত শিক্ষণীয় ঃ

এক ঃ মুসলমান ও কাফেররা যেভাবে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল তাতে উভয় দলের নৈতিক ও চারিত্রিক পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। একদিকে কাফেরদের সেনাবাহিনীতে মদপানের হিড়িক চলছিল। তাদের গায়িকা ও নর্তকী বাঁদীরা সংগে এসেছিল। ফলে সেনা শিবিরে ভোগের পেয়ালা উপচে পড়ছিল। অন্যদিকে মুসলমানদের সেনাদলে আল্লাহভীতি ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের স্নিগ্ধ পরিবেশ বিরাজমান ছিল। তাদের মধ্যে ছিল চরম নৈতিক সংযম। সৈন্যরা নামায-রোযায় মশগুল ছিল। কথায় কথায় আল্লাহর নাম উচ্চারিত হচ্ছিল এবং আল্লাহর কাছে দোয়া ও করুণা ভিক্ষার মহড়া

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿١٤﴾
قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۭ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ
مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا
فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾ الصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ
وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ﴿١٧﴾

মানুষের জন্য নারী, সন্তান, সোনারূপার স্তূপ, সেরা ঘোড়া, গবাদি পশু ও কৃষি ক্ষেতের প্রতি আসক্তিকে বড়ই সুসজ্জিত ও সুশোভিত করা হয়েছে। কিন্তু এগুলো দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র। প্রকৃতপক্ষে উত্তম আবাস তো রয়েছে আল্লাহর কাছে। বলো, আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেবো, ওগুলোর চাইতে ভালো জিনিস কি? যারা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে বাগান, তার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরন্তন জীবন লাভ করবে। পবিত্র স্ত্রীরা হবে তাদের সংগিনী[১১] এবং তারা লাভ করবে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ তার বান্দাদের কর্মনীতির ওপর গভীর ও প্রখর দৃষ্টি রাখেন।[১২] এ লোকেরাই বলে : "হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের গোনাহখাতা মাফ করে দাও এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদের বাঁচাও। এরা সবরকারী,[১৩] সত্যনিষ্ঠ, অনুগত ও দানশীল এবং রাতের শেষভাগে আল্লাহর কাছে গোনাহ মাফের জন্য দোয়া করে থাকে।

চলছিল। দু'টি সৈন্য দল দেখে যে কোন ব্যক্তি অতি সহজেই জানতে পারতো, কোন্ দলটি আল্লাহর পথে লড়াই করছে।

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا
بِالْقِسْطِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾

আল্লাহ নিজেই সাক্ষ দিয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।[১৪] আর ফেরেশতা ও সকল জ্ঞানবান লোকই সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে এ সাক্ষ দিচ্ছে[১৫] যে, সেই প্রবল পরাক্রান্ত ও জ্ঞানবান সত্তা ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।

দুই ঃ মুসলমানরা তাদের সংখ্যাল্পতা ও সমরাস্ত্রের অভাব সত্ত্বেও যেভাবে কাফেরদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ও উন্নত অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত সেনাদলের ওপর বিজয় লাভ করলো তাতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, তারা আল্লাহর সাহায্যপুষ্ট ছিল।

তিন ঃ আল্লাহর প্রবল প্রতাপান্বিত ক্ষমতা সম্পর্কে গাফেল হয়ে যারা নিজেদের সাজ-সরঞ্জাম ও সমর্থকদের সংখ্যাধিক্যের কারণে আত্মম্ভরিতায় মেতে উঠেছিল, তাদের জন্য এ ঘটনাটি ছিল যথার্থই একটি চাবুকের আঘাত। আল্লাহ কিভাবে মাত্র গুটিকয় বিত্তহীন, অভাবী ও প্রবাসী মুহাজির এবং মদীনার কৃষক সমাজের মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠীর সহায়তায় কুরাইশদের মতো অভিজাত শক্তিশালী ও সমগ্র আরবীয় সমাজের মধ্যমণি গোত্রকে পরাজিত করতে পারেন, তা তারা স্বচক্ষেই দেখে নিল।

১১. এর ব্যাখ্যা দেখুন সূরা আল বাকারার ২৭ টীকায়।

১২. অর্থাৎ আল্লাহ অপাত্রে দান করেন না। উপরি উপরি বা ভাসাভাসাভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তার নীতি নয়। তিনি তার বান্দাহদের কার্যাবলী, সংকল্প ও ইচ্ছা পুরোপুরি ও ভালোভাবেই জানেন। কে পুরস্কার লাভের যোগ্য আর কে যোগ্য নয়, তাও তিনি ভালোভাবেই জানেন।

১৩. অর্থাৎ সত্য পথে পূর্ণ অবিচলতার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। কোন ক্ষতি বা বিপদের মুখে কখনো সাহস ও হিম্মতহারা হয় না। ব্যর্থতা এদের মনে কোন চিড় ধরায় না। লোভ-লালসায় পা পিছলে যায় না। যখন আপাতদৃষ্টিতে সাফল্যের কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না তখনো এরা মজবুতভাবে সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকে। (সূরা আল বাকারার ৬০ টীকাটিও দেখে নিন)

১৪. অর্থাৎ যে আল্লাহ বিশ্ব-জাহানের সমস্ত তত্ব, সত্য ও রহস্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান রাখেন, যিনি সমগ্র সৃষ্টিকে আবরণহীন অবস্থায় দেখছেন এবং যার দৃষ্টি থেকে পৃথিবী ও আকাশের কোন একটি বস্তুও গোপন নেই—এটি তার সাক্ষ্য এবং তার চাইতে আর বেশী নির্ভরযোগ্য চাক্ষুষ সাক্ষ্য আর কে দিতে পারে? কারণ সমগ্র সৃষ্টিজগতে তিনি ছাড়া আর কোন সত্তা খোদায়ী গুণে গুণান্বিত নয়। আর কোন সত্তা খোদায়ী কর্তৃত্বের অধিকারী নয় এবং আর কারোর খোদায়ী করার যোগ্যতাও নেই।

১৫. আল্লাহর পর সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য হচ্ছে ফেরেশতাদের। কারণ তারা হচ্ছে বিশ্বরাজ্যের ব্যবস্থাপনা কার্যনির্বাহী ও কর্মচারী। তারা সরাসরি নিজেদের ব্যক্তিগত

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا
مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ
اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ
اتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا
فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾

ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন—জীবনবিধান।[১৬] যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তারা এ দীন থেকে সরে গিয়ে যেসব বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, সেগুলো অবলম্বনের এ ছাড়া আর কোন কারণই ছিল না যে, প্রকৃত জ্ঞান এসে যাওয়ার পর তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ওপর বাড়াবাড়ি করার জন্য এমনটি করেছে।[১৭] আর যে কেউ আল্লাহর হেদায়াতের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে, তার কাছ থেকে হিসেব নিতে আল্লাহর মোটেই দেরী হয় না। এখন যদি এ লোকেরা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের বলে দাও : "আমি ও আমার অনুগতরা আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির নত করেছি।" তারপর আহলি কিতাব ও অ-আহলি কিতাব উভয়কে জিজ্ঞেস করো, "তোমরাও কি তাঁর বন্দেগী কবুল করেছো?"[১৮] যদি করে থাকে তাহলে ন্যায় ও সত্যের পথ লাভ করেছে আর যদি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে থাকে, তাহলে তোমার ওপর কেবলমাত্র পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্বই অর্পিত হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ নিজেই তার বান্দাদের অবস্থা দেখবেন।

জ্ঞানের ভিত্তিতে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এই বিশ্বরাজ্যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম চলে না এবং পৃথিবী ও আকাশের পরিচালনা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তিনি ছাড়া আর কোন সত্তা এমন নেই যার কাছ থেকে তারা নির্দেশ গ্রহণ করতে পারে। ফেরেশতাদের পরে এই সৃষ্টিজগতে আর যারাই প্রকৃত সত্য সম্পর্কে কম বেশী কিছুটা জ্ঞান রাখে, সৃষ্টির আদি থেকে নিয়ে আজ পর্যন্তকার তাদের সবার সর্বসম্মত সাক্ষ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ একাই এই সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মালিক, পরিচালক ও প্রভু।

১৬. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে মানুষের জন্য একটি মাত্র জীবন ব্যবস্থা ও একটি মাত্র জীবন বিধান সঠিক ও নির্ভুল বলে গৃহীত। সেটি হচ্ছে, মানুষ আল্লাহকে নিজের মালিক ও মাবুদ বলে স্বীকার করে নেবে এবং তাঁর ইবাদাত, বন্দেগী ও দাসত্বের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেবে। আর তাঁর বন্দেগী করার পদ্ধতি নিজে আবিষ্কার করবে না। বরং তিনি নিজের নবী-রসূলগণের মাধ্যমে যে হিদায়াত ও বিধান পাঠিয়েছেন কোন প্রকার কমবেশী না করে তার অনুসরণ করবে। এই চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির নাম "ইসলাম"

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ
الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٢﴾

৩ রুকূ'

যারা আল্লাহর বিধান ও হিদায়াত মানতে অস্বীকার করে এবং তাঁর নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে আর এমন লোকদের প্রাণ সংহার করে, যারা মানুষের মধ্যে ন্যায়, ইনসাফ ও সততার নির্দেশ দেবার জন্য এগিয়ে আসে, তাদের কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দাও।[১৯] এরা এমন সব লোক যাদের কর্মকাণ্ড (আমল) দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই নষ্ট হয়ে গেছে[২০] এবং এদের কোন সাহায্যকারী নেই।[২১]

আর বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টার ও প্রভুর নিজের সৃষ্টিকূল ও প্রজা সাধারণের জন্য ইসলাম ছাড়া অন্য কোন কর্মপদ্ধতির বৈধতার স্বীকৃতি না দেয়াও পুরোপুরি ন্যায়সংগত। মানুষ তার নির্বুদ্ধিতার কারণে নাস্তিক্যবাদ থেকে নিয়ে শিরক ও মূর্তিপূজা পর্যন্ত যে কোন মতবাদ ও যে কোন পদ্ধতির অনুসরণ করা নিজের জন্য বৈধ মনে করতে পারে কিন্তু বিশ্ব-জাহানের প্রভুর দৃষ্টিতে এগুলো নিছক বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৭. এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ার যে কোন অঞ্চলে যে কোন যুগে যে নবীই এসেছেন, তাঁর দীনই ছিল ইসলাম। দুনিয়ার যে কোন জাতির ওপর যে কিতাবই নাযিল হয়েছে, তা ইসলামেরই শিক্ষা দান করেছে। এই আসল দীনকে বিকৃত করে এবং তার মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে যেসব ধর্ম মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে, তাদের জন্ম ও উদ্ভবের কারণ এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, লোকেরা নিজেদের বৈধ সীমা অতিক্রম করে অধিকার, স্বার্থ ও বিশিষ্টতা অর্জন করতে চেয়েছে। আর এসব অর্জন করতে গিয়ে নিজেদের খেয়াল খুশী মতো আসল দীনের আকীদা-বিশ্বাস, মূলনীতি ও বিস্তারিত বিধান পরিবর্তন করে ফেলেছে।

১৮. অন্য কথায় এ বক্তব্যটিকে এভাবে বলা যায়, যেমন—"আমি ও আমার অনুসারীরা তো সেই নির্ভেজাল ইসলামের স্বীকৃতি দিয়েছি, যেটি আল্লাহর আসল দীন ও জীবন বিধান। এখন তোমরা বলো, তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা দীনের মধ্যে যে পরিবর্তন সাধন করেছো তা বাদ দিয়ে এই আসল ও প্রকৃত দীনের দিকে কি তোমরা ফিরে আসবে?

১৯. এটি একটি ব্যাংগাত্মক বর্ণনাভংগী। এই বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, নিজেদের যে সমস্ত কীর্তিকলাপের দরুন তারা আজ আনন্দে ফুলে উঠেছে এবং মনে করছে যে তারা খুব ভালো কাজ করে বেড়াচ্ছে, তাদের জানিয়ে দাও, তোমাদের এ সমস্ত কাজের এই হচ্ছে প্রতিফল।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم
مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

তুমি কি দেখনি কিতাবের জ্ঞান থেকে যারা কিছু অংশ পেয়েছে, তাদের কি অবস্থা হয়েছে? তাদের যখন আল্লাহর কিতাবের দিকে সে অনুযায়ী তাদের পরস্পরের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য আহবান জানানো হয়[২২] তখন তাদের মধ্য থেকে একটি দল পাশ কাটিয়ে যায় এবং এই ফায়সালার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের এ কর্মপদ্ধতির কারণ হচ্ছে এই যে, তারা বলে ঃ "জাহান্নামের আগুন তো আমাদের স্পর্শও করবে না। আর যদি জাহান্নামের শাস্তি আমরা পাই তাহলে তা হবে মাত্র কয়েক দিনের।"[২৩] তাদের মনগড়া বিশ্বাস নিজেদের দীনের ব্যাপারে তাদেরকে বড়ই ভুল ধারণার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে।

২০. অর্থাৎ তারা নিজেদের শক্তি ও প্রচেষ্টাসমূহ এমন সব কাজে নিয়োজিত করেছে যার ফল দুনিয়াতে যেমন খারাপ তেমনি আখেরাতেও খারাপ।

২১. অর্থাৎ এমন কোন শক্তি নেই, যে তাদের এসব ভুল প্রচেষ্টা ও অসৎকার্যাবলীকে সুফলদায়ক করতে অথবা কমপক্ষে খারাপ পরিণতি থেকে বাঁচাতে পারে। দুনিয়ায় বা আখেরাতে অথবা উভয় স্থানে তাদের কাজে লাগবে বলে যেসব শক্তির ওপর তারা ভরসা করে, তাদের মধ্য থেকে আসলে কেউই তাদের সাহায্যকারী প্রমাণিত হবে না।

২২. অর্থাৎ তাদের বলা হয়, আল্লাহর কিতাবকে চূড়ান্ত সনদ হিসেবে মেনে নাও এবং তাঁর ফায়সালার সামনে মাথা নত করে দাও। এই কিতাবের দৃষ্টিতে যা হক প্রমাণিত হয় তাকে হক বলে এবং যা বাতিল প্রমাণিত হয় তাকে বাতিল বলে মেনে নাও। এখানে মনে রাখতে হবে, আল্লাহর কিতাব বলতে এখানে তাওরাত ও ইনজীলকে বুঝানো হয়েছে। আর কিতাবের জ্ঞানের কিছু অংশ লাভকারী বলতে ইহুদী ও খৃষ্টান আলেমদের কথা বুঝানো হয়েছে।

২৩. তারা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র মনে করে বসেছে। তাদের মনে এই ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, তারা যাই কিছু করুক না কেন জান্নাত তাদের নামে লিখে দেয়া হয়ে গেছে, তারা ঈমানদার গোষ্ঠী, তারা উমুকের সন্তান, উমুকের উম্মাত, উমুকের মুরীদ এবং উমুকের হাতে হাত রেখেছে, কাজেই জাহান্নামের আগুনের কোন ক্ষমতাই নেই তাদেরকে স্পর্শ করার। আর যদিওবা তাদেরকে কখনো জাহান্নামে দেয়া হয়, তাহলেও তা হবে মাত্র কয়েক দিনের জন্য। গোনাহের যে দাগগুলো গায়ে লেগে

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۖ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ
مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ
مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ۖ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ
مَنْ تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ
الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۖ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

কিন্তু সেদিন তাদের কি অবস্থা হবে, যেদিন আমি তাদের একত্র করবো, যেদিনটির আসা একেবারেই অবধারিত? সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জনের পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে এবং কারো ওপর জুলুম করা হবে না।

বলো ঃ হে আল্লাহ! বিশ্ব-জাহানের মালিক! তুমি যাকে চাও রাষ্ট্রক্ষমতা দান করো এবং যার থেকে চাও রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনিয়ে নাও। যাকে চাও মর্যাদা ও ইজ্জত দান করো এবং যাকে চাও লাঞ্ছিত ও হেয় করো। কল্যাণ তোমার হাতেই নিহিত। নিসন্দেহে তুমি সবকিছুর ওপর শক্তিশালী। তুমি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের মধ্যে। জীবনহীন থেকে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও এবং জীবন্ত থেকে জীবনহীনের। আর যাকে চাও তাকে তুমি বেহিসেব রিযিক দান করো।[২৪]

গেছে সেগুলো মুছে ফেলে দিয়ে সেখান থেকে তাদেরকে সোজা জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। এ ধরনের চিন্তাধারা তাদের এমনি নির্ভিক বানিয়ে দিয়েছিল, যার ফলে তারা নিশ্চিন্তে কঠিন থেকে কঠিনতর অপরাধ করে যেতো, নিকৃষ্টতম গোনাহের কাজ করতো, প্রকাশ্যে সত্যের বিরোধিতা করতো এবং এ অবস্থায় তাদের মনে সামান্যতম আল্লাহর ভয়ও জাগতো না।

২৪. মানুষ যখন একদিকে কাফের ও নাফরমানদের কার্যকলাপ দেখে এবং তারপর দেখে কিভাবে দিনের পর দিন তাদের বিত্ত ও প্রাচুর্য বেড়ে যাচ্ছে, আবার অন্যদিকে দেখে ঈমানদারদের আনুগত্যের পসরা এবং তারপর তাদের দারিদ্র্য, অভাব, অনাহারে জর্জরিত জীবন, আর দেখে তাদের একের পর এক বিপদ মুসিবত ও দুঃখ দুর্দশার শিকার হতে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীগণ তৃতীয় হিজরী ও তার কাছাকাছি সময়ে যার শিকার হয়েছিলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার মনের মধ্যে একটি অদ্ভুত

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ
وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗ
وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨﴾ قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ
صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ
مُّحْضَرًا ۚ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا
بَعِيْدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾

মু'মিনরা যেন ঈমানদারদের বাদ দিয়ে কখনো কাফেরদেরকে নিজেদের পৃষ্টপোষক, বন্ধু ও সহযোগী হিসেবে গ্রহণ না করে। যে এমনটি করবে, আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তবে হ্যাঁ, তাদের জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য তোমরা যদি বাহ্যত এ নীতি অবলম্বন করো তাহলে তা মাফ করে দেয়া হবে।[২৫] কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন আর তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।[২৬] হে নবী! লোকদের জানিয়ে দাও যে, তোমাদের মনের মধ্যে যা কিছু আছে তাকে তোমরা লুকিয়ে রাখো বা প্রকাশ করো, আল্লাহ তা জানেন। পৃথিবী ও আকাশের কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে অবস্থান করছে না এবং তার কর্তৃত্ব সবকিছুর ওপর পরিব্যাপ্ত। সেদিন আসবে, যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের ফল সামনে উপস্থিত পাবে, তা ভালো কাজই হোক আর মন্দ কাজ। সেদিন মানুষ কামনা করবে, হায়! যদি এখনো এই দিন এর থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতো! আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন। আর তিনি নিজের বান্দাদের গভীর শুভাকাংখী।[২৭]

আক্ষেপ মিশ্রিত জিজ্ঞাসা জেগে উঠে। আল্লাহ এখানে এই জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছেন। এমন সূক্ষ্মভাবে জবাব দিয়েছেন, যার চেয়ে বেশী সূক্ষ্মতার কথা কল্পনাই করা যায় না।

২৫. অর্থাৎ যদি কোন মু'মিন কোন ইসলাম দুশমন দলের ফাঁদে আটকা পড়ে যায় এবং সে তাদের জুলুম-নির্যাতন চালাবার আশংকা করে, তাহলে এ অবস্থায় তাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে, সে নিজের ঈমান লুকিয়ে রেখে কাফেরদের সাথে বাহ্যত

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

৪ রুকূ'

হে নবী! লোকদের বলে দাও ঃ "যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালো বাসবেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" তাদেরকে বলো ঃ "আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করো।" তারপর যদি তারা তোমাদের এ দাওয়াত গ্রহণ না করে, তাহলে নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ এমন লোকদের ভালো বাসবেন না, যারা তাঁর ও তাঁর রসূলদের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে।[২৮]

এমনভাবে অবস্থান করতে পারে যেন সে তাদেরই একজন। অথবা যদি তার মুসলমান হবার কথা প্রকাশ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য সে কাফেরদের প্রতি বন্ধুত্বের মনোভাব প্রকাশ করতে পারে। এমন কি কঠিন ভয়ভীতি ও আশংকাপূর্ণ অবস্থায় যে ব্যক্তি সহ্য ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তাকে কুফরী বাক্য পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করার অনুমতিটুকু দেয়া হয়েছে।

২৬. অর্থাৎ মানুষের ভয় যেন তোমাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন না করে ফেলে যার ফলে আল্লাহর ভয় মন থেকে উবে যায়। মানুষ বড়জোর তোমার পার্থিব ও বৈষয়িক স্বার্থের ক্ষতি করতে পারে, যার পরিসর দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ তোমাকে চিরন্তন আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারেন। কাজেই নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য যদি কখনো বাধ্য হয়ে কাফেরদের সাথে আত্মরক্ষামূলক বন্ধুত্বনীতি অবলম্বন করতে হয়, তাহলে তার পরিসর কেবলমাত্র ইসলামের মিশন, ইসলামী জামায়াতের স্বার্থ ও কোন মুসলমানের ধন–প্রাণের ক্ষতি না করেই নিজের জানমালের হেফাজত করে নেয়া পর্যন্তই সীমিত হতে পারে। কিন্তু সাবধান, তোমার মাধ্যমে যেন কুফর ও কাফেরদের এমন কোন খেদমত না হয় যার ফলে ইসলামের মোকাবিলায় কুফরী বিস্তার লাভ করে এবং মুসলমানদের ওপর কাফেরদের বিজয় লাভ ও আধিপত্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। অবশ্যি একথা ভালোভাবে জেনে রাখতে হবে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে যদি তোমরা আল্লাহর দীনকে অথবা মু'মিনদের জামায়াতকে বা কোন মুসলিম ব্যক্তিকে কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকো অথবা আল্লাহদ্রোহীদের কোন যথার্থ খেদমত করে থাকো, তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমরা কোনক্রমেই রক্ষা পেতে পারবে না। তোমাদের তো অবশেষে তার কাছে যেতেই হবে।

২৭. অর্থাৎ তিনি পূর্বাহ্নেই তোমাদের এমনসব কাজ থেকে সতর্ক করে দিচ্ছেন, যা পরিণামে তোমাদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারতো, এটা তার চরম কল্যাণাকাংখারই প্রকাশ।

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾
ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ
رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾

আল্লাহ[২৯] আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর ও 'ইমরানের বংশধরদেরকে[৩০] সমগ্র বিশ্ববাসীর ওপর প্রাধান্য দিয়ে (তাঁর রিসালাতের জন্য) মনোনীত করেছিলেন। এরা সবাই একই ধারার অন্তরগত ছিল, একজনের উদ্ভব ঘটেছিল অন্যজনের বংশ থেকে। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।[৩১] (তিনি তখন শুনছিলেন) যখন ইমরানের মহিলা[৩২] বলছিল ঃ "হে আমার রব! আমার পেটে এই যে সন্তানটি আছে এটি আমি তোমার জন্য নজরানা দিলাম, সে তোমার জন্য উৎসর্গীত হবে। আমার এই নজরানা কবুল করে নাও। তুমি সবকিছু শোনো ও জানো।"[৩৩]

২৮. প্রথম ভাষণটি এখানেই শেষ হয়েছে। এর বিষয়বস্তু, বিশেষ করে এর মধ্যে বদরযুদ্ধের দিকে যে ইংগিত করা হয়েছে, তার বর্ণনাভংগী সম্পর্কে চিন্তা করলে এই ভাষণটি বদর যুদ্ধের পরে এবং ওহোদ যুদ্ধের আগে অর্থাৎ ৩ হিজরীতে নাযিল হয়েছিল বলে প্রবল ধারণা জন্মাবে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা থেকে সাধারণত লোকদের এই ভুল ধারণা হয়েছে যে, এই সূরার প্রথম ৮টি আয়াত নাজরানের প্রতিনিধি দলের আগমনের সময় হিজরী ৯ সনে নাযিল হয়েছিল। কিন্তু প্রথমত এই ভূমিকা হিসেবে প্রদত্ত ভাষণটির বিষয়বস্তু পরিষ্কারভাবে একথা তুলে ধরেছে যে, এটি তার অনেক আগেই নাযিল হয়ে থাকবে। দ্বিতীয়ত, মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের রেওয়ায়াতে একথা পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, নাজরানের প্রতিনিধিদলের আগমনের সময় কেবলমাত্র হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালাম ও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বর্ণনা সম্বলিত ৩০টি বা তার চেয়ে কিছু বেশী আয়াত নাযিল হয়েছিল।

২৯. এখান থেকে দ্বিতীয় ভাষণটি শুরু হচ্ছে। নবম হিজরী সনে নাজরানের খৃষ্টীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হবার পর এ অংশটি নাযিল হয়েছিল। হিজায ও ইয়ামনের মাঝখানে নাজরান এলাকা অবস্থিত। সে সময় এ এলাকায় ৭২টি জনপদ ছিল। বলা হয়ে থাকে, এই জনপদগুলো থেকে সে সময় এক লাখ বিশ হাজার যুদ্ধ করার যোগ্যতা সম্পন্ন জওয়ান বের হয়ে আসতে পারতো। এলাকার সমগ্র অধিবাসীই ছিল খৃষ্টান। তিনজন দলনেতার অধীনে তারা

শাসিত হতো। একজনকে বলা হতো ঃ আকেব। তিনি ছিলেন জাতীয় প্রধান। দ্বিতীয়জনকে বলা হতো সাইয়েদ। তিনি জাতির তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলো দেখাশুনা করতেন। তৃতীয়জনকে বলা হতো ঃ উসকুফ্ (বিশপ)। তিনি ছিলেন ধর্মীয় বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কা বিজয়ের পর যখন সমগ্র আরববাসীর মনে এ বিশ্বাস জন্মালো যে, দেশের ভবিষ্যৎ এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে তখন আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে তার কাছে প্রতিনিধি দলের আগমন হতে লাগলো। এই সময় নাজরানের তিনজন দলনেতাও ৬০ জনের একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে মদীনায় পৌঁছেন। তারা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল না। তখন প্রশ্ন ছিল, তারা ইসলাম গ্রহণ করবে, না যিম্মী হয়ে থাকবে। এ সময় মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এ ভাষণটি নাযিল করেন। এর মাধ্যমে নাজরানের প্রতিনিধি দলের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করার ব্যবস্থা করা হয়।

৩০. ইমরান ছিল হযরত মূসা ও হারুনের পিতার নাম। বাইবেলে তাঁকে 'আমরাম' বলা হয়েছে।

৩১. খৃষ্টানদের ভ্রষ্টতার প্রধানতম কারণ এই যে, তারা হযরত ঈসাকে (আ) আল্লাহর বান্দা ও নবী হবার পরিবর্তে তাঁকে আল্লাহর পুত্র ও আল্লাহর কর্তৃত্বে অংশীদার গণ্য করে। তাদের বিশ্বাসের এই মৌলিক গলদটি দূর করতে পারলে সঠিক ও নির্ভুল ইসলামের দিকে তাদের ফিরিয়ে আনা অনেক সহজ হয়ে যায়। তাই এই ভাষণের ভূমিকা এভাবে ফাঁদা হয়েছে ঃ আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশের ও ইমরানের বংশের সকল নবীই ছিলেন মানুষ। একজনের বংশে আর একজনের জন্ম হয়েছে। তাদের কেউ খোদা ছিলেন না। তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, আল্লাহ তার দীনের প্রচার ও দুনিয়াবাসীর সংশোধনের জন্য তাদেরকে মনোনীত করেছিলেন।

৩২. 'ইমরানের মহিলা' শব্দের অর্থ এখানে যদি ইমরানের স্ত্রী ধরা হয়, তাহলে বুঝতে হবে এখানে সেই ইমরানের কথা বলা হয়নি যার প্রসংগে ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। বরং ইনি ছিলেন হযরত মারয়ামের (আ) পিতা। সম্ভবত এর নাম ছিল ইমরান। আর 'ইমরানের মহিলা' শব্দের অর্থ যদি ধরা হয় ইমরান বংশের মহিলা, তাহলে হযরত মারয়ামের (আ) মা ইমরান বংশের মেয়ে ছিলেন একথাই বুঝতে হবে। কিন্তু এই দু'টি অর্থের মধ্য থেকে কোন একটিকে চূড়ান্তভাবে অগ্রাধিকার দেবার জন্য কোন তথ্য মাধ্যম আমাদের হাতে নেই। কারণ হযরত মারয়ামের পিতা কে ছিলেন এবং তাঁর মাতা ছিলেন কোন বংশের মেয়ে—এ বিষয়ে ইতিহাসে কোন উল্লেখ নেই। তবে হযরত ইয়াহ্ইয়ার মাতা ও হযরত মারয়ামের মাতা পরস্পর আত্মীয় ছিলেন, এই বর্ণনাটি যদি সঠিক বলে মেনে নেয়া হয়, তাহলে ইমরান বংশের মেয়ে-ই হবে "ইমরানের মহিলা" শব্দের সঠিক অর্থ। কারণ লূক লিখিত ইনজীলে আমরা সুস্পষ্টভাবে পাই যে, হযরত ইয়াহ্ইয়ার মাতা হযরত হারুনের বংশধর ছিলেন। (লূক ঃ ৫)

৩৩. অর্থাৎ তুমি নিজের বান্দাদের প্রার্থনা শুনে থাকো এবং তাদের মনের অবস্থা জানো।

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا
وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي
أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ
حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا
زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا
قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾
هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً
طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

তারপর যখন সেই শিশু কন্যাটি তার ওখানে জন্ম নিল, সে বললো ঃ "হে আমার প্রভু! আমার এখানে তো মেয়ে জন্ম নিয়েছে। অথচ সে যা প্রসব করেছিল তা আল্লাহর জানাই ছিল।—আর পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের মতো হয় না।[৩৪] যা হোক আমি তার নাম রেখে দিলাম মারয়াম। আর আমি তাকে ও তার ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে অভিশপ্ত শয়তানের ফিতনা থেকে রক্ষার জন্য তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করছি।" অবশেষে তার রব কন্যা সন্তানটিকে সন্তুষ্টি সহকারে কবুল করে নিলেন, তাকে খুব ভালো মেয়ে হিসেবে গড়ে তুললেন এবং যাকারিয়াকে বানিয়ে দিলেন তার অভিভাবক।

যাকারিয়া[৩৫] যখনই তার কাছে মিহরাবে[৩৬] যেতো, তার কাছে কিছু না কিছু পানাহার সামগ্রী পেতো। জিজ্ঞেস করতো ঃ "মারয়াম! এগুলো তোমার কাছে কোথা থেকে এলো?" সে জবাব দিতো ঃ আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। আল্লাহ যাকে চান, বেহিসেব দান করেন। এ অবস্থা দেখে যাকারিয়া তার রবের কাছে প্রার্থনা করলো ঃ "হে আমার রব! তোমার বিশেষ ক্ষমতা বলে আমাকে সৎ সন্তান দান করো। তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী"।[৩৭]

৩৪. অর্থাৎ মেয়েরা এমন অনেক প্রাকৃতিক দুর্বলতা ও তামাদ্দুনিক বিধি-নিষেধের আওতাধীন থাকে, যেগুলো থেকে ছেলেরা থাকে মুক্ত। কাজেই ছেলে জন্ম নিলে আমি যে

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ
بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ
الصّٰلِحِيْنَ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ
وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ۭ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ
اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۭ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ۭ
وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٤١﴾

যখন তিনি মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন তখন এর জবাবে তাকে ফেরেশতাগণ বললো ঃ "আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার[৩৮] সুসংবাদ দান করছেন। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ফরমানের[৩৯] সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে আসবে। তার মধ্যে নেতৃত্ব ও সততার গুণাবলী থাকবে। সে পরিপূর্ণ সংযমী হবে, নবুওয়াতের অধিকারী হবে এবং সৎকর্মশীলদের মধ্যে গণ্য হবে।" যাকারিয়া বললো ঃ "হে আমার রব! আমার সন্তান হবে কেমন করে? আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি এবং আমার স্ত্রী তো বন্ধা।" জবাব এলো ঃ "এমনটিই হবে।[৪০] আল্লাহ যা চান তাই করেন।" আরজ করলো ঃ "হে প্রভু! তাহলে আমার জন্য কোন নিশানী ঠিক করে দাও।"[৪১] জবাব দিলেন ঃ "নিশানী হচ্ছে এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে ইশারা-ইংগিত ছাড়া কোন কথা বলবে না। এই সময়ে নিজের রবকে খুব বেশী করে ডাকো এবং সকাল সাঁঝে তার 'তাস্‌বীহ করতে থাকো।"[৪২]

উদ্দেশ্যে নিজের সন্তান তোমার পথে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলাম, তা ভালোভাবে পূর্ণ হতো।

৩৫. এখান থেকে সেই সময়ের আলোচনা শুরু হয়েছে যখন হযরত মারয়াম প্রাপ্ত বয়স্কা হলেন, তাঁকে বাইতুল মাকদিসের ইবাদাতগাহে (হাইকেল) পৌঁছিয়ে দেয়া হলো এবং সেখানে তিনি দিন-রাত আল্লাহর যিকিরে মশগুল হয়ে গেলেন। শিক্ষা ও অনুশীলন দানের জন্য তাকে হযরত যাকারিয়ার অভিভাবকত্বে সোপর্দ করা হয়েছিল। আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক দিয়ে সম্ভবত হযরত যাকারিয়া ছিলেন তার খালু। তিনি হাইকেলের অন্যতম পুরোহিত ছিলেন। এখানে সেই যাকারিয়া নবীর কথা বলা হয়নি। যাকে হত্যা করার ঘটনা বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে উল্লেখিত হয়েছে।

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ
عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٢﴾ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ
مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾ ذٰلِكَ مِنْ أَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ
لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُوْنَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۖ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ
إِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٤﴾

৫ রুকূ'

তারপর এক সময় এলো, ফেরেশতারা মারয়ামের কাছে এসে বললো ঃ "হে মারয়াম! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন, তোমাকে পবিত্রতা দান করেছেন এবং সারা বিশ্বের নারী সমাজের মধ্যে তোমাকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজের সেবার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। হে মারয়াম! তোমার রবের ফরমানের অনুগত হয়ে থাকো। তাঁর সামনে সিজদানত হও এবং যেসব বান্দা তাঁর সামনে অবনত হয় তুমিও তাদের সাথে অবনত হও।

হে মুহাম্মাদ! এসব অদৃশ্য বিষয়ের খবর, অহীর মাধ্যমে আমি এগুলো তোমাকে জানাচ্ছি। অথচ তুমি তখন সেখানে ছিলে না, যখন হাইকেলের সেবায়েতরা মারয়ামের তত্ত্বাবধায়ক কে হবে একথার ফায়সালা করার জন্য নিজেদের কলম নিক্ষেপ করছিল।[৪৩] আর তুমি তখনো সেখানে ছিলে না যখন তাদের মধ্যে ঝগড়া চলছিল।

৩৬. মেহরাব শব্দটি বলার সাথে সাথে লোকদের দৃষ্টি সাধারণত আমাদের দেশে মসজিদে ইমামের দাঁড়াবার জন্য যে জায়গাটি তৈরী করা হয় সেদিকে চলে যায়। কিন্তু এখানে মেহরাব বলতে সে জায়গাটি বুঝানো হয়নি। খৃষ্টান ও ইহুদীদের গীর্জা ও উপাসনালয়গুলোতে মূল উপাসনা গৃহের সাথে লাগোয়া ভূমি সমতল থেকে যথেষ্ট উঁচুতে যে কক্ষটি তৈরী করা হয়, যার মধ্যে উপাসনালয়ের খাদেম, পুরোহিত ও এতেকাফকারীরা অবস্থান করে, তাকে মেহরাব বলা হয়। এই ধরনের একটি কামরায় হযরত মারয়াম এতেকাফ করছিলেন।

৩৭. হযরত যাকারিয়া (আ) সে সময় পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। এই যুবতী পুন্যবতী মেয়েটিকে দেখে স্বভাবতই তার মনে এ আকাংখা জন্ম নিল ঃ আহা, যদি আল্লাহ আমাকেও এমনি একটি সৎসন্তান দান করতেন। আর আল্লাহ তার অসীম কুদরাতের মাধ্যমে যেভাবে এই সংসার ত্যাগী, নিসংগ, কক্ষবাসিনী মেয়েটিকে আহার যোগাচ্ছেন

إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ
الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ
الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ
الصّٰلِحِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَتْ رَبِّ أَنّٰى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ
قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ إِذَا قَضٰٓى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ
لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

যখন ফেরেশতারা বলল ঃ "হে মারয়াম! আল্লাহ তোমাকে তাঁর একটি ফরমানের সুসংবাদ দান করছেন। তার নাম হবে মসীহ ঈসা ইবনে মারয়াম। সে দুনিয়ায় ও আখেরাতে সম্মানিত হবে। আল্লাহর নৈকট্যলাভকারী বান্দাদের অন্তরভুক্ত হবে। দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সেও মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সে হবে সৎব্যক্তিদের অন্যতম।" একথা শুনে মারয়াম বললো ঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমার সন্তান কেমন করে হবে? আমাকে তো কোন পুরুষ স্পর্শও করেনি।" জবাব এলো ঃ "এমনটিই হবে।[৪৪] আল্লাহ যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন তখন কেবল এতটুকুই বলেন, হয়ে যাও, তাহলেই তা হয়ে যায়।"

তা দেখে তার মনে আশা জাগে যে, আল্লাহ চাইলে এই বৃদ্ধ বয়সেও তাকে সন্তান দিতে পারেন।

৩৮. বাইবেলে এর নাম লিখিত হয়েছে, খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষাদাতা–জোন (John the baptist)। তাঁর অবস্থা জানার জন্য দেখুন, মথি ঃ ৩, ১১, ১৪ অধ্যায়; মার্ক ঃ ১, ৬ অধ্যায় এবং লুক ঃ ১, ৩ অধ্যায়।

৩৯. আল্লাহর 'ফরমান' বলতে এখানে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু তাঁর জন্ম হয়েছিল মহান আল্লাহর একটি অস্বাভাবিক ফরমানের মাধ্যমে অলৌকিক বিষয় হিসেবে, তাই কুরআন মজীদে তাঁকে "কালেমাতুম মিনাল্লাহ" বা আল্লাহর ফরমান বলা হয়েছে।

৪০. অর্থাৎ তোমার বার্ধক্য ও তোমার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব সত্ত্বেও আল্লাহ তোমাকে পুত্র সন্তান দান করবেন।

৪১. অর্থাৎ এমন নিশানী বলে দাও, যার ফলে একজন জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ও বন্ধা বৃদ্ধার ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম নেবার মতো বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক ঘটনাটি ঘটার খবরটি আগাম জানতে পারি।

৪২. খৃষ্টানরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে 'আল্লাহর পুত্র' ও 'খোদা' বলে বিশ্বাস করে যে ভুল করে চলেছে, সেই বিশ্বাস ও আকীদাগত ভুলটি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরাই এই ভাষণটির মূল উদ্দেশ্য। সূচনায় হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের কথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম যেমন অলৌকিক পদ্ধতিতে হয়েছিল, ঠিক তেমনি তার থেকে মাত্র ছয় মাস আগে একই পরিবারে আর একটি অলৌকিক পদ্ধতিতে হযরত ইয়াহ্ইয়ার জন্ম হয়েছিল। এর মাধ্যমে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ খৃষ্টানদের একথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, ইয়াহ্ইয়ার অলৌকিক জন্ম যদি তাকে খোদা ও উপাস্য পরিণত না করে থাকে তাহলে ঈসার নিছক অস্বাভাবিক জন্মপদ্ধতি কিভাবে তাকে 'ইলাহ' ও 'খোদা'র আসনে বসিয়ে দিতে পারে?

৪৩. অর্থাৎ লটারী করছিল। এই লটারী করার প্রয়োজন দেখা দেবার কারণ এই ছিল যে, হযরত মারয়ামের মাতা হাইকেলে আল্লাহর কাজ করার জন্য মারয়ামকে উৎসর্গ করেছিলেন। আর তিনি মেয়ে হবার কারণে হাইকেলের খাদেম ও সেবায়েতদের মধ্য থেকে তাঁর তত্ত্বাবধায়ক ও অভিভাবক নিযুক্ত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

৪৪. অর্থাৎ কোন পুরুষ তোমাকে স্পর্শ না করলেও তোমার সন্তান হবে। এখানে যে 'এমনটি হবে' (كذلك) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের জবাবেও এই একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল। সেখানে এর যে অর্থ ছিল এখানেও সেই একই অর্থ হওয়াই উচিত। তা ছাড়া পরবর্তী বাক্য বরং পূর্বাপর সমস্ত বর্ণনাই এই অর্থ সমর্থন করে যে, কোন প্রকার যৌন সংযোগ ছাড়াই হযরত মারয়ামকে সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। আর আসলে এভাবেই হযরত ঈসার (আ) জন্ম হয়েছিল। নয়তো দুনিয়ার আর দশটি স্ত্রীলোক যেভাবে সন্তান জন্ম দেয় সেভাবে পরিচিত স্বাভাবিক পদ্ধতিতে যদি হযরত মারয়ামের গর্ভে সন্তান জন্ম নেবার ব্যাপারটি ঘটে থাকতো এবং যদি প্রকৃতপক্ষে হযরত ঈসা (আ) ঐভাবেই জন্মগ্রহণ করে থাকতেন, তাহলে ৪ রুকূ' থেকে ৬ রুকূ' পর্যন্ত যে বর্ণনা চলে আসছে তা পুরোপুরি অর্থহীন হয়ে যায় এবং ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম সংক্রান্ত আয় যে সমস্ত বর্ণনা আমরা কুরআনের আরো বিভিন্ন স্থানে পাই তাও নিরর্থক হয়ে পড়ে। পিতার ঔরস ছাড়াই অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে হযরত ঈসার (আ) জন্ম হয়েছিল বলেই না খৃষ্টানরা তাঁকে 'আল্লাহর পুত্র' ও ইলাহ মনে করেছিল। আর একজন কুমারী মেয়ে সন্তান প্রসব করেছে, এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেই তো ইহুদীরা তাঁর প্রতি দোষারোপ করেছিল। যদি এটা আদতে কোন সত্য ঘটনাই না হয়ে থাকে, তাহলে ঐ দু'টি দলের চিন্তার প্রতিবাদ প্রসংগে কেবল এতটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট হতো যে, তোমরা ভুল বলছো, সে মেয়েটি ছিল বিবাহিতা, উমুক ব্যক্তি ছিল তার স্বামী এবং তারই ঔরসে ঈসার জন্ম হয়েছিল। এই সংক্ষিপ্ত চুম্বক কথা ক'টি বলার পরিবর্তে এতো দীর্ঘ ভূমিকা ফাঁদার, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলার এবং সোজাসুজি উমুক ব্যক্তির পুত্র ঈসা বলার পরিবর্তে মারয়ামের পুত্র ঈসা বলার কি প্রয়োজন ছিল? এর ফলে তো বিষয়টি সহজে মীমাংসা হওয়ার পরিবর্তে আরো জটিল হয়ে পড়েছে। কাজেই যারা

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿٤٨﴾ وَرَسُوْلًا
اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّىْٓ اَخْلُقُ
لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ
اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ
وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِىْ بُيُوْتِكُمْ ۭ اِنَّ فِىْ
ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٤٩﴾

(ফেরেশতারা আবার তাদের আগের কথার জের টেনে বললো ঃ) "আর আল্লাহ তাকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন, তাওরাত ও ইনজীলের জ্ঞান দান করবেন এবং নিজের রসূল বানিয়ে বনী ইসরাঈলদের কাছে পাঠাবেন।"

(আর বনী ইসরাঈলদের কাছে রসূল হিসেবে এসে সে বললো ঃ) "আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে নিশানী নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের সামনে মাটি থেকে পাখির আকৃতি বিশিষ্ট একটি মূর্তি তৈরী করছি এবং তাতে ফুৎকার দিচ্ছি, আল্লাহর হুকুমে সেটি পাখি হয়ে যাবে। আল্লাহর হুকুমে আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করি এবং মৃতকে জীবিত করি। আমি তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি, তোমরা নিজেদের গৃহে কি খাও ও কি মওজুদ করো। এর মধ্যে তোমাদের জন্য যথেষ্ট নিশানী রয়েছে, যদি তোমরা ঈমানদার হও।[৪৫]

কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে মানে এবং এরপর ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, স্বাভাবিকভাবে মাতা পিতার মিলনের ফলে তাঁর জন্ম হয়েছিল, তারা আসলে একথা প্রমাণ করেন যে, মনের কথা প্রকাশ করা ও নিজের বক্তব্য সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার যতটুকু ক্ষমতা তাদের আছে, আল্লাহর ততটুকু নেই (মা'আযাল্লাহ)।

৪৫. অর্থাৎ যদি তোমরা হককে মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে যাও এবং হঠধর্মী না হও, তাহলে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ যে আমাকে পাঠিয়েছেন, এ বিষয়টি মেনে নেবার এবং এ ব্যাপারে তোমাদের নিশ্চিন্ত করার জন্য এই নিশানীগুলোই যথেষ্ট।

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ
حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿٥٠﴾
اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٥١﴾

আমি সেই শিক্ষা ও হিদায়াতের সত্যতা ঘোষণা করার জন্য এসেছি, যা বর্তমানে আমার যুগে তাওরাতে আছে।[৪৬] আর তোমাদের জন্য যেসব জিনিস হারাম ছিল তার কতকগুলো হালাল করার জন্য আমি এসেছি।[৪৭] দেখো, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে আমি নিশানী নিয়ে এসেছি। কাজেই আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদেরও রব। কাজেই তোমরা তার বন্দেগী করো। এটিই সোজাপথ।[৪৮]

৪৬. অর্থাৎ আমি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি এটি তার আর একটি প্রমাণ। যদি আমি তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত না হতাম বরং একজন মিথ্যা দাবীদার হতাম, তাহলে আমি নিজেই একটি ধর্ম তৈরী করে ফেলতাম এবং দক্ষতা সহকারে তোমাদের আগের পুরাতন ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে নিজের নতুন উদ্ভাবিত ধর্মের দিকে টেনে আনার প্রচেষ্টা চালাতাম। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবীরা আমার পূর্বে যেসব দীন এনেছিলেন আমি তো সেই আসল দীনকে মানি এবং তার শিক্ষাকে সঠিক গণ্য করি।

বর্তমানে প্রচলিত ইনজীল থেকেও একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মূসা আলাইহিস সালাম ও অন্যান্য নবীগণ যে দীনের প্রচার করেছিলেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামও সেই একই দীনের প্রচারক ছিলেন। যেমন মথির বর্ণনা মতে পাহাড় থেকে প্রদত্ত ভাষণে ঈসা আলাইহিস সালাম পরিষ্কার বলেন ঃ

"একথা মনে করো না যে, আমি তাওরাত বা নবীদের কিতাব রহিত করতে এসেছি। রহিত করতে নয় বরং সম্পূর্ণ করতে এসেছি।" (৫ ঃ ১৭)।

একজন ইহুদী আলেম হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলেন, দীনের বিধানের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হুকুম কোন্‌টি? জবাবে তিনি বললেন ঃ

"তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করবে। এটি মহৎ ও প্রথম হুকুম। আর দ্বিতীয়টি এর তুল্য; তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসবে। এই দু'টি হুকুমের ওপরই সমস্ত তাওরাত ও নবী রসূলদের সহীফা ও গ্রন্থসমূহ নির্ভরশীল।" (মথি ২২ ঃ ৩৭-৪০)

আবার হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর শিষ্যদের বলেন ঃ

"ধর্মগুরু ও ফরীসীরা মূসার আসনে বসেছে। তারা তোমাদের যা কিছু বলে তা পালন করো ও মানো। কিন্তু তাদের মতো কাজ করো না। কারণ তারা বলে কিন্তু করে না।" (মথি ২৩ ঃ ২-৩)।

৪৭. অর্থাৎ তোমাদের মূর্খদের কাল্পনিক বিশ্বাস, ফকীহদের আইনের চুলচেরা বিশ্লেষণ, বৈরাগ্যবাদীদের কৃচ্ছ্রসাধনা এবং অমুসলিম জাতিদের তোমাদের ওপর প্রাধান্য ও শাসন প্রতিষ্ঠার কারণে তোমাদের আল্লাহ প্রদত্ত আসল শরীয়াতের ওপর যেসব বিধি বন্ধনের বাড়তি বোঝা আরোপিত হয়েছে, আমি সেগুলো রহিত করবো এবং আল্লাহ যেগুলো হালাল বা হারাম গণ্য করেছেন সেগুলোই আমি তোমাদের জন্য হালাল ও হারাম গণ্য করবো।

৪৮. এ থেকে জানা গেল অন্যান্য সকল নবীদের মতো হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতেরও তিনটি মৌলিক বিষয়বস্তু ছিল ঃ

এক ঃ সার্বভৌম কর্তৃত্ব, যার দাসত্ব ও বন্দেগী করতে হবে এবং যার প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে নৈতিক ও তামাদ্দুনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত বলে স্বীকার করতে হবে।

দুই ঃ ঐ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীর প্রতিনিধি হিসেবে নবীর নির্দেশের আনুগত্য করতে হবে।

তিন ঃ মানুষের জীবনকে হালাল ও হারাম এবং বৈধতা ও অবৈধতার বিধিনিষেধে আবদ্ধকারী আইন ও বিধিবিধান একমাত্র আল্লাহ দান করবেন। অন্যদের চাপানো সমস্ত আইন ও বিধিবিধান বাতিল করতে হবে।

কাজেই হযরত ঈসা (আ), হযরত মূসা (আ), হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অন্যান্য নবীদের মিশনের মধ্যে আসলে সামান্যতম পার্থক্যও নেই। যারা বিভিন্ন নবীর মিশন বিভিন্ন বলে গণ্য করেছেন এবং তাদের মিশনের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন, তারা মারাত্মক ভুল করেছেন। বিশ্ব-জাহানের সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারীর পক্ষ থেকে তাঁর প্রজাদের দিকে যে ব্যক্তিই নিযুক্ত হয়ে আসবেন তাঁর আসার উদ্দেশ্য এছাড়া আর দ্বিতীয় কিছুই হতে পারে না যে, তিনি প্রজাদেরকে নাফরমানী, স্বেচ্ছাচারিতা ও শিরক (অর্থাৎ সার্বভৌম প্রভুত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে বিশ্ব-জাহানের একচ্ছত্র মালিক ও প্রভু আল্লাহর সাথে আর কাউকে অংশীদার করা এবং নিজের বিশ্বস্ততা ও ইবাদাত বন্দেগীকে তাদের মধ্যে বিভক্ত করে দেয়া) থেকে বিরত রাখবেন এবং আসল ও প্রকৃত মালিকের নির্ভেজাল আনুগত্য, দাসত্ব, পূজা, আরাধনা ও বন্দেগী করার আহ্বান জানাবেন।

দুঃখের বিষয়, ঈসা আলাইহিস সালামের মিশনকে ওপরে কুরআনে যেমন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে বর্তমান ইনজীলে তেমনটি করা হয়নি। তবুও উপরে যে তিনটি মৌলিক বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে তা বিক্ষিপ্তভাবে ইশারা ইংগিতের আকারে হলেও বর্তমানে ইনজীলে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, হযরত ঈসা (আ) একমাত্র আল্লাহর বন্দেগীর দাওয়াত দিয়েছিলেন, একথা ইনজীলের নিম্নোক্ত ইংগিত থেকে সুস্পষ্ট হয় ঃ

"তোমার ঈশ্বর প্রভূকে প্রণিপাত (সিজদা) করো এবং একমাত্র তাঁরই আরাধনা করো।"
-(মথি ৪ ঃ ১০)।

তিনি যে কেবল এরি দাওয়াত দিয়েছিলেন তা নয় বরং তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যই ছিল, আকাশ রাজ্যে যেমন সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন আল্লাহর নিরংকুশ আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনুরূপভাবে পৃথিবীতেও একমাত্র তাঁরই শরিয়াতী বিধানের আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

"তোমার রাজ্য আসুক। তোমার ইচ্ছা যেমন আকাশে পূর্ণ হয় তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক।" (মথি ৬ ঃ ১০)

আবার ঈসা আলাইহিস সালাম নিজেকে নবী ও আসমানী রাজত্বের প্রতিনিধি হিসেবে পেশ করতেন এবং এ হিসেবেই লোকদেরকে নিজের আনুগত্য করার দাওয়াত দিতেন। তাঁর ভারসাম্যপূর্ণ বক্তব্যগুলো থেকে জানা যায়, তিনি নিজের জন্মভূমি 'নাসেরা' (নাজারাথ)-তে নিজের দাওয়াতের সূচনা করলে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও শহরবাসীরাই তাঁর বিরোধিতায় নেমে পড়ে। এ সম্পর্কে মথি, মার্ক ও লুক একযোগে বর্ণনা করেছেন যে, "নবী তাঁর স্বদেশে জনপ্রিয় হন না।" তারপর জেরুসালেমে যখন তাঁর হত্যার চক্রান্ত চলতে লাগলো এবং লোকেরা তাঁকে অন্য কোথাও চলে যাবার পরামর্শ দিল তখন তিনি জবাব দিলেন ঃ "নবী জেরুসালেমের বাইরে মৃত্যুবরণ করবে, এটা সম্ভব নয়।" (লুক ১৩ ঃ ৩৩) শেষবার যখন তিনি জেরুসালেম প্রবেশ করছিলেন, তখন তাঁর শিষ্যবর্গ উচ্চস্বরে বলতে লাগলো ঃ "ধন্য সেই রাজা যিনি প্রভুর নামে আসছেন।" একথায় ইহুদী আলেমরা অসন্তুষ্ট হলেন এবং তারা হযরত ঈসাকে বললেন, "আপনার শিষ্যদের মুখ বন্ধ করুন।" হযরত ঈসা বললেন ঃ "ওরা যদি মুখ বন্ধ করে তাহলে পাথরগুলো চীৎকার করে উঠবে।" (লুক ১৯ ঃ ৩৮-৪০) আর একবার তিনি বললেন ঃ

"হে শ্রমজীবীরা! হে ভারবহনে পিষ্টলোকেরা! সবাই আমার কাছে এসো। আমি তোমাদের বিশ্রাম দান করবো। আমার জোয়াল তোমাদের কাঁধে উঠিয়ে নাও। .....আমার জোয়াল সহজে বহনীয় এবং আমার বোঝা হালকা।" (মথি ১১ ঃ ২৮-৩০)।

এ ছাড়া ঈসা আলাইহিস সালাম মানব রচিত আইনের পরিবর্তে আল্লাহ প্রদত্ত আইনের আনুগত্য করতে চাইতেন একথাও মথি ও মার্কের বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। তাদের বর্ণনার সারনির্যাস হচ্ছে ঃ ইহুদী আলেমগণ অভিযোগ করলেন, আপনার শিষ্যরা পূর্ববর্তী সম্মানীয় বুযর্গদের ঐতিহ্যের বিপরীত হাত না ধুয়েই আহার করে কেন? হযরত ঈসা (আ) এর জবাবে বললেন ঃ তোমাদের মতো রিয়াকারদের অবস্থা হচ্ছে ঠিক তেমনি যেমন হযরত ইয়াসইয়া নবীর কণ্ঠে এ তিরস্কার করা হয়েছে ঃ "এই উম্মত মুখে আমার প্রতি মর্যাদার বাণী উচ্চারণ করে কিন্তু তাদের হৃদয় আমার থেকে দূরে। কারণ এরা মানবিক বিধানের শিক্ষা দেয়।" তোমরা আল্লাহর হুকুমকে বাতিল করে থাক এবং নিজেদের বানয়াট আইনকে প্রতিষ্ঠিত রাখো। আল্লাহ তাওরাতের মাধ্যমে তোমাদের হুকুম দিয়েছিলেন, মা-বাপের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো এবং যে ব্যক্তি মা-বাপকে সম্মান করবে না তার প্রাণনাশ করো। কিন্তু তোমরা বলছো যে ব্যক্তি মা-বাপকে একথা বলে দেয়, আমার যে খেদমত তোমার কাজে লাগতে পারে তাকে আমি আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছি, তার জন্য মা-বাপের খেদমত না করা সম্পূর্ণ বৈধ।

(মথি ১৫ ঃ ৩-৯, মার্ক ৭ ঃ ৫-১৩)।

فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ
قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ۖ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ ۖ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا
مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾ رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ
ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَكَرُوا۟ وَمَكَرَ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ ﴿٥٤﴾

যখন ঈসা অনুভব করলো, ইসরাঈল কুফরী ও অস্বীকার করতে উদ্যোগী হয়েছে, সে বললো ঃ "কে হবে আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী? হাওয়ারীগণ[৪৯] বললো ঃ "আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী।[৫০] আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলিম (আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির নতকারী)। হে আমাদের মালিক! তুমি যে ফরমান নাযিল করেছ, আমরা তা মেনে নিয়েছি এবং রসূলের আনুগত্য কবুল করে নিয়েছি। সাক্ষ্যদানকারীদের মধ্যে আমাদের নাম লিখে নিয়ো।"

তারপর বনী ইসরাঈল (ঈসার বিরুদ্ধে) গোপন চক্রান্ত করতে লাগলো। জবাবে আল্লাহও তাঁর গোপন কৌশল খাটালেন। আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম কুশলী।

৪৯. 'হাওয়ারী' শব্দটি আমাদের এখানে 'আনসার' শব্দের কাছাকাছি অর্থ বহন করে। বাইবেলে সাধারণভাবে হাওয়ারীর পরিবর্তে 'শিষ্যবৃন্দ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন স্থানে তাদের 'রসূল'ও বলা হয়েছে। কিন্তু রসূল এই অর্থে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে দীন প্রচারের জন্য পাঠাতেন। আল্লাহ তাদেরকে রসূল হিসেবে নিযুক্ত করেছেন, এই অর্থে রসূল বলা হয়নি।

৫০. ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে অংশ গ্রহণকে কুরআন মজীদের অধিকাংশ স্থানে "আল্লাহকে সাহায্য করা" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি অবশ্যি একটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বিষয়। জীবনের যে পরিসরে আল্লাহ মানুষকে ইচ্ছা ও সংকল্পের স্বাধীনতা দান করেছেন সেখানেই তিনি নিজের খোদায়ী শক্তি ব্যবহার করে কুফর বা ঈমান, বিদ্রোহ বা আনুগত্যের মধ্য থেকে কোন একটির পথ অবলম্বন করার জন্য মানুষকে বাধ্য করেননি। এর পরিবর্তে তিনি যুক্তি ও উপদেশের সাহায্য নিয়েছেন। এভাবে তিনি মানুষের কাছ থেকে এই স্বতস্ফূর্ত স্বীকৃতি আদায় করতে চেয়েছেন যে, অস্বীকৃতি, নাফরমানী ও বিদ্রোহ করার স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও তার জন্য নিজের স্রষ্টার দাসত্ব, আনুগত্য ও বন্দেগীর পথ অবলম্বন করাই প্রকৃত সত্য এবং এটিই তার সাফল্য ও নাজাতের পথ। এভাবে প্রচার, উপদেশ ও নসীহতের সাহায্যে মানুষকে সত্য সঠিক পথে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করাই আল্লাহর কাজ। আর যেসব লোক এই কাজে আল্লাহকে সাহায্য করে

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ
مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾

৬ রুকূ'

(এটি আল্লাহরই একটি গোপন কৌশল ছিল) যখন তিনি বললেন ঃ "হে ঈসা ! এখন আমি তোমাকে ফিরিয়ে নেবো[৫১] এবং তোমাকে আমার নিজের দিকে উঠিয়ে নেবো। আর যারা তোমাকে অস্বীকার করেছে তাদের থেকে (অর্থাৎ তাদের সংগ এবং তাদের পূতিগন্ধময় পরিবেশে তাদের সংগে থাকা থেকে) তোমাকে পবিত্র করে দেবো এবং তোমাকে যারা অস্বীকার করেছে[৫২] তাদের ওপর তোমার অনুসারীদের কিয়ামত পর্যন্ত প্রাধান্য দান করবো। তারপর তোমাদের সবাইকে অবশেষে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। সে সময় আমি তোমাদের মধ্যে যেসব বিষয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোর মীমাংসা করে দেবো।

তাদেরকেই আল্লাহর সাহায্যকারী গণ্য করা হয়। আল্লাহর কাছে মানুষের এটিই সর্বোচ্চ মর্যাদা। নামায, রোযা এবং অন্যান্য যাবতীয় ইবাদাত বন্দেগীতে মানুষ নিছক বান্দা ও গোলামের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম-সাধনার মাধ্যমে সে আল্লাহর সাহায্যকারী ও সহযোগীর মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। এই দুনিয়ায় রূহানী ও আধ্যাত্মিক উন্নতির শিখরে অভিষিক্ত হবার এটিই উচ্চতম মর্যাদা ও মকাম।

৫১. এখানে কুরআনের মূল শব্দ হচ্ছে, মুতাওয়াফ্ফীকা (مُتَوَفِّيكَ) মূল তাওয়াফ্ফা (تَوَفَّى) শব্দের আসল মানে হচ্ছে ঃ নেয়া ও আদায় করা। 'প্রাণবায়ু বের করে নেয়া' হচ্ছে এর গৌণ ও পরোক্ষ অর্থ, মূল আভিধানিক অর্থ নয়। এখানে এ শব্দটি ইংরেজী To Recall-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হয়, কোন পদাধিকারীকে তার পদ থেকে ফিরিয়ে ডেকে নেয়া। যেহেতু বনী ইসরাঈল শত শত বছর ধরে অনবরত নাফরমানী করে আসছিল, বার বার উপদেশ দান ও সতর্ক করে দেয়ার পরও তাদের জাতীয় মনোভাব ও আচরণ বিকৃত হয়েই চলছিল, একের পর এক কয়েকজন নবীকে তারা হত্যা করেছিল এবং যে কোন সদাচারী ব্যক্তি তাদেরকে নেকী, সততা ও সৎবৃত্তির দাওয়াত দিতো তাকেই তারা হত্যা করতো। তাই আল্লাহ তাদের মুখ বন্ধ করার ও তাদেরকে শেষবারের মতো সুযোগ দেবার জন্যে হযরত ঈসা ও হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালামের মতো

দু'জন মহান মর্যাদা সম্পন্ন পয়গম্বর পাঠালেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের নিযুক্তির প্রমাণ স্বরূপ তাদের সাথে এমন সব সুস্পষ্ট নিশানী ছিল যেগুলো একমাত্র তারাই অস্বীকার করতে পারতো, যারা ন্যায়, সত্য ও সততার সাথে চরম শত্রুতা পোষণ করতো এবং যাদের সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করার দুঃসাহস ও নির্লজ্জতা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু বনী ঈসরাইলরা এই শেষ সুযোগও হাত ছাড়া করেছিল। তারা কেবল এই দু'জন পয়গম্বরের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং এই সংগে তাদের একজন প্রধান ব্যক্তি নিজের নর্তকীর ফরমায়েশ অনুযায়ী প্রকাশ্যে হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালামের শিরচ্ছেদ করেছিল এবং তাদের আলেম ও ফকীহগণ ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করে রোমান শাসকের সাহায্যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে মৃত্যুদন্ড দেবার চেষ্টা চালিয়েছিল। এরপর আর বনী ইসরাঈলদের উপদেশ দেবার জন্য বেশী সময় ও শক্তি ব্যয় করা ছিল অর্থহীন। তাই মহান আল্লাহ তার নবীকে ফিরিয়ে নিজের কাছে ডেকে নিলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত বনী ইসরাঈলদের জন্য লিখে দিলেন লাঞ্ছনার জীবন।

এখানে অবশ্যি একথা অনুধাবন করতে হবে যে, কুরআনের এ সমগ্র ভাষণ আসলে খৃষ্টানদের ঈসার খোদা হওয়ার আকীদার প্রতিবাদ ও সংশোধনের উদ্দেশ্যেই ব্যক্ত হয়েছে। খৃষ্টানদের মধ্যে এই আকীদার জন্মের মূলে ছিল তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ঃ

এক ঃ হযরত ঈসার অলৌকিক জন্ম।

দুই ঃ তাঁর সুস্পষ্ট অনুভূত মুজিযাসমূহ।

তিন ঃ তাঁর আকাশের দিকে উঠিয়ে নেয়া। তাদের বই পত্রে পরিষ্কার ভাষায় এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

কুরআন প্রথম কথাটিকে সত্য বলে ঘোষণা করেছে। কুরআনের বক্তব্য হচ্ছে, হযরত ঈসার (আ) পিতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ নিছক আল্লাহর কুদরাতের প্রমাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ যাকে যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করে থাকেন। এই অস্বাভাবিক জন্মের কারণে একথা প্রমাণ হয় না যে, হযরত ঈসা (আ) খোদা ছিলেন বা খোদায়ী কর্তৃত্বে তাঁর কোন অংশীদারীত্ব ছিল।

দ্বিতীয় কথাটিকেও কুরআন সত্য বলে ঘোষণা করেছে। কুরআন হযরত ঈসার মুজিযাগুলো একটি একটি করে গণনা করে বর্ণনা করেছে। কিন্তু এখানে সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, এই সমস্ত কাজই তিনি আল্লাহর হুকুমে সম্পাদন করেছিলেন। তিনি নিজে অথবা নিজের শক্তিতে কিছুই করেননি। কাজেই এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি ভিত্তিতেই এই ফল লাভ করা যেতে পারে না যে, খোদায়ী কর্তৃত্ব ও কার্যকলাপে হযরত ঈসার কোন অংশ ছিল।

এখন তৃতীয় কথাটি সম্পর্কে খৃষ্টানদের বর্ণনাগুলো যদি একেবারেই ভুল বা মিথ্যা হতো, তাহলে তাদের ঈসার খোদা হবার আকীদাটির প্রতিবাদ করার জন্য পরিষ্কারভাবে একথা বলে দেয়া অপরিহার্য ছিল যে, যাকে তোমরা খোদার পুত্র বা খোদা বলছো সে তো কবে মরে মাটির সাথে মিশে গেছে। আর যদি এজন্য অধিকতর নিশ্চিন্ত হতে চাও, তাহলে উমুক স্থানে গিয়ে তার কবরটি দেখো। কিন্তু একথা না বলে কুরআন কেবল তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারটি অস্পষ্ট রেখেই থেমে যায়নি এবং তার অদৃশ্য হয়ে যাওয়া সম্পর্কে

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾
ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ
عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾
الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾

যারা কুফরী ও অস্বীকার করার নীতি অবলম্বন করেছে তাদেরকে দুনিয়ায় ও আখেরাতে উভয় স্থানে কঠোর শাস্তি দেবো এবং তারা কোন সাহায্যকারী পাবে না। আর যারা ঈমান ও সৎকাজ করার নীতি অবলম্বন করেছে, তাদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। ভালো করেই জেনে রাখো আল্লাহ জালেমদের কখনোই ভালোবাসেন না।"

এই আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আমি তোমাকে শুনাচ্ছি। আল্লাহর কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতো। কেননা আল্লাহ তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেন এবং হুকুম দেন, হয়ে যাও, আর তা হয়ে যায়।[৫৩] এ প্রকৃত সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে। কাজেই তুমি সন্দেহকারীদের অন্তরভুক্ত হয়ো না।[৫৪]

কেবল এমন শব্দ ব্যবহার করেনি যার ফলে কমপক্ষে তাঁকে জীবিত উঠিয়ে নেয়ার অর্থের সম্ভাবনা থেকে যায় বরং খৃষ্টানদের সুস্পষ্টভাবে একথা বলে দেয় যে, ঈসাকে আদতে শূলে চড়ানোই হয়নি। অর্থাৎ যে ব্যক্তি শেষ সময়ে "এইলী এইলী লিমা শাবাকতানী" (অর্থাৎ ঈশ্বর আমার! কেন আমাকে পরিত্যাগ করেছো?) বলেছিল এবং যার শুলে চড়াবার দৃশ্যের ছবি নিয়ে তোমরা ঘুরে বেড়াও, সে ঈসা ছিল না। ঈসাকে আল্লাহ তার আগেই উঠিয়ে নিয়েছিলেন।

এ ধরনের বক্তব্য পেশ করার পর যে ব্যক্তি কুরআনের আয়াত থেকে হযরত ঈসার (আ) মৃত্যুর অর্থ বের করার চেষ্টা করে সে আসলে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে আল্লাহ পরিষ্কার ভাষায় নিজের বক্তব্য প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখেন না, নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক।

৫২. অস্বীকারকারী বলতে এখানে ইহুদীদেরকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে ঈমান আনার দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং তারা তা প্রত্যাখ্যান

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ
أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ
نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ
الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾

এই জ্ঞান এসে যাওয়ার পর এখন যে কেউ এ ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়া করে, হে মুহাম্মাদ! তাকে বলে দাও ঃ "এসো আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রগণকে এবং তোমাদের পুত্রগণকে। আর আমাদের নারীদেরকে এবং তোমাদের নারীদেরকে আর আমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের নিজেদেরকে ; তারপর আল্লাহর কাছে এই মর্মে দোয়া করি যে, যে মিথ্যাবাদী হবে তার ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক।"৫৫ নিসন্দেহে এটা নির্ভুল সত্য বৃত্তান্ত। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আর আল্লাহর সত্তা প্রবল পরাক্রান্ত এবং তার জ্ঞান ও কর্মকৌশল সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থায় সক্রিয়। কাজেই এরা যদি (এই শর্তে মোকাবিলায় আসার ব্যাপারে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে (তারা যে ফাসাদকারী একথা পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং) আল্লাহ অবশ্যি ফাসাদকারীদের অবস্থা ভালো করেই জানেন।

করেছিল। বিপরীত পক্ষে তাঁর অনুসারী বলতে যদি সঠিক, যথার্থ নির্ভুল অনুসারী ধরা হয় তাহলে কেবল মুসলমানরাই তার অন্তরভুক্ত হতে পারে। আর যদি এর অর্থ হয় মোটামুটি যারা তাঁকে মেনে নিয়েছিল, তাহলে এর মধ্যে খৃষ্টান ও মুসলমান উভয়ই শামিল হবে।

৫৩. অর্থাৎ যদি নিছক অলৌকিক জন্মলাভ কারো খোদা বা খোদার পুত্র হবার যথেষ্ট প্রমাণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, তাহলে সর্বপ্রথম তোমাদের আদম সম্পর্কেই এহেন আকীদা পোষণ করা উচিত ছিল। কারণ ঈসা কেবল বিনা পিতায় জন্মলাভ করেছিলেন কিন্তু আদম জন্মলাভ করেছিলেন পিতা ও মাতা উভয়ের সাহায্য ছাড়াই।

৫৪. এ পর্যন্তকার ভাষণে যেসব মৌলিক বিষয় খৃষ্টানদের সামনে পেশ করা হয়েছে সেগুলোর সংক্ষিপ্তসার ক্রমানুসারে নীচে দেয়া হলো ঃ

প্রথম যে বিষয়টি তাদের বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে সেটি হচ্ছে, যেসব কারণে ঈসাকে আল্লাহ বলে তোমাদের মনে বিশ্বাস জন্মেছে, সেগুলোর মধ্যে একটি কারণও এই ধরনের বিশ্বাসের ভিত্তি হতে পারে না। ঈসা একজন মানুষ ছিলেন। বিশেষ কারণে ও উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাঁকে অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে সৃষ্টি করা সংগত মনে করেন। তাঁকে এমন সব মু'জিযা তথা অলৌকিক ক্ষমতা ও নিদর্শন দান করেন, যা ছিল তাঁর নবুওয়াতের

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ
اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ
دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾ يٰٓاَهْلَ
الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِىْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ
وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٥﴾ هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ
حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

৭ রুকূ'

বলো ঃ [৫৬] হে আহলি কিতাব! এসো এমন একটি কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই ধরনের।[৫৭] তা হচ্ছে ঃ আমরা আল্লাহ ছাড়া কারোর বন্দেগী ও দাসত্ব করবো না। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবো না। আর আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও নিজের রব হিসেবে গ্রহণ করবে না। যদি তারা এ দাওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে পরিষ্কার বলে দাও ঃ "তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা অবশ্যি মুসলিম (একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যকারী)।"

হে আহলি কিতাব! তোমরা ইবরাহীমের ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করছো কেন? তাওরাত ও ইনজীল তো ইবরাহীমের পরে নাযিল হয়েছে। তাহলে তোমরা কি এতটুকু কথাও বুঝো না?[৫৮]—তোমরা যেসব বিষয়ের জ্ঞান রাখো সেগুলোর ব্যাপারে বেশ বিতর্ক করলে, এখন আবার সেগুলোর ব্যাপারে বিতর্ক করতে চললে কেন যেগুলোর কোন জ্ঞান তোমাদের নেই?—আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না।

দ্ব্যর্থহীন আলামত। সত্য অস্বীকারকারী ও সত্যদ্রোহীদের দ্বারা শূলবিদ্ধ হওয়া থেকে তাকে রক্ষা করেন। বরং আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেন। প্রভু তার দাসকে যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার রাখেন। নিছক তাঁর সাথে এই অস্বাভাবিক ব্যবহার দেখে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া যে, তিনি নিজেই প্রভু ছিলেন অথবা প্রভুপুত্র ছিলেন অথবা প্রভুত্বে ও মালিকানা স্বত্বে অংশীদার ছিলেন, এটা কেমন করে সঠিক হতে পারে?

দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তাদের বুঝানো হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, ঈসা যে দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন সেই একই দাওয়াত নিয়ে এসেছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। উভয়ের মিশনের মধ্যে সামান্য চুল পরিমাণ পার্থক্যও নেই।

এই ভাষণের তৃতীয় মৌলিক বিষয়টি হচ্ছে, কুরআন যে ইসলামের দাওয়াত পেশ করছে এই ইসলামই ছিল হযরত ঈসার পর তাঁর হাওয়ারীদের ধর্ম। পরবর্তীকালের ঈসায়ী ধর্ম হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেনি এবং তাঁর অনুসারী বৃন্দ হওয়ারীদের অনুসৃত ধর্মের ওপরও প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেনি।

৫৫. মীমাংসার এই পদ্ধতি উপস্থাপন করার উদ্দেশ্য ছিল আসলে একথা প্রমাণ করা যে, নাজরানের প্রতিনিধিদল জেনে বুঝে হঠধর্মিতার পথ অবলম্বন করছে। ওপরের ভাষণে যেসব কথা বলা হয়েছে তার একটিরও জবাব তাদের কাছে ছিল না। খৃষ্টানদের আকীদাগুলোর মধ্য থেকে কোন একটির পক্ষেও তারা নিজেদের পবিত্র গ্রন্থ ইনজীল থেকে এমন কোন সনদ আনতে পারছিল না যার ভিত্তিতে পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে তারা এ দাবী করতে পারতো যে, তাদের বিশ্বাস প্রকৃত সত্যের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল এবং সত্য কোনক্রমেই তার বিরোধী নয়। তা ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র মাধুর্য এবং তাঁর শিক্ষা ও কার্যাবলী দেখে প্রতিনিধি দলের অধিকাংশ সদস্যের মনে তাঁর নবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাসও জন্মে গিয়েছিল। অথবা কমপক্ষে তাঁর নবুওয়াত অস্বীকার করার ভিত্ নড়ে উঠেছিল। তাই যখন তাদের বলা হলো আচ্ছা, যদি তোমাদের বিশ্বাসের সত্যতার ওপর পূর্ণ ঈমান থাকে, তাহলে এসো আমাদের মোকাবিলায় এই দোয়া করো যে, যে মিথ্যেবাদী হবে তার ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক, তখন তাদের একজনও মোকাবিলায় এগিয়ে এলো না। এভাবে সমগ্র আরববাসীর সামনে একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, নাজরানের খৃষ্টবাদের যেসব পুণ্যাত্মা পাদরী ও যাজকের পবিত্রতার প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত, তারা আসলে এমনসব আকীদা-বিশ্বাস পালন করে আসছে যেগুলোর সত্যতার প্রতি তাদের নিজেদেরও পূর্ণ আস্থা নেই।

৫৬. এখান থেকে তৃতীয় ভাষণ শুরু হচ্ছে। এর বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে মনে হয় এটা বদর ও ওহোদের যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে নাযিল হয়েছিল। কিন্তু এ তিনটি ভাষণের মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক পাওয়া যায়। যার ফলে শূরার শুরু থেকে নিয়ে এখান পর্যন্ত কোথাও বক্তব্যের মধ্যে কোন সম্পর্কচ্ছেদ ঘটেনি। এ জন্য কোন কোন তাফসীরকার সন্দেহ করেছেন যে, এই পরবর্তী আয়াতগুলোও নাজরানের প্রতিনিধিদলের সাথে সম্পর্কিত ভাষণেরই অংশবিশেষ। কিন্তু এখান থেকে যে ভাষণ শুরু হচ্ছে তার ধরন দেখে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে ইহুদীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

৫৭. অর্থাৎ এমন একটি বিশ্বাসের প্রশ্নে একমত হয়ে যাও, যার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং তোমরাও যার নির্ভুলতা অস্বীকার করতে পারো না। তোমাদের নবীদের এ বিশ্বাসের কথাই প্রচারিত হয়েছে। তোমাদের পবিত্র কিতাবগুলোতে এরি শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

৫৮. অর্থাৎ তোমাদের ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ তাওরাত ও ইনজীল নাযিলের পরে সৃষ্টি হয়েছে। আর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যে ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সেটি

مَا كَانَ إِبْرٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ۖ
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرٰهِيمَ لَلَّذِينَ
اتَّبَعُوهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾
وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ ۖ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ
وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِـَٔايٰتِ اللَّهِ وَأَنتُمْ
تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾

ইবরাহীম ইহুদী ছিল না, খৃষ্টানও ছিল না বরং সে তো ছিল একজন একনিষ্ঠ মুসলিম[৫৯] এবং সে কখনো মুশরিকদের অন্তরভুক্ত ছিল না। ইবরাহীমের যারা অনুসরণ করেছে তারাই তার সাথে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক রাখার অধিকারী। আর এখন এই নবী এবং এর ওপর যারা ঈমান এনেছে তারাই এই সম্পর্ক রাখার বেশী অধিকারী। আল্লাহ কেবল তাদেরই সমর্থক ও সাহায্যকারী যারা ঈমান এনেছে।

(হে ঈমানদারগণ!) আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে একটি দল যে কোন রকমে তোমাদের সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত করতে চায়। অথচ তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকেই বিপথগামী করছে না। কিন্তু তারা এটা উপলব্ধি করে না। হে আহলি কিতাব! কেন আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করছো, অথচ তোমরা নিজেরাই তা প্রত্যক্ষ করছো?[৬০] হে আহলি কিতাব! কেন সত্যের গায়ে মিথ্যার প্রলেপ লাগিয়ে তাকে সন্দেহযুক্ত করে তুলছো? কেন জেনে বুঝে সত্যকে গোপন করছো?

ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ ছিল না। এরপর যদি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সত্য–সঠিক পথে থেকে থাকেন এবং নাজাত লাভ করে থাকেন, তাহলে নিসন্দেহে একথা প্রমাণ হয় যে, মানুষের সত্য–সঠিক পথে থাকা ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদের অনুসৃতির ওপর নির্ভরশীল নয়। (সূরা আল বাকারার ১৩৫ ও ১৪১ টীকা দেখুন)

৫৯. আসলে এখানে 'হানীফ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হয় এমন ব্যক্তি যেসব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একটি বিশেষ পথে চলে। এই অর্থটিকেই আমরা 'একনিষ্ঠ মুসলিম' শব্দের মধ্যে আনার চেষ্টা করেছি।

وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ
آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَا تُؤْمِنُوا
إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ ۗ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ
مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ ۗ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ
بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ
مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

৮ রুকূ'

আহলি কিতাবদের একটি দল বলে, এই নবীকে যারা মেনে নিয়েছে তাদের ওপর যা কিছু নাযিল হয়েছে, তার প্রতি তোমরা সকাল বেলায় ঈমান আনো এবং সাঁঝের বেলায় তা অস্বীকার করো। সম্ভবত এই উপায়ে এই লোকেরা নিজেদের ঈমান থেকে ফিরে যাবে।[৬১] তাছাড়া এই লোকেরা পরস্পর বলাবলি করে, নিজের ধর্মের লোক ছাড়া আর কারো কথা মেনে নিয়ো না। হে নবী! এদের বলে দাও, "আল্লাহর হিদায়াতই তো আসল হিদায়াত এবং এটা তো তাঁরই নীতি যে, এক সময় যা তোমাদের দেয়া হয়েছিল তাই অন্য একজনকে দেয়া হবে অথবা অন্যেরা তোমাদের রবের কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে পেশ করার জন্য শক্তিশালী প্রমাণ পেয়ে যাবে।" হে নবী! তাদের বলে দাও, "অনুগ্রহ ও মর্যাদা আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। তিনি ব্যাপক দৃষ্টির অধিকারী[৬২] এবং সবকিছু জানেন।[৬৩] নিজের রহমতের জন্য তিনি যাকে চান নির্ধারিত করে নেন এবং তাঁর অনুগ্রহ বিশাল ব্যাপ্তির অধিকারী।"

৬০. এ বাক্যটির আর একটি অনুবাদও হতে পারে। সেটি হচ্ছে, "তোমরা নিজেরা সাক্ষ দিচ্ছো" উভয় অবস্থাতেই মূল অর্থের ওপর কোন প্রভাব পড়ে না। আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবন, সাহাবায়ে কেরামের জীবনের ওপর তাঁর শিক্ষা ও অনুশীলনের বিস্ময়কর প্রভাব এবং কুরআনের উন্নতমানের বিষয়বস্তু এসবগুলোই মহান আল্লাহর এমনি উজ্জ্বল নিদর্শন ছিল। যা দেখার পর নবী-রসূলদের অবস্থা ও আসমানী কিতাবসমূহের ধারাবিবরণীর সাথে পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেরই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ إِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ
إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۗ ذٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيّٖنَ سَبِيلٌ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ
الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ بَلٰى مَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَإِنَّ
اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

আহলি কিতাবদের মধ্যে কেউ এমন আছে, তার ওপর আস্থাস্থাপন করে যদি তাকে সম্পদের স্তূপ দান করো, তাহলেও সে তোমার সম্পদ তোমাকে ফিরিয়ে দেবে। আবার তাদের কারো অবস্থা এমন যে, যদি তুমি তার ওপর একটি মাত্র দীনারের ব্যাপারেও আস্থাস্থাপন করো, তাহলে সে তা তোমাকে ফিরিয়ে দেবে না, তবে যদি তোমরা তার ওপর চড়াও হয়ে যাও। তাদের এই নৈতিক অবস্থার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা বলে ঃ "নিরক্ষরদের (অ-ইহুদী) ব্যাপারে আমাদের কোন দায়দায়িত্ব নেই।"[৬৪] আর এটা একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট কথা তারা আল্লাহর প্রতি আরোপ করছে। অথচ তারা জানে, (আল্লাহ এমন কোন কথা বলেননি।) আচ্ছা, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না কেন? যে ব্যক্তিই তার অংগীকার পূর্ণ করবে এবং অসৎকাজ থেকে দূরে থাকবে, সে আল্লাহর প্রিয়ভাজন হবে। কারণ আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন।

ছিল। কাজেই অনেক আহলি কিতাব (বিশেষ করে তাদের আলেম সমাজ) একথা জেনে নিয়েছিল যে, পূর্ববর্তী নবীগণ যে নবীর অগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লাম সেই নবী। এমন কি কখনো কখনো সত্যের প্রবল শক্তির চাপে বাধ্য হয়ে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা ও তাঁর উপস্থাপিত শিক্ষাকে সত্য বলে স্বীকার করে নিতো। এ জন্যই কুরআন বার বার তাদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ এনেছে যে, তোমরা নিজেরাই আল্লাহর যেসব নিদর্শনের সত্যতার সাক্ষ দিচ্ছো, সেগুলোকে তোমরা নিজেদের মানসিক দুষ্কৃতিপরায়ণতার কারণে ইচ্ছা করেই মিথ্যে বলছো কেন?

৬১. মদীনার উপকণ্ঠে বসবাসকারী ইহুদীদের সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ইসলামের দাওয়াতকে দুর্বল করার জন্য যেসব চাল চালতো এটি তার অন্যতম। ইসলামের প্রতি মুসলমানদেরকে বিরূপ করে তোলার এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহ ও খারাপ ধারণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তারা গোপনে লোক

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ
لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا
يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ
الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَ
وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾

আর যারা আল্লাহর সাথে করা অংগীকার ও নিজেদের শপথ সামান্য দামে বিকিয়ে দেয়, তাদের জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পাক–পবিত্রও করবেন না।[৬৫] বরং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে, তারা কিতাব পড়ার সময় এমনভাবে জিভ ওলট পালট করে যে, তোমরা মনে করতে থাকো, তারা কিতাবেরই ইবারত পড়ছে, অথচ তা কিতাবের ইবারত নয়।[৬৬] তারা বলে, যাকিছু আমরা পড়ছি, তা আল্লাহর কাছ থেকেই পাওয়া অথচ তা আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া নয়, তারা জেনে বুঝে আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে।

তৈরী করে পাঠাতো। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, প্রথমে এই লোকগুলো প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করবে, তারপর মুরতাদ হয়ে যাবে এবং ইসলাম, মুসলমান ও তাদের নবীর মধ্যে নানা প্রকার গলদ নির্দেশ করে বিভিন্ন স্থানে এই মর্মে প্রচার করে বেড়াবে যে, এই সমস্ত দোষ–ত্রুটি দেখেই তারা ইসলাম থেকে আলাদা হয়ে গেছে।

৬২. মূলে "ওয়াসে" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে সাধারণত তিনটি জায়গায় এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এক, যেখানে কোন একটি মানব গোষ্ঠীর সংকীর্ণমনতা ও সংকীর্ণ চিন্তার উল্লেখ করা হয় এবং আল্লাহ তাদের মতো সংকীর্ণ দৃষ্টির অধিকারী নন, একথা তাদের জানিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দুই, যেখানে কারো কৃপণতা, সংকীর্ণমনতা এবং স্বল্প সাহস ও হিম্মতের কারণে তাকে তিরস্কার করে মহান আল্লাহ যে উদার হস্ত এবং তার মতো কৃপণ নন, একথা বুঝাবার প্রয়োজন হয়। তিন, যেখানে লোকেরা নিজেদের চিন্তার সীমাবদ্ধতার কারণে আল্লাহর ওপরও এক ধরনের সীমাবদ্ধতা আরোপ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে তাদের একথা জানাবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ

সকল প্রকার সীমাবদ্ধতার উর্ধে, তিনি অসীম। (এ প্রসংগে সূরা আল বাকারার ১১৬ টীকাটিও দেখুন)।

৬৩. অর্থাৎ কে অনুগ্রহ ও মর্যাদালাভের যোগ্য আল্লাহই তা জানেন।

৬৪. এটা কেবল সাধারণ ইহুদীদের মূর্খতাপ্রসূত ধারণাই ছিল না। বরং এটাই ছিল তাদের ধর্মীয় শিক্ষা। তাদের বড় বড় ধর্মীয় নেতারা এই ধর্মীয় বিধানও দিতো। বাইবেলে ঋণ ও সূদের বিধানের ক্ষেত্রে ইসরাঈলী ও অ-ইসরাঈলীদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করা হয়েছে। (দ্বিতীয় বিবরণ ১৫ ঃ ৩—২৩ ঃ ২০) তালমূদে বলা হয়েছে, যদি কোন ইসরাঈলীর বলদ কোন অ-ইসরাঈলীর বলদকে আহত করে তাহলে এ জন্য কোন জরিমানা দিতে হবে না। কোন ব্যক্তি যদি কোন জিনিস কুড়িয়ে পায় তাহলে তাকে চারপাশের জনবসতির দিকে নজর দিতে হবে। চারপাশে যদি ইসরাঈলীদের বসতি থাকে, তাহলে তাকে জিনিসটির ঘোষণা দিতে হবে। আর যদি অ-ইসরাঈলীদের বসতি থাকে, তাহলে বিনা ঘোষণায় সে জিনিসটি নিয়ে নিতে পারে। রাব্বী ইসমাঈল বলেন ঃ যদি ইসরাঈলী ও অইসরাঈলীর মামলা বিচারপতির আদালতে আসে, তাহলে বিচারপতি ধর্মীয় আইনের আওতায় নিজের ভাইকে জয়ী করতে পারলে তাই করবেন এবং বলবেন, এটা তো আমাদের আইন। আর অ-ইসরাঈলীদের আইনের আওতায় জয়ী করতে পারলে তাই করবেন এবং বলবেন, এটা তো তোমাদের আইন। যদি দু'টো আইনের কোনটার সাহায্যেই ইসরাইলীকে জয়ী করানো সম্ভব না হয়, তাহলে যে কোন বাহানাবাজী ও কৌশল অবলম্বন করে ইসরাঈলীকে জয়ী করা যায়, তা তাকে করতে হবে। রাব্বী শামওয়াঈল বলেন ঃ অ-ইসরাঈলীর প্রতিটি ভুলের সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। (TALMUDIC MISCELLANY PAUL ISAAC HERSHON, London 1880. Page-37, 220, 221)

৬৫. এর কারণ হচ্ছে, এরা এত বড় বড় এবং কঠিনতম অপরাধ করার পরও মনে করতো, কিয়ামতের দিন তারাই আল্লাহর সবচেয়ে বেশী নৈকট্যলাভের অধিকারী হবে। তাদের প্রতি বর্ষিত হবে আল্লাহর অনুগ্রহ। আর দুনিয়ার জীবনে যে সামান্য গোনাহের দাগ তাদের গায়ে লেগে গেছে, বুযর্গদের বদৌলতে তাও ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়া হবে। অথচ আসলে সেখানে তাদের সাথে এর সম্পূর্ণ উল্টা ব্যবহার করা হবে।

৬৬. এর অর্থ যদিও এটাও হতে পারে যে, তারা আল্লাহর কিতাবের অর্থ বিকৃত করে অথবা শব্দ ওলট পালট করে তার অর্থ সম্পূর্ণ উল্টে দেয় তবুও এর আসল অর্থ হচ্ছে, তারা আল্লাহর কিতাব পড়ার সময় তাদের স্বার্থ বা মনগড়া আকীদা-বিশ্বাস ও মতবাদ বিরোধী কোন বিশেষ শব্দকে জিভের নাড়াচাড়ার মাধ্যমে এমনভাবে উচ্চারণ করে যার ফলে তার চেহারা বদল হয়ে যায়। কুরআনের স্বীকৃতি দানকারী আহ্‌লী কিতাবদের মধ্যেও এর নজীরের অভাব নেই। যেমন নবীর মানব সম্প্রদায়ভুক্ত হবার বিষয়টি যারা অস্বীকার করে তারা কুরআনের اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (অবশ্যি আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ) আয়াতটি পড়ার সময় 'ইন্নামা' শব্দটিকে ভেঙে "ইনা" "মা" দুই শব্দ করে পড়ে। এর অর্থ হয় ঃ "হে নবী! তুমি বলে দাও, অবশ্যি আমি মানুষ নই তোমাদের মতো।"

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ
يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا
رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾
وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۚ أَيَأْمُرُكُم
بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করবেন আর সে লোকদের বলে বেড়াবে, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার দাস হয়ে যাও, এটা তার জন্য শোভনীয় নয়। সে তো একথাই বলবে, তোমরা খাঁটি রব্বানী[৬৭] হয়ে যাও, যেমন এই কিতাবের দাবী, যা তোমরা পড়ো এবং অন্যদের পড়াও। তারা তোমাদের কখনো বলবে না, ফেরেশতা বা নবীদেরকে তোমাদের রব হিসেবে গ্রহণ করো। তোমরা যখন মুসলিম তখন তোমাদেরকে কুফরীর হুকুম দেয়া একজন নবীর পক্ষে কি সম্ভব?[৬৮]

৬৭. ইহুদীদের সমাজে যারা আলেম পদবাচ্য হতেন, যারা ধর্মীয় পদ ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকতেন, ধর্মীয় ব্যাপারে লোকদের নেতৃত্বদান এবং ইবাদাত প্রতিষ্ঠা ও ধর্মীয় বিধান প্রবর্তন করাই ছিল যাদের কাজ তাদের জন্য রব্বানী শব্দটি ব্যবহার করা হতো। যেমন কুরআনের একস্থানে বলা হয়েছে ঃ

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ

(অর্থাৎ তাদের রব্বানী ও আলেমরা তাদেরকে গোনাহের কথা বলতে ও হারাম সম্পদ খেতে বাধা দিতো না কেন?) অনুরূপভাবে খৃষ্টানদের মধ্যে "রব্বানী" এর সমার্থক (Divine) প্রচলন দেখা যায়।

৬৮. দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবীদের ওপর যেসব মিথ্যা কথা আরোপ করে নিজেদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর অন্তরভুক্ত করে নিয়েছে এবং যেগুলোর প্রেক্ষিতে নবী বা ফেরেশতারা কোন না কোন দিক দিয়ে ইলাহ ও মাবুদ হিসেবে গণ্য হয়, এখানে তাদের সেই সমস্ত মিথ্যা কথার বলিষ্ঠ ও পূর্ণাংগ প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। এই আয়াতে একটি মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে, বলা হয়েছে ঃ যে শিক্ষা মানুষকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তার বন্দেগী ও পূজা-অর্চণায় লিপ্ত করে এবং তাকে আল্লাহর দাসত্বের পর্যায় থেকে খোদায়ীর পর্যায়ে উন্নীত করে, তা কখনো নবীর শিক্ষা হতে পারে

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ
قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ
قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٢﴾ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ
مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

৯ রুকূ'

স্মরণ করো, যখন আল্লাহ নবীদের থেকে এই মর্মে অংগীকার নিয়েছিলেন, "আজ আমি তোমাদের কিতাব ও হিকমত দান করেছি, কাল যদি অন্য একজন রসূল এই শিক্ষার সত্যতা ঘোষণা করে তোমাদের কাছে আসে, যা আগে থেকেই তোমাদের কাছে আছে, তাহলে তোমাদের তার প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং তাকে সাহায্য করতে হবে।"[৬৯] এই বক্তব্য উপস্থাপন করার পর আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন ঃ "তোমরা কি একথার স্বীকৃতি দিচ্ছো এবং আমার পক্ষ থেকে অংগীকারের গুরুদায়িত্ব বহন করতে প্রস্তুত আছো?" তারা বললো, হ্যাঁ, আমরা স্বীকার করলাম। আল্লাহ বললেন ঃ "আচ্ছা, তাহলে তোমরা সাক্ষী থাকো এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম, এরপর যারাই এ অংগীকার ভংগ করবে তারাই হবে ফাসেক।"[৭০]

এখন কি এরা আল্লাহর আনুগত্যের পথ (আল্লাহর দীন) ত্যাগ করে অন্য কোন পথের সন্ধান করছে? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল্লাহর হুকুমের অনুগত (মুসলিম)[৭১] এবং তাঁরই দিকে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

না। কোন ধর্মীয় গ্রন্থে এ ধরনের বক্তব্য দেখা গেলে সেখানে বিভ্রান্ত লোকেরা এই বিকৃতি ঘটিয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

৬৯. এর অর্থ হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক নবীর কাছ থেকে এই মর্মে অংগীকার নেয়া হয়েছে। আর যে অংগীকার নবীর কাছ থেকে নেয়া হয়েছে তা নিসন্দেহে ও অনিবার্যভাবে তাঁর অনুসারীদের ওপরও আরোপিত হয়ে যায়। অংগীকারটি হচ্ছে, যে দীনের প্রচার ও

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ
وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى
وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ
مُسْلِمُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ
وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

হে নবী! বলো ঃ "আমরা আল্লাহকে মানি, আমাদের ওপর অবতীর্ণ শিক্ষাকে মানি, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও ইয়াকূব সন্তানদের ওপর অবতীর্ণ শিক্ষাকেও মানি এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদেরকে তাদের রবের পক্ষ থেকে যে হিদায়াত দান করা হয় তার ওপরও ঈমান রাখি। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না[৭২] এবং আল্লাহর হুকুমের অনুগত (মুসলিম)।" এ আনুগত্য (ইসলাম) ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে চায় তার সে পদ্ধতি কখনোই গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ব্যর্থ, আশাহত ও বঞ্চিত।

প্রতিষ্ঠার কাজে তোমাদের নিযুক্ত করা হয়েছে সেই একই দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়ে আমার পক্ষ থেকে যে নবীকে পাঠানো হবে তার সাথে তোমাদের সহযোগিতা করতে হবে। তার প্রতি কোন হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করবে না। নিজেদেরকে দীনের ইজারাদার মনে করো না। সত্যের বিরোধিতা করবে না। বরং যেখানে যে ব্যক্তিকেই আমার পক্ষ থেকে সত্যের পতাকা উত্তোলন করার দায়িত্বে নিযুক্ত করা হবে সেখানেই তার পতাকাতলে সমবেত হয়ে যাবে।

এখানে আরো এতটুকু কথা জেনে নিতে হবে যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে যে নবীই এসেছিলেন তাঁর কাছ থেকে এই অংগীকারই নেয়া হয়েছে। আর এরই ভিত্তিতে প্রত্যেক নবী নিজের উম্মাতকে তাঁর পরে যে নবী আসবেন তার খবর দিয়েছেন এবং তাঁর সাথে সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে এ ধরনের কোন অংগীকার নেয়া হয়েছে এমন কোন কথা কুরআনে ও হাদীসে কোথাও উল্লেখিত হয়নি। অথবা তিনি নিজের উম্মাতকে পরবর্তীকালে আগমনকারী কোন নবীর খবর দিয়ে তার প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিয়ে গেছেন বলে কোন কথাও জানা যায়নি।

৭০. এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে আহ্‌লি কিতাবদের এই মর্মে সতর্ক করা যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকার ভংগ করছো এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ
الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٦﴾
اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٧﴾
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٨٨﴾
اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ﴿٨٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ
تَوْبَتُهُمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ﴿٩٠﴾

ঈমানের নিয়ামত একবার লাভ করার পর পুনরায় যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, তাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করবেন, এটা কেমন করে সম্ভব হতে পারে? অথচ তারা নিজেরা সাক্ষ দিয়েছে যে, রসূল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার কাছে উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহও এসেছে।[৭৩] আল্লাহ জালেমদের হিদায়াত দান করেন না। তাদের ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের লানত, এটিই হচ্ছে তাদের জুলুমের সঠিক প্রতিদান। এই অবস্থায় তারা চিরদিন থাকবে। তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদের বিরামও দেয়া হবে না। তবে যারা তাওবা করে নিজেদের কর্মনীতির সংশোধন করে নেয় তারা এর হাত থেকে রেহাই পাবে। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। কিন্তু যারা ঈমান আনার পর আবার কুফরী অবলম্বন করে তারপর নিজেদের কুফরীর মধ্যে এগিয়ে যেতে থাকে,[৭৪] তাদের তাওবা কবুল হবে না। এ ধরনের লোকেরা তো চরম পথভ্রষ্ট।

সাল্লামকে অস্বীকার ও তাঁর বিরোধিতা করে তোমাদের নবীদের থেকে যে অংগীকার নেয়া হয়েছিল তার বিরুদ্ধাচরণ করছো। কাজেই এখন তোমরা ফাসেক হয়ে গেছো। অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যের শিকল কেটে বের হয়ে গেছো।

৭১. অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব-জাহান ও বিশ্ব-জাহানের মধ্যে যা কিছু আছে সবার দীন ও জীবন বিধানই হচ্ছে এ ইসলাম। অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর দাসত্ব। এখন এই বিশ্ব-জাহানের মধ্যে অবস্থান করে তোমরা ইসলাম ছাড়া আর কোন্ জীবন বিধানের অনুসন্ধান করছো?

৭২. অর্থাৎ কোন নবীকে মানবো ও কোন নবীকে মানবো না এবং কোন নবীকে মিথ্যা ও কোন নবীকে সত্য বলবো, এটা আমাদের পদ্ধতি নয়। আমরা হিংসা-বিদ্বেষ ও

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ
ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٩١﴾

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং কুফরীর অবস্থায় জীবন দিয়েছে, তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি নিজেকে শাস্তি থেকে বাঁচাবার জন্য সারা পৃথিবীটাকে স্বর্ণে পরিপূর্ণ করে বিনিময় স্বরূপ পেশ করে তাহলেও তা গ্রহণ করা হবে না। এ ধরনের লোকদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এবং তারা নিজেদের জন্য কোন সাহায্যকারীও পাবে না।

১০ রুকূ'

তোমরা নেকী অর্জন করতে পারো না যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলো (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো।[৭৫] আর তোমরা যা ব্যয় করবে আল্লাহ তা থেকে বেখবর থাকবেন না।

জাহেলী আত্মম্ভরিতা মুক্ত। দুনিয়ার যেখানেই আল্লাহর যে বান্দাই আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যের পয়গাম এনেছেন আমরা তার সত্যতার সাক্ষ দিয়েছি।

৭৩. এখানে আবার সে একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে বারবার বিবৃত করা হয়েছে অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ইহুদী আলেমরা একথা জানতে পেরেছিল এবং তারা এর সাক্ষ দিয়েছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য নবী এবং তিনি সেই একই শিক্ষা এনেছেন, যা ইতিপূর্বে অন্যান্য নবীগণও এনেছিলেন। এসব জানার পরও তারা যা কিছু করেছে তা ছিল নিছক বিদ্বেষ, হঠধর্মিতা ও সত্যের সাথে দুশমনির পুরাতন অভ্যাসের ফল। শত শত বছর থেকে তারা এ অপরাধ করে আসছিল।

৭৪. অর্থাৎ কেবল অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং কার্যত তার বিরোধিতা ও তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। লোকদের আল্লাহর পথে চলা থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করেছে এবং বিভ্রান্তি ছড়িয়ে বেড়িয়েছে। মনের মধ্যে দ্বিধার সৃষ্টি করেছে ও কুমন্ত্রণা দিয়েছে এবং নবীর মিশন যাতে কোনক্রমে সফলতার সীমান্তে পৌছতে না পারে সেজন্য সবরকমের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে।

৭৫. নেকী, সওয়াব ও পুণ্যের ব্যাপারে তারা যে ভুল ধারণা পোষণ করতো, তা দূর করাই এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য। নেকী ও পুণ্য সম্পর্কে তাদের মনে যে ধারণা ছিল তার মধ্যে

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ
نَفْسِهِۦ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا۟ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَٱتْلُوهَآ
إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٩٣﴾ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنۢ بَعْدِ
ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٩٤﴾ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ ۗ فَٱتَّبِعُوا۟ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ
حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾

এসব খাদ্যবস্তু (শরীয়াতে মুহাম্মাদীতে যেগুলো হালাল) বনী ইসরাঈলদের জন্যও হালাল ছিল।[৭৬] তবে এমন কিছু বস্তু ছিল যেগুলোকে তাওরাত নাযিল হবার পূর্বে বনী ইসরাঈল[৭৭] নিজেই নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিল। তাদেরকে বলে দাও, যদি তোমরা (নিজেদের আপত্তির ব্যাপারে) সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে তাওরাত নিয়ে এসো এবং তার কোন বাক্য পেশ করো। এরপরও যারা নিজেদের মিথ্যা মনগড়া কথা আল্লাহর প্রতি আরোপ করতে থাকবে তারাই আসলে জালেম। বলে দাও, আল্লাহ যা কিছু বলেছেন, সত্য বলেছেন। কাজেই তোমাদের একাগ্রচিত্তে ও একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের পদ্ধতির অনুসরণ করা উচিত। আর ইবরাহীম শিরককারীদের অন্তরভুক্ত ছিল না।[৭৮]

সবচেয়ে উন্নত ধারণাটির চেহারা ছিল নিম্নরূপ ঃ শত শত বছরের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের পথ বেয়ে শরীয়াতের যে একটি বিশেষ আনুষ্ঠানিক চেহারা তাদের সমাজে তৈরি হয়ে গিয়েছিল মানুষ নিজের জীবনে পুরোপুরি তার নকলনবিশী করবে। আর তাদের আলেম সমাজ আইনের চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে একটি বড় রকমের আইন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল জীবনের ছোটখাটো ও খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলোকে দিনরাত বসে বসে তার মানদণ্ডে বিচার করতে থাকবে। ধার্মীকতার এই আবরণের নীচে সাধারণত ইহুদীদের বড় বড় 'ধার্মীকেরা' সংকীর্নতা, লোভ, লালসা, কার্পণ্য, সত্য গোপন করা ও সত্যকে বিক্রি করার দোষগুলো সংগোপনে লুকিয়ে রেখেছিল। ফলে সাধারণ মানুষ তাদেরকে সৎ ও পুণ্যবান মনে করতো। এ বিভ্রান্তি দূর করার জন্য তাদেরকে বলা হচ্ছে ঃ তোমরা যে জিনিসকে কল্যাণ, সততা ও সৎকর্মশীলতা মনে করছো 'সৎলোক' হওয়া তার চেয়ে অনেক বড় ব্যাপার। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাই হচ্ছে নেকীর মূল প্রাণসত্তা। এই ভালোবাসা এমন পর্যায়ে পৌঁছতে হবে, যার ফলে আল্লাহর সন্তুষ্টির মোকাবিলায় মানুষ দুনিয়ার কোন জিনিসকেই প্রিয়তর মনে করবে না। যে জিনিসের প্রতি ভালোবাসা মানুষের মনে এমনভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে যে, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার জন্য সে তাকে ত্যাগ করতে পারে না, সেটিই হচ্ছে একটি দেবতা। এই দেবতাকে বিসর্জন দিতে ও বিনষ্ট করতে না পারলে নেকীর দুয়ার তার জন্য বন্ধ থাকবে। এই প্রাণসত্তা শূণ্য হবার পর নেকী

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾
فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ
اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٨﴾

নিসন্দেহে মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে ইবাদাত গৃহটি নির্মিত হয় সেটি মক্কায় অবস্থিত। তাকে কল্যাণ ও বরকত দান করা হয়েছিল এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াতের কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছিল।[৭৯] তার মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ[৮০] এবং ইবরাহীমের ইবাদাতের স্থান। আর তার অবস্থা হচ্ছে এই যে, যে তার মধ্যে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে।[৮১] মানুষের মধ্য থেকে যারা সেখানে পৌঁছার সামর্থ রাখে, তারা যেন এই গৃহের হজ্জ সম্পন্ন করে, এটি তাদের ওপর আল্লাহর অধিকার। আর যে ব্যক্তি এ নির্দেশ মেনে চলতে অস্বীকার করে তার জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন।

বলো, হে আহলি কিতাব! তোমরা কেন আল্লাহর কথা মানতে অস্বীকার করছো? তোমরা যেসব কাজ কারবার করছো, আল্লাহ তা সবই দেখছেন।

নিছক বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান ভিত্তিক ধার্মিকতায় পরিণত হয় এবং তাকে তখন এমন একটি চকচকে তেলের সাথে তুলনা করা যায়, যা একটি ঘুণে ধরা কাঠের গায়ে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের তেল চকচকে কাঠ দেখে মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারে, আল্লাহ নয়।

৭৬. ইহুদী আলেমরা কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার বিরুদ্ধে যখন কোন নীতিগত আপত্তি জানাতে পারলো না (কারণ যেসব বিষয়ের ওপর দীনের ভিত্তি স্থাপিত ছিল, তার ব্যাপারে পূর্ববর্তী নবীদের শিক্ষা ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার মধ্যে সামান্য চুল পরিমাণ পার্থক্যও ছিল না) তখন তারা ফিকাহ্ ভিত্তিক আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলো। এ প্রসংগে তারা এই বলে আপত্তি জানালো—আপনি পানাহার সামগ্রীর মধ্যে এমন কিছুকে হালাল গণ্য করেছেন, যা পূর্ববর্তী নবীদের সময় থেকে হারাম হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। এখানে এই আপত্তিটির জবাব দেয়া হয়েছে।

৭৭. ইসরাঈল বলতে যদি এখানে বনী ইসরাঈল বুঝানো হয়ে থাকে, তাহলে এর অর্থ হবে, তাওরাত নাযিল হবার পূর্বে বনী ইসরাঈলরা কিছু জিনিস নিছক প্রথাগতভাবে

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا
عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٩﴾ يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٠﴾ وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ
وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ
بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٠١﴾

বলো, হে আহলি কিতাব! তোমরা এ কেমন কর্মনীতি অবলম্বন করেছো, যে ব্যক্তি আল্লাহর কথা মানে তাকে তোমরা আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখো এবং সে যেন বাকা পথে চলে এই কামনা করে থাকো? অথচ তোমরা নিজেরাই তার (সত্য পথাশ্রয়ী হবার) সাক্ষী। তোমরা যা কিছু করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ গাফিল নন।

হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা এই আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে একটি দলের কথা মানো, তাহলে তারা তোমাদের ঈমান থেকে কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। তোমাদের জন্যে কুফরীর দিকে ফিরে যাবার এখন আর কোন্ সুযোগটি আছে, যখন তোমাদের শুনানো হচ্ছে আল্লাহর আয়াত এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর রসূল? যে ব্যক্তি আল্লাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে, সে অবশ্যি সত্য সঠিক পথ লাভ করবে।

নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছিল। আর একথায় যদি হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়ে থাকে তাহলে এর অর্থ হবে, নিজের প্রকৃতিগত অপছন্দ অথবা কোন রোগের কারণে তিনি কোন কোন জিনিস পরিহার করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর সন্তানরা সেগুলো নিষিদ্ধ মনে করে নিয়েছিল। এ শেষোক্ত বক্তব্যটি বেশী প্রচলিত। পরবর্তী আয়াত থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, বাইবেলে উট ও খরগোশ হারাম হবার যে বিধান লিখিত হয়েছে তা মূল তাওরাতের বিধান নয়। বরং ইহুদী আলেমরাই পরবর্তীকালে এ বিধান কিতাবের অন্তরভুক্ত করেছিল। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন সূরা আন'আম–এর ১২২ টীকা)

৭৮. এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা ফিকাহর এ সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ের বিতর্ক আলোচনায় জড়িয়ে পড়েছো, অথচ এক আল্লাহর বন্দেগী করাই হচ্ছে দীনের ভিত্তি। আর এ ভিত্তিকে বাদ দিয়ে তোমরা শিরকের পূতিগন্ধময় আবর্জনা গায়ে মেখে চলছো। আবার এখন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم
مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

১১ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করো। মুসলিম থাকা অবস্থায় ছাড়া যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়।[৮২] তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জু[৮৩] মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং দলাদলি করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন সে কথা স্মরণ রেখো। তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু। তিনি তোমাদের হৃদয়গুলো জুড়ে দিয়েছেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছো। তোমরা একটি অগ্নিকুণ্ডের কিনারে দাঁড়িয়ে ছিলে। আল্লাহ সেখান থেকে তোমাদের বাঁচিয়ে নিয়েছেন।[৮৪] এভাবেই আল্লাহ তাঁর নির্দশনসমূহ তোমাদের সামনে সুস্পষ্ট করে তুলেন। হয়তো এই নিদর্শনগুলোর মাধ্যমে তোমরা নিজেদের কল্যাণের সোজা সরল পথ দেখতে পাবে।[৮৫]

ফিকাহর বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছো। অথচ এগুলো আইনের অহেতুক চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তোমাদের উলামা সম্প্রদায়ের নিজেদের তৈরী। অধপতনের বিগত শতাব্দীগুলোতে আসল ইবরাহিমী মিল্লাত থেকে সরে গিয়ে তারা এগুলো তৈরী করেছিল।

৭৯. ইহুদীদের দ্বিতীয় আপত্তি ছিল এই—তোমরা বাইতুল মাকদিসকে বাদ দিয়ে কাবাকে কিবলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছো কেন? অথচ এ বাইতুল মাকদিসই ছিল পূর্ববর্তী নবীদের কিবলাহ। সূরা বাকারায় এ আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইহুদীরা এরপরও নিজেদের আপত্তির ওপর জোর দিয়ে আসছিল। তাই এখানে আবার এর জবাব দেয়া হয়েছে। বাইতুল মাকদিস সম্পর্কে বাইবেল নিজেই সাক্ষ দিচ্ছে যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাড়ে চারশো বছর পর হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম এটি নির্মাণ করেছিলেন। (১–রাজাবলী, ৬ ঃ ১) আর হযরত সুলাইমানের (আ) আমলেই এটি তাওহীদবাদীদের কিবলাহ গণ্য হয়। (১–রাজাবলী, ৮ ঃ ২৯–৩০) বিপরীত পক্ষে সমগ্র আরববাসীর একযোগে সুদীর্ঘকালীন ধারাবাহিক বর্ণনায় একথা প্রমাণিত যে, কাবা নির্মাণ করেছিলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। তিনি হযরত মূসার (আ) আট নয়শো

বছর আগে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। কাজেই কাবার অগ্রবর্তী অবস্থান ও নির্মাণ সন্দেহাতীতভাবে সত্য।

৮০. অর্থাৎ এর মধ্যে কিছু সুস্পষ্ট আলামত পাওয়া যায়, যা থেকে একথা প্রমাণ হয় যে, এ ঘরটি আল্লাহর কাছে গৃহীত হয়েছে এবং আল্লাহ একে নিজের ঘর হিসেবে পছন্দ করে নিয়েছেন। ধূ ধূ মরুর বুকে এ ঘরটি তৈরী করা হয়। তারপর মহান আল্লাহ এর আশপাশের অধিবাসীদের আহার্য সরবরাহের চমৎকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জাহেলিয়াতের কারণে আড়াই হাজার বছর পর্যন্ত সমগ্র আরব ভূখণ্ডে চরম অশান্তি ও নিরাপত্তা হীনতা বিরাজ করছিল। কিন্তু এই বিপর্যয়ে পরিপূর্ণ দেশটিতে একমাত্র কাবাঘর ও তার আশপাশের এলাকাটি এমন ছিল যেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বরং এই কাবার বদৌলতেই সমগ্র দেশটি বছরে চার মাস শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করতো। তারপর এই মাত্র অর্ধ শতাব্দী আগে সবাই প্রত্যক্ষ করেছিল কাবা আক্রমণকারী আবরাহার সেনাবাহিনী কিভাবে আল্লাহর রোষানলে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। সে সময়ের আরবের শিশু–বৃদ্ধ–যুবক সবাই এ ঘটনা জানতো। এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরাও কুরআন নাযিলের সময় জীবিত ছিল।

৮১. এ ঘরটির মর্যাদা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, মারাত্মক প্রাণঘাতী শত্রুকে এখানে ঘোরাফেরা করতে দেখেও শত্রুর রক্তে হাত রঞ্জিত করার আকাংখা পোষণকারী ব্যক্তিরা পরস্পরের ওপর হাত ওঠাবার সাহস করতো না।

৮২. অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহর প্রতি অনুগ্রহ ও বিশ্বস্ত থাকো।

৮৩. আল্লাহর রজ্জু বলতে তাঁর দীনকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর দীনকে রজ্জুর সাথে তুলনা করার কারণ হচ্ছে এই যে, এটিই এমন একটি সম্পর্ক, যা একদিকে আল্লাহর সাথে ঈমানদারদের সম্পর্ক জুড়ে দেয় এবং অন্যদিকে সমস্ত ঈমানদারদেরকে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে এক জামায়াত বদ্ধ করে। এই রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার মানে হচ্ছে, মুসলমানরা "দীন"–কেই আসল গুরুত্বের অধিকারী মনে করবে, তার ব্যাপারেই আগ্রহ পোষণ করবে, তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে এবং তারই খেদমত করার জন্য পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করবে। যেখানেই মুসলমানরা দীনের মৌলিক শিক্ষা ও দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে এবং তাদের সমগ্র দৃষ্টি ও আগ্রহ ছোটখাট ও খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবে সেখানেই অনিবার্যভাবে তাদের মধ্যে সে একই প্রকারের দলাদলি ও মতবিরোধ দেখা দেবে, যা ইতিপূর্বে বিভিন্ন নবীর উম্মাতদেরকে তাদের আসল জীবন লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে দুনিয়া ও আখেরাতের লাঞ্ছনার আবর্তে নিক্ষেপ করেছিল।

৮৪. ইসলামের আগমনের পূর্বে আরববাসীরা যেসব ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, এখানে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা, কথায় কথায় ঝগড়া বিবাদ এবং রাতদিন মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি ও যুদ্ধ–বিগ্রহের কারণে সমগ্র আরব জাতিই ধ্বংসের কবলে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। এই আগুনে

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا
كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۚ وَأُولٰٓئِكَ
لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٥﴾ يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَأَمَّا
الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۖ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿١٠٦﴾ وَأَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ
اللّٰهِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٧﴾ تِلْكَ آيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ
وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٨﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ
وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ ﴿١٠٩﴾

তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যি থাকতে হবে, যারা নেকী ও সৎকর্মশীলতার দিকে আহবান জানাবে, ভালো কাজের নির্দেশ দেবে ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এ দায়িত্ব পালন করবে তারাই সফলকাম হবে। তোমরা যেন তাদের মতো হয়ে যেয়ো না, যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য হিদায়াত পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে।[৮৬] যারা এ নীতি অবলম্বন করেছে তারা সেদিন কঠিন শাস্তি পাবে যেদিন কিছু লোকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং কিছু লোকের মুখ কালো হয়ে যাবে। তাদেরকে বলা হবে, ঈমানের নিয়ামত লাভ করার পরও তোমরা কুফরী নীতি অবলম্বন করলে? ঠিক আছে, তাহলে এখন এই নিয়ামত অস্বীকৃতির বিনিময়ে আযাবের স্বাদগ্রহণ করো। আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে, তারা আল্লাহর রহমতের আশ্রয় লাভ করবে এবং চিরকাল তারা এই অবস্থায় থাকবে। এগুলো আল্লাহর বাণী, তোমাকে যথাযথভাবে শুনিয়ে যাচ্ছি। কারণ দুনিয়াবাসীদের প্রতি জুলুম করার কোন এরাদা আল্লাহর নেই।[৮৭] আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত জিনিসের মালিক এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহর দরবারে পেশ হয়।

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا
لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾ لَن يَضُرُّوكُمْ
إِلَّا أَذًى ۖ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿١١١﴾ ضُرِبَتْ
عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ
وَبَاءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذَٰلِكَ
بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

১২ রুকূ'

এখন তোমরাই দুনিয়ায় সর্বোত্তম দল। তোমাদের কর্মক্ষেত্রে আনা হয়েছে মানুষের হিদায়াত ও সংস্কার সাধনের জন্য।[৮৮] তোমরা নেকীর হুকুম দিয়ে থাকো, দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো। এই আহলি কিতাবরা[৮৯] ঈমান আনলে তাদের জন্যই ভালো হতো। যদিও তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ঈমানদার পাওয়া যায় ; কিন্তু তাদের অধিকাংশই নাফরমান। এরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। বড় জোর কিছু কষ্ট দিতে পারে। এরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তারপর এমনি অসহায় হয়ে পড়বে যে কোথাও থেকে কোন সাহায্য পাবে না। এদের যেখানেই পাওয়া গেছে সেখানেই এদের ওপর লাঞ্ছনার মার পড়েছে। তবে কোথাও আল্লাহর দায়িত্বে বা মানুষের দায়িত্বে কিছু আশ্রয় মিলে গেলে তা অবশ্যি ভিন্ন কথা,[৯০] আল্লাহর গযব এদেরকে ঘিরে ফেলেছে। এদের ওপর মুখাপেক্ষিতা ও পরাজয় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এসব কিছুর কারণ হচ্ছে এই যে, এরা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করতে থেকেছে এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। এসব হচ্ছে এদের নাফরমানি ও বাড়াবাড়ির পরিণাম।

পুড়ে ভস্মীভূত হওয়া থেকে ইসলামই তাদেরকে রক্ষা করেছিল। এই আয়াত নাযিল হওয়ার তিন চার বছর আগেই মদীনার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইসলামের এ জীবন্ত অবদান তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছিল। তারা দেখছিল ঃ আওস ও খাযরাজ দু'টি গোত্রে বছরের পর বছর থেকে শত্রুতা চলে আসছিল। তারা ছিল পরস্পরের রক্ত পিপাসু। ইসলামের বদৌলতে তারা পরস্পর মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এই গোত্র দু'টি মক্কা থেকে আগত মুহাজিরদের সাথে এমন নজীর বিহীন ত্যাগ ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করছিল, যা সাধারণত একই পরিবারের লোকদের নিজেদের মধ্যে করতে দেখা যায় না।

৮৫. অর্থাৎ যদি তোমাদের সত্যিকার চোখ থেকে থাকে, তাহলে এই আলামতগুলো দেখে তোমরা নিজেরাই আন্দাজ করতে পারবে, কিসে তোমাদের কল্যাণ—এই দীনকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার মধ্যে, না একে পরিত্যাগ করে আবার তোমাদের সেই পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার মধ্যে? তোমাদের আসল কল্যাণকামী কে—আল্লাহ ও তাঁর রসূল, না সেই ইহুদী, মুশরিক ও মুনাফিক, যারা তোমাদের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে?

৮৬. এখানে পূর্ববর্তী নবীদের এমন সব উম্মাতের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যারা সত্য দীনের সরল ও সুস্পষ্ট শিক্ষা লাভ করেছিল। কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর দীনের মৌল বিষয়গুলো পরিত্যাগ করে দীনের সাথে সম্পর্কবিহীন গৌণ ও অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি বিষয়াবলীর ভিত্তিতে নিজেদেরকে একটি আলাদা ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে গড়ে তুলতে শুরু করে দিয়েছিল। তারপর অবান্তর ও আজেবাজে কথা নিয়ে এমনভাবে কলহে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল যে, আল্লাহ তাদের ওপর যে দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন তার কথাই তারা ভুলে গিয়েছিল এবং বিশ্বাস ও নৈতিকতার যেসব মূলনীতির ওপর আসলে মানুষের সাফল্য ও কল্যাণের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, তার প্রতি কোন আগ্রহই তাদের ছিল না।

৮৭. অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ দুনিয়াবাসীদের প্রতি কোন জুলুম করতে চান না তাই তিনি তাদেরকে সোজা পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন। আবার শেষ পর্যন্ত কোন্ কোন্ বিষয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে সে কথাও পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দিচ্ছেন। এরপরও যারা বাঁকা পথ ধরবে এবং নিজেদের ভ্রান্ত কর্মপদ্ধতি পরিহার করবে না, তারা আসলে নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করবে।

৮৮. ইতিপূর্বে সূরা বাকারার ১৭ রুকূ'তে যে কথা বলা হয়েছিল এখানেও সেই একই বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের বলা হচ্ছে, নিজেদের অযোগ্যতার কারণে বনী ইসরাঈলদেরকে দুনিয়ার নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শনের যে আসন থেকে বিচ্যুত করা হয়েছে সেখানে এখন তোমাদেরকে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। কারণ নৈতিক চরিত্র ও কার্যকলাপের দিক দিয়ে এখন তোমরাই দুনিয়ায় সর্বোত্তম মানব গোষ্ঠী। সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্য যেসব গুণাবলীর প্রয়োজন সেগুলো তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেছে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে ন্যায় ও সৎবৃত্তির প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় ও অসৎবৃত্তির মূলোৎপাটন করার মনোভাব ও কর্মস্পৃহা সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর এই সংগে তোমরা এক ও লা-শরীক আল্লাহকেও বিশ্বাসগত দিক দিয়ে এবং কার্যতও নিজেদের ইলাহ, রব ও সর্বময় প্রভু বলে স্বীকার করে নিয়েছো। কাজেই এ কাজের

لَيْسُوْا سَوَآءً ۗ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ
الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿١١٣﴾ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ
بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ۗ
وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٤﴾ وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ۗ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿١١٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ
اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ۗ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١١٦﴾

কিন্তু সমস্ত আহলি কিতাব এক ধরনের নয়। এদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে সত্য পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা রাতে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে এবং তাঁর সামনে সিজদানত হয়। আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে। সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে এবং কল্যাণ ও নেকীর কাজে তৎপর থাকে। এরা সৎলোক। এরা যে সৎকাজই করবে তার অমর্যাদা করা হবে না। আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে খুব ভালোভাবেই জানেন। আর যারা কুফরীনীতি অবলম্বন করেছে, আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের ধন-সম্পদ কোন কাজে লাগবে না এবং তাদের সন্তান-সন্ততিও। তারা তো আগুনের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং সেখানেই তারা থাকবে চিরকাল।

দায়িত্ব এখন তোমাদের মাথায় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমরা নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন করো এবং তোমাদের পূর্ববর্তীরা যেসব ভুল করে গেছে তা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখো। (সূরা বাকারার ১২৩ ও ১৪৪ টীকাও দেখুন)

৮৯. এখানে আহ্‌লি কিতাব বলতে বনী ইসরাঈলকে বুঝানো হয়েছে।

৯০. অর্থাৎ দুনিয়ার কোথাও যদি তারা কিছুটা শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে থাকে। তাহলে তা তাদের নিজেদের ক্ষমতা বলে অর্জিত হয়নি বরং অন্যের সহায়তা ও অনুগ্রহের ফল। কোথাও কোন মুসলিম সরকার আল্লাহর নামে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছে এবং কোথাও কোন অমুসলিম সরকার নিজস্বভাবে তাদেরকে সহায়তা দান করেছে। এভাবে কোন কোন সময় দুনিয়ার কোথাও তারা শক্তিশালী হবার সুযোগও লাভ করেছে।

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ
أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ
وَلٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً
مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ۚ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ
مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۖ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ
الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

তারা তাদের এই দুনিয়ার জীবনে যা কিছু ব্যয় করছে তার উপমা হচ্ছে এমন বাতাস যার মধ্যে আছে তুষার কণা। যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছে তাদের শস্যক্ষেতের ওপর দিয়ে এই বাতাস প্রবাহিত হয় এবং তাকে ধ্বংস করে দেয়। [৯১] *আল্লাহ তাদের ওপর জুলুম করেননি। বরং প্রকৃতপক্ষে এরা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছে।*

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিজেদের জামায়াতের লোকদের ছাড়া অন্য কাউকে তোমাদের গোপন কথার সাক্ষী করো না। তারা তোমাদের দুঃসময়ের সুযোগ গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয় না। [৯২] *যা তোমাদের ক্ষতি করে তাই তাদের কাছে প্রিয়। তাদের মনের হিংসা ও বিদ্বেষ তাদের মুখ থেকে ঝরে পড়ে এবং যা কিছু তারা নিজেদের বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে তা এর চাইতেও মারাত্মক। আমি তোমাদের পরিষ্কার হিদায়াত দান করেছি। তবে যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও (তাহলে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে)।*

কিন্তু তাও নিজের বাহু বলে নয়, বরং নিছক অপরের অনুগ্রহে তথা পরের ধনে পোদ্দারী করার মতো।

৯১. এই উপমাটিতে শস্যক্ষেত মানে হচ্ছে জীবন ক্ষেত্র। আখেরাতে মানুষকে তার এই জীবনক্ষেতের ফসল কাটতে হবে। বাতাস বলতে মানুষের বাহ্যিক কল্যাণাকাংখাকে বুঝানো হয়েছে। যার ভিত্তিতে কাফেরেরা জনকল্যাণমূলক কাজ এবং দান খয়রাত ইত্যাদিতে অর্থ ব্যয় করে থাকে। আর তুষারকণা হচ্ছে, সঠিক ঈমান ও আল্লাহর বিধান অনুসৃতির অভাব, যার ফলে তাদের সমগ্র জীবন মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। এ উপমাটির সাহায্যে আল্লাহ একথা বলতে চাচ্ছেন যে, শস্যক্ষেতের পরিচর্যার ক্ষেত্রে বাতাস যেমন উপকারী তেমনি আবার এই বাতাসের মধ্যে যদি তুষারকণা থাকে তাহলে তা

هَآ أَنتُمْ أُولَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَٰبِ
كُلِّهِۦ ۖ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَوْا۟ عَضُّوا۟ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ
مِنَ ٱلْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا۟ بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿١١٩﴾
إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا۟ بِهَا ۖ
وَإِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا
يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

তোমরা তাদেরকে ভালোবাসো কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালোবাসে না অথচ তোমরা সমস্ত আসমানী কিতাবকে মানো।[৯৩] তারা তোমাদের সাথে মিলিত হলে বলে, আমরাও (তোমাদের রসূল ও কিতাবকে) মেনে নিয়েছি। কিন্তু তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে যাবার পর তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ ও আক্রোশ এতবেশী বেড়ে যায় যে, তারা নিজেদের আঙুল কামড়াতে থাকে। তাদেরকে বলে দাও, নিজেদের ক্রোধ ও আক্রোশে তোমরা নিজেরাই জ্বলে পুড়ে মরো। আল্লাহ মনের গোপন কথাও জানেন। তোমাদের ভালো হলে তাদের খারাপ লাগে এবং তোমাদের ওপর কোন বিপদ এলে তারা খুশী হয়। তোমরা যদি সবর করো এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো, তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের কোন কৌশল কার্যকর হতে পারে না। তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তা চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে আছেন।

শস্যক্ষেতকে সবুজ শ্যামল করার পরিবর্তে ধ্বংস করে দেয়। ঠিক তেমনি দান–খয়রাত যদিও মানুষের আখেরাতের ক্ষেতের পরিচর্যা করে কিন্তু তার মধ্যে কুফরীর বিষ মিশ্রিত থাকলে তা লাভজনক হবার পরিবর্তে মানুষের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। একথা সুস্পষ্ট যে, মানুষের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ এবং মানুষ যে ধন–সম্পদ ব্যয় করছে তার মালিকও আল্লাহ। এখন যদি আল্লাহর এই দাস তার মালিকের সার্বভৌম কর্তৃত্ব স্বীকার না করে অথবা তাঁর বন্দেগীর সাথে আর কারো অবৈধ বন্দেগী শরীক করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ ব্যয় করে ও তাঁর রাজ্যের মধ্যে চলাফেরা ও বিভিন্ন কাজ কারবার করে তাঁর আইন ও বিধানের আনুগত্য না করে, তাহলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার এ সমস্ত কাজ অপরাধে পরিণত হয়। প্রতিদান–পাওয়া তো দূরের কথা বরং এই সমস্ত অপরাধ তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করার ভিত্তি সরবরাহ করে। তার দান খয়রাতের দৃষ্টান্ত

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

১৩ রুকূ'

(হে নবী!)[৯৪] মুসলমানদের সামনে সে সময়ের কথা বর্ণনা করো) যখন তুমি অতি প্রত্যুষে নিজের ঘর থেকে বের হয়েছিলে এবং (ওহোদের ময়দানে) মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত করছিলে। আল্লাহ সমস্ত কথা শুনেন এবং তিনি সবকিছু ভালো করে জানেন।

হচ্ছে ঃ কোন চাকর যেন তার মনিবের অনুমতি ছাড়াই তার অর্থ ভাণ্ডারের দরজা খুলে নিজের ইচ্ছামত যেখানে সংগত মনে করলো সেখানে ব্যয় করে ফেললো।

৯২. মদীনার আশেপাশে যেসব ইহুদী বাস করতো আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদের সাথে প্রাচীন কাল থেকে তাদের বন্ধুত্ব চলে আসছিল। এ দুই গোত্রের লোকেরা ব্যক্তিগতভাবেও বিভিন্ন ইহুদীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতো এবং গোত্রীয়ভাবেও তারা ছিল পরস্পরের প্রতিবেশী ও সহযোগী। আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা মুসলমান হয়ে যাবার পরও ইহুদীদের সাথে তাদের সেই পুরাতন সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। ব্যক্তিগতভাবেও তারা তাদের পুরাতন ইহুদী বন্ধুদের সাথে আগের মতই প্রীতি ও আন্তরিকতার সাথে মেলামেশা করতো। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর মিশনের বিরুদ্ধে ইহুদীদের মধ্যে যে শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তার ফলে তারা এই নতুন আন্দোলনে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে প্রস্তুত ছিল না। আনসারদের সাথে তারা বাহ্যত আগের সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। কিন্তু মনে মনে তারা হয়ে গিয়েছিল তাদের চরম শত্রু। ইহুদীরা তাদের এই বাহ্যিক বন্ধুত্বকে অবৈধভাবে ব্যবহার করে মুসলমানদের জামায়াতে অভ্যন্তরীণ ফিত্না ও ফাসাদ সৃষ্টি করার এবং তাদের জামায়াতের গোপন বিষয়গুলোর খবর সংগ্রহ করে শত্রুদের হাতে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য সর্বক্ষণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। মহান আল্লাহ এখানে তাদের এই মুনাফেকী কর্মনীতি থেকে মুসলমানদের সাবধান থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

৯৩. অর্থাৎ এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপারই বলতে হবে, কোথায় তোমরা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে, তা নয় বরং তারা তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। তোমরা তো কুরআনের সাথে তাওরাতকেও মানো, তাই তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ করার কোন যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে না। বরং তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগ থাকতে পারতো। কারণ তারা কুরআনকে মানে না।

৯৪. এখান থেকে চতুর্থ ভাষণ শুরু হচ্ছে। ওহোদ যুদ্ধের পর এটি নাযিল হয়। এখানে ওহোদ যুদ্ধের ওপর মন্তব্য করা হয়েছে। আগের ভাষণটি শেষ করার সময় বলা হয়েছিল, "যদি তোমরা সবর করো এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো, তাহলে

তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের কোন কৌশল কার্যকর হতে পারবে না।" এখন যেহেতু ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণই দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে সবরের অভাব ছিল এবং কোন কোন মুসলমানের এমন কিছু ভুলচুক হয়ে গিয়েছিল যা ছিল আল্লাহভীতি বিরোধী, তাই তাদের এই দুর্বলতা সম্পর্কে সতর্কবাণী সম্বলিত এ ভাষণটি উপরোক্ত ভাষণের শেষ বাক্যটির পরপরই তার সাথে বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

এ ভাষণটির বর্ণনাভংগী বড়ই বৈশিষ্টময়। ওহোদ যুদ্ধের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তার প্রত্যেকটির ওপর পৃথক পৃথকভাবে কয়েকটি মাপাজোখা শব্দ সমন্বিত ভারসাম্যপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে শিক্ষণীয় মন্তব্য করা হয়েছে। এগুলো বুঝতে হলে সংশ্লিষ্ট ঘটণাগুলোর পটভূমি জানা একান্ত অপরিহার্য।

তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের শুরুতে মক্কার কুরাইশরা প্রায় তিন হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা আক্রমণ করে। সংখ্যায় বেশী হবার পরও অস্ত্রশস্ত্রও তাদের কাছে ছিল মুসলমানদের চাইতে অনেক বেশী। এর ওপর ছিল তাদের বদর যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার তীব্র আকাংখা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অভিজ্ঞ সাহাবীগণ মদীনায় অবরুদ্ধ হয়ে প্রতিরক্ষার লড়াই চালিয়ে যাবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি এমন কতিপয় শাহাদাতের আকাংখায় অধীরভাবে প্রতীক্ষারত তরুণ সাহাবী শহরের বাইরে বের হয়ে যুদ্ধ করার ওপর জোর দিতে থাকেন। অবশেষে তাদের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে বের হবার ফায়সালা করেন। এক হাজার লোক তাঁর সাথে বের হন। কিন্তু 'শওত' নামক স্থানে পৌঁছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার তিনশো সংগী নিয়ে আলাদা হয়ে যায়। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে তার এহেন আচরণে মুসলিম সেনাদলে বেশ বড় আকারের অস্থিরতা ও হতাশার সঞ্চার হয়। এমন কি বনু সালমা ও বনু হারেসার লোকরা এত বেশী হতাশ হয়ে পড়ে যে, তারাও ফিরে যাবার সংকল্প করে ফেলেছিল।

কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয়ী সাহাবীগণের প্রচেষ্টায় তাদের মানসিক অস্থিরতা ও হতাশা দূর হয়ে যায়। এই অবশিষ্ট সাতশো সৈন্য নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনের দিকে এগিয়ে যান এবং ওহোদ পর্বতের পাদদেশে (মদীনা থেকে প্রায় চার মাইল দূরে) নিজের সেনাবাহিনীকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেন যার ফলে পাহাড় থাকে তাদের পেছন দিকে এবং সামনের দিকে থাকে কুরাইশ সেনাদল। একপাশে এমন একটি গিরিপথ ছিল, যেখান থেকে আকস্মিক হামলা হবার আশংকা ছিল। সেখানে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরের নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন তীরন্দাজের একটি বাহিনী মোতায়েন করেন। তাদেরকে জোর তাকীদ দিয়ে জানিয়ে দেন ঃ "কাউকে আমাদের ধারে কাছে ঘেঁষতে দেবে না। কোন অবস্থায় এখান থেকে সরে যাবে না। যদি তোমরা দেখো, পাখিরা আমাদের গোশত ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে, তাহলেও তোমরা নিজেদের জায়গা থেকে সরে যাবে না।" অতপর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। প্রথম দিকে মুসলমানদের পাল্লা ভারী থাকে। এমনকি মুশরিকদের সেনাবাহিনীতে বিশৃংখলা দেখা দেয়। তারা বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু এই প্রাথমিক সাফল্যকে পূর্ণ বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দেবার পরিবর্তে গনীমাতের মাল আহরণ করার লোভ মুসলমানদের বশীভূত করে ফেলে। তারা শত্রু সেনাদের ধন-সম্পদ লুট করতে শুরু করে।

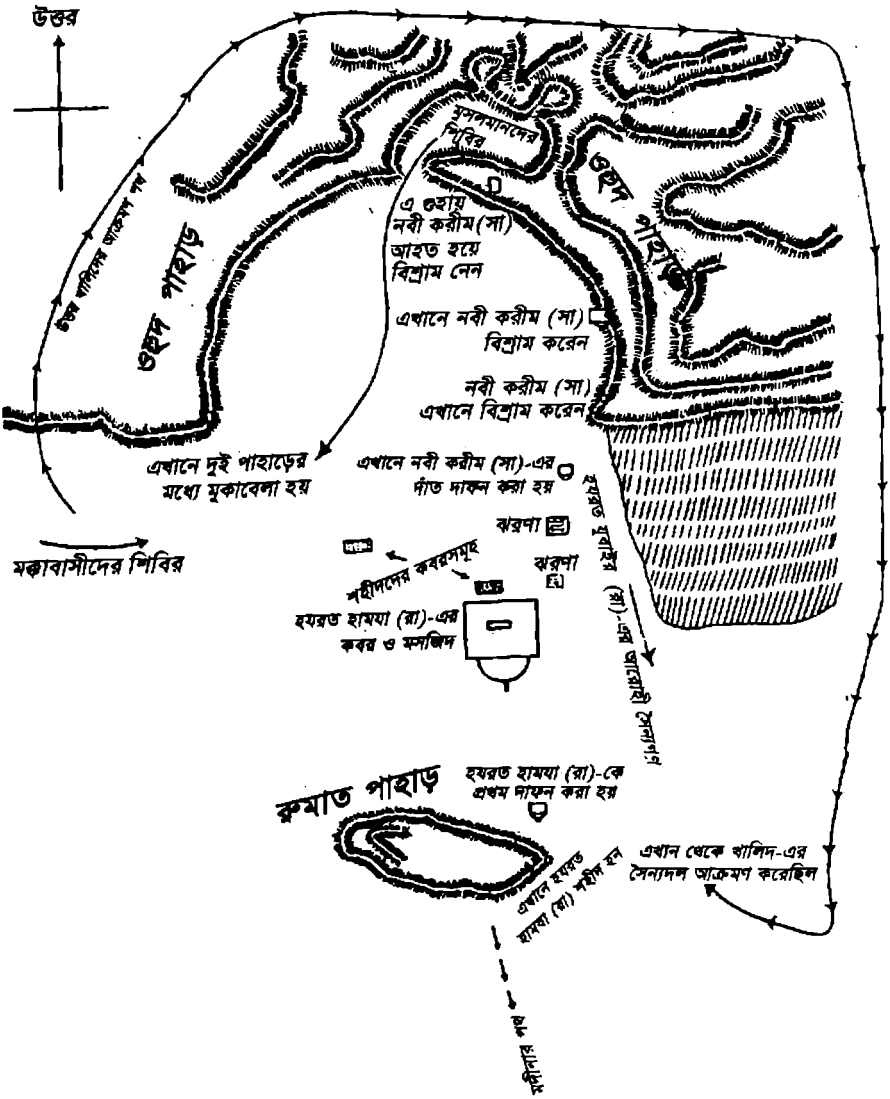

ওহুদ যুদ্ধক্ষেত্রের নক্‌শা

إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن
يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿١٢٤﴾

স্মরণ করো, যখন তোমাদের দু'টি দল কাপুরুষতার প্রদর্শনী করতে উদ্যোগী হয়েছিল,[৯৫] অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যের জন্য বর্তমান ছিলেন এবং মু'মিনদের আল্লাহরই ওপর ভরসা করা উচিত। এর আগে বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন অথচ তখন তোমরা অনেক দুর্বল ছিলে। কাজেই আল্লাহর না-শোকরী করা থেকে তোমাদের দূরে থাকা উচিত, আশা করা যায় এবার তোমরা শোকর গুজার হবে।

স্মরণ করো যখন তুমি মু'মিনদের বলছিলে ঃ "আল্লাহ তাঁর তিন হাজার ফেরেশতা নামিয়ে দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন, এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়?[৯৬]

ওদিকে যে তীরন্দাজদেরকে পেছন দিকের হেফাজতে নিযুক্ত করা হয়েছিল, তারা যখন দেখতে পেলো শত্রুরা পালিয়ে যাচ্ছে এবং গনীমাতের মাল লুট করা হচ্ছে তখন তারাও নিজেদের জায়গা ছেড়ে গনীমাতের মালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কড়া নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বারবার বাঁধা দিতে থাকেন। কিন্তু মাত্র কয়েকজন ছাড়া কাউকে থামানো যায়নি। কাফের সেনাদলের একটি বাহিনীর কমাণ্ডার খালেদ ইবনে অলীদ যথা সময়ে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। তিনি নিজের বাহিনী নিয়ে পাহাড়ের পেছন দিক থেকে এক পাক ঘুরে এসে গিরিপথে প্রবেশ করে আক্রমণ করে বসেন। আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর তাঁর মাত্র কয়েকজন সংগীকে নিয়ে এই আক্রমণ সামাল দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। গিরিপথের ব্যূহ ভেদ করে খালেদ তার সেনাদল নিয়ে অকস্মাৎ মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। খালেদের বাহিনীর এই আক্রমণ পলায়নপর কাফের বাহিনীর মনে নতুন আশার সঞ্চার করে। তারাও পেছন ফিরে মুসলমানদের ওপর একযোগে আক্রমণ করে বসে। এভাবে মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা বদলে যায়। হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত অবস্থার মুখোমুখি হয়ে মুসলমানরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তাদের একটি বড় অংশ বিক্ষিপ্ত হয়ে পলায়নমুখী হয়। তবুও কয়েক জন সাহসী সৈন্য তখনো যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। এমন সময় গুজব ছড়িয়ে পড়ে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়ে গেছেন। এ গুজবটি সাহাবায়ে কেরামের অবশিষ্ট বাহ্যিক জ্ঞানটুকুও বিলুপ্ত করে দেয়। এতক্ষণ যারা ময়দানে লড়ে যাচ্ছিলেন এবার তারাও হিম্মতহারা হয়ে বসে পড়েন। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারপাশে ছিলেন মাত্র দশ বারো জন উৎসর্গীত প্রাণ মুজাহিদ। তিনি নিজেও আহত ছিলেন। পরিপূর্ণ পরাজয়ের আর

بَلٰٓى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ
بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى
لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ۗ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ
الْحَكِيْمِ ﴿١٢٦﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا
خَآئِبِيْنَ ﴿١٢٧﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ
فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٢٨﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ يَغْفِرُ
لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٩﴾

অবশ্যি, যদি তোমরা সবর করো এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো, তাহলে যে মুহূর্তে দুশমন তোমাদের ওপর চড়াও হবে ঠিক তখনি তোমাদের রব (তিন হাজার নয়) পাঁচ হাজার চিহ্নযুক্ত ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন। একথা আল্লাহ তোমাদের এ জন্য জানিয়ে দিলেন যে, তোমরা এতে খুশী হবে এবং তোমাদের মন আশ্বস্ত হবে। বিজয় ও সাহায্য সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী। (আর এ সাহায্য তিনি তোমাদের এ জন্য দেবেন) যাতে কুফরীর পথ অবলম্বনকারীদের একটি বাহু কেটে দেবার অথবা তাদের এমন লাঞ্ছনাপূর্ণ পরাজয় দান করার ফলে তারা নিরাশ হয়ে পশ্চাদপসরণ করবে।

(হে নবী!) চূড়ান্ত ফায়সালা করার ক্ষমতায় তোমার কোন অংশ নেই। এটা আল্লাহর ক্ষমতা-ইখতিয়ারভুক্ত, তিনি চাইলে তাদের মাফ করে দেবেন। আবার চাইলে তাদের শাস্তি দেবেন। কারণ তারা জালেম। পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর মালিকানাধীন। যাকে চান মাফ করে দেন এবং যাকে চান শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[৯৭]

কিছুই বাকি ছিল না। কিন্তু এই মুহূর্তে সাহাবীগণ জানতে পারলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত আছেন। কাজেই তারা সবদিক থেকে একে একে তাঁর চারদিকে সমবেত হতে থাকেন। তারা তাঁকে নিরাপদে পর্বতের ওপরে নিয়ে যান। এ সময়ের এ বিষয়টি আজো দুর্বোধ্য রয়ে গেছে এবং এ প্রশ্নটির জবাব আজো খুঁজে পাওয়া

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۠ وَّاتَّقُوا
اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۚ﴿١٣١﴾
وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۚ﴿١٣٢﴾ وَسَارِعُوْٓا اِلٰى
مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِيْنَ ۚ﴿١٣٣﴾ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ
الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۭ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۚ﴿١٣٤﴾

১৪ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! এ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাওয়া বন্ধ করো[৯৮] এবং আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে। সেই আগুন থেকে দূরে থাকো, যা কাফেরদের জন্য তৈরী করা হয়েছে এবং আল্লাহ ও রসূলের হুকুম মেনে নাও, আশা করা যায় তোমাদের ওপর রহম করা হবে। দৌড়ে চলো তোমাদের রবের ক্ষমার পথে এবং সেই পথে যা পৃথিবী ও আকাশের সমান প্রশস্ত জান্নাতের দিকে চলে গেছে, যা এমন সব আল্লাহভীরু লোকদের জন্য তৈরী করা হয়েছে, যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল সব অবস্থায়ই অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ দমন করে ও অন্যের দোষ-ত্রুটি মাফ করে দেয়। এ ধরনের সৎলোকদের আল্লাহ অত্যন্তভালোবাসেন।[৯৯]

যায়নি যে, কাফেররা তখন অগ্রবর্তী হয়ে ব্যাপকভাবে আক্রমণ না চালিয়ে কিসের তাড়নায় নিজেরাই মক্কায় ফিরে গিয়েছিল? মুসলমানরা এত বেশী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁদের পক্ষে পুনর্বার এক জায়গায় একত্র হয়ে যথারীতি যুদ্ধ শুরু করা কঠিন ছিল। কাফেররা তাদের বিজয়কে পূর্ণতার প্রান্তসীমায় পৌঁছাতে উদ্যোগী হলে তাদের সাফল্য লাভ অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। কিন্তু তারা নিজেরাই বা কেন ময়দান ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তা আজো অজানা রয়ে গেছে।

৯৫. এখানে বনু সালমা ও বনু হারেসার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাথীদের ময়দান থেকে সরে পড়ার কারণে তারা সাহস হারিয়ে ফেলেছিল।

৯৬. মুসলমানরা যখন দেখলেন, একদিকে শত্রুদের সংখ্যা তিন হাজার আর অন্যদিকে তাঁদের মাত্র এক হাজার থেকেও আবার তিনশো চলে যাচ্ছে, তখন তাঁদের

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ
فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۗ وَلَمْ
يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَنِعْمَ
اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ
فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٣٧﴾ هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ
وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٨﴾

আর যারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা কোন গোনাহের কাজ করে নিজেদের ওপর জুলুম করে বসলে আবার সংগে সংগে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়ে তাঁর কাছে নিজেদের গোনাহখাতার জন্য মাফ চায়—কারণ আল্লাহ ছাড়া আর কে গোনাহ মাফ করতে পারেন—এবং জেনে বুঝে নিজেদের কৃতকর্মের ওপর জোর দেয় না, এ ধরনের লোকদের যে প্রতিদান তাদের রবের কাছে আছে তা হচ্ছে এই যে, তিনি তাদের মাফ করে দেবেন এবং এমন বাগীচায় তাদের প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সৎকাজ যারা করে তাদের জন্য কেমন চমৎকার প্রতিদান! তোমাদের আগে অনেক যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করে দেখে নাও যারা (আল্লাহর বিধান ও হিদায়াতকে) মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে। এটি মানব জাতির জন্য একটি সুস্পষ্ট সতর্কবাণী এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশ।

মনোবল ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হলো। সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে একথা বলেছিলেন।

৯৭. আহত হবার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে কাফেরদের জন্য বদ্‌দোয়া নিঃসৃত হয় এবং তিনি বলেন : "যে জাতি তার নবীকে আহত করে সে কেমন করে কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করতে পারে?" এরি জবাবে এই আয়াত নাযিল হয়।

৯৮. ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের একটা বড় কারণ এই ছিল যে, ঠিক বিজয়ের মুহূর্তেই ধন-সম্পদের লোভ তাঁদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে বসে এবং

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾
اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ؕ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ
نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ
شُهَدَآءَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٠﴾ وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤١﴾ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ
اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٢﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ
تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ۖ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿١٤٣﴾

মনমরা হয়ো না, দুঃখ করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো। এখন যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, তাহলে এর আগে এমনি ধরনের আঘাত লেগেছে তোমাদের বিরোধী পক্ষের গায়েও।[১০০] এ-তো কালের উত্থান পতন, মানুষের মধ্যে আমি এর আবর্তন করে থাকি। এ সময় ও অবস্থাটি তোমাদের ওপর এ জন্য আনা হয়েছে যে, আল্লাহ দেখতে চান তোমাদের মধ্যে সাচ্চা মু'মিন কে? আর তিনি তাদেরকে বাছাই করে নিতে চান, যারা যথার্থ (সত্য ও ন্যায়ের) সাক্ষী হবে[১০১]—কেননা জালেমদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না—এবং তিনি এই পরীক্ষার মাধ্যমে সাচ্চা মু'মিনদেরকে বাছাই করে নিয়ে কাফেরদের নিশ্চিহ্ন করতে চাইছিলেন। তোমরা কি মনে করে রেখেছো, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ এখনো আল্লাহ দেখেনইনি, তোমাদের মধ্যে কে তাঁর পথে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত এবং কে তাঁর জন্য সবরকারী। তোমরা তো মৃত্যুর আকাংখা করছিলে! কিন্তু এটা ছিল তখনকার কথা যখন মৃত্যু সামনে আসেনি। তবে এখন তা তোমাদের সামনে এসে গেছে এবং তোমরা স্বচক্ষে তা দেখছো।[১০২]

নিজেদের কাজ পূর্ণরূপে শেষ করার পরিবর্তে তারা গনীমাতের মাল লুট করতে শুরু করে দেন। তাই মহাজ্ঞানী আল্লাহ এই অবস্থার সংশোধনের জন্য অর্থলিপ্সার উৎস মুখে বাঁধ বাঁধা অপরিহার্য গণ্য করেছেন এবং সুদ খাওয়া পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই সুদের ব্যবসায়ে মানুষ দিন-রাত কেবল নিজের লাভ ও লাভ বৃদ্ধির হিসেবেই ব্যস্ত থাকে

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَائِن مَّاتَ
أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ
شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

১৫ রুকূ'

মুহাম্মাদ একজন রসূল বৈ তো আর কিছুই নয়। তার আগে আরো অনেক রসূলও চলে গেছে। যদি সে মারা যায় বা নিহত হয়, তাহলে তোমরা কি পেছনের দিকে ফিরে যাবে?[১০৩] মনে রেখো, যে পেছনের দিকে ফিরে যাবে সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করবে না, তবে যারা আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকবে তাদেরকে তিনি পুরস্কৃত করবেন।

এবং এরই কারণে মানুষের মধ্যে অর্থ লালসা ব্যাপক ও সীমাহীন হারে বেড়ে যেতে থাকে।

৯৯. যে সমাজে সুদের প্রচলন থাকে সেখানে সুদখোরীর কারণে দুই ধরনের নৈতিক রোগ দেখা দেয়। সুদ গ্রহণকারীদের মধ্যে লোভ–লালসা, কৃপণতা ও স্বার্থান্ধতা এবং সুদ প্রদানকারীদের মধ্যে, ঘৃণা, ক্রোধ, হিংসা ও বিদ্বেষ জন্ম নেয়। ওহোদের পরাজয়ে এ দুই ধরনের রোগের কিছু না কিছু অংশ ছিল। মহান আল্লাহ মুসলমানদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, সুদখোরীর কারণে সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে নৈতিক গুণাবলীর সৃষ্টি হয় তার বিপরীত পক্ষে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের কারণে এসব ভিন্নধর্মী নৈতিক গুণাবলী জন্ম হয়। আল্লাহর ক্ষমা, দান ও জান্নাত অর্জিত হতে পারে এই দ্বিতীয় ধরনের গুণাবলীর মাধ্যমে, প্রথম ধরনের গুণাবলীর মাধ্যমে নয়। (আরো বেশী জানার জন্য সূরা বাকারার ৩২০ টীকা দেখুন)

১০০. এখানে বদর যুদ্ধের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। একথা বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, বদর যুদ্ধের আঘাতে যখন কাফেররা হিম্মতহারা হয়নি তখন ওহোদ যুদ্ধের এই আঘাতে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলছো কেন?

১০১. কুরআনের মূল বাক্যটি হচ্ছে, وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ এর একটি অর্থ হচ্ছে, তোমাদের থেকে কিছু সংখ্যক শহীদ নিতে চাইছিলেন। অর্থাৎ কিছু লোককে শাহাদাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে চাইছিলেন। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, বর্তমানে তোমাদের মধ্যে ঈমানদার ও মুনাফিক যে মিশ্রিত দলটি গড়ে উঠেছে তার মধ্য থেকে এমন সব লোকদের ছেঁটে আলাদা করে নিতে চাইছিলেন যারা আসলে شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (সমগ্র মানব জাতির ওপর সাক্ষী) অর্থাৎ এই মহান পদের যোগ্য হিসেবে বিবেচিত। কারণ এই মহান ও মর্যাদাপূর্ণ পদেই মুসলিম উম্মাহকে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ
يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ
مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

কোন প্রাণীই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরতে পারে না। মৃত্যুর সময় তো লেখা আছে।[১০৪] যে ব্যক্তি দুনিয়াবী পুরস্কার লাভের আশায় কাজ করবে আমি তাকে দুনিয়া থেকেই দেবো। আর যে ব্যক্তি পরকালীন পুরস্কার[১০৫] লাভের আশায় কাজ করবে সে পরকালের পুরস্কার পাবে এবং শোকরকারীদেরকে[১০৬] আমি অবশ্যি প্রতিদান দেবো।

১০২. লোকদের শাহাদাত লাভের যে আকাংখার অত্যধিক চাপে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার বাইরে এসে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এখানে সেই আকাংখার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

১০৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাহাদাতের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর অধিকাংশ সাহাবী সাহস হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থায় মুনাফিকরা (যারা মুসলমানদের সাথে সাথেই ছিল) বলতে থাকে ঃ চলো আমরা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কাছে যাই। সে আমাদের জন্য আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে নিরাপত্তা এনে দেবে। আবার কেউ কেউ এমন কথাও বলে ফেলে ঃ যদি মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রসূলই হতেন, তাহলে নিহত হলেন কেমন করে? চলো, আমাদের বাপ-দাদাদের ধর্মের দিকে ফিরে যাই। এ সমস্ত কথার জবাবে বলা হচ্ছে, তোমাদের "সত্যপ্রীতি" যদি কেবল মুহাম্মাদের (সা) ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত হয়ে থাকে এবং তোমাদের ইসলাম যদি এতই দুর্বল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে যে, মুহাম্মাদের (সা) দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার সাথে সাথেই তোমরা আবার সেই কুফরীর দিকে ফিরে যাবে, যা থেকে তোমরা বের হয়ে এসেছিলে, তাহলে আল্লাহর দীন তোমাদের কোন প্রয়োজন অনুভব করে না।

১০৪. এ থেকে মুসলমানদের একথা বুঝানো হয়েছে যে, মৃত্যুর ভয়ে তোমাদের পালিয়ে যাওয়ার কোন অর্থ নেই। মৃত্যুর জন্য আল্লাহ যে সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তার আগে কেউ মরতে পারে না এবং তার পরেও কেউ জীবিত থাকতে পারে না। কাজেই তোমরা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার চিন্তা না করে বরং জীবিত থাকার জন্য যে সময়টুকু পাচ্ছো সেই সময়ে তোমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য দুনিয়া না আখেরাত কোন্‌টি হবে, এ ব্যাপারে চিন্তা করো।

১০৫. পুরস্কার মানে কাজের ফল। দুনিয়ার পুরস্কার মানে, মানুষ তার প্রচেষ্টা ও কাজের ফল স্বরূপ এ দুনিয়ার জীবনে যে লাভ, ফায়দা ও মুনাফা হাসিল করে। আর আখেরাতের পুরস্কার মানে হচ্ছে, ঐ প্রচেষ্টা ও কাজের বিনিময়ে মানুষ তার আখেরাতের চিরন্তন জীবনের জন্য যে ফায়দা, লাভ ও মুনাফা অর্জন করবে। জীবন যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ যে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে সে ক্ষেত্রে তার দৃষ্টি ইহকালীন না পরকালীন ফল প্রাপ্তির

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٦﴾
وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ
اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٧﴾ فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ
ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤٨﴾

এর আগে এমন অনেক নবী চলে গেছে যাদের সাথে মিলে বহু আল্লাহ ওয়ালা লড়াই করেছে। আল্লাহর পথে তাদের ওপর যেসব বিপদ এসেছে তাতে তারা মনমরা ও হতাশ হয়নি, তারা দুর্বলতা দেখায়নি এবং তারা বাতিলের সামনে মাথা নত করে দেয়নি।[১০৭] এ ধরনের সবরকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন। তাদের দোয়া কেবল এতটুকুই ছিল ঃ "হে আমাদের রব! আমাদের ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দাও। আমাদের কাজের ব্যাপারে যেখানে তোমার সীমালংঘিত হয়েছে, তা তুমি মাফ করে দাও। আমাদের পা মজবুত করে দাও এবং কাফেরদের মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য করো।" শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার পুরস্কারও দিয়েছেন এবং তার চেয়ে ভালো আখেরাতের পুরস্কারও দান করেছেন। এ ধরনের সৎকর্মশীলদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন।

দিকে নিবদ্ধ থাকবে, ইসলামের দৃষ্টিতে মানবিক নৈতিকতার ক্ষেত্রে এটিই হচ্ছে চূড়ান্ত এ সিদ্ধান্তকারী প্রশ্ন।

১০৬. শোকরকারী বলতে এমন সব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহর বিশেষ নিয়ামতের কদর করে। আল্লাহর এই বিশেষ নিয়ামতটি হচ্ছে ঃ তিনি মানুষকে দীনের সঠিক ও নির্ভুল শিক্ষা দিয়েছেন। এ শিক্ষার মাধ্যমে তিনি মানুষকে এ দুনিয়া ও এর সীমিত জীবনকাল থেকে অনেক বেশী ব্যাপক একটি অনন্ত ও সীমাহীন জগতের সন্ধান দিয়েছেন এবং তাকে এ অমোঘ সত্যটিও জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষের প্রচেষ্টা, সংগ্রাম-সাধনা ও কাজের ফল কেবলমাত্র এ দুনিয়ার কয়েক বছরের জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এ জীবনের পর আর একটি অনন্ত অসীম জগতে এর বিস্তার ঘটবে। এ দৃষ্টির ব্যাপকতা, দূরদর্শন ক্ষমতা ও পরিণামদর্শিতা অর্জিত হবার পর যে ব্যক্তি নিজের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমকে এ দুনিয়ার জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে ফলপ্রসূ হতে দেখে না অথবা তার বিপরীত ফল লাভ করতে দেখে এবং এ সত্ত্বেও আল্লাহর ওপর ভরসা করে কাজ করতে থাকে, কেননা আল্লাহ তাকে এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, আখেরাতে সে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ
عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾ بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ
النّٰصِرِيْنَ ﴿١٥٠﴾ سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ
اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۭ وَبِئْسَ
مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٥١﴾

১৬ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা তাদের ইশারায় চলো, যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, তাহলে তারা তোমাদের উল্টোদিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে[১০৮] এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (তাদের কথা ভুল) প্রকৃত সত্য এই যে, আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী এবং তিনি সবচেয়ে ভালো সাহায্যকারী। শীঘ্রই সেই সময় এসে যাবে যখন আমি সত্য অস্বীকারকারীদের মনের মধ্যে বিভীষিকা সৃষ্টি করে দেবো। কারণ তারা আল্লাহর সাথে তাঁর খোদায়ী কর্তৃত্বে অংশীদার করে, যার সপক্ষে আল্লাহ কোন প্রমাণপত্র অবতীর্ণ করেননি। তাদের শেষ আবাস জাহান্নাম এবং ঐ জালেমদের ভাগ্যে জুটবে অত্যন্ত খারাপ আবাসস্থল।

অবিশ্য এর ভালো ফল পাবে—এহেন ব্যক্তিই হচ্ছে আল্লাহর শোকর গুজার বান্দা। এর বিপরীতে যারা এরপরও সংকীর্ণ বৈষয়িক স্বার্থ পূজায় নিমগ্ন থাকে এবং দুনিয়ায় নিজেদের ভ্রান্ত প্রচেষ্টাগুলোর আপাত ভালো ফল বের হতে দেখে আখেরাতে সেগুলোর খারাপ ফলের পরোয়া না করে সেগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়ে আর যেখানে দুনিয়ায় সঠিক প্রচেষ্টাগুলোর ফলবতী হবার আশা থাকে না অথবা সেগুলো ক্ষতি হবার আশংকা থাকে, সেখানে আখেরাতে সেগুলোর ভালো ফলের আশায় তাদের জন্য নিজেদের সময়, অর্থ-সম্পদ ও শক্তি-সামর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত হয় না, তারাই সত্যিকার অর্থে না-শোকরগুজার ও অকৃতজ্ঞ বান্দা। আল্লাহ তাদেরকে যে জ্ঞান দান করেছেন তাদের কাছে সেই জ্ঞানের কোন মূল্য নেই।

১০৭. অর্থাৎ নিজেদের সৈন্য সংখ্যা ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের স্বল্পতা ও অভাব এবং অন্যদিকে কাফেরদের বিপুল সংখ্যক সৈন্য ও সাজ-সরঞ্জামের প্রাচুর্য দেখেও তারা বাতিলের কাছে অস্ত্র সম্বরণ করেনি।

১০৮. অর্থাৎ যে কুফরীর অবস্থা থেকে তোমরা বের হয়ে এসেছো, তারা আবার তোমাদের সেখানেই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। ওহোদের পরাজয়ের পর মুনাফিক ও

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ
وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ
مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ
صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ
عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٢﴾ اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰٓى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ
يَدْعُوْكُمْ فِىْٓ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّا ۢ بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى
مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ اَصَابَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ ۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥٣﴾

আল্লাহ তোমাদের কাছে (সাহায্য ও সমর্থনদানের) যে ওয়াদা করেছিলেন, তা পূর্ণ করেছেন। শুরুতে তাঁর হুকুমে তোমরাই তাদেরকে হত্যা করছিলে। কিন্তু যখন তোমরা দুর্বলতা দেখালে এবং নিজেদের কাজে পারস্পরিক মতবিরোধে লিপ্ত হলে আর যখনই আল্লাহ তোমাদের সেই জিনিস দেখালেন যার ভালোবাসায় তোমরা বাঁধা ছিলে (অর্থাৎ গনীমাতের মাল), তোমরা নিজেদের নেতার হুকুম অমান্য করে বসলে, কারণ তোমাদের কিছু লোক ছিল দুনিয়ার প্রত্যাশী আর কিছু লোকের কাম্য ছিল আখেরাত, তখনই আল্লাহ কাফেরদের মোকাবিলায় তোমাদেরকে পিছিয়ে দিলেন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। তবে যথার্থই আল্লাহ এরপরও তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন।[১০৯] কারণ মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহের দৃষ্টি রাখেন।

স্মরণ করো, যখন তোমরা পালাবার কাজে এমনই ব্যস্ত ছিলে যে, কারোর দিকে ফিরে তাকাবার হুঁশও কারো ছিল না এবং রসূল তোমাদের পেছনে তোমাদের ডাকছিল।[১১০] সে সময় তোমাদের এহেন আচরণের প্রতিফল স্বরূপ আল্লাহ তোমাদের দিলেন দুঃখের পর দুঃখ।[১১১] এভাবে তোমরা ভবিষ্যতে এই শিক্ষা পাবে যে, যা কিছু তোমাদের হাত থেকে বের হয়ে যায় অথবা যে বিপদই তোমাদের ওপর নাযিল হয়, সে ব্যাপারে দুঃখিত হবে না। আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে জানেন।

ইহুদীরা মুসলমানদের মধ্যে একথা প্রচার করার চেষ্টা করছিল যে, মুহাম্মাদ (সা) যদি সত্যি সত্যিই আল্লাহর নবী হয়ে থাকেন, তাহলে যুদ্ধে পরাজিত হলেন কেন? তিনি তো

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ ۙ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۗ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَٰهُنَا ۗ قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۖ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾

এ দুঃখের পর আল্লাহ তোমাদের কিছু লোককে আবার এমন প্রশান্তি দান করলেন যে, তারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো।[১৫২] কিন্তু আর একটি দল, নিজের স্বার্থই ছিল যার কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ, আল্লাহ সম্পর্কে নানান ধরনের জাহেলী ধারণা পোষণ করতে থাকলো, যা ছিল একেবারেই সত্য বিরোধী। তারা এখন বলছে, "এই কাজ পরিচালনার ব্যাপারে আমাদেরও কি কোন অংশ আছে?" তাদেরকে বলে দাও, "(কারো কোন অংশ নেই,) এ কাজের সমস্ত ইখতিয়ার রয়েছে এক মাত্র আল্লাহর হাতে।" আসলে এরা নিজেদের মনের মধ্যে যে কথা লুকিয়ে রেখেছে তা তোমাদের সামনে প্রকাশ করে না। এদের আসল বক্তব্য হচ্ছে, "যদি (নেতৃত্ব) ক্ষমতায় আমাদের কোন অংশ থাকতো, তাহলে আমরা মারা পড়তাম না। ওদেরকে বলে দাও, "যদি তোমরা নিজেদের গৃহে অবস্থান করতে তাহলেও যাদের মৃত্যু লেখা হয়ে গিয়েছিল, তারা নিজেরাই নিজেদের বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে আসতো।" আর এই যে বিষয়টি সংঘটিত হলো, এটি এ জন্য ছিল যে, তোমাদের বুকের মধ্যে যা কিছু গোপন রয়েছে আল্লাহ তা পরীক্ষা করে নেবেন এবং তোমাদের মনের মধ্যে যে গলদ রয়েছে তা দূর করে দেবেন। আল্লাহ মনের অবস্থা খুব ভালো করেই জানেন।

একজন সাধারণ লোক। তাঁর অবস্থাও সাধারণ লোকদের থেকে আলাদা নয়। আজকে জিতে গেলেন আবার কালকে হেরে গেলেন। এই তাঁর অবস্থা। তিনি তোমাদেরকে আল্লাহর

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۙ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ
الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا
لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا
مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ۖ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ
يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾ وَلَئِن مُّتُّمْ
أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾

তোমাদের মধ্য থেকে যারা মোকাবিলার দিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল তাদের এ পদস্খলনের কারণ এই ছিল যে, তাদের কোন কোন দুর্বলতার কারণে শয়তান তাদের পা টলিয়ে দিয়েছিল। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহনশীল।

রুকূ' ১৭

হে ঈমানদারগণ! কাফেরদের মতো কথা বলো না। তাদের আত্মীয়স্বজনরা কখনো সফরে গেলে অথবা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে (এবং সেখানে কোন দুর্ঘটনায় পতিত হলে) তারা বলে, যদি তারা আমাদের কাছে থাকতো তাহলে মারা যেতো না এবং নিহত হতো না। এ ধরনের কথাকে আল্লাহ তাদের মানসিক খেদ ও আক্ষেপের কারণে পরিণত করেন।[১১৩] নয়তো জীবন–মৃত্যু তো একমাত্র আল্লাহই দান করে থাকেন এবং তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপের ওপর তিনি দৃষ্টি রাখেন। যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও বা মারা যাও তা হলে তোমরা আল্লাহর যে রহমত ও ক্ষমা লাভ করবে, তা এরা যা কিছু জমা করে তার চাইতে ভালো। আর তোমরা মারা যাও বা নিহত হও, সব অবস্থায় তোমাদের অবশ্যি আল্লাহর দিকেই যেতে হবে।

যে সাহায্য ও সহযোগিতার নিশ্চয়তা দিয়ে রেখেছেন, তা নিছক একটা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا
مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

(হে নবী!) এটা আল্লাহর বড়ই অনুগ্রহ যে, তোমার ব্যবহার তাদের প্রতি বড়ই কোমল। নয়তো যদি তুমি রুক্ষ স্বভাবের বা কঠোর চিত্ত হতে, তাহলে তারা সবাই তোমার চার পাশ থেকে সরে যেতো। তাদের ত্রুটি ক্ষমা করে দাও। তাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করো এবং দীনের ব্যাপারে বিভিন্ন পরামর্শে তাদেরকে অন্তরভুক্ত করো। তারপর যখন কোন মতের ভিত্তিতে তোমরা স্থির সংকল্প হবে তখন আল্লাহর ওপর ভরসা কারো। আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন যারা তাঁর ওপর ভরসা করে কাজ করে।

১০৯. অর্থাৎ তোমরা যে মারাত্মক ভুল করেছিলে আল্লাহ যদি তা মাফ করে না দিতেন, তাহলে এখন আর তোমাদের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেতো না। মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানীর ফলে এবং তাঁর সাহায্য ও সহায়তার বদৌলতেই তোমাদের শত্রুরা তোমাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করার পরও নিজেদের চেতনা ও সম্বিত হারিয়ে ফেলেছিল এবং বিনা কারণে নিজেরাই পিছে হটে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল।

১১০. যখন মুসলমানদের ওপর হঠাৎ একই সময় দু'দিক থেকে আক্রমণ হলো এবং তাদের সারিগুলো ভেঙে চারদিকে বিশৃংখলা অবস্থায় ছড়িয়ে পড়লো তখন কিছু লোক মদীনার দিকে পালাতে লাগলেন এবং কিছু ওহোদ পাহাড়ের ওপর উঠে গেলেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জায়গা থেকে এক ইঞ্চিও সরে গেলেন না। চারদিক থেকে শত্রুদের আক্রমণ হচ্ছিল। তার চারদিকে ছিলমাত্র দশ বারোজন লোকের একটি ছোট্ট দল। এহেন সংগীন অবস্থায়ও আল্লাহর নবী পাহাড়ের মতো নিজে অটলভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি পালায়নপর লোকদের ডেকে ডেকে বলছিলেন : (اِلَىَّ عِبَادَ اللّٰهِ اِلَىَّ عِبَادَ اللّٰهِ) "আল্লাহর বান্দারা, আমার দিকে এসো। আল্লাহর বান্দারা, আমার দিকে এসো।"

১১১. দুঃখ পরাজয়ের দুঃখ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু সংবাদের। দুঃখ নিজেদের বিপুল সংখ্যক নিহত ও আহতদের। দুঃখ এই চিন্তায় যে, এখন নিজেদের বাড়ি-ঘরেরও নিরাপত্তা নেই এবং এখনই মদীনার সমগ্র জনসংখ্যার চাইতেও বেশী তিন হাজার শত্রু সৈন্য পরাজিত সেনাদলকে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে শহরের গলি কুচায় ঢুকে পড়বে এবং নগরীর সবকিছু ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবে।

إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي
يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾ وَمَا كَانَ
لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ
تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

আল্লাহ যদি তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে কোন শক্তি তোমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করেন, তাহলে এরপর কে আছে তোমাদের সাহায্য করার মতো? কাজেই সাচ্চা মু'মিনদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।

খেয়ানত করা কোন নবীর কাজ হতে পারে না।[১১৪] যে ব্যক্তি খেয়ানত করবে কিয়ামতের দিন সে নিজের খেয়ানত করা জিনিস সহকারে হাজির হয়ে যাবে। তারপর প্রত্যেকেই তার উপার্জনের পুরোপুরি প্রতিদান পেয়ে যাবে এবং কারো প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।

১১২. ইসলামী সেনাদলের কিছু কিছু লোক এ সময় এই একটি নতুন ও অদ্ভুত ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। হযরত আবু তালহা এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। তিনি নিজে বর্ণনা করছেন, এ অবস্থায় আমাদের ওপর তন্দ্রাভাব এমনভাবে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল যে, আমাদের হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়ছিল।

১১৩. অর্থাৎ একথাগুলো সত্য নয়। এর পেছনে কোন ভিত্তি নেই। আল্লাহর ফায়সালাকে কেউ নড়াতে পারে না। এটিই সত্য। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং সবকিছুকে নিজেদের বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের ওপর নির্ভরশীল বলে মনে করে, তাদের জন্য এ ধরনের আন্দাজ অনুমান কেবল তাদের আক্ষেপ ও হতাশাই বাড়িয়ে দেয়। তারা কেবল এই বলে আফসোস করতে থাকে, হায়! যদি এমনটি করতাম তাহলে এমনটি হতো।

১১৪. পেছনের অংশের প্রতিরক্ষার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তীরন্দাজ বাহিনী মোতায়েন করেছিলেন তারা যখন দেখলো শত্রুসৈন্যদের মালমাত্তা লুটে নেয়া হচ্ছে তখন তারা আশংকা করলো, হয়তো সমগ্র ধন-সম্পদ তারাই পাবে যারা সেগুলো হস্তগত করছে এবং গনীমাত বন্টনের সময় আমরা বঞ্চিত হবো। তাই তারা নিজেদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে শত্রু সেনাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেবার কাজে লেগে গিয়েছিল। যুদ্ধ শেষে মদীনায় ফিরে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ তীরন্দাজ বাহিনীর লোকদের ডেকে তাদের এ নাফরমানীর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তারা এমন কিছু ওজর পেশ করলো যা ছিল আসলে অত্যন্ত দুর্বল। তাদের জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : بل ظننتم انا نغل ولا نقسم لكم

أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا
يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا
مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم
مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ
أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾

যে ব্যক্তি সবসময় আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী চলে সে কেমন করে এমন ব্যক্তির মতো কাজ করতে পারে, যাকে আল্লাহর গযব ঘিরে ফেলেছে এবং যার শেষ আবাস জাহান্নাম, যা সবচেয়ে খারাপ আবাস? আল্লাহর কাছে এ উভয় ধরনের লোকদের মধ্যে বহু পর্যায়ের পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ সবার কার্যকলাপের ওপর নজর রাখেন। আসলে ঈমানদারদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন নবী পাঠিয়ে আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সে তাঁর আয়াত তাদেরকে শোনায়, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করে এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দেয়। অথচ এর আগে এই লোকেরাই সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল।

তোমাদের ওপর যখন বিপদ এসে পড়লো তোমরা বলতে লাগলে, এ আবার কোথায় থেকে এলো?[১১৫] তোমাদের এ অবস্থা কেন? অথচ (বদরের যুদ্ধে) এর দ্বিগুণ বিপদ তোমাদের মাধ্যমে তোমাদের বিরোধী পক্ষের ওপর পড়েছিল।[১১৬] হে নবী! ওদের বলে দাও, তোমরা নিজেরাই এ বিপদ এনেছো।[১১৭] আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের ওপর শক্তিমান।[১১৮]

"আসল কথা হচ্ছে, আমাদের ওপর তোমাদের আস্থা ছিল না। তোমরা মনে করছিলে আমরা তোমাদের সাথে খেয়ানত করবো এবং তোমাদের অংশ দেবো না।" এ আয়াতটিতে আসলে এ বিষয়টির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। আল্লাহর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর নবী নিজেই যখন ছিলেন তোমাদের সেনাপতি এবং সমস্ত বিষয়ই ছিল তাঁর হাতে তখন

وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٦٦﴾
وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
اَوِ ادْفَعُوْا ۭ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنٰكُمْ ۭ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَىِٕذٍ
اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۭ
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ﴿١٦٧﴾ ۚ اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ
اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ۭ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ﴿١٦٨﴾

যুদ্ধের দিন তোমাদের যে ক্ষতি হয় তা ছিল আল্লাহর হুকুমে এবং তা এ জন্য ছিল যাতে আল্লাহ দেখে নেন তোমাদের মধ্যে কে মু'মিন এবং কে মুনাফিক। এ মুনাফিকদের যখন বলা হলো, এসো আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো অথবা (কমপক্ষে) নিজের শহরের প্রতিরক্ষা করো, ,তারা বলতে লাগলো ঃ যদি আমরা জানতাম আজ যুদ্ধ হবে, তাহলে আমরা অবশ্যি তোমাদের সাথে চলতাম।[১১৯] যখন তারা একথা বলছিল তখন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর অনেক বেশী কাছে অবস্থান করছিল। তারা নিজেদের মুখে এমন সব কথা বলে, যা তাদের মনের মধ্যে নেই এবং যা কিছু তারা মনের মধ্যে গোপন করে আল্লাহ তা খুব ভালো করেই জানেন। এরা নিজেরা বসে থাকলো এবং এদের ভাই-বন্ধু যারা লড়াই করতে গিয়ে মারা গিয়েছিল, তাদের সম্পর্কে বলেছিল ঃ যদি তারা আমাদের কথা মেনে নিতো, তাহলে মারা যেতো না। ওদের বলে দাও, তোমরা নিজেদের একথায় যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে তোমাদের নিজেদের মৃত্যু যখন আসবে তখন তা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে দেখাও।

তোমাদের মনে এ আশংকা কেমন করে দেখা দিল যে, নবীর হাতে তোমাদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে না? আল্লাহর নবীর ব্যাপারে তোমরা কি এ আশংকা করতে পারো যে, তাঁর তত্বাবধানে যে সম্পদ থাকবে তা বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ও ইনসাফের সাথে বন্টন না করে অন্য কোনভাবে বন্টন করা হবে?

১১৫. নেতৃস্থানীয় সাহাবীগণ অবশ্যি যথার্থ সত্য অবগত ছিলেন এবং তাঁদের কোন প্রকার বিভ্রান্তির শিকার হবার সম্ভাবনা ছিল না। তবে সাধারণ মুসলমানরা মনে

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ عِنْدَ
رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۝١٦٩ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ
بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُوْنَ ۝١٧٠ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ
اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٧١

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। তারা আসলে জীবিত।[১২০] নিজেদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকা লাভ করছে। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তাতেই তারা আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত[১২১] এবং যেসব ঈমানদার লোক তাদের পরে এ দুনিয়ায় রয়ে গেছে এবং এখনো সেখানে পৌঁছেনি, তাদের জন্যও কোন ভয় ও দুঃখের কারণ নেই, একথা জেনে তারা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। তারা আল্লাহর পুরস্কার ও অনুগ্রহ লাভে আনন্দিত ও উল্লসিত এবং তারা জানতে পেরেছে যে, আল্লাহ মু'মিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

করছিলেন, আল্লাহর রসূল যখন আমাদের সংগে আছেন এবং আল্লাহ আমাদের সাহায্য ও সহযোগিতা দান করছেন তখন কোন অবস্থাতেই কাফেররা আমাদের ওপর বিজয় লাভ করতে পারে না। তাই ওহোদে পরাজিত হবার পর তারা ভীষণভাবে আশাহত হয়েছেন। তারা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছেন, এ কি হলো? আমরা আল্লাহর দীনের জন্য লড়তে গিয়েছিলাম। তাঁর প্রতিশ্রুতি ও সাহায্য আমাদের সংগে ছিল। তাঁর রসূল সশরীরে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত ছিলেন। এরপরও আমরা হেরে গেলাম? এমন লোকদের হাতে হেরে গেলাম, যারা আল্লাহর দীনকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য এসেছিল? মুসলমানদের এই বিস্ময় পেরেশানী ও হতাশা দূর করার জন্য এ আয়াত নাযিল হয়।

১১৬. ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের সত্তর জন লোক শহীদ হয়। অন্যদিকে ইতিপূর্বে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে সত্তর জন কাফের নিহত এবং সত্তর জন বন্দী হয়েছিল।

১১৭. অর্থাৎ এটা তোমাদের নিজেদের দুর্বলতা ও ভুলের ফসল। তোমরা সবর করোনি। তোমাদের কোন কোন কাজ হয়েছে তাকওয়া বিরোধী। তোমরা নির্দেশ অমান্য করেছো। অর্থ-সম্পদের লোভে আত্মহারা হয়েছো। পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ও মতবিরোধ করেছো। এতোসব করার পর আবার জিজ্ঞেস করছো, বিপদ এলো কোথা থেকে?

১১৮. অর্থাৎ আল্লাহ যদি তোমাদের বিজয় দান করার শক্তি রাখেন তাহলে পরাজয় দান করার শক্তিও রাখেন।

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

১৮ রুকূ'

আহত হবার পরও যারা আল্লাহ ও রসূলের আহবানে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে[১২২] যারা সৎ-নেককার ও মুত্তাকী তাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান। আর যাদেরকে[১২৩] লোকেরা বললো ঃ "তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনা সমাবেশ ঘটেছে। তাদেরকে ভয় করো", তা শুনে তাদের ঈমান আরো বেড়ে গেছে এবং তারা জবাবে বলেছে ঃ "আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট এবং তিনি সবচেয়ে ভালো কার্য উদ্ধারকারী।

১১৯. আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখন তিনশো মুনাফিক নিয়ে মাঝপথ থেকে ফিরে যেতে লাগলো তখন কোন কোন মুসলমান গিয়ে তাকে বুঝাবার চেষ্টা করলো এবং মুসলিম সেনাদলে ফিরে আসার জন্য রাজী করতে চাইলো। কিন্তু সে জবাব দিল, "আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আজ যুদ্ধ হবে না, তাই আমরা চলে যাচ্ছি। নয়তো আজ যুদ্ধ হবার আশা থাকলে আমরা অবশ্যি তোমাদের সাথে চলে যেতাম।"

১২০. এর ব্যাখ্যার জন্য সূরা বাকারার ১৫৫ টীকা দেখুন।

১২১. মুসনাদে আহমাদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার বিষয়বস্তু হচ্ছে, যে ব্যক্তি ভালো কাজ করে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, সে আল্লাহর কাছে এমন আরাম আয়েসের জীবন লাভ করে যে, তারপর এ দুনিয়ায় ফিরে আসার কোন আকাংখাই সে করে না। কিন্তু শহীদরা এর ব্যতিক্রম। তারা আকাংখা করে, আবার যেন তাদেরকে দুনিয়ায় পাঠানো হয় এবং আল্লাহর পথে জীবন দিতে গিয়ে যে ধরনের আনন্দ, উৎফুল্লতা ও উন্মাদনায় তারা পাগল হয়ে গিয়েছিল আবার যেন সেই অভিনব আস্বাদনের সাগরে তারা ডুব দিতে পারে।

১২২. ওহোদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরার পথে বেশ কয়েক মনযিল দূরে চলে যাবার পর মুশরিকদের টনক নড়লো। তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, এ আমরা কি করলাম! মুহাম্মাদের (সা) শক্তি ধ্বংস করার যে সুবর্ণ সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম, তা হেলায় হারিয়ে ফেললাম? কাজেই তারা এক জায়গায় থেমে গিয়ে পরামর্শ করতে বসলো। সিদ্ধান্ত হলো, এখনি মদীনার ওপর দ্বিতীয় আক্রমণ চালাতে হবে। সিদ্ধান্ত তো

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا
رِضْوَانَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ﴿١٧٤﴾ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ
يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۖ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٥﴾
وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ
شَيْئًا ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيْمٌ ﴿١٧٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ
شَيْئًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٧﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا
نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ۗ اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٧٨﴾

অবশেষে তারা ফিরে এলো আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ সহকারে। তাদের কোন রকম ক্ষতি হয়নি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর চলার সৌভাগ্যও তারা লাভ করলো। আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহকারী। এখন তোমরা জেনে ফেলেছো, সে আসলে শয়তান ছিল, তার বন্ধুদের অনর্থক ভয় দেখাচ্ছিল। কাজেই আগামীতে তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো, যদি তোমরা যথার্থ ঈমানদার হয়ে থাকো।[১২৪]

(হে নবী!) যারা আজ কুফরীর পথে খুব বেশী দৌড়াদৌড়ি করছে তাদের তৎপরতা যেন তোমাকে মলিন বদন না করে। এরা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ আখেরাতে এদের কোন অংশ দিতে চান না। আর সবশেষে তারা কঠোর শাস্তি পাবে।

যারা ঈমানকে ছেড়ে দিয়ে কুফরী কিনে নিয়েছে তারা নিসন্দেহে আল্লাহর কোন ক্ষতি করছে না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে। কাফেরদের আমি যে ঢিল দিয়ে চলছি এটাকে যেন তারা নিজেদের জন্য ভালো মনে না করে। আমি তাদেরকে এ জন্য ঢিল দিচ্ছি, যাতে তারা গোনাহের বোঝা ভারী করে নেয়, তারপর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন অপমানকর শাস্তি।

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ
مِنَ الطَّيِّبِ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ
يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا
وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٩﴾

তোমরা বর্তমানে যে অবস্থায় আছো আল্লাহ মু'মিনদের কখনো সেই অবস্থায় থাকতে দেবেন না।[১২৫] পাক-পবিত্র লোকদেরকে তিনি নাপাক ও অপবিত্র লোকদের থেকে আলাদা করেই ছাড়বেন। কিন্তু তোমাদেরকে গায়েবের খবর জানিয়ে দেয়া আল্লাহর রীতি নয়।[১২৬] গায়েবের খবর জানাবার জন্য তিনি নিজের রসূলদের মধ্য থেকে যাকে চান বাছাই করে নেন। কাজেই (গায়েবের ব্যাপারে) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান রাখো। যদি তোমরা ঈমান ও আল্লাহকে ভয় করার নীতি অবলম্বন করো তাহলে বিরাট প্রতিদান পাবে।

তারা করে ফেললো তড়িঘড়ি। কিন্তু আক্রমণ করার আর সাহস হলো না। কাজেই মক্কায় ফিরে এলো। ওদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও আশংকা ছিল, কাফেররা আবার ফিরে এসে মদীনার ওপর আক্রমণ না করে বসে। তাই ওহোদ যুদ্ধের পরদিনই তিনি মুসলমানদের একত্র করে বললেন, কাফেরদের পেছনে ধাওয়া করা উচিত। যদিও সময়টা ছিল অত্যন্ত নাজুক তবুও যারা সাচ্চা মু'মিন ছিলেন তাঁরা প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত ধাওয়া করলেন। এ জায়গাটি মদীনা থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত। এ আয়াতে এ প্রাণ উৎসর্গকারী মু'মিন দলের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

১২৩. এ আয়াত ক'টি ওহোদ যুদ্ধের এক বছর পর নাযিল হয়েছিল। কিন্তু ওহোদের ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কিত হবার কারণে এগুলোকে এ ভাষণের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে।

১২৪. ওহোদ থেকে ফেরার পথে আবু সুফিয়ান মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে গিয়েছিল, আগামী বছর বদর প্রান্তরে আমাদের সাথে তোমাদের আবার মোকাবিলা হবে। কিন্তু নির্ধারিত সময় এগিয়ে এলে আর তার সাহসে কুলালো না। কারণ সে বছর মক্কায় দুর্ভিক্ষ চলছিল। তাই সে মান বাঁচাবার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করলো। গোপনে এক ব্যক্তিকে মদীনায় পাঠিয়ে দিল। সে মদীনায় পৌঁছে মুসলমানদের মধ্যে এ খবর ছড়াতে লাগলো যে, এ বছর কুরাইশরা বিরাট প্রস্তুতি নিয়েছে। তারা এত বড় সেনাবাহিনী তৈরী করছে যার মোকাবিলা করার সাধ্য আরবের কারো নেই। তার উদ্দেশ্য ছিল, এ প্রচারণায় ভীত হয়ে মুসলমানরা নিজেদের জায়গায় বসে থাকবে। মোকাবিলা করার জন্য বাইরে

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

আল্লাহ যাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং তারপরও তারা কার্পণ্য করে, তারা যেন এই কৃপণতাকে নিজেদের জন্য ভালো মনে না করে। না, এটা তাদের জন্য অত্যন্ত খারাপ। কৃপণতা করে তারা যাকিছু জমাচ্ছে তাই কিয়ামতের দিন তাদের গলার বেড়ি হবে। পৃথিবী ও আকাশের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই।[১২৭] আর তোমরা যা কিছু করছো, আল্লাহ তা সবই জানেন।

আসার সাহস তাদের হবে না। ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে না আসার দায় থেকে কাফেররা মুক্ত হয়ে যাবে। আবু সুফিয়ানের এ চালবাজি মুসলমানদের এমনভাবে প্রভাবিত করলো যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদের বদরের দিকে চলার আহবান জানালেন তখন তাতে আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গেলো না। অবশেষে আল্লাহর রসূল ভরা মজলিসে ঘোষণা করে দিলেন, কেউ না গেলে আমি একাই যাবো। এ ঘোষণার পর পনেরো শো প্রাণ উৎসর্গকারী মুজাহিদ তাঁর সাথে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। তাদের সাথে করে নিয়ে তিনি বদরে হাযির হলেন। ওদিকে আবু সুফিয়ান দু' হাজার সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকলো। কিন্তু দু'দিনের পথ অতিক্রম করার পর সে তার সাথীদের বললো, এ বছর যুদ্ধ করা সংগত হবে না। আগামী বছর আমরা আসবো। কাজেই নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে সে ফিরে গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আট দিন পর্যন্ত বদর প্রান্তরে তার অপেক্ষা করলেন। এ সময়ের মধ্যে তাঁর সাথীরা একটি ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে কাজ-কারবার করে প্রচুর অর্থলাভ করলেন। তারপর যখন খবর পাওয়া গেলো, কাফেররা ফিরে গেছে তখন তিনি সংগী-সাথীদের নিয়ে মদীনায় ফিরে এলেন।

১২৫. অর্থাৎ মুসলমানদের দলে সাচ্চা ঈমানদার ও মুনাফিকরা এক সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে, মুসলমানদের দলকে আল্লাহ এভাবে দেখতে চান না।

১২৬. অর্থাৎ আল্লাহ কখনো মু'মিন ও মুনাফিকের পার্থক্য সুস্পষ্ট করার জন্য গায়েব থেকে মুসলমানদের মনের অবস্থা বর্ণনা করে কে মু'মিন ও কে মুনাফিক একথা বলার রীতি অবলম্বন করেন না। বরং তাঁর নির্দেশে এমন সব পরীক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হবে যার মাধ্যমে মু'মিন ও মুনাফিকের অবস্থা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে।

১২৭. অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশের যে কোন জিনিসই যে কেউ ব্যবহার করছে তা আসলে আল্লাহর মালিকানাধীন। তার ওপর সৃষ্টির আধিপত্য ও তাকে ব্যবহার করার অধিকার সাময়িক। প্রত্যেককেই অবশ্যি তার দখল ছাড়তে হবে। অবশেষে সবকিছুই আল্লাহর কাছে চলে যাবে। কাজেই এ সাময়িক আধিপত্য ও দখলী স্বত্ব লাভ করে যে

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ
سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ
الْحَرِيْقِ ﴿١٨١﴾ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ
لِّلْعَبِيْدِ ﴿١٨٢﴾ اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ
حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ۭ قُلْ قَدْ جَاۗءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ
بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٨٣﴾

১৯ রুকূ'

আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন যারা বলে, আল্লাহ গরীব এবং আমরা ধনী।[১২৮] *এদের কথাও আমি লিখে নেবো এবং এর আগে যে পয়গাম্বরদেরকে এরা অন্যায়ভাবে হত্যা করে এসেছে তাও এদের আমলনামায় বসিয়ে দেয়া হয়েছে। (যখন ফায়সালার সময় আসবে তখন) আমি তাদেরকে বলবো ঃ এই নাও, এবার জাহান্নামের আযাবের মজা চাখো! এটা তোমাদের নিজেদের হাতের উপার্জন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য জালেম নন।*

যারা বলে ঃ "আল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা কাউকে রসূল বলে স্বীকার করবো না যতক্ষণ না তিনি আমাদের সামনে এমন কুরবানী করবেন যাকে আগুন (অদৃশ্য থেকে এসে) খেয়ে ফেলবে।" তাদেরকে বলো ঃ আমার আগে তোমাদের কাছে অনেক রসূল এসেছেন, তারা অনেক উজ্জ্বল নিদর্শন এনেছিলেন এবং তোমরা যে নিদর্শনটির কথা বলছো সেটিও তারা এনেছিলেন। এ ক্ষেত্রে (ঈমান আনার জন্য এ শর্ত পেশ করার ব্যাপারে) যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে ঐ রসূলদেরকে তোমরা হত্যা করেছিলে কেন?[১২৯]

ব্যক্তি আল্লাহর সম্পদ আল্লাহর পথে প্রাণ খুলে ব্যয় করে সে-ই বুদ্ধিমান। আর যে ব্যক্তি তা আল্লাহর পথে ব্যয় না করে স্তূপীকৃত করে সে আসলে নিরেট বোকা বৈ আর কিছুই নয়।

১২৮. এটা ইহুদীদের কথা। কুরআনে যখন আল্লাহর এ বক্তব্য উচ্চারিত হলো ঃ مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا (কে আল্লাহকে ভালো ঋণ দেবে?) তখন

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُو بِالْبَيِّنَاتِ
وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١٨٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا
تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ
فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾ لَتُبْلَوُنَّ فِي
أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۖ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ۚ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾

এখন, হে মুহাম্মাদ! যদি এরা তোমাকে মিথ্যা বলে থাকে, তাহলে তোমার পূর্বে বহু রসূলকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তারা স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, সহীফা ও আলোদানকারী কিতাব এনেছিল। অবশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে মরতে হবে এবং তোমরা সবাই কিয়ামতের দিন নিজেদের পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে। একমাত্র সেই ব্যক্তিই সফলকাম হবে, যে সেখানে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে এবং যাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আর এ দুনিয়াটা তো নিছক একটা বাহ্যিক প্রতারণার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।[১৩০]

(হে মুসলমানগণ!) তোমাদের অবশ্যি ধন ও প্রাণের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে এবং তোমরা আহলি কিতাব ও মুশরিকদের থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি এমন অবস্থায় তোমরা সবর ও তাকওয়ার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো[১৩১] তাহলে তা হবে বিরাট সাহসিকতার পরিচায়ক।

ইহুদীরা একে বিদ্রূপ করে বলতে লাগলো ঃ হ্যাঁ, আল্লাহ গরীব হয়ে গেছেন, এখন তিনি বান্দার কাছে ঋণ চাচ্ছেন।

১২৯. বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে একথা বলা হয়েছে, আল্লাহর কাছে কোন কুরবানী গৃহীত হবার আলামত এই ছিল যে, গায়েব থেকে একটি আগুন এসে তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতো। (বিচারকর্তৃগণ ৬ ঃ ২০-২১, ১৩ ঃ ১৯-২০) এ ছাড়াও বাইবেলে এ আলোচনাও এসেছে যে, কোন কোন সময় কোন নবী পোড়া জিনিস কুরবানী করতেন এবং অদৃশ্য থেকে একটি আগুন এসে তা খেয়ে ফেলতো। (লেবীয় পুস্তক ৯ ঃ ২৪ এবং

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ
وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ
فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾

এ আহলি কিতাবদের সেই অংগীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দাও, যা আল্লাহ তাদের থেকে নিয়েছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল ঃ তোমরা কিতাবের শিক্ষা মানুষের মধ্যে প্রচার করবে, তা গোপন করতে পারবে না।[১৩২] কিন্তু তারা কিতাবকে পিছনে ফেলে রেখেছে এবং সামান্য দামে তা বিক্রি করে দিয়েছে। কতই না নিকৃষ্ট কারবার তারা করে যাচ্ছে!

২–বংশাবলী ৯ ঃ ১–২) কিন্তু বাইবেলের কোথাও এ ধরনের কুরবানীকে নবুওয়াতের অপরিহার্য আলামত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি বা একথাও বলা হয়নি যে, যে ব্যক্তিকে এ মুজিযাটি দেয়া হয়নি সে নবী হতে পারে না। এটা ছিল নিছক ইহুদীদের একটি মনগড়া বাহানাবাজী। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত অস্বীকার করার জন্য তারা এ বাহানাবাজীর আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু এদের সত্য বিরোধিতার এর চাইতেও বড় প্রমাণ রয়েছে। বনী ইসরাঈলদের মধ্যেও এমন কোন কোন নবী ছিলেন যারা এ অগ্নিদগ্ধ কুরবানীর মুজিযা দেখিয়েছিলেন; কিন্তু এরপরও এ পেশাগত অপরাধী লোকেরা তাদেরকে হত্যা করতে দ্বিধা করেনি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হযরত ইলিয়াসের কথা বলা যায়। বাইবেলে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ তিনি বা'ল পূজারীদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন, সাধারণ লোকদের সমাবেশে তোমরা একটি গরু কুরবানী করবে এবং আমিও একটি গরু কুরবানী করবো, অদৃশ্য আগুন যার কুরবানী খেয়ে ফেলবে সে–ই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে প্রমাণিত হবে। কাজেই একটি বিপুল জনসমাবেশে এ মোকাবিলাটি হয়। অদৃশ্য আগুন হযরত ইলিয়াসের কুরবানী খেয়ে ফেলে। কিন্তু এরপরও ইসরাঈলী বাদশাহর বা'ল পূজারী বেগম হযরত ইলিয়াসের শত্রু হয়ে যায়। স্ত্রৈণ বাদশাহ নিজের বেগমের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। ফলে বাধ্য হয়ে তাঁকে দেশ ত্যাগ করে সাইনা উপদ্বীপের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিতে হয়। (১–রাজাবলী ১৮ ও ১৯) এ জন্য বলা হয়েছে ঃ ওহে সত্যের দুশমনরা! তোমরা কোন মুখে অগ্নিদগ্ধ কুরবানীর মুজিযা দেখতে চাচ্ছো? যেসব পয়গম্বর এ মুজিযা দেখিয়েছিলেন, তোমরা কি তাদেরকে হত্যা করতে বিরত হয়েছিলে?

১৩০. অর্থাৎ এ দুনিয়ার জীবনে বিভিন্ন কাজের যে ফলাফল দেখা যায় তাকেই যদি কোন ব্যক্তি আসল ও চূড়ান্ত ফলাফল বলে মনে করে এবং তারই ভিত্তিতে সত্য–মিথ্যা ও কল্যাণ–অকল্যাণের সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে, তাহলে সে আসলে মারাত্মক প্রতারণার শিকার হবে। এখানে কারো ওপর অনুগ্রহ ও নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকলে তা থেকে একথা প্রমাণ হয় না যে, সে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং আল্লাহর দরবারে তার কার্যকলাপ গৃহীত হয়েছে। অনুরূপভাবে এখানে কোন ব্যক্তির ওপর বিপদ নেমে এলে এবং সে

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا
لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

যারা নিজেদের কার্যকলাপে আনন্দিত এবং যে কাজ যথার্থই তারা নিজেরা করেনি সে জন্য প্রশংসা পেতে চায়, তাদেরকে তোমরা আযাব থেকে সংরক্ষিত মনে করো না।[১৩৩] আসলে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী রয়েছে। আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের মালিক এবং তাঁর শক্তি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

মহাসংকটের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলে তা থেকে অনিবার্যভাবে ধারণা করা যাবে না যে, সে মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে এবং আল্লাহর দরবারে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ প্রাথমিক পর্যায়ের ফলাফলগুলো চিরন্তন জীবনের পর্যায়ের চূড়ান্ত ফলাফল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর হয়। আর আসলে এ শেষ ফলাফলই নির্ভরযোগ্য।

১৩১. অর্থাৎ তাদের গালিগালাজ, মিথ্যা দোষারোপ, বেহুদা কথাবার্তা ও অপপ্রচারের মোকাবিলায় অধৈর্য হয়ে তোমরা এমন কোন কথা বলতে শুরু করো না, যা সত্য, সততা, ন্যায়, ইনসাফ, শিষ্টাচার শালীনতা ও নৈতিকতা বিরোধী।

১৩২. অর্থাৎ কোন কোন নবীকে অদৃশ্য আগুনে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়া কুরবানীর নিশানী হিসেবে দেয়া হয়েছিল, একথা তারা মনে রেখেছে। কিন্তু আল্লাহ নিজের কিতাব তাদের হাতে সোপর্দ করার সময় তাদের থেকে কি অংগীকার নিয়েছিলেন এবং কোন মহাদায়িত্বের বোঝা তাদের মাথায় চাপিয়ে দিয়েছিলেন, সেকথা তারা ভুলে গেছে।

এখানে যে অংগীকারের কথা বলা হয়েছে, বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে তার উল্লেখ দেখা যায়। বিশেষ করে বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে হযরত মূসার (আ) যে শেষ ভাষণটি উদ্ধৃত হয়েছে তাতে তাঁকে বারবার বনী ইসরাঈলদের থেকে নিম্নোক্ত অংগীকারটি নিতে দেখা যায় ঃ

যে বিধান আমি তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি তা নিজেদের মনের পাতায় খোদাই করে নাও। তোমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে সেগুলো শিখিয়ে দিয়ো। ঘরে বসে থাকা ও পথে চলা অবস্থায় এবং ওঠা, বসা ও শয়ন করার সময় সেগুলোর চর্চা করো। নিজেদের ঘরের চৌকাঠে ও বাইরের দরজার গায়ে সেগুলো লিখে রাখো। (৬ ঃ ৪–৯) তারপর নিজের সর্বশেষ উপদেশ তিনি তাকিদ দিয়ে বলেন ঃ ফিলিস্তীন সীমান্তে প্রবেশ করার পর সর্বপ্রথম যে কাজটি করবে সেটি হচ্ছে এই যে, ইবাল পর্বতের ওপর বড় বড় শিলা খণ্ড স্থাপন করে তার গায়ে তাওরাতের বিধানগুলি খোদাই করে দেবে। (২৭ ঃ ২–৪) এ ছাড়াও তিনি বনী লেভীকে এক খণ্ড তাওরাত গ্রন্থ দিয়ে এ নির্দেশ জারী করেন যে, প্রতি সপ্তম বছরে 'ঈদে খিয়াম' এর সময় জাতির নারী–পুরুষ শিশু সবাইকে বিভিন্ন স্থানে

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى
جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا
مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ
مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظّٰلِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾

২০ রুকূ'

পৃথিবী[১৩৪] ও আকাশের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের পালাক্রমে যাওয়া আসার মধ্যে যে সমস্ত বুদ্ধিমান লোক উঠতে, বসতে ও শয়নে সব অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর গঠনাকৃতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তাদের জন্য রয়েছে বহুতর নিদর্শন।[১৩৫] (তারা আপনা আপনি বলে ওঠে ঃ) "হে আমাদের প্রভু! এসব তুমি অনর্থক ও উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সৃষ্টি করোনি। বাজে ও নিরর্থক কাজ করা থেকে তুমি পাক-পবিত্র ও মুক্ত। কাজেই হে প্রভু! জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করো।[১৩৬] তুমি যাকে জাহান্নামে ফেলে দিয়েছো, তাকে আসলে বড়ই লাঞ্ছনা ও অপমানের মধ্যে ঠেলে দিয়েছো এবং এহেন জালেমদের কোন সাহায্যকারী হবে না।

সমবেত করে সমস্ত তাওরাত গ্রন্থটির প্রতিটি শব্দ তাদেরকে শোনাতে থাকবে। কিন্তু এরপরও আল্লাহর কিতাব থেকে বনি ইসরাঈলরা দিনের পর দিন গাফিল হয়ে যেতে থাকে। এমনকি হযরত মূসার (আ) ইন্তিকালের সাতশো বছর পর হাইকেলে সুলাইমানীর গদীনশীন এবং জেরুসালেমের ইহুদী শাসনকর্তা পর্যন্তও জানতেন না যে, তাদের কাছে তাওরাত নামের একটি কিতাব আছে। (২-রাজাবলী ২২ ঃ ৮-১৩)

১৩৩. যেমন নিজেদের প্রশংসায় তারা একথা শুনতে চায় ঃ তারা বড়ই মুত্তাকী-পরহেজগার, দ্বীনদার, সাধু-সজ্জন, দীনের খাদেম, শরীয়াতের সাহায্যকারী, সংস্কারক, সূফী চরিত্রের লোক। অথচ তারা কিছুই নয়। অথবা নিজেদের পক্ষে এভাবে ঢোল পিটাতে চায় ঃ উমুক মহাত্মা অতি বড় ত্যাগী পুরুষ, জাতির বিশ্বস্ত নেতা। তিনি নিজের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় জাতির বিরাট খেদমত করেছেন। অথচ আসল ব্যাপার তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

১৩৪. সুদীর্ঘ ভাষণটি এখানে শেষ করা হয়েছে। তাই এ শেষাংশটির সম্পর্ক কেবল ওপরের আয়াতের সাথে নয় বরং সমগ্র সূরার মধ্যে তালাশ করতে হবে। এ বক্তব্যটি বুঝতে হলে বিশেষ করে সূরার ভূমিকাটি ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।

رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۚ
رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا
وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّكَ لَا
تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾

হে আমাদের মালিক! আমরা একজন আহবানকারীর আহবান শুনেছিলাম। তিনি ঈমানের দিকে আহবান করছিলেন। তিনি বলছিলেন, তোমরা নিজেদের রবকে মেনে নাও। আমরা তার আহবান গ্রহণ করেছি।[১৩৭] কাজেই, হে আমাদের প্রভু! আমরা যেসব গোনাহ করছি তা মাফ করে দাও। আমাদের মধ্যে যেসব অসৎবৃত্তি আছে সেগুলো আমাদের থেকে দূর করে দাও এবং নেক লোকদের সাথে আমাদের শেষ পরিণতি দান করো। হে আমাদের রব! তোমার রসূলদের মাধ্যমে তুমি যেসব ওয়াদা করেছো আমাদের সাথে, সেগুলো পূর্ণ করো এবং কিয়ামতের দিন আমাদের লাঞ্ছনার গর্তে ফেলে দিয়ো না। নিসন্দেহে তুমি ওয়াদা খেলাফকারী নও।[১৩৮]

১৩৫. অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি সে আল্লাহর প্রতি গাফিল না হয় এবং বিশ্ব-জাহানের নিদর্শনসমূহ বিবেক-বুদ্ধিহীন জন্তু-জানোয়ারের দৃষ্টিতে না দেখে গভীর নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে দেখে ও সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে প্রতিটি নিদর্শনের সাহায্যে অতি সহজে যথার্থ ও চূড়ান্ত সত্যের দ্বারে পৌঁছুতে পারে।

১৩৬. বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনাকে গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করার পর এ সত্য তার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এটি পুরোপুরি একটি জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থাপনা। মহান আল্লাহ তাঁর যে সৃষ্টির মধ্যে নৈতিক অনুভূতি সৃষ্টি করেছেন, যাকে বিশ্ব-জগতে কাজ করার স্বাধীন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দিয়েছেন এবং জ্ঞান-বুদ্ধি ও সত্য-মিথ্যা এবং ভালো-মন্দের পার্থক্য করার ক্ষমতা দিয়েছেন, তাকে তার এ দুনিয়াবী জীবনের কার্যাবলীর জন্য কোন জবাবদিহি করতে হবে না এবং সে ভালো কাজের জন্য পুরস্কার ও খারাপ কাজের জন্য শাস্তি পাবে না—এটা সম্পূর্ণ একটি বুদ্ধি-বিবেক বিরোধী কথা।

১৩৭. এভাবে এ পর্যবেক্ষণ তাদেরকে এ ব্যাপারেও নিশ্চিন্ত করে দেয় যে, এ বিশ্ব এবং এর শুরু ও শেষ সম্পর্কে নবী যে দৃষ্টিভংগী ও বিশ্লেষণ পেশ করেন এবং জীবন ক্ষেত্রে তিনি যে পথ দেখান তা একেবারেই সত্য।

১৩৮. অর্থাৎ আল্লাহ নিজের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করবেন কিনা এ ব্যাপারে তাদের কোন সন্দেহ নেই। তবে সেই প্রতিশ্রুতি তাদের ওপরও কার্যকর হবে কিনা, এ ব্যাপারে তাদের সন্দেহ রয়েছে। তাই তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করে যে, এ প্রতিশ্রুতিগুলো

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ
أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن
دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا
فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾

জবাবে তাদের রব বললেন ঃ "আমি তোমাদের কারো কর্মকাণ্ড নষ্ট করবো না। পুরুষ হও বা নারী, তোমরা সবাই একই জাতির অন্তরভুক্ত।[১৩৯] কাজেই যারা আমার জন্য নিজেদের স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করেছে এবং আমার পথে যাদেরকে নিজেদের ঘর বাড়ি থেকে বের করে দেয়া ও কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং যারা আমার জন্য লড়েছে ও মারা গেছে, তাদের সমস্ত গোনাহ আমি মাফ করে দেবো এবং তাদেরকে এমন সব বাগানে প্রবেশ করাবো যার নীচে দিয়ে ঝরণাধারা বয়ে চলবে। এসব হচ্ছে আল্লাহর কাছে তাদের প্রতিদান এবং সবচেয়ে ভালো প্রতিদান আল্লাহর কাছেই আছে।"[১৪০]

হে নবী! দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে আল্লাহর নাফরমান লোকদের চলাফেরা যেন তোমাকে ধোঁকায় ফেলে না দেয়। এটা নিছক কয়েক দিনের জীবনের সামান্য আনন্দ ফূর্তি মাত্র। তারপর এরা সবাই জাহান্নামে চলে যাবে, যা সবচেয়ে খারাপ স্থান।

তাদের ব্যাপারেও কার্যকর করা হোক এবং তাদের ক্ষেত্রে এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা হোক। এ দুনিয়ায় নবীর ওপর ঈমান আনার কারণে তারা কাফেরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের শিকার হয়েছে আবার কিয়ামতের দিনও যেন কাফেরদের সামনে তাদের অপমান ও লাঞ্ছনা পোহাতে না হয়। কাফেরেরা যেন সেদিন তাদের প্রতি এ ধরনের বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ না করে যে, ঈমান এনেও এদের কোন ভালো হলো না। এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার যেন তাদের না হতে হয়, এ আশাই তারা পোষণ করে।

১৩৯. অর্থাৎ তোমরা সবাই মানুষ। আমার দৃষ্টিতে তোমরা সবাই সমান। আমার এখানে নারী-পুরুষ, চাকর-মনিব, সাদা-কালো ও বড়-ছোটর মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾
وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ
اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ اُولٰٓئِكَ
لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۟ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٢٠٠﴾

বিপরীত পক্ষে যারা নিজেদের রবকে ভয় করে জীবন যাপন করে তাদের জন্য এমন সব বাগান রয়েছে, যার নীচে দিয়ে ঝরণাধারা বয়ে চলছে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য মেহমানদারীর সরঞ্জাম। আর যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে, নেক লোকদের জন্য তাই ভালো। আহলি কিতাবদের মধ্যেও এমন কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহকে মানে তোমাদের কাছে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তার ওপর ঈমান আনে এবং এর আগে তাদের নিজেদের কাছে যে কিতাব পাঠানো হয়েছিল তার ওপরও ঈমান রাখে, যারা আল্লাহর সামনে বিনত মস্তক এবং আল্লাহর আয়াতকে সামান্য দামে বিক্রি করে না। তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের কাছে। আর তিনি হিসেব চুকিয়ে দেবার ব্যাপারে দেরী করেন না।

হে ঈমানদারগণ! সবরের পথ অবলম্বন করো, বাতিলপন্থীদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা দেখাও,[১৪১] হকের খেদমত করার জন্য উঠে পড়ে লাগো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে।

ক্ষেত্রে কোন ভিন্ন ভিন্ন নীতি এবং তাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মীমাংসা করার সময় আলাদা আলাদা মানদণ্ড কায়েম করা হয় না।

১৪০. এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, কোন কোন অমুসলিম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলে ঃ মূসা নবী 'আসা' (অলৌকিক লাঠি) ও উজ্জ্বল হাত এনেছিলেন। ঈসা নবী অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতেন এবং কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করতেন। অন্যান্য নবীরাও কিছু না কিছু মু'জিযা এনেছিলেন। আপনি কি এনেছেন?

একথার জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ রুকূ'র শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেন এবং তাদেরকে বলেন, আমি এগুলো এনেছি।

১৪১. কুরআনের মূল শব্দ হচ্ছে صابروا এর দু'টি অর্থ হয়। এক, কাফেরেরা তাকে কুফরীর ব্যাপারে যে দৃঢ়তা ও অবিচলতা দেখাচ্ছে এবং কুফরীর ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখার জন্য যে ধরনের কষ্ট স্বীকার করছে তোমরা তাদের মোকাবিলায় তাদের চাইতেও বেশী দৃঢ়তা, অবিচলতা ও মজবুতী দেখাও। দুই, তাদের মোকাবেলায় তোমরা দৃঢ়তা অবিচলতা ও মজবুতী দেখাবার ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করো।

আন্ নিসা
৪

নাযিল হওয়ার সময়-কাল ও বিষয়বস্তু

এ সূরাটি কয়েকটি ভাষণের সমষ্টি। সম্ভবত তৃতীয় হিজরীর শেষের দিক থেকে নিয়ে চতুর্থ হিজরীর শেষের দিকে অথবা পঞ্চম হিজরীর প্রথম দিকের সময়-কালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে এর বিভিন্ন অংশ নাযিল হয়। যদিও নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না, কোন আয়াত থেকে কোন আয়াত পর্যন্ত একটি ভাষণের অন্তরভুক্ত হয়ে নাযিল হয়েছিল এবং তার নাযিলের সময়টা কি ছিল, তবুও কোন কোন বিধান ও ঘটনার দিকে কোথাও কোথাও এমন সব ইংগিত করা হয়েছে যার সহায়তায় রেওয়ায়াত থেকে আমরা তাদের নাযিলের তারিখ জানতে পারি। তাই এগুলোর সাহায্যে আমরা এসব বিধান ও ইংগিত সম্বলিত এ ভাষণগুলোর মোটামুটি একটা সীমা নির্দেশ করতে পারি।

যেমন আমরা জানি উত্তরাধিকার বন্টন ও এতিমদের অধিকার সম্বলিত বিধানসমূহ ওহোদ যুদ্ধের পর নাযিল হয়। তখন সত্তর জন মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। এ ঘটনাটির ফলে মদীনার ছোট জনবসতির বিভিন্ন গৃহে শহীদদের মীরাস কিভাবে বন্টন করা হবে এবং তারা যেসব এতিম ছেলেমেয়ে রেখে গেছেন তাদের স্বার্থ কিভাবে সংরক্ষণ করা হবে, এ প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। এরি ভিত্তিতে আমরা অনুমান করতে পারি, প্রথম চারটি রুকূ' ও পঞ্চম রুকূ'র প্রথম তিনটি আয়াত এ সময় নাযিল হয়ে থাকবে।

যাতুর রিকা'র যুদ্ধে ভয়ের নামায (যুদ্ধ চলা অবস্থায় নামায পড়া) পড়ার রেওয়ায়াত আমরা হাদীসে পাই। এ যুদ্ধটি চতুর্থ হিজরীতে সংঘটিত হয়। তাই এখানে অনুমান করা যেতে পারে, যে ভাষণে (১৫ রুকূ') এ নামাযের নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে সেটি এরি কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয়ে থাকবে।

চতুর্থ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে মদীনা থেকে বনী নযীরকে বহিষ্কার করা হয়। তাই যে ভাষণটিতে ইহুদীদেরকে এ মর্মে সর্বশেষ সতর্কবাণী শুনিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, "আমি তোমাদের চেহারা বিকৃত করে পেছন দিকে ফিরিয়ে দেবার আগে ঈমান আনো," সেটি এর পূর্বে কোন নিকটতম সময়ে নাযিল হয়েছিল বলে শক্তিশালী অনুমান করা যেতে পারে।

বনীল মুসতালিকের যুদ্ধের সময় পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুমের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। আর এ যুদ্ধটি পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। তাই যে ভাষণটিতে (৭ম রুকূ') তায়াম্মুমের কথা উল্লেখিত হয়েছে সেটি এ সময়ই নাযিল হয়েছিল মনে করতে হবে।

নাযিল হওয়ার কারণ ও আলোচ্য বিষয়

এভাবে সামগ্রিক পর্যায়ে সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়-কাল জানার পর আমাদের সেই যুগের ইতিহাসের ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়া উচিত। এর সাহায্যে সূরার আলোচ্য বিষয় অনুধাবন করা সহজসাধ্য হবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে সে সময় যেসব কাজ ছিল সেগুলোকে তিনটি বড় বড় বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এক, একটি নতুন ইসলামী সমাজ সংগঠনের বিকাশ সাধন। হিজরাতের পরপরই মদীনা তাইয়েবা ও তার আশেপাশের এলাকায় এ সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের পুরাতন পদ্ধতি নির্মূল করে নৈতিকতা, তামাদ্দুন, সমাজরীতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা নতুন নীতি-নিয়ম প্রচলনের কর্মতৎপরতা এগিয়ে চলছিল। দুই, আরবের মুশরিক সম্প্রদায়, ইহুদী গোত্রসমূহ ও মুনাফিকদের সংস্কার বিরোধী শক্তিগুলোর সাথে ইসলামের যে ঘোরতর সংঘাত চলে আসছিল তা জারী রাখা। তিন, এ বিরোধী শক্তিগুলোর সকল বাধা উপেক্ষা করে ইসলামের দাওয়াতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকা এবং এ জন্য আরো নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করে সেখানে ইসলামকে বিজয়ীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। এ সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে যতগুলো ভাষণ অবতীর্ণ হয়, তা সবই এই তিনটি বিভাগের সাথে সম্পর্কিত।

ইসলামের সামাজিক কাঠামো নির্মাণ এবং বাস্তবে এ সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম অবস্থায় যে সমস্ত নির্দেশ ও বিধানের প্রয়োজন ছিল সূরা বাকারায় সেগুলো প্রদান করা হয়েছিল। বর্তমানে এ সমাজ আগের চাইতে বেশী সম্প্রসারিত হয়েছে। কাজেই এখানে আরো নতুন নতুন বিধান ও নির্দেশের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য সূরা নিসার এ ভাষণগুলোতে মুসলমানরা কিভাবে ইসলামী পদ্ধতিতে তাদের সামাজিক জীবনধারার সংশোধন ও সংস্কার সাধন করতে পারে তা আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে পরিবার গঠনের নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। বিয়েকে বিধি-নিষেধের আওতাধীন করা হয়েছে। সমাজে নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সীমা নির্দেশ করা হয়েছে। এতিমদের অধিকার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মীরাস বন্টনের নিয়ম-কানুন নির্ধারিত হয়েছে। অর্থনৈতিক লেনদেন পরিশুদ্ধ করার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ঘরোয়া বিবাদ মিটাবার পদ্ধতি শিখানো হয়েছে। অপরাধ দণ্ডবিধির ভিত গড়ে তোলা হয়েছে। মদপানের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তাহারাত ও পাক-পবিত্রতা অর্জনের বিধান দেয়া হয়েছে। আল্লাহ ও বান্দার সাথে একজন সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষের কর্মধারা কেমন হতে পারে, তা মুসলমানদের জানানো হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে দলীয় সংগঠন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিধান দেয়া হয়েছে। আহলি কিতাবদের নৈতিক, ধর্মীয় মনোভাব ও কর্মনীতি বিশ্লেষণ করে মুসলমানদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন পূর্ববর্তী উম্মতদের পদাংক অনুসরণ করে চলা থেকে বিরত থাকে। মুনাফিকদের কর্মনীতির সমালোচনা করে যথার্থ ও খাঁটি ঈমানদারীর এবং ঈমান ও নিফাকের পার্থক্য সূচক চেহারা পুরোপুরি উন্মুক্ত করে রেখে দেয়া হয়েছে।

ইসলাম বিরোধী শক্তিদের সাথে যে সংঘাত চলছিল ওহোদ যুদ্ধের পর তা আরো নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি করছিল। ওহোদের পরাজয় আশপাশের মুশরিক গোত্রসমূহ, ইহুদী

প্রতিবেশীবৃন্দ ও ঘরের শত্রু বিভীষণ তথা মুনাফিকদের সাহস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। মুসলমানরা সবদিক থেকে বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় মহান আল্লাহ একদিকে আবেগময় ভাষণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে মোকাবিলায় উদ্বুদ্ধ করলেন এবং অন্যদিকে যুদ্ধাবস্থায় কাজ করার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। মদীনায় মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানদার লোকেরা সব রকমের ভীতি ও আশংকার খবর ছড়িয়ে হতাশা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করছিল। এ ধরনের প্রত্যেকটি খবর দায়িত্বশীলদের কাছে পৌছিয়ে দেবার এবং কোন খবর সম্পর্কে পুরোপুরি অনুসন্ধান না করার আগে তা প্রচার করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার নির্দেশ দেয়া হয়।

মুসলমানদের বারবার যুদ্ধে ও নৈশ অভিযানে যেতে হতো। অধিকাংশ সময় তাদের এমন সব পথ অতিক্রম করতে হতো যেখানে পানির চিহ্নমাত্রও পাওয়া যেতো না। সে ক্ষেত্রে পানি না পাওয়া গেলে ওযু ও গোসল দুয়ের জন্য তাদের তায়াম্মুম করার অনুমতি দেয়া হয়। এ ছাড়াও এ অবস্থায় সেখানে নামায সংক্ষেপ করারও অনুমতি দেয়া হয়। আর যেখানে বিপদ মাথার ওপর চেপে থাকে সেখানে সালাতুল খওফ (ভয়কালীন নামায) পড়ার পদ্ধতি শিকিয়ে দেয়া হয়। আরবের বিভিন্ন এলাকায় যেসব মুসলমান কাফের গোত্রগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল এবং অনেক সময় যুদ্ধের কবলেও পড়ে যেতো, তাদের ব্যাপারটি ছিল মুসলমানদের জন্য অনেক বেশী পেরেশানির কারণ। এ ব্যাপারে একদিকে ইসলামী দলকে বিস্তারিত নির্দেশ দেয়া হয় এবং অন্যদিকে ঐ মুসলমানদেরকেও সবদিক থেকে হিজরাত করে দারুল ইসলামে সমবেত হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

ইহুদীদের মধ্যে বিশেষ করে বনী নাযীরের মনোভাব ও কার্যধারা অত্যন্ত বিরোধমূলক ও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। তারা সব রকমের চুক্তির খোলাখুলি বিরুদ্ধাচরণ করে ইসলামের শত্রুদের সাথে সহযোগিতা করতে থাকে এবং মদীনায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিছাতে থাকে। তাদের এসব কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা করা হয় এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাদেরকে সর্বশেষ সতর্কবাণী শুনিয়ে দেয়া হয় এরপরই মদীনা থেকে তাদের বহিষ্কারের কাজটি সমাধা করা হয়।

মুনাফিকদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে। কোন্ ধরনের মুনাফিকদের সাথে কোন্ ধরনের ব্যবহার করা হবে, এ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মুসলমানদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই এদের সবাইকে আলাদা আলাদা শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণীর মুনাফিকদের সাথে কোন্ ধরনের ব্যবহার করতে হবে, তা বলে দেয়া হয়েছে।

চুক্তিবদ্ধ নিরপেক্ষ গোত্রসমূহের সাথে মুসলমানদের কোন ধরনের ব্যবহার করতে হবে, তাও সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে।

মুসলমানদের নিজেদের চরিত্রকে ত্রুটিমুক্ত করাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এ সংঘাত সংঘর্ষে এ ক্ষুদ্র দলটি একমাত্র নিজের উন্নত নৈতিক চরিত্র বলেই জয়লাভ করতে সক্ষম ছিল। এ ছাড়া তার জন্য জয়লাভের আর কোন উপায় ছিল না। তাই

মুসলমানদেরকে উন্নত নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাদের দলের মধ্যে যে কোন দুর্বলতা দেখা দিয়েছে কঠোর ভাষায় তার সমালোচনা করা হয়েছে।

ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের দিকটিও এ সূরায় বাদ যায়নি। জাহেলিয়াতের মোকাবিলায় ইসলাম দুনিয়াকে যে নৈতিক ও তামাদ্দুনিক সংশোধনের দিকে আহবান জানিয়ে আসছিল, তাকে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করার সাথে সাথে এ সূরায় ইহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিক এ তিনটি সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত ধর্মীয় ধারণা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র নীতি ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে তাদের সামনে একমাত্র সত্য দীন ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হয়েছে।

আয়াত ১৭৬ | সূরা আন্ নিসা—মাদানী | রুকূ' ২৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ
تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ① وَاٰتُوا
الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۠ وَلَا تَاْكُلُوْٓا
اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ②

হে মানব জাতি! তোমাদের রবকে ভয় করো। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে। আর সেই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া। তারপর তাদের দু'জনার থেকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী।[১] সেই আল্লাহকে ভয় করো যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদের হক আদায় করে থাকো এবং আত্মীয়তা ও নিকট সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকো। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের ওপর কড়া নজর রেখেছেন।

এতিমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দাও।[২] ভালো সম্পদের সাথে মন্দ সম্পদ বদল করো না।[৩] আর তাদের সম্পদ তোমাদের সম্পদের সাথে মিশিয়ে গ্রাস করো না। এটা মহাপাপ।

১. যেহেতু সামনের দিকের আয়াতগুলোতে মানুষের পারস্পরিক অধিকারের কথা আলোচনা করা হবে, বিশেষ করে পারিবারিক ব্যবস্থাপনাকে উন্নত ও সুগঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন-কানুন বর্ণনা করা হবে, তাই এভাবে ভূমিকা ফাঁদা হয়েছে ঃ একদিকে আল্লাহকে ভয় করার ও তাঁর অসন্তোষ থেকে আত্মরক্ষার জন্য জোর তাকীদ করা হয়েছে এবং অন্যদিকে একথা মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া হয়েছে যে, একজন মানুষ থেকে সমস্ত মানুষের উৎপত্তি এবং রক্ত-মাংস ও শারীরিক উপাদানের দিক দিয়ে তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের অংশ।

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝٣

আর যদি তোমরা এতিমদের (মেয়েদের) সাথে বেইনসাফী করার ব্যাপারে ভয় করো, তাহলে যেসব মেয়েদের তোমরা পছন্দ করো তাদের মধ্য থেকে দুই, তিন বা চারজনকে বিয়ে করো।[৪] কিন্তু যদি তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না বলে আশংকা করো, তাহলে একজনকেই বিয়ে করো।[৫] অথবা তোমাদের অধিকারে সেসব মেয়ে আছে তাদেরকে বিয়ে করো।[৬] বেইনসাফীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এটিই অধিকতর সঠিক পদ্ধতি।

"তোমাদের একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" অর্থাৎ প্রথমে এক ব্যক্তি থেকে মানব জাতির সৃষ্টি করেন। অন্যত্র কুরআন নিজেই এর ব্যাখ্যা করে বলেছে যে, সেই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম। তাঁর থেকেই এ দুনিয়ায় মানব বংশ বিস্তার লাভ করে।

"সেই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া।" এ বিষয়টির বিস্তারিত জ্ঞান আমাদের কাছে নেই। সাধারণভাবে কুরআনের তাফসীরকারগণ যা বর্ণনা করেন এবং বাইবেলে যা বিবৃত হয়েছে তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ আদমের পাঁজর থেকে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তালমুদে আর একটু বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে ঃ ডান দিকের ত্রয়োদশ হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু কুরআন মজীদ এ ব্যাপারে নীরব। আর এর সপক্ষে যে হাদীসটি পেশ করা হয় তার অর্থ লোকেরা যা মনে করে নিয়েছে তা নয়। কাজেই কথাটিকে আল্লাহ যেভাবে সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট রেখেছেন তেমনি রেখে এর বিস্তারিত অবস্থা জানার জন্য সময় নষ্ট না করাই ভালো।

২. অর্থাৎ যতদিন তারা শিশু ও নাবালেগ থাকে ততদিন তাদের ধন-সম্পদ তাদের স্বার্থে ব্যয় করো। আর প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যাবার পর তাদের হক তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও।

৩. একটি ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য। এর একটি অর্থ হচ্ছে, হালালের পরিবর্তে হারাম উপার্জন করো না এবং দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, এতিমদের ভালো সম্পদের সাথে নিজেদের খারাপ সম্পদ বদল করো না।

৪. মুফাস্‌সিরগণ এর তিনটি অর্থ বর্ণনা করেছেন ঃ

এক ঃ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ জাহেলী যুগে যেসব এতিম মেয়ে লোকদের অভিভাবকত্বাধীন থাকতো তাদের সম্পদ ও সৌন্দর্যের কারণে অথবা তাদের ব্যাপারে তো উচ্চবাচ্য করার কেউ নেই, যেভাবে ইচ্ছা তাদের দাবিয়ে রাখা

যাবে—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক অভিভাবক নিজেরাই তাদেরকে বিয়ে করতো, তারপর তাদের ওপর জুলুম করতে থাকতো। এরি পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, তোমরা যদি আশংকা করো যে তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে সমাজে আরো অনেক মেয়ে আছে, তাদের মধ্য থেকে নিজের পছন্দমতো মেয়েদেরকে বিয়ে করো। এ সূরার ১৯ রুকূর প্রথম আয়াতটি এ ব্যাখ্যা সমর্থন করে।

দুই ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর ছাত্র ইকরামা এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ জাহেলী যুগে স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে কোন নির্ধারিত সীমা ছিল না। এক একজন লোক দশ দশটি বিয়ে করতো। স্ত্রীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে সংসার খরচ বেড়ে যেতো। তখন বাধ্য হয়ে তারা নিজেদের এতিম ভাইঝি ও ভাগ্নীদের এবং অন্যান্য অসহায় আত্মীয়াদের অধিকারের দিকে হাত বাড়াতো। এ কারণে আল্লাহ বিয়ের জন্য চারটির সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। জুলুম ও বেইনসাফী থেকে বাঁচার পন্থা এই যে, এক থেকে চারটি পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করবে যাতে তাদের সাথে সুবিচার করতে পার।

তিন ঃ সাঈদ ইবনে জুবাইর, কাতাদাহ এবং অন্যান্য কোন কোন মুফাস্সির বলেন ঃ এতিমদের সাথে বেইনসাফী করাকে জাহেলী যুগের লোকেরাও সুনজরে দেখতো না। কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির কোন ধারণাই তাদের মনে স্থান পায়নি। তারা যতগুলো ইচ্ছা বিয়ে করতো। তারপর তাদের ওপর জুলুম-অত্যাচার চালাতো ইচ্ছে মতো। তাদের এ ব্যবহারের প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, যদি তোমরা এতিমদের ওপর জুলুম ও বেইনসাফী করতে ভয় করে থাকো, তাহলে মেয়েদের সাথেও বেইনসাফী করার ব্যাপারে ভয় করো। প্রথমত চারটির বেশী বিয়েই করো না। আর চারের সংখ্যার মধ্যেও সেই ক'জনকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে যাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে।

আয়াতের শব্দাবলী এমনভাবে গ্রথিত হয়েছে, যার ফলে সেখান থেকে এ তিনটি ব্যাখ্যারই সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকি একই সংগে আয়াতটির এ তিনটি অর্থই যদি এখানে উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলেও আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এ ছাড়া এর আর একটা অর্থও হতে পারে। অর্থাৎ এতিমদের সাথে যদি এভাবে ইনসাফ না করতে পারো তাহলে যেসব মেয়ের সাথে এতিম শিশু সন্তান রয়েছে তাদেরকে বিয়ে করো।

৫. এ আয়াতের ওপরে মুসলিম ফকীহগণের 'ইজ্মা' অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাঁরা বলেন, এ আয়াতের মাধ্যমে স্ত্রীর সংখ্যা সীমিত করে দেয়া হয়েছে এবং একই সংগে এক ব্যক্তির চারজনের বেশী স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ তায়েফ প্রধান গাইলানের ইসলাম গ্রহণ কালে নয়জন স্ত্রী ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে চারজন স্ত্রী রেখে দিয়ে বাকি পাঁচজনকে তালাক দেবার নির্দেশ দেন। এভাবে আর এক ব্যক্তির (নওফল ইবনে মুআবীয়া) ছিল পাঁচজন স্ত্রী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এক স্ত্রীকে তালাক দেবার হুকুম দেন।

এ ছাড়াও এ আয়াতে একাধিক স্ত্রী রাখার বৈধতাকে ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যবহারের শর্ত সাপেক্ষ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠতার শর্ত পূরণ না করে একাধিক স্ত্রী রাখার বৈধতার সুযোগ ব্যবহার করে সে মূলত আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে। যে স্ত্রী

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوْهُ هَنِیْٓـًٔا مَّرِیْٓـًٔا ۝۴ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِیْ جَعَلَ
اللّٰهُ لَكُمْ قِیٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِیْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝۵

আর আনন্দের সাথে (ফরয মনে করে) স্ত্রীদের মোহরানা আদায় করে দাও। তবে যদি তারা নিজেরাই নিজেদের ইচ্ছায় মোহরানার কিছু অংশ মাফ করে দেয়, তাহলে তোমরা সানন্দে তা খেতে পারো।[৭]

আর তোমাদের যে ধন-সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবন ধারণের মাধ্যমে পরিণত করেছেন, তা নির্বোধদের হাতে তুলে দিয়ো না। তবে তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করো এবং সদুপদেশ দাও।[৮]

বা যেসব স্ত্রীর সাথে সে ইনসাফ করে না ইসলামী সরকারের আদালতসমূহ তাদের অভিযোগ শুনে সে ব্যাপারে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

কোন কোন লোক পাশ্চাত্যবাসীদের খৃষ্টবাদী ধ্যান-ধারণার প্রভাবে আড়ষ্ট ও পরাজিত মনোভাব নিয়ে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকে যে, একাধিক বিয়ের পদ্ধতি (যা আসলে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে একটি খারাপ পদ্ধতি) বিলুপ্ত করে দেয়াই কুরআনের আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু সমাজে এ পদ্ধতির খুব বেশী প্রচলনের কারণে এর ওপর কেবলমাত্র বিধি-নিষেধ আরোপ করেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের কথাবার্তা মূলত নিছক মানসিক দাসত্বের ফলশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই নয়। একাধিক স্ত্রী গ্রহণকে মূলগতভাবে অনিষ্টকর মনে করা কোনক্রমেই সঠিক হতে পারে না। কারণ কোন কোন অবস্থায় এটি একটি নৈতিক ও তামাদ্দুনিক প্রয়োজনে পরিণত হয়। যদি এর অনুমতি না থাকে, তাহলে যারা এক স্ত্রীতে তুষ্ট হতে পারে না, তারা বিয়ের সীমানার বাইরে এসে যৌন বিশৃংখলা সৃষ্টিতে তৎপর হবে। এর ফলে সমাজ-সংস্কৃতি-নৈতিকতার মধ্যে যে অনিষ্ট সাধিত হবে তা হবে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনিষ্টকারিতার চাইতে অনেক বেশী। তাই যারা এর প্রয়োজন অনুভব করে কুরআন তাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছে। তবুও যারা মূলগতভাবে একাধিক বিয়েকে একটি অনিষ্টকারিতা মনে করেন, তাদেরকে অবশ্যি এ ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে যে, তারা কুরআনের রায়ের বিরুদ্ধে এ মতবাদের নিন্দা করতে পারেন এবং একে রহিত করারও পরামর্শ দিতে পারেন কিন্তু নিজেদের মনগড়া রায়কে অনর্থক কুরআনের রায় বলে ঘোষণা করার কোন অধিকার তাদের নেই। কারণ কুরআন সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একে বৈধ ঘোষণা করেছে। ইশারা ইংগিতেও এর নিন্দায় এমন একটি শব্দ ব্যবহার করেনি, যা থেকে বুঝা যায় যে, সে এর পথ বন্ধ করতে চায়। (আরো বেশী জানার জন্য আমার "সুন্নাতের আইনগত মর্যাদা" গ্রন্থটি পড়ুন)

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ
يَّكْبَرُوْا ۭ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا
فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۭ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا
عَلَيْهِمْ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ
وَالْاَقْرَبُوْنَ ۠ وَلِلنِّسَاۗءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۭ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۝

আর এতিমদের পরীক্ষা করতে থাকো, যতদিন না তারা বিবাহযোগ্য বয়সে পৌঁছে যায়।[৯] তারপর যদি তোমরা তাদের মধ্যে যোগ্যতার সন্ধান পাও, তাহলে তাদের সম্পদ তাদের হাতে সোপর্দ করে দাও।[১০] তারা বড় হয়ে নিজেদের অধিকার দাবী করবে, এ ভয়ে কখনো ইনসাফের সীমানা অতিক্রম করে তাদের সম্পদ তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। এতিমদের যে অভিভাবক সম্পদশালী হবে সে যেন পরহেজগারী অবলম্বন করে (অর্থাৎ অর্থ গ্রহণ না করে) আর যে গরীব হবে সে যেন প্রচলিত পদ্ধতিতে খায়।[১১] তারপর তাদের সম্পদ যখন তাদের হাতে সোপর্দ করতে যাবে তখন তাতে লোকদেরকে সাক্ষী বানাও। আর হিসেব নেবার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

মা-বাপ ও আত্মীয়-স্বজনরা যে ধন-সম্পত্তি রেখে গেছে তাতে পুরুষদের অংশ রয়েছে। আর মেয়েদেরও অংশ রয়েছে সেই ধন-সম্পত্তিতে, যা মা-বাপ ও আত্মীয়-স্বজনরা রেখে গেছে, তা সামান্য হোক বা বেশী[১২] এবং এ অংশ (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নির্ধারিত।

৬. এখানে ক্রীতদাসী বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেসব নারী যুদ্ধবন্দিনী হিসেবে আসে এবং সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। একথা বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্বাধীন মহিলাকে বিয়ে করার দায়িত্ব পালন করতে না পারলে একজন যুদ্ধবন্দিনী হিসেবে আনীত বাঁদীকে বিয়ে করো। সামনের দিকে চতুর্থ রুকূ'তে একথাই বলা হয়েছে। অথবা যদি তোমাদের একাধিক স্ত্রীর প্রয়োজন হয়ে

পড়ে এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্বাধীন মেয়েদের বিয়ে করলে তাদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা তোমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে থাকে, তাহলে ক্রীতদাসীদেরকে গ্রহণ করো। কারণ তাদের ব্যাপারে তোমাদের ওপর তুলনামূলকভাবে কম দায়িত্ব আসবে। (সামনের দিকে ৪৪ টীকায় ক্রীতদাসীদের বিধান সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

৭. হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও কাযী শুরাইহর ফায়সালা হচ্ছে ঃ যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীকে সম্পূর্ণ মোহরানা বা তার অংশবিশেষ মাফ করে দেয় এবং তারপর আবার তা দাবী করে, তাহলে তা আদায় করার জন্য স্বামীকে বাধ্য করা হবে। কেননা তার দাবী করাই একথা প্রমাণ করে যে, সে নিজের ইচ্ছায় মোহরানার সমুদয় অর্থ বা তার অংশবিশেষ ছাড়তে রাজী নয়। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আমার "স্বামী–স্ত্রীর অধিকার" বইটির 'মোহরানা' অধ্যায়টি পড়ুন)।

৮. এ আয়াতটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে একটি পরিপূর্ণ বিধান দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে ঃ অর্থ জীবন যাপনের একটি মাধ্যম। যে কোন অবস্থায়ই তা এমন ধরনের অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকদের হাতে তুলে দেয়া উচিত নয়, যারা এ অর্থ–সম্পদের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে তামাদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এবং শেষ পর্যন্ত নৈতিক ব্যবস্থাকেও ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। কোন ব্যক্তির নিজের সম্পদের ওপর তার মালিকানা অধিকার থাকে ঠিকই। কিন্তু তা এত বেশী সীমাহীন নয় যে, যদি সে ঐ সমস্ত অধিকার সঠিকভাবে ব্যবহার করার যোগ্যতা না রাখে এবং তার ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহারের কারণে সামাজিক বিপর্যয় দেখা দেয় তারপরও তার কাছ থেকে ঐ অধিকার হরণ করা যাবে না। মানুষের জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা অবশ্যি পূর্ণ হতে হবে। তবে মালিকানা অধিকারের অবাধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যি এ বিধি–নিষেধ আরোপিত হওয়া উচিত যে, এ ব্যবহার নৈতিক ও তামাদ্দুনিক জীবন এবং সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ক্ষতিকর হতে পারবে না। এ বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক সম্পদ–সম্পত্তির মালিককে ক্ষুদ্র পরিসরে এদিকে অবশ্যি নজর রাখতে হবে যে, নিজের সম্পদ সে যার হাতে সোপর্দ করছে সে তা ব্যবহারের যোগ্যতা রাখে কিনা। আর বৃহত্তর পরিসরে এটা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তরভুক্ত হতে হবে যে, যারা নিজেদের সম্পদ ব্যবহারের যোগ্যতা রাখে না অথবা যারা অসৎপথে নিজেদের ধন–সম্পদ ব্যবহার করছে, তাদের ধন–সম্পত্তি সে নিজের পরিচালনাধীনে নিয়ে নেবে এবং তাদের জীবন নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেবে।

৯. অর্থাৎ যখন তারা সাবালক হয়ে যেতে থাকে তখন তাদের বুদ্ধি–জ্ঞান কি পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে তা দেখতে হবে এবং তারা নিজেদের বিষয়াদি আপন দায়িত্বে পরিচালনা করার যোগ্যতা কতটুকু অর্জন করেছে সে দিকেও তীক্ষ্ণ পর্যালোচনার দৃষ্টিতে নজর রাখতে হবে।

১০. ধন–সম্পদ তাদের হাতে সোপর্দ করার জন্য দু'টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে, সাবালকত্ব আর দ্বিতীয়টি যোগ্যতা, অর্থাৎ অর্থ–সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করার যোগ্যতা। প্রথম শর্তটির ব্যাপারে উম্মতের ফকীহগণ একমত। দ্বিতীয় শর্তটির ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির মত হচ্ছে এই যে, সাবালক হবার পরও যদি এতিমের মধ্যে 'যোগ্যতা' না পাওয়া যায়, তাহলে তার অভিভাবককে সর্বাধিক

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم
مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ
خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا
سَدِيدًا ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ
فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

ধন-সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারার সময় আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও মিসকিনরা এলে তাদেরকেও ঐ সম্পদ থেকে কিছু দিয়ে দাও এবং তাদের সাথে ভালোভাবে কথা বলো।[১৩]

লোকদের একথা মনে করে ভয় করা উচিত, যদি তারা অসহায় সন্তান পিছনে ছেড়ে রেখে যেতো, তাহলে মরার সময় নিজেদের সন্তানদের ব্যাপারে তাদের কতই না আশংকা হতো। কাজেই তাদের আল্লাহকে ভয় করা ও ন্যায়সংগত কথা বলা উচিত। যারা এতিমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা আগুন দিয়ে নিজেদের পেট পূর্ণ করে এবং তাদেরকে অবশ্যি জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দেয়া হবে।[১৪]

আরো সাত বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তারপর 'যোগ্যতা' পাওয়া যাক বা না যাক সর্বাবস্থায় এতিমকে তার ধন-সম্পদের দায়িত্ব দিয়ে দিতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম শাফেঈ রাহেমাহুমুল্লাহর মতে ধন-সম্পদ এতিমের হাতে সোপর্দ করার জন্য অবশ্যি 'যোগ্যতা' একটি অপরিহার্য শর্ত। সম্ভবত এঁদের মতে এ ব্যাপারে শরীয়াতের বিষয়সমূহের ফায়সালাকারী কাযীর শরণাপন্ন হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। যদি কাযীর সামনে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সংশ্লিষ্ট এতিমের মধ্যে যোগ্যতা পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে তার বিষয় সম্পত্তি দেখাশুনার জন্য তিনি নিজেই কোন ভালো ব্যবস্থা করবেন।

১১. অর্থাৎ সম্পত্তি দেখাশুনার বিনিময়ে নিজের পারিশ্রমিক ঠিক ততটুকু পরিমাণ গ্রহণ করতে পারে যতটুকু গ্রহণ করাকে একজন নিরপেক্ষ ও সুবিবেচক ব্যক্তি সংগত বলে মনে করতে পারে। তাছাড়া নিজের পারিশ্রমিক হিসেবে সে যতটুকু গ্রহণ করবে, তা গোপনে গ্রহণ করবে না বরং প্রকাশ্যে নির্ধারিত করে গ্রহণ করবে এবং তার হিসেব রাখবে।

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ
كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا
تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا
أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ
فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

২ রুকূ'

তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

পুরুষদের অংশ দু'জন মেয়ের সমান।[১৫] যদি (মৃতের ওয়ারিস) দু'য়ের বেশী মেয়ে হয়, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ তাদের দাও।[১৬]

আর যদি একটি মেয়ে ওয়ারিশ হয়, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক তার।

যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে, তাহলে তার বাপ-মা প্রত্যেকে সম্পত্তির ছয় ভাগের একভাগ পাবে।[১৭]

আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং বাপ-মা তার ওয়ারিস হয়, তাহলে মাকে তিন ভাগের একভাগ দিতে হবে।[১৮]

যদি মৃতের ভাই-বোনও থাকে, তাহলে মা ছয় ভাগের একভাগ পাবে।[১৯]

(এ সমস্ত অংশ বের করতে হবে) মৃত ব্যক্তি যে অসিয়ত করে গেছে তা পূর্ণ করার এবং সে যে ঋণ রেখে গেছে তা আদায় করার পর।[২০]

তোমরা জানো না তোমাদের বাপ-মা ও তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উপকারের দিক দিয়ে কে তোমাদের বেশী নিকটবর্তী। এসব অংশ আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ অবশ্যি সকল সত্য জানেন এবং সকল কল্যাণময় ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন।[২১]

১২. আয়াতে সুস্পষ্টভাবে পাঁচটি আইনগত নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক, মীরাস কেবল পুরুষদের নয়, মেয়েদেরও অধিকার। দুই, যত কমই হোক না কেন মীরাস অবশ্যি বন্টিত হতে হবে। এমন কি মৃত ব্যক্তি যদি এক গজ কাপড় রেখে গিয়ে থাকে এবং তার দশজন ওয়ারিস থাকে, তাহলেও তা ওয়ারিসদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। একজন ওয়ারিস অন্যজনের থেকে যদি তার অংশ কিনে নেয় তাহলে তা আলাদা কথা। তিন, এ আয়াত থেকে একথাও সুস্পষ্ট হয়েছে যে, মীরাসের বিধান স্থাবর-অস্থাবর, কৃষি-শিল্প বা অন্য যে কোন ধরনের সম্পত্তি হোক না কেন সব ক্ষেত্রে জারী হবে। চার, এ থেকে জানা যায় যে, মীরাসের অধিকার তখনই সৃষ্টি হয় যখন মৃত ব্যক্তি কোন সম্পদ রেখে মারা যায়। পাঁচ, এ থেকে এ বিধানও নির্দিষ্ট হয় যে, নিকটতম আত্মীয়ের উপস্থিতিতে দূরতম আত্মীয় মীরাস লাভ করবে না।

১৩. এখানে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ মীরাস বন্টনের সময় নিকট ও দূরের আত্মীয়রা, নিজের গোত্রের ও পরিবারের গরীব মিসকিন লোকেরা এবং এতিম ছেলেমেয়ে যারা সেখানে উপস্থিত থাকে, তাদের সাথে হৃদয়হীন ব্যবহার করে না। শরীয়াতের বিধান মতে মীরাসে তাদের অংশ নেই ঠিকই কিন্তু একটু ঔদার্যের পরিচয় দিয়ে পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তাদেরকেও কিছু দিয়ে দাও। সাধারণভাবে এহেন অবস্থায় সংকীর্ণমনা লোকেরা যে ধরনের হৃদয়বিদারক আচরণ করে ও নির্মম কথাবার্তা বলে, তাদের সাথে তেমনটি করো না।

১৪. হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ওহোদ যুদ্ধের পর হযরত সা'দ ইবনে রুবী'র স্ত্রী তাঁর দু'টি শিশু সন্তানকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হন। তিনি বলেন, "হে আল্লাহর রসূল। এরা সা'দের মেয়ে। এদের বাপ আপনার সাথে ওহোদের যুদ্ধে গিয়ে শহীদ হয়ে গেছেন। এদের চাচা তার সমস্ত সম্পত্তি নিজের আয়ত্বাধীন করে নিয়েছে। এদের জন্য একটি দানাও রাখেনি। এখন বলুন, কে এ (সহায় সম্পত্তিহীনা) মেয়েদেরকে বিয়ে করবে?" তার এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়।

১৫. মীরাসের ব্যাপারে এটি প্রথম ও প্রধান মৌলিক বিধান যে, পুরুষদের অংশ হবে মেয়েদের দ্বিগুণ। যেহেতু পারিবারিক জীবন ক্ষেত্রে শরীয়াত পুরুষদের ওপর অর্থনৈতিক দায়িত্বের বোঝা বেশী করে চাপিয়ে দিয়েছে এবং অনেকগুলো অর্থনৈতিক দায়িত্ব থেকে মেয়েদেরকে মুক্তি দিয়েছে, তাই মীরাসের ব্যাপারে মেয়েদের অংশ পুরুষদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম রাখা হবে, এটিই ছিল ইনসাফের দাবী।

১৬. দু'টি মেয়ের ব্যাপারেও এই একই বিধান কার্যকর। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির যদি কোন পুত্রসন্তান না থাকে এবং সবগুলোই থাকে কন্যা সন্তান, কন্যাদের সংখ্যা দুই বা দু'য়ের বেশী হোক না কেন, তারা সমগ্র পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ পাবে। অবশিষ্ট তিনভাগের একভাগ অন্যান্য ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে। কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তির শুধুমাত্র একটি পুত্র থাকে, তাহলে এ ব্যাপারে ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে অর্থাৎ ফিকাহবিদগণ সবাই এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, অন্যান্য ওয়ারিসদের অনুপস্থিতিতে সে-ই সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হবে। আর যদি অন্যান্য ওয়ারিসরাও থাকে, তাহলে তাদের অংশ দিয়ে দেবার পর বাকি সমস্ত সম্পত্তিই সে পাবে।

১৭. অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার বাপ-মা প্রত্যেকে ছয়ভাগের একভাগ পাবে। আর সন্তান যদি সবগুলোই হয় কন্যা বা সবগুলোই পুত্র অথবা পুত্র কন্যা উভয়ই হয় বা একটি পুত্র অথবা একটি কন্যা হয়, তাহলে বাকি তিনভাগের দু'ভাগে এ ওয়ারিসরা শরীক হবে।

১৮. বাপ-মা ছাড়া যদি আর কেউ ওয়ারিস না থাকে তাহলে বাকি তিনভাগের দু'ভাগ বাপ পাবে। অন্যথায় তিনভাগের দু'ভাগে বাপ ও অন্যান্য ওয়ারিসরা শরীক হবে।

১৯. ভাই-বোন থাকলে মায়ের অংশ তিনভাগের এক ভাগের পরিবর্তে ছয় ভাগের একভাগ করে দেয়া হয়েছে। এভাবে মায়ের অংশ থেকে যে ছয় ভাগের এক ভাগ বের করে নেয়া হয়েছে তা বাপের অংশে দেয়া হবে। কেননা এ অবস্থায় বাপের দায়িত্ব বেড়ে যায়। মনে রাখতে হবে, মৃতের বাপ-মা জীবিত থাকলে তার ভাই-বোনরা কোন অংশ পাবে না।

২০. অসিয়তের বিষয়টি ঋণের আগে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ঋণ রেখে মারা যাওয়া কোন জরুরী বিষয় নয়। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত করা তার জন্য একান্ত জরুরী। তবে বিধানের গুরুত্বের দিক দিয়ে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, ঋণের স্থান অসিয়তের চাইতে অগ্রবর্তী। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি ঋণ রেখে মারা যায়, তাহলে সর্বপ্রথম তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তা আদায় করা হবে, তারপর অসিয়ত পূর্ণ করা হবে এবং সবশেষে মীরাস বন্টন করা হবে। অসিয়ত সম্পর্কে সূরা বাকারার ১৮২ টীকায় আমি বলেছি, কোন ব্যক্তি তার সমগ্র সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত অসিয়ত করতে পারে। অসিয়তের এই নিয়ম প্রবর্তনের কারণ হচ্ছে এই যে, মীরাসী আইনের মাধ্যমে যেসব আত্মীয়-স্বজন পরিত্যক্ত সম্পত্তির কোন অংশ পায় না, এখান থেকে তাদের যাকে যে পরিমাণ সাহায্য দেবার প্রয়োজন উপলব্ধি করা হয়, তা নির্ধারণ করা যেতে পারে। যেমন কোন এতিম নাতি বা নাতনী রয়েছে। মৃত পুত্রের কোন বিধবা স্ত্রী কষ্টে জীবন যাপন করছে। অথবা কোন ভাই, বোন, ভাবী, ভাই-পো, ভাগিনেয় বা কোন আত্মীয় সাহায্য-সহায়তা লাভের মুখাপেক্ষী। এ ক্ষেত্রে অসিয়তের মাধ্যমে তাদের জন্য অংশ সংরক্ষণ করা যেতে পারে। আর যদি আত্মীয়দের মধ্যে এমন কেউ না থাকে, তাহলে অন্য হকদারদের জন্য বা কোন জনকল্যাণমূলক কাজে সম্পত্তির অংশ অসিয়ত করা যেতে পারে। সারকথা হচ্ছে এই যে, সম্পদ-সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ বা তার চাইতে কিছু বেশী অংশের ওপর ইসলামী শরীয়াত মীরাসের আইন বলবৎ করেছে। শরীয়াতের মনোনীত ওয়ারিসদের মধ্যে তা বন্টন করা হবে। আর তিন ভাগের এক ভাগ বা তার চেয়ে কিছু কম অংশের বন্টনের দায়িত্বভার নিজের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। নিজের বিশেষ পারিবারিক অবস্থার প্রেক্ষিতে (যা বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়ে থাকে) সে যেভাবে সংগত মনে করবে বন্টন করার জন্য অসিয়ত করে যাবে। তারপর কোন ব্যক্তি যদি তার অসিয়তে জুলুম করে অথবা অন্য কথায় নিজের ইখতিয়ারকে এমন ত্রুটিপূর্ণভাবে ব্যবহার করে যার ফলে কারো বৈধ অধিকার প্রভাবিত হয়, তাহলে এর মীমাংসার দায়িত্ব পরিবারের লোকদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। তারা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে এ ত্রুটি সংশোধন করে নেবে অথবা ইসলামী আদালতের কাযীর কাছে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার আবেদন জানাবে এবং তিনি অসিয়তের ত্রুটি দূর করে দেবেন।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ
وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

তোমাদের স্ত্রীরা যদি নিঃসন্তান হয়, তাহলে তারা যা কিছু ছেড়ে যায় তার অর্ধেক তোমরা পাবে। অন্যথায় তাদের সন্তান থাকলে যে অসিয়ত তারা করে গেছে তা পূর্ণ করার এবং যে ঋণ তারা রেখে গেছে তা আদায় করার পর পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের একভাগ তোমাদের। আর তোমাদের সন্তান না থাকলে তারা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ পাবে। অন্যথায় তোমাদের সন্তান থাকলে তোমাদের অসিয়ত পূর্ণ করার ও তোমাদের রেখে যাওয়া ঋণ আদায় করার পর তারা সম্পত্তির আট ভাগের একভাগ পাবে।[২২]

আর যদি পুরুষ বা স্ত্রীলোকের (যার মীরাস বন্টন হবে) সন্তান না থাকে এবং বাপ-মাও জীবিত না থাকে কিন্তু এক ভাই বা এক বোন থাকে, তাহলে ভাই ও বোন প্রত্যেকেই ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। তবে ভাই-বোন একজনের বেশী হলে সমগ্র পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের একভাগে তারা সবাই শরীক হবে,[২৩] যে অসিয়ত করা হয়েছে তা পূর্ণ করার এবং যে ঋণ মৃত ব্যক্তি রেখে গেছে তা আদায় করার পর যদি তা ক্ষতিকর না হয়।[২৪] এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ, আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ও সহিষ্ণু।[২৫]

২১. মীরাসে আল্লাহ প্রদত্ত আইনের গভীর তত্ত্ব উপলব্ধি করতে যারা সক্ষম নয়, এ ব্যাপারে যাদের জ্ঞান অজ্ঞতার পর্যায়ভুক্ত এবং যারা নিজেদের অপরিপক্ক বুদ্ধির সাহায্যে

(তাদের জ্ঞান অনুযায়ী) আল্লাহর এ আইনের ত্রুটি দূর করতে চায়, তাদেরকে এ জবাব দেয়া হয়েছে।

২২. অর্থাৎ একজন স্ত্রী হোক বা একাধিক তাদের যদি সন্তান থাকে তাহলে তারা আট ভাগের একভাগ এবং সন্তান না থাকলে চার ভাগের এক ভাগ পাবে। আর এ চার ভাগের এক ভাগ বা আট ভাগের এক ভাগ সকল স্ত্রীর মধ্যে সমানভাবে বন্টিত হবে।

২৩. অবশিষ্ট ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ বা তিন ভাগের দু'ভাগ থেকে অন্য কোন ওয়ারিস থাকলে তার অংশ পাবে। অন্যথায় অবশিষ্ট ঐ সমস্ত সম্পত্তি ঐ ব্যক্তি অসিয়ত করতে পারবে।

এ আয়াতের ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের 'ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে যে, এখানে মা-শরীক ভাই-বোনের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ মৃতের সাথে তার আত্মীয়তা কেবলমাত্র মায়ের দিক থেকে এবং তাদের বাপ আলাদা। আর সহোদর এবং বৈমাত্রের ভাই-বোনের ব্যাপারে, মৃতের সাথে বাপের দিক থেকে যাদের আত্মীয়তা, তাদের সম্পর্কিত বিধান এ সূরার শেষের দিকে বিবৃত হয়েছে।

২৪. অসিয়ত যদি এমনভাবে করা হয় যে, তার মাধ্যমে হকদার আত্মীয়দের হক নষ্ট হয়, তাহলে এ ধরনের অসিয়ত হয় ক্ষতিকর। আর নিছক হকদারদেরকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি যখন অনর্থক নিজের ওপর এমন কোন ঋণের স্বীকৃতি দেয়, যা সে প্রকৃতপক্ষে নেয়নি, অথবা হকদারকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে এমনি কোন কূটচাল চালে, সে ক্ষেত্রে এ ধরনের ঋণও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের ক্ষতিকারক বিষয়কে কবীরা গোনাহ গণ্য করা হয়েছে। তাই হাদীসে বলা হয়েছে, অসিয়তের ক্ষেত্রে অন্যকে ক্ষতি করার প্রবণতা বড় গোনাহের অন্তরভুক্ত। অন্য একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষ তার সারা জীবন জান্নাতবাসীদের মতো কাজ করতে থাকে কিন্তু মরার সময় অসিয়তের ক্ষেত্রে অন্যের ক্ষতি করার ব্যবস্থা করে নিজের জীবনের আমলনামাকে এমন কাজের মাধ্যমে শেষ করে যায়, যা তাকে জাহান্নামের অধিকারী করে দেয়। এ ক্ষতি করার প্রবণতা ও অন্যের অধিকার হরণ যদিও সর্বাবস্থায় গোনাহ তবুও 'কালালাহ'-এর (যে নিসন্তান ব্যক্তির বাপ-মাও জীবিত নেই) ব্যাপারে মহান আল্লাহ বিশেষ করে এর উল্লেখ এ জন্য করেছেন যে, যে ব্যক্তির সন্তানাদি নেই আবার বাপ-মাও জীবিত নেই, তার মধ্যে সাধারণত নিজের সম্পদ-সম্পত্তি নষ্ট করার প্রবণতা কোন না কোনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং সে দূরবর্তী আত্মীয়দেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা চালায়।

২৫. আল্লাহর জ্ঞানের কথা উচ্চারণ করার পেছনে এখানে দু'টি কারণ রয়েছে। এক, যদি এ আইন ও বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় তাহলে মানুষ আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না। দুই, আল্লাহ যে অংশ যেভাবে নির্ধারণ করেছেন তা একেবারেই নির্ভুল। কারণ যে বিষয়ে মানুষের কল্যাণ ও সুবিধা তা মানুষের চেয়ে আল্লাহ ভালো জানেন। এই সংগে আল্লাহর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা গুণের কথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, এ আইন প্রবর্তনের ব্যাপারে আল্লাহ কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। বরং তিনি এমন নীতি-নিয়ম প্রবর্তন করেছেন যা মেনে চলা মানুষের জন্য অত্যন্ত সহজ এবং এর ফলে মানুষ কোন কষ্ট, অভাব ও সংকীর্ণতার মুখোমুখি হবে না।

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن
يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا
وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

এগুলো আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, তাকে আল্লাহ এমন বাগীচায় প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানি করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করে যাবে, তাকে আল্লাহ আগুনে ফেলে দেবেন। সেখানে সে থাকবে চিরকাল, আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা ও অপমানজনক শাস্তি।[২৫ক]

২৫ ক. যারা আল্লাহ রচিত মীরাস আইন পরিবর্তন করে অথবা আল্লাহ তাঁর কিতাবে অন্যান্য যে সমস্ত আইনগত সুস্পষ্ট সীমা নির্ধারণ করেছেন সেগুলো ভেঙে ফেলে, তাদের জন্য এ আয়াতে চিরন্তন আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে। এ দিক দিয়ে এটি একটি অত্যন্ত ভীতি সৃষ্টিকারী আয়াত। কিন্তু বড়ই আফসোসের সাথে বলতে হয়, এমন মারাত্মক ভীতি প্রদর্শন করার পরও মুসলমানরা পুরোপুরি ইহুদীদের কায়দায় নির্লজ্জভাবে আল্লাহর আইনে পরিবর্তন সাধন করেছে এবং তার সীমারেখা ভেঙে ফেলার দুঃসাহস দেখিয়েছে। এ মীরাস আইনের ব্যাপারে যে নাফরমানি করা হয়েছে তা আল্লাহর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিদ্রোহের শামিল। কোথাও মেয়েদেরকে স্থায়ীভাবে মীরাস থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কোথাও কেবলমাত্র বড় ছেলেকে মীরাসের হকদার গণ্য করা হয়েছে। কোথাও কুরআন নির্ধারিত মীরাস বন্টন পদ্ধতি পুরোপুরি পরিহার করে "যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি" (Joint family System) হিসেবে একে ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও মেয়েদের ও পুরুষদের অংশ সমান করে দেয়া হয়েছে। আর বর্তমানে এসব পুরাতন বিদ্রোহের সাথে নতুন আর একটা বিদ্রোহ যোগ হয়েছে। সেটি হচ্ছে, মুসলিম রাষ্ট্রে পাশ্চাত্যবাসীদের অনুকরণে মৃত্যুকর (Death Duty) প্রবর্তন করা হচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে, রাষ্ট্র এবং সরকারও মৃতের একজন ওয়ারিস। তার অংশ নির্ধারণ করতে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ ভুলে গিয়েছিলেন। অথচ ইসলামী নীতির ভিত্তিতে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি সরকারের হাতে পৌঁছার একটাই মাত্র পথ। আর তা হচ্ছে, মৃতের যদি কোন নিকটতম বা দূরতম আত্মীয় না থাকে, তাহলে তার যাবতীয় পরিত্যক্ত সম্পত্তি Unclaimed Properties-এর মতো রাষ্ট্রের বাইতুলমালে দাখিল হয়ে যাবে। অথবা মৃত ব্যক্তি তার সম্পত্তির একটা অংশ সরকারের নামে অসিয়ত করে গেলে সরকার তা পেতে পারে।

وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً
مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ
اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ
فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿١٦﴾

রুকূ' ৩

তোমাদের নারীদের মধ্য থেকে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী নিয়ে এসো। আর চার জন সাক্ষ্য দিয়ে যাবার পর তাদেরকে (নারীদের) গৃহে আবদ্ধ করে রাখো, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু এসে যায় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য কোন পথ বের করে দেন। আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা (দু'জন) এতে লিপ্ত হবে তাদেরকে শাস্তি দাও। তারপর যদি তারা তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দাও। কেননা আল্লাহ বড়ই তাওবা কবুলকারী ও অনুগ্রহশীল।[২৬]

২৬. এ দু'টি আয়াতে যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম আয়াতটি শুধুমাত্র যিনাকারী মহিলা সম্পর্কিত। সেখানে তার শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাকে দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত বন্দী করে রাখো। দ্বিতীয় আয়াতটিতে যিনাকারী পুরুষ ও যিনাকারী মহিলা উভয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাদের উভয়কে কষ্ট দাও। অর্থাৎ উভয়কে মারধর করো, কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা ও নিন্দা করো এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করো। যিনা সম্পর্কে এটা ছিল প্রাথমিক বিধান। পরবর্তী পর্যায়ে সূরা নূরের আয়াত নাযিল হয়। সেখানে পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য একই নির্দেশ দেয়া হয়। বলা হয়, তাদেরকে একশো করে বেত্রাঘাত করো। সে সময় পর্যন্ত আরববাসীরা যেহেতু কোন নিয়মিত সরকারের অধীনে থাকতে এবং আদালতী আইনের আনুগত্য করতে অভ্যস্ত ছিল না, তাই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই একটি অপরাধ দণ্ডবিধি তৈরী করে তখনই সেখানে তার প্রবর্তন করা কোনক্রমেই বুদ্ধিমানের কাজ হতো না। মহান আল্লাহ তাদেরকে ধীরে ধীরে অপরাধ দণ্ডবিধিতে অভ্যস্ত করার জন্য প্রথমে যিনা সম্পর্কিত এ শাস্তি নির্ধারণ করেন। তারপর পর্যায়ক্রমে যিনা, যিনার অপবাদ ও চুরির শাস্তি নির্ধারণ করেন। অবশেষে এরি ভিত্তিতে দণ্ডবিধি সম্পর্কিত বিস্তারিত আইন প্রণীত হয় এবং তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে সমগ্র ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবর্তিত ছিল।

এ আয়াত দু'টির বাহ্যিক পার্থক্য কুরআনের প্রখ্যাত তাফসীরকার সুদ্দীকে বিভ্রান্ত করেছে। তিনি মনে করেছেন, প্রথম আয়াতটি নাযিল হয়েছে বিবাহিত মহিলাদের জন্য

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ
مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾
وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ
أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ
وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾

তবে একথা জেনে রাখো, আল্লাহর কাছে তাওবা কবুল হবার অধিকার এক মাত্র তারাই লাভ করে যারা অজ্ঞতার কারণে কোন খারাপ কাজ করে বসে এবং তারপর অতি দ্রুত তাওবা করে। এ ধরনের লোকদের প্রতি আল্লাহ আবার তাঁর অনুগ্রহের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং আল্লাহ সমস্ত বিষয়ের খবর রাখেন, তিনি জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ। কিন্তু তাওবা তাদের জন্য নয়, যারা খারাপ কাজ করে যেতেই থাকে, এমন কি তাদের কারো মৃত্যুর সময় এসে গেলে সে বলে, এখন আমি তাওবা করলাম। অনুরূপভাবে তাওবা তাদের জন্যও নয় যারা মৃত্যুর সময় পর্যন্ত কাফের থাকে। এমন সব লোকদের জন্য তো আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি।[২৭]

এবং দ্বিতীয় আয়াতটি অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলাদের জন্য। কিন্তু এটি একটি দুর্বল ব্যাখ্যা। এর সমর্থনে কোন শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ নেই। আর এর চাইতেও দুর্বল কথা লিখেছেন আবু মুসলিম ইসফাহানী। তিনি লিখেছেন, প্রথম আয়াতটি নারীর সাথে নারীর অবৈধ সম্পর্ক এবং দ্বিতীয় আয়াতটি পুরুষের সাথে পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক প্রসংগে নাযিল হয়েছে। বিস্ময়ের ব্যাপার, আবু মুসলিমের ন্যায় জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তির দৃষ্টি কেমন করে এ সত্যটি অনুধাবন করতে অক্ষম হলো যে, কুরআন মানব জীবনের জন্য আইন ও নৈতিকতার রাজপথ তৈরী করে। কুরআন কেবলমাত্র সেই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করে যেগুলো রাজপথে সংগঠিত হয়। গলিপথ ও পায়ে চলার সরু পথের দিকে দৃষ্টি দেয়া এবং সেখানে যেসব ছোটখাট ও খুঁটিনাটি সমস্যা সৃষ্টি হয় সেগুলো সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো মোটেই শাহী কালামের উপযোগী নয়। কুরআন এ ধরনের বিষয় ও সমস্যাগুলোকে ছেড়ে দিয়েছে ইজতিহাদের ওপর। ইজতিহাদের মাধ্যমে এগুলোর সমাধান নির্ণয় করতে হবে। এ কারণেই দেখা যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর যখন এ প্রশ্ন দেখা দিল যে পুরুষে পুরুষে অবৈধ সম্পর্কের জন্য কি শাস্তি দেয়া যায়, তখন সাহাবীগণের মধ্য থেকে একজনও সূরা নিসার এ আয়াতটির মধ্যে এর বিধান রয়েছে বলে মনে করেননি।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ
بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য জোরপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসা মোটেই হালাল নয়।[২৮] আর তোমরা যে মোহরানা তাদেরকে দিয়েছো তার কিছু অংশ তাদেরকে কষ্ট দিয়ে আত্মসাৎ করাও তোমাদের জন্য হালাল নয়। তবে তারা যদি কোন সুস্পষ্ট চরত্রহীনতার কাজে লিপ্ত হয় (তাহলে অবশ্যি তোমরা তাদেরকে কষ্ট দেবার অধিকারী হবে)[২৯] তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো। যদি তারা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় হয়, তাহলে হতে পারে একটা জিনিস তোমরা পছন্দ করো না কিন্তু আল্লাহ তার মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।[৩০]

২৭. তাওবার অর্থ হচ্ছে ফিরে আসা। গোনাহ করার পর বান্দার আল্লাহর কাছে তাওবা করার অর্থ হচ্ছে এই যে, যে দাসটি তার প্রভুর নাফরমান ও অবাধ্য হয়ে প্রভুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সে এখন নিজের কার্যকলাপে অনুতপ্ত। সে প্রভুর আনুগত্য করার ও তাঁর হুকুম মেনে চলার জন্য ফিরে এসেছে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার দিকে তাওবা করার মানে হচ্ছে এই যে, দাসের ওপর থেকে প্রভুর যে অনুগ্রহ দৃষ্টি সরে গিয়েছিল তা আবার নতুন করে তার প্রতি নিবদ্ধ হয়েছে। মহান আল্লাহ এ আয়াতে বলেন, আমার এখানে ক্ষমার দরজা একমাত্র সেইসব বান্দার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে, যারা ইচ্ছা করে নয় বরং অজ্ঞতার কারণে ভুল করে বসে এবং চোখের ওপর থেকে অজ্ঞতার পর্দা সরে গেলে লজ্জিত হয়ে নিজের ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়। এহেন বান্দা তার ভুল বুঝতে পেরে যখনই প্রভু মহান রব্বুল আলামীনের দিকে ফিরে আসবে তখনই নিজের জন্য তাঁর দরজা উন্মুক্ত দেখতে পাবে ঃ

این درگہ ما درگہ نومیدی نیست
صد بار اگر توبہ شکستی بازآ

"আমার এ দরবারে আশাভংগ হয় না কারো
শতবার ভেঙেছো তাওবা, তবু তুমি ফিরে এসো।"

কিন্তু যারা আল্লাহকে ভয় না করে সারা জীবন বেপরোয়াভাবে গোনাহ করতে থাকে তারপর ঠিক যখন মৃত্যুর ফেরেশতা সামনে এসে দাঁড়ায় তখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা

চাইতে থাকে, তাদের জন্য কোন তাওবা নেই, তাদের গোনাহের কোন ক্ষমা নেই। এ বিষয়টিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْ غَرْ

"আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবুল করতে থাকেন যতক্ষণ মৃত্যুর আলামত দেখা না দেয়।" কারণ পরীক্ষার সময় উত্তীর্ণ হবার এবং জীবন গ্রন্থের সব পাতা শেষ হয়ে যাবার পর এখন আর ফিরে আসার সুযোগটাই বা কোথায়? এভাবে কোন ব্যক্তি যখন কুফরীর অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় এবং পরবর্তী জীবনের সীমানায় প্রবেশ করে নিজের চোখেই সবকিছু প্রত্যক্ষ করে, দুনিয়ায় সে যাকিছু ভেবে এসেছিল এখন দেখছে আসল ব্যাপার তার সম্পূর্ণ বিপরীত, তখন তার ক্ষমা চাওয়ার কোন সুযোগই তো আর থাকে না।

২৮. এর অর্থ হচ্ছে, স্বামীর মৃত্যুর পর তার পরিবারের লোকেরা তার বিধবাকে মীরাসী সম্পত্তি মনে করে তার অভিভাবক ও ওয়ারিস হয়ে না বসে। স্বামী মরে গেলে স্ত্রী ইদ্দত পালন করার পর স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা যেতে এবং যাকে ইচ্ছা বিয়ে করতে পারে।

২৯. তাদের চরিত্রহীনতার শাস্তি দেবার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, তাদের সম্পদ লুট করে খাবার জন্য নয়।

৩০. অর্থাৎ স্ত্রী যদি সুন্দরী না হয় অথবা তার মধ্যে এমন কোন ত্রুটি থাকে যে জন্য স্বামী তাকে অপছন্দ করে তাহলে এ ক্ষেত্রে স্বামীর তৎক্ষণাৎ হতাশ হয়ে তাকে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হওয়া উচিত নয়। যতদূর সম্ভব তাকে অবশ্যি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, স্ত্রী সুন্দরী হয় না ঠিকই কিন্তু তার মধ্যে অন্যান্য এমন কিছু গুণাবলী থাকে, যা দাম্পত্য জীবনে সুন্দর মুখের চাইতে অনেক বেশী গুরুত্ব লাভ করে। যদি সে তার এই গুণাবলী প্রকাশের সুযোগ পায়, তা হলে তার স্বামী রত্নটি যিনি প্রথম দিকে শুধুমাত্র স্ত্রীর অসুন্দর মুখশ্রী দেখে হতাশ হয়ে পড়ছিলেন, এখন দেখা যাবে তার চরিত্র মাধুর্যে তার প্রেমে আত্মহারা হয়ে পড়ছেন। এমনিভাবে অনেক সময় দাম্পত্য জীবনের শুরুতে স্ত্রীর কোন কোন কথা ও আচরণ স্বামীর কাছে বিরক্তিকর ঠেকে এবং এ জন্য স্ত্রীর ব্যাপারে তার মন ভেঙে পড়ে। কিন্তু সে ধৈর্য ধারণ করলে এবং স্ত্রীকে তার সম্ভাব্য সকল যোগ্যতার বাস্তবায়নের সুযোগ দিলে সে নিজেই অনুধাবন করতে পারে যে, তার স্ত্রীর মধ্যে দোষের তুলনায় গুণ অনেক বেশী। কাজেই দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা মোটেই পছন্দনীয় নয়। তালাক হচ্ছে সর্বশেষ উপায়। একান্ত অপরিহার্য ও অনিবার্য অবস্থায়ই এর ব্যবহার হওয়া উচিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ اَبْغَضُ الْحَلاَلِ اِلَى اللّٰهِ الطَّلاَقُ

অর্থাৎ তালাক জায়েয হলেও দুনিয়ার সমস্ত জায়েয কাজের মধ্যে এটি আল্লাহর কাছে সবচাইতে অপছন্দনীয়।

অন্য একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ إِحْدٰىهُنَّ
قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضٰى بَعْضُكُمْ إِلٰى بَعْضٍ وَّأَخَذْنَ مِنْكُمْ
مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ۚ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর জায়গায় অন্য স্ত্রী আনার সংকল্প করেই থাকো, তাহলে তোমরা তাকে স্তূপীকৃত সম্পদ দিয়ে থাকলেও তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিয়ো না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ও সুস্পষ্ট জুলুম করে তা ফিরিয়ে নেবে? আর তোমরা তা নেবেই বা কেমন করে যখন তোমরা পরস্পরের স্বাদ গ্রহণ করেছো এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে পাকাপোক্ত অঙ্গীকার নিয়েছে।[৩১]

আর তোমাদের পিতা যেসব স্ত্রীলোককে বিয়ে করেছে, তাদেরকে কোনক্রমেই বিয়ে করো না। তবে আগে যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে।[৩২] *আসলে এটা একটা নির্লজ্জতাপ্রসূত কাজ, অপছন্দনীয় ও নিকৃষ্ট আচরণ।*[৩৩]

تَزَوَّجُوا وَلَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَالذَّوَّاقَاتِ

"বিয়ে করো এবং তালাক দিয়ো না। কারণ আল্লাহ এমন সব পুরুষ ও নারীকে পছন্দ করেন না যারা ভ্রমরের মতো ফুলে ফুলে মধু আহরণ করে বেড়ায়।"

৩১. পাকাপোক্ত অংগীকার অর্থ বিয়ে। কারণ এটি আসলে বিশ্বস্ততার একটি মজবুত ও শক্তিশালী অংগীকার ও চুক্তি এবং এরই স্থিতিশীলতা ও মজবুতীর ওপর ভরসা করেই একটি মেয়ে নিজেকে একটি পুরুষের হাতে সোপর্দ করে দেয়। এখন পুরুষটি যদি নিজের ইচ্ছায় এ অংগীকার ও চুক্তি ভংগ করে তাহলে চুক্তি করার সময় সে যে বিনিময় পেশ করেছিল তা ফিরিয়ে নেবার অধিকার তার থাকে না। (সূরা বাকারার ২৫১ টীকাটিও দেখুন।)

৩২. সামাজিক ও তামাদ্দুনিক সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের ভ্রান্ত পদ্ধতিগুলোকে হারাম গণ্য করে সাধারণভাবে কুরআন মজীদে অবশ্যি একথা বলা হয়ে থাকে ঃ "যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে।" এর দু'টি অর্থ হয়। এক, অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতার যুগে তোমরা যে সমস্ত ভুল করেছো, সেগুলো পাকাড়াও করা হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে এই যে, এখন যথার্থ নির্দেশ এসে যাবার পর তোমরা নিজেদের কার্যকলাপ সংশোধন করে নাও

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ
الْأَخِ وَبَنٰتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ مِّنَ
الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن
نِّسَآئِكُمُ الّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

৪ রুকূ'

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা,[৩৪] কন্যা,[৩৫] বোন,[৩৬] ফুফু, খালা, ভাতিজি, ভাগিনী[৩৭] ও তোমাদের সেই সমস্ত মাকে যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছে এবং তোমাদের দুধ বোন[৩৮] তোমাদের স্ত্রীদের মা[৩৯] ও তোমাদের স্ত্রীদের মেয়েদেরকে যারা তোমাদের কোলে মানুষ হয়েছে,[৪০]—সেই সমস্ত স্ত্রীদের মেয়েদেরকে যাদের সাথে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্যথায় যদি (শুধুমাত্র বিয়ে হয় এবং) স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে (তাদেরকে বাদ দিয়ে তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করলে) তোমাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না,—এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরকেও।[৪১] আর দুই বোনকে একসাথে বিয়ে করাও তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে।[৪২] তবে যা প্রথমে হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[৪৩]

এবং ভুল ও অন্যায় কাজগুলো পরিহার করো, সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করো না। দুই, আগের যুগের কোন পদ্ধতিকে যদি এখন হারাম গণ্য করা হয়ে থাকে, তাহলে তা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঠিক হবে না যে, আগের আইন বা রীতি অনুযায়ী যে কাজ ইতিপূর্বে করা হয়েছে তাকে নাকচ করে দিয়ে তা থেকে উদ্ভূত ফলাফলকে অবৈধ ও তার ফলে যে দায়িত্ব মাথায় চেপে বসেছে তাকে অনিবার্যভাবে রহিত করা হচ্ছে। যেমন এখন বিমাতাকে বিয়ে করা হারাম গণ্য করা হয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, এ পর্যন্ত যত লোক এ ধরনের বিয়ে করেছে, তাদের গর্ভজাত সন্তানদেরকে জারজ গণ্য করা হচ্ছে এবং নিজেদের পিতার সম্পদ সম্পত্তিতে তাদের উত্তরাধিকার রহিত করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে যদি লেনদেনের কোন পদ্ধতিকে হারাম গণ্য করা হয়ে থাকে, তাহলে তার অর্থ এ নয় যে, এ

পদ্ধতিতে এর আগে যতগুলো লেনদেন হয়েছে, সব বাতিল গণ্য হয়েছে এবং এখন এভাবে কোন ব্যক্তি যে ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে তা তার থেকে ফেরত নেয়া হবে অথবা ঐ সম্পদকে হারাম গণ্য করা হবে।

৩৩. ইসলামী আইন মোতাবিক এ কাজটি একটি ফৌজদারী অপরাধ এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখেন। আবু দাউদ, নাসাঈ ও মুসনাদে আহমাদে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অপরাধকারীদেরকে মৃত্যুদণ্ড ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার শাস্তি দিয়েছেন। আর ইবনে মাজাহ ইবনে আব্বাস থেকে যে রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন, তা থেকে জানা যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে এই সাধারণ নির্দেশটি বর্ণনা করেছিলেন ঃ

مَنْ وَقَعَ عَلٰى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوْهُ

"যে ব্যক্তি মুহরিম আত্মীয়ের মধ্য থেকে কারো সাথে যিনা করে তাকে হত্যা করো।"

ফিকাহবিদদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আহমাদের মতে এহেন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে এবং তার ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈর মতে যদি সে কোন মুহরিম আত্মীয়ার সাথে যিনা করে থাকে, তাহলে তাকে যিনার শাস্তি দেয়া হবে আর যদি বিয়ে করে থাকে, তাহলে তাকে কঠিন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে।

৩৪. মা বলতে আপন মা ও বিমাতা উভয়ই বুঝায়। তাই উভয়ই হারাম। এ ছাড়া বাপের মা ও মায়ের মা-ও এ হারমের অন্তরভুক্ত।

যে মহিলার সাথে বাপের অবৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে সে পুত্রের জন্য হারাম কিনা, এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। প্রথম যুগের কোন কোন ফকীহ একে হারাম বলেন না। আবার কেউ কেউ হারাম বলেছেন। বরং তাদের মতে, বাপ যৌন কামনা সহ যে মহিলার গা স্পর্শ করেছে সে-ও পুত্রের জন্য হারাম। অনুরূপভাবে যে মহিলার সাথে পুত্রের অবৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, সে বাপের জন্য হারাম কিনা এবং যে পুরুষের সাথে মা বা মেয়ের অবৈধ সম্পর্ক ছিল অথবা পরে হয়ে যায়, তার সাথে বিয়ে করা মা ও মেয়ে উভয়ের জন্য হারাম কিনা, এ ব্যাপারেও প্রথম যুগের ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। এ প্রসংগে ফকীহদের আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ। তবে সামান্য চিন্তা করলে একথা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন স্ত্রীলোকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, যার ওপর তার পিতার বা পুত্রেরও নজর থাকে অথবা যার মা বা মেয়ের ওপরও তার নজর থাকে, তাহলে এটাকে কখনো সুস্থ ও সৎ সামাজিকতার উপযোগী বলা যেতে পারে না। যে সমস্ত আইনগত চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিবাহ ও অবিবাহ, বিবাহ পূর্ব ও বিবাহ পরবর্তী এবং স্পর্শ ও দৃষ্টিপাত ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য করা হয়, কিন্তু আল্লাহর শরীয়াতের স্বাভাবিক প্রকৃতি তা মেনে নিতে মোটেই প্রস্তুত নয়। সোজা কথায় পারিবারিক জীবনে একই স্ত্রীলোকের সাথে বাপ ও ছেলের অথবা একই পুরুষের সাথে মা ও মেয়ের যৌন সম্পর্ক কঠিন বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ এবং শরীয়াত একে কোনক্রমেই বরদাশ্‌ত করতে পারে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

مَنْ نَظَرَ اِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ اُمُّهَا وَابْنَتُهَا

"যে ব্যক্তি কোন মেয়ের যৌন অংগের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তার মা ও মেয়ে উভয়ই তার জন্যে হারাম হয়ে যায়।"

তিনি আরো বলেন ঃ

لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَى رَجُلٍ نَظَرَ اِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا

"আল্লাহ সেই ব্যক্তির চেহারা দেখাই পছন্দ করেন না, যে একই সময় মা ও মেয়ে উভয়ের যৌনাংগে দৃষ্টিপাত করে।"

এ হাদীসগুলো থেকে শরীয়াতের উদ্দেশ্য দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৩৫. নাতনী ও দৌহিত্রীও কন্যার অন্তরভুক্ত। তবে অবৈধ সম্পর্কের ফলে যে মেয়ের জন্ম হয় সেও হারাম কিনা, এ ব্যাপারে অবশ্যি মতবিরোধ আছে। ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম মালেক (র) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের (র) মতে সেও বৈধ কন্যার মতোই মুহরিম। অন্যদিকে ইমাম শাফেঈর (র) মতে সে মুহরিম নয় অর্থাৎ তাকে বিয়ে করা যায় ; কিন্তু আসলে যে মেয়েটিকে সে নিজে তার নিজেরই ঔরসজাত বলে জানে, তাকে বিয়ে করা তার জন্যে বৈধ, এ চিন্তাটিও সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ বিবেককে ভারাক্রান্ত করে।

৩৬. সহোদর বোন, মা-শরীক বোন ও বাপ-শরীক বোন—তিন জনই সমানভাবে এ নির্দেশের আওতাধীন।

৩৭. এ সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রেও সহোদয় ও বৈমাত্রের বৈপিত্রেয়ের-ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। বাপ ও মায়ের বোন সহোদর, মা-শরীক বা বাপ-শরীক যে পর্যায়েরই হোক না কেন তারা অবশ্যি পুত্রের জন্য হারাম। অনুরূপভাবে ভাই ও বোন সহোদর, মা-শরীক বা বাপ-শরীক যে কোন পর্যায়েরই হোক না কেন তাদের কন্যারা নিজের কন্যার মতই হারাম।

৩৮. সমগ্র উম্মাতে মুসলিমা এ ব্যাপারে একমত যে, একটি ছেলে বা মেয়ে যে স্ত্রীলোকের দুধ পান করে তার জন্য ঐ স্ত্রীলোকটি মায়ের পর্যায়ভুক্ত ও তার স্বামী বাপের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায় এবং আসল মা ও বাপের সম্পর্কের কারণে যে সমস্ত আত্মীয়তা হারাম হয়ে যায় দুধ-মা ও দুধ-বাপের সম্পর্কের কারণেও সেসব আত্মীয়তাও তার জন্য হারাম হয়ে যায়। এ বিধানটির উৎসমূলে রয়েছে নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ নির্দেশটি ঃ

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

"বংশ ও রক্ত সম্পর্কের দিক দিয়ে যা হারাম দুধ সম্পর্কের দিক দিয়েও তা হারাম।"

তবে কি পরিমাণ দুধ পানে দুধ সম্পর্কের দিক দিয়ে বিয়ে করা হারাম হয় যায় সে ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেকের মতে যে পরিমাণ দুধ

পান করলে একজন রোযাদারের রোযা ভেঙে যেতে পারে কোন স্ত্রীলোকের সেই পরিমাণ দুধ যদি শিশু পান করে, তাহলে হারামের বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আহমাদের মতে তিনবার পান করলে এবং ইমাম শাফেঈর মতে পাঁচ বার পান করলে এ হারামের বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও কোন্ বয়সে দুধ পান করলে বিবাহ সম্পর্ক হারাম হয়ে যায় সে ব্যাপারেও মতানৈক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে ফকীহগণ নিম্নোক্ত মত পোষণ করেন।

এক ঃ শিশুর মাতৃদুগ্ধ পানের যে স্বাভাবিক বয়স কাল, যখন তার দুধ ছাড়ানো হয় না এবং দুধকেই তার খাদ্য হিসেবে খাওয়ানো হয়, সেই সময়ের মধ্যে কোন মহিলার দুধ পান করলে বিবাহ সম্পর্ক হারাম হয়ে যায়। নয়তো দুধ ছাড়ানোর পর কোন শিশু কোন মহিলার দুধ পান করলে, তা পানি পান করারই পর্যায়ভুক্ত হয়। উম্মে সালমা (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) এ মত পোষণ করেছেন। হযরত আলী (রা) থেকেও এই অর্থে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। যুহ্রী, হাসান বসরী, কাতাদাহ, ইকরামাহ ও আওযাঈও এ মত পোষণ করেন।

দুই ঃ শিশুর দুই বছর বয়স কালের মধ্যে যে দুধ পান করানো হয় কেবল মাত্র তা থেকেই দুধ সম্পর্ক প্রমাণিত হয়। এটি হযরত উমর (রা), ইবনে মাসউদ (রা), আবু হুরাইয়া (রা) ও ইবনে উমরের (রা) মত। ফকীহগণের মধ্যে ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও সুফিয়ান সাওরী এই মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু হানীফারও একটি অভিমত এরি সপক্ষে ব্যক্ত হয়েছে। ইমাম মালিকও এই মতের সমর্থন করেন। কিন্তু তিনি বলেন ঃ দু'বছর থেকে যদি এক মাস দু' মাস বেশী হয়ে যায় তাহলে তার ওপরও ঐ দুধ পানের সময় কালের বিধান কার্যকর হবে।

তিন ঃ ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম যুফারের বিখ্যাত অভিমত হচ্ছে, দুধপানের মেয়াদ আড়াই বছর এবং এই সময়ের মধ্যে কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করলে দুধ-সম্পর্ক প্রমাণিত হবে।

চার ঃ যে কোন বয়সে দুধ পান করলে দুধ সম্পর্ক স্থাপিত হবে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে বয়স নয়, দুধই আসল বিষয়। পানকারী বৃদ্ধ হলেও দুধ পানকারী শিশুর জন্য যে বিধান তার জন্যও সেই একই বিধান জারী হবে। হযরত আয়েশা (রা) এ মত পোষণ করেন। হযরত আলী (রা) থেকেও এরি সমর্থনে অপেক্ষাকৃত নির্ভুল অভিমত বর্ণিত হয়েছে। ফকীহদের মধ্যে উরওয়াহ ইবনে যুবাইর, আতা ইবনে রিবাহ, লাইস ইবনে সা'দ ও ইবনে হাযম এই মত অবলম্বন করেছেন।

৩৯. যে মহিলার সাথে শুধুমাত্র বিয়ে হয়েছে তার মা হারাম কি না এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ রাহেমাহুমুল্লাহ তার হারাম হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে হযরত আলীর (রা) মতে কোন মহিলার সাথে একান্তে অবস্থান না করা পর্যন্ত তার মা হারাম হবে না।

৪০. সৎ-বাপের ঘরে লালিত হওয়াই এই ধরনের মেয়ের হারাম হওয়ার জন্য শর্ত নয়। মহান আল্লাহ নিছক এই সম্পর্কটির নাজুকতা বর্ণনা করার জন্য এই শব্দাবলী ব্যবহার

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ
اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ
مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ۭ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ
اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ۭ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ
الْفَرِيْضَةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝۲۴

আর (যুদ্ধের মাধ্যমে) তোমাদের অধিকারভুক্ত হয়েছে এমন সব মেয়ে ছাড়া বাকি সমস্ত সধবাই তোমাদের জন্য হারাম।[৪৪] এ হচ্ছে আল্লাহর আইন। এ আইন মেনে চলা তোমাদের জন্য অপরিহার্য গণ্য করা হয়েছে। এদের ছাড়া বাদ বাকি সমস্ত মহিলাকে অর্থ–সম্পদের মাধ্যমে লাভ করা তোমাদের জন্য হালাল গণ্য করা হয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে, অবাধ যৌন লালসা তৃপ্ত করতে পারবে না। তারপর যে দাম্পত্য জীবনের স্বাদ তোমরা তাদের মাধ্যমে গ্রহণ করো, তার বদলে তাদের মোহরানা ফরয হিসেবে আদায় করো। তবে মোহরানার চুক্তি হয়ে যাবার পর পারস্পরিক রেজামন্দির মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে যদি কোন সমঝোতা হয়ে যায় তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও জ্ঞানী।

করেছেন। এ ব্যাপারে মুসলিম ফকীহগণের প্রায় 'ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে যে, সৎ–মেয়ে সৎ–বাপের ঘরে লালিত হোক বা না হোক সর্বাবস্থায়ই সে সৎ–বাপের জন্য হারাম।

৪১. এই শর্তটি কেবলমাত্র এ জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যাকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে, তার বিধবা বা তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী ঐ ব্যক্তির জন্য হারাম নয়। কেবল মাত্র নিজের ঔরস জাত পুত্রের স্ত্রীই বাপের জন্য হারাম। এভাবে পুত্রের ন্যায় প্রপুত্র ও দৌহিত্রের স্ত্রীও দাদা ও নানার জন্য হারাম।

৪২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ, খালা ও ভাগিনী এবং ফুফু ও ভাইঝিকেও এক সাথে বিয়ে করা হারাম। এ ব্যাপারে একটা মূলনীতি মনে রাখা দরকার। সেটি হচ্ছে, এমন ধরনের দু'টি মেয়েকে একত্রে বিয়ে করা হারাম যাদের একজন যদি পুরুষ হতো তাহলে অন্য জনের সাথে তার বিয়ে হারাম হতো।

৪৩. অর্থাৎ জাহেলী যুগে তোমরা জুলুম করতে। দুই বোনকে এক সাথে বিয়ে করতে। সে ব্যাপারে আর জবাবদিহি করতে হবে না। তবে শর্ত হচ্ছে, এখন তা থেকে বিরত থাকতে হবে। (টীকা ৩২ দেখুন) এরি ভিত্তিতে এ নির্দেশ দেয়া হয় যে, যে ব্যক্তি কুফরীর

যুগে দুই সহোদর বোনকে বিয়ে করেছিল তাকে এখন ইসলাম গ্রহণ করার পর এক জনকে রাখতে ও অন্য জনকে ছেড়ে দিতে হবে।

৪৪. অর্থাৎ যেসব মেয়ে যুদ্ধ বন্দিনী হয়ে এসেছে এবং তাদের স্বামীরা দারুল হার্‌বে (ইসলাম বিরোধী ও ইসলামের শত্রুদের শাসিত দেশ) রয়ে গেছে তারা হারাম নয়। কারণ দারুল হার্‌ব থেকে দারুল ইসলামে আসার পর তাদের বিয়ে ভেঙে গেছে। এই ধরনের মেয়েদের বিয়েও করা যায় আবার যাদের মালিকানায় তারা আছে তারা তাদের সাথে সংগমও করতে পারে। তবে স্বামী–স্ত্রী যদি একই সাথে বন্দী হয়ে আসে, তাহলে এ ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের বিধান গৃহীত হবে, এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সাথীগণের মতে, তাদের বিয়ে অপরিবর্তিত থাকবে। অন্যদিকে ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈর মতে তাদের বিয়ে অটুট থাকবে না।

যুদ্ধ বন্দিনী দাসীদের সাথে সংগম করার ব্যাপারে বহু রকমের বিভ্রান্তি লোকদের মধ্যে পাওয়া যায়। তাই এ প্রসংগে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ভালো করে বুঝে নেয়া দরকার।

এক ঃ যে সমস্ত মেয়ে যুদ্ধে বন্দী হয়, তাদেরকে বন্দী করার সাথে সাথেই যে কোন সৈনিক তাদের সাথে সংগম করার অধিকার লাভ করে না। বরং ইসলামী আইন অনুযায়ী এই ধরনের মেয়েদেরকে সরকারের হাতে সোপর্দ করে দেয়া হবে। সরকার চাইলে তাদেরকে বিনাশর্তে মুক্ত করে দিতে পারে, তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করতে পারে, শত্রুর হাতে যেসব মুসলমান বন্দী হয়েছে তাদের সাথে এদের বিনিময়ও করতে পারে এবং চাইলে তাদেরকে সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দিতেও পারে। এ ব্যাপারে সরকারের পূর্ণ ইখতিয়ার রয়েছে। একজন সৈনিক কেবলমাত্র সরকারের পক্ষ থেকে তাকে যে যুদ্ধ বন্দিনীটি দেয়া হয় তার সাথেই সংগম করতে পারে।

দুই ঃ যে মেয়েটিকে এভাবে কারো মালিকানায় দেয়া হয়, যতক্ষণ না তার একবার মাসিক ঋতুস্রাব হয় এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় যে, সে গর্ভবতী নয় ততক্ষণ তার সাথে সংগম করা যেতে পারে না। এর আগে তার সাথে সংগম করা হারাম। আর যদি সে গর্ভবতী হয়, তাহলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগেও তার সাথে সংগম করা অবৈধ।

তিন ঃ যুদ্ধ বন্দিনীদের সাথে সংগম করার ব্যাপারে তাদের অবশ্যি আহ্‌লি কিতাব হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। তাদের ধর্ম যাই হোক না কেন, যাদের মধ্যে তাদেরকে ভাগ করে দেয়া হবে তারা তাদের সাথে সংগম করতে পারবে।

চার ঃ যে মেয়েকে যার ভাগে দেয়া হবে একমাত্র সেই তার সাথে সংগম করতে পারবে। অন্য কারো তার গায়ে হাত দেবার অধিকার নেই। সেই মেয়ের গর্ভে যে সন্তান জন্মাবে সে তার মালিকের বৈধ সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। শরীয়াতে আপন ঔরসজাত সন্তানের যে অধিকার নির্ধারিত হয়েছে এই সন্তানের আইনগত অধিকারও তাই হবে। সন্তানের জননী হয়ে যাবার পর এই মেয়েকে আর বিক্রি করা যাবে না এবং মালিক মরে যাওয়ার সাথে সাথেই সে মুক্ত হয়ে যাবে।

পাঁচ ঃ যে মেয়েটি এভাবে কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন হয়, তাকে তার মালিক যদি দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় তাহলে মালিক তার থেকে অন্য সমস্ত খেদমত নিতে পারবে কিন্তু তার সাথে যৌন সম্পর্ক রাখার অধিকার তার থাকবে না।

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ
فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ
بِاِيْمَانِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ
وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا
مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَاۤ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ
مِنْكُمْ ؕ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٥﴾

আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির সম্ভ্রান্ত পরিবারের মুসলিম মেয়েদের বিয়ে করার সামর্থ নেই তার তোমাদের অধিকারভুক্ত মু'মিন দাসীদের মধ্য থেকে কাউকে বিয়ে করে নেয়া উচিত। আল্লাহ তোমাদের ঈমানের অবস্থা খুব ভালোভাবেই জানেন। তোমরা সবাই একই দলের অন্তরভুক্ত।[৪৫] কাজেই তাদের অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিয়ে করো এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে তাদের মোহরানা আদায় করো, যাতে তারা বিয়ের আবেষ্টনীর মধ্যে সংরক্ষিত থাকে, অবাধ যৌন লালসা পরিতৃপ্ত করতে উদ্যোগী না হয় এবং লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম না করে বেড়ায়। তারপর যখন তারা বিয়ের আবেষ্টনীর মধ্যে সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং এরপর কোন ব্যভিচার করে তখন তাদের জন্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের জন্য নির্ধারিত শাস্তির অর্ধেক শাস্তি দিতে হবে।[৪৬] তোমাদের মধ্য থেকে সেইসব লোকের জন্য এ সুবিধা[৪৭] সৃষ্টি করা হয়েছে, যাদের বিয়ে না করলে তাকওয়ার বাঁধ ভেঙে পড়ার আশংকা থাকে। তবে সবর করলে তা তোমাদের জন্য ভালো। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

ছয় ঃ শরীয়াত স্ত্রীদের সংখ্যার ব্যাপারে যেমন চারজনের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে, দাসীদের ব্যাপারে তেমন কোন সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়নি। ধনী লোকেরা বেশুমার বাঁদী কিনে কিনে মহল ভরে ফেলবে এবং বিলাসিতার সাগরে গা ভাসিয়ে দেবে, এটা শরীয়াতের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং আসলে যুদ্ধের অনিশ্চিত অবস্থাই ছিল এ ব্যাপারে সীমা নির্ধারণ না করার মূলীভূত কারণ।

সাত ঃ সরকার আইনগতভাবে কোন ব্যক্তিকে যুদ্ধবন্দীদের ওপর যে মালিকানা অধিকার দান করেছে মালিকানার অন্যান্য অধিকারের ন্যায় এটিও স্থানান্তর যোগ্য।

আট ঃ বিয়ে যেমন একটি আইনসংগত কাজ তেমনি সরকারের পক্ষ থেকে কাউকে যথারীতি মালিকানা অধিকার দান করাও একটি আইনসংগত কাজ। কাজেই যে ব্যক্তি বিয়ের মধ্যে কোন প্রকার অন্যায় ও অপ্রীতিকর ব্যাপার দেখে না, তার ক্রীতদাসীর সাথে সংগম করার মধ্যে খামাখা কোন অন্যায় ও অপ্রীতিকর বিষয় অনুভব করার পেছনে কোন ন্যায়সংগত কারণ নেই।

নয় ঃ যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে কোন মেয়েকে কারো মালিকানায় দিয়ে দেবার পর পুনর্বার সরকার তাকে ফেরত নেবার অধিকার রাখে না, ঠিক যেমন কোন মেয়ের অভিভাবক তাকে কারো সাথে বিয়ে দেবার পর আবার তাকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার হারিয়ে ফেলে।

দশ ঃ কোন সেনাপতি যদি নিছক সাময়িকভাবে তার সৈন্যদেরকে বন্দিনী মেয়েদের মাধ্যমে নিজেদের যৌন তৃষ্ণা মিটাবার অনুমতি দেয় এবং তাদেরকে সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করে দেয়, তাহলে ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে এটা হবে সম্পূর্ণ একটি অবৈধ কাজ। যিনার সাথে এর কোন পার্থক্য নেই। আর যিনা ইসলামী আইন অনুযায়ী একটি অপরাধ। বিস্তারিত জানার জন্য আমার 'তাফহীমাত' ২য় খণ্ড ও 'রাসায়েল ও মাসায়েল' ১ম খণ্ড দেখুন।

৪৫. অর্থাৎ সমাজ জীবনে মানুষের মধ্যে মর্যাদার যে পার্থক্য দেখা যায় তা নিছক আপেক্ষিক। নয়তো আসলে সব মুসলমান সমান। তাদের মধ্যে যথার্থই পার্থক্য করার মতো যদি কোন বিষয় থাকে তাহলে সেটি হচ্ছে ঈমান। আর ঈমান কোন উঁচু ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। একজন ক্রীতদাসীও ঈমান ও নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার চাইতেও ভালো হতে পারে।

৪৬. আপাত দৃষ্টিতে এখানে একটি জটিলতা দেখা দেয়। খারেজী ও 'রজম' তথা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুর শাস্তি অস্বীকারকারী অন্যান্য লোকেরা এ থেকে সুযোগ গ্রহণ করেছে। তারা বলে ঃ স্বাধীন বিবাহিতা মেয়েদের যিনার শাস্তি ইসলামী শরীয়াতে যদি 'রজম' হয়ে থাকে, তাহলে এর অর্ধেক শাস্তি যা ক্রীতদাসীদেরকে দেয়া হবে, তা কি হতে পারে? কাজেই এই আয়াত একথার চূড়ান্ত সাক্ষ দিচ্ছে যে, ইসলামে রজমের শাস্তিই নেই। কিন্তু তারা আসলে কুরআনের শব্দাবলীর ওপর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেনি। এই রুকূ'তে 'মুহসানাত' (সংরক্ষিত মহিলা) শব্দটি দু'টি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি হচ্ছে, "বিবাহিতা মহিলা", যারা স্বামীর সংরক্ষণ ব্যবস্থা লাভ করে এবং অন্যটি "সম্ভ্রান্ত মহিলা", যারা বিবাহিতা না হলেও পরিবারের সংরক্ষণ লাভ করে। আলোচ্য আয়াতে 'মুহসানাত' শব্দটি ক্রীতদাসীর মোকাবিলায় সম্ভ্রান্ত মহিলাদের জন্য দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, প্রথম অর্থে নয়। আয়াতে উল্লেখিত বিষয়বস্তু থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে বিপরীতপক্ষে ক্রীতদাসীদের জন্য 'মুহসানাত' শব্দটি প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যখন তারা বিয়ের সংরক্ষণ ব্যবস্থা লাভ করবে (فاذا احصن) । কেবলমাত্র তখনই তাদের জন্য যিনা করলে উল্লেখিত শাস্তির ব্যবস্থা

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ
عَلَيْكُمْ ۖ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا
عَظِيمًا ﴿٢٧﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

৫ রুকূ'

তোমাদের আগে যেসব সৎলোক চলে গেছে, তারা যেসব পদ্ধতির অনুসরণ করতো, আল্লাহ তোমাদের সামনে সেই পদ্ধতিগুলো সুস্পষ্ট করে দিতে এবং সেই সব পদ্ধতিতে তোমাদের চালাতে চান। তিনি নিজের রহমত সহকারে তোমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে চান। আর তিনি সর্বজ্ঞ ও জ্ঞানময়।[৪৮] হ্যাঁ, আল্লাহ তো রহমত সহকারে তোমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে চান। কিন্তু যারা নিজেদের প্রবৃত্তির লালসার অনুসরণ করছে তারা চায় তোমরা ন্যায় ও সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে দূরে চলে যাও।[৪৯] আল্লাহ তোমাদের ওপর থেকে বিধি-নিষেধ হাল্কা করতে চান। কারণ মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

দেয়া হয়েছে। এখন গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে একথা একেবারেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সম্ভ্রান্ত মহিলারা দু'টি সংরক্ষণ ব্যবস্থা লাভ করে। একটি হচ্ছে, পরিবারের সংরক্ষণ ব্যবস্থা। এর কারণে তারা বিবাহিতা না হয়েও 'মুহসিনা' অর্থাৎ সংরক্ষিত হয়ে যায়। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, স্বামীর সংরক্ষণ ব্যবস্থা। এর ফলে তারা পরিবারের সংরক্ষণের ওপর আর একটা বাড়তি সংরক্ষণ ব্যবস্থা লাভ করে। বিপরীত পক্ষে ক্রীতদাসী যতদিন ক্রীতদাসী অবস্থায় থাকে ততদিন সে 'মুহসিনা' নয়। কারণ সে কোন পরিবারের সংরক্ষণ ব্যবস্থা লাভ করেনি। তবে হাঁ, বিয়ে হবার পর সে কেবল স্বামীর সংরক্ষণ ব্যবস্থা লাভ করে এবং তাও অসম্পূর্ণ। কারণ স্বামীর সংরক্ষণ ব্যবস্থার আওতায় আসার পরও তারা মালিকের সেবা ও চাকরী থেকে মুক্তি লাভ করে না এবং সম্ভ্রান্ত মহিলারা সমাজে যে মর্যাদা লাভ করে সে ধরনের মর্যাদাও তারা লাভ করে না। কাজেই তাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হবে তা হবে সম্ভ্রান্ত পরিবারের অবিবাহিতা মেয়েদের শাস্তির অর্ধাংশ, সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিবাহিতা মেয়েদের শাস্তির অর্ধাংশ নয়। এ ছাড়াও এখান থেকে একথাও জানা গেছে যে, সূরা নূর-এর আয়াতে কেবলমাত্র অবিবাহিতা সম্ভ্রান্ত মহিলাদের যিনার শাস্তির কথা উল্লেখিত হয়েছে এবং এর মোকাবিলায় এখানে বিবাহিতা ক্রীতদাসীদের শাস্তি অর্ধেক বলা হয়েছে। আর বিবাহিতা সম্ভ্রান্ত মহিলারা তো অবিবাহিতা সম্ভ্রান্ত মহিলাদের তুলনায় কঠিন শাস্তি লাভের যোগ্য। কারণ তারা দু'টি সংরক্ষণ ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলে। যদিও কুরআন তাদের ব্যাপারে রজমের শাস্তির বিধান সুস্পষ্ট করেনি তবুও অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে

সেদিকে ইংগিত করেছে। এ বিষয়টি স্থূল বুদ্ধির লোকদের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যেতে পারে কিন্তু নবীর সূক্ষ্ম ও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির অন্তরালে থাকা তার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

৪৭. অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করার সামর্থ না থাকলে কোন ক্রীতদাসীর মালিকের অনুমতিক্রমে তাকে বিয়ে করার সুবিধা।

৪৮. সূরার শুরু থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত যে নির্দেশ ও বিধান দেয়া হয়েছে এবং এই সূরা নাযিলের পূর্বে সূরা বাকারায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সমস্যাবলী সমাধানের জন্য যে বিধান দেয়া হয়েছিল সেসবের দিকে সামগ্রিকভাবে একটি ইংগিত করে বলা হচ্ছে, মানব সভ্যতার প্রাচীনতম যুগ থেকে প্রতি যুগের নবীগণ ও তাঁদের সৎ ও সত্যনিষ্ঠ অনুসারীগণ সমাজ, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার এই আইনগুলো কার্যকর করে এসেছেন। আল্লাহ তাঁর অসীম অনুগ্রহের বদৌলতে তোমাদেরকে জাহেলীয়াতের অবস্থা থেকে বের করে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ লোকদের জীবনধারার দিকে পরিচালিত করেছেন।

৪৯. এখানে মুনাফিক, রক্ষণশীল ও প্রাচীন পন্থী মূর্খ এবং মদীনার উপকণ্ঠের ইহুদীদের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। সমাজ ও সংস্কৃতিতে শত শত বছরের পুঞ্জীভূত জাহেলী বংশ ও গোত্রপ্রীতি এবং রসম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে যে সংস্কার অভিযান চলছিল মুনাফিক ও রক্ষণশীলদের কাছে তা ছিল অত্যন্ত অপ্রীতিকর। তারা এটাকে কোনক্রমেই বরদাশত করতে পারছিল না। মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে মেয়েদের অংশ লাভ, শ্বশুর বাড়ির বাঁধন থেকে বিধবাদের মুক্তি পাওয়া এবং ইদ্দত শেষ হবার পর যে কোন ব্যক্তিকে বিয়ে করার ব্যাপারে তাদের স্বাধীন ক্ষমতা লাভ, সৎ-মাকে বিয়ে করা হারাম হওয়া, দুই বোনকে একই সাথে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করাকে অবৈধ গণ্য করা, পালকপুত্রকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা, পালক পিতার জন্য পালকপুত্রের তালাক দেয়া স্ত্রীকে বিয়ে করা হালাল গণ্য করা এবং এই ধরনের আরো অনেক সংস্কারমূলক কার্যাবলীর প্রত্যেকটির ওপর বয়োবৃদ্ধ ও বাপ-দাদার রীতি-রেওয়াজের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিরা চীৎকার করে উঠছিল। দীর্ঘদিন থেকে এই বিধানগুলোর বিরুদ্ধে নানান কথাবার্তা চলছিল। দুষ্ট লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সংস্কার মূলক দাওয়াতের বিরুদ্ধে এই বিরূপ কথাগুলো ব্যবহার করে লোকদেরকে উত্তেজিত করে চলছিল। যেমন, ইসলামী শরীয়াত যে ধরনের বিয়েকে হারাম গণ্য করছিল তেমনি ধরনের কোন বিয়ের ফলে ইতিপূর্বে যে ব্যক্তির জন্ম হয়েছিল তাকে এই বলে উত্তেজিত করা হচ্ছিল ঃ "নিন জনাব, আজ যে নতুন বিধান ওখানে এসেছে তার দৃষ্টিতে তো আপনার বাপ ও মায়ের সম্পর্ক অবৈধ গণ্য হয়েছে।" এভাবে সেখানে আল্লাহর বিধানের আওতায় যে সংস্কারমূলক কাজ হচ্ছিল এই নির্বোধ লোকেরা তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিল।

অন্যদিকে ছিল ইহুদীরা। শত শত বছরের অপ্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে তারা আল্লাহর শরীয়াতের গায়ে নিজেদের মনগড়া আইন-বিধানের একটি মোটা চামড়া জড়িয়ে দিয়েছিল। শরীয়াতের মধ্যে তারা অসংখ্য বিধি-নিষেধ, সূক্ষ্মতা ও কঠোরতা বৃদ্ধি করেছিল। বহু হালাল জিনিসকে তারা হারাম করে নিয়েছিল। অনেক কল্পনাভিত্তিক কুসংস্কারকে তারা আল্লাহর আইনের অন্তরভুক্ত করে নিয়েছিল। এখন কুরআন যে সহজ সরল শরীয়াত পেশ করছিল তার মর্যাদা অনুধাবন করা তাদের উলামা ও জনগণ উভয়ের মন-মানস ও রুচির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। কুরআনের বিধান শুনে তারা অস্থির হয়ে

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের ধন–সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেলো না। লেনদেন হতে হবে পারস্পরিক রেজামন্দির ভিত্তিতে।[৫০] আর নিজেকে হত্যা করো না।[৫১] নিশ্চিত জানো, আল্লাহ তোমাদের প্রতি মেহেরবান।[৫২]

পড়তো। এক একটি বিষয়ের ওপর শত শত আপত্তি উত্থাপন করতো। তাদের দাবী ছিল, যদি কুরআন তাদের ফকীহদের সমস্ত ইজতিহাদ ও তাদের পূর্বপুরুষদের যাবতীয় কাল্পনিক কুসংস্কার ও পৌরানিকতাবাদকে আল্লাহর শরীয়াত হিসেবে গণ্য না করে, তাহলে এটি কখনোই আল্লাহর কিতাব হতে পারে না। যেমন, ইহুদীদের নিয়ম ছিল, মাসিক ঋতুস্রাবের সময় তারা মেয়েদেরকে সম্পূর্ণ নাপাক মনে করতো। তাদের রান্না করা খাবার খেতো না। তাদের হাতের পানি পান করতো না। তাদের সাথে এক বিছানায় বসতো না। এমনকি তাদের হাতের স্পর্শ লেগে যাওয়াকে মকরূহ মনে করা হতো। এই কদিন মেয়েরা তাদের নিজেদের ঘরে নিজেরা 'অচ্ছুৎ' হয়ে থাকতো। ইহুদীদের সংস্পর্শে এসে মদীনার আনসারদের মধ্যেও এই রেওয়াজ চালু হয়ে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় এলে তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়। জবাবে সূরা বাকারার ২৮ রুকূ'র প্রথম আয়াতটি নাযিল হয়। এই আয়াতের প্রেক্ষিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুম দেন, মাসিক ঋতুস্রাবের সময় স্ত্রীদের সাথে একমাত্র সংগম করা জায়েয নয়। এ ছাড়া অন্যান্য দিনে স্বাভাবিক অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে যে সমস্ত সম্পর্ক যেভাবে রাখা হতো সেগুলো ঠিক তেমনিভাবেই এখন তাদের সাথে রাখো। এতে ইহুদীরা হৈ চৈ করতে লাগলো। তারা বলতে থাকলো, এ ব্যক্তি তো কসম খেয়ে বসেছে, আমাদের এখানে যা কিছু হারাম হয়ে আছে সেগুলোকে সে হালাল করেই ছাড়বে এবং যেসব জিনিসকে আমরা নাপাক গণ্য করে এসেছি সেগুলোকে পাক–পবিত্র গণ্য করবেই।

৫০. "অন্যায়ভাবে" বলতে এখানে এমন সব পদ্ধতির কথা বুঝানো হয়েছে যা সত্য ও ন্যায়নীতি বিরোধী এবং নৈতিক দিক দিয়েও শরীয়াতের দৃষ্টিতে নাজায়েয। "লেনদেন" মানে হচ্ছে, পরস্পরের মধ্যে স্বার্থ ও মুনাফার বিনিময় করা। যেমন ব্যবসায়, শিল্প ও কারিগরী ইত্যাদি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সেখানে একজন অন্যজনের প্রয়োজন সরবরাহ করার জন্য পরিশ্রম করে এবং তার বিনিময় দান করে। পারস্পরিক রেজামন্দি অর্থ হচ্ছে, কোন বৈধ চাপ বা ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে লেনদেন হবে না। ঘুষ ও সুদের মধ্যে আপাত রেজামন্দি থাকে কিন্তু আসলে এই রেজামন্দির পেছনে থাকে অক্ষমতা। প্রতিপক্ষ নিজের অক্ষমতার কারণে বাধ্য ও অনন্যোপায় হয়ে চাপের মুখে ঘুষ ও সুদ দিতে রাজী হয়। জুয়ার মধ্যেও বাহ্যিক দৃষ্টিতে রেজামন্দিই মনে হয়। কিন্তু আসলে জুয়াতে অংশগ্রহণকারী

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝ اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَاۗىِٕرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ۝

যে ব্যক্তি জুলুম ও অন্যায় বাড়াবাড়ি করে এমনটি করবে তাকে আমি অবশ্যি আগুনে নিক্ষেপ করবো। আর আল্লাহর জন্য এটা কোন কঠিন কাজ নয়। তোমরা যদি বড় বড় গোনাহ থেকে দূরে থাকো, যা থেকে দূরে থাকার জন্য তোমাদের বলা হচ্ছে, তাহলে তোমাদের ছোট-খাটো খারাপ কাজগুলো আমি তোমাদের হিসেব থেকে বাদ দিয়ে দেবো[৫৩] এবং তোমাদের সম্মান ও মর্যাদার জায়গায় প্রবেশ করিয়ে দেবো।

প্রত্যেক ব্যক্তিই একমাত্র সে-ই বিজয়ী হবে এই ভ্রান্ত আশায় এতে অংশগ্রহণে রাজি হয়। পরাজয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ এতে অংশগ্রহণ করে না। প্রতারণা ও জালিয়াতির কারবারেও বাহ্যত রেজামন্দিই দেখা যায়। কিন্তু এখানে রেজামন্দির পেছনে এই ভুল ধারণা কাজ করে যে, এর মধ্যে প্রতারণা ও জালিয়াতী নেই। দ্বিতীয় পক্ষ যদি জানতে পারে যে, প্রথম পক্ষ তার সাথে প্রতারণা ও জালিয়াতী করছে তাহলে সে কখনোই এতে রাজি হবে না।

৫১. এ বাক্যটি আগের বাক্যের পরিশিষ্ট হতে পারে আবার একটি স্বতন্ত্র বাক্যও হতে পারে। একে যদি আগের বাক্যের পরিশিষ্ট মনে করা হয় তাহলে এর অর্থ হয়, অন্যের অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাত করা আসলে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করার নামান্তর। এর ফলে সমাজ ব্যবস্থায় বিপর্যয় দেখা দেয়। এর অনিষ্টকর পরিণতি থেকে হারামখোর ব্যক্তি নিজেও রক্ষা পেতে পারে না এবং আখেরাতে এর কারণে মানুষ কঠিন শাস্তির অধিকারী হয়। আর যদি একে একটি স্বতন্ত্র বাক্য মনে করা হয় তাহলে এর দু'টি অর্থ হয়। এক, পরস্পরকে হত্যা করো না। দুই, আত্মহত্যা করো না। মহান আল্লাহ এ ক্ষেত্রে এমন ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং বাক্য এমনভাবে গঠন করেছেন যার ফলে এই তিনটি অর্থই এখান থেকে পাওয়া যেতে পারে এবং তিনটি অর্থই সত্য।

৫২. অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের শুভাকাংখী। তিনি তোমাদের ভালো চান। তিনি তোমাদের এমন কাজ করতে নিষেধ করছেন যার মধ্যে তোমাদের নিজেদের ধ্বংস নিহিত রয়েছে। এটা তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৫৩. অর্থাৎ আমি সংকীর্ণমনা নই এবং সংকীর্ণ দৃষ্টির অধিকারীও নই। ছোটখাটো ভুল-ভ্রান্তি ধরে আমি বান্দাকে শাস্তি দেই না। তোমাদের আমলনামায় যদি বড় বড় অপরাধ না থাকে তাহলে ছোটখাটো অপরাধগুলোকে উপেক্ষা করা হবে এবং তোমাদের

বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ আনাই হবে না। তবে যদি তোমরা বড় বড় অপরাধ করে থাকো, তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে মামলা চালানো হবে এবং তাতে ছোটখাটো অপরাধগুলোও ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য হবে, সেজন্য পাকড়াও করা হবে।

এখানে বড় গোনাহ ও ছোট গোনাহর মধ্যে নীতিগত পার্থক্য বুঝে নেয়া উচিত। কুরআন ও সুন্নাতের মধ্যে আমি যতটুকু চিন্তা-ভাবনা করতে পেরেছি তাতে আমি এটা বুঝতে সক্ষম হয়েছি (তবে যথার্থ সত্য একমাত্র আল্লাহ জানেন) যে, তিনটি কারণে কোন কাজ বড় গোনাহে পরিণত হয় ঃ

এক ঃ কারো অধিকার হরণ করা। সে অধিকার আল্লাহর, বাপ-মার, অন্য মানুষের বা হরণকারীর নিজেরও হতে পারে। তারপর যার অধিকার যত বেশী হবে তার অধিকার হরণও ঠিক তত বেশী বড় গোনাহ হবে। এ কারণেই গোনাহকে 'জুলুম'ও বলা হয়। আর এ জন্য কুরআনে শিরককে জুলুম বলা হয়েছে।

দুই ঃ আল্লাহকে ভয় না করা এবং আল্লাহর মোকাবিলায় আত্মম্ভরিতা করা, এর ফলে মানুষ আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের পরোয়া করে না। তাঁর নাফরমানি করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করেই এমন কাজ করে যা করতে তিনি নিষেধ করেছেন এবং জেনে বুঝে এমন কাজ থেকে বিরত থাকে যা করার জন্য তিনি হুকুম দিয়েছেন। এই নাফরমানি যে পরিমাণ নির্লজ্জতা, অহমিকা, দুঃসাহস ও আল্লাহভীতির মনোভাবে সমৃদ্ধ হবে গোনাহটিও ঠিক সেই পর্যায়ের কঠিন ও মারাত্মক হবে। এই অর্থের প্রেক্ষিতেই গোনাহের জন্য 'ফিস্‌ক' (ফাসেকী) ও 'মাসিয়াত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

তিন ঃ যে সমস্ত সম্পর্কের সুস্থতা ও বলিষ্ঠতার ওপর মানব জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভর করে সেগুলো বিকৃত ও ছিন্ন করা। এ সম্পর্ক বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে এবং বান্দা ও বান্দার মধ্যে হতে পারে। আবার যে সম্পর্ক যত বেশী গুরুত্বপূর্ণ, যা ছিন্ন করলে শান্তি ও নিরাপত্তার যত বেশী ক্ষতি হয় এবং যার ব্যাপারে যত বেশী নিরাপত্তার আশা করা যেতে পারে, তাকে ছিন্ন করা, কেটে ফেলা ও নষ্ট করার গোনাহ তত বেশী বড় হয়। যেমন যিনা ও তার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে চিন্তা করুন। এ কাজটি আসলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় বিপর্যয় ডেকে আনে। তাই এটি মূলত একটি বড় গোনাহ। কিন্তু এর বিভিন্ন অবস্থা গোনাহের ব্যাপারে একটি অন্যটির চাইতে বেশী মারাত্মক। বিবাহিত ব্যক্তির যিনা করা অবিবাহিত ব্যক্তির যিনা করার তুলনায় অনেক কঠিন গোনাহ। বিবাহিত মহিলার সাথে যিনা করা অবিবাহিতা মেয়ের সাথে যিনা করার তুলনায় অনেক বেশী দূষণীয়। প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা অপ্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করার তুলনায় বেশী খারাপ। মাহরাম মহিলা যেমন মা, মেয়ে, বোনের সাথে যিনা করা অন্য অনাত্মীয় মহিলার সাথে যিনা করার তুলনায় অনেক বেশী পাপ। অন্য কোন জায়গায় যিনা করার তুলনায় মসজিদে যিনা করা কঠিন গোনাহ। ওপরে বর্ণিত কারণের ভিত্তিতে এই দৃষ্টান্তগুলোতে একই কাজের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে গোনাহ হবার দিক দিয়ে পর্যায়ের পার্থক্য সূচিত হয়েছে। যেখানে নিরাপত্তার আশা যত বেশী, যেখানে মানবিক সম্পর্ক যত বেশী সম্মানের অধিকারী এবং যেখানে এই সম্পর্ক ছিন্ন করা যত বেশী বিপর্যয়ের কারণ বলে বিবেচিত হয়, সেখানে যিনা করা তত বেশী বড় গোনাহ। এই অর্থের প্রেক্ষিতে গোনাহের জন্য 'ফুজুর' এর পরিভাষা ব্যবহার করা হয়।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ
فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ﴿٣٢﴾ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ
مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ؕ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ
فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدًا ﴿٣٣﴾

আর যা কিছু আল্লাহ তোমাদের কাউকে অন্যদের মোকাবিলায় বেশী দিয়েছেন তার আকাংখা করো না। যা কিছু পুরুষরা উপার্জন করেছে তাদের অংশ হবে সেই অনুযায়ী। আর যা কিছু মেয়েরা উপার্জন করেছে তাদের অংশ সেই অনুযায়ী। হাঁ, আল্লাহর কাছে তাঁর ফযল ও মেহেরবানীর জন্য দোয়া করতে থাকো। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সমস্ত জিনিসের জ্ঞান রাখেন।[৫৪]

আর বাপ-মা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তিতে আমি তাদের হকদার নির্ধারিত করে দিয়েছি। এখন থাকে তারা, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি ও অংগীকার আছে, তাদের অংশ তাদেরকে দিয়ে দাও। নিশ্চিত জেনে রাখো আল্লাহ সব জিনিসের রক্ষণাবেক্ষণকারী।[৫৫]

৫৪. এই আয়াতে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক বিধান দেয়া হয়েছে। এটি সংরক্ষিত এবং যথাযথভাবে কার্যকরী করা হলে সমাজ জীবনে মানুষ বিপুল শান্তি ও নিরাপত্তা লাভে সক্ষম হবে। আল্লাহ সমস্ত মানুষকে সমান করে তৈরী করেননি। বরং তাদের মধ্যে অসংখ্য দিক দিয়ে পার্থক্য সৃষ্টি করে রেখেছেন। কেউ সুশ্রী, কেউ কুশ্রী। কেউ সুকণ্ঠ, কেউ কর্কশ ভাষী। কেউ শক্তিশালী, কেউ দুর্বল। কেউ পূর্ণাংগ সুগঠিত অংগ-প্রত্যংগের অধিকারী, আবার কেউ জন্মগতভাবে পংগু। কাউকে শারীরিক ও মানসিক শক্তির মধ্যে কোন একটি শক্তি বেশী দেয়া হয়েছে আবার কাউকে দেয়া হয়েছে অন্য কোন শক্তি। কাউকে অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থায় পয়দা করা হয়েছে আর কাউকে খারাপ অবস্থায়। কাউকে বেশী উপায় উপকরণ দেয়া হয়েছে, কাউকে দেয়া হয়েছে কম। এ তারতম্য ও পার্থক্যের ভিত্তিতেই মানুষের সমাজ-সংস্কৃতি বৈচিত্রমণ্ডিত হয়েছে। আর এটিই বুদ্ধি ও যুক্তিসম্মত। কিন্তু যেখানেই এই পার্থক্যের স্বাভাবিক সীমানা ছাড়িয়ে মানুষ তার ওপর নিজের কৃত্রিম পার্থক্যের বোঝা চাপিয়ে দেয় সেখানেই এক ধরনের বিপর্যয় দেখা দেয়। আর যেখানে আদতে এই পার্থক্যকেই বিলুপ্ত করে দেবার জন্য প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালানো হয় সেখানে আর এক ধরনের বিপর্যয় দেখা দেয়। মানুষের মধ্যে একটি বিশেষ মানসিকতা দেখা যায়। নিজের চাইতে কাউকে অগ্রসর দেখতে পেলে সে অস্থির

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا
فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

৬ রুকূ'

পুরুষ নারীর কর্তা।[৫৬] এ জন্য যে, আল্লাহ তাদের একজনকে অন্য জনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন[৫৭] এবং এ জন্য যে, পুরুষ নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। কাজেই সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা আনুগত্যপরায়ণ হয় এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর হেফাজত ও তত্বাবধানে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে।[৫৮] আর যেসব স্ত্রীর ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশংকা করো, তাদেরকে বুঝাও, শয়নগৃহে তাদের থেকে আলাদা থাকো এবং তাদেরকে মারধোর করো।[৫৯] তারপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তাহলে অযথা তাদের ওপর নির্যাতন চালাবার জন্য বাহানা তালাশ করো না। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ ওপরে আছেন, তিনি বড় ও শ্রেষ্ঠ। আর যদি কোথাও তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিগড়ে যাবার আশংকা দেখা দেয় তাহলে পুরুষের আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজন সালিশ এবং স্ত্রীর আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজন সালিশ নির্ধারিত করে দাও। তারা দু'জন[৬০] সংশোধন করে নিতে চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসা ও মিলমিশের পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ।[৬১]

হয়ে পড়ে। মানুষের এই মানসিকতা তাই সমাজ জীবনে হিংসা, বিদ্বেষ, রেষারেষি, শত্রুতা, দ্বন্দ্ব, সংঘাত ইত্যাদি সৃষ্টির মূল। এরই ফলে যে অনুগ্রহ সে বৈধ পথে অর্জন করতে পারে না তাকে অবৈধ পথে লাভ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। এই মানসিকতা থেকে দূরে থাকার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে নির্দেশ দিচ্ছেন, তাঁর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে,

অন্যদের প্রতি তিনি যে অনুগ্রহ করেছেন তুমি তার আকাংখা করো না। তবে আল্লাহর কাছে অনুগ্রহের জন্য দোয়া করো। তিনি নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী তোমার জন্য যে অনুগ্রহটি উপযোগী মনে করবেন সেটিই তোমাকে দান করবেন। আর তিনি যে বলেছেন, "যা কিছু পুরুষরা উপার্জন করেছে তাদের অংশ হবে সেই অনুযায়ী আর যা কিছু মেয়েরা উপার্জন করেছে তাদের অংশ হবে সেই অনুযায়ী" এর অর্থ যতদূর আমি বুঝতে পেরেছি তা হচ্ছে এই যে, পুরুষদের ও মেয়েদের মধ্য থেকে যাকে আল্লাহ যাই কিছু দিয়েছেন তাকে ব্যবহার করে যে যেমন কিছু নেকী বা গোনাহ অর্জন করবে সেই অনুযায়ী অথবা অন্য কথায় সেই জাতীয় জিনিসের মধ্য থেকেই আল্লাহর কাছে সে অংশ পাবে।

৫৫. আরববাসীদের নিয়ম ছিল, যাদের মধ্যে বন্ধুত্ব বা ভ্রাতৃত্বের চুক্তি ও অংগীকার হয়ে যেতো, তারা পরস্পরের উত্তরাধিকারী হয়ে যেতো। এভাবে যাকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করা হতো, সেও পালক পিতার সম্পত্তির ওয়ারিস হয়ে যেতো। এই আয়াতে জাহেলিয়াতের এই পদ্ধতিটি বাতিল করে বলা হয়েছে, মীরাস তো আমার নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে, তবে যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি ও অংগীকার আছে তাদেরকে তোমরা নিজেদের জীবদ্দশায় যা চাও দিতে পারো।

৫৬. কুরআনের মূল শব্দ হচ্ছে, 'কাওয়াম'। এমন এক ব্যক্তিকে 'কাওয়াম' বা 'কাইয়েম' বলা হয়, যে কোন ব্যক্তির, প্রতিষ্ঠানের বা ব্যবস্থাপনার যাবতীয় বিষয় সঠিকভাবে পরিচালনা, তার হেফাজত ও তত্বাবধান এবং তার প্রয়োজন সরবরাহ করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল হয়।

৫৭. এখানে সম্মান ও মর্যাদা অর্থে শ্রেষ্ঠত্ব শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি যেমন সাধারণত আমাদের ভাষায় হয়ে থাকে এবং এক ব্যক্তি এ শব্দটি বলার সাথে সাথেই এর এই অর্থ গ্রহণ করে। বরং এখানে এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাদের এক পক্ষকে (অর্থাৎ পুরুষ) প্রকৃতিগতভাবে এমন সব বৈশিষ্ট ও গুণাবলী দান করেছেন যা অন্য পক্ষটিকে (অর্থাৎ নারী) দেননি অথবা দিলেও প্রথম পক্ষের চেয়ে কম দিয়েছেন। এ জন্য পারিবারিক ব্যবস্থাপনায় পুরুষই 'কাওয়াম' বা কর্তা হবার যোগ্যতা রাখে। আর নারীকে প্রাকৃতিক দিক দিয়ে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, পারিবারিক জীবন ক্ষেত্রে তাকে পুরুষের হেফাযত ও তত্বাবধানে থাকা উচিত।

৫৮. হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সেই স্ত্রীই সর্বোত্তম, যাকে দেখলে তোমার মন আনন্দে ভরে যায়। তুমি তাকে কোন আদেশ করলে সে তোমার আনুগত্য করে। আর তুমি ঘরে না থাকলে সে তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার ধন-সম্পদের ও তার নিজের হেফাজত করে।" এ হাদীসটি এই আয়াতের চমৎকার ব্যাখ্যা পেশ করে। কিন্তু এখানে ভালোভাবে একথা বুঝে নিতে হবে যে, স্ত্রীর জন্য নিজের স্বামীর আনুগত্যের চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগণ্য হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য। কাজেই কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে আল্লাহর নাফরমানি করার হুকুম দেয় অথবা আল্লাহর অর্পিত কোন ফরয থেকে তাকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা চালায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করতে অস্বীকার করা স্ত্রীর জন্য ফরয হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় যদি স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করে তাহলে সে গোনাহগার হবে। বিপরীত পক্ষে স্বামী যদি স্ত্রীকে নফল নামায পড়তে বা নফল রোযা রাখতে নিষেধ করে তাহলে স্বামীর কথা মেনে চলা তার

জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় নফল ইবাদাত করলে তা আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না।

৫৯. তিনটি কাজ একই সংগে করার কথা এখানে বলা হয়নি। বরং এখানে বক্তব্য হচ্ছে, অবাধ্যতা দেখা দিলে এই তিনটি ব্যবস্থা অবলম্বন করার অনুমতি রয়েছে। এখন এগুলোর বাস্তবায়নের প্রশ্ন। এ ক্ষেত্রে অবশ্যি দোষ ও শাস্তির মধ্যে আনুপাতিক সম্পর্ক থাকতে হবে। যেখানে হালকা ব্যবস্থায় কাজ হয়ে যায়, সেখানে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন না করা উচিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম যেখানেই স্ত্রীদের মারার অনুমতি দিয়েছেন। সেখানেই তা দিয়েছেন একান্ত অনিচ্ছা সহকারে এবং লাচার হয়েই। আবার তারপরও একে অপছন্দ করেছেন। তবুও কোন কোন স্ত্রী এমন হয়ে থাকে যাদেরকে মারধর না করলে সোজা থাকে না। এ অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ হচ্ছে, তাদের মুখে বা চেহারায় মেরো না, নির্দয়ভাবে মেরো না এবং এমন জিনিস দিয়ে মেরো না, যা শরীরে দাগ রেখে যায়।

৬০. দু'জন বলতে এখানে দু'জন সালিশকে বুঝানো হয়েছে। আবার স্বামী-স্ত্রীকেও বুঝানো হয়েছে। যে কোন ঝগড়া বিবাদের অবিশ্য মীমাংসা হতে পারে। তবে বিবদমান পক্ষ দু'টি মীমাংসা চায় কিনা এবং যারা মাঝখানে থেকে সালিশ করেন তাঁরা আন্তরিকতার সাথে উভয় পক্ষের মধ্যে মিলমিশ করে দিতে চান কিনা, এরি ওপর মীমাংসার সবটুকু নির্ভর করে।

৬১. এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি দেখা দিলে বিরোধ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর্যায়ে পৌঁছাবার বা ব্যাপারটি আদালত পর্যন্ত গড়াবার আগেই ঘরেই তার সংশোধন ও মীমাংসার চেষ্টা করা উচিত। এ জন্য এ পদ্ধতি বাতলানো হয়েছে যে, স্বামী ও স্ত্রীর উভয়ের পরিবার থেকে একজন করে লোক নিয়ে দু'জনের একটি সালিশ কমিটি বানাতে হবে। তারা উভয়ে মিলে বিরোধের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাবেন। তারপর এক সাথে বসে এর সামাধান ও মীমাংসার পথ বের করবেন। এই সালিশ কে নিযুক্ত করবে? এ প্রশ্নটি আল্লাহ অস্পষ্ট রেখেছেন। এর কারণ হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রী চাইলে নিজেদের আত্মীয়দের মধ্য থেকে নিজেরাই একজন করে লোক বাছাই করে আনতে পারে। তারাই তাদের বিরোধ নিস্পত্তি করবে। আবার উভয়ের পরিবারের বয়স্ক লোকেরা এগিয়ে এসে এ ধরনের সালিশ নিযুক্ত করতে পারে। আর ব্যাপারটি যদি আদালতে চলে যায়, তাহলে আদালত নিজেই কোন সিদ্ধান্ত দেবার আগে পারিবারিক সালিশ নিযুক্ত করে এর মীমাংসা করে দিতে পারে।

সালিশদের ক্ষমতার ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। ফকীহদের একটি দল বলেন, এই সালিশে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও মীমাংসা চাপিয়ে দেবার ক্ষমতা নেই। তবে তাদের মতে, ঝগড়া মিটমাট করার যে সংগত ও সম্ভাব্য পদ্ধতি হতে পারে সেজন্য তারা সুপারিশ করতে পারে। এই সুপারিশ মেনে নেয়া না নেয়ার ইখতিয়ার স্বামী-স্ত্রীর আছে। তবে স্বামী-স্ত্রী যদি তাদেরকে তালাক বা খুলা তালাক অথবা অন্য কোন ব্যাপারে মীমাংসা করে দেবার জন্য দায়িত্বশীল হিসেবে নিযুক্ত করে থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে অবশ্যি তাদের ফায়সালা মেনে নেয়া স্বামী-স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব হয়ে পড়বে। হানাফী ও শাফেয়ী আলেমগণ এই মত পোষণ করেন। অন্য দলের মতে, উভয় সালিশের ইতিবাচক

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا
وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ﴿٣٦﴾ الَّذِيْنَ
يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ
مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۚ﴿٣٧﴾

আর তোমরা সবাই আল্লাহর বন্দেগী করো। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। বাপ-মা'র সাথে ভালো ব্যবহার করো। নিকট আত্মীয় ও এতিম-মিসকিনদের সাথে সদ্ব্যবহার করো। আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্বসাথী,[৬২] মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাধীন বাদী ও গোলামদের প্রতি সদয় ব্যবহার করো। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ এমন কোন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না যে আত্মঅহংকারে ধরাকে সরা জ্ঞান করে এবং নিজের বড়াই করে। আর আল্লাহ এমন লোকদেরকেও পছন্দ করেন না, যারা কৃপণতা করে, অন্যদেরকেও কৃপণতা করার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন সেগুলো গোপন করে।[৬৩] এই ধরনের অনুগ্রহ অস্বীকারকারী লোকদের জন্য আমি লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।

সিদ্ধান্ত দেবার এবং ঝগড়া মিটমাট করে আবার একসাথে মিলেমিশে চলার ফায়সালা করার ইখতিয়ার আছে কিন্তু স্বামী-স্ত্রীকে আলাদা করে দেবার অধিকার তাদের নেই। হাসান বসরী, কাতাদাহ এবং অন্যান্য বেশ কিছু সংখ্যক ফকীহ এই মত পোষণ করেন। তৃতীয় একটি দলের মতে, এই সালিশদ্বয় স্বামী-স্ত্রীকে মিলিয়ে দেবার বা আলাদা করার পূর্ণ ইখতিয়ার রাখে। ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইবরাহীম নাখঈ, সা'বী, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন এবং অন্যান্য ফকীহগণ এই মতের প্রবক্তা।

হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলীর (রা) ফায়সালার যেসব নজীর আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তা থেকে জানা যায়, তারা উভয়েই সালিশ নিযুক্ত করার সাথে সাথেই আদালতের পক্ষ থেকে তাদেরকে নিজেদের ফায়সালা কার্যকর করার প্রশাসনিক ক্ষমতা দান করতেন। তাই হযরত আকীল ইবনে আবু তালেব এবং তাঁর স্ত্রী হযরত ফাতেমা বিনতে উতবাহ ইবনে রাবীআর মামলা যখন হযরত উসমানের আদালতে দায়ের করা

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ﴿٣٨﴾

আর আল্লাহ তাদেরকেও অপছন্দ করেন, যারা নিজেদের ধন-সম্পদ কেবল মাত্র লোকদেরকে দেখাবার জন্য ব্যয় করে এবং আসলে না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে আর না আখেরাতের দিনের প্রতি। সত্য বলতে কি, শয়তান যার সাথী হয়েছে তার ভাগ্যে বড় খারাপ সাথীই জুটেছে।

হলো তখন তিনি স্বামীর পরিবার থেকে হযরত ইবনে আব্বাসকে এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে হযরত মুআবীয়া ইবনে আবু সুফিয়ানকে সালিশ নিযুক্ত করলেন এবং তাদেরকে বললেন, আপনারা দু'জন যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তাদের স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে তাহলে তা করে দেবেন। অনুরূপভাবে একটি মামলায় হযরত আলী সালিশ নিযুক্ত করেন। তাদেরকে মিলিয়ে দেবার বা আলাদা করে দেবার ইখতিয়ার দান করেন। এ থেকে জানা যায়, সালিশের নিজস্ব কোন আদালতী ক্ষমতা বা ইখতিয়ার নেই। তবে তাদের নিযুক্তির সময় আদালত যদি তাদেরকে ক্ষমতা দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের ফায়সালা আদালতের ফায়সালার ন্যায় প্রবর্তিত হবে।

৬২. মূল ইবারতে বলা হয়েছে ঃ "আস্সা-হিবু বিল জানবে।" এর অর্থ অন্তরংগ বন্ধু-বান্ধব হতে পারে আবার এমন লোকও হতে পারে যে জীবন পথে চলার ক্ষেত্রে কোন এক পর্যায়ে সংগ দিয়ে থাকে। যেমন, আপনি বাজারে যাচ্ছেন এবং পথে কোন ব্যক্তি আপনার সাথে চলছে। অথবা কোন দোকানে আপনি সওদা কিনছেন এবং অন্য কোন খরিদ্দারও আপনার পাশে বসে রয়েছে। অথবা সফরের মাঝপথে কোন ব্যক্তি আপনার সফর সংগী হয়ে গেলেন। এই সাময়িক সংগও প্রত্যেক ভদ্র ও শালীন ব্যক্তির ওপর বেশ কিছু অধিকার ও দায়িত্ব অর্পণ করে। যার ফলে সে যথাসম্ভব তার সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং তাকে কষ্ট দিতে বিরত থাকে।

৬৩. মানুষ যদি এমনভাবে থাকে যাতে মনে হয় আল্লাহ তার ওপর কোন অনুগ্রহ করেননি, তাহলে এটাই হয় আল্লাহর অনুগ্রহকে গোপন করা। যেমন কাউকে আল্লাহ অর্থ-সম্পদ দান করেছেন কিন্তু সে নিজের সামর্থের তুলনায় অনেক নিম্নমানের জীবন যাপন করে। নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় করে না। মানুষকে আর্থিক সাহায্য করে না। সৎকাজে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে অংশ গ্রহণ করে না। বাইরের কোন লোক তাকে দেখে মনে করে, এ বেচারা বড়ই গরীব। এটা আসলে আল্লাহর প্রতি মারাত্মক পর্যায়ের অকৃতজ্ঞতা। হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَنْعَمَ نِعْمَةً عَلٰى عَبْدٍ اَحَبَّ اَنْ يَّظْهَرَ اَثَرُهَا عَلَيْهِ

"আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে নেয়ামত দান করেন তখন তিনি সেই নেয়ামতের চিহ্ন বান্দার ওপর প্রকাশিত হওয়া পছন্দ করেন।"

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ
اللّٰهُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ﴿٣٩﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ
تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٤٠﴾ فَكَيْفَ
اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ ۢ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ﴿٤١﴾
يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ
وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ﴿٤٢﴾

হ্যাঁ, যদি তারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনতো এবং যা কিছু আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করতো, তাহলে তাদের মাথায় এমন কী আকাশ ভেঙে পড়তো? যদি তারা এমনটি করতো, তাহলে তাদের নেকীর অবস্থা আল্লাহর কাছে গোপন থেকে যেতো না। আল্লাহ কারো ওপর এক অণু পরিমাণও জুলুম করেন না। যদি কেউ একটি সৎকাজ করে, তাহলে আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে তাকে মহাপুরস্কার প্রদান করেন। তারপর চিন্তা করো, তখন তারা কি করবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মাত থেকে একজন সাক্ষী আনবো এবং তাদের ওপর তোমাকে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করাবো[৬৪] সে সময় যারা রসূলের কথা মানেনি এবং তাঁর নাফরমানি করতে থেকেছে তারা কামনা করবে, হায়! যমীন যদি ফেটে যেতো এবং তারা তার মধ্যে চলে যেতো। সেখানে তারা আল্লাহর কাছ থেকে নিজেদের কোন কথা লুকিয়ে রাখতে পারবে না।

অর্থাৎ তার খাওয়া-দাওয়া, বসবাস করা, লেবাস-পোশাক, গৃহ, আসবাবপত্র, দান-খয়রাত ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের প্রকাশ হতে হবে।

৬৪. অর্থাৎ প্রত্যেক যুগের নবী তাঁর যুগের লোকদের ব্যাপারে আল্লাহর আদালতে সাক্ষী দিবেন। তিনি এই মর্মে সাক্ষী দেবনে, হে আল্লাহ! জীবনের সোজা-সরলপথ এবং চিন্তা ও কর্মের সঠিক ও নির্ভুল পদ্ধতির যে শিক্ষা তুমি আমাকে দিয়েছিলে তা আমি এদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর এই সাক্ষ্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর যুগের লোকদের ব্যাপারেও পেশ করবেন। আর কুরআন থেকে জানা যায়, তাঁর আগমন কাল থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র সময়-কালই তাঁর যুগ। (আলে ইমরানের ৬৯ টীকা দেখুন)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى
تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ
وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ
اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا
بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

৭ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছে যেয়ো না।[৬৫] নামায সেই সময় পড়া উচিত যখন তোমরা যা বলছো তা জানতে পারো।[৬৬] অনুরূপভাবে অপবিত্র অবস্থায়ও[৬৭] গোসল না করা পর্যন্ত নামাযের কাছে যেয়ো না। তবে যদি পথ অতিক্রমকারী হও,[৬৮] তাহলে অবশ্যি স্বতন্ত্র কথা। আর যদি কখনো তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়ো, সফরে থাকো বা তোমাদের কেউ মলমূত্র ত্যাগ করে আসে অথবা তোমরা নারী সম্ভোগ করে থাকো[৬৯] এবং এরপর পানি না পাও, তাহলে পাক–পবিত্র মাটির সাহায্য গ্রহণ করো এবং তা নিজেদের চেহারা ও হাতের ওপর বুলাও।[৭০] নিসন্দেহে আল্লাহ কোমলতা অবলম্বনকারী ও ক্ষমাশীল।

৬৫. এটি মদ সম্পর্কে দ্বিতীয় নির্দেশ। প্রথম নির্দেশটি সূরা বাকারার ২১৯ আয়াতে দেয়া হয়েছে। সেখানে কেবল একথা বলেই শেষ করা হয়েছিল যে, মদ খারাপ জিনিস। আল্লাহ এটি পছন্দ করেন না। একথা বলার পর মুসলমানদের একটি দল মদ পরিহার করেছিল। কিন্তু তখনো অনেক লোক আগের মতোই মদ পান করে চলছিল। এমনকি অনেক সময় নেশায় মাতাল অবস্থায় তারা নামাযে শামিল হয়ে যেতো এবং নামাযে যা পড়ার তা ছাড়া অন্য কিছু পড়ে ফেলতো। সম্ভবত চতুর্থ হিজরীর গোড়ার দিকে এই দ্বিতীয় নির্দেশটি নাযিল হয়। এখানে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। লোকদের ওপর এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। তারা নিজেদের মদপানের সময় বদলে ফেলে। যখন নেশা থাকা অবস্থায় নামাযের সময় হয়ে যাবার আশংকা থাকতো তখন তারা মদপান থেকে বিরত থাকতো। এর কিছুকাল পরে মদপানের বিরুদ্ধে চরম নিষেধাজ্ঞা আসে। মদপান হারাম হবার এ নির্দেশটি এসেছে সূরা মায়েদার ৯০–৯১ আয়াতে। এখানে একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতে 'সুকর' অর্থাৎ 'নেশা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এ নির্দেশটি কেবল মদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না বরং প্রত্যেকটি নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুর সাথেই এর সম্পর্ক। এ নির্দেশটি আজো পুরোপুরি কার্যকর। একদিকে নেশাকর বস্তু

ব্যবহার করা হারাম এবং অন্যদিকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়া দ্বিগুণ এবং আরো অনেক বড় গোনাহ।

৬৬. এ জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন, যখন ব্যক্তির ওপর ঘুমের আক্রমণ হয় এবং নামায পড়তে গিয়ে সে বারবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তখন তার নামায রেখে ঘুমিয়ে পড়া দরকার। কোন কোন লোক এই আয়াত থেকে এই মর্মে প্রমাণ পেশ করেছেন যে, যে ব্যক্তি নামাযে পঠিত আরবী ইবারতের অর্থ বোঝে না তার নামায হবে না। কিন্তু এটা আসলে একটা অযথা কাঠিন্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কুরআনের শব্দাবলীও এর সমর্থন করে না। কুরআনে 'হাত্তা তাফ্কাহু' বা 'হাত্তা তাফহামু মা তাকূলূন' (অর্থাৎ যতক্ষণ তোমরা যা বলো তা তোমরা হৃদয়ংগম না করো অথবা বুঝতে না পারো) বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে, 'হাত্তা তা'লামূ মা তাকূলূন।' অর্থাৎ নামাযে এক ব্যক্তিকে এতটুকুন সজাগ থাকতে হবে যে, সে নিজের মুখে কি কথা বলছে, তা তাকে অবশ্যি জানতে হবে। সে নামায পড়তে দাঁড়িয়ে যেন গজল গাইতে শুরু না করে দেয়।

৬৭. কুরআনে উল্লেখিত মূল শব্দ হচ্ছে, 'জুনুবান'। এর মানে হচ্ছে, দূর হয়ে যাওয়া, দূরত্ব ও সম্পর্কহীনতা। এ থেকে 'আজনবী' (অপরিচিত) শব্দটি বের হয়েছে। শরীয়াতের পরিভাষায় জুনুব বা জানাবাত অর্থ হচ্ছে, যৌন প্রয়োজন পূর্ণ করার এবং স্বপ্নের মধ্যে বীর্যপাত হবার ফলে যে 'নাজাসাত' বা নাপাকী সৃষ্টি হয়। কারণ এর ফলে মানুষ তাহারাত বা পবিত্রতা শূন্য হয়ে পড়ে।

৬৮. ফকীহ ও মুফাস্সিরগণের একটি দল এই আয়াতের অর্থ এভাবে গ্রহণ করেছেন যে, জুনুবী (নাপাক) অবস্থায় মসজিদে না যাওয়া উচিত। তবে কোন কাজে মসজিদের মধ্য দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে যেতে পারে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আনাস ইবনে মালিক, হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ ফকীহগণ এই মত অবলম্বন করেছেন। অন্য এক দলের মতে এর অর্থ হচ্ছে সফর। অর্থাৎ যদি কেউ সফরে থাকে এবং এ অবস্থায় সে জুনুবী হয়ে পড়ে তাহলে তায়াম্মুম করতে পারে। আর মসজিদের ব্যাপারে তাদের মত হচ্ছে এই যে, জুনুবীর জন্য অযু করে মসজিদে বসে থাকা জায়েয। এই মত অবলম্বন করেছেন হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে জুবাইর এবং অন্যান্য কতিপয় ফকীহ। যদিও এ ব্যাপারে প্রায় সবাই একমত যে, কোন ব্যক্তি যদি সফর অবস্থায় জুনুবী হয়ে পড়ে এবং তার পক্ষে গোসল করা সম্ভবপর না হয়, তাহলে সে তায়াম্মুম করে নামায পড়তে পারে। কিন্তু প্রথম দলটি এ বিষয়টি গ্রহণ করেন হাদীস থেকে আর দ্বিতীয় দলটি এর ভিত্তি রাখেন কুরআনের উপরোল্লিখিত আয়াতের ওপর।

৬৯. এখানে কুরআনের মূল শব্দ হচ্ছে 'লামাস'। 'লামাস' অর্থ স্পর্শ করা। ফকীহগণ এই 'স্পর্শ করা' শব্দটির অর্থ গ্রহণের ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, আবু মূসা আশআরী, উবাই ইবনে কা'ব, সাঈদ ইবনে জুবাইর, হাসান বসরী এবং বিভিন্ন ইমামদের মতে এর অর্থ হচ্ছে সহবাস। ইমাম আবু হানীফা, তাঁর শাগরিদবৃন্দ ও ইমাম সুফিয়ান সওরীও এই মতটি অবলম্বন করেছেন। এর বিপরীত মত গ্রহণ করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর। এ ছাড়াও কোন কোন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, হযরত উমর ইবনে খাত্তাবেরও এই অভিমত ছিল। অর্থাৎ তিনি এর অর্থ কেবল মাত্র 'স্পর্শ করা' বা 'হাত লাগানো' নিয়েছেন। ইমাম শাফেঈও এ মতটি গ্রহণ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ
وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ
بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾

তুমি কি তাদেরকেও দেখেছো, যাদেরকে কিতাবের জ্ঞানের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে?[৭১] তারা নিজেরাই গোমরাহীর খরিদ্দার বনে গেছে এবং কামনা করছে যেন তোমরাও পথ ভুল করে বসো। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের ভালো করেই জানেন এবং তোমাদের সাহায্য-সমর্থনের জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট।

করেছেন। আবার কোন কোন ইমাম মাঝামাঝি পথও অবলম্বন করেছেন। যেমন ইমাম মালেকের মতে, যদি নারী বা পুরুষ পরস্পরকে স্পর্শ করে যৌন আবেগ সহকারে, তাহলে তাদের অযু ভেঙে যাবে এবং নামাযের জন্য নতুন করে অযু করতে হবে। কিন্তু যৌন আবেগের তাড়না ছাড়াই যদি তাদের দেহ পরস্পরকে স্পর্শ করে তাহলে এতে কোন ক্ষতি নেই।

৭০. এই নির্দেশটির বিস্তারিত অবস্থা হচ্ছে এই যে, যদি কোন ব্যক্তি অযুবিহীন অবস্থায় থাকে অথবা তার গোসলের প্রয়োজন হয় এবং পানি না পাওয়া যায়, তাহলে সে তায়াম্মুম করে নামায পড়তে পারে। যদি সে অসুস্থ হয় এবং গোসল বা অযু করলে তার জন্য ক্ষতির আশংকা থাকে, তাহলে পানি থাকা সত্ত্বেও সে তায়াম্মুমের অনুমতির সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

তায়াম্মুম অর্থ হচ্ছে, ইচ্ছা বা সংকল্প করা। অর্থাৎ যদি পানি না পাওয়া যায় অথবা পাওয়া গেলেও তার ব্যবহার সম্ভব না হয়, তাহলে পাক-পবিত্র মাটি ব্যবহার করার সংকল্প করা।

তায়াম্মুমের পদ্ধতির ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। একটি দলের মতে এর পদ্ধতি হচ্ছে, একবার মাটির ওপর দুই হাত ঘসে নিয়ে মুখ মণ্ডলের ওপর বুলিয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয়বার দুই হাত ঘসে নিয়ে তা দুই হাতের কনুই পর্যন্ত বুলিয়ে নিতে হবে। এটিই ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালেক এবং অধিকাংশ ফকীহের মাযহাব। আর সাহাবা ও তাবেঈদের মধ্য থেকে হযরত আলী, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, হাসান বসরী, শা'বী, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ এবং আরো অনেকে এই মত পোষণ করতেন। দ্বিতীয় দলের মতে, মাটিতে কেবলমাত্র একবার হাত ঘসে নেয়াই যথেষ্ট, সেই হাত মুখমণ্ডলের ওপর বুলানো যাবে এবং তারপর কব্জি পর্যন্ত দুই হাতের ওপরও বুলানো যাবে। কনুই পর্যন্ত বুলাবার প্রয়োজন হবে না। এটি আতা, মাকহুল, আওযাঈ ও আহমাদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ ফকীহগণের মাযহাব। সাধারণত আহলে হাদীসগণও এই মতের প্রবক্তা।

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا
وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا
فِى الدِّيْنِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ
خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ
اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٤٦﴾

যারা ইহুদী হয়ে গেছে,[৭২] তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা শব্দকে তার স্থান থেকে ফিরিয়ে দেয়[৭৩] এবং সত্য দীনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রকাশের জন্য নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত করে বলে, "আমরা শুনলাম" এবং "আমরা অমান্য করলাম"[৭৪] আর "শোনে না শোনার মতো"[৭৫] এবং বলে "রাঈনা"।[৭৬] অথচ তারা যদি বলতো, "আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম" এবং "শোন" ও "আমাদের প্রতি লক্ষ্য করো" তাহলে এটা তাদেরই জন্য ভালো হতো এবং এটাই হতো অধিকতর সততার পরিচায়ক। কিন্তু তাদের বাতিল পরস্তির কারণে তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ পড়েছে। তাই তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকে।

তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে হাত ঘসা অপরিহার্য নয়। যে জায়গার ওপর ধূলো পড়ে আছে এবং শুকনো মাটি সম্বলিত যেকোনো জায়গায় হাত ঘসে নেয়া এ জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হবে।

অনেকে প্রশ্ন করেন, এভাবে মাটিতে হাত ঘসে সেই হাত চেহারা ও হাতের ওপর বুলালে তাহারাত তথা পাক–পবিত্রতা অর্জিত হয় কিভাবে? কিন্তু আসলে এটি মানুষের মধ্যে তাহারাতের অনুভূতি এবং নামাযের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্বিক কৌশল বিশেষ। এতে যে লাভটুকু অর্জিত হয় তা হচ্ছে ঃ দীর্ঘদিন পর্যন্ত পানি ব্যবহারে সমর্থ না হলেও মানুষের মধ্যে তাহারাতের অনুভূতি জাগ্রত থাকবে। শরীয়াত পাক–পবিত্রতার যে আইন প্রবর্তন করেছে সে বরাবর তা মেনে চলবে। তার মন থেকে নামায পড়ার যোগ্য হবার অবস্থা ও নামায পড়ার যোগ্য না হবার অবস্থার মধ্যকার পার্থক্যবোধ কখনো বিলুপ্ত হবে না।

৭১. আহ্‌লি কিতাবদের আলেম সমাজ সম্পর্কে কুরআন অনেক ক্ষেত্রে এ বক্তব্য পেশ করেছে যে, "তাদেরকে কিতাবের জ্ঞানের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে।" এর কারণ হচ্ছে এই যে, প্রথমত তারা আল্লাহর কিতাবের একটি অংশ হারিয়ে ফেলেছিল। তারপর আল্লাহর কিতাবের যা কিছু তাদের কাছে ছিল তার প্রাণসত্তা এবং তার উদ্দেশ্য ও মূল বক্তব্য

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ
مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰٓى اَدْبَارِهَآ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا
لَعَنَّآ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ۭ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٤٧﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ
اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۗءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ
بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا ﴿٤٨﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ
اَنْفُسَهُمْ ۭ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَاۗءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٤٩﴾ اُنْظُرْ
كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۭ وَكَفٰى بِهٖٓ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٠﴾

হে কিতাবধারীগণ! সেই কিতাবটি মেনে নাও যেটি আমি এখন নাযিল করেছি এবং যেটি তোমাদের কাছে আগে থেকে মওজুদ[৭৭] কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করে ও তার প্রতি সমর্থন জানায়। আর আমি চেহারা বিকৃত করে পেছন দিকে ফিরিয়ে দেবার অথবা শনিবার-ওয়ালাদের মতো তাদেরকে অভিশপ্ত করার আগে[৭৮] এর প্রতি ঈমান আনো। আর মনে রাখো, আল্লাহর নির্দেশ প্রতিপালিত হয়েই থাকে। আল্লাহ অবশ্যি শিরককে মাফ করেন না।[৭৯] এ ছাড়া অন্যান্য যত গোনাহই হোক না কেন তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন।[৮০] যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করেছে সেতো এক বিরাট মিথ্যা রচনা করেছে এবং কঠিন গোনাহের কাজ করেছে।

তুমি কি তাদেরকেও দেখেছো, যারা নিজেদের আত্মশুদ্ধি ও আত্মপবিত্রতার বড়াই করে বেড়ায়? অথচ শুদ্ধি ও পবিত্রতা আল্লাহ যাকে চান তাকে দেন। আর (তারা যে শুদ্ধি ও পবিত্রতা লাভ করে না সেটা আসলে) তাদের ওপর বিন্দুমাত্রও জুলুম করা হয় না। আচ্ছা, দেখো তো, এরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না। এদের স্পষ্ট গোনাহগার হবার ব্যাপারে এই একটি গোনাহই যথেষ্ট।

বিষয়ও তাদের কাছে অপরিচিত হয়ে উঠেছিল। তাদের সমস্ত আগ্রহ কেন্দ্রীভূত হয়ে গিয়েছিল শাব্দিক বিতর্ক, বিধান ও নির্দেশাবলীর খুঁটিনাটি আলোচনা এবং আকীদা-বিশ্বাসের দার্শনিক জটিলতার মধ্যে। এ কারণেই তারা দীনের তাৎপর্য ও

সারবস্তুর সাথে অপরিচিত ছিল। তাদের মধ্যে যথার্থ দীনদারীর চিহ্নমাত্রও ছিল না। অথচ তাদেরকে ধর্মীয় আলেম ও জাতির নেতা বলা হতো।

৭২. 'যারা ইহুদী' না বলে বলেছেন, 'যারা ইহুদী হয়ে গেছে।' এর কারণ প্রথম তারাও মুসলমানই ছিল, যেমন প্রত্যেক নবীর উম্মাত আসলে মুসলমান হয়। কিন্তু পরে তারা কেবলমাত্র ইহুদী হয়েই রয়ে গেছে।

৭৩. এর তিনটি অর্থ হয়। এক, তারা আল্লাহর কিতাবের শব্দের মধ্যে হেরফের করে দেয়। দুই, তারা নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যার সাহায্যে কিতাবের আয়াতের অর্থের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন আনে। তিন, তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের সাহচর্যে এসে তাদের কথা শোনে এবং সেখান থেকে ফিরে গিয়ে লোকদের সামনে তাঁদের সম্পর্কে বানোয়াট কথা বলে। একটি কথা একভাবে বলা হয় এবং তারা নিজেদের শয়তানী মনোবৃত্তি ও দুষ্টবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে তাকে ভিন্নরূপ দিয়ে লোকদের সামনে এনে হাজির করে। এভাবে তারা নবী ও তাঁর অনুসারীদের দুর্নাম করে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে ইসলামী দাওয়াত থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে।

৭৪. অর্থাৎ তাদেরকে আল্লাহর বিধান শুনানো হলে তারা উচ্চৈস্বরে বলে ওঠে, "সামে'না" (আমরা শুনেছি) এবং নীচু স্বরে বলে, "আসাইনা" (আমরা অমান্য করলাম)। অথবা তারা "আতা'য়না" (আমরা আনুগত্য করলাম) শব্দটি এমনভাবে নিজেদের কণ্ঠ বাঁকিয়ে ওলটপালট করে উচ্চারণ করে যার ফলে তা "আসাইনা" (আমরা অমান্য করলাম) হয়ে যায়।

৭৫. অর্থাৎ কথাবার্তার মাঝখানে যখন তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোন কথা বলতে চায় তখন বলে, "ইস্‌মা" (শুনুন)। আবার সাথে সাথেই বলে ওঠে, "গাইরা মুসমাঈন।" এই "গাইরা মুসমাঈন" শব্দের দুই অর্থ হতে পারে। এর একটি অর্থ হতে পারে ঃ আপনি এমনি একজন সম্মানিত বুযর্গ, যাকে তার ইচ্ছা বিরোধী কোন কথা শুনানো যেতে পারে না। এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে ঃ তোমাকে কেউ কিছু শুনাবে এমন যোগ্যতা তোমার নেই। এর আর একটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ করুন তুমি যেন বধির হয়ে যাও।

৭৬. এর ব্যাখ্যার জন্য সূরা বাকারার ১০৮ টীকা দেখুন।

৭৭. এর ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আলে ইমরানের ২ টীকা।

৭৮. সূরা বাকারার ৮২ ও ৮৩ টীকা দেখুন।

৭৯. একথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, আহ্‌লি কিতাবগণ নবী ও আসমানী কিতাবের অনুসৃতির দাবী করলেও তারা শিরকের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল।

৮০. এর অর্থ এ নয় যে, মানুষ কেবলমাত্র শিরক করবে না এবং বাদবাকি গোনাহ এস্তার করে যেতে থাকবে প্রাণ খুলে। বরং এ থেকে একথা বুঝানো হয়েছে যে, শিরকের গোনাহকে তারা মামুলি গোনাহ মনে করে এসেছে। অথচ এটিই সবচেয়ে বড় গোনাহ। এমন কি অন্য সমস্ত গোনাহ মাফ হতে পারে কিন্তু এই গোনাহটি মাফ করা হবে না।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ
وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ
آمَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن
تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ
النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾

৮ রুকূ'

তুমি কি তাদেরকে দেখোনি, যাদেরকে কিতাবের জ্ঞান থেকে কিছু অংশ দেয়া হয়েছে এবং তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা জিব্‌ত[৮১] ও তাগুতকে[৮২] মানে আর কাফেরদের সম্পর্কে বলে, ঈমানদারদের তুলনায় এরাই তো অধিকতর নির্ভুল পথে চলছে?[৮৩] এই ধরনের লোকদের ওপর আল্লাহ লানত বর্ষণ করেছেন। আর যার ওপর আল্লাহ লানত বর্ষণ করেন তোমরা তার কোন সাহায্যকারী পাবে না। রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের কোন অংশ আছে কি? যদি তাই হতো, তাহলে তারা অন্যদেরকে একটি কানাকড়িও দিতো না।[৮৪]

ইহুদী আলেমরা শরীয়াতের ছোট ছোট বিধি–নিষেধ পালনের ওপর বড় বেশী গুরুত্ব দিতেন। বরং তাদের সমস্ত সময় এসব ছোটখাটো বিধানের পর্যালোচনা ও যাচাই বাছাইয়ে অতিবাহিত হতো। তাদের ফকীহগণ এই খুঁটিনাটি বিধানগুলো বের করেছিলেন ইজতিহাদের মাধ্যমে। কিন্তু তাদের চোখে শিরক ছিল একটি হালকা ও ছোট গোনাহ। তাই এই গোনাহটির হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা কোন প্রকার চিন্তা ও প্রচেষ্টা চালাননি। নিজেদের জাতিকে মুশরিকী কার্যকলাপ থেকে বাঁচাবার জন্য কোন উদ্যোগও তারা নেননি। মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব এবং তাদের সাহায্য সহযোগিতাও. তাদের কাছে ক্ষতিকর মনে হয়নি।

৮১. 'জিব্‌ত' মানে অসত্য, অমূলক, ভিত্তিহীন ও অকল্যাণকর জিনিস। ইসলামের পরিভাষায় যাদু, টোনা, টোটকা, ভাগ্য গণনা, জ্যোতিষ, তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাকার কুসংস্কার ও অন্যান্য যাবতীয় কাল্পনিক ও বানোয়াট কথা ও ক্রিয়াকর্মকে জিব্‌ত বলা হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

الزياقة والطرق والطير من الجبت

অর্থাৎ "পশুর ধ্বনি থেকে আন্দাজে ভালো–মন্দ অর্থ গ্রহণ করা, মাটির ওপর পশুর পদচিহ্ন থেকে সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য মূলক ভালো-মন্দ ধারণা নেয়া এবং এই ধরনের কাল্পনিক

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا
آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾ فَمِنْهُم
مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ۖ كُلَّمَا نَضِجَتْ
جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

তাহলে কি অন্যদের প্রতি তারা এ জন্য হিংসা করছে যে, আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহ দানে সমৃদ্ধ করেছেন।[৮৫] যদি এ কথাই হয়ে থাকে, তাহলে তাদের জেনে রাখা দরকার, আমি ইবরাহীমের সন্তানদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করেছি এবং তাদেরকে দান করেছি বিরাট রাজত্ব।[৮৬] কিন্তু তাদের মধ্য থেকে কেউ এর ওপর ঈমান এনেছে আবার কেউ এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।[৮৭] আর যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের জন্য তো জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুনই যথেষ্ট। যারা আমার আয়াতগুলো মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তাদেরকে আমি নিশ্চিতভাবেই আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করবো। আর যখন তাদের চামড়া পুড়ে গলে যাবে তখন তার জায়গায় আমি অন্য চামড়া তৈরী করে দেবো, যাতে তারা খুব ভালোভাবে আযাবের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। আল্লাহ বিপুল ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি নিজের ফায়সালাগুলো বাস্তবায়নের কৌশল খুব ভালোভাবেই জানেন।

আন্দাজ অনুমানভিত্তিক সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য চিহ্নিত করার বিভিন্ন পদ্ধতি জিব্‌ত এর অন্তরভুক্ত।" কাজেই আমাদের ভাষায় আমরা যাকে কুসংস্কার বলি এবং ইংরাজীতে যাকে বলা হয় Superstitions সেটিই আসলে জিব্‌ত।

৮২. এর ব্যাখ্যার জন্য সূরা বাকারার ২৮৬ ও ২৮৮ টীকা দু'টি দেখুন।

৮৩. ইহুদী আলেমদের হঠধর্মিতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে তারা আরবের মুশরিকদের চাইতেও বেশী গোমরাহ মনে করতো। তারা বলতো, এদের চাইতে এই মুশরিকরাই তো বেশী সত্য পথের অনুসারী। অথচ তারা স্পষ্ট দেখছিল, একদিকে রয়েছে নির্ভেজাল তাওহীদ, যার মধ্যে শিরকের সামান্য গন্ধও নেই আর অন্যদিকে নির্ভেজাল মূর্তিপূজা, যার নিন্দায় ও প্রতিবাদে সমগ্র বাইবেল উচ্চ কণ্ঠ।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۫ وَّنُدْخِلُهُمْ
ظِلًّا ظَلِيْلًا ﴿٥٧﴾ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ
وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

আর যারা আমার আয়াতগুলো মেনে নিয়েছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে এমন সব বাগিচার মধ্যে প্রবেশ করাবো যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা থাকবে চিরস্থায়ীভাবে, তারা সেখানে পবিত্র স্ত্রীদেরকে লাভ করবে এবং তাদেরকে আমি আশ্রয় দেবো ঘন স্নিগ্ধ ছায়াতলে।

হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমানত তার হকদারদের হাতে ফেরত দেবার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর লোকদের মধ্যে ফায়সালা করার সময় 'আদল' ও ন্যায়নীতি সহকারে ফায়সালা করো।[৮৮] আল্লাহ তোমাদের বড়ই উৎকৃষ্ট উপদেশ দান করেন। আর অবশ্যি আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন।

৮৪. অর্থাৎ কে সত্য পথে আছে আর কে সত্য পথে নেই, একথা বলার ক্ষমতা তারা কোথায় থেকে পেলো? আল্লাহর রাজত্বের কোন অংশ কি তাদের অধিকারে এসেছে? যদি এমন হতো, তাহলে অন্যেরা তাদের হাত থেকে একটি কানাকড়িও পেতো না। কারণ তাদের মন বড়ই সংকীর্ণ, সত্যের স্বীকৃতিটুকু পর্যন্ত দিতেও তারা অপারগ। এর দ্বিতীয় অর্থ এই হতে পারে ঃ তাদের হাতে কি কোন দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা আছে যে, অন্যেরা তাতে অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছে এবং তারা ওদেরকে তা থেকে কিছুই দিতে চায় না? এখানে নিছক অধিকারের স্বীকৃতির প্রশ্ন ওঠে। আর এ ব্যাপারেও তারা কার্পণ্য করছে।

৮৫. অর্থাৎ তারা নিজেদের অযোগ্যতা সত্ত্বেও নিজেরাই আল্লাহর যে অনুগ্রহ ও পুরস্কারের আশায় বসেছিল, অন্য লোকেরা যখন তা লাভ করে ধন্য হলো এবং আরবের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক মহান নবীর আবির্ভাবের মাধ্যমে এমন এক আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও বাস্তব জীবনধারার উদ্ভব হলো, যার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে উত্থান, উন্নতি ও অগ্রগতি, তখন তারা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে। আর এই হিংসার কারণেই তাদের মুখ থেকে এসব কথা বের হচ্ছে।

৮৬. 'বিরাট রাজত্ব' মানে দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব। আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান লাভ করার এবং সেই জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করার অনিবার্য ফল স্বরূপ পৃথিবীর জাতিদের নেতৃত্ব দান করার এবং তাদের ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা অর্জিত হয়।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى
ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ
إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রসূলের আর সেই সব লোকের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী। এরপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যাপারে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে তাকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।[৮৯] যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান এনে থাকো। এটিই একটি সঠিক কর্মপদ্ধতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটিই উৎকৃষ্ট।[৯০]

৮৭. মনে রাখতে হবে, এখানে বনী ইসরাঈলদের হিংসা ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের জবাব দেয়া হচ্ছে। এই জবাবের অর্থ হচ্ছে, তোমরা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছো কেন? তোমরাও ইবরাহীমের সন্তান। আর এই বনী ইসরাঈলরাও তো ইবরাহীমের সন্তান। দুনিয়ার নেতৃত্ব দানের জন্য ইবরাহীমের কাছে আমি যে ওয়াদা করেছিলাম তা ইবরাহীম সন্তানদের মধ্য থেকে কেবল মাত্র তাদের জন্য ছিল যারা আমার প্রদত্ত কিতাব ও হিকমত তথা শরীয়াত বিধান মেনে চলবে। এই কিতাব ও হিকমত প্রথমে আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু নিজেদের নির্বুদ্ধিতার জন্য তোমরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো। এখন সেই জিনিসটিই আমি বনী ইসমাঈলকে দিয়েছি। তারা এর ওপর ঈমান এনেছে, এটি তাদের সৌভাগ্য।

৮৮. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলরা যেসব খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে গেছে তোমরা সেগুলো থেকে দূরে থেকো। বনী ইসরাঈলদের একটি মৌলিক দোষ ছিল এই যে, তারা নিজেদের পতনের যুগে আমানতসমূহ অর্থাৎ দায়িত্বপূর্ণ পদ, ধর্মীয় নেতৃত্ব ও জাতীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে মর্যাদাপূর্ণ পদসমূহ (Positions of trust) এমন সব লোকদেরকে দেয়া শুরু করেছিল যারা ছিল অযোগ্য, সংকীর্ণমনা, দুশ্চরিত্র, দুর্নীতিপরায়ণ, খেয়ানতকারী ও ব্যভীচারী। ফলে অসৎ লোকদের নেতৃত্বে সমগ্র জাতি অনাচারে লিপ্ত হয়ে গেছে। মুসলমানদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে, তোমরা এই বনী ইসরাঈলদের মতো আচরণ করো না। বরং তোমরা যোগ্য লোকদেরকে আমানত সোপর্দ করো। অর্থাৎ আমানতের বোঝা বহন করার ক্ষমতা যাদের আছে কেবল তাদের হাতে আমানত তুলে দিয়ো। বনী ইসরাঈলদের দ্বিতীয় বড় দুর্বলতা এই ছিল যে, তাদের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির প্রাণশক্তি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থে তারা নির্দ্বিধায় ঈমান বিরোধী কাজ করে চলতো। সত্যকে জেনেও সুস্পষ্ট হঠধর্মীতায় লিপ্ত হতো। ইনসাফের গলায় ছুরি চালাতে কখনো একটুও কুণ্ঠা বোধ করতো না। সে যুগের মুসলমানরা তাদের বেইনসাফীর তিক্ত অভিজ্ঞতা হাতে কলমে লাভ করে চলছিল। একদিকে তাদের সামনে ছিল মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর ওপর যারা ঈমান এনেছিল তাদের পূতপবিত্র জীবনধারা। অন্যদিকে ছিল এমন এক জনগোষ্ঠীর জীবন যারা মূর্তিপূজা করে চলছিল। তারা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতো। বিমাতাদেরকেও বিয়ে করতো। উলংগ অবস্থায় কাবা ঘরের চারদিকে তওয়াফ করতো। এই তথাকথিত আহলি কিতাবরা এদের মধ্য থেকে প্রথম দলটির ওপর দ্বিতীয় দলটিকে প্রাধান্য দিতো। তারা একথা বলতে একটুও লজ্জা অনুভব করতো না যে, প্রথম দলটির তুলনায় দ্বিতীয় দলটি অধিকতর সঠিক পথে চলছে। মহান আল্লাহ তাদের এই বেইনসাফির বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পর এবার মুসলমানদের উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা ওদের মতো অবিচারক হয়ো না। কারো সাথে বন্ধুতা বা শত্রুতা যাই হোক না কেন সব অবস্থায় ইনসাফ ও ন্যায়নীতির কথা বলবে এবং ইনসাফ ও সুবিচার সহকারে ফায়সালা করবে।

৮৯. এ আয়াতটি ইসলামের সমগ্র ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের বুনিয়াদ। এটি একটি ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের প্রথম নম্বর ধারা। এখানে নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলো স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হয়েছে।

এক ঃ ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আসল আনুগত্য লাভের অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ। একজন মুসলমানের সর্বপ্রথম পরিচয় হচ্ছে সে আল্লাহর বান্দা। এরপর সে অন্য কিছু। মুসলমানের ব্যক্তিগত জীবন এবং মুসলমানদের সমাজ ব্যবস্থা উভয়ের কেন্দ্র ও লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য করা ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর নির্দেশ মেনে চলা। অন্যান্য আনুগত্য ও অনুসৃতি কেবল মাত্র তখনই গৃহীত হবে যখন তা আল্লাহর আনুগত্য ও অনুসৃতির বিপরীত হবে না। বরং তার অধীন ও অনুকূল হবে। অন্যথায় এই আসল ও মৌলিক আনুগত্য বিরোধী প্রতিটি আনুগত্য শৃংখলকে ভেঙ্গে দূরে নিক্ষেপ করা হবে। একথাটিকেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত বক্তব্যে পেশ করেছেন ঃ

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

অর্থাৎ "স্রষ্টার নাফরমানি করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।"

দুই ঃ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে, রসূলের আনুগত্য। এটি কোন স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আনুগত্য নয়। বরং আল্লাহর আনুগত্যের এটিই একমাত্র বাস্তব ও কার্যকর পদ্ধতি। রসূলের আনুগত্য এ জন্য করতে হবে যে, আল্লাহর বিধান ও নির্দেশ আমাদের কাছে পৌঁছার তিনিই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। আমরা কেবলমাত্র রসূলের আনুগত্য করার পথেই আল্লাহর আনুগত্য করতে পারি। রসূলের সনদ ও প্রমাণপত্র ছাড়া আল্লাহর কোন আনুগত্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আর রসূলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নামান্তর। নিম্নোক্ত হাদীসে এই বক্তব্যটিই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঃ

مَنْ اَطَاعَنِى فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ

"যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে আসলে আল্লাহর আনুগত্য করলো এবং যে ব্যক্তি আমার নাফরমানি করলো সে আসলে আল্লাহর নাফরমানি করলো।"

একথাটিই কুরআনে সামনের দিকে পুরোপুরি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে পেশ করা হয়েছে।

তিন ঃ উপরোল্লিখিত দু'টি আনুগত্যের পর তাদের অধীনে তৃতীয় আর একটি আনুগত্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আওতাধীনে মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব। সেটি হচ্ছে মুসলমানদের মধ্য থেকে 'উলিল আমর' তথা দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারীদের আনুগত্য। মুসলমানদের সামাজিক ও সামষ্টিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে দায়িত্ব সম্পন্ন ও নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি মাত্রই 'উলিল আমর'–এর অন্তরভুক্ত। তারা মুসলমানদের মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তাগত ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী উলামায়ে কেরাম বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হতে পারেন, আবার দেশের শাসনকার্য পরিচালনাকারী প্রশাসকবৃন্দ হতে পারেন, অথবা আদালতে বিচারের রায় প্রদানকারী বিচারপতি বা তামাদ্দুনিক ও সামাজিক বিষয়ে গোত্র, মহল্লা ও জনবসতির নেতৃত্বদানকারী শেখ সরদার প্রধানও হতে পারেন। মোটকথা যে ব্যক্তি যে কোন পর্যায়েই মুসলমানদের নেতৃত্বদানকারী হবেন তিনি অবশ্যি আনুগত্য লাভের অধিকারী হবেন। তার সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে মুসলমানদের সামাজিক জীবনে বাধা–বিপত্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করা যাবে না। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, তাকে মুসলিম দলভুক্ত হতে হবে এবং আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হতে হবে। এই আনুগত্যের জন্য এই শর্ত দু'টি হচ্ছে অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক। কেবলমাত্র উল্লেখিত আয়াতটির মধ্যভাগে এ সুস্পষ্ট শর্তটি সংশ্লিষ্ট হয়নি বরং হাদীসেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিপূর্ণ ব্যাপকতার সাথে দ্ব্যর্থহীনভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। যেমন নিম্নোক্ত হাদীসগুলো দেখা যেতে পারে ঃ

اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْ مَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ (بخارى ومسلم)

"নিজের নেতৃবৃন্দের কথা শোনা ও মেনে চলা মুসলমানের জন্য অপরিহার্য, তা তার পছন্দ হোক বা না হোক, যে পর্যন্ত না তাকে নাফরমানির হুকুম দেয়া হয়। আর যখন তাকে নাফরমানির হুকুম দেয়া হয় তখন তার কিছু শোনা ও আনুগত্য করা উচিত নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

لاَ طَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةٍ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ (بخارى ومسلم)

"আল্লাহ ও রসূলের নাফরমানির ক্ষেত্রে কোন আনুগত্য নেই, আনুগত্য করতে হবে শুধুমাত্র 'মারূফ' বা বৈধ ও সৎকাজে।" (বুখারী ও মুসলিম)

يَكُوْنُ عَلَيْكُمْ اُمَرَاءُ تَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ اَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ فَقَالُوْا اَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ لاَ مَا صَلُّوْا (مسلم)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাদের ওপর এমন সব লোকও শাসন কর্তৃত্ব চালাবে যাদের অনেক কথাকে তোমরা 'মারূফ' (বৈধ) ও অনেক কথাকে 'মুনকার' (অবৈধ) পাবে। এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তাদের মুনকারের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে, সে দায়মুক্ত হয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তি তা অপছন্দ করেছে, সেও বেঁচে গেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট হয়েছে এবং তার অনুসরণ করেছে সে পাকড়াও হবে।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, "তাহলে এ ধরনের শাসকদের শাসনামলে কি আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবো না?" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দেন ঃ "না, যতদিন তারা নামায পড়তে থাকবে (ততদিন তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে না)।"—(মুসলিম)

অর্থাৎ নামায পরিত্যাগ করা এমন একটি আলামত হিসেবে বিবেচিত হবে, যা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যাবে যে, তারা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছে। এ অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ন্যায়সংগত হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

شِرَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذٰلِكَ ؟ مَالَ لَا مَا اَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلٰوةَ ، لَا مَا اَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلٰوةَ – (مسلم)

"তোমাদের নিকৃষ্টতম সরদার হচ্ছে তারা যারা তোমাদেরকে ঘৃণা করে এবং তোমরা তাদেরকে ঘৃণা করো, তোমরা তাদের প্রতি লানত বর্ষণ করতে থাকো এবং তারা তোমাদের প্রতি লানত বর্ষণ করতে থাকে। সাহাবীগণ আরজ করেন, হে আল্লাহর রসূল। যখন এ অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন কি আমরা তাদের মোকাবিলা করার জন্য মাথা তুলে দাঁড়াবো না? জবাব দেন ঃ না, যতদিন তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করতে থাকবে। না, যতদিন তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করতে থাকবে।"

এই হাদীসটি ওপরে বর্ণিত শর্তটিকে আরো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। ওপরের হাদীসটি থেকে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, যতদিন তারা ব্যক্তিগত জীবনে নামায পড়তে থাকবে ততদিন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। কিন্তু এই হাদীসটি থেকে একথা জানা যায় যে, নামায পড়া মানে আসলে মুসলমানদের সমাজ জীবনে নামাযের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ কেবলমাত্র তাদের নিজেদের নিয়মিতভাবে নামায পড়াটাই যথেষ্ট হবে না বরং এই সংগে তাদের আওতাধীনে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে সেখানেও কমপক্ষে 'ইকামাতে সালাত' তথা নামায প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাপনা থাকা জরুরী বিবেচিত হবে। তাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা তার আসল প্রকৃতির দিক দিয়ে যে একটি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা এটি হবে তারই একটি আলামত। অন্যথায় যদি এতটুকুও না হয়, তাহলে এর অর্থ হবে যে, তারা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের শাসন ব্যবস্থাকে উলটে ফেলার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানো মুসলমানদের জন্য বৈধ হয়ে যাবে। একথাটিকেই অন্য একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে অন্যান্য আরো বিভিন্ন বিষয়ের সাথে এ ব্যাপারেও অংগীকার নিয়েছেন ঃ

اَنْ لاَ نُنَازِعُ الْاَمْرَ اَهْلَهُ اِلاَّ اَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللّٰهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ

"অর্থাৎ আমরা আমাদের সরদার ও শাসকদের সাথে ঝগড়া করবো না, তবে যখন আমরা তাদের কাজে প্রকাশ্য কুফরী দেখতে পাবো যার উপস্থিতিতে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে পেশ করার জন্য আমাদের কাছে প্রমাণ থাকবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

চার ঃ চতুর্থ যে মূলনীতিটি এ আয়াতটি থেকে স্থায়ী ও চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আল্লাহর হুকুম ও রসূলের সুন্নাত হচ্ছে মৌলিক আইন ও চূড়ান্ত সনদ (Final Authority) মুসলমানদের মধ্যে অথবা মুসলিম সরকার ও প্রজাদের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসার জন্য কুরআন ও সুন্নাতের দিকে ফিরে আসতে হবে। কুরআন ও সুন্নাত এ ব্যাপারে যে ফায়সালা দেবে তার সামনে মাথা নত করে দিতে হবে। এভাবে জীবনের সকল ব্যাপারে কুরআন ও রসূলের সুন্নাতকে সনদ, চূড়ান্ত ফায়সালা ও শেষকথা হিসেবে মেনে নেয়ার বিষয়টি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা তাকে কুফরী জীবন ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়। যে ব্যবস্থায় এ জিনিসটি অনুপস্থিত থাকে সেটি আসলে একটি অনৈসলামী ব্যবস্থা।

এ প্রসংগে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করে বলে থাকেন যে, জীবনের যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালার জন্য কুরআন ও সুন্নাতের দিকে ফিরে যাওয়া কিভাবে সম্ভব হতে পারে? কারণ মিউনিসিপ্যালিটি, রেলওয়ে, ডাকঘর ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় সম্পর্কিত কোন নিয়ম-কানুনের উল্লেখই সেখানে নেই। কিন্তু এ সংশয়টি আসলে দীনের মূলনীতি সঠিকভাবে অনুধাবন না করার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। একজন মুসলমানকে একজন কাফের থেকে যে বিষয়টি আলাদা ও বৈশিষ্ট মণ্ডিত করে সেটি হচ্ছে, কাফের অবাধ স্বাধীনতার দাবীদার। আর মুসলমান মূলত আল্লাহর বান্দা ও দাস হবার পর তার রব মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে যতটুকু স্বাধীনতা দান করেছেন শুধুমাত্র ততটুকুই স্বাধীনতা ভোগ করে। কাফের তার নিজের তৈরী মূলনীতি ও আইন-বিধানের মাধ্যমে তার যাবতীয় বিষয়ের মীমাংসা করে। এসব মূলনীতি ও বিধানের ক্ষেত্রে কোন ঐশী সমর্থন ও স্বীকৃতির প্রয়োজন আছে বলে সে মনে করে না এবং নিজেকে সে এর মুখাপেক্ষীও ভাবে না। বিপরীত পক্ষে মুসলমান তার প্রতিটি ব্যাপারে সর্বপ্রথম আল্লাহ ও তাঁর নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিকে ফিরে যায়। সেখান থেকে কোন নির্দেশ পেলে সে তার অনুসরণ করে। আর কোন নির্দেশ না পেলে কেবল মাত্র এই অবস্থায়ই সে স্বাধীনভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে। এ ক্ষেত্রে তার এই কর্মের স্বাধীনতার মূলভিত্তি একথার ওপরই স্থাপিত হয় যে, এই ব্যাপারে শরীয়াত রচয়িতার পক্ষ থেকে কোন বিধান না দেয়াই একথা প্রমাণ করে যে তিনি এ ক্ষেত্রে কর্মের স্বাধীনতা প্রদান করেছেন।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ
مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا
أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾

৯ রুকূ'

হে নবী! তুমি কি তাদেরকে দেখোনি, যারা এই মর্মে দাবী করে চলছে যে, তারা ঈমান এনেছে সেই কিতাবের প্রতি যা তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এবং সেই সব কিতাবের প্রতি যেগুলো তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল; কিন্তু তারা নিজেদের বিষয়সমূহের ফায়সালা করার জন্য 'তাগুতে'র দিকে ফিরতে চায়, অথচ তাদেরকে তাগুতকে অস্বীকার করার হুকুম দেয়া হয়েছিল?[৯১] —শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে সরল সোজা পথ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

৯০. কুরআন মজীদ যেহেতু নিছক একটি আইনের কিতাব মাত্র নয় বরং একই সংগে এটি একটি শিক্ষা ও উপদেশমূলক গ্রন্থও, তাই প্রথম বাক্যে যে আইনগত মূলনীতির বিবরণ দেয়া হয়েছিল এই দ্বিতীয় বাক্যে তার অন্তরনিহিত কারণ ও যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে দু'টি কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, উপরোল্লিখিত চারটি মূলনীতি মেনে চলা ঈমানের অপরিহার্য দাবী। একদিকে মুসলমান হবার দাবী করা এবং অন্যদিকে এই মূলনীতিগুলো উপেক্ষা করা, এ দু'টি পরস্পর বিরোধী জিনিসের কখনো একত্র সমাবেশ হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, এই মূলনীতিগুলোর ভিত্তিতে নিজেদের জীবন বিধান নির্মাণ করার মধ্যেই মুসলমানদের কল্যাণ নিহিত। কেবলমাত্র এই একটি জিনিসই তাদেরকে দুনিয়ায় সত্য-সরল পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে এবং এর মাধ্যমেই তারা পরকালেও সফলকাম হতে পারে। যে ভাষণে ইহুদীদের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার ওপর মন্তব্য করা হচ্ছিল এই উপদেশ বাণীটি ঠিক তার শেষে উক্ত হয়েছে। এভাবে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাত দীনের এই মূলনীতিগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে যেভাবে অধপতনের গভীর গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তা থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। যখন কোন জনগোষ্ঠী আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের হিদায়াত পেছনে ফেলে দিয়ে এমন সব নেতা ও সরদারের আনুগত্য করতে থাকে, যারা আল্লাহ ও রসূলের হুকুম মেনে চলে না এবং নিজেদের ধর্মীয় নেতা ও রাষ্ট্রীয় শাসকদের কাছে কুরআন ও সুন্নাতের সনদ ও প্রমাণপত্র জিজ্ঞেস না করেই তাদের আনুগত্য করতে থাকে তখন তারা এই বনী ইসরাঈলদের মতোই অসৎ ও অনিষ্টকর কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে এমন সব দোষ-ত্রুটি সৃষ্টি হয়ে যায়, যার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ
الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ
بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا
إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো সেই জিনিসের দিকে, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং এসো রসূলের দিকে, তখন তোমরা দেখতে পাও ঐ মুনাফিকরা তোমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।[৯২] তারপর তখন তাদের কী অবস্থা হয় যখন তাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ তাদের ওপর কোন বিপদ এসে পড়ে? তখন তারা কসম খেতে খেতে তোমার কাছে আসে[৯৩] এবং বলতে থাকে ঃ আল্লাহর কসম, আমরা তো কেবল মংগল চেয়েছিলাম এবং উভয় পক্ষের মধ্যে কোন প্রকারে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাক, এটিই ছিল আমাদের বাসনা।

৯১. এখানে 'তাগুত' বলতে সুস্পষ্টভাবে এমন শাসককে বুঝানো হয়েছে যে আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে অন্য কোন আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং এমন বিচার ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার আনুগত্য করে না এবং আল্লাহর কিতাবকে চূড়ান্ত সনদ (Final Authority) হিসেবে স্বীকৃতিও দেয় না। কাজেই যে আদালত তাগুতের ভূমিকা পালন করছে, নিজের বিভিন্ন বিষয়ের ফায়সালার জন্য তার কাছে উপস্থিত হওয়া যে একটি ঈমান বিরোধী কাজ, এ ব্যাপারে এ আয়াতটির বক্তব্য একেবারে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। আর আল্লাহ ও তাঁর কিতাবের ওপর ঈমান আনার অপরিহার্য দাবি অনুযায়ী এ ধরনের আদালতকে বৈধ আদালত হিসেবে স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানানোই প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য। কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও তাগুতকে অস্বীকার করা, এ দু'টি বিষয় পরস্পরের সাথে অংগাংগীভাবে সংযুক্ত এবং এদের একটি অন্যটির অনিবার্য পরিণতি। আল্লাহ ও তাগুত উভয়ের সামনে একই সাথে মাথা নত করাই হচ্ছে সুস্পষ্ট মুনাফেকী।

৯২. এথেকে জানা যায়, মুনাফিকদের সাধারণ রীতি ছিল, যে মামলার ব্যাপারে তারা আশা করতো যে, ফায়সালা তাদের পক্ষে যাবে সেটি তারা নিয়ে আসতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিন্তু যে মামলাটির ফায়সালা তাদের বিপক্ষে যাবে বলে তারা আশংকা করতো সেটি তাঁর কাছে আনতে অস্বীকার করতো। বর্তমান কালের বহু মুনাফিকেরও এই একই অবস্থা। শরীয়াতের ফায়সালা যদি তাদের অনুকূল হয় তাহলে তারা নত মস্তকে তা মেনে নেয়। অন্যথায় যে আইন, প্রচলিত রীতি–রেওয়াজ ও

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ
وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا
لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ
فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا
رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

—আল্লাহ জানেন তাদের অন্তরে যা কিছু আছে। তাদের পেছনে লেগো না, তাদেরকে বুঝাও এবং এমন উপদেশ দাও, যা তাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যায়। (তাদেরকে জানিয়ে দাও) আমি যে কোন রসূলই পাঠিয়েছি, এ উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তার আনুগত্য করা হবে।[৯৪] আর যদি তারা এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতো যার ফলে যখন তারা নিজেদের ওপর জুলুম করতো তখন তোমার কাছে এসে যেতো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতো আর রসূলও তাদের জন্য ক্ষমার আবেদন করতো, তাহলে নিসন্দেহে তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল হিসেবে পেতো। না, হে মুহাম্মাদ! তোমার রবের কসম, এরা কখনো মু'মিন হতে পারে না যতক্ষণ এদের পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে এরা তোমাকে ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে না নেবে, তারপর তুমি যা ফায়সালা করবে তার ব্যাপারে নিজেদের মনের মধ্যে কোন প্রকার কুণ্ঠা ও দ্বিধার স্থান দেবে না, বরং সর্বান্তকরণে মেনে নেবে।[৯৫]

আদালতের মাধ্যমে তারা নিজেদের মন–মাফিক ফায়সালা লাভের আশা রাখে, তারই কোলে তারা আশ্রয় নেয়।

৯৩. সম্ভবত এর অর্থ হচ্ছে এই যে, যখন মুসলমানরা তাদের মুনাফেকী কার্যকলাপ সম্পর্কে জানতে পারে এবং তার জবাবদিহি করার ও শাস্তিলাভের আশংকা করতে থাকে তখন কসম খেয়ে খেয়ে নিজেদের ঈমানের নিশ্চয়তা দিতে থাকে।

৯৪. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল এ জন্য আসেন না যে, কেবল তাঁর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনতে হবে তারপর ইচ্ছেমতো যে কারো আনুগত্য করা যাবে। বরং রসূলের আগমনের উদ্দেশ্যই এই হয় যে, জীবন যাপনের জন্য যে আইন কানুন তিনি আনেন

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٦﴾ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾

যদি আমি তাদের হুকুম দিতাম, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো অথবা নিজেদের ঘর থেকে বের হয়ে যাও, তাহলে তাদের খুব কম লোকই এটাকে কার্যকর করতো।[৯৬] অথচ তাদেরকে যে নসীহত করা হয় তাকে যদি তারা কার্যকর করতো তাহলে এটি হতো তাদের জন্য অধিকতর ভালো ও অধিকতর দৃঢ়তা ও অবিচলতার প্রমাণ।[৯৭] আর এমনটি করলে আমি নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে অনেক বড় পুরস্কার দিতাম এবং তাদেরকে সত্য সরল পথ দেখাতাম।[৯৮]

দুনিয়ার সমস্ত আইন কানুন বাদ দিয়ে কেবল মাত্র তারই অনুসরণ করতে হবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি যে বিধান দেন সমস্ত বিধান ত্যাগ করে একমাত্র তাকেই কার্যকর করতে হবে। যদি কেউ এ কাজে ব্রতী না হয়, তাহলে তার নিছক রসূলকে রসূল মেনে নেয়া অর্থহীন হয়ে পড়ে।

৯৫. এই আয়াতে দেয়া নির্দেশটি কেবল মাত্র রসূলের জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং কিয়ামত পর্যন্ত এটি কার্যকর হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছ থেকে যা কিছু এনেছেন এবং আল্লাহর হেদায়াত ও পথপ্রদর্শনের ভিত্তিতে যে পদ্ধতিতে তিনি কাজ করেছেন, তা চিরস্থায়ীভাবে মুসলমানদের জন্য চূড়ান্ত ফায়সালাকারী সনদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই সনদটি মানা ও নামানার ওপরই কোন ব্যক্তির মু'মিন হওয়া ও না হওয়া নির্ভর করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে একথাটিই এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ

"তোমাদের কোন ব্যক্তি মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমি যে পদ্ধতির প্রবর্তন করেছি তার অধীনতা স্বীকার করে নেবে।"

৯৬. অর্থাৎ যখন তারা শরীয়াত মেনে চলতে গিয়ে সামান্যতম ক্ষতি বা কষ্ট বরদাশত করতে পারে না তখন তাদের কাছ থেকে কোন বড় রকমের ত্যাগ ও কুরবানীর আশা কোনক্রমেই করা যেতে পারে না। তাদের কাছে যদি প্রাণদান বা ঘর বাড়ি পরিত্যাগ করার দাবী করা হয় তাহলে তারা সংগে সংগেই সটকে পড়বে এবং ঈমান ও আনুগত্যের পরিবর্তে কুফরী ও নাফরমানির পথ অবলম্বন করবে।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ
عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ
اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۝٦٩ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ۝٧٠

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে সে তাদের সহযোগী হবে, যাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে।[৯৯] মানুষ যাদের সংগ লাভ করতে পারে তাদের মধ্যে এরা কতই না চমৎকার সংগী।[১০০] আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া এই হচ্ছে প্রকৃত অনুগ্রহ এবং যথার্থ সত্য জানার জন্য একমাত্র আল্লাহর জ্ঞানই যথেষ্ট।

৯৭. অর্থাৎ যদি এরা সন্দেহ সংশয় ও দ্বিধার পথ পরিহার করে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে রসূলের আনুগত্যের পথে এগিয়ে চলতো এবং কোন অবস্থায় দোদুল্যমান না হতো, তাহলে এদের জীবন অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা মুক্ত হতো। এদের চিন্তা-ভাবনা, নীতি-নৈতিকতা, লেনদেন সবকিছুই একটি স্থায়ী ও সুদৃঢ় বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো। একটি সত্য-সরল রাজপথে দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে এগিয়ে চলার ফলে যে সাফল্য ও সমৃদ্ধি অর্জিত হয় তা তারা অর্জন করতে সক্ষম হতো। যে ব্যক্তি দ্বিধা ও দোদুল্যমান অবস্থার শিকার হয়, কখনো এ পথে কখনো ওপথে চলে এবং কোন একটি পথের নির্ভুলতা সম্পর্কে তার মনে আস্থারভাব জাগে না, তার সারাটা জীবন কাটে কচু পাতায় রাখা পানির মতো অবস্থায় এবং তার সারা জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

৯৮. অর্থাৎ যখন তারা সংশয় পরিহার করে ঈমান ও নিশ্চিত বিশ্বাস সহকারে রসূলের আনুগত্য করার ফায়সালা করে তখন আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের সামনে প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের সরল-সোজা পথ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তখন নিজেদের শক্তি ও মেহনত যে পথে ব্যবহার করলে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ আসল মনযিলে মাকসূদের দিকে এগিয়ে যাবে সে পথটি তারা পরিষ্কার দেখতে পায়।

৯৯. সিদ্দীক বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যে পরম সত্যনিষ্ঠ ও সত্যবাদী। তার মধ্যে সততা ও সত্যপ্রিয়তা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত থাকে। নিজের আচার-আচরণ ও লেনদেনে সে হামেশা সুস্পষ্ট ও সরল সোজা পথ অবলম্বন করে। সে সবসময় সাচ্চা দিলে হক ও ইনসাফের সহযোগী হয়। সত্য ও ন্যায়নীতি বিরোধী যে কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে সে পর্বত সমান অটল অস্তিত্ব নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে সামান্যতম দুর্বলতাও দেখায় না। সে এমনই পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হয় যে, তার আত্মীয়-অনাত্মীয়, বন্ধু-শত্রু, আপন-পর কেউই তার কাছ থেকে নির্লজ্জ ও নিখাদ সত্যপ্রীতি, সত্য-সমর্থন ও সত্য-সহযোগিতা ছাড়া আর কিছুরই আশংকা করে না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا
جَمِيْعًا ﴿٧١﴾ وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ
قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ﴿٧٢﴾ وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ
فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ
كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧٣﴾ فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۭ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٧٤﴾

১০ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ। মোকাবিলা করার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকো।[১০১] তারপর সুযোগ পেলে পৃথক পৃথক বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে বের হয়ে পড়ো অথবা এক সাথে। হ্যাঁ, তোমাদের কেউ কেউ এমনও আছে যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে গড়িমসি করে।[১০২] যদি তোমাদের ওপর কোন মুসিবত এসে পড়ে তাহলে সে বলে আল্লাহ আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন, আমি তাদের সাথে যাইনি। আর যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়, তাহলে সে বলে—এবং এমনভাবে বলে যেন তোমাদের ও তার মধ্যে কোন প্রীতির সম্পর্ক ছিলই না, —হায়! যদি আমিও তাদের সাথে হতাম তাহলে বিরাট সাফল্য লাভ করতাম। (এই ধরনের লোকদের জানা উচিত) আল্লাহর পথে তাদের লড়াই করা উচিত যারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিকিয়ে দেয়।[১০৩] তারপর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে লড়বে এবং মারা যাবে অথবা বিজয়ী হবে তাকে নিশ্চয়ই আমি মহাপুরস্কার দান করবো।

শহীদ শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে সাক্ষী। শহীদ বলতে এমন ব্যক্তি বুঝায় যে নিজের জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তার ঈমানের সত্যতার সাক্ষ প্রদান করে। আল্লাহর পথে লড়াই করে প্রাণ উৎসর্গকারীকেও এ কারণেই শহীদ বলা হয় যে, সে প্রাণ উৎসর্গ করে একথা প্রমাণ করে দেয় যে, সে যে জিনিসের ওপর ঈমান এনেছিল তাকে যথার্থই সাচ্চা দিলে সত্য মনে করতো এবং তা তার কাছে এত বেশী প্রিয় ছিল যে, তার জন্য নিজের প্রাণ অকাতরে বিলিয়ে দিতেও দ্বিধা করেনি। আবার এমন ধরনের সত্যনিষ্ঠ

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ
الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَاجْعَلْ لَنَا
مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ
الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

তোমাদের কী হলো, তোমরা আল্লাহর পথে অসহায় নরনারী ও শিশুদের জন্য লড়বে না, যারা দুর্বলতার কারণে নির্যাতীত হচ্ছে? তারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব! এই জনপদ থেকে আমাদের বের করে নিয়ে যাও, যার অধিবাসীরা জালেম এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের কোন বন্ধু, অভিভাবক ও সাহায্যকারী তৈরী করে দাও।[১০৪] যারা ঈমানের পথ অবলম্বন করেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তারা লড়াই করে তাগুতের পথে।[১০৫] কাজেই শয়তানের সহযোগীদের সাথে লড়ো এবং নিশ্চিত জেনে রাখো, শয়তানের কৌশল আসলে নিতান্তই দুর্বল।[১০৬]

ব্যক্তিদেরকেও শহীদ বলা হয় যারা এতই নির্ভরযোগ্য হয় যে, তারা কোন বিষয়ে সাক্ষ দিলে তাকে নির্দ্বিধায় সত্য ও সঠিক বলে স্বীকার করে নেয়া হয়।

সালেহ বা সৎকর্মশীল বলতে এমন ব্যক্তি বুঝায় যে তার নিজের চিন্তাধারা, আকীদা-বিশ্বাস, ইচ্ছা, সংকল্প, কথা ও কর্মের মাধ্যমে সত্য-সরল পথে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং এই সংগে নিজের জীবনে সৎ ও সুনীতি অবলম্বন করে।

১০০. অর্থাৎ দুনিয়ায় যারা এ ধরনের লোকদের সংগ লাভ করে এবং আখেরাতেও এদের সাথী হয় তারা বড়ই সৌভাগ্যবান। অবশ্যি কোন ব্যক্তির অনুভূতি মরে গেলে ভিন্ন কথা, নয়তো অসৎ ও দুশ্চরিত্র লোকদের সাথে দুনিয়ায় জীবন যাপন করা আসলে একটি ভয়াবহ শাস্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। আর আখেরাতে তারা যে পরিণামের সম্মুখীন হবে সেই একই পরিণামের ভাগী হয়ে আখেরাতে তাদের সাথী হওয়ার শাস্তি তো তুলনা বিহীন। তাই তো আল্লাহর নেক্কার বান্দারা হামেশা এই আকাংখা পোষণ করে যে, তারা যেন নেক লোকদের সমাজে বসবাস করতে পারে এবং মৃত্যুর পরও যেন তাদেরই সাথে থাকে।

১০১. উল্লেখ্য এ ভাষণটি এমন এক সময় নাযিল হয়েছিল যখন ওহোদ যুদ্ধের পরাজয়ের পর মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার গোত্রগুলোর সাহস বেড়ে গিয়েছিল এবং বিপদ আপদ চতুর্দিক থেকে মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলেছিল। সে সময় প্রায় প্রতিদিনই নানান ধরনের দুঃসংবাদ আসতো। উমুক গোত্র বিরূপ হয়ে গেছে। উমুক গোত্র শত্রুতা শুরু করে দিয়েছে। উমুক জায়গায় আক্রমণের প্রস্তুতি চলছে। মুসলমানদের সাথে এক নাগাড়ে বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছিল। তাদের প্রচারকদেরকে দীন প্রচারের উদ্দেশ্যে দাওয়াত দিয়ে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করা হতো। মদীনার বাইরে তাদের জানমালের কোন নিরাপত্তা ছিল না। এ অবস্থায় এসব বিপদের ঢেউয়ের আঘাতে যাতে ইসলামের তরী ডুবে না যায় সেজন্য মুসলমানদের পক্ষ থেকে একটি জোরদার প্রচেষ্টা ও জীবন উৎসর্গকারী সংগ্রাম পরিচালনার প্রয়োজন ছিল।

১০২. এর এক অর্থ এও হতে পারে যে, নিজে তো গড়িমসি করেই এমন কি অন্যদেরকেও হিম্মতহারা করে দেয়, তাদের বুকে ভয় ঢুকিয়ে দেয় এবং জিহাদ বন্ধ করার জন্য এমন ধরনের কথা বলতে থাকে যার ফলে তারা নিজেদের জায়গায় চুপচাপ বসে থাকে।

১০৩. অর্থাৎ আল্লাহর পথে লড়াই করা দুনিয়ার লাভ ও দুনিয়ার স্বার্থ পূজারী লোকদের কাজ নয়। এটা এমন এক ধরনের লোকের কাজ যারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখে এবং নিজেদের পার্থিব প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির সমস্ত সম্ভাবনা ও সব ধরনের পার্থিব স্বার্থ একমাত্র আল্লাহর জন্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাদের রব যেন তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং এই দুনিয়ায় তাদের ত্যাগ ও কুরবানী বিফল হয়ে গেলেও আখেরাতেও যেন বিফলে না যায়।

১০৪. এখানে এমন সব মজলুম শিশু, নারী ও পুরুষদের দিকে ইংগিত করা হয়েছে, যারা মক্কায় ও আরবের অন্যান্য গোত্রের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু তাদের হিজরত করার শক্তি ছিল না এবং নিজেদেরকে কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন থেকে রক্ষা করার ক্ষমতাও ছিল না। এদের ওপর বিভিন্ন প্রকার জুলুম চালানো হচ্ছিল। কেউ এসে তাদেরকে এই জুলুমের সাগর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে, এই ছিল তাদের দোয়া ও প্রত্যাশা।

১০৫. এটি আল্লাহর একটি দ্ব্যর্থহীন ফায়সালা। আল্লাহর পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে লড়াই করা হচ্ছে ঈমানদারদের কাজ। যথার্থ ও সত্যিকার মু'মিন এই কাজ থেকে কখনো বিরত থাকবে না। আর আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহ বিরোধী ও আল্লাহদ্রোহীদের রাজত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাগুতের পথে লড়াই করা হচ্ছে কাফেরদের কাজ। কোন ঈমানদার ব্যক্তি এ কাজ করতে পারে না।

১০৬. অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে শয়তান ও তার সাথীরা বিরাট প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে আসে এবং জবরদস্ত কৌশল অবলম্বন করে কিন্তু তাদের প্রস্তুতি ও কৌশল দেখে ঈমানদারদের ভীত হওয়া উচিত নয় অবশ্যি তাদের সকল প্রস্তুতি ও কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ
آتُوا الزَّكَاةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ
كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ
الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۚ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ ۖ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

১১ রুকূ'

তোমরা কি তাদেরকেও দেখেছো, যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমাদের হাত গুটিয়ে রাখো এবং নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও? এখন তাদেরকে যুদ্ধের হুকুম দেয়ায় তাদের একটি দলের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, তারা মানুষকে এমন ভয় করছে যেমন আল্লাহকে ভয় করা উচিত অথবা তার চেয়েও বেশী।[১০৭] তারা বলছে ঃ হে আমাদের রব! আমাদেব জন্য এই যুদ্ধের হুকুমনামা কেন লিখে দিলে? আমাদের আরো কিছু সময় অবকাশ দিলে না কেন? তাদেরকে বলো ঃ দুনিয়ার জীবন ও সম্পদ অতি সামান্য এবং একজন আল্লাহর ভয়ে ভীত মানুষের জন্য আখেরাতই উত্তম। আর তোমাদের ওপর এক চুল পরিমাণও জুলুম করা হবে না।[১০৮]

১০৭. এই আয়াতটির তিনটি অর্থ হয়। এই তিনটি অর্থই তাদের নিজস্ব পরিসরে যথার্থ ও নির্ভুল ঃ

এর একটি অর্থ হচ্ছে, প্রথমে লোকেরা নিজেরাই যুদ্ধ করার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিল। বারবার বলতো ঃ আমাদের ওপর জুলুম করা হচ্ছে। নিপীড়ন নির্যাতন চালানো হচ্ছে। মারপিট করা হচ্ছে। গালি গালাজ করা হচ্ছে। আমরা আর কতদিন সবর করবো? আমাদের মোকাবিলা করার অনুমতি দেয়া হোক। সে সময় তাদেরকে বলা হতো, সবর করো এবং নামায ও যাকাতের মাধ্যমে নিজেদের সংশোধন করতে থাকো। তখন এই সবর ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করার হুকুম পালন করা তাদের জন্য বড়ই কষ্টকর হতো। কিন্তু এখন লড়াই করার হুকুম দেবার পর সেই লড়াইয়ের দাবীদারদের একটি দল শত্রুদের সংখ্যা ও যুদ্ধের বিপদ দেখে আতংকিত হয়ে পড়ছিল।

দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, যতদিন নামায, রোযা এবং এই ধরনের নির্ঝনঝাট ও ঝুঁকিহীন কাজের হুকুম ছিল এবং যুদ্ধ করে প্রাণ দান করার প্রশ্ন সামনে আসেনি ততদিন এরা খাঁটি দীনদার ও ঈমানদার ছিল। কিন্তু এখন সত্যের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করার কাজ শুরু হতেই এরা ভীত ও আতংকিত হয়ে পড়ছে।

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ
وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ
سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ ۗ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ فَمَالِ
هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾ مَّا أَصَابَكَ مِنْ
حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَاكَ
لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾

আর মৃত্যু, সে তোমরা যেখানেই থাকো না কেন সেখানে তোমাদের নাগাল পাবেই, তোমরা কোন মজবুত প্রাসাদে অবস্থান করলেও।

যদি তাদের কোন কল্যাণ হয় তাহলে তারা বলে, এতো আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। আর কোন ক্ষতি হলে বলে, এটা হয়েছে তোমার বদৌলতে।[১০৯] বলে দাও, সবকিছুই হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে। লোকদের কী হয়েছে, কোন কথাই তারা বোঝে না।

হে মানুষ! যে কল্যাণই তুমি লাভ করে থাকো তা আল্লাহর দান এবং যে বিপদ তোমার ওপর এসে পড়ে তা তোমার নিজের উপার্জন ও কাজের বদৌলতেই আসে।

হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে মানব জাতির জন্য রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি এবং এর ওপর আল্লাহর সাক্ষ যথেষ্ট।

এর তৃতীয় অর্থটি হচ্ছে, প্রথমে তো লুটপাট করার ও নিজের স্বার্থোদ্ধারের লড়াই চালিয়ে যাবার জন্য তাদের তরবারি সবসময় কোষমুক্ত থাকতো এবং রাতদিন যুদ্ধ-বিগ্রহই ছিল তাদের কাজ। সে সময় তাদেরকে রক্তপাত থেকে বিরত রাখার জন্য নামায ও যাকাতের মাধ্যমে নফসের সংশোধন করার হুকুম দেয়া হয়েছিল। আর এখন আল্লাহর জন্য তলোয়ার ওঠাবার হুকুম দেবার পর দেখা যাচ্ছে, যারা স্বার্থোদ্ধারের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সিংহ ছিল আল্লাহর জন্য লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তারা হয়ে গেছে বুজদিল কাপুরুষ। নফ্‌স ও শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যে হাতে ইতিপূর্বে তরবারি ঝল্‌সে উঠছিল, আল্লাহর পথে তরবারি চালাবার প্রশ্নে সে হাত নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

এ তিনটি অর্থই বিভিন্ন ধরনের লোকদের আচরণের সাথে খাপ খেয়ে যায়। এখানে আয়াতের মধ্যে এমন ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা একই সাথে এই তিনটি অর্থই প্রকাশ করতে সক্ষম।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ
حَفِيْظًا ﴿٨٠﴾ وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۡ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ
مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِىْ تَقُوْلُ ؕ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ
عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٨١﴾ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ
الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ﴿٨٢﴾

যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করলো সে আসলে আল্লাহরই আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিলো, যাই হোক, তাদের ওপর তো আমি তোমাকে পাহারাদার বানিয়ে পাঠাইনি।[১১০]

তারা মুখে বলে, আমরা অনুগত ফরমাবরদার। কিন্তু যখন তোমার কাছ থেকে বের হয়ে যায় তখন তাদের একটি দল রাত্রে সমবেত হয়ে তোমার কথার বিরুদ্ধে পরামর্শ করে। আল্লাহ তাদের এই সমস্ত কানকথা লিখে রাখছেন। তুমি তাদের পরোয়া করো না, আল্লাহর ওপর ভরসা করো, ভরসা করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? যদি এটি আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষ থেকে হতো, তাহলে তারা এর মধ্যে বহু বর্ণনাগত অসংগতি খুঁজে পেতো।[১১১]

১০৮. অর্থাৎ যখন তোমরা আল্লাহর দীনের খেদমত করবে এবং তাঁর পথে প্রাণপাত পরিশ্রম করতে থাকবে তখন আল্লাহর কাছে তোমাদের প্রতিদান নষ্ট হয়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।

১০৯. অর্থাৎ যখন বিজয় ও সাফল্য আসে তখন তাকে আল্লাহর অনুগ্রহ গণ্য করে থাকো এবং একথা ভুলে যাও যে, আল্লাহ তাঁর নবীর মাধ্যমেই এই অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু নিজেদের দুর্বলতা ও ভুলের জন্য কোথাও পরাজয় বরণ করে থাকলে এবং সামনে এগিয়ে যাওয়া পা পিছিয়ে আসতে থাকলে তখন নবীর ঘাড়েই সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা দায়মুক্ত হতে চাও।

১১০. অর্থাৎ তারা নিজেরাই নিজেদের কাজের জন্য দায়ী। তাদের কাজের জন্য তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। তোমাকে কেবল এতটুকু কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যে, তুমি আল্লাহর নির্দেশ ও বিধানসমূহ তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে। এ কাজটি তুমি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছো। এখন তাদের হাত ধরে জবরদস্তি সত্য-সরল পথে পরিচালিত করা তোমার কাজ নয়। তোমার মাধ্যমে যে হিদায়াত পৌঁছানো হচ্ছে তারা

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ
إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ
مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾
فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا
وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٨٤﴾

তারা যখনই কোন সন্তোষজনক বা ভীতিপ্রদ খবর শুনতে পায় তখনই তা চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। অথচ তারা যদি এটা রসূল ও তাদের জামায়াতের দায়িত্বশীল লোকদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়, তাহলে তা এমন লোকদের গোচরীভূত হয়, যারা তাদের মধ্যে কথা বলার যোগ্যতা রাখে এবং তা থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।[১১২] তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না হতো তাহলে (তোমাদের এমন সব দুর্বলতা ছিল যে) মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া তোমরা সবাই শয়তানের পেছনে চলতে থাকতে।

কাজেই হে নবী! তুমি আল্লাহর পথে লড়াই করো। তুমি নিজের সত্তা ছাড়া আর কারো জন্য দায়ী নও। অবশ্যি ঈমানদারদেরকে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করো। আল্লাহ শীঘ্রই কাফেরদের শক্তির মস্তক চূর্ণ করে দেবেন। আল্লাহর শক্তি সবচেয়ে জবরদস্ত এবং তাঁর শাস্তি সবচেয়ে বেশী কঠোর।

যদি তার অনুসরণ না করে, তাহলে তার কোন দায়-দায়িত্ব তোমার ওপর থাকবে না। তারা কেন নাফরমানি করেছিল, এর জবাবদিহি করার জন্য তোমাকে পাকড়াও করা হবে না।

১১১. মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানদার লোকদের যে আচরণ সম্পর্কে ওপরের আয়াতগুলোতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে তার প্রধান ও আসল কারণ ছিল এই যে, কুরআনে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হবার ব্যাপারে তাদের মনে সন্দেহ ছিল। তারা একথা বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, সত্যি সত্যিই রসূলের ওপর অহী নাযিল হয় এবং এই যে হিদায়াতগুলো আসছে, এগুলো সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে আসছে। তাই তাদের মুনাফেকী আচরণের নিন্দা করার পর এখন বলা হচ্ছে, তারা কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনাই করে না। কেননা এই গ্রন্থ নিজেই সাক্ষী দিচ্ছে যে, এটি আল্লাহ ছাড়া আর

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ
شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ﴿٨٥﴾
وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ﴿٨٦﴾ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۗ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ﴿٨٧﴾

যে ব্যক্তি কল্যাণ ও সৎকাজের সুপারিশ করবে, সে তা থেকে অংশ পাবে এবং যে ব্যক্তি অকল্যাণ ও অসৎকাজের সুপাবিশ করবে, সে তা থেকে অংশ পাবে।[১১৩] আর আল্লাহ সব জিনিসের প্রতি নজর বাখেন।

আর যখনই কেউ মর্যাদা সহকারে তোমাকে সালাম করে তখন তাকে তার চাইতে ভালো পদ্ধতিতে জবাব দাও অথবা কমপক্ষে তেমনিভাবে।[১১৪] আল্লাহ সব জিনিসের হিসেব গ্রহণকারী। আল্লাহ তিনিই যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি তোমাদের সবাইকে সেই কিয়ামতের দিন একত্র করবেন, যার আসার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আর আল্লাহর কথার চাইতে বেশী সত্য আর কার কথা হতে পারে?[১১৫]

কারো বাণী হতেই পারে না। কোন মানুষের ক্ষমতা নেই বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দিতে থাকবে এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার সমস্ত ভাষণ একটি সুসামঞ্জস্য, ভারসাম্যপূর্ণ ও এক বর্ণের মোতির মালায় পরিণত হবে। এর কোন অংশ অন্য অংশের সাথে সংঘর্ষশীল হবে না। এর মধ্যে মত পরিবর্তনের কোথাও কোন নাম নিশানাও পাওয়া যাবে না। ভাষণদাতার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানসিক অবস্থার কোন প্রতিফলনও সেখানে দেখা যাবে না। এই ভাষণের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করার কোন প্রশ্নই কখনো উত্থাপিত হবে না। এই ধরনের ভাষণ দেয়া কোন মানুষের জন্য কোন কালেই সম্ভবপর নয়।

১১২. এ সময় সারা দেশে জরুরী অবস্থা বিরাজ করছিল। তাই চারদিকে নানান ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়ছিল। কখনো ভিত্তিহীন অতিরঞ্জিত আশংকার খবর এসে পৌঁছতো। এর ফলে হঠাৎ মদীনা ও তার আশেপাশে ভীতি চড়িয়ে পড়তো। কখনো ধূর্ত শত্রু কোন যথার্থ বিপদকে গোপন করার জন্য সন্তোষজনক খবর পাঠাতো এবং তা শুনে সাধারণ মানুষ নিশ্চিন্ত ও গাফেল হয়ে পড়তো। এই গুজব ছড়াবার ব্যাপারে নিছক হাংগামাবাজ লোকেরা বড়ই উৎসাহ বোধ করতো। তাদের কাছে ইসলাম ও জাহেলীয়াতের এই সংঘাত কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না। এই ধরনের দায়িত্বহীন গুজব রটানোর পরিণতি

কত সুদূর প্রসারী হতে পারে সে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। তাদের কানে কোন কথা পড়লেই হলো, তারা তাই নিয়ে জায়গায় জায়গায় ফুঁকে দিতে থাকতো। এই আয়াতে এই ধরনের লোকদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে এবং তাদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়ে গুজব ছড়ানো থেকে বিরত থাকার এবং কোন কিছু শুনলে তা সংগে সংগেই দায়িত্বশীলদের কানে পৌঁছিয়ে দিয়ে পরিপূর্ণ নীরবতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১১৩. অর্থাৎ এটা যার যেমন পছন্দ এবং যার যেমন ভাগ্য। কেউ আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা চালাবার এবং সত্যের শির উঁচু রাখার জন্য লোকদেরকে উৎসাহিত করে—এর পুরস্কারও সে পায়। আবার কেউ মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলার, তাদেরকে নির্বীর্য ও সাহসহীন করার এবং তাদেরকে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম থেকে বিরত রাখার জন্য নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে—এর শাস্তিও সে পায়।

১১৪. সে সময় মুসলিম ও অমুসলিমদের সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। আর সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেলে অবস্থা যেমন দাঁড়ায় অর্থাৎ কোথাও মুসলমানরা যেন অন্যদের সাথে অসদ্ব্যবহার না করে, এর আশংকা দেখা দিয়েছিল। তাই তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যারা তোমাদের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করবে তোমরাও তাদের সাথে তেমনি সম্মানজনক বা তার চাইতেও বেশী সম্মানজনক ব্যবহার করবে। ভদ্রতা ও রুচিশীলতার জবাব ভদ্রতা ও রুচিশীলতার মাধ্যমে দাও। বরং তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে তোমরা অন্যদের চাইতও বেশী ভদ্রতা ও রুচিশীলতার পরিচয় দেবে। দুনিয়াকে ন্যায় ও সত্যের সরল পথের দিকে আহবান জানানোর দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে যে আহবায়ক দলটির যাত্রা শুরু হয়েছে, তার জন্য প্রতিপক্ষের প্রতি বিকৃত মুখভংগী করা এবং রূঢ় ব্যবহার ও তিক্ত বাক্যবাণে তাদেরকে বিদ্ধ করা শোভা পায় না। এতে নফ্স পরিতৃপ্ত হয় ঠিকই কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তাদের অভিযাত্রা তা পুরোপুরি নিষ্ফল হয়ে যায়।

১১৫. অর্থাৎ কাফের, মুশরিক ও নাস্তিকরা যা কিছু করছে তাতে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে কোন পরিবর্তন সূচিত হয় না। তাঁর এক আল্লাহ এবং নিরংকুশ ও সার্বভৌম ক্ষমতা-সম্পন্ন ইলাহ হওয়া এমন একটি বাস্তব সত্য, যাকে উল্টে দেবার ক্ষমতা কারো নেই। তারপর একদিন তিনি সমগ্র মানব জাতিকে একত্রে সমবেত করে তাদের প্রত্যেককে তার কর্মফল দেখিয়ে দেবেন। তাঁর ক্ষমতার সীমানা পেরিয়ে কেউ পালিয়ে যেতে পারবে না। কাজেই আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহাত্মক আচরণকারীদের বিরুদ্ধে কেউ তাঁর পক্ষ থেকে বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করবে এবং তাদের সাথে অসদাচরণ করে ও তিক্ত বাক্য শেলে তাদেরকে বিদ্ধ করে আহত হৃদয়ে প্রলেপ লাগাবে, আল্লাহর এর কোন প্রয়োজন নেই।

এটা হচ্ছে এই আয়াতটির সাথে ওপরের আয়াতের সম্পর্কের বিষয়। কিন্তু পেছনের দু'-তিন রুকূ' থেকে যে বর্ণনার ধারাবাহিকতা চলে আসছে এই আয়াতটিতে তার বক্তব্যের সমাপ্তি ঘটেছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে আয়াতটির অর্থ এই দাঁড়ায়, দুনিয়ার জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তি তার ইচ্ছেমতো পথে চলতে পারে এবং যে পথে ইচ্ছে সে তার প্রচেষ্টা ও কর্মশক্তি নিয়োগ করতে পারে। এ ব্যাপারে তার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু সবশেষে একদিন সবাইকে আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে। সেদিন আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রভু থাকবে না। সেখানে সবাই নিজের প্রচেষ্টা ও কাজের ফল স্বচক্ষে দেখে নেবে।

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ؕ
اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ
لَهٗ سَبِيْلًا ۞

১২ রুকূ'

তারপর তোমাদের কী হয়েছে, মুনাফিকদের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে দ্বিমত পাওয়া যাচ্ছে?[১১৬] অথচ যে দুষ্কৃতি তারা উপার্জন করেছে তার বদৌলতে আল্লাহ তাদেরকে উল্টো দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে।[১১৭] তোমরা কি চাও, আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেননি তোমরা তাকে হিদায়াত করবে? অথচ আল্লাহ যাকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন তার জন্য তুমি কোন পথ পাবে না।

১১৬. এখানে এমন সব মুনাফিক মুসলমানদের কথা আলোচনা করা হয়েছে যারা মক্কায় ও আরবের অন্যান্য এলাকায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু হিজরাত করে দারুল ইসলামে না এসে যথারীতি নিজেদের কাফের গোত্রের মধ্যে অবস্থান করছিল। তাদের কাফের গোত্র ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব কাজ করতো তারাও তাদের সাথে কমবেশী সেসব কাজে কার্যত অংশ নিতো। তাদের সাথে কোন্ ধরনের ব্যবহার করা যায়, এ বিষয়টি মুসলমানদের জন্য আসলে অত্যন্ত জটিল ছিল। কেউ কেউ বলছিল, যাই হোক না কেন, তারা তো মুসলমান, কালেমা পড়ে, নামায পড়ে, রোযা রাখে, কুরআন তেলাওয়াত করে। তাদের সাথে কাফেরদের মতো ব্যবহার কেমন করে করা যেতে পারে? এই রুকূ'তে মহান আল্লাহ মুসলমানদের মতবিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা করে দিয়েছেন।

এ প্রসংগে একটি কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে। অন্যথায় কুরআনের কেবল এই জায়গায় নয় আরো বিভিন্ন জায়গায়, যেখানে হিজরাত না করার কারণে মুসলমানদেরকে মুনাফিকের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে, সেখানে কুরআন মজীদের আসল বক্তব্য অনুধাবন করা সম্ভব হবে না। আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনা তাইয়েবায় হিজরাত করে আসেন এবং যখন আরব দেশে এমন একটি ছোট্ট ভূখণ্ড পাওয়া গিয়েছিল, যেখানে একজন মু'মিন বান্দার জন্য তার দীন ও ঈমানের দাবী পূরণ করা সম্ভবপর ছিল তখন যেখানে, যে এলাকায় ও যেসব গোত্রের মধ্যে ঈমানদারগণ কাফেরদের অধীনে ইসলামী জীবন যাপনের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত ছিল, সেখান থেকে তাদের জন্য হিজরাত করার ও মদীনার দারুল ইসলামে চলে আসার সাধারণ হুকুমনামা জারী করে দেয়া হয়েছিল। সে সময় যাদের হিজরাত করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র এজন্য হিজরাত করছিল না যে, তাদের নিজেদের ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন ও নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থ তাদের কাছে ইসলামের তুলনায় বেশী প্রিয় ছিল, তাদের সবাইকে মুনাফিক গণ্য করা হয়। আর যারা যথার্থই একেবারে অক্ষম ছিল তাদেরকে 'মুসতাদআফীন' (দুর্বল) গণ্য করা হয়। যেমন পরবর্তী ১৪ রুকূ'তে বলা হয়েছে।

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ
أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ
حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾

তারা তো এটাই চায়, তারা নিজেরা যেমন কাফের হয়েছে তেমনি তোমরাও কাফের হয়ে যাও, যাতে তারা ও তোমরা সমান হয়ে যাও। কাজেই তাদের মধ্য থেকে কাউকেও নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যতক্ষণ না তারা আল্লাহর পথে হিজরাত করে আসে। আর যদি তারা (হিজরাত থেকে) বিরত থাকে, তাহলে তাদেরকে যেখানেই পাও ধরো এবং হত্যা করো[১১৮] এবং তাদের মধ্য থেকে কাউকেও নিজেদের বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করো না।

এখন একথা সুস্পষ্ট যে, দারুল কুফরে অবস্থানকারী কোন মুসলমানকে নিছক হিজরাত না করার কারণে মুনাফিক কেবলমাত্র তখনি বলা যেতে পারে যখন দারুল ইসলামের পক্ষ থেকে এ ধরনের মুসলমানদেরকে সেখানে বসবাস করার আহবান জানানো হবে অথবা কমপক্ষে তাদের জন্য দারুল ইসলামের দরজা উন্মুক্ত থাকবে। এ অবস্থায় অবশ্যি যেসব মুসলমান দারুল কুফরকে দারুল ইসলামে পরিণত করার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাবে না আবার অন্য দিকে সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হিজরাতও করবে না তারা সবাই মুনাফিক বলে গণ্য হবে। কিন্তু দারুল ইসলামের পক্ষ থেকে যদি আমন্ত্রণই না জানানো হয় এবং মুহাজিরদের জন্য তাদের দরজা যদি উন্মুক্তই না থাকে, তাহলে এ অবস্থায় শুধুমাত্র হিজরাত না করলে কোন মুসলমান মুনাফিক হয়ে যাবে না। বরং এ অবস্থায় যখন সে কোন মুনাফিক সুলভ কাজ করবে কেবলমাত্র তখনই মুনাফিক গণ্য হবে।

১১৭. অর্থাৎ যে দ্বিমুখী নীতি, সুবিধাবাদিতা এবং আখেরাতের ওপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেবার কর্মনীতি তারা অবলম্বন করেছে, তার বদৌলতে আল্লাহ তাদেরকে আবার সেদিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন যেদিক থেকে তারা এসেছিল। তারা কুফরী থেকে বের হয়ে ইসলামের দিকে এগিয়ে এসেছিল ঠিকই কিন্তু এই এলাকায় এসে অবস্থান করার এবং একমুখী ও একাগ্র হবার প্রয়োজন ছিল, ঈমান ও ইসলামের স্বার্থের সাথে সংঘর্ষশীল প্রতিটি স্বার্থ পরিহার করার প্রয়োজন ছিল এবং আখেরাতের ওপর এমন দৃঢ় বিশ্বাসের প্রয়োজন ছিল যার ভিত্তিতে মানুষ নিশ্চিন্তে নিজের দুনিয়ার স্বার্থ পরিহার করতে পারে। কিন্তু তা তারা অর্জন করতে পারেনি। তাই তারা যেদিক থেকে এসেছিল পেছন ফিরে আবার সেদিকেই চলে গেছে। কাজেই এখন তাদের ব্যাপারে মতবিরোধ করার আর কোন অবকাশই নেই।

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ
حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ
وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾
سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ ۖ
كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ
وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿٩١﴾

অবশ্যি সেই সব মুনাফিক এই নির্দেশের আওতাভুক্ত নয়, যারা এমন কোন জাতির সাথে মিলিত হয়, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ।[১১৯] এভাবে সেই সব মুনাফিকও এর আওতাভুক্ত নয়, যারা তোমাদের কাছে আসে এবং যুদ্ধের ব্যাপারে অনুৎসাহিত, না তোমাদের বিরুদ্ধে লড়তে চায়, না নিজেদের জাতির বিরুদ্ধে। আল্লাহ চাইলে তাদেরকে তোমাদের ওপর চাপিয়ে দিতেন এবং তারাও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো। কাজেই তারা যদি তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে আর তোমাদের দিকে সন্ধি ও সখ্যতার হাত বাড়িয়ে দেয়, তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের ওপর হস্তক্ষেপ করার কোন পথ রাখেননি। তোমরা আর এক ধরনের মুনাফিক পাবে, যারা চায় তোমাদের থেকে নিরাপদ থাকতে এবং নিজেদের জাতি থেকেও। কিন্তু যখনই ফিতনার সুযোগ পাবে তারা তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই ধরনের লোকেরা যদি তোমাদের সাথে মোকাবিলা করা থেকে বিরত না থাকে, তোমাদের কাছে সন্ধি ও শান্তির আবেদন পেশ না করে এবং নিজেদের হাত টেনে না রাখে, তাহলে তাদেরকে যেখানেই পাও ধরো এবং হত্যা করো। তাদের ওপর হাত উঠাবার জন্য আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট অধিকার দান করলাম।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ
فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

১৩ রুকূ'

কোন মু'মিনের কাজ নয় অন্য মু'মিনকে হত্যা করা, তবে ভুলবশত হতে পারে।[১২০] আর যে ব্যক্তি ভুলবশত কোন মু'মিনকে হত্যা করে তার কাফ্ফারা হিসেবে একজন মু'মিনকে গোলামী থেকে মুক্ত করে দিতে হবে[১২১] এবং নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদেরকে রক্ত মূল্য দিতে হবে[১২২] তবে যদি তারা রক্ত মূল্য মাফ করে দেয় তাহলে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু যদি ঐ নিহত মুসলিম ব্যক্তি এমন কোন জাতির অন্তরভুক্ত হয়ে থাকে যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে তাহলে একজন মু'মিন গোলামকে মুক্ত করে দেয়াই হবে তার কাফ্ফারা। আর যদি সে এমন কোন অমুসলিম জাতির অন্তরভুক্ত হয়ে থাকে যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে তাহলে তার ওয়ারিসদেরকে রক্ত মূল্য দিতে হবে এবং একজন মু'মিন গোলামকে মুক্ত করে দিতে হবে।[১২৩] আর যে ব্যক্তি কোন গোলাম পাবে না তাকে পরপর দু' মাস রোযা রাখতে হবে।[১২৪] এটিই হচ্ছে এই গোনাহের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে তাওবা করার পদ্ধতি।[১২৫] আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও জ্ঞানময়।

১১৮. মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফের জাতিদের সাথে যেসব মুনাফিক মুসলমান সম্পর্ক রাখে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ও শত্রুতামূলক কার্যকলাপে কার্যত অংশগ্রহণ করে, তাদের সম্পর্কে এই নির্দেশটি দেয়া হয়েছে।

১১৯. এখানে আওতাভুক্ত না করার যে নির্দেশটি জারী করা হয়েছে তার সম্পর্ক "তাদের মধ্য থেকে কাউকে নিজেদের বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করো না" বাক্যটির সাথে নয়। বরং এর সম্পর্ক হচ্ছে "তাদেরকে যেখানেই পাও ধরো এবং হত্যা করো" বাক্যটির সাথে। এর অর্থ হচ্ছে, যেসব মুনাফিককে হত্যা করা ওয়াজিব, তারা যদি এমন কোন জাতির এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নেয় যাদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের চুক্তি

রয়েছে, তাহলে সেই রাষ্ট্রের সীমানায় প্রবেশ করে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা যাবে না। আর দারুল ইসলামের কোন মুসলমান কোন নিরপেক্ষ দেশের এলাকায় যদি এমন কোন মুনাফিককে পায় যাকে হত্যা করা ওয়াজিব এবং তাকে হত্যাও করে ফেলে, তাহলে এটাও কোনক্রমে বৈধ হবে না। এখানে আসলে মুনাফিকের রক্তের প্রতি নয় বরং চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনই লক্ষ।

১২০. ওপরে যেসব মনাফিক মুসলমানদেরকে হত্যা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে এখানে তাদের কথা বলা হয়নি। বরং এখানে এমন মুসলমানদের কথা বলা হয়েছে যারা দারুল ইসলামের অধিবাসী অথবা দারুল হারব বা দারুল কুফরে অবস্থান করলেও ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের তৎপরতায় তাদের অংশগ্রহণের কোন প্রমাণ নেই। সে সময় এমন বহু লোকও ছিল যারা ইসলাম গ্রহণ করার পর নিজেদের যথার্থ অক্ষমতার কারণে ইসলামের শত্রু গোত্রদের মধ্যে অবস্থান করছিল। অনেক সময় এমন দুর্ঘটনা ঘটে যেতো, মুসলমানরা কোন ইসলাম দুশমন গোত্রের ওপর আক্রমণ চালাতো এবং সেখানে তাদের অজ্ঞতাবশত তাদের হাতে কোন মুসলমান মারা যেতো। তাই মহান আল্লাহ এখানে ভুলবশত মুসলমানের হাতে কোন মুসলমানের নিহত হবার বিষয় সম্পর্কিত বিধান বর্ণনা করেছেন।

১২১. যেহেতু নিহত ব্যক্তি একজন মু'মিন, তাই একজন মু'মিন গোলামকে মুক্ত করে দেয়াই তাকে হত্যা করার কাফ্ফারা গণ্য করা হয়েছে।

১২২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রক্ত বিনিময়ের পরিমাণ এক শত উট, দুই শত গরু বা দুই হাজার ছাগল নির্ধারণ করেছেন। কোন ব্যক্তি যদি রক্তমূল্য হিসেবে অন্য কিছু দিতে চায় তাহলে এই জিনিসগুলোর বিক্রয়মূল্য ধরে তার পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে নগদ মুদ্রায় রক্তমূল্য দানকারীদের জন্য ৮ শত দীনার বা ৮ হাজার দিরহাম নির্ধারিত ছিল। হযরত উমর (রা) তাঁর শাসনামলে বলেন ঃ উটের দাম এখন বেড়ে গেছে। কাজেই এখন স্বর্ণমুদ্রায় এক হাজার দীনার বা রৌপ্যমুদ্রায় ১২ হাজার দিরহাম রক্ত মূল্য হিসেবে আদায় করতে হবে। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, রক্তমূল্যের এ পরিমাণটি জেনে বুঝে হত্যা করার জন্য নয় বরং ভুলবশত হত্যা করার জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

১২৩. এই আয়াতটির বিধানসমূহের সংক্ষিপ্তসার নীচে দেয়া হলো ঃ

এক ঃ নিহত ব্যক্তি যদি দারুল ইসলামের অধিবাসী হয় তাহলে তার হত্যাকারীকে রক্তমূল্য দিতে হবে এবং আল্লাহর কাছে নিজের গোনাহমাফীর জন্য একজন গোলামকেও মুক্ত করে দিতে হবে।

দুই ঃ যদি নিহত ব্যক্তি দারুল হারবের বাসিন্দা হয় তাহলে হত্যাকারী কেবলমাত্র গোলাম মুক্ত করে দেবে। তাকে কোন রক্তমূল্য দিতে হবে না।

তিন ঃ যদি নিহত ব্যক্তি এমন কোন দারুল কুফরের বাসিন্দা হয় যার সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের চুক্তি রয়েছে, তাহলে হত্যাকারী একজন গোলামকে মুক্ত করে দেবে এবং এ ছাড়াও রক্তমূল্যও দান করেবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রক্তমূল্যের পরিমাণ তাই হবে, যা সে চুক্তিবদ্ধ জাতির একজন অমুসলিম অধিবাসীকে হত্যা করলে চুক্তি অনুযায়ী দিতে হয়।

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴿٩٣﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ
السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۡ فَعِنْدَ اللّٰهِ
مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۭ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ۭ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿٩٤﴾

আর যে ব্যক্তি জেনে বুঝে কোন মু'মিনকে হত্যা করে, তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। তার ওপর আল্লাহর গযব ও তাঁর লানত এবং আল্লাহ তার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য বের হও তখন বন্ধু ও শত্রুর মধ্যে পার্থক্য করো এবং যে ব্যক্তি সালামের মাধ্যমে তোমাদের দিকে এগিয়ে আসে তাকে সংগে সংগেই বলে দিয়ো না যে, তুমি মু'মিন নও।[১২৬] যদি তোমরা বৈষয়িক স্বার্থলাভ করতে চাও তাহলে আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য অনেক গণীমাতের মাল রয়েছে। ইতিপূর্বে তোমরা নিজেরাও তো একই অবস্থায় ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।[১২৭] কাজেই তোমরা অনুসন্ধান করে পদক্ষেপ গ্রহণ করো। তোমরা যা কিছু করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত।

১২৪. অর্থাৎ একাদিক্রমে রোযা রাখতে হবে। মাঝখানে ফাঁক যাবে না। যদি কোন ব্যক্তি শরঈ ওযর ছাড়াই মাঝখানে একটি রোযাও ছেড়ে দেয় তাহলে তাকে আবার নতুন করে রোযা শুরু করতে হবে।

১২৫. অর্থাৎ এটা 'জরিমানা' নয় বরং 'তাওবা' ও 'কাফ্ফারা'। জরিমানার লজ্জা, অনুতাপ ও আত্মসংশোধনের কোন অন্তরনিহিত প্রাণশক্তি কার্যকর থাকে না। বরং সাধারণত অত্যন্ত বিরক্তিসহকারে বাধ্য হয়েই জরিমানা আদায় করতে হয় এবং এরপরও ধূমায়িত অসন্তোষ ও তিক্ততার মনোভাব থেকেই যায়। বিপরীত পক্ষে মহান আল্লাহ চান, বান্দা এবাদাত-বন্দেগী, সৎকাজ ও অধিকার আদায় করার মাধ্যমে নিজের মন-মানসের ওপর থেকে নিজের ভুলের প্রভাব ধুয়ে মুছে ফেলবে এবং লজ্জা ও অনুতাপ সহকারে

আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে। এভাবে সে কেবল এই গোনাহের ক্ষমা লাভ করবে না বরং এই সংগে ভবিষ্যতের জন্য সে এই ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি করা থেকেও নিজেকে সংরক্ষিত রাখতে পারবে। 'কাফ্ফারার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, "গোপনকারী বস্তু।" কোন সৎকাজকে গোনাহের কাফ্ফারা গণ্য করার অর্থ হচ্ছে এই যে, এই নেকীটি ঐ গোনাহের ওপর ছেয়ে যায় এবং তাকে ঢেকে ফেলে। যেমন কোন দেয়ালের গায়ে দাগ লেগে গেলে চুনকাম করে দাগ মিটিয়ে দেয়া হয়।

১২৬. ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে 'আস্সালামু আলাইকুম' বাক্যটি মুসলমানদের জন্য ঐতিহ্য ও পরিচিতির প্রকাশ ছিল। একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানকে দেখলে এ বাক্যটি ব্যবহার করতো এই অর্থে, "আমিও তোমার দলভুক্ত, তোমার বন্ধু ও শুভাকাংখী। আমার কাছে তোমার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা ছাড়া আর কিছুই নেই। কাজেই তুমি আমার সাথে শত্রুতা করো না এবং আমার পক্ষ থেকেও তোমার জন্য শত্রুতা ও ক্ষতির কোন আশংকাই নেই।" সেনাবাহিনীর মধ্যে যেমন সাংকেতিক শব্দ (Password) হিসেবে একটি শব্দ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় এবং রাতে এক সেনাবাহিনীর লোক অন্য সেনাবাহিনীর কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় এই শব্দ ব্যবহার করে যাতে সে শত্রু সেনাবাহিনীর লোক নয় একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায়, ঠিক তেমনি সালাম শব্দটিকেও মুসলমানদের মধ্যে সাংকেতিক শব্দ হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। বিশেষ করে সেই সময় এই সাংকেতিক শব্দটি ব্যবহারের গুরুত্ব আরো বেশী ছিল এজন্য যে, সে সময় আরবের নওমুসলিম ও কাফেরদের মধ্যে পোশাক, ভাষা বা অন্য কোন জিনিসের ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল না। ফলে একজন মুসলমানের পক্ষে প্রথম দৃষ্টিতে অন্য একজন মুসলমানকে চিনে নেয়া খুব কঠিন ছিল।

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াতো আরো জটিল। মুসলমানরা যখন কোন শত্রুদলের ওপর আক্রমণ করতো এবং সেখানের কোন মুসলমান তাদের তরবারির নীচে এসে যেতো তখন আক্রমণকারী মুসলমানদেরকে সে জানাতে চাইতো, আমি তোমাদের দীনী ভাই। একথা জানাবার জন্য সে 'আস্সালামু আলাইকুম' বা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে চীৎকার করে উঠতো । কিন্তু মুসলমানরা তাতে সন্দেহ করতো। তারা মনে করতো, এ ব্যক্তি কোন কাফের, নিছক নিজের জান বাঁচাবার জন্য সে এই কৌশল অবলম্বন করেছে। এজন্য অনেক সময় তারা এ ধরনের লোককে হত্যা করে বসতো এবং তার মালমাত্তা গণীমাত হিসেবে লুট করে নিতো। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ধরনের ব্যাপারে প্রতি ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোরভাবে তিরস্কার ও শাসন করেছেন। কিন্তু তবুও এ ধরনের দুর্ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ কুরআন মজীদে এই সমস্যার সমাধান পেশ করেছেন।

এখানে এই আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান হিসেবে পেশ করছে তার ব্যাপারে তোমাদের এ ধরনের হালকাভাবে ফায়সালা করার কোন অধিকার নেই যে, সে নিছক প্রাণ বাঁচাবার জন্য মিথ্যা বলছে। সে সত্যবাদীও হতে পারে, মিথ্যাবাদীও হতে পারে। প্রকৃত সত্য তো জানা যাবে অনুসন্ধানের পর। অনুসন্ধান ছাড়াই তাকে ছেড়ে দেবার ফলে যদি একজন কাফেরের মিথ্যা বলে প্রাণ বাঁচাবার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তাকে হত্যা করার পরে তোমাদের হাতে একজন নিরপরাধ মু'মিনের মারা পড়ারও সম্ভাবনা

لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَ
الْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللّٰهُ
الْمُجٰهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا
وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۚ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ
أَجْرًا عَظِيْمًا ۝ دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا
رَّحِيْمًا ۝

যেসব মুসলমান কোন প্রকার অক্ষমতা ছাড়াই ঘরে বসে থাকে আর যারা ধন-প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তাদের উভয়ের মর্যাদা সমান নয়। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের তুলনায় জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের মর্যাদা আল্লাহ বুলন্দ করেছেন। যদিও সবার জন্য আল্লাহ কল্যাণ ও নেকীর ওয়াদা করেছেন তবুও তাঁর কাছে মুজাহিদদের কাজের বিনিময় বসে থাকা লোকদের তুলনায় অনেক বেশী।[১২৮] তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে বিরাট মর্যাদা, মাগফেরাত ও রহমত। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

থাকে। কাজেই ভুলবশত একজন কাফেরকে ছেড়ে দেয়া ভুলবশত একজন মু'মিনকে হত্যা করার চেয়ে অনেক ভালো।

১২৭. অর্থাৎ তোমাদেরও এমন এক সময় ছিল যখন তোমরা কাফের গোত্রগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলে। জুলুম নির্যাতনের ভয়ে ইসলামের কথা বাধ্য হয়ে গোপন রাখতে। ঈমানের মৌখিক অংগীকার ছাড়া তোমাদের কাছে তার আর কোন প্রমাণ ছিল না। এখন আল্লাহর অনুগ্রহে তোমরা সামাজিক জীবন যাপনের সুবিধে ভোগ করছো। তোমরা এখন কাফেরদের মোকাবিলায় ইসলামের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার যোগ্যতা লাভ করেছো। কাজেই যেসব মুসলমান এখনো প্রথম অবস্থায় আছে তাদের ব্যাপারে কোমল ব্যবহার ও সুবিধাদানের নীতি অবলম্বন না করলে তোমাদেরকে যে অনুগ্রহ করা হয়েছে তার প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে না।

১২৮. জিহাদের নির্দেশ জারী করার পর যারা টালবাহানা করে বসে থাকে অথবা জিহাদের জন্য সাধারণভাবে ঘোষণা দেবার এবং জিহাদ করা 'ফরযে আইন' হয়ে যাবার পরও যারা লড়াই করতে গড়িমসি করে তাদের কথা এখানে বলা হয়নি। বরং এমন সব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা জিহাদ করা যখন 'ফরযে কিফায়া' সে অবস্থায় যুদ্ধের

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ۖ
قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ
وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ
مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولَٰئِكَ عَسَى
اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾

১৪ রুকূ'

যারা নিজেদের ওপর জুলুম করছিল[১২৯] ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার সময় জিজ্ঞেস করলো ঃ তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা জবাব দিল, আমরা পৃথিবীতে ছিলাম দুর্বল ও অক্ষম। ফেরেশতারা বললো ঃ আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না? তোমরা কি সেখানে হিজরাত করে অন্যস্থানে যেতে পারতে না?[১৩০] জাহান্নাম এসব লোকের আবাস স্থিরীকৃত হয়েছে এবং আবাস হিসেবে তা বড়ই খারাপ জায়গা। তবে যেসব পুরুষ, নারী ও শিশু যথার্থই অসহায় এবং তারা বের হবার কোন পথ–উপায় খুঁজে পায় না, আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দেবেন এবং আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

ময়দানে যাবার পরিবর্তে অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকে। প্রথম দু'টি অবস্থায় জিহাদের উদ্দেশ্যে যুদ্ধের ময়দানে যেতে বিরত থাকলে একজন মুসলমান কেবল মুনাফিকই হতে পারে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য কল্যাণ ও নেকীর কোন ওয়াদা নেই। তবে যদি সে কোন যথার্থ অক্ষমতার শিকার হয়ে থাকে তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা । বিপরীত পক্ষে শেষোক্ত অবস্থায় ইসলামী জামায়াতের সমগ্র সমরশক্তির প্রয়োজন হয় না । বরং তার একটি অংশের প্রয়োজন হয়। এ অবস্থায় যদি ইমামের পক্ষ থেকে এই মর্মে ঘোষণা দেয়া হয় যে, উমুক অভিযানে যারা অংশ গ্রহণ করতে চায় তারা যেন নিজেদের নাম পেশ করে দেয়—ইমামের এই আহবানে যারা সাড়া দেবে তারা অন্যান্য কল্যাণকর কাজে যারা ব্যস্ত থাকবে তাদের তুলনায় অবশ্যি উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবে।

১২৯. এখানে এমন লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা ইসলাম গ্রহণ করার পরও কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা ও অক্ষমতা ছাড়াই এখনো পর্যন্ত নিজেদের কাফের গোত্রের সাথে অবস্থান করছিল। তারা আধা মুসলমানের ও আধা কাফেরের জীবন যাপন করেই

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ۭ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٠﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে হিজরাত করবে, সে পৃথিবীতে আশ্রয়লাভের জন্য অনেক জায়গা এবং সময় অতিবাহিত করার জন্য বিরাট অবকাশ পাবে। আর যে ব্যক্তি নিজের গৃহ থেকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে হিজরাত করার জন্য বের হবে তারপর পথেই তার মৃত্যু হবে, তার প্রতিদান দেয়া আল্লাহর জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[১৩১]

সন্তুষ্ট ছিল। অথচ ইতিমধ্যে একটি দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। সেখানে হিজরাত করে নিজেদের দীন ও আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী ইসলামী জীবন যাপন করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল। এটিই ছিল নিজেদের ওপর তাদের জুলুম । কেননা পূর্ণাংগ ইসলামী জীবন যাপনের মোকাবিলায় এই আধা কুফরী ও আধা ইসলামী জীবনে যে জিনিসটি তাদেরকে সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত করে তুলেছিল সেটি যথার্থই কোন অক্ষমতা ছিল না। বরং সেটি ছিল নিছক আত্মবিলাসিতা এবং নিজেদের পরিবার, সহায়-সম্পত্তি, অর্থ-সম্পদ ও পার্থিব স্বার্থপ্রীতি। নিজেদের দীনের ওপর তারা এগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য ১১৬ টীকা দেখুন।)

১৩০. অর্থাৎ যদি কোন স্থানে আল্লাহদ্রোহীদের প্রতিপত্তি থেকে থাকে এবং সেখানে আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াতের বিধান কার্যকর করা সম্ভবপর না হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে অবস্থান করতেই হবে এমন কি বাধ্যবাধকতা ছিল? সেই স্থান ত্যাগ করে তারা এমন কোন ভূখণ্ডে স্থানান্তরিত হলো না কেন যেখানে গিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত আইন মেনে চলা সম্ভবপর হতো?

১৩১. এখানে একথা বুঝতে হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর দীনের ওপর ঈমান এনেছে তার জন্য কুফরী জীবন ব্যবস্থার অধীনে জীবন যাপন করা কেবল মাত্র দু'টি অবস্থায় বৈধ হতে পারে। এক, সে ইসলামকে সে দেশে বিজয়ী করার ও কুফরী জীবন ব্যবস্থাকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে থাকবে যেমন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও তাঁর প্রাথমিক অনুসারী বৃন্দ চালিয়ে এসেছেন। দুই, সে আসলে সেখান থেকে বের হয়ে আসার কোন পথ পায়নি, তাই চরম ঘৃণা, অনিচ্ছা ও অসন্তুষ্টি সহকারে বাধ্য হয়ে সেখানে অবস্থান করবে। এই দু'টি অবস্থা ছাড়া অন্য যে কোন অবস্থায় দারুল কুফরে অবস্থান করা একটি স্থায়ী গোনাহের শামিল। আর এই গোনাহের সপক্ষে এই ধরনের কোন ওজর পেশ করা যে, এই দুনিয়ায় আমরা হিজরাত করে গিয়ে অবস্থান করতে পারি এমন কোন দারুল ইসলাম পাইনি আসলে মোটেই কোন গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী ওজর বলে বিবেচিত হবে না। যদি কোন দারুল ইসলাম না থেকে থাকে

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا
مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ
الْكٰفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿١٠١﴾

১৫ রুকূ'

আর যখন তোমরা সফরে বের হও তখন নামায সংক্ষেপ করে নিলে কোন ক্ষতি নেই।[১৩২] (বিশেষ করে) যখন তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফেররা তোমাদেরকে কষ্ট দেবে।[১৩৩] কারণ তারা প্রকাশ্যে তোমাদের শত্রুতা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

তাহলে কি আল্লাহর এই ব্যাপক বিস্তৃত পৃথিবীতে এমন কোন পাহাড় বা বন জংগলও ছিল না যেখানে আশ্রয় নিয়ে মানুষ গাছের পাতা খেয়ে ও ছাগলের দুধপান করে জীবনধারণ করতে পারতো এবং কুফরী জীবনবিধানের আনুগত্য থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম হতো?

"লা হিজরাতা বা'দাল ফাত্হে"—মক্কা বিজয়ের পর এখন আর কোন হিজরাত নেই—এ হাদীসটি থেকে অনেকে ভুল ধারণা নিয়েছেন। অথচ এ হাদীসটি কোন চিরন্তন হুকুম নয়। বরং সে সময়ের অবস্থা ও পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আরবদেরকে একথা বলা হয়েছিল। যতদিন আরবের অধিকাংশ এলাকা দারুল হারব ও দারুল কুফরের অন্তরভুক্ত ছিল এবং কেবলমাত্র মদীনায় ও মদীনার আশেপাশে ইসলামের বিধান জারী হচ্ছিল, ততদিন মুসলমানদের বাধ্যতামূলকভাবে হুকুম দেয়া হয়েছিল যে, চর্তুদিক থেকে এসে তাদের দারুল ইসলামে একত্র হতে হবে। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর আরবে যখন কুফরী শক্তি ভেঙে পড়লো এবং প্রায় সমগ্র দেশ ইসলামী ঝাণ্ডার অধীন হলো, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এখন আর হিজরতের প্রয়োজন নেই। তার এ বক্তব্যের অর্থ এ নয় যে, সারা দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য সর্ব অবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত হিজরাত ফরয হবার বিধান বাতিল হয়ে গেছে।

১৩২. যেসব ওয়াক্তে চার রাকআত নামায ফরয সেসব ওয়াক্তে ফরয নামায দুই রাকআত পড়াই হচ্ছে শান্তির সময়ের সফরের কসর। আর যুদ্ধের সময়ে কসর করার ব্যাপারে কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই। যুদ্ধের অবস্থায় যেভাবে সম্ভব নামায পড়ে নিতে হবে। জামায়াতে পড়ার সুযোগ থাকলে জামায়াতে পড়ে নিতে হবে। অন্যথায় ব্যক্তিগতভাবে একা একা পড়ে নিতে হবে। কিবলার দিকে মুখ করে পড়া সম্ভব না হলে যে দিকে মুখ করে পড়া সম্ভব সেদিকে মুখ করে পড়তে হবে। সাওয়ারীর পিঠে বসে চলন্ত অবস্থায়ও পড়া যেতে পারে। রুকূ' ও সিজদা করা সম্ভব না হলে ইশারায় পড়তে হবে। প্রয়োজন হলে নামায পড়া অবস্থায় হাঁটতেও পারে। কাপড়ে রক্ত লেগে থাকলেও কোন ক্ষতি নেই। এতো সব সহজ ব্যবস্থার পরও যদি অবস্থা এতই বিপজ্জনক হয়, যার ফলে নামায পড়া

সম্ভবপর না হয়ে থাকে, তাহলে বাধ্য হয়ে নামায পিছিয়ে দিতে হবে। যেমন খন্দকের যুদ্ধের সময় হয়েছিল।

সফরে কি কেবল ফরয পড়া হবে, না সুন্নাতও পড়া হবে—এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা কিছু প্রমাণিত তা হচ্ছে এই যে, তিনি সফরে ফজরের সুন্নাত ও এশার বেতের নিয়মিত পড়তেন কিন্তু অন্যান্য ওয়াক্তে কেবল ফরয পড়তেন। নিয়মিত সুন্নাত পড়া তাঁর থেকে প্রমাণিত হয়নি। তবে নফল নামাযের যখনই সুযোগ পেতেন পড়ে নিতেন। এমনকি সাওয়ারীর পিঠে বসেও নফল নামায পড়তেন। এজন্যই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) লোকদের সফরে ফজর ছাড়া অন্য ওয়াক্তে সুন্নাতগুলো পড়তে মানা করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ উলামা সুন্নাত ও নফল পড়া বা না পড়া উভয়টি জায়েয গণ্য করেছেন এবং ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর তা ছেড়ে দিয়েছেন। হানাফী মাযহাবের সর্বজন গৃহীত মতটি হচ্ছে, মুসাফির যখন পথে চলমান অবস্থায় থাকে তখন তার সুন্নাত না পড়াই উত্তম আর যখন কোন স্থানে অবস্থান করতে থাকে এবং সেখানে নিশ্চিন্ত পরিবেশ বিরাজ করে, সে ক্ষেত্রে সুন্নাত পড়াই উত্তম।

যে সফরে কসর করা যেতে পারে সে সম্পর্কে কোন কোন ইমাম শর্ত আরোপ করেছেন যে, তা হতে হবে ফী সাবীলিল্লাহ—আল্লাহর পথে। যেমন জিহাদ, হজ্জ, উমরাহ, ইসলামী জ্ঞান আহরণ ইত্যাদি। ইবনে উমর, ইবনে মাসউদ ও আতা এরি ওপর ফতোয়া দিয়েছেন। ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ বলেন, সফর এমন কোন উদ্দেশ্যে হতে হবে যা শরীয়াতের দৃষ্টিতে জায়েয। হারাম ও নাজায়েয উদ্দেশ্য সামনে রেখে যে সফর করা হয় তাতে কসরের অনুমতির সুবিধা ভোগ করার অধিকার কারোর নেই। হানাফীদের মতে, যে কোন সফরে কসর করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সফরের ধরন সম্পর্কে বলা যায়, তা নিজেই সওয়াব বা আযাবের অধিকারী হতে পারে। কিন্তু কসরের অনুমতির ওপর তার কোন প্রভাব পড়ে না।

কোন কোন ইমাম "কোন ক্ষতি নেই" (فليس عليكم جناح) বাক্যটি থেকে এ অর্থ নিয়েছেন যে, সফরে কসর করা জরুরী নয়। বরং সফরে কসরের নিছক অনুমতিই দেয়া হয়েছে। ব্যক্তি চাইলে এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে আবার চাইলে পুরো নামায পড়তে পারে। ইমাম শাফেঈ এ মতটি গ্রহণ করেছেন, যদিও তিনি কসর করাকে উত্তম এবং কসর না করাকে উত্তম কাজ ত্যাগ করার অন্তরভুক্ত করেছেন। ইমাম আহমাদের মতে কসর করা ওয়াজিব না হলেও কসর না করা মাকরূহ। ইমাম আবু হানীফার মতে কসর করা ওয়াজিব। একটি বর্ণনা মতে ইমাম মালিকেরও এই একই মত উদ্ধৃত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামেশা সফরে কসর করেছেন, এটা হাদীস থেকে প্রমাণিত। কোন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত থেকে একথা প্রমাণিত হয়নি যে, তিনি সফরে কখনো চার রাকাআত ফরয পড়েছেন। ইবনে উমর বলেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর, উমর, ওসমান রাদিআল্লাহু আনহুমের সাথে সফর করেছি। আমি কখনো তাদের সফরে কসর না করতে দেখিনি। এরি সমর্থনে ইবনে আব্বাস এবং আরো অসংখ্য সাহাবীর নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। হযরত উসমান যখন হজ্জের সময় মীনায় চার রাকাআত পড়ালেন তখন সাহাবীগণ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। হযরত উসমান তখন এই জবাব দিয়ে লোকদের নিশ্চিন্ত করলেন ঃ আমি মক্কায় বিয়ে করেছি

আর যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমি শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন শহরে পারিবারিক জীবন শুরু করে সে যেন সেই শহরের অধিবাসী। তাই আমি এখানে কসর করিনি। এই রেওয়ায়াতগুলোর বিরুদ্ধে হযরত আয়েশা থেকে এমন দু'টি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে যা থেকে জানা যায় যে, কসর করা বা পূর্ণ নামায পড়া উভয়টিই ঠিক। কিন্তু এই রেওয়ায়াতগুলো সনদের দিক দিয়ে দুর্বল হবার সাথে সাথে হযরত আয়েশার (রা) নিজের থেকে প্রমাণিত মতেরও বিরোধী। তবে একথা সত্য যে, সফর ও অ-সফরের মাঝামাঝি একটি অবস্থা রয়েছে। সে অবস্থায় একই অস্থায়ী নিবাসে সুবিধা মতো কখনো কসর করা যেতে পারে আবার কখনো পুরো নামায পড়ে নেয়া যেতে পারে। সম্ভবত হযরত আয়েশা (রা) এই অবস্থাটি সম্পর্কে বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে কসর করেছেন আবার পুরো নামাযও পড়েছেন। আর কুরআনের এই "সফরে কসর করলে ক্ষতি নেই" বাক্যটি এ ক্ষেত্রে কোন নতুন কথা নয়। ইতিপূর্বে সূরা বাকারার ১৯ রুকূ'তেও সাফা ও মারাওয়া পাহাড় দু'টির মাঝখানে 'সাঈ' করার নির্দেশও এই একই ভাষায় দেয়া হয়েছে অথচ এই 'সাঈ' 'মানাসিকে হজ্জ' অর্থাৎ হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর অন্তরভুক্ত এবং ওয়াজিব। আসলে এই উভয় স্থানেই লোকদের মনের একটা আশংকা দূর করাই ছিল এর মূল লক্ষ। সে আশংকাটি ছিল এই যে, এ ধরনের কাজে কোন গোনাহ হবে নাতো বা এতে সওয়াবে কোন কমতি দেখা দেবে না তো। এ ধরনের আশংকা দূর করার উদ্দেশ্যেই এ স্থানে এ বর্ণনাভংগী গ্রহণ করা হয়েছে।

কি পরিমাণ দূরত্বের সফর হলে তাতে কসর করা যেতে পারে? এ ব্যাপারে 'যাহেরী ফিকাহ'-এর মত হচ্ছে, এর কোন পরিমাণ নেই। কম বা বেশী যে কোন দূরত্বের সফর হোক না কেন তাতে কসর করা যেতে পারে। ইমাম মালিকের মতে ৪৮ মাইল বা এক দিন রাতের কম সময়ের সফরে কসর নেই। ইমাম আহমাদও এই একই মত পোষণ করেন। ইবনে আব্বাসও (রা) এই মত পোষণ করতেন। ইমাম শাফেঈর একটি বিবৃতিতে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আনাস (রা) ১৫ মাইলের সফরে কসর জায়েয মনে করেন। "একদিনের সফর কসর করার জন্য যথেষ্ট" হযরত উমরের (রা) এই মত ইমাম আওযায়ী ও ইমাম যুহ্‌রী গ্রহণ করেছেন। হাসান বসরী দুই দিন এবং ইমাম আবু ইউসুফ দুই দিনের বেশী দূরত্বের সফরে কসর জায়েয মনে করেন। ইমাম আবু হানীফার মতে পায়ে হেঁটে বা উটের পিঠে চড়ে তিন দিন সফর করে যে দূরত্ব অতিক্রম করা যায় (অর্থাৎ প্রায় ১৮ ফরসঙ্গ বা ৫৪ মাইল) তাতে কসর করা যেতে পারে। ইবনে উমর, ইবনে মাসউদ ও হযরত উসমান রাদি আল্লাহু আনহুমও এই মত পোষণ করেন।

সফরের মাঝখানে কোথাও অবস্থান করলে কতদিন পর্যন্ত কসর করা যেতে পারে—এ ব্যাপারেও ইমামগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। ইমাম আহমাদের মতে যেখানে ৪দিন অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে সেখানে পুরা নামায পড়তে হবে। ইমাম মালেক ও ইমাম সাফেঈর মতে যেখানে ৪দিনের বেশী সময় অবস্থানের নিয়ত থাকে সেখানে কসর করা জায়েয নয়। ইমাম আওযায়ী ১৩ দিনের ও ইমাম আবু হানীফা ১৫ দিনের অথবা তার চেয়ে বেশী দিন অবস্থান করার নিয়ত করলে পুরা নামায পড়ার হুকুম দিয়েছেন। এ অধ্যায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন সুস্পষ্ট বিধান বর্ণিত হয়নি। আর যদি কোন স্থানে এক ব্যক্তি বাধ্য হয়ে আটকে পড়ে এবং সবসময় তার খেয়াল থাকে

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ
وَلْيَأْخُذُوْٓا أَسْلِحَتَهُمْ ۖ فَإِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ ۪
وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوْا
حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ
وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ
بِكُمْ أَذًى مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى أَنْ تَضَعُوْٓا أَسْلِحَتَكُمْ ۚ
وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿١٠٢﴾

আর হে নবী! যখন তুমি মুসলমানদের মধ্যে থাকো এবং (যুদ্ধাবস্থায়) তাদেরকে নামায পড়াবার জন্য দাঁড়াও[১৩৪] তখন তাদের মধ্য থেকে একটি দলের তোমার সাথে দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত[১৩৫] এবং তারা অস্ত্রশস্ত্র সংগে নেবে। তারপর তারা সিজদা করে নিলে পেছনে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দলটি, যারা এখনো নামায পড়েনি, তারা এসে তোমার সাথে নামায পড়বে। আর তারাও সতর্ক থাকবে এবং নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র বহন করবে।[১৩৬] কারণ কাফেররা সুযোগের অপেক্ষায় আছে, তোমরা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিস পত্রের দিক থেকে সামান্য গাফেল হলেই তারা তোমাদের ওপর অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বে। তবে যদি তোমরা বৃষ্টির কারণে কষ্ট অনুভব করো অথবা অসুস্থ থাকো, তাহলে অস্ত্র রেখে দিলে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু তবুও সতর্ক থাকো। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাকর আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।[১৩৭]

যে, বাধা দূর হলেই সে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হবে, তাহলে এমন স্থানে সে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কসর করতে থাকবে। এ ব্যাপারে সমস্ত উলামায়ে কেরাম একমত। সাহাবায়ে কেরামদের থেকে এমন অসংখ্য ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা থেকে জানা যায়, তাঁরা এ ধরনের অবস্থায় দুই দুই বছর পর্যন্ত অনবরত কসর করেছেন। এরি ওপর কিয়াস করে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল কয়েদীকেও তার সমগ্র মেয়াদ ব্যাপী কসর করার অনুমতি দিয়েছেন।

১৩৩. 'যাহেরী' ও 'খারেজী' ফিকাহর অনুসারীরা এ বাক্যের যে অর্থ গ্রহণ করে থাকে তা হচ্ছে, কসর কেবল যুদ্ধাবস্থার জন্য আর শান্তির অবস্থায় যে সফর করা হয়

তাতে কসর করা কুরআন বিরোধী। কিন্তু নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াতের মাধ্যমে হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা) এই একই সন্দেহটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করলে তিনি এর জবাবে বলেন ঃ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُم فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ অর্থাৎ "এই নামাযে কসর করার অনুমতিটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পুরস্কার। আল্লাহ তোমাদের এ পুরস্কার দান করেছেন। কাজেই তোমরা এ পুরস্কারটি গ্রহণ করো।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শান্তি ও ভয় উভয় অবস্থায়ই সফরের নামাযে কসর করেছেন। একথা প্রায় 'মুতাওয়াতির' বা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত সত্য। ইবনে আব্বাস (রা) সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلَى مَكَّةَ لَا يَخَافُ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ –

অর্থাৎ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা থেকে মক্কার দিকে বের হলেন। সে সময় একমাত্র রব্বুল আলামীন ছাড়া আর কারোর ভয় ছিল না। কিন্তু তিনি নামায দুই রাকআত পড়লেন।" এজন্য আমি তরজমায় বন্ধনীর মধ্যে "বিশেষ করে" শব্দটি বাড়িয়ে দিয়েছি।

১৩৪. ইমাম আবু ইউসুফ ও হাসান বিন যিয়াদ এই শব্দাবলী থেকে এ ধারণা নিয়েছেন যে, সালাতে খওফ (ভয়ের নামায) কেবলমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে একটি হুকুম দেয়া হয়েছে আবার সেই হুকুমটিই তাঁর পরে তার স্থলাভিষিক্তদের জন্যও আগের মতই কার্যকর রয়েছে, কুরআন মজীদে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কাজেই 'সালাতে খওফ'কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নির্দিষ্ট করার কোন কারণ নেই। এছাড়াও অসংখ্য নেতৃস্থানীয় সাহাবী থেকেও একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরেও 'সালাতে খওফ' পড়েছেন। এ প্রশ্নে কোন সাহাবীর মতবিরোধের উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

১৩৫. শত্রুর আক্রমণের ভয় আছে কিন্তু কার্যত লড়াই হচ্ছে না, এমন অবস্থায় 'সালাতে খওফে'র (ভয়ের নামায) হুকুম দেয়া হয়েছে। আর কার্যত যখন লড়াই চলছে তেমন অবস্থায় হানাফীদের মতে নামায পিছিয়ে দেয়া হবে। ইমাম মালেক ও ইমাম সুফিয়ান সওরীর মতে রুকূ' ও সিজদা করা সম্ভব না হলে ইশারায় নামায পড়ে নিতে হবে। ইমাম শাফেঈর মতে, নামাযের মধ্যেও কিছুটা যুদ্ধ করা যেতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি খন্দকের যুদ্ধের সময় চার ওয়াক্তের নামায পড়েননি। তারপর সুযোগ পেয়েই তরতীব অনুযায়ী চার ওয়াক্তের নামায এক সাথে পড়ে নেন। অথচ খন্দকের যুদ্ধের আগেই 'সালাতে খওফে'র হুকুম এসে গিয়েছিল।

১৩৬. অনেকটা যুদ্ধের অবস্থার ওপর 'সালাতে খওফ' পড়ার পদ্ধতি নির্ভর করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ নামায পড়িয়েছেন। কাজেই যুদ্ধের অবস্থা বা পরিস্থিতি ঐ পদ্ধতিগুলোর মধ্য থেকে যেটির অনুমতি দেবে তৎকালীন ইসলামী দলের প্রধান সেই পদ্ধতিতেই নামায পড়াবেন।

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلٰى جُنُوبِكُمْ ۚ
فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ ۚ إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ كِتٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِنْ تَكُونُوا
تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا
يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٤﴾

তারপর তোমরা নামায শেষ করার পর দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সব অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো। আর মানসিক প্রশান্তি লাভ করার পর পুরো নামায পড়ে নাও। আসলে নামায নির্ধারিত সময়ে পড়ার জন্য মু'মিনদের ওপর ফরয করা হয়েছে।

এই দলের[১৩৮] পশ্চাদ্ধাবনে তোমরা দুর্বলতা প্রদর্শন করো না। যদি তোমরা যন্ত্রণা ভোগ করে থাকো তাহলে তোমাদের মতো তারাও যন্ত্রণা ভোগ করছে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে এমন জিনিস আশা করো, যা তারা আশা করে না।[১৩৯] আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।

এর একটি পদ্ধতি হচ্ছে ঃ সেনাদলের একটি অংশ ইমামের সাথে নামায পড়বে এবং অন্য অংশটি তখন দুশমনের মোকাবিলা করতে থাকবে। যখন এক রাকআত পুরা হয়ে যাবে তখন প্রথম অংশটি সালাম ফিরে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় অংশটি এসে ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাকআতটি পুরা করবে। এভাবে ইমামের দু'রাকআত এবং সৈন্যদের এক রাকআত নামায হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে ঃ সেনাদলের এক অংশ ইমামের সাথে এক রাকআত পড়ে চলে যাবে তারপর দ্বিতীয় অংশটি এসে ইমামের পেছনে এক রাকআত পড়বে। এরপর উভয় অংশই পালাক্রমে এসে নিজেদের বাকি এক রাকআত একা একা পড়ে নেবে। এভাবে উভয় অংশের এক রাকআত পড়া হবে ইমামের পিছনে এবং এক রাকআত হবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে।

এর তৃতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে ঃ ইমামের পেছনে সেনাদলের একটি অংশ দুই রাকআত পড়বে এবং তাশাহ্হুদের পর সালাম ফিরে চলে যাবে। সেনাদলের দ্বিতীয় অংশ ইমামের সাথে তৃতীয় রাকআতে শরীক হবে এবং তার সাথে আর এক রাকআত করে পড়ে সালাম ফিরবে। এভাবে ইমামের চার ও সেনাদলের দুই রাকআত হবে।

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ
اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٦﴾ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾

১৬ রুকূ'

হে নবী![১৪০] আমি সত্য সহকারে এই কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আল্লাহ তোমাকে যে সঠিক পথ দেখিয়েছেন সেই অনুযায়ী তুমি লোকদের মধ্যে ফায়সালা করতে পারো। তুমি খেয়ানতকারী ও বিশ্বাস ভংগকারীদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হয়ো না। আর আল্লাহর কাছে ক্ষমার আবেদন করো। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়। যারা নিজেদের সাথে খেয়ানত ও প্রতারণা করে,[১৪১] তুমি তাদের সমর্থন করো না। আল্লাহ খেয়ানতকারী পাপীকে পছন্দ করেন না।

চতুর্থ পদ্ধতিটি হচ্ছে ঃ সেনাদলের এক অংশ ইমামের সাথে এক রাকআত পড়বে এবং ইমাম যখন দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াবে তখন মুকতাদীরা নিজেরাই একা একা দ্বিতীয় রাকআত তাশাহহুদ সহ পড়ে সালাম ফিরে চলে যাবে। তারপর দ্বিতীয় অংশ এসে এমন অবস্থায় ইমামের সাথে শামিল হবে যে ইমাম তখনো দ্বিতীয় রাকআতে থাকবেন এবং এরা বাকি নামায ইমামের সাথে পড়ার পর এক রাকআত নিজেরা উঠে একা একা পড়ে নেবে। এ অবস্থায় ইমামকে দ্বিতীয় রাকআতে দীর্ঘতম কিয়াম করতে হবে।

ইবনে আব্বাস, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও মুজাহিদ প্রথম পদ্ধতিটি সম্পর্কে রেওয়ায়াত করেছেন। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি সম্পর্কে রেওয়ায়াত করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। হানাফীগণ এই দ্বিতীয় পদ্ধটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তৃতীয় পদ্ধতিটি রেওয়ায়াত করেছেন হাসান বসরী আবু বাকরাহ থেকে। আর চতুর্থ পদ্ধতিটিকে সামান্য একটু মতবিরোধ সহকারে ইমাম শাফেঈ ও ইমাম মালেক অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এর উৎস হচ্ছে সাহ্‌ল ইবনে আবী হাস্‌মার একটি রেওয়ায়াত।

এগুলো ছাড়া সালাতে খওফের আরো কয়েকটি পদ্ধতি আছে। ফিকাহর কিতাবগুলোয় এগুলোর আলোচনা পাওয়া যাবে।

১৩৭. অর্থাৎ তোমাদের এই যে সতর্কতার হুকুম দেয়া হচ্ছে এটা নিছক একটা পার্থিব কৌশল। নয়তো আসলে জয়–পরাজয় তোমাদের কৌশলের ওপর নির্ভর করে না। বরং তা নির্ভর করে আল্লাহর ফায়সালার ওপর। তাই এই সতর্কতামূলক কৌশল ও পদক্ষেপগুলো কার্যকর করার সময় তোমাদের একথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে,

যারা নিজেদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর আলো নিবিয়ে দিতে চাচ্ছে আল্লাহ তাদের লাঞ্ছিত করবেন।

১৩৮. অর্থাৎ কাফের দল। এ দলটি সে সময় ইসলামী দাওয়াত ও ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে বাধা ও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৩৯. অর্থাৎ কাফেররা বাতিলের জন্য যে পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করছে ঈমানদাররা যদি হকের জন্য অন্তত এতটুকু কষ্টও বরদাশ্‌ত করতে না পারে তাহলে তা হবে সত্যিই বিস্ময়কর। অথচ কাফেরদের সামনে কেবল দুনিয়া ও তার ক্ষণস্থায়ী স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই নেই। বিপরীতপক্ষে ঈমানদাররা আকাশ ও পৃথিবীর প্রভু পরওয়ারদিগারের সন্তুষ্টি, নৈকট্য ও তাঁর চিরন্তন পুরস্কার লাভের আকাংখা পোষণ করে আসছে।

১৪০. এই রুকূ' এবং এর পরবর্তী রুকূ'তে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যাপারটি সেই যুগেই সংঘটিত হয়। ঘটনার নায়ক হচ্ছে আনসারদের যাফর গোত্রের তা'মাহ্ বা বশীর ইবনে উবাইরিক নামক এক ব্যক্তি। সে এক আনসারির বর্ম চুরি করে। এ ব্যাপারে অনুসন্ধান শুরু হলে সে চোরাই মালটি এক ইহুদীর কাছে রাখে। বর্মের মালিক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করে এবং তা'মাহকে সন্দেহ করে। কিন্তু তা'মাহ, তার ভাই বেরাদাররা এবং বনি যাফরের আরো বহু লোক নিজেদের মধ্যে একমত হয়ে সেই ইহুদীটির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে। ইহুদীকে জিজ্ঞেস করা হলে সে নিজের নির্দোষিতা প্রকাশ করে কিন্তু তা'মাহ্‌র পক্ষপাতিরা তার সমর্থনে খুব জোরেশোরে এগিয়ে যায়। তারা বলতে থাকে ঃ এই শয়তান ইহুদী, সেতো সত্যকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করে, তার কথা কেমন করে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে? বরং আমাদের কথা মেনে নেয়া উচিত কারণ আমরা মুসলমান। এই মোকাদ্দমার বাহ্যিক ধারা বিবরণীতে প্রভাবিত হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীটির বিরুদ্ধে রায় দিতে এবং অভিযোগকারীকে বনী উবাইরিকের বিরুদ্ধে দোষারোপ করার জন্য সতর্ক করে দিতে প্রায় উদ্যত হয়েছিলেন। এমন সময় অহী নাযিল হয় এবং সমস্ত ব্যাপারটির প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দেয়া হয়।

একজন বিচারপতি হিসেবে বাহ্যিক যুক্তি প্রমাণ ও সাক্ষী সাবুদের ভিত্তিতে মোকদ্দমার মীমাংসা করা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য কোন গোনাহের কাজ ছিল না। এ ধরনের অবস্থা বিচারপতিদের সামনে আসেও। অর্থাৎ মিথ্যা প্রমাণ ও সাক্ষী সাবুদের ভিত্তিতে তাদের কাছ থেকে নিজেদের সপক্ষে রায় নিয়ে নেয়া হয়। কিন্তু সে সময় ইসলাম ও কুফরের মধ্যে একটি প্রচণ্ড সংঘাত চলছিল। এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি মোকদ্দমার বাহ্যিক ধারা বিবরণী শুনে সেই অনুযায়ী ইহুদীর বিরুদ্ধে ফায়সালা করে দিতেন তাহলে ইসলাম বিরোধীরা তার বিরুদ্ধে এবং সমগ্র ইসলামী দল ও ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে একটি মারাত্মক শক্তিশালী নৈতিক হাতিয়ার পেয়ে যেতো। তারা প্রপাগাণ্ডা করতে থাকতো ঃ আহা, যাই বলেন না কেন, এখানে হক ও ইনসাফের কোন বালাই নেই। এখানেও তো সেই একই দলপ্রীতি ও অন্ধ গোত্রপ্রীতি কাজ করছে যার বিরুদ্ধে এরা নিজেরাই প্রচার অভিযান চালিয়ে আসছে। এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ বিশেষ করে এই মোকদ্দমায় হস্তক্ষেপ করেন।

يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ
مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ﴿١٠٨﴾
هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ
عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿١٠٩﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ
سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١١٠﴾
وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا
حَكِيْمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا
فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿١١٢﴾

এরা মানুষের কাছ থেকে নিজেদের কার্যকলাপ গোপন করতে পারে কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে গোপন করতে পারে না। তিনি তো তখনো তাদের সাথে থাকেন যখন তারা রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে তিনি যা চান না এমন বিষয়ের পরামর্শ করে। আল্লাহ তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। হাঁ, তোমরা এই অপরাধীদের পক্ষ থেকে দুনিয়ার জীবনেই বিতর্ক করে নিলে কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে তাদের জন্য কে বিতর্ক করবে? সেখানে কে তাদের উকিল হবে? যদি কোন ব্যক্তি খারাপ কাজ করে বসে অথবা নিজের ওপর জুলুম করে এবং এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও পরম দয়ালু হিসেবেই পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি পাপ কাজ করবে, তার এই পাপ কাজ তার নিজের জন্যই ক্ষতিকর হবে। আল্লাহ সব কথাই জানেন, তিনি জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। আর যে ব্যক্তি কোন অন্যায় বা গোনাহর কাজ করে কোন নিরপরাধ ব্যক্তির ওপর তার দোষ চাপিয়ে দেয়, সে তো বড় মারাত্মক মিথ্যা অপবাদ ও সুস্পষ্ট গোনাহের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নেয়।

এই রুকূ'তে একদিকে সেসব মুসলমানদের কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করা হয়েছে যারা নিছক অন্ধ গোত্র ও পরিবার প্রীতির কারণে অপরাধীদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। অন্যদিকে সাধারণ মুসলমানদের এই মর্মে শিক্ষা দান করা হয়েছে যে, ন্যায় ও ইনসাফের

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ
وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ
الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ
عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿١١٣﴾ لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ
اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۢ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ
مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١١٤﴾

১৭ রুকূ'

হে নবী! তোমার প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ না হতো এবং তার রহমত যদি তোমার সাথে সংযুক্ত না থাকতো, তাহলে তাদের মধ্য থেকে একটি দলতো তোমাকে বিভ্রান্ত করার ফায়সালা করেই ফেলেছিল। অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে বিভ্রান্ত করছিল না এবং তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারতো না।[১৪২] আল্লাহ তোমার ওপর কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন, এমন সব বিষয় তোমাকে শিখিয়েছেন যা তোমার জানা ছিল না এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ অনেক বেশী।

লোকদের অধিকাংশ গোপন সলা-পরামর্শে কোন কল্যাণ থাকে না। তবে যদি কেউ গোপনে সাদ্‌কা ও দান-খয়রাতের উপদেশ দেয় অথবা কোন সৎকাজের জন্য বা জনগণের পারস্পরিক বিষয়ের সংশোধন ও সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে কাউকে কিছু বলে, তাহলে অবশ্য এটি ভালো কথা। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে কেউ এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তাকে আমি বিরাট পুরস্কার দান করবো।

প্রশ্নে কোন প্রকার অন্ধ বিদ্বেষ ও কওম প্রীতির অবকাশ না থাকাই উচিত। নিজের দলের লোকেরা বাতিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তাদের অযথা সমর্থন করতে হবে এবং অন্য দলের লোকেরা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তাদের প্রতি অন্যায় করতে হবে—এ নীতি কখনো ন্যায়সংগত হতে পারে না।

১৪১. যে ব্যক্তি অন্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে আসলে সবার আগে বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজের সাথে। কারণ মন ও মস্তিষ্কের শক্তিগুলো তার কাছে

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۗ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿١١٥﴾

কিন্তু যে ব্যক্তি রসূলের বিরোধিতায় কোমর বাঁধে এবং ঈমানদারদের পথ পরিহার করে অন্য পথে চলে, অথচ তার সামনে সত্য–সঠিক পথ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, তাকে আমি সেদিকেই চালাবো যেদিকে সে চলে গেছে[১৪৩] এবং তাকে জাহান্নামে ঠেলে দেবো, যা নিকৃষ্টতম আবাস।

আমানত হিসেবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। সে সেগুলোকে অযথা ব্যবহার করে তাদেরকে বিশ্বাসঘাতকতা করার ক্ষেত্রে তার সাথে সহযোগিতা করতে বাধ্য করে। আর যে বিবেককে আল্লাহ তার নৈতিক চরিত্রের পাহারাদার বানিয়েছিলেন তাকে এমনভাবে দাবিয়ে দেয় যার ফলে এই বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষেত্রে সে তাকে কোন বাধা দিতে পারে না। মানুষ তার নিজের মধ্যে অত্যাচারমূলক পদক্ষেপকে যখন এভাবে পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয় তখনই বাইরে সে বিশ্বাসঘাতকতা ও পাপ কাজ করতে শুরু করে।

১৪২. অর্থাৎ যদি তারা মিথ্যা বিবরণী পেশ করে তোমার মনে ভুল ধারণা সৃষ্টিতে সক্ষমও হতো এবং নিজেদের পক্ষে প্রকৃত সত্য ও ইনসাফ বিরোধী ফায়সালা করিয়ে নিতে পারতো তাহলে তাতে প্রকৃত ক্ষতি তাদেরই হতো। তোমার কোন ক্ষতি হতো না। কারণ আল্লাহর কাছে তুমি নও, তারাই হতো অপরাধী। যে ব্যক্তি বিচারককে ধোঁকা দিয়ে নিজের পক্ষে সত্যের বিপরীত ফায়সালা করিয়ে নেয় সে আসলে নিজেকে এই ভুল ধারণার শিকার করে যে, এই ধরনের কলা–কৌশল অবলম্বন করার ফলে সত্য তার পক্ষে এসে গেছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দৃষ্টিতে সত্য যার দিকে মূলত তার দিকেই থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে প্রতারিত বিচারপতির ফায়সালার কারণে আসল সত্যের ওপর কোন প্রভাব পড়ে না। (সূরা বাকারার ১৯৭ নম্বর টীকা দেখুন)

১৪৩. ওপরে উল্লেখিত মোকদ্দমায় আল্লাহর অহীর ভিত্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সেই বিশ্বাসঘাতক মুসলমানটির বিরুদ্ধে এবং নির্দোষ ইহুদীর পক্ষে ফায়সালা শুনিয়ে দিলেন তখন মুনাফিকটির ওপর জাহেলিয়াতের এমন প্রচণ্ড আক্রমণ হলো যার ফলে সে মদীনা ত্যাগ করে মক্কায় ইসলাম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুশমনদের কাছে চলে গেলো এবং প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করতে লাগলো। এ আয়াতে তার এই আচরণের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا ۖ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ﴿١١٧﴾ لَّعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾

১৮ রুকূ'

আল্লাহ[১৪৪] কেবলমাত্র শিরকের গোনাহ মাফ করেন না। এ ছাড়া আর যাবতীয় গোনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করে, সে গোমরাহীর মধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এ ধরনের লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে দেবীর পূজা করে। তারা সেই বিদ্রোহী শয়তানের পূজা করে,[১৪৫] যাকে আল্লাহ অভিশপ্ত করেছেন। (তারা সেই শয়তানের আনুগত্য করছে) যে আল্লাহকে বলেছিল, "আমি তোমার বান্দাদের থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ নিয়েই ছাড়বো।[১৪৬]

১৪৪. এই রুকূ'তে ওপরের প্রসংগের জের টেনে বলা হয়েছে ঃ নিজের জাহেলিয়াতের স্রোতে ভেসে এ ব্যক্তি যে পথে পাড়ি জমিয়েছে সেটি কোন্ ধরনের পথ এবং সৎলোকদের দল থেকে আলাদা হয়ে যাদের সাথে সে জোট বেঁধেছে তারা কেমন লোক।

১৪৫. শয়তানকে কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে পূজা অর্চনা করে না বা তাকে সরাসরি আল্লাহর মর্যাদায় অভিসিক্ত করে না। এ অর্থে কেউ শয়তানকে মাবুদ বানায় না, একথা ঠিক। তবে নিজের প্রবৃত্তি, ইচ্ছা আশা–আকাংখা ও চিন্তা–ভাবনার লাগাম শয়তানের হাতে তুলে দিয়ে যেদিকে সে চালায় সেদিকে চলা এবং এমনভাবে চলা যেন সে শয়তানের বান্দা এবং শয়তান তার প্রভু—এটাইতো শয়তানকে মাবুদ বানাবার একটি পদ্ধতি। এ থেকে জানা যায়, বিনা বাক্য ব্যয়ে, নির্দেশ মেনে চলা এবং অন্ধভাবে কারো হুকুম পালন করার নামই 'ইবাদাত।' আর যে ব্যক্তি এভাবে কারো আনুগত্য করে সে আসলে তার ইবাদাত করে।

১৪৬. অর্থাৎ তাদের সময়, পরিশ্রম, প্রচেষ্টা, শক্তি ও যোগ্যতা এবং তাদের সন্তান ও ধন–সম্পদ থেকে নিজের একটি অংশ নিয়ে নেবো। তাদের এমনভাবে প্ররোচিত করবো যার ফলে তারা এ সবের একটি বিরাট অংশ আমার পথে ব্যয় করবে।

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ
خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿١١٩﴾

আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো। তাদেরকে আশার ছলনায় বিভ্রান্ত করবো। আমি তাদেরকে হুকুম করবো এবং আমার হুকুমে তারা পশুর কান ছিঁড়বেই।[১৪৭] আমি তাদেরকে হুকুম করবো এবং আমার হুকুমে তারা আল্লাহর সৃষ্টি আকৃতিতে রদবদল করে ছাড়বেই।[১৪৮] যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এই শয়তানকে বন্ধু ও অভিভাবক বানিয়েছে সে সুস্পষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

১৪৭. আরববাসীদের বহুতর কুসংস্কারের মধ্যে একটির দিকে এখানে ইশারা করা হয়েছে। তাদের নিয়ম ছিল, উটনী পাঁচটি বা দশটি বাচ্চা প্রসব করার পর তার কান চিরে তাকে তারা নিজেদের দেবতার নামে ছেড়ে দিতো এবং তাকে কোন কাজে ব্যবহার করা হারাম মনে করতো। এভাবে যে উটের ঔরশে দশটি বাচ্চা জন্ম নিতো তাকেও দেবতার নামে উৎসর্গ করা হতো। পশুর কান চিরে দেয়া দেবতার নামে উৎসর্গ করার আলামত হিসেবে বিবেচিত হতো।

১৪৮. আল্লাহর সৃষ্টি-আকৃতিতে রদবদল করার অর্থ বস্তুর সৃষ্টিকালীন কাঠামো ও আকার-আকৃতির পরিবর্তন নয়। এ অর্থ গ্রহণ করলে তো সমগ্র মানব সভ্যতা-সংস্কৃতি শয়তানের অবৈধ হস্তক্ষেপের ফসল বলে গণ্য হবে। কারণ আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুতে মানুষের হস্তক্ষেপের নামই হচ্ছে সভ্যতা ও সংস্কৃতি। আসলে এখানে যে রদবদলকে শয়তানী কাজ বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে, কোন বস্তুকে আল্লাহ যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেননি তাকে সেই কাজে লাগানো এবং যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন সে কাজে না লাগানো। অন্যকথায় বলা যায়, মানুষ নিজের ও বস্তুর প্রকৃতির বিরুদ্ধে যেসব কাজ করে এবং প্রকৃতির প্রকৃত উদ্দেশ্য উপেক্ষা করে যেসব পন্থা অবলম্বন করে তা সবই এই আয়াতের প্রেক্ষিতে শয়তানের বিভ্রান্তিকর আন্দোলনের ফসল। যেমন লূত জাতির কাজ, জন্ম শাসন, বৈরাগ্যবাদ, ব্রহ্মচর্য, নারী-পুরুষের বন্ধ্যাকরণ, পুরুষদেরকে খোজা বানানো, মেয়েদের ওপর প্রকৃতি যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে সে দায়িত্ব সম্পাদন করা থেকে তাদেরকে সরিয়ে রাখা এবং সমাজ-সংস্কৃতির এমনসব বিভাগে তাদের টেনে আনা যেগুলোর জন্য পুরুষদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব কাজ এবং শয়তানের শাগরিদরা দুনিয়ায় এ ধরনের আরো যেসব অসংখ্য কাজ করে বেড়াচ্ছে সেগুলো। আসলে এই অর্থ প্রকাশ করছে যে, তারা বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টার নির্ধারিত বিধি-বিধান ভুল মনে করে এবং তার মধ্যে সংস্কার সাধন করতে চায়।

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾ أُولَٰئِكَ
مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾ لَيْسَ
بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ ۗ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ۙ
وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾

সে তাদের কাছে ওয়াদা করে এবং তাদেরকে নানা প্রকার আশা দেয়,[১৪৯] কিন্তু শয়তানের সমস্ত ওয়াদা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সব লোকের আবাস হচ্ছে জাহান্নাম। সেখান থেকে নিষ্কৃতির কোন পথ তারা পাবে না। আর যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তাদেরকে আমি এমন সব বাগিচায় প্রবেশ করাবো যার নিম্নদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তারা সেখানে থাকবে চিরস্থায়ীভাবে। এটি আল্লাহর সাচ্চা ওয়াদা। আর আল্লাহর চাইতে বেশী সত্যবাদী আর কে হতে পারে?

চূড়ান্ত পরিণতি না তোমাদের আশা-আকাংখার ওপর নির্ভর করছে, না আহলি কিতাবদের আশা-আকাংখার ওপর। অসৎকাজ যে করবে সে তার ফল ভোগ করবে এবং আল্লাহর মোকাবিলায় সে নিজের জন্য কোন সমর্থক ও সাহায্যকারী পাবেনা।

১৪৯. শয়তানের সমস্ত কারবারটাই চলে মৌখিক ওয়াদা ও আশা-ভরসা দেবার ভিত্তিতে। সে ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক পর্যায়ে যখন মানুষকে কোন ভুল পথে পরিচালনা করতে চায়, তার সামনে এক আকাশকুসুম রচনা করে। কাউকে ব্যক্তিগত আনন্দ উপভোগ এ সাফল্যলাভের আশায় উদ্বেল করে তোলে। কাউকে জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির আশ্বাস দেয়। কাউকে মানবজাতির কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধান করে। কাউকে সত্যের কাছে পৌছে গেছে বলে মানসিক সান্ত্বনা দান করে। কারো মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করে যে, আল্লাহ বা আখেরাত বলে কিছুই নেই, মরে যাওয়ার পর সবাইকে মাটিতে মিশে যেতে হবে। কাউকে আশ্বাস দেয়, আখেরাত বলে যদি কিছু থেকেও থাকে

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ
يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿١٢٤﴾ وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ
اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ
اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿١٢٥﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ
شَىْءٍ مُّحِيْطًا ﴿١٢٦﴾

আর যে ব্যক্তি কোন সৎকাজ করবে, সে পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন, তবে যদি সে মু'মিন হয়, তাহলে এই ধরনের লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের এক অণুপরিমাণ অধিকারও হরণ করা হবে না। সেই ব্যক্তির চাইতে ভালো আর কার জীবনধারা হতে পারে, যে আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির নত করে দিয়েছে, সৎনীতি অবলম্বন করেছে এবং একনিষ্ঠ হয়ে ইবরাহীমের পদ্ধতি অনুসরণ করেছে? সেই ইবরাহীমের পদ্ধতি যাকে আল্লাহ নিজের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছিলেন। আসমান ও যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর।[১৫০] আর আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।[১৫১]

তাহলে উমুক হুজুরের বদৌলতে, উমুকের দোয়ার তোফায়েলে সেখানকার ধর-পাকড় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। মোটকথা যাকে যে ধরনের আশার ছলনায় ভুলানো যায় তাকে সেভাবে নিজের প্রতারণা জালে ফাঁসাবার চেষ্টা করে।

১৫০. অর্থাৎ আল্লাহর সামনে আনুগত্যের মাথা নত করে দেয়া এবং আত্মম্ভরিতা ও স্বেচ্ছাচারিতা থেকে বিরত থাকা প্রকৃত সত্যের সাথে যথার্থ সামঞ্জস্যশীল হবার কারণে সর্বোত্তম পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত। আল্লাহ যখন পৃথিবী, আকাশ ও এর মধ্যকার যাবতীয় বস্তুর মালিক তখন তার আনুগত্য ও বন্দেগী করতে প্রস্তুত হওয়া এবং বিদ্রোহী মনোভাব পরিহার করাই হচ্ছে মানুষের জন্য সঠিক পন্থা।

১৫১. অর্থাৎ মানুষ যদি আল্লাহর সামনে আনুগত্যের মাথা নত না করে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক আচরণ থেকে বিরত না হয় তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে রক্ষা করে সে কোথাও পালিয়ে যেতে পারে না। আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও কুদরাত চারদিক থেকে তাকে বেষ্টন করে আছে।

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن
تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

১৯ রুকূ'

লোকেরা মেয়েদের ব্যাপারে তোমার কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করছে।[১৫২] বলে দাও, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে ফতোয়া দেন এবং একই সাথে সেই বিধানও স্মরণ করিয়ে দেন, যা প্রথম থেকে এই কিতাবে তোমাদের শুনানো হচ্ছে।[১৫৩] অর্থাৎ এই এতিম মেয়েদের সম্পর্কিত বিধানসমূহ, যাদের হক তোমরা আদায় করছো না[১৫৪] এবং যাদেরকে বিয়ে দিতে তোমরা বিরত থাকছো (অথবা লোভের বশবর্তী হয়ে নিজেরাই যাদেরকে বিয়ে করতে চাও)।[১৫৫] আর যে শিশুরা কোন ক্ষমতা রাখে না তাদের সম্পর্কিত বিধানসমূহ।[১৫৬] আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, এতিমদের সাথে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ইনসাফের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকো এবং যে কল্যাণ তোমরা করবে তা আল্লাহর অগোচর থাকবে না।

১৫২. একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, মেয়েদের ব্যাপারে লোকেরা কি জিজ্ঞেস করে। তবে পরে যে ফতোয়া দেয়া হয়েছে তা থেকে প্রশ্নের ধরন স্বতস্ফূর্তভাবে সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

১৫৩. এটা আসল প্রশ্নের জওয়াব নয়। তবে লোকদের প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার পূর্বে আল্লাহ এই সূরার শুরুতে বিশেষ করে এতিম মেয়েদের সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে এতিম শিশুদের ব্যাপারে যেসব বিধি–বিধান বর্ণনা করেছিলেন সেগুলো যথাযথভাবে মেনে চলার ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। আল্লাহর দৃষ্টিতে এতিমদের অধিকারের গুরুত্ব যে কত বেশী এ থেকে তা সহজেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম দুই রুকূ'তে তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য জোর তাকীদ করা হয়েছিল। কিন্তু তাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি। কাজেই এখন সামাজিক প্রসংগের আলোচনা আসতেই লোকদের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দেয়ার পূর্বেই আল্লাহ নিজেই এতিমদের স্বার্থের প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।

১৫৪. সেই আয়াতটির দিকে ইংগিত করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে ঃ "যদি এতিমদের সাথে বেইনসাফী করতে ভয় পাও তাহলে যেসব মেয়েদের তোমরা পছন্দ করো....." (সূরা আননিসা, ৩)

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ
وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾ وَلَنْ
تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

যখনই[১৫৭] কোন স্ত্রীলোক নিজের স্বামীর কাছ থেকে অসদাচরণ অথবা উপেক্ষা প্রদর্শনের আশংকা করে, তারা দু'জনে (কিছু অধিকারের কমবেশীর ভিত্তিতে) যদি পরস্পর সন্ধি করে নেয়, তাহলে এতে কোন দোষ নেই। যে কোন অবস্থায়ই সন্ধি উত্তম।[১৫৮] মন দ্রুত সংকীর্ণতার দিকে ঝুঁকে পড়ে।[১৫৯] কিন্তু যদি তোমরা পরোপকার করো ও আল্লাহভীতি সহকারে কাজ করো, তাহলে নিশ্চিত জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের এই কর্মনীতি সম্পর্কে অনবহিত থাকবেন না।[১৬০] স্ত্রীদের মধ্যে পুরোপুরি ইনসাফ করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তোমরা চাইলেও এ ক্ষমতা তোমাদের নেই। কাজেই (আল্লাহর বিধানের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য এটিই যথেষ্ট যে,) এক স্ত্রীকে একদিকে ঝুলিয়ে রেখে অন্য স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে পড়বে না।[১৬১] যদি তোমরা নিজেদের কর্মনীতির সংশোধন করো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।[১৬২] কিন্তু স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পর থেকে আলাদা হয়েই যায়, তাহলে আল্লাহ তার বিপুল ক্ষমতার সাহায্যে প্রত্যেককে অন্যের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি মহাজ্ঞানী।

১৫৫. ترغبون ان تنكحوهن এর এ অর্থও হতে পারে ঃ "তোমরা তাদেরকে বিয়ে করার আগ্রহ পোষণ করো।" আবার এ অর্থও হতে পারে, "তোমরা তাদেরকে বিয়ে করা পছন্দ কর না।" হযরত আয়েশা (রা) এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ কিছু লোকের অভিভাবকত্বে এমন কিছু এতিম মেয়ে ছিল, যাদের কাছে কিছু পৈতৃক ধন-সম্পত্তি ছিল।

তারা এই মেয়েগুলোর ওপর নানাভাবে জুলুম করতো। মেয়েরা সম্পদশালিনী হবার সাথে সাথে সুন্দরী হলে তারা তাদের বিয়ে করতে চাইতো এবং মোহরানা ও খোরপোষ আদায় না করেই তাদের সম্পদ ও সৌন্দর্য উভয়টিই ভোগ করতে চাইতো। আর তারা অসুন্দর বা কুৎসিত হলে নিজেরা তাদের বিয়ে করতো না এবং অন্য কারো সাথে তাদের বিয়ে দিতেও চাইতো না। কারণ অন্য কারো সাথে বিয়ে দিলে এমন কোন শক্ত মালিক পক্ষ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা ছিল, যে তাদের থেকে এতিমদের হক বুঝে নেয়ার দাবী করতো।

১৫৬. এই সূরার প্রথম ও দ্বিতীয় রুকূ'তে এতিমদের অধিকার সম্পর্কে যে সমস্ত বিধান বর্ণিত হয়েছে এখানে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

১৫৭. আসল প্রশ্নের জবাব এখান থেকে শুরু হচ্ছে। এ জবাবটি বুঝতে হলে প্রথমে প্রশ্নটি ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। জাহেলী যুগে এক ব্যক্তি অসংখ্য বিয়ে করতে পারতো। এ ব্যাপারে তার অবাধ স্বাধীনতা ছিল। আর এই অসংখ্য স্ত্রীদের জন্য কোন অধিকারও সংরক্ষিত ছিল না। সূরা নিসার প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযিল হবার পর এই স্বাধীনতার ওপর দু' ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়। এক, স্ত্রীদের সংখ্যা সর্বাধিক চারের মধ্যে সীমিত করে দেয়া হয়। দুই, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করার জন্য 'আদল' (অর্থাৎ সবদিক দিয়ে সমান ব্যবহার) এর শর্ত আরোপ করা হয়। এখানে প্রশ্ন ওঠে, যদি কোন ব্যক্তির স্ত্রী বন্ধ্যা হয় বা চিররুগ্না হয় অথবা কোন ক্রমেই তার স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক সম্পর্ক বজায় রাখার যোগ্যতা না থাকে এবং এ অবস্থায় স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করে তাহলে কি উভয়ের প্রতি সমান আকর্ষণ অনুভব করা, সমান ভালোবাসা পোষণ করা এবং উভয়ের সাথে সমান দৈহিক সম্পর্ক রা[illegible] তার জন্য অপরিহার্য গণ্য হবে? আর যদি সে এমনটি না করে, তাহলে আদলের শর্ত কি এটাই দাবী করে যে, দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করার পূর্বে সে প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেবে? এছাড়াও প্রথম স্ত্রী নিজেই যদি বিচ্ছিন্ন হতে না চায় তাহলে কি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা বোঝাপড়ার মাধ্যমে যে স্ত্রী আকর্ষণহীন হয়ে পড়েছে সে স্বেচ্ছায় নিজের কিছু অধিকার ত্যাগ করে তাকে তালাক দেয়া থেকে বিরত রাখার জন্য স্বামীকে রাজী করতে পারে? এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা কি আদলের বিরোধী হবে? সংশ্লিষ্ট আয়াতটিতে উপরোল্লিখিত প্রশ্নগুলোর জবাব দেয়া হয়েছে।

১৫৮. অর্থাৎ তালাক ও বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে যে স্ত্রী তার জীবনের একটি অংশ এক স্বামীর সাথে অতিবাহিত করেছে এভাবে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও চুক্তির মাধ্যমে বাকি জীবনটা তারই সাথে অবস্থান করাটাই উত্তম।

১৫৯. স্ত্রী যদি নিজের মধ্যে স্বামীর জন্য আকর্ষণহীনতার কারণ অনুভব করতে থাকে এবং এরপরও সে স্বামীর কাছ থেকে একজন আকর্ষণীয় স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার প্রত্যাশা করে তাহলে এটিই হবে সেই স্ত্রীর মনের সংকীর্ণতা। আর স্বামী যদি এমন কোন স্ত্রীকে সীমাতিরিক্তভাবে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে এবং তার অধিকার অসহনীয় পর্যায়ে ছিনিয়ে নিতে চায়, যে স্ত্রী স্বামীর মনরাজ্যে সকল প্রকার আকর্ষণ হারিয়ে বসার পরও তার সাথে অবস্থান করতে চায়, তাহলে এটি হবে স্বামীর পক্ষ থেকে মনের সংকীর্ণতার পরিচয়।

১৬০. এখানে আল্লাহ আবার পুরুষেরই উদার মনোবৃত্তির প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। এ ধরনের ব্যাপারে এটিই আল্লাহর রীতি। তিনি সকল প্রকার আকর্ষণহীনতা সত্ত্বেও মেয়েটির

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ۭ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ
مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴿١٣١﴾ وَلِلّٰهِ مَا
فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٣٢﴾ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ
اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰي ذٰلِكَ قَدِيْرًا ﴿١٣٣﴾ مَنْ كَانَ
يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ
سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا ﴿١٣٤﴾

আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর মালিকানাধীন। তোমাদের পূর্বে যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও আল্লাহকে ভয় করে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। তোমরা না মানতে চাও না মানো, কিন্তু আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি অভাব মুক্ত ও সমস্ত প্রশংসার অধিকারী। হাঁ, আল্লাহ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক। আর কার্যসম্পাদনের জন্য তিনিই যথেষ্ট। তিনি চাইলে তোমাদেরকে সরিয়ে দিয়ে তোমাদের জায়গায় অন্যদেরকে নিয়ে আসবেন এবং তিনি এ ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। যে ব্যক্তি কেবলমাত্র ইহকালের পুরস্কার চায়, তার জেনে রাখা উচিত, আল্লাহর কাছে ইহকাল ও পরকাল উভয়স্থানের পুরস্কার আছে এবং আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন।[১৬৩]

সাথে অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার করার জন্য পুরুষের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। কেননা মেয়েটি বছরের পর বছর ধরে তার জীবন সঙ্গিনী হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেছে। এই সংগে আল্লাহকে ভয় করারও নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা কোন মানুষের ভুল-ত্রুটির কারণে তিনি তার দিক থেকে যদি নিজের কৃপাদৃষ্টি ফিরিয়ে নেন এবং তার ভাগ্যের অংশ হ্রাস করে দেন, তাহলে দুনিয়ায় তার আশ্রয় লাভ করার আর কোন স্থানই থাকে না।

১৬১. এর অর্থ হচ্ছে, মানুষ সব অবস্থায় একাধিক স্ত্রীদের মধ্যে সব দিক দিয়ে পূর্ণ সাম্য কায়েম করতে পারে না। একটি স্ত্রী সুন্দরী রূপসী এবং অন্যটি কুৎসিত। একজন যুবতী এবং অন্যজন বিগত যৌবনা। একজন চির রুগ্না ও অন্যজন সবল স্বাস্থ্যবতী। একজন কর্কশ স্বভাবের ও কটুভাষিণী এবং অন্যজন মধুর প্রকৃতির ও মিষ্টভাষিণী। স্ত্রীদের মধ্যে

এ ধরনের আরো বিভিন্ন প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকতে পারে। এর ফলে স্বভাবতই এক স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ বেশী ও অন্য স্ত্রীর প্রতি কম হতে পারে। এহেন অবস্থায় আইন এ দাবী করে না যে, ভালোবাসা, আকর্ষণ ও দৈহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ সমতা কায়েম রাখা অপরিহার্য। বরং আইন কেবল এতটুকু দাবী করে, যখন তুমি আকর্ষণহীনতা সত্ত্বেও একটি মেয়েকে তালাক দিচ্ছো না এবং নিজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বা তার কামনা অনুযায়ী তাকে নিজের স্ত্রীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখছো, তখন তার সাথে অবশ্যি এতটুকু সম্পর্ক রাখো যার ফলে সে কার্যত স্বামীহীনা হয়ে না পড়ে। এ অবস্থায় এক স্ত্রীর তুলনায় অন্য স্ত্রীর প্রতি বেশী ঝুঁকে পড়া ও তার প্রতি বেশী অনুরক্ত হওয়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু অন্য স্ত্রীর প্রতি যেন এমনভাবে অবহেলা ও অনীহা প্রদর্শিত না হয় যার ফলে মনে হতে থাকে যে, তার কোন স্বামীই নেই।

এ আয়াত থেকে কেউ কেউ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, কুরআন একদিকে আদলের শর্ত সহকারে একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয় আবার অন্যদিকে আদলকে অসম্ভব গণ্য করে এই অনুমতিকে কার্যত বাতিল করে দেয়। কিন্তু আসলে এ ধরনের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন অবকাশই এ আয়াতে নেই। কুরআন যদি কেবল এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হতো যে, "তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে আদল কায়েম করতে পারবে না," তাহলে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুযোগ থাকতো। কিন্তু এর পরপরই বলা হয়েছে, "কাজেই এক স্ত্রীর প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না।" এ বাক্যটি উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন সুযোগই এখানে রাখেনি। খৃষ্টবাদী ইউরোপের কিছু নকলনবিশ এ ব্যাপারে নিতান্ত উদ্ভট সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন।

১৬২. অর্থাৎ যদি তোমরা যথাসম্ভব ইচ্ছা করে জুলুম না করো এবং ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় দিতে থাকো, তাহলে স্বাভাবিক অক্ষমতার কারণে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির ব্যাপারে সামান্য যা ভুলচুক তোমরা করবে আল্লাহ তা মা'ফ করে দেবেন।

১৬৩. সাধারণভাবে আইন সংক্রান্ত বিধি–বিধান বর্ণনা করার পর এবং বিশেষভাবে সমাজ সভ্যতার যেসব অংশে মানুষ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অন্যায় ও জুলুম করে আসছে সেসব অংশের সংস্কার ও সংশোধনের ওপর জোর দেবার পর আল্লাহ তাআলা অবশ্যি এ ধরনের কয়েকটি প্রভাবশালী ও আকর্ষণীয় বাক্যের মাধ্যমে একটি সংক্ষিপ্ত উপদেশমূলক ভাষণ দিয়ে থাকেন। মানুষকে ঐ বিধানগুলো পালনে উদ্বুদ্ধ করাই এর উদ্দেশ্য। ইতিপূর্বে যেহেতু মেয়েদের ও এতিম ছেলেমেয়েদের সাথে ইনসাফ ও সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাই এরপর ঈমানদারদের মনের মধ্যে কিছু কথা গেঁথে দেবার প্রয়োজন বোধ করা হয়েছে।

প্রথম কথা হচ্ছে ঃ কারো ভাগ্য ভাঙা–গড়ার ক্ষমতা তোমার আছে এ ধরনের ভুল ধারণা কখনো পোষণ করো না। তোমার অনুগ্রহের হাত টেনে নিলেই দুনিয়ায় তার আর কোন আশ্রয়ই থাকবে না। এটা সম্পূর্ণ একটা অমূলক ধারণা। এ ধারণায় বিন্দু পরিমাণও সত্যতা নেই। কেননা তোমার, তার ও সবার ভাগ্য আল্লাহর হাতে। তোমার একার মাধ্যমে আল্লাহ তার বান্দাদের সাহায্য করেন না। আকাশ ও পৃথিবীর মালিক মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহর মাধ্যম ও উপায় উপকরণ অত্যন্ত ব্যাপক ও সীমা সংখ্যাহীন। নিজের উপায় উপকরণগুলোকে কাজে লাগাবার এবং সেগুলোর সাহায্যে কার্যোদ্ধার করার কৌশলও তার আয়ত্বাধীন।

দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে ঃ তোমাদের এবং তোমাদের মতো পূর্ববর্তী সমস্ত নবীর উম্মাতদের হামেশা এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের যাবতীয় কাজে আল্লাহকে ভয় করো। এ নির্দেশ মেনে চললে তোমাদের লাভ, আল্লাহর কোন লাভ নেই। আর যদি তোমরা এর বিরুদ্ধাচরণ করো, তাহলে পূর্ববর্তী উম্মাতরা এ ধরনের নাফরমানী করে যেমন আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারেনি তেমনি তোমরাও পারবে না। এই বিশ্ব-জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি পূর্বেও কারো পরোয়া করেননি এবং এখনো তোমাদের পরোয়া করে না। তার হুকুম অমান্য করলে তিনি তোমাদের সরিয়ে দিয়ে অন্য একটি জাতিকে সাফল্যের স্বর্ণচূড়ায় বসিয়ে দেবেন। আর এই ময়দান থেকে তোমাদের সরে যাওয়ার ফলে তার সাম্রাজের বিপুল বৈভবে ও রূপ সৌন্দর্যে একটুও পার্থক্য দেখা দেবে না।

তৃতীয়ত, আল্লাহর কাছে একদিকে যেমন দুনিয়ার স্বার্থ সুযোগ-সুবিধা আছে তেমনি অন্যদিকে আছে আখেরাতের কল্যাণও। এই স্বার্থ, সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণ সাময়িক আবার চিরন্তনও। এখন তোমরা তাঁর কাছ থেকে কোন ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণ লাভ করতে চাও তা তোমাদের নিজেদের সামর্থ, হিম্মত, সাহস ও আকাংখার ওপর নির্ভর করে। যদি তোমরা নিছক দুনিয়ার কয়েকদিনের স্বার্থলাভের জন্য পাগলপারা হয়ে গিয়ে থাকো এবং তার বিনিময়ে চিরন্তন স্বার্থসমূহ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হও, তাহলে আল্লাহ এসব কিছু তোমাদের এখনই এখানেই দিয়ে দেবেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আখেরাতের চিরন্তন স্বার্থ ও সুযোগ সুবিধা লাভের কোন অংশই তোমরা পাবে না। নদী তোমাদের শস্যক্ষেতগুলোতে চিরকাল পানি সিঞ্চন করতে প্রস্তুত। কিন্তু তোমাদের নিজেদের মনের সংকীর্ণতা এবং সাহস, হিম্মত ও মনোবলের অভাবের কারণে তোমরা কেবলমাত্র একটি শস্য মওসূমের পানি সিঞ্চনকে চিরন্তন খরার বিনিময়ে ক্রয় করছো। কাজেই হৃদয় প্রশস্ত করে আনুগত্য ও বন্দেগীর এমন পথ অবলম্বন করো যার ফলে তোমরা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের স্বার্থ ও সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারো।

সবশেষে বলা হয়েছে, আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন। এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ অন্ধ ও বধির নন। কোন অজ্ঞ ও গাফেল রাজার মতো চোখ কান বন্ধ করে আন্দাজে কাজ করা এবং নিজের দান ও দয়া-দাক্ষিণ্যের ক্ষেত্রে ভালো-মন্দের পার্থক্য না করা তার রীতি নয়। পূর্ণ সচেতনতার সাথে তিনি তার এই বিশ্ব-জাহানের ওপর শাসন কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যেকের গ্রহণ ক্ষমতা, হিম্মত ও মনোবলের ওপর তিনি দৃষ্টি রেখেছেন। প্রত্যেকের গুণাবলী তিনি জানেন। তোমাদের কে কোন পথে নিজের শ্রম ও প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছে, তাও তিনি ভালো করেই জানেন তিনি অনুগত বান্দাদের জন্য যেসব অনুগ্রহ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তোমরা তার নাফরমানীর পথ অবলম্বন করে সেগুলো লাভের আশা করতে পারো না।

১৬৪. আল্লাহ কেবল এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি যে, তোমরা ইনসাফের দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করো এবং ইনসাফের পথে চলো বরং বলেছেন তোমরা ইনসাফের পতাকাবাহী হয়ে যাও। কেবল ইনসাফ করাই তোমাদের কাজ হবে না বরং ইনসাফের ঝাণ্ডা নিয়ে এগিয়ে চলাই হবে তোমাদের কাজ। জুলুম খতম করে তার জায়গায় আদল ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করতে তোমাদের দৃঢ় সংকল্প হতে হবে। আদল ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى
اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ
اَوْلٰى بِهِمَا ۣ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا
فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا
بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ
اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۭ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰۗىِٕكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾

২০ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! ইনসাফের পতাকাবাহী[১৬৪] ও আল্লাহর সাক্ষী হয়ে যাও,[১৬৫] তোমাদের ইনসাফ ও সাক্ষ তোমাদের নিজেদের ব্যক্তিসত্তার অথবা তোমাদের বাপ-মা ও আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে গেলেও। উভয় পক্ষ ধনী বা অভাবী যাই হোক না কেন আল্লাহ তাদের চাইতে অনেক বেশী কল্যাণকামী। কাজেই নিজেদের কামনার বশবর্তী হয়ে ইনসাফ থেকে বিরত থেকো না। আর যদি তোমরা পেঁচালো কথা বলো অথবা সত্যতাকে পাশ কাটিয়ে চলো, তাহলে জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ তার খবর রাখেন।

হে ঈমানদারগণ! ঈমান আনো[১৬৬] আল্লাহর প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি, আল্লাহ তাঁর রসূলের ওপর যে কিতাব নাযিল করেছেন তার প্রতি এবং পূর্বে তিনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাবর্গ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলগণ ও পরকালের প্রতি কুফরী করলো[১৬৭] সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূর চলে গেলো।

যে সহায়ক শক্তির প্রয়োজন মু'মিন হিসেবে তোমাদের যোগান দিতে হবে সেই সহায়ক শক্তি।

১৬৫. অর্থাৎ তোমাদের সাক্ষ একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া উচিত। এতে কারো প্রতি দরদ ও সহানুভূতির কোন প্রশ্ন থাকবে না। কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টি অর্জন তোমাদের লক্ষ হবে না।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾

অবশ্যি যেসব লোক ঈমান এনেছে তারপর কুফরী করেছে, আবার ঈমান এনেছে আবার কুফরী করেছে, তারপর নিজেদের কুফরীর মধ্যে এগিয়ে যেতে থেকেছে,[১৬৮] আল্লাহ কখনো তাদেরকে মাফ করবেন না এবং কখনো তাদেরকে সত্য–সঠিক পথও দেখাবেন না।

১৬৬. যারা পূর্বেই ঈমান এনেছে তাদেরকে আবার বলা, 'তোমরা ঈমান আনো'—কথাটা আপাত দৃষ্টিতে অদ্ভুত মনে হয়। কিন্তু আসলে এখানে 'ঈমান' শব্দটি দু'টি আলাদা আলাদা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ঈমান আনার একটি অর্থ হচ্ছে অস্বীকৃতির পরিবর্তে স্বীকৃতির পথ অবলম্বন করা। অস্বীকারকারীদের থেকে আলাদা হয়ে স্বীকৃতিদানকারীদের দলে শামিল হয়ে যাওয়া। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে ঃ কোন জিনিসকে সাচ্চা দিলে, সরল অন্তঃকরণে এবং পূর্ণ দায়িত্ব সচেতনতা সহকারে মেনে নেয়া। নিজের চিন্তা, রুচি, পছন্দ, দৃষ্টিভংগী, মনোভাব, চাল–চলন এবং নিজের বন্ধুতা, শত্রুতা ও প্রচেষ্টা–সংগ্রামের সকল ক্ষেত্রকে সে যে আকীদার ওপর ঈমান এনেছে পুরোপুরি সেই অনুযায়ী ঢেলে সাজানো। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে যেসব মুসলমান স্বীকারকারীদের অন্তরভুক্ত হয় এ আয়াতে তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের কাছে দাবী করা হয়েছে। দ্বিতীয় অর্থটির পেক্ষিতে তোমরা সাচ্চা মু'মিনে পরিণত হও।

১৬৭. কুফরী করারও দু'টি অর্থ হয়। এর একটি অর্থ হচ্ছে, সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অস্বীকার করা। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, মুখে মেনে নেয়া কিন্তু মনে মনে অস্বীকার করা। অথবা নিজের মনোভাবের মাধ্যমে একথা প্রমাণ করা যে, সে যে জিনিসটি মেনে নেয়ার দাবী করছে আসলে সেটিকে মানে না। এখানে কুফরী শব্দটি এই দু'টি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামের এই বুনিয়াদী আকীদাগুলোর ব্যাপারে উপরোল্লিখিত দুই ধরনের কুফরীর মধ্য থেকে যে কোনটি অবলম্বন করা হবে তার ফল হবে কেবল হক থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং বাতিলের পথে নিষ্ফল প্রয়াসে মাথা খুঁড়ে মরা। এ বিষয়টি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে দেয়াই এই আয়াতটির উদ্দেশ্য।

১৬৮. এখানে সেইসব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা দ্বীনকে নিছক একটি হাল্কা প্রমোদ ও চিত্তবিনোদন হিসেবে গ্রহণ করে। যারা দ্বীনকে একটি খেল্না বানিয়ে নিজেদের কল্পনা ও কামনার রশি দিয়ে ইচ্ছেমতো তাকে ঘোরাতে থাকে তাদের কথাই এখানে আলোচিত হয়েছে। চিন্তার জগতে একটা আলোড়ন উঠলো আর অমনি মুসলমান হয়ে গেলো। তারপর আর একটা আলোড়ন উঠলো আর অমনি কাফের হয়ে গেলো। অথবা যখন দেখা গেলো মুসলমান হয়ে গেলে বৈষয়িক স্বার্থ হাসিল করা যাবে তখন মুসলমান হয়ে গেলো। আবার যখন স্বার্থের খুঁটি ঘুরে গেলো তখন তার পদসেবা করার জন্য নির্দ্বিধায় সেদিকে চলে গেলো। এ ধরনের লোকদের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফেরাত বা হিদায়াত

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ
اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۭ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ
جَمِيْعًا ۝ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ
بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ
غَيْرِهٖٓ ڮ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ
جَهَنَّمَ جَمِيْعَۨا ۝

আর যেসব মুনাফিক ঈমানদারদেরকে বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধু বানায় তাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে. এ 'সুসংবাদটি' তাদেরকে জানিয়ে দাও। এরা কি মর্যাদা লাভের সন্ধানে তাদের কাছে যায়?[১৬৯] অথচ সমস্ত মর্যাদা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। আল্লাহ এই কিতাবে তোমাদের পূর্বেই হুকুম দিয়েছেন, যেখানে তোমরা আল্লাহর আয়াতের বিরুদ্ধে কুফরী কথা বলতে ও তার প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করতে শুনবে সেখানে বসবে না, যতক্ষণ না লোকেরা অন্য প্রসংগে ফিরে আসে। অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো হবে।[১৭০] নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদেরকে জাহান্নামে একই জায়গায় একত্র করবেন।

কিছুই নেই। "তারপর নিজেদের কুফরীর মধ্যে তারা এগিয়ে যেতেই থাকলো"—এখানে একথা বলার অর্থ হচ্ছে ঃ কোন ব্যক্তি কেবল কাফের হয়ে গিয়েই ক্ষান্ত হয় না। বরং এরপর সে অন্য লোকদেরকেও ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে। ইসলামের বিরুদ্ধে গোপন চক্রান্ত করে এবং প্রকাশ্যে নানা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকে। কুফরীর শির উন্নত করার এবং তার মোকাবিলায় আল্লাহর দ্বীনের ঝাণ্ডা ধূলায় লুণ্ঠিত করার জন্য নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালায়। এটিকেই বলে কুফরীতে আরো উন্নতি হওয়া, কুফরী আরো বেড়ে যাওয়া এবং একটি অপরাধের পর আর একটি অপরাধ তারপর আর একটি অপরাধ—এভাবে অপরাধের ফিরিস্তি ক্রমাগত বেড়ে যাওয়া। পরিণামে এ শাস্তিও নিছক কুফরী থেকে অনেক বেশী হতে হবে।

১৬৯. এখানে মূল আয়াতে 'ইজ্জত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় 'ইজ্জত' শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। সাধারণত ইজ্জত শব্দটি বললে মান, মর্যাদা, সম্মান ইত্যাদি

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن
مَّعَكُمْ ۖ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ ۙ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ
وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ
وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

এই মুনাফিকরা তোমাদের ব্যাপারে অপেক্ষা করছে। তারা দেখছে পানি কোন্ দিকে গড়ায়। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের বিজয় সূচিত হয় তাহলে তারা এসে বলবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? আর যদি কাফেরদের পাল্লা ভারী থাকে তাহলে তাদেরকে বলবে, আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম ছিলাম না? এরপরও আমরা মুসলমানদের হাত থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করেছি।[১৭১] কাজেই কিয়ামতের দিন তোমাদের ও তাদের ব্যাপারে ফায়সালা আল্লাহই করে দেবেন। আর (এই ফায়সালায়) আল্লাহ কাফেরদের জন্য মুসলমানদের ওপর বিজয় লাভ করার কোন পথই রাখেননি।

বুঝানো হয়; কিন্তু আরবীতে 'ইজ্জত' শব্দের অর্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তির মর্যাদা এতই উন্নত ও সংরক্ষিত হয়ে যাওয়া যার ফলে কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। অন্য কথায় 'ইজ্জত' শব্দটির অর্থে বলা যায়, যে মর্যাদা বিনষ্ট করার ক্ষমতা কারো নেই।

১৭০. অর্থাৎ এক ব্যক্তি মুসলিম হবার দাবী করা সত্ত্বেও যদি কাফেরদের এমন সব বৈঠকে–সমাবেশে–আলোচনায় শরীক হয় যেখানে আল্লাহর আয়াতের বিরুদ্ধে কুফরী বাক্য উচ্চারিত হয় এবং সে ঠাণ্ডা মাথায় নিশ্চিত মনে আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে লোকদের বিদ্রূপাত্মক উক্তি ও সমালোচনা শুনতে থাকে, তাহলে তার ও ঐ কাফেরদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। (এই আয়াতে যে হুকুমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সূরা আনআমের ৬৮ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে)।

১৭১. এটিই প্রত্যেক যুগের মুনাফিকদের বৈশিষ্ট। মৌখিক স্বীকারোক্তি ও ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে নামমাত্র প্রবেশের মাধ্যমে মুসলমান হিসেবে যতটুকু স্বার্থ ভোগ করা যায় তা তারা ভোগ করে। আবার অন্যদিকে কাফের হিসেবে যে স্বার্থটুকু ভোগ করা সম্ভব তা ভোগ করার জন্য তারা কাফেরদের সাথে যোগ দেয়। তারা সর্বোতভাবে কাফেরদের বিশ্বাসভাজন হবার চেষ্টা করে। তাদেরকে বলে ঃ আমরা মোটেই "গোঁড়া ও বিদ্বেষপরায়ণ" মুসলমান নই। মুসলমানদের সাথে আমাদের অবশ্যি নামের সম্পর্ক আছে। কিন্তু আমাদের মানসিক ঝোক, আগ্রহ ও বিশ্বস্ততা রয়েছে তোমাদের প্রতি। চিন্তা–ভাবনা, আচার–ব্যবহার, রুচি–প্রকৃতি ইত্যাদি সব দিক দিয়ে তোমাদের সাথে আমাদের গভীর মিল। তাছাড়া ইসলাম ও কুফরীর সংঘর্ষে আমরা তোমাদের পক্ষই অবলম্বন করবো।

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَإِذَا قَامُوْٓا إِلَى الصَّلٰوةِ
قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٤٢﴾
مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ
اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿١٤٣﴾

২১ রুকূ'

এই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করছে। অথচ আল্লাহই তাদেরকে ধোঁকার মধ্যে ফেলে রেখে দিয়েছেন। তারা যখন নামাযের জন্য ওঠে, আড়মোড়া ভাংতে ভাংতে শৈথিল্য সহকারে নিছক লোক দেখাবার জন্য ওঠে এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।[১৭২] কুফর ও ঈমানের মাঝে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে, না পুরোপুরি এদিকে, না পুরোপুরি ওদিকে। যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন তার জন্য তুমি কোন পথ পেতে পারো না।[১৭৩]

১৭২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায় কোন ব্যক্তি নিয়মিত নামায না পড়ে মুসলমানদের দলের অন্তরভুক্ত হতে পারতো না। দুনিয়ার বিভিন্ন দল ও মজলিস যেমন তাদের বৈঠকগুলোতে কোন সদস্যের বিনা ওজরে অনুপস্থিত থাকাকে দলের প্রতি তার অনাগ্রহ মনে করে থাকে এবং পরপর কয়েকটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ বাতিল করে তাকে দল থেকে বের করে দেয়, ঠিক তেমনি ইসলামী জামায়াতের কোন সদস্যের জামায়াতের সাথে নামাযে গরহাযির থাকাকে সে জামানায় সে ব্যক্তির ইসলামের প্রতি অনাগ্রহের সুস্পষ্ট প্রমাণ মনে করা হতো। আর যদি সে অনবরত কয়েক বার জামায়াতে গরহাযির থাকতো তাহলে ধরে নেয়া হতো সে মুসলমান নয়। তাই বড় বড় কট্টর মুনাফিকদেরও সে যুগে পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে হাযিরি দিতে হতো। কারণ এ ছাড়া তাদের মুসলমানদের দলের অন্তরভুক্ত থাকার আর দ্বিতীয় কোন পথ ছিল না। তবে যে জিনিসটা তাদের সাচ্চা ঈমানদার থেকে আলাদা করতো সেটি হচ্ছে এই যে, সাচ্চা মু'মিনরা বিপুল উৎসাহ আগ্রহ নিয়ে মসজিদে আসতো, জামায়াতের সময়ের পূর্বেই মসজিদে পৌঁছে যেতো এবং নামায শেষ হবার পরও মসজিদে বসে থাকতো। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠতো যে নামাযের প্রতি তাদের যথার্থই হৃদয়ের টান ও আগ্রহ রয়েছে। বিপরীত পক্ষে আযানের আওয়াজ কানে আসতেই মুনাফিকদের যেন জান বেরিয়ে যেতো। মন চাইতো না তবুও নেহাত দায়ে ঠেকে তারা উঠতো। তাদের মসজিদের দিকে আসার ধরন দেখে পরিষ্কার বুঝা যেতো যে স্বতস্ফূর্তভাবে তারা আসছে না বরং অনিচ্ছায় নিজেদের টেনে টেনে আনছে। জামায়াত শেষ হবার পর এমনভাবে মসজিদ থেকে পালাতো যেন মনে হতো কয়েদীরা বন্দীশালা থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাদের

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ
أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ
فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ۖ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ
تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا۟ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ
مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾
مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا
عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾

হে ঈমানদারগণ! মু'মিনদের বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহর হাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ তুলে দিতে চাও? নিশ্চিত জেনো, মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে চলে যাবে এবং তোমরা কাউকে তাদের সাহায্যকারী হিসেবে পাবে না। তবে তাদের মধ্য থেকে যারা তাওবা করবে, নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নেবে, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং নিজেদের দীনকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে নেবে,[১৭৪] তারা মু'মিনদের সাথে থাকবে। আর আল্লাহ নিশ্চয়ই মু'মিনদেরকে মহাপুরস্কার দান করবেন। আল্লাহর কী প্রয়োজন তোমাদের অযথা শাস্তি দেবার, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকো।[১৭৫] এবং ঈমানের নীতির ওপর চলো। আল্লাহ বড়ই পুরস্কার দানকারী[১৭৬] ও সর্বজ্ঞ।

ওঠাবসা চলাফেরা তথা প্রতিটি পদক্ষেপ সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতো যে, আল্লাহর যিকিরের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্রও মানসিক টান ও আগ্রহ নেই।

১৭৩. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর কালাম ও রসূলের জীবন চরিত থেকে হিদায়াত লাভ করেনি, যাকে সত্য বিমুখ ও বাতিলের প্রতি গভীর অনুরাগী দেখে আল্লাহও তাকে সেদিকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন যেদিকে সে নিজে ফিরে যেতে চায় এবং তার গোমরাহীকে আঁকড়ে ধরার কারণে আল্লাহ তার জন্য হিদায়াতের দরজা বন্ধ করে কেবল মাত্র গোমরাহীর দরজা খুলে দিয়েছেন। এহেন ব্যক্তিকে সঠিক পথ দেখানো আসলে কোন মানুষের সাধ্যের অতীত। রিযিকের দৃষ্টান্ত থেকে এ বিষয়টি অনুধাবন করা যেতে পারে।

রিযিকের সমস্ত সম্পদ মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্ষমতা ও কুদরতের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন, এটা একটা জাজ্বল্যমান সত্য। মানুষ যা কিছু পায়, যতটুকু পায় আল্লাহর কাছ থেকেই পায়। কিন্তু যে ব্যক্তি যে পথে রিযিক চায় আল্লাহ তাকে সেই পথেই রিযিক দান করেন। যদি কোন ব্যক্তি হালাল পথে রিযিক চায় এবং সেজন্য প্রচেষ্টাও চালাতে থাকে তাহলে আল্লাহ তার জন্য রিযিকের হালাল পথগুলো খুলে দেন। তার নিয়ত যে পরিমাণ সৎ ও নিষ্কলুষ হয় সেই পরিমাণ হারাম পথ তার জন্য বন্ধ করে দেন। বপরীত পক্ষে যে ব্যক্তি হারাম খাবার জন্য উঠে পড়ে লাগে এবং এ জন্য চেষ্টা-চরিত্র করতে থাকে, আল্লাহর হুকুমে সে হারাম খাবারই পায়। এরপর তার ভাগ্যে হালাল রুজি লিখে দেবার ক্ষমতা আর কারো থাকে না। অনুরূপভাবে এটাও একটা জাজ্বল্যমান সত্য যে, এই দুনিয়ায় চিন্তা ও কর্মের সমস্ত পথ আল্লাহর ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের অধীন। আল্লাহর হুকুম, অনুমতি ও তাওফীক তথা সুযোগ দান ছাড়া কোন একটি পথেও চলার ক্ষমতা মানুষের নেই। তবে কোন্ ব্যক্তি কোন পথে চলার অনুমতি পায় এবং কোন্ পথে চলার উপকরণ তার জন্য সংগ্রহ করে দেয়া হয় এটা পুরোপুরি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিজের চাহিদা, প্রচেষ্টা ও সাধনার ওপর। যদি আল্লাহর সাথে তার মানসিক সংযোগ থাকে, সে সত্যানুসন্ধানী হয় এবং সাচ্চা নিয়তে আল্লাহর পথে চলার জন্য প্রচেষ্টা চালায় তাহলে আল্লাহ তাকে তারই অনুমতি ও সুযোগ দান করেন। তখন এ পথে চলার যাবতীয় উপকরণ ও সরঞ্জাম তার আয়ত্তাধীন হয়ে যায়। বিপরীত পক্ষে যে ব্যক্তি গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা পছন্দ করে এবং ভুল পথে চলার জন্য চেষ্টা-সাধনা করে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য হিদায়াতের সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং সেই সমস্ত পথ তার জন্য খুলে দেয়া হয় যেগুলো সে নিজের জন্য বাছাই করে নিয়েছে। এহেন ব্যক্তিকে ভুল চিন্তা করার, ভুল কাজ করার ও ভুল পথে নিজের শক্তি-সামর্থ ব্যয় করা থেকে নিরস্ত রাখার ক্ষমতা কারো নেই। যে ব্যক্তি নিজেই তার ভাগ্যের সঠিক পথ হারিয়ে বসে এবং আল্লাহ যাকে সঠিক পথ থেকে বঞ্চিত করেন, কেউ তাকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে এবং এই হারানো নেয়ামত খুঁজে দিতে পারে না।

১৭৪. নিজের দীনকে একান্তভাবে আল্লাহর জন্য করে নেয়ার অর্থ হচ্ছে, মানুষ আল্লাহ ছাড়া আর কারো আনুগত্য করবে না, একমাত্র আল্লাহর প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত হবে। তার সমস্ত আগ্রহ আকর্ষণ, প্রীতি-ভালোবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধা একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিবেদিত হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন জিনিসকে যে কোন মুহূর্তে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হবে, এমন ধরনের কোন ভালোবাসা বা হৃদয়ের টান তার কোন জিনিসের প্রতি থাকবে না।

১৭৫. মূল আয়াতে 'শোকর' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'শোকর' শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে নেয়ামতের স্বীকৃতি দেয়া ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা এবং অনুগৃহীত হওয়া। এ ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ না হও এবং তার সাথে নিমকহারামী না করো বরং যথার্থই তার প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুগৃহীত থাকো, তাহলে আল্লাহ অনর্থক তোমাদের শাস্তি দেবেন না।

একজন অনুগ্রহকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঠিক পদ্ধতি কি? হৃদয়ের সমগ্র অনুভূতি দিয়ে তার অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেয়া, মুখে এই অনুভূতির স্বীকারোক্তি করা এবং নিজের কার্যকলাপের মাধ্যমে অনুগৃহীত হবার প্রমাণ পেশ করাই হচ্ছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۭ وَكَانَ
اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿١٤٨﴾ اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ
فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿١٤٩﴾

মানুষ খারাপ কথা বলে বেড়াক, এটা আল্লাহ পছন্দ করেন না। তবে কারো প্রতি জুলুম করা হলে তার কথা স্বতন্ত্র। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন। (মজলুম অবস্থায় তোমাদের খারাপ কথা বলার অধিকার থাকলেও) যদি তোমরা প্রকাশ্যে ও গোপনে সৎকাজ করে যাও অথবা কমপক্ষে অসৎকাজ থেকে বিরত থাকো, তাহলে আল্লাহও বড়ই ক্ষমা-গুণের অধিকারী। অথচ তিনি শাস্তি দেবার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।[১৭৭]

সঠিক উপায়। এই তিনটি কাজের সমবেত রূপই হচ্ছে 'শোকর'। এই শোকরের দাবী হচ্ছে প্রথমত অনুগ্রহকে অনুগ্রহকারীর অবদান বলে স্বীকার করতে হবে। অনুগ্রহের শোকরগুজারী করার এবং নেয়ামতের স্বীকৃতি দেবার ক্ষেত্রে অনুগ্রহকারীর সাথে আর কাউকে শরীক করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, অনুগ্রহকারীর প্রতি প্রেম, প্রীতি, বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের অনুভূতিতে নিজের হৃদয় ভরপুর থাকবে এবং অনুগ্রহকারীর বিরোধীদের প্রতি এ প্রসংগে বিন্দুমাত্র প্রীতি, আন্তরিকতা, আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক থাকবে না। তৃতীয়ত, কার্যত অনুগ্রহকারীর আনুগত্য করতে হবে, তার হুকুম মেনে চলতে হবে এবং তিনি যে নেয়ামতগুলো দান করেছেন সেগুলো তার মর্জীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে না।

১৭৬. কুরআনের আয়াতে এখানে মূলত 'শাকির' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অনুবাদ করতে গিয়ে আমি 'বড়ই পুরস্কারদানকারী' শব্দ ব্যবহার করেছি। আল্লাহর তরফ থেকে যখন বান্দার প্রতি শোকর করার কথা বলা হয় তখন এর অর্থ হয় 'কাজের স্বীকৃতি দেয়া বা কদর করা, মূল্য দান করা ও মর্যাদা দেয়া।' আর যখন বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর প্রতি শোকর করার কথা বলা হয় তখন এর অর্থ হয়, নেয়ামতের স্বীকৃতি দান বা অনুগৃহীত হবার কথা প্রকাশ করা। আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার শোকরিয়া আদায় করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ বান্দার কাজের যথার্থ মূল্যদান করার ব্যাপারে কুণ্ঠিত নন। বান্দা তাঁর পথে যে ধরনের যতটুক কাজ করে আল্লাহ তার কদর করেন, তার যথার্থ মূল্য দেন। বান্দার কোন কাজ, পারিশ্রমিক ও পুরস্কার লাভ থেকে বঞ্চিত থাকে না। বরং তিনি মুক্তহস্তে তার প্রত্যেকটি কাজের তার প্রাপ্যের চাইতে অনেক বেশী প্রতিদান দেন। মানুষের অবস্থা হচ্ছে, মানুষ যা কিছু কাজ করে তার প্রকৃত মূল্যের চাইতে কম মূল্য দেয় আর যা কিছু করে না সে সম্পর্কে কঠোরভাবে পাকড়াও করে। বিপরীত পক্ষে আল্লাহর অবস্থা হচ্ছে, মানুষ যে কাজ করেনি সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত কোমল, উদার ও উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করেন। আর যে কাজ সে করেছে তার মূল্য তার চাইতে অনেক বেশী দেন, যা তার প্রকৃতপক্ষে পাওয়া উচিত।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ
وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن
يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا
بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿١٥٢﴾

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের সাথে কুফরী করে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে আমরা কাউকে মানবো ও কাউকে মানবো না আর কুফর ও ঈমানের মাঝখানে একটি পথ বের করতে চায়, তারা সবাই আসলে কট্টর কাফের।[১৭৮] আর এহেন কাফেরদের জন্য আমি এমন শাস্তি তৈরী করে রেখেছি, যা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবে। বিপরীত পক্ষে যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদেরকে মেনে নেয় এবং তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না, তাদেরকে আমি অবশ্যি তার পুরস্কার দান করবো।[১৭৯] আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[১৮০]

১৭৭. এ আয়াতে মুসলমানদের একটি অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ের নৈতিক শিক্ষা দান করা হয়েছে। সে সময় মুনাফিক, ইহুদী ও মূর্তি পূজারী সবাই একই সংগে সম্ভাব্য যাবতীয় উপায়ে ইসলামের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার ও ইসলাম গ্রহণকারীকে কষ্ট দেবার ও হয়রানী করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। এই নতুন আন্দোলনটির বিরুদ্ধে এমন কোন নিকৃষ্টতম কৌশল ছিল না যা তারা অবলম্বন করেনি। কাজেই মুসলমানদের মধ্যে এর বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্রোধের অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। তাদের মনে এই ধরনের অনুভূতির প্রবল জোয়ার সৃষ্টি হতে দেখে আল্লাহ বলেন তোমাদের খারাপ কথা বলা ও অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করা আল্লাহর কাছে কোন পছন্দনীয় কাজ নয়। তোমরা মজলুম, এতে সন্দেহ নেই। আর মজলুম যদি জালেমের বিরুদ্ধে অশ্লীল কথা বলে, তাহলে তাদের সে অধিকার আছে। কিন্তু তবুও প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় ভাল কাজ করে যাওয়া ও খারাপ কাজ পরিহার করাই উত্তম। কারণ তোমাদের চরিত্র আল্লাহর চরিত্রের নিকটতর হওয়া উচিত। তোমরা যার নৈকট্য লাভ করতে চাও তার অবস্থা হচ্ছে এই যে, তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু। মারাত্মক অপরাধীদেরও তিনি রিযিক দান করেন এবং

يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ الْكِتَٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُوا۟
مُوسَىٰٓ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوٓا۟ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ
بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ
فَعَفَوْنَا عَن ذَٰلِكَ ۚ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ﴿١٥٣﴾

২২ রুকূ'

এই আহ্‌লি কিতাবরা যদি আজ তোমার কাছে আকাশ থেকে তাদের জন্য কোন লিখন অবতীর্ণ করার দাবী করে থাকে,[১৮১] তাহলে ইতিপূর্বে তারা এর চাইতেও বড় ধৃষ্টতাপূর্ণ দাবী মূসার কাছে করেছিল। তারা তো তাকে বলেছিল, আল্লাহকে প্রকাশ্যে আমাদের দেখিয়ে দাও। তাদের এই সীমালংঘনের কারণে অকস্মাৎ তাদের ওপর বিদ্যুত আপতিত হয়েছিল।[১৮২] তারপর সুস্পষ্ট নিশানীসমূহ দেখার পরও তারা বাছুরকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছিল।[১৮৩] এরপরও আমি তাদেরকে ক্ষমা করেছি। আমি মূসাকে সুস্পষ্ট ফরমান দিয়েছি।

বড় বড় পাপ ও ত্রুটি-বিচ্যুতিও তিনি ক্ষমা করে দেন। কাজেই তাঁর নিকটতর হবার জন্য তোমরাও উচ্চ মনোবল, বুলন্দ হিম্মত ও উদার হৃদয়ের অধিকারী হও।

১৭৮. অর্থাৎ যারা আল্লাহকে মানে না এবং তাঁর রসূলদেরকেও মানে না আবার যারা আল্লাহকে মানে কিন্তু রসূলদেরকে মানে না অথবা রসূলকে মানে কিন্তু আর কাউকে মানে না ত.রা সবাই কাফের। কাফের হবার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাদের কারো কাফের হবার ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহও নেই।

১৭৯. অর্থাৎ যারা আল্লাহকে নিজেদের একমাত্র মাবুদ ও মালিক বলে স্বীকার করে নেয় এবং তার প্রেরিত সমস্ত নবীর আনুগত্য স্বীকার করে একমাত্র তারাই নিজেদের কাজের প্রতিদান লাভ করার অধিকার রাখে। তারা যে পর্যায়ের সৎকাজ করবে সেই পর্যায়ের প্রতিদান পাবে। আর যারা আল্লাহকে কোন প্রকার অংশীদারবিহীন মাবুদ ও রব হিসেবে মেনে নেয়নি অথবা যারা আল্লাহর প্রতিনিধিদের মধ্যে কাউকে মেনে নেয়ার ও কাউকে প্রত্যাখ্যান করার বিদ্রোহাত্মক কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছে, তাদের কোন কাজের প্রতিদান দেবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ আল্লাহর দৃষ্টিতে এই ধরনের লোকদের কোন কাজের আইনগত মূল্য নেই।

১৮০. অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও তার রসূলের ওপর ঈমান আনবে তাদের হিসেব নেবার ব্যাপারে আল্লাহ মোটেই কড়াকড়ি করবেন না। বরং তাদের ব্যাপারে কোমলতা ও ক্ষমার নীতি অবলম্বন করবেন।

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِي السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿١٥٤﴾ فَبِمَا
نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ
وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ
اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٥٥﴾

এবং তূর পাহাড় তাদের ওপর উঠিয়ে তাদের থেকে (এই ফরমানের আনুগত্যের) অংগীকার নিয়েছি।[১৮৪] আমি তাদেরকে হুকুম দিয়েছি, সিজ্‌দানত হয়ে দরজার মধ্যে প্রবেশ করো।[১৮৫] আমি তাদেরকে বলেছি, শনিবারের বিধান লংঘন করো না এবং এর সপক্ষে তাদের থেকে পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছি।[১৮৬] শেষ পর্যন্ত তাদের অংগীকার ভংগের জন্য, আল্লাহর আয়াতের ওপর মিথ্যা আরোপ করার জন্য, নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য এবং 'আমাদের দিল আবরণের মধ্যে সুরক্ষিত'[১৮৭] তাদের এই উক্তির জন্য (তারা অভিশপ্ত হয়েছিল)। অথচ[১৮৮] মূলত তাদের বাতিল পরস্তির জন্য আল্লাহ তাদের দিলের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এ জন্য তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকে।

১৮১. মদীনার ইহুদীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অদ্ভুত রকমের দাবী দাওয়া পেশ করতো। তাদের এই দাবীগুলোর মধ্যে একটি ছিল ঃ যতক্ষণ আমাদের চোখের সামনে একটি লিখিত কিতাব আকাশ থেকে নাযিল না হয় অথবা আমাদের প্রত্যেকের নামে ওপর থেকে এই মর্মে একটি লিখন না আসে যে, "মুহাম্মাদ আমার রসূল, তার ওপর তোমরা ঈমান আনো" ততক্ষণ আমরা আপনার রিসালাত মেনে নিতে প্রস্তুত নই।

১৮২. এখানে কোন ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইহুদীদের অপরাধের একটি সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি পেশ করা, তাই তাদের জাতীয় ইতিহাসের কতিপয় সুস্পষ্ট ঘটনার দিকে হালকাভাবে ইংগিত করা হয়েছে। এ আয়াতে যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তা ইতিপূর্বে সূরা বাকারার ৫৫নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে। (সূরা বাকারা ৭১ নম্বর টীকা দেখুন)।

১৮৩. 'সুস্পষ্ট নিশানীসমূহ' বলতে হযরত মূসা আলাইহিস সাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে নিয়ে ফেরাউনের সাগরে নিমজ্জিত হওয়া ও বনী ইসরাঈলদের মিসর ছেড়ে বের হয়ে আসা পর্যন্ত একের পর এক যেসব নিশানী তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে সেগুলো

وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ﴿١٥٦﴾ وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا
الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ
وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۭ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ۭ مَا
لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ﴿١٥٧﴾

তারপর[১৮৯] তাদের নিজেদের কুফরীর মধ্যে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে মারয়ামের ওপর গুরুতর অপবাদ লাগাবার জন্য[১৯০] এবং তাদের 'আমরা আল্লাহর রসূল মারয়াম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি'[১৯১] এই উক্তির জন্য (তারা অভিশপ্ত হয়েছিল)। অথচ[১৯২] প্রকৃতপক্ষে তারা তাকে হত্যাও করেনি এবং শূলেও চড়ায়নি বরং ব্যাপারটিকে তাদের জন্য সন্দিগ্ধ করে দেয়া হয়েছে।[১৯৩] আর যারা এ ব্যাপারে মতবিরোধ করেছে তারাও আসলে সন্দেহের মধ্যে অবস্থান করছে। তাদের কাছে এ সম্পর্কিত কোন জ্ঞান নেই, আছে নিছক আন্দাজ-অনুমানের অন্ধ অনুসৃতি।[১৯৪] নিসন্দেহে তারা ঈসা মসীহকে হত্যা করেনি।

বুঝানো হয়েছে। বলা বাহুল্য কোন গো-বৎস মিসর সাম্রাজ্যের বিপুল শক্তিশালী নখর থেকে বনী ইসরাঈলকে রক্ষা করেনি বরং তাদের রক্ষা করেছিলেন আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিজেই। কিন্তু বনী ইসরাঈল জাতির বাতিল প্রীতি এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যার ফলে আল্লাহর কুদরাত ও তাঁর অনুগ্রহের সুস্পষ্ট নিশানীসমূহ বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জেনে নেবার পরও তারা নিজেদের প্রতি অনুগ্রহশীল আল্লাহর সামনে শির নত না করে একটি কৃত্রিম হাতে গড়া গো-বৎসের মূর্তির সামনে মাথা নত করে।

১৮৪. 'সুস্পষ্ট ফরমান' বলতে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে কাঠের তখতির ওপর যে বিধান লিখে দেয়া হয়েছিল তাই বুঝানো হয়েছে। সামনের দিকে সূরা আরাফের ১৭ রুকূ'তে এ সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আর 'প্রতিশ্রুতি' বলতে সেই জোরদার শপথকে বুঝানো হয়েছে যা তূর পাহাড়ের পাদদেশে বনী ইসরাঈলদের প্রতিনিধিদের থেকে নেয়া হয়েছিল। সূরা বাকারার ৬৩ আয়াতে ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা এসে গেছে এবং আরাফের ১৭১ আয়াতে আবার এর উল্লেখ আসবে।

১৮৫. সূরা বাকারার ৫৮-৫৯ আয়াত ও ৭৫ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮৬. সূরা বাকারার ৬৫ আয়াত এবং ৮২ ও ৮৩ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮৭. সূরা বাকারার ৮৮ আয়াতে ইহুদীদের এই বক্তব্যটির দিকে ইংগিত করা হয়েছে। আসলে দুনিয়ার সমস্ত বাতিল পূজারী জাহেলদের মতো এরাও এই মর্মে গর্ব করতো যে, নিজেদের বাপ-দাদাদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তারা যে সমস্ত চিন্তাধারা,

বংশ-প্রীতি, গোত্র-প্রীতি, রীতি-নীতি, রসম-রেওয়াজ লাভ করেছে সেসবের ওপর তাদের আকীদা-বিশ্বাস এতো বেশী পাকাপোক্ত হয়ে গেছে যে, কোনক্রমেই তাদেরকে সেসব থেকে সরানো যাবে না। যখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গাম্বররা এসে তাদের বুঝাবার চেষ্টা করেছেন তখনই তারা তাদের এই একই জবাব দিয়েছেন ঃ তোমরা যে কোন যুক্তি-প্রমাণ, যে কোন নিদর্শন আনো না কেন আমরা তোমাদের কোন কথায় প্রভাবিত হবো না। এ পর্যন্ত আমরা যা কিছু মেনে এসেছি ও যা কিছু করে এসেছি এখনো তাই মানবো ও তাই করে যেতে থাকবো। (সূরা বাকারার ৯৪ নম্বর টীকা দেখুন)।

১৮৮. এটি প্রসংগক্রমে আগত একটি বিচ্ছিন্ন বাক্য।

১৮৯. এ বাক্যটি মূল ভাষণের ধারাবাহিক বিবরণীর সাথে সংশ্লিষ্ট।

১৯০. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে আসলে ইহুদী জাতির মধ্যে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। বরং যেদিন তার জন্ম হয়েছিল সেদিনই আল্লাহ সমগ্র জাতিকে এই মর্মে সাক্ষী বানিয়েছিলেন যে, এটি একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিশু। তাঁর জন্ম কোন নৈতিক অপরাধের নয় বরং একটি মু'জিযার ফলশ্রুতি। যখন বনী ইসরাঈলের সবচাইতে ভদ্র, শরীফ ও খ্যাতনামা ধর্মীয় পরিবারের একটি কুমারী মেয়ে একটি শিশুপুত্র কোলে নিয়ে এগিয়ে এলেন এবং জাতির ছোট বড় শত শত হাজার হাজার লোক তার ঘরে ভিড় জমালো, তখন কুমারী মেয়েটি তাদের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে নীরবে নবজাত সন্তানের দিকে অংগুলিনির্দেশ করলেন। অর্থাৎ এই নবজাতকই তোমাদের সব প্রশ্নের জবাব দেবে। লোকেরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো ঃ একে আমরা কি জিজ্ঞেস করবো, এতো দোলনায় শুয়ে আছে? কিন্তু হঠাৎ শিশুটির বোল ফুটলো এবং সে সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে উঠলো ঃ

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا

"আমি আল্লাহর বান্দা, আল্লাহ আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী বানিয়েছেন।"
(সূরা মারয়াম, ২য় রুকূ')

এভাবে ঈসা মসীহ আলাইহিস সালামের জন্ম সম্পর্কে যে সংশয় জমে ওঠার সম্ভাবনা ছিল আল্লাহ নিজেই তার মূলোৎপাটন করেন। এ জন্য হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত কেউ কোন দিন হযরত মারয়ামের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনেনি এবং হযরত ঈসাকে অবৈধ সন্তানও বলেনি। কিন্তু তিরিশ বছর বয়স হবার পর যখন তিনি নবুয়াতের কাজের সূচনা করলেন এবং যাবতীয় অসৎকাজের জন্য ইহুদীদের তিরস্কার করতে শুরু করলেন, তাদের আলেম ও ফকীহদের রিয়াকারীর সমালোচনা করতে থাকলেন তাদের সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষকে তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক অবনতির জন্য সতর্ক করতে লাগলেন এবং আল্লাহর দীনকে বাস্তবে কায়েম করার জন্য নিজের জাতিকে সব রকমের ত্যাগ স্বীকার করার ও সব ক্ষেত্রে শয়তানি শক্তির সাথে লড়াই করার আহবান জানালেন, তখন এই নির্লজ্জ অপরাধীরা সত্য ও সততার কণ্ঠরোধ করার জন্য সব রকমের নিকৃষ্টতম অস্ত্র ব্যবহার করতে এগিয়ে এলো। তখন তারা এমন সব কথা বলতে থাকলো যা তারা তিরিশ বছর

পর্যন্ত বলেনি। অর্থাৎ মারয়াম আলাইহাস সালাম (নাউযুবিল্লাহ) একজন ব্যভিচারিনী এবং ঈসা ইবনে মারয়াম তার অবৈধ সন্তান। অথচ এই জালেমরা নিশ্চিতভাবেই জানতো, এই মাতা ও পুত্র উভয়ই এই ধরনের কলুষতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। কাজেই তাদের মনে যথার্থই এ ধরনের কোন সন্দেহ পুঞ্জিভূত ছিল না যার ভিত্তিতে তারা এই দোষারোপ করেছিল। এটা ছিল তাদের একটা স্বেচ্ছাকৃত দোষারোপ। জেনে বুঝে নিছক হকের বিরোধিতা করার জন্য তারা তাদের মাতা পুত্রের বিরুদ্ধে এই মিথ্যাটি তৈরী করেছিল। তাই আল্লাহ একে জুলুম ও মিথ্যার পরিবর্তে কুফরী গণ্য করেছেন। কারণ এই দোষারোপের মাধ্যমে তারা আসলে আল্লাহর দীনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে চাচ্ছিল। একজন নিষ্পাপ ও নিরপরাধ মহিলার বিরুদ্ধে দোষারোপ করা তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল না।

১৯১. অর্থাৎ তাদের অপরাধ করার দুঃসাহস এতই বেড়ে গিয়েছিল যার ফলে তারা আল্লাহর রসূলকে রসূল জেনেও তাকে হত্যা করার পদক্ষেপ নিয়েছিল এবং গর্ব করে বলেছিল ঃ আমরা আল্লাহর রসূলকে হত্যা করেছি। ওপরে আমরা দোলনার ঘটনার যে বর্ণনা দিয়েছি তা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইহুদীদের জন্য ঈসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াতে সন্দেহ করার কোন অবকাশই ছিল না। এ ছাড়াও তারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কাছ থেকে যে উজ্জ্বল নিশানীগুলো প্রত্যক্ষ করেছিল (সূরা আলে ইমরানের ৫ম রুকূ'তে ইতিপূর্বে এটি আলোচিত হয়েছে) তা থেকে তিনি যে আল্লাহর রসূল এ বিষয়টি সকল প্রকার সন্দেহের উর্ধে চলে গিয়েছিল। কাজেই দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তারা তাঁর সাথে যা কিছু করেছিল তা কোন ভুল বুঝাবুঝির ভিত্তিতে করেনি বরং তারা ভালোভাবেই জানতো যে, এই অপরাধ তারা এমন এক ব্যক্তির সাথে করছে যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গাম্বর হয়ে এসেছেন।

কোন জাতি এক ব্যক্তিকে নবী বলে জানার ও মেনে নেয়ার পরও তাকে হত্যা করেছে, আপাতঃ দৃষ্টিতে এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার বলে মনে হয়। কিন্তু দুনিয়ার বিকৃত জাতিদের রীতিনীতি, কাজ-কারবার এমনি বিস্ময়করই হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি তাদের অন্যায় ও পাপ কাজের সমালোচনা করে এবং তাদের অবৈধ কাজে বাধা দেয়, এমন কোন ব্যক্তিকে তারা নিজেদের মধ্যে বরদাশ্‌ত করতে পারে না। নবী হলেও এই ধরনের লোকেরা হামেশা অসৎ, দুশ্চরিত্র ও পাপাচারী জাতিদের হাতে কারাযন্ত্রণা ও মৃত্যুদণ্ড ভোগ করে এসেছেন। তালমুদে লিখিত হয়েছে ঃ বখতে নসর বায়তুল মাক্‌দিস জয় করে সুলাইমানী হাইকেলে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলেন। যে স্থানে কুরবানী করা হয় সে স্থানের ঠিক সামনে দেয়ালে এক জায়গায় তিনি একটি তীরের নিশানী দেখলেন। তিনি ইহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিসের নিশানী? ইহুদীরা জবাব দিল, "এখানে আমরা যাকারিয়া নবীকে হত্যা করেছিলাম। তিনি আমাদের অসৎকাজের জন্য তিরস্কার করতেন। অবশেষে তার তিরস্কারে অতিষ্ঠ হয়ে আমরা তাকে হত্যা করেছি।" বাইবেলে ইয়ারমিয়াহ নবী সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ বনী ইসরাইলদের অসৎকর্মসীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার পর হযরত ইয়ারমিয়াহ তাদের এই মর্মে সতর্ক করে দিলেন যে, এসব বদ কাজের প্রতিফল হিসেবে আল্লাহ অন্য জাতিদের হাতে তোমাদের ধ্বংস করে দেবেন। এর জবাবে তারা তার বিরুদ্ধে দোষারোপ করলো ঃ "এই ব্যক্তি

'কালদানী' জাতির সাথে হাত মিলিয়েছে, তাদের সাথে যোগসাজশ করেছে। এই ব্যক্তি জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।" এই অভিযোগে তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হলো। এমনকি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শূলে চড়াবার ঘটনার মাত্র দুই আড়াই বছর পূর্বে হযরত ইয়াহ্ইয়ার (আ) ব্যাপারটি ঘটে গিয়েছিল। ইহুদীরা সাধারণভাবে তাকে নবী বলে জানতো। অন্তত তাকে জাতির সবচাইতে সৎলোক হিসেবে মানতো। কিন্তু যখন তিনি হিরোডিয়াসের (ইহুদী রাষ্ট্র প্রধান) দরবারের অন্যায় ও অসৎকাজের সমালোচনা করলেন তখন আর তাকে বরদাশত করা হলো না। প্রথমে তাকে কারারুদ্ধ করা হলো তারপর রাষ্ট্র প্রধানের প্রেমিকার দাবী অনুযায়ী তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হলো। ইহুদী জাতির এই অতীত রেকর্ডগুলো পর্যবেক্ষণ করার পর একথা মোটেই বিস্ময়কর মনে হয় না যে, তাদের ধারণা মতে তারা হযরত ঈসা মসীহকে (আ) শূলে চড়াবার পর বুক ঠুকে একথা বলেছে ঃ "আমরা আল্লাহর রসূলকে হত্যা করেছি।"

১৯২. এটি আবার প্রসংগক্রমে আগত একটি অন্তরবর্তী বিচ্ছিন্ন বাক্য।

১৯৩. এ আয়াতটি দ্ব্যর্থহীনভাবে একথা প্রমাণ করে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে শূলে চড়াবার আগেই উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। আর ঈসা মসীহ (আ) শূলবিদ্ধ হয়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন বলে খৃষ্টান ও ইহুদীরা যে ধারণা পোষণ করে তা নিছক একটি ভুল বুঝাবুঝি ছাড়া আর কিছুই নয়। কুরআন ও বাইবেলের তুলনামূলক অধ্যয়ন করে আমরা জানতে পারি, সম্ভবত পীলাতুসের আদালতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকেই পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু যখন সে তার মৃত্যুদণ্ডের রায় শুনিয়ে দিল এবং ইহুদীরা ঈসা মসীহের মতো পূণ্যাত্মার প্রাণের চাইতে একজন দস্যুর প্রাণকে অধিক মূল্যবান গণ্য করে নিজেদের সত্য বিরোধিতা ও বাতিল প্রীতির চূড়ান্ত প্রমাণটিও পেশ করে দিলো, তখন কোন এক সময় আল্লাহ তাকে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। পরে ইহুদীরা যে ব্যক্তিকে শূলে চড়ালো সে ঈসা ইবনে মারয়াম ছিল না। সে ছিল অন্য কোন ব্যক্তি। কোন অজ্ঞাত কারণে তারা তাকে ঈসা ইবনে মারয়াম মনে করে নিয়েছিল। তবুও এতে তাদের অপরাধের পরিমাণ হ্রাস হবে না। কারণ যাকে তারা কাঁটার টুপি পরিয়েছিল, যার মুখে থু থু নিক্ষেপ করেছিল এবং যাকে লাঞ্ছনা সহকারে শূলে চড়িয়েছিল তাকে তো তারা ঈসা ইবনে মারয়ামই মনে করছিল। ব্যাপারটি কিভাবে তাদের কাছে সংশয়িত হয়ে গিয়েছিল তা জানার কোন উপায় আমাদের আয়ত্বে নেই। যেহেতু এই পর্যায়ে সঠিক তথ্য সংগ্রহের কোন উৎস আমাদের জানা নেই তাই ঈসা ইবনে মারয়াম ইহুদীদের কবলমুক্ত হয়ে যাওয়ার পরও তারা ঈসা ইবনে মারয়ামকেই শূলবিদ্ধ করেছে বলে যে সংশয় পোষণ করছিল নিছক ধারণা, আন্দাজ-অনুমান ও জনশ্রুতির ভিত্তিতে তার স্বরূপ নির্ধারণ করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়।

১৯৪. মতবিরোধকারী বলে এখানে খৃষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। ঈসা আলাইহিস সালামকে শূলে চড়াবার ব্যাপারে তাদের কোন একটি সর্বসম্মত মত বা বক্তব্য নেই। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে বহু মতের প্রচলন রয়েছে। তাদের এই অসংখ্য মতই প্রমাণ করে যে, আসল ব্যাপারটি তাদের কাছেও সংশয়পূর্ণই রয়ে গেছে। তাদের একদল বলে ঃ যে ব্যক্তিকে শূলে চড়ানো হয়েছিল সে ঈসা মসীহ ছিল না। ঈসার চেহারায় সে ছিল অন্য এক ব্যক্তি। ইহুদী ও রোমীয় সৈন্যরা তাকে লাঞ্ছনার সাথে শূলে চড়াচ্ছিল। আর ঈসা মসীহ

بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾ وَإِن مِّنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ
شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ
لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾

বরং আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন।[১৯৫] আল্লাহ জবরদস্ত শক্তিশালী ও প্রজ্ঞাময়। আর আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে এমন একজনও হবে না। যে তার মৃত্যুর পূর্বে তার ওপর ঈমান আনবে না,[১৯৬] এবং কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবে।[১৯৭] মোটকথা[১৯৮] এই ইহুদী মতাবলম্বীদের এহেন জুলুম নীতির জন্য, তাদের মানুষকে ব্যাপকভাবে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার জন্য[১৯৯]

সেখানে কোনো এক স্থানে দাঁড়িয়ে তাদের নির্বুদ্ধিতায় হাসছিলেন। অন্য এক দল বলে ঃ শূলদণ্ডে ঈসা মসীহকেই চড়ানো হয়েছিলো। কিন্তু শূলদণ্ডে তার মৃত্যু হয়নি বরং নামিয়ে নেয়ার পর তার মধ্যে প্রাণ ছিল। আর একদল বলে ঃ তিনি শূলে মৃত্যুবরণ করেছিলেন আবার প্রাণ লাভ করেছিলেন। এরপর কমপক্ষে দশবার নিজের বিভিন্ন 'হাওয়ারী'দের সাথে সাক্ষাত করে তাদের সাথে আলাপ করেছিলেন। চতুর্থ আর একদল বলে ঃ শূলের ওপর ঈসার মানবিক দেহের মৃত্যু ঘটেছিলো এবং তাকে দাফনও করা হয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে খোদায়ীর যে আত্মা ছিল তাকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। পঞ্চম দলটি বলে ঃ মরার পর ঈসা মসীহ আলাইহিস সালাম এই জড়দেহসহ জীবিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং সশরীরেই তাকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, আসল সত্য ঘটনাটি তাদের জানা থাকলে সে সম্পর্কে এতগুলো পরস্পর বিরোধী কথা ও মত তাদের মধ্যে প্রচলিত থাকতো না।

১৯৫. এ প্রসংগে এটিই হচ্ছে প্রকৃত সত্য। আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষায় এটি ব্যক্ত করেছেন। এ ব্যাপারে দৃঢ়তা সহকারে যে সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তা কেবল এতটুকু যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করতে ইহুদীরা কামিয়াব হয়নি এবং আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। এখন প্রশ্ন ওঠে কিভাবে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। কুরআনে এর কোন বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়নি। কুরআন যেমন একথা বলে না যে, আল্লাহ তাকে এই জড়দেহ ও আত্মাসহকারে পৃথিবী থেকে তুলে নিয়ে আকাশ রাজ্যের কোথাও রেখে দিয়েছেন আবার তেমনি একথাও বলে না যে, পৃথিবীতে তার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছিল কেবল তাঁর রূহটি ওপরে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। তাই কুরআনের ভিত্তিতে এর কোন একটি দিককে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ ও অন্য দিকটিকে চূড়ান্তভাবে বর্জন করা যেতে পারে না। কিন্তু কুরআনের বর্ণনাভংগী সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে একথা

সুস্পষ্ট অনুভূত হয় যে, উঠিয়ে নেবার ধরন ও অবস্থা যাই হোক না কেন ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে আল্লাহ অবশ্যি এমন কিছু ব্যাপার করে থাকবেন যা নিসন্দেহে অস্বাভাবিক পর্যায়ের। তিনটি বিষয় থেকে এই অস্বাভাবিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এক ঃ ঈসা আলাইহিস সালামকে এই জড় দেহ ও প্রাণ সহকারে উঠিয়ে নেবার ধারণা খৃষ্টানদের মধ্যে আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। আর খৃষ্টানদের একটি বড় দল যে হযরত ঈসাকে 'খোদা' বলে ধারণা করতো এটিই ছিল তার একটি অন্যতম কারণ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কুরআন ব্যর্থহীন ভাষায় শুধু যে এর প্রতিবাদই জানায়নি তাই নয় বরং খৃষ্টানরা এ ঘটনাটির জন্য যে 'উঠিয়ে নেয়া' (Ascension) শব্দটি ব্যবহার করে থাকে কুরআনেও হুবহু সেই একই শব্দ ব্যবহার করেছে। কোন একটি চিন্তার প্রতিবাদ করতে চেয়েও তার জন্য এমন ভাষা ব্যবহার করা যা ঐ চিন্তাকে আরো শক্তিশালী করে—এটা কুরআনের মতো ব্যর্থহীন বক্তব্য উপস্থাপনকারী কিতাবের রীতি ও মর্যাদার সাথে মোটেই খাপ খায় না।

দুই ঃ যদি ঈসা আলাইহিস সালামকে উঠিয়ে নেয়া তেমন ধরনের কোন উঠিয়ে নেয়া হতো যেমন প্রত্যেক মৃত্যুবরণকারীকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়ে থাকে অথবা এই উঠিয়ে নেয়ার অর্থ যদি শুধু সম্মান ও মর্যাদার উন্নতি হতো যেমন হযরত ইদরীস আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ ورفعناه مكانا عليا (আর তাঁকে আমি উচ্চমর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম) তাহলে এখানে কথাটা কখনও এভাবে বর্ণনা করা হতো না। বরং নিম্নোক্ত শব্দাবলী সহযোগে কথাটা বলা অধিক যুক্তিযুক্ত হতো। যেমন ঃ "নিসন্দেহে তারা ঈসাকে হত্যা করেনি বরং আল্লাহ তাকে প্রাণে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। তারপর তাকে স্বাভাবিক মৃত্যুদান করেছেন। ইহুদীরা তাকে হত্যা করতে চাইছিল কিন্তু আল্লাহ তাকে উন্নত মর্যাদা দান করেছেন।"

তিন ঃ যদি এই উঠিয়ে নেয়াটা যেমন তেমন মামুলি ধরনের উঠিয়ে নেয়া হতো, যেমন প্রচলিত নিয়মে কোন মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা বলে থাকি ঃ "আল্লাহ তায়ালা তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন," তাহলে এর উল্লেখ করার পর আবার "আল্লাহ মহাশক্তিধর ও জ্ঞানী" এই বাক্যটি বলা সম্পূর্ণ অসমিচীন ও অপ্রাসংগিক হয়ে পড়তো। যে ঘটনায় আল্লাহর জবরদস্ত শক্তি ও জ্ঞানের অস্বাভাবিক প্রকাশ ঘটে একমাত্র তেমন কোন ঘটনার পরই এ ধরনের বাক্য উচ্চারণ করা উপযোগী ও সমিচীন হতে পারে।

এর জবাবে কুরআন থেকে কোন যুক্তি প্রমাণ পেশ করতে চাইলে বড় জোর এতটুকু বলা যায় যে, সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ متوفيك শব্দটি ব্যবহার করেছেন (৫৫ আয়াত)। কিন্তু সেখানে ৫১ নং টীকায় আমরা একথা পরিকারভাবে উল্লেখ করেছি যে, স্বাভাবিক মৃত্যু অর্থে এ শব্দটির ব্যবহার তেমন সুস্পষ্ট নয়। বরং এ শব্দটি থেকে 'প্রাণ হরণ' এবং 'প্রাণ ও দেহ উভয়টি হরণ' করা অর্থ হতে পারে। কাজেই আমরা ওপরে যে সমস্ত কারণ ও নিদর্শন বর্ণনা করেছি সেগুলো নাকচ করে দেবার জন্য এটি মোটেই যথেষ্ট নয়। ঈসা আলাইহিস সালাম স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন বলে যারা দাবী জানিয়ে আসছে তারা হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে, প্রাণ ও দেহ হরণ করার ব্যাপারে توفى শব্দটির ব্যবহারের আর কোন নজির আছে কি? কিন্তু মানব জাতির সমগ্র ইতিহাসে প্রাণ ও দেহ হরণ করার ব্যাপারটি যখন মাত্র একবারই সংঘটিত হয়েছে তখন এই অর্থে মানুষের ভাষায় এ

শব্দটির ব্যবহারের নজির দাবী করা একেবারেই অর্থহীন। ভাষার মূল আভিধানিক পরিসরে এ শব্দটির এ ধরনের অর্থ ব্যবহারের অবকাশ আছে কি না, এখানে কেবল এতটুকুই দেখা দরকার। যদি অবকাশ থেকে থাকে তাহলে একথা মানতে হবে যে, কুরআন সশরীরে উঠিয়ে নেয়ার আকীদার দ্ব্যর্থহীন প্রতিবাদ জানাবার পরিবর্তে এ শব্দটি ব্যবহার করে এই আকীদাটির সহায়ক কারণ ও নিদর্শনগুলোর সংখ্যা আরো একটি বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যথায় যেখানে পূর্ব থেকেই সশরীরে উঠিয়ে নেবার আকীদা বর্তমান ছিল এবং যার ফলে ঈসাকে খোদায়ী শক্তির অধিকারী মনে করার আকীদা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, সেখানে 'মৃত্যু'–এর ন্যায় সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন শব্দ ব্যবহার না করে 'ওফাত'–এর ন্যায় দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করার কোন কারণ ছিল না।

অসংখ্য হাদীসও সশরীরে উঠিয়ে নেবার আকীদাকে আরো শক্তিশালী করেছে। এ হাদীসগুলোতে হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম আলাইহিস সালামের পুনর্বার দুনিয়ায় আগমন ও দাজ্জালকে হত্যা করার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। (সূরা আহযাবের তাফসীরের পরিশিষ্টে আমি এ ধরনের সমস্ত হাদীস একত্র করে দিয়েছি।) এগুলো থেকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় বার আগমনের ব্যাপারটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে। মৃত্যুর পর তিনি পুনর্বার জীবিত হয়ে এই মরজগতে ফিরে আসবেন অথবা আল্লাহর এই বিশাল সাম্রাজ্যের কোথাও তিনি আছেন এবং সেখান থেকে আবার এই দুনিয়ায় ফিরে আসবেন—এ দু'টির মধ্যে কোন্‌টি এখন অধিকতর যুক্তিসংগত বলে মনে হয়? যে কোন বিবেকবান ব্যক্তি নিজেই এর মীমাংসা করতে পারেন।

১৯৬. এ বাক্যটির দু'টি অর্থ করা হয়েছে। দু'টি অর্থের সমান অবকাশও এখানে রয়েছে। এর একটি অর্থ আমরা আয়াতের তরজমায় বর্ণনা করেছি। আর এর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে : "আহলে কিতাবের মধ্যে এমন একজনও নেই যে মৃত্যুর পূর্বে ঈসার ওপর ঈমান আনবে না।" আহলে কিতাব অর্থ হচ্ছে ইহুদী। এর অর্থ খৃষ্টানও হতে পারে। প্রথম অর্থটির পরিপ্রেক্ষিতে বাক্যটির মূল বক্তব্য হবে : ঈসার যখন স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটবে সে সময় যত আহলে কিতাব থাকবে তারা সবাই তাঁর ওপর (অর্থাৎ তার রিসালাতের ওপর) ঈমান আনবে। দ্বিতীয় অর্থটির দৃষ্টিতে এর মূল বক্তব্য হবে : মৃত্যুর পূর্বে সমস্ত আহলে কিতাবের সামনে ঈসা আলাইহিস সালামের রিসালাতের সত্যতা সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং তারা ঈসার (আ) ওপর ঈমান আনে। কিন্তু তারা এমন এক সময় এ ঈমান আনে যখন ঈমান আনা ফলপ্রসূ হতে পারে না। এই দু'টি অর্থই বিপুল সংখ্যক সাহাবা, তাবেঈ ও প্রধান মুফাস্‌সিরদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। তবে এর সঠিক অর্থ একমাত্র আল্লাহই জানেন।

১৯৭. অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে এবং তিনি যে বাণী এনেছিলেন তার সাথে যে ব্যবহার করেছে তার ওপর তিনি আল্লাহর দরবারে সাক্ষ দেবেন। এই সাক্ষ্যের ওপর কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সূরা মায়েদার শেষ রুকূ'তে।

১৯৮. মধ্যবর্তী প্রাসংগিক বিচ্ছিন্ন বাক্য খতম হবার পর এখান থেকে আবার পূর্বে বর্ণিত ভাষণের সিলসিলা শুরু হচ্ছে।

১৯৯. অর্থাৎ তারা কেবল নিজেরা আল্লাহর পথ থেকে সরে গিয়ে ক্ষান্ত হয়নি বরং এই সংগে তারা এতবড় দুঃসাহসিক অপরাধ প্রবণতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে যে, দুনিয়ায় আল্লাহর

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦١﴾

তাদের সূদ গ্রহণ করার জন্য যা গ্রহণ করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল[২০০] এবং অন্যায়ভাবে লোকদের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য, আমি এমন অনেক পাক-পবিত্র জিনিস তাদের জন্য হারাম করে দিয়েছি, যা পূর্বে তাদের জন্য হালাল ছিল।[২০১] আর তাদের মধ্য থেকে যারা কাফের তাদের জন্য কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি।[২০২]

বান্দাদের প্রথভ্রষ্ট করার জন্য যতগুলো আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে তাদের অধিকাংশের পেছনে ইহুদী মস্তিষ্ক ও ইহুদী পুঁজিকে সক্রিয় দেখা গেছে। হকের পথে ও সত্যের দিকে আহবান করার জন্য যে আন্দোলনই শুরু হয়েছে তার বিরুদ্ধে ইহুদীরাই সবচেয়ে বড় বাধার প্রাচীর দাঁড় করিয়েছে। অথচ এই দুর্ভাগা জাতিটির কাছে আল্লাহর কিতাব আছে এবং তারা নবীদের উত্তরাধিকারী। তাদের সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে কমিউনিষ্ট আন্দোলন। ইহুদী মস্তিষ্ক এ আন্দোলনটির স্রষ্টা। ইহুদী নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় এ আন্দোলন অগ্রগতি লাভ করেছে। আল্লাহকে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করে, প্রকাশ্যে আল্লাহর সাথে শত্রুতা করে এবং আল্লাহর আনুগত্য ব্যবস্থাকে মিটিয়ে দেবার বিঘোষিত সংকল্পের ভিত্তিতে সমগ্র মানবতার ইতিহাসে দুনিয়ার বুকে প্রথম খোদাদ্রোহী জীবন বিধান ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাটি প্রতিষ্ঠার অপরাধও এই তথাকথিত আহলে কিতাব জাতিটির দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উম্মত এই ইহুদী জাতিই ছিল এর উদগাতা, প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। আধুনিক যুগে কমিউনিজমের পরে গোমরাহীর সবচেয়ে বড় খুঁটি ফ্রয়েডের দর্শন, মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই ফ্রয়েডও বনী ইসরাঈলেরই এক সন্তান।

২০০. তাওরাতে সুস্পষ্ট ভাষায় এ নির্দেশটি লিখিত রয়েছে ঃ

"যদি তুমি আমার লোকদের মধ্য থেকে যে তোমার কাছে থাকে এমন কোন অভাবীকে ঋণ দাও তাহলে তার সাথে ঋণদাতার ন্যায় ব্যবহার করো না। তার কাছ থেকে সুদও নিয়ো না। যদি তুমি কখনো নিজের প্রতিবেশীর কাপড় বন্ধকও রাখো তাহলে সূর্য ডোবার আগেই তাবটা তাকে ফেরত দাও। কারণ সেটিই তার একমাত্র পরার কাপড়। সেটিই তার শরীর ঢাকার জন্য একমাত্র পোশাক। তা না হলে সে কি গায়ে দিয়ে ঘুমাবে? কাজেই সে ফরিয়াদ করলে আমি তার কথা শুনবো। কারণ আমি করুণাময়।" (যাত্রা পুস্তক ২২ ঃ ২৫—২৭)

এ ছাড়াও তাওরাতের আরো কয়েক স্থানে সূদ হারাম হবার বিধান রয়েছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই তাওরাতের প্রতি ঈমানের দাবীদার ইহুদী সমাজ আজকের দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় সুদখোর, সংকীর্ণমনা ও পাষাণ হৃদয় জাতি হিসেবে সর্বত্র পরিচিত এবং এসব ব্যাপারে তাদেরকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হয়ে থাকে।

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ
اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ
وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝١٦٢

কিন্তু তাদের মধ্য থেকে যারা পাকাপোক্ত জ্ঞানের অধিকারী ও ঈমানদার তারা সবাই সেই শিক্ষার প্রতি ঈমান আনে, যা তোমার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল।[২০৩] এ ধরনের ঈমানদার নিয়মিতভাবে নামায কায়েমকারী, যাকাত আদায়কারী এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী লোকদেরকে আমি অবশ্যি মহাপুরস্কার দান করবো।

২০১. সামনের দিকে সূরা আনআমের ১৪৬ আয়াতে যে বিষয়বস্তুর আলোচনা আসছে এখানে সম্ভবত সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলদের ওপর এমন সব প্রাণী হারাম করে দেয়া হয় যাদের নখর রয়েছে। গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের ওপর হারাম করে দেয়া হয়। এছাড়াও সম্ভবত ইহুদী ফিকাহ শাস্ত্রে অন্য যে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা ও কঠোরতার সন্ধান পাওয়া যায়, এখানে সেদিকেও ইশারা করা হয়েছে। কোন দলের জীবন যাপনের ক্ষেত্র সংকীর্ণ করে দেয়া আসলে তার জন্য একটি শাস্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।–(বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন সূরা আন'আম, ১২২ নম্বর টীকা)

২০২. অর্থাৎ এ জাতির যেসব লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আনুগত্য পরিহার করে বিদ্রোহ ও অস্বীকৃতির পথ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ায় ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রাখা হয়েছে। দনিয়ায় যে ভীষণ শাস্তি তারা পেয়েছে ও পাচ্ছে তা আজ পর্যন্ত অন্য কোন জাতি পায়নি। দু' হাজার বছর হয়ে গেলো কিন্তু এখনো দুনিয়ার কোথাও তারা সম্মানজনক কোন ঠাঁই করতে পারেনি। দুনিয়ায় তাদের বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হয়েছে। সর্বত্র তারা বিদেশী। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটি যুগও অতিক্রান্ত হয়নি যখন দুনিয়ার কোথাও না কোথাও তাদের লাঞ্ছিত ও বিধ্বস্ত হতে হয়নি। নিজেদের বিপুল ধনাঢ্যতা সত্ত্বেও কোথাও তাদের সম্মানের চোখে দেখা হয় না। আর সবচাইতে মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন জাতির জন্ম হয় তারপর তারা খতম হয়ে যায় কিন্তু এ জাতিটির মৃত্যু হচ্ছে না। একে দুনিয়ায় তাদের لا يموت فيها ولا يحيى অর্থাৎ 'না জীবিত না মৃত'—জীবন্মৃত অবস্থার শাস্তি দেয়া হয়। এ জাতিটি যাতে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির জন্য একটি জীবন্ত শিক্ষণীয় বিষয়ে পরিণত হয় এবং নিজের সুদীর্ঘ ইতিহাস থেকে এ শিক্ষাদান করতে থাকে যে, আল্লাহর কিতাব বগলে দাবিয়ে রেখে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উঁচু করার পরিণাম এমনিই হয়ে থাকে—এটিই হচ্ছে এ জাতিটিকে জীবন্মৃত অবস্থায় টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্য। আর আখেরাতের আযাব হবে ইনশাআল্লাহ এর চাইতেও বেশী কঠোর ও যন্ত্রণাদায়ক। (এ আলোচনার পর ফিলিস্তিনের ইসরাঈল রাষ্ট্রটি

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ
وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ
وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيْمَٰنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ
زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ
نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾

২৩ রুকূ'

হে মুহাম্মাদ! আমি তোমার কাছে ঠিক তেমনিভাবে অহী পাঠিয়েছি যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের কাছে পাঠিয়ে ছিলাম।[২০৪] আমি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুব সন্তানদের কাছে এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারূন ও সুলাইমানের কাছে অহী পাঠিয়েছি। আমি দাউদকে যবূর দিয়েছি।[২০৫] এর পূর্বে যেসব নবীর কথা তোমাকে বলেছি তাদের কাছেও আমি অহী পাঠিয়েছি এবং যেসব নবীর কথা তোমাকে বলিনি তাদের কাছেও। আমি মূসার সাথে কথা বলেছি ঠিক যেমনভাবে কথা বলা হয়।[২০৬]

সম্পর্কে লোকদের মনে যে সন্দেহ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য আলে ইমরানের ১১২ আয়াত দেখুন)

২০৩. অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে যেসব লোক আসমানী কিতাবসমূহের যথার্থ শিক্ষা অবগত হয়েছে এবং সব ধরনের হিংসা বিদ্বেষ, জাহেলী জিদ–হঠধর্মিতা, বংশানুক্রমিক অন্ধ অনুসৃতি ও স্বার্থপূজা থেকে মুক্ত হয়ে আসমানী কিতাবসমূহ থেকে যে নিখাদ সত্যের প্রমাণ পাওয়া যায় তাকে সাচ্চা দিলে আন্তরিকতা সহকারে মেনে নেয়, তাদের ভূমিকা হয় কাফের ও জালেম ইহুদীদের সাধারণ ভূমিকা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তারা এক নজরে অনুভব করে, পূর্ববর্তী নবীগণ যে দীনের শিক্ষা দিয়েছিলেন কুরআন তারই শিক্ষা দিচ্ছে। তাই তারা নিরপেক্ষ সত্যপ্রীতি সহকারে উভয়টির ওপর ঈমান আনে।

২০৪. এখানে যে কথা বলতে চাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কোন নতুন জিনিস আনেননি, যা ইতিপূর্বে আর কেউ আনেননি। তিনি দাবী করছেন না যে, তিনিই এই প্রথমবার একটি নতুন জিনিস পেশ করছেন। বরং পূর্ববর্তী নবীগণ জ্ঞানের যে উৎসটি থেকে হিদায়াত লাভ করেছেন তিনিও হিদায়াত লাভ করেছেন সেই একই উৎস থেকে। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণকারী। পয়গাম্বরগণ হামেশা যে সত্যের বাণী প্রচার করে এসেছেন তিনিও সেই একই সত্য প্রচার করেছেন।

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ
بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٦٥﴾ لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ
بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ۭ وَكَفٰى
بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿١٦٦﴾

এই সমস্ত রসূলকে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী বানিয়ে পাঠানো হয়েছিল,[২০৭] যাতে তাদেরকে রসূল বানিয়ে পাঠাবার পর লোকদের কাছে আল্লাহর মোকাবিলায় কোন প্রমাণ না থাকে।[২০৮] আর আল্লাহ সর্বাবস্থায়ই প্রবল পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়। (লোকেরা চাইলে না মানতে পারে) কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ দেন, তিনি যা কিছু তোমাদের ওপর নাযিল করেছেন নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে নাযিল করেছেন এবং এর ওপর ফেরেশতারাও সাক্ষী, যদিও আল্লাহর সাক্ষী হওয়াই যথেষ্ট হয়।

অহী অর্থ হচ্ছে ইশারা করা, মনের মধ্যে কোন কথা প্রক্ষিপ্ত করা, গোপনভাবে কোন কথা বলা এবং পয়গাম পাঠানো।

২০৫. বর্তমান বাইবেলের মধ্যে 'যাবুর' (গীতসংহিতা) নামে যে অধ্যায়টি পাওয়া যায় তার সবটুকুই দাউদ আলাইহিস সালামের ওপর অবতীর্ণ যাবুর নয়। তার মধ্যে অন্যান্য লোকদের বহু কথা মিশিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সেগুলোকে তাদের রচয়িতাদের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। তবে যে সমস্ত বাণীতে (স্তোত্র) একথা সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, সেগুলো হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের, সেগুলোর মধ্যে যথার্থই সত্য বাণীর উজ্জ্বল আলো অনুভূত হয়। অনুরূপভাবে বাইবেলে 'আমসালে সুলাইমান' (হিতোপদেশ) নামে যে অধ্যায়টি রয়েছে, তাতেও ব্যাপক মিশ্রণ পাওয়া যায়। তার শেষ দু'টি অনুচ্ছেদ যে পরে সংযোজন করা হয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। তবুও তার বৃহত্তর অংশ নির্ভুল ও সত্য মনে হয়। এই দু'টি অধ্যায়ের সাথে সাথে হযরত 'আইউব' (ইয়োব) আলাইহিস সালামের নামেও আর একটি অধ্যায় বাইবেলের অন্তরভুক্ত হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে জ্ঞানের বহু অমূল্য তত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও সেটি পড়তে গিয়ে হযরত আইউবের সাথে তার সংশ্লিষ্ট করার ব্যাপারটি সত্য বলে বিশ্বাস করা যায় না। কারণ কুরআনেও এই অধ্যায়টির প্রথম দিকে হযরত আইউবের যে মহান সবরের প্রশংসা করা হয়েছে সমগ্র অধ্যায় ঠিক তার উলটো চিত্রই পেশ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, হযরত আইউব তার সমগ্র বিপদকালে আল্লাহর বিরুদ্ধে সর্বক্ষণ অভিযোগ মুখর ছিলেন। এমনকি তার সহচর নাকি এই মর্মে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতেন যে, আল্লাহ জালেম নন; কিন্তু তিনি কোনক্রমেই তা মানতে প্রস্তুত হতেন না।

এসব সহীফা ছাড়াও বনী ইসরাঈলদের নবীদের আরো ১৭ খানি সহীফা বাইবেলে অন্তরভুক্ত হয়েছে। এগুলোর বেশীর ভাগ সঠিক বলে মনে হয়। বিশেষ করে ইয়াস'ঈয়াহ্

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا
بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ
لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ
وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ
بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا
فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾

যারা নিজেরাই এটা মানতে অস্বীকার করে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয় তারা নিসন্দেহে ভুল পথে অগ্রসর হয়ে সত্য থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। এভাবে যারা কুফরী ও বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করে এবং জুলুম-নিপীড়ন চালায়, আল্লাহ তাদেরকে কখনো মাফ করবেন না এবং তাদেরকে জাহান্নামের পথ ছাড়া আর কোন পথ দেখাবেন না, যেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। আল্লাহর জন্য এটা কোন কঠিন কাজ নয়।

হে লোকেরা! এই রসূল তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হক নিয়ে এসেছে। কাজেই তোমরা ঈমান আনো তোমাদের জন্যই ভালো। আর যদি অস্বীকার করো, তাহলে জেনে রাখো, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর।[২০৯] আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি প্রজ্ঞাময়।[২১০]

(যিশাইয়), ইয়ারমিয়াহ (যিরমিয়), হাযকী ইল (যিহিস্কেল), অমূস (আমোষ) ও আরো কয়েকটি সহীফার অধিকাংশ স্থান পড়ার পর মানুষের হৃদয় নেচে উঠে। এগুলোর মধ্যে খোদায়ী কালামের সুস্পষ্ট মাহাত্ম অনুভূত হয়। এগুলোতে শিরকের বিরুদ্ধে জিহাদ, তাওহীদের সপক্ষে শক্তিশালী যুক্তি প্রদান এবং বনী ইসরাঈলের নৈতিক অধপতনের ওপর কড়া সমালোচনা পড়ার সময় একজন সাধারণ পাঠক একথা অনুভব না করে থাকতে পারে না যে, ইঞ্জীলে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ভাষণসমূহ এবং কুরআন মজীদ ও এই সহীফাগুলো একই উৎস থেকে উৎসারিত স্রোতধারা ছাড়া আর কিছুই নয়।

২০৬. অন্যান্য নবীদের ওপর যে পদ্ধতিতে অহী আসতো তা ছিল এই যে, একটি আওয়াজ আসতো অথবা ফেরেশতারা পয়গাম শুনাতেন এবং নবীগণ তা শুনতেন। কিন্তু মূসা আলাইহিস সালামের সাথে একটি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। আল্লাহ নিজে তাঁর সাথে কথা বলেন। আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে এমনভাবে কথাবার্তা হতো যেমন দু'জন লোক

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا
الْحَقَّ ؕ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ
اَلْقٰىهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ز فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ
اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ
وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٧١﴾

হে আহলি কিতাব! নিজেদের দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না[২১১] আর সত্য ছাড়া কোন কথা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করো না। মারয়াম পুত্র ঈসা মসীহ আল্লাহর একজন রসূল ও একটি ফরমান[২১২] ছাড়া আর কিছুই ছিল না, যা আল্লাহ মারয়ামের দিকে পাঠিয়েছিলেন। আর সে একটি রূহ ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে[২১৩] (যে মারয়ামের গর্ভে শিশুর রূপ ধারণ করেছিল)। কাজেই তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলদের প্রতি ঈমান আনো[২১৪] এবং "তিন" বলো না।[২১৫] নিবৃত্ত হও, এটা তোমাদের জন্যই ভালো। আল্লাহই তো একমাত্র ইলাহ। কেউ তার পুত্র হবে, তিনি এর অনেক উর্ধে।[২১৬] পৃথিবী ও আকাশের সবকিছুই তার মালিকানাধীন[২১৭] এবং সে সবের প্রতিপালক ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি নিজেই যথেষ্ট।[২১৮]

সামনাসামনি কথা বলে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সূরা 'তা–হা'য় উদ্ধৃত কথোপকথনের বরাত দেয়াই যথেষ্ট মনে করি। বাইবেলেও হযরত মূসার এই বৈশিষ্ট্যটির উল্লেখ এভাবেই করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে : "যেমন কোন ব্যক্তি কথা বলে তার বন্ধুর সাথে, ঠিক তেমনি খোদাবন্দ মূসার সাথে সামনাসামনি কথা বলতেন।" (যাত্রা ৩৩ : ১১)

২০৭. অর্থাৎ তাদের সবার একই কাজ ছিল। সে কাজটি ছিল এই যে, যারা আল্লাহর পাঠানো শিক্ষার ওপর ঈমান আনবে এবং সেই মোতাবেক নিজেদের দৃষ্টিভংগী ও কার্যকলাপ সংশোধন করে নেবে তাদের তাঁরা সাফল্য ও সৌভাগ্য লাভের সুখবর শুনিয়ে দেবেন। আর যারা ভুল চিন্তা ও কর্মের পথ অবলম্বন করবে তাদেরকে এই ভুল পথ অবলম্বন করার খারাপ পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে দেবেন।

২০৮. অর্থাৎ এই সমস্ত পয়গম্বর পাঠাবার একটিই মাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্যটি ছিল এই যে, আল্লাহ মানব জাতির কাছে নিজের দায়িত্ব পূর্ণ করার প্রমাণ পেশ করতে চাইছিলেন। এর ফলে শেষ বিচারের দিনে কোন পথভ্রষ্ট অপরাধী তাঁর কাছে এই ওজর পেশ করতে পারবে না যে, সে জানতো না এবং আল্লাহ যথার্থ অবস্থা সম্পর্কে তাকে অবহিত করার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ দুনিয়ার বিভিন্ন

স্থানে পয়গাম্বর পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন। এ পয়গাম্বরগণ অসংখ্য লোকের নিকট সত্যের জ্ঞান পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন ; কিন্তু এখানে রেখে গেছেন তাঁদের বিভিন্ন কিতাব। মানুষকে পথ দেখাবার জন্য অবশ্যি প্রতি যুগে এ কিতাবগুলোর মধ্য থেকে কোন না কোন কিতাব দুনিয়ায় মওজুদ থেকেছে। এরপর যদি কোন ব্যক্তি গোমরাহ হয়, তাহলে সেজন্য আল্লাহ ও তাঁর পয়গাম্বরকে অভিযুক্ত করা যেতে পারে না। বরং এজন্য ঐ ব্যক্তি নিজেই অভিযুক্ত হবে। কারণ তার কাছে পয়গাম পৌঁছে গিয়েছিল কিন্তু সে তা গ্রহণ করেনি। অথবা সেইসব লোক অভিযুক্ত হবে যারা সত্য-সঠিক পথ জানতো ; কিন্তু আল্লাহর বান্দাদের গোমরাহীতে লিপ্ত দেখেও তাদেরকে সত্য পথের সন্ধান দেয়নি।

২০৯. অর্থাৎ আসমান ও যমীনের মালিকের নাফরমানী করে তোমরা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ক্ষতি হলে তোমাদেরই হবে।

২১০. অর্থাৎ তোমাদের আল্লাহ অজ্ঞ ও বেখবর নন। তাঁর সাম্রাজ্যে বাস করে তোমরা অপরাধমূলক কাজ কারবার করে যেতে থাকবে আর তিনি এর কোন খবর রাখবেন না, এটা কেমন করে হতে পারে। তিনি নাদান ও মূর্খও নন। তাঁর ফরমান ও হুকুমনামার বিরুদ্ধাচরণ করা হবে আর তিনি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করার পদ্ধতিই জানবেন না, এ ধরনের কোন অবস্থা কল্পনাই করা যেতে পারে না।

২১১. এখানে আহলে কিতাব বলতে খৃষ্টানদের বুঝানো হয়েছে এবং 'বাড়াবাড়ি' করা অর্থ হচ্ছে, কোন বিষয়ের সমর্থনে ও সহযোগিতায় সীমা অতিক্রম করে যাওয়া। ইহুদীদের অপরাধ ছিল, তারা ঈসা আলাইহিস সালামকে অস্বীকার ও তাঁর বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আর খৃষ্টানদের অপরাধ ছিল, তারা ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি ভক্তি, প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

২১২. মূলে 'কালেমা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মারয়ামের প্রতি কালেমা (ফরমান) পাঠাবার অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা মারয়াম আলাইহাস সালামের গর্ভাধারকে কোন পুরুষের শুক্রকীটের সহায়তা ছাড়াই গর্ভধারণ করার হুকুম দিলেন। ঈসা আলাইহিস সালামের বিনা বাপে জন্মগ্রহণ করার রহস্য সম্পর্কে খৃষ্টানদের প্রথমে একথাই বলা হয়েছিল। কিন্তু তারা গ্রীক দর্শনের প্রভাবে ভুল পথ অবলম্বন করে। ফলে প্রথমে তারা কালেমা শব্দটিকে 'কালাম' বা 'কথা' (Logos) -এর সমার্থক মনে করে। তারপর এ কালাম ও কথা থেকে আল্লাহ তা'আলার নিজ সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট কালাম-গুণ অর্থাৎ আল্লাহর কথা বলা বুঝানো হয়েছে। অতপর ধারণা করা হয়েছে যে, আল্লাহর সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট এ গুণটি মারয়াম আলাইহাস সালামের উদরে প্রবেশ করে একটি দেহাবয়ব ধারণ করে এবং তাই ঈসা মসীহের রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এভাবেই খৃষ্টানদের মধ্যে ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ মনে করার ভ্রান্ত আকীদার উদ্ভব হয়েছে। তাদের মধ্যে ভ্রান্ত বিশ্বাস শিকড় গেড়ে বসেছে যে, আল্লাহ নিজেই নিজেকে অথবা নিজের চিরন্তন গুণাবলী থেকে 'কালাম' ও 'বাক' গুণকে ঈসার রূপে প্রকাশ করেছেন।

২১৩. এখানে ঈসা আলাইহিস সালামকে روح منه (আল্লাহর কাছ থেকে আসা রূহ) বলা হয়েছে। সূরা আল বাকারায় একথাটিকে নিম্নোক্তভাবে বলা হয়েছে ঃ ايده بروح

القدس (আমি পাক রূহের সাহায্যে ঈসাকে সাহায্য করেছি)। এই উভয় বাক্যের অর্থ হচ্ছে ঃ আল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালামকে পাক রূহ দান করেছিলেন। অন্যায় ও পাপাচারের সাথে এই পাক রূহের কোনদিন কোন পরিচয়ই হয়নি। আপাদমস্তক সত্য ও সততা এবং উন্নত নৈতিক চরিত্র ছিল এর বৈশিষ্ট। খৃষ্টানদের কাছেও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের এই একই পরিচিতি দান করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এর মধ্যেও বাড়াবাড়ি করেছে। روح من الله অর্থাৎ আল্লাহর কাছ থেকে একটি রূহকে তারা বিকৃত করে সরাসরি আল্লাহ বানিয়ে নিয়েছে। আর "রূহুল কুদুস" (Holy Ghost)-'কে ধরে নিয়েছে "আল্লাহর মুকাদ্দাস বা মহাপবিত্র রূহ", যা ঈসার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল। এভাবে আল্লাহ ও ঈসার সাথে রূহুল কুদুসকে তৃতীয় একজন মাবুদ বানিয়ে নেয়া হয়েছিল। এটা ছিল খৃষ্টানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাড়াবাড়ি এবং এর ফলে তারা গোমরাহীতে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। মজার ব্যাপার এই যে, মথি লিখিত ইঞ্জীলে আজো এ বাক্যটি লেখা রয়েছে ঃ ফেরেশ্‌তারা তাকে (অর্থাৎ ইউসূফ নাজ্জারকে) স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললো, "হে ইউসুফ ইবনে দাউদ! তোমার স্ত্রী মারয়ামকে তোমার কাছে নিয়ে আসতে ভয় পেয়ো না। কারণ তার পেটে যে রয়েছে সে রূহুল কুদুসের কুদরাতে সৃষ্টি হয়েছে।" (অধ্যায় ১ ঃ শ্লোক ২০)

২১৪. অর্থাৎ আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ বলে মেনে নাও এবং সমস্ত রসূলদের রিসালাতের স্বীকৃতি দাও। ঈসা মসীও (আ) তাঁদেরই মধ্যকার একজন রসূল। এটিই ছিল হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আসল শিক্ষা। ঈসায়ী সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই যথার্থ সত্য শিক্ষাটি মেনে নেয়া উচিত।

২১৫. অর্থাৎ তিন ইলাহের আকীদা তোমাদের মধ্যে যে কোন আকৃতিতে বিদ্যমান থাক না কেন তা পরিহার করো। আসলে খৃষ্টানরা একই সংগে একত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদ উভয়টিই মানে। ইঞ্জীলগুলোতে মসীহ আলাইহিস সালামের যে সমস্ত সুস্পষ্ট বাণী পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে কোন একজন খৃষ্টানও একথা অস্বীকার করতে পারবে না যে, আল্লাহ এক এবং তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন ইলাহ নেই। তাওহীদ যে দীনের মূলকথা এটা স্বীকার না করে তাদের উপায় নেই। কিন্তু শুরুতেই তাদের মনে এই ভুল ধারণার জন্ম হয়েছিল যে, আল্লাহর কালাম ঈসার রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং আল্লাহর রূহ তাঁর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। এই ভুল ধারণার কারণে তারা সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহর সাথে ঈসা মসীহ ও রূহুল কুদুসের (জিব্রীল) খোদায়ীকেও মেনে নেয়াকে অযথা নিজেদের জন্য অপরিহার্য গণ্য করেছে। এভাবে জোরপূর্বক একটি আকীদা নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে নেবার কারণে একত্ববাদে বিশ্বাসের সাথে সাথে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস আবার ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসের সাথে সাথে একত্ববাদে বিশ্বাসকে কিভাবে একই সংগে মেনে চলা যায়, এটা যথার্থই তাদের জন্য রহস্যময় ও জটিল হয়ে উঠেছে। প্রায় আঠার শো বছর থেকে খৃষ্টান পণ্ডিতগণ নিজেদের সৃষ্ট এই জটিলতার গ্রন্থী উন্মোচন করার জন্য মাথা ঘামিয়ে চলেছেন। এরি বিভিন্ন ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বহু দল উপদল গঠিত হয়েছে। এরি ভিত্তিতে একটি দল অন্য দলকে কাফের বলে প্রচার করেছে। এই বিবাদের ফলে গীর্জার সংহতি বিনষ্ট হয়েছে। এবং বিভিন্ন গীর্জা নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে। তাদের আকায়েদ ও যুক্তি শাস্ত্রের সমস্ত শক্তি এরি পেছনে ব্যয়িত হয়েছে। অথচ এ জটিল সমস্যাটি আল্লাহ সৃষ্টি

لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ
الْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ
إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ
أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا
وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۙ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم
مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾

২৪ রুকূ'

মসীহ কখনো নিজের আল্লাহর এক বান্দা হবার ব্যাপারে লজ্জা অনুভব করে না এবং ঘনিষ্ঠতর ফেরেশতারাও একে নিজেদের জন্য লজ্জাকর মনে করে না। যদি কেউ আল্লাহর বন্দেগীকে নিজের জন্য লজ্জাকর মনে করে এবং অহংকার করতে থাকে তাহলে এক সময় আসবে যখন আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে নিজের সামনে হাযির করবেন। যারা ঈমান এনে সৎকর্মনীতি অবলম্বন করেছে তারা সে সময় নিজেদের পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো প্রতিদান দেবেন। আর যারা বন্দেগীকে লজ্জাকর মনে করেছে ও অহংকার করেছে, তাদেরকে আল্লাহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং আল্লাহ ছাড়া আর যার যার সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার ওপর তারা ভরসা করে, তাদের মধ্যে কাউকেও তারা সেখানে পাবে না।

করেননি। তাঁর প্রেরিত ঈসা মসীহও এ সমস্যাটি সৃষ্টি করেননি। আবার আল্লাহকে তিন মেনে নিয়ে তাঁর একত্ববাদের গায়ে কোন আঁচড় না লাগানো কোনক্রমে সম্ভব নয়। শুধুমাত্র তাদের বাড়াবাড়ির কারণেই এই জটিল সমস্যাটির উদ্ভব হয়েছে। কাজেই বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকাই এর একমাত্র সমাধান। এ জন্য তাদের পরিহার করতে হবে ঈসা মসীহ ও রূহুল কুদুসের ইলাহ ও মাবূদ হবার ধারণা। একমাত্র আল্লাহকেই একক ইলাহ হিসেবে মেনে নিতে হবে এবং মসীহকে কেবলমাত্র তার পয়গাম্বর গণ্য করতে হবে, তাঁর খোদায়ীতে তাকে কোন প্রকারে শরীক করা যাবে না।

২১৬. এটি হচ্ছে খৃষ্টানদের চতুর্থ বাড়াবাড়ির প্রতিবাদ। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের বর্ণনা যদি সঠিক হয়েও থাকে তাহলে তা থেকে (বিশেষ করে প্রথম তিনটি ইঞ্জীল থেকে) বড়জোর এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, মসীহ আলাইহিস সালাম আল্লাহ ও বান্দার

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَٰنٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ
نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِهِۦ فَسَيُدْخِلُهُمْ
فِى رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾

হে লোকেরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে উজ্জল প্রমাণপত্র এসে গেছে এবং আমি তোমাদের কাছে এমন আলোক রশ্মি পাঠিয়েছি যা তোমাদের সুস্পষ্টভাবে পথ দেখিয়ে দেবে। এখন যারা আল্লাহর কথা মেনে নেবে এবং তার আশ্রয় খুঁজবে তাদেরকে আল্লাহ নিজের রহমত, করুণা ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নেবেন এবং নিজের দিকে আসার সোজা পথ দেখিয়ে দেবেন।

সম্পর্ককে বাপ ও বেটার সম্পর্কের সাথে তুলনা করেছিলেন। আর "বাপ" শব্দটি তিনি আল্লাহর জন্য নিছক উপমা ও রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন, যাতে এই সম্পর্ক বুঝা যায়। আসল অর্থে এটিকে ব্যবহার করেননি। এটা কেবলমাত্র ঈসা আলাইহিস সালামের একার বৈশিষ্ট নয়। প্রাচীন যুগ থেকে বনী ইসরাঈলরা আল্লাহর জন্য বাপ প্রতিশব্দটি ব্যবহার করে আসছে। বাইবেলের ওল্ড টেষ্টামেন্টে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। ঈসা আলাইহিস সালাম নিজের কওমের মধ্যে প্রচলিত বাকধারা অনুযায়ী এ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি আল্লাহকে কেবলমাত্র নিজের নয় বরং সমস্ত মানুষের বাপ বলতেন। কিন্তু খৃষ্টানরা এখানে এসে আবার বাড়াবাড়ি করেছে। তারা মসীহকে আল্লাহর একমাত্র পুত্র গণ্য করেছে। এ ক্ষেত্রে তারা যে অদ্ভুত মতবাদ পোষণ করে তার সারনির্যাস হচ্ছে ঃ যেহেতু মসীহ আল্লাহর বহিঃপ্রকাশ এবং তার কালেমা ও তাঁর রূহের শারীরিক কাঠামো, কাজেই তিনি আল্লাহর একমাত্র পুত্র। আর আল্লাহ তার একমাত্র পুত্রকে এ উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন যে, তিনি মানুষের গোনাহ নিজের মাথায় নিয়ে শূলে চড়ে প্রাণ দেবেন এবং নিজের রক্তের বিনিময়ে মানুষের গোনাহের কাফ্ফারা আদায় করবেন। অথচ মসীহ আলাইহিস সালামের কোন বাণী থেকে তারা এর কোন প্রমাণ পেশ করতে পারবে না। এ আকীদাটি তাদের নিজেদের তৈরী করা। তারা নিজেদের পয়গাম্বরের মহান ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়ে যে বাড়াবাড়ি করেছে এটি তারই ফলশ্রুতি।

আল্লাহ এখানে কাফ্ফারা সম্পর্কিত বিশ্বাসের প্রতিবাদ করেননি। কারণ এটা খৃষ্টানদের কোন স্বতন্ত্র ও স্থায়ী বিশ্বাস নয়। বরং এটা হচ্ছে মসীহকে (আ) আল্লাহর পুত্র গণ্য করার পরিণতি এবং 'যদি মসীহ আল্লাহর একমাত্র পুত্রই হন তাহলে তিনি শূলবিদ্ধ হয়ে লাঞ্ছিতের মৃত্যুবরণ করলেন কেন' এ প্রশ্নের একটি দার্শনিক ও মরমীয় ব্যাখ্যা। কাজেই যদি মসীহ আলাইহিস সালামের আল্লাহর পুত্র হবার ধারণার প্রতিবাদ করা হয় এবং তাঁর শূলবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করা সম্পর্কিত ভুল ধারণা দূর করা যায় তাহলে আপনা আপনিই এ বিশ্বাসের প্রতিবাদ হয়ে যায়।

يَسْتَفْتُونَكَ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌا
هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ
يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ
مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

লোকেরা[২১৯] তোমার কাছে পিতা-মাতাহীন নিসন্তান ব্যক্তির[২২০] ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞেস করছে। বলে দাও, আল্লাহ তোমাদের ফতোয়া দিচ্ছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি নিসন্তান মারা যায় এবং তার একটি বোন থাকে,[২২১] তাহলে সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে। আর যদি বোন নিসন্তানা মারা যায় তাহলে ভাই হবে তার ওয়ারিস।[২২২] দুই বোন যদি মৃতের ওয়ারিস হয়, তাহলে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশের হকদার হবে,[২২৩] আর যদি কয়েকজন ভাই ও বোন হয় তাহলে মেয়েদের একভাগ ও পুরুষদের দুইভাগ হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট বিধান বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বিভ্রান্ত না হও এবং আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে জানেন।

২১৭. অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশের অস্তিত্ব সম্পন্ন কোন জিনিসের সাথেও আল্লাহর পিতা-পুত্রের সম্পর্ক নেই। বরং এ সম্পর্ক হচ্ছে মালিক ও তার মালিকানাধীন বস্তুর।

২১৮. অর্থাৎ নিজের খোদায়ীর ব্যবস্থাপনা করার জন্য আল্লাহ নিজেই যথেষ্ট। তার কারো কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই। কাজেই এ জন্য কাউকে পুত্র বানাবারও তার কোন দরকার নেই।

২১৯. এ সূরাটি নাযিল হওয়ার অনেক পরে এ আয়াতটি নাযিল হয়। কোন কোন হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, এটি কুরআনের সর্বশেষ আয়াত। এ বর্ণনাটি সঠিক না হলেও কমপক্ষে এতটুকু প্রমাণিত যে, এ আয়াতটি নবম হিজরীতে নাযিল হয়। এর অনেক পূর্বে সূরা নিসা নাযিল হয় এবং তাকে একটি স্বতন্ত্র সূরা হিসেবে তখন পাঠ করা হচ্ছিল। এ জন্যই মীরাসের বিধান বর্ণনার উদ্দেশ্যে সূরার শুরুতে যে আয়াতগুলো বর্ণনা করা হয় তার সাথে এ আয়াতটি বর্ণিত হয়নি বরং পরিশিষ্ট হিসেবে সূরার শেষে একে রাখা হয়েছে।

২২০. মূল বাক্যে কালালা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'কালালা' শব্দের অর্থের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কারো কারো মতে কালালা হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যার সন্তান নেই

এবং যার বাপ–দাদাও বেঁচে নেই। আবার অন্যদের মতে যে ব্যক্তি নিছক নিসন্তান অবস্থায় মারা যায় তাকে কালালা বলা হয়। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শেষ সময় পর্যন্ত এ ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে প্রথমোক্ত লোকটিকেই কালালা বলা হয়। সাধারণ ফকীহগণ তাঁর এই মত সমর্থন করেছেন। কুরআন থেকেও এই মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ কুরআনে কালালার বোনকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক বানানো হয়েছে। অথচ কালালার বাপ বেঁচে থাকলে বোন সম্পত্তির কিছুই পায় না।

২২১. এখানে এমন সব ভাইবোনের মীরাসের কথা বলা হচ্ছে যারা মৃতের সাথে মা ও বাপ উভয় দিক দিয়ে অথবা শুধুমাত্র বাপের দিক দিয়ে শরীক। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার তাঁর এক ভাষণে এই অর্থের ব্যাখ্যা করেছিলেন। কোন সাহাবা তাঁর এই ব্যাখ্যার সাথে মতবিরোধ করেননি। ফলে এটি একটি সর্বসম্মত মতে পরিণত হয়েছে।

২২২. অর্থাৎ ভাই তার সমস্ত সম্পদের ওয়ারিশ হবে, যদি কোন নির্দিষ্ট অংশের অন্য কোন অধিকারী না থেকে থাকে। আর যদি নির্দিষ্ট অংশের অন্য কোন অধিকারী থাকে—যেমন স্বামী তাহলে প্রথমে তার অংশ আদায় করার পর অবশিষ্ট পরিত্যক্ত সম্পত্তি ভাই পাবে।

২২৩. দু'য়ের বেশী বোন হলে তাদের সম্পর্কেও এই একই বিধান কার্যকর হবে।

আল মা-য়েদাহ

৫

নামকরণ

এ সূরার ১৫ রুকূ'র

هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ

আয়াতে উল্লেখিত "মা-য়েদাহ" শব্দ থেকে এ নামকরণ করা হয়েছে। কুরআনের অধিকাংশ সূরার নামের মতো এ সূরার নামের সাথেও এর আলোচ্য বিষয়বস্তুর তেমন কোন সম্পর্ক নেই। নিছক অন্যান্য সূরা থেকে আলাদা হিসেবে চিহ্নিত করার জন্যই একে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

হোদাইবিয়ার সন্ধির পর ৬ হিজরীর শেষের দিকে অথবা ৭ হিজরীর প্রথম দিকে এ সূরাটি নাযিল হয়। সূরায় আলোচ্য বিষয় থেকে একথা সুস্পষ্ট হয় এবং হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনাও এর সত্যতা প্রমাণ করে। ষষ্ঠ হিজরীর যিলকাদ মাসের ঘটনা। চৌদ্দশ' মুসলমানকে সাথে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরাহ সম্পন্ন করার জন্য মক্কায় উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু কুরাইশ কাফেররা শত্রুতার বশবর্তী হয়ে আরবের প্রাচীনতম ধর্মীয় ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁকে উমরাহ করতে দিল না। অনেক তর্ক বিতর্ক ও বাদানুবাদের পর তারা এতটুকু মেনে নিল যে, আগামী বছর আপনারা আল্লাহর ঘর যিয়ারত করার জন্য আসতে পারেন। এ সময় একদিকে মুসলমানদেরকে কাবাঘর যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করার নিয়ম কানুন বাতলে দেবার প্রয়োজন ছিল, যাতে পরবর্তী বছর পূর্ণ ইসলামী শান শওকতের সাথে উমরাহর সফর করা যায় এবং অন্য দিকে তাদেরকে এ মর্মে ভালভাবে তাকীদ করারও প্রয়োজন ছিল যে, কাফের শত্রু দল তাদের উমরাহ করতে না দিয়ে যে বাড়াবাড়ি করেছে তার জবাবে তারা নিজেরা অগ্রবর্তী হয়ে যেন আবার কাফেরদের ওপর কোন অন্যায় বাড়াবাড়ি ও জুলুম না করে বসে। কারণ অমুক কাফের গোত্রকে হজ্জ সফরের জন্য মুসলিম অধিকারভুক্ত এলাকার মধ্য দিয়ে যাওয়া আসা করতে হতো। মুসলমানদেরকে যেভাবে কাবা যিয়ারত করতে দেয়া হয়নি সেভাবে তারাও এ ক্ষেত্রে জোর পূর্বক এসব কাফের গোত্রের কাবা যিয়ারতের পথ বন্ধ করে দিতে পারতো। এ সূরার শুরুতে ভূমিকাস্বরূপ যে ভাষণটির অবতারণা করা হয়েছে সেখানে এ প্রসংগই আলোচিত হয়েছে। সামনের দিকে তের রুকূ'তে আবার এ প্রসংগটি উত্থাপিত হয়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, প্রথম রুকূ' থেকে নিয়ে চৌদ্দ রুকূ' পর্যন্ত একই ভাষণের ধারাবাহিকতা চলছে। এ ছাড়াও এ সূরার মধ্যে আর যে সমস্ত বিষয়বস্তু আমরা পাই তা সবই একই সময়কার বলে মনে হয়।

বর্ণনার ধারাবাহিকতা দেখে মনে হয় এ সমগ্র সূরাটি একটি মাত্র ভাষণের অন্তরভুক্ত এবং সম্ভবত এটি একই সংগে নাযিল হয়েছে। আবার এর কোন কোন আয়াত পরবর্তীকালে পৃথক পৃথকভাবে নাযিল হতেও পারে এবং বিষয়বস্তুর একাত্মতার কারণে সেগুলোকে এ সূরার বিভিন্ন স্থানে জায়গা মতো জুড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু বর্ণনার ধারাবাহিকতার মধ্যে কোথাও সামান্যতম শূন্যতাও অনুভূত হয় না। ফলে একে দুটি বা তিনটি ভাষণের সমষ্টি মনে করার কোন অবকাশ নেই।

নাযিলের উপলক্ষ

আলে ইমরান ও আন্‌নিসা সূরা দু'টি যে যুগে নাযিল হয় সে যুগ থেকে এ সূরাটির নাযিলের যুগে পৌঁছতে পৌঁছতে বিরাজমান পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে অনেক বড় রকমের পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। ওহোদ যুদ্ধের বিপর্যয় যেখানে মদীনার নিকটতম পরিবেশও মুসলমানদের জন্য বিপদসংকুল করে তুলেছিল; সেখানে এখন সম্পূর্ণ ভিন্নতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। আরবে ইসলাম এখন একটি অজেয় ও অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র একদিকে নজদ থেকে সিরিয়া সীমান্ত এবং অন্যদিকে লোহিত সাগর থেকে মক্কার নিকট এলাকা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। ওহোদে মুসলমানরা যে আঘাত পেয়েছিল তা তাদের হিম্মত ও সাহসকে দমিত এবং মনোবলকে নিস্তেজ করার পরিবর্তে তাদের সংকল্প ও কর্মোদ্দীপনার জন্য চাবুকের কাজ করেছিল। তারা আহত সিংহের মতো গর্জে ওঠে এবং মাত্র তিন বছরের মধ্যে সমগ্র পরিস্থিতি পাল্টে দেয়। তাদের ক্রমাগত প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও আত্মদানের ফলে মদীনার চারদিকে দেড়শ' দুশ' মাইলের মধ্যে সমস্ত বিরোধী গোত্রের শক্তির দর্প চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। মদীনার ওপর সবসময় যে ইহুদী বিপদ শকুনির মতো ডানা বিস্তার করে রেখেছিল তার অশুভ পাঁয়তারার অবসান ঘটেছিল চিরকালের জন্য। আর হিজাযের অন্যান্য যেসব জায়গায় ইহুদী জনবসতি ছিল সেসব এলাকা মদীনার ইসলামী শাসনের অধীনে এসে গিয়েছিল। ইসলামের শক্তিকে দমন করার জন্য কুরাইশরা সর্বশেষ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল খন্দকের যুদ্ধে। এতেও তারা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। এরপর আরববাসীদের মনে এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহই রইলো না যে, ইসলামের এ আন্দোলনকে খতম করার সাধ্য দুনিয়ার আর কোন শক্তির নেই। ইসলাম এখন আর নিছক একটি আকীদা-বিশ্বাস ও আদর্শের পর্যায় সীমিত নয়। নিছক মন ও মস্তিষ্কের ওপরই তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত নয়। বরং ইসলাম এখন একটি পরাক্রান্ত রাষ্ট্রীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে এবং এ রাষ্ট্রের সীমানায় বসবাসকারী সমস্ত অধিবাসীর জীবনের ওপর তার কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত। এখন মুসলমানরা এতটা শক্তির অধিকারী যে, যে চিন্তা ও ভাবধারার ওপর তারা ঈমান এনেছিল সে অনুযায়ী স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবনকে গড়ে তোলার এবং সে চিন্তা ও ভাবধারা ছাড়া অন্য কোন আকীদা-বিশ্বাস, ভাবধারা, কর্মনীতি অথবা আইন-বিধানকে নিজেদের জীবন ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করতে না দেয়ার পূর্ণ ইখতিয়ার তারা লাভ করেছিল।

তাছাড়া এ কয়েক বছরের মধ্যে ইসলামী মূলনীতি ও দৃষ্টিভংগী অনুযায়ী মুসলমানদের নিজস্ব একটি কৃষ্টি ও সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছিল। এ সংস্কৃতি জীবনের যাবতীয় বিস্তারিত বিষয়ে অন্যদের থেকে আলাদা একটি স্বতন্ত্র ভাবমূর্তির অধিকারী ছিল। নৈতিকতা,

স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ, জীবন যাপন প্রণালী, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষেত্রে মুসলমানরা এখন অমুসলিমদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামী রাষ্ট্রের সমস্ত মুসলিম অধ্যুসিত জনপদে মসজিদ ও জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক জনবসতিতে ও প্রত্যেক গোত্রে একজন ইমাম নিযুক্ত রয়েছে। ইসলামের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন-কানুন অনেকটা বিস্তারিত আকারে প্রণীত হয়ে গেছে এবং মুসলমানদের নিজস্ব আদালতের মাধ্যমে সর্বত্র সেগুলো প্রবর্তিত হচ্ছে। লেনদেন ও কেনা-বেচা ব্যবসায় বাণিজ্যের পুরাতন রীতি ও নিয়ম রহিত করে নতুন সংশোধিত পদ্ধতির প্রচলন চলছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের স্বতন্ত্র বিধান তৈরী হয়ে গেছে। বিয়ে ও তালাকের আইন, শ'রয়ী পরদা ও অনুমতি নিয়ে অন্যের গৃহে প্রবেশের বিধান এবং যিনা ও মিথ্যা অপবাদের শাস্তি বিধান জারি হয়ে গেছে। এর ফলে মুসলমানদের সমাজ জীবন একটি বিশেষ ছাঁচে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। মুসলমানদের ওঠা বসা, কথাবার্তা, পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং জীবন যাপন ও বসবাস করার পদ্ধতিও একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্টে সমুজ্জল হয়ে উঠেছে। এভাবে ইসলামী জীবন একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করার এবং মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও তামাদ্দুন গড়ে ওঠার পর, তারা যে আবার কোন দিন অমুসলিম সমাজের সাথে মিলে একাত্ম হয়ে যেতে পারে। তেমনটি আশা করা তৎকালীন অমুসলিম বিশ্বের পক্ষে আর সম্ভবপর ছিল না।

হোদাইবিয়ার চুক্তি সম্পাদিত হবার পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের পথে একটি বড় প্রতিবন্ধক ছিল এই যে, কুরাইশ কাফেরদের সাথে তাদের ক্রমাগত যুদ্ধ, সংঘর্ষ ও সংঘাত লেগেই ছিল। নিজেদের ইসলামী দাওয়াতের সীমানা বৃদ্ধি ও এর পরিসর প্রশস্ত করার কোন অবকাশই তারা পায়নি। হোদাইবিয়ার বাহ্যিক পরাজয় ও প্রকৃত বিজয় এ বাধা দূর করে দিয়েছিল। এর ফলে কেবল নিজেদের রাষ্ট্রীয় সীমায়ই তারা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরে পায়নি বরং আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলামের দাওয়াত বিস্তৃত করার সুযোগ এবং অবকাশও লাভ করেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাজটিরই উদ্বোধন করলেন ইরান, রোম, মিসর ও আরবের বাদশাহ ও রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে পত্র লেখার মাধ্যমে। এ সাথে ইসলাম প্রচারকবৃন্দ মানুষকে আল্লাহর দীনের দিকে আহবান জানাবার জন্য বিভিন্ন গোত্র ও কওমের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লেন।

আলোচ্য বিষয়সমূহ

এ ছিল সূরা মা-য়েদাহ নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট। নিম্নলিখিত তিনটি বড় বড় বিষয় এ সূরাটির অন্তরভুক্ত ঃ

এক ঃ মুসলমানদের ধর্মীয়, তামাদ্দুনিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আরো কিছু বিধি নির্দেশ। এ প্রসংগে হজ্জ সফরের রীতি-পদ্ধতি নির্ধারিত হয়। ইসলামী নিদর্শনগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং কাবা যিয়ারতকারীদেরকে কোন প্রকার বাধা না দেবার হুকুম দেয়া হয়। পানাহার দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে হালাল ও হারামের চূড়ান্ত সীমা প্রবর্তিত হয়। জাহেলী যুগের মনগড়া বাধা নিষেধগুলো উঠিয়ে দেয়া হয়। আহলি কিতাবদের সাথে পানাহার ও তাদের মেয়েদের বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়। অযু,

গোসল ও তায়াম্মুম করার রীতি পদ্ধতি নির্ধারিত হয়। বিদ্রোহ ও অরাজকতা সৃষ্টি এবং চুরি-ডাকাতির শাস্তি প্রবর্তিত হয়। মদ ও জুয়াকে চূড়ান্তভাবে হারাম ও নিষিদ্ধ করা হয়। কসম ভাঙার কাফ্ফারা নির্ধারিত হয়। সাক্ষ প্রদান আইনের আরো কয়েকটি ধারা প্রবর্তন করা হয়।

দুই ঃ মুসলমানদেরকে উপদেশ প্রদান। এখন মুসলমানরা একটি শাসক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে যাওয়ায় তাদের হাতে ছিল শাসন শক্তি। এর নেশায় বহু জাতি পথভ্রষ্ট হয়। মজলুমীর যুগের অবসান ঘটতে যাচ্ছিল এবং তার চাইতে অনেক বেশী কঠিন পরীক্ষার যুগে মুসলমানরা পদার্পণ করেছিল। তাই তাদেরকে সম্বোধন করে বারবার উপদেশ দেয়া হয়েছে ঃ ন্যায়, ইনসাফ ও ভারসাম্যের নীতি অবলম্বন করো। তোমাদের পূর্ববর্তী আহ্‌লি কিতাবদের মনোভাব ও নীতি পরিহার করো। আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর হুকুম ও আইন কানুন মেনে চলার যে অংগীকার তোমরা করেছো তার ওপর অবিচল থাকো। ইহুদী ও খৃষ্টানদের মতো তার সীমালংঘন করে তাদের মতো একই পরিণতির শিকার হয়ো না। নিজেদের যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালার জন্য আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করো। মুনাফিকী নীতি পরিহার করো।

তিন ঃ ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে উপদেশ প্রদান। এ সময় ইহুদীদের শক্তি খর্ব হয়ে গেছে। উত্তর আরবের প্রায় সমস্ত ইহুদী জনপদ মুসলমানদের পদানত। এ অবস্থায় তাদের অনুসৃত ভ্রান্ত নীতি সম্পর্কে তাদেরকে আর একবার সতর্ক করে দেয়া হয়। তাদেরকে সত্য-সঠিক পথে আসার দাওয়াত দেয়া হয়। এ ছাড়া যেহেতু হোদাইবিয়ার চুক্তির কারণে সমগ্র আরবে ও আশপাশের দেশগুলোয় ইসলামের দাওয়াত প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তাই খৃষ্টানদেরকেও ব্যাপকভাবে সম্বোধন করে তাদের বিশ্বাসের ভ্রান্তিগুলো জানিয়ে দেয়া হয় এবং শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনার জন্য তাদেরকে আহবান জানানো হয়। যেসব প্রতিবেশী দেশে মূর্তিপূজারী ও অগ্নি উপাসক জাতির বসবাস ছিল সেসব দেশের অধিবাসীদেরকে সরাসরি সম্বোধন করা হয়নি। কারণ ইতিপূর্বে তাদের সমমনা আরবের মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে মক্কায় যে হেদায়াত নাযিল হয়েছিল তা-ই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল।

আয়াত ১২০ **সূরা আল মা-য়েদাহ - মাদানী** রুকূ' ১৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۭ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ①

হে ঈমানদারগণ! বন্ধনগুলো পুরোপুরি মেনে চলো।[১] তোমাদের জন্য চতুষ্পদ গৃহপালিত পশু জাতীয় সব পশুই হালাল করা হয়েছে[২] তবে সামনে যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের জানানো হবে সেগুলো ছাড়া। কিন্তু ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করা নিজেদের জন্য হালাল করে নিয়ো না।[৩] নিসন্দেহে আল্লাহ যা ইচ্ছা আদেশ করেন।[৪]

১. অর্থাৎ এ সূরায় তোমাদের প্রতি যে সমস্ত নীতি-নিয়ম ও বিধি-বিধান আরোপ করা হচ্ছে এবং সাধারণভাবে আল্লাহর শরীয়াত যেগুলো তোমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে, সেগুলো মেনে চলো। ভূমিকা স্বরূপ এ ছোট্ট একটি বাক্যের অবতারণা করার পর এবার সে বাঁধনগুলোর বর্ণনা শুরু হচ্ছে যেগুলো মেনে নেবার হুকুম দেয়া হয়েছে।

২. মূল শব্দ হচ্ছে, "বাহীমাতুল আন'আম"। "আন'আম" শব্দটি বললে আরবী ভাষায় উট, গরু, ছাগল ও ভেড়া বুঝায়। আর "বাহীমা" বলতে প্রত্যেক বিচরণশীল চতুষ্পদ জন্তু বুঝানো হয়। যদি আল্লাহ বলতেন, "আন'আম" তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, তাহলে এর ফলে কেবলমাত্র আরবীতে যে চারটি জন্তুকে আন'আম বলা হয় সে চারটি জন্তুই হালাল হতো। কিন্তু আল্লাহ বলেছেন ঃ গৃহপালিত পশু পর্যায়ের বিচরণশীল চতুষ্পদ প্রাণী তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। এর ফলে নির্দেশটি ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং গৃহপালিত গবাদি পশু পর্যায়ের সমস্ত বিচরণশীল চতুষ্পদ প্রাণী এর আওতায় এসে গেছে। অর্থাৎ যাদের শিকারী দাঁত নেই, যারা জান্তব খাদ্যের পরিবর্তে উদ্ভিজ্জ খাদ্য খায় এবং অন্যান্য প্রাণীগত বৈশিষ্টের ক্ষেত্রে আরবের 'আন'আম'-এর সাথে সাদৃশ্য রাখে। এ সংগে এখানে এ ইংগিতও পাওয়া যায় যে, গৃহপালিত চতুষ্পদ পশুর বিপরীতধর্মী যে সমস্ত পশুর শিকারী দাঁত আছে এবং অন্য প্রাণী শিকার করে খায়, সেসব পশু হালাল নয়। এ ইংগিতটিকে সুস্পষ্ট করে হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, শিকারী হিংস্র প্রাণী হারাম। অনুরূপভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন সব পাখিকেও হারাম গণ্য করেছেন যাদের শিকারী পাঞ্জা আছে, অন্য প্রাণী

শিকার করে খায় বা মৃত খায়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন ঃ

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِّنَ السَّبَاعِ وَكُلِّ ذِىْ مَخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ -

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিকারী দাঁত সম্পন্ন প্রত্যেকটি পশু এবং নখরধারী ও শিকারী পাঞ্জা সম্পন্ন প্রত্যেকটি পাখি আহার করতে নিষেধ করেছেন।" এর সমর্থনে অন্যান্য বহু সংখ্যক সাহাবীর হাদীসও বর্ণিত হয়েছে।

৩. কাবাঘর যিয়ারত করার জন্য যে ফকিরী পোশাক পরা হয় তাকে বলা হয় "ইহরাম।" কাবার চারদিকে কয়েক মনযিল দূরত্বে একটি করে সীমানা চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। কোন যিয়ারতকারীর নিজের সাধারণ পোশাক বদলে ইহরামের পোশাক পরিধান না করে এ সীমানাগুলো পার হয়ে এগিয়ে আসার অনমুতি নেই। এ পোশাকের মধ্যে থাকে কেবল মাত্র একটি সেলাই বিহীন লুংগী ও একটি চাদর। চাদরটি দিয়ে শরীরের ওপরের অংশ ঢাকা হয়। একে ইহরাম বলার কারণ হচ্ছে এই যে, এ পোশাক পরিধান করার সাথে সাথে মানুষের জন্য এমন অনেক কাজ হারাম হয়ে যায় যেগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় তার জন্য হালাল ছিল। যেমন ক্ষৌরকার্য করা, সুগন্ধি ব্যবহার, সবধরনের সাজসজ্জা, সৌন্দর্য চর্চা, যৌনাচার ইত্যাদি। এ অবস্থায় কোন প্রাণী হত্যা করা যাবে না, শিকার করা যাবে না এবং শিকারের খোঁজও দেয়া যাবে না।, এগুলোও এ বিধিনিষেধের অন্তরভুক্ত।

৪. অর্থাৎ আল্লাহ সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী একচ্ছত্র শাসক। তিনি নিজের ইচ্ছেমতো যে কোন হুকুম দেবার পূর্ণ ইখতিয়ার রাখেন। তাঁর নির্দেশ ও বিধানের ব্যাপারে কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করার বা আপত্তি জানানোর কোন অধিকার মানুষের নেই। তাঁর সমস্ত বিধান জ্ঞান, প্রজ্ঞা, যুক্তি, ন্যায়নীতি ও কল্যাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও ঈমানদার মুসলিম যুক্তিসংগত, ন্যায়ানুগ ও কল্যাণকর বলেই তার আনুগত্য করে না বরং একমাত্র সর্বশক্তিমান প্রভু আল্লাহর হুকুম বলেই তার আনুগত্য করে। যে জিনিসটি তিনি হারাম করে দিয়েছেন তা কেবল তাঁর হারাম করে দেবার কারণেই হারাম হিসেবে গণ্য। আর ঠিক তেমনিভাবে যে জিনিসটি তিনি হালাল করে দিয়েছেন সেটির হালাল হবার পেছনে অন্য কোন কারণ নেই বরং যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ এসব জিনিসের মালিক তিনি নিজের দাসদের জন্য এ জিনিসটি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন বলেই এটি হালাল। তাই কুরআন মজীদ সর্বোচ্চ বলিষ্ঠতা সহকারে এ মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, কোন বস্তুর হালাল ও হারাম হবার জন্য সর্বশক্তিমান প্রভু আল্লাহর অনুমোদন ও অননুমোদন ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন ভিত্তির আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে আল্লাহ যে কাজটিকে বৈধ গণ্য করেছেন সেটি বৈধ এবং যেটিকে অবৈধ গণ্য করেছেন সেটি অবৈধ, এ ছাড়া মানুষের জন্য কোন কাজের বৈধ ও অবৈধ হবার দ্বিতীয় কোন মানদণ্ড নেই।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن
رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ
أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য ও ভক্তির নিদর্শনগুলোর অমর্যাদা করো না।[৫] হারাম মাসগুলোর কোনটিকে হালাল করে নিয়ো না। কুরবানীর পশুগুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করো না। যেসব পশুর গলায় আল্লাহর জন্য উৎসর্গীত হবার আলামত স্বরূপ পট্টি বাঁধা থাকে তাদের ওপরও হস্তক্ষেপ করো না। আর যারা নিজেদের রবের অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টির সন্ধানে সম্মানিত গৃহের (কাবা) দিকে যাচ্ছে তাদেরকেও উত্যক্ত করো না।[৬]. হাঁ, ইহরামের অবস্থা শেষ হয়ে গেলে অবশ্যি তোমরা শিকার করতে পারো।[৭] আর দেখো, একটি দল তোমাদের জন্য মসজিদুল হারামের পথ বন্ধ করে দিয়েছে, এ জন্য তোমাদের ক্রোধ যেন তোমাদেরকে এতখানি উত্তেজিত না করে যে, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা অবৈধ বাড়াবাড়ি করতে শুরু কর।[৮] নেকী ও আল্লাহভীতির সমস্ত কাজে সবার সাথে সহযোগিতা করো এবং গুনাহ ও সীমালংঘনের কাজে কাউকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। তাঁর শাস্তি বড়ই কঠোর।

৫. যে জিনিসটি কোন আকীদা-বিশ্বাস, মতবাদ, চিন্তাধারা, কর্মনীতি বা কোন ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে তাকে তার "শেআ'র" বলা হয়। কারণ সেটি তার আলামত, নিদর্শন বা চিহ্নের কাজ করে। সরকারী পতাকা, সেনাবাহিনী ও পুলিশ প্রভৃতির ইউনিফরম, মুদ্রা, নোট ও ডাকটিকিট সরকারের "শেআ'র" বা নিশানীর অন্তরভুক্ত। সরকার নিজের বিভিন্ন বিভাগের কাছে বরং তার অধীনস্থ সকলের কাছে এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দাবী জানায়। গীর্জা, ফাঁসির মঞ্চ ও ক্রুশ খৃষ্টবাদের শেআ'র বা নিশানী। টিকি, পৈতা ও মন্দির ব্রাহ্মণ্যবাদের নিশানী। ঝুঁটি বাঁধা চুল, হাতের বালা ও কৃপাণ ইত্যাদি শিখ ধর্মের নিশানী। হাতুড়ি ও কাস্তে সমাজতন্ত্রের নিশানী। স্বস্তিকা আর্য বংশ-পূজার নিশানী। এ ধর্ম বা মতবাদগুলো তাদের নিজেদের অনুসারীদের কাছে এ নিদর্শনগুলোর প্রতি মর্যাদা

প্রদর্শনের দাবী করে। যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যবস্থার নিশানীসমূহের মধ্য থেকে কোন একটি নিশানীর অবমাননা করে, তাহলে এটি মূলত তার ঐ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করার আলামত হিসেবে বিবেচিত হয়। আর ঐ অবমাননাকারী নিজে যদি ঐ ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত হয়, তাহলে তার এ কাজটি তার নিজের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সমার্থক বলে গণ্য হয়।

"শাআইর" হচ্ছে "শে'আর" শব্দের বহুবচন। "শাআইরুল্লাহ" বলতে এমন সব আলামত বা নিশানী বুঝায় যা শিরক, কুফরী ও নাস্তিক্যবাদের পরিবর্তে নির্ভেজাল আল্লাহর আনুগত্য সূচক মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করে। এ ধরনের আলামত ও চিহ্ন যেখানে যে মতবাদ ও ব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া যাবে, প্রত্যেক মুসলমানকে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে সেখানে শর্ত হচ্ছে তাদের মনস্তাত্বিক পটভূমিতে নির্ভেজাল আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের মানসিকতা বিরাজ করা চাই এবং সকল প্রকার মুশরিকী ও কুফরী চিন্তার মিশ্রণ থেকে তাদের মুক্ত হওয়া চাই। কোন ব্যক্তি, সে কোন অমুসলিম হলেও, যদি তার নিজের বিশ্বাস ও কর্মের মধ্যে এক আল্লাহর আরাধনা ও ইবাদাতের কোন অংশ থেকে থাকে তাহলে অন্তত সেই অংশে মুসলমানদের উচিত তার সাথে একাত্ম হওয়া এবং সেই অধ্যায়ে তার যে সমস্ত "শে'আর" নির্ভেজাল আল্লাহর ইবাদাত উপসনার আলামত হিসেবে বিবেচিত হবে সেগুলোর প্রতিও পূর্ণ মর্যাদা প্রদর্শন করা। এ বিষয়ে তার ও আমাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই বরং সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য আছে। সে আল্লাহর বন্দেগী করে কেন, এটা বিরোধের বিষয় নয়। বরং বিরোধের বিষয় হচ্ছে এই যে, আল্লাহর বন্দেগীর সাথে সে অন্য কিছুর বন্দেগীর মিশ্রণ ঘটাচ্ছে কেন?

মনে রাখতে হবে, আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এ নির্দেশ এমন এক সময় দেয়া হয়েছিল যখন আরবে মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। মক্কা ছিল মুশরিকদের দখলে। আরবের প্রত্যক এলাকা থেকে মুশরিক গোত্রের লোকেরা হজ্জ ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কাবাগৃহের দিকে আসতো। এ জন্য অনেক গোত্রকে মুসলমানদের এলাকা অতিক্রম করতে হতো। তখন মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তারা মুশরিক হলেও এবং তোমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করলেও তারা যখন আল্লাহর ঘরের দিকে যাচ্ছে তখন তাদেরকে বাধা দিয়ো না। হজ্জের মাসগুলোয় তাদের ওপর আক্রমণ করো না এবং আল্লাহর সমীপে নজরানা পেশ করার জন্য যে পশুগুলো তারা নিয়ে যাচ্ছে সেগুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করো না। কারণ তাদের বিকৃত ধর্মে আল্লাহর আরাধনার যতটুকু অংশ বাকি রয়ে গেছে তা অবশ্যি সম্মান লাভের যোগ্য, অসম্মান লাভের নয়।

৬. আল্লাহর নিশানীসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সাধারণ নির্দেশ দেবার পর কয়েকটি নিশানীর নাম উল্লেখ করে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ তৎকালীন যুদ্ধাবস্থার দরুন মুসলমানদের হাতে ঐগুলোর অবমাননা হবার আশংকা দেখা দিয়েছিল। এ কয়েকটি নিশানীর নাম উল্লেখ করার অর্থ এ নয় যে, কেবল এ ক'টিই মর্যাদা লাভের যোগ্য।

৭. ইহ্‌রামও আল্লাহর একটি অন্যতম নিশানী। এ ব্যাপারে যে বিধিনিষেধগুলো আরোপিত হয়েছে তার মধ্য থেকে কোন একটি ভংগ করার অর্থই হচ্ছে ইহ্‌রামের

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ
إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ
ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ
لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٣

তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে মৃতজীব[৯], রক্ত, শূকরের গোশ্‌ত, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে যবেহকৃত জীব[১০] এবং কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে, আহত হয়ে, ওপর থেকে পড়ে গিয়ে বা ধাক্কা খেয়ে মরা অথবা কোন হিংস্র প্রাণী চিরে ফেলেছে এমন জীব, তোমরা জীবিত পেয়ে যাকে যবেহ করে দিয়েছো সেটি ছাড়া।[১১] আর যা কোন বেদীমূলে[১২] যবেহ করা হয়েছে (তাও তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে।)[১৩] এ ছাড়াও শর নিক্ষেপের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য নির্ণয় করাও তোমাদের জন্য জায়েয নয়।[১৪] এগুলো ফাসেকীর কাজ। আজ তোমাদের দীনের ব্যাপারে কাফেররা পুরোপুরি নিরাশ হয়ে পড়েছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো।[১৫] আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করেছি এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছি (কাজেই তোমাদের ওপর হালাল ও হারামের যে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে তা মেনে চলো।)[১৬] তবে যদি কোন ব্যক্তি ক্ষুধার জ্বালায় বাধ্য হয়ে ঐগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি জিনিস খেয়ে নেয় গুনাহের প্রতি কোন আকর্ষণ ছাড়াই, তাহলে নিসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।[১৭]

অবমাননা করা। তাই আল্লাহর নিশানী প্রসংগে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, যতক্ষণ তোমরা ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় থাকো ততক্ষণ শিকার করা আল্লাহর ইবাদাতের নিশানীগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি নিশানীর অবমাননা বুঝাবে। তবে শরীয়াতের বিধি অনুযায়ী ইহ্‌রামের সীমা খতম হয়ে গেলে তোমাদের শিকার করার অনুমতি আছে।

৮. যেহেতু কাফেররা সে সময় মুসলমানদেরকে কাবা ঘরের যিয়ারতে বাধা দিয়েছিল এবং আরবের প্রাচীন রীতির বিরুদ্ধাচরণ করে মুসলমানদেরকে হজ্জ থেকেও বঞ্চিত করেছিল, তাই মুসলমানদের মনে এ চিন্তার উদয় হলো যে, যেসব কাফের গোত্রকে কাবা যাবার জন্য মুসলিম অধ্যুসিত এলাকার কাছ দিয়ে যেতে হয়, তাদের হজ্জযাত্রার পথ তারা বন্ধ করে দেবে এবং হজ্জের মওসুমে তাদের কাফেলার ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালাবে। কিন্তু এ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ তাদেরকে এ সংকল্প থেকে বিরত রাখলেন।

৯. অর্থাৎ যে পশুর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

১০. অর্থাৎ যাকে যবেহ করার সময় আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নাম নেয়া হয়। অথবা যাকে যবেহ করার আগে এ মর্মে নিয়েত করা হয় যে, অমুক মহাপুরুষ অথবা অমুক দেবী বা দেবতার নামে উৎসর্গীত। (সূরা বাকারার ১৭১ টীকা দেখুন)।

১১. অর্থাৎ যে প্রাণীটি উপরোক্ত দুর্ঘটনাগুলোর শিকার হবার পরও মরেনি। বরং তার মধ্যে জীবনের কিছু আলামত পাওয়া যায়। তাকে যবেহ করলে তার গোশ্‌ত খাওয়া যেতে পারে। এ থেকে একথাও জানা যায় যে, হালাল প্রাণীর গোশ্‌ত একমাত্র যবেহর মাধ্যমে হালাল হয়। একে হালাল করার আর দ্বিতীয় কোন সঠিক পথ নেই। এ 'যবেহ' ও 'যাকাত' ইসলামের একটি বিশেষ পরিভাষা। এর অর্থ হচ্ছে, গলার এতখানি অংশ কেটে দেয়া যার ফলে শরীরের সমস্ত রক্ত ভালভাবে বের হয়ে যেতে পারে। এক কোপে কেটে বা গলায় ফাঁস দিয়ে অথবা অন্য কোনভাবে প্রাণী হত্যা করলে যে ক্ষতিটা হয় তা হচ্ছে এই যে, এর ফলে রক্তের বেশীর ভাগ অংশ তার শরীরের মধ্যে আটকে যায় এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জমে গিয়ে তা গোশ্‌তের সাথে মিশে যায়। অন্য দিকে যবেহ করলে মস্তিষ্কের সাথে শরীরের সম্পর্ক দীর্ঘ সময় বজায় থাকে। এর ফলে প্রতিটি শিরা উপশিরা থেকে রক্ত নিংড়ে বেরিয়ে আসে। এভাবে সারা দেহের গোশ্‌ত রক্তশূন্য হয়ে যায়। রক্ত হারাম একথা আগেই বলা হয়েছে। কাজেই গোশ্‌তের পাক ও হালাল হবার জন্য অবশ্যি তার পুরোপুরি রক্তশূন্য হওয়া অপরিহার্য।

১২. আসলে 'নুসুব' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে এমন সব স্থান বুঝায় যেগুলোকে লোকেরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর উদ্দেশ্যে বলিদান ও নজরানা পেশ করার জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। সেখানে কোন পাথর বা কাঠের মূর্তি থাক বা না থাক তাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের ভাষায় এরি সমার্থবোধক শব্দ হচ্ছে বেদী বা 'আস্তানা'। কোন মহাপুরুষ, কোন দেবতা বা মুশরিকী আকীদার সাথে এ স্থানটি জড়িত থাকে।

১৩. এখানে একথাটি ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, পানাহারযোগ্য দ্রব্যাদির মধ্যে শরীয়াত যেগুলোকে হালাল ও হারাম বলে দিয়েছে সেগুলোর হালাল ও হারাম হবার মূল ভিত্তি তাদের ভেষজ উপকারিতা ও অনুপকারিতা নয়। বরং তাদের নৈতিক লাভ ও ক্ষতিই এর ভিত্তি। প্রাকৃতিক বিষয়গুলোকে আল্লাহ মানুষের নিজের প্রচেষ্টা, সাধনা, অনুসন্ধান ও গবেষণার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। জীব ও জড় পদার্থগুলোর মধ্যে কোন্‌টি মানুষের দেহে সুখাদ্যের যোগান দিতে পারে এবং কোন্‌টি খাদ্য হিসেবে তার জন্য ক্ষতিকর ও অনুপকারী তা উদ্ভাবন ও নির্ণয় করার দায়িত্ব মানুষের নিজের ওপর বর্তায়। এসব বিষয়ে তাকে পথনির্দেশ দেবার দায়িত্ব শরীয়াত নিজের কাঁধে তুলে নেয়নি। এ

দায়িত্ব যদি শরীয়াত নিজের কাঁধে তুলে নিতো তাহলে সর্বপ্রথম 'বিষ' হারাম বলে ঘোষণা করতো। কিন্তু আমরা দেখি কুরআন ও হাদীসের কোথাও এর অথবা মানুষের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর অন্যান্য মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের আদৌ কোন উল্লেখই নেই। শরীয়াত খাদ্যের ব্যাপারে যে বিষয়টির ওপর আলোকপাত করে তা হচ্ছে এই যে, কোন্ খাদ্যটি মানুষের নৈতিকতার ওপর কি প্রভাব বিস্তার করে, আত্মার পবিত্রতার জন্য কোন্ খাদ্যটি কোন্ পর্যায়ভুক্ত এবং খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতিগুলোর মধ্য থেকে কোন্ পদ্ধতিটি বিশ্বাস ও প্রকৃতিগত দিক দিয়ে ভুল বা নির্ভুল? যেহেতু এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাবার সাধ্য মানুষের নেই এবং এ অনুসন্ধান চালাবার জন্য যে উপায় উপকরণের প্রয়োজন তাও মানুষের আয়ত্বের বাইরে, আর এ জন্যই এসব ব্যাপারে মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুল করে বসেছে, তাই শরীয়াত কেবলমাত্র এসব বিষয়েই তাকে পথনির্দেশ দেয়। যেগুলোকে সে হারাম গণ্য করেছে, সেগুলোকে হারাম করার কারণ হচ্ছে এই যে, মানুষের নৈতিক বৃত্তির ওপর সেগুলোর খারাপ প্রভাব পড়ে বা সেগুলো তাহারাত ও পবিত্রতা বিরোধী অথবা কোন খারাপ আকীদার সাথে সেগুলোর সম্পর্ক রয়েছে। পক্ষান্তরে যে জিনিসগুলোকে শরীয়াত হালাল গণ্য করেছে সেগুলোর হালাল হবার কারণ হচ্ছে এই যে, উপরোল্লিখিত দোষগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি দোষেও সেগুলো দুষ্ট নয়।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, এ জিনিসগুলোর হারাম হবার কারণ আল্লাহ আমাদের বুঝাননি কেন? কারণ বুঝিয়ে দিলে তো আমরা যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারতাম। এর জবাব হচ্ছে, আমাদের পক্ষে ঐ কারণগুলো অনুধাবন করা সম্ভব নয়। যেমন রক্ত, শূকরের গোশ্ত বা মৃত জীব খেলে আমাদের নৈতিক বৃত্তিতে কোন্ ধরনের দোষ, কতটুকু এবং কি পরিমাণে দেখা দেয়, সে সম্পর্কে কোন প্রকার অনুসন্ধান চালাবার কোন ক্ষমতাই আমাদের নেই। কারণ নৈতিকতা পরিমাপ করার কোন উপকরণই আমাদের আয়ত্বাধীন নয়। ধরুন যদি এদের খারাপ প্রভাব বর্ণনা করে দেয়াও হতো, তাহলেও সংশয় পোষণকারীরা প্রায় সে একই জায়গায় থাকতেন যেখানে বর্তমানে অবস্থান করছেন। কারণ এ বর্ণনা ভুল না নির্ভুল, তা সে পরিমাপ করবে কিসের সাহায্যে? তাই মহান আল্লাহ হালাল ও হারামের সীমানা মেনে চলাকে ঈমানের ওপর নির্ভরশীল করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি মেনে নেবে যে, কুরআন আল্লাহরই কিতাব, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহরই রসূল এবং আল্লাহকে সর্বজ্ঞ ও সবচেয়ে জ্ঞানী ও কুশলী বলে স্বীকার করবে সে তাঁর নির্ধারিত সীমানা অবশ্যই মেনে চলবে। এর কারণ বোধগম্য হোক বা না হোক তার পরোয়া সে করবে না। আর যে ব্যক্তি এ মৌলিক আকীদাটির ব্যাপারেই নিসংশয় নয় তার জন্য যেসব জিনিসের ক্ষতিকর বিষয় মানুষের জ্ঞানে ধরা পড়েছে কেবল মাত্র সেগুলো থেকে দূরে থাকা এবং যেগুলোর ক্ষতিকর বিষয় মানুষের জ্ঞানে ধরা পড়তে পারেনি সেগুলোর ক্ষতির দুর্ভোগ পোহাতে থাকা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

১৪. এ আয়াতে যে জিনিসটি হারাম করা হয়েছে দুনিয়ায় তার তিনটি সংস্করণ প্রচলিত আছে। আয়াতে ঐ তিনটিকেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

এক ঃ মুশরিকদের মতো করে 'ফাল' গ্রহণ করা। এতে কোন বিষয়ে দেব-দেবীর কাছে ভাগ্যের ফায়সালা জানার জন্য জিজ্ঞেস করা হয় অথবা গায়েবের—অজানার ও

অদৃশ্যের খবর জিজ্ঞেস করা হয় বা পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসা করে নেয়া হয়। মক্কার মুশরিকরা কাবা ঘরে রক্ষিত 'হুবল' দেবতার মূর্তিকে এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। তার বেদীমূলে সাতটি তীর রাখা হয়েছিল। সেগুলোর গায়ে বিভিন্ন শব্দ ও বাক্য খোদাই করা ছিল। কোন কাজ করার বা না করার প্রশ্নে দোদুল্যমানতা দেখা দিলে, হারানো জিনিসের সন্ধান লাভ করতে চাইলে বা হত্যা মামলার ফায়সালা জানতে চাইলে, মোট কথা যেকোন কাজের জন্যই হুবল–এর তীর রক্ষকের কাছে যেতে হতো, সেখানে নজরানা পেশ করতে হতো এবং হুবল–এর কাছে এ মর্মে প্রার্থনা করা হতো, "আমাদের এ ব্যাপারটির ফায়সালা করে দিন।" এরপর তীর রক্ষক তার কাছে রক্ষিত তীরগুলোর সাহায্যে 'ফাল' বের করতো। এতে যে তীরটিই বের হয়ে আসতো, তার গায়ে লিখিত শব্দকেই হুবল–এর ফায়সালা মনে করা হতো।

দুই ঃ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ফাল গ্রহণ। এ ক্ষেত্রে চিন্তা–ভাবনা ও জ্ঞান–বুদ্ধির সাহায্যে জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের মীমাংসার পরিবর্তে কোন প্রকার কুসংস্কার ও অমূলক ধারণা–কল্পনা বা কোন আকস্মিক ঘটনার মাধ্যমে কোন বিষয়ের মীমাংসা করা হয়। অথবা এমন সব উপায়ে ভাগ্যের অবস্থা জানবার চেষ্টা করা হয়, যেগুলো গায়েব জানার উপায় হিসেবে কোন তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে প্রমাণিত নয়। হস্তরেখা গণনা, নক্ষত্র গণনা, রমল করা, বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার এবং নানা ধরনের ফাল বের করা এর অন্তরভুক্ত।

তিন ঃ জুয়া ধরনের যাবতীয় খেলা ও কাজ। যেখানে অধিকার, কর্মমূলক অবদান ও বুদ্ধিবৃত্তিক ফায়সালার মাধ্যমে বস্তু বন্টনের পদ্ধতি গ্রহণ না করে নিছক কোন ঘটনা–ক্রমিক কার্যক্রমের ভিত্তিতে বস্তু বন্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যেমন, লটারীতে ঘটনাক্রমে অমুক ব্যক্তির নাম উঠেছে, কাজেই হাজার হাজার ব্যক্তির পকেট থেকে বের হয়ে আসা টাকা তার একার পকেটে চলে যাবে। অথবা তাত্ত্বিক দিক দিয়ে কোন একটি ধাঁধার একাধিক উত্তর হতে পারে কিন্তু পুরস্কারটি পাবে একমাত্র সেই ব্যক্তি যার উত্তর কোন যুক্তিসংগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নয় বরং নিছক ঘটনাক্রমে ধাঁধা প্রতিযোগিতা পরিচালকের সিন্ধুকে রক্ষিত উত্তরটির সাথে মিলে যাবে।

এ তিন ধরনের ফাল গ্রহণ ও অনুমানভিত্তিক লটারী করাকে হারাম ঘোষণা করার পর ইসলাম 'কুরআ' নিক্ষেপ বা লটারী করার একমাত্র সহজ সরল পদ্ধতিটিকেই বৈধ গণ্য করেছে। এ পদ্ধিতিতে দু'টি সমান বৈধ কাজের বা দু'টি সমপর্যায়ের অধিকারের মধ্যে ফায়সালা করার প্রশ্ন দেখা দেয়। যেমন, একটি জিনিসের ওপর দু' ব্যক্তির অধিকার সবদিক দিয়ে একদম সমান এবং ফায়সালাকারীর জন্য দু'জনের কাউকে অগ্রাধিকার দেবার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই আর তাদের দু'জনের মধ্য থেকে কোন একজন নিজের অধিকার প্রত্যাহার করতেও প্রস্তুত নয়। এ অবস্থায় তাদের সম্মতিক্রমে লটারীর মাধ্যমে ফায়সালা করা যেতে পারে অথবা দু'টি একই ধরনের সঠিক ও জায়েয কাজ। যুক্তির মাধ্যমে তাদের কোন একটিকে অগ্রাধিকার দেবার ব্যাপারে এক ব্যক্তি দোটানায় পড়ে গেছে। এ অবস্থায় প্রয়োজন হলে লটারী করা যেতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে যখন দু'জন সমান হকদারের মধ্যে একজনকে প্রাধান্য দেবার প্রশ্ন দেখা দিতো এবং তাঁর আশংকা হতো যে, তিনি একজনকে প্রাধান্য দিলে তা অন্যজনের মনোকষ্টের কারণ হবে তখন তিনি সাধারণত এ পদ্ধতিটি অবলম্বন করতেন।

১৫. 'আজ' বলতে কোন বিশেষ দিন, ক্ষণ বা তারিখ বুঝানো হয়নি বরং যে যুগে ও যে সময়ে এ আয়াত নাযিল হয় সেই সময়কালকে বুঝানো হয়েছে। আমাদের ভাষায়ও 'আজ' শব্দটি একইভাবে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

"তোমাদের দীনের ব্যাপারে কাফেররা পুরোপুরি নিরাশ হয়ে পড়েছে।"—অর্থাৎ তোমাদের দীন এখন একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে এবং সে তার নিজস্ব শাসন ও কর্তৃত্ব ক্ষমতার জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কাফেররা এতদিন তার পথে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আসছিল। কিন্তু এখন তারা এ দীনকে ধ্বংস করার এবং তোমাদেরকে আবার জাহেলিয়াতের অন্ধকার গর্ভে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে। "কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো।" অর্থাৎ এ দীনের বিধান এবং এর হেদায়াত কার্যকর করার ব্যাপারে এখন তোমাদের আর কোন কাফের শক্তির প্রভাব, পরাক্রম, প্রতিবন্ধকতা, প্রাধান্য ও হস্তক্ষেপের সম্মুখীন হতে হবে না। এখন আর মানুষকে ভয় করার কেন কারণ নেই। তোমাদের এখন আল্লাহকে ভয় করা উচিত। আল্লাহর বিধান কার্যকর করার ব্যাপারে এখন যদি তোমরা কোন ত্রুটি করো তাহলে এ জন্য তোমাদের কাছে এমন কোন ওজর থাকবে না যার ভিত্তিতে তোমাদের সাথে কোমল ব্যবহার করা যেতে পারে। এখন আর শরীয়াতের বিরুদ্ধাচরণের অর্থ এ হবে না যে, এ ব্যাপারে তোমরা অন্যদের প্রভাবে বাধ্য হয়ে এমনটি করেছো। বরং এর পরিষ্কার অর্থ হবে, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করতে চাও না।

১৬. দীনকে পরিপূর্ণ করে দেবার অর্থই হচ্ছে তাকে একটি স্বতন্ত্র চিন্তা ও কর্ম ব্যবস্থা এবং একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় পরিণত করা হয়েছে। তার মধ্যে জীবনের সমস্ত প্রশ্নের নীতিগত বা বিস্তারিত জবাব পাওয়া যায়। হেদায়াত ও পথনির্দেশ লাভ করার জন্য এখন আর কোন অবস্থায়ই তার বাইরে যাবার প্রয়োজন নেই। নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দেবার অর্থ হচ্ছে, হেদায়াতের নিয়ামত পূর্ণ করা। আর ইসলামকে দীন হিসেবে গ্রহণ করে নেবার অর্থ হচ্ছে এই যে, তোমরা আমার আনুগত্য ও বন্দেগী করার যে অংগীকার করেছিলে তাকে যেহেতু তোমরা নিজেদের প্রচেষ্টা ও কর্মের মাধ্যমে সত্য ও আন্তরিক অংগীকার হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছো, তাই আমি তাকে গ্রহণ করে নিয়েছি এবং তোমাদেরকে কার্যত এমন অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছি যে, এখন তোমাদের গলায় প্রকৃতপক্ষে আমার ছাড়া আর কারোর আনুগত্য ও বন্দেগীর শৃংখল নেই। এখন আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যেমন তোমরা আমার মুসলিম (আনুগত্যকারী) ঠিক তেমনি কর্মজীবনেও আমার ছাড়া আর কারোর মুসলিম (আনুগত্যকারী) হয়ে থাকতে তোমরা কোনক্রমেই বাধ্য নও। এ অনুগ্রহগুলোর কথা উচ্চারণ করার পর মহান আল্লাহ নীরবতা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু এ বাক পদ্ধতি থেকে একথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটে ওঠে, যেন এখানে আল্লাহ বলতে চাচ্ছেন, আমি যখন তোমাদের ওপর এ অনুগ্রহগুলো করেছি তখন এর দাবী হচ্ছে, এখন আমার আইনের সীমার মধ্যে অবস্থান করার ব্যাপারে তোমাদের পক্ষ থেকে যেন আর কোন ত্রুটি দেখা না দেয়।

বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, এ আয়াতটি বিদায় হজ্জের সময় ১০ হিজরীতে নাযিল হয়েছিল। কিন্তু যে বক্তব্যের ধারাবাহিকতার সাথে এর সম্পর্ক তা ৬ হিজরীতে হোদাইবিয়া চুক্তির সমসাময়িক কালের। বর্ণনা রীতির কারণে বাক্য দু'টি পরস্পর

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ
ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ
عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٤﴾

লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, তাদের জন্য কি হালাল করা হয়েছে? বলে দাও, তোমাদের জন্য সমস্ত পাক-পবিত্র জিনিস হালাল করা হয়েছে।[১৮] আর যেসব শিকারী প্রাণীকে তোমরা শিক্ষিত করে তুলেছো, যাদেরকে আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে তোমরা শিকার করা শিখিয়েছো, তারা তোমাদের জন্য যেসব প্রাণী ধরে রাখে, তাও তোমরা খেতে পারো।[১৯] তবে তার ওপর আল্লাহর নাম নিতে হবে।[২০] আর আল্লাহর আইন ভাঙ্গার ব্যাপারে সাবধান। অবশ্যি হিসেব নিতে আল্লাহর মোটেই দেরী হয় না।

এমনভাবে মিশে গেছে যার ফলে কোন ক্রমেই ধারণা করা যাবে না যে, শুরুতে এ বাক্যগুলো ছাড়াই এ ধরাবাহিক বক্তব্যটি নাযিল হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে এ বাক্যগুলো নাযিল হবার পর তা এখানে এনে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। অবশ্য প্রকৃত ব্যাপার একমাত্র আল্লাহই জানেন, তবে আমার অনুমান, প্রথমে এ আয়াতটি এ একই প্রসংগে নাযিল হয়েছিল। তাই লোকেরা তখন এর আসল গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেনি। পরে যখন সমগ্র আরব ভূখণ্ড বিজিত হলো এবং ইসলাম শক্তি অর্জন করে পূর্ণ যৌবনে পৌছে গেলো তখন মহান আল্লাহ পুনর্বার এ বাক্য তাঁর নবীর প্রতি নাযিল করেন এবং এটি ঘোষণা করে দেবার নির্দেশ জারি করেন।

১৭. সূরা বাকারার ১৭২ টীকা দেখুন।

১৮. এ জবাবের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। ধর্মীয় ভাবাপন্ন লোকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন এক মানসিকতার শিকার হন যার ফলে তারা কোন জিনিসকে সুস্পষ্টভাবে হালাল গণ্য না করা পর্যন্ত দুনিয়ার সব জিনিসকেই হারাম গণ্য করে থাকেন। এ মানসিকতার ফলে মানুষের ওপর সন্দেহ প্রবণতা ও আইনের গৎবাঁধা রীতি চেপে বসে। জীবনের প্রত্যেকটি কাজে সে হালাল বস্তু ও জায়েয কাজের তালিকা চেয়ে বেড়ায় এবং প্রত্যেকটি কাজ ও প্রত্যেকটি জিনিসকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে, যেন সব কিছুই নিষিদ্ধ। এখানে কুরআন এ মানসিকতার সংশোধন করছে। প্রশ্নকারীদের উদ্দেশ্য ছিল, সমস্ত হালাল জিনিসের বিস্তারিত বিবরণ তাদের জানিয়ে দিতে হবে, যাতে তারা সেগুলো ছাড়া অন্য সব জিনিসকে হারাম মনে করতে পারে। জবাবে কুরআন হারাম জিনিসগুলো বিস্তারিতভাবে বলে দিয়েছে এবং এরপর সমস্ত পাক পবিত্র জিনিস হালাল, এ সাধারণ নির্দেশ দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। এভাবে পুরাতন ধর্মীয় মতাদর্শ সম্পূর্ণ রূপে উল্টে গেছে। পুরাতন মতাদর্শ অনুযায়ী সবকিছুই ছিল হারাম কেবলমাত্র যেগুলোকে হালাল গণ্য

করা হয়েছে সেগুলো ছাড়া। কুরআন এর বিপরীত পক্ষে এ নীতি নির্ধারণ করেছে যে, সবকিছুই হালাল কেবল মাত্র সেগুলো ছাড়া যেগুলোর হারাম হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। এটি ছিল একটি অনেক বড় সংশোধন। মানুষের জীবনকে বাঁধন মুক্ত করে এ সংশোধন প্রশস্ত দুনিয়ার দুয়ার তার জন্য খুলে দিয়েছে। প্রথমে একটি গণ্ডীবদ্ধ ক্ষুদ্র পরিসরের কিছু জিনিস ছিল তার জন্য হালাল, বাকি সমস্ত দুনিয়া ছিল তার জন্য হারাম। আর এখন একটি গণ্ডিবদ্ধ পরিসরের কিছু জিনিস তার জন্য হারাম বাদবাকি সমস্ত দুনিয়াটাই তার জন্য হালাল হয়ে গেছে।

হালালের জন্য "পাক–পবিত্রতার" শর্ত আরোপ করা হয়েছে, যাতে এ সাধারণ বৈধতার দলীলের মাধ্যমে নাপাক জিনিসগুলোকে হালাল গণ্য করার চেষ্টা না করা হয়। এখন কোন জিনিসের "পাক–পবিত্র" হবার বিষয়টি কিভাবে নির্ধারিত হবে, এ প্রশ্নটি থেকে যায়। এর জবাব হচ্ছে, যেসব জিনিস শরীয়াতের মূলনীতিগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি মূলনীতির আওতায় নাপাক গণ্য হয় অথবা ভারসাম্যপূর্ণ রুচিশীলতা যেসব জিনিস অপছন্দ করে বা ভদ্র ও সংস্কৃতিবান মানুষ সাধারণত যেসব জিনিসকে নিজের পরিচ্ছন্নতার অনুভূতির বিরোধী মনে করে থাকে সেগুলো ছাড়া বাকি সবকিছুই পাক।

১৯. শিকারী প্রাণী বলতে বাঘ, সিংহ, বাজ পাখি, শিকরা ইত্যাদি এমনসব পশু–পাখি বুঝায় যাদেরকে মানুষ শিকার করার কাজে নিযুক্ত করে। শিক্ষিত পশু–পাখির বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, তারা যা কিছু শিকার করে সাধারণ পশু–পাখির মতো তাদেরকে ছিঁড়ে ফেড়ে খেয়ে ফেলে না বরং নিজের মালিকের জন্য রেখে দেয়। তাই সাধারণ পশু–পাখির শিকার করা প্রাণী হারাম কিন্তু শিক্ষিত পশু–পাখির শিকার করা প্রাণী হালাল।

এ বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে কিছুটা মতবিরোধ আছে। এক দলের মতে, শিকারী পশু–পাখি তার শিকার করা প্রাণী থেকে যদি কিছুটা খেয়ে নেয় তাহলে তা হারাম হয়ে যাবে। কারণ তার খাওয়া প্রমাণ করে যে, শিকারটিকে সে মালিকের জন্য নয়, নিজের জন্য ধরেছে। ইমাম শাফেঈ এ মত অবলম্বন করেছেন। দ্বিতীয় দলের মতে, সে যদি তার শিকার করা প্রাণীর কিছুটা খেয়ে নেয় তাহলেও তা হারাম হয়ে যায় না। এমনকি এক–তৃতীয়াংশ পর্যন্ত খেয়ে নিলেও বাকি দু'–তৃতীয়াংশ হালালই থেকে যাবে। আর এ ব্যাপারে পশু ও পাখির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ইমাম মালেক এ মত অবলম্বন করেছেন। তৃতীয় দলের মতে, শিকারী পশু যদি তার শিকার থেকে কিছু খেয়ে নেয় তাহলে তা হারাম হয়ে যাবে কিন্তু যদি শিকারী পাখি তার শিকার থেকে কিছু খেয়ে নেয় তাহলে তা হারাম হয়ে যাবে না। কারণ শিকারী পশুকে এমন শিক্ষা দেয়া যেতে পারে যার ফলে সে শিকার থেকে কিছুই না খেয়ে তাকে মালিকের জন্য সংরক্ষণ করে রাখতে পারে কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, শিকারী পাখিকে এ ধরনের শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর শাগরিদবৃন্দ এমত অবলম্বন করেছেন। এর বিপরীত পক্ষে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহ বলেন, শিকারী পাখির শিকার আদৌ জায়েয নয়। কারণ শিকারকে নিজে না খেয়ে মালিকের জন্য রেখে দেবার ব্যাপারটি তাকে কোনক্রমেই শেখানো সম্ভব নয়।

২০. অর্থাৎ শিকারী পশুকে শিকারের পেছনে লেলিয়ে দেবার সময় "বিসমিল্লাহ" বলো। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আদী ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহ আনহ নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۫ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ
مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ
مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ
بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۫ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝٥

আজ তোমাদের জন্য সমস্ত পাক-পবিত্র বস্তু হালাল করে দেয়া হয়েছে। আহ্‌লি কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল।[২১] আর সংরক্ষিত মেয়েরা তোমাদের জন্য হালাল, তারা ঈমানদারদের দল থেকে হোক বা এমন জাতিদের মধ্য থেকে হোক, যাদেরকে তোমাদের আগে কিতাব দেয়া হয়েছিল।[২২] তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, তোমরা তাদের মোহরানা আদায় করে দিয়ে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে তাদের রক্ষক হবে। তোমরা অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত হতে পারবে না অথবা লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করতেও পারবে না। আর যে ব্যক্তি ঈমানের পথে চলতে অস্বীকার করবে, তার জীবনের সকল সৎকার্যক্রম নষ্ট হয়ে যাবে এবং আখেরাতে সে হবে নিঃস্ব ও দেউলিয়া।[২৩]

ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আমি কি কুকুরের সাহায্যে শিকার করতে পারি?' জবাবে তিনি বলেন ঃ "যদি তাকে ছাড়ার সময় তুমি "বিসমিল্লাহ" বলে থাকো, তাহলে তা খেয়ে নাও অন্যথায় খেয়ো না। আর যদি সে শিকার থেকে কিছু খেয়ে নিয়ে থাকে, তাহলে তা খেয়ো না। কারণ সে শিকারকে আসলে তার নিজের জন্য ধরেছে," তারপর তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আমি যদি শিকারের ওপর নিজের কুকুর ছেড়ে দেবার পর দেখি সেখানে আর একটি কুকুর আছে তাহলে?' তিনি জবাব দিলেন ঃ "এ অবস্থায় ঐ শিকারটি খেয়ো না। কারণ আল্লাহর নাম তুমি নিজের কুকুরের ওপর নিয়েছিলে, অন্য কুকুরটির ওপর নয়?"

এ আয়াত থেকে জানা যায়, শিকারের ওপর শিকারী পশুকে ছাড়ার সময় আল্লাহর নাম নেয়া জরুরী। এরপর যদি শিকারকে জীবিত পাওয়া যায় তাহলে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তাকে যবেহ করতে হবে। আর যদি জীবিত না পাওয়া যায় তাহলে যবেহ

করা ছাড়াই তা হালাল। কারণ শুরুতে শিকারী পশুকে তার ওপর ছাড়ার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছিল। তীর দিয়ে শিকার করার ব্যাপারেও এ একই কথা।

২১. আহ্‌লি কিতাবদের খাদ্যের মধ্যে তাদের যবেহকৃত প্রাণীও অন্তরভুক্ত। আমাদের জন্য তাদের এবং তাদের জন্য আমাদের খাদ্য হালাল হবার মানে হচ্ছে এই যে, আমাদের ও তাদের মধ্যে পানাহারের ব্যাপারে কোন বাধ্য বা শুচি-অশুচির ব্যাপার নেই। আমরা তাদের সাথে খেতে পারি এবং তারা আমাদের সাথে খেতে পারে। কিন্তু এভাবে সাধারণ অনুমতি দেবার আগে এ বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যে, "তোমাদের জন্য সমস্ত পাক-পবিত্র জিনিস হালাল করে দেয়া হয়েছে।" এ থেকে জানা গেলো, আহলি কিতাব যদি পাক-পবিত্রতা ও তাহারাতের ব্যাপারে শরীয়াতের দৃষ্টিতে অপরিহার্য বিধানগুলো মেনে না চলে অথবা যদি তাদের খাদ্যের মধ্যে হারাম বস্তু অন্তরভুক্ত থাকে তাহলে তা থেকে দূরে থাকতে হবে। যেমন, যদি তারা আল্লাহর নাম না নিয়েই কোন প্রাণী যবেহ করে অথবা তার ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নাম নেয়, তাহলে তা খাওয়া আমাদের জন্য জায়েয নয়। অনুরূপভাবে যদি তাদের দস্তরখানে মদ, শূকরের গোশ্‌ত বা অন্য কিছু হারাম খাদ্য পরিবেশিত হয়, তাহলে আমরা তাদের সাথে আহারে শরীক হতে পারি না।

আহ্‌লি কিতাবদের ছাড়া অন্যান্য অমুসলিমদের ব্যাপারেও এ একই কথা। তবে সেখানে পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, আহলি কিতাবদের যবেহ করা প্রাণী জায়েয, যদি তারা যবেহ করার সময় তার ওপর আল্লাহর নাম নিয়ে থাকে কিন্তু আহলি কিতাব ছাড়া অন্যান্য অমুসলিমদের হত্যা করা প্রাণী আমরা খেতে পারি না।

২২. এখানে ইহুদী ও খৃষ্টানদের কথা বলা হয়েছে। কেবলমাত্র তাদের মেয়েদেরকেই বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে আর এ সংগে শর্তও আরোপিত হয়েছে যে, তাদের 'মুহসানাত' (সংরক্ষিত মহিলা) হতে হবে। এ নির্দেশটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিরূপণের ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইবনে আব্বাসের (রা) মতে এখানে আহ্‌লি কিতাব বলতে সে সব আহ্‌লি কিতাবকে বুঝানো হয়েছে যারা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজা। অন্যদিকে দারুল হার্‌ব ও দারুল কুফ্‌রের ইহুদী ও খৃষ্টানদের মেয়েদের বিয়ে করা জায়েয নয়। হানাফী ফকীহগণ এর থেকে সামান্য একটু ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের মতে বহির্দেশের আহ্‌লি কিতাবদের মেয়েদেরকে বিয়ে করা হারাম না হলেও মকরূহ, এতে কোন সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব ও হাসান বসরীর মতে, আয়াতটির হুকুম সাধারণভাবে প্রযোজ্য। কাজেই এখানে যিম্মী ও অযিম্মীর মধ্যে পার্থক্য করার কোন প্রয়োজন নেই। তারপর 'মুহসানাত' শব্দের অর্থের ব্যাপারেও ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হযরত উমরের (রা) মতে, এর অর্থ পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী মেয়েরা। মুহসানাত শব্দের এ অর্থ গ্রহণ করার কারণে তিনি আহ্‌লি কিতাবদের স্বেচ্ছাচারী মেয়েদের বিয়ে করাকে এ অনুমতির আওতার বাইরে রেখেছেন। হাসান, শা'বী ও ইব্রাহীম নাখ্‌ঈ (র) এ একই মত পোষণ করেন। হানাফী ফকীহগণও এ মত অবলম্বন করেছেন। অন্যদিকে ইমাম শাফেঈর মতে, এখানে এ শব্দটি ক্রীতদাসীদের মোকাবিলায় ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এখানে এ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, আহলি কিতাবদের এমন সব মেয়ে যারা ক্রীতদাসী নয়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ
وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى
الْكَعْبَيْنِ ۭ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ۭ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰي
سَفَرٍ اَوْ جَاۗءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۗىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۗءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۗءً
فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ۭ
مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

২ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য তৈরী হও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত দু'টি কনুই পর্যন্ত ধুয়ে ফেলো, মাথার ওপর হাত বুলাও এবং পা দু'টি গেরো পর্যন্ত ধুয়ে ফেলো।[২৪] যদি তোমরা 'জানাবাত' অবস্থায় থাকো, তাহলে গোসল করে পাক সাফ হয়ে যাও।[২৫] যদি তোমরা রোগগ্রস্ত হও বা সফরে থাকো অথবা তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করে আসে বা তোমরা নারীদেরকে স্পর্শ করে থাকো এবং পানি না পাও, তাহলে পাক-পবিত্র মাটি দিয়ে কাজ সেরে নাও। তার ওপর হাত রেখে নিজের চেহারা ও হাতের ওপর মসেহ করে নাও।[২৬] আল্লাহ তোমাদের জন্য জীবনকে সংকীর্ণ করে দিতে চান না কিন্তু তিনি চান তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করতে এবং তাঁর নিয়ামত তোমাদের ওপর সম্পূর্ণ করে দিতে,[২৭] হয়তো তোমরা শোকর গুজার হবে।

২৩. আহলি কিতাবদের মেয়েদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দেবার পর এখানে সতর্কবাণী হিসেবে এ বাক্যটি সন্নিবেশিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি এ অনুমতি থেকে লাভবান হতে চাইবে সে যেন নিজের ঈমান ও চরিত্রের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে। এমন যেন না হয়, কাফের স্ত্রীর প্রেমে আত্মহারা হয়ে অথবা তার আকীদা ও কর্মকাণ্ডে প্রভাবিত হয়ে তিনি নিজের ঈমানের মূল্যবান সম্পদ হারিয়ে বসেন বা সামাজিক জীবন যাপন ও আচরণের ক্ষেত্রে ঈমান বিরোধী পথে এগিয়ে চলেন।

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِىْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ قُلْتُمْ
سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۡ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٧
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۗءَ بِالْقِسْطِ ۡ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۭ اِعْدِلُوْا ۣ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۡ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝٨ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝٩ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَآ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝١٠

আল্লাহ তোমাদের যে নিয়ামত দান করেছেন[২৮] তার কথা মনে রাখো এবং তিনি তোমাদের কাছ থেকে যে পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছেন তা ভুলে যেয়ো না। অর্থাৎ তোমাদের একথা—"আমরা শুনেছি ও আনুগত্য করেছি।" আর আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ মনের কথা জানেন। হে ঈমানদারগণ! সত্যের ওপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত ও ইনসাফের সাক্ষদাতা হয়ে যাও।[২৯] কোন দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এমন উত্তেজিত না করে দেয় যার ফলে তোমরা ইনসাফ থেকে সরে যাও। ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত করো। এটি আল্লাহভীতির সাথে বেশী সামঞ্জস্যশীল। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত আছেন। যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তাদের ভুল-ত্রুটি মাফ করে দেয়া হবে এবং তারা বিরাট প্রতিদান লাভ করবে আর যারা কুফরী করবে এবং আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

২৪. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হুকুমটির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা থেকে জানা যায়, কুল্লি করা ও নাক সাফ করাও মুখ ধোয়ার অন্তরভুক্ত। এ ছাড়া মুখমণ্ডল ধোয়ার কাজটি কখনই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। আর কান যেহেতু মাথার একটি অংশ তাই মাথা মসেহ করার মধ্যে কানের ভেতরের ও বাইরের উভয় অংশও শামিল হয়ে যায়। তাছাড়া অযু শুরু করার আগে দু' হাত ধুয়ে নেয়া উচিত। কারণ যে হাত দিয়ে অযু করা হচ্ছে সে হাতেরই তো আগে পাক-পবিত্র হবার প্রয়োজন রয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ
أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى
اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর সে অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যা তিনি (এ সাম্প্রতিককালে) তোমাদের প্রতি করেছেন, যখন একটি দল তোমাদের ক্ষতি করার চক্রান্ত করেছিল কিন্তু আল্লাহ তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন।[৩০] আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো। ঈমানদারদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।

২৫. স্ত্রী সহবাসের কারণে 'জানাবাত' হোক বা স্বপ্নে বীর্য স্খলনের কারণে হোক উভয় অবস্থায়ই গোসল ওয়াজিব। এ অবস্থায় গোসল ছাড়া নামায পড়া বা কুরআন স্পর্শ করা জায়েয নয়। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য সূরা আন্ নিসার ৬৭, ৬৮ ও ৬৯ টীকা দেখুন)।

২৬. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আন নিসার ৬৯ ও ৭০ টীকা।

২৭. আত্মার পবিত্রতা যেমন একটি নিয়ামত ঠিক তেমনি শরীরের পবিত্রতাও একটি নিয়ামত। আর মানুষের ওপর আল্লাহর নিয়ামত তখনই সম্পূর্ণ হতে বা পূর্ণতা লাভ করতে পারবে যখন সে আত্মা ও শরীর উভয়ের তাহারাত ও পাক–পবিত্রতা অর্জনের জন্য পূর্ণ হেদায়াত লাভ করতে সক্ষম হবে।

২৮. অর্থাৎ আল্লাহর এ নিয়ামত যে, জীবনের সরল সঠিক রাজপথ তিনি তোমাদের জন্য আলোকোজ্জ্বল করে দিয়েছেন এবং সারা দুনিয়ার মানুষের হোদায়াত ও নেতৃত্ব দানের আসনে তোমাদের সমাসীন করেছেন।

২৯. সূরা আন নিসার ১৬৪ ও ১৬৫ টীকা দেখুন।

৩০. এখানে একটি বিশেষ ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এ সম্পর্কে রেওয়ায়াত করেছেন ঃ ইহুদীদের একটি দল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বিশেষ বিশেষ সাহাবীদেরকে একটি ভোজে আমন্ত্রণ করেছিল। এই সংগে তারা গোপনে চক্রান্ত করেছিল যে, নবী করীম (সা) ও সাহাবীগণ এসে গেলে একযোগে তাদের ওপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে শেষ করে দেবে এবং এভাবে তারা ইসলামের মূলোৎপাটনে সক্ষম হবে। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে ঠিক সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারলেন। তিনি দাওয়াতে অংশ গ্রহণ করলেন না। যেহেতু এখান থেকে বনী ইসরাঈলদেরকে

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ
وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ
بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ
كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

৩ রুকূ'

আল্লাহ বনী ইসরাঈলদের থেকে পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে বারোজন 'নকীব'[৩১] নিযুক্ত করেছিলেন। আর তিনি তাদেরকে বলেছিলেন ঃ "আমি তোমাদের সাথে আছি। যদি তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও, আমার রসূলদেরকে মানো ও তাদেরকে সাহায্য করো[৩২] এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে থাকো,[৩৩] তাহলে নিশ্চিত বিশ্বাস করো আমি তোমাদের থেকে তোমাদের পাপগুলো মোচন করে দেবা[৩৪] এবং তোমাদের এমন সব বাগানের মধ্যে প্রবেশ করাবো যার তলদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে। কিন্তু এরপর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কুফরী নীতি অবলম্বন করবে, সে আসলে 'সাওয়া-উস-সাবীল[৩৫] তথা সরল সঠিক পথ হারিয়ে ফেলেছে।

সম্বোধন করে বক্তব্য পেশ করা শুরু হয়েছে, তাই ভূমিকা হিসেবে এ ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

এখান থেকে যে ভাষণ শুরু হচ্ছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে দু'টো। প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলমানদের পূর্বসূরী আহলি কিতাবরা যে পথে চলছিল সে পথে চলা থেকে তাদেরকে বিরত রাখা। কাজেই তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, যেভাবে আজ তোমাদের থেকে অংগীকার নেয়া হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে ইতিপূর্বে বনী ইসরাঈল ও ঈসা আলাইহিস সালামের উম্মতদের থেকেও এ একই অংগীকার নেয়া হয়েছিল। তারা যেভাবে নিজেদের অংগীকার ভংগ করে পথভ্রষ্ট হয়েছে তোমরাও যেন তেমনি অংগীকার ভংগ করে পথভ্রষ্ট হয়ে না যাও। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইহুদী ও খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায়কে তাদের ভুলের জন্য সতর্ক করে দেয়া এবং তাদেরকে সত্য দীন তথা ইসলামের দওয়াত দেয়া।

৩১. 'নকীব' অর্থ পর্যবেক্ষক, রক্ষণাবেক্ষণকারী ও তদন্তকারী। বনী ইসরাঈল ছিল বারোটি গোত্রে বিভক্ত। আল্লাহ প্রত্যেক গোত্র থেকে একজনকে নিয়ে সে গোত্রের ওপরই তাকে নকীব নিযুক্ত করার হুকুম দিয়েছিলেন। নকীবের কাজ ছিল তার গোত্রের লোকদের চালচলন ও অবস্থার প্রতি নজর রাখা এবং তাদেরকে বেদীনী ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা। বাইবেলের গণনা পুস্তকে বারো জন 'সরদার'-এর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কুরআনে এ 'নকীব' শব্দের মাধ্যমে তাদের যে পদমর্যাদা ও দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে বাইবেলের বর্ণনা থেকে তা প্রকাশ হয় না। বাইবেল তাদেরকে নিছক সরদার ও প্রধান হিসেবে পেশ করেছে। অন্যদিকে কুরআন তাদেরকে নৈতিক ও ধর্মীয় পর্যবেক্ষক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী বলে গণ্য করেছে।

৩২. অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে যে রসূলই আসবে যদি তোমরা তাঁর দাওয়াত কবুল করতে থাকো এবং তাকে সাহায্য করতে থাকো।

৩৩. অর্থাৎ আল্লাহর পথে নিজের ধন সম্পদ ব্যয় করতে থাকো। যেহেতু মানুষ আল্লাহর পথে যা ব্যয় করে আল্লাহ তার এক একটি পাইকেও কয়েকগুণ বাড়িয়ে ফেরত দেবার ওয়াদা করেন, তাই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর পথে অর্থ সম্পদ ব্যয় করাকে "ঋণ" হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। তবে এখানে শর্ত হচ্ছে, তা অবশ্যি "উত্তম ঋণ" হতে হবে। অর্থাৎ বৈধ উপায়ে সংগৃহীত অর্থ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে এবং আন্তরিকতা, সদিচ্ছা ও সৎ সংকল্প সহকারে ব্যয় করতে হবে।

৩৪. কারোর পাপ মোচন করার দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, সত্য ও সঠিক পথ অবলম্বন করার এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী চিন্তা ও কর্মের সঠিক পথে চলার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ মানুষের আত্মা বিভিন্ন প্রকার পাপের মলিনতা থেকে এবং তার জীবনধারা বহু প্রকার দোষ ও ত্রুটি থেকে মুক্ত হয়ে যেতে থাকবে।

দুই, এ পরিশুদ্ধি সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি সামগ্রিকভাবে পূর্ণতার পর্যায়ে না পৌঁছুতে পারে এবং তার মধ্যে কিছু ত্রুটি ও গুনাহ থেকে যায় তাহলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাকে জবাবদিহির সম্মুখীন করবেন না এবং সে গুনাহগুলো তার হিসেব থেকে বিলুপ্ত করে দেবেন। কারণ যে ব্যক্তি মৌলিক হেদায়াত ও সংশোধন গ্রহণ করে নিয়েছে আল্লাহ তার ছোটখাট ও পরোক্ষ ত্রুটিগুলো পাকড়াও করার মতো কঠোর নীতি অবলম্বন করবেন না।

৩৫. অর্থাৎ সে 'সাওয়া-উস-সাবীল' পেয়ে আবার তা হারিয়ে ফেলেছে এবং ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়েছে। 'সাওয়া-উস-সাবীলের' অনুবাদ করা যেতে পারে 'সরল-সঠিক ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যম পথ।' কিন্তু এরপরও তার পুরোপুরি অর্থ প্রকাশিত হয় না। তাই আয়াতের অনুবাদের সময় হুবহু মূল শব্দটিই রাখা হয়েছে।

এ শব্দটির গভীর অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্য প্রথমেই একথাটি হৃদয়ংগম করে নিতে হবে যে, মানুষের অস্তিত্বের মধ্যেই নিহিত রয়েছে একটি ছোটখাটো জগত। এ খুদে জগতটি অসংখ্য শক্তি ও যোগ্যতায় পরিপূর্ণ। ইচ্ছা, আকাংখা, আবেগ, অনুভূতি ও বিভিন্ন ধরনের প্রবণতা এখানে বাসা বেঁধে আছে। দেহ ও প্রবৃত্তির বিভিন্ন দাবী এবং আত্মা ও মানবিক প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকার চাহিদার ভীড় এখানে সর্বক্ষণ। তারপর ব্যক্তি মানুষেরা একত্র হয়ে যে সমাজ কাঠামো নির্মাণ করে সেখানেও ঘটে অসংখ্য জটিল সম্পর্কের সমন্বয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশের সাথে সাথে এ জটিলতাও বেড়ে যেতে থাকে। এরপর সারা দুনিয়ায় মানুষের চারদিকে জীবন ধারণের যেসব উপকরণ ছড়িয়ে আছে সেগুলো কাজে লাগাবার এবং মানবিক প্রয়োজনে ও মানব সভ্যতার বিনির্মাণে সেগুলো ব্যবহার করার প্রশ্নও ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যায়ে অসংখ্য ছোট বড় সমস্যার জন্ম দেয়।

মানুষ তার সহজাত দুর্বলতার কারণে জীবনের এ সমগ্র কর্মক্ষেত্রটির ওপর একই সময়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টি দিতে পারে না। তাই মানুষ নিজেই নিজের জীবনের জন্য এমন কোন পথ তৈরী করতে পারে না যেখানে তার সমস্ত শক্তির সাথে পুরোপুরি ইনসাফ করা যেতে পারে, যেখানে তার সমস্ত ইচ্ছা ও আশা-আকাংখা যথাযথভাবে পূর্ণ করা যায়, তার সমস্ত আবেগ, অনুভূতি ও প্রবণতার মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, একটি ন্যায়ানুগ সমতা রক্ষা করে তার ভেতরের ও বাইরের সমস্ত চাহিদা ও দাবী পূরণ করা যায়, তার সমাজ জীবনের সমস্ত সমস্যার প্রতি যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করে তাদের সুষ্ঠু সমাধান বের করা যায় এবং জড় বস্তুগুলোকেও ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ন্যায়, ইনসাফ, সমতা, ভারসাম্য ও সত্যনিষ্ঠা সহকারে ব্যবহার করা যায়। মানুষ নিজেই যখন নিজের নেতা ও বিধাতায় পরিণত হয় তখন সত্যের বিভিন্ন দিকের মধ্য থেকে কোন একটি দিক, জীবনের প্রয়োজনের মধ্য থেকে কোন একটি প্রয়োজন, সমাধান প্রত্যাশী সমস্যাগুলোর কোন একটি সমস্যা তার মস্তিষ্ক ও চিন্তা জগতকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে যে, অন্যান্য দিক, প্রয়োজন ও সমস্যাগুলোর সাথে সে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বে-ইনসাফী করতে থাকে। তখন তার এ সিদ্ধান্তকে জোরপূর্বক প্রতিষ্ঠিত করার ফলে জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং সে ভারসাম্যহীনতার কোন এক প্রান্তের দিকে বাঁকাভাবে চলতে থাকে। তারপর এভাবে চলতে চলতে বক্রতার শেষ প্রান্তে পৌছার আগেই তা মানুষের জন্য অসহনীয় হয়ে ওঠে। ফলে যে সমস্ত দিক, প্রয়োজন ও সমস্যার সাথে বেইনসাফী করা হয়েছিল তারা বিদ্রোহ শুরু করে দেয় এবং তাদের সাথে ইনসাফ করার জন্য তারা চাপ দিতে থাকে। কিন্তু এরপরও ইনসাফ হয় না। কারণ আবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। অর্থাৎ আগের ভারসাম্যহীনতার কারণে যেগুলোকে সবচেয়ে বেশী দাবিয়ে দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্য থেকে কোন একটি মানুষের মস্তিষ্ক ও চিন্তা জগতকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং একটি বিশেষ দাবী অনুযায়ী একটি বিশেষ দিকে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এখানে আবার অন্যান্য দিক, প্রয়োজন ও সমস্যার সাথে

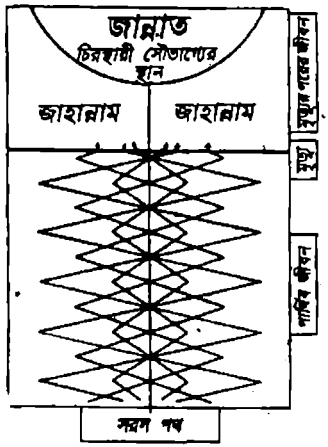

বেইনসাফী হতে থাকে। এভাবে সরল সোজা পথে চলা মানুষের পক্ষে কখনো সম্ভব হয় না। সবসময়ই সে ঢেউয়ের দোলায় দোদুল্যমান থাকে এবং ধ্বংসের এক কিনার থেকে আর এক কিনারে তাকে ঠেলে দেয়া হয়। মানুষ নিজের জীবন ক্ষেত্রে চলার জন্য যতগুলো পথ তৈরী করেছে সবই বক্র রেখার মতো। একটি ভুল দিক থেকে যাত্রা শুরু করে আর একটি ভুল প্রান্তে গিয়ে তার চলা শেষ হয়। আবার সেখান থেকে যখন চলা শুরু করে তখন কোন ভুল দিকেই এগিয়ে চলে।

এ অসংখ্য বক্র ও ভুল পথের মধ্য দিয়ে এমন একটি পথ চলে গেছে যার অবস্থান ঠিক মধ্যভাগে। এ পথে মানুষের সমস্ত শক্তি সামর্থ, প্রবণতা, আশা-আকাংখা, আবেগ, অনুভূতি, তার দেহ ও আত্মার সমস্ত দাবী ও চাহিদা এবং তার জীবনের যাবতীয় সমস্যার সাথে পূর্ণ ইনসাফ করা হয়েছে। এ পথে কোন প্রকার বক্রতার লেশ মাত্র নেই। কোন দিকের প্রতি অযথা পক্ষপাতিত্ব ও তাকে সুযোগ-সুবিধা দান এবং কোন দিকের সাথে জুলুম ও বেইনসাফী করার প্রশ্নই এখানে নেই। মানুষের জীবনের সঠিক উন্নয়ন, ক্রমবিকাশ এবং তার সাফল্য ও অগ্রগতির জন্য এ ধরনের একটি পথ একান্ত অপরিহার্য। মানুষের মূল প্রকৃতি এ পথেরই সন্ধানে ফিরছে। এ সোজা সরল রাজপথটির অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকার কারণেই তার বিভিন্ন বক্র পথের বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু নিজের চেষ্টায় এ রাজপথের সন্ধান লাভ করার ক্ষমতা মানুষের নেই। একমাত্র আল্লাহই তাকে এ পথের সন্ধান দিতে পারেন। মানুষকে এ পথের সন্ধান দেবার জন্যই আল্লাহ তাঁর রসূল পাঠিয়েছেন।

কুরআন এ পথকেই 'সাওয়া-উস-সাবীল' ও 'সিরাতুল মুস্তাকীম' আখ্যা দিয়েছে। দুনিয়ার এ জীবন থেকে নিয়ে আখেরাতের জীবন পর্যন্ত অসংখ্য বক্র পথের মধ্য দিয়ে এ সরল সোজা রাজপথটি চলে গেছে। যে ব্যক্তি এ পথে অগ্রসর হয়েছে সে এ দুনিয়ায়ও সঠিক পথের যাত্রী এবং আখেরাতেও সফলকাম হয়েছে। আর যে ব্যক্তি এ পথ হারিয়ে ফেলেছে সে এখানে বিভ্রান্ত হয়েছে, ভুল পথে চলেছে এবং আখেরাতেও অনিবার্যভাবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। কারণ, জীবনের সমস্ত বক্র পথ জাহান্নামের দিকেই চলে গেছে।

আধুনিক যুগের কতিপয় অজ্ঞ দার্শনিক মানুষকে উপর্যুপরি এক প্রান্তিকতা থেকে আর এক প্রান্তিকতার দিকে ধেয়ে চলতে দেখে এ ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া (Dialectic Process) মানব জীবনের উন্নতি, অগ্রগতি ও ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক পথ। নিজেদের নির্বুদ্ধিতার কারণে তারা এ ধারণা করে বসেছেন যে, প্রথমে একটি চরমপন্থী দাবী (Thesis) মানুষকে একদিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তারপর এর

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ
عَن مَّوَاضِعِهِ ۙ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ
مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا
حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۖ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾

তারপর তাদের নিজেদের অংগীকার ভংগের কারণেই আমি তাদেরকে নিজের রহমত থেকে দূরে নিক্ষেপ করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করে দিয়েছি। এখন তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা শব্দের হেরফের করে কথাকে একদিক থেকে আর একদিকে নিয়ে যায়, যে শিক্ষা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল তার বড় অংশ তারা ভুলে গেছে এবং প্রায় প্রতিদিনই তাদের কোন না কোন বিশ্বাসঘাতকতার খবর তুমি লাভ করে থাকো, তাদের অতি অল্প সংখ্যক লোকই এ দোষমুক্ত আছে (কাজেই তারা যখন এ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তখন তাদের যে কোন কুকর্ম মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়)। তাই তাদেরকে মাফ করে দাও এবং তাদের কাজকর্মকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখো। আল্লাহ তাদেরকে পসন্দ করেন যারা সৎকর্মশীলতা ও পরোপকারের নীতি অবলম্বন করে।

এভাবে যারা বলেছিল আমরা "নাসারা"[৩৬] তাদের থেকেও আমি পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের স্মৃতিপটে যে শিক্ষা সংবদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল তারও বড় অংশ তারা ভুলে গেছে। শেষ পর্যন্ত আমি তাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের বীজ বপন করে দিয়েছি। আর এমন এক সময় অবশ্যি আসবে যখন আল্লাহ তাদের জানিয়ে দেবেন তারা দুনিয়ায় কি করতো।

প্রতিক্রিয়ায় একই পর্যায়ের আরেকটি চরম ভাবাপন্ন দাবী (Antithesis) তাকে আর এক প্রান্তে ঠেলে নিয়ে যায়। আর এরপর তাদের উভয়ের মিশ্রণে (Synthesis) জীবনের অগ্রগতি ও বিকাশের পথ তৈরী হয়। তাদের মতে এটিই হচ্ছে মানব জীবনের ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশের পথ। অথচ এটি মোটেই ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির পথ নয়। বরং এ

হচ্ছে দুর্ভাগ্যের ধাক্কা, যা মানুষের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার এবং তার যথার্থ ক্রমবিকাশের পথে বারবার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। প্রত্যেকটি চরমপন্থী ও প্রান্তিকতাবাদী দাবী জীবনকে কোন একটি লক্ষের দিকে চালিত করে এবং তাকে টেনে নিয়ে চলে। এভাবে চলতে চলতে যখন সে 'সাওয়া-উস-সাবীল' থেকে অনেক দূরে সরে যায় তখন জীবনেরই অপর কতকগুলো উপেক্ষিত সত্য, যাদের সাথে বেইনসাফী করা হচ্ছিল, তারাই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকে। এ বিদ্রোহ একটি পাল্টা দাবীর আকারে আত্মপ্রকাশ করে তাকে উল্টো দিকে টানতে থাকে। 'সাওয়া-উস্ সাবীল' যত কাছে আসতে থাকে ততই এ সংঘর্ষশীল দাবীগুলোর মধ্যে আপোস হতে থাকে এবং তাদের মিশ্রণে এমন কিছু জিনিস অস্তিত্বলাভ করে যা মানুষের জীবনের জন্য উপকারী ও লাভজনক। কিন্তু যখন সেখানে 'সাওয়া-উস-সাবীলের' সন্ধান দেয়ার মতো আলো থাকে না এবং তার ওপর অবিচল থাকার মতো ঈমানেরও অস্তিত্ব থাকে না তখন এ পাল্টা দাবী জীবনকে সেই স্থানে টিকে থাকতে দেয় না বরং নিজের শক্তির জোরে তাকে বিপরীত প্রান্তিকতার দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত জীবনের অন্য কিছু সত্যকে অস্বীকার করার পর্ব শুরু হয়ে যায়। এর ফলে আর একটা বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এসব সংকীর্ণ দৃষ্টির অধিকারী দার্শনিকদের মধ্যে যদি কুরআনের আলো পৌঁছে গিয়ে থাকতো এবং তারা 'সাওয়া-উস-সাবীল' কি জিনিস তা দেখতে পেতেন। তাহলে তারা জানতে পারতেন, এ 'সাওয়া-উস-সাবীল'ই মানুষের জন্য একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল পথ। বক্র রেখায় ক্রমাগত এক প্রান্তিকতা থেকে আর এক প্রান্তিকতায় ধাক্কা খেয়ে বেড়ানো মানব জীবনের ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশের কোন সঠিক ও নির্ভুল পথ নয়।

৩৬. অনেকে মনে করেন নাসারা (نصارى) শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে হযরত ঈসার জন্মভূমির নাম 'নাসেরা' (ناصره) থেকে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। আসলে নাসারা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'নুসরাত' (نصرت) থেকে। ঈসা আলাইহিস সালামের উক্তি من انصارى الى الله (আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে?) এর জবাবে তাঁর হাওয়ারীগণ نحن انصار الله (আমরা হবো আল্লাহর কাজে সাহায্যকারী) বলে বক্তব্য পেশ করেছিলেন। সেখান থেকেই এর উৎপত্তি। খৃষ্টান লেখকরা নিছক বাহ্যিক সাদৃশ্য দেখে এ বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন যে, খৃষ্টবাদের ইতিহাসের প্রথম যুগে নাসেরীয়া(Nazarenes) নামে একটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল; তাদেরকে তাচ্ছিল্যের সাথে নাসেরী ও ইবূনী বলা হতো এবং কুরআন তাদের নামকেই সমগ্র খৃষ্টান সম্প্রদায়ের জন্য ব্যবহার করেছে। কিন্তু এখানে কুরআন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করছে যে, তারা নিজেরাই বলেছিল ঃ 'আমরা নাসারা'। আর একথাও সুস্পষ্ট যে, খৃষ্টানরা নিজেরা কখনো নিজেদেরকে নাসেরী বলে পরিচয় দেয়নি।

এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কখনো নিজের অনুসারীদেরকে 'ঈসায়ী' 'খৃষ্টান' বা 'মসীহী' নামে আখ্যায়িত করেননি। কারণ তিনি নিজের নামে কোন নতুন ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করতে আসেননি। হযরত মূসা

আলাইহিস সালাম এবং তাঁর আগের ও পরের নবীগণ যে দীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন তারই পুনরুজ্জীবন ছিল তাঁর দাওয়াতের লক্ষ। তাই তিনি সাধারণ বনী ইসরাঈলদের এবং মূসার শরীয়াতের অনুসারীদের থেকে আলাদা কোন দল গঠন করেননি এবং তাদের কোন আলাদা নামও রাখেননি। তাঁর প্রাথমিক যুগের অনুসারীরা নিজেদেরকে ইসরাঈলী মিল্লাত থেকে আলাদা মনে করতেন না এবং নিজেরা কোন স্বতন্ত্র দল হিসেবেও সংগঠিত হননি। নিজেদের পরিচিতির জন্য তারা কোন বৈশিষ্টমূলক নাম ও চিহ্ন গ্রহণ করেননি। তারা ইহুদীদের সাথে বাইতুল মাকদিসের হাইকেলেই (ধর্মধাম) ইবাদাত করতে যেতেন এবং মূসার শরীয়াতের বিধিবিধান মেনে চলাকেই নিজেদের কর্তব্য মনে করতেন। (দেখুন বাইবেল, প্রেরিতদের কার্য বিবরণ পুস্তক ৩ ঃ ১-১০, ৫ ঃ ২১-২৫)।

পরবর্তী সময়ে উভয় পক্ষ থেকেই বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যক্রম শুরু হয়েছে। একদিকে হযরত ঈসার (আ) অনুসারীদের মধ্য থেকে সেন্টপল ঘোষণা করেন যে, শরীয়াতের বিধান অনুসরণের আর প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র ঈসার ওপর ঈমান আনাই নাজাতের তথা পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট। আবার অন্যদিকে ইহুদী আলেমগণও হযরত ঈসার অনুসারীদেরকে একটি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় বলে ঘোষণা করে তাদেরকে সাধারণ বনী ইসরাঈলদের থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। কিন্তু এ বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও শুরুতে এ নতুন সম্প্রদায়ের কোন পৃথক নাম ছিল না। হযরত ঈসার অনুসারীরা নিজেদেরকে কখনো 'শিষ্য' বলে উল্লেখ করতেন, কখনো 'ভ্রাতৃগণ' (ইখওয়ান), 'বিশ্বাসী' (মুমিন), 'যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে' (আল্‌লাযীনা আমানূ) আবার কখনো 'পবিত্রগণ' বলেও উল্লেখ করেছেন (প্রেরিতদের কার্যবিবরণ পুস্তক, ২ঃ৪৪; ৪ঃ৩২; ৯ঃ২৬; ১১ঃ২৯; ১৩ঃ৫২; ১৫ঃ১ ও ২৩, রোমীয় ১৫ঃ২৫; কলসীয় ১ঃ১২)। অন্যদিকে ইহুদীরা এদেরকে কখনো 'গালীলী', কখনো 'নাসেরী' বা 'নাসরতী' আবার কখনো 'বেদাতী সম্প্রদায়' বলে অভিহিত করতো (প্রেরিতদের কার্য বিবরণ ২৪ঃ৫, লুক ১৩ঃ২)। নিছক নিন্দা ও বিদ্রূপচ্ছলে হযরত ঈসার অনুসারীদেরকে এ নামে ডাকার কারণ ছিল এই যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মভূমি ছিল নাসেরা এবং তা ছিল ফিলিস্তিনের গালীল জেলার অন্তর্গত। কিন্তু তাদের এ বিদ্রূপাত্মক শব্দগুলো খুব বেশী প্রচলিত হতে পারেনি। ফলে এগুলো হযরত ঈসার অনুসারীদের নামে পরিণত হতে সক্ষম হয়নি।

এ দলের বর্তমান নাম "খৃষ্টান" (Christian) সর্বপ্রথম আন্তাকিয়াতে (انطاكيه) প্রদত্ত হয়। সেখানে ৪৩ বা ৪৪ খৃষ্টাব্দে কতিপয় মুশরিক অধিবাসী হযরত ঈসার অনুসারীদেরকে এ নামে অভিহিত করে। সে সময় সেন্টপল ও বার্নাবাস সেখানে পৌঁছে ধর্ম প্রচারের কাজে নিয়োজিত হন। (প্রেরিতদের কার্য ১১ঃ২৬)। এ নামটিও মূলত বিরোধীদের পক্ষ থেকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপচ্ছলেই রাখা হয়েছিল। ঈসার অনুসারীরা নিজেরাও এটাকে তাদের নাম হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু তাদের শত্রুরা যখন তাদেরকে ঐ নামে ডাকতে শুরু করলো তখন তাদের নেতারা বললেন, যদি তোমাদেরকে খৃষ্টের সাথে যুক্ত করে খৃষ্টান বলে ডাকা হয়। তাহলে তাতে তোমাদের লজ্জা পাবার কি কারণ থাকতে পারে? (১-পিতর ৪ঃ১৬) এভাবে তারা নিজেরাই ধীরে ধীরে শত্রুদের বিদ্রূপচ্ছলে দেয়া এ নামে নিজদেরকে আখ্যায়িত করতে থাকে। অবশেষে তাদের মধ্যে এ অনুভূতিই

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ
تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ
وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ
وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾

হে আহলি কিতাব! আমার রসূল তোমাদের কাছে এসে গেছে। সে আল্লাহর কিতাবের এমন অনেক কথা তোমাদের কাছে প্রকাশ করছে যেগুলো তোমরা গোপন করে রাখতে এবং অনেক ব্যাপার ক্ষমার চোখেও দেখছে।[৩৭] তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে গেছে এক জ্যোতি এবং এমন একখানি সত্য দিশারী কিতাব, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর সন্তোষকামী লোকদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথপ্রদর্শন করেন[৩৮] এবং নিজ ইচ্ছাক্রমে তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোকের দিকে নিয়ে আসেন এবং সরল-সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করেন।

খতম হয়ে যায় যে, এটি আসলে একটি খারাপ নাম এবং তাদেরকে শত্রুরা বিদ্রূপচ্ছলে এ নাম দিয়েছিল।

কুরআন এ কারণেই খৃষ্টের অনুসারীদের ঈসায়ী, মসীহী বা খৃষ্টান নামে আখ্যায়িত করেনি। বরং তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, তোমরা আসলে সেসব লোকদের অন্তর্গত যাদেরকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম 'মান আনসারী ইলাল্লাহ (কে আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে?) বলে আহবান জানিয়েছিলেন এবং এর জবাবে সেই লোকেরা বলেছিল 'নাহ্নু আনসারুল্লাহ (আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী)।' তাই তোমরা নিজেদের প্রাথমিক ও মৌলিক তাৎপর্যের দিক দিয়ে নাসারা বা আনসার। কিন্তু আজকের খৃষ্টীয় মিশনারীরা এ বিস্মৃত বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেবার কারণে কুরআনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে উলটো অভিযোগ জানাচ্ছে যে, কুরআন তাদেরকে খৃষ্টান না বলে নাসারা বলছে কেন?

৩৭. অর্থাৎ তোমাদের অনেক চুরি ও খেয়ানত ফাঁস করে দিচ্ছেন, আল্লাহর সত্য দীন কায়েম করার জন্য যেগুলো ফাঁস করে দেয়া অপরিহার্য। আর যেগুলো ফাঁস করে দেয়ার তেমন কোন যথার্থ প্রয়োজন নেই সেগুলো এড়িয়ে যাচ্ছেন।

৩৮. শান্তি ও নিরাপত্তা মানে ভুল দেখা, ভুল আন্দাজ-অনুমান করা ও ভুল কাজ করা থেকে দূরে থাকা এবং এর ফলাফল থেকেও নিজেকে সংরক্ষিত রাখা। যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের জীবন থেকে আলো সংগ্রহ করে, চিন্তা ও কর্মের

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۭ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ
مِنَ اللّٰهِ شَيْـــًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ
فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۭ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۭ
يَخْلُقُ مَا يَشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝١٧

যারা বলে, "মারয়াম পুত্র মসীহই আল্লাহ" তারা অবশ্যি কুফরী করেছে।[৩৯] হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলে দাও, আল্লাহ যদি মারয়াম পুত্র মসীহকে, তার মাকে ও সারা দুনিয়াবাসীকে ধ্বংস করতে চান, তাহলে তাঁকে তাঁর এ সংকল্প থেকে বিরত রাখার ক্ষমতা কার আছে? আল্লাহ তো আকাশসমূহের এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন।[৪০] তাঁর শক্তি সবকিছুর ওপর পরিব্যাপ্ত।

প্রতিটি চৌমাথায় পৌঁছে সে কিভাবে এ ভুলগুলো থেকে সংরক্ষিত থেকেছে তা বুঝতে পারে।

৩৯. খৃষ্টবাদীরা শুরুতেই ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যক্তিত্বকে মানবিক সত্তা ও ইলাহী সত্তার মিশ্রণ গণ্য করে যে ভুল করেছিল তার ফলে হযরত ঈসার যথার্থ রূপ গোলক ধাঁধায় পরিণত হয়েছে। খৃষ্টীয় আলেম সমাজ এ ধাঁধার রহস্য উন্মোচনে যতই বাগাড়ম্বর ও কল্পনা-অনুমানের আশ্রয় নিয়েছেন। ততই জটিলতা বেড়ে গেছে। তাদের মধ্য থেকে যার চিন্তায় এ মিশ্র ব্যক্তিত্বের মানবিক সত্তার দিকটি বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে তিনি ঈসাকে আল্লাহর পুত্র এবং তিন জন স্বতন্ত্র খোদার একজন হবার ওপর জোর দিয়েছেন। আর যার চিন্তায় ইলাহী সত্তার দিকটি বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে, তিনি ঈসাকে আল্লাহর দৈহিক প্রকাশ গণ্য করে তাঁকে পুরোপুরি আল্লাহ বানিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁকে আল্লাহ মনে করে তাঁর ইবাদাত করেছেন। আবার এ উভয় দলের মাঝামাঝি একটা পথ বের করতে যারা চেয়েছেন তারা নিজেদের সমস্ত শক্তি এমন সব শাব্দিক ব্যাখ্যা সংগ্রহে নিয়োগ করেছেন যাতে হযরত ঈসাকে মানুষও বলা যায় আবার এ সংগে তাঁকে আল্লাহ মনে করাও যেতে পারে। আল্লাহ ও ঈসা পৃথক পৃথক থাকতে পারেন আবার একীভূতও হতে পারেন।(দেখুন, সূরা নিসা, ২১২, ২১৩ ও ২১৫ টীকা)।

৪০. এ বাক্যের মধ্যে এ মর্মে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত করা হয়েছে যে, নিছক ঈসার অলৌকিক জন্ম, তাঁর নৈতিক ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং দৃষ্টি ও অনুভূতি গ্রাহ্য অলৌকিক কার্যকলাপে বিভ্রান্ত হয়ে যারা ঈসাকে 'আল্লাহ' মনে করছে তারা আসলে একান্তই অজ্ঞ। ঈসাতো আল্লাহর অসংখ্য অলৌকিক সৃষ্টির একটি নমুনা মাত্র। এটি দেখেই এসব দুর্বল দৃষ্টির অধিকারী লোকদের চোখ ঝল্‌সে গেছে। এদের দৃষ্টি যদি আর একটু প্রসারিত হতো

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ۭ قُلْ فَلِمَ
يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ۭ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۭ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ
وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۡ
وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاۗءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰي
فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَاۗءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ۡ فَقَدْ جَاۗءَكُمْ
بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

ইহুদী ও খৃষ্টানরা বলে, "আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয়পাত্র।" তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তাহলে তোমাদের গোনাহের জন্য তিনি তোমাদের শাস্তি দেন কেন? আসলে তোমরাও ঠিক তেমনি মানুষ যেমন আল্লাহ অন্যান্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি যাকে চান মাফ করে দেন এবং যাকে চান শাস্তি দেন। পৃথিবী ও আকাশসমূহ এবং এ দুয়ের মধ্যকার যাবতীয় সৃষ্টি আল্লাহর মালিকানাধীন এবং তাঁরই দিকে সবাইকে যেতে হবে।

হে আহ্‌লি কিতাব! আমার এ রসূল এমন এক সময় তোমাদের কাছে এসেছেন এবং তোমাদেরকে দীনের সুস্পষ্ট শিক্ষা দিচ্ছেন যখন দীর্ঘকাল থেকে রসূলদের আগমনের সিল্‌সিলা বন্ধ ছিল, তোমরা যেন একথা বলতে না পারো, "আমাদের কাছে তো সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী আসেনি।" বেশ, এই দেখো, এখন সেই সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী এসে গেছেন এবং আল্লাহ সবকিছুর ওপর শক্তিশালী।[৪১]

তাহলে এরা দেখতে পেতো, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির এর চাইতে আরো অনেক বেশী বিস্ময়কর নমুনা পেশ করে যাচ্ছেন এবং তাঁর শক্তি কোন একটি বিশেষ সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নেই। কাজেই সৃষ্টির কোন বিস্ময়কর ক্ষমতা দেখে তাকে স্রষ্টা মনে করা বিরাট অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। বরং সৃষ্টির কৃতিত্ব ও বিস্ময়কর কার্যাবলীর মধ্যে যে ব্যক্তি স্রষ্টার অসীম ক্ষমতার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে এবং তা থেকে ঈমানের আলো সংগ্রহ করে সে-ই যথার্থ বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী।

৪১. এ বাক্যটি গভীর অর্থব্যঞ্জক ও উচ্চাংগের সাহিত্যিক অলংকারে সমৃদ্ধ। এখানে এর একটি অর্থ হচ্ছে, যে আল্লাহ ইতিপূর্বে সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ
أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾
يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ
أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ۖ
وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا ۖ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا
دَاخِلُونَ ﴿٢٢﴾

৪ রুকূ'

স্মরণ করো যখন মূসা তার জাতিকে বলেছিল, "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা আল্লাহর সেই নিয়ামতের কথা মনে করো, যা তিনি তোমাদের দান করেছিলেন। তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নবীর জন্ম দিয়েছেন, তোমাদেরকে শাসকে পরিণত করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন সব জিনিস দিয়েছেন, যা দুনিয়ায় আর কাউকে দেননি।[৪২] হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! সেই পবিত্র ভূখণ্ডে প্রবেশ করো, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন।[৪৩] পিছনে হটো না। পিছনে হটলে তোমরা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৪৪] তারা জবাব দিল, "হে মূসা! সেখানে একটা অতীব দুর্ধর্ষ জাতি বাস করে। তারা সেখান থেকে বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা কখনই সেখানে যাবো না। হাঁ, যদি তারা বের হয়ে যায় তাহলে আমরা সেখানে প্রবেশ করতে প্রস্তুত আছি।"

পাঠাবার ক্ষমতা রাখতেন এখন তিনিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেই একই দায়িত্বে নিয়োগ করেছেন এবং এ ধরনের নিযুক্তির ক্ষমতাও তাঁর ছিল। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, যদি তোমরা এ সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারীর কথা না মানো, তাহলে মনে রেখো, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু করতে সক্ষম। তিনি তোমাদের যে শাস্তি দিতে চান তা কার্যকর করার ব্যাপারে তাঁকে কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয় না।

৪২. এখানে বনী ইসরাঈলের অতীত গৌরবের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের বহু পূর্বে কোন এক সময়ে তারা এ গৌরবের অধিকারী ছিল। একদিকে তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিলেন হযরত ইবরাহীম, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফের মতো মহান নবী ও রসূলগণ এবং অন্যদিকে তারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের আমলে ও তার পরবর্তী কালে মিসরে

قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ
الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٣﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا
فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ
لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِىْ وَاَخِىْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَ
فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۗ فَلَا تَاْسَ عَلَى
الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٦﴾

ঐ ভীরু লোকদের মধ্যে দু'জন এমন লোকও ছিল[৪৫] যাদের প্রতি আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলেন। তারা বললো, "এ শক্তিশালী লোকদের মোকাবিলা করে দরজার মধ্যে ঢুকে পড়ো। ভেতরে প্রবেশ করলে তোমরাই জয়ী হবে। আর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো তাহলে আল্লাহর ওপর নির্ভর করো।" কিন্তু তারা আবার সেই একই কথা বললো ঃ "হে মূসা! যতক্ষণ তারা সেখানে অবস্থান করবে ততক্ষণ আমরা কোনক্রমেই সেখানে যাবো না। কাজেই তুমি ও তোমার রব, তোমরা দু'জনে সেখানে যাও এবং লড়াই করো, আমরা তো এখানে বসেই রইলাম।" একথায় মূসা বললো, "হে আমার রব! আমার ও আমার ভাই ছাড়া আর কারোর ওপর আমার কোন ইখতিয়ার নেই। কাজেই তুমি এ নাফরমান লোকদের থেকে আমাকে আলাদা করে দাও।" আল্লাহ জবাব দিলেন ঃ ঠিক আছে, তাহলে ঐ দেশটি চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্য হারাম। তারা পৃথিবীতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াবে,[৪৬] এ নাফরমানদের প্রতি কখনো সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করো না।"[৪৭]

ব্যাপক শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছিল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারাই ছিল তৎকালীন সভ্য জগতের সবচেয়ে প্রতাপশালী শাসক শক্তি এবং মিসর ও তার আশপাশের দেশে তাদেরই মুদ্রা প্রচলিত ছিল। সাধারণত ঐতিহাসিকগণ বনী ইসরাঈলের উত্থানের ইতিহাস শুরু করেন হযরত মূসার (আ) আমল থেকে। কিন্তু কুরআন এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করছে যে, বনী ইসরাঈলের উত্থানের আসল যুগটি ছিল হযরত মূসার পূর্বে এবং হযরত মূসা নিজেই তার জাতির সামনে তাদের এ গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তুলে ধরেছিলেন।

৪৩. এখানে ফিলিস্তিনের কথা বলা হয়েছে। এ দেশটি হযরত- ইবরাহীম, হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়াকুবের আবাসভূমি ছিল। বনী ইসরাঈল মিসর থেকে বের হয়ে এলে

আল্লাহ তাদের জন্য এ দেশটি নির্দিষ্ট করেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে এ দেশটি জয় করার নির্দেশ দেন।

৪৪. হযরত মূসা তাঁর জাতিকে নিয়ে মিসর থেকে বের হবার প্রায় দু'বছর পর যখন তাদের সাথে ফারানের মরু অঞ্চলে তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করছিলেন তখনই এ ভাষণটি দেন। এ মরু অঞ্চলটি আরবের উত্তরে ও ফিলিস্তিনের দক্ষিণ সীমান্ত সংশ্লিষ্ট সাইনা উপদ্বীপে অবস্থিত।

৪৫. 'ভীরু লোকদের মধ্য থেকে দু'জন বললো'–এ বাক্যাংশটির দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, যারা শক্তিশালীদেরকে ভয় করছিল তাদের মধ্য থেকে দুজন বলে উঠলো। দুই, যারা আল্লাহকে ভয় করতো তদের মধ্য থেকে দু'জন বলে উঠলো।

৪৬. এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বাইবেলের গণনা পুস্তক, দ্বিতীয় বিবরণ ও যিহোশূয় পুস্তকে পাওয়া যাবে। এর সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে ঃ হযরত মূসা ফিলিস্তিনের অবস্থা জানার জন্য ফারান থেকে বনী ইসরাঈলের ১২ জন সরদারকে ফিলিস্তিন সফরে পাঠান। তারা ৪০ দিন সফর করার পর সেখান থেকে ফিরে আসেন। জাতির এক সাধারণ সমাবেশে তারা জানান যে, ফিলিস্তিন তো খাদ্য ও অন্যান্য ভোগ্য সামগ্রীর প্রাচুর্যে ভরা এক সুখী সমৃদ্ধ দেশ, এতে সন্দেহ নেই। "কিন্তু সেখানকার অধিবাসীরা অত্যন্ত শক্তিশালী ..... তাদের ওপর আক্রমণ করার ক্ষমতা আমাদের নেই..... সেখানে আমরা যত লোক দেখেছি তারা সবাই বড়ই দীর্ঘদেহী। সেখানে আমরা বনী ইনাককেও দেখেছি। তারা মহাপরাক্রমশালী ও দুর্ধর্ষ। তারা বংশ পরম্পরায় পরাক্রমশালী। আর আমরা তো নিজেদের দৃষ্টিতেই ফড়িংয়ের মতো ছিলাম এবং তাদের দৃষ্টিতেও।".....এ বর্ণনা শুনে সবাই সমস্বরে বলে উঠে ঃ "হায়, যদি আমরা মিসরেই মরে যেতাম। হায়, যদি এ মরুর বুকেই আমরা মরে যেতাম। আল্লাহ কেন আমাদের ঐ দেশে নিয়ে গিয়ে তরবারির সাহায্যে হত্যা করাতে চায়? এরপর আমাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা তো লুটের মালে পরিণত হবে। আমাদের জন্য মিসরে ফিরে যাওয়াই কি মংগলজনক হবে না?" তারপর তারা পরস্পর বলাবলি করতে থাকে এসো আমরা কাউকে নিজেদের সরদার বানিয়ে নিই এবং মিসরে ফিরে যাই। একথা শুনে ফিলিস্তিনে যাদেরকে পাঠানো হয়েছিল সেই বারোজন সরদারদের মধ্য থেকে দু'জন—ইউশা ও কালেব উঠে দাঁড়ান। তারা এ ভীরুতা ও কাপুরুষতার জন্য জাতিকে তিরস্কার করেন। কালেব বলেন, "চলো, আমরা অতর্কিতে আক্রমণ করে সে দেশটি দখল করে নিই। কারণ সে দেশটি পরিচালনা করার যোগ্যতা আমাদের আছে।" তারপর তারা দু'জন এক বাক্যে বলে ওঠেন, "যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে তিনি অবশ্যি আমাদের সে দেশে পৌছাবেন।..... তবে তোমরা যেন আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করো এবং সে দেশের লোকদের ভয়ে ভীত না হও।" "আমাদের সাথে আল্লাহ আছেন, কাজেই ওদের ভয় পেয়ো না।" কিন্তু জাতি তার জবাব দিল একথা বলে, "ওদেরকে পাথর মেরে হত্যা করো।" অবশেষে আল্লাহর ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠলো এবং তিনি ফায়সালা করলেন, এখন ইউশা ও কালেব ছাড়া এ জাতির বয়স্ক পুরুষদের মধ্য থেকে আর কেউ সে ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে পারবে না। এ জাতি চল্লিশ বছর পর্যন্ত গৃহহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে থাকবে। অবশেষে যখন এদের মধ্যকার বিশ বছরের থেকে শুরু করে তার ওপরের বয়সের সমস্ত লোক মরে যাবে এবং নবীন বংশধররা যৌবনে প্রবেশ

বনী ইসরাঈলের মরু পরিক্রমা

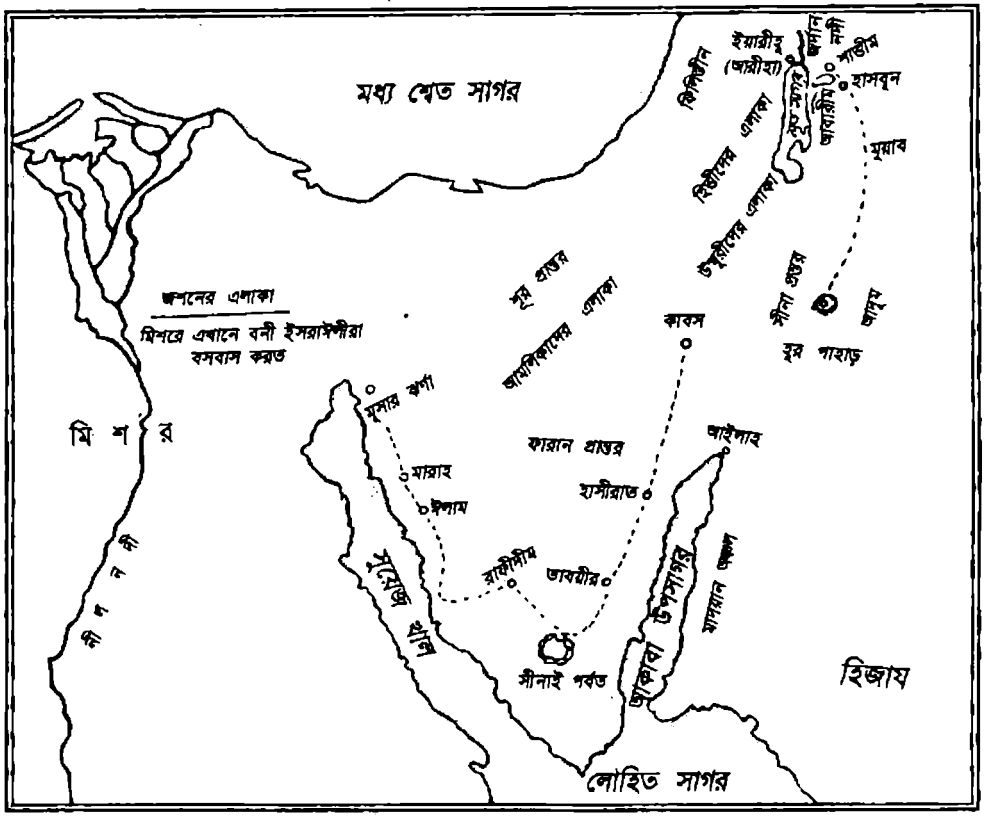

ব্যাখ্যা ঃ হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলদের মিসর হতে বের করে সীনা প্রান্তরের মারাহ, ঈলাম ও কাঁদাম-এর পথে সীন পর্বতের দিকে আসেন এবং এক বছরের কিছু বেশী কাল পর্যন্ত এ স্থানে অবস্থান করতে থাকেন। তাওরাতের বেশীর ভাগ বিধান এখানেই নাযিল হয়। অতপর তাকে বনী ইসরাঈলদের নিয়ে ফিলিস্তিনের দিকে যাওয়ার এবং উহা জয় করার নির্দেশ দেয়া হয়। বলা হয়, ইহা তোমাদেরকে মীরাস হিসেবে দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশ অনুযায়ী হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলদের সাথ নিয়ে তাবয়ীর ও হাচীরাত-এর পথে 'ফারান' প্রান্তরে উপস্থিত হন। এখান হতে তিনি ফিলিস্তিনের অবস্থা জানার জন্য একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। ফিদিল নামক জায়গায় এ প্রতিনিধিদল ফিরে এসে রিপোর্ট পেশ করে। হযরত ইউশা' ও কালিব ছাড়া প্রতিনিধি দলের অন্যান্যের রিপোর্ট ছিল অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। বনী ইসরাঈলরা তা শুনে চীৎকার করে উঠে এবং তারা ফিলিস্তিন অভিযানে যেতে অস্বীকার করে। তখন আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিলেন যে, এখন হতে চল্লিশ বছর কাল এরা এ অঞ্চলে ঘুরে ফিরবে এবং ইউশা' ও কালিব ছাড়া বর্তমান লোকদের আর কেহ ফিলিস্তিনের চেহারা দেখতে পাবে না। এর পর বনী ইসরাঈলরা ফারান প্রান্তর, শূর প্রান্তর, চীন প্রান্তর-এর মাঝে ইতস্তত দিশাহারা হয়ে ঘুরতে থাকে এবং আমালিকা, উমুরিয়া, আদুমীয়, মাদিয়ানী এবং মুয়াব-এর লোকদের সাথে লড়াই করতে থাকে। চল্লিশ বছর অতিবাহিত হবার উপক্রম হলে আদুম-এর সীমান্তের নিকট 'হর' পর্বতে হযরত হারুন (আ) ইন্তেকাল করেন। পরে হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলদের নিয়ে মুয়াব অঞ্চলে প্রবেশ করেন ও এ পূর্ণ অঞ্চলটিকে দখল করে নিলেন। এভাবে হাসবুন ও শিত্তীম পর্যন্ত পৌঁছেন এবং আবারীম পর্বতে হযরত মূসা (আ) প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁর পর তাঁর প্রথম খলীফা ইউশা' পূর্বদিক হতে উর্দুন নদী পার হয়ে ইয়ারুহু (আরীহা) শহর জয় করেন। ইহা ছিল ফিলিস্তিনের প্রথম শহর, যা বনী ইসরাঈলদের দখলে আসে। এরপর অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র ফিলিস্তিন তারা দখল করে।

এ মানচিত্রে উদ্ধৃত 'আয়লা' (প্রাচীন নাম ঈলাত আর বর্তমান নাম আকাবা) সেই ঐতিহাসিক স্থান, যেখানে সম্ভবত শনিবার ওয়ালাদের সূরা আল বাকারা (৮ রুকূ') ও সূরা আল আরাফ-এর (২১ রুকূ') উল্লেখিত সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ ۘ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا
وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ۚ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ
مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ
إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾

৫ রুকূ'

আর তাদেরকে আদমের দু' ছেলের সঠিক কাহিনীও শুনিয়ে দাও। তারা দু'জন কুরবানী করলে তাদের একজনের কুরবানী কবুল করা হলো, অন্য জনেরটা কবুল করা হলো না। সে বললো, আমি তোমাকে মেরে ফেলবো। সে জবাব দিল, "আল্লাহ তো মুত্তাকীদের নজরানা কবুল করে থাকেন।[৪৮] তুমি আমাকে মেরে ফেলার জন্য হাত উঠালেও আমি তোমাকে মেরে ফেলার জন্য হাত উঠাবো না।[৪৯] আমি বিশ্ব জাহানের প্রভু আল্লাহকে ভয় করি।

করবে তখনি এদেরকে ফিলিস্তিন জয় করার সুযোগ দেয়া হবে। আল্লাহর এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বনী ইসরাঈলের ফারান মরুভূমি থেকে পূর্ব জর্দানে পৌঁছতে পৌঁছতে ৩৮ বছর লেগে যায়। যেসব লোক যুব বয়সে মিসর থেকে বের হয়েছিল তারা সবাই এ সময়ের মধ্যে মারা যায়। পূর্ব জর্দান জয় করার পর হযরত মূসারও ইন্তিকাল হয়। এরপর হযরত ইউশা ইবনে নূনের খিলাফত আমলে বনী ইসরাঈল ফিলিস্তিন জয় করতে সমর্থ হয়।

৪৭. বর্ণনার ধারাবাহিকতার প্রতি দৃষ্টি রেখে চিন্তা করলে এখানে এ ঘটনার বরাত দেবার উদ্দেশ্য পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। গল্পচ্ছলে একথা বর্ণনা করে বনী ইসরাঈলকে আসলে একথা বুঝানো হচ্ছে যে, মূসার সময় অবাধ্যতা, সত্য থেকে বিচ্যুতি ও কাপুরুষতার কাজ করে তোমরা যে শাস্তি পেয়েছিলে এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক নীতি অবলম্বন করলে তার চেয়ে অনেক বেশী শাস্তি ভোগ করবে।

৪৮. অর্থাৎ তোমার কুরবানী কবুল না হয়ে থাকলে এতে আমার কোন দোষ নেই। বরং তোমার কুরবানী কবুল না হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, তোমার মধ্যে আল্লাহভীতি বা তাকওয়া নেই। কাজেই আমাকে হত্যা না করে বরং তোমার নিজের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টির চিন্তা করা উচিত।

৪৯. এর অর্থ এ নয় যে, তুমি আমাকে হত্যা করতে এলে আমি হাত বেঁধে তোমার সামনে নিহত হবার জন্য তৈরী হয়ে যাবো এবং নিজের প্রতিরক্ষা করবো না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও করো কিন্তু আমি তোমাকে হত্যা করতে চাইবো না। তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য কলা-কৌশল অবলম্বন ও ফন্দি ফিকির করতে

إِنِّيٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثۡمِي وَإِثۡمِكَ فَتَكُونَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلنَّارِۚ
وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُاْ ٱلظَّٰلِمِينَ ٢٩ فَطَوَّعَتۡ لَهُۥ نَفۡسُهُۥ قَتۡلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُۥ
فَأَصۡبَحَ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٣٠ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابٗا يَبۡحَثُ فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيُرِيَهُۥ
كَيۡفَ يُوَٰرِي سَوۡءَةَ أَخِيهِۚ قَالَ يَٰوَيۡلَتَىٰٓ أَعَجَزۡتُ أَنۡ أَكُونَ
مِثۡلَ هَٰذَا ٱلۡغُرَابِ فَأُوَٰرِيَ سَوۡءَةَ أَخِيۖ فَأَصۡبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ ٣١

আমি চাই, আমার ও তোমার পাপের ভার তুমি একাই বহন করো।[৫০] এবং তুমি জাহান্নামী হয়ে যাও। জালেমদের জুলুমের এটিই সঠিক প্রতিফল।" অবশেষে তার প্রবৃত্তির কুপ্ররোচনা তার ভাইকে মেরে ফেলা তার জন্য সহজ করে দিল এবং তাকে মেরে ফেলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তরভুক্ত হয়ে গেলো। তারপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন। সে মাটি খুঁড়তে লাগলো, যাতে তাকে দেখিয়ে দেয় তার ভাইয়ের লাশ কিভাবে লুকিয়ে ফেলবে। এ দৃশ্য দেখে সে বললো, হায় আফসোস! আমি এ কাকটির মতোও হতে পারলাম না যাতে নিজের ভাইয়ের লাশটিও লুকাতে পারি।[৫১] এরপর নিজের কৃতকর্মের জন্য সে খুবই অনুতপ্ত হলো।[৫২]

চাও, তা করতে পারো, এ ব্যাপারে তোমার পূর্ণ ইখতিয়ার আছে। কিন্তু তুমি আমাকে হত্যা করার প্রস্তুতি চালাচ্ছো, একথা জানার পরও আমি তার আগেই তোমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করবো না। এখানে এতটুকু কথা অবশ্যি মনে রাখতে হবে, কোন ব্যক্তির নিজেকে অবলীলায় হত্যাকারীর সামনে পেশ করে দেয়া এবং জালেমের আক্রমণ প্রতিহত না করা কোন সওয়াবের কাজ নয়। তবে যদি আমি জেনে থাকি, কোন ব্যক্তি আমাকে হত্যা করার ফিকিরে লেগে আছে এবং এ জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে আর এরপরও আমি তাকে হত্যা করার চিন্তা না করি এবং প্রথম অন্যায় আক্রমণ আমার পক্ষ থেকে না হয়ে বরং তার পক্ষ থেকে হোক, এটাকে অগ্রাধিকার দিই, তাহলে এতে অবশ্যি সওয়াব আছে। এটিই ছিল আদম আলাইহিস সালামের সৎছেলেটির বক্তব্যের অর্থ ও মূল কথা।

৫০. অর্থাৎ আমাদের পরস্পরকে হত্যা করার প্রচেষ্টায় আমাদের দু'জনের গুনাহগার হবার পরিবর্তে আমি বরং ভাল মনে করছি আমাদের উভয়ের গুনাহ তোমার একার ভাগে পড়ুক। তোমার নিজের পক্ষ থেকে হত্যার উদ্যোগের গুনাহ এবং তোমার আক্রমণ থেকে আমার আত্মরক্ষার চেষ্টার কারণে তোমার যা ক্ষতি হয় তার গুণাহও।

৫১. এভাবে মহান আল্লাহ একটি কাকের মাধ্যমে আদমের বিভ্রান্ত ও অসৎ পুত্রটিকে তার মূর্খতা ও অজ্ঞতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। আর একবার যখন সে নিজের মনের

مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيٓ إِسْرَآئِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝٣٢

এ কারণেই বনী ইসরাঈলের জন্য আমি এ ফরমান লিখে দিয়েছিলাম,[৫৩] "নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোন কারণে যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলো সে যেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে হত্যা করলো। আর যে ব্যক্তি কারো জীবন রক্ষা করলো সে যেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জীবন রক্ষা করলো।"[৫৪] কিন্তু তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমার রসূলগণ একের পর এক সুস্পষ্ট হেদায়াত নিয়ে তাদের কাছে এলো, তারপরও তাদের বিপুল সংখ্যক লোক পৃথিবীতে সীমালংঘনকারীই থেকে গেলো।

প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার সুযোগ পেয়েছে তখন তার লজ্জা কেবলমাত্র এতটুকু বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি যে, সে লাশ লুকাবার কৌশল বের করার ব্যাপারে কাকের থেকে পেছনে থেকে গেলো কেন বরং তার মনে এ অনুভূতিও জন্ম নিয়েছে যে, নিজের ভাইকে হত্যা করে সে কত বড়ই না মূর্খতার পরিচয় দিয়েছে। পরবর্তী বাক্য "সে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হলো"—থেকে এ অর্থই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৫২. ইহুদীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর কতিপয় মর্যাদাশালী সাহাবায়ে কেরামকে হত্যা করার জন্য যে চক্রান্ত করেছিল তার ব্যাপারে তাদেরকে সূক্ষ্মভাবে তিরস্কার করাই হচ্ছে এখানে এ ঘটনাটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য। (এ জন্য এ সূরার ৩০ টীকাটি দেখে নিন) দু'টি ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মহান আল্লাহ আরবের এ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে আরব ও বিশ্ববাসীর নেতৃত্ব দানের জন্য কবুল করে নিয়েছিলেন এবং এ পুরাতন আহ্‌লি কিতাবদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন—এর ভিত্তি ছিল একমাত্র এই যে, একদিকে তাকওয়া ছিল এবং অন্যদিকে তাকওয়া ছিল না। কিন্তু যাদেরকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল তারা নিজেদের প্রত্যাখ্যাত হবার কারণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা এবং যেসব দোষ ও অপরাধের কারণে তারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল সেগুলো সংশোধন ও দূর করতে উদ্বুদ্ধ হবার পরিবর্তে আদমের বিভ্রান্ত পুত্রটি যেমন মূর্খতার গর্তে নিমজ্জিত হয়েছিল, ঠিক তেমনি তারাও এমনসব লোককে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল যাদেরকে আল্লাহ কবুল করে নিয়েছিলেন। অথচ একথা সুস্পষ্ট ছিল, এ ধরনের মূর্খতাপ্রসূত কার্যকলাপের মাধ্যমে তারা কখনো আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হতে

إِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
أَن يُقَتَّلُوٓا أَوْ يُصَلَّبُوٓا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا
مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْءَاخِرَةِ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوٓا أَنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়,[৫৫] তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলিবিদ্ধ করা হবে বা তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে। অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে।[৫৬] দুনিয়ায় তাদের জন্য এ অপমান ও লাঞ্ছনা নির্ধারিত রয়েছে আর আখেরাতে রয়েছে তাদের জন্য এর চাইতেও বড় শাস্তি। তবে যারা তোমাদের হাতে ধরা পড়ার আগেই তাওবা করে তাদের জন্য নয়। তোমাদের জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।[৫৭]

পারতো না। বরং এসব কার্যকলাপ তাদেরকে আল্লাহর নিকট আরো বেশী অপ্রিয় করে তুলেছিল এবং তারা আরো বেশী প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

৫৩. অর্থাৎ যেহেতু আদমের এ জালেম সন্তানটি যেসব অসৎগুণের প্রকাশ ঘটিয়েছিল বনী ইসরাঈলের মধ্যেও সেইসব গুণের নিদর্শন পাওয়া যেতো, তাই মহান আল্লাহ তাদেরকে নরহত্যা থেকে বিরত থাকার ওপর ভীষণভাবে জোর দিয়েছিলেন এবং তাঁর ফরমানে একথা লিখে দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, বর্তমান প্রচলিত বাইবেলে আল্লাহর ফরমানের এ মূল্যবান শব্দাবলীর ঠাঁই নেই। তবে তালমূদে এ বিষয়বস্তুটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ "যে ব্যক্তি ইসরাঈলের একটি প্রাণকে হত্যা করলো আল্লাহর কিতাবের দৃষ্টিতে সে যেন সারা দুনিয়ার মানুষকে হত্যা করলো। আর যে ব্যক্তি ইসরাঈলের একটি প্রাণ রক্ষা করলো আল্লাহর কিতাবের দৃষ্টিতে সে যেন সারা দুনিয়ার মানুষকে রক্ষা করলো।" এভাবে তালমূদে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, হত্যা মামলায় বনী ইসরাঈলের বিচারপতিরা সাক্ষীদেরকে সম্বোধন করে বলতেন ঃ "যে ব্যক্তি একজন মানুষকে হত্যা করে সে এমনভাবে জবাবদিহি করার যোগ্য যেন সে সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে হত্যা করেছে।"

৫৪. এর অর্থ হচ্ছে, দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরে অন্য মানুষের প্রাণের প্রতি মর্যাদাবোধ যদি জাগ্রত থাকে এবং তাদের প্রত্যেকে অন্যের জীবনের স্থায়িত্বে ও সংরক্ষণে সাহায্যকারী হবার মনোভাব পোষণ করে তা হলেই কেবল মানব জাতির অস্তিত্ব নিশ্চিত

ও নিরাপদ হতে পারে। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে সে কেবলমাত্র ঐ এক ব্যক্তির ওপর জুলুম করে না বরং সে একথাও প্রমাণ করে যে, তার অন্তরে মানুষের জীবনের প্রতি মর্যাদাবোধ ও সহানুভূতির কোন স্থান নেই। কাজেই সে সমগ্র মানবতার শত্রু। কারণ তার মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্টের অস্তিত্ব বিরাজমান যা প্রতিটি মানুষের মধ্যে পাওয়া গেলে সারা দুনিয়া থেকে মানব জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষের জীবন রক্ষায় সাহায্য করে সে আসলে মানবতার সাহায্যকারী ও সমর্থক। কারণ তার মধ্যে এমন গুণ পাওয়া যায়, যার ওপর মানবতার অস্তিত্ব নির্ভরশীল।

৫৫. পৃথিবী বলতে এখানে পৃথিবীর সেই অংশ ও অঞ্চল বুঝাচ্ছে যেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা কায়েম করার দায়িত্ব ইসলামী সরকার গ্রহণ করেছে। আর আল্লাহ ও রসূলের সাথে লড়াই করার অর্থ হচ্ছে, ইসলামী সরকার দেশে যে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন করেছে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা। পৃথিবীতে একটি সৎ ও সত্যনিষ্ঠ রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই আল্লাহর ইচ্ছা এবং এ জন্য তিনি নিজের রসূল পাঠিয়েছিলেন। সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে পৃথিবীতে অবস্থানকারী মানুষ, পশু, বৃক্ষ ইত্যাদি সমস্ত সৃষ্টি শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে, মানবতা তার প্রকৃতির কাংখিত পূর্ণতায় পৌঁছতে সক্ষম হবে এবং পৃথিবীর সমুদয় উপায় উপকরণ এমনভাবে ব্যবহৃত হবে যার ফলে সেগুলো মানবতার ধ্বংস ও বিলুপ্তির নয় বরং তার উন্নতির সহায়ক হবে। এ ধরনের ব্যবস্থা কোন ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর তাকে নষ্ট করার প্রচেষ্টা চালানো, তা ক্ষুদ্র পরিসরে হত্যা, লুণ্ঠন, রাহাজানি, ডাকাতি ইত্যাদির পর্যায়ে চালানো হোক অথবা আরো বড় আকারে, এ সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যবস্থাকে উৎখাত করে তার জায়গায় কোন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেই চালানো হোক না কেন, তা আসলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবেই বিবেচিত হবে। এটা ঠিক তেমনি যেমন ভারতীয় দণ্ডবিধিতে কোন ব্যক্তির ভারতে বৃটিশ সরকারের ক্ষমতা উচ্ছেদের প্রচেষ্টাকে "সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" (Waging war against the king) করার অপরাধে অভিযুক্ত গণ্য করা হয়েছে—সে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোন একজন মামুলি সিপাইয়ের বিরুদ্ধে কিছু করলেও এবং সম্রাট তার নাগালের বহু দূরে অবস্থান করলেও তার অপরাধের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না।

৫৬. এ বিভিন্ন ধরনের শাস্তির কথা এখানে সংক্ষেপে বলে দেয়া হয়েছে, যাতে করে কাযী বা সমকালীন ইসলামী শাসক নিজের ইজতিহাদের মাধ্যমে প্রত্যেক অপরাধীকে তার অপরাধের ধরন ও মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি দিতে পারেন। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা প্রকাশ করা যে, ইসলামী হুকুমাতের আওতায় বাস করে কোন ব্যক্তির ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা চালানো নিকৃষ্ট ধরনের অপরাধ এবং এ জন্য তাকে উল্লেখিত চরম শাস্তিগুলোর মধ্য থেকে কোন শাস্তি দেয়া যেতে পারে।

৫৭. অর্থাৎ যদি তারা বিপর্যয় সৃষ্টির প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়, সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন ও তাকে ছিন্নভিন্ন করার অপচেষ্টা পরিহার করে এবং তাদের পরবর্তী কর্মনীতি একথা প্রমাণ করে যে, তারা শান্তিপ্রিয়, আইনের অনুগত ও সদাচারী হয়ে গেছে আর তারপরই যদি তাদের আগের অপরাধের কথা জানা যায়, তাহলে ওপরে বর্ণিত শাস্তিগুলোর মধ্য থেকে কোন শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবে না। তবে যদি তারা মানুষের

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا
وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٣٦﴾ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ
مِنْهَا ۡ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٣٧﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا
جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٣٨﴾

৬ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর দরবারে নৈকট্যলাভের উপায় অনুসন্ধান করো[৫৮] এবং তাঁর পথে প্রচেষ্টা ও সাধনা করো,[৫৯] সম্ভবত তোমরা সফলকাম হতে পারবে। ভালভাবে জেনে নাও, যারা কুফরীর নীতি অবলম্বন করেছে সারা দুনিয়ার ধন-দৌলত যদি তাদের অধিকারে থাকে এবং এর সাথে আরো সমপরিমাণও যুক্ত হয়। আর তারা যদি কিয়ামতের দিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য সেগুলো মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চায়, তাহলেও তাদের কাছ থেকে তা গৃহীত হবে না। তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবেই। তারা জাহান্নামের আগুন থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে। কিন্তু তা তারা পারবে না। তাদেরকে স্থায়ী শাস্তি দেয়া হবে।

চোর—পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন, উভয়ের হাত কেটে দাও।[৬০] এটা তাদের কর্মফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আল্লাহর শক্তি সবার ওপর বিজয়ী এবং তিনি জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।

অধিকারের ওপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করে থাকে, তাহলে তার দায়িত্ব থেকে তাদেরকে মুক্ত করা যাবে না। যেমন তারা কোন ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল অথবা কারোর সম্পদ অন্যায়ভাবে হস্তগত করেছিল বা অন্য কোন অপরাধ করেছিল, এ অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে ঐ বিশেষ অপরাধ সংক্রান্ত ফৌজদারী মামলা চালানো হবে। কিন্তু বিদ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতা বা আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা সম্পর্কিত কোন মামলা তাদের বিরুদ্ধে চালানো হবে না।

৫৮. অর্থাৎ এমন প্রত্যেকটি উপায় অনুসন্ধান করতে থাকো যার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে পৌঁছতে পারো।

৫৯. মূলে (جاهدوا) "জাহিদু" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে নিছক 'প্রচেষ্টা ও সাধনা' শব্দ দু'টির মাধ্যমে এর অর্থের সবটুকু প্রকাশ হয় না। আর (مجاهده) 'মুজাহাদা' শব্দটির মধ্যে মুকাবিলার অর্থ পাওয়া যায়। এর সঠিক অর্থ হচ্ছে ঃ যেসব শক্তি আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে, যারা তোমাদের আল্লাহর মর্জি অনুসারে চলতে বাধা দেয় এবং তাঁর পথ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে, যারা তোমাদের পুরোপুরি আল্লাহর বান্দা হিসেবে জীবন যাপন করতে দেয় না এবং নিজের বা আল্লাহর ছাড়া আর কারোর বান্দা হবার জন্য তোমাদের বাধ্য করে, তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের সম্ভাব্য সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাও। এ প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ওপর তোমাদের সাফল্য এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ নির্ভর করছে।

এভাবে এ আয়াতটি মুমিন বান্দাকে প্রতিটি ক্ষেত্রে চতুর্মুখী ও সর্বাত্মক লড়াই করার নির্দেশ দেয়। একদিকে আছে অভিশপ্ত ইবলীস এবং তার শয়তানী সেনাদল। অন্যদিকে আছে মানুষের নিজের নফ্‌স ও তার বিদ্রোহী প্রবৃত্তি। তৃতীয় দিকে আছে এমন এক আল্লাহ বিমুখ মানব গোষ্ঠী যাদের সাথে মানুষ সব ধরনের সামাজিক, তামাদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক সূত্রে বাঁধা। চতুর্থ দিকে আছে এমন ভ্রান্ত ধর্মীয় তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যার ভিত্তিভূমি গড়ে উঠেছে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ওপর এবং তা সত্যের আনুগত্য করার পরিবর্তে মিথ্যার আনুগত্য করতে মানুষকে বাধ্য করে। এদের সবার কৌশল বিভিন্ন কিন্তু সবার চেষ্টা একমুখী। এরা সবাই মানুষকে আল্লাহর পরিবর্তে নিজের অনুগত করতে চায়। বিপরীত পক্ষে, মানুষের পুরোপুরি আল্লাহর অনুগত হওয়া এবং ভিতর থেকে বাইর পর্যন্ত একমাত্র আল্লাহর নির্ভেজাল বান্দায় পরিণত হয়ে যাওয়ার ওপরই তার উন্নতি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের মর্যাদায় উন্নীত হওয়া নির্ভর করে। কাজেই এ সমস্ত প্রতিবন্ধক ও সংঘর্ষশীল শক্তির বিরুদ্ধে একই সাথে সংগ্রামমুখর হয়ে, সবসময় ও সব অবস্থায় তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থেকে এবং এ সমস্ত প্রতিবন্ধককে বিধ্বস্ত ও পর্যুদস্ত করে আল্লাহর পথে অগ্রসর না হলে নিজের অভীষ্ট লক্ষে পৌছানো তার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

৬০. দু'হাত নয় বরং এক হাত। আর সমগ্র উম্মত এ ব্যাপারেও একমত যে, প্রথমবার চুরি করলে ডান হাত কাটতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ لا قطع على خائن "খেয়ানতকারীর হাত কাটা হবে না," এ থেকে জানা যায়, খেয়ানত বা আত্মসাৎ ইত্যাদি চুরির পর্যায়ভুক্ত নয়। বরং চুরি বলতে এমন কাজ বুঝায় যার মাধ্যমে মানুষ একজনের ধন সম্পদ তার নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ থেকে বের করে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সাথে এরূপ নির্দেশও দিয়েছেন যে, একটি ঢালের মূল্যের চেয়ে কম পরিমাণ চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে একটি ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম, ইবনে উমরের বর্ণনা অনুযায়ী তার মূল্য ছিল তিন দিরহাম, আনাস ইবনে মালিকের বর্ণনা অনুযায়ী পাঁচ দিরহাম এবং হযরত আয়েশার বর্ণনা অনুযায়ী ছিল অর্ধ দিনার। সাহাবীদের এ মতবিরোধের কারণে চুরির সর্বনিম্ন নিসাব অর্থাৎ কমপক্ষে কি পরিমাণ চুরি করলে হাত কাটা হবে এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٩﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ
يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٠﴾

তবে যে ব্যক্তি জুলুম করার পর তাওবা করবে এবং নিজের সংশোধন করে নেবে, আল্লাহর অনুগ্রহের দৃষ্টি আবার তার দিকে ফিরে আসবে।[৬১] আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তুমি কি জানো না, আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশ রাজ্যের মালিক? তিনি যাকে চান শাস্তি দেন এবং যাকে চান ক্ষমা করে দেন, তিনি সব জিনিসের ওপর ইখতিয়ার রাখেন।

দিয়েছে। ইমাম আবু হানীফার মতে এর সর্বনিম্ন পরিমাণ দশ দিরহাম। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদের মতে এক-চতুর্থাংশ দীনার। (সে যুগের দিরহামে থাকতো ৩ মাসা ১ $\frac{১}{৫}$ রতি পরিমাণ রূপা এবং এক-চতুর্থাংশ দীনার হতো ৩ দিরহামের সমান।)

আবার এমন অনেক জিনিস আছে যেগুলো চুরি করলে হাত কাটার শাস্তি দেয়া যাবে না। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ لا قطع فى ثمرة ولاكثر (অর্থাৎ ফল ও সবজী চুরি করলে হাত কাটা যাবে না) لا قطع فى طعام (অর্থাৎ খাদ্যবস্তু চুরি করলে হাত কাটা যাবে না)। হযরত আয়েশা (রা) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ

لم يكن قطع السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشئ التافه -

"তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তু চুরির অপরাধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে হাত কাটা হতো না।"

হযরত আলী ও হযরত উসমানের ফায়সালা ছিল لا قطع فى الطير (অর্থাৎ পাখি চুরি করলে হাত কাটা যাবে না) এবং সাহাবীগণের মধ্য থেকে কেউ এ ব্যাপারে মতবিরোধ প্রকাশ করেননি। তাছাড়া হযরত উমর ও আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বাইতুলমাল থেকে কেউ কোন বস্তু চুরি করলে তার হাত কাটেননি। এ ব্যাপারেও কোথাও সাহাবায়ে কেরামের কোন মতবিরোধের উল্লেখ নেই। এসব মৌল উৎসের ভিত্তিতে ফিকাহর বিভিন্ন ইমাম কিছু নির্দিষ্ট বস্তু চুরি করার অপরাধে হাত কাটার দণ্ড না দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। ইমাম আবু হানীফার মতে শাক-সবজি, ফল, গোশত রান্না করা খাবার, যে শস্য এখনো স্তূপীকৃত করা হয়নি এবং খেলার সরঞ্জাম ও বাদ্যযন্ত্র চুরি করলে হাত কাটার শাস্তি দেয়া হবে না। এ ছাড়াও তিনি বনে বিচরণকারী পশু ও বাইতুল-

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ
قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛ سَمّٰعُوْنَ
لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ۭ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ
مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ۭ
وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـــًٔا ۭ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ
لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ۭ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْيٌ ۚ وَّلَهُمْ فِى
الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝۴۱

হে রসূল! কুফরীর পথে যারা দ্রুত পদচারণার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে তারা যেন তোমার মর্মপীড়ার কারণ না হয়,[৬২] যদিও তারা এমন সব লোকের অন্তরভুক্ত হয় যারা মুখে বলে আমরা ঈমান এনেছি কিন্তু তাদের অন্তর ঈমান আনেনি অথবা তারা এমন সব লোকের অন্তরভুক্ত হয় যারা ইহুদী হয়ে গেছে, যাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তারা মিথ্যা ভাষণ শোনার জন্য কান পেতে বসে থাকে[৬৩] এবং যারা কখনো তোমার কাছে আসেনি তাদের জন্য আড়ি পেতে থাকে,[৬৪] আল্লাহর কিতাবের শব্দাবলীর সঠিক স্থান নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও যারা সেগুলোকে তাদের আসল অর্থ থেকে বিকৃত করে[৬৫] এবং লোকদের বলে, যদি তোমাদের এ হুকুম দেয়া হয় তাহলে মেনে নাও অন্যথায় মেনো না।[৬৬] যাকে আল্লাহ নিজেই ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেন, তাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাবার জন্য তোমরা কিছুই করতে পারো না।[৬৭] এসব লোকের অন্তরকে আল্লাহ পবিত্র করতে চাননি।[৬৮] এদের জন্য দুনিয়াতে আছে লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে কঠিন শাস্তি।

মালের জিনিস চুরি করলে তাতে হাত কাটার শাস্তি নেই বলে ঘোষণা করেছেন। অনুরূপভাবে অন্যান্য ইমামগণও কোন কোন জিনিস চুরির ক্ষেত্রে এ শাস্তি কার্যকর নয় বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, এ চুরিগুলোর অপরাধে আদতে কোন শাস্তিই দেয়া হবে না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, এ অপরাধগুলোর কারণে হাত কাটা হবে না।

৬১. এর অর্থ এ নয় যে, তার হাত কাটা হবে না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, হাত কাটার পর যে ব্যক্তি তাওবা করবে এবং নিজেকে চুরি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত রেখে আল্লাহর

সৎ বান্দায় পরিণত হয়ে যাবে সে আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা পাবে। এ অবস্থায় তার গায়ে যে গুনাহের কলংক লেগেছিল আল্লাহ তা ধুয়ে দেবেন। কিন্তু কোন ব্যক্তি হাত কেটে যাবার পরও যদি নিজেকে অসৎ সংকল্প মুক্ত না করে এবং আগের দুষ্কৃতির মনোভাব লালন করতে থাকে, যার ভিত্তিতে সে চুরি করেছিল এবং তাকে হাত কাটার শাস্তি দেয়া হয়েছিল, তাহলে এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, হাত তার দেহ থেকে আলাদা হয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু তার অন্তরে চুরির মনোভাব এখনো অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। তাই হাত কাটার আগে সে যেমন আল্লাহর গযবের অধিকারী ছিল হাত কাটার পরেও ঠিক তেমনিই থেকে যাবে। তাই কুরআন মজীদ চোরকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার এবং নিজের সংশোধন করার নির্দেশ দেয়। কারণ হাত কাটা হয়েছে সামাজিক ও তামাদ্দুনিক ব্যবস্থাপনাকে বিশৃংখলামুক্ত করার জন্য। এ শাস্তির কারণে আত্মা ও মন পবিত্র ও কলুষতা মুক্ত হতে পারে না। আত্মা ও মন পবিত্র হতে পারে একমাত্র তাওবা ও আল্লাহর প্রতি সমর্পিত প্রাণ হবার মাধ্যমে। হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে উল্লেখিত হয়েছে ঃ তাঁর হুকুম মোতাবিক এক চোরের হাত কাটার পর তিনি তাকে নিজের কাছে ডেকে আনেন। তাকে বলেন, বলো– قل استغفر الله واتوب اليه (আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তাঁর কাছে তাওবা করছি।) সে তাঁর নির্দেশ অনুসারে ঐ বাক্যটি বলার পর তিনি তার জন্য দোয়া করেন ঃ اللهم تب عليه (হে আল্লাহ! তাকে মাফ করো)।

৬২. অর্থাৎ যারা জাহেলিয়াতের অবস্থা অপরিবর্তিত রাখার এবং ইসলামের এ সংস্কারমূলক দাওয়াত যাতে ঐ সমস্ত বিকৃতি ও গলদ দূর করতে সক্ষম না হয় সে জন্য নিজেদের সকল প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মতৎপরতা নিয়োজিত করে। তারা সমস্ত নৈতিক বাঁধনমুক্ত হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে সব রকমের নিকৃষ্টতম চক্রান্ত চালাচ্ছিল। তারা জেনে বুঝে সত্যকে বেমালুম হজম করে যাচ্ছিল। অত্যন্ত নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা ও দুঃসাহসের সাথে ধোঁকা, প্রতারণা, জালিয়াতি ও মিথ্যার অস্ত্র ব্যবহার করে এমন এক পবিত্র ও নিষ্কলুষ ব্যক্তির কার্যক্রমকে পরাস্ত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল যিনি একান্ত নিস্বার্থভাবে পরোপকার ও নিছক কল্যাণাকাংখার ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের এবং তাদের নিজেদের মংগলের জন্য দিনরাত মেহনত করে যাচ্ছিলেন। তাদের এ তৎপরতা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে অত্যন্ত মর্মজ্বালা অনুভব করতেন। তাঁর এ মর্মজ্বালা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। যখন কোন পবিত্র ও নিষ্কলুষ ব্যক্তি নিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী লোকদের মুখোমুখি হন এবং তারা নিছক নিজেদের মূর্খতা, সংকীর্ণমনতা ও স্বার্থান্ধতার কারণে তাঁর কল্যাণকর ও শুভাকাংখামূলক প্রচেষ্টাবলীর পথ রোধ করার জন্য নিকৃষ্ট ধরনের চালবাজী ও কূটকৌশল অবলম্বন করতে থাকে তখন স্বাভাবিকভাবেই তিনি মনে ব্যাথা পান। কাজেই এখানে আল্লাহর বক্তব্যের উদ্দেশ্য এ নয় যে, তাদের ঐসব কর্মতৎপরতার কারণে রসূলের মনে স্বাভাবিকভাবে যে ব্যাথা ও মর্মবেদনার সৃষ্টি হয় তা না হওয়া উচিত বরং আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, তাঁর মন খারাপ করার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি যেন মনোবল না হারিয়ে ফেলেন এবং সবরের সাথে আল্লাহর বান্দাদের সংস্কার ও সংশোধনের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। আর এসব লোকের ব্যাপারে বলা যায় যে, এরা যে ধরনের নিকৃষ্ট নৈতিক গুণাবলী নিজেদের মধ্যে লালন করেছে তাতে তাদের পক্ষ থেকে এ ধরনের ব্যবহারই আশা করা যেতে পারে এবং এ ব্যাপারে তাদের কোন ব্যবহারই অপ্রত্যাশিত নয়।

৬৩. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এরা যেহেতু প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়ে গেছে তাই সত্যের সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই। এরা মিথ্যাই পছন্দ করে এবং মনোযোগ সহকারে মিথ্যাই শুনে থাকে। কাজেই এতেই এদের মনের তৃষ্ণা মেটে। আর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, এরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের মজলিসে এসে বসে মিথ্যাচারের প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য। এখানে এসে এরা যা কিছু দেখে ও শোনে সেগুলোকে বিপরীত অর্থে প্রয়োগ করে অথবা নিজেদের পক্ষ থেকে মিথ্যার মিশ্রণ দিয়ে সেগুলোর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের দুর্নাম রটাবার জন্য লোকদের মধ্যে ছড়াতে থাকে।

৬৪. এরও দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে, এরা গোয়েন্দা হয়ে আসে। এরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের মজলিসে ঘোরাফেরা করে। কোন গোপন কথা কানে পড়লে তা নিয়ে মুসলমানদের শত্রুদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এরা মিথ্যা দোষারোপ ও নিন্দা করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করে বেড়ায় এবং যেসব লোক সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি তাদের মধ্যে ভুল ধারণা এবং নবী ও ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার কাজে লিপ্ত হয়।

৬৫. অর্থাৎ তাওরাতের যেসব বিধান তাদের মনমাফিক নয়, সেগুলোর মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে রদবদল করে এবং শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে সেখান থেকে নিজেদের ইচ্ছামাফিক বিধান তৈরী করে।

৬৬. অর্থাৎ মূর্খ জনগণকে বলে, আমরা যে বিধান শুনাচ্ছি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও যদি এই একই বিধান তোমাদের শোনায় তাহলেই তা গ্রহণ করো, অন্যথায় প্রত্যাখ্যান করো।

৬৭. আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করার অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহ কোন খারাপ প্রবণতা লালিত হতে দেখেন তার সামনে একের পর এক এমন সব সুযোগ সৃষ্টি করে দেন যার ফলে সে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। সে ব্যক্তি যদি এখনো অসৎকর্মের প্রতি পুরোপুরি ঝুঁকে না পড়ে থাকে তাহলে এ পরীক্ষাগুলোর মাধ্যমে সে নিজেকে সামলে নেয়। তার মধ্যে অসৎপ্রবৃত্তির মোকাবিলা করার জন্য সৎ-প্রবৃত্তির যে শক্তিগুলো থাকে সেগুলো তীব্র হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু যদি সে অসৎ-কর্মের প্রতি পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ে থাকে এবং তার সৎপ্রবণতা তার অসৎপ্রবণতার কাছে পরাজিত হয়ে থাকে তাহলে এ ধরনের প্রত্যেকটি পরীক্ষার সময় সে আরো বেশী অসৎপ্রবণতা ও অসৎকর্মের ফাঁদে জড়িয়ে পড়তে থাকবে। এটিই হচ্ছে আল্লাহর সেই ফিত্না বা পরীক্ষা যার হাত থেকে কোন বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন মানুষকে বাঁচানোর ক্ষমতা তার কোন কল্যাণাকাংখীর নেই। আর এ ফিতনার মধ্যে কেবল ব্যক্তিরাই নয় জাতিরাও নিক্ষিপ্ত হয়।

৬৮. কারণ তারা নিজেরাই পবিত্র হতে চায়নি। যে নিজে পবিত্র হতে চায় এবং এ জন্য প্রচেষ্টা ও সাধনা করে তাকে পবিত্রতা থেকে বঞ্চিত করা আল্লাহর নীতি নয়। যে নিজে পবিত্র হতে চায় না আল্লাহ তাকে পবিত্র করতে চান না।

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ
اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ؕ وَاِنْ
حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٤٢﴾ وَكَيْفَ
يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ
ذٰلِكَ ؕ وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٣﴾

এরা মিথ্যা শ্রবণকারী ও হারাম আহারকারী।[৬৯] কাজেই এরা যদি তোমাদের কাছে (নিজেদের মামলা নিয়ে) আসে তাহলে তোমরা চাইলে তাদের মীমাংসা করে দিতে অথবা অস্বীকার করে দিতে পারো। অস্বীকার করে দিলে এরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর মীমাংসা করে দিলে যথার্থ ইনসাফ সহকারে মীমাংসা করো। কারণ আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।[৭০] আর এরা তোমাকে কিভাবে বিচারক মানছে যখন এদের কাছে তাওরাত রয়ে গেছে, যাতে আল্লাহর হুকুম লিখিত আছে আর তারপরও এরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে?[৭১] আসলে এরা ঈমানই রাখে না।

৬৯. এখানে বিশেষ করে তাদের সে সব মুফতী ও বিচারপতিদের দিকে ইংগিত করা হয়েছে, যারা মিথ্যা সাক্ষ্য নিয়ে ও মিথ্যা বিবরণ শুনে এমন সব লোকদের পক্ষে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি বিরোধী ফায়সালা করতো যাদের কাছ থেকে তারা ঘুষ নিতো অথবা যাদের সাথে তাদের অবৈধ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকতো।

৭০. ইহুদীরা তখনো পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়মিত প্রজা হিসেবে গণ্য হয়নি। বরং সন্ধি ও চুক্তির ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে তাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এ চুক্তিগুলোর প্রেক্ষিতে ইহুদীরা তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহে স্বাধীনতা ভোগ করতো এবং তাদের মামলার ফায়সালা তাদের আইন অনুযায়ীই তাদের নিজেদের বিচারপতিরাই করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা তাঁর নিযুক্ত বিচারপতিদের কাছে নিজেদের মামলা-মোকদ্দমা আনার ব্যাপারে আইনের দিক দিয়ে তারা বাধ্য ছিল না। কিন্তু যেসব ব্যাপারে তারা নিজেদের ধর্মীয় আইন অনুযায়ী ফায়সালা করতে চাইতো না সেসব ব্যাপারে ফায়সালা করার জন্য তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসতো। তারা আশা করতো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়াতে হয়তো তাদের জন্য অন্য কোন বিধান আছে এবং এভাবে নিজেদের ধর্মীয় আইনের আনুগত্য করা থেকে তারা নিষ্কৃতি লাভ করতে পারবে।

এখানে বিশেষ করে যে মামলাটির দিকে ইশারা করা হয়েছে সেটি ছিল খয়বরের সম্ভ্রান্ত ইহুদী পরিবার সংক্রান্ত। এ পরিবারগুলোর এক মহিলার সাথে এক পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক পাওয়া গিয়েছিল। তাওরাতের বিধান অনুসারে তাদের শাস্তি ছিল 'রজম' অর্থাৎ উভয়কে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা। (দ্বিতীয় বিবরণী পুস্তক ২২ঃ২৩-২৪) কিন্তু ইহুদীরা এ শাস্তি প্রয়োগ করতে চাচ্ছিল না। তাই তারা পারস্পরিক পরামর্শক্রমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শালিস মানার সিদ্ধান্ত করলো এবং একথাও স্থির করলো যে, যদি তিনি রজম ছাড়া অন্য কোন হুকুম দেন তাহলে তা মেনে নেয়া হবে আর যদি রজমেরই হুকুম দেন তাহলে তা মানা হবে না। কাজেই রসূলের সামনে মামলা পেশ করা হলো। তিনি রজমের হুকুম দিলেন। তারা এ হুকুম মানতে অস্বীকার করলো। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের ধর্মে এর শাস্তির ব্যাপারে কি বিধান আছে? তারা জবাব দিল ঃ বেত্রাঘাত করা এবং মুখে কালি মাখিয়ে গাধার পিঠে চড়িয়ে প্রদক্ষিণ করানো। তিনি তাদের আলেমদেরকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনীর ব্যাপারে তাওরাতে কি এ বিধানই আছে? তারা আবার সেই মিথ্যা জবাব দিলেন। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে একজন নীরব থাকলেন। তার নাম ছিল ইবনে সূরিয়া। ইহুদীদের বর্ণনা অনুযায়ী সে সময় তাওরাতের তার চেয়ে বড় আলেম আর দ্বিতীয় কেউ ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ আমি তোমাকে সেই আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি যিনি তোমাদের বাঁচিয়েছিলেন ফেরাউনের কবল থেকে এবং তূর পাহাড়ে তোমাদের শরীয়াত দান করেছিলেন, সত্যিই কি তাওরাতে ব্যভিচারের জন্য এ শাস্তির বিধান আছে? ইবনে সূরিয়া জবাব দিলেন ঃ "আপনি আমাকে এ ধরনের কঠিন কসম না দিলে আমি বলতাম না। প্রকৃতপক্ষে রজমই ব্যভিচারের শাস্তি। কিন্তু আমাদের এখানে যখন ব্যভিচার বেড়ে যেতে লাগলো তখন আমাদের শাসকরা এ রীতি অবলম্বন করলো যে, কোন বড় লোক ব্যভিচার করলে তাকে ছেড়ে দিতো এবং গরীবরা এ দুষ্কর্ম করলে তাদেরকে রজম করতো। তারপর এতে যখন জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো তখন আমরা তাওরাতের আইনের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনীকে বেত্রাঘাত করার এবং তাদের মুখে কালি দিয়ে উল্টো মুখে গাধার পিঠে চড়াবার শাস্তির বিধান দিলাম।" এরপর ইহুদীদের আর কিছু বলার অবকাশ রইলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনীকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলা হলো।

৭১. এ আয়াতে আল্লাহ ইহুদীদের দুর্নীতির মুখোস পুরোপুরি উন্মোচন করে দিয়েছেন। এ "ধর্মীয় লোকেরা" সারা আরবে এরূপ প্রচারণার জাল বিস্তার করে রেখেছিল যে, ঐ সমাজে দীনদারী ও "কিতাবী-জ্ঞানের" ব্যাপারে তাদের কোন জুড়ি নেই। এদের অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল যে, যে কিতাবকে তারা নিজেরা আল্লাহর কিতাব বলে মানতো এবং তারা যার প্রতি ঈমান রাখে বলে দাবী করতো, তার বিধান পরিহার করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিজেদের মামলা নিয়ে এসেছিল। অথচ তাঁকে নবী বলে মেনে নিতেও তারা কঠোরভাবে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। এ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এ ইহুদীরা আসলে কোন জিনিসের ওপরই যথার্থ ঈমান রাখতো না। আসলে তাদের ঈমান ছিল নিজেদের নফ্‌স ও প্রবৃত্তির ওপর। আল্লাহর কিতাব বলে তারা

إِنَّآ أَنزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ
أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن
كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ
يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

৭ রুকূ'

আমি তাওরাত নাযিল করেছি। তাতে ছিল পথ নির্দেশ ও আলো। সমস্ত নবী, যারা মুসলিম ছিল, সে অনুযায়ী এ ইহুদী হয়ে যাওয়া লোকদের[৭২] যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালা করতো। আর এভাবে রব্বানী ও আহবারও[৭৩] (এরি ওপর তাদের ফায়সালার ভিত্তি স্থাপন করতো)। কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাব সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এবং তারা ছিল এর ওপর সাক্ষী। কাজেই (হে ইহুদী গোষ্ঠী!) তোমরা মানুষকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো এবং সামান্য তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে আমার আয়াত বিক্রি করা পরিহার করো। আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তারাই কাফের।

তাওরাতে আমি ইহুদীদের জন্য এ বিধান লিখে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং সব রকমের যখমের জন্য সমপর্যায়ের বদলা।[৭৪] তারপর যে ব্যক্তি ঐ শাস্তি সাদকা করে দেবে তা তার জন্য কাফ্ফারায় পরিণত হবে।[৭৫] আর যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই জালেম।

যাকে মানে তার নির্দেশ তাদের নফ্স ও প্রবৃত্তির কাছে অপছন্দনীয় বলেই তারা তাকে মানতে অস্বীকার করে। আর (নাউযুবিল্লাহ) যাকে তারা মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার বলে

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

তারপর ঐ নবীদের পরে মারয়ামপুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি। তাওরাতের মধ্য থেকে যা কিছু তার সামনে ছিল সে তার সত্যতা প্রমাণকারী ছিল। আর তাকে ইনজীল দিয়েছি। তাতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো এবং তাও তাওরাতের মধ্য থেকে যা কিছু সে সময় বর্তমান ছিল তার সত্যতা প্রমাণকারী ছিল[৭৬] আর তা ছিল আল্লাহভীরুদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশ। আমার নির্দেশ ছিল, ইনজীলে আল্লাহ যে আইন নাযিল করেছেন ইনজীল অনুসারীরা যেন সে মোতাবিক ফায়সালা করে। আর যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই ফাসেক।[৭৭]

প্রচার করে বেড়ায় সেখান থেকে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী কোন ফায়সালা লাভ করা যায় কিনা কেবলমাত্র এ আশায় তার কাছে ধর্ণা দেয়।

৭২. এখানে প্রসংগক্রমে এ সত্যটিও প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে যে, সকল নবীই ছিলেন মুসলিম। অন্যদিকে এ ইহুদীরা ইসলাম থেকে সরে এসে সাম্প্রদায়িক দলাদলিতে লিপ্ত হয়ে কেবলমাত্র "ইহুদী" হিসেবেই থেকে গিয়েছিল।

৭৩. রব্বানী মানে আলেম এবং আহবার মানে ফকীহ।

৭৪. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য তাওরাতের যাত্রাপুস্তক ২১ঃ২৩-২৫ দেখুন।

৭৫. অর্থাৎ যে ব্যক্তি সাদকার নিয়েতে কিসাস মাফ করে দেবে তার জন্য এ নেকীটি তার অনেক গোনাহর কাফ্ফারায় পরিণত হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত বাণীটি এ অর্থেই উক্ত হয়েছে ঃ

من جرح فى جسده جراحة فتصدق بها كفر عنه ذنوبه بمثل ما تصدق به -

"যার শরীরে কোন আঘাত করা হয়েছে এবং সে তা মাফ করে দিয়েছে, এ ক্ষেত্রে যে পর্যায়ের ক্ষমা হবে ঠিক একই পর্যায়ের গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে।"

৭৬. অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাম কোন নতুন ধর্ম নিয়ে আসেননি। বরং ইতিপূর্বেকার বিভিন্ন পয়গম্বরের দীনই ছিল তাঁর দীন এবং মানুষকে তিনি এ দীনেরই দাওয়াত দিতেন। তাওরাতের আসল শিক্ষাবলীর যে অংশ তাঁর যুগে সংরক্ষিত ছিল তাকে তিনি নিজেও মানতেন এবং ইনজীলও তার সত্যতা প্রমাণ করতো (মথি ৫ঃ১৭-১৮ দেখুন)। কুরআন বারবার একথাটি ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় যত নবী এসেছেন তাদের একজনও পূর্ববর্তী নবীদের প্রতিবাদ করার এবং তাদের কার্যাবলীকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে নিজের নতুন ধর্ম প্রবর্তন করার জন্য আসেননি। বরং প্রত্যেক নবী তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের সত্যতার সাক্ষ্য দিতেন এবং পূর্ববর্তী নবীগণ নিজেদের পবিত্র উত্তরাধিকার হিসেবে যেসব কাজ রেখে যেতেন সেগুলোর পরিবৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনের জন্য আসতেন। অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোর প্রতিবাদ করার জন্য আল্লাহ কখনো নিজের কোন কিতাব পাঠাননি। বরং তাঁর প্রত্যেকটি কিতাব ইতিপূর্বে প্রেরিত সমস্ত কিতাবের সমর্থক ও তার সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে উপস্থিত হয়েছে।

৭৭. যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তাদের সম্পর্কে আল্লাহ এখানে তিনটি বিধান দিয়েছেন। এক, তারা কাফের। দুই, তারা জালেম। তিন, তারা ফাসেক। এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম ও তার নাযিল করা আইন ত্যাগ করে নিজের বা অন্য মানুষের মনগড়া আইনের ভিত্তিতে ফায়সালা করে সে আসলে বড় ধরনের অপরাধ করে। প্রথমত তার এ কাজটি আল্লাহর হুকুম অস্বীকার করার শামিল। কাজেই এটি কুফরী। দ্বিতীয়ত তার এ কাজটি ইনসাফ ও ভারসাম্যনীতির বিরোধী। কারণ, আল্লাহ যথার্থ ইনসাফ ও ভারসাম্যনীতি অনুযায়ীই হুকুম দিয়েছিলেন। কাজেই আল্লাহর হুকুম থেকে সরে এসে যখন সে ফায়সালা করলো তখন সে আসলে জুলুম করলো। তৃতীয়ত বান্দা হওয়া সত্ত্বেও যখনই সে নিজের প্রভুর আইন অমান্য করে নিজের বা অন্যের মনগড়া আইন প্রবর্তন করলো তখনই সে আসলে বন্দেগী ও আনুগত্যের গণ্ডীর বাইরে পা রাখলো। আর এটি অবাধ্যতা বা ফাসেকী। এ কুফরী, জুলুম ও ফাসেকী তার নিজের ধরন ও প্রকৃতির দিক দিয়ে অনিবার্যভাবেই পুরোপুরি আল্লাহর হুকুম অমান্যেরই বাস্তব রূপ। যেখানে আল্লাহর হুকুম অমান্য করা হবে সেখানে এ তিনটি বিষয় থাকবে না, এটা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তবে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার যেমন পর্যায়ভেদ আছে তেমনি এ তিনটি বিষয়েরও পর্যায়ভেদ আছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমকে ভুল এবং নিজের বা অন্য কোন মানুষের হুকুমকে সঠিক মনে করে আল্লাহর হুকুম বিরোধী ফায়সালা করে সে পুরোপুরি কাফের, জালেম ও ফাসেক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমকে সত্য বলে বিশ্বাস করে কিন্তু কার্যত তার বিরুদ্ধে ফায়সালা করে সে ইসলামী মিল্লাত বহির্ভূত না হলেও নিজের ঈমানকে কুফুরী, জুলুম ও ফাসেকীর সাথে মিশিয়ে ফেলছে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে সে সকল ব্যাপারেই কাফের, ফাসেক ও জালেম। আর যে ব্যক্তি কিছু ব্যাপারে অনুগত এবং কিছু ব্যাপারে অবাধ্য তার জীবনে ঈমান ও ইসলাম এবং কুফরী, জুলুম ও ফাসেকীর মিশ্রণ ঠিক তেমনি হারে অবস্থান করছে যেহারে সে আনুগত্য ও অবাধ্যতাকে এক সাথে মিশিয়ে রেখেছে। কোন কোন তাফসীরকার এ আয়াতগুলোকে আহলি কিতাবদের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত বলে গণ্য করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আল্লাহর কালামের শব্দের মধ্যে

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا
جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

তারপর হে মুহাম্মাদ! তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি, যা সত্য নিয়ে এসেছে এবং আল কিতাবের মধ্য থেকে তার সামনে যা কিছু বর্তমান আছে তার সত্যতা প্রমাণকারী[৭৮] ও তার সংরক্ষক।[৭৯] কাজেই তুমি আল্লাহর নাযিল করা আইনি অনুযায়ী লোকদের বিভিন্ন বিষয়ের ফায়সালা করো এবং যে সত্য তোমার কাছে এসেছে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। —তোমাদের[৮০] প্রত্যেকের জন্য একটি শরীয়াত ও একটি কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করে রেখেছি। আল্লাহ চাইলে তোমাদের সবাইকে একই উম্মতের অন্তরভুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তার মধ্যে তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য এমনটি করেছেন। কাজেই সৎকাজে একে অপরের চাইতে অগ্রবর্তী হবার চেষ্টা করো। শেষ পর্যন্ত তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে। তারপর তিনি সেই প্রকৃত সত্যটি তোমাদের জানিয়ে দেবেন যে ব্যাপারে তোমরা মতবিরোধ করে আসছিলে।[৮১]

এ ধরনের ব্যাখ্যা করার কোন অবকাশ নেই। হযরত হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্যই এ ধরনের ব্যাখ্যার সঠিক ও সর্বোত্তম জবাব। তাঁকে একজন বলেছিল, এ আয়াত তিনটি তো বনী ইসরাঈলের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। সে বুঝাতে চাচ্ছিল যে, ইহুদীদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিল করা হুকুমের বিরুদ্ধে ফায়সালা করে সে-ই কাফের, জালেম ও ফাসেক। একথা শুনে হযরত হুযাইফা বলে ওঠেন ঃ

نعم الاخوة لكم بنو اسرائيل ان كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة
كلا والله لتسلكن طريقهم قدر الشراك -

"এ বনী ইসরাঈল গোষ্ঠী তোমাদের কেমন চমৎকার ভাই, তিতোগুলো সব তাদের জন্য আর মিঠাগুলো সব তোমাদের জন্য। কখ্খনো নয়, আল্লাহর কসম তাদেরই পথে তোমরা কদম মিলিয়ে চলবে।"

৭৮. এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ বক্তব্যটিকে যদিও এভাবে বলা যেতো যে, "আগের কিতাবগুলোর মধ্য থেকে যা কিছু তার প্রকৃত ও সঠিক অবস্থায় বর্তমান আছে কুরআন তার সত্যতা প্রমাণ করে।" কিন্তু আল্লাহ এখানে "আগের কিতাবগুলোর" পরিবর্তে "আল কিতাব" শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ থেকে এ রহস্য উদঘাটিত হয় যে, কুরআন এবং বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন ভাষায় আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কিতাবগুলো নাযিল হয়েছে সবই মূলত একটি কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। তাদের রচয়িতাও একজন। তাদের মূল বক্তব্য, উদ্দেশ্য-লক্ষও একই। তাদের শিক্ষাও একই। তাদের মাধ্যমে মানব জাতিকে একই জ্ঞান দান করা হয়েছে। এ কিতাবগুলোর মধ্যে পার্থক্য থাকলে তা আছে কেবল মাত্র ইবারাত অর্থাৎ বাক্য সংগঠন ও বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে। কাজেই প্রকৃত সত্য কেবল এতটুকুই নয় যে, এ কিতাবগুলো পরস্পরের বিরোধী নয় বরং সমর্থক এবং পরস্পরের প্রতিবাদকারী নয় বরং সত্যতা প্রমাণকারী। বরং প্রকৃত সত্য এর চাইতেও অনেক বেশী। অর্থাৎ এরা সবাই একই "আল কিতাবের" বিভিন্ন সংস্করণ মাত্র।

৭৯. মূলে "মুহাইমিন" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আরবীতে হাইমানা, ইউহাইমিনু, হাইমানাতান (هيمن - يهيمن - هيمنة) মানে হচ্ছে দেখাশুনা, সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সাক্ষ দান, আমানতদারী, সহায়তা দান ও সমর্থন করা। যেমন বলা হয় هيمن الرجل الشيئ অর্থাৎ লোকটি অমুক জিনিসটি হেফাজত ও সংরক্ষণ করেছে। আরো বলা হয় : هيمن الطائر على فراخه অর্থাৎ পাখিটি নিজের বাচ্চাকে নিজের ডানার মধ্যে নিয়ে সংরক্ষিত করে ফেলেছে। হযরত উমর (রা) একবার লোকদের বলেন : انى داع فهيمنوا অর্থাৎ আমি দোয়া করি, তোমরা সমর্থনে আ-মীন বলো। অর্থাৎ কুরআনকে আল-কিতাব বলার পর "মুহাইমিন" বলার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোতে যেসব সত্য শিক্ষা ছিল কুরআন তার সবগুলোই নিজের মধ্যে সংরক্ষিত করে নিয়েছে। সে সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণকারী এই হিসেবে যে, এখন তাদের এ সত্য শিক্ষাগুলোর কোন অংশের নষ্ট হবার আর কোন সম্ভাবনাই নেই। সে সেগুলোর সমর্থক এ অর্থে যে, ঐ কিতাবগুলোতে আল্লাহর কালাম যে অবস্থায় আছে কুরআন তার সত্যতা প্রমাণ করে। সে সেগুলোর ওপর সাক্ষদানকারী এ অর্থে যে, ঐ কিতাবগুলোতে আল্লাহর কালাম ও মানুষের বাণীর মধ্যে যে মিশ্রণ ঘটে গেছে কুরআনের সাক্ষের মাধ্যমে তাকে আবার ছেঁটে আলাদা করা যেতে পারে। সেগুলোর মধ্যে যেগুলো কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং তার অনুরূপ সেগুলো আল্লাহর কালাম আর যেগুলো কুরআন বিরোধী সেগুলো মানুষের বাণী।

৮০. এটি একটি প্রসংগ কথা। একটি প্রশ্নের বিশ্লেষণই এর উদ্দেশ্য। ওপরের ধারাবাহিক ভাষণ শোনার পর শ্রোতার মনে এ প্রশ্নটি সংশয় ও জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। প্রশ্নটি হচ্ছে, সকল নবী ও সকল কিতাব যখন একই ধর্মের দিকে আহবান জানিয়েছে এবং তারা সবাই পরস্পরের সত্যতা প্রমাণ করে ও পরস্পরের সহযোগী তখন

শরীয়াতের বিস্তারিত বিধানের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্য কেন? ইবাদাত-বন্দেগীর বাহ্যিক অবয়ব ও আনুষ্ঠানিকতা, হালাল-হারামের বিধি-নিষেধ এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আইন-কানুনের খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিভিন্ন নবী ও আসমানী কিতাবসমূহের শরীয়াতগুলোর মধ্যে কমবেশী পার্থক্য দেখা যায় কেন?

৮১. এটি হচ্ছে উপরোল্লিখিত প্রশ্নটির একটি পরিপূর্ণ জবাব। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ নিছক শরীয়াতের বিভিন্নতা দেখে এ শরীয়াতগুলো বিভিন্ন মূল ও বিভিন্ন উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছে বলে মনে করা ভুল হবে। আসলে মহান আল্লাহ বিভিন্ন জাতির জন্য বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন অবস্থায় বিধি বিধান নির্ধারণ করে থাকেন।

দুই ঃ নিসন্দেহে প্রথম থেকেই সমগ্র মানব জাতির জন্য একটি বিধান নির্ধারিত করে সবাইকে এক উম্মতে পরিণত করা যেতো। কিন্তু বিভিন্ন নবীর শরীয়াতের মধ্যে আল্লাহ যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন তার পেছনে বিভিন্ন কারণের মধ্যে একটি বড় কারণ এই ছিল যে, এভাবে আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করতে চাচ্ছিলেন। যারা প্রকৃত দীন, তার প্রাণসত্তা ও তাৎপর্য অনুধাবন করে, দীনের মধ্যে এ বিধানগুলোর যথার্থ মর্যাদা জানে এবং কোন প্রকার বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয় না তারা সত্যকে চিনে ফেলবে এবং গ্রহণ করে নেবে, যেভাবেই তা আসুক না কেন। তারা আল্লাহ প্রেরিত আগের বিধানের জায়গায় পরবর্তী বিধান মেনে নেবার ব্যাপারে কোন প্রকার ইতস্তত করবে না। পক্ষান্তরে যারা দীনের মূল প্রাণশক্তি থেকে দূরে অবস্থান করে, দীনের বিধান ও খুঁটিনাটি নিয়ম-কানুনকেই আসল দীন মনে করে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত জিনিসের গায়ে নিজেরাই তকমা এঁটে দিয়ে সে ব্যাপারে স্থবিরতা ও বিদ্বেষে নিমজ্জিত হয়, তারা পরবর্তীকালে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রত্যেকটি আয়াত প্রত্যাখ্যান করতে থাকে। এ দুই ধরনের লোককে পৃথক করার জন্য এ ধরনের পরীক্ষা অপরিহার্য ছিল। তাই মহান আল্লাহ বিভিন্ন শরীয়াতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

তিন ঃ সমস্ত শরীয়াতের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে নেকী ও কল্যাণ অর্জন করা। যে সময় আল্লাহ যে হুকুম দেন তা পালন করার মাধ্যমেই এগুলো অর্জিত হতে পারে। কাজেই যারা আসল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখে তাদের জন্য শরীয়াতের বিভিন্নতা ও পথের পার্থক্য নিয়ে বিরোধ করার পরিবর্তে আল্লাহর কাছে গৃহীত পথের মাধ্যমে মূল উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই হচ্ছে সঠিক কর্মপদ্ধতি।

চার ঃ মানুষেরা নিজেদের স্থবিরতা, বিদ্বেষ, হঠকারিতা ও মানসিক অস্থিরতার কারণে নিজেরাই যে সমস্ত বিরোধ সৃষ্টি করেছে, কোন বিতর্কসভায় বা যুদ্ধের ময়দানে সেগুলোর চূড়ান্ত ফায়সালা হবে না। সেগুলোর চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন আল্লাহ নিজেই, যেদিন প্রকৃত সত্যকে সকল প্রকার আবরণমুক্ত করে দেয়া হবে। সেদিন লোকেরা দেখবে, যেসব বিরোধের মধ্যে তারা নিজেদের সমগ্র জীবনকাল অতিবাহিত করে দুনিয়া থেকে চলে এসেছে তার মধ্যে "সত্য" কতটুকু ছিল এবং "মিথ্যার" মিশ্রণ কতটুকু।

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ
يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ
اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ
لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا
لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

—কাজেই[৮২] হে মুহাম্মাদ! তুমি আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী তাদের যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালা করো এবং তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করো না। সাবধান হয়ে যাও, এরা যেন তোমাকে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করে সেই হেদায়াত থেকে সামান্যতমও বিচ্যুত করতে না পারে, যা আল্লাহ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন। যদি এরা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে রাখো, আল্লাহ এদের কোন কোন গোনাহর কারণে এদেরকে বিপদে ফেলার সিদ্ধান্তই করে ফেলেছেন। আর যথার্থই এদের অধিকাংশ ফাসেক। (যদি এরা আল্লাহর আইন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়) তাহলে কি এরা আবার সেই জাহেলিয়াতের[৮৩] ফায়সালা চায়? অথচ যারা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহর চাইতে ভাল ফায়সালাকারী আর কেউ নেই।

৮২. ওপরে যে ধারাবাহিক ভাষণ চলছিল এখান থেকে আবার তা শুরু হচ্ছে।

৮৩. জাহেলিয়াত শব্দটি ইসলামের বিপরীত শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইসলাম হচ্ছে পুরোপুরি জ্ঞানের পথ। কারণ ইসলামের পথ দেখিয়েছেন আল্লাহ নিজেই। আর আল্লাহ সমস্ত বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। অপরদিকে ইসলাম থেকে ভিন্নধর্মী যে কোন পথই জাহেলিয়াতের পথ। আরবের ইসলাম পূর্ব যুগকে জাহেলিয়াতের যুগ বলার কারণ হচ্ছে এই যে, সে যুগে জ্ঞান ছাড়াই নিছক ধারণা, কল্পনা, আন্দাজ, অনুমান বা মানসিক কামনা বাসনার ভিত্তিতে মানুষেরা নিজেদের জন্য জীবনের পথ তৈরী করে নিয়েছিল। যেখানেই যে যুগেই মানুষেরা এ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করবে তাকে অবশ্যি জাহেলিয়াতের কর্মপদ্ধতি বলা হবে। মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যা কিছু পড়ানো হয় তা নিছক আংশিক জ্ঞান। মানুষকে পথ দেখাবার জন্য এ জ্ঞান কোনক্রমেই যথেষ্ট নয়। কাজেই আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানকে বাদ দিয়ে এ আংশিক জ্ঞানের মাধ্যমে আন্দাজ, অনুমান, কল্পনা ও লালসা-কামনার মিশ্রণে যে জীবন বিধান তৈরী করা হয়েছে তাও ঠিক প্রাচীন জাহেলী পদ্ধতির মতো জাহেলিয়াতের সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হয়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ
اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ
يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا دَاۗىِٕرَةٌ ۭ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ
اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰي مَآ اَسَرُّوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ۝
وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَاۗءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ
اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۭ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ۝

৮ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তাদেরকে বন্ধু হিসেবে পরিগণিত করে তাহলে সেও তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। অবশ্যি আল্লাহ জালেমদেরকে নিজের পথনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত রাখেন।

তুমি দেখতে পাচ্ছো, যাদের অন্তরে মোনাফেকীর রোগ আছে তারা তাদের মধ্যেই তৎপর থাকে। তারা বলে, "আমাদের ভয় হয়, আমরা কোন বিপদের কবলে না পড়ে যাই।"[৮৪] কিন্তু অচিরেই আল্লাহ যখন তোমাদের চূড়ান্ত বিজয় দান করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে অন্য কোন কথা প্রকাশ করবেন[৮৫] তখন তারা নিজেদের অন্তরে লুকিয়ে রাখা এ মোনাফেকীর জন্য লজ্জিত হবে। আর সে সময় ঈমানদাররা বলবে, "এরা কি সে সব লোক যারা আল্লাহর নামে শক্ত কসম খেয়ে আমরা তোমাদের সাথে আছি বলে আশ্বাস দিতো?"—এদের সমস্ত কর্মকাণ্ড নষ্ট হয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত এরা ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে।[৮৬]

৮৪. তখনো পর্যন্ত আরবে কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্বের কোন মীমাংসা হয়নি। যদিও নিজের অনুসারীদের কর্মতৎপরতা, সাধনা ও আত্মত্যাগের কারণে ইসলাম একটি শক্তিতে পরিণত হয়েছিল তবুও বিরুদ্ধ শক্তিগুলোও ছিল প্রবল পরাক্রান্ত। ইসলামের বিজয়ের সম্ভাবনা যেমন ছিল তেমনি কুফরের বিজয়ের সম্ভাবনাও ছিল। তাই মুসলমানদের মধ্যে যেসব মোনাফেক বিদ্যমান ছিল তারা ইসলামী দলের মধ্যে থেকেও ইহুদী ও খৃষ্টানদের

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ
بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ز
يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ط ذٰلِكَ
فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٤﴾ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ
اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ
الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٥٦﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি দীন থেকে ফিরে যায় (তাহলে ফিরে যাক), আল্লাহ এমনিতর আরো বহু লোক সৃষ্টি করে দেবেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন এবং তারা আল্লাহকে ভালবাসবে, যারা মুমিনদের ব্যাপারে কোমল ও কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর হবে,[৮৭] যারা আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা ও সাধনা করে যাবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না।[৮৮] এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে চান তাকে দান করেন। আল্লাহ ব্যাপক উপায় উপকরণের অধিকারী এবং তিনি সবকিছু জানেন।

আসলে তোমাদের বন্ধু হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং সেই ঈমানদাররা যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহর সামনে বিনত হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে, তাঁর রসূলকে ও মুমিনদেরকে নিজের বন্ধু রূপে গ্রহণ করে তার জেনে রাখা দরকার, আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে।

সাথেও সম্পর্ক রাখতে চাইতো। তারা ভাবতো, ইসলাম ও কুফরের এ দ্বন্দ্বে যদি ইসলামের পরাজয় ঘটে যায় তাহলে তাদের জন্য যেন কোন একটা আশ্রয় স্থল অবশিষ্ট থাকে। এ ছাড়াও সে সময় আরবে খৃষ্টান ও ইহুদীদের অর্থবল ছিল সবচেয়ে বেশী। মহাজনী ব্যবসায়ের বেশীর ভাগ ছিল তাদের হাতে। আরবের সবচেয়ে উর্বর ও শস্যশ্যামল ভূখণ্ড ছিল তাদের অধিকারে। তাদের সূদখোরীর জাল চারদিকে ছড়িয়ে ছিল। কাজেই অর্থনৈতিক কারণেও এ মোনাফেকরা তাদের সাথে নিজেদের আগের সম্পর্ক অটুট রাখতে চাইতো। তাদের ধারণা ছিল, ইসলাম ও কুফরের এ সংঘর্ষে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়ে

আমরা যদি ইসলামের সাথে বর্তমানে বিরোধে ও যুদ্ধে লিপ্ত সম্প্রদায়গুলোর সাথে নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করি, তাহলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক দিয়েই এটা হবে আমাদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক।

৮৫. অর্থাৎ চূড়ান্ত বিজয়ের চাইতে কম পর্যায়ের এমন কোন জিনিস যার মাধ্যমে লোকদের মনে বিশ্বাস জন্মে যে, জয় পরাজয়ের চূড়ান্ত ফায়সালা ইসলামের পক্ষেই হবে।

৮৬. অর্থাৎ ইসলামের বিধান মেনে চলতে গিয়ে তারা যা কিছু করলো ঃ নামায পড়লো, রোযা রাখলো, যাকাত দিল, জিহাদে শরীক হলো, ইসলামী আইনের আনুগত্য করলো—এসব কিছুই এ জন্য নষ্ট হয়ে গেলো যে, ইসলামের ব্যাপারে তাদের মনে আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা ছিল না এবং তারা সবার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলে একমাত্র তারই অনুগত বান্দায় পরিণত হয়ে যায়নি। বরং নিজেদের পার্থিব স্বার্থের কারণে তারা আল্লাহ ও তাঁর বিদ্রোহীদের মধ্যে নিজেদেরকে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে রেখেছিল।

৮৭. 'মুমিনদের ব্যাপারে কোমল' হবার মানে হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তি ঈমানদারদের মোকাবিলায় কখনো শক্তি প্রয়োগ করবে না। তার বুদ্ধি, মেধা, যোগ্যতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, অর্থ-সম্পদ, শারীরিক ক্ষমতা কোনটিই মুসলমানদেরকে দাবিয়ে রাখার, কষ্ট দেবার বা ক্ষতি করার জন্য ব্যবহার করবে না। মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে তাকে সবসময় একজন দয়ার্দ্র হৃদয়, কোমল স্বভাবের, দরদী ও ধৈর্যশীল মানুষ হিসেবেই দেখতে পায়।

'কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর' হবার মানে হচ্ছে, নিজের মজবুত ঈমান, নিস্বার্থ ও একনিষ্ঠ দীনদারী, অনমনীয় নীতিবাদিতা, চারিত্রিক শক্তি ও ঈমানী দূরদৃষ্টির কারণে একজন মুমিন ইসলাম বিরোধীদের মোকাবিলায় পাহাড়ের মতো অটল হবে। নিজের স্থান থেকে তাকে এক চুলও নড়ানো যাবে না। ইসলাম বিরোধীরা কখনো তাকে নমনীয়, দোদুল্যমান এবং অক্লেশে গলধঃকরণ করার মতো খাদ্য মনে করতে পারবে না। যখনই তারা তার মুখোমুখি হয় তখনই টের পেয়ে যায় যে, এ আল্লাহর বান্দা মরে যেতে পারে কিন্তু কখনো কোন মূল্যে বিক্রি হতে পারে না এবং কোন চাপের সামনে নতি স্বীকারও করতে পারে না।

৮৮. অর্থাৎ আল্লাহর দীনের অনুসরণ করার ব্যাপারে তাঁর বিধানসমূহ কার্যকর করার ব্যাপারে এবং এ দীনের দৃষ্টিতে যা সত্য তাকে সত্য এবং যা মিথ্যা তাকে মিথ্যা বলার ব্যাপারে সে আপোষহীন ও নির্ভীক। কারোর বিরোধিতা, নিন্দা, তিরস্কার, আপত্তি ও বিদ্রূপবানের সে পরোয়া করবে না। সাধারণ জনমত যদি ইসলামের প্রতিকূল হয় এবং ইসলামের পথে চলার অর্থ যদি সারা দুনিয়ার সামনে নিজেকে অপাংক্তেয় বানানো হয়ে থাকে তাহলেও সে সাচ্চাদিলে যে পথকে সত্য মনে করেছে সে পথেই চলতে থাকবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا
وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾ وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ
اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿٥٨﴾ قُلْ يٰٓاَهْلَ
الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا
وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٥٩﴾

৯ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে যেসব লোক তোমাদের দীনকে বিদ্রূপ ও হাসি-তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছে তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় করো, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। যখন তোমরা নামাযের জন্য ডাক দাও তখন তারা এর প্রতি বিদ্রূপবান নিক্ষেপ করে এবং এ নিয়ে টিটকারী ও তামাশা করে।[৮৯] এর কারণ হচ্ছে তাদের জ্ঞান নেই।[৯০] তাদেরকে বলে দাও, "হে আহলি কিতাব! তোমরা আমাদের প্রতি তোমাদের ক্রোধের একমাত্র কারণ তো এই যে, আমরা আল্লাহর ওপর এবং দীনের সে শিক্ষার ওপর ঈমান এনেছি যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে এবং আমাদের আগেও নাযিল হয়েছিল। আর তোমাদের বেশীরভাগ লোকইতো অবাধ্য।"

৮৯. অর্থাৎ আযানের আওয়াজ শুনে তা নকল করতে থাকে। ঠাট্টা-তামাশা ও বিদ্রূপ করার জন্য তার শব্দ বদল ও বিকৃত করে এবং তা নিয়ে টিটকারী দেয় ও ভেংচি কাটে।

৯০. অর্থাৎ তাদের এ কাজগুলো নিছক মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার ফল। যদি তারা মূর্খতা ও অজ্ঞতায় নিমজ্জিত না হতো তাহলে মুসলমানদের সাথে ধর্মীয় বিরোধ রাখা সত্ত্বেও এ ধরনের ন্যক্কারজনক কাজ তারা করতে পারতো না। আল্লাহর ইবাদাতের জন্য আহবান জানানো হলে তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করাকে কোন বিবেকবান ব্যক্তি পছন্দ করতে পারেন না।

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ
وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ
أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾ وَإِذَا جَاءُوكُمْ
قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا
كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾

তাহলে বলো, আমি কি তাদেরকে চিহ্নিত করবো। যাদের পরিণাম আল্লাহর কাছে এ ফাসেকদের চাইতেও খারাপ? বস্তুত যাদের ওপর আল্লাহ লানত বর্ষণ করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত, যাদের মধ্য থেকে কতককে বানর ও শুয়োর বানানো হয়েছে এবং যারা তাগুতের বন্দেগী করেছে, তারা আরো নিকৃষ্ট এবং তারা সাওয়া-উস-সাবীল-(সরল সঠিক পথ) থেকে বিচ্যুত হয়ে অনেক দূরে সরে গেছে।[৯১] যখন তারা তোমাদের কাছে আসে, তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। অথচ তারা কুফর নিয়ে এসেছিল, কুফর নিয়েই ফিরে গেছে এবং আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন তারা তাদের মনের মধ্যে কি জিনিস লুকিয়ে রেখেছে। তুমি দেখতে পাচ্ছো, এদের বেশীর ভাগ লোক গোনাহ, জুলুম ও সীমালংঘনের কাজে তৎপর এবং এরা হারাম খায়। এরা অত্যন্ত খারাপ কাজ করে যাচ্ছে।

৯১. এখানে স্বয়ং ইহুদীদের দিকে সূক্ষ্ম ইংগিত করা হয়েছে। তাদের ইতিহাস বলছে, বারবার আল্লাহর গযব ও লানতের শিকার হয়েছে। শনিবারের আইন ভাঙার কারণে তাদের কওমের বহু লোকের চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে। এমনকি তারা অধপতনের এমন নিম্নতম পর্যায়ে নেমে গেছে যে, তাদেরকে তাগুত তথা আল্লাহর বিদ্রোহী শক্তির দাসত্ব পর্যন্ত করতে হয়েছে। সার কথা হচ্ছে এই যে, তোমাদের নির্লজ্জতা ও অপরাধমূলক কার্যক্রমের কি কোন শেষ আছে? তোমরা নিজেরা ফাসেকী, শরীয়াত বিরোধী কার্যকলাপ ও চরম নৈতিক অধপতনের মধ্যে নিমজ্জিত আছো আর যদি অন্য কোন দল আল্লাহর ওপর ঈমান এনে সাচ্চা দীনদারীর পথ অবলম্বন করে তাহলে তোমরা তার বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে যাও।

لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ
السُّحْتَ ۭ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿٦٣﴾ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ
مَغْلُوْلَةٌ ۭ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ
يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاۗءُ ۭ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ
رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۭ وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۗءَ اِلٰى
يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۭ كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَيَسْعَوْنَ
فِي الْاَرْضِ فَسَادًا ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٤﴾

এদের উলামা ও মাশায়েখগণ কেন এদেরকে পাপ কথা বলতে ও হারাম খেতে বাধা দেয় না? অবশ্যি এরা যা করে যাচ্ছে তা অত্যন্ত জঘন্য কার্যক্রম।

ইহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত বাঁধা,[৯২] আসলে তো বাঁধা হয়েছে ওদেরই হাত[৯৩] এবং তারা যে বাজে কথা বলছে সে জন্য তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে।[৯৪] —আল্লাহর হাত তো দরাজ, যেভাবে চান তিনি খরচ করে যান।

আসলে তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার ওপর যে কালাম নাযিল করা হয়েছে তা উল্টো তাদের অধিকাংশের বিদ্রোহ ও বাতিলের পূজা বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৯৫] আর (এ অপরাধে) আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করে দিয়েছি। যতবারই তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালায় ততবারই আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কখনোই পছন্দ করেন না।

৯২. আরবী প্রবাদ অনুযায়ী কারোর হাত বাঁধা থাকার অর্থ হচ্ছে সে কৃপণ। দান–খয়রাত করার ব্যাপারে তার হাত নিষ্ক্রীয়। কাজেই ইহুদীদের একথার অর্থ এ নয় যে, সত্যিই আল্লাহর হাত বাঁধা রয়েছে। বরং এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ কৃপণ। যেহেতু শত শত বছর থেকে ইহুদী জাতি ঘোর লাঞ্ছনা–বঞ্চনা ও পতিত দশায় নিমজ্জিত ছিল, তাদের অতীতের গৌরব ও কৃতিত্ব নিছক পুরাতন কাহিনীতে পরিণত হয়েছিল এবং সে গৌরবের যুগ ফিরিয়ে আনার আর কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছিল না, তাই সাধারণত নিজেদের অব্যাহত জাতীয় দুর্যোগ ও দৈন্যদশার জন্য আক্ষেপ ও হাহুতাশ করতে গিয়ে ঐ

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ
وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ
وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ؕ
مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٦﴾

যদি (বিদ্রোহের পরিবর্তে) এ আহলি কিতাব গোষ্ঠী ঈমান আনতো এবং আল্লাহ ভীতির পথ অবলম্বন করতো, তাহলে আমি তাদের থেকে তাদের দুষ্কৃতিগুলো মোচন করে দিতাম এবং তাদেরকে পৌঁছিয়ে দিতাম নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে। হায়, যদি তারা তাওরাত, ইনজিল ও অন্যান্য কিতাবগুলো প্রতিষ্ঠিত করতো, যা তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। তাহলে তাদের জন্য রিযিক ওপর থেকেও বর্ষিত হতো এবং নীচে থেকেও উত্থিত হতো।[৯৬] তাদের মধ্যে কিছু লোক সত্যপন্থী হলেও অধিকাংশই অত্যন্ত খারাপ কাজে লিপ্ত।

অজ্ঞ ও নাদান লোকেরা (নাউযুবিল্লাহ) "আল্লাহ তো কৃপণ হয়ে গেছেন, তার ধনাগারের মুখ বন্ধ এবং আমাদের দেবার জন্য তাঁর কাছে আপদ-বিপদ ছাড়া আর কিছুই নেই"—এ বেহুদা কথা বলে বেড়াতো। কেবল যে ইহুদীরাই একথা বলতো, তা নয় বরং অন্যান্য জাতির মূর্খ ও অজ্ঞ গোষ্ঠীরও এ একই অবস্থা ছিল। তাদের ওপর কোন কঠিন সময় এলে তারা আল্লাহর কাছে নত হওয়ার পরিবর্তে অত্যন্ত ক্রোধের সাথে এ ধরনের বেআদবীমূলক কথা বলতো।

৯৩. অর্থাৎ এরা নিজেরাই কৃপণতায় নিমজ্জিত। নিজেদের কৃপণতা ও সংকীর্ণমনতার জন্য তারা সারা দুনিয়ায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

৯৪. অর্থাৎ এ ধরনের গোস্তাখী ও বিদ্রূপাত্মক কথা বলে এরা যদি মনে করে থাকে যে, আল্লাহ এদের প্রতি করুণাশীল হবেন এবং এদের ওপর তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করতে থাকবেন, তাহলে এদের জেনে রাখা দরকার, এটা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। বরং এদের এ কথাগুলোর ফলে এরা আল্লাহর অনুগ্রহের দৃষ্টি থেকে আরো বেশী বঞ্চিত হয়েছে এবং তাঁর করুণা ও রহমত থেকে আরো দূরে সরে গেছে।

৯৫. অর্থাৎ এ কালাম শুনে তারা কোন ভাল ও সুফলদায়ক শিক্ষা গ্রহণ এবং নিজেদের ভুল ও বিভ্রান্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে সতর্ক হয়ে তার ক্ষতিপূরণ করার ও নিজেদের অধপতিত অবস্থার কারণ জেনে তার সংশোধন করার দিকে নজর দেবার পরিবর্তে উল্টো তাদের ওপর এর এরূপ প্রভাব পড়েছে যে, জিদের বশবর্তী হয়ে তারা

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۭ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا
بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ۭ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكٰفِرِيْنَ ۝٦٧ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰي شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ
وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۭ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا
مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَي
الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝٦٨

১০ রুকূ'

হে রসূল! তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা মানুষের কাছে পৌঁছাও। যদি তুমি এমনটি না করো তাহলে তোমার দ্বারা তার রিসালাতের হক আদায় হবে না। মানুষের অনিষ্টকারিতা থেকে তোমাকে আল্লাহ রক্ষা করবেন। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, তিনি কখনো কাফেরদেরকে (তোমার মোকাবিলায়) সফলতার পথ দেখাবেন না। পরিষ্কার বলে দাও, "হে আহ্‌লি কিতাব! তোমরা কখনোই কোন মূল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে না। যতক্ষণ না তোমরা তাওরাত, ইনজীল ও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে নাযিল করা অন্যান্য কিতাবগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করবে।[৯৭]

তোমার ওপর এই যে ফরমান নাযিল করা হয়েছে এটা অবশ্যি তাদের অনেকের গোয়ার্তুমী ও অবিশ্বাস আরো বাড়িয়ে দেবে।[৯৮] কিন্তু অস্বীকারকারীদের অবস্থার জন্য কোন দুঃখ করো না।

সত্যের বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছে। সৎকর্ম ও আত্মশুদ্ধির বিস্মৃত শিক্ষার কথা শুনে তাদের নিজেদের সত্য পথে ফিরে আসা তো দূরের কথা, উল্টো তারা এ শিক্ষাকে স্মরণ করিয়ে দেবার আহবান যাতে অন্যেরাও শুনতে না পারে এ জন্য তাকে দাবিয়ে দেবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৯৬. বাইবেলের লেবীয় পুস্তক (২৬ অনুচ্ছেদ) ও দ্বিতীয় বিবরণে (২৮ অনুচ্ছেদ) হযরত মূসা আলাইহিস সালামের একটি ভাষণ উদ্ধৃত হয়েছে। এ ভাষণে তিনি বিস্তারিতভাবে বনী ইসরাঈল জাতিকে একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা পুরোপুরি ও যথাযথভাবে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে চললে আল্লাহর রহমত ও বরকত কিভাবে তোমাদের ওপর

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ
رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا
وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ
تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ
بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾

(নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো এখানে কারোর ইজারাদারী নেই।) মুসলমান হোক বা ইহুদী; সাবী হোক বা খৃষ্টান যে-ই আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে নিসন্দেহে তার কোন ভয় বা মর্ম বেদনার কারণ নেই।৯৯

বনী ইসরাঈলের থেকে পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছিলাম এবং তাদের কাছে অনেক রসূল পাঠিয়েছিলাম কিন্তু যখনই তাদের কাছে কোন রসূল তাদের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা বিরোধী কিছু নিয়ে হাযির হয়েছেন তখনই কাউকে তারা মিথ্যুক বলেছে এবং কাউকে হত্যা করেছে আর এতে কোন ফিত্‌না সৃষ্টি হবে না ভেবে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গেছে। তারপর আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। এতে তাদের অনেকেই আরো বেশী অন্ধ ও বধির হয়ে চলেছে। আল্লাহ তাদের এসব কাজ পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছেন।

বর্ষিত হবে এবং আল্লাহর কিতাবকে পেছনে ফেলে দিয়ে তাঁর নাফরমানী করতে থাকলে কিভাবে বালা-মুসিবত আপদ-বিপদ ও ধ্বংস চতুরদিক থেকে তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে। হযরত মূসার ভাষণটি কুরআনের এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটির চমৎকার ব্যাখ্যা।

৯৭. তাওরাত ও ইনজীলকে প্রতিষ্ঠিত করার মানে হচ্ছে, সততা ও নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করা এবং তাদেরকে নিজের জীবন বিধানে পরিণত করা। এ প্রসংগে একথাটি ভালভাবে হৃদয়ংগম করে নিতে হবে যে, বাইবেলের পবিত্র পুস্তক সমষ্টিতে এক ধরনের বাণী আছে, যেগুলো ইহুদী ও খৃষ্টান লেখকরা নিজেরাই রচনা করে লিখে দিয়েছেন আর এক ধরনের বাণী সেখানে আছে, যেগুলো আল্লাহর বাণী বা হযরত ঈসা

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ
يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾

নিসন্দেহে তারা কুফরী করেছে যারা বলেছে, মারয়াম পুত্র মসীহই আল্লাহ। অথচ মসীহ্ বলেছিল, "হে বনী ইসরাঈল! আল্লাহর বন্দেগী করো, যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব! যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেছে তার ওপর আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার আবাস জাহান্নাম। আর এ ধরনের জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

আলাইহিস সালাম ও অন্যান্য পয়গম্বরের বাণী হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে এবং যেগুলোতে একথা সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ একথা বলেছেন বা অমুক নবী একথা বলেছেন। বাইবেলের এ বচনগুলোর মধ্য থেকে প্রথম ধরনের বচনগুলোকে আলাদা করে যদি কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র দ্বিতীয় ধরনের বাণীগুলোর মধ্যে অনুসন্ধান চালান, তাহলে তিনি সহজেই দেখতে পাবেন সেগুলোর শিক্ষা ও কুরআনের শিক্ষার মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। অনুবাদক, অনুলেখক ও ব্যাখ্যাতাগণের হস্তক্ষেপ এবং কোথাও কোথাও ঐশী বর্ণনাকারীদের ভুলের কারণে এ দ্বিতীয় ধরনের বাণীগুলোও পুরোপুরি অবিকৃত নেই তবুও প্রত্যেক ব্যক্তি নিসন্দেহে একথা অনুভব করবেন যে, কুরআন যে নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে চলেছে এগুলোর মধ্যেও ঠিক সেই একই নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। কুরআন যে আকীদা বিশ্বাসের কথা উপস্থাপন করেছে এখানেও সেই একই আকীদা বিশ্বাস উপস্থাপিত হয়েছে। কুরআন যে জীবন পদ্ধতির দিকে পথনির্দেশ করেছে এখানেও সেই একই জীবন পদ্ধতির নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কাজেই ইহুদী ও খৃষ্টানরা যদি তাদের ধর্মগ্রন্থে আল্লাহ ও নবীদের পক্ষ থেকে উদ্ধৃত প্রকৃত শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতো তাহলে নিসন্দেহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবকালে তাদেরকে একটি ন্যায়বাদী ও সত্যপন্থী দল হিসেবে পাওয়া যেতো। এ ক্ষেত্রে তারা কুরআনের মধ্যে সেই একই আলো দেখতে পেতো, যা পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর মধ্যে পাওয়া যেতো। এ অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করার জন্য তাদের ধর্ম পরিবর্তন করার আদতে কোন প্রশ্নই দেখা দিতো না। বরং যে পথে তারা চলে আসছিল সে পথের ধারাবাহিক পরিণতি হিসেবেই তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী হয়ে সামনে অগ্রসর হতে পারতো।

৯৮. অর্থাৎ একথা শোনার পর তারা স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করার ও যথার্থ সত্য হৃদয়ংগম করার পরিবর্তে একগুঁয়েমী ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে আরো বেশী কঠোরভাবে বিরোধিতা শুরু করে দেবে।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ
وَاحِدٌ ۚ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿٧٤﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۖ
وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ
الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٧٥﴾

নিসন্দেহে তারা কুফরী করেছে যারা বলেছে, আল্লাহ তিন জনের মধ্যে একজন। অথচ এক ইলাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই যদি তারা নিজেদের এই সব কথা থেকে বিরত না হয়, তাহলে তাদের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে যন্ত্রণা দায়ক শাস্তি দেয়া হবে। তবে কি তারা আল্লাহর কাছে তাওবা করবে না এবং তাঁর কাছে মাফ চাইবে না? আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

মারয়াম পুত্র মসীহ্ তো একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই ছিল না? তার পূর্বেও আরো অনেক রসূল অতিক্রান্ত হয়েছিল। তার মা ছিল একজন সত্যনিষ্ঠ মহিলা। তারা দু'জনই খাবার খেতো। দেখো কিভাবে তাদের সামনে সত্যের নিদর্শনগুলো সুস্পষ্ট করি। তারপর দেখো তারা কিভাবে উল্টো দিকে ফিরে যাচ্ছে।[১০০]

৯৯. সূরা আল বাকারার ৮ রুকূ'র ৮০ টীকা দেখুন।

১০০. এখানে মাত্র কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে ঈসার 'আল্লাহ' হওয়া সম্পর্কিত খৃষ্টীয় আকীদার এমন সুস্পষ্ট প্রতিবাদ করা হয়েছে যে, এর চাইতে ভাল ও দ্ব্যর্থহীনভাবে আর কোন প্রতিবাদ করা সম্ভবপর নয়। হযরত ঈসা মসীহ্ সম্পর্কে যদি কেউ জানতে চায় যে, তিনি আসলে কি ছিলেন তাহলে এ আলামতগুলো থেকে সম্পূর্ণ সন্দেহাতীতভাবে সে জানতে পারবে যে, তিনি নিছক একজন মানুষ ছিলেন। মোট কথা, যার জন্ম এক মহিলার গর্ভে, যার একটি বংশ তালিকা আছে, যিনি মানবিক দেহের অধিকারী ছিলেন, যিনি এমন সব সীমারেখা ও নিয়ম-কানুনের চার দেয়ালে আবদ্ধ এবং এমন সব গুণাবলী সমন্বিত, যা একমাত্র মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট। যিনি ঘুমাতেন, খেতেন, ঠাণ্ডা-গরম অনুভব

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٦﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾

তাদেরকে বলো, তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর ইবাদাত করছো, যা তোমাদের না ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা রাখে না উপকারের? অথচ একমাত্র আল্লাহই তো সবার সবকিছু শোনেন ও জানেন। বলে দাও, হে আহলি কিতাব! নিজেদের দীনের ব্যাপারে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না এবং তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করো না যারা তোমাদের পূর্বে নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং আরো অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে আর 'সাওয়া-উস-সাবীল' থেকে বিচ্যুত হয়েছে।[১০১]

করতেন, এমনকি যাঁকে শয়তানের মাধ্যমে পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তাঁর সম্পর্কে কোন বিবেকবান ব্যক্তি একথা কল্পনাই করতে পারেন না যে, তিনি নিজে আল্লাহ বা আল্লাহর কাজে তাঁর সাথে শরীক ও তাঁর সমকক্ষ। তাছাড়া খৃষ্টানরা নিজেদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোতে হযরত মসীহ আলাইহিস সালামের জীবনকে সুস্পষ্টভাবে একটি মানুষের জীবন হিসেবে পেয়েছে। এরপরও তারা তাঁকে আল্লাহর গুণাবলী সমন্বিত পূজনীয় সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জোর দিয়ে যাচ্ছে। এটাকে মানব মনের বিভ্রান্তি ও গোমরাহী প্রীতির এক অদ্ভুত প্রবণতা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? আসলে যে ঈসা মসীহ্ আলাইহিস সালামের আবির্ভাব বাস্তবে ঘটেছিল সে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ঈসা মসীহ্কে তারা মানে না। বরং তারা নিজেদের মনোজগতে ঈসার এক উদ্ভট কাল্পনিক ভাবমূর্তি নির্মাণ করে তাকেই আল্লাহর স্থানে বসিয়ে দিয়েছে।

১০১. যেসব গোমরাহ জাতি থেকে খৃষ্টানরা ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও বাতিল পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল এখানে তাদের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। বিশেষ করে এখানে গ্রীক দার্শনিকদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। তাদের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে খৃষ্টানরা সেই সিরাতে মুস্তাকীম—সরল সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল, যেদিকে প্রথমত তাদেরকে পরিচালিত করা হয়েছিল। হযরত ঈসার প্রথম দিকের অনুসারীরা যে আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করতেন তা বেশীর ভাগ তাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানলব্ধ সত্য ছিল এবং তাদের নেতা ও পথপ্রদর্শক তাদেরকে সেগুলো শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালের খৃষ্টানরা একদিকে ঈসার প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনের প্রশ্নে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে

এবং অন্যদিকে প্রতিবেশী জাতিসমূহের অলীক ধ্যান-ধারণা ও দর্শনে প্রভাবিত হয়ে নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের বানোয়াট দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে। এভাবে তারা একটি সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম তৈরী করে ফেলে। এ নতুন ধর্মের সাথে হযরত ঈসার আসল শিক্ষাবলীর দূরতম কোন সম্পর্কও ছিল না। এ ব্যাপারে একজন খৃষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদ রেভারেণ্ড চার্লস এণ্ডারসন স্কটের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার চতুর্দশ সংস্করণে "ঈসা মসীহ" (JESUS CHRIST) শিরোনামে তিনি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাতে তিনি লিখছেন ঃ

"প্রথম তিনটি ইনজীলে (মথি, মার্ক ও লূক) এমন কোন জিনিস নেই যা থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, এ তিনটি ইনজীলের লেখকরা ঈসাকে মানুষ ছাড়া অন্য কিছু মনে করতেন। তাদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন একজন মানুষ। এমন একজন মানুষ যিনি বিশেষভাবে আল্লাহর আত্মা থেকে সঞ্জীবিত হয়েছিলেন এবং আল্লাহর সাথে এমন একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রাখতেন যে জন্য তাঁকে যদি আল্লাহর পুত্র বলা হয় তাহলে তা ন্যায়সংগত হবে। মথি নিজে তাঁর উল্লেখ করেছেন কাঠ মিস্ত্রীর পুত্র হিসেবে। এক জায়গায় তিনি বলছেন, পিতর তাঁকে "মসীহ্" মেনে নেবার পর 'তাঁকে আলাদা একদিকে ডেকে নিয়ে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন।' (মথি ১৬, ২২) লূক-এ আমরা দেখছি ক্রুশবিদ্ধ হবার ঘটনার পর হযরত ঈসার দু'জন শাগরিদ ইম্মায়ু নামক গ্রামের দিকে যাবার সময় নিম্নোক্তভাবে এর উল্লেখ করেছেন, "তিনি আল্লাহর ও সকল লোকের সাক্ষাতে কাজে ও কথায় পরাক্রমী নবী ছিলেন।" (লূক ২৪, ১৯) একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যদিও মার্কের রচনার পূর্বেই খৃষ্টানদের মধ্যে ঈসার জন্য 'প্রভূ' (Lord) শব্দটির ব্যবহার সাধারণভাবে প্রচলিত হয়ে পড়েছিল তবুও মার্কের ইনজীলে ঈসাকে কোথাও এ শব্দের মাধ্যমে স্মরণ করা হয়নি এবং মথির ইনজিলেও নয়। অন্যদিকে এ দুটি পুস্তকে এ শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে আল্লাহর জন্য। ঈসার বিপদের ঘটনা যেভাবে বর্ণনা করা দরকার ঠিক তেমনি জোরে শোরে তিনটি ইনজীলেই বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মার্কের 'মুক্তিপণ' সম্বলিত বাণী (মার্ক ১০, ৪৫) ও শেষ উপদেশের সময়ের কয়েকটি শব্দ বাদ দিলে এ ইনজিলগুলোর কোথাও এ ঘটনার এমন অর্থ গ্রহণ করা হয়নি যা পরবর্তীকালে গ্রহণ করা হয়েছে। এমন কি ঈসার মৃত্যুর সাথে মানুষের পাপ মোচনের কোন সম্পর্ক ছিল, এ মর্মে কোথাও সামান্যতম ইংগিতও করা হয়নি।"

পরবর্তী পর্যায়ে তিনি আরো লিখেছেন ঃ

"ইনজীলগুলোর বিভিন্ন বাক্য থেকে একথা প্রমাণ হয় যে, ঈসা নিজেকে একজন নবী হিসেবে পেশ করতেন। যেমন, 'আমাকে আজ, কাল ও পরশু অবশ্যি নিজের পথে চলতে হবে। কারণ জেরুশালেমের বাইরে কোন নবী মারা যাবে—এমনটি হতে পারে না।' (লূক ১৩, ৩৩)-তিনি অধিকাংশ সময় নিজেকে 'আদম সন্তান' বলে উল্লেখ করেছেন।..... ঈসা কোথাও নিজেকে আল্লাহর পুত্র বলেননি। তার সমকালীন অন্য কেউ যখন তার সম্পর্কে এ শব্দটি ব্যবহার করেন তখন সম্ভবত তার মর্মার্থ এটাই হয় যে, তিনি তাকে 'মসীহ্' মনে করেন তবে তিনি নিজেকে ব্যাপক অর্থে 'পুত্র' বলে

উল্লেখ করেছেন।.....এ ছাড়া আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক বর্ণনা করার জন্যও তিনি 'পিতা' শব্দটিকেও এ ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করেছেন। .....আল্লাহর সাথে কেবল তাঁর একার এ সম্পর্ক আছে বলে তিনি মনে করতেন না। বরং প্রাথমিক যুগে অন্যান্য মানুষেরও আল্লাহর সাথে এ ধরনের বিশেষ গভীর সম্পর্ক ছিল এবং এ ব্যাপারে তিনি তাদেরকে নিজের সাথী মনে করতেন। তবে পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতা এবং মানবিক প্রকৃতির গভীর অধ্যয়ন তাঁকে একথা বুঝতে বাধ্য করে যে, এ ব্যাপারে তিনি একা।"

প্রবন্ধকার সামনে অগ্রসর হয়ে আরো লিখেছেন ঃ

"পুনুতেকুস্তের ঈদের সময় পিতরের এ কথাগুলো—'একজন মানুষ যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ছিলেন'—ঈসাকে এমনভাবে পেশ করে যেমন তাঁর সমকালীনরা তাঁকে জানতো ও বুঝতো। ..... ইনজীলগুলো থেকে আমরা জানতে পারি, শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত ঈসা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভের পর্যায় অতিক্রম করেন। তাঁর ক্ষুধা ও পিপাসা লাগতো। তিনি ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হতেন এবং ঘুমিয়ে পড়তেন। তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হতে পারতেন এবং তার ভালমন্দ জিজ্ঞেস করার মুখাপেক্ষী হতেন। তিনি দুঃখ সয়েছেন এবং মরে গেছেন। তিনি কেবল সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা হবার দাবীই করেননি বরং সুস্পষ্ট ভাষায় এগুলো অস্বীকার করেছেন।..... আসলে যদি দাবী করা হয় যে, তিনি সর্বত্র উপস্থিত ও সর্বদ্রষ্টা, তাহলে ইনজীল থেকে আমরা যে ধারণা পাই এটা হবে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। বরং তাঁর পরীক্ষার ঘটনা এবং গিতাস্মনী ও খোপড়ী নামক স্থানে যা কিছু ঘটেছিল সেগুলোকে সম্পূর্ণ অবাস্তব বলে ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত এ দাবীর সাথে সেগুলোর কোন একটিরও কোন সামঞ্জস্য দেখানো যেতে পারে না। একথা অবশ্যি মানতে হবে, মসীহ্ যখন এ সমস্ত অবস্থার চড়াই উতরাই অতিক্রম করেছেন তখন তিনি মানবিক জ্ঞানের সাধারণ সীমাবদ্ধতার অধিকারী ছিলেন। এ সীমাবদ্ধতার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম থেকে থাকলে তা কেবল এতটুকু হতে পারে যা নবী সুলভ অন্তর্দৃষ্টি ও আল্লাহ সম্পর্কে সন্দেহাতীত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি অর্জন করেছিলেন। তাছাড়া মসীহ্কে সর্বশক্তিমান মনে করার অবকাশ ইনজীলে আরো কম। ইনজীলের কোথাও এতটুকু ইংগিত পাওয়া যাবে না যে, ঈসা আল্লাহর মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেই স্বাধীনভাবে সমস্ত কাজ করতেন। বরং উল্টো তাঁর বারবার দোয়া চাওয়ার অভ্যাস থেকে এবং এ বিপদটির হাত থেকে দোয়া ছাড়া আর কোন উপায়ে রেহাই পাওয়া যাবে না"—এ ধরনের বাক্য থেকে একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করে নেয়া হয় যে, তাঁর সত্তা আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। যদিও খৃষ্টীয় গীর্জাসমূহ যখন থেকে ঈসাকে 'ইলাহ' ও 'আল্লাহ' মনে করতে শুরু করেছে, তার পূর্বে ইনজীল গ্রন্থসমূহ সংকলন ও লিপিবদ্ধ করার কাজ সম্পূর্ণ হতে পারেনি, তবুও এ প্রমাণ পত্রগুলোতে একদিকে ঈসা যে যথার্থই একজন মানুষ, তার সাক্ষ্য সংরক্ষিত রয়ে গেছে এবং অন্যদিকে এগুলোর মধ্যে ঈসা নিজেকে আল্লাহ মনে করতেন, এমন কোন সাক্ষ প্রমাণ নেই। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়টি ইনজীলগুলোর ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ।"

অতপর এ প্রবন্ধকার আরো লিখেছেন ঃ

"আসমানে উঠিয়ে নেবার ঘটনার সময় এ উঠিয়ে নেবার মাধ্যমে ঈসাকে পূর্ণ ক্ষমতা সহকারে প্রকাশ্যে 'আল্লাহর পুত্রের' মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে, একথা সেন্টপলই ঘোষণা করেছিলেন। এ 'আল্লাহর পুত্র' শব্দটির মধ্যে নিশ্চিতভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে পুত্র হবার একটি ইংগিত নিহিত রয়েছে এবং সেন্টপল অন্য এক জায়গায় ঈসাকে 'আল্লাহর নিজের পুত্র' বলে সেই ইংগিতটিকে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। মসীহের জন্য 'বিধাতা বা প্রভু' বা ঈশ্বর শব্দটির আসল ধর্মীয় অর্থে ব্যবহার প্রথমে কে করেছিলেন, প্রথম খৃষ্টীয় দলটি, না সেন্টপল, এ বিষয়ের মীমাংসা করা এখন আর সম্ভবপর নয়। সম্ভবত প্রথমোক্ত দলটিই এর উদ্ভাবক। কিন্তু নিসন্দেহে সেন্টপলই এ সম্বোধনটির সর্বপ্রথম পূর্ণ অর্থে ব্যবহার শুরু করেন। তারপর 'ঈসা মসীহ' সম্পর্কে তিনি এমন অনেক চিন্তাধারা ও পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করেন যেগুলো প্রাচীন পবিত্র গ্রন্থাদিতে একমাত্র 'ঈশ্বর ইহওয়া' (আল্লাহ তাআলা'র) জন্য বলা হয়েছে। এভাবে নিজের বক্তব্যকে তিনি আরো বেশী সুস্পষ্ট করে তোলেন। এ সংগে মসীহকে তিনি আল্লাহর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মর্যাদার ক্ষেত্রে সমপর্যায়ভুক্ত করেন এবং ব্যাপক ও সাধারণ অর্থে তাঁকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করেন। তবুও বিভিন্ন দিক থেকে আল্লাহর সমপর্যায়ভুক্ত করে দেবার পরও সেন্টপল তাঁকে চূড়ান্তভাবে আল্লাহ বলতে বিরত থাকেন।"

ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার আর একজন প্রবন্ধকার রেভারেণ্ড জর্জ উইলিয়ম ফক্স তাঁর 'খৃষ্টবাদ' (Christianity) শীর্ষক প্রবন্ধে খৃষ্টীয় গীর্জার মৌলিক বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে লিখছেন ঃ

"ত্রিত্ববাদী বিশ্বাসের চিন্তাগত কাঠামো গ্রীক দেশীয়। এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে ইহুদী শিক্ষা। এদিক দিয়ে বিচার করলে এটি আমাদের জন্য একটি অদ্ভুত ধরনের যৌগিক। ধর্মীয় চিন্তাধারা বাইবেল থেকে উৎসারিত কিন্তু তা ঢেলে সাজানো হয়েছে এক অপরিচিত দর্শনের আকারে। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার পরিভাষা ইহুদী সূত্রে লাভ করা হয়েছে। শেষ পরিভাষাটি যীশু (ঈসা) নিজে খুব কমই কখনো কখনো ব্যবহার করেছিলেন। আর পল নিজেও এটিকে যেভাবে ব্যবহার করেছেন তাতে এর অর্থ সম্পূর্ণ অস্পষ্ট ছিল। তবুও ইহুদী সাহিত্যে এ শব্দটি ব্যক্তিত্বের রূপ গ্রহণ করার কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিল। কাজেই এ বিশ্বাসটির মৌল উপাদান ইহুদীবাদ থেকে গৃহীত (যদিও এ যৌগিকের অন্তরভুক্ত হবার আগেই এটি গ্রীক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল) এবং বিষয়টি নির্ভেজাল গ্রীকদেশীয়। যে প্রশ্নটির ভিত্তিতে এ বিশ্বাস গড়ে ওঠে সেটি কোন নৈতিক বা ধর্মীয় প্রশ্ন ছিল না। বরং সেটি ছিল আগাগোড়া একটি দার্শনিক প্রশ্ন। অর্থাৎ এ তিনটি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা সত্তার মধ্যে সম্পর্কের স্বরূপ কি? গীর্জা এ প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছে তা নিকিয়া কাউন্সিলে নির্ধারিত আকীদার মধ্যে সংযুক্ত হয়েছে। সেটি দেখার পর পরিষ্কার জানা যায়, ওটা পুরোপুরি গ্রীক চিন্তারই সমষ্টি।

এ প্রসংগে ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় 'চার্চের ইতিহাস' (Church History) শিরোনামে লিখিত অন্য একটি নিবন্ধের নিম্নোক্ত বক্তব্যটিও উল্লেখযোগ্য ঃ

"খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক শেষ হবার আগে মসীহ্‌কে সাধারণভাবে 'বাণী'র দৈহিক প্রকাশ হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছিল। তবুও অধিকাংশ খৃষ্টান মসীহর 'ইলাহ' হওয়ার স্বীকৃতি দেয়নি। চতুর্থ শতকে এ বিষয়টির ওপর তুমুল বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে গিয়েছিল। যার ফলে গীর্জার ভিত্ নড়ে উঠেছিল। অবশেষে ৩২৫ খৃষ্টাব্দে নিকিয়া কাউন্সিল মসীহ্‌কে সরকারীভাবে যথারীতি ইলাহ বা ঈশ্বর হিসেবে ঘোষণা করে। সে সাথে এটিকে খৃষ্টীয় আকীদা বলেও গণ্য করে এবং সুনির্দিষ্ট শব্দাবলী সমন্বয়ে সেটি রচনা করে। এরপরও কিছুকাল পর্যন্ত বিতর্ক চলতে থাকে। কিন্তু শেষ বিজয় হয় নিকিয়া কাউন্সিলের সিদ্ধান্তেরই। পূর্বে ও পশ্চিমে এ সিদ্ধান্তকে যেভাবে মেনে নেয়া হয় তাতে যেন একথা স্বীকৃতি লাভ করে যে, নির্ভুল আকীদা সম্পন্ন খৃষ্টান হতে হলে তাকে অবশ্যি এর ওপর ঈমান আনতে হবে। পুত্রকে 'ইলাহ' বলে মেনে নেবার সাথে সাথে 'পবিত্র আত্মাকে'ও ইলাহ বলে মেনে নেয়া হয়। তাকে ধর্মান্তর গ্রহণের মন্ত্র এবং প্রচলিত ঐতিহ্যসমূহের মধ্যে পিতা ও পুত্রের সাথে এক সারিতে জায়গা দেয়া হয়। এভাবে নিকিয়ায় মসীহর যে ধারণা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তার ফলে ত্রিত্ববাদ খৃষ্ট ধর্মের অবিচ্ছিন্ন অংগ গণ্য হয়েছে।

তারপর "পুত্রের 'ইলাহ' হবার তত্ত্বটি ঈসার ব্যক্তিসত্তায় রূপায়িত হয়েছিল"—এ দাবী আর একটি সমস্যার সৃষ্টি করে। চতুর্থ শতক এবং তার পরেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত এ নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকে। বিষয়টি ছিল, ঈসার ব্যক্তিত্বে ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্বের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল? ৪৫১ খৃষ্টাব্দে ক্যালসিডন কাউন্সিলে এর যে মীমাংসা হয়েছিল তা ছিল এই যে, ঈসার ব্যক্তি সত্তায় দু'টি পূর্ণাঙ্গ প্রকৃতি একত্র হয়েছে। একটি ঐশ্বরিক প্রকৃতি এবং অন্যটি মানবিক প্রকৃতি। উভয়টি একত্রে সংযুক্ত হবার পরও কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ছাড়াই প্রত্যেকের পৃথক বৈশিষ্ট অপরিবর্তিত রয়েছে। ৬৮০ খৃষ্টাব্দে কনষ্ট্যান্টিনোপলে অনুষ্ঠিত তৃতীয় কাউন্সিলে এর ওপর কেবল মাত্র এতটুকু বৃদ্ধি করা হয় যে, এ দু'টি প্রকৃতি নিজ নিজ পৃথক ইচ্ছারও অধিকারী। অর্থাৎ ঈসা একই সংগে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছার ধারক।..... এ অন্তরবর্তীকালে পশ্চিমী চার্চ 'গুনাহ' ও 'অনুগ্রহ' বিষয় দুটির প্রতিও বিশেষ নজর দেয়। 'নাজাত' বা 'মুক্তি'র ব্যাপারে আল্লাহর ভূমিকা কি এবং বান্দার ভূমিকা কি—এ প্রশ্নটি নিয়ে সেখানে দীর্ঘকাল আলোচনা চলতে থাকে। অবশেষে ৫২৯ খৃষ্টাব্দে উরিন্‌জের দ্বিতীয় কাউন্সিলে ..... এ মতবাদ গ্রহণ করা হয় যে, আদমের পৃথিবীতে নেমে আসার কারণে প্রত্যেকটি মানুষ এমন এক অবস্থার শিকার হয়েছে যার ফলে সে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করে নব জীবন ধারণ না করা পর্যন্ত নাজাত বা মুক্তির দিকে এক পাও অগ্রসর হতে পারে না। আর এ নব জীবন শুরু করার পরও যতক্ষণ না আল্লাহর অনুগ্রহ সার্বক্ষণিকভাবে তার সহায়ক থাকে ততক্ষণ সে সততা ও নেকীর অবস্থার মধ্যে টিকে থাকতে পারে না। আল্লাহর অনুগ্রহের এ সার্বক্ষণিক সাহায্য সে একমাত্র ক্যাথলিক চার্চের মাধ্যমেই লাভ করতে পারে।"

খৃষ্টীয় আলেমগণের এসব বর্ণনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, প্রথম দিকে যে জিনিসটি খৃষ্টীয় সমাজকে গোমরাহ করেছিল সেটি ছিল ভক্তি ও ভালবাসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি। এ বাড়াবাড়ির কারণে ঈসা আলাইহিস সালামের জন্য 'ঈশ্বর বা ইলাহ 'আল্লাহর

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى
ابْنِ مَرْيَمَ ۭ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ
عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ۭ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝ تَرٰى كَثِيْرًا
مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ
اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ۝

১১ রুকূ'

বনী ইসরাঈল জাতির মধ্য থেকে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তাদের ওপর দাউদ ও মারয়াম পুত্র ঈসার মুখ দিয়ে অভিসম্পাত করা হয়েছে। কারণ তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং বাড়াবাড়ি করতে শুরু করেছিল। তারা পরস্পরকে খারাপ কাজ করা থেকে বিরত রাখা পরিহার করেছিল,[১০২] তাদের গৃহীত সেই কর্মপদ্ধতি বড়ই জঘন্য ছিল। আজ তুমি তাদের মধ্যে এমন অনেক লোক দেখছো যারা (ঈমানদারদের মোকাবিলায়) কাফেরদের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করে। নিসন্দেহে তাদের প্রবৃত্তি তাদেরকে যে পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট। সে পরিণতি হলো, আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং তারা চিরন্তন শাস্তি ভোগ করবে।

পুত্র' শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়। আল্লাহর গুণাবলী তাঁর সাথে সংযুক্ত করা হয় এবং তথাকথিত কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত সংক্রান্ত আকীদা উদ্ভাবন করা হয়। অথচ হযরত ঈসার শিক্ষাবলীতে এসব বিষয়ের কোন সামান্যতম অবকাশও ছিল না। তারপর খৃষ্টবাদীদের গায়ে যখন দর্শনের বাতাস লাগলো তখন তারা এ প্রাথমিক গোমরাহী অনুধাবন করে তার খপ্পর থেকে বাঁচার চেষ্টা না করে উলটো নিজেদের পূর্ববর্তী নেতৃবৃন্দের ভুলগুলোকেই মেনে চলার জন্য সেগুলোর ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলো এবং ঈসা আলাইহিস সালামের আসল শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ না করে নিছক দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রের সহায়তায় আকীদার পর আকীদা উদ্ভাবন করে চললো। খৃষ্টবাদীদের এ গোমরাহীর বিরুদ্ধেই কুরআনের এ আয়াতগুলোতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

১০২. প্রত্যেক জাতির বিকৃতি শুরু হয় কয়েক ব্যক্তি থেকে। জাতির সামগ্রিক বিবেক জাগ্রত থাকলে সাধারণ জনমত ঐ বিপথগামী লোকদেরকে দমিয়ে রাখে এবং জাতি সামগ্রিকভাবে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু জাতি যদি ঐ ব্যক্তিগুলোর ব্যাপারে উপেক্ষা-অবহেলা ও উদাসীনতার নীতি অবলম্বন করে এবং দুষ্কৃতকারীদের তিরস্কার ও নিন্দা করার পরিবর্তে তাদেরকে সমাজে খারাপ কাজ করার জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়,

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ
أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨١﴾ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ
عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ وَلَتَجِدَنَّ
أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ
بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾

যদি এ লোকেরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ, নবী এবং নবীর ওপর যা নাযিল হয়েছিল তা মেনে নিতো তাহলে কখনো (ঈমানদারদের মোকাবিলায়) কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতো না।[১০৩] কিন্তু তাদের অধিকাংশ আল্লাহর আনুগত্য ত্যাগ করেছে।

ঈমানদারদের সাথে শত্রুতার ক্ষেত্রে তুমি ইহুদী ও মুশরিকদের পাবে সবচেয়ে বেশী উগ্র। আর ঈমানদারদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে নিকটতম পাবে তাদেরকে যারা বলেছিল আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। এর কারণ হচ্ছে, তাদের মধ্যে ইবাদাতকারী আলেম, সংসার বিরাগী দরবেশ পাওয়া যায়, আর তাদের মধ্যে আত্মগরিমা নেই।

তাহলে যে বিকৃতি প্রথমে কয়েক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা ধীরে ধীরে সমগ্র জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বনী ইসরাঈল জাতির বিকৃতি এভাবেই হয়েছে।

হযরত দাউদ ও হযরত ঈসা বনী ইসরাঈলের ওপর যে অভিসম্পাত বা লানত করেছেন তা জানার জন্য দেখুন যবূর (গীত সংহিতা ১০ ও ৫০ এবং মথি ২৩।)

১০৩. এর অর্থ হচ্ছে, যারা আল্লাহ, নবী ও আসমানী কিতাবকে মেনে নেয় তারা স্বাভাবিকভাবে মুশরিকদের মোকাবিলায় এমন লোকদের প্রতি বেশী সহানুভূতিশীল হয়, যাদের সাথে ধর্মের ব্যাপারে বিরোধ থাকলেও তারা তাদেরই মতো আল্লাহ ও আল্লাহ প্রেরিত অহির ধারাবাহিকতা ও রিসালাতকে মানে। কিন্তু এ ইহুদীরা এক অদ্ভুত ধরনের আহ্‌লি কিতাব। তাওহীদ ও শিরকের যুদ্ধে এরা প্রকাশ্যে মুশরিকদের সাথে সহযোগিতা করছে। নবুওয়াতের স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির লড়াইয়ে এদের সহানুভূতি রয়েছে নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের প্রতি। এরপরও এরা লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে এ দাবী করে বেড়াচ্ছে যে, তারা নবী ও কিতাব মানে।

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ
مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ
الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ
يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٦﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

যখন তারা এ কালাম শোনে, যা রসূলের ওপর নাযিল হয়েছে, তোমরা দেখতে পাও, সত্যকে চিনতে পারার কারণে তাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। তারা বলে ওঠে, "হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, সাক্ষদাতাদের মধ্যে আমাদের নাম লিখে নাও।" আর তারা আরো বলে, "আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান কেন আনবো না এবং যে সত্য আমাদের কাছে এসেছে তাকে কেন মেনে নেবো না—যখন আমরা এ ইচ্ছা পোষণ করে থাকি যে, আমাদের রব যেন আমাদের সৎ ও সত্যনিষ্ঠ লোকদের অন্তরভুক্ত করেন। তাদের এ উক্তির কারণে আল্লাহ তাদেরকে এমনসব জান্নাত দান করেছেন যার নিম্নদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হয় এবং তারা সেখানে থাকবে চিরকালের জন্য। সৎ-কর্মনীতি অবলম্বনকারীদের জন্য এ প্রতিদান। আর যারা আমার আয়াত মানতে অস্বীকার করেছে ও সেগুলোকে মিথ্যা বলেছে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

১২ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যেসব পবিত্র জিনিস হালাল করেছেন সেগুলো হারাম করে নিয়ো না।[১০৪] আর সীমালংঘন করো না।[১০৫] সীমা-লংঘনকারীদেরকে আল্লাহ ভীষণভাবে অপছন্দ করেন। আল্লাহ তোমাদের যে হালাল ও পবিত্র রিযিক দিয়েছেন তা থেকে পানাহার করো এবং সে আল্লাহর নাফরমানী থেকে দূরে থাকো যার ওপর তোমরা ঈমান এনেছো।

১০৪. এ আয়াতে দু'টি কথা বলা হয়েছে। এক, তোমরা নিজেরাই কোন জিনিস হালাল ও হারাম গণ্য করার অধিকারী হয়ে বসো না। আল্লাহ যেটি হালাল করেছেন সেটি হালাল এবং আল্লাহ যেটি হারাম করেছেন সেটি হারাম। নিজেদের ক্ষমতা বলে তোমরা নিজেরা যদি কোন হালালকে হারাম করে ফেলো তাহলে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে তোমরা নফসের ও প্রবৃত্তির আইনের অনুগত গণ্য হবে। দুই, খৃষ্টীয় সন্যাসী, হিন্দু যোগী, বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ইশরাকী তাসাউফ পন্থীদের মতো বৈরাগ্য, সংসার বিমুখতা ও দুনিয়ার বৈধ স্বাদ আস্বাদন পরিহার করার পদ্ধতি অবলম্বন করো না। ধর্মীয় মানসিকতার অধিকারী সৎস্বভাব সম্পন্ন লোকদের মধ্যে সাধারণভাবে এ প্রবণতা দেখা গেছে যে, শরীর ও প্রবৃত্তির অধিকার আদায় ও চাহিদা পূরণ করাকে তারা আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় মনে করে থাকেন। তাদের ধারণা, নিজেকে কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করা, নিজের প্রবৃত্তিকে পার্থিব ভোগ ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা এবং দুনিয়ার জীবন যাপনের বিভিন্ন উপায়-উপকরণের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা মূলত একটি মহৎ কাজ এবং এ ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যেতে পারে না। সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যেও কেউ কেউ এ মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারলেন, কোন কোন সাহাবী অংগীকার করেছেন ঃ তারা সর্বক্ষণ রোযা রাখবেন, রাতে বিছানায় ঘুমাবেন না বরং সারা রাত জেগে ইবাদাত করবেন, গোশ্ত, তেল, চর্বি, ঘি ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না, নারীদের সাথে সম্পর্ক রাখবেন না। একথা শুনে তিনি একটি ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন ঃ "আমাকে এ ধরনের কাজ করার হুকুম দেয়া হয়নি। তোমাদের প্রবৃত্তিরও তোমাদের ওপর অধিকার আছে। রোযা রাখো আবার পানাহারও করো। রাতে জেগে ইবাদাত করো আবার নিদ্রাও যাও। আমাকে দেখো। আমি ঘুমাই আবার রাত জেগে ইবাদাতও করি। রোযা রাখি আবার কখনো রাখিও না। গোশতও খাই আবার ঘিও খাই। কাজেই যে ব্যক্তি আমার রীতিনীতি পছন্দ করে না সে আমার অন্তরভুক্ত নয়।" তারপর আবার বললেন ঃ "লোকদের কি হয়ে গেছে, তারা নারী, ভাল খাবার, সুগন্ধি, নিদ্রা ও দুনিয়ার স্বাদ আনন্দ নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছে? আমি তোমাদের পাদ্রী ও সংসারত্যাগী হয়ে যাবার শিক্ষা দেইনি। আমি যে দীনের প্রচলন করেছি তাতে নারী ও গোশ্ত থেকে দূরে থাকার কোন অবকাশ নেই এবং সেখানে সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্যবাদী জীবন যাপনেরও কোন সুযোগ নেই আত্মসংযমের জন্য আমার এখানে আছে রোযা। সংসারত্যাগী জীবনের সমস্ত ফায়দা এখানে লাভ করা হয় জিহাদের মাধ্যমে। আল্লাহর বন্দেগী করো। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। হজ্জ ও উমরাহ করো। নামায কায়েম করো, যাকাত দাও ও রমযানের রোযা রাখো। তোমাদের আগে যারা ধ্বংস হয়েছে তারা এ জন্য ধ্বংস হয়েছে যে, তারা নিজেদের ওপর কঠোরতা আরোপ করেছিল। আর যখন তারা নিজেরা নিজেদের ওপর কঠোরতা আরোপ করলো তখন আল্লাহও তাদের ওপর কঠোরতা আরোপ করলেন। তোমরা গীর্জায় ও খানকাহে যাদেরকে দেখছো এরা হচ্ছে তাদেরই অবশিষ্ট উত্তরসূরী।"

এ প্রসঙ্গে কোন কোন রেওয়ায়াত থেকে এতদূরও জানা যায় যে, একজন সাহাবীর ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারলেন, তিনি দীর্ঘদিন থেকে নিজের স্ত্রী সান্নিধ্যে যাচ্ছেন না এবং রাত দিন ইবাদাতে মশগুল থাকছেন। তিনি তাকে ডেকে হুকুম দিলেন, এখনি তোমার স্ত্রীর কাছে যাও। সাহাবী জবাব দিলেন, আমি রোযা

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ
الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ
اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۭ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ۭ ذٰلِكَ
كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۭ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ
لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

তোমরা যে সমস্ত অর্থহীন কসম খেয়ে ফেলো। সে সবের জন্য আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করেন না। কিন্তু তোমরা জেনে বুঝে যেসব কসম খাও সেগুলোর ওপর তিনি অবশ্যি তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। (এ ধরনের কসম ভেঙে ফেলার) কাফ্‌ফারা হচ্ছে, দশ জন মিসকিনকে এমন মধ্যম পর্যায়ের আহার দান করো যা তোমরা নিজেদের সন্তানদের খেতে দাও অথবা তাদেরকে কাপড় পরাও বা একটি গোলামকে মুক্ত করে দাও। আর যে ব্যক্তি এর সামর্থ রাখে না সে যেন তিন দিন রোযা রাখে। এ হচ্ছে তোমাদের কসমের কাফ্‌ফারা যখন তোমরা কসম খেয়ে তা ভেঙে ফেলো।[১০৬] তোমাদের কসমসমূহ সংরক্ষণ করো।[১০৭] এভাবে আল্লাহ নিজের বিধান তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট করেন, হয়তো তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

রেখেছি। জবাব দিলেন, রোযা ভেঙ্গে ফেলো এবং স্ত্রীর কাছে যাও। হযরত উমরের আমলে জনৈকা মহিলা অভিযোগ করলেন, আমার স্বামী সারাদিন রোযা রাখেন, রাতে ইবাদাত করেন এবং আমার সাথে কোন সম্পর্ক রাখেন না। হযরত উমর (রা) তার মামলার নিষ্পত্তির জন্য প্রখ্যাত তাবেঈ বুযর্গ কা'ব ইবনে সাওরুল আযদিকে নিযুক্ত করলেন। তিনি ফায়সালা দিলেন, এ মহিলার স্বামী তিন রাত ইচ্ছামতো ইবাদাত করতে পারেন কিন্তু চতুর্থ রাতে অবশ্যি তার স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

১০৫. সীমালংঘন করার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। হালালকে হারাম করা এবং আল্লাহর নির্ধারিত পাক–পবিত্র জিনিসগুলো থেকে এমনভাবে দূরে সরে থাকা যেন সেগুলো নাপাক, এটাও এক ধরনের বাড়াবাড়ি। তারপর পাক পবিত্র জিনিসগুলো অযথা ও অপ্রয়োজনে ব্যয় করা, অপচয় ও অপব্যয় করা এবং প্রয়োজনের তুলনায় বেশী ও প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করাও এক ধরনের বাড়াবাড়ি। আবার হালালের সীমা পেরিয়ে হারামের সীমানায় প্রবেশ করাও বাড়াবাড়ি। এ তিনটি কাজই আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়।

১০৬. যেহেতু কোন কোন লোক হালাল জিনিসগুলো নিজেদের ওপর হারাম করে নেবার কসম খেয়েছিল তাই এ প্রসংগে আল্লাহ এ কসমের বিধানও বর্ণনা করে দিয়েছেন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

হে ঈমানদারগণ! এ মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শরসমূহ[১০৮] এ সমস্তই হচ্ছে ঘৃণ্য শয়তানী কার্যকলাপ। এগুলো থেকে দূরে থাকো, আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে।[১০৯]

সে বিধান হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ যদি কোন ব্যক্তির মুখ থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে কসম শব্দ বের হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তা পূর্ণ করার তেমন কোন প্রয়োজন নেই। কারণ এ ধরনের কসমের জন্য পাকড়াও করা হবে না। আর যদি কেউ জেনে বুঝে কসম খেয়ে থাকে..... সে যেন তা ভেঙে ফেলে এবং এ জন্য কাফ্‌ফারা আদায় করে। কারণ যে ব্যক্তি কোন গুনাহের কাজ করার কসম খেয়ে বসে তার নিজের কসম পূর্ণ করা উচিত নয়। (দেখুন, সূরা বাকারা, টীকা ২৪৩, ২৪৪। এ ছাড়া কাফ্‌ফারার ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আন নিসা, টীকা ১২৫)

১০৭. কসম সংরক্ষণ করার কয়েকটি অর্থ হয়। এক, কসমকে সঠিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে। আজেবাজে অর্থহীন কথায় ও গুনাহের কাজে কসম খাওয়া যাবে না। দুই, কোন বিষয় কসম খেলে সেটা মনে রাখতে হবে, নিজের গাফলতির কারণে তা ভুলে গিয়ে তার বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে না। তিন, কোন সঠিক বিষয়ে জেনে বুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে কসম খেলে তা অবশ্যি পূর্ণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধাচরণ করা হলে অবশ্যি কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে।

১০৮. মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শরের ব্যাখ্যার জন্য সূরা মায়েদার ১২ ও ১৪ টীকা দেখুন। এ প্রসংগে জুয়ার ব্যাখ্যাও ১৪ টীকায় পাওয়া যাবে। যদিও ভাগ্য নির্ণায়ক শর (আযলাম) স্বভাবতই এক ধরনের জুয়া তবুও তাদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যটি হচ্ছে, আরবী ভাষায় 'আযলাম' বলা হয় এমন ধরনের ফাল গ্রহণ ও শর নিক্ষেপ করাকে যার সাথে মুশরিকী আকীদা–বিশ্বাস ও কুসংস্কার জড়িত থাকে। আর 'মাইসির' (জুয়া) শব্দটি এমন সব খেলা ও কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যেখানে আকস্মিক ঘটনাকে অর্থোপার্জন, ভাগ্য পরীক্ষা এবং অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী বন্টনের মাধ্যমে পরিণত করা হয়।

১০৯. এ আয়াতে চারটি জিনিস চূড়ান্তভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এক, মদ। দুই, জুয়া। তিন, এমন সব জায়গা যেগুলোকে আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ইবাদাত করার অথবা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য কুরবানী করার ও নজরানা দেবার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। চার, ভাগ্য নির্ণায়ক শর। শেষের তিনটির ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। মদ সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান নীচে দেয়া হলো ঃ

মদ হারাম হওয়া প্রসংগে ইতিপূর্বে আরো দু'টি নির্দেশ এসেছিল। সে দু'টি আলোচিত হয়েছে সূরা বাকারার ২১৯ আয়াতে এবং সূরা আন নিসার ৪৩ আয়াতে। এরপর এ তৃতীয় নির্দেশটি আসার আগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক ভাষণে লোকদেরকে

সতর্ক করে দিয়ে বলেন ঃ মহান আল্লাহ মদ অত্যন্ত অপছন্দ করেন। মদ চিরতরে হারাম হয়ে যাবার নির্দেশ জারি হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। কাজেই যাদের কাছে মদ আছে তাদের তা বিক্রি করে দেয়া উচিত। এর কিছুদিন পর এ আয়াত নাযিল হয়। এবার তিনি ঘোষণা করেন, এখন যাদের কাছে মদ আছে তারা তা পান করতে পারবে না এবং বিক্রিও করতে পারবে না বরং তা নষ্ট করে দিতে হবে। কাজেই তখনই মদীনার সমস্ত গলিতে মদ ঢেলে দেয়া হয়। অনেকে জিজ্ঞেস করেন, এগুলো ফেলে না দিয়ে আমরা ইহুদীদেরকে তোহ্‌ফা হিসেবে দিই না কেন? জবাবে নবী করীম (স) বলেন, "যিনি একে হারাম করেছেন তিনি একে তোহফা হিসেবে দিতেও নিষেধ করেছেন।" কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেন, আমরা মদকে সিরকায় পরিবর্তিত করে দিই না কেন? তিনি এটিও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং নির্দেশ দেন ঃ "না, ওগুলো ঢেলে দাও।" এক ব্যক্তি অত্যন্ত জোর দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, ওষুধ হিসেবে ব্যবহারের নিশ্চয়ই অনুমতি আছে? জবাব দেন ঃ "না, এটা ওষুধ নয় বরং রোগ।" আর একজন আরয করেন, "হে আল্লাহর রসূল! আমরা এমন এক এলাকার অধিবাসী যেখানে শীত অত্যন্ত বেশী এবং আমাদের পরিশ্রমও অনেক বেশী করতে হয়। আমরা মদের সাহায্যে ক্লান্তি ও শীতের মোকাবিলা করি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা যা পান করো তা কি নেশা সৃষ্টি করে? লোকটি ইতিবাচক জবাব দেন। তখন তিনি বলেন, তাহলে তা থেকে দূরে থাকো। লোকটি তবুও বলেন, কিন্তু এটা তো আমাদের এলাকার লোকেরা মানবে না। জবাব দেন, "তারা না মানলে তাদের সাথে যুদ্ধ করো।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

لَعَنَ اللّٰهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ -

"আল্লাহ লানত বর্ষণ করেছেন (১) মদের ওপর, (২) মদ পানকারীর ওপর, (৩) মদ পরিবেশনকারীর ওপর, (৪) মদ বিক্রেতার ওপর, (৫) মদ ক্রয়কারীর ওপর, (৬) মদ উৎপাদন ও শোধনকারীর ওপর, (৭) মদ উৎপাদন ও শোধনের ব্যবস্থাপকের ওপর, (৮) মদ বহনকারীর ওপর এবং (৯) মদ যার কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তার ওপর।"

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন দস্তরখানে আহার করতে নিষেধ করেছেন যেখানে মদ পান করা হচ্ছে। প্রথম দিকে তিনি যেসব পাত্রে মদ তৈরী ও পান করা হতো সেগুলোর ব্যবহারও নিষিদ্ধ করে দেন। পরে মদ হারাম হবার হুকুমটি পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তিনি পাত্রগুলো ব্যবহার করার অনুমতি দেন।

'খাম্‌র' শব্দটি আরবীতে মূলত আংগুর থেকে তৈরী মদের জন্য ব্যবহৃত হতো পরোক্ষ অর্থে গম, যব, কিসমিস, খেজুর ও মধু থেকে উৎপাদিত মদকেও খামর বলা হতো। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এ নির্দেশকে নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেকটি

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم
مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ
فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾

শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। তাহলে তোমরা কি এসব থেকে বিরত থাকবে? আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা মেনে চলো এবং (নিষিদ্ধ কাজ থেকে) বিরত থাকো। কিন্তু যদি তোমরা আদেশ অমান্য করো, তাহলে জেনে রাখো, আমার রসূলের প্রতি শুধুমাত্র সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ পৌঁছিয়ে দেবারই দায়িত্ব ছিল।

যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করছে, তারা পূর্বে যা কিছু পানাহার করেছিল সে জন্য তাদেরকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না, তবে এ জন্য শর্ত হচ্ছে, তাদেরকে অবশ্যি ভবিষ্যতে যেসব জিনিস হারাম করা হয়েছে সেগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে, ঈমানের ওপর অবিচল থাকতে হবে এবং ভাল কাজ করতে হবে তারপর যে যে জিনিস থেকে বিরত রাখা হয় তা থেকে তাদের বিরত থাকতে হবে এবং আল্লাহর যেসব হুকুম নাযিল হয় সেগুলো মেনে চলতে হবে। অতপর আল্লাহভীতি সহকারে সদাচরণ অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহ সদাচারীদের ভালবাসেন।

জিনিসের ওপর ব্যাপ্ত করে দিয়েছেন। তিনি হাদীসে স্পষ্ট বলেছেন ঃ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "প্রত্যেকটি নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস মদ এবং প্রত্যেকটি নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু হারাম।" তিনি আরো বলেছেন ঃ

كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ "যে কোন পানীয় নেশা সৃষ্টি করলে তা হারাম।।"

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ
وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ
فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٩٤﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ
وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ
بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًۢا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ
اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ۗ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

১৩ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ এমন শিকারের মাধ্যমে তোমাদের কঠিন পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করবেন যা হবে একেবারে তোমাদের হাত ও বর্শার নাগালের মধ্যে, তোমাদের মধ্য থেকে কে তাঁকে না দেখেও ভয় করে, তা দেখার জন্য। কাজেই এ সতর্কবাণীর পর যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করলো তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। হে ঈমানদারগণ! ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করো না।[১১০] আর তোমাদের কেউ যদি জেনে বুঝে এমনটি করে বসে, তাহলে যে প্রাণীটি সে মেরেছে গৃহপালিত প্রাণীর মধ্য থেকে তারই সমপর্যায়ের একটি প্রাণী তাকে নযরানা দিতে হবে, যার ফায়সালা করবে তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি। আর এ নযরানা কাবা ঘরে পৌঁছাতে হবে। অথবা এ গুনাহের কাফ্ফারা হিসেবে কয়েক জন মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে হবে। অথবা সে অনুপাতে রোযা রাখতে হবে,[১১১] যাতে সে নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। পূর্বে যা কিছু হয়ে গেছে সেসব আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। কিন্তু এখন যদি কেউ সে কাজের পুনরাবৃত্তি করে তাহলে আল্লাহ তার বদলা নেবেন। আল্লাহ সবার ওপর বিজয়ী এবং তিনি বদলা নেবার ক্ষমতা রাখেন।

তিনি আরো বলেন ঃ وَاَنَا اَنْهٰى مِنْ كُلِّ مُسْكِرٍ "আর আমি প্রত্যেকটি নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করছি।"

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জুমার খুতবায় মদের সংজ্ঞা এভাবে দেন ঃ اَلْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ "মদ বলতে এমন সব জিনিসকে বুঝায় যা বুদ্ধিকে বিকৃত করে ফেলে।"

এ ছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মূলনীতি বর্ণনা করেছেন ঃ مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ "যে জিনিসের বেশী পরিমাণ নেশা সৃষ্টি করে তার সামান্য পরিমাণও হারাম।" তিনি আরো বলেছেন ঃ

مَا اَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْأُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ

"যে জিনিসের বড় এক পাত্র পরিমাণ পান করলে নেশা হয় তার ক্ষুদ্র পরিমাণ পান করাও হারাম।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মদ পানকারীর জন্য বিশেষ কোন শাস্তি নির্ধারিত ছিল না। যে ব্যক্তিকে এ অপরাধে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হতো তাকে কিল, থাপ্পড়, জুতা, লাথি, গিঁট বাঁধা পাকানো কাপড় ও খেজুরের ছড়া দিয়ে পিটানো হতো। রসূলের আমলে এ অপরাধে বড় জোর চল্লিশ ঘা মারা হতো। হযরত আবু বকরের (রা) আমলে ৪০ ঘা বেত্রাঘাত করা হতো। হযরত উমরের (রা) আমলেও শুরুতে ৪০ ঘা বেত মারা হতো। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন লোকেরা এ অপরাধ অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকছে না তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শক্রমে এ অপরাধের দণ্ড হিসেবে ৮০টি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেন। ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানীফা এবং একটি বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম শাফেঈও এ শাস্তিকেই মদ পানের দণ্ড হিসেবে গণ্য করেছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং অন্য একটি বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম শাফেঈ ৪০ বেত্রাঘাতকেই এর শাস্তি হিসেবে মেনে নিয়েছেন। হযরত আলীও (রা) এটিই পছন্দ করেছেন।

শরীয়াতের দৃষ্টিতে মদের প্রতি নিষেধাজ্ঞার এ বিধানটিকে শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিষ্ঠিত করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্যের অন্তরভুক্ত। হযরত উমরের শাসনামলে বনী সাকীফের রুয়াইশিদ নামক এক ব্যক্তির একটি দোকান পুড়িয়ে দেয়া হয়। কারণ সে লুকিয়ে লুকিয়ে মদ বিক্রি করতো। আর একবার হযরত উমরের হুকুমে পুরো একটি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয়। কারণ সেই গ্রামে গোপনে মদ উৎপাদন ও চোলাই করা হতো এবং মদ বেচাকেনার কারবারও সেখানে চলতো।

১১০. ইহরাম বাঁধা অবস্থায় নিজে শিকার করা বা অন্যকে শিকারে সাহায্য করা উভয়টিই নিষিদ্ধ। এ ছাড়াও ইহরাম বাঁধা (মুহরিম) ব্যক্তির জন্য কোন শিকার করে আনা হলে তাও তার জন্য খাওয়া জায়েয নয়। তবে কোন ব্যক্তি নিজে যদি নিজের জন্য শিকার করে থাকে এবং সেখান থেকে মুহরিমকে তোহফা হিসেবে কিছু দিয়ে দেয় তাহলে তা খাওয়ায় কোন ক্ষতি নেই। হিংস্র পশু এ বিধানের আওতার বাইরে। সাপ, বিচ্ছু, পাগলা কুকুর এবং মানুষের ক্ষতি করে এমন সব পশু ইহরাম অবস্থায় মারা যেতে পারে।

১১১. কোন্ ধরনের পশু হত্যা করলে কতজন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে বা ক'টি রোযা রাখতে হবে, এর ফায়সালাও করবেন দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি।

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ
عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾
جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾

তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার এবং তা খাওয়া হালাল করে দেয়া হয়েছে।[১১২] যেখানে তোমরা অবস্থান করবে সেখানে তা খেতে পারো এবং কাফেলার জন্য পাথেয় হিসেবে নিয়ে যেতেও পার। তবে যতক্ষণ তোমরা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় থাকো ততক্ষণ তোমাদের জন্য স্থলভাগের শিকার হারাম করে দেয়া হয়েছে। কাজেই আল্লাহর নাফরমানী করা থেকে দূরে থাকো। তোমাদের সবাইকে ঘেরাও করে তাঁর সামনে হাযির করা হবে।

আল্লাহ পবিত্র কাবা ঘরকে মানুষের জন্য (সমাজ জীবন) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিণত করেছেন আর হারাম মাস, কুরবানীর পশু ও গলায় মালা পরা পশুগুলোকেও (এ কাজে সহায়ক বানিয়ে দিয়েছেন)[১১৩] যাতে তোমরা জানতে পারো যে, আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত অবস্থা জানেন এবং তিনি সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন।[১১৪]

১১২. যেহেতু সামুদ্রিক সফরে অনেক সময় পাথেয় শেষ হয়ে যায় এবং আহার সংগ্রহের জন্য জলজ প্রাণী শিকার করা ছাড়া আর কোন পথ থাকে না, তাই সামুদ্রিক শিকার হালাল করা হয়েছে।

১১৩. আরবে কাবা ঘরের মর্যাদা কেবলমাত্র একটি ইবাদাতগৃহ হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত ছিল না বরং নিজের কেন্দ্রীয় অবস্থান ও পবিত্রতম ভাবমূর্তির কারণে এরই ওপর সারা দেশের অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক জীবনধারায় নির্ভরশীল ছিল। হজ্জ ও উমরাহর জন্য সারাদেশ কাবা ঘরের দিকে ধাবিত হতো। হজ্জ উপলক্ষে এ সম্মিলনের কারণে বিশৃংখল ও বিক্ষিপ্ত আরবদের মধ্যে একটি ঐক্য সূত্র সৃষ্টি হতো। বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রের লোকেরা নিজদের মধ্যে তামাদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতো। কাব্য সম্মেলন ও কবিতা প্রতিযোগিতার ফলে তাদের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধিত হতো। বাণিজ্যিক লেনদেনের ফলে সারাদেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূর্ণ হতো। হারাম মাসগুলোর কারণে আরবরা বছরের এক-তৃতীয়াংশ সময় লাভ করতো শান্তি ও নিরাপত্তার

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٨﴾ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ
اِلَّا الْبَلٰغُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٩٩﴾ قُلْ لَّا يَسْتَوِى
الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِى
الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٠﴾

জেনে রাখো, আল্লাহ শাস্তি দানের ব্যাপারে যেমন কঠোর তেমনি তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়ও। রসূলের ওপর কেবলমাত্র বাণী পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্বই অর্পিত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সমস্ত অবস্থাই আল্লাহ জানেন। হে নবী! এদেরকে বলে দাও, পবিত্র ও অপবিত্র সমান নয়, অপবিত্রের আধিক্য তোমাদের যতই চমৎকৃত করুক না কেন।[১১৫] কাজেই হে বুদ্ধিমানেরা! আল্লাহর নাফরমানী করা থেকে দূরে থাকো আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে।

জন্য। এ সময় তাদের কাফেলা দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত অবাধে চলাফেরা করতো। কুরবানীর পশু ও বিচিত্র বর্ণের ঝলমলে মালা জড়ানো পশু দলের উপস্থিতিও তাদের এ চলাফেরায় বিরাট সাহায্য যোগাতো। কারণ মানত ও নযরানার আলামত হিসেবে যেসব পশুর গলায় ঝলমলে মালা শোভা পেতো তাদের দেখে ভক্তিতে আরবদের মাথা নত হয়ে আসতো। এ সময় কোন লুটেরা আরব গোত্র তাদের ওপর আক্রমণ চালাবার দুঃসাহস করতো না।

১১৪. অর্থাৎ এ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চিন্তা করলে তোমরা নিজেরাই তোমাদের দেশের অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক জীবনে এর একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ পেয়ে যাবে যে, আল্লাহ তাঁর নিজের সৃষ্টির কল্যাণ ও প্রয়োজন সম্পর্কে কত গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং নিজের এক একটি বিধানের সাহায্যে তিনি মানব জীবনের বিভিন্ন বিভাগকে কত ব্যাপকভাবে উপকৃত করছেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে অশান্তি ও অরাজকতার মধ্য দিয়ে যে শত শত বছর অতিবাহিত হয়েছে, সে সময় তোমরা নিজেরাই নিজেদের স্বার্থ ও প্রয়োজন সম্পর্কে অবগত ছিলে না। তখন তোমরা নিজেদের ধ্বংস সাধনের নেশায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের প্রয়োজন জানতেন। তিনি শুধুমাত্র কাবাঘরকে তোমাদের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে তোমাদের জন্য এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন যার ফলে তোমাদের জাতীয় জীবন সুরক্ষিত হয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য অসংখ্য বিষয় বাদ দিয়ে যদি শুধুমাত্র এ একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করো তাহলে তোমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাবে যে, আল্লাহ তোমাদের যে বিধান দিয়েছেন তার আনুগত্য করার মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এর মধ্যে তোমাদের জন্য এমন সব কল্যাণ রয়েছে যেগুলো উপলব্ধি করার ক্ষমতা তোমাদের নেই এবং নিজেদের হাজারো চেষ্টা সাধনা দ্বারাও সেগুলোকে বাস্তবে রূপায়িত করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ
وَاِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ۭ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ۭ وَاللّٰهُ
غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾
مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَاۗىِٕبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۭ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১৪ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! এমন কথা জিজ্ঞেস করো না যা তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দেয়া হলে তোমাদের খারাপ লাগবে।[১১৬] তবে কুরআন নাযিলের সময় যদি তোমরা সেসব বিষয়ে জিজ্ঞেস করো তাহলে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে। এ পর্যন্ত তোমরা যা কিছু করেছো, আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন। তিনি ক্ষমাশীল ও সহনশীল। তোমাদের পূর্বে একটি দল এ ধরনের প্রশ্ন করেছিল। তারপর সেসব কথার জন্যই তারা কুফরীতে লিপ্ত হয়েছিল।[১১৭]

আল্লাহ কোন 'বাহীরা', 'সায়েবা', 'অসীলা' বা হাম নির্ধারণ করেননি[১১৮] কিন্তু এ কাফেররা আল্লাহর ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে এবং তাদের অধিকাংশই জ্ঞানহীন (কারণ তারা এ ধরনের কাল্পনিক বিষয় মেনে নিচ্ছে)।

১১৫. এ আয়াতটি মূল্যবোধ ও মূল্যমানের এমন একটি মানদণ্ড পেশ করে, যা স্থূলদর্শী মানুষের মানদণ্ড থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। স্থূলদর্শীর দৃষ্টিতে পাঁচ টাকার তুলনায় একশ টাকার দাম অবশ্যি অনেক বেশী। কারণ একদিকে পাঁচ টাকা আর একদিকে একশ টাকা। কিন্তু এ আয়াতটি বলছে, যদি আল্লাহর নাফরমানী করে একশ টাকা লাভ করা হয় তাহলে তা নাপাক ও অপবিত্র। অন্যদিকে আল্লাহর হুকুম পালনের আওতায় যদি পাঁচ টাকা লাভ করা হয় তাহলে তা পাক ও পবিত্র। আর অপবিত্রের পরিমাণ যত বেশীই হোক না কেন তা কোন দিন পবিত্রের সমান হতে পারবে না। আবর্জনার একটি স্তূপের তুলনায় এক ফোঁটা আতরের মূল্য ও মর্যাদা অনেক বেশী। এক পুকুর ভর্তি পেশাবের চাইতে সামান্য পরিমাণের পাক পবিত্র পানির মূল্য বেশী। কাজেই একজন যথার্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তির অবশ্যি হালাল জিনিস নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত, আপাত দৃষ্টিতে তার পরিমাণ যতই সামান্য হোক না কেন এবং হারামের দিকে কোন অবস্থাতেই হাত বাড়ানো উচিত নয়, বাহ্যত তা যতই বিপুল পরিমাণ ও যতই আড়ম্বরপূর্ণ হোক না কেন।

১১৬. কোন কোন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অদ্ভুত ধরনের বিভিন্ন প্রশ্ন করতো এ প্রশ্নগুলোর সাথে দীনের কোন প্রয়োজন জড়িত থাকতো না এবং দুনিয়ার কোন প্রয়োজনের সাথেও এর সম্পর্ক থাকতো না। যেমন একবার এক ব্যক্তি প্রকাশ্য জন-সমাবেশে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, "আমার আসল পিতা কে?" এমনিভাবে অনেক লোক শরীয়াতের বিধানের ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করতো এবং এভাবে অনর্থক জিজ্ঞাসাবাদ করে এমন সব বিষয় নির্ধারণ করতে চাইতো যা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ও সংগত কারণেই শরীয়াতের বিধানদাতা নিজেই অনির্ধারিত রেখে দিয়েছেন। যেমন কুরআনে সংক্ষেপে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, হজ্জ তোমাদের ওপর ফরয করা হয়েছে। এক ব্যক্তি এ নির্দেশ শোনার সাথে সাথেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, "এ কি প্রত্যেক বছরে ফরয করা হয়েছে? তিনি এর কোন জবাব দিলেন না? ঐ ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করলো। তিনি এবারও চুপ করে রইলেন। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন ঃ "তোমার প্রতি আফসোস, আমার মুখ থেকে হাঁ শব্দ বের হয়ে গেলে তোমাদের জন্য প্রতি বছর হজ্জ করা ফরয হয়ে যাবে। তখন তোমরাই তা মেনে চলতে পারবে না, ফলে নাফরমানি করতে থাকবে।" এ ধরনের সমস্ত অর্থহীন ও অবান্তর প্রশ্ন করা থেকে এ আয়াতে নিষেধ করা হয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও লোকদেরকে বেশী বেশী প্রশ্ন করতে ও অনর্থক প্রত্যেকটি ব্যাপারের গভীরে প্রবেশ করে ঘাটাঘাটি করতে নিষেধ করতেন। এ প্রসংগে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ فِى الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَىْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى النَّاسِ فَحُرِّمَ مِنْ اَجْلِ مَسْأَلَتِهٖ -

"মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে বড় অপরাধী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে এমন একটি জিনিস সম্পর্কে প্রশ্ন করলো যা লোকদের জন্য হারাম ছিল না, অথচ নিছক তার প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাবাদের কারণে সে জিনিসটি হারাম গণ্য করা হলো।"

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا

"আল্লাহ তোমাদের ওপর কিছু কাজ ফরয করে দিয়েছেন, সেগুলো ত্যাগ করো না। কিছু জিনিস হারাম করে দিয়েছেন, সেগুলোর ধারে কাছে ঘেঁষো না। কিছু সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেগুলো লংঘন করো না। আবার কিছু জিনিসের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন কিন্তু তা ভুলে যাননি, কাজেই সেগুলোর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ো না।"

এ হাদীস দু'টিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের সন্ধান দেয়া হয়েছে। শরীয়াতের বিধানদাতা যেসব বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন এবং যেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেননি

অথবা যে বিধানগুলো সংক্ষেপে দিয়েছেন এবং যেগুলোর পরিমাণ, সংখ্যা বা অন্যান্য বিষয় উল্লেখ করেননি, সেগুলো সংক্ষেপে বা অবিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার কারণ এ নয় যে, বিধানদাতা সেগুলো বর্ণনা করতে ভুলে গিয়েছেন এবং বিস্তারিত বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল কিন্তু তা করেননি বরং এর আসল কারণ হচ্ছে এই যে, বিধানদাতা এ বিষয়গুলোর বিস্তারিত রূপ সংকুচিত ও সীমাবদ্ধ করতে চান না এবং এ বিধানগুলোর মধ্যে মানুষের জন্য প্রশস্ততা ও ব্যাপকতা রাখতে চান। এখন যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে অযথা প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থাপন করে তার বিস্তারিত রূপ, নির্দিষ্ট বিষয়াবলী ও সীমাবদ্ধতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে এবং বিধানদাতার বক্তব্য থেকে যদি বিষয়গুলো কোনক্রমে প্রকাশিত না হয়, তাহলে আন্দাজ-অনুমান করে কল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে কোন না কোন প্রকারে সংক্ষিপ্ত বিষয়কে বিস্তারিত, ব্যাপককে সীমাবদ্ধ এবং অনির্দিষ্টকে নির্দিষ্ট করেই ক্ষান্ত হয়, তবে সে আসলে মুসলমানদের বিরাট বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। কারণ অতিপ্রাকৃতিক বিষয়সমূহ যত বেশী বিস্তারিত আকারে সামনে আসবে ইমানদারদের জন্য জটিলতা তত বেশী বেড়ে যাবে। আর আল্লাহর নির্দেশ ও বিধানের সাথে যত বেশী শর্ত জড়িত হবে এবং এগুলোকে যত বেশী সীমাবদ্ধ করে দেয়া হবে আনুগত্যকারীদের জন্য নির্দেশ অমান্য করার সম্ভাবনা তত বেশী দেখা দেবে।

১১৭. অর্থাৎ প্রথমে তারা নিজেরাই আকীদা বিশ্বাস ও বিধি বিধানের অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এবং এক একটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে নিজেদের জন্য বিস্তারিত অবয়ব ও শর্তাবলীর একটি জাল তৈরী করে। তারপর নিজেরাই সেই জালে জড়িত হয়ে আকীদাগত গোমরাহী ও নাফরমানীতে লিপ্ত হয়। একটি দল বলতে এখানে ইহুদীদের কথা বুঝানো হয়েছে। কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সতর্ক বাণী সত্ত্বেও মুসলমানরা তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলার ব্যাপারে যে কোন প্রকার প্রচেষ্টা চালাতে কসূর করেনি।

১১৮. আমাদের দেশে যেমন গরু, ষাঁড় ও ছাগল আল্লাহর বা ভগবানের নামে অথবা কোন দেবদেবী, ঠাকুর, বা পীর-আউলিয়ার নামে ছেড়ে দেয়া হয়, তাদেরকে ভারবহন বা অন্য কোন কাজে লাগানো হয় না এবং তাদেরকে যবেহ করা বা তাদের সাহায্যে কোন প্রকার ফায়দা হাসিল করা হারাম মনে করা হয়, ঠিক তেমনি জাহেলী যুগে আরববাসীরাও পুণ্য কাজের নিদর্শন হিসেবে বিভিন্ন পশু ছেড়ে দিতো। এ ধরনের ছেড়ে দেয়া পশুদের আলাদা আলাদা নামে আখ্যায়িত করা হতো। যেমন ঃ

বাহীরা ঃ এমন ধরনের উষ্ট্রীকে বলা হতো, যে পাঁচবার শাবক প্রসব করেছে এবং শেষবারের শাবকটি হয়েছে 'নর'। এ উষ্ট্রীর কান চিরে দিয়ে তাকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে ছেড়ে দেয়া হতো। অতপর কেউ কখনো তাকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করতো না। কেউ তার দুধও পান করতো না। কেউ তাকে যবেহও করতো না। এমনকি তার গায়ের পশমও কেউ কাটতো না। সে ইচ্ছেমতো যে কোন ক্ষেতে চরে বেড়াতো, যে কোন চারণভূমিতে ঘাস খেতো এবং যে কোন ঘাটে গিয়ে পানি পান করতো।

সায়েবা ঃ এমন উট বা উষ্ট্রীকে বলা হয়, যাকে কোন মানত পুরো হবার, কোন রোগ থেকে মুক্তি লাভ করার অথবা কোন বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিদর্শন স্বরূপ স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হতো। তাছাড়া সায়েবা এমন উটনীকেও

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا
مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا
يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن
ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا
كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো সেই বিধানের দিকে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং এসো রসূলের দিকে, তখন তারা জবাব দেয়, আমাদের বাপ-দাদাকে যে পথে পেয়েছি সে পথই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তারা কি নিজেদের বাপ-দাদারই অনুসরণ করে চলবে, যদিও তারা কিছুই জানতো না এবং সঠিক পথও তাদের জানা ছিল না?

হে ঈমানদারগণ! নিজেদের কথা চিন্তা করো, অন্য কারোর গোমরাহীতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই যদি তোমরা নিজেরা সত্য সঠিক পথে থাকো।[১১৯] তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে। তখন তোমরা কি করছিলে তা তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন।

বলা হতো, যে দশবার বাচ্চা প্রসব করেছে এবং প্রত্যেকটি বাচ্চা হয়েছে স্ত্রী জাতীয়। তাকেও স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হতো।

অসীলা ঃ ছাগলের প্রথম বাচ্চাটা 'পাঁঠা' হলে তাকে উপাস্য দেবতাদের নামে যবেহ করে দেয়া হতো। আর যদি প্রথম বাচ্চাটা হতো 'পাঁঠী' তাহলে তাকে নিজের জন্য রেখে দেয়া হতো। কিন্তু একই সঙ্গে যদি পাঁঠা ও পাঁঠী বাচ্চা হতো তাহলে পাঁঠাটিকে যবেহ না করে দেবতাদের নামে ছেড়ে দেয়া হতো এবং তাকে বলা হতো অসীলা।

হাম ঃ কোন উটের পৌত্র যদি সওয়ারী বহন করার যোগ্যতা অর্জন করতো তাহলে বুড়ো উটটিকে স্বাধীন ছেড়ে দেয়া হতো। তাছাড়া কোন উটের ঔরসে দশটি সন্তান জন্ম নেবার পর তাকেও স্বাধীন করে দেয়া হতো।

১১৯. অর্থাৎ অমুক কি করছে, অমুকের আকীদার মধ্যে কি গলদ আছে এবং অমুকের কাজে কোন্ কোন্ ধরনের দোষ-ত্রুটি আছে, সবসময় এসব দেখার পরিবর্তে মানুষের

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ
الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ
فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ۭ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ
الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ
وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের কারোর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় এবং সে অসিয়ত করতে থাকে তখন তার জন্য সাক্ষ নির্ধারণ করার নিয়ম হচ্ছে এই যে, তোমাদের সমাজ থেকে দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ[১২০] ব্যক্তিকে সাক্ষী করতে হবে। অথবা যদি তোমরা সফরের অবস্থায় থাকো এবং সেখানে তোমাদের ওপর মৃত্যু রূপ বিপদ উপস্থিত হয় তাহলে দু'জন অমুসলিমকেই সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করে নেবে।[১২১] তারপর কোন সন্দেহ দেখা দিলে নামাযের পরে উভয় সাক্ষীকে (মসজিদে) অপেক্ষমান রাখবে এবং তারা আল্লাহর কসম খেয়ে বলবে ঃ "আমরা কোন ব্যক্তি স্বার্থের বিনিময়ে সাক্ষ বিক্রি করবো না, সে কোন আত্মীয় হলেও (আমরা তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবো না) এবং আল্লাহর ওয়াস্তের সাক্ষকে আমরা গোপনও করবো না। এমনটি করলে আমরা গুনাহগারদের অন্তরভুক্ত হবো।"

দেখা উচিত, সে নিজে কি করছে। তার নিজের চিন্তাধারার এবং নিজের চরিত্র ও কার্যাবলীর কথা চিন্তা করা উচিত সেগুলো যেন খারাপ ও বরবাদ না হয়ে যায়। কোন ব্যক্তি নিজে যদি আল্লাহর আনুগত্য করতে থাকে, তার ওপর আল্লাহ ও বান্দার যেসব অধিকার আরোপিত হয় সেগুলো আদায় করতে থাকে এবং সততা ও সঠিক পথ অবলম্বন করার দাবী পূর্ণ করে যেতে থাকে এবং এই সংগে সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা তার কর্মসূচীর অপরিহার্য অংশরূপে বিবেচিত হতে থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবে অন্য কোন ব্যক্তির গোমরাহী ও বক্র পথে চলা তার জন্য কোন ক্ষতির কারণ হতে পারে না।

তাই বলে মানুষ কেবলমাত্র নিজের নাজাত ও মুক্তির কথা ভাববে, অন্যের সংশোধন করার কথা ভাববে না, এটা নিশ্চয়ই এ আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এ ভুল ধারণার প্রতিবাদ করে এক ভাষণে বলেন ঃ "হে লোকেরা!

فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ إِثْمًا فَـَٔاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ
ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَٰنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَٰدَتِهِمَا
وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ ۖ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٧﴾ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِٱلشَّهَٰدَةِ
عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓا۟ أَن تُرَدَّ أَيْمَٰنٌۢ بَعْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿١٠٨﴾

কিন্তু যদি একথা জানা যায় যে, তারা দু'জন নিজেদেরকে গোনাহে লিপ্ত করেছে, তাহলে যাদের স্বার্থহানি ঘটেছে তাদের মধ্য থেকে সাক্ষ দেবার ব্যাপারে আরো বেশী যোগ্যতা সম্পন্ন দু'জন লোক তাদের স্থলবর্তী হবে এবং তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে "আমাদের সাক্ষ তাদের সাক্ষের চাইতে আরো বেশী ন্যায়নিষ্ঠ এবং নিজেদের সাক্ষের ব্যাপারে আমরা কোন বাড়াবাড়ি করিনি। এমনটি করলে আমরা জালেমদের অন্তরভুক্ত হবো।" এ পদ্ধতিতে বেশী আশা করা যায়, লোকেরা সঠিক সাক্ষ দেবে অথবা কমপক্ষে এতটুকু ভয় করবে যে, তাদের কসমের পর অন্য কসমের সাহায্যে তাদের বক্তব্য খণ্ডন করা হতে পারে। আল্লাহকে ভয় করো এবং শোনো। আল্লাহ নাফরমানদেরকে তাঁর পথনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত করেন।

তোমরা এ আয়াতটি পড়ে থাকো এবং এর ভুল ব্যাখ্যা করে থাকো। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি, যখন লোকদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যে, তারা অসৎকাজ দেখবে কিন্তু তা পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে না, জালেমকে জুলুম করতে দেখবে কিন্তু তার হাত টেনে ধরবে না তখন অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাঁর আযাব সকলের ওপর চাপিয়ে দেবেন। আল্লাহর কসম। তোমরা লোকদেরকে ভাল কাজ করার হুকুম দাও এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখো, নয়তো আল্লাহ তোমাদের ওপর এমন সব লোককে চাপিয়ে দেবেন যারা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ এবং তারা তোমাদেরকে ভীষণ কষ্ট দেবে। তখন তোমাদের সৎলোকেরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবে কিন্তু তা কবুল হবে না।

১২০. অর্থাৎ দীনদার, সত্যনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য।

১২১. এ থেকে জানা যায়, মুসলমানদের ব্যাপারে অমুসলিমদেরকে কেবলমাত্র তখনই সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে যখন কোন মুসলমান সাক্ষী পাওয়া যায় না।

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ۭ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ۭ اِنَّكَ
اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١٠٩﴾ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ
عَلَيْكَ وَعَلٰي وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۭ تُكَلِّمُ النَّاسَ
فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ
وَالْاِنْجِيْلَ ۚ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْــَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا
فَتَكُوْنُ طَيْرًۢا بِاِذْنِيْ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ ۚ

১৫ রুকূ'

যেদিন[১২২] আল্লাহ সমস্ত রসূলকে একত্র করে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের কী জবাব দেয়া হয়েছে?[১২৩] তারা আরয করবে, আমরা কিছুই জানিনা,[১২৪] গোপন সত্যসমূহের জ্ঞান একমাত্র আপনারই আছে। তারপর সে সময়ের কথা চিন্তা করো যখন আল্লাহ বলবেন,[১২৫] "হে মারয়ামের পুত্র ঈসা! আমার সে নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আমি তোমাকে ও তোমার মাকে দিয়েছিলাম। আমি পাক-পবিত্র রূহের মাধ্যমে তোমাকে সাহায্য করেছিলাম। তুমি দোলনায় থেকেও লোকদের সাথে কথা বলেছিলে এবং পরিণত বয়সে পৌঁছেও। আমি তোমাকে কিতাব ও হিকমত এবং তাওরাত ও ইনজীলের শিক্ষা দিয়েছিলাম। তুমি আমার হুকুমে পাখির আকৃতির মাটির পুতুল তৈরী করে তাতে ফুঁক দিতে এবং আমার হুকুমে তা পাখি হয়ে যেতো। তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আমার হুকুমে নিরাময় করে দিতে।

১২২. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন।

১২৩. অর্থাৎ দুনিয়াবাসীকে তোমরা যে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলে তারা তার কী জবাব দিয়েছে?

১২৪. অর্থাৎ আমাদের জীবনে আমরা যে সীমাবদ্ধ বাহ্যিক জবাবটুকু পেয়েছি বলে অনুভব করেছি কেবলমাত্র সেটুকুই আমরা জানি। আর আসলে আমাদের দাওয়াতের কোথায় কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং কোন্ আকৃতিতে তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে তার সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞান একমাত্র আপনার ছাড়া আর কারোর পক্ষে লাভ করা সম্ভবপর নয়।

১২৫. প্রথম প্রশ্নটি সকল রসূলকে সামগ্রিকভাবে করা হবে। তারপর প্রত্যেক রসূলের কাছ থেকে পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষ নেয়া হবে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে একথাটি

وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ
إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ
مُّبِينٌ ﴿١١٠﴾ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ۖ قَالُوا
آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا
اللَّهَ إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

এবং মৃতদেরকে আমার হুকুমে বের করে আনতে।[১২৬] তারপর যখন তুমি সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে বনী ইসরাঈলের কাছে পৌঁছলে এবং তাদের মধ্যে যারা সত্য অস্বীকারকারী ছিল তারা বললো, এ নিশানীগুলো যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন আমিই তোমাকে তাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম। আর যখন আমি হাওয়ারীদেরকে ইংগিত করেছিলাম, আমার ও আমার রসূলের প্রতি ঈমান আনো, তারা বলেছিল, আমরা ঈমান আনলাম এবং সক্ষী থাকো আমরা মুসলিম।[১২৭] — (হাওয়ারীদের[১২৮] প্রসংগে) এ ঘটনাটিও যেন মনে থাকে, যখন হাওয়ারীরা বলেছিল, হে মারয়াম পুত্র ঈসা! আপনার রব কি আমাদের জন্য আকাশ থেকে একটি খাবার পরিপূর্ণ খাঞ্চা নাযিল করতে পারেন? ঈসা বলেছিল, আল্লাহকে ভয় করো, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।

সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখিত হয়েছে। এ প্রসংগে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে যে প্রশ্ন করা হবে তা এখানে বিশেষভাবে উদ্ধৃত হয়েছে।

১২৬. অর্থাৎ মৃত্যুর অবস্থা থেকে বের করে জীবনের অবস্থায় আনতেন।

১২৭. অর্থাৎ হাওয়ারীদের তোমার প্রতি ঈমান আনাও ছিল আমার অনুগ্রহ ও সুযোগ দানেরই ফল। নয়তো যে জনবসতি তোমার দাওয়াতকে মিথ্যা বলে ঘোষণা দিয়েছিল সেখান থেকে নিজের শক্তির জোরে তোমাকে সত্য বলে স্বীকার করে, এমন একজন লোক বের করে আনার ক্ষমতাও তোমার ছিল না। প্রসংগত এখানে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, হাওয়ারীদের আসল ধর্ম ছিল ইসলাম, খৃষ্টবাদ নয়।

১২৮. হাওয়ারীদের কথা আগে বলা হয়েছিল তাই এখানে এ আলোচনা প্রসংগের মধ্যেই হাওয়ারীদের সম্পর্কে আর একটি ঘটনার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ থেকে

قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا
وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿١١٣﴾ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ
اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً
مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿١١٤﴾ قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ
فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا
مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١١٥﴾

তারা বলেছিল, আমরা কেবল এতটুকুই চাই যে, আমরা সেই খাঞ্চা থেকে খাবার খাবো, আমাদের মন নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে এবং আমরা জেনে নেবো যে, আপনি যা কিছু বলেছেন তা সবই সত্য এবং আমরা তার সাক্ষী হয়ে যাবো। এ কথায় ঈসা ইবনে মারয়াম দোয়া করেছিল, "হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! আমাদের ওপর আকাশ থেকে একটি খাদ্য ভরা খাঞ্চা নাযিল করো, যা আমাদের জন্য এবং আমাদের আগের-পিছের সবার জন্য আনন্দের উপলক্ষ হিসেবে গণ্য হবে এবং তোমার পক্ষ থেকে হবে একটি নিদর্শন। আমাদের জীবিকা দান করো এবং তুমি সর্বোত্তম জীবিকা দানকারী।" আল্লাহ জবাব দিয়েছিলেন, "আমি তা তোমাদের ওপর নাযিল করবো।[১২৯] কিন্তু এরপর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কুফরী করবে তাকে আমি এমন শাস্তি দেবো, যা দুনিয়ায় আর কাউকে দেইনি।"

একথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের যেসব শাগরিদ তাঁর কাছ থেকে সরাসরি দীক্ষা লাভ করেছিলেন তারা হযরত মসীহকে একজন মানুষ এবং নিছক আল্লাহর একজন বান্দা মনে করতেন। তাদের পরিচালক ও পথপ্রদর্শক যে আল্লাহ বা আল্লাহর সাথে শরীক অথবা আল্লাহর পুত্র-এই ধরনের কোন কথা মনে করা তাদের চিন্তা ও কল্পনার বাইরে ছিল। তাছাড়া হযরত মসীহ নিজেও তাদের সামনে নিজেকে একজন অক্ষম বান্দা হিসেবে পেশ করেছিলেন।

এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে, কিয়ামতের দিনে যে কথাবার্তা হবে সেখানে এ প্রাসংগিক বক্তব্যটির স্থান কোথায়? এর জবাবে বলা যায়, কিয়ামতের দিনে যে কথাবার্তা হবে তার সাথে এ প্রাসংগিক বক্তব্যের সম্পর্ক নেই। বরং এর সম্পর্ক হচ্ছে দুনিয়ায় আগামভাবে যেসব কথাবার্তা হচ্ছে তার সাথে। কিয়ামতের দিনে যেসব কথাবার্তা হবে এখানে তার আলোচনা করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে, বর্তমান জীবনে খৃষ্টানরা যেন তা থেকে

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي
وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ
مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا
أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا
أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا
مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ
وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾

১৬ রুকূ'

(মোটকথা এসব অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে) আল্লাহ যখন বলবেন, "হে মারয়াম পুত্র ঈসা! তুমি কি লোকদের বলেছিলে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার মাকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করো?"[১৩০] তখন সে জবাব দেবে, "সুবহানাল্লাহ! যে কথা বলার কোন অধিকার আমার ছিল না সে ধরনের কোন কথা বলা আমার জন্য ছিল অশোভন ও অসংগত। যদি আমি এমন কথা বলতাম তাহলে আপনি নিশ্চয়ই তা জানতে পারতেন, আমার মনে যা আছে আপনি জানেন কিন্তু আপনার মনে যা আছে আমি তা জানি না, আপনি তো সমস্ত গোপন সত্যের জ্ঞান রাখেন। আপনি যা হুকুম দিয়েছিলেন তার বাইরে আমি তাদেরকে আর কিছুই বলিনি। তা হচ্ছে ঃ আল্লাহর বন্দেগী করো যিনি আমারও রব এবং তোমাদেরও। আমি যতক্ষণ তাদের মধ্যে ছিলাম ততক্ষণ আমি ছিলাম তাদের তদারককারী ও সংরক্ষক। যখন আপনি আমাকে ফিরিয়ে নিয়েছেন তখন আপনিই ছিলেন তাদের তত্বাবধায়ক ও সংরক্ষক। আর আপনি তো সমস্ত জিনিসের তত্বাবধায়ক ও সংরক্ষক।

শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন করে। কাজেই এ কথাবার্তার মাঝখানে একটি প্রাসংগিক বক্তব্য হিসেবে হাওয়ারীদের ঘটনাটির উল্লেখ মোটেই অবান্তর নয়।

১২৯. খাদ্য সম্ভার পরিপূর্ণ এ খাঞ্চা বাস্তবে নাযিল করা হয়েছিল কিনা, এ ব্যাপারে কুরআন মজীদ নীরব। অন্য কোন নির্ভরযোগ্য উপায়েও এ প্রশ্নটির জবাব পাওয়া যায় না।

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾ قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

এখন যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন তাহলে তারা তো আপনার বান্দা আর যদি মাফ করে দেন তাহলে আপনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়।" তখন আল্লাহ বলবেন, "এটি এমন একটি দিন যেদিন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যতা উপকৃত করে। তাদের জন্য রয়েছে এমন বাগান যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এখানে তারা থাকবে চিরকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।"

পৃথিবী, আকাশসমূহ ও সমগ্র জাতির ওপর রাজত্ব আল্লাহরই জন্য নির্ধারিত এবং তিনি সবকিছুর ওপর শক্তিশালী।

হয়তো এটা নাযিল হয়েছিল। আবার হয়তো এমনও হতে পারে যে, পরবর্তী পর্যায়ে মারাত্মক ধরনের হুমকিটি শুনে হাওয়ারীগণ নিজেদের আবেদন প্রত্যাহার করেছেন।

১৩০. খৃষ্টানরা আল্লাহর সাথে কেবলমাত্র ঈসা ও রূহুল কুদুস তথা পবিত্র আত্মাকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে ক্ষান্ত হয়নি। এ সংগে তারা ঈসার মাতা হযরত মারয়ামকেও (আ) এক স্বতন্ত্র ইলাহে পরিণত করেছে। হযরত মারয়ামের ইলাহ হবার বা তার দেবত্ব বা অতিমানবিকতা সম্পর্কিত কোন ইংগিতও বাইবেলে নেই। হযরত ঈসার (আ) পরে প্রথম তিনশ বছর পর্যন্ত খৃষ্টবাদী জগত এ ধারণার সাথে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত ছিল। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষের দিকে ইসকানদারিয়ার কিছু খৃষ্টান পণ্ডিত হযরত মারয়ামের জন্য সর্বপ্রথম 'উম্মুল্লাহ' বা 'আল্লাহর মাতা' শব্দ ব্যবহার করেন। এরপর ধীরে ধীরে মারয়ামের ইলাহ হবার আকীদা এবং মারয়াম বন্দনা ও মারয়াম পূজার পদ্ধতি খৃষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত হতে থাকে। কিন্তু প্রথম প্রথম চার্চ এটাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মেনে নিতে প্রস্তুত হয়নি। বরং মারয়াম পূজারীদেরকে ভ্রান্ত আকীদা সম্পন্ন বলে অভিহিত করতো। তারপর যখন মসীহের একক সত্তার মধ্যে দু'টি স্বতন্ত্র ও পৃথক সত্তার সমাবেশ ঘটেছে এ মর্মে প্রচারিত নাসতুরিয়াসের আকীদা নিয়ে সমগ্র খৃষ্টীয় জগতে বিতর্ক ও আলোচনা-সমালোচনার ঝড় উঠলো। তখন এর মীমাংসা করার জন্য ৪৩১ খৃষ্টাব্দে

আফসোস নগরে একটি কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো। এ কাউন্সিলে সর্বপ্রথম গীর্জার সরকারী ভাষায় হযরত মারয়ামের জন্য 'আল্লাহর মাতা' শব্দ ব্যবহার করা হলো। এর ফলে এতদিন মারয়াম পূজার যে রোগ গীর্জার বাইরে প্রসার লাভ করছিল এখন তা গীর্জার মধ্যেও দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। এমন কি কুরআন নাযিলের যুগে পৌছতে পৌছতে হযরত মারয়াম এত বড় দেবীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন যার ফলে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা তিনজনই তার সামনে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিলেন। চার্চের বিভিন্ন স্থানে তাঁর মূর্তি স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। তার সামনে ইবাদাতের সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করা হতো। তার কাছে প্রার্থনা করা হতো। তিনিই ছিলেন ফরিয়াদ শ্রবণকারী, অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণকারী, সংকট থেকে উদ্ধারকারী এবং অসহায়ের সহায় ও পৃষ্ঠপোষক। একজন নিষ্ঠাবান খৃষ্ট বিশ্বাসীর জন্য সবচেয়ে বড় ভরসার স্থল ছিল আল্লাহর মাতা'র সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করা। রোম সম্রাট জাষ্টিনিন তাঁর একটি আইনের ভূমিকায় হযরত মারয়ামকে তার রাজত্বের সংরক্ষক ও সাহায্যকারী গণ্য করেছেন। তাঁর প্রখ্যাত সেনাপতি নারসিস যুদ্ধ ক্ষেত্রে হযরত মারয়ামের কাছ থেকে নির্দেশনা চাইতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন রোম সম্রাট হিরাকেল তার পতাকায় আল্লাহর মাতার ছবি এঁকে রেখেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, এ ছবির বদৌলতে এ পতাকা কোনদিন ধূলায় লুন্ঠিত হবে না। যদিও পরবর্তী শতাব্দীগুলোয় সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে প্রটেষ্ট্যান্ট খৃষ্টানরা মারয়াম পূজার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানায় কিন্তু রোমান ক্যাথলিক গীর্জাগুলো এখনো তাদের আগের পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে।

আল আন'আম

৬

নামকরণ

এ সূরার ১৬ ও ১৭ রুকূ'তে কোন কোন আন'আমের (গৃহপালিত পশু) হারাম হওয়া এবং কোন কোনটির হালাল হওয়া সম্পর্কিত আরববাসীদের কাল্পনিক ও কুসংস্কারমূলক ধারণা বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে এ সূরাকে আল আন'আম নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

ইবনে আব্বাসের বর্ণনা মতে এ সম্পূর্ণ সূরাটি একই সাথে মক্কায় নাযিল হয়েছিল। হযরত মুআয ইবনে জাবালের চাচাত বোন হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ বলেন, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটনীর পিঠে সওয়ার থাকা অবস্থায় এ সূরাটি নাযিল হতে থাকে। তখন আমি তাঁর উটনীর লাগাম ধরে ছিলাম। বোঝার ভারে উটনীর অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যেন মনে হচ্ছিল এই বুঝি তার হাড়গোড় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।" হাদীসে একথাও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যে রাতে এ সূরাটি নাযিল হয় সে রাতেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিকে লিপিবদ্ধও করান।

এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে সুস্পষ্টভাবে মনে হয়, এ সূরাটি মক্কী যুগের শেষের দিকে নাযিল হয়ে থাকবে। হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদের রেওয়ায়াতটিও একথার সত্যতা প্রমাণ করে। কারণ তিনি ছিলেন আনসারদের অন্তরভুক্ত। হিজরাতের পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। যদি ইসলাম গ্রহণ করার আগে তিনি নিছক ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণে মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই হয়ে থাকবেন তাঁর মক্কায় অবস্থানের শেষ বছরে। এর আগে ইয়াসরেববাসীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক এত বেশী ঘনিষ্ঠ হয়নি যার ফলে তাদের একটি মহিলা তার খেদমতে হাযির হয়ে যেতে পারে।

নাযিল হওয়ার উপলক্ষ

সূরাটির নাযিল হওয়ার সময়-কাল নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর আমরা সহজেই এর প্রেক্ষাপটের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি। আল্লাহর রসূল যখন মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেবার কাজ শুরু করেছিলেন তারপর থেকে বারোটি বছর অতীত হয়ে গিয়েছিল। কুরাইশদের প্রতিবন্ধকতা, জুলুম ও নির্যাতন চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। ইসলাম গ্রহণকারীদের একটি অংশ তাদের অত্যাচার নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে দেশ ত্যাগ করেছিল। তারা হাবশায়

(ইথিওপিয়া) অবস্থান করছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্য-সমর্থন করার জন্য আবু তালিব বা হযরত খাদীজা (রা) কেউই বেঁচে ছিলেন না। ফলে সব রকমের পার্থিব সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি কঠোর প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে ইসলাম প্রচার ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। তাঁর ইসলাম প্রচারের প্রভাবে মক্কায় ও চারপাশের গোত্রীয় উপজাতিদের মধ্য থেকে সৎলোকেরা একের পর এক ইসলাম গ্রহণ করে চলেছিল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমগ্র জাতি ইসলামকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের গোঁয়ার্তুমি অব্যাহত রেখেছিল। কোথাও কোন ব্যক্তি ইসলামের দিকে সামান্যতম ঝোঁক প্রকাশ করলেও তার পেছনে ধাওয়া করা হতো। তাকে তিরস্কার, গালিগালাজ করা হতো। শারীরিক দুর্ভোগ ও অর্থনৈতিক, সামাজিক নিপীড়নে তাকে জর্জরিত করা হতো। এ অন্ধকার বিভীষিকাময় পরিবেশে একমাত্র ইয়াসরেবের দিক থেকে একটি হালকা আশার আলো দেখা দিয়েছিল। সেখানকার আওস ও খাযরাজ গোত্রের প্রভাবশালী লোকেরা এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাই'আত করে গিয়েছিলেন। সেখানে কোন প্রকার আভ্যন্তরীণ বাধা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হয়েই ইসলাম প্রসার লাভ করতে শুরু করেছিল। কিন্তু এ ছোট্ট একটি প্রারম্ভিক বিন্দুর মধ্যে ভবিষ্যতের যে বিপুল সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল তা কোন স্থূলদর্শীর দৃষ্টিগ্রাহ্য হওয়া সম্ভবপর ছিল না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হতো, ইসলাম একটি দুর্বল আন্দোলন। এর পেছনে কোন বৈষয়িক ও বস্তুগত শক্তি নেই। এর আহবায়কের পেছনে তার পরিবারের ও বংশের দুর্বল ও ক্ষীণ সাহায্য-সমর্থন ছাড়া আর কিছুই নেই। মুষ্টিমেয় অসহায় ও বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করেছে। যেন মনে হয় নিজেদের জাতির বিশ্বাস, মত ও পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে তারা সমাজ থেকে এমনভাবে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে যেমন গাছের মরা পাতা মাটির ওপর ঝরে পড়ে।

আলোচ্য বিষয়

এহেন পটভূমিতে এ ভাষণটি নাযিল হয়। এ হিসেবে এখানে আলোচ্য বিষয়গুলোকে প্রধান সাতটি শিরোনামে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

এক ঃ শিরককে খণ্ডন করা ও তাওহীদ বিশ্বাসের দিকে আহবান জানানো।

দুই ঃ আখেরাত বিশ্বাসের প্রচার এবং এ দুনিয়ার জীবনটাই সবকিছু এ ভুল চিন্তার অপনোদন।

তিন ঃ জাহেলীয়াতের যে সমস্ত ভ্রান্ত কাল্পনিক বিশ্বাস ও কুসংস্কারে লোকেরা ডুবে ছিল তার প্রতিবাদ করা।

চার ঃ যেসব বড় বড় নৈতিক বিধানের ভিত্তিতে ইসলাম তার সমাজ কাঠামো গড়ে তুলতে চায় সেগুলো শিক্ষা দেয়া।

পাঁচ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত লোকদের বিভিন্ন আপত্তি ও প্রশ্নের জবাব।

ছয় ঃ সুদীর্ঘ প্রচেষ্টা ও সাধনা সত্ত্বেও দাওয়াত ফলপ্রসূ না হবার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম ও সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে যে অস্থিরতা ও হতাশাজনক অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছিল সে জন্য তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়া।

সাত ঃ অস্বীকারকারী ও বিরোধী পক্ষকে তাদের গাফলতি, বিহ্বলতা ও অজ্ঞানতা প্রসূত আত্মহত্যার কারণে উপদেশ দেয়া, ভয় দেখানো ও সতর্ক করা।

কিন্তু এখানে যে ভাষণ দেয়া হয়েছে তাতে এক একটি শিরোনামের আওতায় আলাদা আলাদাভাবে একই জায়গায় পূর্ণাঙ্গরূপে আলোচনা করার রীতি অনুসৃত হয়নি। বরং ভাষণ এগিয়ে চলেছে নদীর স্রোতের মতো মুক্ত অবাধ বেগে আর তার মাঝখানে এ শিরোনামগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ভেসে উঠেছে এবং প্রতিবারেই নতুন নতুন ভংগীতে এর ওপর আলোচনা করা হয়েছে।

মক্কী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়

এখানে পাঠকের সামনে সর্বপ্রথম একটি বিস্তারিত মক্কী সূরা আসছে। তাই এ প্রসংগে মক্কী সূরাগুলোর ঐতিহাসিক পটভূমির একটি পূর্ণাঙ্গ বিশদ আলোচনা করে নেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি। এ ধরনের আলোচনার পরে পরবর্তী পর্যায়ে যেসব মক্কী সূরা আসবে এবং তাদের ব্যাখ্যা প্রসংগে আমি যেসব কথা বলবো সেগুলো অনুধাবন করা সহজ হবে।

মাদানী সূরাগুলোর মধ্যে প্রায় সবগুলোর নাযিলের সময়কাল আমাদের জানা আছে অথবা সামান্য চেষ্টা-পরিশ্রম করলে তার সময়-কাল চিহ্নিত করে নেয়া যেতে পারে। এমনকি সেসব সূরার বহু সংখ্যক আয়াতের পর্যন্ত নাযিলের উপলক্ষ ও কারণ নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াতে পাওয়া যায়। কিন্তু মক্কী সূরাগুলো সম্পর্কে এতটা বিস্তারিত তথ্য-উপকরণ আমাদের কাছে নেই। খুব কম সংখ্যক সূরা এমন রয়েছে যার নাযিলের সময়কাল ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কিত নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। কারণ মাদানী যুগের তুলনায় মক্কী যুগের ইতিহাসে খুঁটিনাটি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা কম। তাই মক্কী সূরাগুলোর ব্যাপারে আমাদের ঐতিহাসিক সাক্ষ-প্রমাণের পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সূরার বিষয়বস্তু, আলোচ্য বিষয় ও বর্ণনা পদ্ধতি এবং প্রত্যেক সূরার নাযিলের পটভূমি সংক্রান্ত সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট ইশারা-ইংগিতের আকারে যে আভ্যন্তরীণ সাক্ষ-প্রমাণ রয়েছে তার ওপরই নির্ভর করতে হয়। একথা সুস্পষ্ট যে, এ ধরনের সাক্ষ-প্রমাণের সাহায্যে প্রত্যেকটি সূরা ও আয়াত সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অংগুলি নির্দেশ করে একথা বলা যেতে পারে না যে, এটি অমুক তারিখে অমুক বছর বা অমুক উপলক্ষে নাযিল হয়েছে। সর্বাধিক নির্ভুলভাবে বড় জোর এতটুকু বলা যেতে পারে যে, একদিকে আমরা মক্কী সূরাগুলোর ভেতরের সাক্ষ-প্রমাণ এবং অন্যদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনের ইতিহাস পাশাপাশি রেখে এবং উভয়ের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে কোন্ সূরা কোন্ পর্যায়ের সাথে সম্পর্কিত ছিল সে সম্পর্কে একটি মত গঠন করতে পারি।

গবেষণা ও অনুসন্ধানের এ পদ্ধতি অনুসরণ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা ইসলামী দাওয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে একে চারটি প্রধান প্রধান ও উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে বিভক্ত দেখতে পাই ঃ

প্রথম পর্যায় ঃ নবুওয়াত প্রাপ্তির সূচনা থেকে শুরু করে নবুওয়াতের প্রকাশ্য ঘোষণা পর্যন্ত প্রায় তিন বছর। এ সময় গোপনে দাওয়াত দেবার কাজ চলে। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়। মক্কার সাধারণ লোকেরা এ সম্পর্কে তখনো কিছুই জানতো না।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ নবুওয়াতের প্রকাশ্য ঘোষণার পর থেকে জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন ও উৎপীড়নের সূচনাকাল পর্যন্ত প্রায় দু' বছর। এ সময় প্রথমে বিরোধিতা শুরু হয়। তারপর তা প্রতিরোধের রূপ নেয়। এরপর ঠাট্টা, বিদ্রূপ, উপহাস, দোষারোপ, গালিগালাজ, মিথ্যা প্রচারণা এবং জোটবদ্ধভাবে বিরোধিতা করার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এমনকি শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের ওপর জুলুম-নির্যাতন শুরু হয়ে যায়। যারা তুলনামূলকভাবে বেশী গরীব, দুর্বল ও আত্মীয় বান্ধবহীন ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে তারাই হয় সর্বাধিক নির্যাতনের শিকার।

তৃতীয় পর্যায় ঃ চরম উৎপীড়নের সূচনা অর্থাৎ নবুওয়াতের ৫ম বছর থেকে নিয়ে আবু তালিব ও হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তিকাল তথা ১০ম বছর পর্যন্ত পাঁচ বছর সময়-কাল পর্যন্ত এ পর্যায়টি বিস্তৃত। এ সময়ে বিরোধিতা চরম আকার ধারণ করতে থাকে। মক্কার কাফেরদের জুলুম নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক মুসলমান আবিসিনিয়া হিজরত করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও অবশিষ্ট মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কট করা হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সমর্থক ও সংগী-সাথীদের নিয়ে আবু তালিব গিরিবর্তে অবরুদ্ধ হন।

চতুর্থ পর্যায় ঃ নবুওয়াতের দশম বছর থেকে ত্রয়োদশ বছর পর্যন্ত প্রায় তিন বছর। এটি ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীদের জন্য সবচেয়ে কঠিন ও বিপজ্জনক সময়। তাঁর জন্য মক্কায় জীবন যাপন করা কঠিন করে দেয়া হয়েছিল। তায়েফে গেলেন। সেখানেও আশ্রয় পেলেন না। হজ্জের সময়ে আরবের প্রতিটি গোত্রকে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ ও তাঁকে সাহায্য করার আবেদন জানালেন। কিন্তু কোথাও সাড়া পেলেন না। এদিকে মক্কাবাসীরা তাঁকে হত্যা করার, বন্দী করার বা নগর থেকে বিতাড়িত করার জন্য সলা-পরামর্শ করেই চলছিল। অবশেষে আল্লাহর অপার অনুগ্রহে আনসারদের হৃদয় দুয়ার ইসলামের জন্য খুলে গেলো। তাদের আহবানে তিনি মদীনায় হিজরত করলেন।

এ সকল পর্যায়ে বিভিন্ন সময় কুরআন মজীদের যে সমস্ত আয়াত নাযিল হয় সেগুলোর প্রত্যেকটি তাদের বিষয়বস্তু ও বর্ণনা রীতির দিক দিয়ে পরস্পর থেকে বিভিন্ন। এক পর্যায়ের আয়াতের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী অন্য পর্যায়ের আয়াতের থেকে ভিন্নধর্মী। এদের বহু স্থানে এমন সব ইশারা-ইংগিত পাওয়া যায়, যা থেকে তাদের পটভূমির অবস্থা ও ঘটনাবলীর ওপর সুস্পষ্ট আলোকপাত হয়। প্রত্যেক পর্যায়ের বৈশিষ্টের প্রভাব সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে নাযিলকৃত বাণীর মধ্যে বিপুলভাবে লক্ষণীয়। এসব আলামতের ওপর নির্ভর করে আমি পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত প্রত্যেকটি মক্কী সূরার ভূমিকায় সেটি মক্কী যুগের কোন্ পর্যায়ে নাযিল হয় তা জানিয়ে দেবো।

আয়াত ১৬৫ | সূরা আল আন'আম - মক্কী | রুকূ' ২০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ
وَالنُّوْرَ ؕ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ۝١ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ
مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰٓى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ۝٢
وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ ؕ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا
تَكْسِبُوْنَ ۝٣ وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا
مُعْرِضِيْنَ ۝٤ فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ؕ فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا
كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٥

প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোর উৎপত্তি ঘটিয়েছেন। তবুও সত্যের দাওয়াত অস্বীকারকারীরা অন্যদেরকে তাদের রবের সমকক্ষ দাঁড় করাচ্ছে।[১] তিনিই তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।[২] তারপর তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন জীবনের একটি সময়সীমা এবং আর একটি সময়সীমাও আছে, যা তাঁর কাছে স্থিরীকৃত,[৩] কিন্তু তোমরা কেবল সন্দেহেই লিপ্ত রয়েছো।

তিনিই এক আল্লাহ আকাশেও আছেন এবং পৃথিবীতেও, তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব অবস্থাই জানেন এবং ভালো বা মন্দ যা-ই তোমরা উপার্জন করো তাও তিনি ভালোভাবেই অবগত।

মানুষের অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, তাদের রবের নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে এমন কোন নিদর্শন নেই যা তাদের সামনে আসার পর তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। অনুরূপভাবে এখন যে সত্য তাদের কাছে এসেছে তাকেও তারা মিথ্যা বলেছে। ঠিক আছে, এতদিন পর্যন্ত যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে এসেছে শীঘ্রই সে সম্পর্কে কিছু খবর তাদের কাছে পৌঁছুবে।[৪]

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ
نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا
آخَرِينَ ۝٦

তারা কি দেখেনি তাদের পূর্বে এমনি ধরনের কত মানব গোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি, যারা নিজ নিজ যুগে ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপশালী? পৃথিবীতে তাদেরকে এমন কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকেও দেইনি। তাদের ওপর আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম এবং তাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করেছিলাম। (কিন্তু যখন তারা নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো তখন) অবশেষে তাদের গোনাহের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের জায়গায় পরবর্তী যুগের মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি।

১. মনে রাখতে হবে, এখানে আরবের মুশরিকদের সম্বোধন করে বলা হচ্ছে। আর এ মুশরিকরা একথা স্বীকার করতো যে, আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা। তিনি দিন ও রাতের উদ্ভব ঘটান। সূর্য ও চন্দ্রকে তিনিই অস্তিত্ব দান করেছেন। এ কাজগুলো লাত, উয্যা, হোবল অথবা আর কোন দেবদেবী করেছে–এ ধরনের কোন বিশ্বাস তাদের কেউ পোষণ করতো না। তাই তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে : মূর্খরা! যখন তোমরা নিজেরাই একথা স্বীকার করে থাকো যে, পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা হচ্ছেন আল্লাহ এবং দিন–রাতের আবর্তন তিনিই করান তখন তোমরা আবার অন্যের সামনে সিজদা করো কেন? তাদেরকে নযরানা দাও, তাদের কাছে প্রার্থনা করো এবং নিজেদের অভাব–অভিযোগ পেশ করো কেন? এরা কারা? (সূরা ফাতহা ২ টীকা এবং সূরা আল বাকারা ১৬৩ টীকা দেখুন)।

আলোর মোকাবিলায় 'অন্ধকার' শব্দটিকে বহুবচনে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। কারণ, অন্ধকার বলা হয় আলোবিহীনতাকে আর আলোবিহীনতার রয়েছে অসংখ্য পর্যায়। তাই আলো এক বা একক এবং অন্ধকার একাধিক, বহু।

২. মানব দেহের সমুদয় অংশ মাটি থেকে গৃহীত। এর সামান্যতম অংশও অ–মৃত্তিকা নয়। তাই বলা হয়েছে, তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে।

৩. অর্থাৎ কিয়ামতের সময়। তখন আগের ও পরের সমস্ত মানুষকে আবার নতুন করে জীবিত করা হবে এবং নিজেদের সমস্ত কাজের হিসেব দেবার জন্য তারা তাদের রবের সামনে হাযির হয়ে যাবে।

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٧ وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ
مَلَكٌ ۭ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ۝٨

হে নবী! যদি তোমার প্রতি কাগজে লেখা কোন কিতাবও নাযিল করতাম এবং লোকেরা নিজেদের হাত দিয়ে তা স্পর্শ করেও দেখে নিতো, তাহলেও আজ যারা সত্যকে অস্বীকার করছে তারা তখন বলতো, এটা সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা বলে, এ নবীর কাছে কোন ফেরেশতা পাঠানো হয় না কেন?[৫] যদি ফেরেশতা পাঠাতাম, তাহলে এতদিনে কবেই ফায়সালা হয়ে যেতো, তখন তাদেরকে আর কোন অবকাশই দেয়া হতো না।[৬]

৪. এখানে হিজরত এবং হিজরতের পরে ইসলাম একের পর এক যেসব সাফল্য অর্জন করবে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। যখন এ ইংগিত করা হয়েছিল সে সময় কোন্ ধরনের খবর পৌঁছুবে সে সম্পর্কে কাফেররা কোন কল্পনাই করতে পারেনি এবং মুসলমানদেরও এ সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন।

৫. অর্থাৎ যখন এ ব্যক্তিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছে তখন আকাশ থেকে একজন ফেরেশতাও পাঠানো উচিত ছিল। এ ফেরেশতা লোকদের ডেকে ডেকে বলবে, ইনি আল্লাহর নবী, এঁর কথা মেনে চলো, নয়তো তোমাদের শাস্তি দেয়া হবে। মূর্খ আপত্তিকারীরা অবাক হচ্ছিল এ ভেবে যে, পৃথিবী ও আকাশের মহা শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী স্রষ্টা একজনকে নিজের পয়গম্বর নিযুক্ত করবেন এবং তাকে মানুষের গালিগালাজ ও প্রস্তরাঘাত সহ্য করার জন্য সহায় সম্বলহীনভাবে ছেড়ে দেবেন, এটা কেমন করে হতে পারে? এত বড় বাদশাহর দূত বিপুল সংখ্যক রাজকীয় ও সরকারী আমলা কর্মচারীসহ না এলেও অন্তত আরদালী হিসেবে একজন ফেরেশতাকেও তো সংগে নিয়ে আসবেন। সে ফেরেশতা তাঁর হেফাজত করতো, মানুষের ওপর তাঁর প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করতো, তিনি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত একথা সবাইকে বুঝাতো এবং অস্বাভাবিক ও অলৌকিক পদ্ধতিতে তাঁর দায়িত্ব সম্পাদন করতো।

৬. এটা হচ্ছে তাদের আপত্তির প্রথম জবাব। এর অর্থ হচ্ছে, ঈমান আনার ও নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করার জন্য তোমরা যে সময়-সুযোগ ও অবকাশ লাভ করেছো এর সময়সীমা ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ সত্য অদৃশ্যের পর্দান্তরালে গোপন রয়েছে। নয়তো অদৃশ্যের পর্দা ছিন্ন হবার সাথে সাথেই এ অবকাশের সুযোগও শেষ হয়ে যাবে। এরপর শুধু হিসেব নেবার কাজটি বাকি থাকবে। কেননা দুনিয়ার জীবন তোমাদের জন্য একটি

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ۝٩ وَلَقَدِ
اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ
يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝١٠

যদি ফেরেশতা পাঠাতাম তাহলেও তাকে মানুষের আকৃতিতেই পাঠাতাম এবং এভাবে তাদেরকে ঠিক তেমনি সংশয়ে লিপ্ত করতাম যেমন তারা এখন লিপ্ত রয়েছে।[৭]

হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বেও অনেক রসূলের প্রতি বিদ্রূপ করা হয়েছে। কিন্তু বিদ্রূপকারীরা যে অকাট্য সত্য নিয়ে বিদ্রূপ করতো, সেটাই অবশেষে তাদের ওপর চেপে বসেছিল।

পরীক্ষাকাল। পরীক্ষা হচ্ছে এ বিষয়ের যে, প্রকৃত সত্যকে না দেখে নিজেদের চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে তোমরা তাকে উপলব্ধি করতে ও জানতে পারো কি না এবং এ উপলব্ধি করার ও জানার পর নিজেদের নফস ও তার কামনা বাসনাকে নিয়ন্ত্রিত করে প্রকৃত সত্যের নিরীখে নিজেদের কর্মকাণ্ডকে সঠিক পথে চালাতে পারো কি না। এ পরীক্ষার জন্য অদৃশ্যের অদৃশ্য থাকাটা হচ্ছে একটি অপরিহার্য শর্ত। আর তোমাদের দুনিয়ার জীবন, যা আসলে পরীক্ষার অবকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়, এটিও ততক্ষণ প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে যতক্ষণ অদৃশ্য অদৃশ্যই থাকে। যখনই অদৃশ্য দৃশ্যমান হয়ে যাবে তখনই অবশ্যি এ অবকাশ খতম হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষার পরিবর্তে পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময় সমাগত হবে। কাজেই তোমাদের দাবী অনুসারে ফেরেশতাকে তার আসল চেহারায় তোমাদের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহ এখনই তোমাদের পরীক্ষার সময়কাল শেষ করে দিতে চান না। (সূরা আল বাকারার ২২৮ টীকা দেখুন)।

৭. এটি হচ্ছে তাদের আপত্তির দ্বিতীয় জবাব। প্রথমত ফেরেশতা তার আসল অদৃশ্য আকৃতিতে আসতে পারতো এবং এভাবে নিজেকে মানুষের সামনে প্রকাশ করতে পারতো। কিন্তু আগেই বলে দেয়া হয়েছে, এখনো তার সময় হয়নি। দ্বিতীয়ত ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরে আসতে পারতো। এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যদি সে মানুষের রূপ ধরে আসতো, তাহলে সে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত হয়ে এসেছে সে ব্যাপারে তোমাদের মনে সে একই সন্দেহ ও বিভ্রম সৃষ্টি হয়ে যেতো যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্তির ব্যাপারে তোমাদের মনে সৃষ্টি হয়েছে।

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾
قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلْ لِلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ
لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿١٣﴾

২ রুকূ'

এদেরকে বলে দাও, পৃথিবীর বুকে একটু চলাফেরা করে দেখো, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে।[৮]

এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সেগুলো কার?—বলো, সবকিছু আল্লাহরই।[৯] *অনুগ্রহের পথ অবলম্বন করা তিনি নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিয়েছেন। (এ জন্যই তিনি নাফরমানী ও সীমালংঘন করার অপরাধে তোমাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে পাকড়াও করেন না।) কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদের সবাইকে অবশ্যি একত্র করবেন। এটি এমন একটি সত্য যার মধ্যে সংশয়-সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। কিন্তু যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে তারা একথা মানে না।*

রাতের আঁধারে ও দিনের আলোয় যা কিছু বিরাজমান সবই আল্লাহর এবং তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।

৮. অর্থাৎ যেসব জাতি ও মানব গোষ্ঠী দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তাদের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও ঐতিহাসিক কাহিনীসমূহ একথার সাক্ষ দেবে যে, সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার এবং বাতিলের অনুসৃতির ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণে কিভাবে তারা শোচনীয় পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল।

৯. এটি একটি চমকপ্রদ বর্ণনাভংগী। প্রথমে হুকুম হলো, এদেরকে জিজ্ঞেস করো, পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে যা কিছু আছে সেগুলো কার? প্রশ্নকারী প্রশ্ন করে জবাবের অপেক্ষায় থেমে রইল। যদিও শ্রোতা নিজেই স্বীকার করে যে, সবকিছু আল্লাহর তবুও সে ভুল জবাব দেবার সাহস করে না আবার সঠিক জবাব দিতেও চায় না। কারণ সঠিক জবাব দিলে তার আশংকা যে, বিরোধী পক্ষ তা থেকে তার মুশরিকী আকীদার বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপন করবে তাই সে জবাব না দিয়ে নীরব থাকে। তখনই হুকুম হয়, তাহলে তুমি নিজেই বলে দাও ঃ সবকিছু আল্লাহরই জন্য।

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ
وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ
عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾
وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ
فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ
الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾

বলো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমি কি আর কাউকে নিজের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবো? সেই আল্লাহকে বাদ দিয়ে—যিনি পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা এবং যিনি জীবিকা দান করেন, জীবিকা গ্রহণ করেন না।[১০] বলো, আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে যেন আমি সবার আগে তাঁর সামনে আনুগত্যের শির নত করি। (আর তাকিদ করা হয়েছে, কেউ শিরক করলে করুক) কিন্তু তুমি মুশরিকদের অন্তরভুক্ত হয়ো না। যদি আমি আমার রবের নাফরমানী করি, তাহলে ভয় হয় একটি মহা (ভয়ংকর) দিনে আমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। সেদিন যে ব্যক্তি শাস্তি থেকে রেহাই পাবে আল্লাহ তার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন এবং এটিই সুস্পষ্ট সাফল্য। যদি আল্লাহ তোমার কোন ধরনের ক্ষতি করেন তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যে তোমাকে ঐ ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে। আর যদি তিনি তোমার কোন কল্যাণ করেন, তাহলে তিনি সবকিছুর ওপর শক্তিশালী। তিনি নিজের বান্দাদের ওপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং তিনি জ্ঞানী ও সবকিছু জানেন।

১০. এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পরিহাস নিহিত রয়েছে। মুশরিকরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ইলাহ বানিয়েছে তারা সবাই নিজেদের এ বান্দাদেরকে জীবিকা দেবার পরিবর্তে বরং এদের থেকে জীবিকা লাভের মুখাপেক্ষী। কোন ফেরাউন তার বান্দাদের কাছ থেকে কর ও নযরানা না পেলে প্রভুত্বের দাপট দেখাতে পারে না। কোন কবরে সমাহিত ব্যক্তির পূজারীরা যদি তার কবরে জমকালো গম্বুজ তৈরী না করে দেয় তাহলে তার উপাস্য ও আরাধ্য হবার চমক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কোন দেবতার পূজারীরা তার মূর্তি বানিয়ে কোন বিশাল মন্দিরে বা পূজা মণ্ডপে রেখে তাকে সুসজ্জিত ও সুশোভিত

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ
إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ۚ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ
أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُل لَّا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي
بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ
أَبْنَاءَهُمُ ۘ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾

এদেরকে জিজ্ঞেস করো, কার সাক্ষ সবচেয়ে বড়?—বলো, আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী।[১১] আর এ কুরআন আমার কাছে পাঠানো হয়েছে অহীর মাধ্যমে, যাতে তোমাদের এবং আর যার যার কাছে এটি পৌঁছে যায় তাদের সবাইকে আমি সতর্ক করি। সত্যিই কি তোমরা এমন সাক্ষ দিতে সক্ষম যে, আল্লাহর সাথে আরো ইলাহও আছে?[১২] বলে দাও, আমি তো কখনোই এমন সাক্ষ দিতে পারি না।[১৩] বলো, আল্লাহ তো একজনই এবং তোমরা যে শিরকে লিপ্ত রয়েছো আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা এ বিষয়টিকে এমন সন্দেহাতীতভাবে চেনে যেমন নিজেদের সন্তানদেরকে চেনার ব্যাপারে তারা সন্দেহের শিকার হয় না।[১৪] কিন্তু যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তারা একথা মানে না।

না করা পর্যন্ত সে দেবতার দেব মহিমা ও খোদায়ী কর্তৃত্ব ব্যক্ত হবার কোন পথ পায় না। এসব বানোয়াট ইলাহদের গোষ্ঠীই তাদের বান্দাদের মুখাপেক্ষী। একমাত্র সমগ্র বিশ্বজাহানের প্রকৃত একচ্ছত্র মালিক ও প্রভু আল্লাহই সে আসল আল্লাহ, যাঁর কর্তৃত্ব, সার্বভৌমত্ব, উপাস্যত্ব ও প্রভুত্বের গৌরব তাঁর আপন শক্তি ও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী।

১১. অর্থাৎ এ মর্মে সাক্ষী যে, আমি তাঁর পক্ষ থেকে নিযুক্ত এবং যা কিছু বলছি তাঁরি নির্দেশ অনুসারে বলছি।

১২. কোন বিষয়ের সাক্ষ দেবার জন্য কেবল আন্দাজ-অনুমান যথেষ্ট নয়। বরং এ জন্য প্রত্যক্ষ ও সুনিশ্চিত জ্ঞান থাকা অপরিহার্য যেন সে এহেন নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে বলতে পারে যে, হাঁ, ব্যাপারটি ঠিক এরূপই। কাজেই এখানে প্রশ্নের অর্থ হচ্ছে, সত্যিই কি তোমরা নির্ভুলভাবে একথা জানো যে, এ বিশাল সৃষ্টিজগতে আল্লাহ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন প্রভু আছে, যে বন্দেগী ও পূজা-অর্চনা লাভের যোগ্য?

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ
شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ
قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

৩ রুকূ'

আর তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে[১৫] অথবা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে?[১৬] অবশ্যি এ ধরনের জালেমরা কখনই সফলকাম হতে পারে না।

যেদিন এদের সবাইকে একত্র করবো এবং মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস করবো, এখন তোমাদের মনগড়া সেই শরীকরা কোথায়, যাদেরকে তোমরা নিজেদের ইলাহ মনে করতে? তখন তারা এ (মিথ্যা বিবৃতি দেয়া) ছাড়া আর কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারবে না যে, হে আমাদের প্রভু! তোমার কসম, আমরা কখনো মুশরিক ছিলাম না। দেখো, সে সময় এরা কিভাবে নিজেরাই নিজেদের সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে নেবে এবং সেখানে তাদের সমস্ত বানোয়াট মাবূদ উধাও হয়ে যাবে।

১৩. অর্থাৎ যদি তোমরা নির্ভুল ও নিশ্চিত জ্ঞান ছাড়া নিছক মিথ্যা সাক্ষ দিতে চাও, তাহলে দিতে পারো কিন্তু আমি তো এ ধরনের সাক্ষ দিতে পারি না।

১৪. অর্থাৎ যারা আসমানী কিতাবসমূহের জ্ঞান রাখে, তারা সন্দেহাতীতভাবে এ সত্যটি জানে ও উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ একক সত্তা এবং তাঁর প্রভুত্বের কর্তৃত্বে আর কেউ শরীক নয়। যেমন কারোর ছেলে অন্যান্য ছেলেদের ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলেও সে তাকে চিনে নেয়, ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান রাখে, সে ইলাহী কর্তৃত্ব ও উপাস্য হবার ব্যাপারে মানুষের অসংখ্য আকীদা, বিশ্বাস ও মতবাদের মধ্য থেকে কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় ছাড়াই প্রকৃত সত্যটি সহজেই চিনে নেয়।

১৫. অর্থাৎ এ মর্মে দাবী করে যে, প্রভুত্বের ব্যাপারে আরো অনেক সত্তা আল্লাহর সাথে শরীক। তাদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার গুণাবলী এবং তারা মানুষের সামনে তাদের বন্দেগীলাভ করার জন্য নিজেদেরকে উপস্থাপন করার যোগ্যতা

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَّفْقَهُوهُ وَفِيٓ
أَذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِنْ يَّرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ۖ حَتَّىٰٓ
إِذَا جَآءُوكَ يُجَٰدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ
ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِنْ يُّهْلِكُونَ إِلَّآ
أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

এদের কিছু লোক কান পেতে তোমার কথা শোনে কিন্তু অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমি তাদের অন্তরের ওপর আবরণ ফেলে দিয়েছি যার ফলে তারা এর কিছুই বোঝে না এবং তাদের কানে ভার রেখে দিয়েছি (যার ফলে সবকিছু শোনার পরও তারা কিছুই শোনে না)।[১৭] তারা যে নিদর্শনই প্রত্যক্ষ করুক তার ওপর ঈমান আনবে না। এমনকি যখন তারা তোমার কাছে এসে তোমার সাথে ঝগড়া করে তখন তাদের মধ্য থেকে যারা অস্বীকার করার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছে তারা (সমস্ত কথা শোনার পর) একথাই বলে যে, এটি প্রাচীন কালের একটি গালগল্প ছাড়া আর কিছুই নয়।[১৮] তারা এ মহাসত্যবাণী গ্রহণ করা থেকে লোকদেরকে বিরত রাখে এবং নিজেরাও এর কাছ থেকে দূরে পালায়। (তারা মনে করে এ ধরনের কাজ করে তারা তোমার কিছু ক্ষতি করছে) অথচ আসলে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করছে। কিন্তু এটা তারা উপলব্ধি করে না।

রাখে। তাছাড়া আল্লাহ অমুক অমুক সত্তাকে নিজের বিশেষ নিকটতম হিসেবে গণ্য করেছেন এবং তিনিই এ হুকুম দিয়েছেন অথবা কমপক্ষে তাদের সাথে ইলাহসুলভ গুণাবলী সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে সম্মত রয়েছেন এবং আল্লাহর সাথে বান্দার যে ধরনের আচার-আচরণ করা উচিত তাদের সাথেও সে ধরনের আচরণ করতে হবে—কারোর এ জাতীয় কথা বলাও আল্লাহর প্রতি এক ধরনের মিথ্যা দোষারোপ।

১৬. আল্লাহর নিদর্শনাবলী বলতে এমন সব নিদর্শন বুঝানো হয়েছে যেগুলো মানুষের নিজের সত্তার মধ্যে এবং সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে, নবী-রসূলগণের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে যেগুলোর প্রকাশ ঘটেছে এবং যেগুলো আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে পেশ করা হয়েছে। এ সমস্ত নিদর্শন একটি মাত্র সত্যের প্রতিই মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সে সত্যটি হচ্ছে, এ সৃষ্টিজগতের বুকে যা কিছু অস্তিত্বমান তার মধ্যে বিধাতা ও মনিব মাত্র একজনই এবং বাকি সবাই প্রজা ও বান্দা। এখন যে ব্যক্তি এ সমস্ত নিদর্শনের মোকাবিলায় প্রকৃত ও যথার্থ সাক্ষ-প্রমাণ ছাড়াই, কোন জ্ঞান, প্রত্যক্ষ

দর্শন ও কোন প্রকার অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াই নিছক আন্দাজ-অনুমান বা পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণের ভিত্তিতে অন্যদের সাথে উপাস্য ও পূজনীয় হবার গুণাবলী সংযুক্ত করে এবং আল্লাহ যেসব অধিকার এককভাবে লাভ করেন, তাদেরকে সেগুলোর যোগ্য গণ্য করে, তাদের চেয়ে বড় জালেম আর কেউ হতে পারে না। তারা সুস্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান সত্যের প্রতি অবিচার ও জুলুম করছে। তারা নিজেদের নফসের ওপর জুলুম করছে। তারা এ ভ্রান্ত মতাদর্শের ভিত্তিতে বিশ্ব-জাহানের যেসব জিনিসের সাথে সম্পর্ক ও সংযোগ স্থাপন করে এবং তাদেরকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে তাদের প্রত্যেকের সাথে জুলুম করছে।

১৭. এখানে একথাটি সামনে রাখতে হবে যে, প্রাকৃতিক আইনের আওতায় দুনিয়ায় যা কিছু ঘটে সবকিছুকেই আল্লাহ নিজের কাজ বলে দাবী করেন। কারণ এ আইন আসলে আল্লাহর তৈরী এবং এর আওতায় যা কিছু সংঘটিত হয় তা মূলত আল্লাহর নির্দেশ ও অনুমতিক্রমেই বাস্তব রূপ লাভ করে। হঠকারী ও সত্য অস্বীকারকারীদের সবকিছু শোনার পরও কিছু না শোনা এবং সত্যের আহবায়কের কোন কথা তাদের মনের গহনে প্রবেশ না করা তাদের একগুঁয়েমি, গোঁড়ামি ও স্থবিরতার স্বাভাবিক ফল। যে ব্যক্তি জিদ ও হঠকারিতার শিকার হয় এবং সকল প্রকার পক্ষপাতিত্ব ও একদেশদর্শিতা পরিহার করে সত্যনিষ্ঠ মানুষের দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করতে প্রস্তুত হয় না। তার মনের দরজা তার কামনা ও প্রবৃত্তি বিরোধী প্রতিটি সত্যের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, এটিই প্রকৃতির আইন। একথাটি বলার সময় আমরা বলি, অমুক ব্যক্তির মনের দুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে। আর আল্লাহ একথাটি বলার সময় বলেন, তার মনের দরজা আমি বন্ধ করে দিয়েছি। কারণ আমরা কেবলমাত্র ঘটনা বর্ণনা করি আর আল্লাহ বর্ণনা করেন ঘটনার অভ্যন্তরের প্রকৃত সত্য।

১৮. মূর্খ ও নির্বোধদের সত্যের দিকে আহবান জানালে তারা সাধারণত বলে থাকে, তুমি আর নতুন কথা কি বললে? এসব তো সে পুরনো কথা, যা আমরা আগে থেকেই শুনে আসছি। যেন এ নির্বোধদের মতে কোন কথা সত্য হতে হলে তা একেবারে আনকোরা নতুন হওয়া চাই এবং পুরনো কোন কথা সত্য হতে পারে না। অথচ সত্য প্রতি যুগেই এক এবং চিরকাল একই থাকবে। আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে যারা মানব জাতিকে পথ দেখাবার জন্য এগিয়ে এসেছেন তারা ইতিহাসের প্রাচীনতম যুগ থেকে একই সত্য পেশ করে এসেছেন এবং ভবিষ্যতেও যে ব্যক্তি এই জ্ঞানের উৎস থেকে লাভবান হয়ে কিছু পেশ করবেন তিনিও এই একই পুরনো কথার পুনরাবৃত্তিই করবেন। অবশ্যি নতুন ও উদ্ভট অলীক কথা কেবল তারাই উদ্ভাবন করতে পারবেন যারা আল্লাহর আলোক থেকে বঞ্চিত হয়ে আদি ও চিরন্তন সত্য প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবেন এবং নিজেদের কিছু মনগড়া মতবাদকে সত্যের নামে মানুষের সামনে উপস্থাপন করবেন। এ ধরনের লোকেরাই নিসন্দেহে এমন নতুন ও আজগুবী কথা বলতে পারেন, যা তাদের পূর্বে দুনিয়ায় কেই কোনদিন বলেনি।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ
رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧﴾ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ؕ
وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَقَالُوْٓا اِنْ هِىَ اِلَّا
حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ؕ
قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٠﴾

হায়! যদি তুমি সে সময়ের অবস্থা দেখতে পারতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারে দাঁড় করানো হবে। সে সময় তারা বলবে, হায়! যদি এমন কোন উপায় হতো যার ফলে আমরা আবার দুনিয়ায় প্রেরিত হতাম তখন আমাদের রবের নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা বলতাম না এবং মুমিনদের অন্তরভুক্ত হয়ে যেতাম। আসলে একথা তারা নিছক এ জন্য বলবে যে, তারা যে সত্যকে ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিল তা সে সময় আবরণমুক্ত হয়ে তাদের সামনে এসে যাবে।[১৯] নয়তো তাদেরকে যদি আগের জীবনের দিকে ফেরত পাঠানো হয় তাহলে আবার তারা সে সবকিছুই করে যাবে যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। তারা তো মিথ্যুকই (তাই নিজেদের মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করার ক্ষেত্রেও তারা মিথ্যারই আশ্রয় নেবে)। আজ এরা বলে, জীবন বলতে যা কিছু আছে, তা কেবল এ দুনিয়ার জীবনটুকুই এবং মরার পর আমাদের আর কোনক্রমেই উঠানো হবে না। হায়! সেই দৃশ্যটা যদি তোমরা দেখতে পারতে যখন এদেরকে এদের রবের সামনে দাঁড় করানো হবে। সে সময় এদের রব এদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, "এটা কি সত্য নয়"? এরা বলবে, "হাঁ, হে আমাদের রব! এটা সত্যই।" তিনি বলবেন, "আচ্ছা, এবার তাহলে নিজেদের সত্য অস্বীকারের ফলস্বরূপ আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো।

১৯. অর্থাৎ তাদের একথা আসলে বুদ্ধি–বিবেক ও চিন্তা–ভাবনার কোন সঠিক সিদ্ধান্ত এবং তার ভিত্তিতে কোন যথার্থ মত পরিবর্তনের ফল হবে না। বরং তা হবে নিছক সত্যের সাথে সরাসরি সাক্ষাতের ফল, যার পরে কোন কট্টর কাফেরও আর অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে না।

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا
يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ؕ
اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٣١﴾ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ
خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٣٢﴾ قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ
يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
يَجْحَدُوْنَ ﴿٣٣﴾

৪ রুকূ'

যারা আল্লাহর সাথে নিজেদের সাক্ষাতের ঘোষণাকে মিথ্যা গণ্য করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যখন অকস্মাৎ সে সময় এসে যাবে তখন এরাই বলবে, "হায়, আফসোস! এ ব্যাপারে আমাদের কেমন ভুল হয়ে গেছে।" আর তারা নিজেদের পিঠে নিজেদের গোনাহের বোঝা বহন করতে থাকবে। দেখো, কেমন নিকৃষ্ট বোঝা এরা বহন করে চলছে! দুনিয়ার জীবন তো একটি খেল-তামাসার ব্যাপার।[২০] আসলে যারা ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে চায় তাদের জন্য আখেরাতের আবাসই ভালো। তবে কি তোমরা বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাজে লাগাবে না?

হে মুহাম্মাদ! একথা অবশ্যি জানি, এরা যেসব কথা তৈরী করে, তা তোমাকে কষ্ট দেয় কিন্তু এরা তোমাকে মিথ্যা বলে না বরং এ জালেমরা আসলে আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করছে।[২১]

২০. এর মানে এ নয় যে, দুনিয়ার জীবনটি নেহাত হাল্কা ও গুরুত্বহীন বিষয়, এর মধ্যে কেন গাম্ভীর্য নেই এবং নিছক খেল-তামাসা করার জন্য এ জীবনটি তৈরী করা হয়েছে। বরং এর মানে হচ্ছে, আখেরাতের যথার্থ ও চিরন্তন জীবনের তুলনায় দুনিয়ার এ জীবনটি ঠিক তেমনি যেমন কোন ব্যক্তি কিছুক্ষণ খেলাধূলা করে চিত্তবিনোদন করে তারপর তার আসল ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ কারবারে মনোনিবেশ করে। তাছাড়া একে খেলাধূলার সাথে তুলনা করার কারণ হচ্ছে এই যে, এখানে প্রকৃত সত্য গোপন থাকার ফলে যারা ভেতরে দৃষ্টি না দিয়ে শুধুমাত্র বাইরেরটুকু দেখতে অভ্যস্ত তাদের জন্য বিভ্রান্তির শিকার হবার বহুতর কারণ বিদ্যমান। এসব বিভ্রান্তির শিকার হয়ে মানুষ প্রকৃত সত্যের বিরুদ্ধে এমন সব অদ্ভুত ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে যার ফলশ্রুতিতে তাদের জীবন নিছক একটি খেলা ও তামাসার বস্তুতে পরিণত হয়। যেমন যে ব্যক্তি এ

পৃথিবীতে বাদশাহের আসনে বসে তার মর্যাদা আসলে নাট্যমঞ্চের সেই কৃত্রিম বাদশাহর চাইতে মোটেই ভিন্নতর নয়, যে সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে সিংহাসনে বসে এবং এমনভাবে হুকুম চালাতে থাকে যেন সে সত্যিকারের একজন বাদশাহ। অথচ প্রকৃত বাদশাহীর সামান্যতম নামগন্ধও তার মধ্যে নেই। পরিচালকের সামান্য ইংগিতেই তার বরখাস্ত, বন্দী ও হত্যার সিদ্ধান্তও হয়ে যেতে পারে। এ দুনিয়ার সর্বত্র এ ধরনের অভিনয়ই চলছে। কোথাও কোন পীর–অলী বা দেব–দেবীর দরবারে মনস্কামনা পূরণের জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে। অথচ সেখানে মনস্কামনা পূর্ণ করার ক্ষমতার লেশ মাত্রও নেই। কোথাও অদৃশ্য জ্ঞানের কৃতিত্বের প্রকাশ ঘটানো হচ্ছে। অথচ সেখানে অদৃশ্য জ্ঞানের বিন্দু বিসর্গও নেই। কোথাও কেউ মানুষের জীবিকার মালিক হয়ে বসে আছে। অথচ সে বেচারা নিজের জীবিকার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী। কোথাও কেউ নিজেকে সম্মান ও অপমানের এবং লাভ ও ক্ষতির সর্বময় কর্তা মনে করে বসে আছে। সে এমনভাবে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ডংকা বাজিয়ে চলছে যেন মনে হয়, আশপাশের সমুদয় সৃষ্টির সে এক মহাপ্রভু। অথচ তার ললাটে চিহ্নিত হয়ে আছে দাসত্বের কলংক টীকা। ভাগ্যের সামান্য হেরফেরই শ্রেষ্টত্বের আসন থেকে নামিয়ে তাকে সেসব লোকের পদতলে নিষ্পিষ্ট করা হতে পারে যাদের ওপর কাল পর্যন্তও সে প্রভুত্ব ও কৃর্তত্ব চালিয়ে আসছিল। দুনিয়ার এই মাত্র কয়েকদিনের জীবনেই এসব অভিনয় চলছে। মৃত্যুর মুহূর্ত আসার সাথে সাথেই এক লহমার মধ্যেই এসব কিছুই বন্ধ হয়ে যাবে। এ জীবনের সীমান্ত পার হবার সাথে সাথেই মানুষ এমন এক জগতে পৌঁছে যাবে যেখানে সবকিছুই হবে প্রকৃত সত্যের অনুরূপ এবং যেখানে এ দুনিয়ার জীবনের সমস্ত বিভ্রান্তির আবরণ খুলে ফেলে দিয়ে মানুষকে দেখিয়ে দেয়া হবে কি পরিমাণ সত্য সে সাথে করে এনেছে। সত্যের মীযান তথা তারসাম্যপূর্ণ তুলাদণ্ডে পরিমাপ করে তার মূল্য ও মান নির্ধারণ করা হবে।

২১. প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যতদিন পর্যন্ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জাতিকে আল্লাহর আয়াত শুনাতে শুরু করেননি ততদিন তারা তাঁকে "আমীন" ও সত্যবাদী মনে করতো এবং তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতো। যখন তিনি তাদেরকে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাতে শুরু করলেন তখন থেকেই তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে শুরু করলো। এ দ্বিতীয় যুগেও তাদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলার সাহস করতে পরতো। তাঁর কোন কট্টর বিরোধীও তাঁর বিরুদ্ধে কখনো এ ধরনের দোষারোপ করেনি যে, দুনিয়াবী ব্যাপারে তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেছেন। নবী হবার কারণে এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করার জন্যই তারা তাঁকে মিথ্যাচারে অভিযুক্ত করেছে। তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল আবু জাহেল। হযরত আলীর (রা) বর্ণনা মতে একবার আবু জাহেল নিজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আলাপ প্রসংগে বলে ঃ

انا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به

"আমরা আপনাকে মিথ্যাবাদী মনে করি না বরং আপনি যা কিছু পেশ করছেন সেগুলোকেই মিথ্যা বলছি।"

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا
حَتّٰٓى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ
نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ۝ وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ
اَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ۭ
وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝

তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকে মিথ্যা বলা হয়েছে কিন্তু তাদের ওপর যে মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে এবং যে কষ্ট দেয়া হয়েছে, তাতে তারা সবর করেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে গেছে। আল্লাহর কথাগুলো পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারোর নেই[২২] এবং আগের রসূলদের সাথে যা কিছু ঘটে গেছে তার খবর তো তোমার কাছে পৌঁছে গেছে। তবুও যদি তাদের উপেক্ষা তোমার কাছে অসহনীয় হয়ে থাকে তাহলে তোমার মধ্যে কিছু শক্তি থাকলে তুমি ভূগর্ভে কোন সুড়ংগ খুঁজে নাও অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগাও এবং তাদের কাছে কোন নিদর্শন আনার চেষ্টা করো।[২৩] আল্লাহ চাইলে এদের সবাইকে হেদায়াতের ওপর একত্র করতে পারতেন। কাজেই মূর্খদের অন্তরভুক্ত হয়ো না।[২৪]

বদর যুদ্ধের সময় আখনাস ইবনে শারীক নিরিবিলিতে আবু জাহেলকে জিজ্ঞেস করে, "এখানে আমি ও তুমি ছাড়া আর তৃতীয় কেউ নেই। সত্যি করে বল তো, মুহাম্মাদকে তুমি সত্যবাদী মনে করো, না মিথ্যাবাদী? আবু জাহেল জবাব দেয়, "আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ একজন সত্যবাদী। সারা জীবনে কখনো মিথ্যা বলেনি। কিন্তু যখন পতাকা, হাজীদের পানি পান করানো, আল্লাহর ঘরের পাহারাদারী ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ও নবুওয়াত সবকিছুই 'কুসাই' বংশের লোকদের ভাগে পড়ে তখন কুরাইশ বংশের অন্যান্য শাখার ভাগে কি থাকে বলো?" তাই এখানে আল্লাহ তাঁর নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, তারা তোমার নয় বরং আমার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছে আর আমি যখন এসব সহ্য করে নিচ্ছি এবং তাদেরকে ঢিল দিয়ে চলছি তখন তুমি কেন অস্থির হয়ে পড়েছো?

২২. অর্থাৎ হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার সংঘাতের যে বিধান আল্লাহ তৈরী করে দিয়েছেন, তা বদলে দেবার ক্ষমতা কারোর নেই। সত্যপন্থীদের অবশ্যি দীর্ঘকাল পরীক্ষার আগুনে ঝালাই হতে হবে। তাদের পরীক্ষা দিতে হবে নিজেদের সবর, সহিষ্ণুতা, সততা, সত্যবাদিতা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, আত্মোৎসর্গিতা, ঈমানী দৃঢ়তা ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার। বিপদ, মুসিবত, সমস্যা ও সংকটের সুকঠিন পথ অতিক্রম করে তাদের মধ্যে এমন গুণাবলী সৃষ্ট করতে হবে, যা কেবল মাত্র ঐ কঠিন বিপদ সংকুল গিরিবর্তেই

লালিত হতে পারে। তাদের শুরুতেই নির্ভেজাল উন্নত নৈতিক গুণাবলী ও সচ্চরিত্রের অস্ত্র ব্যবহার করে জাহেলিয়াতের ওপর বিজয় লাভ করতে হবে। এভাবে তারা নিজেদেরকে উন্নত সংস্কারকারী বলে প্রমাণ করতে পারলেই আল্লাহর সাহায্য যথা সময়ে তাদেরকে সহায়তা দান করার জন্য এগিয়ে আসবে। সময় হবার পূর্বে কেউ হাজার চেষ্টা করেও তাকে আনতে পারবে না।

২৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দেখতেন, এ জাতিকে বুঝাতে বুঝাতে দীর্ঘকাল হয়ে গেলো অথচ এরা কোনক্রমেই হেদায়াতের পথে আসছে না, তখন অনেক সময় তাঁর মনের গহনে এ ধরনের ইচ্ছা ও বাসনা জন্ম নিতো যে, আহা, যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কোন নিদর্শন প্রকাশিত হতো, যার ফলে এরা কুফরী পরিহার করে আমার দাওয়াতকে সত্য বলে গ্রহণ করে নিতো। তাঁর এ ইচ্ছা ও বাসনার জবাব এ আয়াতে দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, অধৈর্য হয়ো না। যে বিন্যাস ও ধারবাহিকতা সহকারে আমি এ কাজটি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তার ওপর সবর করে এগিয়ে চলো। অলৌকিকতার আশ্রয় নিতে হলে তা কি আমি নিজেই নিতে পারতাম না? কিন্তু আমি জানি, তোমাকে যে চিন্তাগত ও নৈতিক বিপ্লব এবং যে সুস্থ সাংস্কৃতিক জীবনধারা নির্মাণের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে তাকে সফলতার মনযিলে পৌছাবার সঠিক পথ এটা নয়। তবুও যদি লোকদের বর্তমান নিশ্চলতা ও অস্বীকৃতির অচলায়তনের মোকাবিলায় তুমি সবর করতে না পারো এবং তুমি ধারণা করে থাকো যে, এ নিশ্চলতা দূর করার জন্য কোন বস্তুগত নিদর্শনের চাক্ষুষ প্রদর্শনী অপরিহার্য, তাহলে তুমি নিজেই চেষ্টা করো, শক্তি ব্যবহার করো এবং ক্ষমতা থাকলে যমীনের মধ্যে সুড়ংগ কেটে বা আসমানে উঠে এমন কোন অলৌকিক ব্যাপার ঘটাবার চেষ্টা করো, যা অবিশ্বাসকে বিশ্বাসে রূপান্তরিত করে দেবার জন্য যথেষ্ট বলে তুমি মনে করো। কিন্তু আমি তোমার এ বাসনা পূর্ণ করবো, এ ধরনের আকাংখা আমার ব্যাপারে পোষণ করো না। কারণ আমার পরিকল্পনায় এ ধরনের কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বনের কোন অবকাশ নেই।

২৪. অর্থাৎ যদি কেবলমাত্র সমস্ত মানুষকে কোন না কোনভাবে সত্যপন্থী বানানোই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে কিতাব নাযিল করা, মুমিনদেরকে কাফেরদের মোকাবিলায় সংগ্রামরত করা এবং সত্যের দাওয়াতকে পর্যায়ক্রমে আন্দোলনের মনযিল অতিক্রম করাবার কি প্রয়োজন ছিল? আল্লাহর একটি মাত্র সৃজনী ইংগিতেই এ কাজ সম্পন্ন হতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ এ কাজটি এ পদ্ধতিতে করতে চান না। তিনি চান সত্যকে যুক্তি-প্রমাণ সহকারে লোকদের সামনে পেশ করতে। তারপর তাদের মধ্য থেকে যারা সঠিক ও নির্ভুল চিন্তা শক্তি প্রয়োগ করে সত্যকে চিনে নেবে, তারা নিজেদের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে তার প্রতি ঈমান আনবে। নিজেদের চরিত্রকে তার ছাঁচে ঢালাই করে বাতিল পূজারীদের মোকাবিলায় নিজেদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে। নিজেদের শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন, উন্নত লক্ষ ও উদ্দেশ্য, উত্তম জীবনধারা এবং পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্র মাধুর্যে মানব সমাজের সত্যনিষ্ঠ ও সদাচারী ব্যক্তিদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকবে এবং বাতিলের বিরুদ্ধে উপর্যুপরি সংগ্রাম চালিয়ে স্বাভাবিক পরিবর্তনের পথ ধরে আল্লাহর সত্য দীন প্রতিষ্ঠার মনযিলে পৌছে যাবে। এ কাজে আল্লাহ তাদেরকে পথ দেখাবেন এবং যে পর্যায়ে তারা আল্লাহর কাছ থেকে যে ধরনের সাহায্য

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ
يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ
أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي
الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي
الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

সত্যের দাওয়াতে তারাই সাড়া দেয় যারা শোনে। আর মৃতদেরকে[২৫] তো আল্লাহ কবর থেকেই ওঠাবেন, তারপর তাদেরকে (তাঁর আদালতে হাযির হবার জন্য) ফিরিয়ে আনা হবে।

তারা বলে, এ নবীর ওপর তার রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন? বলো, আল্লাহ নিদর্শন অবতীর্ণ করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক অজ্ঞতায় ডুবে আছে।[২৬] ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল কোন প্রাণী এবং বাতাসে ডানা বিস্তার করে উড়ে চলা কোন পাখিকেই দেখ না কেন, এরা সবাই তোমাদের মতই বিভিন্ন শ্রেণী। তাদের ভাগ্যলিপিতে কোন কিছু লিখতে আমি বাদ দেইনি।

লাভের যোগ্য বলে নিজেদেরকে প্রমাণ করতে পারবে সে পর্যায়ে তাদেরকে সে সাহায্যও দিয়ে যেতে থাকবেন। কিন্তু যদি কেউ চায় এ স্বাভাবিক পথ পরিহার করে আল্লাহ নিছক তাঁর প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির জোরে খারাপ চিন্তা নির্মূল করে মানুষের মধ্যে সুস্থ চিন্তার বিস্তার ঘটাবেন এবং অসুস্থ সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিলোপ সাধন করে সৎ ও সুস্থ জীবনধারা নির্মাণ করে দেবেন, তাহলে এমনটি কখনো হবে না। কারণ, যে প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্মনীতির ভিত্তিতে আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় একটি দায়িত্বশীল প্রাণী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, তাকে কাজ করার ও আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুকে কাজে লাগাবার ক্ষমতা দিয়েছেন, আনুগত্য ও অবাধ্যতা করার স্বাধীনতা দান করেছেন, পরীক্ষার অবকাশ দিয়েছেন এবং তার প্রচেষ্টা অনুযায়ী পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের জন্য ফায়সালার সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন, এটি তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

২৫. যারা শোনে বলতে এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে যাদের বিবেক জীবন্ত ও জাগ্রত, যারা নিজেদের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিকে অচল করে দেয়নি এবং যারা নিজেদের মনের দুয়ারে পক্ষপাতিত্ব, বিদ্বেষ ও জড়তার তালা ঝুলিয়ে দেয়নি। পক্ষান্তরে মৃত হচ্ছে তারা যারা ভেড়ার পালের মতো গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে অন্ধের মতো এগিয়ে যেতে থাকে এবং প্রথম ভেড়াটির পথ ছাড়া অন্য কোন পথ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না, তা দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট ও অকাট্য সত্য হলেও।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِى الظُّلُمٰتِ ؕ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ؕ
وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٩﴾ قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ
عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ﴿٤٠﴾ بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ
وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ﴿٤١﴾

তারপর তাদের সবাইকে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে। কিন্তু যারা আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা বলে তারা বধির ও বোবা, তারা অন্ধকারে ডুবে আছে,[২৭] আল্লাহ যাকে চান বিপথগামী করেন আবার যাকে চান সত্য সরল পথে পরিচালিত করেন।[২৮] এদেরকে বলো, একটু ভেবে চিন্তে বলতো দেখি, যদি তোমাদের ওপর কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বড় রকমের বিপদ এসে পড়ে অথবা শেষ সময় এসে যায়, তাহলে সে সময় কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ডাকো? বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তখন তোমরা একমাত্র আল্লাহকেই ডেকে থাকো। তারপর তিনি চাইলে তোমাদেরকে সেই বিপদমুক্ত করেন। যাদেরকে তোমরা তাঁর সাথে শরীক করতে তাদের কথা এ সময় একদম ভুলে গিয়ে থাকো।[২৯]

২৬. নিদর্শন বলতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মু'জিযাকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর এ বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, মু'জিযা না দেখাবার কারণ এ নয় যে, আমি তা দেখাতে অক্ষম বরং এর কারণ অন্য কিছু। নিছক নিজেদের অজ্ঞতার কারণে তারা এটা বুঝতে পারছে না।

২৭. অর্থাৎ তোমরা যদি নিছক তামাশা দেখার জন্য নয় বরং এ নবী যে বিষয়ের দিকে আহবান জানাচ্ছেন তা সত্য কিনা যথার্থই তা জানার জন্য নিদর্শন দেখতে চাও, তাহলে ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখো, তোমাদের চারদিকে অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। পৃথিবীর বুকে বিচরণশীল প্রাণীকূল এবং শূন্যে উড়ে চলা পাখিদের কোন একটি শ্রেণীকে নিয়ে তাদের জীবন সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করো। দেখো, কীভাবে তাদেরকে অবস্থা ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তাদের আকৃতি নির্মাণ করা হয়েছে। কীভাবে তাদের সৃষ্টিগত স্বাভাবিক প্রবণতার মধ্যে তাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন অনুযায়ী শক্তি ও সামর্থের সঞ্চার করা হয়েছে। কীভাবে তাদের জীবিকা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কীভাবে তাদের জন্য ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তারা তার সীমানা পেরিয়ে এগিয়ে যেতেও পারে না, পিছিয়ে আসতেও পারে না। কীভাবে তাদের এক একটি প্রাণীকে

এবং এক একটি ছোট ছোট কীট-পতংগকেও তার নিজের স্থানে সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পথপ্রদর্শন করা হচ্ছে। কীভাবে একটি নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী তার থেকে কাজ আদায় করে নেয়া হচ্ছে। কীভাবে তাকে একটি নিয়ম-শৃংখলার আওতাধীন করে রাখা হয়েছে। কীভাবে তার জন্ম, মৃত্যু ও বংশ বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা যথা নিয়মে চলছে। আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনের মধ্য থেকে যদি কেবলমাত্র এ একটি নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করো তাহলে তোমরা জানতে পারবে যে, আল্লাহর একত্ব এবং তাঁর গুণাবলীর যে ধারণা এ নবী তোমাদের সামনে পেশ করছেন এবং সে ধারণা অনুযায়ী দুনিয়ায় জীবন যাপন করার জন্য যে কর্মনীতি অবলম্বন করার দিকে তোমাদের আহবান জানাচ্ছেন, তা-ই যথার্থ ও প্রকৃত সত্য। কিন্তু তোমরা নিজেদের চোখ মেলে এগুলো দেখও না আর কেউ বুঝাতে এলে তার কথা মেনেও নাও না। তোমরা তো মুখ গুঁজে পড়ে আছো মূর্খতার নিকষ অন্ধকারে। অথচ তোমরা চাইছো আল্লাহর বিস্ময়কর ক্ষমতার তেলেসমাতি দেখিয়ে তোমাদের মন মাতিয়ে রাখা হোক।

২৮. আল্লাহর বিপথগামী করার অর্থ হচ্ছে একজন মূর্খতা ও অজ্ঞতাপ্রিয় ব্যক্তিকে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অধ্যয়ন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা। আর একজন পক্ষপাতদুষ্ট, বিদ্বেষী ও সত্যবিরোধী জ্ঞানান্বেষী কখনো আল্লাহর নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করলেও সত্যের পক্ষে পৌছার নিশানীগুলো তার দৃষ্টির অগোচরে থেকে যাবে এবং বিভ্রান্তির অক্টোপাসে জড়িয়ে ফেলার মতো জিনিসগুলো তাকে সত্য থেকে দূরে টেনে নিয়ে যেতে থাকবে। অপরদিকে আল্লাহর হেদায়াত তথা সত্য-সরল পথে পরিচালিত করার অর্থ হচ্ছে এই যে, একজন সত্যান্বেষী ব্যক্তি জ্ঞানের উপকরণসমূহ থেকে লাভবান হবার সুযোগ লাভ করে এবং আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে সত্যের লক্ষ্যে পৌছার নিশানীগুলো লাভ করে যেতে থাকে। এ তিনটি অবস্থার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আজকাল প্রায়ই আমাদের সামনে এসে থাকে। এমন বহু লোক আছে যাদের সামনে পৃথিবীর বস্তুনিচয় ও প্রাণীকুলের মধ্যে তাদের জন্য আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে কিন্তু তারা জন্তু-জানোয়ারের মতো সেগুলো দেখে থাকে এবং সেখান থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না। বহু লোক প্রাণীবিদ্যা (ZOOLOGY), উদ্ভিদ বিদ্যা (BOTANY), জীববিদ্যা (BIOLOGY), ভূতত্ব (GEOLOGY), মহাকাশ বিদ্যা (ASTRONOMY), শরীর বিজ্ঞান (PHYSIOLOGY), শবব্যবচ্ছেদ বিদ্যা (ANATOMY), এবং বিজ্ঞানের আরো বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় ব্যাপক অধ্যয়ন করেন, ইতিহাস, প্রত্নতত্ব ও সমাজ বিজ্ঞানে গবেষণা করেন এবং এমন সব নিদর্শন তাদের সামনে আসে যেগুলো হৃদয়কে ঈমানের আলোয় ভরে দেয়। কিন্তু যেহেতু তারা বিদ্বেষ ও পক্ষপাতদুষ্ট মানসিকতা নিয়ে অধ্যয়নের সূচনা করেন এবং তাদের সামনে বৈষয়িক লাভ ছাড়া আর কিছুই থাকে না, তাই এ অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণকালে তারা সত্যের দোরগোড়ায় পৌছবার মতো কোন নিদর্শন পায় না। বরং তাদের সামনে যে নিদর্শনটিই উপস্থিত হয় সেটিই তাদেরকে নাস্তিকতা, আল্লাহ বিমুখতা, বস্তুবাদিতা ও প্রকৃতিবাদিতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। তাদের মোকাবিলায় এমন লোকের সংখ্যাও একেবারে নগণ্য নয় যারা সচেতন বুদ্ধি বিবেকের সাথে চোখ মেলে বিশ্ব প্রকৃতির এ সুবিশাল কর্মক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করেন এবং বলে ওঠেন ঃ

"সচেতন দৃষ্টি সমুখে গাছের প্রতিটি সবুজ পাতা
একেকটি গ্রন্থ যেন স্রষ্টা-সন্ধানের এনেছে বারতা।"

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ
يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ
فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم
بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾

৫ রুকূ'

তোমার পূর্বে অনেক মানব গোষ্ঠীর কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে বিপদ ও কষ্টের মুখে নিক্ষেপ করেছি, যাতে তারা বিনীতভাবে আমার সামনে মাথা নত করে। কাজেই যখন আমার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কঠোরতা আরোপিত হলো তখন তারা বিনম্র হলো না কেন? বরং তাদের মন আরো বেশী কঠিন হয়ে গেছে এবং শয়তান তাদেরকে এ মর্মে নিশ্চিন্ততা বিধান করেছে যে, তোমরা যা কিছু করছো ভালই করছো। তারপর যখন তারা তাদের যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তা ভুলে গেলো তখন তাদের জন্য সমৃদ্ধির সকল দরজা খুলে দিলাম। শেষ পর্যন্ত তারা যখন তাদেরকে যা কিছু দান করা হয়েছিল তার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে গেলো তখন অকস্মাত তাদেরকে পাকড়াও করলাম এবং তখন অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, তারা সব রকমের কল্যাণ থেকে নিরাশ হয়ে পড়েছিল।

২৯. আগের আয়াতে বলা হয়েছিল, তোমরা একটি নিদর্শন নিয়ে আসার দাবী জানাচ্ছো অথচ তোমাদের চারদিকে অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। এ প্রসংগে প্রথম দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রাণীদের জীবনধারা পর্যবেক্ষণ করার আহবান জানানো হয়েছিল। এরপর এখন আর একটি নিদর্শনের দিকে ইংগিত করা হচ্ছে। এ নিদর্শনটি সত্য অস্বীকারকারীদের নিজেদের মধ্যেই রয়েছে। মানুষ কোন বড় রকমের বিপদের সম্মুখীন হলে অথবা মৃত্যু তার ভয়াবহ চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালে এক আল্লাহর আশ্রয় ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল তখন আর মানুষের চোখে পড়ে না। বড় বড় মুশরিকরা এ সময় নিজেদের উপাস্য দেবতাদের কথা ভুলে এক আল্লাহকে ডাকতে থাকে। কট্টর খোদাদ্রোহী নাস্তিকও এ সময় আল্লাহর কাছে দু'হাত তুলে দোয়া করে। এ নিশানীটিকে এখানে সত্যের নিদর্শন হিসেবে পেশ করা হচ্ছে। কারণ আল্লাহ ভক্তি ও তাওহীদের সাক্ষ প্রত্যেক মানুষের নিজের মধ্যেই বিদ্যমান। এর ওপর গাফলতি ও অজ্ঞানতার যতই আবরণ পড়ুক না কেন তবুও তা কখনো না কখনো দৃষ্টি সমক্ষে জেগে ওঠে। আবু জাহেলের ছেলে ইকরামা এ ধরনের নিশানী প্রত্যক্ষ

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۭ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٥﴾ قُلْ
اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ
مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ۭ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ
هُمْ يَصْدِفُوْنَ ﴿٤٦﴾ قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً
هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٧﴾

এ ভাবে যারা জুলুম করেছিল তাদের শিকড় কেটে দেয়া হলো। আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রভু আল্লাহর জন্য (কারণ তিনিই তাদের শিকড় কেটে দিয়েছেন।)।

হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলো, তোমরা কি কখনো একথা ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহ তোমাদের থেকে তোমাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি ছিনিয়ে নেন এবং তোমাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন[৩০] তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোন্ ইলাহ আছে যে এ শক্তিগুলো তোমাদের ফিরিয়ে দিতে পারে? দেখো, কিভাবে আমরা বারবার আমাদের নিশানীগুলো তাদের সামনে পেশ করি এবং এরপরও তারা কিভাবে এগুলো থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। বলো, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে অকস্মাৎ অথবা প্রকাশ্যে আযাব এসে যায় তাহলে জালেমরা ছাড়া আর কেউ ধ্বংস হবে কি?

করেই ঈমানের সম্পদলাভে সক্ষম হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে মক্কা বিজিত হবার পর ইকরামা জেদ্দার দিকে পালিয়ে যান। একটি নৌকায় চড়ে তিনি হাবশার (ইথিয়োপিয়ার) পথে যাত্রা করেন। পথে ভীষণ ঝড়-তুফানে তার নৌকা চরম বিপদের সম্মুখীন হয়। প্রথমে দেবদেবীদের দোহাই দেয়া শুরু হয়। কিন্তু এতে তুফানের ভয়াবহতা কমে না বরং আরো বেড়ে যেতেই থাকে। যাত্রীদের মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, এবার নৌকা ডুবে যাবে। তখন সবাই বলতে থাকে, এখন আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ডাকলে চলবে না। একমাত্র তিনি চাইলে আমাদের বাঁচাতে পারেন। এ সময় ইকরামার চোখ খুলে যায়। তার মন বলে ওঠে, যদি এখানে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সাহায্যকারী না থেকে থাকে, তাহলে অন্য জায়গায়ই বা আর কেউ থাকবে কেন? একথাটাই তো আল্লাহর সেই নেক বান্দাটি আমাদের গত বিশ বছর থেকে বুঝাচ্ছেন আর আমরা খামখা তাঁর সাথে লড়াই করছি। এটি ছিল ইকরামার জীবনের সিদ্ধান্তকরী মুহূর্ত। সে মুহূর্তেই তিনি আল্লাহর কাছে অংগীকার করেন, যদি এ যাত্রায় আমি বেঁচে যাই, তাহলে সোজা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাবো এবং তাঁর হাতে আমার হাত দিয়ে দেবো। পরে তিনি নিজের এ অংগীকার পূর্ণ করেন। ফিরে এসে তিনি কেবল

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ
الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٤٩﴾ قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ
اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا
يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۭ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۭ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٥٠﴾

আমি যে রসূল পাঠাই তা তো কেবল এ জন্যই পাঠাই যে, তারা সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদ দানকারী এবং দুষ্কৃতকারীদের জন্য ভীতিপ্রদর্শনকারী হবে। তারপর যারা তাদের কথা মেনে নেবে এবং নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করবে তাদের জন্য কোন ভয় ও দুঃখের কারণ নেই। আর যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলবে তাদেরকে নিজেদের নাফরমানীর শাস্তি ভোগ করতেই হবে।

হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলো, "আমি তোমাদের একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে, আমি গায়েবের জ্ঞানও রাখি না এবং তোমাদের একথাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো কেবলমাত্র সে অহীর অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি নাযিল করা হয়।"[৩১] তারপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে?[৩২] তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করো না?

মুসলমান হয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং অবশিষ্ট জীবন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করেই কাটান।

৩০. এখানে হৃদয়ে মোহর মেরে দেবার মানে হচ্ছে চিন্তা ও অনুধাবন করার শক্তি কেড়ে নেয়া।

৩১. অজ্ঞ লোকেরা চিরকাল এ ধরনের নির্বুদ্ধিতা প্রসূত চিন্তা পোষণ করে এসেছে যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী ও তাঁর গভীর সান্নিধ্যে অবস্থানকারী ব্যক্তিকে অবশ্যি মানবিক গুণাবলীর উর্ধে অবস্থান করতে হবে। তিনি অভিনব, বিস্ময়কর ও অলৌকিক কার্যাবলী সম্পাদন করবেন। তাঁর হাতের একটি মাত্র ইশারায় পাহাড় সোনায় পরিণত হবে। তাঁর আদেশ দেবার সাথে সাথেই পৃথিবী ধন উদগীরণ করতে থাকবে। লোকদের ভূত-ভবিষ্যত তার সামনে দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট থাকবে। হারানো জিনিস কোথায় আছে তিনি এক নিমেষে বলে দেবেন। রোগী মরে যাবে, না বেঁচে উঠবে এবং প্রসূতির পেটে ছেলে না মেয়ে আছে তা বলে দিতে তার একটুও বেগ পেতে হবে না। এ ছাড়া তাকে মানবিক দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতামুক্ত হতে হবে। সে ব্যক্তি আবার কেমন করে

وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن
دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ
رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم
مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ
مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾

৬ রুকূ'

আর হে মুহাম্মাদ! তুমি এ অহীর জ্ঞানের সাহায্যে তাদেরকে নসিহত করো যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের রবের সামনে কখনো এমন অবস্থায় পেশ করা হবে যে, সেখানে তাদের সাহায্য-সমর্থন বা সুপারিশ করার জন্য তিনি ছাড়া আর কেউ (ক্ষমতা ও কর্তৃত্বশালী) থাকবে না। হয়তো (এ নসিহতের কারণে সতর্ক হয়ে) তারা আল্লাহভীতির পথ অবলম্বন করবে।[৩৩] আর যারা তাদের রবকে দিন-রাত ডাকতে থাকে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টারত থাকে তাদেরকে তোমার কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিয়ো না।[৩৪] তাদের কৃতকর্ম থেকে কোন জিনিসের (জবাবদিহির) দায়িত্ব তোমার ওপর নেই এবং তোমার কৃতকর্ম থেকেও কোন জিনিসের (জবাবদিহির) দায়িত্ব তাদের ওপর নেই। এ সত্ত্বেও যদি তুমি তাদেরকে দূরে ঠেলে দাও তাহলে তুমি জালেমদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে।[৩৫]

আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করলো যে ক্ষুধা ও পিপাসা অনুভব করে এবং নিদ্রার শিকার হয়, যার স্ত্রী-পুত্র পরিবার আছে, নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য যাকে কেনাবেচা করতে হয়, কখনো ঋণ নিতে হয় এবং কখনো অভাবে-অনটনে চরম দুরাবস্থার শিকার হতে হয়? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন লোকদের মনেও এ ধরনের চিন্তা বিরাজ করতো। তারা তাঁর নবুওয়াতের দাবী শুনে তার সত্যতা যাচাই করার জন্য তাঁর কাছে গায়েবের খবর জিজ্ঞেস করতো। তাঁর কাছে অলৌকিক কার্যাবলী সম্পাদন করার দবী জানাতো। তাঁকে একজন সাধারণ পর্যায়ের মানুষ দেখে তারা আপত্তি করতো যে, এ আবার কেমন পয়গম্বর যিনি খাওয়া দাওয়া করছেন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে থাকছেন এবং হাট-বাজারেও চলাফেরা করছেন? এসব কথার জবাব এ আয়াতে দেয়া হয়েছে।

৩২. এর অর্থ হচ্ছে, আমি যে সত্যগুলো তোমাদের সামনে পেশ করছি, আমি নিজে সেগুলো প্রত্যক্ষ করেছি। সরাসরি আমার অভিজ্ঞতায় সেগুলো ধরা পড়েছে। অহীর মাধ্যমে

সেগুলোর সঠিক জ্ঞান আমাকে দান করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে আমার সাক্ষ চাক্ষুস সাক্ষ ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ তোমরা এ সত্যগুলোর ব্যাপারে একেবারেই অন্ধ। তোমরা এ সত্যগুলো সম্পর্কে যেসব চিন্তা পোষণ করে থাকো তা নিছক আন্দাজ-অনুমান ও ধারণা-কল্পনা ভিত্তিক অথবা সেগুলোর ভিত গড়ে উঠেছে নিছক অন্ধ অনুসরণের ওপর। কাজেই আমার ও তোমাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে চক্ষুষ্মান ও অন্ধের পার্থক্য। তোমাদের ওপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব কেবল এ কারণেই। আমার কাছে আল্লাহর কোন গোপন ধনভাণ্ডার আছে অথবা আমি গায়েবের খবর জানি বা মানবিক দুর্বলতা থেকে আমি মুক্ত—এ জাতীয় কোন বৈশিষ্টের কারণে তোমাদের ওপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

৩৩. এর অর্থ হচ্ছে, যারা দুনিয়ার জীবনে এমনভাবে নিমগ্ন হয়েছে যে, তাদের মৃত্যুর চিন্তাই নেই এবং কখনো আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে এমন কথা ভাবেও না, তাদের জন্য এ নসীহত কখনো ফলপ্রসূ হবে না। অনুরূপভাবে যারা এই ভিত্তিহীন ভরসায় জীবন যাপন করছে যে, দুনিয়ায় তারা যাই কিছু করুক না কেন আখেরাতে তাদের সামান্যতম ক্ষতিও হবে না, কারণ তারা অমুকের সাথে সম্পর্ক পাতিয়ে রেখেছে। অমুক তাদের জন্য সুপারিশ করবে অথবা অমুক তাদের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে, তাদের ওপরও এর কোন প্রভাব পড়বে না। কাজেই এ ধরনের লোকদেরকে বাদ দিয়ে তুমি এমন লোকদেরকে সম্বোধন করো যাদের মনে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবার ভীতি বিরাজমান এবং তাঁর ব্যাপারে কোন মিথ্যা আশ্বাসবাণীতে বিশ্বাস করে না। কেবলমাত্র এ ধরনের লোকদের ওপরই এ নসীহতের প্রভাব পড়তে পারে এবং তাদের সংশোধনের আশা করা যেতে পারে।

৩৪. কুরাইশদের বড় বড় সরদার এবং তাদের বিত্তবান ও স্বচ্ছল লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি উত্থাপন করেছিল তার একটি ছিল এই যে, আপনার চারদিকে আমাদের জাতির ক্রীতদাস, মুক্তি প্রাপ্ত ক্রীতদাস এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা সমবেত হয়েছে। তারা এ বলে নিন্দা ও বিদ্রূপ করতোঃ দেখো, এ ব্যক্তির সাথীও জুটেছে কত বড় সব সম্ভ্রান্ত লোকেরা। বেলাল, আম্মার, সোহাইব, খাব্বাব এরাই তার সাথী। আল্লাহ আমাদের মধ্য থেকে সম্মানিত করার জন্য কি এদের ছাড়া আর কাউকে খুঁজে পেলেন না? তারপর তারা এ ঈমান গ্রহণকারীদের কেবল দূরবস্থার প্রতি বিদ্রূপ করেই ক্ষান্ত হতো না, তাদের মধ্য থেকে যারা ইতিপূর্বে কোন নৈতিক দুর্বলতার শিকার হয়েছিল তারও সমালোচনা করতো এবং বলতো, যারা গতকাল পর্যন্ত এমন ছিল এবং অমুক ব্যক্তি যে অমুক কাজটি করেছিল, এসব লোকই এই 'সম্মানিত দলের' অন্তরভুক্ত হয়েছে। এখানে এসব কথার জবাব দেয়া হয়েছে।

৩৫. অর্থাৎ নিজের দোষ-গুণ ও ভাল-মন্দের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই দায়ী। এ ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তির কাজের জবাবদিহি করার জন্য তুমি দাঁড়াবে না এবং তোমার কাজের জবাবদিহি করার জন্যও তাদের কেউ দাঁড়াবে না। তোমার অংশের কোন নেকী তারা ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এবং তাদের অংশের কোন গোনাহও তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারবে না। এরপরও যখন তারা নিছক সত্যান্বেষী হিসেবে তোমার কাছে আসে তখন তুমি তাদেরকে দূরে ঠেলে দেবে কেন?

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ
بَيْنِنَا ۭ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ۝ وَاِذَا جَاۗءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ
بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۣ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰي نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ
مِنْكُمْ سُوْۗءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝
وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

আসলে আমি এভাবে মানুষের মধ্য থেকে এক দলকে আর এক দলের সাহায্যে পরীক্ষা করেছি,৩৬ যাতে তারা এদেরকে দেখে বলে, "এরা কি সেসব লোক, আমাদের মধ্য থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন?"—হাঁ, আল্লাহ কি তাঁর শোকরগুজার বান্দা কারা, সেটা এদের চাইতে বেশী জানেন না? আমার আয়াতের প্রতি যারা ঈমান আনে তারা যখন তোমার কাছে আসে তখন তাদেরকে বলো, "তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের রব দয়া ও অনুগ্রহের নীতি নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিয়েছেন। তোমাদের কেউ যদি অজ্ঞতা বশত কোন খারাপ কাজ করে বসে, তারপর তাওবা করে এবং সংশোধন করে নেয়, তাহলে তিনি তাকে মাফ করে দেন এবং নরম নীতি অবলম্বন করেন, এটি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহেরই প্রকাশ।৩৭ আর এভাবে আমি আমার নিশানীগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করে থাকি যাতে অপরাধীদের পথ একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।৩৮

৩৬. অর্থাৎ সমাজের নিম্ন পর্যায়ে অবস্থানকারী দরিদ্র, অভাবী ও কপর্দকহীনদেরকে সর্বপ্রথম ঈমান আনার সুযোগ দান করে আমি ধন ও বিত্তের অহংকারে মত্ত লোকদেরকে পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করেছি।

৩৭. যারা সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিলেন তাদের মধ্যে বহু লোক এমনও ছিলেন, যারা জাহেলী যুগে বড় বড় গোনাহ করেছিলেন। এখন ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে বদলে গেলেও ইসলাম বিরোধীরা তাদের পূর্ববর্তী জীবনের দোষ ও কার্যাবলীর জন্য তাদেরকে বিদ্রূপ করতো ও খোঁটা দিতো। এর জবাবে বলা হচ্ছে ঃ ঈমানদারদেরকে সান্ত্বনা দাও। তাদেরকে বলো, যে ব্যক্তি তাওবা করে নিজের সংশোধন করে নেয় তার পেছনের গোনাহের জন্য তাকে পাকড়াও করা আল্লাহর রীতি নয়।

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۚ قُل لَّا أَتَّبِعُ
أَهْوَاءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ
مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ
إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا
تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

৭ রুকূ'

হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলে দাও, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য যাদেরকে ডাকো তাদের বন্দেগী করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বলো, আমি তোমাদের ইচ্ছা-বাসনার অনুসরণ করবো না। এমনটি করলে আমি বিপথগামী হবো এবং সরল-সত্য পথ লাভকারীদের অন্তরভুক্ত থাকবো না। বলো, আমার রবের পক্ষ থেকে আমি একটি উজ্জ্বল প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তোমরা তাকে মিথ্যা বলেছো। এখন তোমরা যে জিনিসটি তাড়াতাড়ি চাচ্ছো সেটি আমার ক্ষমতার আওতাধীন নয়।[৩৯] ফায়সালার সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর হাতে। তিনিই সত্য বিবৃত করেন এবং তিনিই সবচেয়ে ভাল ফায়সালাকারী। বলো, তোমরা যে জিনিসটি তাড়াতাড়ি চাচ্ছো সেটি যদি আমার আওতার মধ্যে থাকতো তাহলে তো আমার ও তোমাদের মধ্যে কবেই ফায়সালা হয়ে যেতো। কিন্তু জালেমদের সাথে কোন্ ধরনের ব্যবহার করা উচিত তা আল্লাহই ভাল জানেন।

৩৮. "এভাবে" শব্দটি বলে ইংগিত করা হয়েছে এ সমগ্র ধারাবাহিক ভাষণটির প্রতি—যেটি শুরু হয়েছে চতুর্থ রুকূ'র নিম্নোক্ত আয়াতটি থেকে : "তারা বলে, এ নবীর ওপর তার রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন?" এর অর্থ হচ্ছে, এ ধরনের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন দলীল, প্রমাণ ও নিদর্শনের পরও যারা নিজেদের কুফরী, অস্বীকার ও অবাধ্যতার ওপর জিদ ধরে চলছে, তাদের অপরাধী হওয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। এ সংগে এ সত্যটি দিবালোকের মত স্বচ্ছ হয়ে ভেসে উঠছে যে, আসলে এসব লোক নিজেদের গোমরাহী প্রীতির কারণেই এ পথে চলছে। সত্যপথে চলার স্বপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি অথবা নিজেদের এ গোমরাহীর পক্ষেও তাদের কাছে কিছু দলীল-প্রমাণ আছে, এ কারণে তারা এ পথে চলছে না।

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ وَمَا
تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ
وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٩﴾ وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ
مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ
مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٠﴾

তাঁরই কাছে আছে অদৃশ্যের চাবি, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। জলে স্থলে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে গাছের একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকার প্রদেশে এমন একটি শস্যকণাও নেই যে সম্পর্কে তিনি অবগত নন। শুষ্ক ও আর্দ্র সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিখিত আছে। তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিবসে তোমরা যা কিছু করো তা জানেন। আবার পরদিন তোমাদের সেই কর্মজগতে ফেরত পাঠান, যাতে জীবনের নির্ধারিত সময়-কাল পূর্ণ হয়। সবশেষে তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি জানিয়ে দেবেন তোমরা কি কাজে লিপ্ত ছিলে।

৩৯. এখানে আল্লাহর আযাবের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। বিরোধীরা বলছিল, যদি তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী হয়ে থাকো তাহলে আমরা যেখানে প্রকাশ্যে তোমাকে মিথ্যুক বলছি এবং তোমার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করছি সেখানে আল্লাহর আযাব আমাদের ওপর আপতিত হচ্ছে না কেন? তোমার আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত হবার বিষয়টি একথা দাবী করে যে, কেউ তোমাকে মিথ্যুক বলার ও অবমাননা করার সাথে সাথেই মাটির বুক বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং সে তার মধ্যে চাপা পড়ে যাবে অথবা সাথে সাথেই বজ্রপাত হবে এবং সে বজ্রাঘাতে সে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। আল্লাহর প্রেরিত ব্যক্তি এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান আনছে তাদের ওপর বিপদের পরে বিপদ আসছে এবং তাদেরকে হেয় ও অপদস্থ করা হচ্ছে অথচ যারা তাদেরকে গালিগালাজ করছে এবং তাদের গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারছে তারা আরামে ও নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করছে।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۚ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ
الْحَقِّ ۭ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۡ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ﴿٦٢﴾ قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ
مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَىِٕنْ اَنْجٰىنَا مِنْ
هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٣﴾ قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ
كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾

৮ রুকূ'

তিনি নিজের বান্দাদের ওপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং তোমাদের ওপর রক্ষক নিযুক্ত করে পাঠান।[৪০] অবশেষে যখন তোমাদের কারোর মৃত্যুর সময় সমুপস্থিত হয় তখন তাঁর প্রেরিত ফেরেশতারা তার প্রাণ বের করে নেয় এবং নিজেদের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তারা সামান্যতম শৈথিল্যও দেখায় না। তারপর তাদের প্রকৃত মালিক ও প্রভু আল্লাহর দিকে তাদের সবাইকে ফিরিয়ে আনা হয়। সাবধান হয়ে যাও, ফায়সালা করার যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র তিনিই এবং তিনি হিসেব গ্রহণের ব্যাপারে অত্যন্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন।

হে মুহাম্মাদ! এদেরকে জিজ্ঞেস করো, জল-স্থলের গভীর অন্ধকারে কে তোমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করে? কার কাছে তোমরা কাতর কণ্ঠে ও চুপে চুপে প্রার্থনা করো? কার কাছে বলে থাকো, এ বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করলে আমরা অবশ্যি তোমার শোকরগুজারী করবো?—বলো, আল্লাহ তোমাদের এ থেকে এবং প্রতিটি দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দেন। এরপরও তোমরা অন্যদেরকে তাঁর সাথে শরীক করো।[৪১]

৪০. অর্থাৎ এমন ধরনের ফেরেশতা নিযুক্ত করেন, যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কথা এবং তৎপরতার ওপর, প্রতিটি নড়াচড়ার ওপর নজর রাখে এবং তোমাদের প্রতিটি গতিবিধিকে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করতে থাকে।

৪১. অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহই যে, সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন, সকল শক্তির অধিকারী, সমস্ত ইখতিয়ার ও কর্মক্ষমতা যে, তাঁরই হাতে সীমাবদ্ধ, তোমাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ করার যাবতীয় ক্ষমতা যে, তাঁরই আয়ত্তাধীন এবং তাঁরই হাতে যে, রয়েছে তোমাদের

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ
تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ؕ
اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ
وَهُوَ الْحَقُّ ؕ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٦٦﴾ لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ وَّسَوْفَ
تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ
حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ؕ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ
بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٦٨﴾

বলো, তিনি ওপর থেকে বা তোমাদের পদতল থেকে তোমাদের ওপর কোন আযাব নাযিল করতে অথবা তোমাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে এক দলকে আর এক দলের শক্তির স্বাদ গ্রহণ করিয়ে দিতে সক্ষম। দেখো, আমি কিভাবে বারবার বিভিন্ন পদ্ধতিতে আমার নিদর্শনসমূহ তাদের সামনে পেশ করছি, হয়তো তারা এ সত্যটি অনুধাবন করবে।[৪২] তোমার জাতি সেটি অস্বীকার করছে। অথচ সেটি সত্য। এদেরকে বলে দাও, আমাকে তোমাদের ওপর হাবিলদার নিযুক্ত করা হয়নি।[৪৩] প্রত্যেকটি খবর প্রকাশিত হবার একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। শীঘ্রই তোমরা নিজেরাই পরিণাম জানতে পারবে।

আর হে মুহাম্মাদ! যখন তুমি দেখো, লোকেরা আমার আয়াতের মধ্যে দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন তাদের কাছ থেকে সরে যাও, যে পর্যন্ত না তারা এ আলোচনা বাদ দিয়ে অন্য প্রসংগে লিপ্ত হয়। আর যদি কখনো শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়,[৪৪] তাহলে যখনই তোমার মধ্যে এ ভুলের অনুভূতি জাগে তারপর আর এ জালেম লোকদের কাছে বসো না।

ভাগ্যের চাবিকাঠি—এ সত্যগুলোর সাক্ষ তো তোমাদের নিজেদের অস্তিত্বের মধ্যেই বিদ্যমান। কোন কঠিন সংকটকাল এলে এবং যাবতীয় উপায় উপকরণ হাতছাড়া হতে দেখা গেলে তোমরা নিতান্ত অসহায়ের মতো তাঁর আশ্রয় চাও। কিন্তু এ সমস্ত দ্ব্যর্থহীন আলামত থাকা সত্ত্বেও তোমরা প্রভুত্বের ক্ষেত্রে কোন প্রকার যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই তাঁর সাথে অন্যদেরকে শরীক করেছো। তাঁরই দেয়া জীবিকায় প্রতিপালিত হয়ে অন্নদাতা

وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُوْنَ ۝ وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ
الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ۚ وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۭ اُولٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ
بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝

তাদের কৃতকর্ম থেকে কোন কিছুর দায়-দায়িত্ব সতর্কতা অবলম্বনকারীদের ওপর নেই। তবে নসীহত করা তাদের কর্তব্য। হয়তো তারা ভুল কর্মনীতি অবলম্বন করা থেকে বেঁচে যাবে।৪৫ যারা নিজেদের দীনকে খেল-তামাশায় পরিণত করেছে এবং দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারণায় নিক্ষেপ করেছে তাদেরকে পরিত্যাগ করো। তবে এ কুরআন শুনিয়ে উপদেশ দিতে ও সতর্ক করতে থাকো, যাতে কোন ব্যক্তি নিজের কর্মকাণ্ডের দরুন ধ্বংসের শিকার না হয়, যখন আল্লাহর হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্য কোন রক্ষাকারী, সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী থাকবে না, আর যদি সে সম্ভাব্য সকল জিনিসের বিনিময়ে নিষ্কৃতি লাভ করতে চায় তাহলে তাও গৃহীত হবে না। কারণ, এ ধরনের লোকেরা তো নিজেরাই নিজেদের কৃতকর্মের ফলে ধরা পড়ে যাবে। নিজেদের সত্য অস্বীকৃতির বিনিময়ে তারা পান করার জন্য পাবে ফুটন্ত পানি আর ভোগ করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

বলছো অন্যদেরকে। তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা লাভ করে অন্যদেরকে বন্ধু ও সাহায্যকারী আখ্যা দিচ্ছো। তাঁর দাস হওয়া সত্ত্বেও অন্যের বন্দেগী ও দাসত্ব করছো। সংকট থেকে তিনিই উদ্ধার করেন এবং বিপদ ও দুঃখ-কষ্টের দিনে তাঁরই কাছে কান্নাকাটি করো কিন্তু তাঁর সহায়তায় সে কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করার পর অন্যদেরকে ত্রাণকর্তা মনে করতে থাকো এবং অন্যদের নামে নযরানা দিতে থাকো।

৪২. আল্লাহর আযাবকে নিজেদের থেকে দূরে অবস্থান করতে দেখার কারণে তারা সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করার ব্যাপারে অত্যন্ত দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে চলছিল। তাই তাদের উদ্দেশ্যে এখানে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলা হচ্ছে, আল্লাহর আযাব আসতে একটুও দেরী

قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ
إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ
أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۖ
وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ الَّذِي
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٢﴾

৯ রুকূ'

হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, আমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে ডাকবো, যারা আমাদের উপকারও করতে পারে না, অপকারও করতে পারে না? আর আল্লাহ যখন আমাদের সোজা পথ দেখিয়ে দিয়েছেন তখন আবার কি আমরা উল্টো দিকে ফিরে যাবো? আমরা কি নিজেদের অবস্থা সে ব্যক্তির মতো করে নেবো, যাকে শয়তানরা মরুভূমির বুকে পথ ভুলিয়ে দিয়েছে এবং সে হয়রান, পেরেশান ও উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে? অথচ তার সাথীরা তাকে চীৎকার করে ডেকে বলছে, এদিকে এসো, এখানে রয়েছে সোজা পথ? বলো, আসলে আল্লাহর হেদায়াতই একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল হেদায়াত এবং তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে নির্দেশ এসেছে, বিশ্ব-জাহানের প্রভুর সামনে আনুগত্যের শির নত করে দাও, নামায কায়েম করো এবং তাঁর নাফরমানী করা থেকে দূরে থাকো। তাঁরই কাছে তোমাদের সমবেত করা হবে।

হয় না। একটি ঘূর্ণিঝড় অকস্মাত তোমাদের সবকিছু বরবাদ করে দিতে পারে। ভূমিকম্পের একটি মাত্র ঝট্‌কা তোমাদের সমগ্র জনপদকে ধূলিস্মাত করে দেবার জন্য যথেষ্ট। গোত্রীয় ও জাতীয় বিবাদ বিসম্বাদ এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিরাজমান শত্রুতার বারুদে শুধু ছোট্ট একটু খানি আগুনের স্ফুলিংগ রেখে দিলেই তা এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্ম দিতে পারে যার ফলে বছরের পর বছর ধরে রক্তপাত, বিশৃংখলা ও অশান্তি থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব হবে না। কাজেই আযাব আসছে না বলে তোমরা গাফলতির জোয়ারে বেহুঁশের মতো গা ভাসিয়ে দিয়ো না। তোমরা যেন একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে ভুল-নির্ভুল, ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যার মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করা ছাড়াই অন্ধের মতো জীবন পথে এগিয়ে চলো না। আল্লাহ তোমাদের অবকাশ দিয়েছেন এবং তোমাদের সামনে এমন সব নিশানী পেশ করছেন যার সাহায্যে তোমরা সত্যকে চিনে নিয়ে সঠিক ও নির্ভুল পথ অবলম্বন করতে পারবে, এটাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করো।

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۚ قَوْلُهُ
الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْمُ
الْخَبِيْرُ ﴿٧٣﴾ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْٓ اَرٰىكَ
وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٤﴾ وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ﴿٧٥﴾

তিনিই যথাযথভাবে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।[৪৬] আর যেদিন তিনি বলবেন, হাশর হয়ে যাও, সেদিনই তা হয়ে যাবে। তাঁর কথা যথার্থ অকাট্য সত্য। আর যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে[৪৭] সেদিন রাজত্ব হবে একমাত্র তাঁরই।[৪৮] তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য[৪৯] সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন এবং তিনি প্রজ্ঞাময় ও সবকিছু জানেন।

ইবরাহীমের ঘটনা স্মরণ করো যখন সে তার পিতা আযরকে বলেছিল, "তুমি কি মূর্তিগুলোকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করছো?[৫০] আমি তো দেখছি, তুমি ও তোমার জাতি প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিপ্ত।" ইবরাহীমকে এভাবেই আমি যমীন ও আসমানের রাজ্য পরিচালন ব্যবস্থা দেখাতাম।[৫১] আর এ জন্য দেখাতাম যে, এভাবে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে।[৫২]

৪৩. অর্থাৎ তোমরা যা দেখতে পাচ্ছো না তা জোর করে তোমাদের দেখিয়ে দেয়া এবং যা বুঝতে পারছো না তা জোর করে তোমাদের বুঝিয়ে দেয়া আমার কাজ নয়। আর তোমরা না দেখলে ও না বুঝলে তোমাদের ওপর আযাব নাযিল করাও আমার কাজ নয়। আমার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যাকে সুস্পষ্ট করে তোমাদের সামনে তুলে ধরা। এখন যদি তোমরা তা মেনে নিতে প্রস্তুত না হও তাহলে যে খারাপ পরিণতির ভয় তোমাদের দেখিয়ে আসছি তা যথা সময়ে তোমাদের সামনে এসে যাবে।

৪৪. অর্থাৎ যদি কখনো আমার এ নির্দেশ ভুলে যাও এবং ভুলবশত এ ধরনের লোকদের সাহচর্যে গিয়ে বসো।

৪৫. এর অর্থ হচ্ছে, যারা নিজেরা আল্লাহর নাফরমানী থেকে দূরে অবস্থান করে কাজ করতে থাকে, নাফরমানদের কোন কাজের দায়-দায়িত্ব তাদের ওপর নেই। সুতরাং নাফরমানদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করে যেনতেন প্রকারে তাদের সমর্থন আদায় করতেই হবে এবং তাদের প্রত্যেকটি আজেবাজে প্রশ্নের জবাব দিতেই হবে আর তারা সত্যকে

স্বীকার না করলে কোন না কোনভাবে তাদের স্বীকৃতি আদায় করে নিতেই হবে, এ ধরনের দায়িত্ব কেন তারা খামখা নিজেদের ওপর চাপিয়ে নেবে? তাদের দায়িত্ব শুধু এতটুকু, যাদেরকে ভুল পথে চলতে দেখবে তাদেরকে উপদেশ দেবে এবং সত্যকে তাদের সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরবে। তারপর যদি তারা সত্যকে না মানে এবং ঝগড়া-ঝাঁটি ও তর্ক-বিতর্ক করতে প্রবৃত্ত হয় তাহলে তাদের সাথে অযথা বুদ্ধির লড়াই করে নিজের শক্তি ও সময় নষ্ট করা সত্যপন্থীদের কাজ নয়। এ ধরনের গোমরাহীর প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ব্যক্তিদের পেছনে সময় ও শক্তি নষ্ট না করে যারা নিজেরাই সত্যের সন্ধানে লিপ্ত তাদের শিক্ষা-দীক্ষা সংশোধন এবং উপদেশ দানে সত্যপন্থীদের সময় ব্যয় করা উচিত।

৪৬.. কুরআনের বিভিন্ন স্থানে একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে বা হকের সাথে সৃষ্টি করেছেন। এ বাণীটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবহ।

এর একটি অর্থ হচ্ছে, পৃথিবী ও আকাশসমূহের সৃষ্টি নিছক খেলাচ্ছলে সাধিত হয়নি। এটি ঈশ্বরের বা ভগবানের লীলা নয়। এটি কোন শিশুর হাতের খেলনাও নয়। নিছক মন ভুলাবার জন্য কিছুক্ষণ খেলার পর শিশু অকস্মাত একে ভেঙ্গে চুরে শেষ করে ফেলে দেবে এমনও নয়। আসলে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ। অত্যন্ত গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের ভিত্তিতে এ কাজটি করা হয়েছে। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে একটি বিরাট উদ্দেশ্য। এর একটি পর্যায় অতিক্রান্ত হবার পর এ পর্যায়ে যে সমস্ত কাজ হয়েছে তার হিসেব নেয়া এবং এই পর্যায়ের কাজের ফলাফলের ওপর পরবর্তী পর্যায়ের বুনিয়াদ রাখা স্রষ্টার জন্য একান্ত অপরিহার্য। এ কথাটিকেই অন্যান্য জায়গায় এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا "হে আমাদের রব! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করোনি।"

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ

"আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে সেগুলোকে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।"

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ -

"তোমরা কি ভেবেছো, আমি তোমাদেরকে এমনি অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার দিকে ফিরিয়ে আনা হবে না?"

দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে ঃ আল্লাহ তাআলা বিশ্ব-জাহানের গোটা ব্যবস্থা ও অবকাঠামোকে নিরেট ও নির্ভেজাল সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ন্যায়নীতি, সূক্ষ্মদর্শীতা ও বিচক্ষণতা এবং সততার বিধান এর প্রতিটি জিনিসের পেছনে ক্রিয়াশীল। বাতিল ও অসত্যের জন্য শেকড় গাড়া ও ফলপ্রসূ হবার কোন অবকাশই এ অবকাঠামোতে নেই। অবশ্য বাতিলপন্থীরা যদি তাদের মিথ্যা, অন্যায় ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটাতে চায়, তবে তাদেরকে সে জন্য চেষ্টা-সাধনা চালানোর কিছু সুযোগ আল্লাহ দিতেও

পারেন—সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে বাতিলের প্রতিটি বীজকে পৃথিবী উগরে ফেলে দেবে এবং শেষ হিসেব-নিকেশে প্রত্যেক বাতিলপন্থী দেখতে পাবে যে, এ নোংরা ও অবাঞ্ছিত বৃক্ষের চাষ করতে সে যত চেষ্টা চালিয়েছে, তার সবই বৃথা ও নিষ্ফল হয়ে গেছে।

তৃতীয় অর্থ হচ্ছে ঃ মহান আল্লাহ বিশ্ব-জাহানের এ সমগ্র ব্যবস্থাপনাটি হকের তথা নিরেট ও নির্ভেজাল সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাঁর নিজস্ব হক ও অধিকারের ভিত্তিতে তার ওপর শাসন কর্তৃত্ব চালাচ্ছেন। তাঁর হুকুম এখানে এ জন্য চলে যে, তিনিই তাঁর সৃষ্ট এ বিশ্ব-জাহানের ওপর রাজত্ব করার অধিকার রাখেন। আপাত দৃষ্টিতে যদি অন্যদের রাজত্বও এখানে চলতে দেখা যায় তাহলে তাতে প্রতারিত হয়ো না। প্রকৃতপক্ষে তাদের হুকুম চলে না, চলতে পারেও না। কারণ এ বিশ্ব-জাহানের কোন জিনিসের ওপর তাদের কর্তৃত্ব চালাবার কোন অধিকারই নেই।

৪৭. শিংগায় ফুঁক দেবার সঠিক স্বরূপ ও ধরনটা কি হবে তার বিস্তারিত চেহারা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। কুরআন থেকে আমরা যা কিছু জানতে পেরেছি তা কেবল এতটুকু যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর হুকুমে একবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং তাতে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর নাজানি কত সময় কত বছর চলে যাবে, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন, দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। এর ফলে পূর্বের ও পরের এবং প্রথমের ও শেষের সবাই পুনর্বার জীবিত হয়ে নিজেদেরকে হাশরের ময়দানে উপস্থিত দেখতে পাবে। প্রথম ফুঁকে বিশ্ব-জাহানের সমস্ত ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে পড়বে, সবকিছু ওলট পালট ও লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ফুঁকে নতুন প্রকৃতি ও নতুন আইন কানুন নিয়ে আর একটি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হবে।

৪৮. এর অর্থ এ নয় যে, সেদিন রাজত্ব তাঁর হবে আর আজকে রাজত্ব তাঁর নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, সেদিন যখন পর্দা উঠে যাবে, অন্তরাল সরে যাবে এবং প্রকৃত অবস্থা একেবারে সামনে এসে যাবে, তখন জানা যাবে, যাদেরকে দুনিয়ায় ক্ষমতাশালী দেখা যেতো, তারা সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন এবং যে আল্লাহ এ বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করেছেন রাজত্ব করার সমস্ত ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের একমাত্র ও একচ্ছত্রভাবে তিনিই অধিকারী।

৪৯. সৃষ্টির দৃষ্টি থেকে যা কিছু গোপন আছে তাই অদৃশ্য।

সৃষ্টির সামনে যা কিছু প্রকাশিত ও তার গোচরীভূত, তাই দৃশ্য।

৫০. এখানে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনাবলী উল্লেখ করে এ বিষয়টির পক্ষে সমর্থন ও সাক্ষ পেশ করা হচ্ছে যে, আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতের বদৌলতে যেভাবে আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীরা শিরককে অস্বীকার করেছেন এবং সকল কৃত্রিম ইলাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একমাত্র বিশ্ব-জাহানের মালিক, স্রষ্টা ও প্রভু আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির নত করে দিয়েছেন ঠিক তেমনি ইতিপূর্বে ইবরাহীম আলাইহিস সালামও করেছেন। আর যেভাবে আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর ওপর যারা ঈমান এনেছেন তাদের সাথে তাদের মূর্খ ও অজ্ঞ জাতি ঝগড়া ও বিতর্ক করছে ঠিক তেমনি ইতিপূর্বে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথেও তার জাতি বাক-বিতণ্ডা করেছে। উপরন্তু ইতিপূর্বে হযরত ইবরাহীম

আলাইহিস সালাম তাঁর জাতিকে যে জওয়াব দিয়েছিলেন আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের পক্ষ থেকেও তাদের জাতির জন্য রয়েছে সেই একই জওয়াব। নূহ, ইবরাহীম ও ইবরাহীমী বংশোদ্ভূত সমস্ত নবী যে পথে চলেছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে একই পথে চলছেন। কাজেই এখন যারা তাঁর আনুগত্য অস্বীকার করছে তাদের জেনে রাখা উচিত, তারা নবীদের পথ থেকে সরে গিয়ে গোমরাহীর পথ অবলম্বন করেছে।

এ প্রসংগে আরো একটি কথা মনে রাখতে হবে। আরবের লোকেরা সাধারণভাবে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে নিজেদের নেতা ও শ্রেষ্ঠ অনুসরণীয় পূর্বপুরুষ হিসেবে স্বীকার করতো। বিশেষ করে কুরাইশ বংশের লোকদের সমস্ত আভিজাত্যবোধের মূলে ছিল তাদের ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধর হবার এবং তাঁর নির্মিত কাবাঘরের সেবক হবার অহংকার। তাই তাদের সামনে হযরত ইবরাহীমের তাওহীদ বিশ্বাস ও শিরক অস্বীকৃতি এবং মুশরিক সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর বিতর্কের উল্লেখ করার অর্থ ছিল যে জিনিস কুরাইশদের সমস্ত আভিজাত্য গৌরবের উৎস ছিল এবং মুশরিকী ও পৌত্তলিক ধর্মের ওপর আরবের কাফের সমাজের যে পরিপূর্ণ মনস্তুষ্টি ও তৃপ্তি ছিল তা ছিনিয়ে নেয়া এবং তাদের ওপর একথা প্রমাণ করে দেয়া যে, আজ মুসলমানরা ঠিক সেখানে অবস্থান করছে যেখানে ইতিপূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ) ছিলেন এবং তোমাদের অবস্থা এখন সেই পর্যায়ভুক্ত যে পর্যায়ে অবস্থান করছিল সেদিন হযরত ইবরাহীমের সাথে বিতর্ককারী তাঁর মূর্খ জাতি। এটা ঠিক তেমনি যেমন হযরত আবদুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ভক্ত-অনুরক্ত ও কাদেরী বংশজাত পীরজাদাদের সামনে হযরত শায়খের আসল শিক্ষা ও তাঁর জীবনের ঘটনাবলী পেশ করে কেউ যদি প্রমাণ করে দেয় যে, যে মহান ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে তোমরা নিজেদেরকে গৌরবান্বিত মনে করো তোমাদের নিজেদের নিয়ম-রীতি ও কর্মকাণ্ড তার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং তোমাদের পীর ও মুরশিদ সারা জীবন যাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেছেন তোমরা আজ সেসব গোমরাহ লোকের পথ অবলম্বন করেছো।

৫১. অর্থাৎ তোমাদের সামনে আজ যেমন বিশ্ব-জাহানের নিদর্শনাবলী সুস্পষ্ট এবং আল্লাহর নিশানীগুলো তোমাদর দেখানো হচ্ছে ঠিক তেমনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সামনেও এ নিদর্শন ও নিশানীগুলোই ছিল। কিন্তু তোমরা এগুলো দেখার পরও এমন ভাব করছো যেন অন্ধের মতো কিছুই দেখতে পাও না। অথচ ইবরাহীম এগুলো দেখেছিলেন একজন সত্যিকার চক্ষুষ্মান ব্যক্তির মতো বিস্ফারিত নেত্রে। এ একই সূর্য, চন্দ্র, তারকা প্রতিদিন তোমাদের সামনে উদিত হচ্ছে। উদয়কালে এরা তোমাদের যেমন গোমরাহীতে লিপ্ত দেখে অস্তমিত হবার সময়ও ঠিক তেমনি একই অবস্থায় রেখে যায়। সে চক্ষুষ্মান মানুষটিও এদেরকে দেখেছিলেন এবং এ নিদর্শন ও নিশানীগুলোর মাধ্যমে তিনি প্রকৃত মহাসত্যের সন্ধান লাভ করেছিলেন।

৫২. কুরআনের এ আয়াতের বক্তব্য এবং হযরত ইবরাহীমের সাথে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের বিতর্কের বিবরণ আরো যে সমস্ত আয়াতে এসেছে সেগুলো ভালভাবে অনুধাবন করতে হলে হযরত ইবরাহীমের নিজ এলাকার সমকালীন জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। আধুনিক

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও খনন কার্যের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম যে শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কেবলমাত্র সেই শহরটিই আবিষ্কৃত হয়নি বরং ইবরাহীমের যুগে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক অবস্থা কেমন ছিল তার ওপরও যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে। স্যার লিওনার্ড উলী (SIR LEONARD WOOLLEY) তাঁর 'আব্রাহাম' (Abraham, London, 1935) গ্রন্থে এ গবেষণার যে ফল প্রকাশ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত সার নীচে দেয়া হলো।

আধুনিক ইতিহাস গবেষকগণ সাধারণভাবে এ মত প্রকাশ করেছেন যে, খৃষ্টপূর্ব ২১০০ সালের কাছাকাছি সময়ে হযরত ইবরাহীমের আবির্ভাব হয়। অনুমান করা হয়, এ সময় "উর" শহরের জনসংখ্যা ছিল আড়াই লাখ। পাঁচ লাখ থাকাটাও অসম্ভব নয়। এটি ছিল বৃহৎ শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। একদিকে পামীর ও নীলগিরি পর্যন্ত এলাকা থেকে সেখানে পণ্য সম্ভার আমদানী হতো এবং অন্যদিকে আনাতোলিয়া পর্যন্ত তার বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিস্তৃত ছিল। উর্ যে রাজ্যটির কেন্দ্রীয় শহর হিসেবে পরিচিত ছিল তার সীমানা বর্তমান ইরাক রাষ্ট্রের উত্তর এলাকায় কিছু কম এবং পশ্চিম দিকে কিছু বেশীদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দেশের অধিকাংশ জনবসতি শিল্প ও ব্যবসায়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এ যুগের যে শিলালিপিগুলো পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায়, সেখানকার অধিবাসীদের জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভংগী ছিল সম্পূর্ণ বস্তুবাদী। অর্থ উপার্জন করা এবং আরাম, আয়েশ ও বিলাস উপকরণ সংগ্রহ করাই ছিল তাদের জীবনের প্রধানতম লক্ষ। সুদী কারবার সারা দেশে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল। জনগণ ছিল কঠোর ব্যবসায়ী মনোভাবাপন্ন। প্রত্যেকে অন্যকে সন্দেহের চোখে দেখতো এবং পরস্পরের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমার প্রচলন ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। নিজেদের উপাস্য দেবতা ও 'ইলাহ'দের কাছে তারা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দীর্ঘায়ু, আর্থিক সচ্ছলতা ও ব্যবসায়িক উন্নতি লাভের জন্য দোয়া করতো। দেশের জনগোষ্ঠী তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

(এক) আমীলূ ঃ এরা ছিল উচ্চ শ্রেণীভুক্ত। এদের অন্তরভুক্ত ছিল পূজারী পুরোহিত, পদস্থ সরকারী কর্মচারীবৃন্দ, সেনাবাহিনীর অফিসারবৃন্দ এবং এ পর্যায়ের অন্যান্য লোকেরা।

(দুই) মিশকীনূ ঃ ব্যবসায়ী, শিল্পী, কারিগর ও কৃষিজীবীরা এর অন্তরভুক্ত।

(তিন) আরদূ ঃ অর্থাৎ দাস।

এদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীটি অর্থাৎ আমীলুরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল। তাদের ফৌজদারী ও দেওয়ানী অধিকার ছিল অন্যদের তুলনায় স্বতন্ত্র। তাদের অর্থ-সম্পদ ও প্রাণের মূল্যও ছিল অন্যদের চাইতে বেশী।

এহেন নাগরিক ও সামাজিক পরিবেশে হযরত ইবরাহীমের জন্ম হয়। তালমূদে আমরা হযরত ইবরাহীম ও তার পরিবারের অবস্থার যে বর্ণনা পাই তা থেকে জানা যায়, তিনি আমীলূ শ্রেণীর অন্তরভুক্ত ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন রাজ্যের সবচেয়ে বড় সরকারী অফিসার। (সূরা বাকারা, ২৯০ টীকা দেখুন)

উর নগরীর শিলালিপিতে প্রায় পাঁচ হাজার উপাস্য দেবতা ও খোদার নাম পাওয়া যায়। দেশের বিভিন্ন শহরের খোদা ছিল বিভিন্ন। প্রত্যেক শহরের একজন বিশেষ রক্ষক খোদার

আসনে বসেছিল। তাকে নগরীর প্রভু, মহাদেব বা খোদাদের প্রধান মনে করা হতো। অন্যান্য মাবূদদের তুলনায় তার মর্যাদা হতো অনেক বেশী। উরের 'নগর প্রভু' ছিল 'নান্নার' (চন্দ্র দেব)। এ সম্পর্কের কারণে পরবর্তীকালের লোকেরা এ শহরের নাম দিয়েছে 'কামরীনা' বা 'চান্দ্র' শহর। দ্বিতীয় বড় শহর ছিল 'লারসা'। পরবর্তীকালে উরের পরিবর্তে এ শহরটি রাজধানী শহরে পরিণত হয়। এর 'নগর প্রভু' ছিল 'শাম্মাস' (সূর্য দেব)। এসব বড় বড় খোদার অধীনে ছিল অনেক ছোট ছোট খোদা। এদের বেশীর ভাগ নেয়া হয়েছিল আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র থেকে এবং কম সংখ্যক নেয়া হয়েছিল যমীন থেকে। লোকেরা নিজেদের বিভিন্ন ছোটখাট প্রয়োজন এদের আওতাধীন মনে করতো। পৃথিবী ও আকাশের এসব দেবতার প্রতীকী প্রতিমূর্তি নির্মাণ করা হয়েছিল। বন্দনা, পূজাপাঠ, আরাধনা ও উপাসনার সমস্ত অনুষ্ঠান তাদের সামনে সম্পন্ন করা হতো।

উর নগরীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের ওপর একটি বিশাল সুরম্য প্রাসাদে 'নান্নার' দেবতার প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর কাছেই ছিল নান্নারের স্ত্রী 'নানগুল' এর মন্দির। নান্নার-এর মন্দির ছিল একটি রাজপ্রাসাদের মতো। একজন করে পূজারিনী প্রতি রাতে বিয়ের কণে সেজে তার শয়নগৃহে যেতো। মন্দিরে অসংখ্য নারী দেবতার নামে উৎসর্গীত ছিল। তারা ছিল দেবদাসী (RELIGIOUS PROSTITUTES)। দেবতার নামে নিজের কুমারীত্ব বিসর্জনকারী মহিলাকে অত্যন্ত সম্মানীয়া মনে করা হতো। অন্ততপক্ষে একবার "দেবতার উদ্দেশ্যে" নিজেকে কোন পর পুরুষের হাতে সোপর্দ করে দেয়া নারীর জন্য মুক্তির উপায় মনে করা হতো। অতপর একথা বলার তেমন কোন প্রয়োজন নেই যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পূজারীরাই এ ধর্মীয় বেশ্যাবৃত্তির ফায়দা লুটতো।

নান্নার কেবল দেবতাই ছিল না বরং ছিল দেশর সবচেয়ে বড় জমিদার, সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী, সবচেয়ে বড় শিল্পপতি এবং দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক শাসকও। বিপুল সংখ্যক বাগান, গৃহ ও বিপুল পরিমাণ জমি এই মন্দিরে নামে ওয়াকফ ছিল। এই বিরাট সম্পত্তির আয় ছাড়াও কৃষক, জমিদার, জোতদার, ব্যবসায়ী সবাই সব ধরনের শস্য, দুধ, সোনা, কাপড় এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র মন্দিরে নজরানা দিতো। এগুলো আদায় ও গ্রহণ করার জন্য মন্দিরে একটি কর্মচারী বাহিনী নিযুক্ত ছিল। মন্দিরের আওতাধীনে বহু কারখানা প্রতিষ্ঠিত ছিল। মন্দিরের পক্ষ থেকে ব্যবসায়-বাণিজ্যেরও বিরাট কারবার চলতো। দেবতার প্রতিনিধি হিসেবে পূজারীরাই এসব কাজ সম্পাদন করতো। এ ছাড়া দেশের বৃহত্তম আদালত মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। পূজারী ছিল তার প্রধান বিচারপতি। তার ফায়সালাকে আল্লাহর ফায়সালা মনে করা হতো। দেশে রাজপরিবারের শাসনও ছিল নান্নার-এর অনুগ্রহ পুষ্ট। আসল বাদশাহ ছিল নান্নার আর দেশের শাসনকর্তা তার পক্ষ থেকে দেশ শাসন করতো। এ সম্পর্কের কারণে বাদশাহ নিজেও মাবূদদের অন্তরভুক্ত হয়ে যেতো এবং অন্যান্য খোদা ও দেবতাদের মতো তারও পূজা করা হতো।

হযরত ইবরাহীমের সময় উরের যে রাজপরিবারটি ক্ষমতাসীন ছিল তার প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল উরনাম্মু। খৃষ্টপূর্ব ২৩০০ অব্দে তিনি একটি বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তার রাজ্যের সীমানা পূর্বে সোসা থেকে শুরু করে পশ্চিমে লেবানন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তার নাম থেকেই এ পরিবারের নামকরণ হয় 'নাম্মু'। এটিই আরবীতে এসে 'নমরূদ'-এ পরিণত হয়। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের হিজরতের পর এ পরিবার ও এ জাতির ওপর

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ
الْاٰفِلِيْنَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ
رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ
هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٨﴾ اِنِّيْ وَجَّهْتُ
وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٧٩﴾

অতপর যখন রাত তাকে আচ্ছন্ন করলো তখন একটি নক্ষত্র দেখে সে বললো ঃ এ আমার রব। কিন্তু যখন তা ডুবে গেলো, সে বললো ঃ যারা ডুবে যায় আমি তো তাদের ভক্ত নই। তারপর যখন চাঁদকে আলো বিকীরণ করতে দেখলো, বললো ঃ এ আমার রব। কিন্তু যখন তাও ডুবে গেলো তখন বললো ঃ আমার রব যদি আমাকে পথ না দেখাতেন তাহলে আমি পথভ্রষ্টদের অন্তরভুক্ত হয়ে যেতাম। এরপর যখন সূর্যকে দীপ্তিমান দেখলো তখন বললো ঃ এ আমার রব, এটি সবচেয়ে বড়। কিন্তু তাও যখন ডুবে গেলো তখন ইবরাহীম চীৎকার করে বলে উঠলো ঃ "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করো তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।[৫৩] আমি তো একনিষ্ঠভাবে নিজের মুখ সেই সত্তার দিকে ফিরিয়ে নিয়েছি যিনি যমীন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কখখনো মুশরিকদের অন্তরভুক্ত নই।"

ধ্বংস নেমে আসে এবং এর ধারা ক্রমাগত চলতে থাকে। প্রথমে ঈলামীরা উরকে ধ্বংস করে। তারা নান্নারের মূর্তি সহকারে নমরূদকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তারপর লারসায় একটি ঈলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে উর এলাকা এর অধীনে শাসিত হতে থাকে। অবশেষে একটি আরব বংশজাত পরিবারের অধীনে ব্যাবিলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং উর ও লারসা তাদের শাসনাধীনে চলে যায়। এ ধ্বংসলীলার পর নান্নারের সাথে সাথে উরের অধিবাসীদের বিশ্বাসেও ধস নামে। করণ নান্নার তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি।

নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না, পরবর্তীকালে হযরত ইবরাহীমের শিক্ষা এ দেশের লোকেরা কি পরিমাণ গ্রহণ করেছিল। তবে খৃষ্টপূর্ব ১৯১০ সালে ব্যাবিলনের বাদশাহ 'হামুরাবি' (বাইবেলে উল্লেখিত আমুরাফীল) যে আইন সংকলন করেন তা থেকে প্রমাণ হয় যে, এ আইন রচনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নবুওয়াতের প্রদীপ থেকে নির্গত কিছুটা আলো অবশ্যই ক্রিয়াশীল ছিল। এ আইন সংক্রান্ত বিস্তারিত শিলালিপি আবিষ্কার করেন

খৃষ্টপূর্ব ১৯০২ সালে একজন ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানী এবং ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে C. H. W. John এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন The oldest code of law নামে। এ আইনের বহু মূলনীতি ও খুঁটিনাটি ধারা-উপধারা হযরত মূসার শরীয়াতের সাথে সামঞ্জস্য রাখে।

এ পর্যন্তকার প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার উপরোক্ত ফলাফল যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে এ থেকে একথা একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, হযরত ইবরাহীমের জাতির মধ্যে শিরক নিছক একটি ধর্মীয় বিশ্বাস এবং একটি পৌত্তলিক উপাসনা ও পূজাপাঠের সমষ্টি ছিল না বরং এ জাতির সমগ্র অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ব্যবস্থাপনা শিরকের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। এর মোকাবিলায় হযরত ইবরাহীম তাওহীদের যে দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন তার প্রভাব কেবল মূর্তিপূজার ওপরই পড়তো না বরং রাজ পরিবারের উপাস্য ও পূজনীয় হওয়া, তাদের শাসন কর্তৃত্ব, পূজারী ও উচ্চ শ্রেণীর লোকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা এবং সমগ্র দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা এর আক্রমণের লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করে নেয়ার অর্থ ছিল নীচে থেকে ওপর পর্যন্ত সমাজের সমগ্র ইমারতটি গুড়িয়ে ফেলে তাকে নতুন করে তাওহীদের ভিত্তিতে গড়ে তোলা। এ জন্য হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আওয়াজ বুলন্দ হবার সাথে সাথেই সমাজের বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী ও সাধারণ মানুষ এবং পূজারী ও নমরূদ সবাই একই সংগে একই সময়ে তাঁকে থামিয়ে দেবার জন্য এগিয়ে আসে।

৫৩. নবুওয়াতের দায়িত্বে সমাসীন হবার আগে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যে প্রাথমিক চিন্তাধারার সাহায্যে মহাসত্যে পৌছে গিয়েছিলেন এখানে তার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, সুস্থ মস্তিষ্ক, নির্ভুল চিন্তা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তির অধিকারী এক ব্যক্তি যখন এমন এক পরিবেশে চোখ মেললেন যেখানে চারদিকে শিরকের ছড়াছড়ি, কোথাও থেকে তাওহীদের শিক্ষা লাভ করার মতো অবস্থা তাঁর নেই, তখন তিনি কিভাবে বিশ্ব প্রকৃতির নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ এবং সেগুলোর মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তা থেকে সঠিক ও নির্ভুল যুক্তি-প্রমাণ সংগ্রহের মাধ্যমে প্রকৃত সত্যে উপনীত হতে সক্ষম হলেন। ইতিপূর্বে ইবরাহীমের জাতির যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তার ওপর একটু চোখ বুলালেই জানা যায় যে, ছোট বেলায় জ্ঞান হবার পর হযরত ইবরাহীম দেখেন তাঁর চারদিকে চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজির পূজার ধুম চলছে। তাই সত্যি এদের কেউ রব কিনা—এই প্রশ্নটি থেকে হযরত ইবরাহীমের সত্য অনুসন্ধানের সূচনা হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। এ কেন্দ্রীয় প্রশ্নটি নিয়ে তিনি চিন্তা-ভাবনা করেন। অবশেষে নিজের জাতির সমস্ত রবকে একটি অমোঘ বিধানের আওতায় বন্দী দাসানুদাসের মতো আবর্তন করতে দেখে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যাদের রব হওয়ার দাবী করা হয় তাদের কারোর মধ্যে রব হবার যোগ্যতার লেশমাত্রও নেই। রব মাত্র একজনই, যিনি এদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর বন্দেগী করতে সবাইকে বাধ্য করেছেন।

যে ধরনের বাচনভংগী প্রয়োগের মাধ্যমে এ ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে তাতে সাধারণ লোকদের মনে এক প্রকার সন্দেহ জাগে। বলা হয়েছে ঃ যখন রাত হয়ে গেলো, সে একটি তারকা দেখলো আবার যখন তা ডুবে গেলো তখন একথা বললো। তারপর যখন

চাঁদ দেখলো এবং পরে তা ডুবে গেলো তখন একথা বললো। এরপর সূর্য দেখলো এবং যখন তাও ডুবে গেলো তখন এ কথা বললো। ঘটনা বর্ণনার এ পদ্ধতি একজন সাধারণ পাঠকের মনে এ প্রশ্ন সৃষ্টি করে যে, ছোটবেলায় জ্ঞান চক্ষু উন্মেলিত হবার পর থেকেই কি প্রতিদিন হযরত ইবরাহীম দিনের পরে রাত হতে দেখতেন না? তিনি কি প্রতিদিন সূর্য, চন্দ্র ও তারকাদের উদিত ও অস্তমিত হতে দেখতেন না? আর একথা তো সুস্পষ্ট যে, এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পরই করেছেন। তাহলে এ ঘটনাটি এভাবে বলা হয়েছে কেন যে, রাত হলে এই দেখলেন এবং দিন হলে এই দেখলেন? যেন মনে হচ্ছে, এ বিশেষ ঘটনাটির আগে তাঁর এসব দেখার সুযোগ হয়নি। অথচ একথা মোটেই সত্য নয়। অনেকের কাছে এ সন্দেহের নিরসন এমনই অসাধ্য মনে হয়েছে যে, তারা এর জবাব দেবার জন্য হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জন্ম ও প্রতিপালন সম্পর্কে একটি অস্বাভাবিক গল্প ফেঁদে বসা ছাড়া আর কোন উপায়ই দেখেননি। তাদের সেই গল্পে বলা হয়েছে ঃ হযরত ইবরাহীমের জন্ম ও প্রতিপালন হয় একটি গুহার মধ্যে। সেখানে প্রাপ্ত বয়স্ক হবার আগে পর্যন্ত তাঁকে চন্দ্র, সূর্য, তারকার দর্শন থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। অথচ কথা এখানে দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। একথা বোঝার জন্য এ ধরনের গল্প তৈরী করার কোন প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞানী নিউটন সম্পর্কে বহুল প্রচলিত ঘটনা, তিনি একদিন একটি বাগানে গাছ থেকে আপেল পড়তে দেখেন অকস্মাত তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, আপেলটি আকাশে না উঠে মাটিতে পড়লো কেন? এর ওপর চিন্তা-ভাবনা করতে করতে তিনি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার করেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ঘটনাটির পূর্বে নিউটন কি কখনো কোন জিনিস ওপর থেকে নীচে পড়তে দেখেন নি? অবশ্যই দেখেছেন। বহুবার দেখেছেন। তাহলে কি কারণে সেই একটি বিশেষ দিনে বিশেষ সময়ে আপেলটি মাটিতে পড়ার ঘটনা নিউটনের মনে এমন প্রশ্ন সৃষ্টি করে, যা ইতিপূর্বে প্রতিদিনে শত শত বার এ ধরনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেও তার মনে সৃষ্টি হয়নি? এর একমাত্র জওয়াব এই যে, চিন্তা-ভাবনাকারী ও অনুসন্ধানী মন সবসময় এক ধরনের পর্যবেক্ষণ থেকে একইভাবে আলোড়িত হয় না। অনেক সময়ই এমন হতে দেখা গেছে, একটি জিনিস মানুষ ক্রমাগতভাবে দেখতে থাকে কিন্তু তা তার মনকে কোনভাবে নাড়া দেয় না। কিন্তু অন্য এক সময় সেই একই জিনিস দেখে তার মনে হঠাৎ একটি প্রশ্ন জাগে এবং তার ফলে তার চিন্তাশক্তিগুলো একটি বিশেষ বিষয়ের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। অথবা প্রথম থেকে কোন একটি বিষয়ের অনুসন্ধানে মনে খটকা বা জটিলতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু হঠাৎ একদিন প্রতিদিনকার বারবার দেখা একটি জিনিসের ওপর নজর পড়ার সাথে সাথেই জটিল গ্রন্থী উন্মোচনের সূত্র হাতে এসে যায় আর তারপর সবকিছু পানির মত তরল মনে হয়। হযরত ইবরাহীমের ঘটনাটিও এ ধরনেরই। রাত প্রতিদিন আসতো এবং চলেও যেতো। সূর্য, চন্দ্র, তারকা প্রতিদিন চোখের সামনে উদিত ও অস্তমিত হতো। কিন্তু সেটি ছিল একটি বিশেষ দিন যেদিন একটি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ হযরত ইবরাহীমের চিন্তা ও দৃষ্টিকে এমন একটি পথে পরিচালিত করে যার ফলে অবশেষে তিনি মহান আল্লাহর একত্বের (তাওহীদ) কেন্দ্রীয় সত্যে পৌছতে সক্ষম হন। হতে পারে হযরত ইবরাহীম (আ) প্রথম থেকে এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে আসছিলেন যে, যে বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাঁর জাতির সমগ্র জীবন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে তার মধ্যে কতটুকু সত্যতা আছে? আর এ অবস্থায় অকস্মাত আকাশের একটি নক্ষত্রের উদয়াস্ত তাঁর চিন্তার সমস্ত জট খুলে দিয়ে

وَحَاجَّهٗ قَوْمُهٗ ؕ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّىْ فِى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰٮنِ ؕ وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ
بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّىْ شَيْـًٔا ؕ وَسِعَ رَبِّىْ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٨٠﴾
وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ
عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ؕ فَاَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨١﴾ اَلَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٨٢﴾

তার সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো। তাতে সে তার সম্প্রদায়কে বললো ঃ তোমারা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে বিতর্ক করছো? অথচ তিনি আমাকে সত্য–সরল পথ দেখিয়ে দিয়েছেন এবং তোমরা যাদেরকে তাঁর সাথে শরীক করছো তাদেরকে আমি ভয় করি না, তবে আমার রব যদি কিছু চান তাহলে অবশ্যি তা হতে পারে। আমার রবের জ্ঞান সকল জিনিসের ওপর পরিব্যাপ্ত। এরপরও কি তোমাদের চেতনার উদয় হবে না?[৫৪] আর তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করেছো তাদেরকে আমি কেমন করে ভয় করবো যখন তোমরা এমন সব জিনিসকে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে শরীক করতে ভয় করো না যাদের জন্য তিনি তোমাদের কাছে কোন সনদ অবতীর্ণ করেননি? আমাদের এ দু'দলের মধ্যে কে বেশী নিরাপত্তালাভের অধিকারী? বলো, যদি তোমরা কিছু জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকো। আসলে তো নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা তাদেরই জন্য এবং সত্য–সরল পথে তারাই পরিচালিত যারা ঈমান এনেছে এবং যারা নিজেদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশিয়ে ফেলেনি।[৫৫]

যায়। প্রকৃত সত্য তাঁর সামনে দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আবার এও হতে পারে, নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের ফলেই তাঁর মনে প্রথম চিন্তার উন্মেষ ঘটে।

এ প্রসংগে আর একটি প্রশ্নও দেখা দেয়। সেটি হচ্ছে, হযরত ইবরাহীম (আ) যখন তারকা দেখে বলেন, এ আমার রব আবার যখন চাঁদ ও সূর্য দেখে তাদেরকেও নিজের রব বলে ঘোষণা দেন, সে সময় কি তিনি সাময়িকভাবে হলেও শিরকে লিপ্ত হননি? এর জওয়াব হচ্ছে, একজন সত্যসন্ধানী তাঁর সত্য অনুসন্ধানের পথে পরিভ্রমণকালে মাঝপথে যেসব মনযিলে চিন্তা–ভাবনা করার জন্য থামে, আসল গুরুত্ব সে মনযিলগুলোর নয় বরং আসল গুরুত্ব হচ্ছে সে গন্তব্যের, যে দিকে তিনি অগ্রসর হচ্ছেন এবং যেখানে গিয়ে তিনি অবস্থান করেন। মাঝখানের এ মনযিলগুলো অতিক্রম করা প্রত্যেক সত্যসন্ধানীর জন্য অপরিহার্য। সেখানে অবস্থান হয় অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে, অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সেখানে অবস্থান করা হয় না। মূলত এ অবস্থান হয় জিজ্ঞাসা সূচক ও প্রশ্নবোধক,

সিদ্ধান্তমূলক নয়। অনুসন্ধানী যখন এ মনযিলগুলোর কোনটিতে অবস্থান করে বলেন, "ব্যাপারটি এমন" তখন এটি মূলত তার শেষ সিদ্ধান্ত হয় না বরং তার একথা বলার উদ্দেশ্য হয়, জিজ্ঞাসা মূলক। অর্থাৎ "ব্যাপারটি কি এমন?" তারপর পরবর্তী অনুসন্ধানে এর নেতিবাচক জবাব পেয়ে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে যান। তাই পথের মাঝখানে যেখানে যেখানে থামেন সেখানেই তিনি সাময়িকভাবে কুফরী বা শিরক করেন একথা সম্পূর্ণ ভুল। কাজেই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর সত্য অনুসন্ধানের পথে কোন প্রকার শিরকে লিপ্ত হননি।

৫৪. কুরআনের মূল আয়াতে 'তাযাক্কুর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি গাফলতি ও ভুলের মধ্যে ডুবে ছিল তার হঠাৎ গাফলতি থেকে জেগে ওঠে যে জিনিস থেকে গাফেল হয়ে ছিল তার স্মরণ করা। তাই আমি اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ এর অনুবাদ করেছি ঃ "এরপরও কি তোমাদের চেতনার উদয় হবে না" হযরত ইবরাহীমের বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, তোমরা যা কিছু করছো তোমাদের আসল ও যথার্থ রব সে সম্পর্কে মোটেই অনবহিত নন। তিনি সব জিনিসের বিস্তারিত জ্ঞান রাখেন। কাজেই এ সত্য অবগত হয়েও কি তোমরা সচেতন হবে না?

৫৫. এ সমগ্র ভাষণটি একথার সাক্ষ্য বহন করে যে, হযরত ইবরাহীমের জাতি পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না বরং তাদের আসল অপরাধ ছিল তারা আল্লাহর গুণাবলী এবং তার প্রভুত্বের অধিকারে অন্যদের শরীক করতো। প্রথমত হযরত ইবরাহীম নিজেই বলছেন ঃ তোমরা আল্লাহর সাথে অন্যদের শরীক করছো। দ্বিতীয়ত নিজের জাতিকে সম্বোধন করে আল্লাহর কথা বলার জন্য হযরত ইবরাহীম যে বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন এ ধরনের পদ্ধতি একমাত্র এমন লোকদের জন্য অবলম্বিত হয় যারা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। কাজেই কুরআনের যেসব তাফসীরকার এখানে এবং কুরআনের অন্যান্য জায়গায় হযরত ইবরাহীম প্রসংগে কুরআনের বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একথা বলেছেন যে, হযরত ইবরাহীমের জাতি আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী বা আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে অনবহিত ছিল এবং কেবলমাত্র নিজেদের মাবুদদেরকেই ইলাহী ক্ষমতার পূর্ণাঙ্গ অধিকারী মনে করতো, তাদের বক্তব্য সঠিক নয়।

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে, "যারা নিজেদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশিয়ে ফেলেনি।" এর মধ্যে জুলুম শব্দটি থেকে কোন কোন সাহাবীর ভুল ধারণা হয়েছিল যে, বোধ হয় এর অর্থ গোনাহ, তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ আসলে এখানে জুলুম মানে শিরক। কাজেই এ আয়াতের অর্থ দাঁড়ালো ঃ যারা আল্লাহকে মেনে নেবে এবং নিজেদের এ মেনে নেবার মধ্যে কোন প্রকার মুশরিকী বিশ্বাস ও কর্মের অনুপ্রবেশ ঘটাবে না, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি একমাত্র তারাই লাভ করবে এবং একমাত্র তারাই সত্য সরল পথে অধিষ্ঠিত থাকবে।

এ প্রসঙ্গে আর একটি মজার কথা জানাও প্রয়োজন। এ ঘটনাটি হচ্ছে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মহান নবুওয়াতী জীবনের সূচনা বিন্দু। কিন্তু বাইবেলে এটি স্থান পেতে পারেনি। তবে তালমূদে এর উল্লেখ আছে। সেখানে এমন দু'টি কথা আছে, যা কুরআন থেকে ভিন্ন। একটি হচ্ছে, সেখানে হযরত ইবরাহীমের সত্য অনুসন্ধানের সূচনা করা হয়েছে

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ۭ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاۗءُ ۭ اِنَّ رَبَّكَ
حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۝ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۭ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا
مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۭ
وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ۭ
كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ۭ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى
الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَمِنْ اٰبَاۗىِٕهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

১০ রুকূ'

ইবরাহীমকে তার জাতির মোকাবিলায় আমি এ যুক্তি-প্রমাণ প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে চাই উন্নত মর্যাদা দান করি। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, তোমার রব প্রজ্ঞাময় ও জ্ঞানী।

তারপর আমি ইবরাহীমকে ইসহাক ও ইয়াকূবের মতো সন্তান দিয়েছি এবং সবাইকে সত্য পথ দেখিয়েছি, (সে সত্য পথ যা) ইতিপূর্বে নূহকে দেখিয়েছিলাম। আর তারই বংশধরদের থেকে দাউদ, সুলাইমান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুণকে (হোদায়াত দান করেছি)। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে তাদের সৎ-কাজের বদলা দিয়ে থাকি। (তারই সন্তানদের থেকে) যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকে (সত্য পথের পথিক বানিয়েছি)। তাদের প্রত্যেকে ছিল সৎ। (তারই বংশ থেকে) ইসমাঈল, আল ইয়াসা, ইউনুস ও লূতকে (পথ দেখিয়েছি)। তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেককে আমি সমস্ত দুনিয়াবাসীর ওপর মর্যাদাসম্পন্ন করেছি। তাছাড়া তাদের বাপ-দাদা, সন্তান সন্ততি ও ভ্রাতৃ সমাজ থেকে অনেককে আমি সম্মানিত করেছি, নিজের খেদমতের জন্য তাদেরকে নির্বাচিত করেছি এবং সত্য-সরল পথের দিকে তাদেরকে পরিচালিত করেছি।

সূর্য থেকে এবং তারকা পর্যন্ত পৌছার পর তাকে আল্লাহতে পৌছিয়ে শেষ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তালমূদের বর্ণনা মতে হযরত ইবরাহীম সূর্যকে "এ আমার রব" বলার সাথে সাথে তার বন্দনাও করে ফেলেন। আর এভাবে চাঁদকে "এ আমার রব" বলার পর তারও বন্দনা করেন।

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٨﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ
يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ﴿٨٩﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ ؕ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى
لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٠﴾

এটি হচ্ছে আল্লাহর হেদায়াত, নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে তিনি যাকে চান তাকে এর সাহায্যে হেদায়াত দান করেন। কিন্তু যদি তারা কোন শিরক করে থাকতো তাহলে তাদের সমস্ত কৃতকর্ম ধ্বংস হয়ে যেতো।[৫৬] তাদেরকে আমি কিতাব, হুকুম ও নবুওয়াত দান করেছিলাম।[৫৭] এখন যদি এরা তা মানতে অস্বীকার করে তাহলে (কোন পরোয়া নেই) আমি অন্য এমন কিছু লোকের হাতে এ নিয়ামত সোপর্দ করে দিয়েছি যারা এগুলো অস্বীকার করে না।[৫৮] হে মুহাম্মাদ! তারাই আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত প্রাপ্ত ছিল, তাদেরই পথে তুমি চল এবং বলে দাও, এ (তাবলীগ ও হেদায়াতের) কাজে আমি তোমাদের কাছ থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না। এটি সারা দুনিয়াবাসীর জন্য একটি সাধারণ উপদেশমালা।

৫৬. অর্থাৎ যে শিরকের মধ্যে তোমরা লিপ্ত রয়েছো তারাও যদি কোন পর্যায়ে এর মধ্যে লিপ্ত হতো তাহলে এ মর্যাদা তারা কোনক্রমেই লাভ করতে পারতো না। কোন ব্যক্তির পক্ষে দস্যুতা ও রাহাজানির কাজে সফলতা লাভ করে দুনিয়ায় একজন বিজেতা হিসেবে খ্যাত হওয়া সম্ভবপর ছিল। অথবা চরম অর্থলিপ্সার মাধ্যমে কারূনের সমান খ্যাতি অর্জন বা অন্য কোন উপায়ে দুনিয়ার অসৎ ও দুশ্চরিত্র লোকদের মধ্যে নামজাদা দুশ্চরিত্র হয়ে যাওয়াটাও সম্ভব ছিল। কিন্তু শিরক থেকে দূরে অবস্থান না করে এবং নির্ভেজাল আল্লাহ প্রীতির পথে অবিচল না থেকে কোন ব্যক্তিই এ হেদায়াতের ইমাম ও সৎলোকদের নেতা হবার মর্যাদা এবং সারা দুনিয়ার জন্য কল্যাণ, সততা ও সৎ বৃত্তির উৎস হিসেবে পরিগণিত হতে পারতো না।

৫৭. এখানে নবীদেরকে তিনটি জিনিস দেবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এক, কিতাব অর্থাৎ আল্লাহর হেদায়াতনামা। দুই, হুকুম অর্থাৎ এ হেদায়াতনামার সঠিক জ্ঞান, তার মূলনীতিগুলোকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন ব্যাপারে প্রয়োগ করার যোগ্যতা এবং বিভিন্ন জীবন সমস্যার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তকর মত প্রতিষ্ঠিত করার আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা। তিন, নবুওয়াত অর্থাৎ তিনি এ হেদায়াতনামা অনুযায়ী আল্লাহর সৃষ্টিকে পথ দেখাতে পারেন এমন একটি দায়িত্বশীল পদ ও মর্যাদা।

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ۗ قُلْ مَنْ
اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ
قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ۖ
قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿٩١﴾

১১ রুকূ'

তারা আল্লাহ সম্পর্কে বড়ই ভুল অনুমান করলো যখন তারা বললো, আল্লাহ কোন মানুষের ওপর কিছুই নাযিল করেননি।[৫৯] তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তাহলে মূসা যে কিতাবটি এনেছিল, যা ছিল সমস্ত মানুষের জন্য আলো ও পথনির্দেশনা, যাকে তোমরা খণ্ড বিখণ্ড করে রাখছো, কিছু দেখাও আর কিছু লুকিয়ে রাখো এবং যার মাধ্যমে তোমাদের এমন জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা তোমাদেরও ছিল না, তোমাদের বাপ-দাদাদেরও ছিল না।—কে তা নাযিল করেছিল[৬০] কেবল এতটুকুই বলে দাও : আল্লাহ, তারপর তাদেরকে তাদের যুক্তিবাদের খেলায় মেতে থাকতে দাও।

৫৮. এর অর্থ হচ্ছে, এ কাফের ও মুশরিকরা যদি আল্লাহর হেদায়াত ও পথ-নির্দেশনা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাহলে করুক। আমি ঈমানদারদের এমন একটি দল সৃষ্টি করে দিয়েছি যারা এ নিয়ামতের যথার্থ কদর করে ও মর্যাদা দেয়।

৫৯. আগের ধারাবাহিক বর্ণনা ও পরবর্তী জওয়াবী ভাষণ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটি ছিল ইহুদীদের উক্তি। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাবী ছিল, আমি নবী এবং আমার কাছে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাই স্বাভাবিকভাবে কুরাইশ কাফের সম্প্রদায় এবং আরবের অন্যান্য মুশরিকরা এ দাবীর যথার্থতা অনুসন্ধান করার জন্য ইহুদী ও খৃষ্টানদের কাছে যেতো এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করতো, তোমরাও তো নবী-রসূলদের মানো, বলো সত্যিই কি এ ব্যক্তির কাছে আল্লাহর কালাম নাযিল হয়েছে? এর জওয়াবে তারা যা বলতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কট্টর বিরোধী পক্ষ বিভিন্ন জায়গায় সে কথাগুলো বলে বলে লোকদেরকে বিভ্রান্ত ও উত্তেজিত করতো। তাই ইসলাম বিরোধীরা ইহুদীদের যে উক্তিটিকে প্রমাণ হিসেবে খাড়া করেছিল সেটি এখানে উদ্ধৃত করে তার জওয়াব দেয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, তাওরাতকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা কিতাব বলে মানে, এমন একজন ইহুদী কেমন করে বলতে পারে যে, আল্লাহ কোন মানুষের কাছে কিছুই নাযিল করেননি? কিন্তু এখানে এ প্রশ্নটি যথার্থ নয়। কারণ গোয়ার্তুমি ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে অনেক সময় মানুষ অন্যের সত্য বক্তব্য অস্বীকার করতে গিয়ে

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ
الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ
يُحَافِظُوْنَ ﴿٩٢﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِىَ اِلَىَّ
وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَىْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ
الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْۤا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ
اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ
عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٩٣﴾

(সে কিতাবের মতো) এটি একটি কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি, বড়ই কল্যাণ ও বরকতপূর্ণ, এর পূর্বে যা এসেছিল তার সত্যতা প্রমাণকারী এবং এর সাহায্যে তুমি জনপদসমূহের এ কেন্দ্র (অর্থাৎ মক্কা) ও তার চারপাশের অধিবাসীদেরকে সতর্ক করবে। যারা আখেরাত বিশ্বাস করে তারা এ কিতাবের ওপর ঈমান আনে এবং নিজেদের নামাযগুলো নিয়মিত যথাযথভাবে হেফাজত করে।[৬১] আর সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে যে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রটায় অথবা বলে আমার কাছে অহী এসেছে অথচ তার ওপর কোন অহী নাযিল করা হয়নি অথবা যে আল্লাহর নাযিল করা জিনিসের মোকাবিলায় বলে, আমিও এমন জিনিস নাযিল করে দেখিয়ে দেবো? হায়! তুমি যদি জালেমদেরকে সে অবস্থায় দেখতে পেতে যখন তারা মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকবে এবং ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতে থাকবে। "নাও, তোমাদের প্রাণ বের করে দাও।" তোমরা আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করে যেসব অন্যায় ও অসত্য কথা বলতে এবং তাঁর আয়াতের বিরুদ্ধে যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে তারি শাস্তি স্বরূপ আজ তোমাদের অবমাননাকর শাস্তি দেয়া হবে।

এমন সব কথাও বলে ফেলে যা তার নিজের স্বীকৃত সত্যের পরিপন্থী হয়। তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত প্রত্যাখ্যান করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। ফলে বিরোধিতার জোশে তারা এমনই অন্ধ হয়ে পড়েছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের প্রতিবাদ করতে করতে তারা এক সময় মূল রিসালাতকেই অস্বীকার করে বসে।

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ
ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَد
تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾

(আর আল্লাহ বলবেনঃ) "দেখো এবার তোমরা ঠিক তেমনি নিসংগ ও একাকী আমার সামনে হাযির হয়ে গেছো যেমনটি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, যা কিছু তোমাদের দুনিয়ায় দিয়েছিলাম তা সব তোমরা পেছনে রেখে এসেছো এবং এখন তোমাদের সাথে তোমাদের সে সব সুপারিশকারীদেরকেও দেখছি না যাদের সম্পর্কে তোমরা মনে করতে তোমাদের কার্য সম্পাদন করার ব্যাপারে তাদেরও কিছুটা অবদান আছে। তোমাদের মধ্যকার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা যেসব ধারণা করতে তা সবই তোমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে।"

আর এখানে যে বলা হয়েছে, "তারা আল্লাহ সম্পর্কে বড়ই ভুল অনুমান করলো যখন তারা বললো", এর অর্থ হচ্ছে, তারা আল্লাহর কুশলতা বিচক্ষণতা ও ক্ষমতার মূল্যায়ণে ভুল করেছে। যে ব্যক্তি একথা বলে যে, আল্লাহ কোন মানুষের কাছে সত্যের জ্ঞান ও জীবন যাপনের জন্য পথ নির্দেশনা নাযিল করেননি, সে মানুষের কাছে অহী নাযিল হওয়াকে অসম্ভব মনে করে এবং এটি আল্লাহর ক্ষমতার অবমূল্যায়ণ ও ভুল অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। অথবা সে মনে করে, আল্লাহ তো মানুষকে বুদ্ধির অস্ত্র ও তা ব্যবহারের ক্ষমতা দিয়েছেন কিন্তু তার সঠিক পথপ্রদর্শনের কোন ব্যবস্থা করেননি বরং তাকে দুনিয়ার বুকে অন্ধের মতো কাজ করার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন এবং এটি আল্লাহর কুশলতা ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে ভুল অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়।

৬০. এ জওয়াবটি যেহেতু ইহুদীদেরকে দেয়া হচ্ছে তাই মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি তাওরাত নাযিলকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। কারণ তারা নিজেরাই এটা মানতো। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ওপর তাওরাত নাযিল হয়েছিল একথা যখন তারা স্বীকার করতো তখন তাদের একথাটিই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের এ বক্তব্যকে খণ্ডন করে যে, আল্লাহ কোন মানুষের ওপর কিছুই নাযিল করেননি। তাছাড়া এ থকে কমপক্ষে এতটুকু কথা তো অবশ্যি প্রমাণ হয়ে যায় যে, মানুষের ওপর আল্লাহর কালাম নাযিল হতে পারে এবং ইতিপূর্বে হয়েছে।

৬১. মানুষের ওপর আল্লাহর কালাম নাযিল হতে পারে এবং কার্যত হয়েছেও—এরি স্বপক্ষে দেয়া হয়েছে প্রথম যুক্তিটি। এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যে কালামটি নাযিল হয়েছে সেটি আল্লাহরই কালাম, এর স্বপক্ষে দেয়া হচ্ছে এ দ্বিতীয় যুক্তিটি। এ সত্যটি প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ হিসেবে চারটি কথা পেশ করা হয়েছে।

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ
مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ اللَّيْلَ
سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾ وَهُوَ الَّذِي
جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ
وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾

১২ রুকূ'

আল্লাহই শস্যবীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী।[৬২] তিনিই জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন এবং তিনিই বের করেন মৃতকে জীবিত থেকে।[৬৩] এ সমস্ত কাজ তো আল্লাহই করেন, তাহলে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে কোন্ দিকে ছুটে চলছো? রাতের আবরণ দীর্ণ করে তিনিই ফোটান উষার আলো। তিনিই রাতকে করেছেন প্রশান্তিকাল। চন্দ্র ও সূর্যের উদয়াস্তের হিসেব তিনিই নির্দিষ্ট করেছেন। এসব কিছুই সেই জবরদস্ত ক্ষমতা ও জ্ঞানের অধিকারীর নির্ধারিত পরিমাপ। আর তিনিই তারকাগুলোকে বানিয়েছেন তোমাদের জন্য পৃথিবী ও সমুদ্রের গভীর অন্ধকারে পথের দিশা জানার মাধ্যম। দেখো, আমি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি তাদের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।[৬৪] আর তিনিই একটি মাত্র প্রাণসত্তা থেকে তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন।[৬৫] তারপর প্রত্যেকের জন্য রয়েছে একটি অবস্থান স্থল এবং তাকে সোপর্দ করার একটি জায়গা। এ নিদর্শনগুলো সুস্পষ্ট করে দিয়েছি তাদের জন্য যারা জ্ঞান বুদ্ধি রাখে।[৬৬]

এক ঃ এ কিতাবটি বড়ই কল্যাণ ও বরকতপূর্ণ। অর্থাৎ মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য এর মধ্যে সর্বোত্তম মূলনীতি পেশ করা হয়েছে। এখানে নির্ভুল ও সঠিক আকীদা–বিশ্বাসের শিক্ষা দেয়া হয়েছে, সৎকাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, উন্নত নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টির উপদেশ দেয়া হয়েছে, পাক–পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনের পথ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং অন্যদিকে মূর্খতা, অজ্ঞতা, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণ মনতা, জুলুম, চরিত্রহীনতা, অশ্লীলতা ও অন্যান্য যেসব অসৎকর্ম তোমরা পবিত্র আসমানী কিতাবসমূহে স্তূপীকৃত করে রেখেছো সেগুলো থেকে এ কিতাবটিকে মুক্ত রাখা হয়েছে।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا
مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ
دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ اُنْظُرُوْٓا
اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٩٩﴾ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ
الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا
يَصِفُوْنَ ﴿١٠٠﴾

আর তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। তারপর তার সাহায্যে সব ধরনের উদ্ভিদ উৎপাদন করেছেন। এরপর তা থেকে সবুজ শ্যামল ক্ষেত ও বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন। তারপর তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করেছেন। আর খেজুর গাছের মাথি থেকে খেজুরের কাঁদির পর কাঁদি সৃষ্টি করেছেন, যা বোঝার ভারে নুয়ে পড়ে। আর সজ্জিত করেছেন আংগুর, যয়তুন ও ডালিমের বাগান। এসবের ফলগুলো পরস্পরের সাথে সাদৃশ্যও রাখে আবার প্রত্যেকে পৃথক বৈশিষ্টেরও অধিকারী। এ গাছ যখন ফলবান হয় তখন এর ফল ধরা ও ফল পাকার অবস্থাটি একটু গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করো এসব জিনিসের মধ্যে ঈমানদারদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। এসব সত্ত্বেও লোকেরা জ্বিনদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করলো,[৬৭] অথচ তিনি তাদের সৃষ্টিকর্তা। আর তারা না জেনে বুঝে তাঁর জন্য পুত্র ও কন্যা তৈরী করে ফেললো,[৬৮] অথচ এরা যেসব কথা বলে তা থেকে তিনি পবিত্র এবং তার উর্ধে।

দুই ঃ এর আগে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব হেদায়াতনামা এসেছিল এ কিতাব সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে অন্য কোন হেদায়াত পেশ করে না বরং সেগুলোয় যা কিছু পেশ করা হয়েছিল তার সত্যতা প্রমাণ করে এবং তার প্রতি সমর্থন যোগায়।

তিন ঃ প্রত্যেক যুগে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে উদ্দেশ্যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে এ কিতাবটিও সে একই উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষকে গাফলতির নিঁদ থেকে জাগিয়ে সতর্ক করা এবং বিপথগামী লোকদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করাই এর উদ্দেশ্য।

চার ঃ মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা দুনিয়া পূজারী ও প্রবৃত্তির লালসার দাসত্বে জীবন উৎসর্গকারী, এ কিতাব তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে সমবেত করেনি বরং নিজের চারদিকে এমন সব লোককে সমবেত করেছে যাদের দৃষ্টি দুনিয়ার সংকীর্ণ সীমানা ছাড়িয়ে আরো আগে চলে যায়। তারপর এ কিতাবের দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে তাদের জীবনে যে বিপ্লব আসে তার সবচেয়ে সুস্পষ্ট আলামত হচ্ছে এই যে, তারা নিজেদেব আল্লাহ প্রীতির কারণে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে বিশিষ্টতা অর্জন করে। কোন মিথ্যাচারী ব্যক্তি যে কিতাব রচনা করেছে এবং নিজের রচনাকে আল্লাহর রচনা বলে চালিয়ে দেবার চরম ধৃষ্ঠতা দেখিয়েছে তার সে কিতাব কি এহেন বৈশিষ্ট ও সুফলের অধিকারী হতে পারে?

৬২. অর্থাৎ জমির অভ্যন্তরে শস্যবীজ ফাটিয়ে তার মধ্য থেকে অংকুর গজান।

৬৩. জীবিতকে মৃত থেকে বের করার অর্থ প্রাণহীন বস্তু থেকে জীবন্ত সৃষ্টির উদ্ভব ঘটানো। আর মৃতকে জীবিত থেকে বের করার অর্থ জীবন্ত দেহ থেকে প্রাণহীন বস্তু বের করা।

৬৪. অর্থাৎ আল্লাহ যে মাত্র একজনই তার নিদর্শন। অন্য কেউ আল্লাহর গুণাবলীরও অধিকারী নয়, আল্লাহর ক্ষমতায়ও অংশীদার নয় এবং তাঁর প্রভুত্বের অধিকার লাভেরও যোগ্য নয়। কিন্তু মূর্খ ও অজ্ঞদের পক্ষে এ সমস্ত নিদর্শন ও আলামাতের সাহায্যে প্রকৃত ও মূল সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

৬৫. অর্থাৎ এক ব্যক্তি থেকেই মানব বংশ ধারার উৎপত্তি হয়।

৬৬. অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টি, তার মধ্যে আবার নারী-পুরুষের পার্থক্য, সন্তান উৎপাদনের মাধ্যমে তাদের বংশ বৃদ্ধি এবং মাতৃগর্ভাশয়ে বীর্যের মাধ্যমে মানব ভ্রূণের অস্তিত্ব সঞ্চারের পর থেকে পৃথিবীতে তার পদার্পণ পর্যন্ত জীবনের বিভিন্ন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তার মধ্যে অসংখ্য সুস্পষ্ট নিদর্শন মানুষের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। এগুলোর মাধ্যমে সে ওপরে বর্ণিত প্রকৃত সত্যটি চিনতে পারবে। কিন্তু যারা যথার্থ বুদ্ধি-জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র তারাই এসব নিশানী থেকে সত্য জ্ঞান লাভ করতে পারে। দুনিয়ায় যারা পশুর মতো জীবন যাপন করে, যারা শুধুমাত্র নিজেদের পাশবিক প্রবৃত্তির পূজা এবং তার চাহিদা পূরণেই ব্যস্ত থাকে সারাক্ষণ, তারা এ নিদর্শনগুলোর সাহায্যে কিছুই পাবে না।

৬৭. অর্থাৎ তারা নিজেদের কল্পনা ও আন্দাজ অনুমানের সাহায্যে এ সিদ্ধান্ত করে বসেছে যে, এ বিশ্ব-জাহান পরিচালনা এবং মানুষের ভাগ্যের ভাঙ্গাগড়ায় আল্লাহর সাথে আরো অনেক গোপন সত্তার শরীকানা আছে। তাদের মধ্যে কেউ বৃষ্টির দেবতা, কেউ ফসল উৎপাদনের দেবতা, কেউ ধন-দৌলতের দেবী, কেউ রোগের দেবী এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ ধরনের আরো বিভিন্ন দেবদেবী বিরাজ করছে। ভূত, প্রেত, শয়তান, রাক্ষস ও দেবদেবী সম্পর্কিত এ ধরনের নানান অর্থহীন বিশ্বাস দুনিয়ার বিভিন্ন মুশরিক জাতির মধ্যে গড়ে উঠেছে।

৬৮. আরবের মূর্খ লোকরা ফেরেশতাদেরকে বলতো আল্লাহর মেয়ে। এভাবে দুনিয়ার অন্যান্য মুশরিক জাতিরাও আল্লাহর বংশধারা চালিয়ে দিয়েছে। তারপর কল্পনার সাহায্যে তারা দেবদেবীদের একটি পূর্ণাঙ্গ বংশ তালিকা তৈরী করে ফেলেছে।

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَنّٰى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهُ صَاحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ
كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ
كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ
الْأَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ أَبْصَرَ
فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿١٠٤﴾

১৩ রুকূ'

তিনি তো আসমান ও যমীনের উদ্ভাবক। তাঁর কোন সন্তান হতে পারে কেমন করে, যখন তাঁর কোন জীবন সংগিনী নেই? তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সবকিছুর জ্ঞান রাখেন। এ তো আল্লাহ তোমাদের রব। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। সবকিছুর তিনিই স্রষ্টা। কাজেই তোমরা তাঁরই বন্দেগী করো। তিনি সবকিছুর তত্বাবধায়ক। দৃষ্টিশক্তি তাঁকে দেখতে অক্ষম কিন্তু তিনি দৃষ্টিকে আয়ত্ব করে নেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ।

দেখো, তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে অন্তরদৃষ্টির আলো এসে গেছে। এখন যে ব্যক্তি নিজের দৃষ্টিশক্তিকে কাজে লাগাবে, সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করবে। আর যে অন্ধ সাজবে, সে নিজেই নিজের ক্ষতি করবে। আমি তো তোমাদের পাহারাদার নই।[৬৯]

৬৯. এ বাক্যটি আল্লাহর কালাম হলেও নবীর পক্ষ থেকে উচ্চারিত হয়েছে। কুরআন মজীদে বক্তার লক্ষ ও সম্বোধন বারবার পরিবর্তিত হয়। কখনো নবীকে সম্বোধন করা হয়, কখনো মুমিনদেরকে, কখনো আহলি কিতাবদেরকে, কখনো কাফের ও মুশরিকদেরকে, কখনো কুরাইশদেরকে, কখনো আরববাসীদেরকে আবার কখনো সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করা হয়। অথচ আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির হেদায়াত। অনুরূপভাবে সম্বোধনকারী ও বক্তাও বারবার পরিবর্তিত হয়। কোথাও বক্তা হন আল্লাহ নিজেই, কোথাও অহী বহনকারী ফেরেশতা, কোথাও ফেরেশতাদের দল, কোথাও নবী আবার ঈমানদাররা। অথচ এসব অবস্থায়ই সমস্ত কালামই একমাত্র আল্লাহরই কালাম হয়ে থাকে।

"আমি তো তোমাদের পাহারাদার নই"—এ বাক্যের মানে হচ্ছে, তোমাদের কাছে আলো পৌছে দেয়াই শুধু আমার কাজ। তারপর চোখ খুলে দেখা বা না দেখা তোমাদের কাজ। যারা চোখ বন্ধ করে রেখেছে জোরপূর্বক তাদের চোখ খুলে দেবো এবং যা কিছু তারা দেখছে না তা তাদেরকে দেখিয়ে ছাড়বো, এটা আমার দায়িত্ব নয়।

وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿١٠٥﴾
اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٦﴾
وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا ۭ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿١٠٧﴾
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۭ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا
لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۠ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٨﴾

এভাবে আমার আয়াতকে আমি বার বার বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করে থাকি। এ জন্য বর্ণনা করি যাতে এরা বলে, তুমি কারোর কাছ থেকে শিখে এসেছো এবং যারা জ্ঞানের অধিকারী তাদের কাছে প্রকৃত সত্যকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরতে চাই।[৭০] হে মুহাম্মাদ! সে অহীর অনুসরণ করো, যা তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, কারণ সে একক রব ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং এ মুশরিকদের পেছনে লেগে থেকো না। যদি আল্লাহর ইচ্ছা হতো, তাহলে (তিনি নিজেই এমন ব্যবস্থা করতে পারতেন যাতে) এরা শিরক করতো না। তোমাকে এদের ওপর পাহারাদার নিযুক্ত করিনি এবং তুমি এদের অভিভাবকও নও।[৭১] আর (হে ঈমানদারগণ!) এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকে তোমরা তাদেরকে গালি দিয়ো না। কেননা, এরা শিরক থেকে আরো খানিকটা অগ্রসর হয়ে অজ্ঞতাবশত যেন আল্লাহকে গালি দিয়ে না বসে।[৭২] আমি তো এভাবে প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্য তাদের কার্যক্রমকে সুশোভন করে দিয়েছি।[৭৩] তারপর তাদের ফিরে আসতে হবে তাদের রবের দিকে। তখন তিনি তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদেরকে জানিয়ে দেবেন।

৭০. সূরা বাকারার তৃতীয় রুকূতে যে কথা বলা হয়েছে সে একই কথা এখানেও বলা হয়েছে। অর্থাৎ মশা, মাকড়শা ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতংগের উপমা শুনে এগুলোর মাধ্যমে যে মহাসত্য উদঘাটন করা হয়েছে সত্য সন্ধানীরা তার নাগাল পেয়ে যায়। কিন্তু অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতার রোগে যারা আক্রান্ত হয়ে পড়েছে তারা বিদ্রূপের সুরে বলতে থাকে, আল্লাহর কালামে এ তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিসগুলোর উল্লেখের কী প্রয়োজন হতে পারে! এ বিষয়বস্তুটিকে এখানে অন্য একভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর এ কালামটি লোকদের জন্য একটি পরীক্ষার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ফলে এর মাধ্যমে খাঁটি ও অখাঁটি মানুষের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়ে যাচ্ছে। এক দল লোক এ কালাম শুনে বা পড়ে এর উদ্দেশ্য ও মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং এর

মধ্যে যেসব জ্ঞান ও উপদেশের কথা বলা হয়েছে তা থেকে লাভবান হয়। অন্যদিকে এগুলো শুনার পর আর একদল লোকের চিন্তা কালামের মূল বক্তব্যের দিকে না গিয়ে আর এক ভিন্নধর্মী অনুসন্ধানের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। তারা অনুসন্ধান করতে থাকে, এ নিরক্ষর ব্যক্তি এ ধরনের রচনা আনলো কোথা থেকে? আর যেহেতু বিরোধিতাসুলভ বিদ্বেষে তাদের অন্তর আগে থেকে আচ্ছন্ন থাকে, তাই একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হবার সম্ভাবনা বাদ দিয়ে বাকি সকল প্রকার সম্ভাবনাই তাদের মনে উঁকি দিতে থাকে। এগুলোকে তারা এমনভাবে বর্ণনা করতে থাকে যেন মনে হয় তারা এ কিতাবের উৎস সন্ধানে সফলকাম হয়ে গেছে।

৭১. এর অর্থ হচ্ছে, তোমাকে আহবায়ক ও প্রচারকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, কোতোয়ালের দায়িত্ব নয়। লোকদের সামনে এ আলোকবর্তিকাটি তুলে ধরা এবং সত্যের পূর্ণ প্রকাশের ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে কোন প্রকার ত্রুটি না রাখাই তোমার কাজ। এখন কেউ এ সত্যটি গ্রহণ না করতে চাইলে না করুক। লোকদেরকে সত্যপন্থী বানিয়েই ছাড়তে হবে, এ দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয়নি। তোমার নবুওয়াতের প্রভাবাধীন এলাকার মধ্যে মিথ্যার অনুসারী কোন এক ব্যক্তিও থাকতে পারবে না, একথাটিকে তোমার দায়িত্ব ও জবাবদিহির অন্তরভুক্ত করা হয়নি। কাজেই অন্ধদেরকে কিভাবে চক্ষুষ্মান করা যায় এবং যারা চোখ খুলে দেখতে চায় না তাদেরকে কিভাবে দেখানো যায়—এ চিন্তায় তুমি খামখা নিজের মন-মস্তিষ্ককে পেরেশান করো না। দুনিয়ায় একজনও বাতিলপন্থী থাকতে না দেয়াটাই যদি যথার্থই আল্লাহর উদ্দেশ্য হতো তাহলে এ কাজটি তোমাদের মাধ্যমে করাবার আল্লাহর কি প্রয়োজন ছিল? তাঁর একটি মাত্র প্রাকৃতিক ইংগিতেই কি দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে সত্যপন্থী করার জন্য যথেষ্ট ছিল না? কিন্তু সেখানে এটা আদতে উদ্দেশ্যের অন্তরভুক্তই নয়। সেখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের জন্য সত্য ও মিথ্যার মধ্য থেকে কোন একটিকে বাছাই করে নেবার স্বাধীনতা বজায় রাখা, তারপর সত্যের আলো তার সামনে তুলে ধরে উভয়ের মধ্য থেকে কোন্‌টিকে সে গ্রহণ করে তার পরীক্ষা করা। কাজেই যে আলো তোমাকে দেখানো হয়েছে তার উজ্জ্বল আভায় তুমি নিজে সত্য-সরল পথে চলতে থাকো এবং অন্যদেরকে সে পথে চলার জন্য আহবান জানাও। এটিই হচ্ছে তোমার জন্য সঠিক কর্মপদ্ধতি। যারা এ দাওয়াত গ্রহণ করে তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরো এবং দুনিয়ার দৃষ্টিতে তারা যতই নগণ্য হোক না কেন তাদেরকে তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন করো না। আর যারা এ দাওয়াত গ্রহণ করেনি তাদের পেছনে লেগে থেকো না। তারা যে অশুভ পরিণামের দিকে নিজেরাই চলে যেতে চায় এবং যাবার জন্য অতি মাত্রায় উদগ্রীব, সেদিকে তাদেরকে যেতে দাও।

৭২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদেরকে এ উপদেশ দেয়া হয়েছিল। তাদেরকে বলা হয়েছিল, নিজেদের ইসলাম প্রচারের আবেগে তারা যেন এমনই লাগামহীন ও বেসামাল হয়ে না পড়ে যার ফলে তর্ক-বিতর্ক ও বিরোধের ব্যাপারে এগিয়ে যেতে যেতে তারা অমুসলিমদের আকীদা-বিশ্বাসের কঠোর সমালোচনা করতে গিয়ে তাদের নেতৃবৃন্দ ও উপাস্যদেরকে গালিগালাজ করে না বসে। কারণ, এগুলো তাদেরকে সত্যের নিকটবর্তী করার পরিবর্তে তা থেকে আরো দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে।

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ
عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۙ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ
وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ
يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾

এরা শক্ত কসম খেয়ে বলছে, যদি কোন নিদর্শন[৭৪] আমাদের সামনে এসে যায় তাহলে আমরা তার প্রতি ঈমান আনবো। হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলে দাও, "নিদর্শন তো রয়েছে আল্লাহর কাছে"।[৭৫] আর তোমাদের কিভাবে বুঝানো যাবে যে, নিদর্শন এসে গেলেও এরা বিশ্বাস করবে না।[৭৬] প্রথম বারে যেমন তারা এর প্রতি ঈমান আনেনি ঠিক তেমনিভাবেই আমি তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি।[৭৭] আমি এদেরকে এদের বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার মধ্যে উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দিচ্ছি।

৭৩. এখানে আবার সে সত্যটিকে সামনে রাখতে হবে যেদিকে ইতিপূর্বে ব্যাখ্যার মধ্যে আমি ইশারা করেছি। অর্থাৎ যেসব ঘটনা প্রাকৃতিক আইনের আওতাধীনে সংঘটিত হয় আল্লাহ সেগুলোকে নিজের কর্মকাণ্ড হিসেবে গণ্য করে থাকেন। কারণ এ আইনগুলো তিনিই প্রবর্তন করেছেন এবং এগুলোর সাহায্যে যা কিছু ঘটে তাঁর হুকুমেই ঘটে। এগুলো বর্ণনা করার সময় তিনি বলে থাকেন ঃ আমি এমন করেছি আর অন্যদিকে আমরা মানুষেরা এগুলো বর্ণনা করার সময় বলি ঃ প্রকৃতিগতভাবে এমনটিই হয়ে থাকে।

৭৪. নিদর্শন মানে এমন কোন সুস্পষ্ট মু'জিযা, যা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা এবং তাঁর আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্তিকে মেনে না নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

৭৫. অর্থাৎ নিদর্শনসমূহ পেশ করার ও নিদর্শন তৈরী করে আনার ক্ষমতা আমার নেই। একমাত্র আল্লাহ এ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি চাইলে দেখাতে পারেন, না চাইলে নাও দেখাতে পারেন।

৭৬. এখানে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা অস্থির হয়ে এ আকাংখা পোষণ করতো এবং কখনো কখনো মুখেও এ ইচ্ছা প্রকাশ করতো যে, এমন কোন নিদর্শন প্রকাশ হয়ে যাক যা দেখে তাদের বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ভাইয়েরা সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন করতে পারে। তাদের এ আকাংখা ও ইচ্ছার জবাবে বলা হচ্ছে ঃ তোমাদের কেমন করে বুঝানো যাবে যে, এদের ঈমান আনা কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটার ওপর নির্ভরশীল নয়।

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا
عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ﴿١١١﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ
وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ۭ وَلَوْ شَآءَ
رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١١٢﴾

১৪ রুকূ'

যদি আমি তাদের কাছে ফেরেশতাও নাযিল করতাম, মৃতেরাও তাদের সাথে কথা বলতে থাকতো এবং সারা দুনিয়ার সমস্ত জিনিসও তাদের চোখের সামনে একসাথে তুলে ধরতাম, তাহলেও তারা ঈমান আনতো না। তবে তারা ঈমান আনুক এটা যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয়, তাহলে অবশ্যি অন্য কথা[৭৮] কিন্তু বেশীর ভাগ লোক অজ্ঞের মতো কথা বলে থাকে। আর এভাবে আমি সবসময় মনুষ্য জাতীয় শয়তান ও জিন জাতীয় শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর দুশমনে পরিণত করেছি, তারা ধোঁকা ও প্রতারণার ছলে পরস্পরকে চমকপ্রদ কথা বলতো।[৭৯] তোমার রব চাইলে তারা এমনটি কখনো করতো না।[৮০] কাজেই তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও, তারা মিথ্যা রচনা করতে থাকুক।

৭৭. অর্থাৎ যে মানসিকতার কারণে প্রথমবার তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত শুনে তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল সে একই মানসিকতা তাদের মধ্যে এখনো কাজ করছে। তাদের দৃষ্টিভংগীর মধ্যে এখনো কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। যে বুদ্ধির প্যাঁচে পড়ে ও দৃষ্টির স্থূলতার শিকার হয়ে তারা সেদিন সত্যকে দেখতে ও বুঝতে পারেনি সে একই অবস্থা আজো তাদের ওপর চেপে বসে আছে।

৭৮. অর্থাৎ তারা নিজেদের স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা ব্যবহার করে মিথ্যার মোকাবিলায় সত্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে গ্রহণ করার ইচ্ছা পোষণ করে না। এমতাবস্থায় তাদের সত্যপন্থী হবার কেবলমাত্র একটি পথ বাকি থাকে। সেটি হচ্ছে, সৃষ্টিগত ও প্রকৃতিগতভাবে যেমন প্রতিটি স্বাধীন ক্ষমতাহীন সৃষ্টিকে সত্যপন্থী হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে ঠিক তেমনি তাদের থেকেও স্বাধীন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে প্রকৃতিগত ও জন্মগতভাবে তাদেরকে সত্যপন্থী বানিয়ে দেয়া। কিন্তু আল্লাহ যে কর্মকৌশলের ভিত্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এটি তার পরিপন্থী। কাজেই আল্লাহ সরাসরি তাঁর প্রকৃতিগত ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদেরকে মুমিন বানিয়ে দেবেন, তোমাদের এ ধরনের আশা করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৭৯. অর্থাৎ আজ যদি মানুষ ও জিন সম্প্রদায়ের শয়তানরা একজোট হয়ে তোমার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে থাকে তাহলে আশংকার কোন কারণ নেই। কারণ এটা কোন নতুন কথা নয়। শুধুমাত্র তোমার একার ব্যাপারে এমনটি ঘটছে না। প্রত্যেক যুগে এমনটি হয়ে এসেছে। যখনই কোন নবী দুনিয়াবাসীকে সত্য পথ দেখাতে এগিয়ে এসেছেন তখনই সমস্ত শয়তানী শক্তি তাঁর মিশনকে ব্যর্থ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

"চমকপ্রদ কথা" বলতে সত্যের আহবায়ক ও তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত ও বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে তোলার জন্য তারা যেসব কৌশল ও ব্যবস্থা অবলম্বন এবং যে সমস্ত সন্দেহ সংশয় ও আপত্তি উত্থাপন করতো সেগুলোর কথা বলা হয়েছে। তারপর এ সমস্ত কথাকে সামষ্টিকভাবে ধোঁকা ও প্রতারণা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। কারণ সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সত্য বিরোধীরা যেসব অস্ত্রই ব্যবহার করে বাহ্যত সেগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী ও সফল অস্ত্র মনে হলেও তা কেবল অন্যদের জন্যই নয়, তাদের নিজেদের জন্যও প্রকৃতপক্ষে একটি ধোঁকা ও প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই হয় না।

৮০. এ ব্যাপারে আমরা আগে যেসব ব্যাখ্যা দিয়ে এসেছি সেগুলো ছাড়াও এখানে এ সত্যটি ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর ইচ্ছা ও চাওয়া এবং তাঁর সন্তুষ্টির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এটিকে উপেক্ষা করতে গেলে সাধারণভাবে অনেক বিভ্রান্তি দেখা দেয়। কোন জিনিস আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর অনুমোদনক্রমে আত্মপ্রকাশ করার অর্থ অবশ্যই এ নয় যে, আল্লাহ তাতে সন্তুষ্ট আছেন এবং তাকে পছন্দও করেন। আল্লাহ কোন ঘটনা সংঘটিত হবার অনুমতি না দিলে, তাঁর মহাপরিকল্পনায় তার সংঘটিত হবার অবকাশ না রাখলে এবং কার্যকারণসমূহকে সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি সংঘটিত করার অনুকূলে সক্রিয় না করলে দুনিয়ায় কোন ঘটনা সংঘটিত হয় না। আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমোদন ছাড়া কোন চোরের চুরি, হত্যাকারীর হত্যা, জালেম ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর বিপর্যয় এবং কাফের ও মুশরিকের কুফরী ও শিরক সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে কোন মুমিন ও মুত্তাকী ব্যক্তির ঈমান ও তাকওয়াও আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া সম্ভব নয়। দু' ধরনের ঘটনাই একইভাবে আল্লাহর ইচ্ছায়ই সংঘটিত হয়। কিন্তু প্রথম ধরনের ঘটনায় আল্লাহ সন্তুষ্ট নন। আর দ্বিতীয় ধরনের ঘটনা তিনি পছন্দ করেন, ভালবাসেন এবং এর প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। যদিও কোন বৃহত্তর কল্যাণের জন্যই বিশ্ব-জাহানের মালিকের ইচ্ছা কাজ করছে তবুও আলো ও আঁধার, ভাল ও মন্দ এবং সংস্কার ও বিপর্যয়ের বিপরীতমুখী শক্তিগুলোর পরস্পরের সাথে সংঘর্ষশীল হবার ফলেই এ কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হয়। তাই এ বৃহত্তর কল্যাণের ভিত্তিতেই তিনি আনুগত্য ও অবাধ্যতা, ইবরাহিমী প্রকৃতি ও নমরূদী প্রকৃতি, মূসার স্বভাব ও ফেরাউনী স্বভাব এবং মানবিক স্বভাব ও শয়তানী স্বভাব উভয়কেই কাজ করার সুযোগ দেন। তিনি নিজের স্বাধীন চেতনা ও ক্ষমতা সম্পন্ন সৃষ্টিকে (জিন ও মানুষ) ভাল ও মন্দের মধ্য থেকে কোন একটি বাছাই করে নেবার স্বাধীনতা দান করেছেন। পৃথিবীর এ কর্মশালায় প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামতো ভাল কাজ করতে পারে এবং খারাপ কাজও করতে পারে। আল্লাহর মর্জী ও ইচ্ছা যত দূর সুযোগ দেয়, যতদূর তিনি অনুমোদন দান করেন ততদূর পর্যন্ত উভয় ধরনের কর্মীরা পার্থিব উপায়-উপকরণসমূহের

وَلِتَصْغٰٓى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ
وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿١١٣﴾ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ
اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ۭ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ
رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١١٤﴾

(এসব কিছু আমি তাদেরকে এ জন্য করতে দিচ্ছি যে) যারা আখেরাত বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর এ (সুদৃশ্য) প্রতারণার প্রতি ঝুঁকে পড়ুক, তারা এর প্রতি তুষ্ট থাকুক এবং যেসব দুষ্কর্ম তারা করতে চায় সেগুলো করতে থাকুক। এমতাবস্থায় আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মীমাংসাকারীর সন্ধান করবো? অথচ তিনি পূর্ণ বিস্তারিত বিবরণসহ তোমাদের কাছে কিতাব নাযিল করেছেন।[৮১] আর যাদেরকে আমি (তোমার আগে) কিতাব দিয়েছিলাম তারা জানে এ কিতাবটি তোমার রবেরই পক্ষ থেকে সত্য সহকারে নাযিল হয়েছে। কাজেই তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তরভুক্ত হয়ো না।[৮২]

সমর্থন লাভ করে থাকে। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে একমাত্র তারাই যারা ভাল ও কল্যাণের জন্য কাজ করে আর আল্লাহর বান্দা তাঁর প্রদত্ত নির্বাচনের স্বাধীনতা ব্যবহার করে মন্দকে নয়, ভাল ও কল্যাণকে অবলম্বন করুক, এটাই আল্লাহ ভালবাসেন।

এ সংগে একথাটিও বুঝে নিতে হবে যে, সত্যের দুশমনদের বিরোধিতামূলক কার্যকলাপের উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ বারবার নিজের ইচ্ছার বরাত দেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং তাঁর মাধ্যমে মুমিনদেরকে একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, তোমাদের কাজের ধরন ফেরেশতাদের মতো নয়। ফেরেশতারা কোন প্রকার বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই আল্লাহর হুকুম তামিল করছে। অন্যদিকে দুষ্কৃতিকারী ও বিদ্রোহীদের মোকাবিলায় আল্লাহর পছন্দনীয় পদ্ধতিকে বিজয়ী করার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানোই হচ্ছে তোমাদের আসল কাজ। আল্লাহ নিজের ইচ্ছায় তাদেরকেও কাজ করার সুযোগ দিচ্ছেন, যারা নিজেদের প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের মাধ্যমে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করে যাচ্ছে। আবার তোমরা যারা আনুগত্য ও বন্দেগীর পথ অবলম্বন করেছো তাদেরকেও একইভাবে কাজ করার পূর্ণ সুযোগ দিচ্ছেন। অবশ্য তাঁর সন্তুষ্টি, হেদায়াত, সমর্থন ও সাহায্য-সহায়তার হাত প্রসারিত হয়েছে তোমাদের দিকেই, কারণ তিনি যে কাজ পছন্দ করেন তোমরা তাই করে যাচ্ছো। কিন্তু তোমরা এ আশা করো না যে, আল্লাহ তাঁর অতি প্রাকৃতিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে যারা ঈমান আনতে চায় না তাদেরকে ঈমান গ্রহণে বাধ্য করবেন অথবা মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায়ের

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ
الْعَلِيْمُ ﴿١١٥﴾ وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ
اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿١١٦﴾

সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে তোমার রবের কথা পূর্ণাংগ, তাঁর ফরমানসমূহ পরিবর্তন করার কেউ নেই এবং তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।

আর হে মুহাম্মাদ! যদি তুমি দুনিয়ায় বসবাসকারী অধিকাংশ লোকের কথায় চলো তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে। তারা তো চলে নিছক আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে এবং তারা কেবল আন্দাজ-অনুমানই করে থাকে।[৮৩]

এমন সব শয়তানকে জোরপূর্বক সমস্ত পথ থেকে সরিয়ে দেবেন, যারা নিজেদের মন-মস্তিষ্ক ও হাত-পায়ের শক্তি এবং নিজেদের সমস্ত উপায়-উপকরণ সত্যের পথ রোধ করার জন্য ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেটা কখনো হবার নয়। যদি সত্যিই তোমরা সত্য, সততা, সৎবৃত্তি ও কল্যাণের জন্য কাজ করার সংকল্প করে থাকো, তাহলে অবশ্যি তোমাদের মিথ্যা ও বাতিলপন্থীদের মোকাবিলায় কঠোর প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে নিজেদের সত্যপ্রিয়তার প্রমাণ পেশ করতে হবে। অন্যথায় মুজিযা, কারামতি ও অলৌকিক ক্ষমতার জোরে যদি বাতিলকে নির্মূল ও হককে বিজয়ী করাই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে তো তোমাদের কোন প্রয়োজন ছিল না। আল্লাহ নিজেই দুনিয়ার সমস্ত শয়তানকে নির্মূল করে কুফরী ও শিরকের সম্ভাবনার সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করতে পারতেন।

৮১. এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি এবং এখানে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এখানে এ বক্তব্যের মর্ম হচ্ছে, আল্লাহ নিজের কিতাবে সুস্পষ্টভাবে এ সত্যগুলো ব্যক্ত করে দিয়েছেন এবং এ সিদ্ধান্তও জানিয়ে দিয়েছেন যে, অতি প্রাকৃতিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই সত্যপন্থীদেরকে স্বাভাবিক পথেই সত্যের বিজয়ের জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমি কি আল্লাহ ছাড়া এমন কোন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীর সন্ধান করবো, যে আল্লাহর এ সিদ্ধান্ত পুনরবিবেচনা করবে এবং এমন কোন মুজিযা পাঠাবে যার বদৌলতে এরা ঈমান আনতে বাধ্য হবে?

৮২. অর্থাৎ ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করার জন্য এসব কথাবার্তা আজ নতুন করে রচনা করা হয়নি যারা আসমানী কিতাবসমূহের জ্ঞান রাখে এবং নবীদের মিশন সম্পর্কে যারা অবগত তারা একথার সাক্ষ প্রদান করবে যে, যা কিছু কুরআনে বর্ণনা করা হচ্ছে তা সবই অকাট্য, আদি, অকৃত্রিম ও চিরন্তন সত্য এবং তার মধ্যে কখনো কোন পরিবর্তন সূচিত হয়নি।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧﴾
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

আসলে তোমার রবই ভাল জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে আছে আর কে সত্য-সরল পথে অবিচল রয়েছে।

এখন যদি তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহ বিশ্বাস করে থাকো, তাহলে যে পশুর ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তার গোশ্‌ত খাও।[৮৪]

৮৩. অর্থাৎ দুনিয়ার অধিকাংশ লোক নির্ভুল জ্ঞানের পরিবর্তে কেবলমাত্র আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাদের আকীদা-বিশ্বাস, দর্শন, চিন্তাধারা, জীবন যাপনের মূলনীতি ও কর্মবিধান সবকিছুই ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে আল্লাহর পথ অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী দুনিয়ায় জীবন যাপন করার পথ মাত্র একটিই। সেটি হচ্ছে, আল্লাহ নিজে যে পথটি জানিয়ে দিয়েছেন—লোকেরা নিজেদের আন্দাজ-অনুমান ও ধারণা-কল্পনার ভিত্তিতে নিজেরাই যে পথটি তৈরী করেছে, সেটি নয়। কাজেই দুনিয়ার বেশীর ভাগ লোক কোন্ পথে যাচ্ছে, কোন সত্য সন্ধানীর এটা দেখা উচিত নয়। বরং আল্লাহ যে পথটি তৈরী করে দিয়েছেন তার ওপরই তার দৃঢ় পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলা উচিত। এ পথে চলতে গিয়ে দুনিয়ায় যদি সে নিসংগ হয়ে পড়ে তাহলেও তাকে একাকীই চলতে হবে।

৮৪. দুনিয়ার বেশীর ভাগ মানুষ নিজেদের ধারণা, কল্পনা ও আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে যেসব ভুল কর্মপন্থা অবলম্বন করেছে এবং যেগুলো ধর্মীয় বিধি-নিষেধের পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে পানাহার সামগ্রী সম্পর্কিত। বিভিন্ন জাতির মধ্যে এ জাতীয় বিধি-নিষেধের প্রচলন রয়েছে। অনেক জিনিসকে লোকেরা নিজেরাই হালাল গণ্য করেছে। অথচ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সেগুলো হারাম। আবার অনেক জিনিসকে লোকেরা নিজেরাই হারাম করে নিয়েছে। অথচ আল্লাহ সেগুলো হালাল করে দিয়েছেন। বিশেষ করে আল্লাহর নাম নিয়ে যেসব পশু যবেহ করা হবে সেগুলোকে হারাম ঠাওরানো হয়েছে এবং আল্লাহর নাম না নিয়ে যেগুলো যবেহ করা হবে সেগুলোকে একেবারেই হালাল মনে করা হয়েছে। এ ধরনের নিদারুণ অজ্ঞতাপ্রসূত দৃষ্টিভংগীর ওপর অতীতেও কোন কোন দল জোর দিয়েছিল এবং বর্তমানেও দুনিয়ার একদল লোক জোর দিয়ে চলছে। এরি প্রতিবাদে আল্লাহ এখানে মুসলমানদেরকে বলছেন, যদি সত্যি তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাকো এবং তাঁর বিধানসমূহ মেনে নিয়ে থাকো, তাহলে কাফের ও মুশরিকদের মধ্যে যেসব কুসংস্কার ও বিদ্বেষমূলক রীতি-প্রথার প্রচলন রয়েছে সেগুলো পরিহার করো, আল্লাহর বিধানের পরোয়া না করে মানুষ নিজেই যেসব বিধি-নিষেধের প্রাচীর তৈরী করেছে সেগুলো ভেঙ্গে ফেলো এবং আল্লাহ যে জিনিস হারাম করেছেন কেবল তাকেই হারাম মনে করো আর আল্লাহ যে জিনিস হালাল করেছেন কেবল তাকেই হালাল মনে করো।

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ
عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ
إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا
تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ
لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۚ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ
لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

যে জিনিসের ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে সেটি না খাওয়ার তোমাদের কি কারণ থাকতে পারে? অথচ যেসব জিনিসের ব্যবহার আল্লাহ নিরূপায় অবস্থা ছাড়া অন্য সব অবস্থায় হারাম করে দিয়েছেন সেগুলোর বিশদ বিবরণও তিনি তোমাদের জানিয়ে দিয়েছেন।[৮৫] অধিকাংশ লোকের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা জ্ঞান ছাড়া নিছক নিজেদের খেয়াল খুশী অনুযায়ী বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলে থাকে। তোমার রব এ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে খুব ভাল করেই জানেন। তোমরা প্রকাশ্য গোনাহসমূহ থেকে বাঁচো এবং গোপন গোনাহসমূহ থেকেও। যারা গোনাহে লিপ্ত হয়, তাদেরকে নিজেদের সব কৃতকর্মের প্রতিফল ভোগ করতেই হবে। আর যে পশুকে আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়নি তার গোশ্‌ত খেয়ো না। এটা অবশ্যি মহাপাপ। শয়তানরা তাদের সাথীদের অন্তরে সন্দেহ ও আপত্তির উদ্ভব ঘটায়, যাতে তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া করতে পারে।[৮৬] কিন্তু যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো তাহলে অবশ্যি তোমরা মুশরিক হবে।[৮৭]

৮৫. সূরা নাহ্‌লের ১১৫ আয়াত দেখুন। এ ইংগিত থেকে পরোক্ষভাবে একথাও প্রমাণিত হলো যে, সূরা নাহ্‌ল এ সূরাটির আগে নাযিল হয়েছিল।

৮৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, ইহুদী আলেমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করার জন্য আরবের অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকদেরকে যেসব প্রশ্ন শেখাতো তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল ঃ "আল্লাহ যেগুলো হত্যা করেন সেগুলো হারাম হয়ে যায় আর তোমরা যেগুলো হত্যা করো সেগুলো

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَٰفِرِينَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا۟ فِيهَا ۚ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾

১৫ রুকূ'

যে ব্যক্তি প্রথমে মৃত ছিল, পরে আমি তাকে জীবন দিয়েছি[৮৮] এবং তাকে এমন আলো দিয়েছি যার উজ্জ্বল আলোয় সে মানুষের মধ্যে জীবন পথে চলতে পারে, সেকি এমন ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে অন্ধকারের বুকে পড়ে আছে এবং কোনক্রমেই সেখান থেকে বের হয় না?[৮৯] কাফেরদের জন্য তো এভাবেই তাদের কর্মকাণ্ডকে সুদৃশ্য বানিয়ে দেয়া হয়েছে।[৯০] আর এভাবে প্রতিটি লোকালয়ে আমি অপরাধীদের লাগিয়ে দিয়েছি, যাতে তারা নিজেদের প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার জাল ছড়াতে পারে। আসলে নিজেদের প্রতারণার জালে তারা নিজেরাই আবদ্ধ হয় কিন্তু তারা এর চেতনা রাখে না।

হালাল হয়ে যায় এর কারণ কি?" তথাকথিত আহলি কিতাবদের কুটিল ও বক্র মানসিকতার এটি একটি নমুনা মাত্র। সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করার এবং সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে ইহুদী আলেমরা এ ধরনের প্রশ্ন তৈরী করে তাদেরকে সরবরাহ করতো।

৮৭. অর্থাৎ একদিকে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দেয়া এবং অন্যদিকে আল্লাহ বিমুখ লোকদের বিধান অনুযায়ী চলা এবং তাদের নির্ধারিত পদ্ধতির অনুসরণ করাই হচ্ছে শিরক। আর জীবনের সমগ্র বিভাগে আল্লাহর পূর্ণাংগ আনুগত্য কায়েম করার নামই তাওহীদ। আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে যদি আকীদাগতভাবে স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আনুগত্যলাভের অধিকারী বলে মনে করা হয়, তাহলে তা হবে আকীদাগত শিরক। আর যদি কার্যত এমন লোকদের আনুগত্য করা হয়, যারা আল্লাহর বিধানের পরোয়া না করে নিজেরাই হুকুমকর্তা ও বিধি-নিষেধের মালিক হয়ে বসে তাহলে তা হবে কর্মগত শিরক।

৮৮. এখানে মৃত্যু বলা হয়েছে অজ্ঞতা, মূর্খতা ও চেতনাবিহীন অবস্থাকে। আর জীবন বলতে জ্ঞান, উপলব্ধি ও প্রকৃত সত্যকে চিনতে পারার অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তির মধ্যে ভুল ও নির্ভুলের পার্থক্যবোধ নেই এবং যার সত্য-সরল পথের স্বরূপ জানা নেই, জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সে জীবন সম্পন্ন হলেও প্রকৃত সত্যের বিচারে সে মনুষ্য পদবাচ্য নয়। সে অবশ্যি জীবন্ত প্রাণী কিন্তু জীবন্ত মানুষ নয়। জীবন্ত মানুষ একমাত্র তাকেই বলা যাবে যে সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও ভুল-নির্ভুলের চেতনা রাখে।

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ
اللَّهِ ۘ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا
صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾ فَمَنْ يُرِدِ
اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ
اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾

তাদের সামনে কোন আয়াত এলে তারা বলে, "আল্লাহর রসূলদেরকে যে জিনিস দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তা আমাদের দেয়া হয় ততক্ষণ আমরা মানবো না।"[৯১] আল্লাহ নিজের রিসালাতের কাজ কাকে দিয়ে কিভাবে নেবেন তা তিনি নিজেই ভাল জানেন। এ অপরাধীরা নিজেদের প্রতারণা ও কূটকৌশলের অপরাধে আল্লাহর কাছে অচিরেই লাঞ্ছনা ও কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যাকে সত্যপথ দেখাবার সংকল্প করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।[৯২] আর যাকে তিনি গোমরাহীতে নিক্ষেপ করার সংকল্প করেন তার বক্ষদেশ সংকীর্ণ করে দেন এবং এমনভাবে তাকে সংকুচিত করতে থাকেন যে, (ইসলামের কথা চিন্তা করতেই) তার মনে হতে থাকে যেন তার আত্মা আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। এভাবে আল্লাহ (সত্য থেকে দূরে পলায়ন ও সত্যের প্রতি ঘৃণার) আবিলতা ও অপবিত্রতা বেঈমানদের ওপর চাপিয়ে দেন।

৮৯. অর্থাৎ যে মানুষটি মানবিক চেতনা লাভ করেছে এবং জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোয় বাঁকা পথগুলোর মাঝখানে পড়ে থাকা সত্যের সোজা রাজপথটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, তার ব্যাপারে কেমন করে আশা করা যেতে পারে যে, সে এমনসব চেতনাবিহীন লোকদের মতো দুনিয়ায় জীবন যাপন করবে, যারা অজ্ঞতা ও মূর্খতার অন্ধকারে পথ হারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

৯০. অর্থাৎ যাদেরকে আলো দেখানো হয় এবং তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে আর যাদেরকে সত্য-সরল পথের দিকে আহবান জানানো হয় এবং তারা সে আহবানে কর্ণপাত না করে নিজেদের বাঁকা পথেই চলতে থাকে, তাদের জন্য এটিই আল্লাহর বিধান যে, এরপর অন্ধকারই তাদের কাছে ভাল মনে হতে থাকবে। তারা অন্ধের মতো পথ হাতড়ে চলা এবং এখানে সেখানে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাওয়া পছন্দ করবে। ঝোপ-ঝাড়

وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾
لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٧﴾
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ
وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ
اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ۗ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ
اللّٰهُ ۗ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٢٨﴾ وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا
بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٢٩﴾

অথচ এ পথটিই তোমাদের রবের সোজা পথ। আর তার নিদর্শনগুলো তাদের জন্য সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যারা উপদেশ গ্রহণ করে। তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে শান্তির আবাস[৯৩] এবং তিনি তাদের অভিভাবক। কারণ, তারা সঠিক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে ঘেরাও করে একত্র করবেন সেদিন তিনি জিনদের[৯৪] সম্বোধন করে বলবেন, "হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা তো মানুষদেরকে অনেক বেশী তোমাদের অনুগামী করেছো।" মানুষদের মধ্য থেকে যারা তাদের বন্ধু ছিল তারা বলবে, "হে আমাদের রব! আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকে প্রত্যেককে খুব বেশী ব্যবহার করেছে[৯৫] এবং তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছিলে এখন আমরা সেখানে পৌঁছে গেছি।" আল্লাহ বলবেন, "বেশ, এখন আগুনই তোমাদের আবাস। সেখানে তোমরা থাকবে চিরকাল।" তা থেকে রক্ষা পাবে একমাত্র তারাই যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করতে চাইবেন। নিসন্দেহে তোমাদের রব জ্ঞানময় ও সবকিছু জানেন।[৯৬] দেখো এভাবে আমি (আখেরাতে) জালেমদেরকে পরস্পরের সাথী বানিয়ে দেবো (দুনিয়ায় তারা এক সাথে মিলে) যা কিছু উপার্জন করেছিল তার কারণে।[৯৭]

তাদের চোখে বাগান এবং কাঁটা তাদের দৃষ্টিতে ফুল হয়ে দেখা দেবে। সব রকমের অন্যায়, অসৎকাজ ও ব্যভিচারে তারা আনন্দ পায়। প্রত্যেকটি নির্বুদ্ধিতাকে তারা গবেষণা ও অনুসন্ধানলব্ধ কীর্তি মনে করে। প্রত্যেকটি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তারা

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي
وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ
الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كٰفِرِينَ ﴿١٣٠﴾

১৬ রুকূ'

(এ সময় আল্লাহ তাদেরকে একথাও জিজ্ঞেস করবেন) "হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে কি রসূলরা আসেনি, যারা তোমাদেরকে আমার আয়াত শোনাতো এবং এ দিনটির পরিণাম সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করতো?" তারা বলবে, "হাঁ, আমরা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দিচ্ছি।"[৯৮] আজ দুনিয়ার জীবন এদেরকে প্রতারণা জালে আবদ্ধ করে রেখেছে কিন্তু সেদিন এরা কাফের ছিল বলে নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবে।[৯৯]

এ আশায় আরো বড় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তৈরী হয়ে যায় যে, প্রথমবারে তো ঘটনাক্রমে জ্বলন্ত অংগারে হাত লেগেছিল কিন্তু এবারে আর কোন অনিশ্চয়তা নেই, এবারে একেবারে নির্ঘাৎ মনি-মুক্তো হাতে ঠেকবে।

৯১. অর্থাৎ রসূলদের কাছে ফেরেশতা এসেছে এবং তারা আল্লাহর পয়গাম এনেছে, রসূলদের এ দাবী আমরা মানি না। যতক্ষণ ফেরেশতারা সরাসরি আমাদের কাছে না আসে এবং "এটি আল্লাহর বাণী" একথা সরাসরি আমাদের না বলে ততক্ষণ আমরা ঈমান আনতে পারি না।

৯২. বক্ষদেশ উন্মুক্ত করে দেয়ার মানে হচ্ছে, ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে হৃদয়ে পূর্ণ নিসংশয়তা ও নিশ্চিন্ততা সৃষ্টি করা এবং যাবতীয় সন্দেহ, সংশয় ও দোদুল্যমানতা দূর করে দেয়া।

৯৩. শান্তির ঘর মানে জান্নাত, যেখানে মানুষ সব রকমের বিপদ আপদ থেকে সংরক্ষিত এবং সব রকমের ক্ষতির হাত থেকে নিরাপদ থাকবে।

৯৪. এখানে জিন বলতে শয়তান জিন বুঝানো হয়েছে।

৯৫. অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকে প্রত্যেককে অবৈধভাবে কাজে লাগিয়েছে এবং তার দ্বারা লাভবান হয়েছে। প্রত্যেকে অন্যকে প্রতারণা করে নিজের কামনা বাসনা চরিতার্থ করেছে।

৯৬. অর্থাৎ যদিও আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবার এবং যাকে ইচ্ছা মাফ করার ইখতিয়ার রাখেন কিন্তু এ শাস্তি দেয়া ও মাফ করা যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া নিছক খেয়াল খুশীর ভিত্তিতে হবে না। বরং এর পেছনে থাকবে জ্ঞান ও ন্যায়সংগত কারণ। আল্লাহ সেই অপরাধীকে মাফ করবেন যার সম্পর্কে তিনি জানেন যে, তার অপরাধের জন্য সে

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ﴿١٣١﴾ وَلِكُلٍّ
دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۭ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٢﴾ وَرَبُّكَ
الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۭ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ
مَّا يَشَاۗءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ﴿١٣٣﴾

(একথা প্রমাণ করার জন্য তাদের কাছ থেকে এ সাক্ষ নেয়া হবে যে,) তোমাদের রব জনপদগুলোকে জুলুম সহকারে ধ্বংস করতেন না যখন সেখানকার অধিবাসীরা প্রকৃত সত্য অবগত নয়।[১০০]

প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা তার কার্য অনুযায়ী হয়। আর তোমার রব মানুষের কাজের ব্যাপারে বেখবর নন। তোমার রব কারোর মুখাপেক্ষী নন এবং দয়া ও করুণা তাঁর রীতি।[১০১] তিনি চাইলে তোমাদের সরিয়ে দিতে এবং তোমাদের জায়গায় তার পছন্দমত অন্য লোকদের এনে বসাতে পারেন, যেমন তিনি তোমাদের আবির্ভূত করেছেন অন্য কিছু লোকের বংশধারা থেকে।

নিজে দায়ী নয়। তিনি তাকেই শাস্তি দেবেন যাকে শাস্তি দেয়া তিনি যুক্তিসংগত মনে করবেন।

৯৭. অর্থাৎ যেভাবে দুনিয়ায় গোনাহ ও অসৎকাজ করার ব্যাপারে তারা পরস্পরের শরীক ছিল ঠিক তেমনি আখেরাতেও শাস্তি পাওয়ার ব্যাপারে তারা পরস্পরের শরীক হবে।

৯৮. অর্থাৎ আমরা স্বীকার করছি, আপনার পক্ষ থেকে রসূলের পর রসূল এসেছেন। তারা প্রকৃত সত্যের ব্যাপারে ক্রমাগতভাবে আমাদের অবহিত ও সতর্কও করেছেন। কিন্তু তাদের কথা না মেনে আমরা নিজেরাই ভুল করেছি।

৯৯. অর্থাৎ এরা বেখবর বা অজ্ঞ ছিল না বরং অস্বীকারকারী কাফের ছিল। তারা নিজেরাই স্বীকার করবে, সত্য তাদের কাছে পৌছেছিল কিন্তু আমরা নিজেরাই তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলাম।

১০০. অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর মোকাবিলায় এ মর্মে প্রতিবাদ জানাবার সুযোগ দিতে চান না যে, আপনি প্রকৃত সত্য সম্পর্কে আমাদের অবগত করেননি এবং আমাদের সঠিক পথ জানাবার কোন ব্যবস্থাও করেননি। ফলে অজ্ঞতাবশত আমরা যখন ভুল পথে চলতে শুরু করেছি অমনি আমাদের পাকড়াও করতে শুরু করেছেন। এ যুক্তি প্রদর্শনের পথ রোধ করার জন্য আল্লাহ নবী পাঠিয়েছেন, কিতাব নাযিল করেছেন। এভাবে জিন ও মানব জাতিকে সত্যপথ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবগত করেছেন। এরপর লোকেরা ভুল পথে চললে এবং আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিলে এর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তাদের ওপর বর্তায়, আল্লাহর ওপর নয়।

إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ ۙ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٤﴾ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ
مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۙ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ
الدَّارِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٥﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ
وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا ۖ فَمَا كَانَ
لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ
شُرَكَائِهِمْ ۗ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾

তোমাদের কাছে যে জিনিসের ওয়াদা করা হচ্ছে তা নিশ্চিতভাবেই আসবে।[১০২] আর তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করে দেবার ক্ষমতা রাখো না। হে মুহাম্মাদ! বলে দাও, হে লোকেরা, তোমরা নিজেদের জায়গায় কাজ করে যেতে থাকো এবং আমিও নিজের জায়গায় কাজ করে যেতে থাকি,[১০৩] শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে পরিণাম কার জন্য মংগলজনক হবে। তবে জালেম কখনো সফলকাম হতে পারে না, এটি একটি চিরন্তন সত্য।

এ লোকেরা[১০৪] আল্লাহর জন্য তাঁরই সৃষ্ট ক্ষেত-খামার ও গবাদি পশুর মধ্য থেকে একটি অংশ নির্দিষ্ট করেছে আর নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলছে, এটি আল্লাহর জন্য এবং এটি আমাদের বানানো আল্লাহর শরীকদের জন্য।[১০৫] তারপর যে অংশ তাদের বানানো শরীকদের জন্য, তা তো আল্লাহর কাছে পৌঁছে না কিন্তু যে অংশ আল্লাহর জন্য তা তাদের বানানো শরীকদের কাছে পৌঁছে যায়।[১০৬] কতই না খারাপ ফায়সালা করে এরা!

১০১. "তোমাদের রব কারো মুখাপেক্ষী নন।" অর্থাৎ তাঁর কোন কাজ তোমাদের জন্য আটকে নেই। তোমাদের সাথে তাঁর কোন স্বার্থ জড়িত নেই। কাজেই তোমাদের নাফরমানীর ফলে তাঁর কোন ক্ষতি হবে না। অথবা তোমাদের আনুগত্যের ফলে তিনি লাভবানও হবেন না। তোমরা সবাই মিলে কঠোরভাবে তাঁর হুকুম অমান্য করলে তাঁর বাদশাহী ও সার্বভৌম কর্তৃত্বে এক বিন্দু পরিমাণ কমতি দেখা দেবে না। আবার সবাই মিলে তাঁর হুকুম মেনে চললে এবং তাঁর বন্দেগী করতে থাকলেও তাঁর সাম্রাজ্যে এক বিন্দু পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটবে না। তিনি তোমাদের সেলামীর মুখাপেক্ষী নন। তোমাদের মানত-নযরানারও তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর বিপুল ভাণ্ডার তোমাদের জন্য অকাতরে বিলিয়ে দিচ্ছেন এবং এর বিনিময়ে তোমাদের কাছ থেকে কিছুই চান না।

"দয়া ও করুণা তাঁর রীতি।" পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এখানে এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হয়। একটি অর্থ হচ্ছে, তোমাদের রব তোমাদেরকে সত্য-সরল পথে চলার নির্দেশ দেন এবং প্রকৃত ও বাস্তব সত্যের বিপরীত পথে চলতে নিষেধ করেন। তাঁর এ আদেশ-নিষেধের অর্থ এ নয় যে, তোমরা সঠিক পথে চললে তাঁর লাভ এবং তোমরা ভুল পথে চললে তাঁর ক্ষতি। বরং এর আসল অর্থ হচ্ছে এই যে, সঠিক পথে চললে তোমাদের লাভ এবং ভুল পথে চললে তোমাদের ক্ষতি। কাজেই তিনি তোমাদের সঠিক কর্মপদ্ধতি শিক্ষা দেন। তার সাহায্যে তোমরা উচ্চতম পর্যায়ে উন্নীত হবার যোগ্যতা লাভ করতে পার। তিনি তোমাদের ভুল কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখেন। এর ফলে তোমরা নিম্ন পর্যায়ে নেমে যাওয়া থেকে রক্ষা পাও। এগুলো তাঁর করুণা ও মেহেরবানী ছাড়া আর কিছুই নয়। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমাদের রব কঠোরভাবে পাকড়াও করেন না। তোমাদের শাস্তি দেবার মধ্যে তাঁর কোন আনন্দ নেই। তোমাদের পাকড়াও করার ও আঘাত দেবার জন্য তিনি ওঁৎ পেতে বসে নেই। তোমাদের সামান্য ভুল হলেই অমনি তিনি তোমাদের ওপর চড়াও হবেন, তা নয়। আসলে নিজের সকল সৃষ্টির প্রতি তিনি বড়ই মেহেরবান। নিজের সার্বভৌম কর্তৃত্ব পরিচালনার ব্যাপারে তিনি চরম দয়া, করুণা, অনুগ্রহ ও অনুকম্পার পরিচয় দিয়ে চলেছেন। মানুষের ব্যাপারেও তিনি এ নীতিই অবলম্বন করছেন। তাই তিনি একের পর এক তোমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে যেতে থাকেন। তোমরা নাফরমানী করে যেতে থাকো, গোনাহ করতে থাকো, অপরাধ করতে থাকো, তাঁর দেয়া জীবিকায় প্রতিপালিত হয়ে তাঁরই বিধান অমান্য করতে থাকো। কিন্তু তিনি ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার আশ্রয় নেন এবং তোমাদের উপলব্ধি করার ও সংশোধিত হবার জন্য ছাড় ও অবকাশ দিয়ে যেতে থাকেন। অন্যথায় তিনি যদি কঠোরভাবে পাকড়াও করতেন, তাহলে তোমাদের এ দুনিয়া থেকে বিদায় দিয়ে তোমাদের জায়গায় অন্য একটি জাতির উত্থান ঘটানো অথবা সমগ্র মানব জাতিকে ধ্বংস করে দিয়ে আর একটি নতুন প্রজাতির জন্ম দেয়া তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না।

১০২. অর্থাৎ কিয়ামত। তখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষকে আবার নতুন করে জীবিত করা হবে। শেষ বিচারের জন্য তাদেরকে তাদের রবের সামনে পেশ করা হবে।

১০৩. অর্থাৎ আমার বুঝাবার পরও যদি তোমরা না বুঝতে চাও এবং নিজেদের ভ্রান্ত পদক্ষেপ থেকে বিরত না হও, তাহলে যে পথে তোমরা চলছো সে পথে চলে যেতে থাকো আর আমাকে আমার পথে চলতে দাও। এর পরিণাম যা কিছু হবে তা তোমাদের সামনেও আসবে এবং আমার সামনেও।

১০৪. ওপরের ভাষণটি এ বলে শেষ করা হয়েছিল যে, এরা যদি উপদেশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত না হয় এবং নিজেদের মূর্খতার ওপর জিদ চালিয়ে যেতেই থাকে, তাহলে তাদেরকে বলে দাও ঃ ঠিক আছে, তোমরা তোমাদের পথে চলো এবং আমি আমার পথে চলি, তারপর একদিন কিয়ামত অবশ্যি আসবে, সে সময় এ কর্মনীতির ফল তোমরা অবশ্যি জানতে পারবে, তবে একথা ভালভাবে জেনে রাখো, সেখানে জালেমদের ভাগ্যে কোন সফলতা লেখা নেই। তারপর যে জাহেলিয়াতের ওপর তারা জোর দিয়ে আসছিল এবং যাকে কোনক্রমেই ত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত ছিল না, তার কিছুটা ব্যাখ্যা এখন

এখানে করা হচ্ছে। তাদের সামনে তাদের সে "জুলুমের" স্বরূপ তুলে ধরা হচ্ছে যার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে তারা কোন সফলতার মুখ দেখার আশা করতে পারে না।

১০৫. তারা একথা স্বীকার করতো, পৃথিবীর মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। তিনিই গাছপালা ও শস্যাদি উৎপন্ন করেন। তাছাড়া যেসব গবাদি পশুকে তারা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে তাদের স্রষ্টাও আল্লাহ। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের ধারণা ছিল, তাদের প্রতি আল্লাহ এই যেসব অনুগ্রহ করেছেন এগুলো তাদের প্রতি স্নেহ মমতা ও করুণার ধারা বর্ষণকারী দেবদেবী, ফেরেশতা, জিন, তারকা ও পূর্ববর্তী সৎব্যক্তিবর্গের পবিত্র আত্মার বদৌলতেই সম্ভব হয়েছে। এ জন্য তারা নিজেদের ক্ষেতের ফসল ও গৃহপালিত পশু থেকে দু'টি অংশ উৎসর্গ করতো। একটি অংশ উৎসর্গ করতো আল্লাহর নামে। যেহেতু তিনিই এ ফসল ও পশু তাদেরকে দান করেছেন। তাই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় অংশটি উৎসর্গ করতো নিজেদের গোত্র বা পরিবারের অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক উপাস্যদের নযরানা হিসেবে। তাদের করুণা ও অনুগ্রহের ধারা অব্যাহত রাখাই ছিল এর উদ্দেশ্য। আল্লাহ সর্বপ্রথম তাদের এ জুলুমের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেছেন। আল্লাহ বলেন, এসব গবাদি পশু আমিই সৃষ্টি করেছি এবং আমিই এগুলো তোমাদের দান করেছি, তাহলে এ জন্য অন্যদের কাছে নযরানা পেশ করছো কেন? যিনি তোমাদের প্রতি সরাসরি অনুগ্রহ ও করুণা করেছেন, তোমাদের সে মহান অনুগ্রহকারী সত্তার অনুগ্রহকে অন্যদের হস্তক্ষেপ, সহায়তা ও মধ্যস্থতার ফল গণ্য করা এবং এ জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে সে মহান অনুগ্রহকারীর অধিকারের মধ্যে তাদেরকে শরীক করা কি নিমকহারামী নয়? তারপর ইথগিতে এ বলে তাদের পুনরায় সমালোচনা করেছেন যে, তারা আল্লাহর এই যে অংশ নির্ধারণ করেছে এও তাদের নিজেদের নির্ধারিত, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নয়। তারা নিজেরাই নিজেদের বিধায়কে পরিণত হয়েছে। নিজেরাই ইচ্ছামতো যে অংশটা চাচ্ছে আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করছে আবার যে অংশটা চাচ্ছে অন্যদের জন্য নির্ধারণ করছে। অথচ এ দানের আসল মালিক ও সর্বময় অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এ দান থেকে কি পরিমাণ তাঁর জন উৎসর্গ করতে হবে এবং বাকি অংশের মধ্যে আর কার কার অধিকার আছে তা নির্ধারিত হতে হবে আল্লাহর দেয়া শরীয়াতের মাধ্যমে। কাজেই তারা নিজেরা নিজেদের মনগড়া বাতিল পদ্ধতিতে আল্লাহর জন্য যে অংশ উৎসর্গ করে এবং যে অংশ গরীব ও অভাবীদের মধ্যে দান করে দেয়, তাও কোন সৎকাজ হিসেবে গণ্য হবে না। আল্লাহর দরবারে তার গৃহীত হবার কোন কারণ নেই।

১০৬. তারা আল্লাহর নামে যে অংশ নির্ধারণ করতো নানা ধরনের চালবাজীর আশ্রয় নিয়ে তার মধ্যেও বিভিন্ন প্রকার কমতি করতে থাকতো এবং প্রত্যেকবার নিজেদের মনগড়া শরীকদের অংশ বাড়াবার প্রচেষ্টা চালাতো, তাদের কর্মনীতির প্রতি এখানে সূক্ষ্ম বিদ্রূপ করা হয়েছে। এ থেকে একথা প্রকাশ হতো যে, নিজেদের মনগড়া উপাস্যদের সাথে তাদের যে মানসিক যোগ আছে তা আল্লাহর সাথে নেই। যেমন আল্লাহর নামে যেসব শস্য বা ফল নির্ধারণ করা হতো তার মধ্য থেকে কিছু পড়ে গেলে তা মনগড়া মাবুদদের অংশে শামিল করা হতো। আর মনগড়া মাবুদদের অংশ থেকে কিছু পড়ে গেলে বা আল্লাহর অংশে পাওয়া গেলে তা আবার মনগড়া মাবুদদের অংশে ফেরত দেয়া হতো। শস্য ক্ষেত্রের যে অংশ মনগড়া মাবুদদের নযরানার জন্য নির্দিষ্ট ছিল সেদিক থেকে যদি আল্লাহর

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ
لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ
وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾

আর এভাবেই বহু মুশরিকের জন্য তাদের শরীকরা নিজেদের সন্তান হত্যা করাকে সুশোভন করে দিয়েছে,[১০৭] যাতে তাদেরকে ধ্বংসের আবর্তে নিক্ষেপ করতে[১০৮] এবং তাদের দীনকে তাদের কাছে সংশয়িত করে তুলতে পারে।[১০৯] আল্লাহ চাইলে তারা এমনটি করতো না। কাজেই তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা নিজেদের মিথ্যা রচনায় ডুবে থাক।[১১০]

নযরানার জন্য নির্দিষ্ট অংশের দিকে পানির ধারা প্রবাহিত হতো তাহলে তার সমস্ত ফসল মনগড়া মাবুদদের অংশে দিয়ে দেয়া হতো। কিন্তু এর বিপরীত ঘটনা ঘটলে আল্লাহর অংশে কোন বৃদ্ধি করা হতো না। কোন বছর দুর্ভিক্ষের কারণে যদি নযরানার ফসল খেয়ে ফেলার প্রশ্ন দেখা দিতো, তাহলে আল্লাহর ভাগের ফসল খেয়ে ফেলা হতো। কিন্তু মনগড়া শরীকদের ভাগের ফসলে হাত লাগানো হতো না। ভয় করা হতো, এ অংশে হাত দিলে কোন বালা-মুসিবত নাযিল হয়ে যাবে। কোন কারণে শরীকদের অংশ কম হয়ে গেলে আল্লাহর অংশ থেকে কেটে তা পূরণ করে দেয়া হতো। কিন্তু আল্লাহর অংশ কম হয়ে গেলে শরীকদের অংশ থেকে একটি দানাও সেখানে ফেলা হতো না। এ কর্মনীতির সমালোচনা করা হলে নানা ধরনের মুখরোচক ও চিত্তাকর্ষক ব্যাখ্যার অবতারণা করা হতো। যেমন বলা হতো, আল্লাহ তো কারোর মুখাপেক্ষী নন। তাঁর অংশ কিছু কম হয়ে গেলেও তাঁর কোন পরোয়া নেই। আর শরীকরা তো আল্লাহর বান্দা। তারা আল্লাহর মতো অভাবহীন নয়। কাজেই তাদের ওখানে সামান্য কমবেশী হলেও তারা আপত্তি জানায়।

এ কাল্পনিক ধারণা ও কুসংস্কারগুলোর মূল কোথায় প্রোথিত ছিল তা বুঝার জন্য এটা জানা প্রয়োজন যে, আরবের মূর্খ ও অজ্ঞ লোকেরা নিজেদের ধন-সম্পদ থেকে আল্লাহর জন্য যে অংশ নির্ধারণ করতো তা গরীব মিসকীন, মুসাফির, এতীম ইত্যাদির সাহায্যের কাজে ব্যয়িত হতো। আর মনগড়া শরীকদেরকে নযরানা দেবার জন্য যে অংশ নির্ধারণ করতো তা হয় সরাসরি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পেটে চলে যেতো অথবা পূজার বেদীমূলে অর্ঘরূপে পেশ করা হতো এবং এভাবে তাও পরোক্ষভাবে পূজারী ও সেবায়েতদের ঝুলিতে গিয়ে পড়তো। এ জন্যই শত শত বছর ধরে এ স্বার্থ শিকারী ধর্মীয় নেতারা ক্রমাগতভাবে উপদেশ দানের মাধ্যমে অজ্ঞ জনতার মনে একথা বসিয়ে দিয়েছিল যে, আল্লাহর অংশ কিছু কম হয়ে গেলে ক্ষতি নেই কিন্তু "আল্লাহর প্রিয়পাত্রদের" অংশে কিছু কম হওয়া উচিত নয় বরং সম্ভব হলে সেখানে কিছু বেশী হতে থাকাটাই ভালো।

১০৭. এখানে শরীকরা শব্দটি আগের অর্থ থেকে পৃথক অন্য একটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ওপরের আয়াতে "শরীক" শব্দটি থেকে তাদের এমন সব মাবুদদেরকে বুঝানো

হয়েছিল যাদের বরকত, সুপারিশ বা মাধ্যমকে তারা নিয়ামত ও অনুগ্রহলাভের কাজে সাহায্যকারী মনে করতো এবং তাদের নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতালাভের অধিকারের ক্ষেত্রে তাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করতো। অন্যদিকে এ আয়াতে শরীক বলতে মানুষ ও শয়তানদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা সন্তান হত্যাকে তাদের দৃষ্টিতে একটি বৈধ ও পছন্দনীয় কাজে পরিণত করেছিল। তাদেরকে শরীক বলার কারণ হচ্ছে এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে যেভাবে পূজা ও উপাসনালাভের একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ অনুরূপভাবে বান্দাদের জন্য আইন প্রণয়ন এবং বৈধ ও অবৈধের সীমা নির্ধারণ করার অধিকারও একমাত্র আল্লাহর। কাজেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর সামনে পূজা ও উপাসনার কোন অনুষ্ঠান করা যেমন তাকে আল্লাহর সাথে শরীক করার সমার্থক ঠিক তেমনি কারোর মনগড়া আইনকে সত্য মনে করে তার আনুগত্য করা এবং তার নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করাকে অপরিহার্য মনে করাও তাকে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে শরীক গণ্য করারই শামিল। এ দু'টি কাজ অবশ্যি শিরক। যে ব্যক্তি এ কাজটি করে, সে যাদের সামনে মানত ও নযরানা পেশ করে অথবা যাদের নির্ধারিত আইনকে অপরিহার্যভাবে মেনে চলে, তাদেরকে মুখে ইলাহ বা রব বলে ঘোষণা করুক বা না করুক তাতে এর শিরক হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য সূচিত হয় না।

আরববাসীদের মধ্যে সন্তান হত্যা করার তিনটি পদ্ধতির প্রচলন ছিল। কুরআনে এ তিনটির দিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

এক ঃ মেয়ের কারণে কোন ব্যক্তিকে জামাই হিসেবে গ্রহণ করতে হবে অথবা গোত্রীয় যুদ্ধে শত্রুরা তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে বা অন্য কোন কারণে তার জন্য পিতামাতাকে লজ্জার সম্মুখীন হতে হবে—এসব চিন্তায় মেয়েদের হত্যা করা হতো।

দুই ঃ সন্তানদের লালন পালনের বোঝা বহন করা যাবে না এবং অর্থনৈতিক উপাদান ও সুযোগ-সুবিধার অভাবের দরুন তারা দুর্বিসহ বোঝায় পরিণত হবে—এ ভয়ে সন্তানদের হত্যা করা হতো।

তিন ঃ নিজেদের উপাস্যদের সন্তুষ্টির জন্য সন্তানদের বলি দেয়া হতো।

১০৮. এ "ধ্বংস" শব্দটি এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ ঃ নৈতিক ধ্বংসও হয়। যে ব্যক্তি নির্মমতা ও হৃদয়হীনতার এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যার ফলে নিজের সন্তানকে নিজের হাতে হত্যা করতে থাকে, তার মধ্যে মানবিক গুণ তো দূরের কথা পাশবিক গুণেরও অস্তিত্ব থাকে না। আবার এর অর্থ ঃ সম্প্রদায়গত ও জাতীয় ধ্বংসও হয়। সন্তান হত্যার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে বংশ হ্রাস ও জনসংখ্যা কমে যেতে থাকে। এর ফলে মানব সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সংশ্লিষ্ট জাতিও ধ্বংসের আবর্তে নেমে যেতে থাকে। কারণ এ জাতি নিজেদের সাহায্য, সহায়তা ও সমর্থন দানকারী, নিজেদের তামাদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী এবং নিজেদের উত্তরাধিকারীদের জন্মের পথ রুদ্ধ করে অথবা জন্মের পরপরই নিজেরাই নিজেদের হাতে তাদেরকে খতম করে দেয়। এ ছাড়া এর অর্থ পরিণামগত ধ্বংসও হয়। যে ব্যক্তি নিরপরাধ-নিষ্পাপ শিশুদের ওপর এ ধরনের জুলুম করে, নিজের মনুষ্যত্বকে এমনকি প্রাণী-সুলভ প্রকৃতিকেও এভাবে জবাই করে এবং মানব সম্প্রদায়ের সাথে ও নিজের জাতির সাথেও এ ধরনের শত্রুতা করে, সে নিজেকে আল্লাহর কঠিনতম আযাবের উপযোগী করে তোলে।

وَقَالُوا هٰذِهٖٓ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ۖ لَّا يَطْعَمُهَآ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ
وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا
افْتِرَآءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٨﴾

তারা বলে, এ পশু ও এ ক্ষেত-খামার সুরক্ষিত। এগুলো একমাত্র তারাই খেতে পারে যাদেরকে আমরা খাওয়াতে চাই। অথচ এ বিধি-নিষেধ তাদের মনগড়া।[১১১] তারপর কিছু পশুর পিঠে চড়া ও তাদের পিঠে মাল বহন করা হারাম করে দেয়া হয়েছে আবার কিছু পশুর ওপর তারা আল্লাহর নাম নেয় না[১১২] আর এসব কিছু আলাহ সম্পর্কে তাদের মিথ্যা রটনা।[১১৩] শীঘ্রই আল্লাহ তাদেরকে এ মিথ্যা রটনার প্রতিফল দেবেন।

১০৯. জাহেলী যুগের আরবরা নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিমাস সালামের অনুসারী মনে করতো এবং এ হিসেবে নিজেদের পরিচয়ও দিতো। এ জন্য তাদের ধারণা ছিল, তারা যে ধর্মের অনুসরণ করছে সেটি আল্লাহর পছন্দনীয় ধর্ম। কিন্তু হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈলের কাছ থেকে যে জীবন বিধানের শিক্ষা তারা নিয়েছিল তার মধ্যে পরবর্তী বিভিন্ন শতকে বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা, গোত্রীয় সরদার, পরিবারের বয়োবৃদ্ধ এবং অন্যান্য লোকেরা নানান ধরনের বিশ্বাস ও কর্মের সংযোজন ঘটিয়েছে। পরবর্তী বংশধরেরা সেগুলোকেই আসল দীন ও জীবন বিধানের অংশ মনে করেছে এবং ভক্তি সহকারে সেগুলো মেনে চলেছে। যেহেতু জাতীয় ঐতিহ্যে, ইতিহাসে বা কোন গ্রন্থে এমন কোন রেকর্ড সংরক্ষিত ছিল না, যা থেকে আসল ধর্ম কি ছিল এবং পরবর্তীকালে কোন্ সময় কে কোন্ বিষয়টি তাতে বৃদ্ধি করেছিল, তা জানা যেতে পারে, তাই আরববাসীদের জন্য তাদের সমগ্র দীনটিই সন্দেযুক্ত হয়ে পড়েছিল। কোন বিষয় সম্পর্কে তারা নিশ্চয়তার সাথে একথা বলতে পারতো না যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আসল দীনটি এসেছিল এটি তার অংশ এবং এ বিদআত ও ভুল রসম-রেওয়াজ- অনুষ্ঠানগুলো পরবর্তীকালে এর সাথে সংযুক্ত ও বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ বাক্যটির মধ্যে এ অবস্থারই প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে।

১১০. অর্থাৎ যদি আল্লাহ চাইতেন তারা এমনটি না করুক তাহলে তারা কখনই এমনটি করতে পারতো না। কিন্তু যেহেতু যে ব্যক্তি যে পথে চলতে চায় তাকে সে পথে চলতে দেয়াটাই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা তাই এসব কিছু হয়েছে। কাজেই যদি তোমাদের বুঝাবার পর এরা না মানে এবং নিজেদের মিথ্যাচার ও মিথ্যা রচনার ওপর তারা জোর দিয়ে যেতে থাকে, তাহলে তারা যা করতে চায় করতে দাও। তাদের পেছনে লেগে থাকার কোন প্রয়োজন নেই।

১১১. আরববাসীদের রীতি ছিল, তারা কোন কোন পশু বা কোন কোন ক্ষেতের উৎপন্ন ফসল এভাবে মানত করতো ঃ এটি অমুক মন্দির, অমুক আস্তানা বা অমুক হযরতের নযরানা। এ নযরানা সবাই খেতে পারতো না। বরং এর সম্পর্কিত একটি বিস্তারিত বিধান

وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰٓى
اَزْوَاجِنَا ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ ۚ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ
اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٣٩﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ۚ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا
مُهْتَدِيْنَ ﴿١٤٠﴾

আর তারা বলে, এ পশুদের পেটে যা কিছু আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং আমাদের স্ত্রীদের জন্য সেগুলো হারাম। কিন্তু যদি তা মৃত হয় তাহলে উভয়েই তা খাবার ব্যাপারে শরীক হতে পারে।[১১৪] তাদের এ মনগড়া কথার প্রতিফল আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যি দেবেন। অবশ্যি তিনি প্রজ্ঞাময় ও সবকিছু জানেন।

নিসন্দেহে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা নিজেদের সন্তানদেরকে নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতাবশত হত্যা করেছে এবং আল্লাহর দেয়া জীবিকাকে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা ধারণাবশত হারাম গণ্য করেছে নিসন্দেহে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা কখনোই সত্য পথ লাভকারীদের অন্তরভুক্ত ছিল না।[১১৫]

তাদের কাছে ছিল। এ বিধান অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের লোকের জন্য বিভিন্ন নযরানা নির্দিষ্ট ছিল। তাদের এ কাজটিকে আল্লাহ কেবল মুশরিকী কাজ বলেই ক্ষান্ত হননি বরং এ ব্যাপারেও তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এটি তাদের একটি মনগড়া বিধান। অর্থাৎ যে আল্লাহর প্রদত্ত রিযিকের মধ্যে এ নযরানাগুলো নির্দিষ্ট করা হয় এবং মানত মানা হয় তিনি এ নযরানা দেবার ও মানত মানার হুকুম দেননি এবং তিনি এগুলো ব্যবহার করার ওপর এ ধরনের কোন বিধি-নিষেধও আরোপ করেননি। এসব কিছুই এ অহংকারী ও বিদ্রোহী বান্দাদের মনগড়া রচনা।

১১২. হাদীস থেকে জানা যায়, আরববাসীরা কিছু কিছু বিশেষ নযরানা ও মানতের পশুর ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা জায়েয মনে করতো না। এ পশুগুলোর পিঠে চড়ে হজ্জ করাও নিষিদ্ধ ছিল। কারণ হজ্জের জন্য লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা বলতে হতো। অনুরূপভাবে এগুলোর পিঠে সওয়ার হবার সময়, এদের দুধ দোয়ার সময়, যবেহ করার সময় অথবা এদের গোশ্‌ত খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম যাতে উচ্চারিত না হয় তার ব্যবস্থা করা হতো।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ
وَلَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٤١﴾ وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ؕ
كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٤٢﴾

১৭ রুকূ'

তিনি আল্লাহই নানা প্রকার লতাগুল্ম[১১৬] ও বাগান সৃষ্টি করেছেন। খেজুর বীথি সৃষ্টি করেছেন। শস্য উৎপাদন করেছেন, তা থেকে নানা প্রকার খাদ্য সংগৃহিত হয়। যাইতুন ও ডালিম বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন, এদের ফলের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকলেও স্বাদ বিভিন্ন। এগুলোর ফল খাও যখন ফলবান হয় এবং এগুলোর ফসল কাটার সময় আল্লাহর হক আদায় করো আর সীমা অতিক্রম করো না। কারণ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। আবার তিনিই গবাদি পশুর মধ্যে এমন পশুও সৃষ্টি করেছেন, যাদের সাহায্যে যাত্রী ও ভারবহনের কাজ নেয়া হয় এবং যাদেরকে খাদ্য ও বিছানার কাজেও ব্যবহার করা হয়।[১১৭] খাও এ জিনিসগুলো থেকে, যা আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন এবং শয়তানের অনুসরণ করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[১১৮]

১১৩. অর্থাৎ এ নিয়মগুলো আল্লাহ নির্ধারিত নয়। কিন্তু এগুলো আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছেন এ মনে করেই তারা এগুলো মেনে চলছে। কিন্তু এ ধরনের কথা মনে করার স্বপক্ষে তাদের কাছে আল্লাহর হুকুমের কোন প্রমাণ নেই বরং কেবল বাপ-দাদাদের থেকে এমনটি চলে আসছে, এ সনদই আছে তাদের কাছে।

১১৪. মানত ও নযরানার পশুর ব্যাপারে যে মন গড়া বিধান আরববাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তার একটি ধারা এও ছিল যে, এ পশুগুলোর পেট থেকে যেসব বাচ্চা জন্মায় কেবলমাত্র পুরুষরাই তাদের গোশ্ত খেতে পারে। মেয়েদের জন্য তাদের গোশ্ত খাওয়া নাজায়েয। তবে যদি সে বাচ্চা মৃত হয় অথবা মরে যায় তাহলে পুরুষরা ও মেয়েরা সবাই তার গোশ্ত খেতে পারে।

১১৫. অর্থাৎ যদিও এ রীতি-পদ্ধতিগুলো যারা রচনা করেছিল তারা ছিল তোমাদের বাপ-দাদা, তোমাদের ধর্মীয় বুযর্গ, তোমাদের নেতা ও সরদার কিন্তু এ সত্ত্বেও সত্য যা

তা চিরকালই সত্য। তারা তোমাদের পূর্বপুরুষ এবং তোমাদের ধর্মীয় বুযর্গ ছিল বলেই তাদের উদ্ভাবিত ভুল পদ্ধতিগুলো সঠিক ও পবিত্র হয়ে যাবে না। যেসব জালেম সন্তান হত্যার মতো জঘন্য ও নিষ্ঠুর কাজকে রেওয়াজে পরিণত করেছিল, যারা আল্লাহ প্রদত্ত রিযিককে খামখা আল্লাহর বান্দাদের জন্য হারাম করেছিল এবং যারা আল্লাহর দীনের মধ্যে নিজেদের পক্ষ থেকে নতুন নতুন কথা শামিল করে সেগুলোকে আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দিয়েছিল তারা কেমন করে সঠিক পথ পেতে ও সফলকাম হতে পারে? তারা তোমাদের পূর্বপুরুষ ও বুযর্গ হলেও আসলে তারা গোমরাহ ছিল। তাদের অবশ্যি নিজেদের গোমরাহীর অশুভ পরিণতির মুখোমুখি হতেই হবে।

১১৬. আয়াতের মূল শব্দ হচ্ছে جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ । এর অর্থ হচ্ছে দু' ধরনের বাগান। এক ধরনের বাগান হচ্ছে লতানো গাছের, যেগুলো মাচানের ওপর বা কোন কিছুকে আশ্রয় করে বিস্তার লাভ করে। আর দ্বিতীয় ধরনের বাগান হচ্ছে এমন সব গাছের যেগুলো অন্যের সাহায্য ছাড়াই নিজের কাণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। আমাদের ভাষায় বাগান শব্দটি কেবলমাত্র এ দ্বিতীয় ধরনের বাগানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তাই এখানে কেবল جنت غير معروشت এর অনুবাদ করা হয়েছে বাগান। আর جنت معروشت এর অর্থ করা হয়েছে লতাগুল্ম।

১১৭. মূল আয়াতে فرش শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এক ধরনের পশুকে ফরশ বলা হয়েছে। এ অর্থে যে, তারা আকারে ছোট এবং যমীনের সাথে মিশে চলাফেরা করে। অথবা তাদেরকে এ জন্য ফরশ বলা হয়েছে যে, যবেহ করার সময় তাদেরকে যমীনের ওপর শোয়ানো হয়। অথবা তাদের চামড়া ও লোম থেকে ফরশ বা বিছানা বানানো হয় তাই তাদেরকে ফরশ বলা হয়েছে।

১১৮. বক্তব্য বিষয়টির ধারাবাহিক বর্ণনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে জানা যায়, এখানে মহান আল্লাহ তিনটি কথা হৃদয়ংগম করাতে চান। এক, তোমরা এই যে বাগান, ক্ষেত-খামার ও গবাদি পশু লাভ করেছো, এগুলো সবই আল্লাহর দান। এ দানে অন্য কারোর কোন অংশ নেই। তাই এ দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাপারেও কারোর কোন অংশ থাকতে পারে না। দুই, এগুলো যেহেতু আল্লাহর দান তাই এগুলোর ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করতে হবে। এগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিজের পক্ষ থেকে কোন সীমা নির্ধারণ করে দেবার অধিকার কারোর নেই। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নির্ধারিত রীতি ও নিয়মের অনুসরণ করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর সামনে অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে নযরানা পেশ করাই সীমা অতিক্রম করার নামান্তর এবং এটিই শয়তানের অনুসৃতি। তিন, এসব জিনিস আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মানুষের পানাহার ও ব্যবহার করার জন্য। এগুলোকে অযথা নিজের জন্য হারাম করে নেবার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি। নিজেদের আন্দাজ-অনুমান ও কুসংস্কারের ভিত্তিতে লোকেরা আল্লাহর দেয়া রিযিক এবং তাঁর প্রদত্ত বিভিন্ন জিনিসের ব্যবহারের ওপর যেসব বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে সেগুলো সবই আল্লাহর উদ্দেশ্য বিরোধী।

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ
ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۗ
نَبِّئُوْنِيْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٤٣﴾ وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ
الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ
عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۗ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ
فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٤﴾

এ আটটি নর ও মাদী, দু'টি মেষ শ্রেণীর ও দুটি ছাগল শ্রেণীর। হে মুহাম্মাদ! এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আল্লাহ এদের নর দু'টি হারাম করেছেন, না মাদী দু'টি অথবা মেষ ও ছাগলের পেটে যে বাচ্চা আছে সেগুলো? যথার্থ জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাকে জানাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।[১১৯] আর এভাবে দু'টি উট শ্রেণীর ও দুটি গাভী শ্রেণীর মধ্য থেকে। জিজ্ঞেস করো, আল্লাহ এদের নর দু'টি হারাম করেছেন, না মাদী দু'টি, না সেই বাচ্চা যা উটনী ও গাভীর পেটে রয়েছে?[১২০] তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ তোমাদেরকে এদের হারাম হবার হুকুম দিয়েছিলেন? কাজেই তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে যে আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা বলে? তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সঠিক জ্ঞান ছাড়াই মানুষকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করা। নিসন্দেহে আল্লাহ এহেন জালেমদের সত্য–সঠিক পথ দেখাননা।

১১৯. অর্থাৎ আন্দাজ, অনুমান, ধারণা বা পৈত্রিক ঐতিহ্য ও সংস্কার পেশ করো না। বরং যথার্থ ও সুনিশ্চিত তথ্য ও জ্ঞান পেশ করো, যদি তা তোমাদের কাছে থাকে।

১২০. তাদের নিজেদের ধারণা, অনুমান ও কুসংস্কার যাতে তাদের নিজেদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে সে উদ্দেশ্যেই এ প্রশ্নগুলো এমন বিস্তারিতভাবে তাদের কাছে পেশ করা হয়েছে। একই শ্রেণীর পশুর নর হালাল ও মাদী হারাম অথবা মাদী হালাল ও নর হারাম বা পশুটি হালাল কিন্তু তার গর্ভস্থিত বাচ্চাটি হারাম—এগুলো এমন সুস্পষ্ট অযৌক্তিক কথা যে, কোন সুস্থ বিবেক একথা মেনে নিতে অস্বীকার করবে। আল্লাহ কখনো এ ধরনের অর্থহীন বাজে হুকুম দিতে পারেন তা কোন বুদ্ধিমান মানুষ কল্পনাও

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ
يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا
اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ﴿١٤٥﴾ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ
وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ
اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۭ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۡ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿١٤٦﴾

১৮ রুকূ'

হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলে দাও, যে অহী আমার কাছে এসেছে তার মধ্যে তো আমি এমন কিছু পাই না যা খাওয়া কারো ওপর হারাম হতে পারে, তবে মরা, বহমান রক্ত বা শুয়োরের গোশ্‌ত ছাড়া। কারণ তা নাপাক। অথবা যদি অবৈধ হয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে যবেহ করার কারণে।[১২১] তবে অক্ষম অবস্থায় যে ব্যক্তি (তার মধ্য থেকে কোন জিনিস খেয়ে নেবে) নাফরমানীর ইচ্ছা না করে এবং প্রয়োজনের সীমা না পেরিয়ে, সে ক্ষেত্রে অবশ্যি তোমার রব ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। আর যারা ইহুদীবাদ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য নখরধারী প্রাণী হারাম করেছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও, তবে যা তাদের পিঠ, অন্ত্র বা হাড়ের সাথে লেগে থাকে তা ছাড়া। তাদের সীমালংঘনের দরুন তাদেরকে এ শাস্তিটি দিয়েছিলাম।[১২২] আর এই যা কিছু আমি বলছি সবই সত্য।

করতে পারে না। তাছাড়া কুরআন যে পদ্ধতিতে আরববাসীদেরকে তাদের এ সমস্ত ধারণা-কল্পনা ও কুসংস্কারের অযৌক্তিকতা বুঝাবার চেষ্টা করেছে ঠিক সে একই পদ্ধতিতে দুনিয়ার যেসব জাতির মধ্যে পানাহার দ্রব্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে হারাম-হালালের অযৌক্তিক বিধি-নিষেধ এবং অস্পৃশ্যতাবোধ ও ছোঁয়া-ছুঁয়ির নিয়ম প্রচলিত রয়েছে, তাদের সেই সমস্ত কুসংস্কার ও ধারণা-কল্পনার অযৌক্তিকতা সম্পর্কেও তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া যেতে পারে।

১২১. এ বিষয়টি সূরা আল বাকারার ১৭৩ আয়াতে এবং সূরা আল মায়েদাহর ৩ আয়াতে আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে সূরা আন নাহ্‌লের ১১৫ আয়াতেও এ আলোচনা আসবে।

সূরা আল বাকারার আয়াত এবং এ আয়াতটির মধ্যে বাহ্যত কেবলমাত্র এতটুকু বিরোধ দেখা যায় যে, সেখানে শুধু "রক্ত" বলা হয়েছে আর এখানে বলা হয়েছে "বহমান রক্ত"। অর্থাৎ কোন প্রাণীকে জখম বা জবাই করে যে রক্ত বের করা হয়। কিন্তু এটা আসলে কোন বিরোধ নয় বরং ঐ নির্দেশটির ব্যাখ্যা। অনুরূপভাবে সূরা আল মায়েদাহর আয়াতে এ চারটি জিনিস ছাড়াও আরো কয়েকটি জিনিসের হারাম হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ এমনসব প্রাণীকেও সেখানে হারাম গণ্য করা হয়েছে যারা কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে, আঘাত পেয়ে, ওপর থেকে পড়ে অথবা ধাক্কা খেয়ে মরে গেছে। অথবা কোন হিংস্র প্রাণী যাকে চিরে ফেড়ে ফেলেছে। কিন্তু আসলে এটাও কোন বিরোধ নয়। বরং এটাও একটা ব্যাখ্যা। এ থেকে জানা যায়, এভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাণীরাও 'মরা' বলে গণ্য হবে।

মুসলিম ফকীহগণের একটি দলের মতে আহারযোগ্য প্রাণীদের এ চারটি অবস্থায়ই মাত্র হারাম। এ ছাড়া আর সব ধরনের প্রাণী খাওয়া জায়েয। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত আয়েশা (রা)ও এমত পোষণ করতেন। কিন্তু একাধিক হাদীস থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন জিনিস খেতে মানা করেছেন অথবা সেগুলোর প্রতি নিজের ঘৃণা ও অপছন্দের ভাব প্রকাশ করেছেন। যেমন গৃহপালিত গাধা, নখরযুক্ত হিংস্র পশু ও পাঞ্জাধারী পাখি। এ কারণে অধিকাংশ ফকীহ হারামকে এ চারটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁরা এর সীমারেখা আরো বিস্তৃত করেছেন। কিন্তু এর পরও আবার বিভিন্ন জিনিসের হারাম ও হালাল হওয়ার ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে যেমন গৃহপালিত গাধা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈ হারাম গণ্য করেন। কিন্তু অন্যান্য কয়েকজন ফকীহ বলেন, গৃহপালিত গাধা হারাম নয় বরং কোন বিশেষ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সময় এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। হানাফীদের মতে হিংস্র পশু, শিকারী পাখি ও মৃত ভক্ষণকারী প্রাণী একেবারেই হারাম। কিন্তু ইমাম মালেক ও ইমাম আওযাঈর মতে শিকারী পাখি হালাল। ইমাম লাইসের মতে বিড়াল হালাল। ইমাম শাফেঈর মতে একমাত্র মানুষের ওপর আক্রমণকারী হিংস্র পশু যেমন বাঘ, সিংহ, নেকড়ে ইত্যাদি হারাম। ইকরামার মতে কাক ও চিল উভয়ই হালাল। অনুরূপভাবে হানাফীরা সব রকমের পোকামাকড় হারাম গণ্য করে। কিন্তু ইবনে আবী লাইলা, ইমাম মালেক ও আওযাঈর মতে সাপ হালাল।

এসব বিভিন্ন বক্তব্য ও এর পক্ষের বিপক্ষের যুক্তি প্রমাণাদি বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কারভাবে একথা জানা যায় যে, আসলে কুরআনে যে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াতে সে চারটিই চূড়ান্ত ও অকাট্যভাবে হারাম। এ চারটি জিনিস যেখানে নেই সেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের মাকরূহ বা অপছন্দের ভাব রয়েছে। যেগুলোর মাকরূহ হবার বিষয়টি সহী হাদীসের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত সেগুলো হারাম হবার বেশী নিকটবর্তী। আর যেগুলোর ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে তাদের হারাম হবার ব্যাপারটি সন্দেহযুক্ত। তবে রুচিগতভাবে ও স্বভাবগতভাবে কেউ কেউ কোন কোন জিনিস খাওয়া পছন্দ করে না অথবা শ্রেণীগতভাবে কোন কোন শ্রেণীর মানুষ কোন কোন জিনিস অপছন্দ করে বা জাতিগতভাবে কোন কোন জাতি কোন কোন জিনিসকে ঘৃণা

করে,—এসব ক্ষেত্রে আল্লাহর শরীয়াত কাউকে বাধ্য করে না যে, যে জিনিসটি হারাম করা হয়নি প্রয়োজন না হলেও অযথা তা তাকে খেতেই হবে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি নিজের অপছন্দকে আইনে পরিণত করবে এবং সে নিজে যা পছন্দ করে না অন্যেরা তা ব্যবহার করছে বলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবে, এ ধরনের কোন অধিকারও শরীয়াত কাউকে দেয়নি।

১২২. এ বিষয়টি কুরআন মজীদের তিনটি স্থানে বিবৃত হয়েছে। সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে ঃ "এ সমস্ত খাদ্যবস্তু (শরীয়াতে মুহাম্মাদীয়ায় যা হালাল হিসেবে গণ্য) বনী ইসরাঈলদের জন্যও হালাল ছিল। তবে কিছু জিনিস এমন ছিল যেগুলোকে তাওরাত নাযিলের পূর্বে ইসরাঈলীরা নিজেরাই নিজেদের ওপর হারাম করে নিয়েছিল। ওদেরকে বলো, তাওরাত আনো এবং তার কোন উদ্ধৃতি পেশ করো, যদি তোমরা (নিজেদের আপত্তির ব্যাপারে) সত্যবাদী হয়ে থাকো।" (৯৩ আয়াত) সূরা আন নিসায় বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈলদের অপরাধের কারণে "আমি এমন বহু পাক-পবিত্র বস্তু তাদের ওপর হারমা করে দিয়েছি, যা পূর্বে তাদের জন্য হালাল ছিল।" (১৬০ আয়াত) আর এখানে বলা হয়েছে ঃ এদের অবাধ্যতার কারণে আমি সমস্ত নখরধারী প্রাণী এদের জন্য হারাম করে দিয়েছি এবং ছাগল ও গরুর চর্বিও এদের জন্য হারাম গণ্য করেছি। এ তিনটি আয়াত একত্র করলে জানা যায়, শরীয়াতে মুহাম্মাদী ও ইহুদী ফিকাহর মধ্যে আহারযোগ্য প্রাণীদের হালাল ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে দুটি কারণে পার্থক্য দেখা যায়।

এক ঃ তাওরাত নাযিল হবার শত শত বছর আগে ইয়াকুব (ইসরাঈল) আলাইহিস সালাম কোন কোন জিনিসের ব্যবহার ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর পরে তাঁর সন্তানরাও সেগুলো ত্যাগ করেছিল। এমনকি ইহুদী ফকীহগণ এগুলোকে রীতিমত হারাম মনে করতে থাকে এবং এগুলোর হারাম হওয়ার বিষয়টি তাওরাতে লিখে নেয়। উট, খরগোশ ও শাফনও এ হারামের তালিকার অন্তরভুক্ত ছিল। বর্তমান বাইবেলে আমরা তাওরাতের যে অংশটুকু পাই তাতে এ তিনটিরই হারাম হবার বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। (লেবীয় পুস্তক ১১ঃ ৪-৬ এবং দ্বিতীয় বিবরণ ১৪ঃ ৭) কিন্তু কুরআন মজীদে ইহুদীদের যে এ বলে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিল ঃ আনো তাওরাত এবং দেখাও কোথায় এ জিনিসগুলো হারাম বলে লেখা হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, তাওরাতে এ বিধানগুলো বৃদ্ধি করা হয়েছে এ ঘটনার পর। কারণ তখন যদি তাওরাতে এ বিধানগুলো থাকতো, তাহলে বনী ইসরাঈল সংগে সংগেই তাওরাত এনে তা দেখিয়ে দিতো।

দুই ঃ দ্বিতীয় পার্থক্যটি সৃষ্টি হবার কারণ হচ্ছে এই যে, ইহুদীরা যখন আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়াতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো এবং নিজেদের আইন নিজেরাই প্রণয়ন করতে শুরু করলো তখন নিজেদের চুলচেরা আইনগত বিশ্লেষণ ও বাড়াবাড়ির মাধ্যমে তারা অনেক পাক-পবিত্র জিনিসকে নিজেরাই হারাম করে নিয়েছিল এবং এর শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তাদেরকে এ বিভ্রান্তির মধ্যে অবস্থান করতে দিয়েছিলেন। সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে নখরধারী প্রাণী। অর্থাৎ উটপাখি, বক, হাঁস ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, গরু ও ছাগলের চর্বি। এ দু' ধরনের হারামকে বাইবেলে তাওরাতের বিধানের অন্তরভুক্ত করা হয়েছে। (লেবীয় পুস্তক ১১ঃ১৬-১৮, দ্বিতীয় বিবরণ ১৪ঃ১৪-১৫-১৬, লেবীয় পুস্তক ৩ঃ১৭ এবং ৭ঃ২২-২৩) কিন্তু সূরা নিসা থেকে জানা যায়, এ জিনিসগুলো

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ
عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ
مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ
فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾

এখন তারা যদি তোমার কথা না মানে তাহলে তাদেরকে বলে দাও, তোমাদের রবের অনুগ্রহ সর্বব্যাপী এবং অপরাধীদের ওপর থেকে তাঁর আযাব রদ করা যেতে পারে না।[১২৩]

এ মুশরিকরা (তোমাদের এসব কথার জবাবে) নিশ্চয়ই বলবে, "যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে আমরা শিরকও করতাম না, আমাদের বাপ-দাদারাও শিরক করতো না। আর আমরা কোন জিনিসকে হারামও গণ্য করতাম না।"[১২৪] এ ধরনের উদ্ভট কথা তৈরী করে করে এদের পূর্ববর্তী লোকেরাও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, এভাবে তারা অবশেষে আমার আযাবের স্বাদ গ্রহণ করেছে। এদেরকে বলে দাও, "তোমাদের কাছে কোন জ্ঞান আছে কি? থাকলে আমার কাছে পেশ করো। তোমরা তো নিছক অনুমানের ওপর চলছো এবং শুধুমাত্র ধারণা ও আন্দাজ করা ছাড়া তোমাদের কাছে আর কিছুই নেই।" তাহলে বলো, (তোমাদের এ যুক্তির মোকাবিলায়) প্রকৃত সত্যে উপনীত অকাট্য যুক্তি তো আল্লাহর কাছে আছে। অবশ্যি যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে তোমাদের সবাইকে সঠিক পথ দেখাতেন।[১২৫]

তাওরাতে হারাম ছিল না। বরং হযরত ইসা আলাইহিস সালামের পর এগুলো হারাম হয়েছে। ইতিহাসও সাক্ষ দেয়, বর্তমান ইহুদী শরীয়াত লিপিবদ্ধ করার কাজ দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে রাব্বি ইয়াহুদার হাতে সম্পন্ন হয়।

এখন বাকি থাকে এ প্রশ্নটি, তাহলে মহান আল্লাহ এ জিনিসগুলো সম্পর্কে এখানে এবং সূরা নিসায় (আমি হারাম করেছি) শব্দ ব্যবহার করলেন কেন? এর জওয়াব হচ্ছে, আল্লাহ কেবলমাত্র নবী ও কিতাবের মাধ্যমে কোন জিনিস হারাম করেন না। বরং তিনি

কখনো তাঁর বিদ্রোহী বান্দাদের ওপর বানোয়াট বিধান রচয়িতা ও আইন প্রণেতাদের চাপিয়ে দেন এবং তারা পাক-পবিত্র জিনিসগুলো তাদের জন্য হারাম করে দেয়। প্রথম ধরনের হারামটি আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত হিসেবে প্রবর্তিত হয় এবং দ্বিতীয় ধরনের হারামটি প্রবর্তিত হয় তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তি ও লানত হিসেবে।

১২৩. অর্থাৎ এখনো যদি তোমরা নিজেদের নাফরমানীর নীতি ও কার্যক্রম পরিহার করে বন্দেগীর সঠিক দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করো, তাহলে তোমাদের রবের অনুগ্রহের ক্ষেত্র নিজেদের জন্য অনেক বেশী বিস্তৃত পাবে। কিন্তু যদি তোমরা নিজেদের এই অপরাধ বৃত্তি ও বিদ্রোহী মানসিকতার ওপর অবিচল থাকো তাহলে ভালভাবে জেনে রাখো, তাঁর গযব থেকে তোমাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না।

১২৪. অর্থাৎ অপরাধী ও অসৎলোকেরা নিজেদের অপরাধ ও অসৎকাজের স্বপক্ষে হামেশা যে ধরনের ওজর পেশ করে এসেছে তারাও সে একই ওযর পেশ করতে থাকবে। তারা বলবে, আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ চান আমরা শিরক করি এবং যে জিনিসগুলোকে আমরা হারাম করে নিয়েছি সেগুলো আমাদের জন্য হারাম হয়ে যাক। নয়তো আল্লাহ যদি চাইতেন আমরা এমনটি না করি তাহলে এ ধরনের কাজ করা আমাদের পক্ষে কেমন করে সম্ভবপর হতো? যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী আমরা এসব কিছু করছি তাই আমরা ঠিকই করছি। কাজেই এ ব্যাপারে কোন দোষ হয়ে থাকলে সে জন্য আমরা নই, আল্লাহ দায়ী। আর আমরা যা কিছু করছি এমনটি করতে আমরা বাধ্য। কারণ এ ছাড়া অন্য কিছু করা আমাদের সাধ্যের বাইরে।

১২৫. এটি তাদের ওজুহাতের পূর্ণাংগ জওয়াব। এ জওয়াবটি বুঝার জন্য এর যথার্থ বিশ্লেষণ করতে হবে ঃ

এখানে প্রথম কথা বলা হয়েছে, নিজেদের অন্যায় কাজ ও গোমরাহীর জন্য আল্লাহর ইচ্ছাকে ওযর হিসেবে পেশ করা এবং এর বাহানা বানিয়ে সঠিক হেদায়াত ও পথনির্দেশ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানো অপরাধীদের প্রাচীন রীতি হিসেবে চলে আসছে। এর পরিণামে দেখা গেছে অবশেষে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সত্যের বিরুদ্ধে চলার অশুভ পরিণাম তারা স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, তোমরা যে ওযরটি পেশ করছো তার পেছনে প্রকৃত জ্ঞানগত ও তথ্যগত কোন ভিত্তি নেই। বরং আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে তোমরা এটি পেশ করছো। তোমরা নিছক কোথাও আল্লাহর ইচ্ছার কথা শুনতে পেয়েছো তারপর তার ওপর অনুমানের একটি বিরাট ইমারত দাঁড় করিয়ে দিয়েছো। মানুষের ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা কি, একথা বুঝার চেষ্টাই তোমরা করোনি। তোমরা আল্লাহর ইচ্ছা বলতে মনে করছো, চোর যদি আল্লাহর ইচ্ছার আওতাধীনে চুরি করে তাহলে সে অপরাধী নয়। কারণ সে তো আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে চুরি করেছে। অথচ মানুষের ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা হচ্ছে এই যে, সে কৃতজ্ঞতা ও কুফরী, হেদায়াত ও গোমরাহী এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতার মধ্য থেকে যে পথটিই নিজের জন্য নির্বাচিত করবে, আল্লাহ তার জন্য সে পথটিই উন্মুক্ত করে দেবেন। তারপর মানুষ ন্যায়-অন্যায় ও ভুল-নির্ভুল যে কাজটিই করতে চাইবে, আল্লাহ নিজের বিশ্বব্যাপী কার্যক্রমের দৃষ্টিতে যতটুকু সংগত মনে করবেন তাকে সে কাজটি করার অনুমতি ও সুযোগ দান করবেন। কাজেই তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা আল্লাহর ইচ্ছার আওতাধীনে যদি শিরক ও পবিত্র জিনিসগুলোকে হারাম গণ্য

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥٠﴾

এদেরকে বলে দাও, "আনো তোমাদের সাক্ষী, যে এ সাক্ষ দেবে যে, আল্লাহই এ জিনিসগুলো হারাম করেছেন।" তারপর যদি তারা সাক্ষ দিয়ে দেয় তাহলে তুমি তাদের সাথে সাক্ষ দিয়ো না।[১২৬] এবং যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে, যারা আখেরাত অস্বীকারকারী এবং অন্যদেরকে নিজেদের রবের সমকক্ষ দাঁড় করায় কখ্খনো তাদের খেয়াল খুশী অনুযায়ী চলো না।

করার সুযোগ লাভ করে থাকো তাহলে এর অর্থ কখনোই এ নয় যে, তোমরা নিজেদের এসব কাজের জন্য দায়ী নও এবং এ জন্য তোমাদের জওয়াবদিহি করতে হবে না। তোমরা নিজেরাই নিজেদের ভুল পথ নির্বাচন, ভুল সংকল্প গ্রহণ ও ভুল প্রচেষ্টার জন্য দায়ী।

সবশেষে একটি বাক্যের মধ্যে আসল কথাটি বলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ বলা হয়েছে ঃ

قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ

নিজেদের ওযর পেশ করতে গিয়ে তোমরা এ মর্মে যে যুক্তিটির অবতারণা করেছো যে, "আল্লাহ চাইলে আমরা শিরক করতাম না" এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ কথাটি ব্যক্ত হয়নি। সম্পূর্ণ কথাটি বলতে হলে এভাবে বলো ঃ "আল্লাহ চাইলে তোমাদের সবাইকে হেদায়াত দান করতেন।" অন্য কথায় তোমরা নিজেরা নিজেদের নির্বাচনের মাধ্যমে সঠিক পথ গ্রহণ করতে প্রস্তুত নও। বরং তোমরা চাও, আল্লাহ যেভাবে ফেরেশতাদেরকে জন্মগতভাবে সত্যানুসারী বানিয়েছেন সেভাবে তোমাদেরকেও বানাতেন। মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ এ ইচ্ছা করলে অবশ্যি করতে পারতেন। কিন্তু এটি তাঁর ইচ্ছা নয়। কাজেই নিজেদের জন্য তোমরা নিজেরাই যে গোমরাহীটি পছন্দ করে নিয়েছো আল্লাহ তার মধ্যেই তোমাদের ফেলে রাখবেন।

১২৬. অর্থাৎ যদি তারা সাক্ষ দানের দায়িত্ব অনুধাবন করে এবং যে বিষয়ের জ্ঞান মানুষের আছে সে বিষয়ের সাক্ষই তার দেয়া উচিত, এ সম্পর্কে অবহিত থাকে, তাহলে তাদের সমাজে পানাহারের ওপর বিধি-নিষেধের যে মনগড়া নিয়ম-রীতি প্রচলিত রয়েছে, অমুক জিনিসটি অমুক ব্যক্তি খেতে পারবে না এবং অমুক জিনিসটি অমুক ব্যক্তি স্পর্শ করতে পারবে না, এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা যে আল্লাহ কর্তৃক আরোপিত হয়েছে, সেরূপ সাক্ষ দেবার সাহসই কখনো তারা করবে না। কিন্তু যদি তারা সাক্ষ দানের দায়িত্ব অনুধাবন না করেই আল্লাহর নামে মিথ্যা সাক্ষ দেবার মতো নির্লজ্জতার পরিচয় দিতে

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ
نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ
وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

১৯ রুকূ'

হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলো, এসো আমি তোমাদের শুনাই তোমাদের রব তোমাদের ওপর কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন।[১২৭]

(১) তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না[১২৮]

(২) পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।[১২৯]

(৩) দারিদ্রের ভয়ে নিজের সন্তানদেরকে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে জীবিকা দিচ্ছি এবং তাদেরকেও দেবো।

(৪) প্রকাশ্যে বা গোপনে অশ্লীল বিষয়ের ধারে কাছেও যাবে না।[১৩০]

(৫) আল্লাহ যে প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন ন্যায়সংগতভাবে ছাড়া তাকে ধ্বংস করো না।[১৩১]

তিনি তোমাদের এ বিষয়গুলোর নির্দেশ দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা ভেবে-চিন্তে কাজ করবে।

ইতস্তত না করে, তাহলে তাদের এ মিথ্যাচারে তুমি তাদের সহযোগী হয়ো না। কারণ তাদের কাছ থেকে এ সাক্ষ এ জন্য চাওয়া হচ্ছে না যে, তারা যদি এ সাক্ষ দিয়ে দেয়, তাহলে তুমি তাদের কথা মেনে নেবে। বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের মধ্য থেকে যাদের মধ্যে কিছুমাত্র সত্যনিষ্ঠা আছে তাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হবে, সত্যই কি এ নিয়ম-কানুন ও বিধি-নিষেধগুলো আল্লাহ নির্ধারিত কিনা এবং তোমরা কি যথার্থ ঈমানদারীর সাথে এর সত্যতার সাক্ষ দিতে পারো? তখন তারা নিজেদের এ নিয়ম-রীতিগুলোর স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করবে এবং যখন এগুলোর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হবার কোন প্রমাণই পাবে না তখন তারা এ অর্থহীন রীতিনীতি ও নিয়ম-কানুনগুলোর আনুগত্য পরিহার করবে।

১২৭. অর্থাৎ তোমরা যেসব বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আছো সেগুলো তোমাদের রবের পক্ষ থেকে আরোপিত বিধি-নিষেধ নয়। বরং মানুষের জীবনকে সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ করার জন্য আল্লাহ যেসব বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন এবং যেগুলো সর্বকালে ও সর্বদেশে আল্লাহর দেয়া শরীয়াতের মৌল বিষয় হিসেবে পরিচিত হয়ে এসেছে সেগুলোই হচ্ছে আসল বিধি-নিষেধ। (তুলনামূলক আলোচনার জন্য বাইবেলের যাত্রা পুস্তক ২০ অধ্যায় দেখুন)।

১২৮. অর্থাৎ আল্লাহর সত্তায়, তাঁর গুণাবলীতে, তাঁর ক্ষমতা-ইখতিয়ারে বা তাঁর অধিকারে কোন ক্ষেত্রে কাউকে শরীক করো না।

আল্লাহর সত্তায় শরীক করার অর্থ হচ্ছে, ইলাহী সত্তার মৌল উপাদানে কাউকে অংশীদার করা। যেমন খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদের আকীদা, আরব মুশরিকদের ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা গণ্য করা এবং অন্যান্য মুশরিকদের নিজেদের দেবদেবীদেরকে এবং নিজেদের রাজ পরিবারগুলোকে আল্লাহর বংশধর বা দেবজ ব্যক্তিবর্গ হিসেবে গণ্য করা---এসবগুলোই আল্লাহর সত্তায় শরীক করার অন্তরভুক্ত।

আল্লাহর গুণাবলীতে শরীক করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর গুণাবলী আল্লাহর জন্য যে অবস্থায় থাকে ঠিক তেমনি অবস্থায় সেগুলোকে বা তার কোনটিকে অন্য কারোর জন্য নির্ধারিত করা। যেমন কারোর সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করা যে, সমস্ত অদৃশ্য সত্য তার কাছে দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট। অথবা সে সবকিছু দেখে ও সবকিছু শোনে। অথবা সে সবরকমের দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা মুক্ত একটি পবিত্র সত্তা।

ক্ষমতা-ইখতিয়ারের ক্ষেত্রে শিরক করার অর্থ হচ্ছে, সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন ইলাহ হবার কারণে যে সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত সেগুলোকে বা সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটিকে আল্লাহ ছাড়া আর কারোর জন্য স্বীকার করে নেয়া। যেমন অতিপ্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কাউকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করা, কারোর অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণ করা, কাউকে সাহায্য করা, কারোর হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, কারোর প্রার্থনা শোনা, ভাগ্য ভাঙ্গাগড়া করা। এ ছাড়া হারাম-হালাল ও জায়েয-নাজায়েযের সীমানা নির্ধারণ করা এবং মানব জীবনের জন্য আইন-বিধান রচনা করা। এসবই আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতা ও ইখতিয়ার। এর মধ্য থেকে কোন একটিকেও আল্লাহ ছাড়া আর কারোর জন্য স্বীকার করা শিরক।

অধিকারের ক্ষেত্রে শিরক করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ হবার কারণে বান্দাদের ওপর আল্লাহর বিশেষ অধিকার রয়েছে। সে অধিকারসমূহ বা তার মধ্য থেকে কোন একটি অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারোর জন্য মেনে নেয়া। যেমন রুকূ ও সিজদা করা, বুকে হাত বেঁধে বা হাত জোড় করে দাঁড়ানো, সালামী দেয়া ও আস্তানা চুম্বন করা, নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ নযরানা ও কুরবানী পেশ করা, প্রয়োজন পূরণ ও সংকট দূর করার জন্য মানত করা, বিপদ-আপদে সাহায্যের জন্য আহবান করা এবং এভাবে পূজা-অর্চনা, সম্মান ও মর্যাদা দান করার জন্য অন্যান্য যাবতীয় পদ্ধতি একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত অধিকার। অনুরূপভাবে কাউকে এমন প্রিয় জ্ঞান করা যে, তার প্রতি ভালবাসার মোকাবিলায় অন্য সমস্ত ভালবাসাকে উৎসর্গ করে দেয়া হয় এবং কাউকে এমন ভয় করা যে, গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় তার

অসন্তোষকে ভীতির নজরে দেখা—এসবও একমাত্র আল্লাহর অধিকার। আল্লাহর শর্তহীন আনুগত্য করা, তাঁর নির্দেশকে ভুল ও নির্ভুলের মানদণ্ড মনে করা এবং এমন কোন আনুগত্যের শৃংখল নিজের গলায় পরিধান না করা যা আল্লাহর আনুগত্যের শৃংখলমুক্ত একটি স্বতন্ত্র আনুগত্য এবং যার নির্দেশের পেছনে আল্লাহর নির্দেশের সনদ নেই—এসবও আল্লাহর অধিকার। এ অধিকারগুলোর মধ্য থেকে যে কোন একটি অধিকারও কাউকে দেয়া হলে, তাকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট নামগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি নাম না দিলেও তাকে আল্লাহর সাথে শরীক করা হবে।

১২৯. আদব, সম্মান, আনুগত্য, সন্তুষ্টি বিধান, সেবা সবকিছুই সদ্ব্যবহারের অন্তরভুক্ত। কুরআনের সর্বত্র পিতামাতার এ অধিকারকে তাওহীদের বিধানের পরপরই বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহর পর বান্দার অধিকারের দিক দিয়ে মানুষের ওপর তার পিতামাতার অধিকার সর্বাগ্রগণ্য।

১৩০. এখানে আসল শব্দ হচ্ছে فواحش । এ শব্দটি এমন সব কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যেগুলো সুস্পষ্ট খারাপ কাজ হিসেবে পরিচিত। কুরআনে ব্যভিচার, সমকাম (পুরুষ কামিতা), উলংগতা, মিথ্যা দোষারোপ এবং পিতার বিবাহিত স্ত্রীকে বিয়ে করাকে ফাহেশ কাজের অন্তরভুক্ত করা হয়েছে। হাদীসে চুরি ও মদপানের সাথে সাথে ভিক্ষাবৃত্তিকেও ফাহেশ ও অশ্লীল কাজের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য সমস্ত নির্লজ্জতার কাজও ফাহেশের অন্তরভুক্ত। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে, এ ধরনের কাজ প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনভাবেই করা যাবে না।

১৩১. অর্থাৎ মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের প্রাণকে হারাম ও মর্যাদা সম্পন্ন ঘোষণা করা হয়েছে। তাকে ন্যায় ও সত্যের খাতিরে ছাড়া কোনক্রমেই ধ্বংস করা যাবে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ "ন্যায়সংগতভাবে" বা "ন্যায় ও সত্যের খাতিরে" এর অর্থ কি? কুরআনে এর তিনটি পর্যায় বর্ণিত হয়েছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর আরো দু'টি পর্যায় বৃদ্ধি করেছেন। কুরআন বর্ণিত তিনটি পর্যায় হচ্ছে ঃ

(১) যখন এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে জেনে বুঝে হত্যা করার অপরাধ করে এবং হত্যাকারীর ওপর কিসাস বা রক্তপণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

(২) যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর সত্য দীন প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় এবং তার সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

(৩) যখন কোন ব্যক্তি দারুল ইসলামের সীমানার মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে অথবা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার পতন ঘটাবার চেষ্টা করে।

হাদীসে বর্ণিত অন্য পর্যায় দু'টি হচ্ছে ঃ

(৪) কোন ব্যক্তি বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যিনা করলে।

(৫) কোন ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে গেলে এবং মুসলিম সমাজ ত্যাগ করলে। এ পাঁচটি পর্যায় ও অবস্থা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় একজন মানুষ আর একজন মানুষকে হত্যা করতে পারে না। সে মুমিন, যিম্মী বা সাধারণ কাফের যেই হোক না কেন, কোন ক্ষেত্রেই তার রক্ত হালাল নয়।

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ
وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ
وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ۭ
ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٢﴾ وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا
فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ
بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٥٣﴾ ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ
اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاۗءِ رَبِّهِمْ
يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٥٤﴾

(৬) আর তোমরা প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত এতীমের সম্পদের ধারে কাছেও যেয়ো না, তবে উত্তম পদ্ধতিতে যেতে পারো।[১৩২]

(৭) ওজন ও পরিমাপে পুরোপুরি ইনসাফ করো, প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর আমি ততটুকু দায়িত্বের বোঝা রাখি যতটুকু তার সামর্থের মধ্যে রয়েছে।[১৩৩]

(৮) যখন কথা বলো, ন্যায্য কথা বলো, চাই তা তোমার আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারই হোক না কেন।

(৯) আল্লাহর অংগীকার পূর্ণ করো।[১৩৪]

এ বিষয়গুলোর নির্দেশ আল্লাহ তোমাদের দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা নসীহত গ্রহণ করবে।

(১০) এ ছাড়াও তাঁর নির্দেশ হচ্ছে এই ঃ এটিই আমার সোজা পথ। তোমরা এ পথেই চলো এবং অন্য পথে চলো না। কারণ তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে সরিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে।[১৩৫] *এ হেদায়াত তোমাদের রব তোমাদেরকে দিয়েছেন, সম্ভবত 'তোমরা বাঁকা পথ অবলম্বন করা থেকে বাঁচতে পারবে।*

তারপর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, যা সৎকর্মশীল মানুষের প্রতি নিয়ামতের পূর্ণতা এবং প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় জিনিসের বিশদ বিবরণ, সরাসরি পথ নির্দেশ ও রহমত ছিল, (এবং তা এ জন্য বনী ইসরাঈলকে দেয়া হয়েছিল যে,) সম্ভবত লোকেরা নিজেদের রবের সাথে সাক্ষাতের প্রতি ঈমান আনবে।[১৩৬]

১৩২. অর্থাৎ এমন পদ্ধতিতে, যা হবে সর্বাধিক নিঃস্বার্থপরতা, সদুদ্দেশ্য ও এতীমের প্রতি সদিচ্ছা ও কল্যাণকামিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যার বিরুদ্ধে আল্লাহর অসন্তোষ বা মানুষের আপত্তি উত্থাপন করার কোন অবকাশই না থাকে।

১৩৩. এটি যদিও আল্লাহর শরীয়াতের একটি স্থায়ী ও স্বতন্ত্র নীতি তবুও এটি বর্ণনার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজস্ব পরিসরে ওজন-পরিমাপ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে সততা ও ইনসাফের পরিচয় দেবার চেষ্টা করবে সে নিজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কিছু ভুল-চুক বা অজ্ঞাতসারে কমবেশী হয়ে গেলে সে জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে না।

১৩৪. "আল্লাহর অংগীকার" বলতে এমন অংগীকারও বুঝায় যা মানুষ তার সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন ইলাহর তথা আল্লাহর সাথে করে। আবার এমন অংগীকারও বুঝায় যা আল্লাহর নামে বান্দার সাথে করে। একটি মানব শিশু এ আল্লাহর যমীনে মানব সমাজে চোখ মেলে তাকাবার সাথে সাথেই আল্লাহ ও মানুষ এবং মানুষ ও মানুষের মধ্যে স্বতস্ফূর্তভাবে যে অংগীকারের বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাও এ অংগীকারের অন্তরভুক্ত।

প্রথম অংগীকার ও চুক্তি দু'টি হয় সচেতন ও ইচ্ছাকৃত। অন্যদিকে তৃতীয়টি হয় একটি প্রাকৃতিক ও স্বভাবজাত (Natural Contact) অংগীকার ও চুক্তি। এ তৃতীয় চুক্তিটি সম্পাদনে মানুষের ইচ্ছা ও সংকল্পের কোন হাত না থাকলেও পরিপূর্ণ মর্যাদা সম্পন্ন হবার দিক দিয়ে প্রথম দু'টির তুলনায় এটি কোন অংশে খাটো নয়। আল্লাহ মানুষকে যে অস্তিত্ব দান করেছেন, তাকে যে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি দান করেছেন, তাকে দেহের অভ্যন্তরে যে যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা দান করেছেন, যমীনে তার জন্য সৃষ্ট উপায়-উপকরণ ও জীবিকা ব্যবহারের যে ব্যবস্থা করেছেন এবং প্রাকৃতিক বিধি-ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন যাপনের যে সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয় তা থেকে লাভবান হবার যে সুযোগ তাকে দিয়েছেন-এসবগুলোই স্বতস্ফূর্ত ও স্বাভাবিকভাবে তার ওপর আল্লাহর কিছু অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। অনুরূপভাবে মানব শিশুর একটি মানব জননীর পেটে তার রক্তে প্রতিপালিত হওয়া, একটি পিতার পরিশ্রমলব্ধ কুটীরে জন্মগ্রহণ করা এবং একটি সমাজবদ্ধ অংগনে অসংখ্য সংগঠন সংস্থা থেকে বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য-সহায়তা লাভ করার কারণে মর্যাদা ও গুরুত্বের ক্রমানুসারে তার ওপর বহু ব্যক্তি ও সমাজ সংস্থার অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহর সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে মানুষের কৃত এই অংগীকার অবশ্যি কোন কাগজে লিখিত হয়নি ঠিকই কিন্তু এ অংগীকার ও চুক্তির বাণী মানুষের শিরা উপশিরায় ও তার শরীরের প্রতিটি লোমকূপে মোহরাংকিত হয়ে আছে। মানুষ সচেতনভাবে এ চুক্তিবদ্ধ হয়নি ঠিকই কিন্তু তার সমগ্র সত্তা এ চুক্তি ও অংগীকারের ফসল। এ চুক্তি ও অংগীকারের দিকে সূরা বাকারার ২৭ আয়াতে ইংগিত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ফাসেক হচ্ছে তারা যারা "আল্লাহর সাথে অংগীকার করার পর তা ভেঙে ফেলে, আল্লাহ যাকে সংযুক্ত করার হুকুম দিয়েছেন তাকে কেটে ফেলে এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে।" পরবর্তী পর্যায়ে সূরা আ'রাফের ১৭২ আয়াতেও এরি উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, সৃষ্টির আদি পর্বে আল্লাহ আদমের পিঠ থেকে তার সন্তানদের বের করে তাদেরকে এ মর্মে সাক্ষ দিতে বলেছিলেন—আমি কি তোমাদের রব নই? এর জবাবে তারা স্বীকৃতি দিয়ে বলেছিল, হাঁ আমরা এর সাক্ষী।

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٥٥﴾ اَنْ
تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۪ وَاِنْ كُنَّا
عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿١٥٦﴾ اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ
لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ
فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۭ سَنَجْزِي الَّذِيْنَ
يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ﴿١٥٧﴾

২০ রুকূ'

আর এভাবেই এ কিতাব আমি নাযিল করেছি একটি বরকতপূর্ণ কিতাব হিসেবে। কাজেই তোমরা এর অনুসরণ করো এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করো, হয়তো তোমাদের প্রতি রহম করা হবে। এখন তোমরা আর একথা বলতে পারো না যে, কিতাব তো দেয়া হয়েছিল আমাদের পূর্বের দু'টি দলকে[১৩৭] এবং তারা কি পড়তো পড়াতো তাতো আমরা কিছুই জানি না। আর এখন তোমরা এ ওজুহাতও দিতে পারো না যে, যদি আমাদের ওপর কিতাব নাযিল করা হতো তাহলে আমরা তাদের চাইতে বেশী সত্য পথানুসারী প্রমাণিত হতাম। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ, পথনির্দেশ ও রহমত এসে গেছে। এখন তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে, যে আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলে এবং তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়?[১৩৮] যারা আমার আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের এ সত্য বিমুখতার কারণে তাদেরকে আমি নিকৃষ্টতম শাস্তি দেবো।

১৩৫. যে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক অংগীকারের কথা উল্লেখিত হয়েছে তার অনিবার্য দাবী হচ্ছে এই যে, মানুষ তার রবের দেখানো পথে চলবে। কারণ তার রবের নির্দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং আত্মম্ভরিতা, স্বেচ্ছাচার ও অন্যের দাসত্বের পথে পা বাড়ানো মানুষের পক্ষ থেকে সে অংগীকারের প্রাথমিক বিরুদ্ধাচরণ হিসেবে পরিগণিত হবে। এরপর প্রতি পদক্ষেপে তার ধারাগুলো লংঘিত হতে থাকবে। এ ছাড়াও মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ প্রদত্ত পথনির্দেশ গ্রহণ করে তাঁর দেখানো পথে জীবন যাপন করে না ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে এ অত্যন্ত নাজুক, ব্যাপক ও জটিল দায়িত্ব পালন করা কোনক্রমেই সম্ভবপর হয় না। আল্লাহ প্রদত্ত এ পথনির্দেশ গ্রহণ না করার ফলে মানুষকে

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ
اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ
نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا
خَيْرًا ؕ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٥٨﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ
وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ؕ اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ
يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿١٥٩﴾

লোকেরা কি এখন এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, তাদের সামনে ফেরেশতারা এসে দাঁড়াবে অথবা তোমার রব নিজেই এসে যাবেন বা তোমার রবের কোন কোন সুস্পষ্ট নিশানী প্রকাশিত হবে?[১৩৯] যে দিন তোমার রবের বিশেষ কোন কোন নিশানী প্রকাশিত হয়ে যাবে তখন এমন কোন ব্যক্তির ঈমান কোন কাজে লাগবে না যে প্রথমে ঈমান আনেনি অথবা যে তার ঈমানের সাহায্যে কোন কল্যাণ অর্জন করতে পারেনি।[১৪০] হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলে দাও, তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও অপেক্ষা করছি।

যারা নিজেদের দীনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে নিসন্দেহে তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।[১৪১] তাদের ব্যাপারটি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত রয়েছে। তারা কি করেছে, সে কথা তিনিই তাদেরকে জানাবেন।

দু'টি বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এক, অন্য পথ অবলম্বন করার কারণে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র পথ থেকে মানুষ অনিবার্যভাবে সরে যায়। দুই, এ সঠিক পথ থেকে সরে যাওয়ার সাথে সাথেই অসংখ্য সরু সরু পথ সামনে এসে যায়। এ পথগুলোয় চলতে গিয়ে দিকভ্রান্ত হয়ে সমগ্র মানব সমাজ বিক্ষিপ্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মানব সমাজের এ বিপর্যয় ও বিক্ষিপ্ততা তার উন্নতি ও পূর্ণতা প্রাপ্তির সুখ স্বপ্নকে চিরতরে ধূলিস্মাত করে দেয়। এ দু'টি ক্ষতিকে এখানে নিম্নোক্ত বাক্যের মধ্যে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ "অন্য পথে চলো না, কারণ তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে সরিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে।" (সূরা আল মায়েদাহর ৩৫ টীকাটিও দেখুন)।

১৩৬. রবের সাথে সাক্ষাতের প্রতি ঈমান আনার অর্থ নিজেকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করা এবং দায়িত্বপূর্ণ জীবন যাপন করা। এখানে এ

বক্তব্যের দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, এ কিতাবের জ্ঞানগর্ভ শিক্ষার ফলে বনী ইসরাঈলদের মধ্যে দায়িত্বের অনুভূতি জেগে উঠবে। দুই, সাধারণ মানুষ এ উন্নত জীবন বিধান অধ্যয়ন করে এবং সৎকর্মশীল লোকদের মধ্যে এ হেদায়াত ও রহমতের প্রভাব লক্ষ করে একথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, আখেরাত অস্বীকৃতির ভিত্তিতে সৃষ্ট দায়িত্বহীন জীবনের মোকাবিলায় আখেরাত স্বীকৃতির ভিত্তিতে পরিচালিত দায়িত্বপূর্ণ জীবন যাপন সব দিক দিয়েই উত্তম। আর এভাবে এ পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়ন তাকে কুফরী থেকে ঈমানের দিকে টেনে আনবে।

১৩৭. অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে।

১৩৮. আল্লাহর আয়াত বলতে কুরআনের আকারে মানুষের সামনে যে বাণী পেশ করা হচ্ছিল তাও বুঝাবে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিলেন তাদের পাক-পাবিত্র জীবনে যেসব নিশানী সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল সেগুলোও বুঝাবে আবার কুরআন তার দাওয়াতের সমর্থনে বিশ্ব-জাহানের যে নিদর্শনগুলো পেশ করছিল সেগুলোও বুঝাবে।

১৩৯. অর্থাৎ কিয়ামতের নিশানী বা আযাব অথবা এমন কোন নিশানী যা প্রকৃত সত্যের ওপর থেকে পুরোপুরি পর্দা উঠিয়ে নেয় এবং যার আত্মপ্রকাশের ফলে পরীক্ষার আর কোন প্রয়োজন থাকে না।

১৪০. অর্থাৎ এ ধরনের নিশানী দেখে নেবার পর যদি কোন কাফের তার কুফরী থেকে তাওবা করে ঈমানের দিকে চলে আসে তাহলে তার এ ঈমান আনাটা হবে অর্থহীন। অনুরূপভাবে এ অবস্থায় কোন নাফরমান মুমিন যদি তার নাফরমানীর কার্যক্রম পরিহার করে অনুগত মুমিনের জীবন যাপন করতে শুরু করে দেয় তাহলে তাও হবে সমান অর্থহীন। কারণ প্রকৃত সত্য যতক্ষণ পর্দান্তরালে রয়েছে ততক্ষণই থাকছে ঈমান ও আনুগত্যের মূল্য ও মর্যাদা। এখানে অবকাশের সুযোগ অনেক দীর্ঘ ও বিস্তৃত দেখা যাচ্ছে এবং দুনিয়া তার আত্মম্ভরিতা ও প্রবঞ্চনার সমস্ত উপকরণ সহকারে প্রতারণা করার জন্য এগিয়ে আসছে। সে তার প্রতারণা জাল বিস্তার করে ঘোষণা করছে ঃ কিসের আল্লাহ খোদা? কোথায় আখেরাত? এসব মিথ্যা। আসলে দুনিয়ায় যে ক'দিন আছো, খাও দাও, ফূর্তি করো।

১৪১. এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহর সত্যদীনের সকল অনুসারীকে সম্বোধন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বক্তব্যের সার নির্যাস হচ্ছে ঃ এক আল্লাহকে ইলাহ ও রব বলে মেনে নাও। আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা-ইখতিয়ার ও অধিকারে কাউকে শরীক করো না। আল্লাহর সামনে নিজেকে জবাবদিহি করতে হবে মনে করে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনো। আল্লাহ তাঁর রসূলদের ও কিতাবসমূহের মাধ্যমে যে ব্যাপক মূলনীতি ও মৌল বিষয়ের শিক্ষা দিয়েছেন সে অনুযায়ী জীবন যাপন করো। এগুলোই চিরকাল আসল দীন হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে এবং এখনো যথার্থ দীন বলতে এগুলোকেই বুঝায়। জন্মের প্রথম দিন থেকে প্রত্যেক মানুষকে এ দীনই দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন যুগের লোকেরা তাদের নিজস্ব চিন্তা ও মানসিকতার ভ্রান্ত উদ্ভাবনী ক্ষমতার সাহায্যে অথবা নিজেদের প্রবৃত্তি ও লালসার মাত্রাতিরিক্ত প্রভাবে বা

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى
اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦٠﴾ قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰىنِىْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِ
كِيْنَ ﴿١٦١﴾ قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ
رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ
الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٦٣﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে হাযির হবে সৎকাজ নিয়ে তার জন্য রয়েছে দশগুণ প্রতিফল আর যে ব্যক্তি অসৎকাজ নিয়ে আসবে সে ততটুকুই প্রতিফল পাবে যতটুকু অপরাধ সে করেছে এবং কারোর ওপর জুলুম করা হবে না।

হে মুহাম্মাদ! বলো, আমার রব নিশ্চিতভাবেই আমাকে সোজা পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। একদম সঠিক নির্ভুল দীন, যার মধ্যে কোন বক্রতা নেই, ইবরাহীমের পদ্ধতি,[১৪২] যাকে সে একাগ্রচিত্তে একমুখী হয়ে গ্রহণ করেছিল এবং সে মুশরিকদের অন্তরভুক্ত ছিল না। বলো, আমার নামায, আমার ইবাদাতের সমস্ত অনুষ্ঠান,[১৪৩] আমার জীবন ও মৃত্যু সবকিছু আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য, যার কোন শরীক নেই। এরি নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে এবং সবার আগে আমিই আনুগত্যের শির নতকারী।

ভক্তির আতিশয্যে এ আসল দীনকে বিকৃত করে বিভিন্ন প্রকার ধর্মের সৃষ্টি করেছে। এ দীনের মধ্যে তারা নতুন নতুন কথা মিশিয়ে দিয়েছে। নিজেদের কুসংস্কার, কল্পনা, বিলাসিতা, আন্দাজ-অনুমান ও নিজেদের দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার ছাঁচে ফেলে তার আকীদা বিশ্বাসে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে এবং কাটাই ছাঁটাই এর মাধ্যমে তাকে পুরোপুরি বিকৃত করে দিয়েছে। অনেক নতুন বিষয় উদ্ভাবন করে তার বিধানসমূহের সাথে জুড়ে দিয়েছে। মনগড়া আইন রচনা করেছে। আইনের খুটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে অযথা চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছে। ছোটখাটো বিষয়গুলো নিয়ে মতবিরোধ করার ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেছে। গুরুত্বপূর্ণকে গুরুত্বহীন ও গুরুত্বহীনকে গুরুত্বপূর্ণ বানিয়ে দিয়েছে। যেসব নবী-রসূল এ দীন প্রচার করেছেন এবং যেসব মহান মনীষী ও বুযর্গ এ দীনের প্রতিষ্ঠায় জীবনপাত করে গেছেন তাদের কারোর কারোর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশের ক্ষেত্রে অত্যধিক বাড়াবাড়ি করেছে আবার কারোর কারোর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ
نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾ وَهُوَ الَّذِي
جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

বল, আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন রবের সন্ধান করবো অথচ তিনিই সকল কিছুর মালিক?[১৪৪] প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু উপার্জন করে সে জন্য সে নিজে দায়ী, কেউ কারো বোঝা বহন করবে না।[১৪৫] তারপর তোমাদের সবাইকে তোমাদের রবের দিকে ফিরে যেতে হবে। সে সময় তোমাদের মতবিরোধের প্রকৃত স্বরূপ তিনি তোমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেবেন। তিনিই তোমাদের করেছেন দুনিয়ার প্রতিনিধি এবং যা কিছু তোমাদের দিয়েছেন তাতে তোমাদের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কাউকে অন্যের ওপর অধিক উন্নত মর্যাদা দান করেছেন।[১৪৬] নিসন্দেহে তোমার রব শাস্তি দেবার ব্যাপারে অতি তৎপর এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

প্রকাশ ঘটিয়েছে এবং তাদের বিরোধিতা করেছে। এভাবে অসংখ্য ধর্ম ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে চলেছে। এদের প্রত্যেকটি ধর্ম ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব মানব সমাজকে কলহ, বিবাদ ও পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত করেছে। এভাবে মানব সমাজ দ্বন্দ্বমুখর দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে চলেছে। কাজেই বর্তমানে যে ব্যক্তিই আসল দীনের অনুসারী হবে, তার জন্য এসব বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় ও দলাদলি থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া এবং তাদের থেকে নিজেদের পথকে আলাদা করে নেয়াই হবে অপরিহার্য।

১৪২. "ইবরাহীমের পদ্ধতি" বলে এ পথকে চিহ্নিত করার জন্য তার আর একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। একে মূসার পদ্ধতি বা ঈসার পদ্ধতিও বলা যেতো। কিন্তু লোকেরা ইহুদীবাদকে হযরত মূসার এবং খৃষ্টবাদকে হযরত ঈসার আনিত বিধান বলে আখ্যায়িত করে রেখেছে। তাই বলা হয়েছে, "ইবরাহীমের পদ্ধতি"। ইহুদী ও খৃষ্টান উভয় দলই হযরত ইবরাহীমকে সত্যানুসারী বলে স্বীকার করে এবং তারা উভয়ে একথাও জানে যে, ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদের উদ্ভবের অনেক আগেই হযরত ইবরাহীমের যুগ শেষ হয়েছিল।

তাছাড়া আরবের মুশরিকরাও তাঁকে সত্যপন্থী বলে স্বীকার করতো এবং নিজেদের সকল প্রকার অজ্ঞতা সত্ত্বেও তারা অন্ততপক্ষে এতটুকু স্বীকার করতো যে, কাবাঘরের ভিত্তি স্থাপনকারী পাক-পবিত্র ব্যক্তি মূর্তি পূজারী ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক আল্লাহর অনুগত বান্দা।

১৪৩. এখানে যে মূল শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেটি হচ্ছে نسك । এর অর্থ কুরবানীও হয়। আর ব্যাপক ও সাধারণভাবে এটিকে বন্দেগী ও পূজা-অর্চনার অন্যান্য বিভিন্ন অবস্থার জন্যও ব্যবহার করা হয়।

১৪৪. অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের সমস্ত জিনিসের রব হচ্ছে আল্লাহ, কাজেই অন্য কেউ কেমন করে আমার রব হতে পারে? সমস্ত বিশ্ব-জাহান আল্লাহর আনুগত্য ব্যবস্থার অধীনে সচল রয়েছে এবং বিশ্ব-জাহানের একটি অংশ হিসেবে আমার নিজের অস্তিত্বও সে পথের অনুসারী। কিন্তু নিজের চেতনাসঞ্জাত ও নিজস্ব ক্ষমতা ইখতিয়ারের আওতাধীন জীবনের জন্য আমি অন্য কোন রবের সন্ধান করবো, এটা কেমন করে যুক্তিসংগত হতে পারে? সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক অবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করে আমি একাই কি অন্যদিকে চলতে থাকবো?

১৪৫. অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই নিজের কাজের জন্য দায়ী। একজনের কাজের দায়-দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপবে না।

১৪৬. এ বাক্যটির মধ্যে তিনটি সত্য বিবৃত হয়েছে ঃ এক, সমস্ত মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। এ অর্থে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিলোকের বহু জিনিস মানুষের কাছে আমানত রেখেছেন এবং তা ব্যবহার করার স্বাধীন ক্ষমতা তাকে দান করেছেন।

দুই, আল্লাহ নিজেই এ প্রতিনিধিদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। কারোর আমানতের গণ্ডী ব্যাপক আবার কারোর সীমাবদ্ধ। কাউকে বেশী জিনিস ব্যবহারের ক্ষমতা দিয়েছেন, কাউকে দিয়েছেন কম। কাউকে বেশী কর্মক্ষমতা দিয়েছেন, কাউকে কম। আবার কোন কোন মানুষকে কোন কোন মানুষের কাছে আমানত রেখেছেন।

তিন, এ সবকিছুই আসলে পরীক্ষার বিষয়বস্তু। সারা জীবনটাই একটি পরীক্ষা ক্ষেত্র। আল্লাহ যাকে যা কিছুই দিয়েছেন তার মধ্যেই তার পরীক্ষা। সে কিভাবে আল্লাহর আমানত ব্যবহার করলো? আমানতের দায়িত্ব কতটুকু অনুধাবন করলো এবং তার হক আদায় করলো? কতটুকু নিজের যোগ্যতা বা অযোগ্যতার স্বাক্ষর রাখলো? এ পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর করে জীবনের অন্যান্য পর্যায়ে মানুষের মর্যাদা নির্ধারণ।

আল আ'রাফ

৭

নামকরণ

এ সূরার ৪৬ ও ৪৭নং আয়াতে (পঞ্চম রুকূ'তে) "আসহাবে আ'রাফ" বা আরাফবাসীদের উল্লেখ করা হয়েছে। সেই জন্য এর নামকরণ করা হয়েছে "আল আ'রাফ"। অন্য কথায় বলা যায়, এ সূরাকে সূরা আরাফ বলার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, যে সূরার মধ্যে আ'রাফের কথা বলা হয়েছে, এটা সেই সূরা।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরার আলোচ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয় যে, এ সূরাটি সূরা আন'আমের প্রায় সমসময়ে নাযিল হয়। অবশ্য এটি আগে না আন'আম আগে নাযিল হয় তা নিশ্চয়তার সাথে চিহ্নিত করা যাবে না। তবে এ সূরায় প্রদত্ত ভাষণের বাচনভংগী থেকে এটি যে ঐ সময়ের সাথে সম্পর্কিত তা পরিষ্কার বুঝা যায়। কাজেই এর ঐতিহাসিক পটভূমি অনুধাবন করার জন্য সূরা আন'আমের শুরুতে যে ভূমিকা লেখা হয়েছে তার ওপর একবার নজর বুলিয়ে নেয়া যথেষ্ট হবে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার ভাষণের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হচ্ছে রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত। আল্লাহ প্রেরিত রসূলের আনুগত্য করার জন্য শ্রোতাদেরকে উদ্বুদ্ধ করাই এর সমগ্র আলোচনার মৌল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কিন্তু এ দাওয়াতে সতর্ক করার ও ভয় দেখানোর ভাবধারাই ফুটে উঠেছে বেশী করে। কারণ এখানে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে (অর্থাৎ মক্কাবাসী) তাদেরকে বুঝাতে বুঝাতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। তাদের স্থূল শ্রবণ ও অনুধাবন শক্তি, হঠকারিতা, গোয়ার্তুমী ও একগুঁয়ে মনোভাব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। যার ফলে রসূলের প্রতি তাদেরকে সম্বোধন করা বন্ধ করে দিয়ে অন্যদেরকে সম্বোধন করার হুকুম অচিরেই নাযিল হতে যাচ্ছিল। তাই বুঝাবার ভংগীতে নবুওয়াত ও রিসালাতের দাওয়াত পেশ করার সাথে সাথে তাদেরকে একথাও জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, নবীর মোকাবিলায় তোমরা যে কর্মনীতি অবলম্বন করেছো তোমাদের আগের বিভিন্ন মানব সম্প্রদায়ও নিজেদের নবীদের সাথে অনুরূপ আচরণ অবলম্বন করে অত্যন্ত মারাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল। তারপর বর্তমানে যেহেতু তাদেরকে যুক্তি প্রমাণ সহকারে দাওয়াত দেবার প্রচেষ্টা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হতে চলেছে। তাই ভাষণের শেষ অংশে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আহলি কিতাবদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

আর এক জায়গায় সারা দুনিয়ার মানুষকে সাধারণভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। এ থেকে এরূপ আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে, এখন হিজরত নিকটবর্তী এবং নবীর জন্য তার নিকটতর লোকদেরকে সম্বোধন করার যুগ শেষ হয়ে আসছে।

এ ভাষণের এক পর্যায়ে ইহুদিদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে। তাই এই সাথে রিসালাত ও নবুওয়াতের দাওয়াতের আর একটি দিকও সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। নবীর প্রতি ঈমান আনার পর তাঁর সাথে মুনাফিকী নীতি অবলম্বন করার, আনুগত্য ও অনুসৃতির অংগীকার করার পর তা ভংগ করার এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে যাওয়ার পর মিথ্যার প্রতি সাহায্য সহযোগিতা দানের কাজে আপাদমস্তক ডুবে থাকার পরিণাম কি, তাও এতে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

সূরার শেষের দিকে ইসলাম প্রচারের কৌশল সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদেরকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিরুদ্ধবাদীদের উত্তেজনা সৃষ্টি এবং নিপীড়ন ও দমনমূলক কার্যকলাপের মোকাবিলায় ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন এবং আবেগ–উত্তেজনার বশে মূল উদ্দেশ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করার জন্য তাদেরকে বিশেষভাবে উপদেশ দেয়া হয়েছে।

আয়াত ২০৬ | সূরা আল আ'রাফ–মক্কী | রুকূ' ২৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও মেহেরবান আল্লাহর নামে

الٓمٓصٓ ① كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ
بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ② اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا
مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ③ وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا
بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ④ فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ
اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ⑤

আলিফ, লাম, মীম, সোয়াদ। এটি তোমার প্রতি নাযিল করা একটি কিতাব।[১] কাজেই তোমার মনে যেন এর সম্পর্কে কোন সংকোচ না থাকে।[২] এটি নাযিল করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এর মাধ্যমে তুমি (অস্বীকারকারীদেরকে) ভয় দেখাবে এবং মুমিনদের জন্য এটি হবে একটি স্মারক।[৩]

হে মানব সমাজ! তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর যাকিছু নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরণ করো এবং নিজেদের রবকে বাদ দিয়ে অন্য অভিভাবকদের অনুসরণ করো না।[৪] কিন্তু তোমরা খুব কমই উপদেশ মেনে থাকো।

কত জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের ওপর আমার আযাব অকস্মাত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রাতের বেলা অথবা দিনের বেলা যখন তারা বিশ্রামরত ছিল। আর যখন আমার আযাব তাদের ওপর আপতিত হয়েছিল তখন তাদের মুখে এ ছাড়া আর কোন কথাই ছিল না যে, "সত্যিই আমরা জালেম ছিলাম।"[৫]

১. কিতাব বলতে এখানে এই সূরা আ'রাফকেই বুঝানো হয়েছে।

২. অর্থাৎ কোন প্রকার সংকোচ, ইতস্ততভাব ও ভীতি ছাড়াই একে মানুষের কাছে পৌছিয়ে দাও। বিরুদ্ধবাদীরা একে কিভাবে গ্রহণ করবে তার কোন পরোয়া করবে না।

তারা ক্ষেপে যায় যাক, বিদ্রূপ করে করুক, নানান আজেবাজে কথা বলে বলুক এবং তাদের শত্রুতা আরো বেড়ে যায় যাক। তোমরা নিশ্চিন্তে ও নিসংকোচে তাদের কাছে এ পয়গাম পৌঁছিয়ে দাও। এর প্রচারে একটুও গড়িমসি করো না।

এখানে যে অর্থে আমরা সংকোচ শব্দটি ব্যবহার করেছি, মূল ইবারতে তার জন্য حرج শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'হারজ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, এমন একটি ঘন ঝোপঝাড়, যার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলা কঠিন। মনে 'হারজ' হবার মানে হচ্ছে এই যে, বিরোধিতা ও বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে নিজের পথ পরিষ্কার না দেখে মানুষের মন সামনে এগিয়ে চলতে পারে না, থেমে যায়। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়বস্তুকে ضيق صدر শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ

"হে মুহাম্মাদ! আমি জানি এরা যেসব কথা বলে বেড়াচ্ছে তাতে তোমার মন সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে।" অর্থাৎ যারা জিদ, হঠকারিতা ও সত্য বিরোধিতায় এ পর্যায়ে নেমে এসেছে যে, তাদেরকে কিভাবে সোজা পথে আনা যাবে, এ চিন্তায় তুমি পেরেশান হয়ে পড়েছো। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَاءَ مَعَهٗ مَلَكٌ (هود : ١٢)

"এমন যেন না হয় যে, তোমার দাওয়াতের জবাবে তারা তোমার কাছে কোন ধনভাণ্ডার অবতীর্ণ হয়নি কেন? তোমার সাথে কোন ফেরেশতা আসেনি কেন? একথা বলবে ভেবে তুমি তোমার প্রতি নাযিল করা কোন কোন অহী প্রচার করা বাদ দিয়ে দেবে এবং বিব্রত বোধ করবে।"

৩. এর অর্থ হচ্ছে, এ সূরার আসল উদ্দেশ্য তো ভয় দেখানো। অর্থাৎ রসূলের দাওয়াত গ্রহণ না করার পরিণাম সম্পর্কে লোকদেরকে সতর্ক করা ও ভয় দেখানো এবং গাফেলদেরকে সজাগ করা। তবে এটি যে মুমিনদের জন্য স্মারকও, (অর্থাৎ তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়) সেটি এর একটি আনুসঙ্গিক লাভ, ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে এটি আপনা আপনিই অর্জিত হয়ে যায়।

৪. এটি হচ্ছে এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। এ ভাষণটিতে যে আসল দাওয়াত দেয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে ঃ দুনিয়ায় মানুষের জীবন যাপনের জন্য যে হেদায়াত ও পথ-নির্দেশনার প্রয়োজন, নিজের ও বিশ্বজাহানের স্বরূপ এবং নিজের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুধাবন করার জন্য তার যে জ্ঞানের প্রয়োজন এবং নিজের আচার-আচরণ, চরিত্র-নৈতিকতা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ধারাকে সঠিক ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সে যেসব মূলনীতির মুখাপেক্ষী সেগুলোর জন্য তাকে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনকেই নিজের পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নিতে হবে এবং আল্লাহ তাঁর রসূলদের মাধ্যমে যে হেদায়াত ও পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন একমাত্র তারই অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারোর দিকে পথ-নির্দেশনা লাভ করার

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٦ فَلَنَقُصَّنَّ
عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَائِبِيْنَ ۝٧ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ
مَوَازِيْنُهٗ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٨ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَأُولٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ۝٩ وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ
فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝١٠

কাজেই যাদের কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি তাদেরকে অবশ্যি জিজ্ঞাসাবাদ করবো[৬] এবং রসূলদেরকেও জিজ্ঞেস করবো (তারা পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্ব কতটুকু সম্পাদন করেছে এবং এর কি জবাব পেয়েছে)।[৭] তারপর আমি নিজেই পূর্ণ জ্ঞান সহকারে সমুদয় কার্যবিবরণী তাদের সামনে পেশ করবো। আমি তো আর সেখানে অনুপস্থিত ছিলাম না! আর ওজন হবে সেদিন যথার্থ সত্য।[৮] যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে তারা নিজেরাই হবে নিজেদের ক্ষতি সাধনকারী।[৯] কারণ তারা আমার আয়াতের সাথে জালেম সুলভ আচরণ চালিয়ে গিয়েছিল।

তোমাদেরকে আমি ক্ষমতা-ইখতিয়ার সহকারে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্য এখানে জীবন ধারণের উপকরণ সরবরাহ করেছি। কিন্তু তোমরা খুব কমই শোকর গুজারী করে থাকো।

জন্য মুখ ফিরানো এবং তার নেতৃত্বের আওতায় নিজেকে সমর্পণ করা মানুষের একটি মৌলিক ভ্রান্ত কর্মপদ্ধতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এর পরিণামে মানুষকে সব সময় ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তাকে সবসময় এই একই পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে।

এখানে "আউলিয়া" (অভিভাবকগণ) শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে, মানুষ সাধারণত যার নির্দেশে ও নেতৃত্বে চলে তাকে আসলে নিজের 'ওলি' তথা অভিভাবকে পরিণত করে। মুখে সে তার প্রশংসা করতে পারে বা তার প্রতি অভিশাপও বর্ষণ করতে পারে, আবার তার অভিভাবকত্বের স্বীকৃতি দিতে পারে বা কঠোরভাবে তা অস্বীকারও করতে পারে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন আশ্‌শূরা, টীকা নং ৬)।

৫. অর্থাৎ তোমাদের শিক্ষার জন্য এমন সব জাতির দৃষ্টান্ত রয়েছে যারা আল্লাহর হেদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মানুষ ও শয়তানের নেতৃত্বে জীবন পথে এগিয়ে

চলেছে। অবশেষে তারা এমনভাবে বিপথগামী ও বিকারগ্রস্ত হয়ে গেছে যার ফলে পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্ব এক দুঃসহ অভিশাপে পরিণত হয়েছে এবং আল্লাহর আযাব এসে তাদের নাপাক অস্তিত্ব থেকে দুনিয়াকে মুক্ত করেছে।

শেষ বাক্যটির উদ্দেশ্য দু'টি বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া ঃ এক, সংশোধনের সময় অতিক্রান্ত হবার পর কারোর সচেতন হওয়া এবং নিজের ভুল স্বীকার করা অর্থহীন। যে ব্যক্তি ও জাতি গাফিলতিতে লিপ্ত ও ভোগের নেশায় মত্ত হয়ে স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে আল্লাহর দেয়া অবকাশ ও সুযোগ হারিয়ে বসে, সত্যের আহবায়কদের আওয়াজ যাদের অসচেতন কানের পর্দায় একটুও সাড়া জাগায় না এবং আল্লাহর হাত মজবুতভাবে পাকড়াও করার পরই যারা সচেতন হয় তাদের চাইতে বড় নাদান ও মূর্খ আর কেউ নেই। দুই, ব্যক্তি ও জাতিদের জীবনের দু'-একটি নয়, অসংখ্য দৃষ্টান্ত তোমাদের সামনে এসে গেছে। কারোর অসৎ কর্মের পেয়ালা যখন পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং তার অবকাশের সীমা শেষ হয়ে যায় তখন অকস্মাৎ এক সময় আল্লাহ তাকে পাকড়াও করেন। আর আল্লাহ একবার কাউকে পাকড়াও করার পর আর তার মুক্তি লাভের কোন পথই থাকে না। তাছাড়া মানব জাতির ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা এক দু'-বার নয়, শত শত বার, হাজার হাজার বার ঘটে গেছে। এ ক্ষেত্রে মানুষের জন্য বারবার সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করার যৌক্তিকতা কোথায়? সচেতন হবার জন্য সে কেনই বা সেই শেষ মুহূর্তেরই অপেক্ষা করতে থাকবে যখন কেবলমাত্র আক্ষেপ করা ও মর্মজ্বালা ভোগ করা ছাড়া সচেতন হবার আর কোন স্বার্থকতাই থাকে না।

৬. এখানে জিজ্ঞাসাবাদ বলতে কিয়ামতের হিসেব-নিকেশ বুঝানো হয়েছে। অসৎ ব্যক্তি ও জাতিদের ওপর দুনিয়ায় যেসব আযাব আসে সেগুলো আসলে তাদের অসৎকর্মের চূড়ান্ত ফল নয় এবং সেগুলো তাদের অপরাধের পূর্ণ শাস্তিও নয়। বরং এটাকে এ অবস্থার পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে যে, একজন অপরাধী স্বাধীনভাবে অপরাধ করে বেড়াচ্ছিল, তাকে অকস্মাত গ্রেফতার করে তার আরো বেশী জুলুম, অন্যায় ও ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার সুযোগ ছিনিয়ে নেয়া হলো। মানব জাতির ইতিহাসে এ ধরনের গ্রেফতারীর অসংখ্য নজীর পাওয়া যায়। এ নজীরগুলো এ কথারই এক একটি সুস্পষ্ট আলামত যে, মানুষকে এ দুনিয়ায় যেখানে সেখানে চরে বেড়াবার এবং যাচ্ছে তাই করে বেড়াবার জন্য লাগামহীন উটের মতো স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়নি। বরং সবার ওপরে কোন এক শক্তি আছে যে একটি বিশেষ সীমারেখা পর্যন্ত তার রশি আলগা করে রাখে। অসৎ প্রবণতা থেকে ফিরে আসার জন্য একের পর এক সতর্ক সিগন্যাল দিয়ে যেতে থাকে। আর যখন দেখা যায়, সে কোনক্রমেই সৎ পথে ফিরে আসছে না তখন হঠাৎ এক সময় তাকে পাকড়াও করে ফেলে। তারপর এ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ওপর চিন্তা-ভাবনা করলে কোন ব্যক্তি সহজেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে, এ বিশ্ব জাহানের ওপর যে শাসনকর্তার শাসন চলছে তিনি নিশ্চয়ই এমন একটি সময় নির্ধারিত করে রেখে থাকবেন যখন এসব অপরাধীদের বিচার করা হবে এবং নিজেদের কর্মকাণ্ডের জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে। এ কারণে ওপরের যে আয়াতটিতে পার্থিব আযাবের কথা বলা হয়েছে, তাকে "কাজেই" শব্দটি দ্বারা পরবর্তী আয়াতের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ পার্থিব আযাব বার বার আসা যেন আখেরাতে জবাবদিহির নিশ্চয়তার একটি প্রমাণ।

৭. এ থেকে জানা গেলো, আখেরাতে জিজ্ঞাসাবাদ সরাসরি রিসালাতের ভিত্তিতেই অনুষ্ঠিত হবে। একদিকে নবীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, মানব সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবার জন্য তোমরা কি কি কাজ করেছো? অন্যদিকে যাদের কাছে, রসূলের দাওয়াত পৌঁছে গেছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, এ দাওয়াতের সাথে তোমরা কি ব্যবহার করেছো? যেসব ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের কাছে নবীদের বাণী পৌঁছেনি তাদের মামলার নিষ্পত্তি কিভাবে হবে, সে সম্পর্কে কুরআন মজীদ আমাদের কিছুই বলেনি। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর ফায়সালা সংরক্ষিত করে রেখেছেন। কিন্তু যেসব ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের কাছে নবীদের শিক্ষা পৌঁছে গেছে তাদের সম্পর্কে কুরআন পরিষ্কার ঘোষণা করছে যে, তারা নিজেদের কুফরী, অবাধ্যতা, অস্বীকৃতি, ফাসেকী ও নাফরমানীর স্বপক্ষে কোন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে পারবে না। আর লজ্জায়, আক্ষেপে ও অনুতাপে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে জাহান্নামের পথে এগিয়ে চলা ছাড়া কিয়ামতের দিন তাদের জন্য দ্বিতীয় কোন পথ থাকবে না।

৮. অর্থাৎ আল্লাহর ন্যায়ের তুলাদণ্ডে সেদিন 'ওজন' ও 'সত্য' হবে পরস্পরের সমার্থক। সত্য বা হক ছাড়া কোন জিনিসের সেখানে কোন ওজন থাকবে না। আর ওজন ছাড়াও কোন জিনিস সত্য সাব্যস্ত হবে না। যার সাথে যতটুকু সত্য থাকবে সে হবে ততটুকু ওজনদার ও ভারী। ওজনের পরিপ্রেক্ষিতেই সব কিছুর ফায়সালা হবে। অন্য কোন জিনিসের বিন্দুমাত্রও মর্যাদা ও মূল্য দেয়া হবে না। মিথ্যা ও বাতিলের স্থিতিকাল দুনিয়ায় যতই দীর্ঘ ও বিস্তৃত থাকুক না কেন এবং আপাতদৃষ্টিতে তার পেছনে যতই জাঁকজমক, শান-শওকত ও আড়ম্বর শোভা পাক না কেন, এ তুলাদণ্ডে তা একেবারেই ওজনহীন প্রমাণিত হবে। বাতিলপন্থীদেরকে যখন এ তুলাদণ্ডে ওজন করা হবে, তারা নিজেদের চোখেই দেখে নেবে দুনিয়ায় দীর্ঘকাল ধরে তারা যা কিছু করেছিল তার ওজন একটি মাছির ডানার সমানও নয়। সূরা কাহাফের শেষ তিনটি আয়াতে একথাটিই বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যারা দুনিয়ার জীবনে সবকিছু দুনিয়ারই জন্য করে গেছে এবং আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করে এ ভেবে কাজ করেছে যে, পরকাল বলে কিছু নেই, কাজেই কারোর কাছে নিজের কাজের হিসেব দিতে হবে না, আখেরাতে আমি তাদের কার্যকলাপের কোন ওজন দেবো না।

৯. এ বিষয়টিকে এভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে যে, মানুষের জীবনের সমগ্র কার্যাবলী দু'টি অংশে বিভক্ত হবে। একটি ইতিবাচক বা সৎ কাজ এবং অন্যটি নেতিবাচক বা অসৎ কাজ। ইতিবাচক অংশের অন্তর্ভুক্ত হবে সত্যকে জানা ও মেনে নেয়া এবং সত্যের অনুসরণ করে সত্যের খাতিরে কাজ করা। আখেরাতে একমাত্র এটিই হবে ওজনদার, ভারী ও মূল্যবান। অন্যদিকে সত্য থেকে গাফিল হয়ে অথবা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে মানুষ নিজের নফস-প্রবৃত্তি বা অন্য মানুষের ও শয়তানের অনুসরণ করে অসত্য পথে যা কিছুই করে, তা সবই নেতিবাচক অংশে স্থান লাভ করবে। আর এ নেতিবাচক অংশটি কেবল যে, মূল্যহীনই হবে তাই নয় বরং এটি মানুষের ইতিবাচক অংশের মর্যাদাও কমিয়ে দেবে।

কাজেই মানুষের জীবনের সমুদয় কার্যাবলীর ভাল অংশ যদি তার মন্দ অংশের ওপর বিজয় লাভ করে এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে অনেক কিছু দেবার পরও তার হিসেবে কিছু না

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ
فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۗ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ﴿١١﴾ قَالَ مَا مَنَعَكَ
اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ۗ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ
طِيْنٍ ﴿١٢﴾ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ
الصّٰغِرِيْنَ ﴿١٣﴾ قَالَ اَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٤﴾ قَالَ اِنَّكَ مِنَ
الْمُنْظَرِيْنَ ﴿١٥﴾

২ রুকূ'

আমি তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করলাম তারপর তোমাদের আকৃতি দান করলাম অতপর ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা করো।[১০] এ নির্দেশ অনুযায়ী সবাই সিজদা করলো। কিন্তু ইবলীস সিজদাকারীদের অন্তরভুক্ত হলো না।

আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন। "আমি যখন তোকে হুকুম দিয়েছিলাম তখন সিজদা করতে তোকে বাধা দিয়েছিল কিসে"?

সে জবাব দিল ঃ "আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো এবং ওকে সৃষ্টি করেছো মাটি থেকে।"

তিনি বললেন ঃ "ঠিক আছে, তুই এখান থেকে নীচে নেমে যা। এখানে অহংকার করার অধিকার তোর নেই। বের হয়ে যা। আসলে তুই এমন লোকদের অন্তরভুক্ত, যারা নিজেরাই নিজেদেরকে লাঞ্ছিত করতে চায়।"[১১]

সে বললো ঃ "আমাকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দাও যখন এদের সবাইকে পুনর্বার ওঠানো হবে।"

তিনি বললেন ঃ "তোকে অবকাশ দেয়া হলো।"

কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবেই আখেরাতে তার সাফল্য লাভ করা সম্ভব। আর যে ব্যক্তির জীবনের মন্দ কাজ তার সমস্ত ভাল কাজকে মূল্যহীন করে দেবে তার অবস্থা হবে সেই দেউলিয়া ব্যবসায়ীর মত যার সমুদয় পুঁজি ক্ষতিপূরণ ও দাবী পূরণ করতে করতেই শেষ হয়ে যায় এবং এরপরও কিছু কিছু দাবী তার জিম্মায় অনাদায়ী থেকে যায়।

১০. তুলনামূলক পাঠের জন্য সূরা বাকারার ৪ রুকূ' দেখুন (আয়াত ৩০ থেকে ৩৯)।

সূরা বাকারায় যেসব শব্দ সমন্বয়ে সিজদার আদেশ উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে সন্দেহ হতে পারে যে, নিছক এক ব্যক্তি হিসেবেই আদম আলাইহিস সালামের সামনে ফেরেশতাদেরকে সিজদা করার হুকুম দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এখান থেকে সে সন্দেহ দূর হয়ে যায়। এখানে যে বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তা থেকে পরিষ্কার জানা যায়, আদম আলাইহিস সালামকে আদম হিসেবে নয় বরং মানব জাতির প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে সিজদা করানো হয়েছিল।

আর "আমি তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করলাম তারপর তোমাদের আকৃতিদান করলাম অতপর ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা করো" একথার অর্থ হচ্ছে আমি প্রথমে তোমাদের সৃষ্টির পরিকল্পনা প্রণয়ন করলাম, তোমাদের সৃষ্টির মৌলিক উপাদান তৈরী করলাম তারপর সেই উপাদানকে মানবিক আকৃতি দান করলাম অতপর আদম যখন একজন জীবিত মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো তখন তাকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে হুকুম দিলাম। কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানেও এ আয়াতটির এরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন সূরা "সোয়াদ"-এর পঞ্চম রুকূ'তে বলা হয়েছে ঃ

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ○ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ○

"সেই সময়ের কথা চিন্তা করো যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, আমি মাটি থেকে একটি মানুষ তৈরী করবো। তারপর যখন আমি সেটি পুরোপুরি তৈরী করে ফেলবো এবং তার মধ্যে নিজের রূহ থেকে কিছু ফুঁকে দেবো তখন তোমরা সবাই তার সামনে সিজদানত হবে।"

এ আয়াতটিতে ঐ তিনটি পর্যায় বর্ণিত হয়েছে অন্য এক ভংগীমায়। এখানে বলা হয়েছে ঃ প্রথমে মাটি থেকে একটি মানুষ সৃষ্টি করা হবে, তারপর তার "তাসবীয়া" করা হবে অর্থাৎ তাকে আকার-আকৃতি দান করা হবে এবং তার দেহ-সৌষ্ঠব ও শক্তি-সামর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হবে এবং সবশেষে নিজের রূহ থেকে কিছু ফুঁকে দিয়ে আদমকে অস্তিত্ব দান করা হবে। এ বিষয়বস্তুটিকেই সূরা হিজ্‌র-এর তৃতীয় রুকূ'তে নিম্নলিখিত শব্দাবলীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ○ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ○

"আর সেই সময়টির কথা ভাবো যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, আমি ছাঁচে ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে একটি মানুষ সৃষ্টি করবো, তারপর যখন তাকে পুরোপুরি তৈরী করে ফেলবো এবং তার মধ্যে নিজের রূহ থেকে কিছু ফুঁকে দেবো তখন তোমরা সবাই তার সামনে সিজদানত হবে।"

মানব সৃষ্টির এ সূচনা পর্বের বিস্তারিত অবস্থা অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে কঠিন। মাটির পিণ্ড থেকে কিভাবে মানুষ বানানো হলো তারপর কিভাবে তাকে আকার আকৃতি

দান ও তার মধ্যে ভাবসাম্য কায়েম করা হলো এবং তার মধ্যে প্রাণ বায়ু ফুঁকে দেবার ধরনটিই বা কি ছিল—এসবের পূর্ণ তাৎপর্য বিশ্লেষণ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও একথা সুস্পষ্ট যে, বর্তমান যুগে ডারউইনের অনুসারীরা বিজ্ঞানের নামে যেসব মতবাদ পেশ করছে মানব সৃষ্টির সূচনা পর্বের অবস্থা সম্পর্কে কুরআন মজীদ তার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী অবস্থার বর্ণনা দিয়েছে। এসব মতবাদের দৃষ্টিতে মানুষ একটি সম্পূর্ণ অমানবিক বা অর্ধমানবিক অবস্থার বিভিন্ন স্তর থেকে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে মানবিক স্তরে উপনীত হয়েছে। আর এ ক্রমবিবর্তন ধারার সুদীর্ঘ পথে এমন কোন বিশেষ বিন্দু নেই যেখান থেকে অমানবিক অবস্থার ইতি ঘোষণা করে মানব জাতির সূচনা হয়েছে বলে দাবী করা যেতে পারে। বিপরীত পক্ষে কুরআন আমাদের জানাচ্ছে, মানব বংশধারার সূচনা হয়েছে নির্ভেজাল মানবিক অস্তিত্ব থেকেই। কোন অমানবিক ধারার সাথে তার ইতিহাসের কোন কালেও কোন সম্পর্ক ছিল না। প্রথম দিন থেকে তাকে মানুষ হিসেবেই সৃষ্টি করা হয়েছিল। আল্লাহ পরিপূর্ণ মানবিক চেতনা সহকারে পূর্ণ আলোকে তার পার্থিব জীবনের সূচনা করেছিলেন।

মানুষের ইতিহাস সম্পর্কে এ দু'টি ভিন্ন ধর্মী দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ সম্পর্কে দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী চিন্তাধারার উদ্ভব হয়। একটি চিন্তাধারা মানুষকে জীব-জন্তু ও পশু জগতের একটি শাখা হিসেবে পেশ করে। তার জীবনের সমস্ত আইন-কানুন এমন কি নৈতিক ও চারিত্রিক আইনের জন্যও মূলনীতির সন্ধান করা হয় ইতর প্রাণীসমূহের জীবন রীতিতে ও পশুদের জীবন ধারায়। তার জন্য পশুদের ন্যায় কর্মপদ্ধতি একটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কর্মপদ্ধতি মনে হয়। সেখানে মানবিক কর্মপদ্ধতি ও পাশবিক কর্মপদ্ধতির মধ্যে বড় জোর এতটুকু পার্থক্য দেখার প্রত্যাশা করা হয় যে, মানুষ যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা, শিল্প-সভ্যতা-সংস্কৃতির সূক্ষ্ম ও নিপুন কারুকার্য অবলম্বনে কাজ করে। পক্ষান্তরে পশুরা কাজ করে ঐসবের সহায়তা ছাড়াই। বিপরীত পক্ষে অন্য চিন্তাধারাটি মানুষকে পশুর পরিবর্তে "মানুষ" হিসেবেই উপস্থাপন করে। সেখানে মানুষ "বাকশক্তি সম্পন্ন পশু" বা "সামাজিক ও সংস্কৃতিবান জন্তু" (Social animal) নয় বরং পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। সেখানে বাকশক্তি বা সামাজিকতাবোধ তাকে অন্যান্য জীব ও প্রাণী থেকে আলাদা করে না। বরং তাকে আলাদা করে তার নৈতিক দায়িত্ব এবং ক্ষমতা ও ইখতিয়ার যা আল্লাহ তাকে দান করেছেন এবং যার ভিত্তিতে তাকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। এভাবে এখানে মানুষ ও তার সাথে সম্পৃক্ত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কিত দৃষ্টিকোণ পূর্ববর্তী দৃষ্টিকোণটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। এখানে মানুষের জন্য অন্য একটি জীবন দর্শন এবং অন্য একটি নৈতিক ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক জীবন ও আইন বিধানের প্রত্যাশা করা হবে। এ জীবন দর্শন ও নৈতিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার মূলনীতি অনুসন্ধান করার জন্য মানুষের দৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিম্ন জগতের পরিবর্তে উর্ধ জগতের দিকে উঠতে থাকবে।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, মানুষ সম্পর্কিত এ দ্বিতীয় ধারণাটি নৈতিক ও মনস্তাত্বিক দিক দিয়ে যতই উন্নত পর্যায়ের হোক না কেন, নিছক কল্পনার ওপর নির্ভর করে যুক্তি-তথ্য দ্বারা প্রমাণিত একটি মতাবাদকে কেমন করে রদ করা যেতে পারে? কিন্তু যারা এ ধরনের প্রশ্ন করেন, তাদের কাছে আমার পাল্টা প্রশ্ন, সত্যিই কি ডারউইনের বিবর্তনবাদ বৈজ্ঞানিক যুক্তি-তথ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত? বিজ্ঞান সম্পর্কে নিছক ভাসা ভাসা

قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّنۢ
بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَـٰنِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ
أَكْثَرَهُمْ شَـٰكِرِينَ ﴿١٧﴾ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۚ لَّمَن تَبِعَكَ
مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾ وَيَـٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ
وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ
فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿١٩﴾ فَوَسْوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَـٰنُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَا وُۥرِىَ
عَنْهُمَا مِن سَوْءَٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَىٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّآ
أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَـٰلِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّى لَكُمَا
لَمِنَ ٱلنَّـٰصِحِينَ ﴿٢١﴾

সে বললো ঃ "তুমি যেমন আমাকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেছো তেমনি আমিও এখন তোমার সরল–সত্য পথে এ লোকদের জন্য ওঁত পেতে বসে থাকবো, সামনে–পেছনে, ডাইনে–বাঁয়ে, সবদিক থেকে এদেরকে ঘিরে ধরবো এবং এদের অধিকাংশকে তুমি শোকর গুজার পাবে না।"১২

আল্লাহ বললেন ঃ "বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও ধিকৃত অবস্থায়। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখিস, এদের মধ্য থেকে যারাই তোর অনুসরণ করবে তাদেরকে এবং তোকে দিয়ে আমি জাহান্নাম ভরে দেবো। আর হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী তোমরা দু'জনাই এ জান্নাতে থাকো। যেখানে যা তোমাদের ইচ্ছা হয় খাও, কিন্তু এ গাছটির কাছে যেয়ো না, অন্যথায় তোমরা জালেমদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে।"

তারপর তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের পরস্পর থেকে গোপন রাখা হয়েছিল, তাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেবার জন্য শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল। সে তাদেরকে বললো ঃ "তোমাদের রব যে, তোমাদের এ গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করেছেন তার পেছনে এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, পাছে তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাও অথবা তোমরা চিরন্তন জীবনের অধিকারী হয়ে পড়ো।" আর সে কসম খেয়ে তাদেরকে বললো, আমি তোমাদের যথার্থ কল্যাণকামী।

ও স্থূল জ্ঞান রাখে এমন ধরনের লোকেরা অবশ্যি এ মতবাদকে একটি প্রমাণিত তাত্ত্বিক সত্য মনে করার ভ্রান্তিতে লিপ্ত। কিন্তু বিশেষজ্ঞ ও অনুসন্ধান বিশারদরা জানেন, গুটিকয় শব্দ ও হাড়গোড়ের লম্বা চওড়া ফিরিস্তি সত্ত্বেও এখনো এটি একটি মতবাদের পর্যায়েই রয়ে গেছে এবং এর যেসব যুক্তি-তথ্যকে ভুলক্রমে প্রামাণ্য বলা হচ্ছে সেগুলো নিছক সম্ভাব্যতার যুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ সেগুলোর ভিত্তিতে বড় জোর এতটুকু বলা যেতে পারে যে, ডারউইনের বিবর্তনবাদের সম্ভাবনা ঠিক ততটুকুই যতটুকু সম্ভাবনা আছে সরাসরি সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে এক একটি শ্রেণীর পৃথক অস্তিত্ব লাভের।

১১. মূলে صَاغِرِيْنَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। صَاغِرٌ মানে হচ্ছে লাঞ্ছনা ও অবমাননার মধ্যে সন্তুষ্ট থাকা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেই লাঞ্ছনা, অবমাননা ও নিকৃষ্টতর অবস্থা অবলম্বন করে। কাজেই আল্লাহর বাণীর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর বান্দা ও সৃষ্টি হয়েও তোমার অহংকারে মত্ত হওয়া এবং তুমি নিজের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের যে ধারণা নিজেই তৈরী করে নিয়েছো তার দৃষ্টিতে তোমার রবের হুকুম তোমার জন্য অবমাননাকর মনে হওয়া ও সে জন্য তা অমান্য করার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তুমি নিজেই নিজেকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করতে দাও। শ্রেষ্ঠত্বের মিথ্যা অহমিকা, মর্যাদার ভিত্তিহীন দাবী এবং কোন জন্মগত ও স্বতসিদ্ধ অধিকার ছাড়াই নিজেকে অযথা শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন মনে করা তোমাকে বড়, শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাশালী করতে পারে না। বরং এর ফলে তুমি মিথ্যুক লাঞ্ছিত ও অপমানিতই হবে এবং তোমার এ লাঞ্ছনা ও অবমাননার কারণ হবে তুমি নিজেই।

১২. এটি ছিল ইবলীসের চ্যালেঞ্জ। সে আল্লাহকে এ চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল। তার এ বক্তব্যের অর্থ ছিল এই যে, তুমি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত এই যে অবকাশ দিয়েছো তাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে আমি একথা প্রমাণ করার জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করবো যে, তুমি মানুষকে আমার মোকাবিলায় যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছো সে তার যোগ্য নয়। মানুষ যে কতবড় নাফরমান, নিমক হারাম ও অকৃতজ্ঞ তা আমি দেখিয়ে দেবো।

শয়তান যে অবকাশ চেয়েছিল এবং আল্লাহ তাকে যে অবকাশ দিয়েছিলেন সেটি নিছক সময়ের অবকাশ ছিল না বরং সে যে কাজ করতে চাচ্ছিল সে কাজটি করার সুযোগও এর অন্তরভুক্ত ছিল। অর্থাৎ তার দাবী ছিল, মানুষকে বিভ্রান্ত করে তার দুর্বলতাসমূহকে কাজে লাগিয়ে তাকে অযোগ্য প্রমাণ করার সুযোগ দিতে হবে। এ সুযোগ আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। সূরা বনী ইসরাঈলের সপ্তম রুকূ'তে (আয়াত ৬১-৬৫) এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেখানে আল্লাহ শয়তানকে এ ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দেবার কথা বলেছেন যে, আদমকে ও তার সন্তান-সন্ততিদেরকে সত্য-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য সে নিজের ইচ্ছা মত যে কোন কৌশল অবলম্বন করতে পারে। এসব কৌশল অবলম্বন করার ক্ষেত্রে তাকে কোন প্রকার বাধা দেয়া হবে না। বরং যেসব পথে সে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে সেই সমস্ত পথই খোলা থাকবে। কিন্তু এই সংগে এ শর্তটিও জুড়ে দেয়া হয়েছে-

إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

অর্থাৎ "আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোন কর্তৃত্ব থাকবে না।" তুমি কেবল এতটুকু করতে পারবে, তাদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারবে। মিথ্যা আশার ছলনে ভুলাতে পারবে, অসৎ কাজ ও গোমরাহীকে সুশোভন করে তাদের সামনে পেশ

فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ
عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۭ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ
وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٢﴾ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ
اَنْفُسَنَا ۖ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾
قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ
اِلٰى حِيْنٍ ﴿٢٤﴾ قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ﴿٢٥﴾

এভাবে প্রতারণা করে সে তাদের দু'জনকে ধীরে ধীরে নিজের পথে নিয়ে এলো। অবশেষে যখন তারা সেই গাছের ফল আস্বাদন করলো, তাদের লজ্জা স্থান পরস্পরের সামনে খুলে গেলো এবং তারা নিজেদের শরীর ঢাকতে লাগলো জান্নাতের পাতা দিয়ে।

তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললো ঃ "আমি কি তোমাদের এ গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করিনি এবং তোমাদের বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?"

তারা দু'জন বলে উঠলো ঃ "হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের ওপর জুলুম করেছি। এখন যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না করো এবং আমাদের প্রতি রহম না করো, তাহলে নিসন্দেহে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।"[১৩]

তিনি বললেন ঃ "নেমে যাও,[১৪] তোমরা পরস্পরের শত্রু এবং তোমাদের জন্য একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত পৃথিবীতেই রয়েছে বসবাসের জায়গা ও জীবন যাপনের উপকরণ।" আর বললেন ঃ "সেখানেই তোমাদের জীবন যাপন করতে এবং সেখানেই মরতে হবে এবং সেখান থেকেই তোমাদের সবশেষে আবার বের করে আনা হবে।

পারবে, ভোগের আনন্দ ও স্বার্থের লোভ দেখিয়ে তাদেরকে ভুল পথের দিকে আহবান জানাতে পারবে। কিন্তু তাদের হাত ধরে জবরদস্তি তাদেরকে তোমার পথের দিকে টেনে আনবে এবং তারা যদি সত্য-সঠিক পথে চলতে চায় তাহলেও তুমি তা থেকে তাদেরকে বিরত রাখবে, সে ক্ষমতা তোমাকে দেয়া হবে না। সূরা ইবরাহীমের চতুর্থ রুকূ'তেও এ

একই কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালত থেকে ফায়সালা শুনিয়ে দেবার পর শয়তান তার অনুসারী মানুষদেরকে বলবে ঃ

وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ -

"তোমাদের ওপর আমার তো কোন জবরদস্তি ছিল না, আমার অনুসরণ করার জন্য আমি তোমাদের বাধ্য করিনি। আমি তোমাদেরকে আমার পথের দিকে আহবান জানিয়েছিলাম, এর বেশী আমি কিছুই করিনি। আর তোমরা আমার আহবান গ্রহণ করেছিলে। কাজেই এখন আমাকে তিরস্কার করো না বরং তোমাদের নিজেদেরকেই তিরস্কার করো।"

আর শয়তান যে এখানে আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে যে, তুমিই আমাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছো, এর অর্থ হচ্ছে এই যে, শয়তান নিজের গোনাহের দায়–দায়িত্ব আল্লাহর ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। তার অভিযোগ হচ্ছে, আদমের সামনে সিজদা করার হুকুম দিয়ে তুমি আমাকে বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছো এবং আমার আত্মাভিমান ও আত্মম্ভরিতায় আঘাত দিয়ে আমাকে এমন অবস্থার সম্মুখীন করেছো যার ফলে আমি তোমার নাফরমানী করেছি। অন্য কথায় বলা যায়, নির্বোধ শয়তান চাচ্ছিল, তার মনের গোপন ইচ্ছা যেন ধরা না পড়ে। বরং যে মিথ্যা অহমিকা ও বিদ্রোহ সে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল, তাকে সে পর্দার অন্তরালে সংগোপন করে রাখতে চাচ্ছিল। এটা ছিল একটা হীন ও নির্বোধসুলভ আচরণ। এহেন আচরণের জবাব দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাই মহান আল্লাহ তার এ অভিযোগের আদৌ কোন গুরুত্বই দেননি।

১৩. এ কাহিনীটি থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় ঃ

এক ঃ লজ্জা মানুষের একটি প্রকৃতিগত ও স্বাভাবিক অনুভূতি। মানুষ নিজের শরীরের বিশেষ স্থানগুলোকে অন্যের সামনে উন্মুক্ত করার ব্যাপারে প্রকৃতিগতভাবে যে লজ্জা অনুভব করে সেটি ঐ স্বাভাবিক অনুভূতির প্রাথমিক প্রকাশ। কুরআন আমাদের জানায়, সভ্যতার ক্রমোন্নতির ফলে মানুষের মধ্যে কৃত্রিমভাবে এ লজ্জার সৃষ্টি হয়নি বা এটি বাইরের থেকে অর্জিত কোন জিনিসও নয়, যেমন শয়তানের কোন কোন সুচতুর শিষ্য ও অনুসারী অনুমান করে থাকে। বরং জন্মের প্রথম দিন থেকেই এ প্রকৃতিগত গুণটি মানুষের মধ্যে রয়েছে।

দুইঃ মানুষকে তার স্বভাবসুলভ সোজা–সরল পথ থেকে সরিয়ে দেবার জন্য শয়তানের প্রথম কৌশলটি ছিল তার এ লজ্জার অনুভূতিতে আঘাত করা, উলংগতার পথ দিয়ে তার জন্য নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার দরজা খুলে দেয়া এবং যৌন বিষয়ে তাকে খারাপ পথে পরিচালিত করা। অন্য কথায় বলা যায়, প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণ চালাবার জন্য তার যে দুর্বলতম স্থানটিকে সে বেছে নিয়েছিল সেটি ছিল তার জীবনের যৌন বিষয়ক দিক। যে লজ্জাকে মানবীয় প্রকৃতির দুর্গরক্ষক হিসেবে মহান আল্লাহ নিযুক্ত করেছিলেন তারই ওপর হেনেছে সে প্রথম আঘাতটি। শয়তান ও তার শিষ্যবর্গের এ কর্মনীতি আজো

অপরিবর্তিত রয়েছে। মেয়েদেরকে উলংগ করে প্রকাশ্য বাজারে না দাঁড় করানো পর্যন্ত তাদের "প্রগতি"র কোন কার্যক্রম শুরুই হতে পারে না।

তিন ঃ অসৎকাজ করার প্রকাশ্য আহবানকে মানুষ খুব কমই গ্রহণ করে, এটাও মানুষের স্বভাবসুলভ প্রবণতা। সাধারণত তাকে নিজের জালে আবদ্ধ করার জন্য তাই প্রত্যেক অসৎকর্মের আহবায়ককে কল্যাণকামীর ছদ্মবেশে আসতে হয়।

চার ঃ মানুষের মধ্যে উচ্চতর বিষয়াবলী যেমন মানবিক পর্যায় থেকে উন্নতি করে উচ্চতর মার্গে পৌঁছার বা চিরন্তন জীবনলাভের স্বাভাবিক আকাংখা থাকে। আর শয়তান তাকে ধোঁকা দেবার ক্ষেত্রে প্রথম সাফল্য অর্জন করে এ পথেই। সে মানুষের এ আকাংখাটির কাছে আবেদন জানায়। শয়তানের সবচেয়ে সফল অস্ত্র হচ্ছে, সে মানুষের সামনে তাকে উন্নতির উচ্চ শিখরে নিয়ে যাওয়ার এবং বর্তমান অবস্থা থেকে উন্নততর অবস্থায় পৌঁছিয়ে দেবার টোপ ফেলে, তারপর তাকে এমন পথের সন্ধান দেয়, যা তাকে নীচের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

পাঁচ ঃ সাধারণভাবে একথাটি প্রচলিত হয়ে গেছে যে, শয়তান প্রথমে হযরত হাওয়াকে তার প্রতারণা জালে আবদ্ধ করে, তারপর হযরত আদমকে জালে আটকাবার জন্য তাকে ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু কুরআন এ ধারণা খণ্ডন করে। কুরআনের বক্তব্য হচ্ছে, শয়তান তাদের উভয়কেই ধোঁকা দেয় এবং তারা উভয়েই শয়তানের ধোঁকায় বিভ্রান্ত হয়। আপাতদৃষ্টিতে এটা একটা মামুলী কথা বলে মনে হয়। কিন্তু যারা জানেন, হযরত হাওয়া সম্পর্কিত এ সাধারণ্যে প্রচলিত বক্তব্যটি সারা দুনিয়ায় নারীর নৈতিক, সামাজিক ও আইনগত মর্যাদা হ্রাস করার ক্ষেত্রে কত বড় ভূমিকা পালন করেছে একমাত্র তারাই কুরআনের এ বর্ণনার যথার্থ মূল্য ও মর্যাদা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন।

ছয় ঃ এরূপ ধারণা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই যে, নিষিদ্ধ গাছের এমন কোন বিশেষ গুণ ছিল, যে কারণে তার ফল মুখে দেবার সাথে সাথেই হযরত আদম ও হাওয়ার লজ্জাস্থান অনাবৃত হয়ে গিয়েছিল। আসলে এটি কেবল আল্লাহর নাফরমানীরই ফলশ্রুতি ছিল। আল্লাহ ইতিপূর্বে নিজের ব্যবস্থাপনায় তাদের লজ্জাস্থান আবৃত করেছিলেন। তারা তাঁর নির্দেশ অমান্য করার সাথে সাথেই তিনি তাদের ওপর থেকে নিজের হেফাজত ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে নিয়েছিলেন, তাদের আবরণ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তারা যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে নিজেরাই নিজেদের লজ্জাস্থান আবৃত করার ব্যবস্থা করুক। এ কাজের দায়িত্ব তাদের নিজেদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর যদি তারা প্রয়োজন মনে না করে অথবা এ জন্য প্রচেষ্টা না চালায় তাহলে তারা যেভাবেই বিচরণ করুক না কেন, তাতে আল্লাহর কিছু এসে যায় না। এভাবে যেন চিরকালের জন্য এ সত্যটি প্রকাশ করে দেয়া হলো যে, মানুষ আল্লাহর নাফরমানী করলে একদিন না একদিন তার আবরণ উন্মুক্ত হয়ে যাবেই এবং মানুষের প্রতি আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা ততদিন থাকবে যতদিন সে থাকবে আল্লাহর হুকুমের অনুগত। আনুগত্যের সীমানার বাইরে পা রাখার সাথে সাথেই সে আল্লাহর সাহায্য লাভ করতে পারবে না। বরং তখন তাকে তার নিজের হাতেই সঁপে দেয়া হবে। বিভিন্ন হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এবং এ সম্পর্কে তিনি দোয়া করেছেন।

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমতের আশা করি। কাজেই এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার নিজের হাতে সোপর্দ করে দিয়ো না।"

সাত ঃ শয়তান একথা প্রমাণ করতে চাচ্ছিল যে, তার মোকাবিলায় মানুষকে যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে সে তার যোগ্য নয়। কিন্তু প্রথম মোকাবিলায় সে পরাজিত হলো। সন্দেহ নেই, এ মোকাবিলায় মানুষ তার রবের নির্দেশ মেনে চলার ব্যাপারে পূর্ণ সফলকাম হতে পারেনি এবং তার এ দুর্বলতাটিও প্রকাশ হয়ে পড়লো যে, তার পক্ষে নিজের প্রতিপক্ষের প্রতারণা জালে আবদ্ধ হয়ে তার আনুগত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া সম্ভব। কিন্তু এ প্রথম মোকাবিলায় একথাও চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, মানুষ তার নৈতিক মর্যাদার দিক দিয়ে একটি উন্নত ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। প্রথমত শয়তান নিজেই নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার ছিল। আর মানুষ নিজে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করেনি বরং শ্রেষ্ঠত্ব তাকে দান করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত শয়তান নির্জলা অহংকার ও আত্মম্ভরিতার ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে। অন্যদিকে মানুষ স্বেচ্ছায় ও স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে আল্লাহর হুকুম অমান্য করেনি। বরং শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে এতে প্রবৃত্ত হয়। অসৎকাজের প্রকাশ্য আহবানে সে সাড়া দেয়নি। বরং অসৎকাজের আহবায়ককে সৎকাজের আহবায়ক সেজে তার সামনে আসতে হয়েছিল। সে নীচের দিকে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে নীচের দিকে যায়নি বরং এ পথটি তাকে উপরের দিকে নিয়ে যাবে এ ধোঁকায় পড়ে সে নীচের দিকে যায়। তৃতীয়ত শয়তানকে সতর্ক করার পর সে নিজের ভুল স্বীকার করে বন্দেগীর দিকে ফিরে আসার পরিবর্তে নাফরমানীর ওপর আরো বেশী অবিচল হয়ে যায়। অন্যদিকে মানুষকে তার ভুলের ব্যাপারে সতর্ক করে দেবার পর সে শয়তানের মত বিদ্রোহ করেনি বরং নিজের ভুল বুঝতে পারার সাথে সাথেই লজ্জিত হয়ে পড়ে, নিজের ত্রুটি স্বীকার করে, বিদ্রোহ থেকে আনুগত্যের দিকে ফিরে আসে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে নিজের রবের রহমতের ছত্রছায়ায় আশ্রয় খুঁজতে থাকে।

আট ঃ এভাবে শয়তানের পথ ও মানুষের উপযোগী পথ দু'টি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। আল্লাহর বন্দেগী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাঁর মোকাবিলায় বিদ্রোহের ঝাণ্ডা বুলন্দ করা, সতর্ক করে দেয়া সত্বেও সগর্বে নিজের বিদ্রোহাত্মক কর্মপদ্ধতির ওপর অটল হয়ে থাকা এবং যারা আল্লাহর আনুগত্যের পথে চলে তাদেরকেও বিভ্রান্ত ও প্ররোচিত করে গোনাহ ও নাফরমানীর পথে টেনে আনার চেষ্টা করাই হচ্ছে নির্ভেজাল শয়তানের পথ। বিপরীত পক্ষে মানুষের উপযোগী পথটি হচ্ছে ঃ প্রথমত শয়তানের প্ররোচনা ও অপহরণ প্রচেষ্টার মোকাবিলা করতে হবে। তার এ প্রচেষ্টায় বাধা দিতে হবে। নিজের শত্রুর চাল ও কৌশল বুঝতে হবে এবং তার হাত থেকে বাঁচার জন্য সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। কিন্তু এরপর যদি কখনো তার পা বন্দেগী ও আনুগত্যের পথ থেকে সরেও যায় তাহলে নিজের ভুল উপলব্ধি করার সাথে সাথেই লজ্জায় অধোবদন হয়ে তাকে নিজের রবের দিকে ফিরে আসতে হবে এবং নিজের অপরাধ ও ভুলের প্রতিকার ও সংশোধন করতে হবে। এ কাহিনী থেকে মহান আল্লাহ এ মৌল শিক্ষাটিই দিতে চান। এখানে মানুষের মনে তিনি একথাগুলো বদ্ধমূল করে দিতে চান যে, তোমরা যে পথে চলছো সেটি শয়তানের পথ। এভাবে আল্লাহর হেদায়াতের পরোয়া না করে জিন ও

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۭ
وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ۭ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ
يَذَّكَّرُوْنَ ۝ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ
الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۭ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ
مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۭ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاۗءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

৩ রুকূ'

হে বনী আদম![১৫] তোমাদের শরীরের লজ্জাস্থানগুলো ঢাকার এবং তোমাদের দেহের সংরক্ষণ ও সৌন্দর্য বিধানের উদ্দেশ্যে আমি তোমাদের জন্য পোশাক নাযিল করেছি। আর তাকওয়ার পোশাকই সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম, সম্ভবত লোকেরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে আবার ঠিক তেমনিভাবে বিভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ না করে যেমনভাবে সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল এবং তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের কাছে উন্মুক্ত করে দেবার জন্য তাদেরকে বিবস্ত্র করেছিল। সে ও তার সাথীরা তোমাদেরকে এমন জায়গা থেকে দেখে যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। এ শয়তানদেরকে আমি যারা ঈমান আনে না তাদের অভিভাবক করে দিয়েছি।[১৬]

মানুষের মধ্যকার শয়তানদেরকে নিজেদের বন্ধু ও অভিভাবকে পরিণত করা এবং ক্রমাগত সতর্ক বাণী উচ্চারণ করার পরও তোমাদের এভাবে নিজেদের ভুলের ওপর অবিচল থাকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া মূলত নির্ভেজাল শয়তানী কর্মনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা নিজেদের আদি ও চিরন্তন দুশমনের ফাঁদে আটকা পড়েছো। এবং তার কাছে পূর্ণ পরাজয় বরণ করছো। শয়তান যে পরিণতির মুখোমুখি হতে চলছে, তোমাদের এ বিভ্রান্তির পরিণামও তাই হবে। যদি তোমরা সত্যিই নিজেরা নিজেদের শত্রু না হয়ে গিয়ে থাকো এবং তোমাদের মধ্যে সামান্যতম চেতনাও থেকে থাকে, তাহলে তোমরা নিজেদের ভুল শুধরিয়ে নাও, সতর্ক হয়ে যাও এবং তোমাদের বাপ আদম ও মা হাওয়া পরিশেষে যে পথ অবলম্বন করেছিলেন তোমরাও সেই একই পথ অবলম্বন করো।

১৪. হযরত আদম ও হযরত হাওয়া আলাইহিমাস সালামকে জান্নাত থেকে বের হয়ে যাওয়ার এ হুকুম দেয়া হয়েছিল শাস্তি হিসেবে—এরূপ ধারণা পোষণ করার কোন কারণ নেই। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে একথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ

তাঁদের তাওবা কবুল করেন এবং তাঁদেরকে মা'ফ করে দেন। কাজেই এ নির্দেশের মধ্যে শাস্তির কোন ব্যাপার থাকতে পারে না। বরং যে উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল এর মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্যটিই পূর্ণ হয়েছে। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা আল বাকারার ৪৮ ও ৫৩ নম্বর টীকা)।

১৫. এবার আদম ও হাওয়ার ঘটনার একটি বিশেষ দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরববাসীদের সামনে তাদের নিজেদের জীবনে শয়তানী ভ্রষ্টতা-প্রতারণার একটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট প্রভাবের প্রতি অংগুলী নির্দেশ করা হয়েছে। তারা কেবলমাত্র সৌন্দর্য সামগ্রী হিসেবে ও বিভিন্ন ঋতুর প্রভাব থেকে শারীরিকভাবে আত্মরক্ষা করার জন্য পোশাক ব্যবহার করতো। কিন্তু এর যে প্রাথমিক ও মৌলিক উদ্দেশ্য শরীরের লজ্জাস্থানগুলোকে আবৃত করা, সেটি তাদের কাছে কোন গুরুত্ব লাভ করেনি। নিজেদের লজ্জাস্থানগুলোকে অন্যের সামনে উন্মুক্ত করে দিতে তারা মোটেই ইতস্তত করতো না। প্রকাশ্য স্থানে উলংগ হয়ে গোসল করা, পথে ঘাটে যেখানে সেখানে প্রকাশ্য জায়গায় প্রকৃতির ডাকে উদোম হয়ে বসে পড়া, পরণের কাপড় খুলে পড়ে যেতে এবং লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে যেতে থাকলেও তার পরোয়া না করা ইত্যাদি ছিল তাদের প্রতিদিনের অভ্যাস। সবচেয়ে মারাত্মক ছিল হজ্জের সময় তাদের অসংখ্য লোকের কাবার চারদিকে উলংগ হয়ে তাওয়াফ করা। এ ব্যাপারে তাদের পুরষদের চেয়ে মেয়েরাই ছিল কিছু বেশী নির্লজ্জ। তাদের দৃষ্টিতে এটি ছিল একটি ধর্মীয় কাজ এবং সৎকাজ মনে করেই তারা এটি করতো। আর যেহেতু এটি কেবল আরবদেরই বৈশিষ্ট্য ছিল না বরং দুনিয়ার অধিকাংশ জাতি এ নির্লজ্জ বেহায়াপনায় লিপ্ত ছিল এবং আজো আছে, তাই এখানে কেবলমাত্র আরববাসীদেরকে সম্বোধন করা হয়নি বরং ব্যাপকভাবে সারা দুনিয়ার মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। এখানে সমগ্র মানব জাতিকে এই বলে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে যে, দেখো শয়তানী প্রতারণার একটি সুস্পষ্ট আলামত তোমাদের নিজেদের জীবনেই রয়েছে। তোমরা নিজেদের রবের পথনির্দেশনার তোয়াক্কা না করে এবং নিজেদের নবী-রসূলদের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজেরাই নিজেদেরকে শয়তানের হাতে তুলে দিয়েছো। আর সে তোমাদেরকে মানবিক প্রকৃতির পথ থেকে বিচ্যুত করে সেই একই নির্লজ্জতার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে যার মধ্যে ইতিপূর্বে সে তোমাদের প্রথম পিতা-মাতাকে নিক্ষেপ করতে চেয়েছিল। এ ব্যাপারে চিন্তা করলে প্রকৃত সত্য তোমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে। অর্থাৎ রসূলদের নেতৃত্ব ও পথনির্দেশনা ছাড়া তোমরা নিজেদের প্রকৃতির প্রাথমিক দাবীগুলো পর্যন্তও বুঝতে এবং তা পূর্ণ করতে অক্ষম।

১৬. এ আয়াতগুলোতে যে কথাগুলো বলা হয়েছে তা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য সুস্পষ্ট হয়ে সামনে ভেসে উঠেছে ঃ

এক ঃ পোশাক মানুষের জন্য কোন কৃত্রিম জিনিস নয়। বরং এটি মানব প্রকৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবী। আল্লাহ মানুষের দেহের বহির্ভাগে পশুদের মত কোন লোমশ আচ্ছাদন জন্মগতভাবে তৈরী করে দেননি। বরং লজ্জার অনুভূতি তার প্রকৃতির মধ্যে গচ্ছিত রেখে দিয়েছেন। তিনি মানুষের যৌন অংগগুলোকে কেবলামাত্র যৌনাংগ হিসেবেই তৈরী করেননি বরং এগুলোকে "সাওআত"ও বানিয়েছেন। আরবী ভাষায় "সাওআত" এমন

জিনিসকে বলা হয় যার প্রকাশকে মানুষ খারাপ মনে করে। আবার এ প্রকৃতিগত লজ্জার দাবী পূরণ করার জন্য তিনি মানুষকে কোন তৈরী করা পোশাক দেননি। বরং তার প্রকৃতিকে পোশাক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করেছেন, (اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا) যাতে নিজের বুদ্ধি ব্যবহার করে সে প্রকৃতির এ দাবীটি উপলব্ধি করতে পারে এবং আল্লাহর সৃষ্ট উপাদান ও উপকরণসমূহ কাজে লাগিয়ে নিজের জন্য পোশাক তৈরী করতে সক্ষম হয়।

দুই ঃ এ প্রাকৃতিক ও জন্মগত উপলব্ধির প্রেক্ষিতে মানুষের জন্য পোশাকের নৈতিক প্রয়োজনই অগ্রগণ্য। অর্থাৎ প্রথমে সে 'সাওআত' তথা নিজের লজ্জাস্থান আবৃত করবে। আর তার স্বভাবগত চাহিদা ও প্রয়োজন দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ তারপর তার পোশাক তার জন্য 'রীশ' অর্থাৎ তার দৈহিক সৌন্দর্য বিধান করবে এবং আবহাওয়ার প্রভাব থেকে তার দেহ সৌষ্ঠবকে রক্ষা করবে। এ পর্যায়েও মানুষ ও পশুর ব্যাপার স্বভাবতই সম্পূর্ণ ভিন্ন। পশুর শরীরের লোমশ আচ্ছাদন মূলত তার জন্য "রীশ' অর্থাৎ তার শরীরের শোভা বর্ধন ও ঋতুর প্রভাব থেকে তাকে রক্ষা করে। তার লোমশ আচ্ছাদন তার লজ্জাস্থান ঢাকার কাজ করে না। কারণ তার যৌনাংগ আদতে তার "সাওআত" বা লজ্জাস্থান নয়। কাজেই তাকে আবৃত করার জন্য পশুর স্বভাব ও প্রকৃতিতে কোন অনুভূতি ও চাহিদা থাকে না এবং তার চাহিদা পূরণ করার উদ্দেশ্যে তার জন্য কোন পোশাকও সৃষ্টি করা হয় না। কিন্তু মানুষ যখন শয়তানের নেতৃত্ব গ্রহণ করলো তখন ব্যাপারটি আবার উল্টে গেলো। শয়তান তার এ শিষ্যদেরকে এভাবে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হলো যে, তোমাদের জন্য পোশাকের প্রয়োজন পশুদের জন্য পোশাকের প্রয়োজনের সমপর্যায়ভুক্ত, আর পোশাক দিয়ে লজ্জাস্থান ঢেকে রাখার ব্যাপারটি মোটেই কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। বরং পশুদের অংগ-প্রত্যংগ যেমন তাদের লজ্জাস্থান হিসেবে বিবেচিত হয় না, ঠিক তেমনি তোমাদের এ অংগ-প্রত্যংগগুলোও লজ্জাস্থান নয় বরং এগুলো নিছক যৌনাংগ।

তিন ঃ মানুষের পোশাক কেবলমাত্র তার লজ্জাস্থান আবৃত করার এবং তার শারীরিক শোভাবর্ধন ও দেহ সংরক্ষণের উপায় হবে, এতটুকুই যথেষ্ট নয়। বরং আসলে এ ব্যাপারে তাকে অন্তত এতটুকু মহত্তর মানে পৌঁছতে হবে, যার ফলে তার পোশাক তাকওয়ার পোশাকে পরিণত হয়। অর্থাৎ তার পোশাক দিয়ে সে পুরোপুরি 'সতর' তথা লজ্জাস্থান ঢেকে ফেলবে। সৌন্দর্য চর্চা ও সাজসজ্জার মাধ্যমে শরীরের শোভা বর্ধন করার ক্ষেত্রে তা সীমা অতিক্রম করে যাবে না বা ব্যক্তির মর্যাদার চেয়ে নিম্ন মানেরও হবে না। তার মধ্যে গর্ব, অহংকার ও আত্মম্ভরিতার কোন প্রদর্শনী থাকবে না। আবার এমন কোন মানসিক রোগের প্রতিফলনও তাতে থাকবে না যার আক্রমণের ফলে পুরুষ নারীসুলভ আচরণ করতে থাকে, নারী করতে থাকে পুরুষসুলভ আচরণ এবং এক জাতি নিজেকে অন্য এক জাতির সদৃশ বানাবার প্রচেষ্টায় নিজেই নিজের হীনতা ও লাঞ্ছনার জীবন্ত প্রতীকে পরিণত হয়। যেসব লোক নবীদের প্রতি ঈমান এনে নিজেদেরকে পুরোপুরি আল্লাহর পথনির্দেশনার আওতাধীন করে দেয়নি তাদের পক্ষে পোশাকের ব্যাপারে এ কাংখিত মহত্তর মানে উপনীত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। যখন তারা আল্লাহর পথনির্দেশনা গ্রহণে অসম্মতি জানায় তখন শয়তানদেরকে তাদের পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক বানিয়ে দেয়া হয় এবং এ শয়তানরা তাদেরকে কোন না কোনভাবে ভুল-ভ্রান্তি ও অসৎকাজে লিপ্ত করেই ছাড়ে।

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ
قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾
قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾ فَرِيقًا هَدَىٰ
وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۗ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن
دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ
عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

তারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করে তখন বলে, আমাদের বাপ-দাদাদেরকে আমরা এভাবেই করতে দেখেছি এবং আল্লাহই আমাদের এমনটি করার হুকুম দিয়েছেন।[১৭] তাদেরকে বলে দাও, আল্লাহ কখনো নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার হুকুম দেন না।[১৮] তোমরা কি আল্লাহর নাম নিয়ে এমন কথা বলো যাকে তোমরা আল্লাহর কথা বলে জানো না? হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলে দাও, আমার রব তো সততা ও ইনসাফের হুকুম দিয়েছেন। তাঁর হুকুম হচ্ছে, প্রত্যেক ইবাদাতে নিজের লক্ষ্য ঠিক রাখো এবং নিজের দীনকে একান্তভাবে তাঁর জন্য করে নিয়ে তাঁকেই ডাকো। যেভাবে তিনি এখন তোমাদের সৃষ্টি করেছেন ঠিক তেমনিভাবে তোমাদের আবার সৃষ্টি করা হবে।[১৯] একটি দলকে তিনি সোজা পথ দেখিয়ে দিয়েছেন কিন্তু অন্য দলটির ওপর গোমরাহী সত্য হয়ে চেপেই বসেছে। কারণ তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানদেরকে নিজেদের অভিভাবকে পরিণত করেছে এবং তারা মনে করছে, আমরা সঠিক পথেই আছি।

হে বনী আদম! প্রত্যেক ইবাদাতের সময় তোমরা নিজ নিজ সুন্দর সাজে সজ্জিত হও।[২০] আর খাও ও পান করো কিন্তু সীমা অতিক্রম করে যেয়ো না, আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।[২১]

চার ঃ দুনিয়ার চারদিকে আল্লাহর যেসব অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে এবং যেগুলো মহাসত্যের সন্ধানলাভের ব্যাপারে মানুষকে সাহায্য করে, পোশাকের ব্যাপারটিও তার অন্যতম। তবে এখানে শর্ত হচ্ছে, মানুষের নিজের তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ওপরে আমি যেসব সত্যের দিকে ইংগিত করেছি সেগুলোকে একটু গভীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে পোশাক কোন্ দৃষ্টিতে আল্লাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন তা সহজেই অনুধাবন করা যেতে পারে।

১৭. এখানে আরববাসীদের উলংগ অবস্থায় কাবা শরীফ তাওয়াফ করার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। ইতিপূর্বে আমি এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। একটি ধর্মীয় কাজ মনে করেই তারা এটি করতো। তারা মনে করতো, আল্লাহ তাদেরকে এমনটি করার হুকুম দিয়েছেন।

১৮. আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি অতি সংক্ষিপ্ত বাক্য। কিন্তু আসলে এর মধ্যে কুরআন মজীদ উলংগ তাওয়াফকারীদের জাহেলী আকীদার বিরুদ্ধে একটি মস্তবড় যুক্তি পেশ করেছে। এ যুক্তি উপস্থাপন পদ্ধতিটি অনুধাবন করতে হলে ভূমিকা স্বরূপ দু'টি কথা অবশ্যি বুঝে নিতে হবে ঃ

এক ঃ আরববাসীরা যদিও নিজেদের কোন কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের সময় উলংগ হতো এবং একে একটি পবিত্র ধর্মীয় কাজ মনে করতো। কিন্তু উলংগ হওয়াটাকে তারা এমনিতে একটি লজ্জাজনক কাজ বলে মনে করতো এবং এটি তাদের নিকট স্বীকৃত ছিল। তাই কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্র ও অভিজাত আরব কোন সংস্কৃতিবান মজলিসে বা কোন বাজারে অথবা নিজের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে উলংগ হওয়াটাকে কোনক্রমেই পছন্দ করতো না।

দুই ঃ উলংগপনাকে লজ্জাজনক জানা সত্ত্বেও তারা একটি ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে নিজেদের ইবাদাতের সময় উলংগ হতো। আর যেহেতু নিজেদের ধর্মকে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ধর্ম বলে মনে করতো তাই তারা মনে করতো এ আনুষ্ঠানিকতাটিও আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। এরই ভিত্তিতে কুরআন মজীদ এখানে এ যুক্তি উপস্থাপন করেছে যে, যে কাজটি অশ্লীল এবং যাকে তোমরা নিজেরাও অশ্লীল বলে জানো ও স্বীকার করো সে সম্পর্কে তোমরা কেমন করে একথা বিশ্বাস করো যে, আল্লাহ এর হুকুম দিয়ে থাকবেন? আল্লাহর পক্ষ থেকে কখনো কোন অশ্লীল কাজের হুকুম আসতে পারে না। আর যদি তোমাদের ধর্মে এমন কোন হুকুম পাওয়া যায় তাহলে তোমাদের ধর্ম যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নয়, এটিই তার অকাট্য প্রমাণ।

১৯. এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের এসব অর্থহীন রীতি-আনুষ্ঠানিকতার সাথে আল্লাহর দীনের কি সম্পর্ক? তিনি যে দীনের শিক্ষা দিয়েছেন তার মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ মানুষের নিজের জীবনকে সত্য, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

দুই ঃ ইবাদাতের ক্ষেত্রে সঠিক লক্ষ্যের ওপর অবিচল থাকতে হবে অর্থাৎ তার ইবাদাতে আল্লাহ ছাড়া আর কারোর বন্দেগীর সামান্যতম স্পর্শও থাকবে না। আসল মাবুদ আল্লাহর দিকে ফিরে ছাড়া আর কোন দিকে ফিরে তার আনুগত্য, দাসত্ব, হীনতা ও দীনতার সামান্যতম প্রকাশও ঘটতে পারবে না।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۭ
قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ
كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ
مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَي اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ
اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَاۗءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝

৪ রুকূ'

হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলে দাও, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব সৌন্দর্য সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো কে হারাম করেছে? আর আল্লাহর দেয়া পবিত্র জিনিসগুলো কে নিষিদ্ধ করেছে?[২২] বলো, দুনিয়ার জীবনেও এ সমস্ত জিনিস ঈমানদারদের জন্য, আর কিয়ামতের দিনে এগুলো তো একান্তভাবে তাদেরই জন্য হবে।[২৩] এভাবে যারা জ্ঞানের অধিকারী তাদের জন্য আমার কথাগুলো আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণনা করে থাকি।

হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলে দাও, আল্লাহ যেসব জিনিস হারাম করেছেন সেগুলো হচ্ছে ঃ প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা,[২৪] গোনাহ,[২৫] সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি,[২৬] আল্লাহর সাথে তোমাদের কাউকে শরীক করা, যার স্বপক্ষে তিনি কোন সনদ পাঠাননি এবং আল্লাহর নামে তোমাদের এমন কোন কথা বলা, যা মূলত তিনি বলেছেন বলে তোমাদের জানা নেই।

প্রত্যেক জাতির জন্য অবকাশের একটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। তারপর যখন কোন জাতির সময় পূর্ণ হয়ে যাবে তখন এক মুহূর্তকালের জন্যও তাকে বিলম্বিত বা ত্বরান্বিত করা হবে না।[২৭]

তিন ঃ পথনির্দেশনা, সাহায্য, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষকতা, হেফাজত ও সংরক্ষণের জন্য একমাত্র আল্লাহরই কাছে দোয়া চাইতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, এসব বিষয়ের জন্য দোয়া প্রার্থীকে পূর্বাহ্নেই নিজের দীনকে একান্তভাবে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করতে হবে। জীবনের সমগ্র ব্যবস্থা কুফরী, শিরক, গোনাহ ও অন্যের বন্দেগীর ভিত্তিতে পরিচালিত

হবে। কিন্তু সাহায্য চাওয়া হবে আল্লাহর কাছে এ বলে, 'হে আল্লাহ! তোমার বিরুদ্ধে আমার এ বিদ্রোহে আমাকে সাহায্য করো', এমনটি যেন না হয়।

চার ঃ এ মর্মে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, এ দুনিয়ায় সে যেভাবে জন্ম নিয়েছে ঠিক তেমনিভাবে অন্য একটি জগতেও তার জন্ম হবে এবং সেখানে আল্লাহর কাছে তার সমস্ত কাজের হিসেব দিতে হবে।

২০. এখানে সুন্দর সাজ বলতে পূর্ণ পোশাক–পরিচ্ছদের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য দাঁড়াবার সময় কেবল মাত্র লজ্জাস্থান ঢাকাই যথেষ্ট হবে না বরং একই সংগে সামর্থ অনুযায়ী নিজের পূর্ণ পোশাক পরে নিতে হবে, যার মাধ্যমে লজ্জাস্থান আবৃত হবার সাথে সাথে সৌন্দর্যের প্রকাশও ঘটবে। মূর্খ ও অজ্ঞ লোকেরা নিজেদের ভ্রান্তনীতির ভিত্তিতে ইবাদাতের ক্ষেত্রে যেসব কাজ করতো এবং এখনো করে চলছে, এ নির্দেশে তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তারা মনে করতো উলংগ বা অর্ধ–উলংগ হয়ে এবং নিজেদের আকার আকৃতি ও বেশভূষা বিকৃত করে আল্লাহর ইবাদাত করা উচিত। আল্লাহ বলেন, নিজেকে সুন্দর সাজে সজ্জিত করে এমন আকার আকৃতি ধারণ করে ইবাদাত করতে হবে যার মধ্যে উলংগপনা তো দূরের কতা অশ্লীলতার লেশমাত্রও যেন না পাওয়া যায়।

২১. অর্থাৎ তোমাদের দৈন্যদশা, অনাহারক্লিষ্ট জীবন এবং হালাল জীবিকা থেকে বঞ্চিত থাকা আল্লাহর কাছে প্রিয় নয়। তাঁর বন্দেগী করার জন্য তোমাদের কোন পর্যায়ে এসবের শিকার হতে হোক—এটা তিনি চান না। বরং তোমরা তাঁর দেয়া উত্তম পোশাক পরলে এবং পবিত্র ও হালাল খাবার খেলে তিনি খুশী। মানুষ যখন হালালকে হারাম করার বা হারামকে হালাল করার জন্য তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করে তখনি সেটা তাঁর শরীয়াতে আসল গোনাহ হিসেবে চিহ্নিত হয়।

২২. এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তো তাঁর দুনিয়ার সমস্ত শোভা–সৌন্দর্য এবং সমস্ত পাক–পবিত্র জিনিস তাঁর বান্দাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। কাজেই এগুলো বান্দাদের জন্য হারাম করে দেয়া কখনো তাঁর উদ্দেশ্য হতে পারে না। এখন যদি কোন ধর্ম বা নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা এগুলোকে হারাম, ঘৃণ্য অথবা আত্মিক উন্নতির প্রতিবন্ধক গণ্য করে তাহলে তার এ কাজটিই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সেটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসেনি। বাতিল ধর্মমতগুলোর বিরুদ্ধে কুরআন যেসব যুক্তি–প্রমাণ পেশ করেছে এটি তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি। বস্তুত কুরআনের যুক্তি উপস্থাপন পদ্ধতি অনুধাবন করার জন্য এ যুক্তিটি অনুধাবন করা একান্ত অপরিহার্য।

২৩. অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সৃষ্ট সমস্ত জিনিস দুনিয়ার জীবনেও ঈমানদারদের জন্যই। কারণ তারাই আল্লাহর বিশ্বস্ত প্রজা। আর একমাত্র নিমকহালাল, বিশ্বস্ত ও অনুগত লোকেরাই অনুগ্রহলাভের অধিকারী হতে পারে। কিন্তু দুনিয়ার বর্তমান ব্যবস্থাপনা যেহেতু পরীক্ষা ও অবকাশদানের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত তাই এখানে অধিকাংশ সময় আল্লাহর অনুগ্রহগুলো নিমকহারাম ও অকৃতজ্ঞদের মধ্যেও বন্টিত হতে থাকে। আর অনেক সময় বিশ্বস্ত ও নিমকহালালদের তুলনায় তাদের ওপরই বেশী অনুগ্রহ বর্ষণ করা হয়ে থাকে। তবে আখেরাত (যেখানকার সমস্ত ব্যবস্থাপনা হক, সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ
فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا
خٰلِدُوْنَ ۝ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ
بِاٰيٰتِهٖ ۭ اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَاۗءَتْهُمْ
رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ قَالُوْا
ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ۝

(আর সৃষ্টির সূচনাপর্বেই আল্লাহ একথা পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন ঃ) হে বনী আদম! মনে রেখো, যদি তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে কোন রসূল এসে তোমাদেরকে আমার আয়াত শুনাতে থাকে, তাহলে যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকবে এবং নিজের কর্মনীতির সংশোধন করে নেবে, তার কোন ভয় এবং দুঃখের কারণ নেই। আর যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলবে এবং তার সাথে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করবে, তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে থাকবে তারা চিরকাল।[২৮] একথা সুস্পষ্ট, যে ব্যক্তি ডাহা মিথ্যা কথা বানিয়ে আল্লাহর কথা হিসেবে প্রচার করে অথবা আল্লাহর সত্য আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে? এ ধরনের লোকেরা নিজেদের তকদীরের লিখন অনুযায়ী তাদের অংশ পেতে থাকবে,[২৯] অবশেষে সেই সময় উপস্থিত হবে যখন আমার পাঠানো ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করার জন্য তাদের কাছে এসে যাবে। সে সময় তারা (ফেরেশতারা) তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, বলো, এখন তোমাদের সেই মাবুদরা কোথায়, যাদেরকে তোমরা ডাকতে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে? তারা বলবে, "সবাই আমাদের কাছ থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেছে" এবং তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, বাস্তবিক পক্ষেই তারা সত্য অস্বীকারকারী ছিল।

হবে) জীবনের আরাম আয়েশের সমস্ত উপকরণ এবং সমস্ত পবিত্র খাদ্য ও পানীয় একমাত্র অনুগত, কৃতজ্ঞ ও নিমকহালাল বান্দাদের জন্যই নির্ধারিত থাকবে। যেসব

নিমকহারাম বান্দা তাদের রবের দেয়া খাদ্য-পানীয়ে জীবন ধারণ করার পরও তাঁরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়েছে তারা এর থেকে কোন অংশই পাবে না।

২৪. বাখ্যার জন্য সূরা আন'আমের ১২৮ ও ১৩১ টীকা দেখুন।

২৫. এখানে মূল শব্দ হচ্ছে اثم (ইস্‌ম)। এর আসল অর্থ হচ্ছে, ত্রুটি-বিচ্যুতি। اثمة এমন এক ধরনের উটনীকে বলা হয়, যে দ্রুত চলতে পারে কিন্তু জেনে বুঝে অলসভাবে চলে। এ থেকেই এ শব্দের মধ্যে গোনাহের ভাবধারা সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ যখন নিজের রবের আনুগত্য করার ও তাঁর হুকুম মেনে চলার ক্ষমতা ও সামর্থ থাকা সত্ত্বেও গড়িমসি ও গাফলতী করে এবং জেনে বুঝে ভুল-ত্রুটি করে তাঁর সন্তুষ্টিলাভে অসমর্থ হয়, তখন সেই আচরণটিকেই গোনাহ বলা হয়।

২৬. অর্থাৎ নিজের সীমানা অতিক্রম করে এমন একটি সীমানায় পদার্পণ করা যেখানে প্রবেশ করার অধিকার মানুষের নেই। এ সংজ্ঞার আলোকে বিচার করলে যারা বন্দেগীর সীমানা পেরিয়ে আল্লাহর রাজ্যে স্বেচ্ছাচারী মনোভাব ও আচরণ গ্রহণ করে, যারা আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মধ্যে থেকেও নিজেদের অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্বের ডংকা বাজায় এবং যারা মানুষের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, তারা সবাই বিদ্রোহী গণ্য হয়।

২৭. অবকাশের সময় নির্দিষ্ট করার মানে এ নয়, যে, প্রত্যেক জাতির জন্য বছর, মাস, দিন ধরে একটি আয়ুষ্কাল নির্দিষ্ট করা হয় এবং এ সময়টি শেষ হয়ে যেতেই তাকে অবশ্যিই খতম করে দেয়া হয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেক জাতিকে দুনিয়ায় কাজ করার যে সুযোগ দেয়া হয়, তার কর্মকাণ্ডের মধ্যে ভাল ও মন্দের আনুপাতিক হার কমপক্ষে কতটুকু বরদাশত করা যেতে পারে, এ অর্থে তার কাজ করার একটি নৈতিক সীমানা চিহ্নিত করা হয়। যতদিন একটি জাতির মন্দ গুণগুলো তার ভাল গুণাবলীর তুলনায় ঐ আনুপাতিক হারের সর্বশেষ সীমার মধ্যে অবস্থান করতে থাকে ততদিন তাকে তার সমস্ত অসৎকর্ম সত্ত্বেও অবকাশ দেয়া হয়, আর যখন তা ঐ সর্বশেষ সীমানা পার হয়ে যায় তখন এ ধরনের অসৎ বৃত্তিসম্পন্ন ও অসৎকর্মশীল জাতিকে আর কোন বাড়তি অবকাশ দেয়া হয় না। (সূরা নূহের ৪-১০-১২ আয়াত দ্রষ্টব্য)।

২৮. কুরআন মজীদের যেখানেই আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামের জান্নাত থেকে নামিয়ে দেবার ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। (যেমন দেখুন সূরা আল বাকারার ৪ রুকূ ও সূরা তা-হা-এর ৬ রুকূ) সেখানেই একথা বলা হয়েছে। কাজেই এখানেও এটিকে এই একই ঘটনার সাথে সম্পর্কিত মনে করা হবে। অর্থাৎ যখন মানব জাতির জীবনের সূচনা হচ্ছিল ঠিক তখনই একথাটি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল। (দেখুন সূরা আলে ইমরান, ৬৯ টীকা)।

২৯. অর্থাৎ দুনিয়ায় যতদিন তাদের অবকাশের মেয়াদ নির্ধারিত থাকবে ততদিন তারা এখানে থাকবে এবং যে ধরনের ভাল বা মন্দ জীবন যাপন করার কথা তাদের নসীবে লেখা থাকবে, সেই ধরনের জীবন তারা যাপন করবে।

قَالَ ادْخُلُوا فِيْٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي
النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتّٰٓى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا
جَمِيعًا ۙ قَالَتْ أُخْرٰىهُمْ لِأُولٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ أَضَلُّونَا فَـَٔاتِهِمْ عَذَابًا
ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَقَالَتْ
أُولٰىهُمْ لِأُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾

আল্লাহ বলবেন ঃ যাও, তোমরাও সেই জাহান্নামে চলে যাও, যেখানে চলে গেছে তোমাদের পূর্বের অতিক্রান্ত জিন ও মানবগোষ্ঠী। প্রত্যেকটি দলই নিজের পূর্ববর্তী দলের প্রতি অভিসম্পাত করতে করতে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অবশেষে যখন সবাই সেখানে একত্র হয়ে যাবে তখন পরবর্তী প্রত্যেকটি দল পূর্ববর্তী দলের ব্যাপারে বলবে, হে আমাদের রব! এরাই আমাদের গোমরাহ করেছে, কাজেই এদেরকে আগুনের দ্বিগুণ শাস্তি দাও। জওয়াবে বলা হবে, প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ শাস্তিই রয়েছে কিন্তু তোমরা জানো না।[৩০] প্রথম দলটি দ্বিতীয় দলকে বলবে ঃ (যদি আমরা দোষী হয়ে থাকি) তাহলে তোমরা কোন্ দিক দিয়ে আমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলে? এখন নিজেদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো।[৩১]

৩০. অর্থাৎ সর্বাবস্থায় তোমাদের প্রত্যেকটি দল কোন না কোন দলের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী দল ছিল। কোন দলের পূর্ববর্তী দল উত্তরাধিকার হিসেবে যদি তার জন্য ভুল ও বিপথগামী চিন্তা ও কর্ম রেখে গিয়ে থাকে, তাহলে সে নিজেও তো তার পরবর্তীদের জন্য একই ধরনের উত্তরাধিকার রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। যদি একটি দলের পথভ্রষ্ট হবার কিছুটা দায়–দায়িত্ব তার পূর্ববর্তীদের ওপর বর্তায়। তাহলে তার পরবর্তীদের পথভ্রষ্ট হবার বেশ কিছু দায়–দায়িত্ব তার নিজের ওপরও বর্তায়। তাই বলা হয়েছে, প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ শাস্তিই রয়েছে। একটি শাস্তি হচ্ছে, নিজে ভুল পথ অবলম্বনের এবং অন্য শাস্তিটি অন্যদেরকে ভুল পথ দেখাবার। একটি শাস্তি নিজের অপরাধের এবং অন্য শাস্তিটি অন্যদের জন্য পূর্বাহ্নেই অপরাধের উত্তরাধিকার রেখে আসার।

এ বিষয়বস্তুটিকে হাদীসে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ

مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لاَ يَرْضَاهَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلَ اٰثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا -

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূল অপছন্দ করেন এমন কোন নতুন বিভ্রান্তিকর কাজের সূচনা করে, তার ঘাড়ে সেই সমস্ত লোকের পথভ্রষ্টতার গোনাহও চেপে বসবে। যারা তার উদ্ভাবিত পথে চলেছে। তবে এ জন্য ঐ লোকদের নিজেদের দায়-দায়িত্ব মোটেই লাঘব হবে না।"

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا اِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِاَنَّهُ اَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ -

"এই দুনিয়ায় যে ব্যক্তিকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, সেই অন্যায় হত্যাকাণ্ডের পাপের একটি অংশ হযরত আদমের সেই প্রথম সন্তানটির আমলনামায় লিখিত হয়, যে তার ভাইকে হত্যা করেছিল। কারণ মানুষ হত্যার পথ সে-ই সর্বপ্রথম উন্মুক্ত করেছিল।"

এ থেকে জানা যায়, যে ব্যক্তি বা দল কোন ভুল চিন্তা বা কর্মনীতির ভিত্ রচনা করে সে কেবল নিজের ভুলের ও গোনাহের জন্য দায়ী হয় না বরং দুনিয়ায় যতগুলো লোক তার দ্বারা প্রভাবিত হয় তাদের সবার গোনাহের দায়িত্বের একটি অংশও তার আমলনামায় লিখিত হতে থাকে। যতদিন তার এ গোনাহের প্রভাব বিস্তৃত হতে থাকে ততদিন তার আমলনামায় গোনাহ লিখিত হতে থাকে। তাছাড়া এ থেকে একথাও জানা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নেকী বা গোনাহের দায়-দায়িত্ব কেবল তার নিজের ওপরই বর্তায় না বরং অন্যান্য লোকদের জীবনে তার নেকী ও গোনাহের কি প্রভাব পড়ে সে জন্যও তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ একজন ব্যভিচারীর কথাই ধরা যাক। যাদের শিক্ষা ও অনুশীলনের দোষে, যাদের সাহচর্যের প্রভাবে, যাদের খারাপ দৃষ্টান্ত দেখে এবং যাদের উৎসাহ দানের ফলে ঐ ব্যক্তির মধ্যে যিনা করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়, তারা সবাই তার যিনাকারী হয়ে গড়ে ওঠার ব্যাপারে অংশীদার। আবার ঐ লোকগুলোও পূর্ববর্তী যেসব লোকদের কাছ থেকেই কুদৃষ্টি, কুচিন্তা, কুসংকল্প ও কুকর্মের প্ররোচনা উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করে তাদের কাঁধে পর্যন্তও তার দায়-দায়িত্ব গিয়ে পৌছায়। এমন কি এ ধারা অগ্রসর হতে হতে সেই প্রথম ব্যক্তিতে গিয়ে ঠেকে যে সর্বপ্রথম ভ্রান্ত পথে যৌন লালসা চরিতার্থ করে মানব জাতিকে ভুল পথে পরিচালিত করেছিল। এ যিনাকারীর আমলনামার এ অংশটি তার সমকালীনদের ও পূর্ববর্তী লোকদের সাথে সম্পর্কিত। এছাড়া সে নিজেও নিজের যিনা ও ব্যভিচারের জন্য দায়ী। তাকে ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল, তাকে যে বিবেকবোধ দান করা হয়েছিল, আত্মসংযমের যে শক্তি তার মধ্যে গচ্ছিত রাখা হয়েছিল, সৎলোকদের কাছ থেকে সে ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের যে জ্ঞান লাভ করেছিল, তার সামনে সৎলোকদের যেসব দৃষ্টান্ত সমুজ্জ্বল ছিল, যৌন

অসদাচারের অশুভ পরিণামের ব্যাপারে তার যেসব তথ্য জানা ছিল—সে সবের কোনটিকেও সে কাজে লাগায়নি। উপরন্তু সে নিজেকে কামনা-বাসনার এমন একটি অন্ধ আবেগের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছিল যে কোন প্রকারে নিজের আকাংখা চরিতার্থ করাই ছিল যার অভিপ্রায়। তার আমলনামার এ অংশটি তার নিজের সাথে সম্পর্কিত। তারপর এ ব্যক্তি যে গোনাহ নিজে করেছে এবং যাকে স্বকীয় প্রচেষ্টায় লালন করে চলেছে, তাকে অন্য লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। কোথাও থেকে কোন যৌন রোগের জীবাণু নিজের মধ্যে বহন করে আনে, তারপর তাকে নিজের বংশধরদের মধ্যে এবং নাজানি আরো যে কত শত বংশদরদের মধ্যে ছড়িয়ে কত শত লোকদের জীবন ধ্বংস করে তা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। কোথাও নিজের শুক্রবীজ রেখে আসে। যে শিশুটির লালন-পালনের দায়িত্ব তারই বহন করা উচিত ছিল, তাকে অন্য একজনের উপার্জনের অবৈধ অংশীদার, তার সন্তানদের অধিকার থেকে জোরপূর্বক হিস্সা গ্রহণকারী এবং তার উত্তরাধিকারে অবৈধ শরীক বানিয়ে দেয়। এ অধিকার হরণের ধারা চলতে থাকে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে বহুদূর পর্যন্ত। কোন কুমারী মেয়েকে ফুসলিয়ে ব্যভিচারের পথে টেনে আনে এবং তার মধ্যে এমন অসৎ গুণাবলী সৃষ্টি করে যা তার থেকে অন্যদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে নাজানি আরো কত দূর, কত পরিবার ও কত বংশধরদের মধ্যে পৌঁছে যায় এবং কত পরিবারে বিকৃতি আনে। নিজের সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সমাজের অন্যান্য লোকদের সামনে সে নিজের চরিত্রের একটি কুদৃষ্টান্ত পেশ করে এবং অসংখ্য লোকের চরিত্র নষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে এর প্রভাব চলতে থাকে দীর্ঘকালব্যাপী। ইনসাফের দাবী হচ্ছে, এ ব্যক্তি সমাজ দেহে যেসব বিকৃতি সৃষ্টি করলো সেগুলো তারই আমলনামায় লিখিত হওয়া উচিত এবং ততদিন পর্যন্ত লিখিত হওয়া উচিত যতদিন তার সরবরাহ করা অসৎ বৃত্তি ও অসৎকাজের ধারা দুনিয়ায় চলতে থাকে।

সৎকাজ ও পুণ্যকর্মের ব্যাপারটিও অনুরূপ। আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে আমরা নেকীর ও সৎকাজের যে উত্তরাধিকার লাভ করেছি তার প্রতিদান তাদের সবার পাওয়া উচিত, যারা সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে আমাদের যুগ পর্যন্ত এগুলো আমাদের কাছে হস্তান্তর করার ব্যাপারে অংশ নিয়েছেন। এ উত্তরাধিকার নিয়ে তাকে সযত্নে হেফাজত করার ও তার উন্নতি বিধানের জন্য আমরা যেসব প্রচেষ্টা চালাবো ও পদক্ষেপ গ্রহণ করবো তার প্রতিদান আমাদেরও পাওয়া উচিত। তারপর নিজেদের সৎ প্রচেষ্টার যেসব চিহ্ন ও প্রভাব আমরা দুনিয়ায় রেখে যাবো সেগুলোও আমাদের সৎকাজের হিসেবের খাতায় ততদিন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে লিখিত হওয়া উচিত যতদিন এ চিহ্ন ও প্রভাবগুলো দুনিয়ার বুকে অক্ষত থাকবে, মানব জাতির বংশধরদের মধ্যে এর ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকূল এর দ্বারা লাভবান হতে থাকবে।

প্রতিটি বিবেকবান ব্যক্তিই একথা স্বীকার করবেন যে, কুরআন মজীদ প্রতিদানের এই যে পদ্ধতি উপস্থাপন করেছে একমাত্র এ পদ্ধতিতেই সঠিক ও পূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ সত্যটি ভালভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হলে যারা প্রতিদানের জন্য এ দুনিয়ার বর্তমান জীবনকেই যথেষ্ট মনে করেছে এবং যারা মনে করেছে যে, জন্মান্তরের মাধ্যমে মানুষকে তার কাজের পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া যেতে পারে তাদের সবার

বিভ্রান্তিও সহজে দূর হয়ে যেতে পারে। আসলে এ উভয় দলই মানুষের কার্যকলাপ, তার প্রভাব, ফলাফল ও পরিণতির ব্যাপ্তি এবং ন্যায়সংগত প্রতিদান ও তার দাবীসমূহ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। একজন লোকের বয়স এখন ষাট বছর। সে তার এ ষাট বছরের জীবনে ভাল-মন্দ যা কিছু কাজ করেছে নাজানি উপরের দিকে কত দূর পর্যন্ত তার পূর্ব-পুরুষরা এ কাজের সাথে জড়িত এবং তাদের ওপর এর দায়িত্ব বর্তায়। আর তাদেরকে এর পুরস্কার বা শাস্তি দান করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তারপর এ ব্যক্তি আজ যে ভাল বা মন্দ কাজ করছে তার মৃত্যু সাথে সাথেই তা বন্ধ হয়ে যাবে না বরং তার প্রভাব চলতে থাকবে আগামী শত শত বছর পর্যন্ত। হাজার হাজার, লাখো লাখো বরং কোটি কোটি মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়বে। এর প্রভাব চলা ও বিস্তৃত হওয়া পর্যন্ত তার আমলনামার পাতা খোলা থাকবে। এ অবস্থায় আজই এ দুনিয়ার জীবনে এ ব্যক্তিকে তার উপার্জনের সম্পূর্ণ ফসল প্রদান করা কেমন করে সম্ভব? কারণ তার উপার্জনের এক লাখ ভাগের এক ভাগও এখনো অর্জিত হয়নি। তাছাড়া এ দুনিয়ার সীমিত জীবন ও এর সীমিত সম্ভাবনা আদতে এমন কোন অবকাশই রাখেনি যার ফলে এখানে কোন ব্যক্তি তার উপার্জনের পূর্ণ ফসল লাভ করতে পারে। মনে করুন, কোন ব্যক্তি দুনিয়ায় এক মহাযুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং তার এ মারাত্মক অপকর্মের বিপুল বিষময় কুফল হাজার বছর পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এ ব্যক্তির এ ধরনের অপরাধের কথা একবার কল্পনা করুন। এ দুনিয়ায় যত বড় ধরনের দৈহিক, নৈতিক, মানসিক অথবা বস্তুগত শাস্তি দেয়া সম্ভব, তার কোনটিও কি তার এ অপরাধের ন্যায়সংগত পরিপূর্ণ শাস্তি হতে পারে? অনুরূপভাবে দুনিয়ার সবচাইতে বড় যে পুরস্কারের কথা কল্পনা করা যেতে পারে, তার কোনটিও কি এমন এক ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট হতে পারে, যে সারা জীবন মানবজাতির কল্যাণার্থে কাজ করে গেছে এবং হাজার হাজার বছর পর্যন্ত অসংখ্য মানব সন্তান যার প্রচেষ্টার ফসল থেকে লাভবান হয়ে চলেছে? যে ব্যক্তি কর্ম ও প্রতিদানের বিষয়টিকে এ দৃষ্টিতে বিচার করবে সে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করবে যে, কর্মফলের জন্য আসলে আর একটি জগতের প্রয়োজন, যেখানে পূর্বের ও পরের সমগ্র মানব গোষ্ঠী একত্র হবে, সকল মানুষের আমলনামা বন্ধ হয়ে যাবে, হিসেব গ্রহণ করার জন্য একজন সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানময় আল্লাহ বিচারের আসনে বসবেন এবং কর্মের পুরোপুরি প্রতিদান লাভ করার জন্য মানুষের কাছে সীমাহীন জীবন ও তার চারদিকে পুরস্কার ও শাস্তির অঢেল সম্ভাবনা বিরাজিত থাকবে।

আবার এই একই দিক সম্পর্কে চিন্তা করলে জন্মান্তরবাদীদের আর একটি মৌলিক ভ্রান্তির অপনোদনও হতে পারে। এ ভ্রান্তিটিই তাদের পুনর্জন্মের ধারণা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। তারা এ সত্যটি উপলব্ধি করতে পারেনি যে, মাত্র একটি সংক্ষিপ্ত পঞ্চাশ বছরের জীবনের কর্মফল ভোগের জন্য তার চাইতে হাজার গুণ বেশী দীর্ঘ জীবনের প্রয়োজন হয়। অথচ পুনর্জন্মবাদের ধারণা মতে তার পরিবর্তে পঞ্চাশ বছরের জীবন শেষ হতেই দ্বিতীয় আর একটি দায়িত্বপূর্ণ জীবন, তারপর তৃতীয় জীবন এ দুনিয়াতেই শুরু হয়ে যায়। আবার এসব জীবনে পুনরায় শাস্তিযোগ্য বা পুরস্কারযোগ্য বহু কাজ করা হতে থাকে। এভাবে তো হিসেব চুকে যাওয়ার পরিবর্তে আরো বাড়তেই থাকবে এবং কোন দিন তা খতম হওয়া সম্ভব হবে না।

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ
السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ
غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٢﴾

৫ রুকূ'

নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাদের জন্য কখনো আকাশের দরজা খুলবে না। তাদের জান্নাতে প্রবেশ এমনই অসম্ভব ব্যাপার যেমন সূঁচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করানো। অপরাধীরা আমার কাছে এভাবেই বদলা পেয়ে থাকে। তাদের জন্য বিছানাও হবে জাহান্নামের এবং ওপরের আচ্ছাদনও হবে জাহান্নামের। এ প্রতিফল আমি জালেমদেরকে দিয়ে থাকি। অন্যদিকে যারা আমার আয়াত মেনে নিয়েছে এবং সৎকাজ করেছে—আর এ পর্যায়ে আমি কাউকে তার সামর্থের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করি না—তারা হচ্ছে জান্নাতবাসী। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।

৩১. জাহান্নামবাসীদের এ পারস্পরিক সংলাপ ও তর্ক-বিতর্ক কুরআন মজীদের আরো কয়েকটি স্থানে বর্ণিত হয়েছে। যেমন সূরা সাবা'র ৪ রুকূ'তে বলা হয়েছে ঃ "হায়! তোমরা যদি সেই সময়টি দেখতে পেতে যখন এ জালেমরা নিজেদের রবের সামনে দাঁড়াবে এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে থাকবে। যাদেরকে দুনিয়ায় দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তারা বড় ও শক্তিশালীর আসনে যারা বসেছিল তাদেরকে বলবে ঃ তোমরা না থাকলে আমরা মু'মিন হতাম। বড় ও শক্তিশালীর আসনে যারা বসেছিল, তারা দুর্বল করে রাখা লোকদেরকে জবাব দেবে ঃ তোমাদের কাছে যখন হেদায়াত এসেছিল তখন আমরা কি তা গ্রহণ করতে তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিলাম? না, তা নয়, বরং তোমরা নিজেরাই অপরাধী ছিলে।" এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা আবার কবে হেদায়াতের প্রত্যাশী ছিলে? আমরা যদি তোমাদেরকে দুনিয়ার লোভ দেখিয়ে নিজেদের দাসে পরিণত করে থাকি, তাহলে তোমরা লোভী ছিলে বলেই তো আমাদের ফাঁদে পা দিয়েছিলে। যদি আমরা তোমাদেরকে কিনে নিয়ে থাকি, তাহলে তোমরা নিজেরাই তো বিকোবার জন্য তৈরী ছিলে,

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۚ
وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ
هَدَانَا اللَّهُ ۚ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ
الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

তাদের মনে পরস্পরের বিরুদ্ধে যা কিছু গ্লানি থাকবে তা আমি বের করে দেবো।[৩২] তাদের নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে এবং তারা বলবে ঃ "প্রশংসা সব আল্লাহরই জন্য, যিনি আমাদের এ পথ দেখিয়েছেন। আমরা নিজেরা পথের সন্ধান পেতাম না যদি না আল্লাহ আমাদের পথ দেখাতেন। আমাদের রবের পাঠানো রসূলগণ যথার্থ সত্য নিয়েই এসেছিলেন।" সে সময় আওয়াজ ধ্বনিত হবে ঃ "তোমাদেরকে এই যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে, এটি তোমরা লাভ করেছো সেই সমস্ত কাজের প্রতিদানে যেগুলো তোমরা অব্যাহতভাবে করতে।"[৩৩]

তবেই না আমরা কিনতে পেরেছিলাম। যদি আমরা তোমাদেরকে বস্তুবাদ, বৈষয়িক লালসা, জাতিপূজা এবং এ ধরনের আরো বিভিন্ন প্রকার গোমরাহী ও অসৎকাজে লিপ্ত করে থাকি, তাহলে তোমরা নিজেরাই তো আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দুনিয়ার পূজারী সেজেছিলে, তবেই না তোমরা আল্লাহর আনুগত্য ও আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহবানকারীদেরকে ত্যাগ করে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। যদি আমরা তোমাদেরকে ধর্মের আবরণে প্রতারিত করে থাকি, তাহলে যে জিনিসগুলো আমরা পেশ করছিলাম এবং তোমরা লুফে নিচ্ছিলে, সেগুলোর চাহিদা তো তোমাদের নিজেদের মধ্যেই ছিল। তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমনসব প্রয়োজন পূরণকারী খুঁজে বেড়াচ্ছিলে, যারা তোমাদের কাছে কোন নৈতিক বিধানের আনুগত্যের দাবী না করেই কেবলমাত্র তোমাদের ইপ্সিত কাজই করে যেতে থাকতো। আমরা সেই সব প্রয়োজন পূরণকারী তৈরী করে তোমাদেরকে দিয়েছিলাম। তোমরা আল্লাহর আদেশ নিষেধ থেকে বেপরোয়া হয়ে দুনিয়ার কুকুর হয়ে গিয়েছিলে এবং তোমাদের পাপ মোচনের জন্য এমন এক ধরনের সুপারিশকারী খুঁজে বেড়াচ্ছিলে যারা তোমাদের গোনাহ মাফ করিয়ে দেয়ার সমস্ত দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়ে নেবে। আমরা সেই সব সুপারিশকারী তৈরী করে তোমাদের কাছে সরবরাহ করেছিলাম। তোমরা নিরস ও স্বাদ-গন্ধহীন দীনদারী, পরহেজগারী, কুরবানী এবং প্রচেষ্টা ও সাধনার পরিবর্তে নাজাতলাভের জন্য অন্য কোন পথের সন্ধান চাচ্ছিলে। তোমরা চাচ্ছিলে এ পথে তোমাদের প্রবৃত্তি ও লালসা চরিতার্থ করতে, নানা প্রকার স্বাদ আহরণ করতে কোন বাধা না থাকে এবং প্রবৃত্তি ও লালসা যেন সব রকমের বিধি-নিষেধের আওতামুক্ত থাকে। আমরা এ ধরনের সুদৃশ্য ধর্ম উদ্ভাবন করে তোমাদের সামনে রেখেছিলাম। মোটকথা দায়-দায়িত্ব কেবল আমাদের একার নয়। তোমরাও এতে

সমান অংশীদার। আমরা যদি গোমরাহী সরবরাহ করে থাকি, তাহলে তোমরা ছিলে তার খরিদ্দার।

৩২. অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে এ সৎলোকদের মধ্যে কিছু পারস্পরিক তিক্ততা, মনোমালিন্য ও ভুল বুঝাবুঝি থেকে থাকলেও আখেরাতের জীবনে তা সব দূর করে দেয়া হবে। তাদের মন পরস্পরের ব্যাপারে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তারা পরস্পর আন্তরিকতা সম্পন্ন অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। দুনিয়ায় যে ব্যক্তি তাদের বিরোধী ছিল, যে তাদের সাথে লড়াই করেছিল এবং তাদের বিরূপ সমালোচনা করেছিল, তাকে তাদের সাথে জান্নাতের আপ্যায়নে শামিল থাকতে দেখে তাদের কারোর মনে কোন প্রকার কষ্টের উদ্রেক হবে না। এ আয়াতটি পড়ে হযরত আলী (রা) বলেছিলেন ঃ আমি আশা করি, আল্লাহ আমার, উসমানের, তালহার ও যোবাইরের মধ্যে সাফাই করে দেবেন।

এ আয়াতটিকে ব্যাপকতর দৃষ্টিতে দেখলে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, এ দুনিয়ায় সৎলোকদের গায়ে ঘটনাক্রমে যেসব দাগ বা কলংক লেগে যায়, সেই দাগগুলো সহকারে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন না। বরং সেখানে প্রবেশ করার আগে নিজের বিশেষ অনুগ্রহে তাদেরকে একেবারে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে নেবেন এবং একটি নিরেট নিষ্কলংক জীবন নিয়ে তারা সেখানে উপস্থিত হবেন।

৩৩. বেহেশ্‌তে এ ধরনের একটি মজার ব্যাপার ঘটবে। জান্নাতবাসীরা নিজেদের কাজের জন্য অহংকারে মেতে উঠবে না। তারা একথা মনে করবে না যে, তারা এমন কাজ করেছিল যার বিনিময়ে তাদের জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গিয়েছিল। বরং তারা আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে। তারা বলবে, এসব আমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ, নয়তো আমরা এর যোগ্য ছিলাম না। অন্যদিকে আল্লাহ তাদের ওপর নিজের অনুগ্রহের বড়াই করবেন না। বরং জবাবে বলবেন, তোমরা নিজেদের কাজের বিনিময়ে এ মর্যাদার অধিকারী হয়েছো। তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হচ্ছে সবই তোমাদের মেহনতের ফসল। এগুলো ভিক্ষে করে পাওয়া নয় বরং তোমাদের প্রচেষ্টার ফল এবং তোমাদের কাজের মজুরী। নিজেদের মেহনতের বিনিময়ে তোমরা এসব সম্মানজনক জীবিকা অর্জনের অধিকার লাভ করেছো। অপর দিকে আল্লাহ তাঁর জবাবের কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন না যে, "আমি একথা বলবো" বরং তিনি বলছেন, "আওয়াজ ধ্বনিত হবে"—এভাবে বর্ণনা করার কারণে বিষয়টি আরো বেশী আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

আসলে এই একই ধরনের সম্পর্ক দুনিয়ায় আল্লাহ ও তাঁর নেক বান্দাদের মধ্যেও রয়েছে। দুরাচারী লোকেরা দুনিয়ায় যে অনুগ্রহ লাভ করে থাকে তারা সে জন্য গর্ব করে বেড়ায়। তারা বলে থাকে, এসব আমাদের যোগ্যতা, প্রচেষ্টা–সাধনা ও কর্মের ফল। আর এ জন্যই তারা প্রত্যেকটি অনুগ্রহলাভের কারণে আরো বেশী অহংকারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীতে পরিণত হতে থাকে। বিপরীত পক্ষে সৎলোকেরা যে কোন অনুগ্রহ লাভ করুক না কেন তাকে অবশ্যি আল্লাহর দান মনে করে। সে জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আল্লাহর দান যতই বাড়তে থাকে ততই তারা বিনয় প্রকাশ করতে থাকে এবং ততই তাদের দয়া, স্নেহ ও বদান্যতা বেড়ে যেতে থাকে। তারপর আখেরাতের ব্যাপারেও তারা নিজেদের সৎকর্মের জন্য অহংকারে মত্ত হয় না। তারা একথা বলে না

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا
رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؕ قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَاَذَّنَ
مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَبَيْنَهُمَا
حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا بِسِيْمٰهُمْ ۚ وَنَادَوْا اَصْحٰبَ
الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۫ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَاِذَا صُرِفَتْ
اَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ اَصْحٰبِ النَّارِ ۙ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾

তারপর জান্নাতের অধিবাসীরা জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে ডেকে বলবে : "আমাদের রব আমাদের সাথে যে সমস্ত ওয়াদা করেছিলেন তার সবগুলোকেই আমরা সঠিক পেয়েছি, তোমাদের রব যেসব ওয়াদা করেছিলেন তোমরাও কি সেগুলোকে সঠিক পেয়েছো?" তারা জবাবে বলবে : "হাঁ", তখন একজন ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করবে : "আল্লাহর লানত সেই জালেমদের ওপর, যারা মানুষকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিতো এবং তাকে বাঁকা করে দিতে চাইতো আর তারা ছিল আখেরাত অস্বীকারকারী।"

এ উভয় দলের মাঝখানে থাকবে একটি অন্তরাল। এর উঁচু স্থানে (আ'রাফ) অপর কিছু লোক থাকবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করেনি ঠিকই কিন্তু তারা হবে তার প্রার্থী।[৩৪] তারা প্রত্যেককে তার লক্ষণের সাহায্যে চিনে নেবে। জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে তারা বলবে : "তোমাদের প্রতি শান্তি হোক!" আর যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামবাসীদের দিকে ফিরবে, তারা বলবে : "হে আমাদের রব! এ জালেমদের সাথে আমাদের শামিল করো না।

যে, তাদের গুনাহখাতা নিশ্চিতভাবেই মাফ করে দেয়া হবে। বরং নিজেদের ভুল-ত্রুটির জন্য তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকে। নিজেদের কর্মফলের পরিবর্তে আল্লাহর করুণা ও মেহেরবানীর ওপর পূর্ণ আস্থাশীল হয়। তারা সবসময় ভয় করতে থাকে,

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ قَالُوْا مَآ
اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٤٨﴾ اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ
اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ؕ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ
اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٤٩﴾

৬ রুকূ'

আবার এ আ'রাফের লোকেরা জাহান্নামের কয়েকজন বড় বড় ব্যক্তিকে তাদের আলামত দেখে চিনে নিয়ে ডেকে বলবে ঃ "দেখলে তো তোমরা, আজ তোমাদের দলবলও তোমাদের কোন কাজে লাগলো না। আর তোমাদের যেই সাজ–সরঞ্জামকে তোমরা অনেক বড় মনে করতে তাও কোন উপকারে আসলো না। আর এ জান্নাতের অধিবাসীরা কি তারাই নয়, যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম খেয়ে বলতে, এদেরকে তো আল্লাহ তাঁর রহমত থেকে কিছুই দেবেন না? আজ তাদেরকেই বলা হয়েছে, প্রবেশ করো জান্নাতে—তোমাদের কোন ভয়ও নেই, দুঃখও নেই।"

তাদের আমলনামায় প্রাপ্যের পরিবর্তে কোন দেনার খাত বের হয়ে না আসে। বুখারী ও মুসলিম উভয় হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اِعْلَمُوْا اَنَّ اَحَدَكُمْ لَنْ يُّدْخِلَهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ

"খুব ভালভাবেই জেনে রাখো, তোমরা নিছক নিজেদের কর্মকাণ্ডের জোরে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! আপনিও? জবাব দিলেন, হাঁ আমিও–

اِلَّا اَنْ يَّتَغَمَّدَنِىَ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ عَنْهُ وَفَضْلٍ

"হাঁ, তবে যদি আল্লাহ আমাকে তাঁর রহমত ও অনুগ্রহের আবরণে ঢেকে নেন।"

৩৪. অর্থাৎ এ আ'রাফাবাসীরা হবে এমন একদল লোক, যাদের জীবনের ও কর্মকাণ্ডের ইতিবাচক বা ভাল দিক এত বেশী শক্তিশালী হবে না, যার ফলে তারা জান্নাতলাভ করতে সক্ষম হয়, আবার এর নেতিবাচক বা খারাপ দিকও এত বেশী খারাপ হবে না, যার ফলে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা যেতে পারে। তাই তারা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি সীমান্ত এলাকায় অবস্থান করবে।

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ
اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۭ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝
الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ
نَنْسٰىهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ۝

আর জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে বলবে ঃ সামান্য একটু পানি আমাদের উপর ঢেলে দাও না। অথবা আল্লাহ তোমাদের যে রিযিক দান করেছেন তা থেকেই কিছু ফেলে দাও না। তারা জবাবে বলবে ঃ আল্লাহ এ দু'টি জিনিসই সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য হারাম করেছেন, যারা নিজেদের দীনকে খেলা ও কৌতুকের ব্যাপার বানিয়ে নিয়েছিল এবং দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারণায় নিমজ্জিত করেছিল। আল্লাহ বলেন, আজ আমিও তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে ভুলে যাবো যেভাবে তারা এ দিনটির মুখোমুখী হওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিল এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল।৩৫

৩৫. জান্নাতবাসী, জাহান্নামবাসী ও আ'রাফবাসীদের এ পারস্পরিক সংলাপ থেকে পরকালীন জীবনে মানুষের শক্তির সীমানা কতদূর বিস্তৃত হবে তা কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে। সেখানে দৃষ্টিশক্তি এতটা প্রসারিত হবে যার ফলে জান্নাত, জাহান্নাম বা আ'রাফের লোকেরা যখন ইচ্ছা পরস্পরকে দেখতে পারবে। সেখানে আওয়াজ ও শ্রবণশক্তিও হবে বহু দূরপাল্লার। ফলে এ পৃথক পৃথক জগতের লোকেরা পরস্পরের সাথে অতি সহজেই কথাবার্তা বলতে পারবে। পরকালীন জগত সম্পর্কে এ বর্ণনা এবং এ ধরনের আরো যেসব বর্ণনা কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে তা এ ধারণা সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট যে, সেখানকার জীবন যাপনের বিধান আমাদের এ দুনিয়ার প্রাকৃতিক বিধান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর হবে। অবশ্যি এখানে আমাদের যে ব্যক্তি–সত্তা রয়েছে সেখানেও তাই থাকবে। তবে যেসব লোকের মস্তিষ্ক এ প্রাকৃতিক জগতের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়ে গেছে এবং বর্তমান জীবন ও এর সংক্ষিপ্ত পরিমাপগুলো ছাড়া ব্যাপকতর কোন জিনিসের ধারণা যাদের মস্তিষ্কে সংকুলান হয় না, তারা কুরআন ও হাদীসের এ ধরনের বর্ণনাগুলোকে অবাক দৃষ্টিতে দেখে থাকে এবং কখনো কখনো এগুলোকে বিদ্রূপও করে থাকে। এভাবে তারা তাদের বুদ্ধির স্বল্পতারই প্রমাণ দিয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের বুদ্ধির পরিসর যতটা সংকীর্ণ, জগত ও জীবনের সম্ভাবনাগুলো ততটা সংকীর্ণ নয়।

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾
هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِىْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ
مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا
لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٥٣﴾

আমি এদের কাছে এমন একটি কিতাব নিয়ে এসেছি যাকে পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে বিশদ ব্যাখ্যামূলক করেছি[৩৬] এবং যা ঈমানদারদের জন্য পথনির্দেশনা ও রহমতস্বরূপ[৩৭] এখন এরা কি এর পরিবর্তে এ কিতাব যে পরিণামের খবর দিচ্ছে তার প্রতীক্ষায় আছে?[৩৮] যেদিন সেই পরিণাম সামনে এসে যাবে সেদিন যারা তাকে উপেক্ষা করেছিল তারাই বলবে ঃ "যথার্থই আমাদের রবের রসূলগণ সত্য নিয়ে এসেছিলেন। এখন কি আমরা এমন কিছু সুপারিশকারী পাবো যারা আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে? অথবা আমাদের পুনরায় ফিরে যেতে দেয়া হবে, যাতে পূর্বে আমরা যা কিছু করতাম তার পরিবর্তে এখন অন্য পদ্ধতিতে কাজ করে দেখাতে পারি?"[৩৯] তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং যে মিথ্যা তারা রচনা করেছিল তার সবটুকুই আজ তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে।

৩৬. অর্থাৎ এতে পরিপূর্ণ বিশদ বিবরণ সহকারে যথার্থ সত্য, মানুষের জন্য দুনিয়ার জীবনে সঠিক কর্মনীতি এবং সঠিক জীবন পদ্ধতির মূল নীতিগুলো কি কি, তা বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর নিছক আন্দাজ-অনুমান বা ধারণা-কল্পনার ভিত্তিতে এ বিস্তারিত বিবরণগুলো দেয়া হয়নি। বরং নির্ভেজাল ও নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে।

৩৭. অর্থ হচ্ছে, প্রথমত এ কিতাবের বিষয়বস্তু ও এর শিক্ষাবলী এত বেশী স্পষ্ট যে, এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে যে কোন মানুষের সামনে সত্য পথ পরিষ্কারভাবে ভেসে উঠতে পারে। তাছাড়া যারা এ কিতাবকে মানে, এ কিতাবটি তাদের জীবনে কেমন সঠিক পথনির্দেশনা দেয় এবং এটি যে কতবড় অনুগ্রহ তা তাদের জীবনের ঘটনাবলী থেকে কার্যত প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। এর প্রভাব গ্রহণ করার সাথে সাথেই মানুষের মন-মানস, নৈতিক বৃত্তি ও চরিত্রে সর্বোত্তম বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। এ কিতাবের প্রতি ঈমান আনার পর সাহাবায়ে কেরামের জীবনে যে বিস্ময়কর পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল তার দিকে এখানে ইশারা করা হয়েছে।

৩৮. এ বিষয়বস্তুটিকে অন্য কথায় এভাবে বলা যেতে পারে, এক ব্যক্তিকে অত্যন্ত যুক্তিসংগত পদ্ধতিতে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয় কিন্তু এরপরও

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ
اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ
اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ
خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

৭ রুকূ'

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তোমাদের রব, যিনি আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।[৪০] তারপর তিনি নিজের কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন হন।[৪১] তিনি রাত দিয়ে দিনকে ঢেকে দেন তারপর রাতের পেছনে দিন দৌড়িয়ে চলে আসে। তিনি সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি সৃষ্টি করেন। সবাই তাঁর নির্দেশের অনুগত। জেনে রাখো, সৃষ্টি তাঁরই এবং নির্দেশও তাঁরই।[৪২] আল্লাহ বড়ই বরকতের অধিকারী[৪৩] তিনি সমগ্র বিশ্ব জাহানের মালিক ও প্রতিপালক। তোমাদের রবকে ডাকো কান্নাজড়িত কণ্ঠে ও চুপে চুপে। অবশ্যি তিনি সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। দুনিয়ায় সুস্থ পরিবেশ বহাল করার পর আর সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।[৪৪] আল্লাহকেই ডাকো ভীতি ও আশা সহকারে।[৪৫] নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীল লোকদের নিকটবর্তী।

সে তা মানতে প্রস্তুত হয় না। তারপর তার সামনে কিছু লোক সঠিক পথে চলে দেখিয়েও দেয় যে, ভুল পথে চলার সময় তারা কেমন ছিল এবং এখন সঠিক পথ অবলম্বন করার পর তাদের জীবনে কত ভাল পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু এ থেকেও ঐ ব্যক্তি কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না তাহলে এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, এখন ঐ ব্যক্তি নিজের ভুল পথে চলার শাস্তি লাভ করার পরই কেবল একথা মেনে নেবে যে, সে ভুল পথে ছিল। যে ব্যক্তি ডাক্তারের জ্ঞানগর্ভ পরামর্শ গ্রহণ করে না এবং নিজের মত অসংখ্য রোগীকে ডাক্তারের পরামর্শ মত চলে রোগমুক্ত হতে দেখেও তা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না, সে এখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত হয়েই কেবল একথা স্বীকার করবে যে, যেভাবে ও যে পদ্ধতিতে সে জীবন যাপন করে আসছিল তা সত্যিই তার জন্য ধ্বংসকর ছিল।

৩৯. অর্থাৎ তারা পুনর্বার এ দুনিয়ায় ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করবে। তারা বলবে, আমাদের যে সত্যের খবর দেয়া হয়েছিল এবং তখন আমরা যে সত্যটি মেনে নেইনি, এখন চাক্ষুষ দেখার পর আমরা সে ব্যাপারে জেনে গেছি। কাজেই এখন যদি আমাদের আবার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেযা হয় তাহলে এখন আমাদের কর্মপদ্ধতি আর আগের মত হবে না। (এ মিনতি এবং এর কি জবাব দেয়া হবে তা জানার জন্য দেখুন সূরা আন'আম আয়াত ২৭-২৮, ইবরাহীম ৪৪-৪৫, সাজ্‌দা ১২-১৩, ফাতের ৩৭, যুমার ৫৬-৫৯, মুমিন ১১-১২)।

৪০. এখানে দিন শব্দটি প্রচলিত ২৪ ঘন্টার দিন অর্থে অথবা যুগ বা কাল (PERIOD) অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। শেষোক্ত অর্থে কুরআনে একাধিক ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন সূরা হজ্জের ৬ রুকূতে (আয়াত ৪৭) বলা হয়েছে ঃ

وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ○

(আর প্রকৃতপক্ষে তোমরা যে হিসাব কষে থাকো সেই দৃষ্টিতে তোমার রবের এখানে একটি দিন এক হাজার বছরের সমান)।

আবার সূরা মা'আরিজ-এর ৪নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ

(ফেরেশতারা ও জিব্রীল তাঁর দিকে আরোহণ করে একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর)। তবে এখানে 'দিন' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য কি, তা আল্লাহই ভাল জানেন। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, সূরা হামীম সাজদা-টীকা ১১-১৫)

৪১. আল্লাহর "ইস্তিওয়া আলাল আরশ" (কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন হওয়া")-এর বিস্তারিত স্বরূপ অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে কঠিন। খুব সম্ভবত সমগ্র বিশ্ব-জাহান সৃষ্টির পর মহান আল্লাহ কোন একটি স্থানকে তাঁর এ অসীম সাম্রাজ্যের কেন্দ্র নির্ধারণ করেন এবং সেখানে নিজের আলোক রশ্মীর বিচ্ছুরণকে কেন্দ্রীভূত করে দেন আর তারই নাম দেন "আরশ" (কর্তৃত্বের আসন)। সেখান থেকে সমগ্র বিশ্ব-জাহানে নব নব সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে ও ক্রমাগত শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটছে, সেই সাথে সৃষ্টি জগতের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনাও অব্যাহত রয়েছে। আবার এও সম্ভব হতে পারে যে, আরশ অর্থ শাসন কর্তৃত্ব এবং আরশের ওপর সমাসীন হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ এ বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করার পর এর শাসন দণ্ড নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। মোটকথা আরশের ওপর সমাসীন হওয়ার বিস্তারিত অর্থ যাই হোক না কেন মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ যে, এ বিশ্ব-জগতের নিছক স্রষ্টাই নন বরং এর পরিচালক ও ব্যবস্থাপকও একথা ভালভাবে হৃদয়ংগম করানোই কুরআনে এর উল্লেখের আসল উদ্দেশ্য। তিনি এ দুনিয়াকে অস্তিত্বশীল করার পর এর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে কোথাও বসে যাননি। বরং কার্যত তিনিই সারা বিশ্ব-জাহানের ছোট বড় প্রত্যেকটি বস্তুর ওপর কর্তৃত্ব করছেন। পরিচালনা ও শাসন কর্তৃত্বের যাবতীয় ক্ষমতা কার্যত তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। প্রতিটি বস্তু তাঁর নির্দেশের অনুগত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণাও তাঁর নির্দেশ মেনে চলে। প্রতিটি বস্তু ও প্রাণীর ভাগ্যই চিরন্তনভাবে তাঁর নির্দেশের সাথে যুক্ত। যে মৌলিক বিভ্রান্তিটির কারণে মানুষ কখনো শিরকের

গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েছে আবার কখনো নিজেকে স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন ঘোষণা করার মতো ভ্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, কুরআন এভাবে তার মূলোৎপাটন করতে চায়। বিশ্ব-জাহানের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা থেকে আল্লাহকে কার্যত সম্পর্কহীন মনে করার অনিবার্য ফল দাঁড়ায় দু'টি। মানুষ নিজের ভাগ্যকে অন্যের হাতে বন্দী মনে করবে এবং তার সামনে মাথা নত করে দেবে অথবা নিজেকেই নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা মনে করবে এবং নিজেকে সর্বময় কর্তৃত্বশালী স্বাধীন সত্তা মনে করে কাজ করে যেতে থাকবে।

এখানে আরো একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ক সুস্পষ্ট করার জন্য কুরআন মজীদে মানুষের ভাষা থেকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এমন সব শব্দ, পরিভাষা, উপমা ও বর্ণনাভংগী গ্রহণ করা হয়েছে, যা রাজত্ব ও বাদশাহীর সাথে সম্পর্ক রাখে। এ বর্ণনাভংগী কুরআনে এত বেশী স্পষ্ট যে, অর্থ বুঝে কুরআন পাঠকারী যে কোন ব্যক্তিই এ বিষয়টি অনুভব না করে থাকতে পারবেন না। কোন কোন অর্বাচীন সমালোচক স্বীয় বিকৃত চিন্তা ও মানসিকতার কারণে এ বাচনভংগী থেকে বুঝেছেন যে, এ কিতাবটি যে যুগের "রচনা" সে যুগে মানুষের মন-মস্তিষ্কে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভাব ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল। তাই এ কিতাবের রচয়িতা (এ বিবেকহীন নিন্দুকদের মতে এর রচয়িতা নাকি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহকে একজন রাজা ও বাদশাহ হিসেবেই পেশ করেছেন। অথচ কুরআন যে শাশ্বত ও অনাদি-অনন্ত সত্য উপস্থাপন করছে তা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সে সত্যটি হচ্ছে, ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে একমাত্র আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) বলতে যা বুঝায় তা একমাত্র তারই সত্তার একচেটিয়া অধিকার ও বৈশিষ্ট। আর বিশ্ব-জাহানের এ ব্যবস্থাপনা একটি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা বিশেষ, যেখানে ঐ একক সত্তা সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী। কাজেই এ ব্যবস্থার মধ্যে যে ব্যক্তি বা দল নিজের বা অন্য কারুর আংশিক বা পূর্ণ কর্তৃত্বের দাবীদার হয়, সে নিজেকে নিছক প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে রেখেছে। তাছাড়া এ ব্যবস্থার মধ্যে অবস্থান করে মানুষের পক্ষে ঐ একক সত্তাকে একই সাথে ধর্মীয় অর্থেও একমাত্র মাবুদ এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অর্থেও একমাত্র শাসক (Sovereign) হিসেবে মেনে নেয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন সঠিক দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি হতে পারে না।

৪২. "আরশের উপর সমাসীন হলেন" বাক্যটির মাধ্যমে সংক্ষেপে যে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছিল এখানে তারই কিছুটা অতিরিক্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ নিছক স্রষ্টাই নন, তিনি হুকুমকর্তা এবং শাসকও। তিনি সৃষ্টি করার পর নিজের সৃষ্ট বস্তুসমূহকে অন্যের কর্তৃত্বে সোপর্দ করে দেননি অথবা সমগ্র সৃষ্টিকে বা তার অংশ বিশেষকে ইচ্ছামত চলার জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেননি। বরং কার্যত সমগ্র বিশ্ব-জগতের পরিচালন ব্যবস্থা আল্লাহর নিজের হাতেই কেন্দ্রীভূত রয়েছে। দিন-রাত্রির আবর্তন আপনা আপনিই হচ্ছে না। বরং আল্লাহর হুকুমে হচ্ছে। তিনি যখনই চাইবেন দিন ও রাতকে থামিয়ে দেবেন আবার যখনই চাইবেন এ ব্যবস্থা বদলে দেবেন। সূর্য, চন্দ্র, তারকা এরা কেউ নিজস্ব কোন শক্তির অধিকারী নয়। বরং এরা সবাই সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন। এরা একান্ত অনুগত দাসের মত সেই কাজই করে যাচ্ছে যে কাজে আল্লাহ এদেরকে নিযুক্ত করেছেন।

৪৩. বরকতের আসল অর্থ হচ্ছে, বৃদ্ধি, উন্নতি, বিকাশ। এই সংগে এ শব্দটির মধ্যে একদিকে উচ্চতা ও মহত্বের ভাবধারা নিহিত রয়েছে এবং অন্যদিকে রয়েছে স্থীতিশীলতা ও অবিচলতার ভাবধারাও। আবার মংগল ও কল্যাণের ভাবধারাও নিশ্চিতভাবে এসব অর্থের অন্তরভুক্ত রয়েছে। কাজেই আল্লাহর বড়ই বরকতের অধিকারী হবার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, তাঁর মংগল ও কল্যাণের কোন সীমা নেই। তাঁর সত্তা থেকে সীমাহীন কল্যাণ চতুর্দিকে বিস্তৃত হচ্ছে এবং তিনি অতি উন্নত ও শ্রেষ্ঠ এক সত্তা। তাঁর মহত্বের কোন শেষ নেই। আর তাঁর এ কল্যাণ, মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব চিরস্থায়ী ও অনন্তকালীন—সাময়িক নয়। এর ক্ষয়ও নেই। পতনও নেই। (আল-ফুরকান, টীকা ১-১৯ দ্রষ্টব্য)।

৪৪. "পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।"—অর্থাৎ পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত ও বিনষ্ট করো না। মানুষ যখন আল্লাহর বন্দেগী না করে নিজের বা অন্য কারোর তাবেদারী করে এবং আল্লাহর পথনির্দেশনা গ্রহণ না করে নিজের সমাজ, সংস্কৃতি ও নৈতিকতাকে এমনসব মূলনীতি ও আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে যা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারোর পথনির্দেশনা থেকে গৃহীত, তখন এমন একটি মৌলিক ও সার্বিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়, যা পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থাকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই বিপর্যয়ের পথরোধ করাই কুরআনের উদ্দেশ্য। এই সংগে কুরআন এ সত্যটি সম্পর্কেও সজাগ করতে চায় যে, 'বিপর্যয়' পৃথিবীর ব্যবস্থাপনায় মৌল বিষয় নয় এবং 'সুস্থতা' তার সাথে সাময়িকভাবে সংযুক্ত হয়নি। বরং 'সুস্থতা' হচ্ছে এ ব্যবস্থাপনার মৌল বিষয় এবং নিছক মানুষের মূর্খতা, অজ্ঞতা ও বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপের ফলে 'বিপর্যয়' তার ওপর সাময়িকভাবে আপতিত হয়। অন্য কথায় বলা যায়, এখানে মূর্খতা, অজ্ঞতা, অসভ্যতা, শিরক, বিদ্রোহ ও নৈতিক বিশৃংখলার মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের সূচনা হয়নি এবং এগুলো দূর করার জন্য পরবর্তীকালে ক্রমাগত সংশোধন, সংস্কার ও সুস্থতা বিধানের কাজ চলেনি। বরং প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনের সূচনা হয়েছে সুস্থ ও সুসভ্য ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে এবং পরবর্তীকালে দুষ্কর্মশীল লোকেরা নিজেদের নির্বুদ্ধিতা ও দুষ্ট মনোবৃত্তির সাহায্যে এ সুস্থ ব্যবস্থাটিকে ক্রমান্বয়ে বিনষ্ট ও বিপর্যস্ত করেছে। এ বিপর্যয় নির্মূল করে জীবন ব্যবস্থাকে আবার নতুন করে সংশোধিত ও সুস্থ করে তোলার জন্যই মহান আল্লাহ যুগে যুগে ধারাবাহিকভাবে নবী পাঠিয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেক যুগে মানুষকে এ একই দাওয়াত দিয়ে এসেছেন যে, যে সুস্থ ও সভ্য বিধানের ভিত্তিতে দুনিয়ার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল তার মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকো।

সভ্যতার বিবর্তন সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে একটি মহল যে উদ্ভট মতাদর্শ পেশ করেছেন, কুরআনের দৃষ্টিভংগী তাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁরা বলছেন, মানুষ অন্ধকার থেকে বের হয়ে ধীরে ধীরে ও পর্যায়ক্রমে আলোর মধ্যে এসেছে। বিকৃতি, অসভ্যতা ও বর্বরতা থেকে তার জীবনের সূচনা হয়েছে। তারপর পর্যায়ক্রমে তা সুস্থতা ও সভ্যতার দিকে এসেছে। বিপরীতপক্ষে কুরআন বলছে, আল্লাহ মানুষকে পূর্ণ আলোকের মধ্যে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। পূর্ণ আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে একটি সুস্থ জীবন ব্যবস্থার আওতাধীনে তার জীবন পথে চলা শুরু হয়েছিল। তারপর মানুষ নিজেই শয়তানের নেতৃত্ব গ্রহণ করে বারবার অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং এ সুস্থ জীবন ব্যবস্থায় বিপর্যয় ডেকে এনেছে। অন্যদিকে আল্লাহ বারবার নিজের নবী ও রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। তাঁরা

وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۭ حَتّٰٓى اِذَآ
اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاۗءَ فَاَخْرَجْنَا
بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۭ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝
وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِيْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا
نَكِدًا ۭ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ۝

আর আল্লাহই বায়ুকে নিজের অনুগ্রহের পূর্বাহ্নে সুসংবাদবাহীরূপে পাঠান। তারপর যখন সে পানি ভরা মেঘ বহন করে তখন কোন মৃত ভূখণ্ডের দিকে তাকে চালিয়ে দেন এবং সেখানে বারি বর্ষণ করে (সেই মৃত ভূখণ্ড থেকে) নানা প্রকার ফল উৎপাদন করেন। দেখো, এভাবে আমি মৃতদেরকে মৃত্যুর অবস্থা থেকে বের করে আনি। হয়তো এ চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ থেকে তোমরা শিক্ষা লাভ করবে। উৎকৃষ্ট ভূমি নিজের রবের নির্দেশে প্রচুর ফসল উৎপন্ন করে এবং নিকৃষ্ট ভূমি থেকে নিকৃষ্ট ধরনের ফসল ছাড়া আর কিছুই ফলে না।[৪৬] এভাবেই আমি কৃতজ্ঞ জনগোষ্ঠীর জন্য বারবার নিদর্শনসমূহ পেশ করে থাকি।

মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আসার এবং বিপর্যয় সৃষ্টি থেকে বিরত থাকার জন্য আহবান জানিয়েছেন। (দেখুন সূরা বাকারা ২৩০ টীকা)।

৪৫. এ বাক্যটি থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ওপরের বাক্যে যাকে "বিপর্যয়" বলা হয়েছিল তা হচ্ছে আসলে মানুষের আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কাউকে নিজের অভিভাবক, বন্ধু ও কার্য সম্পাদনকারী গণ্য করে সাহায্যের জন্য তাকে ডাকা। অন্যদিকে মানুষের এ ডাক একমাত্র আল্লাহর সত্তাকে কেন্দ্র করে উচ্চারিত হওয়ার নামই 'সুস্থতা' ও বিশুদ্ধতা।

ভীতি ও আশা সহকারে ডাকার অর্থ হচ্ছে, তোমাদের ভয় করতে হলে একমাত্র আল্লাহকেই করতে হবে এবং কোন আশা পোষণ করতে হলে তাও করতে হবে একমাত্র আল্লাহরই কাছ থেকে। এ অনুভূতি সহকারে আল্লাহকে ডাকতে হবে যে, তোমাদের ভাগ্য পুরোপুরি তাঁরই করুণা নির্ভর। সৌভাগ্য, সাফল্য ও মুক্তিলাভ একমাত্র তাঁরই সাহায্য ও পথনির্দেশনায় সম্ভব। অন্যথায় তাঁর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হলে তোমাদের জন্য ব্যর্থতা ও ধ্বংস অনিবার্য।

৪৬. এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। মূল বক্তব্য বিষয়টি অনুধাবন করার জন্যে এ সম্পর্কে অবহিত হওয়া অপরিহার্য। এখানে বৃষ্টি ও তার বরকতের

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ
غَيْرُهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ
قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٦٠﴾ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ
وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ
لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

৮ রুকূ'

নূহকে আমি তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠাই।[৪৭] সে বলে ঃ "হে আমার স্বগোত্রীয় ভাইয়েরা! আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।[৪৮] আমি তোমাদের জন্য একটি ভয়াবহ দিনের আযাবের আশংকা করছি।" তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা জবাব দেয় ঃ "আমরা তো দেখতে পাচ্ছি তুমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েছো।" নূহ বলে ঃ "হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা! আমি কোন গোমরাহীতে লিপ্ত হইনি বরং আমি রব্বুল আলামীনের রসূল। তোমাদের কাছে আমার রবের বাণী পৌঁছে দিচ্ছি। আমি তোমাদের কল্যাণকামী। আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি এমন সব কিছু জানি যা তোমরা জান না।

উল্লেখ করার উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহর অসীম ক্ষমতা বর্ণনা ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের প্রমাণ তুলে ধরাই নয়, বরং সেই সাথে একটি উপমার সাহায্যে রিসালাত ও তার বরকতসমূহ এবং তার মাধ্যমে ভাল ও মন্দের মধ্যে এবং উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের মধ্যে পার্থক্যের চিত্র অংকন করাও এর লক্ষ। রসূলের আগমন এবং আল্লাহর শিক্ষা ও পথনির্দেশনা নাযিল হওয়াকে জলকণা বহনকারী বায়ু প্রবাহ ও রহমতের মেঘমালায় আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া এবং অমৃতধারাপূর্ণ বারিবিন্দু বর্ষণের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আবার বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে মৃত পতিত ভূমির অকস্মাত সঞ্জীবিত হওয়া এবং তার উদর থেকে জীবনের অঢেল সম্পদরাজি উৎসারিত হবার ঘটনাকে নবীর শিক্ষা, অনুশীলন ও নেতৃত্বে মৃত ভূপতিত মানবতার অকস্মাত জেগে ওঠার এবং তার বক্ষদেশ থেকে কল্যাণের স্রোতস্বিনী উৎসারিত হবার পরিস্থিতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, বৃষ্টি বর্ষণের ফলে এসব বরকত কেবলমাত্র এমনসব ভূমি লাভ করে, যা মূলত উর্বর কিন্তু নিছক পানির অভাবে যার শস্য উৎপাদনের যোগ্যতা চাপা পড়েছিল। ঠিক তেমনি রিসালাতের এ কল্যাণধারা থেকেও কেবলমাত্র সেই সব লোক লাভবান হতে পারে যারা মূলত মৃৎবৃত্তির অধিকারী এবং কেবলমাত্র নেতৃত্ব ও পথনির্দেশনা না পাওয়ার কারণে

যাদের যোগ্যতা ও সুস্থ মনোবৃত্তি সুস্পষ্ট রূপলাভ করার ও কর্মতৎপর হবার সুযোগ পায় না। অন্যদিকে দুষ্ট মনোবৃত্তির অধিকারী ও দুষ্কর্মশীল মানুষেরা হচ্ছে এমন ধরনের অনুর্বর জমির মত, যা রহমতের বারি বর্ষণে কোনক্রমেই লাভবান হয় না বরং বৃষ্টির পানি পড়ার সাথে সাথেই যার পেটের সমস্ত বিষ কাঁটা গাছ ও ঝোপ ঝাড়ের আকারে বের হয়ে আসে। অনুরূপভাবে রিসালাতের আবির্ভাবে তাদের কোন ফায়দা হয় না বরং উলটো তাদের অভ্যন্তরের সমস্ত দুষ্কৃতি ও শয়তানী মনোবৃত্তি পূর্ণোদ্যমে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

পরবর্তী কয়েকটি রুকূ'তে ধারাবাহিকভাবে ঐতিহাসিক প্রমাণ সহকারে এ উপমাটিকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, প্রত্যেক যুগে নবীর আগমনের পর মানব জাতি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি ভাগ হচ্ছে সুস্থ ও সৎ চেতনা সম্পন্ন লোকদের। রিসালাতের অমিয় ধারায় অবগাহন করে তারা পরিপুষ্ট হয় এবং উন্নতি ও উত্তম ফলে ফুলে সুশোভিত হয়। আর দ্বিতীয় ভাগটি হচ্ছে দুষ্ট চেতনা সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর। কষ্টিপাথরের সামনে আসার সাথে সাথেই তারা নিজেদের সমস্ত অসৎ প্রবণতার ডালি উন্মুক্ত করে দেয়। তাদের সমস্ত দুষ্কৃতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশেষে তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে ছেঁটে দূরে নিক্ষেপ করা হয় যেভাবে স্বর্ণকার রূপা ও সোনার তেজাল অংশটুকু ছেঁটে দূরে নিক্ষেপ করে।

৪৭. হযরত নূহ আলাইহিস সালাম ও তার সম্প্রদায় থেকে এ ঐতিহাসিক বিবরণের সূচনা করা হয়েছে। কারণ কুরআনের দৃষ্টিতে হযরত আদম আলাইহিস সালাম তাঁর সন্তানদের যে সৎ ও সুস্থ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে যান, তাতে প্রথম বিকৃতি দেখা দেয় হযরত নূহের যুগে এবং এরি সংশোধন ও এ জীবন ব্যবস্থাকে আবার সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য মহান আল্লাহ হযরত নূহকে পাঠান।

কুরআনের ইংগিত ও বাইবেলের সুস্পষ্ট বর্ণনার পর একথা আজ নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত হয়ে গেছে যে, বর্তমান ইরাকেই হযরত নূহের সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। বেবিলনের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের অভ্যন্তরে বাইবেলের চাইতেও যে প্রাচীন লিপি পাওয়া গেছে তা থেকেও এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কুরআনে ও তাওরাতে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, ঐ প্রাচীন লিপিতেও তদ্রূপ এক কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ঘটনাটি মুসেল–এর আশেপাশে ঘটেছিল বলে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কুর্দিস্তান ও আরমেনিয়া এলাকায় প্রাচীনকাল থেকে বংশ পরম্পরায় যেসব কিংবদন্তী চলে আসছে তা থেকেও জানা যায় যে, প্লাবনের পর হযরত নূহের নৌকা এ এলাকার কোন এক স্থানে থেমেছিল। আজো মুসেলের উত্তরে ইবনে উমর দ্বীপের আশেপাশে এবং আরমেনিয়া সীমান্তে 'আরারাত' পাহাড়ের আশেপাশে নূহ আলাইহিস সালামের বিভিন্ন নিদর্শন চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। 'নখচীওয়ান' শহরের অধিবাসীদের মধ্যে আজো এ প্রবাদ প্রচলিত যে, হযরত নূহ এ শহরের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

নূহের প্লাবনের মত প্রায় একই ধরনের ঘটনার কথা গ্রীক, মিসর, ভারত ও চীনের প্রাচীন সাহিত্যেও পাওয়া যায়। এছাড়াও বার্মা, মালয়েশিয়া, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, অষ্ট্রেলিয়া, নিউগিনি এবং আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন এলাকায়ও এ একই ধরনের কিংবদন্তী প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, এ ঘটনাটি এমন এক সময়ের সাথে সম্পর্কিত যখন সমগ্র মানব জাতি দুনিয়ার একই এলাকায়

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ
وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ
فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿٦٤﴾

তোমরা কি এ জন্য অবাক হচ্ছো যে, তোমাদের কাছে তোমাদের স্বীয় সম্প্রদায়েরই এক ব্যক্তির মাধ্যমে তোমাদের রবের স্মারক এসেছে, তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্য যাতে তোমরা ভুল পথে চলা থেকে রক্ষা পাও এবং তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়?[৪৯] কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলো। অবশেষে আমি তাকে ও তার সাথীদেরকে একটি নৌকায় (আরোহণ করিয়ে) রক্ষা করি এবং আমার আয়াতকে যারা মিথ্যা বলেছিল তাদেরকে ডুবিয়ে দেই।[৫০] নিসন্দেহে তারা ছিল দৃষ্টিশক্তিহীন জনগোষ্ঠী।

অবস্থান করতো, তারপর সেখান থেকে তাদের বংশধরেরা দুনিয়ার চতুরদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই সকল জাতি তাদের উন্মেষকালীন ইতিহাসে একটি সর্বব্যাপী প্লাবনের ঘটনা নির্দেশ করেছে। অবশ্য কালের আবর্তনে এর যথার্থ বিস্তারিত তথ্যাদি তারা বিস্মৃত হয়ে গেছে এবং প্রত্যেকে নিজের চিন্তা–ভাবনা অনুযায়ী আসল ঘটনার গায়ে প্রলেপ লাগিয়ে এক একটা বিরাট কল্পকাহিনী তৈরী করে নিয়েছে।

৪৮. কুরআন মজীদের এ স্থানে ও অন্যান্য স্থানে হযরত নূহ ও তাঁর সম্প্রদায়ের যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এ সম্প্রদায়টি আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না, তাঁর সম্পর্কে নিরেট অজ্ঞও ছিল না এবং তাঁর ইবাদাত করতেও তারা অস্বীকার করতো না। বরং তারা প্রকৃতপক্ষে যে গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল সেটি ছিল শিরক। অর্থাৎ তারা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে অন্যান্য সত্তাকেও শরীক করতো এবং ইবাদাতলাভের অধিকারে তাদেরকে তাঁর সাথে হিস্‌সাদার মনে করতো। তারপর এ মৌলিক গোমরাহী থেকে এ জাতির মধ্যে অসংখ্য ত্রুটি ও দুষ্কৃতির জন্ম নেয়। যেসব মনগড়া মাবুদকে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে অংশীদার গণ্য করা হয়েছিল, তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য জাতির মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণীর জন্ম হয়। এ শ্রেণীটি সমস্ত ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের একচ্ছত্র মালিক হয়ে বসে। জাতিকে তারা উচ্চ শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে। সমাজ জীবন জুলুম ও বিপর্যয়ে ভরপুর করে তোলে। নৈতিক উচ্ছৃংখলতা, চারিত্রিক নৈরাজ্য ও পাপাচারের মাধ্যমে মানবতার মূলে কুঠারাঘাত করে। এ অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য হযরত নূহ আলাইহিস সালাম অত্যন্ত সবর, সহিষ্ণুতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে দীর্ঘকাল প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালান। কিন্তু সাধারণ মানুষকে তারা নিজেদের প্রতারণা জালে এমনভাবে আবদ্ধ করে নেয় যার ফলে সংশোধনের কোন কৌশল কার্যকর প্রমাণিত হয়নি। অবশেষে হযরত নূহ (আ) আল্লাহর

কাছে এ মর্মে দোয়া করেন। হে আল্লাহ! এ কাফেরদের একজনকেও পৃথিবীর বুকে জীবিত ছেড়ে দিয়ো না। কারণ এদের কাউকে জীবিত ছেড়ে দিলে এরা তোমার বান্দাদেরকে গোমরাহ করতে থাকবে এবং এদের বংশে যাদেরই জন্ম হবে তারাই হবে অসৎকর্মশীল, দুশ্চরিত্র ও বিশ্বাসঘাতক। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা হুদ ৩ রুকূ, সূরা শূ'আরা ৬ রুকূ ও সমগ্র সূরা নূহ)।

৪৯. এ ব্যাপারটি ঘটেছিল হযরত নূহ (আ) ও তাঁর জাতির মধ্যে। ঠিক এ একই ধরনের ঘটনা ঘটছিল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও হযরত নূহের (আ) মত একই বাণী এনেছিলেন। মক্কার সরদাররা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের বিরুদ্ধে যেসব সন্দেহ প্রকাশ করছিল সেই একই ধরনের সন্দেহ হাজার হাজার বছর আগে হযরত নূহের সম্প্রদায়ের প্রধানরাও পেশ করেছিল। আবার এসবের জবাবে হযরত নূহ (আ) যেসব কথা বলতেন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সেই একই কথা বলতেন। পরবর্তীতে অন্যান্য নবীদের ও তাদের জাতির যেসব ঘটনা ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে সেখানেও এটাই দেখানো হয়েছে যে, প্রত্যেক নবীর জাতির ভূমিকা মক্কাবাসীদের ভূমিকার সাথে এবং প্রত্যেক নবীর ভাষণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষণের সাথে পুরাপুরি সাদৃশ্য রাখে। এর সাহায্যে কুরআন তার পাঠক ও শ্রোতাদেরকে একথা বুঝাতে চায় যে, প্রতি যুগে মানুষের গোমরাহী মূলগতভাবে একই ধরনের ছিল এবং আল্লাহর পাঠানো মানবতার শিক্ষকদের দাওয়াতও প্রতিযুগে প্রত্যেকটি দেশে একই রকম ছিল। অনুরূপভাবে যারা নবীদের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং নিজেদের গোমরাহীর নীতিতে অবিচল থেকেছে তাদের পরিণামও একই হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে।

৫০. কুরআনের বর্ণনাভংগীর সাথে যাদের ভাল পরিচয় নেই তারা অনেক সময় এ সন্দেহে পড়ে যান যে, সম্ভবত এই সমগ্র ব্যাপারটি একটি বা দু'টি বৈঠকেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। গোটা কার্যধারা এরূপ ছিল বলে মনে হয় যে, নবী এলেন এবং তিনি নিজের দাওয়াত পেশ করলেন। লোকেরা আপত্তি ও প্রশ্ন উত্থাপন করলো এবং তিনি তার জবাব দিলেন। তারপর লোকেরা তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো আর অমনি আল্লাহ আযাব পাঠিয়ে দিলেন। অথচ ব্যাপারটি ঠিক এমন নয়। যেসব ঘটনাকে যুথবদ্ধ করে এখানে মাত্র কয়েকটি বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো সংঘটিত হতে সুদীর্ঘকাল ও বছরের পর বছর সময় লেগেছিল। কুরআনের একটি বিশেষ বর্ণনা পদ্ধতি হচ্ছে, কুরআন শুধুমাত্র গল্প বলার জন্য ঘটনা বা কাহিনী বর্ণনা করে যায় না বরং শিক্ষা দেবার জন্য বর্ণনা করে যায়। তাই সর্বত্র ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনা করার সময় কাহিনীর কেবলমাত্র সেই অংশটুকুই কুরআন উপস্থাপন করে, যার সাথে উদ্দেশ্য ও মূল বিষয়বস্তুর কোন সম্পর্ক থাকে। এ ছাড়া কাহিনীর অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণকে সম্পূর্ণ বাদ দেয়। আবার যদি কোন কাহিনীকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বর্ণনা করে থাকে তাহলে সর্বত্র উদ্দেশ্যর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন বিস্তারিত বিবরণও পেশ করে থাকে। যেমন এই নূহ আলাইহিস সালামের কাহিনীটির কথাই ধরা যাক। নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার ও তাকে মিথ্যুক বলার পরিণাম বর্ণনা করাই এখানে এর উদ্দেশ্য। কাজেই নবী যত দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিজের

জাতিকে দাওয়াত দিতে থেকেছেন, সে কথা বলার এখানে কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যেখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীদেরকে সবর করার উপদেশ দেয়ার উদ্দেশ্যে এ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে বিশেষভাবে নূহ আলাইহিস সালামের দাওয়াতের দীর্ঘ সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীগণ নিজেদের মাত্র কয়েক বছরের প্রচেষ্টা ও সাধনা ফলপ্রসূ হতে না দেখে হতোদ্যম না হয়ে পড়েন এবং অন্যদিকে তারা যেন নূহ আলাইহিস সালামের সবরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, যিনি সুদীর্ঘকাল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক পরিবেশে সত্যের দাওয়াত দেয়া অব্যাহত রেখেছেন, এবং কোন সময় একটুও হতাশ হননি। (সূরা আনকাবুত, আয়াত–১৪)।

এখানে আর একটি সন্দেহও দেখা দেয়। এটি দূর করাও প্রয়োজন। কোন ব্যক্তি যখন বারবার কুরআনে পড়তে থাকে, অমুক জাতি নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল, নবী তাদেরকে আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হবার খবর দিয়েছিলেন এবং অকস্মাত একদিন আল্লাহর আযাব এসে সেই জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এ সময় তার মনে প্রশ্ন জাগে, এ ধরনের ঘটনা এখন ঘটে না কেন? যদিও এখনো বিভিন্ন জাতির উত্থান পতন হয় কিন্তু এ উত্থান পতনের ধরনই আলাদা। এখন তো এমন হয় না যে, একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পর ভূমিকম্প, প্লাবন বা ঝড় এলো এবং পুরো এক একটি জাতি ধ্বংস হয়ে গেলো। এর জবাবে বলা যায়, প্রকৃতপক্ষে একজন নবী সরাসরি যে জাতিকে দাওয়াত দেন তার ব্যাপারটি অন্য জাতিদের ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। যে জাতির মধ্যে কোন নবীর জন্ম হয়, তিনি সরাসরি তার ভাষায় তার কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দেন এবং নিজের নিখুঁত ব্যক্তি চরিত্রের মাধ্যমে নিজের বিশ্বস্ততা ও সত্যতার জীবন্ত আদর্শ তার সামনে তুলে ধরেন এতে করে তার সামনে আল্লাহর যুক্তি–প্রমাণ তথা তাঁর দাওয়াত পূর্ণরূপে উপস্থাপিত হয়েছে বলে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় তার জন্য ওযর–আপত্তি পেশ করার আর কোন অবকাশই থাকে না। আল্লাহর পাঠানো রসূলকে সামনা–সামনি অস্বীকার করার পর তার অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছে, যার ফলে ঘটনাস্থলেই তার সম্পর্কে চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যাওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যেসব জাতির কাছে আল্লাহর বাণী সরাসরি নয় বরং বিভিন্ন মাধ্যমে এসে পৌঁছেছে তাদের ব্যাপারটির ধরন এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কাজেই নবীদের সময় যেসব ঘটনার অবতারণা হতে দেখা যেতো এখন যদি আর সে ধরনের কোন ঘটনা না ঘটে থাকে তাহলে তাতে অবাক হবার কিছুই নেই। কারণ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর নবুওয়াতের সিলসিলা বন্ধ হয়ে গেছে। তবে হাঁ, কোন নবীকে সামনা সামনি প্রত্যাখ্যান করার পর কোন জাতির ওপর যে আযাব আসতো তেমনি ধরনের কোন আযাব যদি বর্তমানে কোন জাতির ওপর আসে তাহলে তাতেই বরং অবাক হতে হবে।

কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, বর্তমানে যেসব জাতি আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করছে এবং নৈতিক ও চিন্তাগত দিক দিয়ে গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েছে তাদের ওপর আল্লাহর আযাব আসা বন্ধ হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে এখনো এসব জাতির ওপর আযাব আসছে। কখনো সতর্ককারী ছোট ছোট আযাব, আবার কখনো চূড়ান্ত ফায়সালাকারী বড় বড় আযাব। কিন্তু আম্বিয়া আলাহিমুস সালাম ও আসমানী কিতাবগুলোর মত এ আযাবগুলোর নৈতিক

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ
غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ
فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي
سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي
وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٨﴾

৯ রুকূ'

আর 'আদ' (জাতি)র[৫১] কাছে আমি পাঠাই তাদের ভাই হূদকে। সে বলে ঃ "হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। এরপরও কি তোমরা ভুল পথে চলার ব্যাপারে সাবধান হবে না?" তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা তার কথা মানতে অস্বীকার করছিল, তারা বললো ঃ "আমরা তো তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত মনে করি এবং আমাদের ধারণা তুমি মিথ্যুক।" সে বললো ঃ "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আমি নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত নই। বরং আমি রব্বুল আলামীনের রসূল, আমার রবের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের এমন হিতাকাংখী যার ওপর ভরসা করা যেতে পারে।

তাৎপর্যের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার দায়িত্ব কেউ গ্রহণ করছে না। বরং এর বিপরীত পক্ষে স্থূল দৃষ্টির অধিকারী বিজ্ঞানী, সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ ঐতিহাসিক ও দার্শনিকদের একটি বিরাট গোষ্ঠী মানব জাতির ঘাড়ে চেপে বসে আছে। তারা এ ধরনের যাবতীয় ঘটনার ব্যাখ্যা করে প্রাকৃতিক আইন বা ঐতিহাসিক কার্যকারণের মানদণ্ডে। এভাবে তারা মানুষকে অচেতনতা ও বিস্মৃতির মধ্যে নিক্ষেপ করতে থাকে। তারা মানুষকে কখনো একথা বুঝার সুযোগ দেয় না যে, উপরে একজন আল্লাহ আছেন, তিনি অসৎকর্মশীল জাতিদেরকে প্রথমে তাদের অসৎকর্মের জন্য সতর্ক করে দেন, তারপর যখন তারা তাঁর পাঠানো সতর্ক সংকেতসমূহ থেকে চোখ বন্ধ করে নিয়ে নিজেদের অসৎকর্ম চালিয়ে যেতে থাকে অবিশ্রান্তভাবে, তখন তিনি তাদেরকে ধ্বংসের আবর্তে নিক্ষেপ করেন।

৫১. 'আদ' ছিল আরবের প্রাচীনতম জাতি। আরবের সাধারণ মানুষের মুখে মুখে এদের কাহিনী প্রচলিত ছিল। ছোট ছোট শিশুরাও তাদের নাম জানতো। তাদের অতীত কালের প্রতাপ–প্রতিপত্তি ও গৌরব গাঁথা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। তারপর দুনিয়ার বুক থেকে

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ۚ
وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ
بَصْطَةً ۚ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا
لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۚ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا
إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٠﴾

তোমরা কি এ জন্য অবাক হচ্ছো যে, তোমাদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তোমাদেরই স্বগোত্রীয় এক ব্যক্তির মাধ্যমে তোমাদের রবের স্মারক তোমাদের কাছে এসেছে? ভুলে যেয়ো না, তোমাদের রব নূহের সম্প্রদায়ের পর তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেন এবং অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান ও সুঠাম দেহের অধিকারী করেন। কাজেই আল্লাহর অপরিসীম শক্তির কথা স্মরণ রাখো,[৫২] আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।" তারা জবাব দিলো ঃ "তুমি কি আমাদের কাছে এ জন্য এসেছো যে, আমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবো। এবং আমাদের বাপ–দাদারা যাদের ইবাদাত করে এসেছে তাদেরকে পরিহার করবো?[৫৩] বেশ, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তাহলে আমাদের যে আযাবের হুমকি দিচ্ছো, তা নিয়ে এসো।"

তাদের নাম–নিশানা মুছে যাওয়াটাও প্রবাদের রূপ নিয়েছিল। আদ জাতির এ বিপুল পরিচিতির কারণেই আরবী ভাষায় প্রত্যেকটি প্রাচীন ও পুরাতন জিনিসের জন্য 'আদি' শব্দ ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষকে 'আদিয়াত' বলা হয়। যে জমির মালিক বেঁচে নেই এবং চাষাবাদকারী না থাকার কারণে যে জমি অনাবাদ পড়ে থাকে তাকে 'আদি–উল–আরদ' বলা হয়। প্রাচীন আরবী কবিতায় আমরা এ জাতির নামের ব্যবহার দেখি প্রচুর পরিমাণে। আরবের বংশধারা বিশেষজ্ঞগণও নিজেদের দেশের বিলুপ্ত জাতিদের মধ্যে সর্বপ্রথম এ জাতিটির নামোচ্চারণ করে থাকেন। হাদীসে বলা হয়েছে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বনূ যহল ইবনে শাইবান গোত্রের এক ব্যক্তি আসেন। তিনি আদ জাতির এলাকার অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রাচীনকাল থেকে তাদের এলাকার লোকদের মধ্যে আদ জাতি সম্পর্কে যেসব কিংবদন্তী চলে আসছে তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুনান।

কুরআনের বর্ণনা মতে এ জাতিটির আবাসস্থল ছিল 'আহকাফ' এলাকা। এ এলাকাটি হিজায, ইয়ামন ও ইয়ামামার মধ্যবর্তী 'রাবয়ুল খালী'র দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এখান থেকে অগ্রসর হয়ে তারা ইয়ামনের পশ্চিম সমুদ্রোপকূল এবং ওমান ও হাজরা মাউত

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَادِلُونَنِي
فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ
فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿٧١﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ
مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا
مُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾

সে বললো ঃ "তোমাদের রবের অভিসম্পাত পড়েছে তোমাদের ওপর এবং তাঁর গযবও। তোমরা কি আমার সাথে এমন কিছু নাম নিয়ে বিতর্ক করছো, যেগুলো তৈরী করেছো তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা[৫৪] এবং যেগুলোর স্বপক্ষে আল্লাহ কোন সনদ নাযিল করেননি?[৫৫] ঠিক আছে, তোমরা অপেক্ষা করো এবং আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।" অবশেষে নিজ অনুগ্রহে আমি হূদ ও তার সাথীদেরকে উদ্ধার করি এবং আমার আয়াতকে যারা মিথ্যা বলেছিল এবং যারা ঈমান আনেনি তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেই।[৫৬]

থেকে ইরাক পর্যন্ত নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিস্তৃত করেছিল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এ জাতিটির নিদর্শনাবলী দুনিয়ার বুক থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু দক্ষিণ আরবের কোথাও কোথাও এখনো কিছু পুরাতন ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। সেগুলোকে আদ জাতির নিদর্শন মনে করা হয়ে থাকে। হাজরা মাউতে এক জায়গায় হযরত হূদ আলাইহিস সালামের নামে একটি কবরও পরিচিতি লাভ করেছে। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে James R. Wellested নামক একজন ইংরেজ নৌ-সেনাপতি "হিস্‌নে গুরাবে" একটি পুরাতন ফলকের সন্ধান লাভ করেন এতে হযরত হূদ আলাইহিস সালামের উল্লেখ রয়েছে। এ ফলকে উৎকীর্ণ লিপি থেকে পরিষ্কার জানা যায়, এটি হযরত হূদের শরীয়াতের অনুসারীদের লেখা ফলক। (আল্ আহকাফ দেখুন)।

৫২. মূল শব্দটি হচ্ছে "আলা-"। এর আভিধানিক অর্থ নিয়ামতসমূহ, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির প্রতীকসমূহ, এবং প্রশংসনীয় চারিত্রিক গুণাবলী। আয়াতের সার্বিক মর্ম এই যে, আল্লাহর অপার অনুগ্রহের কথাও মনে রেখো, আবার এটাও ভুলে যেও না যে, তিনি তোমাদের কাছ থেকে প্রদত্ত অনুগ্রহ ছিনিয়ে নেয়ারও ক্ষমতা রাখেন।

৫৩. এখানে আবার একথাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ জাতিটিও আল্লাহকে অস্বীকার করতো না, আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল না। অথবা তাঁর ইবাদাত করতে অস্বীকার করছিল না। আসলে তারা হযরত হূদের একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করতে হবে এবং তাঁর

বন্দেগীর সাথে আর কারোর বন্দেগী যুক্ত করা যাবে না—এ বক্তব্যটিই মেনে নিতে অস্বীকার করছিল।

৫৪. অর্থাৎ তোমরা কাউকে বৃষ্টির দেবতা, কাউকে বায়ুর দেবতা, কাউকে ধন-সম্পদের দেবতা, আবার কাউকে রোগের দেবতা বলে থাকো। অথচ তাদের কেউ মূলত কোন জিনিসের স্রষ্টা ও প্রতিপালক নয়। বর্তমান যুগেও আমরা এর দৃষ্টান্ত দেখি। এ যুগেও লোকেরা দেখি কাউকে বিপদ মোচনকারী বলে থাকে। অথচ বিপদ থেকে উদ্ধার করার কোন ক্ষমতাই তার নেই। লোকেরা কাউকে 'গন্‌জ বখ্‌শ' (গুপ্ত ধন ভাণ্ডার দানকারী) বলে অভিহিত করে থাকে। অথচ তার কাছে কাউকে দান করার মত কোন ধনভাণ্ডার নেই। কাউকে 'দাতা' বলা হয়ে থাকে। অথচ সে কোন জিনিসের মালিকই নয়, যে কাউকে দান করতে পারবে। কাউকে 'গরীব নওয়াজ' আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। অথচ তিনি নিজেই গরীব। যে ধরনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ফলে কোন গরীবকে প্রতিপালন ও তার প্রতি অনুগ্রহ করা যেতে পারে সেই ধরনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে তার কোন অংশ নেই। কাউকে 'গউস' (ফরিয়াদ শ্রবণকারী) বলা হয় অথচ কারোর ফরিয়াদ শুনার এবং তার প্রতিকার করার কোন ক্ষমতাই তার নেই। কাজেই এ ধরনের যাবতীয় নাম বা উপাধি নিছক নাম বা উপাধি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ নামগুলোর পিছনে কোন সত্তা বা ব্যক্তিত্ব নেই। যারা এগুলো নিয়ে ঝগড়া ও বিতর্ক করে তারা আসলে কোন বাস্তব জিনিসের জন্য নয়, বরং কেবল কতিপয় নামের জন্যই ঝগড়া ও বিতর্ক করে।

৫৫. অর্থাৎ তোমরা নিজেরাই যে আল্লাহকে সর্বশ্রেষ্ঠ রব বলে থাকো তিনি তোমাদের এ বানোয়াট ইলাহদের সার্বভৌম ক্ষমতা-কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের স্বপক্ষে কোন সনদ দান করেননি। তিনি কোথাও বলেননি যে, আমি অমুকের ও অমুকের কাছে আমার ইলাহী কর্তৃত্বের এ পরিমাণ অংশ স্থানান্তরিত করে দিয়েছি। কাউকে 'বিপদ ত্রাতা, অথবা 'গন্‌জ বখ্‌শ' হবার কোন পরোয়ানা তিনি দেননি। তোমরা নিজেরাই নিজেদের ধারণা ও কল্পনা অনুযায়ী তাঁর ইলাহী ক্ষমতার যতটুকু অংশ যাকে ইচ্ছা তাকে দান করে দিয়েছো।

৫৬. 'নিশ্চিহ্ন করে দেই' অর্থাৎ তাদেরকে বিধ্বস্ত ও ধ্বংস করে দিয়েছি। দুনিয়ার বুক থেকে তাদের নাম-নিশানা মুছে দিয়েছি। প্রাথমিক পর্বের 'আদ' জাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে এবং তাদের যাবতীয় নিদর্শনও দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, একথা আরববাসীদের ঐতিহাসিক কথামালা ও কিংবদন্তীসমূহ থেকেও প্রমাণিত হয় এবং আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারসমূহও এর সত্যতা প্রমাণ করে। তাই আরব ঐতিহাসিকগণ তাদেরকে বিলুপ্ত জাতি হিসেবেই গণ্য করে থাকেন। তারপর আদ জাতির কেবলমাত্র সেই অংশটুকুই দুনিয়ার বুকে রয়ে গেছে যারা ছিল হযরত হূদ আলাইহিস সালামের অনুসারী, এটাও আরব ইতিহাসের একটি স্বীকৃত সত্য। ইতিহাসে আদ জাতির এ অবশিষ্টাংশ দ্বিতীয় আদ নামে খ্যাত। উপরে আমরা হিস্‌নে গুরাবের যে পুরাতন ফলকটির কথা উল্লেখ করেছি সেটি আসলে তাদেরই স্মৃতিফলক। প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞগণ এ স্মৃতি ফলকে (এটিকে হযরত ঈসার জন্মের প্রায় ১৮ শত বছর পূর্বের লিখন বলে মনে করা হচ্ছে) যে উৎকীর্ণ লিখন পাঠ করেছেন, তার কতিপয় বাক্য নীচে উদ্ধৃত করা হলো :

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ
غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً
فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ
فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ
بُيُوتًا ۚ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾

১০ রুকূ'

আর সামূদের[৫৭] কাছে পাঠাই তাদের ভাই সালেহকে। সে বলে ঃ হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। আল্লাহর এ উটনীটি তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন।[৫৮] কাজেই তাকে আল্লাহর জমিতে চরে খাবার জন্য ছেড়ে দাও। কোন অসদুদ্দেশ্যে এর গায়ে হাত দিয়ো না। অন্যথায় একটি যন্ত্রণাদায়ক আযাব তোমাদের ওপর আপতিত হবে। স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আল্লাহ আদ জাতির পর তোমাদেরকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন এবং পৃথিবীতে তোমাদেরকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন যার ফলে আজ তোমরা তাদের সমতলভূমিতে বিপুলায়তন প্রাসাদ ও তার পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছো।[৫৯] কাজেই তাঁর সর্বময় ক্ষমতার স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যেয়ো না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।[৬০]

"আমরা সুদীর্ঘকাল এই দুর্গে এমন অবস্থায় অতিবাহিত করেছিলাম যখন অভাব অনটন থেকে আমাদের জীবন ছিল অনেক দূরে। আমাদের খালগুলো নদীর পানিতে ভরে থাকতো.....এবং আমাদের শাসকগণ এমন ধরনের বাদশাহ ছিলেন যারা ছিলেন অসৎ চিন্তা মুক্ত এবং দুষ্কৃতকারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের প্রতি কঠোর মনোভাবাপন্ন। তারা হূদের শরীয়াত অনুযায়ী আমাদের ওপর শাসন কার্য পরিচালনা করতেন এবং উত্তম ফায়সালাসমূহ একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ করে নিতেন। আমরা মুজিযা ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান রাখতাম।"

কুরআনে যে কথা বিধৃত হয়েছে যে, আদ জাতির প্রাচীন মহিমা, গৌরব ও সমৃদ্ধির উত্তরাধিকারী তারাই হয়েছিল যারা হূদ আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান এনেছিল, এ লিপিটি আজো এরই সত্যতা প্রমাণ করে যাচ্ছে।

৫৭. এটি আরবের প্রাচীন জাতিগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় জাতি। আদের পরে এরাই সবচেয়ে বেশী খ্যাতি ও পরিচিতি অর্জন করে। কুরআন নাযিলের পূর্বে এদের কাহিনী সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। জাহেলী যুগের কবিতা ও খুতবা সাহিত্যে এর ব্যাপক উল্লেখ পাওয়া যায়। আসিরিয়ার শিলালিপি, গ্রীস, ইসকানদারীয়া ও রোমের প্রাচীন ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদগণও এর উল্লেখ করেছেন। ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের কিছুকাল পূর্বেও এ জাতির কিছু কিছু লোক বেঁচেছিল। রোমীয় ঐতিহাসিকগণের মতে, এরা রোমীয় সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে এদের শত্রু নিবৃতীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

উত্তর–পশ্চিম আরবের যে এলাকাটি আজো 'আল হিজর' নামে খ্যাত, সেখানেই ছিল এদের আবাস। আজকের সউদী আরবের অন্তর্গত মদীনা ও তাবুকের মাঝখানে হিজায রেলওয়ের একটি স্টেশন রয়েছে, তার নাম মাদায়েনে সালেহ। এটিই ছিল সামূদ জাতির কেন্দ্রীয় স্থান। প্রাচীনকালে এর নাম ছিল হিজ্‌র। সামূদ জাতির লোকেরা পাহাড় কেটে যেসব বিপুলায়তন ইমারত নির্মাণ করেছিল এখনো হাজার হাজার একর এলাকা জুড়ে সেগুলো অবস্থান করছে। এ নিঝুম পুরীটি দেখে আন্দাজ করা যায় যে, এক সময়ে এ নগরীর জনসংখ্যা চার পাঁচ লাখের কম ছিল না। কুরআন নাযিল হওয়ার সময়কালে হেজাযের ব্যবসায়ী কাফেলা এ প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতো। তাবুক যুদ্ধের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ এলাকা অতিক্রম করছিলেন তখন তিনি মুসলমানদেরকে এ শিক্ষণীয় নিদর্শনগুলো দেখান এবং এমন শিক্ষা দান করেন যা এ ধরনের ধ্বংসাবশেষ থেকে একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তির শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এক জায়গায় তিনি একটি কূয়ার দিকে অংগুলি নির্দেশ করে বলেন, এ কূয়াটি থেকে হযরত সালেহের উটনী পানি পান করতো। তিনি মুসলমানদেরকে একমাত্র এ কূয়াটি থেকে পানি পান করতে বলেন এবং অন্য সমস্ত কূয়া থেকে পানি পান করতে নিষেধ করেন। একটি গিরিপথ দেখিয়ে তিনি বলেন, এ গিরিপথ দিয়ে হযরত সালেহের উটনীটি পানি পান করতে আসতো। তাই সেই স্থানটি আজো 'ফাজ্জুন নাকাহ' বা 'উটনীর পথ' নামে খ্যাত হয়ে আছে। তাদের ধ্বংসস্তূপগুলোর মধ্যে যেসব মুসলমান ঘোরাফেরা করছিল তাদেরকে একত্র করে তিনি একটি ভাষণ দেন। এ ভাষণে সামূদ জাতির ভয়াবহ পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ দিয়ে তিনি বলেন, এটি এমন একটি জাতির এলাকা যাদের ওপর আল্লাহর আযাব নাযিল হয়েছিল। কাজেই এ স্থানটি দ্রুত অতিক্রম করে চলে যাও। এটা ভ্রমণের জায়গা নয় বরং কান্নার জায়গা।

৫৮. আয়াতটির আপাত বক্তব্য দৃষ্টে পরিষ্কার অনুভূত হয় যে, পূর্বের বাক্যটিতে আল্লাহর যে সুস্পষ্ট প্রমাণের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা এ পরবর্তী বাক্যটিতে 'নিদর্শন' হিসেবে উল্লেখিত উটনীটিই বুঝানো হয়েছে। সূরা 'শুআরা'র ৮ রুকূ'তে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, সামূদ জাতির লোকেরা নিজেরাই হযরত সালেহের কাছে এমন একটি নিদর্শনের দাবী করেছিল যা তাঁর আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্তির দ্ব্যর্থহীন ও অকাট্য

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ
آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ
بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُم بِهِ
كَافِرُونَ ﴿٧٦﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ
ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾

তার সম্প্রদায়ের স্বঘোষিত প্রতাপশালী নেতারা দুর্বল শ্রেণীর মুমিনদেরকে বললো ঃ "তোমরা কি সত্যিই জানো, সালেহ তার রবের প্রেরিত নবী?" তারা জবাব দিলো ঃ "নিশ্চয়ই, যে বাণী সহকারে তাঁকে পাঠানো হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি।" ঐ শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদাররা বললো "তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা অস্বীকার করি।"

তারপর তারা সেই উটনীটিকে মেরে ফেললো,[৬১] পূর্ণদাম্ভিকতা সহকারে নিজেদের রবের হুকুম অমান্য করলো এবং সালেহকে বললো ঃ "নিয়ে এসো সেই আযাব, যার হুমকি তুমি আমাদের দিয়ে থাকো, যদি সত্যিই তুমি নবী হয়ে থাকো।"

প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এরি জবাবে হযরত সালেহ উটনীটি হাজির করেন। এ থেকে একথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় যে, উটনীর আবির্ভাব হয়েছিল মুজিযা হিসেবে এবং কোন কোন নবী তাঁদের নবুওয়াতের প্রমাণ স্বরূপ নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের দাবীর জবাবে যেসব মুজিযা পেশ করেছিলেন এটি ছিল সেই ধরনেরই একটি মুজিযা। তাছাড়া হযরত সালেহ এই উটনীটি হাজির করার পর যে বক্তব্য রেখেছিলেন তাও এর অলৌকিক জন্মের প্রমাণ। তিনি নবুওয়াত অস্বীকারকারীদেরকে হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, এখন এ উটনীটির প্রাণের সাথে তোমাদের জীবন জড়িত হয়ে গেছে। উটনীটি স্বাধীনভাবে তোমাদের ক্ষেতে চরে বেড়াবে। একদিন সে একাই পানি পান করবে এবং অন্যদিন সমগ্র জাতির যত পশু আছে সবাই পানি পান করবে। আর যদি তোমরা তার গায়ে কোনভাবে হাত উঠাও তাহলে অকস্মাত তোমাদের ওপর আল্লাহর আযাব নেমে আসবে। বলা বাহুল্য যে জিনিসটির অস্বাভাবিকতা লোকেরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিল একমাত্র সেই জিনিসটি সম্পর্কেই এভাবে কথা বলা সম্ভব। উপরন্তু এ কথাও প্রণিধানযোগ্য যে, দীর্ঘদিন ধরে সামূদ জাতির লোকেরা তার স্বাধীনভাবে চরে বেড়ানো এবং একদিন তার একাকী পানি পান করা অন্যদিন সমগ্র জাতির সমস্ত পশুদের পানি পান করার বিষয়টি অনিচ্ছা সত্ত্বেও

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٧٨﴾ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ
وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ
لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٧٩﴾ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ
مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً
مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ۭ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨١﴾

অবশেষে একটি প্রলয়ংকর দুর্যোগ তাদেরকে গ্রাস করলো[৬২] এবং তারা নিজেদের ঘরের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো। আর সালেহ একথা বলতে বলতে তাদের জনপদ থেকে বের হয়ে গেলো ঃ "হে আমার সম্প্রদায়! আমার রবের বাণী আমি তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং আমি তোমাদের জন্য যথেষ্ট কল্যাণ কামনা করেছি। কিন্তু আমি কি করবো, তোমরা তো নিজেদের হিতাকাংখীকে পসন্দই কর না।"

আর লূতকে আমি পয়গম্বর করে পাঠাই। তারপর স্মরণ করো, যখন সে নিজের সম্প্রদায়ের[৬৩] লোকদেরকে বললো ঃ "তোমরা কি এতই নির্লজ্জ হয়ে গেলে যে, দুনিয়ায় ইতিপূর্বে কেউ কখনো করেনি এমন অশ্লীল কাজ করে চলছো? তোমরা মেয়েদের বাদ দিয়ে পুরুষদের দ্বারা কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করছো?[৬৪] প্রকৃতপক্ষে তোমরা একেবারেই সীমালংঘনকারী গোষ্ঠী।"

বরদাশত করে এসেছে। অবশেষে অনেক শলা-পরামর্শ ও ষড়যন্ত্রের পর তারা তাকে হত্যা করে। অথচ তাদের হযরত সালেহকে ভয় করার কিছুই ছিল না। কারণ তাঁর কোন ক্ষমতা বা প্রতাপ ছিল না। এ অকাট্য ও জ্বলন্ত সত্য দ্বারা আরো প্রমাণিত হচ্ছে যে, তারা এ উটনীর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল। তারা জানতো, এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন শক্তি আছে, তারই জোরে সে তাদের মধ্যে দোর্দণ্ড প্রতাপে ঘুরে বেড়ায়। উটনীটি কেমন ছিল এবং কিভাবে জন্ম লাভ করলো, তার কোন বর্ণনা কুরআন দেয়নি। কোন নির্ভরযোগ্য সহীহ্ হাদীসেও এর বিস্তারিত কোন বিবরণ নেই। তাই এ উটনীটির জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে যেসব বর্ণনা মুফাসসিরগণ উদ্ধৃত করেছেন তা মেনে নেয়া অপরিহার্য নয়। কিন্তু এর জন্ম যে, কোন না কোনভাবে মুজিযা ও অলৌকিক ঘটনার পর্যায়ভুক্ত তা অবশ্যি কুরআন থেকে প্রমাণিত।

৫৯. সামূদদের এ গৃহ নির্মাণ শিল্পটি ছিল ভারতের ইলোরা, অজন্তা গুহা ও অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত পর্বত গাত্রের গৃহের ন্যায়। অর্থাৎ তারা পাহাড় কেটে তার মধ্যে বিরাট বিরাট ইমারত তৈরী করতো। মাদায়েনে সালেহ এলাকায় এখনো তাদের এসব ইমারত সম্পূর্ণ

অবিকৃত অবস্থায় রয়ে গেছে। সেগুলো দেখে এ জাতি স্থাপত্য বিদ্যায় কেমন বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করেছিল, তা অনুমান করা যায়।

৬০. অর্থাৎ আদ জাতির-পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। তোমরা যদি আদদের মতো বিপর্যয় সৃষ্টি করতে থাকো, তাহলে যে মহান আল্লাহর অসাধারণ ক্ষমতা এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী জাতিকে ধ্বংস করে দিয়ে তার জায়গায় তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন, সেই মহা শক্তিধর আল্লাহই আবার তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে অন্যদেরকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন। (টীকা ৫২ দ্রষ্টব্য)।

৬১. সূরা কামার ও সূরা শামস–এর বর্ণনা অনুযায়ী যদিও এক ব্যক্তিই মেরেছিল তবুও যেহেতু সমগ্র জাতি এ অপরাধীর পেছনে ইন্ধন যুগিয়েছিল এবং অপরাধী লোকটি ছিল নিছক তার জাতির ক্রীড়নক মাত্র, তাই অভিযোগ আনা হয়েছে সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে। জাতির ইচ্ছা ও আকাংখা অনুযায়ী যে সমস্ত গুনাহ করা হয় অথবা যে সমস্ত গুনাহ করার ব্যাপারে জাতির সম্মতি ও সমর্থন থাকে কোন ব্যক্তিবিশেষ সেগুলো করলেও সেগুলোও জাতীয় গুনাহেরই পর্যায়ভুক্ত। শুধু তাই নয়, কুরআন বলে, জাতীয় অংগনে প্রকাশ্যে যে গুনাহ করা হয় এবং জাতি তা বরদাশত করে নেয় তাও জাতীয় পাপ হিসেবে বিবেচিত।

৬২. এ দুর্যোগকে এখানে رجفة (প্রলয়ংকর ও ভূকম্পনের সাহায্যে মৃত্যুদানকারী) বলা হয়েছে। অন্য স্থানে এ জন্য صيحة (চীৎকার), صاعقة (বজ্রপাত) ও طاغية (বিকট শব্দ) শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে।

৬৩. বর্তমানে যে এলাকাটিকে ট্রান্স জর্ডান (شرق اردن) বলা হয় সেখানেই ছিল এ জাতিটির বাস। ইরাক ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী স্থানে এ এলাকাটি অবস্থিত। বাইবেলে 'সাদূম'কে এ জাতির কেন্দ্রস্থল বলা হয়েছে। মৃত সাগরের (Dead Sea) নিকটবর্তী কোথাও এর অবস্থান ছিল। তালমূদে বলা হয়েছে, সাদূম ছাড়া তাদের আরো চারটি বড় বড় শহর ছিল। এ শহরগুলোর মধ্যবর্তী এলাকাসমূহ এমনই শ্যামল সবুজে পরিপূর্ণ ছিল যে, মাইলের পর মাইল জুড়ে এ বিস্তৃত এলাকা যেন একটি বাগান মনে হতো। এ এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষকে মুগ্ধ ও বিমোহিত করতো। কিন্তু আজ এ জাতির নাম–নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমনকি তাদের জনপদগুলো কোথায় কোথায় অবস্থিত ছিল তাও আজ সঠিকভাবে জানা যায় না। মৃত সাগরই তাদের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে টিকে আছে। বর্তমানে এটি 'লূত সাগর' নামে পরিচিত।

হযরত লূত আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভাইপো। তিনি চাচার সাথে ইরাক থেকে বের হন এবং কিছুকাল সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও মিসর সফর করে দাওয়াত ও তাবলীগের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকেন। অতপর স্বতন্ত্রভাবে রিসালাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে এ পথ ভ্রষ্ট জাতিটির সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত হন। সাদূমবাসীদের সাথে সম্ভবত তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে তাদেরকে তার সম্প্রদায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইহুদীদের হাতে বিকৃত বাইবেলে হযরত লূতের চরিত্রে বহুতর কলংক কালিমা লেপন করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, তিনি নাকি হযরত ইবরাহীম

আলাইহিস সালামের সাথে ঝগড়াঝাঁটি করে সাদূম এলাকায় চলে গিয়েছিলেন। (আদিপুস্তক ১৩ঃ ১-১২) কিন্তু কুরআন এ মিথ্যাচারের প্রতিবাদ করছে। কুরআনের বক্তব্য মতে আল্লাহ তাঁকে রসূল নিযুক্ত করে এ জাতির কাছে পাঠান।

৬৪. অন্যান্য স্থানে এ জাতির আরো কয়েকটি নৈতিক অপরাধের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এখানে কেবলমাত্র তাদের সবচেয়ে বড় অপরাধটির উল্লেখ করেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ অপরাধটির ফলে তাদের ওপর আল্লাহর আযাব আপতিত হয়।

এ ঘৃণ্য অপকর্মটির বদৌলতে এ জাতি যদিও দুনিয়ার বুকে চিরদিনই ধিক্কার ও কুখ্যাতি কুড়িয়েছে। কিন্তু অসৎ ও দুষ্কর্মশীল লোকেরা এ অপকর্মটি থেকে কখনো বিরত থাকেনি। তবে একমাত্র গ্রীকরাই এ একক কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছে যে, তাদের দার্শনিকরা এ জঘন্য অপরাধটিকে উৎকৃষ্ট নৈতিক গুণের পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। এরপর আর যেটুকু বাকি ছিল, আধুনিক ইউরোপ তা পূর্ণ করে দিয়েছে। ইউরোপে এর স্বপক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছে। এমনকি একটি দেশের (জার্মানী) পার্লামেন্ট একে রীতিমতো বৈধ গণ্য করেছে। অথচ সমকামিতা যে সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিরোধী একথা একটি অকাট্য সত্য। মহান আল্লাহ শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদন ও বংশরক্ষার উদ্দেশ্যেই সকল প্রাণীর মধ্যে নর-নারীর পার্থক্য সৃষ্টি করে রেখেছেন। আর মানব জাতির মধ্যে এ বিভিন্নতার আর একটি বাড়তি উদ্দেশ্য হচ্ছে, নর ও নারী মিলে এক একটি পরিবারের জন্ম দেবে এবং তার মাধ্যমে সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিত্ গড়ে উঠবে। এ উদ্দেশ্যেই নারী ও পুরুষের দু'টি পৃথক লিংগের সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়েছে। পারস্পরিক দাম্পত্য উদ্দেশ্য পূর্ণ করার উপযোগী করে তাদের শারীরিক ও মানসিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। তাদের পারস্পরিক আকর্ষণ ও মিলনের মধ্যে এমন একটি আনন্দ মধুর স্বাদ রাখা হয়েছে যা প্রকৃতির উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য একই সংগে আকর্ষণকারী ও আহবায়কের কাজ করে এবং এ সংগে তাদেরকে দান করে এ কাজের প্রতিদানও। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃতির এ পরিকল্পনার বিরুদ্ধাচরণ করে সমমৈথুনের মাধ্যমে যৌন আনন্দ লাভ করে সে একই সংগে কয়েকটি অপরাধ করে। প্রথমত সে নিজের এবং নিজের স্বাভাবিক দৈহিক ও মানসিক কাঠামোর সাথে যুদ্ধ করে এবং তার মধ্যে বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এর ফলে তাদের উভয়ের দেহ, মন ও নৈতিক বৃত্তির ওপর অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। দ্বিতীয়ত সে প্রকৃতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। কারণ প্রকৃতি তাকে যে আনন্দ স্বাদ মানব জাতির ও মানবিক সংস্কৃতির সেবার প্রতিদান হিসেবে দিয়েছিল এবং যা অর্জন করাকে তার দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের সাথে শর্তযুক্ত করেছিল, সেই স্বাদ ও আনন্দ সে কোন প্রকার সেবামূলক কার্যক্রম, কর্তব্য পালন, অধিকার আদায় ও দায়িত্ব সম্পাদন ছাড়াই ভোগ করে। তৃতীয়ত সে মানব সমাজের সাথে প্রকাশ্য বিশ্বাঘাতকতা করে। কারণ সমাজ যে সমস্ত তামাদ্দুনিক প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছে সেগুলোকে সে ব্যবহার করে এবং তার সাহায্যে লাভবান হয়। কিন্তু যখন তার নিজের দেবার পালা আসে তখন অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা বহন করার পরিবর্তে সে নিজের সমগ্র শক্তিকে নিরেট স্বার্থপরতার সাথে এমনভাবে ব্যবহার করে, যা সামাজিক সংস্কৃতি ও নৈতিকতার জন্য কেবলমাত্র অপ্রয়োজনীয় ও অলাভজনকই হয় না বরং নিদারুণভাবে ক্ষতিকরও হয়। সে নিজেকে বংশ ও পরিবারের সেবার অযোগ্য করে

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ
اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ
الْغٰبِرِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٨٤﴾

কিন্তু তার সম্প্রদায়ের জওয়াব এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, "এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা বড়ই পবিত্রতার ধ্বজাধারী হয়েছে।[৬৫] শেষ পর্যন্ত আমি লূতের স্ত্রীকে ছাড়া—যে পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তরভুক্ত ছিল[৬৬] তাকে ও তার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি এবং এ সম্প্রদায়ের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করি।[৬৭] তারপর সেই অপরাধীদের কী পরিণাম হয়েছিল দেখো।[৬৮]

তোলে। নিজের সাথে অন্ততপক্ষে একজন পুরুষকে নারী সুলভ আচরণে লিপ্ত করে। আর এই সংগে কমপক্ষে দু'টি মেয়ের জন্য যৌন ভ্রষ্টতা ও নৈতিক অধপতনের দরজা উন্মুক্ত করেদেয়।

৬৫. এ থেকে জানা যায়, এ লোকগুলো কেবল নির্লজ্জ, দুষ্কৃতিকারী ও দুশ্চরিত্রই ছিল না বরং তারা নৈতিক অধপতনের এমন চরমে পৌঁছে গিয়েছিল যে, নিজেদের মধ্যে কতিপয় সৎব্যক্তির ও সৎকর্মের দিকে আহবানকারী ও অসৎকর্মের সমালোচনাকারীর অস্তিত্ব পর্যন্ত বরদাশত করতে প্রস্তুত ছিল না। তারা অসৎকর্মের মধ্যে এতদূর ডুবে গিয়েছিল যে, সংশোধনের সামান্যতম আওয়াজও ছিল তাদের সহ্যের বাইরে। তাদের জঘন্যতম পরিবেশে পবিত্রতার যে সামান্যতম উপাদান অবশিষ্ট থেকে গিয়েছিল তাকেও তারা উৎখাত করতে চাইছিল। এ ধরনের একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে উৎখাত করার সিদ্ধান্ত হয়। কারণ যে জাতির সমাজ জীবনে পবিত্রতার সামান্যতম উপাদানও অবশিষ্ট থাকে না তাকে পৃথিবীর বুকে বাঁচিয়ে রাখার কোন কারণই থাকতে পারে না। পচা ফলের ঝুড়িতে যতক্ষণ কয়েকটি ভাল ফল থাকে ততক্ষণ ঝুড়িটি যত্নের সাথে রেখে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু এ ভাল ফলগুলো ঝুড়ি থেকে বের করে নেয়ার পর এই ঝুড়িটি যত্নের সাথে সংরক্ষিত করে রাখার পরিবর্তে পথের ধারে কোন আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করারই যোগ্য হয়ে পড়ে।

৬৬. অন্যান্য স্থানে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, হযরত লূতের এ স্ত্রীটি সম্ভবত এ সম্প্রদায়েরই কন্যা ছিল, সে তার নিজের কাফের আত্মীয়গোষ্ঠীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায় এবং শেষ সময় পর্যন্তও তাদের সংগ ছাড়েনি। তাই আযাব আসার পূর্বে মহান আল্লাহ যখন হযরত লূত ও তাঁর ঈমানদার সাথীদেরকে হিজরত করার নির্দেশ দেন তখন তাঁর ঐ স্ত্রীকে সংগে নিতে নিষেধ করেন।

৬৭. বৃষ্টি মানে এখানে পানি–বৃষ্টি নয় বরং পাথর–বৃষ্টি। কুরআনের অন্যান্য স্থানে এ কথাটি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া কুরআনে একথাও বলা হয়েছে যে, তাদের জনপদসমূহ উল্টিয়ে দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

৬৮. এখানে এবং কুরআনের আরো বিভিন্ন স্থানে কেবল এতটুকুন বলা হয়েছে যে, লূত জাতি একটি অতি জঘন্য ও নোংরা পাপ কাজের অনুশীলন করে যাচ্ছিল এবং এ ধরনের পাপ কাজের পরিণামে এ জাতির ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসে। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনা থেকে আমরা একথা জানতে পেরেছি যে, এটি এমন একটি অপরাধ সমাজ অংগনকে যার কলুষমুক্ত রাখার চেষ্টা করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং এ ধরনের অপরাধকারীদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া উচিত। এ প্রসংগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার কোনটিতে বলা হয়েছে : اقتلوا الفاعل والمفعول به (এ অপরাধকারী ও যার সাথে সে অপরাধ করেছে তাদের উভয়কে হত্যা করো)। আবার কোনটিতে এর ওপর এতটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে : احصنا اولم يحصنا (বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত)। আবার কোথাও এও বলা হয়েছে : فارجموا الاعلى والاسفل (ওপরের ও নীচের উভয়কে পাথর মেরে হত্যা করো) কিন্তু যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এ ধরনের কোন মামলা আসেনি তাই এর শাস্তি কিভাবে দেয়া হবে, তা অকাট্যভাবে চিহ্নিত হতে পারেনি। সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আলীর (রা) মতে অপরাধীকে তরবারির আঘাতে হত্যা করতে হবে এবং কবরস্থ করার পরিবর্তে তার লাশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে। হযরত আবু বকর (রা) এ মত সমর্থন করেন। হযরত উমর (রা) ও হযরত উসমানের (রা) মতে কোন পতনোন্মুখ ইমারতের নীচে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ইমারতটিকে তার ওপর ধ্বসিয়ে দিতে হবে। এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাসের (রা) ফতোয়া হচ্ছে, মহল্লার সবচেয়ে উঁচু বাড়ির ছাদ থেকে তাকে পা উপরের দিকে এবং মাথা নীচের দিকে করে নিক্ষেপ করতে এবং এই সংগে উপর থেকে তার ওপর পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। ফকীহদের মধ্যে ইমাম শাফেঈ (র) বলেন, অপরাধী ও যার সাথে অপরাধ করা হয়েছে তারা বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত, তাদের উভয়কে হত্যা করা ওয়াজিব। শা'বী, যুহরী, মালিক ও আহমদ রাহেমাহুমুল্লাহ বলেন, তাদের শাস্তি হচ্ছে রজম অর্থাৎ পাথর মেরে হত্যা করা। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, আতা, হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখঈ, সুফিয়ান সওরী ও আওযাঈর (রাহেমাহুমুল্লাহর) মতে যিনার অপরাধে যে শাস্তি দেয়া হয় এ অপরাধে সেই একই শাস্তি দেয়া হবে। অর্থাৎ অবিবাহিতকে একশত বেত্রাঘাত করে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে এবং বিবাহিতকে রজম করা হবে। ইমাম আবু হানীফার (র) মতে, তার ওপর কোন দণ্ডবিধি নির্ধারিত নেই বরং এ কাজটি এমন যে, সরকার তার বিরুদ্ধে অবস্থা ও প্রয়োজন অনুপাতে যে কোন শিক্ষণীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। এর সমর্থনে ইমাম শাফেঈর একটি বক্তব্যও পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তির তার নিজের স্ত্রীর সাথেও লূত জাতির কুকর্ম করা চূড়ান্তভাবে হারাম। আবু দাউদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে : ملعون من اتى المراة فى دبرها (যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পশ্চাদ্দেশে যৌন

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ
غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

১১ রুকূ'

আর মাদ্‌ইয়ানবাসীদের[৬৯] কাছে আমি তাদের ভাই শো'আইবকে পাঠাই। সে বলে ঃ হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের সুস্পষ্ট পথনির্দেশনা এসে গেছে। কাজেই ওজন ও পরিমাপ পুরোপুরি দাও, লোকদের পাওনা জিনিস কম করে দিয়ো না[৭০] এবং পৃথিবী পরিশুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর তার মধ্যে আর বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।[৭১] এরই মধ্যে রয়েছে তোমাদের কল্যাণ, যদি তোমরা যথার্থ মুমিন হয়ে থাকো।[৭২]

কার্য করে সে অভিশপ্ত)। ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণী উদ্ধৃত হয়েছে ঃ لا ينظر الله الى رجل جامع امراته فى دبرها (যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর পশ্চাদ্দেশে যৌন সংগমে লিপ্ত হয় আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না)। ইমাম তিরমিযী তাঁর আর একটি নির্দেশ উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ

من اتى حائضا او امراة فى دبرها او كاهنا فصدقه كفربما انزل على محمد

"যে ব্যক্তি ঋতুবতী অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে অথবা নিজের স্ত্রীর পশ্চাদ্দেশে যৌন কার্য করে বা কোন গণকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে মুহাম্মাদের (সা) প্রতি অবতীর্ণ বিধান অস্বীকার করে।"

৬৯. মাদ্‌ইয়ানের (মাদায়েন) মূল এলাকাটি হিজাযের উত্তর পশ্চিমে এবং ফিলিস্তিনের দক্ষিণে লোহিত সাগর ও আকাবা উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত ছিল। তবে সাইনা (সিনাই) উপদ্বীপের পূর্ব উপকূলেও এর কিছুটা অংশ বিস্তৃত ছিল। এখানকার অধিবাসীরা ছিল একটি বিরাট ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। প্রাচীন যুগে যে বাণিজ্যিক সড়কটি লোহিত সাগরের উপকূল ধরে ইয়ামন থেকে মক্কা ও ইয়াম্বু হয়ে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং দ্বিতীয় যে বাণিজ্যিক সড়কটি ইরাক থেকে মিসরের দিকে চলে যেতো তাদের ঠিক

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ
بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا
بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ
بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٧﴾

আর লোকদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করার, ঈমানদারদেরকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেবার এবং সোজা পথকে বাঁকা করার জন্য (জীবনের) প্রতিটি পথে লুটেরা হয়ে বসে থেকো না। স্মরণ করো, সেই সময়ের কথা যখন তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক। তারপর আল্লাহ তোমাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেন। আর বিপর্যয় সৃষ্টিকারীরা কোন্ ধরনের পরিণামের সম্মুখীন হয়েছে তা একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখো। যে শিক্ষা সহকারে আমাকে পাঠানো হয়েছে, তোমাদের মধ্য থেকে কোন একটি দল যদি তার প্রতি ঈমান আনে এবং অন্য একটি দল যদি তার প্রতি ঈমান না আনে তাহলে ধৈর্যসহকারে দেখতে থাকো, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেন। আর তিনিই সবচেয়ে ভাল ফায়সালাকারী।

সন্ধিস্থলে এ জাতির জনপদগুলো অবস্থিত ছিল। এ কারণে আরবের ছোট বড় সবাই মাদ্‌ইয়ানী জাতি সম্পর্কে জানতো এবং এ জাতিটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পরও সারা আরবে এর খ্যাতি অপরিবর্তিত থাকে। কারণ আরববাসীদের বাণিজ্যিক কাফেলা মিসর ও ইরাক যাবার পথে দিন রাত এর ধ্বংসাবশেষের ভেতর দিয়েই চলাচল করতো।

মাদ্‌ইয়ানবাসীদের সম্পর্কে আর একটি প্রয়োজনীয় কথা ভালভাবে জেনে নিতে হবে। সেটি হচ্ছে, এ মাদ্‌ইয়ানের অধিবাসীরা হযরত ইবরাহীমের পুত্র মিদিয়ান–এর সাথে বিভিন্ন রকমের সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। মিদিয়ান ছিলেন হযরত ইবরাহীমের তৃতীয় স্ত্রী কাতুরা–এর গর্ভজাত সন্তান। প্রাচীন যুগের নিয়ম অনুযায়ী যারা কোন খ্যাতিমান পুরুষের সাথে সম্পর্কিত থাকতো তাদেরকে কালক্রমে ঐ ব্যক্তির সন্তান গণ্য করে 'অমুকের বংশধর' বলা হতো। এ নিয়ম অনুযায়ী আরবের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ বনী ইসমাঈল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। অন্যদিকে ইয়াকূবের (অন্য নাম ইসরাঈল) সন্তানদের হাতে ইসলাম গ্রহণকারীদের সবাই বনী ইসরাঈল নামে অভিহিত হয়। অনুরূপভাবে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পুত্র মিদিয়ানের প্রভাবিত মাদ্‌ইয়ানের অধিবাসীগণ বনী মিদিয়ান নামে পরিচিত হয় এবং তাদের দেশের নামই হয়ে যায় মাদ্‌ইয়ান বা মিদিয়ান। এ ঐতিহাসিক তথ্যটি জানার পর এ ক্ষেত্রে একথা ধারণা করার আর কোন কারণই থাকে

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا
كَارِهِينَ ﴿٨٨﴾ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ
إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ
رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا
وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾

নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মত্ত গোত্রপতিরা তাকে বললো : "হে শো'আইব! আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেবো। অন্যথায় তোমাদের ফিরে আসতে হবে আমাদের ধর্মে।" শো'আইব জবাব দিলো : "আমরা রাজি না হলেও কি আমাদের জোর করে ফিরিয়ে আনা হবে? তোমাদের ধর্ম থেকে আল্লাহ আমাদের উদ্ধার করার পর আবার যদি আমরা তাতে ফিরে আসি, তাহলে আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী বিবেচিত হবো। আমাদের রব আল্লাহ যদি না চান, তাহলে আমাদের পক্ষে সে দিকে ফিরে যাওয়া আর কোনক্রমেই সম্ভব নয়।[৭৩] আমাদের রবের জ্ঞান সমস্ত জিনিসকে ঘিরে আছে। আমরা তাঁরই ওপর নির্ভর করি। হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে যথাযথভাবে ফায়সালা করে দাও এবং তুমি সবচেয়ে ভাল ফায়সালাকারী।"

না যে, এ জাতিটি সর্বপ্রথম হযরত শো'আইব আলাইহিস সালামের মাধ্যমেই সত্য দীন তথা ইসলামের দাওয়াত পেয়েছিল। আসলে শুরুতে বনী ইসরাঈলদের মত এরাও ছিল মুসলমান। শো'আইব আলাইহিস সালামের আবির্ভাবকালে এদের অবস্থা ছিল একটি বিকৃত মুসলিম মিল্লাতের মত, যেমন মূসা আলাইহিস সালামের আবির্ভাবকালে ছিল বনী ইসরাঈলের অবস্থা। হযরত ইবরাহীমের পরে ছয় সাত শো বছর পর্যন্ত এরা মুশরিক ও চরিত্রহীন জাতিদের মধ্যে বসবাস করতে করতে শিরক ও নানা রকমের দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও এদের ঈমানের দাবী ও সে জন্য অহংকার করার মনোবৃত্তি অপরিবর্তিত ছিল।

৭০. এ থেকে জানা যায়, এ জাতির দু'টি বড় দোষ ছিল। একটি শিরক এবং অন্যটি ব্যবসায়িক লেন দেনে অসাধুতা। এ দু'টি দোষ সংশোধন করার জন্য হযরত শো'আইব আলাইহিস সালামকে তাদের মধ্যে পাঠানো হয়েছিল।

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ
إِذًا لَّخَاسِرُونَ ﴿٩٠﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٩١﴾
الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا
كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٢﴾ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ
رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٩٣﴾

তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা, যারা তার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল, পরস্পরকে বললো ঃ "যদি তোমরা শো'আইবের আনুগত্য মেনে নাও, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে।"[৭৪] কিন্তু সহসা একটি প্রলয়ংকরী বিপদ তাদেরকে পাকড়াও করে এবং তারা নিজেদের ঘরের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে, যারা শোআইবকে মিথ্যা বলেছিল তারা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় যেন সেই সব গৃহে কোনদিন তারা বসবাসই করতো না। শো'আইবকে যারা মিথ্যা বলেছিল অবশেষে তারাই ধ্বংস হয়ে যায়।[৭৫] আর শো'আইব একথা বলতে বলতে তাদের জনপদ থেকে বের হয়ে যায়—"হে আমার জাতির লোকেরা! আমি আমার রবের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনার হক আদায় করেছি। এখন আমি এমন জাতির জন্য দুঃখ করবো কেন, যারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করে?"[৭৬]

৭১. এ বাক্যটির যথাযথ ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে সূরা আরাফের ৪৪ ও ৪৫নং টীকায় করা হয়েছে। এখানে হযরত শো'আইব তাঁর এ উক্তিটির মাধ্যমে আভাসে ইংগিতে যে কথাটি বিশেষভাবে বলতে চেয়েছেন তা এই যে, পূর্ববর্তী নবীগণের বিধান ও পথনির্দেশনার ভিত্তিতে সত্য দীন ও সৎ চারিত্রিক গুণাবলীতে ভূষিত যে জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এখন তোমরা নিজেদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও নৈতিক দুষ্কৃতির মাধ্যমে তাকে বিনষ্ট করে দিয়ো না।

৭২. এ বাক্যটি থেকে পরিষ্কার জানা যায়, তারা নিজেরা ঈমানের দাবীদার ছিল। ওপরের আলোচনায় আমি এদিকে ইংগিত করেছি। তারা আসলে ছিল গোমরাহ ও বিকৃত মুসলমান। বিশ্বাসগত ও চারিত্রিক বিপর্যয়ে লিপ্ত থাকলেও তারা কেবল ঈমানের দাবীই করতো না বরং এ জন্য তাদের গর্বও ছিল। তাই হযরত শো'আইব বলেন, যদি তোমরা মুমিন হও, তাহলে তোমাদের এ বিশ্বাসও থাকা উচিত যে, সততা ও বিশ্বস্ততার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত এবং যেসব দুনিয়া পূজারী লোক আল্লাহ ও আখেরাতকে স্বীকার করে না তোমাদের ভাল-মন্দের মানদণ্ড তাদের থেকে আলাদা হওয়া উচিত।

৭৩. এ বাক্যটি ঠিক সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে অর্থে আমরা ইনশাআল্লাহ বলে থাকি এবং যে সম্পর্কে সূরা কাহাফে (আয়াত ২৩-২৪) বলা হয়েছে ঃ কোন জিনিস

সম্পর্কে দাবী সহকারে একথা বলো না, আমি এমনটি করবো বরং এভাবে বলো, যদি আল্লাহ চান তাহলে আমি এমনটি করবো। কারণ যে মুমিন আল্লাহর সর্বময় কর্তৃত্ব এবং নিজের দাসত্ব, অধীনতা ও বশ্যতা সম্পর্কে যথাযথ উপলব্ধির অধিকারী হয়, সে কখনো নিজের শক্তির ওপর ভরসা করে এ দাবী করতে পারে না—আমি অমুক কাজটি করেই ছাড়বো অথবা অমুক কাজটি কখনো করবোই না। বরং সে এভাবে বলবে, আমার এ কাজ করার বা না করার ইচ্ছা আছে কিন্তু আমার এ ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া তো আমার মালিকের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে, তিনি তাওফীক দান করলে আমি সফলকাম হবো অন্যথায় ব্যর্থ হয়ে যাবো।

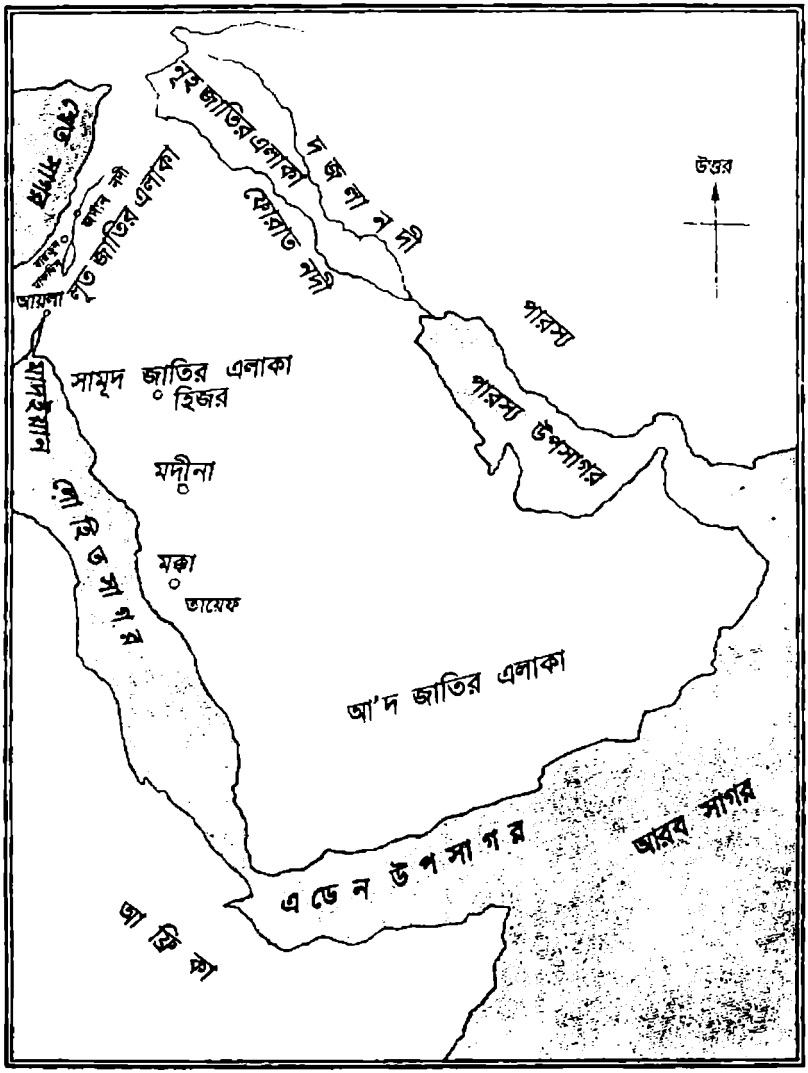

সূরা আল আ'রাফে উল্লেখিত জাতিসমূহের এলাকা

৭৪. এ ছোট বাক্যটির ওপর ভাসা ভাসা দৃষ্টি বুলিয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়। এটি থমকে দাঁড়িয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার একটি স্থান। মাদ্‌ইয়ানের সরদাররা ও নেতারা আসলে যে কথা বলছিল এবং নিজের জাতিকেও বিশ্বাস করাতে চাইছিল তা এই যে, শো'আইব যে সততা ও ঈমানদারীর দাওয়াত দিচ্ছেন এবং মানুষকে নৈতিকতা ও বিশ্বস্ততার যেসব স্বতন্ত্র মূলনীতির অনুসারী করতে চাচ্ছেন, সেগুলো মেনে নিলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো। আমরা যদি পূর্ণ সততার সাথে ব্যবসায় করতে থাকি এবং কোন প্রকার প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে ঈমানদারীর সাথে পণ্য বেচাকেনা করতে থাকি তাহলে আমাদের ব্যবসা কেমন করে চলবে? আমরা দুনিয়ার দু'টি সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক সড়কের সন্ধিস্থলে বাস করি এবং মিসর ও ইরাকের মতো দু'টি বিশাল সুসভ্য ও উন্নত রাষ্ট্রের সীমান্তে আমাদের জনপদ গড়ে উঠেছে। এমতাবস্থায় আমরা যদি বাণিজ্যিক কাফেলার মালপত্র ছিনতাই করা বন্ধ করে দিয়ে শান্তিপ্রিয় হয়ে যাই তাহলে বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে আমরা এতদিন যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভ করে আসছিলাম তা একদম বন্ধ হয়ে যাবে এবং আশেপাশের বিভিন্ন জাতির ওপর আমাদের যে প্রতাপ ও আধিপত্য কায়েম আছে তাও খতম হয়ে যাবে। এ ব্যাপারটি কেবল শো'আইবের সম্প্রদায়ের প্রধানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং প্রত্যেক যুগের পথভ্রষ্ট লোকেরা সত্য, ন্যায়, সততা ও বিশ্বস্ততার নীতি অবলম্বন করার মধ্যে এমনি ধরনেরই বিপদের আশংকা করেছে। প্রত্যেক যুগের নৈরাজ্যবাদীরা একথাই চিন্তা করেছে যে, ব্যবসায়-বাণিজ্য, রাজনীতি এবং অন্যান্য পার্থিব বিষয়াবলী মিথ্যা, বেঈমানী ও দুর্নীতি ছাড়া চলতে পারে না। প্রত্যেক জায়গায় সত্যের দাওয়াতের মোকাবিলায় যেসব বড় বড় অজুহাত পেশ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, যদি দুনিয়ার প্রচলিত পথ থেকে সরে গিয়ে এ দাওয়াতের অনুসরণ করা হয় তাহলে সমগ্র জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে।

৭৫. মাদ্‌ইয়ানের এ ধ্বংসলীলা দীর্ঘকাল পর্যন্ত আশেপাশের বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। তাই দেখা যায়, দাউদ আলাইহিস সালামের ওপর অবতীর্ণ যবুরের এক স্থানে বলা হয়েছে ঃ হে খোদা! অমুক অমুক জাতি তোমার বিরুদ্ধে অংগীকারাবদ্ধ হয়েছে, কাজেই তুমি তাদের সাথে ঠিক তেমনি ব্যবহার করো যেমন মিদিয়ানের সাথে করেছিলে। (৮৩ ঃ ৫-৯) ইয়াসঈয়াহ নবী এক স্থানে বনী ইসরাঈলকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেন, আশূরীয়দেরকে ভয় করো না যদিও তারা তোমাদের জন্য মিসরীয়দের মতই জালেম হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বেশী দেরী হবে না, বাহিনীগণের প্রভু তাদের ওপর নিজের দণ্ড বর্ষণ করবেন এবং তাদের সেই একই পরিণতি হবে যেমন মিদিয়ানের হয়েছিল। (যিশাইয় ১০ ঃ ২২-২৬)।

৭৬. এখানে যতগুলো কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে সবগুলোতে আসলে "একজনের ঘটনা বর্ণনা করে তার মধ্যে অন্যজনের চেহারা দেখানোর রীতি অবলম্বন করা হয়েছে। এখানকার প্রত্যেকটি কাহিনী সে সময় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর জাতির মধ্যে যা কিছু সংঘটিত হচ্ছিল তার সাথে পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রত্যেকটি কাহিনী ও ঘটনার এক পক্ষে একজন নবী আছেন। তাঁর শিক্ষা, দাওয়াত, উপদেশ ও কল্যাণকামিতা এবং তাঁর সমস্ত কথাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুরূপ।

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِىٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ
لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ﴿٩٤﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّ
قَّالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ
لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩٥﴾ وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ
مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٦﴾

১২ রুকূ'

আমি যখনই কোন জনপদে নবী পাঠিয়েছি, সেখানকার লোকদেরকে প্রথমে অর্থকষ্ট ও দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন করেছি, একথা ভেবে যে, হয়তো তারা বিনম্র হবে ও নতি স্বীকার করবে। তারপর তাদের দুরবস্থাকে সমৃদ্ধিতে ভরে দিয়েছি। ফলে তারা প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং বলতে শুরু করেছে "আমাদের পূর্বপুরুষদের ওপরও দুর্দিন ও সুদিনের আনাগোনা চলতো।" অবশেষে আমি তাদেরকে সহসাই পাকড়াও করেছি। অথচ তারা জানতেও পারেনি।[৭৭] যদি জনপদের লোকেরা ঈমান আনতো এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করতো, তাহলে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বরকতসমূহের দুয়ার খুলে দিতাম। কিন্তু তারা তো প্রত্যাখ্যান করেছে। কাজেই তারা যে অসৎকাজ করে যাচ্ছিলো তার জন্য আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি।

আর প্রত্যেকটি কাহিনীর দ্বিতীয় পক্ষে আছে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও জাতি। তাদের আকীদাগত বিভ্রান্তি, নৈতিক চরিত্রহীনতা, মূর্খতা জনিত হঠকারিতা, তাদের গোত্র প্রধানদের শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকা এবং সত্য অস্বীকারকারী লোকদের নিজেদের গোমরাহীর ব্যাপারে একগুয়েমী ইত্যাদি সবকিছুই ঠিক তেমনটি যেমন কুরাইশদের মধ্যে পাওয়া যেতো। আবার প্রত্যেকটি কাহিনীতে সত্য অস্বীকারকারী জাতিগুলোর যে পরিণাম দেখানো হয়েছে তার মাধ্যমে আসলে কুরাইশদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা আল্লাহর পাঠানো নবীদের কথা না মানো এবং চরিত্র সংশোধনের যে সুযোগ তোমাদের দেয়া হচ্ছে অন্ধ জিদ ও গোয়ার্তুমীর বশবর্তী হয়ে তা হেলায় হারিয়ে বসো, তাহলে চিরদিন গোমরাহী ও ফিত্না-ফাসাদের ক্ষেত্রে জিদ ধরে বিভিন্ন জাতি যেমন পতন ও ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে, তোমরাও তেমনি ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।

৭৭: এক একজন নবী ও এক একটি সম্প্রদায়ের ব্যাপার আলাদা আলাদাভাবে বর্ণনা করার পর এবার একটি সাধারণ ও সর্বব্যাপী নিয়ম ও বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রতি যুগে

প্রত্যেক নবীকে প্রেরণ করার সময় মহান আল্লাহ এ নিয়মটি অবলম্বন করেন। নিয়মটি হচ্ছে, যখনই কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন নবী পাঠানো হয়েছে তখনই প্রথমে সেই সম্প্রদায়ের বাহ্যিক পরিবেশকে নবীর দাওয়াত গ্রহণের জন্য সর্বাধিক অনুকূল ও উপযোগী বানানো হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে রকমারি দুর্যোগ দুর্বিপাক ও বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বাণিজ্যিক ক্ষয়ক্ষতি, সামরিক পরাজয় ও এ ধরনের আরো নানান দুর্ভোগ তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে তাদের মন নরম হয়ে যায়, অহংকার ও ঔদ্ধত্যে দৃপ্ত গ্রীবা নত হয়, শক্তিমদমত্ততা ও ধনলিপ্সা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। নিজেদের উপায়-উপকরণ, শক্তি ও যোগ্যতার ওপর নির্ভরতা ভেংগে পড়ে এবং তারা যাতে অনুভব করতে পারে যে, ওপরে অন্য কোন শক্তিধর সত্তা আছে এবং তারই হাতে রয়েছে তাদের ভাগ্যের লাগাম। এভাবে উপদেশের বাণী শোনার জন্য তাদের কান খুলে যাবে এবং নিজেদের প্রভু পরওয়ারদিগারের সামনে সবিনয়ে শির আনত করার জন্য তারা প্রস্তুত হয়ে যাবে। তারপর এ ধরনের উপযোগী পরিবেশেও তাদের মন সত্যকে গ্রহণ করতে উদ্যোগী না হলে সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের পরীক্ষার মধ্যে তাদেরকে ঠেলে দেয়া হয়। এখান থেকেই শুরু হয় তাদের ধ্বংসের প্রক্রিয়া। প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির মধ্যে জীবন যাপন করার সময় তারা নিজেদের দুর্দিনের কথা ভুলে যায়। তাদের বিকৃত বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন নেতৃবর্গ তাদের মনোজগতে ইতিহাসের এ নির্বোধ সুলভ ধারণা ঢুকিয়ে দেয় যে, জগতে যা কিছু উত্থান পতন ও ভাংগা-গড়া চলছে, তা কোন বিচক্ষণ কুশলী সত্তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় হচ্ছে না এবং কোন নৈতিক কারণেও হচ্ছে না। বরং একটি অচেতন ও অন্ধ প্রকৃতি সম্পূর্ণ নীতি বিবর্জিত কার্যকারণের ভিত্তিতে কখনো ভালো ও কখনো মন্দ দিনের উদ্ভব ঘটাতে থাকে। কাজেই ঝড়-ঝন্‌ঝা ও বিপদ-আপদের অবতারণা থেকে কোন নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করা এবং কোন শুভাকাংখীর সদুপদেশ মেনে নিয়ে আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়া এক ধরনের মানসিক দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নির্বোধসুলভ মানসিকতারই নকশা এঁকেছেন নিম্নোক্ত হাদীসটিতে।

لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِّنْ ذُنُوْبِهٖ ، وَالْمُنَافِقُ مَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْحِمَارِ لَا يَدْرِىْ فِيْمَ رَبَطَهٗ اَهْلُهٗ وَلَا فِيْمَ اَرْسَلُوْهُ -

"বিপদ-মুসিবত তো মুমিনকে পর্যায়ক্রমে সংশোধন করতে থাকে, অবশেষে যখন সে এ চুল্লী থেকে বের হয় তখন তার সমস্ত ভেজাল ও খাদ পুড়ে সে পরিচ্ছন্ন ও খাঁটি হয়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু মুনাফিকের অবস্থা হয় ঠিক গাধার মতো। সে কিছুই বোঝে না, তার মালিক কেন তাকে বেঁধে রেখেছিল আবার কেনইবা তাকে ছেড়ে দিল।"

কাজেই যখন কোন জাতির অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, বিপদেও তার হৃদয় আল্লাহর সামনে নত হয় না, আল্লাহর অপরিসীম অনুগ্রহে ও ধন-সম্পদের প্রাচুর্যেও তার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতাবোধ জাগে না এবং কোন অবস্থায়ই সে সংশোধিত হয় না তখন ধ্বংস তার মাথার ওপর এমনভাবে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে যেন তা যে কোন সময় তার ওপর নেমে আসবে। ঠিক যেমন সন্তান ধারণের সময়কাল পূর্ণ হয়ে গেছে, এমন একজন গর্ভবতী নারীর যে কোন সময় সন্তান প্রসব হতে পারে।

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾ أَوَأَمِنَ
أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ
اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾

জনপদের লোকেরা কি এখন এ ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে গেছে যে, আমার শাস্তি কখনো অকস্মাত রাত্রিকালে তাদের ওপর এসে পড়বে না, যখন তারা থাকবে নিদ্রামগ্ন? অথবা তারা নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, আমাদের মজবুত হাত কখনো দিনের বেলা তাদের ওপর এসে পড়বে না, যখন তারা খেলা ধূলায় মেতে থাকবে? এরা কি আল্লাহর কৌশলের ব্যাপারে নির্ভীক হয়ে গেছে?[৭৮] অথচ যে সব সম্প্রদায়ের ধ্বংস অবধারিত তারা ছাড়া আল্লাহর কৌশলের ব্যাপারে আর কেউ নির্ভীক হয় না।

এখানে আরো একটি কথাও জেনে নেয়া উচিত। এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ নিজের যে নিয়মের কথা উল্লেখ করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবকালেও ঠিক সেই নিয়মটিই কার্যকর করা হয়। ভাগ্য বিড়ম্বিত জাতিগুলোর যেসব কর্মকাণ্ডের দিকে ইংগিত করা হয়েছে, সূরা আ'রাফ অবতীর্ণ হওয়ার দিনগুলোতে মক্কার কুরাইশরা ঠিক সেই একই ধরনের কর্মকাণ্ডের প্রকাশ ঘটিয়ে চলছিল। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) উভয়েই একযোগে রেওয়ায়াত করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর যখন কুরাইশরা তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে চরম উগ্র মনোভাব অবলম্বন করতে শুরু করে তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করেন, হে আল্লাহ! ইউসুফের যুগে যেমন সাত বছর দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তেমনি ধরনের দুর্ভিক্ষের সাহায্যে এ লোকদের মোকাবিলা করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করো। ফলে আল্লাহ তাদেরকে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন করেন। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, লোকেরা মৃত প্রাণীর গোশত খেতে শুরু করে, এমন কি চামড়া, হাড় ও পশম পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। অবশেষে মক্কার লোকেরা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করার আবেদন জানায়। কিন্তু তাঁর দোয়ায় আল্লাহ যখন সেই মহা সংকট থেকে তাদেরকে উদ্ধার করেন এবং লোকেরা আবার সুদিনের মুখ দেখে, তখন তাদের বুক অহংকারে আগের চাইতে আরো বেশী স্ফীত হয়ে ওঠে। তাদের মধ্য থেকে যে গুটিকয় লোকের মন নরম হয়ে গিয়েছিল দুষ্টলোকেরা তাদেরকেও এ বলে ঈমানের পথ থেকে ফিরিয়ে নিতে থাকে ঃ আরে মিয়া! এসব তো সময়ের উত্থান পতন ও কালের আবর্তন ছাড়া আর কিছুই নয়। এর আগেও দুর্ভিক্ষ এসেছে। এবারের দুর্ভিক্ষ দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয়েছে, এটা কোন নতুন কথা নয়। কাজেই এসব ব্যাপারে প্রতারিত হয়ে মুহাম্মাদের ফাঁদে পা দিয়ো না। এ সূরা আ'রাফ যে সময় নাযিল হয় সে সময় মুশরিকরা এ বাগাড়ম্বর করে বেড়াচ্ছিল। কাজেই কুরআন

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ
أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾ تِلْكَ
الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۚ
فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ
الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۖ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ
لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
فَظَلَمُوا بِهَا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٣﴾

১৩ রুকূ'

পৃথিবীর পূর্ববর্তী অধিবাসীদের পর যারা তার উত্তরাধিকারী হয়, তারা কি এ বাস্তবতা থেকে ততটুকুও শেখেনি যে, আমি চাইলে তাদের অপরাধের দরুন তাদেরকে পাকড়াও করতে পারি।[৭৯] (কিন্তু তারা শিক্ষণীয় বিষয়াবলীর ব্যাপারে অবজ্ঞা ও অবহেলা প্রদর্শন করে থাকে।) আর আমি তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেই। ফলে তারা কিছুই শোনে না।[৮০] যেসব জাতির কাহিনী আমি তোমাদের শুনাচ্ছি (যাদের দৃষ্টান্ত তোমাদের সামনে রয়েছে) তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তাদের কাছে আসে, কিন্তু যে জিনিসকে তারা একবার মিথ্যা বলেছিল তাকে আবার মেনে নেবার পাত্র তারা ছিল না। দেখো, এভাবে আমি সত্য অস্বীকারকারীদের দিলে মোহর মেরে দেই।[৮১] তাদের অধিকাংশের মধ্যে আমি অংগীকার পালনের মনোভাব পাইনি। বরং অধিকাংশকেই পেয়েছি ফাসেক ও নাফরমান।[৮২]

তারপর এ জাতিগুলোর পর (যাদের কথা ওপরে বলা হয়েছে) আমার নিদর্শনসমূহ সহকারে মূসাকে পাঠাই ফেরাউন ও তার জাতির প্রধানদের কাছে।[৮৩] কিন্তু তারাও আমার নিদর্শনসমূহের ওপর জুলুম করে।[৮৪] ফলতঃ এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল একবার দেখো।

মজীদের এসব আয়াত অত্যন্ত সময়োপযোগী ও চলতি ঘটনাবলীর সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। এ পটভূমিকার আলোকে এ আয়াতগুলোর নিগূঢ় অর্থ ও তাৎপর্য পুরোপুরি অনুধাবন করা

যেতে পারে। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, সূরা ইউনুস ২১ আয়াত, আন নহল ১১২ আয়াত, আল মুমিনূন ৫ ও ৭৬, আদ দুখান ৯–১৬)।

৭৮. মূলে مكر (মকর) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবীতে এর অর্থ হচ্ছে, গোপনে গোপনে কোন চেষ্টা তদবীর করা। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমনভাবে গুটি চালানো, যার ফলে তার ওপর চরম আঘাত না আসা পর্যন্ত সে জানতেই পারে না যে, তার ওপর এক মহা বিপদ আসন্ন। বরং বাইরের অবস্থা দেখে সে একথাই মনে করতে থাকে যে, সব কিছু ঠিকমতই চলছে।

৭৯. অর্থাৎ একটি পতিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির স্থানে অন্য যে জাতিটির উত্থান ঘটে তার জন্য নিজের পূর্ববর্তী জাতির পতনের মধ্যে যথেষ্ট পথনির্দেশনা থাকে। কিছুকাল পূর্বে যে জাতিটি এ স্থানে বিলাস ব্যসনে লিপ্ত ছিল এবং যাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবের ঝাণ্ডা এখানে পত্ পত্ করে উড়তো, চিন্তা ও কর্মের কোন্ ধরনের ত্রুটি ও ভ্রান্তি তাদেরকে ধ্বংস করেছে, নিজেদের বিবেক–বুদ্ধির যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে তারা একথা সহজেই অনুধাবন করতে পারে। তারা এটাও অনুভব করতে পারে, যে উচ্চতর শক্তি পূর্ববর্তী জাতিদেরকে তাদের অপরাধের কারণে ইতিপূর্বে পাকড়াও করেছিল এবং তাদেরকে এ স্থান থেকে সরিয়ে দিয়ে স্থানটি শূন্য করেছিল, সে শক্তি এখনো যথা স্থানে বহাল আছে এবং তার কাছ থেকে এ ক্ষমতাও কেউ ছিনিয়ে নেয়নি যে, এ স্থানের পূর্ববর্তী অধিবাসীরা যে ধরনের ভুল করে আসছিল সেই ধরনের ভুল যদি এ স্থানের বর্তমান অধিবাসীরা করতে থাকে, তাহলে পূর্ববর্তীদেরকে যেমন এ জায়গা থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল তেমনি এদেরকেও সরিয়ে দেয়া যেতে পারবে না।

৮০. অর্থাৎ যখন তারা ইতিহাস জেনে এবং শিক্ষণীয় ধ্বংসস্তূপ প্রত্যক্ষ করেও শিক্ষা গ্রহণ করে না এবং নিজেরাই নিজেদেরকে বিস্মৃতির মধ্যে নিক্ষেপ করে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের চিন্তা করার, বুঝার ও কোন উপদেশ দাতার উপদেশ শুনার সুযোগ মেলে না। যে ব্যক্তি নিজের চোখ বন্ধ করে নেয়, প্রখর সূর্যালোকও তার চোখে আলো ছড়াতে পারে না এবং যে ব্যক্তি নিজে শুনতে চায় না তাকে আর কেউ শুনাতে পারে না, এটিই আল্লাহর অমোঘ প্রাকৃতিক আইন।

৮১. আগের আয়াতে বলা হয়েছিল ঃ "আমি তাদের দিলে মোহর মেরে দেই, তারপর তারা কিছুই শুনতে পায় না"–এর ব্যাখ্যা আল্লাহ নিজেই এ আয়াতটিতে করে দিয়েছেন। এ ব্যাখ্যা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, দিলে মোহর মারার অর্থ হচ্ছে ঃ মানবিক বুদ্ধিবৃত্তির এমন একটি মনস্তাত্ত্বিক নিয়মের আওতাধীন হয়ে যাওয়া, যার দৃষ্টিতে একবার জাহেলী বিদ্বেষ বা হীন ব্যক্তি স্বার্থের ভিত্তিতে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার পর মানুষ নিজের জিদ ও হঠকারিতার শৃংখলে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে যেতে থাকে যে, তারপর কোন প্রকার যুক্তি–প্রমাণ, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা, নিরীক্ষাই সত্যকে গ্রহণ করার জন্য তার মনের দুয়ার খুলে দেয় না।

৮২. "কারোর মধ্যে অংগীকার পালনের মনোভাব পাইনি"–অর্থাৎ কোন ধরনের অংগীকার পালনের পরোয়াই তাদের নেই। আল্লাহর পালিত বান্দা হবার কারণে জন্মগতভাবে প্রত্যেকটি মানুষ আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ, তা প্রতিপালনের কোন

পরোয়াই তাদের নেই। তারা সামাজিক অংগীকার পালনেরও কোন পরোয়া করে না, মানব সমাজের একজন সদস্য হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তি যার সাথে একটি সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ অন্যদিকে নিজের বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টের মুহূর্তগুলোতে অথবা কোন সদিচ্ছা ও মহৎ বাসনা পোষণের মুহূর্তে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর সাথে যে অংগীকারে আবদ্ধ হয়, তাও তারা পালন করে না। এ তিন ধরনের অংগীকার ভংগ করাকে এখানে ফাসেকী বলা হয়েছে।

৮৩. ওপরে বর্ণিত ঘটনাগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা ভালভাবে মানসপটে গেঁথে দেয়া যে, যে জাতি আল্লাহর পয়গাম পাওয়ার পর তা প্রত্যাখ্যান করে, ধ্বংসই তার অনিবার্য পরিণতি। এরপর এখন মূসা, ফেরাউন ও বনি ইসরাঈলের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে ধারাবাহিকভাবে কয়েক রুকূ' পর্যন্ত। এর মধ্যে কুরাইশ বংশীয় কাফের, ইহুদি ও মুমিনদেরকে উপরোক্ত বিষয়বস্তুটি ছাড়াও আরো কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

এ কাহিনীর মাধ্যমে কুরাইশ বংশোদ্ভূত কাফেরদেরকে একথা বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, সত্যের দাওয়াতের প্রাথমিক স্তরে সত্য ও মিথ্যার শক্তির যে অনুপাত ব্যাহত দেখা যায় তাতে প্রতারিত না হওয়া উচিত। সত্যের সমগ্র ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয় যে, সূচনা বিন্দুতে তার সংখ্যা এত কম থাকে যে, শুরুতে সারা দুনিয়ার মোকাবিলায় মাত্র এক ব্যক্তি সত্যের অনুসারী এবং কোন প্রকার সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই সে মিথ্যার বিরুদ্ধে একাকী যুদ্ধ শুরু করে দেয়। এমন এক মিথ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেয় যার পেছনে রয়েছে বড় বড় জাতি ও রাষ্ট্রের বিপুল শক্তি। তারপরও শেষ পর্যন্ত সত্যই বিজয় লাভ করে। এ ছাড়াও এ কাহিনীতে তাদেরকে একথাও জানানো হয়েছে যে, সত্যের আহবায়কের মোকাবিলায় যেসব কৌশল অবলম্বন করা হয় এবং যেসব পন্থায় তার দাওয়াতকে দাবিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয় তা কিভাবে বুমেরাং হয়ে যায়। এ সংগে তাদেরকে একথাও জানানো হয় যে, সত্যের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের ধ্বংসের শেষ সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদের সংশোধিত হবার ও সঠিক পথ অবলম্বন করার জন্য কত দীর্ঘ সময় দিয়ে থাকেন এবং এরপরও যখন কোন প্রকার সতর্ক বাণী, কোন শিক্ষণীয় ঘটনা এবং কোন উজ্জ্বল নিদর্শন থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে না ও প্রভাবিত হয় না তখন তিনি তাদেরকে কেমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দান করেন।

যারা নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিল এ কাহিনীর মাধ্যমে তাদেরকে দ্বিবিধ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এক, নিজেদের সংখ্যাল্পতা ও দুর্বলতা এবং সত্য বিরোধীদের বিপুল সংখ্যা ও শক্তি যেন তাদেরকে হিম্মতহারা না করে এবং আল্লাহর সাহায্য বিলম্বিত হতে দেখে যেন তাদের মনোবল ভেংগে না পড়ে। দুই, ঈমান আনার পর যে দলই ইহুদিদের মত আচরণ করে তারা অবশ্যি ইহুদিদের মতই আল্লাহর লানতের শিকার হয়।

বনী ইসরাঈলের সামনে তাদের শিক্ষণীয় ইতিহাস পেশ করে তাদেরকে মিথ্যার পূজারি সাজার ক্ষতিকর পরিণাম থেকে সাবধান করা হয়েছে। তাদেরকে এমন এক নবীর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। যিনি পূর্বের নবীগণের প্রচলিত দীনকে সব রকমের মিশ্রণ মুক্ত করে আবার তার আসল আকৃতিতে পেশ করছিলেন।

وَقَالَ مُوسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ حَقِيْقٌ
عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۭ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ
فَاَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىٓ اِسْرَاۗءِيْلَ ۝ قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ
بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ
مُّبِيْنٌ ۝ وَنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيْضَاۗءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ۝

মূসা বললো ঃ "হে ফেরাউন![৮৫] আমি বিশ্বজাহানের প্রভুর নিকট থেকে প্রেরিত। আমার দায়িত্বই হচ্ছে, আল্লাহর নামে সত্য ছাড়া আর কিছুই বলবো না। আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নিযুক্তির সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছি। কাজেই তুমি বনী ইসরাঈলকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও।"[৮৬]

ফেরাউন বললো ঃ "তুমি যদি কোন প্রমাণ এনে থাকো এবং নিজের দাবীর ব্যাপারে সত্যবাদী হও, তাহলে তা পেশ করো।"

মূসা নিজের লাঠিটি ছুড়ে দিল। অমনি তা একটি জ্বলজ্যান্ত অজগরের রূপ ধারণ করলো। সে নিজের হাত বের করলো তৎক্ষণাত দেখা গেলো সেটি দর্শকদের সামনে চমকাচ্ছে।[৮৭]

৮৪. নিদর্শনসমূহের সাথে জুলুম করে। অর্থাৎ সেগুলো মানে না এবং যাদুকরের কারসাজি গণ্য করে সেগুলো এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। যেমন কোন উচ্চাংগের কবিতাকে কবিতাই নয় বরং তাকে দুর্বল বাক্য বিন্যাস গণ্য করা এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা কেবল সেই কবিতাটির প্রতিই নয় বরং সমগ্র কাব্য জগত ও কাব্য চিন্তার প্রতিই জুলুমের নামান্তর। অনুরূপভাবে যেসব নিদর্শন নিজেই আল্লাহর পক্ষ থেকে হবার ব্যাপারে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য–প্রমাণ পেশ করে এবং যেগুলোর ব্যাপারে যাদুর সাহায্যে এমনি ধরনের নিদর্শনের প্রকাশ ঘটতে পারে বলে কোন বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ধারণাও করতে পারে না বরং যাদু বিদ্যা বিশারদগণ যেগুলো সম্পর্কে তাদের বিদ্যার সীমানার আওতার অনেক উর্ধের বলে সাক্ষ্য দেয় সেগুলোকেও যাদু গণ্য করা কেবল ঐ নিদর্শনগুলোর প্রতিই নয় বরং সুস্থ বিবেক বুদ্ধি ও প্রকৃত সত্যের প্রতিও বিরাট জুলুম।

৮৫. ফেরাউন শব্দের অর্থ "সূর্য দেবতার সন্তান।" প্রাচীন কালে মিসরীয়রা সূর্যকে তাদের মহাদেব বা প্রধান দেবতা মনে করতো। এ অর্থে তারা তাকে বলতো (রাও)। ফেরাউন এ 'রাও' এর সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। মিসরীয়দের বিশ্বাস অনুযায়ী কোন শাসনকর্তার সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হতে হলে তাকে 'রাও' এর

শারীরিক অবতার এবং তার দুনিয়াবী প্রতিনিধি হওয়া অপরিহার্য ছিল। এ জন্যই যতগুলো রাজ পরিবার মিসরের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে সূর্য বংশীয় হিসেবে পেশ করেছে। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর প্রত্যেকটি শাসক নিজেদের জন্য "ফেরাউন" (ফারাও) উপাধি গ্রহণ করে দেশবাসীর সামনে একথা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে যে, আমি-ই তোমাদের প্রধান রব বা মহাদেব।

এখানে একথাটিও মনে রাখতে হবে যে, কুরআন মজীদে হযরত মূসার ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে দু'জন ফেরাউনের কথা বলা হয়েছে। একজন ফেরাউনের আমলে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং তার গৃহে প্রতিপালিত হন। আর দ্বিতীয় জনের কাছে তিনি ইসলামের দাওয়াত ও বনি ইসরাঈলদের মুক্তির দাবী নিয়ে উপস্থিত হন এবং এ দ্বিতীয় ফেরাউনই অবশেষে জলমগ্ন হয়। বর্তমান যুগের গবেষকদের অধিকাংশের মতে প্রথম ফেরাউন ছিল দ্বিতীয় রামেসাস। তার শাসনকাল ছিল ১২৯২ থেকে ১২২৫ খৃষ্টপূর্বাব্দ। আর এখানে উল্লেখিত দ্বিতীয় ফেরাউন ছিল "মিনফাতা" বা "মিনফাতাহ"। পিতা দ্বিতীয় রামেসাসের জীবনকালেই সে শাসন কর্তৃত্বে অংশগ্রহণ করে এবং পিতার মৃত্যুর পর পুরোপুরি রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হয়। এ ধারণা বাহ্যত সন্দেহযুক্ত মনে হচ্ছে। কারণ ইসরাঈলী ইতিহাসের হিসেব অনুযায়ী হযরত মূসা (আ) ইন্তিকাল করেন ১২৭২ খৃষ্টপূর্বাব্দে। তবুও যা হোক আমাদের মনে রাখতে হবে, এগুলো নেহাত ঐতিহাসিক ধারণা ও আন্দাজ-অনুমান আর মিসরীয়, ইসরাঈলী ও খৃষ্টীয় পঞ্জিকার সাহায্যে একেবারে নির্ভুল সময়কালের হিসেব করা কঠিন।

৮৬. হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে দু'টি জিনিসের দাওয়াত সহকারে ফেরাউনের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এক, আল্লাহর বন্দেগী তথা ইসলাম গ্রহণ করো। দুই, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়, যারা আগে থেকেই মুসলমান ছিল, তাদের প্রতি জুলুম-নির্যাতন বন্ধ করে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। কুরআনের কোথাও এ দু'টি দাওয়াতের উল্লেখ করা হয়েছে এক সাথে আবার কোথাও স্থান-কাল বিশেষে আলাদা আলাদাভাবে এদের উল্লেখ এসেছে।

৮৭. হযরত মূসা যে বিশ্ব জাহানের শাসক ও সর্বময় কর্তৃত্বশালী আল্লাহর প্রতিনিধি, একথার প্রমাণ স্বরূপ এ দু'টি নিদর্শন তাঁকে দেয়া হয়েছিল। ইতিপূর্বেও আমি বলেছি যে, নবী রসূলগণ যখনই নিজেদেরকে রব্বুল আলামীনের প্রেরিত হিসেবে পেশ করেছেন তখনই লোকদের পক্ষ থেকে এ দাবীই জানানো হয়েছে যে, সত্যিই যদি তুমি রব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি হয়ে থাকো তাহলে তোমার মাধ্যমে এমন কিছু ঘটনার প্রকাশ হওয়া দরকার, যাতে প্রাকৃতিক আইনের সাধারণ নীতিমালার ব্যতিক্রম ঘটে এবং যার থেকে সুস্পষ্টভাবে একথা প্রকাশ হয় যে, বিশ্বপ্রভু তোমার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নিজের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে নিদর্শন হিসেবে এ ঘটনা ঘটিয়েছেন। এ দাবীর প্রেক্ষিতে নবীগণ বিভিন্ন নিদর্শন দেখিয়েছেন, যাকে কুরআনের পরিভাষায় "আয়াত" ও কালাম শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় "মুজিযা" বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের মুজিযাকে যারা প্রাকৃতিক আইনের অধীনে উদ্ভূত সাধারণ ঘটনা গণ্য করার চেষ্টা করে তারা আসলে আল্লাহর কিতাবকে মানার ও না মানার মাঝামাঝি এমন একটি ভূমিকা গ্রহণ করে, যাকে কোনক্রমেই যুক্তিসংগত মনে করা যেতে পারে না। কারণ কুরআন যেখানে দ্ব্যর্থহীন প্রাকৃতিক আইন

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ
مِنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي
الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿١١١﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾ وَجَاءَ السَّحَرَةُ
فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ نَعَمْ
وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ
نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾ قَالَ أَلْقُوا ۖ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ
وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ
عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾

১৪ রুকূ'

এ দৃশ্য দেখে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের প্রধানরা পরস্পরকে বললো ঃ "নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি একজন অত্যন্ত দক্ষ যাদুকর, তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বে-দখল করতে চায়।[৮৮] এখন তোমরা কি বলবে বলো?" তখন তারা সবাই ফেরাউনকে পরামর্শ দিলো, তাকে ও তার ভাইকে অপেক্ষারত রাখুন এবং নগরে নগরে সংগ্রাহক পাঠান। তারা প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে আপনার কাছে নিয়ে আসবে।[৮৯] অবশেষে যাদুকরেরা ফেরাউনের কাছে এলো।

তারা বললো ঃ "যদি আমরা বিজয়ী হই, তাহলে অবশ্যি এর প্রতিদান পাবো তো?"

ফেরাউন জবাব দিলো ঃ "হাঁ তাছাড়া তোমরা আমার দরবারের ঘনিষ্ঠজনেও পরিণত হবে।"

তখন তারা মূসাকে বললো ঃ "তুমি ছুঁড়বে, না আমরা ছুঁড়বো?"

মূসা জবাব দিলো ঃ "তোমরাই ছোঁড়ো।"

তারা যখনই নিজেদের যাদুর বাণ ছুঁড়লো তখনই তা লোকদের চোখে যাদু করলো, মনে আতংক ছড়ালো এবং তারা বড়ই জবরদস্ত যাদু দেখালো।

মূসাকে আমি ইংগিত করলাম, তোমার লাঠিটা ছুঁড়ে দাও। তার লাঠি ছোঁড়ার সাথে সাথেই তা এক নিমেষেই তাদের মিথ্যা যাদু কর্মগুলোকে গিলে ফেলতে লাগলো।[৯০]

বিরোধী ঘটনা উল্লেখ করছে সেখানে পূর্বাপর আলোচনার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করে তাকে একটি সাধারণ ঘটনা হিসেবে চিত্রিত করার প্রচেষ্টা চালানো নিছক একটি উদ্ভট বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই নয়। এর প্রয়োজন হয় একমাত্র এমন ধরনের লোকদের যারা একদিকে প্রাকৃতিক আইন বিরোধী ঘটনার উল্লেখকারী কোন কিতাবের প্রতি ঈমান আনতে চায় না আবার অন্যদিকে জন্মগতভাবে পৈতৃক ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে এমন একটি কিতাবকে অস্বীকার করতে চায় না, যাতে প্রাকৃতিক আইন বিরোধী ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে।

মুজিযার ব্যাপারে আসল ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকর প্রশ্ন কেবল একটিই এবং সেটি হচ্ছে এই যে, মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থাকে একটি আইনের ভিত্তিতে সচল করে দেবার পর কি নিজে স্থবির হয়ে বসে পড়েছেন এবং বর্তমানে বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনায় কখনো কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারেন না? অথবা তিনি কার্যত নিজের সাম্রাজ্যের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা নিজের কর্তৃত্বাধীনে রেখেছেন, প্রতি মুহূর্তে এ বিশ্ব রাজ্যে তাঁর বিধান জারি হচ্ছে এবং সর্বক্ষণ তিনি সকল বস্তুর আকৃতি প্রকৃতিতে এবং ঘটনাবলী স্বাভাবিক গতিধারায় আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে যেভাবে এবং যখন চান পরিবর্তন করেন? এরই প্রশ্নের জওয়াবে যারা প্রথম মতটি পোষণ করেন তাদের পক্ষে মুজিযার স্বীকৃতি দেয়া অসম্ভব। কারণ আল্লাহ সম্পর্কে তারা যে ধারণা পোষণ করেন তার সাথে মুজিযা খাপ খায় না। এবং বিশ্ব-জাহানের ব্যাপারে তাদের যে ধারণা তার সাথেও না। এ ধরনের লোকদের পক্ষে কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার পরিবর্তে পরিষ্কারভাবে কুরআন অস্বীকার করাই সংগত মনে হয়। কারণ কুরআন তো আল্লাহ সম্পর্কিত প্রথমোক্ত ধারণাটিকে মিথ্যা ও শেষোক্ত ধারাণাটিকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই নিজের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা ব্যয় করেছে। অন্যদিকে যে ব্যক্তি কুরআনের উপস্থাপিত যুক্তি প্রমাণে নিশ্চিন্ত হয়ে শেষোক্ত মতটি গ্রহণ করেন তার জন্য মুজিযার তাৎপর্য ও স্বরূপ অনুধাবন করা এবং তাকে স্বীকার করে নেয়া মোটেই কঠিন হয় না। সোজা কথায় বলা যায়, কেউ যদি বিশ্বাস করে অজগর সাপের জন্ম যেভাবে হচ্ছে কেবলমাত্র সেভাবেই তার জন্ম হতে পারে, অন্য কোন পন্থায় তাকে জন্ম দেবার ক্ষমতা আল্লাহর নেই, তাহলে সে "একটি লাঠি অজগরে পরিণত হয়েছে বা অজগর লাঠিতে রূপান্তরিত হয়েছে" এ মর্মে কেউ খবর দিলে তা বিশ্বাস করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যে আল্লাহর হুকুমে প্রাণ সঞ্চারিত হয় এবং যে বস্তুকে আল্লাহ যেভাবে চান জীবন দান করতে পারেন, তার কাছে আল্লাহর হুকুমে লাঠির অজগরে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া ঠিক তেমনি স্বাভাবিক সত্য ব্যাপার যেমন সেই একই আল্লাহর হুকুমে ডিমের মধ্যে কতিপয় প্রাণহীন উপাদানের অজগরে পরিণত হওয়া। একটি ঘটনা সবসময় ঘটে চলছে এবং অন্যটি মাত্র তিনবার ঘটেছে, শুধু মাত্র এতটুকু পার্থক্যের জন্য একটি ঘটনাকে স্বাভাবিক ও অন্যটিকে অস্বাভাবিক বলা চলে না।

৮৮. এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, একটি পরাধীন জাতির এক সহায়-সম্বলহীন ব্যক্তি যদি হঠাৎ একদিন ফেরাউনের মত মহা পরাক্রান্ত বাদশাহর কাছে চলে যান। সিরিয়া থেকে লিবিয়া পর্যন্ত এবং ভূমধ্যসাগরের উপকূল থেকে ইথিয়োপিয়া পর্যন্ত বিশাল ভূভাগের ওপর যার একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তৃত, অধিকন্তু সে নিজেকে জনগণের ঘাড়ের

ওপর দেবতা হিসেবেও সওয়ার হয়ে আছে। তাহলে নিছক তাঁর একটি লাঠিকে অজগরে পরিণত করে দেয়ার কাজটি কেমন করে এত বড় একটি সাম্রাজ্যকে আতংকিত করে তোলে। কিভাবেই বা এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, এ ধরনের একজন মানুষ একাকীই মিসর রাজকে সিংহাসনচ্যুত করে দেবেন এবং শাসক সম্প্রদায়সহ সমগ্র রাজ পরিবারকে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে দেবেন? তারপর ঐ ব্যক্তি যখন কেবলমাত্র নবুওয়াতের দাবী এবং বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দেবার দাবী উত্থাপন করেছিলেন আর এ ছাড়া অন্য কোন প্রকার রাজনৈতিক আলোচনাই করেননি তখন এ রাজনৈতিক বিপ্লবের আশংকা দেখা দিয়েছিল কেমন করে?

এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, মূসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াতের দাবীর মধ্যেই এ তাৎপর্য নিহিত ছিল যে, তিনি আসলে গোটা জীবন ব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে পরিবর্তিত করতে চান। দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাও নিশ্চিতভাবে এর অন্তর্ভুক্ত। কোন ব্যক্তির নিজেকে বিশ্ব প্রভু আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এ দাঁড়ায় যে, তিনি মানুষের কাছে নিজের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের দাবী জানাচ্ছেন। কারণ রব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি কখনো অন্যের অনুগত ও অন্যের প্রজা হয়ে থাকতে আসেন না। বরং তিনি আসেন অন্যকে অনুগত ও প্রজায় পরিণত করতে। কোন কাফেরের শাসনাধিকার মেনে নেয়া তার রিসালাতের মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ কারণেই হযরত মূসার মুখ থেকে রিসালাতের দাবী শুনার সাথে সাথেই ফেরাউন ও তার রাষ্ট্র পরিচালকবর্গের মনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের আশংকা দেখা দেয়। তবে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে যখন তাঁর এক ভাই ছাড়া আর কোন সাহায্যকারী ছিল না এবং কেবল মাত্র একটি সর্পে রূপান্তরিত হবার ক্ষমতা সম্পন্ন লাঠি ও একটি ঔজ্জ্বল্য বিকীরণকারী হাত ছাড়া তাঁর রসূল হিসেবে নিযুক্তির আর কোন প্রমাণ ছিল না তখন মিসরের রাজ দরবারে তাঁর এ দাবীকে এত গুরুত্ব দেয়া হলো কেন? আমার মতে এর দু'টি বড় বড় কারণ রয়েছে। এক, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে ফেরাউন ও তার সভাসদরা পুরোপুরি অবগত ছিল। তার পবিত্র-পরিচ্ছন্ন ও অনমনীয় চরিত্র। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও যোগ্যতা এবং জন্মগত নেতৃত্ব ও শাসন ক্ষমতার কথা তাদের সবার জানা ছিল। তালমূদ ও ইউসীফূসের বর্ণনা যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে বলতে হয়, হযরত মূসা (আ) এসব জন্মগত যোগ্যতা ছাড়াও ফেরাউনের গৃহে লাভ করেছিলেন বিভিন্ন জাগতিক বিদ্যা, দেশ শাসন ও সমর বিদ্যায় পারদর্শিতা। রাজপরিবারের সদস্যদের এসব শিক্ষা দেয়ার রেওয়াজ ছিল। তাছাড়া ফেরাউনের গৃহে যুবরাজ হিসেবে অবস্থান করার সময় আবিসিনিয়ায় সামরিক অভিযানে গিয়েও তিনি নিজেকে একজন সুযোগ্য সেনাপতি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তদুপরি রাজ প্রাসাদে জীবন যাপন এবং ফেরাউনী রাষ্ট্র ব্যবস্থার আওতাধীনে নির্বাহী কর্তৃত্বের আসনে বসার কারণে যে সামান্য পরিমাণ দুর্বলতা তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তাও মাদায়েন এলাকায় আট দশ বছর মরুচারী জীবন যাপন ও ছাগল চরাবার কঠোর দায়িত্ব পালনের কারণে দূর হয়ে গিয়েছিল। কাজেই আজ যিনি ফেরাউনের দরবারে দণ্ডায়মান, তিনি আসলে এক বয়স্ক, বিচক্ষণ ও তেজোদ্দীপ্ত দরবেশ সম্রাট। তিনি নবুওয়াতের দাবীদার হিসেবে তার সামনে উপস্থিত। এরূপ ব্যক্তির কথাকে হাওয়াই ফানুস মনে করে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব ছিল না। এর দ্বিতীয় কারণটি ছিল এই যে, লাঠি ও শ্বেতহস্তের মুজিযা দেখে

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا
صَاغِرِينَ ﴿١١٩﴾ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾
رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ
إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ
تَعْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ
آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا ۚ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾

এভাবে যা সত্য ছিল তা সত্য প্রমাণিত হলো এবং যা কিছু তারা বানিয়ে রেখেছিল তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো। ফেরাউন ও তার সাথীরা মোকাবিলার ময়দানে পরাজিত হলো এবং (বিজয়ী হবার পরিবর্তে) উল্টো তারা লাঞ্ছিত হলো। আর যাদুকরদের অবস্থা হলো এই—যেন কোন জিনিস ভিতর থেকে তাদেরকে সিজদাবনত করে দিলো। তারা বলতে লাগলো ঃ "আমরা ঈমান আনলাম বিশ্বজাহানের রবের প্রতি, যিনি মূসা ও হারুনেরও রব।"[৯১]

ফেরাউন বললো ঃ "আমার অনুমতি দেবার আগেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয়ই এটা কোন গোপন চক্রান্ত ছিল। তোমরা এ রাজধানীতে বসে এ চক্রান্ত এঁটেছো এর মালিকদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য। বেশ, এখন এর পরিণাম তোমরা জানতে পারবে। তোমাদের হাত-পা আমি কেটে ফেলবো বিপরীত দিক থেকে এবং তারপর তোমাদের সবাইকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করবো।"

তারা জবাব দিলো ঃ "সে যাই হোক আমাদের রবের দিকেই তো আমাদের ফিরতে হবে। তুমি যে ব্যাপারে আমাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছো, তা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, আমাদের রবের নিদর্শনসমূহ যখন আমাদের সামনে এসেছে তখন আমরা তা মেনে নিয়েছি। হে আমাদের রব! আমাদের সবর দান করো এবং তোমার অনুগত থাকা অবস্থায় আমাদের দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নাও।"[৯২]

ফেরাউন ও তার সভাসদরা অত্যন্ত অভিভূত, বিচলিত ও ভীত হয়ে পড়েছিল। তাদের প্রায় নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, এ ব্যক্তির পেছনে নিশ্চয়ই কোন অতিপ্রাকৃতিক

শক্তির সহায়তা রয়েছে। তাদের একদিকে হযরত মূসাকে যাদুকর বলা আবার অন্যদিকে তিনি তাদেরকে এ দেশের শাসন কর্তৃত্ব থেকে উৎখাত করতে চান বলে আশংকা প্রকাশ করা—এ দুটি বিষয় পরস্পরের বিপরীত। আসলে নবুওয়াতের প্রথম প্রকাশ তাদেরকে কিংকর্তব্য বিমূঢ় করে দিয়েছিল। তাদের উল্লেখিত মনোভাব, বক্তব্য ও কার্যক্রম তারই প্রমাণ। সত্যিই যদি তারা হযরত মূসাকে যাদুকর মনে করতো, তাহলে তিনি কোন রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটাবেন এ আশংকা তারা কখনো করতো না। কারণ যাদুর জোরে আর যাই হোক—দুনিয়ার কোথাও কখনো কোন রাজনৈতিক বিপ্লব সাধিত হয়নি।

৮৯. ফেরাউনের সভাসদদের এ বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে একথা জানা যায় যে, আল্লাহর নিদর্শন ও যাদুর মধ্যকার পার্থক্য তাদের কাছে একেবারেই পানির মত পরিষ্কার ছিল। তারা জানতো, আল্লাহর নিদর্শনের সাহায্যে প্রকৃত ও সত্যিকার পরিবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। আর যাদু নিছক দৃষ্টিশক্তি ও মনকে প্রভাবিত করে বস্তুর মধ্যে একটি বিশেষ ধরনের পরিবর্তন অনুভব করায়। তাই তারা হযরত মূসার রিসালাতের দাবী প্রত্যাখ্যান করার জন্য বলে, এ ব্যক্তি যাদুকর। অর্থাৎ লাঠি আসলে সাপে পরিণত হয়নি, কাজেই তাকে আল্লাহর নিদর্শন বলে মেনে নেয়া যায় না। বরং সেটি যেন সাপের মত বলে আমাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে। প্রত্যেক যাদুকর এভাবেই তার তেলেসমাতি দেখিয়ে থাকে। তারপর তারা পরামর্শ দেয়, সারা দেশের শ্রেষ্ঠ দক্ষ যাদুকরদেরকে একত্র করা হোক এবং তাদের যাদুকরী শক্তির মাধ্যমে লাঠি ও রশিকে সাপে পরিণত করে লোকদের দেখানো হোক। এর ফলে নবী সুলভ এ মুজিযা দেখে সাধারণ লোকের মনে যে উচ্চতর ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তা পুরোপুরি দূর না হলেও কমপক্ষে সন্দেহে রূপান্তরিত করা যাবে।

৯০. যাদুকরেরা যেসব রশি ও লাঠি ছুঁড়ে ফেলার পর সেগুলো বিভিন্ন প্রকারের সাপ ও অজগরের মত দেখাচ্ছিল হযরত মূসার লাঠি সেগুলোকে গিলে খেয়ে ফেলেছিল, এ ধারণা করা ঠিক হবে না। কুরআন এখানে যা কিছু বলছে তা হচ্ছে এই যে, হযরত মূসার লাঠি সাপে পরিণত হয়ে তাদের যাদুর প্রতারণার জাল ছিন্ন করতে শুরু করে। অর্থাৎ এ সাপ যেদিকে গেছে সেদিকেই তাদের যাদুর প্রভাবে যেসব লাঠি ও রশি সাপের মত হেলেদুলে নড়াচড়া করতে দেখা যাচ্ছিল তাদের সব প্রভাব খতম করে দিয়েছে এবং তার একটি মাত্র চক্করে যাদুকরদের প্রত্যেক সর্প অবয়বধারী লাঠি ও রশি সংগে সংগেই আগের মত লাঠি ও রশিতে পরিণত হয়ে গেছে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা তা-হা, টীকা ৪২)

৯১. এভাবে মহান আল্লাহ ফেরাউন ও তার দলবলের ফাঁদে তাদেরকেই আটকে দিলেন। তারা সারা দেশের শ্রেষ্ঠ যাদুকরদের আহবান করে প্রকাশ্য স্থানে তাদের যাদুর প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, এভাবে তারা হযরত মূসার যাদুকর হবার ব্যাপারে জনগণকে নিশ্চয়তা দিতে পারবে অথবা কমপক্ষে তাদেরকে সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারবে। কিন্তু এ প্রতিযোগিতায় পরাজিত হবার পর তাদের নিজেদের আহূত যাদু বিশারদরাই সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিল যে, হযরত মূসা (আ) যা পেশ করছেন তা মোটেই যাদু নয় বরং নিশ্চিতভাবে তা রব্বুল আলামীনের শক্তির নিদর্শন এবং এর ওপর যাদুর কোন প্রভাব ঘাটতে পারে না। একথা সুস্পষ্ট যে, যাদুকে

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ وَإِنَّا
فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٢٧﴾ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ
إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ ۖ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾
قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ
عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ
فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾

১৫ রুকূ'

ফেরাউনকে তার জাতির প্রধানরা বললো ঃ "তুমি কি মূসা ও তার জাতিকে এমনিই ছেড়ে দেবে যে, তারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াক এবং তোমার ও তোমার মাবুদদের বন্দেগী পরিত্যাগ করুক?" ফেরাউন জবাব দিল ঃ "আমি তাদের পুত্রদের হত্যা করবো এবং তাদের কন্যাদের জীবিত রাখবো।[৯৩] আমরা তাদের ওপর প্রবল কর্তৃত্বের অধিকারী।

মূসা তার জাতিকে বললো ঃ "আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং সবর করো। এ পৃথিবী তো আল্লাহরই। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান তাকে এর উত্তরাধিকারী করেন। আর যারা তাঁকে ভয় করে কাজ করে চূড়ান্ত সাফল্য তাদের জন্য নির্ধারিত।" তার জাতির লোকেরা বললো ঃ "তোমার আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং এখন তোমার আসার পরেও নির্যাতিত হচ্ছি।"। সে জবাব দিল ঃ "শীঘ্রই তোমাদের রব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দেবেন এবং পৃথিবীতে তোমাদেরকে খলীফা করবেন, তারপর তোমরা কেমন কাজ করো তা তিনি দেখবেন।

যাদুকরদের চাইতে বেশী ভালো করে আর কে জানতে পারে? কাজেই তারা যখন বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সাক্ষ দিল যে, ওটা যাদু নয়, তখন ফেরাউন ও তার সভাসদদের পক্ষে মূসাকে নিছক একজন যাদুকর বলে জনমনে বিশ্বাস জন্মানো অসম্ভব হয়ে পড়লো।

وَلَقَدْ أَخَذْنَآ آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣٠﴾ فَإِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۗ أَلَآ إِنَّمَا طَٰٓئِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ
لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ
وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ءَايَٰتٍ مُّفَصَّلَٰتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا
مُّجْرِمِينَ ﴿١٣٣﴾

১৬ রুকূ'

ফেরাউনের লোকদেরকে আমি কয়েক বছর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ ও ফসলহানিতে আক্রান্ত করেছি এ উদ্দেশ্যে যে, হয়তো তাদের চেতনা ফিরে আসবে। কিন্তু তাদের এমনি অবস্থা ছিল যে, ভাল সময় এলে তারা বলতো, এটা তো আমাদের প্রাপ্য। আর খারাপ সময় এলে মূসা ও তার সাথীদেরকে নিজেদের জন্য কুলক্ষুণে গণ্য করতো। অথচ তাদের কুলক্ষণ তো আল্লাহর কাছে ছিল। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ছিল অজ্ঞ। তারা মূসাকে বললো : "আমাদের যাদু করার জন্য তুমি যে কোন নিদর্শনই আনো না কেন, আমরা তোমার কথা মেনে নেবো না।[৯৪] অবশেষে আমি তাদের ওপর দুর্যোগ পাঠালাম,[৯৫] পংগপাল ছেড়ে দিলাম, উকুন[৯৬] ছড়িয়ে দিলাম, ব্যাংগের উপদ্রব সৃষ্টি করলাম এবং রক্ত বর্ষণ করলাম। এসব নিদর্শন আলাদা আলাদা করে দেখালাম। কিন্তু তারা অহংকারে মেতে রইলো এবং তারা ছিল বড়ই অপরাধপ্রবণ সম্প্রদায়।

৯২. পরিস্থিতি পাল্টে যেতে দেখে ফেরাউন তার শেষ চালটি চাললো। সে এই সমগ্র ব্যাপারটিকে হয়রত মূসা ও যাদুকরদের ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করলো, তারপর যাদুকরদেরকে শারীরিক নির্যাতন ও হত্যার হুমকি দিয়ে তাদের থেকে নিজের এ দোষারোপের স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করলো। কিন্তু এবারে এ চালটিরও উল্টো ফল হলো। যাদুকররা নিজেদেরকে সব রকমের শাস্তির জন্য পেশ করে একথা প্রমাণ করে দিল যে, মূসা আলাইহিস সালামকে সত্য বলে স্বীকার করা ও তাঁর ওপর তাদের ঈমান আনাটা কোন ষড়যন্ত্রের নয় বরং সত্যের অকুণ্ঠ স্বীকৃতির ফল। কাজেই তখন সত্য ও

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يٰمُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ
عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ
بَنِيٓ إِسْرَآئِيلَ ﴿١٣٤﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ هُمْ بَٰلِغُوهُ
إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿١٣٥﴾ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا
بِـَٔايَٰتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَٰفِلِينَ ﴿١٣٦﴾

যখনই তাদের ওপর বিপদ আসতো তারা বলতো ঃ "হে মূসা! তোমার রবের কাছে তুমি যে মর্যাদার অধিকারী তার ভিত্তিতে তুমি আমাদের জন্য দোয়া করো। যদি এবার তুমি আমাদের ওপর থেকে এ দুর্যোগ হটিয়ে দাও, তাহলে আমরা তোমার কথা মেনে নেবো এবং বনী ইসরাঈলকে তোমার সাথে পাঠিয়ে দেবো।" কিন্তু যখনই তাদের ওপর থেকে আযাব সরিয়ে নিতায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, অমনি তারা সেই অংগীকার ভংগ করতো। তাই আমি তাদের থেকে বদলা নিয়েছি এবং তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছি। কারণ তারা আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা বলেছিল এবং সেগুলোর ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল।

ইনসাফের যে প্রহসন সে সৃষ্টি করতে চাচ্ছিল তা পরিহার করে সোজাসুজি জুলুম ও নির্যাতনের পথে এগিয়ে আসা ছাড়া তার আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

এ প্রসঙ্গে এ বিষয়টিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঈমানের স্ফলিংগ যাদুকরদের চরিত্রে কি বিরাট পরিবর্তন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। মাত্র কিছুক্ষণ আগেই এ যাদুকরদের কী দাপট ছিল। নিজেদের পৈতৃক ধর্মের সাহায্যার্থে তারা নিজ নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে এসেছিল। তারা ফেরাউনকে জিজ্ঞেস করছিল, আমরা যদি মূসার আক্রমণ থেকে নিজেদের ধর্মকে রক্ষা করতে পারি তাহলে সরকার আমাদের পুরস্কৃত করবে তো? আর এখন ঈমানের নিয়ামত লাভ করার পর তাদেরই সত্যপ্রীতি, সত্য নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যে, মাত্র কিছুক্ষণ আগে যে বাদশাহর সামনে তারা লোভীর মত দু'হাত পেতে দিয়েছিল এখন তার প্রতাপ প্রতিপত্তি ও দর্পকে নির্ভয়ে পদাঘাত করতে লাগলো। সে যে ভয়াবহ শাস্তি দেবার হুমকি দিচ্ছিল তা বরদাশত করার জন্য তারা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে সত্যের দরজা তাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল প্রাণের বিনিময়েও তাকে পরিত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত ছিল না।

৯৩. এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জন্মের পূর্বে দ্বিতীয় রামেসাসের আমলে নির্যাতনের একটা যুগ অতিবাহিত হয়। আর নির্যাতনের

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا
الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۛ
بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا
يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ
يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ
آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ
مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾

আর তাদের জায়গায় আমি প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম দুর্বল ও অধোপতিত করে রাখা মানব গোষ্ঠীকে। অতপর যে ভূখণ্ডকে আমি প্রাচুর্যে ভরে দিয়েছিলাম, তার পূর্ব ও পশ্চিম অংশকে তাদেরই করতলগত করে দিয়েছিলাম।[৯৭] এভাবে বনী ইসরাঈলের ব্যাপারে তোমার রবের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। কারণ তারা সবর করেছিল। আর ফেরাউন ও তার জাতি যা কিছু তৈরী করছিল ও উঁচু করছিল তা সব ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

বনী ইসরাঈলকে আমি সাগর পার করে দিয়েছি। তারপর তারা চলতে চলতে এমন একটি জাতির কাছে উপস্থিত হলো যারা নিজেদের কতিপয় মূর্তির পূজায় লিপ্ত ছিল। বনী ইসরাঈল বলতে লাগলো ঃ "হে মূসা! এদের মাবূদদের মত আমাদের জন্যও একটা মাবূদ বানিয়ে দাও।"[৯৮] মূসা বললো ঃ "তোমরা বড়ই অজ্ঞের মত কথা বলছো। এরা যে পদ্ধতির অনুসরণ করছে তাতে ধ্বংস হবে এবং যে কাজ এরা করছে তা সম্পূর্ণ বাতিল।"

দ্বিতীয় যুগটি শুরু হয় হযরত মূসার নবুওয়াত লাভের পর। এ উভয় যুগেই বনী ইসরাঈলদের ছেলেদেরকে হত্যা করা হয় এবং মেয়েদেরকে জীবিত রাখা হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে তাদের বংশধারা বিলুপ্ত করার এবং এ জাতিটিকে অন্যজাতির মধ্যে বিলীন করে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৯৬ সালে প্রাচীন মিসরের ধ্বংসাবশেষ খনন করার সময় সম্ভবত এ যুগেরই একটি শিলালিপি পাওয়া যায়। তাতে এ মিনফাতাহ ফিরাউন নিজের কৃতিত্ব ও বিজয় ধারা বর্ণনা করার পর লিখছে, "আর ইসরাঈলকে বিলুপ্ত করে দেয়া

হয়েছে। তার বীজও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। (আরো জানার জন্য পড়ুন সূরা আল মুমিনূন ২৫ আয়াত)।

৯৪. ফেরাউনের সভাসদরা এমন একটি জিনিসকে যাদু গণ্য করছিল, যে সম্পর্কে তারা নিজেরাও নিশ্চিতভাবে জানতো যে, তা যাদুর ফল হতে পারে না। এটা তাদের চরম হঠকারিতা ও বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। একটি দেশের সমগ্র এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়া এবং একনাগাড়ে কয়েক বছর কম ফসল উৎপাদন ও ফসলহানি হওয়া কোন যাদুর কারসাজি হতে পারে বলে সম্ভবত কোন নির্বোধও বিশ্বাস করবে না। এ জন্যই কুরআন মজীদ বলছে ঃ

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا

"যখন আমার নিদর্শনসমূহ প্রকাশ্যে তাদের দৃষ্টি সমক্ষে এসে গেলো তখন তারা বললো, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু। অথচ তাদের মন ভিতর থেকে স্বীকার করে নিয়েছিল, কিন্তু তারা নিছক জুলুম ও বিদ্রোহের কারণে তা অস্বীকার করলো।"

(আন নামল ১৩–১৪ আয়াত)।

৯৫. সম্ভবত এখানে বৃষ্টিজনিত দুর্যোগ বুঝানো হয়েছে। বৃষ্টির সাথে শিলাও বর্ষিত হয়েছিল। যদিও অন্য ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগও হতে পারে কিন্তু বাইবেলে শিলাবৃষ্টি জনিত দুর্যোগের কথা বলা হয়েছে। তাই এখানে এ অর্থটিকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছি।

৯৬. এখানে মূল শব্দ হচ্ছে قُمَّلَ (কুম্মাল্)। এর কয়েকটি অর্থ হয়। যেমন উকুন, ছোট মাছি, ছোট পংগপাল, মশা, ঘুণ ইত্যাদি। সম্ভবত এ বহু অর্থবোধক শব্দটি ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, একই সংগে উকুন ও মশা মানুষের ওপর এবং ঘুণ খাদ্য শস্যের ওপর আক্রমণ করে থাকবে। (তুলনামূলক পাঠের জন্য দেখুন বাইবেলের যাত্রা পুস্তক ৭–১২ অধ্যায়। এ ছাড়াও সূরা যুখরুফ–এর ৪৩ টীকাটিও দেখুন)।

৯৭. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের উত্তরাধিকারী করে দিয়েছি। কেউ কেউ এর এ অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, বনী ইসরাঈলকে খোদ্ মিসরের মালিক বানিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু এ অর্থ গ্রহণ করার স্বপক্ষে একে তো কুরআনের ইংগিতগুলো যথেষ্ট পরিমাণে স্পষ্ট নয়। তদুপরি ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলী থেকেও এর স্বপক্ষে কোন শক্তিশালী প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই এ অর্থ গ্রহণ করার ব্যাপারে আমি দ্বিধান্বিত। (দেখুন সূরা আল কাহাফের ৫৭ টীকা এবং আশ্ শু'আরার ৪৫ টীকা)।

৯৮. বনী ইসরাঈল যে স্থান থেকে লোহিত সাগর অতিক্রম করেছিল সেটি ছিল সম্ভবত বর্তমান সুয়েজ ও ইসমাঈলীয়ার মধ্যবর্তী কোন একটি স্থান। এখান থেকে লোহিত সাগর পার হয়ে তারা সিনাই উপদ্বীপের দক্ষিণ অঞ্চলের দিকে উপকূলের কিনারা ঘেঁষে রওয়ানা হয়েছিল। সে সময় সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিম ও উত্তরাংশ মিসরের শাসনাধীন ছিল। দক্ষিণের এলাকায় বর্তমান তূর শহর ও আবু যানীমার মধ্যবর্তী স্থানে তামা ও নীলম পাথরের খনি ছিল। এ খনিজ সম্পদ দ্বারা মিসরবাসী প্রচুর লাভবান

قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَإِذْ
أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ
أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾

মূসা আরো বললো ঃ "আমি কি তোমাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ খুঁজবো? অথচ আল্লাহই সারা দুনিয়ার সমস্ত জাতি গোষ্ঠীর ওপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর (আল্লাহ বলেন) ঃ সেই সময়ের কথা স্মরণ করো যখন আমি ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছিলাম, যারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দিতো, তোমাদের ছেলেদের হত্যা করতো এবং মেয়েদের জীবিত রাখতো। আর এর মধ্যে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য ছিল মহা পরীক্ষা।"

হতো। এ খনিগুলো সংরক্ষণ করার জন্য মিসরীয়রা কয়েক জায়গায় টহলদার চৌকি স্থাপন করেছিল। মাফকাহ নামক স্থানে এ ধরনের একটি চৌকি ছিল। এখানে ছিল মিসরীয়দের একটি বিরাট মন্দির। উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এখনো এর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এর কাছাকাছি আর একটি স্থানে প্রাচীন সিরীয় জাতিসমূহের চন্দ্রদেবীর মন্দির ছিল। সম্ভবত এরই কোন একটি জায়গা দিয়ে যাবার সময় দীর্ঘকাল মিসরীয়দের গোলামীতে জীবন যাপন করার কারণে মিসরীয় পৌত্তলিক ভাবধারায় গভীরভাবে প্রভাবিত বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মনে একটি কৃত্রিম খোদার প্রয়োজন অনুভূত হয়ে থাকবে।

মিসরবাসীদের দাসত্ব বনি ইসরাঈলীদের মনমানসকে কিভাবে বিকৃত করে দিয়েছিল নিম্নোক্ত বিষয়টি থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়। মিসর থেকে বের হয়ে আসার ৭০ বছর পর হযরত মূসার প্রথম খলীফা হযরত ইউসা ইবনে নূন বনী ইসরাঈলীদের সাধারণ সমাবেশে তাঁর শেষ ভাষণে বলেন ঃ

"তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সৎ সংকল্প ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর উপাসনা করো। আর তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা বড় নদীর (ফোরাত) ওপারে ও মিসরে যেসব দেবতার পূজা করতো তাদেরকে বাদ দাও। আর একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত যদি তোমাদের খারাপ লাগে তাহলে তোমরা যার উপাসনা করবে আজই তাকে মনোনীত করে নাও।..... এখন রইলো আমার ও আমার পরিবারবর্গের কথা, আমরা শুধুমাত্র আল্লাহরই উপাসনা করতে থাকবো।" (যিহোশূয় ২৪ ঃ ১৪-১৫)

এ থেকে বুঝা যায় যে, ফেরাউন শাসিত মিসরের দাসত্বের যুগে এ জাতির শিরা উপশিরায় পৌত্তলিকতার যে প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল, ৪০ বছর পর্যন্ত হযরত মূসার এবং

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖۤ
اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ
وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٤٢﴾

১৭ রুকূ'

মূসাকে আমি তিরিশ রাত-দিনের জন্য (সিনাই পর্বতের ওপর) ডাকলাম এবং পরে দশ দিন আরো বাড়িয়ে দিলাম। এভাবে তার রবের নির্ধারিত সময় পূর্ণ চল্লিশ দিন হয়ে গেলো।[৯৯] যাওয়ার সময় মূসা তার ভাই হারুনকে বললো ঃ "আমার অনুপস্থিতিতে তুমি আমার জাতির মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, সঠিক কাজ করতে থাকবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথে চলবে না।"[১০০]

২৮ বছর পর্যন্ত হযরত ইউশা'র অধীনে শিক্ষা ও অনুশীলন লাভ এবং তাঁদের নেতৃত্বে জীবন পরিচালনা করার পরও তা দূর করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় তারা নিজেদের সাবেক প্রভুদেরকে এসব মূর্তির পদতলে মাথা ঘষতে দেখেছে, মিসর থেকে বের হবার সাথে সাথেই সেই ধরনের মূর্তি দেখে তার সামনে মাথা নোয়াতে এসব বিকৃতমনা ও পথভ্রষ্ট মুসলমানরা যে উদগ্রীব হয়ে উঠবে না, সেটা কেমন করেই বা সম্ভব।

৯৯. মিসর থেকে বের হবার পর বনী ইসরাঈলীদের দাসসুলভ জীবনের অবসান ঘটলো। তারা একটি স্বাধীন জাতির মর্যাদা লাভ করলো। এ সময় বনী ইসরাঈলীদেরকে একটি শরীয়াত দান করার জন্য মহান আল্লাহর হুকুমে মূসা আলাইহিস সালামকে সিনাই পাহাড়ে ডাকা হলো। কাজেই ওপরে যে ডাকের কথা বলা হয়েছে তা ছিল এ ব্যাপারে প্রথম ডাক। আর এর জন্য চল্লিশ দিনের মেয়াদ নির্দিষ্ট করার বিশেষ কারণ ছিল। হযরত মূসা চল্লিশ দিন পাহাড়ের ওপর কাটাবেন। রোযা রাখবেন। দিনরাত ইবাদাত-বন্দেগী ও চিন্তা-গবেষণা করে মন-মস্তিষ্ককে একমুখী ও একনিষ্ঠ করবেন এবং এভাবে তাঁর ওপর যে গুরুত্বপূর্ণ বাণী নাযিল হতে যাচ্ছিল তাকে যথাযথভাবে গ্রহণ করার যোগ্যতা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারবেন।

হযরত মূসা এ নির্দেশ পালন করার উদ্দেশ্যে সিনাই পাহাড়ে যাবার সময় বর্তমান মানচিত্রে বনী সালেহ ও সিনাই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ওয়াদি আল শায়খ (আল শায়খ উপত্যকা) নামে অভিহিত স্থানটিতে বনী ইসরাঈলকে রেখে গিয়েছিলেন। এ উপত্যকার যে অংশে বনী ইসরাঈল তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করেছিল বর্তমানে তার নাম আল রাহা প্রান্তর। উপত্যকার এক প্রান্তে একটি ছোট পাহাড় অবস্থিত। স্থানীয় বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম সামূদের এলাকা থেকে হিজরত করে এখানে এসে অবস্থান

করেছিলেন। বর্তমানে সেখানে তাঁর স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। অন্যদিকে রয়েছে জাবাল-ই-হারুন নামে আর একটি ছোট পাহাড়। কথিত আছে, হযরত হারুন আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈলীদের বাছুর পূজায় অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়ে এখানে এসে বসেছিলেন। তৃতীয় দিকে রয়েছে সিনাইয়ের উঁচু পর্বত। এর ওপরের ভাগ সবসময় মেঘে আচ্ছন্ন থাকে। এর উচ্চতা ৭৩৫৯ ফুট। এ পাহাড়ের শিখর দেশে অবস্থিত একটি গুহা আজো তীর্থ যাত্রীদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়ে আছে। এ গুহায় হযরত মূসা (আ)

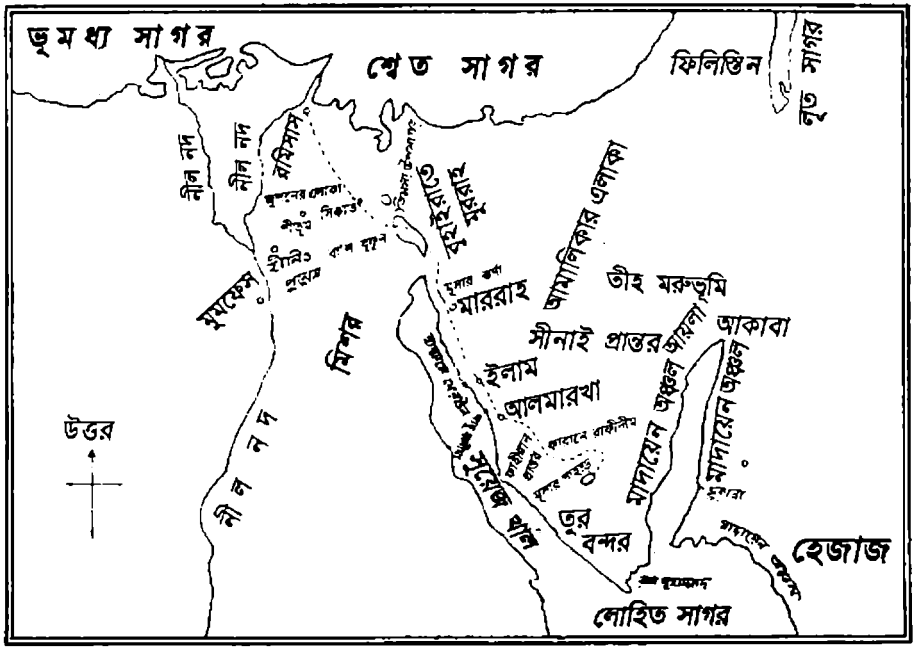

বনী ইসরাঈলের নির্গমন পথ

চিল্লা দিয়েছিলেন অর্থাৎ চল্লিশ দিন রোযা রেখে দিনরাত আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগী ও চিন্তা-গবেষণায় কাটিয়েছিলেন। এর কাছেই রয়েছে মুসলমানদের একটি মসজিদ ও খৃষ্টানদের একটি গীর্জা। অন্যদিকে পাহাড়ের পাদদেশে রোম সম্রাট জস্টিনিনের আমলের একটি খানকাহ আজো সশরীরে বিরাজ করছে। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা আন নামল ৯-১০ টীকা)।

১০০. হযরত হারুন আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত মূসা আলাইহিস সালামের চেয়ে তিন বছরের বড়। তবুও নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন তাঁর সাহায্যকারী। তাঁর নবুওয়াত স্বতন্ত্র ছিল না। বরং হযরত মূসা আলাইহিস সাল্যম আল্লাহর কাছে আবেদন জানিয়ে তাঁকে নিজের উজীর নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কুরআন মজীদের সামনের দিকের আলোচনায় এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ؕ
قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ
تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ
فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٤٣﴾
قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِيْ وَبِكَلَامِيْ ۖ
فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾ وَكَتَبْنَا لَهٗ فِي الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ
شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا
بِاَحْسَنِهَا ؕ سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٤٥﴾

অতপর মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলো এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন তখন সে আকূল আবেদন জানালো, "হে প্রভূ! আমাকে দর্শনের শক্তি দাও, আমি তোমাকে দেখবো।" তিনি বললেন ঃ "তুমি আমাকে দেখতে পারো না। হাঁ, সামনের পাহাড়ের দিকে তাকাও। সেটি যদি নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তাহলে অবশ্যি তুমি আমাকে দেখতে পাবে।" কাজেই তার রব যখন পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলো। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে মূসা বললো ঃ "পাক–পবিত্র তোমার সত্তা। আমি তোমার কাছে তাওবা করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম মুমিন।" বললেন ঃ "হে মূসা! আমি সমস্ত লোকদের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে তোমাকে নির্বাচিত করেছি যেন আমার নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে পারো এবং আমার সাথে কথা বলতে পারো। কাজেই আমি তোমাকে যা কিছু দেই তা নিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।"

এরপর আমি মূসাকে কতকগুলো ফলকে জীবনের সকল বিভাগ সম্পর্কে উপদেশ এবং প্রত্যেকটি দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ লিখে দিলাম[১০১] এবং তাকে বললাম ঃ

"এগুলো শক্ত হাতে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং তোমার জাতিকে এর উত্তম তাৎপর্যের অনুসরণ করার হুকুম দাও।[১০২] শীঘ্রই আমি তোমাদের দেখাবো ফাসেকদের গৃহ।[১০৩]

سَأَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ
وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا
يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ؕ ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٤٦﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا
وَلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٧﴾

কোন প্রকার অধিকার ছাড়াই যারা পৃথিবীতে বড়াই করে বেড়ায়,[১০৪] শীঘ্রই আমার নিদর্শনসমূহ থেকে আমি তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবো। তারা আমার যে কোন নিদর্শন দেখলেও তার প্রতি ঈমান আনবে না। তাদের সামনে যদি সোজা পথ এসে যায় তাহলে তারা তা গ্রহণ করবে না। আর যদি তারা বাঁকা পথ দেখতে পায় তাহলে তার ওপর চলতে আরম্ভ করবে। কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং সেগুলোর ব্যাপারে বেপরোয়া থেকেছে। আমার নিদর্শনসমূহকে যারাই মিথ্যা বলেছে এবং আখেরাতের সাক্ষাতের কথা অস্বীকার করেছে তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড ব্যর্থ হয়ে গেছে।[১০৫] যেমন কর্ম তেমন ফল—এ ছাড়া লোকেরা কি আর কোন প্রতিদান পেতে পারে?

১০১. বাইবেলে এ দু'টি ফলক সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এ দু'টি ছিল প্রস্তর ফলক। এ ফলকে লেখার কাজটিকে কুরআন ও বাইবেল উভয় কিতাবেই স্বয়ং আল্লাহর কীর্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। তবে আল্লাহ নিজের কুদরত তথা অসীম ক্ষমতা বলে নিজেই সরাসরি এ ফলকে লেখার কাজ সম্পাদন করেছিলেন, না কোন ফেরেশতাকে দিয়ে এ কাজ সম্পন্ন করেছিলেন অথবা এ কাজে হযরত মূসার হাত ব্যবহার করেছিলেন, এ ব্যাপারটি জানার কোন মাধ্যম আমাদের হাতে নেই। (তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য পড়ুন ঃ বাইবেল, যাত্রা পুস্তক ৩১ ঃ ১৮, ৩২ ঃ ১৫-১৬ এবং দ্বিতীয় বিবরণ ৫ ঃ ৬-২২)।

১০২. অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের সরল, সোজা ও সুস্পষ্ট মর্ম ও তাৎপর্য গ্রহণ করো। একজন সহজ সরল বিবেক সম্পন্ন মানুষ, যার মনে কোন অসৎ উদ্দেশ্য ও বক্রতা নেই, সে সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা যে অর্থ বোঝে, এখানে তার কথাই বলা হয়েছে। যারা আল্লাহর বিধানের সরল সোজা অর্থবোধক শব্দগুলো থেকে জটিল আইনগত মারপ্যাঁচ এবং বিভ্রান্তি ও কলহ কোন্দল সৃষ্টির পথ খুঁজে বের করে, তাদের সেই সব কূটতর্ককে যাতে আল্লাহর কিতাবের অনুমোদিত বিষয় মনে না করা হয় তাই এ শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسٰى مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ ۚ
أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۘ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا
ظٰلِمِينَ ﴿١٤٨﴾ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا ۙ قَالُوا لَئِنْ
لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿١٤٩﴾

১৮ রুকূ'

মূসার অনুপস্থিতিতে[১০৬] তার জাতির লোকেরা নিজেদের অলংকার দিয়ে একটি বাছুরের মূর্তি তৈরী করলো। তার মুখ দিয়ে গরুর মত 'হাম্বা' রব বের হতো। তারা কি দেখতে পেতো না যে, ঐ বাছুর তাদের সাথে কথাও বলে না আর কোন ব্যাপারে তাদেরকে পথনির্দেশনাও দেয় না? কিন্তু এরপরও তাকে মাবুদে পরিণত করলো। বস্তুত তারা ছিল বড়ই জালেম।[১০৭] তারপর যখন তাদের প্রতারণার জাল ছিন্ন হয়ে গেলো এবং তারা দেখতে পেল যে, আসলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে তখন বলতে লাগলো ঃ "যদি আমাদের রব আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন এবং আমাদের ক্ষমা না করেন, তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।"

১০৩. অর্থাৎ সামনে অগ্রসর হয়ে তোমরা এমন সব জাতির প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখবে যারা আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং ভুল পথে চলার ব্যাপারে অবিচল ছিল। সেই ধ্বংসাবশেষগুলো দেখে এ ধরনের কর্মনীতি অবলম্বনের পরিণাম কি হয় তা তোমরা নিজেরাই জানতে পারবে।

১০৪. অর্থাৎ আমার প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী এ ধরনের লোকেরা কোন শিক্ষাপ্রদ ঘটনা অনুধাবন করতে এবং কোন শিক্ষণীয় বিষয় থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে না।

'বড়র আসন গ্রহণ করা' বা 'বড়াই করে বেড়ানো' বাক্যাংশটি কুরআন মজীদে এমন এক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা থেকে বুঝা যায় যে, বান্দা নিজেকে আল্লাহর বন্দেগী করার উর্ধে স্থান দেয়, আল্লাহর আদেশ নিষেধের কোন ধার ধারে না এবং এমন একটি কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে যাতে মনে হয়, সে আল্লাহর বান্দা নয় এবং আল্লাহ তার রব নয়। একটি মিথ্যা ও ভূয়া আত্মম্ভরিতা ছাড়া এ ধরনের অহংকারের কোন অর্থ হয় না। কারণ আল্লাহর যমীনে বাস করে কোন মানুষের অন্যের বান্দা হয়ে থাকার কোন অধিকার নেই। তাই এখানে বলা হয়েছে ঃ "কোন প্রকার অধিকার ছাড়াই যারা পৃথিবীতে বড়াই করে বেড়ায়।"

১০৫. ব্যর্থ হয়ে গেছে অর্থাৎ ফলদায়ক হয়নি এবং তা অলাভজনক ও অর্থহীন হয়ে পড়েছে। কারণ আল্লাহর দরবারে মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টা ও কর্ম সফল হওয়া নির্ভর করে

দু'টি বিষয়ের ওপর। এক, সেই প্রচেষ্টা ও কর্মটি অনুষ্ঠিত হতে হবে শরীয়াতের আইনের আওতাধীনে। দুই, দুনীয়ার পরিবর্তে আখেরাতের সাফল্য হবে সেই প্রচেষ্টা ও কর্মের লক্ষ্য। এ শর্ত দু'টি পূর্ণ না হলে অনিবার্যভাবেই সমস্ত কৃতকর্ম পণ্ড ও বৃথা হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর হেদায়াত গ্রহণ করে না বরং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে বিদ্রোহাত্মক পদ্ধতিতে দুনিয়ায় কাজ করে, সে কোনক্রমেই আল্লাহর কাছে কোন প্রকার প্রতিদানের আশা করার অধিকার রাখে না। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্যই সব কিছু করে এবং আখেরাতের জন্য কিছুই করে না, সোজা কথায় বলা যায়, আখেরাতে তার কোন সুফল লাভের আশা করা উচিত নয় এবং সেখানে তার কোন ধরনের সুফল লাভ করার কোন কারণও নেই। আমার মালিকানাধীন জমিকে কোন ব্যক্তি যদি আমার অনুমোদন ছাড়াই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে থাকে তাহলে আমার পক্ষ থেকে শাস্তি পাওয়া ছাড়া সে আর কিসের প্রত্যাশা করতে পারে? আর সেই জমির ওপর অন্যায়ভাবে নিজের দখলী স্বত্ব বহাল রাখার সময় যদি এ সমস্ত কাজ সে নিজে এ উদ্দেশ্যেই করে থাকে যে, যত দিন আসল মালিক তার অন্যায় ধৃষ্টতাকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সে এ দ্বারা লাভবান হতে থাকবে এবং জমি পুনরায় মালিকের দখলে চলে যাওয়ার পর সে আর তা থেকে লাভবান হবার আশা করবে না। বা লাভবান হতে চাইবে না, তাহলে এ ধরনের অবৈধ দখলদারের কাছ থেকে নিজের জমি ফেরত নেবার পর কি কারণে আমি আবার নিজের উৎপন্ন ফসলের কিছু অংশ অনর্থক তাকে দিতে থাকবো?

১০৬. অর্থাৎ ৫০ দিন পর্যন্ত হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহর ডাকে সিনাই পাহাড়ে গিয়ে অবস্থান করছিলেন এবং তার জাতি পাহাড়ের পাদদেশে 'আর রাহা' প্রান্তরে অবস্থান করছিল সেই সময়।

১০৭. বনী ইসরাঈলীরা যে মিসরীয় কৃষ্টি নিয়ে মিসর ত্যাগ করেছিল এটি ছিল তার দ্বিতীয় প্রকাশ। মিসরে গো-পূজা ও গরুর পবিত্রতার যে ধারণা প্রচলিত ছিল তাতে এ জাতিটি এমন গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল যে, এ সম্পর্কে কুরআন বলছে : وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ অর্থাৎ "তাদের মনের গভীরে গো-বৎসের ভাবমূর্তি বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল।" সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, সবেমাত্র তিন মাস হলো তারা মিসর ত্যাগ করেছিল। সাগরের দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যাওয়া, সাগর বুকে ফেরাউনের সলিল সমাধি লাভ করা, এমন একটি দাসত্বের নিগড় ভেঙে তাদের বেরিয়ে আসা যা ভাঙার কোন আশাই ছিল না এবং এ ধরনের আরো বিভিন্ন ঘটনা এখনো তাদের স্মৃতিতে জীবন্ত ছিল। তারা খুব ভাল করেই জানতো, এসব কিছুই আল্লাহর অসীম ক্ষমতা বলেই সম্ভব হয়েছিল। অন্য কারোর শক্তির সামান্যতম অংশও এতে ছিল না। কিন্তু এরপরও তারা প্রথমে নবীর কাছে একটি কৃত্রিম ইলাহর চাহিদা পেশ করলো, তারপর নবীর অনুপস্থিতির প্রথম সুযোগেই নিজেরাই একটি মূর্তি বানিয়ে ফেললো। এ ধরনের কার্যকলাপের কারণেই বনী ইসরাঈলের কোন কোন নবী নিজের জাতিকে এমন এক ব্যভিচারী নারীর সাথে তুলনা করেছেন, যে নিজের স্বামী ছাড়া অন্য যে কোন পুরুষের সাথে প্রেম করে এবং বিয়ের প্রথম রাতেই যে স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে দ্বিধা করে না।

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِىْ
مِنْۢ بَعْدِىْ ۚ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ
اَخِيْهِ يَجُرُّهٗٓ اِلَيْهِ ۭ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِىْ وَكَادُوْا
يَقْتُلُوْنَنِىْ ۠ فَلَا تُشْمِتْ بِىَ الْاَعْدَاۗءَ وَلَا تَجْعَلْنِىْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۱۵۰
قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَلِاَخِىْ وَاَدْخِلْنَا فِىْ رَحْمَتِكَ ۡ وَاَنْتَ اَرْحَمُ
الرّٰحِمِيْنَ ۱۵۱

ওদিকে মূসা ফিরে এলেন তার জাতির কাছে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ অবস্থায়। এসেই বললেন ঃ "আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার বড়ই নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছো! তোমরা কি নিজেদের রবের হুকুমের অপেক্ষা করার মত এতটুকু সবরও করতে পারলে না।?" সে ফলকগুলো ছুঁড়ে দিল এবং নিজের ভাইয়ের (হারুন) মাথার চুল ধরে টেনে আনলো। হারুন বললো ঃ "হে আমার সহোদর! এ লোকগুলো আমাকে দুর্বল করে ফেলেছিল এবং আমাকে হত্যা করার উপক্রম করেছিল। কাজেই তুমি শত্রুর কাছে আমাকে হাস্যাস্পদ করো না এবং আমাকে এ জালেম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করো না।[১০৮] তখন মূসা বললো ঃ "হে আমার রব! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করো এবং তোমার অনুগ্রহের মধ্যে আমাদের দাখিল করে নাও, তুমি সবচাইতে বেশী অনুগ্রহকারী।"

১০৮. ইহুদীরা জোরপূর্বক হযরত হারুনের ওপর একটি জঘন্য অপবাদ আরোপ করে আসছিল। কুরআন মজীদ এখানে তা খণ্ডন করেছে। বাইবেলে বাছুর পূজার ঘটনাটি নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ হযরত মূসার যখন পাহাড় থেকে নেমে আসতে দেরি হলো তখন বনী ইসরাঈলীরা অধৈর্য হয়ে হযরত হারুনকে বললো, আমাদের জন্য একটি মাবূদ বানিয়ে দাও। হযরত হারুন তাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী একটি সোনার বাছুর বানিয়ে দিলেন। বাছুরটিকে দেখেই বনী ইসরাঈলীরা বলে উঠলো, হে বনী ইসরাঈল! এ তো তোমাদের সেই খোদা, যা তোমাদেরকে মিসর থেকে বের করে নিয়ে এসেছে। তারপর হযরত হারুন তার জন্য একটি বেদী নির্মাণ করলেন, এক ঘোষণার মাধ্যমে পরের দিন সমস্ত বনী ইসরাঈলকে একত্রিত করলেন এবং সেই গো-দেবতার বেদীমূলে কুরবানী দিলেন। (যাত্রা পুস্তক ৩২ ঃ ১-৬) কুরআন মজীদের একাধিক স্থানে এ মিথ্যা বর্ণনার প্রতিবাদ করা হয়েছে, এবং যথার্থ সত্য ঘটনা বর্ণনা করে সেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহর

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٢﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ
ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٣﴾
وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا
هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾

১৯ রুকূ'

(জওয়াবে বলা হলো) "যারা বাছুরকে মাবুদ বানিয়েছে তারা নিশ্চয়ই নিজেদের রবের ক্রোধের শিকার হবেই এবং দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত হবে। মিথ্যা রচনাকারীদেরকে আমি এমনি ধরনের শাস্তিই দিয়ে থাকি। আর যারা খারাপ কাজ করে তারপর তাওবা করে নেয় এবং ঈমান আনে, এ ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে এ তাওবা ও ঈমানের পর তোমার রব ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

তারপর মূসার ক্রোধ প্রশমিত হলে সে ফলকগুলি উঠিয়ে নিল। যারা নিজেদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য ঐ সব ফলকে ছিল পথনির্দেশ ও রহমত।

নবী হারুন এ ঘৃণ্য অপরাধটি করেননি বরং এটি করেছিল আল্লাহর দুশমন ও বিদ্রোহী সামেরী। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা তা–হা ৯০–৯৪ আয়াত)।

আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটি বড় বিস্ময়কর মনে হয়। বনী ইসরাঈলীরা যাদেরকে আল্লাহর নবী বলে মানে তাদের মধ্য থেকে কারোর চরিত্রে তারা কলংক লেপন না করে ছাড়েনি, আবার কলংক লেপনও করেছে এমন বিশ্রীভাবে, যা শরীয়াত ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে নিকৃষ্টতম অপরাধ বিবেচিত হয়। যেমন শিরক, যাদু, ব্যভিচার, মিথ্যাচার, প্রতারণা এবং এমনি ধরনের আরো বিভিন্ন জঘন্য গুনাহের কাজ, যেগুলোতে লিপ্ত হওয়া একজন নবী তো দূরের কথা সাধারণ মুমিন ও ভদ্রলোকের পক্ষেও মারাত্মক লজ্জার ব্যাপার মনে করা হয়। বাহ্যত কথাটি বড়ই অদ্ভুত মনে হয়। কিন্তু বনী ইসরাঈলীদের নৈতিকতার ইতিহাস অধ্যয়ন করলে জানা যায়, আসলে এ জাতিটির ব্যাপারে এটি মোটেই বিস্ময়কর নয়। এ জাতিটি যখন নৈতিক ও ধর্মীয় অধপতনের শিকার হলো এবং তাদের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পর্যন্ত এমনকি উলামা, মাশায়েখ ও দীনী পদাধিকারী ব্যক্তিরাও গোমরাহী ও চরিত্রহীনতার সয়লাবে ভেসে গেলো তখন তাদের অপরাধী বিবেক নিজেদের এ অবস্থার জন্য ওযর তৈরী করতে শুরু করে দিল এবং যেসব অপরাধ তারা নিজেরা করে চলছিল সেগুলো সবই নবীদের সাথে সংশ্লিষ্ট করে তাদের

وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ
قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ
مِنَّا ۖ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ ۖ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۖ أَنتَ
وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٥﴾ وَاكْتُبْ لَنَا فِي
هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي
أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ
يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾

আর মূসা (তার সাথে) আমার নির্ধারিত সময়ে হাযির হবার জন্য নিজের জাতির সত্তর জন লোককে নির্বাচিত করলো।[১০৯] যখন তারা একটি ভয়াবহ ভূমিকম্পে আক্রান্ত হলো তখন মূসা বললো : "হে প্রভু! তুমি চাইলে আগেই এদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করে দিতে পারতে। আমাদের মধ্য থেকে কিছু নির্বোধ লোক যে অপরাধ করেছিল সে জন্য কি তুমি আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবে? এটি তো ছিল তোমার পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা, এর মাধ্যমে তুমি যাকে চাও পথভ্রষ্ট করো আবার যাকে চাও হেদায়াত দান করো।[১১০] তুমিই তো আমাদের অভিভাবক। কাজেই আমাদের মাফ করে দাও এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করো। ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ। আর আমাদের জন্য এ দুনিয়ার কল্যাণ লিখে দাও এবং আখেরাতেরও, আমরা তোমার দিকে ফিরেছি।" জওয়াবে বলা হলো : "শাস্তি তো আমি যাকে চাই তাকে দিয়ে থাকি কিন্তু আমার অনুগ্রহ সব জিনিসের ওপর পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।[১১১] কাজেই তা আমি এমন লোকদের নামে লিখবো যারা নাফরমানী থেকে দূরে থাকবে, যাকাত দেবে এবং আমার আয়াতের প্রতি ঈমান আনবে।"

নবীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। এভাবে তারা বলতে চাইলো যে, নবীরাই যখন এসব থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারেননি তখন অন্যেরা আর কেমন করে বাঁচতে পারে? এ ব্যাপারে হিন্দুদের সাথে ইহুদীদের অবস্থার মিল রয়েছে। হিন্দুদের মধ্যেও যখন নৈতিক অধপতন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল তখন এমন ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল, যেখানে দেবতা,

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ۡ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ
عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۭ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ
وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝۱۵۷

(আজ তারাই এ রহমতের অংশীদার) যারা এ প্রেরিত উম্মী নবীর আনুগত্য করে,[১১২] যার উল্লেখ নিকট এখানে তাওরাত ও ইনজীলে লিখিত অবস্থায় পাওয়া যায়।[১১৩] সে তাদের সৎকাজের আদেশ দেয়, অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে, তাদের জন্য পাক পবিত্র জিনিসগুলো হালাল ও নাপাক জিনিসগুলো হারাম করে[১১৪] এবং তাদের ওপর থেকে এমন সব বোঝা নামিয়ে দেয়। যা তাদের ওপর চাপানো ছিল আর এমন সব বাঁধন থেকে তাদেরকে মুক্ত করে যাতে তারা আবদ্ধ ছিল।[১১৫] কাজেই যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সাহায্য সহায়তা দান করে এবং তার সাথে অবতীর্ণ আলোক রশ্মির অনুসরণ করে তারাই সফলতা লাভের অধিকারী।

মুনি-ঋষি, অবতার তথা জাতির যারা সর্বোত্তম আদর্শ ব্যক্তিত্ব ছিল তাদের সবার গায়ে কলংক লেপন করে দেয়া হয়েছিল। এভাবে তারা বলতে চেয়েছিল যে, এত বড় মহান ব্যক্তিত্বরাই যখন এসব খারাপ কাজে লিপ্ত হতে পারে তখন আমরা সাধারণ মানুষরা আর কোন্ ছার? আর এ কাজগুলো যখন এ ধরনের মহীম মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য লজ্জাকর নয় তখন আমাদের জন্যই বা তা কলংকজন হতে যাবে কেন?

১০৯. জাতীয় প্রতিনিধিদের তলব করার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। জাতির ৭০ জন প্রতিনিধি সিনাই পাহাড়ে আল্লাহর সমীপে হাযির হয়ে সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে গো-বৎস পূজার অপরাধের ক্ষমা চাইবে এবং নতুন করে আল্লাহর আনুগত্যের অংগীকার করবে, এই ছিল এর উদ্দেশ্য। বাইবেল ও তালমুদে এ বিষয়টির উল্লেখ নেই। তবে হযরত মূসা যে ফলকগুলি ছুঁড়ে দিয়ে ভেঙে ফেলেছিলেন সেগুলোর বদলে অন্য ফলক দেবার জন্য তাঁকে সিনাই পাহাড়ে ডেকে পাঠানো হয়েছিল একথা অবশ্যি সেখানে উল্লেখিত হয়েছে। (যাত্রা পুস্তক ৩৪ অধ্যায়)।

১১০. এর অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেকটি পরীক্ষাকাল মানুষের জন্য চূড়ান্তই হয়ে থাকে। এ পরীক্ষা চালুনীর মত একটি মিশ্রিত দল থেকে কর্মঠ লোকগুলোকে বাছাই করে নিয়ে

অকর্মণ্য লোকগুলোকে দূরে নিক্ষেপ করে দল থেকে আলাদা করে দেয়। এই ধরনের পরীক্ষা মাঝে মাঝে আসতে থাকে, এটা আল্লাহর একটি কর্ম কৌশল। এসব পরীক্ষায় যারা সফলকাম হয় তারা মূলত আল্লাহর সাহায্য ও পথনির্দেশেই সাফল্য লাভ করে থাকে। আর যারা ব্যর্থ হয় তারা আল্লাহর সাহায্য ও পথনির্দেশ থেকে বঞ্চিত হবার কারণেই ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। যদিও আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও পথনির্দেশনা লাভ করারও একটি নিয়ম আছে এবং এ নিয়মটি সম্পূর্ণরূপে প্রজ্ঞা ও ইনসাফের ওপর নির্ভরশীল। তবুও এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে, পরীক্ষায় কারোর সফলকাম বা অসফল হওয়া আসলে আল্লাহরই সাহায্য, অনুগ্রহ ও পথনির্দেশনার ওপর নির্ভর করে।

১১১. অর্থাৎ মহান আল্লাহ যে পদ্ধতিতে বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন সেখানে ক্রোধ মুখ্য নয় এবং অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী সেখানে মাঝে মধ্যে দেখা যায় এমন নয়। বরং অনুগ্রহই সেখানে মুখ্য এবং সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থা তারই ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর সেখানে ক্রোধের প্রকাশ কেবল তখনই ঘটে যখন মানুষের দম্ভ ও অহংকার সীমা ছাড়িয়ে যায়।

১১২. ওপরের বাক্যটি পর্যন্ত হযরত মূসার দোয়ার জওয়াব শেষ হয়ে গিয়েছিল। অতপর সুযোগ বুঝে এবার সাথে সাথেই বনী ইসরাঈলকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। এ ভাষণটির মূল বক্তব্য হচ্ছে তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হবার জন্য হযরত মূসা আলাইহিস সালামের যুগে যেসব শর্ত আরোপ করা হয়েছিল আজো সেগুলোই বহাল রয়ে গেছে। আর তোমাদের এ নবীর প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারটি আসলে সেই শর্তগুলোরই দাবী। তোমাদের বলা হয়েছিল, যারা আল্লাহর নাফরমানী থেকে দূরে থাকে আল্লাহর রহমত তাদেরই প্রাপ্য। তাইতো যে নবীকে আল্লাহ নিযুক্ত করেছেন তার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করাই হচ্ছে আজকের সবচেয়ে বড় মৌলিক নাফরমানী। কাজেই যতদিন তোমরা এ নাফরমানী থেকে বিরত হবে না ততদিন তোমরা খুটিনাটি ও ছোটখাটো তাকওয়ার বিষয় নিয়ে যতই মাতামাতি কর না কেন তাকওয়ার ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত হবে না। তোমাদের বলা হয়েছিল যাকাতও আল্লাহর রহমতের অংশ পাওয়ার একটি শর্ত। তাইতো আজ এ নবীর নেতৃত্বে দীন প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম চলছে যতদিন তার সাথে সেই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা হবে না ততদিন কোন প্রকার অর্থ ব্যয় যাকাতের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে না। কাজেই তোমরা যতই দান খয়রাত করো এবং নজর-নিয়াজ দাও না কেন এ পথে অর্থ ব্যয় না করা পর্যন্ত যাকাতের মৌলিক ভিত্তিই প্রতিষ্ঠিত হবে না। তোমাদের বলা হয়েছিল, যারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি ঈমান আনে আল্লাহ নিজের রহমত কেবল তাদের জন্যই লিখে রেখেছেন। তাইতো আজ এ নবীর ওপর যেসব আয়াত নাযিল হচ্ছে সেগুলো অস্বীকার করে তোমরা কোনক্রমেই আল্লাহর আয়াত মান্যকারী হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারো না। কাজেই তোমরা তাওরাতের প্রতি ঈমান রাখার যতই দাবী কর না কেন যতদিন তোমরা এ নবীর প্রতি ঈমান আনবে না ততদিন এ শেষ শর্তটিও পূর্ণ হবে না।

এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য "উম্মী" শব্দটির ব্যবহারও বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। বনী ইসরাঈলীরা নিজেদের ছাড়া দুনিয়ার অন্য জাতিদেরকে উম্মী (GENTILES) বলতো। কোন উম্মীর নেতৃত্ব গ্রহণ করা তো দূরের কথা উম্মীদের জন্য নিজেদের সমান মানবিক অধিকার স্বীকার করাও ছিল তাদের জাতীয় মর্যাদা ও অহংকারের

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ
وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٨﴾ وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ
يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥٩﴾

২০ রুকূ'

হে মুহাম্মাদ! বলে দাও, "হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের জন্য সেই আল্লাহর রসূল হিসেবে এসেছি, যিনি পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলীর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। কাজেই ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি এবং তার প্রেরিত সেই নিরক্ষর নবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীর প্রতি ঈমান আনে এবং তার আনুগত্য করো। আশা করা যায়, এভাবে তোমরা সঠিক পথ পেয়ে যাবে।"

মূসার[১১৬] জাতির মধ্যে এমন একটি দলও ছিল যারা সত্য অনুযায়ী পথনির্দেশ দিতো এবং সত্য অনুযায়ী ইনসাফ করতো।[১১৭]

পরিপন্থী। তাই কুরআনেই বলা হয়েছে : لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ (উম্মীদের ধন-সম্পদ ভোগ দখল করার জন্য আমাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না। (আলে ইমরান ৭৫ আয়াত) কাজেই আল্লাহ এ ক্ষেত্রে তাদেরই পরিভাষা ব্যবহার করে বলছেন, এখন তো এ উম্মীর সাথে তোমাদের ভাগ্য জুড়ে দেয়া হয়েছে। এর আনুগত্য স্বীকার করলে তোমরা আমার অনুগ্রহের অংশ লাভ করবে, নয়তো শত শত বছর থেকে তোমরা আমার যে ক্রোধের শিকার হয়ে আসছো এখনো তাই তোমাদের কপালে লেখা হবে।

১১৩. দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাওরাত ও ইনজীলের নিম্নোক্ত স্থানগুলো দেখুন। এসব স্থানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের ব্যাপারে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন, দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ : ১৫-১৯, মথি ২১ : ৩৩-৪৬, যোহন ১:১৯-২১, যোহন ১৪ : ১৫-১৭ এবং ২৫-৩০, যোহন ১৫ : ২৫-২৬, যোহন ১৬ : ৭-১৫)

১১৪. অর্থাৎ যে পাক-পবিত্র জিনিসগুলো তারা হারাম করে রেখেছে সেগুলো তিনি হালাল করে দেন এবং যেসব নাপাক ও অপবিত্র জিনিস তারা হালাল করে নিয়েছে সেগুলো তিনি হারাম গণ্য করেন।

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ؕ وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ
قَوْمُهٗۤ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ
قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ
الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ
كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٠﴾

আর তার জাতিকে আমি বারোটি পরিবারে বিভক্ত করে তাদেরকে স্বতন্ত্র গোত্রের রূপ দিয়েছিলাম।[১১৮] আর যখন মূসার কাছে তার জাতি পানি চাইলো তখন আমি তাকে ইঙ্গিত করলাম, অমুক পাথরে তোমার লাঠি দিয়ে আঘাত করো। ফলে সেই পাথরটি থেকে অকস্মাত বারোটি ঝরণাধারা প্রবাহিত হলো এবং প্রত্যেকটি দল তাদের পানি গ্রহণ করার জায়গা নির্দিষ্ট করে নিল। আমি তাদের ওপর মেঘমালার ছায়া দান করলাম এবং তাদের ওপর অবতীর্ণ করলাম মান্না ও সালওয়া[১১৯] —যেসব ভাল ও পাক জিনিস তোমাদের দিয়েছি সেগুলো খাও। কিন্তু এরপর তারা যা কিছু করেছে তাতে আমার ওপর জুলুম করেনি বরং নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছে।

১১৫. অর্থাৎ তাদের ফকীহরা নিজেদের আইনগত সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক নেতৃবর্গ নিজেদের ধার্মিকতা ও পরহেজগারীর অতি বাড়াবাড়ির সাহায্যে এবং মূর্খ সাধারণ মানুষ নিজেদের কল্প কুসংস্কার ও মনগড়া নীতি-নিয়মের বেড়াজালে আটকে তাদের জীবনকে যেসব বোঝার নীচে দাবিয়ে রাখে এবং যেসব বাঁধনে তাদেরকে বেঁধে রাখে এ নবী সেই সমস্ত বোঝা নামিয়ে দেন এবং সমস্ত বাঁধন খুলে দেন।

১১৬. মূল আলোচনা চলছিল বনী ইসরাঈল সম্পর্কে। মাঝখানে প্রসঙ্গক্রমে আলোচ্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। এখান থেকে আবার বক্তৃতার ধারা পরিবর্তন করে আগের আলোচনায় ফিরে আসা হয়েছে।

১১৭. অধিকাংশ অনুবাদক এ আয়াতের অনুবাদ এভাবে করেছেন—"মূসার জাতির মধ্যে এমন একটি দল আছে যারা সত্য অনুযায়ী পথনির্দেশ দেয় ও ইনসাফ করে।" অর্থাৎ তাদের মতে কুরআন নাযিল হবার সময় বনী ইসরাঈলীদের যে নৈতিক ও মানসিক অবস্থা বিরাজমান ছিল তারই কথা এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু পূর্বাপর আলোচনা বিশ্লেষণ করে আমরা এ মতটিকেই অগ্রাধিকার দিতে চাই যে, এখানে হযরত মূসার সময়

বনী ইসরাঈলীদের যে অবস্থা ছিল তারই কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে এ বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ জাতির মধ্যে যখন বাছুর পূজার অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপর পাকড়াও করা হয় তখন সমগ্র জাতি গোমরাহ ছিল না। বরং তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তখনো সৎ ছিল।

১১৮. সূরা মায়েদার ১২ আয়াতে বনী ইসরাঈলের সমাজ কাঠামো পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস প্রসংগে যে কথা বলা হয়েছে এবং বাইবেলের গণনা পুস্তকে যে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সেদিকেই এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, আল্লাহর আদেশে হযরত মূসা সিনাই পাহাড়ের জনবসতিহীন এলাকায় অবস্থানকালে বনী ইসরাঈল জাতির আদম শুমারী সম্পন্ন করেন। হযরত ইয়াকূবের দশ ছেলে এবং হযরত ইউসুফের দুই ছেলের বংশের ভিত্তিতে ১২টি পরিবারকে পৃথকভাবে ১২টি গোত্র বা গোষ্ঠীতে বিন্যস্ত ও সংগঠিত করেন। প্রত্যেকটি দলে একজন সরদার নিযুক্ত করেন। তাদের দায়িত্ব ছিল নৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক দিক দিয়ে দলের মধ্যে নিয়ম-শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং তাদের মধ্যে শরীয়াতের বিধান জারি করা। এ ছাড়া হযরত ইয়াকুবের যে দ্বাদশতম পুত্র লাবীর বংশে হযরত মূসা ও হযরত হারুনের জন্ম হয়েছিল, সেই শাখাটিকে বাদবাকী সব ক'টি গোত্রের মধ্যে সত্যের আলোক শিখা সমুজ্জ্বল রাখার দায়িত্ব পালনের জন্য একটি পৃথক দলের আকারে সংগঠিত করেন।

১১৯. ওপরে যে পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের কথা বলা হয়েছে সেটি ছিল মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলীদের ওপর যেসব অনুগ্রহ করেছিলেন তার অন্যতম। এরপর এখানে আরো তিনটি অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

এক ঃ সিনাই উপদ্বীপের জনমানবহীন এলাকায় তাদের জন্য অলৌকিক উপায়ে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। দুই, রৌদ্র তাপ থেকে বাঁচাবার জন্য তাদের ওপর আকাশে মেঘমালার ছায়া রচনা করা হয়। তিন, মান্না ও সালওয়ার আকারে তাদের জন্য খাদ্য সরবরাহের অস্বাভাবিক ব্যবস্থা করা হয়। তাদের জীবন ধারণের জন্য এ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা না করা হলে কয়েক লাখ জনসংখ্যা সম্বলিত এ জাতিটি এ খাদ্য-পানীয় বিহীন পাহাড়-মরু-প্রান্তরে ক্ষুধা পিপাসায় একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। আজো কোন ব্যক্তি সেই এলাকায় গেলে সেখানকার পরিবেশ দেখে অবাক হয়ে যাবে। অকস্মাত পনের বিশ লাখ মানুষ যদি সেই এলাকায় গিয়ে ওঠে তাহলে তাদের জন্য খাদ্য, পানি ও ছায়াদানের কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে, তা তার মাথায়ই আসবে না। বর্তমানে সমগ্র সিনাই উপদ্বীপের জনসংখ্যা ৫৫ হাজারের বেশী নয়। আর আজ এই বিশ শতকেও যদি কোন দেশের শাসক সেখানে ৫ লাখ সৈন্য নিয়ে যেতে চায় তাহলে তাদের জন্য খাদ্য ও পানীয় সরবরাহের ব্যবস্থাপনায় তার বিশেষজ্ঞদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ কারণে আল্লাহর কিতাব অমান্যকারী ও মুজিযা অস্বীকারকারী বহু আধুনিক পুরাতত্ত্ববিদ ও গবেষকগণ একথা মানতেই চান না যে, বনী ইসরাঈলীরা সিনাই উপদ্বীপের কুরআনে ও বাইবেলে উল্লেখিত অংশ অতিক্রম করেছিল। তাদের ধারণা, সম্ভবত এ ঘটনাগুলো

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا
حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ ۚ سَنَزِيدُ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦١﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٦٢﴾

স্মরণ করো[১২০] সেই সময়ের কথা যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, এ জনপদে গিয়ে বসবাস করো, সেখানে উৎপাদিত ফসল থেকে নিজেদের ইচ্ছামত আহার্য সংগ্রহ করো, 'হিত্তাতুন' 'হিত্তাতুন' বলতে বলতে যাও এবং শহরের দরজা দিয়ে সিজদানত হয়ে প্রবেশ করতে থাকো। তাহলে আমি তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবো এবং সৎকর্মপরায়ণদেরকে অতিরিক্ত অনুগ্রহ দান করবো।" কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জালেম ছিল তারা তাদেরকে যে কথা বলা হয়েছিল তা পরিবর্তিত করে ফেললো। এর ফলে তাদের জুলুমের বদলায় আমি আকাশ থেকে তাদের প্রতি আযাব পাঠিয়ে দিলাম।[১২১]

ফিলিস্তিনের দক্ষিণে ও আরবের উত্তরের এলাকায় কোথাও সংঘটিত হয়ে থাকবে। সিনাই উপদ্বীপের প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগলিক পরিবেশ যে রকম, তা দেখে তারা কল্পনাও করতে পারেন না যে, এত বড় একটা জাতির পক্ষে এখানে বছরের পর বছর এক একটি এলাকায় তাঁবু খাঁটিয়ে অবস্থান করতে করতে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। বিশেষ করে যখন মিসরের দিক থেকেও তাদের খাদ্য সরবরাহের পথ রুদ্ধ ছিল এবং অন্যদিকে পূর্ব ও উত্তরে আমালিকা গোত্রগুলো তাদের বিরোধিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এসব বিষয় বিবেচনা করলে সঠিকভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে, এ কয়েকটি সংক্ষিপ্ত আয়াতে মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলীদের প্রতি নিজের যে সমস্ত অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করেছেন, তা আসলে কত বড় অনুগ্রহ ছিল। এরপর আল্লাহর দান ও অনুগ্রহের এ ধরনের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন নিদর্শনাবলী দেখার পরও আল্লাহর সাথে এ জাতির নাফরমানী ও বিশ্বাসঘাতকতার যে ধারাবাহিক ঘটনাবলীতে ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ, তা থেকে বুঝা যায় যে, তারা কত বড় অকৃতজ্ঞ ছিল। (তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন সূরা বাকারা ৭২, ৭৩ ও ৭৬ টীকা)

১২০. মহান আল্লাহর উপরোল্লিখিত অনুগ্রহসমূহের জবাবে বনী ইসরাঈল কি ধরনের অপরাধমূলক ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্য দেখাতে থাকে এবং কিভাবে ক্রমাগত ধ্বংসের আবর্তে নেমে যেতে থাকে, তা তুলে ধরার জন্য এখানে এ জাতির সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে।

১২১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আল বাকারা ৭৪ ও ৭৫ টীকা।

وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِي
السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا
تَاْتِيْهِمْ ۛ كَذٰلِكَ ۛ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٣﴾

২১ রুকূ'

আর সমুদ্রের তীরে যে জনপদটি অবস্থিত ছিল তার অবস্থা সম্পর্কেও তাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করো।[১২২] তাদের সেই ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দাও যে, সেখানকার লোকেরা শনিবারে আল্লাহর হুকুম অমান্য করতো এবং শনিবারেই মাছেরা পানিতে ভেসে ভেসে তাদের সামনে আসতো।[১২৩] অথচ শনিবার ছাড়া অন্য দিন আসতো না। তাদের নাফরমানীর কারণে তাদেরকে আমি ক্রমাগত পরীক্ষার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছিলাম বলেই এমনটি হতো।[১২৪]

১২২. বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশের মতে এ স্থানটি ছিল 'আয়লা', আয়লাত বা 'আয়লুত"। ইসরাঈলের ইহুদী রাষ্ট্র বর্তমানে এখানে এ নামে একটি বন্দর নির্মাণ করেছে। এর কাছেই রয়েছে জর্দানের বিখ্যাত বন্দর আকাবা। লোহিত সাগরের যে শাখাটি সিনাই উপদ্বীপের পূর্ব উপকূল ও আরবের পশ্চিম উপকূলের মাঝখানে একটি লম্বা উপসাগরের মত দেখায় তার ঠিক শেষ মাথায় এ স্থানটি অবস্থিত। বনী ইসরাঈলের উত্থান যুগে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম এ শহরেই তাঁর লোহিত সাগরের সামরিক ও বাণিজ্যিক নৌবহরের কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন।

এখানে যে ঘটনাটির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ইহুদীদের পবিত্র গ্রন্থসমূহে আমরা তার কোন উল্লেখ পাই না। তাদের ইতিহাসও এ প্রসংগে নীরব। কিন্তু কুরআন মজীদে যেভাবে এ ঘটনাটিকে এখানে ও সূরা বাকারায় বর্ণনা করা হয়েছে, তা থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন নাযিলের সময় বনী ইসরাঈলীরা সাধারণভাবে এ ঘটনাটি সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত ছিল। এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতার প্রশ্নে যেখানে মদীনার ইহুদীরা কোন একটি সুযোগও হাতছাড়া হতে দিতো না সেখানে কুরআনের এ বর্ণনার বিরুদ্ধে তারা আদৌ কোন আপত্তিই তোলেনি।

১২৩. কুরআনে 'সাবৃত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'সাবৃত' মানে শনিবার। বনী ইসরাঈলীদের জন্য এ দিনটিকে পবিত্র দিন গণ্য করা হয়েছিল। মহান আল্লাহ এ দিনটিকে নিজের ও বনী ইসরাঈলীদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে সম্পাদিত পুরুষানুক্রমিক স্থায়ী অংগীকার গণ্য করে তাকীদ করেছিলেন যে, এ দিন কোন পার্থিব কাজ করা যাবে না, ঘরে আগুন পর্যন্ত জ্বালানো যাবে না, গৃহপালিত পশু এমন কি চাকর-বাকর-দাসদাসীদের থেকেও কোন সেবা গ্রহণ করা চলবে না এবং যে ব্যক্তি এ নিয়ম লংঘন করবে তাকে

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾

আর তাদের একথাও স্মরণ করিয়ে দাও, যখন তাদের একটি দল অন্য দলকে বলেছিল ঃ "তোমরা এমন লোকদের উপদেশ দিচ্ছো কেন যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন বা কঠোর শাস্তি দেবেন?" জবাবে তারা বলেছিল, "এসব কিছু এ জন্যই করছি যেন আমরা তোমাদের রবের সামনে নিজেদের ওযর পেশ করতে পারি এবং এ আশায় করছি যে, হয়তো এ লোকেরা তাঁর নাফরমানী করা ছেড়ে দেবে।" শেষ পর্যন্ত তাদেরকে যে সমস্ত হেদায়াত স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল তারা যখন সেগুলো সম্পূর্ণ ভুলে গেলো তখন যারা খারাপ কাজে বাধা দিতো তাদেরকে আমি বাঁচিয়ে নিলাম এবং বাকি সমস্ত লোক যারা দোষী ছিল তাদের নাফরমানীর জন্য তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিলাম।[১২৫]

হত্যা করা হবে। কিন্তু উত্তরকালে বনী ইসরাঈল প্রকাশ্যে এ আইনের বিরোধিতা করতে থাকে। ইয়ারমিয়াহ (যিরমিয়) নবীর আমলে (যিনি খৃষ্টপূর্ব ৬২৮ ও ৫৮৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে বেঁচে ছিলেন) লোকেরা খাস জেরুসালেমের সিংহ দরজাগুলো দিয়ে মালপত্র নিয়ে চলাফেরা করতো। এতে ঐ নবী ইহুদীদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, তোমরা যদি এভাবে প্রকাশ্যে শরীয়াতের বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে বিরত না হও তাহলে জেরুসালেমে আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে। (যিরমিয় ১৭ ঃ ২১–২৭) হযরত হিযকিঈল (যিহিস্কেল) নবীও এ একই অভিযোগ করেন। তাঁর আমল ছিল খৃষ্টপূর্ব ৫৯৫ ও ৫৩৬ এর মধ্যবর্তী সময়ে। তাঁর গ্রন্থে শনিবারের অবমাননাকে ইহুদীদের একটি মস্তবড় জাতীয় অপরাধ গণ্য করা হয়েছে। (যিহিস্কেল ২০ ঃ ১২–২৪) এসব উদ্ধৃতি থেকে অনুমান করা যেতে পারে, কুরআন মজীদ এখানে যে ঘটনাটির কথা বলছে সেটিও সম্ভবত এ একই যুগের ঘটনা।

১২৪. মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য মহান আল্লাহ যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন তার মধ্যে এও একটি পদ্ধতি যে, যখন কোন ব্যক্তি বা দলের মধ্যে আনুগত্য বিচ্যুতি ও নাফরমানীর প্রবণতা বাড়তে থাকে তখন তাকে আরো বেশী করে নাফরমানী করার সুযোগ দেয়া হয়। যেন তার যেসব প্রবণতা ভেতরে লুকিয়ে থাকে সেগুলো পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং যেসব অপরাধে সে নিজেকে কলুষিত করতে চায় কেবলমাত্র সুযোগের অভাবে সে সেগুলো থেকে বিরত থেকে না যায়।

১২৫. এ বর্ণনা থেকে জানা যায়, এ জনপদে তিন ধরনের লোক ছিল। এক, যারা প্রকাশ্যে ও পূর্ণ ঔদ্ধত্য সহকারে আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করছিল। দুই, যারা নিজেরা বিরুদ্ধাচরণ করছিল না কিন্তু অন্যের বিরুদ্ধাচরণকে নীরবে হাত পা গুটিয়ে বসে বসে দেখছিল এবং উপদেশ দানকারীদের বলছিল, এ হতভাগাদের উপদেশ দিয়ে কী লাভ? তিন, যারা ঈমানী সম্ভ্রমবোধ ও মর্যাদাবোধের কারণে আল্লাহর আইনের এহেন প্রকাশ্য অমর্যাদা বরদাশত করতে পারেনি এবং তারা এ মনে করে সৎকাজের আদেশ দিতে ও অসৎকাজ থেকে অপরাধীদেরকে বিরত রাখতে তৎপর ছিল যে, হয়তো ঐ অপরাধীরা তাদের উপদেশের প্রভাবে সৎপথে এসে যাবে, আর যদি তারা সৎপথে নাও আসে তাহলে অন্তত নিজেদের সামর্থ মোতাবিক কর্তব্য পালন করে তারা আল্লাহর সামনে নিজেদের দায় মুক্তির প্রমাণ পেশ করতে পারবে। এ অবস্থায় এ জনপদের ওপর যখন আল্লাহর আযাব নেমে এলো তখনকার অবস্থা বিশ্লেষণ করে কুরআন মজীদ বলছে, এ তিনটি দলের মধ্য থেকে একমাত্র তৃতীয় দলটিকেই বাঁচিয়ে নেয়া হয়েছিল। কারণ একমাত্র তারাই আল্লাহর সামনে নিজেদের ওযর পেশ করার চিন্তা করছিল এবং একমাত্র তারাই নিজেদের দায়িত্ব মুক্তির প্রমাণ সংগ্রহ করে রেখেছিল। বাকি দল দু'টিকে অপরাধীদের মধ্যে গণ্য করা হলো এবং নিজেদের অপরাধ অনুপাতে তারা শাস্তি ভোগ করলো।

কোন কোন তাফসীরকার এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহ প্রথম দলটির শাস্তি ভোগ করার এবং দ্বিতীয় দলটির উদ্ধার প্রাপ্তির ব্যাপারে স্পষ্ট উক্তি করেছেন। কিন্তু তৃতীয় দলটির ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। কাজেই তারা শাস্তি ভোগ করেছিল না উদ্ধার পেয়েছিল, এ ব্যাপারে কিছুই বলা যায় না। আবার আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে, তিনি প্রথমে দ্বিতীয় দলটি শাস্তি লাভ করেছিল বলে মত পোষণ করতেন। পরে তাঁর ছাত্র ইকরামা তাঁকে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করে দেন যে, দ্বিতীয় দলটি উদ্ধার পেয়েছিল। কিন্তু কুরআনের বর্ণনা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে মনে হয়, হযরত ইবনে আব্বাসের প্রথম চিন্তাটিই সঠিক ছিল। একথা সুস্পষ্ট যে, কোন জনপদের ওপর আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হলে সমগ্র জনপদবাসীরা দু'ভাগেই বিভক্ত হয়ে যেতে পারে। এক ভাগে এমন সব লোকেরা থাকে যারা আযাব ভোগ করে এবং অন্য ভাগে থাকে তারা যারা আযাব থেকে বেঁচে যায়। এখন কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী উদ্ধারপ্রাপ্ত যদি কেবল তৃতীয় দলটিই হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, যারা উদ্ধার পায়নি তাদের মধ্যে থাকবে প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় দলই। এরি সমর্থন পাওয়া যায় مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ (অর্থাৎ এসব কিছুই করছি আমরা তোমাদের রবের সামনে নিজের ওযর পেশ করার উদ্দেশ্যে) বাক্যাংশটির মধ্যে। এ বাক্যাংশটিতে আল্লাহ নিজেই একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আল্লাহর কাছে ওযর পেশ করার জন্য অবশ্যি নিজেদের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে যেতে হবে। এভাবে দায়িত্বমুক্তির প্রমাণ যারা সংগ্রহ করতে পারবে একমাত্র তারাই আল্লাহর কাছে ওযর পেশ করতে পারবে। এ থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত হচ্ছে, যে জনপদে প্রকাশ্যে আল্লাহর বিধান লংঘন করা চলতে থাকে সেখানকার সবাই জবাবদিহির সম্মুখীন হয়। সেখানকার কোন অধিবাসী শুধু নিজেই আল্লাহর বিধান লংঘন করেনি বলেই আল্লাহর সামনে জবাবদিহি থেকে বাঁচতে পারে না। বরং আল্লাহর সামনে নিজের সাফাই পেশ করার জন্য তাকে অবশ্যই এ মর্মে

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ﴿١٦٦﴾ وَاِذْ
تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ
الْعَذَابِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ۚ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٦٧﴾
وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ۫
وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٦٨﴾ فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ
خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ
سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ؕ

তারপর যে কাজ থেকে তাদেরকে বাধা দেয়া হয়েছিল তাই যখন তারা পূর্ণ ঔদ্ধত্যসহকারে করে যেতে লাগলো তখন আমি বললাম, তোমরা লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত বানর হয়ে যাও।[১২৬]

আর স্মরণ করো যখন তোমাদের রব ঘোষণা করেন[১২৭] "কিয়ামত পর্যন্ত তিনি সবসময় বনী ইসরাঈলীদের ওপর এমন সব লোককে চাপিয়ে দিয়ে যেতে থাকবেন যারা তাদেরকে দেবে কঠিনতম শাস্তি।"[১২৮] নিসন্দেহে তোমাদের রব দ্রুত শাস্তিদানকারী এবং নিশ্চিতভাবেই তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়ও।

আমি তাদেরকে পৃথিবীতে খণ্ড বিখণ্ড করে বহু সংখ্যক জাতিতে বিভক্ত করে দিয়েছি। তাদের মধ্যে কিছু লোক ছিল সৎ এবং কিছু লোক অন্য রকম। আর আমি ভাল ও খারাপ অবস্থায় নিক্ষেপ করার মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষা করতে থাকি, হয়তো তারা ফিরে আসবে। তারপর পরবর্তী বংশধরদের পর এমন কিছু অযোগ্য লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় যারা আল্লাহর কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়ে এ তুচ্ছ দুনিয়ার স্বার্থ আহরণে লিপ্ত হয় এবং বলতে থাকে আশা করা যায়, আমাদের ক্ষমা করা হবে। পরক্ষণে সেই ধরনের পার্থিব সামগ্রী যদি আবার তাদের সামনে এসে যায় তাহলে তারা তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গিয়ে তা লুফে নেয়।[১২৯]

প্রমাণ পেশ করতে হবে যে, নিজের সামর্থ মোতাবিক মানুষের সংশোধন ও আল্লাহর সত্য দীনের প্রতিষ্ঠার জন্য সে প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে। এ ছাড়া কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য বক্তব্য থেকেও আমরা সামষ্টিক অপরাধের ক্ষেত্রে আল্লাহর এ একই ধরনের আইনের কথা জানতে পারি। তাই আমরা দেখি কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لاَّ تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً

(সেই বিপর্যয় থেকে সাবধান হও, যার কবলে বিশেষভাবে কেবলমাত্র তোমাদের মধ্য থেকে যারা জুলুম করেছে তারাই পড়বে না।) আর এর ব্যাখ্যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتّٰى يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَا نَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُّنْكِرُوْهُ فَلاَ يُنْكِرُوْهُ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَذَّبَ اللّٰهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ –

"মহান আল্লাহ বিশেষ লোকদের অপরাধের দরুন সর্বসাধারণকে শাস্তি দেন না, যতক্ষণ সাধারণ লোকদের অবস্থা এমন পর্যায়ে না পৌঁছে যায় যে, তারা নিজেদের চোখের সামনে খারাপ কাজ হতে দেখে এবং তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশের ক্ষমতাও রাখে এরপরও কোন অসন্তোষ প্রকাশ করে না। কাজেই লোকেরা যখন এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় তখন আল্লাহ সাধারণ ও অসাধারণ নির্বিশেষে সবাইকে আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করেন।"

এ ছাড়াও আলোচ্য আয়াত থেকে একথাও জানা যায় যে, এ জনপদের ওপর দুই পর্যায়ে আল্লাহর আযাব নাযিল হয়। প্রথম পর্যায়ে নাযিল হয় عَذَابٌ بَئِيْسٌ (কঠিন শাস্তি) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে নাফরমানী যারা অব্যাহত রেখেছিল তাদেরকে বানরে পরিণত করা হয়। আমার মতে প্রথম পর্যায়ের আযাবে উভয় দলই শামিল ছিল এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের আযাব দেয়া হয়েছিল কেবলমাত্র প্রথম দলকে।

এ ক্ষেত্রে অবশ্যি সঠিক ব্যাপার একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। যদি আমার অভিমত সঠিক হয়ে থাকে তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। আর যদি আমি ভুল করে থাকি তাহলে সে জন্য আমিই দায়ী। আল্লাহ অবশ্যি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

১২৬. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আল বাকারা ৮৩ টীকা।

১২৭. এখানে মূল শব্দ হচ্ছে تَاْذَنَ এর অর্থ হয় অনেকটা নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেবার মত।

১২৮. প্রায় খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকে বনী ইসরাঈলকে এভাবে ক্রমাগত সতর্ক করে দিয়ে আসা হচ্ছিল। তাই দেখা যায়, ইহুদীদের পবিত্র গ্রন্থ সমষ্টিতে ইয়াসইয়াহ (যিশাইয়) ও ইয়ারমিয়াহ (যিরমিয়) এবং তাঁদের পর আগমনকারী নবীদের সকল গ্রন্থে কেবল এ সতর্কবাণী লিপিবদ্ধ রয়েছে। তারপর ঈসা আলাইহিস সালামও তাদেরকে এ একই

أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا
مَا فِيهِ ۗ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾
وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ
الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ
وَاقِعٌ بِهِمْ ۚ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾

তাদের কাছ থেকে কি কিতাবের অংগীকার নেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর নামে কেবলমাত্র সত্য ছাড়া আর কিছুই বলবে না? আর কিতাবে যা লেখা আছে তাতো তারা নিজেরাই পড়ে নিয়েছে।[১৩০] আখেরাতের আবাস তো আল্লাহর ভয়ে ভীত লোকদেরই জন্য ভাল[১৩১]—এতটুকু কথাও কি তোমরা বুঝো না? যারা কিতাবের বিধান যথাযথভাবে মেনে চলে এবং নামায কায়েম করে, নিসন্দেহে এহেন সৎকর্মশীল লোকদের কর্মফল আমি নষ্ট করবো না। তাদের কি সেই সময়টার কথা কিছু মনে আছে যখন আমি পাহাড়কে হেলিয়ে তাদের ওপর ছাতার মত এমনভাবে বিস্তৃত করে দিয়েছিলাম যে, তারা ধারণা করছিল, তা বুঝি তাদের ওপর পতিত হবে? সে সময় আমি তাদেরকে বলেছিলাম, তোমাদেরকে আমি যে কিতাব দিচ্ছি তাকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং তাতে যা কিছু লেখা আছে তা স্মরণ রাখো, আশা করা যায়, তোমরা ভুল পথ অবলম্বন করা থেকে বাঁচতে পারবে।[১৩২]

সতর্কবাণী শুনান। বিভিন্ন ইনজীল গ্রন্থে তাঁর একাধিক ভাষণ থেকেই এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সবশেষে কুরআন মজীদও একথাটিকে দৃঢ়ভাবে পুনর্ব্যক্ত করেছে। সে সময় থেকে নিয়ে আজো পর্যন্ত ইতিহাসের এমন একটি যুগও অতিক্রান্ত হয়নি যখন ইহুদী জাতির ওপর দুনিয়ার কোথাও না কোথাও নিপীড়ন ও লাঞ্ছনা অব্যাহত থাকেনি। ইহুদী জাতির এ অবস্থা কুরআন ও তার পূর্বেকার আসমানী গ্রন্থাবলীর সত্যতারই সুস্পষ্ট সাক্ষবহ।

১২৯. অর্থাৎ গুনাহ করে। তারা জানে এ কাজটি করা গুনাহ তবুও এ আশায় তারা এ কাজটি করে যে, কোন না কোনভাবে তাদের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। কারণ তারা মনে করে, তারা আল্লাহর প্রিয়পাত্র এবং তারা যত কঠিন অপরাধই করুক না কেন তাদের ক্ষমালাভ অপরিহার্য। এ ভুল ধারণার ফলে কোন গুনাহ করার পর তারা লজ্জিত

হয় না এবং তাওবাও করে না। বরং ঐ একই ধরনের গুনাহ করার সুযোগ এলে তারা আবার তাতে জড়িয়ে পড়ে। এ হতভাগ্য লোকেরা এমন একটি কিতাবের উত্তরাধিকারী ছিল, যা তাদেরকে দুনিয়ার নেতৃত্বের পদে আসীন করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের হীনমন্যতা ও নীচাশয়তার ফলে তারা এ সৌভাগ্যের পরশমণিটির সাহায্যে তুচ্ছ পার্থিব সম্পদ আহরণ করার চাইতে বড় কোন জিনিস উপার্জনের হিম্মতই করলো না। তারা দুনিয়ায় ন্যায়-ইনসাফ, সত্য-সততার পতাকাবাহী এবং কল্যাণ ও সুকৃতির অগ্রপথিক ও পথপ্রদর্শক হবার পরিবর্তে নিছক দুনিয়ার কুকুর হয়েই রইল।

১৩০. অর্থাৎ তারা নিজেরাই জানে, তাওরাতের কোথাও বনী ইসরাঈলের জন্য শর্তহীন মুক্তি সনদ দেয়ার উল্লেখ নেই। আল্লাহ কখনো তাদেরকে একথা বলেননি এবং তাদের নবীগণও কখনো তাদেরকে এ ধরনের নিশ্চয়তা দেননি যে, তোমরা যা ইচ্ছা করতে পারো, তোমাদের সকল গুনাহ অবশ্যি মাফ হয়ে যাবে। তাছাড়া আল্লাহ নিজে যে কথা কখনো বলেননি তাকে আল্লাহর কথা বলে প্রচার করার কি অধিকারই বা তাদের থাকতে পারে? অথচ তাদের কাছ থেকে অংগীকার নেয়া হয়েছিল যে, আল্লাহর নামে কোন অসত্য কথা তারা বলবে না।

১৩১. এ আয়াতটির দু'টি অনুবাদ হতে পারে। একটি অনুবাদ আমি এখানে করেছি। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, "আল্লাহর ভয়ে ভীত লোকদের জন্য তো আখেরাতের আবাসই ভাল" প্রথম অনুবাদের আলোকে আয়াতের তাৎপর্য হবে এই যে, মাগফেরাত কারোর একচেটিয়া ব্যক্তিগত বা পারিবারিক অধিকার নয়। তুমি এমন কাজ করবে যা শাস্তি লাভের যোগ্য কিন্তু আখেরাতে তুমি নিছক ইহুদী বা ইসরাঈলী হবার কারণে ভাল জায়গা পেয়ে যাবে, এটা কখনো হতে পারে না। তোমাদের মধ্যে সামান্যতম বিবেক-বুদ্ধি থাকলেও তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে যে, আখেরাতের ভাল জায়গা একমাত্র তারাই পেতে পারে যারা দুনিয়ায় আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে কাজ করে। আর দ্বিতীয় অনুবাদটি গ্রহণ করলে মর্ম এ দাঁড়ায় যে, যেসব লোক আল্লাহর ভয়ে ভীত নয় একমাত্র তারাই দুনিয়াবী লাভ ও স্বার্থকে আখেরাতের ওপর অগ্রাধিকার দেয়। আল্লাহর ভয়ে ভীত লোকেরা নিশ্চিতভাবে আখেরাতের স্বার্থকে দুনিয়ার স্বার্থের ওপর এবং আখেরাতের কল্যাণ ও লাভকে দুনিয়ার আয়েশ-আরামের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

১৩২. মূসা আলাইহিস সালামকে অংগীকারনামা খোদিত শিলালিপিগুলো দেবার সময় সিনাই পাহাড়ের পাদদেশে যে ঘটনাটি ঘটেছিল সেদিকে এখানে ইংগিত করা হয়েছে। বাইবেলে নিম্নোক্ত ভাষায় এ ঘটনাটির বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

> "পরে মূসা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করিয়ে দেয়ার জন্য লোকদেরকে শিবির থেকে বাইরে আনলেন। আর তারা পর্বতের তলায় দাঁড়ালো। তখন সমস্ত সিনাই পর্বত ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। কারণ মহান আল্লাহ অগ্নিশিখার মধ্য দিয়ে তার ওপর নেমে এলেন। আর ভাঁটির ধোঁয়ার মত ধোঁয়া ওপরে উঠছিল এবং গোটা পর্বত ভীষণভাবে কাঁপছিল।" (যাত্রা পুস্তক ১৯ ঃ ১৭-১৮)

এভাবে আল্লাহ কিতাবের বিধান মেনে চলার জন্য বনী ইসরাঈলীদের কাছ থেকে অংগীকার নেন। এ অংগীকার নিতে গিয়ে বাইরে তাদের জন্য একটি বিশেষ পরিবেশ

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ
وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾ وَكَذَٰلِكَ
نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾

২২ রুকূ'

আর হে নবী![১৩৩] লোকদের স্মরণ করিয়ে দাও সেই সময়ের কথা যখন তোমাদের রব বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করেছিলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের ওপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ "আমি কি তোমাদের রব নই?" তারা বলেছিল ঃ "নিশ্চয়ই তুমি আমাদের রব, আমরা এর সাক্ষ দিচ্ছি।"[১৩৪] এটা আমি এ জন্য করেছিলাম যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা না বলে বসো, "আমরা তো একথা জানতাম না।" অথবা না বলে ওঠো, "শিরকের সূচনা তো আমাদের বাপ–দাদারা আমাদের পূর্বেই করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাদের বংশে আমাদের জন্ম হয়েছে। তবে কি ভ্রষ্টাচারী লোকেরা যে অপরাধ করেছিল সে জন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করছো?"[১৩৫] দেখো, এভাবে আমি নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে পেশ করে থাকি।[১৩৬] আর এ জন্য করে থাকি যাতে তারা ফিরে আসে।[১৩৭]

সৃষ্টি করেন যাতে আল্লাহর প্রতাপ–প্রতিপত্তি, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব এবং এ অংগীকারের গুরুত্ব তাদের মনে পুরোপুরি অনুভূত হয় এবং বিশ্ব জাহানের সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী শাহানশাহের সাথে অংগীকার ও চুক্তি সম্পাদন করাকে তারা যেন মামুলি ব্যাপার মনে করতে না পারে। এ থেকে এ ধারণা করা ঠিক হবে না যে, তারা আল্লাহর সাথে অংগীকার করতে প্রস্তুত ছিল না, ভয় দেখিয়ে জোর জবরদস্তি করে তাদেরকে অংগীকারাবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আসল ব্যাপার হচ্ছে, তারা সবাই ছিল মুমিন। সিনাই পাহাড়ের পাদদেশে তারা গিয়েছিল অংগীকারাবদ্ধ হতে। কিন্তু আল্লাহ তাদের সাথে মামুলীভাবে অংগীকার ও প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হবার পরিবর্তে এ অংগীকারের অনুভূতি তাদের মনে ভালভাবে বদ্ধমূল করার চেষ্টা করেন। অংগীকার করার সময় কোন্ মহাশক্তিধর সত্তার সাথে তারা অংগীকার করছে এবং তাঁর সাথে অংগীকার ভংগ করার পরিণাম কি হতে পারে, তা যেন তারা অনুভব করতে পারবে, এটাই ছিল আল্লাহর অভিপ্রায়।

এখানে এসে বনী ইসরাঈল জাতিকে সম্বোধনের পালা শেষ হয়ে যায়। পরবর্তী রুকূ'গুলোতে সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। বিশেষ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদেরকে সরাসরি ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, তাদেরকে লক্ষ করে বক্তব্য রাখা হয়েছে।

১৩৩. পূর্ববর্তী আলোচনা যেখানে শেষ হয়েছিল সেখানে বলা হয়েছিল, মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে বন্দেগী ও আনুগত্যের অংগীকার নিয়েছিলেন এখন সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করে তাদেরকে জানানো হচ্ছে যে, এ ব্যাপারে বনী ইসরাঈলের কোন বিশেষত্ব নেই বরং প্রকৃতপক্ষে তোমরা সবাই নিজেদের স্রষ্টার সাথে একটি অংগীকারে আবদ্ধ এবং এ অংগীকার তোমরা কতটুকু পালন করেছো সে ব্যাপারে তোমাদের এক দিন জবাবদিহি করতে হবে।

১৩৪. বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, এটি আদম সৃষ্টির সময়কার একটি ঘটনা। সে সময় একদিকে যেমন ফেরেশতাদের একত্র করে প্রথম মানুষটিকে সিজদা করানো হয়েছিল এবং পৃথিবীতে মানুষের খিলাফতের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল, অন্যদিকে ঠিক তেমনি কিয়ামত পর্যন্ত আদমের যে অগণিত সংখ্যক বংশধর জন্মলাভ করবে মহান আল্লাহ তাদের সবাইকে একই সংগে সজীব ও সচেতন সত্তায় আবির্ভূত করে নিজের সামনে উপস্থিত করেছিলেন এবং তাদের কাছ থেকে তাঁর রব হবার ব্যাপারে সাক্ষ গ্রহণ করেছিলেন। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্ভবত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জ্ঞান লাভ করে যা কিছু বর্ণনা করেন তা এ বিষয়ের সবচেয়ে ভাল ব্যাখ্যা বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

"মহান আল্লাহ সবাইকে একত্র করেন। (এক এক ধরনের বা এক এক যুগের) লোকদেরকে আলাদা আলাদা দলে সংগঠিত করেন। তাদেরকে মানবিক আকৃতি ও বাকশক্তি দান করেন। তারপর তাদের থেকে অংগীকার গ্রহণ করেন। তাদেরকে নিজেদের ওপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলে ঃ অবশ্যই তুমি আমাদের রব। তখন আল্লাহ বলেন ঃ কিয়ামতের দিন যাতে তোমরা না বলতে পারো আমরা তো একথা জানতাম না, তাই আমি তোমাদের ওপর পৃথিবী ও আকাশ এবং তোমাদের পিতা আদমকে সাক্ষী করছি। ভালভাবে জেনে রাখো, আমি ছাড়া ইবাদাত লাভের যোগ্য আর কেউ নেই এবং আমি ছাড়া আর কোন রব নেই। তোমরা আমার সাথে আর কাউকে শরীক করো না। আমি তোমাদের কাছে আমার নবী পাঠাবো। আমার সাথে তোমরা যেসব অংগীকার করছো তারা সেসব তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবে। আর তোমাদের প্রতি আমার কিতাব নাযিল করবো। এ কথায় সমস্ত মানুষ বলে ওঠে ঃ আমরা সাক্ষ দিচ্ছি, তুমিই আমাদের রব, তুমিই আমাদের মাবুদ, তুমি ছাড়া আমাদের আর কোন রব ও মাবুদ নেই।"

কেউ কেউ এ ব্যাপারটিকে নিছক রূপক বা উপমা হিসেবে বর্ণিত একটি ব্যাপার মনে করে থাকেন। তাদের মতে এখানে কুরআন মজীদ কেবল একথাই বুঝাতে চায় যে, আল্লাহর রব হবার বিষয়টির স্বীকৃতি মানবিক প্রকৃতির মধ্যে নিহিত রয়েছে এবং এ কথাটি এখানে এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে যেন এটি বাস্তব জগতে অনুষ্ঠিত একটি ঘটনা ছিল। কিন্তু এ ব্যাখ্যাকে আমি সঠিক মনে করি না। কুরআন ও হাদীসে এটিকে একটি

বাস্তব ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর শুধু ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেই শেষ করে দেয়া হয়নি বরং এই সংগে একথাও বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন অনাদিকালের এ অংগীকারটিকে মানুষের বিরুদ্ধে একটি দলীল ও প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হবে। কাজেই একে নিছক একটি রূপক বর্ণনা গণ্য করার কোন কারণ আমি দেখি না। আমার মতে, বাস্তবে যেমন বিভিন্ন ঘটনা ঘটে থাকে ঠিক তেমনিভাবে এ ঘটনাটিও ঘটেছিল। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত যেসব মানুষকে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তাদের সবাইকে বাস্তবে একই সংগে জীবন, চেতনা ও বাকশক্তি দান করে নিজের সামনে হাযির করেছিলেন এবং বাস্তবে তাদেরকে এ সত্যটি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত করেছিলেন যে, তাঁর মহান, পবিত্র ও উন্নত সত্তা ছাড়া তাদের আর কোন রব ও ইলাহ নেই এবং তাঁর বন্দেগী ও হুকুমের আনুগত্য (ইসলাম) ছাড়া তাদের জন্য আর কোন সঠিক জীবন বিধান নেই। এ সম্মেলন অনুষ্ঠানকে কোন ব্যক্তি যদি অসম্ভব মনে করে থাকে তাহলে এটি নিছক তার চিন্তার পরিসরের সংকীর্ণতার ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যথায় বাস্তবে মানব সন্তানের বর্তমান পর্যায়ক্রমিক জন্ম ও বিকাশ যতটা সম্ভব সৃষ্টির আদিতে তার সামষ্টিক আবির্ভাব ও অন্তে তার সামষ্টিক পুনরুত্থান ও সমাবেশ ঠিক ততটাই সম্ভবপর। তাছাড়া মানুষের মত একটি সচেতন, বুদ্ধিমান ও স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন সৃষ্টিকে পৃথিবীতে নিজের প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্তির প্রাক্কালে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে প্রকৃত সত্য জানিয়ে দেয়া এবং তার কাছ থেকে নিজের পক্ষে বিশ্বস্ততার অংগীকার নিয়ে নেয়াটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হচ্ছে। এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটা মোটেই বিস্ময়কর নয়। বরং এ ধরনের একটি ঘটনা না ঘটলেই অবাক হতে হতো।

১৩৫. আদিকালে তথা সৃষ্টির সূচনা লগ্নে সমগ্র মানব জাতির কাছ থেকে যে অংগীকার নেয়া হয়েছিল এখানে তার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব জাতির মধ্য থেকে যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করবে তারা যেন নিজেরাই নিজেদের এ অপরাধের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী হয়। নিজেদের সাফাই গাইবার জন্য না জানার ওজুহাত পেশ করার কোন সুযোগ যেন তাদের না থাকে এবং পূর্ববর্তী বংশধরদের ওপর নিজেদের গোমরাহীর সমস্ত দায়–দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা দায়মুক্ত হতেও না পারে। অন্য কথায় বলা যায়, প্রত্যেকটি মানুষ ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিজের মধ্যে আল্লাহর একমাত্র ইলাহ ও একমাত্র রব হবার সাক্ষ ও স্বীকৃতি বহন করে চলেছে, আদিতম অংগীকারকে আল্লাহ প্রত্যেকটি মানুষের জন্য এরি প্রমাণ হিসেবে গণ্য করেছেন। এ জন্য কোন ব্যক্তি নিজের অজ্ঞতা অথবা ভ্রান্ত পরিবেশে লালিত হবার কারণে তার গোমরাহীর জন্য মোটেই দায়ী নয়, একথা কোনক্রমেই বলা যেতে পারে না।

এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, সৃষ্টির প্রথম দিনের এ অংগীকার যদি বাস্তবে সংঘটিত হয়েও থাকে তাহলে তা কি আমাদের চেতনা ও স্মৃতিপটে সংরক্ষিত আছে? আমাদের মধ্য থেকে কোন একজনও কি একথা জানে, সৃষ্টির সূচনা লগ্নে তাকে আল্লাহর সামনে পেশ করা হয়েছিল, সেখানে তার সামনে الست بربكم (আমি কি তোমাদের রব নই?) প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং তার জবাবে সে বলেছিল بلى (হাঁ)? জবাব যদি নেতিবাচক হয়ে থাকে, তাহলে যে অংগীকারের কথা আমাদের চেতনা ও স্মৃতিপট থেকে উধাও হয়ে গেছে তাকে কেমন করে আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে?

এর জবাবে বলা যায়, সেই অংগীকারের কথা যদি মানুষের চেতনা ও স্মৃতিপটে জাগরুক রাখা হতো, তাহলে মানুষকে দুনিয়ার বর্তমান পরীক্ষাগারে পাঠানোর ব্যাপারটা একেবারে অর্থহীন হয়ে যেতো। কারণ এরপর পরীক্ষার আর কোন অর্থই থাকতো না। তাই এ অংগীকারের কথা চেতনা ও স্মৃতিপটে জাগরুক রাখা হয়নি ঠিকই কিন্তু অবচেতন মনে (Sub-conscious mind) ও সুপ্ত অনভূতিতে (Intution) তাকে অবশ্যি সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। তার অবস্থা আমাদের অবচেতন ও অনুভূতি সঞ্জাত অন্যান্য জ্ঞানের মতই। সভ্যতা, সংস্কৃতি, নৈতিক ও ব্যবহারিক জীবনের সকল বিভাগে মানুষ আজ পর্যন্ত যা কিছুর উদ্ভব ঘটিয়েছে তা সবই আসলে মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে (Potentially) বিরাজিত ছিল। বাইরের কার্যকারণ ও ভিতরের উদ্যোগ আয়োজন ও চেষ্টা সাধনা মিলেমিশে কেবলমাত্র অব্যক্তকে ব্যক্ত করার কাজটুকুই সম্পাদন করেছে। এমন কোন জিনিস যা মানুষের মধ্যে অব্যক্তভাবে বিরজিত ছিল না, তাকে কোন শিক্ষা, অনুশীলন, পরিবেশের প্রভাব ও আভ্যন্তরীণ চেষ্টা–সাধনার বলে কোনক্রমেই তার মধ্যে সৃষ্টি করা সম্ভব নয় এটি একটি জাজ্বল্যমান সত্য। আর এ প্রভাব–প্রচেষ্টাসমূহ নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করলেও মানুষের মধ্যে যেসব জিনিস অব্যক্তভাবে বিরাজিত রয়েছে তাদের কোনটিকেও পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেবার ক্ষমতা রাখে না। বড় জোর তারা তাকে তার মূল স্বভাব প্রকৃতি থেকে বিকৃত (Pervert) করতে পারে মাত্র। তবুও সব রকমের বিকৃতি ও বিপথগামিতা সত্ত্বেও সেই জিনিসটি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, আত্মপ্রকাশের প্রচেষ্টা চালাতে থাকবে এবং বাইরের আবেদনে সাড়া দেয়ার জন্য সর্বক্ষণ উন্মুখ থাকবে। এ ব্যাপারটি যেমন আমি ইতিপূর্বে বলেছি, আমাদের সকল প্রকার অবচেতন ও প্রচ্ছন্ন অনুভূতি লব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে সত্য ঃ

ঃ এগুলো সবই আমাদের মধ্য অব্যক্তভাবে রয়েছে। আমরা বাস্তবে যা কিছু ব্যক্ত করি এবং যেসব কাজ করি তার মাধ্যমেই এগুলোর অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ আমরা পেয়ে থাকি।

ঃ এগুলোর কার্যকর অভিব্যক্তির জন্য বাইরের আলোচনা (স্মরণ করিয়ে দেয়া), শিক্ষা, অনুশীলন ও কাঠামো নির্মাণের প্রয়োজন হয়। আর আমাদের দ্বারা বাস্তবে যা কিছু সংঘটিত হয়, তা আসলে বাইরের সেই আবেদনেরই সাড়া বলে প্রতীয়মান হয় যা আমাদের মধ্যে সুপ্তভাবে বিরাজমান জিনিসসমূহের পক্ষ থেকে এসে থাকে।

ঃ ভিতরের ভ্রান্ত কামনা বাসনা ও বাইরের প্রতিকূল প্রভাব, প্রতিপত্তি ও কার্যক্রম এগুলোকে দাবিয়ে দিয়ে বিকৃত ও বিপথগামী করে এবং এগুলোর ওপর আবরণ ফেলে দিয়ে এগুলোকে নিস্তেজ ও নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে না। আর এ জন্যই ভিতরের চেতনা ও বাইরের প্রচেষ্টা–উভয়ের সহায়তায় সংস্কার, সংশোধন ও পরিবর্তন (Conversion) সম্ভবপর।

বিশ্ব জাহানে আমাদের যথার্থ মর্যাদা এবং বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টার সাথে আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারে আমরা যে সুপ্ত চেতনা লব্ধ জ্ঞানের অধিকারী তার অবস্থাও এ একই পর্যায়ভুক্ত ঃ এ জ্ঞান যে আবহমানকাল ধরেই বিরাজমান তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে, তা মানব জীবনের প্রতি যুগে পৃথিবীর সব এলাকায়, প্রতিটি জনপদে প্রত্যেকটি বংশে, প্রজন্মে

ও পরিবারে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং কখনো দুনিয়ার কোন শক্তিই তাকে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হয়নি।

ঃ ঐ জ্ঞান যে প্রকৃত সত্যের অনুরূপ, তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে, যখনই তা আত্মপ্রকাশ করে আমাদের জীবনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে তখনই তা সুস্থ ও কল্যাণকর ফল প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে।

ঃ তার আত্মপ্রকাশ করার ও কার্যকর রূপলাভ করার জন্য সবসময় একটি বহিরাগত আবেদনের প্রয়োজন হয়েছে। তাই নবীগণ, আসমানী কিতাবসমূহ ও তাদের আনুগত্যকারী সত্যের আহবায়কদের সবাই এ দায়িত্বই পালন করে এসেছেন। এ জন্যই কুরআনে তাদেরকে মুযাক্কির (স্মারক) এবং তাদের কাজকে তাযকীর (স্মরণ করিয়ে দেয়া), যিক্‌র (স্মরণ) ও তাযকিরাহ (স্মৃতি) ইত্যাদি শব্দাবলীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায়, নবীগণ, কিতাবসমূহ ও সত্যের আহবায়কগণ মানুষের মধ্যে কোন নতুন জিনিস সৃষ্টি করেন না বরং তার মধ্যে আগে থেকেই যে জিনিসটির অস্তিত্ব বিরাজ করছিল তাকে জাগিয়ে তোলেন ও নতুন জীবনীশক্তি দান করেন মাত্র।

ঃ মানবাত্মার পক্ষ থেকে প্রতি যুগে এ স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়াসে ইতিবাচক সাড়া দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে যে প্রকৃতপক্ষে এমন এক জ্ঞান সুপ্ত ছিল, যা নিজের আহবানকারীর আওয়াজ চিনতে পেরে তার জবাব দেবার জন্য জেগে উঠেছে, এটি তার আর একটি প্রমাণ।

ঃ তারপর মূর্খতা, অজ্ঞতা, ইন্দ্রিয় লিপ্সা, স্বার্থপ্রীতি এবং মানুষ ও জিনের বংশদ্ভূত শয়তানদের বিভ্রান্তিকর শিক্ষা ও প্ররোচনা তাকে সবসময় দাবিয়ে রাখার, বিপথগামী ও বিকৃত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এর ফলে শিরক, আল্লাহ বিমুখতা, আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং নৈতিক ও কর্ম ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। কিন্তু বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার এ সমুদয় শক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সেই জ্ঞানের জন্মগত ছাপ মানুষের হৃদয়পটে কোন না কোন পর্যায়ে অক্ষুণ্ন থেকেছে। এ জন্যই স্মরণ করিয়ে দেয়া ও নবায়নের প্রচেষ্টা তাকে জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে সফল ভূমিকা পালন করে এসেছে।

অবশ্যি দুনিয়ার বর্তমান জীবনে যারা পরম সত্য ও বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে বদ্ধপরিকর তারা নিজেদের তথাকথিত যুক্তিবাদের ভিত্তিতে জন্মগতভাবে হৃদয়ফলকে খোদিত এ লিপিটির অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে অথবা কমপক্ষে একে সন্দেহযুক্ত সাব্যস্ত করতে পারে। কিন্তু যেদিন হিসেব নিকেশ ও বিচারের আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিন মহাশক্তিশালী স্রষ্টা তাদের চেতনা ও স্মৃতিপটে সৃষ্টির প্রথম দিনের সেই সম্মেলনটির স্মৃতি জাগিয়ে তুলবেন। সৃষ্টির প্রথম দিনে তারা একযোগে যে মহান স্রষ্টাকে তাদের একমাত্র রব ও মাবুদ বলে স্বীকার করে নিয়েছিল সেই স্মৃতি আবার পুরোদমে তরতাজা করে দেবেন। তারপর তিনি তাদের নিজেদের অভ্যন্তর থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে এ অংগীকারলিপি যে তাদের হৃদয়ে সবসময় খোদিত ছিল তা দেখিয়ে দেবেন। তাদের জীবনের সংরক্ষিত কার্যবিবরণী থেকে সর্বসমক্ষে এও দেখিয়ে দেবেন যে, তারা কিভাবে হৃদয়ফলকে খোদিত সে লিপিটি উপেক্ষা করেছে, কখন কোন্ সময় তাদের হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে এ লিপির সত্যতার স্বীকৃতি স্বগতভাবে উচ্চারিত হয়েছে, নিজের ও নিজের

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ
فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ
وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ
اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۭ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ
الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٧٦﴾ سَاۗءَ مَثَلَۨا ِۨالْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٧٧﴾ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ
يُّضْلِلْ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٧٨﴾

আর হে মুহাম্মাদ! এদের সামনে সেই ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করো যাকে আমি দান করেছিলাম আমার আয়াতের জ্ঞান।[১৩৮] কিন্তু সে তা যথাযথভাবে মেনে চলা থেকে দূরে সরে যায়। অবশেষে শয়তান তার পিছনে লাগে। শেষ পর্যন্ত সে বিপথগামীদের অন্তরভুক্ত হয়েই যায়। আমি চাইলে ঐ আয়াতগুলোর সাহায্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম কিন্তু সে তো দুনিয়ার প্রতিই ঝুঁকে রইল এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। কাজেই তার অবস্থা হয়ে গেল কুকুরের মত, তার ওপর আক্রমণ করলেও সে জিভ্ ঝুলিয়ে রাখে আর আক্রমণ না করলেও জিভ ঝুলিয়ে রাখে।[১৩৯] যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তাদের দৃষ্টান্ত এটাই।

তুমি এ কাহিনী তাদেরকে শুনাতে থাকো, হয়তো তারা কিছু চিন্তা-ভাবনা করবে। যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলেছে তাদের দৃষ্টান্ত বড়ই খারাপ এবং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম চালিয়ে গেছে। আল্লাহ যাকে সুপথ দেখান সে-ই সঠিক পথ পেয়ে যায় এবং যাকে আল্লাহ নিজের পথনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত করেন সে-ই ব্যর্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

চারপাশের ভ্রষ্টতার ওপর তাদের বিবেক কোথায় কখন অসম্মতি ও বিদ্রোহের আওয়াজ বুলন্দ করেছে, সত্যের আহবায়কদের আহবানের জবাব দেবার জন্য তাদের অভ্যন্তরের লুকানো জ্ঞান কতবার কত জায়গায় আত্মপ্রকাশে উন্মুখ হয়েছে এবং তারা নিজেদের স্বার্থপ্রীতি ও প্রবৃত্তির লালসার বশবর্তী হয়ে কোন্ ধরনের তাট বাহানার মাধ্যমে তাকে ক্রমাগত প্রতারিত ও স্তব্ধ করে দিয়েছে। সেদিন যখন এসব গোপন কথা প্রকাশ হয়ে

পড়বে তখন যুক্তি-তর্ক করার অবকাশ থাকবে না বরং পরিষ্কারভাবে অপরাধ স্বীকার করে নিতে হবে। তাই কুরআন মজীদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে ঃ সেদিন অপরাধীরা একথা বলবে না, আমরা মূর্খ ছিলাম, অজ্ঞ ছিলাম, আমরা গাফেল ছিলাম বরং তারা একথা বলতে বাধ্য হবে, আমরা কাফের ছিলাম, অর্থাৎ আমরা জেনে বুঝে সত্যকে অস্বীকার করেছিলাম।

وَشَهِدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ

"আর তারা নিজেদের ব্যাপারেই সাক্ষ দেবে, তারা কাফের তথা অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানকারী ছিল।" (আন'আম ঃ ১৩০)

১৩৬. অর্থাৎ সত্যকে উপলব্ধি করার ও চিনে নেবার যেসব উপকরণ ও নিদর্শন মানুষের নিজের মধ্যে রয়েছে সেগুলো পরিষ্কারভাবে তুলে ধরি।

১৩৭. অর্থাৎ বিদ্রোহ ও বিকৃতি-বিভ্রান্তির নীতি পরিত্যাগ করে বন্দেগী ও আল্লাহর আনুগত্যের আচরণের দিকে যেন ফিরে আসে।

১৩৮. এ বাক্যটিতে কোন এক নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উৎকৃষ্টতম নৈতিক মানও এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তাঁরা যখনই কারোর কোন দুষ্কৃতির উদাহরণ দেন তখন সাধারণত তার নাম উল্লেখ করেন না। বরং তার ব্যক্তিত্বকে উহ্য রেখে শুধুমাত্র তার দোষটি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন। এভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবমাননা ও লাঞ্ছনা ছাড়াই আসল উদ্দেশ্য সফল হয়ে যায়। তাই যে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এখানে পেশ করা হয়েছে কুরআন ও হাদীসের কোথাও তার পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। মুফাস্সিরগণ রসূলের যুগের এবং তাঁর পূর্ববর্তী যুগের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে এ দৃষ্টান্তের লক্ষ্য বলে চিহ্নিত করেছেন। কেউ বাল'আম ইবনে বাউরার নাম নিয়েছেন। কেউ নিয়েছেন উমাইয়া ইবনে আবীস সালতের নাম। আবার কেউ বলেছেন, এ ব্যক্তি ছিল সাইফী ইবনুর রাহেব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উদাহরণ হিসেবে যে বিশেষ ব্যক্তির ভূমিকা এখানে পেশ করা হয়েছে সে তো পর্দান্তরালেই রয়ে গেছে। তবে যে ব্যক্তিই এ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে তার ব্যাপারে এ উদাহরণটি প্রযোজ্য হবেই।

১৩৯. এ দু'টি সংক্ষিপ্ত বাক্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিষয়টি একটু বিস্তারিতভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। এখানে যে ব্যক্তির উদাহরণ পেশ করা হয়েছে সে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানের অধিকারী ছিল। অর্থাৎ প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত ছিল। এ ধরনের জ্ঞানের অধিকারী হবার কারণে যে কর্মনীতিকে সে ভুল বলে জানতো তা থেকে দূরে থাকা এবং যে কর্মনীতিকে সঠিক মনে করতো তাকে অবলম্বন করাই তার উচিত ছিল। এ যথার্থ জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করলে আল্লাহ তাকে মানবতার উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করতেন। কিন্তু সে দুনিয়ার স্বার্থ, স্বাদ ও আরাম আয়েশের দিকে ঝুঁকে পড়ে। প্রবৃত্তির লালসার মোকাবিলা করার পরিবর্তে সে তার সামনে নতজানু হয়। উচ্চতর বিষয়সমূহ লাভের জন্য সে পার্থিব লোভ-লালসার উর্ধে ওঠার পরিবর্তে তার মধ্যে এমনভাবে ডুবে যায় যার ফলে নিজের সমস্ত উচ্চতর আশা-আকাংখা, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক উন্নতির সমস্ত সম্ভাবনা পরিত্যাগ করে বসে। তার নিজের জ্ঞান যেসব সীমানা

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ
قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ
آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا
الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾
وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾

আর এটি একটি অকাট্য সত্য যে, বহু জিন ও মানুষ এমন আছে যাদেরকে আমি জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করেছি।[১৪০] তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না। তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না। তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না। তারা পশুর মত বরং তাদের চাইতেও অধম। তারা চরম গাফলতির মধ্যে হারিয়ে গেছে।

ভাল নামগুলো[১৪১] আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। সুতরাং ভাল নামেই তাঁকে ডাকো এবং তাঁর নাম রাখার ব্যাপারে যারা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় তাদেরকে বর্জন কর। তারা যা কিছু করে এসেছে। তার ফল অবশ্যি পাবে।[১৪২] আমার সৃষ্টির মধ্যে একটি দল এমনও আছে যে, যথার্থ সত্য অনুযায়ী পথনির্দেশ দেয় এবং সত্য অনুযায়ী বিচার করে।

রক্ষণাবেক্ষণের দাবী জানিয়ে আসছিল সেগুলো লংঘন করে এগিয়ে চলতে থাকে। তারপর যখন সে নিছক নিজের নৈতিক দুর্বলতার কারণে জেনে বুঝে সত্যকে উপেক্ষা করে এগিয়ে চললো। তখন তার নিকটেই ওঁৎ পেতে থাকা শয়তান তার পেছনে লেগে যায় এবং অনবরত তাকে এক অধপতন থেকে আর এক অধপতনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে এ জালেম শয়তান তাকে এমন সব লোকের দলে ভিড়িয়ে দেয় যারা তার ফাঁদে পা দিয়ে বুদ্ধি বিবেক সব কিছু হারিয়ে বসেছিল।

এরপর আল্লাহ এ ব্যক্তির অবস্থাকে এমন একটি কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন যার জিভ সবসময় ঝুলে থাকে এবং এ ঝুলন্ত জিভ থেকে অনবরত লালা টপকে পড়তে থাকে। এহেন অবস্থা তার উদগ্র লালসার আগুন ও অতৃপ্ত কামনার কথা প্রকাশ করে। যে কারণে আমাদের ভাষায় আমরা এহেন পার্থিব লালসায় অন্ধ ব্যক্তিকে দুনিয়ার কুকুর বলে থাকি। ঠিক সেই একই কারণে এ বিষয়টিকে এখানে উপমার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

কুকুরের স্বভাব কি? লোভ ও লালসা। চলাফেরার পথে তার নাক সব সময় মাটি শুঁকতে থাকে, হয়তো কোথাও কোন খাবারের গন্ধ পাওয়া যাবে এ আশায়। তার গায়ে কেউ কোন পাথর ছুঁড়ে মারলেও তার ভুল ভাংবে না। বরং তার মনে সন্দেহ জাগবে, যে জিনিসটি দিয়ে তাকে মারা হয়েছে সেটি হয়তো কোন হাড় বা রুটির টুকরো হবে। পেট পূজারি লোভী কুকুর একবার লাফিয়ে দৌড়ে গিয়ে সেই নিক্ষিপ্ত পাথরটিও কামড়ে ধরে। পথিক তার দিকে কোন দৃষ্টি না দিলেও দেখা যাবে সে লোভ–লালসার প্রতিমূর্তি হয়ে বিরাট আশায় বুক বেঁধে জিভ্ ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। সে তার পেটের দৃষ্টি দিয়ে সারা দুনিয়াকে দেখে। কোথাও যদি কোন বড় লাশ পড়ে থাকে, কয়েকটি কুকুরের পেট ভরার জন্য সেটি যথেষ্ট হলেও একটি কুকুর তার মধ্য থেকে কেবলমাত্র তার নিজের অংশটি নিয়েই ক্ষান্ত হবে না বরং সেই সম্পূর্ণ লাশটিকে নিজের একার জন্য আগলে রাখার চেষ্টা করবে এবং অন্য কাউকে তার ধারে কাছেও ঘেঁসতে দেবে না। এ পেটের লালসার পর যদি দ্বিতীয় কোন বস্তু তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে তাহলে সেটি হচ্ছে যৌন লালসা। সারা শরীরের মধ্যে কেবলমাত্র লজ্জাস্থানটিই তার কাছে আকর্ষণীয় এবং সেটিরই সে ঘ্রাণ নিতে ও তাকেই চাটতে থাকে। কাজেই এখানে এ উপমা দেবার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথাটি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা যে, দুনিয়া পূজারী ব্যক্তি যখন জ্ঞান ও ঈমানের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে প্রবৃত্তির অন্ধ লালসার কাছে আত্মসমর্পন করে এগিয়ে চলতে থাকে তখন তার অবস্থা পেট ও যৌনাংগ সর্বস্ব কুকুরের মত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

১৪০. এর অর্থ এটা নয় যে, আমি তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্যই সৃষ্টি করেছিলাম এবং তাদেরকে সৃষ্টি করার সময় এ সংকল্প করেছিলাম যে, তাদেরকে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত করবো। বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, আমি তো তাদেরকে হৃদয়, মস্তিষ্ক, কান, চোখ সবকিছুসহ সৃষ্টি করেছিলাম। কিন্তু এ বেকুফরা এগুলোকে যথাযথভাবে ব্যবহার করেনি এবং নিজেদের অসৎ কাজের বদৌলতে শেষ পর্যন্ত তারা জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হয়েছে। চরম দুঃখ প্রকাশ ও আক্ষেপ করার জন্য মানুষের ভাষায় যে ধরনের বাকরীতির প্রচলন রয়েছে এখানেও এ বিষয়বস্তুটি প্রকাশ করার জন্য সেই একই ধরনের বাকরীতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোন মায়ের কয়েক জন জোয়ান ছেলে যুদ্ধে মারা গেলে সে লোকদের বলতে থাকে, আমি তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে জীবন দান করার জন্যই বুঝি খাইয়ে পরিয়ে বড় করেছিলাম। এ বাক্যে মায়ের বক্তব্যের উদ্দেশ্য এ নয় যে, সত্যই সে তার সন্তানদেরকে এ উদ্দেশ্যে লালন পালন করেছিল বরং এ ধরনের আক্ষেপের সুরে সে আসলে বলতে চায়, আমি নিজের সন্তানদেরকে বড়ই পরিশ্রম করে নিজের শরীরের রক্ত পানি করে বড় করে তুলেছিলাম। কিন্তু আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী যুদ্ধবাজদেরকে শাস্তি দিন। কারণ তাদের জন্যই আমার পরিশ্রম ও ত্যাগের ফসল এভাবে মাটি হয়ে গেলো।

১৪১. এখন ভাষণ শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে। তাই উপসংহারে উপদেশ ও তিরস্কার মিশ্রিত পদ্ধিতিতে লোকদেরকে তাদের কয়েকটি প্রধান প্রধান গোমরাহীর ব্যাপারে সতর্ক

করে দেয়া হচ্ছে। এই সংগে নবীর দাওয়াতের মোকাবিলায় তারা যে অস্বীকার, প্রত্যাখ্যান ও বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করেছিল আর ভুল বুঝিয়ে দিয়ে তার অশুভ পরিণাম সম্পর্কেও তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হচ্ছে।

১৪২. মানুষের মনে বিভিন্ন জিনিসের যে ধারণা থাকে এবং বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে মানুষ যেসব কল্পনা করে থাকে তারই ভিত্তিতে নিজের ভাষায় সে তাদের নাম রাখে। ধারণা ও কল্পনায় গলদ থাকলে তা নামের মধ্যেও ফুটে ওঠে। আবার নামের ভ্রান্তি ধারণা ও কল্পনার ভ্রান্তির কথাই প্রকাশ করে। তারপর বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে মানুষের মনে যে ধারণা থাকে তারই ভিত্তিতে তার সাথে তার সম্পর্কও গড়ে ওঠে এবং সেই হিসেবে তার সাথে সে ব্যবহারও করে। ধারণা ও কল্পনার ত্রুটি সম্পর্ক ও ব্যবহারের ত্রুটির আকারে আত্মপ্রকাশ করে। আবার ধারণা ও কল্পনা নির্ভুল হলে পারস্পরিক সম্পর্কও নির্ভুল ও সঠিক রূপ নেয়। একথা দুনিয়ার অন্যান্য সমস্ত জিনিসের ব্যাপারে যেমন সত্য তেমনি আল্লাহর ব্যাপারেও সত্য। মানুষ আল্লাহর নাম (তাঁর সত্তা সম্পর্কিত হোক বা গুণবাচক নাম হোক) স্থির করার ব্যাপারে যে ভুল করে থাকে তা হয় আসলে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত তার আকীদা বিশ্বাসের ফলশ্রুতি। তারপর আল্লাহ সম্পর্কে নিজের ধারণা ও আকীদার মধ্যে মানুষ যতটুকু ও যে ধরনের ভুল করে ঠিক ততটুকু ও সেই ধরনের ভুল তার নিজের জীবনের সমগ্র নৈতিক দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি গড়ে তোলার ব্যাপারেও সংঘটিত হয়ে যায়। কারণ মানুষ আল্লাহর ব্যাপারে এবং আল্লাহর সাথে নিজের ও বিশ্ব-জাহানের সম্পর্কের ব্যাপারে যে ধারণা গড়ে তোলে পুরোপুরি তারই ভিত্তিতে তার নৈতিক দৃষ্টিভংগী গড়ে ওঠে। তাই বলা হয়েছে, আল্লাহর নাম রাখার ব্যাপারে ভুল করা থেকে দূরে থাকো। ভাল নামই আল্লাহর উপযোগী এবং তার সাহায্যেই তাঁকে স্মরণ করা উচিত। তার নাম ঠিক করার ব্যাপারে 'ইলহাদ' তথা বিদ্রোহাত্মক দৃষ্টিভংগী মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে।

"ভাল ভাল নাম" বলতে এমন সব নাম বুঝায় যার মাধ্যমে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব, তাঁর পাক-পবিত্রতা ও তাঁর পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর প্রকাশ ঘটে। কুরআনে উল্লেখিত 'ইলহাদ' শব্দের অর্থ হচ্ছে, মধ্যবর্তী স্থান থেকে সরে যাওয়া এবং সোজা সরল দিক থেকে বিপথগামী হয়ে যাওয়া। তীর যখন সোজা নিশানায় না লেগে অন্য কোন দিকে লাগে তখন আরবীতে বলা হয় الحد السهم الهدف অর্থাৎ তীর নিশানা থেকে ইলহাদ করেছে। অর্থাৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। আল্লাহর নাম রাখার ব্যাপারে 'ইলহাদ' হচ্ছে এই যে, আল্লাহর এমনভাবে নামকরণ করা, যাতে তাঁর মর্যাদাহানি হয়, যা তাঁর আদবের পরিপন্থী হয়। যার মাধ্যমে তাঁর প্রতি দোষ-ত্রুটি আরোপ করা হয় অথবা যার সাহায্যে তাঁর উন্নত ও পবিত্র সত্তা সম্পর্কে কোন প্রকার ভুল আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে থাকে। যে নাম একমাত্র আল্লাহর উপযোগী সৃষ্টি জগতের কাউকে সে নামে ডাকাও ইলহাদের অন্তরভুক্ত। তারপর কুরআনের আয়াতে যে বলা হয়েছে "আল্লাহর নাম রাখার ব্যাপারে যারা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় (ইলহাদ করে) তাদেরকে বর্জন কর। এর অর্থ হচ্ছে, সোজাভাবে বুঝাবার পর যদি তারা না বোঝে তাহলে তাদের সাথে অনর্থক বিতর্কে জড়িত হবার তোমাদের কোন প্রয়োজন নেই। নিজেদের গোমরাহীর ফল তারা নিজেরাই ভুগবে।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾ وَأُمْلِي
لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ۗ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ ۚ
إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١٨٤﴾ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ
اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ
فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾

২৩ রুকূ'

আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে তাদেরকে আমি এমন পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবো যে, তারা জানতেও পারবে না। আমি তাদেরকে ঢিল দিচ্ছি। আমার কৌশল অব্যর্থ।

তারা কি কখনো চিন্তা করে না, তাদের সাথীর ওপর উন্মাদনার কোন প্রভাব নেই? সে তো একজন সতর্ককারী মাত্র, (অশুভ পরিণতির উদ্ভব হবার আগেই) সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিচ্ছে। তারা কি কখনো আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চিন্তা করেনি এবং আল্লাহর সৃষ্ট কোন জিনিসের দিকে চোখ মেলে তাকায়নি?[১৪৩] আর তারা কি এটাও ভেবে দেখেনি যে, সম্ভবত তাদের জীবনের অবকাশকাল পূর্ণ হবার সময় ঘনিয়ে এসেছে?[১৪৪] তাহলে নবীর এ সতর্কীকরণের পর আর এমন কি কথা থাকতে পারে যার প্রতি তারা ঈমান আনবে? আল্লাহ যাকে পথনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত করেন তার জন্য আর কোন পথ নির্দেশক নেই। আর আল্লাহ তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যে উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দেন।

১৪৩. সাথী বলতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। তিনি তাদের মধ্যেই জন্মলাভ করেন। তাদের মধ্যে বসবাস করেন। শৈশব থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্যে পদার্পণ করেন। নবুওয়াত লাভের পূর্বে সমগ্র জাতি তাঁকে একজন অত্যন্ত শান্ত-শিষ্ট-ভারসাম্যপূর্ণ স্বভাব প্রকৃতি ও সুস্থ মন-মগজধারী মানুষ বলে জানতো। নবুওয়াত লাভের পর যে-ই তিনি মানুষের কাছে আল্লাহর দাওয়াত পৌঁছাতে শুরু করলেন, অমনি তাঁকে পাগল বলা আরম্ভ হয়ে গেল। একথা সুস্পষ্ট, নবী হবার আগে

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ۖ
لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ
إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْـَٔلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا
شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا
مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾

তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিয়ামত কবে ও কখন হবে? বলে দাও, "এক মাত্র আমার রবই এর জ্ঞান রাখেন। সঠিক সময়ে তিনিই তা প্রকাশ করবেন। আকাশ ও পৃথিবীতে তা হবে ভয়ংকর কঠিন সময়। সহসাই তা তোমাদের ওপর এসে পড়বে।" তারা তোমার কাছে এ ব্যাপারে এমনভাবে জিজ্ঞেস করছে যেন তুমি তার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছ? বলে দাও, "একমাত্র আল্লাহই এর জ্ঞান রাখেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্যটি জানে না।"

হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলো, "নিজের জন্য লাভ-ক্ষতির কোন ইখতিয়ার আমার নেই। একমাত্র আল্লাহই যা কিছু চান তাই হয়। আর যদি আমি গায়েবের খবর জানতাম, তাহলে নিজের জন্য অনেক ফায়দা হাসিল করতে পারতাম এবং কখনো আমার কোন ক্ষতি হতো না।[১৪৫] আমি তো যারা আমার কথা মেনে নেয় তাদের জন্য নিছক একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা মাত্র।"

তিনি যেসব কথা বলতেন সেগুলোর জন্য তাঁকে পাগল বলা হয়নি বরং নবী হবার পর তিনি যেসব কথা প্রচার করতে থাকেন সেগুলোর জন্য তাঁকে পাগল বলা হতে থাকে। তাই এখানে বলা হচ্ছে, তারা কি কখনো ভেবে দেখেছে, যে কথাগুলো তিনি বলছেন তার মধ্যে কোন্‌টি পাগলামির কথা? কোন্ কথাটি অর্থহীন, ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক? যদি তারা আসমান ও যমীনের ব্যবস্থাপনা নিয়ে চিন্তা করতো অথবা আল্লাহর তৈরী যে কোন একটি জিনিসকে গভীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করতো তাহলে তারা নিজেরাই বুঝতে পারতো যে, শিরকের মতবাদ খণ্ডন, তাওহীদের প্রমাণ, রবের বন্দেগীর দাওয়াত এবং মানুষের দায়িত্ব পালন ও জবাবদিহি সম্পর্কে তাদের ভাই তাদেরকে যা কিছু বুঝাচ্ছেন এই সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থা ও আল্লাহর সৃষ্টিলোকের প্রতিটি অনুকণিকা তারই সত্যতার সাক্ষ দিয়ে যাচ্ছে।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ
إِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ أَثْقَلَتْ
دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٨٩﴾
فَلَمَّآ اٰتٰهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا
يُشْرِكُوْنَ ﴿١٩٠﴾ أَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿١٩١﴾

২৪ রুকূ'

আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র প্রাণ থেকে এবং তারই প্রজাতি থেকে তার জুড়ি বানিয়েছেন, যাতে তার কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারে। তারপর যখন পুরুষ নারীকে ঢেকে ফেলে তখন সে হালকা গর্ভধারণ করে। তাকে বহন করে সে চলাফেরা করে। গর্ভ যখন ভারি হয়ে যায় তখন তারা দু'জনে মিলে এক সাথে তাদের রব আল্লাহর কাছে দোয়া করে ঃ যদি তুমি আমাদের একটি ভাল সন্তান দাও তাহলে আমরা তোমার শোকরগুজারী করবো। কিন্তু যখন আল্লাহ তাদেরকে একটি সুস্থ-নিখুঁত সন্তান দান করেন, তখন তারা তাঁর এ দান ও অনুগ্রহে অন্যদেরকে তাঁর সাথে শরীক করতে থাকে। তারা যেসব মুশরিকী কথাবার্তা বলে আল্লাহ তার অনেক উর্ধে।১৪৬ কি ধরনের নির্বোধ লোক এরা! আল্লাহর শরীক গণ্য করে তাদেরকে, যারা কোন জিনিস সৃষ্টি করেনি বরং নিজেরাই সৃষ্ট।

১৪৪. অর্থাৎ এ নির্বোধরা এতটুকুও চিন্তা করে না যে, মৃত্যুর সময় কারোর জানা নেই। কেউ জানে না কার মৃত্যু কখন এসে পড়বে। তারপর যখন কারোর মৃত্যুর সময় এসে যাবে এবং তার কর্মনীতির সংশোধন করার জন্য ইহকালীন জীবনকালের যে অবকাশটুকু সে পেয়েছিল তাকে যদি সে তখন গোমরাহী ও অসৎকাজে নষ্ট করে দিয়ে থাকে তাহলে তার পরিণাম কি হবে?

১৪৫. এর অর্থ হচ্ছে, কিয়ামতের সঠিক তারিখ একমাত্র সে-ই বলতে পারে, যে গায়েবের জ্ঞান রাখে, আর আমার অবস্থা এমন যে, আমি আগামীকাল আমার ও আমার পরিবারবর্গের কি অবস্থা হবে তাও বলতে পারি না। তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারো, যদি আমি এ জ্ঞানের অধিকারী হতাম তাহলে পূর্বাহ্নে অবগত হয়ে বহু ক্ষতির হাত থেকে আমি বেঁচে যেতাম এবং নিছক আগেভাগে জানতে পারার কারণে নিজের বহু স্বার্থোদ্ধার করা আমার পক্ষে সহজতর হতো। এ অবস্থা দেখার ও জানার পরও তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করছো—কিয়ামত কবে হবে? এটা তোমাদের কত বড় অজ্ঞতার পরিচায়ক।

১৪৬. এখানে মুশরিকদের জাহেলিয়াত প্রসূত গোমরাহীর সমালোচনা করা হয়েছে। এ ভাষণটির মূল বক্তব্য হচ্ছে, মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহই সর্বপ্রথম মানব জাতিকে সৃষ্টি করেন। মুশরিকরাও একথা অস্বীকার করে না। তারপর পরবর্তী কালের প্রত্যেকটি মানুষকেও তিনিই অস্তিত্ব দান করেন। আর একথাটিও মুশরিকরা জানে। নারী গর্ভে শুক্রকে সংরক্ষণ, তারপর এ সামান্য হালকা গর্ভটি লালন করে তাকে একটি জীবন্ত মানব শিশুতে পরিণত করা, এরপর সেই শিশুটির মধ্যে বিভিন্ন ধরনে শক্তি ও যোগ্যতা সৃষ্টি করে তাকে একটি সুস্থ ও পরিপূর্ণ অবয়বের অধিকারী মানুষ হিসেবে দুনিয়ার বুকে ভূমিষ্ঠ করা—এসব কিছু আল্লাহর ইচ্ছাধীন। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি নারীর গর্ভে সাপ, বাঁদর বা অন্য কোন অদ্ভুত দেহাবয়ব বিশিষ্ট জীব সৃষ্টি করে দেন অথবা মায়ের গর্ভেই শিশুকে অন্ধ, বধির, বোবা, খঞ্জ করে দেন বা তার শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক শক্তির মধ্যে কোন ত্রুটি জন্মিয়ে দেন, তাহলে আল্লাহর গড়া এ আকৃতিকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারোর নেই। একক আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসীদের ন্যায় মুশরিকরাও এ সত্যটি সম্পর্কে সমানভাবে অবগত। তাই দেখা যায়, গর্ভাবস্থায় সুস্থ, সবল ও নিখুঁত অবয়বধারী শিশু ভূমিষ্ঠ হবার ব্যাপারে আল্লাহর ওপরই পূর্ণ ভরসা করা হয়। কিন্তু সেই আশা পূর্ণ হয়ে যদি চাঁদের মত ফুটফুটে সুন্দর শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলেও জাহেলী কর্মকাণ্ড নবতর রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে কোন দেবী, অবতার, অলী ও পীরের নামে নজরানা ও শিন্নী নিবেদন করা হয় এবং শিশুকে এমন সব নামে অভিহিত করা হয় যেন মনে হয় সে আল্লাহর নয়, বরং অন্য কারোর অনুগ্রহের ফল। যেমন তার নামকরণ করা হয় হোসাইন বখ্‌শ (হোসাইনের দান), পীর বখশ্‌ (পীরের দান), আবদুর রসূল (রসূলের গোলাম), আবদুল উয্‌যা (উয্‌যা দেবতার দাস), আবদে শামস (সূর্য দাস) ইত্যাদি ইত্যাদি।

সূরার এ অংশটি অনুবাধন করার ব্যাপারে আরো একটি বড় ধরনের ভুল হয়ে থাকে। বিভিন্ন দুর্বল হাদীসের বর্ণনা এ ভুলের ভিত্‌কে আরো শক্তিশালী করে দিয়েছে। শুরুতে একটি মাত্র প্রাণ থেকে মানব জাতির জন্মের সূচনা হবার কথা বলা হয়েছে। এ প্রথম মানব প্রাণটি হচ্ছে হযরত আদম আলাইহিস সালাম। তারপর তার সাথে সাথেই একটি পুরুষ ও একটি নারীর কথা বলা হয়েছে। তারা প্রথমে সুস্থ ও পূর্ণাবয়ব সম্পন্ন শিশুর জন্মের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে। তারপর যখন শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তখন তারা আল্লাহর দানের সাথে অন্যদেরকেও শরীক করে নেয়। এ বর্ণনাভংগীর কারণে একদল লোক মনে করে নিয়েছে যে, আল্লাহর সাথে শরীককারী এ স্বামী-স্ত্রী নিশ্চয়ই হযরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামই হবেন। মজার ব্যাপার এই যে, এ ভুল ধারণার সাথে আবার কিছু দুর্বল হাদীসের মিশ্রণ ঘটিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গল্প রচনা করা হয়েছে। গল্পটি এ রকম যে, হযরত হাওয়ার ছেলে মেয়ে পয়দা হবার পর মরে যেতো। অবশেষে এক সন্তান জন্মের পর শয়তানের প্ররোচনায় তিনি তার নাম আবদুল হারেস (শয়তানের বান্দা) রাখতে উদ্বুদ্ধ হন। সবচেয়ে মারাত্মক ও সর্বনাশা ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এ হাদীসগুলোর মধ্য থেকে কোন কোনটির সনদ খোদ্‌ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্তও পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু মূলত এ জাতীয় সমস্ত হাদীসই ভুল। কুরআনের বক্তব্যও এর সমর্থন করে না। কুরআন কেবল এতটুকুই বলছে : মানব জাতির যে প্রথম দম্পতির মাধ্যমে পৃথিবীতে মানব বংশের সূচনা হয়েছিল তার স্রষ্টাও ছিলেন আল্লাহ, অন্য কেউ নয়। তাই সৃষ্টিকর্মে কেউ তার সাহায্যকারী ছিল না। তারপর প্রত্যেকটি পুরুষ ও

নারীর মিলনে যে শিশু জন্ম নেয় তার স্রষ্টাও সেই একই আল্লাহ যার সাথে কৃত অঙ্গীকারের ছাপ তোমাদের সবার হৃদয়ে সংরক্ষিত আছে। তাই এ অংগীকারের কারণে তোমরা আশা–নিরাশার দোলায় আন্দোলিত হয়ে যখন দোয়া করো তখন সেই আল্লাহর কাছেই দোয়া করে থাকো। কিন্তু পরে আশা পূর্ণ হয়ে গেলে তোমাদের মাথায় আবার শিরকের উদ্ভব হয়। এ আয়াতে কোন বিশেষ পুরুষ ও বিশেষ নারীর কথা বলা হয়নি বরং মুশরিকদের প্রত্যেকটি পুরুষ ও নারীর অবস্থা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও প্রণিধানযোগ্য। এসব আয়াতে আল্লাহ যাদের নিন্দাবাদ করেছেন তারা ছিল আরবের মুশরিক সম্প্রদায়। তাদের অপরাধ ছিল, তারা সুস্থ, সবল ও পূর্ণাবয়ব সম্পন্ন সন্তান জন্মের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতো কিন্তু সন্তানের জন্মের পর আল্লাহর এ দানে অন্যদেরকে অংশীদার করতো। নিসন্দেহে তাদের এ অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ। কিন্তু বর্তমানে তাওহীদের দাবীদারদের মধ্যে আমরা যে শিরকের চেহারা দেখছি তা তার চাইতেও খারাপ। এ তাওহীদের তাথাকথিত দাবীদাররা সন্তানও চায় আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের কাছে। গর্ভ সঞ্চারের পর আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের নামে মানত মানে এবং সন্তান জন্মের পর তাদেরই আস্তানায় যেয়ে নজরানা নিবেদন করে। এরপরও জাহেলী যুগের আরবরাই কেবল মুশরিক, আর এরা নাকি পাক্কা তাওহীদবাদী! তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত ছিল আর এদের জন্য রয়েছে নাজাতের গ্যারান্টি, তাদের গোমরাহীর কঠোর সমালোচনা ও নিন্দা করা হয় কিন্তু এদের গোমরাহীর সমালোচনা করলে ধর্মীয় নেতাদের দরবারে বিরাট অস্থিরতা দেখা দেয়। কবি আলতাফ হোসাইন হালী তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ "মুসাদ্দাস"–এ এ অবস্থারই চিত্র এঁকেছেন ঃ

کرے غیر گر تو کی پوجا تو کافر جو ٹھیرائے بیٹا خدا کا تو کافر
جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر کو اکسیر میں مانے کر شمہ تو کافر
مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں
پرستش کریں شوق سے جس کی جاہیں
نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں امامو کا رتبہ نبی سے بڑھائیں
مزاروں پہ جا جا کے نذریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں
نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے
نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے

"অন্যে করে মূর্তি পূজা
সে হয় কাফের সন্দেহ নেই
অন্যে বানায় খোদার পুত্র
সে হয় কাফের সন্দেহ নেই
অগ্নিতে যে নোয়ায় মাথা
সে হয় কাফের সন্দেহ নেই
তারার শক্তি মানলে তুমি
কাফের হবে সন্দেহ নেই,
কিন্তু মুমিন তারা তাই প্রশস্ত এসব পথই তাদের জন্য
করুক পূজা ইচ্ছা যাকে অনেক খোদার ভিন্ন ভিন্ন।

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٢﴾ وَإِن تَدْعُوهُمْ
إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۖ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ
صَامِتُونَ ﴿١٩٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ
فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ
يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ
بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ
فَلَا تُنظِرُونِ ﴿١٩٥﴾

যারা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে না এবং নিজেরাও নিজেদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না। যদি তোমরা তাদেরকে সত্য-সরল পথে আসার দাওয়াত দাও তাহলে তারা তোমাদের পেছনে আসবে না, তোমরা তাদেরকে ডাকো বা চুপ করে থাকো উভয় অবস্থায়ই ফল তোমাদের জন্য সমানই থাকবে।[১৪৭] তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকো তারা তো তোমাদের মতই বান্দা। তাদের কাছে দোয়া চেয়ে দেখো, তাদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে তারা তোমাদের দোয়ায় সাড়া দিক। তাদের কি পা আছে, যা দিয়ে তারা চলতে পারে? তাদের কি হাত আছে, যা দিয়ে তারা ধরতে পারে? তাদের কি চোখ আছে, যার সাহায্যে তারা দেখতে পারে? তাদের কি কান আছে, যা দিয়ে তারা শুনতে পারে?[১৪৮] হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলো, "তোমাদের বানানো শরীকদেরকে ডেকে নাও তারপর তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করো এবং আমাকে একদম অবকাশ দিয়ো না।

নবীকে বসাও যদি আল্লাহর আসনে
ইমামকে বসাও যদি নবীজির সামনে
পীরের মাজারে চাও সিন্নী চড়াও
শহীদের কবরে গিয়ে দোয়া যদি চাও
তবুও তাওহীদের গায়ে লাগে না আঁচড়
ঈমান অটুট থাকে ইসলাম অনড়।"

إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾ وَالَّذِينَ
تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٧﴾
وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۖ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ
لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾
إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم
مُّبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾

আমার সহায় ও সাহায্যকারী সেই আল্লাহ যিনি কিতাব নাযিল করেছেন এবং তিনি সৎ-লোকদের সহায়তা দান করে থাকেন।[১৪৯] অন্যদিকে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডেকে থাকো তারা তোমাদেরও সাহায্য করতে পারে না এবং নিজেরাও নিজেদের সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না। বরং তোমরা যদি তাদেরকে সত্য-সঠিক পথে আসতে বলো তাহলে তারা তোমাদের কথা শুনতেও পাবে না। বাহ্যত তোমরা দেখছো, তারা তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু আসলে তারা কিছুই দেখছে না।"

হে নবী! কোমলতা ও ক্ষমার পথ অবলম্বন করো। সৎকাজের উপদেশ দিতে থাকো এবং মূর্খদের সাথে বিতর্কে জড়িও না। যদি কখনো শয়তান তোমাকে উত্তেজিত করে তাহলে আল্লাহর আশ্রয় চাও। তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন। প্রকৃতপক্ষে যারা মুত্তাকী, তাদেরকে যদি কখনো শয়তানের প্রভাবে অসৎচিন্তা স্পর্শও করে যায় তাহলে তারা তখনই সতর্ক হয়ে ওঠে, তারপর তারা নিজেদের সঠিক কর্মপদ্ধতি পরিষ্কার দেখতে পায়। আর তাদের অর্থাৎ (শয়তানদের) ভাই-বন্ধুরা তো তাদেরকে তাদের বাঁকা পথেই টেনে নিয়ে যেতে থাকে এবং তাদেরকে বিভ্রান্ত করার ব্যাপারে তারা কোন ত্রুটি করে না।[১৫০]

১৪৭. অর্থাৎ মুশরিকদের বাতিল মাবুদদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তাদের পক্ষে কাউকে সঠিক পথ দেখানো এবং নিজেদের অনুগামী ও পূজারীদেরকে পথের সন্ধান দেয়া তো দূরের কথা, তারা তো কোন পথপ্রদর্শকের অনুসরণ করারও যোগ্যতা রাখে না। এমন কি কোন আহবানকারীর আহবানের জবাব দেবার ক্ষমতাও তাদের নেই।

১৪৮. এখানে একটি কথা পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে হবে। শিরক আশ্রিত ধর্মগুলোয়

তিনটি জিনিস আলাদা আলাদা পাওয়া যায়, এক, যেসব মূর্তি, ছবি বা নিদর্শনকে পূজা করা হয় এবং যেগুলোকে কেন্দ্র করে সমগ্র পূজা কর্মটি অনুষ্ঠিত হয়। দুই, যেসব ব্যক্তি, আত্মা বা ভাবদেবীকে আসল মাবুদ গণ্য করা হয় এবং মূর্তি, ছবি ইত্যাদির মাধ্যমে যেগুলোর প্রতিনিধিত্ব করা হয়। তিন, এসব মুশরিকী পূজা অনুষ্ঠানাদির গভীরে যেসব আকীদা বিশ্বাস কার্যকর থাকে। কুরআন বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ তিনটি জিনিসের ওপর আঘাত হেনেছে। তবে এখানে তার সমালোচনার লক্ষ হচ্ছে প্রথম জিনিসটি। অর্থাৎ মুশরিকরা যেসব মূর্তির সামনে পূজার অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে এবং যাদের সামনে নিজেদের আবেদন নিবেদন ও নজরানা পেশ করে তাদেরকেই এখানে সমালোচনার বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৪৯. মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে হুমকি দিয়ে আসছিল এটা হচ্ছে তার জবাব। তারা বলতো, যদি তুমি আমাদের এসব মাবুদের বিরোধিতা করা থেকে বিরত না হও এবং তাদের বিরুদ্ধে লোকদের বিশ্বাস এভাবে নষ্ট করে যেতে থাকো, তাহলে তুমি তাদের গযবের শিকার হবে এবং তারা তোমাকে একেবারে নেস্তনাবুদ করে দেবে।

১৫০. এ আয়াতগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রচার, পথনির্দেশনা দান, সংস্কার ও সংশোধন কৌশলের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানিয়ে দেয়া হয়েছে। কেবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নয়, বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থলাভিসিক্ত হয়ে যেসব লোক দুনিয়াবাসীকে সঠিক পথ দেখাবার দায়িত্ব পালন করার জন্য এগিয়ে আসবে তাদেরকেও তাঁরই মাধ্যমে এ একই কৌশল শিখানোও এর উদ্দেশ্য। এ বিষয়গুলোকে ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করা যায় ঃ

(১) ইসলামের আহবায়কের জন্য যে গুণগুলো সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, তাকে কোমল স্বভাবের, সহিষ্ণু ও উদার হৃদয় হতে হবে। তাকে হতে হবে নিজের সংগী-সহযোগীদের জন্য স্নেহশীল, সাধারণ মানুষের জন্য দয়াদ্র হৃদয় এবং নিজের বিরোধীদের জন্য সহিষ্ণু। নিজের সাথীদের দুর্বলতাগুলোও তাকে সহ্য করে নিতে হবে এবং নিজের বিরোধীদের কঠোর ব্যবহারকেও। চরম উত্তেজনাকর অবস্থার মধ্যেও তার নিজের আচরণে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। অত্যন্ত বিরক্তিকর ও অপছন্দনীয় কথাগুলোও উদার মনে এড়িয়ে যেতে হবে। বিরোধীদের পক্ষ থেকে যতই কড়া ভাষায় কথা বলা হোক, যতই দোষারোপ করা ও মনে ব্যথা দেয়া হোক এবং যতই বর্বরোচিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা হোক না কেন, তাকে অবশ্যি এসব কিছুকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতে হবে। কঠোর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা, কর্কশ আচরণ করা, তিক্ত ও কড়া কথা বলা এবং প্রতিশোধমূলক মানসিক উত্তেজনায় ভোগা এ কাজের জন্য বিষতুল্য। এতে গোটা কাজ পণ্ড হয়ে যায়। এ জিনিসটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ "আমার রব আমাকে হুকুম দিয়েছেন, আমি যেন ক্রোধ ও সন্তুষ্টি উভয় অবস্থায়ই ইনসাফের কথা বলি, যে আমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে তার সাথে সম্পর্ক জুড়ি, যে আমাকে আমার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাকে তার অধিকার দান করি, যে আমার প্রতি জুলুম করে আমি তাকে মাফ করে দেই।" ইসলামের কাজে তিনি নিজের পক্ষ থেকে যাদেরকে পাঠাতেন তাদেরকেও এ একই বিষয়গুলো মেনে চলার নির্দেশ দিতেন। তিনি বলেন ঃ

بَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا وَيَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا

"যেখানে তোমরা যাবে সেখানে তোমাদের পদার্পণ যেন লোকদের জন্য সুসংবাদ হিসেবে দেখা দেয়, তা যেন লোকদের মধ্যে ঘৃণার সঞ্চার না করে। লোকদের জীবন যেন তোমাদের কারণে সহজ হয়ে যায়, কঠিন ও সংকীর্ণ হয়ে না পড়ে।"

আল্লাহ নিজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ গুণেরই প্রশংসা করেছেন :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ -

"আল্লাহর রহমতে তুমি তাদের জন্য কোমল প্রমাণিত হয়েছো, নয়তো যদি তোমার ব্যবহার কর্কশ হতো এবং তোমার মন হতো সংকীর্ণ ও অনুদার, তাহলে এসব লোক তোমার চারদিক থেকে সরে যেতো।" (আলে ইমরান : ১৫৯)

(২) সত্যের দাওয়াতের সাফল্যের মূলমন্ত্র হচ্ছে, দাওয়াতদানকারীরা দার্শনিক তত্ত্ব ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বালোচনার পরিবর্তে লোকদেরকে এমনসব সহজ সরল সৎকাজের নির্দেশ দেবেন যা সবার কাছে সৎকাজ হিসেবে পরিচিত অথবা যাদের সৎকাজ হবার ব্যাপারটি বুঝার জন্য প্রত্যেক মানুষের সাধারণ জ্ঞানই (Common sense) যথেষ্ট হয়। এভাবে সত্যের আহবায়কের আবেদন সাধারণ–অসাধারণ নির্বিশেষে সবাইকে প্রভাবিত করে এবং প্রত্যেকটি শ্রোতার কান থেকে হৃদয় অভ্যন্তরে প্রবেশের পথ সে নিজেই তৈরী করে নেয়। এ ধরনের পরিচিত সৎকর্মের দাওয়াতের বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদের ঝড় তোলে তারা নিজেরাই নিজেদের ব্যর্থতা ও এ দাওয়াতের সাফল্যের পথ প্রশস্ত করে। কারণ সাধারণ মানুষ যতই বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হোক না কেন যখন তারা দেখে যে, একদিকে সৎ, ভদ্র ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী এক ব্যক্তি সরল সহজভাবে সোজাসুজি সৎকাজের দাওয়াত দিচ্ছে এবং অন্যদিকে এক দল লোক তার বিরোধিতায় নেমে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করছে যা নৈতিকতা ও মানবতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী, তখন স্বাভাবিকভাবেই ধীরে ধীরে সত্য বিরোধীদের প্রতি তাদের মন বিরূপ হয়ে উঠতে থাকে এবং সত্যের আহবায়কের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যেতে থাকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত মোকাবিলার ময়দানে কেবলমাত্র এমন সব লোক থেকে যায়, বাতিল ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার মধ্যে যাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ নিহিত অথবা পূর্ববর্তীদের অন্ধ অনুকরণের প্রেরণা ও জাহেলী বিদ্বেষ যাদের মনে যে কোন ধরনের আলো গ্রহণ করার ক্ষমতা বিনষ্ট করে দিয়েছে। এ কর্মকৌশলের বদৌলতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবে সাফল্য অর্জন করেন এবং তাঁর পর মাত্র কিছু দিনের মধ্যে নিকটবর্তী দেশগুলোয় ইসলাম এমনভাবে বিস্তার লাভ করে যে, সেখানে কোথাও মুসলমানের সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা একশ ভাগ, কোথাও নব্বই ভাগ এবং কোথাও আশী ভাগ।

(৩) সত্যের এ দাওয়াতের ক্ষেত্রে যেখানে একদিকে ন্যায় ও কল্যাণ অনুসন্ধানীদেরকে সৎকাজের দিকে উদ্বুদ্ধ করা জরুরী, সেখানে মূর্খদের সাথে কোন প্রকার সংঘর্ষ ও বিরোধে জড়িয়ে না পড়াও অপরিহার্য, চাই তারা সংঘর্ষ ও বিরোধ সৃষ্টি করার জন্য যত চেষ্টাই করুক। যারা ন্যায়সংগতভাবে বুদ্ধি বিবেচনার সাথে বক্তব্য

অনুধাবন করতে চায় আহবায়কের উচিত একমাত্র তাদেরকেই সম্বোধন করা। এ ব্যাপারে তাঁকে অতি সাবধানী হতে হবে। অন্যদিকে যখন কোন ব্যক্তি নিরেট মূর্খের মত ব্যবহার শুরু করে দেয়, তর্ক-বিতর্ক, গোঁয়ার্তুমি, ঝগড়া-ঝাঁটি ও গালিগালাজের পর্যায়ে নেমে আসে তখন আহবায়কের তার প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে অস্বীকার করা উচিত। কারণ এ ধরনের বিতর্ক ও ঝগড়া-ঝাঁটিতে লিপ্ত হয়ে কোন লাভ নেই। বরঞ্চ এতে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ আহবায়কের যে শক্তি ইসলামী দাওয়াত সম্প্রসারণ ও ব্যক্তি চরিত্র সংশোধনের কাজে ব্যয়িত হওয়া উচিত তা অযথা এ বাজে কাজে ব্যয় হয়ে যায়।

(৪) তিন নম্বরে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেই প্রসংগে আরো নির্দেশ হচ্ছে এই যে, সত্যের আহবায়ক যখনই বিরোধীদের জুলুম, নির্যাতন ও অনিষ্টকর কার্যকলাপ এবং তাদের মূর্খতা প্রসূত অভিযোগ-আপত্তির কারণে মানসিক উত্তেজনা অনুভব করবে তখনই তার বুঝে নেয়া উচিত যে, এটি শয়তানের উস্কানি ছাড়া আর কিছুই নয়। তখনই তার আল্লাহর কাছে এ মর্মে আশ্রয় চাওয়া উচিত যে, আল্লাহ যেন তাঁর বান্দাকে এ উত্তেজনার স্রোতে ভাসিয়ে না দেন এবং তাকে এমন অসংযমী ও নিয়ন্ত্রণবিহীন না করেন যার ফলে সে সত্যের দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার মত কোন কাজ করে বসে। সত্যের দাওয়াতের কাজ ঠাণ্ডা মাথায়ই করা যেতে পারে। আবেগ-উত্তেজনার বশবর্তী না হয়ে পরিবেশ পরিস্থিতি এবং সময়-সুযোগ দেখে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে যে পদক্ষেপটি নেয়া হয় একমাত্র সেটিই সঠিক হতে পারে। কিন্তু শয়তান যেহেতু এ কাজটির উন্নতি কখনো দু'চোখে দেখতে পারে না তাই সে হামেশা নিজের সংগী-সাথীদের সাহায্যে সত্যের আহবায়কের ওপর নানান ধরনের আক্রমণ পরিচালনার চেষ্টা চালায়। আবার প্রত্যেকটি আক্রমণের পর সে আহবায়ককে এই বলে ক্ষেপাতে থাকে যে, এ আক্রমণের জবাব তো অবশ্যই দেয়া দরকার। আহবায়কের মনের দুয়ারে শয়তানের এ আবেদন অধিকাংশ সময় অতিশয় প্রতারণাপূর্ণ ব্যাখ্যা ও ধর্মীয় সংস্কারের মোড়কে আবৃত হয়ে আসে। কিন্তু এর গভীরে সংকীর্ণ স্বার্থপ্রীতি ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তাই শেষ দু' আয়াতে বলা হয়েছে ঃ যারা মুত্তাকী (অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করে কাজ করে এবং অসৎকাজ থেকে দূরে থাকতে চায়) তারা নিজেদের মনে কোন শয়তানী প্ররোচনার প্রভাব এবং কোন অসৎ চিন্তার ছোঁয়া অনুভব করতেই সাথে সাথেই সজাগ হয়ে ওঠে। তারপর এ পর্যায়ে কোন্ ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বনে দীনের স্বার্থ রক্ষিত হবে এবং সত্য প্রীতির প্রকৃত দাবী কি তা তারা পরিষ্কার দেখতে পায়। আর যাদের কাজের সাথে স্বার্থপ্রীতি অংগাংগীভাবে জড়িত এবং এ জন্য শয়তানের সাথে যাদের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তারা অবশ্যি শয়তানী প্ররোচনার মোকাবিলায় টিকে থাকতে পারে না এবং তার কাছে পরাজিত হয়ে ভুল পথে পা বাড়ায়। তারপর শয়তান তাদেরকে নাকে রসি লাগিয়ে যেখানে ইচ্ছা ঘোরাতে থাকে এবং কোথাও গিয়ে স্থির হতে দেয় না। বিরোধীদের প্রত্যেকটি গালির জবাবে তাদের কাছে গালির স্তূপ এবং তাদের প্রত্যেকটি অপকৌশলের জবাবে তার চাইতেও বড় অপকৌশল তাদের কাছে তৈরী থাকে।

এ বক্তব্যের একটি সাধারণ প্রয়োগ ক্ষেত্রও রয়েছে। মুত্তাকী লোকেরা নিজেদের জীবনে সাধারণত অমুত্তাকী লোকদের থেকে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। যারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে ভয় করে এবং সর্বান্তকরণে অসৎকাজ থেকে দূরে থাকতে চায়

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ
مِن رَّبِّي ۚ هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾
وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ
لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٢٠٦﴾

হে নবী! যখন তুমি তাদের সামনে কোন নিদর্শন (অর্থাৎ মুজিযা) পেশ করো না তখন তারা বলে, তুমি নিজের জন্য কোন নিদর্শন বেছে নাওনি কেন?[১৫১] তাদেরকে বলে দাও, "আমি তো কেবল সেই অহীরই আনুগত্য করি যা আমার রব আমার কাছে পাঠান। এটি তো অন্তরদৃষ্টির আলো তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এবং হেদায়াত ও রহমত তাদের জন্য যারা একে গ্রহণ করে।[১৫২] যখন কুরআন তোমাদের সামনে পড়া হয়, তা শোনো মনোযোগ সহকারে এবং নীরব থাকো, হয়তো তোমাদের প্রতিও রহমত বর্ষিত হবে।[১৫৩]

হে নবী! তোমার রবকে স্মরণ করো সকাল-সাঁঝে মনে মনে কান্নাজড়িত স্বরে ও ভীতি বিহ্বল চিত্তে এবং অনুচ্চ কণ্ঠে। তুমি তাদের অন্তরভুক্ত হয়ো না যারা গাফলতির মধ্যে ডুবে আছে।[১৫৪] তোমার রবের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণ কখনো নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে তাঁর ইবাদাতে বিরত হয় না,[১৫৫] বরঞ্চ তারা তাঁরই মহিমা ঘোষণা করে[১৫৬] এবং তাঁর সামনে বিনত থাকে।[১৫৭]

তাদের মনে যদি কখনো অসৎ চিন্তার সামান্যতম স্পর্শও লাগে তাহলে তাদের মনকে তা ঠিক তেমনিভাবে আহত করে যেমন আঙুলে কাঁটা বিঁধে গেলে বা চোখে বালির কণা পড়লে মানুষ যন্ত্রণা বোধ করে। যেহেতু তারা অসৎ চিন্তা, অসৎ কামনা-বাসনা ও অসৎ সংকল্প করতে অভ্যস্ত নয় তাই এ জিনিসগুলো তাদের জন্য আঙুলে কাঁটা ফুটে যাওয়া, চোখে বালি পড়া অথবা স্পর্শকাতর ও পরিচ্ছন্নতা প্রিয় ব্যক্তির কাপড়ে কালির দাগ লেগে যাওয়া বা ময়লার ছিটে পড়ার মত অস্বস্তিকর বোধ হয়। তারপর তাদের মনে এভাবে অস্বস্তির কাঁটা বিঁধে যাবার পর তাদের চোখ খুলে যায় এবং তাদের বিবেক জেগে উঠে, অসৎ প্রবণতার এ ধূলোমাটি ঝেড়ে ফেলার কাজে ব্যাপৃত হয়। অন্যদিকে যারা আল্লাহকে

ভয় করে না, অসৎকাজ থেকে বাঁচতেও চায় না এবং শয়তানের সাথে নিবিড় সম্পর্কও কায়েম করে রেখেছে, তাদের মনে অসৎ চিন্তা, অসৎ সংকল্প ও অসৎ উদ্দেশ্য পরিপক্কতা লাভ করতে থাকে এবং তারা এসব পচা দুর্গন্ধময় আবর্জনায় কোন প্রকার অস্বস্তি অনুভব করে না। তাদের অবস্থা হয় ঠিক তেমনি যেমন কোন ডেকচিতে শূয়োরের মাংস রান্না করা হচ্ছে কিন্তু ডেকচি এর কোন খবরই রাখে না যে, তার মধ্যে কি রান্না হচ্ছে। অথবা কোন ধাঙড়ের সারা দেহ ও কাপড় চোপড় ময়লায় ভরে গেছে এবং তা থেকে ভীষণ দুর্গন্ধও বেরুচ্ছে কিন্তু তার মধ্যে কোন অনুভূতিই নেই যে, সে কিসের মধ্যে আছে।

১৫১. কাফেরদের এ প্রশ্নের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট বিদ্রূপের ভাব ফুটে উঠেছিল। অর্থাৎ তাদের কথাটার অর্থ ছিল ঃ আরে মিয়া! তুমি যেভাবে নবী হয়ে বসেছো ঠিক তেমনিভাবে নিজের জন্য একটি মুজিযাও বেছে খুটে সাথে নিয়ে এলে পারতে। কিন্তু এ বিদ্রূপের জবাব কিভাবে দেয়া হয়েছে তা দেখুন।

১৫২. অর্থাৎ যে জিনিসটির চাহিদা দেখা দেয় বা আমি নিজে যার প্রয়োজন অনুভব করি সেটি আমি নিজে উদ্ভাবন বা তৈরী করে পেশ করে দেবো, এটা আমার কাজ নয়। আমি তো একজন রসূল—আল্লাহর প্রেরিত। আমার দায়িত্ব কেবল এতটুকু, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে যাবো। মুজিযার পরিবর্তে আমার প্রেরণকারী আমার কাছে এ কুরআন পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে আছে অন্তরদৃষ্টির আলো। এর প্রধানতম বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, যারা একে মেনে নেয় তারা জীবনের সঠিক–সরল পথ পেয়ে যায় এবং তাদের নৈতিক বৃত্তিতে আল্লাহর অনুগ্রহের নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।

১৫৩. অর্থাৎ বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা ও হঠকারিতার কারণে তোমরা কুরআনের বাণী শুনতেই যে কানে আঙুল দাও এবং নিজেরা না শুনার ও অন্যদের না শুনতে দেয়ার উদ্দেশ্যে যে হৈ চৈ ও শোরগোল শুরু করে থাকো, এ নীতি পরিহার করো। বরং কুরআনের বাণী গভীর মনোযোগসহকারে শোনো এবং তার শিক্ষা অনুধাবন করো। এর শিক্ষার সাথে পরিচিত হবার পর ঈমানদারদের মত তোমাদের নিজেদেরও এর রহমতের আংশীদার হয়ে যাওয়া কোন বিচিত্র ব্যাপার নয়। বিরোধীদের বিদ্রূপাত্মক বক্রোক্তির জবাবে এটি এমন একটি মার্জিত মধুর ও হৃদয়গ্রাহী প্রচার নীতি, যার চমৎকারিত্ব বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। যে ব্যক্তি প্রচার কৌশল শিখতে চায় গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে এ জবাব থেকে সে তা শিখতে পারে।

এ আয়াতের মূল উদ্দেশ্য তো আমি ওপরে বর্ণনা করেছি। কিন্তু পরোক্ষভাবে এ থেকে এ বিধানটিও পাওয়া যায় যে, যখন আল্লাহর কালাম পাঠ করা হয় তখন লোকদের আদব সহকারে নীরব থাকা এবং মনোযোগ সহকারে তা শোনা উচিত। এ থেকে এ কথাটিও প্রমাণিত হয় যে, নামাযের মধ্যে ইমাম যখন কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকেন তখন মুকতাদীদের নীরবে তা শোনা উচিত। কিন্তু এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং তাঁর সাথীদের মতে ইমামের কেরাআত উচ্চস্বরে হোক বা অনুচ্ছ স্বরে হোক সব অবস্থায় মুকতাদীদের নীরব থাকতে হবে। ইমাম মালিক (র) ও ইমাম আহমদের (র) মতে কেবলমাত্র ইমাম যখন উচ্চ স্বরে কেরাআত পড়বেন তখনই মুকতাদীদের নীরব থাকতে হবে। কিন্তু ইমাম শাফেঈ (র) বলেন, ইমামের উচ্চ ও

অনুচ্চ স্বরে কেরাআত পড়ার উভয় অবস্থায়ই মুকতাদীদের কেরাআত পড়তে হবে। কারণ কোন কোন হাদীসের ভিত্তিতে তিনি মনে করেন, যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতেহা পড়ে না তার নামায হয় না।

১৫৪. স্মরণ করা অর্থ নামাযও এবং অন্যান্য ধরনের স্মরণ করাও। চাই মুখে মুখে বা মনে মনে যে কোনভাবেই তা হোক না কেন। সকাল–সাঁঝ বলতে নির্দিষ্টভাবে এ দু'টি সময়ও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। আর এ দু' সময়ে আল্লাহর স্মরণ বলতে বুঝানো হয়েছে নামাযকে। পক্ষান্তরে সকাল–সাঁঝ কথাটা "সর্বক্ষণ" অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং তখন এর অর্থ হয় সবসময় আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকা। এ ভাষণটির উপসংহারে সর্বশেষ উপদেশ হিসেবে এটি বলা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে, তোমাদের অবস্থা যেন গাফেলদের মত না হয়ে যায়। দুনিয়ায় যা কিছু গোমরাহী ছড়িয়েছে এবং মানুষের নৈতিক চরিত্রে ও কর্মকাণ্ডে যে বিপর্যয়ই সৃষ্টি হয়েছে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, মানুষ ভুলে যায়, আল্লাহ তার রব, সে আসাহর বান্দা, দুনিয়ায় তাকে পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়েছে এবং এ দুনিয়ার জীবন শেষ হবার পর তাকে তার রবের কাছে হিসাব দিতে হবে। কাজেই যে ব্যক্তি নিজেও সঠিক পথে চলতে চায় এবং দুনিয়ার অন্যান্য মানুষকেও তদনুসারে চালাতে চায় সে নিজে যেন কখনো এ ধরনের ভুল না করে, এ ব্যাপারে তাকে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এ জন্যেই নামায ও আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে সব সময় স্থায়ীভাবে আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট থাকার ও তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখার জন্য বার বার তাকীদ করা হয়েছে।

১৫৫. এর অর্থ হচ্ছে, শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করা ও রবের বন্দেগী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া শয়তানের কাজ। এর ফল হয় অধপতন ও অবনতি। পক্ষান্তরে তার আল্লাহর সামনে ঝুঁকে পড়া এবং তাঁর বন্দেগীতে অবিচল থাকা একটি ফেরেশতাসুলভ কাজ। এর ফল হয় উন্নতি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ। যদি তোমরা এ উন্নতি চাও তাহলে নিজেদের কর্মনীতিকে শয়তানের পরিবর্তে ফেরেশতাদের কর্মনীতির অনুরূপ করে গড়ে তোল।

১৫৬. মহিমা ঘোষণা করে অর্থাৎ আল্লাহ যে ত্রুটিমুক্ত, দোষমুক্ত, ভুলমুক্ত সব ধরনের দুর্বলতা থেকে তিনি যে একেবারেই পাক–পবিত্র এবং তিনি যে লা–শরীক, তুলনাহীন ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী, এ বিষয়টি সর্বান্তকরণে মেনে নেয়। মুখে তার স্বীকৃতি দেয় ও অংগীকার করে এবং স্থায়ীভাবে সবসময় এর প্রচার ও ঘোষণায় সোচ্চার থাকে।

১৫৭. এ ক্ষেত্রে শরীয়াতের বিধান এই যে, যে ব্যক্তি এ আয়াতটি পড়বে বা শুনবে তাকে সিজদা করতে হবে। এভাবে তার অবস্থা হয়ে যাবে আল্লাহর নিকটতম ফেরেশতাদের মত। এভাবে সারা বিশ্ব–জাহানের ব্যবস্থাপনা পরিচালনাকারী কর্মীরা যে মহান আল্লাহর সামনে নত হয়ে আছে তারাও তাদের সাথে তাঁর সামনে নত হয়ে যাবে এবং নিজেদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সংগে সংগেই একথা প্রমাণ করে দেবে যে, তারা কোন অহমিকায় ভোগে না এবং আল্লাহর বন্দেগী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়াও তাদের স্বভাব নয়।

কুরআন মজীদে চৌদ্দটি স্থানে সিজদার আয়াত এসেছে। এ আয়াতগুলো পড়লে বা শুনলে সিজদা করতে হবে, এটি ইসলামী শরীয়াতের একটি বিধিবদ্ধ বিষয়, এ ব্যাপারে

সবাই একমত। তবে এ সিজদা ওয়াজিব হবার ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহে আলাইহে তেলাওয়াতের সিজদাকে ওয়াজিব বলেন। অন্যান্য উলামা বলেন, এটি সুন্নাত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক সময় একটি বড় সমাবেশে কুরআন পড়তেন এবং সেখানে সিজদার আয়াত এলে তিনি নিজে তৎক্ষণাৎ সিজদা করতেন এবং সাহাবীগণের যিনি যেখানে থাকতেন তিনি সেখানেই সিজদানত হতেন। এমনকি কেউ কেউ সিজদা করার জায়গা না পেয়ে নিজের সামনের ব্যক্তির পিঠের ওপর সিজদা করতেন। হাদীসে একথাও এসেছে, মক্কা বিজয়ের সময় তিনি কুরআন পড়েন। সেখানে সিজদার আয়াত এলে যারা মাটির ওপর দাঁড়িয়েছিলেন তারা মাটিতে সিজদা করেন এবং যারা ঘোড়া ও উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন তারা নিজেদের বাহনের পিঠেই ঝুঁকে পড়েন। কখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুত্‌বার মধ্যে সিজদার আয়াত পড়তেন, তখন মিম্বার থেকে নেমে সিজদা করতেন তারপর আবার মিম্বারের ওপর উঠে খুত্‌বা দিতেন।

অধিকাংশ আলেমের মতে নামাযের জন্য যেসব শর্ত নির্ধারিত এ তেলাওয়াতের সিজদার জন্যও তাই নির্ধারিত। অর্থাৎ অযুসহকারে কিবলার দিকে মুখ করে নামাযের সিজদার মত করে মাটিতে মাথা ঠেকাতে হবে। কিন্তু তেলাওয়াতের সিজদার অধ্যায়ে আমরা যতগুলো হাদীস পেয়েছি সেখানে কোথাও এ শর্তগুলোর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। সেখান থেকে তো একথাই জানা যায় যে, সিজদার আয়াত শুনে যে ব্যক্তি যেখানে যে অবস্থায় থাকে সে অবস্থায়ই যেন সিজদা করে—তার অযু থাক বা না থাক, কিবলামুখী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হোক বা না হোক, মাটিতে মাথা রাখার সুযোগ পাক বা না পাক তাতে কিছু আসে যায় না। প্রথম যুগের আলেমদের মধ্যেও আমরা এমন অনেক লোক দেখি যারা এভাবেই তেলাওয়াতের সিজদা করেছেন। ইমাম বুখারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি অযু ছাড়াই তেলাওয়াতের সিজদা করতেন। ফাত্‌হুল বারীতে আবু আবদুর রহমান সুলামী সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি পথ চলতে কুরআন মজীদ পড়তেন এবং কোথাও সিজদার আয়াত এলেই মাথা ঝুঁকিয়ে নিতেন। অযু সহকারে থাকুন বা না থাকুন এবং কিবলার দিকে মুখ ফিরানো থাক বা না থাক, তার পরোয়া করতেন না। এসব কারণে আমি মনে করি, যদিও অধিকাংশ আলেমের মতটিই অধিকতর সতর্কতামূলক তবুও কোন ব্যক্তি যদি অধিকাংশ আলেমের মতের বিপরীত আমল করে তাহলে তাকে তিরস্কার করা যেতে পারে না। কারণ অধিকাংশ আলেমের মতের স্বপক্ষে কোন প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত নেই। আবার প্রথম দিকের আলেমদের মধ্যে এমনসব লোকও পাওয়া গেছে যাদের রীতি ছিল পরবর্তীকালের অধিকাংশ আলেমদের থেকে ভিন্নতর।

আল আনফাল

৮

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরাটি দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধের পরে নাযিল হয়। ইসলাম ও কুফরের মধ্যে সংঘটিত এ প্রথম যুদ্ধের ওপর এতে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। সূরার মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে অনুমান করা যায়, সম্ভবত এ সমগ্র সূরাটি একটি মাত্র ভাষণের অন্তরভুক্ত এবং একই সংগে এ ভাষণটি নাযিল করা হয়। তবে এর কোন কোন আয়াত বদর যুদ্ধ থেকে উদ্ভূত সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পরে নাযিল হয়ে থাকতে পারে। পরবর্তী পর্যায়ে ভাষণের ধারবাহিকতায় এগুলোকে উপযুক্ত স্থানে রেখে এ সমগ্র ভাষণটিকে একটি ধারাবাহিক ভাষণের রূপ দান করা হয়েছে। কিন্তু দু'-তিনটি আলাদা আলাদা ভাষণকে এক সাথে জুড়ে দিয়ে একটি অখণ্ড ভাষণে রূপান্তরিত করা হয়েছে বলে মনে হতে পারে এমন কোন জোড়ের সন্ধান এ সমগ্র ভাষণের কোথাও পাওয়া যাবে না।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এ সূরাটি পর্যালোচনা করার আগে বদরের যুদ্ধ এবং তার সাথে সম্পর্কিত অবস্থা ও ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দাওয়াতের প্রথম দশ বারো বছর মক্কা মুয়ায্যমায় অবস্থান করেছিলেন। এ সময় তাঁর দাওয়াত যথেষ্ট পরিপক্কতা ও স্থিতিশীলতা অর্জন করেছিল। কারণ এর পেছনে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী দাওয়াতের পতাকাবাহী উন্নত চরিত্র ও বিশাল হৃদয়বৃত্তির অধিকারী এক জ্ঞানী পুরুষ। তিনি নিজের ব্যক্তি সত্তার সমস্ত যোগ্যতা ও সামর্থ এ কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর কার্যধারা থেকে এ সত্যটি পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, এ আন্দোলনকে তার সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য তিনি দৃঢ়সংকল্প। এ লক্ষে উপনীত হবার জন্য পথের যাবতীয় বিপদ-আপদ ও সংকট-সমস্যার মোকাবিলায় তিনি সর্বক্ষণ প্রস্তুত। অন্যদিকে এ দাওয়াতের মধ্যে ছিল এমন এক অদ্ভুত ও তীব্র আকর্ষণী ক্ষমতা যে, হৃদয়-মস্তিষ্কের গভীরে তার অনুপ্রবেশ কার্য চলছিল দ্রুত ও অপ্রতিহত গতিতে। মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার এবং হিংসা ও সংকীর্ণ স্বার্থপ্রীতির প্রাচীর তার পথ রোধ করতে পারছিল না। এ কারণে আরবের প্রাচীন জাহেলী ব্যবস্থার সমর্থক শ্রেণী প্রথম দিকে একে হালকাভাবে এবং অবজ্ঞার চোখে দেখলেও মক্কী যুগের শেষের দিকে একে একটি গুরুতর বিপদ বলে মনে করছিল। একে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তারা নিজেদের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু তখনো পর্যন্ত এ দাওয়াতের মধ্যে কোন কোন দিক দিয়ে বেশ কিছুটা অভাব রয়ে গিয়েছিল।

এক ঃ তখনো একথা পুরোপুরি প্রমাণ হয়নি যে, এমন ধরনের যথেষ্ট সংখ্যক অনুসারী এ দাওয়াতের পতাকা তলে সমবেত হয়েছে যারা শুধু তার অনুগতই নয় বরং তার নীতিকে মনেপ্রাণে ভালও বাসে, তাকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে নিজেদের সর্বশক্তি ও সকল উপায়-উপকরণ ব্যয় করতে প্রস্তুত এবং এ জন্য নিজেদের সব কিছু কুরবানী করে দিতে, সারা দুনিয়ার সাথে লড়াই করতে, এমন কি নিজেদের প্রিয়তম আত্মীয়তার বাঁধনগুলো কেটে ফেলতেও উদগ্রীব। যদিও মক্কায় ইসলামের অনুসারীরা কুরাইশদের জুলুম-নির্যাতন বরদাশত করে নিজেদের ঈমানের অবিচলতা ও নিষ্ঠা এবং ইসলামের সাথে তাদের অটুট সম্পর্কের পক্ষে বেশ বড় আকারের প্রমাণ পেশ করেছিল, তবুও একথা প্রমাণিত হওয়া তখনো বাকী ছিল যে, ইসলামী আন্দোলন এমন একদল উৎসর্গীত প্রাণ অনুসারী পেয়ে গেছে যারা নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষের মোকাবিলায় অন্য কোন জিনিসকেই প্রিয়তর মনে করে না। বস্তুত একথা প্রমাণ করার জন্য তখনো অনেক পরীক্ষারও প্রয়োজন ছিল।

দুই ঃ এ দাওয়াতের আওয়াজ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়লেও এর প্রভাবগুলো ছিল চারদিকে বিক্ষিপ্ত ও অসংহত। এ দাওয়াত যে জনশক্তি সংগ্রহ করেছিল তা এলোমেলো অবস্থায় সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। পুরাতন জাহেলী ব্যবস্থার সাথে চূড়ান্ত মোকাবিলা করার জন্য যে ধরনের সামষ্টিক শক্তির প্রয়োজন ছিল তা সে তখনো অর্জন করেনি।

তিন ঃ এ দাওয়াত তখনো মাটিতে কোথাও শিকড় গাড়তে পারেনি। তখনো তা কেবল বাতাসেই উড়ে বেড়াচ্ছিল। দেশের অভ্যন্তরে এমন কোন এলাকা ছিল না যেখানে দৃঢ়পদ হয়ে নিজের ভূমিকাকে সুসংহত করে সে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারতো। তখনো পর্যন্ত যেখানেই যে মুসলমান ছিল, কুফর ও শিরকে নিমজ্জিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে তার অবস্থান ছিল ঠিক খালি পেটে গেলা কুইনিনের মত। অর্থাৎ খালি পেটে কুইনিন গিললে পেট তাকে বমি করে উগ্‌রে দেবার জন্য সর্বক্ষণ চাপ দিতে থাকে এবং কোথাও তাকে এক দণ্ড তিষ্টাতে দেয় না।

চার ঃ সে সময় পর্যন্ত এ দাওয়াত বাস্তব জীবনের কার্যাবলী নিজের হাতে পরিচালনা করার সুযোগ পায়নি। তখনো সে তার নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়নি। নিজস্ব অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা রচনাও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অন্যান্য শক্তির সাথে তার যুদ্ধ ও সন্ধির কোন ঘটনাই ঘটেনি। তাই যেসব নৈতিক বিধানের ভিত্তিতে এ দাওয়াত সমগ্র দেশ ও সমাজকে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত করতে চাচ্ছিল তার কোন প্রদর্শনীও করা যায়নি। আর এ দাওয়াতের বাণীবাহক ও তাঁর অনুসারীরা যে জিনিসের দিকে সমগ্র দুনিয়াবাসীকে আহবান জানিয়ে আসছিলেন তাকে কার্যকর করার ব্যাপারে তারা নিজেরা কতটুকু নিষ্ঠাবান, এখনো কোন পরীক্ষার মানদণ্ডে যাচাই বাছাই করার পর তার সুস্পষ্ট চেহারাও সামনে আসেনি।

মক্কী যুগের শেষ তিন-চার বছরে ইয়াসরেবে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়তে থাকে অপ্রতিহত গতিতে। সেখানকার লোকেরা আরবের অন্যান্য এলাকার গোত্রগুলোর তুলনায় অধিকতর সহজে ও নির্দ্বিধায় এ আলো গ্রহণ করতে থাকে। শেষে নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে হজ্জের সময় ৭৫ জনের একটি প্রতিনিধি দল রাতের আঁধারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করলো, তারা কেবল ইসলাম গ্রহণই করেননি

বরং তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে নিজেদের শহরে স্থান দেয়ারও আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসের একটি বৈপ্লবিক পটপরিবর্তন। মহান আল্লাহ তাঁর নিজ অনুগ্রহে এ দুর্লভ সুযোগটি দিয়েছিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও হাত বাড়িয়ে তা লুফে নিয়েছিলেন। ইয়াসরেববাসীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুধুমাত্র একজন শরণার্থী হিসেবে নয় বরং আল্লাহর প্রতিনিধি এবং নেতা ও শাসক হিসেবেও আহবান করছিলেন। আর তাঁর অনুসারীদেরকে তারা একটি অপরিচিত দেশে নিছক মুহাজির হিসেবে বসবাস করার জন্য আহবান জানাচ্ছিলেন না। বরং আরবের বিভিন্ন এলাকায় ও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যেসব মুসলমান ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তাদের সবাইকে ইয়াসরেবে জমা করে ইয়াসরেবী মুসলমানদের সাথে মিলে একটি সুসংবদ্ধ সমাজ গড়ে তোলাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এভাবে মূলত ইয়াসরেব নিজেকে "মদীনাতুল ইসলাম" তথা ইসলামের নগর হিসেবে উপস্থাপিত করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে সেখানে আরবের প্রথম দারুল ইসলাম গড়ে তুললেন।

এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের অর্থ কি হতে পারে সে সম্পর্কে মদীনাবাসীরা অনবহিত ছিল না। এর পরিষ্কার অর্থ ছিল, একটি ছোট্ট শহর সারাদেশের উদ্যত তরবারি এবং সমগ্র দেশবাসীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বয়কটের মোকাবিলায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। কাজেই আকাবার বাইআত গ্রহণ করার সময় সেদিনের সেই রাত্রিকালীন মজলিসে ইসলামের প্রাথমিক সাহায্যকারীরা (আনসারগণ) এ পরিণাম সম্পর্কে পুরোপুরি জেনে বুঝেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে নিজেদের হাত রেখেছিলেন। যখন এ বাইআত অনুষ্ঠিত হচ্ছিল ঠিক তখনই ইয়াসরেবী প্রতিনিধি দলের সর্বকনিষ্ঠ যুব সদস্য আস'আদ ইবনে যুরারাহ (রা) উঠে বললেন ঃ

رويدا يا اهل يثرب ! انالم نضرب اليه اكباد الابل الاونحن نعلم انه رسول الله ، وان اخراجه اليوم مناواة للعرب كافة ، وقتل خياركم ، وتعضكم السيوف – فاما انتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه واجره على الله ، واما انتم قوم تخافون من انفسكم خيفة فذروه فبينوا ذلك فهو اعذر لكم عند الله –

"থামো, হে ইয়াসরেব বাসীরা! আমরা একথা জেনে বুঝেই এঁর কাছে এসেছি যে, ইনি আল্লাহর রসূল এবং আজ এঁকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে সমগ্র আরববাসীর শত্রুতার ঝুঁকি নেয়া। এর ফলে তোমাদের শিশু সন্তানদেরকে হত্যা করা হবে এবং তোমাদের ওপর তরবারি বর্ষিত হবে। কাজেই যদি তোমাদের এ আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা থাকে তাহলে এঁর দায়িত্ব গ্রহণ করো। আল্লাহ এর প্রতিদান দেবেন। আর যদি তোমরা নিজেদের প্রাণকে প্রিয়তর মনে করে থাকো তাহলে দায়িত্ব ছেড়ে দাও এবং পরিষ্কার ভাষায় নিজেদের অক্ষমতা জানিয়ে দাও। কারণ এ সময় অক্ষমতা প্রকাশ করা আল্লাহর কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য হতে পারে।"

প্রতিনিধি দলের আর একজন সদস্য আব্বাস ইবনে উবাদাহ ইবনে নাদ্‌লাহ (রা) একথারই পুনরাবৃত্তি করেন এভাবে ঃ

اتعلمون علام تبايعون هذا الرجل ؟ (قالوا نعم ، قال) انكم تبايعونه على حرب الاحمر والاسود من الناس - فان كنتم ترون انكم اذا نهكت اموالكم مصيبة واشرافكم قتلا اسلمتموه فمن الان فدعوه ، فهو والله ان فعلتم خزى الدنيا والاخرة وان كنتم ترون انكم وافون له بما دعوتموه اليه على نهكة الاموال وقتل الاشراف فخذوه ، فهو والله خير الدنيا والاخرة -

"তোমরা কি জানো, এ ব্যক্তির হাতে কিসের বাইআত করছো? (ধ্বনি ঃ হাঁ আমরা জানি) তোমরা এঁর হাতে বাইআত করে সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ঝুঁকি নিচ্ছো। কাজেই যদি তোমরা মনে করে থাকো, যখন তোমাদের ধন-সম্পদ ধ্বংসের মুখোমুখি হবে এবং তোমাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের নিহত হবার আশংকা দেখা দেবে তখন তোমরা এঁকে শত্রুদের হাতে সোপর্দ করে দেবে, তাহলে আজই বরং এঁকে ত্যাগ করাই ভাল। কারণ আল্লাহর কসম, এটা দুনিয়ায় ও আখেরাতে সবখানেই লাঞ্ছনার কারণ হবে। আর যদি তোমরা মনে করে থাকো, এ ব্যক্তিকে তোমরা যে আহবান জানাচ্ছো, নিজেদের ধন-সম্পদ ধ্বংস ও নেতৃস্থানীয় লোকদের জীবন নাশ সত্ত্বেও তোমরা তা পালন করতে প্রস্তুত থাকবে, তাহলে অবশ্যি তাঁর হাত আঁকড়ে ধরো। কারণ আল্লাহর কসম, এরই মধ্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ।"

একথায় প্রতিনিধি দলের সবাই এক বাক্যে বলে উঠলেন ঃ

فانا ناخذه على مصيبة الاموال وقتل الاشراف

"আমরা এঁকে গ্রহণ করে আমাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করতে ও নেতৃস্থানীয় লোকদের নিহত হবার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত।"

এ ঘটনার পর সেই ঐতিহাসিক বাইআত অনুষ্ঠিত হয়। ইতিহাসে একে আকাবার দ্বিতীয় বাইআত বলা হয়।

অন্যদিকে মক্কাবাসীর কাছেও এ ঘটনাটির তাৎপর্য ছিল সুবিদিত। ইতিপূর্বে কুরাইশরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিপুল প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ যোগ্যতার সাথে পরিচিত হয়েছিল এবং এখন সেই মুহাম্মাদই (সা) যে, একটি আবাস লাভ করতে যাচ্ছিলেন, তা তারা বেশ অনুধাবন করতে পারছিল। তাঁর নেতৃত্বে ইসলামের অনুসারীরা যে একটি সুসংগঠিত দলের আকারে অচিরেই গড়ে উঠবে এবং সমবেত হবে একথাও তারা বুঝতে পারছিল। আর ইসলামের এ অনুসারীরা সংকল্পে কত দৃঢ়, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগে কত অবিচল, এতদিনে সেটা তাদের কাছে অনেকটা পরীক্ষিত হয়ে

গিয়েছিল। এহেন সত্যাভিসারী কাফেলার এ নব উত্থান পুরাতন ব্যবস্থার জন্য মৃত্যুর ঘন্টাস্বরূপ। তাছাড়া মদীনার মত জায়গায় এই মুসলিম শক্তির একত্র সমাবেশ কুরাইশদের জন্য আরো নতুন বিপদের সংকেত দিচ্ছিল। কারণ লোহিত সাগরের কিনারা ধরে ইয়ামন থেকে সিরিয়ার দিকে যে বাণিজ্য পথটি চলে গিয়েছিল তার সংরক্ষিত ও নিরাপদ থাকার ওপর কুরাইশ ও অন্যান্য বড় বড় গোত্রের অর্থনৈতিক জীবন নির্ভরশীল ছিল। আর এটি এখন মুসলমানদের প্রভাবাধীনে চলে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত। এ প্রধান বাণিজ্য পথটি দখল করে মুসলমানরা জাহেলী ব্যবস্থার জীবন ধারণ দুর্বিসহ করে তুলতে পারতো। এ প্রধান বাণিজ্য পথের ভিত্তিতে শুধু মাত্র মক্কাবাসীদের যে ব্যবসায় চলতো তার পরিমাণ ছিল বছরে প্রায় আড়াই লাখ আশরফী। তায়েফ ও অন্যান্য স্থানের ব্যবসায় ছিল এর বাইরে।

কুরাইশরা এ পরিণতির কথা ভালভাবেই জানতো। যে রাতে আকাবার বাইআত অনুষ্ঠিত হলো সে রাতেই এ ঘটনার উড়ো খবর মক্কাবাসীদের কানে পৌঁছে গেলো। আর সাথে সাথেই সেখানে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেলো। প্রথমে তারা চেষ্টা করলো মদীনাবাসীদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের দল থেকে ভাগিয়ে নিতে। তারপর যখন মুসলমানরা একজন দু'জন করে মদীনায় হিজরত করতে থাকলো এবং কুরাইশদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেলো যে, এখন মুহাম্মাদও (সা) সেখানে স্থানান্তরিত হয়ে যাবেন তখন তারা এ বিপদকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য সর্বশেষ উপায় অবলম্বনে এগিয়ে এলো। রসূলের (সা) হিজরতের মাত্র কয়েক দিন আগে কুরাইশদের পরামর্শ সভা বসলো। অনেক আলোচনা পর্যালোচনার পর সেখানে স্থির হলো, বনী হাশেম ছাড়া কুরাইশদের প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে লোক বাছাই করা হবে এবং এরা সবাই মিলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করবে। এর ফলে বনী হাশেমের জন্য এ সমস্ত গোত্রের সাথে একাকী লড়াই করা কঠিন হবে। কাজেই এ ক্ষেত্রে তারা প্রতিশোধের পরিবর্তে রক্ত মূল্য গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানী এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আল্লাহর ওপর নির্ভরতা ও উন্নত কৌশল অবলম্বনের কারণে তাদের সব চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে গেলো। ফলে রসূলুল্লাহ (সা) নির্বিঘ্নে মদীনায় পৌঁছে গেলেন। এভাবে হিজরত প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে কুরাইশরা মদীনার সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে (যাকে হিজরতের আগে মদীনাবাসীরা নিজেদের বাদশাহ বানাবার প্রস্তুতি নিয়েছিল এবং রসূলের মদীনায় পৌঁছে যাবার এবং আওস ও খাযরাজদের অধিকাংশের ইসলাম গ্রহণের ফলে যার বাড়া ভাতে ছাই পড়ে গিয়েছিল) পত্র লিখলো ঃ "তোমরা আমাদের লোককে তোমাদের ওখানে আশ্রয় দিয়েছো। আমরা এ মর্মে আল্লাহর কসম খেয়েছি, হয় তোমরা তার সাথে লড়বে বা তাকে সেখান থেকে বের করে দেবে। অন্যথায় আমরা সবাই মিলে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো এবং তোমাদের পুরুষদেরক হত্যা ও মেয়েদেরকে বাঁদী বানাবো।" কুরাইশদের এ উস্কানির মুখে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই কিছু দুষ্কর্ম করার চক্রান্ত এঁটেছিল। কিন্তু সময় মত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দুষ্কর্ম রুখে দিলেন। তারপর মদীনার প্রধান সা'দ ইবনে মু'আয উমরাহ করার জন্য মক্কা গেলেন। সেখানে হারম শরীফের দরজার ওপর আবু জেহেল তার সমালোচনা করে বললো ঃ

الا اراك تطوف بمكه امنا وقد او يتم الصباة وزعمتم انكم تنصرونهم وتعينونهم ؟ لولا انك مع ابى صفوان مارجعت الى اهلك سالما -

"তোমরা আমাদের ধর্মত্যাগীদেরকে আশ্রয় দেবে এবং তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা দান করবে আর আমরা তোমাদেরকে অবাধে মক্কায় তাওয়াফ করতে দেবো ভেবেছ? যদি তুমি আবু সফওয়ান তথা উমাইয়াহ ইবনে খল্‌ফের মেহমান না হতে তাহলে তোমাকে এখান থেকে প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরে যেতে দিতাম না।"

সা'দ জবাবে বললেন ঃ

والله لئن منعتنى هذا لامنعنك ماهو اشد عليك منه طريقك على المدينة -

"আল্লাহর কসম, যদি তুমি আমাকে এ কাজে বাধা দাও তাহলে আমি তোমাকে এমন জিনিস থেকে রুখে দেবো, যা তোমার জন্য এর চাইতে অনেক বেশী মারাত্মক। অর্থাৎ মদীনা দিয়ে তোমাদের যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেবো।"

অর্থাৎ এভাবে মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে যেন একথা ঘোষণা করে দেয়া হলো যে, বায়তুল্লাহ যিয়ারত করার পথ মুসলমানদের জন্য বন্ধ। আর এর জবাবে মদীনাবাসীদের পক্ষ থেকে বলা হলো, সিরিয়ার সাথে বাণিজ্য করার পথ ইসলাম বিরোধীদের জন্য বিপদসংকুল।

আসলে সে সময় মুসলমানদের জন্য উল্লেখিত বাণিজ্য পথের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব মজবুত করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় ছিল না। কারণ এ পথের সাথে কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রগুলোর স্বার্থ বিজড়িত ছিল। ফলে এর ওপর মুসলমানদের কর্তৃত্ব বেশী মজবুত হলে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে নিজেদের শত্রুতামূলক নীতি পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হতে পারে বলে আশা করা যায়। কাজেই মদীনায় পৌছার সাথে সাথেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদ্যজাত ইসলামী সমাজে প্রাথমিক নিয়ম-শৃংখলা বিধান ও মদীনার ইহুদী অধিবাসীদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করার পর সর্বপ্রথম এ বাণিজ্য পথটির প্রতি নজর দিলেন। এ ব্যাপারে তিনি দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন।

প্রথমত মদীনা ও লোহিত সাগরের উপকূলের মধ্যবর্তীস্থলে এ বাণিজ্য পথের আশেপাশে যেসব গোত্রের বসতি ছিল তাদের সাথে তিনি আলাপ-আলোচনা শুরু করে দিলেন। এভাবে তাদেরকে সহযোগিতামূলক মৈত্রী অথবা কমপক্ষে নিরপেক্ষতার চুক্তিতে আবদ্ধ করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে তিনি পূর্ণ সফলতা লাভ করলেন। সর্বপ্রথম নিরপেক্ষতার চুক্তি অনুষ্ঠিত হলো সাগর তীরবর্তী পার্বত্য এলাকার জুহাইনা গোত্রের সাথে। এ গোত্রটির ভূমিকা এ এলাকায় ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারপর প্রথম হিজরীর শেষের দিকে চুক্তি অনুষ্ঠিত হলো বনী যাম্‌রার সাথে। এ গোত্রটির অবস্থান ছিল ইয়াম্বু ও যুল আশীরার সন্নিহিত স্থানে এটি ছিল প্রতিরক্ষামূলক সহযোগিতার চুক্তি। দ্বিতীয় হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে বনী মুদলিজও এ চুক্তিতে শামিল হলো। কারণ এ গোত্রটি ছিল বনী

যাম্‌রার প্রতিবেশী ও বন্ধু গোত্র। এ ছাড়াও ইসলাম প্রচারের ফলে এ গোত্রগুলোতে ইসলামের সমর্থক ও অনুসারীদের একটি বিরাট গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত কুরাইশদের সওদাগরী কাফেলাগুলোকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলার জন্য বাণিজ্য পথের ওপর একের পর এক ছোট ছোট ঝটিকা বাহিনী পাঠাতে থাকলেন। কোন কোন ঝটিকা বাহিনীর সাথে তিনি নিজেও গেলেন। প্রথম বছর এ ধরনের ৪টি বাহিনী পাঠানো হলো। মাগাযী (যুদ্ধ ইতিহাস) গ্রন্থগুলো এগুলোকে সারীয়া হামযা, সারীয়া উবাইদা ইবনে হারেস, সারীয়া সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ও গায্‌ওয়াতুল আবওয়া নামে অভিহিত করা হয়েছে।[১] দ্বিতীয় বছরের প্রথম দিকের মাসগুলোয় একই দিকে আরো দু'টি আক্রমণ চালানো হলো। মাগাযী গ্রন্থগুলোয় এ দু'টিকে গায্‌ওয়া বুওয়াত ও গায্‌ওয়া যুল আশীরা নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সমস্ত অভিযানের দু'টি বৈশিষ্ট উল্লেখযোগ্য। এক, এ অভিযানগুলোয় কোন রক্তপাতের ঘটনা ঘটেনি এবং কোন কাফেলা লুণ্ঠিতও হয়নি। এ থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এর মাধ্যমে কুরাইশদেরকে বাতাসের গতি কোন্ দিকে তা জানিয়ে দেয়াই ছিল আসল উদ্দেশ্য। দুই, এর মধ্য থেকে কোন একটি বাহিনীতেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার একটি লোককেও শামিল করেননি। মক্কা থেকে আগত মুহাজিরদেরকেই তিনি এসব বাহিনীর অন্তরভুক্ত করেন। কারণ এর ফলে যদি সংঘর্ষ বাধে তাহলে তা যেন শুধু কুরাইশদের নিজেদের পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অন্য গোত্রগুলো যেন এর সাথে জড়িয়ে পড়ে এ আগুনকে চারদিকে ছড়িয়ে না দেয়। ওদিকে মক্কাবাসীরাও মদীনার দিকে লুটেরা বাহিনী পাঠাতে থাকে। তাদেরই একটি বাহিনী কুর্‌য ইবনে জাবের আল ফিহ্‌রীর নেতৃত্বে একেবারে মদীনার কাছাকাছি এলাকায় হামলা চালিয়ে মদীনাবাসীদের গৃহপালিত পশু লুট করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে কুরাইশরা এ সংঘর্ষের মধ্যে অন্যান্য গোত্রদেরকেও জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। তাছাড়া তারা কেবল ভয় দেখিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছিলো না, লুটতরাজও শুরু করে দিয়েছিল।

এ অবস্থায় ২য় হিজরীর শাবান মাসে (৬২৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বা মার্চ মাস) কুরাইশদের একটি বিরাট বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কার পথে অগ্রসর হয়ে এমন এক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল যে জায়গাটি ছিল মদীনাবাসীদের আওতার মধ্যে। এ কাফেলার সাথে ছিল প্রায় ৫০ হাজার আশরফীর সামগ্রী। তাদের সাথে তিরিশ চল্লিশ জনের বেশী রক্ষী ছিল না। যেহেতু পণ্যসামগ্রী ছিল বেশী এবং রক্ষীর সংখ্যা ছিল কম আর আগের অবস্থার কারণে মুসলমানদের কোন শক্তিশালী দলের তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করার আশংকা ছিল অত্যন্ত প্রবল, তাই কাফেলা সরদার আবু সুফিয়ান এ বিপদ সংকুল স্থানে পৌঁছেই সাহায্য আনার জন্য এক ব্যক্তিকে মক্কা অভিমুখে পাঠিয়ে দিল। লোকটি মক্কায় পৌঁছেই প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী নিজের উটের কান কেটে ফেললো, তার নাক চিরে দিল, উটের পিঠের আসন উল্টে দিলে এবং নিজের জামা সামনের দিকে ও পিছনের দিকে ছিঁড়ে ফেলে এই বলে চিৎকার করতে থাকলো ঃ

১. ইসলামের ইতিহাসের পরিভাষায় "সারীয়া" বলা হয় এমন ধরনের ছোটখাট বাহিনীকে যাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম কোন সাহাবীর নেতৃত্বে পাঠিয়ে ছিলেন আর যে বাহিনীতে তিনি নিজে গিয়েছিলেন তাকে বলা হয় গায্‌ওয়া।

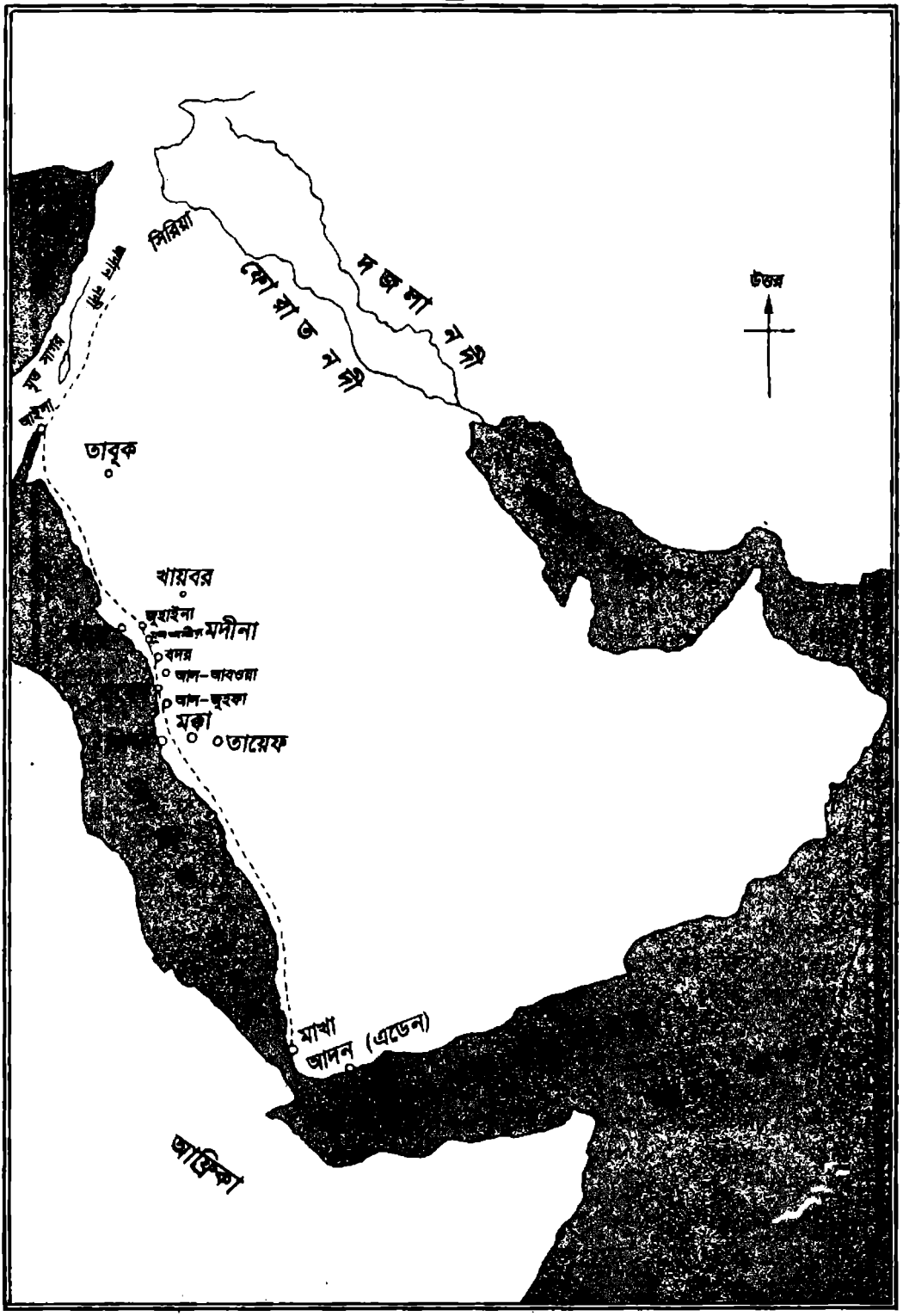

কোরাইশদের বাণিজ্যিক পথ

يا معشر قريش اللطيمه اللطيمه ، اموالكم مع ابى سفيان قد عرض لها محمد فى اصحابه ، لا ارى ان تدركوها ، الغوث ، الغوث ،

"হে কুরাইশরা! তোমাদের বাণিজ্য কাফেলার খবর শোনো। আবু সুফিয়ানের সাথে তোমাদের যে সম্পদ আছে, মুহাম্মাদ তার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে তার পেছনে ধাওয়া করেছে। তোমাদের তা পাবার আশা নেই। সাহায্যের জন্য দৌড়ে চলো! সাহায্যের জন্য দৌড়ে চলো।!"

এ ঘোষণা শুনে সারা মক্কায় বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেলো। কুরাইশদের বড় বড় সরদাররা সবাই যুদ্ধের জন্য তৈরী হলো। প্রায় এক হাজার যোদ্ধা রণসাজে সজ্জিত হয়ে পূর্ণ আড়ম্বর ও জাঁক-জমকের সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে রওয়ানা হলো। তাদের মধ্যে ছিল ৬শ বর্মধারী এবং একশ' জন অশ্বারোহী। নিজেদের কাফেলাকে শুধু নিরাপদে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে আসাই তাদের কাজ ছিল না বরং এই সংগে তারা নিত্য দিনের এ আশংকা ও আতংকবোধকে চিরতরে খতম করে দিতে চাচ্ছিল। মদীনায় এ বিরোধী শক্তির নতুন সংযোজনকে তারা গুঁড়িয়ে দিতে এবং এর আশপাশের গোত্রগুলোকে এত দূর সন্ত্রস্ত করে তুলতে চাচ্ছিল যার ফলে ভবিষ্যতে এ বাণিজ্য পথটি তাদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলমান ঘটনাবলীর প্রতি সবসময় সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে অনুভব করলেন যেন চূড়ান্ত মীমাংসার সময় এসে গেছে। তিনি ভাবলেন এ সময় যদি একটি সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হয় তাহলে ইসলামী আন্দোলন চিরকালের জন্য নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে। বরং এরপর এ আন্দোলনের জন্য হয়তো আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার আর কোন সুযোগই থাকবে না। মক্কা থেকে হিজরত করে এ নতুন শহরে আসার পর এখনো দু'টি বছরও পার হয়ে যায়নি। মুহাজিররা বিত্ত ও সরঞ্জামহীন, আনসাররা অনভিজ্ঞ, ইহুদিগোত্রগুলো বিরুদ্ধবাদিতায় মুখর খোদ মদীনাতেই মুনাফিক ও মুশরিকদের একটি বিরাট গোষ্ঠী উপস্থিত এবং চারপাশের সমস্ত গোত্র কুরাইশদের ভয়ে ভীত। আর সেই সংগে ধর্মীয় দিক দিয়েও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। এ অবস্থায় যদি কুরাইশরা মদীনা আক্রমণ করে তাহলে মুসলমানদের এ ক্ষুদ্র দলটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি তারা মদীনা আক্রমণ না করে শুধু মাত্র নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করে বাণিজ্য কাফেলাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় এবং মুসলমানরা দমে গিয়ে ঘরের কোণে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে তাহলেও সহসাই মুসলমানদের প্রতিপত্তি এমনভাবে আহত হবে এবং তাদের প্রভাব এত বেশী ক্ষুণ্ন হবে যার ফলে আরবের প্রতিটি শিশুও তাদের বিরুদ্ধে দুঃসাহসী হয়ে উঠবে। সারাদেশে তাদের কোন আশ্রয় স্থল থাকবে না। তখন চারপাশের সমস্ত গোত্র কুরাইশদের ইংগিতে কাজ করতে থাকবে। মদীনার ইহুদী, মুনাফিক ও মুশরিকরা প্রকাশ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। মদীনায় জীবন-ধারণ করাও সে সময় দুসাধ্য হয়ে পড়বে। মুসলমানদের কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকবে না। ফলে তাদের ধন-প্রাণ-ইজ্জত-আবরুর ওপর আক্রমণ চালাতে কেউ ইতস্তত করবে না। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৃঢ় সংকল্প নিলেন যে, বর্তমানে যতটুকু শক্তি-সামর্থ আমাদের আছে তাই নিয়েই আমরা বের হয়ে পড়বো।

দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকার ও টিকে থাকার ক্ষমতা কার আছে এবং কার নেই ময়দানেই তার ফায়সালা হয়ে যাবে।

এ চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেবার সংকল্প করেই তিনি আনসার ও মোহাজিরদের একত্র করলেন। তাদের সামনে পরিস্থিতি পরিষ্কার করে তুলে ধরলেন। একদিকে উত্তরে বাণিজ্য কাফেলা এবং অন্যদিকে দক্ষিণে এগিয়ে আসছে কুরাইশদের সেনাদল। আল্লাহর ওয়াদা, এ দু'টির মধ্য থেকে কোন একটি তোমরা পেয়ে যাবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ বলো, এর মধ্য থেকে কার মোকাবিলায় তোমরা এগিয়ে যেতে চাও? জবাবে বিপুল সংখ্যক সাহাবী মত প্রকাশ করলেন, কাফেলার ওপর আক্রমণ চালানো হোক। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ছিল অন্য কিছু অভিপ্রায়। তাই তিনি নিজের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। একথায় মোহাজিরদের মধ্য থেকে মিকদাদ ইবনে আমর (রা) উঠে বললেন ঃ

মদীনা থেকে বদর পর্যন্ত

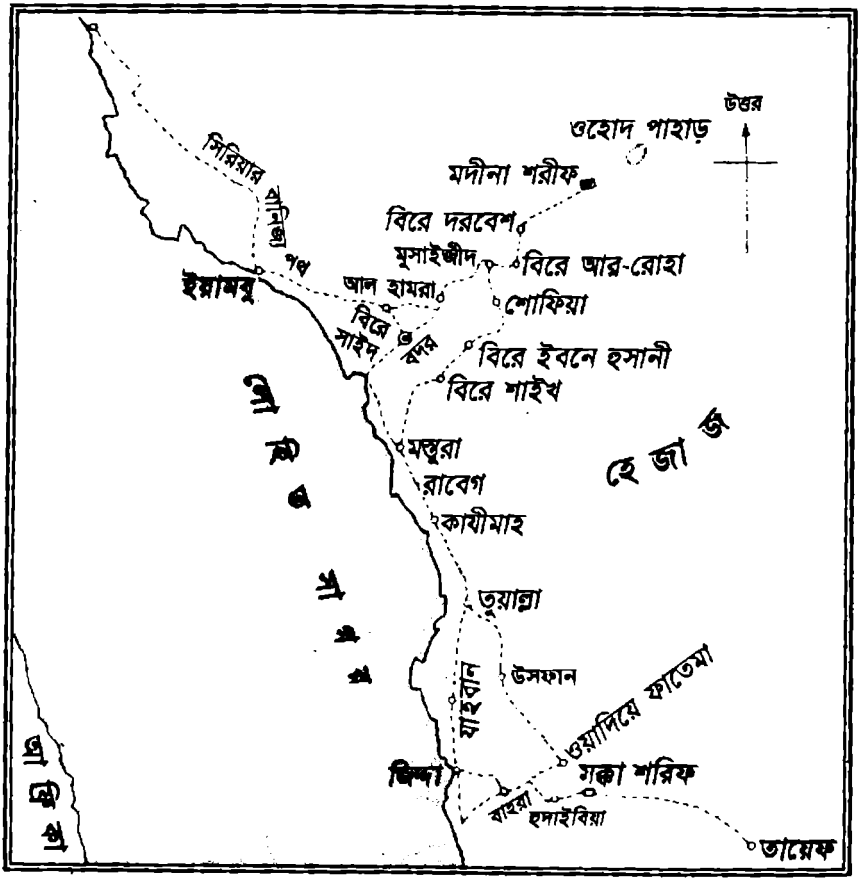

উপরোক্ত মানচিত্র কাফেলাদের মক্কা এবং মদীনা থেকে বদর পর্যন্ত যাতায়াতের রাস্তা প্রদর্শিত হইল।

يا رسول الله ! امض لما امرك الله ، فانا معك حيثما احببت ، لا نقول لك كما قال بنوا اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هٰهنا قاعدون ، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون مادامت عين مناتطرف –

"হে আল্লাহর রসূল! আপনার রব আপনাকে যেদিকে যাবার হুকুম দিচ্ছেন সেদিকে চলুন। আপনি যেদিকে যাবেন আমরা আপনার সাথে আছি। আমরা বনী ইসরাঈলের মত একথা বলবো না ঃ যাও, তুমি ও তোমার আল্লাহ দু'জনে লড়াই করো, আমরা তো এখানেই বসে রইলাম। বরং আমরা বলছি ঃ চলুন আপনি ও আপনার আল্লাহ দু'জনে লড়ুন আর আমরাও আপনাদের সাথে জানপ্রাণ দিয়ে লড়াই করবো। যতক্ষণ আমাদের একটি চোখের তারাও নড়াচড়া করতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত।"

কিন্তু আনসারদের মতামত না জেনে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না। কারণ এ পর্যন্ত যেসব সামরিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল তাতে তাদের সাহায্য গ্রহণ করা হয়নি এবং প্রথম দিন তারা ইসলামকে সমর্থন করার যে শপথ নিয়েছিল তাকে কার্যকর করতে তারা কতটুকু প্রস্তুত তা পরীক্ষা করার এটি ছিল প্রথম সুযোগ। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সা) সরাসরি তাদেরকে সম্বোধন না করে নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। একথায় সা'দ ইবনে মু'আয উঠে বললেন, সম্ভবত আপনি আমাদের সম্বোধন করে বলছেন? জবাব দিলেন ঃ হাঁ। একথা শুনে সা'দ বললেন ঃ

لقد امنا بك وصدقناك وشهدنا ان ماجئت به هوا الحق واعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة – فامض يارسول الله لما اردت فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد – ومانكره ان تلقى بنا عدونا غدا انا لنصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا مانقربه عينك فسربنا على بركة الله –

"আমরা আপনার ওপর ঈমান এনেছি। আপনি যা কিছু এনেছেন তাকে সত্য বলে ঘোষণা করেছি। আপনার কথা শুনার ও আপনার আনুগত্য করার দৃঢ় শপথ নিয়েছি। কাজেই হে আল্লাহর রসূল! আপনি যা সংকল্প করেছেন তা করে ফেলুন। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দেন তাহলে আমরাও আপনার সাথে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বো। আমাদের একজনও পিছনে পড়ে থাকবে না। আপনি কালই আমাদের দুশমনের সাথে যুদ্ধ শুরু করুন। এটা আমাদের কাছে মোটেই অপছন্দনীয় নয়। আমরা যুদ্ধে অবিচল ও দৃঢ়পদ থাকবো।

মোকাবিলায় আমরা সত্যিকার প্রাণ উৎসর্গীতার প্রমাণ দেবো। সম্ভবত আল্লাহ আমাদের থেকে আপনাকে এমন কিছু কৃতিত্ব দেখিয়ে দেবেন, যাতে আপনার চোখ শীতল হবে। কাজেই আল্লাহর বরকতের ভরসায় আপনি আমাদের নিয়ে চলুন।"

এ আলোচনা ও বক্তৃতার পরে সিদ্ধান্ত হলো, বাণিজ্য কাফেলার পরিবর্তে কুরাইশ সেনা দলের মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু এটা কোন যেনতেন সিদ্ধান্ত ছিল না। এ সংক্ষিপ্ত সময়ে যারা যুদ্ধ করতে এগিয়ে এলেন, তাদের সংখ্যা ছিল তিনশ'র কিছু বেশী (৮৬ জন মোহাজির, ৬১ জন আওস গোত্রের এবং ১৭০ জন খাযরাজ গোত্রের)। এদের মধ্যে মাত্র দু'তিন জনের কাছে ঘোড়া ছিল। আর বাকি লোকদের জন্য ৭০ টির বেশী উট ছিল না। এগুলোর পিঠে তারা তিন চারজন করে পালাক্রমে সওয়ার হচ্ছিলেন। যুদ্ধাস্ত্রও ছিল একেবারেই অপ্রতুল। মাত্র ৬০ জনের কাছে বর্ম ছিল। এ কারণে গুটিকয় উৎসর্গীত প্রাণ মুজাহিদ ছাড়া এ ভয়ংকর অভিযানে শরীক অধিকাংশ মুজাহিদই হৃদয়ে উৎকণ্ঠা অনুভব করছিলেন। তারা মনে করছিলেন, যেন তারা জেনে বুঝে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাচ্ছেন। কিছু সুবিধাবাদী ধরনের লোক ইসলামের পরিসরে প্রবেশ করলেও তারা এমন ইসলামের প্রবক্তা ছিল না যাতে ধন-প্রাণের সংশয় দেখা দেয়। তারা এ অভিযানকে নিছক পাগলামী বলে অভিহিত করছিল। তারা মনে করছিল, ধর্মীয় আবেগ উচ্ছ্বাস এ লোকগুলোকে পাগলে পরিণত করেছে। কিন্তু নবী ও সাচ্চা-সত্যনিষ্ঠ মুমিনগণ একথা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, এটিই প্রাণ উৎসর্গ করার সময়। তাই আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাঁরা বের হয়ে পড়েছিলেন। তারা সোজা দক্ষিণ পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেলেন। এই পথেই কুরাইশদের বাহিনী মক্কা থেকে ধেয়ে আসছিল। অথচ শুরুতে যদি বাণিজ্য কাফেলা লুট করার ইচ্ছা থাকতো তাহলে উত্তর পশ্চিমের পথে এগিয়ে যাওয়া হতো।[১]

রমযান মাসের ১৭ তারিখে বদর নামক স্থানে উভয় পক্ষের মোকাবিলা হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন, তিনজন কাফেরের মোকাবিলায় একজন মুসলমান দাঁড়িয়েছে এবং তাও আবার তারা পুরোপুরি অস্ত্র সজ্জিত নয়। এ অবস্থা দেখে তিনি আল্লাহর সামনে দোয়া করার জন্য দু' হাত বাড়িয়ে দিলেন। অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে ও কান্না বিজড়িত স্বরে তিনি দোয়া করতে থাকলেন ঃ

اللهم هذه قريش قد اتت بخيلائها تحاول ان تكذب رسولك ، اللهم فنصرك الذى وعدتنى ، اللهم ان تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد –

১. উল্লেখ্য, বদরের যুদ্ধের ব্যাপারে ইতিহাস ও সীরাত লেখকরা যুদ্ধ কাহিনী সংক্রান্ত হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থগুলোয় উদ্ধৃত বর্ণনাসমূহের ওপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু এই বর্ণনাগুলোর বিরাট অংশ কুরআন বিরোধী ও অনির্ভরযোগ্য। শুধুমাত্র ঈমানের কারণেই আমরা বদর যুদ্ধ সংক্রান্ত কুরআনী বর্ণনাকে সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য বলে মনে করতে বাধ্য হই না বরং ঐতিহাসিক দিক দিয়েও যদি আজ এ যুদ্ধ সংক্রান্ত সবচাইতে নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনা থেকে থাকে তাহলে তা হচ্ছে এ সূরা আনফাল। কারণ যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই এটি নাযিল হয়েছিল। যুদ্ধে যারা শরীক ছিলেন এবং যুদ্ধের স্বপক্ষের বিপক্ষের সবাই এটি শুনেছিলেন ও পড়েছিলেন। 'নাউযুবিল্লাহ' এর মধ্যে কোন একটি কথাও যদি সত্য ও বাস্তব ঘটনা বিরোধী হতো তাহলে হাজার হাজার লোক এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতো।

"হে আল্লাহ! এই যে কুরাইশরা এসেছে, তাদের সকল ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা নিয়ে তোমার রসূলকে মিথ্যা প্রমাণ করতে। হে আল্লাহ! এখন তোমার সেই সাহায্য এসে যাওয়া দরকার, যার ওয়াদা তুমি করেছিলে আমার সাথে। হে আল্লাহ! যদি আজ এ মুষ্টিমেয় দলটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে এ পৃথিবীতে আর কোথাও তোমার ইবাদাত করার মত কেউ থাকবে না।"

এ যুদ্ধের ময়দানে মক্কার মোহাজিরদের পরীক্ষা ছিল সবচেয়ে কঠিন। তাদের আপন ভাই-চাচা ইত্যাদি তাদের বিরুদ্ধে ময়দানে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারোর বাপ, কারোর ছেলে, কারোর চাচা, কারোর মামা, কারোর ভাই দাঁড়িয়েছিল তার প্রতিপক্ষে। এ যুদ্ধে নিজের কলিজার টুকরার ওপর তরবারি চালাতে হচ্ছিল তাদের। এ ধরনের কঠিন পরীক্ষায় একমাত্র তারাই উত্তীর্ণ হতে পারে যারা পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে হক ও সত্যের সাথে সম্পর্ক জুড়েছে এবং মিথ্যা ও বাতিলের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করতে পুরোপুরি উদ্যোগী হয়েছে। ওদিকে আনসারদের পরীক্ষাও কিছু কম ছিল না। এতদিন তারা মুসলমানদেরকে শুধুমাত্র আশ্রয় দিয়ে কুরাইশ ও তাদের সহযোগী গোত্রগুলোর শত্রুতার ঝুঁকি নিয়েছিল। কিন্তু এবার তো তারা ইসলামের সমর্থনে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছিল। এর মানে ছিল, কয়েক হাজার লোকের একটি জনবসতি সমগ্র আরব দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে গেছে। এ ধরনের দুঃসাহস একমাত্র তারাই করতে পারে যারা সত্য আদর্শের ওপর ঈমান এনে তার জন্য নিজের

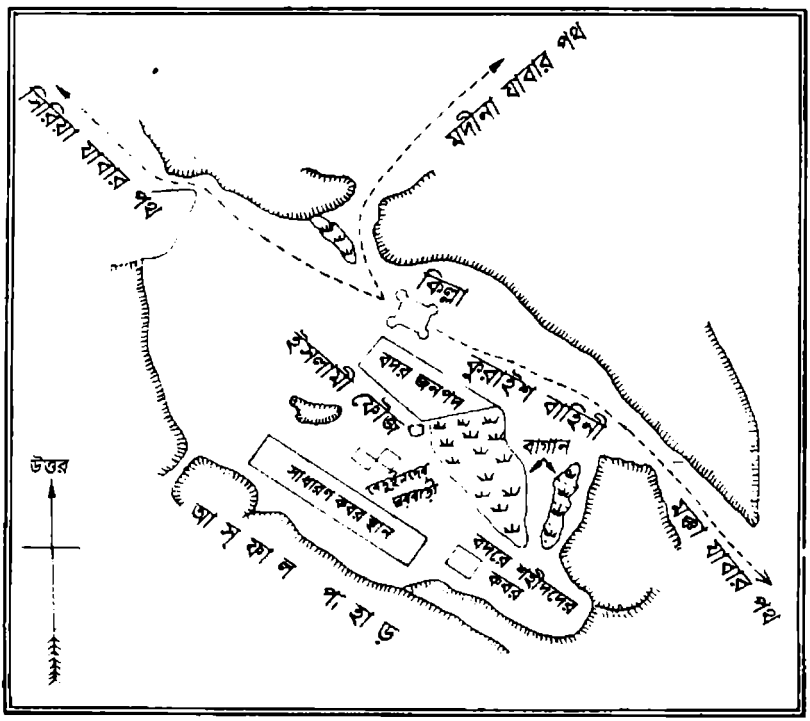

বদর যুদ্ধের মানচিত্র

ব্যক্তিগত স্বার্থকে পুরোপুরি জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত হতে পারে। অবশেষে তাদের অবিচল ঈমান ও সত্যনিষ্ঠা আল্লাহর সাহায্যের পুরস্কার লাভে সফল হয়ে গেলো। আর নিজেদের সমস্ত অহংকার ও শক্তির অহমিকা সত্ত্বেও কুরাইশরা এ সহায় সম্বলহীন জানবাজ সৈনিকদের হাতে পরাজিত হয়ে গেলো। তাদের ৭০ জন নিহত হলো, ৭০ জন বন্দী হলো এবং তাদের সাজসরঞ্জামগুলো গনীমাতের সামগ্রী হিসেবে মুসলমানদের দখলে এলো। কুরাইশদের যেসব বড় বড় সরদার তাদের মজলিস গুলজার করে বেড়াতো এবং ইসলাম বিরোধী আন্দোলনে যারা সর্বক্ষণ তৎপর থাকতো তারা এ যুদ্ধে নিহত হলো। এ চূড়ান্ত বিজয় আরবে ইসলামকে একটি উল্লেখযোগ্য শক্তিতে পরিণত করলো। একজন পাশ্চাত্য গবেষক লিখেছেন, "বদর যুদ্ধের আগে ইসলাম ছিল শুধুমাত্র একটি ধর্ম ও রাষ্ট্র। কিন্তু বদর যুদ্ধের পরে তা রাষ্ট্রীয় ধর্মে বরং নিজেই রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে গেলো।"

আলোচ্য বিষয়

কুরআনের এ সূরাটিতে এ ঐতিহাসিক যুদ্ধের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু দুনিয়ার রাজা বাদশাহরা যুদ্ধ জয়ের পর যেভাবে নিজেদের সেনাবাহিনীর পর্যালোচনা করে থাকেন এ পর্যালোচনার ধারাটি তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

মুসলমানরা যাতে তাদের নৈতিক ত্রুটিগুলো দূর করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে, সে উদ্দেশ্যে এখানে সর্বপ্রথম সে সব নৈতিক ত্রুটি নির্দেশ করা হয়েছে। যেগুলো তখনো পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান ছিল। তারপর তাদের জানানো হয়েছে, এ বিজয়ে আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন কি পরিমাণ ছিল। এর ফলে তারা নিজেদের সাহসিকতা ও শৌর্য-বীর্যের মিথ্যা গরীমায় স্ফীত না হয়ে বরং এ থেকে আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

এরপর যে নৈতিক উদ্দেশ্যে মুসলমানদের হক ও বাতিলের এ সংঘাত সৃষ্টি করতে হবে তা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। এই সংগে এ সংঘাতে যেসব নৈতিক গুণের সাহায্যে তারা সাফল্য লাভ করতে পারে সেগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তারপর মুনাফিক, মুশরিক ও ইহুদিদের এবং এ যুদ্ধে বন্দী অবস্থায় আনীত লোকদের সম্বোধন করে অত্যন্ত শিক্ষণীয় বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

অতপর যুদ্ধের ফলে যেসব সম্পদ দখলে এসেছিল সেগুলো সম্পর্কে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেগুলোকে যেন তারা নিজেদের নয় বরং আল্লাহর সম্পদ মনে করে আল্লাহ তার মধ্য থেকে তাদের জন্য যতটুকু অংশ নির্ধারিত করেছেন ঠিক ততটুকুই যেন তারা কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করে নেয় এবং আল্লাহ নিজের কাজের জন্য এবং নিজের গরীব বান্দাদের সাহায্য করার জন্য যতটুকু অংশ নির্দিষ্ট করেছেন সন্তোষ ও আগ্রহ সহকারে যেন তা মেনে নেয়।

এরপর যুদ্ধ ও সন্ধি সম্পর্কে কতিপয় নৈতিক বিধান দেয়া হয়েছে। ইসলামী দাওয়াতের এ পর্যায়ে এগুলো ছিল একান্ত জরুরী। এর মাধ্যমে নিজেদের যুদ্ধ বিগ্রহ ও সন্ধির ক্ষেত্রে মুসলমানরা জাহেলী পদ্ধতি থেকে দূরে থাকতে পারবে এবং দুনিয়ার ওপর তাদের নৈতিক

শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এ সংগে সারা দুনিয়াবাসী একথা জানতে সক্ষম হবে যে, ইসলাম তার আবির্ভাবের প্রথম দিন থেকেই নৈতিকতার ওপর বাস্তব জীবনের ভিত্ কায়েম করার যে দাওয়াত দিয়ে আসছে তার নিজের বাস্তব জীবনেই সে যথার্থই তা কার্যকর করেছে।

সবশেষে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক আইনের কতিপয় ধারা বর্ণনা করা হয়েছে এতে দারুল ইসলামের মুসলমান অধিবাসীদের আইনগত মর্যাদা দারুল ইসলামের সীমানার বাইরে অবস্থানকারী মুসলমানদের থেকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে।

আয়াত ৭৫ **সূরা আল আনফাল–মাদানী** রুকূ' ১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও মেহেরবান আল্লাহর নামে

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ۭ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۠ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ①
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰي رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ②ۚ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ③ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۭ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ④

লোকেরা তোমার কাছে গনীমাতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে? বলে দাও, "এ গনীমাতের মাল তো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক শুধরে নাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।[১] সাচ্চা ঈমানদার তো তারাই আল্লাহকে স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পড়া হয়, তাদের ঈমান বেড়ে যায়[২] এবং তারা নিজেদের রবের ওপর ভরসা করে। তারা নামায কায়েম করে এবং যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে (আমার পথে) খরচ করে। এ ধরনের লোকেরাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে বিরাট মর্যাদা, ভুলত্রুটির ক্ষমা[৩] ও উত্তম রিযিক।

১. এক অদ্ভুত ধরনের ভূমিকা দিয়ে যুদ্ধের ঘটনাবলীর পর্যালোচনা শুরু করা হয়েছে। বদরের ময়দানে কুরাইশ সেনাদলের কাছ থেকে যে গনীমাতের মাল লাভ করা হয়েছিল তা বন্টন করার ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিয়েছিল। যেহেতু ইসলাম গ্রহণ করার পর এই প্রথমবার তাঁরা ইসলামের পতাকা তলে লড়াই করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

তাই এ প্রসংগে যুদ্ধ ও যুদ্ধজনিত বিষয়াদিতে ইসলামের বিধান কি তা তাদের জানা ছিল না। সূরা বাকারাহ ও সূরা মুহাম্মাদে কিছু প্রাথমিক নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তখনো কোন সামরিক কৃষ্টি, সভ্যতা ও রীতিনীতির ভিত্তি পত্তন করা হয়নি। আরো বহু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের ন্যায় মুসলমানরা তখনো পর্যন্ত যুদ্ধের ব্যাপারেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরাতন জাহেলিয়াতের ধারণাই পোষণ করতো। এ কারণে বদরের যুদ্ধে কাফেরদের পরাজয়ের পর যে ব্যক্তি যে পরিমাণ গনীমাতের মাল হস্তগত করেছিল আরবের পুরাতন রীতি অনুযায়ী সে নিজেকে তার মালিক ভেবে নিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় একটি দল গনীমাতের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে কাফেরদের পিছনে ধাওয়া করেছিল। তারা এ সম্পদে নিজেদের সমান সমান অংশ দাবী করলো। কারণ তারা বললো, আমরা যদি শত্রুর পেছনে ধাওয়া করে তাদেরকে দূরে ভাগিয়ে দিয়ে না আসতাম এবং তোমাদের মত গনীমাতের মাল আহরণ করতে লেগে যেতাম তাহলে শত্রুদের ফিরে এসে পাল্টা হামলা চালিয়ে আমাদের বিজয়কে পরাজয়ে রূপান্তরিত করে দেবারও সম্ভাবনা ছিল। তৃতীয় একটি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আইলাইহি ওয়া সাল্লামের হেফাজতে নিয়োজিত ছিল। তারাও নিজেদের দাবী পেশ করলো। তারা বললো, এ যুদ্ধে আমরাই তো সবচেয়ে বেশী মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছি। আমরা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারদিকে মজবুত প্রাচীর গড়ে না তুলতাম এবং আল্লাহ না করুন! তাঁর ওপর যদি কোন আঘাত আসতো তাহলে বিজয় লাভ করারই কোন প্রশ্ন উঠতো না। ফলে কোন গনীমাতের মালও লাভ করা যেতো না এবং বন্টন করারও সমস্যা দেখা দিতো না। কিন্তু গনীমাতের মাল কার্যত যাদের হাতে ছিল তাদের মালিকানার জন্য যেন কোন প্রমাণের প্রয়োজন ছিল না। একটি জ্বলজ্যান্ত সত্য যুক্তি–প্রমাণের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে যাবে, যুক্তি–প্রমাণের এ অধিকার মানতে তারা প্রস্তুত ছিল না। এভাবে অবশেষে এ বিবাদ তিক্ততার রূপ ধারণ করলো এবং কথাবার্তার তিক্ততা এক পর্যায়ে মনেও ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

মহান আল্লাহ সূরা আনফাল নাযিল করার জন্য এ মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ বেছে নিয়েছেন। এ বিষয় দিয়ে যুদ্ধ সংক্রান্ত নিজের পর্যালোচনামূলক বক্তব্যের সূচনা করেছেন। প্রথম বাক্যটির মধ্যেই প্রশ্নের জবাব নিহিত ছিল। বলেছেন ঃ "তোমার কাছে গনীমাতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে?" মূল বক্তব্যে গনীমাতের মালকে "আনফাল" বলা হয়েছে। এ "আনফাল" শব্দের মধ্যে মূল সমস্যার সমাধান নিহিত রয়ে গেছে। আনফাল বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে "নফল"। আরবী ভাষায় ওয়াজিব অথবা যথার্থ অধিকার ও মূল পাওনার অতিরিক্তকে নফল বলা হয়। এ ধরনের নফল যদি কোন অধীনের পক্ষ থেকে হয় তাহলে তার অর্থ হয়, গোলাম নিজের প্রভুর জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের চাইতে বাড়তি কিছু কাজ করেছে। আর যখন তা মালিক বা কর্তার পক্ষ থেকে হয় তখন তার অর্থ হয়, এমন ধরনের দান বা পুরস্কার যা প্রভুর পক্ষ থেকে বান্দা বা গোলামকে তার যথার্থ পাওনা ও অধিকারের অতিরিক্ত বা বখশিস হিসেবে দেয়া হয়েছে। কাজেই এখানে এ বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর দেয়া পুরস্কার ও অনুগ্রহ সম্পর্কেই কি এ সমস্ত বাদানুবাদ, জিজ্ঞাসাবাদ ও কলহ–বিতর্ক চলছে? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে তোমরা কবেই বা তার মালিক ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলে যে, তোমরা নিজেরাই তা বন্টন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলে? যিনি এ সম্পদ দান করেছেন

তিনিই সিদ্ধান্ত দেবেন, কাকে দেয়া হবে, কাকে দেয়া হবে না এবং যাকে দেয়া হবে কতটুকু দেয়া হবে।

যুদ্ধ প্রসংগে এটা ছিল একটা অনেক বড় ধরনের নৈতিক সংস্কার। মুসলমানের যুদ্ধ দুনিয়ার বস্তুগত স্বার্থ ও সম্পদ লাভ করার জন্য নয় বরং সত্যের নীতি অনুযায়ী দুনিয়ার নৈতিক ও তামাদ্দুনিক বিকৃতির সংস্কার সাধন করার জন্যই তা হয়ে থাকে। আর এ যুদ্ধ নীতি বাধ্য হয়ে তখনই অবলম্বন করা হয় যখন প্রতিবন্ধক শক্তিগুলো স্বাভাবিক দাওয়াত ও প্রচার পদ্ধতির মাধ্যমে সংস্কার সাধনের সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দেয়। কাজেই সংস্কারকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতে হবে উদ্দেশ্যের প্রতি। উদ্দেশ্যের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার হিসেবে যেসব সম্পদ লাভ করা হয় সেদিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা উচিত নয়। শুরুতেই যদি এসব স্বার্থ থেকে তাদের দৃষ্টি সরিয়ে না দেয়া হয় তাহলে অতি দ্রুত তাদের মধ্যে নৈতিক অধপতন সূচিত হবে এবং তারা এসব স্বার্থ লাভকে নিজেদের উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করবে।

তাছাড়া এটা যুদ্ধ প্রসংগে একটা বড় রকমের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সংস্কারও ছিল। প্রাচীন যুগের পদ্ধতি ছিল, যুদ্ধে যে মালমাত্তা যার হস্তগত হতো সে-ই তার মালিক গণ্য হতো। অথবা বাদশাহ ও সেনাপতি সমস্ত গনীমাতের মালের মালিক হয়ে বসতো। প্রথম অবস্থায় দেখা যেতো, প্রায়ই বিজয়ী সেনাদলের মধ্যে গনীমাতের মাল নিয়ে প্রচণ্ড সংঘাত দেখা দিয়েছে। এমনকি অনেক সময় তাদের এ অভ্যন্তরীণ সংঘাত তাদের বিজয়কে পরাজয়ে রূপান্তরিত করে দিতো। দ্বিতীয় অবস্থায় সৈন্যরা চুরি করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়তো। তারা গনীমাতের মাল লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করতো। কুরআন গনীমাতের মালকে আল্লাহ ও রসূলের সম্পদ গণ্য করে প্রথমে এ নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, সমস্ত গনীমাতের মাল কোন রকম কমবেশী না করে পুরাপুরি ইমামের সামনে এনে রেখে দিতে হবে। তার মধ্য থেকে একটি সুঁইও লুকিয়ে রাখা যাবে না। তারপর সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে এ সম্পদ বন্টনের জন্য নিম্নোক্ত আইন প্রণয়ন করেছে ঃ এ সম্পদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ আল্লাহর কাজ ও তাঁর গরীব বান্দাদের সাহায্যের জন্য বায়তুল মালে জমা দিতে হবে। আর বাকি চার ভাগ যুদ্ধে যে সেনাদল শরীক হয়েছিল তাদের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করে দিতে হবে। এভাবে জাহেলী যুগের পদ্ধতিতে যে দু'টি ত্রুটি ছিল তা দূর হয়ে গেছে।

এখানে আরো একটি সূক্ষ্ম তত্ত্বও জেনে রাখতে হবে। গনীমাতের মাল সম্পর্কে এখানে শুধুমাত্র এতটুকু কথা বলেই শেষ করে দেয়া হয়েছে যে, "এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের।" এ সম্পদ বন্টনের কোন প্রসংগ এখানে উত্থাপন করা হয়নি। এর কারণ প্রথমে স্বীকৃতি ও আনুগত্যের ভাবধারার পূর্ণতা লাভই ছিল উদ্দেশ্য। তারপর সামনের দিকে গিয়ে কয়েক রুকূ' পরে এ সম্পদ কিভাবে বন্টন করতে হবে তা বলে দেয়া হয়েছে। তাই এখানে একে "আনফাল" বলা হয়েছে এবং পঞ্চম রুকূ'তে এ সম্পদ বন্টন করার বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে একে "গানায়েম" (গনীমাতের বহুবচন) বলা হয়েছে।

২. অর্থাৎ যখনই মানুষের সামনে আল্লাহর কোন হুকুম আসে এবং সে তার সত্যতা মেনে নিয়ে আনুগত্যের শির নত করে দেয় তখনই তার ঈমান বেড়ে যায়। এ ধরনের প্রত্যেকটি অবস্থায় এমনটিই হয়ে থাকে। যখনই আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের হেদায়াতের

كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنۢ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
لَكَٰرِهُونَ ۝٥ يُجَٰدِلُونَكَ فِى ٱلْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى
ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۝٦ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآئِفَتَيْنِ أَنَّهَا
لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ
أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَٰفِرِينَ ۝٧ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ
ٱلْبَٰطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ۝٨

(এই গনীমাতের মালের ব্যাপারে ঠিক তেমনি অবস্থা দেখা দিচ্ছে যেমন অবস্থা সে সময় দেখা দিয়েছিল যখন) তোমার রব তোমাকে সত্য সহকারে ঘর থেকে বের করে এনেছিলেন এবং মুমিনদের একটি দলের কাছে এটা ছিল বড়ই অসহনীয়। তারা এ সত্যের ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়া করছিল অথচ তা একেবারে পরিষ্কার হয়ে ভেসে উঠেছিল। তাদের অবস্থা এমন ছিল, যেন তারা দেখছিল তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।[৪]

স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আল্লাহ তোমাদের সাথে ওয়াদা করছিলেন, দু'টি দলের মধ্য থেকে একটি তোমরা পেয়ে যাবে।[৫] তোমরা চাচ্ছিলে, তোমরা দুর্বল দলটি লাভ করবে।[৬] কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, নিজের বাণীসমূহের সাহায্যে তিনি সত্যকে সত্যরূপে প্রাকাশিত করে দেখিয়ে দেবেন এবং কাফেরদের শিকড় কেটে দেবেন, যাতে সত্য সত্য রূপে এবং বাতিল বাতিল হিসেবে প্রমাণিত হয়ে যায়, অপরাধীদের কাছে তা যতই অসহনীয় হোক না কেন।[৭]

মধ্যে মানুষ এমন কোন জিনিস দেখে, যা তার ইচ্ছা, আশা-আকাংখা, চিন্তা-ভাবনা, মতবাদ, পরিচিত আচার-আচরণ, স্বার্থ, আরাম-আয়েশ, ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব বিরোধী হয় এবং সে তা মেনে নিয়ে আল্লাহ ও রসূলের বিধান পরিবর্তন করার পরিবর্তে নিজেকে পরিবর্তিত করে ফেলে এবং তা গ্রহণ করতে গিয়ে কষ্ট স্বীকার করে নেয় তখন মানুষের ঈমান তরতাজা ও পরিপুষ্ট হয়। পক্ষান্তরে এমনটি করতে অস্বীকৃতি জানালে মানুষের ঈমানের প্রাণ শক্তি নিস্তেজ হয়ে যেতে থাকে। কাজেই জানা গেলো, ঈমান কোন অনড়, নিশ্চল ও স্থির জিনিসের নাম নয়। এটা শুধুমাত্র একবার মানা ও না মানার ব্যাপার নয়। একবার না মানলে শুধুমাত্র একবারই না মানা হলো এবং একবার মেনে নিলে কেবলমাত্র

একবারই মেনে নেয়া হলো এমন নয়। বরং মানা ও না মানা উভয়ের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি রয়েছে। প্রত্যেকটি অস্বীকৃতির মাত্রা কমতেও পারে, বাড়তেও পারে। আবার এমনিভাবে প্রত্যেকটি স্বীকৃতি ও মেনে নেয়ার মাত্রাও বাড়তে কমতে পারে। তবে ফিকাহর বিধানের দিক দিয়ে তামাদ্দুনিক ব্যবস্থায় অধিকার ও মর্যাদা নির্দিষ্ট করার সময় মানা ও না মানার ব্যাপারটি একবারই গণ্য করা হয়। ইসলামী সমাজে সকল স্বীকৃতি দানকারীর (মুমিন) আইনগত অধিকার ও মর্যাদা সমান। তাদের মধ্যে মানার (ঈমান) ব্যাপারে বহুতর পার্থক্য থাকতে পরে। তাতে কিছু আসে যায় না। আবার সকল অস্বীকৃতিদানকারী একই পর্যায়ের যিম্মী বা হরবী (যুদ্ধমান) অথবা চুক্তিবদ্ধ ও আশ্রিত গণ্য হয়, তাদের মধ্যে কুফরীর ব্যাপারে যতই পার্থক্য থাক না কেন।

৩. বড় বড় ও উন্নত পর্যায়ের ঈমানদাররাও ভুল করতে পারে এবং তাদের ভুল হয়েছেও। যতদিন মানুষ মানুষ হিসেবে দুনিয়ার বুকে বেঁচে আছে ততদিন তার আমলনামা শুধুমাত্র উৎকৃষ্ট মানের কার্যকলাপে ভর্তি থাকবে এবং দোষ-ত্রুটি ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকবে এমনটি হতে পারে না। কিন্তু মহান আল্লাহর একটি বড় রহমত হচ্ছে এই যে, যতদিন মানুষ বন্দেগীর অনিবার্য শর্তসমূহ পূর্ণ করে ততদিন আল্লাহ তার ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করতে থাকেন এবং তার কার্যাবলী যে ধরনের প্রতিদান লাভের যোগ্যতা সম্পন্ন হয় নিজ অনুগ্রহে তার চেয়ে কিছু বেশী প্রতিদান তাকে দান করেন। নয়তো যদি প্রত্যেকটি ভুলের শাস্তি ও প্রত্যেকটি ভাল কাজের পুরস্কার আলাদাভাবে দেবার নিয়ম করা হতো তাহলে কোন অতি বড় সৎলোকও শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেতো না।

৪. অর্থাৎ তারা সে সময় বিপদের মোকাবিলা করতে ভয় পাচ্ছিল, অথচ বিপদের মুখে এগিয়ে যাওয়াই তখন ছিল সত্যের দাবী। ঠিক তেমনি গনীমাতের মাল হাতছাড়া করতে আজ তাদের কষ্ট হচ্ছে, অথচ তা পরিহার করে হুকুমের প্রতীক্ষা করাই আজ সত্যের দাবী। এর দ্বিতীয় অর্থ এ হতে পারে, যদি আল্লাহর আনুগত্য করো এবং নিজের নফসের খাহেশের পরিবর্তে রসূলের কথা মেনে নাও তাহলে ঠিক তেমনি ভাল ফল দেখতে পাবে যেমন এখনি বদর যুদ্ধের সময় দেখেছো। কুরাইশদের সেনাদলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাওয়া তোমাদের কাছে বড়ই দুসহনীয় মনে হয়েছিল এবং তাকে তোমরা ধ্বংসের বার্তাবহ মনে করছিলে। কিন্তু যখন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ পালন করলে তখন এ বিপজ্জনক কাজটিই তোমাদের জন্য জীবনের সাফল্যের বার্তা বহন করে আনলো।

সাধারণভাবে সীরাত ও যুদ্ধের বর্ণনা সংক্রান্ত ইতিহাস গ্রন্থসমূহে বদর যুদ্ধ প্রসংগে যেসব বর্ণনা এসেছে। কুরআনের এ বক্তব্য পরোক্ষভাবে তার প্রতিবাদ করছে। অর্থাৎ এসব গ্রন্থে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিনদের নিয়ে প্রথমে কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা লুট করার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তারপর কয়েক মনযিল পথ অতিক্রম করার পর যখন জানা গেলো মক্কা থেকে কুরাইশদের সেনাবাহিনী কাফেলার হেফাজত করার জন্য এগিয়ে আসছে তখন পরামর্শ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ
مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿٩﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ
قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

আর সেই সময়ের কথাও স্মরণ করো যখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে ফরিয়াদ করছিলে। জবাবে তিনি বললেন, তোমাদের সাহায্য করার জন্য আমি একের পর এক, এক হাজার ফেরেশতা পাঠাচ্ছি। একথা আল্লাহ তোমাদের শুধুমাত্র এ জন্য জানিয়ে দিলেন যাতে তোমরা সুখবর পাও এবং তোমাদের হৃদয় নিশ্চিন্ততা অনুভব করে। নয়তো সাহায্য যখনই আসে আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। অবশ্যই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।

করা হলো, কাফেলার ওপর আক্রমণ করা হবে না সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করা হবে? কিন্তু কুরআন এর সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলছে। কুরআন বলছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘর থেকে বের হয়েছিলেন তখনই কুরাইশ সেনাদলের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ করার বিষয়টি তাঁর সামনে ছিল। আর কাফেলা ও সেনাদল কোন্‌টিকে আক্রমণ করা হবে, এ পরামর্শও তখনি করা হয়েছিল। সেনাদলের মোকাবিলা করা অপরিহার্য, এ সত্যটি মুমিনদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেলেও তাদের মধ্য থেকে একদল লোক যুদ্ধের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য বিতর্ক করে চলছিল। তারপর সবশেষে যখন সেনাদলের দিকে অগ্রসর হবার বিষয়টি চূড়ান্তভাবে স্থিরিকৃত হয়ে গেলো তখন এ দলটি মদীনা থেকে একথা মনে করেই বের হলো যে, তাদেরকে সোজা মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

৫. অর্থাৎ বাণিজ্য কাফেলা বা কুরাইশ সেনাদল।

৬. অর্থাৎ বাণিজ্য কাফেলা। তাদের সাথে মাত্র তিরিশ চল্লিশ জন রক্ষী ছিল।

৭. এ থেকে অনুমান করা যায়, সে সময় কোন্ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। এ সূরার ভূমিকায় আমি উল্লেখ করেছি, কুরাইশ সেনাদল অগ্রসর হবার পর মূলত প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, ইসলামী দাওয়াত ও জাহেলী ব্যবস্থা এ দু'য়ের মধ্যে আরব ভূখণ্ডে কার বেঁচে থাকার অধিকার আছে? যদি মুসলমানরা সে সময় সাহসের সাথে মোকাবিলা করতে এগিয়ে না আসতো তাহলে এরপর ইসলামের জন্য আর বেঁচে থাকার কোন সুযোগ থাকতো না। পক্ষান্তরে মুসলমানদের ঘর থেকে বের হয়ে পড়ার এবং প্রথম পদক্ষেপেই কুরাইশ শক্তির ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানার কারণে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যার ফলে ইসলাম মজবুতভাবে পা রাখার জায়গা পেয়ে গিয়েছিল এবং এর পরের সমস্ত মোকাবিলায় জাহেলিয়াত একের পর এক পরাজয়বরণ করেছিল।

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً
لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ
وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ
فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ
فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾

২ রুকূ'

আর সেই সময়, যখন আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তন্দ্রার আকারে তোমাদের জন্য নিশ্চিন্ততা ও নির্ভীকতার পরিবেশ সৃষ্টি করছিলেন[৮] এবং আকাশ থেকে তোমাদের ওপর পানি বর্ষণ করছিলেন, যাতে তোমাদের পাক-পবিত্র করা যায়, শয়তান তোমাদের ওপর যে নাপাকী ফেলে দিয়েছিল তা তোমাদের থেকে দূর করা যায়, তোমাদের সাহস যোগানো যায় এবং তার মাধ্যমে তোমাদেরকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।[৯]

আর সেই সময়, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে ইঙ্গিত করছিলেন এই বলে ঃ "আমি তোমাদের সাথে আছি, তোমরা ঈমানদারদেরকে অবিচল রাখো, আমি এখনই এ কাফেরদের মনে আতংক সৃষ্টি করে দিচ্ছি। কাজেই তোমরা তাদের ঘাড়ে আঘাত করো এবং প্রতিটি জোড়ে ও গ্রন্থী-সন্ধিতে ঘা মারো।"[১০]

৮. অহোদ যুদ্ধেও মুসলমানদের এ একই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে। সূরা আলে ইমরানের ১১ রুকূ'তে একথা আলোচিত হয়েছে। উভয় জায়গায় কারণ একটিই ছিল। অর্থাৎ যখনই প্রচণ্ড ভীতি ও আতংক দেখা দিয়েছে তখনই আল্লাহ মুসলমানদের দিল বিপুল নিশ্চিন্ততায় ভরে দিয়েছেন। এর ফলে তারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

৯. যে রাতটি পোহাবার পরের দিন সকালে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, এটি ছিল সেই রাতের ঘটনা। এ বৃষ্টির সুফল ছিল তিনটি। এক, মুসলমানরা বিপুল পরিমাণ পানি পেয়ে গিয়েছিল। তারা সংগে সংগেই জলাধার তৈরী করে পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। দুই, মুসলমানরা উপত্যকার ওপরের দিকে অবস্থান করছিল। কাজেই বৃষ্টির ফলে বালি জমাট বেঁধে যথেষ্ট শক্ত হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর দিয়ে মুসলমানদের বলিষ্ঠভাবে চলাফেরা করা সহজ হয়েছিল। তিন, কাফেরদের সেনা দল ছিল নীচের দিকে। বৃষ্টির পানি সেখানে জমে গিয়ে কাদা হয়ে গিয়েছিল। ফলে সেখানে হাঁটতে গেলেই পা দেবে যাচ্ছিল।

মুসলমানদের মধ্যে প্রথম দিকে যে ভীতির অবস্থা বিরাজমান ছিল তাকেই শয়তানের ছুঁড়ে দেয়া নাপাকী বলা হয়েছে।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾ ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ
عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا
فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ﴿١٥﴾ وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ
اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ
الْمَصِيْرُ ﴿١٦﴾

এটা করার কারণ, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিদ্রোহ পোষণ করেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিদ্রোহ করে আল্লাহ তার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আর আল্লাহর পাকড়াও বড়ই কঠিন।[১১] —এটা[১২] হচ্ছে তোমাদের শাস্তি, এখন এর মজা উপভোগ কর। আর তোমাদের জানা উচিত, সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব।

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা একটি সেনাবাহিনীর আকারে কাফেরদের মুখোমুখি হও তখন তাদের মোকাবিলায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না। যে ব্যক্তি এ অবস্থায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সে আল্লাহর গযবে ঘেরাও হয়ে যাবে। তার আবাস হবে জাহান্নাম এবং ফিরে যাবার জন্য তা বড়ই খারাপ জায়গা।[১৩] তবে হাঁ যুদ্ধের কৌশল হিসেবে এমনটি করে থাকলে অথবা অন্য কোন সেনাদলের সাথে যোগ দেবার জন্য করে থাকলে তা ভিন্ন কথা।

১০. কুরআন থেকে আমরা যে নীতিগত কথাগুলো জানতে পারি তার ভিত্তিতে আমরা মনে করি, যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফেরেশতারা হয়তো প্রত্যক্ষভাবে লড়াই করেননি এবং তরবারি হাতে নিয়ে সরাসরি মারামারি কাটাকাটিতে অংশও নেননি। সম্ভবত তারা এভাবে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল যে, কাফেরদের ওপর মুসলমানরা যে আঘাত হানছিল তা ফেরেশতাদের সহযোগিতায় সঠিক জায়গায় পড়ছিল এবং প্রতিটি আঘাত হচ্ছিল চূড়ান্ত ও মারাত্মক। অবশ্যি সঠিক ব্যাপার আল্লাহই ভাল জানেন।

১১. এ পর্যন্ত এক এক করে বদর যুদ্ধের যে ঘটনাবলী স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো, "আনফাল" শব্দের অন্তরনিহিত তত্ব উদঘাটন করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। শুরুতে বলা হয়েছিল, কেমন করে তোমরা এ গনীমাতের মালকে নিজেদের প্রচেষ্টা ও মেহনতের

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ
اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾
ذٰلِكُمْ وَأَنَّ اللّٰهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِينَ ﴿١٨﴾ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ
جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَإِنْ تَعُودُوا
نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَأَنَّ اللّٰهَ
مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾

কাজেই সত্য বলতে কি, তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তোমরা নিক্ষেপ করনি বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন।[১৪] (আর এ কাজে মুমিনদের হাত ব্যবহার করা হয়েছিল) এ জন্য যে, আল্লাহ মুমিনদেরকে একটি চমৎকার পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সফলতার সাথে পার করে দেবেন। অবশ্যি আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন। এ ব্যাপারটি তো তোমাদের সাথে। আর কাফেরদের সাথে যে আচরণ করা হবে তা হচ্ছে, আল্লাহ তাদের কৌশলগুলো দুর্বল করে দেবেন। (এ কাফেরদের বলে দাও) যদি তোমরা ফায়সালা চেয়ে থাকো, তাহলে এই নাও ফায়সালা তোমাদের সামনে এসে গেছে।[১৫] এখন যদি ক্ষান্ত হও, তাহলে তো তোমাদের জন্যই ভাল হবে। নয়তো যদি ফিরে আবার সেই বোকামির পুনরাবৃত্তি করো তাহলে আমিও সেই শাস্তির পুনরাবৃত্তি করবো এবং তোমাদের দলবল যত বেশীই হোক না কেন, তা তোমাদের কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ অবশ্যি মুমিনদের সাথে রয়েছেন।

ফল মনে করে এর মালিক বনে যেত চাচ্ছো? এতো আসলে আল্লাহর দান। দাতা নিজেই তার সম্পদের ওপর পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। এর স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে এ ঘটনাগুলো শুনিয়ে দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা নিজেরাই হিসাব লাগিয়ে দেখে নাও, এ ব্যাপারে তোমাদের নিজেদের প্রচেষ্টা, মেহনত ও সাহসিকতার অংশ কি পরিমাণ ছিল এবং আল্লাহর দান ও অনুগ্রহের অংশ ছিল কি পরিমাণ?

১২. এখান থেকে হঠাৎ কাফেরদেরকে সমবোধন করা শুরু হয়েছে। যাদেরকে একটু আগে শাস্তি লাভের যোগ্য বলা হয়েছিল।

১৩. শত্রুর প্রবল চাপের মুখে নিজেদের পেছনের কেন্দ্রে ফিরে আসা অথবা নিজেদেরই সেনাদলের অন্য কোন অংশের সাথে যোগ দেবার জন্য সুপরিকল্পিত

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ
تَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾
إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَوْ عَلِمَ
اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا
يُحْيِيكُمْ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

৩ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো এবং হুকুম শোনার পর তা অমান্য করো না। তাদের মতো হয়ে যেয়ো না, যারা বললো, আমরা শুনেছি অথচ তারা শোনে না।[১৬] অবশ্যি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের জানোয়ার হচ্ছে সেই সব বধির ও বোবা লোক[১৭] যারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না। যদি আল্লাহ জানতেন, এদের মধ্যে সামান্য পরিমাণও কল্যাণ আছে তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তাদেরকে শুনতে উদ্বুদ্ধ করতেন। (কিন্তু কল্যাণ ছাড়া) যদি তিনি তাদের শুনাতেন তাহলে তারা নির্লিপ্ততার সাথে মুখ ফিরিয়ে নিতো।[১৮]

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন রসূল তোমাদের এমন জিনিসের দিকে ডাকেন যা জীবন দান করবে। আর জেনে রাখো আল্লাহ মানুষ ও তার দিলের মাঝখানে আড়াল হয়ে আছেন এবং তোমাদের তাঁর দিকেই সমবেত করা হবে।[১৯]

পশ্চাদপসরণ (Orderly Retreat) নাজায়েয নয়। তবে যুদ্ধের উদ্দেশ্য নিয়ে নয় বরং নিছক কাপুরুষতা ও পরাজিত মানসিকতার কারণে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ছত্রভংগ হয়ে পালানো (Rout) হারাম। কারণ এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও লক্ষের তুলনায় মানুষের প্রাণটাই তার কাছে বেশী প্রিয় হয়ে ওঠে। এ পালানোকে কবীরা গুনাহের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিনটি গুনাহ এমন যে, তার সাথে কোন নেকী সংযুক্ত হলে কোন লাভ নেই। এক, শিরক। দুই, বাপ-মায়ের অধিকার নষ্ট করা। তিন, আল্লাহর পথে লড়াই এর ময়দান থেকে পালানো। এভাবে তিনি আর একটি

হাদীসে এমন সাতটি বড় বড় গুনাহের কথা বর্ণনা করেছেন যা মানুষের জন্য ধ্বংসকর এবং পরকালেও তাকে ভয়াবহ পরিণামের মুখোমুখি করবে। এর মধ্যে একটি গুনাহ হচ্ছে, কুফর ও ইসলামের যুদ্ধে কাফেরদের সামনে থেকে পালানো। এটা একটা কাপুরুষোচিত কাজ বলেই যে, একে এতবড় গুনাহ গণ্য করা হয়েছে তা নয়। বরং এর কারণ হচ্ছে, একজন সৈনিকের ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি এবং ছত্রভংগ হয়ে বেরিয়ে যাওয়া অনেক সময় পুরো একটি বাহিনীকে ভীত সন্ত্রস্ত ও দিশেহারা করে দেয় এবং পালাতে উদ্বুদ্ধ করে। আর একবার যখন একটি সেনাদলের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি ও পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়, তখন তাদের বিপর্যয় ও ধ্বংস যে কতদূর গিয়ে ঠেকবে তা বলা যায় না। এ ধরনের ছুটাছুটি ও পলায়ণপরতা শুধু সেনাদলের জন্যই ধ্বংসকর নয় বরং যে দেশের সেনাদল এ ধরনের পরাজয় বরণ করে তার জন্যও বিপর্যয়কর।

১৪. বদরের যুদ্ধে যখন মুসলমান ও কাফেরদের সেনাদল ময়দানে পরস্পরের মুখোমুখি হলো এবং আঘাত-পাল্টা আঘাতের সময় এসে গেলো তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মুঠো বালি হাতে নিয়ে شاهت الوجوه (শত্রুদলের চেহারাগুলো বিগড়ে যাক) বলে কাফেরদের দিকে ছুড়ে দিলেন। এই সঙ্গে তাঁর ইঙ্গিতে মুসলমানরা অকস্মাত কাফেরদের ওপর আক্রমণ করলো। এখানে এ ঘটনাটির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৫. মক্কা থেকে রওয়ানা হবার সময় মুশরিকরা কাবা শরীফের পরদা দুহাতে আঁকড়ে ধরে দোয়া করেছিল, হে আল্লাহ! উভয় দলের মধ্যে যে দলটি ভাল তাকে বিজয় দান করো। আর আবু জেহেল বিশেষ করে বলেছিল, হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে দলটি সত্য পথে আছে তাকে বিজয় দান করো এবং যে দলটি জুলুমের পথ অবলম্বন করেছে তাকে লাঞ্ছিত করো। বস্তুত আল্লাহ তাদের নিজ মুখে উচ্চারিত আবদার অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করলেন এবং দুই দলের মধ্যে কোন্‌টি ভাল ও সত্যপন্থী তার মীমাংসা করে দিলেন।

১৬. এখানে শোনা বলতে এমন শোনা বুঝায় যা মেনে নেয়া ও গ্রহণ করা অর্থ প্রকাশ করে। যেসব মুনাফিক ঈমানের কথা মুখে বলতো কিন্তু আল্লাহর হুকুম মেনে চলতো না এবং তার আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতো তাদের দিকেই এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৭. অর্থাৎ যারা সত্য কথা শোনেও না। সত্য কথা বলেও না। যাদের কান ও মুখ সত্যের ব্যাপারে বধির ও বোবা।

১৮. অর্থাৎ যখন তাদের মধ্যে সত্যপ্রিয়তা ও সত্যের জন্য কাজ করার আবেগ ও প্রেরণা নেই তখন তাদের যদি আদেশ পালন করার জন্য যুদ্ধে যেতে উদ্বুদ্ধ করাও হতো তাহলেও তারা এ আসন্ন বিপদ দেখেই অবলীলাক্রমে পালিয়ে যেতো। এ অবস্থায় তাদের সংগ তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবার পরিবর্তে ক্ষতিকর প্রমাণিত হতো।

১৯. মানুষকে মুনাফেকী আচরণ থেকে বাঁচাবার জন্য সবচেয়ে প্রভাবশালী পদ্ধতি যেটি হতে পারে, তা হলো তার মনে দু'টো বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেয়া। এক, যাবতীয় কর্মকাণ্ড সেই আল্লাহর সাথে জড়িত যিনি মনের অবস্থাও জানেন। মানুষ তার মনে মনে যে সংকল্প পোষণ করে এবং মনের মধ্যে যেসব ইচ্ছা, আশা, আকাংখা, উদ্দেশ্য, লক্ষ ও চিন্তা-ভাবনা লুকিয়ে রাখে তার যাবতীয় গোপন তথ্য তাঁর কাছে দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট। দুই, একদিন আল্লাহর সামনে যেতেই হবে। তাঁর হাত থেকে বের হয়ে কেউ

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ
اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى
الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ
وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٦﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ
اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾

আর সেই ফিত্‌না থেকে দূরে থাকো, যার অনিষ্টকারিতা শুধুমাত্র তোমাদের গোনাহগারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।[২০] জেনে রাখো, আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন তোমরা ছিলে সামান্য কয়েকজন। পৃথিবীর বুকে তোমাদের দুর্বল মনে করা হতো। লোকেরা তোমাদেরকে খতম করেই দেয় নাকি, এ ভয়ে তোমরা কাঁপতে। তারপর আল্লাহ তোমাদের আশ্রয়স্থল যোগাড় করে দিলেন, নিজের সাহায্য দিয়ে তোমাদের শক্তিশালী করলেন এবং তোমাদের ভাল ও পবিত্র জীবিকা দান করলেন, হয়তো তোমরা শোকরগুজার হবে।[২১] হে ঈমানদারগণ! জেনে বুঝে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না, নিজেদের আমানতসমূহের[২২] খেয়ানত করো না। এবং জেনে রাখো, তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি আসলে পরীক্ষার সামগ্রী।[২৩] আর আল্লাহর কাছে প্রতিদান দেবার জন্য অনেক কিছুই আছে।

কোথাও পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। এ দু'টি বিশ্বাস যত বেশী শক্তিশালী ও পাকাপোক্ত হবে ততই মানুষ মুনাফেকী আচরণ থেকে দূরে থাকবে। এ জন্য মুনাফেকী আচরণের বিরুদ্ধে উপদেশ দান প্রসংগে কুরআন এ বিশ্বাস দু'টির উল্লেখ করেছে বারবার।

২০. এখানে 'ফিতনা' দ্বারা একটি সর্বব্যাপী সামাজিক অনাচার বুঝানো হয়েছে। এ অনাচার মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ে মানুষের জীবনে দুর্ভাগ্য ও ধ্বংস ডেকে আনে। শুধুমাত্র যারা গোনাহ করে তারাই এ দুর্ভাগ্য ও ধ্বংসের শিকার হয় না বরং এর শিকার তারাও হয় যারা এ পাপাচারে জর্জরিত সমাজে বসবাস করা বরদাশত করে নেয়। উদাহরণস্বরূপ ধরে নেয়া যেতে পারে, যখন কোন শহরে ময়লা আবর্জনা এখানে সেখানে

ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে জমে থাকে তখন তার প্রভাবও থাকে সীমাবদ্ধ। এ অবস্থায় শুধুমাত্র যেসব লোক নিজেদের শরীরে ও ঘরোয়া পরিবেশে ময়লা আবর্জনা ভরে রেখেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু যখন সেখানে ময়লা আবর্জনার স্তূপ ব্যাপকভাবে জমে উঠতে থাকে এবং সারা শহরে ময়লা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালাবার মতো একটি দলও থাকে না তখন মাটি, পানি ও বাতাসের সর্বত্রই বিষক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে যে মহামারী দেখা দেয় তাতে যারা ময়লা ও আবর্জনা ছড়ায়, যারা নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন থাকে এবং যারা ময়লা ও আবর্জনাময় পরিবেশে বসবাস করে তারা সবাই আক্রান্ত হয়। নৈতিক ময়লা ও আবর্জনার বেলায়ও ঠিক একই ব্যাপার ঘটে। যদি তা ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছু ব্যক্তির মধ্যে থেকে থাকে এবং সৎ ও সত্যনিষ্ঠ সমাজের প্রতিপত্তির চাপে কোণঠাসা ও নিস্তেজ অবস্থায় থাকে তাহলে তার ক্ষতিকর প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু যখন সমাজের সামষ্টিক বিবেক দুর্বল হয়ে পড়ে, নৈতিক অনিষ্টগুলোকে দমিয়ে রাখার ক্ষমতা তার থাকে না, সমাজ অংগনে অসৎ, নির্লজ্জ ও দুশ্চরিত্র লোকেরা নিজেদের ভেতরের ময়লাগুলো প্রকাশ্যে উৎক্ষিপ্ত করতে ও ছড়াতে থাকে, সৎলোকেরা নিষ্কর্মা হয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত সততা ও সদগুণাবলী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে এবং সামাজিক ও সামষ্টিক দুষ্কৃতির ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করে তখন সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজের ওপর দুর্ভোগ নেমে আসে। এ সময় এমন ব্যাপক দুর্যোগের সৃষ্টি হয় যার ফলে বড়–ছোট, সবল–দুর্বল সবাই সমানভাবে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হয়।

কাজেই আল্লাহর বক্তব্যের মর্ম হচ্ছে, রসূল যে সংস্কার ও হেদায়াতের কর্মসূচী নিয়ে মাঠে নেমেছেন এবং যে কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য তোমাদের প্রতি আহবান জানাচ্ছেন তারিমধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় দিক দিয়ে তোমাদের জন্য যথার্থ জীবনের গ্যারান্টি। যদি সাচ্চা দিলে আন্তরিকতা সহকারে তাতে অংশ না নাও এবং সমাজের বুকে যেসব দুষ্কৃতি ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলোকে বরদাশত করতে থাকো তাহলে ব্যাপক বিপর্যয় দেখা দেবে। যদিও তোমাদের মধ্যে এমন অনেক লোক থেকে থাকে যারা কার্যত দুষ্কৃতিতে লিপ্ত হয় না এবং দুষ্কৃতি ছড়াবার জন্য তাদেরকে দায়ীও করা যায় না বরং নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে তারা সুকৃতির অধিকারী হয়ে থাকে তবুও এ ব্যাপক বিপদ তোমাদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে। সূরা আ'রাফের ১৬৩–১৬৬ আয়াতে শনিবারওয়ালাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত পেশ করতে গিয়ে এ এক কথাই বলা হয়েছে। এ দৃষ্টিভংগীকেই ইসলামের ব্যক্তি চরিত্র ও সমাজ সংস্কারমূলক কার্যক্রমের মৌলিক দৃষ্টিকোণ বলা যেতে পারে।

২১. এখানে শোকরগুজার শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ওপরের ধারাবাহিক বক্তব্যগুলো সামনে রাখলে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে যায়। আল্লাহ মুসলমানদের দুর্বলতার অবস্থা থেকে বের করে এনেছেন এবং মক্কার বিপদসংকুল জীবন থেকে উদ্ধার করে তাদেরকে এমন শান্তি ও নিরাপত্তার ভূমিতে আশ্রয় দিয়েছিলেন যেখানে তারা উত্তম রিযিক লাভ করছে, শুধুমাত্র এতটুকু কথা মেনে নেয়াই শোকরগুজারী অর্থ প্রকাশের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং সেই সাথে একথাও অনুধাবন করা শোকরগুজারী'র অন্তরভুক্ত যে, যে মহান আল্লাহ মুসলমানদের প্রতি এত সব অনুগ্রহ করেছেন সেই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করা তাদের কর্তব্য। আর রসূল যে আন্দোলনের সূচনা করেছেন, তাকে সফল করার সাধনায়

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ
كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ
اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا
لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا ۙ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣١﴾

৪ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করার পথ অবলম্বন করো তাহলে আল্লাহ তোমাদের কষ্টিপাথর দান করবেন[২৪] এবং তোমাদের পাপগুলো তোমাদের থেকে দূর করে দেবেন এবং তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতিশয় অনুগ্রহশীল।

সেই সময়ের কথাও স্মরণ করার মত যখন সত্য অস্বীকারকারীরা তোমার বিরুদ্ধে নানান রকমের চক্রান্ত আঁটছিল। তারা চাচ্ছিল তোমাকে বন্দী করতে। হত্যা করতে বা দেশ ছাড়া করতে।[২৫] তারা নিজেদের কূট-কৌশল প্রয়োগ করে চলছিল, অন্যদিকে আল্লাহও তাঁর কৌশল প্রয়োগ করছিলেন আর আল্লাহ সবচেয়ে ভাল কৌশল অবলম্বনকারী। যখন তাদেরকে আমার আয়াত শুনানো হতো, তারা বলতো, "হাঁ, আমরা শুনেছি, আমরা চাইলে এমন কথা আমরাও শুনাতে পারি। এতো সেই সব পুরানো কাহিনী, যা আগে থেকে লোকেরা বলে আসছে।"

তাদেরকে আন্তরিকতা ও উৎসর্গীত মনোভাব নিয়ে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এ কাজে যেসব বাধা-বিপত্তি, বিপদ-আপদ ও ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেবে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে তারা সাহসের সাথে তার মোকাবিলা করে যাবে। কারণ এ আল্লাহই ইতিপূর্বে বিপদ আপদ থেকে তাদেরকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। তারা নিশ্চিততাবে বিশ্বাস রাখবে যখন তারা আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহর কাজ করবে তখন আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের পক্ষ সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা করবেন—এসবই শোকরগুজারীর অর্থের অন্তরভুক্ত। কাজেই শুধুমাত্র মুখে স্বীকৃতি দান পর্যায়ের শোকরগুজারী এখানে উদ্দেশ্য নয়। বরং এ শোকরগুজারী বাস্তবে কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে। অনুগ্রহের কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও অনুগ্রহকারীর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রচেষ্টা না চালানো, তার খিদমত করার ব্যাপারে আন্তরিক না হওয়া এবং না জানি আগামীতেও তিনি অনুগ্রহ করবেন কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা—এসব কোন ক্রমেই শোকরগুজারী নয় বরং উলটো অকৃতজ্ঞতারই আলামত।

২২. নিজেদের "আমানতসমূহ" মানে কারোর ওপর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করে যেসব দায়িত্ব তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। তার আনুগত্য করা ও অংগীকার পালনের দায়িত্বও হতে পারে। অথবা কোন সামাজিক চুক্তি পালন, দলের গোপনীয়তা রক্ষা করা বা ব্যক্তিগত ও দলীয় সম্পত্তি রক্ষা করার কিংবা এমন কোন পদের অংগীকারও হতে পারে যা কোন ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে দল তার হাতে সোপর্দ করে দেয়। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আন নিসার ৮৮ টীকা)।

২৩. যে জিনিসটি সাধারণত মানুষের ঈমানী চেতনায় এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় বিশৃংখলা সৃষ্টি করে এবং যে জন্য মানুষ প্রায়ই মুনাফেকী, বিশ্বাসঘাতকতা ও খেয়ানতে লিপ্ত হয় সেটি হচ্ছে, তার অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সন্তান-সন্ততির স্বার্থের প্রতি সীমাতিরিক্ত আগ্রহ। এ কারণে বলা হয়েছে, এ অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মোহে অন্ধ হয়ে তোমরা সাধারণত সত্য-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাও। অথচ এগুলো তো আসলে দুনিয়ার পরীক্ষাগৃহে তোমাদের জন্য পরীক্ষার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। যাকে তোমরা পুত্র বা কন্যা বলে জানো প্রকৃতপক্ষে সে তো পরীক্ষার একটি বিষয় (Subject)। আর যাকে তোমরা সম্পত্তি বা ব্যবসায় বলে থাকে সেও প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষার আর একটি বিষয় মাত্র। এ জিনিসগুলো তোমাদের হাতে সোপর্দ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমরা অধিকার ও দায়-দায়িত্বের প্রতি কতদূর লক্ষ রেখে কাজ করো, দায়িত্বের বোঝা মাথায় নিয়ে আবেগ তাড়িত হয়েও কতদূর সত্য-সঠিক পথে চলা অব্যাহত রাখো এবং পার্থিব বস্তুর প্রেমাসক্ত নফসকে কতদূর নিয়ন্ত্রণে রেখে পুরোপুরি আল্লাহর বান্দায় পরিণত হও এবং আল্লাহ তাদের যতটুকু অধিকার নির্ধারণ করেছেন ততটুকু আদায়ও করতে থাকো, এগুলোর মাধ্যমে তা যাচাই করে দেখা হবে।

২৪. কষ্টিপাথর এমন একটি জিনিসকে বলা হয় যা খাঁটি ও ভেজালের মধ্যকার পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরে। এটিই "ফুরকান"-এর অর্থ। এ জন্যই আমি ফুরকানের অনুবাদ করেছি কষ্টিপাথর শব্দ দিয়ে। এখানে আল্লাহর বাণীর অর্থ হচ্ছে, যদি তোমরা দুনিয়ায় আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো এবং আন্তরিকভাবে আল্লাহর ইচ্ছা বিরোধী কোন কাজ করতে প্রস্তুত না হয়ে থাকো, তাহলে মহান আল্লাহ তোমাদের মধ্যে এমন পার্থক্যকারী শক্তি সৃষ্টি করে দেবেন যার ফলে প্রতি পদে পদে তোমরা জানতে পারবে কোন্ কর্মনীতিটা ভুল ও কোন্‌টা নির্ভুল এবং কোন্ কর্মনীতি অবলম্বন করলে আল্লাহর সন্তোষ লাভ করা যায়। এবং কিসে তিনি অসন্তুষ্ট হন। জীবন পথের প্রতি বাঁকে বাঁকে, প্রতিটি চৌরাস্তায় এবং প্রতিটি চড়াই উতরাইয়ে তোমাদের অন্তরদৃষ্টি বলে দেবে কোন্ দিকে চলা উচিত এবং কোন্ দিকে চলা উচিত নয়। কোন্‌টি সেই নিরেট সত্যের পথ যা আল্লাহর দিকে নিয়ে যায় এবং কোন্‌টি মিথ্যা ও অসত্যের পথ, যা শয়তানের সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেয়।

২৫. এটা এমন সময়ের কথা যখন কুরাইশদের এ যাবতকার আশংকা নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল যে, এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও মদীনায় চলে যাবেন। তখন তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, এ ব্যক্তি মক্কা থেকে বের হয়ে গেলে বিপদ আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। কাজেই তারা তাঁর ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছার জন্য দারুন নদওয়ায় জাতীয় নেতৃবৃন্দের একটি সভা ডাকলো। কিভাবে এ বিপদের পথরোধ করা যায়, এ ব্যাপারে তারা পরামর্শ করলো। এক দলের মত ছিল, এ ব্যক্তির হাতে পায়ে লোহার বেড়ী পরিয়ে এক জায়গায় বন্দী করে রাখা হোক।

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا
حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا لَهُمْ
أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا
أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

আর সেই কথাও স্মরণযোগ্য যা তারা বলেছিল ঃ "হে আল্লাহ! যদি এটা যথার্থই সত্য হয়ে থাকে এবং তোমার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ওপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করো অথবা কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব আমাদের ওপর আনো।[২৬] তুমিই যখন তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলে তখন আল্লাহ তাদের ওপর আযাব নাযিল করতে চাচ্ছিলেন না। আর এটা আল্লাহর রীতিও নয় যে, লোকেরা ক্ষমা চাইতে থাকবে এবং তিনি তাদেরকে আযাব দেবেন।[২৭] কিন্তু এখন কেন তিনি তাদের ওপর আযাব নাযিল করবেন না যখন তারা মসজিদে হারামের পথ রোধ করছে? অথচ তারা এ মসজিদের বৈধ মুতাওয়াল্লীও নয়। এর বৈধ মুতাওয়াল্লী হতে পারে একমাত্র তাকওয়াধারীরাই। কিন্তু অধিকাংশ লোক একথা জানে না।

মৃত্যুর পূর্বে আর তাকে মুক্তি দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ মত গৃহীত হলো না। কারণ তারা বললো, আমরা তাকে বন্দী করে রাখলেও তার যেসব সাথী কারাগারের বাইরে থাকবে তারা বরাবর নিজেদের কাজ করে যেতে থাকবে এবং সামান্য একটু শক্তি অর্জন করতে পারলেই তাঁকে মুক্ত করার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। দ্বিতীয় দলের মত ছিল, একে আমাদের এখান থেকে বের করে দাও। তারপর যখন সে আমাদের মধ্যে থাকবে না তখন সে কোথায় থাকে ও কি করে তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার কি আছে? মোটকথা এভাবে তার অস্তিত্ব আমাদের জীবন ব্যবস্থায় যে বিশৃংখলা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু এ মতটিকেও এই বলে রদ করে দেয়া হলো যে, এ ব্যক্তি হচ্ছে কথার যাদুকর। কথার মাধ্যমে মানুষের মন গলিয়ে ফেলার ব্যাপারে এর জুড়ি নেই। সে এখান থেকে বের হয়ে গেলে না জানি আরবের কোন্ কোন্ উপজাতি ও গোত্রকে নিজের অনুসারী বানিয়ে নেবে! তারপর না জানি কী পরিমাণ ক্ষমতা অর্জন করে আরবের কেন্দ্রস্থলে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তোমাদের ওপর আক্রমণ করে বসবে। সব শেষে আবু জেহেল মত প্রকাশ করলো যে, আমাদের প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে উচ্চ বংশীয় অসি চালনায় পারদর্শী যুবক বাছাই করে নিতে হবে। তারা সবাই মিলে একই সংগে মুহাম্মাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং তাকে হত্যা করবে। এভাবে মুহাম্মাদকে হত্যা করার দায়টি সমস্ত গোত্রের ওপর ভাগাভাগি হয়ে যাবে। আর সবার

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ
حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾ لِيَمِيزَ
اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ
جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٧﴾

বায়তুল্লাহর কাছে তারা কি নামায পড়ে। তারা তো শুধু সিটি দেয় ও তালি বাজায়।[২৮] কাজেই তোমরা যে সত্য অস্বীকার করে আসছিলে তার প্রতিদানে এখন আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো।[২৯] যারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথ রোধ করার জন্য ব্যয় করছে এবং এখনো আরো ব্যয় করতে থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ প্রচেষ্টা তাদের অনুশোচনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তারপর তারা বিজিত হবে। আর এ কাফেরদেরকে ঘেরাও করে জাহান্নামের দিকে আনা হবে। মূলত আল্লাহ কলুষতাকে পবিত্রতা থেকে ছেঁটে আলাদা করবেন এবং সকল প্রকার কলুষতা মিলিয়ে একত্র করবেন তারপর এ পুঁটলিটা জাহান্নামে ফেলে দেবেন। মূলত এরাই হবে দেউলিয়া।[৩০]

সংগে লড়াই করা বনু আবদে মান্নাফের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়বে। কাজেই বাধ্য হয়ে তারা রক্তমূল্য গ্রহণ করতে রাজী হয়ে যাবে। এ মতটি সবাই পছন্দ করলো। হত্যা করার জন্য লোকদের নাম স্থিরীকৃত হলো। হত্যা করার সময়ও নির্ধারিত হলো। এমনকি যে রাতটি হত্যার জন্য নির্ধারিত করা হয়েছিল সে রাতে ঠিক সময়ে হত্যাকারীরাও যথা স্থানে নিজেদের মতলব হাসিল করার উদ্দেশ্যে পৌছে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের হাত উঠাবার আগেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের চোখে ধূলো দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে একেবারে শেষ সময়ে তাদের পরিকল্পিত কৌশল বানচাল হয়ে গেলো।

২৬. একথা তারা দোয়া হিসেবে নয়, চ্যালেঞ্জের সুরে বলতো। অর্থাৎ তাদের একথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, যদি যথার্থই এটি সত্য হতো এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে হতো, তাহলে একে মিথ্যা বলার ফলে তাদের ওপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হতো এবং ভয়াবহ আযাব তাদের ওপর আপতিত হতো। কিন্তু তা হয়নি। আর যখন তা হয়নি তখন এর অর্থ হচ্ছে, এটি সত্যও নয় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকেও আসেনি।

২৭. ওপরে তাদের যে বাহ্যিক দোয়ার উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে যে প্রশ্ন নিহিত ছিল এটি তার জওয়াব। এ জওয়াবে বলা হয়েছে, আল্লাহ মক্কী যুগে আযাব পাঠাননি কেন?

এর প্রথম কারণ ছিল, যতদিন কোন নবী কোন জনবসতিতে উপস্থিত থাকেন এবং সত্যের দাওয়াত দিতে থাকেন ততদিন পর্যন্ত জনবসতির অধিবাসীদের অবকাশ দেয়া হয় এবং পূর্বাহ্নে আযাব পাঠিয়ে তাদের সংশোধিত হবার সুযোগ কেড়ে নেয়া হয় না। এর দ্বিতীয় কারণ, যতদিন পর্যন্ত কোন জনবসতি থেকে এমন ধরনের লোকেরা একের পর এক বের হয়ে আসতে থাকে যারা নিজেদের পূর্ববর্তী গাফলতি ও ভুল কর্মনীতি সম্পর্কে সজাগ হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকে এবং নিজেদের ভবিষ্যত কর্মনীতি ও আচার-আচরণ সংশোধন করে নেয়, ততদিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট জনবসতিকে মহান আল্লাহ অনর্থক ধ্বংস করে দেবেন, এটা মোটেই যুক্তিসংগত নয়। তবে নবী যখন সংশ্লিষ্ট জনবসতির ব্যাপারে তাঁর দায়িত্ব সর্বতোভাবে পালন করার পর নিরাশ হয়ে সেখান থেকে বের হয়ে যান অথবা তাঁকে বের করে দেয়া হয় কিংবা তাঁকে হত্যা করা হয় এবং জনবসতিটি তার কার্যধারার মাধ্যমে একথা প্রমাণ করে দেয় যে, সে নিজের মধ্যে কোন সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে দেখতে প্রস্তুত নয়, তখনই আযাবের আসল সময় এসে যায়।

২৮. আরববাসীদের মনে যে ভুল ধারণা প্রচ্ছন্ন ছিল এবং সাধারণ আরববাসীরা যার ফলে প্রতারিত হচ্ছিল এখানে সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। তারা মনে করতো, কুরাইশরা যেহেতু বাইতুল্লাহর খাদেম ও মুতাওয়াল্লী এবং সেখানে ইবাদাত করে তাই তাদের ওপর রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ। এ ধারণার প্রতিবাদ করে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র উত্তরাধিকার সূত্রে খাদেম ও মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব লাভ করলে কোন ব্যক্তি বা দল কোন ইবাদাত গৃহের বৈধ খাদেম ও মুতাওয়াল্লী হতে পারে না। একমাত্র যারা মুত্তাকী আল্লাহকে ভয় করে তারাই ইবাদাত গৃহের বৈধ মুতাওয়াল্লী হতে পারে। আর এদের অবস্থা হচ্ছে, যে গৃহটিকে শুধুমাত্র এবং নির্ভেজাল আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য নির্ধারিত করা হয়েছিল সেখানে এরা এমন এক দল লোককে প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে যারা নির্ভেজাল আল্লাহর ইবাদাতকারী। এভাবে এরা মুতাওয়াল্লী ও খাদেমের দায়িত্ব পালন করার পরিবর্তে এ ইবাদাত গৃহের মালিক হয়ে বসেছে। এখন এরা যার ওপর নারায হবে তাকে এ ইবাদাত গৃহে আসতে দেবে না। এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যাপারে এরা নিজেদেরকে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করছে। এ ধরনের পদক্ষেপ ও কার্যকলাপ এদের মুত্তাকী না হবার এবং আল্লাহকে ভয় না করার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আর এরা বাইতুল্লাহে এসে যে ইবাদাত করে তাতে না আছে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা এবং না আছে আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও নিষ্ঠা এবং আল্লাহকে স্মরণ করার প্রবণতা। তারা একটা অর্থহীন হৈ চৈ, শোরগোল ও ক্রীড়া-কৌতুক চালিয়ে যাচ্ছে। একে এরা নাম দিয়েছে ইবাদাত। আল্লাহর গৃহের এ ধরনের নাম সর্বস্ব খিদমত এবং এ ধরনের মিথ্যা ইবাদাতের ভিত্তিতে এরা কেমন করে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের অধিকারী হয়ে গেলো। এ ধরনের কার্যকলাপ এদেরকে কেমন করে আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ রাখতে পারে?

২৯. তারা মনে করতো, শুধুমাত্র আকাশ থেকে পাথর বৃষ্টি অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের আকারেই আল্লাহর আযাব আসে। কিন্তু এখানে তাদের জানানো হয়েছে, বদর যুদ্ধে তাদের চূড়ান্ত পরাজয়ই আসলে তদের জন্য আল্লাহর আযাব ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের এ পরাজয় ইসলামকে জীবনী শক্তি লাভের সুসংবাদ এবং জাহেলী ব্যবস্থাকে মৃত্যুর সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিয়েছে।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ
مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ
الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٣٩﴾ وَاِنْ
تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ۭ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿٤٠﴾

৫ রুকূ'

হে নবী! এ কাফেরদের বলে দাও, যদি এখনো তারা ফিরে আসে, তাহলে যা কিছু আগে হয়ে গেছে তা মাফ করে দেয়া হবে। কিন্তু যদি তারা আগের আচরণের পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে অতীতের জাতিগুলোর সাথে যা কিছু ঘটে গেছে তা সবার জানা।

হে ঈমানদারগণ! এ কাফেরদের সাথে এমন যুদ্ধ করো যেন গোমরাহী ও বিশৃংখলা নির্মূল হয়ে যায় এবং দীন পুরোপুরি আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।[৩১] তারপর যদি তারা ফিত্‌না থেকে বিরত হয় তাহলে আল্লাহই তাদের আমল দেখবেন। আর যদি তারা না মানে তাহলে জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের পৃষ্ঠপোষক এবং তিনি সবচেয়ে ভাল সাহায্য-সহায়তা দানকারী।

৩০. মানুষ যে পথে নিজের সমস্ত সময়, শ্রম, যোগ্যতা ও জীবন পুঁজি ব্যয় করে, তার একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়ে যদি সে জানতে পারে যে, এসব তাকে সোজা ধ্বংসের দিকে টেনে এনেছে এবং এ পথে সে যা কিছু খাটিয়েছে তাতে সূদ বা মুনাফা পাওয়ার পরিবর্তে উল্‌টো তাকে দণ্ড ভোগ করতে হবে, তাহলে এর চাইতে বড় দেউলিয়াপনা তার জন্য আর কী হতে পারে!

৩১. ইতিপূর্বে সূরা আল বাকারার ১৯৩ আয়াতে মুসলমানদের যুদ্ধের যে একটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছিল এখানে আবার সেই একই উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যের নেতিবাচক দিক হচ্ছে, ফিত্‌নার অস্তিত্ব থাকবে না আর এর ইতিবাচক দিক হচ্ছে, দীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। এটি একটি নৈতিক উদ্দেশ্য এবং এ উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা মুমিনদের জন্য শুধু বৈধই নয় বরং ফরযও। এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা জায়েয নয় এবং মুমিনদের জন্য তা শোভনীয়ও নয়। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য সূরা বাকারার ২০৪ ও ২০৫ টীকা দেখুন)।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ
بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۭ وَاللّٰهُ
عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤١﴾ اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ
الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ۭ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي
الْمِيْعٰدِ ۙ وَلٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۙ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ
بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٤٢﴾

আর তোমরা জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু গনীমাতের মাল লাভ করেছো তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ, তাঁর রসূল, আত্মীয়স্বজন, এতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য নির্ধারিত।[৩২] যদি তোমরা ঈমান এনে থাকো আল্লাহর প্রতি এবং ফায়সালার দিন অর্থাৎ উভয় সেনাবাহিনীর সামনা সামনি মোকাবিলার দিন আমি নিজের বান্দার ওপর যা নাযিল করেছিলাম তার প্রতি,[৩৩] (অতএব সানন্দে এ অংশ আদায় করো) আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর শক্তিশালী।

স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন তোমরা উপত্যকার এদিকে ছিলে এবং তারা ছিল অন্যদিকে শিবির তৈরী করে আর কাফেলা ছিল তোমাদের থেকে নিচের (উপকূল) দিকে। যদি আগেভাগেই তোমাদের ও তাদের মধ্যে মোকাবিলার চুক্তি হয়ে থাকতো তাহলে তোমরা অবশ্যি এ সময় পাশ কাটিয়ে যেতে। কিন্তু যা কিছু সংঘটিত হয়েছে তা এ জন্য ছিল যে, আল্লাহ যে বিষয়ের ফায়সালা করে ফেলেছিলেন তা তিনি কার্যকর করবেনই। এভাবে যাকে ধ্বংস হতে হবে সে সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে ধ্বংস হবে এবং যাকে জীবিত থাকতে হবে সে সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে জীবিত থাকবে।[৩৪] অবশ্যি আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।[৩৫]

৩২. এ ভাষণটির শুরুতেই গনীমাতের মাল সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার এবং তার ব্যাপারে ফায়সালা করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর

রসূলই রাখেন। এখানে এ গনীমাতের মাল বন্টনের আইন-কানুন বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে এ ফায়সালাটিও শুনিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যুদ্ধের পরে সকল সৈনিকের সব ধরনের গনীমাতের মাল এনে আমীর বা ইমামের কাছে জমা দিতে হবে। কোন একটি জিনিসও তারা লুকিয়ে রাখতে পারবে না। তারপর এ সম্পদ থেকে পাঁচ ভাগের এক ভাগ বের করে নিতে হবে। আয়াতে যে উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে এ দিয়ে তা পূর্ণ করতে হবে। বাকি চার অংশ যারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছে তাদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। কাজেই এ আয়াত অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামেশা যুদ্ধের পর ঘোষণা দিতেন ঃ

ان هذه غنائمكم وانه ليس لى فيها الا نصيبى معكم الخمس والخمس مردود عليكم فادوا الخيط والمخيط واكبر من ذلك واصغر ولا تغلوا فان الغلول عار ونار –

"এ গনীমাতের সম্পদগুলো তোমাদের জন্যই। এক পঞ্চমাংশ ছাড়া এর মধ্যে আমার নিজের কোন অধিকার নেই। আর এই এক পঞ্চমাংশও তোমাদেরই সামগ্রিক কল্যাণার্থেই ব্যয়িত হয়। কাজেই একটি সুঁই ও একটি সূতা পর্যন্তও এনে রেখে দাও। কোন ছোট বা বড় জিনিস লুকিয়ে রেখো না। কারণ এমনটি করা কলংকের ব্যাপার এবং এর পরিণাম জাহান্নাম।"

এ বন্টনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অংশ একটিই। এ অংশটিকে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করা এবং সত্য দীন প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করাই মূল লক্ষ।

আত্মীয় স্বজন বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তো তাঁর আত্মীয় স্বজনই বুঝাতো। কারণ তিনি নিজের সবটুকু সময় দীন প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করতেন। নিজের অন্ন সংস্থানের জন্য কোন কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এ কারণে তাঁর নিজের, তাঁর পরিবারের লোকদের এবং যেসব আত্মীয়ের ভরণ পোষণের দায়িত্ব তাঁর ওপর ছিল তাদের সবার প্রয়োজন পূরণ করার কোন একটা ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন ছিল। তাই 'খুমুস' তথা এক পঞ্চমাংশে তাঁর আত্মীয়দের অংশ রাখা হয়েছে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর 'আত্মীয়-স্বজনদের' এ অংশটি কাদেরকে দেয়া হবে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এক দলের মতে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে এ অংশটি বাতিল হয়ে গেছে। দ্বিতীয় দলের মতে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে যে ব্যক্তি তাঁর খেলাফতের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত হবেন তার আত্মীয়-স্বজনরা এ অংশটি পাবে। তৃতীয় দলটির মতে, এ অংশটি নবীর বংশের ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করা হতে থাকবে। আমার নিজস্ব গবেষণা-অনুসন্ধানের ফলে যেটুকু আমি জানতে পেরেছি, তাতে দেখা যায় যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের যামানায় এ তৃতীয় মতটিই কার্যকর হতে থেকেছে।

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ
وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٣﴾
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي
أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٤﴾

আর স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন হে নবী, আল্লাহ তোমার স্বপ্নের মধ্যে তাদেরকে সামান্য সংখ্যক দেখাচ্ছিলেন।[৩৬] যদি তিনি তোমাকে তাদের সংখ্যা বেশী দেখিয়ে দিতেন তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং যুদ্ধ করার ব্যাপারে ঝগড়া শুরু করে দিতে। কিন্তু আল্লাহই তোমাদের এ থেকে রক্ষা করেছেন। অবশ্যি তিনি মনের অবস্থাও জানেন।

আর স্মরণ করো, যখন সামনাসামনি যুদ্ধের সময় আল্লাহ তোমাদের দৃষ্টিতে শত্রুদের সামান্য সংখ্যক দেখিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টিতেও তোমাদের কম করে দেখিয়েছেন, যাতে যে বিষয়টি অনিবার্য ছিল তাকে আল্লাহ প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিষয় আল্লাহর দিকেই ফিরে যায়।

৩৩. অর্থাৎ যে সাহায্য–সমর্থনের মাধ্যমে তোমরা বিজয় অর্জন করেছো।

৩৪. অর্থাৎ প্রমাণ হয়ে যাবে যে, যে জীবিত আছে তার জীবিত থাকাই উচিত ছিল এবং যে ধ্বংস হয়ে গেছে তার ধ্বংস হয়ে যাওয়াই সমীচীন ছিল। এখানে জীবিত থাকা ও ধ্বংস হওয়া বলতে ব্যক্তিদেরকে নয় বরং ইসলাম ও জাহেলিয়াতকে বুঝানো হয়েছে।

৩৫. অর্থাৎ আল্লাহ অন্ধ, বধির ও বেখবর নন। বরং তিনি জ্ঞানী—সবকিছু জানেন এবং সবকিছু দেখেন। তাঁর রাজত্বে অন্ধের মত আন্দাজে কাজ কারবার হচ্ছে না।

৩৬. এটা এমন এক সময়ের কথা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের নিয়ে মদীনা থেকে বের হচ্ছিলেন অথবা পথে কোন মনযিলে অবস্থান করছিলেন তখন কাফেরদের যথার্থ সৈন্য সংখ্যা জানা যায়নি। এ সময় নবী (সা) স্বপ্নে কাফেরদের সেনাবাহিনী দেখলেন। তাঁর সামনে যে দৃশ্যপট পেশ করা হয় তাতে শত্রু সেনাদের সংখ্যা খুব বেশী নয় বলে তিনি অনুমান করতে পারলেন। এ স্বপ্নের বিবরণ তিনি মুসলমানদের শুনালেন। এতে মুসলমানদের হিম্মত বেড়ে গেলো এবং তারা তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখলো।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ
رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ
اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٤٧﴾ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا
تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي
أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

৬ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! যখন কোন দলের সাথে তোমাদের মোকাবিলা হয়, তোমরা দৃঢ়পদ থাকো এবং আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো বেশী বেশী করে। আশা করা যায়, এতে তোমরা সাফল্য অর্জন করবে। আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ করো না, তাহলে তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দেবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তির দিন শেষ হয়ে যাবে। সবরের পথ অবলম্বন করো,[৩৭] অবশ্যি আল্লাহ সবরকারীদের সাথে রয়েছেন। আর তোমরা এমন লোকদের মত আচরণ করো না, যারা অহংকার করতে করতে ও লোকদেরকে নিজেদের মাহাত্ম্য দেখাতে দেখাতে ঘর থেকে বের হয়েছে এবং যারা আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) বিরত রাখে।[৩৮] তারা যা কিছু করছে তা আল্লাহর নাগালের বাইরে নয়।

সেই সময়ের কথা একটু মনে করো যখন শয়তান এদের কার্যকলাপকে এদের চোখে ঔজ্জ্বল্যময় করে দেখিয়েছিল এবং এদেরকে বলেছিল, আজ তোমাদের ওপর কেউ বিজয়ী হতে পারে না এবং আমি তোমাদের সাথে আছি। কিন্তু যখন উভয় বাহিনীর সামনাসামনি মোকাবিলা শুরু হলো তখনই সে পিছনের দিকে ফিরে গেলো এবং বলতে লাগলো ঃ তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি এমন কিছু দেখছি যা তোমরা দেখো না। আমি আল্লাহকে ভয় পাচ্ছি। আল্লাহ বড় কঠোর শাস্তিদাতা।

৩৭. অর্থাৎ নিজেদের আবেগ-অনুভূতি ও কামনা-বাসনাকে সংযত রাখো। তাড়াহুড়ো করো না। ভীত-আতংকিত হওয়া, লোভ-লালসা পোষণ করা এবং অসংগত উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রকাশ থেকে দূরে থাকো। স্থির মস্তিষ্কে এবং ভারসাম্যপূর্ণ ও যথার্থ পরিমিত বিচক্ষণতা ও ফায়সালা করার শক্তি সহকারে কাজ করে যাও। বিপদ-আপদ ও সংকট-সমস্যার সম্মুখীন হলেও যেন তোমাদের পা না টলে। উত্তেজনাকর পরিস্থিতি দেখা দিলে ক্রোধ ও ক্ষোভের তরংগে ভেসে গিয়ে তোমরা যেন কোন অর্থহীন কাজ করে না বসো। বিপদের আক্রমণ চলতে থাকলে এবং অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে মোড় নিয়েছে দেখতে পেলে মানসিক অস্থিরতার কারণে তোমাদের চেতনা শক্তি বিক্ষিপ্ত ও বিশৃংখল না হয়ে পড়ে। উদ্দেশ্য সফল হবার আনন্দে অধীর হয়ে অথবা কোন আধা-পরিপক্ক ব্যবস্থাপনাকে আপাতদৃষ্টিতে কার্যকর হতে দেখে তোমাদের সংকল্প যেন তাড়াহুড়োর শিকার না হয়ে পড়ে। আর যদি কখনো বৈষয়িক স্বার্থ, লাভ ও ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্ররোচনা তোমাদের লোভাতুর করে তোলে তাহলে তাদের মোকাবিলায় তোমাদের নফ্স যেন দুর্বল হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেদিকে এগিয়ে যেতে না থাকে। এ সমস্ত অর্থ শুধু একটি মাত্র শব্দ "সবর"-এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। আল্লাহ বলছেন, এসব দিক দিয়ে যারা সবরকারী হবে তারাই আমার সাহায্য ও সমর্থন পেয়ে ধন্য হবে।

৩৮. এখানে কুরাইশ গোত্রভুক্ত কাফেরদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদের সেনাবাহিনী মক্কা থেকে বের হয়েছিল অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে। বাদ্য-গীত পারদর্শীনী ক্রীতদাসী পরিবেষ্টিত হয়ে তারা চলছিল। পথের মাঝখানে বিভিন্ন জায়গায় থেমে তারা নাচ-গান, শরাব পান ও আনন্দ উল্লাসের মাহফিল জমিয়ে তুলেছিল। পথে যেসব গোত্র ও জনবসতির ওপর দিয়ে তারা যাচ্ছিল তাদের ওপর নিজেদের শান শওকত, সংখ্যাধিক্য ও শক্তির দাপট এবং যুদ্ধ সরঞ্জামের ভীতি ও প্রভাব বিস্তার করে চলছিল। তারা এমনভাবে বাহাদুরী দেখাচ্ছিল যেন তাদের সামনে দাঁড়াবার মত কেউ নেই। এমনি একটা উৎকট অহংকারের ভাব তাদের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠছিল। এ ছিল তাদের নৈতিক অবস্থা। আর যে উদ্দেশ্যে তারা ঘর থেকে বের হয়েছিল তা ছিল তাদের এ নৈতিক অবস্থার চাইতেও আরো বেশী নোংরা ও অপবিত্র এবং তা তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল অতিরিক্ত অভিশাপের বোঝা। তারা সত্য, সততা ও ইনসাফের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার জন্য ধন ও প্রাণ উৎসর্গ করতে এগিয়ে আসেনি। বরং এ ঝাণ্ডা যাতে বুলন্দ না হয় এবং যে একটি মাত্র দল সত্যের এ লক্ষে পৌছার জন্য এগিয়ে এসেছে তাকেও যাতে খতম করা যায় সেই উদ্দেশ্যেই তারা বের হয়েছিল। তারা চাইছিল দুনিয়ায় এ ঝাণ্ডা বহনকারী আর কেউ থাকবে না। এ ব্যাপারে মুসলমানদের সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা এমনটি হয়ে যেয়ো না। আল্লাহ তোমাদের ঈমান ও সত্যপ্রিয়তার যে নিয়ামত দান করেছেন তার দাবী অনুযায়ী তোমাদের চরিত্র যেমন পাক-পবিত্র হতে হবে তেমনি তোমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্যও হতে হবে মহৎ।

إِذْ يَقُولُ الْمُنٰفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ ۗ
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى
الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوقُوا
عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ
بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٥١﴾

৭ রুকূ'

যখন মুনাফিকরা এবং যাদের দিলে রোগ আছে তারা সবাই বলছিল, এদের দীনই তো এদের মাথা বিগড়ে দিয়েছে।[৩৯] অথচ যদি কেউ আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাহলে আল্লাহ অবশ্যি বড়ই পরাক্রান্ত ও জ্ঞানী। হায়, যদি তোমরা সেই অবস্থা দেখতে পেতে যখন ফেরেশতারা নিহত কাফেরদের রূহ কবয করছিল। তারা তাদের চেহারায় ও পিঠে আঘাত করছিল এবং বলে চলছিল "নাও এবং জ্বালাপোড়ার শাস্তি ভোগ করো। এ হচ্ছে সেই অপকর্মের প্রতিফল যা তোমরা আগেই করে রেখে এসেছো। নয়তো আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর জুলুমকারী নন।"

এ নির্দেশ শুধুমাত্র সেই যুগের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। আজকের জন্যও এবং চিরকালের জন্য এ নির্দেশ প্রযোজ্য। সেদিন কাফেরদের সেনাবাহিনীর যে অবস্থা ছিল আজো তার মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি। বেশ্যালয়, ব্যভিচারের আড্ডা ও মদের পিপা যেন অবিচ্ছেদ্য অংগের মত তাদের সাথে জড়িয়ে আছে। গোপনে নয়, প্রকাশ্যে তারা অত্যন্ত নির্লজ্জতার সাথে মেয়ে ও মদের বেশী বেশী বরাদ্দ দাবী করে। তাদের সৈন্যরা নিজেদের জাতির কাছে যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের সমাজের বেশী সংখ্যক যুবতী মেয়েদেরকে তাদের হাতে তুলে দেবার দাবী জানাতে লজ্জাবোধ করে না। এ অবস্থায় অন্য জাতিরা এদের থেকে কি আশা করতে পারে যে, এরা নিজেদের নৈতিক আবর্জনার পাঁকে তাদেরকে ডুবিয়ে দেবার ব্যাপারে কোন প্রকার চেষ্টার ত্রুটি করবে না? আর এদের দম্ভ ও অহংকারের ব্যাপারে বলা যায়, এদের প্রত্যেকটি সৈনিক ও অফিসারের চালচলন ও কথাবার্তার ধরন থেকে তা একেবারে পরিষ্কার দেখা যেতে পারে। আর এদের প্রত্যেক জাতির নেতৃস্থানীয় পরিচালকবৃন্দের বক্তৃতাবলীতে لا غالب لكم اليوم (আজ তোমাদের ওপর বিজয়ী হতে পারে দুনিয়াতে এমন কেউ নেই) এবং من اشد منا قوة (কে আমাদের চেয়ে শক্তিশালী?) ধরনের দম্ভোক্তিই শ্রুত হয়ে থাকে। এদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ এ নৈতিক পূতিগন্ধময় আবর্জনা থেকেও বেশী কুৎসিত ও নোংরা। এদের প্রত্যেকেই অত্যন্ত প্রতারণাপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করে দুনিয়াবাসীকে একথার নিশ্চয়তা

كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ
اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ
لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰي قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَاَنَّ
اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ
رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝

এ ব্যাপারটি তাদের সাথে ঠিক তেমনিভাবে ঘটেছে যেমন ফেরাউনের লোকদের ও তাদের আগের অন্যান্য লোকদের সাথে ঘটে এসেছে। তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। ফলে তাদের গোনাহের ওপর আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন। আল্লাহ ক্ষমতাশালী এবং কঠোর শাস্তিদাতা। এটা ঠিক আল্লাহর এ রীতি অনুযায়ী হয়েছে, যে রীতি অনুযায়ী তিনি কোন জাতিকে কোন নিয়ামত দান করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে কোন পরিবর্তন সাধন করেন না যতক্ষণ না সেই জাতি নিজেই নিজের কর্মনীতির পরিবর্তন সাধন করে।[৪০] আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও সবকিছু জানেন। ফেরাউনের লোকজন ও তাদের আগের জাতিদের সাথে যা কিছু ঘটেছে এ রীতি অনুযায়ীই ঘটেছে। তারা নিজেদের রবের নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। ফলে তাদের গুনাহের জন্য আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং ফেরাউনের লোক-লস্করকে ডুবিয়ে দিয়েছি। এরা সবাই ছিল জালেম।

দিয়ে যায় যে, মানবতার কল্যাণ ছাড়া তার সামনে আর কোন লক্ষ নেই। কিন্তু আসলে শুধুমাত্র মানবতার কল্যাণটাই তাদের লক্ষ্যের অন্তরভুক্ত নয়, বাকি সবকিছুই সেখানে আছে। এদের যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তাঁর এ পৃথিবীতে সমগ্র মানব জাতির জন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার জাতি একাই হবে তার ওপর দখলদার এবং অন্যদের তার চাকর ও কৃপাপ্রার্থী হয়ে থাকতে হবে। কাজেই এখানে ঈমানদারদেরকে কুরআন এ স্থায়ী নির্দেশ দিয়েছে যে, এ ফাসেক ও ফাজেরদের আচার আচরণ থেকেও দূরে থাকো। আবার যেসব অপবিত্র ও পূতিগন্ধময় উদ্দেশ্য নিয়ে এরা যুদ্ধে লিপ্ত হয় সেই ধরনের উদ্দেশ্যে নিজেদের ধন-প্রাণ উৎসর্গ করতে উদ্যোগী হয়ো না।

৩৯. অর্থাৎ মদীনার মুনাফিক গোষ্ঠী এবং বৈষয়িক স্বার্থ পূজায় ও আল্লাহর প্রতি গাফলতির রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গ যুদ্ধের সাজ সরঞ্জামহীন মুষ্টিমেয় লোকের একটি দলকে কুরাইশদের মত বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করতে দেখে নিজেদের মধ্যে এ

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾ الَّذِينَ
عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾
فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٥٧﴾
وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

অবশ্যি আল্লাহর কাছে যমীনের ওপর বিচরণশীল জীবের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে তারাই যারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। তারপর তারা আর কোন মতেই তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। (বিশেষ করে) তাদের মধ্য থেকে এমন সব লোক যাদের সাথে তুমি চুক্তি করেছো তারপর তারা প্রত্যেকবার তা ভংগ করে এবং একটুও আল্লাহর ভয় করে না।৪১ কাজেই এ লোকদের যদি তোমরা যুদ্ধের মধ্যে পাও তাহলে তাদের এমনভাবে মার দেবে যেন তাদের পরে অন্য যারা এমনি ধরনের আচরণ করতে চাইবে তারা দিশা হারিয়ে ফেলে।৪২ আশা করা যায়, চুক্তি ভংগকারীদের এ পরিণাম থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে। আর যদি কখনো কোন জাতির পক্ষ থেকে তোমাদের খেয়ানতের আশংকা থাকে তাহলে তার চুক্তি প্রকাশ্যে তার সামনে ছুঁড়ে দাও।৪৩ নিসন্দেহে আল্লাহ খেয়ানতকারীকে পছন্দ করেন না।

মর্মে বলাবলি করছিল যে, এরা আসলে নিজেদের ধর্মীয় আবেগে উন্মাদ হয়ে গেছে। এ যুদ্ধে এদের ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু এই নবী এদের কানে এমন মন্ত্র ফুঁকে দিয়েছে যার ফলে এরা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং সামনে মৃত্যু গুহা দেখেও তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

৪০. অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতি নিজেকে আল্লাহর নিয়ামতের পুরোপুরি অনুপযুক্ত প্রমাণ না করে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার কাছ থেকে নিজের নিয়ামত ছিনিয়ে নেন না।

৪১. এখানে বিশেষভাবে ইহুদীদের প্রতি ইশারা করা হয়ছে। মদীনা তাইয়েবায় আসার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম তাদের সাথেই সৎ প্রতিবেশী সুলভ জীবন যাপন ও পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার চুক্তি করেছিলেন। তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য তিনি নিজের সামর্থ অনুযায়ী পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাছাড়া ধর্মীয় দিক দিয়েও তিনি ইহুদীদেরকে মুশরিকদের তুলনায় নিজের অনেক কাছের মনে করতেন, প্রত্যেক ব্যাপারেই তিনি মুশরিকদের মোকাবিলায় আহলি কিতাবদের মত

ও পথকে অগ্রাধিকার দিতেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্ভেজাল তাওহীদ ও সৎ চরিত্র নীতি সংক্রান্ত যেসব কথা প্রচার করে চলছিলেন, বিশ্বাস ও কর্মের গোমরাহীর বিরুদ্ধে যে সমালোচনা করে চলছিলেন এবং সত্য দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন ইহুদীদের উলামা ও মাশায়েখ গোষ্ঠী তা একটুও পছন্দ করতো না। এ নতুন আন্দোলন যাতে কোনভাবেই সাফল্য লাভ করতে না পারে সে জন্য তারা অনবরত ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিল। এ উদ্দেশ্যে তারা মদীনার মুনাফিক মুসলমানদের সাথে মিলে চক্রান্ত করে চলছিল। এ উদ্দেশ্যেই তারা আওস ও খাযরাজ বংশীয় লোকদের যেসব পুরাতন শত্রুতা ইসলাম পূর্বযুগে তাদের মধ্যে খুনাখুনি ও হানাহানির কারণ হতো সেগুলোকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করতো। এ উদ্দেশ্যেই কুরাইশ ও অন্যান্য ইসলাম বিরোধী গোত্রগুলোর সাথে তাদের গোপন যোগসাজস চলছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাদের মধ্যে যে মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তা সত্ত্বেও এসব কাজ করে চলছিল। যখন বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হলো, শুরুতে তারা আশা করেছিল, কুরাইশদের প্রথম আঘাতেই এই আন্দোলনের মৃত্যুঘন্টা বেজে উঠবে। কিন্তু ফলাফল দেখা গেলো তাদের প্রত্যাশার বিপরীত। এ অবস্থায় তাদের অন্তরে আরো বেশী করে জ্বলে উঠলো হিংসার আগুন। বদরের বিজয় যাতে ইসলামের শক্তিকে একটি স্থায়ী "বিপদে" পরিণত না করে দেয় এ আশংকায় তারা নিজেদের বিরোধিতামূলক প্রচেষ্টা আরো বেশী জোরদার করে দিল। এমনকি একজন নেতা কা'ব ইবনে আশরাফ (কুরাইশদের পরাজয়ের খবর শুনে যে ব্যক্তি চিৎকার করে বলে উঠেছিল, আজ যমীনের পেট তার পিঠের চেয়ে আমাদের জন্য অনেক ভাল) নিজে মক্কা গেলো। সেখানে সে উদ্দীপনাময় শোক গীতি গেয়ে কুরাইশদের অন্তরে প্রতিশোধ স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে থাকলো। এখানেই তারা ক্ষান্ত হলো না। ইহুদীদের বনী কাইনুকা গোত্র সৎ প্রতিবেশী সুলভ বসবাসের চুক্তি ভংগ করে তাদের জনবসতিতে যেসব মুসলমান মেয়ে কোন কাজে যেতো তাদেরকে উত্যক্ত ও উৎপীড়ন করতে শুরু করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদের এ অন্যায় কার্যকলাপের জন্য তাদের তিরস্কার করলেন তখন তারা জবাবে হুমকি দিল ঃ "আমাদের মক্কার কুরাইশ মনে করো না। আমরা যুদ্ধ করতে ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দিতে জানি। আমাদের মোকাবিলায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে নামলে তোমরা টের পাবে, পুরুষ কাকে বলে।"

৪২. এর অর্থ হচ্ছে, যদি কোন জাতির সাথে আমাদের চুক্তি হয়, তারপর তারা নিজেদের চুক্তির দায়িত্ব বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে আমরাও চুক্তির নৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবো। এ ক্ষেত্রে আমরাও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ন্যায়সংগত অধিকার লাভ করবো। তাছাড়া যদি কোন জাতির সাথে আমাদের যুদ্ধ চলতে থাকে এবং আমরা দেখি, শত্রুপক্ষের সাথে এমন এক সম্প্রদায়ের লোকরাও যুদ্ধে শামিল হয়েছে যাদের সাথে আমাদের চুক্তি রয়েছে তাহলে আমরা তাদেরকে হত্যা করতে এবং তাদের সাথে শত্রুর মত ব্যবহার করতে একটুও দ্বিধা করবো না। কারণ তারা ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের সম্প্রদায়ের চুক্তি ভংগ করে তাদের ধন–প্রাণের নিরাপত্তার প্রশ্নে তাদের সম্প্রদায়ের সাথে আমাদের যে চুক্তি রয়েছে তা লংঘন করেছে। ফলে নিজেদের নিরাপত্তার অধিকার তারা প্রমাণ করতে পারেনি।

৪৩. এ আয়াতের দৃষ্টিতে যদি কোন ব্যক্তি, দল বা দেশের সাথে আমাদের চুক্তি থাকে এবং তার কর্মনীতি আমাদের মনে তার বিরুদ্ধে চুক্তি মেনে চলার ব্যাপারে গড়িমসি করার অভিযোগ সৃষ্টি করে অথবা সুযোগ পেলেই সে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এ ধরনের আশংকা দেখা দেয়, তাহলে আমাদের পক্ষে একতরফাভাবে এমন সিদ্ধান্ত করা কোনক্রমেই বৈধ নয় যে, আমাদের ও তার মধ্যে কোন চুক্তি নেই। আর এই সংগে হঠাৎ তার সাথে আমাদের এমন ব্যবহার করা উচিত নয় যা একমাত্র চুক্তি না থাকা অবস্থায় করা যেতে পারে। বরং এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হলে কোন বিরোধিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করার আগে দ্বিতীয় পক্ষকে স্পষ্টভাষায় একথা জানিয়ে দেবার জন্য আমাদের তাগিদ দেয়া হয়েছে যে, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এখন আর কোন চুক্তি নেই। এভাবে চুক্তি ভংগ করার জ্ঞান আমরা যতটুকু অর্জন করেছি তারাও ততটুকু অর্জন করতে পারবে এবং চুক্তি এখনো অপরিবর্তিত আছে, এ ধরনের ভুল ধারণা তারা পোষণ করবে না। আল্লাহর এ ফরমান অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিম্নোক্ত স্থায়ী মূলনীতি ঘোষণা করেছিলেন ঃ

مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَحُلُّنَّ عَقْدَهُ حَتّٰى يَنْقَضِىَ اَمَدُهَا اَوْ يُنْبَذُ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ -

"কোন জাতির সাথে কারোর কোন চুক্তি থাকলে চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার আগে তার চুক্তি লংঘন করা উচিত নয়। এক পক্ষ চুক্তি ভংগ করলে উভয় পক্ষের সমতার ভিত্তিতে অপর পক্ষ চুক্তি বাতিল করার কথা জানাতে পারে।"

তারপর এ নিয়মকে তিনি আরো একটু ব্যাপকভিত্তিক করে সমস্ত ব্যাপারে এ সাধারণ নীতি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ঃ لاَتَخُنْ مَنْ خَانَكَ (যে ব্যক্তি তোমার সাথে খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি তার সাথে খেয়ানত করো না।)। এ নীতিটি শুধুমাত্র বক্তৃতা বিবৃতিতে বলার ও বইয়ের শোভা বর্ধনের জন্য ছিল না বরং বাস্তব জীবনে একে পুরাপুরি মেনে চলা হতো। আমীর মু'আবীয়া (রা) একবার নিজের রাজত্বকালে রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তে সেনা সমাবেশ করতে শুরু করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার সাথে সাথেই অতর্কিতে রোমান এলাকায় আক্রমণ চালাবেন। তাঁর এ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রসূলের (সা) সাহাবী আমর ইবনে আমবাসা (রা) কঠোর প্রতিবাদ জানান। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীসটি শুনিয়েই চুক্তির মেয়াদের মধ্যেই এ ধরনের শত্রুতামূলক কার্যকলাপকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করেন। অবশেষে আমীর মু'আবীয়াকে এ নীতির সামনে মাথা নোয়াতে হয় এবং তিনি সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ বন্ধ করে দেন।

একতরফাভাবে চুক্তি ভংগ ও যুদ্ধ ঘোষণা করা ছাড়া আক্রমণ করার পদ্ধতি প্রাচীন জাহেলী যুগেও ছিল এবং বর্তমান যুগের সুসভ্য জাহেলিয়াতেও এর প্রচলন আছে। এর নতুনতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়ার ওপর জার্মানীর আক্রমণ এবং ইরানের বিরুদ্ধে রাশিয়া ও বৃটেনের সামরিক কার্যক্রম। সাধারণত এ ধরনের কার্যক্রমের স্বপক্ষে এ ওযর পেশ করা হয় যে, আক্রমণের পূর্বে জানিয়ে দিলে প্রতিপক্ষ সতর্ক হয়ে

যায়। এ অবস্থায় কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয় অথবা যদি আমরা অগ্রসর হয়ে হস্তক্ষেপ না করতাম তাহলে আমাদের শত্রুরা সুবিধা লাভ করতো। কিন্তু নৈতিক দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য এ ধরনের বাহানাকে যদি যথেষ্ট মনে করা হয় তাহলে দুনিয়ায় আর এমন কোন অপরাধ থাকে না যা কোন না কোন বাহানায় করা যেতে পারে না। প্রত্যেক চোর, ডাকাত, ব্যভিচারী, ঘাতক ও জালিয়াত নিজের অপরাধের জন্য এমনি ধরনের কোন না কোন কারণ দর্শাতে পারে। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে, আন্তরজাতিক পরিবেশে এরা একটি জাতির জন্য এমন অনেক কাজ বৈধ মনে করে যা জাতীয় পরিবেশে কোন ব্যক্তিবিশেষ করলে তাদের দৃষ্টিতে অবৈধ বলে গণ্য হয়।

এ প্রসংগে একথা জেনে নেয়ারও প্রয়োজন যে, ইসলামী আইন শুধুমাত্র একটি অবস্থায় পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই আক্রমণ করা বৈধ গণ্য করে। সে অবস্থাটি হচ্ছে, দ্বিতীয় পক্ষ যখন ঘোষণা দিয়েই চুক্তি ভংগ করে এবং আমাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে শত্রুতামূলক কাজ করে। এহেন অবস্থায় উল্লেখিত আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের পক্ষ থেকে তার কাছে চুক্তি ভংগ করার নোটিশ দেবার প্রয়োজন হয় না। বরং আমরা অঘোষিতভাবে তার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার লাভ করি। বনী খুযাআর ব্যাপারে কুরাইশরা যখন হুদাইবিয়ার চুক্তি প্রকাশ্যে ভংগ করে তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে চুক্তি ভংগ করার নোটিশ দেয়ার প্রয়োজন মনে করেননি এবং কোন প্রকার ঘোষণা না দিয়েই মক্কা আক্রমণ করে বসেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কার্যক্রম থেকেই মুসলিম ফকীহগণ এ ব্যতিক্রমধর্মী বিধি রচনা করেছেন। কিন্তু কোন অবস্থায় যদি আমরা এ ব্যতিক্রমধর্মী নিয়ম থেকে ফায়দা উঠাতে চাই তাহলে অবশ্যি সেই সমস্ত অবস্থা আমাদের সামনে থাকতে হবে যে অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এভাবে তাঁর সমগ্র কার্যক্রমের একটি সুবিধাজনক অংশ মাত্রের অনুসরণ না করে তার সবটুকুর অনুসরণ করা হবে। হাদীস ও সীরাতের কিতাবগুলো থেকে যা কিছু প্রমাণিত হয় তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ কুরাইশদের চুক্তি ভংগের ব্যাপারটি এত বেশী সুস্পষ্ট ছিল যে, তারা যে, চুক্তি ভংগ করেছে এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করার কোন সুযোগ ছিল না। কুরাইশরা এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকেরা নিজেরাও চুক্তি যথার্থই ভেঙে গেছে বলে স্বীকার করতো। তারা নিজেরাই চুক্তি নবায়নের জন্য আবু সুফিয়ানকে মদীনায় পাঠিয়েছিল। এর পরিষ্কার অর্থ ছিল, তাদের দৃষ্টিতেও চুক্তি অক্ষুণ্ন ছিল না। তবুও চুক্তি ভঙ্গকারী জাতি নিজেই চুক্তি ভঙ্গ করার কথা স্বীকার করবে, এটা জরুরী নয়। তবে চুক্তি ভংগ করার ব্যাপারটি একেবারে সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীত হওয়া অবশ্যি জরুরী।

দুই ঃ কুরাইশদের পক্ষ থেকে চুক্তি ভংগ করার পরও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে বা ইশারা ইঙ্গিতে এমন কোন কথা বলেননি যা থেকে এ ইশারা পাওয়া যায় যে, এ চুক্তি ভঙ্গ করা সত্ত্বেও তিনি এখনো তাদেরকে একটি চুক্তিবদ্ধ জাতি মনে করেন এবং এখনো তাদের সাথে তাঁর চুক্তিমূলক সম্পর্ক বজায় রয়েছে বলে মনে করেন। সমস্ত বর্ণনা একযোগে একথা প্রমাণ করে যে, আবু সুফিয়ান যখন মদীনায় এসে চুক্তি নবায়নের আবেদন করে তখন তিনি তা গ্রহণ করেননি।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿٥٩﴾ وَأَعِدُّوا لَهُمْ
مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُونَهُمْ ۚ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنْ
جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

৮ রুকূ'

সত্য অস্বীকারকারীরা যেন এ ভুল ধারণা পোষণ না করে যে, তারা জিতে গেছে। নিশ্চয়ই তারা আমাকে হারাতে পারবে না। আর তোমরা নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী সর্বাধিক পরিমাণ শক্তি ও সদাপ্রস্তুত ঘোড়া তাদের মোকাবিলার জন্য যোগাড় করে রাখো।[৪৪] এর মাধ্যমে তোমরা ভীতসন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে, নিজের শত্রুকে এবং অন্য এমন সব শত্রুকে যাদেরকে তোমরা চিন না। কিন্তু আল্লাহ চেনেন। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু খরচ করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি কখনো জুলুম করা হবে না।

আর হে নবী! শত্রু যদি সন্ধি ও শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে তুমিও সেদিকে ঝুঁকে পড়ো এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভর করো। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।

তিন ঃ তিনি নিজে কুরাইশদের বিরুদ্ধে সামরিক কার্যক্রম গ্রহণ করেন এবং প্রকাশ্যে গ্রহণ করেন। তাঁর কার্যক্রমে কোন প্রকার প্রতারণার সামান্যতম গন্ধও পাওয়া যায় না। তিনি বাহ্যত সন্ধি এবং গোপনে যুদ্ধের পথ অবলম্বন করেননি।

এটিই এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম আদর্শ। কাজেই ওপরে উল্লেখিত আয়াতের সাধারণ বিধান থেকে সরে গিয়ে যদি কোন কার্যক্রম অবলম্বন করা যেতে পারে তাহলে তা এমনি বিশেষ অবস্থায়ই করা যেতে পারে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ধরনের সরল–সহজ–ভদ্রজনোচিত পথে তা করেছিলেন তেমনি পথেই করা যেতে পারে।

তাছাড়া কোন চুক্তিবদ্ধ জাতির সাথে কোন বিষয়ে যদি আমাদের কোন বিবাদ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং আমরা দেখি পারস্পরিক আলাপ আলোচনা বা আন্তর্জাতিক সালিশের মাধ্যমে এ বিবাদের মীমাংসা হচ্ছে না অথবা যদি আমরা দেখি, দ্বিতীয় পক্ষ বল প্রয়োগ

وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَّدَكَ
بِنَصْرِهِۦ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِى
ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ
إِنَّهُۥ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ
ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾

যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চায় তাহলে তোমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট।[৪৫] তিনিই তো নিজের সহায়তায় ও মুমিনদের মাধ্যমে তোমাকে সমর্থন জানিয়েছেন এবং মুমিনদের অন্তর পরস্পরের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। তুমি সারা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ ব্যয় করলেও এদের অন্তর জোড়া দিতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের অন্তর জুড়ে দিয়েছেন।[৪৬] অবশ্যি তিনি বড়ই পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী। হে নবী! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী ঈমানদারদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

করে এর মীমাংসা করতে উঠে পড়ে লেগেছে, তাহলে এ ক্ষেত্রে আমাদের জন্য বল প্রয়োগ করে এর মীমাংসায় পৌঁছানো সম্পূর্ণরূপে বৈধ হয়ে যাবে। কিন্তু উপরোক্ত আয়াত আমাদের ওপর এ নৈতিক দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের এ বল প্রয়োগ পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার পর হতে হবে এবং তা হতে হবে প্রকাশ্যে। লুকিয়ে লুকিয়ে গোপনে এমন ধরনের সামরিক কার্যক্রম করা যার প্রকাশ্য ঘোষণা দিতে আমরা প্রস্তুত নই, একটি অসদাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলাম এর শিক্ষা আমাদের দেয়নি।

৪৪. এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের কাছে যুদ্ধোপকরণ ও একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী (Standing Army) সর্বক্ষণ তৈরী থাকতে হবে। তাহলে প্রয়োজনের সময় সংগে সংগেই সামরিক পদক্ষেপ নেয়া সম্ভবপর হবে। এমন যেন না হয়, বিপদ মাথার ওপর এসে পড়ার পর হতবুদ্ধি হয়ে তাড়াতাড়ি স্বেচ্ছাসেবক, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য রসদপত্র যোগাড় করার চেষ্টা করা হবে এবং এভাবে প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন হতে হতেই শত্রু তার কাজ শেষ করে ফেলবে।

৪৫. অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বিষয়াদিতে তোমাদের কাপুরুষোচিত নীতি অবলম্বন করা উচিত নয়। বরং আল্লাহর ওপর ভরসা করে নির্ভীক ও সাহসী নীতি অবলম্বন করা উচিত। শত্রু সন্ধির কথা আলোচনা করতে চাইলে নিসংকোচে তার সাথে আলোচনার টেবিলে বসে যাবার জন্য তৈরী থাকা প্রয়োজন। সে সদুদ্দেশ্যে সন্ধি করতে চায় না বরং বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায়, এ অজুহাত দেখিয়ে তার সাথে আলোচনায় বসতে অস্বীকার করো না। কারোর নিয়েত নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভবপর নয়। সে যদি সত্যিই সন্ধি

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ
عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا
أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ
وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا
مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ
مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾

৯ রুকূ'

হে নবী! মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করো। তোমাদের মধ্যে বিশজন সবরকারী থাকলে তারা দু'শ জনের ওপর বিজয়ী হবে। আর যদি এমনি ধরনের একশ জন থাকে তাহলে তারা সত্য অস্বীকারকারীদের মধ্য থেকে এক হাজার জনের ওপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক ধরনের লোক যাদের বোধশক্তি নেই।[৪৭]

বেশ, এখন আল্লাহ তোমাদের বোঝা হাল্কা করে দিয়েছেন এবং তিনি জেনেছেন যে, এখনো তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। কাজেই যদি তোমাদের মধ্যে একশ জন সবরকারী হয় তাহলে তারা দু'শ জনের ওপর এবং এক হাজার লোক এমনি পর্যায়ের হলে তারা দু'হাজারের ওপর আল্লাহর হুকুমে বিজয়ী হবে।[৪৮] *আর আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।*

করার নিয়েত করে থাকে তাহলে অনর্থক তার নিয়েতের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে রক্তপাতকে দীর্ঘায়িত করবে কেন? আর যদি বিশ্বাসঘাতকতা করার নিয়েত করে থাকে তাহলে তোমাদের আল্লাহর ওপর ভরসা করে সাহসী হওয়া দরকার। সন্ধির জন্য যে হাত এগিয়ে এসেছে তার জবাবে হাত বাড়িয়ে দাও। এর ফলে তোমাদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে। আর যুদ্ধ করার জন্য যে হাত উঠবে নিজের তেজস্বী বাহু দিয়ে তাকে ভেংগে গুঁড়ো করে দাও। এভাবে সমুচিত জবাব দিতে পারলে কোন বিশ্বাসঘাতক জাতি আর তোমাদের ননীর পুতুল মনে করার দুঃসাহস দেখাবে না।

৪৬. আরববাসীদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছিলেন তাদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ব, স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা সৃষ্টি করে মহান আল্লাহ তাদেরকে একটি শক্তিশালী দলে পরিণত করেছিলেন, এখানে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথচ এ দলের ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন গোত্র

থেকে বের হয়ে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে শত শত বছর থেকে শত্রুতা চলে আসছিল। বিশেষ করে আল্লাহর এ মেহেরবানী তো আওস ও খাযরাজের ব্যাপারে ছিল সবচেয়ে বেশী সুস্পষ্ট। এ গোত্র দু'টি মাত্র দু'বছর আগেও পরস্পরের রক্তের পিয়াসী ছিল। ইতিহাসখ্যাত বুআস যুদ্ধ শেষ হয়েছিল তখনো খুব বেশী দিন হয়নি। এ যুদ্ধে আওস খাযরাজকে এবং খাযরাজ আওসকে যেন দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য মরণ পণ করেছিল। এ ধরনের মারাত্মক পর্যায়ের শত্রুতাকে মাত্র দু'তিন বছরের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বে ও ভ্রাতৃত্বে পরিণত করা এবং এসব পরস্পর বিরোধী অংশগুলোকে একত্র করে এমন একটি সীসা ঢালা প্রাচীরে পরিণত করা, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের ইসলামী দলটি—নিসন্দেহে সাধারণ মানবীয় শক্তির অসাধ্য ব্যাপার ছিল। অন্যদিকে পার্থিব উপকরণাদির সাহায্যে এত বড় মহান কার্য সম্পাদন সম্ভবপর ছিল না। কাজেই মহান আল্লাহ বলেন, আমার সাহায্য ও সমর্থনের এ বিরাট সুফল যখন তোমরা লাভ করতে পেরেছো তখন আগামীতেও তোমাদের দৃষ্টি পার্থিব কার্যকারণের ওপর নয় বরং আল্লাহর সমর্থনের ওপর নিবদ্ধ হওয়া উচিত। কারণ সবকিছুর সফলতা একমাত্র তাঁর মাধ্যমেই সম্ভব।

৪৭. আধুনিক পরিভাষায় যাকে আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্মতর শক্তি, নৈতিক শক্তি বা মনোবল (Morale) বলা হয় আল্লাহ তাকেই ফিক্‌হ, বোধ, উপলব্ধি, বুদ্ধি ও ধী-শক্তি (Understanding) বলেছেন। এ অর্থ ও ভাবধারা প্রকাশের জন্য এ শব্দটি আধুনিক পরিভাষার তুলনায় বেশী বিজ্ঞানসম্মত। যে ব্যক্তি নিজের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সঠিকভাবে সচেতন এবং ঠাণ্ডা মাথায় ভালভাবে ভেবে চিন্তে এ জন্য সংগ্রাম করতে থাকে যে, যে জিনিসের জন্য সে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে এসেছে তা তার ব্যক্তিগত জীবনের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান এবং তা নষ্ট হয়ে গেলে তার জন্য বেঁচে থাকা অর্থহীন হয়ে পড়বে, সে এ ধরনের চেতনা ও উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত একজন যোদ্ধার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী শক্তিশালী। যদিও শারীরিক শক্তির প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তারপর যে ব্যক্তি সত্যের জ্ঞান রাখে, যে ব্যক্তি নিজের অস্তিত্ব, আল্লাহর অস্তিত্ব, আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক এবং পার্থিব জীবনের তাৎপর্য, মৃত্যুর তাৎপর্য ও মৃত্যুর পরের জীবনের তাৎপর্য ভালভাবে উপলব্ধি করে এবং যে ব্যক্তি হক ও বাতিলের পার্থক্য আর এই সাথে বাতিলের বিজয়ের ফলাফল সম্পর্কেও সঠিকভাবে জ্ঞাত, তার শক্তির ধারে কাছেও এমন সব লোক পৌঁছতে পারবে না যারা জাতীয়তাবাদ, স্বাদেশিকতাবাদ বা শ্রেণী সংগ্রামের চেতনা নিয়ে কর্মক্ষেত্রে নেমে আসে। এ জন্যই বলা হয়েছে, একজন বোধশক্তি সম্পন্ন সজাগ মুমিন ও একজন কাফেরের মধ্যে সত্যের জ্ঞান ও সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই প্রকৃতিগতভাবে এক ও দশের অনুপাত সৃষ্টি হয়। কিন্তু শুধুমাত্র উপলব্ধি ও জ্ঞানের সাহায্যে এই অনুপাত প্রতিষ্ঠিত হয় না বরং সেই সাথে সবরের গুণও এর একটি অপরিহার্য শর্ত।

৪৮. এর অর্থ এ নয় যে, প্রথমে এক ও দশের অনুপাত ছিল এবং এখন যেহেতু তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা এসে গেছে তাই এক ও দুইয়ের অনুপাত কায়েম করা হয়েছে। বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, নীতিগত ও মানগতভাবে মুমিন ও কাফেরের মধ্যেতো এক ও দশেরই অনুপাত বিদ্যমান কিন্তু যেহেতু এখন তোমাদের নৈতিক প্রশিক্ষণ পূর্ণতা লাভ করেনি

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ
تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾
لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾ فَكُلُوا
مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٩﴾

সারা দেশে শত্রুদেরকে ভালভাবে পর্যুদস্ত না করা পর্যন্ত কোন নবীর পক্ষে নিজের কাছে বন্দীদের রাখা শোভনীয় নয়। তোমরা চাও দুনিয়ার স্বার্থ। অথচ আল্লাহর সামনে রয়েছে আখেরাত। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ। আল্লাহর লিখন যদি আগেই না লেখা হয়ে যেতো, তাহলে তোমরা যা কিছু করেছো সে জন্য তোমাদের কঠোর শাস্তি দেয়া হতো। কাজেই তোমরা যা কিছু সম্পদ লাভ করেছো তা খাও, কেননা, তা হালাল ও পাক-পবিত্র এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো।৪৯ নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

এবং এখনো তোমাদের চেতনা, উপলব্ধি ও অনুধাবন ক্ষমতা পরিপক্কতা অর্জন করেনি, তাই আপাতত সর্বনিম্ন মান ধরেই তোমাদের কাছে দাবী করা হচ্ছে যে, নিজেদের চাইতে দ্বিগুণ শক্তিধরদের বিরুদ্ধে লড়তে তো তোমাদের ইতস্তত করা উচিত নয়। মনে রাখতে হবে, ২য় হিজরীতে এ বক্তব্য উপস্থাপিত হয়। তখন মুসলমানদের মধ্যে বহু লোক সবেমাত্র নতুন নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তাদের প্রশিক্ষণ ছিল প্রাথমিক অবস্থায়। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে যখন তারা পরিপক্কতা অর্জন করলেন তখন প্রকৃতপক্ষে তাদের ও কাফেরদের মধ্যে এক ও দশের অনুপাতই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। বস্তুত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলের শেষের দিকে এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের বিভিন্ন যুদ্ধে বারবার এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

৪৯. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় টীকাকারগণ যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন তার মোদ্দা-কথা হচ্ছে ঃ বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের যেসব লোক বন্দী হয় তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করা হবে এ নিয়ে পরে পরামর্শ হয়। হযরত আবু বকর (রা) পরামর্শ দেন, ফিদিয়া (মুক্তিপণ) নিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়া হোক। হযরত উমর (রা) বলেন, তাদের হত্যা করা হোক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকরের (রা) মত গ্রহণ করেন এবং ফিদিয়া তথা বিনিময় মূল্য স্থিরীকৃত হয়ে যায়। এর ফলে মহান আল্লাহ তিরস্কার করে ও অসন্তোষ প্রকাশ করে এ আয়াত নাযিল করেন। কিন্তু তাফসীরকারগণ "আল্লাহর লিখন যদি আগেই লেখা না হয়ে যেতো" আয়াতের এ অংশের কোন যুক্তি সংগত ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। তারা বলেন, এখানে আল্লাহর তকদীরের কথা বলা হয়েছে অথবা আল্লাহ আগেভাগেই মুসলমানদের জন্য গনীমাতের মাল হালাল করে দেবার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট, যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়াতের বিধান প্রদানকারী

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٠﴾ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

১০ রুকূ'

হে নবী! তোমাদের হাতে যেসব বন্দী আছে তাদেরকে বলো, যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভাল কিছু দেখেন, তাহলে তিনি তোমাদের থেকে যা নেয়া হয়েছে তা থেকে অনেক বেশী দেবেন এবং তোমাদের ভুলগুলো মাফ করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। কিন্তু তারা যদি তোমার সাথে বিশ্বাস ভংগ করতে চায় তাহলে এর আগেও তারা আল্লাহর সাথে বিশ্বাস ভংগ করেছে, কাজেই এরি সাজা আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন, যার ফলে তারা তোমার করায়ত্ব হয়েছে। আর আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি জ্ঞানী।

অহীর মাধ্যমে কোন জিনিসের অনুমতি না দেয়া হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত তা গ্রহণ করা জায়েয হতে পারে না। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসহ সমগ্র ইসলামী জামায়াত এ ব্যাখ্যার কারণে গুনাহগার গণ্য হবে। "খবরে ওয়াহিদ" (অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী হাদীস) এর ওপর নির্ভর করে এ ধরনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করে নেয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার।

আমার মতে এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ বদরের যুদ্ধের আগে সূরা মুহাম্মাদে যুদ্ধ সম্পর্কে যে প্রাথমিক নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল ঃ

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ

"কাজেই যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকো তখন তাদের গর্দানে আঘাত করো। শেষে যখন তোমরা তাদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করবে তখন তাদের কষে বাঁধবে। তারপর হয় করুণা, নয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না যুদ্ধের অবসান ঘটে।"—সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৪

এ বক্তব্যে যুদ্ধবন্দীদের থেকে ফিদিয়া আদায় করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এই সংগে এ মর্মে শর্ত লাগানো হয়েছিল যে, প্রথমে শত্রুদের শক্তি ভালভাবে চূর্ণ করে দিতে হবে তারপর তাদের বন্দী করার কথা চিন্তা করতে হবে। এ ফরমান অনুযায়ী মুসলমানরা বদরে যেসব যুদ্ধ অপরাধীকে বন্দী করেছিল, তারপর তাদের কাছ থেকে যেসব

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ
آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ
يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ
قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

যারা ঈমান এনেছে, হিজরাত করেছে এবং আল্লাহর পথে নিজের জানমালের ঝুঁকি নিয়ে জিহাদ করেছে আর যারা হিজরাতকারীদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, আসলে তারাই পরস্পরের বন্ধু ও অভিভাবক। আর যারা ঈমান এনেছে ঠিকই কিন্তু হিজরাত করে (দারুল ইসলামে) আসেনি তারা হিজরাত করে না আসা পর্যন্ত তাদের সাথে তোমাদের বন্ধুত্বের ও অভিভাবকত্বের কোন সম্পর্ক নেই।[৫০] তবে হাঁ, দীনের ব্যাপারে যদি তারা তোমাদের কাছে সাহায্য চায় তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের জন্য ফরয। কিন্তু এমন কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয় যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে।[৫১] তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা দেখেন।

ফিদিয়া আদায় করেছিল তা অনুমতি মোতাবিক ছিল ঠিকই কিন্তু সেখানে ভুলটি ছিল এইঃ পূর্বাহ্নে "শত্রুর শক্তি ভালভাবে চূর্ণ করে দেবার" যে শর্তটি রাখা হয়েছিল তা পূর্ণ করার ব্যাপারে ত্রুটি দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধে কুরাইশ সেনারা যখন পালাতে শুরু করলো তখন মুসলমানদের অনেকেই গনীমাতের মাল লুটপাট করতে এবং কাফেরদের ধরে ধরে বাঁধতে লাগলো।। এ সময় খুব কম লোকই শত্রুদের পিছনে কিছু দূর পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল। অথচ মুসলমানরা যদি পূর্ণ শক্তিতে তাদেরকে ধাওয়া করতো তাহলে সেদিনই কুরাইশদের শক্তি নির্মূল হয়ে যেতো। এ জন্য আল্লাহ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আর এ ক্ষোভ নবীর ওপর নয় বরং মুসলমানদের ওপর। আল্লাহর এ মহান ফরমানের মর্ম হচ্ছে ঃ "তোমরা এখনো নবীর মিশন ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারোনি। ফিদিয়া ও গনীমাতের মাল আদায় করে অর্থভাণ্ডার ভরে তোলা নবীর আসল কাজ নয়। একমাত্র কুফরের শক্তির দম্ভ ভেঙে গুড়িয়ে দেয়ার কাজটিই তার উদ্দেশ্য ও লক্ষের সাথে সরাসরি সম্পর্ক রাখে। কিন্তু দুনিয়ার লোভ লালসা তোমাদের ওপর বারবার প্রাধান্য বিস্তার করে। প্রথমে তোমরা চাইলে শত্রুর মূল শক্তিকে এড়িয়ে বাণিজ্য কাফেলার ওপর আক্রমণ চালাতে। তারপর চাইলে শত্রুর মাথা গুঁড়িয়ে দেবার পরিবর্তে গনীমাতের মাল লুট করতে ও যুদ্ধ অপরাধীদের বন্দী করতে। আবার এখন গনীমাতের মাল নিয়ে ঝগড়া করতে শুরু করেছো। যদি আমি আগেই ফিদিয়া আদায় করার অনুমতি না দিয়ে দিতাম তাহলে তোমাদের এ

কার্যক্রমের জন্য তোমাদের কঠোর শাস্তি দিতাম। যা হোক এখন তোমরা যা কিছু নিয়েছো তা খেয়ে ফেলো কিন্তু আগামীতে এমন ধরনের আচরণ অবলম্বন করা থেকে দূরে থাকো যা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়।" এ ব্যাখ্যার ব্যাপারে আমি মত স্থির করে ফেলেছিলাম এমন সময় ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস তার আহকামুল কুরআন গ্রন্থে এ ব্যাখ্যাটিকে কমপক্ষে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন দেখে আমি আরো একটু বেশী মানসিক নিশ্চিন্ততা অনুভব করতে পেরেছি। তারপর সীরাতে ইবনে হিশামেও একটি রেওয়ায়াত দেখেছি। তাতে বলা হয়েছে, মুসলিম মুজাহিদরা যখন গনীমাতের মাল আহরণ করতে ও কাফেরদেরকে ধরে ধরে বেঁধে ফেলতে ব্যস্ত ছিলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সা'দ ইবনে মু'আযের (রা) চেহারায় কিছু বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "হে সা'দ! মনে হচ্ছে লোকদের এ কাজ তোমার পছন্দ হচ্ছে না।" তিনি জবাব দিলেন, "ঠিকই, হে আল্লাহর রসূল!, মুশরিকদের সাথে এ প্রথম যুদ্ধ এবং এ যুদ্ধে আল্লাহ তাদেরকে পরাজিত করেছেন। কাজেই এ সময় বন্দী করে তাদের প্রাণ বাঁচাবার চাইতে বরং তাদেরকে চরমভাবে গুঁড়িয়ে দিলেই বেশী ভাল হতো। (২য় খণ্ড, ২৮০–২৮১ পৃঃ)।

৫০. এ আয়াতটি ইসলামের সাংবিধানিক আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। এখানে একটি মূলনীতি নির্ধারিত হয়েছে। সেটি হচ্ছে, "অভিভাবকত্বের" সম্পর্ক এমন সব মুসলমানদের মধ্যে স্থাপিত হবে যারা দারুল ইসলামের বাসিন্দা অথবা বাইর থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামে এসেছে। আর যেসব মুসলমান ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার বাইরে বাস করে তাদের সাথে অবশ্যি ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিন্তু "অভিভাবকত্বের" সম্পর্ক থাকবে না। অনুরূপভাবে যেসব মুসলমান হিজরত করে দারুল ইসলামে আসবে না বরং দারুল কুফরের প্রজা হিসেবে দারুল ইসলামে আসবে তাদের সাথেও এ সম্পর্ক থাকবে না। অভিভাবকত্ব শব্দটিকে এখানে মূলে "ওয়ালায়াত" (ولايت) শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। আরবীতে "ওয়ালায়াত" বলতে সাহায্য, সহায়তা, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষকতা, মৈত্রী, বন্ধুত্ব, নিকট আত্মীয়তা, অভিভাবকত্ব এবং এ সবের সাথে সামঞ্জস্যশীল অর্থ বুঝায়। এ আয়াতের পূর্বাপর আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে এ থেকে এমন ধরনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বুঝানো হয়েছে, যা একটি রাষ্ট্রের তার নাগরিকদের সাথে, নাগরিকদের নিজেদের রাষ্ট্রের সাথে এবং নাগিরকদের নিজেদের মধ্যে বিরাজ করে। কাজেই এ আয়াতটি "সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব"কে ইসলামী রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়। এ সীমানার বাইরের মুসলমানদেরকে এ বিশেষ সম্পর্কের বাইরে রাখে। এ অভিভাবকত্ব না থাকার আইনগত ফলাফল অত্যন্ত ব্যাপক। এখানে এগুলোর বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। উদাহরণ হিসেবে শুধুমাত্র এতটুকু ইংগিত করাই যথেষ্ট হবে যে, এ অভিভাবকত্বহীনতার ভিত্তিতে এ দারুল কুফর ও দারুল ইসলামের মুসলমানরা পরস্পরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না এবং তারা একজন অন্যজনের আইনানুগ অভিভাবক (Guardian) হতে পারে না, পরস্পরের মধ্যে বিয়ে–শাদী করতে পারে না এবং দারুল কুফরের সাথে নাগরিকত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করেনি এমন কোন মুসলমানকে ইসলামী রাষ্ট্র নিজেদের কোন দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত করতে পারে না।[১]

১. এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন লেখকের "রাসায়েল ও মাসায়েল" ২য় খণ্ডের "দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরে মুসলমানদের মধ্যে উত্তরাধিকার ও বিয়ে–শাদীর সম্পর্ক" নিবন্ধটি।–অনুবাদক

তাছাড়া এ আয়াতটি ইসলামী রাষ্ট্রের বিদেশ নীতির ওপরও উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। এর দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে যেসব মুসলমান অবস্থান করে তাদের দায়িত্বই ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর বর্তায়। বাইরের মুসলমানদের কোন দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর বর্তায় না। একথাটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিম্নোক্ত হাদীসে বলেছেনঃ انا برى من كل مسلم بين ظهرا نى المشركين অর্থাৎ "আমার ওপর এমন কোন মুসলমানের সাহায্য সমর্থন ও হেফাজতের দায়িত্ব নেই যে মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে।" এভাবে সাধারণত যেসব বিবাদের কারণে আন্তর্জাতিক জটিলতা দেখা দেয়, ইসলামী আইন তার শিকড় কেটে দিয়েছে। কারণ যখনই কোন সরকার নিজের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে অবস্থানকারী কিছু সংখ্যালঘুর দায়িত্ব নিজের মাথায় নিয়ে নেয় তখনই এর কারণে এমন সব জটিলতা দেখা দেয় বার বার যুদ্ধের পরও যার কোন মীমাংসা হয় না।

৫১. এ আয়াতে দারুল ইসলামের বাইরে অবস্থানকারী মুসলমানদের "রাজনৈতিক অভিভাবকত্বের" সম্পর্ক মুক্ত গণ্য করা হয়েছিল। এখন এ আয়াতটি বলছে যে, তারা এ সম্পর্কের বাইরে অবস্থান করা সত্ত্বেও "ইসলামী ভ্রাতৃত্বের" সম্পর্কের বাইরে অবস্থান করছে না। যদি কোথাও তাদের ওপর জুলুম হতে থাকে এবং ইসলামী ভ্রাতৃ সমাজের সাথে সম্পর্কের কারণে তারা দারুল ইসলামের সরকারের ও তার অধিবাসীদের কাছে সাহায্য চায় তাহলে নিজেদের এ মজলুম ভাইদের সাহায্য করা তাদের জন্য ফরয হয়ে যাবে। কিন্তু এরপর আরো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, চোখ বন্ধ করে এসব দীনী ভাইয়ের সাহায্য করা যাবে না। বরং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরোপিত দায়িত্ব ও নৈতিক সীমারেখার প্রতি নজর রেখেই এ দায়িত্ব পালন করা যাবে। জুলুমকারী জাতির সাথে যদি ইসলামী রাষ্ট্রের চুক্তিমূলক সম্পর্ক থাকে তাহলে এ অবস্থায় এ চুক্তির নৈতিক দায়িত্ব ক্ষুণ্ন করে মজলুম মুসলমানদের কোন সাহায্য করা যাবে না।

আয়াতে চুক্তির জন্য "মীসাক" (ميثاق) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মূল হচ্ছে "ওসুক" (وثوق) । এর মানে আস্থা ও নির্ভরতা। এমন প্রত্যেকটি জিনিসকে "মীসাক" বলা হবে, যার ভিত্তিতে কোন জাতির সাথে আমাদের সুস্পষ্ট যুদ্ধ নয় চুক্তি না থাকলেও তারা প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী আমাদের ও তাদের মধ্যে কোন যুদ্ধ নেই এ ব্যাপারে যথার্থ আস্থাশীল হতে পারে।

তারপর আয়াতে বলা হয়েছে بينكم وبينهم ميثاق অর্থাৎ "তোমাদের ও তাদের মধ্যে চুক্তি থাকে" এ থেকে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে, ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার কোন অমুসলিম সরকারের সাথে যে চুক্তি স্থাপন করে তা শুধুমাত্র দু'টি সরকারের মধ্যকার সম্পর্ক নয় বরং দু'টি জাতির সম্পর্কও এবং মুসলমান সরকারের সাথে সাথে মুসলিম জাতি ও তার সদস্যরাও এর নৈতিক দায়িত্বের অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। মুসলিম সরকার অন্য দেশ বা জাতির সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করে ইসলামী শরীয়াত তার নৈতিক দায়িত্ব থেকে মুসলিম জাতি বা তার ব্যক্তিবর্গকে মুক্ত থাকাকে আদৌ বৈধ গণ্য করে না। তবে দারুল ইসলাম সরকারের চুক্তিগুলো মেনে চলার দায়িত্ব একমাত্র তাদের ওপর বর্তাবে যারা এ রাষ্ট্রের কর্মসীমার মধ্যে অবস্থান করবে। এ সীমার বাইরে বসবাসকারী সারা দুনিয়ার মুসলমানরা কোনক্রমেই এ দায়িত্বে শামিল হবে না। এ কারণেই হোদাইবিয়ায় নবী

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى
الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ﴿٧٣﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ
لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٤﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا
وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى
بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٥﴾

যারা সত্য অস্বীকার করেছে তারা পরস্পরের সাহায্য সহযোগিতা করে। যদি তোমরা এটা না করো তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা সৃষ্টি হবে ও বড় বিপর্যয় দেখা দেবে।[৫২]

যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর পথে বাড়ি-ঘর ত্যাগ করেছে ও জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য-সহায়তা করেছে তারাই সাচ্চা মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে ভুলের ক্ষমা ও সর্বোত্তম রিযিক। আর যারা পরে ঈমান এনেছে ও হিজরত করে এসেছে এবং তোমাদের সাথে মিলে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাচ্ছে তারাও তোমাদেরই অন্তরভুক্ত। কিন্তু আল্লাহর কিতাবে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ পরস্পরের বেশী হকদার।[৫৩] *অবশ্যি আল্লাহ সব জিনিস জানেন।*

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার কাফেরদের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন হযরত আবু বুসাইর ও আবু জান্দাল এবং অন্যান্য মুসলমানদের ওপর তার কোন দায়িত্ব অর্পিত হয়নি, যারা মদীনার দারুল ইসলামের প্রজা ছিলেন না।

৫২. সবচেয়ে কাছের বাক্যটির সাথে যদি এ বাক্যটির সম্পর্ক মেনে নেয়া হয় তাহলে এর অর্থ হবে, যেভাবে কাফেররা পরস্পরের সাহায্য-সমর্থন করে, তোমরা ঈমানদাররা যদি সেভাবে পরস্পরের সাহায্য-সমর্থন না করো তাহলে পৃথিবীতে বিরাট ফিত্না ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে যাবে। আর যদি ৭২ আয়াত থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত যতগুলো হেদায়াত দেয়া হয়েছে তার সবগুলোর সাথে যদি এর সম্পর্ক মেনে নেয়া হয় তাহলে এ উক্তির অর্থ হবে ঃ যদি দারুল ইসলামের মুসলমানরা পরস্পরের 'অলী' ও অভিভাবক না হয়, হিজরত করে যেসব মুসলমান দারুল ইসলামে আসেনি এবং যেসব মুসলমান দারুল কুফরে বসবাস করছে তাদেরকে যদি দারুল ইসলামের অধিবাসীরা নিজেদের রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব বহির্ভূত মনে না করে, যদি বাইরের মজলুম মুসলমানদের সাহায্য চাওয়ার

পর তাদের সাহায্য না করা হয়, আর যদি এ সংগে যে জাতির সাথে মুসলমানদের চুক্তি থাকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্যের আবেদনকারী মুসলমানদের সাহায্য না করার নীতিও না মেনে চলা হয় এবং যদি মুসলমানরা কাফেরদের সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক খতম না করে, তাহলে পৃথিবীতে বিরাট ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।

৫৩. এর মানে হচ্ছে, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে তাদের পরস্পরের উত্তরাধিকার বন্টন করা হবে না। বংশধারা ও বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে যেসব অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় দীনী ভাইরা পরস্পরের ব্যাপারে সেসব অধিকারও লাভ করবে না। এসব ব্যাপারে ইসলামী সম্পর্কের পরিবর্তে আত্মীয়তার সম্পর্কই আইনগত অধিকারের ভিত্তির কাজ করবে। হিজরতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন কায়েম করেছিলেন তার ফলে এ দীনী ভাইরা পরস্পরের ওয়ারিসও হবে বলে কেউ কেউ ভাবতে শুরু করেছিলেন। তাদের এ ভাবনা যে ঠিক নয়, তা বুঝাবার জন্য আল্লাহ একথা বলেছেন।

আত্ তাওবা

৯

নামকরণ

এ সূরাটি দু'টি নামে পরিচিত ঃ আত্ তাওবাহ ও আল বারাআত্। তাওবা নামকরণের কারণ, এ সূরার এক জায়গায় কতিপয় ঈমানদারের গোনাহ মাফ করার কথা বলা হয়েছে। আর এর শুরুতে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করা হয়েছে বলে একে বারাআত (অর্থাৎ সম্পর্কচ্ছেদ) নামে অভিহিত করা হয়েছে।

বিসমিল্লাহ্ না লেখার কারণ

এ সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম লেখা হয় না। মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু মতভেদ ঘটেছে। তবে এ প্রসংগে ইমাম রাযীর বক্তব্যটিই সঠিক। তিনি লিখেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এর শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখাননি, কাজেই সাহাবায়ে কেরামও লেখেননি এবং পরবর্তী লোকেরাও এ রীতির অনুসরণ অব্যাহত রেখেছেন। পবিত্র কুরআন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হুবহু ও সামান্যতম পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়াই গ্রহণ করা হয়েছিল এবং যেভাবে তিনি দিয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই তাকে সংরক্ষণ করার জন্য যে সর্বোচ্চ পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, এটি তার আর একটি প্রমাণ।

নাযিলের সময়-কাল ও সূরার অংশসমূহ

এ সূরাটি তিনটি ভাষণের সমষ্টি। প্রথম ভাষণটি সূরার প্রথম থেকে শুরু হয়ে পঞ্চম রুকূ'র শেষ অবধি চলেছে। এর নাযিলের সময় হচ্ছে ৯ হিজরীর যিলকাদ মাস বা তার কাছাকাছি সময়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে বছর হযরত আবু বকরকে (রা) আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করে মক্কায় রওয়ানা দিয়েছিলেন। এমন সময় এ ভাষণটি নাযিল হয়। তিনি সংগে সংগেই হযরত আলীকে (রা) তাঁর পিছে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে হজ্জের সময় সারা আরবের প্রতিনিধিত্বশীল সমাবেশে তা শুনানো হয় এবং সে অনুযায়ী যে কর্মপদ্ধতি নির্দেশিত হয়েছিল তা ঘোষণা করা যায়।

দ্বিতীয় ভাষণটি ৬ রুকূ'র শুরু থেকে ৯ রুকূ'র শেষ পর্যন্ত চলেছে। এটি ৯ হিজরীর রজব মাসে বা তার কিছু আগে নাযিল হয়। সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এখানে মুমিনদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আর যারা মুনাফিকী বা দুর্বল ঈমান অথবা কুড়েমি ও অলসতার কারণে আল্লাহর পথে

ধন-প্রাণের ক্ষতি বরদাশত করার ব্যাপারে টালবাহানা করছিল তাদেরকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে।

তৃতীয় ভাষণটি ১০ রুকূ' থেকে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর এ অংশটি নাযিল হয়। এর মধ্যে এমনও অনেকগুলো খণ্ডিত অংশ রয়েছে যেগুলো ঐ দিনগুলোতে বিভিন্ন পরিবেশে নাযিল হয় এবং পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর ইংগিতে সেগুলো সব একত্র করে একই ধারাবাহিক ভাষণের সাথে সংযুক্ত করে দেন। কিন্তু যেহেতু সেগুলো একই বিষয়বস্তু ও একই ঘটনাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট তাই ভাষণের ধারাবাহিকতা কোথাও ব্যাহত হতে দেখা যায় না। এখানে মুনাফিকদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। তাবুক যুদ্ধে যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন তাদেরকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করা হয়েছে। আর যে সাচ্চা ঈমানদার লোকেরা নিজেদের ঈমানের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান ছিলেন ঠিকই কিন্তু আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলেন তিরস্কার করার সাথে সাথে তাদের ক্ষমার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

আয়াতগুলো যে পর্যায়ক্রমিক ধারায় নাযিল হয়েছে তার প্রেক্ষিতে প্রথম ভাষণটি সবশেষে বসানো উচিত ছিল। কিন্তু বিষয়বস্তুর গুরুত্বের দিক দিয়ে সেটিই ছিল সবার আগে। এ জন্য কিতাব আকারে সাজাবার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে প্রথমে রাখেন এবং অন্য ভাষণ দু'টিকে তার পরে রাখেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

নাযিলের সময়-কাল নির্ধারিত হবার পর এ সূরার ঐতিহাসিক পটভূমির ওপর একটু দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। এ সূরার বিষয়বস্তুর সাথে যে ঘটনা পরম্পরার সম্পর্ক রয়েছে, তার সূত্রপাত ঘটেছে হোদাইবিয়ার সন্ধি থেকে। হোদাইবিয়া পর্যন্ত ছ' বছরের অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ফলে আরবের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ এলাকায় ইসলাম একটি সুসংগঠিত ও সংঘবদ্ধ সমাজের ধর্ম, একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। হোদাইবিয়ার চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর এ ধর্ম বা দীন আরো বেশী নিরাপদ ও নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশে চারদিকে প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পেয়ে যায়।[১] এরপর ঘটনার গতিধারা দু'টি বড় বড় খাতে প্রবাহিত হয়। আরো সামনে অগ্রসর হয়ে ঐ দু'টি খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। এর মধ্যে একটির সম্পর্ক ছিল আরবের সাথে এবং অন্যটির রোম সাম্রাজ্যের সাথে।

আরব বিজয়

হোদাইবিয়ার সন্ধির পর আরবে ইসলামের প্রচার, প্রসারের জন্য এবং ইসলামী শক্তি সুসংহত করার জন্য যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তার ফলে মাত্র দু'বছরের মধ্যেই ইসলামের প্রভাব বলয় এত বেড়ে যায় এবং তার শক্তি এতটা পরাক্রান্ত ও প্রতাপশালী

১. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা মায়েদা ও সূরা ফাত্হ-এর ভূমিকা।

হয়ে ওঠে যে, পুরাতন জাহেলিয়াত তার মোকাবিলায় অসহায় ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। অবশেষে কুরাইশদের অতি উৎসাহী লোকেরা নিজেদের পরাজয় আসন্ন দেখে আর সংযত থাকতে পারেনি। তারা হোদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে। এ সন্ধির বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে একটা চূড়ান্ত যুদ্ধ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু এ চুক্তি ভংগের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে আর গুছিয়ে নেবার কোন সুযোগ দেননি। তিনি ৮ হিজরীর রমযান মাসে আকস্মিকভাবে মক্কা আক্রমণ করে তা দখল করে নেন।[১] এরপর প্রাচীন জাহেলী শক্তি হোনায়েনের ময়দানে তাদের শেষ মরণকামড় দিতে চেষ্টা করে। সেখানে হাওয়াযিন, সাকীফ, নদর, জুসাম এবং অন্যান্য কতিপয় জাহেলিয়াতপন্থী গোত্র তাদের পূর্ণ শক্তির সমাবেশ ঘটায়। এভাবে তারা মক্কা বিজয়ের পর যে সংস্কারমূলক বিপ্লবটি পূর্ণতার পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল তার পথ রোধ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু তাদের এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। হোনায়েন যুদ্ধে তাদের পরাজয়ের সাথে সাথেই আরবের ভাগ্যের চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যায়। আর এ ফায়সালা হচ্ছে, আরবকে এখন দারুল ইসলাম হিসেবেই টিকে থাকতে হবে। এ ঘটনার পর পুরো এক বছর যেতে না যেতেই আরবের বেশীর ভাগ এলাকার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। এ অবস্থায় জাহেলী ব্যবস্থার শুধুমাত্র কতিপয় বিচ্ছিন্ন লোক দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। উত্তরে রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তে সে সময়ে যেসব ঘটনা ঘটে চলছিল তা ইসলামের এ সম্প্রসারণ ও বিজয়কে পূর্ণতায় পৌছুতে আরো বেশী করে সাহায্য করে। সেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দুঃসাহসিকতার সাথে ৩০ হাজারের বিরাট বাহিনী নিয়ে যান এবং রোমীয়রা যেভাবে তাঁর মুখোমুখি হবার ঝুঁকি না নিয়ে পিঠটান দিয়ে নিজেদের দুর্বলতার প্রকাশ ঘটায় তাতে সারা আরবে তাঁর ও তাঁর দীনের অপ্রতিরোধ্য প্রতাপ ও অজেয় ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এর ফলশ্রুতিতে তাবুক থেকে ফিরে আসার সাথে সাথেই তাঁর কাছে একের পর এক প্রতিনিধি দল আসতে থাকে আরবের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকা থেকে। তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাঁর বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করে।[২] এ অবস্থাটিকেই কুরআনে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا

"যখন আল্লাহর সাহায্য এসে গেলো ও বিজয় লাভ হলো এবং তুমি দেখলে লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করছে।"

তাবুক অভিযান

মক্কা বিজয়ের আগেই রোম সাম্রাজ্যের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছিল। হোদাইবিয়ার সন্ধির পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে

১. সূরা আনফালের ৪৩ টীকা দেখুন।

২.মুহাদ্দিসগণ এ প্রসংগে যেসব গোত্র, সরদার, আমীর ও বাদশাহদের প্রতিনিধি দলের নাম উল্লেখ করেছেন তাদের সংখ্যা ৭০ পর্যন্ত পৌছে। এরা আরবের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম সব এলাকা থেকেই এসেছিল।

আরবের বিভিন্ন অংশে যেসব প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি দল গিয়েছিল উত্তর দিকে সিরিয়া সীমান্তের লাগোয়া গোত্রগুলোর মধ্যে। তাদের বেশীর ভাগ ছিল খৃষ্টান এবং রোম সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন। তারা 'যাতুত্ তালাহ' (অথবা যাতু-আত্লাহ) নামক স্থানে ১৫ জন মুসলমানকে হত্যা করে। কেবলমাত্র প্রতিনিধি দলের নেতা হযরত কা'ব ইবনে উমাইর গিফারী প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। একই সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুসরার গবর্ণর শুরাহ্বীল ইবনে 'আমরের নামেও দাওয়াত নামা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেও তাঁর দূত হারেস ইবনে উমাইরকে হত্যা করে। এ সরদারও ছিল খৃষ্টান এবং সরাসরি রোমের কাইসারের হুকুমের অনুগত। এসব কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৮ হিজরীর জমাদিউল উলা মাসে তিন হাজার মুজাহিদদের একটি সেনাবাহিনী সিরিয়া সীমান্তের দিকে পাঠান। ভবিষ্যতে এ এলাকাটি যাতে মুসলমানদের জন্য নিরাপদ হয়ে যায় এবং এখানকার লোকেরা মুসলমানদেরকে দুর্বল মনে করে তাদের ওপর জুলুম ও বাড়াবাড়ি করার সাহস না করে, এ-ই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এ সেনাদলটি মা'আন নামক স্থানের কাছে পৌঁছার পর জানা যায়, শুরাহবীল ইবনে আমর এক লাখ সেনার একটি বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের মোকাবিলায় আসছে। ওদিকে রোমের কাইসার হিমস নামক স্থানে সশরীরে উপস্থিত। তিনি নিজের ভাই থিয়োডরের নেতৃত্বে আরো এক লাখের একটি সেনাবাহিনী রওয়ানা করে দেন। কিন্তু এসব আতংকজনক খবরাখবর পাওয়ার পরও তিন হাজারের এ প্রাণোৎসর্গী ছোট্ট মুজাহিদ বাহিনীটি অগ্রসর হতেই থাকে। অবশেষে তারা মুতা নামক স্থানে শুরাহবীলের এক লাখের বিরাট বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ অসম সাহসিকতা দেখানোর ফলে মুসলিম মুজাহিদদের পিষ্ট হয়ে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সারা আরব দেশ এবং সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দেখলো যে, এক ও তেত্রিশের এ মোকাবিলায়ও কাফেররা মুসলমানদের ওপর বিজয়ী হতে পারলো না। এ জিনিসটিই সিরিয়া ও তার সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী আধা স্বাধীন আরব গোত্রগুলোকে এমনকি ইরাকের নিকটবর্তী এলাকায় বসবাসকারী পারস্য সম্রাটের প্রভাবাধীন নজ্দী গোত্রগুলোকেও ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করে। তাদের হাজার হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করে। বনী সুলাইম (আব্বাস ইবনে মিরদাস সুলামী ছিলেন তাদের সরদার), আশজা, গাত্ফান, যুব্ইয়ান ও ফাযারাহ গোত্রের লোকেরা এ সময়ই ইসলাম গ্রহণ করে। এ সময়ই রোম সাম্রাজ্যের আরবীয় সৈন্য দলের একজন সেনাপতি ফারওয়া ইবনে আমর আলজুযামী মুসলমান হন। তিনি নিজের ঈমানের এমন অকাট্য প্রমাণ পেশ করেন, যা দেখে আশেপাশের সব এলাকার লোকেরা বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে পড়ে। ফারওয়ার ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে কাইসার তাঁকে গ্রেফতার করিয়ে নিজের দরবারে আনেন। তাঁকে দু'টি জিনিসের মধ্যে যে কোন একটি নির্বাচন করার ইখতিয়ার দেন। তাঁকে বলেন, ইসলাম ত্যাগ করো। তাহলে তোমাকে শুধু মুক্তিই দেয়া হবে না বরং আগের পদমর্যাদাও বহাল করে দেয়া হবে। অথবা মুসলমান থাকো। কিন্তু এর ফলে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। তিনি ধীর স্থিরভাবে চিন্তা করে ইসলামকে নির্বাচিত করেন এবং সত্যের পথে প্রাণ বিসর্জন দেন। এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে কাইসার তার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে উদ্ভূত এক ভয়াবহ 'হুমকির' স্বরূপ উপলব্ধি করেন, যা আরবের মাটিতে সৃষ্ট হয়ে তার সাম্রাজ্যের দিকে ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছিল।

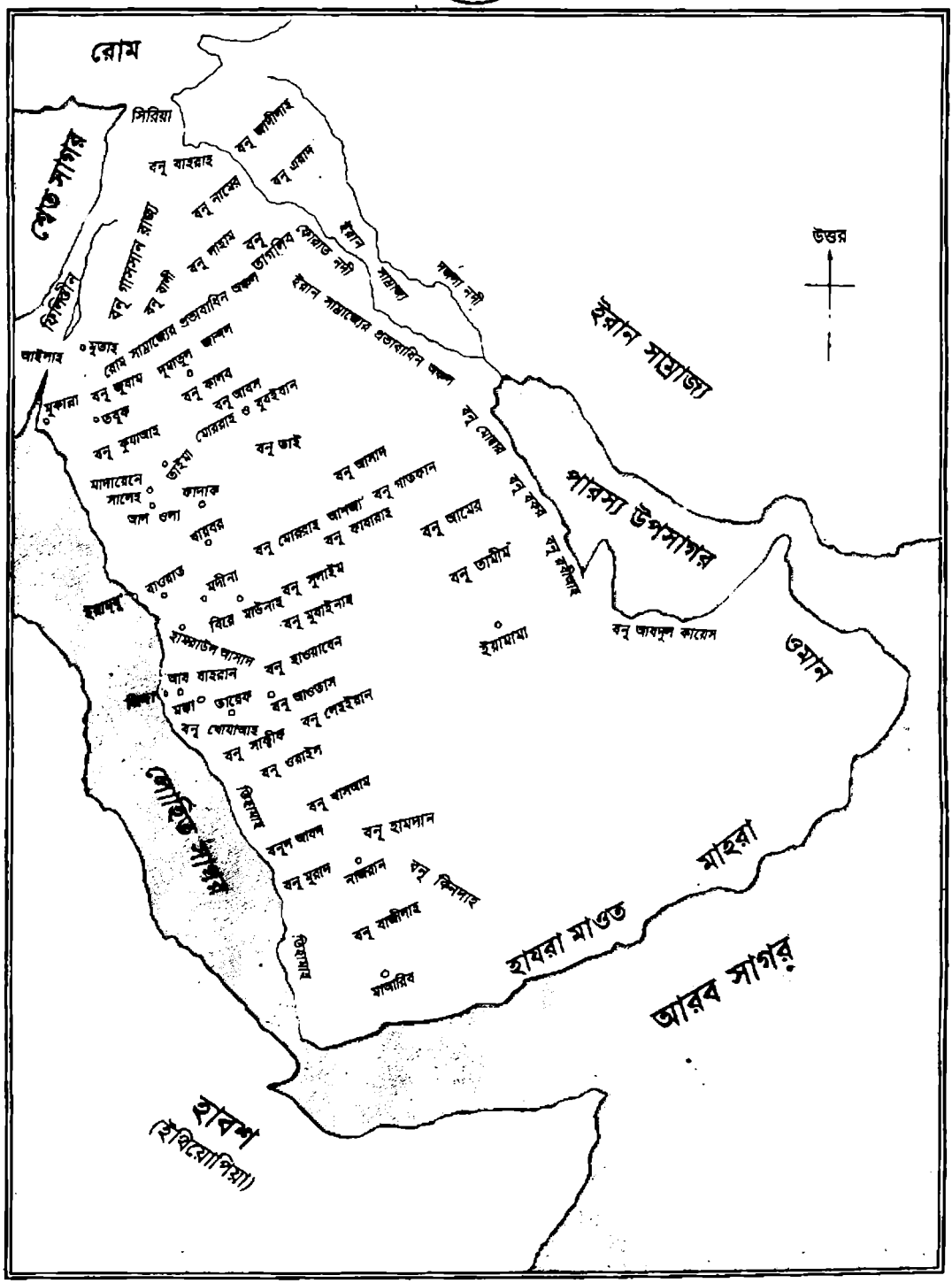

তাবুক যুদ্ধকালীন অবস্থায় আরবের চিত্র

পরের বছর কাইসার মুসলমানদের মূতা যুদ্ধের শাস্তি দেবার জন্য সিরিয়া সীমান্তে সামরিক প্রস্তুতি শুরু করে দেন। তার অধীনে গাসসানী ও অন্যান্য আরব সরদাররা সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে বেখবর ছিলেন না। একেবারেই নগণ্য ও তুচ্ছ যেসব ব্যাপার ইসলামী আন্দোলনের ওপর সামান্যতমও অনুকূল বা প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তার প্রত্যেকটি সম্পর্কে তিনি সর্বক্ষণ সচেতন ও সতর্ক থাকতেন। এ প্রস্তুতিগুলোর অর্থ তিনি সংগে সংগেই বুঝে ফেলেন। কোন প্রকার ইতস্তত না করেই কাইসারের বিশাল বিপুল শক্তির সাথে তিনি সংঘর্ষে লিপ্ত হবার ফায়সালা করে ফেলেন। এ সময় সামান্যতমও দুর্বলতা দেখানো হলে এতদিনকার সমস্ত মেহনত ও কাজ বরবাদ হয়ে যেতো। একদিকে হোনায়েনে আরবের যে ক্ষয়িষ্ণু ও মুমূর্ষু জাহেলিয়াতের বুকে সর্বশেষ আঘাত হানা হয়েছিল তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো এবং অন্যদিকে মদীনার যে মুনাফিকরা আবু আমের রাহেবের মধ্যস্থতায় গাসসানের খ্রীষ্টান বাদশাহ এবং স্বয়ং কাইসারের সাথে গোপন যোগসাজশে লিপ্ত হয়েছিল। উপরন্তু যারা নিজেদের দুষ্কর্মের ওপর দীনদারীর প্রলেপ লাগাবার জন্য মদীনার সংলগ্ন এলাকায় "মসজিদে দ্বিরার" (ইসলামী মিল্লাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে তৈরী মসজিদ) নির্মাণ করেছিল, তারা পিঠে ছুরি বসিয়ে দিতো। সামনের দিক থেকে কাইসার আক্রমণ করতে আসছিল। ইরানীদের পরাজিত করার পর দূরের ও কাছের সব এলাকায় তার দোর্দণ্ড প্রতাপ ও দাপট ছড়িয়ে পড়েছিল। এ তিনটি ভয়ংকর বিপদের সম্মিলিত আক্রমণের মুখে ইসলামের অর্জিত বিজয় অকস্মাত পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারতো। তাই, যদিও দেশে দুর্ভিক্ষ চলছিল, আবহাওয়া ছিল প্রচণ্ড গরম, ফসল পাকার সময় কাছে এসে গিয়েছিল, সওয়ারী ও সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার ছিল। অর্থের অভাব ছিল প্রকট এবং দুনিয়ার দু'টি বৃহত্তম শক্তির একটির মোকাবিলা করতে হচ্ছিল ; তবুও আল্লাহর নবী এটাকে সত্যের দাওয়াতের জন্য জীবন-মৃত্যুর ফায়সালা করার সময় মনে করে এ অবস্থায়ই যুদ্ধ প্রস্তুতির সাধারণ ঘোষণা জারি করে দেন। এর আগের সমস্ত যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কাউকে বলতেন না কোন্‌দিকে যাবেন এবং কার সাথে মোকাবিলা করতে হবে। বরং মদীনা থেকে বের হবার পরও অভীষ্ট মনযিলের দিকে যাবার সোজা পথ না ধরে তিনি অন্য বাঁকা পথ ধরতেন। কিন্তু এবার তিনি এ আবরণটুকুও রাখলেন না। এবার পরিষ্কার বলে দিলেন যে, রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং সিরিয়ার দিকে যেতে হবে।

এ সময়টি যে অত্যন্ত নাজুক ছিল তা আরবের সবাই অনুভব করছিল। প্রাচীন জাহেলিয়াতের প্রেমিকদের মধ্যে যারা তখনো বেঁচে ছিল তাদের জন্য এটি ছিল শেষ আশার আলো। রোম ও ইসলামের এ সংঘাতের ফলাফল কি দাঁড়ায় সে দিকেই তারা অধীর আগ্রহে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছিল। কারণ তারা নিজেরাও জানতো, এরপর আর কোথাও কোন দিক থেকেই আশার সামান্যতম ঝলকও দেখা দেবার কোন সম্ভাবনা নেই। মুনাফিকরাও এরি পেছনে তাদের শেষ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছিল। তারা নিজেদের "মসজিদে দ্বিরার" বানিয়ে নিয়েছিল। এরপর অপেক্ষা করছিল, সিরিয়ার যুদ্ধে ইসলামের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটা মাত্রই তারা দেশের ভেতরে গোমরাহী ও অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দেবে। এখানেই শেষ নয়, বরং তারা তাবুকের এ অভিযানকে ব্যর্থ করার জন্য সম্ভাব্য

সব রকমের কৌশলও অবলম্বন করে। এদিকে নিষ্ঠাবান মুসলমানরাও পুরোপুরি অনুভব করতে পেরেছিলেন, যে আন্দোলনের জন্য বিগত ২২টি বছর ধরে তারা প্রাণপাত করে এসেছেন বর্তমানে তার ভাগ্যের চূড়ান্ত ফায়সালা হবার সময় এসে পড়েছে। এ সময় সাহস দেখাবার অর্থ দাঁড়ায়, সারা দুনিয়ার ওপর এ আন্দোলনের বিজয়ের দরজা খুলে যাবে। অন্যদিকে এ সময় দুর্বলতা দেখাবার অর্থ দাঁড়ায়, খোদ আরব দেশেও একে পাত্তাড়ি গুটিয়ে ফেলতে হবে। কাজেই এ অনুভূতি সহকারে সত্যের নিবেদিত প্রাণ সিপাহীরা চরম উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম যোগাড় করার ব্যাপারে প্রত্যেকেই নিজের সামর্থের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে অংশগ্রহণ করেন। হযরত উসমান (রা) ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) বিপুল অর্থ দান করেন। হযরত উমর (রা) তাঁর সারা জীবনের উপার্জনের অর্ধেক এনে রেখে দেন। হযরত আবু বকর (রা) তাঁর সঞ্চিত সম্পদের সবটাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করেন। গরীব সাহাবীরা মেহনত মজদুরী করে যা কামাই করতে পেরেছিলেন তার সবটুকু উৎসর্গ করেন। মেয়েরা নিজেদের গহনা খুলে নযরানা পেশ করেন। চারদিক থেকে দলে দলে আসতে থাকে প্রাণ উৎসর্গকারী স্বেচ্ছাসেবকদের বাহিনী। তারা আবেদন জানান, বাহন ও অস্ত্র শস্ত্রের ব্যবস্থা হয়ে গেলে আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত। যারা সওয়ারী পেতেন না তারা কাঁদতে থাকতেন। তারা এমনভাবে নিজেদের আন্তরিকতা ও মানসিক অস্থিরতা প্রকাশ করতে থাকতেন যার ফলে রাসূলে পাকের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো। এ ঘটনাটি কার্যত মুমিন ও মুনাফিক চিহ্নিত করার একটি মানদণ্ডে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি এ সময় কোন ব্যক্তি পেছনে থেকে যাওয়ার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, ইসলামের সাথে তার সম্পর্কের দাবী সত্য কিনা সেটাই সন্দেহজনক হয়ে পড়তো। কাজেই তাবুকের পথে যাওয়ার সময় সফরের মধ্যে যেসব ব্যক্তি পেছনে থেকে যেতো সাহাবায়ে কেরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তাদের খবর পৌঁছিয়ে দিতেন। এর জবাবে তিনি সংগে সংগেই স্বতস্ফূর্তভাবে বলে ফেলতেন ঃ

دعوه فان يك فيه خير فسيلحقه الله بكم ، وان يك غير ذلك فقد اراحكم الله منه -

"যেতে দাও, যদি তার মধ্যে ভালো কিছু থেকে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাকে আবার তোমাদের সাথে মিলিয়ে দেবেন। আর যদি অন্য কোন ব্যাপার হয়ে থাকে, তাহলে শোকর করো যে, আল্লাহ তার ভণ্ডামীপূর্ণ সাহচর্য থেকে তোমাদের বাঁচিয়েছেন।"

৯ হিজরীর রজব মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৩০ হাজারের মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার পথে রওয়ানা হন। তাঁর সাথে ছিল দশ হাজার সওয়ার। উটের সংখ্যা এত কম ছিল যে, এক একটি উটের পিঠে কয়েক জন পালাক্রমে সওয়ার হতেন। এর ওপর ছিল আবার গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা। পানির স্বল্পতা সৃষ্টি করেছিল আরো এক বাড়তি সমস্যা। কিন্তু এ নাজুক সময়ে মুসলমানরা যে সাচ্চা ও দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দেন তার ফল তারা তাবুকে পৌঁছে হাতে হাতে পেয়ে যান। সেখানে পৌঁছে তারা জানতে পারেন, কাইসার ও তার অধীনস্থরা সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার পরিবর্তে নিজেদের সেনা বাহিনী সীমান্ত থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। এখন এ সীমান্তে আর কোন দুশমন নেই। কাজেই

এখানে যুদ্ধেরও প্রয়োজন নেই। সীরাত রচয়িতারা এ ঘটনাটিকে সাধারণত এমনভাবে লিখে গেছেন যাতে মনে হবে যেন সিরিয়া সীমান্তে রোমীয় সৈন্যদের সমাবেশ সম্পর্কে যে খবর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে তা আদতে ভুলই ছিল। অথচ আসল ঘটনা ছিল এই যে, কাইসার সৈন্য সমাবেশ ঠিকই শুরু করেছিল। কিন্তু তার প্রস্তুতি শেষ হবার আগেই যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোকাবিলা করার জন্য পৌঁছে যান তখন সে সীমান্ত থেকে সৈন্য সরিয়ে নেয়া ছাড়া আর কোন পথ দেখেনি। মুতার যুদ্ধে এক লাখের সাথে ৩ হাজারের মোকাবিলার যে দৃশ্য সে দেখেছিল তারপর খোদ নবী করীমের (সা) নেতৃত্বে ৩০ হাজারের যে বাহিনী এগিয়ে আসছিল সেখানে লাখ দু'লাখ সৈন্য মাঠে নামিয়ে তার সাথে মোকাবিলা করার হিম্মত তার ছিল না।

কাইসারের এভাবে পিছু হটে যাওয়ার ফলে যে নৈতিক বিজয় লাভ হলো, এ পর্যায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যথেষ্ট মনে করেন। তিনি তাবুক থেকে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সিরিয়া সীমান্তে প্রবেশ করার পরিবর্তে এ বিজয় থেকে যত দূর সম্ভব রাজনৈতিক ও সামরিক ফায়দা হাসিল করাকেই অগ্রাধিকার দেন। সে জন্যই তিনি তাবুকে ২০ দিন অবস্থান করে রোম সাম্রাজ্য ও দারুল ইসলামের মধ্যবর্তী এলাকায় যে বহু সংখ্যক ছোট ছোট রাজ্য এতদিন রোমানদের প্রভাবাধীনে ছিল। সামরিক চাপ সৃষ্টি করে তাদেরকে ইসলামী সাম্রাজ্যের অনুগত করদ রাজ্যে পরিণত করেন। এভাবে দুমাতুল জান্‌দালের খৃষ্টান শাসক উকাইদির ইবনে আবদুল মালিক কিন্‌দী, আইলার খৃষ্টান শাসক ইউহান্না ইবনে রুবাহ এবং অনুরূপ মাকনা, জারবা ও আযরূহের খৃষ্টান শাসকরাও জিযিয়া দিয়ে মদীনার বশ্যতা স্বীকার করে। এর ফলে ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানা সরাসরি রোম সাম্রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়। রোম সম্রাটরা যেসব আরব গোত্রকে এ পর্যন্ত আরবদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে আসছিল এখন তাদের বেশীর ভাগই রোমানদের মোকাবিলায় মুসলমানদের সহযোগী হয়ে গেল। এভাবে রোম সাম্রাজ্যের সাথে একটি দীর্ঘ মেয়াদী সংঘর্ষে লিপ্ত হবার আগে ইসলাম সমগ্র আরবের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ ও বাঁধন মজবুত করে নেবার পূর্ণ সুযোগ পেয়ে যায়। এটাই হয় এ ক্ষেত্রে তার সবচেয়ে বড় লাভ। এতদিন পর্যন্ত যারা প্রকাশ্যে মুশরিকদের দলভুক্ত থেকে অথবা মুসলমানদের দলে যোগদান করে পরদার অন্তরালে মুনাফিক হিসেবে অবস্থান করে প্রাচীন জাহেলীয়াতের পুনর্বহালের আশায় দিন গুণছিল তাবুকের এ বিনা যুদ্ধে বিজয় লাভের ঘটনা তাদের কোমর ভেংগে দেয়। এ সর্বশেষ ও চূড়ান্ত হতাশার ফলে তাদের অধিকাংশের জন্য ইসলামের কোলে আশ্রয় নেয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আর যদি বা তাদের নিজেদের ইসলামের নিয়ামতলাভের সুযোগ নাও থেকে থাকে, তবে কমপক্ষে তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য সম্পূর্ণরূপে ইসলামের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না। এরপর একটি নামমাত্র সংখ্যালঘু গোষ্ঠী তাদের শিরক ও জাহেলী কার্যক্রমে অবিচল থাকে। কিন্তু তারা এত বেশী হীনবল হয়ে পড়ে যে, ইসলামের যে সংস্কারমূলক বিপ্লবের জন্য আল্লাহ তাঁর নবীকে পাঠিয়েছিলেন তার পূর্ণতা সাধনের পথে তারা সামান্যতমও বাধা সৃষ্টি করতে সমর্থ ছিল না।

আলোচ্য বিষয় ও সমস্যাবলী

এ পটভূমি সামনে রেখে আমরা সে সময় যেসব বড় বড় সমস্যা দেখা দিয়েছিল এবং সূরা তাওবায় যেগুলো আলোচিত হয়েছে, সেগুলো সহজেই চিহ্নিত করতে পারি। সেগুলো হচ্ছে।

১। এখন যেহেতু সমগ্র আরবের শাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে মুমিনদের হাতে এসে গিয়েছিল এবং সমস্ত প্রতিবন্ধক শক্তি নির্জীব ও নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল, তাই আরবদেশকে পূর্ণাঙ্গ দারুল ইসলামে পরিণত করার জন্য যে নীতি অবলম্বন করা অপরিহার্য ছিল তা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করতে আর বিলম্ব করা চলে না। তাই নিম্নোক্ত আকারে তা পেশ করা হয় ঃ

(ক) আরব থেকে শিরককে চূড়ান্তভাবে নির্মূল করতে হবে। প্রাচীন মুশরিকী ব্যবস্থাকে পুরোপুরি খতম করে ফেলতে হবে। ইসলামের কেন্দ্র যেন চিরকালের জন্য নির্ভেজাল ইসলামী কেন্দ্রে পরিণত হয়ে যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। অন্য কোন অনৈসলামী উপাদান যেন সেখানকার ইসলামী মেজায ও প্রকৃতিতে অনুপ্রবেশ করতে এবং কোন বিপদের সময় আভ্যন্তরীণ ফিত্নার কারণ হতে না পারে। এ উদ্দেশ্যে মুশরিকদের সাথে সব রকমের সম্পর্ক ছিন্ন করার এবং তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিসমূহ বাতিল করার কথা ঘোষণা করা হয়।

(খ) কাবা ঘরের ব্যবস্থাপনা মুমিনদের হাতে এসে যাবার পর, একান্তভাবে আল্লাহর বন্দেগী করার জন্য উৎসর্গীত সেই ঘরটিতে আবারো আগের মত মূর্তিপূজা হতে থাকবে এবং তার পরিচালনা ও পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব এখনো মুশরিকদের হাতে বহাল থাকবে, এটা কোনক্রমেই সংগত হতে পারে না। তাই হুকুম দেয়া হয় ঃ আগামীতে কাবা ঘরের পরিচালনা ও অভিভাবকত্বের দায়িত্বও তাওহীদবাদীদের হাতেই ন্যস্ত থাকা চাই। আর এ সংগে বায়তুল্লাহর চতুসীমার মধ্যে শিরক ও জাহেলীয়াতের যাবতীয় রসম-রেওয়াজ বল প্রয়োগে বন্ধ করে দিতে হবে। বরং এখন থেকে মুশরিকরা আর এ ঘরের ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে পারবে না। তাওহীদের মহান অগ্রণী পুরুষ ইবরাহীমের হাতে গড়া এ গৃহটি আর শিরক দ্বারা কলুষিত হতে না পারে তার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) আরবের সাংস্কৃতিক জীবনে জাহেলী রসম রেওয়াজের যেসব চিহ্ন এখনো অক্ষুণ্ন ছিল নতুন ইসলামী যুগে সেগুলোর প্রচলন থাকা কোনক্রমেই সমিচীন ছিল না। তাই সেগুলো নিশ্চিহ্ন করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। "নাসী" (ইচ্ছাকৃতভাবে হারাম মাসকে হালাল ও হালাল মাসকে হারাম নির্দিষ্ট করে নেয়া)'র নিয়মটা ছিল সবচেয়ে খারাপ প্রথা। তাই তার ওপর সরাসরি আঘাত হানা হয়েছে। এ আঘাতের মাধ্যমে জাহেলীয়াতের অন্যান্য নিদর্শনগুলোর ব্যাপারে মুসলমানদের করণীয় কী। তাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

২। আরবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম পূর্ণতায় পৌঁছে যাবার পর সামনে যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়টি ছিল সেটি হলো, আরবের বাইরে আল্লাহর সত্য দীনের প্রভাব-বলয় বিস্তৃত করা। এ পথে রোম ও ইরানের রাজনৈতিক শক্তি ছিল সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। আরবের কার্যক্রম শেষ হবার পরই তার সাথে সংঘর্ষ বাধা ছিল অনিবার্য। তাছাড়া পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য অমুসলিম রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাগুলোর সাথেও এমনি ধরনের

সংঘাত ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হওয়া ছিল স্বাভাবিক। তাই মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়, আরবের বাইরে যারা সত্য দীনের অনুসারী নয়, তারা ইসলামী কর্তৃত্বের প্রতি বশ্যতা ও আনুগত্যের স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত শক্তি প্রয়োগ করে তাদের স্বাধীন ও সার্বভৌম শাসন কর্তৃত্ব খতম করে দাও। অবশ্য আল্লাহর সত্য দ্বীনের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারটি তাদের ইচ্ছাধীন। তারা চাইলে ঈমান আনতে পারে, চাইলে নাও আনতে পারে। কিন্তু আল্লাহর যমীনে নিজেদের হুকুম জারি করার এবং মানব সমাজের কর্তৃত্ব ও পরিচালনা ব্যবস্থা নিজেদের হাতে রেখে মানুষের ওপর এবং তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের ওপর নিজেদের গোমরাহীসমূহ জোরপূর্বক চাপিয়ে দেবার কোন অধিকার তাদের নেই। বড় জোর তাদেরকে এতটুকু স্বাধীনতা দেয়া যেতে পারে যে, তারা নিজেরা চাইলে পথভ্রষ্ট হয়ে থাকতে পারবে। কিন্তু সে জন্য শর্ত হচ্ছে, তাদের জিযিয়া আদায় করে ইসলামী শাসন কর্তৃত্বের অধীন থাকতে হবে।

৩। মুনাফিক সংক্রান্ত বিষয়টি ছিল তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাময়িক বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তাদের ব্যাপারে এ পর্যন্ত উপেক্ষা ও এড়িয়ে যাবার নীতি অবলম্বন করা হচ্ছিলো। এখন যেহেতু বাইরের বিপদের চাপ কমে গিয়েছিল বরং একেবারে ছিলই না বললে চলে, তাই হুকুম দেয়া হয়, আগামীতে তাদের সাথে আর নরম ব্যবহার করা যাবে না। প্রকাশ্য সত্য অস্বীকারকারীদের সাথে যেমন কঠোর ব্যবহার করা হয় তেমনি কঠোর ব্যবহার গোপন সত্য অস্বীকারকারীদের সাথেও করা হবে। এ নীতি অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে সুওয়াইলিমের গৃহে আগুন লাগান। সেখানে মুনাফিকদের একটি দল মুসলমানদেরকে যুদ্ধে যোগদান করা থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে প্রচারাভিযান চালাবার জন্য জমায়েত হতো। আবার এ নীতি অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক থেকে ফিরে আসার পর সর্বপ্রথম "মসজিদে দ্বিরার" ভেংগে ফেলার ও জ্বালিয়ে দেবার হুকুম দেন।

৪। নিষ্ঠাবান মুমিনদের কতকের মধ্যে এখনো পর্যন্ত যে সামান্য কিছু সংকল্পের দুর্বলতা রয়ে গিয়েছিল তার চিকিৎসারও প্রয়োজন ছিল। কারণ ইসলাম এখন আন্তরজাতিক প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে চলেছে। যে ক্ষেত্রে মুসলিম আরবকে একাকী সারা অমুসলিম দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে হবে সে ক্ষেত্রে ইসলামী সংগঠনের জন্য ঈমানের দুর্বলতার চাইতে বড় কোন আভ্যন্তরীণ বিপদ থাকতে পারে না। তাই তাবুক যুদ্ধের সময় যারা অলসতা ও দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছিল অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাদের তিরস্কার ও নিন্দা করা হয়। যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল তাদের ন্যায়সঙ্গত ওযর ছাড়াই পিছনে থেকে যাওয়াটাকে একটা মুনাফেকসুলভ আচরণ এবং সাচ্চা ঈমানদার না হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়। ভবিষ্যতের জন্য দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানিয়ে দেয়া হয়, আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার সংগ্রাম এবং কুফর ও ইসলামের সংঘাতই হচ্ছে মুমিনের ঈমানের দাবী যাচাই করার আসল মানদণ্ড। এ সংঘর্ষে যে ব্যক্তি ইসলামের জন্য ধন-প্রাণ, সময় ও শ্রম ব্যয় করতে ইতস্তত করবে তার ঈমান নির্ভরযোগ্য হবে না। অন্য কোন ধর্মীয় কাজের মাধ্যমে এ ক্ষেত্রের কোন অভাব পূরণ করা যাবে না।

এসব বিষয়ের প্রতি নজর রেখে সূরা তাওবা অধ্যয়ন করলে এর যাবতীয় বিষয় সহজে অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

আয়াত ১২৯ | সূরা আত্ তাওবা – মাদানী | রুকূ' ১৬

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝١ فَسِيْحُوْا
فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ
مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ۝٢ وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ
الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ۭ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۭ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝٣

সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করা হলো[১] আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে, যেসব মুশরিকের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে তাদের সাথে।[২] কাজেই তোমরা দেশের মধ্যে আরো চার মাসকাল চলাফেরা করে নাও[৩] এবং জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম ও শক্তিহীন করতে পারবে না। আর আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের অবশ্যই লাঞ্ছিত করবেন।

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে বড় হজ্জের[৪] দিনে সমস্ত মানুষের প্রতি সাধারণ ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ "আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত এবং তাঁর রসূলও। এখন যদি তোমরা তাওবা করে নাও তাহলে তা তোমাদেরই জন্য ভাল। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে খুব ভাল করেই বুঝে নাও, তোমরা আল্লাহকে শক্তি সামর্থহীন করতে পারবে না। আর হে নবী! অস্বীকারকারীদের কঠিন আযাবের সুখবর দিয়ে দাও।

১. এ সূরার ভূমিকায় আমি বলে এসেছি, ৫ রুকূ'র শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত এ ভাষণটি ৯ হিজরীতে এমন এক সময় নাযিল হয় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকরকে (রা) হজ্জের জন্য রওয়ানা করে দিয়েছিলেন। তাঁর চলে যাওয়ার পর এটি নাযিল হলে সাহাবায়ে কেরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন করেন ঃ এটি হযরত আবু বকরের (রা) কাছে পাঠিয়ে দিন, তিনি হজ্জের সময় লোকদের এটি শুনিয়ে দেবেন। কিন্তু তিনি বলেন, এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ঘোষণা আমার পক্ষ থেকে

আমারই ঘরের এক জনের করা উচিত। কাজেই তিনি হযরত আলীকে (রা) এ কাজে নিযুক্ত করেন। এ সংগে তাঁকে নির্দেশ দেন, হাজীদের সাধারণ সমাবেশে আল্লাহর এ বাণী শুনিয়ে দেবার পর নিম্নলিখিত চারটি কথাও যেন ঘোষণা করে দেন। এক, দীন ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এমন কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। দুই, এ বছরের পরে আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে আসতে পারবে না। তিন, বাইতুল্লাহর চারদিকে উলংগ অবস্থায় তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ। চার, যাদের সাথে আল্লাহর রসূলের চুক্তি অক্ষুণ্ন আছে অর্থাৎ যারা চুক্তি ভঙ্গ করেনি, চুক্তির সময়সীমা পর্যন্ত তা পূর্ণ করা হবে।

এ প্রসংগে জানা থাকা দরকার, মক্কা বিজয়ের পর ইসলামী যুগে প্রথম হজ্জ অনুষ্ঠিত হয় ৮ হিজরীতে প্রাচীন পদ্ধতিতে। ৯ হিজরীতে মুসলমানরা এ দ্বিতীয় হজ্জটি সম্পন্ন করে নিজস্ব পদ্ধতিতে এবং অন্যদিকে মুশরিকরা করে তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে। এরপর ১০ হিজরীতে তৃতীয় হজ্জ অনুষ্ঠিত হয় খালেস ইসলামী পদ্ধতিতে। এটিই বিখ্যাত বিদায় হজ্জ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম দু'বছর হজ্জ করতে যাননি। তৃতীয় বছর শিরকের পুরোপুরি অবসান ঘটার পর তিনি হজ্জ আদায় করেন।

২. সূরা আনফালের ৫৮ আয়াতে একথা আলোচনা করা হয়েছে যে, কোন জাতির পক্ষ থেকে যখন তোমাদের খেয়ানত করার তথা অঙ্গীকার ভংগ ও বিশ্বাসঘাতকতা করার আশংকা দেখা দেয় তখন প্রকাশ্যে তার চুক্তি তার মুখের ওপর ছুঁড়ে দাও এবং তাকে এ মর্মে সতর্ক করে দাও যে, এখন তোমাদের সাথে আমাদের আর কোন চুক্তি নেই। এরূপ ঘোষণা ও বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে কোন চুক্তিবদ্ধ জাতির বিরুদ্ধে সামরিক কার্যক্রম শুরু করে দেয়া মূলত বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর। এ নৈতিক বিধি অনুযায়ী চুক্তি বাতিল করার এ সাধারণ ঘোষণা এমনসব গোত্রের বিরুদ্ধে করা হয়েছে যারা অংগীকার করা ও চুক্তিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সবসময় ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাতো এবং সুযোগ পেলেই সকল অংগীকার ও চুক্তি শিকেয় তুলে রেখে শত্রুতায় লিপ্ত হতো। সে সময় যেসব গোত্র শিরকের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাদের মধ্য থেকে কিনানাহ্ ও বনী দ্বামরাহ এবং হয়তো আরো এক আধটি গোত্র ছাড়া বাদবাকি সকল গোত্রের অবস্থা এ রকমই ছিল।

এ দায়িত্ব মুক্তি ও সম্পর্কচ্ছেদ সংক্রান্ত ঘোষণার ফলে আরবে শিরক ও মুশরিকদের অস্তিত্বই যেন কার্যত আইন বিরোধী (Out of Law) হয়ে গেলো। এখন আর তাদের জন্য সারাদেশে কোন আশ্রয়স্থল রইল না। কারণ দেশের বেশীরভাগ এলাকা ইসলামী শাসন কর্তৃত্বের আওতাধীন হয়ে গিয়েছিল। এরা নিজেদের জায়গায় বসে অপেক্ষা করছিল, রোম ও পারস্যের পক্ষ থেকে ইসলামী সালতানাত কখন বিপদের সম্মুখীন হবে অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখন ইন্তিকাল করবেন, তখনই এরা অকস্মাত চুক্তি ভংগ করে দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু করে দেবে। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা) তাদের প্রতীক্ষিত সময় আসার আগেই তাদের পরিকল্পনার ছক উলটে দিলেন এবং তাদের থেকে দায়িত্ব মুক্তির কথা ঘোষণা করে তাদেরকে তিনটি পথের একটিকে বেছে নিতে বাধ্য করলেন। এক, তাদের যুদ্ধ করার জন্য তৈরী হতে হবে এবং ইসলামী শক্তির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। দুই, তাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। তিন, তাদের ইসলাম গ্রহণ করতে হবে এবং দেশের বৃহত্তর অংশ আগেই যে শাসন ব্যবস্থার আওতাধীন চলে এসেছে তারই আয়ত্বে নিজেদেরকে ও নিজেদের এলাকাকে সোপর্দ করে দিতে হবে।

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

তবে যেসব মুশরিকের সাথে তোমরা চুক্তি করেছো তারপর তারা তোমাদের সাথে নিজেদের চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করেনি আর তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি তাদের ছাড়া। এ ধরনের লোকদের সাথে তোমরাও নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে। কারণ আল্লাহ তাকওয়া তথা সংযম অবলম্বনকারীদেরকে পছন্দ করেন।[৫]

এ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের প্রকৃত রহস্য ও যথার্থ যৌক্তিকতা অনুধাবন করার জন্য আমাদেরকে পরবর্তীকালে উদ্ভূত ইসলাম বর্জন আন্দোলনের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। আলোচ্য ঘটনার দেড় বছর পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পরই দেশের বিভিন্ন এলাকায় এ অশুভ তৎপরতা ও গোলযোগ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার ফলে ইসলামের নব নির্মিত প্রাসাদটি আকস্মিকভাবে নড়ে ওঠে। ৯ হিজরীর এ সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণার মাধ্যমে যদি শিরকের সংগঠিত শক্তিকে খতম করে না দেয়া হতো এবং সারাদেশে ইতিমধ্যে ইসলামের নিয়ন্ত্রণে ক্ষমতা প্রাধান্য বিস্তার না করতো, তাহলে হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফত আমলের শুরুতেই মুরতাদ হওয়ার যে হিড়িক লেগে গিয়েছিল তার চেয়ে অন্তত দশগুণ বেশী শক্তি নিয়ে বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধের ভয়াবহ তাণ্ডব শুরু হয়ে যেতো। এ অবস্থায় ইসলামের ইতিহাসের চেহারাই হয়তো সম্পূর্ণ পাল্টে যেতো।

৩. এ ঘোষণাটি হয়েছিল ৯ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে। নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য এ সময় থেকে ১০ হিজরী ১০ রবিউস সানী পর্যন্ত ৪ মাসের অবকাশ তাদেরকে দেয়া হয়। তারা যুদ্ধ করতে চাইলে যুদ্ধ করার জন্য তৈরী হোক। দেশ ত্যাগ করতে চাইলে এ সময়ের মধ্যে নিজেদের আশ্রয়স্থল খুঁজে নিক। আর যদি ইসলাম গ্রহণ করতে চায় তাহলে স্থিরমস্তিষ্কে ভেবে-চিন্তে তা গ্রহণ করুক।

৪. অর্থাৎ ১০ যিলহজ্জ। একে "ইয়াওমুন নহর" বা যবেহ করার দিন বলা হয়। সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ বিদায় হজ্জে ভাষণ দিতে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত জনতাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আজকের এ দিনটি কোন্ দিন? লোকেরা জবাব দেয় ঃ "ইয়াওমুন নহর"-আজ যবেহ করার দিন। তিনি বলেন ঃ هذا يوم الحج الاكبر অর্থাৎ আজ হজ্জে আকবর তথা বড় হজ্জের দিন। এখানে বড় হজ্জ শব্দটি এসেছে ছোট হজ্জের বিপরীত শব্দ হিসেবে। আরববাসীরা "উমরাহ"কে ছোট হজ্জ বলে থাকে। এর মোকাবিলায় যিলহজ্জের নির্দিষ্ট দিনগুলোতে যে হজ্জ করা হয় তাকে বলা হয় বড় হজ্জ।

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾ وَإِنْ أَحَدٌ
مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

অতএব, হারাম মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে গেলে[৬] মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা করো এবং তাদের ধরো, ঘেরাও করো এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে বসে থাকো। তারপর যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহলে তাদের ছেড়ে দাও।[৭] আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। আর যদি মুশরিকদের কোন ব্যক্তি আশ্রয় প্রার্থনা করে তোমার কাছে আসতে চায় (যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে) তাহলে তাকে আল্লাহর কালাম শোনা পর্যন্ত আশ্রয় দাও, তারপর তাকে তার নিরাপদ জায়গায় পৌঁছিয়ে দাও। এরা অজ্ঞ বলেই এটা করা উচিত।

৫. অর্থাৎ যারা তোমাদের সাথে চুক্তি ভংগ করেনি তোমরা তাদের সাথে চুক্তি ভংগ করবে, এটা হবে তাকওয়া বিরোধী কাজ। আল্লাহর কাছে তারাই প্রিয় ও পছন্দনীয়, যারা সব অবস্থায় তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।

৬. পারিভাষিক অর্থে যে মাসগুলোকে হজ্জ ও উমরাহ করার সুবিধার জন্য হারাম মাস গণ্য করা হয়েছে, এখানে সে মাসগুলোর কথা বলা হয়নি। বরং মুশরিকদের যে চার মাসের অবকাশ দেয়া হয়েছিল সেই চারটি মাসের কথা এখানে বলা হয়েছে। যেহেতু এ অবকাশকালীন সময়ে মুশরিকদের ওপর আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্য জায়েয ছিল না তাই এগুলোকে হারাম মাস বলা হয়েছে।

৭. অর্থাৎ কুফর ও শিরক থেকে নিছক তাওবা করে নিলেই ব্যাপারটি খতম হয়ে যাবে না। বরং তাদের কার্যত নামায কায়েম করতে ও যাকাত দিতে হবে। এটা না হলে তারা যে কুফুরী ত্যাগ করে ইসলামকে অবলম্বন করেছে, একথা মেনে নেয়া যাবে না। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুরতাদ হবার ফিতনা দেখা দেবার সময় এ আয়াত থেকেই যুক্তি সংগ্রহ করে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর যারা গোলযোগ সৃষ্টি করেছিল তাদের একটি দল বলতো, আমরা ইসলামকে অস্বীকার করি না। আমরা নামায পড়তে প্রস্তুত কিন্তু যাকাত দেবো না। সাহাবায়ে কেরাম সাধারণভাবে এ ভেবে বিব্রত হচ্ছিলেন যে, এ ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَّا الَّذِيْنَ
عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ۭ اِنَّ
اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝ كَيْفَ وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ
اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۭ يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝
اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۭ اِنَّهُمْ سَاۗءَ مَا كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ ۝

২ রুকূ'

মুশরিকদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে কোন নিরাপত্তার অংগীকার কেমন করে হতে পারে? তবে যাদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছিলে মসজিদে হারামের কাছে, তাদের কথা স্বতন্ত্র।[৯] কাজেই যতক্ষণ তারা তোমাদের জন্য সোজা–সরল থাকে ততক্ষণ তোমরাও তাদের জন্য সোজা–সরল থাকো। কারণ আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন। তবে তাদের ছাড়া অন্য মুশরিকদের জন্য কোন নিরাপত্তা চুক্তি কেমন করে হতে পারে, যখন তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা তোমাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পারলে তোমাদের ব্যাপারে কোন আত্মীয়তার পরোয়া করবে না এবং কোন অংগীকারের দায়িত্বও নেবে না। তারা মুখের কথায় তোমাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে কিন্তু তাদের মন তা অস্বীকার করে।[১০] আর তাদের অধিকাংশই ফাসেক।[১১] তারা আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্যতম মূল্য গ্রহণ করে নিয়েছে।[১২] তারপর আল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।[১৩] তারা যা করতে অভ্যস্ত, তা অত্যন্ত খারাপ কাজ।

কেমন করে তরবারি ওঠানো যেতে পারে? কিন্তু হযরত আবু বকর (রা) এ আয়াতটির বরাত দিয়ে বললেন, আমাদের তো কেবলমাত্র যখন এরা শিরক থেকে তাওবা করবে, নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে তখনই এদেরকে ছেড়ে দেবার হুকুম দেয়া হয়েছিল। কিন্তু যখন এ তিন শর্তের মধ্য থেকে একটি শর্ত এরা উড়িয়ে দিচ্ছে তখন আমরা এদের ছেড়ে দেই কেমন করে?

৮. অর্থাৎ যুদ্ধ চলার মাঝখানে যদি কোন শত্রু তোমাদের কাছে আবেদন করে, আমি ইসলামকে জানতে ও বুঝতে চাই তাহলে তাকে নিরাপত্তা দান করে নিজেদের কাছে আসতে দেয়া এবং তাকে ইসলাম সম্পর্কে বুঝানো মুসলমানদের উচিত। তারপর যদি সে

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾ فَإِنْ
تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ
عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ
لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾

কোন মুমিনের ব্যাপারে তারা না আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা করে, আর না কোন অঙ্গীকারের ধার ধারে। আগ্রাসন ও বাড়াবাড়ি সবসময় তাদের পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। কাজেই যদি তারা তাওবা করে নেয় এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই। যারা জানে, তাদের জন্য আমার বিধান স্পষ্ট করে বর্ণনা করি।[১৪] আর যদি অঙ্গীকার করার পর তারা নিজেদের কসম ভংগ করে এবং তোমাদের দীনের ওপর হামলা চালাতে থাকে তাহলে কুফরীর পতাকাবাহীদের সাথে যুদ্ধ করো। কারণ তাদের কসম বিশ্বাসযোগ্য নয়। হয়তো (এরপর তরবারির ভয়েই) তারা নিরস্ত হবে।[১৫]

ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে নিজেদের নিরাপত্তায় তাকে তার আবাস স্থলে পৌছিয়ে দেয়া উচিত। এ ধরনের লোক, যারা নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে আসে, ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রে তাদের "মুস্তামিন" তথা নিরাপত্তা প্রার্থী বলা হয়।

৯. অর্থাৎ বনী কিনানাহ্, বনী খুযাআহ ও বনী দ্বাম্‌রাহ।

১০. অর্থাৎ বাহ্যত তারা চুক্তির শর্তাবলী নির্ণয় করে কিন্তু মনে থাকে তাদের চুক্তি ভংগ করার কুমতলব। অভিজ্ঞতা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ দেখা গেছে, যখনই তারা কোন চুক্তি করেছে, ভংগ করার জন্যই তা করেছে।

১১. অর্থাৎ তারা এমন লোক, যাদের নৈতিক দায়িত্বের কোন অনুভূতি নেই এবং নৈতিক বিধি-নিষেধ ভঙ্গ করতেও তারা কখনো কুণ্ঠিত বা শংকিত হয় না।

১২. অর্থাৎ একদিকে আল্লাহর আয়াত তাদের সৎকাজ করার, সত্য পথে থাকার ও ন্যায়নিষ্ঠ আইন মেনে চলার আহবান জানাচ্ছিল এবং অন্য দিকে তাদের সামনে ছিল দুনিয়ার জীবনের মুষ্টিমেয় কয়েকদিনের সুখ-সুবিধা-আরাম-ঐশ্বর্য। প্রবৃত্তির আশা-আকাংখার লাগামহীন আনুগত্যের দ্বারা এগুলো অর্জন করা যায়। তারা এ দু'টি জিনিসের মধ্যে তুলনা করে প্রথমটি বাদ দিয়ে দ্বিতীয় জিনিসটি নিজেদের জন্য বেছে নিল।

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم
بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن
كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ
وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن
تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ
اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

তোমরা কি লড়াই করবে না[১৬] এমন লোকদের সাথে যারা নিজেদের অঙ্গীকার ভংগ করে এসেছে এবং যারা রসূলকে দেশ থেকে বের করে দেবার দুরভিসন্ধি করেছিল আর বাড়াবাড়ির সূচনা তারাই করেছিল? তোমরা কি তাদেরকে ভয় করো? যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহকে ভয় করাই তোমাদের জন্য অধিক সমীচীন। তাদের সাথে লড়াই করো, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করবেন, তাদের মোকাবিলায় তোমাদের সাহায্য করবেন এবং অনেক মুমিনের অন্তর শীতল করে দেবেন। আর তাদের অন্তরের জ্বালা জুড়িয়ে দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা তাওবা করার তওফীকও দান করবেন।[১৭] আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি মহাজ্ঞানী। তোমরা কি একথা মনে করে রেখেছো যে, তোমাদের এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ এখনো দেখেননি তোমাদের মধ্য থেকে কারা (তাঁর পথে) সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালালো এবং আল্লাহ, রসূল ও মুমিনদের ছাড়া কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু রূপে গ্রহণ করলো না?[১৮] তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তা জানেন।

১৩. অর্থাৎ এ জালেমরা শুধুমাত্র হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহীকে নিজেদের জন্য বেছে নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং আরো অগ্রসর হয়ে তারা যাতে সত্যের দাওয়াতের কাজ কোনক্রমেই না চলতে পারে এবং কল্যাণ ও সৎবৃত্তির এ আওয়াজ কেউ শুনতে না পায় সে জন্যও অপচেষ্টা চালিয়েছে। বরং তারা চেয়েছে, যে মুখ থেকে এ ডাক দেয়া হয় সেই মুখই বন্ধ করে দিতে। মহান আল্লাহ যে সত্যনিষ্ঠ ও কল্যাণময় জীবন বিধান পৃথিবীতে

কায়েম করতে চাচ্ছিলেন তার পথ রোধ করার জন্য তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এ জন্য যারা এ বিধানকে সত্য জেনে এর অনুসারী হয়েছিল দুনিয়ার বুকে তাদের জীবন যাপনকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল।

১৪. এখানে আবার একথা স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, নামায পড়া ও যাকাত দেয়া ছাড়া নিছক তাওবা করে নিলেই তারা তোমাদের দীনী ভাই হয়ে যাবে না। আর এগুলো আদায় করলে তারা তোমাদের দীনী ভাই হবে, একথা বলার মানে হচ্ছে এই যে, এ শর্তগুলো পূরণ করার ফল কেবল এতটুকুই হবে না যে, তোমাদের জন্য তাদের ওপর হাত ওঠানো এবং তাদের ধন-প্রাণ নষ্ট করা হারাম হয়ে যাবে বরং এ সংগে আরো একটি সুবিধা লাভ করা যাবে। অর্থাৎ এর ফলে ইসলামী সমাজে তারা সমান অধিকার লাভ করবে। সামাজিক, তামাদ্দুনিক ও আইনগত দিক দিয়ে তারা অন্যান্য সকল মুসলমানের মতোই হবে। কোন পার্থক্য ও বিশেষ গুণাবলী তাদের উন্নতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারবে না।

১৫. পূর্বাপর আলোচনা থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে একথা বুঝা যাচ্ছে যে, কসম, অঙ্গীকার ও শপথ বলতে কুফরী ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার অংগীকারের কথাই এখানে বুঝানো হয়েছে। কারণ এদের সাথে এখন আর কোন চুক্তি করার প্রশ্নই ওঠে না। আগের সমস্ত চুক্তিই তারা ভংগ করেছে। তাদের অংগীকার ভংগের কারণেই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিষ্কার ঘোষণা শুনিয়ে দেয়া হয়েছে। একথাও বলা হয়েছে যে, এ ধরনের লোকদের সাথে কেমন করে চুক্তি করা যেতে পারে? এ সাথে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছিল যে, এখন তারা কুফরী ও শিরক ত্যাগ করে নামায কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে, একমাত্র এ নিশ্চয়তা বিধান করলেই তাদের ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। এ কারণে এ আয়াতটি মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে একেবারেই দ্ব্যর্থহীন আদেশ স্বরূপ। আসলে দেড় বছর পরে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফত আমলে ইসলাম বর্জনের যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল এখানে সেদিকেই ইংগিত দেয়া হয়েছে। এ আয়াতে ইতিপূর্বে প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। অতিরিক্ত ও বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন আমার বই "ইসলামী আইনে মুরতাদের শাস্তি।"

১৬. এখান থেকে ভাষণটি মুসলমানদের দিকে মোড় নিচ্ছে। তাদেরকে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে এবং দীনের ব্যাপারে কোন প্রকার সম্পর্ক, নিকট আত্মীয়তা ও বৈষয়িক সুবিধার কথা একটুও বিবেচনায় না আনার কঠোর নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। ভাষণের এ অংশটির সমগ্র প্রাণসত্তা ও মর্ম অনুধাবন করার জন্য সে সময় যে অবস্থা ও পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল তা আর একবার ভেবে দেখা দরকার। সন্দেহ নেই, ইসলাম এ সময় দেশের একটি বড় অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল। আরবে এমন কোন বড় শক্তি তখন ছিল না, যে তাকে শক্তি পরীক্ষার আহবান জানাতে পারতো। তবুও এ সময় যে সিদ্ধান্তকর ও চরম বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছিল স্থূল দৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা তাতে অনেক বিপদের ঝুঁকি দেখতে পাচ্ছিল।

এক ঃ সমস্ত মুশরিক গোত্রগুলোকে একই সংগে সকল চুক্তি বাতিল করার চ্যালেঞ্জ দিয়ে দেয়া, মুশরিকদের হজ্জ বন্ধ করে দেয়া, কাবার অভিভাবকের পরিবর্তন এবং

জাহেলী রসম রেওয়াজের একেবারেই মূলোৎপাটন—এসবের অর্থ ছিল, একই সংগে সারাদেশে আগুন জ্বলে উঠবে এবং মুশরিক ও মুনাফিকরা নিজেদের স্বার্থ ও গোত্রীয় বৈশিষ্টের হেফাজতের জন্য শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত প্রবাহিত করতে উদ্বুদ্ধ হবে।

দুই ঃ হজ্জকে শুধুমাত্র তাওহীদবাদীদের জন্য নির্দিষ্ট করা এবং মুশরিকদের জন্য কাবাঘরের পথ রুদ্ধ করে দেয়ার অর্থ ছিল, দেশের জনসংখ্যার যে একটি বিরাট অংশ তখনো মুশরিক ছিল, ধর্মীয় কাজ কর্মের জন্য তাদের কাবাঘরে আসার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। শুধু এ নয়, সমকালীন আরবের অর্থনৈতিক জীবনে কাবার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম এবং কাবার ওপর আরবদের অর্থনৈতিক জীবন বিপুলভাবে নির্ভরশীল ছিল। কাজেই এভাবে কাবার দরজা বন্ধ করার কারণে তারা কাবাঘর থেকে কোন প্রকার অর্থনৈতিক সুবিধাদি লাভ করতে পারবে না।

তিন ঃ যারা হোদাইবিয়ার চুক্তি ও মক্কা বিজয়ের পর ঈমান এনেছিলেন তাদের জন্য এটি ছিল কঠিন পরীক্ষার বিষয়। কারণ তাদের অনেক জ্ঞাতি-ভাই, আত্মীয়-স্বজন তখনো মুশরিক ছিল। তাদের মধ্যে এমন অনেক লোকও ছিল পুরাতন জাহেলী ব্যবস্থার বিভিন্ন পদমর্যাদার সাথে যাদের স্বার্থ বিজড়িত ছিল। এখন বাহ্যত আরবের মুশরিকদের গোটা সমাজ ব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন করে দেবার যে আয়োজন চলছিল তার মানে ছিল, মুসলমানরা নিজেদের হাতেই নিজেদের বংশ, পরিবার ও কলিজার টুকরাদেরকে ধূলায় মিশিয়ে দেবে এবং তাদের মান, মর্যাদা ও শত শত বছরের প্রতিষ্ঠিত বৈশিষ্টসমূহ চিরতরে খতম করে দেবে।

যদিও বাস্তবে এর মধ্য থেকে কোন একটা বিপদও কার্যত সংঘটিত হয়নি। দায়মুক্তির ঘোষণার পর সারা দেশে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠার পরিবর্তে বরং দেশের বিভিন্ন এলাকায় যেসব মুশরিক গোত্র এতদিন নির্লিপ্ত ছিল তাদের এবং বিভিন্ন আমীর, রইস ও রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি দল মদীনায় আসতে শুরু করলো। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ইসলাম গ্রহণ করে আনুগত্যের শপথ নিতে লাগলো। ইসলাম গ্রহণ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রত্যেককে নিজের পদমর্যাদায় বহাল রাখলেন। কিন্তু এ নতুন নীতি ঘোষণা করার সময় তার এ ফলাফলকে কেউ আগাম অনুমান করতে পারেনি। তাছাড়া এ ঘোষণার সাথে সাথেই যদি মুসলমানরা শক্তি প্রয়োগ করে তা বাস্তবায়িত করার জন্য পুরোপুরি তৈরী না হয়ে যেতো, তাহলে সম্ভবত এ ধরনের ফলাফল দেখাই যেতো না। কাজেই এ সময় মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদ করার উদ্দীপনা ও আবেগ সৃষ্টি করা এবং এ নীতি কার্যকর করতে গিয়ে তাদের মনে যেসব আশংকা দেখা দিয়েছিল সেগুলো দূর করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। এ সংগে তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য তাদের কোন জিনিসের পরোয়া না করা উচিত। এ বক্তব্যই আলোচ্য ভাষণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

১৭. এখানে একটি সম্ভাবনার দিকে হালকা ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে পরবর্তীতে এটি বাস্তব ঘটনার রূপে আত্মপ্রকাশ করে। মুসলমানরা মনে করছিল, এ ঘোষণার সাথে সাথেই দেশে রক্তের নদী বয়ে যাবে। এ ভুল ধারণা দূর করার জন্য ইশারা-ইঙ্গিতে তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ কঠোর নীতি অবলম্বন করার কারণে যেখানে একদিকে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে লোকদের তাওবার সৌভাগ্য লাভের সম্ভাবনাও

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ
بِالْكُفْرِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚ وَفِي النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ۝۱۷
اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ
وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰۗىِٕكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا
مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۝۱۸ اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاۗجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ لَا يَسْتَوٗنَ
عِنْدَ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝۱۹

৩ রুকূ'

মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরীর সাক্ষ দিচ্ছে তখন আল্লাহর মসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণকারী ও খাদেম হওয়া তাদের কাজ নয়।[১৯] তাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে গেছে[২০] এবং তাদেরকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। তারাই হতে পারে আল্লাহর মসজিদ আবাদকারী (রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সেবক) যারা আল্লাহ ও পরকালকে মানে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। তাদেরই ব্যাপারে আশা করা যেতে পারে যে, তারা সঠিক সোজা পথে চলবে। তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং মসজিদে হারামের রক্ষণা-বেক্ষণ করাকে এমন ব্যক্তিদের কাজের সমান মনে করে নিয়েছ যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি এবং সংগ্রাম-সাধনা করেছে আল্লাহর পথে?[২১] এ উভয় দল আল্লাহর কাছে সমান নয়। আল্লাহ জালেমদের পথ দেখান না।

রয়েছে। কিন্তু এ ইঙ্গিতকে খুব বেশী শানিত ও স্পষ্ট করা হয়নি। কারণ এর ফলে একদিকে মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতি স্তিমিত হয়ে পড়তো এবং অন্যদিকে যে হুমকিটি মুশরিকদেরকে তাদের অবস্থানের নাজুকতার কথা ভাবার এবং পরিশেষে তাদের ইসলামী ব্যবস্থার মধ্যে বিলীন হবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা হালকা ও নিষ্প্রভ হয়ে যেতো।

১৮. স্বল্পকাল আগে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল এখানে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, যতক্ষণ তোমরা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একথা প্রমাণ করে

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ
وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفَاۗىِٕزُوْنَ ۝
يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ
مُّقِيْمٌ ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝ يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَاۗءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاۗءَ اِنِ
اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰۗىِٕكَ
هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

আল্লাহর কাছে তো তারাই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, যারা ঈমান এনেছে এবং তাঁর পথে ঘর-বাড়ি ছেড়েছে ও ধন-প্রাণ সমর্পণ করে জিহাদ করেছে। তারাই সফলকাম। তাদের রব তাদেরকে নিজের রহমত, সন্তোষ ও এমন জান্নাতের সুখবর দেন, যেখানে তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী সুখের সামগ্রী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। অবশ্যি আল্লাহর কাছে কাজের প্রতিদান দেবার জন্য অনেক কিছুই রয়েছে।

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের বাপ ও ভাইয়েরা যদি ঈমানের ওপর কুফরীকে প্রাধান্য দেয় তাহলে তাদেরকেও নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে তারাই জালেম।

না দেবে যে, যথার্থই তোমরা আল্লাহ ও তাঁর দীনকে নিজেদের ধন-প্রাণ ও ভাই-বন্ধুদের তুলনায় বেশী ভালবাসো, ততক্ষণ তোমাদের সাচ্চা মুমিন বলে গণ্য করা যেতে পারে না।

এ পর্যন্ত বাহ্যত তোমাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, যেহেতু সাচ্চা মুমিন ও প্রথম যুগের দৃঢ়চিত্ত মুসলিমদের প্রাণপন প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের মাধ্যমে ইসলাম বিজয় লাভ করেছে এবং সারাদেশে ছেয়ে গেছে তাই তোমরাও মুসলমান হয়ে গেছো।

১৯. অর্থাৎ এক আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য যেসব মসজিদ তৈরী করা হয়েছে সেগুলোর মুতাওয়াল্লী, রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সেবক কখনো এমন ধরনের লোক হতে পারে না যারা আল্লাহর গুণাবলী, অধিকার ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারের ক্ষেত্রে অন্যদের শরীক করে। তারপর তারা নিজেরাই যখন তাওহীদের দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ
مَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ
فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

হে নবী! বলে দাও, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, তোমাদের যে ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়ার ভয়ে তোমরা তটস্থ থাক এবং তোমাদের যে বাসস্থানকে তোমরা খুবই পছন্দ কর—এসব যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চাইতে তোমাদের কাছে বেশী প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর ফায়সালা তোমাদের কাছে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর[২২] আল্লাহ ফাসেকদেরকে কখনো সত্য পথের সন্ধান দেন না।

এবং পরিষ্কার বলে দিয়েছে, আমরা নিজেদের ইবাদাত বন্দেগী এক আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করতে রাযী নই, তখন একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য যে ইবাদাত গৃহ তৈরী করা হয়েছে তার মুতাওয়াল্লী হবার অধিকার তারা কোথা থেকে পায়?

এখানে যদিও কথাটা সাধারণভাবেই বলা হয়েছে এবং তাৎপর্যের দিক দিয়েও এটি সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তবুও বিশেষভাবে এখানে এর উল্লেখের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কাবাঘর ও মসজিদে হারামের ওপর থেকে মুশরিকদের মুতাওয়াল্লীগিরির পাট একেবারে চুকিয়ে দিয়ে সেখানে চিরকালের জন্য তাওহীদবাদীদের অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠিত করা।

২০. অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে বায়তুল্লাহর যে সামান্য কিছু সেবা তারা করেছিল তাও বরবাদ হয়ে গেছে। কারণ এ সেবা কাজের সাথে তারা শিরক ও জাহেলী পদ্ধতি মিশিয়ে একাকার করে ফেলেছিলো। তাদের সেই সামান্য পরিমাণ ভাল কাজকে নস্যাত করে দিয়েছে, তাদের অনেক বড় আকারের অসৎকাজ।

২১. অর্থাৎ কোন তীর্থ কেন্দ্রে পূর্ব-পুরুষদের গদিনশীন হওয়া, তার রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং এমন কিছু লোক দেখানো ধর্মীয় কাজ করা যার ওপর লোকেরা বৈষয়িক পর্যায়ে সাধারণত মর্যাদা ও পবিত্রতার ভিত্ গড়ে তোলে আল্লাহর কাছে এগুলোর কোন মূল্য ও মার্যাদা নেই। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর পথে কুরবানী ও ত্যাগ স্বীকার করাই যথার্থ মূল্য ও মর্যাদার অধিকারী। যে ব্যক্তি এসব গুণের অধিকারী হয়, সে কোন উচ্চ বংশ ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাথে সম্পর্কিত না হলেও এবং তার কপালে কোন বিশেষ গুণের "তকমা" আঁটা না থাকলেও সে-ই যথার্থ মর্যাদাবান ব্যক্তি। কিন্তু যারা এসব গুণের

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ
كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا
رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ
وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ
وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ
يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٧﴾

৪ রুকূ'

এর আগে আল্লাহ বহু ক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করেছেন। এই তো সেদিন, হুনায়েন যুদ্ধের দিন (তাঁর সাহায্যের অভাবনীয় রূপ তোমরা দেখেছো),[২৩] সেদিন তোমাদের মনে তোমাদের সংখ্যাধিক্যের অহমিকা ছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি। আর এত বড় বিশাল পৃথিবীও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল এবং তোমরা পেছন ফিরে পালিয়ে গিয়েছিলে। তারপর আল্লাহ তাঁর প্রশান্তি নাযিল করেন তাঁর রসূলের ওপর ও মুমিনদের ওপর এবং এমন সেনাদল নামান যাদেরকে তোমরা চোখে দেখতে পাচ্ছিলে না এবং সত্য অস্বীকারকারীদের শাস্তি দেন। কারণ, যারা সত্য অস্বীকার করে এটাই তাদের প্রতিফল। তারপর (তোমরা এও দেখেছো), এভাবে শাস্তি দেবার পর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাওবার তাওফীকও দান করেন।[২৪] আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

অধিকারী নয়, তারা নিছক বিরাট সম্মানিত ও বুজর্গ ব্যক্তির সন্তান, দীর্ঘকাল থেকে তাদের পরিবারে গদিনশীনী প্রথা চলে আসছে এবং বিশেষ সময়ে তারা বেশ ধুমধাম সহকারে কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে থাকে বলেই কোন প্রকার মর্যাদার অধিকারী হবে না। উপরন্তু এ ধরনের মেকী "মৌরুসী" অধিকারকে স্বীকৃতি দান করে পবিত্র স্থানসমূহ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এ অযোগ্য ও অপাংক্তেয় লোকদের হাতে রেখে দেয়াও কোনক্রমে বৈধ হতে পারে না।

২২. অর্থাৎ তোমাদের হটিয়ে দিয়ে সেখানে আল্লাহ অন্য কোন দলকে দীনের নিয়ামত দান করবেন। তাদেরকে দীনের ধারক ও বাহক হবার মর্যাদায় উন্নীত করবেন। এ সংগে মানুষকে সৎপথে পরিচালনা করার নেতৃত্বও তাদের হাতে সোপর্দ করবেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن
فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র, কাজেই এ বছরের পর তারা যেন আর মসজিদে হারামের কাছে না আসে।[২৫] আর যদি তোমাদের দারিদ্রের ভয় থাকে, তাহলে আল্লাহ চাইলে তাঁর নিজ অনুগ্রহে শীঘ্রই তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন ও তিনি প্রজ্ঞাময়।

আহ্‌লি কিতাবদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান আনে না,[২৬] যা কিছু আল্লাহ ও তাঁর রসূল হারাম গণ্য করেছেন তাকে হারাম করে না[২৭] এবং সত্য দীনকে নিজেদের দীনে পরিণত করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করো যে পর্যন্ত না তারা নিজের হাতে জিযিয়া দেয় ও পদানত হয়ে থাকে।[২৮]

২৩. দায়িত্ব মুক্তি ও সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা সম্বলিত ভয়ংকর নীতি কার্যকর করার ফলে সারা আরবে সর্বত্র যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠবে এবং তার মোকাবিলা করা অসম্ভব হবে বলে যারা আশংকা করছিল তাদেরকে বলা হচ্ছে, এসব অমূলক ভয়ে ভীত হচ্ছো কেন? এর চাইতেও বেশী কঠিন বিপদের সময় যে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন তিনি এখনো তোমাদের সাহায্য করার জন্য রয়েছেন। এ কাজ যদি তোমাদের শক্তির ওপর নির্ভর করতো, তাহলে এর আর মক্কার সীমানা পার হতে হতো না। আর না হোক, বদরের ময়দানে তো খতমই হয়ে যেতো। কিন্তু এর পেছনে তো রয়েছে স্বয়ং আল্লাহর শক্তি। আর অতীতের অভিজ্ঞতাসমূহ তোমার কাছে একথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এখনো পর্যন্ত আল্লাহর শক্তিই এর উন্নতি ও বিকাশ সাধন করে এসেছে। কাজেই নিশ্চিত বিশ্বাস রাখো, আজো তিনিই একে উন্নতি ও অগ্রগতি দান করবেন।

এখানে হুনায়েন যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। এ যুদ্ধটি ৮ হিজরীর শওয়াল মাসে এ আয়াতগুলো নাযিলের মাত্র বার তের মাস আগে মক্কা ও তায়েফের মাঝখানে হুনায়েন উপত্যকায় সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে ছিল ১২ হাজার সৈন্য। এর

আগে কোন যুদ্ধে মুসলমানদের এত বিপুল সংখ্যক সৈন্য জমায়েত হয়নি। অন্যদিকে কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা ছিল এর তুলনায় অনেক কম। কিন্তু এ সত্ত্বেও হাওয়াযিন গোত্রের তীরন্দাজরা যুদ্ধের মোড় ফিরিয়ে দিল। মুসলিম সেনাদলে মারাত্মক বিশৃংখলা দেখা দিল। তারা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পিছু হটতে লাগলো। এ সময় শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুষ্টিমেয় কতিপয় মরণপণ সাহাবী যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়পদ ছিলেন। তাদের অবিচলতার ফলেই সেনাবাহিনী পুনর্বার সংগঠিত হলো এবং মুসলমানরা বিজয় লাভ করলো। অন্যথায় মক্কা বিজয়ের ফলে মুসলমানরা যে পরিমাণ লাভবান হয়েছিল হুনায়েনে তাদেরকে তার চাইতে অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে হতো।

২৪. হুনায়েন যুদ্ধে জয়লাভ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজিত শত্রুদের সাথে যে সদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করেন তার ফলে তাদের বেশীরভাগ লোক মুসলমান হয়ে যায়। এখানে মুসলমানদেরকে যে কথা বলার উদ্দেশ্যে এ দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে তা এই যে, এখন সারা আরবের সমস্ত মুশরিককে ধ্বংস করা হবে, এ কথা তোমরা ভাবলে কেন? না, তা নয় বরং আগের অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের আশা করা উচিত যে, যখন এ লোকদের মনে জাহেলী ব্যবস্থার বিকাশ ও স্থায়িত্বের আর কোন আশা থাকবে না এবং যেসব সহায়তা ও আনুকূল্যের কারণে এতদিন তারা জাহেলিয়াতকে বুকের সাথে জড়িয়ে রেখেছে তা সব খতম হয়ে যাবে, তখন তারা নিজেরাই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেবার জন্য এগিয়ে আসবে।

২৫. অর্থাৎ আগামীতে শুধু তাদের হজ্জ ও যিয়ারতই বন্ধ নয় বরং মসজিদে হারামের সীমানায় তাদের প্রবেশই নিষিদ্ধ। এভাবে শিরক ও জাহেলিয়াতের পুনরাবর্তনের কোন সম্ভাবনাই থাকবে না।

"অপবিত্র" কথাটির মানে এই নয় যে, তারা নিজেরাই অপবিত্র বা নাপাক। বরং এর মানে হচ্ছে, তাদের আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র, কাজকর্ম এবং তাদের জাহেলী চালচলন ও সমাজ ব্যবস্থা অপবিত্র। আর এ অপবিত্রতার কারণে হারাম শরীফের চতুসীমায় তাদের প্রবেশ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ইমাম আবু হানীফার মতে এর অর্থ শুধু এতটুকুই যে, হজ্জ ও উমরাহ এবং জাহেলী অনুষ্ঠানাদি পালন করার জন্য তারা হারাম শরীফের সীমানায় প্রবেশ করতে পারবে না। ইমাম শাফেয়ীর মতে এ হুকুমের অর্থ হচ্ছে, তারা (যে কোন অবস্থায়ই) মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে পারবে না। ইমাম মালেক বলেন, শুধু মসজিদে হারামেই নয়, দুনিয়ার অন্য কোন মসজিদেও তাদের প্রবেশ জায়েয নয়। তবে এ শেষোক্ত মতটি সঠিক নয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তাদের মসজিদে নববীতে আসার অনুমতি দিয়েছিলেন।

২৬. যদিও আহলি কিতাবরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখার দাবীদার কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, না আখেরাতের প্রতি। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ শুধুমাত্র আল্লাহ আছে একথা মেনে নেয়া নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, মানুষ আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ ও একমাত্র রব বলে মেনে নেবে এবং তাঁর সত্তা, গুণাবলী, অধিকার ও ক্ষমতায় নিজেকে বা অন্য কাউকে শরীক করবে না। কিন্তু খৃষ্টান ও ইহুদীরা এ অপরাধে লিপ্ত। পরবর্তী পর্যায়ের আয়াতগুলোতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই তাদের আল্লাহকে মেনে নেয়ার কথাটা অর্থহীন। একে কোনক্রমেই ঈমান

বিল্লাহ বলা যেতে পারে না। অনুরূপভাবে আখেরাতকে মানার অর্থ মরে যাওয়ার পর আমাদের আবার উঠানো হবে, শুধু এতটুকু কথার স্বীকৃতি দেয়া নয় বরং এ সংগে এ কথা মেনে নেয়াও অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, সেখানে কোন চেষ্টা তদবীর ও সুপারিশ করা, জরিমানা দেয়া এবং কোন বুজর্গ ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ও বন্ধন কোন কাজে লাগবে না। কেউ কারোর পাপের কাফ্ফারা হবে না। আল্লাহর আদালতে ইনসাফ হবে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন এবং মানুষের ঈমান ও আমল ছাড়া আর কোন জিনিসকে মোটেই মূল্য দেয়া হবে না। এরূপ বিশ্বাস ছাড়া আখেরাতকে মেনে নেয়া অর্থহীন। কিন্তু ইহুদী ও খৃষ্টানরা ঐ দিক দিয়েই নিজেদের ঈমান আকীদা নষ্ট করে ফেলেছে। কাজেই তাদের আখেরাতের প্রতি ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়।

২৭. অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর রসূলের মাধ্যমে যে শরীয়াত নাযিল করেছেন তাকে নিজেদের জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করে না।

২৮. অর্থাৎ তারা ঈমান আনবে ও আল্লাহর সত্য দীনের অনুসারী হয়ে যাবে, যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তা নয়। বরং যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ হচ্ছে ঃ তাদের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য খতম হয়ে যাবে। তারা পৃথিবীতে শাসন ও কর্তৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না। বরং পৃথিবীতে মানুষের জীবন ব্যবস্থার লাগাম এবং মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করা ও তাদের নেতৃত্ব দান করার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার সত্যের অনুসারীদের হাতে থাকবে এবং তারা এ সত্যের অনুসারীদের অধীনে অনুগত জীবন যাপন করবে।

যিম্মীদেরকে ইসলামী শাসনের আওতায় যে নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ দান করা হবে তার বিনিময়কে জিযিয়া বলা হয়। তাছাড়া তারা যে হুকুম মেনে চলতে এবং ইসলামী শাসনের আওতাধীনে বসবাস করতে রাযী হয়েছে, এটা তার একটা আলামত হিসেবেও চিহ্নিত হবে। "নিজের হাতে জিযিয়া দেয়"–এর অর্থ হচ্ছে, সহজ সরল আনুগত্যের ভঙ্গীতে জিযিয়া আদায় করা। আর "পদানত হয়ে থাকে"–এর অর্থ, পৃথিবীতে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাদের নয় বরং যে মুমিন ও মুসলিমরা আল্লাহর খিলাফত ও প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করছে তাদের হাতে থাকবে।

প্রথম দিকে ইহুদী ও খৃষ্টানদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে মাজুসীদের (অগ্নিউপাসক) থেকে জিযিয়া আদায় করে তাদেরকে যিম্মী করেন। এরপর সাহাবায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে আরবের বাইরের সব জাতির ওপর সাধারণভাবে এ আদেশ প্রয়োগ করেন।

উনিশ শতকে মুসলিম মিল্লাতের পতন ও অবনতির যুগে এ 'জিযিয়া' সম্পর্কে মুসলমানদের পক্ষ থেকে বড় বড় সাফাই পেশ করা হতো। সেই পদাংক অনুসারী কিছু লোক এখনো রয়েছে এবং তারা এখনো এ ব্যাপারে সাফাই গেয়ে চলেছে। কিন্তু আল্লাহর দীন এসবের অনেক উর্ধে। আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহের ভূমিকায় অবতীর্ণ, তাদের কাছে কৈফিয়ত দান ও ওযর পেশ করার তার কোন প্রয়োজন নেই। পরিষ্কার ও সোজা কথায়, যারা আল্লাহর দীনকে গ্রহণ করে না এবং নিজেদের বা অন্যের উদ্ভাবিত ভুল পথে চলে, তারা বড় জোর এতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার রাখে যে, নিজেরা

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ
ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۚ
قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا
مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۖ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا
وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

৫ রুকূ'

ইহুদীরা বলে, 'উযাইর আল্লাহর পুত্র[২৯] এবং খৃষ্টানরা বলে, মসীহ আল্লাহর পুত্র। এগুলো একেবারেই আজগুবী ও উদ্ভট কথাবার্তা। তাদের পূর্বে যারা কুফরিতে লিপ্ত হয়েছিল তাদের দেখাদেখি তারা এগুলো নিজেদের মুখে উচ্চারণ করে থাকে।[৩০] আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক তাদের ওপর, তারা কোথা থেকে ধোঁকা খাচ্ছে! তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের উলামা ও দরবেশদেরকে নিজেদের খোদায় পরিণত করেছে।[৩১] এবং এভাবে মারয়াম পুত্র মসীহকেও। অথচ তাদের এক মা'বুদ ছাড়া আর কারোর বন্দেগী করার হুকুম দেয়া হয়নি, এমন এক মা'বুদ যিনি ছাড়া ইবাদাত লাভের যোগ্যতা সম্পন্ন আর কেউ নেই। তারা যেসব মুশরিকী কথা বলে তা থেকে তিনি পাক পবিত্র।

ভুল পথে চলতে চাইলে চলতে পারে, কিন্তু আল্লাহর যমীনে কোন একটি জায়গায়ও মানুষের ওপর শাসন চালাবার এবং নিজেদের ভ্রান্ত নীতি অনুযায়ী মানুষের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা পরিচালিত করার আদৌ কোন অধিকার তাদের নেই। দুনিয়ার যেখানেই তারা এ জিনিসটি লাভ করবে সেখানেই বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। তাদেরকে এ অবস্থান থেকে সরিয়ে দিয়ে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ জীবন বিধানের অনুগত করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোই হবে মুমিনদের কর্তব্য।

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, এ জিযিয়া কিসের বিনিময়ে দেয়? এর জবাব হচ্ছে, ইসলামী শাসন কর্তৃত্বের আওতাধীনে নিজেদের গোমরাহীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য অমুসলিমদের যে স্বাধীনতা দান করা হয় এটা তারই মূল্য। আর যে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা তাদের এ স্বাধীনতাকে কাজে লাগাবার অনুমতি দেয় এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ করে তার শাসন ও আইন-শৃংখলা ব্যবস্থা পরিচালনায় এ অর্থ ব্যয়িত হওয়া উচিত। এর সবচেয়ে বড় ফায়দা হচ্ছে এই যে, জিযিয়া আদায় করার সময় প্রতি বছর যিম্মীদের মধ্যে একটি অনুভূতি জাগতে থাকবে। প্রতি বছর তারা মনে করতে থাকবে,

তারা আল্লাহর পথে যাকাত দেবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত আর এর পরিবর্তে গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য তাদের মূল্য দিতে হচ্ছে। এটা তাদের কত বড় দুর্ভাগ্য। এ দুর্ভাগ্যের কারাগারে তারা বন্দী।

২৯. উযাইর বলা হয়েছে "আয্‌রা"কে (EZRA)। ইহুদীরা তাঁকে নিজেদের ধর্মের মুজাদ্দিদ বা পুনরুজ্জীবনকারী বলে মানে। তিনি খৃষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের কাছাকাছি সময়ের লোক ছিলেন বলে মনে করা হয়। ইসরাঈলী বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের পরে বনী ইসরাঈলের ওপর যে কঠিন দুর্যোগ নেমে আসে তার ফলে শুধু যে তাওরাত দুনিয়া থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল তা নয়, বরং বেবিলনের বন্দী জীবন যাপন ইসরাঈলী জনগণকে তাদের শরীয়াত, ঐতিহ্য এবং জাতীয় ভাষা ইবরানীর সাথে পর্যন্ত অপরিচিত করে দিয়েছিল। অবশেষে এ উযাই'র বা আযরা বাইবেলের আদি পুস্তক সংকলন করেন। তিনি শরীয়াতকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এ কারণেই বনী ইসরাঈল তাকে অত্যাধিক ভক্তি করে। এ ভক্তি এতদূর বেড়ে যায় যে, কোন কোন দল তাঁকে আল্লাহর পুত্র পর্যন্ত বানিয়ে দেয়। এখানে কুরআন মজীদের বক্তব্য এ নয় যে, সমস্ত ইহুদী জাতি একজোট হয়ে আয্‌রাকে আল্লাহর পুত্র বানিয়েছে। বরং কুরআন বলতে চায়, ইহুদীদের আল্লাহ সম্পর্কিত বিশ্বাসে এত বেশী গলদ দেখা দেয় যে, আয্‌রাকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করার মতো লোকও তাদের সমাজে পয়দা হয়ে যায়।

৩০. অর্থাৎ মিসর, গ্রীস, রোম, ইরান এবং অন্যান্য দেশে যেসব জাতি আগেই পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাদের পৌরানিক ধ্যান-ধারণা ও অলীক চিন্তা-ভাবনায় প্রভাবিত হয়ে তারাও তেমনি ধরনের ভ্রষ্ট আকীদা-বিশ্বাস তৈরী করে নিতো। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন আল মায়েদাহ ১০১ টীকা)।

৩১. হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আদী ইবনে হাতেম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন খৃষ্টান। ইসলাম গ্রহণ করার সময় তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। এর মধ্যে একটি প্রশ্ন হচ্ছে, কুরআনের এ আয়াতটিতে আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের উলামা ও দরবেশদেরকে খোদা বানিয়ে নেবার যে দোষারোপ করা হয়েছে তার প্রকৃত তাৎপর্য কি? জবাবে তিনি বলেন, তারা যেগুলোকে হারাম বলতো তোমরা সেগুলোকে হারাম বলে মেনে নিতে এবং তারা যেগুলোকে হালাল বলতো তোমরা সেগুলোকে হালাল বলে মেনে নিতে, একথা কি সত্য নয়? জবাবে হযরত আদী বলেন, হাঁ, একথা তো ঠিক, আমরা অবশ্যি এমনটি করতাম। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, বস্, এটিই তো হচ্ছে তাদেরকে প্রভু বানিয়ে নেয়া। এ থেকে জানা যায়, আল্লাহর কিতাবের সনদ ছাড়াই যারা মানব জীবনের জন্য জায়েয ও নাজায়েযের সীমানা নির্ধারণ করে তারা আসলে নিজেদের ধারণা মতে নিজেরাই আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদায় সমাসীন হয়। আর যারা শরীয়াতের বিধি রচনার এ অধিকার তাদের জন্য স্বীকার করে নেয় তারা তাদেরকে কার্যত প্রভুতে পরিণত করে।

কাউকে আল্লাহর পুত্রে পরিণত করা এবং কাউকে শরীয়াত রচনার অধিকার দেয়া সংক্রান্ত অভিযোগ দু'টি পেশ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, তাদের আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবী মিথ্যা। তারা আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করলেও তাদের আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণা এতই ভ্রান্ত যে, তার কারণে তাদের আল্লাহকে মানা, না মানা সমান হয়ে গেছে।

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ
وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٣٢﴾ هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ
الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٤﴾ يَّوْمَ
يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ۗ
هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿٣٥﴾

তারা চায় তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণতা দান না করে ক্ষান্ত হবেন না, তা কাফেরদের কাছে যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন। আল্লাহই তাঁর রসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন যাতে তিনি একে সকল প্রকার দীনের ওপর বিজয়ী করেন,[৩২] মুশরিকরা একে যতই অপছন্দ করুক না কেন।

হে ঈমানদারগণ! এ আহলে কিতাবদের অধিকাংশ আলেম ও দরবেশের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায় পদ্ধতিতে খায় এবং তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে।[৩৩] যারা সোনা ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাময় আযাবের সুখবর দাও। একদিন আসবে যখন এ সোনা ও রূপাকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, অতপর তারই সাহায্যে তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে-এ সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে। নাও, এখন তোমাদের জমা করা সম্পদের স্বাদগ্রহণ কর।

৩২. কুরআনের মূল আয়াতে "আদ্‌দীন" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আমি এর অনুবাদে বলেছি, "সকল প্রকার দীন" ইতিপূর্বে যেমন বলে এসেছি, এ দীন শব্দটি আরবী ভাষায় এমন একটি জীবন ব্যবস্থা বা জীবন পদ্ধতি অর্থে ব্যবহৃত হয় যার প্রতিষ্ঠাতাকে সনদ ও

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا
فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

আসলে যখন আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই আল্লাহর লিখন ও গণনায় মাসের সংখ্যা বারো চলে আসছে।[৩৪] এর মধ্যে চারটি হারাম মাস। এটিই সঠিক বিধান। কাজেই এ চার মাসে নিজেদের ওপর জুলুম করো না।[৩৫] আর মুশরিকদের সাথে সবাই মিলে লড়াই করো যেমন তারা সবাই মিলে তোমাদের সাথে লড়াই করে।[৩৬] এবং জেনে রেখো আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথেই আছেন।

অনুসরণযোগ্য বলে মেনে নিয়ে তার আনুগত্য করতে হয়। কাজেই এ আয়াতে রসূল পাঠাবার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হেদায়াত ও সত্য দীন এনেছেন তাকে দীন জাতীয় বা দীনের শ্রেণীভুক্ত অন্য কথায় জীবন বিধান পদবাচ্য সমস্ত পদ্ধতি ও ব্যবস্থার ওপর জয়ী করবেন। অন্য কথায় রসূলকে কখনো এ উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়নি যে, তিনি যে জীবন ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন তা অন্যান্য জীবন ব্যবস্থার কাছে পরাজিত হয়ে ও সেগুলোর পদানত থেকে তাদের দেয়া সুযোগ সুবিধা ভোগ করার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ ও সংকুচিত করে রাখবে। বরং তিনি আকাশ ও পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতির প্রতিনিধি হয়ে আসেন এবং নিজের মনিবের সত্য ও ন্যায়ের ব্যবস্থাকে বিজয়ী দেখতে চান। দুনিয়ায় যদি অন্য কোন জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকে তাহলে তাকে আল্লাহর ব্যবস্থার আওতাধীনেই তার দেয়া সুযোগ-সুবিধা হাত পেতে নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। যেমন জিযিয়া আদায় করার মাধ্যমে যিম্মীরা নিজেদের অধীনতার জীবন মেনে নেয়। (দেখুন, আয্ যুমার ৩ টীকা, আল মুমিন ৪৩ টীকা, আশ শূরা ২০ টীকা)

৩৩. অর্থাৎ এ জালেমরা শুধু ফতোয়া বিক্রি করে, ঘুষ খেয়ে এবং নজরানা লুটে নিয়েই ক্ষান্ত হয় না। এ সংগে তারা এমন সব ধর্মীয় নিয়ম-কানুন ও রসম-রেওয়াজ উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করে যেগুলোর সাহায্যে লোকেরা তাদের কাছ থেকে নিজেদের পরকালীন মুক্তি কিনে নেয়। তাদের উদর পূর্তি না করলে লোকদের জীবন-মরণ, বিয়ে-শাদী এবং আনন্দ ও বিষাদ কোন অবস্থাই অতিবাহিত হতে পারে না। তারা এদেরকে নিজেদের ভাগ্য ভাংগা-গড়ার একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। উপরন্তু নিজেদের এসব স্বার্থ উদ্ধারের মতলবে তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে গোমরাহীতে লিপ্ত করে রাখে। যখনই কোন সত্যের দাওয়াত সমাজের সংশোধনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসে তখনই সবার আগে এরাই নিজেদের জ্ঞানীসুলভ প্রতারণা ও ধান্দাবাজীর অস্ত্র ব্যবহার করে তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়।

إِنَّمَا النَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ
عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ
اللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَٰفِرِينَ ﴿٣٧﴾

"নাসী" (মাসকে পিছিয়ে দেয়া) তো কুফরীর মধ্যে আরো একটি কুফরী কর্ম, যার সাহায্যে এ কাফেরদেরকে ভ্রষ্টতায় লিপ্ত করা হয়ে থাকে। কোন বছর একটি মাসকে হালাল করে নেয় এবং কোন বছর তাকে আবার হারাম করে নেয়, যাতে আল্লাহর হারাম করা মাসের সংখ্যাও পুরা করতে পারে এবং আল্লাহর হারাম করাকে হালালও করতে পারে।[৩৭] তাদের খারাপ কাজগুলোকে তাদের জন্য শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ সত্য-অস্বীকারকারীদেরকে হেদায়াত দান করেন না।

৩৪. অর্থাৎ যখন আল্লাহ চাঁদ, সূর্য ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই এ হিসাবও চলে আসছে যে, প্রতি মাসে প্রথমার চাঁদ একবারই ওঠে। এ হিসাবে এক বছরে ১২ মাস হয়। একথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, আরবের লোকেরা 'নাসী'র কারণে ১৩ বা ১৪ মাসে বছর বানিয়ে ফেলতো। যে হারাম মাসকে তারা হালাল করে নিয়েছে তাকে এভাবে বছরের পঞ্জিকায় জায়গা দেবার ব্যবস্থা করতো। সামনের দিকে এ বিষয়টির আরো ব্যাখ্যা করা হবে।

৩৫. অর্থাৎ যেসব উপযোগিতা ও কল্যাণ কারিতার ভিত্তিতে এ মাসগুলোতে যুদ্ধ করা হারাম করা হয়েছে সেগুলোকে নষ্ট করো না এবং এ দিনগুলোতে শান্তি ভংগ করে বিশৃংখলা ছড়িয়ে নিজেদের ওপর জুলুম করো না। চারটি হারাম মাস বলতে যিলকদ্দ, যিল হজ্জ ও মহররম মাস হজ্জের জন্য এবং উমরাহের জন্য রজব মাস।

৩৬. অর্থাৎ মুশরিকরা যদি উল্লেখিত মাসগুলোতে লড়াই করা থেকে বিরত না হয় তাহলে তারা যেমন একমত ও একজোট হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে, তোমরাও তেমনি একমত ও একজোট হয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়ো। সূরা আল বাকারার ১৯৪ আয়াতটি এর ব্যাখ্যা পেশ করছে।

৩৭. আরবে 'নাসী' ছিল দু' ধরনের। এক ধরনের 'নাসী'র প্রেক্ষিতে আরববাসীরা যুদ্ধ-বিগ্রহ, লুট-তরাজ ও হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য কোন হারাম মাসকে হালাল গণ্য করতো এবং তার বদলে কোন হালাল মাসকে হারাম গণ্য করে হারাম মাসগুলোর সংখ্যা পূর্ণ করতো। আর দ্বিতীয় ধরনের 'নাসী'র প্রেক্ষিতে তারা চান্দ্রবর্ষকে সৌরবর্ষ সদৃশ করার জন্য তাতে 'কাবীসা' নামে একটা মাস বাড়িয়ে দিতো। তাদের উদ্দেশ্য হতো, এভাবে হজ্জ সবসময় একই মওসুমে অনুষ্ঠিত হতে থাকবে। ফলে চান্দ্রবর্ষ অনুযায়ী বিভিন্ন মওসুমে হজ্জ অনুষ্ঠিত হবার ফলে তাদের যে কষ্ট করতে হতো তা থেকে তারা

রেহাই পাবে। এভাবে ৩৩ বছর ধরে হজ্জ তার আসল সময়ে অনুষ্ঠিত না হয়ে অন্য তারিখে অনুষ্ঠিত হতো এবং শুধুমাত্র ৩৪ বছরের মাথায় একবার যিল হজ্জ মাসের ৯–১০ তারিখে অনুষ্ঠিত হতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় তাঁর প্রদত্ত খুতবায় একথাটিই বলেছিলেন ঃ

ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض

"এ বছর হজ্জের সময় ঘুরতে ঘুরতে ঠিক তার প্রাকৃতিক হিসেব অনুযায়ী আসল তারিখে এসে গেছে।"

এ আয়াতে 'নাসী'কে নিষিদ্ধ ও হারাম গণ্য করে আরবের মূর্খ লোকদের উল্লেখিত দু'টি উদ্দেশ্য ও স্বার্থান্বেষণকেই বাতিল করে দেয়া হয়েছে। প্রথম উদ্দেশ্যটি তো একটি সুস্পষ্ট গুনাহ ছিল। এ ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা নেই। এর অর্থ তো এটাই ছিল, আল্লাহর হারাম করা জিনিসকে হালালও করে নেয়া হবে আবার কৌশল করে আইন মেনে চলার একটা বহিকাঠামোও তৈরী করে রেখে দেয়া হবে। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি আপাত দৃষ্টিতে নির্দোষ ও কল্যাণ ভিত্তিক মনে হলেও আসলে এটাও ছিল আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম বিদ্রোহ। মহান আল্লাহ তাঁর আরোপিত ফরযগুলোর জন্য সৌরবর্ষের হিসেবের পরিবর্তে চান্দ্রবর্ষের হিসেব অবলম্বন করেছেন যেসব গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণকারিতার ভিত্তিতে তিনি এসব করেছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে, তাঁর বান্দা কালের সকল প্রকার আবর্তনের মধ্যে সব রকমের অবস্থায় ও পরিস্থিতিতে তাঁর হুকুম আহকাম মেনে চলতে অভ্যস্ত হবে। যেমন রমযান, কখনো আসে গরমকালে, কখনো বর্ষাকালে আবার কখনো শীতকালে। ঈমানদাররা এসব পরিবর্তিত অবস্থায় রোযা রেখে অনুগত থাকার প্রমাণও পেশ করে এবং এ সংগে সর্বোত্তম নৈতিক প্রশিক্ষণও লাভ করে। অনুরূপভাবে হজ্জও চান্দ্রমাসের হিসেব অনুযায়ী বিভিন্ন মওসুমে আসে। এসব মওসুমের ভালো–মন্দ সব ধরনের অবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সফর করে বান্দা আল্লাহর পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্তরে যায় এবং বন্দেগীর ক্ষেত্রে পরিপক্কতা অর্জন করে। এখন যদি এক দল লোক নিজেদের সফর, ব্যবসা–বাণিজ্য ও মেলা–পার্বনের সুবিধার্থে চিরদিনের জন্য অনুকূল মওসুমে হজ্জের প্রচলন করে, তাহলে সেটা হবে এরূপ যেন মুসলমানরা কোন সম্মেলন করে সিদ্ধান্ত নিল যে, আগামী থেকে রমযান মাসকে ডিসেম্বর বা জানুয়ারীর সাথে মিলিয়ে দেয়া হবে। এর পরিষ্কার মানে দাঁড়ায়, বান্দারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজেরাই স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে গেছে। এ জিনিসটিরই নাম কুফরী। এ ছাড়াও একটি বিশ্বজনীন দীন ও জীবন ব্যবস্থা, যা সমগ্র মানব জাতির জন্য এসেছে তা কোন্ সৌরমাসকে রোযা ও হজ্জের জন্য নির্ধারিত করবে? যে মাসটিই নির্ধারিত হবে সেটিই পৃথিবীর সব এলাকার বাসিন্দাদের জন্য সমান সুবিধাজনক মওসুম হবে না। কোথাও তা পড়বে গরম কালে, কোথাও পড়বে শীতকালে, কোথাও তখন হবে বর্ষাকাল, কোথাও হবে খরার মওসুম, কোথাও তখন ফসল কাটার কাজ চলবে আবার কোথাও চলবে বীজ বপন করার কাজ।

এ সংগে একথাও মনে রাখতে হবে যে, ৯ হিজরীর হজ্জের সময় 'নাসী' বাতিল করার এ ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। পরের বছর ১০ হিজরীতে চান্দ্র মাসের হিসেব অনুযায়ী ঠিক নির্ধারিত তারিখেই হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত সঠিক তারিখেই হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ۭ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ
فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ۝ اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ
عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْـــًٔا ۭ وَاللّٰهُ
عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৬ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ![৩৮] তোমাদের কী হলো, যখনই তোমাদের আল্লাহর পথে বের হতে বলা হলো, অমনি তোমরা মাটি কামড়ে পড়ে থাকলে? তোমরা কি আখেরাতের মোকাবিলায় দুনিয়ার জীবন পছন্দ করে নিয়েছো? যদি তাই হয়, তাহলে তোমরা মনে রেখো, দুনিয়ার জীবনের এসব সাজ সরঞ্জাম আখেরাতে খুব সামান্য বলে প্রমাণিত হবে।[৩৯] তোমরা যদি না বের হও তাহলে আল্লাহ তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন[৪০] এবং তোমাদের জায়গায় আর একটি দলকে ওঠাবেন,[৪১] আর তোমরা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী।

৩৮. তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি চলাকালে যে ভাষণটি নাযিল হয়েছিল এখান থেকে সেটিই শুরু হচ্ছে।

৩৯. এর দু'টো অর্থ হতে পারে। এক, আখেরাতের অনন্ত জীবন ও সেখানকার সীমা-সংখ্যাহীন সাজ সরঞ্জাম দেখার পর তোমরা জানতে পারবে, দুনিয়ার সামান্য জীবনকালে সুখৈশ্বর্য ভোগের যে বড় বড় সম্ভাবনা তোমাদের করায়ত্ব ছিল এবং যে সর্বাধিক পরিমাণ বিলাস সামগ্রী তোমরা লাভ করতে পেরেছিলে তা আখেরাতের সেই সীমাহীন সম্ভাবনা এবং সেই অন্তহীন নিয়ামতে পরিপূর্ণ সুবিশাল রাজ্যের তুলনায় কিছুই নয়। তখন তোমরা নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টি ও অদূরদর্শিতার জন্য এ মর্মে আফসোস করতে থাকবে যে, আমার হাজার বুঝানো সত্ত্বেও দুনিয়ার তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী লাভের মোহে তোমরা কেন নিজেদেরকে এ চিরন্তন ও বিপুল পরিমাণ লাভ থেকে বঞ্চিত রাখলে। দুই, দুনিয়ার জীবনের সামগ্রী আখেরাতে কোন কাজে লাগবে না। এখানে যতই ঐশ্বর্য সম্পদ ও সাজ-সরঞ্জাম তোমরা সংগ্রহ করো না কেন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার সাথে সাথেই সব কিছু থেকে হাত গুটিয়ে নিতে হবে। মৃত্যুর পরপারে যে জগত রয়েছে এখানকার কোন জিনিসই সেখানে তোমাদের সাথে স্থানান্তরিত হবে না। এখানকার জিনিসের যে অংশটুকু তোমরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কুরবানী করেছো এবং যে জিনিসকে ভালবাসার ওপর

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ
إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۚ
فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾ انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ
وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

তোমরা যদি নবীকে সাহায্য না কর, তাহলে কোন পরোয়া নেই। আল্লাহ তাকে এমন সময় সাহায্য করেছেন যখন কাফেররা তাকে বের করে দিয়েছিল, যখন সে ছিল মাত্র দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় জন, যখন তারা দু'জন গুহার মধ্যে ছিল, তখন সে তার সাথীকে বলছিল, "চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।"৪২ সে সময় আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তার ওপর মানসিক প্রশান্তি নাযিল করেন এবং এমন সেনাদল পাঠিয়ে তাকে সাহায্য করেন, যা তোমরা দেখোনি এবং তিনি কাফেরদের বক্তব্যকে নীচু করে দেন। আর আল্লাহর কথা তো সমুন্নত আছেই। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।—বের হও, হালকা কিংবা ভারী যাই হওনা কেন, এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজের ধন-প্রাণ দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে।৪৩

তোমরা আল্লাহ ও তাঁর দীনের প্রতি ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিয়েছো একমাত্র সেই অংশই তোমরা সেখানে পেতে পারো।

৪০. এ থেকেই শরীয়াতের এ বিধি জানা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন সাধারণ ঘোষণা (যুদ্ধ করার জন্য সর্বসাধারণ মুসলমানদেরকে আহবান জানানো) না দেয়া হবে কিংবা কোন এলাকার সকল মুসলিম অধিবাসীকে বা মুসলমানদের কোন দলকে জিহাদের জন্য বের হবার হুকুম দেয়া না হবে ততক্ষণ তো জিহাদ ফরযে কিফায়াই থাকে। অর্থাৎ যদি কিছু লোক জিহাদ করতে থাকে তাহলে বাদবাকি লোকদের ওপর থেকে ঐ ফরয রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু যখন মুসলমানদের শাসকের পক্ষ থেকে মুসলমানদেরকে সর্বাত্মক জিহাদের জন্য আহবান জানানো হবে অথবা কোন বিশেষ দলকে বা বিশেষ এলাকার অধিবাসীদেরকে ডাকা হবে তখন যাদেরকে ডাকা হয়েছে

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ
الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُونَ
أَنفُسَهُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٤٢﴾

হে নবী! যদি সহজ লাভের সম্ভাবনা থাকতো এবং সফর হাল্কা হতো, তাহলে তারা নিশ্চয়ই তোমার পেছনে চলতে উদ্যত হতো। কিন্তু তাদের জন্য তো এ পথ বড়ই কঠিন হয়ে গেছে।[৪৪] এখন তারা আল্লাহর কসম খেয়ে খেয়ে বলবে, "যদি আমরা চলতে পারতাম তাহলে অবশ্যি তোমাদের সাথে চলতাম।" তারা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আল্লাহ ভালো করেই জানেন তারা মিথ্যাবাদী।

তাদের ওপর জিহাদ "ফরযে আইন" হয়ে যাবে। এমনকি যে ব্যক্তি কোন যথার্থ অসুবিধা বা ওযর ছাড়া জিহাদে অংশগ্রহণ করবে না তার ঈমানই গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪১. অর্থাৎ আল্লাহর কাজ তোমাদের ওপর নির্ভরশীল নয়। তোমরা করলে তা হবে এবং তোমরা না করলে হবে না, এমন নয়। আসলে আল্লাহ যে তোমাদের তাঁর দীনের খেদমতের সুযোগ দিচ্ছেন, এটা তাঁর মেহেরবানী ও অনুগ্রহ। যদি তোমরা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে এ সুযোগ হারাও, তাহলে তিনি অন্য কোন জাতিকে এ সুযোগ দেবেন এবং তোমরা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

৪২. মক্কার কাফেররা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিল, এটা সে সময়ের কথা। যে রাতে তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সে রাতেই তিনি মক্কা থেকে বের হয়ে মদীনার দিকে হিজরত করেছিলেন। ইতিপূর্বে দু'জন চারজন করে যেতে যেতে মুসলমানদের বেশীর ভাগ মদীনায় পৌঁছে গিয়েছিল। মক্কায় কেবলমাত্র তারাই থেকে গিয়েছিল যারা ছিল একেবারেই অসহায় অথবা যাদের ঈমানের মধ্যে মোনাফেকীর মিশ্রণ ছিল এবং তাদের ওপর কোন প্রকারে ভরসা করা যেতে পারতো না। এ অবস্থায় যখন তিনি জানতে পারলেন, তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, তখন তিনি শুধুমাত্র একজন সাথী হযরত আবু বকরকে (রা) সংগে নিয়ে মক্কা থেকে বের হয়ে পড়লেন। নিশ্চয়ই তাঁর পেছনে ধাওয়া করা হবে, এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি মদীনার পথ ছেড়ে (যা ছিল উত্তরের দিকে) দক্ষিণের পথ অবলম্বন করলেন। এখানে তিন দিন পর্যন্ত তিনি 'সাওর' নামক পর্বত গুহায় আত্মগোপন করে থাকলেন। তাঁর রক্ত পিপাসু দুশমনেরা তাঁকে চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। মক্কার আশপাশের উপত্যকাগুলোর কোন জায়গা খুঁজতে তারা বাকি রাখেনি। এভাবে তাদের কয়েকজন খুঁজতে খুঁজতে যে গিরি গুহায় তিনি লুকিয়েছিলেন তার মুখে পৌঁছে গেলো। হযরত আবু বকর (রা) ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, দুশমনদের একজন যদি একটু ভিতরে ঢুকে উঁকি দেয়, তাহলে তাদের দেখে ফেলবে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا
وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٤٣﴾ لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٤﴾
اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ
قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ﴿٤٥﴾

৭ রুকূ'

হে নবী! আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন, তুমি তাদের অব্যাহতি দিলে কেন? (তোমার নিজের তাদের অব্যাহতি না দেয়া উচিত ছিল) এভাবে তুমি জানতে পারতে কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যুক।[৪৫] যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তারা কখনো তোমার কাছে তাদের ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আবেদন জানাবে না। আল্লাহ মুত্তাকীদের খুব ভাল করেই জানেন। এমন আবেদন তো একমাত্র তারাই করে; যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে না, যাদের মনে রয়েছে সন্দেহ এবং এ সন্দেহের দোলায় তারা দোদুল্যমান।[৪৬]

সাল্লাম একটুও বিচলিত না হয়ে হযরত আবু বকরকে এ বলে সান্ত্বনা দিলেন, "চিন্তিত হয়ো না, মন খারাপ করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।"

৪৩. এখানে হাল্কা ও ভারী শব্দ দু'টি ব্যাপক অর্থবোধক। এর অর্থ হচ্ছে, বের হবার হুকুম যখন হয়ে গেছে তখন তোমাদের বের হয়ে পড়তে হবে। স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে হোক বা অনিচ্ছায়–অনাগ্রহে, সচ্ছলতায় ও সমৃদ্ধির মধ্যে হোক বা দারিদ্রের মধ্যে, বিপুল পরিমাণ সাজসরঞ্জাম থাক বা একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় হোক, অনুকূল অবস্থা হোক বা প্রতিকূল অবস্থা, যৌবন ও সুস্বাস্থের অধিকারী হও বা বৃদ্ধ ও দুর্বল হও, সর্বাবস্থায় বের হতে হবে।

৪৪. অর্থাৎ মোকাবিলা রোমের মতো বড় শক্তির সাথে। একদিকে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মওসুম এসে গেছে এবং দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। তার ওপর নতুন বছরের বহু প্রত্যাশিত ফসল কাটার সময় এসে গেছে। এসব কারণে তাবুকের সফর তাদের কাছে বড়ই কঠিন ও চড়ামূল্যের বলে মনে হচ্ছিল।

৪৫. কোন কোন মুনাফিক বানোয়াট ওযর পেশ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যুদ্ধে যাওয়া থেকে অব্যাহতি চেয়েছিল। তিনিও নিজের স্বভাবগত কোমলতা

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ
فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٤٦﴾ لَوْ خَرَجُوا فِيكُم
مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ
وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

যদি সত্যিসত্যিই তাদের বের হবার ইচ্ছা থাকতো তাহলে তারা সে জন্য কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করতো। কিন্তু তাদের অংশগ্রহণ আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়ই ছিল না।[৪৭] তাই তিনি তাদের শিথিল করে দিলেন এবং বলে দেয়া হলো ঃ "বসে থাকো, যারা বসে আছে তাদের সাথে।" যদি তারা তোমাদের সাথে বের হতো তাহলে তোমাদের মধ্যে অনিষ্ট ছাড়া আর কিছুই বাড়াতো না। তারা ফিত্না সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে প্রচেষ্টা চালাতো। আর তোমাদের লোকদের অবস্থা হচ্ছে, তাদের মধ্যে এখনো এমন লোক আছে যারা তাদের কথা আড়ি পেতে শোনে। আল্লাহ এ জালেমদের খুব ভাল করেই চেনেন।

ও উদারতার ভিত্তিতে তারা যে নিছক ভাওতাবাজী করছে, তা জানা সত্ত্বেও তাদের অব্যাহতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ এটা পছন্দ করেননি। এ ধরনের উদার নীতি সংগত নয় বলে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন। অব্যাহতি দেবার কারণে এ মুনাফিকরা নিজেদের মুনাফিকী ও প্রতারণামূলক কার্যকলাপ গোপন করার সুযোগ পেয়ে গেলো। যদি তাদের অব্যাহতি না দেয়া হতো এবং তারপর তারা ঘরে বসে থাকতো তাহলে তখন তাদের মিথ্যা ঈমানের দাবী সর্বসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়তো।

৪৬. এ থেকে জানা যায়, ইসলাম ও কুফরীর দ্বন্দ্ব একটি মাপকাঠি স্বরূপ। এর মাধ্যমে খাঁটি মুমিন ও নকল ঈমানের দাবীদারের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে যে ব্যক্তি মনপ্রাণ দিয়ে ইসলামকে সমর্থন করে এবং নিজের সমস্ত শক্তি সামর্থ ও উপায় উপকরণ তাকে বিজয়ী করার সংগ্রামে নিয়োজিত করে এবং এ পথে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠিত হয় না, সে-ই সাচ্চা মুমিন। পক্ষান্তরে এ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে যে ব্যক্তি ইসলামের সাথে সহযোগিতা করতে ইতস্তত করে এবং কুফরের শির উঁচু হবার বিপদ সামনে দেখেও ইসলামের বিজয়ের জন্য জান-মালের কুরবানী করতে কুণ্ঠিত হয়, তার এ মনোভাব ও কার্যকলাপ এ সত্যটিকে সুস্পষ্ট করে দেয় যে, তার অন্তরে ঈমান নেই।

৪৭. অর্থাৎ মনের তাগিদ ছাড়া অনিচ্ছায় যুদ্ধযাত্রা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় ছিল না। কারণ তাদের মধ্যে যখন জিহাদে অংশগ্রহণ করার প্রেরণা ও সংকল্প অনুপস্থিত ছিল এবং ইসলামের বিজয়ের জন্য প্রাণপাত করার কোন ইচ্ছাই তাদের ছিল না তখন শুধুমাত্র

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ
وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٤٨﴾ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا
تَفْتِنِّي ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٤٩﴾

এর আগেও এরা ফিত্না সৃষ্টির চেষ্টা করেছে এবং তোমাদের ব্যর্থ করার জন্য ধুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন ধরনের কৌশল খাটিয়েছে। এ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য এসে গেছে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে বলে, "আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে পাপের ঝুঁকির মধ্যে ফেলবেন না।"[৪৮] শুনে রাখো, এরা তো ঝুঁকির মধ্যেই পড়ে আছে[৪৯] এবং জাহান্নাম এ কাফেরদের ঘিরে রেখেছে।[৫০]

মুসলমানদের সামনে লজ্জিত হবার ভয়ে অসন্তুষ্ট মনে অথবা কোন অনিষ্ট করার উদ্দেশ্যে তারা জোরেশোরে এগিয়ে আসতো এবং এটা সমূহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতো। পরবর্তী আয়াতে বিষয়টি পরিষ্কার করে বলা হয়েছে।

৪৮. যেসব মুনাফিক মিথ্যা বাহানা বানিয়ে পিছনে থেকে যাবার অনুমতি চাচ্ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এতই বেপরোয়া ছিল যে, আল্লাহর পথ থেকে পেছনে সরে যাবার জন্য ধর্মীয় ও নৈতিক ধরনের বাহানাবাজীর আশ্রয় নিতো। জাদ্দ ইবনে কায়েস নামক তাদের একজনের সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে : সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলো, আমি একজন সৌন্দর্য পিপাসু লোক আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার এ দুর্বলতা জানে যে, মেয়েদের ব্যাপারে আমি সবর করতে পারি না। আমার ভয় হয়, রোমান মেয়েদের দেখে আমার পদস্খলন না হয়ে যায়। কাজেই আপনি আমাকে ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দেবেন না এবং এ অক্ষমতার কারণে আমাকে এ জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে রেহাই দিন.

৪৯. অর্থাৎ তারা তো ফিতনা বা পাপের ঝুঁকি থেকে রেহাই পাওয়ার দোহাই দিচ্ছে কিন্তু আসলে তারা আকণ্ঠ ডুবে আছে মুনাফিকী, মিথ্যাচার ও রিয়াকারীর মত জঘন্য পাপের মধ্যে। নিজেদের ধারণা মতে তারা মনে করছে, ছোট ছোট ফিতনার সম্ভাবনার ব্যাপারে ভয় ও পেরেশানি প্রকাশ করে তারা নিজেদের বড় ধরনের মুত্তাকী হবার প্রমাণ পেশ করে যাচ্ছে। অথচ কুফর ও ইসলামের চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্তকর সংঘর্ষকালে ইসলামের পক্ষ সমর্থনে ইতস্তত করে তারা আরো বড় পাপ এবং আরো বড় ফিত্নার মধ্যে নিজেদের ফেলে দিচ্ছে যার চাইতে বড় কোন ফিতনার কথা কল্পনাই করা যায় না।

৫০. অর্থাৎ তাকওয়ার এ প্রদর্শনী তাদের জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখেনি। বরং মুনাফিকীর কারণেই তাদেরকে জাহান্নামের করাল গ্রাসে নিক্ষেপ করেছে.

إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا
أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿٥٠﴾ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا
كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾
قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ
أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوا
إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿٥٢﴾

তোমার ভাল কিছু হলে তা তাদের কষ্ট দেয় এবং তোমার ওপর কোন বিপদ এলে তারা খুশী মনে সরে পড়ে এবং বলতে থাকে, "ভালই হয়েছে, আমরা আগেভাগেই আমাদের ব্যাপার সেরে নিয়েছি।" তাদের বলে দাও, "আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা ছাড়া আর কোন (ভাল বা মন্দ) কিছুই আমাদের হয় না। আল্লাহই আমাদের অভিভাবক ও কার্যনির্বাহক এবং ঈমানদারদের তাঁর ওপরই ভরসা করা উচিত।"[৫১]

তাদের বলে দাও, "তোমরা আমাদের ব্যাপারে যে জিনিসের অপেক্ষায় আছো তা দু'টি ভালর একটি ছাড়া আর কি?[৫২] অন্যদিকে আমরা তোমাদের ব্যাপারে যে জিনিসের অপেক্ষায় আছি তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ হয় নিজেই তোমাদের শাস্তি দেবেন, না হয় আমাদের হাত দিয়ে দেয়াবেন? তাহলে এখন তোমরা অপেক্ষা করো এবং আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় থাকছি।"

৫১. এখানে দুনিয়াপূজারী ও আল্লাহে বিশ্বাসী মানসিকতার পার্থক্য সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। দুনিয়া পূজারী নিজের প্রবৃত্তির আকাংখা পূর্ণ করার জন্য সবকিছু করে। কোন বৈষয়িক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার ওপরই তার প্রবৃত্তির সুখ ও আনন্দ নির্ভর করে। এ উদ্দেশ্য লাভে সক্ষম হলেই সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। আর উদ্দেশ্য লাভে ব্যর্থ হলে সে ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। তারপর বস্তুগত কার্যকারণই প্রায় তার সমস্ত সহায় অবলম্বনের কাজ করে। সেগুলো অনুকূল হলে তার মনোবল বেড়ে যেতে থাকে। আর প্রতিকূল হলে সে হিম্মত হারাতে থাকে। অন্যদিকে আল্লাহে বিশ্বাসী মানুষ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই সবকিছু করে। এ কাজে সে নিজের শক্তি বা বস্তুগত উপায় উপকরণের ওপর ভরসা করে না বরং সে পুরোপুরি নির্ভর করে আল্লাহর সত্তার ওপর। সত্যের পথে কাজ করতে গিয়ে

সে বিপদ-আপদের সম্মুখীন হলে অথবা সাফল্যের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করলে, উভয় অবস্থায় সে মনে করে আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ হচ্ছে। বিপদ আপদ তার মনোবল ভাংতে পারে না। আবার সাফল্যও তাকে অহংকারে লিপ্ত করতে পারে না। কারণ, প্রথমত সে উভয়কে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বলে মনে করে। সব অবস্থায় সে আল্লাহর সৃষ্ট এ পরীক্ষায় নিরাপদে উত্তীর্ণ হতে চায়। দ্বিতীয়ত তার সামনে কোন বৈষয়িক উদ্দেশ্য থাকে না এবং তার মাধ্যমে সে নিজের সাফল্য ও ব্যর্থতার বিচার করে না। তার সামনে থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের একটি মাত্র উদ্দেশ্য। বৈষয়িক সাফল্য লাভ করা বা না করার মাধ্যমে তার এ উদ্দেশ্যের নিকটবর্তী হওয়া বা দূরে অবস্থান করার ব্যাপারটি পরিমাপ করা যায় না। বরং আল্লাহর পথে জান ও মাল উৎসর্গ করার যে দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হয়েছিল তা সে কতদূর পালন করেছে। তার ভিত্তিতেই তার পরিমাপ করা যায়। যদি এ দায়িত্ব সে পালন করে থাকে তাহলে দুনিয়ায় সে সম্পূর্ণরূপে হেরে গেলেও তার পূর্ণ আস্থা থাকে যে, সে যে আল্লাহর জন্য ধন-প্রাণ উৎসর্গ করেছে তিনি তার প্রতিদান নষ্ট করে দেবেন না। তারপর বৈষয়িক কার্যকারণ ও উপায় উপকরণের আশায় সে বসে থাকে না। সেগুলোর অনুকূল ও প্রতিকূল হওয়া তাকে আনন্দিত ও নিরানন্দ করে না। সে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখে। তিনিই কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণ রাজ্যের একচ্ছত্র মালিক। কাজেই তাঁর ওপর ভরসা করে সে প্রতিকূল অবস্থায়ও এমন হিম্মত ও দৃঢ় সংকল্প সহকারে কাজ করে যায় যে, দুনিয়া পূজারীরা একমাত্র অনুকূল অবস্থায়ই সেভাবে কাজ করতে পারে। তাই মহান আল্লাহ বলেন, ঐ সব দুনিয়া পূজারী মুনাফিকদের বলে দাও, আমাদের ব্যাপারটা তোমাদের থেকে মূলগতভাবে ভিন্ন। তোমাদের আনন্দ ও নিরানন্দের রীতি-পদ্ধতি আমাদের থেকে আলাদা। তোমাদের নিশ্চিন্ততা ও অস্থিরতার উৎস এক, আমাদের অন্য।

৫২. মুনাফিকরা তাদের অভ্যাস অনুযায়ী এ সময়ও কুফর ও ইসলামের সংঘাতে অংশ না নিয়ে নিজেরা চরম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিচ্ছে বলে মনে করছিল। এ সংঘাতের পরিণামে রসূল ও তাঁর সাহাবীরা বিজয়ীর বেশে ফিরে আসেন, না রোমীয়দের সামরিক শক্তির সাথে সংঘর্ষে ছিন্নভিন্ন হয়ে যান, দূরে বসে তারা তা দেখতে চাচ্ছিল। এখানে তাদের প্রত্যাশার জবাব দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, দু'টি ফলাফলের মধ্যে তোমরা একটির প্রকাশের অপেক্ষা করছো। অথচ ঈমানদারদের জন্য উভয় ফলাফলই যথার্থ ভাল ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা বিজয়ী হলে, এটা যে তাদের জন্যে ভাল একথা সবার জানা। কিন্তু নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পাদনের পথে প্রাণ দান করে যদি তারা মাটিতে বিলীন হয়ে যায়, তাহলে দুনিয়াবাসীরা তাদের চরম ব্যর্থ বলে মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে এটিও আর এক রকমের সাফল্য। কারণ মুমিন একটি দেশ জয় করলো কি করলো না অথবা কোন সরকার প্রতিষ্ঠিত করলো কি করলো না, এটা তার সাফল্য ও ব্যর্থতার মাপকাঠি নয়। বরং মুমিন তার আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য নিজের মন, মস্তিষ্ক, দেহ ও প্রাণের সমুদয় শক্তি নিয়োজিত করেছে কিনা, এটাই তার মাপকাঠি। এ কাজ যদি সে করে থাকে তাহলে দুনিয়ার বিচারে তার ফলাফল শূন্য হলেও আসলে সে সফলকাম।

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا
فَاسِقِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا
بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ
إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٥٤﴾ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ
كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾

তাদের বলে দাও, "তোমরা নিজেদের ধন-সম্পদ স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ব্যয় কর অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে ব্যয় কর[৫৩] তা গৃহীত হবে না। কারণ তোমরা ফাসেক গোষ্ঠী।" তাদের দেয়া সম্পদ গৃহীত না হবার এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে, নামাযের জন্য যখন আসে আড়মোড়া ভাংতে ভাংতে আসে এবং আল্লাহর পথে খরচ করলে তা করে অনিচ্ছাকৃতভাবে। তাদের ধন-দৌলত ও সন্তানের আধিক্য দেখে তোমরা প্রতারিত হয়ো না। আল্লাহ চান, এ জিনিসগুলোর মাধ্যমে দুনিয়ার জীবনে তাদের শাস্তি দিতে।[৫৪] আর তারা যদি প্রাণও দিয়ে দেয়, তাহলে তখন তারা থাকবে সত্য অস্বীকার করার অবস্থায়।[৫৫]

৫৩. কোন কোন মুনাফিক এমনও ছিল, যারা নিজেদেরকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে যদিও প্রস্তুত ছিল না, তবে তারা এ জিহাদ ও এ চেষ্টা-সাধনা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন থেকে মুসলমানদের দৃষ্টিতে নিজেদের সমস্ত মর্যাদা খুইয়ে ফেলতে এবং নিজেদের মুনাফিকীকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দিতেও চাচ্ছিল না। তাই তারা বলছিল, বর্তমানে আমরা যদিও অক্ষমতার কারণে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি চাচ্ছি। কিন্তু যুদ্ধের জন্য অর্থ সাহায্য করতে আমরা প্রস্তুত।

৫৪. অর্থাৎ এ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মায়ার ডোরে আবদ্ধ হয়ে তারা যে মুনাফিকী নীতি অবলম্বন করেছে, সে জন্য মুসলিম সমাজে তারা চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। এতদিনকার আরবীয় সমাজে তাদের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি, মান-মর্যাদা, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ছিল নব্য ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় তা সম্পূর্ণ মাটিতে মিশে যাবে। যেসব নগণ্য দাস ও দাস পুত্ররা এবং মামুলী ধরনের কৃষক ও রাখালরা ঈমানী নিষ্ঠা ও আন্তরিকাতার প্রমাণ পেশ করেছে, এ নতুন সমাজে তারা হবে মর্যাদাশালী। অন্যদিকে

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ
يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ
وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا
مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا
مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ
وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾

তারা আল্লাহর কসম খেয়ে খেয়ে বলে, আমরা তোমাদেরই লোক। অথচ তারা মোটেই তোমাদের অন্তরভুক্ত নয়। আসলে তারা এমন একদল লোক যারা তোমাদের ভয় করে। যদি তারা কোন আশ্রয় পেয়ে যায় অথবা কোন গিরি-গুহা কিংবা ভিতরে প্রবেশ করার মত কোন জায়গা, তাহলে দৌড়ে গিয়ে সেখানে লুকিয়ে থাকবে।[৫৬]

হে নবী! তাদের কেউ কেউ সাদকাহ বন্টনের ব্যাপারে তোমার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাচ্ছে। এ সম্পদ থেকে যদি তাদের কিছু দেয়া হয় তাহলে তারা খুশী হয়ে যায়, আর না দেয়া হলে বিগড়ে যেতে থাকে।[৫৭] কতই না ভাল হতো, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা কিছুই তাদের দিয়েছিলেন তাতে যদি তারা সন্তুষ্ট থাকতো[৫৮] এবং বলতো, "আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি নিজের অনুগ্রহ থেকে আমাদের আরো অনেক কিছু দেবেন এবং তাঁর রসূলও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন।[৫৯] আমরা আল্লাহরই প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছি।[৬০]

বংশানুক্রমিক সমাজনেতা ও সমাজপতিরা নিজেদের দুনিয়া প্রীতির কারণে মর্যাদাহীন হয়ে পড়বে।

হযরত উমরের (রা) মজলিসে একবার একটি ঘটনা ঘটেছিল। সেটি ছিল এ অবস্থার একটি চমকপ্রদ চিত্র। সুহাইল ইবনে আমর ও হারেস ইবনে হিশামের মতো বড় বড় কুরাইশী সরদাররা হযরত উমরের (রা) সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন। সেখানে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্য থেকে মামুলী পর্যায়ের কোন লোক হলেও হযরত উমর (রা) তাকে ডেকে নিজের কাছে বসাচ্ছিলেন এবং এ সমাজপতিদের সরে তার জন্য জায়গা করে দিতে বলছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সমাজপতিরা সরতে সরতে একেবারে মজলিসের

কিনারে গিয়ে পৌছলেন। বাইরে বের হয়ে এসে হারেস ইবনে হিশাম নিজের সাথীদের বললেন, তোমরা দেখলে তো আজ আমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হলো? সুহাইল ইবনে আমর বললেন, এতে উমরের কোন দোষ নেই। দোষ আমাদের। কারণ আমাদের যখন এ দীনের দিকে ডাকা হয়েছিল তখন আমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম এবং এ লোকেরা দৌড়ে এসেছিল। তারপর এ দু' সমাজপতি দ্বিতীয়বার হযরত উমরের কাছে হাযির হলেন। এবার তারা বললেন, আজ আমরা আপনার আচরণ দেখলাম। আমরা জানি, আমাদের ত্রুটির কারণেই এ অবস্থা হয়েছে। কিন্তু এখন এর প্রতিবিধানের কোন উপায় আছে কি? হযরত উমর (রা) মুখে কোন জবাব দিলেন না। তিনি শুধু রোম সীমান্তের দিকে ইশারা করলেন। মানে, তিনি বলতে চাচ্ছিলেন, এখন জিহাদের ময়দানে জান-মাল উৎসর্গ করো, তাহলে হয়তো তোমরা নিজেদের হারানো মর্যাদা আবার ফিরে পাবে।

৫৫. অর্থাৎ এতসব লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যেও তাদের জন্য আরো বড় বিপদ হবে এই যে, তারা নিজেদের মধ্যে যে মুনাফিকী চরিত্র বৈশিষ্ট লালন করছে তার বদৌলতে মরার আগ পর্যন্ত তারা সত্যিকার ঈমানলাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং নিজেদের পার্থিব সুখ-সুবিধা ধ্বংস করার পর দুনিয়া থেকে এমন অবস্থায় বিদায় নেবে যে, তাদের আখেরাত হবে এর চাইতেও অনেক বেশী খারাপ।

৫৬. মদীনার এ মুনাফিকদের বেশীরভাগই ছিল ধনী ও বয়স্ক। ইবনে কাসীর তাঁর আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া গ্রন্থে তাদের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে শুধুমাত্র একজন যুবকের নাম পাওয়া যায়। তাদের একজনও গরীব নয়। এরা মদীনায় বিপুল ভূ-সম্পত্তি ও চারদিকে ছড়িয়ে থাকা বিরাট কারবারের মালিক ছিল। সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা এদের সুযোগ-সন্ধানী ও সুবিধাবাদী বানিয়ে দিয়েছিল। ইসলাম যখন মদীনায় পৌছলো এবং জনবসতির একটি বড় অংশ পূর্ণ আন্তরিকতা ও ঈমানী জোশের সাথে ইসলাম গ্রহণ করলো তখন এ শ্রেণীটি পড়লো উভয় সংকটে। তারা দেখলো এ নতুন দীন একদিকে তাদের নিজেদের গোত্রের অধিকাংশ বরং তাদের ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত ঈমানের নেশায় মাতিয়ে তুলেছে। তাদের বিপরীত সারিতে দাঁড়িয়ে তারা যদি এখন কুফরী ও অস্বীকারের ঝাণ্ডা উত্তোলিত করে রাখে, তাহলে তাদের নেতৃত্ব-সরদারী, প্রভাব-প্রতিপত্তি, মান-সম্মান, সুনাম-সুখ্যাতি সবকিছুই হারিয়ে যাবে। এমনকি তাদের নিজেদের পারিবারিক পরিমণ্ডলেই তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার আশংকা দেখা দেবে। অন্যদিকে এ দীনের সাথে সহযোগিতা করার অর্থ হবে, তাদেরকে সমগ্র আরবের এমনকি চারপাশের সমস্ত জাতি-গোত্র ও রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকা। সত্য ও ন্যায় যে আসলেই একটি মূল্যবান জিনিস তার প্রেমসুধা পান করে যে মানুষ সব রকমের বিপদ আপদ মাথা পেতে নিতে পারে, এমনকি প্রয়োজনে নিজের জান-মালও পর্যন্ত কুরবানী করতে পারে। পার্থিব স্বার্থে মোহ ও প্রবৃত্তির গোলামীতে আকণ্ঠ ডুবে থাকার কারণে সে কথা উপলব্ধি করার যোগ্যতা তারা হারিয়ে ফেলেছিল। তারা দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়কে শুধুমাত্র স্বার্থ ও সুবিধাবাদের দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তাই ঈমানের দাবী করার মধ্যেই তারা নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থ সংরক্ষণের সবচেয়ে অনুকূল ও উপযোগী পথ খুঁজে পেয়েছিল। কারণ, তারা এভাবে একদিকে নিজেদের জাতি-সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেদের বাহ্যিক মান-সম্ভ্রম, সহায়-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য

যথাযথভাবে টিকিয়ে রাখতে পারবে। অন্যদিকে একনিষ্ঠ মুমিন হওয়াটাও তাদের এড়িয়ে যাওয়া দরকার, যাতে আন্তরিকতার পথ অবলম্বন করার ফলে অনিবার্যভাবে যেসব বিপদ–আপদ ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় তার হাত থেকে রেহাই পেতে পারে। তাদের এ মানসিক অবস্থাকে এখানে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আসলে তারা তোমাদের সাথে নেই। বরং ক্ষতির ভয় তাদেরকে জবরদস্তি তোমাদের সাথে বেঁধে দিয়েছে। যে জিনিসটি তাদের নিজেদেরকে মুসলমানদের মধ্যে গণ্য করাতে বাধ্য করেছে তা হচ্ছে এই ভীতি যে, মদীনায় থাকা অবস্থায় যদি তারা প্রকাশ্যে অমুসলিম হয়ে বাস করতে থাকে তাহলে তাদের সমস্ত মর্যাদা ও প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে এমনকি স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সাথেও তাদের সম্পর্কচ্ছেদ ঘটবে। আর যদি তারা মদীনা ত্যাগ করে তাহলে নিজেদের সম্পদ–সম্পত্তি ও ব্যবসা–বাণিজ্য ত্যাগ করতে হবে। আবার কুফরীর প্রতিও তাদের এতটা আন্তরিকতা ছিল না যে, তার জন্য তারা এসব ক্ষতি বরদাশত করতে পারতো। এ উভয় সংকটে পড়ে তারা বাধ্য হয়ে মদীনায় থেকে গিয়েছে। মন না চাইলেও অনিচ্ছা সত্ত্বেও নামায পড়তো। এবং যাকাতকে "জরিমানা" ভেবে হলেও অগত্যা আদায় করতো। নয়তো প্রতিদিন জিহাদ, প্রতিদিন কোন না কোন ভয়াবহ দুশমনের সাথে পাঞ্জা কষাকষি এবং প্রতিদিন জান ও মাল কুরবানীর যে বিপদ ঘাড়ে চেপে আছে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তারা এত বেশী অস্থির যে, যদি তারা সাধারণ কোন সুড়ংগ তথা কোন গর্তও দেখতে পেতো এবং সেখানে গেলে নিরাপদ আশ্রয় লাভের সম্ভাবনা থাকতো তাহলে দৌড়ে গিয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়তো।

৫৭. এ প্রথমবার আরবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী ধন–সম্পদের অধিকারী লোকদের ওপর যথারীতি যাকাত ধার্য করা হয়েছিল। তাদের কৃষি উৎপাদন, গবাদি পশু ও ব্যবসায় পণ্য এবং খনিজ দ্রব্য ও সোনা রূপার সঞ্চয় থেকে শতকরা আড়াই ভাগ, ৫ ভাগ, ১০ ভাগ ও ২০ ভাগ আদায় করা হতো। একটি বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে এসব যাকাতের সম্পদ সংগ্রহ করা হতো এবং একটি কেন্দ্রে জমা করে বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে খরচ করা হতো। এভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ–সম্পদ সংগৃহীত হয়ে আসতো এবং তার হাত দিয়ে তা লোকদের মধ্যে বিতরণ করা হতো, যা ইতিপূর্বে আরবের লোকেরা কখনো এক জন লোকের হাতে একই সংগে সংগৃহীত হতে এবং তাঁর হাত দিয়ে খরচ হতে দেখেনি। এ সম্পদ দেখে দুনিয়া পূজারী মুনাফিকদের জিভ দিয়ে লালা ঝরতো। তারা চাইতো, এ প্রবহমান নদী থেকে তারা যেন আশ মিটিয়ে পানি পান করতে পারে। কিন্তু এখানে তো ব্যাপার ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। এখানে যিনি পানি পান করাচ্ছিলেন তিনি নিজের জন্য এবং নিজের সংশ্লিষ্টদের জন্য এ নদীর প্রতি বিন্দু পানি হারাম করে দিয়েছিলেন। কেউ আশা করতে পারতো না, তার হাতের পানির পেয়ালা হকদার ছাড়া আর কারোর ঠোঁট স্পর্শ করতে পারে। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাদকা বিতরণের অবস্থা দেখে মুনাফিকরা চাপা আক্রোশে গুমরে মরছিল। বন্টনের সময় তারা নানা অভিযোগে তাঁকে অভিযুক্ত করতো। তাদের আসল অভিযোগ ছিল, এ সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ আমাদের দেয়া হচ্ছে না। কিন্তু এ আসল অভিযোগ গোপন করে তারা এ মর্মে অভিযোগ উথাপন করতো যে, ইনসাফের সাথে সম্পদ বন্টন করা হচ্ছে না এবং এ ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে।

إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ
النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ ۚ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ
رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾

৮ রুকূ'

এ সাদ্‌কাগুলো তো আসলে ফকীর[৬১] মিসকিনদের[৬২] জন্য। আর যারা সাদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত[৬৩] এবং যাদের মন জয় করা প্রয়োজন তাদের জন্য।[৬৪] তাছাড়া দাস মুক্ত করার,[৬৫] ঋণগ্রস্তদের সাহায্য করার,[৬৬] আল্লাহর পথে[৬৭] এবং মুসাফিরদের উপকারে[৬৮] ব্যয় করার জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিধান এবং আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ।

তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা নিজেদের কথা দ্বারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, এ ব্যক্তি অতিশয় কর্ণপাতকারী।[৬৯] বলে দাও, "সে এরূপ করে কেবল তোমাদের ভালোর জন্যই।[৭০] সে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং ঈমানদারদেরকে বিশ্বাস করে।[৭১] তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমানদার তাদের জন্য সে পরিপূর্ণ রহমত। আর যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

৫৮. অর্থাৎ গনীমতের মাল থেকে যা কিছু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দেন, তাই নিয়ে তারা সন্তুষ্ট থাকতো। অন্যদিকে আল্লাহর অনুগ্রহে তারা যা কিছু উপার্জন করে এবং অর্থ উপার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উপকরণের মাধ্যমে যে ধরনের সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি তারা লাভ করেছে তাকেই নিজেদের জন্য যথেষ্ট মনে করতো।

৫৯. অর্থাৎ যাকাত ছাড়াও অন্য যে সমস্ত ধন–সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে আসবে তা থেকে নিজ নিজ প্রাপ্য অনুযায়ী আমরা অংশ লাভ করতে থাকবো, যেমন ইতিপূর্বে করে এসেছি।

৬০. অর্থাৎ দুনিয়া ও তার তুচ্ছ সম্পদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নেই। বরং আমাদের দৃষ্টি রয়েছে আল্লাহ ও তাঁর অনুগ্রহের ওপর। তাঁরই সন্তুষ্টি আমরা চাই। আমাদের সমস্ত

আশা-আকাংখা তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে। তিনি যা দেন তাতেই আমরা সন্তুষ্ট।

৬১. ফকীর এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নিজের জীবিকার ব্যাপারে অন্যের মুখাপেক্ষী। কোন শারীরিক ত্রুটি বা বার্ধক্যজনিত কারণে কেউ স্থায়ীভাবে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে অথবা কোন সাময়িক কারণে আপাতত কোন ব্যক্তি অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে এবং সাহায্য-সহায়তা পেলে আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, এ পর্যায়ের সব ধরনের অভাবী লোকের জন্য সাধারণভাবে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন এতীম শিশু, বিধবা নারী, উপার্জনহীন বেকার এবং এমন সব লোক যারা সাময়িক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে।

৬২. মিসকীন শব্দের মধ্যে দীনতা, দুর্ভাগ্য পীড়িত অভাব, অসহায়তা ও লাঞ্ছনার অর্থ নিহিত রয়েছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে সাধারণ অভাবীদের চাইতে যাদের অবস্থা বেশী খারাপ তারাই মিসকীন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ শব্দটির ব্যাখ্যা করে বিশেষ করে এমন সব লোকদেরকে সাহায্যলাভের অধিকারী গণ্য করেছেন, যারা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী উপায়-উপকরণ লাভ করতে পারেনি, ফলে অত্যন্ত অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু তাদের আত্মমর্যাদা সচেতনতা কারোর সামনে তাদের হাত পাতার অনুমতি দেয় না। আবার তাদের বাহ্যিক অবস্থাও এমন নয় যে, কেউ তাদেরকে দেখে অভাবী মনে করবে এবং সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেবে। হাদীসে এভাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ

المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسئال الناس -

"যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ-সম্পদ পায় না, যাকে সাহায্য করার জন্য চিহ্নিত করা যায় না এবং যে নিজে দাঁড়িয়ে কারোর কাছে সাহায্যও চায় না, সে-ই মিসকীন।" অর্থাৎ সে একজন সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র গরীব মানুষ।

৬৩. অর্থাৎ যারা সাদকা আদায় করা, আদায় করা ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করা, সে সবের হিসেব-নিকেশ করা, খাতাপত্রে লেখা এবং লোকদের মধ্যে বন্টন করার কাজে সরকারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত থাকে। ফকীর বা মিসকীন না হলেও এসব লোকের বেতন সর্বাবস্থায় সাদকার খাত থেকে দেয়া হবে। এখানে উচ্চারিত এ শব্দগুলো এবং এ সূরার ১০৩ আয়াতের শব্দাবলী خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً (তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদকা উসূল করো) একথাই প্রমাণ করে যে, যাকাত আদায় ও বন্টন ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তরভুক্ত।

এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোদ নিজের ও নিজের বংশের (বনী হাশেম) ওপর যাকাতের মাল হারাম ঘোষণা করেছিলেন। কাজেই তিনি নিজে সবসময় বিনা পারিশ্রমিকে যাকাত আদায় ও বন্টনের কাজ করেন। বনী হাশেমদের অন্য লোকদের জন্যও তিনি এ নীতি নির্ধারণ করে যান। তিনি বলে যান, তারা যদি বিনা

পারিশ্রমিকে এ কাজ করে তাহলে এটা তাদের জন্য বৈধ। আর পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এ বিভাগের কোন কাজ করলে তা তাদের জন্য বৈধ নয়। তার বংশের কোন লোক যদি সাহেবে নেসাব (অর্থাৎ কমপক্ষে যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত দেয়া ফরয) হয়, তাহলে তার ওপর যাকাত দেয়া ফরয হবে। কিন্তু যদি সে গরীব, অভাবী, ঋণগ্রস্ত ও মুসাফির হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য যাকাত নেয়া হারাম হবে। তবে বনী হাশেমদের নিজেদের যাকাত বনী হাশেমরা নিতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। ইমাম আবু ইউসুফের মতে, নিতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ তাও না জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন।

৬৪. মন জয় করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করার যে হুকুম এখানে দেয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা ইসলামের বিরোধিতায় ব্যাপকভাবে তৎপর এবং অর্থ দিয়ে যাদের শত্রুতার তীব্রতা ও উগ্রতা হ্রাস করা যেতে পারে অথবা যারা কাফেরদের শিবিরে অবস্থান করছে ঠিকই কিন্তু অর্থের সাহায্যে সেখান থেকে ভাগিয়ে এনে মুসলমানদের দলে ভিড়িয়ে দিলে তারা মুসলমানদের সাহায্যকারী হতে পারে কিংবা যারা সবেমাত্র ইসলামে প্রবেশ করেছে এবং তাদের পূর্বেকার শত্রুতা বা দুর্বলতাগুলো দেখে আশংকা জাগে যে, অর্থ দিয়ে তাদের বশীভূত না করলে তারা আবার কুফরীর দিকে ফিরে যাবে, এ ধরনের লোকদেরকে স্থায়ীভাবে বৃত্তি দিয়ে বা সাময়িকভাবে এককালীন দানের মাধ্যমে ইসলামের সমর্থক ও সাহায্যকারী অথবা বাধ্য ও অনুগত কিংবা কমপক্ষে এমন শত্রুতে পরিণত করা যায়, যারা কোন প্রকার ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। এ খাতে গনীমাতের মাল ও অন্যান্য উপায়ে অর্জিত অর্থ থেকেও ব্যয় করা যেতে পারে এবং প্রয়োজন হলে যাকাতের তহবিল থেকেও ব্যয় করা যায়। এ ধরনের লোকদের জন্য ফকীর, মিসকিন বা মুসাফির হবার শর্ত নেই। বরং ধনী ও বিত্তশালী হওয়া সত্ত্বেও তাদের যাকাত দেয়া যেতে পারে।

এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে "তালীফে কলবু" তথা মন জয় করার উদ্দেশ্যে বহু লোককে বৃত্তি দেয়া এবং এককালীন দান করা হতো। কিন্তু তাঁর পরেও এ খাতটি অপরিবর্তিত ও অব্যাহত রয়েছে কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ দেখা যায়। ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর সহযোগীদের মতে, হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমরের (রা) আমল থেকে এ খাতটি রহিত হয়ে গেছে। কাজেই এখন "তালীফে কলবের" জন্য কাউকে কিছু দেয়া জায়েয নয়। ইমাম শাফেয়ীর (র) মতে তালীফে কলবের উদ্দেশ্যে ফাসেক মুসলমানদেরকে যাকাত তহবিল থেকে দেয়া যেতে পারে কিন্তু কাফেরদের দেয়া যেতে পারে না। অন্যান্য কতিপয় ফকীহের মতে, "মুআল্লাফাতুল কুলূব" (যাদের মন জয় করা ইপ্সিত হয়) এর খাত আজো অব্যাহত রয়েছে। প্রয়োজন দেখা দিলে এ খাতে ব্যয় করা যেতে পারে।

হানাফীগণ এ প্রসঙ্গে প্রমাণ উপস্থাপন করে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর উয়াইনা ইবনে হিস্‌ন ও আক্‌রা ইবনে হাবেস হযরত আবু বকরের (রা) কাছে আসে এবং তাঁর কাছে একটি জমি চায়। তিনি তাদেরকে জমিটির একটি দানপত্র লিখে দেন। তারা এ দানপত্রকে আরো পাকাপোক্ত করার জন্য অন্যান্য প্রধান সাহাবীগণের সাক্ষও এতে সন্নিবেশ করতে চায়। সে মতে অনেক সাক্ষ সংগৃহীত

হয়ে যায়। কিন্তু তারা যখন হযরত উমরের (রা) কাছে সাক্ষ নিতে যায় তখন তিনি দানপত্রটি পড়ে তাদের সামনেই সেটি ছিঁড়ে ফেলেন। তিনি তাদেরকে বলেন, অবশ্যি "তালীফে কল্‌ব" করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের দান করতেন। কিন্তু তখন ছিল ইসলামের দুর্বলতার যুগ। আর এখন আল্লাহ ইসলামকে তোমাদের মতো লোকদের প্রতি নির্ভরতা থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। এ ঘটনার পর তারা হযরত আবু বকরের (রা) কাছে এসে অভিযোগ করে এবং তাঁকে টিটকারী দিয়ে বলে ঃ খলীফা কি আপনি, না উমর? কিন্তু হযরত আবু বকর নিজেও এর কোন প্রতিবাদ করেননি। কিংবা অন্যান্য সাহাবীদের একজনও হযরত উমরের এ মতের সাথে দ্বিমত প্রকাশ করেননি। এ থেকে হানাফীগণ এ মর্মে প্রমাণ পেশ করেছেন, যখন মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে গেছে এবং নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি তারা অর্জন করেছে তখন যে কারণে প্রথম দিকে "মুআল্লাফাতুল কুলূবের" অংশ রাখা হয় তা আর বর্তমান রইলো না। এ কারণে সাহাবীগণের "ইজমা"র মাধ্যমে এ অংশটি চিরকালের জন্য বাতিল হয়ে গেছে।

ইমাম শাফেয়ী (র) এ প্রসঙ্গে প্রমাণ পেশ করে বলেন, "তালীফে কল্‌ব"–এর জন্য যাকাতের মাল দেবার ব্যাপারটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মকাণ্ড থেকে প্রমাণিত নয়। হাদীসে আমরা যতগুলো ঘটনা পাই তা থেকে একথাই জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ (সা) "তালীফে কল্‌বের" জন্য কাফেরদেরকে যা কিছু দেবার তা গনীমাতের মাল থেকেই দিয়েছেন, যাকাতের মাল থেকে দেননি।

আমাদের মতে প্রকৃত সত্য হচ্ছে, মুআল্লাফাতুল কুলূবের অংশ কিয়ামত পর্যন্ত বাতিল হবার কোন প্রমাণ নেই। হযরত উমর (রা) যা কিছু বলেছেন তা নিসন্দেহে পুরোপুরি সঠিক ছিল। ইসলামী রাষ্ট্র যদি তালীফে কল্‌বের জন্য অর্থ–সম্পদ ব্যয় করার প্রয়োজন নেই বলে মনে করে, তাহলেও এ খাতে কিছু না কিছু ব্যয় করতেই হবে এমন কোন ফরয তার ওপর কেউ চাপিয়ে দেয়নি। কিন্তু কখনো প্রয়োজন দেখা দিলে যাতে ব্যয় করা যেতে পারে এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ যে অবকাশ রেখেছেন তা অবশ্যি অক্ষুণ্ন থাকা উচিত। হযরত উমর ও সাহাবায়ে কেরামের যে বিষয়ে মতৈক্য হয়েছিল তা ছিল মূলত এই যে, তাঁদের আমলে যে অবস্থা ছিল তাতে তালীফে কল্‌বের জন্য কাউকে কিছু দেবার প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করতেন না। কাজেই কোন গুরুত্বপূর্ণ দীনী স্বার্থ তথা প্রয়োজন ও কল্যাণের খাতিরে কুরআনে যে খাতটি রাখা হয়েছিল, সাহাবীগণের মতৈক্য তাকে খতম করে দিয়েছে বলে সিদ্ধান্তে আসার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই।

অন্যদিকে ইমাম শাফেয়ীর অভিমতটি অবশ্যি এতটুকু পর্যন্ত তো সঠিক মনে হয় যে, সরকারের কাছে যখন অন্যান্য খাতে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ–সম্পদ মওজুদ থাকে তখন তালীফে কল্‌বের খাতে তার যাকাতের অর্থ–সম্পদ ব্যয় না করা উচিত। কিন্তু যখন যাকাতের অর্থ–সম্পদ থেকে এ খাতে সাহায্য নেবার প্রয়োজন দেখা দেবে তখন তা ফাসেকদের জন্য ব্যয় করা যাবে, কাফেরদের জন্য ব্যয় করা যাবে না, এ ধরনের পার্থক্য করার কোন কারণই সেখানে নেই। কারণ কুরআনে মুআল্লাফাতুল কুলূবের যে অংশ রাখা হয়েছে, তা তাদের ঈমানের দাবীর কারণে নয়। বরং এর কারণ হচ্ছে, ইসলাম নিজের প্রয়োজনে তাদের তালীফে কল্‌ব তথা মন জয় করতে চায়। আর শুধুমাত্র অর্থের সাহায্যেই এ ধরনের লোকদের মন জয় করা যেতে পারে। এ প্রয়োজন ও এ গুণ–বৈশিষ্ট যেখানেই

পাওয়া যাবে সেখানেই মুসলমানদের সরকার কুরআনের বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার অধিকার রাখে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খাত থেকে কাফেরদের কিছুই দেননি। এর কারণ তাঁর কাছে অন্য খাতে অর্থ ছিল। নয়তো এ খাত থেকে কাফেরদেরকে দেয়া যদি অবৈধ হতো তাহলে তিনি একথা সুস্পষ্ট করে বলে দিতেন।

৬৫. দাসদেরকে দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা দু'ভাবে হতে পারে। এক, যে দাস তার মালিকের সাথে এ মর্মে চুক্তি করেছে যে, সে একটা বিশেষ পরিমাণ অর্থ আদায় করলে মালিক তাকে দাসত্ব মুক্ত করে দেবে। তাকে দাসত্ব মুক্তির এ মূল্য আদায় করতে যাকাত থেকে সাহায্য করা যায়। দুই, যাকাতের অর্থে দাস কিনে তাকে মুক্ত করে দেয়া। এর মধ্যে প্রথমটির ব্যাপারে সকল ফকীহ একমত। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থাটিকে হযরত আলী (রা), সাঈদ ইবনে জুবাইর, লাইস, সাওরী, ইবরাহীম নাখয়ী, শা'বী, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন, হানাফী ও শাফেয়ীগণ নাজায়েয গণ্য করেন। অন্যদিকে ইবনে আব্বাস (রা) হাসান বাসরী, মালেক, আহমদ ও আবু সাওর একে জায়েয মনে করেন।

৬৬. অর্থাৎ এমন ধরনের ঋণগ্রস্ত, যারা নিজেদের সমস্ত ঋণ আদায় করে দিলে তাদের কাছে নেসাবের চাইতে কম পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট থাকে। তারা অর্থ উপার্জনকারী হোক বা বেকার, আবার সাধারণ্যে তাদের ফকীর মনে করা হোক বা ধনী। উভয় অবস্থায় যাকাতের খাত থেকে তাদেরকে সাহায্য করা যেতে পারে। কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক ফকীহ এ মত পোষণ করেছেন যে, অসৎকাজে ও অমিতব্যয়িতা করে যারা নিজেদের টাকা পয়সা উড়িয়ে দিয়ে ঋণের ভারে ডুবে মরছে, তাওবা না করা পর্যন্ত তাদের সাহায্য করা যাবে না।

৬৭. "আল্লাহর পথে" শব্দ দু'টি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেসব সৎকাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট এমন সমস্ত কাজই এর অন্তরভুক্ত। এ কারণে কেউ কেউ এমত পোষণ করেছেন যে, এ হুকুমের প্রেক্ষিতে যাকাতের অর্থ যে কোন সৎকাজে ব্যয় করা যেতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রথম যুগের ইমামগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে মত পোষণ করেছেন সেটিই যথার্থ সত্য। তাদের মতে এখানে আল্লাহর পথে বলতে আল্লাহর পথে জিহাদ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেসব প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য কুফরী ব্যবস্থাকে উৎখাত করে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। যেসব লোক এ প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে রত থাকে, তারা নিজেরা সচ্ছল ও অবস্থাসম্পন্ন হলেও এবং নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তাদেরকে সাহায্য করার প্রয়োজন না থাকলেও তাদের সফর খরচ বাবদ এবং বাহন, অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি সংগ্রহ করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। অনুরূপ যারা স্বেচ্ছায় নিজেদের সমস্ত সময় ও শ্রম সাময়িক বা স্থায়ীভাবে এ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যও যাকাতের অর্থ এককালীন বা নিয়মিত ব্যয় করা যেতে পারে।

এখানে আর একটি কথা অনুধাবন করতে হবে। প্রথম যুগের ইমামগণের বক্তব্যে সাধারণত এ ক্ষেত্রে "গাযওয়া" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি যুদ্ধের সমার্থক। তাই লোকেরা মনে করে যাকাতের ব্যয় খাতে ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথের যে খাত রাখা

হয়েছে তা শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু আসলে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ যুদ্ধ-বিগ্রহের চাইতে আরো ব্যাপকতর জিনিসের নাম। কুফরের বাণীকে অবদমিত এবং আল্লাহর বাণীকে শক্তিশালী ও বিজয়ী করা আর আল্লাহর দীনকে একটি জীবন ব্যবস্থা হিসেবে কায়েম করার জন্য দাওয়াত ও প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়ে অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহের চরম পর্যায়ে যেসব প্রচেষ্টা ও কাজ করা হয়, তা সবই এ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর আওতাভুক্ত।

৬৮. মুসাফির তার নিজের গৃহে ধনী হলেও সফরের মধ্যে সে যদি সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে তাহলে যাকাতের খাত থেকে তাকে সাহায্য করা যাবে। এখানে কোন কোন ফকীহ শর্ত আরোপ করেছেন, অসৎকাজ করা যার সফরের উদ্দেশ্য নয় কেবল মাত্র সেই ব্যক্তিই এ আয়াতের প্রেক্ষিতে সাহায্যলাভের অধিকারী হবে। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের কোথাও এ ধরনের কোন শর্ত নেই। অন্যদিকে দীনের মৌলিক শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি, যে ব্যক্তি অভাবী ও সাহায্য লাভের মুখাপেক্ষী তাকে সাহায্য করার ব্যাপারে তার পাপাচার বাধা হয়ে দাঁড়ানো উচিত নয়। বরং প্রকৃতপক্ষে গোনাহগার ও অসৎ চরিত্রের লোকদেরকে বিপদে সাহায্য করলে এবং ভাল ও উন্নত ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের চরিত্র সংশোধন করার প্রচেষ্টা চালালে তা তাদের চরিত্র সংশোধনের সবচেয়ে বড় উপায় হতে পারে।

৬৯. মুনাফিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যেসব দোষারোপ করতো তার মধ্যে একটি ছিল এই যে, তিনি সবার কথা শুনতেন এবং প্রত্যেককে তার নিজের কথা বলার সুযোগ দিতেন। তাদের দৃষ্টিতে এ গুণটি ছিল দোষ। তারা বলতো, তিনি কান পাতলা লোক। যার ইচ্ছা হয়, সে-ই তার কাছে পৌঁছে যায়, যেভাবে ইচ্ছা তাঁর কান ভরে দেয় এবং তিনি তার কথা মেনে নেন। এ ব্যাপারটির তারা খুব বেশী করে চর্চা করতো। এর সবচেয়ে বড় কারণ ছিল এই যে, সাচ্চা ঈমানদাররা এসব মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র, এদের শয়তানী কাজকারবার ও বিরোধিতাপূর্ণ কথাবার্তার রিপোর্ট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে দিতেন। এতে এ মুনাফিকরা গোস্বা হয়ে বলতো, আপনি আমাদের মতো সম্মানিত ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে যে কোন কাংগাল-ভিখিরীর দেয়া খবরে বিশ্বাস করে বসেন।

৭০. এ দোষারোপের জবাবে একটি ব্যাপক অর্থবোধক কথা বলা হয়েছে। এর দু'টো দিক রয়েছে। এক, তিনি বিপর্যয়, বিকৃতি ও দুষ্কৃতির কথা শোনার মতো লোক নন। বরং তিনি শুধুমাত্র এমনসব কথায় কান দেন যেগুলোর মধ্যে রয়েছে মঙ্গল ও সুকৃতি এবং উম্মতের কল্যাণ ও দীনের কল্যাণের জন্য যেগুলোতে কান দেয়া শুভ ফলদায়ক। দুই, তাঁর এমন ধরনের হওয়া তোমাদের জন্যই কল্যাণকর। যদি তিনি প্রত্যেকের কথা না শুনতেন এবং ধৈর্য ও সংযমের সাথে কাজ না করতেন, তাহলে তোমরা ঈমানের যে মিথ্যা দাবী করে থাকো, শুভেচ্ছার যেসব লোক দেখানো বুলি আওড়ে যাও এবং আল্লাহর পথ থেকে সটকান দেয়ার জন্য যেসব ঠুনকো ওযর পেশ করে থাকো, সেগুলো ধৈর্যসহকারে শুনার পরিবর্তে তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। তার ফলে এ মদীনা শহরে জীবনধারণ করা তোমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়তো। কাজেই তাঁর এ গুণটি তোমাদের জন্য খারাপ নয় বরং ভাল।

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ۚ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ
إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾ يَحْذَرُ
الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ
اسْتَهْزِئُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾

তারা তোমাদের সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের সামনে কসম খায়। অথচ যদি তারা মুমিন হয়ে থাকে তাহলে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করার কথা চিন্তা করবে, কারণ তাঁরাই এর বেশী হকদার। তারা কি জানে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের মোকাবিলা করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, তার মধ্যে তারা চিরকাল থাকবে। এটি একটি বিরাট লাঞ্ছনার ব্যাপার।

এ মুনাফিকরা ভয় করছে, মুসলমানদের ওপর এমন একটি সূরা না নাযিল হয়ে যায়, যা তাদের মনের গোপন কথা প্রকাশ করে দেবে।[৭২] হে নবী! তাদের বলে দাও, "বেশ, ঠাট্টা করতেই থাকো, তবে তোমরা যে জিনিসটির প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয় করছো আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেবেন।"

৭১. অর্থাৎ তিনি প্রত্যেকের কথা বিশ্বাস করেন, তোমাদের এ ধারণা ভুল। তিনি যদিও সবার কথাই শোনেন, কিন্তু বিশ্বাস করেন একমাত্র যথার্থ ও সাচ্চা মুমিনদের কথা। তোমাদের যেসব শয়তানী ও দুষ্কৃতির খবর তাঁর কাছে পৌঁছে গেছে এবং যেগুলো তিনি বিশ্বাস করে ফেলেছেন, সেগুলো দুষ্কৃতিকারী চোগলখোরদের সরবরাহ করা নয় বরং সৎ ঈমানদার লোকরাই সেগুলো সরবরাহ করেছে এবং সেগুলো নির্ভরযোগ্য।

৭২. তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতে সঠিক অর্থে বিশ্বাসী ছিল না। কিন্তু বিগত আট নয় বছরের অভিজ্ঞতায় তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিল যে, তাঁর কাছে নিশ্চয়ই এমন কোন না কোন অতি প্রাকৃতিক তথ্য-মাধ্যম আছে, যার সাহায্যে তিনি তাদের গোপন কথা জানতে পারেন এবং এভাবে অনেক সময় কুরআনে (যাকে তারা রসূলের নিজের রচনা বলে মনে করতো) তাদের মুনাফিকী ও চক্রান্তসমূহ প্রকাশ করে দেন।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ
وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ
إِيمَانِكُمْ ۚ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ
كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি কথা বলছিলে? তাহলে তারা ঝটপট বলে দেবে, আমরা তো হাসি-তামাসা ও পরিহাস করছিলাম।[৭৩] তাদের বলো, "তোমাদের হাসি-তামাসা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রসূলের সাথে ছিল? এখন আর ওযর পেশ করো না। তোমরা ঈমান আনার পর কুফরী করেছো, যদি আমরা তোমাদের একটি দলকে মাফও করে দেই তাহলে আরেকটি দলকে তো আমরা অবশ্যি শাস্তি দেবো। কারণ তারা অপরাধী।"[৭৪]

৭৩. তাবুকের যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা প্রায়ই তাদের আসরগুলোয় বসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের নিয়ে হাসি-তামাসা ও বিদ্রূপ করতো। এভাবে তারা যাদেরকে সদুদ্দেশ্যে জিহাদ করতে প্রস্তুত দেখতো নিজেদের বিদ্রূপ পরিহাসের মাধ্যমে তাদেরকে হিম্মতহারা করার চেষ্টা করতো। হাদীসে এ ধরনের লোকদের বহু উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন এক মাহফিলে কয়েক জন মুনাফিক বসে আড্ডা দিচ্ছিল। তাদের একজন বললো, "আরে, এ রোমানদেরকেও কি তোমরা আরবদের মতো মনে করেছো? কালকে দেখে নিও এ যেসব বীর বাহাদুর লড়তে এসেছেন এদের সবাইকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হবে।" দ্বিতীয় জন বললো, "মজা হবে তখন যখন একশটি করে চাবুক মারার নির্দেশ দেয়া হবে।" আরেক মুনাফিক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে বিপুলভাবে কর্মতৎপর দেখে নিজের ইয়ার বন্ধুদের বললো : "উনাকে দেখো উনি রোম ও সিরিয়ার দূর্গ জয় করতে চলেছেন।"

৭৪. অর্থাৎ স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন ভাঁড়দেরকে তো তবুও মাফ করে দেয়া যেতে পারে। কারণ তারা হয়তো এ ধরনের কথা শুধু এ জন্য বলে যাচ্ছে যে, তাদের কাছে দুনিয়ার কোন জিনিসেরই কোন গুরুত্ব নেই। সব কিছুকেই তারা হাল্কা নজরে দেখে। কিন্তু যারা জেনে-বুঝে নিজেদের ঈমানের দাবী সত্ত্বেও শুধুমাত্র রসূলকে এবং তিনি যে দীন এনেছেন তাকে হাস্যাস্পদ মনে করার কারণেই একথা বলে থাকে এবং যাদের বিদ্রূপের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈমানদারদের হিম্মত ও সাহস যেন নিস্তেজ হয়ে যায় এবং তারা যেন পূর্ণ শক্তিতে জিহাদের প্রস্তুতি নিতে না পারে। এরূপ অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত যারা তাদেরকে তো কোনক্রমেই ক্ষমা করা যেতে পারে না। কারণ তারা ভাঁড় নয়, তারা অপরাধী।

الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ۭ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ۭ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ
هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ هِىَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝

৯ রুকূ'

মুনাফিক পুরুষ ও নারী পরস্পরের দোসর। খারাপ কাজের হুকুম দেয়, ভাল কাজে নিষেধ করে এবং কল্যাণ থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখে।[৭৫] তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। নিশ্চিতভাবেই এ মুনাফিকরাই ফাসেক। এ মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফেরদের জন্য আল্লাহ জাহান্নামের আগুনের ওয়াদা করেছেন। তার মধ্যে তারা চিরকাল থাকবে। সেটিই তাদের জন্য উপযুক্ত। আল্লাহর অভিশাপ তাদের ওপর এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব।

৭৫. সমস্ত মুনাফিকের এটা সাধারণ বৈশিষ্ট। তারা সবাই খারাপ কাজের ব্যাপারে আগ্রহী এবং ভাল কাজের প্রতি তাদের প্রচণ্ড অনিহা ও শত্রুতা। কোন ব্যক্তি খারাপ কাজ করতে চাইলে তারা তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। তাকে পরামর্শ দেয়। তার মনে সাহস যোগায়। তাকে সাহায্য–সহায়তা দান করে। তার জন্য সুপারিশ পেশ করে। তার প্রশংসা করে। মোট কথা তার জন্য নিজেদের সব কিছুই তারা ওয়াকফ করে দেয়। মনেপ্রাণে তারা তার ঐ খারাপ কাজে শরীক হয়। অন্যদেরকেও তাতে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। আর যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করে এরা তার সাহস বাড়াতে থাকে। তাদের প্রতিটি অংগ ভংগী ও নড়াচড়া থেকে একথা প্রকাশ হতে থাকে যে, এ অসৎকাজটির বিস্তার ঘটলে তাদের হৃদয়ে কিছুটা প্রশান্তি অনুভূত হতে থাকে এবং তাদের চোখ জুড়িয়ে যায়। অন্যদিকে কোন ভাল কাজ হতে থাকলে তার খবর শুনে তারা মনে ব্যথা অনুভব করতে থাকে। একথার কল্পনা করতেই তাদের মন বিষিয়ে ওঠে। এ সম্পর্কিত কোন প্রস্তাবও তারা শুনতে পারে না। এর দিকে কাউকে এগিয়ে যেতে দেখলে তারা অস্থির হয়ে পড়ে। সম্ভাব্য সকল পদ্ধতিতে তার পথে বাধা সৃষ্টি করতে তৎপর হয়ে পড়ে। তাকে এ সৎকাজ থেকে বিরত রাখার জন্য এবং বিরত রাখতে সক্ষম না হলে যাতে সে এ কাজে সফলকাম না হতে পারে এ জন্য তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। তাছাড়া ভাল কাজে অর্থ ব্যয় করার জন্য তাদের হাত কখনো এগিয়ে আসে না, এটাও তাদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট। তারা কৃপণ হোক বা দানশীল সর্বাবস্থায় এটা দেখা যায়। তাদের অর্থ সিন্দুকে জমা থাকে, আর নয়তো হারাম পথে আসে হারাম পথে ব্যয় হয়। অসৎকাজের ব্যাপারে তারা যেন নিজেদের যুগের কারূন (অর্থাৎ দেদার অর্থ ব্যয় করতে পারংগম) হলেও সৎকাজের ব্যাপারে তারা চরম দরিদ্র।

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا
وَّاَوْلَادًا ۭ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا
اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ
خَاضُوْٓا ۭ اُولٰۗىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰۗىِٕكَ
هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝ اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ
وَّثَمُوْدَ ۙ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ۭ
اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ
كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

তোমাদের[৭৬] আচরণ তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতোই। তারা ছিল তোমাদের চাইতে বেশী শক্তিশালী এবং তোমাদের চাইতে বেশী সম্পদ ও সন্তানের মালিক। তারপর তারা দুনিয়ায় নিজেদের অংশের স্বাদ উপভোগ করেছে এবং তোমরাও একইভাবে নিজেদের অংশের স্বাদ উপভোগ করেছো যেমন তারা করেছিল এবং তারা যেমন অনর্থক বিতর্কে লিপ্ত ছিল তেমনি বিতর্কে তোমরাও লিপ্ত রয়েছো। কাজেই তাদের পরিণতি হয়েছে এই যে, দুনিয়ায় ও আখেরাতে তাদের সমস্ত কাজকর্ম পণ্ড হয়ে গেছে এবং তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

তাদের[৭৭] কাছে কি তাদের পূর্ববর্তীদের ইতিহাস পৌঁছেনি? নূহের জাতির, আদ, সামূদ ও ইবরাহীমের জাতির, মাদ্‌ইয়ানের অধিবাসীদের এবং যে জনবসতিগুলো উল্টে দেয়া হয়েছিল সেগুলোর? তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিশানীসহ তাদের কাছে এসেছিলেন। এরপর তাদের ওপর জুলুম করা আল্লাহর কাজ ছিল না বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল।[৭৮]

৭৬. মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা প্রথম পুরুষে করতে করতে হঠাৎ এখান থেকে আবার তাদেরকে সরাসরি সম্বোধন করা শুরু হয়েছে।

৭৭. এখান থেকে আবার তাদের আলোচনা শুরু হয়েছে প্রথম পুরুষে।

৭৮. লূত জাতির জনবসতিগুলোর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ
بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ
الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ اُولٰۗىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۭ
اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ
جَنّٰتِ عَدْنٍ ۭ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٧٢﴾

মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, এরা সবাই পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী। এরা ভাল কাজের হুকুম দেয় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে।[৮০] এরা এমন লোক যাদের ওপর আল্লাহর রহমত নাযিল হবেই। অবশ্যি আল্লাহ সবার ওপর পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানী ও বিজ্ঞ। এ মুমিন পুরুষ ও নারীকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদেরকে তিনি এমন বাগান দান করবেন যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবহমান হবে এবং তারা তার মধ্যে চিরকাল বাস করবে। এসব চির সবুজ বাগানে তাদের জন্য থাকবে বাসগৃহ এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।

৭৯. অর্থাৎ তাদের সাথে আল্লাহর কোন শত্রুতা ছিল এবং তিনি তাদেরকে ধ্বংস করতে চাচ্ছিলেন বলে তারা ধ্বংস হয়নি। বরং প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরাই এমন ধরনের জীবন যাপন প্রণালী পছন্দ করে নিয়েছিল যা তাদেরকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল! আল্লাহ তাদের চিন্তা-ভাবনা করার ও সামলে নেবার পূর্ণ সুযোগ দিয়েছিলেন। তাদেরকে উপদেশ দেবার ও পরিচালনা করার জন্য রসূল পাঠিয়েছিলেন। রসূলদের মাধ্যমে ভুল পথ অবলম্বন করার অনিষ্টকর ফলাফল সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এবং কোন প্রকার রাখ ঢাক না করে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তাদেরকে সাফল্য ও ধ্বংসের পথ বাতলে দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন তারা অবস্থার সংশোধনের কোন একটি সুযোগেরও সদ্ব্যবহার করলো না এবং ধ্বংসের পথে চলার ওপর অবিচল থাকলো তখন তাদের অনিবার্য পরিণতির সম্মুখীন হতেই হলো। তাদের ওপর এ জুলুম আল্লাহ করেননি বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর এ জুলুম করেছিল।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۭ وَمَاْوٰىهُمْ
جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ۚ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ
الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْٓا
اِلَّآ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا
لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ فِي الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

১০ রুকূ'

হে নবী![৮১] পূর্ণ শক্তি দিয়ে কাফের ও মুনাফিক উভয়ের মোকাবিলা করো এবং তাদের প্রতি কঠোর হও।[৮২] শেষ পর্যন্ত তাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থান স্থল। তারা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে খেয়ে বলে, "আমরা ও কথা বলিনি।" অথচ তারা নিশ্চয়ই সেই কুফরীর কথাটা বলেছে।[৮৩] তারা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী অবলম্বন করেছে। তারা এমনসব কিছু করার সংকল্প করেছিল যা করতে পারেনি।[৮৪] আল্লাহ ও তাঁর রসূল নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিয়েছেন বলেই তাদের এত ক্রোধ ও আক্রোশ![৮৫] এখন যদি তারা নিজেদের এহেন আচরণ থেকে বিরত হয়, তাহলে তাদের জন্যই ভাল। আর যদি বিরত না হয়, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং পৃথিবীতে তাদের পক্ষ অবলম্বনকারী ও সাহায্যকারী কেউ থাকবে না।

৮০. মুনাফিকরা যেমন একটি জাতি বা দল তেমনি মুমিনরাও একটি স্বতন্ত্র দল। যদিও উভয় দলই প্রকাশ্যে ঈমানের স্বীকৃতি দেয়া এবং বাহ্যত ইসলামের আনুগত্য করার ক্ষেত্রে সমানভাবে অংশ নেয় কিন্তু তবুও উভয়ের স্বভাব-প্রকৃতি, আচার-আচরণ, অভ্যাস, চিন্তা-পদ্ধতি ও কর্মধারা পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যেখানে কেবল মুখে ঈমানের দাবী কিন্তু অন্তরে সত্যিকার ঈমানের ছিটেফোটাও নেই সেখানে জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ড তার প্রতিটি পদক্ষেপের মাধ্যমে ঈমানের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। বাইরে লেবেল আটা রয়েছে "মিশ্‌ক" (মৃগনাভি) বলে। কিন্তু লেবেলের নীচে যা কিছু আছে তা তার নিজের সমগ্র অস্তিত্বের সাহায্যে প্রমাণ করছে যে, সে গোবর ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যদিকে ঈমান যেখানে তার মূল তাৎপর্য সহকারে বিরাজিত সেখানে "মিশ্‌ক" তার নিজের চেহারা-আকৃতিতে নিজের খোশবু-সুরভিতে এবং নিজের বৈশিষ্ট-গুণাবলীতে সব

ব্যাপারেই ও সব পরীক্ষাতেই নিজের "মিশক" হবার কথা সাড়ম্বরে প্রকাশ করে যাচ্ছে। ইসলাম ও ঈমানের পরিচিত নামই বাহ্যত উভয় দলকে এক উম্মতের অন্তরভুক্ত করে রেখেছে। নয়তো আসলে মুনাফিক মুসলমানের নৈতিক বৃত্তি ও স্বভাব প্রকৃতি সত্যিকার ও সাচ্চা ঈমানদার মুসলমান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ কারণে মুনাফিকী স্বভাবের অধিকারী পুরুষ ও নারীরা একটি পৃথক দলে পরিণত হয়ে গেছে। আল্লাহ থেকে গাফেল হয়ে যাওয়া, অসৎকাজে আগ্রহী হওয়া, নেকীর কাছ থেকে দূরে থাকা এবং সৎকাজের সাথে অসহযোগিতা করার সাধারণ বৈশিষ্টগুলো তাদেরকে পরস্পরের সাথে যুথিবদ্ধ করেছে এবং মুমিনদের সাথে কার্যত সম্পর্কহীন করে দিয়েছে। অন্যদিকে সাচ্চা মুমিন পুরুষ ও নারীরা একটি পৃথক দলে পরিণত হয়েছে। তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সাধারণ বৈশিষ্ট হচ্ছে, তারা নেকীর কাজে আগ্রহী এবং গুনাহের কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। আল্লাহর স্মরণ তাদের জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনের অন্তরভুক্ত। আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার জন্য তাদের অন্তর ও হাত সারাক্ষণ উন্মুক্ত থাকে। আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য তাদের জীবনাচরণের অন্তরভুক্ত। এ সাধারণ নৈতিক বৃত্তি ও জীবন যাপন পদ্ধতি তাদেরকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছে এবং মুনাফিকদের দল থেকে আলাদা করে দিয়েছে।

৮১. তাবুক যুদ্ধের পর যে ভাষণটি নাযিল হয়েছিল এখান থেকে সেই তৃতীয় ভাষণটি শুরু হচ্ছে।

৮২. এ পর্যন্ত মুনাফিকদের কার্যকলাপের ব্যাপারে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করা হচ্ছিল। এর দু'টি কারণ ছিল। এক, তখনো পর্যন্ত মুসলমানদের হাত এত বেশী শক্তিশালী হতে পারেনি যে, বাইরের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাথে সাথে তারা ভেতরের শত্রুদের সাথেও লড়াই করতে পারতো। দুই, যারা সন্দেহ-সংশয়ে ডুবে ছিল ঈমান ও প্রত্যয় লাভ করার জন্য তাদেরকে যথেষ্ট সুযোগ দেয়াই ছিল উদ্দেশ্য। এ দু'টি কারণ এখন আর বর্তমান ছিল না। মুসলিম শক্তি এখন সমগ্র আরব ভূখণ্ডকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে নিয়েছিল এবং আরবের বাইরের শক্তিগুলোর সাথে সংঘাতের সিলসিলা শুরু হতে যাচ্ছিল। এ কারণে ঘরের এ শত্রুদের মাথা গুঁড়ো করে দেয়া এখন সম্ভবও ছিল এবং অপরিহার্যও হয়ে পড়েছিল। তাহলে তারা আর বিদেশী শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে দেশে আভ্যন্তরীণ বিপদ সৃষ্টি করতে পারতো না। তাছাড়া তাদেরকে ৯ বছর সময় দেয়া হয়েছিল চিন্তা-ভাবনা করার, বুঝার এবং আল্লাহর সত্য দীনকে যাচাই-পর্যালোচনা করার জন্য। তাদের মধ্যে যথার্থই কল্যাণ লাভের কোন আকাংখা থাকলে তারা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারতো। এরপর তাদেরকে আরো বেশী সুযোগ-সুবিধা দেয়ার আর কোন কারণ ছিল না। তাই নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কাফেরদের সাথে সাথে এ মুনাফিকদের বিরুদ্ধেও এবার জিহাদ শুরু করে দিতে হবে এবং এদের ব্যাপারে এ পর্যন্ত যে উদার নীতি অবলম্বন করা হয়েছে তার অবসান ঘটিয়ে কঠোর নীতি অবলম্বন করতে হবে।

তাই বলে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ও কঠোর নীতি অবলম্বন করার মানে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নয়। আসলে এর অর্থ হচ্ছে, তাদের মুনাফিকী মনোভাব ও কর্মনীতিকে এ পর্যন্ত যেভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে এবং যে কারণে তারা মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে থেকেছে, সাধারণ মুসলমানরা তাদেরকে নিজেদের সমাজেরই একটি

অংশ মনে করেছে এবং তারা ইসলামী দল ও সংগঠনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ও ইসলামী সমাজে মুনাফিকীর বিষ ছড়াবার যে সুযোগ পেয়েছে তা এখন ভবিষ্যতের জন্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে হবে। এখন যে ব্যক্তিই মুসলমানদের অন্তরভুক্ত হয়ে মুনাফিকী নীতি অবলম্বন করবে এবং যার কার্যধারা থেকে একথাও প্রকাশ হবে যে, সে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিনদের অন্তরঙ্গ বন্ধু নয়, সর্বসমক্ষে তার মুখোশ খুলে দিতে হবে এবং নিন্দা করতে হবে। মুসলিম সমাজে তার মর্যাদা ও আস্থা লাভের সকল প্রকার সুযোগ খতম করে দিতে হবে। তাকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। দলীয় পরামর্শের ক্ষেত্র থেকে তাকে দূরে রাখতে হবে। আদালতে তার সাক্ষ অনির্ভরযোগ্য গণ্য করতে হবে। বড় বড় পদ ও মর্যাদার দরজা তার জন্য বন্ধ করে দিতে হবে। সভা–সমিতিতে তাকে গুরুত্ব দেবে না। প্রত্যেক মুসলমান তার সাথে এমন আচরণ করবে যাতে সে নিজে অনুভব করতে পারে যে, সমগ্র মুসলিম সমাজে কোথাও তার কোন মর্যাদা ও গুরুত্ব নেই এবং কারো অন্তরে তার জন্য এতটুকু সম্ভ্রমবোধও নেই। তারপর তাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি যদি কোন সুস্পষ্ট বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে তার অপরাধ লুকানো যাবে না এবং তাকে ক্ষমা করাও যাবে না। বরং সর্বসমক্ষে তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাতে হবে এবং তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

এটি ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। এ পর্যায়ে মুসলমানদেরকে এ নির্দেশটি দেয়ার প্রয়োজন ছিল। এ ছাড়া ইসলামী সমাজকে অবনতি ও পতনের আভ্যন্তরীণ কার্যকারণ থেকে সংরক্ষণ করা সম্ভব হতো না। যে জামায়াত ও সংগঠন তার নিজের মধ্যে মুনাফিক ও বিশ্বাসঘাতকদেরকে লালন করে এবং যেখানে দুধকলা দিয়ে সাপ পোষা হয়, তার নৈতিক অধপতন এবং সবশেষে পূর্ণ ধ্বংস ছাড়া গত্যন্তর নেই। মুনাফিকী প্লেগের মতো একটি মহামারী। আর মুনাফিক হচ্ছে এমন একটি ইঁদুর যে এ মহামারীর জীবাণু বহন করে বেড়ায়। তাকে জনবসতির মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার সুযোগ দেয়ার অর্থ গোটা জনবসতিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া। মুসলমানদের সমাজে একজন মুনাফিকের মর্যাদা ও সম্ভ্রম লাভ করার অর্থ হলো হাজার হাজার মানুষকে বিশ্বাসঘাতকতা ও মুনাফিকী করতে দুঃসাহস যোগানো। এতে সাধারণ্যে এ ধারণা বিস্তার লাভ করে যে, এ সমাজে মর্যাদা লাভ করার জন্য আন্তরিকতা, সদিচ্ছা ও সাচ্চা ঈমানদারীর কোন প্রয়োজন নেই। বরং মিথ্যা ঈমানের প্রদর্শনীর সাথে খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতার পথ অবলম্বন করেও এখানে মানুষ ফুলে ফেঁপে বড় হয়ে উঠতে পারে। একথাটিই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام

"যে ব্যক্তি কোন বিদআতপন্থীকে সম্মান করলো সে আসলে ইসলামের ইমারত ভেংগে ফেলতে সাহায্য করলো।"

৮৩. এখানে যে কথার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে সেটি কি ছিল? সে সম্পর্কে কোন নিশ্চিত তথ্য আমাদের কাছে পৌঁছেনি। তবে হাদীসে বেশ কিছু কুফরী কথাবার্তার উল্লেখ করা হয়েছে যা মুনাফিকরা বলাবলি করতো। যেমন এক মুনাফিকের ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ
مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ
مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٦﴾ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ
اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٧٧﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا
اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٧٨﴾

তাদের মধ্যে এমনও কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর কাছে অংগীকার করেছিল, যদি তিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের ধন্য করেন তাহলে আমরা দান করবো এবং সৎ হয়ে যাবো। কিন্তু যখন আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে বিত্তশালী করে দিলেন তখন তারা কার্পণ্য করতে লাগলো এবং নিজেদের অংগীকার থেকে এমনভাবে পিছটান দিল যে, তার কোন পরোয়াই তাদের রইলো না।[৮৬] ফলে তারা আল্লাহর সাথে এই যে অংগীকার ভংগ করলো এবং এই যে, মিথ্যা বলতে থাকলো, এ কারণে আল্লাহ তাদের অন্তরে মুনাফিকী বদ্ধমূল করে দিলেন ; তাঁর দরবারে তাদের উপস্থিতির দিন পর্যন্ত তা তাদের পিছু ছাড়বে না। তারা কি জানে না, আল্লাহ তাদের গোপন কথা ও গোপন সলা–পরামর্শ পর্যন্ত জানেন এবং তিনি সমস্ত অদৃশ্য বিষয়ও পুরোপুরি অবগত?

সে তার আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজন মুসলিম যুবকের সাথে কথা বলার সময় বললো ঃ "যদি এ ব্যক্তি (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলছেন তা সব সত্য হয় তাহলে আমরা সবাই গাধার চেয়েও অধম।" আর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ তাবুকের সফরে এক জায়গায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটনী হারিয়ে যায়। মুসলমানরা সেটি খুঁজে বেড়াতে থাকে। মুনাফিকদের একটি দল এ ব্যাপারটি নিয়ে নিজেদের মজলিসে খুব হাসাহাসি করতে থাকে। তারা বলতে থাকে, "ইনি তো আকাশের খবর খুব শুনিয়ে থাকেন কিন্তু নিজের উটনীটি এখন কোথায় সে খবরতো তাঁর জানা নেই।"

৮৪. তাবুক যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা যেসব ষড়যন্ত্র করেছিল এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ষড়যন্ত্রটির মুহাদ্দিসগণ নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন। তাবুক থেকে ফেরার পথে মুসলিম সেনাদল যখন এমন একটি পাহাড়ী রাস্তার কাছে পৌঁছুল তখন কয়েক জন মুনাফিক নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিল যে, রাতে উঁচু গিরিপথ দিয়ে চলার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তারা পার্শ্ববর্তী গভীর খাদের মধ্যে

الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ
لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٩﴾ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ
وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٨٠﴾

(তিনি এমনসব কৃপণ ধনীদেরকে ভাল করেই জানেন) যারা ঈমানদারদের সন্তোষ ও আগ্রহ সহকারে আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের প্রতি দোষ ও অপবাদ আরোপ করে এবং যাদের কাছে (আল্লাহর পথে দান করার জন্য) নিজেরা কষ্ট সহ্য করে যা কিছু দান করে তাছাড়া আর কিছুই নেই, তাদেরকে—বিদ্রূপ করে।[৮৭] আল্লাহ এ বিদ্রূপকারীদেরকে বিদ্রূপ করেন। এদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। হে নবী! তুমি এ ধরনের লোকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো বা না করো, তুমি যদি এদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলেও আল্লাহ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না। কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে। আর আল্লাহ ফাসেকদেরকে মুক্তির পথ দেখান না।

ঠেলে ফেলে দেবে। নবী (সা) একথা জানতে পারলেন। তিনি সমগ্র সেনাদলকে গিরীপথ এড়িয়ে উপত্যকার সমতল ভূমির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলেন এবং নিজে শুধুমাত্র আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা) ও হুযাইফা ইবনে ইয়ামনকে (রা) নিয়ে গিরিপথের মধ্য দিয়ে চলতে থাকলেন। পথিমধ্যে জানতে পারলেন, দশ বারোজন মুনাফিক মুখোশ পরে পিছনে পিছনে আসছে। এ অবস্থা দেখে হযরত হুযাইফা (রা) তাদের দিকে ছুটলেন, যাতে তিনি তাদের উটগুলোকে আঘাত করে ফিরিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তারা দূর থেকেই হযরত হুযাইফাকে আসতে দেখে ভয় পেয়ে গেলো এবং ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে সংগে সংগেই পালিয়ে গেলো।

এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় যে ষড়যন্ত্রটির কথা বর্ণিত হয়েছে সেটি হচ্ছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বিশ্বস্ত সাথীরা রোমানদের সাথে লড়াই করে নিরাপদে ফিরে আসবেন, এটা মুনাফিকরা আশা করেনি। তাই তারা ঠিক করে নিয়েছিল যে, যখনই ওদিকে কোন দুর্ঘটনা ঘটে যাবে তখনই তারা মদীনায় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেবে।

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُولِ اللّٰهِ وَكَرِهُوٓا اَنْ
يُّجَاهِدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا
فِي الْحَرِّ ۭ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ۭ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾ فَلْيَضْحَكُوا
قَلِيلًا وَّلْيَبْكُوا كَثِيرًا ۚ جَزَاۗءًۢ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَاِنْ رَّجَعَكَ
اللّٰهُ اِلٰى طَاۗىِٕفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوا
مَعِيَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا ۭ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُوْدِ
اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ﴿٨٣﴾

১১ রুকূ'

যাদেরকে পিছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল তারা আল্লাহর রসূলের সাথে সহযোগিতা না করার ও ঘরে বসে থাকার জন্য আনন্দিত হলো এবং তারা নিজেদের ধন-প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে অপছন্দ করলো। তারা লোকদেরকে বললো, "এ প্রচণ্ড গরমের মধ্যে বের হয়ো না।" তাদেরকে বলে দাও, জাহান্নামের আগুন এর চেয়েও বেশী গরম, হায়! যদি তাদের সেই চেতনা থাকতো। এখন তাদের কম হাসা ও বেশী কাঁদা উচিত। কারণ তারা যে গোনাহ উপার্জন করেছে তার প্রতিদান এ ধরনেরই হয়ে থাকে (যে, সে জন্য তাদের কাঁদা উচিত)। যদি আল্লাহ তাদের মধ্যে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং আগামীতে তাদের মধ্য থেকে কোন দল জিহাদ করার জন্য তোমার কাছে অনুমতি চায় তাহলে পরিষ্কার বলে দেবে, "এখন আর তোমরা কখ্খনো আমার সাথে যেতে পারবে না এবং আমার সংগী হয়ে কোন দুশমনের সাথে লড়াইও করতে পারবে না। তোমরা তো প্রথমে বসে থাকাই পছন্দ করেছিলে, তাহলে এখন যারা ঘরে বসে আছে তাদের সাথে তোমরাও বসে থাকো।"

৮৫. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের পূর্বে মদীনা ছিল আরবের মফস্বল এলাকার ছোট শহরগুলোর মত একটি মামুলী শহর। আওস ও খাযরাজ গোত্র দু'টিও অর্থ-সম্পদ ও মর্যাদা-প্রতিপত্তির দিক দিয়ে কোন উঁচু পর্যায়ের ছিল না। কিন্তু রসূলুল্লাহর (সা) সেখানে আগমনের পর আনসাররা যখন তাঁর সাথে সহযোগিতা করে

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ۭ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝ وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ۭ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

আর আগামীতে তাদের মধ্য থেকে কেউ মারা গেলে তার জানাযার নামাযও তুমি কখ্খনো পড়বে না। এবং কখনো তার কবরের পাশে দাঁড়াবে না। কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং তাদের মৃত্যু হয়েছে ফাসেক অবস্থায়।[৮৮] তাদের ধনাঢ্যতা ও তাদের অধিক সংখ্যক সন্তান সন্ততি তোমাকে যেন প্রতারিত না করে। আল্লাহ তো তাদেরকে এ ধন ও সম্পদের সাহায্যে এ দুনিয়ায়ই সাজা দেবার সংকল্প করে ফেলেছেন এবং কাফের থাকা অবস্থায় তাদের মৃত্যু হোক—এটাই চেয়েছেন।

নিজেদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দিল তখন মাত্র আট নয় বছরের মধ্যে এ মাঝারী ধরনের মফস্বল শহরটি সারা আরবের রাজধানীতে পরিণত হলো। আর সেই আওস ও খাযরাজের কৃষকরাই হয়ে গেলেন রাষ্ট্রের কর্মকর্তা ও পরিচালক। চতুরদিক থেকে বিজয়, গনীমাতের মাল ও ব্যবসায় বাণিজ্যের মুনাফা লব্ধ সম্পদ এ কেন্দ্রীয় শহরটির ওপর বৃষ্টি ধারার মতো বর্ষিত হতে থাকলো। এ অবস্থাটিকে সামনে রেখে আল্লাহ তাদেরকে এ বলে লজ্জা দিচ্ছেন যে, আমার এ নবীর বদৌলতে তোমাদের ওপর এসব নিয়ামত বর্ষণ করা হচ্ছে—এটাই কি তাঁর দোষ এবং এ জন্যই কি তার প্রতি তোমাদের এ ক্রোধ?

৮৬. উপরের আয়াতে মুনাফিকদের যে অকৃতজ্ঞতা ও কৃতঘ্ন আচরণের নিন্দা করা হয়েছিল তার আর একটি প্রমাণ তাদের নিজেদেরই জীবন থেকে পেশ করে এখানে সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, আসলে এরা দাগী অপরাধী। এদের নৈতিক বিধানে কৃতজ্ঞতা, অনুগ্রহের স্বীকৃতি ও অংগীকার পালন ইত্যাদি গুণাবলীর নামগন্ধও পাওয়া যায় না।

৮৭. তাবুক যুদ্ধের সময় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাঁদার জন্য আবেদন জানালেন তখন বড় বড় ধনশালী মুনাফিকরা হাত গুটিয়ে বসে রইলো। কিন্তু যখন নিষ্ঠাবান ঈমানদাররা সামনে এগিয়ে এসে চাঁদা দিতে লাগলেন তখন ঐ মুনাফিকরা তাদেরকে বিদ্রূপ করতে লাগলো। কোন সামর্থবান মুসলমান নিজের ক্ষমতা ও মর্যাদা অনুযায়ী বা তার চেয়ে বেশী অর্থ পেশ করলে তারা তাদের অপবাদ দিতো যে, তারা লোক দেখাবার ও সুনাম কুড়াবার জন্য এ পরিমাণ দান করছে। আর যদি কোন গরীব মুসলমান নিজের ও নিজের স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের অভুক্ত রেখে সামান্য পরিমাণ টাকাকড়ি নিয়ে

وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَجَٰهِدُوا۟ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَـْٔذَنَكَ أُو۟لُوا۟ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا۟ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَٰعِدِينَ ﴿٨٦﴾ رَضُوا۟ بِأَن يَكُونُوا۟ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾ لَٰكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ جَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَٰتُ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾

আল্লাহকে মেনে চলো এবং তাঁর রসূলের সহযোগী হয়ে জিহাদ করো, এ মর্মে যখনই কোন সূরা নাযিল হয়েছে তোমরা দেখেছো, তাদের মধ্যে যারা সামর্থবান ছিল তারাই তোমাদের কাছে আবেদন জানিয়েছে, জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে তাদেরকে রেহাই দেয়া হোক এবং তারা বলেছে, আমাদের ছেড়ে দাও। যারা বসে আছে তাদের সাথে আমরা বসে থাকবো। তারা গৃহবাসিনী মেয়েদের সাথে শামিল হয়ে ঘরে থাকতে চেয়েছে এবং তাদের দিলে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। তাই তারা কিছুই বুঝতে পারছে না।[৮৯] অন্যদিকে রসূল ও তাঁর ঈমানদার সাথীরা নিজেদের জান-মাল দিয়ে জিহাদ করেছে। সমস্ত কল্যাণ এখন তাদের জন্য এবং তারাই সফলকাম হবে। আল্লাহ তাদের জন্য এমন বাগান তৈরী করে রেখেছেন যার নিম্নদেশে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হচ্ছে। তার মধ্যে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই মহা সাফল্য।

আসতো, অথবা সারা রাত মেহনত মজদুরি করে সামান্য কিছু খেজুর উপার্জন করে তাই এনে রসূলের (সা) সামনে হাযির করতো, তাহলে এ মুনাফিকরা তাদেরকে এ বলে ঠাট্টা করতো, "সাবাশ, এবার এক ফড়িং এর ঠ্যাং পাওয়া গেল। এ দিয়ে রোমের দূর্গ জয় করা যাবে।"

৮৮. তাবুক থেকে ফিরে আসার পর বেশী দিন যেতে না যেতেই মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলো। তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে কাফনে ব্যবহারের জন্য তাঁর কোর্তা চাইলেন। তিনি অত্যন্ত উদার হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে

وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ
كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ﴿٩٠﴾ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ
لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ مَا عَلَى
الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩١﴾

১২ রুকূ'

গ্রামীণ আরবদের[৯০] মধ্য থেকেও অনেক লোক এলো। তারা ওযর পেশ করলো, যাতে তাদেরকেও পিছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে ঈমানের মিথ্যা অংগীকার করেছিল তারাই এভাবে বসে রইল। এ গ্রামীণ আরবদের মধ্য থেকে যারাই কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে[৯১] শীঘ্রই তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। দুর্বল ও রুগ্ন লোকেরা এবং যেসব লোক জিহাদে শরীক হবার জন্য পাথেয় পায় না, তারা যদি পিছনে থেকে যায় তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই, যখন তারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বস্ত।[৯২] এ ধরনের সৎকর্মশীলদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন অবকাশই নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

কোর্তা দিয়ে দিলেন। তারপর আবদুল্লাহ তাঁকেই জানাযার নামায পড়াবার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি এ জন্যও তৈরী হয়ে গেলেন। হযরত উমর (রা) বারবার এ মর্মে আবেদন জানাতে লাগলেন—"হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি এমন ব্যক্তির জানাযার নামায পড়াবেন যে অমুক অমুক কাজ করেছে? কিন্তু তিনি তাঁর এ সমস্ত কথা শুনে মুচকি হাসতে লাগলেন। তাঁর অন্তরে শত্রু মিত্র সবার প্রতি যে করুণার ধারা প্রবাহিত ছিল তারি কারণে তিনি ইসলামের এ নিকৃষ্টতম শত্রুর মাগফেরাতের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেও ইতস্তত করলেন না। শেষে যখন, তিনি জানাযার নামায পড়াবার জন্য দাঁড়িয়েই গেলেন, তখন এ আয়াতটি নাযিল হলো। এবং সরাসরি আল্লাহর হুকুমে তাঁকে জানাযা পড়ানো থেকে বিরত রাখা হলো। কারণ এ সময় মুনাফিকদের ব্যাপারে স্থায়ী নীতি নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল যে, মুসলমানদের সমাজে আর মুনাফিকদেরকে কোন প্রকারে শিকড় গেড়ে বসার সুযোগ দেয়া যাবে না এবং এমন কোন কাজ করা যাবে না যাতে এ দলটির সাহস বেড়ে যায়।

এ থেকে শরীয়াতের এ বিষয়টি স্থিরিকৃত হয়েছে যে, ফাসেক, অশ্লীল ও নৈতিকতা বিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত ব্যক্তি এবং ফাসেক হিসেবে পরিচিত ব্যক্তির জানাযার নামায মুসলমানদের ইমাম ও নেতৃস্থানীয় লোকদের পড়ানো উচিত নয়। তাতে শরীক হওয়াও উচিত নয়। এ আয়াতগুলো নাযিল হবার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ম করে নিয়েছিলেন যে, কোন জানাযায় শরীক হবার জন্য তাঁকে ডাকা হলে তিনি প্রথমে মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। জিজ্ঞেস করতেন, সে কেমন লোক ছিল। যদি জানতে পারতেন সে অসৎ চরিত্রের অধিকারী ছিল, তাহলে তার পরিবারের লোকদের বলে দিতেন, তোমরা যেভাবে চাও একে দাফন করে দিতে পারো।

৮৯. অর্থাৎ যদিও এটা বড়ই লজ্জার ব্যাপার ছিল যে, স্বাস্থ্যবান, বলিষ্ঠ, সুঠামদেহী ও সামর্থবান লোকেরা ঈমানের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও কাজের সময় মাঠে ময়দানে বের হবার পরিবর্তে ঘরের মধ্যে ঢুকে বসে থাকবে এবং মেয়েদের দলে শামিল হবে, তবুও যেহেতু এ লোকেরা জেনে বুঝে নিজেদের জন্য এ পথটি পছন্দ করে নিয়েছিল তাই প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী তাদের থেকে এমন সব পবিত্র অনুভূতি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে যেগুলোর উপস্থিতিতে মানুষ এ ধরনের ঘৃণ্য আচরণ করতে লজ্জা বোধ করে।

৯০. গ্রামীণ আরব মানে মদীনার আশেপাশে বসবাসকারী পল্লী ও মরুবাসী আরবরা। এদেরকে সাধারণভাবে বেদুঈন বা বদ্দু বলা হয়।

৯১. মুনাফিক সুলভ তথা ভণ্ডামীপূর্ণ ঈমানের প্রকাশ, যার ভেতরে নেই সত্যের যথার্থ স্বীকৃতি, আত্মসমর্পণ, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও আনুগত্য এবং যার বাহ্যিক স্বীকৃতি সত্ত্বেও মানুষ আল্লাহ ও তাঁর দীনের তুলনায় নিজের স্বার্থ এবং পার্থিব মোহ ও আশা-আকাংখাকে প্রিয়তর মনে করে। এ ধরনের ঈমান প্রকৃতপক্ষে কুফরী ও অস্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। দুনিয়ায় এ ধরনের লোকদেরকে কাফের গণ্য না করা এবং তাদের সাথে মুসলমানের মতো ব্যবহার করা হলেও আল্লাহর দরবারে তাদের সাথে অবাধ্য অস্বীকারকারী ও বিদ্রোহীদের মতো আচরণ করা হবে। এ পার্থিব জীবনে মুসলিম সমাজের ভিত্তি যে আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যে বিধানের ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্র ও তার বিচারক আইন প্রয়োগ করেন তার প্রেক্ষিতে মুনাফিকীকে কুফরী বা কুফরী সদৃশ কেবল তখনই বলা যেতে পারে যখন অস্বীকৃতি, বিদ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতা ও অবিশ্বস্ততার প্রকাশ সুস্পষ্টভাবে হবে। তাই মুনাফিকীর এমন অনেক ধরন ও অবস্থা থেকে যায় শরীয়াতের বিচারে যেগুলোকে কুফরী নামে অভিহিত করা যায় না। কিন্তু শরীয়াতের বিচারে কোন মুনাফিকের কুফরীর অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহর বিচারেও সে এ অভিযোগ ও এর শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

৯২. এ থেকে জানা যায়, যারা বাহ্যত অক্ষম, তাদের জন্যও নিছক শারীরিক দুর্বলতা, রুগ্নতা বা নিছক অপারগতা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তাদের অক্ষমতাগুলো কেবলমাত্র তখনই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভের কারণ হতে পারে যখন তারা হবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সত্যিকার বিশ্বস্ত ও অনুগত। অন্যথায় কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি বিশ্বস্ততা না থাকে তাহলে তাকে শুধুমাত্র এ জন্য মাফ করা যেতে পারে না যে, কর্তব্য পালনের সময় সে রোগগ্রস্ত বা অপারগ ছিল। আল্লাহ শুধু বাইরের অবস্থাই দেখেন না। তাই যেসব লোক অসুস্থতার ডাক্তারী সার্টিফিকেট অথবা বার্ধক্য ও শারীরিক

وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ
عَلَيْهِ ۖ تَوَلَّوْا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوْا مَا
يُنْفِقُوْنَ ﴿٩٢﴾ إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآءُ ۚ
رَضُوْا بِأَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ ۖ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ
فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٣﴾

অনুরূপভাবে তাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগের কোন সুযোগ নেই যারা নিজেরা এসে তোমার কাছে আবেদন করেছিল, তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করতে, কিন্তু তুমি বলেছিলে, আমি তোমাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করতে পারছি না। তখন তারা বাধ্য হয়ে ফিরে গিয়েছিল। তখন তাদের অবস্থা এ ছিল যে, তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল এবং নিজেদের অর্থ ব্যয়ে জিহাদে শরীক হতে অসমর্থ হবার দরুন তাদের মনে বড়ই কষ্ট ছিল।[৯৩] অবশ্যি অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে যারা বিত্তশালী হবার পরও জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে তোমার কাছে অব্যাহতি চাচ্ছে। তারা পুরবাসিনীদের সাথে থাকাই পছন্দ করেছে। আল্লাহ তাদের দিলে মোহর মেরে দিয়েছেন, তাই তারা এখন কিছুই জানে না (যে, আল্লাহর কাজে তাদের এহেন কর্মনীতি গ্রহণের ফল কী দাঁড়াবে)।

ত্রুটির ওযর পেশ করবে তাদেরকে আল্লাহর দরবারেও তদ্রূপ অক্ষম গণ্য করা হবে এবং তাদেরকে আর কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হবে না, একথা ঠিক নয়। তিনি তো তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির মন-মানসিকতা বিশ্লেষণ করবেন, তার সমগ্র গোপন ও আপাতদৃষ্ট আচরণ নিরীক্ষণ করবেন এবং তাদের অক্ষমতা কোন বিশ্বস্ত বান্দার অক্ষমতার পর্যায়ভুক্ত ছিল, না বিদ্রোহীর পর্যায়ভুক্ত, তা যাচাই করবেন। কেউ কেউ এমন আছে যে, কর্তব্যের ডাক শুনে লাখো লাখো শুকরিয়া আদায় করে এবং মনে মনে বলে, "বড় ভালো সময়ে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি, নয়তো কোনক্রমেই এ বিপদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতো না এবং অনর্থক আমাকে গঞ্জনা ভুগতে হতো।" আবার অন্য একজন এ একই ডাক শুনে অস্থির হয়ে উঠে বলে, "হায়, কেমন এক সময় আমি অসুখে পড়লাম। যখন মাঠে-ময়দানে নেমে কাজ করার সময় তখন কিনা আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে অযথা সময় নষ্ট করছি।" একজন নিজের রোগকে কর্তব্যের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বাহানা হিসেবে ব্যবহার তো করছিলই এ সংগে সে অন্যদেরকেও এ কর্তব্য পালনে বাধা দেবার চেষ্টা করলো। অন্যজন বাধ্য হয়ে রোগশয্যায় পড়ে থাকলেও বরাবর নিজের ভাই-বেরাদর, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে জিহাদ করতে উদ্বুদ্ধ করে

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ
لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ۚ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ
تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾
سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ
إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾ يَحْلِفُونَ
لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۖ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ
الْفَاسِقِينَ ﴿٩٦﴾

তোমরা যখন ফিরে তাদের কাছে পৌঁছবে তখন তারা নানা ধরনের ওযর পেশ করতে থাকবে। কিন্তু তুমি পরিষ্কার বলে দেবে, "বাহানাবাজী করো না, আমরা তোমাদের কোন কথাই বিশ্বাস করবো না। তোমাদের অবস্থা আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। এখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ করবেন। তারপর তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, যিনি প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুই জানেন এবং তোমরা কি কাজ করছিলে তা তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন।"

তোমরা ফিরে এলে তারা তোমাদের সামনে কসম খাবে, যাতে তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করো। ঠিক আছে, তোমরা অবশ্যি তাদেরকে উপেক্ষা করো[৯৪] কারণ তারা অপবিত্র এবং তাদের আসল আবাস জাহান্নাম। তাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ এটি তাদের ভাগ্যে জুটবে। তারা তোমাদের সামনে কসম খাবে, যাতে তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হও। অথচ তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হলেও আল্লাহ কখনো এহেন ফাসেকদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না।

চলছিল এবং নিজের সেবা ও শুশ্রূষাকারীদেরকেও বলে চলছিল, "আমাকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দিয়ে যাও। অষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা কোন না কোনভাবে হয়েই যাবে। আমার একজনের জন্য আল্লাহর সত্য দীনের সেবায় নিবেদিত মূল্যবান সময়টি তোমরা নষ্ট করো না।" একজন অসুস্থতার অজুহাতে ঘরে বসে থেকে যুদ্ধের সারাটা সময় মানুষের মন ভাংগাবার, দুঃসংবাদ ছড়াবার, যুদ্ধের প্রচেষ্টাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার এবং মুজাহিদদের অনুপস্থিতিতে তাদের পারিবারিক জীবন বিধ্বস্ত করার কাজ করে। অন্যজন নিজেকে যুদ্ধের

الْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى
رَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٩٧﴾ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ
مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ وَاللّٰهُ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٩٨﴾ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ
مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ
سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٩﴾

এ বেদুইন আরবরা কুফরী ও মুনাফিকীতে বেশী কঠোর এবং আল্লাহ তাঁর রসূলের প্রতি যে দীন নাযিল করেছেন তার সীমারেখা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।[৯৫] আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। এ গ্রামীণদের মধ্যে এমন এমন লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর পথে কিছু ব্যয় করলে তাকে নিজেদের ওপর জোরপূর্বক চাপানো অর্থদণ্ড মনে করে[৯৬] এবং তোমাদের ব্যাপারে কালের আবর্তনের প্রতীক্ষা করছে (অর্থাৎ তোমরা কোন বিপদের মুখে পড়লে যে শাসন ব্যবস্থার আনুগত্যের শৃংখল তোমরা তাদের গলায় বেঁধে দিয়েছ তা তারা গলা থেকে নামিয়ে ফেলবে)। অথচ মন্দের আবর্তন তাদের ওপরই চেপে বসেছে। আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন। আবার এ গ্রামীণদের মধ্য থেকে কিছু লোক এমনও আছে যারা আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে এবং যা কিছু খরচ করে তাকে আল্লাহর দরবারে নৈকট্য লাভের এবং রসূলের কাছ থেকে রহমতের দোয়া লাভের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে। হাঁ, অবশ্যি তা তাদের জন্য নৈকট্যলাভের উপায় এবং আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে নিজের রহমতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। অবশ্যি আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

ময়দানে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে দেখে জেহাদের ঘরোয়া অংগনকে (Home front) মজবুত রাখার জন্য নিজের সাধ্যমতো প্রচেষ্টা চালায়। বাহ্যত এরা দু'জনই অক্ষম। কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে এ দুই ধরনের অক্ষমরা কখনো সমান হতে পারে না। আল্লাহ যদি ক্ষমা করেন তাহলে কেবল এ দ্বিতীয় জনকেই ক্ষমা করবেন। আর প্রথম ব্যক্তি নিজের অক্ষমতা সত্ত্বেও বিশ্বাসঘাতকতা ও নাফরমানীর অপরাধে অভিযুক্ত হবে।

৯৩. যারা দীনের খেদমত করার জন্য সর্বক্ষণ উদগ্রীব থাকে তারা যদি কোন সত্যিকার অক্ষমতার কারণে অথবা উপায়-উপকরণ বা মাধ্যম যোগাড় না হওয়ার দরুন

কার্যত খেদমত করতে না পারে তাহলে মনে ঠিক তেমনি কষ্ট পায় যেমন কোন বৈষয়িক স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গেলে অথবা কোন বড় আকারের লাভের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে মনে কষ্ট হয়, তারা বাস্তবে কোন খেদমত না করলেও আল্লাহর কাছে খেদমতকারী হিসেবেই গণ্য হবে।কারণ তারা হাত-পা চালিয়ে কোন কাজ করতে পারেনি ঠিকই কিন্তু মানসিক দিক দিয়ে তারা সর্বক্ষণ কাজের মধ্যেই থাকে। এ কারণে তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এক জায়গায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সংগী-সাথীদেরকে সম্বোধন করে বলেন,

ان بالمدينة اقواما ماسرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم

"মদীনায় কিছু লোক আছে, যারা প্রতিটি উপত্যকা অতিক্রমকালে এবং প্রতিটি যাত্রার সময় তোমাদের সাথে থেকেছে।"

সাহাবীগণ অবাক হয়ে বলেন, "মদীনায় অবস্থান করেই?" বলেন, "হাঁ, মদীনায় অবস্থান করেই। কারণ অক্ষমতা তাদেরকে আটকে রেখেছিল, নয়তো তারা নিজেরা থেকে যাবার লোক ছিল না।"

৯৪. প্রথম বাক্যে উপেক্ষা করার অর্থ হচ্ছে, এড়িয়ে যাওয়া আর দ্বিতীয় বাক্যে এর অর্থ হচ্ছে সম্পর্ক ছিন্ন করা। অর্থাৎ তারা চায় তোমরা যেন তাদের ব্যাপারে বেশী মাথা না ঘামাও এবং অনুসন্ধান না চালাও। কিন্তু তোমাদের পক্ষেও এটাই উত্তম যে, তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবে না এবং মনে করে নেবে যে, তোমরা তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেছো এবং তারাও তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

৯৫. আমরা আগেই বলে এসেছি, বেদুইন আরব বলতে এখানে গ্রামীণ ও মরুবাসীদের কথা বলা হয়েছে। এরা মদীনার আশপাশে বসবাস করতো। মদীনায় একটি মজবুত ও সংগঠিত শক্তির উত্থান ঘটতে দেখে এরা প্রথমে শংকিত হয়। তারপর ইসলাম ও কুফরের সংঘাতকালে বেশ কিছুকাল তারা সুযোগ সন্ধানী নীতি অবলম্বন করতে থাকে। এরপর ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব হেজায ও নজদের একটি বড় অংশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে এবং তার মোকাবিলায় বিরোধী গোত্রগুলোর শক্তি ভেংগে পড়তে থাকলে তারা ইসলামের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করাকেই সে সময় নিজেদের জন্য সুবিধাজনক ও নিরাপদ মনে করে। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কম লোকই ইসলামকে যথার্থই আল্লাহর সত্য দীন মনে করে সাচ্চা দিলে ঈমান আনে এবং আন্তরিকতার সাথে তার দাবীসমূহ পূর্ণ করতে উদ্যোগী হয়। অধিকাংশ বেদুইনের জন্য ইসলাম গ্রহণ করা ঈমান ও আকিদার ব্যাপার নয় বরং নিছক স্বার্থ, সুবিধা ও কৌশলের ব্যাপার ছিল। তারা চাচ্ছিল, ক্ষমতাসীন দলের সদস্যপদ লাভ করার ফলে যেসব সুবিধা ভোগ করা যায় শুধু সেগুলোই তাদের ভাগে এসে যাক। কিন্তু ইসলাম তাদের ওপর যেসব নৈতিক বিধি-নিষেধ আরোপ করেছিল ইসলাম গ্রহণ করার পরপরই তাদের ওপর নামায পড়ার ও রোযা করার যে বিধান আরোপিত হতো, যথারীতি তহশীলদার নিযুক্ত করে তাদের খেজুর বাগান ও শস্যগোলা থেকে যে যাকাত উসূল করা হতো, তাদের জাতীয় ইতিহাসে এ প্রথমবারের মতো তাদেরকে যে আইন-শৃংখলার রশিতে শক্তভাবে বাঁধা হয়েছিল এবং লুটতরাজের যুদ্ধের জন্য নয় বরং খালেস আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য দিনের পর দিন তাদের কাছ থেকে যে জানমালের কুরবানী চাওয়া

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ
بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ
تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٠٠﴾ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ
مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۛ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۛ مَرَدُوْا عَلَي النِّفَاقِ ۣ
لَا تَعْلَمُهُمْ ۭ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۭ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى
عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠١﴾

১৩ রুকূ'

মুহাজির ও আনসারদের মধ্য থেকে যারা সবার আগে ঈমানের দাওয়াত গ্রহণ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে এবং যারা পরে নিষ্ঠা সহকারে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য এমন বাগান তৈরী করে রেখেছেন যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে এবং তারা তার মধ্যে থাকবে চিরকাল। এটাই মহা সাফল্য।

তোমাদের আশেপাশে যেসব বেদুইন থাকে তাদের মধ্যে রয়েছে অনেক মুনাফিক। অনুরূপভাবে মদীনাবাসীদের মধ্যেও রয়েছে এমন কিছু মুনাফিক, যারা মুনাফিকীতে পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। তোমরা তাদেরকে চিন না, আমি চিনি তাদেরকে।[৯৭] শীঘ্রই আমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেবো।[৯৮] তারপর আরো বেশী বড় শাস্তির জন্য তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।

হচ্ছিল—এসব জিনিস তাদের কাছে ছিল অতিশয় অপ্রীতিকর, বিরক্তিকর এবং এগুলোর হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা নানা ধরনের চালবাজী ও টালবাহানার আশ্রয় নিতো। সত্য কি এবং তাদের ও সমস্ত মানুষের যথার্থ কল্যাণ কিসে, তা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যাথা ছিল না। তারা শুধুমাত্র নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ, নিজেদের আয়েশ–আরাম, নিজেদের জমি, উট, ছাগল–ভেড়া এবং নিজেদের তাঁবুর চারপাশের জগত নিয়ে মাথা ঘামাতো। এর উর্ধের কোন জিনিসের প্রতি তাদের কোন আকর্ষণ ছিল না। অবশ্য পীর–ফকীরদের কাছে যেমন নযরানা পেশ করা হয়, এবং তার বিনিময়ে তারা আয় বৃদ্ধি, বিপদ থেকে নিষ্কৃতি এবং এ ধরনের আরো বিভিন্ন উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য ঝাড়ফুঁক করেন, তাবীজ দেন ও

তাদের জন্য দোয়া করেন ঠিক তেমনি ধরনের কোন কাল্পনিক জিনিসের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণের প্রবণতা হয়তো তাদের ছিল। কিন্তু এমন কোন ঈমান ও আকীদার জন্য তারা তৈরী ছিলো না, যা তাদের সমগ্র তামাদ্দুনিক ও সামাজিক জীবনকে একটি নৈতিক ও আইনগত বাঁধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবে এবং এ সংগে একটি বিশ্বজনীন সংস্কার কার্যক্রমের জন্য তাদের কাছে জান-মালের কুরবানীরও দাবী জানাবে।

তাদের এ অবস্থাটিকেই এখানে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, নগরবাসীদের তুলনায় এ গ্রামীণ ও মরুবাসী লোকরাই বেশী মুনাফিকী ও ভণ্ডামীর আচরণ অবলম্বন করে থাকে এবং সত্যকে অস্বীকার করার প্রবণতা এদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। আবার এর কারণও বলে দেয়া হয়েছে যে, নগরবাসীরা তো জ্ঞানীগুণী ও সত্যানুসারী লোকদের সাহচর্যে এসে দীন ও তার বিধি-বিধান সম্পর্কে কিছু না কিছু জ্ঞান লাভ করতেও পারে কিন্তু এ বেদুইনরা যেহেতু সারাটা জীবন নিরেট খাদ্যান্বেষী জীব-জানোয়ারের মতো দিন রাত কেবল রুজী রোজগারের ধান্দায় লেগে থাকে এবং পশু জীবনের প্রয়োজনের চাইতে উন্নত পর্যায়ের কোন জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দেবার সময়ই তাদের থাকে না, তাই ইসলাম ও তার বিধি-বিধান সম্পর্কে তাদের অজ্ঞ থাকার সম্ভাবনাই বেশী।

এখানে এ বাস্তব সত্যটির প্রতি ইংগিত করাও অপ্রাসংগিক হবে না যে, এ আয়াতগুলো নাযিলের প্রায় দু'বছর পর হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফতের প্রাথমিক যুগে মুরতাদ হওয়ার ও যাকাত বর্জনের যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল আলোচ্য আয়াতগুলোতে বর্ণিত এ কারণটি তার অন্যতম ছিল।

৯৬. এর অর্থ হচ্ছে, তাদের থেকে যে যাকাত আদায় করা হয় তারা তাকে একটা জরিমানা মনে করে। মুসাফিরদের আহার করাবার ও মেহমানদারীর যে দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত হয়েছে, তা তাদের কাছে অসহনীয় বোঝা মনে হয়। আর যদি কোন যুদ্ধ উপলক্ষে তারা কোন চাঁদা দেয় তাহলে আন্তরিকভাবে আবেগ আপ্লুত হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দেয় না। বরং নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুধুমাত্র নিজেদের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করার জন্য দিয়ে থাকে।

৯৭. অর্থাৎ নিজেদের মুনাফিকী গোপন করার ব্যাপারে তারা এতই দক্ষতা অর্জন করেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও তাঁর অসাধারণ অন্তরদৃষ্টি, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা সত্ত্বেও তাদেরকে চিনতে পারতেন না।

৯৮. দ্বিগুণ শাস্তি মানে হচ্ছে, একদিকে যে দুনিয়ার প্রেমে মত্ত হয়ে তারা ঈমান ও আন্তরিকতার পরিবর্তে মুনাফিকী, ভণ্ডামী ও বিশ্বাসঘাতকতার নীতি অবলম্বন করেছে তা তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং তারা ধন-সম্পদ, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি লাভের পরিবর্তে বরং শোচনীয় অমর্যাদা, লাঞ্ছনা ও ব্যর্থতার শিকার হবে। অন্যদিকে তারা যে সত্যের দাওয়াতকে ব্যর্থ ও অসফল দেখতে এবং নিজেদের চালবাজীর মাধ্যমে নস্যাৎ করে দিতে চায় তা তাদের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাদের চোখের সামনে উন্নতি ও বিকাশ লাভ করতে থাকবে।

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ؕ عَسَى
اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٠٢﴾ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً
تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٣﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ
وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٤﴾ وَقُلِ اعْمَلُوْا
فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٥﴾

আরো কিছু লোক আছে, যারা নিজেদের ভুল স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের কাজকর্ম মিশ্র ধরনের কিছু ভাল, কিছু মন্দ। অসম্ভব নয়, আল্লাহ তাদের প্রতি আবার মেহেরবান হয়ে যাবেন। কারণ, তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়। হে নবী! তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদকা নিয়ে তাদেরকে পাক-পবিত্র করো, (নেকীর পথে) তাদেরকে এগিয়ে দাও এবং তাদের জন্য রহমতের দোয়া করো। তোমার দোয়া তাদের সান্ত্বনার কারণ হবে। আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন। তারা কি জানে না, আল্লাহই তার বান্দাদের তাওবা কবুল করেন, তাদের দান-খয়রাত গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়? আর হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, তোমরা কাজ করতে থাকো। আল্লাহ তাঁর রসূল ও মুমিনরা তোমাদের কাজের ধারা এখন কেমন থাকে তা দেখবেন।[৯৯] তারপর তোমাদের তাঁর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে যিনি প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু জানেন এবং তোমরা কি করতে তা তিনি তোমাদের বলে দেবেন।[১০০]

৯৯. এখানে মিথ্যা ঈমানের দাবীদার ও গোনাহগার মুমিনের পার্থক্য পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যে ব্যক্তি ঈমানের দাবী করে কিন্তু আসলে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিনদের জামায়াতের ব্যাপারে আন্তরিক নয়, তার এ আন্তরিকতাহীনতার প্রমাণ যদি তার কার্যকলাপের মাধ্যমে পাওয়া যায়, তাহলে তার সাথে কঠোর ব্যবহার করা হবে। আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য সে কোন সম্পদ পেশ করলে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। সে মারা গেলে কোন মুসলমান তার জানাযার নামায পড়বে না। এবং তার গোনাহ মাফের জন্য দোয়াও করবে না, সে তার বাপ বা ভাই হলেও। অন্যদিকে যে ব্যক্তি সত্যিকার মুমিন

কিন্তু এ সত্ত্বেও সে এমন কিছু কাজ করে বসেছে যা তার আন্তরিকতাহীনতা প্রমাণ করে, এ ক্ষেত্রে সে যদি নিজের ভুল স্বীকার করে নেয় তাহলে তাকে মাফ করে দেয়া হবে। তার সাদ্‌কা, দান–খয়রাত গ্রহণ করা হবে এবং তার ওপর রহমত নাযিলের জন্য দোয়াও করা হবে। এখন কোন ব্যক্তির আন্তরিকতাবিহীন কার্যকলাপের পরও তাকে নিছক একজন গোনাহগার মুমিন গণ্য করতে হলে তাকে তিনটি মানদণ্ডে যাচাই করতে হবে। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত এ মানদণ্ডগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) নিজের ভুলের জন্য সে খোঁড়া অজুহাত ও মনগড়া ব্যাখ্যা পেশ করবে না। বরং যে ভুল হয়ে গেছে সহজ সরলভাবে তা মেনে নেবে।

(২) তার আগের কার্যকলাপ দেখা হবে। সে আন্তরিকতাহীনতার দাগী অপরাধী কিনা তা যাচাই করা হবে। যদি আগে সে ইসলামী জামায়াতের এক সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে এবং তার জীবনের সমস্ত কার্যকলাপে আন্তরিক সেবা, ত্যাগ, কুরবানী ও ভালো কাজে অগ্রবর্তী থাকার রেকর্ড থেকে থাকে, তাহলে ধরে নেয়া হবে যে, বর্তমানে যে ভুল সে করেছে তা ঈমান ও আন্তরিকতাহীনতার ফল নয় বরং তা নিছক সাময়িকভাবে সৃষ্ট একটি দুর্বলতা বা পদস্খলন ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৩) তার ভবিষ্যত কার্যকলাপের ওপর নজর রাখা হবে। দেখতে হবে, তার ভুলের স্বীকৃতি কি নিছক মৌখিক, না তার মধ্যে লজ্জার গভীর অনুভূতি রয়েছে। যদি নিজের ভুল সংশোধনের জন্য তাকে অস্থির ও উৎকণ্ঠিত দেখা যায় এবং তার প্রতিটি কথা থেকে এ কথা প্রকাশ হয় যে, তার জীবনে যে ঈমানী ত্রুটির চিত্র ভেসে উঠেছিল তাকে মুছে ফেলার ও তা সংশোধন করার জন্য সে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তাহলে সে যথার্থই লজ্জিত হয়েছে বলে মনে করা হবে। এ লজ্জা ও অনুশোচনাই হবে তার ঈমান ও আন্তরিকতার প্রমাণ।

মুহাদ্দিসগণ এ আয়াতগুলোর নাযিলের পটভূমি হিসেবে যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তা থেকে এ বিষয়বস্তুটি আয়নার মতো স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। তাঁরা বলেন, এ আয়াতগুলো আবু লুবাবাহ ইবনে আবদুল মুনযির ও তাঁর ছ'জন সাথীর প্রসংগে নাযিল হয়েছিল। হিজরতের আগে আকাবার বাইআতের সময় যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আবু লুবাবাহ ছিলেন তাদের একজন। বদর, ওহোদ ও অন্যান্য যুদ্ধে তিনি বরাবর অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু তাবুক যুদ্ধের সময় মানসিক দুর্বলতা তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং কোন প্রকার শরয়ী ওযর ছাড়াই তিনি ঘরে বসে থাকেন। তার অন্য সাথীরাও ছিলেন তারই মতো আন্তরিকতা সম্পন্ন। তারাও এ একই প্রকার দুর্বলতার শিকার হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন এবং যারা পিছনে থেকে গিয়েছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের মতামত কি তা তারা জানতে পারলেন তখন তারা ভীষণভাবে অনুতপ্ত হলেন। কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদের আগেই তারা নিজেদেরকে একটি খুঁটির সাথে বেঁধে নেন এবং বলেন, আমাদের মাফ না করে দেয়া পর্যন্ত আমাদের জন্য আহার–নিদ্রা হারাম। এ অবস্থায় আমাদের প্রাণ বায়ু বের হয়ে গেলেও আমরা তার পরোয়া করবো না। কয়েক দিন পর্যন্ত এভাবেই তারা বাঁধা অবস্থায় অনাহার অনিদ্রায় কাটান। এমনকি একদিন তারা বেহুশ হয়ে পড়ে যান। শেষে তাদের জানানো হলো, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন! তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ
عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠٦﴾ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ
الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَيَحْلِفُنَّ
اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٠٧﴾ لَا تَقُمْ فِيْهِ
اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ
فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿١٠٨﴾

অপর কিছু লোকের ব্যাপার এখনো আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় আছে, তিনি চাইলে তাদেরকে শাস্তি দেবেন, আবার চাইলে তাদের প্রতি নতুন করে অনুগ্রহ করবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।[১০১]

আরো কিছু লোক আছে, যারা একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে (সত্যের দাওয়াতকে) ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে, (আল্লাহর বন্দেগী করার পরিবর্তে) কুফরী করার জন্য, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার লক্ষে এবং (এ বাহ্যিক ইবাদাতগাহকে) এমন এক ব্যক্তির জন্য গোপন ঘাঁটি বানাবার উদ্দেশ্যে যে ইতিপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। তারা অবশ্যি কসম খেয়ে বলবে, ভালো ছাড়া আর কোন ইচ্ছাই আমাদের ছিল না। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী, তারা একেবারেই মিথ্যেবাদী। তুমি কখনো সেই ঘরে দাঁড়াবে না। যে মসজিদটি প্রথম দিন থেকে তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল সেই মসজিদে দাঁড়ানোই (ইবাদাতের জন্য) তোমার পক্ষে অধিকতর সমীচীন। সেখানে এমন লোক আছে, যারা পাক-পবিত্র থাকা পছন্দ করে এবং আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন।[১০২]

সাল্লামকে বলেন, ঘরের যে আরাম আয়েশ আমাদের ফরয থেকে গাফেল করে দিয়েছিল তা এবং নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ আমরা আল্লাহর পথে দান করে দেবো, এটাও আমাদের তাওবার অন্তরভুক্ত। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সমস্ত ধন-সম্পদ দান করে দেবার দরকার নেই, শুধুমাত্র এক তৃতীয়াংশই যথেষ্ট। তদনুসারে তখনই তারা সেগুলো আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে দেন। এ ঘটনাটি বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার জানা যায়, কোন্ ধরনের দুর্বলতা আল্লাহ মাফ করেন। উল্লিখিত মহান

সাহাবীগণ এ ধরনের আন্তরিকতাহীন আচরণে অভ্যস্ত ছিলেন না। বরং তাদের বিগত জীবনের কার্যকলাপ তাদের ঈমানী নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ ছিল। এবারেও রসূল (সা)–এর নিকট তাদের কেউ মিথ্যা অজুহাত পেশ করেননি। বরং নিজেদের ভুলকে নিজেরাই অকপটে ভুল হিসেবে স্বীকৃতি দেন। তাঁরা ভুলের স্বীকারোক্তি সহকারে নিজেদের কার্য ধারার মাধ্যমে একথা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তারা যথার্থই লজ্জিত হয়েছেন এবং নিজেদের গোনাহ মাফ করাবার জন্য অত্যন্ত অস্থির ও উদ্বিগ্ন।

এখানে আলোচ্য আয়াতটিতে আর একটি মূল্যবান কথা বলা হয়েছে। সে কথাটি হচ্ছে, গোনাহ মাফের জন্য মুখ ও অন্তর দিয়ে তাওবা করার সাথে সাথে বাস্তব কাজের মাধ্যমেও তাওবা করতে হবে। আর আল্লাহর পথে ধন–সম্পদ দান করা হচ্ছে বাস্তব তাওবার একটি পদ্ধতি। এভাবে নফসের মধ্যে যে দূষিত ময়লা আবর্জনা লালিত হচ্ছিল এবং যার কারণে মানুষ গোনাহে লিপ্ত হয়েছিল তা দূর হয়ে যায় এবং ভালো ও কল্যাণের দিকে ফিরে যাবার যোগ্যতা বেড়ে যায়। গোনাহ করার পর তা স্বীকার করার ব্যাপারটি এমন যেমন এক ব্যক্তি গর্তের মধ্যে পড়ে যায় এবং নিজের পড়ে যাওয়াটা সে অনুভব করতে পারে। তারপর নিজের গোনাহের ওপর তার লজ্জিত হওয়াটা এ অর্থ বহন করে যে, এ গর্তকে সে নিজের অবস্থানের জন্য বড়ই খারাপ জায়গা মনে করে এবং এ জন্য ভীষণ কষ্ট অনুভব করতে থাকে। এরপর সাদ্‌কা, দান–খয়রাত এবং অন্যান্য সৎকাজের মাধ্যমে এর ক্ষতি পূরণ করার প্রচেষ্টা চালানোর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, সে গর্ত থেকে বের হয়ে আসার জন্য চেষ্টা করছে এবং হাত–পা ছুঁড়ছে।

১০০. এর অর্থ হচ্ছে, চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতিটি বিষয় সম্পূর্ণরূপে স্বয়ং আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত। আর আল্লাহ এমন এক সত্তা যার কাছে কোন কিছু গোপন থাকতে পারে না। এ জন্য কোন ব্যক্তি দুনিয়ায় তার ভণ্ডামী ও মুনাফিকী গোপন করতে সক্ষমও হয় এবং মানুষ যেসব মানদণ্ডে কারোর ঈমান ও আন্তরিকতা পরখ করতে পারে সেসবগুলোতে পুরাপুরি উত্তীর্ণ হলেও একথা মনে করা উচিত নয় যে, সে মুনাফিকীর শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে গেছে।

১০১. এদের ব্যাপারটি ছিল সন্দেহপূর্ণ। এদেরকে না মুনাফিক বলে চিহ্নিত করা যেতো আর না বলা যেতো গোনাহগার মুমিন। এ দু'টি জিনিসের কোনটিরই আলামত তখনো তাদের মধ্যে পুরোপুরি ফুটে ওঠেনি। তাই আল্লাহ তাদের ব্যাপারটি মুলতবী রাখেন। মুলতবী রাখার অর্থ এই নয় যে, আসলে আল্লাহর কাছেও তাদের ব্যাপারটি সন্দেহপূর্ণ ছিল। বরং এর অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তি বা দলের ব্যাপারে মুসলমানদের নিজেদের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে অতিমাত্রায় তাড়াহুড়ো করা চাই না। যতক্ষণ পর্যন্ত না এমন ধরনের আলামতের মাধ্যমে তার অবস্থান সুস্পষ্ট হয়ে যায়, যা অদৃশ্য জ্ঞান দিয়ে নয় বরং যুক্তি ও অনুভূতি দিয়ে পরখ করা যেতে পারে, ততক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত।

১০২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় আগমনের আগে খাযরাজ গোত্রে আবু আমের নামে এক ব্যক্তি ছিল। জাহেলী যুগে সে খৃষ্টান রাহেবের (সাধু) মর্যাদা লাভ করেছিল। তাকে আহলে কিতাবদের আলেমদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি গণ্য করা হতো। অন্যদিকে সাধুগিরির কারণে পণ্ডিত সুলভ মর্যাদার পাশাপাশি তার দরবেশীর প্রভাবও মদীনা ও আশপাশের এলাকার অশিক্ষিত আরব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় পৌঁছলেন তখন সেখানে বিরাজ করছিল আবু আমেরের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বের রমরমা অবস্থা। কিন্তু এ জ্ঞান, বিদ্যাবত্তা ও দরবেশী তার মধ্যে সত্যানুসন্ধিৎসা ও সত্যকে চেনার মতো ক্ষমতা সৃষ্টি করার পরিবর্তে উলটো তার জন্য একটি বিরাট অন্তরাল সৃষ্টি করলো। আর এ অন্তরাল সৃষ্টির ফলে রসূলের আগমনের পরে সে নিজে ঈমানের নিয়ামত থেকে শুধু বঞ্চিতই রইল না বরং রসূলকে নিজের ধর্মীয় পৌরহিত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং নিজের দরবেশী ও সাধুবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের শত্রু মনে করে তাঁর ও তাঁর সমুদয় কার্যক্রমের বিরোধিতায় নেমে পড়লো। প্রথম দু'বছর তার আশা ছিল কুরাইশী কাফেরদের শক্তি ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হবে। কিন্তু বদরের যুদ্ধে কুরাইশরা চরমভাবে পরাজিত হলো। এ অবস্থায় সে আর নীরব থাকতে পারলো না। সেই বছরই সে মদীনা থেকে বের হয়ে পড়লো। সে কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করলো। যেসব কুচক্রীর চক্রান্ত ও যোগসাজশে ওহোদ যুদ্ধ বাধে, তাদের মধ্যে এ আবু আমেরও অন্যতম। বলা হয়ে থাকে, ওহোদের যুদ্ধের ময়দানে সে অনেকগুলো গর্ত খুঁড়েছিল। এরই একটির মধ্যে পড়ে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহত হয়েছিলেন। তারপর আহযাব যুদ্ধের সময় চারদিক থেকে যে সেনাবাহিনী মদীনার ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল তাকে আক্রমণে উস্কে দেয়ার ব্যাপারেও তার অগ্রণী ভূমিকা ছিল। এরপর হুনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত আরব মুশরিক ও মুসলমানদের মধ্যে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে সবগুলোতেই এ ঈসায়ী দরবেশ ইসলামের বিরুদ্ধে মুশরিক শক্তির সক্রিয় সহায়ক ছিল। শেষ পর্যন্ত আরবের কোন শক্তি ইসলামের অগ্রযাত্রা রুখে দিতে পারবে বলে তার আর আশা রইল না। কাজেই সে আরব দেশ ত্যাগ করে রোমে চলে যায় এবং আরব থেকে যে "বিপদ" মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল সে সম্পর্কে সে কাইসারকে (সীজার) অবহিত করে। এ সময়ই মদীনায় খবর পৌঁছে যে, কাইসার আরব আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং এরই প্রতিবিধান করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাবুক অভিযান করতে হয়।

ঈসায়ী রাহেব আবু আমেরের এ ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতায় তার সাথে শরীক ছিল মদীনার মুনাফিক গোষ্ঠীর একটি দল। আবু আমেরকে তার ধর্মীয় প্রভাব ব্যবহার করে ইসলামের বিরুদ্ধে রোমের কাইসার ও উত্তরাঞ্চলের খৃষ্টান আরব রাজ্যগুলোর সামরিক সাহায্য লাভ করতেও এ মুনাফিকরা তাকে পরামর্শ দেয় ও মদদ যোগায়। যখন সে রুমের পথে রওয়ানা হচ্ছিল তখন তার ও এ মুনাফিকদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হলো। এ চুক্তি অনুযায়ী স্থির হলো যে, মদীনায় তারা নিজেদের একটি পৃথক মসজিদ তৈরী করে নেবে। এভাবে সাধারণ মুসলমানদের থেকে আলাদা হয়ে মুনাফিক মুসলমানদের এমন একটি স্বতন্ত্র জোট গড়ে উঠবে, যা ধর্মীয় আলখেল্লায় আবৃত থাকবে। তার প্রতি সহজে কোন প্রকার সন্দেহ করা যাবে না। সেখানে শুধু যে, মুনাফিকরাই সংগঠিত হবে এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য পরামর্শ করবে তা নয়। বরং আবু আমেরের কাছ থেকে যেসব এজেন্ট খবর ও নির্দেশ নিয়ে আসবে তারাও সন্দেহের উর্ধে থেকে নিরীহ ফকীর ও মুসাফিরের বেশে এ মসজিদে অবস্থান করতে থাকবে। এ ন্যাক্কারজনক ষড়যন্ত্রটির ভিত্তিতেই এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল এবং এরি কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে।

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ
أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي
قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١٠﴾

তাহলে তুমি কি মনে করো, যে ব্যক্তি আল্লাহ ভীতি ও তার সন্তুষ্টি অর্জনের উপর নিজের ইমারতের ভীত্তি স্থাপন করলো সে ভাল, না যে ব্যক্তি তার ইমারতের ভিত্ উঠালো একটি উপত্যকার স্থিতিহীন ফাঁপা প্রান্তের ওপর[১০৩] এবং তা তাকে নিয়ে সোজা জাহান্নামের আগুনে গিয়ে পড়লো? এ ধরনের জালেমদেরকে আল্লাহ কখনো সোজা পথ দেখান না।[১০৪] তারা এই যে ইমারত নির্মাণ করেছে এটা সবসময় তাদের মনে সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে (যার বের হয়ে যাওয়ার আর কোন উপায়ই এখন নেই)—যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।[১০৫] আল্লাহ অত্যন্ত সচেতন, জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।

মদীনায় এ সময় দু'টি মসজিদ ছিল। একটি মসজিদে কুবা। এটি ছিল নগর উপকণ্ঠে। অন্যটি ছিল মসজিদে নববী। শহরের অভ্যন্তরে ছিল এর অবস্থান। এ দু'টি মসজিদ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তৃতীয় একটি মসজিদ নির্মাণ করার কোন প্রয়োজনই ছিল না। আর এটা কোন যুক্তিহীন ধর্মীয় আবেগের যুগ ছিল না যে, প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক মসজিদ নামে নিছক একটি ইমারত তৈরী করে দিলেই তখন নেকীর কাজ বলে মনে করা হবে। বরং একটি নতুন মসজিদ তৈরী করার অর্থই ছিল মুসলমানদের জামায়াতের মধ্যে অনর্থক বিভেদ সৃষ্টি করা। একটি সত্যনিষ্ঠ ইসলামী ব্যবস্থা কোনক্রমেই এটা বরদাশত করতে পারে না। তাই তারা নিজেদের পৃথক মসজিদ তৈরী করার আগে তার প্রয়োজনের বৈধতা প্রমাণ করতে বাধ্য ছিল। এ উদ্দেশ্যে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এ নতুন নির্মাণ কাজের প্রয়োজন পেশ করে। এ প্রসঙ্গে তারা বলে, বৃষ্টি-বাদলের জন্য এবং শীতের রাতে সাধারণ লোকদের বিশেষ করে উল্লেখিত দু'টি মসজিদ থেকে দূরে অবস্থানকারী বৃদ্ধ, দুর্বল ও অক্ষম লোকদের প্রতিদিন পাঁচবার মসজিদে হাজিরা দেয়া কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই আমরা শুধুমাত্র নামাযীদের সুবিধার্থে এ নতুন মসজিদটি নির্মাণ করতে চাই।

মুখে এ পবিত্র ও কল্যাণমূলক বাসনার কথা উচ্চারণ করে যখন এ "দ্বিরার" (ক্ষতিকর) মসজিদটির নির্মাণ কাজ শেষ হলো তখন এ দুর্বৃত্তরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হলো এবং সেখানে একবার নামায পড়িয়ে মসজিদটির উদ্বোধন করার জন্য তাঁর কাছে আবেদন জানালো। কিন্তু "আমি এখন যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আছি এবং শীঘ্রই আমাকে একটি বড় অভিযানে বের হতে হবে, সেখান থেকে ফিরে এসে

দেখা যাবে," একথা বলে তিনি তাদের আবেদন এড়িয়ে গেলেন। এরপর তিনি তাবুক রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং তাঁর রওয়ানা হওয়ার পর এ মুনাফিকরা এ মসজিদে নিজেদের জোট গড়ে তুলতে এবং ষড়যন্ত্র পাকাতে লাগলো।

এমনকি তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, ওদিকে রোমানদের হাতে মুসলমানদের মূলোৎপাটনের সাথে সাথেই এদিকে এরা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিবে। কিন্তু তাবুকে যা ঘটলো তাতে তাদের সে আশার গুড়ে বালি পড়লো। ফেরার পথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনার নিকটবর্তী 'যী আওয়ান' নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন এ আয়াত নাযিল হলো। তিনি তখনই কয়েকজন লোককে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। তাদেরকে দায়িত্ব দিলেন, তাঁর মদীনায় পৌঁছার আগেই যেন তারা 'যিরার' মসজিদটি জ্বালিয়ে ধূলিস্মাত করে দেয়।

১০৩. এখানে কুরআনের মূল শব্দ হচ্ছে جُرُف (যুরুফ)। আরবী ভাষায় সাগর বা নদীর এমন কিনারাকে যুরুফ বলা হয় স্রোতের টানে যার তলা থেকে মাটি সরে গেছে এবং ওপরের অংশ কোন বুনিয়াদ ও নির্ভর ছাড়াই দাঁড়িয়ে আছে। যারা আল্লাহকে ভয় না করা এবং তাঁর সন্তুষ্টির পরোয়া না করার ওপর নিজেদের কর্মকান্ডের ভিত্ গড়ে তোলে, তাদের জীবন গঠনকে এখানে এমন একটি ইমারতের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা এমনি ধরনের একটি অন্তসারশূন্য অস্থিতিশীল সাগর কিনারে নির্মাণ করা হয়েছে। এটি একটি নযীরবিহীন উপমা। এর চাইতে সুন্দরভাবে এ অবস্থার আর কোন চিত্র আঁকা সম্ভব নয়। এর সমগ্র অন্তরনিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে বুঝে নিতে হবে যে, দুনিয়ার জীবনের যে উপরিভাগের ওপর মুমিন, মুনাফিক, কাফের, সৎকর্মশীল, দুষ্কৃতকারী তথা সমস্ত মানুষ কাজ করে, তা মাটির উপরিভাগের স্তরের মতো, যার ওপর দুনিয়ার সমস্ত ইমারত নির্মাণ করা হয়ে থাকে। এ স্তরের মধ্যে কোন স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতা নেই। বরং এর নীচে নিরেট জমি বিদ্যমান থাকার ওপরই এর স্থিতিশীলতা নির্ভর করে। যে স্তরের নীচের মাটি কোন কারণে যেমন নদীর পানির তোড়ে ভেসে গেছে তার ওপর যদি কোন মানুষ যে মাটির প্রকৃত অবস্থা জানে না বাহ্যিক অবস্থায় প্রতারিত হয়ে নিজের গৃহ নির্মাণ করে, তাহলে তা তার গৃহসহ ধ্বসে পড়বে এবং সে কেবল নিজেই ধ্বংস হবে না বরং এ অস্থিতিশীল ভিতের ওপর নির্ভর করে নিজের জীবনের যা কিছু পুঁজিপাটা সে সংস্থিত গৃহের মধ্যে জমা করেছিল সবই এ সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে। দুনিয়ার জীবনের এ বাহ্যিক স্তরটিরও এ উপমাটির সাথে হুবহু মিল রয়েছে। এ স্তরটির ওপরই আমরা সবাই আমাদের জীবনের যাবতীয় কার্যক্রমের ইমারত নির্মাণ করি। অথচ এর নিজের কোন স্থিতি ও স্থায়িত্ব নেই। বরং আল্লাহর ভয়, তাঁর সামনে জবাবদিহির অনুভূতি এবং তাঁর ইচ্ছা ও মর্জি মতো চলার শক্ত ও নিরেট পাথর যদি তার নীচে বসানো থাকে, এরি ওপর তার মজবুতী ও স্থিতিশীলতা নির্ভর করে। যে অন্ধ ও অপরিণামদর্শী মানুষ নিছক দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিকের ওপর ভরসা করে আল্লাহর ভয়ে ভীত না হয়ে এবং তাঁর সন্তোষলাভের পরোয়া না করে দুনিয়ায় কাজ করে যায় সে আসলে নিজের জীবন গঠনের বুনিয়াদ নীচে থেকেই অন্তসার শূন্য করে দেয়। তার শেষ পরিণতি এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, ভিত্তিহীন যে উপরিস্তরের ওপর সে তার সারা জীবনের সঞ্চয় জমা করেছে। একদিন অকস্মাৎ তা ধ্বসে পড়বে এবং তাকে তার জীবনের সমস্ত সম্পদসহ ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবে।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي
التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ
فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

১৪ রুকূ'

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের প্রাণ ও ধন-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন।[১০৬] তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে। তাদের প্রতি তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে (জান্নাতের ওয়াদা) আল্লাহর জিম্মায় একটি পাকাপোক্ত ওয়াদা বিশেষ।[১০৭] আর আল্লাহর চাইতে বেশী নিজের ওয়াদা পূরণকারী আর কে আছে? কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে যে কেনা-বেচা করেছো সে জন্য আনন্দ করো। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।

১০৪. 'সোজা পথ' অর্থাৎ যে পথে মানুষ সফলকাম হয় এবং যে পথে অগ্রসর হয়ে সে যথার্থ সাফল্যের মনযিলে পৌঁছে যায়।

১০৫. অর্থাৎ তারা মুনাফিক সুলভ ধোঁকা ও প্রতারণার বিরাট অপরাধ করে নিজেদের অন্তরকে চিরকালের জন্য ঈমানী যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত করেছে। বেঈমানী ও নাফরমানীর রোগ তাদের অন্তরের অন্তস্থলে অনুপ্রবেশ করেছে। যতদিন তাদের এ অন্তর থাকবে ততদিন এ রোগও সেখানে অবস্থান করবে। আল্লাহর হুকুম অমান্য করার জন্য যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে মন্দির নির্মাণ করে অথবা তাঁর দীনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ব্যারিকেড ও ঘাঁটি তৈরী করে তার হেদায়াতও কোন না কোন সময় সম্ভব। কারণ তার মধ্যে স্পষ্টবাদিতা, আন্তরিকতা ও নৈতিক সাহসের সূক্ষ্মতম উপাদান মৌলিকভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। আর এ উপাদান সত্য ও ন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করার জন্য ঠিক তেমনিভাবে কাজে লাগে যেমন মিথ্যা ও অন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করার জন্য কাজে লাগে। কিন্তু যে কাপুরুষ, মিথ্যুক ও প্রতারক আল্লাহর নাফরমানী ও হুকুম অমান্য করার জন্য মসজিদ নির্মাণ করে এবং আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আল্লাহ পরস্তির প্রতারণামূলক পোশাক পরিধান করে, মুনাফিকীর ঘুণে তার চরিত্র কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে। আন্তরিকতার সাথে ঈমানের বোঝা বহন করার ক্ষমতা সে কোথা থেকে পাবে?

১০৬. আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে ঈমানের যে ব্যাপারটা স্থিরিকৃত হয় তাকে কেনাবেচা বলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, ঈমান শুধুমাত্র একটা অতি প্রাকৃতিক আকীদা-বিশ্বাস নয়। বরং এটা একটা চুক্তি। এ চুক্তির প্রেক্ষিতে বান্দা তার নিজের প্রাণ ও নিজের ধন-সম্পদ আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দেয়। আর এর বিনিময়ে সে আল্লাহর

পক্ষ থেকে এ ওয়াদা কবুল করে নেয় যে, মরার পরে পরবর্তী জীবনে তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু অনুধাবন করার জন্য সর্বপ্রথম কেনা-বেচার তাৎপর্য ও স্বরূপ কি তা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।

নিরেট সত্যের আলোকে বিচার করলে বলা যায়, মানুষের ধন-প্রাণের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। কারণ, তিনিই তার এবং তার কাছে যা কিছু আছে সব জিনিসের স্রষ্টা। সে যা কিছু ভোগ ও ব্যবহার করছে তাও তিনিই তাকে দিয়েছেন। কাজেই এদিক দিয়ে তো কেনাবেচার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মানুষের এমন কিছু নেই, যা সে বিক্রি করবে। আবার কোন জিনিস আল্লাহর মালিকানার বাইরেও নেই, যা তিনি কিনবেন। কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন একটি জিনিস আছে, যা আল্লাহ পুরোপুরি মানুষের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে তার ইখতিয়ার অর্থাৎ নিজের স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি (Free will and freedom of choice)। এ ইখতিয়ারের কারণে অবশ্যি প্রকৃত সত্যের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু মানুষ এ মর্মে স্বাধীনতা লাভ করে যে, সে চাইলে প্রকৃত সত্যকে মেনে নিতে পারে এবং চাইলে তা অস্বীকার করতে পারে। অন্য কথায়, এ ইখতিয়ারের মানে এ নয় যে, মানুষ প্রকৃতপক্ষে তার নিজের প্রাণের, নিজের বুদ্ধিবৃত্তি ও শারীরিক শক্তির এবং দুনিয়ায় সে যে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লাভ করেছে, তার মালিক হয়ে গেছে। এ সংগে এ জিনিসগুলো সে যেভাবে চাইবে সেভাবে ব্যবহার করার অধিকার লাভ করেছে, একথাও ঠিক নয়। বরং এর অর্থ কেবল এতটুকুই যে, তাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি ছাড়াই সে নিজেই নিজের সত্তার ও নিজের প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর আল্লাহর মালিকানা ইচ্ছা করলে স্বীকার করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে নিজেই নিজের মালিক হয়ে যেতে পারে এবং নিজেই একথা মনে করতে পারে যে, সে আল্লাহ থেকে বেপরোয়া হয়ে নিজের ইখতিয়ার তথা স্বাধীন কর্মক্ষমতার সীমানার মধ্যে নিজের ইচ্ছামত কাজ করার অধিকার রাখে। এখানেই কেনা-বেচার প্রশ্নটা দেখা দেয়। আসলে এ কেনা-বেচা এ অর্থে নয় যে, মানুষের একটি জিনিস আল্লাহ কিনতে চান, বরং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, যে জিনিসটি আল্লাহর মালিকানাধীন, যাকে তিনি আমানত হিসেবে মানুষের হাতে সোপর্দ করেছেন এবং যে ব্যাপারে বিশ্বস্ত থাকার বা অবিশ্বস্ত হবার স্বাধীনতা তিনি মানুষকে দিয়ে রেখেছেন সে ব্যাপারে তিনি মনুষের কাছে দাবী করেন, আমার জিনিসকে তুমি স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে (বাধ্য হয়ে নয়) আমার জিনিস বলে মেনে নাও এবং সারা জীবন স্বাধীন মালিকের মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নয় বরং আমানতদার হিসেবে তা ব্যবহার করার বিষয়টি গ্রহণ করে নাও। এ সংগে খেয়ানত করার যে স্বাধীনতা তোমাকে দিয়েছি তা তুমি নিজেই প্রত্যাহার করো। এভাবে যদি তুমি দুনিয়ার বর্তমান অস্থায়ী জীবনে নিজের স্বাধীনতাকে (যা তোমার অর্জিত নয় বরং আমার দেয়া) আমার হাতে বিক্রি করে দাও তাহলে আমি পরবর্তী চিরন্তন জীবনে এর মূল্য জান্নাতের আকারে তোমাকে দান করবো। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কেনা-বেচার এ চুক্তি সম্পাদন করে সে মুমিন। ঈমান আসলে এ কেনা-বেচার আর এক নাম। আর যে ব্যক্তি এটা অস্বীকার করবে অথবা অঙ্গীকার করার পরও এমন আচরণ করবে যা কেবলমাত্র কেনা-বেচা না করার অবস্থায় করা যেতে পারে সে কাফের। আসলে এ কেনা-বেচাকে পাস কাটিয়ে চলার পারিভাষিক নাম কুফরী।

কেনা-বেচার এ তাৎপর্য ও স্বরূপটি অনুধাবন করার পর এবার তার অন্তরনিহিত বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা যাক ঃ

এক ঃ এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ মানুষকে দু'টি বড় বড় পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। প্রথম পরীক্ষাটি হচ্ছে, তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেবার পর সে মালিককে মালিক মনে করার এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের পর্যায়ে নেমে না আসার মতো সৎ আচরণ করে কিনা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, নিজের প্রভু ও মালিক আল্লাহর কাছ থেকে আজ নগদ যে মূল্য পাওয়া যাচ্ছে না বরং মরার পর পরকালীন জীবনে যে মূল্য আদায় করার ওয়াদা তাঁর পক্ষ থেকে করা হয়েছে তার বিনিময়ে নিজের আজকের স্বাধীনতা ও তার যাবতীয় স্বাদ বিক্রি করতে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে রাজী হয়ে যাবার মত আস্থা তাঁর প্রতি আছে কিনা।

দুই ঃ যে ফিকাহর আইনের ভিত্তিতে দুনিয়ায় ইসলামী সমাজ গঠিত হয় তার দৃষ্টিতে ঈমান শুধুমাত্র কতিপয় বিশ্বাসের স্বীকৃতির নাম। এ স্বীকৃতির পর নিজের স্বীকৃতি ও অংগীকারের ক্ষেত্রে মিথ্যুক হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত শরীয়াতের কোন বিচারক কাউকে অমুমিন বা ইসলামী মিল্লাত বহির্ভূত ঘোষণা করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ঈমানের তাৎপর্য ও স্বরূপ হচ্ছে, বান্দা তার চিন্তা ও কর্ম উভয়ের স্বাধীনতা ও স্বাধীন ক্ষমতা আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দিবে এবং নিজের মালিকানার দাবী পুরোপুরি তাঁর সপক্ষে প্রত্যাহার করবে। কাজেই যদি কোন ব্যক্তি ইসলামের কালেমার স্বীকৃতি দেয় এবং নামায-রোযা ইত্যাদির বিধানও মেনে চলে কিন্তু নিজেকে নিজের দেহ ও প্রাণের, নিজের মন, মস্তিষ্ক ও শারীরিক শক্তির, নিজের ধন-সম্পদ, উপায়-উপকরণ ইত্যাদির এবং নিজের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণাধীন সমস্ত জিনিসের মালিক মনে করে এবং সেগুলোকে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করার স্বাধীনতা নিজের জন্য সংরক্ষিত রাখে, তাহলে হয়তো দুনিয়ায় তাকে মুমিন মনে করা হবে কিন্তু আল্লাহর কাছে সে অবশ্যি অমুমিন হিসেবে গণ্য হবে। কারণ কুরআনের দৃষ্টিতে কেনা-বেচার ব্যাপারকে ঈমানের আসল তাৎপর্য ও স্বরূপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু সে আল্লাহর সাথে আদতে কোন কেনা-বেচার কাজই করেনি। যেখানে আল্লাহ চান সেখানে ধন-প্রাণ নিয়োগ না করা এবং যেখানে তিনি চান না সেখানে ধন-প্রাণ নিয়োগ ও ব্যবহার করা—এ দু'টি কার্যধারাই চূড়ান্তভাবে ফায়সালা করে দেয় যে, ঈমানের দাবীদার ব্যক্তি তার ধন-প্রাণ আল্লাহর হাতে বিক্রি করেইনি অথবা বিক্রির চুক্তি করার পরও সে বিক্রি করা জিনিসকে যথারীতি নিজের জিনিস মনে করছে।

তিন ঃ ঈমানের এ তাৎপর্য ও স্বরূপ ইসলামী জীবনাচরণকে কাফেরী জীবনাচরণ থেকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়। যে মুসলিম ব্যক্তি সঠিক অর্থে আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে সে জীবনের সকল বিভাগে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হয়ে কাজ করে। তার আচরণে কোথাও স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী দৃষ্টিভংগীর প্রকাশ ঘটতে পারে না। তবে কোন সময় সাময়িকভাবে সে গাফলতির শিকার হতে পারে এবং আল্লাহর সাথে নিজের কেনা-বেচার চুক্তির কথা ভুলে গিয়ে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী ভূমিকা অবলম্বন করাও তার পক্ষে সম্ভব। এটা অবশ্যি ভিন্ন ব্যাপার। অনুরূপভাবে ঈমানদারদের সমন্বয়ে গঠিত কোন দল বা সমাজ সমষ্টিগতভাবেও আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর শরয়ী আইনের বিধিনিষেধমুক্ত হয়ে কোন নীতি-পদ্ধতি, রাষ্ট্রীয় নীতি, তামাদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক পদ্ধতি

এবং কোন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আন্তরজাতিক আচরণ অবলম্বন করতে পারে না। কোন সাময়িক গাফলতির কারণে যদি সেটা অবলম্বন করেও থাকে তাহলে যখনই সে এ ব্যাপারে জানতে পারবে তখনই স্বাধীন ও স্বৈরাচারী আচরণ ত্যাগ করে পুনরায় বন্দেগীর আচরণ করতে থাকবে। আল্লাহর আনুগত্য মুক্ত হয়ে কাজ করা এবং নিজের ও নিজের সাথে সংশ্লিষ্টদের ব্যাপারে নিজে নিজেই কি করবো না করবো, সিদ্ধান্ত নেয়া অবশ্যি একটি কুফরী জীবনাচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। যাদের জীবন যাপন পদ্ধতি এ রকম তারা "মুসলমান" নামে আখ্যায়িত হোক বা "অমুসলিম" নামে তাতে কিছু যায় আসে না।

চার ঃ এ কেনা-বেচার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর যে ইচ্ছার আনুগত্য মানুষের জন্য অপরিহার্য হয় তা মানুষের নিজের প্রস্তাবিত বা উদ্ভাবিত নয় বরং আল্লাহ নিজে যেমন ব্যক্ত করেন তেমন। নিজে নিজেই কোন জিনিসকে আল্লাহর ইচ্ছা বলে ধরে নেয়া এবং তার আনুগত্য করতে থাকা মূলত আল্লাহর ইচ্ছার নয় বরং নিজেরই ইচ্ছার আনুগত্য করার শামিল। এটি এ কেনাবেচার চুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। যে ব্যক্তি ও দল আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর হেদায়াত থেকে নিজের সমগ্র জীবনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে একমাত্র তাকেই আল্লাহর সাথে কৃত নিজের কেনা-বেচার চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হবে।

এ হচ্ছে এ কেনা-বেচার অন্তরনিহিত বিষয়। এ বিষয়টি অনুধাবন করার পর এ কেনা-বেচার ক্ষেত্রে বর্তমান পার্থিব জীবনের অবসানের পর মূল্য (অর্থাৎ জান্নাত) দেবার কথা বলা হয়েছে কেন তাও আপনাআপনিই বুঝে আসে। "বিক্রেতা নিজের প্রাণ ও ধন-সম্পদ আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দেবে" কেবলমাত্র এ অংগীকারের বিনিময়েই যে জান্নাত পাওয়া যাবে তা নয়। বরং "বিক্রেতা নিজের পার্থিব জীবনে এ বিক্রি করা জিনিসের ওপর নিজের স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার প্রত্যাহার করবে এবং আল্লাহ প্রদত্ত আমানতের রক্ষক হয়ে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী হস্তক্ষেপ করবে।" এরূপ বাস্তব ও সক্রিয় তৎপরতার বিনিময়েই জান্নাত প্রাপ্তি নিশ্চিত হতে পারে। সুতরাং বিক্রেতার পার্থিব জীবনকাল শেষ হবার পর যখন প্রমাণিত হবে যে, কেনা-বেচার চুক্তি করার পর সে নিজের পার্থিব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চুক্তির শর্তসমূহ পুরোপুরি মেনে চলেছে একমাত্র তখনই এ বিক্রি সম্পূর্ণ হবে। এর আগে পর্যন্ত ইনসাফের দৃষ্টিতে সে মূল্য পাওয়ার অধিকারী হতে পারে না।

এ বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে বুঝে নেবার সাথে সাথে এ বর্ণনার ধারাবাহিকতায় কোন্ প্রেক্ষাপটে এ বিষয়বস্তুটির অবতারণা হয়েছে তাও জেনে নেয়া উচিত। ওপর থেকে যে ধারবাহিক ভাষণ চলে আসছিল তাতে এমন সব লোকের কথা ছিল যারা ঈমান আনার অংগীকার করেছিল ঠিকই কিন্তু পরীক্ষার কঠিন সময় সমুপস্থিত হলে তাদের অনেকে গাফলতির কারণে, অনেকে আন্তরিকতার অভাবে এবং অনেকে চূড়ান্ত মুনাফিকীর পথ অবলম্বন করার ফলে আল্লাহ ও তাঁর দীনের জন্য নিজের সময়, ধন-সম্পদ, স্বার্থ ও প্রাণ দিতে ইতস্তত করেছিল। কাজেই এ বিভিন্ন ব্যক্তি ও শ্রেণীর আচরণের সমালোচনা করার পর এখন তাদেরকে পরিষ্কার বলে দেয়া হচ্ছে, তোমরা যে ঈমান গ্রহণ করার অংগীকার করেছো তা নিছক আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব মেনে নেবার নাম নয়। বরং একমাত্র আল্লাহই যে তোমাদের জান ও তোমাদের ধন-সম্পদের মালিক এ অকাট্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব

মেনে নেয়া ও এর স্বীকৃতি দেয়ার নামই ঈমান। কাজেই এ অংগীকার করার পর যদি তোমরা এ প্রাণ ও ধন-সম্পদ আল্লাহর হুকুমে কুরবানী করতে ইতস্তত করো এবং অন্যদিকে নিজের দৈহিক ও আত্মিক শক্তিসমূহ এবং নিজের উপায়-উপকরণসমূহ আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে থাকো তাহলে এ থেকে একথাই প্রমাণিত হবে যে, তোমাদের অংগীকার মিথ্যা। সাচ্চা ঈমানদার একমাত্র তারাই যারা যথার্থই নিজেদের জান-মাল আল্লাহর হাতে বিকিয়ে দিয়েছে এবং তাঁকেই এ সবের মালিক মনে করেছে। তিনি এগুলো যেখানে ব্যয় করার নির্দেশ দেন সেখানে নির্দ্বিধায় এগুলো ব্যয় করে এবং যেখানে তিনি নিষেধ করেন সেখানে দেহ ও আত্মার সামান্যতম শক্তিও এবং আর্থিক উপকরণের নগণ্যতম অংশও ব্যয় করতে রাজী হয় না।

১০৭. এ ব্যাপারে অনেকগুলো আপত্তি তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে, এখানে যে ওয়াদার কথা বলা হয়েছে তা তাওরাত ও ইনজীলে নেই। কিন্তু ইনজীলের ব্যাপারে এ ধরনের কথা বলার কোন ভিত্তি নেই। বর্তমানে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে যে ইনজীলসমূহ পাওয়া যায় সেগুলোয় হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের এমন অনেকগুলো উক্তি পাওয়া যায় যেগুলো এ আয়াতের সমার্থক। যেমন ঃ

"ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য তাড়িত হইয়াছে, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।"
(মথি ৫ ঃ ১০)

"যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করে, সে তাহা হারাইবে; এবং যে কেহ আমার নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায়, সে তাহা রক্ষা করিবে।" (মথি ১০ ঃ ৩৯)

"আর যে কোন ব্যক্তি আমার নামের জন্য বাটী, কি ভ্রাতা, কি ভগিনী, কি পিতা ও মাতা, কি সন্তান, কি ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, সে তাহার শতগুণ পাইবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে।" (মথি ১৯ ঃ ২৯)

তবে তাওরাত বর্তমানে যে অবস্থায় পাওয়া যায় তাতে অবশ্যি এ বিষয়বস্তুটি পাওয়া যায় না। শুধু এটি কেন, সেখানে তো মৃত্যুর পরবর্তী জীবন, শেষ বিচারের দিন ও পরকালীন পুরস্কার ও শাস্তির ধারণাই অনুপস্থিত। অথচ এ আকীদা সর্বসময় আল্লাহর সত্য দীনের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবেই বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু বর্তমান তাওরাতে এ বিষয়টির অস্তিত্ব না থাকার ফলে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও ঠিক নয় যে, যথার্থই তাওরাতে এর অস্তিত্ব ছিল না। আসলে ইহুদিরা তাদের অবনতির যুগে এতই বস্তুবাদী ও দুনিয়াবী সমৃদ্ধির মোহে এমন পাগল হয়ে গিয়েছিলো যে, তাদের কাছে নিয়ামত ও পুরস্কার এ দুনিয়ায় লাভ করা ছাড়া তার আর কোন অর্থই ছিলো না। এ কারণে আল্লাহর কিতাবে বন্দেগী ও আনুগত্যের বিনিময়ে তাদেরকে যেসব পুরস্কার দেবার ওয়াদা করা হয়েছিল সে সবকে তারা দুনিয়ার এ মাটিতেই নামিয়ে এনেছিল এবং জান্নাতের প্রতিটি সংজ্ঞা ও বৈশিষ্টকে তারা তাদের আকাংখিত ফিলিস্তিনের ওপর প্রয়োগ করেছিল। তাওরাতের বিভিন্ন স্থানে আমরা এ ধরনের বিষয়বস্তু দেখতে পাই। যেমন ঃ

"হে ইস্রায়েল শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভূ একই সদাপ্রভূ; আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভূকে প্রেম করিবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৬ ঃ ৪, ৫)

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ
الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ
اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾

আল্লাহর দিকে বারবার প্রত্যাগমনকারী[১০৮] তাঁর ইবাদাতকারী, তাঁর প্রশংসা বাণী উচ্চারণকারী, তাঁর জন্য যমীনে বিচরণকারী[১০৯] তার সামনে রুকূ' ও সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশকারী, অসৎকাজ থেকে বিরতকারী এবং আল্লাহর সীমারেখা সংরক্ষণকারী[১১০] (সেই সব মুমিন হয়ে থাকে যারা আল্লাহর সাথে কেনাবেচার সওদা করে)। আর হে নবী! এ মুমিনদেরকে সুখবর দাও!

আরো দেখি ঃ

"তিনি কি তোমার পিতা নহেন, যিনি তোমাকে লাভ করিলেন। তিনিই তোমার নির্মাতা ও স্থিতিকর্তা।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৩২ ঃ ৬)

কিন্তু আল্লাহর সাথে এ সম্পর্কের যে পুরস্কার বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, তোমরা এমন একটি দেশের মালিক হয়ে যাবে যেখানে দুধ ও মধুর নহর প্রবাহিত হচ্ছে অর্থাৎ ফিলিস্তিন। এর আসল কারণ হচ্ছে, তাওরাত বর্তমানে যে অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে তা প্রথমত সম্পূর্ণ নয়, তাছাড়া নির্ভেজাল আল্লাহর বাণী সম্বলিতও নয়। বরং তার মধ্যে আল্লাহর বাণীর সাথে অনেক ব্যাখ্যামূলক বক্তব্যও সংযোজিত করে দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে ইহুদীদের জাতীয় ঐতিহ্য, বংশপ্রীতি, কুসংস্কার, আশা-আকাংখা, ভুল ধারণা ও ফিকাহভিত্তিক ইজতিহাদের একটি বিরাট অংশ একই ভাষণ ও বাণী পরম্পরার মধ্যে এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে গেছে যে, অধিকাংশ স্থানে আল্লাহর আসল কালামকে তার মধ্য থেকে পৃথক করে বের করে নিয়ে আসা একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। (এ প্রসঙ্গে আরো দেখুন সূরা আলে ইমরানের ২ টীকা)।

১০৮. মূল আয়াতে التائبون (আত্ তা-য়েবুন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক অনুবাদ করলে দাঁড়ায় 'তাওবাকারী'। কিন্তু যে বর্ণনা রীতিতে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তাওবা করা ঈমানদারদের স্থায়ী ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের অন্তরভুক্ত। তাই এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, তারা কেবলমাত্র একবার তাওবা করে না বরং সবসময় তাওবা করতে থাকে। আর তাওবার আসল অর্থ হচ্ছে, ফিরে আসা। কাজেই এ শব্দটির মূল প্রাণ সত্তা প্রকাশ করার জন্য আমি এর ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ এভাবে করেছি, "তারা আল্লাহর দিকে বারবার ফিরে আসে।" মুমিন যদিও তার পূর্ণ চেতনা ও সংকল্প সহকারে আল্লাহর সাথে নিজের প্রাণ ও ধন-সম্পদ কেনা-বেচার কারবার করে কিন্তু যেহেতু বাইরের অবস্থার প্রেক্ষিতে এটাই অনুভূত হয় যে, প্রাণ তার নিজের এবং ধনও তার নিজের আর তাছাড়া এ প্রাণ ও ধনের আসল মালিক মহান আল্লাহ

কোন অনুভূত সত্তা নন বরং একটি যুক্তিগ্রাহ্য সত্তা। তাই মুমিনের জীবনে বারবার এমন সময় আসতে থাকে যখন সে সাময়িকভাবে আল্লাহর সাথে করা তার কেনা-বেচার চুক্তি ভুলে যায়। এ অবস্থায় এ চুক্তি থেকে গাফেল হয়ে সে কোন লাগামহীন কার্যকলাপ করে বসে। কিন্তু একজন প্রকৃত ও যথার্থ মুমিনের বৈশিষ্ট এই যে, এ সাময়িক ভুলে যাওয়ার হাত থেকে যখনই সে রেহাই পায়, তখনই নিজের গাফলতির পর্দা ছিঁড়ে সে বেরিয়ে আসে এবং অনুভব করতে থাকে যে, অবচেতনভাবে সে নিজের অংগীকারের বিরুদ্ধাচরণ করে ফেলেছে তখনই সে লজ্জা অনুভব করে, তীব্র অনুশোচনা সহকারে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে ক্ষমা চায় এবং নিজের অংগীকারকে পুনরায় তরতাজা করে নেয়। এ বারবার তাওবা করা, বারবার আল্লাহর দিকে ফিরে আসা এবং প্রত্যেকটি পদস্খলনের পর বিশ্বস্ততার পথে ফিরে আসাই ঈমানের স্থিতি ও স্থায়িত্বের প্রতীক। নয়তো যেসব মানবিক দুর্বলতা সহকারে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেগুলোর উপস্থিতিতে তার পক্ষে এটা কোনক্রমেই সম্ভব নয় যে, সে আল্লাহর হাতে একবার ধন-প্রাণ বিক্রি করার পর চিরকাল পূর্ণ সচেতন অবস্থায় এ কেনা-বেচার দাবী পূরণ করতে থাকবে এবং কখনো গাফলতি ও বিস্মৃতির শিকার হবে না। তাই মহান আল্লাহ মুমিনের এ সজ্ঞা বর্ণনা করেন না যে, বন্দেগীর পথে এসে কখনো যার পা পিছলে যায় না সে মুমিন। বরং বার বার পা পিছলে যাবার পরও প্রতিবারই সে একই পথে ফিরে আসে, এটিকেই আল্লাহ মুমিনের প্রশংসনীয় গুণ হিসেবে গণ্য করেছেন। আর এটিই হচ্ছে মানুষের আয়ত্বের ভেতরের শ্রেষ্ঠতম গুণ।

আবার এ প্রসংগে মুমিনদের গুণাবলীর মধ্যে সবার আগে তাওবার কথা বলার আর একটি উপযোগিতাও রয়েছে। আগে থেকে যে ধারাবাহিক বক্তব্য চলে আসছে তাতে এমনসব লোকের উদ্দেশ্যে কথা বলা হয়েছে যাদের থেকে ঈমান বিরোধী কার্যকলাপের প্রকাশ ঘটেছিল। কাজেই তাদেরকে ঈমানের তাৎপর্য ও তার মৌলিক দাবী জানিয়ে দেবার পর এবার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, মুমিনদের যে অপরিহার্য গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান গুণ হচ্ছে ঃ যখনই বন্দেগীর পথ থেকে তাদের পা পিছলে যায় তারা যেন সংগে সংগেই আবার সেদিকে ফিরে আসে। নিজেদের সত্য বিচ্যুতির ওপর যেন অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে না থাকে এবং পিছনের দিকে বেশী দূরে চলে না যায়।

১০৯. মূল ইবারতে السائحون (আস্ সায়েহুন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ করেছেন الصائمون (আস্ সা-য়েমুন) অর্থাৎ যারা রোযা রাখে। কিন্তু السائحون বা বিচরণকারীকে রোযাদার অর্থে ব্যবহার করলে সেটা হবে তার রূপক ও পরোক্ষ অর্থ। এর প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অর্থ এটা নয়। আর যে হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এ শব্দটির এ অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন সেটিকে নবীর (সা) ওপর প্রয়োগ করা ঠিক নয়। তাই আমরা একে এর প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করাকেই বেশী সঠিক মনে করি। কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় ইনফাক শব্দটি সরল ও সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, এর মানে হয় ব্যয় করা এবং এর উদ্দেশ্য আল্লাহর পথে ব্যয় করা। ঠিক তেমনি এখানে বিচরণ করা মানেও নিছক ঘোরাফেরা করা নয়। বরং এমন উদ্দেশ্যে যমীনে চলাফেরা করা, যা পবিত্র ও উন্নত এবং যার মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। যেমন দীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জিহাদ করা, কুফর শাসিত

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا
أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾ وَمَا كَانَ
اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ
أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

নবী ও যারা ঈমান এনেছে তাদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা সংগত নয়, তারা তাদের আত্মীয়-স্বজন হলেই বা কি এসে যায়, যখন একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছ যে, তারা জাহান্নামেরই উপযুক্ত।[১১১] ইবরাহীম তার বাপের জন্য যে মাগফিরাতের দোয়া করেছিল তা তো সেই ওয়াদার কারণে ছিল যা সে তার বাপের সাথে করেছিল।[১১২] কিন্তু যখন তার কাছে একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, তার বাপ আল্লাহর দুশমন তখন সে তার প্রতি বিমুখ হয়ে গেছে। যথার্থই ইবরাহীম কোমল হৃদয়, আল্লাহভীরু ও ধৈর্যশীল ছিল।[১১৩]

এলাকা থেকে হিজরত করা, দীনের দাওয়াত দেয়া, মানুষের চরিত্র সংশোধন করা, পরিচ্ছন্ন ও কল্যাণকর জ্ঞান অর্জন করা, আল্লাহর নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ করা এবং হালাল জীবিকা উপার্জন করা। এ গুণটিকে এখানে বিশেষভাবে মুমিনদের গুণের অন্তরভুক্ত করা হয়েছে এ জন্য যে, যারা ঈমানের দাবী করা সত্ত্বেও জিহাদের আহবানে ঘর থেকে বের হয়নি তাদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, সত্যিকার মুমিন ঈমানের দাবী করার পর নিজের জায়গায় আরামে বসে থাকতে পারে না। বরং সে আল্লাহর দীন গ্রহণ করার পর তার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে যায় এবং তার দাবী পূরণ করার জন্য সারা পৃথিবীব্যাপী অবিরাম প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে থাকে।

১১০. অর্থাৎ মহান আল্লাহ আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদাত-বন্দেগী, নৈতিক চরিত্র, সামাজিকতা, তামাদ্দুন অর্থনীতি-রাজনীতি, আইন-আদালত এবং যুদ্ধ ও শান্তির ব্যাপারে যে সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন তারা তা পুরোপুরি মেনে চলে। নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কর্মকাণ্ড এ সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখে। কখনো এ সীমা অতিক্রম করে ইচ্ছামতো কাজ করতে থাকে না। আবার কখনো আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মনগড়া আইনের বা মানুষের তৈরী ভিন্নতর আইনকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করে না। এ ছাড়াও আল্লাহর সীমারেখা সংরক্ষণের মধ্যে এ মর্মার্থও নিহিত রয়েছে যে, এ সীমারেখাগুলো প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং এগুলো লংঘন করতে দেয়া যাবে না। কাজেই সাচ্চা ঈমানদারদের সংজ্ঞা কেবল এতটুকুই নয় যে, তারা নিজেরা আল্লাহর সীমা মেনে চলে বরং তাদের অতিরিক্ত গুণাবলী হচ্ছে এই যে, তারা দুনিয়ায় আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে, সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং সেগুলো অটুট রাখার জন্য নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

১১১. কোন ব্যক্তির জন্য ক্ষমার আবেদন জানানোর অনিবার্য অর্থ হচ্ছে এই যে, আমরা তার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাকে ভালোবাসি। দ্বিতীয়ত আমরা তার দোষকে ক্ষমাযোগ্য মনে করি। যারা বিশ্বস্তদের অন্তরভুক্ত এবং শুধুমাত্র গোনাহগার তাদের ক্ষেত্রে এ দু'টো কথাই ঠিক। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে তার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, তাকে ভালবাসা ও তার অপরাধকে ক্ষমাযোগ্য মনে করা শুধু যে, নীতিগতভাবে ভুল তাই নয় বরং এর ফলে আমাদের নিজেদের বিশ্বস্ততাও সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে। আর যদি শুধুমাত্র আমাদের আত্মীয় বলে আমরা তাকে মাফ করে দিতে চাই তাহলে এর মানে হবে, আমাদের কাছে আত্মীয়তার সম্পর্ক আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ততার দাবীর তুলনায় অনেক বেশী মূল্যবান। আল্লাহ ও তাঁর দীনের প্রতি আমাদের ভালবাসা নির্ভেজাল ও শর্তহীন নয়। আল্লাহদ্রোহীদের সাথে আমরা যে সম্পর্ক জুড়ে রেখেছি তার ফলে আমরা চাচ্ছি, আল্লাহ নিজেও যেন এ সম্পর্ক গ্রহণ করেন এবং আমাদের আত্মীয়কে যেন অবশ্যই ক্ষমা করে দেন, যদিও এ একই অপরাধ করার কারণে অন্যান্য অপরাধীদেরকে তিনি জাহান্নামের শাস্তি দিয়ে থাকেন। বস্তুত এ সমস্ত কথাই ভুল, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার বিরোধী এবং সেই একনিষ্ঠ ঈমানের পরিপন্থী যার দাবী হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর দীনের প্রতি আমাদের ভালবাসা নির্ভেজাল হতে হবে, আল্লাহর বন্ধু হবে আমাদের বন্ধু এবং তাঁর শত্রু হবে আমাদের শত্রু। এ কারণে মহান আল্লাহ এ কথা বলেননি যে, "তোমরা মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো না।" বরং তিনি বলেছেন, "তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা তোমাদের পক্ষে শোভা পায় না।" অর্থাৎ আমার মানা করায় যদি তোমরা বিরত থাকো তাহলে তো এর তেমন কোন গুরুত্ব থাকে না। মূলত তোমাদের মধ্যে আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার অনুভূতি এত বেশী তীব্র হওয়া উচিত যার ফলে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারীদের সাথে সহানুভূতির সম্পর্ক রাখা এবং তাদের অপরাধকে ক্ষমাযোগ্য মনে করা তোমাদের নিজেদের কাছেই অশোভন ঠেকে।

এখানে আরো এতটুকু বুঝে নিতে হবে যে, আল্লাহদ্রোহীদের প্রতি যে সহানুভূতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা কেবলমাত্র এমন পর্যায়ের সহানুভূতি যা দীনের ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে মানবিক সহানুভূতি এবং পার্থিব সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আত্মীয়তা ও রক্ত সম্পর্ক এবং স্নেহ-সম্প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার—এসব নিষিদ্ধ নয় বরং প্রশংসনীয়। আত্মীয় কাফের হোক বা মুমিন, তার সামাজিক অধিকার অবশ্যি প্রদান করতে হবে। বিপদগ্রস্ত মানুষকে সকল অবস্থায় সাহায্য দিতে হবে। অভাবীকে যে কোন সময় সহায়তা দান করতে হবে। রুগ্ন ও আহতের সেবা ও তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের ব্যাপারে কোন ত্রুটি দেখানো যাবে না। ইয়াতীমের মাথায় অবশ্যি স্নেহের হাত বুলাতে হবে। এসব ব্যাপারে কখনো মুসলিম ও অমুসলিমের বাজবিচার করা চলবে না।

১১২. হযরত ইবরাহীম তাঁর মুশরিক পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সময় যে কথা বলেছিলেন সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন ঃ

سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ إِنَّهُ كَانَ بِيْ حَفِيًّا

"আপনার প্রতি সালাম, আপনার জন্য আমি আমার রবের কাছে দোয়া করবো যেন তিনি আপনাকে মাফ করে দেন। তিনি আমার প্রতি বড়ই মেহেরবান।" (মারয়াম ঃ ৪৭)

তিনি আরো বলেছিলেন ঃ

لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ

"আমি আপনার জন্য অবশ্যি ক্ষমা চাইবো। তবে আপনাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা আমার নেই।" (আল মুমতাহিনা ঃ ৪)

উপরোক্ত ওয়াদার ভিত্তিতে তিনি নিজের পিতার জন্য এ দোয়া করেছিলেন ঃ

وَاغْفِرْ لِاَبِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ۙ وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ۙ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ۙ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۙ

"আর আমার পিতাকে মাফ করে দাও, তিনি পথভ্রষ্টদের অন্তরভুক্ত ছিলেন। আর যেদিন সকল মানুষকে উঠানো হবে সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত করো না। যেদিন ধনসম্পদ এবং সন্তান সন্ততি কারোর কোন কাজে লাগবে না। একমাত্র সে-ই নাজাত পাবে, যে আল্লাহর সামনে হাযির হবে বিদ্রোহমুক্ত হৃদয় নিয়ে।" (আশ্ শুআরা ঃ ৮৬-৮৯)

এ দোয়া তো প্রথমত অত্যন্ত সতর্ক ও সংযত ভাষায় করা হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই হযরত ইবরাহীম চিন্তা করলেন যে, তিনি যে ব্যক্তির জন্য দোয়া করছেন সে তো ছিল প্রকাশ্য আল্লাহদ্রোহী এবং আল্লাহর দীনের ঘোরতর শত্রু তখন তিনি এ থেকে বিরত হলেন এবং একজন যথার্থ বিশ্বস্ত মুমিনের মত বিদ্রোহীর প্রতি সহানুভূতি দেখানো থেকে পরিষ্কারভাবে সরে দাঁড়ালেন। অথচ এ বিদ্রোহী ছিল তাঁর পিতা, যে এক সময় স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে তাঁকে লালন পালন করেছিল।

১১৩. মূলে اواه (আওওয়াহুন) ও حليم (হালীমুন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আওওয়াহুন মানে হচ্ছে, যে অনেক বেশী হা-হুতাশ করে, কান্নাকাটি করে, ভয় পায় ও আক্ষেপ করে। আর "হালীম" এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নিজের মেজায সংযত রাখে, রাগে, শত্রুতায় ও বিরোধিতায় বেসামাল আচরণ করে না এবং অন্যদিকে ভালবাসায়, বন্ধুত্বে ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করে যায় না। এখানে এ শব্দ দু'টি দ্বিবিধ অর্থ প্রকাশ করছে। হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর পিতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেছেন। কারণ তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংবেদনশীল হৃদয় বৃত্তির অধিকারী। তাঁর পিতা জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবে, একথা ভেবে তিনি কেঁপে উঠেছিলেন। আবার তিনি ছিলেন হালীম—সংযমী ও ধৈর্যশীল। তাঁর পিতা ইসলামের পথে এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে বাধা দেবার জন্য তাঁর ওপর যে জুলুম নির্যাতন চালিয়েছিল তা সত্ত্বেও তাঁর মুখ থেকে পিতার জন্য দোয়া বের হয়ে গিয়েছিল। তারপর তিনি দেখলেন, তাঁর পিতা আল্লাহর দুশমন, তাই তিনি তার থেকে নিজেকে দায়মুক্ত করে নিলেন। কারণ তিনি আল্লাহকে ভয় করতেন এবং কারোর প্রতি ভালোবাসায় সীমা অতিক্রম করতেন না।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ۚ
إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾ إِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ
يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١١٦﴾

লোকদেরকে হেদায়াত দান করার পর আবার গোমরাহীতে লিপ্ত করা আল্লাহর রীতি নয়, যতক্ষণ না তিনি তাদেরকে কোন্ জিনিস থেকে সংযত হয়ে চলতে হবে তা পরিষ্কার করে জানিয়ে দেন।[১১৪] আসলে আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের জ্ঞান রাখেন। আর এও সত্য, আসমান ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন, জীবন ও মৃত্যু তাঁরই ইখতিয়ারভুক্ত এবং তোমাদের এমন কোন সহায় ও সাহায্যকারী নেই যে তোমাদেরকে তাঁর হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

১১৪. অর্থাৎ লোকদের কোন্ চিন্তা, কার্যধারা ও পদ্ধতি থেকে বাঁচতে হবে তা আল্লাহ আগেই বলে দেন। তারপর যখন তারা তা থেকে বিরত হয় না এবং ভুল চিন্তা ও কাজে লিপ্ত হয়ে তার ওপর অবিচল থাকে তখন আল্লাহও তাদের হোদায়াত করার ও সঠিক পথনির্দেশনা দেয়া থেকে বিরত হন এবং যে ভুল পথে তারা যেতে চায় তার ওপর তাদেরকে ঠেলে দেন।

এ বক্তব্যটি থেকে একটি মূলনীতি অনুধাবন করা যায়। আল্লাহ কুরআন মজীদের যেসব জায়গায় হেদায়াত দেয়া ও গোমরাহ করাকে তাঁর নিজের কাজ বলে উল্লেখ করেছেন সেগুলো এ মূলনীতিটির মাধ্যমে ভালোভাবে বুঝা যেতে পারে। আল্লাহর হেদায়াত দেয়ার মানে হচ্ছে, তিনি নিজের নবী ও কিতাবসমূহের সাহায্যে লোকদের সামনে সঠিক চিন্তা ও কর্মধারা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তারপর যারা স্বেচ্ছায় এ পথে চলতে উদ্যোগী হয় তাদের চলার সুযোগ ও সামর্থ দান করেন। আর আল্লাহর গোমরাহীতে লিপ্ত করার মানে হচ্ছে, তিনি যে সঠিক চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন যদি তার বিপরীত পথে চলার জন্য কেউ জোর প্রচেষ্টা চালায় এবং সোজা পথে চলতে না চায় তাহলে আল্লাহ জোর করে তাকে সত্য পথ দেখান না এবং সত্যের দিকে চালিতও করেন না বরং যেদিকে সে নিজে যেতে চায় সেদিকে যাবার সুযোগ ও সামর্থ তাকে দান করেন।

আলোচ্য ভাষণটির একথাটি কোন্ প্রসংগে বর্ণনা করা হয়েছে, আগের ও পরের ভাষণগুলো গভীর মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করলে তা সহজেই বুঝা যেতে পারে। এটা এক ধরনের সতর্কবাণী। একে অত্যন্ত সংগতভাবে আগের বর্ণনার সমাপ্তি হিসাবেও গণ্য করা যেতে পারে। আবার পরে যে আলোচনা আসছে তার ভূমিকাও বলা যেতে পারে।

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ
سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ
عَلَيْهِمْ ۚ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٧﴾ وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰٓى
اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا
اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ۚ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ
هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١١٨﴾

আল্লাহ নবীকে মাফ করে দিয়েছেন এবং অত্যন্ত কঠিন সময়ে যে মুহাজির ও আনসারগণ নবীর সাথে সহযোগিতা করেন তাদেরকেও মাফ করে দিয়েছেন।[১১৫] যদিও তাদের মধ্য থেকে কিছু লোকের দিল বক্রতার দিকে আকৃষ্ট হতে যাচ্ছিল[১১৬] (কিন্তু তারা এ বক্রতার অনুগামী না হয়ে নবীর সহযোগী হয়েছেন। ফলে) আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন।[১১৭] নিসন্দেহে এ লোকদের প্রতি তিনি স্নেহশীল ও মেহেরবান। আর যে তিনজনের ব্যাপার মুলতবী করে দেয়া হয়েছিল তাদেরকেও তিনি মাফ করে দিয়েছেন।[১১৮] পৃথিবী তার সমগ্র ব্যাপকতা সত্ত্বেও যখন তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেলো, তাদের নিজেদের প্রাণও তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ালো এবং তারা জেনে নিল যে, আল্লাহর হাত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিজের রহমতের আশ্রয় ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই তখন আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের দিকে ফিরলেন যাতে তারা তাঁর দিকে ফিরে আসে। অবশ্যি আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[১১৯]

১১৫. অর্থাৎ তাবুক যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের যেসব ছোটখাটো ত্রুটি–বিচ্যুতি হয়েছিল তাদের উৎকৃষ্ট মানের কার্যকলাপের বদৌলতে আল্লাহ সেগুলো মাফ করে দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজে যে ত্রুটি হয়েছিল আগেই ৪৩ আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও পিছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিল তাদেরকে তিনি অনুমতি দিয়েছিলেন।

১১৬. অর্থাৎ কোন কোন আন্তরিকতা সম্পন্ন সাহাবাও এ কঠিন সময়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে কোন না কোন ভাবে ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাদের দিলে ঈমান ছিল এবং তারা আন্তরিকভাবে আল্লাহর সত্য দীনকে ভালবাসতেন তাই শেষ পর্যন্ত তারা নিজেদের দুর্বলতার ওপর বিজয়ী হতে পেরেছিলেন।

১১৭. অর্থাৎ তাদের মনে ভ্রান্ত নীতির প্রতি এ ঝোঁক কেন সৃষ্টি হয়েছিল সে জন্য আল্লাহ এখন আর তাদেরকে পাকড়াও করবেন না। কারণ মানুষ নিজেই যে দুর্বলতার সংশোধন করে নেয় আল্লাহ সে জন্য কোন কৈফিয়ত তলব করেন না।

১১৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবুক থেকে মদীনায় ফিরে এলেন তখন যারা পিছনে অর্থাৎ মদীনায় থেকে গিয়েছিল। তারা ওযর পেশ করার জন্য হাজির হলো। তাদের মধ্যে ৮০ জনেরও বেশী ছিল মুনাফিক। মুনাফিকরা মিথ্যা ওযর পেশ করছিল এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা মেনে নিচ্ছিলেন। তারপর এলো এ তিন জন মুমিনের পালা। তারা পরিষ্কারভাবে নিজেদের দোষ স্বীকার করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের তিনজনের ব্যাপারে ফায়সালা মুলতবী রাখলেন।

তিনি সাধারণ মুসলমানদের হুকুম দিলেন, আল্লাহর নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাদের সাথে কোন প্রকার সামাজিক সম্পর্ক রাখা যাবে না। এ বিষয়টির ফায়সালা করার জন্য এ আয়াত নাযিল হয়। (এখানে একথাটি অবশ্যি) সামনে রাখতে হবে যে, ৯৯ টীকায় যে সাতজন সাহাবীর আলোচনা এসেছে তাদের ব্যাপারটি কিন্তু এদের থেকে স্বতন্ত্র। তারা তো জবাবদিহির আগেই নিজেরাই নিজেদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন।)

১১৯. এ তিন জন সাহাবী ছিলেন কা'ব ইবনে মালেক, হিলাল ইবনে উমাইয়াহ এবং মুরারাহ ইবনে রুবাই। আগেই বলেছি, এরা তিনজন ছিলেন সাচ্চা মুমিন। এর আগে তারা বহবার নিজেদের আন্তরিকতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। শেষের দু'জন তো বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কাজেই তাঁদের ঈমানী সত্যতা সব রকমের সংশয়-সন্দেহের উর্ধে ছিল। আর প্রথম জন যদিও বদরী সাহাবী ছিলেন না কিন্তু বদর ছাড়া প্রতিটি যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের জন্য তাঁর এসব ত্যাগ, প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম-সাধনা সত্ত্বেও এমন এক নাজুক সময়ে যখন যুদ্ধ করার শক্তি ও সামর্থের অধিকারী প্রত্যেক মুমিনকে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে আসার হুকুম দেয়া হয়েছিল তখন তাঁরা যে অলসতা ও গাফলতির পরিচয় দিয়েছিলেন সে জন্য তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা হয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক থেকে ফিরে এসে মুসলমানদের প্রতি কড়া নির্দেশ জারি করেন—কেউ এদের সাথে সালাম কালাম করতে পারবে না। ৪০ দিন পরে তাদের স্ত্রীদেরকেও তাদের থেকে আলাদা বসবাস করার কঠোর আদেশ দেয়া হলো। আসলে এ আয়াতে তাদের অবস্থার যে ছবি আঁকা হয়েছে মদীনার জনবসতিতে তাদের অবস্থা ঠিক তা-ই হয়ে গিয়েছিল। শেষে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারটি যখন ৫০ দিনে এসে ঠেকলো তখন ক্ষমার এ ঘোষণা নাযিল হলো।

এ তিন জনের মধ্য থেকে হযরত কা'ব ইবনে মালেক অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনা বড়ই শিক্ষাপ্রদ। বৃদ্ধ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এ সময় তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ তাঁকে হাত ধরে নিয়ে চলাফেরা করতেন। আবদুল্লাহকে তিনি নিজেই এ ঘটনা এভাবে শুনান ঃ

"তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই মুসলমান-দেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার আবেদন জানাতেন তখনই আমি মনে মনে সংকল্প করে নিতাম যে, যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি নেবো। কিন্তু ফিরে এসে আমাকে অলসতায় পেয়ে বসতো এবং আমি বলতাম, এখনই এতো তাড়াহুড়া কিসের, রওয়ানা দেবার সময় যখন আসবে তখন তৈরী হতে কতটুকু সময়ই বা লাগবে। এভাবে আমার প্রস্তুতি পিছিয়ে যেতে থাকলো। তারপর একদিন সেনাবাহিনীর রওয়ানা দেবার সময় এসে গেল। অথচ তখনো আমি তৈরী ছিলাম না। আমি মনে মনে বললাম, সেনাবাহিনী চলে যাক, আমি এক-দু'দিন পরে পথে তাদের সাথে যোগ দেবো। কিন্তু তখনো একই অলসতা আমার পথের বাধা হয়ে দাঁড়ালো। এভাবে সময় পার হয়ে গেলো।

এ সময় যখন আমি মদীনায় থেকে গিয়েছিলাম আমার মন ক্রমেই বিষিয়ে উঠছিল। কারণ আমি দেখছিলাম যাদের সাথে এ শহরে আমি রয়েছি তারা হয় মুনাফিক, নয়তো দুর্বল, বৃদ্ধ ও অক্ষম লোক, যাদেরকে আল্লাহ অব্যাহতি দিয়েছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক থেকে ফিরে এসে যথারীতি মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নফল নামায পড়লেন। তারপর তিনি লোকদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য বসলেন। মুনাফিকরা এ মজলিসে এসে লম্বা লম্বা কসম খেয়ে তাদের ওযর পেশ করতে লাগলো। এদের সংখ্যা ছিল ৮০-এর চাইতেও বেশী। রসূলুল্লাহ (সা) তাদের প্রত্যেকের বানোয়াট ও সাজানো কথা শুনলেন। তাদের লোক দেখানো ওযর মেনে নিলেন এবং তাদের অন্তরের ব্যাপার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, আল্লাহ তোমাদের মাফ করুন। তারপর আমার পালা এলো। আমি সামনে গিয়ে সালাম দিলাম। তিনি আমার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন, আসুন! আপনাকে কিসে আটকে রেখেছিল? আমি বললাম, আল্লাহর কসম! যদি আমি কোন দুনিয়াদারের সামনে হাযির হতাম তাহলে অবশ্যি কোন না কোন কথা বানিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতাম। কথা বানিয়ে বলার কৌশল আমিও জানি। কিন্তু আপনার ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি এখন কোন মিথ্যা ওযর পেশ করে আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করেও নেই তাহলে আল্লাহ নিশ্চয়ই আপনাকে আমার প্রতি আবার নারাজ করে দেবেন। তবে যদি আমি সত্য বলি তাহলে আপনি নারাজ হয়ে গেলেও আমি আশা রাখি আল্লাহ আমার জন্য ক্ষমার কোন পথ তৈরী করে দেবেন। আসলে পেশ করার মতো কোন ওযরই আমার নেই। যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে আমি পুরোপুরি সক্ষম ছিলাম।" একথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "এ ব্যক্তি সত্য কথা বলেছে। ঠিক আছে, চলে যাও এবং আল্লাহ তোমার ব্যাপারে কোন ফায়সালা না দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকো।" আমি উঠে নিজের গোত্রের লোকদের মধ্যে গিয়ে বসলাম। এখানে সবাই আমার পিছনে লাগলো। তারা আমাকে এ বলে তিরস্কার করতে লাগলো যে, তুমিও কোন মিথ্যা ওযর পেশ করলে না কেন! এসব কথা শুনে আবার রসূলের কাছে গিয়ে কিছু বানোয়াট ওযর পেশ করার জন্য আমার মনে আগ্রহ সৃষ্টি হলো। কিন্তু যখন আমি শুনলাম আরো দু'জন সৎলোক (মুরারাহ ইবনে রুবাই ও হেলাল ইবনে উমাইয়াহ) আমার মতো একই সত্য কথা বলেছেন তখন আমি মানসিক প্রশান্তি অনুভব করলাম এবং আমার সত্য কথার ওপর অটল থাকলাম।

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণ হুকুম জারি করলেন, আমাদের তিন জনের সাথে কেউ কথা বলতে পারবে না। অন্য দু'জন তো ঘরের মধ্যে বসে রইলো কিন্তু আমি বাইরে বের হতাম, জামায়াতে নামায পড়তাম এবং বাজারে ঘোরাফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলতো না। মনে হতো, এ দেশটি একদম বদলে গেছে। আমি যেন এখানে একজন অপরিচিত, আগন্তুক। এ জনপদের কেউ আমাকে জানে না, চেনে না। মসজিদে নামায পড়তে গিয়ে যথারীতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম করতাম। আমার সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁট নড়ে উঠছে কিনা তা দেখার জন্য আমি অপেক্ষা করতাম। কিন্তু শুধু অপেক্ষা করাই সার হতো। তাঁর নজর আমার ওপর কিভাবে পড়ছে তা দেখার জন্য আমি আড়চোখে তাঁর প্রতি তাকাতাম। কিন্তু অবস্থা ছিল এই যে, যতক্ষণ আমি নামায পড়তাম ততক্ষণ তিনি আমাকে দেখতে থাকতেন এবং যেই আমি নামায শেষ করতাম অমনি আমার ওপর থেকে তিনি চোখ ফিরিয়ে নিতেন। একদিন ঘাবড়ে গিয়ে আমার চাচাত ভাই ও ছেলে বেলার বন্ধু আবু কাতাদার কাছে গেলাম। তার বাগানের পাঁচিলের ওপর উঠে তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু আল্লাহর সেই বান্দাটি আমার সালামের জবাবও দিলো না। আমি বললাম ঃ "হে আবু কাতাদাহ! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আমি কি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি না?" সে নীরব রইলো। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, সে নীরব রইলো। তৃতীয়বার যখন আমি কসম দিয়ে তাকে এ প্রশ্ন করলাম তখন সে শুধুমাত্র এতটুকু বললো ঃ "আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন।" একথায় আমার চোখে পানি এসে গেলো। আমি পাঁচিল থেকে নেমে এলাম। এ সময় আমি একদিন বাজার দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় সিরিয়ার নাবতী বংশীয় এক লোকের সাথে দেখা হলো। সে রেশমে মোড়া গাসসান রাজার একটি পত্র আমার হাতে দিল। আমি পত্রটা খুলে পড়লাম। তাতে লেখা ছিল, "আমরা শুনেছি, তোমার নেতা তোমার ওপর উৎপীড়ন করছে। তুমি কোন নগণ্য ব্যক্তি নও। তোমাকে ধ্বংস হতে দেয়া যায় না। আমাদের কাছে চলে এসো। আমরা তোমাকে মর্যাদা দান করবো।" আমি বললাম, এ দেখি, আর এক আপদ! তখনই চিঠিটাকে চুলোর আগুনে ফেলে দিলাম।

চল্লিশটা দিন এভাবে কেটে যাবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে তাঁর দূত এই হুকুম নিয়ে এলেন যে, নিজের স্ত্রী থেকেও আলাদা হয়ে যাও। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাকে কি তালাক দিয়ে দেবো? জবাব এলো, না, তালাক নয়, শুধু আলাদা থাকো। কাজেই আমি স্ত্রীকে বলে দিলাম, তুমি বাপের বাড়ি চলে যাও এবং আল্লাহ এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকো।

এভাবে উনপঞ্চাশ দিন পার হয়ে পঞ্চাশ দিন পড়লো। সেদিন সকালে নামাযের পরে আমি নিজের ঘরের ছাদের ওপর বসে ছিলাম। নিজের জীবনের প্রতি আমার ধিক্কার জাগছিল হঠাৎ এক ব্যক্তি চেঁচিয়ে বললো ঃ "কা'ব ইবনে মালিককে অভিনন্দন!" একথা শুনেই আমি সিজদায় নত হয়ে গেলাম। আমি নিশ্চিত হলাম যে, আমার ক্ষমার ঘোষণা জারি হয়েছে। এরপর লোকেরা দলে দলে ছুটে আসতে লাগলো। তারা প্রত্যেকে পাল্লা দিয়ে আমাকে মুবারকবাদ দিচ্ছিল। তারা বলছিল, তোমার তাওবা কবুল হয়েছে। আমি উঠে সোজা মসজিদে নববীর দিকে গেলাম। দেখলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমি সালাম দিলাম। তিনি বললেন, "তোমাকে মোবারকবাদ! আজকের দিনটি তোমার জীবনের সর্বোত্তম দিন।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ ক্ষমা কি আপনার পক্ষ থেকে, না আল্লাহর পক্ষ থেকে? বললেন, "আল্লাহর পক্ষ থেকে" এবং এ সংগে তিনি সংশ্লিষ্ট আয়াত শুনিয়ে দিলেন। আমি বললাম ঃ "হে আল্লাহর রসূল! আমার সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে সাদকা করে দিতে চাই। এটাও আমার তাওবার অংশ বিশেষ।" বললেন ঃ "কিছু রেখে দাও, এটাই তোমার জন্য ভাল।" এ বক্তব্য অনুযায়ী আমি নিজের খয়বরের সম্পত্তির অংশটুকু রেখে দিলাম। বাদবাকি সব সাদকা করে দিলাম। তারপর আল্লাহর কাছে অংগীকার করলাম, যে সত্যকথা বলার কারণে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিয়েছেন তার ওপর আমি সারা জীবন প্রতিষ্ঠিত থাকবো। কাজেই আজ পর্যন্ত আমি জেনে বুঝে যথার্থ সত্য ও প্রকৃত ঘটনা বিরোধী কোন কথা বলিনি এবং আশা করি আল্লাহ আগামীতেও তা থেকে আমাকে বাঁচাবেন।"

এ ঘটনার মধ্যে শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে। প্রত্যেক মুমিনের মনে তা বদ্ধমূল হয়ে যাওয়া উচিত।

এ থেকে প্রথম যে শিক্ষাটি পাওয়া যায়, তা হচ্ছে কুফর ও ইসলামের সংঘাতের ব্যাপারটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক। এ সংঘাতে কুফরের সাথে সহযোগিতা করা তো দূরের কথা, যে ব্যক্তি ইসলামের সাথে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে অসৎ উদ্দেশ্যে নয়, সৎ উদ্দেশ্যে এবং সারা জীবনও নয় বরং কোন এক সময় ভুল করে বসে, তারও সারা জীবনের ইবাদাত-বন্দেগী ও দীনদারী ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। এমন কি এমন উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন লোকও পাকড়াও হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে না যে বদর, ওহোদ, আহযাব ও হুনায়েনের ভয়াবহ যুদ্ধ ক্ষেত্রে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লড়াই করেছিল এবং যার ঈমান ও আন্তরিকতার মধ্যে বিন্দুমাত্র খাদ ছিলো না।

দ্বিতীয় শিক্ষাটিও এর চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেটি হচ্ছে, দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে গড়িমসি করা কোন মামুলি ব্যাপার নয়। বরং অনেক সময় শুধুমাত্র গড়িমসি করতে করতে মানুষ এমন কোন ভুল করে বসে যা বড় বড় গোনাহের অন্তরভুক্ত। তখন একথা বলে সে নিষ্কৃতি পেতে পারে না যে, সে অসৎ উদ্দেশ্যে এ কাজটি করেনি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে যে সমাজ গড়ে উঠেছিল। এ ঘটনা খুবই চমৎকারভাবে তার প্রাণসত্তা উন্মোচন করে দেয়। একদিকে রয়েছে মুনাফিকের দল। তাদের বিশ্বাসঘাতকতা সবার কাছে সুস্পষ্ট ছিল। এরপরও তাদের বাহ্যিক ওযরসমূহ শোনা হয় এবং সেগুলোর সত্যাসত্য এড়িয়ে যাওয়া হয়। কারণ তাদের কাছ থেকে তো আন্তরিকতার আশাই করা হয়নি কোন দিন। কাজেই এখন আন্তরিকতার অভাব নিয়ে অভিযোগ তোলার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অন্যদিকে রয়েছেন একজন পরীক্ষিত মুমিন। তার উৎসর্গীত প্রাণ কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে কারো মনে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশই নেই। তিনি মিথ্যাও বলেন না। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিজের ভুল স্বীকার করে নেন। কিন্তু তার ওপর ক্রোধ বর্ষিত হয়। এ ক্রোধের কারণ এ নয় যে, তার মুমিন হবার ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিয়েছে বরং এর কারণ হচ্ছে, মুমিন হওয়া সত্ত্বেও সে মুনাফিক সুলভ কাজ করলো কেন? আসলে এভাবে তাকে একথাই বলা হচ্ছে যে, তোমরাই পৃথিবীর সারবস্তু। তোমাদের থেকে যদি মৃত্তিকা উর্বরতা লাভ করতে না পারে তাহলে উর্বরতা কোথা থেকে

আসবে? তারপর মজার ব্যাপার হচ্ছে, এ পুরো ঘটনায় নেতা যেভাবে শাস্তি দিচ্ছেন এবং ভক্ত যেভাবে তা মাথা পেতে নিচ্ছেন আর এ সাথে সমগ্র দলটি যেভাবে এ শাস্তি কার্যকর করছে তার প্রত্যেকটি দিকই তুলনা বিহীন। এ ক্ষেত্রে কে বেশী প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য তা স্থির করাই কঠিন। নেতা অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দিচ্ছেন। কিন্তু সেখানে ক্রোধ বা ঘৃণার লেশমাত্র নেই। বরং গভীর স্নেহ ও প্রীতি সহকারে তিনি শাস্তি দিচ্ছেন। ক্রুদ্ধ পিতার ন্যায় তার দৃষ্টি একদিকে অনল বর্ষণ করে চলেছে ঠিকই কিন্তু অন্য দিকে আবার তাকে প্রতি মুহূর্তে একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, তোমার সাথে কোন শত্রুতা নেই বরং তোমার ভুলের কারণে আমার অন্তরটা ব্যথায় টনটন করছে। তুমি নিজের ভুল শুধরে নিলে তোমাকে এ বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য আমি ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করছি। ভক্ত শাস্তির তীব্রতায় অস্থির হয়ে পড়ছে। কিন্তু তার পদযুগল আনুগত্যের রাজপথ থেকে এক চুল পরিমাণও টলছে না। সে আত্মম্ভরিতা ও জাহেলী দাম্ভিকতারও শিকার হচ্ছে না এবং প্রকাশ্যে অহংকার করে বেড়ানো তো দূরের কথা, এমনকি নিজের প্রিয় নেতার বিরুদ্ধে মনের গভীরে সামান্যতম অভিযোগও সৃষ্টি হতে দিচ্ছে না। বরং নেতার প্রতি ভালবাসায় তার মন আরো ভরে উঠেছে। শাস্তির পুরো পঞ্চাশ দিন তার দৃষ্টি সবচেয়ে বেশী অধীর হয়ে যে জিনিসটি খুঁজে বেড়িয়েছে, সেটি হচ্ছে, নেতার চোখে তার প্রতি আগের সেই মমত্বপূর্ণ দৃষ্টি বহাল আছে কিনা, যা তার সমস্ত আশা-আকাংখার শেষ আশ্রয় স্থল। সে যেন একজন দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষক। আকাশের এক কিনারে যে ছোট্ট এক টুকরো মেঘ দেখা যাচ্ছে সেটিই তার সমস্ত আশার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু। তারপর দলের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, তার অভূতপূর্ব শৃংখলা ও নৈতিক প্রাণ স্পন্দন মানুষকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করে দেয়। সেখানে এমন অটুট শৃংখলা বিরাজিত যে, নেতার মুখ থেকে বয়কটের নির্দেশ উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই অপরাধীর ওপর থেকে দলের সমস্ত লোক দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে। প্রকাশ্যে তো দূরের কথা গোপনেও কোন নিকটতম আত্মীয় এবং সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুও তার সাথে কথা বলছে না। স্ত্রীও তার থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর দোহাই দিয়ে সে জিজ্ঞেস করছে, আমার আন্তরিকতায় কি তোমাদের কোন সন্দেহ জেগেছে? কিন্তু যারা দীর্ঘকাল তাকে আন্তরিক দেখে আসছিল তারা পরিষ্কার বলে দিচ্ছে ঃ "আমাদের কাছ থেকে নয়, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছ থেকে নিজের আন্তরিকতার সনদ নাও।" অন্যদিকে দলের নৈতিক প্রাণসত্তা এত বেশী উন্নত ও পবিত্র যে, এক ব্যক্তির উঁচু মাথা নীচু হবার সাথে সাথেই নিন্দুকদের কোন দল তার নিন্দায় সোচ্চার হয়ে ওঠে না। বরং শাস্তির এ পুরো সময়টায় দলের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের এ সাজাপ্রাপ্ত ভাইয়ের বিপদে মর্মবেদনা অনুভব করে এবং পুনরায় তাকে উঠিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য ব্যাকুল থাকে। ক্ষমার কথা ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথেই লোকেরা অতি দ্রুত তার কাছে পৌঁছে তার সাথে সাক্ষাত করার ও তাকে সুসংবাদ দেবার জন্য দৌড়াতে থাকে। কুরআন যে ধরনের সত্যনিষ্ঠ দল দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এটি হচ্ছে তারই দৃষ্টান্ত।

এ প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত আয়াত বিশ্লেষণ করলে আমাদের কাছে একথাটি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ সাহাবীগণ আল্লাহর দরবার থেকে যে ক্ষমা লাভ করেছিলেন এবং সেই ক্ষমার কথা বর্ণনা করার ভাষার মধ্যে যে স্নেহ ও করুণা ধারা প্রবাহিত হচ্ছে তার মূলে রয়েছে তাদের আন্তরিকতা। পঞ্চাশ দিনের কঠোর শাস্তি ভোগকালে তারা এ আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। ভুল করার পর যদি তারা অহংকার করতেন, নিজেদের নেতার অসন্তোষের

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾ مَا كَانَ
لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ
رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ
ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَئُوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ
الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১৫ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সহযোগী হও। মদীনাবাসী ও তাদের আশপাশের বেদুইনদের জন্য আল্লাহর রসূলকে ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকা এবং তার ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে নিজেদের জীবনের চিন্তায় মশগুল হয়ে যাওয়া কোনক্রমেই সমীচীন ছিল না। কারণ আল্লাহর পথে তারা যখনই ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও শারীরিক কষ্ট ভোগ করবে, যখনই এমন পথ অবলম্বন করবে যা সত্য অমান্যকারীদের কাছে অসহনীয় এবং যখনই কোন দুশমনের ওপর (সত্যের প্রতি দুশমনির) প্রতিশোধ নেবে তৎক্ষণাৎ তার বদলে তাদের জন্য একটি সৎকাজ লেখা হবেই। এর ব্যতিক্রম কখনো হবে না। অবশ্যি আল্লাহর দরবারে সৎ কর্মশীলদের পরিশ্রম বিফল যায় না।

জবাবে ক্রোধ ও ক্ষোভের প্রকাশ ঘটাতেন, শাস্তিলাভের ফলে এমনই বিক্ষুব্ধ হতেন যেমন স্বার্থবাদী লোকদের আত্মাভিমানে আঘাত লাগলে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, সামাজিক বয়কটকালে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে রাজি। কিন্তু নিজের আত্মাভিমানকে আহত করতে রাজি নই—এ নীতি অবলম্বন করতেন এবং যদি এ সমগ্র শাস্তিকালে দলের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে বেড়াতেন এবং অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ লোকদের খুঁজে বের করে এক সাথে মিলিয়ে জোটবদ্ধ করতেন, তাহলে তাদের ক্ষমা করা তো দূরের কথা বরং নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, দল থেকে তাদেরকে আলাদা করে দেয়া হতো এবং এ শাস্তির মেয়াদ শেষ হবার পর তাদের যোগ্য শাস্তিই তাদেরকে দেয়া হতো। তাদেরকে বলা হতো, যাও তোমরা নিজেদের অহম পূজায় লিপ্ত থাকো। সত্যের কালেমা বুলন্দ করার সংগ্রামে অংশ নেবার সৌভাগ্য তোমাদের আর কখনো হবে না।

وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَّلَا كَبِيرَةً وَّلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ
لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ
لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

অনুরূপভাবে তারা যখনই (আল্লাহর পথে) কম বা বেশী কিছু সম্পদ ব্যয় করবে এবং (সংগ্রাম সাধনায়) যখনই কোন উপত্যকা অতিক্রম করবে, অমনি তা তাদের নামে লেখা হয়ে যাবে, যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের এ ভাল কাজের পুরস্কার দান করেন।

আর মুমিনদের সবার এক সাথে বের হয়ে পড়ার কোন দরকার ছিল না। কিন্তু তাদের জনবসতির প্রত্যেক অংশের কিছু লোক বেরিয়ে এলে ভাল হতো। তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতো এবং ফিরে গিয়ে নিজের এলাকার লোকদেরকে সতর্ক করতো, যাতে তারা (অমুসলমানী আচরণ থেকে) বিরত থাকতো, এমনটি হলো না কেন?[১২০]

কিন্তু এ কঠিন পরীক্ষায় ঐ তিনজন সাহাবী এ পথ অবলম্বন করেননি, যদিও এ পথটি তাদের জন্য খোলা ছিল। তারা বরঞ্চ আমাদের আলোচিত পূর্বোক্ত পথ অবলম্বন করেছিলেন। এ পথ অবলম্বন করে তারা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহর আনুগত্যের নীতি তাদের হৃদয় থেকে পূজা ও বন্দনা করার মতো সকল মূর্তি অপসারিত করেছে। নিজেদের সমগ্র ব্যক্তি সত্তাকে তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম সাধনা করার জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছে। নিজেদের ফিরে যাবার নৌকাগুলোকে এমনভাবে জ্বালিয়ে দিয়ে ইসলামী জামায়াতে প্রবেশ করেছিলেন যে, পেছনে ফিরে যেতে চাইলেও আর ফেরার কোন জায়গা ছিল না। এখানেই মার খাবেন এবং এখানেই মরবেন। অন্য কোথাও কোন বৃহত্তম সম্মান ও মর্যাদা লাভের নিশ্চয়তা পেলেও এখানকার লাঞ্ছনা ত্যাগ করে তা গ্রহণ করতে এগিয়ে যাবেন না। এরপর তাদেরকে উঠিয়ে বুকে জড়িয়ে না ধরে আর কী করা যেতো? এ কারণেই আল্লাহ তাদের ক্ষমার কথা বলেছেন অত্যন্ত স্নেহমাখা ভাষায়। তিনি বলেছেন : "আমি তাদের দিকে ফিরলাম যাতে তারা আমার দিকে ফিরে আসে।" এ কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে এমন একটি অবস্থার ছবি আঁকা হয়েছে যা থেকে বুঝা যায় যে, প্রভু আগে ঐ বান্দাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিলেন কিন্তু যখন তারা পালিয়ে না গিয়ে ভগ্ন হৃদয়ে তাঁরই দোরগোড়ায় বসে পড়লো তখন তাদের বিশস্ততার চিত্র দেখে প্রভু নিজে আর স্থির থাকতে পারলেন না। প্রেমের আবেগে অধীর হয়ে তাকে দরজা থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তিনি নিজেই বের হয়ে এলেন।

১২০. এ আয়াতের অর্থ অনুধাবন করার জন্য এ সূরার ৯৭ আয়াতটি সামনে রাখতে হবে। তাতে বলা হয়েছে ঃ

"মরুচারী আরবরা কুফরী ও মুনাফিকীতে অপেক্ষাকৃত শক্ত এবং আল্লাহ তাঁর রসূলের প্রতি যে দীন নাযিল করেছেন তার সীমারেখা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞ হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশী।"

সেখানে শুধু এতটুকু বলেই শেষ করা হয়েছিল যে, দারুল ইসলামের গ্রামীণ এলাকার বেশীরভাগ জনবসতি মুনাফিকী রোগে আক্রান্ত। কারণ এসব লোক অজ্ঞতার মধ্যে ডুবে আছে। জ্ঞানের কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ না থাকা এবং জ্ঞানবানদের সাহচর্য না পাওয়ার ফলে এরা আল্লাহর দীনের সীমারেখা জানে না। আর এখানে বলা হচ্ছে, গ্রামীন জনবসতিকে এ অবস্থায় থাকতে দেয়া যাবে না। বরং তাদের অজ্ঞতা দূর এবং তাদের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি করার জন্য এখন যথাযথ ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এ জন্য গ্রামীণ এলাকার সমস্ত আরব অধিবাসীদের নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে মদীনায় জমায়েত হবার এবং এখানে বসে জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজন নেই। বরং এ জন্য প্রয়োজন হচ্ছে, প্রত্যেক গ্রাম, পল্লী ও গোত্র থেকে কয়েকজন করে লোক বের হবে। তারা জ্ঞানের কেন্দ্রগুলো যেমন মদীনা ও মক্কা এবং এ ধরনের অন্যান্য জায়গায় আসবে। এখানে এসে তারা দীনের জ্ঞান আহরণ করবে। এখান থেকে তারা নিজেদের জনবসতিতে ফিরে যাবে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে দীনী চেতনা ও জাগরণ সৃষ্টিতে তৎপর হবে।

এটি ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। ইসলামী আন্দোলনকে শক্তিশালী ও মজবুত করার জন্য সঠিক সময়ে এ নির্দেশটি দেয়া হয়েছিল। শুরুতে ইসলাম যখন আরবে ছিল একেবারেই নতুন এবং একটি চরম প্রতিকূল পরিবেশে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল তখন এ ধরনের নির্দেশের প্রয়োজন ছিল না। কারণ তখন যে ব্যক্তি ইসলামকে পুরোপুরি বুঝে নিতো এবং সব দিক দিয়ে তাকে যাচাই করে নিশ্চিন্ত হতে পারতো একমাত্র সে–ই ইসলাম গ্রহণ করতো। কিন্তু যখন এ আন্দোলন সাফল্যের পর্যায়ে প্রবেশ করলো এবং পৃথিবীতে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো তখন দলে দলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো এবং এলাকার পর এলাকা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকলো। এ সময় খুব কম লোকই ইসলামের যাবতীয় চাহিদা ও দাবী অনুধাবন করে ভালভাবে জেনে বুঝে ইসলাম গ্রহণ করতো। বেশীর ভাগ লোকই নিছক অচেতনভাবে সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলে আসছিল। নতুন মুসলিম জনবসতির এ দ্রুত বিস্তার বাহ্যত ইসলামের শক্তিমত্তার কারণ ছিল। কেননা, ইসলামের অনুসারীদের সংখ্যা বেড়ে চলছিল। কিন্তু বাস্তবে এ ধরনের জনবসতি ইসলামী ব্যবস্থার কোন কাজে লাগছিল না বরং তার জন্য ক্ষতিকর ছিল। কারণ তাদের ইসলামী চেতনা ছিল না এবং এ ব্যবস্থার নৈতিক দাবী পূরণ করতেও তারা প্রস্তুত ছিল না। বস্তুত তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় এ ক্ষতি সুস্পষ্ট আকারে সামনে এসে গিয়েছিল। তাই সঠিক সময়ে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, ইসলামী আন্দোলনের বিস্তৃতির কাজ যে গতিতে চলছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাকে শক্তিশালী ও মজবুত করার ব্যবস্থা করতে হবে। আর সে ব্যবস্থাটি হচ্ছে, প্রত্যেক এলাকার লোকদের মধ্য থেকে কিছু লোককে নিয়ে শিক্ষা ও অনুশীলন দান করতে হবে, তারপর তারা প্রত্যেকে নিজেদের এলাকায় ফিরে গিয়ে সাধারণ মানুষের শিক্ষা ও

অনুশীলনের দায়িত্ব পালন করবে। এভাবে সমগ্র মুসলিম জনবসতিতে ইসলামের চেতনা ও আল্লাহর বিধানের সীমারেখা সম্পর্কিত জ্ঞান ছড়িয়ে পড়বে।

এ প্রসংগে এতটুকু কথা অবশ্যি অনুধাবন করতে হবে যে, এ আয়াতে যে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করার হুকুম দেয়া হয়েছে তার আসল উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে নিছক সাক্ষরতা সম্পন্ন করা এবং তাদের মধ্যে বইপত্র পড়ার মতো যোগ্যতা সৃষ্টি করা ছিল না। বরং লোকদের মধ্যে দীনের বোধ ও জ্ঞান সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে অমুসলিম সুলভ জীবনধারা থেকে রক্ষা করা, সতর্ক ও সজ্ঞান করে তোলা এর আসল উদ্দেশ্য হিসেবে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছিল। এটিই মুসলমানদের শিক্ষার উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ নিজেই চিরকালের জন্য এ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। প্রত্যেকটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করতে হবে। দেখতে হবে এ উদ্দেশ্য সে কতটুকু পূরণ করতে সক্ষম। এর অর্থ এ নয় যে, ইসলাম লোকদেরকে লেখা–পড়া শেখাতে, বই পড়তে সক্ষম করে তুলতে ও পার্থিব জ্ঞান দান করতে চায় না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, ইসলাম লোকদের মধ্যে এমন শিক্ষা বিস্তার করতে চায় যা ওপরে বর্ণিত শিক্ষালাভের জন্য সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত আসল উদ্দেশ্যের দিকে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নয়তো প্রত্যেক ব্যক্তি যদি তার যুগের আইনষ্টাইন ও ফ্রয়েড হয়ে যায় কিন্তু দীনের জ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা শূন্যের কোঠায় অবস্থান করে এবং অমুসলিম সুলভ জীবনধারায় বিভ্রান্ত হতে থাকে তাহলে ইসলাম এ ধরনের শিক্ষার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে।

এ আয়াতে উল্লেখিত لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّيْنِ বাক্যাংশটির ফলে পরবর্তীকালে লোকদের মধ্যে আশ্চর্য ধরনের ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়ে গেছে। মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা বরং তাদের ধর্মীয় জীবনধারার ওপরও এর বিষময় প্রভাব দীর্ঘকাল থেকে মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ "তাফাক্কুহ্ ফিদ্ দীন" কে শিক্ষার উদ্দেশ্যে পরিণত করেছিলেন। এর অর্থ হচ্ছে ঃ দীন অনুধাবন করা বা বুঝা, দীনের ব্যবস্থা সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা, তার প্রকৃতি ও প্রাণশক্তির সাথে পরিচিত হওয়া এবং এমন যোগ্যতার অধিকারী হওয়া যার ফলে চিন্তা ও কর্মের সকল দিক ও জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগে কোন্ চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি ইসলামের প্রাণশক্তির অনুসারী তা মানুষ জানতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে যে আইন সম্পর্কিত জ্ঞান পারিভাষিক অর্থে ফিক্হ নামে পরিচিত হয় এবং যা ধীরে ধীরে ইসলামী জীবনের নিছক বাহ্যিক কাঠামোর (প্রাণশক্তির মোকাবিলায়) বিস্তারিত জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, লোকেরা শাব্দিক অভিন্নতার কারণে তাকেই আল্লাহর নির্দেশ-অনুযায়ী শিক্ষার চরম ও পরম লক্ষ মনে করে বসেছে। অথচ সেটিই সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ নয়। বরং তা ছিল উদ্দেশ্য ও লক্ষের একটি অংশ মাত্র। এ বিরাট ভুল ধারণার ফলে দীন ও তার অনুসারীদের যে ক্ষতি হয়েছে তা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করতে হলে একটি বিরাট গ্রন্থের প্রয়োজন। কিন্তু এখানে আমরা এ সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার জন্য সংক্ষেপে শুধুমাত্র এতটুকু ইংগিত করছি যে, মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষাকে যে জিনিসটি দীনী প্রাণশক্তি বিহীন করে নিছক দীনী কাঠামো ও দীনী আকৃতির ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে এবং অবশেষে যার বদৌলতে মুসলমানদের জীবনে একটি নিছক প্রাণহীন বাহ্যিকতা দীনদারীর শেষ মনযিলে পরিণত হয়েছে তা বহুলাংশে এ ভুল ধারণারই ফল।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ
فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ
سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾

১৬ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! সত্য অস্বীকারকারীদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ করো।[১২১] তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়।[১২২] জেনে রাখো আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।[১২৩] যখন কোন নতুন সূরা নাযিল হয় তখন তাদের কেউ কেউ (ঠাট্টা করে মুসলমানদের) জিজ্ঞেস করে, "বলো, এর ফলে তোমাদের কার ঈমান বেড়ে গেছে?" (এর জবাব হচ্ছে) যারা ঈমান এনেছে (প্রত্যেকটি অবতীর্ণ সূরা) যথার্থই তাদের ঈমান বাড়িয়েই দিয়েছে এবং তারা এর ফলে আনন্দিত।

১২১. মূল আয়াতে যে শব্দ সংযোজিত হয়েছে তার বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে, দারুল ইসলামের যে অংশ ইসলামের শত্রুদের এলাকার যে অংশের সাথে মিশে আছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রাথমিক দায়িত্ব ঐ অংশের মুসলমানদের ওপর আরোপিত। কিন্তু পরে যা বলা হয়েছে তার সাথে—এ আয়াতটিকে মিলিয়ে পড়লে জানা যাবে, এখানে কাফের বলতে এমন সব মুনাফিককে বুঝানো হয়েছে যাদের সত্য অস্বীকার করার বিষয়টি পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে সামনে এসে গিয়েছিল এবং যাদের ইসলামী সমাজের মধ্যে মিশে একাকার হয়ে থাকার কারণে মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছিল। ১০ রুকূর শুরুতেও এ ভাষণটি আরম্ভ করার সময় প্রথম কথার সূচনা এভাবেই করা হয়েছিল ঃ এবার এ ঘরের শত্রুদের প্রতিহত করার জন্য যথারীতি জিহাদ শুরু করে দিতে হবে। এখানে ভাষণ শেষ করার সময় তাকীদ সহকারে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এভাবে মুসলমানরা এর গুরুত্ব অনুধাবন করবে। যে আত্মীয়তা এবং বংশগত ও সামাজিক সম্পর্কের কারণে তারা মুনাফিকদের সাথে সম্পর্ক জুড়ে ছিল এরপর আর তারা তাদের সাথে ঐ সম্পর্কের পরোয়া করবে না। সেখানে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার হুকুম দেয়া হয়েছিল। আর এখানে তার চেয়ে কড়া "কিতাল" শব্দ (সশস্ত্র যুদ্ধ করে হত্যা করা) ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, তাদেরকে পুরোপুরি উৎখাত করে দাও, তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে যেন কোন প্রকার ত্রুটি না থাকে। সেখানে "কাফের" ও "মুনাফিক" দু'টো আলাদা শব্দ বলা হয়েছিল। আর এখানে শুধুমাত্র "কাফের" শব্দের ওপরই নির্ভর করা হয়েছে। কারণ তাদের সত্য অস্বীকৃতি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছিল।

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا
وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٢٥﴾ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ
ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ
إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾

তবে যাদের অন্তরে (মুনাফিকী) রোগ বাসা বেঁধেছিল তাদের পূর্ব কলুষতার ওপর (প্রত্যেকটি নতুন সূরা) আরো একটি কলুষতা বাড়িয়ে দিয়েছে[১২৪] এবং তারা মৃত্যু পর্যন্ত কুফরীতে লিপ্ত রয়েছে। এরা কি দেখে না, প্রতি বছর এদেরকে দু'একটি পরীক্ষার মুখোমুখি করা হয়?[১২৫] কিন্তু এরপরও এরা তাওবাও করে না কোন শিক্ষাও গ্রহণ করে না। যখন কোন সূরা নাযিল হয়, এরা চোখের ইশারায় একে অন্যকে জিজ্ঞেস করে, "তোমাদের কেউ দেখতে পায়নি তো?" তারপর চুপেচুপে সরে পড়ে।[১২৬] আল্লাহ তাদের মন বিমুখ করে দিয়েছেন কারণ তারা এমন একদল লোক যাদের বোধশক্তি নেই।[১২৭]

কাজেই ঈমানের বাহ্যিক স্বীকৃতির অন্তরালে আত্মগোপন করে তা যে কোন প্রকার সুবিধা আদায় করতে না পারে একথাটি ব্যক্ত করাই এর উদ্দেশ্য।

১২২. অর্থাৎ এ পর্যন্ত তাদের সাথে যে নরম ব্যবহার করা হয়েছে তার এখন পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত। দশ রুকূ'র শুরুতে একথাটিই বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে واغلظ عليهم তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করো।

১২৩. এ সতর্ক বাণীর দু'টি অর্থ হয়। দু'টো অর্থই এখানে সমানভাবে প্রযোজ্য। এক, এ সত্য অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে যদি তোমরা নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরোয়া করো তাহলে এটা হবে তাকওয়া বিরোধী। কারণ মুত্তাকী হওয়া এবং আল্লাহর দুশমনদের সাথে মানসিক সম্পর্ক রাখা—এ দু'টো বিষয় পরস্পর বিরোধী। কাজেই আল্লাহর সাহায্য পেতে হলে এ ধরনের সম্পর্ক থেকে দূরে থাকতে হবে। দুই, এ কঠোরতা ও যুদ্ধ করার যে হুকুম দেয়া হচ্ছে এর অর্থ এ নয় যে, তাদের প্রতি কঠোর হবার ব্যাপারে নৈতিকতা ও মানবিকতার সমস্ত সীমারেখা ভেংগে ফেলতে হবে। সমস্ত কাজে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা অটুট রাখার দায়িত্ব অবশ্যি মানুষের ওপর বর্তায়। মানুষ যদি তা পরিত্যাগ করে তাহলে তার অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহও তাকে পরিত্যাগ করবে।

১২৪. ঈমান, কুফরী ও মুনাফিকীর মধ্যে কম-বেশী হওয়ার অর্থ কি? এর আলোচনা দেখুন সূরা আনফালের ২ টীকায়।

১২৫. অর্থাৎ এমন কোন বছর অতিবাহিত হয় না যখন তাদের ঈমানের দাবী এক-দু'বার পরীক্ষার সম্মুখীন হয় না এবং এভাবে তার অন্তসারশূণ্যতা প্রকাশ হয়ে যায় না। কখনো কুরআনে এমন কোন হুকুম আসে যার মাধ্যমে তাদের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির আশা-আকাংখার ওপর কোন নতুন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। কখনো দীনের এমন কোন দাবী সামনে এসে যায় যার ফলে তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। কখনো এমন কোন আভ্যন্তরীণ সংকট সৃষ্টি হয় যার মাধ্যমে তারা নিজেদের পার্থিব সম্পর্ক এবং নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও গোত্রীয় স্বার্থের মোকাবিলায় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দীনকে কি পরিমাণ ভালবাসে তার পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য হয়। কখনো এমন কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় যার মাধ্যমে তারা যে দীনের ওপর ঈমান আনার দাবী করছে তার জন্য ধন, প্রাণ, সময় ও শ্রম ব্যয় করতে তারা কতটুকু আগ্রহী তার পরীক্ষা হয়ে যায়। এ ধরনের সকল অবস্থায় কেবল তাদের মিথ্যা অংগীকারের মধ্যে যে মুনাফিকীর আবর্জনা চাপা পড়ে আছে তা শুধু উন্মুক্ত হয়ে সামনে চলে আসে না বরং যখন তারা ঈমানের দাবী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পালাতে থাকে তখন তাদের ভেতরের ময়লা আবর্জনা আগের চাইতে আরো বেশী বেড়ে যায়।

১২৬. নিয়ম ছিল, কোন সূরা নাযিল হওয়ার সাথে সাথেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের সম্মেলন আহবান করতেন তারপর সাধারণ সভায় ভাষণের আকারে সূরাটি পড়ে শুনাতেন। এ ধরনের মাহফিলে ঈমানদাররা পূর্ণ মনোযোগ সহকারে ভাষণ শুনতেন এবং তার মধ্যে ডুবে যেতেন। কিন্তু মুনাফিকদের ওপর এর ভিন্নতর প্রভাব পড়তো। হাযির হওয়ার হুকুম ছিল বলে তারা হাযির হয়ে যেতো। তাছাড়া মাহফিলে শরীক না হলে তাদের মুনাফিকী প্রকাশ হয়ে যাবে, একথা মনে করেও তারা সম্মেলনে হাযির হতো। কিন্তু এ ভাষণের ব্যাপারে তাদের মনে কোন আগ্রহ জাগতো না। অত্যন্ত অনীহা ও বিরক্তি সহকারে তারা সেখানে বসে থাকতো। নিজেদের উপস্থিতি গণ্য করাবার পর তাদের চিন্তা হতো, কিভাবে দ্রুত এখান থেকে পালাবে। তাদের এ অবস্থার চিত্র এখানে আঁকা হয়েছে।

১২৭. অর্থাৎ এ নির্বোধরা নিজেরাই নিজেদের স্বার্থ বুঝে না। নিজেদের কল্যাণের ব্যাপারে তারা গাফেল এবং নিজেদের ভালর কথা চিন্তা করে না। তারা যে এ কুরআন ও এ পয়গম্বরের মাধ্যমে কত বড় নিয়ামত লাভ করেছে তার কোন অনুভূতিই তাদের নেই। নিজেদের সংকীর্ণ জগত এবং এর নিতান্ত নিম্ন পর্যায়ের কার্যকলাপের মধ্যে তা'রা কুয়ার ব্যাঙের মতো ডুবে আছে। যার ফলে যে মহা জ্ঞান ও অতি উন্নত পর্যায়ের পথনির্দেশনার বদৌলতে তারা আরবের এ মরু প্রান্তরের সংকীর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্ত থেকে বের হয়ে সমগ্র বিশ্ব মানবতার নেতা ও সর্বাধিনায়কে পরিণত হতে পারে এবং শুধুমাত্র এ নশ্বর দুনিয়াতেই নয় বরং পরবর্তী অনন্তকালীণ অবিনশ্বর জীবনেও চিরন্তন সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হয়, সেই জ্ঞান ও শিক্ষার মূল্য ও মর্যাদা তারা বুঝতে পারে না। এ অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে আল্লাহ লাভবান হবার সুযোগ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করেছেন। যখন কল্যাণ ও সাফল্য এবং শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বের এ সম্পদ বিনামূল্যে বিতরণ করা

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ
إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

দেখো, তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল। তোমাদের ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া তার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকামী। মুমিনদের প্রতি সে স্নেহশীল ও করুণাসিক্ত।—এখন যদি তারা তোমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, "আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। আমি তাঁর ওপরই ভরসা করেছি এবং তিনি মহা–আরশের অধিপতি।"

হয়ে থাকে এবং সৌভাগ্যবানরা দু'হাতে তা লুটতে থাকে তখন এ দুর্ভাগাদের মন অন্য কোন দিকে বাঁধা পড়ে এবং এ অবসরে কত বড় মহামূল্যবান সম্পদ থেকে যে তারা বঞ্চিত হয়ে গেছে তা তারা ঘুর্ণাক্ষরেও জানতে পারে না।

ইউনুস

১০

নামকরণ

যথারীতি ৯৮ আয়াত থেকে নিছক আলামত হিসেবে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এ আয়াতে প্রসংগক্রমে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের কথা এসেছে কিন্তু মূলত এ সূরার আলোচ্য বিষয় হযরত ইউনুসের কাহিনী নয়।

নাযিল হওয়ার স্থান

এ গোটা সূরাটি মক্কা মুয়াযযামায় নাযিল হয়। হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত। সূরার বিষয়বস্তুও এ বক্তব্য সমর্থন করে। কেউ কেউ মনে করেন এর কিছু আয়াত মাদানী যুগে নাযিল হয়। কিন্তু এটা শুধুমাত্র একটা হাওয়াই অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। বক্তব্যের ধারাবাহিক উপস্থাপনা গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার অনুভূত হয়, এগুলো একাধিক ভাষণ বা বিভিন্ন সময় নাযিলকৃত বিভিন্ন আয়াতের সমষ্টি নয়। বরং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটা একটা সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ ভাষণ। এটা সম্ভবত এক সাথে নাযিল হয়ে থাকবে এবং এর বক্তব্য বিষয় একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এটা মক্কী যুগের সূরা।

নাযিল হওয়ার সময়কাল

এ সূরাটি কখন নাযিল হয়, এ সম্পর্কিত কোন হাদীস আমরা পাইনি। কিন্তু এর বক্তব্য বিষয় থেকে বুঝা যায়, এ সূরাটি রাসূলুল্লাহর (সা) মক্কায় অবস্থানের শেষের দিকে নাযিল হয়ে থাকবে। কারণ, এর বক্তব্য বিষয় থেকে সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয় যে, এ সময় ইসলামী দাওয়াতের বিরোধীদের পক্ষ থেকে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কাজ প্রচণ্ডভাবে শুরু হয়ে গিয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যে নবী ও তাঁর অনুসারীদেরকে আর বরদাশত করতে রাযী নয়। উপদেশ-অনুরোধের মাধ্যমে তারা সঠিক পথে চলবে, এমন আশা করা যায় না। নবীকে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করার ফলে তাদের যে অনিবার্য পরিণতির সম্মুখীন হওয়ার কথা। এখন তা থেকে তাদের সতর্ক করে দেয়ার সময় এসে গেছে। কোন্ ধরনের সূরা মক্কার শেষ যুগের সাথে সম্পর্ক রাখে বক্তব্য বিষয়ের এ বৈশিষ্টই তা আমাদের জানিয়ে দেয়। কিন্তু এ সূরায় হিজরতের প্রতি কোন ইংগিত পাওয়া যায় না। তাই যেসব সূরা থেকে আমরা হিজরতের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোন না কোন ইংগিত পাই এ সূরাটির যুগ সেগুলো থেকে আগের মনে করতে হবে। এ সময়-কাল চিহ্নিত করার পর ঐতিহাসিক

পটভূমি বর্ণনা করার প্রয়োজন থাকে না। কারণ, সূরা আনআম ও সূরা আরাফের ভূমিকায় এ যুগের ঐতিহাসিক পটভূমি বর্ণনা করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু

এ ভাষণের বিষয়বস্তু হচ্ছে, দাওয়াত দেয়া, বুঝানো ও সতর্ক করা। ভাষণের শুরু হয়েছে এভাবে ঃ

একজন মানুষ নবুওয়াতের বাণী প্রচার করছে। তা দেখে লোকেরা অবাক হচ্ছে। তারা অযথা তার বিরুদ্ধে যাদুকরিতার অভিযোগ আনছে। অথচ যেসব কথা সে পেশ করছে তার মধ্যে আজব কিছুই নেই এবং যাদু ও জ্যোতির্বিদ্যার সাথে সম্পর্ক রাখে এমন কোন বিষয়ও তাতে নেই। সে তো দু'টো গুরুত্বপূর্ণ সত্য তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছে। এক, যে আল্লাহ এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা এবং যিনি কার্যত এর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছেন একমাত্র তিনিই তোমাদের মালিক ও প্রভু এবং একমাত্র তিনিই তোমাদের বন্দেগী ও আনুগত্য লাভের অধিকার রাখেন। দুই, বর্তমান পার্থিব জীবনের পরে আর একটি জীবন আসবে। সেখানে তোমাদের পুনর্বার সৃষ্টি করা হবে। সেখানে তোমরা নিজেদের বর্তমান জীবনের যাবতীয় কাজের হিসেব দেবে। একটি মৌলিক প্রশ্নের ভিত্তিতে তোমরা শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করবে। সে প্রশ্নটি হচ্ছে, তোমরা আল্লাহকে নিজেদের প্রভু মেনে নিয়ে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সৎকাজ করেছো, না তার বিপরীত কাজ করেছ? তিনি তোমাদের সামনে এই যে সত্য দু'টি পেশ করছেন এ দু'টি যথার্থ ও অকাট্য বাস্তব সত্য। তোমাদের মানা নামানায় এর কিছু আসে যায় না। এ সত্য তোমাদেরকে আহবান জানাচ্ছে যে, একে মেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী তোমরা নিজেদের জীবন গড়ে তোল। তার এ আহবানে সাড়া দিলে তোমাদের পরিণাম ভাল হবে। অন্যথায় দেখবে নিজেদের অশুভ পরিণতি।

আলোচনার বিষয়াদি

এ প্রাথমিক আলোচনার পর নিম্নোক্ত বিষয়গুলো একটি বিশেষ ধারাবাহিকতা সহকারে সামনে আসে ঃ

এক ঃ যারা অন্ধ বিদ্বেষ ও গোঁড়ামীতে লিপ্ত হয় না এবং আলোচনায় হারজিতের পরিবর্তে নিজেরা ভুল দেখা ও ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বাঁচার চিন্তা করে তাদের বুদ্ধি-বিবেককে আল্লাহর একত্ব ও পরকালীন জীবন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করার মতো যুক্তি প্রমাণাদি।

দুই ঃ লোকদের তাওহীদ ও রিসালাতের আকীদা স্বীকার করে নেয়ার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে যেসব বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল সেগুলো দূর করা এবং যেসব গাফলতি সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া।

তিন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত এবং তিনি যে বাণী এনেছিলেন সেসব সম্পর্কে যে সন্দেহ ও আপত্তি পেশ করা হতো, তার যথাযথ জবাব দান।

চার ঃ পরবর্তী জীবনে যা কিছু ঘটবে সেগুলো আগেভাগেই জানিয়ে দেয়া, যাতে মানুষ সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে নিজের কার্যকলাপ সংশোধন করে নেয় এবং পরে আর তাকে সে জন্য আফসোস করতে না হয়।

পাঁচ ঃ এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া যে, এ দুনিয়ার বর্তমান জীবন আসলে একটি পরীক্ষার জীবন। এ পরীক্ষার জন্য তোমাদের যে অবকাশ দেয়া হয়েছে তা শুধুমাত্র ততটুকুই যতটুকু সময় তোমরা এ দুনিয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছ। এ সময়টুকু যদি তোমরা নষ্ট করে দাও এবং নবীর হেদায়াত গ্রহণ করে পরীক্ষায় সাফল্য লাভের ব্যবস্থা না করো, তাহলে তোমরা আর দ্বিতীয় কোন সুযোগ পাবে না। এ নবীর আগমন এবং এ কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে সত্য জ্ঞান পৌঁছে যাওয়া তোমাদের পাওয়া একমাত্র ও সর্বোত্তম সুযোগ। একে কাজে লাগাতে না পারলে পরবর্তী জীবনে তোমাদের চিরকাল পস্তাতে হবে।

ছয় ঃ এমন সব সুস্পষ্ট অজ্ঞতা, মূর্খতা ও বিভ্রান্তি চিহ্নিত করা, যা শুধুমাত্র আল্লাহর হেদায়াত ছাড়া জীবন যাপন করার কারণেই লোকদের জীবনে সৃষ্টি হচ্ছিল।

এ প্রসঙ্গে নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা সংক্ষেপে এবং মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। চারটি কথা অনুধাবন করানোই এ ইতিহাস বর্ণনার উদ্দেশ্য।

প্রথমত, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তোমরা যে ব্যবহার করছো তা নূহ (আ) ও মূসার (আ) সাথে তোমাদের পূর্ববর্তীরা যে ব্যবহার করেছে অবিকল তার মতই। আর নিশ্চিত থাকো যে, এ ধরনের কার্যকলাপের যে পরিণতি তারা ভোগ করেছে তোমরাও সেই একই পরিণতির সম্মুখীন হবে। দ্বিতীয়ত, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীদেরকে আজ তোমরা যে অসহায়ত্ব ও দুর্বল অবস্থার মধ্যে দেখছো তা থেকে একথা মনে করে নিয়ো না যে, অবস্থা চিরকাল এ রকমই থাকবে। তোমরা জানো না, যে আল্লাহ মূসা ও হারুণের পেছনে ছিলেন এদের পেছনেও তিনিই আছেন। আর তিনি এমনভাবে গোটা পরিস্থিতি পাল্টে দেন যা কেউ চিন্তাও করতে পারে না। তৃতীয়ত, নিজেদের শুধরে নেয়ার জন্য আল্লাহ তোমাদের যে অবকাশ দিচ্ছেন তা যদি তোমরা নষ্ট করে দাও এবং তারপর ফেরাউনের মতো আল্লাহর হাতে পাকড়াও হবার পর একেবারে শেষ মুহূর্তে তাওবা করো, তাহলে তোমাদের মাফ করা হবে না। চতুর্থত, যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান এনেছিল তারা যেন প্রতিকূল পরিবেশের চরম কঠোরতা ও তার মোকাবিলায় নিজেদের অসহায়ত্ব দেখে হতাশ হয়ে না পড়ে। তাদের জানা উচিত, এ অবস্থায় তাদের কিভাবে কাজ করতে হবে। তাদের এ ব্যাপারেও সতর্ক হতে হবে যে, আল্লাহ যখন নিজের মেহেরবানীতে তাদেরকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করবেন তখন যেন তারা বনী ইসরাঈল মিসর থেকে মুক্তি পাওয়ার পর যে আচরণ করেছিল তেমন আচরণ না করে।

সবশেষে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ এ আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী এবং এ পথ ও নীতির ভিত্তিতে এগিয়ে চলার জন্য আল্লাহ তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে সামান্যতমও কাটছাঁট করা যেতে পারে না। যে ব্যক্তি এটা গ্রহণ করবে সে নিজের ভাল করবে এবং যে একে বর্জন করে ভুল পথে পা বাড়াবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে।

আয়াত ১০৯ | সূরা ইউনুস – মক্কী | রুকূ' ১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও মেহেরবান আল্লাহর নামে

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۝١ اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا
اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذٰى لَسٰحِرٌ
مُّبِيْنٌ ۝٢ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ
سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ۭ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ
بَعْدِ اِذْنِهٖ ۭ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۭ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝٣

আলিফ-লাম-রা। এগুলো এমন একটি কিতাবের আয়াত যা হিকমত ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ।[১]

মানুষের জন্য এটা কি একটা আশ্চর্যের ব্যাপার হয়ে গেছে যে, আমি তাদেরই মধ্য থেকে একজনকে নির্দেশ দিয়েছি, (গাফিলতিতে ডুবে থাকা) লোকদেরকে সজাগ করে দাও এবং যারা মেনে নেবে তাদেরকে এ মর্মে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে যথার্থ সম্মান ও মর্যাদা?[২] (একথার ভিত্তিতেই কি) অস্বীকারকারীরা বলেছে, এ ব্যক্তি তো একজন সুস্পষ্ট যাদুকর?[৩]

আসলে তোমাদের রব সেই আল্লাহই, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছ'দিনে, তারপর শাসন কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং বিশ্ব-জগতের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছেন।[৪] কোন শাফায়াতকারী (সুপারিশকারী) এমন নেই, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া শাফায়াত করতে পারে।[৫] এ আল্লাহই হচ্ছেন তোমাদের রব। কাজেই তোমরা তাঁরই ইবাদাত করো।[৬] এরপরও কি তোমাদের চৈতন্য হবে না?[৭]

১. এ প্রারম্ভিক বাক্যে একটি সূক্ষ্ম সতর্কবাণী রয়েছে। অজ্ঞ লোকেরা মনে করছিল, নবী কুরআনের নামে যে বাণী শুনাচ্ছেন তা নিছক ভাষার তেলেসমাতী, কবিসুলভ অবাস্তব কল্পনা এবং গণক ও জ্যোতিষীদের মতো উর্ধজগৎ সম্পর্কিত কিছু আলোচনার সমষ্টি মাত্র। তাদেরকে এ মর্মে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তোমাদের ধারণা ঠিক নয়। এগুলো তো জ্ঞানময় কিতাবের আয়াত। এর প্রতি মনোযোগী না হলে তোমরা জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে।

২. অর্থাৎ এতে অবাক হবার কি আছে? মানুষকে সতর্ক করার জন্য মানুষ নিযুক্ত না করে কি জিন, ফেরেশতা বা পশু নিযুক্ত করা হবে? আর মানুষ যদি সত্য থেকে গাফেল হয়ে ভুল পথে জীবন যাপন করে তাহলে তাদের স্রষ্টা ও প্রভু তাদেরকে নিজেদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবেন অথবা তিনি তাদের হেদায়াত ও পথ দেখাবার কোন ব্যবস্থা করবেন, এর মধ্যে কোন্‌টা বিস্ময়কর? আর যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন হেদায়াত আসে তাহলে যারা তা মেনে নেবে তাদের মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী হওয়া উচিত, না যারা তা প্রত্যাখ্যান করবে তাদের? কাজেই যারা অবাক হচ্ছে তাদের চিন্তা করা উচিত, কি জন্য তারা অবাক হচ্ছে।

৩. অর্থাৎ তারা তাঁকে যাদুকর বলে দোষারোপ করলো কিন্তু এ দোষ তাঁর ওপর আরোপিত হয় কিনা একথা চিন্তা করলো না। কোন ব্যক্তি উন্নত মানের বক্তৃতা ও ভাষণ দানের মাধ্যমে মানুষের মন-মস্তিষ্ক জয় করে ফেললেই সে যাদুকরের কাজ করছে এ কথা বলা চলে না। দেখতে হবে এ বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে সে কি বলছে? কি উদ্দেশ্যে তার বাগ্মীতার শক্তি ব্যবহার করছে? এ বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে ঈমানদারদের জীবনে কোন্ ধরনের প্রভাব পড়ছে? যে বক্তা কোন অবৈধ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তার বাগ্মীতার অসাধারণ শক্তি ব্যবহার করে সে তো একজন নির্লজ্জ, নিয়ন্ত্রণহীন ও দায়িত্বহীন বক্তা। সত্য, ইনসাফ ও ন্যায়নীতিমুক্ত হয়ে সে এমন সব কথা বলে দেয়, যার প্রত্যেকটি কথা শ্রোতাদের প্রভাবিত করে, তা যতই মিথ্যা অতিরঞ্জিত ও অন্যায় হোক না কেন। তার কথায় বিজ্ঞতার পরিবর্তে থাকে জনতাকে প্রতারণা করার ফন্দী। কোন সুশৃংখল ও সমন্বিত চিন্তাধারার পরিবর্তে সেখানে থাকে স্ববিরোধিতা ও অসামঞ্জস্য। ভারসাম্যের পরিবর্তে থাকে অসমতা। সে নিছক নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বড় বড় বুলি আওড়ায় অথবা বাগ্মীতার মদে মত্ত করে পরস্পরকে লড়াবার এবং এক দলকে অন্য দলের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার জন্য উস্কানি দেয়। লোকদের ওপর এর যে প্রভাব পড়ে তার ফলে তাদের কোন নৈতিক উন্নতি সাধিত হয় না এবং তাদের জীবনে কোন শুভ পরিবর্তনও দেখা দেয় না। অথবা কোন সৎচিন্তা কিংবা সৎকর্মময় পরিবেশ জন্ম লাভ করে না। বরং লোকেরা আগের চাইতেও খারাপ চরিত্রের প্রদর্শনী করতে থাকে। অথচ এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছো, নবী যে কালাম পেশ করছেন তার মধ্যে রয়েছে সুগভীর তত্ত্বজ্ঞান, একটি উপযোগী ও সমন্বিত চিন্তা ব্যবস্থা, সর্বোচ্চ পর্যায়ের সমতা ও ভারসাম্য, সত্য ও ন্যায়নীতির কঠোর ব্যবস্থাপনা। প্রতিটি শব্দ মাপাজোকা এবং প্রতিটি বাক্য পাল্লায় ওজন করা। তাঁর বক্তৃতায় মানুষের সংশোধন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা যেতে পারে না। তিনি যা কিছু বলে থাকেন তার মধ্যে তাঁর নিজের, পরিবারের, জাতির বা কোন প্রকার দুনিয়াবী স্বার্থের কোন গন্ধই পাওয়া যায় না। লোকেরা যে গাফলতির মধ্যে ডুবে আছে তিনি শুধু তাদেরকে তার খারাপ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেন এবং যে পথে

তাদের নিজেদের কল্যাণ সে দিকে তাদেরকে আহবান জানান। তারপর তার বক্তৃতার যে প্রভাব পড়ে তাও যাদুকরদের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। এখানে যে ব্যক্তিই তার প্রভাব গ্রহণ করেছে তার জীবনই সুন্দর ও সুসজ্জিত হয়ে উঠেছে। সে আগের তুলনায় উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হয়েছে। তার সকল কাজে কল্যাণ ও সৎবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠেছে। এখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা করো, সত্যিই কি যাদুকর এমন কথা বলে এবং তার যাদুর ফলাফল কি এমনটিই হয়?

৪. অর্থাৎ সৃষ্টি করার পরে তিনি নিষ্ক্রীয় হয়ে যাননি। বরং নিজের সৃষ্ট বিশ্ব-জাহানের শাসন কর্তৃত্বের আসনে নিজেই সমাসীন হয়েছেন এবং এখন সমগ্র জগতের ব্যবস্থাপনা কার্যত তিনিই পরিচালনা করছেন। অবুঝ লোকেরা মনে করে, আল্লাহ বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করে তারপর একে এমনিই ছেড়ে দিয়েছেন। যে যেভাবে চায় চলতে পারে। অথবা একে অন্যদের হাওয়ালা করে দিয়েছেন। তারা যেভাবে চায় একে চালাতে ও ব্যবহার করতে পারে। এ ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত কুরআন যে সত্য পেশ করে তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাঁর এ সৃষ্টিজগতের সমগ্র এলাকায় নিজেই শাসন কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। এখানকার সমগ্র ক্ষমতার তিনিই একচ্ছত্র মালিক। সমগ্র কর্তৃত্ব তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। বিশ্ব-জাহানের বিভিন্ন স্থানে প্রতি মুহূর্তে যা কিছু হচ্ছে তা সরাসরি তাঁর হুকুম বা অনুমতিক্রমে হচ্ছে। এ সৃষ্টি জগতের সাথে তাঁর সম্পর্ক শুধু এতটুকুই নয় যে, তিনি এক সময় একে সৃজন করেছিলেন বরং তিনিই সর্বক্ষণ এর পরিচালক ও ব্যবস্থাপক, একে তিনিই প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন বলেই প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তিনি চালাচ্ছেন বলেই চলছে। (দেখুন সূরা আ'রাফ, ৪০ ও ৪১ টীকা)।

৫. অর্থাৎ দুনিয়ার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অন্য কারোর হস্তক্ষেপ করা তো দূরের কথা, কারোর আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে তাঁর কোন ফায়সালা পরিবর্তন করার অথবা কারোর ভাগ্য ভাঙা গড়ার ইখতিয়ারও নেই। বড়জোর সে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারে। কিন্তু তার দোয়া কবুল হওয়া না হওয়া পুরাপুরি আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহর এ একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার রাজ্যে নিজের কথা নিশ্চিতভাবে কার্যকর করিয়ে নেবার মতো শক্তিধর কেউ নেই। এমন শক্তি কারোর নেই যে, তার সুপারিশকে প্রত্যাখ্যাত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে এবং আল্লাহর আরশের পা জড়িয়ে ধরে বসে থেকে নিজের দাবী আদায় করে নিতে পারে।

৬. ওপরের তিনটি বাক্যে প্রকৃত সত্য বর্ণনা করা হয়েছিল, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তোমাদের রব। এখন বলা হচ্ছে, এ প্রকৃত সত্যের উপস্থিতিতে তোমাদের কোন্ ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। মূলত রবুবীয়াত তথা বিশ্ব-জাহানের সার্বভৌম ক্ষমতা, নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব যখন পুরাপুরি আল্লাহর আয়ত্বাধীন তখন এর অনিবার্য দাবী স্বরূপ মানুষকে তাঁরই বন্দেগী করতে হবে। তারপর রবুবীয়াত শব্দটির যেমন তিনটি অর্থ হয় অর্থাৎ প্রতিপালন ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও শাসন ক্ষমতা ঠিক তেমনি-এর পাশাপাশি ইবাদাত শব্দেরও তিনটি অর্থ হয় অর্থাৎ পূজা, দাসত্ব ও আনুগত্য।

আল্লাহর একমাত্র রব হওয়ার অনিবার্য ফল হচ্ছে এই যে, মানুষ তাঁরই প্রতি কৃতজ্ঞ হবে, তাঁরই কাছে প্রার্থনা করবে এবং তাঁরই সামনে ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালবাসায় মাথা নোয়াবে। এটি হচ্ছে ইবাদাতের প্রাথমিক অর্থ।

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤﴾ هُوَ الَّذِي
جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾

তাঁরই দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।[৮] এটা আল্লাহর পাকাপোক্ত ওয়াদা। নিসন্দেহে সৃষ্টির সূচনা তিনিই করেন তারপর তিনিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন,[৯] যাতে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদেরকে পূর্ণ ইনসাফ সহকারে প্রতিদান দেয়া যায় এবং যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করে তারা পান করে ফুটন্ত পানি এবং ভোগ করে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নিজেদের সত্য অস্বীকৃতির প্রতিফল হিসেবে।[১০]

তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিশালী ও চন্দ্রকে আলোকময়, এবং তার মনযিলও ঠিকমত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা তার সাহায্যে বছর গণনা ও তারিখ হিসেব করতে পারো। আল্লাহ এসব কিছু (খেলাচ্ছলে নয় বরং) উদ্দেশ্যমূলকভাবেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজের নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে পেশ করছেন যারা জ্ঞানবান তাদের জন্য। অবশ্য দিন ও রাতের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা (ভুল দেখা ও ভুল আচরণ করা থেকে) আত্মরক্ষা করতে চায়।[১১]

আল্লাহর একমাত্র মালিক ও প্রভু হওয়ার অনিবার্য ফল হচ্ছে এই যে, মানুষ তাঁর বান্দা ও দাস হয়ে থাকবে, তাঁর মোকাবিলায় স্বেচ্ছাচারী নীতি অবলম্বন করবে না এবং তাঁর ছাড়া আর কারোর মানসিক বা কর্মগত দাসত্ব করবে না। এটি ইবাদাতের দ্বিতীয় অর্থ।

আল্লাহকে একমাত্র শাসনকর্তা বলে মেনে নেবার অনিবার্য ফল হচ্ছে এই যে, মানুষ তাঁর হুকুমের আনুগত্য করবে ও তাঁর আইন মেনে চলবে। মানুষ নিজেই নিজের শাসক

হবে না এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারোর শাসন কর্তৃত্ব স্বীকার করবে না। এটি ইবাদাতের তৃতীয় অর্থ।

৭. অর্থাৎ যখন এ সত্য তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে এবং তোমাদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ সত্যের উপস্থিতিতে তোমাদের কি কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে তখন এরপরও কি তোমাদের চোখ খুলবে না এবং তোমরা এমন বিভ্রান্তির মধ্যে ডুবে থাকবে যার ফলে তোমাদের জীবনের সমগ্র দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি সত্যবিরোধী পথে পরিচালিত হয়েছে?

৮. এটি নবীর শিক্ষার দ্বিতীয় মূলনীতি। প্রথম মূলনীতি হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহই তোমাদের রব কাজেই তাঁরই ইবাদাত করো। আর দ্বিতীয় মূলনীতি হচ্ছে, তোমাদের এ দুনিয়া থেকে ফিরে গিয়ে নিজেদের রবের কাছে হিসেব দিতে হবে।

৯. এ বাক্যটির মধ্যে দাবী ও প্রমাণ উভয়েরই সমাবেশ ঘটেছে। দাবী হচ্ছে, আল্লাহ পুনর্বার মানুষকে সৃষ্টি করবেন। এর প্রমাণ হিসেবে বলা হয়েছে, তিনিই প্রথমবার মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আর যে ব্যক্তি একথা স্বীকার করে যে, আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অবশ্যি শুধুমাত্র পাদরীদের প্রচারিত ধর্ম থেকে দূরে অবস্থান করার লক্ষে স্রষ্টাবিহীন সৃষ্টির মতে নির্বোধ জনোচিত মতবাদ পোষণ করতে উদ্যোগী কিছু নাস্তিক ছাড়া আর কে এটা অস্বীকার করতে পারে। সে কখনো আল্লাহর পক্ষে এ সৃষ্টির পুনরাবৃত্তিকে অসম্ভব বা দুর্বোধ্য মনে করতে পারে না।

১০. এ প্রয়োজনটির ভিত্তিতেই আল্লাহ মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। একই জিনিসের পুনঃসৃজন সম্ভব এবং তাকে দুরধিগম্য মনে করার কোন কারণ নেই, একথা প্রমাণ করার জন্য ওপরে বর্ণিত যুক্তি যথেষ্ট ছিল।

এখন এখানে বলা হচ্ছে, সৃষ্টির এ পুনরাবর্তন বুদ্ধি ও ন্যায়নীতির দৃষ্টিতে অপরিহার্য। আর এ অপরিহার্য প্রয়োজন দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোন পথেই পূর্ণ হতে পারে না। আল্লাহকে নিজের একমাত্র রব হিসেবে মেনে নিয়ে যারা সঠিক বন্দেগীর নীতি অবলম্বন করবে তারা নিজেদের এ যথার্থ কার্যধারার পূর্ণ প্রতিদান লাভ করার অধিকার রাখে। অন্যদিকে যারা সত্য অস্বীকার করে তার বিরোধী অবস্থানে জীবন যাপন করবে তারাও নিজেদের এ ভ্রান্ত কার্যধারার কুফল প্রত্যক্ষ করবে। এ প্রয়োজন যদি বর্তমান পার্থিব জীবনে পূর্ণ না হয় (এবং যারা হঠকারী নন তারা প্রত্যেকেই জানেন, এ প্রয়োজন পূর্ণ হচ্ছে না) তাহলে অবশ্যি এটা পূর্ণ করার জন্য পুনরুজ্জীবন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। (আরো বেশী জানার জন্য সূরা আ'রাফ ৩০ টীকা ও সূরা হুদ ১০৫ টীকা দেখুন)।

১১. এটি আখেরাত বিশ্বাসের পক্ষে তৃতীয় যুক্তি। এ বিশ্ব-জাহানের চারদিকে মহান আল্লাহর যেসব কীর্তি দেখা যাচ্ছে, যার বড় বড় নিদর্শন সূর্য, চন্দ্র, দিন ও রাত্রির আবর্তনের আকারে মানুষের সামনে রয়েছে, এগুলো থেকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, কোন একটা ছোট্ট শিশু এ সৃষ্টি জগতের বিশাল কারখানার স্রষ্টা নয়। সে কোন শিশুর মত নিছক খেলা করার জন্য এসব কিছু তৈরী করেনি আবার খেলা করে মন ভরে যাওয়ার পর এসব কিছু ভেঙে চুরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে না। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তাঁর সব কাজে রয়েছে শৃঙ্খলা, বিচক্ষণতা, নৈপুণ্য ও কলা কৌশল। প্রতিটি অণুপরমাণু সৃষ্টির

পেছনে পাওয়া যায় একটি লক্ষ্যাভিসারী উদ্যোগ। কাজেই তিনি যখন মহাজ্ঞানী এবং তাঁর জ্ঞানের লক্ষণ ও আলামতগুলো তোমাদের সামনে প্রকাশ্যে মওজুদ রয়েছে, তখন তোমরা তাঁর থেকে কেমন করে আশা করতে পারো যে, তিনি মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তি, নৈতিক অনুভূতি এবং স্বাধীন দায়িত্ব ও এসব কিছু ব্যবহারের ক্ষমতা দান করার পর তার জীবনের কার্যক্রম হিসেব কখনো নেবেন না এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক দায়িত্বের কারণে পুরস্কার ও শাস্তি লাভের যে যোগ্যতা অনিবার্যভাবে সৃষ্টি হয়ে যায় তাকে অনর্থক এমনিই ছেড়ে দেবেন?

অনুরূপভাবে এ আয়াতগুলোতে আখেরাত বিশ্বাস পেশ করার সাথে সাথে তার স্বপক্ষে যৌক্তিক ধারাবাহিকতা সহকারে তিনটি যুক্তি পেশ করা হয়েছে ঃ

এক ঃ দ্বিতীয় জীবন অর্থাৎ পরকালীন জীবন সম্ভব। কারণ, প্রথম অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনের সম্ভাবনা জাজ্বল্যমান ঘটনার আকারে বিরাজমান।

দুই ঃ পরকালীন জীবনের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, বর্তমান জীবনে মানুষ নিজের নৈতিক দায়িত্ব সঠিক বা বেঠিক যেভাবে পালন করে এবং তা থেকে পুরস্কার ও শাস্তিলাভের যে অবশ্যম্ভাবী যোগ্যতা সৃষ্টি হয় তার ভিত্তিতে বুদ্ধি ও ইনসাফ আর একটি জীবনের দাবী করে। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নৈতিক কার্যক্রমের উপযুক্ত ফল প্রত্যক্ষ করবে।

তিন ঃ বুদ্ধি ও ইনসাফের দৃষ্টিতে যখন পরকালীন জীবনের প্রয়োজন তখন এ প্রয়োজন অবশ্যি পূর্ণ করা হবে। কারণ, মানুষ ও বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা হচ্ছেন মহাজ্ঞানী। আর মহাজ্ঞানীর কাছে আশা করা যেতে পারে না যে, জ্ঞান ও ইনসাফ যা দাবী করে তিনি তা কার্যকর করবেন না।

গভীরভাবে চিন্তা করলে জানা যাবে, মৃত্যুর পরের জীবনকে যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করতে হলে, এ তিনটি যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনই সম্ভব এবং এ ক্ষেত্রে এগুলো যথেষ্টও। এ যুক্তি-প্রমাণগুলোর পরে যদি আর কিছু অপূর্ণতা থেকে যায় তাহলে তা হচ্ছে মানুষকে চর্ম চোখে দেখিয়ে দেয়া যে, যে জিনিসটি সম্ভব, যার অস্তিত্বশীল হওয়ার প্রয়োজনও আছে এবং যাকে অস্তিত্বশীল করা আল্লাহর জ্ঞানের দাবীও, তাকে মানুষের চোখের সামনে হাযির করে দিতে হবে। কিন্তু বর্তমান দুনিয়াবী জীবনে এ শূন্যতা পূর্ণ করা হবে না। কারণ, চোখে দেখে ঈমান আনার কোন অর্থই হয় না। মহান আল্লাহ মানুষের পরীক্ষা নিতে চান। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের উর্ধে উঠে নিছক চিন্তা-ভাবনা ও সঠিক যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহকে মেনে নেয় কিনা, এটাই এ পরীক্ষা।

এ প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও বর্ণনা করা হয়েছে। সেটি গভীর মনোযোগের দাবী রাখে। বলা হয়েছে, "আল্লাহ তাঁর নিশানীগুলোকে উন্মুক্ত করে পেশ করছেন তাদের জন্য, যারা জ্ঞানের অধিকারী।" আর "আল্লাহর সৃষ্ট প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে নিশানী রয়েছে তাদের জন্য যারা ভুল দেখা ও ভুল পথে চলা থেকে বাঁচতে চায়।" এর মানে হচ্ছে, আল্লাহ অত্যন্ত বিজ্ঞ জনোচিত পদ্ধতিতে জীবনের নিদর্শনাবলীর মধ্যে চতুরদিকে এমন সব চিহ্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন যা ঐ নিদর্শনগুলোর পেছনে আত্মগোপন করে থাকা সত্যগুলোকে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করছে। কিন্তু এ নিদর্শনগুলোর সাহায্যে নিগূঢ় সত্যে একমাত্র তারাই উপনীত হতে পারে যাদের মধ্যে নিম্নোক্ত গুণ দু'টি আছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ۝٧ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝٨ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ۖ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝٩ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝١٠

এ কথা সত্য, যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবনেই পরিতৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত থাকে আর যারা আমার নিদর্শনসমূহ থেকে গাফেল, তাদের শেষ আবাস হবে জাহান্নাম এমন সব অসৎকাজের কর্মফল হিসেবে যেগুলো তারা (নিজেদের ভুল আকীদা ও ভুল কার্যধারার কারণে) ক্রমাগতভাবে আহরণ করতো।[১২]

আবার একথাও সত্য, যারা ঈমান আনে (অর্থাৎ যারা এ কিতাবে পেশকৃত সত্যগুলো গ্রহণ করে) এবং সৎকাজ করতে থাকে, তাদেরকে তাদের রব তাদের ঈমানের কারণে সোজা পথে চালাবেন। নিয়ামত ভরা জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে।[১৩] *সেখানে তাদের ধ্বনি হবে "পবিত্র তুমি যে আল্লাহ!" তাদের দোয়া হবে, "শান্তি ও নিরাপত্তা হোক!" এবং তাদের সবকথার শেষ হবে এভাবে, "সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব-জাহানের রব আল্লাহর জন্য।"*[১৪]

এক ঃ তারা মূর্খতা ও অজ্ঞতাপ্রসূত একগুয়েমী বিদ্বেষ ও স্বার্থ প্রীতি থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞান অর্জন করার এমন সব মাধ্যম ব্যবহার করে যেগুলো আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন।

দুই ঃ তারা ভুল থেকে আত্মরক্ষা ও সঠিক পথ অবলম্বন করার ইচ্ছা নিজেদের অন্তরে পোষণ করে।

১২. এখানে আবার দাবীর সাথে সাথে ইশারা-ইংগিতে তার যুক্তিও বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। দাবী হচ্ছে, পরকালীন জীবনের ধারণা অস্বীকার করার অনিবার্য ও নিশ্চিত ফল জাহান্নাম। এর প্রমাণ হচ্ছে, এ ধারণা অস্বীকার করে অথবা এ ধরনের কোন প্রকার ধারণার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে মানুষ এমন সব অসৎকাজ করে যেগুলোর শাস্তি জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এটি একটি জাজ্বল্যমান সত্য। মানুষ হাজার

হাজার বছর থেকে যে দৃষ্টিভংগি পোষণ এবং যে কর্মনীতি অবলম্বন করে আসছে তার অভিজ্ঞতাই এর সাক্ষ বহন করছে। যারা আল্লাহর সামনে নিজেদেরকে দায়িত্বশীল এবং জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করে না, যারা কখনো নিজেদের সারা জীবনের সমস্ত কাজের শেষে একদিন আল্লাহর কাছে তার হিসেব পেশ করার ভয় করে না, যারা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করে যায় যে, দুনিয়ার সমস্ত কাজ কারবার ও তার হিসাব নিকাশ এ দুনিয়ার জীবনেই শেষ, যাদের দৃষ্টিতে দুনিয়ায় মানুষ যে পরিমাণ সমৃদ্ধি, সুখৈশ্বর্য, খ্যাতি ও শক্তিমত্তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে শুধুমাত্র তারই ভিত্তিতে তার সাফল্য ও ব্যর্থতা বিচার্য এবং যারা নিজেদের বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার কারণে আল্লাহর আয়াতের প্রতি দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন বোধ করে না, তাদের সারা জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তারা দুনিয়ায় বাস করে লাগামহীন উটের মত। তারা অত্যন্ত নিকৃষ্ট পর্যায়ের চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী হয়। পৃথিবীকে জুলুম, নির্যাতন, বিপর্যয়, বিশৃংখলা, ফাসেকী ও অশ্লীল জীবন চর্চায় ভরে দেয়। ফলে জাহান্নামের আযাব ভোগের যোগ্যতা অর্জন করে।

এটি আখেরাত বিশ্বাসের পক্ষে আর এক ধরনের যুক্তি। প্রথম তিনটি যুক্তি ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক। আর এটি হচ্ছে অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভিত্তিক। এখানে এটিকে শুধুমাত্র ইশারা ইংগিতে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু কুরআনের অন্যান্য জায়গায় আমরা একে বিস্তারিত আকারে দেখতে পাই। এ যুক্তিটির সারমর্ম হচ্ছে ঃ মানুষের ব্যক্তিগত মনোভাব ও দৃষ্টিভংগী এবং মানবিক সমাজ ও গোষ্ঠীগুলোর সামষ্টিক মনোভাব ও দৃষ্টিভংগী ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক হয় না যতক্ষণ না 'আমাকে আল্লাহর সামনে নিজের কাজের জবাব দিতে হবে' এ চেতনা ও বিশ্বাস মানুষের নৈতিক চরিত্রের ভিত্তিমূলে গভীরভাবে শিকড় গেঁড়ে বসে। এখন চিন্তার বিষয়, এমনটি কেন? কি কারণে এ চেতনা ও বিশ্বাস বিনষ্ট হওয়া বা দুর্বল হওয়ার সাথে সাথেই মানুষের নৈতিক বৃত্তি ও কর্মকাণ্ড অসৎ ও অন্যায়ের পথে ধাবিত হয়? যদি আখেরাত বিশ্বাস বাস্তব ও প্রকৃত সত্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল না হতো এবং তার অস্বীকৃতি প্রকৃত সত্যের বিরোধী না হতো, তাহলে তার স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির এ পরিণাম ফল একটি অনিবার্য বাধ্যবাধকতা সহকারে অনবরত আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়তো না। একই জিনিস বিদ্ধমান থাকলে সবসময় সঠিক ফলাফল বের হয়ে আসা এবং তার অবর্তমানে হামেশা ভুল ফলাফল দেখা দেয়া চূড়ান্তভাবে একথাই প্রমাণ করে যে, ঐ জিনিসটি আসলে সঠিক।

এর জবাবে অনেক সময় যুক্তি পেশ করে বলা হয় যে, যারা পরকাল মানে না এবং যাদের নৈতিক দর্শন ও কর্মনীতি একেবারেই নাস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদের ভিত্তিতে তৈরী তাদের মধ্যে অনেকে এমনও আছেন যারা যথেষ্ট পাক পরিচ্ছন্ন চরিত্রের অধিকারী এবং তারা জুলুম, বিপর্যয়, ফাসেকী ও অশ্লীলতার প্রকাশ ঘটান না। বরং নিজেদের লেনদেন ও আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারা সৎ এবং মানুষ ও সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত থাকেন। কিন্তু এ যুক্তির দুর্বলতা অতি সহজেই স্পষ্ট হয়ে যায়। সমস্ত বস্তুবাদী ধর্মহীন দর্শন ও চিন্তা ব্যবস্থা যাচাই পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, উল্লেখিত 'সৎকর্মকারী' নাস্তিকদেরকে তাদের যে সৎকাজের জন্য এত মোবারকবাদ দেয়া হচ্ছে তাদের ঐসব নৈতিক সৎবৃত্তি ও বাস্তব সৎকাজের পেছনে কোন পরিচালিকা শক্তির অস্তিত্ব নেই। কোন ধরনের যুক্তি

প্রদর্শন করে একথা প্রমাণ করা যাবে না যে, ঐ সমস্ত ধর্মহীন দর্শনে সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারী, অংগীকার পালন, ইনসাফ, দানশীলতা, ত্যাগ, কুরবানী, সহানুভূতি, আত্মসংযম, চারিত্রিক সততা সত্যানুসন্ধিৎসা ও অধিকার প্রদানের কারণে কোন উদ্দীপক শক্তি সক্রীয় আছে। আল্লাহ ও পরকালকে বাদ দেবার পর নৈতিকবৃত্তির জন্য যদি কোন কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে তাহলে তা গড়ে তোলা যায় একমাত্র উপযোগবাদের (Utilitareanism) অর্থাৎ স্বার্থপরতার ভিত্তিতে। বাদবাকি অন্যান্য সমস্ত নৈতিক দর্শন শুধুমাত্র কাল্পনিক, আনুমানিক ও কেতাবী রচনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেগুলো বাস্তবে কার্যকর হবার যোগ্য নয়। আর উপযোগবাদ যে নৈতিক চরিত্র সৃষ্টি করে তাকে যতই ব্যাপকতা দান করা হোক না কেন তা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না। বড় জোর তা এতদূর যেতে পারে যে, মানুষ এমন কাজ করবে যা থেকে তার নিজের সত্তার বা যে সমাজে সে বাস করে তার লাভবান হবার আশা থাকে। এটি এমন একটি জিনিস যা লাভের আশা ও ক্ষতির আশংকার ভিত্তিতে মানুষকে সুযোগ মতো সত্য ও মিথ্যা, বিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতা, ঈমানদারী ও বেঈমানী, আমানতদারী ও আত্ম-সাৎ,ইনসাফ ও জুলুম ইত্যাকার প্রত্যেকটি সৎকাজ ও তার বিপরীতমুখী মন্দ কাজে লিপ্ত করতে পারে। এ নৈতিক বৃত্তিগুলোর সবচেয়ে ভাল নমুনা হচ্ছে বর্তমান যুগের ইংরেজ জাতি। প্রায়ই এদেরকে এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করে বলা হয় যে, বস্তুবাদী জীবন দর্শনের অধিকারী এবং পরকালের ধারণায় বিশ্বাসী না হয়েও এ জাতির ব্যক্তিবর্গ সাধারণভাবে অন্যদের তুলনায় বেশী সৎ, সত্যবাদী, আমানতদার, অংগীকার পালনকারী, ন্যায়নিষ্ঠ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য। কিন্তু স্বার্থপ্রণোদিত নৈতিকতা ও সততা যে মোটেই টেকসই হয় না, তার সবচেয়ে সুস্পষ্ট বাস্তব প্রমাণ আমরা এ জাতির চরিত্রেই পাই। সত্যিই যদি ইংরেজদের সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও অংগীকার পালন এ বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতো যে, এ গুণগুলো আদতেই এবং বাস্তবিক পক্ষেই শাশ্বত নৈতিক গুণাবলীর অন্তরভুক্ত, তাহলে এ সম্পর্কে তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দৃষ্টিভংগী পরস্পরের বিপরীত হয় কেমন করে? একজন ইংরেজ তার ব্যক্তিগত জীবনে এ গুণগুলোতে ভূষিত হবে কিন্তু সমগ্র জাতি মিলে যাদেরকে নিজেদের প্রতিনিধি এবং নিজেদের সামষ্টিক বিষয়াবলীর পরিচালক ও তত্বাবধায়ক মনোনীত করে তারা বৃহত্তর পরিমণ্ডলে তাদের সাম্রাজ্য ও তার আন্তরজাতিক বিষয়াবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে নগ্নভাবে মিথ্যাচার, অংগীকার ভংগ, জুলুম, বে-ইনসাফী ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নেয় এবং তার পরও তারা সমগ্র জাতির আস্থা লাভ করে—এটা কেমন করে সম্ভব হয়? তারা যে মোটেই কোন স্থায়ী ও শাশ্বত নৈতিক গুণাবলীতে বিশ্বাসী নয় বরং স্রেফ পার্থিব লাভ-ক্ষতির প্রেক্ষিতেই তারা একই সময় দু'টি বিপরীতধর্মী নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করে থাকে বা করতে পারে, সেটাই কি এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না?

তবুও সত্যই যদি দুনিয়ায় এমন কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব থেকে থাকে, যে আল্লাহ ও পরকাল অস্বীকার করা সত্ত্বেও স্থায়ীভাবে কোন কোন সৎকাজ করে ও অসৎকাজ থেকে দূরে থাকে তাহলে আসলে তার এ সৎপ্রবণতা ও সৎকর্মস্পৃহা তার বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ফল নয়। বরং এগুলো তার এমন সব ধর্মীয় প্রভাবের ফল যা অবচেতনভাবে তার অন্তরাত্মার মধ্যে শেকড় গেড়ে রয়েছে। তার এ নৈতিক সম্পদ ধর্মের ভাণ্ডার থেকে চুরি করে আনা হয়েছে এবং সে একে ধর্মহীনতার মোড়কে অবৈধভাবে ব্যবহার করছে। কারণ

সে তার ধর্মহীনতা ও বস্তুবাদিতার ভাণ্ডারে এ সম্পদটির উৎস নির্দেশ করতে কখনই সক্ষম হবে না।

১৩. এ বাক্যটিকে হালকাভাবে নেবেন না। এর বিষয়বস্তুর ক্রম বিন্যাস গভীর মনোনিবেশের দাবীদার।

পরকালীন জীবনে তারা জান্নাত লাভ করবে কেন? কারণ, তারা পার্থিব জীবনে সত্য পথে চলেছে। প্রত্যেক কাজে, জীবনের প্রতিটি বিভাগে, প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক বিষয়ে তারা সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ পথ অবলম্বন করেছে এবং বাতিলের পথ পরিহার করেছে।

তারা প্রতিটি পদক্ষেপে, জীবনের প্রতি মোড়ে মোড়ে ও প্রতিটি পথের চৌমাথায় তারা ন্যায় ও অন্যায় হতে ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারলো কেমন করে? তারপর এ পার্থক্য অনুযায়ী সঠিক পথের ওপর দৃঢ়তা এবং অন্যায় পথ থেকে দূরে থাকার শক্তি তারা কোথা থেকে পেলো?—এসব তারা লাভ করেছে তাদের রবের পক্ষ থেকে। তিনিই তাত্ত্বিক পথনির্দেশনা দান এবং বাস্তব কাজের ক্ষমতা দান ও সুযোগ সৃষ্টির উৎস।

তাদের রব তাদেরকে পথনির্দেশনা এবং সুযোগ দান করেন কেন?—তাদের ঈমানের কারণে এ সুযোগ দেন।

ওপরে এই যে ফলাফলগুলো বর্ণিত হয়েছে এগুলো কোন্ ঈমান ও বিশ্বাসের ফল? এমন ঈমানের ফল নয় যার অর্থ হয় নিছক বিশ্বাস করা। বরং এমন ঈমানের ফল যা চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের পরিচালক শক্তি ও প্রাণসত্তায় পরিণত হয় এবং যার উদ্বুদ্ধকারী শক্তিতে শক্তিমান হয়ে কর্ম ও চরিত্রে নেকী ও সৎবৃত্তির প্রকাশ ঘটে। মানুষের পার্থিব ও জৈবিক জীবনেই দেখা যায় তার জীবন ধারণ, শারীরিক সুস্থতা, কর্মক্ষমতা ও জীবনের স্বাদ আহরণ করার জন্য তাকে বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হয়। কিন্তু শুধু খাদ্য খেয়ে নিলেই এসব গুণ ও ফল লাভ করা যায় না। বরং এমনভাবে খেতে হয় যার ফলে তা হজম হয়ে গিয়ে রক্ত সৃষ্টি করে এবং প্রতিটি শিরা উপ-শিরায় পৌঁছে শরীরের প্রতিটি অংশে এমন শক্তি সঞ্চার করে যার ফলে সে তার অংশের কাজ ঠিকমত করতে পারে। ঠিক একইভাবে নৈতিক জীবনে মানুষের সঠিক পথনির্দেশনা লাভ করা, সত্যকে দেখা, সত্য পথে চলা এবং সবশেষে কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করা সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু এমন ধরনের কোন আকীদা-বিশ্বাস এ ফল সৃষ্টি করতে পারে না, যা নিছক মুখে উচ্চারিত হয় অথবা মন ও মস্তিষ্কের কোন অংশে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে থাকে। বরং যে আকীদা-বিশ্বাস হৃদয়ের মর্মমূলে প্রবেশ করে তার সাথে একাকার হয়ে যায় এবং তারপর চিন্তা পদ্ধতি রুচি-প্রকৃতি ও মেজায-প্রবণতার অঙ্গীভূত হয়ে চরিত্র, কর্মকাণ্ড ও জীবনভংগীতে সুস্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে। তাই এ ফল সৃষ্টিতে সক্ষম। যে ব্যক্তি খাদ্য খেয়ে তা যথাযথভাবে হজম করতে সক্ষম হয় তার জন্য যে পুরস্কার রাখা হয়েছে, যে ব্যক্তি আহার করেও অনাহারীর মতো থাকে আল্লাহর জৈব বিধান অনুযায়ী সে কখনো সেই পুরস্কারের অধিকারী হয় না। তাহলে যে ব্যক্তি ঈমান এনেও বেঈমানের মতো জীবন যাপন করে সে আল্লাহর নৈতিক বিধানে ঈমান আনয়নের পর সৎকর্মশীলের মত জীবন যাপনকারী যে পুরস্কার পায়, সে-ই পুরস্কার পাওয়ার আশা করতে পারে?

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۚ
فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١﴾ وَإِذَا مَسَّ
الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ۖ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ
ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾

২ রুকূ'

আল্লাহ যদি[১৫] লোকদের সাথে খারাপ ব্যবহার করার ব্যাপারে অতটাই তাড়াহুড়া করতেন যতটা দুনিয়ার ভালো চাওয়ার ব্যাপারে তারা তাড়াহুড়া করে থাকে, তাহলে তাদের কাজ করার অবকাশ কবেই খতম করে দেয়া হতো (কিন্তু আমার নিয়ম এটা নয়)। তাই যারা আমার সাথে সাক্ষাৎ করার আশা পোষণ করে না তাদেরকে আমি তাদের অবাধ্যতার মধ্যে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দেই। মানুষের অবস্থা হচ্ছে, যখন সে কোন কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়, তখন সে দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আমাকে ডাকে। কিন্তু যখন আমি তার বিপদ হটিয়ে দেই তখন সে এমনভাবে চলতে থাকে যেন সে কখনো নিজের কোন খারাপ সময়ে আমাকে ডাকেইনি। ঠিক তেমনিভাবে সীমা অতিক্রমকারীদের জন্য তাদের কার্যক্রমকে সুশোভন করে দেয়া হয়েছে।

১৪. এখানে চমকপ্রদ ভংগীতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার পরীক্ষাগৃহ থেকে সফলকাম হয়ে বের হয়ে সুখৈশ্বর্য ও সম্ভোগপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করেই তারা বুভুক্ষের মত ভোগ্য সামগ্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না এবং চারদিক থেকে–

"হূর আনো, শরাব আনো,
গীটার বাজাও বাজাও পিয়ানো"

–এর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হবে না—যদিও জান্নাতের কথা শুনতেই কোন কোন বিকৃত বুদ্ধির অধিকারী লোকের মানসপটে এ ধরনের ছবিই ভেসে ওঠে। আসলে সৎ ঈমানদার ব্যক্তি দুনিয়ায় উন্নত চিন্তা ও উচ্চাংগের নৈতিক বৃত্তি অবলম্বন করা, নিজের আবেগ–অনুভূতিকে সংযত ও সুসজ্জিত করা, নিজের ইচ্ছা–অভিলাশকে পরিশুদ্ধ করা এবং নিজের চরিত্র ও কার্যকলাপকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করার মাধ্যমে নিজের মধ্যে যে ধরনের উৎকৃষ্টতম ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলবে ও মহত্তম গুণাবলী লালন করবে, দুনিয়ার পরিবেশ থেকে ভিন্নতর জান্নাতের অতি পবিত্র পরিবেশে সেই ব্যক্তিত্ব এবং সেই গুণাবলী

আরো বেশী উজ্জ্বল, প্রখর ও তেজোময় হয়ে ভেসে উঠবে। দুনিয়ায় আল্লাহর যে প্রশংসা ও পবিত্রতার কথা তারা বর্ণনা করতো সেখানে সেটিই হবে তাদের সবচেয়ে প্রিয় কাজ। দুনিয়ায় বাস করার সময় পরস্পরের শান্তি ও নিরাপত্তা কামনার যে অনুভূতিকে তারা নিজেদের সামাজিক মনোভংগীর প্রাণ বায়ুতে পরিণত করেছিল সেখানকার সমাজ পরিবেশেও তাদের সেই অনুভূতিই সক্রিয় থাকবে।

১৫. ওপরের ভূমিকার পর এবার উপদেশ দেয়া ও বুঝাবার জন্য ভাষণ শুরু করা হচ্ছে। এ ভাষণটি পড়ার আগে এর পটভূমি সম্পর্কিত কিছুকথা সামনে রাখতে হবে।

এক ঃ এ ভাষণটি শুরু হওয়ার মাত্র কিছুকাল আগেই একটি দীর্ঘস্থায়ী ও কঠিন বিপজ্জনক দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটেছিল। সেই বিপদের আবর্তে পড়ে মক্কাবাসীদের নাভিশ্বাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। দুর্ভিক্ষের দিনগুলোতে কুরাইশ গোত্রের অংকোরী লোকদের উদ্ধত মাথাগুলো অনেক নীচু হয়ে গিয়েছিল। তারা প্রার্থনা ও আহাজারি করতো। মূর্তি পূজায় ভাটা পড়ে গিয়েছিল। এক লা-শরীক আল্লাহর প্রতি আকর্ষণ বেড়ে গিয়েছিল। অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল যে, শেষ পর্যন্ত আবু সুফিয়ান এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ বালা-মুসিবত দূর করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করার আবেদন জানালো। কিন্তু যখন দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেলো, বৃষ্টি শুরু হলো এবং সমৃদ্ধির দিন এসে গেলো তখন আবার এ লোকদের সেই আগের বিদ্রোহাত্মক আচরণ, অসৎকর্ম ও সত্যবিরোধী তৎপরতা শুরু হয়ে গেলো। যাদের হৃদয় আল্লাহর দিকে ফিরতে শুরু করেছিল তারা আবার তাদের আগের ঘোর গাফলতিতে নিমজ্জিত হলো। (দেখুন ঃ আন নহল ১৩ আয়াত, আল মুমিনুন ৭৫-৭৭ আয়াত এবং আদ্ দুখান ১০-১৬ আয়াত)

দুই ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই তাদেরকে সত্য অমান্য করার কারণে ভয় দেখাতেন তখনই তারা জবাবে বলতো ঃ তুমি আল্লাহর যে আযাবের হুমকি দিচ্ছো তা আসছে না কেন? তার আসতে দেরি হচ্ছে কেন?

এরি জবাবে বলা হচ্ছে ঃ মানুষের প্রতি দয়া ও করুণা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আল্লাহ যতটা দ্রুতগামী হন, তাদের সাজা দেবার ও পাপ কাজ করার দরুন তাদেরকে পাকড়াও করার ব্যাপারে ততটা ত্বরিৎ গতি অবলম্বন করেন না। তোমরা চাও, তোমাদের দোয়া শুনে যেভাবে তিনি দুর্ভিক্ষের বিপদ দ্রুত অপসারণ করেছেন ঠিক তেমনি তোমাদের চ্যালেঞ্জ শুনে এবং তোমাদের বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা দেখে সংগে সংগেই আযাবও পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু এটা আল্লাহর নিয়ম নয়। মানুষ যতই অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ করুক না কেন, এ অপরাধে তাদেরকে পাকড়াও করার আগে তিনি তাদেরকে সংশোধিত হবার যথেষ্ট সুযোগ দেন। একের পর এক সতর্ক বাণী পাঠান এবং রশি ঢিলে করে ছেড়ে দেন। অবশেষে যখন সুবিধা ও অবকাশ শেষ সীমায় উপনীত হয়, তখনই কর্মফলের নীতি কার্যকর হয়। এ হচ্ছে আল্লাহর পদ্ধতি। পক্ষান্তরে তোমরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছ সেটা হচ্ছে সংকীর্ণমনা মানুষদের পদ্ধতি। অর্থাৎ বিপদ এলে আল্লাহর কথা মনে পড়তে থাকে। তখন হা-হুতাশ ও কান্নাকাটির রোল পড়ে যায়। আবার যেই বিপদমুক্ত স্বস্তির দিন আসে অমনি সবকিছু ভুলে যাও। এ ধরনের অভ্যাস ও নীতির বদৌলতেই বিভিন্ন জাতির জন্য আল্লাহর আযাব অনিবার্য ও অবধারিত হয়ে ওঠে।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم
بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ
الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ
كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

হে মানব জাতি! তোমাদের আগের জাতিদেরকে[১৬] (যারা তাদের নিজেদের যুগে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল) আমি ধ্বংস করে দিয়েছি—যখন তারা জুলুমের নীতি[১৭] অবলম্বন করলো এবং তাদের রসূলগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিশানী নিয়ে এলেন, কিন্তু তারা আদৌ ঈমান আনলো না। এভাবে আমি অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধের প্রতিফল দিয়ে থাকি। এখন তাদের পরে আমি পৃথিবীতে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি, তোমরা কেমন আচরণ করো তা দেখার জন্য।[১৮]

১৬. মূল আয়াতে "কারূন" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণভাবে আরবীতে এর অর্থ হয় কোন বিশেষ যুগের অধিবাসী বা প্রজন্ম। কিন্তু কুরআন মজীদে যেভাবে বিভিন্ন জায়গায় এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তাতে মনে হয় 'কারূন' শব্দের মাধ্যমে এমন জাতির কথা বুঝানো হয়েছে যারা নিজেদের যুগে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল এবং পুরোপুরি বা আংশিকভাবে বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ ধরনের জাতির ধ্বংস নিশ্চিতভাবে এ অর্থ বহন করে না যে, শাস্তি হিসেবে তাদের সমগ্র জনশক্তিকেই ধ্বংস করে দেয়া হতো বরং তাদেরকে উন্নতি ও নেতৃত্বের আসন থেকে নামিয়ে দেয়া, তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যাওয়া, তাদের বৈশিষ্ট বিলুপ্ত হওয়া এবং তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য জাতির মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার মাধ্যমেও শাস্তি দেয়া হতো। মূলত এসবই ধ্বংসের এক একটি প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৭. সাধারণভাবে জুলুম বলতে যা বুঝায় এখানে সেই ধরনের কোন সংকীর্ণ অর্থ ব্যবহার করা হয়নি। বরং আল্লাহর বান্দা ও গোলাম হিসেবে যে সীমারেখা ও বিধি-নিষেধ মেনে চলা মানুষের কর্তব্য, সেই বিধি-নিষেধ ও সীমারেখা লংঘন করে সে যেসব গোনাহ করে এখানে সেগুলোর অর্থেই জুলুম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আল বাকারার ৪৯ নম্বর টীকা)।

১৮. মনে রাখতে হবে, এখানে সম্বোধন করা হচ্ছে আরববাসীদেরকে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, আগের জাতিগুলোকে তাদের যুগে কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত জুলুম ও বিদ্রোহের নীতি অবলম্বন করেছিল এবং তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য যেসব নবী পাঠানো হয়েছিল তাঁদের কথা তারা মানেনি। তাই আমার পরীক্ষায় তারা

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

যখন তাদেরকে আমার সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার কথা শুনানো হয় তখন যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তারা বলে, "এটার পরিবর্তে অন্য কোন কুরআন আনো অথবা এর মধ্যে কিছু পরিবর্তন করো।"[১৯] হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলে দাও, "নিজের পক্ষ থেকে এর মধ্যে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন করা আমার কাজ নয়। আমি তো শুধুমাত্র আমার কাছে যে অহী পাঠানো হয়, তার অনুসারী। যদি আমি আমার রবের নাফরমানী করি তাহলে আমার একটি ভয়াবহ দিনের আযাবের আশংকা হয়।"[২০]

ব্যর্থ হয়েছে। এবং তাদেরকে ময়দান থেকে সরিয়ে দেয়া হয়ছে। এখন হে আরববাসীরা! তোমাদের পালা এসেছে। তাদের জায়গায় তোমাদের কাজ করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। তোমরা এখন পরীক্ষা গৃহে দাঁড়িয়ে আছো। তোমাদের পূর্ববর্তীরা ব্যর্থ হয়ে এখান থেকে বের হয়ে গেছে। তোমরা যদি তাদের মতো একই পরিণামের সম্মুখীন হতে না চাও তাহলে তোমাদের এই যে সুযোগ দেয়া হচ্ছে এ থেকে যথাযথভাবে লাভবান হও। অতীতের জাতিদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো এবং যেসব ভুল তাদের ধ্বংসের কারণে পরিণত হয়েছিল সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করো না।

১৯. তাদের এ বক্তব্য প্রথমত এ ধারণার ভিত্তিতে উচ্চারিত হয়েছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু পেশ করছেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয় বরং তাঁর নিজের চিন্তার ফসল এবং শুধুমাত্র নিজের কথার গুরুত্ব বাড়াবার জন্য তিনি তাকে আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। দ্বিতীয়ত তারা বলতে চাচ্ছিল, তুমি এসব তাওহীদ, আখেরাত ও নৈতিক বিধি-নিষেধের আলোচনার অবতারণা করছো কেন? যদি জাতির পথ-নির্দেশনা তোমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে এমন জিনিস পেশ করো যার ফলে জাতি লাভবান হয় এবং সে বৈষয়িক উন্নতি লাভ করতে পারে। তবুও যদি তুমি নিজের এ দাওয়াতকে একদম বদলাতে না চাও তাহলে কমপক্ষে এর মধ্যে এতটুকু নমনীয়তা সৃষ্টি করো যার ফলে আমাদের ও তোমার মধ্যে দরকষাকষির ভিত্তিতে সমঝোতা হতে পারে। আমরা তোমার কথা কিছু মেনে নেবো এবং তুমি আমাদের কথা কিছু মেনে নেবে। তোমার তাওহীদের মধ্যে আমাদের শিরকের জন্য কিছু জায়গা দিতে হবে তোমার আল্লাহ প্রীতির মধ্যে আমাদের দুনিয়া প্রীতির সহাবস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তোমার পরকাল

قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ
عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝١٦ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا
اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ۭ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝١٧

আর বলো, যদি এটিই হতো আল্লাহর ইচ্ছা তাহলে আমি এ কুরআন তোমাদের কখনো শুনাতাম না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে এর খবরও দিতেন না। আমি তো এর আগে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছি, তবুও কি তোমরা বুদ্ধি-বিবেচনা করে কাজ করতে পার না?[২১] তারপর যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বানিয়ে তাকে আল্লাহর কথা বলে প্রচার করে অথবা আল্লাহর যথার্থ আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে?[২২] নিসন্দেহে, অপরাধী কোনদিন সফলকাম হতে পারে না।[২৩]

বিশ্বাসের মধ্যে আমাদের এ ধরনের বিশ্বাসের কিছু অবকাশ রাখতে হবে যে, দুনিয়ায় আমরা যা চাই তা করতে থাকবো কিন্তু আখেরাতে কোন না কোনভাবে অবশ্যি আমরা মুক্তি পেয়ে যাবো। তাছাড়া তুমি যে কঠোরতম ও অনমনীয় নৈতিক মূলনীতিগুলোর প্রচার করে থাক, তা আমাদের কাছে গ্রহণীয় নয়। এর মধ্যে আমাদের সংকীর্ণ গোত্রস্বার্থ, রসম-রেওয়াজ, ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থ এবং আমাদের প্রবৃত্তির আশা-আকংখার জন্যও কিছুটা অবকাশ থাকা উচিত। আমাদের ও তোমার মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে ইসলামের দবীসমূহের একটি ন্যায়সংগত পরিসর স্থিরিকৃত হয়ে যাওয়াটা কি বাঞ্ছনীয় নয়? সেই পরিসরে আমরা আল্লাহর হক আদায় করে দেবো। এরপর আমাদের স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিতে হবে। আমরা যেভাবে চাইবো বৈষয়িক কাজ কারবার চালিয়ে যেতে থাকবো। কিন্তু তুমি তো সমগ্র জীবন ও সমস্ত কাজ-কারবারকে তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাস এবং শরীয়াতের বিধানের কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন করার সর্বনাশা নীতি গ্রহণ করেছো।

২০. এটি হচ্ছে ওপরের দু'টি কথার জবাব। এখানে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, আমি এ কিতাবের রচয়িতা নই বরং অহীর মাধ্যমে এটি আমার কাছে এসেছে এবং এর মধ্যে কোন রকম রদ বদলের অধিকারও আমার নেই। আর তাছাড়া এ ব্যাপারে কোন প্রকার সমঝোতার সামান্যতম সম্ভাবনাও নেই। যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে এ সমগ্র দীনকে হুবহু গ্রহণ করতে হবে, নয়তো পুরোপুরি রদ করে দিতে হবে।

২১. কুরআনের বাণীগুলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে তৈরী করে আল্লাহর বলে চালিয়ে দিচ্ছেন, এ মর্মে তারা যে অপবাদ রটাচ্ছিল এটি তার একটি দাঁতভাংগা জবাব ও তার প্রতিবাদে একটি অকাট্য যুক্তি। এই সাথে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নিজে এ কিতাবের রচয়িতা নন বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে এটি তাঁর ওপর নাযিল হচ্ছে, তাঁর এ দাবীর সপক্ষেও এটি একটি জোরালো

যুক্তি। অন্য যুক্তি-প্রমাণগুলো তবুওতো তুলনামূলকভাবে দূরবর্তী বিষয় ছিল কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন তো তাদের সামনের জিনিস ছিল। নবুওয়াত লাভের আগে পুরো চল্লিশটি বছর তিনি তাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি তাদের শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাদের চোখের সামনে তাঁর শিশুকাল অতিক্রান্ত হয়। সেখানেই বড় হন। যৌবনে পদার্পণ করেন তারপর প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেন। থাকা-খাওয়া, ওঠাবসা, লেনদেন, বিয়ে শাদী ইত্যাদি সব ধরনের সামাজিক সম্পর্ক তাদের সাথেই ছিল এবং তাঁর জীবনের কোন দিক তাদের কাছে গোপন ছিল না। এমন ধরনের সুপরিচিত ও চোখে দেখা জিনিসের চাইতে ভালো সাক্ষ আর কি হতে পারে?

তাঁর এ জীবনধারার মধ্যে দু'টি বিষয় একেবারেই সুস্পষ্ট ছিল। মক্কার প্রত্যেকটি লোকই তা জানতো।

এক, নবুওয়াত লাভ করার আগে তাঁর জীবনের পুরো চল্লিশটি বছরে তিনি এমন কোন শিক্ষা, সাহচর্য ও প্রশিক্ষণ লাভ করেননি এবং তা থেকে এমন তথ্যাদি সংগ্রহ করেননি যার ফলে একদিন হঠাৎ নবুওয়াতের দাবী করার সাথে সাথেই তার কণ্ঠ থেকে এ তথ্যাবলীর ঝরণাধারা নিঃসৃত হতে আরম্ভ করেছে। কুরআনের এসব সূরায় এখন একের পর এক যেসব বিষয় আলোচিত হচ্ছিল এবং যেসব চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটছিল এর আগে কখনো তাঁকে এ ধরনের সমস্যার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করতে, এ বিষয়াবলীর ওপর আলোচনা করতে এবং এ ধরনের অভিমত প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। এমনকি এ পুরো চল্লিশ বছরের মধ্যে কখনো তাঁর কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং কোন নিকটতম আত্মীয়ও তাঁর কথাবার্তা ও আচার-আচরণে এমন কোন জিনিস অনুভব করেনি যাকে তিনি হঠাৎ চল্লিশ বছরে পদার্পণ করে যে মহান দাওয়াতের সূচনা করেন তার ভূমিকা বা পূর্বাভাস বলা যেতে পারে। কুরআন যে তার নিজের মস্তিষ্ক প্রসূত নয় বরং বাইর থেকে তাঁর মধ্যে আগত এটাই ছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। কারণ জীবনের কোন পর্যায়েও মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি তার জন্য এমন কোন জিনিস পেশ করতে পারে না যার উন্নতি ও বিকাশের সুস্পষ্ট আলামত তার পূর্ববর্তী পর্যায়গুলোয় পাওয়া যায় না। এ কারণে মক্কার কিছু চতুর লোক যখন নিজেরাই কুরআনকে রসূলের মস্তিষ্কপ্রসূত গণ্য করাকে একেবারেই একটি বাজে ও ভূয়া দোষারোপ বলে উপলব্ধি করলো তখন শেষ পর্যন্ত তারা বলতে শুরু করলো, অন্য কেউ মুহাম্মাদকে একথা শিখিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এ দ্বিতীয় কথাটি প্রথম কথাটির চাইতেও বেশী বাজে ও ভূয়া ছিল। কারণ শুধু মক্কায়ই নয়, সারা আরব দেশেও এমন একজন লোক ছিল না যার দিকে অংগুলি নির্দেশ করে বলা যেতে পারতো যে, ইনিই এ বাণীর রচয়িতা বা রচয়িতা হতে পারেন। এহেন যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তি কোন সমাজে আত্মগোপন করে থাকার মত নয়।

দ্বিতীয় যে কথাটি তাঁর পূর্ববর্তী জীবনে একদম সুস্পষ্ট ছিল সেটি ছিল এই যে, মিথ্যা, প্রতারণা, জালিয়াতী, ধোঁকা, শঠতা, ছলনা এবং এ ধরনের অন্যান্য অসৎগুণাবলীর কোন সমান্যতম গন্ধও তাঁর চরিত্রে পাওয়া যেতো না। গোটা আরব সমাজে এমন এক ব্যক্তিও ছিল না যে একথা বলতে পারতো যে, এ চল্লিশ বছরের সহাবস্থানের সময় তাঁর ব্যাপারে এমন কোন আচরণের অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। পক্ষান্তরে তাঁর সাথে যাদেরই যোগাযোগ হয়েছে তারাই তাঁকে একজন অত্যন্ত সাচ্চা, নিষ্কলংক ও বিশ্বস্ত (আমানতদার) ব্যক্তি

হিসেবেই জেনেছে। নবুওয়াত লাভের মাত্র পাঁচ বছর আগের কথা। কাবা পুনর্নির্মাণের সময় কুরাইশদের বিভিন্ন পরিবার হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) সংস্থাপনের প্রশ্নে বিরোধে লিপ্ত হয়েছিল। পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে স্থিরিকৃত হয়েছিল, পরদিন সকালে সবার আগে যে ব্যক্তি কাবাঘরে প্রবেশ করবে তাকেই শালিস মানা হবে। পরদিন সেখানে সবার আগে প্রবেশ করেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁকে দেখেই সবাই সমস্বরে বলে ওঠে ঃ هذا الامين ،رضينا ،هذا محمد "এ সেই সাচ্চা ও সৎ ব্যক্তি। আমরা এর ফায়সালায় রাযী। এতো মুহাম্মাদ।" এভাবে তাঁকে নবী হিসেবে নিযুক্ত করার আগেই আল্লাহ সমগ্র কুরাইশ গোত্র থেকে তাদের ভরা মজলিসে তাঁর "আমীন' হবার সাক্ষী নিয়েছিলেন। এখন যে ব্যক্তি তার সারা জীবন কোন ক্ষুদ্রতম ব্যাপারেও মিথ্যা, প্রতারণা ও জালিয়াতির আশ্রয় নেননি তিনি অকস্মাত এতবড় মিথ্যা, জালিয়াতী ও প্রতারণার জাল বিস্তার করে এগিয়ে আসবেন কেন? তিনি নিজের মনে মনে কিছু বাণী রচনা করে নেবেন এবং সর্বাত্মক বলিষ্ঠতা সহকারে চ্যালেঞ্জ দিয়ে সেগুলোকে আল্লাহর বাণী বলে প্রচার করবেন, এ ধরনের কোন সন্দেহ পোষণ করার অবকাশই বা সেখানে কোথায়?

এ কারণে মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, তাদের এ নিরর্থক দোষারোপের জবাবে তাদেরকে বলো ঃ হে আল্লাহর বান্দারা! নিজেদের বিবেক বুদ্ধিকে কিছু কাজে লাগাও। আমি তো বহিরাগত কোন অপরিচিত আগন্তুক নই। তোমাদের মাঝে জীবনের একটি বিরাট সময় আমি অতিবাহিত করেছি। আমার অতীত জীবনের কার্যাবলী দেখার পর তোমরা কেমন করে আমার কাছ থেকে আশা করতে পারো যে, আমি আল্লাহর হুকুম ও তাঁর শিক্ষা ছাড়াই এ কুরআন তোমাদের সামনে পেশ করতে পারি? (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা কাসাস ১০৯ টীকা)।

২২. অর্থাৎ যদি এ আয়াতগুলো আল্লাহর না হয়ে থাকে এবং আমি নিজে এগুলো রচনা করে আল্লাহর আয়াত বলে পেশ করে থাকি, তাহলে আমার চাইতে বড় জালেম আর কেউ নেই। আর যদি এগুলো সত্যিই আল্লাহর আয়াত হয়ে থাকে এবং তোমরা এগুলো অস্বীকার করে থাকো তাহলে তোমাদের চাইতে বড় জালেম আর কেউ নেই।

২৩. কোন কোন অজ্ঞ লোক "সফলকাম" বলতে দীর্ঘজীবন বা বৈষয়িক সমৃদ্ধি অথবা পার্থিব উন্নতি অর্থ গ্রহণ করেন। তারপর এ আয়াত থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চান যে, নবুওয়াতের দাবী করার পর যে ব্যক্তি বেঁচে থাকে, দুনিয়ায় উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে অথবা তার দাওয়াত সম্প্রসারিত হতে থাকে, তাকে সত্য নবী বলে মেনে নেয়া উচিত। কারণ সে সফলকাম হয়েছে। যদি সে সত্য নবী না হতো তাহলে মিথ্যা দাবী করার সাথে সাথেই তাকে হত্যা করা হতো অথবা অনাহারে মেরে ফেলা হতো এবং দুনিয়ায় তার কথা ছড়াতেই পারতো না। কিন্তু এ ধরনের নির্বুদ্ধিতাসূলভ যুক্তি একমাত্র সেই ব্যক্তিই প্রদর্শন করতে পারে, যে কুরআনী পরিভাষা "সফলকাম"–এর অর্থ জানে না এবং অবকাশ দানের বিধান সম্পর্কেও জ্ঞাত নয়। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ অপরাধীদের জন্য এ বিধান নির্ধারিত করেছেন। এ সংগে এ বর্ণনার মধ্যে এ বাক্যটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তাও বুঝে না।

প্রথমত "অপরাধী সফলকাম হতে পারে না" একথাটি এ আলোচনার ক্ষেত্রে এভাবে বলা হয়নি যে, এটিকে কারোর নবুওয়াতের দাবী যাচাই করার মাপকাঠিতে পরিণত করা হবে এবং সাধারণ জনসমাজ যাচাই পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছবে যে, যে নবুওয়াতের দাবীদার "সফলকাম" হচ্ছে তার দাবী মেনে নেয়া হবে এবং যে "সফল কাম" হচ্ছে না। তার দাবী অস্বীকার করা হবে। বরং এখানে একথাটি এ অর্থে বলা হয়েছে যে, "আমি নিশ্চয়তা সহকারে জানি অপরাধিরা সফলকাম হতে পারে না। তাই আমি নিজে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবী করার অপরাধ করতে পারি না। তবে তোমাদের ব্যাপারে আমি নিশ্চিতভাবে জানি, তোমরা সত্য নবীকে অস্বীকার করার অপরাধ করছো। কাজেই তোমরা সফলকাম হবে না।

তাছাড়া সফলকাম শব্দটিও কুরআনে বৈষয়িক সফলতার সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং এর অর্থ এমন ধরনের চিরন্তন সফলতা যা কোন দিন ব্যর্থতা ও ক্ষতিতে পর্যবসিত হবে না। পার্থিব জীবনের এ প্রাথমিক পর্যায়ে এর মধ্যে সাফল্যের কোন দিক থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে। হতে পারে একজন গোমরাহীর আহবায়ক দুনিয়ায় আরাম-আয়েশে জীবন যাপন করছে। তার জীবনে উন্নতি ও অগ্রগতির জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। তার গোমরাহী দুনিয়ার বুকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু কুরআনের পরিভাষায় এটা সাফল্য নয় বরং দ্ব্যর্থহীন ক্ষতি ও ব্যর্থতা। আবার এও হতে পারে, একজন সত্যের আহবায়ক দুনিয়ায় কঠিন বিপদের মুখোমুখি হচ্ছে। দুঃখ-কষ্টের ভয়াবহতা তার স্নায়ুতন্ত্রকে অসাড় করে দেবার ফলে অথবা জালেমদের নির্যাতনের শিকার হয়ে সে দুনিয়ার বুক থেকে দ্রুত বিদায় নিচ্ছে। এবং তার আহবানে কেউ সাড়া দিচ্ছে না। কিন্তু কুরআনের ভাষায় এটা ক্ষতি ও ব্যর্থতা নয় বরং এটাই সফলতা।

এ ছাড়া কুরআনে বারবার একথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ অপরাধীদেরকে দ্রুত পাকড়াও করেন না। বরং তাদেরকে সামলে নেবার জন্য যথেষ্ট অবকাশ দেন। এ অবকাশের সুযোগকে যদি তারা অবৈধভাবে ব্যবহার করে আরো বেশী অপকর্ম করতে থাকে তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের রশি ঢিলে করে দেয়া হয় এবং অনেক সময় তাদের ওপর অনুগ্রহ ধারা বর্ষিত হয়। এর ফলে তাদের অন্তরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা যাবতীয় অসৎবৃত্তি বাইরে বেরিয়ে আসার সুযোগ পায়। এভাবে নিজেদের অসৎগুণাবলীর কারণে প্রকৃতপক্ষে তাদের যে ধরনের শাস্তি পাওয়া উচিত নিজেদের কাজের ভিত্তিতে তারা ঠিক তেমনি শাস্তির উপযুক্ত হয়। কাজেই কোন মিথ্যা দাবীদারের রশি দীর্ঘ হতে এবং তার ওপর পার্থিব সাফল্যের বারিধারা বর্ষিত হতে থাকলে তার এ অবস্থাকে তার সত্য ও সঠিক পথাশ্রয়ী হবার প্রমাণ মনে করা মারাত্মক ভুল হবে। কাজেই আল্লাহর অবকাশ ও ক্রমান্বয়ে ঢিল দেবার নীতি যেমন সমস্ত অপরাধীদের জন্য সাধারণভাবে কার্যকর থাকে তেমনি কার্যকর থাকে মিথ্যা দাবীদারদের জন্যও। এ নীতি ও আইন থেকে তাদের ব্যতিক্রম ঘটার কোন প্রমাণ নেই। তারপর শয়তানকে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত যে অবকাশ দিয়েছেন সেখানেও এ ব্যতিক্রমের কথা কোথাও উল্লেখ নেই। সেখানে একথা বলা হয়নি যে, তোমার অন্য সমস্ত জালিয়াতীকে অবাধে চলার সুযোগ দেয়া হবে কিন্তু যদি তুমি নিজের পক্ষ থেকে কোন নবী দাঁড় করিয়ে দাও তাহলে এ ধরনের জালিয়াতীকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হবে না।

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ
شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا
فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾ وَمَا كَانَ النَّاسُ
إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ
بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ
فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا ۖ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾

এ লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদাত করছে তারা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলে দাও, "তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের খবর দিচ্ছো যার অস্তিত্বের কথা তিনি আকাশেও জানেন না এবং যমিনেও না!"[২৪] তারা যে শিরক্ করে তা থেকে তিনি পাক-পবিত্র এবং তার উর্ধে।

শুরুতে সমস্ত মানুষ ছিল একই জাতি। পরবর্তীকালে তারা বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস ও মত-পথ তৈরী করে নেয়।[২৫] আর যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে আগেভাগেই একটি কথা স্থিরীকৃত না হতো তাহলো যে বিষয়ে তারা পরস্পর মতবিরোধ করছে তার মীমাংসা হয়ে যেতো।[২৬]

আর এই যে তারা বলে যে, এ নবীর প্রতি তার রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করা হয়নি কেন?[২৭] এর জবাবে তুমি তাদেরকে বলে দাও, "গায়েবের মালিক তো একমাত্র আল্লাহ, ঠিক আছে, তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করবো।"[২৮]

কোন ব্যক্তি আমাদের এ বক্তব্যের জওয়াবে সূরা আল হাক্কার ৪৪ থেকে ৪৭ পর্যন্ত আয়াত ক'টি পেশ করতে পারেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۝ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا
مِنْهُ الْوَتِينَ ۝

"যদি মুহাম্মাদ নিজে কোন মনগড়া কথা আমার নামে বলতো তাহলে আমি তার হাত ধরে ফেলতাম এবং তার হৃদপিণ্ডের রগ কেটে দিতাম।"

কিন্তু এ আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তিকে যথার্থই আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী নিযুক্ত করা হয়েছে সে যদি মিথ্যা কথা বানিয়ে অহী হিসেবে পেশ করে তাহলে সংগে সংগেই তাকে পাকড়াও করা হবে। এ থেকে যে স্বকথিত নবীকে পাকড়াও করা হচ্ছে না সে নিশ্চয়ই সাচ্চা নবী, এ সিদ্ধান্ত টানা একটি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহর অবকাশ দান ও ঢিল দেয়ার আইনের ব্যাপারে এ আয়াত থেকে যে ব্যতিক্রম প্রমাণ হচ্ছে তা কেবল সাচ্চা নবীর জন্য। নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদারও এ ব্যতিক্রমের আওতাভুক্ত—এ সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন সুযোগই এখানে নেই। সবাই জানে, সরকারী কর্মচারীদের জন্য সরকার যে আইন তৈরী করেছে তা কেবল তাদের ওপরই প্রযোজ্য হবে যারা যথার্থই সরকারী কর্মচারী। আর যারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজেদেরকে সরকারী কর্মচারী হিসেবে পেশ করে তাদের ওপর সরকারী কর্মচারী আইন কার্যকর হবে না। বরং ফৌজদারী আইন অনুযায়ী সাধারণ বদমায়েশ ও অপরাধীদের সাথে যে ব্যবহার করা হয় তাদের সাথেও সেই একই ব্যবহার করা হবে। এ ছাড়াও সূরা আল হাক্কার এ আয়াতে যা কিছু বলা হয়েছে সেখানেও নবী যাচাই করার কোন মানদণ্ড বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। সেখানে এ উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলা হয়নি যে, কোন অদৃশ্য হাত এসে যদি অকস্মাত নবুওয়াতের দাবীদারের হৃদপিণ্ডের রগ কেটে দেয় তাহলে মনে করবে সে মিথ্যা নবী অন্যথায় তাকে সাচ্চা বলে মেনে নেবে। নবীর সাচ্চা বা মিথ্যা হবার ব্যাপারটি যদি তার চরিত্র, কর্মকাণ্ড এবং তার উপস্থাপিত দাওয়াতের মাধ্যমে যাচাই করা সম্ভব না হয় তবেই এ ধরনের অযৌক্তিক মানদণ্ড উপস্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

২৪. কোন জিনিসের আল্লাহর জ্ঞানের অন্তরভুক্ত না হওয়ার মানেই হচ্ছে এই যে, সেটির আদতে কোন অস্তিত্বই নেই। কারণ, যা কিছুর অস্তিত্ব আছে সবই আল্লাহর জ্ঞানের অন্তরভুক্ত। কাজেই আল্লাহ তো জানেন না আকাশে ও পৃথিবীতে তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে কোন সুপারিশকারী আছে, এটি আসলে সুপারিশকারীদের অস্তিত্বহীনতার ব্যাপারে একটি কৌতুকপ্রদ বর্ণনা পদ্ধতি। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীতে যখন কোন সুপারিশকারী আছে বলে আল্লাহর জানা নেই এখন তোমরা কোন্ সুপারিশকারীদের কথা বলছো?

২৫. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আল-বাকারার ২৩০ এবং সূরা আল আনআমের ২৪ টীকা।

২৬. অর্থাৎ মহান আল্লাহ যদি পূর্বাহ্নেই ফায়সালা না করে নিতেন যে, প্রকৃত সত্যকে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না করে তাদের বুদ্ধি, জ্ঞান, বিবেক ও স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতিকে পরীক্ষার সম্মুখীন করবেন এবং যে ব্যক্তি এ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে ভুল পথে যেতে চাইবে তাকে সে পথে যাবার ও চলার সুযোগ দেয়া হবে, তাহলে প্রকৃত সত্যকে আজই প্রকাশ ও উন্মুক্ত করে দিয়ে সমস্ত মতবিরোধের অবসান ঘটানো যেতে পারতো।

একটি মারাত্মক বিভ্রান্তি দূর করার জন্য এখানে একথাটি বলা হয়েছে। সাধারণভাবে আজো লোকেরা এ বিভ্রান্তিজনিত জটিল সমস্যায় ভুগছে। কুরআন নাযিল হবার সময়ও এ সমস্যাটি তাদের সামনে ছিল। সমস্যাটি হচ্ছে, দুনিয়ায় বহু ধর্ম রয়েছে এবং প্রত্যেক ধর্মের

وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِىٓ
ءَايَاتِنَا ۚ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾
هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ ۖ
وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا۟ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ
ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ
لَهُ ٱلدِّينَ ۖ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿٢٢﴾

৩ রুকূ'

লোকদের অবস্থা হচ্ছে, বিপদের পরে যখন আমি তাদের রহমতের স্বাদ ভোগ করতে দেই তখনই তারা আমার নিদর্শনের ব্যাপারে ধড়িবাজী শুরু করে দেয়।[২৯] তাদেরকে বলো, "আল্লাহ তাঁর চালাকিতে তোমাদের চেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন। তাঁর ফেরেশতারা তোমাদের সমস্ত চালাকি লিখে রাখছে।"[৩০] তিনিই তোমাদের জলে-স্থলে চলাচলের ব্যবস্থা করেন। কাজেই যখন তোমরা নৌকায় চড়ে অনুকূল বাতাসে আনন্দে সফর করতে থাকো, তারপর অকস্মাত বিরুদ্ধ বাতাস প্রবল হয়ে ওঠে, চারদিক থেকে ঢেউয়ের আঘাত লাগতে থাকে এবং আরোহীরা মনে করতে থাকে তারা তরংগ বেষ্টিত হয়ে গেছে তখন সবাই নিজের আনুগত্যকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে তাঁর কাছে দোয়া করতে থাকে এবং বলতে থাকে, "যদি তুমি আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো তাহলে আমরা শোকরগুজার বান্দা হয়ে যাবো।"[৩১]

লোকেরা তাদের নিজেদের ধর্মকে সত্য মনে করে। এ অবস্থায় এগুলোর মধ্যে কোন্ ধর্মটি সত্য এবং কোন্‌টি মিথ্যা তা কেমন করে যাচাই করা যাবে? এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, এ ধর্ম বিরোধ ও মতপার্থক্য আসলে পরবর্তীকালের সৃষ্টি। শুরুতে সমগ্র মানবগোষ্ঠী একই ধর্মের আওতাভুক্ত ছিল। সেটিই ছিল সত্য ধর্ম। তারপর এ সত্যের ব্যাপারে মতবিরোধ করে লোকেরা বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্ম গড়ে যেতে থাকে। এখন যদি ধর্ম-বৈষম্য ও ধর্ম-বিরোধ দূর করার জন্য তোমাদের মতে বুদ্ধি ও চেতনার সঠিক ব্যবহারের পরিবর্তে শুধুমাত্র আল্লাহর নিজেকে সামনে এসে সত্যকে উন্মুক্ত ও আবরণমুক্ত করে তুলে ধরতে হয়, তাহলে বর্তমান পার্থিব জীবনে তা সম্ভব নয়। দুনিয়ার এ জীবনটাতো

পরীক্ষার জন্য। এখানে সত্যকে না দেখে বুদ্ধি ও বিবেচনার সাহায্যে তাকে চিনে নেয়ার পরীক্ষা হয়ে থাকে।

২৭. অর্থাৎ এ ব্যাপারে নিদর্শন যে, তিনি যথার্থই সত্য নবী এবং যা কিছু তিনি পেশ করছেন তা পুরোপুরি ঠিক। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে হবে। সেটি হচ্ছে, নিদর্শন পেশ করার দাবী তারা এ জন্য করেনি যে, তারা সাচ্চা দিলে সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করতে এবং তার দাবী অনুযায়ী নিজেদের স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ, সমাজ ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক জীবন তথা নিজেদের সমগ্র জীবন ঢেলে সাজাতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু নবীর সমর্থনে এ পর্যন্ত তারা এমন কোন নিদর্শন দেখেনি যা দেখে তাঁর নবুওয়াতের প্রতি তাদের বিশ্বাস জন্মাতে পারে। কেবলমাত্র এ জন্যই তারা হাত পা গুটিয়ে বসেছিল। আসলে নিশানীর এ দাবী শুধুমাত্র ঈমান না আনার জন্য একটি বাহানা হিসেবে পেশ করা হচ্ছিল। তাদেরকে যাই কিছু দেখানো হতো তা দেখার পরও তারা একথাই বলতো, আমাদের কোন নিশানীই দেখানো হয়নি। কারণ তারা ঈমান আনতে চাচ্ছিল না। দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক কাঠামো অবলম্বন করে প্রবৃত্তির খায়েশ ও পছন্দ অনুযায়ী যেভাবে ইচ্ছা কাজ করার এবং যে জিনিসের মধ্যে স্বাদ বা লাভ অনুভব করে তার পেছনে দৌড়াবার যে স্বাধীনতা তাদের ছিল তা পরিত্যাগ করে তারা এমন কোন অদৃশ্য সত্য (তাওহীদ ও আখেরাত) মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না যা মেনে নেবার পর তাদের সমগ্র জীবন ব্যবস্থাকে স্থায়ী ও স্বতন্ত্র নৈতিক বিধানের বাঁধনে বেঁধে ফেলতে হতো।

২৮. আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন তা আমি পেশ করে দিয়েছি। আর যা তিনি নাযিল করেননি তা আমার ও তোমাদের জন্য "অদৃশ্য" এর ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ইখতিয়ার নেই। তিনি চাইলে তা নাযিল করতে পারেন আবার চাইলে নাও করতে পারেন। এখন আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেননি তা আগে তিনি নাযিল করুন—একথার ওপর যদি তোমাদের ঈমান আনার বিষয়টি আটকে থাকে তাহলে তোমরা তার অপেক্ষায় বসে থাকো। আমিও দেখবো, তোমাদের এ জিদ পুরো করা হয় কিনা।

২৯. ১১-১২ আয়াতে যে দুর্ভিক্ষের কথা বলা হয়েছে এখানে আবার তারই প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এর মানে, তোমরা কোন্ মুখে নিদর্শন চাইছো? এ কিছুদিন আগে তোমরা একটি দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হয়েছিলে। তাতে তোমরা নিজেদের মাবুদদের থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছিলে। তোমরা এ মাবুদদেরকে আল্লাহর কাছে নিজেদের সুপারিশকারী বানিয়ে রেখেছিলে। এদের সম্পর্কে তোমরা বলে বেড়াতে : "অমুক বেদী-মূলে অর্ঘ পেশ করা মাত্রই ফল পাওয়া যায়" এবং "অমুক দরগায় সিন্নি দিলে নির্ঘাত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়।" এবার তোমরা দেখে নিয়েছো, এসব তথাকথিত উপাস্য ও মাবুদদের হাতে কিছুই নেই। একমাত্র আল্লাহই সমস্ত ক্ষমতার মালিক। এ জন্যই তো তোমরা সর্বশেষে একমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের যে শিক্ষা দিচ্ছেন তার সত্যতার প্রতি তোমাদের মনে বিশ্বাস জন্মাতো, এ নিদর্শনটিই কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল না? কিন্তু এ নিদর্শন দেখে তোমরা কি করেছো? যখনই দুর্ভিক্ষের অবসান হয়েছে এবং আল্লাহর রহমতের বারি সিঞ্চনে তোমাদের বিপদ দূরীভূত হয়েছে তখনই তোমরা এ বিপদ আসার ও দূরীভূত হবার হাজারটা ব্যাখ্যা (চালাকি) করতে শুরু করেছো। এভাবে তোমরা

فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ
اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ
فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٣﴾ اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ
اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ
وَالْاَنْعَامُ ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَآ
اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ ۙ اَتٰىهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا
كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾

কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে বিপদমুক্ত করেন তখন তারাই সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে বিদ্রোহ করতে থাকে। হে মানুষ! তোমাদের এ বিদ্রোহ উলটা তোমাদের বিরুদ্ধেই চলে যাচ্ছে। দুনিয়ার কয়েকদিনের আরাম আয়েশ (ভোগ করে নাও), তারপর আমার দিকেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তোমরা কি কাজে লিপ্ত ছিলে তা তখন তোমাদের আমি জানিয়ে দেবো। দুনিয়ার এ জীবন (যার নেশায় মাতাল হয়ে তোমরা আমার নিশানীগুলোর প্রতি উদাশীন হয়ে যাচ্ছো) এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন আকাশ থেকে আমি পানি বর্ষণ করলাম, তার ফলে যমীনের উৎপাদন, যা মানুষ ও জীব-জন্তু খায়, ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে গেল। তারপর ঠিক এমন সময় যখন যমীন তার ভরা বসন্তে পৌঁছে গেল এবং ক্ষেতগুলো শস্যশ্যামল হয়ে উঠলো। আর তার মালিকরা মনে করলো এবার তারা এগুলো ভোগ করতে সক্ষম হবে, এমন সময় অকস্মাত রাতে বা দিনে আমার হুকুম এসে গেলো। আমি তাকে এমনভাবে ধ্বংস করলাম যেন কাল সেখানে কিছুই ছিল না। এভাবে আমি বিশদভাবে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করে থাকি তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

তাওহীদকে মেনে নেয়া থেকে নিষ্কৃতি পেতে এবং নিজেদের শিরকের ওপর অবিচল থাকতে চাও। এখন যারা নিজেদের বিবেককে এভাবে নষ্ট করে দিয়েছে তাদেরকে কোন্ ধরনের নিদর্শন দেখানো হবে এবং তা দেখানোর ফায়দা বা কি হবে?

৩০. আল্লাহর চালাকি মানে হচ্ছে, যদি তোমরা সত্যকে না মেনে নাও এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের মনোভাবের পরিবর্তন না করো তাহলে তিনি তোমাদের এ বিদ্রোহাত্মক

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ۭ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۗءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٢٥
لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ۭ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا
ذِلَّةٌ ۭ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝٢٦ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا
السَّيِّاٰتِ جَزَاۗءُ سَيِّئَةٍۢ بِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۭ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ
عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ۭ اُولٰۗىِٕكَ
اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝٢٧

(তোমরা এ অস্থায়ী জীবনের প্রতারণা জালে আবদ্ধ হচ্ছো) আর আল্লাহ তোমাদের শান্তির ভুবনের দিকে আহবান জানাচ্ছেন।[৩২] (হেদায়াত তাঁর ইখতিয়ারভুক্ত) যাকে তিনি চান সোজা পথ দেখান। যারা কল্যাণের পথ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আছে কল্যাণ এবং আরো বেশী।[৩৩] কলংক কালিমা বা লাঞ্ছনা তাদের চেহারাকে আবৃত করবে না। তারা জান্নাতের হকদার, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আর যারা খারাপ কাজ করেছে, তারা তাদের খারাপ কাজ অনুযায়ীই প্রতিফল পাবে।[৩৪] লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। আল্লাহর হাত থেকে তাদেরকে বাঁচাবার কেউ থাকবে না। তাদের চেহারা যেন আঁধার রাতের কালো আবরণে আচ্ছাদিত হবে।[৩৫] তারা দোজখের হকদার, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

নীতি অবলম্বন করে চলার সুযোগ করে দেবেন। তোমরা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তিনি নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের রিযিক ও অনুগ্রহ দান করতে থাকবেন। এর ফলে তোমাদের জীবন সামগ্রী এভাবেই তোমাদের মোহান্ধ করে রাখবে। এ মোহান্ধতার মধ্যে তোমরা যা কিছু করবে আল্লাহর ফেরেশতারা নীরবে বসে বসে তা লিখে নিতে থাকবেন। এভাবে এক সময় অকস্মাত মৃত্যুর পয়গাম এসে যাবে। তখন নিজেদের কৃতকর্মের হিসাব দেবার জন্য তোমাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হবে।

৩১. প্রত্যেক মানুষের অন্তরে রয়েছে তাওহীদের সত্যতার নিশানী। যতদিন উপায়-উপকরণ অনুকূল থাকে ততদিন মানুষ আল্লাহকে ভুলে পার্থিব জীবন নিয়ে অহংকারে মত্ত হয়ে থাকে। আর উপায় উপকরণ প্রতিকূল হয়ে গেলে এবং এ সংগে যেসব সহায়ের ভিত্তিতে সে পৃথিবীতে বেঁচেছিল সেগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেলে তারপর কট্টর মুশরিক ও নাস্তিকের মনেও এ সাক্ষ ধ্বনিত হতে থাকে যে, কার্যকারণের এ সমগ্র জগতের ওপর কোন আল্লাহর কর্তৃত্ব পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, তিনি একক আল্লাহ এবং তিনি শক্তিশালী ও বিজয়ী (আনআম ২৯ টীকা দেখুন)।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ
وَشُرَكَاؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾
فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴿٢٩﴾
هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٠﴾

যেদিন আমি তাদের সবাইকে এক সাথে (আমার আদালতে) একত্র করবো তারপর যারা শিরক করেছে তাদেরকে বলবো, থেমে যাও তোমারাও এবং তোমাদের তৈরী করা শরীকরাও। তারপর আমি তাদের মাঝখান থেকে অপরিচিতির আবরণ সরিয়ে নেবো।[৩৬] তখন তারা যাদেরকে শরীক করেছিল তারা বলবে, "তোমরা তো আমাদের ইবাদাত করতে না। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহর সাক্ষ যথেষ্ট, (তোমরা আমাদের ইবাদাত করতে থাকলেও) আমরা তোমাদের এ ইবাদাত সম্পর্কে কিছুই জানতাম না।"[৩৭] সে সময় প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কৃতকর্মের স্বাদ নেবে। সবাইকে তার প্রকৃত মালিক আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তারা যে সমস্ত মিথ্যা তৈরী করে রেখেছিল তা সব উধাও হয়ে যাবে।

৩২. অর্থাৎ দুনিয়ায় জীবন যাপন করার এমন পদ্ধতির দিকে তোমাদের আহবান জানানো, যা আখেরাতের জীবনে তোমাদের দারুস সালাম বা শান্তির ভবনের অধিকারী করে। দারুস সালাম বলতে জান্নাত বুঝানো হয়েছে এবং এর মানে হচ্ছে শান্তি ও নিরাপত্তার ভবন বা গৃহ। এমন জায়গাকে দারুস সালাম বলা হয়েছে যেখানে কোন বিপদ, ক্ষতি, দুঃখ ও কষ্ট নেই।

৩৩. তারা কেবল তাদের নেকী অনুযায়ীই প্রতিদান পাবে না বরং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে পুরস্কৃতও করবেন।

৩৪. অর্থাৎ নেককারদের মোকাবিলায় বদকারদের সাথে যে ব্যবহার করা হবে তা হচ্ছে এই যে, তারা যে পরিমাণ খারাপ কাজ করেছে তাদেরকে সেই পরিমাণ শাস্তি দেয়া হবে। অপরাধের চাইতে একটু সামান্য পরিমাণ বেশী শাস্তিও তাদেরকে দেয়া হবে না। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা নামল ১০৯ (ক) টীকা)।

৩৫. অর্থাৎ পাকড়াও হবার এবং উদ্ধার পাওয়ার সকল আশা তিরোহিত হবার পর অপরাধীদের চেহারার ওপর যে অন্ধকার ছেয়ে যায়।

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَ
مَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ
يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٣١﴾ فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ
رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ﴿٣٢﴾ كَذٰلِكَ
حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٣﴾

৪ রুকূ'

তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, "কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দেয়? এই শুনার ও দেখার শক্তি কার কর্তৃত্বে আছে? কে প্রাণহীন থেকে সজীবকে এবং সজীব থেকে প্রাণহীনকে বের করে? কে চালাচ্ছে এই বিশ্ব-ব্যবস্থাপনা? তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ। বলো, তবুও কি তোমরা (সত্যের বিরোধী পথে চলার ব্যাপারে) সতর্ক হচ্ছো না? তাহলে তো এ আল্লাহই তোমাদের আসল রব।[৩৮] কাজেই সত্যের পরে গোমরাহী ও বিভ্রান্তি ছাড়া আর কি বাকি আছে? সুতরাং তোমরা কোন্‌দিকে চালিত হচ্ছো?[৩৯] (হে নবী! দেখো) এভাবে নাফরমানীর পথ অবলম্বনকারীদের ওপর তোমার রবের কথা সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না।[৪০]

৩৬. মূল আয়াতে বলা হয়েছে فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ কোন কোন তাফসীরকার এর অর্থ করেছেন : আমরা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করবো, যাতে কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে তারা পরস্পরকে মর্যাদা না দেয়। কিন্তু এ অর্থ প্রচলিত আরবী বাকরীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। আরবী বাকরীতি অনুযায়ী এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেবো অথবা তাদেরকে পরস্পর থেকে পৃথক করে দেবো। এ অর্থ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে আমরা এ বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করেছি যে, "তাদের মধ্য থেকে আমি অপরিচিতির পরদা সরিয়ে দেবো।" অর্থাৎ মুশরিকরা ও তাদের উপাস্যরা সামনাসামনি অবস্থান করবে এবং উভয় দলের পরিচিতি উভয়ের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। মুশরিকরা জানবে, এদেরকেই আমরা দুনিয়ায় মাবুদ বানিয়ে রেখেছিলাম। অন্যদিকে তাদের মাবুদরাও জানবে এরাই তাদেরকে মাবুদ বানিয়ে রেখেছিল।

৩৭. অর্থাৎ এমন সব ফেরেশতা যাদেরকে দুনিয়ায় দেবদেবী বানিয়ে পূজা করা হয়েছে এবং এমন সব জিন, রূহ, পূর্ববর্তী মনীষী, পূর্ব পুরুষ, নবী, অলী, শহীদ ইত্যাদি যাদেরকে আল্লাহর গুণাবলীতে অংশীদার করে এমন অধিকারসমূহ দান করা হয়েছে যেগুলো

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٤﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ؕ اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۫ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ؕ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾

তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমাদের তৈরী করা শরীকদের মধ্যে কেউ আছে কি যে সৃষ্টির সূচনা করে আবার তার পুনরাবৃত্তিও করে?—বলো, একমাত্র আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করে এবং তার পুনরাবৃত্তিও ঘটান,[৪১] কাজেই তোমরা কোন্ উল্টো পথে চলে যাচ্ছো?[৪২]

তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমাদের তৈরী করা শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে সত্যের দিকে পথনির্দেশ করে?[৪৩] বলো, একমাত্র আল্লাহই সত্যের দিকে পথনির্দেশ করেন তাহলে বলো, যিনি সত্যের দিকে পথনির্দেশ করেন তিনি আনুগত্য লাভের বেশী হকদার না যাকে পথ না দেখালে পথ পায় না—সে বেশী হকদার? তোমাদের হয়েছে কি? কেমন উল্টো সিদ্ধান্ত করে বসছো?

আসলে তাদের বেশীরভাগ লোকই নিছক আন্দাজ–অনুমানের পেছনে চলছে।[৪৪] অথচ আন্দাজ–অনুমান দ্বারা সত্যের প্রয়োজন কিছুমাত্র মেটে না। তারা যা কিছু করছে তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন।

ছিল আল্লাহর অধিকার। তারা সেখানে নিজেদের পূজারীদেরকে পরিষ্কার বলে দেবে, তোমরা যে আমাদের পূজা করতে তা তো আমরা জানতামই না। তোমাদের কোন দোয়া, আকুতি, আবেদন, নিবেদন, ফরিয়াদ, নযরানা, মানত, শিরনী, প্রশংসা, স্তবস্তুতি, জপতপ এবং কোন সিজদা, বেদী চুম্বন ও দরগাহ প্রদক্ষিণ আমাদের কাছে পৌঁছেনি।

৩৮. অর্থাৎ যদি এসবই আল্লাহর কাজ হয়ে থাকে, যেমন তোমরা নিজেরাও স্বীকার করে থাকো, তাহলে তো প্রামাণিত হলো যে, একমাত্র আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত মালিক, প্রতিপালক, প্রভু এবং তোমাদের বন্দেগী ও ইবাদাতের হকদার। কাজেই অন্যেরা, যাদের এসব কাজে কোন অংশ নেই তারা কেমন করে রবের দায়িত্বে শরীক হয়ে গেলো।

৩৯. মনে রাখতে হবে, এখানে সাধারণ লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদেরকে একথা বলা হচ্ছে না যে, তোমরা কোন্ দিকে চলে যাচ্ছো? বরং বলা হচ্ছে, "তোমরা কোন্ দিকে চালিত হচ্ছো?" এ থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, এমন কিছু বিভ্রান্তকারী ব্যক্তি বা দল আছে যারা লোকদেরকে সঠিক দিক থেকে টেনে নিয়ে ভুল দিকে ফিরিয়ে দেয়। তাই মানুষকে আবেদন জানানো হচ্ছে, তোমরা অন্ধ হয়ে ভুল পথপ্রদর্শনকারীদের পেছনে ছুটে যাচ্ছো কেন? নিজেদের বুদ্ধি ব্যবহার করে চিন্তা করছো না কেন যে, প্রকৃত সত্য যখন এই, তখন তোমাদেরকে কোন্ দিকে চালিত করা হচ্ছে? এরূপ ক্ষেত্রে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় লোকদেরকে এ ধরনের প্রশ্ন করার রীতি অনুসৃত হয়েছে। এসব জায়গায় বিভ্রান্তকারীদের নাম না নিয়ে তাদেরকে উহ্য বা পর্দান্তরালে রাখা হয়েছে, যাতে তাদের ভক্ত-অনুরক্তরা ঠাণ্ডা মাথায় নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে এবং কোন ব্যক্তি একথা বলে তাদেরকে উত্তেজিত করার এবং তাদের চিন্তাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভারসাম্য বিনষ্ট করার সুযোগ না পায় যে, দেখো তোমাদের মুরব্বী ও নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করা হচ্ছে এবং তাদেরকে আঘাত দেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে প্রচার কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এ ব্যাপারে সজাগ থাকা উচিত।

৪০. অর্থাৎ এমনি ধরনের সব স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন ও সহজবোধ্য যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে বক্তব্য বুঝানো হয় কিন্তু যারা মানবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছে তারা একগুঁয়েমীর বশবর্তী হয়ে কোন প্রকারেই মেনে নিচ্ছে না।

৪১. সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে মুশরিকরাও স্বীকার করতো যে, এটা একমাত্র আল্লাহরই কাজ। তাঁর সাথে যাদেরকে তারা শরীক করে তাদের কারো এ কাজে কোন অংশ নেই। আর সৃষ্টির পুনরাবৃত্তির ব্যাপারটিও সুস্পষ্ট। অর্থাৎ প্রথমে যিনি সৃষ্টি করেন তাঁর পক্ষেই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা সম্ভব। কিন্তু যে প্রথমবারই সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি সে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে পারে কেমন করে? এটি যদিও একটি অকাট্য যুক্তিসংগত কথা এবং মুশরিকদের মন ও ভেতর থেকে এর সত্যতার সাক্ষ দিতো তবুও তারা শুধুমাত্র এ কারণে একথা স্বীকার করতে ইতস্তত করতো যে, এটা মেনে নিলে পরকাল অস্বীকার করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণেই পূর্ববর্তী প্রশ্নের জবাবে তো আল্লাহ বললেন যে, তারা নিজেরাই বলবে যে, এটা আল্লাহর কাজ। কিন্তু এখানে এর পরিবর্তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হচ্ছে, তুমি জোরালো কণ্ঠে বলে দাও প্রথমবারের সৃষ্টি এবং সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি সবই একমাত্র আল্লাহর কাজ।

৪২. অর্থাৎ যখন তোমাদের জীবনের সূচনার প্রান্তভাগ আল্লাহর হাতে এবং শেষের প্রান্ত ভাগও তাঁরই হাতে। তখন নিজেদের কল্যাণকামী হয়ে একবার ভেবে দেখো, তোমাদের কিভাবে একথা বুঝানো হচ্ছে যে, এ দুই প্রান্তের মাঝখানে আল্লাহ ছাড়া অন্য জন তোমাদের বন্দেগী ও নযরানা পাওয়ার অধিকার লাভ করেছে?

৪৩. এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। একটু বিস্তারিতভাবে এটিকে বুঝে নিতে হবে। দুনিয়ায় মানুষের প্রয়োজন শুধুমাত্র তার খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও জীবন যাপনের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লাভ করা এবং বিপদ-আপদ ও ক্ষতি থেকে সংরক্ষিত থাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং জীবন যাপন করার সঠিক পদ্ধতি জানাও তার একটি প্রয়োজন (এবং সবচেয়ে বড় প্রয়োজন)। তার আরো জানতে হবে, নিজের ব্যক্তিগত সত্তার

সাথে, নিজের শক্তি, সামর্থ, যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার সাথে, পৃথিবীতে যে উপায়-উপকরণ ও সাজ-সরঞ্জাম তার কর্তৃত্বাধীনে আছে তার সাথে, যে অসংখ্য মানুষের সাথে বিভিন্নভাবে তাকে জড়িত হতে হয় তাদের সাথে এবং সামগ্রিকভাবে যে বিশ্ব ব্যবস্থার আওতাধীনে তাকে কাজ করতে হয় তার সাথে তার কি ব্যবহার করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে। এটা জানা এ জন্য প্রয়োজন যেন তার জীবন সামগ্রিকভাবে সফলকাম হয় এবং তার প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম বিভিন্ন ভুল পথে নিয়োজিত হয়ে ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়। এ সঠিক পদ্ধতির নাম হক বা সত্য আর যে পথনির্দেশনা মানুষকে এ পদ্ধতির দিকে নিয়ে যায় সেটিই 'হকের হেদায়াত' বা 'সত্যের পথনির্দেশনা।' কুরআন সমস্ত মুশরিককে এবং নবীর শিক্ষা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এমন সকল লোককে জিজ্ঞেস করে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের বন্দেগী করো তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যার মাধ্যমে তোমরা 'সত্যের পথনির্দেশনা' লাভ করতে পার? অবশ্যি সবাই জানে, এর জবাব 'না' ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের বন্দেগী করে তারা দুটি বড় বড় ভাগে বিভক্ত।

এক ঃ দেব-দেবী, জীবিত ও মৃত মানুষ, যাদের পূজা করা হয়। তারা অলৌকিক পদ্ধতিতে মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করবে এবং তাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবে-এ উদ্দেশ্যেই মানুষ তাদের দিকে রুজু হয়। আর সত্যের পথনির্দেশনার ব্যাপারে বলা যায়, এ জিনিসটা কখনো ঐসব দেব-দেবী ইত্যাদির পক্ষ থেকে আসেওনি, মুশরিকরাও কখনো এ জন্য তাদের কাছে ধর্ণা দেয়নি এবং কোন মুশরিক একথা বলেও না যে, তার দেবতারা তাকে নৈতিকতা, সামাজিক জীবন-যাপন পদ্ধতি, সাংস্কৃতিক বিধান, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন-আদালত ইত্যাদির মূলনীতি শেখায়।

দুই ঃ এমন ধরনের মানুষ যাদের রচিত নীতিমালা ও আইনের আনুগত্য করা হয়। এ দিক দিয়ে তারা যে নেতা এবং পথপ্রদর্শক, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তারা কি সত্যপন্থী নেতা বা নেতা হতে পারে? মানুষের জীবন যাপনের সঠিক মূলনীতি রচনা করার জন্য যেসব তত্ব জানা প্রয়োজন তাদের কেউ কি সেসব সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান রাখে? মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলো যে বিস্তীর্ণ পরিসরে ছড়িয়ে আছে, তাদের কারো দৃষ্টি কি তার সবটার ওপর পৌছে যায়? তাদের কেউ কি এমন সব দুর্বলতা, স্বার্থ প্রীতি, একদেশদর্শিতা, গোষ্ঠীপ্রীতি, ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত আশা-আকাংখা, লোভ-লালসা ও ঝোঁক প্রবণতা থেকে মুক্ত যা মানুষের সমাজ জীবনের জন্য ন্যায়নিষ্ঠ আইন প্রণয়নের পথে বাধা হয়ে থাকে? জবাব যদি না বাচক হয় এবং এ কথা সুস্পষ্ট যে, কোন সুস্থ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি এ প্রশ্নগুলোর হাঁ বাচক জবাব দিতে পারবেন না তাহলে এরা কি সত্য পথনির্দেশনার উৎস হতে পারে?

এ কারণে কুরআন এ প্রশ্ন করে, হে লোকেরা! তোমাদের এ ধর্মীয় ও তামাদ্দুনিক প্রভুদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে তোমাদের সত্য সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করতে পারে? ওপরের প্রশ্নগুলোর সাথে মিলে এ শেষ প্রশ্নটি দীন ও ধর্মের সমগ্র বিষয়ের ফায়সালা করে দেয়। মানুষের সমস্ত প্রয়োজন দুই ধরনের, এক ধরনের প্রয়োজন হচ্ছে, তার একজন প্রতিপালক হবে, একজন আশ্রয়দাতা হবে, একজন প্রার্থনা শ্রবণকারী ও অভাব পূরণকারী হবে। এ কার্যকারণের জগতের অস্থায়ী ও অস্থিতিশীল সহায়গুলোর মধ্যে

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ
الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٧﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۭ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا
مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٨﴾ بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ
يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ۭ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٩﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمِنْهُمْ
مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ۭ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤٠﴾

আর এ কুরআন আল্লাহর অহী ও শিক্ষা ছাড়া রচনা করা যায় না। বরং এ হচ্ছে যা কিছু আগে এসেছিল তার সত্যায়ন এবং আল কিতাবের বিশদ বিবরণ।[৪৫] এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি বিশ্ব-জাহানের অধিকর্তার পক্ষ থেকে এসেছে।

তারা কি একথা বলে যে, পয়গম্বর নিজেই এটি রচনা করেছে? বলো, "তোমাদের এ দোষারোপের ব্যাপারে তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে এরই মতো একটি সূরা রচনা করে আনো এবং এক আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে যাকে ডাকতে পারো সাহায্যের জন্য ডেকে নাও।[৪৬] আসল ব্যাপার হচ্ছে, যে জিনিসটি এদের জ্ঞানের আওতায় আসেনি এবং যার পরিণামও এদের সামনে নেই তাকে এরা (অনর্থক আন্দাজে) মিথ্যা বলে।[৪৭] এমনিভাবে এদের আগের লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছে। কাজেই দেখো জালেমদের পরিণাম কী হয়েছে! তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক ঈমান আনবে এবং কিছু লোক ঈমান আনবে না। আর তোমার রব এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে ভালভাবেই জানেন।[৪৮]

অবস্থান করে সে তার স্থায়ী সহায় অবলম্বন করতে পারবে। বস্তুত ওপরের প্রশ্নগুলো এ ফায়সালা করে দিয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এ প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারবে না। আর এক ধরনের প্রয়োজন হচ্ছে এই যে, এমন একজন পথপদর্শক থাকতে হবে যিনি দুনিয়ায় বসবাস করার সঠিক নীতি নির্ধারণ করে দেবেন এবং যার দেয়া জীবন বিধানের আনুগত্য পরিপূর্ণ আস্থার সাথে করা যেতে পারে। এই শেষ প্রশ্নটি এ ব্যাপারটিরও মীমাংসা করে দিয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহই সেই পথপ্রদর্শক হতে পারেন। এরপরে একমাত্র জিদ

ও হঠকারিতা ছাড়া মানুষের মুশরিকী ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) তামাদ্দুনিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক নীতির সাথে লেপটে থাকার আর কোন কারণ থাকে না।

৪৪. অর্থাৎ যারা বিভিন্ন ধর্ম প্রবর্তন করেছে, দর্শন রচনা করেছে এবং জীবন বিধান তৈরী করেছে, তারাও এসব কিছু জ্ঞানের ভিত্তিতে নয় বরং আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে করেছে। আর যারা এসব ধর্মীয় ও দীনী নেতৃবৃন্দের আনুগত্য করেছে তারাও জেনেবুঝে নয় বরং নিছক অনুমানের ভিত্তিতে তাদের পেছনে চলেছে। কারণ তারা মনে করে, এত বড় বড় লোকেরা যখন একথা বলেন এবং আমাদের বাপ-দাদারা এসব মেনে আসছেন আবার এ সংগে দুনিয়ার বিপুল সংখ্যক লোক এগুলো মেনে নিয়ে এ অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে তখন নিশ্চয়ই এই লোকেরা ঠিক কথাই বলে থাকবেন।

৪৫. "যা কিছু আগে এসে গিয়েছিল তার সত্যায়ণ"—অর্থাৎ শুরু থেকে নবীদের মাধ্যমে মানুষকে যে মৌলিক শিক্ষা দান করা হতে থাকে এ কুরআন তা থেকে সরে গিয়ে কোন নতুন জিনিস পেশ করছে না। বরং তার সত্যতা প্রমাণ করছে এবং তাকে পাকাপোক্ত করছে। যদি এটা কোন নতুন ধর্মপ্রবর্তকের মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী ক্ষমতার ফসল হতো, তাহলে অবশ্যি এর মধ্যে পুরাতন সত্যগুলোর সাথে কিছু নিজের অভিনব বক্তব্য মিশিয়ে দিয়ে এর একটা অভিনব ও বিশিষ্ট চরিত্র ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা দেখা যেতো।

"আল কিতাবের বিশদ বিবরণ"—অর্থাৎ সমস্ত আসমানী কিতাবের সারমর্ম যে মৌলিক শিক্ষাবলীর সমষ্টি, সেগুলো এর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে যুক্তি-প্রমাণ সহকারে উপদেশ দান ও বুঝাবার ভংগীতে, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং বাস্তব অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪৬. সাধারণভাবে লোকেরা এ চ্যালেঞ্জটিকে নিছক কুরআনের ভাষাশৈলী অলংকার ও সাহিত্য সুষমার দিক দিয়ে ছিল বলে মনে করে। কুরআনের অলৌকিকতার ওপর যেভাবে আলোচনা করা হয়েছে তার ফলে এ ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কুরআন যে, তার অনন্য ও অতুলনীয় হবার দাবীর ভিত্তি নিছক নিজের শাব্দিক সৌন্দর্য সুষমার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেনি, এ ধরনের সীমিত ব্যাপার থেকে কুরআনের মর্যাদা অনেক উর্ধে। নিসন্দেহে ভাষাশৈলীর দিক দিয়েও কুরআন নজিরবিহীন। কিন্তু মূলত যে জিনিসটির ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, কোন মানবিক মেধা ও প্রতিভা এহেন কিতাব রচনা করতে পারে না, সেটি হচ্ছে তার বিষয়বস্তু ও শিক্ষা। এর মধ্যে অলৌকিকতার যেসব দিক রয়েছে এবং যেসব কারণে বলা যায় যে, এটি নিসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা কিতাব এবং কোন মানুষের পক্ষে এ ধরনের কিতাব রচনা করা অসম্ভব, তা এ কুরআনেরই বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের বর্ণনা ইতিপূর্বে যেখানেই এসেছে সেখানে আমরা তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে এসেছি এবং পরবর্তিতেও করে যেতে থাকবো। তাই কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এখানে এর আলোচনা করা হলো না। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন আত-তূর টীকা ২৬, ২৭)।

৪৭. কুরআনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার দু'টি ভিত্তি হতে পারতো। গবেষণা করে তথ্য প্রমাণাদির মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যেতো যে, এটি বানোয়াট ও নকল। অথবা এতে যে

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُمْ بَرِيئُونَ
مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ
أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ
أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ
النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾

৫ রুকূ'

যদি তারা তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তাহলে তুমি বলে দাও, "আমার আমল আমার জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমি যা কিছু করি তার দায়িত্ব থেকে তোমরা মুক্ত এবং তোমরা যা কিছু করছো তার দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত।[৪৯]

তাদের মধ্যে বহু লোক আছে যারা তোমার কথা শোনে। কিন্তু তুমি কি বধিরদের শুনাবে, তারা কিছু না বুঝলেও?[৫০] *তাদের মধ্যে বহু লোক আছে যারা তোমাকে দেখে। কিন্তু তুমি কি অন্ধদের পথ দেখাবে, তারা কিছু না দেখতে পেলেও?*[৫১] *আসলে আল্লাহ মানুষের প্রতি জুলুম করেন না, মানুষ নিজেই নিজের প্রতি জুলুম করে।*[৫২]

সত্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং যে খবর দেয়া হয়েছে তা মিথ্যা প্রমাণিত হলে তার ভিত্তিতে এ মিথ্যা সাব্যস্তকরণকে যুক্তিসঙ্গত মনে করা যেতো। কিন্তু মিথ্যা সাব্যস্ত করার এ দু'টি কারণের মধ্য থেকে কোন একটি কারণও এখানে বর্তমান নেই। কোন ব্যক্তি একথা বলতে পারে না যে, এ কিতাবটি কেউ নিজে তৈরী করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিয়েছে, একথা সে তথ্য-জ্ঞানের ভিত্তিতে জানে। কেউ অদৃশ্যের পরদা উন্মোচন করে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখেও নেয়নি যে, সত্যিই সেখানে বহুসংখ্যক খোদা রয়েছে এবং এ কিতাবটিতে অনর্থক শুধুমাত্র একজন ইলাহর কথা শুনানো হচ্ছে। অথবা আসলে আল্লাহ, ফেরেশতা, অহী ইত্যাদির কোন সত্যতাই নেই এবং এ কিতাবে অযথা এসব গালগল্প বানিয়ে নেয়া হয়েছে। কেউ মরে গিয়েও দেখে নেয়নি যে, এ কিতাবে বর্ণিত পরকালীন জীবন এবং তার হিসাব নিকাশ ও শাস্তি-পুরস্কারের সমস্ত কাহিনীই মিথ্যা। কিন্তু এ সত্ত্বেও নিছক সন্দেহ ও ধারণার ভিত্তিতে এমনভাবে একে মিথ্যা বলা হচ্ছে যে, তাতে মনে হয় যেন এটি যে নকল ও মিথ্যা তা তাত্ত্বিকভাবেই চূড়ান্ত অনুসন্ধানের মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়ে গেছে।

৪৮. যারা ঈমান আনে না তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, "আল্লাহ এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে খুব ভাল করেই জানেন।" অর্থাৎ নবীর কথা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না বলে সদিচ্ছা সহকারেই আমরা তা মেনে নিতে পারছি না। এরূপ অজুহাত দিয়ে তারা দুনিয়াবাসীর মুখ বন্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু মনের গোপন কথা যিনি জানেন সেই আল্লাহ তাদের প্রতিটি ব্যক্তি সম্পর্কে জানেন, সে কিভাবে নিজের হৃদয় ও মস্তিষ্কের দরজায় তালা এঁটে দিয়েছে, নিজেই নিজেকে গাফলতির সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছে, নিজের বিবেকের কণ্ঠরোধ করেছে, নিজের অন্তরে সত্যের সাক্ষকে দমিয়ে দিয়েছে এবং নিজের মস্তিষ্ক থেকে সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতার বিলুপ্তি ঘটিয়েছে। সে শুনেও শোনেনি। বুঝেও না বুঝার ভান করেছে। সত্যের মোকাবিলায় নিজের অন্ধ বিদ্বেষকে, নিজের পার্থিব স্বার্থকে নিজের বাতিলের সাথে সংঘর্ষমুখর স্বার্থকে এবং নিজের নফসানী খাহেশ ও আগ্রহকে প্রাধান্য দিয়েছে। তাই সে "নিষ্পাপ ভ্রষ্টাচারী" নয় বরং প্রকৃত অর্থে বিপর্যয়কারী।

৪৯. অর্থাৎ অযথা বিরোধ ও কূটতর্ক করার কোন প্রয়োজন নেই। যদি আমি মিথ্যা আরোপ করে থাকি তাহলে আমার কাজের জন্য আমি দায়ী হবো। এর কোন দায়ভার তোমাদের ওপর পড়বে না। আর যদি তোমরা সত্য কথাকে মিথ্যা বলে থাকো তাহলে এর মাধ্যমে আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বরং এর দ্বারা তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করছো।

৫০. শ্রবণ কয়েক রকমের হতে পারে। পশুরা যেমন আওয়াজ শোনে তেমনি এক ধরনের শ্রবণ আছে। আবার আর এক ধরনের শ্রবণ হয়, যার মধ্যে অর্থের দিকে নজর থাকে এবং এমনি ধরনের একটা প্রবণতা দেখা দেয় যে, যুক্তিসংগত কথা হলে মেনে নেয়া হবে। যারা কোন প্রকার বদ্ধ ধারণা বা অন্ধ বিদ্বেষে আক্রান্ত থাকে এবং যারা আগে থেকেই ফায়সালা করে বসে থাকে যে, নিজের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আকীদা-বিশ্বাস ও পদ্ধতিসমূহের বিরুদ্ধে এবং নিজের প্রবৃত্তির আশা-আকাংখা ও আগ্রহ বিরোধী কথা যত যুক্তিসংগতই হোক না কেন মেনে নেবো না, তারা সবকিছু শুনেও আসলে কিছুই শোনে না। তেমনিভাবে যারা দুনিয়ায় পশুদের মতো উদাসীন জীবন যাপন করে, চারদিকে বিচরণ করা ছাড়া আর কিছুতেই যাদের আগ্রহ নেই অথবা যারা প্রবৃত্তির স্বাদ-আনন্দের পেছনে এমন পাগলের মতো দৌড়ায় যে, তারা নিজেরা যা কিছু করছে তার ন্যায় বা অন্যায় হবার কথা চিন্তা করে না তারা শুনেও শোনে না। এ ধরনের লোকদের কান বধির হয় না কিন্তু মন বধির হয়।

৫১. ওপরের বাক্যাংশে যে কথা বলা হয়েছে এখানেও সেই একই কথা বলা হয়েছে। চোখের দৃষ্টি উন্মুক্ত থাকলে কোন লাভ নেই, চোখ দিয়ে তো পশুরাও দেখে। আসল জিনিস হচ্ছে মনের দৃষ্টি উন্মুক্ত থাকা। এ জিনিসটি যদি কারোর অর্জিত না হয়ে থাকে তাহলে সে সবকিছু দেখেও কিছুই দেখে না।

এ আয়াত দু'টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তিনি যাদের সংশোধন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ উচ্চারণ করা হচ্ছে। আর এ নিন্দাবাদের উদ্দেশ্য নিছক নিন্দাবাদ নয় বরং বিদ্রূপবানে বিদ্ধ করে তাদের সুপ্ত মনুষত্বকে জাগিয়ে তোলা এবং চোখ ও কানের মাধ্যমে তাদের মনের ভেতরে প্রবেশ করার পথ খুলে দেয়াই এর উদ্দেশ্য। এভাবে যুক্তিসঙ্গত কথা ও সমবেদনাপূর্ণ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ۭ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاۗءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۝۴۵ وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰي مَا يَفْعَلُوْنَ ۝۴۶ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَاۗءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝۴۷

(আজ তারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে মত্ত হয়ে আছে) আর যেদিন আল্লাহ তাদেরকে একত্র করবেন সেদিন (এ দুনিয়ার জীবন তাদের কাছে এমন ঠেকবে) যেন মনে হবে তারা পরস্পরের মধ্যে পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে নিছক একদণ্ডের জন্য অবস্থান করেছিল।[৫৩] (সে সময় নিশ্চিতভাবে জানা যাবে) প্রকৃতপক্ষে যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে মিথ্যা বলেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে[৫৪] এবং তারা মোটেই সঠিক পথে ছিল না। তাদেরকে যেসব খারাপ পরিণামের ভয় দেখাচ্ছি সেগুলোর কোন অংশ যদি তোমার জীবদ্দশায় দেখিয়ে দেই অথবা এর আগেই তোমাকে উঠিয়ে নেই, সর্বাবস্থায় তাদের আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে এবং তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তার সাক্ষী।

প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রসূল রয়েছে।[৫৫] যখন কোন উম্মতের কাছে তাদের রসূল এসে যায় তখন পূর্ণ ইনসাফ সহকারে তাদের বিষয়ের ফায়সালা করে দেয়া হয় এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হয় না।[৫৬]

উপদেশ সেখানে পৌছতে পারবে। এ বর্ণনা পদ্ধতিটি কিছুটা এমনি ধরনের যেমন কোন সৎলোক অসৎলোকদের মাঝে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী সহকারে বাস করতে থাকে এবং অত্যন্ত আন্তরিকতা ও দরদসহকারে তারা যে পতনশীল অবস্থার মধ্যে পড়ে আছে সে সম্পর্কে তাদের মনে অনুভূতি জাগাতে থাকে। তাদের জীবন যাপন প্রণালীতে কি কি গলদ আছে এবং সঠিক জীবন যাপন প্রণালী কি তা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে ও যুক্তিসংগত পদ্ধতিতে সে তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাঁর পূত-পবিত্র জীবন থেকে কেউ শিক্ষা নিচ্ছে না এবং তার এ শুভাকাংখামূলক উপদেশকেও কেউ গ্রাহ্য করছে না। এ অবস্থায় যখন সে তাদেরকে বুঝাবার কাজে ব্যস্ত রয়েছে এবং তারা তার কথাগুলোর প্রতি কর্ণপাত করছে না ঠিক এমন সময় তার কোন বন্ধু এসে তাকে বলে, আরে ভাই এ তুমি কি করছো? তুমি এমন লোকদের শুনাচ্ছো যারা কানে শুনে না এবং এমন লোকদের পথ দেখাচ্ছো যারা চোখে দেখে না। এদের মনের কানে তালা লেগেছে এবং এদের হৃদয়ের

চোখ কানা হয়ে গেছে। এ সৎলোককে তার সংস্কার প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখা তার বন্ধুর একথা বলার উদ্দেশ্য নয় বরং তার উদ্দেশ্য হয়, হয়তো এ বিদ্রূপ ও তিরস্কারের ফলে অচেতন লোকদের কিছুটা চেতনা ফিরে আসবে।

৫২. অর্থাৎ আল্লাহ তো তাদের কানও দিয়েছেন এবং মনও দিয়েছেন। হক ও বাতিলের পার্থক্য দেখার ও বুঝার জন্য প্রয়োজন ছিল এমন কোন জিনিস তিনি নিজের পক্ষ থেকে তাদের দিতে কার্পণ্য করেননি। কিন্তু লোকেরা প্রবৃত্তির দাসত্ব ও দুনিয়ার প্রেমে মত্ত হয়ে নিজেরাই নিজেদের চোখ কানা করে নিয়েছে, কানে তালা লাগিয়েছে এবং অন্তরকে বিকৃত করে ফেলেছে। ফলে তার মধ্যে ভাল-মন্দের পার্থক্য, ভুল-নির্ভুলের জ্ঞান এবং বিবেকের সজীবতার কোন লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

৫৩. অর্থাৎ যখন একদিকে তাদের সামনে থাকবে আখেরাতের অনন্ত জীবন এবং অন্যদিকে তারা পেছন ফিরে নিজেদের পৃথিবীর জীবনের দিকে তাকাবে তখন তাদের ভবিষ্যতের তুলনায় নিজেদের এ অতীত বড়ই সামান্য ও নগণ্য মনে হবে। সে সময় তারা একথা উপলব্ধি করতে পারবে যে, তারা নিজেদের পূর্ববর্তী জীবনের সামান্য স্বাদ ও লাভের বিনিময়ে নিজেদের এ চিরন্তন ভবিষ্যত নষ্ট করে কত বড় বোকামি করেছে!

৫৪. অর্থাৎ একদিন আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে, একথাকে মিথ্যা বলেছে।

৫৫. এ "উম্মত" শব্দটি এখানে শুধুমাত্র সম্প্রদায় অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বরং একজন রসূলের আগমনের পর তাঁর দাওয়াত যেসব লোকের কাছে পৌঁছে তারা সবাই তাঁর উম্মতভুক্ত হয়ে যায়। তাছাড়া রসূলকে তাদের মধ্যে জীবিত অবস্থায় উপস্থিত থাকতে হবে এটা এ জন্য অপরিহার্য নয়। বরং রসূলের পরেও যতদিন পর্যন্ত তাঁর শিক্ষা অবিকৃত থাকবে এবং তিনি মূলত কিসের তালীম দিতেন এ বিষয়টা জানা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যতদিন সম্ভব হবে ততদিন পর্যন্ত দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তাঁরই উম্মত গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে সামনের দিকে যে বিধানের আলোচনা আসছে তা তাদের ওপর কার্যকর হবে। এ দৃষ্টিতে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পর সারা দুনিয়ার মানুষ তাঁর উম্মতভুক্ত। যতদিন কুরআন তার নির্ভুল ও নির্ভেজাল অবস্থায় প্রকাশিত হতে থাকবে ততদিন এ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে। এ কারণে আয়াতে একথা বলা হয়নি যে, "প্রত্যেক জাতির (বা সম্প্রদায়ের) মধ্যে একজন রসূল রয়েছে" বরং বলা হয়েছে, "প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রসূল রয়েছে।"

৫৬. এর অর্থ হচ্ছে, রসূলের দাওয়াত কোন মানব গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে যাওয়ার পর ধরে নিতে হবে যে, সেই গোষ্ঠীর হেদায়াতের জন্য আল্লাহর যা কিছু করণীয় ছিল, তা করা হয়ে গেছে। এরপর কেবল ফায়সালা করাই বাকি থেকে যায়। অতিরিক্ত কোন যুক্তি বা সাক্ষ-প্রমাণের অবকাশ থাকে না। আর চূড়ান্ত ইনসাফ সহকারে এ ফায়সালা করা হয়ে থাকে। যারা রসূলের কথা মেনে নেয় এবং নিজেদের নীতি ও মনোভাব পরিবর্তন করে তারা আল্লাহর রহমত লাভের অধিকারী হয়। আর যারা তাঁর কথা মেনে নেয় না তারা শাস্তি লাভের যোগ্য হয়। তাদেরকে এ শাস্তি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় দেয়া যেতে পারে বা এক জায়গায়।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا
وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ
سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا
مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ ۚ آلْآنَ
وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ
الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾ وَيَسْتَنبِئُونَكَ
أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ۖ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾

তারা বলে, যদি তোমার এ হুমকি সত্য হয় তাহলে এটা কবে কার্যকরী হবে? বলো, "নিজের লাভ-ক্ষতিও আমার ইখতিয়ারে নেই। সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।[৫৭] প্রত্যেক জাতির জন্য অবকাশের একটি নির্দিষ্ট সময় আছে, এ সময় পূর্ণ হয়ে গেলে তারা মুহূর্তকালও সামনে পেছনে করতে পারবে না।[৫৮] তাদেরকে বলো, তোমরা কি কখনো একথাও চিন্তা করেছো যে, যদি আল্লাহর আযাব অকস্মাত রাতে বা দিনে এসে যায় (তাহলে তোমরা কি করতে পারো)? এটা এমন কি জিনিস যে জন্য অপরাধীরা তাড়াহুড়া করতে চায়? সেটা যখন তোমাদের ওপর এসে পড়বে তখন কি তোমরা ঈমান আনবে? এখন বাঁচতে চাও? অথচ তোমরাইতো তাগাদা দিচ্ছিলে যে, ওটা শিগ্‌গির এসে পড়ুক। তারপর জালেমদেরকে বলা হবে, এখন অনন্ত আযাবের স্বাদ আস্বাদন করো, তোমরা যা কিছু উপার্জন করতে তার শাস্তি ছাড়া তোমাদের আর কি বিনিময় দেয়া যেতে পারে?

তারপর তারা জিজ্ঞেস করে যে, তুমি যা বলছো তা কি যথার্থই সত্য? বলো, "আমার রবের কসম, এটা যথার্থই সত্য এবং এর প্রকাশ হবার পথে বাধা দেবার মতো শক্তি তোমাদের নেই।"

৫৭. অর্থাৎ আমি কবে একথা বলেছিলাম যে, আমিই এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করবো এবং অমান্যকারীদেরকে আমিই শাস্তি দেবো? কাজেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হুমকি কবে কার্যকরী করা হবে, একথা আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? হুমকি তো আল্লাহ দিয়েছেন।

وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ ۭ وَاَسَرُّوا
النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٥٤﴾
اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ
اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٥﴾ هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٦﴾
يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاۗءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاۗءٌ لِّمَا فِي
الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾

৬ রুকূ'

আল্লাহর নাফরমানী করেছে এমন প্রতিটি ব্যক্তির কাছে যদি সারা দুনিয়ার ধন-দৌলত থাকতো তাহলে সেই আযাব থেকে বাঁচার বিনিময়ে সে তা দিতে উদ্যত হতো। যখন তারা এ আযাব দেখবে তখন তারা মনে মনে পস্তাতে থাকবে।[৫৯] কিন্তু তাদের মধ্যে পূর্ণ ইনসাফ সহকারে ফায়সালা করা হবে, তাদের প্রতি কোন জুলুম হবে না। শোনো, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। শুনে রাখো, আল্লাহর অংগীকার সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। তিনিই জীবন দেন, তিনিই মৃত্যু দেন এবং তাঁরই দিকে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

হে লোকেরা! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নসীহত এসে গেছে। এটি এমন জিনিস যা অন্তরের রোগের নিরাময় এবং যে তা গ্রহণ করে নেয় তার জন্য পথনির্দেশনা ও রহমত।

তিনিই তাঁর ফায়সালা বাস্তবায়িত করবেন। কখন ফায়সালা করবেন এবং কিভাবে তা তোমাদের সামনে আনবেন তা সব তাঁরই ইচ্ছাধীন।

৫৮. এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাড়াহুড়া করেন না। যখনই রসূলের দাওয়াত কোন ব্যক্তি বা দলের কাছে পৌঁছে যায়, তখনই যারা ঈমান আনে কেবল তারাই রহমতের হকদার হবে। এবং যারা তা মানতে অস্বীকার করবে অথবা মেনে নিতে ইতস্তত করবে তাদেরকে সংগে সংগে শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এটা আল্লাহর রীতি নয়। বরং আল্লাহর রীতি হচ্ছে, নিজের বাণী পৌঁছিয়ে দেবার পর তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত মর্যাদা অনুযায়ী এবং প্রত্যেক দল ও জাতিকে তার সামগ্রিক মর্যাদা অনুসারে চিন্তা-ভাবনা ও বোঝাপড়া করার জন্য যথেষ্ট সময় দেন। এ অবকাশকাল অনেক সময় শত শত বছর ধরে চলতে থাকে। এ ব্যাপারে কার কতটা অবকাশ পওয়া উচিত তা আল্লাহই ভাল জানেন।

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٥٨﴾
قُلْ أَرَءَيْتُمْ مَّآ أَنزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا
وَحَلٰلًا قُلْ آٰللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ
يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ إِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٦٠﴾

হে নবী! বলো, "এ জিনিসটি যে, তিনি পাঠিয়েছেন এটি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর মেহেরবানী। এ জন্য তো লোকদের আনন্দিত হওয়া উচিত। তারা যা কিছু জমা করছে সে সবের চেয়ে এটি অনেক ভাল।" হে নবী! তাদেরকে বলো, "তোমরা কি কখনো একথাও চিন্তা করেছো যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিযিক[৬০] অবতীর্ণ করেছিলেন তার মধ্য থেকে তোমরা নিজেরাই কোনটাকে হারাম ও কোনটাকে হালাল করে নিয়েছো?[৬১] তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন? নাকি তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছো?[৬২] যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে তারা কি মনে করে, কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করা হবে? আল্লাহ তো লোকদের প্রতি অনুগ্রহ পরায়ণ কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকরগুজারী করে না।[৬৩]

তারপর পুরোপুরি ইনসাফের ভিত্তিতে দেয়া এ অবকাশ যখন পূর্ণ হয়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা দল তার বিদ্রোহাত্মক নীতি পরিবর্তন করতে চায় না তখন এরি ভিত্তিতে তার ওপর আল্লাহ তাঁর ফায়সালা কার্যকর করেন। এ ফায়সালার সময়টি আল্লাহর নির্ধারিত সময় থেকে এক মুহূর্ত আগেও আসতে পারে না এবং সময় এসে যাবার পর মুহূর্তকালের জন্য তাকে ঠেকিয়ে রাখাও সম্ভব নয়।

৫৯. সারা জীবন তারা যে জিনিসটিকে মিথ্যা বলতে থাকে, যাকে মিথ্যা মনে করে সারাটা জীবন ভুল কাজে ব্যয় করে এবং যার সংবাদদানকারী পয়গম্বরদেরকে বিভিন্নভাবে দোষারোপ করতে থাকে, সেই জিনিসটি যখন তাদের সমস্ত প্রত্যাশাকে গুড়িয়ে দিয়ে অকস্মাৎ সামনে এসে দাঁড়াবে তখন তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে। এটিই যেহেতু যথার্থ সত্য ছিল তাই তারা দুনিয়ায় যা কিছু করে এসেছে তার পরিণাম এখন কি হওয়া উচিত তা তাদের বিবেকই তাদেরকে জানিয়ে দেবে। নিজের কৃতকর্মের হাত থেকে বাঁচার কোন পথ থাকে না। মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। লজ্জায় ও আক্ষেপে অন্তর ভিতরে ভিতরেই দমে যাবে। আন্দাজ ও অনুমানের ব্যবসায়ে যে ব্যক্তি তার সমস্ত পুঁজি ঢেলে দিয়েছে এবং

কোন শুভাকাংখীর কথা মেনে নেয়নি সে দেউলিয়া হয়ে যাবার পর তার নিজের ছাড়া আর কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারে?

৬০. রিযিক বলতে আমাদের ভাষায় শুধুমাত্র পানাহারের জিনিসপত্র বুঝায়। এ কারণে লোকেরা মনে করে ধর্মীয় সংস্কার ও রসম রেওয়াজের ভিত্তিতে খাদ্য সামগ্রীর ক্ষুদ্রতর পরিসরে লোকেরা যেসব আইন কানুন প্রণয়ন করে রেখেছে এখানে শুধুমাত্র তারই সমালোচনা করা হয়েছে। এ বিভ্রান্তিতে শুধুমাত্র অজ্ঞ-অশিক্ষিত ও সাধারণ মানুষরাই ভুগছে না, শিক্ষিত সমাজ ও আলেমরাও এর শিকার হয়েছেন। অথচ আরবী ভাষায় রিযিক শব্দটি নিছক খাদ্যের অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং রকমারি দান, অনুদানও এর আওতাভুক্ত রয়েছে। আল্লাহ দুনিয়ায় মানুষকে যা কিছু দিয়েছেন তা সবই তার রিযিক। এমন কি সন্তান-সন্ততিও রিযিক। আসমাউর রিজাল তথা রাবীদের জীবনী গ্রন্থসমূহে রিয্ক, রুযাইক ও রিয্কুল্লাহ নামে অসংখ্য রাবী পাওয়া যায়। আমাদের দেশে আল্লাহ বখশ, খোদা বখ্শ নামগুলো প্রায় এই একই অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি বহুল প্রচলিত দোয়ার ভাষা হলো ঃ

اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه

"হে আল্লাহ! সত্যকে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে দাও এবং আমাদের তার অনুসরণ করে চলার সুযোগ দাও।"

প্রচলিত আরবী প্রবাদে বলা হয়, " رُزِقَ عِلْمًا " অর্থাৎ অমুক ব্যক্তিকে তাত্ত্বিক জ্ঞান দেয়া হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ প্রত্যেক গর্ভবতীর পেটে একজন ফেরেশতা পাঠান। তিনি শিশুর রিযিক এবং তার আয়ু ও কর্ম লিখে দেন। এখানে রিযিক মানে শুধু খাদ্য নয়, যা ভূমিষ্ঠ হবার পরে এ শিশু লাভ করবে। বরং এ দুনিয়ায় তাকে যা কিছু দেয়া হবে সবই রিযিকের অন্তরভুক্ত। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ অর্থাৎ "যা কিছু আমি তাদের দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে।" কাজেই রিযিককে নিছক খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা এবং পানাহারের জিনিসের ব্যাপারে মানুষ নিজেই নিজের ওপর যেসব বিধি-নিষেধ ও স্বাধীনতা আরোপ করেছে আল্লাহ কেবল তার বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন, একথা মনে করা মারাত্মক ভুল। এটা কোন সামান্য ভুল নয়। এর কারণে আল্লাহর দীনের একটি বিরাট মৌলিক ও নীতিগত শিক্ষা মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেছে। এ ভুলের ফলশ্রুতিতেই তো আজ পানাহারের জিনিসের মধ্যে হারাম ও হালাল এবং জায়েয ও নাজায়েযের ব্যাপারটিকে একটি দীনী বিষয় মনে করা হয় কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ব্যাপকতর বিষয়াবলীতে যদি এ নীতি স্থির করে নেয়া হয় যে, মানুষ নিজেই নিজের সীমা নির্দিষ্ট করে নেয়ার অধিকার রাখে এবং এ কারণে আল্লাহ ও তাঁর কিতাবের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবমুক্ত হয়ে আইন প্রণয়ন করা হতে থাকে তাহলে সাধারণ লোক তো দূরের কথা দীনী উলামা, শরীয়াতের মুফতীবৃন্দ এবং কুরআনের মুফাসসির ও হাদীসের শায়খগণের পর্যন্ত এ অনুভূতি হয় না যে, পানাহারের সামগ্রীর ক্ষেত্রে আল্লাহর শরীয়াতের প্রভাবমুক্ত হয়ে জায়েয ও নাজায়েযের সীমা নির্ধারণ করার মতো এটিও দীনের সাথে সমান সংঘর্ষশীল।

৬১. অর্থাৎ তোমরা যে এটা কতবড় মারাত্মক বিদ্রোহাত্মক অপরাধ করছো তার কোন অনুভূতিই তোমাদের নেই। রিযিকের মালিক আল্লাহ। তোমরা নিজেরাও আল্লাহর অধীন। এ অবস্থায় আল্লাহর সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ এবং তা ব্যবহার ও ভোগ করার জন্য তার মধ্যে বিধি-নিষেধ আরোপ করার অধিকার তোমরা কোথা থেকে পেলে? কোন চাকর যদি দাবী করে প্রভুর সম্পত্তি ব্যবহার করার এবং তার ওপর যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য তার নিজেরই বিধি-নিষেধ আরোপ করার অধিকার আছে এবং এ ব্যাপারে প্রভুর কিছু বলার আদতে কোন প্রয়োজনই নেই, তাহলে তার ব্যাপারে তোমরা কি বলবে? তোমাদের নিজেদের কর্মচারী যদি তোমাদের গৃহ এবং গৃহের যাবতীয় জিনিসপত্র ব্যবহার করার ও কাজে লাগাবার ব্যাপারে এ ধরনের স্বাধীনতা ও ক্ষমতার দাবী করে তাহলে তোমরা তার সাথে কেমন ব্যবহার করবে? আর যে চাকর আদতে এ কথাই মানে না যে, সে কারোর চাকর, কেউ তার প্রভু এবং তার হাতে যে সম্পদ আছে তা অন্য কারোর মালিকানাধীন, তার ব্যাপারটাই আলাদা। এখানে এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকের কথা আলোচনা করা হচ্ছে না। এখানে এমন ধরনের চাকরের কথা আলোচিত হচ্ছে, যে নিজে একথা মানে যে, সে কারোর চাকর এবং এই সাথে এ কথাও মানে যে, সে যার চাকর সে-ই সমস্ত সম্পদের মালিক। তারপর বলে, এ সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহার করার অধিকার আমি নিজে নিজেই লাভ করেছি এবং এ জন্য প্রভুকে জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজন নেই।

৬২. অর্থাৎ তোমাদের এ মর্যাদা কেবলমাত্র তখনই সঠিক হতো যখন প্রভু নিজেই তোমাদের অধিকার দান করতেন এবং বলে দিতেন, আমার সম্পদ তোমরা যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করো এবং নিজেদের কাজ ও ব্যবহার করার সীমারেখা, আইন-কানুন ও নীতি-নিয়ম সবকিছু তৈরী করার যাবতীয় অধিকার তোমাদের দিয়ে দিলাম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রভু তোমাদের এ অধিকার ও ক্ষমতা যে দিয়েছেন এ মর্মে তোমাদের কাছে সত্যিই প্রভুর দেয়া কোন প্রমাণ পত্র আছে কি? নাকি কোন প্রমাণপত্র ছাড়াই তোমরা এ দাবী করছো যে, তিনি তোমাদের সমস্ত অধিকার দান করেছেন? যদি প্রথমটি সত্য হয় তাহলে মেহেরবানী করে সেই প্রমাণপত্রটি দেখাও। আর দ্বিতীয়টি সত্য হলে একথা পরিষ্কার যে, তোমরা বিদ্রোহের সাথে সাথে মিথ্যাচার ও মিথ্যা দোষারোপের অপরাধও করছো।

৬৩. অর্থাৎ এটা তো প্রভুর অপার অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর ভৃত্যকে নিজেই বলে দিচ্ছেন, আমার গৃহে, আমার সম্পদে এবং স্বয়ং আমার ব্যাপারে কোন্ ধরনের কর্মনীতি অবলম্বন করলে তুমি আমার সন্তুষ্টি, পুরস্কার ও উন্নতি হাসিল করতে সক্ষম হবে এবং কোন্ কর্মনীতি অবলম্বন করলে অনিবার্যভাবে আমার ক্রোধ, শাস্তি ও অবনতির সম্মুখীন হবে। কিন্তু অনেক নির্বোধ ভৃত্য এ অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। অর্থাৎ তাদের মতে যেন এমনটি হওয়া উচিত ছিল যে, প্রভু তাদেরকে নিজের গৃহে এনে স্বাধীন ছেড়ে দিতেন এবং সব সম্পদ তাদের কর্তৃত্বাধীন করে দেবার পর কোন্ ভৃত্য কি করে তা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে থাকতেন। তারপর যখনই কেউ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে—যা কোন ভৃত্য বা চাকরের জানা নেই—কোন কাজ করতো তখনই তাকে তিনি শাস্তি দিয়ে দিতেন। অথচ প্রভু যদি তার চাকরদেরকে এমন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি করতেন তাহলে তাদের এক জনেরও শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব হতো না।

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ
اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ۭ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ
ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاۗءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا
فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝ اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَاۗءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُوْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۭ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۭ
هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

৭ রুকূ'

হে নবী! তুমি যে অবস্থায়ই থাকো এবং কুরআন থেকে যা কিছুই শুনাতে থাকো। আর হে লোকেরা, তোমরাও যা কিছু করো সে সবের মধ্যে আমি তোমাদের দেখতে থাকি। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে কোন অণুপরিমাণ বস্তুও এমন নেই, এবং তার চেয়ে ছোট বা বড় কোন জিনিসও নেই, যা তোমাদের রবের দৃষ্টির অগোচরে আছে এবং যা একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা নেই।[৬৪] শোনো, যারা আল্লাহর বন্ধু, ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করেছে, তাদের কোন ভয় ও মর্মযাতনার অবকাশ নেই। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জীবনে তাদের জন্য শুধু সুসংবাদই রয়েছে। আল্লাহর কথার পরিবর্তন নেই। এটিই মহাসাফল্য। হে নবী! এরা তোমাকে যেসব কথা বলছে তা যেন তোমাকে মর্মাহত না করে। সমস্ত মর্যাদা আল্লাহর হাতে এবং তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।

৬৪. নবীকে সান্ত্বনা দেয়া এবং তাঁর বিরোধীদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যেই এখানে এ কথার উল্লেখ করা হয়েছে। একদিকে নবীকে বলা হচ্ছে, সত্যের বাণী লোকদের কাছে প্রচার এবং আল্লাহর বান্দাদের সংশোধন করার জন্য তুমি যেভাবে জানপ্রাণ দিয়ে এবং সবর ও সহিষ্ণুতা সহকারে কাজ করে যাচ্ছো তার প্রতি আমি নজর রাখছি। এমন নয় যে, এ বিপদসংকুল কাজে তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আমি তোমাকে অসহায় ছেড়ে দিয়েছি। যা

أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ
يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا
يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾

জেনে রেখো, আকাশের অধিবাসী হোক বা পৃথিবীর, সবাই আল্লাহর মালিকানাধীন। আর যারা আলাহকে বাদ দিয়ে (নিজেদের মনগড়া) কিছু শরীকদের ডাকছে তারা নিছক আন্দাজ ও ধারণার অনুগামী এবং তারা শুধু অনুমানই করে। তিনিই তোমাদের জন্য রাত তৈরী করেছেন, যাতে তোমরা তাতে প্রশান্তি লাভ করতে পারো এবং দিনকে উজ্জ্বল করেছেন। এর মধ্যে শিক্ষা আছে এমন লোকদের জন্য যারা (খোলা কানে নবীর দাওয়াত) শোনে।৬৫

কিছু তুমি করছো তাও আমি দেখছি এবং যে আচরণ তোমার সাথে করা হচ্ছে সে সম্বন্ধেও আমি বেখবর নই। অন্যদিকে নবীর বিরোধীদেরকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, একজন সত্যের আহবায়ক ও মানব হিতৈষীর সংস্কারধর্মী প্রচেষ্টার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তোমরা একথা মনে করে নিয়ো না যে, তোমাদের এসব কাজ কারবার দেখার মতো কেউ নেই এবং কখনো তোমাদেরকে এহেন কাজের জন্য কোন জবাবদিহি করতে হবে না। জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু করছো সবই আল্লাহর রেকর্ডে সংরক্ষিত হচ্ছে।

৬৫. এখানে আসলে একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বক্তব্যকে অত্যন্ত সংক্ষেপে কয়েক কথায় বর্ণনা করা হয়েছে। দুনিয়ায় যারা অহী ও ইলহামের সাহায্যে সরাসরি প্রকৃত সত্যের সন্ধান পায় না, তাদের ধর্ম সম্বন্ধে মতামত প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে দার্শনিক সুলভ তত্ত্বানুসন্ধান। এর উদ্দেশ্য হলো, এ বিশ্ব-জাহানে বাহ্যত আমরা যা কিছু দেখছি ও অনুভব করছি তার পেছনে কোন সত্য লুকিয়ে আছে কিনা এবং থাকলে তা কি—এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করা। কোন ব্যক্তি চাই সে নাস্তিক্যবাদ অবলম্বন করুক বা শিরক অথবা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হোক। তার পক্ষে অবশ্যি কোন না কোন ধরনের দার্শনিক চিন্তা-গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানের আশ্রয় না নিয়ে ধর্ম সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব নয়। আর নবীগণ যে ধর্ম পেশ করেছেন তা কেবল এভাবেই যাচাই করা যেতে পারে। অর্থাৎ দার্শনিক সুলভ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে মানুষকে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ততা অর্জন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে যে, নবী তাকে বিশ্ব-জাহানের বিভিন্ন নিদর্শনের পেছনে যে গভীর তত্ব ও সত্য লুকিয়ে থাকার সন্ধান দিচ্ছেন তার বিবেক মন তার প্রতি সায় দেয় কি না। এ অনুসন্ধানের সঠিক বা বেঠিক হওয়ার বিষয়টি পুরাপুরি নির্ভর করে অনুসন্ধান পদ্ধতির ওপর। এ পদ্ধতি ভুল হলে ভুল অভিমত গড়ে

উঠবে এবং সঠিক হলে সঠিক অভিমত গড়ে উঠবে। এখন বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, দুনিয়ায় বিভিন্ন দল এ অনুসন্ধানের জন্য কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।

মুশরিকরা নির্জলা সংশয়, কল্পনা ও অনুমানের ওপর নিজেদের অনুসন্ধানের ভিত গড়ে তুলেছে।

ইশরাকী সাধক ও যোগীরা যদিও মুরাকাবা তথা ধ্যানযোগের ভড়ং সৃষ্টি করেছেন এবং দাবী করেছেন যে, তারা বহিরাঙ্গের পেছনে উঁকি দিয়ে অভ্যন্তরের চেহারা দেখে নিয়েছেন কিন্তু আসলে তারা নিজেদের এ অনুসন্ধানের ভিত রেখেছেন আন্দাজ-অনুমানের ওপর। তারা আসলে নিজেদের আন্দাজ-অনুমানের বিষয় নিয়েই ধ্যান করেন। আর তারা এই যে বলেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা আসলে এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, অনুমানের ভিত্তিতে যে ধারণাটা তারা দাঁড় করিয়েছিলেন তারি ওপর তাদের চিন্তা-ভাবনাকে কেন্দ্রীভূত করেছেন। তারপর তার ওপর মস্তিষ্কের চাপ সৃষ্টি করেছেন, ফলে সেই একই ধারণাকে নিজেদের সামনে চলমান দেখতে পেয়েছেন।

দার্শনিকগণ যুক্তির সাহায্যে গৃহীত সিদ্ধান্তকে নিজেদের অনুসন্ধানের ভিত রূপে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আসলে তা আন্দাজ-অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এ আন্দাজ-অনুমান ভিত্তিক যুক্তি যে একেবারেই খোঁড়া যুক্তি, সে কথা উপলব্ধি করে তারা তর্কশাস্ত্র সম্মত যুক্তি প্রদান ও কৃত্রিম বুদ্ধিবৃত্তিক যষ্ঠির ওপর ভর দিয়ে তাকে চালাবার চেষ্টা করেছেন এবং এর নাম দিয়েছেন যুক্তি ভিত্তিক সিদ্ধান্ত।

বিজ্ঞানীগণ যদিও বিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে অনুসন্ধান ও গবেষণার জন্য তাত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তবুও অতিপ্রাকৃতের সীমানায় পা ফেলার সাথে সাথেই তারাও তাত্বিক পদ্ধতি পরিহার করে আন্দাজ-অনুমান ও ধারণা-কল্পনার পেছনে চলেছেন।

আবার এ দলগুলোর আন্দাজ-অনুমান সংকীর্ণ দল প্রীতি, অন্ধ বিদ্বেষ ও স্বার্থ-প্রীতি রোগেও আক্রান্ত হয়েছে। ফলে তারা অন্যের কথা না শোনার জিদ ধরে বসেছে এবং নিজেদের প্রিয় পথের ওপর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছে।

কুরআন এ ধরনের অনুসন্ধান পদ্ধতিকে আগাগোড়াই ভুল গণ্য করে। কুরআন বলে, তোমাদের পথভ্রষ্টতার আসল কারণ হচ্ছে এই যে, তোমরা সত্যানুসন্ধানের ভিত্তি রাখো আন্দাজ-অনুমান ও ধারণা-কল্পনার ওপর। আবার অন্ধ দল-প্রীতি ও সংকীর্ণ স্বার্থ-বিদ্বেষের শিকার হয়ে অন্যের যুক্তিসংগত কথাও শুনতে রাজী হও না। এ দ্বিবিধ ভুলের কারণে তোমাদের পক্ষে সত্যের সন্ধান লাভ অসম্ভব তো ছিলই, এমন কি নবীগণ যে দীন পেশ করেছেন তাকে যাচাই পর্যালোচনা করে সঠিক পথে অগ্রসর হওয়াও অসম্ভব হয়ে গেছে।

এর মোকাবিলায় কুরআন দার্শনিক অনুসন্ধান গবেষণার জন্য যে সঠিক তাত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পথের সন্ধান দিয়েছে তা হচ্ছে এই যে, যারা দাবী করছে, আমরা ধারণা-কল্পনা, আন্দাজ-অনুমান ও ধ্যান-তপস্যার মাধ্যমে নয় বরং যথার্থ "নিশ্চিত জ্ঞানের" ভিত্তিতে তোমাদের সামনে প্রকৃত সত্যের বর্ণনা দিচ্ছি। প্রথমে তাদের বর্ণনা সকল প্রকার সংকীর্ণ দল-প্রীতি ও স্বার্থ-বিদ্বেষ মুক্ত হয়ে মনোযোগ দিয়ে শোনো। তারপর বিশ্ব-জাহানে যেসব নিদর্শন (কুরআনের পরিভাষায় "আয়াত"সমূহ) তোমাদের

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ الْغَنِیُّ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی
الْاَرْضِ ؕ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍۭ بِهٰذَا ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَی اللّٰهِ مَا لَا
تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾ قُلْ اِنَّ الَّذِیْنَ یَفْتَرُوْنَ عَلَی اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا یُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾
مَتَاعٌ فِی الدُّنْیَا ثُمَّ اِلَیْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِیْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِیْدَ بِمَا
كَانُوْا یَكْفُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

লোকেরা বলে, আল্লাহ কাউকে পুত্র বানিয়েছেন।[৬৬] সুবহানাল্লাহ—তিনি মহান-পবিত্র।[৬৭] তিনি তো অভাবমুক্ত। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর মালিকানাধীন।[৬৮] একথার সপক্ষে তোমাদের কাছে কি প্রমাণ আছে? তোমরা কি আল্লাহর সপক্ষে এমন সব কথা বলো যা তোমাদের জানা নেই? হে মুহাম্মাদ! বলো, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তারা কখনো সফলকাম হতে পারে না। দুনিয়ার দু'দিনের জীবন ভোগ করে নাও, তারপর আমার দিকে তাদের ফিরে আসতে হবে, তখন তারা যে কুফরী করছে তার প্রতিফল স্বরূপ তাদেরকে কঠোর শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো।

দৃষ্টিগোচর ও অভিজ্ঞতালব্ধ হয় সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করো, সেগুলোর সাক্ষ সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করো এবং অনুসন্ধান করতে থাকো যে, এ বাহ্যিক অবয়বের পেছনে যে সত্যের প্রতি এরা অংগুলি নির্দেশ করছেন তার প্রতি ইংগিতকারী আলামত তোমরা ঐ বাহ্যিক অবয়বেই পাচ্ছো কিনা? যদি এ ধরনের আলামত দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাদের ইংগিতও সুস্পষ্ট হয় তাহলে যাদের বর্ণনা নিদর্শনসমূহের সাক্ষ্য অনুযায়ী পাওয়া যাচ্ছে তাদেরকে অযথা মিথ্যুক বলার আর কোন কারণ নেই। এ দর্শন পদ্ধতিই ইসলামের ভিত্তি। দুঃখের বিষয় এ পদ্ধতি পরিত্যাগ করে মুসলিম দার্শনিকগণও প্লেটো ও এরিষ্টটলের পদাংক অনুসরণ করছেন।

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে শুধুমাত্র এ পদ্ধতি অবলম্বনের নির্দেশ দেয়াই হয়নি বরং বিশ্ব-জাহানের নিদর্শনসমূহ পেশ করে তার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার এবং প্রকৃত সত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌছার যথারীতি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এভাবে চিন্তা-ভাবনা ও অনুসন্ধান করার এ পদ্ধতি মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হবে। এখানে এ আয়াতেও উদাহরণ স্বরূপ শুধুমাত্র দু'টি নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ রাত ও দিন। আসলে সূর্য ও পৃথিবীর দূরত্বের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সুশৃংখল পরিবর্তনের কারণে রাত-দিনের ওলটপালট ও বিপ্লব সাধিত হয়। এটি একজন বিশ্বজনীন ব্যবস্থাপক এবং সমগ্র বিশ্ব-জগতের ওপর নিরংকুশ কর্তৃত্বশালী শাসকের অস্তিত্বের সুস্পষ্ট আলামত। এর মধ্যে

সুস্পষ্ট কুশলতা, নৈপুণ্য, বিজ্ঞতা ও উদ্দেশ্যমূলক তৎপরতাও দেখা যায়। কারণ দুনিয়ার সমস্ত বস্তুর অসংখ্য প্রয়োজন ও অভাব পূরণ এ দিন-রাতের আবর্তনের সাথে যুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে প্রভুত্ব, কৃপাশীলতা ও প্রতিপালনের সুস্পষ্ট আলামতও পাওয়া যায়। কারণ এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যিনি পৃথিবীর বুকে এসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন তিনি নিজেই তাদের স্থিতি ও স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোও সরবরাহ করেন। এ থেকে এও জানা যায় যে, এ বিশ্বজনীন ব্যবস্থাপক মাত্র একজন, তিনি কোন ক্রীড়ামোদী বা তামাসাপ্রিয় নন, খেলাচ্ছলে এ বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করেননি এবং সেভাবে একে চালাচ্ছেনও না বরং তিনি প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞানময় এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে তিনি কাজ করছেন। এ থেকে এও জানা যায় যে, অনুগ্রহকারী ও পালনকারী হিসেবে তিনিই ইবাদাত লাভের হকদার এবং দিন-রাতের আবর্তনের অধীন কোন সত্তাই রব ও প্রভু নয় বরং রবের অধীনস্থ দাস। এইসব নিদর্শনগত সুস্পষ্ট সাক্ষ্যের মোকাবিলায় মুশরিকরা আন্দাজ-অনুমান ও ধারণা-কল্পনার ভিত্তিতে যে ধর্ম উদ্ভাবন করেছে তা কিভাবে সঠিক হতে পারে?

৬৬. ওপরের আয়াতগুলোতে মানুষের জাহেলী ধ্যান-ধারণা ও মূর্খতার সমালোচনা করা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, তোমরা নিজেদের ধর্মের ভিত রাখো প্রত্যয় মিশ্রিত জ্ঞানের পরিবর্তে আন্দাজ ও অনুমানের ওপর। তারপর যে ধর্মের অনুসারী হয়ে তোমরা এগিয়ে যাও তার পেছনে কোন যুক্তি-প্রমাণ আছে কি না, কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এ মর্মে অনুসন্ধান করার কোন চেষ্টাই করো না। এখন এ প্রসংগে খৃষ্টান ও অন্যান্য কতিপয় ধর্মাবলম্বীদের এ অজ্ঞতার সমালোচনা এ বলে করা হয়েছে যে, তারা নিছক আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে নিয়েছে।

৬৭. সুবহানাল্লাহ শব্দটি কখনো বিস্ময় প্রকাশ করার জন্য বলা হয় আবার কখনো এর আসল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ "আল্লাহ সকল দোষ-ত্রুটি মুক্ত।" এখানে এ শব্দটি থেকে এ উভয় অর্থই প্রকাশ হচ্ছে। লোকেরা যে কথা বলছে তার ওপর একদিকে বিস্ময় প্রকাশ করাও যেমন উদ্দেশ্য, তেমনি অন্যদিকে এ মর্মে তাদের জবাব দেয়াও উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তো ত্রুটিমুক্ত, কাজেই তাঁর সন্তান আছে একথা বলা কেমন করে সঠিক হতে পারে।

৬৮. এখানে তাদের এ বক্তব্যের প্রতিবাদে তিনটি কথা বলা হয়েছে। এক, আল্লাহ ত্রুটিমুক্ত। দুই, তাঁর কোন অভাব নেই, তিনি কারোর মুখাপেক্ষী নন। তিন, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই তাঁর মালিকানাধীন সামান্য একটু ব্যাখ্যা করলে এ সংক্ষিপ্ত জবাবটি সহজেই অনুধাবন করা যেতে পারে ঃ

পুত্র দুই রকমের হতে পারে। ঔরসজাত অথবা পালিত। তারা যদি কাউকে ঔরসজাত অর্থে আল্লাহর পুত্র গণ্য করে তাহলে এর মানে হবে যে, তারা আল্লাহকে এমন এক জীবের মত মনে করে, যে স্বভাব-প্রকৃতির দিক দিয়ে মরণশীল এবং যার অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য তার কোন স্বজাতি থাকতে হবে আবার এ স্বজাতি থেকে তার একজন স্ত্রী হতে হবে এবং তাদের দু'জনের যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে তার সন্তান উৎপন্ন হবে। এ সন্তান তার প্রজাতীয় সত্তা এবং তার কাজ টিকিয়ে রাখবে। এ ছাড়া তার অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষা হতে পারে না। আর যদি তারা কাউকে দত্তক অর্থে আল্লাহর পুত্র গণ্য করে তাহলে এর দু'টি অর্থ হবে। এক, তারা আল্লাহকে এমন এক মানুষের মতো মনে করে, যে নিসন্তান হবার কারণে নিজের উত্তরাধিকারী করার এবং

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ ۘ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ
مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ
وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ ﴿٧١﴾
فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ
أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ
وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٣﴾

৮ রুকূ'

তাদেরকে নূহের কথা শুনাও।[৬৯] সেই সময়ের কথা যখন সে তার কওমকে বলেছিল, "হে আমার কওমের লোকেরা! যদি তোমাদের মধ্যে আমার অবস্থান ও বসবাস এবং আল্লাহর আয়াত শুনিয়ে শুনিয়ে তোমাদের গাফলতি থেকে জাগিয়ে তোলা তোমাদের কাছে অসহনীয় হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করি, তোমরা নিজেদের তৈরী করা শরীকদের সংগে নিয়ে একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্ত করে নাও এবং তোমাদের সামনে যে পরিকল্পনা আছে সে সম্পর্কে খুব ভালোভাবে চিন্তা করে নাও, যাতে তার কোন একটি দিকও তোমাদের দৃষ্টির আড়ালে না থেকে যায়। তারপর আমার বিরুদ্ধে তাকে সক্রিয় করো এবং আমাকে মোটেই অবকাশ দিয়ো না।[৭০] তোমরা আমার নসীহত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো (এতে আমার কি ক্ষতি করেছো), আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইনি। আমার প্রতিদান তো আল্লাহর কাছে। আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে (কেউ স্বীকার করুক বা না করুক) আমি যেন মুসলিম হিসাবে থাকি।" তারা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে, ফলে আমি তাকে এবং তার সাথে যারা নৌকায় ছিল সবাইকে রক্ষা করেছি এবং তাদেরকেই পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেছি আর যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলেছিল তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিয়েছি। কাজেই যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল (এবং তারপরও তারা মেনে নেয়নি) তাদের পরিণাম কি হয়েছে দেখো।

সন্তানহীনতার দরুন তার যে ক্ষতি হচ্ছে নামমাত্র হলেও তার কিছুটা প্রতিকার করার উদ্দেশ্যে নিজের প্রজাতির কোন একজনকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে। দুই, তারা মনে করে আল্লাহও মানবিক আবেগের অধিকারী। এ কারণে নিজের অসংখ্য বান্দাদের মধ্য থেকে কোন একজনের প্রতি তার স্নেহ ভালোবাসা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তাকে নিজের পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন।

এ তিনটি অবস্থার যে কোনটিই সঠিক হোক না কেন, সর্বাবস্থায়ই এ বিশ্বাসের মৌল তত্ত্বের মধ্যে আল্লাহর প্রতি আরোপিত হবে বহু দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতা ও অভাব। এ কারণে প্রথম বাক্যাংশে বলা হয়েছে তোমরা আল্লাহর ওপর যেসব দোষ, ত্রুটি ও দুর্বলতা আরোপ করছো সেসব থেকে তিনি মুক্ত। দ্বিতীয় বাক্যাংশে বলা হয়েছে, তিনি এমন ধরনের অভাব থেকেও মুক্ত যার কারণে মরণশীল মানুষদের সন্তানের দত্তক নেবার প্রয়োজন হয়। তৃতীয় বাক্যাংশে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে যে, পৃথিবীতে ও আকাশে সবাই আল্লাহর বান্দা ও তাঁর দাস। তাদের কারোর সাথে আল্লাহর এমন কোন বিশেষ বা ব্যক্তিগত সম্পর্ক নেই যার ফলে সবাইকে বাদ দিয়ে তিনি তাকেই নিজের পুত্র বা একমাত্র পুত্র অথবা উত্তরাধিকারী মনোনীত করবেন। বান্দার গুণের কারণে অবশ্যি আল্লাহ একজনের তুলনায় আর একজনকে বেশী ভালোবাসেন। কিন্তু এ ভালবাসার অর্থ এ নয় যে, কোন বান্দাকে বন্দেগী পর্যায় থেকে উঠিয়ে নিয়ে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অংশীদার করার পর্যায়ে উন্নীত করবেন। বড়জোর এ ভালোবাসার দাবী ততটুকুই হতে পারে যা এর আগের একটি আয়াতে বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ "যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করেছে তাদের কোন ভয় ও মর্মযাতনা নেই। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই তাদের জন্য আছে শুধু সুসংবাদ।"

৬৯. এ পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে তাতে এ লোকদেরকে ন্যায়সংগত যুক্তি ও হৃদয়গ্রাহী উপদেশের মাধ্যমে তাদের আকীদা-বিশ্বাস এবং চিন্তা ও পদ্ধতিতে কি কি ভুল-ভ্রান্তি আছে এবং সেগুলো ভুল কেন আর এর মোকাবিলায় সঠিক পথ কি এবং তা সঠিক কেন, একথা বুঝানো হয়েছিল। এই সহজ, সরল ও সুস্পষ্ট উপদেশের জবাবে তারা যে কর্মনীতি অবলম্বন করছিল আলোচ্য রুকূ'তে সে দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। দশ বারো বছর ধরে তারা এ নীতি অবলম্বন করে আসছিল যে, এ যুক্তিসংগত সমালোচনা ও সঠিক পথপ্রদর্শনের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে নিজেদের ভুল পথ অবলম্বনের ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনা না করে উল্টো যে ব্যক্তি নিজের কোন স্বার্থে নয় বরং তাদের ভালোর জন্য একথাগুলো পেশ করছিলেন তার প্রাণনাশে উদ্যোগী হয়। তারা যুক্তির জবাব পাথরের সাহায্যে এবং নসীহতের জবাব গালির সাহায্যে দিয়ে চলছিল। নিজেদের লোকালয়ে এমন ব্যক্তির অস্তিত্ব তাদের কাছে ভয়ানক বিরক্তিকর বরং অসহ্যকর হয়ে উঠেছিল যিনি মিথ্যাকে মিথ্যা বলেন এবং সঠিক কথা বলার চেষ্টা করেন। তাদের দাবী ছিল, আমাদের এ অন্ধদের সমাজে যদি কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি থেকে থাকে তবে সে আমাদের চোখ খুলে দেবার পরিবর্তে তার নিজের চোখও বন্ধ করে রাখুক। নয়তো আমরা জোর করে তার চোখ কানা করে দেবো, যাতে আমাদের দেশে দৃষ্টিশক্তি নামক কোন জিনিস না থাকে। তারা এই যে কর্মনীতি অবলম্বন করেছিল এ সম্পর্কে আরো কিছু বলার পরিবর্তে আল্লাহ তাঁর নবীকে হুকুম দিচ্ছেন, তাদেরকে নূহের ঘটনা শুনিয়ে দাও, এ ঘটনা থেকেই তারা তোমার ও তাদের মধ্যকার ব্যাপারটির জবাব পেয়ে যাবে।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا
لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٧٤﴾
ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا
فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا
قَالُوْٓا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٦﴾ قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا
جَآءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ﴿٧٧﴾

তারপর নূহের পর আমি বিভিন্ন পয়গম্বরকে তাদের কওমের কাছে পাঠাই এবং তারা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে তাদের কাছে আসে। কিন্তু যে জিনিসকে তারা আগেই মিথ্যা বলেছিল তাকে আর মেনে নিতে প্রস্তুত হলো না। এভাবে আমি সীমা অতিক্রমকারীদের দিলে মোহর মেরে দেই।[৭১]

তারপর[৭২] *মূসা ও হারুনকে আমি তাদের পরে আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার সরদারদের কাছে পাঠাই। কিন্তু তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মত্ত হয়*[৭৩] *এবং তারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়। পরে যখন আমার কাছ থেকে সত্য তাদের সামনে আসে, তারা বলে দেয়, এ তো সুস্পষ্ট যাদু।*[৭৪] *মূসা বললো, "সত্য যখন তোমাদের সামনে এলো তখন তোমরা তার সম্পর্কে এমন (কথা) বলছো? এ কি যাদু? অথচ যাদুকর সফলকাম হয় না।"*[৭৫]

৭০. এটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। বলা হচ্ছে, আমি নিজের কাজ থেকে বিরত হবো না। তোমরা আমার বিরুদ্ধে যা করতে চাও করো। আমি আল্লাহর ওপর ভরসা রাখি। (তুলনামূলক পাঠের জন্য দেখুন সূরা হূদের ৫৫ আয়াত)।

৭১. সীমা অতিক্রমকারী লোক তাদেরকে বলে যারা একবার ভুল করার পর আবাব নিজের কথার বক্রতা, একগুঁয়েমী ও হঠকারিতার কারণে নিজের ভুলের ওপর অবিচল থাকে এবং যে কথা মেনে নিতে একবার অস্বীকার করেছে তাকে আর কোন প্রকার উপদেশ, অনুরোধ–উপরোধ ও কোন উন্নত থেকে উন্নত পর্যায়ের যুক্তি প্রদানের মাধ্যমে মেনে নিতে চায় না। এ ধরনের লোকদের ওপর শেষ পর্যন্ত আল্লাহর এমন লানত পড়ে যে, তাদের আর কোনদিন সঠিক পথে চলার সুযোগ হয় না।

৭২. এ প্রসংগে সূরা আ'রাফের ১৩ থেকে ২১ রুকূ'র মধ্যে মূসা ও ফেরাউনের সংঘাতের ব্যাপারে আমি যে টীকাগুলো দিয়েছি সেগুলো পড়ে দেখা যেতে পারে। সেখানে যেসব বিষয়ের ব্যাখ্যা করেছি এখানে আর সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করা হবে না।

৭৩. অর্থাৎ সে নিজের বিপুল বৈভব, রাজক্ষমতা ও শান-শওকতের নেশায় মত্ত হয়ে নিজেই নিজেকে ভৃত্যের আসন থেকে ওপরে তুলে নিয়েছে এবং আনুগত্যের শির নত করার পরিবর্তে গর্বোন্নত হয়েছে।

৭৪. অর্থাৎ হযরত মূসার বাণী শুনে তারা সেই একই কথা বলেছিল যা মক্কার কাফেররা বলেছিল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনে। কাফেররা বলেছিল, "এ ব্যক্তি তো পাক্কা যাদুকর।" (দেখুন এ সূরা ইউনুসের দ্বিতীয় আয়াত)।

এখানে প্রাসংগিক আলোচনার প্রতি দৃষ্টি রাখলে একথা স্পষ্টই ধরা পড়ে যে, আসলে হযরত নূহ (আ) এবং তাঁর পরে সাইয়িদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সকল নবী পর্যায়ক্রমে যে দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছেন হযরত মূসা ও হারুন আলাইহিমাস সালাম সেই একই দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ সূরার শুরু থেকে একই বিষয়বস্তু চলে আসছে। এ বিষয়বস্তুটি হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে নিজের রব ও ইলাহ হিসেবে মেনে নাও। এই সংগে একথা স্বীকার করে নাও যে, এ জীবনের পরে আর একটি জীবন আসছে, সেখানে তোমাদের আল্লাহর সামনে হাযির হতে এবং নিজেদের কাজের হিসাব দিতে হবে। তারপর যারা নবীর এ দাওয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করছিল তাদেরকে বুঝানো হচ্ছে, শুধুমাত্র তোমাদের কল্যাণ নয় বরং সমগ্র বিশ্ব মানবতার কল্যাণ চিরকাল একটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে এসেছে। সে বিষয়টি হচ্ছে, তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসের আহবানে সাড়া দেয়া। প্রতি যুগে আল্লাহর নবীগণ এ আহবানই জানিয়েছেন। তাঁরা এ আহবানে সাড়া দিয়ে নিজের সমগ্র জীবন ব্যবস্থাকে এরই ভিত্তিতে কায়েম করার তাগিদ করেছেন। যারা এ কাজ করেছে একমাত্র তারাই কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করেছে। আর যে জাতি একে অস্বীকার করেছে তারা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গেছে। এটিই এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। এ প্রেক্ষাপটে যখন ঐতিহাসিক নজীর হিসেবে অন্যান্য নবীদের প্রসংগ আলোচিত হয়েছে তখন অনিবার্যভাবে এর অর্থ হয়েছে এই যে, এ সূরায় যে দাওয়াত দেয়া হয়েছে সেটিই ছিল সকল নবীর দাওয়াত এবং এ দাওয়াত নিয়েই হযরত মূসা ও হারুনও ফেরাউন ও তার কওমের সরদারদের কাছে গিয়েছিলেন। কোন কোন লোক যেমন মনে করে থাকেন, হযরত মূসা ও হারুনের দায়িত্ব ছিল একটি বিশেষ জাতিকে অন্যান্য জাতির গোলামী থেকে মুক্ত করা। যদি এটিই সত্য হতো তাহলে এ প্রেক্ষাপটে এ ঘটনাটিকে ঐতিহাসিক নজীর হিসেবে পেশ করা একেবারেই বেমানান হতো। নিসন্দেহে বনী ইসরাঈলকে (একটি মুসলিম কওম) একটি কাফের কওমের আধিপত্য (যদি তারা নিজেদের কুফরীর ওপর অটল থাকে) মুক্ত করা এঁদের দু'জনের মিশনের একটি অংশ ছিল। কিন্তু এটি ছিল তাঁদের নবুওয়াতের একটি আনুসংগিক উদ্দেশ্য, মূল উদ্দেশ্য ছিল না। আসল উদ্দেশ্য তা-ই ছিল যা কুরআনের দৃষ্টিতে সকল নবীর নবুওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল এবং সূরা নাযিআতে যে সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে বলে দেয়া হয়েছে ঃ

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ
فِى الْاَرْضِ ۭ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٨﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِىْ
بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ
مُّلْقُوْنَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ۭ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٨٢﴾

তারা জবাবে বললো, "তুমি কি যে পথে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি সে পথ থেকে আমাদের ফিরিয়ে দিতে এবং যাতে যমীনে তোমাদের দু'জনের প্রাধান্য কায়েম হয়ে যায় সে জন্য এসেছো?[৭৬] তোমাদের কথা তো আমরা মেনে নিতে প্রস্তুত নই।" আর ফেরাউন (নিজের লোকদের) বললো, "সকল দক্ষ ও অভিজ্ঞ যাদুকরকে আমার কাছে হাযির করো।"—যখন যাদুকররা এসে গেলো, মূসা তাদেরকে বললো, "যা কিছু তোমাদের নিক্ষেপ করার আছে নিক্ষেপ করো।" তারপর যখন তারা নিজেদের ভোজবাজি নিক্ষেপ করলো, মূসা বললো, "তোমরা এই যা কিছু নিক্ষেপ করেছো এগুলো যাদু।[৭৭] আল্লাহ এখনই একে ব্যর্থ করে দেবেন। ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজকে আল্লাহ সার্থক হতে দেন না। আর অপরাধীদের কাছে যতই বিরক্তিকর হোক না কেন আল্লাহ তাঁর ফরমানের সাহায্যে সত্যকে সত্য করেই দেখিয়ে দেন।"

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝ فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ۝ وَاَهْدِيَكَ
اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى –

"ফেরাউনের কাছে যাও, কারণ সে গোলামীর সীমা অতিক্রম করে গেছে এবং তাকে বলো, তুমি কি নিজেকে শুধরে নেবার জন্য তৈরী আছো? আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে পথ দেখাবো, তুমি কি তাঁকে ভয় করবে?"

কিন্তু যেহেতু ফেরাউন ও তার রাজ্যের প্রধানগণ এ দাওয়াত গ্রহণ করেনি এবং শেষ পর্যন্ত হযরত মূসাকে নিজের মুসলিম কওমকে তার অধীনতার নাগপাশ থেকে বের করে আনতে হয়েছিল। তাই তাঁর মিশনের এ অংশটিই ইতিহাসে প্রাধান্য লাভ করেছে এবং

কুরআনেও একে ঠিক ইতিহাসে যেভাবে আছে তেমনিভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যে ব্যক্তি কুরআনের বিস্তারিত বিবরণগুলোকে তার মৌলিক বক্তব্য থেকে আলাদা করে দেখার মতো ভুল করে না বরং সেগুলোকে সমগ্র বক্তব্যের অধীনেই দেখে থাকে, সে কখনো একটি জাতির দাসত্ব মুক্তিকে কোন নবীর নবুওয়াতের আসল উদ্দেশ্য এবং আল্লাহর সত্য দীনের দাওয়াতকে নিছক তার আনুসংগিক উদ্দেশ্য মনে করার মত বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হতে পারে না। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা ত্বা-হা ৪৪ থেকে ৫২ আয়াত, যুখরুফ ৪৬ থেকে ৫৬ আয়াত এবং মুয্যাম্মিল ১৫ থেকে ১৬ আয়াত)।

৭৫. এর মানে হচ্ছে আপাতদৃষ্টিতে মু'জিযা ও যাদুর মধ্যে যে সাদৃশ্য রয়েছে তার ফলে তোমরা নির্দ্বিধায় তাকে যাদু গণ্য করেছো। কিন্তু মূর্খের দল, তোমরা একটুও ভেবে দেখলে না, যাদুকররা কোন্ ধরনের চরিত্রের অধিকারী হয় এবং তারা কি উদ্দেশ্যে যাদু করে। একজন যাদুকর কি কখনো কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়াই এবং কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই বেধড়ক একজন স্বৈরাচারী শাসকের দরবারে আসে, তাকে তার ভ্রষ্টতার জন্য ধমক দেয় ও তিরস্কার করে এবং তার প্রতি আল্লাহর আনুগত্য করার ও আত্মিক পবিত্রতা অর্জন করার আহবান জানায়? তোমাদের কাছে কোন যাদুকর এলে প্রথমে রাজ সমক্ষে নিজের তেলেসমাতি দেখাবার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য দরবারের পারিষদবর্গের খোশামোদ করতে থাকতো। তারপর দরবারে প্রবেশ করার সৌভাগ্য হলে সাধারণ তোষামোদকারীদের থেকেও বেশী নির্লজ্জতার সাথে অভিবাদন পেশ করতো, চীৎকার করে করে রাজার দীর্ঘায়ু কামনা করতো, তাঁর সৌভাগ্যের জন্য দোয়া করতো এবং বড়ই কাতর কাকুতি মিনতি সহকারে নিবেদন করতো, হে রাজন! আপনার একজন উৎসর্গীত প্রাণ সেবাদাসের কৃতিত্ব কিছুটা দর্শন করুন। আর তার যাদু দেখে নেবার পর সে পুরস্কার লাভের আশায় নিজের হাত পাততো। এ সমগ্র বিষয়বস্তুটি শুধু একটি মাত্র বাক্যের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে বলা হয়েছে, যাদুকর কোন কল্যাণ প্রাপ্ত লোক হয় না।

৭৬. বনী ইসরাঈলকে উদ্ধার করা যদি হযরত মূসা (আ) ও হারুনের (আ) মূল দাবী হতো তাহলে ফেরাউন ও তার দরবারের লোকদের এ ধরনের আশংকা করার কোন প্রয়োজন ছিল না যে, এ দুই মহান ব্যক্তির দাওয়াত ছড়িয়ে পড়লে সারা মিসরের লোকদের ধর্ম বদলে যাবে এবং দেশে তাদের পরিবর্তে এদের দু'জনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। হযরত মূসা (আ) মিসরবাসীকে আল্লাহর বন্দেগীর প্রতি যে আহবান জানাচ্ছিলেন এটিই তো ছিল তাদের আশংকার কারণ। এর ফলে যে মুশরিকী ব্যবস্থার ওপর ফেরাউনের বাদশাহী, তার সরদারদের নেতৃত্ব এবং ধর্মীয় নেতাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল তা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা আ'রাফের ৬৬ এবং সূরা মুমিনের ৪৩ টীকা)।

৭৭. অর্থাৎ আমি যা দেখিয়েছি তা যাদু ছিল না বরং তোমরা এই যা দেখাচ্ছো এ হচ্ছে যাদু।

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰٓى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ
اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ۭ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٨٣﴾
وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ
مُّسْلِمِيْنَ ﴿٨٤﴾ فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٥﴾
وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ
اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۭ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٧﴾

৯ রুকূ'

(তারপর দেখো) মূসাকে তার কওমের কতিপয় নওজোয়ান[৭৮] ছাড়া কেউ মেনে নেয়নি,[৭৯] ফেরাউনের ভয়ে এবং তাদের নিজেদেরই কওমের নেতৃস্থানীয় লোকদের ভয়ে। (তাদের আশংকা ছিল) ফেরাউন তাদের ওপর নির্যাতন চালাবে। আর প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ফেরাউন দুনিয়ায় পরাক্রমশালী ছিল এবং সে এমন লোকদের অন্তরভুক্ত ছিল যারা কোন সীমানা মানে না।[৮০]

মূসা তার কওমকে বললো, "হে লোকেরা! যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে থাকো তাহলে তাঁর ওপর ভরসা করো, যদি তোমরা মুসলিম —আত্মসমর্পণকারী হও।[৮১] তারা জবাব দিল, "আমরা আল্লাহরই ওপর ভরসা করলাম। হে আমাদের রব! আমাদেরকে জালেমদের নির্যাতনের শিকারে পরিণত করো না[৮২] এবং তোমার রহমতের সাহায্যে কাফেরদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো।"

আর আমি মূসা ও তার ভাইকে ইশারা করলাম এই বলে যে, "মিসরে নিজের কওমের জন্য কতিপয় গৃহের সংস্থান করো, নিজেদের ঐ গৃহগুলোকে কিব্‌লায় পরিণত করো এবং নামায কায়েম করো।[৮৪] আর ঈমানদারদেরকে সুখবর দাও।[৮৫]

৭৮. কুরআনের মূল বাক্যে ذُرِّيَّةٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে সন্তান–সন্ততি। আমি এর অনুবাদ করেছি নওজোয়ান। কিন্তু এ বিশেষ শব্দটির মাধ্যমে কুরআন মজীদ যে কথা

বর্ণনা করতে চায় তা হচ্ছে এই যে, এ বিভীষিকাময় দিনগুলোতে গুটিকয় ছেলেমেয়েই তো সত্যের সাথে সহযোগিতা করার এবং সত্যের পতাকাবাহীকে নিজেদের নেতা হিসেবে মেনে নেয়ার দুঃসাহস করেছিল। কিন্তু মা-বাপ ও জাতির বয়স্ক লোকেরা এ সৌভাগ্য লাভ করতে পারেনি। তারা তখন বৈষয়িক স্বার্থ পূজা, সুবিধাবাদিতা ও নিরাপদ জীবন যাপনের চিন্তায় এত বেশী বিভোর ছিল যে, এমন কোন সত্যের সাথে সহযোগিতা করতে তারা উদ্যোগী হয়নি যার পথ তারা দেখছিল বিপদসংকুল। বরং তারা উল্টো নওজোয়ানদের পথ রোধ করে দাঁড়াচ্ছিল। তাদেরকে বলছিল, তোমরা মূসার ধারে কাছেও যেয়ো না, অন্যথায় তোমরা নিজেরা ফেরাউনের রোষাগ্নিতে পড়বে এবং আমাদের জন্যও বিপদ ডেকে আনবে।

কুরআনের একথা বিশেষভাবে সুস্পষ্ট করে পেশ করার কারণ হচ্ছে এই যে, মক্কার জনবসতিতেও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সহযোগিতা করার জন্য যারা এগিয়ে এসেছিলেন তারাও জাতির বয়স্ক ও বয়োবৃদ্ধ লোক ছিলেন না বরং তারাও সবাই ছিলেন বয়সে নবীন। আলী ইবনে আবী তালেব (রা), জাফর তাইয়ার (রা), যুবাইর (রা), তালহা (রা), সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা), মুসআব ইবনে উমাইর (রা), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) মতো লোকদের বয়স ইসলাম গ্রহণের সময় ২০ বছরের কম ছিল। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা), বিলাল (রা) ও সোহাইবের (রা) বয়স ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ছিল। আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা) যায়েদ ইবনে হারেসাহ (রা), উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) ও উমর ফারুকের (রা) বয়স ছিল ৩০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। এদের সবার থেকে বেশী বয়সের ছিলেন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা)। তাঁর বয়স ঈমান আনার সময় ৩৮ বছরর বেশী ছিল না। প্রাথমিক মুসলমানদের মধ্যে শুধুমাত্র একজন সাহাবীর নাম আমরা পাই যাঁর বয়স ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে বেশী। তিনি ছিলেন হযরত উবাইদাহ ইবনে হারেস মুত্তালাবী (রা)। আর সম্ভবত সাহাবীগণের সমগ্র দলের মধ্যে একমাত্র হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমবয়সী।

৭৯. মূল ইবারতে فَمَا اٰمَنَ لِمُوْسٰى শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। এতে কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করেছেন, হয়তো বনী ইসরাঈলের সবাই কাফের ছিল এবং শুরুতে তাদের মধ্য থেকে মাত্র গুটিকয় লোক ঈমান এনেছিল। কিন্তু "ঈমান' শব্দের পরে যখন "লাম" ব্যবহৃত হয় তখন সাধারণত এর অর্থ হয় আনুগত্য ও তাঁবেদারী করা। অর্থাৎ কারোর কথা মেনে নেয়া এবং তার কথায় ওঠাবসা করা। কাজেই মূলত এ শব্দগুলোর ভাবগত অর্থ হচ্ছে, গুটিকয় নওজোয়ানকে বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত বনী ইসরাঈল জাতির কেউই হযরত মূসাকে নিজের নেতা ও পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর আনুগত্য করতে এবং ইসলামী দাওয়াতের কাজে তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়নি। তারপর পরবর্তী বাক্যাংশ একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তাদের এ কার্যধারার আসল কারণ এ ছিল না যে, হযরত মূসার সত্যবাদী ও তাঁর দাওয়াত সত্য হবার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন সন্দেহ ছিল বরং এর কারণ শুধুমাত্র এই ছিল যে, তারা এবং বিশেষ করে তাদের প্রধান ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ হযরত মূসার সহযোগী হয়ে ফেরাউনের নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হবার ঝুঁকি নিতে রাজী ছিল না। যদিও তারা বংশধারা ও ধর্মীয় উভয় দিক দিয়ে হযরত

ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইউসুফ আলাইহিমুস সালামের উম্মত ছিল এবং এ দিক দিয়ে তারা সবাই মুসলমান ছিল। কিন্তু দীর্ঘকালীন নৈতিক অবক্ষয় এবং পরাধীনতার ফলে সৃষ্ট কাপুরুষতা তাদের মধ্যে কুফরী ও গোমরাহীর শাসনের বিরুদ্ধে ঈমান ও হেদায়াতের ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে নিজেরা এগিয়ে আসার অথবা যে এগিয়ে এসেছে তাকে সাহায্য করার মত মনোবল অবশিষ্ট রাখেনি।

হযরত মূসা ও ফেরাউনের এ সংঘাতে সাধারণ বনী ইসরাঈলদের ভূমিকা কি ছিল? একথা বাইবেলের নিম্নোক্ত অংশ থেকে আমরা জানতে পারি।

"পরে ফেরাউনের নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিবার সময় তাহারা মূসার ও হারুনের সাক্ষাত পাইল। তাঁহারা পথে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাহারা তাঁহাদিগকে কহিল, সদাপ্রভু তোমাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বিচার করুন ঃ কেননা, তোমরা ফেরাউনের দৃষ্টিতে ও তাহার দাসগণের দৃষ্টিতে আমাদিগকে দুর্গন্ধ স্বরূপ করিয়া আমাদের প্রাণনাশার্থে তাহাদের হস্তে খড়গ দিয়াছ।" (যাত্রা পুস্তক ৫ ঃ ২০–২১)

তালমূদে লেখা হয়েছে, বনী ইসরাঈল মূসা ও হারুন আলাইহিমাস সালামকে বলতো ঃ

"আমাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, একটি নেকড়ে বাঘ একটি ছাগলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং রাখাল এসে নেকড়ের মুখ থেকে ছাগলটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করলো। তাদের উভয়ের দ্বন্দ্ব–সংঘাতে ছাগলটা টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। ঠিক এভাবেই তোমার ও ফেরাউনের টানাহেঁচড়ায় আমাদের দফা রফা হয়েই যাবে।"

সূরা আরাফে একথাগুলোর দিকে ইংগিত করে বলা হয়েছে ঃ বনী ইসরাঈল হযরত মূসাকে বললো ঃ

أُوذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا (ايت : ١٢٩)

"তুমি আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি, তুমি আসার পরেও নিপীড়নের শিকার হচ্ছি।"

৮০. মূল ইবারতে مسرفين শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, সীমা অতিক্রমকারী। কিন্তু এ শাব্দিক অনুবাদের সাহায্যে তার আসল প্রাণবস্তু সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না। "মুসরিফীন" শব্দটির আসল অর্থ হচ্ছে, এমন সব লোক যারা নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য যে কোন নিকৃষ্টতম পন্থা অবলম্বন করতে দ্বিধা করে না। যারা কোন প্রকার জুলুম, নৈতিকতা বিগর্হিত কাজ এবং যে কোন ধরনের পাশবিকতা ও বর্বরতায় লিপ্ত হতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না। যারা নিজেদের লালসা ও প্রবৃত্তির শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে। তারা এমন কোন সীমানাই মানে না যেখানে তাদের থেমে যেতে হবে।

৮১. এ ধরনের কথা কখনো কোন কাফের জাতিকে সম্বোধন করে বলা যেতে পারে না। হযরত মূসার এ বক্তব্য পরিষ্কার ঘোষণা করছে যে, সমগ্র বনী ইসরাঈল জাতিই তখন মুসলমান ছিল এবং হযরত মূসা তাদেরকে এ উপদেশ দিচ্ছিলেন যে, তোমরা যদি সত্যিই মুসলমান হয়ে থাকো যেমন তোমরা দাবী করে থাকো তাহলে ফেরাউনের শক্তি দেখে ভয় করো না বরং আল্লাহর শক্তির ওপর আস্থা রাখো।

৮২. যেসব নওজোয়ান মূসা আলাইহিস সালামের সাথে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছিলেন এটা ছিল তাদের জবাব। এখানে قالوا (তারা বললো) শব্দের মধ্যে 'তারা' সর্বনামটি জাতির বা কওমের সাথে যুক্ত না হয়ে ذرية বা সন্তান সন্ততি তথা নওজোয়ানদের সাথে যুক্ত হয়েছে যেমন পরবর্তী বক্তব্য থেকে বুঝা যাচ্ছে।

৮৩. "আমাদেরকে জালেম লোকদের নির্যাতনের শিকারে পরিণত করো না"—উক্ত সাচ্চা ঈমানদার নওজোয়ানদের এ দোয়া বড়ই ব্যাপক অর্থ ও তাৎপর্যবোধক। গোমরাহির সর্বব্যাপী প্রাধান্য ও আধিপত্যের মধ্যে যখন কিছু লোক সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য কোমর বেঁধে লাগে তখন তারা বিভিন্ন ধরনের জালেমের মুখোমুখি হয়। একদিকে থাকে বাতিলের আসল ধারক ও বাহক। তারা পূর্ণশক্তিতে এ সত্যের আহবায়কদের বিধ্বস্ত ও পর্যুদস্ত করতে চায়। দ্বিতীয় দিকে থাকে তথাকথিত সত্যপন্থীদের একটি বেশ বড়সড় দল। তারা সত্যকে মেনে চলার দাবী করে কিন্তু মিথ্যার পরাক্রান্ত শাসন ও দোর্দণ্ড প্রতাপের মোকাবিলায় সত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও সংগ্রামকে অনাবশ্যক বা নির্বুদ্ধিতা মনে করে। সত্যের সাথে তারা যে বিশ্বাসঘাতকতা করছে তাকে কোন না কোন প্রকারে সঠিক ও বৈধ প্রমাণ করার জন্য তারা চরম প্রচেষ্টা চালায়। এ সংগে উল্টা তাদেরকে মিথ্যার ধারক গণ্য করে নিজেদের বিবেকের মর্মমূলে জমে ওঠা ক্লেশ ও জ্বালা মেটায়। সত্যপন্থীদের সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠার দাওয়াতের ফলে তাদের মনের গভীরে, সুস্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে এ ক্লেশ জমে ওঠে। তৃতীয় দিকে থাকে সাধারণ জন মানুষ। তারা নিরপেক্ষভাবে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখতে থাকে। যার পাল্লা ভারী হয়—সে সত্য হোক বা মিথ্যা—তাদের ভোট শেষ পর্যন্ত তারই পাল্লায় পড়ে। এমতাবস্থায় এ সত্যের আহবায়কদের প্রতিটি ব্যর্থতা বিপদ-আপদ, ভুল-ভ্রান্তি, দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি বাতিল পন্থী বা নিরপেক্ষ বিভিন্ন দলের জন্য বিভিন্নভাবে উৎপীড়ন ও উত্যক্ত করণের সুযোগ ও উপলক্ষ হয়ে দেখা দেয়। তাদেরকে বিধ্বস্ত ও পর্যুদস্ত করে দেয়া হলে অথবা তারা যদি পরাজিত হয়ে যায় তাহলে প্রথম দলটি বলে, আমরাই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলাম। যে নির্বোধরা পরাজিত হয়ে গেছে তারা সত্যপন্থী ছিল না। দ্বিতীয় দলটি বলে, দেখলে তো! আমরা না বলেছিলাম, এসব বড় বড় শক্তির সাথে বিবাদ ও সংঘর্ষের ফল নিছক কয়েকটি মূল্যবান প্রাণের বিনাশ ছাড়া আর কিছুই হবে না। শরীয়াত কবেইবা নিজেদেরকে এ ধ্বংসের গর্তে নিক্ষেপ করার দায়-দায়িত্ব আমাদের ওপর চাপিয়েছিল? সমকালীন ফেরাউনেরা তথা স্বৈরাচারী শাসকেরা যেসব ধ্যান-ধারণা পোষণ ও কাজ করার অনুমতি দিয়েছিল তার মাধ্যমেই তো দীনের সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় দাবীগুলো পূরণ হচ্ছিল। তৃতীয় দলটি তার সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দেয়, যে বিজয়ী হয়েছে সে-ই সত্য। এভাবে যদি সে তার দাওয়াতের কাজে কোন প্রকার ভুল করে বসে অথবা বিপদ ও সংকটকালে কোন সাহায্য-সহায়তা না পাওয়ার কারণে দুর্বলতা দেখায় কিংবা তার বা তার কোন সদস্যের কোন নৈতিক ত্রুটির প্রকাশ ঘটে তাহলে বহু লোকের জন্য মিথ্যার পক্ষাবলম্বনের হাজারো বাহানা সৃষ্টি হয়ে যায়। আর তারপর এ দাওয়াতের ব্যর্থতার পর সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত সত্যের দাওয়াতের উত্থানের আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না। কাজেই মূসা আলাইহিস সালামের সাথীরা যে দোয়া করেছিলেন তা ছিল বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ দোয়া। তারা দোয়া করেছিলেন, "হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি এমন অনুগ্রহ বর্ষণ করো যাতে আমরা জালেমদের জন্য ফিৎনায় তথা উৎপীড়নের অসহায় শিকারে পরিণত না হই।" অর্থাৎ আমাদের ভুল-ভ্রান্তি, দোষ-ত্রুটি ও

وَقَالَ مُوسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى
قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٨٨﴾ قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ
دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾

মূসা দোয়া করলো, "হে আমাদের রব! তুমি ফেরাউন ও তার সরদারদেরকে দুনিয়ার জীবনের শোভা-সৌন্দর্য[৮৭] ও ধন-সম্পদ[৮৮] দান করেছো। হে আমাদের রব! একি এ জন্য যে, তারা মানুষকে তোমার পথ থেকে বিপথে সরিয়ে দেবে? হে আমাদের রব! এদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং এদের অন্তরে এমনভাবে মোহর মেরে দাও যাতে মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ না করা পর্যন্ত যেন এরা ঈমান না আনে।[৮৯] আল্লাহ জবাবে বললেন, "তোমাদের দু'জনের দোয়া কবুল করা হলো। তোমরা দু'জন অবিচল থাকো এবং মূর্খদের পথ কখনো অনুসরণ করো না।[৯০]

দুর্বলতা থেকে রক্ষা করো এবং আমাদের প্রচেষ্টাকে দুনিয়ায় ফলদায়ক করো, যাতে আমাদের অস্তিত্ব তোমার সৃষ্টির জন্য কল্যাণপ্রদ হয়, জালেমদের দুরাচারের কারণ না হয়।

৮৪. এ আয়াতটির অর্থের ব্যাপারে মুফাস্‌সিরদের মধ্যে মতভেদ ঘটেছে। এর শব্দাবলী এবং যে পরিবেশে এ শব্দাবলী উচ্চারিত হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করে আমি একথা বুঝেছি যে, সম্ভবত মিসরে সরকারের কঠোর নীতি ও নির্যাতন এবং বনী ইসরাঈলের নিজের দুর্বল ঈমানের কারণে ইসরাঈলী ও মিসরীয় মুসলমানদের মধ্যে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ব্যবস্থা খতম হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে তাদের ঐক্যগ্রন্থী ছিন্নভিন্ন এবং তাদের দীনী প্রাণসত্তার মৃত্যু ঘটেছিল। এ জন্য এ ব্যবস্থাটিকে নতুন করে কায়েম করার জন্য হযরত মূসাকে হুকুম দেয়া হয়েছিল। তাঁকে বলা হয়েছিল, জামায়াতবদ্ধভাবে নামায পড়ার জন্য মিসরে কয়েকটি গৃহ নির্মাণ করো অথবা গৃহের ব্যবস্থা করে নাও। কারণ একটি বিকৃত ও বিক্ষিপ্ত মুসলিম জাতির দীনী প্রাণসত্তার পুনরুজ্জীবন এবং তার ইতস্তত ছড়ানো শক্তিকে নতুন করে একত্র করার উদ্দেশ্যে ইসলামী পদ্ধতিতে যে কোন প্রচেষ্টাই চালানো হবে তার প্রথম পদক্ষেপেই অনিবার্যভাবে জামায়াতের সাথে নামায কায়েম করার ব্যবস্থা করতে হবে। এ গৃহগুলোকে কিবলাহ গণ্য করার যে অর্থ আমি বুঝেছি তা হচ্ছে এই যে, এ গৃহগুলোকে সমগ্র জাতির জন্য কেন্দ্রীয় গুরুত্বের অধিকারী এবং তাদের কেন্দ্রীয় সম্মিলন স্থলে পরিণত করতে হবে। আর এরপরই "নামায কায়েম করো" কথাগুলো বলার মানে হচ্ছে এই যে, পৃথক পৃথকভাবে যার যার জায়গায় নামায পড়ে নেয়ার পরিবর্তে লোকদের এ নির্ধারিত স্থানগুলোয় জমায়েত হয়ে নামায পড়তে হবে। কারণ কুরআনের পরিভাষায়

যাকে "ইকামাতে সালাত" বলা হয় জামায়াতের সাথে নামায পড়া অনিবার্যভাবে তার অন্তরভুক্ত রয়েছে।

৮৫. অর্থাৎ বর্তমানে ঈমানদারদের ওপর যে হতাশা, ভীতি-বিহ্বলতা ও নিস্তেজ-নিস্পৃহ ভাব ছেয়ে আছে তা দূর করে দাও। তাদেরকে আশান্বিত করো। তাদেরকে উৎসাহিত ও উদ্যমশীল করো। 'সুখবর দাও' বাক্যাটির মধ্যে এসব অর্থ রয়েছে।

৮৬. ওপরের আয়াতগুলো হযরত মূসার দাওয়াতের প্রথম যুগের সাথে সম্পর্ক রাখে। এ দোয়াটি হচ্ছে মিসরে অবস্থানকালের একেবারে শেষ সময়ের। মাঝখানে কয়েক বছরের দীর্ঘ ব্যবধান। এ সময়কার বিস্তারিত বিবরণ এখানে নেই। তবে কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এ মাঝখানের যুগেরও বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

৮৭. অর্থাৎ আড়ম্বর, শান-শওকত ও সাংস্কৃতিক জীবনের এমন চিত্তাকর্ষক চাকচিক্য, যার কারণে দুনিয়ার মানুষ তাদের ও তাদের রীতি-নীতির মোহে মত্ত হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের পর্যায়ে পৌছার আকাঙ্খা করতে থাকে।

৮৮. অর্থাৎ উপায়-উপকরণ, যেগুলোর প্রাচুর্যের কারণে নিজেদের কলা-কৌশলসমূহ কার্যকর করা তাদের জন্য সহজসাধ্য ছিল এবং যেগুলোর অভাবে সত্যপন্থীরা নিজেদের যাবতীয় কর্মসূচী কার্যকর করতে অক্ষম ছিল।

৮৯. যেমন একটু আগেই আমি বলেছি, এ দোয়াটি হযরত মূসা (আ) করেছিলেন তাঁর মিসরে অবস্থানের একেবারে শেষ সময়ে। এটি তিনি এমন সময় করেছিলেন যখন একের পর এক সকল নিদর্শন দেখে নেবার এবং দীনের সাক্ষ প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যাবার পরও ফেরাউন ও তার রাজসভাসদরা সত্যের বিরোধিতায় চরম হঠকারিতার সাথে অবিচল ছিল। এহেন পরিস্থিতিতে পয়গম্বর যে বদদোয়া করেন তা কুফরীর ওপর অবিচল থাকার ব্যাপারে হঠকারিতার ভূমিকা অবলম্বনকারীদের সম্পর্কে আল্লাহর নিজের ফায়সালারই অনুরূপ হয়ে থাকে। অর্থাৎ তাদেরকে আর ঈমান আনার সুযোগ দেয়া হয় না।

৯০. যারা প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত নয় এবং আল্লাহর মহৎ উদ্দেশ্য ও মানব কল্যাণ নীতি বুঝে না, তারা মিথ্যার মোকাবিলায় সত্যের দুর্বলতা, সত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টাকারীদের অনবরত ব্যর্থতা এবং বাতিল মতাদর্শের নেতৃবৃন্দের বাহ্যিক আড়ম্বর, ঐশ্বর্য ও তাদের পার্থিব সাফল্য দেখে ধারণা করতে থাকে, হয়তো মহান আল্লাহ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণকারীদেরকে এ দুনিয়ার ওপর কর্তৃত্বশীল দেখতে চান। তারা মনে করে, হয়তো আল্লাহ স্বয়ং মিথ্যার মোকাবিলায় সত্যকে সমর্থন করতে চান না, তারপর এ মূর্খের দল শেষ পর্যন্ত নিজেদের বিভ্রান্তিকর অনুমানের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে পৌছে যে, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম আসলে অর্থহীন এবং এ অবস্থায় কুফরী ও ফাসেকী শাসনের আওতায় দীনের পথে চলার যে সামান্যতম অনুমতিটুকু পাওয়া যাচ্ছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এ আয়াতে মহান আল্লাহ হযরত মূসা ও তাঁর অনুসারীদেরকে এ ভ্রান্তি থেকে নিজেদের রক্ষা করার তাগিদ করেছেন। এখানে আল্লাহর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সবরের সাথে নিজেদের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করে যাও। সাধারণত মূর্খ ও অজ্ঞরা এ ধরনের অবস্থায় যে বিভ্রান্তির শিকার হয় তোমরাও যেন তেমনি বিভ্রান্ত না হও।

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ؕ
حَتّٰٓى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا
اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩٠﴾ آٰلْئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ
الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٩١﴾ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا
مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ﴿٩٢﴾

আর আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করে নিয়ে গেলাম। তারপর ফেরাউন ও তার সেনাদল জুলুম-নির্যাতন ও সীমালংঘন করার উদ্দেশ্যে তাদের পেছনে চললো। অবশেষে যখন ফেরাউন ডুবতে থাকলো তখন বলে উঠলো, "আমি মেনে নিলাম, বনী ইসরাঈল যার ওপর ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া আর কোন প্রকৃত ইলাহ নেই এবং আমিও আনুগত্যের শির নতকারীদের অন্তরভুক্ত।[৯১] (জবাব দেয়া হলো) "এখন ঈমান আনছো! অথচ এর আগে পর্যন্ত তুমি নাফরমানী চালিয়ে এসেছো এবং তুমি বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের একজন ছিলে। এখন তো আমি কেবল তোমার লাশটাকেই রক্ষা করবো যাতে তুমি পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শন হয়ে থাকো।[৯২] যদিও অনেক মানুষ এমন আছে যারা আমার নিদর্শনসমূহ থেকে উদাসীন।"[৯৩]

৯১. বাইবেলে এ ঘটনার কোন উল্লেখ নেই। তবে তালমূদে বলা হয়েছে, ডুবে যাওয়ার সময় ফেরাউন বলেছিল ঃ "আমি তোমার ওপর ঈমান আনছি। হে প্রভু! তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।"

৯২. সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিম সাগর তীরে যেখানে ফেরাউনের লাশ সাগরে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল আজো সে জায়গাটি অপরিবর্তিত রয়েছে। বর্তমান সময়ে এ জায়গাটির নাম জাবালে ফেরাউন বা ফেরাউন পর্বত। এরি কাছাকাছি আছে একটি গরম পানির ঝরণা। স্থানীয় লোকেরা এর নাম দিয়েছে হাম্মামে ফেরাউন। এর অবস্থান স্থল হচ্ছে আবু যানীমার কয়েক মাইল ওপরে উত্তরের দিকে। স্থানীয় লোকেরা এ জায়গাটি চিহ্নিত করে বলে, ফেরাউনের লাশ এখানে পড়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

এ ডুবন্ত ব্যক্তি যদি মিনফাতাহ ফেরাউন হয়ে থাকে, যাকে আধুনিক গবেষণায় মূসার আমলের ফেরাউন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাহলে এর লাশ এখনো কায়রোর যাদু ঘরে রয়েছে। ১৯০৭ সালে স্যার গ্রাফটিন এলিট স্মিথ তার মমির ওপর থেকে যখন পট্টি খুলেছিলেন তখন তার লাশের ওপর লবনের একটি স্তর জমাটবাঁধা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। এটি লবণাক্ত পানিতে তার ডুবে যাওয়ার একটি সুস্পষ্ট আলামত ছিল।

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ۚ فَمَا ٱخْتَلَفُوا۟
حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾ فَإِن كُنتَ فِى شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ
ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ
مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٩٥﴾

১০ রুকূ'

বনী ইসরাঈলকে আমি খুব ভালো আবাসভূমি দিয়েছি[৯৪] এবং অতি উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ তাদেরকে দান করেছি। তারপর যখন তাদের কাছে জ্ঞান এসে গেলো, তখনই তারা পরস্পরে মতভেদ করলো[৯৫] নিশ্চয়ই তোমার রব কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সেই জিনিসের ফায়সালা করে দেবেন, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত ছিল।

এখন যদি তোমার সেই হিদায়াতের ব্যাপারে সামান্যও সন্দেহ থেকে থাকে যা আমি তোমার ওপর নাযিল করেছি তাহলে যারা আগে থেকেই কিতাব পড়ছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে নাও। প্রকৃতপক্ষে তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার কাছে এ কিতাব মহাসত্য হয়েই এসেছে। কাজেই তুমি সন্দেহকারীদের অন্তরভুক্ত হয়ো না এবং যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলেছে তাদের মধ্যেও শামিল হয়ো না, তাহলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবে।[৯৬]

৯৩. অর্থাৎ আমি তো শিক্ষণীয় ও উপদেশমূলক নিদর্শনসমূহ দেখিয়েই যেতে থাকবো, যদিও বেশীর ভাগ লোকদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, বড় বড় শিক্ষণীয় নিদর্শন দেখেও তাদের চোখ খোলে না।

৯৪. অর্থাৎ মিসর থেকে বের হবার পর ফিলিস্তিন।

৯৫. এর অর্থ হচ্ছে, পরবর্তী পর্যায়ে তারা নিজেদের দীনের মধ্যে যে দলাদলি শুরু করে এবং নতুন নতুন মাযহাব তথা ধর্মীয় চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটায় তার কারণ এ ছিল না যে, তারা প্রকৃত সত্য জানতো না এবং এ না জানার কারণে তারা বাধ্য হয়ে এমনটি করে। বরং আসলে এসব কিছুই ছিল তাদের দুর্বৃত্তসুলভ চরিত্রের ফসল। আল্লাহর পক্ষ থেকে

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ
حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا
إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ۖ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ
أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

আসলে যাদের ব্যাপারে তোমার রবের কথা সত্য সাব্যস্ত হয়েছে[৯৭] তাদের সামনে যতই নিদর্শন এসে যাক না কেন তারা কখনই ঈমান আনবে না যতক্ষণ না যন্ত্রণাদায়ক আযাব চাক্ষুস দেখে নেবে। এমন কোন দৃষ্টান্ত আছে কি যে, একটি জনবসতি চাক্ষুস আযাব দেখে ঈমান এনেছে এবং তার ঈমান তার জন্য সুফলদায়ক প্রমাণিত হয়েছে? ইউনুসের কওম ছাড়া[৯৮] (এর কোন নজির নেই) তারা যখন ঈমান এনেছিল তখন অবশ্যি আমি তাদের ওপর থেকে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনার আযাব হটিয়ে দিয়েছিলাম[৯৯] এবং তাদেরকে একটি সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করার সুযোগ দিয়েছিলাম।[১০০] যদি তোমার রবের ইচ্ছা হতো (যে, যমীনে সবাই হবে মুমিন ও অনুগত) তাহলে সারা দুনিয়াবাসী ঈমান আনতো।[১০১] তবে কি তুমি মুমিন হবার জন্য লোকদের ওপর জবরদস্তি করবে?[১০২] আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউই ঈমান আনতে পারে না।[১০৩] আর আল্লাহর রীতি হচ্ছে, যারা বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না তাদের ওপর কলুষতা চাপিয়ে দেন।[১০৪]

তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছিল : এ হচ্ছে সত্য দীন, এ হচ্ছে তার মূলনীতি, এগুলো—এর দাবী ও চাহিদা, এগুলো হচ্ছে কুফর ও ইসলামের পার্থক্য সীমা, একে বলে আনুগত্য। আর এর নাম হচ্ছে গোনাহ, এসব জিনিসের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে এবং এসব নিয়মনীতির ভিত্তিতে দুনিয়ায় তোমার জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কিন্তু এ সুস্পষ্ট হেদায়াত সত্ত্বেও তারা একটি দীনকে অসংখ্য দীনে পরিণত করে এবং আল্লাহর দেয়া বুনিয়াদগুলো বাদ দিয়ে অন্য বুনিয়াদের ওপর নিজেদের ধর্মীয় ফেরকার প্রাসাদ নির্মাণ করে।

৯৬. বাহ্যত এ সম্বোধনটা করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। কিন্তু আসলে যারা তাঁর দাওয়াতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছিল তাদেরকে শুনানোই মূল

উদ্দেশ্য। এ সংগে আহলি কিতাবদের উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, আরবের সাধারণ মানুষ যথার্থই আসমানী কিতাবের জ্ঞানের সাথে মোটেই পরিচিত ছিল না। তাদের জন্য এটি ছিল একটি সম্পূর্ণ নতুন আওয়াজ। কিন্তু আহলি কিতাবদের আলেমদের মধ্যে যারা ধর্মভীরু ও ন্যায়নিষ্ঠ মননশীলতার অধিকারী ছিলেন তারা একথার সত্যতার সাক্ষ্য দিতে পারতেন যে, কুরআন যে জিনিসটির দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে পূর্ববর্তী যুগের সকল নবী তারই দাওয়াত দিয়ে এসেছেন।

৯৭. সে কথাটি হচ্ছে এই যে, যারা নিজেরাই সত্যের অন্বেষী হয় না এবং যারা নিজেদের মনের দুয়ারে জিদ, হঠকারিতা, অন্ধগোষ্ঠী প্রীতি ও সংকীর্ণ স্বার্থ-বিদ্বেষের তালা ঝুলিয়ে রাখে আর যারা দুনিয়া প্রেমে বিভোর হয়ে পরিণামের কথা চিন্তাই করে না তারাই ঈমান লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

৯৮. ইউনুস আলাইহিস সালাম (যাঁকে বাইবেলে যোনা নামে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাঁর সময়কাল খৃষ্টপূর্ব ৮৬০ থেকে ৭৮৪ সালের মাঝামাঝি সময় বলা হয়ে থাকে) যদিও বনী ইসরাঈলী নবী ছিলেন তবুও তাঁকে আসিরিয়াবাসীদের হেদায়াতের জন্য ইরাকে পাঠানো হয়েছিল। এ কারণে আসিরীয়দেরকে এখানে ইউনুসের কওম বলা হয়েছে। সে সময় এ কওমের কেন্দ্র ছিল ইতিহাস খ্যাত নিনোভা নগরী। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এ নগরীর ধ্বংসাবশেষ আজো বিদ্যমান। দাজলা নদীর পূর্ব তীরে আজকের মুসেল শহরের ঠিক বিপরীত দিকে এ ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এ এলাকায় ইউনুস নবী নামে একটি স্থান আজো বর্তমান রয়েছে। এ জাতির রাজধানী নগরী নিনোভা প্রায় ৬০ মাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত ছিল। এ থেকে এদের জাতীয় উন্নতির বিষয়টি অনুমান করা যেতে পারে।

৯৯. কুরআনে এ ঘটনার দিকে তিন জায়গায় শুধুমাত্র ইংগিত করা হয়েছে। কোন বিস্তারিত বিবরণ সেখানে দেয়া হয়নি। (দেখুন আম্বিয়া ৮৭-৮৮ আয়াত, আস্ সাফ্ফাত ১৩৯-১৪৮ আয়াত ও আল কলম ৪৮-৫০ আয়াত) তাই "আযাবের ফায়সালা হয়ে যাবার পর কারোর ঈমান আনা তার জন্য উপকারী হয় না।" আল্লাহ তার এ আইন থেকে হযরত ইউনুসের কওমকে কোন্ কোন্ কারণে নিষ্কৃতি দেন তা নিশ্চয়তার সাথে বলা সম্ভব নয়। বাইবেলে "যোনা ভাববাদীর পুস্তক" নাম দিয়ে যে সংক্ষিপ্ত সহীফা লিপিবদ্ধ হয়েছে তাতে কিছু বিবরণ পাওয়া গেলেও বিভিন্ন কারণে তা নির্ভরযোগ্য নয়। প্রথমত তা আসমানী সহীফা নয় এবং ইউনুস আলাইহিস সালামের লেখাও নয়। বরং তাঁর তিরোধানের চার পাঁচশো বছর পর কোন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ইউনুসের ইতিহাস হিসেবে লিখে এটিকে পবিত্র গ্রন্থসমূহের অন্তরভুক্ত করেন। দ্বিতীয়ত এর মধ্যে কতক একেবারেই আজেবাজে কথাও পাওয়া যায়। এগুলো মেনে নেবার মত নয়। তবুও কুরআনের ইশারা ও ইউনুসের সহীফার বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে কুরআনের তাফসীরকারগণ যে কথা বলেছেন তাই সঠিক বলে মনে হয়। তারা বলেছেন, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম যেহেতু আযাবের ঘোষণা দেবার পর আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই নিজের আবাসস্থল ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন তাই আযাবের লক্ষণ দেখে যখন আসিরীয়রা তওবা করলো এবং গোনাহের জন্য ক্ষমা চাইলো তখন মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। কুরআন মজীদে আল্লাহর বিধানের যে মৌল নিয়ম-কানুন বর্ণনা করা হয়েছে তার একটি স্বতন্ত্র ধারা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ কোন

জাতিকে ততক্ষণ আযাব দেন না যতক্ষণ না পূর্ণাঙ্গ দলীল–প্রমাণ সহকারে সত্যকে তাদের সামনে সুস্পষ্ট করে তোলেন। কাজেই নবী যখন সংশ্লিষ্ট জাতির জন্য নির্ধারিত অবকাশের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উপদেশ বিতরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারেননি এবং আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের আগেই নিজ দায়িত্বে হিজরাত করে চলে গেছেন তখন আল্লাহর সুবিচার নীতি এ জাতিকে আযাব দেয়া সমীচীন মনে করেনি। কারণ তার কাছে পূর্ণাঙ্গ দলীল–প্রমাণ সহকারে সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার আইনগত শর্তাবলী পূর্ণ হতে পারেনি। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা আস্ সাফ্ফাত–এর ব্যাখ্যা ৮৫ টীকা)।

১০০. ঈমান আনার পর এ জাতিটির আয়ু বাড়িয়ে দেয়া হলো। পরে তারা আবার চিন্তা ও কাজের ক্ষেত্রে ভুল পথে পা বাড়ানো শুরু করলো। নাহোম নবী (খৃষ্টপূর্ব ৭২০–৬৯৮) এ সময় তাদেরকে সতর্ক করলেন। কিন্তু তাতে কোন কাজ হলো না। তারপর সফনীয় নবীও (খৃষ্টপূর্ব ৬৪০–৬০৯) তাদেরকে শেষবারের মত সতর্ক করলেন। তাও কার্যকর হলো না। শেষ পর্যন্ত ৬১২ খৃষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে আল্লাহ তাদের ওপর মিডিয়াবাসীদের আগ্রাসন সংঘটিত করালেন। মিডিয়ার বাদশাহ ব্যাবিলনবাসীদের সহায়তায় আসিরিয়া এলাকা আক্রমণ করলেন। আসিরীয় সেনাদল পরাজিত হয়ে রাজধানী নিনোভায় অন্তরীণ হলো। কিছুকাল পর্যন্ত তারা জোরেশোরে মোকাবিলা করলো। তারপর দাজলায় এলো বন্যা। এ বন্যায় নগর প্রাচীর ধ্বসে পড়লো। সংগে সংগে আক্রমণকারীরা নগরে প্রবেশ করলো এবং পুরো শহর জ্বালিয়ে ভস্ম করলো। আশপাশের এলাকারও একই দশা হলো। আসিরীয়ার বাদশাও নিজের মহলে আগুন লাগিয়ে তাতে পুড়ে মরলো। আর এ সাথে আসিরীয় রাজত্ব ও সভ্যতারও ইতি ঘটলো চিরকালের জন্য। আধুনিক কালে এ এলাকায় প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খননের যে প্রচেষ্টা চলেছে, তাতে এখানে অগ্নিকাণ্ডের চিহ্ন অত্যন্ত স্পষ্ট দেখা গেছে।

১০১. অর্থাৎ আল্লাহ যদি চাইতেন যে, এ পৃথিবীতে শুধুমাত্র তাঁর আদেশ পালনকারী অনুগতরাই বাস করবে এবং কুফরী ও নাফরমানীর কোন অস্তিত্বই থাকবে না তাহলে তাঁর জন্য সারা দুনিয়াবাসীকে মুমিন ও অনুগত বানানো কঠিন ছিল না এবং নিজের একটি মাত্র সৃজনী ইংগিতের মাধ্যমে তাদের অন্তর ঈমান ও আনুগত্যে ভরে তোলাও তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু মানব জাতিকে সৃষ্টি করার পেছনে তাঁর যে প্রজ্ঞাময় উদ্দেশ্য কাজ করছে এ প্রাকৃতিক বল প্রয়োগে তা বিনষ্ট হয়ে যেতো। তাই আল্লাহ নিজেই ঈমান আনা বা না আনা এবং আনুগত্য করা বা না করার ব্যাপারে মানুষকে স্বাধীন রাখতে চান।

১০২. এর অর্থ এ নয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে জোর করে মুমিন বানাতে চাচ্ছিলেন এবং আল্লাহ তাঁকে এমনটি করতে বাধা দিচ্ছিলেন। আসলে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আমরা যে বর্ণনা পদ্ধতি পাই এ বাক্যেও সেই একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। সেখানে আমরা দেখি, সম্বোধন করা হয়েছে বাহ্যত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিন্তু আসলে নবীকে সম্বোধন করে যে কথা বলা হয় তা লোকদেরকে শুনানোই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এখানে যা কিছু বলতে চাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, হে লোকেরা! যুক্তি–প্রমাণের সাহায্যে হেদায়াত ও গোমরাহীর পার্থক্য স্পষ্ট করে তুলে ধরার এবং সঠিক পথ পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেবার যে দায়িত্ব ছিল তা আমার নবী পুরাপুরি পালন করেছেন। এখন যদি তোমরা নিজেরাই সঠিক পথে চলতে না চাও

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ
لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠١﴾ فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ قُلْ
فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾

তাদেরকে বলো, "পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু আছে চোখ মেলে দেখো।" আর যারা ঈমান আনতেই চায় না তাদের জন্য নিদর্শন ও উপদেশ–তিরস্কার কীইবা উপকারে আসতে পারে।[১০৫] এখন তারা এছাড়া আর কিসের প্রতীক্ষায় আছে যে, তাদের আগে চলে যাওয়া লোকেরা যে দুঃসময় দেখেছে তারাও তাই দেখবে? তাদেরকে বলো, "ঠিক আছে, অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।" তারপর (যখন এমন সময় আসে তখন) আমি নিজের রসূলদের এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে রক্ষা করি। এটিই আমার রীতি। মুমিনদের রক্ষা করা আমার দায়িত্ব।

এবং তোমাদের সঠিক পথে চলা যদি এর ওপর নির্ভরশীল হয় যে, কেউ তোমাদের ধরে বেঁধে সঠিক পথে চালাবে, তাহলে তোমাদের জেনে রাখা উচিত, নবীকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়নি। এভাবে জবরদস্তি ঈমান আনা যদি আল্লাহর অভিপ্রেত হতো তাহলে এ জন্য নবী পাঠাবার কি প্রয়োজন ছিল? এ কাজ তো তিনি নিজেই যখন ইচ্ছা করতে পারতেন।

১০৩. অর্থাৎ সমস্ত নিয়ামত যেমন আল্লাহর একচ্ছত্র মালিকানাধীন এবং আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন ব্যক্তি কোন নেয়ামতও নিজে লাভ করতে বা অন্যকে দান করতে পারে না ঠিক তেমনিভাবে এ ঈমানের নিয়ামতও আল্লাহর একচ্ছত্র মালিকানাধীন। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির ঈমানদার হওয়া এবং তার সত্য–সঠিক পথের সন্ধান লাভ করাও আল্লাহর অনুমতির ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন ব্যক্তি এ নিয়ামতটি নিজে লাভ করতে পারে না এবং কোন মানুষ ইচ্ছা করলে কাউকে এ নিয়ামতটি দান করতেও পারে না। কাজেই নবী যদি লোকদেরকে মুমিন বানাবার জন্য একান্ত আন্তরিকতাবে কামনাও করেন তাহলেও তাঁর জন্য আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর পক্ষ থেকে এ কাজের জন্য সুযোগ দানেরও প্রয়োজন হয়।

১০৪. এখানে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে, আল্লাহর অনুমতি ও তাঁর সুযোগ দান অন্ধভাবে বিচার–বিবেচনা ছাড়াই সম্পন্ন হয় না। কোন রকম মহৎ উদ্দেশ্য ছাড়া এবং কোন প্রকার যুক্তিসংগত নিয়ম–কানুন ছাড়াই যেভাবে ইচ্ছা এবং যাকে ইচ্ছা এ নিয়ামতটি লাভ করার সুযোগ দেয়াও হয় না এবং যাকে ইচ্ছা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিতও করা হয় না। বরং এর একটি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ নিয়ম হচ্ছে, যে ব্যক্তি সত্যের সন্ধানে নিজের

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ ۖ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ
مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٤﴾ وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ
الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٥﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ
فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾

১১ রুকূ'

হে নবী! বলে দাও,[১০৬] "হে লোকেরা! যদি তোমরা এখনো পর্যন্ত আমার দীনের ব্যাপারে কোন সন্দেহের মধ্যে থাকো তাহলে শুনে রাখো, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের বন্দেগী করো আমি তাদের বন্দেগী করি না বরং আমি কেবলমাত্র এমন আল্লাহর বন্দেগী করি যার করতলে রয়েছে তোমাদের মৃত্যু।[১০৭] আমাকে মুমিনদের অন্তরভুক্ত হবার জন্য হুকুম দেয়া হয়েছে। আর আমাকে বলা হয়েছে, তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে ঠিকভাবে এ দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করো[১০৮] এবং কখ্খনো মুশরিকদের অন্তরভুক্ত হয়ো না।[১০৯] আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কোন সত্তাকে ডেকো না, যে তোমার না কোন উপকার করতে না ক্ষতি করতে পারে। যদি তুমি এমনটি করো তাহলে জালেমদের দলভুক্ত হবে।

বুদ্ধিবৃত্তিকে নির্দ্বিধায় যথাযথভাবে ব্যবহার করে তার জন্য তো আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যে পৌঁছে যাবার কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণ তার নিজের প্রচেষ্টা ও চাহিদার অনুপাতে সরবরাহ করে দেয়া হয় এবং তাকেই সঠিক জ্ঞান লাভ করার ও ঈমান আনার সুযোগ দান করা হয়। আর যারা সত্যসন্ধই নয় এবং নিজেদের বুদ্ধিকে অন্ধগোষ্ঠী প্রীতি ও সংকীর্ণ স্বার্থ-বিদ্বেষের ফাঁদে আটকে রাখে অথবা আদৌ তাকে সত্যের সন্ধানে ব্যবহারই করে না তাদের জন্য আল্লাহর নিয়তির ভাণ্ডারে মূর্খতা, অজ্ঞতা, ভ্রষ্টতা, ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টি ও ত্রুটিপূর্ণ কর্মের আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা নিজেদেরকে এ ধরনের আবর্জনা ও অপবিত্রতার যোগ্য করে এবং এটিই হয়ে যায় তাদের নিয়তির লিখন।

১০৫. ঈমান আনার জন্য তারা যে দাবীটিকে শর্ত হিসেবে পেশ করতো এটি হচ্ছে তার শেষ ও চূড়ান্ত জবাব। তাদের এ দাবীটি ছিল, আমাদের এমন কোন নিদর্শন দেখাও যার ফলে তোমার নবুওয়াতকে আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারি। এর জবাবে বলা হচ্ছে, যদি তোমাদের মধ্যে সত্যের আকাংখা এবং সত্য গ্রহণ করার আগ্রহ থাকে তাহলে পৃথিবী ও আকাশের চারদিকে যে অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে এগুলো মুহাম্মাদের

বাণীর সত্যতার ব্যাপারে তোমাদের নিশ্চিন্ত করার জন্য শুধু যথেষ্ট নয় বরং তার চাইতেও বেশী। শুধুমাত্র চোখ খুলে সেগুলো দেখার প্রয়োজন। কিন্তু যদি এ চাহিদা ও আগ্রহই তোমাদের মধ্যে না থাকে, তাহলে অন্য কোন নিদর্শন, তা যতই অলৌকিক, অটল ও চিরন্তন রীতি ভংগকারী এবং বিস্ময়কর ও অত্যাশ্চর্য হোক না কেন, তোমাদেরকে ঈমানের নিয়ামত দান করতে পারে না। প্রত্যেকটি মু'জিযা দেখে তোমরা ফেরাউন ও তার কওমের সরদারদের মতই বলবে, এ তো যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। এ রোগে যারা আক্রান্ত হয় তাদের চোখ কেবলমাত্র তখনই খুলে থাকে যখন ক্রোধ, রোষবহ্নি ও গযব তার বিভীষিকাময় কঠোরতা সহকারে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঠিক এমনিভাবে ডুবে যাবার সময় ফেরাউনের চোখ খুলেছিল। কিন্তু একেবারে পাকড়াও করার সময় শেষ মুহূর্তে যে তওবা করা হয় তার কোন দাম নেই।

১০৬. যে বক্তব্য দিয়ে ভাষণ শুরু করা হয়েছিল এখন আবার তারই মাধ্যমে ভাষণ শেষ করা হচ্ছে। তুলনামূলক পাঠের জন্য প্রথম রুকূ'র আলোচনার ওপর আর একবার নজর বুলিয়ে নিন।

১০৭. মূল আয়াতে يَتَوَفَّكُم শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে "যিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন।" কিন্তু এ শাব্দিক অনুবাদ থেকে আসল মর্মবাণীর প্রকাশ হয় না। এ উক্তির মর্মবাণী হচ্ছে এই যে, "তোমাদের প্রাণ যে সত্তার করতলগত, যিনি তোমাদের ওপর এমনই পূর্ণাঙ্গ শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী যে, যতক্ষণ তিনি ইচ্ছা করেন ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা জীবনী শক্তি লাভ করতে পারো এবং তাঁর ইশারা হবার সাথে সাথেই তোমাদের নিজেদের প্রাণ সেই প্রাণ স্রষ্টার হাতে সোপর্দ করে দিতে হয়, আমি কেবলমাত্র সেই সত্তারই উপাসনা, বন্দেগী ও দাসত্ব এবং আনুগত্য করার ও হুকুম মেনে চলার কথা বলি। এখানে আরো একটি কথা বুঝে নিতে হবে। মক্কার মুশরিকরা একথা মানতো এবং আজো সকল শ্রেণীর মুশরিকরা একথা স্বীকার করে যে, মৃত্যু একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইখতিয়ারাধীন। এর ওপর অন্য কারো নিয়ন্ত্রণ নেই। এমনকি এ মুশরিকরা যেসব মনীষীকে আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতায় শরীক করে তাদের কেউই যে তাদের মৃত্যুর সময় পিছিয়ে দিতে পারেনি, তাদের ব্যাপারে একথাও তারা স্বীকার করে। কাজেই বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য আল্লাহর অসংখ্য গুণাবলীর মধ্য থেকে অন্য কোন গুণের কথা বর্ণনা করার পরিবর্তে এ বিশেষ গুণটি যে, "যিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন" এখানে বর্ণনা করার জন্য এ উদ্দেশ্যে নির্বাচন করা হয়েছে যে, নিজের দৃষ্টিভংগী বর্ণনা করার সাথে সাথে তার সঠিক হওয়ার যুক্তিও এর মাধ্যমে এসে যাবে। অর্থাৎ সবাইকে বাদ দিয়ে আমি একমাত্র তাঁর বন্দেগী করি এ জন্য যে, জীবন ও মৃত্যুর ওপর একমাত্র তাঁরই কর্তৃত্ব রয়েছে। আর তাঁর ছাড়া অন্যের বন্দেগী করবোই বা কেন, তারা তো অন্য কারোর জীবন-মৃত্যু তো দূরের কথা খোদ তাদের নিজেদেরই জীবন-মৃত্যুর ওপর কোন কর্তৃত্ব রাখে না। তাছাড়া আলংকারিক মাধুর্যকেও এখানে এভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছে যে, "তিনি আমাকে মৃত্যু দান করবেন" না বলে বলা হয়েছে, "তিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন।" এভাবে একটি বাক্যের সাহায্যে মূল বক্তব্য বিষয়, বক্তব্যের স্বপক্ষের যুক্তি এবং বক্তব্যের প্রতি আহবান তিনটিই সম্পন্ন করা হয়েছে। যদি বলা হতো, "আমি এমন সত্তার বন্দেগী করি যিনি আমাকে মৃত্যু দান

করবেন" তাহলে এর অর্থ কেবল এতটুকুই হতো যে, "আমার তাঁর বন্দেগী করা উচিত।" তবে এখন যে কথা বলা হয়েছে যে, "আমি এমন এক সত্তার বন্দেগী করি যিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন",—এর অর্থ হবে, শুধু আমারই নয় তোমাদেরও তাঁর বন্দেগী করা উচিত আর তোমরা তাকে বাদ দিয়ে অন্যদের বন্দেগী করে ভুল করে যাচ্ছো।

১০৮. এ দাবী কত জোরালো, তা গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য। বক্তব্য এভাবেও বলা যেতো, "তুমি এ দীন অবলম্বন করো" অথবা "এ দীনের পথে চলো" কিংবা "এ দীনের অনুগত ও অনুসারী হয়ে যাও।" কিন্তু মহান আল্লাহ এ বর্ণনাভংগীকে টিলেঢালা সাব্যস্ত করেছেন। এ দীন যেমন অবিচল ও তেজোদ্দীপ্ত আনুগত্য চায় এ দুর্বল শব্দসমূহের সাহায্যে তা প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। তাই নিজের দাবী তিনি নিম্নোক্ত শব্দাবলীর মাধ্যমে পেশ করেছেন ঃ

أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا

এখানে اقم وجهك এর শাব্দিক মানে হচ্ছে, "নিজের চেহারাকে স্থির করে দাও।" এর অর্থ, তুমি একই দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকো। নড়াচড়া করো না এবং এদিক ওদিক ফিরো না। সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে মুড়ে যেয়ো না। একেবারে নাক বরাবর সোজা পথে দৃষ্টি রেখে চলো, যেপথ তোমাকে দেখানো হয়েছে। এটি বড়ই শক্ত বাঁধন ছিল। কিন্তু এখানেই ক্ষান্ত থাকা হয়নি। এর ওপর আরো একটু বাড়তি বাঁধন দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে حنيفا অর্থাৎ সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শুধুমাত্র একদিকে মুখ করে থাকো। কাজেই দাবী হচ্ছে, এ দীন, আল্লাহর বন্দেগীর এ পদ্ধতি এবং জীবন যাপন প্রণালীর ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের উপাসনা–আরাধনা, ইবাদাত–বন্দেগী, দাসত্ব, আনুগত্য করতে ও হুকুম মেনে চলতে হবে। এমন একনিষ্ঠভাবে করতে হবে যে, অন্য কোন পদ্ধতির দিকে সামান্যতম ঝুঁকে পড়াও যাবে না। যেসব পথ তুমি ইতিপূর্বে পরিত্যাগ করে এসেছো এ পথে এসে সেই ভুল পথগুলোর সাথে সামান্যতম সম্পর্কও রাখবে না এবং দুনিয়ার মানুষ যেসব বাঁকা পথে চলেছে সেসব পথের দিকে একবার ভুল করেও তাকাবে না।

১০৯. অর্থাৎ যারা আল্লাহর সত্তা, তাঁর গুণাবলী, অধিকার ও ক্ষমতা–ইখতিয়ারে কোনভাবে অন্য কাউকে শরীক করে কখ্খনো তাদের অন্তরভুক্ত হয়ো না। এ অন্য কেউ তারা নিজেরাও হতে পারে আবার অন্য কোন মানুষ, মানব গোষ্ঠী, কোন আত্মা, জিন, ফেরেশতা অথবা কোন বস্তুগত, কাল্পনিক বা আনুমানিক সত্তাও হতে পারে। কাজেই পূর্ণ অবিচলতা সহকারে নির্ভেজাল তাওহীদের পথ অনুসরণ করার মত ইতিবাচক পদ্ধতির মধ্যেই শুধু দাবীকে আটকে রাখা হয়নি। বরং নেতিবাচক অবস্থার ক্ষেত্রে এমনসব লোকের থেকে আলাদা হয়ে যাবার দাবী জানানো হয়েছে যারা কোন না কোন প্রকারে শিরক করে থাকে। শুধু আকীদা–বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই নয় কাজে–কর্মে ও ব্যক্তি জীবন ধারায়ই নয় সামষ্টিক জীবন বিধানের ক্ষেত্রেও, ইবাদাতগাহ ও উপাসনালয়েই নয় শিক্ষায়তনেও, আদালত গৃহে, আইন প্রণয়ন পরিষদে, রাজনৈতিক মঞ্চে, অর্থনৈতিক বাজারে সর্বত্রই যারা নিজেদের চিন্তা ও কর্মের সমগ্র ব্যবস্থাই আল্লাহর আনুগত্য ও গায়রুল্লাহর আনুগত্যের মিশ্রণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। সব জায়গায়ই তাদের

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ
فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا
يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾
وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٠٩﴾

যদি আল্লাহ তোমাকে কোন বিপদে ফেলেন তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যে, এ বিপদ দূর করতে পারে। আর যদি তিনি তোমার কোন মঙ্গল চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করারও কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান অনুগ্রহ করেন এবং তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

হে মুহাম্মাদ! বলে দাও, "হে লোকেরা! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য এসে গেছে। এখন যারা সোজা পথ অবলম্বন করবে তাদের সোজা পথ অবলম্বন তাদের জন্যই কল্যাণকর হবে। এবং যারা ভুল পথ অবলম্বন করবে তাদের ভুল পথ অবলম্বন তাদের জন্যই ধ্বংসকর হবে। আর আমি তোমাদের ওপর হাবিলদার হয়ে আসিনি।" হে নবী! তোমার কাছে অহীর মাধ্যমে যে হেদায়াত পাঠানো হচ্ছে তুমি তার অনুসরণ করো। আর আল্লাহ ফায়সালা দান করা পর্যন্ত সবর করো এবং তিনিই সবচেয়ে ভালো ফায়সালাকারী।

পদ্ধতি থেকে নিজেদের পদ্ধতি আলাদা করে নাও। তাওহীদের অনুসারীরা জীবনের কোন ক্ষেত্রে ও বিভাগেও শিরকের অনুসারীদের অনুসৃত পথে পায়ের সাথে পা মিলিয়ে চলতে পারে না। এ ক্ষেত্রে তাদের শিরকের অনুসারীদের পেছনে চলার তো প্রশ্নই ওঠে না এবং এভাবে পেছনে চলার পরও তাদের তাওহীদবাদের দাবী ও চাহিদা নিশ্চিন্তে পূরণ হতে থাকবে একথা কল্পনাই করা যায় না।

তারপর শুধুমাত্র সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন শিরক (শিরকে জলী) থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়নি বরং অস্পষ্ট শিরক (শিরকে খফী) থেকেও পুরাপুরি ও কঠোরভাবে দূরে থাকারও আদেশ দেয়া হয়েছে। বরং অস্পষ্ট শিরক আরো বেশী বিপজ্জনক এবং তার ব্যাপারে সতর্ক থাকার প্রয়োজন আরো অনেক বেশী। কোন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি অস্পষ্ট শিরককে হাল্কা শিরক মনে করে থাকেন। তারা ধারণা করেন, এ ধরনের শিরকের ব্যাপারটা সুস্পষ্ট শিরকের মত অতোটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। অথচ অস্পষ্ট (খফী) মানে হাল্কা নয় বরং গুপ্ত ও গোপনে লুকিয়ে থাকা। এখন চিন্তা করার ব্যাপার হচ্ছে, যে শত্রু

দিন-দুপুরে চেহারা উন্মুক্ত করে সামনে এসে যায় সে-ই বেশী বিপজ্জনক, না যে কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকে বা বন্ধুর ছদ্মাবরণে এসে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করছে সে-ই বেশী বিপজ্জনক? যে রোগের আলামত একেবারে পরিষ্কার দেখা যায় সেটি বেশী ধ্বংসকারক, না যেটি দীর্ঘকাল সুস্থতার ছদ্মাবরণে ভেতরে ভেতরে স্বাস্থ্যকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে সে-ই বেশী ধ্বংসকর? যে শিরককে প্রত্যেক ব্যক্তি এক নজর দেখেই বলে দেয় এটি শিরক তার সাথে তাওহীদী দীনের সংঘাত একেবারে মুখোমুখি। কিন্তু যে শিরককে বুঝতে হলে গভীর দৃষ্টি ও তাওহীদের দাবীসমূহের নিবিড় ও অতলস্পর্শী উপলব্ধি প্রয়োজন, সে তার অদৃশ্য শিকড়গুলো দীনের ব্যবস্থার মধ্যে এমনভাবে ছড়িয়ে দেয় যে, সাধারণ তাওহীদবাদীরা তা ঘুণাক্ষরেও টের পায় না তারপর ধীরে ধীরে অবচেতন পদ্ধতিতে সে দীনের সার পদার্থসমূহ এমনভাবে খেয়ে ফেলে যে, কোথাও কোন বিপদ-ঘন্টা বাজাবার সুযোগই আসে না।

হূদ
১১

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে একথা উপলব্ধি করা যায় যে, এটা সূরা ইউনূসের সমসময়ে নাযিল হয়েছিল। এমনকি তার অব্যবহিত পরেই যদি নাযিল হয়ে থাকে তবে তাও বিচিত্র নয়। কারণ ভাষণের মূল বক্তব্য একই। তবে সতর্ক করে দেয়ার ধরনটা তার চেয়ে বেশী কড়া।

হাদীসে আছে। হযরত আবু বকর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : "আমি দেখছি আপনি বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন, এর কারণ কি?" জবাবে তিনি বলেন, شَيَّبَتْنِي هُوْدٌ وَاَخَوَاتُهَا "সূরা হূদ ও তারই মতো বিষয়বস্তু সম্বলিত সূরাগুলো আমাকে বুড়ো করে দিয়েছে।" এ থেকে অনুমান করা যাবে, যখন একদিকে কুরাইশ বংশীয় কাফেররা নিজেদের সমস্ত অস্ত্র নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যের দাওয়াতকে স্তব্ধ করে দিতে চাচ্ছিল এবং অন্যদিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে একের পর এক এসব সতর্কবাণী নাযিল হচ্ছিল, তখনকার সময়টা তাঁর কাছে কত কঠিন ছিল। সম্ভবত এহেন অবস্থায় সর্বক্ষণ এ আশংকা তাঁকে অস্থির করে তুলছিল যে, আল্লাহর দেয়া অবকাশ কখন নাজানি খতম হয়ে যায় এবং সেই শেষ সময়টি এসে যায় যখন আল্লাহ কোন জাতির ওপর আযাব নাযিল করে তাকে পাকড়াও করার সিদ্ধান্ত নেন। আসলে এ সূরাটি পড়ার সময় মনে হতে থাকে যেন একটি বন্যার বাঁধ ভেংগে পড়ার উপক্রম হয়েছে এবং যে অসতর্ক জনবসতিটি এ বন্যার গ্রাস হতে যাচ্ছে তাকে শেষ সাবধান বাণী শুনানো হচ্ছে।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

যেমন একটু আগেই বলেছি, ভাষণের বিষয়বস্তু সূরা ইউনূসের অনুরূপ। অর্থাৎ দাওয়াত, উপদেশ ও সতর্কবাণী। তবে পার্থক্য হচ্ছে, সূরা ইউনূসের তুলনায় দাওয়াতের অংশ এখানে সংক্ষিপ্ত, উপদেশের মধ্যে যুক্তির পরিমাণ কম ও ওয়াজ-নসীহত বেশী এবং সতর্কবাণীগুলো বিস্তারিত ও বলিষ্ঠ।

এখানে দাওয়াত এভাবে দেয়া হয়েছে : নবীর কথা মেনে নাও, শিরক থেকে বিরত হও অন্য সবার বন্দেগী ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও এবং নিজেদের দুনিয়ার জীবনের সমস্ত ব্যবস্থা আখেরাতে জবাবদিহির অনুভূতির ভিত্তিতে গড়ে তোলো।

উপদেশ দেয়া হয়েছে ঃ দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিকের ওপর ভরসা করে যেসব জাতি আল্লাহর নবীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে ইতিপূর্বেই তারা অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। এমতাবস্থায় ইতিহাসের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতায় যে পথটি ধ্বংসের পথ হিসেবে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে, সেই একই পথে তোমাদেরও চলতেই হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা আছে নাকি?

সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে ঃ আযাব আসতে যে দেরী হচ্ছে, তা আসলে একটা অবকাশ মাত্র।

আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তোমাদের এ অবকাশ দান করছেন। এ অবকাশকালে যদি তোমরা সংযত ও সংশোধিত না হও তাহলে এমন আযাব আসবে যাকে হটিয়ে দেবার সাধ্য কারোর নেই এবং যা ঈমানদারদের ক্ষুদ্রতম দলটি ছাড়া বাকি সমগ্র জাতিকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

এ বিষয়বস্তুটি উপলব্ধি করাবার জন্য সরাসরি সম্বোধন করার তুলনায় নূহের জাতি, আদ, সামুদ, লূতের জাতি, মাদ্‌য়ানবাসী ও ফেরাউনের সম্প্রদায়ের ঘটনাবলীর সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে বেশী করে। এ ঘটনাবলী বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ঃ আল্লাহ যখন কোন বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করতে উদ্যত হন তখন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ পদ্ধতিতেই মীমাংসা করেন। সেখানে কাউকে সামান্যতমও ছাড় দেয়া হয় না। তখন দেখা হয় না কে কার সন্তান ও কার আত্মীয়। যে সঠিক পথে চলে একমাত্র তার ভাগেই রহমত আসে। অন্যথায় আল্লাহর গযব থেকে কোন নবীপুত্র বা নবী পত্নী কেউই বাঁচতে পারে না। শুধু এখানেই শেষ নয়, বরং যখন ঈমান ও কুফরীর চূড়ান্ত ফায়সালার সময় এসে পড়ে তখন দীনের প্রকৃতির এ দাবীই জানাতে থাকে যে, মুমিন নিজেও যেন পিতা–পুত্র ও স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্ক ভুলে যায় এবং আল্লাহর ইনসাফের তরবারির মতো পূর্ণ নিরপেক্ষতার সাথে একমাত্র সত্যের সম্বন্ধ ছাড়া অন্য সব সম্বন্ধ কেটে ছিঁড়ে দূরে নিক্ষেপ করে। এহেন অবস্থায় বংশ ও রক্ত সম্বন্ধের প্রতি সামান্যতম পক্ষপাতিত্বও হবে ইসলামের প্রাণসত্তার সম্পর্ক বিরোধী। তিন চার বছর পরে বদরের ময়দানে মক্কার মুসলমানরা এ শিক্ষারই প্রদর্শনী করেছিলেন।

আয়াত ১২৩ | সূরা হূদ – মক্কী | রুকূ' ১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۙ﴿١﴾
اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۭ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ ۙ﴿٢﴾ وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ
ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ
ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ۭ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ۭ﴿٣﴾
اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤﴾

আলিফ-লাম-র। একটি ফরমান।[১] এর আয়াতগুলো পাকাপোক্ত এবং বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে,[২] এক পরম প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ থেকে। (এতে বলা হয়েছে) তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারোর বন্দেগী করবে না। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সতর্ককারীও এবং সুসংবাদদাতাও। আরো বলা হয়েছে ঃ তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো, তাহলে তিনি একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তোমাদের উত্তম জীবন সামগ্রী দেবেন[৩] এবং অনুগ্রহ লাভের যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অনুগ্রহ দান করবেন।[৪] তবে যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আমি তোমাদের ব্যাপারে একটি অতীব ভয়াবহ দিনের আযাবের ভয় করছি। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে এবং তিনি সবকিছুই করতে পারেন।

১. মূল আয়াতে 'কিতাব' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বর্ণনাভংগীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার অনুবাদ করা হয়েছে "ফরমান।" আরবী ভাষায় এ শব্দটি কেবলমাত্র কিতাব ও লিপি অর্থে ব্যবহৃত হয় না বরং হুকুম ও বাদশাহী ফরমান অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

২. অর্থাৎ এ ফরমানে যেসব কথা বলা হয়েছে সেগুলো পাকা ও অকাট্য কথা এবং সেগুলোর কোন নড়চড় নেই। ভালোভাবে যাচাই পর্যালোচনা করে সে কথাগুলো বলা

হয়েছে। নিছক বড় বড় বুলি আওড়াবার উদ্দেশ্যে বলা হয়নি। বক্তার বক্তৃতার যাদু এবং ভাব-কল্পনার কবিত্ব এখানে নেই। প্রকৃত ও হুবহু সত্য বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃত সত্যের চেয়ে কম বা তার চেয়ে বেশী একটি শব্দও এতে নেই। তারপর এ আয়াতগুলো বিস্তারিতও। এর মধ্যে প্রত্যেকটি কথা খুলে খুলে ও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। বক্তব্য জটিল, বক্র ও অস্পষ্ট নয়। প্রত্যেকটি কথা আলাদা আলাদা করে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ দুনিয়ায় তোমাদের অবস্থান করার জন্য যে সময় নির্ধারিত রয়েছে সেই সময় পর্যন্ত তিনি তোমাদের খারাপভাবে নয় বরং ভালোভাবেই রাখবেন। তাঁর নিয়ামতসমূহ তোমাদের ওপর বর্ষিত হবে। তাঁর বরকত ও প্রাচুর্যলাভে তোমরা ধন্য হবে। তোমরা সচ্ছল ও সুখী-সমৃদ্ধ থাকবে। তোমাদের জীবন শান্তিময় ও নিরাপদ হবে। তোমরা লাঞ্ছনা, হীনতা ও দীনতার সাথে নয় বরং সম্মান ও মর্যাদার সাথে জীবন যাপন করবে। এ বক্তব্যটিই সূরা নাহ্‌লের ৯৭ আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً - (النحل : ٩٧)

"যে ব্যক্তিই ঈমান সহকারে সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করবো।"

লোকদের মধ্যে সাধারণভাবে ছড়িয়ে থাকা একটি বিভ্রান্তি দূর করাই এর উদ্দেশ্য। বিভ্রান্তিটি হচ্ছে, আল্লাহ ভীতি, সততা, সাধুতা ও দায়িত্বানুভূতির পথ অবলম্বন করলে মানুষ আখেরাতে লাভবান হলেও হতে পারে কিন্তু এর ফলে তার দুনিয়া একদম বরবাদ হয়ে যায়। এ মন্ত্র শয়তান প্রত্যেক দুনিয়ার মোহে মুগ্ধ অজ্ঞ-নির্বোধের কানে ফুঁকে দেয়। এ সংগে তাকে এ প্ররোচনাও দেয় যে, এ ধরনের আল্লাহ ভীরু ও সৎলোকদের জীবনে দারিদ্র, অভাব ও অনাহার ছাড়া আর কিছুই নেই। আল্লাহ এ ধারণার প্রতিবাদ করে বলেন, এ সঠিক পথ অবলম্বন করলে তোমাদের শুধুমাত্র আখেরাতই নয়, দুনিয়াও সমৃদ্ধ হবে। আখেরাতের মতো এ দুনিয়ায় যথার্থ মর্যাদা ও সাফল্যও এমনসব লোকের জন্য নির্ধারিত, যারা আল্লাহর প্রতি যথার্থ আনুগত্য সহকারে সৎ জীবন যাপন করে, যারা পবিত্র ও ত্রুটিমুক্ত চরিত্রের অধিকারী হয়, যাদের ব্যবহারিক জীবনে ও লেনদেনে কোন ক্লেদ ও গ্লানি নেই, যাদের ওপর প্রত্যেকটি বিষয়ে ভরসা করা যেতে পারে, যাদের থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি কল্যাণের আশা পোষণ করে এবং কোন ব্যক্তি বা জাতি যাদের থেকে অকল্যাণের আশংকা করে না।

এ ছাড়া متاعحسن (উত্তম জীবন সামগ্রী) শব্দের মধ্যে আর একটি দিকও রয়েছে। এ দিকটি দৃষ্টির আগোচরে চলে যাওয়া উচিত নয়। কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার জীবন সামগ্রী দু' প্রকারের। এক প্রকারের জীবন সামগ্রী আল্লাহ বিমুখ লোকদেরকে ফিত্‌নার মধ্যে নিক্ষেপ করার জন্য দেয়া হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে প্রতারিত হয়ে তারা নিজেদেরকে দুনিয়া পূজা ও আল্লাহ বিস্মৃতির মধ্যে আরো বেশী করে হারিয়ে যায়। আপাত দৃষ্টিতে এটি নিয়ামত ঠিকই কিন্তু গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলে দেখা যাবে এটি আল্লাহর

أَلَآ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥﴾

দেখো, এরা তাঁর কাছ থেকে আত্মগোপন করার জন্য বুক ভাঁজ করছে।[৫] সাবধান! যখন এরা কাপড় দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকে তখন তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে তা সবই আল্লাহ জানেন। তিনি তো অন্তরে যা সংগোপন আছে তাও জানেন।

লানত ও আযাবের পটভূমিই রচনা করে। কুরআন মজীদ متاع غرور তথা প্রতারণার সামগ্রী নামেও একে স্মরণ করে। দ্বিতীয় প্রকারের জীবন সামগ্রী মানুষকে আরো বেশী সচ্ছল, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করে তাকে তার আল্লাহর আরো বেশী কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত করে। এভাবে সে আল্লাহর, তাঁর বান্দাদের এবং নিজের অধিকার আরো বেশী করে আদায় করতে সক্ষম হয়। আল্লাহর দেয়া উপকরণাদির সাহায্যে শক্তি সঞ্চয় করে সে দুনিয়ায় ভালো, ন্যায় ও কল্যাণের উন্নয়ন এবং মন্দ, বিপর্যয় ও অকল্যাণের পথ রোধ করার জন্য আরো বেশী প্রভাবশালী ও কার্যকর প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এ হচ্ছে কুরআনের ভাষায় উত্তম জীবন সামগ্রী। অর্থাৎ এমন উন্নত পর্যায়ের জীবন সামগ্রী যা নিছক দুনিয়ার আয়েশ আরামের মধ্যেই খতম হয়ে যায় না বরং পরিণামে আখেরাতেরও শান্তির উপকরণে পরিণত হয়।

৪. অর্থাৎ যে ব্যক্তি চরিত্রগুণে ও নেক আমলে যত বেশী এগিয়ে যাবে আল্লাহ তাকে ততই বড় মর্যাদা দান করবেন। আল্লাহর দরবারে কারোর কৃতিত্ব ও সৎকাজকে নষ্ট করা হয় না। তাঁর কাছে যেমন অসৎকাজ ও অসৎবৃত্তির কোন মর্যাদা নেই তেমনি সৎকাজ ও সৎবৃত্তিরও কোন অমর্যদা হয় না। তাঁর রাজ্যের রীতি এ নয় যে;

"আরবী ঘোড়ার পিঠে জরাজীর্ণ জিন
আর গাধার গলায় ঝোলে সোনার শৃংখল।"

যে ব্যক্তিই নিজের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেকে যেরূপ মর্যাদার অধিকারী প্রমাণ করবে তাকে আল্লাহ সে মর্যাদা অবশ্যই দেবেন।

৫. মক্কায় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আন্দোলন নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হলো তখন সেখানে এমন বহু লোক ছিল যারা বিরোধিতায় প্রকাশ্যে তেমন একটা তৎপর ছিল না কিন্তু মনে মনে তার দাওয়াতের প্রতি ছিল চরমভাবে ক্ষুব্ধ ও বিরূপভাবাপন্ন। তারা তাঁকে পাশ কাটিয়ে চলতো। তাঁর কোন কথা শুনতে চাইতো না। কোথাও তাঁকে বসে থাকতে দেখলে পেছন ফিরে চলে যেতো। দূর থেকে তাঁকে আসতে দেখলে মুখ ফিরিয়ে নিতো অথবা কাপড়ের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ফেলতো, যাতে তাঁর মুখোমুখি হতে না হয় এবং তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে নিজের কথা বলতে না শুরু করে দেন। এখানে এ ধরনের লোকদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ এরা

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٦﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ
عَمَلًا ۗ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ
أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا
عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨﴾

ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর বর্তায় না এবং যার সম্পর্কে তিনি জানেন না, কোথায় সে থাকে এবং কোথায় তাকে সোপর্দ করা হয়।[৬] সবকিছুই একটি পরিষ্কার কিতাবে লেখা আছে।

তিনিই আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, —যখন এর আগে তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল,[৭]—যাতে তোমাদের পরীক্ষা করে দেখেন তোমাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে।[৮] এখন যদি হে মুহাম্মাদ! তুমি বলো, হে লোকেরা, মরার পর তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে, তাহলে অস্বীকারকারীরা সংগে সংগেই বলে উঠবে। এতো সুস্পষ্ট যাদু।[৯] আর যদি আমি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের শাস্তি পিছিয়ে দেই তাহলে তারা বলতে থাকে, কোন্ জিনিস শাস্তিটাকে আটকে রেখেছে? শোনো! যেদিন সেই শাস্তির সময় এসে যাবে সেদিন কারো ফিরানোর প্রচেষ্টা তাকে ফিরাতে পারবে না এবং যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করছে তা-ই তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলবে।

সত্যের মুখোমুখি হতে ভয় পায় এবং উটপাখির মতো বালির মধ্যে মুখ গুঁজে রেখে মনে করে, যে সত্যকে দেখে তারা মুখ লুকিয়েছে তা অন্তর্হিত হয়ে গেছে। অথচ সত্য নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এবং এ তামাশাও দেখছে যে, এ নির্বোধরা তার থেকে বাঁচার জন্য মুখ লুকাচ্ছে।

৬. অর্থাৎ যে আল্লাহ এমন সূক্ষ্মজ্ঞানী যে প্রত্যেকটি পাখির বাসা ও প্রত্যেকটি পোকা-মাকড়ের গর্ত তাঁর জানা এবং তাদের প্রত্যেকের কাছে তিনি তাদের

জীবনোপকরণ পাঠিয়ে দিচ্ছেন, আর তাছাড়া প্রত্যেকটি প্রাণী কোথায় থাকে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করে প্রতি মুহূর্তে যিনি এ খবর রাখেন, তাঁর সম্পর্কে যদি তোমরা এ ধারণা করে থাকো যে, এভাবে মুখ লুকিয়ে অথবা কানে আংগুল চেপে কিংবা চোখ বন্ধ করে তাঁর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাবে তাহলে তোমরা বড়ই বোকা। সত্যের আহবায়ককে দেখে তোমরা মুখ লুকালে তাতে লাভ কি? এর ফলে কি তোমরা আল্লাহর কাছ থেকেও নিজেদের গোপন করতে পেরেছো? আল্লাহ কি দেখছেন না, এক ব্যক্তি তোমাদের সত্যের সাথে পরিচিত করাবার দায়িত্ব পালন করছেন আর তোমরা তার কোন কথা যাতে তোমাদের কানে না পড়ে সেজন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছো?

৭. সম্ভবত লোকদের একটি প্রশ্নের জবাবে প্রাসংগিকভাবে এ বাক্যটি মাঝখানে এসে গেছে। প্রশ্নটি ছিল, আকাশ ও পৃথিবী যদি প্রথমে না থেকে থাকে এবং পরে সৃষ্টি করা হয়ে থাকে তাহলে প্রথমে কি ছিল? এ প্রশ্নটি এখানে উল্লেখ না করেই এর সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়া হয়েছে এ বলে যে, প্রথমে পানি ছিল। এ পানি মানে কি তা আমরা বলতে পারি না। পানি নামে যে পদার্থটিকে আমরা চিনি সেটি, না এ শব্দটিকে এখানে নিছক রূপক অর্থে অর্থাৎ ধাতুর বর্তমান কঠিন অবস্থার পূর্ববর্তী দ্রবীভূত (Fluid) অবস্থা বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে? তবে আল্লাহর আরশ পানির ওপরে ছিল—এ বাক্যটির যে অর্থ আমরা বুঝতে পেরেছি তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহর সাম্রাজ্য তখন পানির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

৮. এ বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী এজন্য সৃষ্টি করেছেন যে, মূলত তোমাদের (অর্থাৎ মানুষ) সৃষ্টি করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। আর তোমাদের তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের ওপর নৈতিক দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেবার জন্য। তোমাদেরকে খিলাফতের ইখতিয়ার দান করে তিনি দেখতে চান তোমাদের মধ্য থেকে কে সেই ইখতিয়ার এবং নৈতিক দায়িত্ব কিভাবে ব্যবহার ও পালন করে? এ সৃষ্টি কর্মের গভীরে যদি এ উদ্দেশ্য নিহিত না থাকতো, যদি ইখতিয়ার সোপর্দ করা সত্ত্বেও কোন পরীক্ষা, হিসেব-নিকেশ, জবাবদিহি ও শাস্তি-পুরস্কারের প্রশ্ন না থাকতো এবং নৈতিকভাবে দায়িত্বশীল হওয়া সত্ত্বেও যদি মানুষকে কোন পরিণাম ফল ভোগ না করে এমনি এমনিই মরে যেতে হতো, তাহলে এ সমস্ত সৃষ্টিকর্ম পুরোপুরি একটি অর্থহীন খেলা-তামাশা বলে বিবেচিত হতো এবং প্রকৃতির এ সমগ্র কারখানাটিরই একটি বাজে কাজ ছাড়া আর কোন মর্যাদাই থাকতো না।

৯. অর্থাৎ তারা এমন শোচনীয় অজ্ঞতা ও মূর্খতায় লিপ্ত যে, তারা বিশ্ব-জাহানকে একজন খেলোয়াড়ের খেলাঘর এবং নিজেদেরকে তার মনভুলানো খেলনা মনে করে বসেছে। এ নির্বোধ জনোচিত কল্পনাবিলাসে তারা এত বেশী নিমগ্ন হয়ে পড়েছে যে, যখন তুমি তাদেরকে এ কর্মবহুল জীবনের নিরেট উদ্দেশ্য এবং এ সংগে তাদের নিজেদের অস্তিত্বের যুক্তিসংগত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বুঝাতে থাকো তখন তারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে এবং তোমাকে এ বলে বিদ্রূপ করতে থাকে যে, তুমি তো যাদুকরের মতো কথা বলছো।

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ
كَفُورٌ ﴿٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ
السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿١٠﴾ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾

২ রুকূ'

আমি মানুষকে নিজের অনুগ্রহভাজন করার পর আবার কখনো যদি তাকে তা থেকে বঞ্চিত করি তাহলে সে হতাশ হয়ে পড়ে এবং অকৃতজ্ঞতার প্রকাশ ঘটাতে থাকে। আর যদি তার ওপর যে বিপদ এসেছিল তার পরে আমি তাকে নিয়ামতের স্বাদ আস্বাদন করাই তাহলে সে বলে, আমার সব বিপদ কেটে গেছে। তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে এবং অহংকার করতে থাকে।[১০] এ দোষ থেকে একমাত্র তারাই মুক্ত যারা সবর করে[১১] এবং সৎকাজ করে আর তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং বিরাট প্রতিদানও।[১২]

১০. এ হচ্ছে মানুষের নীচতা, স্থূলদৃষ্টি ও অপরিণামদর্শিতার বাস্তব চিত্র। জীবনের কর্মচঞ্চল অংগনে পদে পদে এর সাক্ষাত পাওয়া যায়। সাধারণভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মন-মানসিকতা পর্যালোচনা করে নিজের মধ্যেও এর অবস্থান অনুভব করতে পারে। কখনো সে সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের অধিকারী হয়ে এবং শক্তি-সামর্থ লাভ করে অহংকার করে বেড়ায়। শরতের প্রকৃতি যেমন সবদিক সবুজ-শ্যামল দেখা যায় তেমনি কখনো দেখতে পায় চারদিক সবুজ শ্যামলে পরিপূর্ণ। মনের কোণে তখন একথা একবার উঁকিও দেয় না যে, এ সবুজের সমারোহ একদিন তিরোহিত হয়ে পাতা ঝরার মওসুমও আসতে পারে। কোন বিপদের ফেরে পড়লে আবেগে উত্তেজনায় সে কেঁদে ফেলে, বেদনা ও হতাশায় ডুবে যায় তার সারা মন-মস্তিষ্ক এবং এত বেসামাল হয়ে পড়ে যে, আল্লাহকে পর্যন্ত গালমন্দ করে বসে এবং তাঁর সার্বভৌম শাসন কর্তৃত্বকে অতিসম্পাত করে নিজের দুঃখ-বেদনা লাঘব করতে চেষ্টা করে। তারপর যখন দুঃসময় পার হয়ে গিয়ে সুসময় এসে যায় তখন আবার সেই আগের মতোই দম্ভ ও অহংকারে ধরাকে সরা জ্ঞান করে এবং সুখ-ঐশ্বর্যের নেশায় মত্ত হয়।

এখানে মানুষের এ নীচপ্রকৃতির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে কেন? অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে লোকদেরকে সতর্ক করাই এর উদ্দেশ্য। এখানে বলা হচ্ছে যে, আজ নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত পরিবেশে যখন আমার নবী আল্লাহর নাফরমানীর পরিণামে তোমাদের ওপর আযাব নাযিল হবে বলে তোমাদের সাবধান করে দেন তখন তোমরা তাঁর একথা শুনে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে এবং বলতে থাকো, "আরে পাগল! দেখছো না আমরা সুখ-ঐশ্বর্যের সাগরে ভাসছি,

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ
يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۚ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾

কাজেই হে নবী এমন যেন না হয়, তোমার প্রতি যে জিনিসের অহি করা হচ্ছে তুমি তার মধ্য থেকে কোন জিনিস (বর্ণনা করা) বাদ দেবে এবং একথায় তোমার মন সংকুচিত হবে এ জন্য যে, তারা বলবে, "এ ব্যক্তির ওপর কোন ধনভাণ্ডার অবতীর্ণ হয়নি কেন" অথবা "এর সাথে কোন ফেরেশতা আসেনি কেন?" তুমি তো নিছক সতর্ককারী। এরপর আল্লাহই সব কাজের ব্যবস্থাপক।[১৩]

চারদিকে আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের ঝাণ্ডা উড়ছে, এ সময় দিন-দুপুরে তুমি কেমন করে দেখলে আমাদের ওপর আযাব নাযিল হওয়ার বিভীষিকাময় স্বপ্ন।" এ অবস্থায় আসলে নবীর উপদেশের জবাবে তোমাদের এ ঠাট্টা বিদ্রূপ তোমাদের নীচ সহজাত প্রবৃত্তির একটি নিকৃষ্টতর প্রদর্শনী ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ তো তোমাদের ভ্রষ্টতা ও অসৎকার্যাবলী সত্ত্বেও নিছক তাঁর অনুগ্রহ ও করুণার কারণে তোমাদের শাস্তি বিলম্বিত করছেন। তোমাদের সংশোধিত হবার সুযোগ দেয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু তোমরা এ অবকাশ কালে ভাবছো, আমাদের সচ্ছলতা ও প্রাচুর্য কেমন স্থায়ী বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আমাদের এ বাগানে কেমন চিরবসন্তের আমেজ লেগেছে, যেন এখানে শীতের পাতা ঝরার মওসুমের আগমনের কোন আশংকাই নেই।

১১. এখানে সবরের আর একটি অর্থ সামনে আসছে। ওপরে যে নীচতার বর্ণনা এসেছে সবর তার বিপরীত গুণ প্রকাশ করে। সবরকারী ব্যক্তি কালের পরিবর্তনশীল অবস্থায় নিজের মানসিক ভারসাম্য অটুট রাখে। সময়ের প্রত্যেকটি পরিবর্তনের প্রভাব গ্রহণ করে সে নিজের রং বদলাতে থাকে না। বরং সব অবস্থায় একটি যুক্তিসংগত ও সঠিক মনোভাব ও দৃষ্টিভংগী নিয়ে এগিয়ে চলে। যদি কখনো অবস্থা অনুকূলে এসে যায় এবং সে ধনাঢ্যতা, কর্তৃত্ব ও খ্যাতির উচ্চাসনে চড়তে থাকে তাহলে শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকারের নেশায় মত্ত হয়ে বিপথে পরিচালিত হয় না। আর যদি কখনো বিপদ-আপদ ও সমস্যা-সংকটের করাল আঘাত তাকে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকে তাহলে এহেন অবস্থায়ও সে নিজের মানবিক চরিত্র বিনষ্ট করে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে সুখৈশ্বর্য বা বিপদ-মুসীবত যে কোন আকারেই তাকে পরীক্ষায় ফেলা হোক না কেন উভয় অবস্থায়ই তার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অপরিবর্তিত ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তার হৃদয়পাত্র কখনো কোন ছোট বা বড় জিনিসের আধিক্যে উপচে পড়ে না।

১২. অর্থাৎ আল্লাহ এমন ধরনের লোকদের দোষ-ত্রুটি মাফও করে দেন এবং তাদের সৎকাজের পুরস্কারও দেন।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ
وَّادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾

এরা কি বলছে, নবী নিজেই এ কিতাবটি রচনা করেছে? বলো, ঠিক আছে, তাই যদি হয়, তাহলে এর মতো দশটি সূরা তোমরা বানিয়ে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর যেসব মাবুদ আছে তাদেরকে সাহায্যের জন্যে ডাকতে পারলে ডেকে নাও, যদি তোমরা (তাদেরকে মাবুদ মনে করার ব্যাপারে) সাচ্চা হয়ে থাকো।

১৩. এ বক্তব্যের অর্থ বুঝার জন্যে যে অবস্থায় এটি পেশ করা হয় সেটি অবশ্যি সামনে রাখতে হবে। মক্কা এমন একটি গোত্রের কেন্দ্রভূমি যার ধর্মীয় কর্তৃত্ব এবং আর্থিক, বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার দাপট সমগ্র আরবের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ গোত্রটি যখন অগ্রগতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছে, ঠিক তখনই সেই জনপদের এক ব্যক্তি উঠে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, তোমরা যে ধর্মের পৌরহিত্য করছো তা পরিপূর্ণ গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার নেতার আসনে বসে আছো তার শিকড়ের গভীর মূলদেশে পর্যন্ত পচন ধরেছে এবং তা একটি গলিত ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহর আযাব তোমাদের ওপর প্রচণ্ডবেগে ঝাঁপিয়ে পড়িতে উদ্যত। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সামনে যে সত্য ধর্ম ও কল্যাণময় জীবন বিধান পেশ করছি তাকে গ্রহণ করা ছাড়া তোমাদের জন্য বাঁচার আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তার সাথে তার নিজের পূত-পবিত্র চরিত্র এবং যুক্তিসংগত কথা ছাড়া আর এমন কোন অসাধারণ জিনিস নেই যা দেখে সাধারণ মানুষ তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত বলে মনে করতে পারে। আর চারপাশের পরিমণ্ডলেও ধর্ম, নৈতিকতা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গভীর মৌলিক ত্রুটি ছাড়া এমন কোন বাহ্যিক আলামত নেই, যা আযাব নাযিল হওয়াকে চিহ্নিত করতে পারে। বরং এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সমস্ত সুস্পষ্ট আলামত একথাই প্রকাশ করছে যে, তাদের ওপর আল্লাহর (এবং তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী) দেবতাদের বড়ই অনুগ্রহ রয়েছে এবং তারা যাকিছু করছে ঠিকই করছে। এহেন অবস্থায় একথা বলার ফলে জনপদের কতিপয় অত্যন্ত সুস্থ বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন এবং সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ছাড়া বাদবাকি সমস্ত লোকই যে তার বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এটাই স্বাভাবিক, এর পরিণতি এ ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না। কেউ জুলুম-নির্যাতনের সাহায্যে তাকে দাবিয়ে দিতে চায়। কেউ মিথ্যা দোষারোপ এবং আজে বাজে প্রশ্ন-আপত্তি ইত্যাদি উত্থাপন করে তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। কেউ বিদ্বেষমূলক বিরূপ আচরণের মাধ্যমে তার সাহস ও হিম্মত গুঁড়িয়ে দিতে চায়। আবার কেউ ঠাট্টা-তামাশা, পরিহাস, ব্যাংগ-বিদ্রূপ ও অশ্লীল-কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে তার কথাকে গুরুত্বহীন করে দিতে চায়। এভাবে কয়েক বছর ধরে এ ব্যক্তির দাওয়াতকে মোকাবিলা করা হতে থাকে। এ মোকাবিলা যে কত হৃদয়বিদারক ও হতাশাব্যঞ্জক হতে পারে তা সুস্পষ্ট করে বলার প্রয়োজন নেই। এরূপ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাঁর নবীর হিম্মত

فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٤﴾

এখন যদি তোমাদের মাবুদরা তোমাদের সাহায্যে না পৌঁছে থাকে তাহলে জেনে রাখো এ আল্লাহর ইল্‌ম থেকে নাযিল হয়েছে এবং তিনি ছাড়া আর কোন সত্যিকার মাবুদ নেই। তাহলে কি তোমরা (এ সত্যের সামনে) আনুগত্যের শির নত করছো?[১৪]

অটুট রাখার জন্য তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলছেন, ভালো ও অনুকূল অবস্থায় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠা এবং খারাপ ও প্রতিকূল অবস্থায় হতাশ হয়ে পড়া মূলত নীচ ও হীনমন্য লোকদের কাজ। আমার দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি নিজে সৎ হয় এবং সততার পথে ধৈর্য, দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে অগ্রসর হয় সে-ই আসলে মর্যাদার অধিকারী। কাজেই যে ধরনের বিদ্বেষ, বিরূপ ব্যবহার, ব্যংগ-বিদ্রূপ ও মূর্খজনোচিত আচরণ দ্বারা তোমার মোকাবিলা করা হচ্ছে, তার ফলে তোমার দৃঢ়তা ও অবিচলতায় যেন ফাটল না ধরে। অহীর মাধ্যমে তোমার সামনে যে মহাসত্যের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে তার প্রকাশ ও ঘোষণায় এবং তার প্রতি আহবান জানাতে যেন তুমি একটুও কুণ্ঠিত ও ভীত না হও। অমুক বিষয়টি শোনার সাথে সাথেই যখন লোকেরা তা নিয়ে ব্যংগ-বিদ্রূপ করতে থাকে তখন তা কেমন করে বলবো এবং অমুক সত্যটি যখন কেউ শুনতেই প্রস্তুত নয় তখন তা কিভাবে প্রকাশ করবো, এ ধরনের চিন্তা এবং দোদুল্যমানতা তোমার মনে যেন কখনো উদয়ই না হয়। কেউ মানুক বা না মানুক তুমি যা সত্য মনে করবে নির্দ্বিধায় ও নির্ভয়ে এবং কোন প্রকার কমবেশী না করে তা বলে যেতে থাকবে, পরিণাম আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দেবে।

১৪. এখানে একই যুক্তির মাধ্যমে কুরআনের আল্লাহর কালাম হওয়ার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে এবং একই সংগে তাওহীদের প্রমাণও। এ যুক্তির সার নির্যাস হচ্ছে ঃ

এক ঃ তোমাদের মতে যদি এটা মানুষের বাণী হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যি এমন বাণী রচনার ক্ষমতা মানুষের থাকা উচিত। কাজেই তোমরা যখন দাবী করছো, এ কিতাবটি আমি (মুহাম্মাদ) নিজেই রচনা করেছি তখন তোমাদের এ দাবী কেবলমাত্র তখনই সঠিক হতে পারে যখন তোমরা এমনি ধরনের একটি কিতাব রচনা করে দেখিয়ে দেবে। কিন্তু বারবার চ্যালেঞ্জ দেবার পরও যদি তোমরা সবাই মিলে এর নজীর পেশ করতে না পারো তাহলে আমার এ দাবী সত্য যে, আমি এ কিতাবের রচয়িতা নই বরং আল্লাহর জ্ঞান থেকে এটি নাযিল হয়েছে।

দুই ঃ তারপর এ কিতাবে যেহেতু তোমাদের মাবুদদের প্রকাশ্যে বিরোধিতা করা হয়েছে এবং পরিষ্কার বলা হয়েছে, তাদের ইবাদাত বন্দেগী করো না, কারণ আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতায় তাদের কোন অংশ নেই, তাই অবশ্যি তোমাদের মাবুদদেরও (যদি সত্যি তাদের কোন শক্তি থাকে) আমার দাবীকে মিথ্যা প্রমাণ এবং এ কিতাবের নজীর

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ
فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ﴿١٥﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ
اِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾

যারা শুধুমাত্র এ দুনিয়ার জীবন এবং এর শোভা-সৌন্দর্য কামনা করে[১৫] তাদের কৃতকর্মের সমুদয় ফল আমি এখানেই তাদেরকে দিয়ে দেই এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে কম দেয়া হয় না। কিন্তু এ ধরনের লোকদের জন্য আখেরাতে আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই।[১৬] (সেখানে তারা জানতে পারবে) যাকিছু তারা দুনিয়ায় বানিয়েছে সব বরবাদ হয়ে গেছে এবং এখন তাদের সমস্ত কৃতকর্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

পেশ করার ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য করা উচিত। কিন্তু এ ফায়সালার সময়ও যদি তারা তোমাদের সাহায্য না করে এবং তোমাদের মধ্যে এ কিতাবের নজীর পেশ করার মতো শক্তি সঞ্চার করতে না পারে, তাহলে এ থেকে পরিষ্কার প্রমাণ হয়ে যায় যে, তোমরা তাদেরকে অযথা তোমাদের মাবুদ বানিয়ে রেখেছো। মূলত তাদের মধ্যে কোন শক্তি নেই এবং আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার কোন অংশও নেই, যার ভিত্তিতে তারা মাবুদ হবার অধিকার লাভ করতে পারে।

এ আয়াত থেকে আনুষংগিকভাবে একথাও জানা যায় যে, এ সূরাটি সূরা ইউনূসের পূর্বে নাযিল হয়। এখানে দশটি সূরা রচনা করে আনার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়। এ চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে তারা অক্ষম হলে এরপর সূরা ইউনূসে বলা হয় ঃ ঠিক আছে, তাহলে শুধুমাত্র এরি মতো একটি সূরাই রচনা করে নিয়ে এসো। (ইউনূস, ৩৮ আয়াত, ৪৬ টীকা)

১৫. এখানে যে প্রসংগে ও যে সামঞ্জস্যের পেক্ষিতে একথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, সে যুগে যে ধরনের লোকেরা কুরআনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করছিল এবং আজও প্রত্যাখ্যান করছে তাদের বেশীর ভাগই দুনিয়া পূজারী। বৈষয়িক স্বার্থ তাদের মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখে। আল্লাহর বাণী প্রত্যাখ্যান করার জন্য তারা যে ওজুহাত দেখায় তা সবই মেকী। আসল কারণ হচ্ছে তাদের দৃষ্টিতে দুনিয়া ও তার বস্তুবাদী স্বার্থের উর্ধে কোন জিনিসের কোন মূল্য নেই এবং এ স্বার্থগুলো থেকে লাভবান হতে হলে তাদের প্রয়োজন লাগামহীন স্বাধীনতা।

১৬. অর্থাৎ যার সামনে রয়েছে শুধু দুনিয়ার এ জীবন এবং এর স্বার্থ ও সুখ-সম্ভোগ লাভ সে এ বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যেমন প্রচেষ্টা এখানে চালাবে তেমনি তার ফল সে এখানে পাবে। কিন্তু আখেরাত যখন তার লক্ষ নয় এবং সেজন্য সে কোন চেষ্টাও করেনি তখন তার দুনিয়ার বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার প্রচেষ্টার ফল লাভ আখেরাত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হবার কোন কারণ নেই। সেখানে ফল লাভের সম্ভাবনা একমাত্র তখনই হতে পারে যখন দুনিয়ায় মানুষ এমন সব কাজের জন্য প্রচেষ্টা চালায় যেগুলো আখেরাতেও

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ
مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ
الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۖ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن
رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾

তারপর যে ব্যক্তি তার রবের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট সাক্ষের অধিকারী ছিল,[১৭] এরপর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন সাক্ষীও (এ সাক্ষের সমর্থনে) এসে গেছে[১৮] এবং পথপ্রদর্শকও অনুগ্রহ হিসেবে পূর্বে আগত মূসার কিতাবও বর্তমান ছিল (এ অবস্থায় সে ব্যক্তিও কি দুনিয়া পূজারীদের মতো তা অস্বীকার করতে পারে?) এ ধরনের লোকেরা তো তার প্রতি ঈমান আনবেই,[১৯] আর মানব গোষ্ঠীর মধ্য থেকে যে-ই একে অস্বীকার করে তার জন্য যে জায়গার ওয়াদা করা হয়েছে তা হচ্ছে দোযখ। কাজেই হে নবী! তুমি এ জিনিসের ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহে পড়ে যেয়ো না, এতো তোমার রবের পক্ষ থেকে পাঠানো সত্য। তবে বেশীর ভাগ লোক তা স্বীকার করে না।

ফলদায়ক হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি কেউ তার নিজের বসবাস করার জন্য একটি সুরম্য প্রাসাদ চায় এবং এখানে এ ধরনের প্রাসাদ তৈরী করার জন্য যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার তা সবই সে অবলম্বন করে তাহলে নিশ্চয়ই একটি সুরম্য প্রাসাদ তৈরী হয়ে যাবে এবং তার কোন একটি ইটও নিছক একজন কাফের তাকে দেয়ালের গায় বসাচ্ছে বলে প্রাসাদের দেয়ালে বসতে অস্বীকার করবে না। কিন্তু মৃত্যুর আগমন এবং জীবনের শেষ নিশ্বাসের সাথে সাথেই তাকে নিজের এ প্রাসাদ এবং এর সমস্ত সাজসরঞ্জাম এ দুনিয়ায় ছেড়ে চলে যেতে হবে। এর কোন জিনিসও সে সংগে করে পরলোকে নিয়ে যেতে পারবে না। যদি সে আখেরাতে প্রাসাদ তৈরী করার জন্য কিছু না করে থাকে তাহলে তার এ প্রাসাদ তার সাথে সেখানে স্থানান্তরিত হবার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। দুনিয়ায় সে যদি এমন সব কাজে প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে যেগুলোর সাহায্যে আল্লাহর আইন অনুযায়ী আখেরাতে প্রাসাদ নির্মিত হয় তাহলে একমাত্র তখনই সে ওখানে কোন প্রাসাদ লাভ করতে পারে।

এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে, এ যুক্তি দ্বারা তো শুধু এতটুকুই বুঝা যায় যে, সেখানে সে কোন প্রাসাদ পাবে না। কিন্তু প্রাসাদের পরিবর্তে সে আগুন লাভ করবে, এ কেমন কথা? এর জবাব হচ্ছে (কুরআনই বিভিন্ন সময় এ জবাবটি দিয়েছে) যে ব্যক্তি আখেরাতকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্য কাজ করে সে অনিবার্য ও স্বাভাবিকভাবে এমন পদ্ধতিতে কাজ করে যার ফলে আখেরাতে প্রাসাদের পরিবর্তে আগুনের কুণ্ড তৈরী হয়। (সূরা ইয়াসীনের ১২ টীকা দেখুন)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ
وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى
الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ
وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করে তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে?[২০] এ ধরনের লোকদের তাদের রবের সামনে উপস্থিত করা হবে এবং সাক্ষীরা সাক্ষ দেবে, এরাই নিজেদের রবের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করেছিল। শোনো, জালেমদের ওপর আল্লাহর লানত[২১]—এমন জালেমদের[২২] ওপর যারা আল্লাহর পথে যেতে মানুষকে বাধা দেয়, সেই পথকে বাঁকা করে দিতে চায়[২৩] এবং আখেরাত অস্বীকার করে।

১৭. অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেই নিজের অস্তিত্ব, পৃথিবী ও আকাশের নির্মাণ এবং বিশ্ব-জাহানের শাসন-শৃংখলা বিধানের ক্ষেত্রে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট সাক্ষলাভ করছিল যে, একমাত্র আল্লাহই এ দুনিয়ার স্রষ্টা, মালিক ও প্রতিপালক এবং এ সাক্ষ দেখে যার মনে আগে থেকেই বিশ্বাস জন্মাচ্ছিল যে, এ জীবনের পরে আরো কোন জীবন অবশ্যি হওয়া উচিত যেখানে মানুষ আল্লাহর কাছে তার কাজের হিসাব দেবে এবং নিজের কৃতকর্মের জন্য পুরস্কার ও শাস্তি লাভ করবে।

১৮. অর্থাৎ কুরআন এসে এ প্রকৃতিগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক সাক্ষের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করলো এবং তাকে জানালো তুমি বিশ্বপ্রকৃতিতে ও জীবন ক্ষেত্রে যার নিদর্শন ও পূর্বাভাস পেয়েছো প্রকৃতপক্ষে তাই সত্য।

১৯. বক্তব্যের যে প্রাসংগিক ধারাবাহিকতা চলে এসেছে তার প্রেক্ষিতে এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যারা দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিকগুলো এবং তার আপাত চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে গেছে তাদের জন্য কুরআনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা সহজ। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের অস্তিত্ব ও বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনায় আগে থেকেই তাওহীদ ও আখেরাতের স্পষ্ট সাক্ষ-প্রমাণ পেয়ে আসছিল তারপর কুরআন এসে ঠিক সেই একই কথা বললো, যার সাক্ষ সে ইতিপূর্বে নিজের মধ্যে এবং বাইরেও পাচ্ছিল আর কুরআনের পূর্বে আগত আসমানী কিতাব থেকেও এর পক্ষে আরো সমর্থন পাওয়া গেলো, সে কেমন করে এসব শক্তিশালী সাক্ষ-প্রমাণের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে এ অস্বীকারকারীদের সুরে সুর মিলাতে পারে? এ উক্তি থেকে একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন নাযিলের পূর্বেই ঈমান বিল গাইব-এর মনযিল অতিক্রম করেছিলেন। সূরা আন'আমে যেমন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن
دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ۘ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ
السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ
عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿٢٢﴾

—তারা[২৪] পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারতো না এবং আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের কোন সাহায্যকারী ছিল না। তাদেরকে এখন দ্বিগুণ আযাব দেয়া হবে।[২৫] তারা কারোর কথা শুনতেও পারতো না এবং তারা নিজেরা কিছু দেখতেও পেতো না। তারা এমন লোক যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে এবং তাদের মনগড়া সবকিছুই তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে।[২৬] অনিবার্যভাবে আখেরাতে তারাই হবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত।

নবী হবার আগেই বিশ্ব-জগতের নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করে তাওহীদের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছিলেন, ঠিক তেমনি এ আয়াত পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে এ সত্যে উপনীত হয়েছিলেন। আর এর পর কুরআন এসে কেবল এর সত্যতা প্রমাণ এবং একে সুদৃঢ়ই করেনি বরং তাঁকে সরাসরি সত্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞানও দান করেছে।

২০. আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাঁর বন্দেগী লাভ করার অধিকারে অন্যকে শরীক করার কথা বলে। অথবা একথা বলে যে, নিজের বান্দাদের হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারে আল্লাহর কোন আগ্রহ নেই এবং তিনি আমাদের পথ দেখাবার জন্য কোন কিতাব ও কোন নবী পাঠাননি। বরং তিনি আমাদের স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছেন, যেভাবে ইচ্ছা আমরা আমাদের জীবন যাপন করতে পারি। অথবা বলে, আল্লাহ এমনি খেলাচ্ছলে আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং সেভাবে আমাদের খতমও করে দেবেন। তাঁর সামনে আমাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না। কাজেই আমাদের কোন পুরস্কার বা শাস্তিও লাভ করতে হবে না।

২১. এটা হচ্ছে আখেরাতের জীবনের বর্ণনা। সেখানে এ ঘোষণা দেয়া হবে।

২২. এটা প্রসংগক্রমে মাঝখানে বলা একটা বাক্য। যেসব জালেমের ওপর পরকালে আল্লাহর লানতের কথা ঘোষণা করা হবে তারা হবে এমনসব লোক যারা আজ দুনিয়ায় এ ধরনের কাজ করে যাচ্ছে।

২৩. অর্থাৎ তাদের সামনে এই যে সোজা পথ পেশ করা হচ্ছে এ পথ তারা পছন্দ করে না। তারা চায় এ পথ যদি তাদের মানসিক প্রবৃত্তি এবং তাদের জাহেলী স্বার্থ-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ
وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

তবে যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে এবং নিজের রবের একনিষ্ঠ অনুগত বান্দা হয়ে থাকে, তারা নিশ্চিত জান্নাতের অধিবাসী এবং জান্নাতে তারা চিরকাল থাকবে।[২৭] এ দল দু'টির উপমা হচ্ছে ঃ যেমন একজন লোক অন্ধ ও বধির এবং অন্যজন চক্ষুষ্মান ও শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন। এরা দু'জন কি সমান হতে পারে? তোমরা (এ উপমা থেকে) কি কোন শিক্ষা গ্রহণ করো না?

প্রীতি–বিদ্বেষ ও তাদের ধারণা–কল্পনা অনুযায়ী বাঁকা হয়ে যায় তাহলেই তারা তা গ্রহণ করবে।

২৪. এখানে আবার আখেরাতের জীবনের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে।

২৫. একটি আযাব হবে নিজের গোমরাহ হবার জন্য এবং আর একটি আযাব হবে অন্যদেরকে গোমরাহ করার এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্য গোমরাহীর উত্তরাধিকার রেখে যাবার জন্য। (দেখুন সূরা আরাফের ৩০ টীকা)

২৬. অর্থাৎ তারা আল্লাহ, বিশ্ব–জগত এবং নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে যেসব মতবাদ তৈরী করে নিয়েছিল তা সবই ভিত্তিহীন হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের উপাস্য, সুপারিশকারী ও পৃষ্ঠপোষকদের ওপর যেসব আস্থা স্থাপন করেছিল সেগুলোও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল। আর মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে যেসব চিন্তা–অনুমান কল্পনা রেখেছিল তাও ভুল প্রমাণিত হয়েছিল।

২৭. এখানে আখেরাতের জীবনের বর্ণনা খতম হয়ে গেছে।

২৮. অর্থাৎ এ দু'জনের কাজের ধারা এবং সবশেষে এদের পরিণাম কি এক রকম হতে পারে? যে ব্যক্তি নিজেই পথ দেখে না এবং এমন কোন লোকের কথাও শোনে না, যে তাকে পথের কথা বলছে, সে নিশ্চয়ই কোথাও ধাক্কা খাবে এবং মারাত্মক ধরনের দুর্ঘটনার সম্মুখীন হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজে পথ দেখতে পাচ্ছে এবং কোন পথের সন্ধান জানা লোকের পথনির্দেশনারও সাহায্য গ্রহণ করেছে সে নিশ্চয়ই নিরাপদে নিজের মনযিলে পৌঁছে যাবে। উল্লেখিত দু'জন লোকের মধ্যেও এ একই পর্যায়ের পার্থক্য রয়েছে। তাদের একজন স্বচক্ষেও বিশ্ব–জগতে মহা সত্যের নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করে এবং আল্লাহর পাঠানো পথপ্রদর্শকদের কথাও শোনে আর অন্য জন আল্লাহর নিদর্শনসমূহ দেখার জন্য নিজের চোখ খোলা রাখে না এবং নবীদের কথাও শোনে না। জীবনক্ষেত্রে এদের উভয়ের কার্যধারা এক রকম হবে কেমন করে? তারপর তাদের পরিণামের মধ্যে পার্থক্যই বা হবে না কেন?

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَنْ
لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾
فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا
وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ ۖ وَمَا نَرَىٰ
لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾

৩ রুকূ'

(আর এমনি অবস্থা ছিল যখন) আমি নূহকে তার কওমের কাছে পাঠিয়েছিলাম।[২৯] (সে বললোঃ) "আমি তোমাদের পরিষ্কার ভাষায় সাবধান করে দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারোর বন্দেগী করো না। নয়তো আমার আশংকা হচ্ছে তোমাদের ওপর একদিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসবে।"[৩০] জবাবে সেই কওমের সরদাররা, যারা তার কথা মানতে অস্বীকার করেছিল, বললো ঃ "আমাদের দৃষ্টিতে তুমি তো ব্যস আমাদের মতো একজন মানুষ বৈ আর কিছুই নও।[৩১] আর আমরা তো দেখছি আমাদের সমাজের মধ্যে যারা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও নিম্নশ্রেণীর ছিল তারাই কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা না করে তোমার অনুসরণ করেছে।[৩২] আমরা এমন কোন জিনিসও দেখছি না যাতে তোমরা আমাদের চেয়ে অগ্রবর্তী আছো।[৩৩] বরং আমরা তো তোমাদের মিথ্যাবাদী মনে করি।"

২৯. এ প্রসংগে সূরা আরাফের ৮ রুকূ'র টীকাগুলো সামনে রাখলে ভালো হয়।

৩০. এ সূরার শুরুতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখেও এ এক কথাই উচ্চারিত হয়েছে।

৩১. মক্কার লোকেরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যে মূর্খ জনোচিত আপত্তি উত্থাপন করতো এখানেও সেই একই আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাদেরই মতো একজন মামুলি পর্যায়ের লোক, খায় দায়, চলাফেরা করে, ঘুমায় আবার জেগে থাকে, ছেলেমেয়ের বাপ হয়, তাকে আমরা কেমন করে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী নিযুক্ত হয়ে এসেছেন বলে মেনে নিতে পারি? (দেখুন সূরা ইয়াসীন, ১১ টীকা)

৩২. মক্কার বড় বড় ও উঁচু শ্রেণীর লোকেরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যে কথা বলতো এখানেও তারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে। তারা বলতো, এর সাথে কারা আছে? ক'জন মাথাগরম ছোকরা, যাদের দুনিয়ার কোন অভিজ্ঞতাই নেই।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ رَحْمَةً
مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ﴿٢٨﴾
وَيٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ؕ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَاۤ اَنَا
بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّىْۤ اَرٰىكُمْ قَوْمًا
تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٩﴾

সে বললো, " হে আমার কওম! একটু ভেবে দেখো, যদি আমি আমার রবের পক্ষ থেকে একটি স্পষ্ট সাক্ষ-প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকি এবং তারপর তিনি আমাকে তাঁর বিশেষ রহমত দান করে থাকেন[৩৪] কিন্তু তা তোমাদের নজরে পড়েনি, তাহলে আমার কাছে এমন কি উপায় আছে যার সাহায্যে তোমরা মানতে না চাইলেও আমি জবরদস্তি তোমাদের ঘাড়ে তা চাপিয়ে দিবো? হে আমার কওম! এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন অর্থ চাচ্ছি না।[৩৫] আমার প্রতিদান তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে। আর যারা আমার কথা মেনে নিয়েছে তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়াও আমার কাজ নয়, তারা নিজেরাই নিজেদের রবের কাছে যাবে।[৩৬] কিন্তু আমি দেখছি তোমরা মূর্খতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছ।

অথবা কয়েকজন গোলাম এবং নিম্ন শ্রেণীর কিছু সাধারণ মানুষ, যাদের বুদ্ধিশুদ্ধি নেই এবং বিশ্বাসের দিক দিয়েও কমজোর। (দেখুন সূরা আন'আম ৩৪-৩৭ টীকা এবং সূরা ইউনূস ৭৮ টীকা)।

৩৩. অর্থাৎ তোমরা বলে থাকো, আমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত এবং যারা আমাদের পথ অবলম্বন করেনি তারা আল্লাহর গযবের সম্মুখীন হয়েছে। তোমাদের এসব কথার কোন আলামত আমাদের নজরে পড়ে না। অনুগ্রহ যদি হয়ে থাকে তাহলে তা আমাদের প্রতি হয়েছে। কারণ আমরা ধন-দৌলত ও শান-শওকতের অধিকারী এবং একটি বিরাট জনগোষ্ঠী আমাদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে। অন্যদিকে তোমরা কপর্দক শূন্য দেউলিয়ার দল, কোন্ বিষয়ে তোমরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছো? তোমাদের আল্লাহর প্রিয়পাত্র মনে করা হবে কেন?

৩৪. আগের রুকূ'তে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ দিয়ে যে কথা উচ্চারিত হয়েছে এখানে তারই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রথমে আমি বিশ্ব-জাহান ও মানুষের মধ্যে আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখে তাওহীদের মূল তত্ত্বে পৌঁছে গিয়েছিলাম। তারপর আল্লাহ তাঁর নিজের রহমতের (অর্থাৎ অহী) মাধ্যমে আমাকে সরাসরি

وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ۭ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝ وَلَآ
اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَاۗىِٕنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّىْ
مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ۭ
اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۚ اِنِّىْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

আর হে আমার কওম! যদি আমি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কে আমাকে বাঁচাবে? তোমরা কি এতটুকু কথাও বোঝ না? আমি তোমাদের একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে। একথাও বলি না যে, আমি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখি এবং আমি ফেরেশ্‌তা এ দাবীও করি না।[৩৭] আর আমি একথাও বলতে পারি না যে, তোমরা যাদেরকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখো তাদেরকে আল্লাহ কখনো কোন কল্যাণ দান করবেন না। তাদের মনের অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন। যদি আমি এমনটি বলি তাহলে আমি হবো জালেম"।

এ সত্যগুলোর জ্ঞান দান করেছেন। আমার মন ইতিপূর্বেই এগুলোর পক্ষে সাক্ষ দিয়ে আসছিল। এ থেকে এও জানা যায় যে, নবুওয়াত লাভ করার আগেই সকল নবী অনুসন্ধান ও চিন্তা–গবেষণার মাধ্যমে ঈমান বিল গাইব তথা অদৃশ্যে বিশ্বাস লাভ করে থাকেন। তারপর মহান আল্লাহ নবুওয়াতের মর্যাদা দান করার সময় তাঁদেরকে ঈমান বিশ্ শাহাদাত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দর্শন লব্ধ বিশ্বাস দান করে থাকেন।

৩৫. আমি একজন নিস্বার্থ উপদেশদাতা। নিজের কোন লাভের জন্য নয় বরং তোমাদেরই ভালোর জন্য এত কঠোর পরিশ্রম ও দুঃখ–কষ্ট সহ্য করছি। এ সত্যের দাওয়াত দেবার, এর জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করার ও বিপদ–মুসিবতের সম্মুখীন হবার পেছনে আমার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ সক্রিয় আছে এমন কথা তোমরা প্রমাণ করতে পারবে না। (দেখুন আল মুমিনূন ৭০ টীকা, ইয়াসীন ১৭ টীকা, আশ শূরা ৪১ টীকা)।

৩৬. অর্থাৎ তাদের রবই তাদের মর্যাদা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছেন। তাঁর সামনে যাবার পরই তাদের সবকিছু প্রকাশিত হবে। তারা যদি সত্যিকার মহামূল্যবান রত্ন হয়ে থাকে তাহলে তোমাদের ছুঁড়ে ফেলার কারণে তারা তুচ্ছ মূল্যহীন পাথরে পরিণত হয়ে যাবে না। আর যদি তারা মূল্যহীন পাথরই হয়ে থাকে তাহলে তাদের মালিকের ইচ্ছা, তিনি তাদেরকে যেখানে চান ছুঁড়ে ফেলতে পারেন। (দেখুন সূরা আন'আম ৫২ আয়াত এবং সূরা কাহাফ ২৮ আয়াত)।

৩৭. বিরোধী পক্ষ তাঁর ব্যাপারে আপত্তি উথাপন করে বলেছিল, তোমাকে তো আমরা আমাদেরই মত একজন মানুষ দেখছি। তাদের আপত্তির জবাবে একথা বলা হয়েছিল। এখানে

قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ
كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَآ
اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ
لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ۭ هُوَ رَبُّكُمْ ۣ وَاِلَيْهِ
تُرْجَعُوْنَ ﴿٣٤﴾

শেষ পর্যন্ত তারা বললো, "হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে ঝগড়া করেছো, অনেক ঝগড়া করেছো, যদি সত্যবাদী হও তাহলে এখন আমাদের যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছো তা নিয়ে এসো।" নূহ জবাব দিল, "তা তো আল্লাহই আনবেন যদি তিনি চান এবং তা প্রতিহত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। এখন যদি আমি তোমাদের কিছু মংগল করতে চাইও তাহলে আমার মংগলাকাংখা তোমাদের কোন কাজে লাগবে না যখন আল্লাহ নিজেই তোমাদের বিভ্রান্ত করার এরাদা করে ফেলেছেন।[৩৮] তিনিই তোমাদের রব এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।"

হযরত নূহ (আ) বলেন, যথার্থই আমি একজন মানুষ। একজন মানুষ হওয়া ছাড়া নিজের ব্যাপারে তো আমি আর কিছুই দাবী করিনি। তাহলে তোমরা আমার বিরুদ্ধে এ আপত্তি উঠাচ্ছো কেন? আমি শুধু এতটুকুই দাবী করি যে, আল্লাহ আমাকে জ্ঞান ও কর্মের সহজ সোজা পথ দেখিয়েছেন। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা এ ব্যাপারটির পরীক্ষা করে নাও। কিন্তু এ দাবীর ব্যাপারটি পরীক্ষা করার এ কোন্ ধরনের পদ্ধতি যে, কখনো তোমরা আমার কাছে গায়েবের খবর জিজ্ঞেস করো, কখনো এমন ধরনের অদ্ভুত দাবী উত্থাপন করতে থাকো যাতে মনে হয় যেন আল্লাহর ভাণ্ডারের সমস্ত চাবী আমার কাছে আছে আবার কখনো আপত্তি করতে থাকো যে, আমি মানুষের মতো আহার-বিহার করি কেন? যেন মনে হয় আমি ফেরেশতা হবার দাবী করেছিলাম। যে ব্যক্তি আকীদা-বিশ্বাস, চরিত্র-নৈতিকতা ও সমাজ-সংস্কৃতির ব্যাপারে সঠিক পথের দিশা দেবার দাবী করেছে তাকে এ জিনিসগুলোর ব্যাপারে যে কোন প্রশ্ন চাও করতে পারো। কিন্তু তোমরা দেখি অদ্ভুত লোক। তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করছো অমুকের মোষের নর-বাচ্চা হবে না মাদী-বাচ্চা? প্রশ্ন হলো মানুষের জীবনের জন্য সঠিক নৈতিক ও তামাদ্দুনিক নীতি বর্ণনা করার সাথে মোষের বাচ্চা প্রসব করার কোন সম্পর্ক আছে কি? (দেখুন সূরা আনআম, ৩১ ও ৩২ টীকা)

৩৮. অর্থাৎ আল্লাহ যদি তোমাদের হঠকারিতা, দুর্মতি এবং সদাচারে আগ্রহহীনতা দেখে এ ফায়সালা করে থাকেন যে, তোমাদের সঠিক পথে চলার সুযোগ আর দেবেন না এবং যেসব পথে তোমরা উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে চাও সেসব পথে তোমাদের ছেড়ে

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي
وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ﴿٣٥﴾

হে মুহাম্মাদ ! এরা কি একথা বলে যে, এ ব্যক্তি নিজেই সবকিছু রচনা করেছে ? ওদেরকে বলে দাও, "যদি আমি নিজে এসব রচনা করে থাকি, তাহলে আমার অপরাধের দায়-দায়িত্ব আমার। আর যে অপরাধ তোমরা করে যাচ্ছো তার জন্য আমি দায়ী নই।"৩৯

দেবেন তাহলে এখন আর তোমাদের কল্যাণের জন্য আমার কোন প্রচেষ্টা সফলকাম হতে পারে না।

৩৯. বক্তব্যের ধরন থেকে মনে হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে হযরত নূহের (আ) এ কাহিনী শুনে বিরোধীরা আপত্তি করে থাকবে যে, মুহাম্মাদ (সা) আমাদের ওপর প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে নিজেই এ কাহিনী বানিয়ে পেশ করছে। যেসব আঘাত সে সরাসরি আমাদের ওপর করতে চায় না সেগুলোর জন্য সে একটি কাহিনী তৈরী করেছে এবং এভাবে "ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো"র মতো আমাদের ওপর আক্রমণ চালায়। এ কারণে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা ভেংগে এ বাক্যে তাদের আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে।

আসলে হীনমনা লোকদের দৃষ্টি সবসময় কোন বিষয়ের খারাপ দিকের প্রতিই পড়ে থাকে। ভালোর প্রতি তাদের কোন আগ্রহ না থাকায় ভালো দিকের প্রতি তাদের দৃষ্টিই যায় না। কোন ব্যক্তি যদি তোমাদের কোন জ্ঞানের কথা বলে থাকে অথবা কোন সুশিক্ষা দিতে থাকে কিংবা তোমাদের কোন ভুলের দরুন তোমাদের সতর্ক করে, তাহলে তা থেকে ফায়দা হাসিল করো এবং নিজেদের সংশোধন করে নাও। কিন্তু হীন লোকেরা সবসময় তার মধ্যে দুষ্কৃতির এমন কোন বিষয় খুঁজবে যার ফলে জ্ঞান ও উপদেশ ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং তারা নিজেরা কেবল দুষ্কৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিতই থাকবে না বরং বক্তার গায়েও কিছু দুষ্কৃতির ছাপ লাগিয়ে দেবে। সর্বোত্তম উপদেশও নষ্ট করে দেয়া যেতে পারে যদি শ্রোতা তাকে কল্যাণকামিতার পরিবর্তে "আঘাত" করার অর্থে গ্রহণ করে এবং সে মানসিকভাবে নিজের ভুল উপলব্ধি ও অনুভব করার পরিবর্তে কেবল বিরূপ মনোভাবই পোষণ করতে থাকে। তারপর এ ধরনের লোকেরা হামেশা নিজেদের চিন্তার ভিত্ গড়ে তোলে একটি মৌলিক কুধারণার ওপর। কোন একটি বক্তব্য নিরেট সত্য অথবা স্রেফ একটি বানোয়াট কাহিনী উভয়ই হতে পারে। এ উভয় রকমের সম্ভাবনা যেখানে সমান সমান, সেখানে বক্তব্যটি যদি কারোর অবস্থার সাথে পুরোপুরি খাপ খেয়ে যায় এবং তাতে তার কোন ভুলের প্রতি অংগুলি নির্দেশ থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে একজন প্রকৃত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাজ হবে তাকে একটি যথার্থ সত্য কথা মনে করে তার শিক্ষণীয় দিক থেকে ফায়দা হাসিল করা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন প্রকার সাক্ষ-প্রমাণ ছাড়াই এ মর্মে দোষারোপ করে যে, বক্তা নিছক তার ওপর চাপিয়ে দেবার জন্য এ মনগড়া কাহিনী রচনা করেছে তাহলে সে হবে নেহাতই একজন কুধারণা পোষক ও বক্র দৃষ্টির অধিকারী ব্যক্তি।

وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا
تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا
وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾ وَيَصْنَعُ
الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ إِن
تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾ فَسَوْفَ
تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٩﴾

৪ রুকূ'

নূহের প্রতি অহী নাযিল করা হলো এ মর্মে যে, তোমার কওমের মধ্য থেকে যারা ইতিমধ্যে ঈমান এনেছে, তারা ছাড়া এখন আর কেউ ঈমান আনবে না। তাদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ করা পরিহার করো এবং আমার তত্ত্বাবধানে আমার অহী অনুযায়ী একটি নৌকা বানানো শুরু করে দাও। আর দেখো যারা জুলুম করেছে তাদের জন্য আমার কাছে কোন সুপারিশ করো না, এরা সবাই এখন ডুবে যাবে।[৪০]

নূহ যখন নৌকা নির্মাণ করছিল তখন তার কওমের সরদারদের মধ্য থেকে যারাই তার কাছ দিয়ে যেতো তারাই তাকে উপহাস করতো। সে বললো, "যদি তোমরা আমাকে উপহাস করো তাহলে আমিও তোমাদের উপহাস করছি। শিগ্‌গীর তোমরা জানতে পারবে কার ওপর লাঞ্ছনাকর আযাব নাযিল হবে এবং কার ওপর এমন আযাব নাযিল হবে যা ঠেকাতে চাইলেও ঠেকানো যাবে না।[৪১]

এ কারণে বলা হয়েছে, যদি আমি এ কাহিনী তৈরী করে থাকি তাহলে আমার অপরাধের জন্য আমি দায়ী কিন্তু তোমরা যে অপরাধ করছো তা তো যথাস্থানে অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। তার জন্য আমি নই, তোমরাই দায়ী হবে এবং তোমরাই পাকড়াও হবে।

৪০. এ থেকে জানা যায়, কোন জাতির কাছে যখন নবীর পয়গাম পৌঁছে যায় তখন সে কেবল ততক্ষণ পর্যন্ত অবকাশ পায় যতক্ষণ তার মধ্যে কিছু সৎ ব্যক্তির বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যখন তার সমস্ত সত্যনিষ্ঠ লোক বের হয়ে যায় এবং সেখানে কেবল অসৎ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকেরাই অবশিষ্ট থেকে যায় তখন আল্লাহ সেই জাতিকে আর অবকাশ দেন না। তখন তার রহমতই দাবী জানাতে থাকে যে, পঁচা ফলের

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ۭ وَمَآ اٰمَنَ مَعَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلٌ ۝۴۰

অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে গেলো এবং চুলা উথলে উঠলো[৪২] তখন আমি বললাম, "সব ধরনের প্রাণীর এক এক জোড়া নৌকায় তুলে নাও। নিজের পরিবারবর্গকেও—তবে তাদের ছাড়া যাদেরকে আগেই চিহ্নিত করা হয়েছে[৪৩] —এতে তুলে নাও এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে এতে বসাও।"[৪৪] তবে সামান্য সংখ্যক লোকই নূহের সাথে ঈমান এনেছিল।

ঝুড়ি সদৃশ ঐ জাতিটাকে দূরে ছুড়ে ফেলে দেয়া হোক যাতে তা ভালো ফলগুলোকেও নষ্ট না করে দেয়। এ অবস্থায় তার প্রতি সদয় হওয়া আসলে সারা দুনিয়াবাসী এবং এ সংগে ভবিষ্যত বংশধরদের প্রতিও নির্দয় আচরণ করার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়।

৪১. এটি একটি চমকপ্রদ ব্যাপার। এ সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে বুঝা যায়, মানুষ দুনিয়ার বাইরের চেহারা দেখে কেমন প্রতারিত হয়। যখন নূহ আলাইহিস সালাম সাগর থেকে অনেক দূরে শুকনো স্থলভূমির ওপর নিজের জাহাজটি নির্মাণ করছিলেন তখন যথার্থই লোকদের দৃষ্টিতে তাঁর এ কাজটি অত্যন্ত হাস্যকর মনে হয়ে থাকবে এবং তারা হয়তো হাসতে হাসতে বলে থাকবে, "মিয়া সাহেবের পাগলামী শেষ পর্যন্ত এতদূর পৌঁছে গেছে যে, এবার তিনি শুকনো ডাংগায় জাহাজ চালাবেন।" সেদিন তাদের কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, কয়েকদিন পরে সত্যিই এখানে জাহাজ চলবে। তারা এ কাজটিকে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের মস্তিষ্ক বিকৃতির একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ গণ্য করে থাকবে এবং পরস্পরকে বলে থাকবে, যদি ইতিপূর্বে এ ব্যক্তির পাগলামির ব্যাপারে তোমাদের মনে কোন সন্দেহ থেকে থাকে তাহলে এবার নিজের চোখে দেখে নাও কি কাণ্ডটা সে এখন করছে। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্য ব্যাপার জানতো এবং আগামীকাল এখানে জাহাজের কি রকম প্রয়োজন হবে একথা যার জানা ছিল সে উল্টো তাদের অজ্ঞতা ও প্রকৃত ব্যাপার না জানা এবং তদুপরি তাদের বোকার মতো নিশ্চিন্ত থাকার ব্যাপারটি নিয়ে নিশ্চয়ই হেসে থাকবে।

সে নিশ্চয়ই বলে থাকবে "কত বড় অজ্ঞ নাদান এ লোকগুলো, এদের মাথার ওপর উদ্যত মৃত্যুর খড়্গ, আমি এদেরকে সাবধানও করে দিলাম যে, সেই খড়্গ মাথার ওপর পড়ার উপক্রম হয়েছে এবং এরপর এদের চোখের সামনেই তার হাত থেকে বাঁচার জন্য আমি নিজেও প্রস্তুতি গ্রহণ করছি কিন্তু এরা নিশ্চিন্তে বসে রয়েছে এবং উলটো আমাকেই পাগল মনে করছে। এ বিষয়টিকে যদি একটু বিস্তারিতভাবে ভেবে দেখা যায় তাহলে বুঝা যাবে যে, দুনিয়ায় বাহ্যিক ও স্থূল জ্ঞানের আলোকে বুদ্ধিমত্তা ও নির্বুদ্ধিতার যে মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয় তা প্রকৃত ও যথার্থ সত্য জ্ঞানের আলোকে নির্ধারিত মানদণ্ডের তুলনায়

কত বেশী ভিন্নতর হয়ে থাকে। বাহ্য দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি দেখে, সে যে জিনিসটিকে চরম বুদ্ধিমত্তা মনে করে, প্রকৃত সত্যদর্শীর চোখে তা হয় চরম নির্বুদ্ধিতা। অন্যদিকে বাহ্যদর্শীর চোখে যে জিনিসটি একেবারেই অর্থহীন, পুরোপুরি পাগলামি ও নেহাত হাস্যকর ছাড়া আর কিছুই নয়, সত্যদর্শীর কাছে তা-ই পরম জ্ঞানগর্ভ, সুচিন্তিত ও গুরুত্বের অধিকারী এবং বুদ্ধিবৃত্তির যথার্থ দাবী হিসেবে পরিগণিত হয়।

৪২. এ সম্পর্কে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে যা বুঝা যায় সেটিকেই আমরা সঠিক মনে করি। কুরআনের বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, প্লাবনের সূচনা হয় একটি বিশেষ চুলা থেকে। তার তলা থেকে পানির স্রোত বের হয়ে আসে। তারপর একদিকে আকাশ থেকে মুশল ধারে বৃষ্টি হতে থাকে এবং অন্যদিকে বিভিন্ন জায়গায় মাটি ফুঁড়ে পানির ফোয়ারা বেরিয়ে আসতে থাকে। এখানে কেবল চুলা থেকে পানি উথলে ওঠার কথা বলা হয়েছে এবং সামনের দিকে গিয়ে বৃষ্টির দিকে ইংগিত করা হয়েছে। কিন্তু সূরা 'কামারে' এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে।

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ -

"আমি আকাশের দরজা খুলে দিলাম। এর ফলে অনবরত বৃষ্টি পড়তে লাগলো। মাটিতে ফাটল সৃষ্টি করলাম। ফলে চারদিকে পানির ফোয়ারা বের হতে লাগলো। আর যে কাজটি নির্ধারিত করা হয়েছিল এ দু' ধরনের পানি তা পূর্ণ করার জন্য পাওয়া গেলো।"

তাছাড়া "তান্নুর" (চুলা) শব্দটির ওপর আলিফ-লাম ব্যবহারের মাধ্যমে একথা প্রকাশ করা হয় যে, একটি বিশেষ চুলাকে আল্লাহ এ কাজ শুরু করার জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন। ইশারা পাওয়ার সাথে সাথেই চুলাটির তলা ঠিক সময়মতো ফেটে পানি উথলে ওঠে। পরে এ চুলাটিই প্লাবনের চুলা হিসেবে পরিচিত হয়। সূরা মুমিনূনের ২৭ আয়াতে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে, এ চুলাটির কথা আগেই বলে দেয়া হয়েছিল।

৪৩. অর্থাৎ তোমার পরিবারের যেসব লোকের কথা আগেই বলে দেয়া হয়েছে যে, তারা কাফের এবং আল্লাহর রহমতের অধিকারী নয় তাদেরকে নৌকায় ওঠাবে না। সম্ভবত এরা ছিল দু'জন। একজন ছিল হযরত নূহের (আ) ছেলে। তার ডুবে যাওয়ার কথা সামনেই এসে যাচ্ছে। অন্যজন ছিল হযরত নূহের (আ) স্ত্রী। সূরা তাহরীমে এর আলোচনা এসেছে। সম্ভবত পরিবারের অন্যান্য লোকজনও এ তালিকার অন্তরভুক্ত হতে পারে। কিন্তু কুরআনে তাদের নাম নেই।

৪৪. যেসব ঐতিহাসিক ও নৃ-বিজ্ঞানী সমগ্র মানবজাতির বংশধারা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের তিন ছেলের সাথে সংযুক্ত করেন, এখান থেকে তাদের মতবাদ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। আসলে ইসরাঈলী পৌরাণিক বর্ণনাগুলো এ বিভ্রান্তির উৎস। সেখানে বলা হয়েছে যে, নূহের প্লাবনের হাত থেকে হযরত নূহ (আ) ও তার তিন ছেলে এবং তাদের স্ত্রীরা

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿٤١﴾ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۖ وَنَادَىٰ نُوحٌ ۨ
ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾
قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ
مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ
الْمُغْرَقِينَ ﴿٤٣﴾

নূহ বললো, "এতে আরোহণ করো, আল্লাহর নামেই এটা চলবে এবং থামবে। আমার রব বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"[৪৫]

নৌকা তাদেরকে নিয়ে পর্বত প্রমাণ ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে ভেসে চলতে লাগলো। নূহের ছেলে ছিল তাদের থেকে দূরে। নূহ চীৎকার করে তাকে বললো, "হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে আরোহণ করো, কাফেরদের সাথে থেকো না।" সে পালটা জবাব দিল, "আমি এখনই একটি পাহাড়ে চড়ে বসছি। তা আমাকে পানি থেকে বাঁচাবে।" নূহ বললো, "আজ আল্লাহর হুকুম থেকে বাঁচাবার কেউ নেই, তবে যার প্রতি আল্লাহ রহম করবেন সে ছাড়া।" এমন সময় একটি তরংগ উভয়ের মধ্যে আড়াল হয়ে গেলো এবং সেও নিমজ্জিতদের দলে শামিল হলো।

ছাড়া আর কেউ রক্ষা পায়নি (দেখুন বাইবেল, আদি পুস্তক ৬ঃ১৮, ৭ঃ৭, ৯ঃ১ এবং ৯ঃ১৯)। কিন্তু কুরআনের বহু জায়গায় একথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত নূহের পরিবার ছাড়া তাঁর কওমের বেশ কিছুসংখ্যক লোককেও, তাঁদের সংখ্যা সামান্য হলেও আল্লাহ প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাছাড়া কুরআন পরবর্তী মানব সম্প্রদায়কে শুধুমাত্র নূহের বংশধর নয় বরং তাঁর সাথে নৌকায় যেসব লোককে আল্লাহ রক্ষা করেছিলেন তাদের সবার বংশধর গণ্য করেছে। বলা হয়েছে ঃ

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ

"যাদেরকে আমি নৌকায় নূহের সাথে সওয়ার করিয়েছিলাম তাদের বংশধর।"

(বনী ইসরাঈল ৩)

مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ

وَقِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ
الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾

হুকুম হলো, " হে পৃথিবী! তোমার সমস্ত পানি গিলে ফেলো এবং হে আকাশ। থেমে যাও।" সে মতে পানি ভূগর্ভে বিলীন হয়ে গেলো, ফায়সালা চূড়ান্ত করে দেয়া হলো এবং নৌকা জূদীর ওপর থেমে গেলো[৪৬] তারপর বলে দেয়া হলো, জালেম সম্প্রদায় দূর হয়ে গেলো!

"আদমের বংশধরদের মধ্য থেকে এবং নূহের সাথে যাদেরকে আমি নৌকায় সওয়ার করিয়েছিলাম তাদের মধ্য থেকে।" (মারয়াম, ৫৮ আয়াত)

৪৫. এ হলো মুমিনের সত্যিকার পরিচয়। কার্যকারণের এ জগতে সে অন্যান্য দুনিয়াবাসীর ন্যায় প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী সমস্ত উপায় ও কলাকৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু সে উপায় ও কলা-কৌশলের ওপর ভরসা করে না। ভরসা করে একমাত্র আল্লাহর ওপর। সে খুব ভালো করেই জানে যে, আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর দয়া ও করুণা পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে যুক্ত না হলে তার কোন উপায় ও কলাকৌশল শুরুও হতে পারে না, ঠিকমতো চলতেও পারে না, আর চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌছুতেও পারে না।

৪৬. জূদী পাহাড়টি কুর্দিস্তান অঞ্চলে ইবনে উমর দ্বীপের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। বাইবেলে উল্লেখিত নৌকার অবস্থান স্থলের নাম আরারত বলা হয়েছে। এটি আর্মেনিয়ার একটি পাহাড়েরও নাম এবং একটি পাহাড় শ্রেণীর নামও। পাহাড় শ্রেণী বলতে যে আরারতের কথা বলা হয়েছে সেটি আর্মেনিয়ার উচ্চ মালভূমি থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণে কুর্দিস্তান পর্যন্ত চলে গেছে। এ পাহাড় শ্রেণীর একটি পাহাড়ের নাম জূদী পাহাড়। আজো এ পাহাড়টি এ নামেই পরিচিত। প্রাচীন ইতিহাসে এটাকেই নৌকা থামার জায়গা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের আড়াই হাজার বছর আগে বেরাসাস (BERASUS) নামে ব্যবিলনের একজন ধর্মীয় নেতা পুরাতন কুলদানী বর্ণনার ভিত্তিতে নিজের দেশের যে ইতিহাস লেখেন তাতে তিনি জূদী নামক স্থানকেই নূহের নৌকা থামার জায়গা হিসেবে উল্লেখ করেন। এরিস্টটলের শিষ্য এবিডেনাস (ABYDENUS) ও নিজের ইতিহাসগ্রন্থে একথা সত্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া তিনি নিজের সময়ের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ইরাকে বহু লোকের কাছে এ নৌকার অংশ বিশেষ রয়েছে। সেসব ধুয়ে তারা রোগ নিরাময়ের জন্য রোগীদের পান করায়।

এখানে যে প্লাবনের কথা বলা হয়েছে সেটি কি সারা পৃথিবীব্যাপী ছিল অথবা যে এলাকায় নূহের সম্প্রদায়ের অধিবাস ছিল কেবল সেই এলাকাভিত্তিক ছিল? এটি এমন একটি প্রশ্ন যার মীমাংসা আজো হয়নি। ইসরাঈলী বর্ণনাগুলোর কারণে সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, এ প্লাবন এসেছিল সারা দুনিয়া জুড়ে-(আদিপুস্তক ৭:১৮-২৪)। কিন্তু কুরআনের কোথাও একথা বলা হয়নি। কুরআনের ইংগিতসমূহ থেকে অবশ্যি একথা জানা যায় যে, নূহের প্লাবন থেকে যাদেরকে রক্ষা করা হয়েছিল পরবর্তী মানব বংশ তাদেরই আওলাদ।

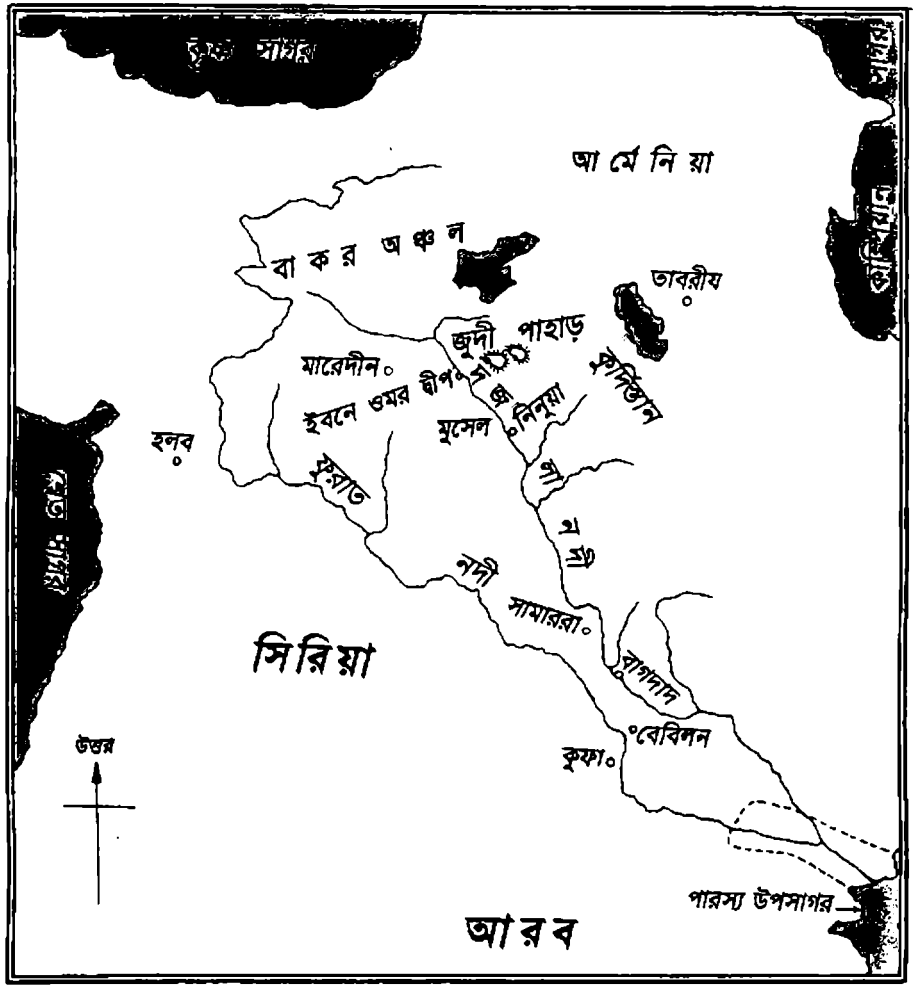

কওমে নূহ-এর এলাকা ও জুদী পাহাড়

কিন্তু এথেকে একথা প্রমাণ হয় না যে, প্লাবন সারা দুনিয়া জুড়ে এসেছিল। কেননা একথা এভাবেও সত্য হতে পারে যে, সে সময় দুনিয়ার যে অংশ জুড়ে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল প্লাবন সে অংশেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর প্লাবনের পরে মানুষের যে বংশধারার উন্মেষ ঘটেছিল তারাই ধীরে ধীরে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এ মতবাদের সমর্থন দু'টি জিনিস থেকে পাওয়া যায়। এক, ঐতিহাসিক বিবরণ, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও মৃত্তিকাস্তরের ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণা থেকে দাজলা ও ফোরাত বিধৌত এলাকায় একটি মহাপ্লাবনের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সারা দুনিয়ার সমস্ত অংশ জুড়ে কোন এক সময়

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ وَاِنَّ وَعْدَكَ
الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ
اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۭ اِنِّىْٓ اَعِظُكَ
اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٤٦﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ
مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ ۭ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِىْ وَتَرْحَمْنِىْٓ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٤٧﴾

নূহ তার রবকে ডাকলো। বললো, "হে আমার রব! আমার ছেলে আমার পরিবারভুক্ত এবং তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য[৪৭] আর তুমি সমস্ত শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও উত্তম শাসক।"[৪৮] জবাবে বলা হলো, "হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে তো অসৎ কর্মপরায়ণ।[৪৯] কাজেই তুমি আমার কাছে এমন বিষয়ের আবেদন করো না যার প্রকৃত তত্ত্ব তোমার জানা নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, নিজেকে অজ্ঞদের মতো বানিয়ে ফেলো না।"[৫০] নূহ তখনই বললো, "হে আমার রব! যে জিনিসের ব্যাপারে আমার জ্ঞান নেই তা তোমার কাছে চাইবো— এ থেকে আমি তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি। যদি তুমি আমাকে মাফ না করো এবং আমার প্রতি রহম না করো তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো।"[৫১]

একটি মহাপ্লাবন হয়েছিল এমন কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। দুই, সারা দুনিয়ার অধিকাংশ জাতির মধ্যে প্রাচীন কাল থেকে একটি মহাপ্লাবনের কাহিনী শ্রুত হয়ে আসছে। এমন কি অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও নিউগিনির মতো দূরবর্তী দেশগুলোর পুরাকালের কাহিনীতেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কোন এক সময় এসব জাতির পূর্বপুরুষরা পৃথিবীর একই ভূখণ্ডের অধিবাসী ছিল এবং তখন সেখানেই এ মহাপ্লাবন এসেছিল। তারপর যখন তাদের বংশধররা দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল তখন এ ঘটনার কাহিনীও তারা সংগে করে নিয়ে গিয়েছিল। (দেখুন সূরা আ'রাফ, ৪৭ টীকা)

৪৭. অর্থাৎ তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে আমার পরিজনদেরকে এ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে। এখন ছেলে তো আমার পরিজনদের অন্তরভুক্ত। কাজেই তাকেও রক্ষা করো।

৪৮. অর্থাৎ তোমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এরপর আর কোন আবেদন নিবেদন খাটবে না। আর তুমি নির্ভেজাল জ্ঞান ও পূর্ণ ইনসাফের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকো।

৪৯. ব্যাপারটা ঠিক এ রকম, যেমন এক ব্যক্তির শরীরের কোন একটা অংশ পচে গেছে। ডাক্তার অংগটি কেটে ফেলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখন রোগী ডাক্তারকে

বলছে, এটা তো আমার শরীরের একটা অংশ, আপনি কেটে ফেলে দেবেন? ডাক্তার জবাবে বলেন, এটা তোমার শরীরের অংশ নয়। কারণ এটা পচে গেছে। এ জবাবের অর্থ কখনো এ নয় যে, প্রকৃতপক্ষে এ অংগটির শরীরের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। বরং এর অর্থ হবে, তোমার শরীরের জন্য সুস্থ ও কার্যকর অংগের প্রয়োজন, পচা অংগের নয়। কারণ পচা অংগ একদিকে যেমন শরীরের কোন কাজে আসে না তেমনি অন্যদিকে বাদবাকি সমস্ত শরীরটাকেও নষ্ট করে দেয়। কাজেই যে অংগটি পচে গেছে সেটি আর এ অর্থে তোমার শরীরের কোন অংশ নয় যে অর্থে শরীরের সাথে অংগের সম্পর্কের প্রয়োজন হয়। ঠিক এমনিভাবেই একজন সৎ ও সত্যনিষ্ঠ পিতাকে যখন একথা বলা হয় যে, এ ছেলেটি তোমার পরিজনদের অন্তরভুক্ত নয়, কারণ চরিত্র ও কর্মের দিক দিয়ে সে ধ্বংস হয়ে গেছে তখন এর অর্থ এ হয় না যে, এর মাধ্যমে তার ছেলে হবার বিষয়টি অস্বীকার করা হচ্ছে বরং এর অর্থ শুধু এতটুকুই হয় যে, বিকৃত ও ধ্বংস হয়ে যাওয়া লোক তোমার সৎ পরিবারের সদস্য হতে পারে না। সে তোমার রক্ত সম্পর্কীয় পরিবারের একজন সদস্য হতে পারে কিন্তু তোমার নৈতিক পরিবারের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। আর আজ যে বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে সেটি বংশগত বা জাতি-গোষ্ঠীগত কোন বিরোধের ব্যাপার নয়। এক বংশের লোকদের রক্ষা করা হবে এবং অন্য বংশের লোকদের ধ্বংস করে দেয়া হবে, ব্যাপারটি এমন নয়। বরং এটি হচ্ছে কুফরী ও ঈমানের বিরোধের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপার। এখানে শুধুমাত্র যারা সৎ তাদেরকে রক্ষা করা হবে এবং যারা অসৎ ও নষ্ট হয়ে গেছে তাদেরকে খতম করে দেয়া হবে।

ছেলেকে অসৎকর্ম পরায়ণ বলে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা সন্তানকে ভালোবাসে ও লালন করে শুধু এজন্য যে, তারা তাদের পেটে বা ঔরসে জন্ম নিয়েছে এবং তাদের সাথে তাদের রক্ত সম্পর্ক রয়েছে। তাদের সৎ বা অসৎ হওয়ার ব্যাপারটি তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু মুমিনের দৃষ্টি হতে হবে সত্যের প্রতি নিবদ্ধ। তাকে তো ছেলেমেয়েদেরকে এ দৃষ্টিতে দেখতে হবে যে, এরা আল্লাহর সৃষ্ট কতিপয় মানুষ। প্রাকৃতিক নিয়মে আল্লাহ এদেরকে তার হাতে সোপর্দ করেছেন। এদেরকে লালন-পালন করে ও প্রশিক্ষণ দিয়ে যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ দুনিয়ায় মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য তৈরী করতে হবে। এখন তার যাবতীয় পরিশ্রম ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পরও তার ঘরে জন্ম নেয়া কোন ব্যক্তি যদি সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য তৈরী হতে না পারে এবং যিনি তাকে মুমিন বাপের হাতে সোপর্দ করেছিলেন নিজের সেই রবেরই বিশ্বস্ত খাদেম হতে না পারে, তাহলে সেই বাপকে অবশ্যি বুঝতে হবে যে, তার সমস্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। এরপর এ ধরনের ছেলে-মেয়েদের সাথে তার মানসিক যোগ থাকার কোন কারণই থাকতে পারে না।

তারপর সংসারের সবচেয়ে প্রিয় ছেলেমেয়েদের ব্যাপারটি যখন এই তখন অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে মুমিনের দৃষ্টিভংগী যাকিছু হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। ঈমান একটি চিন্তাগত ও নৈতিক গুণ। এ গুণের প্রেক্ষিতেই মুমিনকে মুমিন বলা হয়। মুমিন হওয়ার দিক দিয়ে অন্য মানুষের সাথে তার নৈতিক ও ঈমানী সম্পর্ক ছাড়া আর কোন সম্পর্কই নেই। রক্ত-মাংসের সম্পর্কযুক্ত কেউ যদি তার সাথে এ গুণের ক্ষেত্রে সম্পর্কিত হয় তাহলে নিসন্দেহে সে তার আত্মীয়। কিন্তু যদি সে এ গুণ শূন্য হয়

قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٨﴾

হুকুম হলো, "হে নূহ! নেমে যাও,৫২ আমার পক্ষ থেকে শান্তি ও বরকত তোমার ওপর এবং তোমার সাথে যেসব সম্প্রদায় আছে তাদের ওপর। আবার কিছু সম্প্রদায় এমনও আছে যাদেরকে আমি কিছুকাল জীবন উপকরণ দান করবো তারপর আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে স্পর্শ করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

তাহলে মুমিন শুধুমাত্র রক্তমাংসের দিক দিয়ে তার সাথে সম্পর্ক রাখবে। তার হৃদয় ও আত্মার সম্পর্ক তার সাথে হতে পারে না। আর ঈমান ও কুফরীর বিরোধের ক্ষেত্রে যদি সে তার মুখোমুখি দাঁড়ায় তাহলে এ অবস্থায় সে এবং একজন অপরিচিত কাফের তার চোখে সমান হয়ে দেখা দেবে।

৫০. এ উক্তি দেখে কারো এ ধারণা করা ঠিক হবে না যে, হযরত নূহের (আ) মধ্যে ঈমানী চেতনার অভাব ছিল অথবা তাঁর ঈমানে জাহেলিয়াতের কোন গন্ধ ছিল। আসল কথা হচ্ছে, নবীগণও মানুষ। আর মুমিনের পূর্ণতার জন্য যে সর্বোচ্চ মানদণ্ড কায়েম করা হয়েছে সর্বক্ষণ তার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে থাকা কোন মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। কোন কোন সময় কোন নাজুক মনস্তাত্ত্বিক অবস্থায় নবীর মতো উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন লোকও মুহূর্তকালের জন্য হলেও নিজের মানবিক দুর্বলতার কাছে পরাস্ত হন। কিন্তু যখনই তিনি অনুভব করেন অথবা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর মধ্যে এ অনুভূতি জাগানো হয় যে, তিনি কাংখিত মানের নিচে নেমে যাচ্ছেন তখনই তিনি তাওবা করেন এবং নিজের ভুলের সংশোধন করে নেবার ব্যাপারে এক মুহূর্তও ইতস্তত করেন না। হযরত নূহের নৈতিক উচ্চমানের এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে যে, জওয়ান ছেলেকে চোখের সামনে ডুবে যেতে দেখছেন। এ দৃশ্য দেখে তাঁর কলিজা ফেটে যাবার উপক্রম হচ্ছে। কিন্তু যখনই আল্লাহ সাবধান করে জানিয়ে দেন, যে ছেলে হককে ত্যাগ করে বাতিলের সহযোগী হয়েছে তাকে নিছক তোমার ঔরসজাত বলেই নিজের ছেলে মনে করা একটি জাহেলী ভাবাবেগ ছাড়া আর কিছুই নয়। তখনই তিনি নিজের মানসিক আঘাতের ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে ইসলামের কাংখিত চিন্তা ও ভাবধারার দিকে ফিরে আসেন।

৫১. নূহের ছেলের এ ঘটনা বর্ণনা করে আল্লাহ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে তাঁর ইনসাফ যে কি পরিমাণ পক্ষপাতহীন এবং তাঁর ফায়সালা যে কত চূড়ান্ত হয়ে থাকে তা বলেছেন। মক্কার মুশরিকরা মনে করতো, আমরা যাই করি না কেন আমাদের ওপর আল্লাহর গযব নাযিল হতে পারে না। কারণ আমরা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আওলাদ এবং বড় বড় দেবদেবীর ভক্ত। ইহুদী ও খৃষ্টানরাও এমনি ধরনের কিছু ধারণা পোষণ করতো এবং এখনো পোষণ করে থাকে। অনেক ভ্রষ্টাচারী মুসলমানও এ ধরনের কিছু মিথ্যা ধারণার ওপর নির্ভর করে বসে আছে। তারা মনে করে, আমরা অমুক বোজর্গের আওলাদ এবং অমুক বোজর্গের ভক্ত। কাজেই তাদের সুপারিশই আমাদের আল্লাহর শাস্তির হাত থেকে বাঁচাবে। কিন্তু এখানে এর বিপরীতে যে দৃশ্য দেখানো হচ্ছে তা

تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۖ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ
وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا ۛ فَاصْبِرْ ۖ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ
غَيْرُهُ ۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾

হে মুহাম্মাদ! এসব গায়েবের খবর, যা আমি তোমাকে অহীর মাধ্যমে জানাচ্ছি। এর আগে তুমি এসব জানতে না এবং তোমার কওমও জানতো না। কাজেই সবর করো। মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম।[৫৩]

৫ রুকূ'

আর আদের কাছে আমি তাদের ভাই হূদকে পাঠালাম।[৫৪] সে বললোঃ "হে আমার স্বজাতীয় ভাইয়েরা! আল্লাহর বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তোমরা নিছক মিথ্যা বানিয়ে রেখেছো।[৫৫]

হচ্ছে এই যে, একজন মহান মর্যাদাশালী নবী নিজের চোখের সামনে নিজের কলিজার টুকরা সন্তানকে ডুবে যেতে দেখছেন এবং অস্থির হয়ে সন্তানের গোনাহ মাফ করার জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন জানাচ্ছেন। কিন্তু আল্লাহর দরবার থেকে জবাবে তাকে ধমক দেয়া হচ্ছে। বাপের পয়গম্বরীর মর্যাদাও ছেলেকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে পারছে না।

৫২. অর্থাৎ যে পাহাড়ের ওপর নৌকা থেমেছিল তার ওপর থেকে নেমে যাও।

৫৩. অর্থাৎ যেভাবে শেষ পর্যন্ত নূহ ও তাঁর সংগী সাথীরা সাফল্য লাভ করেছিলেন এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল ঠিক তেমনি তুমি ও তোমার সাথীরাও সাফল্য লাভ করবে এবং তোমাদেরও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এটিই আল্লাহর চিরাচরিত রীতি, শুরুতে সত্যের দুশমনরা যতই সফলতার অধিকারী হোক না কেন সবশেষে একমাত্র তারাই সফলকাম হয় যারা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে চিন্তা ও কর্মের ভুল পথ পরিহার করে হকের উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকে। কাজেই এখন যেসব বিপদ আপদ ও দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হতে হচ্ছে, যেসব সমস্যা সংকটের সম্মুখীন তোমাদের হতে হচ্ছে এবং তোমাদের দাওয়াতকে দাবিয়ে দেবার জন্য তোমাদের বিরোধীদের আপাতদৃষ্টে যে সাফল্য দেখা যাচ্ছে, তাতে তোমাদের মন খারাপ করার প্রয়োজন নেই। বরং তোমরা সবর ও হিম্মত সহকারে কাজ করে যাও।

৫৪. সূরা আরাফের ৫ রুকূ'র টীকাগুলো একনজর দেখে নিন।

৫৫. অর্থাৎ অন্যান্য যেসব মাবুদদের তোমরা বন্দেগী ও পূজা-উপাসন করো তারা আসলে কোন ধরনের প্রভুত্বের গুণাবলী ও শক্তির অধিকারী নয়। বন্দেগী ও পূজা লাভের কোন অধিকারই তাদের নেই। তোমরা অযথাই তাদেরকে মাবুদ বানিয়ে রেখেছো। তারা তোমাদের আশা পূরণ করবে এ আশা নিয়ে বৃথাই বসে আছো।

يٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ۭ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَي الَّذِيْ
فَطَرَنِيْ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا
اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاۗءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا
تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ۝

হে আমার কওমের ভাইয়েরা! এ কাজের বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো তাঁরই জিম্মায় যিনি আমাকে পয়দা করেছেন। তোমরা কি একটুও বুদ্ধি-বিবেচনা করে কাজ করো না?[৫৬] আর হে আমার কওমের লোকেরা! মাফ চাও তোমাদের রবের কাছে তারপর তাঁর দিকেই ফিরে এসো। তিনি তোমাদের জন্য আকাশের মুখ খুলে দেবেন এবং তোমাদের বর্তমান শক্তির ওপর আরো শক্তি বৃদ্ধি করবেন।[৫৭] অপরাধীদের মতো মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।"

৫৬. এটি একটি চমৎকার অলংকার সমৃদ্ধ বাক্য। এর মধ্যে একটি শক্তিশালী যুক্তি পেশ করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, আমার কথাকে তোমরা হালকাভাবে গ্রহণ করে উপেক্ষা করে যাচ্ছো এবং এ নিয়ে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা-ভাবনা করছো না। ফলে তোমরা যে বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করো না এটি তার একটি প্রমাণ। নয়তো যদি তোমরা বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে তাহলে অবশ্যি একথা চিন্তা করতে যে, নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়াই যে ব্যক্তি দাওয়াত, প্রচার, উপদেশ, নসীহতের ক্ষেত্রে এহেন কষ্ট, ক্লেশ ও পরিশ্রম করে যাচ্ছে, যার এ প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম তোমরা কোন ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্বার্থের গন্ধই পেতে পারো না, সে নিশ্চয়ই বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের এমন কোন বুনিয়াদ এবং মানসিক প্রশান্তির এমন কোন উপকরণের অধিকারী যার ভিত্তিতে সে নিজের আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করে এবং নিজের বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধারের চিন্তা থেকে বেপরোয়া হয়ে নিজেকে মারাত্মক ঝুঁকি ও বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। যার ফলে শত শত বছরের রচিত জমাট বাঁধা আকীদা-বিশ্বাস, রসম- রেওয়াজ ও জীবনধারার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে এবং তার কারণে সারা দুনিয়ার শত্রুতার মুখোমুখি হয়েছে। এ ধরনের মানুষের কথা আর যাই হোক এতটা হালকা হতে পারে না যে, না জেনে বুঝেই তা প্রত্যাখ্যান করা যায়। একটু বিবেচনা সহকারে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য মন-মস্তিষ্ককে সামান্যতম কষ্ট না দেবার মতো গুরুত্বহীন তা কোনক্রমেই হতে পারে না।

৫৭. প্রথম রুকূ'তে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ দিয়ে যে কথা উচ্চারণ করানো হয়েছিল এখানে সেই একই কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছিল, "তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো, তাহলে তিনি তোমাদের উত্তম জীবন সামগ্রী দেবেন" এ থেকে জানা গেলো, কেবল আখেরাতেই নয়, এ দুনিয়াতেও জাতিদের ভাগ্যের ওঠানামা চরিত্র ও নৈতিকতার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। এ বিশ্ব-

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٣﴾ اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ۭ قَالَ اِنِّيْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّيْ بَرِيْۗءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٥٤﴾

তারা জবাব দিল ঃ "হে হূদ! তুমি আমাদের কাছে কোন সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসোনি।[৫৮] তোমার কথায় আমরা আমাদের মাবুদদেরকে ত্যাগ করতে পারি না। আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনছি না। আমরা তো মনে করি তোমার ওপর আমাদের কোন দেবতার অভিশাপ পড়েছে।"[৫৯]

হূদ বললো ঃ " আমি আল্লাহর সাক্ষ পেশ করছি।[৬০] আর তোমরা সাক্ষী থাকো তোমরা আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতায় আল্লাহকে ছাড়া যে অন্যদেরকে শরীক করে রেখেছো তা থেকে আমি মুক্ত।[৬১]

জাহানের ওপর আল্লাহ তাঁর শাসন পরিচালনা করছেন নৈতিক মূলনীতির ভিত্তিতে, নৈতিক ভালো-মন্দের পার্থক্য শূন্য প্রাকৃতিক নীতির ভিত্তিতে নয়। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে একথা বলা হয়েছে যে, যখন নবীর মাধ্যমে একটি জাতির কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে যায় তখন তার ভাগ্য ঐ পয়গামের সাথে বাঁধা হয়ে যায়। যদি সে ঐ পয়গাম গ্রহণ করে নেয় তাহলে আল্লাহ তার ওপর অনুগ্রহ ও বরকতের দরজা খুলে দেন। আর যদি তা প্রত্যাখ্যান করে বসে তাহলে তাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। যে নৈতিক আইনের ভিত্তিতে আল্লাহ মানুষের সাথে আচরণ করছেন এটি যেন তার একটি ধারা। অনুরূপভাবে সেই আইনের আর একটি ধারা হচ্ছে এই যে, দুনিয়ার প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধিতে প্রতারিত হয়ে যে জাতি জুলুম ও গোনাহের কাজে অগ্রসর হয় তার পরিণাম হয় ধ্বংস। কিন্তু ঠিক যখন সে তার অশুভ পরিণামের দিকে লাগামহীনভাবে ছুটে চলছে তখনই যদি সে তার ভুল অনুভব করে এবং নাফরমানির পথ পরিহার করে আল্লাহর বন্দেগীর পথ অবলম্বন করে তাহলে তার ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যায়। তার কাজের অবকাশ দানের সময় বাড়িয়ে দেয়া হয় আগামীতে তার ভাগ্যে আযাবের পরিবর্তে পুরস্কার, উন্নতি ও সফলতা লিখে দেয়া হয়।

৫৮. অর্থাৎ এমন কোন দ্ব্যর্থহীন আলামত অথবা কোন সুস্পষ্ট দলীল নিয়ে আসোনি যার ভিত্তিতে আমরা নিসংশয়ে জানতে পারি যে, আল্লাহ তোমাকে পাঠিয়েছেন এবং যে কথা তুমি পেশ করছো তা সত্য।

৫৯. অর্থাৎ তুমি কোন দেবদেবী, বা কোন মহাপুরুষের আস্তানায় গিয়ে কিছু বেয়াদবী করেছো, যার ফল এখন তুমি ভোগ করছো। এর ফলে তুমি আবোল তাবোল কথা বলতে শুরুকরেছো এবং গতকালও যেসব জনবসতিতে তুমি সম্মান ও মর্যাদা সহকারে বাস

مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ﴿٥٥﴾ اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ
عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ ۭ مَا مِنْ دَاۗبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ۭ اِنَّ
رَبِّيْ عَلٰي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٦﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ
بِهٖٓ اِلَيْكُمْ ۭ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْـــًٔا ۭ
اِنَّ رَبِّيْ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿٥٧﴾

তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে যা করার করো, তাতে কোন ত্রুটি রেখো না এবং আমাকে একটুও অবকাশ দিয়ো না।[৬২] আমার ভরসা আল্লাহর ওপর, যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব। তিনিই প্রতিটি প্রাণীর ভাগ্যনিয়ন্তা। নিসন্দেহে আমার রব সরল পথে আছেন।[৬৩] যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিতে চাও তাহলে ফিরিয়ে নাও, কিন্তু যে পয়গাম দিয়ে আমাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল তা আমি তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। এখন আমার রব তোমাদের জায়গায় অন্য জাতিকে বসাবেন এবং তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।[৬৪] অবশ্যি আমার রব প্রতিটি জিনিসের সংরক্ষক।

করছিলে আজ সেখানে গালিগালাজ ও মারধরের মাধ্যমে তোমাকে অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে।

৬০. অর্থাৎ তোমরা বলছো আমি কোন সাক্ষ–প্রমাণ নিয়ে আসিনি অথচ ছোট ছোট সাক্ষ–প্রমাণ পেশ করার পরিবর্তে আমি তো সবচেয়ে বড় আল্লাহর সাক্ষ পেশ করছি। তিনি তাঁর সমগ্র সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সহকারে সৃষ্টি জগতের সকল অংশে এবং তার দীপ্তির প্রতিটি কণিকায় একথার সাক্ষ দিয়ে যাচ্ছেন যে, তোমাদের কাছে আমি যে সত্য বর্ণনা করেছি তা পুরোপুরি ও সম্পূর্ণ সত্য। তার মধ্যে মিথ্যার নাম গন্ধও নেই। অন্যদিকে তোমরা যেসব ধারণা–কল্পনা ও অনুমান দাঁড় করিয়েছো সেগুলো মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয় এবং সেগুলোর মধ্যে সত্যের গন্ধও নেই।

৬১. তারা যে কথা বলে আসছিল যে, তোমার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদের. ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই—এর জবাবেই একথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ আমার এ সিদ্ধান্তও শুনে রাখো, আমি তোমাদের এসব উপাস্যের প্রতি চরমভাবে বিরূপ ও অসন্তুষ্ট।

৬২. 'তোমার ওপর আমাদের কোন দেবতার অভিশাপ পড়েছে—তাদের এ বক্তব্যের জবাবেই একথা বলা হয়েছে। (তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন সূরা ইউনূস ৭১ আয়াত)।

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ
وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ عَادٌ ۖ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ
وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٥٩﴾ وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ
الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اَلَآ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ۗ اَلَا
بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ﴿٦٠﴾ وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا
اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ
فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ۗ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ﴿٦١﴾

তারপর যখন আমার হুকুম এসে গেলো তখন নিজের রহমতের সাহায্যে হূদ ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমি রক্ষা করলাম এবং একটি কঠিন আযাব থেকে বাঁচালাম।

এ হচ্ছে আদ, নিজের রবের নিদর্শন তারা অস্বীকার করেছে, নিজের রসূলদের কথাও অমান্য করেছে।[৬৫] এবং প্রত্যেক স্বৈরাচারী সত্যের দুশমনের আদেশ মেনে চলেছে। শেষ পর্যন্ত এ দুনিয়ায় তাদের ওপর লানত পড়েছে এবং কিয়ামতের দিনেও। শোনো! আদ তাদের রবের সাথে কুফরী করেছিল। শোনো! দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে হূদের জাতি আদকে।

৬ রুকূ'

আর সামূদের কাছে আমি তাদের ভাই সালেহকে পাঠালাম।[৬৬] সে বললো, "হে আমার কওমের লোকেরা! আল্লাহর বন্দেগী করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তিনিই তোমাদের যমীন থেকে পয়দা করেছেন এবং এখানেই তোমাদের বসবাস করিয়েছেন।[৬৭] কাজেই তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাও[৬৮] এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো। নিশ্চয়ই আমার রব নিকটে আছেন তিনি ডাকের জবাব দেন।"[৬৯]

৬৩. অর্থাৎ তিনি যা কিছু করেন ঠিকই করেন। তাঁর প্রত্যেকটি কাজই সহজ সরল। তিনি অন্ধকার ও অন্যায়ের রাজত্বে বাস করেন না। তিনি পূর্ণসত্য ও ন্যায়ের মাধ্যমে তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্ব করে যাচ্ছেন। তুমি পথভ্রষ্ট ও অসৎকর্মশীল হবে এবং তারপরও আখেরাতে সফলকাম হবে আর আমি সত্য-সরল পথে চলবো ও সৎকর্মশীল হবো এবং তারপরও ক্ষতিগ্রস্ত ও অসফল হবো, এটা কোনক্রমেই সম্ভবপর হতে পারে না।

৬৪. 'আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনছি না' তাদের একথার জবাবে এ উক্তি করা হয়েছে।

৬৫. তাদের কাছে মাত্র একজন রসূলই এসেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি তাদেরকে এমন এক বিষয়ের দাওয়াত দিয়েছিলেন যে দাওয়াত সবসময় সবযুগে ও সকল জাতির মধ্যে আল্লাহর নবীগণ পেশ করতে থেকেছেন, তাই এক রসূলের কথা না মানাকে সকল রসূলের প্রতি নাফরমানী গণ্য করা হয়েছে।

৬৬. এ ক্ষেত্রে সূরা আ'রাফের দশম রুকূ'র টীকাগুলো সামনে রাখুন।

৬৭. প্রথম বাক্যাংশে যে দাবী করা হয়েছিল যে, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন প্রকৃত ইলাহ নেই, এটি হচ্ছে সেই দাবীর সপক্ষে যুক্তি। মুশরিকরা নিজেরাও স্বীকার করতো যে, আল্লাহই তাদের স্রষ্টা। এ স্বীকৃত সত্যের ওপর যুক্তির ভিত্তি করে হযরত সালেহ (আ) তাদেরকে বুঝান ঃ পৃথিবীর নিষ্প্রাণ উপাদানের সংমিশ্রণে যখন আল্লাহই তোমাদের এ পার্থিব অস্তিত্ব দান করেছেন এবং তিনিই যখন এ পৃথিবীর বুকে জীবন ধারণের ব্যবস্থা করেছেন তখন সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকার সেই আল্লাহ ছাড়া আর কার থাকতে পারে? তিনি ছাড়া আর কে বন্দেগী পূজা-উপাসনা লাভের অধিকার পেতে পারে?

৬৮. অর্থাৎ এতদিন পর্যন্ত তোমরা অন্যের বন্দেগী ও পূজা-অর্চনা করে এসেছো। সে অপরাধের জন্য তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও।

৬৯. এখানে মুশরিকদের একটি মস্তবড় বিভ্রান্তির প্রতিবাদ করা হয়েছে। সাধারণভাবে প্রায় তাদের প্রত্যেকেই এর শিকার। যেসব মারাত্মক বিভ্রান্তি প্রতি যুগে মানুষকে শিরকে লিপ্ত করেছে, এটি তাদের অন্যতম। তারা আল্লাহকে দুনিয়ার অন্যান্য রাজা, মহারাজা ও বাদশাহদের সমান মনে করে। অথচ এ রাজা-বাদশাহরা প্রজাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে নিজেদের প্রাসাদসমূহে বিলাসী জীবন যাপন করে। তাদের দরবারে সাধারণ প্রজারা পৌছুতে পারে না এবং সেখানে কোন আবেদন পৌছাতে হলে ঐ রাজাদের প্রিয়পাত্রদের কারো শরণাপন্ন হতে হয়। এরপর আবার সৌভাগ্যক্রমে কারো আবেদন যদি তাদের সুউচ্চ বালাখানায় পৌছে যায়ও তাহলেও প্রভুত্বের অহমিকায় মত্ত হয়ে তারা নিজেরা এর জবাব দিতে পছন্দ করে না। বরং প্রিয়পাত্রদের মধ্য থেকে কারো ওপর এর জবাব দেবার দায়িত্ব অর্পণ করে। এ ভুল ধারণার কারণে তারা মনে করে এবং ধুরন্ধর লোকেরা তাদের একথা বুঝাবার চেষ্টাও করেছে যে, বিশ্ব-জাহানের অধিপতি মহাশক্তিধর আল্লাহর মহিমান্বিত দরবার সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে বহুদূরে অবস্থিত। কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে তাঁর দরবারে পৌছে যাওয়া কেমন করে সম্ভবপর হতে পারে। মানুষের দোয়া ও প্রার্থনা সেখানে পৌছে যাওয়া এবং সেখান থেকে তার জওয়াব আসা তো কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তবে হাঁ যদি পবিত্র আত্মাসমূহের 'অসিলা' ধরা হয় এবং যেসব ধর্মীয় পদাধিকারীরা ওপর তলায় নযর-নিয়ায ও আবেদন নিবেদন পেশ করার কায়দা জানেন তাদের সহায়তা গ্রহণ করা হয় তাহলে এটা সম্ভব হতে পারে। এ বিভ্রান্তিটিই বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে বহু ছোটবড় মাবুদ এবং বিপুল সংখ্যক সুপারিশকারী দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আর এই সাথে পুরোহিতগিরির (Priesthood) এক সুদীর্ঘ ধারা চালু হয়ে গেছে, যার মাধ্যমে ছাড়া

قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ اَتَنْهٰنَآ اَنْ نَّعْبُدَ
مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ۝

তারা বললো, "হে সালেহ! এর আগে তুমি আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি ছিলে যার কাছে ছিল আমাদের বিপুল প্রত্যাশা।[৭০] আমাদের বাপ-দাদারা যেসব উপাস্যের পূজা করতো তুমি কি তাদের পূজা করা থেকে আমাদের বিরত রাখতে চাচ্ছো?[৭১] তুমি যে পথের দিকে আমাদের ডাকছো সে ব্যাপারে আমাদের ভীষণ সন্দেহ, যা আমাদের পেরেশানির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।"[৭২]

জাহেলী ধর্মসমূহের অনুসারীরা তাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানও পালন করতে সক্ষম নয়।

হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম জাহেলিয়াতের এ গোটা ধুম্রজালকে শুধুমাত্র দু'টি শব্দের সাহায্যে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন। শব্দ দুটির একটি হচ্ছে 'কারীব'—আল্লাহ নিকটবর্তী এবং দ্বিতীয়টি 'মুজীব' —আল্লাহ জবাব দেন। অর্থাৎ তিনি দূরে আছেন, তোমাদের এ ধারণা যেমন ভুল তেমনি তোমরা সরাসরি তাঁকে ডেকে নিজেদের আবেদন নিবেদনের জবাব হাসিল করতে পারো না, এ ধারণাও একই রকম ভুল। তিনি যদিও অনেক উচ্চস্থানের অধিকারী ও অনেক উচ্চ মর্যাদাশালী তবুও তিনি তোমাদের নিকটেই থাকেন। তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁকে নিজের ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্যে পেতে পারে এবং তাঁর সাথে সংগোপনে কথা বলতে পারে। প্রকাশ্য জনসমক্ষে এবং একান্ত গোপনে একাকী অবস্থায়ও নিজের আবেদন নিবেদন তাঁর কাছে পেশ করতে পারে। তারপর তিনি সরাসরি প্রত্যেক বান্দার আবেদনের জবাব নিজেই দেন। কাজেই বিশ্ব-জাহানের বাদশাহর সাধারণ দরবার যখন সবসময় সবার জন্য খোলা আছে এবং তিনি সবার কাছাকাছি রয়েছেন তখন তোমরা বোকার মতো এ জন্য মাধ্যম ও অসীলা খুঁজে বেড়াচ্ছো কেন? (এছাড়া দেখুন সূরা বাকারার ১৮৮ টীকা)

৭০. অর্থাৎ তোমার বুদ্ধিমত্তা, বিচারবুদ্ধি, বিচক্ষণতা, গাম্ভীর্য, দৃঢ়তা ও মর্যাদাশালী ব্যক্তিত্ব দেখে আমরা আশা করেছিলাম তুমি ভবিষ্যতে একজন বিরাট নামীদামী ব্যক্তি হবে। একদিকে যেমন তুমি বিপুল বৈষয়িক ঐশ্বর্যের অধিকারী হবে তেমনি অন্যদিকে আমরাও অন্য জাতি ও গোত্রের মোকাবিলায় তোমার প্রতিভা ও যোগ্যতা থেকে লাভবান হবার সুযোগ পাবো। কিন্তু তুমি এ তাওহীদ ও আখেরাতের নতুন ধূয়া তুলে আমাদের সমস্ত আশা-আকাংখা বরবাদ করে দিয়েছো। উল্লেখ্য, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কেও এ ধরনের কিছু চিন্তা তাঁর স্বগোত্রীয় লোকদের মধ্যেও পাওয়া যেতো। তারাও নবুওয়াত লাভের পূর্বে তাঁর উন্নত যোগ্যতা ও গুণাবলীর স্বীকৃতি দিতো। তারা মনে করতো এ ব্যক্তি ভবিষ্যতে একজন বিরাট ব্যবসায়ী হবে এবং তার বিচক্ষণতা ও বিপুল বুদ্ধিমত্তা আমাদেরও অনেক কাজে লাগবে। কিন্তু তাদের প্রত্যাশার বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে যখন তিনি তাওহীদ ও আখেরাত এবং উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর দাওয়াত দিতে

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ مِنْهُ
رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ ۖ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِىْ
غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ﴿٦٣﴾ وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ
فِىْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ﴿٦٤﴾

সালেহ বললো, "হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা! তোমরা কি কখনো একথাটিও চিন্তা করেছো যে, যদি আমি আমার রবের পক্ষ থেকে একটি অকাট্য প্রমাণ পেয়ে থাকি এবং তারপর তিনি তাঁর অনুগ্রহও আমাকে দান করে থাকেন, আর এরপরও যদি আমি তাঁর নাফরমানী করি তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কে আমাকে বাঁচাবে? আমাকে আরো বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করা ছাড়া তোমরা আমার আর কোন্ কাজে লাগতে পারো?[৭৩] আর হে আমার কওমের লোকেরা! দেখো, এ আল্লাহর উটনীটি তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। একে আল্লাহর যমীনে স্বাধীনভাবে চরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দাও। একে পীড়া দিয়ো না। অন্যথায় তোমাদের ওপর আল্লাহর আযাব আসতে বেশী দেরী হবে না"।

থাকলেন তখন তারা তাঁর ব্যাপারে কেবল নিরাশই হলো না বরং তাঁর প্রতি হয়ে উঠলো অসন্তুষ্ট। তারা বলতে লাগলো, বেশ ভালো কাজের লোকটি ছিল কিন্তু কি জানি তাকে কি পাগলামিতে পেয়ে বসলো, নিজের জীবনটাও বরবাদ করলো এবং আমাদের সমস্ত প্রত্যাশাও ধূলায় মিশিয়ে দিল।

৭১. এ মাবুদগুলো ইবাদাত লাভের হকদার কেন এবং কেন এদের পূজা করা উচিত—এর যুক্তি হিসেবে একথা বলা হয়েছে। এখানে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের যুক্তি উপস্থাপন পদ্ধতির পার্থক্য একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হযরত সালেহ (আ) বলেছিলেন, আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রকৃত মাবুদ নেই এবং এর যুক্তি হিসেবে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীতে বসবাস করিয়েছেন। এর জবাবে এ মুশরিকরা বলছে, আমাদের এ মাবুদরাও ইবাদাত লাভের হকদার এবং এদের ইবাদাতও পরিত্যাগ করা যেতে পারে না। কারণ বাপ-দাদাদের আমল থেকে এদের ইবাদাত হতে চলে আসছে। অর্থাৎ গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলা উচিত। কারণ শুরুতে একটি নির্বোধ এ পথে চলেছিল। তাই এখন এ পথে চলার জন্য আর এর চেয়ে বেশী কোন যুক্তির প্রয়োজন নেই যে, দীর্ঘকাল ধরে বহু বেকুফ এ পথেই চলছে।

৭২. এ সন্দেহ ও সংশয় কোন্ বিষয়ে ছিল? এখানে একথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। এর কারণ, সবাই সন্দেহের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রত্যেকের সন্দেহের ধরন ছিল আলাদা। সত্যের দাওয়াতের বৈশিষ্ট হচ্ছে, এ দাওয়াত দেবার পর লোকদের মানসিক প্রশান্তি

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ
مَكْذُوبٍ ﴿٦٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾
وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٦٧﴾
كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ ﴿٦٨﴾

কিন্তু তারা উটনীটিকে মেরে ফেললো। এর ফলে সালেহ তাদেরকে সাবধান করে দিলো এই বলে, "ব্যস, আর তিন দিন তোমাদের গৃহে অবস্থান করে নাও। এটি এমন একটি মেয়াদ, যা মিথ্যা প্রমাণিত হবে না।"

শেষ পর্যন্ত যখন আমার ফায়সালার সময় এসে গেলো তখন আমি নিজ অনুগ্রহে সালেহ ও তার ওপর যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং সেই দিনের লাঞ্ছনা থেকে তাদেরকে বাঁচালাম।[৭৪] নিসন্দেহে তোমার রবই আসলে শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী। আর যারা জুলুম করেছিল একটি বিকট আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করলো এবং তারা নিজেদের বাড়ীঘরে এমন অসাড় ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে রইলো যেন তারা সেখানে কখনো বসবাসই করেনি।

শোনো! সামূদ তার রবের সাথে কুফরী করলো। শোনো! দূরে নিক্ষেপ করা হলো সামূদকে।

খতম হয়ে যায় এবং একটি ব্যাপক অস্থিরতা জন্ম নেয়। যদিও প্রত্যেকের অনুভূতি অন্যের থেকে ভিন্নতর হয় কিন্তু এ অস্থিরতার অংশ প্রত্যেকেই কিছু না কিছু পেয়ে যায়। ইতিপূর্বে লোকেরা যেমন নিশ্চিন্ত মনে গোমরাহীতে লিপ্ত থাকতো এবং নিজেরা কি করে যাচ্ছে একথা একবার চিন্তা করার প্রয়োজন অনুভব করতো না, ঠিক এ ধরনের নিশ্চিন্ততা এ সত্যের দাওয়াত দানের পর আর অব্যাহত থাকতো না এবং থাকতে পারে না। জাহেলী ব্যবস্থার দুর্বলতার ওপর সত্যের আহবায়কের নির্দয় সমালোচনা, সত্যকে প্রমাণ করার জন্য তার শক্তিশালী ও হৃদয়গ্রাহী যুক্তি, তারপর তার উন্নত চরিত্র, দৃঢ় সংকল্প, ধৈর্য-স্থৈর্য ও ব্যক্তিগত চরিত্রমাধুর্য তার অত্যন্ত স্পষ্ট সরল ও সত্যনিষ্ঠ ভূমিকা এবং তার অসাধারণ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা, যার প্রভাব তার চরম হঠকারী ও কট্টর বিরুদ্ধবাদীরও মনের গভীরে শিকড় গেড়ে বসে, সর্বোপরি সমকালীন সমাজের সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গের তাঁর কথায় প্রভাবিত হতে থাকা এবং তাদের জীবনে সত্যের দাওয়াতের প্রভাবে অস্বাভাবিক পরিবর্তন সূচিত হওয়া—এসব জিনিস মিলেমিশে একটা জটিল

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ۭ قَالَ سَلٰمٌ
فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ۝ فَلَمَّا رَآٰ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ
اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ۭ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّآ
اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ۝ وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا
بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ۝

৭ রুকূ'

আর দেখো ইবরাহীমের কাছে আমার ফেরেশতারা সুখবর নিয়ে পৌঁছলো। তারা বললো, তোমার প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। ইবরাহীম জওয়াবে বললো, তোমাদের প্রতিও সালাম বর্ষিত হোক। তারপর কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই ইবরাহীম একটি কাবাব করা বাছুর (তাদের মেহমানদারীর জন্য)[৭৫] নিয়ে এলো। কিন্তু যখন দেখলো তাদের হাত আহারের দিকে এগুচ্ছে না তখন তাদের প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়লো এবং তাদের ব্যাপারে মনে মনে ভীতি অনুভব করতে লাগলো।[৭৬] তারা বললো, "ভয় পাবেন না, আমাদের তো লূতের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছে।"[৭৭] ইবরাহীমের স্ত্রীও দাঁড়িয়ে ছিল, সে একথা শুনে হেসে ফেললো।[৭৮] তারপর আমি তাকে ইসহাকের এবং ইসহাকের পরে ইয়াকূবের সুখবর দিলাম।[৭৯]

পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এর ফলে যারা সত্যের আগমনের পরও পুরাতন জাহেলিয়াতের ঝাণ্ডা উঁচু করে রাখতে চায় তাদের মনে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়ে যায়।

৭৩. অর্থাৎ যদি আমি নিজের অন্তরদৃষ্টির বিরুদ্ধে এবং আল্লাহ আমাকে যে জ্ঞান দান করেছেন সেই জ্ঞানের বিরুদ্ধে নিছক তোমাদের খুশী করার জন্য গোমরাহীর পথ অবলম্বন করি তাহলে শুধু আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমরা আমাকে বাঁচাতে পারবে না। তাই নয় বরং তোমাদের কারণে আমার অপরাধ আরো বেশী বেড়ে যাবে। উপরন্তু আমি তোমাদের সোজা পথ বাতলে দেবার পরিবর্তে উলটো আরো জেনেবুঝে তোমাদের গোমরাহ করেছি এ অপরাধে আল্লাহ আমাকে আরো অতিরিক্ত শাস্তি দেবেন।

৭৪. সিনাই উপদ্বীপে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায়, যখন সামূদ জাতির ওপর আযাব আসে তখন হযরত সালেহ (আ) হিজরাত করে সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। এ জন্যই "হযরত মূসার পাহাড়ের" কাছেই একটি ছোট পাহাড়ের নাম "নবী সালেহের পাহাড়" এবং কথিত আছে যে, এখানেই তিনি অবস্থান করেছিলেন।

৭৫. এ থেকে জানা যায়, ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীমের কাছে এসেছিলেন মানুষের আকৃতি ধরে। শুরুতে তারা নিজেদের পরিচয় দেননি। তাই হযরত ইবরাহীম (আ) তাদেরকে অপরিচিত বিদেশী মেহমান মনে করে আসার সাথে সাথেই তাদের খানাপিনার ব্যবস্থা করেছিলেন।

৭৬. কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে এ ভয়ের কারণ ছিল এই যে, অপরিচিত নবাগতরা খেতে ইতস্তত করলে তাদের নিয়তের ব্যাপারে হযরত ইবরাহীমের মনে সন্দেহ জাগে এবং তারা কোন প্রকার শত্রুতার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে কিনা—এ চিন্তা তাঁর মনকে আতংকিত করে তোলে। কারণ আরব দেশে কোন ব্যক্তি কারোর মেহমানদারীর জন্য আনা খাবার গ্রহণ না করলে মনে করা হতো সে মেহমান হিসেবে নয় বরং হত্যা ও লুটতরাজের উদ্দেশ্যে এসেছে। কিন্তু পরবর্তী আয়াতগুলো এ ব্যাখ্যা সমর্থন করে না।'

৭৭. কথা বলার এ ধরন থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, খাবারের দিকে তাদের হাত এগিয়ে যেতে না দেখে হযরত ইবরাহীম (আ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, তারা ফেরেশতা। আর যেহেতু ফেরেশতাদের প্রকাশ্যে মানুষের বেশে আসা অস্বাভাবিক অবস্থাতেই হয়ে থাকে, তাই হযরত ইবরাহীম মূলত যে বিষয়ে ভীত হয়েছিলেন তা ছিল এই যে, তাঁর পরিবারের সদস্যরা বা তাঁর জনপদের লোকেরা অথবা তিনি নিজেই এমন কোন দোষ করে বসেননি তো যে ব্যাপারে পাকড়াও করার জন্য ফেরেশতাদের এই আকৃতিতে পাঠানো হয়েছে। কোন কোন মুফাস্‌সির যে কথা বুঝেছেন প্রকৃত ব্যাপার যদি তাই হতো তাহলে ফেরেশতারা এভাবে বলতো ঃ "ভয় পেয়ো না, আমরা তোমার রবের প্রেরিত ফেরেশতা।" কিন্তু যখন তারা তাঁর ভয় দূর করার জন্য বললো ঃ "আমাদের তো লূতের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছে," তখন জানা গেলো যে, তাদের ফেরেশতা হওয়ার ব্যাপারটা হযরত ইবরাহীম জেনে গিয়েছিলেন, তবে এ ভেবে তিনি শংকিত হয়ে পড়েছিলেন যে, ফেরেশতারা যখন এ ফিতনা ও পরীক্ষার আবরণে হাযির হয়েছেন তখন কে সেই দুর্ভাগা যার সর্বনাশ সূচিত হতে যাচ্ছে?

৭৮. এ থেকে বুঝা যায়, ফেরেশতার মানুষের আকৃতিতে আসার খবর শুনেই পরিবারের সবাই পেরেশান হয়ে পড়েছিল। এ খবর শুনে হযরত ইবরাহীমের স্ত্রীও ভীত হয়ে বাইরে বের হয়ে এসেছিলেন। তারপর যখন তিনি শুনলেন, তাদের গৃহের বা পরিবারের ওপর কোন বিপদ আসছে না। তখনই তার ধড়ে প্রাণ এলো এবং তিনি আনন্দিত হলেন।

৭৯. ফেরেশতাদের হযরত ইবরাহীমের পরিবর্তে তাঁর স্ত্রী হযরত সারাহকে এ খবর শুনাবার কারণ এই ছিল যে, ইতিপূর্বে হযরত ইবরাহীম একটি পুত্র সন্তান লাভ করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী হযরত হাজেরার গর্ভে সাইয়্যিদিনা ইসমাঈল আলাইহিস সালামের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত হযরত সারাহ ছিলেন সন্তানহীনা। তাই তাঁর মনটিই ছিল বেশী বিষন্ন। তাঁর মনের এ বিষন্নতা দূর করার জন্য তাঁকে শুধু ইসহাকের মতো মহান গৌরবান্বিত পুত্রের জন্মের সুসংবাদ দিয়ে ক্ষান্ত হননি বরং এ সংগে এ সুসংবাদও দেন যে, এ পুত্রের পরে আসছে ইয়াকূবের মতো নাতি, যিনি হবেন বিপুল মর্যাদাসম্পন্ন পয়গম্বর।

قَالَتْ يٰوَيْلَتٰى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ۭ اِنَّ هٰذَا
لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۭ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ
عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ۭ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ﴿٧٣﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ
اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَاۗءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِيْ قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٧٤﴾ اِنَّ
اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ﴿٧٥﴾ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ
قَدْ جَاۗءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ﴿٧٦﴾

সে বললো ঃ হায়, আমার পোড়া কপাল![৮০] এখন আমার সন্তান হবে নাকি, যখন আমি হয়ে গেছি খুনখুনে বুড়ী আর আমার স্বামীও হয়ে গেছে বুড়ো?[৮১] এ তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার!" ফেরেশতারা বললো ঃ "আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে অবাক হচ্ছো?[৮২] হে ইবরাহীমের গৃহবাসীরা! তোমাদের প্রতি তো রয়েছে আল্লাহর রহমত ও বরকত, আর অবশ্যি আল্লাহ অত্যন্ত প্রশংসাই এবং বড়ই শান শওকতের অধিকারী।"

তারপর যখন ইবরাহীমের আশংকা দূর হলো এবং (সন্তানের সুসংবাদে) তার মন খুশীতে ভরে গেলো তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আমার সাথে বাদানুবাদ শুরু করলো।[৮৩] আসলে ইবরাহীম ছিল বড়ই সহনশীল ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী এবং সে সকল অবস্থায়ই আমার দিকে রুজু করতো। (অবশেষে আমার ফেরেশ্‌তারা তাকে বললা ঃ) "হে ইবরাহীম! এ থেকে বিরত হও। তোমার রবের হুকুম হয়ে গেছে, কাজেই এখন তাদের ওপর এ আযাব অবধারিত। কেউ ফেরাতে চাইলেই তা ফিরতে পারে না।"[৮৪]

৮০. এর মানে এ নয় যে, হযরত সারাহ এ খবর শুনে যথার্থই খুশী হবার পরিবর্তে উল্‌টো একে দুর্ভাগ্য মনে করেছিলেন। বরং আসলে এগুলো এমন ধরনের শব্দ ও বাক্য, যা মেয়েরা সাধারণত কোন ব্যাপারে অবাক হয়ে গেলে বলে থাকে। এ ক্ষেত্রে এর শাব্দিক অর্থ এখানে লক্ষ হয় না বরং নিছক বিস্ময় প্রকাশই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

৮১. বাইবেল থেকে জানা যায়, হযরত ইবরাহীমের বয়স এ সময় ছিল ১০০ বছর এবং হযরত সারাহর বয়স ছিল ৯০ বছর।

৮২. এর মানে হচ্ছে, যদিও প্রকৃতিগত নিয়ম অনুযায়ী এ বয়সে মানুষের সন্তান হয় না তবুও আল্লাহর কুদরতে এমনটি হওয়া কোন অসম্ভব ব্যাপারও নয়। আর এ সুসংবাদ

যখন তোমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হচ্ছে তখন তোমার মতো একজন মুমিনা মহিলার পক্ষে এ ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করার কোন কারণ নেই।

৮৩. এহেন পরিস্থিতিতে "বাদানুবাদ" শব্দটি আল্লাহর সাথে হযরত ইবরাহীমের গভীর ভালোবাসা ও মান-অভিমানের সম্পর্কের কথা প্রকাশ করে। এ শব্দটি বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে দীর্ঘক্ষণ বিতর্ক জারি থাকার একটি দৃশ্যপট অংকন করে। লূতের সম্প্রদায়ের ওপর থেকে কোন প্রকারে আযাব সরিয়ে দেবার জন্য বান্দা বারবার জোর দিচ্ছে। আর জবাবে আল্লাহ বলছেন, এ সম্প্রদায়টির মধ্যে এখন ন্যায়, কল্যাণ ও সততার কোন অংশই নেই। এর অপরাধসমূহ এমনভাবে সীমা অতিক্রম করেছে যে, একে আর কোন প্রকার সুযোগ দেয়া যেতে পারে না। বান্দা তবুও আবার বলে যাচ্ছে ঃ "হে পরওয়ারদিগার! যদি সামান্যতম সদ্‌গুণও এর মধ্যে থেকে থাকে, তাহলে একে আরো একটু অবকাশ দিন, হয়তো এ সদগুণ কোন সুফল বয়ে আনবে।" বাইবেলে এ বাদানুবাদের কিছু বিস্তারিত বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু কুরআনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তার তুলনায় আরো বেশী অর্থবহ ব্যাপকতার অধিকারী। তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য বাইবেল আদি পুস্তকের ১৮ অধ্যায়ের ২৩-৩২ বাক্য দেখুন)

৮৪. বর্ণনার এ ধারাবাহিকতায় হযরত ইবরাহীমের এ ঘটনাটি বিশেষ করে লূতের সম্প্রদায়ের ঘটনার মুখবন্ধ হিসেবে বাহ্যত কিছুটা বেখাপ্পা মনে হয়। কিন্তু আসলে যে উদ্দেশ্যে অতীত ইতিহাসের এ ঘটনাবলী এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে তার প্রেক্ষিতে এটা এখানে যথার্থই প্রযোজ্য হয়েছে। ঘটনাগুলোর এ পারস্পরিক যোগসূত্র অনুধাবন করার জন্য নিম্নোক্ত দু'টি বিষয় সামনে রাখতে হবে।

এক ঃ এখানে কুরাইশ গোত্রের লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীমের আওলাদ হওয়ার কারণে তারা আরব এলাকার সমগ্র জনবসতির কাছে পীরজাদা, আল্লাহর ঘর কা'বার খাদেম এবং ধর্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের অধিকারী সেজে বসেছে। তারা প্রচন্ড অহংকারে মত্ত। তারা মনে করে, তাদের ওপর আল্লাহর গজব কেমন করে আসতে পারে! তারা তো আল্লাহর সেই প্রিয় বান্দার আওলাদ। আল্লাহর দরবারে তাদের পক্ষে সুপারিশ করার জন্য তিনি রয়েছেন। তাদের এ মিথ্যা অহংকার চূর্ণ করার জন্য প্রথমে তাদের এ দৃশ্য দেখানো হলো যে, হযরত নূহের মতো মহান মর্যাদাশালী নবী নিজের চোখের সামনে নিজের কলিজার টুকরা ছেলেকে ডুবতে দেখছেন। তাকে বাঁচাবার জন্য আল্লাহর কাছে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করছেন। কিন্তু শুধু যে, তাঁর সুপারিশ তাঁর ছেলের কোন কাজে আসেনি তা নয় বরং উল্‌টো এ সুপারিশ করার কারণে তাঁকে ধমক খেতে হচ্ছে। তারপর এখন এ দ্বিতীয় দৃশ্য দেখানো হচ্ছে খোদ হযরত ইবরাহীমের। একদিকে তাঁর ওপর অজস্র অনুগ্রহ বর্ষণ করা হয়েছে এবং অত্যন্ত স্নেহার্দ্র ও কোমল ভংগীতে তাঁর কথা আলোচনা করা হচ্ছে। কিন্তু অন্যদিকে যখন সেই ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আবার ইনসাফের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন তখন তাঁর তাকীদ ও চাপ প্রদান সত্ত্বেও আল্লাহ অপরাধী জাতির মোকাবিলায় তাঁর সুপারিশ রদ করে দিচ্ছেন।

দুই ঃ এ ভাষণের উদ্দেশ্য কুরাইশদের মনের মধ্যে একথাও গেঁথে দেয়া যে, আল্লাহর যে কর্মফল বিধির ব্যাপারে একেবারে নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত হয়ে তারা বসে ছিল,

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ
عَصِيْبٌ ﴿٧٧﴾ وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ؕ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ ؕ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ
رَّشِيْدٌ ﴿٧٨﴾ قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَاِنَّكَ
لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ﴿٧٩﴾

আর যখন আমার ফেরেশতারা লূতের কাছে পৌঁছে গেলো[৮৫] তখন তাদের আগমনে সে খুব ঘাবড়ে গেলো এবং তার মন ভয়ে জড়সড় হয়ে গেলো। সে বলতে লাগলো, আজ বড় বিপদের দিন।[৮৬] (এ মেহমানদের আসার সাথে সাথেই) তার সম্প্রদায়ের লোকেরা নির্দ্বিধায় তার ঘরের দিকে ছুটে আসতে লাগলো। আগে থেকেই তারা এমনি ধরনের কুকর্মে অভ্যস্ত ছিল। লূত তাদেরকে বললো ঃ "ভাইয়েরা! এই যে, এখানে আমার মেয়েরা আছে, এরা তোমাদের জন্য পবিত্রতর।[৮৭] আল্লাহর ভয়-ডর কিছু করো এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে লাঞ্ছিত করো না, তোমাদের মধ্যে কি একজনও ভালো লোক নেই?" তারা জবাব দিল ঃ "তুমি তো জানোই, তোমার মেয়েদের দিয়ে আমাদের কোন কাজ নেই[৮৮] এবং আমরা কি চাই তাও তুমি জানো।"

তা কিভাবে ইতিহাসের আবর্তনে ধারাবাহিকভাবেও যথারীতি প্রকাশ পেয়ে এসেছে এবং কেমন সব প্রকাশ্য লক্ষণ তাদের নিজেদের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। একদিকে রয়েছেন হযরত ইবরাহীম। তিনি সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে গৃহহারা হয়ে একটি অপরিচিত দেশে অবস্থান করছেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর কোন শক্তি-সামর্থ নেই। কিন্তু তাঁর সৎকর্মের ফল আল্লাহ তাঁকে এমনভাবে দান করেন যে, তাঁর বুড়ী ও বন্ধ্যা স্ত্রীর গর্ভে ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্ম হয়। তারপর হযরত ইসহাকের ঔরসে ইয়াকূব আলাইহিস সালামেরও জন্ম হয়। তাঁর থেকে বনী ইসরাঈলের সুবিশাল বংশধারা এগিয়ে চলে। তাদের শ্রেষ্ঠত্বের ডংকা শত শত বছর ধরে বাজতে থাকে ফিলিস্তিন ও সিরীয় ভূখণ্ডে, যেখানে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম একদিন গৃহহারা মুহাজির হিসেবে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। অন্যদিকে রয়েছে লূতের সম্প্রদায়। এ ভূখণ্ডের একটি অংশে তারা প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছে এবং নিজেদের ব্যভিচারমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত

থাকছে। বহুদূর পর্যন্ত কোথাও তারা নিজেদের বদকর্মের জন্য কোন আযাবের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে না। লূত আলাইহিস সালামের উপদেশকে তারা ফুৎকারে উড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু যে তারিখে ইবরাহীমের বংশ থেকে একটি বিরাট সৌভাগ্যবান জাতির উত্থানের ফায়সালা করা হয় ঠিক সেই একই তারিখেই এ ব্যভিচারী জাতিটিকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার ফরমানও জারি হয়ে যায়। এমন বিভীষিকাময় পদ্ধতিতে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয় যে, আজ তাদের জনবসতির নাম-নিশানাও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

৮৫. সূরা আ'রাফের ১০ রুকূ'র টীকাগুলো দেখুন।

৮৬. এ ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ কুরআন মজীদে দেয়া হয়েছে তার বক্তব্যের অন্তরনিহিত তাৎপর্য থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ফেরেশতারা সুন্দর ছেলেদের ছদ্মবেশে হযরত লূতের গৃহে এসেছিলেন। তারা যে ফেরেশতা একথা হযরত লূত জানতেন না। এ কারণে এ মেহমানদের আগমনে তিনি খুব বেশী মানসিক উৎকণ্ঠা অনুভব করছিলেন এবং তাঁর মনও সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজের সম্প্রদায়কে জানতেন। তারা কেমন ব্যভিচারী এবং কী পর্যায়ের নির্লজ্জ হয়ে গেছে তা তাঁর জানা ছিল।

৮৭. হতে পারে হযরত লূত সমগ্র সম্প্রদায়ের মেয়েদের দিকে ইংগিত করেছেন। কারণ নবী তার সম্প্রদায়ের জন্য বাপের পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকেন। আর সম্প্রদায়ের মেয়েরা তাঁর দৃষ্টিতে নিজের মেয়ের মতো হয়ে থাকে। আবার এও হতে পারে যে, তাঁর ইংগিত ছিল তাঁর নিজের মেয়েদের প্রতি। তবে ব্যাপার যাই হোক না কেন উভয় অবস্থাতেই একথা ধারণা করার কোন কারণই নেই যে, হযরত লূত তাদেরকে যিনা করার জন্য আহবান জানিয়েছিলেন। "এরা তোমাদের জন্য পবিত্রতর"— একথাই যাবতীয় ভুল অর্থের অবকাশ খতম করে দিয়েছে। হযরত লূতের বক্তব্যের পরিষ্কার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আল্লাহ যে জায়েয পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন সেই পদ্ধতিতেই নিজেদের যৌন কামনা পূর্ণ করো এবং এ জন্য মেয়েদের অভাব নেই।

৮৮. এ বাক্যটি তাদের মানসিক অবস্থার পূর্ণচিত্র এঁকে দেয়। বুঝা যায় লাম্পট্যের ক্ষেত্রে তারা কত নিচে নেমে গিয়েছিল। তারা স্বভাব-প্রকৃতি ও পবিত্রতার পথ পরিহার করে একটি পূতিগন্ধময় প্রকৃতি বিরোধী পথে চলতে শুরু করেছিল, ব্যাপার শুধুমাত্র এতটুকুই ছিল না বরং অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিল যে, এখন শুধুমাত্র এ একটি নোংরা পথের প্রতিই ছিল তাদের সমস্ত ঝোঁক-প্রবণতা, আকর্ষণ ও অনুরাগ। তাদের প্রবৃত্তি এখন শুধুমাত্র এ নোংরামিরই অনুসন্ধান করে ফিরছিল। প্রকৃতি ও পবিত্রতার পথ তো আমাদের জন্য তৈরীই হয়নি—একথা বলতে তারা কোন লজ্জা অনুভব করতো না। এটা হচ্ছে নৈতিক অধপতন ও চারিত্রিক বিকৃতির চূড়ান্ত পর্যায়। এর চেয়ে বেশী নিম্নগামিতার কথা কল্পনাই করা যেতে পারে না। যে ব্যক্তি নিছক নফ্‌স ও প্রবৃত্তির দুর্বলতার কারণে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যায়, এ সত্ত্বেও হালালকে কাংখিত এবং হারামকে পরিত্যাজ্য মনে করে, তার বিষয়টি খুবই হাল্কা। এমন ব্যক্তি কখনো সংশোধিত হয়ে যেতে পারে। আর সংশোধিত হয়ে না গেলেও তার সম্পর্কে বড় জোর এতটুকু বলা যেতে পারে যে, সে একজন বিকৃত চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তি। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তির সমস্ত আগ্রহ হারামের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়ে যায় এবং সে মনে করতে থাকে

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٨٠﴾ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا
رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ
وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ
إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا
جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿٨٢﴾
مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾

লূত বললো ঃ "হায়! যদি আমার এতটা শক্তি থাকতো যা দিয়ে আমি তোমাদের সোজা করে দিতে পারতাম অথবা কোন শক্তিশালী আশ্রয় থাকতো সেখানে আশ্রয় নিতে পারতাম।" তখন ফেরেশতারা তাকে বললো ঃ "হে লূত! আমরা তোমার রবের প্রেরিত ফেরেশতা। এরা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি কিছুটা রাত থাকতে তোমার পরিবার পরিজন নিয়ে বের হয়ে যাও। আর সাবধান। তোমাদের কেউ যেন পেছন ফিরে না তাকায়।[৮৯] কিন্তু তোমার স্ত্রী ছাড়া (সে সাথে যাবে না) কারণ তার ওপরও তাই ঘটবে যা ঐ সব লোকের ঘটবে।[৯০] তাদের ধ্বংসের জন্য প্রভাতকাল নির্দিষ্ট রয়েছে।–প্রভাত হবার আর কতটুকই বা দেরী আছে!"

তারপর যখন আমার ফায়সালার সময় এসে গেলো, আমি গোটা জনপদটি উল্‌টে দিলাম এবং তার ওপর পাকা মাটির পাথর অবিরামভাবে বর্ষণ করলাম,[৯১] যার মধ্য থেকে প্রত্যেকটি পাথর তোমার রবের কাছে চিহ্নিত ছিল।[৯২] আর জালেমদের থেকে এ শাস্তি মোটেই দূরে নয়।[৯৩]

হালাল তার জন্য তৈরীই হয়নি তখন তাকে মানুষের মধ্যেই গণ্য করা যেতে পারে না। সে আসলে একটি নোংরা কীট। মলমূত্র ও দুর্গন্ধের মধ্যেই সে প্রতিপালিত হয় এবং পাক–পবিত্রতার সাথে তার প্রকৃতিগত কোন সম্পর্কই নেই। এ ধরনের কীট যদি কোন পরিচ্ছন্নতা প্রিয় মানুষের ঘরে জন্ম নেয় তাহলে প্রথম সুযোগেই সে ফিনাইল ঢেলে দিয়ে তার অস্তিত্ব থেকে নিজের গৃহকে মুক্ত করে নেয়। তাহলে আল্লাহ তার যমীনে এ ধরনের নোংরা কীটদের সমাবেশকে কতদিন বরদাশ্‌ত করতে পারতেন।

৮৯. এর মানে হচ্ছে, এখন তোমাদের কিভাবে তাড়াতাড়ি এ এলাকা থেকে বের হয়ে যেতে পারো সে চিন্তা করা উচিত। পেছনে শোরগোল ও বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে তোমরা

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ
إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ
وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ
وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿٨٦﴾

৮ রুকূ'

আর মাদ্‌য়ানবাসীদের কাছে আমি তাদের ভাই শো'আয়েবকে পাঠালাম।[৯৪] সে বললো ঃ "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আল্লাহর বন্দেগী করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। আর মাপে ও ওজনে কম করো না। আজ আমি তোমাদের ভালো অবস্থায় দেখছি কিন্তু আমার ভয় হয় কাল তোমাদের ওপর এমন দিন আসবে যার আযাব সবাইকে ঘেরাও করে ফেলবে। আর হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা! যথাযথ ইনসাফ সহকারে মাপো ও ওজন করো এবং লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য সামগ্রী কম দিয়ো না। আর পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে বেড়িয়ো না। আল্লাহর দেয়া উদ্বৃত্ত তোমাদের জন্য ভালো যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। মোট কথা আমি তোমাদের ওপর কোন কর্ম তত্ত্বাবধানকারী নই।"[৯৫]

যেন পথে থেমে না যাও এবং আযাবের জন্য যে এলাকা নির্ধারিত হয়েছে আযাবের সময় এসে যাবার পরও তোমাদের কেউ যেন সেখানে অবস্থান না করে।

৯০. এটি তৃতীয় মর্মন্তুদ শিক্ষণীয় ঘটনা। এ সূরায় লোকদেরকে একথা শিক্ষা দেবার জন্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন বুযর্গের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং কোন বুযর্গের সুপারিশ তোমাদের নিজেদের গোনাহের পরিণতি থেকে বাঁচাতে পারে না।

৯১. সম্ভবত একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের আকারে এ আযাব এসেছিল। ভূমিকম্প জনবসতিটিকে ওলট-পালট করে দিয়েছিল এবং অগ্নুৎপাতের ফলে তার ওপর হয়েছিল ব্যাপক হারে পাথর বৃষ্টি। "পাকা মাটির পাথর" বলতে সম্ভবত এমন মাটি বুঝানো হয়েছে যা আগ্নেয়গিরির আওতাধীন এলাকার ভূগর্ভস্থ উত্তাপ ও লাভার প্রভাবে পাথরে পরিণত হয়। আজ পর্যন্ত লূত সাগরের (Dead Sea) দক্ষিণ ও পূর্ব এলাকায় এ পাথর বর্ষণের চিহ্ন সর্বত্র সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ
اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ۭ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ۝

তারা জবাব দিল ঃ "হে শো'আয়েব! তোমার নামায কি তোমাকে একথা শেখায়[৯৬] যে, আমরা এমন সমস্ত মাবুদকে পরিত্যাগ করবো যাদেরকে আমাদের বাপ-দাদারা পূজা করতো? অথবা নিজেদের ধন-সম্পদ থেকে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী খরচ করার ইখতিয়ার আমাদের থাকবে না?[৯৭] ব্যস, শুধু তুমিই রয়ে গেছো একমাত্র উচ্চ হৃদয়ের অধিকারী ও সদাচারী!"

৯২. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি পাথরকে কি ধ্বংসাত্মক কাজ করতে হবে এবং কোন্ পাথরটি কোন্ অপরাধীর ওপর পড়বে তা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিল।

৯৩. অর্থাৎ আজ যারা জুলুমের পথে চলছে তারাও যেন এ আযাবকে নিজেদের থেকে দূরে না মনে করে। লূতের সম্প্রদায়ের ওপর যদি আযাব আসতে পেরে থাকে তাহলে তাদের ওপরও আসতে পারে। লূতের সম্প্রদায় আল্লাহর আযাব ঠেকাতে পারেনি, এরাও পারবে না।

৯৪. সূরা আ'রাফের ১১ রুকূ' দেখুন।

৯৫. অর্থাৎ তোমাদের ওপর আমার কোন জোর নেই। আমি তো শুধু একজন কল্যাণকামী উপদেষ্টা মাত্র। বড় জোর আমি তোমাদের বুঝাতে পারি। তারপর তোমরা চাইলে মানতে পারো আবার নাও মানতে পারো। আমার কাছে জবাবদিহি করার ভয় করা বা না করার প্রশ্ন নয়। বরং আসল প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করা। আল্লাহর কিছু ভয় যদি তোমাদের মনে থেকে থাকে তাহলে তোমরা যা কিছু করছো তা থেকে বিরত থাকো।

৯৬. এটি আসলে একটি তিরস্কারসূচক বাক্য। যে সমাজ আল্লাহকে ভুলে গেছে এবং ফাসেকী, অশ্লীলতা ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের মধ্যে ডুবে গেছে এমন প্রত্যেকটি সমাজেই এ ভাবধারা আজো মূর্ত দেখা যাবে। যেহেতু নামায দীনদারীর সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে সুস্পষ্ট চিহ্ন এবং ফাসেক ও ব্যভিচারী লোকেরা নামাযকে একটি ভয়ংকর বরং সবচেয়ে মারাত্মক রোগ মনে করে থাকে তাই এ ধরনের লোকদের সমাজে নামায ইবাদাতের পরিবর্তে রোগের চিহ্ন হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। নিজেদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলে সংগে সংগেই তাদের মনে এ অনুভূতি জাগে যে, এ ব্যক্তির ওপর "দীনদারীর আক্রমণ" ঘটেছে। তারপর এরা দীনদারীর এ বৈশিষ্টও ভালোভাবে জানে যে, এ জিনিসটি যার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায় সে কেবল নিজের সৎ ও পরিচ্ছন্ন কর্মধারার ওপরই সন্তুষ্ট থাকে না বরং অন্যদেরকেও সংশোধন করার চেষ্টা করে এবং বে-দীনী ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সমালোচনা না করে সে স্থির থাকতে পারে না। তাই নামাযের বিরুদ্ধে এদের অস্থিরতা শুধুমাত্র এ আকারে দেখা দেয় না যে, এদের এক ভাই দীনদারীর মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে গেছে বরং এ সংগে এদের মনে সন্দেহও

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَرَزَقَنِىْ مِنْهُ
رِزْقًا حَسَنًا ۭ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ۭ اِنْ
اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۭ وَمَا تَوْفِيْقِىْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ۭ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝

শো'আয়েব বললো ঃ "ভাইয়েরা! তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, যদি আমি আমার রবের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট সাক্ষের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকি, তারপর তিনি আমাকে উত্তম রিযিকও দান করেন[৯৮] (তাহলে এরপর আমি তোমাদের গোমরাহী ও হারামখোরীর কাজে তোমাদের সাথে কেমন করে শরীক হতে পারি?) আর যেসব বিষয় থেকে আমি তোমাদের বিরত রাখতে চাই আমি নিজে কখনো সেগুলোতে লিপ্ত হতে চাই না।[৯৯] আমি তো আমার সাধ্য অনুযায়ী সংশোধন করতে চাই। যাকিছু আমি করতে চাই তা সবই আল্লাহর তাওফীকের ওপর নির্ভর করে। তাঁরি ওপর আমি ভরসা করেছি এবং সব ব্যাপারে তাঁরই দিকে রুজু করি।

জাগে যে, এবার খুব শিগগির চরিত্র, নৈতিকতা ও দীনদারীর ওয়াজ-নসীহত শুরু হয়ে যাবে আর এ সাথে সমাজ জীবনের প্রত্যেকটি দিকে খুঁত বের করার একটি দীর্ঘ সিলসিলার সূচনা হবে। এ কারণেই এ ধরনের সমাজে নামায সবচেয়ে বেশী ভর্ৎসনা, তিরস্কার, নিন্দা ও সমালোচনার সম্মুখীন হয়। আর নামাযী সম্পর্কে পূর্বাহ্নে যে ধরনের আশংকা করা হয়েছিল কোন নামাযী যদি ঠিক সেই পর্যায়েই অসৎকাজের সমালোচনা ও ভালো কাজ করার উপদেশ দিতে শুরু করে দেয় তাহলে তো নামাযীকে এমনভাবে দোষারোপ করা শুরু হয়ে যায় যেন সে-ই এসব আপদের উৎস।

৯৭. এ বক্তব্যটি ইসলামের মোকাবিলায় জাহেলী মতবাদের পূর্ণ পরিচয় তুলে ধরছে। ইসলামের দৃষ্টিভংগী হচ্ছে, আল্লাহর বন্দেগী ছাড়া বাকি অন্যান্য যাবতীয় পদ্ধতিই ভুল। এগুলো অনুসরণ করা উচিত নয়। কারণ অন্য কোন পদ্ধতির পক্ষে বুদ্ধি, জ্ঞান ও আসমানী কিতাবসমূহে কোন যুক্তি-প্রমাণ নেই। আর তাছাড়া শুধুমাত্র একটি সীমিত ধর্মীয় গণ্ডীর মধ্যে আল্লাহর বন্দেগী হওয়া উচিত নয় বরং তামাদ্দুনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা জীবনের সকল বিভাগেই হওয়া উচিত। কারণ দুনিয়ায় মানুষের কাছে যা কিছু আছে সব আল্লাহর মালিকানাধীন। আল্লাহর ইচ্ছার গণ্ডী ভেদ করে স্বাধীনভাবে কোন একটি জিনিসও মানুষ ব্যবহার করার অধিকার রাখে না। এর মোকাবিলায় জাহেলী মতবাদ হচ্ছে, বাপ-দাদা থেকে যে পদ্ধতি চলে আসছে মানুষের তারই অনুসারী হওয়া উচিত। এর অনুসরণের জন্য এ ছাড়া আর অতিরিক্ত কোন যুক্তি প্রমাণের প্রয়োজন নেই যে, এটা বাপ-দাদাদের পদ্ধতি। তাছাড়া শুধুমাত্র পূজা-অর্চনার

সাথে দীন ও ধর্মের সম্পর্ক রয়েছে। আর আমাদের জীবনের সাধারণ পার্থিব বিষয়াবলীর ব্যাপারে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা দরকার, যেভাবে ইচ্ছা আমরা সেভাবে কাজ করতে পারি।

এ থেকে একথাও আন্দাজ করা যেতে পারে যে, জীবনকে ধর্মীয় ও পার্থিব এ দু'ভাগে ভাগ করার চিন্তা আজকের কোন নতুন চিন্তা নয় বরং আজ থেকে তিন সাড়ে তিন হাজার বছর আগে হযরত শো'আয়েব আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ও এ বিভক্তির ওপর ঠিক তেমনিই জোর দিয়েছিল যেমন আজকের যুগে পাশ্চাত্যবাসীরা এবং তাদের প্রাচ্যদেশীয় শাগরিদবৃন্দ জোর দিচ্ছেন। এটা আসলে কোন "নতুন আলো" বা "প্রগতি" নয় যা "মানসিক উন্নয়নে"র কারণে মানুষ আজ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। বরং এটা সেই একই পুরাতন অন্ধকার ও পশ্চাতপদ চিন্তা যা হাজার হাজার বছর আগের জাহেলিয়াতের মধ্যেও আজকের মতো একই আকারে বিরাজমান ছিল। এর সাথে ইসলামের সংঘাত আজকের নয়, অনেক পুরাতন।

৯৮. রিজিক শব্দটি এখানে দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর একটি অর্থ হচ্ছে, সত্য-সঠিক জ্ঞান, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে, আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে এ শব্দটি থেকে সাধারণত যে অর্থ বুঝা যায় সেটি অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে জীবন যাপন করার জন্য যে জীবন সামগ্রী দান করে থাকেন। প্রথম অর্থটির প্রেক্ষিতে এ আয়াত থেকে এমন একটি বিষয়বস্তুর প্রকাশ ঘটে, যা এ সূরায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, নূহ (আ) ও সালেহ আলাইহিস সালামের মুখ থেকে প্রকাশ হয়ে এসেছে। অর্থাৎ নবুওয়াতের আগেও আমি নিজের রবের পক্ষ থেকে সত্যের স্বপক্ষে সুস্পষ্ট সাক্ষ নিজের মনের মধ্যে ও বিশ্ব-জগতের সমস্ত নিদর্শনের মধ্যে পাচ্ছিলাম এবং এরপর আমার রব আমাকে সরাসরিভাবেও সত্য-জ্ঞান দান করেছেন। এখন তোমরা যেসব গোমরাহী ও নৈতিকতা বিরোধী কাজে লিপ্ত রয়েছো তাতে আমার পক্ষে জেনে বুঝে লিপ্ত হওয়া কেমন করে সম্ভবপর হতে পারে? আর দ্বিতীয় অর্থের প্রেক্ষিতে হযরত শো'আয়েবকে তারা ভর্ৎসনা করেছিল এ আয়াতটিকে তার জওয়াব বলা যায়। হযরত শো'আয়েবকে তারা ভর্ৎসনা করে বলেছিল : "ব্যস শুধু তুমিই রয়ে গেছো একজন উদারমনা ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি! এ কড়া ও তিক্ত অক্রমণের জবাব এভাবে দেয়া হয়েছে : "ভাইয়েরা! যদি আমার রব সত্যকে চিনবার মতো অন্তরদৃষ্টি এবং হালাল রিযিক আমাকে দিয়ে থাকেন তাহলে তোমাদের নিন্দাবাদের কারণে এ অনুগ্রহ কি করে বিগ্রহে পরিণত হবে? আল্লাহ যখন আমার প্রতি মেহেরবানী করেছেন তখন তোমাদের ভ্রষ্টতা ও হারাম খাওয়াকে আমি সত্য ও হালাল গণ্য করে তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হই কেমন করে?

৯৯. অর্থাৎ একথা থেকেই তোমরা আমার সত্যতা আন্দাজ করে নিতে পারো যে, অন্যদের আমি যাকিছু বলি আমি নিজেও তা করি। যদি আমি তোমাদের আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহর পূজা বেদীতে যেতে নিষেধ করতাম এবং নিজে কোন বেদীর সেবক হয়ে বসতাম তাহলে নিসন্দেহে তোমরা বলতে পারতে, নিজের পীরগিরির ব্যবসায়ের প্রসারের জন্য অন্য দোকানগুলোর সুনাম নষ্ট করতে চাচ্ছি। যদি আমি তোমাদের হারাম

وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ
نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ۭ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ۝
وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ۭ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ۝

আর হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা! আমার বিরুদ্ধে তোমাদের একগুঁয়েমি যেন এমন পর্যায়ে না পৌঁছে যায় যে, শেষ পর্যন্ত তোমাদের ওপরও সেই একই আযাব এসে পড়ে, যা এসেছিল নূহ, হূদ বা সালেহের সম্প্রদায়ের ওপর। আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদের থেকে বেশী দূরের নয়।[১০০] দেখো, নিজেদের রবের কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো। অবশ্যি আমার রব করুণাশীল এবং নিজের সৃষ্টিকে ভালোবাসেন।[১০১]

জিনিস খেতে নিষেধ করতাম এবং নিজের কারবারে বেঈমানী করতে থাকতাম তাহলে তোমরা অবশ্যি এ সন্দেহ পোষণ করতে পারতে যে, আমি নিজের সুনাম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঈমানদারীর ঢাক পিটাচ্ছি। কিন্তু তোমরা দেখছো, যেসব অসৎকাজ থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করছি। আমি নিজেও সেগুলো থেকে দূরে থাকছি। যেসব কলংক থেকে আমি তোমাদের মুক্ত দেখতে চাচ্ছি আমার নিজের জীবনও তা থেকে মুক্ত। তোমাদের আমি যে পথের দিকে আহবান জানাচ্ছি আমার নিজের জন্যও আমি সেই পথটিই পছন্দ করেছি। এসব জিনিস একথা প্রমাণ করে যে, আমি যে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছি সে ব্যাপারে আমি সত্যবাদী ও একনিষ্ঠ।

১০০. অর্থাৎ লূতের সম্প্রদায়ের ঘটনা তো খুব বেশী দিনের কথা নয়। তোমাদের সামনে এ ঘটনা এখনো তরতাজা আছে। তোমাদের কাছাকাছি এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছিল। সম্ভবত লূতের কওমের ধ্বংসের পর তখন ছ'–সাতশো বছরের বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়নি। আর ভৌগোলিক দিক দিয়েও লূতের কওম যেখানে বসবাস করতো শো'আয়েবের কওমের এলাকাও ছিল একেবারে তার লাগোয়া।

১০১. অর্থাৎ মহান আল্লাহ পাষাণ হৃদয় ও নির্দয় নন। নিজের সৃষ্টির সাথে তাঁর কোন শত্রুতা নেই। তাদেরকে অযথা শাস্তি দিতে তিনি চান না। নিজের বান্দাদেরকে মারপিট করে তিনি খুশী হন না। তোমরা যখন নিজেদের বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপে সীমা অতিক্রম করে যাও এবং কোন প্রকারেই বিপর্যয় সৃষ্টিতে বিরত হও না তখন তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমাদের শাস্তি দেন। নয়তো তাঁর অবস্থা হচ্ছে এই যে, তোমরা যতই দোষ কর না কেন যখনই তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের ব্যাপারে লজ্জিত হয়ে তাঁর দিকে ফিরে আসবে তখনই তাঁর হৃদয়কে নিজেদের জন্য প্রশস্ততর পাবে। কারণ নিজের সৃষ্ট জীবের প্রতি তাঁর স্নেহ ও ভালোবাসার অন্ত নেই।

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ۖ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ۝٩١

তারা জবাব দিল ঃ "হে শোআয়েব! তোমার অনেক কথাই তো আমরা বুঝতে পারি না[১০২] আর আমরা দেখছি তুমি আমাদের মধ্যে একজন দুর্বল ব্যক্তি। তোমার ভ্রাতৃগোষ্ঠী না থাকলে আমরা কবেই তোমাকে পাথর নিক্ষেপে মেরে ফেলতাম। আমাদের ওপর প্রবল হবার মতো ক্ষমতা তোমার নেই।"[১০৩]

এ বিষয়বস্তুটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টান্ত দিয়ে সুস্পষ্ট করেছেন। তিনি একটি দৃষ্টান্ত এভাবে দিয়েছেন যে, তোমাদের কোন ব্যক্তির উট যদি কোন বিশুষ্ক তৃণপানিহীন এলাকায় হারিয়ে গিয়ে থাকে, তার পিঠে তার পানাহারের সামগ্রীও থাকে এবং সে ব্যক্তি তার খোঁজ করতে করতে নিরাশ হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের নীচে শুয়ে পড়ে। ঠিক এমনি অবস্থায় সে দেখে তার উটটি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এ সময় সে যে পরিমাণ খুশী হবে আল্লাহর পথভ্রষ্ট বান্দা সঠিক পথে ফিরে আসার ফলে আল্লাহ তার চেয়ে অনেক বেশী খুশী হন। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি এর চেয়ে আরো বেশী মর্মস্পর্শী। হযরত উমর (রা) বলেন, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু যুদ্ধবন্দী এলো। এদের মধ্যে একজন মহিলাও ছিল। তার দুগ্ধপোষ্য শিশুটি হারিয়ে গিয়েছিল। মাতৃস্নেহে সে এতই অস্থির হয়ে পড়েছিল যে, কোন বাচ্চা সামনে দেখলেই তাকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরতো এবং নিজের বুকের দুধ তাকে পান করাতে থাকতো। তার এ অবস্থা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি মনে করো এ মা তার নিজের বাচ্চাকে নিজের হাতে আগুনে ছুঁড়ে ফেলতে পারে? আমরা জবাব দিলাম ঃ কখনোই নয়, তার নিজের ছুঁড়ে দেবার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না, বাচ্চা নিজেই যদি আগুনে পড়ে যায় তাহলে সে তাকে বাঁচাবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। তিনি বলেন ঃ

الله ارحم بعباده من هذه بولدها

"এ মহিলা তার বাচ্চার প্রতি যে পরিমাণ অনুগ্রহশীল আল্লাহর অনুগ্রহ তাঁর বান্দার প্রতি তার চেয়ে অনেক বেশী।"

আর এমনি চিন্তা-ভাবনা করলে একথা সহজেই বুঝা যায়। আল্লাহই তো বাচ্চার লালন-পালনের জন্য মা-বাপের মনে স্নেহ-প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নয়তো আল্লাহ যদি এ স্নেহ-প্রীতি সৃষ্টি না করে দিতেন তাহলে বাচ্চাদের মা-বাপের চেয়ে বড় শত্রু আর হতো না। কারণ তারা মা-বাপের জন্য হয় সবচেয়ে বেশী কষ্টদায়ক। এখন যে আল্লাহ মাতৃ-পিতৃস্নেহের স্রষ্টা তার নিজের মধ্যে নিজের সৃষ্টির জন্য কি পরিমাণ স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসা থাকবে—একথা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই আন্দাজ করতে পারে।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ۭ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَاۗءَكُمْ
ظِهْرِيًّا ۭ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ۝ وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰي
مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۭ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ
يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۭ وَارْتَقِبُوْٓا اِنِّىْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ۝
وَلَمَّا جَاۗءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا
وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝
كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۭ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ۝

শো'আয়েব বললো ঃ "ভাইয়েরা! আমার ভ্রাতৃজোট কি তোমাদের ওপর আল্লাহর চাইতে প্রবল যে, তোমরা (ভ্রাতৃজোটের ভয় করলে এবং) আল্লাহকে একেবারে পেছনে ঠেলে দিলে? জেনে রাখো, যাকিছু তোমরা করছো তা আল্লাহর পাকড়াও-এর বাইরে নয়। হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজেদের পথে কাজ করে যাও এবং আমি আমার পথে কাজ করে যেতে থাকবো। শিগগীরই তোমরা জানতে পারবে কার ওপর লাঞ্ছনার আযাব আসছে এবং কে মিথ্যুক? তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাকো এবং আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারত রইলাম।"

শেষ পর্যন্ত যখন আমার ফায়সালার সময় এসে গেলো তখন আমি নিজের রহমতের সাহায্যে শো'আয়েব ও তার সাথী মুমিনদেরকে উদ্ধার করলাম। আর যারা জুলুম করেছিল একটি প্রচণ্ড আওয়াজ তাদেরকে এমনভাবে পাকড়াও করলো যে, নিজেদের আবাসভূমিতেই তারা নির্জীব নিস্পন্দের মতো পড়ে রইলো, যেন তারা সেখানে কোনদিন বসবাসই করতো না।

শোন, মাদয়ানবাসীরাও দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে যেমন সামূদ নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

১০২. হযরত শো'আয়েব কোন বিদেশী ভাষায় কথা বলছিলেন তাই তারা বুঝতে পারছিল না, এমন কোন ব্যাপার ছিল না। অথবা তাঁর কথা কঠিন, সূক্ষ্ম বা জটিলও ছিল না। কথা সবই সোজা ও পরিষ্কার ছিল। সেখানকার প্রচলিত ভাষায়ই কথা বলা হতো। কিন্তু তাদের মানসিক কাঠামো এত বেশী বেঁকে গিয়েছিল যে, হযরত শো'আয়েবের সোজা সরল কথাবার্তা তার মধ্যে কোনপ্রকারেই প্রবেশ করতে পারতো না। একথা স্বতসিদ্ধ যে,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ
فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٨﴾ وَأُتْبِعُوا فِي
هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٩٩﴾ ذَٰلِكَ مِنْ
أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١٠٠﴾

৯ রুকূ'

আর মূসাকে আমি নিজের নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট নিয়োগপত্রসহ ফেরাউন ও তার রাজ্যের প্রধান কর্মকর্তাদের কাছে পাঠালাম। কিন্তু তারা ফেরাউনের নির্দেশ মেনে চললো। অথচ ফেরাউনের নির্দেশ সত্যাশ্রয়ী ছিল না। কিয়ামতের দিন সে নিজের কওমের অগ্রবর্তী হবে এবং নিজের নেতৃত্বে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে।[১০৪] অবস্থানের জন্য কেমন নিকৃষ্ট স্থান সেটা! আর তাদের ওপর এ দুনিয়ায় লানত পড়েছে এবং কিয়ামতের দিনও পড়বে। কত নিকৃষ্ট প্রতিদান সেটা, যা কেউ লাভ করবে!

এগুলো কতক জনপদের খবর, যা আমি তোমাকে শুনাচ্ছি। এদের কোনটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে আবার কোনটার ফসল কাটা হয়ে গেছে।

যারা অন্ধপ্রীতি, বিদ্বেষ ও গোষ্ঠী স্বার্থ দোষে দুষ্ট হয় এবং প্রবৃত্তির লালসার পূজা করার ক্ষেত্রে একগুঁয়েমির নীতি অবলম্বন করে, আবার এ সংগে কোন বিশেষ চিন্তাধারার ওপর অনড় হয়ে বসে থাকে তারা তো প্রথমত এমন কোন কথা শুনতেই পারে না যা তাদের চিন্তাধারা থেকে ভিন্নতর আর যদি কখনো শুনেই নিয়ে থাকে তাহলে তারা বুঝতেই পারে না যে, এসব আবার কেমন ধারার কথা।

১০৩. একথা অবশ্যি সামনে থাকা দরকার যে, এ আয়াতগুলো যখন নাযিল হয় তখন হুবহু একই রকম অবস্থা মক্কাতেও বিরাজ করছিল। সে সময় কুরাইশরাও একইভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রক্ত পিপাসু হয়ে উঠেছিল। তারা তাঁর জীবননাশ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু শুধু বনী হাশেম তাঁর পেছনে ছিল বলেই তাঁর গায়ে হাত দিতে ভয় পাচ্ছিল। কাজেই হযরত শো'আয়েব ও তার কওমের এ ঘটনাকে যথাযথভাবে কুরাইশ ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে দিয়ে বর্ণনা করা হচ্ছে এবং সামনের দিকে হযরত শো'আয়েবের যে চরম শিক্ষণীয়

وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ
الَّتِيْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۭ وَمَا
زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ﴿١٠١﴾

আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি, তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছে। আর যখন আল্লাহর হুকুম এসে গেলো তখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা নিজেদের যেসব মাবুদকে ডাকতো তারা তাদের কোন কাজে লাগলো না এবং তারা ধ্বংস ছাড়া তাদের আর কোন উপকার করতে পারলো না।

জবাব উদ্ধৃত করা হয়েছে তার মধ্যে এ অর্থ লুকিয়ে রয়েছে যে, হে কুরাইশের লোকেরা! তোমাদের জন্যও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে এ একই জবাব দেয়া হলো।

১০৪. এ আয়াত ও কুরআনের অন্য কিছু বক্তব্য থেকে জানা যায়, যারা দুনিয়ায় কোন জাতির বা দলের নেতৃত্ব দেয় কিয়ামতের দিনও তারাই তাদের নেতা হবে। যদি তারা দুনিয়ায় নেকী, সততা ও সত্যের পথে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে তাহলে এখানে যারা তাদের অনুসরণ করেছে তারা কিয়ামতের দিনও তাদেরই পতাকাতলে সমবেত হবে এবং তাদের নেতৃত্বে জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাবে। আর যদি তারা দুনিয়ায় কোন ভ্রষ্টতা, নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ ও এমন কোন পথের দিকে মানুষকে আহবান জানিয়ে থাকে যা সত্য দীনের পথ নয়, তাহলে যারা এখানে তাদের পথে চলেছে তারা সেখানেও তাদেরই পেছনে থাকবে এবং তাদের নেতৃত্বে জাহান্নামের দিকে এগিয়ে যাবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসটি এ একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করছে ঃ

امرو القيس حامل لواء شعراء الجاهلية الى النار

"কিয়ামতের দিন কবি ইমরাউল কয়েসের হাতে থাকবে জাহেলী কাব্যচর্চার ঝাণ্ডা এবং আরবের জাহেলিয়াত পন্থী সমস্ত কবি তার নেতৃত্বে জাহান্নামের পথে এগিয়ে যাবে।"

এ দু'ধরনের শোভাযাত্রা কোন্ ধরনের জৌলুস ও জাঁক জমকের সাথে তাদের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাবে তার চিত্র এখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের চিন্তা ও কল্পনার পটে এঁকে নিতে পারে। যেসব নেতা দুনিয়ায় লোকদেরকে গোমরাহ করেছে এবং সত্য বিরোধী পথে চালিয়েছে তাদের অনুসারীরা যখন নিজেদের চোখে দেখে নেবে এ জালেমরা কী ভয়াবহ পরিণতির দিকে তাদেরকে টেনে এনেছে তখন তারা নিজেদের সমস্ত বিপদ–

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ ۭ اِنَّ اَخْذَهٗٓ
اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ﴿١٠٢﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ۭ
ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ﴿١٠٣﴾

আর তোমার রব যখন কোন অত্যাচারী জনপদকে পাকড়াও করেন তখন তার পাকড়াও এমনি ধরনেরই হয়। প্রকৃতপক্ষে তার পাকড়াও হয় বড়ই কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক। আসলে এর মধ্যে একটি নিশানী আছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আখেরাতের আযাবের ভয় করে।[১০৫] তা হবে এমন একটি দিন যেদিন সমস্ত লোক একত্র হবে এবং তারপর সেদিন যা কিছু হবে সবার চোখের সামনে হবে।

মুসীবতের জন্য তাদেরকে দায়ী মনে করবে এবং তাদের শোভাযাত্রা তাদেরকে নিয়ে এমন অবস্থায় জাহান্নামের দিকে রওয়ানা দেবে যে, আগে আগে তাদের নেতারা চলবে এবং তারা পেছনে পেছনে তাদেরকে গালি দিতে দিতে এবং তাদের প্রতি লানত বর্ষণ করতে করতে চলতে থাকবে। অন্যদিকে যাদের নেতৃত্ব মানুষকে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতের অধিকারী করবে তাদের অনুসারীরা নিজেদের শুভ পরিণাম দেখে তাদের নেতাদের জন্য দোয়া করতে থাকবে এবং তাদের ওপর প্রশংসা ও শুভেচ্ছার পুষ্প বর্ষণ করতে করতে এগিয়ে যাবে।

১০৫. অর্থাৎ ইতিহাসের এ ঘটনাবলীর মধ্যে এমন একটি নিশানী রয়েছে যে সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে মানুষের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাবে যে, আখেরাতের আযাব অবশ্যি আসবে এবং এ সম্পর্কিত নবীদের দেয়া খবর সত্য। তাছাড়া এ নিশানী থেকে সেই আখেরাতের আযাব কেমন কঠিন ও ভয়াবহ হবে সেকথাও জানতে পারবে। ফলে এ জ্ঞান তার মনে ভীতির সঞ্চার করে তাকে সঠিক পথে এনে দাঁড় করিয়ে দেবে।

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, ইতিহাসের সেই জিনিসটি কি, যাকে আখেরাত ও তার আযাবের আলামত বলা যেতে পারে? এর জবাবে বলা যায়, যে ব্যক্তি ইতিহাসকে শুধুমাত্র ঘটনার সমষ্টি মনে করে না বরং এ ঘটনার যুক্তি প্রমাণ নিয়েও মাথা ঘামায় এবং তা থেকে ফলাফল গ্রহণ করতেও অভ্যস্ত হয় সে সহজেই তা অনুধাবন করতে পারে। মানব জাতির হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে যে ধারাবাহিকতা ও নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে জাতি, সম্প্রদায় ও দলের উত্থান ও পতন ঘটতে থেকেছে এবং এ উত্থান ও পতনে যেমন সুস্পষ্টভাবে কিছু নৈতিক কার্যকারণ সক্রিয় থেকেছে আর পতনশীল জাতিগুলো যে ধরনের মারাত্মক ও শিক্ষণীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে পতন ও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে গেছে—এসব কিছুই এ অকাট্য সত্যের প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিতবহ যে, মানুষ এ বিশ্ব–জাহানে এমন একটি রাষ্ট্রশক্তির অধীন যে নিছক অন্ধ প্রাকৃতিক আইনের ওপর রাজত্ব করছে না বরং তার নিজের এমন একটি ন্যায়সংগত নৈতিক বিধান আছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে সে

وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ﴿١٠٤﴾ يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا
بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ ﴿١٠٥﴾

তাকে আনার ব্যাপারে আমি কিছু বেশী বিলম্ব করছি না, হাতে গোনা একটি সময়কাল মাত্র তার জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে। সেদিন যখন আসবে তখন কারোর কথা বলার সামর্থ থাকবে না, তবে আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে কেউ কথা বলতে পারবে।[১০৬] তারপর আবার সেদিন কিছু লোক হবে হতভাগ্য এবং কিছু লোক ভাগ্যবান।

নৈতিকতার একটি বিশেষ সীমানার ওপরে অবস্থানকারীদেরকে পুরস্কৃত করে, যারা এ সীমানার নীচে নেমে আসে তাদেরকে কিছুকালের জন্য ঢিল দিতে থাকে এবং যখন তারা এর অনেক নীচে নেমে যায় তখন তাদেরকে এমনভাবে ঠেলে ফেলে দেয় যে, তারা ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য একটি শিক্ষণীয় ইতিহাস হয়ে যায়। একটি ধারাবাহিক বিন্যাস সহকারে সবসময় এ ঘটনাবলীর প্রকাশ হতে থাকার ফলে এ ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ থাকে না যে, পুরস্কার ও শাস্তি এবং প্রতিদান ও প্রতিবিধান এ বিশ্ব-জাহানের রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি স্থায়ী আইন।

তারপর বিভিন্ন জাতির ওপর যেসব আযাব এসেছে সেগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে অনুমান করা যায় যে, আইনের দৃষ্টিতে পুরস্কার ও শাস্তির নৈতিক দাবী এ আযাবগুলোর মাধ্যমে কিছুটা অবশ্যি পূর্ণ হয়েছে কিন্তু এখনো এ দাবীর বিরাট অংশ অপূর্ণ রয়ে গেছে। কারণ দুনিয়ায় যে আযাব এসেছে তা কেবলমাত্র সমকালে দুনিয়ার বুকে যে প্রজন্ম বর্তমান ছিল তাদেরকেই পাকড়াও করেছে। কিন্তু যে প্রজন্ম অসৎকাজের বীজ বপন করে জুলুম-নির্যাতন ও অসৎকাজের ফসল তৈরী করে তা কাটার আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিল এবং যাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হলো পরবর্তী প্রজন্মকে, তারা যেন প্রতিদান ও প্রতিশোধের আইনের কার্যকারিতা থেকে পরিষ্কার গা বাঁচিয়ে চলে গেছে। এখন যদি আমরা ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে বিশ্ব-জাহানের রাষ্ট্র ব্যবস্থার মেজাজ সঠিকভাবে বুঝতে পেরে থাকি। তাহলে আমাদের এ অধ্যয়নই একথার সাক্ষ দেবার জন্য যথেষ্ট যে, ইনসাফ ও বুদ্ধিবৃত্তির দৃষ্টিতে প্রতিদান ও প্রতিশোধের আইনের যে নৈতিক চাহিদাগুলো এখনো অপূর্ণ রয়ে গেছে সেগুলো পূর্ণ করার জন্য এ ভারসাম্যপূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠ রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আবার একটি দ্বিতীয় বিশ্বের জন্ম দেবে এবং সেখানে দুনিয়ার সমস্ত জালেমকে তাদের কৃতকর্মের পুরোপুরি বদলা দেয়া হবে। সেই বদলা দুনিয়ার এ আযাবগুলো থেকে হবে অনেক বেশী কঠিন ও কঠোর। (দেখুন সূরা আ'রাফ ৩০ এবং সূরা ইউনূস ১০ টীকা।)

১০৬. অর্থাৎ এ নির্বোধরা নিজেদের মনে এ ধারণা নিয়ে বসে আছে যে, অমুক হুযুর আমাদের পক্ষে সুপারিশ করে আমাদের বাঁচিয়ে দেবেন, অমুক বুযর্গ জিদ ধরে বসে যাবেন এবং নিজের সাথে সম্পর্কিত প্রত্যেক ব্যক্তির গুনাহ মাফ করিয়ে না নিয়ে নিজের জায়গা থেকে উঠবেন না। অমুক হুযুর, যিনি আল্লাহর প্রিয়পাত্র, জান্নাতের পথে গোঁ ধরে বসে

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾
خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ
إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ
خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ
عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿١٠٨﴾ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ ۚ
مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ
نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ﴿١٠٩﴾

হতভাগ্যরা জাহান্নামে যাবে (যেখানে অত্যধিক গরমে ও পিপাসায়) তারা হাঁপাতে ও আর্তচীৎকার করতে থাকবে। আর এ অবস্থায় তারা চিরকাল থাকবে যতদিন আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত থাকবে,[১০৭] তবে যদি তোমার রব অন্য কিছু করতে চান। অবশ্যি তোমার রব যা চান তা করার পূর্ণ ইখতিয়ার রাখেন।[১০৮] আর যারা ভাগ্যবান হবে, তারা জান্নাতে যাবে এবং সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন পৃথিবী ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তবে যদি তোমার রব অন্য কিছু করতে চান।[১০৯] এমন পুরস্কার তারা পাবে যার ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হবে না।

কাজেই হে নবী! এরা যেসব মাবুদের ইবাদাত করছে তাদের ব্যাপারে তুমি কোন প্রকার সন্দেহের মধ্যে থেকো না। এরা তো (নিছক গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছে।) ঠিক তেমনিভাবে পূজা-অর্চনা করে যাচ্ছে যেমন পূর্বে এদের বাপ-দাদারা করতো।[১১০] আর আমি কিছু কাটছাঁট না করেই তাদের অংশ তাদেরকে পুরোপুরি দিয়ে দেবো।

পড়বেন এবং নিজের অনুসারীদের বখশিশের পরোয়ানা আদায় করিয়ে নিয়েই ছাড়বেন। অথচ জিদ করা ও গোঁ ধরাতো দূরের কথা সেদিনের সেই আড়ম্বরপূর্ণ মহিমান্বিত আদালতে অতি বড় কোন গৌরবান্বিত ব্যক্তি এবং মর্যাদাসম্পন্ন ফেরেশতাও টুঁ শব্দটি করতে পারবে না। আর যদি কেউ সেখানে কিছু বলতে পারে তাহলে একমাত্র বিশ্ব জাহানের সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মহান অধিকারীর নিজের প্রদত্ত অনুমতি সাপেক্ষেই বলতে পারবে। কাজেই যারা একথা বুঝেই গায়রুল্লাহর বেদীমূলে নযরানা ও ভেট চড়ায় যে, এরা আল্লাহর দরবারে বড়ই প্রভাবশালী এবং তাদের সুপারিশের ভরসায় নিজেদের আমলনামা কালো করে যেতে থাকে, তাদের সেখানে চরম হতাশার সম্মুখীন হতে হবে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۭ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ
مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۭ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿١١٠﴾

১০ রুকূ'

আমি এর আগে মূসাকেও কিতাব দিয়েছি এবং সে সম্পর্কে মতভেদ করা হয়েছিল (যেমন আজ তোমাদের এই যে কিতাব দেয়া হয়েছে এ সম্পর্কে করা হচ্ছে১১১)। যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে একটি কথা প্রথমেই স্থির করে না দেয়া হতো তাহলে এ মতভেদকারীদের মধ্যে কবেই ফায়সালা করে দেয়া হয়ে যেতো।১১২ একথা সত্যি যে, এরা তার ব্যাপারে সন্দেহ ও পেরেশানীর মধ্যে পড়ে রয়েছে।

১০৭. এ শব্দগুলোর অর্থ পরকালীন জগতের আকাশ ও পৃথিবী হতে পারে। অথবা এমনও হতে পারে যে, নিছক সাধারণ বাকধারা হিসেবে একে চিরকালীন স্থায়িত্ব অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। মোটকথা এর অর্থ বর্তমান পৃথিবী ও আকাশ তো কোনক্রমেই হতে পারে না। কারণ কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী কিয়ামতের দিন এগুলো বদলে দেয়া হবে এবং এখানে যেসব ঘটনার কথা বলা হচ্ছে সেগুলো কিয়ামতের পরে ঘটবে।

১০৮. অর্থাৎ তাদেরকে এ চিরন্তন আযাব থেকে বাঁচাবার মতো আর কোন শক্তিই তো নেই। তবে আল্লাহ নিজেই যদি কারোর পরিণতি বদলাতে চান অথবা কাউকে চিরন্তন আযাব দেবার পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আযাব দিয়ে মাফ করে দেবার ফায়সালা করে নেন তাহলে এমনটি করার পূর্ণ ইখতিয়ার তাঁর আছে। কারণ তিনি নিজেই নিজের আইন রচয়িতা। তাঁর ইখতিয়ার ও ক্ষমতাকে সীমিত করে দেবার মতো কোন উচ্চতর আইন নেই।

১০৯. অর্থাৎ তাদের জান্নাতে অবস্থান করাও এমন কোন উচ্চতর আইনের ভিত্তিতে হবে না, যা আল্লাহকে এমনটি করতে বাধ্য করে রেখেছে। বরং আল্লাহ যে তাদেরকে সেখানে রাখবেন এটা হবে সরাসরি তাঁর অনুগ্রহ। যদি তিনি তাদের ভাগ্য বদলাতে চান, তা করার পূর্ণ ক্ষমতা তাঁর আছে।

১১০. এর অর্থ এ নয় যে, এ মাবুদদের ব্যাপারে সত্যিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে কোন প্রকার সন্দেহ ছিল। বরং আসলে একথাগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে সাধারণ মানুষকে শুনানো হচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে, এরা যে এসব মাবুদের পূজা করছে এবং এদের কাছে প্রার্থনা করছে ও ভিক্ষা মাগছে, নিশ্চয়ই এরা কিছু দেখে থাকবে যে কারণে এরা এদের থেকে উপকৃত হবার আকাংখা পোষণ করে—কোন বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির মনে এ ধরনের কোন সংশয় থাকা উচিত নয়। সত্যি কথা হচ্ছে এই যে, এ পূজা-অর্চনা, নযরানা ও প্রার্থনা আসলে কোন অভিজ্ঞতা ও সত্যিকার পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নয় বরং এসব কিছু করা হচ্ছে নিছক অন্ধ অনুসৃতির

وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١١﴾
فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُم
مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾

আর একথাও সত্যি যে, তোমার রব তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের পুরোপুরি বদলা দিয়েই তবে ক্ষান্ত হবেন। অবশ্যি তিনি তাদের সবার কার্যকলাপের খবর রাখেন। কাজেই হে মুহাম্মাদ। তুমিও তোমার সাথীরা যারা (কুফরী ও বিদ্রোহ থেকে ঈমান ও আনুগত্যের দিকে) ফিরে এসেছে সত্য সঠিক পথে অবিচল থাকো যেমন তোমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে এবং বন্দেগীর সীমানা অতিক্রম করো না। তোমরা যা কিছু করছো তার ওপর তোমাদের রব দৃষ্টি রাখেন। এ জালেমদের দিকে মোটেই ঝুঁকবে না, অন্যথায় জাহান্নামের গ্রাসে পরিণত হবে এবং তোমরা এমন কোন পৃষ্ঠপোষক পাবে না যে আল্লাহর হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করতে পারে আর কোথাও থেকে তোমাদের কাছে কোন সাহায্য পৌঁছুবে না।

ভিত্তিতে। এসব বেদী ও আস্তানা পূর্ববর্তী জাতিদেরও ছিল এবং তাদের এ ধরনের কেরামতি ও অলৌকিক কার্যকলাপ তাদের মধ্যেও লোকমুখে খুব বেশী শোনা যেতো। কিন্তু যখন আল্লাহর আযাব এলো তখন তারা ধ্বংস হয়ে গেলো এবং বেদী ও আস্তানাগুলো কোন কাজে লাগলো না।

১১১. অর্থাৎ এ কুরআন সম্পর্কে আজ বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কথা বলছে, নানা রকম সন্দেহ-সংশয় পোষণ করছে, এটা কোন নতুন কথা নয়। বরং এর আগে মূসাকে যখন কিতাব দেয়া হয়েছিল তখন তার ব্যাপারেও এ ধরনের বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করা হয়েছিল। কাজেই হে মুহাম্মাদ! এমন সোজা, সরল ও পরিষ্কার কথা কুরআনে বলা হচ্ছে এবং তারপরও লোকেরা তা গ্রহণ করছে না—এ অবস্থা দেখে তোমার মন খারাপ করা ও হতাশ হওয়া উচিত নয়।

১১২. এ বাক্যটিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ঈমানদারদেরকে নিশ্চিন্ত ও তাদের মনে স্থৈর্য সৃষ্টি করার জন্য বলা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, যারা এ কুরআনের ব্যাপারে মতবিরোধ সৃষ্টি করছে তাদের ফায়সালা শিগ্‌গির চুকিয়ে দেবার ব্যাপারটি নিয়ে তোমরা অস্থির হয়ো না। আল্লাহ প্রথমেই স্থির করে নিয়েছেন যে, ফায়সালা নির্দিষ্ট সময়ের আগে করা হবে না এবং দুনিয়ার লোকেরা ফায়সালা চাওয়ার ব্যাপারে যে তাড়াহুড়ো করে থাকে আল্লাহ ফায়সালা করে দেয়ার ব্যাপারে সে ধরনের তাড়াহুড়ো করবেন না।

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ
السَّيِّاٰتِ ۚ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ﴿١١٤﴾ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ
أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١١٥﴾ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوْا بَقِيَّةٍ
يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ أُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿١١٦﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ
لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّأَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ﴿١١٧﴾

আর দেখো, নামায কায়েম করো দিনের দু' প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবার পর।[১১৩] আসলে সৎকাজ অসৎকাজকে দূর করে দেয়। এটি একটি স্মারক তাদের জন্য যারা আল্লাহকে স্মরণ রাখে।[১১৪] আর সবর করো কারণ আল্লাহ সৎকর্মকারীদের কর্মফল কখনো নষ্ট করেন না।

তাহলে তোমাদের পূর্বে যেসব জাতি অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের মধ্যে এমন সব লোক থাকলো না কেন যারা লোকদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিতে বাধা দিতো? এমন লোক থাকলেও অতি সামান্য সংখ্যক ছিল। তাদেরকে আমি ঐ জাতিদের থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছি। নয়তো জালেমরা তো এমনি সব সুখৈশ্বর্যের পেছনে দৌড়াতে থেকেছে, যার সরঞ্জাম তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে দেয়া হয়েছিল এবং তারা অপরাধী হয়েই গিয়েছিল। তোমার রব এমন নন যে, তিনি জনবসতিসমূহ অন্যায়ভাবে ধ্বংস করবেন, অথচ তার অধিবাসীরা সংশোধনকারী।[১১৫]

১১৩. দিনের দু' প্রান্ত বলতে ফজর ও মাগরিব এবং কিছু রাত অতিবাহিত হবার পর বলতে এশার সময় বুঝানো হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, এ বক্তব্য এমন এক সময়ের যখন পাঁচ ওয়াক্তের নামায নির্ধারিত হয়নি। মি'রাজের ঘটনা এরপর সংঘটিত হয় এবং তাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার বিধান দেয়া হয়। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন বনী ইসরাঈল ৯৫, ত্বা-হা ১১১, রূম ১২৪ টীকা)

১১৪. অর্থাৎ যেসব অসৎকাজ দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে এবং সত্যের এ দাওয়াতের প্রতি শত্রুতার ব্যাপারে তোমাদের সাথে যেসব অসৎকাজ করা হচ্ছে এসবগুলো দূর করার আসল পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, তোমরা নিজেরা অনেক বেশী সৎ হয়ে যাও এবং নিজেদের সৎকাজের সাহায্যে এ অসৎকাজকে পরাস্ত করো। আর তোমাদের সৎ বানাবার সর্বোত্তম

মাধ্যম হচ্ছে এ নামায। নামায আল্লাহর স্মরণকে তরতাজা করতে থাকবে এবং তার শক্তির জোরে তোমরা অসৎকাজের এ সংঘবদ্ধ তুফানী শক্তির কেবল মোকাবিলাই করতে পারবে তাই নয় বরং দুনিয়ায় কার্যত সৎকাজ ও কল্যাণের ব্যবস্থাও কায়েম করতে পারবে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন আনকাবুত ৭৭-৭৯ টীকা)

১১৫. আগের ছ'টি রুকূ'তে যেসব জাতির ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে এ আয়াতগুলোতে অত্যন্ত শিক্ষণীয় পদ্ধতিতে তাদের ধ্বংসের মূল কারণের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এ ইতিহাসের ওপর মন্তব্য করে বলা হচ্ছে, শুধুমাত্র এ জাতিগুলোকেই নয় বরং মানব জাতির অতীত ইতিহাসে যতগুলো জাতিই ধ্বংস হয়েছে তাদের সবাইকে যে জিনিসটি অধপতিত করেছে তা হচ্ছে এই যে, যখন আল্লাহ নিজের নিয়ামতের দ্বারা তাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন তখন নিজেদের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির নেশায় মত্ত হয়ে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিতে তৎপর হয়েছে এবং তাদের সামষ্টিক প্রকৃতি এমন পর্যায়ে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, তাদেরকে অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার মতো সৎ লোক তাদের মধ্যে ছিলই না অথবা যদি এমনি ধরনের কিছু লোক থেকেও থাকে তাহলে তাদের সংখ্যা এত কম ছিল এবং তাদের আওয়াজ এতই দুর্বল ছিল যে, অসৎকাজ থেকে তারা বিরত রাখার চেষ্টা করলেও বিপর্যয় ঠেকাতে পারেনি। এ কারণেই শেষ পর্যন্ত এ জাতিগুলো আল্লাহর গযবের শিকার হয়েছে। নয়তো নিজের বান্দাদের সাথে আল্লাহর কোন শত্রুতা নেই। তারা ভালো কাজ করে যেতে থাকলেও আল্লাহ অযথা তাদেরকে শাস্তি দেন না। আল্লাহর এ বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য এখানে তিনটি কথা মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া।

এক ঃ প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থায় ভালো কাজের দিকে আহবানকারী ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার মতো সৎলোকের উপস্থিতি অপরিহার্য। কারণ সৎবৃত্তিই আল্লাহর কাছে কাংখিত। আর মানুষের অসৎকাজ যদি আল্লাহ বরদাশত করে থাকেন তাহলে তা শুধুমাত্র তাদের মধ্যকার এ সৎবৃত্তির কারণেই করে থাকেন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত করে থাকেন যতক্ষণ তাদের মধ্যে সৎ প্রবণতার কিছুটা সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কোন মানব গোষ্ঠী যখন একেবারেই সৎলোক শূন্য হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে শুধু অসৎলোকই বর্তমান থাকে অথবা সৎলোক বর্তমান থাকলেও তাদের কথা কেউ শোনে না এবং সমগ্র জাতিই একসাথে নৈতিক বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে তখন আল্লাহর আযাব তাদের মাথার ওপর এমনভাবে ঘুরতে থাকে যেমন পূর্ণ গর্ভবতী নারী, যার গর্ভকাল একেবারে টায় টায় পূর্ণ হয়ে গেছে, কেউ বলতে পারে না কোন্ মুহূর্তে সে সন্তান প্রসব করে বসবে।

দুই ঃ যে জাতি নিজের মধ্যে সবকিছু বরদাশ্‌ত করতে পারে কিন্তু শুধুমাত্র এমন গুটিকয় হাতে গোনা লোককে বরদাশত করতে পারে না যারা তাকে অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার ও সৎকাজ করার দাওয়াত দেয়, সে জাতির ব্যাপারে একথা জেনে নাও যে, তার দুর্দিন কাছে এসে গেছে। কারণ এখন সে নিজেই নিজের প্রাণের শত্রু হয়ে গেছে। যেসব জিনিস তার ধ্বংসের কারণ সেগুলো তার অতি প্রিয় এবং শুধুমাত্র একটি জিনিসই সে একদম বরদাশত করতে প্রস্তুত নয় যা তার জীবনের ধারক ও বাহক।

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾
إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ
جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾

অবশ্যি তোমার রব চাইলে সমগ্র মানব জাতিকে একই গোষ্ঠীভুক্ত করতে পারতেন, কিন্তু এখন তারা বিভিন্ন পথেই চলতে থাকবে এবং বিপথে যাওয়া থেকে একমাত্র তারাই বাঁচবে যাদের ওপর তোমার রব অনুগ্রহ করেন। এ (নির্বাচন ও ইখতিয়ারের স্বাধীনতার) জন্যই তো তিনি তাদের পয়দা করেছিলেন।[১১৬] আর তোমার রবের একথা পূর্ণ হয়ে গেছে যা তিনি বলেছিলেন—"আমি জাহান্নামকে জিন ও মানুষ উভয়কে দিয়ে ভরে দেবো।"

তিন ঃ একটি জাতির মধ্যে সৎকাজ করার আহবানে সাড়া দেবার মতো লোক কি পরিমাণ আছে তার ওপর নির্ভর করে তার আযাবে লিপ্ত হওয়ার ও না হওয়ার ব্যাপারটির শেষ ফায়সালা। যদি তার মধ্যে বিপর্যয় খতম করে কল্যাণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার লোকের সংখ্যা এমন পর্যায়ে থাকে যা এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে তাহলে তার ওপর সাধারণ আযাব পাঠানো হয় না। বরং ঐ সৎলোকদেরকেই অবস্থার সংশোধনের সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু লাগাতার প্রচেষ্টা ও সাধনা করার পরও যদি তার মধ্যে সংস্কার সাধনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ লোক না পাওয়া যায় এবং এ জাতি তার অংগন থেকে কয়েকটা হীরে বাইরে ছুঁড়ে ফেলার পর নিজের কার্যধারা থেকে একথা প্রমাণ করে দেয় যে, এখন তার কাছে শুধু কয়লা ছাড়া আর কিছুই নেই, তাহলে এরপর আর বেশী সময় হাতে থাকে না। এরপর শুধুমাত্র কুণ্ডে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়, যা কয়লাগুলোকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন যারিয়াত ৩৪ টীকা)

১১৬. সাধারণত এ ধরনের অবস্থায় তকদীরের নামে যে সন্দেহের অবতারণা করা হয়ে থাকে এটি তার জবাব। ওপরে অতীতের জাতিদের ধ্বংসের যে কারণ বর্ণনা করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা যেতে পারতো যে, তাদের মধ্যে সৎলোক না থাকা বা অতি অল্প সংখ্যক থাকাও আল্লাহর ইচ্ছার মধ্যে শামিল ছিল, এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট জাতিদেরকে এ জন্য দায়ী করা হচ্ছে কেন? তাদের মধ্যে আল্লাহ বিপুল সংখ্যক সৎলোক সৃষ্টি করে দিলেন না কেন? এর জবাবে মানুষের ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা সম্পর্কিত বাস্তব সত্যটি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। পশু, উদ্ভিদ ও অন্যান্য সৃষ্টির মতো মানুষকেও প্রকৃতিগতভাবে একটি নির্দিষ্ট ও গতানুগতিক পথে পাড়ি জমাতে বাধ্য করা হবে এবং এ পথ থেকে সরে গিয়ে অন্য কোন পথে সে চলতে পারবে না, মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ এটা কখনোই চান না। যদি এটাই তাঁর ইচ্ছা হতো তাহলে ঈমানের দাওয়াত, নবী প্রেরণ ও কিতাব নাযিলের কি প্রয়োজন ছিল? সমস্ত মানুষ মুমিন ও

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ
فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَقُل لِّلَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ ﴿١٢١﴾ وَانتَظِرُوا ۚ
إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿١٢٢﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ
الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾

আর হে মুহাম্মাদ! এ রসূলদের বৃত্তান্ত, যা আমি তোমাকে শোনাচ্ছি, এসব এমন জিনিস যার মাধ্যমে আমি তোমার হৃদয়কে মজবুত করি। এসবের মধ্যে তুমি পেয়েছো সত্যের জ্ঞান এবং মুমিনরা পেয়েছে উপদেশ ও জাগরণবাণী। তবে যারা ঈমান আনে না তাদেরকে বলে দাও তোমরা তোমাদের পদ্ধতিতে কাজ করতে থাকো এবং আমরা আমাদের পদ্ধতিতে কাজ করে যাই। কাজের পরিণামের জন্য তোমরা অপেক্ষা করো এবং আমরাও অপেক্ষায় আছি। আকাশে ও পৃথিবীতে যাকিছু লুকিয়ে আছে সবই আল্লাহর কুদরাতের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সমস্ত বিষয়ে তাঁরই দিকে রুজু করা হয়। কাজেই হে নবী! তুমি তাঁর বন্দেগী করো এবং তাঁরই ওপর ভরসা রাখো। যাকিছু তোমরা করছো তা থেকে তোমার রব গাফেল নন।[১১৭]

মুসলমান হিসেবে পয়দা হতো এবং কুফরী ও গুণাহগারীর কোন সম্ভাবনাই থাকতো না। কিন্তু মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর যে ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন তা আসলে হচ্ছে এই যে, তাকে নির্বাচন ও গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেয়া হবে। তাকে নিজের পছন্দ মাফিক বিভিন্ন পথে চলার ক্ষমতা দেয়া হবে। তার সামনে জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের পথ খুলে দেয়া হবে। তারপর প্রত্যেকটি মানুষকে ও মানুষের প্রত্যেকটি দলকে এর মধ্য থেকে যে কোন একটি পথ নিজের জন্য পছন্দ করে নিয়ে তার ওপর চলার সুযোগ দেয়া হবে। এর ফলে প্রত্যেকে নিজের প্রচেষ্টা ও উপার্জনের ফল হিসেবেই সবকিছু লাভ করবে। কাজেই যে পরিকল্পনার ভিত্তিতে মানুষকে পয়দা করা হয়েছে তা যখন নির্বাচনের স্বাধীনতা এবং কুফরী ও ঈমানের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত তখন যে জাতি নিজে অসৎ পথে এগিয়ে যেতে চায়, আল্লাহ তাকে জোর করে সৎ পথে নিয়ে যাবেন এটা কেমন করে হতে পারে? কোন জাতি যখন নিজের নির্বাচনের ভিত্তিতে মানুষ তৈরীর এমন এক কারখানা বানিয়েছে যার ছাঁচ থেকে সবচেয়ে বড় অসৎ, ব্যভিচারী, জালেম ও ফাসেক লোক তৈরী হয়ে বেরিয়ে আসবে, তখন আল্লাহ কেন সরাসরি হস্তক্ষেপ করে সেখানে এমন সব জন্মগত সৎলোক

সরবরাহ করবেন যারা তার বিকৃত ছাঁচগুলোকে ঠিক করে দেবে? এ ধরনের হস্তক্ষেপ আল্লাহর রীতি বিরোধী। সৎ ও অসৎ উভয় ধরনের লোক প্রত্যেক জাতি নিজেই সরবরাহ করবে। যে জাতি সমষ্টিগতভাবে অসৎ পথ পছন্দ করবে, যার মধ্য থেকে সততার ঝাণ্ডা বুলন্দ করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ লোক এগিয়ে আসবে না এবং যে তার সমাজ ব্যবস্থায় সংস্কার প্রচেষ্টার বিকশিত হওয়া ও সমৃদ্ধি লাভ করার কোন অবকাশই রাখবে না, আল্লাহ তাকে জোর করে সৎ বানাতে যাবেন কেন? তিনি তো তাকে সেই পরিণতির দিকে এগিয়ে দেবেন যা সে নিজের জন্য নির্বাচন করে নিয়েছে। তবে আল্লাহর রহমতের অধিকারী যদি কোন জাতি হতে পারে তাহলে সে হবে একমাত্র সেই জাতি যার মধ্যে এমন বহু লোকের জন্ম হবে যারা নিজেরা সৎকর্মশীলতা, কল্যাণ ও ন্যায়ের দাওয়াতে সাড়া দেবে এবং এ সংগে নিজেদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সংস্কার সাধনকারীদের কাজ করতে পারার মতো পরিবেশ ও যোগ্যতা টিকিয়ে রাখবে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন আনআম ২৪ টীকা)

১১৭. অর্থাৎ কুফর ও ইসলামের এ সংঘাতের সাথে জড়িত উভয় পক্ষ যা কিছু করছে আল্লাহ তা দেখছেন। আল্লাহর রাজত্বে কোন অন্যায় ও দুঃশাসনের স্থান নেই। রাজ্যে যাচ্ছেতাই হতে থাকবে কিন্তু শাসক রাজার তার কোন খবরই থাকবে না এবং তিনি এসবের সাথে কোন সম্পর্কই রাখবেন না, এ ধরনের কোন পরিস্থিতি এখানে নেই। এখানে বিজ্ঞতা, কৌশল ও সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে বিলম্ব অবশ্যি হয় কিন্তু অরাজকতা ও অন্যায়ের কোন স্থান নেই। যারা সংশোধনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তারা বিশ্বাস করুন তাদের পরিশ্রম মাঠে মারা যাবে না। আর যারা বিপর্যয় সৃষ্টি ও তা সম্প্রসারণে লিপ্ত আছে, যারা সংশোধন প্রচেষ্টাকারীদের ওপর জুলুম ও নির্যাতন চালাচ্ছে এবং সংশোধনের এ কাজকে যেনতেন প্রকারে অগ্রসর হতে না দেয়ার জন্য নিজেদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাদেরও জেনে রাখা উচিত যে, তাদের এসব কার্যকলাপ আল্লাহর জানা আছে এবং এর পরিণাম তাদের অবশ্যি ভোগ রকতে হবে।

ইউসুফ

১২

নাযিল হওয়ার সময়-কাল ও এর কারণসমূহ

এ সূরার বিষয়বস্তু থেকে একথা বুঝা যাচ্ছে যে, এটিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কায় অবস্থানের শেষ যুগে নাযিল হয়ে থাকবে। তখন কুরাইশের লোকেরা নবীকে (সা) হত্যা বা দেশান্তর করবে, না বন্দী করবে, এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল। এ সময় মক্কার কাফের সমাজের কোন কোন লোক (সম্ভবত ইহুদীদের ইংগিতে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরীক্ষা করার জন্য তাঁকে প্রশ্ন করে, বনী ইসরাঈলরা কি কারণে মিসরে চলে গিয়েছিল? যেহেতু আরববাসীরা এ ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানতো না, তাদের কথা–কাহিনী ও পৌরানিক বৃত্তান্তসমূহে কোথাও এর কোন উল্লেখই পাওয়া যেতো না এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের মুখেও ইতিপূর্বে এ সম্পর্কিত কোন কথা শোনা যায়নি, তাই তারা আশা করছিল, তিনি এর কোন বিস্তারিত জবাব দিতে পারবেন না অথবা এ সময় টালবাহানা করে কোন ইহুদীকে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করবেন এবং এভাবে তাঁর বুজরুকি ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু এ পরীক্ষায় উলটো তারাই মার খেয়ে গেলো। আল্লাহ কেবল সংগে সংগেই ইউসুফ আলাইহিস সালামের এ ঘটনা সম্পূর্ণ তাঁর মুখ দিয়ে শুনিয়েই ক্ষান্ত হলেন না বরং এ ঘটনাকে কুরাইশরা ইউসুফের ভাইদের মতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যে ব্যবহার করছিল ঠিক তার সদৃশ ঘটনা হিসেবে উপস্থাপিত করলেন।

নাযিলের উদ্দেশ্য

এক ঃ এর মাধ্যমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের প্রমাণ এবং তাও আবার বিরোধিদের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা। এ সংগে তাদের স্থিরীকৃত পরীক্ষায় একথা প্রমাণ করে দেয়া যে, নবী শোনা কথা বলেন না বরং অহীর মাধ্যমে যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন। ৩ ও ৭ আয়াতে এ উদ্দেশ্যটি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং ১০২ ও ১০৩ আয়াতে পূর্ণ শক্তিতে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দুই ঃ কুরাইশ সরদারদের ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে এ সময় যে দ্বন্দ্ব চলছিল তার ওপর ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের ঘটনা প্রয়োগ করে কুরাইশদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, আজ তোমরা নিজেদের ভাইয়ের সাথে ঠিক তেমনি আচরণ করছো যেমন ইউসুফের ভাইয়েরা তাঁর সাথে করেছিলেন। কিন্তু যেমন তারা আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে লড়াই করে সফল হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত যাকে চরম নির্দয়ভাবে কূয়ার মধ্যে ফেলে দিয়েছিলো সেই ভাইয়ের পদতলেই নিজেদের সঁপে দিতে

হয়েছিল। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর কৌশল ও ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে তোমাদের শক্তি প্রয়োগ সফল হতে পারবে না। একদিন তোমাদেরও নিজেদের এ ভাইয়ের কাছে দয়া ও অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে হবে, যাকে আজ তোমরা খতম করে দেবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছো। সূরার শুরুতে এ উদ্দেশ্যটিও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

لَقَدْ كَانَ فِىْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ

"ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনার মধ্যে এ প্রশ্নকারীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।"

আসলে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনাকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরাইশদের দ্বন্দ্বের ওপর প্রয়োগ করে কুরআন মজীদ যেন একটি স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। পরবর্তীকালের ঘটনাবলী তাকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণ করেছে। এ সূরাটি নাযিল হওয়ার দেড় দু'বছর পরই কুরাইশরা ইউসুফের ভাইদের মতো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। তাদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য তাঁকে বাধ্য হয়ে মক্কা থেকে বের হতে হয়। তারপর তাদের প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধেই দেশান্তরী অবস্থায়ই তিনি ঠিক তেমনি উন্নতি ও কর্তৃত্ব লাভ করেন যেমন ইউসুফ আলাইহিস সালাম করেছিলেন । তারপর মক্কা বিজয়ের সময় ঠিক সেই একই ঘটনা ঘটেছিল যা মিসরের রাজধানীতে ইউসুফ আলাইহিস সালামের সামনে তাঁর ভাইদের শেষ উপস্থিতির সময় ঘটেছিল। সেখানে যখন ইউসুফের ভাইয়েরা চরম অসহায় ও দীন হীন অবস্থায় তাঁর সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে বলছিলেন ঃ

تَصَدَّقْ عَلَيْنَا اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ

"আমাদের প্রতি সাদ্‌কা করুন। আল্লাহ সাদকাকারীদেরকে উত্তম পুরস্কার দিয়ে থাকেন।"

তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম প্রতিশোধ নেবার শক্তি রাখা সত্ত্বেও তাদেরকে মাফ করে দিলেন এবং বললেন ঃ

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিন। তিনি সকল অনুগ্রহকারীর চাইতে বড় অনুগ্রহকারী।"

অনুরূপভাবে এখানে যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পরাজিত বিধ্বস্ত কুরাইশরা মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিল এবং তিনি তাদের প্রত্যেকটি জুলুমের বদলা নেবার ক্ষমতা রাখতেন তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তোমারা কি মনে করো, আমি তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবো?" তারা জবাব দিল ঃ اخ كريم وابن اخ كريم "আপনি একজন উদারচেতা ভাই এবং একজন উদারচেতা ভাইয়ের সন্তান।" একথায় তিনি বললেন ঃ

فانى اقول لكم كما قال يوسف لاخوته ، لا تثريب عليكم اليوم اذ هبوا فانتم الطلقاء –

"আমি তোমাদের সেই একই জবাব দিচ্ছি যে জবাব ইউসুফ তার ভাইদেরকে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। যাও তোমাদের মাফ করে দিলাম।"

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

এ দু'টি বিষয় তো এ সূরার উদ্দেশ্যের পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু এ কাহিনীটিকেও কুরআন মজীদ নিছক গল্প বলার ও ইতিহাস লেখার ঢংয়ে বর্ণনা করছে না বরং নিজের রীতি অনুসারে তাকে মূল দাওয়াত প্রচারে ব্যবহার করছে।

এ পুরো ঘটনাটিতে সে একথা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ইসহাক (আ), হযরত ইয়াকুব (আ) ও হযরত ইউসুফ (আ) সেই একই দীনের অনুসারী ছিলেন যে দীনের অনুসারী ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং যে দাওয়াত তিনি দিচ্ছেন সেই একই দাওয়াত তাঁরাও দিতেন।

তাছাড়া সে একদিকে হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফের কর্মকাণ্ড ও চরিত্র এবং অন্যদিকে ইউসুফের ভ্রাতৃবৃন্দ, বণিক দল, আযীযে মিসর, তার স্ত্রী, মিসরের অভিজাত পরিবারের নারী সমাজ ও শাসকদের কর্মকাণ্ড ও চরিত্র পরস্পরের মোকাবিলায় তুলে ধরছে এবং নিছক নিজের বর্ণনাভংগীর মাধ্যমে শ্রোতা ও পাঠকদের সামনে এ নীরব প্রশ্ন উপস্থাপন করছে যে, দেখো, একদিকে ইসলাম একটি আদর্শ চরিত্র পেশ করছে। আল্লাহর বন্দেগী ও আখেরাতে জবাবদিহির প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতেই এ চরিত্র গড়ে ওঠে। আবার অন্যদিকে রয়েছে আর একটি চরিত্র। কুফরী, জাহেলিয়াত, বৈষয়িক স্বার্থপূজা ও আখেরাতের সাথে সম্পর্কহীনতার ছাঁচে ঢালাই হয়ে এ চরিত্র তৈরী হয়। এখন তোমরা নিজেদের বিবেককে জিজ্ঞেস করো, সে এর মধ্য থেকে কোন্ চারিত্রিক আদর্শটি পছন্দ করে?

তারপর এ ঘটনা থেকে কুরআন মজীদ আরো একটি গভীর তত্ত্বও মানুষের হৃদয়পটে অংকন করে দেয়। সেটি হচ্ছে, আল্লাহ যে কাজ করতে চান তা যে কোন অবস্থায় সম্পাদিত হয়েই যায়। মানুষ নিজের বুদ্ধিমত্তা ও কলাকৌশলের মাধ্যমে তাঁর পরিকল্পনা প্রতিহত করার বা বদলাবার ব্যাপারে কখনো সফল হতে পারে না। বরং অনেক সময় মানুষ নিজের পরিকল্পনার লক্ষে একটি কাজ করে এবং মনে করতে থাকে যে, সে তীরটি ঠিক নিশানায় মেরে দিয়েছে কিন্তু শেষে প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ তারই হাত দিয়ে এমন কাজ করিয়ে নিয়েছেন যা ছিল তার নিজের পরিকল্পনার বিরোধী এবং আল্লাহর পরিকল্পনার পুরোপুরি বাস্তবায়ন। ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা যখন তাঁকে কূয়ায় ফেলে দিচ্ছিলো তখন তারা মনে করছিলো আমরা নিজেদের পথের কাঁটা চিরতরে দূর করে দিচ্ছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ইউসুফকে নিজেদের হাতে এমন এক উন্নতির প্রথম ধাপে চড়িয়ে দিয়েছিলো যার ওপর আল্লাহ তাঁকে চড়াতে চাচ্ছিলেন এবং এ কাজ

করে তারা নিজেরা যে ফল লাভ করেছে তা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, ইউসুফের উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে যাবার পর তারা নিজের ভাইয়ের সাথে সসম্মানে সাক্ষাত করতে যাওয়ার পরিবর্তে লজ্জা ও অনুতাপের অনুভূতি সহকারে মাথা নত করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। আযীযে মিসরের স্ত্রী ইউসুফকে কারাগারে পাঠিয়ে মনে করছিল সে প্রতিশোধ নিচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পৌঁছার পথ পরিষ্কার করেছিল। আর নিজের এ কৌশলের মাধ্যমে সে নিজের জন্য এর চেয়ে বেশী কিছু অর্জন করতে পারেনি যে, যথার্থ কাজের সময়ে দেশের শাসকের স্ত্রী হিসেবে 'মুরব্বী'র সম্মান লাভ করার পরিবর্তে তাকে নিজের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য লজ্জায় অধোবদন হতে হয়। এসব নিছক দু'চারটে বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং ইতিহাসের পাতা এমনি ধরনের অসংখ্য ঘটনায় ভরা। এগুলো এ সত্যটিরই সাক্ষ প্রদান করে যে, আল্লাহ যাকে ওপরে উঠাতে চান সারা দুনিয়ার লোকেরা মিলেও তাকে নিচে ফেলে দিতে পারে না। বরং দুনিয়ার লোকেরা তাকে নিচে ফেলে দেয়ার জন্য যে কৌশলটি অত্যন্ত কার্যকর ও নিশ্চিত মনে করে অবলম্বন করে সেই কৌশলের মধ্য দিয়েই আল্লাহ তার ওপরে ওঠার পথ বের করে দেন এবং যারা তাকে নামাতে চেয়েছিল তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও অপমান ছাড়া আর কিছুই থাকে না। অনুরূপভাবে এর ঠিক বিপরীতে আল্লাহ যাকে ভূপাতিত করতে চান কোন কৌশলই তাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারে না। বরং দাঁড় করিয়ে রাখার যাবতীয় কার্যক্রম ও কৌশল উলটে যায় এবং এ ধরনের কৌশল অবলম্বনকারীকে ব্যর্থ মনোরথ হতে হয়।

যে ব্যক্তি এ সত্যটি উপলব্ধি করবে সে প্রথমে এ শিক্ষা লাভ করবে যে, মানুষকে নিজের উদ্দেশ্য ও কলাকৌশল উভয় ক্ষেত্রে এমন সব সীমারেখা অতিক্রম করা উচিত নয় যা আল্লাহর আইনে তার জন্য নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। সাফল্য ও ব্যর্থতা অবশ্যি আল্লাহর হাতে। কিন্তু যে ব্যক্তি পবিত্র উদ্দেশ্যে সরল সোজা ও বৈধ কলাকৌশল অবলম্বন করবে সে ব্যর্থ হয়ে গেলেও তাকে লাঞ্ছনা ও অপমানের সম্মুখীন হতে হবে না। আর যে ব্যক্তি অপবিত্র উদ্দেশ্যে বাঁকা কলাকৌশল অবলম্বন করবে সে আখেরাতে তো অবশ্যি অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবেই, দুনিয়াতেও তার জন্য অপমান ও লাঞ্ছনার ভয় কিছু কম নেই। দ্বিতীয়ত সে এ থেকে লাভ করবে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল এবং তাঁর প্রতি আত্মসমর্পিত হবার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। যারা সত্য ও সততার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং দুনিয়াবাসীরা তাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে তারা যদি এ সত্যটি সামনে রাখে তাহলে এ থেকে তারা দুর্লভ মানসিক প্রশান্তি লাভ করবে এবং বিরোধী শক্তিবর্গের বাহ্যত অত্যন্ত ভয়াবহ কলাকৌশলসমূহ দেখে তারা মোটেই ভীত হবে না। বরং ফলাফল আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকবে।

কিন্তু এ ঘটনাটি থেকে সবচেয়ে বড় যে শিক্ষাটি পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে এই যে, একজন মরদে মুমিন যদি সত্যিকার ইসলামী চরিত্রের অধিকারী হয় এবং সে বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার গুণেও গুণান্বিত হয় তাহলে নিছক নিজের চরিত্র বলে সে সারা দেশ জয় করতে পারে। ইউসুফ আলাইহিস সালামের ব্যাপারটি দেখুন। ১৭ বছর বয়সে একাকী সহায় সম্বলহীন অবস্থায় বিদেশ বিভূঁইয়ে তিনি একেবারেই অপরিচিত পরিবেশে, অধিকন্তু চরম দুর্বল অবস্থায় নিপতিত। কারণ তাঁকে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করা হয়। ইতিহাসের

সেই অধ্যায়ে গোলামদের যে অবস্থা ছিল তা কারো অজানা নেই। এর ওপর মরার ওপর খাঁড়ার ঘা স্বরূপ একটি মারাত্মক নৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত করে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। এখানে শাস্তির কোন মেয়াদ নির্ধারিত হয়নি। এভাবে তাঁকে একেবারে চরম পর্যায়ে নামিয়ে দেবার পরও তিনি নিছক নিজের ঈমান ও চরিত্র বলে উঠে দাঁড়ান এবং শেষ পর্যন্ত সারা দেশের ওপর বিজয়ী হন।

ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থা

এ ঘটনাটি সঠিকভাবে বুঝতে হলে এ সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্যও পাঠকদের সামনে থাকা উচিত।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত ইয়াকূবের (আ) পুত্র, হযরত ইসহাকের পৌত্র এবং হযরত ইবরাহীমের প্রপৌত্র। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী (কুরআনের ইংগিত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়) হযরত ইয়াকূবের চার স্ত্রী থেকে ছিল বারটি ছেলে। হযরত ইউসুফ (আ) ও বিন ইয়ামীন ছিলেন এক স্ত্রীর গর্ভজাত এবং বাকি দশজন অন্য স্ত্রীদের গর্ভজাত।

ফিলিস্তিনে হযরত ইয়াকূবের আবাস ছিল হিবরূন (বর্তমান আল খাইল) উপত্যকায়। এখানে হযরত ইসহাক (আ) এবং তাঁর পূর্বে হযরত ইবরাহীমও (আ) থাকতেন। এ ছাড়া সিক্‌কিমে (বর্তমান নাবলুস) হযরত ইয়াকূবের (আ) কিছু জমি ছিল।

বাইবেল বিশারদগণের গবেষণাকে সঠিক বলে ধরে নিলে হযরত ইউসুফের জন্ম খৃষ্টপূর্ব ১৯০৬ সালের কাছাকাছি সময়ে হয় বলে ধরা যায়। এ হিসেবে খৃষ্টপূর্ব ১৮৯০ সালের কাছাকাছি সময়ে যে ঘটনাটি ঘটে অর্থাৎ স্বপ্ন দেখা এবং কূয়ায় নিক্ষিপ্ত হওয়া, এ থেকে এ ঘটনাটির সূত্রপাত হয়। এ সময় হযরত ইউসুফের বয়স ছিল ১৭ বছর। যে কূয়ায় তাঁকে ফেলে দেয়া হয় সেটি বাইবেল ও তালমূদের ভাষ্যমতে সিক্‌কিমের উত্তর দিকে দূতান (বর্তমানে দূসান) নামক স্থানের কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। আর যে কাফেলাটি তাঁকে কূয়া থেকে উদ্ধার করে তারা জাল'আদ (পূর্ব জর্দান) থেকে আসছিল এবং মিসরের দিকে যাচ্ছিল। (জাল'আদের ধ্বংসাবশেষ আজো জর্দান নদীর পূর্ব দিকে ইলিয়াবিস উপত্যকার কিনারে পাওয়া যায়।)

এ সময় মিসরে পঞ্চদশতম রাজ পরিবারের শাসন চলছিল। মিসরের ইতিহাসে এ পরিবারটি রাখাল রাজন্যবর্গ (HYKSOS KINGS) নামে পরিচিত। এরা ছিল আরবীয় বংশজাত। খৃষ্টপূর্ব দু'হাজার বছরের কাছাকাছি সময়ে এরা ফিলিস্তিন ও সিরিয়া থেকে মিসরে গিয়ে দেশের শাসন কর্তৃত্ব দখল করেছিল। আরব ঐতিহাসিক ও কুরআনের তাফসীরকারগণ তাদের জন্য "আমালীক" নাম ব্যবহার করেছেন। মিসর সম্পর্কীয় আধুনিক অনুসন্ধান ও গবেষণার সাথে এটি পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। মিসরে এরা বিদেশী হানাদারের পর্যায়ভুক্ত ছিল এবং দেশে গৃহবিবাদের কারণে তারা সেখানে নিজেদের রাজত্ব কায়েম করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। এ কারণে তাদের রাজত্বে হযরত ইউসুফের (আ) উত্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল এবং তারা বনী ইসরাঈলকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। দেশের

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী সংক্রান্ত মানচিত্র

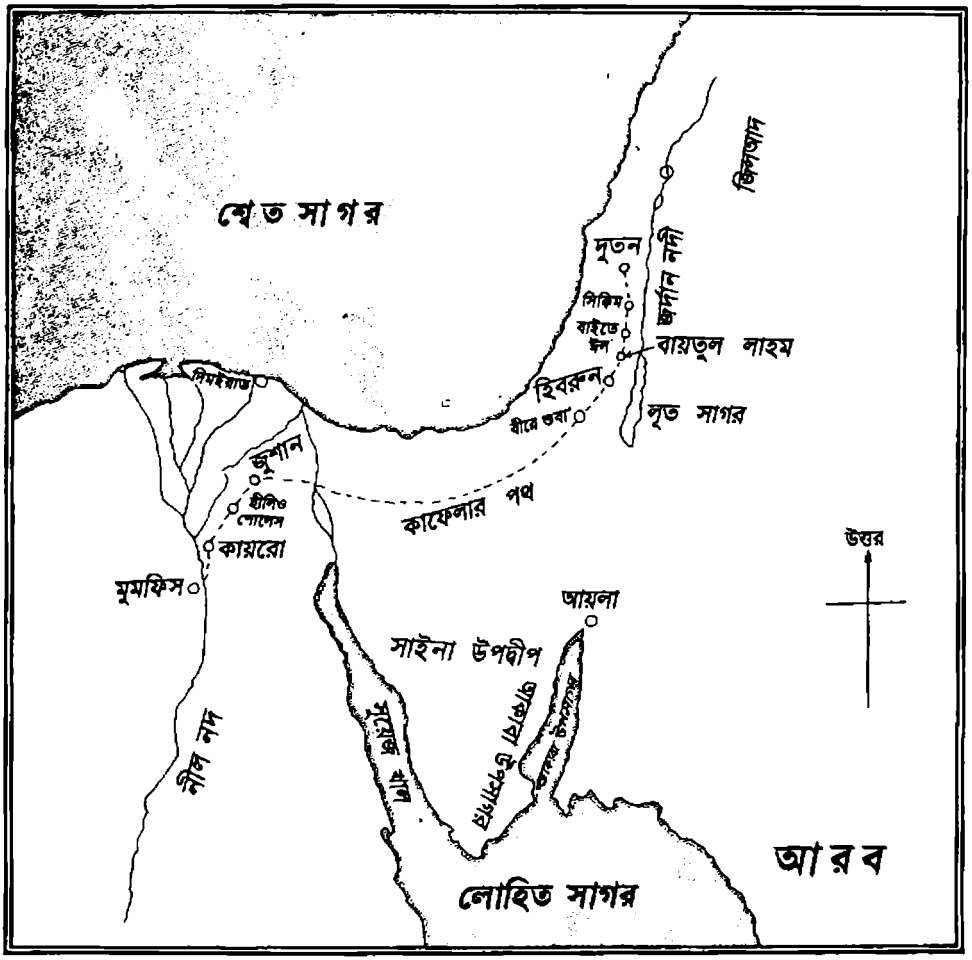

দূতন ঃ বাইবেলের মতে এ স্থানেই হযরত ইউসুফ কূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

সিক্কিম ঃ এখানে হযরত ইয়াকূবের পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। বর্তমানে এর নাম নাবলূস।

হিবরুন ঃ এখানে হযরত ইয়াকূব বসবাস করতেন। এর আর এক নাম 'আল-খলীল।'

জুশান ঃ হযরত ইউসুফ এখানে বনী ইসরাঈলদেরকে পূনর্বাসিত করেন।

সবচেয়ে উর্বর এলাকা তাদের বসতি স্থাপন করার জন্য দেয়া হয়েছিল। সেখানে তারা বিপুল প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছিল। কারণ তারা ছিল বিদেশী শাসকদের সগোত্রীয়। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকের শেষ অবধি তারা মিসর শাসন করতে থাকে। তাদের আমলে কার্যত দেশের যাবতীয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বনী ইসরাঈলদের হাতে ন্যস্ত থাকে। সূরা মায়েদার ২০ আয়াতে এ যুগের প্রতি ইংগিত করে বলা হয়েছে ঃ

اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا এরপর দেশে একটি প্রবল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সৃষ্টি হয়। এর ফলে হিক্সুস (HYKSOS) শাসনের অবসান ঘটে। আড়াই লাখের মতো আমালিকাকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়। একটি চরম বিদ্বেষী কিবৃতী বংশোদ্ভূত পরিবার দেশের শাসন কর্তৃত্ব দখল করে। তারা আমালিকাদের আমলের প্রত্যেকটি স্মৃতি চিহ্ন খুঁজে খুঁজে বের করে এনে ধ্বংস করে দেয় এবং হযরত মূসার (আ) ঘটনা প্রসংগে বনী ইসরাঈলদের প্রতি যেসব অত্যাচারের কাহিনী উল্লেখিত হয়েছে তার ধারাবাহিকতার সূত্রপাত করে।

মিসরের ইতিহাস থেকে একথাও জানা যায় যে, এ রাখাল বাদশাহরা মিসরীয় দেবতাদেরকে স্বীকৃতি দেয়নি। তারা সিরিয়া থেকে নিজেদের দেবতা সংগে করে এনেছিল। মিসরে নিজেদের ধর্মের প্রসারে তারা প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। এ কারণে কুরআন মজীদ হযরত ইউসুফের সমকালীন মিসর সম্রাটকে "ফেরাউন" নামে উল্লেখ করছে না। কারণ ফেরাউন ছিল মিসরের ধর্মীয় পরিভাষা এবং এরা মিসরীয় ধর্মের প্রবক্তা ছিল না। কিন্তু বাইবেলে ভুলক্রমে তাকেও "ফেরাউন" বলা হয়েছে। সম্ভবত বাইবেল সংকলকগণ মনে করতেন যে, মিসরের সব বাদশাহই "ফেরাউন" ছিল।

বর্তমান যুগের অনুসন্ধানী ও গবেষকগণ বাইবেল ও মিসরীয় ইতিহাসের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। তারা সাধারণভাবে এ অভিমত পোষণ করেন যে, মিসরের ইতিহাসে রাখাল বাদশাহদের মধ্যে আপোফিস (APOPHIS) নামক বাদশাহই ছিলেন হযরত ইউসুফের সমসাময়িক।

এ সময় মমফিস (মনফ) ছিল মিসরের রাজধানী। কায়রোর দক্ষিণে ১৪ মাইল দূরে এর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। হযরত ইউসুফ (আ) ১৭/১৮ বছর বয়সে সেখানে পৌছেন। দু'তিন বছর আযীযে মিসরের বাড়িতে থাকেন। আট নয় বছর কারাগারে বাস করেন। ৩০ বছর বয়সে দেশের শাসক নিযুক্ত হন। ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত একচ্ছত্রভাবে সমগ্র মিসর শাসন করতে থাকেন। তাঁর শাসনকালের নবম বা দশম বছরে তিনি হযরত ইয়াকূবকে (আ) তাঁর সমগ্র পরিবার পরিজনসহ ফিলিস্তিন থেকে মিসরে নিয়ে আসেন। তাদেরকে দিমীয়াত ও কায়রোর মাঝামাঝি এলাকায় আবাদ করেন। বাইবেলে এ এলাকার নাম জুশান বা গুশান বলা হয়েছে। হযরত মূসার (আ) আমল পর্যন্ত তারা সেখানেই বসবাস করতো। বাইবেলের বর্ণনামতে হযরত ইউসুফ একশো দশ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি বনী ইসরাঈলকে অসিয়াত করে যান, তোমরা যখন এ দেশ ত্যাগ করবে তখন আমার হাড়গুলো সংগে করে নিয়ে যাবে।

বাইবেলে ও তালমূদে ইউসূফ আলাইহিস সালামের ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে কুরআনের বর্ণনা তা থেকে অনেকটা ভিন্নতর। কিন্তু ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ অংশে তিনটি বর্ণনাই একাত্ম। আমার ব্যাখ্যা ও টীকাগুলোতে আমি প্রয়োজনমতো এ পার্থক্য সুস্পষ্ট করে যেতে থাকবো।

আয়াত ১১১ সূরা ইউসুফ – মক্কী রুকূ' ১২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝١ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا
لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝٢ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ
اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ
الْغٰفِلِيْنَ ۝٣ اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ
عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ۝٤

আলিফ-লাম-র। এগুলো এমন কিতাবের আয়াত যা নিজের বক্তব্য পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে। আমি একে আরবী ভাষায় কুরআন বানিয়ে নাযিল করেছি,[১] যাতে তোমরা (আরববাসীরা) একে ভালোভাবে বুঝতে পারো।[২] হে মুহাম্মাদ! আমি এ কুরআনকে তোমার কাছে অহীর মাধ্যমে পাঠিয়ে উত্তম পদ্ধতিতে ঘটনাবলী ও তত্ত্বকথা তোমার কাছে বর্ণনা করছি। নয়তো ইতিপূর্বে তুমি (এসব জিনিস থেকে) একেবারেই বেখবর ছিলে।[৩]

এটা সেই সময়ের কথা, যখন ইউসুফ তার বাপকে বললো ঃ "আব্বাজান! আমি স্বপ্ন দেখেছি, এগারটি তারকা এবং সূর্য ও চাঁদ আমাকে সিজদা করছে।"

১. قران হচ্ছে قَرَاء ক্রিয়াপদের শব্দমূল। এর আসল মানে হচ্ছে 'পড়া', শব্দমূলকে যখন কোন জিনিসের জন্য নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন তার অর্থ হয় সংশ্লিষ্ট জিনিসটির মধ্যে তার শব্দমূলের অর্থ পুরোপুরি পাওয়া যায়। যেমন যখন কোন ব্যক্তিকে বীর বলার পরিবর্তে 'বীরত্ব' বলা হবে তখন তার মানে হবে, তার মধ্যে সাহসিকতা ও বীর্যবত্তা এমন পূর্ণাংগ পর্যায়ে পাওয়া যায় যেন সে এবং বীরত্ব একই জিনিস হয়ে গেছে। কাজেই এ কিতাবের নাম 'কুরআন' (পড়া) রাখার অর্থ হচ্ছে এই যে, এ কিতাব সাধারণ ও অসাধারণ নির্বিশেষে সকলের পড়ার জন্য এবং খুব বেশী বেশী করে পঠিত হবার জিনিস।

قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ۭ اِنَّ
الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ
مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ
اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ۭ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

জবাবে তার বাপ বললো ঃ "হে পুত্র! তোমার এ স্বপ্ন তোমার ভাইদেরকে শুনাবে না; শুনালে তারা তোমার ক্ষতি করার জন্য পেছনে লাগবে।[৪] আসলে শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু এবং ঠিক এমনটিই হবে (যেমনটি তুমি স্বপ্নে দেখেছো যে,) তোমার রব তোমাকে (তাঁর কাজের জন্য) নির্বাচিত[৫] করবেন এবং তোমাকে কথার মর্মমূলে পৌঁছানো শেখাবেন[৬] আর তোমার প্রতি ও ইয়াকূবের পরিবারের প্রতি তাঁর নিয়ামত ঠিক তেমনিভাবে পূর্ণ করবেন যেমন এর আগে তিনি তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি করেছেন। নিসন্দেহে তোমার রব সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞানময়।"[৭]

২. এর মানে এ নয় যে, এ কিতাবটি বিশেষভাবে আরববাসীদের জন্য নাযিল করা হয়েছে। বরং এ বাক্যাংশটির আসল বক্তব্য হচ্ছে, "হে আরববাসীরা! এসব কথা তোমাদের ইরানী ও গ্রীক ভাষায় শুনানো হচ্ছে না, তোমাদের নিজেদেরই ভাষায় শুনানো হচ্ছে। কাজেই তোমরা এ ওজর পেশ করতে পারো না যে, এসব কথা তো আমরা বুঝতে পারছি না। আর এ কিতাবে অলৌকিকতার যে দিকগুলো রয়েছে, যা এর আল্লাহর বাণী হওয়ার সাক্ষ দিচ্ছে, সেগুলোও যে তোমাদের দৃষ্টির আগোচরে থেকে যাবে, এটাও সম্ভব নয়।"

কেউ কেউ কুরআন মজীদে এ ধরনের বাক্য দেখে আপত্তি করে থাকেন যে, এ কিতাব তো আরববাসীদের জন্য নাযিল হয়েছে, অনারবদের জন্য নয়। এ ক্ষেত্রে একে সমগ্র মানব জাতির জন্য হেদায়াত কেমন করে বলা যেতে পারে? কিন্তু এটি নিছক একটি হালকা ও ফাঁকা আপত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল সত্য উপলব্ধি করার চেষ্টা না করেই এ আপত্তি উত্থাপন করা হয়। মানব জাতির ব্যাপক ও সার্বজনীন হেদায়াতের জন্য যে জিনিসই পেশ করা হবে তা অবশ্যি মানব সমাজে প্রচলিত ভাষাগুলোর যে কোন একটিতেই পেশ করা হবে। এ হেদায়াত পেশকারী এটিকে যে জাতির ভাষায় পেশ করছেন প্রথমে তাকে এর শিক্ষাবলী দ্বারা পুরোপুরি প্রভাবিত করার চেষ্টা করবেন। তারপর এ জাতিই অন্যান্য জাতির কাছে এর শিক্ষা পৌঁছাবার মাধ্যমে পরিণত হবে। কোন দাওয়াত ও আন্দোলনকে আন্তরজাতিক পর্যায়ে সম্প্রসারিত করার জন্য এটিই একটি বাস্তব ও স্বাভাবিক পদ্ধতি।

৩. সূরার ভূমিকায় আমি একথা বর্ণনা করে এসেছি যে, মক্কার কাফেরদের কোন কোন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরীক্ষা করার বরং তাদের মতে তাঁর

মুখোশ খুলে দেবার জন্য সম্ভবত ইহুদীদের ইংগিতে তাঁকে হঠাৎ এ প্রশ্ন করে বসেছিল যে, বনী ইসরাঈলদের মিসরে চলে যাওয়ার কারণ কি ছিল? এ কারণে তাদের প্রশ্নের জবাবে বনী ইসরাঈলদের ইতিহাসের এ অধ্যায় বর্ণনা করার আগে ভূমিকা স্বরূপ একথা বলে দেয়া হলো। হে মুহাম্মাদ! তুমি এসব ঘটনা জানতে না, আমি অহির মাধ্যমে তোমাকে তাদের কথা জানাচ্ছি। আপাতদৃষ্টে এ বাক্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু আসলে এখানে এমন সব বিরোধীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখা হয়েছে যারা অহীর মাধ্যমে নবী (সা) যে সঠিক জ্ঞান লাভ করেন একথা বিশ্বাস করতো না।

৪. এখানে হযরত ইউসুফের (আ) দশজন বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কথা বলা হয়েছে। হযরত ইয়াকূব (আ) জানতেন এ বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা ইউসুফকে (আ) হিংসা করে। নৈতিক দিক দিয়েও তারা এমন পর্যায়ের সচ্চরিত্র ছিল না যে, নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য কোন অবৈধ কাজ করতে কুণ্ঠিত হবে। তাই তিনি নিজের সদাচারী পুত্রকে বলে দিলেন, তাদের থেকে সাবধান থেকো। স্বপ্নের পরিষ্কার অর্থ ছিল এই ঃ সূর্য মানে হযরত ইয়াকূব (আ), চাঁদ মানে তাঁর স্ত্রী (হযরত ইউসুফের বিমাতা) এবং এগারটি তারকা মানে এগারটি ভাই।

৫. অর্থাৎ নবুওয়াত দান করবেন।

৬. تاويل الاحاديث মানে নিছক স্বপ্নের তাবীরের জ্ঞান নয়, যেমন মনে করা হয়ে থাকে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তোমাকে সমস্যা ও পরিস্থিতি অনুধাবন করার এবং সত্য পর্যন্ত পৌঁছুবার জ্ঞান দান করবেন। আর এ সংগে এমন গভীর অন্তরদৃষ্টি দান করবেন যার মাধ্যমে তুমি প্রত্যেকটি বিষয়ের গভীরে নামার এবং তার তলদেশে পৌঁছে যাবার যোগ্যতা অর্জন করবে।

৭. বাইবেল ও তালমূদের বর্ণনা কুরআনের এ বর্ণনা থেকে ভিন্নতর। তাদের বর্ণনা হচ্ছে, হযরত ইয়াকূব স্বপ্নের বর্ণনা শুনে ছেলেকে খুব ধমক দেন এবং তাকে বলেন ঃ "আচ্ছা, এখন তাহলে এ স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছো যে, আমি, তোমার মা ও তোমার সব ভাইয়েরা তোমাকে সিজদা করবো।" কিন্তু একটু চিন্তা করলে সহজেই একথা উপলব্ধি করা যেতে পারে যে, বাইবেল ও তালমূদের বর্ণনা নয় বরং কুরআনের বর্ণনাটিই হযরত ইয়াকূবের নবীসুলভ চরিত্রের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। হযরত ইউসুফ নিজের স্বপ্ন বর্ণনা করেছিলেন, নিজের আকাংখা ও অভিলাষ ব্যক্ত করেননি। স্বপ্ন যদি সত্য হয়ে থাকে এবং বলা বাহুল্য যে, হযরত ইয়াকূব তার যে তাবীর করেছিলেন তা সত্য স্বপ্ন মনে করেই করেছিলেন, তাহলে এর পরিষ্কার অর্থ ছিল, এটা ইউসুফ আলাইহিস সালামের আকাংখা ছিল না বরং আল্লাহর তকদীরের ফায়সালা ছিল যে, এক সময় তিনি উন্নতির এহেন উচ্চ শিখরে আরোহণ করবেন। এ ক্ষেত্রে একজন নবী তো দূরের কথা একজন বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিও কি এরূপ আচরণ করতে পারেন? এ ধরনের কথায় কি তিনি অসন্তুষ্ট হতে এবং যে স্বপ্ন দেখেছে উলটো তাকে ধমক দিতে পারেন? কোন ভদ্র পিতাও কি এমন হতে পারেন যে, নিজের পুত্রের ভবিষ্যত উন্নতির সুখবর শুনে খুশী হবার পরিবর্তে তিনি উলটো বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হবেন?

لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ۝٧ اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ
وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ۭ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ
مُّبِيْنِ ۝٨ اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ
وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ۝٩

২ রুকূ'

আসলে ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনার মধ্যে এ প্রশ্নকারীদের জন্য বড় বড় নিদর্শন রয়েছে। এ ঘটনা এভাবে শুরু হয় ঃ তার ভাইয়েরা পরস্পর বলাবলি করলো, "এ ইউসুফ ও তার ভাই,[৮] এরা দু'জন আমাদের বাপের কাছে আমাদের সবার চাইতে বেশী প্রিয়, অথচ আমরা একটি পূর্ণ সংঘবদ্ধ দল। সত্যি বলতে কি আমাদের পিতা একেবারেই বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন।[৯] চলো আমরা ইউসুফকে মেরে ফেলি অথবা তাকে কোথাও ফেলে দেই, যাতে আমাদের পিতার দৃষ্টি কেবল আমাদের দিকেই ফিরে আসে। এ কাজটি শেষ করে তারপর তোমরা ভালো লোক হয়ে যাবে।"[১০]

৮. এখানে হযরত ইউসুফের সহোদর ভাই বিন ইয়ামীনের কথা বলা হয়েছে। এ ভাইটি তাঁর থেকে কয়েক বছরের ছোট ছিল। তার জন্মের সময় তার মায়ের ইন্তিকাল হয়। এ কারণে হযরত ইয়াকূব এ দু'টি মাতৃহীন সন্তানের প্রতি একটু বেশী নজর দিতেন। এ ছাড়াও এ স্নেহের আর একটি কারণ ছিল এই যে, তাঁর সব ছেলের মধ্যে একমাত্র হযরত ইউসুফই এমন ছিলেন যার মধ্যে তিনি সৌভাগ্য ও সত্য সঠিক পথের সন্ধান লাভের লক্ষণ দেখেছিলেন। হযরত ইউসুফের স্বপ্নের কথা শুনে তিনি যাকিছু বলেছিলেন ওপরে তার যে বর্ণনা এসেছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তিনি নিজের এ ছেলেটির অসাধারণ যোগ্যতা সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই জানতেন। অন্যদিকে সামনের দিকে যেসব ঘটনার প্রকাশ ঘটেছে তা থেকে তাঁর বাকি দশ ছেলের চারিত্রিক মান সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে কোন সৎব্যক্তি এ ধরনের সন্তানদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন একথা কেমন করে আশা করা যেতে পারে? কিন্তু বাইবেলের বর্ণনায় অবাক হতে হয়। সেখানে ইউসুফের প্রতি তাঁর ভাইদের হিংসার এমন একটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যার ফলে উল্টো হযরত ইউসুফই দোষী সাব্যস্ত হন। বাইবেলের বর্ণনা মতে হযরত ইউসুফ তাঁর পিতার কাছে ভাইদের বিরুদ্ধে চুগলখোরী করতেন। এ কারণে তাঁর ভাইয়েরা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল।

৯. এ বাক্যটির মর্ম উপলব্ধি করার জন্য বেদুইনদের গোত্রীয় জীবনের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। সেখানে কোন রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা থাকে না। স্বাধীন উপজাতিরা

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ
بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿١٠﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا
عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴿١١﴾ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١٢﴾

এ কথায় তাদের একজন বললো, "ইউসুফকে মেরে ফেলো না। যদি কিছু করতেই হয় তাহলে তাকে কোন অন্ধ কূপে ফেলে দাও, আসা-যাওয়ার পথে কোন কাফেলা তাকে তুলে নিয়ে যাবে।" (এ প্রস্তাবের ভিত্তিতে) তারা তাদের বাপকে গিয়ে বললো, " আব্বাজান! কি ব্যাপার, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদের ওপর ভরসা করেন না? অথচ আমরা তার সত্যিকার শুভাকাংখী। আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, সে কিছু ফলমূল খাবে এবং দৌড়ঝাঁপ করে মন চাংগা করবে। আমরা তার হেফাজত করবো।"[১১]

পরস্পর পাশাপাশি বসবাস করে। সেখানে কোন ব্যক্তির বিপুল সংখ্যক ছেলে, নাতি-পুতি, ভাই, ভাতিজা ইত্যাদির ওপর তার ক্ষমতা নির্ভর করে। তার ধন-প্রাণ, ইজ্জত-আবরু রক্ষার প্রয়োজনে তারা তাকে সাহায্য করে। এ ধরনের অবস্থায় মেয়েদের ও শিশুদের তুলনায় স্বাভাবিকভাবে জোয়ান ছেলেরাই মানুষের কাছে বেশী প্রিয় হয়। কারণ দুশমনের সাথে মোকাবিলায় তারা সাহায্য করতে পারে। এ কারণে ইউসুফের ভাইয়েরা বললো, বুড়ো বয়সে আমাদের বাপ দিশেহারা হয়েছে। আমাদের মতো দলবদ্ধ এ যুবক ছেলেরা, যারা খারাপ সময়ে তাঁর কাজে লাগতে পারে, তাঁর কাছে ততটা প্রিয় নয় যতোটা এ ছোট ছোট ছেলে দু'টি যারা তাঁর কোন কাজে লাগতে পারে না বরং উলটো তাদেরকেই হেফাজত করতে হবে।

১০. যারা নিজেদেরকে প্রবৃত্তির কামনা বাসনার হাতে সোপর্দ করে দেবার সাথে সাথে ঈমানদারী ও সততার সাথেও কিছুটা সম্পর্ক রেখে চলে এ বাক্যটির মধ্যে তাদের মানসিকতার একটি চমৎকার অভিব্যক্তি ঘটেছে। এ ধরনের লোকদের রীতি হচ্ছে, যখনই প্রবৃত্তি তাদের কাছে কোন খারাপ কাজ করার তাগিদ দেয় তখনই ঈমানের তাগিদ মুলতবি রেখে তারা প্রথমে প্রবৃত্তির তাগিদ পূর্ণ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। এ সময় বিবেক ভেতর থেকে দংশন করতে থাকলে তাকে এ বলে সান্তনা দেবার চেষ্টা করে যে, একটুখানি সবর করো, এ অনিবার্য গুনাহটি না করলে আমার কাজ আটকে থাকে, কাজেই এটা করে নিতে দাও, তারপর ইনশাআল্লাহ তাওবা করে আমি তেমনি সৎ হয়ে যাবো যেমনটি তুমি আমাকে দেখতে চাও।

১১. এ বর্ণনাটিও বাইবেল ও তালমূদের বর্ণনা থেকে ভিন্ন ধরনের। তাদের বর্ণনা হচ্ছে, ইউসুফের ভাইয়েরা তাদের পশু চরাতে সিক্কিমের দিকে গিয়েছিল। হযরত ইয়াকূব

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ
وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا
إِذًا لَخَاسِرُونَ ﴿١٤﴾ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ ۚ
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾

বাপ বললো, "তোমরা তাকে নিয়ে যাবে, এটা আমাকে কষ্ট দেবে এবং আমার আশংকা হয়, তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী থাকবে এবং নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলবে।" তারা জবাব দিল, "যদি আমাদের সংঘবদ্ধ দল থাকতে তাকে নেকড়ে খেয়ে ফেলে তাহলে তো আমরা হবো বড়ই অকর্মন্য।" এভাবে চাপ দিয়ে যখন তারা তাকে নিয়ে গেলো এবং সিদ্ধান্ত করলো তাকে একটি অন্ধ কূপে ফেলে দেবে তখন আমি ইউসুফকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলাম, "এক সময় আসবে যখন তুমি তাদেরকে তাদের এ কৃতকর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। তাদের কাজের ফলাফল সম্পর্কে তারা জানে না"[১২]

নিজেই তাদের সন্ধানে হযরত ইউসুফকে তাদের পেছনে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু একথা কল্পনাই করা যায় না যে, হযরত ইয়াকূব (আ) হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে তার ভাইদের হিংসার কথা জানা সত্ত্বেও তাঁকে নিজের হাতে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবেন। তাই কুরআনের বর্ণনাই অধিকতর বাস্তবসম্মত বলে মনে হয়।

১২. মূল ইবারতে وهم لا يشعرون বাক্য এমনভাবে এসেছে যার ফলে তার তিনটি অর্থ হয় এবং তিনটি অর্থই এখানে মানানসই বলে মনে হয়। একটি অর্থ হচ্ছে, আমি ইউসুফকে এ সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম এবং তার ভাইয়েরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেখবর ছিল যে, তাকে অহীর মাধ্যমে সবকিছু জানানো হচ্ছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তুমি এমন অবস্থায় তাদের এ কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেবে যেখানে তোমার অবস্থানের ব্যাপারটি তারা কল্পনাও করতে পারবে না। তৃতীয় অর্থটি হচ্ছে, আজ এরা না জেনে বুঝে একটি কাজ করছে এবং ভবিষ্যতে এর ফলাফল কি হবে তা এরা জানে না।

এ সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যে কি সান্ত্বনা দেয়া হয়েছিল বাইবেল ও তালমূদে এর কোন উল্লেখ নেই। বিপরীত পক্ষে তালমূদে যে বর্ণনা এসেছে তা হচ্ছে এই যে, ইউসুফকে যখন কূপে ফেলে দেয়া হলো তখন তিনি জোরে জোরে কাঁদতে থাকলেন এবং চিৎকার করে ভাইদের কাছে ফরিয়াদ করলেন। কুরআনের বর্ণনা পড়লে মনে হবে এমন এক যুবকের কথা বলা হচ্ছে যিনি আগামীতে ইতিহাসের মহান ব্যক্তিদের অন্তরভুক্ত হবেন। অন্যদিকে তালমূদ পড়লে যে ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠবে তা হচ্ছে এই যে, জনমানবশূন্য বিয়াবনে কয়েকজন বদ্দু একটি বালককে কূপের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে এবং এ সময় একজন সাধারণ বালক যা করে সে-ও তাই করছে।

وَجَآءُوْٓ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ﴿١٦﴾ قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ
وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ
لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ﴿١٧﴾ وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ۭ قَالَ بَلْ
سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ۭ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۭ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى
مَا تَصِفُوْنَ ﴿١٨﴾

রাতে তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের বাপের কাছে এসে বললো, "আব্বাজান! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের জিনিসপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম, ইতিমধ্যে নেকড়েবাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী।" তারা ইউসূফের জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে নিয়ে এসেছিল। একথা শুনে তাদের বাপ বললো, "বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি বড় কাজকে সহজ করে দিয়েছে। ঠিক আছে, আমি সবর করবো এবং খুব ভালো করেই সবর করবো।[১৩] তোমরা যে কথা সাজাচ্ছো তার ওপর একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া যেতে পারে।"[১৪]

১৩. কুরআনের ইবারতে صبر جميل শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর শাব্দিক অনুবাদ "ভালো সবর" হতে পারে। এর অর্থ হয় এমন সবর যার মধ্যে অভিযোগ, ফরিয়াদ, ভয়-ভীতি ও কান্নাকাটি নেই। একজন উচ্চ ও প্রশস্ত হৃদয়বত্তার অধিকারী মানুষের ওপর যে বিপদ আসে তাকে ধীর স্থির চিত্তে বরদাশত করে যাওয়াই এ সবরের প্রকৃতি।

১৪. বাইবেল ও তালমূদ এখানে হযরত ইয়াকূবের প্রতিক্রিয়ার এমন ছবি এঁকেছে যা যে কোন সাধারণ বাপের প্রতিক্রিয়া থেকে কোন অংশেই ভিন্নতর নয়। বাইবেলের বর্ণনা হচ্ছে, "তখন ইয়াকূব নিজের জামা ফেড়ে ফেলেন, নিজের কোমরের সাথে চট জড়িয়ে নেন এবং বহুদিন পর্যন্ত ছেলের জন্য মাতম করতে থাকেন।" তালমূদে বলা হয়েছে, "ইয়াকূব ছেলের জামা চিনতে পেরেই উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে যান এবং দীর্ঘক্ষণ নিথর-নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকেন। তারপর উঠে বিকট জোরে চিৎকার দিয়ে বলেন, হাঁ এ আমার ছেলের জামা। এরপর তিনি বছরের পর বছর ধরে ইউসুফের জন্য মাতম করতে থাকেন।"

এ বর্ণনায় হযরত ইয়াকূবকে ঠিক তেমনটি করতে দেখা যাচ্ছে যেমনটি এ অবস্থায় প্রত্যেক বাপ করে থাকে। কিন্তু কুরআন এর যে বর্ণনা দিয়েছে তা আমাদের সামনে একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ছবি তুলে ধরেছে। এ ব্যক্তি আপাদমস্তক ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। এতবড় শোকাবহ ও হৃদয়বিদারক খবর শুনেও তিনি নিজের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে

وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ ۖ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا
غُلَامٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ
بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۚ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

ওদিকে একটি কাফেলা এলো। তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে পানি নেবার জন্য পাঠালো। সে কূয়ার মধ্যে পানির ডোল নামিয়ে দিল। সে (ইউসুফকে দেখে) বলে উঠলো, "কী সুখবর! এখানে তো দেখছি একটি বালক।" তারা তাকে পণ্য দ্রব্য হিসেবে লুকিয়ে ফেললো। অথচ তারা যা কিছু করছিল সে সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত ছিলেন। শেষে তারা তাকে সামান্য দামে কয়েক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিল।[১৫] আর তার দামের ব্যাপারে তারা বেশী আশা করছিল না।

হারিয়ে ফেলছেন না। প্রখর বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে পরিস্থিতির সঠিক চেহারা অনুমান করতে পারছেন। তিনি বুঝতে পারেন এটা একটা বানোয়াট কথা। তাঁর হিংসুটে ছেলেরা ঘটনাটা সাজিয়ে তাঁর সামনে পেশ করেছে। তারপর বিশাল হৃদয় ব্যক্তিদের মতো তিনি সবর করেন এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করেন।

১৫. ঘটনাটা সহজভাবে বলতে গেলে এরূপ বলা যায় যে, ইউসুফের ভাইয়েরা হযরত ইউসুফকে কূপের মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে যায়। পরে কাফেলার লোকজন এসে তাকে সেখান থেকে বের করে আনে। তারা তাকে মিসরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। কিন্তু বাইবেলের বর্ণনা হচ্ছে, ইউসুফের ভাইয়েরা পরে ইসমাঈলীদের একটি কাফেলা দেখে ইউসুফকে কূয়া থেকে বের করে তাদের হাতে বিক্রি করে দিতে চায়। কিন্তু তার আগেই মাদয়ানের সওদাগর তাকে কূয়া থেকে বের করে ফেলে। এ সওদাগরেরা বিশ দিরহামে ইউসুফকে ইসমাঈলীদের হাতে বিক্রি করে দেয়। সামনের দিকে গিয়ে বাইবেল লেখকরা একথা ভুলে যান যে, ইতিপূর্বে তারা ইউসুফকে ইসমাঈলীদের হাতে বিক্রি করে দিয়ে এসেছেন। তাই তারা ইসমাঈলীদের পরিবর্তে আবার মাদয়ানের সওদাগরদের দ্বারা তাঁকে মিসরীয়দের হাতে বিক্রি করাচ্ছেন। (দেখুন, আদি পুস্তক ৩৭ঃ২৫–২৮ এবং ৩৬) অন্যদিকে তালমূদের বর্ণনা হচ্ছে, মাদয়ানের সওদাগরেরা ইউসুফকে কূয়া থেকে বের করে এনে নিজেদের গোলামে পরিণত করে। তারপর ইউসুফের ভাইয়েরা ইউসুফকে তাদের হাতে দেখে তাদের সাথে ঝগড়া করতে থাকে। অবশেষে তারা বিশ দিরহাম মূল্য পরিশোধ করে ইউসুফের ভাইদেরকে রাজি করে। তারপর তারা বিশ দিরহামের বিনিময়েই ইউসুফকে ইসমাঈলীদের হাতে বিক্রি করে। আর ইসমাঈলীরা মিসরে গিয়ে তাকে বিক্রি করে। এখান থেকেই মুসলমানদের মধ্যে এ বর্ণনার প্রচলন হয়েছে যে, ইউসুফের ভাইয়েরা ইউসুফকে বিক্রি করে। কিন্তু জানা উচিত, কুরআন এ সমস্ত বর্ণনা সমর্থন করেনি।

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن
يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ۖ
وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾

৩ রুকূ'

মিসরে যে ব্যক্তি তাকে কিনেছিল[১৬] সে তার স্ত্রীকে[১৭] বললো, "একে ভালোভাবে রাখো, বিচিত্র নয় সে আমাদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে অথবা আমরা তাকে পুত্র বানিয়ে নেবো।[১৮] এভাবে আমি ইউসুফের জন্য সে দেশে প্রতিষ্ঠালাভের পথ বের করে দিলাম এবং তাকে সমস্যা ও বিষয়াবলী অনুধাবন করার জন্য যথোপযোগী শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করলাম।[১৯] আল্লাহ তাঁর কাজ সম্পন্ন করেই থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। আর যখন সে তার পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো, আমি তাকে ফায়সালা করার শক্তি ও জ্ঞান দান করলাম।[২০] এভাবে আমি নেক লোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

১৬. বাইবেলে এ ব্যক্তির নাম লেখা হয়েছে "পোটীফর"। সামনের দিকে গিয়ে কুরআন মজীদ একে "আযীয" নামে উল্লেখ করেছে। তারপর আবার এক জায়গায় হযরত ইউসুফের জন্যও এ উপাধি ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, তিনি ছিলেন মিসরের কোন বড় অফিসার অথবা পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। কারণ "আযীয" মানে হচ্ছে এমন কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি যার ক্ষমতাকে প্রতিহত করা যেতে পারে না। বাইবেল ও তালমূদের বর্ণনা হচ্ছে, তিনি ছিলেন বাদশাহর রক্ষক সেনাপতি (দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান)। ইবনে জারীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি ছিলেন রাজকীয় অর্থ বিভাগের প্রধান।

১৭. তালমূদে এ মহিলাটিকে যালীখা (Zelicha) নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এখান থেকেই এ নামটি মুসলমানদের বর্ণনায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু আমাদের এখানে সাধারণভাবে প্রচলিত হয়ে গেছে যে, পরবর্তীকালে হযরত ইউসুফের সাথে মহিলাটির বিয়ে হয়ে যায়। একথাটির আসলে কুরআনে বা ইসরাঈলী ইতিহাসে কোন ভিত্তি নেই। একজন নবী এমন একটি মহিলাকে বিয়ে করবেন যার অসতিপনা তাঁর নিজের অভিজ্ঞতায়ই ধরা পড়েছে—এটা আসলে তাঁর নবী সুলভ মর্যাদার তুলনায় অনেক

নিম্নমানের। কুরআন মজীদে এ ব্যাপারে যে সাধারণ নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে ঃ

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ -

"অসৎ মেয়েরা অসৎ পুরুষদের জন্য এবং অসৎ পুরুষরা অসৎ মেয়েদের জন্য আর পবিত্র মেয়েরা পবিত্র পুরুষদের জন্য এবং পবিত্র পুরুষরা পবিত্র মেয়েদের জন্য।"

১৮. তালমূদের বর্ণনামতে এ সময় হযরত ইউসুফের বয়স ছিল ১৮ বছর। পোটীফর তাঁর গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ যুবক গোলাম নয় বরং কোন অভিজাত পরিবারের আদরের দুলাল এবং অবস্থার আবর্তন তাকে এখানে টেনে এনেছে। তাকে কেনার সময়ই তিনি সওদাগরদের বলেন ঃ এ ছেলে তো কোন গোলাম বলে মনে হচ্ছে না, আমার সন্দেহ হচ্ছে তোমরা একে কোথাও থেকে চুরি করে এনেছো এ কারণে পোটীফর তাঁর সাথে দাস সুলভ ব্যবহার করেননি। বরং তাঁর ওপর নিজের গৃহের এবং নিজের যাবতীয় সম্পদ-সম্পত্তি পরিচালনার একচ্ছত্র দায়িত্ব অর্পণ করেন। বাইবেলের বর্ণনা মতে "তিনি নিজের সবকিছু ইউসুফের হাতে ছেড়ে দেন এবং শুধুমাত্র খাবার রুটি টুকু ছাড়া নিজের আর কোন জিনিসেরই তাঁর খবর ছিল না।" (আদি পুস্তক ৩৯ঃ৬)

১৯. এ পর্যন্ত হযরত ইউসুফের জীবন গড়ে উঠেছিল বিজন মরু প্রান্তরে আধা যাযাবর ও পশুপালকদের পরিবেশে। কেনান ও উত্তর আরব এলাকায় সে সময় কোন সংগঠিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছিল না এবং সেখানকার সমাজ-সংস্কৃতিও তেমন কোন বড় ধরনের উন্নতি লাভ করেনি। সেখানে ছিল কিছুসংখ্যক স্বাধীন উপজাতির বাস। তারা মাঝে মাঝে এক এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় গিয়ে বসবাস করতো। আবার কোন কোন উপজাতি বিভিন্ন এলাকায় স্থায়ী বসতি গড়ে তুলে নিজেদের ছোট ছোট রাষ্ট্রও গঠন করে নিয়েছিল। মিসরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী এসব লোকের অবস্থা ছিল প্রায় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় বসবাসরত স্বাধীন পাঠান উপজাতিদের মতো। এখানে হযরত ইউসুফ যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন তাতে অবশ্যই অন্তরভুক্ত ছিল বেদুইন জীবনের সৎগুণাবলী এবং ইবরাহিমী পরিবারের আল্লাহমুখী জীবন চিন্তা ও ধর্মচর্চা। কিন্তু মহান আল্লাহ সমসাময়িক বিশ্বের সবচেয়ে সুসভ্য ও উন্নত দেশ অর্থাৎ মিসরে তাঁর মাধ্যমে যে কাজ নিতে চাচ্ছিলেন এবং এ জন্য যে পর্যায়ের জানাশোনা, অভিজ্ঞতা ও গভীর অন্তরদৃষ্টির প্রয়োজন ছিল তার বিকাশ সাধনের কোন সুযোগ বেদুইন জীবনে ছিল না। তাই আল্লাহ তাঁর সর্বময় ক্ষমতাবলে তাঁকে মিসর রাজের একজন বড় সরকারী কর্মচারীর কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন। আর তিনি তাঁর অসাধারণ যোগ্যতা দেখে তাঁকে নিজের গৃহ ও ভূসম্পত্তির দেখাশোনা ও পরিচালনার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব দান করলেন। এভাবে ইতিপূর্বে তাঁর যেসব যোগ্যতাকে কোন কাজে লাগানো হয়নি তা পূর্ণ বিকাশ লাভ করার সুযোগ পেয়ে গেলো। ছোট্ট একটি জমিদারী পরিচালনার মাধ্যমে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করলেন তা আগামীতে একটি বড় রাষ্ট্রের আইন শৃংখলা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিল। এ আয়াতে এ বিষয়টির দিকে ইংগিত করা হয়েছে।

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ
هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ
كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾

যে মহিলাটির ঘরে সে ছিল সে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে থাকলো এবং একদিন সে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললো, "চলে এসো"। ইউসুফ বললো, "আমি আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি, আমার রব তো আমাকে ভালই মর্যাদা দিয়েছেন (আর আমি এ কাজ করবো!)। এ ধরনের জালেমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারে না।[২১] মহিলাটি তার দিকে এগিয়ে এলো এবং ইউসুফও তার দিকে এগিয়ে যেতো যদি না তার রবের জ্বলন্ত প্রমাণ প্রত্যক্ষ করতো।[২২] এমনটিই হলো, যাতে আমি তার থেকে অসৎবৃত্তি ও অশ্লীলতা দূর করে দিতে পারি।[২৩] আসলে সে ছিল আমার নির্বাচিত বান্দাদের অন্তরভুক্ত।

২০. কুরআনের ভাষায় সাধারণভাবে এমন শব্দের মানে হয় "নবুওয়াত দান করা।" ফায়সালা করার শক্তিকে কুরআনের মূল ভাষ্যে বলা হয়েছে "হুকুম"। এ হুকুম অর্থ কর্তৃত্বও হয়। কাজেই আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বান্দাকে হুকুম দান করার মানে হলো আল্লাহ তাঁকে মানব জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে ফায়সালা দান করার যোগ্যতা দান করেছেন আবার এ জন্য ক্ষমতাও অর্পণ করেছেন। আর "জ্ঞান" বলতে এমন বিশেষ সত্য জ্ঞান বুঝানো হয়েছে যা নবীদেরকে অহীর মাধ্যমে সরাসরি দেয়া হয়।

২১. সাধারণভাবে মুফাস্‌সির ও অনুবাদকগণ মনে করে থাকেন, এখানে "আমার রব" তথা আমার প্রভু শব্দটি বলে হযরত ইউসুফ সেসময় যার অধীনে চাকরি করতেন তার কথা বলতে চেয়েছেন। তারা মনে করেন, তাঁর এ জবাবের অর্থ ছিল এই যে, আমার মনিব তো আমাকে খুব যত্নের সাথেই রেখেছেন, এ অবস্থায় আমি তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করার মতো নিমকহারামী কেমন করে করতে পারি? কিন্তু এ অনুবাদ ও ব্যাখ্যার আমি কঠোর বিরোধিতা করছি। যদিও আরবী ভাষার দিক দিয়ে এ অর্থ গ্রহণ করারও অবকাশ আছে, কারণ আরবীতে "রব" শব্দটি প্রভু অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু একজন নবী একটি গুনাহ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আল্লাহর পরিবর্তে কোন বান্দার প্রতি নজর দেবেন এটা তাঁর মর্যাদার তুলনায় অনেক নিম্নমানের। তাছাড়া কোন নবী আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে নিজের রব বলেছেন, কুরআনে এর কোন নজীরও নেই। সামনের দিকে ৪১, ৪২ ও ৫০ আয়াতে আমরা দেখছি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বারবার তাঁর নিজের ও মিসরীয়দের মতবাদের মধ্যে এ পার্থক্যটি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরছেন যে, তাঁর রব হচ্ছেন

আল্লাহ এবং মিসরীয়রা বান্দাকে নিজেদের রব বানিয়ে রেখেছে। কাজেই এখানে আয়াতের শব্দের মধ্যে যখন এ অর্থ গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে যে, হযরত ইউসুফ "রব্বী" বলে আল্লাহর সত্তা বুঝাতে চেয়েছেন তখন কি কারণে আমরা এমন একটি অর্থ গ্রহণ করবো যার মধ্যে দোষের দিকটি সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে?

২২. মূল আয়াতে আছে "বুরহান।" বুরহান মানে দলীল বা প্রমাণ। রবের প্রমাণ মানে রবের দেখিয়ে দেয়া বা বুঝিয়ে দেয়া এমন প্রমাণ যার ভিত্তিতে হযরত ইউসুফের (আ) বিবেক তার ব্যক্তিসত্তার কাছ থেকে একথার স্বীকৃতি আদায় করেছে যে, এ নারীর ভোগের আহবানে সাড়া দেয়া তার পক্ষে শোভনীয় নয়। এ প্রমাণটি কি ছিল? ইতিপূর্বে পিছনের বাক্যেই তা বলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে বলা হয়েছে ঃ "আমার রব তো আমাকে ভালই মর্যাদা দিয়েছেন আর আমি এমন খারাপ কাজ করবো। এ ধরনের জালেমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারে না।" এ অকাট্য যুক্তিই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে সদ্যোন্মিত যৌবনকালের এ সংকট সন্ধিক্ষণে পাপ কাজ থেকে বিরত রেখেছিল। তারপর বলা হলো, "ইউসুফও তার দিকে এগিয়ে যেতো যদি না তার রবের জ্বলন্ত প্রমাণ প্রত্যক্ষ করতো।" এ থেকে নবীগণের নিষ্পাপ হবার (ইস্‌মতে আম্বিয়া) তত্বের অন্তরনিহিত সত্য পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নবীর নিষ্পাপ হবার মানে এ নয় যে, তাঁর গুনাহ, ভুল ও ত্রুটি করার ক্ষমতা ও সামর্থ ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, ফলে তাঁর দ্বারা গুনাহর কাজ সংঘটিত হতেই পারে না। বরং এর মানে হচ্ছে, নবী যদিও গুনাহ করার শক্তি রাখেন কিন্তু সমস্ত মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন হওয়া এবং যাবতীয় মানবিক আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা–প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও তিনি এমন সদাচারী ও আল্লাহভীরু হয়ে থাকেন যে, জেনেবুঝে কখনো গুনাহ করার ইচ্ছা করেন না। তাঁর বিবেকের অভ্যন্তরে আল্লাহর এমন সব শক্তিশালী দলীল প্রমাণ তিনি রাখেন যেগুলোর মোকাবিলায় প্রবৃত্তির কামনা বাসনা কখনো সফলকাম হবার সুযোগ পায় না। আর যদি সজ্ঞানে তিনি কোন ত্রুটি করেই বসেন তাহলে মহান আল্লাহ তখনই সুস্পষ্ট অহীর মাধ্যমে তা সংশোধন করে দেন। কারণ তাঁর পদস্খলন শুধুমাত্র এক ব্যক্তির পদস্খলন নয় বরং সমগ্র উম্মতের পদস্খলনের রূপ নেয়। তিনি সঠিক পথ থেকে এক চুল পরিমাণ সরে গেলে সারা দুনিয়া গোমরাহীর পথে মাইলের পর মাইল চলে যায়।

২৩. এ উক্তির দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, তার রবের প্রমাণ দেখা ও গুনাহ থেকে রক্ষা পাওয়া আমার দেয়া সুযোগ ও পথপ্রদর্শনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। কেননা, আমি নিজের এ নির্বাচিত বান্দাটি থেকে অসৎবৃত্তি ও অশ্লীলতা দূর করতে চাচ্ছিলাম। এর দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে এবং এটি অত্যন্ত গভীর অর্থবোধক যে, ইউসুফের সাথে এই যে ব্যাপারটি ঘটে গেলো এটি আসলে তার প্রশিক্ষণ পর্বের একটি প্রয়োজনীয় পর্যায় ছিল। তাঁকে অসৎ প্রবণতা ও অশ্লীলতা মুক্ত করার এবং তাঁর আত্মিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাকে পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য আল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী অপরিহার্য ছিল যে, তাঁর সামনে গুনাহের এমনি একটি সংকটময় পরিস্থিতি আসুক এবং সেই পরীক্ষার সময় তিনি নিজের সমগ্র ইচ্ছাশক্তিকে তাকওয়া ও আল্লাহভীতির পাল্লায় রেখে দিয়ে নিজের নফ্‌সের অসৎ প্রবণতাগুলোকে চিরকালের জন্য চূড়ান্তভাবে পরাজিত করুন। বিশেষ করে তদানীন্তন মিসরীয় সমাজে যে নৈতিক পরিবেশ বিরাজিত ছিল তা দৃষ্টি সমক্ষে রাখলে এ

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ۚ
قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾
قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ
قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٦﴾ وَإِن كَانَ
قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٧﴾

শেষ পর্যন্ত ইউসুফ ও সে আগেপিছে দরজার দিকে দৌড়ে গেলো এবং সে পেছন থেকে ইউসুফের জামা (টেনে ধরে) ছিঁড়ে ফেললো। উভয়েই দরজার ওপর তার স্বামীকে উপস্থিত পেলো। তাকে দেখতেই মহিলাটি বলতে লাগলো, "তোমার পরিবারের প্রতি যে অসৎ কামনা পোষণ করে তার কি শাস্তি হতে পারে? তাকে কারাগারে প্রেরণ করা অথবা কঠোর শাস্তি দেয়া ছাড়া আর কি শাস্তি দেয়া যেতে পারে?" ইউসুফ বললো, "সে-ই আমাকে ফাঁসাবার চেষ্টা করছিল।" "মহিলাটির নিজের পরিবারের একজন (পদ্ধতিগত) সাক্ষ দিল,[২৪] "যদি ইউসুফের জামা সামনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে মহিলাটি সত্য কথা বলেছে এবং সে মিথ্যুক আর যদি তার জামা পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে মহিলাটি মিথ্যা কথা বলেছে এবং সে সত্যবাদী।"[২৫]

বিশেষ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সহজেই উপলব্ধি করা যাবে। সামনের দিকে চতুর্থ রুকূতে এ পরিবেশের একটি সামান্যতম নমুনা দেখানো হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যাবে, তৎকালীন 'সুসভ্য মিসরে' সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে সে দেশের উচ্চ শ্রেণীতে স্বাধীন যৌনাচারিতা প্রায় বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশসমূহে এবং আমাদের দেশের ফিরিংগী প্রভাবিত সমাজের সমমানে অবস্থান করছিল। এ ধরনের বিকৃত রুচিসম্পন্ন লোকদের মধ্যে হযরত ইউসুফকে কাজ করতে হবে। এ কাজ করতে হবে একজন সাধারণ লোক হিসেবে নয় বরং দেশের শাসনকর্তা হিসেবে। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, একজন সুন্দর ও সুশ্রী গোলামের জন্য যেসব ভদ্র মহিলা নিজেদেরকে এভাবে বিলীন করে দিচ্ছিল তারা একজন যুবক বয়সের সুদর্শন শাসনকর্তাকে পথভ্রষ্ট করার ও ফাঁদে ফেলার জন্য কত কী-ইনা করতে পারতো। আল্লাহ এরি পথ বন্ধ করার জন্য এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন যে, প্রথমেই এ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর করিয়ে হযরত ইউসুফকে পাকাপোক্ত করে দিয়েছেন তারপর অন্যদিকে মিসরীয় মহিলাদেরকেও তাঁর ব্যাপারে হতাশ করে দিয়ে তাদের সমস্ত ছলনা ও কারসাজির দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ؕ اِنَّ كَيْدَكُنَّ
عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾ يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ۚ اِنَّكِ
كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْنَ ﴿٢٩﴾

স্বামী যখন দেখলো ইউসুফের জামা পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া তখন সে বললো, "এসব তোমাদের মেয়েলোকদের ছলনা। সত্যিই বড়ই ভয়ানক তোমাদের ছলনা! হে ইউসুফ! এ ব্যাপারটি উপেক্ষা করো। আর হে নারী! তুমি নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, তুমিই আসল অপরাধী।[২৫] (ক)

২৪. এ ব্যাপারটি মনে হয় এভাবে ঘটে থাকবে যে, গৃহকর্তার সাথে সংশ্লিষ্ট মহিলার আত্মীয়দের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তিও আসছিল। সে এ ঝগড়া শুনে হয়তো বলেছে ঃ এরা দু'জনেই যখন পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করছে এবং উপস্থিত ঘটনার কোন সাক্ষীও নেই তখন পরিবেশগত সাক্ষের সূত্র ধরে বিষয়টি সম্পর্কে এভাবে অনুসন্ধান চালানো যেতে পারে। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু এ সাক্ষ পেশ করেছিল। শিশুটি ঐ ঘরে দোলনায় শায়িত ছিল। আল্লাহ তাকে বাকশক্তি দান করে তার মুখ দিয়ে এ সাক্ষের কথা উচ্চারণ করিয়েছিলেন। কিন্তু এ বর্ণনাটি কোন নির্ভুল সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত নয়। আর তাছাড়া এ ব্যাপারে অযথা মু'জিযার সাহায্য নেয়ার কোন প্রয়োজন অনুভূত হয় না। সাক্ষদাতা যে পরিবেশগত সাক্ষের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা ছিল যথার্থই যুক্তিসংগত ব্যাপার। এ সাক্ষের প্রতি দৃষ্টি দিলে এক মুহূর্তেই বুঝা যায় যে, এ ব্যক্তি অতীব বিচক্ষণ, সূক্ষ্মদর্শী ও ব্যাপকতর অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিল। ঘটনার চিত্র তার সামনে এসে যেতেই সে তার গভীরে পৌঁছে গেছে। বিচিত্র নয় যে, উল্লেখিত ব্যক্তি কোন বিচারপতি বা ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারে। (উল্লেখ থাকে, মুফাস্‌সিরগণ দুগ্ধপোষ্য শিশুর সাক্ষদানের যে বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন তা ইহুদী বর্ণনা থেকে গৃহীত হয়েছে। দেখুন, তালমূদের নির্বাচিত অংশ, পল ইসহাক হিরশূন, লণ্ডন ১৮৮০, ২৫৬ পৃষ্ঠা)

২৫. এর মানে হচ্ছে, ইউসুফের কাপড় যদি সামনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে ইউসুফের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল এবং মহিলাটি নিজেকে বাঁচাবার জন্য ধস্তাধস্তিতে লিপ্ত হয়েছিল, এটা হবে তার স্পষ্ট আলামত। কিন্তু যদি ইউসুফের কাপড় পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে স্পষ্ট বুঝতে হবে, মহিলাটি তার পেছনে লেগেছিল এবং ইউসুফ তার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। এ ছাড়াও আর একটি বাস্তব সাক্ষও এ সাক্ষের মধ্যে লুকিয়েছিল। সেটি হচ্ছে, এ সাক্ষী শুধুমাত্র ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাপড়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছে। এ থেকে একথা

পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মহিলাটির শরীরে বা পোশাকে আদতে বল প্রয়োগের কোন আলামতই ছিল না। অথচ যদি এটা বলাৎকারজনিত মামলা হতো তাহলে মহিলাটির শরীরে ও পোশাকে এর পরিষ্কার আলামত দেখা যেতো।

২৫(ক). বাইবেলে এ কাহিনীকে যে কদাকাররূপে চিত্রিত করা হয়েছে নিচের বর্ণনায় তা দেখা যেতে পারে ঃ

"তখন সে যোসেফের বস্ত্র ধরিয়া বলিল, আমার সহিত শয়ন কর ; কিন্তু যোসেফ তাহার হস্তে আপন বস্ত্র ফেলিয়া রাখিয়া বাহিরে পলাইয়া গেলেন। তখন যোসেফ তাহার হস্তে বস্ত্র ফেলিয়া রাখিয়া বাহিরে পলাইলেন দেখিয়া, সে নিজ ঘরের লোকদিগকে ডাকিয়া কহিল, দেখ তিনি আমাদের সাথে ঠাট্টা করিতে একজন ইব্রীয় পুরুষকে আনিয়াছেন, সে আমার সংগে শয়ন করিবার জন্য আমার নিকটে আসিয়াছিল, তাহাতে আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম, আমার চীৎকার শুনিয়া সে আমার নিকটে নিজ বস্ত্রখানি ফেলিয়া বাহিরে পলাইয়া গেল। আর যে পর্যন্ত তাহার কর্তা ঘরে না আসিলেন, সে পর্যন্ত সেই স্ত্রীলোক তাঁহার বস্ত্র আপনার কাছে রাখিয়া দিল।..... তাঁহার প্রভু যখন আপন স্ত্রীর একথা শুনিলেন যে, " তোমার দাস আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিয়াছে", তখন ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। অতএব যোসেফের প্রভু তাঁহাকে লইয়া কারাগারে রাখিলেন, যে স্থানে রাজার বন্দিগণ বদ্ধ থাকিত।" (আদি পুস্তক ৩৯ঃ১২-২০)

এ অদ্ভুত বর্ণনার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে এই যে, হযরত ইউসুফ এমন ধরনের পোশাক পরেছিলেন যে, যুলাইখা তাতে হাত লাগাতেই সমস্ত পোশাকটাই খুলে তার হাতে এসে পড়লো! তারপর আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে, হযরত ইউসুফ নিজে পোশাক তার কাছে রেখে দিয়ে একেবারে দিগম্বর হয়ে ভাগলেন এবং তাঁর পোশাক (অর্থাৎ তাঁর অপরাধের অনস্বীকার্য প্রমাণ) ঐ মহিলার কাছে রয়ে গেলো। এরপরে হযরত ইউসুফের অপরাধী হবার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে কি?

এতো গেলো বাইবেলের বর্ণনা। অন্যদিকে তালমূদের বর্ণনা হচ্ছে, পোটিফর যখন তার স্ত্রীর মুখ থেকে এ অভিযোগ শুনলেন তখন তিনি ইউসুফকে খুব মারধর করালেন। তারপর তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করলেন। আদালতে কর্মকর্তারা হযরত ইউসুফের পোশাক পরীক্ষা করে রায় দিল, "দোষ মহিলাটির, কারণ কাপড় সামনের দিক থেকে নয় বরং পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া।" কিন্তু যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সামান্য চিন্তা করলেই একথাটি বুঝতে পারে যে, কুরআনের বর্ণনা তালমূদের বর্ণনা থেকে অনেক বেশী যুক্তিসংগত। একথা কেমন করে মেনে নেয়া যায় যে, এত বড় একজন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর ওপর নিজের দাসের তথাকথিত চড়াও হবার মামলাটি নিজেই আদালতে নিয়ে গেছেন? এটি কুরআন ও ইসরাঈলী বর্ণনার মধ্যে পার্থক্যের একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। এ থেকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কাহিনীটি বনী ইসরাঈলদের থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন বলে পশ্চিমী প্রাচ্যবিদরা যে অভিযোগ আনেন তার অন্তসারশূন্যতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সত্যি কথা হচ্ছে, কুরআন তাদের বর্ণনা সংশোধন করেছে এবং সঠিক সত্য ঘটনাটিই দুনিয়াবাসীর সামনে তুলে ধরেছে।

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ ۖ
قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ
أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ
سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ
أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾
قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ
فَاسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ
الصَّاغِرِينَ ﴿٣٢﴾

৪ রুকূ'

শহরের মেয়েরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো।, "আযীযের স্ত্রী তার যুবক গোলামের পেছনে পড়ে আছে, প্রেম তাকে উন্মাদ করে দিয়েছে। আমাদের মতে সে পরিষ্কার ভুল করে যাচ্ছে।" সে যখন তাদের এ শঠতাপূর্ণ কথা শুনলো তখন তাদেরকে ডেকে পাঠালো। তাদের জন্য হেলান দিয়ে বসার মজলিসের আয়োজন করলো।[২৬] খাওয়ার বৈঠকে তাদের সবার সামনে একটি করে ছুরি রাখলো। (তারপর ঠিক সেই মুহূর্তে যখন তারা ফল কেটে কেটে খাচ্ছিল) সে ইউসুফকে তাদের সামনে বের হয়ে আসার ইশারা করলো। যখন ঐ মেয়েদের দৃষ্টি তার ওপর পড়লো, তারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলো। এবং নিজেদের হাত কেটে ফেললো। তারা বললো, "আল্লাহর কী অপার মহিমা! এতো মানুষ নয়, এতো এক মহিমান্বিত ফেরেশ্‌তা।" আযীযের স্ত্রী বললো, " দেখলে তো! এ হলো সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে তোমরা আমার বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করতে। অবশ্যই আমি তাকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সে নিজেকে রক্ষা করেছে। যদি সে আমার কথা না মেনে নেয় তাহলে কারারুদ্ধ হবে এবং নিদারুণভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।"[২৭]

২৬. অর্থাৎ এমন মজলিস যে মজলিসে মেহমানদের হেলান দিয়ে বসার জন্য বালিশ সাজানো ছিল। মিসরের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার থেকেও এর সত্যতার

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ
عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾ فَاسْتَجَابَ
لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾

ইউসুফ বললো, "হে আমার রব! এরা আমাকে দিয়ে যে কাজ করাতে চাচ্ছে তার চাইতে কারাগারই আমার কাছে প্রিয়। আর যদি তুমি এদের চক্রান্ত থেকে আমাকে না বাঁচাও তাহলে আমি এদের ফাঁদে আটকে যাবো এবং অজ্ঞদের অন্তরভুক্ত হবো।[২৮] —তার রব তার দোয়া কবুল করলেন এবং তাদের অপকৌশল থেকে তাকে রক্ষা করলেন।[২৯] অবশ্যি তিনি সবার কথা শোনেন এবং সবকিছু জানেন।

প্রমাণ পাওয়া গেছে। দেখা গেছে তাদের মজলিসে মহফিলে বালিশের ব্যাপক ব্যবহার ছিল।

বাইবেলে এ ভোজসভার কোন উল্লেখ নেই। তবে তালমূদে এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার বর্ণনাধারা কুরআন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কুরআনের বর্ণনায় যে জীবন জোয়ার, যে প্রাণশক্তি, স্বাভাবিকতা ও উন্নত নৈতিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় তালমূদে তার সামান্যতম স্পর্শও নেই।

২৭. এ থেকে তদানীন্তন মিসরের উচ্চ ও অভিজাত সমাজে নৈতিকতার অবস্থা কোথায় গিয়ে ঠেকেছিল তা অনুমান করা যায়। একথা সুস্পষ্ট, আযীযের স্ত্রী যেসব মহিলাকে দাওয়াত দিয়েছিল তারা নিশ্চয়ই নগরের আমীর-উমরাহ ও বড় বড় সরকারী কর্মকর্তাদের বেগমরাই ছিল। এসব উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ভদ্র মহিলার সামনে সে নিজের প্রিয় যুবককে পেশ করলো। তার সুদর্শন যৌবনোদ্ভিন্ন দেহ সুষমা দেখিয়ে সে তাদের কাছ থেকে এ স্বীকৃতি আদায় করতে চাইলো যে, এমন সুন্দর যুবকের জন্য যদি আমি পাগল না হয়ে যাই তাহলে আর কী হবো। তারপর এসব পদস্থ ব্যক্তিবর্গের স্ত্রী-কন্যারা নিজেদের কাজের মাধ্যমে যেন একথার সত্যতা প্রমাণ করলো যে, সত্যিই এ ধরনের অবস্থায় তাদের প্রত্যেকেই ঠিক তাই করতো যা আযীযের স্ত্রী করেছে। আবার অভিজাত মহিলাদের এ ভরা মজলিসে মেজবান সাহেবা প্রকাশ্যে এ সংকল্প ঘোষণা করতে একটুও লজ্জা অনুভব করলো না যে, যদি এ সুন্দর যুবক তার কামনার ক্রীড়নক হতে রাযি না হয় তাহলে সে তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেবে। এ সবকিছুই একথা প্রমাণ করে যে, ইউরোপ ও আমেরিকা এবং তাদের প্রাচ্যদেশীয় অন্ধ অনুসারীরা আজ যে নারী স্বাধীনতা এবং নারীদের অবাধ বিচরণ ও মেলামেশাকে বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীলতার অবদান মনে করে থাকে তা আসলে কোন নতুন জিনিস নয়, অনেক পুরাতন, প্রাচীন জিনিস। অতি প্রাচীনকালে দাকিয়ানুসের শাসনেরও বহুশত বছর আগে মিসরে ঠিক একই রকম শানশওকতের সাথে এর প্রচলন ছিল যেমন আজকের এ "প্রগতিশীলতার" যুগে আছে।

২৮. সে সময় হযরত ইউসুফ যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন এ আয়াতগুলো আমাদের সামনে তার একটি অদ্ভুত চিত্র তুলে ধরেছে। উনিশ বিশ বছরের একটি সুন্দর যুবক। বেদুইন জীবনের উদ্দামতায় লালিত বলিষ্ঠ ও সুঠাম দেহী। আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন প্রবাস জীবন, দেশান্তর ও বলপূর্বক দাসত্বের পর্যায় অতিক্রম করার পর ভাগ্য তাকে দুনিয়ার বৃহত্তম সুসভ্য রাষ্ট্রের রাজধানীতে একজন উচ্চ রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির বাড়িতে টেনে এনেছে। এখানে এ বাড়ির যে বেগম সাহেবার সাথে সকাল বিকাল তাকে ওঠাবসা করতে হয় সে-ই প্রথমে তার পেছনে লাগে। তারপর তার সৌন্দর্যের আলোচনা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র রাষ্ট্রে। সারা শহরের অভিজাত পরিবারের মেয়েরা তার প্রেমে হাবুডুবু খেতে থাকে। এখন তার চতুর্দিকে সর্বত্র সবসময় শত শত সুন্দর জাল বিছানো থাকে তাকে আটকাবার জন্য। তার ভাবাবেগকে উসকিয়ে দেবার এবং তার ধার্মিকতাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করার জন্য সব ধরনের কৌশল ও ফন্দি আঁটা হতে থাকে। তিনি যেদিকে যান সেদিকেই দেখতে পান পাপ তার সমস্ত চাকচিক্য ও মোহনীয়তা নিয়ে দরজা উন্মুক্ত করে তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। অনেকে অসৎ ও অশালীন কার্যকলাপ করার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকে। কিন্তু এখানে সুযোগই তাকে খুঁজে ফিরছে এবং সবসময় গুঁৎ পেতে আছে যখনই তার মনে অসৎকাজের প্রতি সামান্যতম ঝোঁকপ্রবণতা দেখা দেবে তখনই সে তার সামনে নিজেকে পেশ করে দেবে। দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা তিনি এক মহা আতংকের মধ্যে জীবন যাপন করছেন। কখনো মাত্র এক লহমার জন্য যদি তাঁর ইচ্ছা ও সংকল্পের বাঁধন সামান্যতম ঢিলে হয়ে যায় তাহলে পাপের যে অসংখ্য দরজা তার অপেক্ষায় হরহামেশা খোলা আছে তার যে কোন একটির মধ্য দিয়ে তিনি ভেতরে পবেশ করে যেতে পারেন। এ অবস্থায় এ আল্লাহ বিশ্বাসী যুবক যে সাফল্যের সাথে এসব শয়তানী প্ররোচনার মোকাবিলা করেছেন তা এমনিতেই কম প্রশংসনীয় নয়। কিন্তু এ সর্বোচ্চ মানের আত্মসংযমের পরিচয় দেয়ার পর আত্মোপলব্ধি ও চিন্তার বিশুদ্ধতারও তিনি চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এমন নজীরবিহীন পরহেজগারীর দৃষ্টান্ত স্থাপনের পরও তাঁর মনে কখনো এ মর্মে অহমিকা জাগেনি যে, "বাহ, কত মজবুত আমার চরিত্র! এতো সুন্দরী ও যুবতী মেয়েরা আমার প্রেমে পাগলপারা কিন্তু এরপরও আমার পদস্খলন হয়নি।" বরং এর পরিবর্তে তিনি নিজের মানবিক দুর্বলতার কথা চিন্তা করে ভয়ে কেঁপে উঠেছেন এবং অত্যন্ত দীনতার সাথে আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়ে বলেছেন, হে আমার রব! আমি একজন দুর্বল মানুষ। এ অসংখ্য অগণিত প্ররোচণার মোকাবিলা করার শক্তি আমার কোথায়! তুমি আমাকে সহায়তা দান করো এবং আমাকে বাঁচাও। আমি ভয় করছি আমার পা পিছলে না যায়—আসলে এটি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের নৈতিক প্রশিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সংকটময় অধ্যায় ছিল। বিশ্বস্ততা, আমানতদারী, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, সত্যনিষ্ঠা, অকপটতা, সংযম ও চিন্তার ভারসাম্যের অসাধারণ গুণাবলী এ পর্যন্ত তাঁর মধ্যে সুপ্ত ছিল এবং এ সম্পর্কে তিনি নিজেও বেখবর ছিলেন। এ কঠোর পরীক্ষার যুগে এ গুণগুলো সবই তাঁর মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠলো। এগুলো পূর্ণ শক্তিতে কাজ করতে থাকলো। তিনি নিজেও জানতে পারলেন তাঁর মধ্যে কোন্ কোন্ শক্তি আছে এবং তাদেরকে তিনি কোন্ কোন্ কাজে লাগাতে পারেন।

ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٣٥﴾

তারপর তারা মনে করলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাকে কারারুদ্ধ করতে হবে, অথচ তারা (তার নিষ্কলুষতা এবং নিজেদের স্ত্রীদের অসতিপনার) সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখে নিয়েছিল।[৩০]

২৯. রক্ষা করা এ অর্থে যে, ইউসুফ আলাইহিস সালামের সচ্চরিত্রকে এমন শক্তিমত্তা ও দৃঢ়তা দান করা হয় যার ফলে তার মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট নারী সমাজের সমস্ত অপকৌশলই ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাছাড়া এ অর্থেও রক্ষা করা যে, আল্লাহর ইচ্ছায় কারাগারের দরজা তাঁর জন্য খুলে দেয়া হয়।

৩০. এভাবে হযরত ইউসুফকে কারাগারে নিক্ষেপ করা আসলে তাঁর নৈতিক বিজয় এবং মিসরের সমগ্র অভিজাত ও শাসক সমাজের চূড়ান্ত নৈতিক পরাজয়ের ঘোষণা ছিল। হযরত ইউসুফ তখন কোন অজ্ঞাতনামা ও অপরিচিত লোক ছিলেন না। সারাদেশে এবং কমপক্ষে তো রাজধানী নগরীতে বিশেষ ও সাধারণ সব মহলেই তিনি পরিচিতি লাভ করেছিলেন। যে ব্যক্তির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি দু'–একটি নয়, অধিকাংশ অভিজাত পরিবারের মহিলারা প্রণয়াসক্ত এবং যার মনমাতানো ও চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্যের তীব্র আকর্ষণে নিজেদের দাম্পত্য জীবন ধ্বংস হতে দেখে মিসরের শাসকরা তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেই নিজেদের ঘর–দোর সামলাবার ব্যবস্থা করেছিল। এহেন ব্যক্তিত্ব কখনো লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে থাকতে পারে না, একথা সহজেই অনুমান করা যায়। নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে তাঁর কথা আলোচিত হতো। সাধারণভাবেও লোকেরা নিশ্চয়ই তাঁর অসাধারণ উন্নত, শক্তিশালী ও পবিত্র চরিত্রের কথা জেনে গিয়েছিল। তারা জেনেছিল, এ ব্যক্তিকে তার কোন অপরাধের কারণে কারাগারে পাঠানো হয়নি বরং মিসরের অভিজাত লোকেদের জন্য নিজেদের স্ত্রী–কন্যাদেরকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার পরিবর্তে এ নিরপরাধকে কারগারে পাঠানো সহজ ছিল বলেই তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এ থেকে একথাও জানা গেলো, কোন ব্যক্তিকে ইনসাফের শর্ত অনুযায়ী আদালতে অপরাধী প্রমাণ না করেই খেয়ালখুশীমত গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া বেঈমান শাসকদের পুরাতন রীতি। এ ব্যাপারেও আজকের শয়তানরা চার হাজার বছর আগের শয়তানদের থেকে খুব বেশী ভিন্নতর নয়। ফারাক কেবল এতটুকুই, তারা "গণতন্ত্রের" নাম নিত না আর এরা নিজেদের কার্যকলাপের সাথে গণতন্ত্রের নাম নেয়। তারা কোন আইন ছাড়াই বেআইনী কার্যকলাপ করতো। আর এরা প্রত্যেকটি অবৈধ অন্যায় কাজের জন্য প্রথমে একটি "আইন" তৈরী করে নেয়। তারা পরিষ্কারভাবে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মানুষের ওপর জুলুম অত্যাচার করতো আর এরা যার ওপর জুলুম নির্যাতন চালায় তার সম্পর্কে দুনিয়াবাসীকে বুঝাবার চেষ্টা করে যে, তার কারণে তার নিজের নয় বরং দেশ ও জাতির জন্য আশংকা দেখা দিয়েছিল। মোটকথা, তারা শুধু জালেম ছিল কিন্তু এরা সেই সাথে মিথ্যুক এবং নির্লজ্জও।

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ۖ قَالَ اَحَدُهُمَآ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ
وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ
نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٦﴾ قَالَ لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ
تُرْزَقٰنِهٖٓ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا ۚ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ
رَبِّيْ ۚ اِنِّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ
كٰفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۚ
مَا كَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا
وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٨﴾

৫ রুকূ'

কারাগারে[৩১] তার সাথে আরো দু'টি ভৃত্যও প্রবেশ করলো।[৩২] একদিন তাদের একজন তাকে বললো, "আমি স্বপ্নে দেখেছি আমি মদ তৈরী করছি।" অন্যজন বললো, "আমি দেখলাম আমার মাথায় রুটি রাখা আছে এবং পাখিরা তা খাচ্ছে।" তারা উভয়ে বললো, "আমাদের এর তা'বীর বলে দিন। আমরা আপনাকে সৎকর্মশীল হিসেবে পেয়েছি।"[৩৩] ইউসুফ বললো ঃ

"এখানে তোমরা যে খাবার পাও তা আসার আগেই আমি তোমাদের এ স্বপ্নগুলোর অর্থ বলে দেবো। আমার রব আমাকে যা দান করেছেন এ জ্ঞান তারই অন্তরভুক্ত। আসল ব্যাপার হচ্ছে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না এবং আখেরাত অস্বীকার করে তাদের পথ পরিহার করে আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের পথ অবলম্বন করেছি। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। আসলে এটা আমাদের এবং সমগ্র মানব জাতির প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ (যে, তিনি আমাদের তাঁর ছাড়া আর কারোর বান্দা হিসেবে তৈরী করেননি) কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

৩১. হযরত ইউসুফকে যখন কারাগারে পাঠানো হয়েছিল তখন সম্ভবত তাঁর বয়স বিশ একুশ বছরের বেশী ছিল না। তালমূদে বলা হয়েছে, কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে যখন

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾
مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ
اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۭ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۭ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ۭ
ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٠﴾

হে জেলখানার সাথীরা! তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, ভিন্ন ভিন্ন বহু সংখ্যক রব ভালো, না এক আল্লাহ, যিনি সবার ওপর বিজয়ী।

তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের বন্দেগী করছো তারা শুধুমাত্র কতকগুলো নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃ-পুরুষরা রেখেছো, আল্লাহ এগুলোর পক্ষে কোন প্রমাণ পাঠাননি। শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নেই। তাঁর হুকুম—তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারোর বন্দেগী করবে না। এটিই সরল সঠিক জীবন পদ্ধতি, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

তিনি মিসরের শাসনকর্তা হন তখন তাঁর বয়স ছিল তিরিশ বছর। এদিকে কুরআন বলছে, কারাগারে তিনি بضع سنين অর্থাৎ কয়েক বছর কাটান। بضع শব্দটি আরবী ভাষায় ১০ পর্যন্ত সংখ্যার জন্য বলা হয়ে থাকে।

৩২. হযরত ইউসুফের সাথে এই যে দু'জন গোলাম কারাগারে প্রবেশ করেছিল তাদের সম্পর্কে বাইবেলের বর্ণনা হচ্ছে, তাদের একজন ছিল মিসরের বাদশাহর মদ পরিবেশকদের সরদার এবং দ্বিতীয়জন রাজকীয় রুটি প্রস্তুতকারকদের অফিসার। তালমূদের বর্ণনা মতে, মিসরের বাদশাহ তাদের এ অপরাধে কারাগারে পাঠিয়েছিলেন যে, একবার এক দাওয়াতের মজলিসে পরিবেশিত রুটি একটু বিস্বাদ লেগেছিল এবং একটি মদের পাত্রে পাওয়া গিয়েছিল মাছি।

৩৩. কারাগারে হযরত ইউসুফকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখা হতো এ থেকে তা আন্দাজ করা যেতে পারে। ওপরে যেসব ঘটনার কথা আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো সামনে রাখলে ব্যাপারটা আর মোটেই বিস্ময়কর মনে হয় না যে, এ কয়েদী দুজন হযরত ইউসুফের কাছেই-বা এসে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলো কেন এবং তাঁকে "আমরা আপনাকে সদাচারী হিসেবে পেয়েছি" বলে শ্রদ্ধার্ঘ পেশ করলো কেন। জেলখানার ভেতরে বাইরে সবাই জানতো, এ ব্যক্তি কোন অপরাধী নয়, বরং একজন অত্যন্ত সদাচারী পুরুষ। কঠিনতম পরীক্ষায় তিনি নিজের আল্লাহভীতি ও আল্লাহর হুকুম মেনে চলার প্রমাণ পেশ করেছেন। আজ সারাদেশে তাঁর চেয়ে বেশী সৎব্যক্তি আর কেউ নেই। এমনকি দেশের ধর্মীয় নেতাদের মধ্যেও তাঁর মতো লোক একজনও নেই। এ কারণে শুধু কয়েদীরাই

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ
فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ۭ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ۝ وَقَالَ
لِلَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ۡ فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ
ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ۝

হে জেলখানার সাথীরা! তোমাদের স্বপ্নের তা'বীর হচ্ছে, তোমাদের একজন তার নিজের প্রভুকে (মিসর রাজ) মদ পান করাবে আর দ্বিতীয় জনকে শূলবিদ্ধ করা হবে এবং পাখি তার মাথা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। তোমরা যে কথা জিজ্ঞেস করছিলে তার ফায়সালা হয়ে গেছে।[৩৪]

আবার তাদের মধ্য থেকে যার সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে ইউসুফ তাকে বললো ঃ " তোমার প্রভুকে (মিসরের বাদশাহ) আমার কথা বলো।" কিন্তু শয়তান তাকে এমন গাফেল করে দিল যে, সে তার প্রভুকে (মিসরের বাদশাহ) তার কথা বলতে ভুলে গেলো। ফলে ইউসুফ কয়েক বছর কারাগারে পড়ে রইলো।[৩৫]

তাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতো না বরং কয়েদখানার পরিচালকবৃন্দ এবং কর্মচারীরাও তাঁর ভক্তদলে শামিল হয়ে গিয়েছিল। বাইবেলে বলা হয়েছে ঃ "কারারক্ষক কারাস্থিত সমস্ত বন্দির ভার যোসেফের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং তথাকার লোকদের সমস্ত কর্ম যোসেফের আজ্ঞা অনুসারে চলিতে লাগিল। কারারক্ষক তাঁহার হস্তগত কোন বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতেন না।" (আদি পুস্তক ৩৯ঃ ২২, ২৩)

৩৪. এখানে যে কাহিনীটি বর্ণনা করা হয়েছে এ ভাষণটি হচ্ছে তার প্রাণ। এটি কুরআনেরও তাওহীদ সম্পর্কিত সর্বোত্তম ভাষণগুলোর অন্যতম। কিন্তু বাইবেল ও তালমূদে কোথাও এ সম্পর্কে সামান্য ইংগিতও নেই। সেখানে হযরত ইউসুফকে নিছক একজন জ্ঞানী ও আল্লাহভীরু লোক হিসেবেই পেশ করা হয়েছে। কিন্তু কুরআন কেবল তাঁর চরিত্রের এ দিকগুলোকে বাইবেল ও তালমূদের চাইতে বেশী উজ্জ্বল করে পেশ করেছে তাই নয় বরং এ ছাড়াও আমাদেরও একথা জানায় যে, হযরত ইউসুফের নিজের একটি নবুওয়াত মিশন ছিল এবং তাঁর দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ তিনি কারাগারেই শুরু করে দিয়েছিলেন।

এ ভাষণটির ওপর শুধুমাত্র সাদামাটাভাবে চোখ বুলিয়ে চলে যাওয়া যাবে, এমন পর্যায়ের ভাষণ এটি নয়। এর এমন অনেকগুলো দিক আছে যেগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়া এবং যেগুলো সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করার প্রয়োজন আছে ঃ

এক ঃ এ প্রথম আমরা দেখছি হযরত ইউসুফ (আ) আল্লাহর সত্য দীনের প্রচার করছেন। এর আগে তাঁর জীবন কাহিনীর যে অংশ কুরআন পেশ করেছে তাতে কেবলমাত্র

তাঁর উন্নত নৈতিক চরিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে। কিন্তু তাবলীগ বা প্রচারের কোন আভাস সেখানে পাওয়া যায় না। এ থেকে প্রমাণ হয়, প্রথম পর্যায়গুলো ছিল নিছক প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণমূলক। নবুওয়াতের কাজ কার্যত এ কারাগার পর্যায়ে তাঁকে সোপর্দ করা হয় এবং নবী হিসেবে এটি তাঁর প্রথম দাওয়াতী ভাষণ।

দুই ঃ এ প্রথম তিনি লোকদের সামনে নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করেন। এর আগে আমরা দেখেছি তিনি যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন অত্যন্ত ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে সেগুলো গ্রহণ করতে থেকেছেন। যখন কাফেলার লোকেরা তাঁকে ধরে গোলাম বানালো, যখন তিনি মিসরে আনীত হলেন, যখন তাঁকে মিসরের আযীযের হাতে বিক্রি করা হলো, যখন তাঁকে কারাগারে পাঠানো হলো, এর মধ্যে কোন এক সময়েও তিনি একথা বলেননি যে, তিনি ইবরাহীম ও ইসহাক আলাইহিমাস সালামের পৌত্র এবং ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ছেলে। তাঁর বাপ ও দাদা কেউ অপরিচিত ছিলেন না। কাফেলার লোকেরা, মাদয়ানবাসী হোক বা ইসমাঈলী উভয়েরই তাদের পরিবারের সাথে নিকট সম্পর্ক ছিল। মিসরবাসীরাও তো কমপক্ষে হযরত ইবরাহীম সম্পর্কে বেখবর ছিল না। (বরং হযরত ইউসুফ যেভাবে তাঁদের এবং হযরত ইয়াকূব ও ইসহাকের কথা বলেছেন তাতে অনুমান করা যায় এ তিনজন মনীষীর খ্যাতি মিসরে পৌঁছে গিয়েছিল।) কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ) বিগত চার পাঁচ বছর ধরে যেসব অবস্থার সম্মুখীন হতে থেকেছেন তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কখনো নিজের বাপ-দাদাদের নাম নেননি। সম্ভবত তিনি নিজেও জানতেন, আল্লাহ তাঁকে যা কিছু বানাতে চান সে জন্য তাঁকে এসব অবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এখন শুধুমাত্র নিজের দাওয়াত ও তাবলীগের খাতিরে তিনি এ সত্যটি সামনে তুলে ধরলেন যে, তিনি কোন নতুন ও অভিনব দীন পেশ করছেন না বরং তাওহীদ প্রচারের এমন একটি বিশ্বজনীন আন্দোলনের সাথে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে যার নেতা হচ্ছেন ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব আলাইহিমুস সালাম। তাঁর এমনটি করা এ জন্য জরুরী ছিল যে, সত্য দীনের আহবায়ক কখনো "আমি একটি নতুন কথা বলছি যা এর আগে কেউ বলেনি" এ ধরনের দাবীর মাধ্যমে তাঁর দাওয়াতের কাজ শুরু করেন না। বরং প্রথম পদক্ষেপেই তিনি একথা পরিষ্কার করে বলে দেন যে, তিনি একটি চিরন্তন ও চিরস্থায়ী সত্যের দিকে আহবান জানাচ্ছেন, যা ইতিপূর্বে সবসময়ই সকল সত্যপন্থী পেশ করে এসেছেন।

তিন ঃ তারপর ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিজের বক্তব্য পেশ করার জন্য যেভাবে সুযোগ সৃষ্টি করেছেন তা থেকে আমরা প্রচার কৌশলের ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করি। দু'জন লোক তাদের স্বপ্ন বর্ণনা করছে। তারা নিজেদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার কথা প্রকাশ করে তার তা'বীর জিজ্ঞেস করছে। জবাবে তিনি বলছেন, তা'বীর তো আমি অবশ্যি বলবো কিন্তু তার আগে শুনে রাখো, যে জ্ঞানের মাধ্যমে আমি তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেবো তার উৎস কি? এভাবে তাদের কথার মধ্য থেকে নিজের কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করে তিনি তাদের সামনে নিজের দীন পেশ করতে থাকেন। এ থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি সত্য প্রচারের ফিকিরে লেগে যায় এবং সে সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তিরও অধিকারী হয় তাহলে কেমন চমৎকারভাবে আলোচনার মোড় নিজের দিকে ফিরিয়ে নিতে পারে। যে ব্যক্তি দাওয়াত দেবার ধান্দায় থাকে না তার সামনে সুযোগের পর সুযোগ

আসতে থাকে কিন্তু কোন সুযোগেই সে নিজের কথা পেশ করার প্রয়োজন অনুভব করে না। কিন্তু যার এ ধান্দা থাকে, সে সুযোগের জন্য ওঁৎ পেতে বসে থাকে এবং সুযোগ পাওয়ার সাথে সাথেই নিজের কাজ শুরু করে দেয়। তবে বিচক্ষণ ও জ্ঞানী প্রচারকের সুযোগ সন্ধান এবং নির্বোধ ও অবিবেচক প্রচারকের সুযোগ সন্ধানের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। নির্বোধ প্রচারক পরিবেশ–পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি না রেখে লোকদের কানে জোরপূর্বক নিজের দাওয়াত ঠেসে দেবার চেষ্টা করে তারপর অনর্থক তর্কবিতর্ক ও ঝাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে তাদের মনে নিজের দাওয়াতের প্রতি উল্টো বিরক্তির সৃষ্টি করে।

চার ঃ লোকদের সামনে দীনের দাওয়াত পেশ করার সঠিক পদ্ধতি কি, একথাও এখান থেকে জানা যেতে পারে। হযরত ইউসুফ (আ) সুযোগ পেতেই ইসলামের বিস্তারিত বিধান ও নীতিগুলো পেশ করতে শুরু করেননি। বরং শ্রোতাদের সামনে দীনের এমন একটি সূচনা বিন্দু তুলে ধরেন যেখান থেকে সত্যপন্থী ও মিথ্যাপন্থীদের পথ পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে গেছে। অর্থাৎ তাওহীদ ও শিরকের পার্থক্য তুলে ধরেছেন। আবার এ পার্থক্যকে এমন যুক্তিসংগত পদ্ধতিতে সুস্পষ্ট করেছেন যার ফলে সাধারণ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তিই তা অনুভব না করে পারেন না। বিশেষ করে সে সময় যাদেরকে সম্বোধন করে তিনি একথা বলছিলেন তাদের মন–মস্তিষ্কে তীরের মতো একথা গেঁথে গিয়ে থাকবে। কারণ তারা ছিল কর্মজীবী গোলাম। নিজেদের মনের গভীরে তারা একথা ভালোভাবে অনুভব করতো যে, একজন প্রভুর গোলাম হওয়া ভালো, না একাধিক প্রভুর গোলাম হওয়া আর সারা দুনিয়ার একক প্রভু যিনি, তার বন্দেগী করা ভালো, না তার বান্দাদের বন্দেগী করা? তারপর তিনি একথাও বলেন না যে, তোমাদের ধর্ম ত্যাগ করো এবং আমার দীন গ্রহণ করো। বরং এক বিচিত্র ভংগীতে বলছেন, আল্লাহর কতবড় মেহেরবানী, তিনি আমাদের তাঁর ছাড়া আর কারো বান্দা হিসেবে পয়দা করেননি, অথচ অধিকাংশ লোক তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না বরং অনর্থক নিজেরাই মনগড়া রব তৈরী করে তাদের পূজা ও বন্দেগী করছে। তারপর তিনি শ্রোতাদের অনুসৃত ধর্মের সমালোচনাও করছেন কিন্তু অত্যন্ত যুক্তিসংগতভাবে এবং কোন প্রকার মনোকষ্ট না দিয়ে। তিনি এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন যে, এই যেসব মাবুদ–যাদের কাউকে তোমরা অন্নদাতা, কাউকে অনুগ্রহদাতা ও করুণানিধান, কাউকে ভূমির অধিপতি এবং কাউকে ধন–সম্পদের মালিক অথবা স্বাস্থ্য ও রোগের একচ্ছত্র অধিপতি ও পরিচালক ইত্যাদি বলে থাকো—এরা নিছক কিছু অন্তসারশূন্য নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। এ নামগুলোর পিছনে কোন সত্যিকার অন্নদাতা, অনুগ্রহকারী, মালিক ও প্রভুর অস্তিত্ব নেই। আসল মালিক ও প্রভু হচ্ছেন মহান আল্লাহ, যাকে তোমরাও বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক বলে স্বীকার করে থাকো। তিনি এসব মালিক ও প্রভুদের কাউকে মালিকানা, প্রভুত্ব ও উপাস্য হবার ছাড়পত্র দেননি। তিনি সার্বভৌমত্ব ও শাসন কর্তৃত্বের যাবতীয় অধিকার ও ক্ষমতা নিজের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন এবং তাঁরই আদেশ হচ্ছে, তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো বন্দেগী করবে না।

পাঁচ ঃ হযরত ইউসুফ (আ) কারাগারের এ আট দশ বছরের জীবন কিভাবে অতিবাহিত করেছেন এ থেকে একথাও অনুমান করা যেতে পারে। লোকেরা মনে করে, কুরআনে যেহেতু তাঁর শুধু একটি মাত্র ভাষণের উল্লেখ আছে কাজেই তিনি কেবল একবারই

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ
وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۖ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ
إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ
الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ
أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾

৬ রুকূ'

একদিন[৩৬] বাদশাহ বললো, "আমি স্বপ্ন দেখেছি, সাতটি মোটা গাভীকে সাতটি পাতলা গাভী খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও সাতটি শুকনো শীষ। হে সভাসদবৃন্দ! আমাকে এ স্বপ্নের তা'বীর বলে দাও, যদি তোমরা স্বপ্নের মানে বুঝে থাকো।[৩৭] লোকেরা বললা, "এসব তো অর্থহীন স্বপ্ন, আর আমরা এ ধরনের স্বপ্নের মানে জানি না।"

সেই দু'জন কয়েদীর মধ্য থেকে যে বেঁচে গিয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে এখন যার মনে পড়েছিল, সে বললো, "আমি আপনাদের এর তা'বীর বলে দিচ্ছি, আমাকে একটু (কারাগারে ইউসুফের কাছে) পাঠিয়ে দিন।[৩৮]

দীনের দাওয়াত দেবার জন্য মুখ খুলেছিলেন। কিন্তু প্রথমত নবী তাঁর আসল কাজ থেকে গাফেল ছিলেন, একজন নবী সম্পর্কে এ ধারণা করা মারাত্মক ধরনের কুধারণার পর্যায়ভুক্ত। তারপর যে ব্যক্তির সত্যদীন প্রচারের আগ্রহ ও ফিকির এত বেশী প্রবল ছিল যে, দু'জন লোক স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতেই তিনি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাদের কাছে দীনের তাবলীগ করতে শুরু করে দেন, তাঁর সম্পর্কে কেমন করে এ ধারণা করা যেতে পারে যে, তিনি কারাবাসের এ কয়েক বছর নীরবে কাটিয়ে দিয়েছিলেন?

৩৫. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, "শয়তান হযরত ইউসুফকে তাঁর রবের (অর্থাৎ আল্লাহর) স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয় এবং তিনি এক বান্দার কাছে চান যে, সে তার রবের (মিসরের বাদশাহর) কাছে তার কথা আলোচনা করে তার কারামুক্তির চেষ্টা করুক, তাই আল্লাহ তাঁকে কয়েক বছর জেলখানা পড়ে থাকার শাস্তি দেন।" মূলত এটি পুরোপুরি একটি ভুল ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে, যেমন আল্লামা ইবনে কাসীর এবং প্রথম যুগের তাফসীরকারদের মধ্যে মুজাহিদ, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইত্যাদি তাফসীরকারগণ বলেন, فانساه الشيطان ذكر ربه (শয়তান তাকে ভুলিয়ে দেয় তার রবের বা প্রভুর স্মরণ) এর মধ্যে "তার" বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যার সম্পর্কে হযরত ইউসুফের

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ
عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى
النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾

সে গিয়ে বললো, "হে সত্যবাদিতার প্রতীক ইউসুফ![৩৯] আমাকে এ স্বপ্নের অর্থ বলে দাও ঃ সাতটি মোটা গাভীকে সাতটি পাতলা গাভী খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি শীষ সবুজ ও সাতটি শীষ শুকনো সম্ভবত আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারবো এবং তারা জানতে পারবে।"[৪০]

ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে এবং এ আয়াতের মানে হচ্ছে, "শয়তান তার প্রভুর কাছে হযরত ইউসুফের বিষয়টা উথাপন করার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল।" এ প্রসংগে একটি হাদীসও পেশ করা হয়। হাদীসটিতে বলা হয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে কথা বলেছিলেন সে কথা যদি তিনি না বলতেন তাহলে তিনি কয়েক বছর কারাগারে আটক থাকতেন না।" কিন্তু আল্লামা ইবনে কাসীর বলেছেন ঃ "এ হাদীস যে ক'টি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে সব কটিই দুর্বল। কোন কোন সূত্রে এটি "মরফূ" হাদীস। সেখানে বর্ণনাকারী হচ্ছে সুফিয়ান ইবনে ওয়াকী' ও ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ। এরা উভয়ই অনির্ভরযোগ্য। আবার কোন কোন সূত্রে এটি "মুরসাল" হাদীস। কিন্তু এ ধরনের বিষয়ে মুরসাল হাদীসের ওপর ভরসা করা যেতে পারে না।" এ ছাড়া একজন মজলুম ব্যক্তি নিজের মুক্তির জন্য পার্থিব পন্থা অবলম্বন করাকে আল্লাহ থেকে গাফলতির ও তাঁর প্রতি অনির্ভরশীলতার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হবে—একথা যুক্তির দিক দিয়েও গ্রহণযোগ্য নয়।

৩৬. মাঝখানে কারাগার জীবনের কয়েক বছরের অবস্থা বাদ দিয়ে এখন হযরত ইউসুফের পার্থিব উন্নতির সূচনা লগ্নের সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেয়া হয়েছে।

৩৭. বাইবেল ও তালমূদের বর্ণনা মতে এ স্বপ্ন দেখার পর বাদশাহ বড়ই পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন। তিনি সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে নিজের রাজ্যের বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল গোষ্ঠী, জ্যোতিষী, গণক, ধর্মীয় নেতা ও যাদুকরদের একত্র করে তাদের সবার সামনে এ স্বপ্ন পেশ করেছিলেন।

৩৮. কুরআন এখানে ঘটনার আলোচনা সংক্ষেপে সেরে দিয়েছে। বাইবেল ও তালমূদে এর যে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে (বস্তুত যুক্তির আলোকে এ বিবরণই সঠিক মনে হয়।) তা হচ্ছে এই ঃ মদ পরিবেশকদের সরদার ইউসুফ আলাইহিস সালামের অবস্থা বাদশাহর কাছে বর্ণনা করে এবং এ সংগে জেলখানায় তাদের স্বপ্ন এবং হযরত ইউসুফ (আ) তার যে তা'বীর করেছিলেন আর এ তা'বীর যেভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে তা সবই তার সামনে তুলে ধরে। শেষে সে বাদশাহর কাছে আবেদন করে, আমি জেলখানায় গিয়ে তাঁর কাছ থেকে এর তা'বীর জিজ্ঞেস করে আসবো, আমাকে সেখানে যাবার অনুমতি দেয়া হোক।

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ
إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا
قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ
عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾

ইউসুফ বললো, "তোমরা সাত বছর পর্যন্ত লাগাতার চাষাবাদ করতে থাকবে। এ সময় তোমরা যে ফসল কাটবে তা থেকে সামান্য পরিমাণ তোমাদের আহারের প্রয়োজনে বের করে নেবে এবং বাদবাকি সব শীষ সমেত রেখে দেবে। তারপর সাতটি বছর আসবে বড়ই কঠিন। এ সময়ের জন্য তোমরা যে শস্য জমা করবে তা সমস্ত এ সময়ে খেয়ে ফেলা হবে। যদি কিছু বেঁচে যায় তাহলে তা হবে কেবলমাত্র সে টুকুই যা তোমরা সংরক্ষণ করবে। এরপর আবার এক বছর এমন আসবে যখন রহমতের বৃষ্টি ধারার মাধ্যমে মানুষের আবেদন পূর্ণ করা হবে এবং তারা রস নিংড়াবে।[৪১]

৩৯. মূল ভাষ্যে صديق শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি আরবী ভাষায় সর্বোচ্চ মানের সততা ও সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, কারাগারে অবস্থানকালে এ ব্যক্তি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের পবিত্র জীবন ও চরিত্র দ্বারা কী বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পরও এ প্রভাব কেমন অটুট ছিল। "সিদ্দীক" শব্দটির আরো বেশী ব্যাখ্যা জানার জন্য দেখুন সূরা নিসার ৯৯ টীকা।

৪০. অর্থাৎ তারা আপনার মর্যাদা ও মূল্য বুঝতে পারবে। তারা অনুভব করতে পারবে কত উঁচুদরের ব্যক্তিত্বকে তারা কোথায় আটকে রেখেছে। এভাবে আপনার সাথে কারাবাসের সময় আমি যে ওয়াদা করেছিলাম তা পূর্ণ করার সুযোগ আমি পেয়ে যাবো।

৪১. মূল ভাষ্যে يعصرون শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক মানে হচ্ছে 'নিংড়ানো'। এখানে এর মাধ্যমে পরবর্তীকালের চতুরদিকের এমন শষ্য শ্যামল তরতাজা পরিবেশ বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যা দুর্ভিক্ষের পর রহমতের বৃষ্টিধারা ও নীলনদের জোয়ারের পানি সিঞ্চনের মাধ্যমে সৃষ্টি হবে। জমি ভালোভাবে পানিসিক্ত হলে তেল উৎপাদনকারী বীজ, রসাল ফল ও অন্যান্য ফলফলাদি বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং ভালো ঘাস খাওয়ার কারণে গৃহপালিত পশুরাও প্রচুর পরিমাণে দুধ দেয়।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এ তা'বীরে শুধুমাত্র বাদশাহর স্বপ্নের অর্থ বর্ণনা করেই ক্ষান্ত থাকেননি বরং তিনি এ সংগে প্রাচুর্যের প্রথম সাত বছরে আসন্ন দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা ও শস্য সংরক্ষণ করার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে তাও বলে দিয়েছেন। এ ছাড়াও তিনি দুর্ভিক্ষের পরে সুদিন আসার সুখবরও দিয়েছেন অথচ বাদশাহর স্বপ্নে এর কোন উল্লেখ ছিল না।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ
رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي
بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ۚ قُلْنَ
حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ ۚ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ
حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥١﴾
ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ
الْخَائِنِينَ ﴿٥٢﴾

৭ রুকূ'

বাদশাহ বললো, "তাকে আমার কাছে আনো।" কিন্তু বাদশাহর দূত যখন ইউসুফের কাছে পৌঁছুল তখন সে বললো,[৪২] তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো, যে মহিলারা হাত কেটে ফেলেছিল তাদের ব্যাপারটা কি? আমার রব তো তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে অবগত।"[৪৩] একথায় বাদশাহ সেই মহিলাদেরকে জিজ্ঞেস করলো,[৪৪] "তোমরা যখন ইউসুফকে অসৎকাজে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিলে তোমাদের তখনকার অভিজ্ঞতা কি?" সবাই একবাক্যে বললো, "আল্লাহর কী অপার মহিমা! আমরা তার মধ্যে অসৎ প্রবণতার গন্ধই পাইনি।" আযীযের স্ত্রী বলে উঠলো, "এখন সত্য প্রকাশ হয়ে গেছে। আমিই তাকে ফুসলাবার চেষ্টা করেছিলাম, নিসন্দেহে সে একদম সত্যবাদী।"[৪৫]

(ইউসুফ বললো :)[৪৬] "এ থেকে আমার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আযীয জানতে পারুক, আমি তার অবর্তমানে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং আল্লাহ বিশ্বাস ঘাতকতাকারীদের চক্রান্ত সফল করেন না।

৪২. এখান থেকে শুরু করে বাদশাহর সাথে সাক্ষাত পর্যন্ত আলোচনাটি এ কাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ সম্পর্কে যাকিছু কুরআনে বর্ণিত হয়েছে তার কোন উল্লেখ বাইবেল ও তালমূদে নেই। বাইবেলে বলা হয়েছে, বাদশাহর ডাকে হযরত ইউসুফ (আ) সংগে সংগেই চলে আসার জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি ক্ষৌরকর্ম শেষ করলেন, পোশাক বদলালেন এবং রাজ দরবারে হাযির হয়ে গেলেন। তালমূদ এর চাইতেও নিকৃষ্ট ভংগীতে

এ ঘটনাকে পেশ করেছে। তার বর্ণনামতে, "বাদশাহ তার কর্মচারীদেরকে হুকুম দিলেন, ইউসুফকে আমার সামনে হাজির করো এবং এ সংগে এও নির্দেশ দিলেন যে, দেখো এমন কোন কাজ করো না যাতে ছেলেটি ভয় পেয়ে যায় এবং সঠিক তা'বীর দিতে না পারে। কাজেই রাজ কর্মচারীরা হযরত ইউসুফকে কারাগার থেকে বের করলো। তাঁর ক্ষৌরকর্ম সম্পন্ন করলো, পোশাক বদলালো এবং দরবারে নিয়ে এলো। বাদশাহ নিজের সিংহাসনে বসেছিলেন। সেখানে হীরা, মুক্তা, মনি–মাণিক্যের চোখ ধাঁধানো দৃশ্য ও দরবারের শান–শওকত দেখে ইউসুফ হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং তাঁর দৃষ্টি বিক্ষারিত হয়ে গেলো। বাদশাহর সিংহাসনের সাতটি সিঁড়ি ছিল। নিয়ম ছিল, যখন কোন সম্মানিত ও মর্যাদাশালী ব্যক্তি কিছু বলতে চাইতেন তখন ছয়টি সিঁড়ি চড়ে ওপরে যেতেন এবং বাদশাহর সাথে কথা বলতেন। আর যখন নিম্ন শ্রেণীর কোন ব্যক্তিকে বাদশাহর সাথে কথা বলার জন্য ডাকা হতো তখন সে নিচে দাঁড়িয়ে থাকতো এবং বাদশাহ তৃতীয় সিঁড়িতে নেমে এসে তার সাথে কথা বলতেন। এ নিয়ম মোতাবেক ইউসুফ নীচে দাঁড়িয়ে ভূমি চুম্বন করে বাদশাহকে সালামী দিলেন এবং বাদশাহ তৃতীয় সিঁড়িতে নেমে এসে তাঁর সাথে কথা বললেন।" এ চিত্রে বনী ইসরাঈল তার মহান মর্যাদাশালী পয়গম্বরকে যেভাবে হেয় করে পেশ করেছে তা চোখের সামনে রেখে কুরআন তাঁর কারাগার থেকে বের হওয়া এবং বাদশাহর সাথে সাক্ষাত করার ঘটনাকে যে মর্যাদাপূর্ণ ও গৌরবময় ভংগীতে পেশ করেছে তা একবার পর্যালোচনা করে দেখুন। এখন একজন বিবেকবান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি এ ফায়সালা করতে পারেন যে, এ দু'টি চিত্রের মধ্যে কোন্ চিত্রটি নবুওয়াতের মর্যাদার সাথে বেশী সামঞ্জস্যশীল। তাছাড়া সাধারণ বিচার বুদ্ধির দৃষ্টিতেও একথাটি ত্রুটিপূর্ণ মনে হয় যে, বাদশাহর সাথে সাক্ষাত করা পর্যন্ত যদি হযরত ইউসুফ এতই নিকৃষ্ট মর্যাদার অধিকারী থেকে থাকেন যেমন তালমূদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, তাহলে স্বপ্নের তা'বীর শুনার পর অকস্মাত তাঁকে একেবারে সমগ্র রাজ্যের সার্বিক ক্ষমতার অধিকারী করে দেয়া হলো কেমন করে? একটি উন্নত ও সুসভ্য দেশে এতবড় মর্যাদা মানুষ তখনই লাভ করে যখন সে লোকদের কাছে নিজের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে দেয়। কাজেই বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়েও বাইবেল ও তালমূদের তুলনায় কুরআনের বর্ণনাই বাস্তবতার সাথে বেশী সামঞ্জস্যশীল মনে হয়।

৪৩. অর্থাৎ আমার রব আল্লাহ তো আগে থেকেই জানেন যে, আমি নিরপরাধ। কিন্তু তোমাদের রব অর্থাৎ বাদশাহেরও আমার মুক্তির পূর্বে যে কারণে আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে সে ব্যাপারটির পুরোপুরি অনুসন্ধান করে নেয়া উচিত। কারণ আমি কোন সন্দেহ ও অপবাদের কলংক মাথায় নিয়ে মানুষের সামনে যেতে চাই না। আমাকে মুক্তি দিতে চাইলে আগে আমি যে নিরপরাধ ছিলাম একথাটি সর্বসমক্ষে প্রমাণিত হওয়া উচিত। আসল অপরাধী ছিল তোমাদের রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। তারা নিজেদের স্ত্রীদের অসচ্চরিত্রতার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে আমার নিরপরাধ সত্তা ও নিষ্কলংক চরিত্রের ওপর।

হযরত ইউসুফ (আ) তাঁর এ দাবীকে যে ভাষায় পেশ করেছেন তা থেকে সুস্পষ্টভাবে একথা প্রকাশিত হয় যে, আযীযের স্ত্রীর ভোজের মজলিসে যে ঘটনা ঘটেছিল সে সম্পর্কে মিসরের বাদশাহ পুরোপুরি অবগত ছিলেন। বরং সেটি এমনি একটি বহুল প্রচারিত ঘটনা ছিল যে, সেদিকে কেবলমাত্র একটি ইংগিতই যথেষ্ট ছিল।

তারপর এ দাবীতে হযরত ইউসুফ (আ) আযীযের স্ত্রীকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র যে মহিলাগুলো আংগুল কেটে ফেলেছিল তাদের ব্যাপারটি উত্থাপন করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। এটি তাঁর চরম ভদ্রতা ও উন্নত হৃদয়বৃত্তির আর একটি প্রমাণ। আযীযের স্ত্রী তাঁর সাথে যে পর্যায়ের অসদ্ব্যবহার করে থাকুক না কেন তবুও তার স্বামী তাঁর উপকার করেছিলেন। তাই তাঁর ইজ্জত-আবরুর ওপর হামলা করে কোন কথা তিনি বলতে চাননি।

৪৪. সম্ভবত শাহীমহলে এ মহিলাদেরকে ডেকে এনে এ জবানবন্দী নেয়া হয়েছিল। আবার এও হতে পারে যে, বাদশাহ নিজের কোন বিশেষ বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পাঠিয়ে প্রত্যেকের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে এ স্বীকারোক্তি আদায় করেছিলেন।

৪৫. অনুমান করা যেতে পারে, এ স্বীকারোক্তিগুলো কিভাবে আট নয় বছর আগের ঘটনাবলীকে আবার নতুন করে তরতাজা করে দিয়েছিল, কিভাবে হযরত ইউসুফের ব্যক্তিত্ব কারাজীবনের দীর্ঘকালীন বিস্মৃতির পর আবার অকস্মাত বিপুলভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, কিভাবে মিসরের সমস্ত অভিজাত, মর্যাদাশালী ও মধ্যবিত্ত সমাজে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেও তাঁর নৈতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। ওপরে বাইবেল ও তালমূদের বরাত দিয়ে একথা বলা হয়েছে যে, বাদশাহ সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে সারা দেশের জ্ঞানী-গুণী, আলেম ও পীরদের একত্র করেছিলেন এবং তারা সবাই তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে অক্ষম হয়েছিল। এরপর হযরত ইউসুফ (আ) এর ব্যাখ্যা করেছিলেন। এ ঘটনার ফলে সারা দেশের জনতার দৃষ্টি আগে থেকেই তাঁর প্রতি নিবদ্ধ হয়েছিল। তারপর বাদশাহর তলবনামা পেয়ে যখন তিনি জেলখানা থেকে বাইরে আসতে অস্বীকার করলেন তখন সমগ্র দেশবাসী অবাক হয়ে গিয়েছিল যে, এ আবার কেমন অদ্ভুত প্রকৃতির উচ্চ মনোবল সম্পন্ন মানুষ, যাকে আট নয় বছরের কারাবাসের পর বাদশাহ নিজেই মেহেরবানী করে ডাকছেন এবং তারপরও তিনি ব্যাকুল চিত্তে দৌড়ে আসছেন না! তারপর যখন তারা ইউসুফের নিজের কারামুক্তির এবং বাদশাহর সাথে দেখা করতে আসার জন্য পেশকৃত শর্তাবলী শুনলো তখন সবার দৃষ্টি এ অনুসন্ধান ও তদন্তের ফলাফলের প্রতি কেন্দ্রীভূত হয়ে রইল। এরপর যখন লোকেরা এর ফলাফল শুনলো তখন দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই বলে বাহ্‌বা দিল যে, আহা, এ ব্যক্তি কেমন পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবন ও চরিত্রের অধিকারী! কাল যারা নিজেদের সমবেত প্রচেষ্টায় তাঁকে কারাগারে পাঠিয়েছিল আজ তাঁর চারিত্রিক নিষ্কলুষতার পক্ষে তারাই সাক্ষ দিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে একথা ভালোভাবেই উপলব্ধি করা যায় যে, সে সময় হযরত ইউসুফের উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠার জন্য কেমন অনুকূল পরিবেশ তৈরী হয়ে গিয়েছিল। এরপর বাদশাহর সাথে সাক্ষাতের সময় হযরত ইউসুফ হঠাৎ কেমন করে তাঁকে দেশের অর্থ-সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব দান করার দাবী জানিয়েছিলেন এবং বাদশাহ কেন নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করে নিয়েছিলেন একথা আর মোটেই বিস্ময়কর ঠেকে না। ব্যাপার যদি শুধু এতটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো যে কারাগারের একজন বন্দী বাদশাহর একটি স্বপ্নের তা'বীর বলে দিয়েছিলেন তাহলে এ জন্য তিনি বড়জোর কোন পুরস্কারের এবং কারাগার থেকে মুক্তিলাভের অধিকারী হতে পারতেন। কিন্তু শুধুমাত্র এতটুকুন কথায় তিনি বাদশাহকে বলবেন "আমাকে দেশের যাবতীয় অর্থ-সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব দান করো" এবং বাদশাহ বলে দেবেন "নাও, সবকিছু তোমার জন্য হাযির"—এটা যথেষ্ট হতে পারতো না।

৪৬. একথা সম্ভবত হযরত ইউসুফ তখনই বলে থাকবেন যখন কারাগারে তাঁকে তদন্তের ফলাফল জানিয়ে দেয়া হয়ে থাকবে। ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে কাসীরের মতো বড় বড় মুফাস্‌সিরসহ আরো কোন কোন তাফসীরকার এ বাক্যটিকে হযরত ইউসুফের নয় বরং আযীযের স্ত্রীর বক্তব্যের অংশ হিসেবে গণ্য করেছেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে, এ বাক্যটি আযীযের স্ত্রীর উক্তির সাথে সংযুক্ত এবং মাঝখানে এমন কোন শব্দ নেই যা থেকে একথা মনে করা যেতে পারে যে, انه لمن الصادقين এ এসে আযীযের স্ত্রীর কথা শেষ হয়ে গেছে এবং পরবর্তী কথা হযরত ইউসুফ বলেছেন। তাঁরা বলেন, দু'টি লোকের কথা যদি পরস্পরের সাথে সংলগ্ন থাকে এবং এটা অমুকের কথা ও ওটা অমুকের কথা—এ বিষয়টি যদি সুস্পষ্ট না থাকে তাহলে এ অবস্থায় অবশ্যি এমন কোন চিহ্ন থাকা উচিত যা উভয় কথার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। কিন্তু এখানে এ ধরনের কোন পার্থক্য চিহ্ন নেই। কাজেই একথা মেনে নিতে হবে যে الئن حصحص الحق থেকে শুরু করে ان ربى غفور رحيم পর্যন্ত সম্পূর্ণ বক্তব্যটি আযীযের স্ত্রীর। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি, এ বিষয়টি কেমন করে ইবনে তাইমিয়ার মতো সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিরও দৃষ্টির আগোচরে থেকে গেলো যে, কথা বলার ধরন ও ভংগী নিজেই একটি বড় পার্থক্য চিহ্ন এবং এর উপস্থিতিতে আর কোন পার্থক্য চিহ্নের প্রয়োজনই হয় না। প্রথম বাক্যটি অবশ্যি আযীযের স্ত্রীর মুখে সাজে কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটিও কি তার মুখে খাপ খায়? দ্বিতীয় বাক্যের প্রকাশভংগী তো পরিষ্কার জানাচ্ছে যে, আযীযের স্ত্রী নয় হযরত ইউসুফই তার প্রবক্তা। এ বাক্যে যে সৎহৃদয়বৃত্তি, উচ্চ মনোভাব, বিনয় ও আল্লাহভীতি সোচ্চার তা নিজেই সাক্ষ দিচ্ছে যে, তা এমন এক নারীর কণ্ঠে উচ্চারিত হতে পারে না যে কণ্ঠে ইতিপূর্বে هيت لك (এসে যাও) উচ্চারিত হয়েছিল, যে কণ্ঠ থেকে ইতিপূর্বে বের হয়েছিল ما جزاء من اراد باهلك سوء (যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীকে কুকর্মে লিপ্ত করতে চায় তার শাস্তি কি?) এর মতো মিথ্যা ভাষণ এবং যে কণ্ঠে প্রকাশ্য মাহফিলে لئن لم يفعل ما امره ليسجنن (যদি সে আমার কথা মতো কাজ না করে তাহলে তাকে কারাগারে পাঠানো হবে)–এর মতো হুমকি উচ্চারিত হয়েছিল। এমন ধরনের পবিত্র বাক্য কেবলমাত্র এমনি এক কণ্ঠে উচ্চারিত হতে পারতো যে কণ্ঠে ইতিপূর্বে معاذ الله انه ربى احسن مثواى (আল্লাহর পানাহ চাই, তিনি আমার রব, তিনি আমাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন) এ ধরনের সকৃতজ্ঞ বাণী উচ্চারিত হয়েছিল, যে কণ্ঠ ইতিপূর্বে رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِىْ اِلَيْهِ (হে আমার রব! এরা আমাকে যে পথে চলার জন্য ডাকছে তার চেয়ে কারাগার আমার কাছে ভালো।)–এর মতো সৎপথে অটল থাকার দৃঢ় মনোবৃত্তির ঘোষণা দিয়েছিল এবং যে কণ্ঠ ইতিপূর্বে اِلَّا تَصْرِفْ عَنِّىْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ (হে আল্লাহ! যদি তুমি আমাকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে উদ্ধার না করো তাহলে আমি তাদের জালে আটকে যাবো)–এর মতো সমর্পিত প্রাণ বান্দার আকুতি ধ্বনিত হয়েছিল। এ ধরনের পবিত্র বাণীকে সত্যনিষ্ঠ–সত্যবাদী ইউসুফের পরিবর্তে আযীযের স্ত্রীর উক্তি বলে মেনে নেয়া ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত এমন কোন আলামত বা চিহ্ন না পাওয়া যায় যা থেকে প্রমাণ হয় এ পর্যায়ে পৌঁছে আযীযের স্ত্রী তাওবা করে ঈমান এনেছিল এবং নিজের প্রবৃত্তি ও আচরণ সংশোধন করার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এমন কোন আলামত ও নিদর্শন পাওয়া যায় না।

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىْ ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ
رَبِّىْ ۚ إِنَّ رَبِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥٣﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِىْ بِهٖٓ أَسْتَخْلِصْهُ
لِنَفْسِىْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ أَمِيْنٌ ﴿٥٤﴾ قَالَ
اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٥﴾

আমি নিজের নফ্‌সকে দোষমুক্ত করছি না। নফ্‌স তো খারাপ কাজ করতে প্ররোচিত করে, তবে যদি কারোর প্রতি আমার রবের অনুগ্রহ হয় সে ছাড়া। অবশ্যি আমার রব বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।"

বাদশাহ বললো, "তাকে আমার কাছে আনো, আমি তাকে একান্তভাবে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেব।"

ইউসুফ যখন তার সাথে আলাপ করলো, সে বললো, "এখন আপনি আমাদের এখানে সম্মান ও মর্যদার অধিকারী এবং আপনার আমানতদারীর ওপর পূর্ণ ভরসা আছে।[৪৭] ইউসুফ বললো, "দেশের অর্থ-সম্পদ আমার হাতে সোপর্দ করুন। আমি সংরক্ষণকারী এবং জ্ঞানও রাখি।[৪৭(ক)]

৪৭. এটা যেন বাদশাহর পক্ষ থেকে এ মর্মে একটি সুস্পষ্ট ইংগিত ছিল যে, আপনার হাতে যে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ সোপর্দ করা যেতে পারে।

৪৭(ক). এর আগে যেসব আলোচনা হয়েছে তার আলোকে পর্যালোচনা করলে একথা পরিষ্কার বুঝা যাবে যে, কোন পদলোভী ব্যক্তি বাদশাহর ইশারা পাওয়ার সাথে সাথেই যেমন কোন পদলাভের জন্য আবেদন করে বসে এটি তেমনি ধরনের কোন চাকরির আবেদন ছিল না। আসলে এটি ছিল একটি বিপ্লবের দরজা খোলার জন্য সর্বশেষ আঘাত। হযরত ইউসুফের নৈতিক শক্তির বলে বিগত দশ-বারো বছরের মধ্যে এ বিপ্লব ক্রমবিকাশ লাভ করে আত্মপ্রকাশ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল এবং এখন এর দরজা খোলার জন্য শুধুমাত্র একটি হাল্‌কা আঘাতের প্রয়োজন ছিল। হযরত ইউসুফ (আ) একটি সুদীর্ঘ ধারাবাহিক পরীক্ষার অংগন অতিক্রম করে আসছিলেন। কোন অজ্ঞাত স্থানে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। বরং বাদশাহ থেকে শুরু করে মিসরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই এ সম্পর্কে অবগত ছিল। এসব পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি একথা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, আমানতদারী, সততা, ধৈর্য, সংযম, উদারতা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শীতার ক্ষেত্রে অন্তত সমকালীন লোকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর ব্যক্তিত্বের এ গুণগুলো এমনভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল যে, এগুলো অস্বীকার করার সাধ্য কারোর ছিল না। দেশবাসী মুখে এগুলোর পক্ষে সাক্ষ দিয়েছিল। তাদের হৃদয়

এগুলোর দ্বারা বিজিত হয়েছিল। বাদশাহ নিজেই এগুলোর সামনে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এখন তাঁর "সংরক্ষণকারী" ও "জ্ঞানী" হওয়া শুধুমাত্র একটি দাবীর পর্যায়ভুক্ত ছিল না বরং এটি ছিল একটি প্রমাণিত ঘটনা। সবাই এটা বিশ্বাস করতো। এখন শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কর্তৃত্ব পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার ক্ষেত্রে হযরত ইউসুফের সম্মতিটুকুই বাকি ছিল। বাদশাহ, তাঁর মন্ত্রী পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণ একথা ভালোভাবেই জেনেছিলেন যে, তিনি ছাড়া এ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করার মতো আর দ্বিতীয় কোন যোগ্য ব্যক্তিত্বই নেই। কাজেই নিজের এ উক্তির সাহায্যে তিনি এ সম্মতিটুকুরই প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন মাত্র। তাঁর কণ্ঠে এ দাবীটুকু উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই বাদশাহ ও তাঁর রাজ পরিষদ যেভাবে দু'হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করে নিয়েছেন তা একথাই প্রমাণ করে যে, ফল পুরোপুরি পেকে গিয়েছিল এবং তা ছিঁড়ে পড়ার জন্য শুধুমাত্র একটা ইশারার অপেক্ষায় ছিল। (তালমূদের বর্ণনামতে হযরত ইউসুফকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দান করার ফায়সালাটি কেবল বাদশাহ একাই করেননি। বরং সমগ্র রাজপরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর পক্ষে রায় দিয়েছিল।

হযরত ইউসুফ (আ) এই যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব চান এবং যা তাকে দেয়া হয়, এটা কোন্ ধরনের ছিল? অজ্ঞ লোকেরা এখানে خزائن ارض (দেশের ধন-সম্পদ) শব্দ এবং পরবর্তী পর্যায়ে অগ্রসর হয়ে খাদ্য বন্টনের ঘটনাবলীর উল্লেখ দেখে মনে করেন সম্ভবত তিনি ধনভাণ্ডারের কর্তা, অর্থ বিভাগীয় কর্মকর্তা, দুর্ভিক্ষ কমিশনার, অর্থমন্ত্রী অথবা খাদ্য মন্ত্রী ধরনের একটা কিছু ছিলেন। কিন্তু কুরআন, বাইবেল ও তালমূদের সম্মিলিত সাক্ষ হচ্ছে এই যে, আসলে ইউসুফকে মিসর রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্বের আসনে (রোমীয় পরিভাষায় ডিকটেটর) অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁকে দান করা হয়েছিল। কুরআন বলছে, হযরত ইয়াকুব (আ) যখন মিসরে পৌঁছলেন তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম সিংহাসনে বসেছিলেন ورفع ابويه على العرش এবং তিনি নিজের পিতামাতাকে তাঁর পাশে সিংহাসনে বসালেন)। হযরত ইউসুফের মুখ নিঃসৃত এ বাণী কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে : "হে আমার রব! তুমি আমাকে বাদশাহী দান করেছো।" (رب قد اتيتنى من الملك) আবার আল্লাহ মিসরে তাঁর কর্তৃত্বের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করছেন যেন সমগ্র মিসর তাঁর অধীনে ছিল (يتبوا منها حيث يشاء) অন্যদিকে বাইবেল সাক্ষ দিচ্ছে :

"তুমিই আমার বাটির অধ্যক্ষ হও, আমার সমস্ত প্রজা তোমার বাক্য শিরোধার্য করিবে, কেবল সিংহাসনে আমি তোমা হইতে বড় থাকিব।"..... দেখো, আমি তোমাকে সমস্ত মিসর দেশের উপরে নিযুক্ত করিলাম।.....তোমার আজ্ঞা ব্যতিরেকে সমস্ত মিসর দেশে কোন লোক হাত কি পা তুলিতে পারিবে না। আর ফেরাউন যোসেফের নাম সাফনৎ পানেহ (দুনিয়ার মুক্তিদাতা) রাখিলেন।" (আদি পুস্তক ৪১ : ৪০-৪৫)

আবার তালমূদ বলছে, ইউসুফের ভাইয়েরা মিসর থেকে ফিরে গিয়ে মিসরের শাসন-কর্তার (ইউসুফ) প্রশংসা করে বলে :

"দেশের অধিবাসীদের ওপর তিনি সর্বোচ্চ কর্তৃত্বশালী। তাঁর হুকুমে তারা বের হয় এবং তাঁর হুকুমে প্রবেশ করে তাঁর কণ্ঠ সারা দেশ শাসন করে। কোন ব্যাপারেই তাঁর ফেরাউনের অনুমতির প্রয়োজন হয় না।"

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, হযরত ইউসুফ কি উদ্দেশ্যে এ কর্তৃত্ব চেয়েছিলেন? তিনি কি একটি কাফের সরকারের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রচলিত কুফরী নীতি ও আইনের ভিত্তিতেই পরিচালনা করার জন্য কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা চেয়েছিলেন? অথবা তাঁর সামনে এ লক্ষ্য ছিল যে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব লাভ করার পর দেশের তামাদ্দুনিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইসলামী নীতির ভিত্তিতে ঢেলে সাজাবেন? এর সবচেয়ে চমৎকার জবাব আল্লামা যামাখ্‌শারী তাঁর তাফসীর "কাশ্‌শাফ" গ্রন্থে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন :

"হযরত ইউসুফ اجعلنى على خزائن الارض বলেছেন। একথা বলার পেছনে তাঁর কেবল এতটুকুই উদ্দেশ্য ছিল যে, তাঁকে আল্লাহর বিধান জারি ও সত্য প্রতিষ্ঠা করা এবং ন্যায় ও ইনসাফের সুফল চতুরদিকে ছড়িয়ে দেবার সুযোগ দেয়া হোক। আর যেসব কাজের জন্য নবীদেরকে পাঠানো হয়ে থাকে সেগুলো সম্পন্ন করার জন্য তিনি শক্তি অর্জন করবেন। তিনি রাজত্বের লোভে বা কোন বৈষয়িক লালসার বসবর্তী হয়ে এ দাবী করেননি। বরং তিনি ছাড়া আর কেউ এ কাজ করতে পারবে না একথা জেনেই এ দাবী করেছিলেন।"

আর সত্যি বলতে কি, এ প্রশ্নটি আসলে অন্য একটি প্রশ্নের জন্ম দেয়। সেটি অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক প্রশ্ন। সেটি হচ্ছে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নবীই ছিলেন কি না? যদি নবী থেকে থাকেন তাহলে কুরআন থেকে কি আমরা পয়গম্বরীর এ ধারণা লাভ করি যে, ইসলামের আহবায়ক নিজেই কুফরী ব্যবস্থাকে কাফেরী পদ্ধতিতে পরিচালনা করার জন্য নিজের শক্তি ও যোগ্যতা পেশ করছেন? বরং এ প্রশ্ন শুধু এখানেই শেষ হয়ে যায় না, এর চেয়েও আরো অনেক বেশী কঠিন ও নাজুক অন্য একটি প্রশ্নেরও জন্ম দেয়। অর্থাৎ হযরত ইউসুফ একজন সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন কি না? যদি সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি হয়ে থেকে থাকেন তাহলে একজন সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি কি এ ধরনের কাজ করে থাকেন যে, কারাগারে অবস্থানকালে এ প্রশ্নের মাধ্যমে তাঁর নবুওয়াতের দাওয়াতের সূচনা করেন : "অনেক প্রভু ভালো অথবা একজন আল্লাহ তিনি সবার ওপর বিজয়ী" এবং বারংবার মিসরবাসীদের কাছে একথা সুস্পষ্ট করে দেন যে, মিসরের বাদশাহও তোমাদের এসব বিভিন্ন মনগড়া প্রভুদের একজন আর এ সংগে পরিষ্কারভাবে নিজের মিশনের এ মৌলিক বিশ্বাসটিও বর্ণনা করে দেন যে, "শাসন কর্তৃত্বের অধিকার এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নেই।" কিন্তু যখন বাস্তব পরীক্ষার সময় আসে তখন এ ব্যক্তিই আবার হয়ে যান মিসরের বাদশাহর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার খাদেম বরং ব্যবস্থাপক, সংরক্ষক ও পৃষ্ঠপোশক, যার মৌলিক আদর্শই ছিল, "শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহর জন্য নয়, বাদশাহর জন্য নির্ধারিত?"

আসলে এ অংশের ব্যাখ্যায় পতন যুগের মুসলমানরা অনেকটা তেমনি ধরনের মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন যা এক সময় ইহুদিদের বৈশিষ্ট ছিল। ইহুদীদের অবস্থা ছিল এই যে, অতীত ইতিহাসের যেসব মনীষীর জীবন ও চরিত্র তাদেরকে উন্নতির শিখরে আরোহণে উদ্বুদ্ধ করতো, নিজেদের নৈতিক ও মানসিক পতনের যুগে তারা তাদের সবাইকে নিচে নামিয়ে নিজেদের সমপর্যায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। এভাবে তারা নিজেদের জন্য আরো বেশি নিচে নেমে যাবার বাহানা সৃষ্টি করে নিয়েছিল। দুঃখের বিষয় যে, মুসলমানরাও একই ধরনের আচরণ করেছে। তাদের কাফের সরকারের চাকরি করার

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ۚ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۭ
نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٦﴾ وَلَاَجْرُ
الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٧﴾

এভাবে আমি পৃথিবীতে ইউসুফের জন্য কর্তৃত্বের পথ পরিষ্কার করেছি। সেখানে সে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারতো।[৪৮] আমি যাকে ইচ্ছা নিজের রহমতে অভিষিক্ত করি। সৎকর্মশীল লোকদের প্রতিদান আমি নষ্ট করি না। আর যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া সহকারে কাজ করতে থেকেছে আখেরাতের প্রতিদান তাদের জন্য আরো ভালো।[৪৯]

প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এভাবে নিচে নামতে গিয়ে ইসলাম ও তার পতাকাবাহীদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব দেখে তারা লজ্জা পেলো। তাই এ লজ্জা দূর করার এবং নিজেদের বিবেককে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা নিজেদের সাথে এমন মহান মর্যাদাশালী পয়গম্বরকেও কুফরের সেবা করার পংকে নামিয়ে আনলো, যাঁর জীবন তাদেরকে এ শিক্ষা দিচ্ছিল যে, কোন দেশে যদি শুধুমাত্র একজন মর্দে মুমিনও নির্ভেজাল ইসলামী চরিত্র এবং ঈমানী বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার অধিকারী থেকে থাকে, তাহলে সে একাকীই কেবলমাত্র নিজের চরিত্র ও বুদ্ধিমত্তার জোরে সে দেশে ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে। আর মর্দে মুমিনের চারিত্রিক শক্তি (শর্ত হচ্ছে, সে যেন তা ব্যবহার করতে জানে এবং ব্যবহার করার ইচ্ছাও রাখে) সেনাবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই দেশ জয় করতে পারে এবং রাষ্ট্র ও সরকারের ওপর বিজয় লাভ করে।

৪৮. অর্থাৎ এখন সমগ্র মিসর দেশ ছিল তার অধিকারভুক্ত। এ দেশের যে কোন জায়গায় তিনি নিজের আবাস গড়ে তুলতে পারতেন। এ দেশের কোন জায়গায় বসতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁকে বাধা দেবার ক্ষমতা কারো ছিল না। এ দেশের ওপর হযরত ইউসুফের যে পূর্ণাংগ কর্তৃত্ব অধিকার ছিল এ যেন ছিল তার বর্ণনা। প্রথম যুগের মুফাস্‌সিরগণ এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন। ইবনে যায়েদের বরাত দিয়ে আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী তাঁর নিজের তাফসীর গ্রন্থে এর এই অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, "আমি ইউসুফকে মিসরে যা কিছু ছিল সব জিনিসের মালিক বানিয়ে দিলাম। দুনিয়ার সেই এলাকার যেখানেই সে যা কিছু চাইতো করতে পারতো। সেই দেশটির সমগ্র এলাকা তার হাতে সোপর্দ করে দেয়া হয়েছিল। এমনকি সে যদি ফেরাউনকে নিজের অধীনস্থ করে তার ওপর কর্তৃত্ব করতে চাইতো তাহলে তাও করতে পারতো।" আল্লামা তাবারী দ্বিতীয় একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, সেটি মুজাহিদের উক্তি। মুজাহিদ হচ্ছেন তাফসীর শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম। তাঁর মতে মিসরের বাদশাহ হযরত ইউসুফের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿٥٨﴾
وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ
أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿٥٩﴾ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا
كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿٦٠﴾ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا
لَفَاعِلُونَ ﴿٦١﴾ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٢﴾

৮ রুকূ'

ইউসুফের ভাইয়েরা মিসরে এলো এবং তার কাছে হাযির হলো।[৫০] সে তাদেরকে চিনে ফেললো। কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারলো না।[৫১] তারপর সে যখন তাদের জিনিসপত্র তৈরী করালো তখন চলার সময় তাদেরকে বললো, "তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে আমাদের কাছে আনবে, দেখছো না আমি কেমন পরিমাপ পাত্র ভরে দেই এবং আমি কেমন ভালো অতিথিপরায়ণ? যদি তোমরা তাকে না আনো তাহলে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোন শস্য নেই বরং তোমরা আমার ধারেকাছেও এসো না"।[৫২] তারা বললো, "আমরা চেষ্টা করবো যাতে আব্বাজান তাকে পাঠাতে রাযী হয়ে যান এবং আমরা নিশ্চয়ই এমনটি করবো।" ইউসুফ নিজের গোলামদেরকে ইশারা করে বললো, "ওরা শস্যের বিনিময়ে যে অর্থ দিয়েছে তা চুপিসারে ওদের জিনিসপত্রের মধ্যেই রেখে দাও।" ইউসুফ এটা করলো এ আশায় যে, বাড়িতে পৌঁছে তারা নিজেদের ফেরত পাওয়া অর্থ চিনতে পারবে (অথবা এ দানশীলতার ফলে তারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে) এবং বিচিত্র নয় যে, তারা আবার ফিরে আসবে।

৪৯. এখানে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যেন পার্থিব রাষ্ট্র-ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করাকে সততা ও সৎকর্মশীলতার প্রকৃত পুরস্কার ও যথার্থ কাংখিত প্রতিদান মনে না করে বসে। বরং তাকে জেনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ আখেরাতে যে পুরস্কার দেবেন সেটিই সর্বোত্তম প্রতিদান এবং সেই প্রতিদানটিই মুমিনের কাংখিত হওয়া উচিত।

৫০. এখানে আবার সাত আট বছরের ঘটনা মাঝখানে বাদ দিয়ে বর্ণনার ধারাবাহিকতা এমন এক জায়গা থেকে শুরু করে দেয়া হয়েছে যেখান থেকে বনী ইসরাঈলের মিসরে

স্থানান্তরিত হবার এবং হযরত ইয়াকূবের (আ) হারানো ছেলের সন্ধান পাওয়ার সূত্রপাত হয়। মাঝখানে যেসব ঘটনা বাদ দেয়া হয়েছে সেগুলোর সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে, হযরত ইউসুফের (আ) রাজত্বের প্রথম সাত বছর মিসরে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। এ সময় তিনি আসন্ন দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করার জন্য পূর্বাহ্নে এমন সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন যার পরামর্শ তিনি স্বপ্নের তা'বীর বলার সময় বাদশাহকে দিয়েছিলেন। এরপর শুরু হয় দুর্ভিক্ষের যামানা। এ দুর্ভিক্ষ শুধু মিসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। আশেপাশের দেশগুলোতেও দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে। সিরিয়া, ফিলিস্তিন, পূর্ব জর্দান, দক্ষিণ আরব সব জায়গায় চলে দুর্ভিক্ষের অবাধ বিচরণ। এ অবস্থায় হযরত ইউসুফের বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনার কারণে একমাত্র মিসরে দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও খাদ্যশস্যের প্রাচুর্য থাকে। কাজেই প্রতিবেশী দেশগুলোর লোকেরা খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য মিসরে আসতে বাধ্য হয়। এ সময় ফিলিস্তিন থেকে হযরত ইউসুফের (আ) ভাইয়েরা খাদ্যশস্য কেনার জন্য মিসরে পৌঁছে। সম্ভবত হযরত ইউসুফ (আ) খাদ্য ব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তোলেন যার ফলে বাইরের দেশগুলোয় বিশেষ অনুমতিপত্র ছাড়া এবং বিশেষ পরিমাণের বেশী খাদ্য সরবরাহ করা যেতে পারতো না। এ কারণে ইউসুফের ভাইয়েরা যখন বহির্দেশ থেকে এসে খাদ্য সংগ্রহ করতে চেয়েছিল তখন সম্ভবত তাদের বিশেষ অনুমতিপত্র সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়েছিল এবং এভাবেই তাদের হযরত ইউসুফের সামনে হাযির হতে হয়েছিল।

৫১. ইউসুফের ভাইয়েরা যে ইউসুফকে চিনতে পারেনি এটা কোন অযৌক্তিক বা অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। যে সময় তারা তাঁকে কূয়ায় ফেলে দিয়েছিল তখন তিনি ছিলেন সতের বছর বয়সের একটি কিশোর মাত্র। আর এখন তাঁর বয়স আটতিরিশ বছরের কাছাকাছি। এত দীর্ঘ সময়ে মানুষের চেহারার কাঠামোয় অনেক পরিবর্তন আসে। তাছাড়া যে ভাইকে তারা কূয়ায় ফেলে দিয়েছিল সে আজ মিসরের অধিপতি হবে, একথা তারা কল্পনাও করতে পারেনি।

৫২. বর্ণনা সংক্ষেপের কারণে হয়তো কারো পক্ষে একথা অনুধাবন করা কঠিন হয়ে পড়ছে যে, হযরত ইউসুফ যখন নিজের ব্যক্তিত্বকে তাদের সামনে প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন না তখন আবার তাদের বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কথা এলো কেমন করে? এবং তাকে আনার ব্যাপারে তাঁর এত বেশী পীড়াপীড়ি করারই বা অর্থ কি? কেননা, এভাবে তো রহস্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। কিন্তু সামান্য চিন্তা করলে একথা পরিষ্কার বুঝা যায়। সেখানে খাদ্যশস্যের নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা ছিল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য গ্রহণ করতে পারতো। শস্য নেবার জন্য তারা দশ ভাই এসেছিল। কিন্তু তারা তাদের পিতার ও একাদশতম ভাইয়ের অংশও হয়তো চেয়েছিল। একথায় হযরত ইউসুফ (আ) বলে থাকবেন, বুঝলাম তোমাদের পিতার না আসার জন্য যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং তার ওপর চোখে দেখতে পান না, ফলে তাঁর পক্ষে সশরীরে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু ভাইয়ের না আসার কি ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকতে পারে? এমন তো নয় যে, একজন বানোয়াট ভাইয়ের নাম করে অতিরিক্ত শস্য সংগ্রহ করে তোমরা অবৈধ ব্যবসায়ে নামার চেষ্টা করছো? জওয়াবে তারা হয়তো নিজেদের গৃহের অবস্থা বর্ণনা করেছে। তারা বলে থাকবে, সে আমাদের বৈমাত্রেয় ভাই। কিছু অসুবিধার কারণে পিতা তাকে আমাদের সাথে পাঠাতে ইতস্তত করেন। তাদের এসব কথায় হযরত

فَلَمَّا رَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَآ
اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿٦٣﴾ قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ
اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ؕ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّهُوَ اَرْحَمُ
الرّٰحِمِيْنَ ﴿٦٤﴾ وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ؕ
قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا نَبْغِىْ ؕ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا
وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ﴿٦٥﴾ قَالَ
لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِىْ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ
يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٦٦﴾

যখন তারা তাদের বাপের কাছে ফিরে গেলো তখন বললো, "আব্বাজান! আগামীতে আমাদের শস্য দিতে অস্বীকার করা হয়েছে, কাজেই আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা শস্য নিয়ে আসতে পারি এবং অবশ্যি আমরা হেফাজতের জন্য দায়ী থাকবো।" বাপ জবাব দিল, "আমি কি ওর ব্যাপারে তোমাদের ওপর ঠিক তেমনি ভরসা করবো যেমন ইতিপূর্বে তার ভাইয়ের ব্যাপারে করেছিলাম? অবশ্য আল্লাহ সবচেয়ে ভালো হেফাজতকারী এবং তিনি সবচেয়ে বেশী করুণাশীল।" তারপর যখন তারা নিজেদের জিনিসপত্র খুললো, তারা দেখলো তাদের অর্থও তাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। এ দৃশ্য দেখে তারা চিৎকার করে উঠলো, "আব্বাজান, আমাদের আর কী চাই! দেখুন এই আমাদের অর্থও আমাদের ফেরত দেয়া হয়েছে। ব্যস্ এবার আমরা যাবো আর নিজেদের পরিজনদের জন্য রসদ নিয়ে আসবো, নিজেদের ভাইয়ের হেফাজতও করবো এবং অতিরিক্ত একটি উট বোঝাই করে শস্যও আনবো, এ পরিমাণ শস্য বৃদ্ধি অতি সহজেই হয়ে যাবে।" তাদের বাপ বললো, "আমি কখনোই তাকে তোমাদের সাথে পাঠাবো না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে আমার কাছে অংগীকার করবে। এ মর্মে যে তাকে নিশ্চয়ই আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে তবে হাঁ যদি কোথাও তোমরা ঘেরাও হয়ে যাও তাহলে ভিন্ন কথা।" যখন তারা তার কাছে অংগীকার করলো তখন সে বললো, "দেখো, আল্লাহ আমাদের একথার রক্ষক।"

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ
مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا
لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَلَمَّا دَخَلُوْا
مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ؕ مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ
اِلَّا حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ؕ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾

তারপর সে বললো, "হে আমার সন্তানরা! মিসরের রাজধানীতে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না বরং বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করো।[৫৩] কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা থেকে আমি তোমাদের বাঁচাতে পারি না। তাঁর ছাড়া আর কারোর হুকুম চলে না, তাঁর ওপরই আমি ভরসা করি এবং যার ভরসা করতে হয় তাঁর ওপরই করতে হবে।" আর ঘটনাক্ষেত্রে তা-ই হলো, যখন তারা নিজেদের বাপের নির্দেশ মতো শহরে (বিভিন্ন দরজা দিয়ে) প্রবেশ করল তখন তার এ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আল্লাহর ইচ্ছার মোকাবিলায় কোন কাজে লাগলো না। তবে হাঁ, ইয়াকূবের মনে যে একটি খটকা ছিল তা দূর করার জন্য সে নিজের মনমতো চেষ্টা করে নিল। অবশ্যি সে আমার দেয়া শিক্ষায় জ্ঞানবান ছিল কিন্তু অধিকাংশ লোক প্রকৃত সত্য জানে না।[৫৪]

ইউসুফ সম্ভবত বলেছেন, যাক এবারের জন্য তো আমি তোমাদের কথা বিশ্বাস করে পূর্ণ শস্য দিয়ে দিলাম কিন্তু আগামীতে তোমরা যদি তাকে সংগে করে না আনো তাহলে তোমাদের ওপর থেকে আস্থা উঠে যাবে এবং এখান থেকে তোমরা আর কোন শস্য পাবে না। এ শাসক সুলভ হুমকি দেবার সাথে সাথে তিনি নিজের দাক্ষিণ্য ও মেহমানদারীর মাধ্যমে তাদেরকে বশীভূত করার চেষ্টা করেন। কারণ নিজের ছোট ভাইকে দেখার এবং ঘরের অবস্থা জানার জন্য তাঁর মন অস্থির হয়ে পড়েছিল। এটি ছিল ঘটনার একটি সাদামাটা চেহারা। সামান্য একটু চিন্তা-ভাবনা করলে ব্যাপারটি আপনাআপনিই বুঝতে পারা যায়। এ অবস্থায় বাইবেলের আদি পুস্তকের ৪২-৪৩ অধ্যায়ে নানা প্রকার রং চড়িয়ে যে অতিরঞ্জিত কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তার ওপর আস্থা স্থাপন করার কোন প্রয়োজন নেই।

৫৩. এ থেকে অনুমান করা যায়, ইউসুফের পরে তার ভাইকে পাঠাবার সময় হযরত ইয়াকূবের মন কত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। যদিও আল্লাহর প্রতি আস্থা ছিল এবং সবর

ও আত্মসমর্পণের দিক দিয়েও তাঁর স্থান ছিল অনেক উঁচুতে তবুও তো তিনি মানুষই ছিলেন। নানা সন্দেহ ও আশংকা তাঁর মনে জেগে ওঠা বিচিত্র নয় এবং স্বতই এ চিন্তায় তিনি পেরেশান হয়ে গিয়ে থাকবেন যে, আল্লাহই ভালো জানেন এখন এ ছেলের চেহারাও আর দেখতে পাবো কি না। তাই তিনি হয়তো নিজের সাধ্যমত সতর্কতা অবলম্বন করার ক্ষেত্রে কোনপ্রকার ত্রুটি না রাখতে চেয়েছিলেন।

সে সময় যে রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজিত ছিল তার কথা চিন্তা করলেই এক দরজা দিয়ে সকল ভাইয়ের মিসরের রাজধানীতে প্রবেশ না করার এ সতর্কতামূলক পরামর্শটির তাৎপর্য পরিষ্কার বুঝা যেতে পারে। তারা ছিল মিসর সীমান্তের স্বাধীন উপজাতীয় এলাকার বাসিন্দা। বিচিত্র নয় যে, মিসরবাসীরা এ এলাকার লোকদেরকে ঠিক তেমনি সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতো যেমন বৃটিশ শাসনামলে ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসকরা সীমান্ত এলাকার স্বাধীন অধিবাসীদেরকে দেখে এসেছে। হযরত ইয়াকূবের মনে আশংকা জেগে থাকবে, এ দুর্ভিক্ষের দিনে যদি তারা দলবদ্ধ হয়ে সেখানে প্রবেশ করে তাহলে হয়তো তাদেরকে সন্দেহভাজন মনে করা হবে এবং ধারণা করা হবে, তারা এখানে লুটপাট করতে এসেছে। আগের আয়াতে হযরত ইয়াকূবের "তবে যদি তোমাদের ঘেরাও করা হয়" এ উক্তিটি নিজেই এ বিষয়বস্তুর দিকে ইংগিত করছে যে, রাজনৈতিক কারণে এ পরামর্শটি দেয়া হয়েছিল।

৫৪. এর অর্থ হচ্ছে, কৌশল ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার মধ্যে এ যথাযথ ভারসাম্য স্থাপন, যা তোমরা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের উপরোল্লিখিত উক্তির মধ্যে পাও। আসলে আল্লাহর অনুগ্রহে তার সত্যজ্ঞানের যে ধারা বর্ষিত হয়েছিল এ ছিল তারই ফলশ্রুতি। একদিকে উপায় উপকরণের স্বাভাবিক বাধ্যবাধকতার বিধান অনুযায়ী তিনি এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, যা বুদ্ধি, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অবলম্বন করা সম্ভব ছিল। ছেলেদেরকে তাদের প্রথম অপরাধের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভয় দেখান ও সাবধান করে দেন, যাতে তারা পুনর্বার ঐ ধরনের অপরাধ করার সাহস না করে। তাদের কাছ থেকে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের হেফাজত করার জন্য আল্লাহর নামে শপথ নেন এবং তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন অনুভূত হয় তা অবলম্বন করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেন, যাতে নিজেদের সাধ্যমত ব্যবস্থাপনার মধ্যে এমন কোন ত্রুটি থাকতে না দেয়া হয় যার ফলে তারা ঘেরাও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অন্যদিকে প্রতি মুহূর্তে একথা তাঁর সামনে আছে এবং তিনি বারবার একথা প্রকাশও করেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা প্রয়োগের পথে কোন মানবীয় কৌশল বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহর হেফাজতই আসল হেফাজত এবং নিজের কৌশল ও ব্যবস্থাপনার ওপর ভরসা না করে আল্লাহর অনুগ্রহের ওপর ভরসা করা উচিত। যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্যের জ্ঞান রাখে, যে ব্যক্তি একথাও জানে যে, দুনিয়ার জীবনের বাইরের দিকে আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক ব্যবস্থা কোন্ ধরনের প্রচেষ্টা ও কাজ দাবী করে এবং একথাও জানে যে, এ বাহ্যিক দিকের পেছনে যে প্রকৃত সত্য লুকিয়ে আছে তার ভিত্তিতে আসল কার্যকর শক্তি কি এবং তার উপস্থিতিতে নিজের প্রচেষ্টা ও কাজের ওপর মানুষের ভরসা কত বেশী ভিত্তিহীন—একমাত্র সে-ই নিজের কথা ও কাজের মধ্যে এ সঠিক ভারসাম্য কায়েম করতে পারে। একথাটিই অধিকাংশ লোক জানে না। তাদের মধ্য

وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْٓ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا
تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ
فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ﴿٧٠﴾ قَالُوْا
وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ﴿٧١﴾ قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ
جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ
فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ ﴿٧٣﴾ قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ﴿٧٤﴾

৯ রুকূ'

তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছলে সে তার সহোদর ভাইকে নিজের কাছে আলাদা করে ডেকে নিল এবং তাকে বললো, "আমি তোমার সেই (হারানো) ভাই, এখন আর সেসব আচরণের জন্য দুঃখ করো না যা এরা করে এসেছে।"[৫৫]

যখন ইউসুফ তাদের মালপত্র বোঝাই করাতে লাগলো তখন নিজের ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে নিজের পেয়ালা রেখে দিল।[৫৬] তারপর একজন নকীব চীৎকার করে বললো, "হে যাত্রীদল! তোমরা চোর।"[৫৭] তারা পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করলো, "তোমাদের কি হারিয়ে গেছে?" সরকারী কর্মচারী বললো, "আমরা বাদশাহর পানপাত্র পাচ্ছি না," (এবং তাদের জমাদার বললো ঃ) "যে ব্যক্তি তা এনে দেবে তার জন্য রয়েছে পুরস্কার এক উট বোঝাই মাল। আমি এর দায়িত্ব নিচ্ছি।" এ ভাইয়েরা বললো, "আল্লাহর কসম! তোমরা খুব ভালোভাবেই জানো, আমরা এ দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে আসিনি এবং চুরি করার মতো লোক আমারা নই।" তারা বললো, "আচ্ছা, যদি তোমাদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে চোরের কি শাস্তি হবে?"

থেকে যাদের ওপর বাহ্যিক দিকের প্রভাব বেশী পড়ে তারা আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা থেকে গাফেল হয়ে কৌশল ও ব্যবস্থা অবলম্বনকে সবকিছু মনে করে বসে এবং অন্তরনিহিত সত্য যার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে সে জাগতিক কৌশল ও ব্যবস্থা অবলম্বন না করে শুধু মাত্র আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার ভিত্তিতে জীবনের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

৫৫. একুশ বাইশ বছরের ব্যবধানে দু'ভাইয়ের পুনরমিলনের পর যে অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকবে এ বাক্যে তার সম্পূর্ণ চেহারাটাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ)

قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٧٥﴾

তারা জবাব দিল, "তার শাস্তি" যার মালপত্রের মধ্যে ঐ জিনিস পাওয়া যাবে তার শাস্তি হিসেবে তাকেই রেখে দেয়া হবে। আমাদের এখানে তো এটাই এ ধরনের জালেমদের শাস্তির পদ্ধতি।"৫৮

নিজের অবস্থা বর্ণনা করে কোন্ কোন্ অবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি আজকের এ মর্যাদায় পৌঁছেছেন তা বলে থাকবেন। বিন ইয়ামীন বর্ণনা করে থাকবেন তাঁর অন্তরধানের পর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তার সাথে কেমনতর দুর্ব্যবহার করেছে। হযরত ইউসুফ (আ) ভাইকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়ে থাকবেন, এখন থেকে তুমি আমার কাছেই থাকবে, এ জালেমদের খন্নরে তোমাকে আর দ্বিতীয়বার পড়তে দেবো না। সম্ভবত এ সময়ই বিন ইয়ামীনকে মিসরে আটকে রাখার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে এবং প্রয়োজনের খাতিরে এখন তা গোপন রাখতে হবে এ ব্যাপারে আলোচনার পর দু'ভাই একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান।

৫৬. সম্ভবত পেয়ালা রেখে দেবার কাজটা হযরত ইউসুফ (আ) নিজের ভাইয়ের সম্মতি নিয়ে তার জ্ঞাতসারেই করেছিলেন। আগের আয়াতে এ দিকে ইংগিত করা হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ) দীর্ঘকালীন বিচ্ছেদের পর জালেম বৈমাত্রেয় ভাইদের হাত থেকে নিজের সহোদর ভাইকে রক্ষা করতে চাচ্ছিলেন। তাই নিজেও এ জালেমদের সাথে ফিরে না যেতে চেয়ে থাকবেন। কিন্তু হযরত ইউসুফের নিজের পরিচয় প্রকাশ না করে তাকে প্রকাশ্যে আটকে রাখা এবং তার মিসরে থেকে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আর এ অবস্থায় এ পরিচয় প্রকাশ করাটা কল্যাণকর ছিল না। তাই বিন ইয়ামীনকে আটকে রাখার জন্য দু'ভাইয়ের মধ্যে এ পরামর্শ হয়ে থাকবে। যদিও এর মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য ভাইয়ের অপমান অনিবার্য ছিল, কারণ তার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনা হচ্ছিল, কিন্তু পরে উভয় ভাই মিলে আসল ব্যাপারটি জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিলেই এ কলংকের দাগ অতি সহজেই মুছে ফেলা যেতে পারবে।

৫৭. এ আয়াতে এবং পরবর্তী আয়াতগুলোতে কোথাও এ ধরনের কোন ইশারা পাওয়া যায় না, যা থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, হযরত ইউসুফ (আ) নিজের কর্মচারীদেরকে এ গোপন ব্যাপারটি পূর্বাহ্নে অবহিত করেছিলেন এবং তাদেরকে যাত্রীদলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনার ব্যাপারটি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। ঘটনার যে সরল আকৃতিটি সহজেই চোখে ধরা পড়ে তা হচ্ছে এই যে, পেয়ালাটি হয়তো নীরবে রেখে দেয়া হয়েছিল, পরে সরকারী কর্মচারীরা সেটি খুঁজে না পেলে অনুমান করা হয়েছিল, এটা নিশ্চয় সেই কাফেলার অন্তরভুক্ত কোন লোকের কাজ যারা এখানে অবস্থান করেছিল।

৫৮. উল্লেখ্য, এ ভাইয়েরা ছিল ইবরাহিমী পরিবারের সন্তান। কাজেই চুরির ব্যাপারে তারা যে আইনের কথা বলে তা ছিল ইবরাহিমী শরীয়াতের আইন। এ আইন অনুযায়ী চোরের শাস্তি ছিল, যে ব্যক্তির সম্পদ সে চুরি করেছে তাকে তার দাসত্ব করতে হবে।

فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاۤءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَاۤءِ
اَخِيْهِ ۭ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ۭ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ
دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّآ اَنْ يَّشَاۗءَ اللّٰهُ ۭ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاۗءُ ۭ وَفَوْقَ
كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ۝

তখন ইউসুফ নিজের ভাইয়ের আগে তাদের থলের তল্লাশী শুরু করে দিল। তারপর নিজের ভাইয়ের থলের মধ্য থেকে হারানো জিনিস বের করে ফেললো।—এভাবে আমি নিজের কৌশলের মাধ্যমে ইউসুফকে সহায়তা করলাম।[৫৯] বাদশাহর দীন (অর্থাৎ মিসরের বাদশাহর আইন) অনুযায়ী নিজের ভাইকে পাকড়াও করা তার পক্ষে সংগত ছিল না, তবে যদি আল্লাহই এমনটি চান।[৬০] যাকে চাই তার মর্তবা আমি বুলন্দ করে দেই। আর একজন জ্ঞানবান এমন আছে যে প্রত্যেক জ্ঞানবানের চেয়ে জ্ঞানী।

৫৯. এ সমগ্র ধারাবাহিক ঘটনাবলীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত ইউসুফের সমর্থনে সরাসরি কোন্ কৌশলটি অবলম্বন করা হয়েছিল তা অবশ্যি এখানে ভেবে দেখার মতো বিষয়। একথা সুস্পষ্ট যে, পেয়ালা রাখার কৌশলটি হযরত ইউসুফ নিজেই করেছিলেন। এটাও সুস্পষ্ট, সরকারী কর্মচারীদের চুরির সন্দেহে কাফেলাকে আটকানোও একটি নিয়ম মাফিক কাজ ছিল, যা এ ধরনের অবস্থায় সব সরকারী কর্মচারীই করে থাকে। তাহলে আল্লাহর সেই কৌশল কোন্‌টি? ওপরের আয়াতের মধ্যে অনুসন্ধান চালালে এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন জিনিসই এর ক্ষেত্রহিসেবে পাওয়া যেতে পারে না যে, সরকারী কর্মচারীরা নিয়ম বিরোধীভাবে নিজেরাই সন্দেহপূর্ণ অপরাধীদের কাছে চুরির শাস্তি জিজ্ঞেস করলো এবং জবাবে তারাও এমন শাস্তির কথা বললো যা ইবরাহিমী শরীয়াতের দৃষ্টিতে চোরকে দেয়া হতো। এর ফলে দু'টি লাভ হলো। প্রথমত হযরত ইউসুফ ইবরাহিমী শরীয়াতকে কার্যকর করার সুযোগ পেলেন এবং দ্বিতীয়ত নিজের ভাইকে হাজতে পাঠাবার পরিবর্তে তিনি নিজের কাছে রাখতে পারলেন।

৬০. অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ) নিজের একটি ব্যক্তিগত ব্যাপারে মিসরের বাদশাহর আইন কার্যকর করবেন, এটা তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল না। ভাইকে আটকে রাখার জন্য তিনি নিজে যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তার মধ্যে তাঁর জন্য একটি বাধা থেকে গিয়েছিল। অর্থাৎ তিনি ভাইকে আটক করতে পারতেন ঠিকই কিন্তু এ জন্য তাঁকে মিসরের বাদশাহর অপরাধ দণ্ডবিধির আশ্রয় নিতে হতো। আর এটি ছিল তাঁর পয়গম্বরীর মর্যাদা বিরোধী। কারণ তিনি ইসলাম বিরোধী আইনের জায়গায় ইসলামী শরীয়াতের আইন প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যেই দেশের শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়েছেলেন। আল্লাহ চাইলে তাঁর নবীকে এ ধরনের একটি বেমানান ভুলের অবতারণা

করতে দিতে পারতেন। কিন্তু এ কলংক কালিমা তাঁর গায়ে লেগে থাকুক এটা তিনি চাননি। তাই তিনি সরাসরি নিজ ব্যবস্থাপনায় একটি পথ বের করে দিলেন। ঘটনাক্রমে ইউসুফের ভাইদের কাছে চোরের শাস্তি কি হতে পারে তা জিজ্ঞেস করা হলো এবং তারা এ জন্য ইবরাহিমী শরীয়াতের আইন বর্ণনা করলো। ইউসুফের ভাইয়েরা মিসরের নাগরিক না হওয়ার কারণে এ জিনিসটি এদিক দিয়ে একেবারেই যথাযথ ছিল। তারা এসেছিল একটি স্বাধীন এলাকা থেকে। কাজেই তারা যদি তাদের এলাকায় প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী নিজেদের লোককে এমন এক ব্যক্তির দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করতে রাযী থাকে যার সম্পদ সে চুরি করেছে তাহলে এ ক্ষেত্রে আর মিসরীয় দণ্ডবিধির সাহায্য নেবার প্রয়োজনই থাকে না। পরবর্তী দু'টি আয়াতে আল্লাহ এ জিনিসটিকেই নিজের অনুগ্রহ ও তাত্বিক শ্রেষ্ঠত্ব হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি যখন তার মানবিক দুর্বলতার কারণে নিজে কোন পদস্খলনের শিকার হয় তখন আল্লাহ অদৃশ্য থেকে তাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন, তার জন্য এর চেয়ে বড় মর্যাদা আর কি হতে পারে! এ ধরনের উন্নত মর্যাদা একমাত্র তারাই লাভ করতে পারেন যারা নিজেদের প্রচেষ্টা ও কর্মের মাধ্যমে বড় বড় পরীক্ষায় নিজেদের 'মুহসিন' তথা সৎকর্মশীল হওয়া প্রমাণ করে দিয়েছেন। যদিও হযরত ইউসুফ (আ) তাত্বিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, নিজে প্রখর প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে কাজ করতেন, তবুও এ সময় তাঁর জ্ঞানের মধ্যে একটি ফাঁক থেকে গিয়েছিল এবং এমন এক সত্তা এ ফাঁক পূরণ করেছিলেন যিনি সবার চেয়ে বড় জ্ঞানী।

এখানে আরো কয়েকটি বিষয় ব্যাখ্যা সাপেক্ষ থেকে যায়। সেগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

এক ঃ সাধারণভাবে এ আয়াতটির অনুবাদ এভাবে করা হয়ে থাকে ঃ "বাদশাহর আইন মোতাবিক ইউসুফ নিজের ভাইকে পাকড়াও করতে পারতো না।" অর্থাৎ ما كان ليأخذ কে অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতাগণ অক্ষমতা অর্থে নিয়েছেন, অন্যায় বা অসংগত অর্থে নেননি। কিন্তু প্রথমত এ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা আরবী বাকধারা ও কুরআনিক ব্যবহার উভয় দিক দিয়েই ঠিক নয়। কেননা আরবীতে সাধারণত ما كان له শব্দ ব্যবহৃত হয় ما ينبغى له ، ما استقام له ، ما صح له ইত্যাদি অর্থে। আর কুরআনেও এটি বেশীর ভাগ এ অর্থেই এসেছে। যেমন–

مَا كَانَ اللّٰهُ اَن يَّتَّخِذَ مِن وَّلَدٍ – مَا كَانَ لَنَا اَن نُّشرِكَ بِاللّٰهِ مِن شَىءٍ – مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ – مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ – فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ – مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَا اَنتُمْ عَلَيْهِ – مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَن يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا –

দ্বিতীয়ত অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতাগণ সাধারণভাবে যে অর্থ বর্ণনা করেন যদি এর সে অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে ব্যাপারটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। বাদশাহর আইনে চোরকে পাকড়াও

করতে না পারার কি কারণ হতে পারে? দুনিয়ায় কি কখনো এমন পর্যায়েরও কোন রাষ্ট্র ছিল যার আইন চোরকে গ্রেফতার করার অনুমতি দিত না?

দুই ঃ রাজকীয় আইনের জন্য আল্লাহ دين الملك (বাদশাহর আইন) শব্দ ব্যবহার করে নিজেই ما كان ليأخذ থেকে যে অর্থ গ্রহণ করা উচিত সেদিকে ইংগিত করেছেন। একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর নবীকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল دين الله (আল্লাহর আইন) জারী কার জন্য, دين الملك (বাদশাহর আইন) জারী করার জন্য নয়। পরিবেশ ও পরিস্থিতির অনিবার্যতার কারণে যদি সেই রাষ্ট্রে সেই সময় পর্যন্ত বাদশাহর আইনের পরিবর্তে আল্লাহর আইন পুরোপুরি জারি করা সম্ভব না হয়ে থাকে তাহলে অন্ততপক্ষে নিজের একটি ব্যক্তিগত বিষয়ে বাদশাহর আইন কার্যকর করাতো নবীর পক্ষে সমিচীন ছিল না। কাজেই হযরত ইউসুফের (আ) বাদশাহর আইন অনুযায়ী নিজের ভাইকে গ্রেফতার না করার কারণ এটা ছিল না যে, বাদশাহর আইনে এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের অবকাশ ছিল না বরং এর কারণ শুধু এটিই ছিল যে, নবী হিসেবে অন্ততপক্ষে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে আল্লাহর আইন কার্যকর করা তাঁর জন্য ফরয ছিল। এ ক্ষেত্রে বাদশাহর আইন অনুযায়ী কাজ করা তাঁর জন্য কোনক্রমেই সংগত ছিল না।

তিন ঃ দেশীয় আইনের (Law of the land) জন্য "দীন" শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহর দীনের অর্থের ব্যাপকতা পুরোপুরি প্রকাশ করে দিয়েছেন। এ থেকে "দীন" সম্পর্কে এক ধরনের লোকদের ধারণার মূল উৎপাটিত হয়ে গেছে। তারা ধারণা করেন, নবীগণের দাওয়াত শুধুমাত্র সাধারণ ধর্মীয় অর্থে এক আল্লাহর পূজা উপাসনা–আরাধনা করা এবং নিছক কতিপয় ধর্মীয় আকীদা–বিশ্বাস ও রসম–রেওয়াজ মেনে চলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তারা এও মনে করেন, মানুষের সমাজ–সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন–আদালত এবং এ ধরনের অন্যান্য পার্থিব বিষয়াদির সাথে দীনের কোন সম্পর্ক নেই। অথবা যদি সম্পর্ক থাকে তাহলে উল্লেখিত বিষয়াদি সম্পর্কে দীনের নির্দেশাবলী নিছক ঐচ্ছিক সুপারিশের পর্যায়ভুক্ত। এগুলো কার্যকর করতে পারলে ভালো, অন্যথায় মানুষের নিজের হাতে গড়া বিধান মেনে চলায় কোন ক্ষতি নেই। এটি পুরোপুরি দীন সম্পর্কে একটি বিভ্রান্ত চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয়। দীর্ঘদিন থেকে মুসলমানদের মধ্যে এর অনুশীলন চলছে। মুসলমানদেরকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম থেকে গাফেল করে দেবার ক্ষত্রে এটিই বেশীরভাগ দায়ী। এরি বদৌলতে মুসলমানরা কুফরী ও জাহেলী জীবন ব্যবস্থায় কেবল সন্তুষ্টই হয়নি বরং একজন নবীর সুন্নাত মনে করে এ ব্যবস্থার কল–কব্জায় পরিণত হতে এবং নিজেরাই তাকে পরিচালিত করতেও উদ্যোগী হয়েছে। এ আয়াতের দৃষ্টিতে এ চিন্তা ও কর্মনীতি পুরোপুরি ভুল প্রমাণিত হচ্ছে। এখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পরিষ্কার ভাষায় বলছেন ঃ যেভাবে নামায, রোযা ও হজ্জ দীনের অন্তরভুক্ত ঠিক তেমনি যে আইনের ভিত্তিতে দেশ ও সমাজ ব্যবস্থা পরিচালনা করা হয় তাও দীনের অন্তরভুক্ত। কাজেই وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا এবং إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ইত্যাদি আয়াতগুলোতে যে দীনের প্রতি আনুগত্যের দাবী জানানো হয়েছে তার অর্থ শুধু নামায–রোযাই নয় বরং ইসলামের সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাও তার আওতায় এসে যায়। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর মনোনীত এ ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য পরিহার করে অন্য কোন ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য করা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

চার ঃ প্রশ্ন করা যেতে পারে, অন্ততপক্ষে এতটুকুন তো প্রমাণিত যে, এ সময় পর্যন্ত মিসরে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে "বাদশাহর দীন"-ই জারী ছিল। যদি এ সরকারের প্রধান শাসনকর্তা হযরত ইউসুফই হয়ে থাকেন যেমন এর আগে আপনি প্রমাণ করেছেন, তাহলে তো দেখা যায় আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ নিজেই নিজের হাতে "বাদশাহর দীন" জারী করছিলেন। এরপর হযরত ইউসুফ যদি নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে "বাদশাহর দীন"-এর পরিবর্তে ইবরাহীমের শরীয়াতকে কার্যকর করেন তাহলে তাতেই বা কি পার্থক্য হয়? এর জবাব হচ্ছে, হযরত ইউসুফ তো আল্লাহর দীন জারী করার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। এটিই ছিল তাঁর নবুওয়াতী মিশন এবং তাঁর শাসনের উদ্দেশ্য। কিন্তু একটি দেশের ব্যবস্থা কার্যত এক দিনেই বদলে দেয়া যায় না। আজ যদি কোন দেশ সম্পূর্ণভাবে আমাদের কর্তৃত্বাধীনে থাকে এবং আমরা সেখানে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক সংকল্প সহকারে তার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা নিজেদের হাতে নেই, তাহলেও তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এবং আইন ও আদালত ব্যবস্থা বাস্তবে পরিবর্তিত করতে কয়েক বছর লেগে যাবে। এ অবস্থায় কিছুকাল পর্যন্ত আমাদের ব্যবস্থাপনায়ও পূর্বের আইন বহাল রাখতে হবে। ইতিহাস কি একথার সাক্ষ দেয় না যে, আরবের জীবন ব্যবস্থায় পূর্ণ ইসলামী বিপ্লব সাধনের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নয়-দশ বছর সময় লেগেছিল? এ সময় শেষ নবীর নিজের রাষ্ট্রেই কয়েক বছর মদ পান চলতে থাকে। সূদের লেন-দেন জারী থাকে। জাহেলী যুগের মীরাসী আইন জারী থাকে। পুরাতন বিয়ে-তালাকের আইন চালু থাকে। অনেক ধরনের অবৈধ ব্যবসায় কার্যকর হতে থাকে। প্রথম দিনেই ইসলামের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন পুরোপুরি ও সর্বতোভাবে প্রবর্তিত হয়নি। কাজেই হযরত ইউসুফের রাষ্ট্রে যদি প্রথম আট-নয় বছর পর্যন্ত সাবেক মিসরীয় রাজতন্ত্রের কিছু আইন চালু থাকে তাহলে তাতে অবাক হবার কি আছে? আর এ থেকে আল্লাহর নবীকে মিসরে আল্লাহর দীন প্রবর্তনের জন্য নয় বরং বাদশাহর দীন প্রবর্তনের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল, এ যুক্তির উদ্ভব হয় কেমন করে? তবে দেশে যখন বাদশাহর দীন জারী ছিলই তখন হযরত ইউসুফের নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে তাকে কার্যকর করা তাঁর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল না কেন, এ প্রশ্নের জবাবও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে সহজেই পাওয়া যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাসন কালের প্রথম যুগে যতদিন ইসলামী আইন জারি হয়নি ততদিন লোকেরা পুরাতন পদ্ধতি অনুযায়ী শরাব পান করতে থাকে। কিন্তু নবী (সা) নিজেও কি শরাব পান করেন? লোকেরা সুদী লেনদেন করতো। কিন্তু তিনি নিজেও কি সুদী লেনদেন করেন? লোকেরা মুতা বিয়ে করতে থাকে এবং দুই সহোদরা বোনকে একসাথে বিয়ে করতে থাকে। কিন্তু নবী (সা)ও কি এমনটি করেন? এ থেকে জানা যায়, বাস্তব অক্ষমতার কারণে ইসলামের আহবায়কের ইসলামী বিধান জারি করার জন্য পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হওয়া একটি ভিন্ন ব্যাপার এবং এ পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হওয়ার যুগে তাঁর নিজের জাহেলী পদ্ধতিকে কার্যকর করা এর থেকে একটি সম্পূর্ণ ভিন্নতর ব্যাপার। পর্যায়ক্রমের কারণে যে ছুট দেয়া হয় তা অন্যদের জন্য। আহবায়ক নিজে এমন সব পদ্ধতির মধ্য থেকে কোন একটিকে বাস্তবায়িত করবেন যেগুলোকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছে, এটা আসলে তাঁর নিজের কাজ নয়।

قَالُوْٓا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ
فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا
تَصِفُوْنَ ﴿٧٧﴾ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗٓ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ
اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٧٨﴾ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ
اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ﴿٧٩﴾

এ ভাইয়েরা বললো, "এ যদি চুরি করে থাকে তাহলে অবাক হবার কিছু নেই, কারণ এর আগে এর ভাইও (ইউসুফ) চুরি করেছিল।"[৬১] ইউসুফ তাদের একথা শুনে আত্মস্থ করে ফেললো, সত্য তাদের কাছে প্রকাশ করলো না, শুধুমাত্র (মনে মনে) এতটুকু বলে থেমে গেলো, "বড়ই বদ তোমরা, (আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার ওপর) এই যে দোষারোপ তোমরা করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ প্রকৃত সত্য ভালোভাবে অবগত।"

তারা বললো, " হে ক্ষমতাসীন সরদার (আযীয)![৬২] এর বাপ অত্যন্ত বৃদ্ধ, এর জায়গায় আপনি আমাদের কাউকে রেখে দিন। আমরা আপনাকে বড়ই সদাচারী ব্যক্তি হিসেবে পেয়েছি।" ইউসুফ বললেন, "আল্লাহর পানাহ! অন্য কাউকে আমরা কেমন করে রাখতে পারি? যার কাছে আমরা নিজেদের জিনিস পেয়েছি[৬৩] তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কাউকে রাখলে আমরা জালেম হয়ে যাবো।"

৬১. আসলে নিজেদের অপমান স্খলন করার জন্য তারা একথা বলে। প্রথমে তারা বলে এসেছে, আমরা চোর নই। আর এখন দেখছে, তাদের ভাইয়ের থলের মধ্য থেকে হারানো জিনিসটি বের হচ্ছে। কাজেই এখন সংগে সংগেই একটি মিথ্যা কথা বলে সেই ভাই থেকে নিজেদেরকে আলাদা করে নিয়েছে এবং তার সাথে তার আগের ভাইকেও জড়িয়ে ফেলেছে। এ থেকে অনুমান করা যায়, হযরত ইউসুফের অবর্তমানে বিন ইয়ামিনের সাথে এ ভাইয়েরা কোন্ ধরনের ব্যবহার করে আসছে এবং কি কারণে তার ও হযরত ইউসুফের মনে এ আকাংখা জেগেছে যে, সে তাদের সাথে ফিরে না গিয়ে ওখানে থেকে যাক।

৬২. এখানে "আযীয" শব্দটি হযরত ইউসুফের জন্য ব্যবহার করার কারণে তাফসীরকারগণ ধারণা করে নিয়েছেন যে, যুলায়খার স্বামী ইতিপূর্বে যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন হযরত ইউসুফ সেই পদেই অধিষ্ঠিত হন। এরপর আরো ধারণা করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী আযীয মারা গিয়েছিল এবং হযরত ইউসুফ তার স্থলাভিষিক্ত হন। যুলায়খাকে নতুন করে অলৌকিকভাবে যুবতী বানিয়ে দেয়া হয় এবং মিসরের বাদশাহ হযরত

ইউসুফের সাথে তাঁর বিয়ে দেন। এমন কি বাসর রাতে হযরত ইউসুফের সাথে যুলায়খার যে কথাবার্তা হয় তাও পর্যন্ত আমাদের একশ্রেণীর তাফসীরকারগণের কাছে পৌছে যায়। অথচ একথাগুলো সবই কাল্পনিক। "আযীয" শব্দটি সম্পর্কে আমি আগেই একথা বলে এসেছি যে, মিসরে এটি কোন বিশেষ পদবী হিসেবে চিহ্নিত ছিল না বরং নিছক "কর্তৃত্বশালী" অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সম্ভবত মিসরে বড় বড় লোকদের জন্য এ ধরনের কিছু শব্দ পারিভাষিক অর্থে প্রচলিত ছিল, যেমন আমাদের দেশে "সরকার" শব্দটির প্রচলন দেখা যায়। এরি অনুবাদ কুরআনে "আযীয" শব্দের মাধ্যমে করা হয়েছে। আর যুলায়খার সাথে হযরত ইউসুফের বিয়ের যে গল্প ফাঁদা হয়েছে এর ভিত্তি শুধু এতটুকুই যে, বাইবেল ও তালমূদে পোটিফেরের মেয়ে আসনাত–এর সাথে তার বিয়ের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ওদিকে যুলায়খার স্বামীর নামও ছিল পোটিফর। এ ঘটনাগুলো ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্ধৃত হতে হতে মুফাস্‌সিরগণের কাছে পৌছে যায়। তারপর গুজব ও জনশ্রুতির বিস্তার লাভের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী। পোটিফের সহজেই পোটিফর হয়ে গেছে। মেয়ে হয়ে গেছে স্ত্রী। আর এ স্ত্রী নিশ্চিতভাবেই হয়ে গেছে যুলায়খা। কাজেই তার সাথে হযরত ইউসুফের বিয়ে দেবার জন্য পোটিফরকে হত্যা করা হয়েছে। এভাবেই "ইউসুফ যুলায়খার" উপাখ্যান পূর্ণতা লাভ করেছে।

৬৩. এখানে কতদূর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে একবার তলিয়ে দেখুন। এখানে "চোর" বলা হচ্ছে না বরং কেবল এতটুকু বলা হচ্ছে, "যার কাছে আমরা আমাদের জিনিস পেয়েছি।" শরীয়াতী পরিভাষায় একেই বলা হয় "তাওরীয়া" অর্থাৎ "সত্যকে সুকৌশলে গোপন করা"। যখন কোন মজলুমকে জালেমের হাত থেকে বাঁচাবার অথবা কোন বড় আকারের জুলুমের প্রতিরোধ করার জন্য প্রকৃত ঘটনার বিপরীত কথা বলা বা সত্য বিরোধী বাহানাবাজী করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না তখন এ অবস্থায় একজন আল্লাহভীরু ব্যক্তি সুস্পষ্ট মিথ্যা এড়িয়ে এমন কথা বলবে বা এমন কৌশল অবলম্বন করার চেষ্টা করবে যার ফলে প্রকৃত সত্যকে গোপন করে দুষ্কৃতিকে রোধ করা যেতে পারে। এমনটি করা শরীয়াত ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে বৈধ, তবে এখানে শর্ত থাকবে যে, নিছক কার্যোদ্ধার করার জন্য এমনটি করা যাবে না বরং কোন বড় আকারের দুষ্কৃতি দূর করাই হবে উদ্দেশ্য। এখন এ সমগ্র ব্যাপারটিতে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কেমন ধরনের বৈধ তাওরীয়ার শর্ত পূরণ করেছেন দেখুন ঃ ভাইয়ের সম্মতিক্রমে তার মালপত্রের মধ্যে নিজের পেয়ালাটি রেখে দিয়েছেন। কিন্তু কর্মচারীদেরকে একথা বলেননি যে, এর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ দায়ের করো। তারপর সরকারী কর্মচারীরা যখন চুরির অভিযোগে তাদেরকে ধরে এনেছে তখন কোন প্রকার হৈ চৈ না করে নীরবে তাদের মালপত্র তল্লাশী করতে শুরু করেছেন। এরপর যখন এ ভাইয়েরা বললো, বিন ইয়ামীনের জায়গায় আমাদের কাউকে রাখুন তখন এর জবাবে তাদেরই কথা তাদের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এই বলে যে, তোমরাইতো ফতোয়া দিয়েছিলে, যার মালপত্রের মধ্য থেকে পেয়ালা বের হবে তাকেই রেখে দেয়া হবে। কাজেই এখন তোমাদের সামনে বিন ইয়ামীনের মালপত্রের মধ্য থেকে আমাদের জিনিস বের হয়েছে এবং তাকেই আমরা রেখে দিচ্ছি। অন্যকে তার জায়গায় আমরা কেমন করে রাখতে পারি? এ ধরনের তাওরীয়ার দৃষ্টান্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাসেও পাওয়া যাবে। কোন যুক্তি দিয়ে নৈতিক দৃষ্টিতে একে দোষণীয়ও বলা যেতে পারে না।

فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ
اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ
يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ
لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّ
ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ﴿٨١﴾
وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْۤ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ؕ وَاِنَّا
لَصٰدِقُوْنَ ﴿٨٢﴾ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ
عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٨٣﴾

১০ রুকূ'

যখন তারা ইউসুফের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেলো তখন একান্তে পরামর্শ করতে লাগলো। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বয়সে বড় ছিল সে বললো ঃ "তোমরা কি জান না, তোমাদের বাপ তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে কি অংগীকার নিয়েছেন এবং ইতিপূর্বে ইউসুফের ব্যাপারে তোমরা যেসব বাড়াবাড়ি করেছো তাও তোমরা জানো। এখন আমি তো এখান থেকে কখনোই যাবো না যে পর্যন্ত না আমার বাপ আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ আমার ব্যাপারে কোন ফায়সালা করে দেন, কেননা তিনি সবচেয়ে ভালো ফায়সালাকারী। তোমরা তোমাদের বাপের কাছে ফিরে গিয়ে বলো, "আব্বাজান, আপনার ছেলে চুরি করেছে, আমরা তাকে চুরি করতে দেখিনি, যতটুকু আমরা জেনেছি শুধু ততটুকুই বর্ণনা করছি এবং অদৃশ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করা তো আমাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। আমরা যে পল্লীতে ছিলাম সেখানকার লোকজনদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন এবং যে কাফেলার সাথে আমরা ছিলাম তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, আমরা যা বলছি সত্য বলছি।"

ইয়াকূব এ কাহিনী শুনে বললো, "আসলে তোমাদের মন তোমাদের জন্য আরো একটি বড় ঘটনাকে সহজ করে দিয়েছে।[৬৪] ঠিক আছে, এ ব্যাপারেও আমি সবর করবো এবং ভালো করেই করবো। হয়তো আল্লাহ এদের সবাইকে এনে আমার সাথে মিলিয়ে দেবেন। তিনি সবকিছু জানেন এবং তিনি জ্ঞানের ভিত্তিতে সমস্ত কাজ করেন।"

وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰٓاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ
فَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿٨٤﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا
اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿٨٥﴾ قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ
وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾ يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ
يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ
رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٧﴾ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ
مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ
عَلَيْنَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿٨٨﴾

তারপর সে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বসে গেলো এবং বলতে লাগলো, "হায় ইউসুফ"— সে মনে মনে দুঃখে ও শোকে জর্জরিত হয়ে যাচ্ছিল এবং তার চোখগুলো সাদা হয়ে গিয়েছিল,—ছেলেরা বললো, "আল্লাহর দোহাই! আপনি তো শুধু ইউসুফের কথাই স্মরণ করে যাচ্ছেন। অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তার শোকে আপনি নিজেকে দিশেহারা করে ফেলবেন অথবা নিজের প্রাণ সংহার করবেন।" সে বললো, "আমি আমার পেরেশানি এবং আমার দুঃখের ফরিয়াদ আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে করছি না। আর আল্লাহর ব্যাপারে আমি যতটুকু জানি তোমরা ততটুকু জানো না। হে আমার ছেলেরা! তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের ব্যাপারে কিছু অনুসন্ধান চালাও। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। তাঁর রহমত থেকে তো একমাত্র কাফেররাই নিরাশ হয়।"

যখন তারা মিসরে গিয়ে ইউসুফের সামনে হাযির হলো তখন আরয করলো, "হে পরাক্রান্ত শাসক! আমরা ও আমাদের পরিবার পরিজন কঠিন বিপদের মুখোমুখি হয়েছি এবং আমরা মাত্র সামান্য পুঁজি নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদের পূর্ণমাত্রায় শস্য দিয়ে দিন এবং আমাদেরকে দান করুন,[৬৫] আল্লাহ দানকারীদেরকে প্রতিদান দেন।"

৬৪. অর্থাৎ আমার ছেলের চারিত্রিক সততা সম্পর্কে আমি ভালোভাবেই জানি। তার একটি পেয়ালা চুরির দোষে অভিযুক্ত হবার কথা মেনে নেয়া তোমাদের জন্য সহজ হতে

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ﴿٨٩﴾
قَالُوْٓا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ۭ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَآ اَخِيْ ۡ قَدْ مَنَّ
اللّٰهُ عَلَيْنَا ۭ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٠﴾
قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕيْنَ ﴿٩١﴾ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ
عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۭ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۡ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٩٢﴾ اِذْهَبُوْا
بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰي وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِيْ
بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٣﴾

(একথা শুনে ইউসুফ আর চুপ থাকতে পারলো না) সে বললো, "তোমরা কি জানো, তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি ব্যবহার করেছিলে, যখন তোমরা অজ্ঞ ছিলে?" তারা চমকে উঠে বললো, "হায় তুমিই ইউসুফ নাকি?" সে বললো, "হাঁ, আমি ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আসলে কেউ যদি তাকওয়া ও ছবর অবলম্বন করে তাহলে আল্লাহর কাছে এ ধরনের সৎলোকদের কর্মফল নষ্ট হয়ে যায় না।" তারা বললো, "আল্লাহর কসম, আল্লাহ তোমাকে আমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং যথার্থই আমরা অপরাধী ছিলাম।" সে জবাব দিল, "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিন। তিনি সবার প্রতি অনুগ্রহকারী। যাও, আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং এটি আমার পিতার চেহারার ওপর রেখো, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমাদের সমস্ত পরিবার পরিজনকে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

পারে। ইতিপূর্বে তোমাদের জন্য তোমাদের এক ভাইকে জেনেবুঝে নিখোজ করে দেয়া এবং তার পোশাকে কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনা খুব সহজ কাজ হয়ে গিয়েছিল। আর এখন অন্য এক ভাইকে সত্যি সত্যি চোর বলে মেনে নেয়া এবং আমাকে এসে তার খবর দেয়াও তেমনি সহজ কাজ হয়ে গেছে।

৬৫. অর্থাৎ আমাদের এ আবেদনে সাড়া দিয়ে আপনি যাকিছু দেবেন তাই যেন আপনি আমাদের দান করছেন বলে মনে করা হবে। এ শস্যের মূল্য হিসেবে যে অর্থ আমরা দিচ্ছি তা আমাদের প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ শস্যের মূল্য হিসেবে বিবেচিত হবার অবশ্যি যোগ্যতা রাখে না।

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّىْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَآ
اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ﴿٩٤﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِىْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿٩٥﴾ فَلَمَّآ اَنْ
جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ
اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ
اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ ﴿٩٧﴾ قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ
الرَّحِيْمُ ﴿٩٨﴾ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا
مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾

১১ রুকূ'

কাফেলাটি যখন (মিসর থেকে) রওয়ানা দিল তখন তাদের বাপ (কেনানে) বললো, "আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি,[৬৬] তোমরা যেন আমাকে একথা বলো না যে, বুড়ো বয়সে আমার বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছে।" ঘরের লোকেরা বললো, "আল্লাহর কসম, আপনি এখনো নিজের সেই পুরাতন পাগলামি নিয়েই আছেন।"[৬৭]

তারপর যখন সুখবর বহনকারী এলো তখন সে ইউসুফের জামা ইয়াকূবের চেহারার ওপর রাখলো এবং অকস্মাত তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো। তখন সে বললো, "আমি না তোমাদের বলেছিলাম, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সব কথা জানি যা তোমরা জানো না?" সবাই বলে উঠলো, "আব্বাজান! আপনি আমাদের গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করুন, সত্যিই আমরা অপরাধী ছিলাম।" তিনি বললেন, "আমি আমার রবের কাছে তোমাদের মাগফেরাতের জন্য আবেদন জানাবো, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

তারপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছলো[৬৮] তখন সে নিজের বাপ-মাকে নিজের কাছে বসালো[৬৯] এবং (নিজের সমগ্র পরিবার পরিজনকে) বললো, "চলো, এবার শহরে চলো, আল্লাহ চাহেতো শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে বসবাস করবে।"

৬৬. আল্লাহর নবীগণ কেমন অসাধারণ শক্তির অধিকারী হয়ে থাকেন, এ ঘটনা থেকে সে সম্পর্কে ধারণা জন্মে। একদিকে হযরত ইউসুফের (আ) জামা নিয়ে মিসর থেকে কাফেলা সবেমাত্র রওয়ানা দিচ্ছে আর অন্যদিকে শত শত মাইল দূরে হযরত ইয়াকূব

(আ) তার গন্ধ পাচ্ছেন। কিন্তু এ থেকে একথাও জানা যায় যে, নবীগণের এ শক্তিগুলো আসলে তাঁদের সহজাত ছিল না বরং এগুলো আল্লাহ তাঁদেরকে দান করেছিলেন এবং আল্লাহ যখন ও যে পরিমাণ চাইতেন এ শক্তিকে কাজে লাগানোর সুযোগ দিতেন। হযরত ইউসুফ (আ) বহু বছর যাবত মিসরে রয়েছেন এবং সে সময় হযরত ইয়াকূব (আ) কখনো তাঁর গন্ধ পাননি। কিন্তু এখন হঠাৎ ঘ্রাণ শক্তি এত তীব্র হয়ে গেলো যে, তাঁর জামা মিসর থেকে চলা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই তিনি তার সুগন্ধ পেতে শুরু করলেন।

এখানে এ আলোচনাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, একদিকে কুরআন হযরত ইয়াকূব আলাইহিস সালামকে এভাবে পয়গম্বরের বিপুল মর্যাদা সহকারে পেশ করছে কিন্তু অন্যদিকে বনী ইসরাঈল তাঁকে পেশ করছে আরবের একজন সাধারণ বেদুইনের মতো করে। বাইবেলের বর্ণনা মতে, যখন ছেলেরা এসে খবর দিল, "ইউসুফ এখনো বেঁচে আছে এবং সে-ই সারা মিসর দেশের শাসনকর্তা তখন ইয়াকূব হতভম্ব হয়ে গেলেন। কেননা তিনি এটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না..... পরে যখন তিনি তাঁদের নিয়ে যাবার জন্য ইউসুফের পাঠানো শকটগুলো দেখলেন তখন তাঁর ধড়ে প্রাণ এলো।" (আদি পুস্তক ৭৫ ঃ ২৬-২৭)

৬৭. এ থেকে বুঝা যায়, সমগ্র পরিবারে হযরত ইউসুফ (আ) ছাড়া তাদের পিতার মর্যাদা উপলব্ধিকারী আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি ছিল না। হযরত ইয়াকূব (আ) নিজেও তাদের এ মানসিক ও নৈতিক অধোপতনের কারণে হতাশ ছিলেন। গৃহের প্রদীপের আলো বাইরে ছড়িয়ে পড়ছিল কিন্তু গৃহবাসীরা নিজেরাই আঁধারের মধ্যে বাস করছিল। তাদের দৃষ্টিতে তিনি একটি পোড়া মাটি ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অধিকাংশই প্রকৃতির এ নির্মম পরিহাসের শিকার হয়েছেন।

৬৮. বাইবেলের বর্ণনামতে এ সময় মিসরে আগমনকারী হযরত ইয়াকূবের (আ) পরিবারের সদস্য সংখ্যা মোট ৬৭ ছিল। অন্যান্য পরিবারের যেসব মেয়েকে হযরত ইয়াকূবের (আ) পরিবারে বিয়ে দেয়া হয়েছিল তাদেরকে এ সংখ্যার অন্তরভুক্ত করা হয়নি। এ সময় হযরত ইয়াকূবের (আ) বয়স ছিল ১৩০ বছর এবং এরপরও তিনি মিসরে ১৭ বছর জীবিত থাকেন।

এখানে একজন জ্ঞানানুসন্ধানীর মনে প্রশ্ন জাগে, বনী ইসরাঈল যখন মিসরে প্রবেশ করে তখন হযরত ইউসুফ (আ) সহ তাদের সংখ্যা ছিল ৬৮ এবং প্রায় ৫ শত বছর পর যখন তারা মিসর থেকে বের হয় তখন তাদের সংখ্যা ছিল কয়েক লাখ। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী মিসর ত্যাগ করার পরের বছর সিনাইয়ের মরু এলাকায় হযরত মূসা (আ) তাদের যে আদমশুমারী করান তাতে কেবলমাত্র যুদ্ধ করতে সমর্থ যুবকদের সংখ্যা ৬,০৩,৫৫০ ছিল। এর মানে এ দাঁড়ায়, নারী-পুরুষ-শিশু মিলিয়ে সব শুদ্ধ তাদের সংখ্যা হবে অন্তত ২০ লাখ। কোন হিসেবে কি ৬৮ জন থেকে ৫শত বছরে বংশবৃদ্ধি পেয়ে ২০ লাখ হতে পারে? যদি ধরা যায়, সারা মিসরের জনসংখ্যা এ সময় ছিল ২ কোটি (যা অবশ্যি খুব বেশী অতিরঞ্জিত বিবেচিত হবে) তাহলে এর অর্থ এ দাঁড়াবে যে, শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলের সংখ্যাই সেখানে ছিল শতকরা ১০ ভাগ। শুধুমাত্র বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে একটি পরিবারের লোকসংখ্যা কি এ পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে? এ প্রশ্নটি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের প্রকাশ ঘটে। একথা ঠিক ৫শত বছরে একটি পরিবারের

লোকসংখ্যা এত বেশী বাড়তে পারে না। কিন্তু বনী ইসরাঈল ছিল নবীদের সন্তান। তাদের নেতা হযরত ইউসুফের (আ) বদৌলতে তারা মিসরে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। এ ইউসুফ (আ) নিজেই ছিলেন নবী। তাঁর পর থেকে চার পাঁচশো বছর পর্যন্ত দেশের শাসন কর্তৃত্ব তাদেরই হাতে ছিল। এ সময় নিশ্চয়ই তারা মিসরে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করে থাকবেন। মিসরবাসীদের মধ্য থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের কেবল ধর্মই নয়, তামাদ্দুন এবং সমগ্র জীবন ব্যবস্থাই মিসরীয় অমুসলিমদের থেকে আলাদা হয়ে বনী ইসরাঈলের রঙে রঞ্জিত হয়ে গিয়ে থাকবে। মিসরীয়রা তাদের সবাইকে ঠিক তেমনি আগন্তুক গণ্য করে থাকবে যেমন ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দুরা ভারতীয় মুসলমানদেরকে গণ্য করে থাকে। অনারব মুসলমানদের ওপর আজ 'মোহামেডান' শব্দটি যেভাবে লাগানো হয় তাদের ওপর ঠিক তেমনিভাবেই 'ইসরাঈলী' শব্দটি লাগানো হয়ে থাকবে। আর তাছাড়া তারা নিজেরাও দীনী ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এবং বিয়ে–শাদীর সম্পর্কের কারণে অমুসলিম মিসরীয়দের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বনী ইসরাঈলের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়ে থাকবে। এ কারণে যখন মিসরে জাতীয়তাবাদের প্রবল জোয়ার উঠলো তখন কেবলমাত্র বনী ইসরাঈলই নির্যাতনের শিকার হলো না বরং মিসরীয় মুসলিমরাও তাদের সাথে একইভাবে নির্যাতীত হলো। আর বনী ইসরাঈল যখন মিসর ত্যাগ করলো তখন মিসরীয় মুসলমানরাও তাদের সাথে বের হলো এবং তাদের সবাইকে বনী ইসরাঈলের সাথে গণ্য করা হতে থাকলো।

বাইবেলের বিভিন্ন ইংগিত থেকে আমাদের এ ধারণার সমর্থন মেলে। উদাহরণ স্বরূপ "যাত্রা পুস্তকে" যেখানে বনী ইসরাঈলদের মিসর থেকে বের হবার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে বাইবেল লেখক বলছেন ঃ "আর তাহাদের সাথে মিশ্রিত লোকদের মহাজনতাও গেলো।" (১২ঃ৩৮) অনুরূপভাবে "গণনা পুস্তকে"ও তিনি আবার বলছেন ঃ "আর তাহাদের মধ্যবর্তী মিশ্রিত লোকেরা লোভাতুর হইয়া উঠিল।" (১১ঃ৪) তারপর পর্যায়ক্রমে এ অইসরাঈলী মুসলমানদের জন্য "আগন্তুক" ও "পরদেশী" পরিভাষা ব্যবহার করা হতে থাকে। বস্তুত তাওরাতে হযরত মূসাকে যেসব বিধান দেয়া হয় তার মধ্যে আমরা পাই ঃ

" তোমরা ও তোমাদের মধ্যে বসবাসকারী বিদেশী লোক, উভয়ের জন্য একই ব্যবস্থা হইবে ; ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি। সদা প্রভুর সামনে তোমরা ও বিদেশীয়েরা, উভয়ে সমান। তোমাদের ও তোমাদের মধ্যে বসবাসকারী বিদেশীয়দের জন্য একই ব্যবস্থা ও একই শাসন হইবে।"

(গণনা পুস্তক ১৫ঃ ১৫–১৬)

"কি স্বজাতীয় কি বিদেশী যে ব্যক্তি নিসংকোচে পাপ করে, সে সদাপ্রভুর অবমাননা করে, সেই ব্যক্তি আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।" (গণনা পুস্তক ১৫ঃ৩০)

"তোমরা তোমাদের ভ্রাতাদের মধ্যে, চাই স্বদেশী হোক বা বিদেশী হোক, ন্যায্য বিচার করিও।" (দ্বিতীয় বিবরণ ১ঃ১৬)

আল্লাহর কিতাবে অইসরাঈলীদের জন্য আসলে কি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল যাকে অনুবাদকরা 'বিদেশী" বানিয়ে রেখে দিয়েছে, সেটা এখন অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা কঠিন।

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا أَبَتِ
هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِن قَبْلُ ۖ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ
بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ
أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ
لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾

(শহরে প্রবেশ করার পর) সে নিজের বাপ-মাকে উঠিয়ে নিজের পাশে সিংহাসনে বসালো এবং সবাই তার সামনে স্বতস্ফূর্তভাবে সিজদায় ঝুঁকে পড়লো।[৭০] ইউসুফ বললো, "আব্বাজান! আমি ইতিপূর্বে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম এ হচ্ছে তার তা'বীর। আমার রব তাকে সত্যে পরিণত করেছেন। আমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ হিসেবে তিনি আমাকে কারাগার থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে মরু অঞ্চল থেকে এনে আমার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন, অথচ শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। আসলে আমার রব অননুভূত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করেন। নিসন্দেহে তিনি সবকিছু জানেন ও সুগভীর প্রজ্ঞার অধিকারী।

৬৯. তালমূদে লিখিত হয়েছে, হযরত ইয়াকূবের (আ) আগমন সংবাদ যখন রাজধানীতে এসে পৌছুল তখন হযরত ইউসুফ (আ) রাজ্যের বড় বড় আমীর উমরাহ, উচ্চ পদস্থ কর্মচারীবৃন্দ ও বিরাট এক সেনাবাহিনী নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে বের হলেন। অত্যন্ত মর্যাদা ও শান-শওকতের সাথে তাঁদেরকে শহরে নিয়ে এলেন। সেদিনটি সেখানে ছিল উৎসবের দিন। নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সবাই সেদিন এ শোভাযাত্রা দেখতে জমা হয়েছিল। সারা দেশে আনন্দের ঢেউ প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল।

৭০. এ "সিজদাহ" শব্দটি বহু লোককে বিভ্রান্ত করেছে। এমনকি একটি দল তো এ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে বাদশাহ ও পীরদের জন্য "আদবের সিজদাহ" ও "সম্মান প্রদর্শনের সিজদাহ"-এর বৈধতা আবিষ্কার করেছেন। এর দোষমুক্ত হবার জন্য অন্য লোকদের এ ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে যে, আগের নবীদের শরীয়াতে কেবলমাত্র ইবাদাতের সিজদা আল্লাহ ছাড়া আর সবার জন্য হারাম ছিল। এ ছাড়া যে সিজ্‌দার মধ্যে ইবাদাতের অনুভূতি নেই তা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের জন্যও করা যেতে পারতো। তবে মুহাম্মাদী শরীয়াতে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের জন্য সবরকমের সিজদা হারাম করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আসলে "সিজদাহ" শব্দটিকে বর্তমান ইসলামী পরিভাষার অর্থে গ্রহণ করার ফলেই যাবতীয় বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ হাত, হাঁটু ও কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে দেয়া। অথচ

সিজদার মূল অর্থ হচ্ছে শুধুমাত্র ঝুঁকে পড়া। আর এখানে এ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কারো প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার, কাউকে অভ্যর্থনা জানাবার অথবা নিছক কাউকে সালাম করার জন্য বুকে দু'হাত বেঁধে সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়ার রেওয়াজ প্রাচীন যুগের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। (এবং আজো দুনিয়ার কোন কোন দেশে এর প্রচলন আছে)। এ ধরনের ঝুঁকে পড়ার জন্য আরবীতে "সিজদাহ" এবং ইংরেজীতে Bow শব্দ ব্যবহার করা হয়। বাইবেলে আমরা এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাই, যা থেকে প্রমাণ হয় যে, প্রাচীন যুগে এ পদ্ধতিটি সাংস্কৃতিক জীবনের অংশ ছিল। তাই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ তিনি নিজের তাঁবুর দিকে তিনটি লোককে আসতে দেখলেন। তাদেরকে অভ্যর্থনা করার জন্য তিনি দৌড়ে গেলেন এবং মাটি পর্যন্ত ঝুঁকে পড়লেন। আরবী বাইবেলে এখানে যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ

فَلَمَّا نَظَرَ رَكَضَ لاِسْتِقْبَالِهِمْ مِنْ بَابِ الْخَيْمَةِ وَسَجَدَ اِلَى الْاَرْضِ

(تكوين : ١٨-٣)

তারপর যেখানে বলা হচ্ছে, হেতের সন্তানরা হযরত সারাকে দাফন করার জন্য বিনামূল্যে কবরের জন্য জমি দান করে, সেখানে উর্দু বাইবেলে যা বলা হয়েছে তার বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়। "ইবরাহীম উঠে বনী হেতের সামনে, যারা সেই দেশের বাসিন্দা ছিল, কুর্নিশ করলেন এবং তাদের সাথে এভাবে আলাপ করলেন।" (বাংলা বাইবেলে বলা হয়েছে ঃ তখন আব্রাহাম উঠিয়া তদ্দেশীয় লোকদিগের, অর্থাৎ হেতের সন্তানগণের কাছে প্রণিপাত করিলেন ও সম্ভাসন করিয়া কহিলেন,) তারপর যখন তারা শুধু কবরের জমিই নয়, পুরো একটি ক্ষেত এবং একটি গুহা দান করে তখন "ইবরাহীম সেই দেশীয় লোকদের সামনে মাথা নত করলেন (বাংলা বাইবেলে বলা হয়েছে ঃ তখন আব্রাহাম তদ্দেশীয় লোকদের সামনে প্রণিপাত করিলেন)। কিন্তু আরবী অনুবাদে এ উভয় জায়গায় কুর্নিশ করা, প্রণিপাত করা, মাথা নত করা ইত্যাদির জন্য "সিজদাহ" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

فقام ابراهيم وسجد لشعب الارض لبنى حت (تكوين : ٢١ - ٧)

فسجد ابراهيم امام شعب الارض (تكوين : ٢٣ - ١٢)

ইংরেজী বাইবেলে এখানে যে শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ

"Bowed himself towards the ground.

"Bowed himself to the people of the land and Abraham bowed down himself before the people of the land."

এ ধরনের বিষয়ের বহু দৃষ্টান্ত বাইবেলে পাওয়া যায়। এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, বর্তমানে ইসলামী পরিভাষায় "সিজদাহ" বলতে যা বুঝায় এ সিজদাহর অর্থ তা নয়।

যারা বিষয়টির যথার্থ স্বরূপ না জেনে এর ব্যাখ্যায় হালকাভাবে লিখে দিয়েছেন যে, পূর্ববর্তী শরীয়াতগুলোয় গায়রুল্লাহকে সম্মানের সিজদা অথবা আদবের সিজদা করা জায়েয

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ
فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ
تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠١﴾ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ
نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ وَهُمْ
يَمْكُرُوْنَ ﴿١٠٢﴾ وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾ وَمَا
تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾

হে আমার রব! তুমি আমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছো এবং আমাকে কথার গভীরে প্রবেশ করা শিখিয়েছো। হে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা! দুনিয়ায় ও আখেরাতে তুমিই আমার অভিভাবক। ইসলামের ওপর আমাকে মৃত্যু দান করো এবং পরিণামে আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তরভুক্ত করো।"[৭১]

হে মুহাম্মাদ! এ কাহিনী অদৃশ্যলোকের খবরের অন্তরভুক্ত, যা আমি তোমাকে অহীর মাধ্যমে জানাচ্ছি। নয়তো, তুমি তখন উপস্থিত ছিলে না যখন ইউসুফের ভাইয়েরা একজোট হয়ে ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু তুমি যতই চাওনা কেন অধিকাংশ লোক তা মানবে না।[৭২] অথচ তুমি এ খেদমতের বিনিময়ে তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিকও চাচ্ছো না। এটা তো দুনিয়াবাসীদের জন্য সাধারণভাবে একটি নসীহত ছাড়া আর কিছুই নয়।[৭৩]

ছিল তারা নিছক একটি ভিত্তিহীন কথা বলেছেন। ইসলামী পরিভাষায় যাকে সিজদা বলা হয়, যদি সিজদা বলতে তাকেই বুঝানো হয় তাহলে আল্লাহর পাঠানো শরীয়াতে তা কোনদিন গায়রুল্লাহর জন্য জায়েয ছিল না। বাইবেলে উল্লেখিত হয়েছে যে, ব্যবিলনের পরাধীনতার যুগে বাদশাহ অহশ্বেরশ যখন হামানকে নিজের প্রধান অধ্যক্ষ করলেন এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য তাকে সিজদা করার জন্য সবাইকে হুকুম দিলেন তখন বনী ইসরাঈলের পরম খোদাভক্ত ওলী মর্দখয় (মর্দকী) তা করতে অস্বীকার করলেন। (ইষ্টের ৩:১–২) তালমূদে এ ঘটনাটির ব্যাখ্যা প্রসংগে এর যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য ঃ

"বাদশাহর কর্মচারীরা জিজ্ঞেস করলো ঃ ব্যাপার কি, তুমি কেনইবা হামানকে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছো? আমরাও তো মানুষ কিন্তু আমরা বাদশাহর হুকুম মেনে চলি। তিনি জবাব দিলেন ঃ তোমরা অজ্ঞ, একজন মরণশীল মানুষ, যে কাল মাটির

সাথে মিশে যাবে, সে কি এমন যোগ্যতা রাখে যে, তার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়া হবে? আমি কি এমন একজনকে সিজদা করবো, যে একটি মহিলার পেট থেকে জন্ম নিয়েছে? যে কাল শিশু ছিল, আজ যুবক হয়েছে, কাল বুড়ো হয়ে যাবে এবং পরশু মারা যাবে? না, আমি তো একমাত্র সেই অনাদি অনন্ত আল্লাহর সামনে মাথা নত করবো যিনি রিচজীব ও স্বয়ম্ভু..... যিনি বিশ্বলোকের স্রষ্টা ও শাসক, আমি তো একমাত্র তাঁকেই সম্মান করবো, আর কাউকে নয়।"

কুরআন নাযিলের প্রায় এক হাজার বছর আগে একজন ইসরাঈলী মুমিনের কণ্ঠে এ কথাগুলো উচ্চারিত হয়। কোন অর্থেও গায়রুল্লাহকে সিজদা করা বৈধ এ ধরনের চিন্তার নামগন্ধও এতে পাওয়া যায় না।

৭১. এ সময় হযরত ইউসুফের (আ) কণ্ঠ নিঃসৃত এ বাক্য ক'টি আমাদের সামনে একজন সাচ্চা মুমিনের চরিত্রের একটা অদ্ভুত মনোমুগ্ধকর চিত্র তুলে ধরে। মরু পশুপালক পরিবারের এক ব্যক্তি, যাঁকে তাঁর হিংসুটে ভাইয়েরা মেরে ফেলতে চেয়েছিল, জীবনের উত্থান-পতন দেখতে দেখতে অবশেষে পার্থিব উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। তার দুর্ভিক্ষ পীড়িত পরিবারবর্গ তারই করুণা ভিখারী হয়ে তার সামনে এসে হাযির হয়েছে এবং এ সাথে এসেছে তার সেই হিংসুটে ভাইয়েরা যারা তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তারা সবাই তার রাজকীয় সিংহাসনের সামনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছে। দুনিয়ার সাধারণ রীতি অনুযায়ী এটি ছিল অহংকার, অভিযোগ ও দোষারোপ করার এবং তিরস্কার ও ভর্ৎসনার তীর বর্ষণ করার উপযুক্ত সময়। কিন্তু আল্লাহর সত্যিকার অনুগত একজন মানুষ এ সময় কিছুটা ভিন্ন ধরনের চারিত্রিক গুণাবলীর প্রকাশ ঘটান। তিনি নিজের এ উন্নতির জন্য অহংকার করার পরিবর্তে যে আল্লাহ তাকে এ মর্যাদা দান করেছেন তাঁর অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেন। তার পরিবারের লোকেরা জীবনের প্রথম দিকে তার ওপর যে জুলুম অত্যাচার চালিয়েছিল সে জন্য তিনি তাদেরকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করেন না। বরং আল্লাহ এত দীর্ঘদিনের বিচ্ছিন্নতার পর তাদেরকে আমার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন এ বলে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি হিংসুটে ভাইদের বিরুদ্ধে মুখে অভিযোগের একটি শব্দও উচ্চারণ করেন না। এমন কি একথাও বলেন না যে, তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল। বরং নিজেই এভাবে তাদের সাফাই গাইছেন যে, শয়তান আমার ও তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে দিয়েছে। আবার সেই বিরোধের খারাপ দিক বাদ দিয়ে তার এ ভালো দিকটি পেশ করছেন যে, আল্লাহ আমাকে যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে চাচ্ছিলেন সে জন্য এ সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ ভাইদের দ্বারা শয়তান যা কিছু করায় তার মধ্যে আল্লাহর জ্ঞান অনুযায়ী আমার জন্য কল্যাণ ছিল। কয়েক শব্দে এসব কিছু প্রকাশ করার পর তিনি স্বতস্ফূর্তভাবে নিজের প্রভু-আল্লাহর সামনে নত হন এবং তাঁর প্রতি এ বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ঃ তুমিই আমাকে বাদশাহী দান করেছো এবং এমন সব যোগ্যতা দান করেছো যার বদৌলতে আমি জেলখানায় পচে মরার বদলে আজ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রটির ওপর শাসন কর্তৃত্ব চালাচ্ছি। সবশেষে তিনি আল্লাহর কাছে যা কিছু চান তা হচ্ছে এই যে, দুনিয়ায় যতদিন বেঁচে থাকি ততদিন যেন তোমার বন্দেগী ও দাসত্বে অবিচল থাকি আর যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেই তখন আমাকে সৎ বান্দাদের সাথে মিশিয়ে দিয়ো। কতই উন্নত, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র এ চারিত্রিক আদর্শ!

হযরত ইউসুফের এ মূল্যবান ভাষণটিও বাইবেল ও তালমূদে কোন স্থান পায়নি। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এ কিতাব দু'টি অপ্রয়োজনীয় গল্প কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণে ভরা। অথচ যেসব বিষয় নৈতিক মূল্যমান ও মূল্যবোধের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং যার সাহায্যে নবীগণের মূল শিক্ষা, তাঁদের যথার্থ মিশন এবং তাঁদের সীরাতের শিক্ষণীয় দিকগুলোর ওপর আলোকপাত হয়, এ কিতাব দু'টিতে সেগুলোর কোন উল্লেখই নেই।

এখানে এ কাহিনী শেষ হচ্ছে। তাই পাঠকদেরকে পুনর্বার এ সত্যটির ব্যাপারে সজাগ করে দেয়া জরুরী মনে করি যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম, সম্পর্কে কুরআনের এ বর্ণনাটি একান্তই তার নিজস্ব ও স্বতন্ত্র বর্ণনা। এটি বাইবেল বা তালমূদের চর্বিতচর্বন নয়। তিনটি কিতাবের তুলনামূলক অধ্যয়নের পর একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কাহিনীটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশে কুরআনের বর্ণনা অন্য দু'টি থেকে আলাদা। কোন কোন জিনিস কুরআন তাদের চেয়ে বেশী বর্ণনা করে, কোন কোনটা কম এবং কোন কোনটায় তাদের বর্ণনার প্রতিবাদ করে। কাজেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী ইসরাঈলের থেকে এ কাহিনীটি শুনে থাকবেন এবং তারি ভিত্তিতে এটি বর্ণনা করেন, একথা বলার সুযোগই কারোর নেই।

৭২. অর্থাৎ এরা এক অদ্ভুত ধরনের হটকারিতার রোগে ভুগছে। তোমার নবুওয়াতের বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য অনেক চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শ করে তারা যে দাবী করেছিল তুমি সংগেসংগেই সবার সামনে তা পূরণ করে দিয়েছো। এখন হয়তো তুমি আশা করছো, এ কুরআন তুমি নিজে রচনা কর না বরং সত্যিই তোমার প্রতি অহীর মাধ্যমে নাযিল হয়, একথা মেনে নিতে তারা আর ইতস্তত করবে না। কিন্তু নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, এরা এখনো মানবে না এবং নিজেদের অস্বীকৃতির ওপর অবিচল থাকার জন্য আরেকটি বাহানা খুঁজে বের করবে। কেননা, এদের না মানার আসল কারণ এটা নয় যে, তোমার সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হবার জন্য এরা কোন যুক্তিসংগত প্রমাণ চাচ্ছিল এবং তা এরা এখনো পায়নি। বরং এর কারণ শুধুমাত্র একটিই যে, এরা তোমার কথা মেনে নিতে রাজী নয়। তাই এরা আসলে মেনে নেবার জন্য কোন প্রমাণ খুঁজে ফিরছে না বরং না মানার জন্য বাহানা খুঁজে বেড়াচ্ছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন ভুল ধারণা দূর করা এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য নয়। যদিও বাহ্যত তাঁকেই সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে দলকে সম্বোধন করে তাদের সমাবেশে এ ভাষণ দেয়া হচ্ছিল তাদেরকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অলংকারপূর্ণ বাগধারার মাধ্যমে এ হঠকারিতা সম্পর্কে সতর্ক করা। তারা নিজেদের মাহফিলে তাঁকে ডেকে এনেছিল তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য। সেখানে তারা অকস্মাত দাবী করেছিল, যদি আপনি নবী হয়ে থাকেন তাহলে বলুন বনী ইসরাঈলের মিসর যাবার ঘটনাটা কি ছিল? এর জবাবে তাদেরকে তখনই এবং সেখানেই এ সংক্ষিপ্ত কাহিনী শুনিয়ে দেয়া হয়। আর সর্বশেষে এ ছোট্ট বাক্যটি বলে তাদের সামনে একটি আয়নাও তুলে ধরা হয়েছে যে, ওহে হঠকারীর দল! এ আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখে নাও, তোমরা কোন্ মুখে পরীক্ষা নিতে বসে গিয়েছিলে? বিবেকবান ব্যক্তি তো সত্য প্রমাণ হয়ে গেলে তা মেনে নেয়, এ জন্যই সে পরীক্ষা নিয়ে থাকে। কিন্তু তোমরা নিজেদের মনের মতো প্রমাণ পেয়ে গেলেও তা মেনে নাও না।

وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا
مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾
أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ
بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾

১২ রুকূ'

আকাশসমূহে[৭৪] ও পৃথিবীতে কত নিদর্শন রয়েছে, যেগুলো তারা অতিক্রম করে যায় কিন্তু সেদিকে একটুও দৃষ্টিপাত করে না।[৭৫] তাদের বেশীর ভাগ আল্লাহকে মানে কিন্তু তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে।[৭৬] তারা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, আল্লাহর আযাবের কোন আকস্মিক আক্রমণ তাদেরকে গ্রাস করে নেবে না অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে তাদের ওপর সহসা কিয়ামত এসে যাবে না?[৭৭]

৭৩. ওপরের সতর্কীকরণের পর এটি দ্বিতীয় সতর্কীকরণ। তবে ওর তুলনায় এর মধ্যে তিরস্কারের দিকটি কম এবং উপদেশের অংশ বেশী। এ উক্তিটিও বাহ্যত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে করা হয়েছে কিন্তু আসলে এখানে কাফেরদের সমাবেশকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদেরকে একথা বুঝানোই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর বান্দারা! একটু ভেবে দেখো, তোমাদের এ হঠকারিতার এখানে অবকাশ কোথায়? যদি পয়গম্বর নিজের কোন ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য দাওয়াত ও প্রচারের এ কাজ চালু করে থাকতেন অথবা নিজের জন্য তিনি কিছু চাইতেন তাহলে অবশ্যি তোমাদের জন্য একথা বলার সুযোগ ছিল যে, আমরা এ ধরনের মতলবী লোকের কথা কেন মানবো? কিন্তু তোমরা দেখছো, এ ব্যক্তি নিস্বার্থ, তোমাদের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের ভালোর জন্য নসীহত করে যাচ্ছেন এবং এর মধ্যে তার নিজের কোন স্বার্থ লুকিয়ে নেই। কাজেই এ ধরনের হঠকারিতার সাহায্যে এর মোকাবিলা করার পেছনে কি যুক্তি আছে? যে ব্যক্তি সবার ভালোর জন্য নিস্বার্থভাবে একটি কথা বলে। তার বিরুদ্ধে খামখা জিদ ধরে বসে থাকা কেন? খোলা মনে তার কথা শোনো। ভালো লাগলে মেনে নাও, ভালো না লাগলে মানবে না।

৭৪. ওপরের এগারটি রুকূ'তে হযরত ইউসুফের (আ) কাহিনী শেষ হয়েছে। যদি নিছক গল্প বলা আল্লাহর অহীর উদ্দেশ্য হতো তাহলে ভাষণ এখানেই শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু এখানে তো কোন উদ্দেশ্য সামনে রেখেই গল্প বলা হয়। এ উদ্দেশ্য প্রচার করার যে কোন সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করতে মোটেই ইতস্তত করা হয় না। এখন যেহেতু লোকেরা নিজেরাই নবীকে ডেকে এনেছিল এবং গল্প শোনার জন্য কান খাড়া করেছিল, তাই তাদের ফরমায়েশী কথা শেষ হতেই নিজের উদ্দেশ্যমূলক কয়েকটি বাক্যও বলে দেয়া হলো। অতি সংক্ষেপে এ কয়েকটি বাক্যে উপদেশ ও দাওয়াতের সমস্ত বিষয়বস্তু একত্র করে দেয়া হয়েছে।

৭৫. লোকদেরকে তাদের গাফলতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়াই এর উদ্দেশ্য। পৃথিবী ও আকাশের প্রত্যেকটি জিনিস নিছক একটি জিনিসই নয় বরং সত্যের প্রতি ইংগিতকারী একটি নিদর্শনও। যারা এ জিনিসগুলোকে শুধুমাত্র একটি জিনিস হিসেবে দেখে তারা মানুষের মতো নয় বরং পশুর মতো দেখে। পানিকে পানি, গাছকে গাছ এবং পাহাড়কে পাহাড় তো পশুরাও দেখে থাকে এবং নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রত্যেকটি পশু এগুলোর ব্যবহার ক্ষেত্রও জানে। কিন্তু মানুষকে যে উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়ানুভূতি সহকারে চিন্তা–ভাবনা করার জন্য মস্তিষ্ক দান করা হয়েছে তা শুধু এ জন্য নয় যে, মানুষ সেগুলো দেখবে এবং সেগুলোর ব্যবহার ক্ষেত্র জানবে বরং মানুষ সত্য অনুসন্ধান করবে এবং এ নিদর্শনগুলোর সাহায্যে তাকে চিনে নেবে, এটিই হচ্ছে এর মূল উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ গাফলতির মধ্যে পড়ে আছে। আর এ গাফলতিই তাদেরকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেছে। যদি মনের দুয়ারে এ তালা না লাগিয়ে নেয়া হতো, তাহলে নবীদের কথা বুঝা এবং তাঁদের নেতৃত্ব থেকে ফায়দা হাসিল করা লোকদের জন্য এত কঠিন হতো না।

৭৬. ওপরে যে গাফলতির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে এটা আসলে তার স্বাভাবিক ফল। লোকেরা যখন পথের চিহ্ন থেকে চোখ বন্ধ করে নিয়েছে তখনই তারা সোজা পথ থেকে সরে গেছে এবং চারপাশের ঝোপঝাড়ের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। এরপরও খুব কম লোকই এমন রয়েছে, যারা গন্তব্য সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছে এবং আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা হিসেবে চূড়ান্তভাবে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। অধিকাংশ লোক যে গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে তা আল্লাহকে অস্বীকার করার গোমরাহী নয় বরং শিরকের গোমরাহী। অর্থাৎ তারা আল্লাহ নেই একথা বলে না বরং তারা আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও অধিকারে অন্যদেরকে কোন না কোনভাবে অংশীদার করার বিভ্রান্তিতে লিপ্ত। পৃথিবী ও আকাশের বিভিন্ন নিদর্শন, যেগুলো সর্বত্র সর্বক্ষণ আল্লাহর একক সার্বভৌম কর্তৃত্বের ঘোষণা দিচ্ছে, সেগুলোতে যদি শিক্ষণীয় দৃষ্টিতে দেখা হতো তাহলে কোনদিন এ বিভ্রান্তির জন্ম হতো না।

৭৭. লোকদেরকে সতর্ক করাই এর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ অবকাশ জীবনকে দীর্ঘতর মনে করে এবং বর্তমানের শান্তি ও নিরাপত্তাকে চিরস্থায়ী ভেবে পরিণামের চিন্তাকে ভবিষ্যতের জন্য শিকেয় তুলে রেখো না। কোন ব্যক্তিই নিশ্চয়তা সহকারে একথা বলতে পারে না যে, তার জীবনকাল অমুক সময় পর্যন্ত অবশ্যি স্থায়ী হবে। কাকে হঠাৎ কখন গ্রেফতার করা হবে এবং কোথা থেকে কি অবস্থায় তাকে ধরে আনা হবে তা কেউ জানে না। তোমাদের দিনরাতের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, ভবিষ্যতের গর্ভে তোমাদের জন্য কি লুকানো আছে তা এক মুহূর্ত আগেও তোমরা জানতে পার না। কাজেই যা কিছু চিন্তা করার এখনই করে নাও। জীবনের যে পথে এগিয়ে যাচ্ছো তার ওপর সামনে অগ্রসর হবার আগে ঠিক পথে যাচ্ছো কিনা একটু থেমে চিন্তা করে দেখো। এটা যে সঠিক পথ, এর সপক্ষে কোন যথার্থ দলীল তোমাদের কাছে আছে কি? বিশ্ব প্রকৃতির নিদর্শনাবলী থেকে এর সত্যসঠিক পথ হবার কোন প্রমাণ পাচ্ছো কি? তোমাদের স্বজাতীয় লোকেরা এ পথে চলে ইতিপূর্বে যে ফল লাভ করেছে এবং বর্তমানে তোমাদের সমাজ সংস্কৃতিতে এর যে ফলাফল দেখা যাচ্ছে তা কি একথাই প্রমাণ করে যে, তোমরা সঠিক পথে যাচ্ছো?

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۣ عَلٰي بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۭ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝۱۰۸ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ۭ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝۱۰۹

তাদেরকে পরিষ্কার বলে দাও ঃ আমার পথতো এটাই, আমি আল্লাহর দিকে ডাকি, আমি নিজেও পূর্ণ আলোকে নিজের পথ দেখছি এবং আমার সাথীরাও। আর আল্লাহ পাক-পবিত্র[৭৮] এবং শিরককারীদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বে আমি যে নবীদেরকে পাঠিয়েছিলাম তারা সবাই মানুষই ছিল, এসব জনবসতিরই অধিবাসী ছিল এবং তাদের কাছেই আমি অহী পাঠাতে থেকেছি। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং তাদের পূর্বে যেসব জাতি চলে গেছে তাদের পরিণাম দেখেনি? নিশ্চিতভাবেই আখেরাতের আবাস তাদের জন্য আরো বেশী ভালো যারা (নবীর কথা মেনে নিয়ে) তাকওয়ার পথ অবলম্বন করেছে। এখনো কি তোমরা বুঝবে না?[৭৯]

৭৮. অর্থাৎ তাঁর প্রতি যেসব কথা প্রয়োগ করা হচ্ছে তা থেকে তিনি পাক-পবিত্র। যেসব দোষ, ত্রুটি, অভাব ও দুর্বলতা প্রত্যেক মুশরিকী আকীদার ভিত্তিতে তার প্রতি অনিবার্যভাবে আরোপিত হয় তা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এমন সব দোষ, ত্রুটি ও ভুল-ভ্রান্তি থেকেও মুক্ত যেগুলো শিরকের ফলশ্রুতি হিসেবে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হয়।

৭৯. এখানে একটি বিরাট বিষয়কে দু'তিনটি বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। একে যদি কোন বিস্তারিত বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হয় তাহলে এভাবে বলা যেতে পারে ঃ "তারা যে তোমার কথার প্রতি দৃষ্টি দেয় না, তার কারণ হচ্ছে এই যে, কালকে যে ব্যক্তির জন্ম হলো তাদেরই শহরে এবং তাদেরই সামনে সে শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্যে পৌঁছুলো, তার ব্যাপারে তারা কেমন করে একথা মেনে নেবে যে, একদিন হঠাৎ আল্লাহ তাকে নিজের দূত হিসেবে নিযুক্ত করেছেন? কিন্তু এটা কোন নতুন কথা নয়। দুনিয়ায় আজ প্রথমবার তাদেরকেই এর মুখোমুখি হতে হয়নি। এর আগেও আল্লাহ দুনিয়ায় নবী পাঠিয়েছেন। তাঁরা সবাই মানুষই ছিলেন। সেখানেও কখনো অকস্মাত কোন শহরে কোন অপরিচিত ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেনি এবং তিনি একথা বলেননি যে, তাঁকে নবী নিযুক্ত করে পাঠানো হয়েছে। বরং মানবতার সংস্কার ও সংশোধনের জন্য যাদেরই আবির্ভাব হয়েছে তারা সবাই সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর নিজস্ব

حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّىَ مَنْ نَّشَآءُ ۭ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١١٠﴾ لَقَدْ كَانَ فِىْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ۭ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١١١﴾

(আগের নবীদের সাথেও এমনটি হতে থেকেছে। অর্থাৎ তারা দীর্ঘদিন উপদেশ দিয়ে গেছেন কিন্তু লোকেরা তাদের কথা শোনেনি।) এমনকি যখন নবীরা লোকদের থেকে হতাশ হয়ে গেলো এবং লোকেরাও ভাবলো তাদেরকে মিথ্যা বলা হয়েছিল তখন অকস্মাত আমার সাহায্য নবীদের কাছে পৌঁছে গেলো। তারপর এ ধরনের সময় যখন এসে যায় তখন আমার নিয়ম হচ্ছে, যাকে আমি চাই তাকে রক্ষা করি এবং অপরাধীদের প্রতি আমার আযাব তো রদ করা যেতে পারে না।

পূর্ববর্তী লোকদের এ কাহিনীর মধ্যে বুদ্ধি ও বিবেচনা সম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। কুরআনে এ যা কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে এগুলো বানোয়াট কথা নয় বরং এগুলো ইতিপূর্বে এসে যাওয়া কিতাবগুলোতে বর্ণিত সত্যের সমর্থন এবং সবকিছুর বিশদ বিবরণ,[৮০] আর যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

এলাকার ও জনবসতির লোকই ছিলেন। ঈসা, মূসা, ইবরাহীম, নূহ আলাইহিমুস সালাম কারা ছিলেন? যেসব জাতি তাঁদের সংস্কারের আহবান গ্রহণ করেনি এবং নিজেদের ভিত্তিহীন কল্পনা বিলাসিতা ও নিয়ন্ত্রণহীন কামনা বাসনার পিছনে দৌড়াতে থেকেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে তোমরা নিজেরাই দেখে নাও। তোমরা নিজেদের বাণিজ্যিক সফরসমূহে আদ, সামুদ, মাদয়ান ও লূত জাতির ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকার ওপর দিয়ে যাওয়া আসা করছো। সেখানে কি তোমরা কোন শিক্ষা পাওনি? দুনিয়ায় তারা এই যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে এটিই তো এ খবর দিয়ে যাচ্ছে যে, আখেরাতে তাদের পরিণাম হবে এর চেয়ে আরো বেশী ভয়াবহ। আর যারা দুনিয়ায় নিজেদের সংশোধন করে নিয়েছে তারা কেবল দুনিয়ায়ই ভালো থাকেনি, আখেরাতেও তাদের পরিণতি এর চেয়ে আরো অনেক বেশী ভালো হবে।"

৮০. অর্থাৎ মানুষের হেদায়াত পাওয়া ও পথ দেখার জন্য যেসব জিনিসের প্রয়োজন তার প্রত্যেকটির বিস্তারিত বিবরণ। কেউ কেউ "প্রত্যেকটি জিনিসের বিস্তারিত বিবরণ"

শব্দাবলী থেকে অযথা সারা দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের বিস্তারিত বিবরণ অর্থ করেন এবং এরপর কুরআনে উদ্ভিদ বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, বিজ্ঞান ও অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ না পেয়ে পেরেশান হয়ে পড়েন।

আর্ রা'দ

১৩

নামকরণ

তের নম্বর আয়াতের وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ বাক্যাংশের "আর্ রা'দ" শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ নামকরণের মানে এ নয় যে, এ সূরায় রা'দ অর্থাৎ মেঘগর্জনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বরং এটা শুধু আলামত হিসেবে একথা প্রকাশ করে যে, এ সূরায় "রাদ" উল্লেখিত হয়েছে বা "রা'দ"–এর কথা বলা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

৪ ও ৬ রুকূ'র বিষয়বস্তু সাক্ষ দিচ্ছে, এ সূরাটিও সূরা ইউনূস, হূদ ও আ'রাফের সমসময়ে নাযিল হয়। অর্থাৎ মক্কায় অবস্থানের শেষ যুগে। বর্ণনাভংগী থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াত শুরু করার পর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেছে। বিরোধী পক্ষ তাঁকে লাঞ্ছিত করার এবং তাঁর মিশনকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে থাকে। মুমিনরা বারবার এ আকাংখা পোষণ করতে থাকে, হায়! যদি কোনপ্রকার অলৌকিক কাণ্ড–কারখানার মাধ্যমে এ লোকগুলোকে সত্য সরল পথে আনা যায়। অন্যদিকে আল্লাহ মুসলমানদেরকে এ মর্মে বুঝাচ্ছেন যে, ঈমানের পথ দেখাবার এ পদ্ধতি আমার এখানে প্রচলিত নেই আর যদি ইসলামের শত্রুদের রশি ঢিলে করে দেয়া হয়ে থাকে তাহলে এটা এমন কোন ব্যাপার নয় যার ফলে তোমরা ভয় পেয়ে যাবে। তারপর ৩১ আয়াত থেকে জানা যায়, বার বার কাফেরদের হঠকারিতার এমন প্রকাশ ঘটেছে যারপর ন্যায়সংগতভাবে একথা বলা যায় যে, যদি কবর থেকে মৃত ব্যক্তিরাও উঠে আসেন তাহলেও এরা মেনে নেবে না বরং এ ঘটনার কোন না কোন ব্যাখ্যা করে নেবে। এসব কথা থেকে অনুমান করা যায় যে, এ সূরাটি মক্কার শেষ যুগে নাযিল হয়ে থাকবে।

কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু

সূরার মূল বক্তব্য প্রথম আয়াতেই বলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু পেশ করছেন তাই সত্য কিন্তু এ লোকেরা তা মেনে নিচ্ছে না, এটা এদের ভুল। এ বক্তব্যই সমগ্র ভাষণটির কেন্দ্রীয় বিষয়। এ প্রসংগে বার বার বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাওহীদ, রিসালাত ও পরকালের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। এগুলোর

প্রতি ঈমান আনার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ফায়দা বুঝানো হয়েছে। এগুলো অস্বীকার করার ক্ষতি জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এ সংগে একথা মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া হয়েছে যে, কুফরী আসলে পুরোপুরি একটি নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপর এ সমগ্র বর্ণনাটির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বুদ্ধি-বিবেককে দীক্ষিত করা নয় বরং মনকে ঈমানের দিকে আকৃষ্ট করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল-প্রমাণ পেশ করেই শেষ করে দেয়া হয়নি, এ সংগে এক একটি দলীল ও এক একটি প্রমাণ পেশ করার পর থেমে গিয়ে নানা প্রকার ভীতি প্রদর্শন, উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি এবং স্নেহপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে অজ্ঞ লোকদের নিজেদের বিভ্রান্তিকর হঠকারিতা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

ভাষণের মাঝখানে বিভিন্ন জায়গায় বিরোধীদের আপত্তিসমূহের উল্লেখ না করেই তার জবাব দেয়া হয়েছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের ব্যাপারে লোকদের মনে যেসব সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল অথবা বিরোধীদের পক্ষ থেকে সৃষ্টি করা হচ্ছিল সেগুলো দূর করা হয়েছে। এ সংগে মুমিনরা কয়েক বছরের দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রামের কারণে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছিল এবং অস্থির চিত্তে অদৃশ্য সাহায্যের প্রতীক্ষা করছিল, তাই তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে।

আয়াত ৪৩ | সূরা আর্ রা'দ–মক্কী | রুকূ' ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

الٓمّٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ۗ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ
الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝١ اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ
بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ ۭ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ
لَعَلَّكُمْ بِلِقَاۗءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ۝٢

আলিফ লাম মীম র। এগুলো আল্লাহর কিতাবের আয়াত। আর তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যাকিছু নাযিল হয়েছে তা প্রকৃত সত্য কিন্তু (তোমার কওমের) অধিকাংশ লোক তা বিশ্বাস করে না।[১]

আল্লাহই আকাশসমূহ স্থাপন করেছেন এমন কোন স্তম্ভ ছাড়াই যা তোমরা দেখতে পাও।[২] তারপর তিনি নিজের শাসন কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন হয়েছেন।[৩] আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে একটি আইনের অধীন করেছেন।[৪] এ সমগ্র ব্যবস্থার প্রত্যেকটি জিনিস একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলে।[৫] আল্লাহই এ সমস্ত কাজের ব্যবস্থাপনা করছেন। তিনি নিদর্শনাবলী খুলে খুলে বর্ণনা করেন,[৬] সম্ভবত তোমরা নিজেদের রবের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারটি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করবে।[৭]

১. এটাই এ সূরার ভূমিকা। এখানে মাত্র কয়েকটি শব্দে সমগ্র বক্তব্যের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। বক্তব্যের লক্ষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁকে সম্বোধন করে মহান আল্লাহ বলছেন : হে নবী! তোমার সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক এ শিক্ষা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি এটা তোমার প্রতি নাযিল করেছি এবং লোকেরা মানুক বা না মানুক এটাই সত্য। এ সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর মূল ভাষণ শুরু হয়ে গেছে। তাতে অস্বীকারকারীদেরকে এ শিক্ষা সত্য কেন এবং এর ব্যাপারে তাদের নীতি কতটুকু ভুল—একথা বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ভাষণটি বুঝতে হলে শুরুতেই এ

বিষয়টি সামনে থাকা প্রয়োজন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় যে জিনিসটির দিকে লোকদেরকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন তা তিনটি মৌলিক বিষয় সমন্বিত ছিল। এক, প্রভুত্বের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। এ কারণে তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদাত ও বন্দেগী লাভের যোগ্য নয়। দুই, এ জীবনের পরে আর একটি জীবন আছে। সেখানে তোমাদের নিজেদের যাবতীয় কার্যক্রমের জবাবদিহি করতে হবে। তিন, আমি আল্লাহর রসূল এবং আমি যা কিছু পেশ করছি নিজের পক্ষ থেকে নয় বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে পেশ করছি। এ তিনটি মৌলিক কথা মানতে লোকেরা অস্বীকার করছিল। এ কথাগুলোকেই এ ভাষণের মধ্যে বার বার বিভিন্ন পদ্ধতিতে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এগুলো সম্পর্কে লোকদের সন্দেহ ও আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে।

২. অন্য কথায় আকাশসমূহকে অদৃশ্য ও অননুভূত স্তম্ভসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আপাতদৃষ্টে মহাশূন্যে এমন কোন জিনিস নেই, যা এ সীমাহীন মহাকাশ ও নক্ষত্র জগতকে ধরে রেখেছে। কিন্তু একটি অননুভূত শক্তি তাদের প্রত্যেককে তার নিজের স্থানে ও আবর্তন পথের ওপর আটকে রেখেছে এবং মহাকাশের এ বিশাল বিশাল নক্ষত্রগুলোকে পৃথিবীপৃষ্ঠে বা তাদের পরস্পরের ওপর পড়ে যেতে দিচ্ছে না।

৩. এর ব্যাখ্যার জন্য সূরা আ'রাফের ৪১ টীকা দেখুন। তবে সংক্ষেপে এখানে এতটুকু ইশারা যথেষ্ট মনে করি যে, আরশের (অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল) ওপর আল্লাহর সমাসীন হবার ব্যাপারটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে কুরআনে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ এ বিশ্ব-জাহানকে কেবল সৃষ্টিই করেননি বরং তিনি নিজেই এ রাজ্যের শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনা করছেন। এ সুবিশাল জগতটি এমন কোন কারখানা নয়, যা নিজে নিজেই চলছে, যেমন অনেক মূর্খ ও অজ্ঞ লোক ধারণা করে থাকে। আর এ প্রাকৃতিক জগতটি বহু ইলাহর বিচরণক্ষেত্র নয়, অন্য এক দল অজ্ঞ ও মূর্খ যেমনটি মনে করে বসে আছে বরং এটি একটি নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং এর সৃষ্টিকর্তা নিজেই এ ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন।

৪. এখানে এ বিষয়টি সামনে রাখতে হবে যে, এমন এক কওমকে এখানে সম্বোধন করা হচ্ছে যারা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না, তিনি যে সবকিছুর স্রষ্টা তাও অস্বীকার করতো না এবং এখানে যেসব কাজের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সেগুলোর কর্তা এ ধারণাও পোষণ করতো না। তাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই যে এ আকাশসমূহ স্থাপন করেছেন এবং তিনিই চন্দ্র ও সূর্যকে একটি নিয়মের অধীন করেছেন, একথার সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন বোধ করা হয়নি। বরং যেহেতু শ্রোতা নিজে এ সত্যগুলোর বিশ্বাস করতো, তাই এগুলোকে অন্য একটি মহাসত্যের জন্য যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। সে মহাসত্যটি হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া মাবূদ গণ্য হবার অধিকার রাখে এমন দ্বিতীয় কোন সত্তা এ বিশ্ব ব্যবস্থায় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী নয়। প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, যে ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্বই মানে না এবং তিনি যে বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা ও শাসনকর্তা সে কথা একেবারেই অস্বীকার করে তার মোকাবিলায় এ যুক্তি কেমন করে কার্যকর হতে পারে? এর জবাবে বলা যায়, মুশরিকদের মোকাবিলায় তাওহীদকে প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ যেসব যুক্তি দেন নাস্তিকদের মোকাবিলায় আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য সেই একই যুক্তি যথেষ্ট। তাওহীদের সমস্ত যুক্তির ভিত্তিভূমি

হচ্ছে এই যে, পৃথিবী থেকে নিয়ে আকাশ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব-জাহান একটি পূর্ণাংগ কারখানা এবং এ সমগ্র কারখানাটি চলছে একটি মহাপরাক্রান্ত শক্তির অধীনে। এর মধ্যে সর্বত্র একটি সার্বভৌম কর্তৃত্ব, একটি নিখুঁত প্রজ্ঞা ও নির্ভুল জ্ঞানের লক্ষণ প্রতিভাত। এ লক্ষণ ও চিহ্নগুলো যেমন একথা প্রকাশ করে যে, এ ব্যবস্থার বহু পরিচালক নেই তেমনি একথাও প্রকাশ করে যে, এ ব্যবস্থার একজন পরিচালক অবশ্যই রয়েছেন। প্রতিষ্ঠান থাকবে অথচ তার পরিচালক থাকবে না, আইন থাকবে অথচ শাসক থাকবে না, প্রজ্ঞা নৈপুণ্য ও দক্ষতা বিরাজ করবে অথচ কোন প্রাজ্ঞ, দক্ষ ও নিপুণ সত্তা থাকবে না, জ্ঞান থাকবে অথচ জ্ঞানী থাকবে না, সর্বোপরি সৃষ্টি থাকবে অথচ তার স্রষ্টা থাকবে না-এমন উদ্ভট ধারণা কেবল সেই ব্যক্তিই করতে পারে যে চরম হঠকারী ও গোঁয়ার অথবা যার বুদ্ধি বিভ্রম ঘটেছে।

৫. অর্থাৎ এ অবস্থা কেবল মাত্র একথার সাক্ষ্য দিচ্ছে না যে, সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন এক সত্তা এর ওপর শাসন কর্তৃত্ব চালাচ্ছে এবং একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রজ্ঞা এর মধ্যে কাজ করছে বরং এর সমস্ত অংশ এবং এর মধ্যে কর্মরত সমস্ত শক্তিই এ সাক্ষও দিচ্ছে যে, এর কোন জিনিসই স্থায়ী নয়। প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য একটি সময় নির্ধারিত রয়েছে। সেই সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত তা চলতে থাকে এবং সময় শেষ হয়ে গেলে খতম হয়ে যায়। এ সত্যটি যেমন এ কারখানার প্রত্যেকটি অংশের ব্যাপারে সঠিক তেমনি সমগ্র কারখানা বা স্থাপনাটির ব্যাপারেও সঠিক। এ প্রাকৃতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক কাঠামো জানিয়ে দিচ্ছে যে, এটি চিরন্তন ব্যবস্থা নয়, এর জন্যও কোন সময় অবশ্যি নির্ধারিত রয়েছে, যখন এ সময় খতম হয়ে যাবে তখন এর জায়গায় আর একটি জগত শুরু হয়ে যাবে। কাজেই যে কিয়ামতের আসার খবর দেয়া হয়েছে তার আসাটা অসম্ভব নয় বরং না আসাটাই অসম্ভব।

৬. অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব সত্যের খবর দিচ্ছেন সেগুলোর যথার্থতা ও সত্যতা নিরূপক নিদর্শনাবলী। বিশ্ব-জাহানের সর্বত্র সেগুলোর পক্ষে সাক্ষ দেবার মতো নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। লোকেরা চোখ খুলে দেখলে দেখতে পাবে যে, কুরআনে যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেয়া হয়েছে, পৃথিবী ও আকাশে ছড়ানো অসংখ্য নিদর্শন সেগুলোর সত্যতা প্রমাণ করছে।

৭. ওপরে বিশ্ব-জাহানের যে নিদর্শনাবলীকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে তাদের এ সাক্ষ তো একেবারেই সুস্পষ্ট যে, এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও পরিচালক একজনই কিন্তু মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন, আল্লাহর আদালতে মানুষের হাযির হওয়া এবং পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব খবর দিয়েছেন সেগুলোর সত্যতার সাক্ষও এ নিদর্শনগুলোই দিচ্ছে। তবে এ সাক্ষ একটু অস্পষ্ট এবং সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে বোধগম্য হয়। তাই প্রথম সত্যটির ব্যাপারে সজাগ করে দেবার প্রয়োজনবোধ করা হয়নি। কারণ শ্রোতা শুধুমাত্র যুক্তি শুনেই বুঝতে পারে, এ থেকে কি কথা প্রমাণ হয়। তবে দ্বিতীয় সত্যটির ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। কারণ এ নিদর্শনগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলেই নিজের রবের দরবারে হাযির হবার ব্যাপারটির ওপর বিশ্বাস জন্মাতে পারে।

উপরোক্ত নিদর্শনগুলো থেকে আখেরাতের প্রমাণ দু'ভাবে পাওয়া যায় ঃ

وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا ۭ وَمِنْ كُلِّ
الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ ۭ اِنَّ
فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝ وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ
مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ
صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَاۗءٍ وَّاحِدٍ ۣ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰي بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ ۭ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

আর তিনিই এ ভূতলকে বিছিয়ে রেখেছেন, এর মধ্যে পাহাড়ের খুঁটি গেড়ে দিয়েছেন এবং নদী প্রবাহিত করেছেন। তিনিই সব রকম ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায় এবং তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে ফেলেন।[৮] এ সমস্ত জিনিসের মধ্যে বহুতর নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

আর দেখো, পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন আলাদা আলাদা ভূখণ্ড,[৯] রয়েছে আংগুর বাগান, শস্যক্ষেত, খেজুর গাছ—কিছু একাধিক কাণ্ডবিশিষ্ট আবার কিছু এক কাণ্ডবিশিষ্ট,[১০] সবই সিঞ্চিত একই পানিতে কিন্তু স্বাদের ক্ষেত্রে আমি করে দেই তাদের কোনটাকে বেশী ভালো এবং কোনটাকে কম ভালো। এসব জিনিসের মধ্যে যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায় তাদের জন্য রয়েছে বহুতর নিদর্শন।[১১]

এক ঃ যখন আমরা আকাশমণ্ডলীর গঠনাকৃতি এবং চন্দ্র ও সূর্যকে একটি নিয়মের অধীনে পরিচালনা করার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি তখনই আমাদের মন সাক্ষ দেয় যে, আল্লাহ এ বিশাল জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর অসীম শক্তি এ বিরাট বিরাট গ্রহ-নক্ষত্রকে মহাশূন্যে আবর্তিত করছে তাঁর পক্ষে মানব জাতিকে মৃত্যুর পর পুনর্বার সৃষ্টি করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।

দুই ঃ এ মহাশূন্য ব্যবস্থা থেকে আমরা একথারও সাক্ষ লাভ করি যে, এর স্রষ্টা একজন সর্বজ্ঞ এ পরিপূর্ণ জ্ঞানবান সত্তা। তিনি মানব জাতিকে বুদ্ধিমান সচেতন এবং স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম শক্তি সম্পন্ন সৃষ্টি হিসেবে তৈরী করার এবং নিজের যমীনের অসংখ্য বস্তুনিচয়ের ওপর তাদেরকে কর্তৃত্ব ক্ষমতা দান করার পর তাদের জীবনকালের বিভিন্ন কাজের হিসেব নেবেন না, তাদের মধ্যে যারা জালেম তাদেরকে জুলুম-অত্যাচারের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না এবং মজলুমদের ফরিয়াদ শুনবেন না, তাদের সৎলোকদেরকে সৎকাজের পুরস্কার এবং অসৎলোকদেরকে অসৎকাজের জন্য শাস্তি দেবেন না এবং

তাদেরকে কখনো একথা জিজ্ঞেসই করবেন না যে, আমি তোমাদের হাতে যে মূল্যবান আমানত সোপর্দ করেছিলাম তাকে তোমরা কিভাবে ব্যবহার করেছো—একথা তাঁর পূর্ণজ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে কখনো কল্পনাই করা যায় না। একজন অন্ধ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন রাজা অবশ্যি নিজের রাজ্যের যাবতীয় কাজ-কারবার নিজের কর্মচারীদের হাতে সোপর্দ করে দিয়ে নিজের দায়িত্বের ব্যাপারে গাফেল হয়ে যেতে পারেন কিন্তু একজন জ্ঞানী ও সচেতন রাজার কাছ থেকে কখনো এ ধরনের ভ্রান্তি, অসতর্কতা ও গাফলতি আশা করা যেতে পারে না।

আকাশ সম্পর্কে এ ধরনের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ফলে পরকালীণ জীবন যে সম্ভবপর শুধু এ ধারণাই আমাদের মনে সৃষ্টি হয় না বরং তা যে একদিন অবশ্যি শুরু হবে এ ব্যাপারে সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মে।

৮. মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের পর পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এখানেও আল্লাহর শক্তি ও জ্ঞানের নিদর্শন থেকে পূর্বোক্ত দু'টি চিরন্তন সত্যের (তাওহীদ ও আখেরাত) স্বপক্ষে যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়। ইতিপূর্বে পিছনের আয়াতগুলোতে মহাকাশ জগতের নিদর্শনসমূহ থেকে এরি সপক্ষে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছিল। এ দলীল-প্রমাণের সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ মহাকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সাথে পৃথিবীর সম্পর্ক, পৃথিবীর সাথে সূর্য ও চন্দ্রের সম্পর্ক, পৃথিবীর অসংখ্য সৃষ্টির প্রয়োজনের সাথে পাহাড়-পর্বত ও নদী-সাগরের সম্পর্ক—এসব জিনিস এ মর্মে সুস্পষ্টভাবে সাক্ষ দিচ্ছে যে, কোন পৃথক এক স্রষ্টা এদেরকে সৃষ্টি করেনি এবং বিভিন্ন স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন সত্তা এদেরকে পরিচালনা করছে না। যদি এমনটি হতো তাহলে এসব জিনিসের মধ্যে এত বেশী পারস্পরিক সম্পর্ক সামঞ্জস্য ও একাত্মতা সৃষ্টি হতো না এবং তা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতেও পারতো না। পৃথক পৃথক স্রষ্টার জন্য এটা কেমন করে সম্ভবপর ছিল যে, তারা সবাই মিলে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টি ও পরিচালনার জন্য এমন পরিকল্পনা তৈরী করতেন, যার প্রত্যেকটি জিনিস পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত একটার সাথে আর একটা মিলে যেতে থাকতো এবং কখনো তাদের স্বার্থের মধ্যে কোন প্রকার সংঘাত হতো না?

দুই ঃ পৃথিবীর এ বিশাল গ্রহটির মহাশূন্যে ঝুলে থাকা, এর উপরিভাগে এত বড় বড় পাহাড় জেগে ওঠা, এর বুকের ওপর এ বিশালকায় নদী ও সাগরগুলো প্রবাহিত হওয়া, এর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য বৃক্ষরাজির ফলে ফুলে সুশোভিত হওয়া এবং অত্যন্ত নিয়ম-শৃংখলাবদ্ধভাবে অনবরত রাত ও দিনের নিদর্শনের বিস্ময়করভাবে আবর্তিত হওয়া এসব জিনিস যে আল্লাহ এদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর শক্তিমত্তার সাক্ষ দিচ্ছে। এহেন অসীম শক্তিধর মহান সত্তাকে মানুষের মৃত্যুর পর পুনর্বার তাকে জীবন দান করতে অক্ষম মনে করা বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার নয়, নিরেট নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ।

তিন ঃ পৃথিবীর ভৌগোলিক রূপকাঠামো, তার ওপর পর্বতমালা সৃষ্টি, পাহাড় থেকে নদী ও ঝরণাধারা প্রবাহিত হবার ব্যবস্থা, সকল প্রকার ফলের মধ্যে দু' ধরনের ফল সৃষ্টি এবং রাতের পরে দিন ও দিনের পরে রাতকে নিয়মিতভাবে আনার মধ্যে যে সীমাহীন প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা সরবে সাক্ষ দিয়ে যাচ্ছে যে, যে আল্লাহ

সৃষ্টির এ নকশা তৈরী করেছেন তিনি একজন পূর্ণ জ্ঞানী। এ সমস্ত জিনিসই এ সংবাদ পরিবেশন করে যে, এগুলো কোন সংকল্পবিহীন শক্তির কার্যক্রম এবং কোন উদ্দেশ্যবিহীন খেলোয়াড়ের খেলনা নয়। এর প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে একজন জ্ঞানীর জ্ঞান এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের পরিপক্ক প্রজ্ঞার সক্রিয়তা দৃষ্টিগোচর হয়। এসব কিছু দেখার পর শুধুমাত্র অজ্ঞ ও মূর্খই এ ধারণা করতে পারে যে, পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করে এবং তাকে এমন সংঘাতমুখর ঘটনাপ্রবাহ সৃষ্টির সুযোগ দিয়ে তিনি তাকে কোন প্রকার হিসেব নিকেশ ছাড়া এমনিই মাটিতে মিশিয়ে দেবেন।

৯. অর্থাৎ সারা পৃথিবীকে তিনি একই ধরনের একটি ভূখণ্ড বানিয়ে রেখে দেননি। বরং তার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য ভূখণ্ড, এ ভূখণ্ডগুলো পরস্পর সংলগ্ন থাকা। সত্ত্বেও আকার-আকৃতি, রং, গঠন, উপাদান, বৈশিষ্ট, শক্তি ও যোগ্যতা এবং উৎপাদন ও রাসায়নিক বা খনিজ সম্পদে পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে। এ বিভিন্ন ভূখণ্ডের সৃষ্টি এবং তাদের মধ্যে নানা প্রকার বিভিন্নতার অস্তিত্ব এত বিপুল পরিমাণ জ্ঞান ও কল্যাণে পরিপূর্ণ যে, তা গণনা করে শেষ করা যেতে পারে না। অন্যান্য সৃষ্টির কথা বাদ দিয়ে কেবলমাত্র মানুষের স্বার্থকে সামনে রেখে যদি দেখা যায় তাহলে অনুমান করা যেতে পারে যে, মানুষের বিভিন্ন স্বার্থ ও চাহিদা এবং পৃথিবীর এ ভূখণ্ডগুলোর বৈচিত্রের মধ্যে যে সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য পাওয়া যায় এবং এসবের বদৌলতে মানুষের সমাজ সংস্কৃতি বিকশিত ও সম্প্রসারিত হবার যে সুযোগ লাভ করে তা নিশ্চিতভাবেই কোন জ্ঞানী ও বিজ্ঞানময় সত্তার চিন্তা, তাঁর সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং বিজ্ঞতাপূর্ণ সংকল্পের ফলশ্রুতি। একে নিছক একটি আকস্মিক ঘটনা মনে করা বিরাট হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

১০. কিছু কিছু খেজুর গাছের মূল থেকে একটি খেজুর গাছ বের হয় আবার কিছু কিছুর মূল থেকে একাধিক গাছ বের হয়।

১১. এ আয়াতে আল্লাহর তাওহীদ এবং তাঁর শক্তি ও জ্ঞানের নিদর্শনাবলী দেখানো ছাড়া আরো একটি সত্যের দিকেও সূক্ষ্ম ইশারা করা হয়েছে। এ সত্যটি হচ্ছে, আল্লাহ এ বিশ্ব-জাহানে কোথাও এক রকম অবস্থা রাখেননি। একই পৃথিবী কিন্তু এর ভূখণ্ডগুলোর প্রত্যেকের বর্ণ, আকৃতি ও বৈশিষ্ট আলাদা। একই জমি ও একই পানি, কিন্তু তা থেকে বিভিন্ন প্রকার ফল ও ফসল উৎপন্ন হচ্ছে। একই গাছ কিন্তু তার প্রত্যেকটি ফল একই জাতের হওয়া সত্ত্বেও তাদের আকৃতি, আয়তন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট সম্পূর্ণ আলাদা। একই মূল থেকে দু'টি ভিন্ন গাছ বের হচ্ছে এবং তাদের প্রত্যেকেই নিজের একক বৈশিষ্টের অধিকারী। যে ব্যক্তি এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে সে কখনো মানুষের স্বভাব, প্রকৃতি, ঝোঁক-প্রবণতা ও মেজাজের মধ্যে এতবেশী পার্থক্য দেখে পেরেশান হবে না। যেমন এ সূরার সামনের দিকে গিয়ে বলা হয়েছে, যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে সকল মানুষকে একই রকম তৈরী করতে পারতেন কিন্তু যে জ্ঞান ও কৌশলের ভিত্তিতে আল্লাহ এ বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করেছেন তা সমতা, সাম্য ও একাত্মতা নয় বরং বৈচিত্র ও বিভিন্নতার প্রয়াসী। সবাইকে এক ধরনের করে সৃষ্টি করার পর তো এ অস্তিত্বের সমস্ত জীবন প্রবাহই অর্থহীন হয়ে যেতো।

وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ۚ
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ
بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦﴾
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ إِنَّمَا أَنتَ
مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٧﴾

এখন যদি তুমি বিস্মিত হও, তাহলে লোকদের একথাটিই বিস্ময়কর : "মরে মাটিতে মিশে যাবার পর কি আমাদের আবার নতুন করে পয়দা করা হবে?" এরা এমনসব লোক যারা নিজেদের রবের সাথে কুফরী করেছে।[১২] এরা এমনসব লোক যাদের গলায় শেকল পরানো আছে।[১৩] এরা জাহান্নামী এবং চিরকাল জাহান্নামেই থাকবে।

এ লোকেরা ভালোর পূর্বে মন্দের জন্য তাড়াহুড়ো করছে।[১৪] অথচ এদের আগে (যারাই এ নীতি অবলম্বন করেছে তাদের ওপর আল্লাহর আযাবের) বহু শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত অতীত হয়ে গেছে। একথা সত্য, তোমার রব লোকদের বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও তাদের প্রতি ক্ষমাশীল আবার একথাও সত্য যে, তোমার রব কঠোর শাস্তিদাতা।

যারা তোমার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা বলে, "এ ব্যক্তির ওপর এর রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন?"[১৫] —তুমিতো শুধুমাত্র একজন সতর্ককারী, আর প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্য রয়েছে একজন পথপ্রদর্শক।[১৬]

১২. অর্থাৎ তাদের আখেরাত অস্বীকার ছিল মূলত আল্লাহ, তাঁর শক্তিমত্তা ও জ্ঞান অস্বীকারের নামান্তর। তারা কেবল এতটুকুই বলতো না যে, আমাদের মাটিতে মিশে যাবার পর পুনর্বার পয়দা হওয়া অসম্ভব। বরং তাদের এ একই উক্তির মধ্যে এ চিন্তাও প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, (নাউযুবিল্লাহ) যে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি শক্তিহীন, অক্ষম, দুর্ভাগ্যপীড়িত, অজ্ঞ ও বুদ্ধিহীন।

১৩. গলায় শেকল পরানো থাকা কয়েদী হবার আলামত। তাদের গলায় শেকল পরানো আছে বলে একথা বুঝানো হচ্ছে যে, তারা নিজেদের মূর্খতা, হঠকারিতা, নফসানী খাহেশাত ও বাপ–দাদার অন্ধ অনুকরণের শেকলে বাঁধা পড়ে আছে। তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা–ভাবনা করতে পারে না। অন্ধ স্বার্থ ও গোষ্ঠীপ্রীতি তাদেরকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে যে, তারা আখেরাতকে মেনে নিতে পারে না, যদিও তা মেনে নেয়া পুরোপুরি যুক্তিসংগত। আবার অন্যদিকে এর ফলে তারা আখেরাত অস্বীকারের ওপর অবিচল রয়েছে, যদিও তা পুরোপুরি যুক্তিহীন।

১৪. মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতো, যদি তুমি সত্যিই নবী হয়ে থাকো এবং তুমি দেখছো আমরা তোমাকে অস্বীকার করছি, তাহলে তুমি আমাদের যে আযাবের ভয় দেখিয়ে আসছো তা এখন আমাদের ওপর আসছে না কেন? তার আসার ব্যাপারে অযথা বিলম্ব হচ্ছে কেন? কখনো তারা চ্যালেঞ্জের ভংগীতে বলতে থাকে ঃ

رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ

"হে আমাদের রব। এখনই তুমি আমাদের হিসেব নিকেশ চুকিয়ে দাও। কিয়ামতের জন্য তাকে ঠেকিয়ে রেখো না।"

আবার কখনো বলতে থাকে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِاْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ –

"হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ (সা) যে কথাগুলো পেশ করছে এগুলো যদি সত্য হয় এবং তোমারই পক্ষ থেকে হয় তাহলে আমাদের ওপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করো অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাযিল করো।"

এ আয়াতে কাফেরদের পূর্বোক্ত কথাগুলোর জবাব দিয়ে বলা হয়েছে ঃ এ মূর্খের দল কল্যাণের আগে অকল্যাণ চেয়ে নিচ্ছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এদেরকে যে অবকাশ দেয়া হচ্ছে তার সুযোগ গ্রহণ করার পরিবর্তে এরা এ অবকাশকে দ্রুত খতম করে দেয়ার এবং এদের বিদ্রোহাত্মক কর্মনীতির কারণে এদেরকে অনতিবিলম্বে পাকড়াও করার দাবী জানাচ্ছে।

১৫. এখানে তারা এমন নিশানীর কথা বলতে চাচ্ছিল যা দেখে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আল্লাহর রসূল হবার ওপর ঈমান আনতে পারে। তারা তাঁর কথাকে তার সত্যতার যুক্তির সাহায্যে বুঝতে প্রস্তুত ছিল না। তারা তাঁর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবনধারা ও চরিত্র থেকে শিক্ষা নিতে প্রস্তুত ছিল না। তাঁর শিক্ষার প্রভাবে তাঁর সাহাবীগণের জীবনে যে ব্যাপক ও শক্তিশালী নৈতিক বিপ্লব সাধিত হচ্ছিল তা থেকেও তারা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে প্রস্তুত ছিল না। তাদের মুশরিকী ধর্ম এবং জাহেলী কল্পনা ও ভাববাদিতার ভ্রান্তি সুস্পষ্ট করার জন্য কুরআনে যেসব বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তি–প্রমাণ উপস্থাপন

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ؕ
وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ۝٨ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ
الْمُتَعَالِ ۝٩ سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ
مُسْتَخْفٍۢ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ۝١٠ لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى
يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ
مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ۝١١ هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا
وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝١٢ ۚ

২ রুকূ'

আল্লাহ প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভ সম্পর্কে জানেন। যাকিছু তার মধ্যে গঠিত হয় তাও তিনি জানেন এবং যাকিছু তার মধ্যে কমবেশী হয় সে সম্পর্কেও তিনি খবর রাখেন।[১৭] তাঁর কাছে প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট রয়েছে। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান প্রত্যেক জিনিসের জ্ঞান রাখেন। তিনি মহান ও সর্বাবস্থায় সবার ওপর অবস্থান করেন। তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি জোরে কথা বলুক বা নীচু স্বরে এবং কেউ রাতের আঁধারে লুকিয়ে থাকুক বা দিনের আলোয় চলতে থাকুক, তাঁর জন্য সবই সমান। প্রত্যেক ব্যক্তির সামনে ও পেছনে তাঁর নিযুক্ত পাহারাদার লেগে রয়েছে, যারা আল্লাহর হুকুমে তার দেখাশুনা করছে।[১৮] আসলে আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতির অবস্থা বদলান না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের গুণাবলী বদলে ফেলে। আর আল্লাহ যখন কোন জাতিকে দুর্ভাগ্য কবলিত করার ফায়সালা করে ফেলেন তখন কারো রদ করায় তা রদ হতে পারে না এবং আল্লাহর মোকাবিলায় এমন জাতির কোন সহায় ও সাহায্যকারী হতে পারে না।[১৯]

তিনিই তোমাদের সামনে বিজলী চমকান, যা দেখে তোমাদের মধ্যে আশংকার সঞ্চার হয় আবার আশাও জাগে।

করা হচ্ছিল তারা সেগুলোর প্রতি কর্ণপাত করতে প্রস্তুত ছিল না। এসব বাদ দিয়ে তারা চাচ্ছিল তাদেরকে এমন কোন তেলেসমাতি দেখানো হোক যার মাধ্যমে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাচাই করতে পারে।

১৬. এটি হচ্ছে তাদের দাবীর সংক্ষিপ্ত জবাব। তাদেরকে সরাসরি এ জবাব দেবার পরিবর্তে আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে এ জবাব দিয়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে, হে নবী! তাদেরকে নিশ্চিন্ত করার জন্য কোন্ ধরনের তেলেসমাতি দেখানো হবে এ ব্যাপারটি নিয়ে তুমি কোন চিন্তা করো না। প্রত্যেককে নিশ্চিন্ত করা তোমার কাজ নয়। তোমার কাজ হচ্ছে কেবলমাত্র গাফলতির ঘুমে বিভোর লোকদেরকে জাগিয়ে দেয়া এবং ভুল পথে চলার পরিণাম সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা। প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জাতির মধ্যে একজন হেদায়াতকারী নিযুক্ত করে আমি এ দায়িত্ব সম্পাদন করেছি। এখন তোমাকেও এ দায়িত্ব সম্পাদনে নিয়োজিত করা হয়েছে। এরপর যার মন চায় চোখ খুলতে পারে এবং যার মন চায় গাফলতির মধ্যে ডুবে থাকতে পারে। এ সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে আল্লাহ তাদের দাবীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং তাদেরকে এ বলে সতর্ক করে দেন যে, তোমরা এমন কোন রাজ্যে বাস করছো না যেখানে কোন শাসন, শৃংখলা ও কর্তৃত্ব নেই। তোমাদের সম্পর্ক এমন এক আল্লাহর সাথে যিনি তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে যখন সে তার মায়ের জঠরে আবদ্ধ ছিল তখন থেকেই জানেন এবং সারা জীবন তোমাদের প্রত্যেকটি কাজের প্রতি নজর রাখেন। তাঁর দরবারে তোমাদের ভাগ্য নির্ণীত হবে নির্ভেজাল আদল ও ইনসাফের ভিত্তিতে, তোমাদের প্রত্যেকের দোষ-গুণের প্রেক্ষিতে। পৃথিবী ও আকাশে তাঁর ফায়সালাকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা কারোর নেই।

১৭. এর অর্থ হচ্ছে, মায়ের গর্ভাশয়ে ভ্রূণের অংগ-প্রত্যংগ, শক্তি-সামর্থ, যোগ্যতা ও মানসিক ক্ষমতার মধ্যে যাবতীয় হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহর সরাসরি তত্ত্বাবধানে সাধিত হয়।

১৮. অর্থাৎ ব্যাপার শুধু এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয় যে, আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সব অবস্থায় নিজেই সরাসরি দেখছেন এবং তার সমস্ত গতি-প্রকৃতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত রয়েছেন বরং আল্লাহর নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়কও প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে রয়েছেন এবং তার জীবনের সমস্ত কার্যক্রমের রেকর্ডও সংরক্ষণ করে চলছেন। এ সত্যটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এমন অকল্পনীয় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীন থেকে যারা একথা মনে করে জীবন যাপন করে যে, তাদেরকে লাগামহীন উটের মতো দুনিয়ায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং তাদের কার্যকলাপের জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। তারা আসলে নিজরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে।

১৯. অর্থাৎ এ ধরনের ভুল ধারণা পোষণ করো না যে, তোমরা যাই কিছু করতে থাকো না কেন আল্লাহর দরবারে এমন কোন শক্তিশালী পীর, ফকীর বা কোন পূর্ববর্তী-পরবর্তী মহাপুরুষ অথবা কোন জিন বা ফেরেশতা আছে যে তোমাদের নযরানার উৎকোচ নিয়ে তোমাদেরকে অসৎকাজের পরিণাম থেকে বাঁচাবে।

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ
فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ
الْمِحَالِ ﴿١٣﴾ لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۭ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ
لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَاۗءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ۭ
وَمَا دُعَاۗءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿١٤﴾ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿١٥﴾

তিনিই পানিভরা মেঘ উঠান। মেঘের গর্জন তাঁর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে[২০] এবং ফেরেশতারা তাঁর ভয়ে কম্পিত হয়ে তাঁর তাস্‌বীহ করে।[২১] তিনি বজ্রপাত করেন এবং (অনেক সময়) তাকে যার ওপর চান, ঠিক সে যখন আল্লাহ সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত তখনই নিক্ষেপ করেন। আসলে তাঁর কৌশল বড়ই জবরদস্ত।[২২]

একমাত্র তাঁকেই ডাকা সঠিক।[২৩] আর অন্যান্য সত্তাসমূহ, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে এ লোকেরা ডাকে, তারা তাদের প্রার্থনায় কোন সাড়া দিতে পারে না। তাদেরকে ডাকা তো ঠিক এমনি ধরনের যেমন কোন ব্যক্তি পানির দিকে হাত বাড়িয়ে তার কাছে আবেদন জানায়, তুমি আমার মুখে পৌঁছে যাও, অথচ পানি তার মুখে পৌঁছতে সক্ষম নয়। ঠিক এমনিভাবে কাফেরদের দোয়াও একটি লক্ষভ্রষ্ট তীর ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহকেই সিজ্‌দা করছে পৃথিবী ও আকাশের প্রত্যেকটি বস্তু ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়[২৪] এবং প্রত্যেকটি বস্তুর ছায়া সকাল-সাঁঝে তাঁর সামনে নত হয়।[২৫]

২০. অর্থাৎ মেঘের গর্জন একথা প্রকাশ করে যে, যে আল্লাহ এ বায়ু পরিচালিত করেছেন, বাষ্প উঠিয়েছেন, ঘন মেঘরাশিকে একত্র করেছেন, এ বিদ্যুৎকে বৃষ্টির মাধ্যম বা উপলক্ষ বানিয়েছেন এবং এভাবে পৃথিবীর সৃষ্টিকুলের জন্য পানির ব্যবস্থা করেছেন তিনি যাবতীয় ভুল-ত্রুটি-অভাব মুক্ত, তিনি জ্ঞান ও শক্তির দিক দিয়ে পূর্ণতার অধিকারী। তাঁর গুণাবলী সকল প্রকার আবিলতা থেকে মুক্ত এবং নিজের প্রভুত্বের ক্ষেত্রে তাঁর কোন অংশীদার নেই। পশুর মতো নির্বোধ শ্রবণ শক্তির অধিকারীরা তো এ মেঘের মধ্যে শুধু গর্জনই শুনতে পায় কিন্তু বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন সজাগ শ্রবণ শক্তির অধিকারীরা মেঘের গর্জনে তাওহীদের গুরুগম্ভীর বাণী শুনে থাকে।

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهِ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ
دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى
الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ
شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ
كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾

এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আকাশ ও পৃথিবীর রব কে? —বলো আল্লাহ![২৬] *তারপর এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আসল ব্যাপার যখন এই তখন তোমরা কি তাঁকে বাদ দিয়ে এমন মাবুদদেরকে নিজেদের কার্যসম্পাদনকারী বানিয়ে নিয়েছো যারা তাদের নিজেদের জন্যও কোন লাভ ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না? বলো অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হয়ে থাকে?*[২৭] *আলো ও আঁধার কি এক রকম হয়?*[২৮] *যদি এমন না হয়, তাহলে তাদের বানানো শরীকরাও কি আল্লাহর মতো কিছু সৃষ্টি করেছে, যে কারণে তারাও সৃষ্টি ক্ষমতার অধিকারী বলে সন্দেহ হয়েছে?*[২৯] *— বলো, প্রত্যেকটি জিনিসের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। তিনি একক ও সবার ওপর পরাক্রমশালী।*[৩০]

২১. আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের মহিমান্বিত প্রকাশে ফেরেশতাদের প্রকম্পিত হওয়া এবং তাঁর তাসবীহ ও প্রশংসা গীতি গাইতে থাকার কথা বিশেষভাবে এখানে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, মুশরিকরা প্রত্যেক যুগে ফেরেশতাদেরকে দেবতা ও উপাস্য গণ্য করে এসেছে এবং আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে তাদেরকে শরীক মনে করে এসেছে। এ ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করে বলা হয়েছে, সার্বভৌম কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর সাথে শরীক নয় বরং তারা তাঁর অনুগত সেবক মাত্র এবং প্রভুর কর্তৃত্ব মহিমায় প্রকম্পিত হয়ে তারা তার প্রশংসা গীতি গাইছে।

২২. অর্থাৎ তাঁর কাছে অসংখ্য কৌশল রয়েছে। যে কোন সময় যে কারো বিরুদ্ধে যে কোন কৌশল তিনি এমন পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে পারেন যে, আঘাত আসার এক মুহূর্ত আগেও সে জানতে পারে না কখন কোন্ দিক থেকে তার ওপর আঘাত আসছে। এ ধরনের একচ্ছত্র শক্তিশালী সত্তা সম্পর্কে যারা না ভেবেচিন্তে এমনি হাল্কাভাবে আজে-বাজে কথা বলে, কে তাদের বুদ্ধিমান বলতে পারে?

২৩. ডাকা মানে নিজের অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে সাহায্যের জন্য ডাকা। এর মানে হচ্ছে, অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণ এবং সংকটমুক্ত করার সব ক্ষমতা একমাত্র তাঁর হাতেই কেন্দ্রীভূত। তাই একমাত্র তাঁর কাছেই প্রার্থনা করা সঠিক ও যথার্থ সত্য বলে বিবেচিত।

২৪. সিজ্‌দা মানে আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য ঝুঁকে পড়া, আদেশ পালন করা এবং পুরোপুরি মেনে নিয়ে মাথা নত করা। পৃথিবী ও আকাশের প্রত্যেকটি সৃষ্টি আল্লাহর আইনের অনুগত এবং তাঁর ইচ্ছার চুল পরিমাণও বিরোধিতা করতে পারে না—এ অর্থে তারা প্রত্যেকেই আল্লাহকে সিজদা করছে। মুমিন স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে তাঁর সামনে নত হয় কিন্তু কাফেরকে বাধ্য হয়ে নত হতে হয়। কারণ আল্লাহর প্রাকৃতিক আইনের বাইরে চলে যাওয়ার ক্ষমতা তার নেই।

২৫. ছায়ার নত হওয়ার ও সিজদা করার মানে হচ্ছে, বস্তুর ছায়ার সকাল-সাঁঝে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ঢলে পড়া এমন একটি আলামত যা থেকে বুঝা যায় যে, এসব জিনিস কারো হুকুমের অনুগত এবং কারোর আইনের অধীন।

২৬. উল্লেখ করা যেতে পারে, আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের রব একথা তারা নিজেরা মানতো। এ প্রশ্নের জবাবে তারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারতো না। কারণ একথা অস্বীকার করলে তাদের নিজেদের আকীদাকেই অস্বীকার করা হতো। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিজ্ঞাসার পর তারা এর জবাব পাশ কাটিয়ে যেতে চাচ্ছিল। কারণ স্বীকৃতির পর তাওহীদকে মেনে নেয়া অপরিহার্য হয়ে উঠতো এবং এরপর শিরকের জন্য আর কোন যুক্তিসংগত বুনিয়াদ থাকতো না। তাই নিজেদের অবস্থানের দুর্বলতা অনুভব করেই তারা এ প্রশ্নের জবাবে নীরব হয়ে যেতো। এ কারণেই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, ওদেরকে জিজ্ঞেস করো পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা কে? বিশ্ব-জাহানের রব কে? কে তোমাদের রিযিক দিচ্ছেন? তারপর হুকুম দেন, তোমরা নিজেরাই বলো আল্লাহ এবং এরপর এভাবে যুক্তি পেশ করেন যে, আল্লাহই যখন এ সমস্ত কাজ করছেন তখন আর কে আছে যার তোমরা বন্দেগী করে আসছো?

২৭. অন্ধ বলে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যার সামনে বিশ্ব-জগতের চতুরদিকে আল্লাহর একত্বের চিহ্ন ও প্রমাণ ছড়িয়ে আছে কিন্তু সে তার মধ্য থেকে কোন একটি জিনিসও দেখছে না। আর চক্ষুষ্মান হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি, যার দৃষ্টি বিশ্ব-জগতের প্রতিটি অণু-কণিকায় এবং প্রতিটি পত্র-পল্লবে একজন অসাধারণ কারিগরের অতুলনীয় কারিগরীর নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে। আল্লাহর এ প্রশ্নের অর্থ হচ্ছে ঃ ওহে বুদ্ধিভ্রষ্টেরা। যদি তোমরা কিছুই দেখতে না পেয়ে থাকো তাহলে যাদের দেখার মতো চোখ আছে তারা কেমন করে নিজেদের চোখ বন্ধ করে নেবে? যে ব্যক্তি সত্যকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে কেমন করে দৃষ্টিশক্তিহীন লোকদের মতো আচরণ করবে এবং পথে বিপথে ঘুরে বেড়াবে?

২৮. আলো মানে সত্যজ্ঞানের আলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীরা এ সত্য জ্ঞানের আলো লাভ করেছিলেন। আর আঁধার মানে মূর্খতার আঁধার। নবীর অস্বীকারকারীরা এ আঁধারে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। প্রশ্নের অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি আলো পেয়ে গেছে সে কেন নিজের প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে আঁধারের বুকে হোঁচট খেয়ে ফিরতে থাকবে? তোমাদের কাছে আলোর মর্যাদা না থাকলে না থাকতে পারে কিন্তু যে তার সন্ধান পেয়েছে, যে আলো ও আঁধারের পার্থক্য জেনে ফেলেছে এবং যে দিনের আলোয়

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ
زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ
زَبَدٌ مِّثْلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ
فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ
كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾

আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং প্রত্যেক নদী-নালা নিজের সাধ্য অনুযায়ী তা নিয়ে প্রবাহিত হয়। তারপর যখন প্লাবন আসে তখন ফেনা পানির ওপরে ভাসতে থাকে।[৩১] আর লোকেরা অলংকার ও তৈজসপত্রাদি নির্মাণের জন্য যেসব ধাতু গরম করে তার ওপরও ঠিক এমনি ফেনা ভেসে ওঠে।[৩২] এ উপমার সাহায্যে আল্লাহ হক ও বাতিলের বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দেন। ফেনারাশি উড়ে যায় এবং যে বস্তুটি মানুষের জন্য উপকারী হয় তা যমীনে থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ উপমার সাহায্যে নিজের কথা বুঝিয়ে থাকেন।

সোজা পথ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে কেমন করে আলো ত্যাগ করে আঁধারের মধ্যে পথ হাতড়ে বেড়াতে পারে?

২৯. এ প্রশ্নের অর্থ হচ্ছে, যদি দুনিয়ার কিছু জিনিস আল্লাহ সৃষ্টি করে থাকতেন এবং কিছু জিনিস অন্যেরা সৃষ্টি করতো আর কোন্‌টা আল্লাহর সৃষ্টি এবং কোন্‌টা অন্যদের এ পার্থক্য করা সম্ভব না হতো তাহলে তো সত্যিই শিরকের জন্য কোন যুক্তিসংগত ভিত্তি হতে পারতো। কিন্তু যখন এ মুশরিকরা নিজেরাই তাদের মাবুদদের একজনও একটি তৃণ এবং একটি চুলও সৃষ্টি করেনি বলে স্বীকার করে এবং যখন তারা একথাও স্বীকার করে যে, সৃষ্টিকর্মে এ বানোয়াট ইলাহ্‌দের সামান্যতমও অংশ নেই। তখন এ বানোয়াট মাবুদদেরকে স্রষ্টার ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও অধিকারে শামিল করা হলো কিসের ভিত্তিতে?

৩০. মূল আয়াতে 'কাহ্‌হার' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, এমন সত্তা যিনি নিজ শক্তিতে সবার ওপর হুকুম চালান এবং সবাইকে অধীনস্থ করে রাখেন। "আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের স্রষ্টা" একথাটি এমন একটি সত্য যাকে মুশরিকরাও স্বীকার করে নিয়েছিল এবং তারা কখনো এটা অস্বীকার করেনি। "তিনি একক ও মহাপরাক্রমশালী" একথাটি হচ্ছে মুশরিকদের ঐ স্বীকৃত সত্যের অনিবার্য ফল। প্রথম সত্যটি মেনে নেবার পর কোন জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে একে অস্বীকার করা সম্ভবপর নয়। কারণ

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ۚ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾

যারা নিজেদের রবের দাওয়াত গ্রহণ করেছে তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে আর যারা তা গ্রহণ করেনি তারা যদি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের মালিক হয়ে যায় এবং এ পরিমাণ আরো সংগ্রহ করে নেয় তাহলেও তারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য এ সমস্তকে মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিতে তৈরী হয়ে যাবে।[৩৩] এদের হিসেব নেয়া হবে নিকৃষ্টভাবে[৩৪] এবং এদের আবাস হবে জাহান্নাম, বড়ই নিকৃষ্ট আবাস।

যিনি প্রত্যেকটি জিনিসের স্রষ্টা নিসন্দেহে তিনি একক, অতুলনীয় ও সাদৃশ্যবিহীন। কারণ অন্য যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্টি। এ অবস্থায় কোন সৃষ্টি কেমন করে তার স্রষ্টার সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা বা অধিকারে তাঁর সাথে শরীক হতে পারে? এভাবে তিনি নিসন্দেহে মহাপরাক্রমশালীও। কারণ সৃষ্টি তার স্রষ্টার অধীন হয়ে থাকবে, এটি সৃষ্টি-ধারণার অংগীভূত। সৃষ্টির ওপর স্রষ্টার যদি পূর্ণ কর্তৃত্ব ও দখল না থাকে তাহলে তিনি সৃষ্টিকর্মই বা করবেন কেমন করে? কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্রষ্টা বলে মানে তার পক্ষে এ দু'টি বুদ্ধিবৃত্তিক ও ন্যায়ানুগ ফলশ্রুতি অস্বীকার করা সম্ভবপর হয় না। কাজেই এরপরে কোন ব্যক্তি স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির বন্দেগী করবে এবং মহাপরাক্রমশালীকে বাদ দিয়ে দুর্বল ও অধীনকে সংকট উত্তরণ করাবার জন্য আহবান জানাবে, একথা একেবারেই অযৌক্তিক প্রমাণিত হয়।

৩১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহীর মাধ্যমে যে জ্ঞান নাযিল করা হয়েছিল এ উপমায় তাকে বৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর ঈমানদার, সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ স্বাভাবিক বৃত্তির অধিকারী মানুষদেরকে এমনসব নদীনালার সাথে তুলনা করা হয়েছে যেগুলো নিজ নিজ ধারণক্ষমতা অনুযায়ী রহমতের বৃষ্টি ধারায় নিজদেরকে পরিপূর্ণ করে প্রবাহিত হতে থাকে। অন্যদিকে সত্য অস্বীকারকারী ও সত্য বিরোধীরা ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে হৈ-হাংগামা ও উপদ্রব সৃষ্টি করেছিল তাকে এমন ফেনা ও আবর্জনারাশির সাথে তুলনা করা হয়েছে যা হামেশা বন্যা শুরু হবার সাথে সাথেই পানির উপরিভাগে উঠে আসতে থাকে।

৩২. অর্থাৎ নির্ভেজাল ধাতু গলিয়ে কাজে লাগাবার জন্য স্বর্ণকারের চুলা গরম করা হয়। কিন্তু যখনই এ কাজ করা হয় তখনই অবশ্যি ময়লা আবর্জনা ওপরে ভেসে ওঠে এবং এমনভাবে তা ঘূর্ণিত হতে থাকে যাতে কিছুক্ষণ পর্যন্ত উপরিভাগে শুধু আবর্জনারাশিই দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

৩৩. অর্থাৎ তখন তাদের ওপর এমন বিপদ আসবে যার ফলে তারা নিজেদের জান বাঁচাবার জন্য দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ দিয়ে দেবার ব্যাপারে একটুও ইতস্তত করবে না।

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ
وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ صَبَرُوا
ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾

৩ রুকূ'

আচ্ছা তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার ওপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে, তাকে যে ব্যক্তি সত্য মনে করে আর যে ব্যক্তি এ সত্যটির ব্যাপারে অন্ধ, তারা দু'জন সমান হবে, এটা কেমন করে সম্ভব?[৩৫] উপদেশ তো শুধু বিবেকবান লোকেরাই গ্রহণ করে।[৩৬] আর তাদের কর্মপদ্ধতি এমন হয় যে, তারা আল্লাহকে প্রদত্ত নিজেদের অংগীকার পালন করে এবং তাকে মজবুত করে বাঁধার পর ভেঙ্গে ফেলে না।[৩৭] তাদের নীতি হয়, আল্লাহ যেসব সম্পর্ক ও বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখার হুকুম দিয়েছেন[৩৮] সেগুলো তারা অক্ষুণ্ন রাখে, নিজেদের রবকে ভয় করে এবং তাদের থেকে কড়া হিসেব না নেয়া হয় এই ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে। তাদের অবস্থা হয় এই যে, নিজেদের রবের সন্তুষ্টির জন্য তারা সবর করে,[৩৯] নামায কায়েম করে, আমার দেয়া রিযিক থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে খরচ করে এবং ভালো দিয়ে মন্দ দূরীভূত করে।[৪০] আখেরাতের গৃহ হচ্ছে তাদের জন্যই। অর্থাৎ এমন সব বাগান যা হবে তাদের চিরস্থায়ী আবাস।

৩৪. নিকৃষ্টভাবে হিসেব নেয়া অথবা কড়া হিসেব নেয়ার মানে হচ্ছে এই যে, মানুষের কোন ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করা হবে না। তার কোন অপরাধের বিচার না করে তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে না।

কুরআন আমাদের জানায়, এ ধরনের হিসেব আল্লাহ তাঁর এমন বান্দাদের থেকে নেবেন যারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দুনিয়ায় জীবন যাপন করেছে। বিপরীতপক্ষে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ত আচরণ করেছে এবং তাঁর প্রতি অনুগত থেকে জীবন যাপন করেছে তাদের থেকে "সহজ হিসেব" অর্থাৎ হাল্কা হিসেব নেয়া হবে। তাদের বিশ্বস্ততামূলক কার্যক্রমের মোকাবিলায় ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো মাফ করে দেয়া হবে। তাদের সামগ্রিক

কর্মনীতির সুকৃতিকে সামনে রেখে তাদের বহু ভুল-ভ্রান্তি উপেক্ষা করা হবে। হযরত আয়েশা (রা) থেকে আবু দাউদে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সেখানে এ বিষয়টির আরো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার কাছে আল্লাহর কিতাবের সবচেয়ে ভয়াবহ আয়াত হচ্ছে সেই আয়াতটি যাতে বলা হয়েছে ঃ وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُجْزَ بِهٖ অর্থাৎ "যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করবে সে তার শাস্তি পাবে।" একথায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আয়েশা! তুমি কি জানো না, আল্লাহর বিশ্বস্ত ও অনুগত বান্দা দুনিয়ায় যে কষ্টই পেয়েছে, এমনকি তার শরীরে যদি কোন কাঁটাও ফুটে থাকে তাহলে তাকে তার কোন অপরাধের শাস্তি হিসেবে গণ্য করে দুনিয়াতেই তার হিসেব পরিষ্কার করে দেন? আখেরাতে তো যারই হিসেব শুরু হবে সে অবশ্যি শাস্তি পাবে। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, তাহলে আল্লাহর এ উক্তির তাৎপর্য কি যাতে বলা হয়েছে—

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ؕ

"যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার থেকে হাল্কা হিসেব নেয়া হবে।"

এর জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এর অর্থ হচ্ছে, উপস্থাপনা (অর্থাৎ তার সৎকাজের সাথে সাথে অসৎকাজগুলোর উপস্থাপনা আল্লাহর সামনে) অবশ্যি হবে কিন্তু যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তার ব্যাপারে জেনে রাখো, সে মারা পড়েছে।

৩৫. অর্থাৎ এ দু' ব্যক্তির নীতি দুনিয়ায় এক রকম হতে পারে না এবং আখেরাতে তাদের পরিণামও একই ধরনের হতে পারে না।

৩৬. অর্থাৎ আল্লাহর পাঠানো এ শিক্ষা এবং আল্লাহর রসূলের এ দাওয়াত যারা গ্রহণ করে তারা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয় না বরং তারা হয় বিবেকবান, সতর্ক ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। এ ছাড়া দুনিয়ায় তাদের জীবন ও চরিত্র যে রূপ ধারণ করে এবং আখেরাতে তারা যে পরিণাম ফল ভোগ করে পরবর্তী আয়াতগুলোতে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

৩৭. এর অর্থ হচ্ছে সেই অনন্তকালীন অংগীকার যা সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ সমস্ত মানুষের কাছ থেকে নিয়েছিলেন। তিনি অংগীকার নিয়েছিলেন, মানুষ একমাত্র তাঁর বন্দেগী করবে (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা আ'রাফ ১৩৪ ও ১৩৫ টীকা)। প্রত্যেকটি মানুষের কাছ থেকে এ অংগীকার নেয়া হয়েছিল। প্রত্যেকের প্রকৃতির মধ্যে এটি নিহিত রয়েছে। যখনই আল্লাহর সৃজনী কর্মের মাধ্যমে মানুষ অস্তিত্ব লাভ করে এবং তাঁর প্রতিপালন কর্মকাণ্ডের আওতাধীনে সে প্রতিপালিত হতে থাকে তখনই এটি পাকাপোক্ত হয়ে যায়। আল্লাহর রিযিকের সাহায্যে জীবন যাপন করা, তাঁর সৃষ্ট প্রত্যেকটি বস্তুকে কাজে লাগানো এবং তাঁর দেয়া শক্তিগুলো ব্যবহার করা—এগুলো মানুষকে স্বতস্ফূর্তভাবে একটি বন্দেগীর অংগীকারে বেঁধে ফেলে। কোন সচেতন ও বিশ্বস্ত মানুষ এ অংগীকার ভেংগে ফেলার সাহস করতে পারে না। তবে হাঁ, অজান্তে কখনো সে কোন ভুল করে ফেলতে পারে, সেটা অবশ্যি ভিন্ন কথা।

৩৮. অর্থাৎ এমন সব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক, যেগুলো সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেই মানুষের সামগ্রিক জীবনের কল্যাণ ও সাফল্য নিশ্চিত হয়।

৩৯. অর্থাৎ নিজেদের প্রবৃত্তি ও আকাংখা নিয়ন্ত্রণ করে, নিজেদের আবেগ, অনুভূতি ও ঝোঁক প্রবণতাকে নিয়ম ও সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখে, আল্লাহর নাফরমানিতে বিভিন্ন স্বার্থলাভ ও ভোগ-লালসার চরিতার্থ হওয়ার সুযোগ দেখে পা পিছলে যায় না এবং আল্লাহর হুকুম মেনে চলার পথে যেসব ক্ষতি ও কষ্টের আশংকা দেখা দেয় সেসব বরদাশ্‌ত করে যেতে থাকে। এ দৃষ্টিতে বিচার করলে মুমিন আসলে পুরোপুরি একটি সবরের জীবন যাপন করে। কারণ সে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় এবং আখেরাতের স্থায়ী পরিণাম ফলের পতি দৃষ্টি রেখে এ দুনিয়ায় আত্মসংযম করতে থাকে এবং সবরের সাথে মনের প্রতিটি পাপ প্রবণতার মোকাবিলা করে।

৪০. অর্থাৎ তারা মন্দের মোকাবিলায় মন্দ করে না বরং ভালো করে। তারা অন্যায়ের মোকাবিলা অন্যায়কে সাহায্য না করে ন্যায়কে সাহায্য করে। কেউ তাদের প্রতি যতই জুলুম করুক না কেন তার জবাবে তারা পাল্টা জুলুম করে না বরং ইনসাফ করে। কেউ তাদের বিরুদ্ধে যতই মিথ্যাচার করুক না কেন জবাবে তারা সত্যই বলে। কেউ তাদের সাথে যতই বিশ্বাস ভংগ করুক না কেন জবাবে তারা বিশ্বস্ত আচরণই করে থাকে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসটি এ অর্থই প্রকাশ করে ঃ

لَا تَكُوْنُوْا اِمَّعَةً ، تَقُوْلُوْنَ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَحْسَنَّا وَاِنْ ظَلَمُوْنَا ظَلَمْنَا وَلٰكِنْ وَطِّنُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تَحْسِنُوْا وَاِنْ اَسَاءُوْا فَلَا تَظْلِمُوْا -

"তোমরা নিজেদের কার্যধারাকে অন্যের কর্মধারার অনুসারী করো না। একথা বলা ঠিক নয় যে লোকেরা ভালো করলে আমরা ভালো করবো এবং লোকেরা জুলুম করলে আমরাও জুলুম করবো। তোমরা নিজেদেরকে একটি নিয়মের অধীন করো। যদি লোকেরা সদাচার করে তাহলে তোমরাও সদাচার করো। আর যদি লোকেরা তোমাদের সাথে অসৎ আচরণ করে তাহলে তোমরা জুলুম করো না।"

রসূলুল্লাহর (সা) এ হাদীসটিও এ একই অর্থ প্রকাশ করে, যাতে বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ আমাকে নয়টি বিষয়ের হুকুম দিয়েছেন। এর মধ্যে তিনি এ চারটি কথা বলেছেন ঃ কারোর প্রতি সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট যাই থাকি না কেন সর্বাবস্থায় আমি যেন ইনসাফের কথা বলি। যে আমার অধিকার হরণ করে আমি যেন তার অধিকার আদায় করি। যে আমাকে বঞ্চিত করবে আমি যেন তাকে দান করি। আর যে আমার প্রতি জুলুম করবে আমি যেন তাকে মাফ করে দেই। আর এ হাদীসটিও এ একই অর্থ প্রকাশ করে, যাতে বলা হয়েছে ঃ لا تخن من خانك অর্থাৎ "যে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না।" হযরত উমরের (রা) নিম্নোক্ত উক্তিটিও এ অর্থ প্রকাশ করে ঃ "যে ব্যক্তি তোমার প্রতি আচরণ করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে না তুমি আল্লাহকে ভয় করে তার প্রতি আচরণ করো।"

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ
وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلٰمٌ
عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾ وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ
مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى
الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾ اَللّٰهُ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ
الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾

তারা নিজেরা তার মধ্যে প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদারা ও স্ত্রী-সন্তানদের মধ্য থেকে যারা সৎকর্মশীল হবে তারাও তাদের সাথে সেখানে যাবে। ফেরেশতারা সব দিক থেকে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আসবে এবং তাদেরকে বলবে ঃ "তোমাদের প্রতি শান্তি।[৪১] তোমরা দুনিয়ায় যেভাবে সবর করে এসেছো তার বিনিময়ে আজ তোমরা এর অধিকারী হয়েছো।"—কাজেই কতই চমৎকার এ আখেরাতের গৃহ! আর যারা আল্লাহর অংগীকারে মজবুতভাবে আবদ্ধ হবার পর তা ভেঙে ফেলে, আল্লাহ যেসব সম্পর্ক জোড়া দেবার হুকুম দিয়েছেন সেগুলো ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তারা লানতের অধিকারী এবং তাদের জন্য রয়েছে আখেরাতে বড়ই খারাপ আবাস।

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিযিক সম্প্রসারিত করেন এবং যাকে চান মাপাজোকা রিযিক দান করেন।[৪২] এরা দুনিয়ার জীবনে উল্লসিত, অথচ দুনিয়ার জীবন আখেরাতের তুলনায় সামান্য সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।

৪১. এর মানে কেবল এ নয় যে, ফেরেশতারা চারদিক থেকে এসে তাদেরকে সালাম করতে থাকবে বরং তারা তাদেরকে এ সুখবরও দেবে যে, এখন তোমরা এমন জায়গায় এসেছো যেখানে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজমান। এখন তোমরা এখানে সবরকমের আপদ-বিপদ, কষ্ট, কাঠিন্য, কঠোর পরিশ্রম, শংকা ও আতংকমুক্ত। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা হিজ্‌র ২৯ টীকা)

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۭ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ
يُضِلُّ مَنْ يَّشَاۗءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ۝ۚ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَتَطْمَىِٕنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۭ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَىِٕنُّ الْقُلُوْبُ ۝
اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ ۝ كَذٰلِكَ
اَرْسَلْنٰكَ فِيْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ
اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ۭ قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ ۭ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ۝

৪ রুকূ'

যারা (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত মেনে নিতে) অস্বীকার করেছে তারা বলে, "এ ব্যক্তির কাছে এর রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন?"[৪৩] বলো, আল্লাহ যাকে চান গোমরাহ করে দেন এবং তিনি তাকেই তাঁর দিকে আসার পথ দেখান যে তাঁর দিকে রুজু করে।[৪৪] তারাই এ ধরনের লোক যারা (এ নবীর দাওয়াত) গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর স্মরণে তাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়। সাবধান হয়ে যাও। আল্লাহর স্মরণই হচ্ছে এমন জিনিস যার সাহায্যে চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে। তারপর যারা সত্যের দাওয়াত মেনে নিয়েছে এবং সৎকাজ করেছে তারা সৌভাগ্যবান এবং তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম।

হে মুহাম্মাদ! এহেন মাহাত্ম সহকারে আমি তোমাকে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছি[৪৫] এমন এক জাতির মধ্যে যার আগে বহু জাতি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, যাতে তোমার কাছে আমি যে পয়গাম অবতীর্ণ করেছি তা তুমি এদেরকে শুনিয়ে দাও, এমন অবস্থায় যখন এরা নিজেদের পরম দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করছে।[৪৬] এদেরকে বলে দাও, তিনিই আমার রব, তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তাঁরই ওপর আমি ভরসা করেছি এবং তাঁরই কাছে আমাকে ফিরে যেতে হবে।

৪২. এ আয়াতের পটভূমি হচ্ছে, সাধারণ মূর্খ ও অজ্ঞদের মতো মক্কার কাফেররাও বিশ্বাস ও কর্মের সৌন্দর্য বা কদর্যতা দেখার পরিবর্তে ধনাঢ্যতা বা দারিদ্রের দৃষ্টিতে

মানুষের মূল্য ও মর্যাদা নিরূপণ করতো। তাদের ধারণা ছিল, যারা দুনিয়ায় প্রচুর পরিমাণ আরাম আয়েশের সামগ্রী লাভ করছে তারা যতই পথভ্রষ্ট ও অসৎকর্মশীল হোক না কেন তারা আল্লাহর প্রিয়। আর অভাবী ও দারিদ্র পীড়িতরা যতই সৎ হোক না কেন তারা আল্লাহর অভিশপ্ত। এ নীতির ভিত্তিতে তারা কুরাইশ সরদারদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গরীব সাথীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতো এবং বলতো, আল্লাহ কার সাথে আছেন তোমরা দেখে নাও। এ ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে বলা হচ্ছে, রিযিক কমবেশী হবার ব্যাপারটা আল্লাহর অন্য আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট। সেখানে অন্যান্য অসংখ্য প্রয়োজন ও কল্যাণ-অকল্যাণের প্রেক্ষিতে কাউকে বেশী ও কাউকে কম দেয়া হয়। এটা এমন কোন মানদণ্ড নয় যার ভিত্তিতে মানুষের নৈতিক ও মানসিক সৌন্দর্য ও কদর্যতার ফায়সালা করা যেতে পারে। মানুষের মধ্যে কে চিন্তা ও কর্মের সঠিক পথ অবলম্বন করেছে এবং কে ভুল পথ, কে উন্নত ও সৎগুণাবলী অর্জন করেছে এবং কে অসৎগুণাবলী—এরি ভিত্তিতে মানুষে মানুষে মর্যাদার মূল পার্থক্য নির্ণীত হয় এবং তাদের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের আসল মানদণ্ডও এটিই। কিন্তু মূর্খরা এর পরিবর্তে দেখে, কাকে ধন-দৌলত বেশী এবং কাকে কম দেয়া হয়েছে।

৪৩. এর আগে এ সূরার প্রথম রুকূ'র শেষ আয়াতে এ প্রশ্নের যে জবাব দেয়া হয়েছে তা এখানে সামনে রাখা দরকার। এখানে দ্বিতীয়বার তাদের একই আপত্তির কথা উল্লেখ করে অন্যভাবে তার জবাব দেয়া হচ্ছে।

৪৪. অর্থাৎ যে নিজেই আল্লাহর দিকে রুজু হয় না বরং তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাকে জোর করে সত্য-সঠিক পথ দেখানো আল্লাহর রীতি নয়। এ ধরনের লোকেরা সত্য-সঠিক পথ পরিত্যাগ করে উদভ্রান্তের মতো যেসব ভুল পথে ঘুরে বেড়াতে চায় আল্লাহ তাদেরকে সেই সব পথে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ দান করেন। একজন সত্য-সন্ধানীর জন্য যেসব কার্যকারণ সত্য পথলাভের সহায়ক হয়, একজন অসত্য ও ভ্রান্ত পথ প্রত্যাশী ব্যক্তির জন্য সেগুলো বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর কারণে পরিণত করে দেয়া হয়। উজ্জ্বল প্রদীপ তার সামনে এলেও তা তাকে পথ দেখাবার পরিবর্তে তার চোখকে অন্ধ করে দেবার কাজ করে। আল্লাহ কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে গোমরাহ করার অর্থ এটাই।

নিদর্শন দেখতে চাওয়ার জবাবে একথা বলা নজিরবিহীন বাকশৈলীর পরিচায়ক। তারা বলছিল, কোন নিদর্শন দেখাও, তাহলে আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারি। জবাবে বলা হয়েছে, মূর্খের দল! তোমাদের সত্য পথ না পাওয়ার আসল কারণ এ নয় যে, তোমাদের সামনে কোন নিদর্শন নেই বরং এর কারণ হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে সত্য পথ লাভের কোন আকাংখাই নেই। নিদর্শন তো চতুরদিকে অসংখ্য ছড়িয়ে আছে। কিন্তু সেগুলোর কোনটিই তোমাদের পথপ্রদর্শকে পরিণত হয় না। কারণ আল্লাহর পথে চলার ইচ্ছাই তোমাদের নেই। এখন যদি কোন নিদর্শন আসে তাহলে তা তোমাদের জন্য কেমন করে উপকারী হতে পারে? কোন নিদর্শন দেখানো হয়নি বলে তোমরা অভিযোগ করছো। কিন্তু যারা আল্লাহর পথের সন্ধান করে ফিরছে তারা নিদর্শন দেখতে পাচ্ছে এবং নিদর্শনসমূহ দেখেই তারা সত্য পথের সন্ধান লাভ করছে।

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ
بِهِ الْمَوْتٰى ؕ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ؕ اَفَلَمْ يَايْئَسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى
يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝

আর কী হতো, যদি এমন কোন কুরআন নাযিল করা হতো যার শক্তিতে পাহাড় চলতে থাকতো অথবা পৃথিবী বিদীর্ণ হতো কিংবা মৃত কবর থেকে বের হয়ে কথা বলতে থাকতো?[৪৭] (এ ধরনের নিদর্শন দেখিয়ে দেয়া তেমন কঠিন কাজ নয়) বরং সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই হাতে কেন্দ্রীভূত।[৪৮] তাহলে ঈমানদাররা কি (এখনো পর্যন্ত কাফেরদের চাওয়ার জবাবে কোন নিদর্শন প্রকাশের আশায় বসে আছে এবং তারা একথা জেনে) হতাশ হয়ে যায়নি যে, যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে সমগ্র মানব জাতিকে হেদায়াত দিয়ে দিতেন?[৪৯] যারা আল্লাহর সাথে কুফরীর নীতি অবলম্বন করে রেখেছে তাদের ওপর তাদের কৃতকর্মের দরুন কোন না কোন বিপর্যয় আসতেই থাকে অথবা তাদের ঘরের কাছেই কোথাও তা অবতীর্ণ হয়। এ ধারাবাহিকতা চলতেই থাকবে যে পর্যন্ত না আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ হয়ে যায়। অবশ্যি আল্লাহ নিজের ওয়াদার ব্যতিক্রম করেন না।

৪৫. অর্থাৎ তারা যে নিদর্শন চাচ্ছে তেমনি কোন নিদর্শন ছাড়াই।

৪৬. অর্থাৎ তাঁর বন্দেগী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আছে। তাঁর গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারে অন্যদেরকে তাঁর সাথে শরীক করছে। তাঁর দানের জন্য অন্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

৪৭. এ আয়াতটির অর্থ উপলব্ধি করার জন্য লক্ষ রাখতে হবে যে, এখানে কাফেরদেরকে নয় বরং মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। মুসলমানরা কাফেরদের পক্ষ থেকে বার বার এসব নিদর্শন দেখাবার দাবী শুনতো। ফলে তাদের মন অস্থির হয়ে উঠতো। তারা মনে করতো, আহা, যদি এদেরকে এমন কোন নিদর্শন দেখিয়ে দেয়া হতো যার ফলে এরা মেনে নিতো, তাহলে কতই না ভালো হতো! তারপর যখন তারা অনুভব করতো, এ ধরনের কোন নিদর্শন না আসার কারণে কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত সম্পর্কে লোকদের মনে সন্দেহ সৃষ্টির সুযোগ পাচ্ছে তখন তাদের এ অস্থিরতা আরো বেড়ে যেতো। তাই মুসলমানদেরকে বলা হচ্ছে, যদি কুরআনের কোন

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ
أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ
بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ۚ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا
لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۚ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾
لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُمْ
مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٣٤﴾

৫ রুকূ'

তোমার আগেও অনেক রসূলকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। কিন্তু আমি সবসময় অমান্যকারীদেরকে ঢিল দিয়ে এসেছি এবং শেষ পর্যন্ত তাদেরকে পাকড়াও করেছি। তাহলে দেখো আমার শাস্তি কেমন কঠোর ছিল।

তবে কি যিনি প্রত্যেক ব্যক্তির উপার্জনের প্রতি নজর রাখেন[৫০] (তাঁর মোকাবিলায় এ দুঃসাহস করা হচ্ছে যে)[৫১] লোকেরা তাঁর কিছু শরীক ঠিক করে রেখেছে? হে নবী! এদেরকে বলো, (যদি তারা সত্যিই আল্লাহর বানানো শরীক হয়ে থাকে তাহলে) তাদের পরিচয় দাও, তারা কারা? না কি তোমরা আল্লাহকে এমন একটি নতুন খবর দিচ্ছো যার অস্তিত্ব পৃথিবীতে তাঁর অজানাই রয়ে গেছে? অথবা তোমরা এমনি যা মুখে আসে বলে দাও?[৫২] আসলে যারা সত্যের দাওয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য তাদের প্রতারণাসমূহকে[৫৩] সুসজ্জিত করে দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে সত্য-সঠিক পথ থেকে নিবৃত্ত করা হয়েছে।[৫৪] তারপর আল্লাহ যাকে গোমরাহীতে লিপ্ত করেন তাকে পথ দেখাবার কেউ নেই। এ ধরনের লোকদের জন্য দুনিয়ার জীবনেই রয়েছে আযাব এবং আখেরাতের আযাব এর চেয়েও বেশী কঠিন। তাদেরকে আল্লাহর হাত থেকে বাঁচাবার কেউ নেই।

সূরার সাথে এমন ধরনের নিদর্শনাদি অকস্মাত দেখিয়ে দেয়া হতো তাহলে কি তোমরা মনে করো যে, সত্যিই এরা ঈমান আনতো? তোমরা কি এদের সম্পর্কে এ সুধারণা পোষণ করো যে, এরা সত্য গ্রহণের জন্য একেবারে তৈরী হয়ে বসে আছে, শুধুমাত্র

একটি নিদর্শন দেখিয়ে দেবার কাজ বাকি রয়ে গেছে? যারা কুরআনের শিক্ষাবলীতে, বিশ্ব-জগতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে, নবীর পবিত্র-পরিচ্ছন্ন জীবনে, সাহাবায়ে কেরামের বিপ্লবমুখর জীবনধারায় কোন সত্যের আলো দেখতে পাচ্ছে না, তোমরা কি মনে করো তারা পাহাড়ের গতিশীল হওয়া, মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া এবং কবর থেকে মৃতদের বের হয়ে আসার মত অলৌকিক ঘটনাবলীতে কোন আলোর সন্ধান পাবে?

৪৮. নিদর্শনসমূহ না দেখাবার আসল কারণ এ নয় যে, আল্লাহর এগুলো দেখাবার শক্তি নেই বরং আসল কারণ হচ্ছে, এ পদ্ধতিকে কাজে লাগানো আল্লাহর উদ্দেশ্য বিরোধী। কারণ আসল উদ্দেশ্য হেদায়াত লাভ করা, নবীর নবুওয়াতের স্বীকৃতি আদায় করা নয়। আর চিন্তা ও অন্তরদৃষ্টির সংশোধন ছাড়া হেদায়াত লাভ সম্ভব নয়।

৪৯. জ্ঞান ও উপলব্ধি ছাড়া নিছক একটি অসচেতন ঈমানই যদি উদ্দেশ্য হতো তাহলে এ জন্য নিদর্শনাদি দেখাবার কষ্টের কি প্রয়োজন ছিল? আল্লাহ্ সমস্ত মানুষকে মুসলমান হিসেবে পয়দা করে দিলেই তো এ উদ্দেশ্য সফল হতে পারতো।

৫০. অর্থাৎ যিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি লোকের অবস্থা জানেন। কোন সৎলোকের সৎকাজ এবং অসৎলোকের অসৎকাজ যার দৃষ্টির আড়ালে নেই।

৫১. দুঃসাহস হচ্ছে এই যে, তাঁর সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ দাঁড় করানো হচ্ছে, তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও অধিকারে তাঁর সৃষ্টিকে শরীক করা হচ্ছে এবং তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীনে অবস্থান করে লোকেরা মনে করছে আমরা যা ইচ্ছা—করবো, আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার কেউ নেই।

৫২. অর্থাৎ তোমরা যে তাঁর শরীক দাঁড় করাচ্ছো এ ব্যাপারে তিন ধরনের অবস্থা সম্ভবপরঃ

এক ঃ আল্লাহ কোন নির্দিষ্ট সত্তাকে তাঁর গুণাবলী, ক্ষমতা বা অধিকারে শরীক গণ্য করেছেন বলে তোমাদের কাছে কোন প্রামাণ্য ঘোষণা এসেছে কি? যদি এসে থাকে তাহলে মেহেরবানী করে বলো তারা কারা এবং তাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করার সংবাদ তোমরা পেয়েছো কিসের মাধ্যমে?

দুই ঃ আল্লাহ নিজেই জানেন না পৃথিবীতে কিছু সত্তা তাঁর অংশীদার হয়ে গেছে এবং এখন তোমরা তাঁকে এ খবর দিতে যাচ্ছো যদি এ ব্যাপারই হয়ে থাকে তাহলে স্পষ্টভাবে নিজেদের এ ভূমিকার কথা স্বীকার করো। তারপর দুনিয়ায় কতজন নির্বোধ তোমাদের এ উদ্ভট মতবাদের অনুসারী থাকে তা আমিও দেখে নেবো।

তিন ঃ কিন্তু যদি এ দু'টি অবস্থার কোনটি সম্ভবপর না হয়ে থাকে তাহলে তৃতীয় যে অবস্থাটি থাকে সেটি হচ্ছে এই যে, কোন প্রকার যুক্তি প্রমাণ ছাড়াই তোমরা যাকে ইচ্ছা তাকেই আল্লাহর আত্মীয় মনে করে নাও, যাকে ইচ্ছা তাকেই পরম দাতা ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী গণ্য করো এবং যার সম্পর্কে ইচ্ছা দাবী করে দাও যে, অমুক এলাকার রাজা অমুক সাহেব এবং অমুক কাজটি অমুক সাহেবের সাহায্য-সহায়তায় সম্পন্ন হয়।

৫৩. এ শিরককে প্রতারণা বলার একটি কারণ হচ্ছে এই যে, আসলে যেসব নক্ষত্র, ফেরেশতা, আত্মা বা মহামানবকে আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতার অধিকারী গণ্য করা হয়েছে

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ
أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ وَعُقْبَى
الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ
إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ
أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ ﴿٣٦﴾ وَكَذَٰلِكَ
أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ
مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾

যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার অবস্থা হচ্ছে এই যে, তার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হচ্ছে, তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং তার ছায়ার বিনাশ নেই।' এ হচ্ছে মুত্তাকীদের পরিণাম। অন্যদিকে সত্য অমান্যকারীদের পরিণাম হচ্ছে জাহান্নামের আগুন।

হে নবী! যাদেরকে আমি আগে কিতাব দিয়েছিলাম তারা তোমার প্রতি আমি যে কিতাব নাযিল করেছি তাতে আনন্দিত। আর বিভিন্ন দলে এমন কিছু লোক আছে যারা এর কোন কোন কথা মানে না। তুমি পরিষ্কার বলে দাও, "আমাকে তো শুধুমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করার হুকুম দেয়া হয়েছে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কাজেই আমি তাঁরই দিকে আহবান জানাচ্ছি এবং তাঁরই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।"[৫৫] এ হেদায়াতের সাথে আমি এ আরবী ফরমান তোমার প্রতি নাযিল করেছি। এখন তোমার কাছে যে জ্ঞান এসে গেছে তা সত্ত্বেও যদি তুমি লোকদের খেয়াল খুশীর তাবেদারী করো তাহলে আল্লাহর মোকাবিলায় তোমার কোন সহায়ও থাকবে না, আর কেউ তাঁর পাকড়াও থেকেও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।

এবং যাদেরকে আল্লাহর বিশেষ অধিকারে শরীক করা হয়েছে, তাদের কেউই কখনো এসব গুণ, অধিকার ও ক্ষমতার দাবী করেনি এবং কখনো লোকদেরকে এ শিক্ষা দেয়নি যে, তোমরা আমাদের সামনে পূজা-অর্চনার অনুষ্ঠানাদি পালন করো, আমরা তোমাদের আকাংখা পূর্ণ করে দেবো। কিছু ধূর্ত লোক সাধারণ মানুষের ওপর নিজেদের প্রভুত্বের দাপট

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾ يَمْحُو
اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ
الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾

৬ রুকূ'

তোমার আগেও আমি অনেক রসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি দিয়েছি।[৫৬] আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া নিজেই কোন নিদর্শন এনে দেখাবার শক্তি কোন রসূলেরও ছিল না।[৫৭] প্রত্যেক যুগের জন্য একটি কিতাব রয়েছে। আল্লাহ যা চান নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যা চান কায়েম রাখেন। উম্মুল কিতাব তাঁর কাছেই আছে।[৫৮]

হে নবী! আমি এদেরকে যে অশুভ পরিণামের ভয় দেখাচ্ছি চাই তার কোন অংশ আমি তোমার জীবিতাবস্থায় তোমাকে দেখিয়ে দেই অথবা তা প্রকাশ হবার আগেই তোমাকে উঠিয়ে নিই—সর্বাবস্থায় তোমার কাজই হবে শুধুমাত্র পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়া আর হিসেব নেয়া হলো আমার কাজ।[৫৯]

চালাবার এবং তাদের উপার্জনে অংশ নেবার উদ্দেশ্যে কিছু বানোয়াট ইলাহ তৈরী করে নিয়েছে। লোকদেরকে তাদের ভক্তশ্রেণীতে পরিণত করেছে এবং নিজেদেরকে কোন না কোনভাবে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড় করিয়ে আপন আপন স্বার্থোদ্ধারের কাজ শুরু করে দিয়েছে।

শিরককে প্রতারণা বলার দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে এই যে, আসলে এটি একটি অত্মপ্রতারণা এবং এমন একটি গোপন দরজা যেখান দিয়ে মানুষ বৈষয়িক স্বার্থ–পূজা, নৈতিক বিধিনিষেধ থেকে বাঁচা এবং দায়িত্বহীন জীবন যাপন করার জন্য পলায়নের পথ বের করে।

তৃতীয় যে কারণটির ভিত্তিতে মুশরিকদের কর্মপদ্ধতিকে প্রতারণা বলা হয়েছে তা পরে আসছে।

৫৪. মানুষ যখন একটি জিনিসের মোকাবিলায় অন্য একটি জিনিস গ্রহণ করে তখন মানসিকভাবে নিজেকে নিশ্চিন্ত করার এবং নিজের নির্ভুলতা ও সঠিক পথ অবলম্বনের ব্যাপারে লোকদেরকে নিশ্চয়তা দান করার জন্য নিজের গৃহীত জিনিসকে সকল প্রকার যুক্তি–প্রমাণ পেশ করে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করে এবং নিজের প্রত্যাখ্যাত জিনিসটির বিরুদ্ধে সব রকম যুক্তি–প্রমাণ পেশ করতে থাকে। এটাই মানুষের প্রকৃতি। এ কারণে

বলা হয়েছে ঃ যখন তারা সত্যের আহবান মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তখন প্রকৃতির আইন অনুযায়ী তাদের জন্য তাদের পথভ্রষ্টতাকে এবং এ পথভ্রষ্টতার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য তাদের প্রতারণাকে সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত করে দেয়া হয়েছে এবং এ প্রাকৃতিক রীতি অনুযায়ী তাদের সত্য সঠিক পথে আসা থেকে বিরত রাখা হয়েছে।

৫৫. এ সময় বিরোধীদের পক্ষ থেকে যে একটি বিশেষ কথা বলা হচ্ছিল এটি তার জবাব। তারা বলতো, এ ব্যক্তি নিজের দাবী অনুযায়ী যদি সত্যিসত্যিই সেই একই শিক্ষা নিয়ে এসে থাকেন যা ইতিপূর্বেকার সকল নবী এনেছিলেন, তাহলে আগের নবীদের অনুসারী ইহুদী ও খৃষ্টানরা অগ্রবর্তী হয়ে এঁকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে না কেন? এর জবাবে বলা হচ্ছে, তাদের মধ্য থেকে কেউ এতে খুশী এবং কেউ অখুশী, কিন্তু হে নবী! কেউ খুশী হোক বা অখুশী, তুমি পরিষ্কার বলে দাও, আমাকে তো আল্লাহর পক্ষ থেকে এ শিক্ষা দান করা হয়েছে এবং আমি সর্বাবস্থায় এর অনুসারী থাকবো।

৫৬. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হতো এটি তার মধ্য থেকে আর একটি আপত্তির জবাব। তারা বলতো, এ আবার কেমন নবী, যার স্ত্রী-সন্তানাদিও আছে! নবী-রসূলদের যৌন কামনার সাথে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না কি?

৫৭. এটিও একটি আপত্তির জবাব। বিরোধীরা বলতো, মূসা 'সূর্য করোজ্জ্বল হাত' ও 'লাঠি' এনেছিলেন, ঈসা মসীহ অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতেন এবং কুষ্ঠরোগীদেরকে রোগমুক্ত করতে পারতেন। সালেহ উটনীর নিদর্শন দেখিয়েছিলেন। তুমি কি নিদর্শন নিয়ে এসেছো? এর জবাবে বলা হয়েছে, যে নবী যে জিনিসই দেখিয়েছেন নিজের ক্ষমতা বা শক্তির জোরে দেখাননি। আল্লাহ যে সময় যার মাধ্যমে যে জিনিস প্রকাশ করা সংগত মনে করেছেন তা প্রকাশিত হয়েছে। এখন যদি আল্লাহ প্রয়োজন মনে করেন তাহলে যা তিনি চাইবেন দেখাবেন। নবী নিজে কখনো এমন খোদায়ী ক্ষমতার দাবী করেননি যার ভিত্তিতে তোমরা তাঁর কাছে নিদর্শন দেখাবার দাবী করতে পারো।

৫৮. এটিও বিরোধীদের একটি আপত্তির জবাব। তারা বলতো, ইতিপূর্বে যেসব কিতাব এসেছে সেগুলোর উপস্থিতিতে আবার নতুন কিতাবের কি প্রয়োজন ছিল? তুমি বলছো, সেগুলো বিকৃত হয়ে গেছে, এখন সেগুলো নাকচ করে দেয়া হয়েছে এবং তার পরিবর্তে এ নতুন কিতাবের অনুসারী হবার হুকুম দেয়া হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর কিতাব কেমন করে বিকৃত হতে পারে? আল্লাহ তার হেফাজত করেননি কেন? আর আল্লাহর কিতাব কেমন করে নাকচ হতে পারে? তুমি বলছো, এটি সেই আল্লাহর কিতাব যিনি তাওরাত ও ইঞ্জীল নাযিল করেছিলেন। কিন্তু এ কি ব্যাপার, তোমার কোন কোন পদ্ধতি দেখছি তাওরাতের বিধানের বিরোধী? যেমন কোন কোন জিনিস তাওরাত হারাম ঘোষণা করেছে কিন্তু তুমি সেগুলো হালাল মনে করে খাও। এসব আপত্তির জবাব পরবর্তী সূরাগুলোয় বেশী বিস্তারিত আকারে দেয়া হয়েছে। এখানে এগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাংগ জবাব দিয়ে শেষ করে দেয়া হয়েছে।

"উম্মুল কিতাব" মানে আসল কিতাব অর্থাৎ এমন উৎসমূল যা থেকে সমস্ত আসমানী কিতাব উৎসারিত হয়েছে।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ
لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤١﴾ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ
جَمِيعًا ۚ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى
الدَّارِ ﴿٤٢﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٤٣﴾

এরা কি দেখে না আমি এ ভূখণ্ডের ওপর এগিয়ে চলছি এবং এর গণ্ডী চতুরদিক থেকে সংকুচিত করে আনছি?[৬০] আল্লাহ রাজত্ব করছেন, তাঁর সিদ্ধান্ত পুনরবিবেচনা করার কেউ নেই এবং তাঁর হিসেব নিতে একটুও দেরী হয় না। এদের আগে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে তারাও বড় বড় চক্রান্ত করেছিল[৬১] কিন্তু আসল সিদ্ধান্তকর কৌশল তো পুরোপুরি আল্লাহর হাতে রয়েছে। তিনি জানেন কে কি উপার্জন করছে এবং শীঘ্রই এ সত্য অস্বীকারকারীরা দেখে নেবে কার পরিণাম ভালো হয়।

এ অস্বীকারকারীরা বলে, তুমি আল্লাহর প্রেরিত নও। বলো, "আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহর সাক্ষ যথেষ্ট এবং তারপর আসমানী কিতাবের জ্ঞান রাখে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির সাক্ষ।"[৬২]

৫৯. অর্থ হচ্ছে, যারা তোমার এ সত্যের দাওয়াতকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয় এবং কবে তা প্রকাশ হয় তা চিন্তা করার প্রয়োজন তোমার নেই। তোমার ওপর যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে তা পালন করে যেতে থাকো এবং ফায়সালা আমার হাতে ছেড়ে দাও। এখানে বাহ্যত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হলেও মূলত তাঁর বিরোধীদেরকে শুনানোই উদ্দেশ্য। তারা চ্যালেঞ্জের ভংগিতে বার বার তাঁকে বলতো, তুমি আমাদের যে বিপর্যয় ও ধ্বংসের হুমকি দিয়ে আসছো তা আসছে না কেন?

৬০. অর্থাৎ তোমার বিরোধীরা কি দেখছে না ইসলামের প্রভাব আরব ভূখণ্ডের সর্বত্র দিনের পর দিন ছড়িয়ে পড়ছে? চতুরদিক থেকে তার বেষ্টনী সংকীর্ণতর হয়ে আসছে? এটা এদের বিপর্যয়ের আলামত নয় তো আবার কি?

"আমি এ ভূখণ্ডে এগিয়ে চলছি"—আল্লাহর একথা বলার একটি সূক্ষ্ম তাৎপর্য রয়েছে। যেহেতু হকের দাওয়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং এ দাওয়াত যারা পেশ করে আল্লাহ

তাদের সাথে থাকেন, তাই কোন দেশে এ দাওয়াত ছড়িয়ে পড়াকে আল্লাহ এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নিজেই ঐ দেশে এগিয়ে চলছেন।

৬১. সত্যের কণ্ঠ রুদ্ধ করার জন্য মিথ্যা, প্রতারণা ও জুলুমের অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে, এটা আজ কোন নতুন কথা নয়। অতীতে বারবার এমনি ধরনের কৌশল অবলম্বন করে সত্যের দাওয়াতকে পরাস্ত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

৬২. অর্থাৎ আসমানী কিতাবের জ্ঞান রাখে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি একথার সাক্ষ দেবে যে, যাকিছু আমি পেশ করছি তা ইতিপূর্বে আগত নবীগণের শিক্ষার পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইব্‌রাহীম

১৪

নামকরণ

৩৫ নং আয়াতে উল্লেখিত وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا বাক্যাংশ থেকে এ সূরার নাম গৃহীত হয়েছে। এ নামকরণের মানে এ নয় যে, এ সূরায় হযরত ইব্‌রাহীমের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। বরং অধিকাংশ সূরার নামের মতো এখানেও আলামত হিসেবে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এটি এমন একটি সূরা যেখানে ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

সূরাটির সাধারণ বর্ণনা পদ্ধতি মক্কার শেষ যুগের সূরাগুলোর মতো। তাই এটি সূরা রা'আদের নিকটবর্তী কালে অবতীর্ণ বলে মনে হয়। বিশেষ করে ১৩নং আয়াতের وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِىْ مِلَّتِنَا (এবং অস্বীকারকারীরা নিজেদের রসূলদের বললো, তোমাদের ফিরে আসতে হবে আমাদের ধর্মীয় জাতিসত্তার মধ্যে, অন্যথায় আমরা তোমাদের বের করে দেবো আমাদের দেশ থেকে) শব্দাবলী থেকে পরিষ্কার ইংগিত পাওয়া যায় যে, সে সময় মক্কায় মুসলমানদের ওপর জুলুম-নিপীড়ন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। মক্কাবাসীরা অতীতের কাফের জাতিগুলোর মতো তাদের দেশের মুমিন সমাজকে দেশ থেকে উৎখাত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। এ জন্য অতীতে তাদের মতো যেসব জাতি একই কর্মনীতি অবলম্বন করেছিল তাদেরকে যে ধরনের হুমকি দেয়া হয়েছিল তাদেরকেও সেই একই হুমকি দেয়া হয়। অতীতের কাফের জাতিসমূহকে হুমকি দেয়া হয়েছিল, لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ (আমি জালেমদেরকে ধ্বংস করে ছাড়বো)। অন্যদিকে মুমিনদেরকে তাদের পূর্ববর্তীদের মতো একই সান্ত্বনা দেয়া হয়। তাদেরকে বলা হয় ঃ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ অর্থাৎ এ জালেমদেরকে খতম করার পর আমি এ ভূখণ্ডে তোমাদের বসতি স্থাপন করাবো।

এভাবে শেষ রুকূ'র আলোচ্য বিষয় থেকেও অনুমান করা যায় যে, এ সূরাটি মক্কার শেষ যুগের সাথে সম্পর্ক রাখে।

কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত মেনে নিতে অস্বীকার করছিল এবং তাঁর দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য সব রকমের নিকৃষ্টতম প্রতারণা ও চক্রান্ত

চালিয়ে যাচ্ছিল তাদের প্রতি উপদেশ ও সতর্কবাণী এ সূরার কেন্দ্রীয় বক্তব্য। কিন্তু উপদেশের তুলনায় এ সূরায় সতর্কীকরণ, তিরস্কার, হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনের ভাবধারাই বেশী উচ্চকিত। এর কারণ, এর আগের সূরাগুলোতে বুঝাবার কাজটা পুরোপুরি এবং সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এরপরও কুরাইশ কাফেরদের হঠকারিতা, হিংসা, বিদ্বেষ, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, অনিষ্টকর ক্রিয়াকর্ম ও জুলুম-নির্যাতন দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছিল।

আয়াত ৫২ **সূরা ইবরাহীম—মক্কী** রুকূ' ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ
اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝١ اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ
مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ
شَدِيْدِ ۙ ۝٢ الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۗ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ۝٣

আলিফ লাম্ র। হে মুহাম্মাদ। এটি একটি কিতাব, তোমার প্রতি এটি নাযিল করেছি, যাতে তুমি লোকদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর মধ্যে নিয়ে আসো তাদের রবের প্রদত্ত সুযোগ ও সামর্থের ভিত্তিতে, এমন এক আল্লাহর পথে[১] যিনি প্রবল প্রতাপান্বিত ও আপন সত্তায় আপনি প্রশংসিত[২] এবং পৃথিবী ও আকাশের যাবতীয় বস্তুর মালিক।

আর কঠিন ধ্বংসকর শাস্তি রয়েছে তাদের জন্য যারা সত্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের ওপর প্রাধান্য দেয়[৩] যারা লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে রুখে দিচ্ছে এবং চাচ্ছে এ পথটি (তাদের আকাংখা অনুযায়ী) বাঁকা হয়ে যাক।[৪] ভ্রষ্টতায় এরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

১. অন্ধকার থেকে বের করে আলোর মধ্যে আনার মানে হচ্ছে, শয়তানের পথ থেকে সরিয়ে আল্লাহর পথে নিয়ে আসা। অন্য কথায়, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নেই সে আসলে অজ্ঞতা ও মূর্খতার অন্ধকারে বিভ্রান্তের মতো পথ হাতড়ে মরছে। সে নিজেকে যতই উন্নত চিন্তার অধিকারী এবং জ্ঞানের আলোকে যতই উদ্ভাসিত মনে করুক না কেন তাতে আসল অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের সন্ধান পেয়েছে, গ্রামীণ এলাকার একজন অশিক্ষিত লোক হলেও সে আসলে জ্ঞানের আলোর রাজ্যে পৌঁছে গেছে।

তারপর এই যে, বলা হয়েছে "যাতে তুমি এদেরকে স্বীয় রবের প্রদত্ত সুযোগ ও সামর্থের ভিত্তিতে আল্লাহর পথে নিয়ে এসো" এ উক্তির মধ্যে আসলে এদিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, কোন প্রচারক, তিনি নবী হলেও, সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়া ছাড়া তিনি আর বেশী কিছু করতে পারেন না। কাউকে এ পথে নিয়ে আসার ক্ষমতা তাঁর নেই। এটা পুরোপুরি আল্লাহর দেয়া সুযোগ ও সামর্থের ওপর নির্ভর করে। আল্লাহ কাউকে সুযোগ দিলে সে হেদায়াত লাভ করতে পারে। নয়তো নবীর মতো সফল ও পূর্ণ শক্তিধর প্রচারকও নিজের সকল শক্তি নিয়োগ করেও তাকে হেদায়াত দান করতে পারেন না। আর আল্লাহর সুযোগ দান সম্পর্কে বলা যায়, এর একটি স্বতন্ত্র বিধান রয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এটি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভের সুযোগ একমাত্র সেই ব্যক্তি পায় যে নিজেই হেদায়াতের প্রত্যাশী হয়, জিদ, হঠকারিতা ও হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত থাকে, নিজের প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার দাস হয় না, পরিষ্কার খোলা চোখে দেখে সজাগ ও সতর্ক কানে শোনে, মুক্ত সুস্থ ও পরিষ্কার মস্তিষ্কে চিন্তা করে এবং যুক্তিসংগত কথাকে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় না নিয়ে মেনে নেয়।

২. মূল আয়াতে বলা হয়েছে 'হামীদ'। হামীদ শব্দটি 'মাহমুদ' (প্রশংসিত)-এর সমার্থক হলেও উভয় শব্দের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। কাউকে "মাহমুদ" তখনই বলা হবে যখন তার প্রশংসা করা হয়েছে বা হয়। কিন্তু "হামীদ" বললে বুঝা যাবে কেউ তার প্রশংসা করুক বা না করুক সে নিজেই প্রশংসার অধিকারী ও যোগ্য। এখানে প্রশংসিত, প্রশংসার যোগ্য ও প্রশংসা লাভের হকদার ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে এ শব্দটির পূর্ণ অর্থ প্রকাশ হয় না। তাই আমি এর অনুবাদ করেছি 'আপন সত্তায় আপনি প্রশংসিত' শব্দাবলীর মাধ্যমে।

৩. অথবা অন্য কথায় যারা শুধুমাত্র দুনিয়ার স্বার্থ ও লাভের কথাই চিন্তা করে, আখেরাতের কোন পরোয়া করে না। যারা বৈষয়িক লাভ, স্বাদ ও আরাম-আয়েশের বিনিময়ে আখেরাতের ক্ষতি কিনে নিতে পারে কিন্তু আখেরাতের সাফল্য ও সমৃদ্ধির বিনিময়ে দুনিয়ার কোন ক্ষতি, কষ্ট ও বিপদ এমনকি কোন স্বাদ থেকে বঞ্চিত হওয়াও বরদাশত করতে পারে না। যারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের পর্যালোচনা করে ধীর ও সুস্থ মস্তিষ্কে দুনিয়াকে বেছে নিয়েছে এবং আখেরাতের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তার স্বার্থ যেসব ক্ষেত্রে দুনিয়ার স্বার্থের সাথে সংঘর্ষশীল হবে সেসব ক্ষেত্রে তাকে ত্যাগ করে যেতে থাকবে।

৪. অর্থাৎ তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হয়ে থাকতে চায় না। বরং আল্লাহর দীনকে নিজেদের ইচ্ছার অনুগত করে রাখতে চায়। নিজেদের প্রত্যেকটি ভাবনা-চিন্তা, মতবাদ ও ধারণা-অনুমানকে তারা নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের অন্তরভুক্ত করে এবং এমন কোন আকীদাকে নিজেদের চিন্তারাজ্যে অবস্থান করতে দেয় না যা তাদের ভাবনার সাথে খাপ খায় না। তারা চায় আল্লাহর দীন তাদের অনুসৃত প্রত্যেকটি রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ও অভ্যাসকে বৈধতার ছাড়পত্র দিক এবং তাদের কাছে এমন কোন পদ্ধতির অনুসরণের দাবী না জানাক যা তারা পছন্দ করে না। এরা নিজেদের প্রবৃত্তি ও শয়তানের অনুসরণে যেদিকে মুখ ফিরায়, আল্লাহর দীনও যেন এদের গোলাম হয়ে ঠিক সেদিকেই মুখ ফিরায়।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ اللّٰهُ
مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٤﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا
مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ
بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٥﴾ وَاِذْ قَالَ
مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ
فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ
نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿٦﴾

আমি নিজের বাণী পৌঁছাবার জন্য যখনই কোন রসূল পাঠিয়েছি, সে তার নিজের সম্প্রদায়েরই ভাষায় বাণী পৌঁছিয়েছে, যাতে সে তাদেরকে খুব ভালো করে পরিষ্কারভাবে বুঝাতে পারে।[৫] তারপর আল্লাহ যাকে চান তাকে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান হেদায়াত দান করেন।[৬] তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও জ্ঞানী।[৭]

আমি এর আগে মূসাকেও নিজের নিদর্শনাবলী সহকারে পাঠিয়েছিলাম। তাকেও আমি হুকুম দিয়েছিলাম, নিজের সম্প্রদায়কে অন্ধকার থেকে বের করে আলোকের মধ্যে নিয়ে এসো এবং তাদেরকে ইতিহাসের[৮] শিক্ষণীয় ঘটনাবলী শুনিয়ে উপদেশ দাও। এ ঘটনাবলীর মধ্যে বিরাট নিদর্শন[৯] রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে সবর করে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।[১০]

স্মরণ করো যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বললো, "আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যা তিনি তোমাদের প্রতি করেছেন। তিনি তোমাদের ফিরাউনী সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্ত করেছেন, যারা তোমাদের ওপর ভয়াবহ নির্যাতন চালাতো, তোমাদের ছেলেদের হত্যা করতো এবং তোমাদের মেয়েদের জীবিত রাখতো। এর মধ্যে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য মহা পরীক্ষা ছিল।

সে যেন কোথাও এদেরকে বাধা না দেয় বা সমালোচনা না করে এবং কোথাও এদেরকে নিজের পথের দিকে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা না করে। আল্লাহ তাদের কাছে এ ধরনের দীন পাঠালেই তারা তা মানতে প্রস্তুত।

৫. এর দু'টি অর্থ হয় ঃ এক, আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের মধ্যে যে নবী পাঠিয়েছেন তার ওপর তার ভাষায়ই নিজের বাণী অবতীর্ণ করেছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল, সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় যেন তা ভালোভাবে বুঝতে পারে এবং পরবর্তী পর্যায়ে তারা এ ধরনের কোন ওজর পেশ করতে না পারে যে, আপনার পাঠানো শিক্ষা তো আমরা বুঝতে পারিনি কাজেই কেমন করে তার প্রতি ঈমান আনতে পারতাম। দুই, আল্লাহ কখনো নিছক অলৌকিক ক্ষমতা দেখাবার জন্য আরব দেশে নবী পাঠিয়ে তাদের মুখ দিয়ে জাপানী বা চৈনিক ভাষায় নিজের কালাম শুনাননি। এ ধরনের তেলেসমাতি দেখিয়ে লোকদের অভিনবত্ব প্রিয়তাকে পরিতৃপ্ত করার তুলনায় আল্লাহর দৃষ্টিতে শিক্ষা ও উপদেশ দান এবং বুঝিয়ে বলা ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করাই বেশী গুরুত্বের অধিকারী। এ উদ্দেশ্যে কোন জাতিকে তার নিজের ভাষায়, যে ভাষা সে বোঝে, পয়গাম পৌছানো প্রয়োজন।

৬. অর্থাৎ সমগ্র জাতি যে ভাষা বোঝে নবী সে ভাষায় তার সমগ্র প্রচার কার্য পরিচালনা ও উপদেশ দান করা সত্ত্বেও সবাই হেদায়াত লাভ করে না। কারণ কোন বাণী কেবলমাত্র সহজবোধ্য হলেই যে, সকল শ্রোতা তা মেনে নেবে এমন কোন কথা নেই। সঠিক পথের সন্ধান লাভ ও পথভ্রষ্ট হওয়ার মূল সূত্র রয়েছে আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে চান নিজের বাণীর সাহায্যে সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং যার জন্য চান এ একই বাণীকে তার জন্য পথভ্রষ্টতার উপকরণে পরিণত করেন।

৭. অর্থাৎ লোকেরা নিজে নিজেই সৎপথ লাভ করবে বা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, এটা সম্ভব নয়। কারণ তারা পুরোপুরি স্বাধীন নয়। বরং আল্লাহর কর্তৃত্বের অধীন। কিন্তু আল্লাহ নিজের এ কর্তৃত্বকে অন্ধের মতো প্রয়োগ করেন না। কোন যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করবেন এবং যাকে ইচ্ছা অযথা পথভ্রষ্ট করবেন এটা তাঁর রীতি নয়। কর্তৃত্বশীল ও বিজয়ী হওয়ার সাথে সাথে তিনি জ্ঞানী এবং প্রাজ্ঞও। তাঁর কাছ থেকে কোন ব্যক্তি যুক্তিসংগত কারণেই হেদায়াত লাভ করে। আর যে ব্যক্তিকে সঠিক পথ থেকে বঞ্চিত করে ভ্রষ্টতার মধ্যে ছেড়ে দেয়া হয় সে নিজেই নিজের ভ্রষ্টতাপ্রীতির কারণে এহেন আচরণলাভের অধিকারী হয়।

৮. আরবী ভাষায় পারিভাষিক অর্থে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর স্মারককে "আইয়াম" বলা হয়। "আইয়ামুল্লাহ" বলতে মানুষের ইতিহাসের এমন সব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বুঝায় যেখানে আল্লাহ অতীতের জাতিসমূহ ও বড় বড় ব্যক্তিত্বকে তাদের কর্মকাণ্ড অনুযায়ী শাস্তি বা পুরস্কার দিয়েছেন।

৯. অর্থাৎ এসব ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে এমন সব নিদর্শন রয়েছে যার মাধ্যমে এক ব্যক্তি আল্লাহর একত্বের সত্যতা ও নির্ভুলতার প্রমাণ পেতে পারে। এ সংগে এ সত্যের পক্ষেও অসংখ্য সাক্ষ–প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারে যে, প্রতিদানের বিধান একটি বিশ্বজনীন আইন, তা পুরোপুরি হক ও বাতিলের তাত্ত্বিক ও নৈতিক পার্থক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং তার দাবী পূরণ করার জন্য অন্য একটি জগত অর্থাৎ পরকালীন জগত অপরিহার্য। তাছাড়া এ ঘটনাবলীর মধ্যে এমনসব নিদর্শনও রয়েছে যার সাহায্যে কোন ব্যক্তি বাতিল বিশ্বাস ও মতবাদের ভিত্তিতে জীবনের ইমারত তৈরী করার অশুভ পরিণামের সন্ধান লাভ করতে এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ
عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٨﴾ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ
لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ
فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا
تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٩﴾

২ রুকূ'

আর স্মরণ করো, তোমাদের রব এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যদি কৃতজ্ঞ থাকো[১১] তাহলে আমি তোমাদের আরো বেশী দেবো আর যদি নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হও তাহলে আমার শাস্তি বড়ই কঠিন।[১২] আর মূসা বললো, "যদি তোমরা কুফরী করো এবং পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীও কাফের হয়ে যায় তাহলে আল্লাহর কিছুই আসে যায় না এবং তিনি আপন সত্তায় আপনি প্রশংসিত।[১৩]

তোমাদের কাছে কি[১৪] তোমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত জাতিগুলোর বৃত্তান্ত পৌঁছেনি? নূহের জাতি, আদ, সামূদ এবং তাদের পরে আগমনকারী বহু জাতি, যাদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ জানেন? তাদের রসূলরা যখন তাদের কাছে দ্ব্যর্থহীন কথা ও সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আসেন তখন তারা নিজেদের মুখে হাত চাপা দেয়[১৫] এবং বলে, "যে বার্তা সহকারে তোমাদের পাঠানো হয়েছে আমরা তা মানি না এবং তোমরা আমাদের যে জিনিসের দাওয়াত দিচ্ছো তার ব্যাপারে আমরা যুগপৎ উদ্বেগ ও সংশয়ের মধ্যে আছি।[১৬]

১০. অর্থাৎ এ নিদর্শনসমূহ তো যথাস্থানে আছে। কিন্তু একমাত্র তারাই এ থেকে লাভবান হতে পারে যারা আল্লাহর পরীক্ষায় ধৈর্য ও অবিচলতার সাথে এগিয়ে চলে এবং আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে যথাযথভাবে অনুভব করে তাদের জন্য যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। নীচমনা, সংকীর্ণচেতা ও কৃতঘ্ন স্বভাবের লোকেরা যদি এ নিদর্শনগুলো উপলব্ধি করেও তাহলে তাদের এ নৈতিক দুর্বলতা তাদেরকে সেই উপলব্ধি দ্বারা লাভবান হতে দেয় না।

১১. অর্থাৎ যদি আমার নিয়ামতসমূহের অধিকার ও মর্যাদা চিহ্নিত করে সেগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করো, আমার বিধানের মোকাবিলায় অহংকারে মত্ত হতে ও বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ না হও এবং আমার অনুগ্রহের অবদান স্বীকার করে নিয়ে আমার বিধানের অনুগত থাকো।

১২. এ বিষয়বস্তু সম্বলিত ভাষণ বাইবেলের 'দ্বিতীয় বিবরণ' পুস্তকে বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। এ ভাষণে হযরত মূসা (আ) তাঁর ইন্তিকালের কয়েকদিন আগে বনী ইসরাঈলকে তাদের ইতিহাসের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তারপর মহান আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলের নিকট তাওরাতের যেসব বিধান পাঠিয়েছিলেন তিনি সেগুলোরও পুনরাবৃত্তি করেছেন। এরপর একটি সুদীর্ঘ ভাষণ দিয়েছেন। এ ভাষণে তিনি বলেছেন, যদি তারা তাদের রবের হুকুম মেনে চলে তাহলে তাদেরকে কিভাবে পুরস্কৃত করা হবে আর যদি নাফরমানির পথ অবলম্বন করে তাহলে কেমন কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। এ ভাষণটি দ্বিতীয় বিবরণের ৪, ৬, ৮, ১০, ১১ ও ২৮ থেকে ৩০ অধ্যায় পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। এর কোন কোন স্থান অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষণীয়। উদাহরণ স্বরূপ এর কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। এ থেকে সমগ্র ভাষণটির ব্যাপারে একটা ধারণা করা যাবে।

"হে ইসরায়েল শুন ; আমাদের সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু ; আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ, ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া আপন সদাপ্রভুকে প্রেম করিবে। আর এই যে সকল কথা আমি অদ্য তোমাকে আজ্ঞা করি, তাহা তোমার হৃদয়ে থাকুক। আর তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন সন্তানগণকে এ সকল যত্নপূর্বক শিক্ষা দিবে এবং গৃহে বসিবার কিম্বা পথে চলিবার সময়ে এবং শয়ন কিংবা গাত্রোত্থানকালে ঐ সমস্তের বিষয়ে কথোপকথন করিবে।" (২ঃ৪-৭)

"এখন হে ঈসরায়েল, তোমার সদাপ্রভু তোমার কাছে কি চাহেন? কেবল এই, যেন তুমি আপন সদাপ্রভুকে ভয় করো, তাঁহার সকল পথে চল ও তাঁহাকে প্রেম কর এবং তোমার সমস্ত হৃদয় ও তোমার সমস্ত প্রাণের সহিত তোমার সদাপ্রভুর সেবা কর, অদ্য আমি তোমার মংগলার্থে সদাপ্রভুর যে যে আজ্ঞা ও বিধি তোমাকে দিতেছি, সেই সকল যেন পালন কর। দেখ স্বর্গ এবং পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তু তোমার সদাপ্রভুর।" (১০ঃ১২-১৪)

"আমি তোমাকে অদ্য যে সকল আজ্ঞা আদেশ করিতেছি, যত্নপূর্বক সেই সকল পালন করিবার জন্য যদি তুমি আপন সদাপ্রভুর রবে মনোযোগ সহকারে কর্ণপাত কর, তবে তোমার সদাপ্রভু পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতির উপরে তোমাকে উন্নত করিবেন; আর তোমার সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত করিলে এ সকল আশীর্বাদ তোমার উপর বর্তিবে ও তোমাকে আশ্রয় করিবে। তুমি নগরে আশীর্বাদযুক্ত হইবে ও ক্ষেত্রে আশীর্বাদযুক্ত হইবে।.....তোমার যে শত্রুগণ তোমার ওপর আক্রমণ চালায় তাহাদিগকে সদাপ্রভু তোমার সম্মুখে আঘাত করাইবেন..... সদাপ্রভু আজ্ঞা করিয়া তোমার গোলাঘর সম্বন্ধে ও তুমি যে কোন কার্যে হস্তক্ষেপ কর তৎসম্বন্ধে আশীর্বাদকে তোমার সহচর করিবেন;.....সদাপ্রভু আপন দিব্যানুসারে তোমাকে আপন পবিত্র

প্রজা বলিয়া স্থাপন করিবেন ; কেবল তোমার সদাপ্রভুর আজ্ঞা পালন ও তাহার পথে গমন করিতে হইবে। আর পৃথিবীর সমস্ত জাতি দেখিতে পাইবে যে, তোমার উপরে সদা প্রভুর নাম কীর্তিত হইয়াছে এবং তাহারা তোমা হইতে ভীত হইবে।.....এবং তুমি অনেক জাতিকে ঋণ দিবে, কিন্তু আপনি ঋণ লইবে না। আর সদাপ্রভু তোমাকে মস্তক স্বরূপ করিবেন, পুচ্ছ স্বরূপ করিবেন না; তুমি অবনত না হইয়া কেবল উন্নত হইবে।" (২৮ঃ১-১৩)

"কিন্তু যদি তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত না কর, আমি অদ্য তোমাকে যে সকল আজ্ঞা ও বিধি আদেশ করিতেছি, যত্নপূর্বক সেই সকল পালন না কর, তবে এ সমস্ত অভিশাপ তোমার প্রতি বর্তিবে ও তোমাকে আশ্রয় করিবে। তুমি নগরে শাপগ্রস্ত হইবে ও ক্ষেত্রে শাপগ্রস্ত হইবে।..... .... যে কোন কার্যে তুমি হস্তক্ষেপ কর, সেই কার্যে সদাপ্রভু তোমার উপর অভিশাপ, উদ্বেগ ও ভর্ৎসনা প্রেরণ করিবেন। .....তুমি যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সেই দেশ হইতে যাবৎ উচ্ছিন্ন না হও, তাবৎ সদাপ্রভু তোমাকে মহামারীর আশ্রয় করিবেন।.....তোমার মস্তকের উপরিস্থিত আকাশ পিত্তল ও নিম্নস্থিত ভূমি লৌহস্বরূপ হইবে।.....সদাপ্রভু তোমার শত্রুদের সম্মুখে তোমাকে পরাজিত করাইবেন; তুমি একপথ দিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যাইবে, কিন্তু সাত পথ দিয়া তাহাদের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিবে।..... তোমার সাথে কন্যার বিবাহ হইবে, কিন্তু অন্য পুরুষ তাহার সহিত সংগম করিবে। তুমি গৃহ নির্মাণ করিবে, কিন্তু তাহাতে বাস করিতে পাইবে না; দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিবে, কিন্তু তাহার ফল ভোগ করিবে না। তোমার গরু তোমার সম্মুখে জবাই হইবে, ...সদাপ্রভু তোমার বিরুদ্ধে যে শত্রুগণকে পাঠাইবেন, তুমি ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, উলংগতায় ও সকল বিষয়ের অভাব ভোগ করিতে করিতে তাহাদের দাসত্ব করিবে ; এবং যে পর্যন্ত তিনি তোমার বিনাশ না করেন, সে পর্যন্ত শত্রুরা তোমার গ্রীবাতে লৌহের জোয়াল দিয়া রাখিবে।.....আর সদাপ্রভু তোমাকে পৃথবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র জাতির মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন করিবেন।" (২৮ঃ১৫-১৬)

১৩. এখানে হযরত মূসা (আ) ও তাঁর জাতির ইতিহাসের প্রতি এ সংক্ষিপ্ত ইংগিত করার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। তা হচ্ছে, মক্কাবাসীদেরকে একথা জানানো যে, আল্লাহ যখন কোন জাতির প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং এর জবাবে সুশ্রিষ্ট জাতি বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহ করে তখন এ ধরনের জাতির এমন মারাত্মক ও ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হতে হয় যার সম্মুখীন আজ তোমাদের চোখের সামনে বনী ইসরাঈলরা হচ্ছে। কাজেই তোমরাও কি আল্লাহর নিয়ামত ও তাঁর অনুগ্রহের জওয়াবে অকৃতজ্ঞ মনোভাব প্রদর্শন করে নিজেদের এ একই পরিণাম দেখতে চাও?

এ প্রসংগে একথাও মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাঁর যে নিয়ামতের কদর করার জন্য এখানে কুরাইশদের কাছে দাবী জানাচ্ছেন তা বিশেষভাবে তাঁর এ নিয়ামতটি যে, তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের মধ্যে পয়দা করেছেন এবং তাঁর মাধ্যমেই তাদের কাছে এমন মহিমান্বিত শিক্ষা পাঠিয়েছেন যে সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার কুরাইশদেরকে বলতেন-

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ
لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ۚ قَالُوا إِنْ
أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ۖ تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ
آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿١٠﴾ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا
بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا
أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾
وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا
آذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٢﴾

তাদের রসূলরা বলে, "আল্লাহর ব্যাপারে কি সন্দেহ আছে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা?[১৭] তিনি তোমাদের ডাকছেন তোমাদের গুনাহ মাফ করার এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেয়ার জন্য।[১৮] তারা জবাব দেয়, "তোমরা আমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও।[১৯] বাপ-দাদাদের থেকে যাদের ইবাদাত চলে আসছে তোমরা তাদের ইবাদাত থেকে আমাদের ফেরাতে চাও। ঠিক আছে তাহলে আনো কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ।[২০] তাদের রসূলরা তাদেরকে বলে, "যথার্থই আমরা তোমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কিছুই নই। কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন।[২১] আর তোমাদের কোন প্রমাণ এনে দেবো, এ ক্ষমতা আমাদের নেই। প্রমাণ তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে আসতে পারে এবং ঈমানদারদের আল্লাহরই ওপর ভরসা রাখা উচিত। আর আমরা আল্লাহরই ওপর ভরসা করবো না কেন, যখন আমাদের জীবনের পথে তিনি আমাদের পথ দেখিয়েছেন? তোমরা আমাদের যে যন্ত্রণা দিচ্ছো তার ওপর আমরা সবর করবো এবং ভরসাকারীদের ভরসা আল্লাহরই ওপর হওয়া উচিত।"

كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تُعْطُوْنِيْهَا تَمْلِكُوْنَ بِهَا الْعَرَبَ وَتَدِيْنُ لَكُمُ الْعَجَمُ -

"আমার একটি মাত্র কথা মেনে নাও। আরব ও আজম সব তোমাদের করতলগত হয়ে যাবে।"

১৪. হযরত মূসার (আ) ভাষণ ওপরে শেষ হয়ে গেছে। এখন সরাসরি মক্কার কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে।

১৫. এ শব্দগুলোর ব্যাখ্যার ব্যাপারে তাফসীরকারদের মধ্যে বেশ কিছু মতবিরোধ দেখা গেছে। বিভিন্ন জন বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। আমাদের মতে এর সবচেয়ে নিকটবর্তী অর্থ তাই হতে পারে যা প্রকাশ করার জন্য আমরা বলে থাকি, 'কানে হাত চাপা দিয়েছে' বা 'মুখে হাত চাপা দিয়েছে।' কারণ পরবর্তী বাক্যের বক্তব্যের মধ্যে পরিষ্কার অস্বীকৃতি ও এ সাথে হতবাক হয়ে যাওয়ার ভাব প্রকাশ পেয়েছে এবং এর মধ্যে কিছু ক্রোধের ভাবধারাও মিশে আছে।

১৬. অর্থাৎ এমন সংশয় যার ফলে প্রশান্তি বিদায় নিয়েছে। সত্যের দাওয়াতের বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, এ দাওয়াত যখন শুরু হয় তখন তার কারণে চতুরদিকে অবশ্যি একটা ব্যাকুলতা, হৈ চৈ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়ে যায় ঠিকই এবং অস্বীকার ও বিরোধিতাকারীরাও ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করে পূর্ণ প্রশান্তির সাথে তা অস্বীকার বা তার বিরোধিতা করতে পারে না। তারা যত প্রবলভাবেই তাকে প্রত্যাখ্যান করুক এবং যতই শক্তি প্রয়োগ করে তার বিরোধিতা করুক না কেন দাওয়াতের সত্যতা, তার ন্যায়-সংগত যুক্তিসমূহ, তার সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন কথা, তার মনোমুগ্ধ কর ভাষা, তার আহবায়কের নিখুঁত চরিত্র, তার প্রতি বিশ্বাসীদের জীবনধারায় সূচিত সুস্পষ্ট বিপ্লব এবং তাদের নিজেদের সত্য কথা অনুযায়ী পরিচ্ছন্ন কার্যাবলী—এসব জিনিস মিলেমিশে অতীব কট্টর বিরোধীর মনেও এক অস্থিরতার তরংগ সৃষ্টি করে দেয়। সত্যের আহবায়কদেরকে যারা অস্থির ও ব্যাকুল করে দেয় তারা নিজেরাও স্থিরতা ও মানসিক প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত হয়।

১৭. রসূলদের একথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক যুগের মুশরিকরা আল্লাহর অস্তিত্ব মানতো এবং আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা একথাও স্বীকার করতো। এরি ভিত্তিতে রসূলগণ বলেছেন, এরপর তোমাদের সন্দেহ থাকে কিসে? আমরা যে জিনিসের দিকে তোমাদের দাওয়াত দিচ্ছি তা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা আল্লাহ তোমাদের বন্দেগীলাভের যথার্থ হকদার। এরপরও কি আল্লাহর ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ আছে?

১৮. নির্দিষ্ট সময় মানে ব্যক্তির মৃত্যুকালও হতে পারে আবার কিয়ামতও হতে পারে। জাতিসমূহের উত্থান ও পতনের ব্যাপারে বলা যেতে পারে, আল্লাহর কাছে তাদের উত্থান-পতনের সময়-কাল নির্দিষ্ট হওয়ার বিষয়টি তাদের গুণগত অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। একটি ভালো জাতি যদি তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিকৃতির সৃষ্টি করে তাহলে তার কর্মের অবকাশ কমিয়ে দেয়া হয় এবং তাকে ধ্বংস করে ফেলা হয়। আর একটি ভ্রষ্ট জাতি যদি নিজেদের অসৎগুণাবলীকে শুধরে নিয়ে সৎগুণাবলীতে পরিবর্তিত করে তাহলে তার কর্মের অবকাশ বাড়িয়ে দেয়া হয়। এমনকি তা কিয়ামত পর্যন্তও দীর্ঘায়িত হতে পারে। এ বিষয়বস্তুর দিকেই সূরা রা'আদের ১১ আয়াতে ইংগিত করে। আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ কোন জাতির অবস্থার ততক্ষণ পরিবর্তন ঘটান না যতক্ষণ না সে নিজের গুণাবলীর পরিবর্তন করে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ
اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ۭ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ۙ﴿١٣﴾
وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۭ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ
وَخَافَ وَعِيْدِ ﴿١٤﴾ وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿١٥﴾ مِّنْ
وَّرَاۗىِٕهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّاۗءٍ صَدِيْدٍ ﴿١٦﴾ يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ
وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۭ وَمِنْ وَّرَاۗىِٕهٖ عَذَابٌ
غَلِيْظٌ ﴿١٧﴾

৩ রুকূ'

শেষ পর্যন্ত অস্বীকারকারীরা তাদের রসূলদের বলে দিল, "হয় তোমাদের ফিরে আসতে হবে আমাদের মিল্লাতে[২২] আর নয়তো আমরা তোমাদের বের করে দেবো আমাদের দেশ থেকে।" তখন তাদের রব তাদের কাছে অহী পাঠালেন, "আমি এ জালেমদের ধ্বংস করে দেবো এবং এদের পর পৃথিবীতে তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করবো।[২৩] এটা হচ্ছে তার পুরস্কার, যে আমার সামনে জবাবদিহি করার ভয় করে এবং আমার শাস্তির ভয়ে ভীত।" তারা ফায়সালা চেয়েছিল (ফলে এভাবে তাদের ফায়সালা হলো) এবং প্রত্যেক উদ্ধত সত্যের দুশমন ব্যর্থ মনোরথ হলো।[২৪] এরপর সামনে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে তাকে পান করতে দেয়া হবে গলিত পুঁজের মতো পানি, যা সে জবরদস্তি গলা দিয়ে নামাবার চেষ্টা করবে এবং বড় কষ্টে নামাতে পারবে। মৃত্যু সকল দিক দিয়ে তার ওপর ছেয়ে থাকবে কিন্তু তার মৃত্যু হবে না এবং সামনের দিকে একটি কঠোর শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে।

১৯. তাদের কথার অর্থ ছিল এই যে, তোমাকে আমরা সব দিক দিয়ে আমাদের মত একজন মানুষই দেখছি। তুমি পানাহার করো, নিদ্রা যাও, তোমার স্ত্রী ও সন্তানাদি আছে, তোমার মধ্যে ক্ষুধা, পিপাসা, রোগ, শোক, ঠাণ্ডা ও গরমের তথা সব জিনিসের অনুভূতি আছে। এসব ব্যাপারে এবং সব ধরনের মানবিক দুর্বলতার ক্ষেত্রে আমাদের সাথে তোমার সাদৃশ্য রয়েছে। তোমার মধ্যে এমন কোন অসাধারণত্ব দেখছি না যার ভিত্তিতে আমরা এ

কথা মেনে নিতে পারি যে, তুমি আল্লাহর কাছে পৌঁছে গিয়েছো, আল্লাহ তোমার সাথে কথা বলেন এবং ফেরেশতারা তোমার কাছে আসে।

২০. অর্থাৎ এমন কোন প্রমাণ যা আমরা চোখে দেখি এবং হাত দিয়ে স্পর্শ করি। যে প্রমাণ দেখে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে, যথার্থই আল্লাহ তোমাকে পাঠিয়েছেন এবং তুমি এই যে বাণী এনেছো তা আল্লাহর বাণী।

২১. অর্থাৎ নিসন্দেহে আমি তো মানুষই। তবে আল্লাহ সত্যের তত্ত্বজ্ঞান ও পূর্ণ অন্তরদৃষ্টি দান করে তোমাদের মধ্য থেকে আমাকে বাছাই করে নিয়েছেন। এখানে আমার সামর্থের কোন ব্যাপার নেই। এ তো আল্লাহর পূর্ণ ইখতিয়ারের ব্যাপার। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে যা ইচ্ছা দেন। আমার কাছে যা কিছু এসেছে তা আমি তোমাদের কাছে পাঠাতে বলতে পারি না এবং আমার কাছে যে সত্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেছে তা থেকে আমি নিজের চোখ বন্ধ করে নিতেও পারি না।

২২. এর মানে এ নয় যে, নবুওয়াতের মর্যাদায় সমাসীন হবার আগে নবীগণ নিজেদের পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের মিল্লাত বা ধর্মের অন্তরভুক্ত হতেন। বরং এর মানে হচ্ছে, নবুওয়াত লাভের পূর্বে যেহেতু তাঁরা এক ধরনের নীরব জীবন যাপন করতেন, কোন ধর্ম প্রচার করতেন না এবং প্রচলিত কোন ধর্মের প্রতিবাদও করতেন না তাই তাঁদের সম্প্রদায় মনে করতো তাঁরা তাদেরই ধর্মের অন্তরভুক্ত রয়েছেন। তারপর নবুওয়াতের কাজ শুরু করে দেয়ার পর তাঁদের বিরুদ্ধে দোষারোপ করা হতো যে, তাঁরা বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছেন। অথচ নবুওয়াত লাভের আগেও তাঁরা কখনো মুশরিকদের ধর্মের অন্তরভুক্ত ছিলেন না। যার ফলে তাঁদের বিরুদ্ধে ধর্মচ্যুতির অভিযোগ করা যেতে পারে।

২৩. অর্থাৎ ভীত হয়ো না, এরা বলছে, তোমরা এ দেশে থাকতে পারবে না কিন্তু আমি বলছি, এখন আর এরা এ দেশে থাকতে পারবে না। এখন যারা তোমাকে মানবে তারাই এখানে থাকবে।

২৪. মনে রাখা দরকার, এখানে এ ঐতিহাসিক ধারা বিবরণীর আকারে আসলে মক্কার কাফেরদের কথার জবাব দেয়া হচ্ছে, যা তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতো। আপাতদৃষ্টিতে অতীতের নবীগণ এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের ঘটনাবলী উল্লেখ করা হচ্ছে, কিন্তু তা প্রযুক্ত হচ্ছে এ সূরা নাযিলের সময় যেসব ঘটনা ঘটে চলছিল তার ওপর। এ স্থানে মক্কার কাফেরদেরকে বরং আরবের মুশরিকদেরকে যেন পরিষ্কার ভাষায় সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের ভবিষ্যত এখন নির্ভর করবে তোমরা মুহাম্মাদী দাওয়াতের মোকাবিলায় যে মনোভাব ও কর্মনীতি অবলম্বন করবে তার ওপর। যদি এ দাওয়াত গ্রহণ করো তাহলে আরব ভূখণ্ডে থাকতে পারবে আর যদি তা প্রত্যাখ্যান করো তাহলে এখান থেকে তোমাদের নাম-নিশানা মুছে যাবে। কার্যত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী একথাটিকে একটি প্রমাণিত সত্যে পরিণত করে দিয়েছে। এ ভবিষ্যত বাণীর পর পুরো পনের বছর পার হতে না হতেই দেখা গেলো সমগ্র আরব ভূখণ্ডে একজন মুশরিকেরও অস্তিত্ব নেই।

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ نِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ
يَوْمٍ عَاصِفٍ ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ
الْبَعِيْدُ ﴿١٨﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ
اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٩﴾ وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ
بِعَزِيْزٍ ﴿٢٠﴾ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا
اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ
قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا
مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿٢١﴾

যারা তাদের রবের সাথে কুফরী করলো তাদের কার্যক্রমের উপমা হচ্ছে এমন ছাই-এর মতো, যাকে একটি ঝনঝাক্ষুব্ধ দিনের প্রবল বাতাস উড়িয়ে দিয়েছে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের কোনই ফল লাভ করতে পারবে না।[২৫] এটিই চরম বিভ্রান্তি। তুমি কি দেখছো না, আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন?[২৬] তিনি চাইলে তোমাদের নিয়ে যান এবং একটি নতুন সৃষ্টি তোমাদের স্থলাভিসিক্ত হয়। এমনটি করা তাঁর জন্য মোটেই কঠিন নয়।[২৭]

আর এরা যখন সবাই একত্রে আল্লাহর সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাবে,[২৮] সে সময় এদের মধ্য থেকে যারা দুনিয়ায় দুর্বল ছিল তারা যারা নিজেদেরকে বড় বলে জাহির করতো তাদেরকে বলবে, "দুনিয়ায় আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে আমাদের বাঁচাবার জন্যও কিছু করতে পারো? তারা জবাব দেবে, "আল্লাহ যদি আমাদের মুক্তিলাভের কোন পথ দেখাতেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদেরও দেখিয়ে দিতাম। এখন তো সব সমান, কান্নাকাটি করো বা সবর করো—সর্বাবস্থায় আমাদের বাঁচার কোন পথ নেই।[২৯]

২৫. অর্থাৎ যারা নিজেদের রবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা, অবিশ্বস্ততা, অবাধ্যতা, স্বেচ্ছাচারমূলক আচরণ, নাফরমানী ও বিদ্রোহাত্মক কর্মপন্থা অবলম্বন করলো এবং নবীগণ যে আনুগত্য ও বন্দেগীর পথ অবলম্বন করার দাওয়াত নিয়ে আসেন তা গ্রহণ

করতে অস্বীকার করলো, তাদের সমগ্র জীবনের কর্মকাণ্ড এবং সারা জীবনের সমস্ত আমল শেষ পর্যন্ত এমনি অর্থহীন প্রমাণিত হবে যেমন একটি ছাই-এর স্তূপ, দীর্ঘদিন ধরে এক জায়গায় জমা হতে হতে তা এক সময় একটি বিরাট পাহাড়ে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মাত্র একদিনের ঘূর্ণিঝড়ে তা এমনভাবে উড়ে গেলো যে তার প্রত্যেকটি কণা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। তাদের চাকচিক্যময় সভ্যতা, বিপুল ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি, বিস্ময়কর শিল্প-কল-কারখানা, মহা প্রতাপশালী রাষ্ট্র, বিশালায়তন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, চারুকলা-ভাস্কর্য-স্থাপত্যের বিশাল ভাণ্ডার, এমনকি তাদের ইবাদাত-বন্দেগী, বাহ্যিক সৎকার্যাবলী এবং দান ও জনকল্যাণমূলক এমন সব কাজ-কর্ম যেগুলোর জন্য তারা দুনিয়ায় গর্ব করে বেড়ায়, সবকিছুই শেষ পর্যন্ত ছাই-এর স্তূপে পরিণত হবে। কিয়ামতের দিনের ঘূর্ণিঝড় এ ছাই-এর স্তূপকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেবে এবং আখেরাতের জীবনে আল্লাহর মীযানে রেখে সামান্যতম ওজন পাওয়ার জন্য তার একটি কণাও তাদের কাছে থাকবে না।

২৬. ইতিপূর্বে যে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছিল এটি হচ্ছে তার সপক্ষে যুক্তি। এর মানে হচ্ছে, একথা শুনে তোমরা অবাক হচ্ছো কেন? তোমরা কি দেখছো না এ যমীন ও আসমানের বিরাট সৃষ্টি কারখানা মিথ্যার ওপর নয় বরং সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত? এখানে যে জিনিসটি সত্য ও যথার্থতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় না বরং নিছক একটি ধারণা-অনুমানের ওপর যার ভিত রাখা হয় সেটি কখনো স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। তার প্রতিষ্ঠা ও মজবুতী—লাভের কোন সম্ভাবনা থাকে না। তার ওপর ভরসা করে যে ব্যক্তি কাজ করে সে কখনো নিজের ভরসার ক্ষেত্রে সফলকাম হতে পারে না। যে ব্যক্তি পানির ওপর নকশা কাটে এবং বালির বাঁধ নির্মাণ করে, সে যদি মনে করে, তার এ নক্শা স্থায়ী হবে এবং এ বাঁধ কায়েম থাকবে তাহলে তার এ আশা কখনো পূর্ণ হতে পারে না। কারণ পানির প্রকৃতিই এমন যে তাতে কোন নক্শা টিকে থাকে না এবং বাঁধের জন্য যে মজবুত বুনিয়াদের প্রয়োজন তা সরবরাহ করার ক্ষমতা বালির নেই। কাজেই সত্যতা ও বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে যে ব্যক্তি মিথ্যা আশা-আকাংখার ওপর কর্মের ভিত্ গড়ে তোলে তার ব্যর্থতা অনিবার্য। একথা যদি তোমরা বুঝতে পেরে থাকো তাহলে একথা শুনে তোমরা অবাক হচ্ছো কেন যে, আল্লাহর এ বিশ্ব-জাহানে যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য মুক্ত মনে করে কাজ করবে অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে (যার আসলে কোন সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নেই) জীবন যাপন করবে তার জীবনের সমস্ত কাজ নষ্ট হয়ে যাবে? যখন মানুষ এখানে যথার্থই স্বাধীন নয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর বান্দাও নয় তখন এ মিথ্যা ও অবাস্তব কল্পনার ওপর নিজের সমগ্র চিন্তা ও কর্মের ভিত্তি স্থাপনকারী মানুষ যদি তোমাদের মতে পানির ওপর নকশা অংকনকারী নির্বোধের পরিণাম না ভোগে তাহলে তার জন্য তোমরা আর কোন্ ধরনের পরিণাম আশা করো"?

২৭. দাবীর সপক্ষে যুক্তি পেশ করার সাথে সাথেই উপদেশ হিসেবে এ বাক্য উচ্চারণ করা হয়েছে এবং এ সাথে ওপরের দ্ব্যর্থহীন কথা শুনে মানুষের মনে যে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে তা দূর করার ব্যবস্থাও এতে রয়েছে। কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে এ আয়াতগুলোতে

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ
وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّاۤ اَنْ
دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَاۤ اَنَا
بِمُصْرِخِكُمْ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ؕ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَاۤ اَشْرَكْتُمُوْنِ
مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٢﴾

৪ রুকূ'

আর যখন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে, "সত্যি বলতে কি আল্লাহ তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা সব সত্যি ছিল এবং আমি যেসব ওয়াদা করেছিলাম তার মধ্য থেকে একটিও পূরা করিনি।[৩০] তোমাদের ওপর আমার তো কোন জোর ছিল না, আমি তোমাদের আমার পথের দিকে আহবান জানানো ছাড়া আর কিছুই করিনি এবং তোমরা আমার আহবানে সাড়া দিয়েছিলে।[৩১] এখন আমার নিন্দাবাদ করো না, নিজেরাই নিজেদের নিন্দাবাদ করো। এখানে না আমি তোমাদের অভিযোগের প্রতিকার করতে পারি আর না তোমরা আমার। ইতিপূর্বে তোমরা যে আমাকে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে শরীক করেছিলে[৩২] তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, এ ধরনের জালেমদের জন্য তো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবধারিত।

যে কথা বলা হয়েছে তাই যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে প্রত্যেক মিথ্যাপূজারী ও দুষ্কৃতকারী ধ্বংস হয় না কেন? এর জবাব হচ্ছে, হে নির্বোধ! তুমি কি মনে করো তাকে ধ্বংস করা আল্লাহর জন্য তেমন কোন কঠিন কাজ? অথবা আল্লাহর সাথে তার কোন আত্মীয়তা আছে যে কারণে তার দুষ্কৃতি সত্ত্বেও নিছক স্বজন প্রীতির বশে বাধ্য হয়ে আল্লাহ তাকে অব্যাহতি দিয়েছেন? যদি এমনটি না হয়ে থাকে এবং তুমি নিজে জানো এমন কোন ব্যাপার নেই তাহলে তোমার অবশ্যি বুঝা উচিত, একটি মিথ্যাপূজারী ও দুষ্কৃতকারী জাতি সবসময় তাকে সরিয়ে দেয়ার এবং তার জায়গায় অন্য কোন জাতিকে কাজ করার সুযোগ দেয়ার আশংকা করে থাকে। এ আশংকার বাস্তবে রূপ নিতে দেরী হয়ে থাকলে আদতে আশংকার কোন অস্তিত্বই নেই এ ধরনের বিভ্রান্তির নেশায় মত্ত হয়ে যাওয়া উচিত নয়। অবকাশের প্রত্যেকটি মুহূর্তকে মূল্যবান মনে করো এবং নিজের মিথ্যা চিন্তা ও কর্ম ব্যবস্থার অস্থায়িত্ব অনুভব করে তাকে দ্রুত স্থায়ী বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করো।

২৮. মূল শব্দ 'বারাযা'। 'বারাযা' মানে শুধু বের হয়ে সামনে আসা এবং উপস্থাপিত হওয়া নয় বরং এর মধ্যে প্রকাশ হয়ে যাওয়া এবং খুলে যাওয়ার অর্থও রয়েছে। তাই আমি এর অনুবাদ করেছি সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে বান্দা তো সবসময় তার রবের সামনে উন্মুক্ত রয়েছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন নিজের রবের সামনে পেশ হওয়ার সময় যখন সবাই আল্লাহর আদালতে হাযির হবে তখন তারা নিজেরাও জানবে যে, তারা সকল বিচারপতির শ্রেষ্ঠ বিচারপতি এবং শেষ বিচার দিনের সর্বময় কর্তার সামনে একেবারে অনাবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাদের কোন কাজ বরং কোন চিন্তাও হৃদয়ের গহন কোণে লুকানো কোন ইচ্ছাও তাঁর কাছে গোপন নেই।

২৯. এটি এমন সব লোকের জন্য সতর্কবাণী যারা দুনিয়ায় চোখ বন্ধ করে অন্যের পেছনে চলে অথবা নিজেদের দুর্বলতাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে শক্তিশালী জালেমদের আনুগত্য করে। তাদের জানানো হচ্ছে, আজ যারা তোমাদের নেতা, কর্মকর্তা ও শাসক হয়ে আছে আগামীকাল এদের কেউই তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে সামান্যতম নিষ্কৃতিও দিতে পারবে না। কাজেই আজই ভেবে নাও, তোমরা যাদের পেছনে ছুটে চলছো অথবা যাদের হুকুম মেনে চলছো তারা নিজেরাই কোথায় যাচ্ছে এবং তোমাদের কোথায় নিয়ে যাবে।

৩০. অর্থাৎ আল্লাহ সত্যবাদী ছিলেন এবং আমি ছিলাম মিথ্যেবাদী তোমাদের এতটুকুন অভিযোগ ও দোষারোপ যে পুরোপুরি সত্যি এতে কোন সন্দেহ নেই। একথা আমি অস্বীকার করছি না। তোমরা দেখতেই পাচ্ছো, আল্লাহর প্রত্যেকটি প্রতিশ্রুতি ও হুমকি অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অন্যদিকে আমি তোমাদের যেসব আশ্বাস দিয়েছিলাম, যেসব লাভের লোভ দেখিয়েছিলাম, যেসব সুদৃশ্য আশা-আকাংখার জালে তোমাদের ফাঁসিয়েছিলাম এবং সর্বাগ্রে তোমাদের মনে যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়েছিলাম যে, ওসব আখেরাত টাখেরাত বলে কিছুই নেই, ওগুলো নিছক প্রতারণা ও গাল-গল্প, আর যদি সত্যিই কিছু থেকে থাকে, তাহলে অমুক বুযুর্গের বদৌলতে তোমরা সোজা উদ্ধার পেয়ে যাবে, কাজেই তাদের খেদমতে নযরানা ও অর্থ-উপাচারের উৎকোচ প্রদান করতে থাকো এবং তারপর যা মন চায় তাই করে যেতে থাকো আমি তোমাদের এই যেসব কথা নিজে এবং আমার এজেন্টদের মাধ্যমে বলেছিলাম, এগুলো সবই ছিল নিছক প্রতারণা।

৩১. অর্থাৎ আপনারা যদি এ মর্মে কোন প্রমাণ দেখাতে পারেন যে, আপনারা নিজেরা সত্য-সঠিক পথে চলতে চাচ্ছিলেন এবং আমি জবরদস্তি আপনাদের হাত ধরে আপনাদেরকে ভুল পথ থেকে টেনে নিয়েছিলাম তাহলে অবশ্যি তা দেখান। এর যা শাস্তি হয় আমি মাথা পেতে নেবো। কিন্তু আপনারা নিজেরাও স্বীকার করবেন, আসল ঘটনা তা নয়। আমি হকের আহবানের মোকাবিলায় বাতিলের আহবান আপনাদের সামনে পেশ করেছি। সত্যের মোকাবিলায় মিথ্যার দিকে আপনাদেরকে ডেকেছি। সৎকাজের মোকাবিলায় অসৎকাজ করার জন্য আপনাদেরকে আহবান জানিয়েছি। এর বেশী আর কিছুই করিনি। আমার কথা মানা না মানার পূর্ণ স্বাধীনতা আপনাদের ছিল। আপনাদেরকে বাধ্য করার কোন ক্ষমতা আমার ছিল না। এখন আমার এ দাওয়াতের জন্য নিসন্দেহে আমি নিজে দায়ী ছিলাম এবং এর শাস্তিও আমি পাচ্ছি। কিন্তু আপনারা যে এ দাওয়াতে সাড়া

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۖ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿٢٣﴾ أَلَمْ تَرَ
كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ
وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ
خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ۟ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ﴿٢٦﴾

অপরদিকে যারা দুনিয়ায় ঈমান এনেছে এবং যারা সৎকাজ করেছে তাদেরকে এমন বাগীচায় প্রবেশ করানো হবে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা তাদের রবের অনুমতিক্রমে চিরকাল বসবাস করবে। সেখানে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হবে শান্তি ও নিরাপত্তার মোবারকবাদ সহকারে।[৩৩] তুমি কি দেখছো না আল্লাহ কালেমা তাইয়েবার[৩৪] উপমা দিয়েছেন কোন্ জিনিসের সাহায্যে? এর উপমা হচ্ছে যেমন একটি ভালো জাতের গাছ, যার শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত এবং শাখা-প্রশাখা আকাশে পৌঁছে গেছে।[৩৫] প্রতি মুহূর্তে নিজের রবের হুকুমে সে ফলদান করে।[৩৬] এ উপমা আল্লাহ এ জন্য দেন যাতে লোকেরা এর সাহায্যে শিক্ষা লাভ করতে পারে। অন্যদিকে অসৎ বাক্যের[৩৭] উপমা হচ্ছে, একটি মন্দ গাছ, যাকে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপড়ে দূরে নিক্ষেপ করা হয়, যার কোন স্থায়িত্ব নেই।[৩৮]

দিয়েছেন, এর দায়ভার কেমন করে আমার ঘাড়ে চাপাতে চাচ্ছেন? নিজেদের ভুল নির্বাচন এবং নিজেদের ক্ষমতার অসৎ ব্যবহারের দায়ভার পুরোপুরি আপনাদের বহন করতে হবে।

৩২. এখানে আবার বিশ্বাসগত শিরকের মোকাবিলায় শিরকের একটি স্বতন্ত্র ধারা অর্থাৎ কর্মগত শিরকের অস্তিত্বের একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। একথা সুস্পষ্ট, বিশ্বাসগত দিক দিয়ে শয়তানকে কেউই আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে শরীক করে না এবং কেউ তার পূজা, আরাধনা ও বন্দেগী করে না। সবাই তাকে অভিশাপ দেয়। তবে তার আনুগত্য ও দাসত্ব এবং চোখ বুজে বা খুলে তার পদ্ধতির অনুসরণ অবশ্যি করা হচ্ছে। এটিকেই এখানে শিরক বলা হয়েছে। কেউ বলতে পারেন, এটা তো শয়তানের উক্তি, আল্লাহ এটা উদ্ধৃত করেছেন মাত্র। কিন্তু আমরা বলবো, প্রথমত তার বক্তব্য যদি ভুল হতো তাহলে আল্লাহ নিজেই তার প্রতিবাদ করতেন। দ্বিতীয়ত কুরআনে কর্মগত শিরকের শুধু এ একটিমাত্র দৃষ্টান্ত নেই বরং পূর্ববর্তী সূরাগুলোয় এর একাধিক প্রমাণ পাওয়া গেছে

এবং সামনের দিকে আরো পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইহুদী ও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ ঃ তারা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের "আহবার" (উলামা) ও "রাহিব"দেরকে (সংসার বিরাগী সন্যাসী) রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। [আত্ তাওবা ঃ ৩১] জাহেলিয়াতের আচার অনুষ্ঠান উদ্ভাবনকারীদের সম্পর্কে একথা বলা ঃ তাদের অনুসারীরা তাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করে নিয়েছে। [আল আন'আম ঃ ১৩৭] প্রবৃত্তির কামনা বাসনার পূজারীদের সম্পর্কে বলা ঃ তারা নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। (আল ফুরকান ঃ ৪৩) নাফরমান বান্দাদের সম্পর্কে এ উক্তি ঃ তারা শয়তানের ইবাদাত করতে থেকেছে। (ইয়াসীন ঃ ৬০) মানুষের গড়া আইন অনুযায়ী জীবন যাপনকারীদেরকে এ বলে ভর্ৎসনা করা ঃ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া যারা তাদের জন্য শরীয়াত প্রণয়ন করেছে তারা হচ্ছে তাদের "শরীক"। (আশ্-শূরা ঃ ২১) এগুলো সব কি কর্মগত শিরকের নজীর নয়? এ নজীরগুলো থেকে একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, কোন ব্যক্তি আকীদাগতভাবে কোন গাইরুল্লাহকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বে শরীক করলো, শিরকের শুধুমাত্র এ একটিই আকৃতি নেই। এর আর একটি আকৃতিও আছে। সেটি হচ্ছে, আল্লাহর অনুমোদন ছাড়াই অথবা আল্লাহর বিধানের বিপরীত কোন গাইরুল্লাহর অনুসরণ ও আনুগত্য করতে থাকা। এ ধরনের অনুসারী বা আনুগত্যকারী যদি নিজের নেতার বা যার আনুগত্য করছে তার ওপর লানত বর্ষণ করা অবস্থায়ও কার্যত এ আনুগত্যের নীতি অবলম্বন করে তাহলে কুরআনের দৃষ্টিতে সে তাকে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের শরীক করছে। শরীয়াতের দৃষ্টিতে আকীদাগত মুশরিকদের জন্য যে বিধান তাদের জন্য সেই একই বিধান না হলেও তাতে কিছু আসে যায় না। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা আন'আমের ৮৭ ও ১০৭ টীকা এবং সূরা আল কাহাফের ৫০ টীকা)।

৩৩. মূল শব্দ تَحِيَّة এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া। কিন্তু পারিভাষিক অর্থে আরবী ভাষায় এ শব্দটিকে সম্বর্ধনা ও অভ্যর্থনা সূচক শব্দ বা স্বাগত বচন হিসেবে বলা হয়ে থাকে। লোকেরা পরস্পর মুখোমুখি হলে সবার আগে একজন অন্যজনের উদ্দেশ্যে এ শব্দটিই উচ্চারণ করে। আমাদের ভাষায় এর সমার্থক শব্দ হচ্ছে , "সালাম" বা "সালাম কালাম"। কিন্তু প্রথম শব্দটি ব্যবহার করলে অনুবাদ যথাযথ হয় না এবং দ্বিতীয় শব্দটি হাল্‌কা হয়ে যায়। তাই আমি এর অনুবাদে "অভ্যর্থনা" শব্দ ব্যবহার করেছি।

تحيتهم শব্দের মানে এও হতে পারে যে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক অভ্যর্থনার পদ্ধতি এ হবে। আবার এ মানেও হতে পারে যে, তাদের অভ্যর্থনা এভাবে হবে। তাছাড়া سَلَام শব্দের মধ্যে নিরাপত্তার দোয়ার অর্থ রয়েছে এবং নিরাপত্তার জন্য মোবারকবাদও রয়েছে। পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমি এখানে অনুবাদে উল্লেখিত অর্থ গ্রহণ করেছি।

৩৪. "কালেমা তাইয়েবা"র শাব্দিক অর্থ "পবিত্র কথা।" কিন্তু এ শব্দের মাধ্যমে যে তাৎপর্য গ্রহণ করা হয়েছে তা হচ্ছে, এমন সত্য কথা এবং এমন পরিচ্ছন্ন বিশ্বাস যা পুরোপুরি সত্য ও সরলতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ উক্তি ও আকীদা কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে অপরিহার্যভাবে এমন একটি কথা ও বিশ্বাস হতে পারে যার মধ্যে রয়েছে তাওহীদের স্বীকৃতি, নবীগণ ও আসমানী কিতাবসমূহের স্বীকৃতি এবং আখেরাতের স্বীকৃতি। কারণ কুরআন এ বিষয়গুলোকেই মৌলিক সত্য হিসেবে পেশ করে।

৩৫. অন্য কথায় এর অর্থ হলো, পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থা যেহেতু এমন একটি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত যার স্বীকৃতি একজন মুমিন তার কালেমা তাইয়েবার মধ্যে দিয়ে থাকে, তাই কোন স্থানের প্রাকৃতিক আইন-এর সাথে সংঘর্ষ বাধায় না, কোন বস্তুর আসল, স্বভাব ও প্রাকৃতিক গঠন একে অস্বীকার করে না এবং কোথাও কোন প্রকৃত সত্য ও সততা এর সাথে বিরোধ করে না। তাই পৃথিবী ও তার সমগ্র ব্যবস্থা তার সাথে সহযোগিতা করে এবং আকাশ তথা সমগ্র মহাশূন্য জগত তাকে স্বাগত জানায়।

৩৬. অর্থাৎ সেটি একটি ফলদায়ক ও ফলপ্রসূ কালেমা। কোন ব্যক্তি বা জাতি তার ভিত্তিতে জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুললে প্রতি মুহূর্তে সে তার সুফল লাভ করতে থাকে। সেটি চিন্তাধারায় পরিপক্কতা ও পরিচ্ছন্নতা, স্বভাবে প্রশান্তি, মেজাজে ভারসাম্য, এ জীবন ধারায় মজবুতী, চরিত্রে পবিত্রতা, আত্মায় প্রফুল্লতা ও স্নিগ্ধতা, শরীরে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা, আচরণে মাধুর্য, ব্যবহার ও লেনদেনে সততা, কথাবার্তায় সত্যবাদিতা, ওয়াদা ও অংগীকারে দৃঢ়তা, সামাজিক জীবন যাপনে সদাচার, কৃষ্টিতে ঔদার্য ও মহত্ব, সভ্যতায় ভারসাম্য, অর্থনীতিতে আদল ও ইনসাফ, রাজনীতিতে বিশ্বস্ততা, যুদ্ধে সৌজন্য, সন্ধিতে আন্তরিকতা এবং চুক্তি ও অংগীকারে বিশ্বস্ততা সৃষ্টি করে। সেটি এমন একটি পরশ পাথর যার প্রভাব কেউ যথাযথভাবে গ্রহণ করলে খাঁটি সোনায় পরিণত হয়।

৩৭. এটি কালেমা তাইয়েবার বিপরীত শব্দ। যদিও প্রতিটি সত্য বিরোধী ও মিথ্যা কথার ওপর এটি প্রযুক্ত হতে পারে তবুও এখানে এ থেকে এমন প্রতিটি বাতিল আকীদা বুঝায়, যার ভিত্তিতে মানুষ নিজের জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এ বাতিল আকীদা নাস্তিক্যবাদ, নিরীশ্বরবাদ, ধর্মদ্রোহিতা, অবিশ্বাস, শিরক, পৌত্তলিকতা অথবা এমন কোন চিন্তাধারাও হতে পারে, যা নবীদের মাধ্যমে আসেনি।

৩৮. অন্য কথায় এর অর্থ হলো, বাতিল আকীদা যেহেতু সত্য বিরোধী তাই প্রাকৃতিক আইন কোথাও তার সাথে সহযোগিতা করে না। বিশ্ব-জগতের প্রতিটি অণুকণিকা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। পৃথিবী ও আকাশের প্রতিটি বস্তু তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। জমিতে তার বীজ বপন করার চেষ্টা করলে জমি সবসময় তাকে উদগীরণ করার জন্য তৈরী থাকে! আকাশের দিকে তার শাখা প্রশাখা বেড়ে উঠতে থাকলে আকাশ তাদেরকে নিচের দিকে ঠেলে দেয়। পরীক্ষার খাতিরে মানুষকে যদি নির্বাচন করার স্বাধীনতা ও কর্মের অবকাশ না দেয়া হতো তাহলে এ অসৎজাতের গাছটি কোথাও গজিয়ে উঠতে পারতো না। কিন্তু যেহেতু মহান আল্লাহ আদম সন্তানকে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রবণতা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ দান করেছেন, তাই যেসব নির্বোধ লোক প্রাকৃতিক আইনের বিরুদ্ধে লড়ে এ গাছ লাগাবার চেষ্টা করে তাদের শক্তি প্রয়োগের ফলে জমি একে সামান্য কিছু জায়গা দিয়েও দেয়, বাতাস ও পানি থেকে সে কিছু না কিছু খাদ্য পেয়েই যায় এবং শূন্যও তার ডালপালা ছড়াবার জন্য অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু জায়গা তাকে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু যতদিন এ গাছ বেঁচে থাকে ততদিন তিতা, বিস্বাদ ও বিষাক্ত ফল দিতে থাকে এবং অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথেই আকস্মিক ঘটনাবলীর এক ধাক্কাই তাকে সমূলে উৎপাটিত করে।

পৃথিবীর ধর্মীয়, নৈতিক, চিন্তাগত ও তামাদ্দুনিক ইতিহাস অধ্যয়নকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই কালেমায়ে তাইয়েবা তথা ভালো কথা এবং মন্দ কথার এ পার্থক্য সহজে অনুভব

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَفِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾

ঈমানদারদেরকে আল্লাহ একটি শাশ্বত বাণীর ভিত্তিতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে প্রতিষ্ঠা দান করেন[৩৯] আর জালেমদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন।[৪০] আল্লাহ যা চান তাই করেন।

করতে পারে। সে দেখবে, ইতিহাসের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ভালো কথা একই থেকেছে। কিন্তু মন্দ কথা সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য। ভালো কথাকে কখনো শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলা যায়নি। কিন্তু মন্দ কথার তালিকা হাজারো মৃত কথার নামে ভরে আছে। এমনকি তাদের অনেকের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আজ ইতিহাসের পাতা ছাড়া আর কোথাও তাদের নাম নিশানাও পাওয়া যায় না। স্ব স্ব যুগে যেসব কথার প্রচণ্ড দাপট ছিল আজ সে সব কথা উচ্চারিত হলে মানুষ এই ভেবে অবাক হয়ে যায় যে, একদিন এমন পর্যায়ের নির্বুদ্ধিতাও মানুষ করেছিল।

তারপর ভালো কথাকে যখনই যে জাতি বা ব্যক্তি যেখানেই গ্রহণ করে সঠিক অর্থে প্রয়োগ করেছে সেখানেই তার সমগ্র পরিবেশ তার সুবাসে আমোদিত হয়েছে। তার বরকতে শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি বা জাতিই সমৃদ্ধ হয়নি বরং তার আশপাশের জগতও সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু কোন মন্দ কথা যেখানেই ব্যক্তি বা সমাজ জীবনে শিকড় গেড়েছে সেখানেই তার দুর্গন্ধে সমগ্র পরিবেশ পুতিগন্ধময় হয়ে উঠেছে এবং তার কাঁটার আঘাত থেকে তার মান্যকারীরা নিরাপদ থাকেনি এবং এমন কোন ব্যক্তিও নিরাপদ থাকতে পারেনি যে তার মুখোমুখি হয়েছে।

এ প্রসংগে একথা উল্লেখ্য যে, এখানে উপমার মাধ্যমে ১৮ আয়াতে যে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছিল সেটিই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। ১৮ আয়াতে বলা হয়েছিল, "নিজের রবের সাথে যারা কুফরী করে তাদের দৃষ্টান্ত এমন ছাই-এর মতো যাকে ঝন্‌ঝা বিক্ষুব্ধ দিনের প্রবল বাতাস উড়িয়ে দিয়েছে।" এ একই বিষয়বস্তু ইতিপূর্বে সূরা 'আর রা'দ'-এর ১৭ আয়াতে অন্যভাবে বন্যা ও গলিত ধাতুর উপমার সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩৯. অর্থাৎ এ কালেমার বদৌলতে তারা দুনিয়ায় একটি স্থায়ী দৃষ্টিভংগী, একটি শক্তিশালী ও সুগঠিত চিন্তাধারা এবং একটি ব্যাপকভিত্তিক মতবাদ ও জীবন দর্শন লাভ করে। জীবনের সকল জটিল গ্রন্থীর উন্মোচনে এবং সকল সমস্যার সমাধানে তা এমন এক চাবির কাজ করে যা দিয়ে সকল তালা খোলা যায়। তার সাহায্যে চরিত্র মজবুত এবং নৈতিক বৃত্তিগুলো সুগঠিত হয়। তাকে কালের আবর্তন একটুও নড়াতে পারে না। তার সাহায্যে জীবন যাপনের এমন কতগুলো নিরেট মূলনীতি পাওয়া যায় যা একদিকে তাদের হৃদয়ে প্রশান্তি ও মস্তিষ্কে নিশ্চিন্ততা এনে দেয় এবং অন্যদিকে তাদেরকে প্রচেষ্টা ও কর্মের পথে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াবার দ্বারে দ্বারে ঠোকর খাওয়ার এবং অস্থিরতার শিকার হওয়ার হাত থেকে বাঁচায়। তারপর যখন তারা মৃত্যুর সীমানা পার হয়ে পরলোকের

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ
الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا
لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾
قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴿٣١﴾

৫ রুকূ'

তুমি দেখেছো তাদেরকে, যারা আল্লাহর নিয়ামত লাভ করলো এবং তাকে কৃতঘ্নতায় পরিণত করলো আর (নিজেদের সাথে) নিজেদের সম্প্রদায়কেও ধ্বংসের আবর্তে ঠেলে দিল—অর্থাৎ জাহান্নাম, যার মধ্যে তাদেরকে ঝলসানো হবে এবং তা নিকৃষ্টতম আবাস—এবং আল্লাহর কিছু সমকক্ষ বানিয়ে নিল, যাতে তারা তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করে দেয়। এদেরকে বলো, ঠিক আছে, মজা ভোগ করে নাও, শেষ পর্যন্ত তোমাদের তো ফিরে যেতে হবে দোজখের মধ্যেই।

হে নবী! আমার যে বান্দারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলে দাও, তারা যেন নামায কায়েম করে এবং যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে (সৎপথে) ব্যয় করে[৪১] —সেই দিন আসার আগে যেদিন না বেচা-কেনা হবে আর না হতে পারবে বন্ধু বাৎসল্য।[৪২]

সীমান্তে পা রাখে তখন সেখানে তারা বিস্ময়াভিভূত, হতবাক ও পেরেশান হয় না। কারণ সেখানে তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী সবকিছু হতে থাকে। সে জগতে তারা এমনভাবে প্রবেশ করতে থাকে যেন সেখানকার আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি সম্পর্কে তারা পূর্বাহ্নেই অবহিত ছিল। সেখানে এমন কোন পর্যায় উপস্থাপিত হয় না যে সম্পর্কে তাদের পূর্বাহ্নে খবর দেয়া হয়নি এবং যে জন্য তারা পূর্বেই প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন করে রাখেনি। তাই সেখানে প্রত্যেক মনযিলই তারা দৃঢ়পদে অতিক্রম করে যায়। পক্ষান্তরে কাফের ব্যক্তি মৃত্যুর পরপরই নিজের প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিপরীত অকস্মাত এক ভিন্ন অবস্থার মুখোমুখি হয়। তার অবস্থা মুমিন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়।

৪০. অর্থাৎ যেসব জালেম কালেমায়ে তাইয়েবা বাদ দিয়ে কোন মন্দ কালেমার অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও মন-মানসকে দিশেহারা করে দেন এবং তাদের প্রচেষ্টাবলীর মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেন। তারা কোন দিক দিয়েও চিন্তা ও কর্মের সঠিক পথে পাড়ি জমাতে পারে না। তাদের কোন তীরও সঠিক লক্ষ্যস্থলে লাগে না।

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً
فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِیَ
فِی الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ دَآئِبَیْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾ وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ
مَا سَاَلْتُمُوْهُ ۚ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۚ اِنَّ الْاِنْسَانَ
لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

আল্লাহ তো তিনিই,[৪৩] যিনি এ পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর তার মাধ্যমে তোমাদের জীবিকা দান করার জন্য নানা প্রকার ফল উৎপন্ন করেছেন। যিনি নৌযানকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর হুকুমে তা সাগরে বিচরণ করে এবং নদী সমূহকে তোমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন। যিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, তারা অবিরাম চলছে এবং রাত ও দিনকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন।[৪৪] যিনি এমন সবকিছু তোমাদের দিয়েছেন যা তোমরা চেয়েছো[৪৫] যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গণনা করতে চাও তাহলে তাতে সক্ষম হবে না। আসলে মানুষ বড়ই বে-ইনসাফ ও অকৃতজ্ঞ।

৪১. এর মানে হচ্ছে, মুমিনদের মনোভাব ও কর্মনীতি কাফেরদের মনোভাব ও কর্মনীতি থেকে আলাদা হওয়া উচিত। ওরা তো নিয়ামত অস্বীকারকারী। অন্যদিকে এদের হতে হবে কৃতজ্ঞ। আর এ কৃতজ্ঞতার বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য এদের নামায কায়েম এবং আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করতে হবে।

৪২. অর্থাৎ সেখানে কোন কিছুর বিনিময়ে নাজাত কিনে নেয়া যাবে না এবং আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাবার জন্য কারো বন্ধুত্ব কাজে লাগবে না।

৪৩. অর্থাৎ সেই আল্লাহ, যাঁর নিয়ামত অস্বীকার করা হচ্ছে, যাঁর বন্দেগী ও আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে, যাঁর সাথে জোর করে অংশীদার বানিয়ে দেয়া হচ্ছে। তিনিই তো সেই আল্লাহ, এসব এবং ওসব যাঁর দান, যাঁর দানের কোন সীমা-পরিসীমা নেই।

৪৪. "তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন"কে সাধারণত লোকেরা ভুল করে "তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন"-এর অর্থে গ্রহণ করে থাকেন। তারপর এ বিষয়বস্তু

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ
نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ﴿٣٥﴾ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ
تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٦﴾ رَبَّنَا اِنِّيْٓ
اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ
رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ
وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٧﴾

৬ রুকূ'

স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন ইবরাহীম দোয়া করেছিল,[৪৬] "হে আমার রব! এ শহরকে[৪৭] নিরাপত্তার শহরে পরিণত করো এবং আমার ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচাও। হে আমার রব! এ মূর্তিগুলো অনেককে ভ্রষ্টতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে,[৪৮] (হয়তো আমার সন্তানদেরকেও এরা পথভ্রষ্ট করতে পারে, তাই তাদের মধ্য থেকে) যে আমার পথে চলবে সে আমার অন্তরগত আর যে আমার বিপরীত পথ অবলম্বন করবে, সে ক্ষেত্রে অবশ্যি তুমি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।[৪৯] হে আমাদের রব! আমি একটি তৃণ পানিহীন উপত্যকায় নিজের বংশধরদের একটি অংশকে তোমার পবিত্র গৃহের কাছে এনে বসবাস করিয়েছি। পরওয়ারদিগার! এটা আমি এ জন্য করেছি যে, এরা এখানে নামায কায়েম করবে। কাজেই তুমি লোকদের মনকে এদের প্রতি আকৃষ্ট করো এবং ফলাদি দিয়ে এদের আহারের ব্যবস্থা করো,[৫০] হয়তো এরা শোকরগুজার হবে।

সম্বলিত আয়াত থেকে বিভিন্ন অদ্ভুত ধরনের অর্থ বের করে থাকেন। এমন কি কোন কোন লোক এ থেকে এ ধারণা করে নিয়েছেন যে, পৃথিবী ও আকাশ জয় করা হচ্ছে মানুষের জীবনের মূল লক্ষ। অথচ মানুষের জন্য এসবকে অনুগত করে দেয়ার অর্থ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, মহান আল্লাহ এদেরকে এমন সব আইনের অধীন করে রেখেছেন যেগুলোর বদৌলতে তারা মানুষের জন্য উপকারী হয়েছে। নৌযান যদি প্রকৃতির কতিপয় আইনের অনুসারী না হতো, তাহলে মানুষ কখনো সামুদ্রিক সফর করতে পারতো না। নদ-নদীগুলো যদি কতিপয় বিশেষ আইনের জালে আবদ্ধ না থাকতো, তাহলে কখনো তা থেকে খাল কাটা যেতো না। সূর্য, চন্দ্র এবং দিন ও রাত যদি বিশেষ নিয়ম কানুনের অধীনে শক্ত করে বাঁধা না থাকতো তাহলে এ বিকাশমান মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির উদ্ভব তো দূরের কথা, এখানে জীবনের স্ফূরণই সম্ভবপর হতো না।

৪৫. অর্থাৎ তোমাদের প্রকৃতির সর্ববিধ চাহিদা পূরণ করেছেন। তোমাদের জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই সরবরাহ করেছেন। তোমাদের বেঁচে থাকা ও বিকাশ লাভ করার জন্য যেসব উপাদান ও উপকরণের প্রয়োজন ছিল তা সবই যোগাড় করে দিয়েছেন।

৪৬. সাধারণ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করার পর এবার আল্লাহ কুরাইশদের প্রতি যেসব বিশেষ অনুগ্রহ করেছিলেন সেগুলার কথা বলা হচ্ছে। এ সংগে একথাও বলা হচ্ছে যে, তোমাদের প্রপিতা ইবরাহীম (আ) কোন্ ধরনের প্রত্যাশা নিয়ে তোমাদের এখানে আবাদ করেছিলেন, তাঁর দেয়ার জবাবে আমি তোমাদের প্রতি কোন্ ধরনের অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলাম এবং এখন তোমরা নিজেদের প্রপিতার প্রত্যাশা ও নিজেদের রবের অনুগ্রহের জবাবে কোন্ ধরনের ভ্রষ্টতা ও দুষ্কর্মের অবতারণা করে যাচ্ছো।

৪৭. অর্থাৎ মক্কাকে।

৪৮. অর্থাৎ আল্লাহর দিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে নিজের ভক্তে পরিণত করেছে। এ বাক্যটিকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। মূর্তি যেহেতু অনেকের পথভ্রষ্টতার কারণ হয়েছে তাই পথভ্রষ্ট করার কাজকে তার কৃতকর্ম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৯. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কোন অবস্থাতেও মানুষকে আল্লাহর আযাবের শিকার দেখতে চান না। বরং শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করার আবেদন জানাতে থাকেন। এটি তাঁর আন্তরিক কোমলতা এবং মানুষের অবস্থার প্রতি চরম স্নেহ–মমতার ফল। জীবিকার ব্যাপারে তো তিনি এতটুকু বলে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি যে–

وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ –

"এর অধিবাসীদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস করে তাদেরকে ফলমূল থেকে জীবিকা প্রদান করো।" –আল বাকারাহ ঃ ১২৬

কিন্তু যেখানে আখেরাতে পাকড়াও করার প্রশ্ন আসে সেখানে তাঁর কণ্ঠ থেকে একথা ধ্বনিত হয় না যে, আমার পথ ছেড়ে যে অন্য পথে চলে তাকে শাস্তি দিয়ে দিয়ো। বরং তিনি উল্টো একথা বলেন যে, তাদের ব্যাপারে আর কীইবা আবেদন জানাবো, তুমি তো পরম করুণাময় ও ক্ষমাশীল। আর এ আপাদমস্তক স্নেহ ও মমতার পুতলী মানুষটির এ মনোভাব শুধুমাত্র তাঁর নিজের সন্তান ও বংশধরদের ব্যাপারেই নয় বরং যখন ফেরেশতারা লূতের সম্প্রদায়ের মতো দুষ্কৃতকারী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করতে যাচ্ছিল তখনো মহান আল্লাহ বড়ই প্রীতিপূর্ণ কণ্ঠে বলেন, "ইবরাহীম আমার সাথে ঝগড়া করতে লাগলো" (হূদ ঃ ৭৪) হযরত ঈসা আলাইহিস সালামেরও এ একই অবস্থা। আল্লাহ যখন তাঁর সামনেই খৃষ্টবাদীদের ভ্রষ্টতা প্রমাণ করে দেন তখন তিনি আবেদন জানান ঃ "যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন তাহলে তারা তো আসলে আপনার বান্দা আর যদি ক্ষমা করেন তাহলে আপনি প্রবল প্রতাপান্বিত ও জ্ঞানী।" (আল মায়েদাহ ঃ ১১৮)

৫০. এ দোয়ারই বরকতে প্রথমে সমস্ত আরবের লোকেরা হজ্জ ও উমরাহ করার জন্য মক্কায় ছুটে আসতো আবার এখন সারা দুনিয়ার লোক সেখানে দৌড়ে যাচ্ছে। তারপর এ

رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ۭ وَمَا يَخْفٰى عَلَي اللّٰهِ مِنْ
شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاۗءِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ
عَلَي الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ۭ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاۗءِ ۝ رَبِّ
اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ڰ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاۗءِ ۝ رَبَّنَا
اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ۝

হে পরওয়ারদিগার! তুমি জানো যা কিছু আমরা লুকাই এবং যা কিছু প্রকাশ করি।"[৫১] —আর[৫২] যথার্থই আল্লাহর কাছে কিছুই গোপন নেই, না পৃথিবীতে না আকাশে—"শোকর সেই আল্লাহর, যিনি এ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাকের মতো পুত্র দিয়েছেন। আসলে আমার রব নিশ্চয়ই দোয়া শোনেন। হে আমার রব! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী করো এবং আমার বংশধরদের থেকেও (এমন লোকদের উঠাও যারা এ কাজ করবে)। পরওয়ারদিগার! আমার দোয়া কবুল করো। হে পরওয়ারদিগার! যেদিন হিসেব কায়েম হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সমস্ত মুমিনদেরকে মাফ করে দিয়ো।"[৫৩]

দোয়ার বরকতেই সব যুগে সব ধরনের ফল, ফসল ও অন্যান্য জীবন ধারণ সামগ্রী সেখানে পৌঁছে থাকে। অথচ এ তৃণপানি হীন অনুর্বর এলাকায় পশুখাদ্যও উৎপন্ন হয় না।

৫১. অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি মুখে যা কিছু বলছি তা তুমি শুনছো এবং যেসব আবেগ-অনুভূতি আমার হৃদয় অভ্যন্তরে লুকিয়ে আছে তাও তুমি জানো।

৫২. এটি একটি প্রাসঙ্গিক বাক্য। হযরত ইবরাহীমের (আ) কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ একথা বলেন।

৫৩. হযরত ইবরাহীম (আ) স্বদেশ ভূমি থেকে বের হবার সময় ساستغفرلك ربى (অর্থাৎ "আমি তোমার জন্য আমার রবের কাছে দোয়া করবো।"-তাওবা : ১১৪) বলে নিজের বাপের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তারি ভিত্তিতে তিনি মাগফেরাতের দোয়ার মধ্যে নিজের বাপকেও অন্তরভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু পরে যখন তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর বাপ তো আল্লাহর দুশমন ছিল তখন আবার সুস্পষ্টভাবে এ থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছিলেন।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۬ؕ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ
تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ
طَرْفُهُمْ ۚ وَاَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿٤٣﴾ وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ
فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَاۤ اَخِّرْنَاۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ
وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ؕ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْۤا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ
زَوَالٍ ﴿٤٤﴾ وَّسَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ
كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ ﴿٤٥﴾ وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَ
عِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ؕ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٦﴾

৭ রুকূ'

এখন এ জালেমরা যা কিছু করছে আল্লাহকে তোমরা তা থেকে গাফেল মনে করো না। আল্লাহ তো তাদেরকে সময় দিচ্ছেন সেই দিন পর্যন্ত যখন তাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে যাবে, তারা মাথা তুলে পালাতে থাকবে, দৃষ্টি ওপরের দিকে স্থির হয়ে থাকবে[৫৪] এবং মন উড়তে থাকবে। হে মুহাম্মাদ! সেই দিন সম্পর্কে এদেরকে সতর্ক করো, যে দিন আযাব এসে এদেরকে ধরবে। সে সময় এ জালেমরা বলবে, "হে আমাদের রব! আমাদের একটুখানি অবকাশ দাও, আমরা তোমার ডাকে সাড়া দেবো এবং রসূলদের অনুসরণ করবো।" (কিন্তু তাদেরকে পরিষ্কার জবাব দেয়া হবে ঃ "তোমরা কি তারা নও যারা ইতিপূর্বে কসম খেয়ে খেয়ে বলতো, আমাদের কখনো পতন হবে না?" অথচ তোমরা সেই সব জাতির আবাস ভূমিতে বসবাস করেছিলে যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল এবং আমি তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছি তা দেখেও ছিলে আর তাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে দিয়ে আমি তোমাদের বুঝিয়েও ছিলাম। তারা তাদের সব রকমের চক্রান্ত করে দেখেছে কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি চক্রান্তের জবাব আল্লাহর কাছে ছিল, যদিও তাদের চক্রান্তগুলো এমন পর্যায়ের ছিল যাতে পাহাড় টলে যেতো।[৫৫]

৫৪. অর্থাৎ কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য তাদের সামনে হবে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তারা তা দেখতে থাকবে যেন তাদের চোখের মনি স্থির হয়ে গেছে, পলক পড়ছে না। ঠায় এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকবে।

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤٧﴾
يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ
الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ﴿٤٩﴾
سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِيَ اللّٰهُ
كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾ هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ
وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا
الْاَلْبَابِ ﴿٥٢﴾

কাজেই হে নবী! কখখনো এ ধারণা করো না যে, আল্লাহ তাঁর নবীদের প্রতি প্রদত্ত ওয়াদার বিরুদ্ধাচরণ করবেন।[৫৬] আল্লাহ প্রতাপান্বিত ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তাদেরকে সেই দিনের ভয় দেখাও যেদিন পৃথিবী ও আকাশকে পরিবর্তিত করে অন্য রকম করে দেয়া হবে[৫৭] এবং সবাই এক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে উন্মুক্ত হয়ে হাযির হবে। সেদিন তোমরা অপরাধীদের দেখবে, শিকলে তাদের হাত পা বাঁধা, আলকাতরার[৫৮] পোশাক পরে থাকবে এবং আগুনের শিখা তাদের চেহারা ঢেকে ফেলতে থাকবে। এটা এ জন্য হবে যে, আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বদলা দেবেন। হিসেব নিতে আল্লাহর একটুও দেরী হয় না।

এটি একটি পয়গাম সব মানুষের জন্য এবং এটি পাঠানো হয়েছে এ জন্য যাতে এর মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করা যায় এবং তারা জেনে নেয় যে, আসলে আল্লাহ মাত্র একজনই আর যারা বুদ্ধি-বিবেচনা রাখে তারা সচেতন হয়ে যায়।

৫৫. অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধাচরণের পরিণাম থেকে নিষ্কৃতি লাভের এবং নবীগণের দাওয়াতকে ব্যর্থ করার জন্য কেমন সব শক্তিশালী কৌশল অবলম্বন করেছিল তোমরা তাও দেখেছো। আবার আল্লাহর একটি মাত্র কৌশলের কাছে তারা কিভাবে পরাজয় বরণ করে নিয়েছিল। তাও দেখেছো। কিন্তু তবুও তোমরা হকের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা থেকে বিরত থাকছো না এবং তোমরা মনে করে আসছো তোমাদের চক্রান্ত নিশ্চয়ই সফল হবে।

৫৬. এ বাক্যে আপাতদৃষ্টে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ করে কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আসলে উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর বিরোধীদেরকে শুনানো। তাদেরকে বলা হচ্ছে, আল্লাহ পূর্বেই তাঁর রসূলদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা পূর্ণ করেছেন এবং তাদের বিরোধীদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন। আর এখনও নিজের রসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তিনি যে ওয়াদা করছেন তা পূর্ণ করবেন এবং যারা এর বিরোধিতা করছে তাদেরকে বিধ্বস্ত করে দেবেন।

৫৭. এ আয়াত এবং কুরআনের অন্যান্য বিভিন্ন ইশারা থেকে জানা যায়, কিয়ামতের সময় পৃথিবী ও আকাশ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে না। বরং শুধুমাত্র বর্তমান প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ওলট পালট করে দেয়া হবে। এরপর প্রথম শিংগা ধ্বনি ও শেষ শিংগাধ্বনির মাঝখানে একটি বিশেষ সময়কালের মধ্যে—যা একমাত্র আল্লাহই জানেন—পৃথিবী ও আকাশের বর্তমান কাঠামো বদলে দেয়া হবে এবং ভিন্ন একটি প্রাকৃতিক অবকাঠামো ভিন্ন একটি প্রাকৃতিক আইনসহ তৈরী করা হবে। সেটিই হবে পরলোক। তারপর শেষ শিংগাধ্বনির সাথে সাথেই আদমের সৃষ্টির পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ জন্ম নিয়েছিল তাদের সবাইকে পুনর্বার জীবিত করা হবে এবং তারা আল্লাহর সামনে উপস্থাপিত হবে। কুরআনের ভাষায় এরি নাম হাশর। এর শাব্দিক অর্থ এক জায়গায় জমা ও একত্র করা। কুরআনের ইশারা ইংগিত ও হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে প্রমাণ হয় যে, পৃথিবীর এ সরযমীনেই হাশর অনুষ্ঠিত হবে, এখানেই আদালত কায়েম হবে, এখানেই মীযান তথা তুলাদণ্ড বসানো হবে এবং পৃথিবীর বিষয়াবলী পৃথিবীর মাটিতেই চুকিয়ে দেয়া হবে। তাছাড়া কুরআন ও হাদীস থেকে একথাও প্রমাণ হয় যে, আমাদের সেই দ্বিতীয় জীবনটি—যেখানে এসব ব্যাপার সংঘটিত হবে–নিছক আত্মিক জীবন হবে না। বরং আজ আমরা যেভাবে দেহ ও আত্মা সহকারে জীবিত আছি সেখানেও আমাদের তেমনিভাবে জীবিত করা হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যে ব্যক্তিসত্তা সহকারে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিল সেখানে ঠিক সেই একই ব্যক্তিসত্তা সহকারে উপস্থিত হবে।

৫৮. কোন কোন অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা قطران শব্দের অর্থ করেছেন গন্ধক আবার কেউ কেউ করেছেন গলিত তামা। কিন্তু আসলে আরবী ভাষায় "কাতেরান" শব্দটি আলকাতরা, গালা ইত্যাদির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

আল হিজ্‌র

১৫

নামকরণ

৮০ আয়াত وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ এর আল হিজ্‌র শব্দটি থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, এ সূরাটি সূরা ইবরাহীমের সমসময়ে নাযিল হয়। এর পটভূমিতে দু'টি জিনিস পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এক, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের একটি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। যে জাতিকে তিনি দাওয়াত দিচ্ছেন তাদের অবিরাম হঠকারিতা, বিদ্রূপ, বিরোধিতা, সংঘাত ও জুলুম-নিপীড়ন সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এরপর বুঝাবার সুযোগ কমে এসেছে এবং তার পরিবর্তে সতর্ক করা ও ভয় দেখাবার পরিবেশই বেশী সৃষ্টি হয়েছে। দুই, নিজের জাতির কুফরী, স্থবিরতা ও বিরোধিতার পাহাড় ভাংতে ভাংতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। মানসিক দিক দিয়ে তিনি বারবার হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। তা দেখে আল্লাহ তাঁকে সান্তনা দিচ্ছেন এবং তাঁর মনে সাহস যোগাচ্ছেন।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়

এই দু'টি বিষয়বস্তুই এ সূরায় আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত যারা অস্বীকার করছিল, যারা তাঁকে বিদ্রূপ করছিল এবং তাঁর কাজে নানা প্রকার বাধার সৃষ্টি করে চলছিল, তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। আর খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্তনা ও সাহস যোগানো হয়েছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, বুঝাবার ও উপদেশ দেবার ভাবধারা নেই। কুরআনে আল্লাহ শুধুমাত্র সতর্কবাণী উচ্চারণ বা নির্ভেজাল ভীতিপ্রদর্শনের পথ অবলম্বন করেননি; কঠোরতম হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন এবং তিরস্কার ও নিন্দাবাদের মধ্যেও তিনি বুঝাবার ও নসীহত করার ক্ষেত্রে কোন কমতি রাখেননি। এ জন্যই এ সূরায়ও একদিকে তাওহীদের যুক্তি-প্রমাণের প্রতি সংক্ষেপে ইংগিত করা হয়েছে এবং অন্যদিকে আদম ও ইবলীসের কাহিনী শুনিয়ে উপদেশ দানের কার্যও সমাধা করা হয়েছে।

আয়াত ৯৯ **সূরা আল হিজর – মক্কী** রুকূ ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝١
رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ۝٢ ذَرْهُمْ
يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝٣ وَمَآ اَهْلَكْنَا
مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ۝٤ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا
وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ۝٥

আলিফ–লাম–র। এগুলো আল্লাহর কিতাব ও সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত।[১]

এমন এক সময় আসা বিচিত্র নয় যখন আজ যারা (ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করতে) অস্বীকার করছে, তারা অনুশোচনা করে বলবে ঃ হায়, যদি আমরা আনুগত্যের শির নত করে দিতাম! ছেড়ে দাও এদেরকে, খানাপিনা করুক, আমোদ ফূর্তি করুক এবং মিথ্যা প্রত্যাশা এদেরকে ভুলিয়ে রাখুক। শিগ্‌গির এরা জানতে পারবে। ইতিপূর্বে আমি যে জনবসতিই ধ্বংস করেছি তার জন্য একটি বিশেষ কর্ম–অবকাশ লেখা হয়ে গিয়েছিল।[২] *কোন জাতি তার নিজের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে যেমন ধ্বংস হতে পারে না, তেমনি সময় এসে যাওয়ার পরে অব্যাহতিও পেতে পারে না।*

১. এটি এ সূরার সংক্ষিপ্ত পরিচিতিমূলক ভূমিকা। এরপর সাথে সাথেই আসল বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভাষণ শুরু হয়ে গেছে।

"সুস্পষ্ট" শব্দটি কুরআনের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, এগুলো এমন এক কুরআনের আয়াত যে নিজের বক্তব্য পরিষ্কারভাবে বলে দেয়।

২. এর মানে হচ্ছে, কুফরী করার সাথে সাথেই আমি কখনো কোন জাতিকে পাকড়াও করিনি। তাহলে এই নির্বোধরা কেন এ ভুল ধারণা করছে যে, নবীকে তারা

وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ۝٦ لَوْمَا
تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٧ مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ
اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْٓا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ۝٨ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ
لَحٰفِظُوْنَ ۝٩

এরা বলে, "ওহে যার প্রতি বাণী[৩] অবতীর্ণ হয়েছে,[৪] তুমি নিশ্চয়ই উন্মাদ! যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আমাদের সামনে ফেরেশতাদেরকে আনছো না কেন?" —আমি ফেরেশতাদেরকে এমনিই অবতীর্ণ করি না, তারা যখনই অবতীর্ণ হয় সত্য সহকারে অবতীর্ণ হয়, তারপর লোকদেরকে আর অবকাশ দেয়া হয়না।[৫] আর এই বাণী, একে তো আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।[৬]

যেভাবে মিথ্যা বলছে এবং ঠাট্টা–বিদ্রূপ করছে, তাতে যেহেতু এখনো তাদেরকে কোন শাস্তি দেয়া হয়নি, তাই এ নবী আসলে কোন নবীই নয়? আমার নিয়ম হচ্ছে, প্রত্যেক জাতিকে শুনবার, বুঝবার ও নিজেকে শুধরে নেবার জন্য কি পরিমাণ অবকাশ দেয়া হবে এবং তার যাবতীয় দুষ্কৃতি ও অনাচার সত্ত্বেও পূর্ণ ধৈর্য সহকারে তাকে নিজের ইচ্ছামত কাজ করার কতটুকু সুযোগ দেয়া হবে তা আমি পূর্বাহ্নেই স্থির করে নিই। যতক্ষণ এ অবকাশ থাকে এবং আমার নির্ধারিত শেষ সীমা না আসে ততক্ষণ আমি ঢিল দিতে থাকি। (কর্মের অবকাশ দেবার ব্যাপারটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সূরা ইবরাহীমের ১৮ টীকা দেখুন।)

৩. "যিকির" বা বাণী শব্দটি পারিভাষিক অর্থে কুরআন মজীদে আল্লাহর বাণীর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আর এ বাণী হচ্ছে আগাগোড়া উপদেশমালায় পরিপূর্ণ। পূর্ববর্তী নবীদের ওপর যতগুলো কিতাব নাযিল হয়েছিল সেগুলো সবই "যিকির" ছিল এবং এ কুরআন মজীদও যিকির। যিকিরের আসল মানে হচ্ছে স্মরণ করিয়ে দেয়া, সতর্ক করা এবং উপদেশ দেয়া।

৪. তারা ব্যংগ ও উপহাস করে একথা বলতো। এ বাণী যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল হয়েছে একথা তারা স্বীকারই করতো না। আর একথা স্বীকার করে নেয়ার পর তারা তাঁকে পাগল বলতে পারতো না। আসলে তাদের একথা বলার অর্থ ছিল এই যে, "ওহে, এমন ব্যক্তি! যার দাবী হচ্ছে, আমার ওপর যিকির তথা আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়েছে।'' এটা ঠিক তেমনি ধরনের কথা যেমন ফেরাউন হযরত মূসার (আ) দাওয়াত শুনার পর তার সভাসদদের বলেছিল ঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ
رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١١﴾ كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ
الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَلَوْ
فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا
سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴿١٥﴾

হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বে আমি অতীতের অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে রসূল পাঠিয়েছিলাম। তাদের কাছে কোন রসূল এসেছে এবং তারা তাকে বিদ্রূপ করেনি, এমনটি কখনো হয়নি। এ বাণীকে অপরাধীদের অন্তরে আমি এভাবেই (লৌহ শলাকার মত) প্রবেশ করাই। তারা এর প্রতি ঈমান আনে না।[৭] এ ধরনের লোকদের এ রীতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। যদি আমি তাদের সামনে আকাশের কোন দরজা খুলে দিতাম এবং তারা দিন দুপুরে তাতে আরোহণও করতে থাকতো তবুও তারা একথাই বলতো, আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম হচ্ছে বরং আমাদের ওপর যাদু করা হয়েছে।

إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ

"এই যে পয়গম্বর সাহেবকে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছে, এর মাথা ঠিক নেই।"

৫. অর্থাৎ নিছক তামাশা দেখাবার জন্য ফেরেশতাদেরকে অবতরণ করানো হয় না। কোন জাতি দাবী করলো, ডাকো ফেরেশতাদেরকে আর অমনি ফেরেশতারা হাযির হয়ে গেলেন, এমনটি হয় না। কারণ ফেরেশতারা এ জন্য আসেন না যে, তারা লোকদের সামনে সত্যকে উন্মুক্ত করে দেবেন এবং গায়েবের পর্দা চিরে এমন সব জিনিস দেখিয়ে দেবেন যার প্রতি ঈমান আনার জন্য নবীগণ দাওয়াত দিয়েছেন। যখন কোন জাতির শেষ সময় উপস্থিত হয় এবং তার ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালা করার সংকল্প করে নেয়া হয় তখনই ফেরেশতাদেরকে পাঠানো হয়। তখন কেবলমাত্র ফায়সালা অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করে ফেলা হয়। তখন আর একথা বলা হয় না যে, এখন ঈমান আনলে ছেড়ে দেয়া হবে। যতক্ষণ সত্য আবরণ মুক্ত না হয়ে যায়, কেবল ততক্ষণ পর্যন্তই ঈমান আনার অবকাশ থাকে। তার আবরণ মুক্ত হয়ে যাওয়ার পর আর ঈমান আনার কি অর্থ থাকে?

"সত্য সহকারে অবতীর্ণ হওয়ার" মানে হচ্ছে সত্য নিয়ে অবতীর্ণ হওয়া। অর্থাৎ তারা মিথ্যাকে মিটিয়ে দিয়ে তার জায়গায় সত্যকে কায়েম করার জন্যই আসেন। অথবা অন্য

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾ وَحَفِظْنَاهَا
مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿١٧﴾ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ
مُبِينٌ ﴿١٨﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ
لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾

২ রুকূ'

আকাশে আমি অনেক মজবুত দূর্গ নির্মাণ করেছি,[৮] দর্শকদের জন্য সেগুলো সুসজ্জিত করেছি,[৯] এবং প্রত্যেক অতিশপ্ত শয়তান থেকে সেগুলোকে সংরক্ষণ করেছি।[১০] কোন শয়তান সেখানে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, তবে আড়ি পেতে বা চুরি করে কিছু শুনতে পারে।[১১] আর যখন সে চুরি করে শোনার চেষ্টা করে তখন একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা তাকে ধাওয়া করে।[১২]

পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি, তার মধ্যে পাহাড় স্থাপন করেছি, সকল প্রজাতির উদ্ভিদ তার মধ্যে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করেছি[১৩] এবং তার মধ্যে জীবিকার উপকরণাদি সরবরাহ করেছি তোমাদের জন্যও এবং এমন বহু সৃষ্টির জন্যও যাদের আহারদাতা তোমরা নও।

কথায় বুঝে নিন, তারা আল্লাহর ফায়সালা নিয়ে আসেন এবং তা প্রতিষ্ঠিত করেই ক্ষান্ত হন।

৬. অর্থাৎ এই বাণী, যার বাহককে তোমরা পাগল বলছো, আমিই তা অবতীর্ণ করেছি, তিনি নিজে তা তৈরী করেননি। তাই এ গালি তাকে দেয়া হয়নি বরং আমাকে দেয়া হয়েছে। আর তোমরা যে এ বাণীর কিছু ক্ষতি করতে পারবে তা ভেব না। এটি সরাসরি আমার হেফাজতে রয়েছে। তোমাদের চেষ্টায় একে বিলুপ্ত করা যাবে না। তোমরা একে ধামাচাপা দিতে চাইলেও দিতে পারবে না। তোমাদের আপত্তি ও নিন্দাবাদের ফলে এর মর্যাদাও কমে যাবে না। তোমরা ঠেকাতে চাইলেও এর দাওয়াতকে ঠেকাতে পারবে না। একে বিকৃত বা এর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করার সুযোগও তোমরা কেউ কোনদিন পাবে না।

৭. সাধারণত অনুবাদক ও তাফসীরকারগণ نَسْلُكُهُ (আমি তাকে প্রবেশ করাই বা চালাই) এর মধ্যকার সর্বনামটিকে استهزاء (বিদ্রূপ) এর সাথে এবং لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ

(তারা এর প্রতি ঈমান আনে না) এর মধ্যকার সর্বনামটিকে ذكر এর সাথে সংযুক্ত করেছেন। তারা এর অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ "আমি এভাবে এ বিদ্রূপকে অপরাধীদের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেই এবং তারা এ বাণীর প্রতি ঈমান আনে না।" যদিও ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী এতে কোন ত্রুটি নেই, তবুও ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী উভয় সর্বনামই "যিকির" বা বাণীর সাথে সংযুক্ত হওয়াই আমার কাছে বেশী নির্ভুল বলে মনে হয়।

আরবী ভাষায় سَلَكَ শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন জিনিসকে অন্য জিনিসের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া, অনুপ্রবেশ করানো, চালিয়ে দেয়া বা গলিয়ে দেয়া। যেমন সুঁইয়ের ছিদ্রে সূতো গলিয়ে দেয়া হয়। কাজেই এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, ঈমানদারদের মধ্যে তো এই "বাণী" হৃদয়ের শীতলতা ও আত্মার খাদ্য হয়ে প্রবেশ করে। কিন্তু অপরাধীদের অন্তরে তা বারুদের মত আঘাত করে এবং তা শুনে তাদের মনে এমন আগুন জ্বলে ওঠে যেন মনে হয় একটি গরম শলাকা তাদের বুকে বিদ্ধ হয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে।

৮. আরবী ভাষায় দূর্গ, প্রাসাদ ও মজবুত ইমারতকে বুরুজ বলা হয়। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যায় সূর্যের পরিভ্রমণ পথকে যে বারটি স্তরে বা রাশিচক্রে বিভক্ত করা হয়েছিল 'বুরুজ' শব্দটিকে পারিভাষিক অর্থে সেই বারটি স্তরের জন্য ব্যবহার করা হতো। এ কারণে কুরআন ঐ বুরুজগুলোর দিকে ইংগিত করেছে বলে কোন কোন মুফাস্‌সির মনে করেছেন। আবার কোন কোন মুফাস্‌সির এটিকে গ্রহ অর্থে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী বক্তব্য সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে মনে হবে, এর অর্থ সম্ভবত উর্ধ জগতের এমন সব অংশ যার মধ্যকার প্রত্যেকটি অংশকে অত্যন্ত শক্তিশালী সীমান্ত অন্যান্য অংশ থেকে আলাদা করে রেখেছে। যদিও এ সীমান্তরেখা মহাশূন্যে অদৃশ্যভাবে অংকিত হয়ে আছে তবুও সেগুলো অতিক্রম করে কোন জিনিসের এক অংশ থেকে অন্য অংশে যাওয়া খুবই কঠিন। এ অর্থের প্রেক্ষিতে আমি বুরুজ শব্দটিকে সংরক্ষিত অঞ্চলসমূহ (Fortified spheres) অর্থে গ্রহণ করা অধিকতর নির্ভুল বলে মনে করি।

৯. অর্থাৎ প্রত্যেক অঞ্চলে কোন না কোন উজ্জ্বল গ্রহ বা তারকা রেখে দিয়েছেন এবং এভাবে সমগ্র জগত ঝলমলিয়ে উঠেছে। অন্য কথায়, আমি দৃশ্যত কুলকিনারাহীন এ বিশ্ব জগতকে একটি বিশাল পরিত্যক্ত ভূতুড়ে বাড়ি বানিয়ে রেখে দেইনি। বরং তাকে এমন একটি সুন্দর সুসজ্জিত জগত বানিয়ে রেখেছি যার মধ্যে সর্বত্র সব দিকে নয়নাভিরাম দীপ্তি ছড়িয়ে রয়েছে। এ শিল্পকর্মে শুধুমাত্র একজন মহান কারিগরের অতুলনীয় শিল্প নৈপুণ্য এবং একজন মহাবিজ্ঞানীর অনুপম বৈজ্ঞানিক কুশলতাই দৃষ্টিগোচর হয় না বরং এই সংগে একজন অতীব পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রুচির অধিকারী শিল্পীর শিল্পও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ বিষয়বস্তুটিই অন্য এক স্থানে এভাবে বলা হয়েছে ঃ اَلَّذِىْ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ (আল্লাহ, যে জিনিসই বানিয়েছেন, চমৎকার বানিয়েছেন।) আস–সাজদাহ ঃ ৭।

১০. অর্থাৎ পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টি যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বন্দী হয়ে রয়েছে, ঠিক তেমনি জিন বংশোদ্ভূত শয়তানরাও এ অঞ্চলে বন্দী হয়ে রয়েছে। উর্ধ জগতে পৌঁছুবার ক্ষমতা তাদের নেই। এর মাধ্যমে মূলত লোকদের একটি বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করাই উদ্দেশ্য। সাধারণ মানুষ এ বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিল এবং আজো আছে। তারা মনে করে,

শয়তান ও তার সাংগপাংগদের জন্য সারা বিশ্ব জাহানের দরজা খোলা আছে, যত দূর ইচ্ছা তারা যেতে পারে। কুরআন এর জবাবে বলছে, শয়তানরা একটি বিশেষ সীমানা পর্যন্তই যেতে পারে, তার ওপরে আর যেতে পারে না। তাদেরকে কখনোই সীমাহীন উড্ডয়নের ক্ষমতা দেয়া হয়নি।

১১. অর্থাৎ যেসব শয়তান তাদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোশকদেরকে গায়েবের খবর এনে দেবার চেষ্টা করে থাকে, যাদের সাহায্যে অনেক জ্যোতিষী, গণক ও ফকির-বেশী বহুরূপী অদৃশ্য জ্ঞানের ভড়ং দেখিয়ে থাকে, গায়েবের খবর জানার কোন একটি উপায়-উপকরণও আসলে তাদের আয়ত্বে নেই। তারা চুরি-চামারি করে কিছু শুনে নেবার চেষ্টা অবশ্যি করে থাকে। কারণ তাদের গঠনাকৃতি মানুষের তুলনায় ফেরেশতাদের কিছুটা কাছাকাছি কিন্তু আসলে তাদের কপালে শিকে ছেঁড়ে না।

১২. شهاب مبين এর আভিধানিক অর্থ উজ্জ্বল আগুনের শিখা। কুরআনের অন্য জায়গায় এজন্য شهاب ثاقب শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, অন্ধকার বিদীর্ণকারী অগ্নি-স্ফুলিংগ। এর মানে যে, আকাশ থেকে নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত নক্ষত্র হতে হবে, যাকে আমাদের পরিভাষায় "উল্‌কা পিণ্ড" বলা হয়, তেমন কোন কথা নেই। এটা হয়তো অন্য কোন ধরনের রশ্মি হতে পারে। যেমন মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic Rays) অথবা এর চেয়েও তীব্র ধরনের অন্য কিছু, যা এখনো আমাদের জ্ঞানের আওতার বাইরে রয়ে গেছে। আবার এ উল্‌কা পিণ্ডও হতে পারে, যাকে আমরা মাঝে মধ্যে আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসতে দেখি। বর্তমানকালের পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায়, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর দিকে যেসব উল্‌কা ছুটে আসতে দেখা যায় তার সংখ্যা হবে প্রতিদিন এক লক্ষ কোটি। এর মধ্য থেকে প্রায় ২ কোটি প্রতিদিন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এলাকার মধ্যে প্রবেশ করে পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়। তার মধ্য থেকে কোন রকমে একটা ভূ-পৃষ্ঠে পৌছে। মহাশূন্যে এদের গতি হয় কমবেশী প্রতি সেকেণ্ডে ২৬ মাইল এবং কখনো কখনো তা প্রতি সেকেণ্ডে ৫০ মাইলেও পৌছে যায়। অনেক সময় খালি চোখেও অস্বাভাবিক উল্‌কা বৃষ্টি দেখা যায়। পুরাতন রেকর্ড থেকে জানা যায়, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ নভেম্বর উত্তর আমেরিকার পূর্ব এলাকায় শুধুমাত্র একটিস্থানে মধ্য রাত্র থেকে প্রভাত পর্যন্ত ২ লক্ষ উল্‌কা পিণ্ড নিক্ষিপ্ত হতে দেখা গিয়েছিল। (ইনসাই-ক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ১৯৪৬, ১৫ খণ্ড, ৩৩৭-৩৯ পৃঃ) হয়তো এই উল্‌কা বৃষ্টিই উর্ধ জগতের দিকে শয়তানদের উড্ডয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে। কারণ পৃথিবীর উর্ধ সীমানা পার হয়ে মহাশূন্যে প্রতিদিন এক লক্ষ কোটি উল্‌কাপাত তাদের জন্য মহাশূন্যের ঐ এলাকাকে সম্পূর্ণরূপে অনতিক্রম্য বানিয়ে দিয়ে থাকবে।

এখানে উপরে যে সংরক্ষিত দুর্গগুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলোর ধরন সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। আপাত দৃষ্টিতে মহাশূন্য একেবারে পরিষ্কার। এর মধ্যে কোথাও কোন দেয়াল বা ছাদ দেখা যায় না। কিন্তু আল্লাহ এ মহাশূন্যের বিভিন্ন অংশকে এমন কিছু অদৃশ্য দেয়াল দিয়ে ঘিরে রেখেছেন যা এক অংশের বিপদ ও ক্ষতিকর প্রভাব থেকে অন্য অংশকে সংরক্ষিত করে রাখে। এ দেয়ালগুলোর বদৌলতেই প্রতিদিন গড়ে যে এক লক্ষ কোটি উল্‌কা পিণ্ড পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে তা সব পথেই জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং মাত্র একটি এসে পৃথিবী পৃষ্ঠে পড়তে সক্ষম হয়। পৃথিবীতে উল্‌কা পিণ্ডের

وَإِنْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾
وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ ۖ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ
الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا
الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

এমন কোন জিনিস নেই যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই এবং আমি যে জিনিসই অবতীর্ণ করি একটি নির্ধারিত পরিমাণেই করে থাকি।[১৪]

বৃষ্টিবাহী বায়ু আমিই পাঠাই। তারপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি এবং এ পানি দিয়ে তোমাদের পিপাসা মিটাই। এ সম্পদের ভাণ্ডার তোমাদের হাতে নেই।

জীবন ও মৃত্যু আমিই দান করি এবং আমিই হবো সবার উত্তরাধিকারী।[১৫]

তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকে আমি দেখে রেখেছি এবং পরবর্তী আগমনকারীরাও আমার দৃষ্টি সমক্ষে আছে। অবশ্যি তোমার রব তাদের সবাইকে একত্র করবেন। তিনি জ্ঞানময় ও সবকিছু জানেন।[১৬]

যেসব নমুনা দুনিয়ার বিভিন্ন যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড়টির ওজন ৬৪৫ পাউণ্ড। এ পাথরটি ওপর থেকে পড়ে মাটির মধ্যে ১১ ফুট গভীরে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়াও এক জায়গায় ৩৬ $\frac{১}{২}$ টনের একটি লোহার স্তূপ পাওয়া গেছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে আকাশ থেকে এ লোহা নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এ ছাড়া সেখানে এর স্তূপাকার অস্তিত্বের কোন কারণই তারা খুঁজে পাননি। চিন্তা করুন পৃথিবীর উর্ধ সীমানাকে যদি মজবুত দেয়ালের মাধ্যমে সংরক্ষিত না করা হতো তাহলে এসব উল্‌কাপাতে পৃথিবীর কী অবস্থা হতো! এ দেয়ালগুলোকেই কুরআনে বুরুজ (সংরক্ষিত দূর্গ) বলা হয়েছে।

১৩. এর মাধ্যমে আল্লাহর কুদ্‌রত, শক্তিমত্তা ও জ্ঞানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। উদ্ভিদের প্রতিটি প্রজাতির মধ্যে বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা এত বেশী যে, তার যদি শুধু একটি মাত্র তারাকে দুনিয়ায় বংশ বৃদ্ধির সুযোগ দেয়া হয় তাহলে কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবীর চতুরদিকে শুধু তারই চারা দেখা যাবে, অন্যকোন উদ্ভিদের জন্য আর কোন জায়গা খালি থাকবে না। কিন্তু একজন মহাজ্ঞানী ও অসীম শক্তিধরের সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী অসংখ্য প্রজাতির উদ্ভিদ এ বিশ্ব চরাচরে

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ وَالْجَانَّ
خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ
إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٨﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ
كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾

৩ রুকূ'

আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি শুকনো ঠন্‌ঠনে পচা মাটি থেকে।[১৭] আর এর আগে জিনদের সৃষ্টি করেছি আগুনের শিখা থেকে।[১৮] তারপর তখনকার কথা স্মরণ করো যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, আমি শুকনো ঠন্‌ঠনে পচা মাটি থেকে একটি মানুষ সৃষ্টি করছি। যখন আমি তাকে পূর্ণ অবয়ব দান করবো এবং তার মধ্যে আমার রূহ থেকে কিছু ফুঁকে দেবো[১৯] তখন তোমরা সবাই তার সামনে সিজদাবনত হয়ো। সেমতে সকল ফেরেশতা একযোগে তাকে সিজদা করলো, ইবলীস ছাড়া, কারণ সে সিজদাকারীদের অন্তরভুক্ত হতে অস্বীকার করলো।[২০]

উৎপন্ন হচ্ছে। প্রত্যেক প্রজাতির উৎপাদন একটি বিশেষ সীমায় পৌঁছে যাওয়ার পর থেমে যায়। এ প্রক্রিয়ার আর একটি দিক হচ্ছে, প্রত্যেক প্রজাতির উদ্ভিদের আয়তন, বিস্তৃতি, উচ্চতা ও বিকাশের একটি সীমা নির্ধারিত আছে। কোন উদ্ভিদ এ সীমা অতিক্রম করতে পারে না। পরিষ্কার জানা যায়, প্রতিটি বৃক্ষ, চারা ও লতাপাতার জন্য কেউ শরীর, উচ্চতা, আকৃতি, পাতা, ফুল, ফল ও উৎপাদনের একটি মাপাজোকা পরিমাণ পুরোপুরি হিসেব ও গণনা করে নির্ধারিত করে দিয়েছে।

১৪. এখানে এ সত্যটি সম্পর্কে সজাগ করে দেয়া হয়েছে যে, সীমিত ও পরিকল্পিত প্রবৃদ্ধির এই নিয়ম কেবল উদ্ভিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় বরং যাবতীয় সৃষ্টির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বায়ু, পানি, আলো, শীত, গ্রীষ্ম, জীব, জড়, উদ্ভিদ তথা প্রত্যেকটি জিনিস, প্রত্যেকটি প্রজাতি, প্রত্যেকটি শ্রেণী ও প্রত্যেকটি শক্তির জন্য একটি সীমা নির্ধারিত রয়েছে। তার মধ্যে তারা অবস্থান করছে। তাদের জন্য একটি পরিমাণও নির্ধারিত রয়েছে, তার চাইতে তারা কখনো বাড়েও না আবার কমেও না। এই নির্ধারিত অবস্থা এবং পরিপূর্ণ প্রজ্ঞামূলক নির্ধারিত অবস্থার বদৌলতেই পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বব্যবস্থায় এই ভারসাম্য, সমন্বয় ও পারিপাট্য দেখা যাচ্ছে। এই বিশ্ব জাহানটি যদি একটি আকস্মিক ঘটনার ফসল হতো অথবা বহু খোদার কর্মকুশলতা ও কর্মতৎপরতার

ফল হতো, তাহলে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অসংখ্য বস্তু ও শক্তির মধ্যে এই পর্যায়ের পূর্ণ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও অব্যাহতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা কেমন করে সম্ভব হতো?

১৫. অর্থাৎ তোমাদের ধ্বংসের পরে একমাত্র আমিই টিকে থাকবো। তোমরা যা কিছু পেয়েছো, ওগুলো নিছক সাময়িকভাবে ব্যবহার করার জন্য পেয়েছো। শেষ পর্যন্ত আমার দেয়া সব জিনিস ত্যাগ করে তোমরা এখান থেকে বিদায় নেবে একেবারে খালি হাতে এবং এসব জিনিস যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটি আমার ভাণ্ডারে থেকে যাবে।

১৬. অর্থাৎ তার অপার কর্মকুশলতা ও প্রজ্ঞার বলেই তিনি সবাইকে একত্র করবেন। আবার তাঁর জ্ঞানের পরিধি এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে তার নাগালের বাইরে কেউ নেই। বরং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোন মানুষের মাটি হয়ে যাওয়া দেহের একটি কণাও তাঁর কাছ থেকে হারিয়ে যেতে পারে না। তাই যে ব্যক্তি পরকালীন জীবনকে দূরবর্তী বা অবাস্তব মনে করে সে মূলত আল্লাহর প্রজ্ঞা ও কুশলতা সম্পর্কেই বেখবর। আর যে ব্যক্তি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, "মরার পরে যখন আমাদের মৃত্তিকার বিভিন্ন অণু-কণিকা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে তখন আমাদের কিভাবে পুনর্বার জীবিত করা হবে," সে আসলে আল্লাহর জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ।

১৭. এখানে কুরআন পরিষ্কার করে একথা বলে দিচ্ছে যে, মানুষ বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পশুত্বের পর্যায় অতিক্রম করে মানবতার পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। ডারউইনের ক্রমবিবর্তনবাদে প্রভাবিত আধুনিক যুগের কুরআনের ব্যাখ্যাতাগণ একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। বরং কুরআন বলছে, সরাসরি মৃত্তিকার উপাদান থেকে তার সৃষ্টিকর্ম শুরু হয়। صلصال من حمأ مسنون (শুক্‌নো ঠন্‌ঠনে পচা মাটি) শব্দাবলীর মাধ্যমে একথা ব্যক্ত করা হয়েছে। حما বলতে আরবী ভাষায় এমন ধরনের কালো কাদা মাটিকে বুঝায় যার মধ্যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়ে গেছে, যাকে আমরা নিজেদের ভাষায় পংক বা পাঁক বলে থাকি অথবা অন্য কথায় বলা যায়, যা মাটির গোলা বা মণ্ড হয়ে গেছে। مسنون শব্দের দুই অর্থ হয়। একটি অর্থ, পরিবর্তিত, অর্থাৎ এমন পচা, যার মধ্যে পচন ধরার ফলে চক্‌চকে ও তেলতেলে ভাব সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয় অর্থ, চিত্রিত। অর্থাৎ যা একটা নির্দিষ্ট আকৃতি ও কাঠামোতে রূপান্তরিত হয়েছে। صلصال বলা হয় এমন পচা কাদাকে যা শুকিয়ে যাওয়ার পর ঠন্‌ঠন করে বাজে। এ শব্দাবলী থেকে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যে, গাঁজানো কাদা মাটির গোলা বা মণ্ড থেকে প্রথমে একটি পুতুল বানানো হয় এবং পুতুলটি তৈরী হবার পর যখন শুকিয়ে যায় তখন তার মধ্যে প্রাণ ফুঁকে দেয়া হয়।

১৮. سموم বলা হয় গরম বাতাসকে। আর আগুনকে সামুমের সাথে সংযুক্ত করার ফলে এর অর্থ আগুনের পরিবর্তে হয় প্রখর উত্তাপ। কুরআনের যেসব জায়গায় জিনকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে এ আয়াত থেকে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হয়ে যায়। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা আর রহমান, টীকা ঃ ১৪-১৬)

১৯. এ থেকে জানা যায়, মানুষের মধ্যে যে রূহ ফুঁকে দেয়া হয় অর্থাৎ প্রাণ সঞ্চার করা হয় তা মূলত আল্লাহর গুণাবলীর একটি প্রতিচ্ছায়া। জীবন, জ্ঞান, শক্তি, সামর্থ, সংকল্প এবং অন্যান্য যতগুলো গুণ মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়, যেগুলোর সমষ্টির নাম প্রাণ—সেসবই আসলে আল্লাহরই গুণাবলীর একটি প্রতিচ্ছায়া। মানুষের মাটির দেহ-

قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ لَمْ
اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٣٣﴾
قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿٣٤﴾ وَّاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ
الدِّيْنِ ﴿٣٥﴾ قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَاِنَّكَ
مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿٣٧﴾ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ بِمَآ
اَغْوَيْتَنِيْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٣٩﴾ اِلَّا
عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٤٠﴾

আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, "হে ইবলীস! তোমার কি হলো, তুমি সিজ্‌দাকারীদের অন্তরভুক্ত হলে না?" সে জবাব দিল, "এমন একটি মানুষকে সিজ্‌দা করা আমার মনোপূত নয় যাকে তুমি শুক্‌নো ঠন্‌ঠনে পচা মাটি থেকে সৃষ্টি করেছো।" আল্লাহ বললেন, "তবে তুমি বের হয়ে যাও এখান থেকে, কেননা, তুমি ধিকৃত। আর এখন কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোমার ওপর অভিসম্পাত!"[২১] সে আরয করলো, "হে আমার রব! যদি তাই হয়, তাহলে সেই দিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও যেদিন সকল মানুষকে পুনর্বার উঠানো হবে।" বললেন, "ঠিক আছে, তোমাকে অবকাশ দেয়া হলো সেদিন পর্যন্ত যার সময় আমার জানা আছে।" সে বললো, "হে আমার রব! তুমি যেমন আমাকে বিপথগামী করলে ঠিক তেমনিভাবে আমি পৃথিবীতে এদের জন্য প্রলোভন সৃষ্টি করে এদের সবাইকে বিপথগামী করবো,[২২] তবে এদের মধ্য থেকে তোমার যেসব বান্দাকে তুমি নিজের জন্য নির্বাচিত করে নিয়েছো তাদের ছাড়া।"

কাঠামোটির ওপর এ প্রতিচ্ছায়া ফেলা হয়। আর এ প্রতিচ্ছায়ার কারণেই মানুষ এ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হয়েছে এবং ফেরেশতাগণসহ পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টি তাকে সিজদা করেছে।

আসলে তো সৃষ্টির মধ্যে যেসব গুণের সন্ধান পাওয়া যায় তার প্রত্যেকটিরই উৎস ও উৎপত্তিস্থল আল্লাহরই কোন না কোন গুণ। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ
سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾

বললেন, "এটিই আমার নিকট পৌঁছুবার সোজা পথ।[২৩] অবশ্যি যারা আমার প্রকৃত বান্দা হবে তাদের ওপর তোমার কোন জোর খাটবে না। তোমার জোর খাটবে শুধুমাত্র এমন বিপথগামীদের ওপর যারা তোমার অনুসরণ করবে[২৪] এবং তাদের সবার জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তির অংগীকার।"[২৫]

এ জাহান্নাম (ইবলীসের অনুসারীদের জন্য যার শাস্তির অংগীকার করা হয়েছে) সাতটি দরজা বিশিষ্ট। প্রত্যেকটি দরজার জন্য তাদের মধ্য থেকে একটি অংশ নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে।[২৬]

جَعَلَ اللّٰهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ وَأَنْزَلَ فِي
الْأَرْضِ جُزْءًا وَّاحِدًا فَمِنْ ذٰلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ حَتّٰى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ
حَافِرَهَا عَنْ وَّلَدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيْبَهُ - (بخارى ، مسلم)

"মহান আল্লাহ রহমতকে একশো ভাগে বিভক্ত করেছেন। তারপর এর মধ্য থেকে ৯৯টি অংশ নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন এবং মাত্র একটি অংশ পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেছেন। এই একটি মাত্র অংশের বরকতেই সমুদয় সৃষ্টি পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহশীল হয়। এমনকি যদি একটি প্রাণী তার নিজের সন্তান যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এ জন্য তার ওপর থেকে নিজের নখর উঠিয়ে নেয় তাহলে এটিও আসলে এ রহমত গুণের প্রভাবেরই ফলশ্রুতি।"–(বুখারী ও মুসলিম)

কিন্তু আল্লাহর গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়া যে ধরনের পূর্ণতার সাথে মানুষের ওপর ফেলা হয় অন্য কোন প্রাণীর ওপর তেমনভাবে ফেলা হয়নি। এ জন্যই অন্যান্য সৃষ্টির ওপর মানুষের এ প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব।

এটি একটি সূক্ষ্ম বিষয়। এটি অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সামান্যতম ভ্রান্তি মানুষকে এমন বিভ্রান্তির মধ্যে ঠেলে দিতে পারে যার ফলে সে আল্লাহর গুণাবলীর একটি অংশ লাভ করাকে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার কোন অংশ লাভ করার সমার্থক মনে করতে পারে। অথচ আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার সামান্যতম অংশ লাভ করার কথাও কোন সৃষ্টির জন্য কল্পনাই করা যায় না।

২০. তুলনামূলক পর্যালোচনার জন্য সূরা বাকারার ৪ রুকূ', সূরা নিসার ১৮ রুকূ' এবং সূরা আরাফের ২ রুকূ দেখুন। তাছাড়া এসব জায়গায় আমি যে টীকাগুলো লিখেছি সেগুলোও একটু সামনে রাখলে ভাল হয়।

২১. অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত তুমি অভিশপ্ত থাকবে। তারপর যখন প্রতিফল দিবস কায়েম হবে তখন তোমাকে তোমার নাফরমানির শাস্তি দেয়া হবে।

২২. অর্থাৎ যেভাবে তুমি এ নগণ্য ও হীন সৃষ্টিকে সিজ্‌দা করার হুকুম দিয়ে আমাকে তোমার হুকুম অমান্য করতে বাধ্য করেছো ঠিক তেমনিভাবে এ মানুষদের জন্য আমি দুনিয়াকে এমন চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর জিনিসে পরিণত করে দেবো যার ফলে তারা সবাই এর দ্বারা প্রতারিত হয়ে তোমার নাফরমানী করতে থাকবে। অন্য কথায়, ইবলীসের উদ্দেশ্য ছিল, সে পৃথিবীর জীবন এবং তার সুখ–আনন্দ ও ক্ষণস্থায়ী আরাম–আয়েশ ও ভোগ–বিলাসকে মানুষের জন্য এমন চমকপ্রদ ও সুদৃশ্য করে তুলবে যার ফলে সে খিলাফত ও তার দায়িত্বসমূহ এবং পরকালের জবাবদিহির কথা ভুলে যাবে, এমনকি আল্লাহকেও ভুলে যাবে অথবা স্মরণ রাখা সত্ত্বেও তাঁর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করবে।

২৩. هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ বাক্যের দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ আমি অনুবাদে অবলম্বন করেছি। আর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে একথা ঠিক, আমি এটা মেনে চলবো।

২৪. এ বাক্যেরও দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ আমি অনুবাদে অবলম্বন করেছি। আর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, আমার বান্দাদের (অর্থাৎ সাধারণ মানুষদের) ওপর তোমার কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। তুমি তাদেরকে জবরদস্তি নাফরমান বানাতে পারবে না। তবে যারা নিজেরাই বিভ্রান্ত হবে এবং নিজেরাই তোমার অনুসরণ করতে চাইবে তাদেরকে তোমার পথে চলার জন্য ছেড়ে দেয়া হবে। তোমার পথ থেকে তাদেরকে আমি জোর করে বিরত রাখার চেষ্টা করবো না।

প্রথম অর্থের দিক দিয়ে বক্তব্যের সার সংক্ষেপ হবেঃ বন্দেগীর পথই হচ্ছে আল্লাহর কাছে পৌঁছুবার সোজা পথ। যারা এ পথ অবলম্বন করবে তাদের ওপর শয়তানের কোন কর্তৃত্ব চলবে না। আল্লাহ তাদেরকে নিজের জন্য একান্তভাবে গ্রহণ করে নেবেন। আর শয়তান নিজেও স্বীকৃতি দিচ্ছে যে, তারা তার ফাঁদে পা দেবে না। তবে যারা নিজেরাই বন্দেগীর পথ থেকে সরে এসে নিজেদের কল্যাণ ও সৌভাগ্যের পথ হারিয়ে ফেলবে তারা ইবলীসের শিকারে পরিণত হবে এবং ইবলীস তাদেরকে প্রতারিত করে যেদিকে নিয়ে যেতে চাইবে তারা তার পেছনে সেদিকেই বিভ্রান্তের মত ছুটে বেড়াতে বেড়াতে দূরে—বহু দূরে চলে যাবে।

দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে বক্তব্যের সার সংক্ষেপ হবেঃ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য শয়তান তার যে কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করেছে তা হচ্ছে এই যে, সে পৃথিবীর জীবনকে মানুষের জন্য সুদৃশ্য ও সুশোভিত করে তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে গাফিল ও বন্দেগীর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। আল্লাহ তার এই কর্মপদ্ধতির স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, এ শর্ত আমি মেনে নিয়েছি এবং এর আরো ব্যাখ্যা করে একথা সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, তোমাকে কেবলমাত্র ধোঁকা দেয়ার ক্ষমতা দেয়া হচ্ছে, তাদের হাত ধরে জোর করে

নিজের পথে টেনে নিয়ে যাবার ক্ষমতা দেয়া হচ্ছে না। আল্লাহ তাঁর যেসব বান্দাকে নিজের একনিষ্ঠ বান্দা করে নিয়েছেন শয়তান তাদের নাম নিজের খাতায় রাখেনি। এ থেকে এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হচ্ছিল যে, সম্ভবত কোন যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই আল্লাহ ইচ্ছামতো যাকে চাইবেন নিজের একনিষ্ঠ বান্দা করে নেবেন এবং সে শয়তানের হাত থেকে বেঁচে যাবে। আল্লাহ একথা বলে বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি নিজেই বিভ্রান্ত হবে সে–ই তোমার অনুসারী হবে। অন্য কথায়, যে বিভ্রান্ত হবে না সে তোমার অনুসরণ করবে না এবং সে–ই হবে আমার বিশেষ বান্দা, যাকে আমি একান্ত করে নেব।

২৫. এখানে এ ঘটনাটি যে উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয়েছে তা অনুধাবন করার জন্য পূর্বাপর আলোচনা পরিষ্কারভাবে মনে রাখতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় রুকূ'র বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে একটি কথা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। সেটি হচ্ছে ঃ এ বর্ণনা ধারায় আদম ও ইবলীসের এ কাহিনী বর্ণনা করার পেছনে একটি উদ্দেশ্য কাজ করছে। অর্থাৎ কাফেরদেরকে এ সত্যটি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া এর উদ্দেশ্য যে, তোমরা নিজেদের আদি শত্রু শয়তানের ফাঁদে পড়ে গেছো এবং সে নিজের হিংসা চরিতার্থ করার জন্য তোমাদের যে হীনতার গর্তে নামিয়ে দিতে চায় তোমরা তার মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছো। পক্ষান্তরে এ নবী তোমাদের এ ফাঁদ থেকে উদ্ধার করে উন্নতির সেই উচ্চ শিখরের দিকে নিয়ে যেতে চান যা আসলে মানুষ হিসেবে তোমাদের স্বাভাবিক অবস্থান স্থল। কিন্তু তোমরা অদ্ভুত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিচ্ছো। নিজেদের শত্রুকে বন্ধু এবং কল্যাণকামীকে তোমরা শত্রু মনে করছো।

এই সংগে এ সত্যটিও এ কাহিনীর মাধ্যমে তাদের সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে যে, তোমাদের জন্য একটি মাত্র মুক্তির পথ রয়েছে এবং সেটি হচ্ছে আল্লাহর বন্দেগী করা। এ পথ পরিহার করে তোমরা যে পথেই চলবে তা হবে শয়তানের পথ এবং সে পথটি চলে গেছে সোজা জাহান্নামের দিকে।

এ কাহিনীর মাধ্যমে তৃতীয় যে কথাটি বুঝানো হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, তোমরা নিজেরাই নিজেদের এ ভুলের জন্য দায়ী। শয়তানের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে এর বেশী আর কিছু নয় যে, সে দুনিয়ার বাহ্যিক জীবনোপকরণের সাহায্যে ধোঁকা দিয়ে তোমাদের আল্লাহর বন্দেগীর পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে। তার ধোঁকায় পড়ে যাওয়া তোমাদের নিজেদের ত্রুটি। এর কোন দায়–দায়িত্ব তোমাদের নিজেদের ছাড়া আর কারোর ওপর বর্তায় না।

(এ ব্যাপারে আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য সূরা ইবরাহীম ২২ আয়াত ও ৩১ টীকা দেখুন)।

২৬. যেসব গোমরাহী ও গোনাহের পথ পাড়ি দিয়ে মানুষ নিজের জন্য জাহান্নামের পথের দরজা খুলে নেয় সেগুলোর প্রেক্ষিতে জাহান্নামের এ দরজাগুলো নির্ধারিত হয়েছে। যেমন কেউ নাস্তিক্যবাদের পথ পাড়ি দিয়ে জাহান্নামের দিকে যায়। কেউ যায় শিরকের পথ পাড়ি দিয়ে, কেউ মুনাফিকীর পথ ধরে, কেউ প্রবৃত্তি পূজা, কেউ অশ্লীলতা ও ফাসেকী, কেউ জুলুম, নিপীড়ন ও নিগ্রহ, আবার কেউ ভ্রষ্টতার প্রচার ও কুফরীর প্রতিষ্ঠা এবং কেউ অশ্লীলতা ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের প্রচারের পথ ধরে জাহান্নামের দিকে যায়।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ﴿٤٦﴾
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾
لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾ نَبِّئْ عِبَادِي
أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾

৪ রুকূ'

অন্যদিকে মুত্তাকীরা[২৭] থাকবে বাগানে ও নির্ঝরিণীসমূহে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা এগুলোতে প্রবেশ করো শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে। তাদের মনে যে সামান্য কিছু মনোমালিন্য থাকবে তা আমি বের করে দেবো,[২৮] তারা পরস্পর ভাই ভাইয়ে পরিণত হয়ে মুখোমুখি আসনে বসবে। সেখানে তাদের না কোন পরিশ্রম করতে হবে আর না তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হবে।[২৯]

হে নবী! আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়। কিন্তু এ সংগে আমার আযাবও ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক।

২৭. অর্থাৎ যারা শয়তানের পদানুসরণ থেকে দূরে থেকেছে এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর বন্দেগী ও দাসত্বের জীবন যাপন করেছে।

২৮. অর্থাৎ সৎ লোকদের মধ্যে পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝির কারণে দুনিয়ার জীবনে যদি কিছু মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করার সময় তা দূর হয়ে যাবে এবং পরস্পরের পক্ষ থেকে তাদের মন একেবারে পরিষ্কার করে দেয়া হবে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য সূরা আরাফের ৩২ টীকা দেখুন)।

২৯. নিম্নলিখিত হাদীস থেকে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেন ঃ

يُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا وَلَا تَمْرَضُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَعِيشُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا وَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تُقِيمُوا فَلَا تَظْعَنُوا أَبَدًا –

অর্থাৎ "জান্নাতবাসীদেরকে বলে দেয়া হবে, এখন তোমরা সবসময় সুস্থ থাকবে, কখনো রোগাক্রান্ত হবে না। এখন তোমরা চিরকাল জীবিত থাকবে, কখনো মরবে না। এখন তোমরা চির যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না। এখন তোমরা হবে চির অবস্থানকারী, কখনো স্থান ত্যাগ করতে হবে না"

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرٰهِيمَ ﴿٥١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلٰمًا ۖ
قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾
قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلٰى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا بَشَّرْنٰكَ
بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقٰنِطِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ
إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾ قَالُوا إِنَّا
أُرْسِلْنَا إِلٰى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ ۖ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا ۙ إِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِينَ ﴿٦٠﴾

আর তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমানদের কাহিনী একটু শুনিয়ে দাও।[৩০] যখন তারা এলো তার কাছে এবং বললো, "সালাম তোমার প্রতি" সে বললো, "আমরা তোমাদের দেখে ভয় পাচ্ছি।"[৩১] তারা জবাব দিল, "ভয় পেয়ো না, আমরা তোমাকে এক পরিণত জ্ঞান সম্পন্ন পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি।"[৩২] ইবরাহীম বললো, "তোমরা কি বার্ধক্যাবস্থায় আমাকে সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছো? একটু ভেবে দেখো তো এ কোন্ ধরনের সুসংবাদ তোমরা আমাকে দিচ্ছো?" তারা জবাব দিল, "আমরা তোমাকে সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি, তুমি নিরাশ হয়ো না।" ইবরাহীম বললো, "পথভ্রষ্ট লোকেরাই তো তাদের রবের রহমত থেকে নিরাশ হয়।" তারপর ইবরাহীম জিজ্ঞেস করলো, "হে আল্লাহর প্রেরিতরা! তোমরা কোন্ অভিযানে বের হয়েছো?"[৩৩] তারা বললো, "আমাদের একটি অপরাধী সম্প্রদায়ের দিকে পাঠানো হয়েছে।[৩৪] শুধুমাত্র লূতের পরিবর্গ এর অন্তরভুক্ত নয়। তাদের সবাইকে আমরা বাঁচিয়ে নেবো, তার স্ত্রী ছাড়া, যার জন্য (আল্লাহ বলেন ঃ) আমি স্থির করেছি, সে পেছনে অবস্থানকারীদের সাথে থাকবে"।

এর আরো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এমন সব আয়াত ও হাদীস থেকে যেগুলোতে বলা হয়েছে জান্নাতে নিজের খাদ্য ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের জন্য মানুষকে কোন শ্রম করতে হবে না। বিনা প্রচেষ্টায় ও পরিশ্রম ছাড়াই সে সবকিছু পেয়ে যাবে।

فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ِالْمُرْسَلُوْنَ ﴿٦١﴾ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٦٢﴾
قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿٦٣﴾ وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا
لَصٰدِقُوْنَ ﴿٦٤﴾ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ
وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَقَضَيْنَآ
اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ﴿٦٦﴾

৫ রুকূ'

প্রেরিতরা যখন লূতের পরিবারের কাছে পৌঁছুলো[৩৫] তখন সে বললো, "আপনারা অপরিচিত মনে হচ্ছে।"[৩৬] তারা জবাব দিল, "না, বরং আমরা তাই এনেছি যার আসার ব্যাপারে এরা সন্দেহ করছিল। আমরা তোমাকে যথার্থই বলছি, আমরা সত্য সহকারে তোমার কাছে এসেছি। কাজেই এখন তুমি কিছু রাত থাকতে নিজের পরিবারবর্গকে নিয়ে বের হয়ে যাও এবং তুমি তাদের পেছনে পেছনে চলো।[৩৭] তোমাদের কেউ যেন পেছন ফিরে না তাকায়।[৩৮] ব্যাস, সোজা চলে যাও যেদিকে যাবার জন্য তোমাদের হুকুম দেয়া হচ্ছে।" আর তাকে আমি এ ফায়সালা পৌঁছিয়ে দিলাম যে, সকাল হতে হতেই এদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হবে।

৩০. এখানে যে উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীম এবং তার সাথে সাথে লূতের সম্প্রদায়ের কাহিনী শুনানো হচ্ছে তা অনুধাবন করার জন্য এ সূরার প্রথম দিকের আয়াতগুলো সামনে থাকা প্রয়োজন। প্রথম দিকে ৭ ও ৮ আয়াতে কাফেরদের এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতো ঃ "যদি তুমি সাচ্চা নবী হয়ে থাকো তাহলে ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে আনছো না কেন?" সেখানে এ প্রশ্নটির নিছক একটি সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল ঃ "ফেরেশতাদেরকে আমি এমনি অযথা পাঠাই না যখনই তাদেরকে পাঠাই সত্য সহকারে পাঠাই।" এখন এখানে এর বিস্তারিত জবাব এ দু'টি কাহিনীর আকারে দেয়া হচ্ছে। এখানে তাদেরকে জানানো হচ্ছে যে, একটি "সত্য" নিয়ে ফেরেশতারা ইবরাহীমের কাছে এসেছিল আবার অন্য একটি "সত্য" নিয়ে তারা এসেছিল লূতের সম্প্রদায়ের কাছে। এখন তোমরা নিজেরাই দেখে নাও, ঐ দু'টি সত্যের মধ্য থেকে কোন্‌টি নিয়ে ফেরেশতারা তোমাদের কাছে আসতে পারে? একথা সুস্পষ্ট যে, ইবরাহীমের কাছে যে সত্য নিয়ে তারা এসেছিল সেটি লাভ করার যোগ্যতা তোমাদের নেই। এখন কি যে সত্যটি নিয়ে তারা লূতের সম্প্রদায়ের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল সেটি সহকারে তোমরা তাদেরকে আনতে চাও?

وَجَآءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا
تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٦٩﴾ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ
عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٧١﴾

ইত্যবসরে নগরবাসীরা মহা উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে লূতের বাড়ি চড়াও হলো।[৩৯] লূত বললো, "ভাইয়েরা আমার! এরা হচ্ছে আমার মেহমান, আমাকে বে-ইজ্জত করো না। আল্লাহকে ভয় করো, আমাকে লাঞ্ছিত করো না।" তারা বললো, "আমরা না তোমাকে বারবার মানা করেছি, সারা দুনিয়ার ঠিকেদারী নিয়ো না?" লূত লাচার হয়ে বললো, "যদি তোমাদের একান্তই কিছু করতেই হয় তাহলে এই যে আমার মেয়েরা রয়েছে।[৪০]

৩১. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য সূরা হূদের ৭ রুকূ' টীকা সহকারে দেখুন।

৩২. অর্থাৎ হযরত ইসহাকের (আ) জন্মের সুসংবাদ। সূরা হূদে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩৩. হযরত ইবরাহীমের (আ) এ প্রশ্নটি থেকে পরিষ্কার প্রমাণ হয় যে, ফেরেশতারা সবসময় অস্বাভাবিক অবস্থায়ই মানুষের আকৃতি ধরে আসেন এবং বড় বড় ও গুরুতর ধরনের অভিযানেই তাদেরকে পাঠানো হয়।

৩৪. এ ধরনের সংক্ষিপ্ত ইংগিত থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, লূতের সম্প্রদায়ের অপরাধের পেয়ালা তখন কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। যার ফলে হযরত ইবরাহীমের (আ) মত সজাগ ও অভিজ্ঞ লোকের সামনে তার নাম উচ্চারণ করার আদৌ প্রয়োজনই হয়নি। কাজেই শুধুমাত্র "একটি অপরাধী সম্প্রদায়" বলাই যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে।

৩৫. তুলনামূলক পর্যালোচনার জন্য সূরা 'আরাফের ১০ রুকূ' এবং সূরা হূদের ৭ রুকূ' দেখুন।

৩৬. এখানে বক্তব্য সংক্ষেপ করা হয়েছে। সূরা হূদে ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, তাদের আগমনে হযরত লূত (আ) অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর মন ভীষণভাবে সংকুচিত হয়ে পড়ে। তাদেরকে দেখার সাথে সাথেই তিনি মনে মনে বলতে থাকেন আজ বড় কঠিন সময় এসেছে। তাঁর এ ভয়ের কারণ হিসেবে কুরআনের বর্ণনা থেকে যে ইংগিত এবং হাদীস থেকে যে সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে, এ ফেরেশতারা অত্যন্ত সুশ্রী কিশোরদের আকৃতি ধরে হযরত লূতের কাছে এসেছিলেন। এদিকে হযরত লূত (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের চারিত্রিক দুষ্কৃতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি আগত মেহমানদেরকে ফিরিয়ে দিতে পারছিলেন না আবার নিজের সম্প্রদায়ের বদমায়েশদের হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করাও তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল। তাই তিনি বড়ই পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন।

৩৭. অর্থাৎ নিজের পরিবারবর্গের পেছনে পেছনে এ জন্য চলো যেন তাদের কেউ থেকে যেতে না পারে।

৩৮. এর মানে এ নয় যে, পেছন ফিরে তাকালেই তোমরা পাথর হয়ে যাবে, যেমন বাইবেলে বলা হয়েছে বরং এর মানে হচ্ছে, পেছনের আওয়াজ, শোর গোল শুনে তামাশা দেখার জন্য থেমে যেয়ো না। এটা তামাশা দেখার সময় নয় এবং অপরাধী জাতির ধ্বংসক্রিয়া দেখে অশ্রুপাত করার সময়ও নয়। এক মুহূর্ত যদি তোমরা আযাব প্রাপ্ত জাতির এলাকায় থেমে যাও তাহলে ধ্বংস-বৃষ্টির কিছুটা তোমাদের ওপরও বর্ষিত হতে পারে এবং তাতে তোমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারো।

৩৯. এ থেকে এ জাতির ব্যভিচারবৃত্তি কোন্ পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল তা অনুমান করা যেতে পারে। জনপদের এক ব্যক্তির বাড়িতে কয়েকজন সুশ্রী অতিথি এসেছেন. ব্যাস, আর যায় কোথায় অমনি তার বাড়িতে বিপুল সংখ্যক দুর্বৃত্ত চড়াও হয় এবং তার অতিথিদের কাছে প্রকাশ্যে দাবী জানাতে থাকে যে, তার অতিথিদেরকে এ দুর্বৃত্তদের হাতে তুলে দিতে হবে, যাতে তারা তাদের সাথে ব্যভিচার করতে পারে তাদের সারা জনপদে তাদের এসব কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত কেউ ছিল না। তাদের জাতির নৈতিক চেতনাও খতম হয়ে গিয়েছিল ফলে লোকেরা প্রকাশ্যে এ ধরনের বাড়াবাড়ি করতে লজ্জাবোধ করতো না হযরত লূতের (আ) মত পবিত্রাত্মা ও নৈতিকতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের গৃহে যখন বদমায়েশদের এমন নির্লজ্জ হামলা হতে পারে তখন এ থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে যে, এসব জনবসতিতে সাধারণ মানুষদের সাথে কোন্ ধরনের ব্যবহার করা হতো।

তালমূদে এ জাতির যে অবস্থা লিখিত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এখানে তুলে ধরছি এ থেকে এ জাতিটি নৈতিক অধোপতনের কোন্ প্রান্ত সীমায় পৌছে গিয়েছিল তার কিছুটা বিস্তারিত সংবাদ জানা যাবে। তালমূদে বলা হয়েছে ঃ একবার আইলাম এলাকার একজন মুসাফির এ জাতিটির এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। পথে রাত হয়ে গেল ফলে তাকে বাধ্য হয়ে তাদের সাদুম নগরীতে অবস্থান করতে হলো। তার সাথে ছিল তার নিজের পাথেয়। কারোর কাছে সে অতিথি হবার আবেদন জানালো না। সে একটি গাছের নীচে বসে পড়লো। কিন্তু একজন সাদুমবাসী পীড়াপীড়ি করে তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। রাত্রে তাকে নিজের কাছে রাখলো এবং প্রভাত হবার আগেই তার গাধাটি তার জীন ও বাণিজ্যিক মালপত্রসহ লোপাট করে দিল। বিদেশী লোকটি শোরগোল করলো কিন্তু কেউ তার ফরিয়াদ শুনলো না। বরং জনবসতির লোকেরা তার অন্যান্য মালপত্রও লুট করে নিয়ে তাকে বাইরে বের করে দিল।

একবার হযরত সারা হযরত লূতের পরিবারের খবরাখবর সংগ্রহের জন্য নিজের গোলাম ইলিয়াযিরকে সাদুমে পাঠালেন। ইলিয়াযির নগরীতে প্রবেশ করে দেখলেন, একজন সাদুমী একজন বিদেশীকে মারছে। ইলিয়াযির সাদুমীকে বললো, তোমার লজ্জা হয় না তুমি একজন অসহায় মুসাফিরের সাথে এ ব্যবহার করছো? কিন্তু জবাবে সর্বসমক্ষে ইলিয়াযিরের মাথা ফাটিয়ে দেয়া হলো।

একবার এক গরীব লোক কোথাও থেকে তাদের শহরে এলো। কেউ তাকে খাবার দাবারের জন্য কিছু দিল না সে ক্ষুধায় অবসন্ন হয়ে এক জায়গায় মাটিতে পড়েছিল এ

অবস্থায় হযরত লূতের (আ) মেয়ে তাকে দেখতে পেলেন। তিনি তার কাছে খাবার পৌঁছে দিলেন। এ জন্য হযরত লূত (আ) ও তাঁর মেয়েকে কঠোরভাবে নিন্দা করা হলো এবং তাদেরকে এই বলে হুমকি দেয়া হলো যে, এ ধরনের কাজ করতে থাকলে তোমরা আমাদের জনবসতিতে থাকতে পারবে না।

এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা বর্ণনা করার পর তালমূদ রচয়িতা লিখছেন, নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে এ লোকেরা ছিল বড়ই জালেম, ধোঁকাবাজ এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে অসৎ। কোন মুসাফির তাদের এলাকা নিরাপদে অতিক্রম করতে পারতো না। তাদের লোকালয় থেকে কোন গরীব ব্যক্তি এক টুকরো রুটি সংগ্রহ করতে পারতো না। বহুবার এমন দেখা গেছে বাইরের কোন লোক তাদের এলাকায় প্রবেশ করে অনাহারে মারা গেছে এবং তারা তার গায়ের পোশাক খুলে নিয়ে তার লাশকে উলংগ অবস্থায় দাফন করে দিয়েছে। বাইরের ব্যবসায়ীরা দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে পৌঁছে গেলে সর্বসমক্ষে তাদের মালামাল লুট করে নেয়া হতো এবং তাদের ফরিয়াদের জবাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হতো। নিজেদের উপত্যকাকে তারা একটি উদ্যান বানিয়ে রেখেছিল। মাইলের পর মাইল ব্যাপী ছিল এ উদ্যান। তারা নিতান্ত নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে এ উদ্যানে ব্যভিচারমূলক কুকর্ম করতো। একমাত্র লূত আলাইহিস সালাম ছাড়া তাদের এসব কাজের প্রতিবাদ করার কেউ ছিল না। এ সমগ্র কাহিনীকে সংক্ষেপ করে কুরআন মজীদে শুধুমাত্র দু'টি বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ

"তারা আগে থেকেই অনেক খারাপ কাজ করে আসছিল।" (হূদঃ ৭৮)

اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙ وَتَاْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ

"তোমরা পুরুষদের দ্বারা যৌন কামনা পূর্ণ করো, মুসাফিরদের মালপত্র লুটপাট করো এবং নিজেদের মজলিসসমূহে প্রকাশ্যে দুষ্কর্ম করো।" (আনকাবুতঃ ২৯)।

৪০. সূরা হূদের ৮৭ টীকায় এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে কেবল এতটুকুন ইংগিতই যথেষ্ট যে, একথাগুলো একজন ভদ্রলোকের মুখ থেকে এমন সময় বের হয়েছে যখন তিনি একেবারেই লাচার হয়ে গিয়েছিলেন এবং বদমায়েশরা তাঁর কোন ফরিয়াদ ও আবেদন নিবেদনে কান না দিয়ে তাঁর মেহমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল।

এ সুযোগে একটি কথা পরিষ্কার করে দেয়া প্রয়োজন। সূরা হূদে ঘটনাটি যে ধারাবাহিকতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, বদমায়েশদের এ হামলার সময় পর্যন্তও হযরত লূত (আ) একথা জানতেন না যে, তাঁর মেহমানরা আসলে আল্লাহর ফেরেশতা। তখনো পর্যন্ত তিনি মনে করছিলেন, এ ছেলে কয়টি মুসাফির এবং এরা তাঁর বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বদমায়েশদের দল যখনই মেহমানদের অবস্থান স্থলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং হযরত লূত (আ) অস্থির হয়ে বলে উঠলেন,

لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ
مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً
مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ
مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ
الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾

তোমার জীবনের কসম হে নবী! সে সময় তারা যেন একটি নেশায় বিভোর হয়ে মাতালের মত আচরণ করে চলছিল।

অবশেষে প্রভাত হতেই একটি বিকট আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করলো এবং আমি সেই জনপদটি ওলট পালট করে রেখে দিলাম আর তাদের ওপর পোড়া মাটির পাথর বর্ষণ করলাম।[৪১]

প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ লোকদের জন্য এ ঘটনার মধ্যে বিরাট নিদর্শন রয়েছে। আর সেই এলাকাটি (যেখানে এটা ঘটেছিল) লোক চলাচলের পথের পাশে অবস্থিত।[৪২] ঈমানদার লোকদের জন্য এর মধ্যে শিক্ষার বিষয় রয়েছে।

আর আইকাবাসীরা[৪৩] জালেম ছিল। কাজেই দেখে নাও আমিও তাদের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছি। আর এ উভয় সম্প্রদায়ের বিরাণ এলাকা প্রকাশ্য পথের ধারে অবস্থিত।[৪৪]

(হায়, যদি আমার তোমাদের মোকাবিলা করার শক্তি থাকতো অথবা আমার সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করার মতো কোন সহায় থাকতো।) তখনই মেহমানরা নিজেদের ফেরেশতা হবার কথা প্রকাশ করলো। এরপর ফেরেশতারা তাঁকে বললো, এখন আপনি নিজের পরিবারবর্গকে নিয়ে এখান থেকে বের হয়ে যান এবং এদের সাথে বোঝাপড়া করার জন্য আমাদের ছেড়ে দেন। ঘটনাবলীর এ ধারাবাহিকতা সামনে রাখার পর কোন্ সংকটপূর্ণ অবস্থায় একেবারে লাচার হয়ে হযরত লূত (আ) একথা বলেছিলেন তা পুরোপুরি অনুমান করা যেতে পারে। ঘটনাগুলো যে ধারাবাহিকতায় সংঘটিত হয়েছিল এ সূরায় সেগুলো বর্ণনা করার সময় যেহেতু সেই ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখা হয়নি বরং যে বিশেষ দিকটি শ্রোতাদের মনে বদ্ধমূল করার জন্য এ কাহিনীটি এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে সেটিকে বিশেষভাবে সুস্পষ্ট করাই এখানে কাম্য। তাই একজন সাধারণ পাঠক এ ভুল ধারণা পোষণ করতে পারে যে, ফেরেশতারা শুরুতেই হযরত লূতের কাছে নিজেদের

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٨٠﴾ وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا
عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٨١﴾ وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ﴿٨٢﴾
فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ﴿٨٣﴾ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ
وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ ؕ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ﴿٨٥﴾

৬ রুকূ'

হিজ্‌রবাসীরাও[৪৫] রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। আমি তাদের কাছে আমার নিদর্শন পাঠাই, নিশানী দেখাই কিন্তু তারা সবকিছু উপেক্ষা করতে থাকে। তারা পাহাড় কেটে কেটে গৃহ নির্মাণ করতো এবং নিজেদের বাসস্থানে একেবারেই নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ছিল। শেষ পর্যন্ত প্রভাত হতেই একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ তাদেরকে আঘাত হানলো এবং তাদের উপার্জন তাদের কোন কাজে লাগলো না।[৪৬]

আমি পৃথিবী ও আকাশকে এবং তাদের মধ্যকার সকল জিনিসকে সত্য ছাড়া অন্য কিছুর ভিত্তিতে সৃষ্টি করিনি[৪৭] এবং ফায়সালার সময় নিশ্চিতভাবেই আসবে। কাজেই হে মুহাম্মাদ! (এই লোকদের আজেবাজে আচরণগুলোকে) ভদ্রভাবে উপেক্ষা করে যাও।

পরিচয় দিয়েছিল এবং এখন নিজের মেহমানদের ইজ্জত-আব্রু বাঁচাবার জন্য তাঁর এ সমস্ত ফরিয়াদ ও আবেদন নিবেদন নিছক নাটুকেপনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৪১. এ পোড়া মাটির পাথর বৃষ্টি হতে পারে উল্‌কাপাত ধরনের কিছু। আবার আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে তা মৃত্তিকা গর্ভ থেকে বের হয়ে তাদের ওপর চতুরদিক থেকে বৃষ্টির মত বর্ষিত হয়ে থাকতে পারে। তাছাড়া একটি মারাত্মক ধরনের ঘূর্ণি ঝড়ও তাদের ওপর এ পাথর বৃষ্টি করতে পারে।

৪২. অর্থাৎ হেজায থেকে সিরিয়া এবং ইরাক থেকে মিসর যাবার পথে এই ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকাটি পড়ে। সাধারণত বাণিজ্য যাত্রীদল এ ধ্বংসের নিদর্শনগুলো দেখে থাকে। আজো সমগ্র এলাকা জুড়ে এ ধ্বংসাবশেষগুলো ছড়িয়ে আছে। এ এলাকাটির অবস্থান লূত সাগরের (Dead sea) পূর্বে ও দক্ষিণে। বিশেষ করে এর দক্ষিণ অংশ সম্পর্কে

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي
وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا
مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ وَقُلْ
إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾

নিশ্চিতভাবে তোমার রব সবার স্রষ্টা এবং সবকিছু জানেন।[৪৮] আমি তোমাকে এমন সাতটি আয়াত দিয়ে রেখেছি, যা বারবার আবৃত্তি করার মত[৪৯] এবং তোমাকে দান করেছি মহান কুরআন।[৫০] আমি তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের দুনিয়ার যে সম্পদ দিয়েছি সেদিকে তুমি চোখ উঠিয়ে দেখো না এবং তাদের অবস্থা দেখে মনঃক্ষুণ্ণও হয়ো না।[৫১] তাদেরকে বাদ দিয়ে মুমিনদের প্রতি ঘনিষ্ঠ হও এবং (অমান্যকারীদেরকে) বলে দাও—আমিতো প্রকাশ্য সতর্ককারী।

ভূগোলবিদগণের বর্ণনা হচ্ছে, এ এলাকাটি এত বেশী বিধ্বস্ত যার নজীর দুনিয়ার আর কোথাও পাওয়া যায় না।

৪৩. অর্থাৎ হযরত শো'আয়েবের (আ) সম্প্রদায়ের লোক। এ সম্প্রদায়টির নাম ছিল বনী মাদ্‌ইয়ান। তাদের এলাকার কেন্দ্রীয় শহরেরও নাম ছিল মাদ্‌ইয়ান এবং সমগ্র এলাকাটিকেও মাদ্‌ইয়ান বলা হতো। আর "আইকা" ছিল তাবুকের প্রাচীন নাম। এ শব্দটির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ঘন জংগল। বর্তমানে একটি পাহাড়ী ঝরণার নাম আইকা। এটি জাবালে নূরে উৎপন্ন হয়ে আফাল উপত্যকায় এসে পড়ছে। (ব্যাখ্যার জন্য সূরা শূ'আরার ১১৫ টীকা দেখুন)

৪৪. মাদ্‌ইয়ান ও আইকাবাসীদের এলাকাও হেজায থেকে ফিলিস্তিন ও সিরিয়া যাবার পথে পড়ে।

৪৫. এটি ছিল সামুদ জাতির কেন্দ্রীয় শহর। মদীনার উত্তর পশ্চিমে বর্তমান আল'উলা শহরের কয়েক মাইল দূরে এ শহরটির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। মদীনা থেকে তাবুক যাবার সময় প্রধান সড়কের ওপরই এ জায়গাটি পড়ে। এ উপত্যকাটির মধ্য দিয়ে কাফেলা এগিয়ে যায়। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী কেউ এখানে অবস্থান করে না। হিজরী আট শতকে পর্যটক ইবনে বতুতা হজ্জে যাবার পথে এখানে এসে পৌঁছেন। তিনি লেখেন ঃ "এখানে লাল রংয়ের পাহাড়গুলোতে সামুদ জাতির ইমারতগুলো রয়েছে। এগুলো তারা পাহাড় কেটে কেটে তার মধ্যে নির্মাণ করেছিল। এ গৃহগুলোর কারুকাজ এখনো এমন উজ্জ্বল ও তরতাজা আছে যেন মনে হয় আজই এগুলো খোদাই করা হয়েছে। পচাগলা মানুষের হাড় এখনো এখানকার ঘরগুলোর মধ্যে পাওয়া যায়।" (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য সূরা আ'রাফের ৫৭ টীকা দেখুন)।

৪৬. অর্থাৎ তারা পাহাড় কেটে কেটে তার মধ্যে যেসব আলীশান ইমারত নির্মাণ করেছিল সেগুলো তাদেরকে কোন প্রকারে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

৪৭. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্তনা দেবার জন্য একথা বলা হচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে, বর্তমানে বাতিলের যে আপাত পরাক্রম ও বিজয় তুমি দেখতে পাচ্ছো এবং হকের পথে যেসব সমস্যা ও সংকটের মুখোমুখি তোমাকে হতে হচ্ছে এতে ভয় পেলে চলবে না। এটি একটি সাময়িক অবস্থা মাত্র। এ অবস্থা সবসময় এবং চিরকাল থাকবে না। কারণ পৃথিবী ও আকাশের সমগ্র ব্যবস্থা হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বাতিলের ওপর নয়। বিশ্ব জাহানের প্রকৃতি হকের সাথে সামঞ্জস্যশীল, বাতিলের সাথে নয়। কাজেই এখানে যদি অবস্থান ও স্থায়িত্বের অবকাশ থাকে তাহলে তা আছে হকের জন্য, বাতিলের জন্য নয়।

৪৮. অর্থাৎ স্রষ্টা হিসেবে তিনি নিজের সৃষ্টির ওপর পূর্ণ প্রভাব ও প্রতিপত্তির অধিকারী। তাঁর পাকড়াও থেকে আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা কোন সৃষ্টির নেই। আবার এই সংগে তিনি পুরোপুরি সজাগ ও সচেতনও। তুমি এদের সংশোধনের জন্য যা কিছু করছো তাও তিনি জানেন এবং যেসব চক্রান্ত দিয়ে এরা তোমার সংস্কার কার্যাবলীকে ধ্বংস করতে চাচ্ছে সেগুলো সম্পর্কেও তিনি অবগত। কাজেই তোমার ঘাবড়াবার এবং অধৈর্য হবার প্রয়োজন নেই। নিশ্চিন্ত থাকো। সময় হলে ন্যায্য বিচার করে ফায়সালা চুকিয়ে দেয়া হবে।

৪৯. অর্থাৎ সূরা ফাতিহার সাতটি আয়াত। যদিও কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন দু' দু' শো আয়াত বিশিষ্ট সাতটি বড় বড় সূরা। অর্থাৎ আল বাকারাহ, আলে ইমরান, আন নিসা, আল মায়েদাহ, আল আন'আম, আল আ'রাফ ও ইউনুস অথবা আল আনফাল ও আত্‌তাওবাহ। কিন্তু পূর্ববর্তী আলেমগণের অধিকাংশই এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে সূরা ফাতিহার কথাই বলা হয়েছে। বরং খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাতটি বারবার আবৃত্তি করার মত সূরা বলে যে সূরা ফাতিহার দিকে ইংগিত করেছেন এর প্রমাণ স্বরূপ ইমাম বুখারী দু'টি "মরফূ" হাদীসও বর্ণনা করেছেন।

৫০. একথাটিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাথিদেরকে সান্তনা দেবার জন্য বলা হয়েছে। তখন এমন একটা সময় ছিল যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাথিরা সবাই চরম দুরবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করছিলেন। নবুওয়াতের গুরু দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নেবার সাথে সাথেই নবী করীমের (সা) ব্যবসায় প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ওদিকে দশ বারো বছরের মধ্যে হযরত খাদীজার (রা) সব সম্পদও খরচ হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে কিছু উঠতি যুবক ছিলেন। তাদেরকে অভিভাবকরা ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল। কতক ছিলেন ব্যবসায়ী ও কারিগর। অনবরত অর্থনৈতিক বয়কটের আঘাতে তাদের কাজ কারবার একদম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর কতক দুর্ভাগ্য পীড়িত আগে থেকেই ছিলেন দাস বা মুক্ত দাস শ্রেণীভুক্ত। তাদের কোন অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডই ছিল না। এরপর দুর্ভাগ্যের ওপর দুর্ভাগ্য হচ্ছে এই যে, নবী (সা) সহ সমস্ত মুসলমান মক্কা ও তার চারপাশের পল্লীগুলোতে চরম নির্যাতিতের জীবন যাপন করছিলেন। তারা ছিলেন সবদিক থেকে নিন্দিত ও ধিক্কৃত। সব জায়গায় তাঁরা লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও হাসি-তামাশার খোরাক হয়েছিলেন। এই সংগে মানসিক ও আত্মিক মর্মজ্বালার সাথে সাথে তারা দৈহিক নিপীড়নের হাত থেকেও রেহাই পাননি। অন্যদিকে কুরাইশ সরদাররা

كَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩١﴾
فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ فَاصْدَعْ
بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٥﴾
الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ
أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ
السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

এটা ঠিক তেমনি ধরনের সতর্কীকরণ যেমন সেই বিভক্তকারীদের দিকে আমি পাঠিয়েছিলাম যারা নিজেদের কুরআনকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলে। [৫২] *তোমার রবের কসম, আমি অবশ্যি তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করবো, তোমরা কি কাজে নিয়োজিত ছিলে?*

কাজেই হে নবী! তোমাকে যে বিষয়ের হুকুম দেয়া হচ্ছে তা সরবে প্রকাশ্যে ঘোষণা করো এবং শিরককারীদের মোটেই পরোয়া করো না। যেসব বিদ্রূপকারী আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও ইলাহ বলে গণ্য করে তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের ব্যবস্থা করার জন্য আমিই যথেষ্ট। শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

আমি জানি, এরা তোমার সম্বন্ধে যেসব কথা বানিয়ে বলে তাতে তুমি মনে ভীষণ ব্যথা পাও। এর প্রতিকার এই যে, তুমি নিজের রবের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করতে থাকো, তাঁর সকাশে সিজ্‌দাবনত হও এবং যে চূড়ান্ত সময়টি আসা অবধারিত সেই সময় পর্যন্ত নিজের রবের বন্দেগী করে যেতে থাকো। [৫৩]

পার্থিব অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে সবরকমের সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের অধিকারী ছিল। এ অবস্থায় বলা হচ্ছে, তোমার মন হতাশাগ্রস্ত কেন? তোমাকে আমি এমন সম্পদ দান করেছি যার তুলনায় দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ তুচ্ছ। তোমার এ জ্ঞানগত ও নৈতিক সম্পদ ঈর্ষার যোগ্য, ওদের বস্তুগত সম্পদ নয়। ওরা তো নানান হারাম উপায়ে এ সম্পদ আহরণ করছে এবং নানাবিধ হারাম পথে এ উপার্জিত সম্পদ নষ্ট করছে। শেষ পর্যন্ত ওরা একদম কপর্দক শূন্য ও কাংগাল হয়ে নিজেদের রবের সামনে হাযির হবে।

৫১. অর্থাৎ তারা যে নিজেদের কল্যাণকামীকে নিজেদের শত্রু মনে করছে, নিজেদের ভ্রষ্টতা ও নৈতিক ত্রুটিগুলোকে নিজেদের গুণাবলী মনে করছে, নিজেরা এমন পথে এগিয়ে চলছে এবং নিজেদের সমগ্র জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যার নিশ্চিত পরিণাম ধ্বংস এবং যে ব্যক্তি তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ দেখাচ্ছে তার সংস্কার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম চালাচ্ছে, তাদের এ অবস্থা দেখে মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না।

৫২. সেই বিভক্তকারী দল বলতে এখানে ইহুদীদেরকে বুঝানো হয়েছে। তাদেরকে বিভক্তকারী এ অর্থে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর দীনকে বিভক্ত করে ফেলেছে। তার কিছু কথা মেনে নিয়েছে এবং কিছু কথা মেনে নেয়নি। এ ছাড়া তার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কাটছাঁট ও পরিবর্তন–পরিবর্ধন করে অসংখ্য ফের্‌কার জন্ম দিয়েছে। তাদের "কুরআন" বলতে তাওরাতকে বুঝানো হয়েছে। এ কিতাবটি তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে দেয়া হয়েছিল যেমন উম্মতে মুহাম্মাদীয়াকে কুরআন দেয়া হয়। আর এ কুরআনকে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলার কথা বলে ঠিক এমন ধরনের একটি কর্মের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যেমন সূরা আল বাকারার ৮৫ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ

তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের কিছু কথা মেনে নেবে এবং কিছু কথা অস্বীকার করবে?

তারপর যে কথা বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে আজ এই যে সতর্ক করা হচ্ছে এটা ঠিক তেমনি ধরনের সতর্কীকরণ যেমন ইতিপূর্বে ইহুদীদেরকে করা হয়েছিল,—মূলত ইহুদীদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করানোই এর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ইহুদীরা আল্লাহর পাঠানো সতর্ক সংকেত থেকে গাফেল থাকার ফলে যে পরিণামের সম্মুখীন হয়েছে তা তোমাদের চোখের সামনে রয়েছে। এখন ভেবে দেখো, তোমারাও কি এই একই পরিণাম দেখতে চাও?

৫৩. অর্থাৎ সত্যের বাণী প্রচার এবং সংস্কার প্রচেষ্টা চালাবার ক্ষেত্রে তোমাকে অশেষ কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। এগুলোর মোকাবিলা করার শক্তি তুমি একমাত্র নামায ও আল্লাহর বন্দেগী করার ক্ষেত্রে অবিচল দৃঢ়তার পথ অবলম্বন করার মাধ্যমেই অর্জন করতে পারো। এ জিনিসটি তোমার মনকে প্রশান্তিতে ভরে তুলবে, তোমার মধ্যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার জন্ম দেবে, তোমার সাহস ও হিম্মত বাড়িয়ে দেবে এবং তোমাকে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলবে যার ফলে সারা দুনিয়ার মানুষের গালিগালাজ নিন্দাবাদ ও প্রতিরোধের মুখে তুমি দৃঢ়ভাবে এমন দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকবে যার মধ্যে তোমার রবের রেজামন্দি রয়েছে।

আন্ নাহ্‌ল

১৬

নামকরণ

৬৮ আয়াতের وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ বাক্যাংশ থেকে এ নামকরণ করা হয়েছে। এও নিছক আলামত ভিত্তিক, নয়তো নাহ্‌ল বা মৌমাছি এ সূরার আলোচ্য বিষয় নয়।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য-প্রমাণ এর নাযিল হওয়ার সময়-কালের ওপর আলোকপাত করে। যেমন,

৪১ আয়াতের وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَاظُلِمُوْا বাক্যাংশ থেকে একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, এ সময় হাবশায় হিজরত অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১০৬ আয়াতের مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ বাক্য থেকে জানা যায়, এ সময় জুলুম-নিপীড়নের কঠোরতা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল এবং এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি নির্যাতনের আধিক্যে বাধ্য হয়ে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে ফেলে তাহলে তার ব্যাপারে শরীয়াতের বিধান কি হবে।

১১২-১১৪ আয়াতগুলোর - ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً ..... اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ বাক্যগুলো পরিষ্কার এদিকে ইংগিত করছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর মক্কায় যে বড় আকারের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল এ সূরা নাযিলের সময় তা শেষ হয়ে গিয়েছিল।

এ সূরার ১১৫ আয়াতটি এমন একটি আয়াত যার বরাত দেয়া হয়েছে সূরা আন'আমের ১১৯ আয়াতে। আবার সূরা আন'আমের ১৪৬ আয়াতে এ সূরার ১১৮ আয়াতের বরাত দেয়া হয়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, এ সূরা দুটির নাযিলের মাঝখানে খুব কম সময়ের ব্যবধান ছিল।

এসব সাক্ষ-প্রমাণ থেকে একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, এ সূরাটিও মক্কী জীবনের শেষের দিকে নাযিল হয়। সূরার সাধারণ বর্ণনাভংগীও একথা সমর্থন করে।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়

শিরককে বাতিল করে দেয়া, তাওহীদকে সপ্রমাণ করা, নবীর আহবানে সাড়া না দেবার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা ও উপদেশ দেয়া এবং হকের বিরোধিতা ও

তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শন করা এ সূরার মূল বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়।

আলোচনা

কোন ভূমিকা ছাড়াই আকস্মিকভাবে একটি সতর্কতামূলক বাক্যের সাহায্যে সূরার সূচনা করা হয়েছে। মক্কার কাফেররা বারবার বলতো, "আমরা যখন তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছি এবং প্রকাশ্যে তোমার বিরোধিতা করছি তখন তুমি আমাদের আল্লাহর যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছো তা আসছে না কেন?" তাদের এ কথাটি বারবার বলার কারণ ছিল এই যে, তাদের মতে এটিই ছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবী না হওয়ার সবচেয়ে বেশী সুস্পষ্ট প্রমাণ। এর জবাবে বলা হয়েছে, নির্বোধের দল, আল্লাহর আযাব তো তোমাদের মাথার ওপর একেবারে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখন তা কেন দ্রুত তোমাদের ওপর নেমে পড়ছে না এ জন্য হৈ চৈ করো না। বরং তোমরা যে সামান্য অবকাশ পাচ্ছো তার সুযোগ গ্রহণ করে আসল সত্য কথাটি অনুধাবন করার চেষ্টা করো। এরপর সংগে সংগেই বুঝাবার জন্য ভাষণ দেবার কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু একের পর এক একাধিকবার সামনে আসতে শুরু করেছে।

(১) হৃদয়গ্রাহী যুক্তি এবং জগত ও জীবনের নিদর্শনসমূহের সুস্পষ্ট সাক্ষ–প্রমাণের সাহায্যে বুঝানো হয়েছে যে, শিরক মিথ্যা এবং তাওহীদই সত্য।

(২) অস্বীকারকারীদের সন্দেহ, সংশয়, আপত্তি, যুক্তি ও টালবাহানার প্রত্যেকটির জবাব দেয়া হয়েছে।

(৩) মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরার গোয়ার্তুমি এবং সত্যের মোকাবিলায় অহংকার ও আস্ফালনের অশুভ পরিণামের ভয় দেখানো হয়েছে।

(৪) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে জীবন ব্যবস্থা এনেছেন, মানুষের জীবনে যে সব নৈতিক ও বাস্তব পরিবর্তন সাধন করতে চায় সেগুলো সংক্ষেপে কিন্তু হৃদয়গ্রাহী করে বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসংগে মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে, তারা যে আল্লাহকে. রব হিসেবে মেনে নেবার দাবী করে থাকে এটা নিছক বাহ্যিক ও অন্তসারশূন্য দাবী নয় বরং এর বেশ কিছু চাহিদাও রয়েছে। তাদের আকীদা–বিশ্বাস, নৈতিক–চারিত্রিক ও বাস্তব জীবনে এগুলোর প্রকাশ হওয়া উচিত।

(৫) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সংগী–সাথীদের মনে সাহস সঞ্চার করা হয়েছে এবং সংগে সংগে কাফেরদের বিরোধিতা, প্রতিরোধ সৃষ্টি ও জুলুম–নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মনীতি কি হতে হবে তাও বলে দেয়া হয়েছে।

আয়াত ১২৮ **সূরা আন নাহ্‌ল – মক্কী** রুকূ' ১৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١﴾ يُنَزِّلُ
الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا
أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿٢﴾ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ
تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣﴾

এসে গেছে আল্লাহর ফায়সালা।[১] এখন আর একে ত্বরান্বিত করতে বলো না। পবিত্র তিনি এবং এরা যে শিরক করছে তার উর্ধে তিনি অবস্থান করেন।[২] তিনি এ রূহকে[৩] তাঁর নির্দেশানুসারে ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার ওপর চান নাযিল করেন।[৪] (এ হেদায়াত সহকারে যে, লোকদের) "জানিয়ে দাও, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন মাবুদ নেই। কাজেই তোমরা আমাকেই ভয় করো"[৫] তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে সত্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন। এরা যে শিরক করছে তাঁর অবস্থান তার অনেক উর্ধে।[৬]

১. অর্থাৎ তা একেবারে আসন্ন হয়ে উঠেছে। তার প্রকাশ ও প্রয়োগের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। ব্যাপারটা একেবারেই অবধারিত ও সুনিশ্চিত অথবা একান্ত নিকটবর্তী এ ধারণা দেবার জন্য ব্যাক্যটি অতীতকালের ক্রিয়াপদের সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে। কিংবা কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের সবরের পেয়ালা কানায় কানায় ভরে উঠেছিল এবং শেষ ও চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময় এসে গিয়েছিল বলেই অতীতকালের ক্রিয়াপদ দ্বারা একথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন জাগে, এ "ফায়সালা" কি ছিল এবং কোন্ আকৃতিতে এসেছে? আমরা মনে করি (তবে আল্লাহই সঠিক খবর ভাল জানেন) এ ফায়সালা বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কা থেকে হিজরতকে বুঝানো হয়েছে। এ আয়াত নাযিলের কিছুদিন পরেই এ হিজরতের হুকুম দেয়া হয়। কুরআন অধ্যয়নে জানা যায়, যে সমাজে নবীর আগমন ঘটে তাদের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান একেবারে শেষ সীমানায় পৌঁছে গেলেই নবীকে হিজরতের

হুকুম দেয়া হয়। এ হুকুম উল্লেখিত সমাজের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। এরপর হয় তাদের ওপর ধ্বংসাত্মক আযাব এসে যায় অথবা নবী ও তাঁর অনুসারীদের হাত দিয়ে তাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করে দেয়া হয়। ইতিহাস থেকেও একথাই জানা যায়। হিজরত সংঘটিত হবার পর মক্কার কাফেররা মনে করলো ফায়সালা তাদের পক্ষেই হয়েছে। কিন্তু আট দশ বছরের মধ্যেই দুনিয়াবাসীরা দেখে নিল, শুধুমাত্র মক্কা থেকেই নয়, সমগ্র আরব ভূখণ্ড থেকেই শিরক ও কুফরীকে শিকড় সুদ্ধ উপড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে।

২. প্রথম বাক্য ও দ্বিতীয় বাক্যের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করার জন্য এর পটভূমি সামনে রাখা প্রয়োজন। কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বারবার চ্যালেঞ্জ দিয়ে আসছিল যে, তুমি আল্লাহর যে ফায়সালার কথা বলে আমাদের ভয় দেখিয়ে থাকো তা আসছে না কেন? তাদের এ চ্যালেঞ্জের পিছনে আসলে যে চিন্তাটি সক্রিয় ছিল তা ছিল এই যে, তাদের মুশরিকী ধর্মই সত্য এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খামাখা আল্লাহর নামে একটি ভ্রান্ত ধর্ম পেশ করছেন। আল্লাহ এ ধর্মকে অনুমোদন দান করেননি। তাদের যুক্তি ছিল, আমরা যদি আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে থাকি এবং মুহাম্মাদ (সা) তাঁর পাঠানো নবী হয়ে থাকেন তাহলে আমরা তাঁর সাথে যে ব্যবহার করছি তাতে আমাদের সর্বনাশ হওয়া উচিত ছিল না কি? কিন্তু তা হচ্ছে না, এটা কেমন করে সম্ভব? তাই আল্লাহর ফায়সালার ঘোষণা দেবার সাথে সাথেই বলা হয়েছে, এ ফায়সালার প্রয়োগ বিলম্বিত হবার যে কারণ তোমরা মনে করছো তা মোটেই সঠিক নয়। আল্লাহর সাথে কারো শরীক হবার প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর সত্তা এর অনেক উর্ধে এবং এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

৩. অর্থাৎ নবুওয়াতের রূহ। এ রূহ বা প্রাণসত্তায় উজ্জীবিত হয়েই নবী কাজ করেন ও কথা বলেন। স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক জীবনে প্রাণের যে মর্যাদা এ অহী ও নবুওয়াতী প্রাণসত্তা নৈতিক জীবনে সেই একই মর্যাদার অধিকারী। তাই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তার জন্য 'রূহ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ সত্যটি না বুঝার কারণে ঈসায়ীগণ রূহুল কুদুস (Holy Ghost)-কে তিন খোদার এক খোদা বানিয়ে নিয়েছেন।

৪. ফায়সালা কার্যকর করাবার দাবী জানিয়ে কাফেররা যে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছিল তার পেছনে যেহেতু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের অস্বীকৃতিও কার্যকর ছিল, তাই শিরক খণ্ডনের পরপরই তাঁর নবুওয়াতের সত্যতা সুদৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। তারা বলতো, এ ব্যক্তি যা বলছে, এসব মিথ্যা ও বানোয়াট। এর জবাবে আল্লাহ বলছেন, এ ব্যক্তি হচ্ছে আমার পাঠানো রূহ। এ রূহ ও প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত হয়েই সে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করছে।

তারপর তিনি যে বান্দার ওপর চান এ রূহ নাযিল করেন –একথার মাধ্যমে নবী করীমের (সা) বিরুদ্ধে উত্থাপিত কাফেরদের একটি আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। কাফেররা আপত্তি করে বলতো, আল্লাহর যদি নবী পাঠাবার দরকার হয়ে থাকে তাহলে কেবলমাত্র আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদই (সা) কি এ কাজের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছিল? মক্কা ও তায়েফের সমস্ত বড় বড় সরদাররা কি মরে গিয়েছিল? তাদের কারোর ওপর আল্লাহর দৃষ্টি পড়েনি? এ ধরনের অর্থহীন ও অযৌক্তিক আপত্তির জবাব এ ছাড়া আর কি হতে পারতো? এ কারণেই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এর এ জবাব দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে,

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٤﴾ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ
لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ
حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ
لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ
رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا
لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ
لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ছোট্ট একটি ফোঁটা থেকে। তারপর দেখতে দেখতে সে এক কলহপ্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে।[৭] তিনি পশু সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য পোশাক, খাদ্য এবং অন্যান্য নানাবিধ উপকারিতাও। তাদের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য সৌন্দর্য যখন সকালে তোমরা তাদেরকে চারণভূমিতে পাঠাও এবং সন্ধ্যায় তাদেরকে ফিরিয়ে আনো। তারা তোমাদের জন্য বোঝা বহন করে এমন সব জায়গায় নিয়ে যায় যেখানে তোমরা কঠোর প্রাণান্ত পরিশ্রম না করে পৌঁছুতে পারো না। আসলে তোমার রব বড়ই স্নেহশীল ও করুণাময়। তোমাদের আরোহণ করার এবং তোমাদের জীবনের শোভা-সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। তিনি (তোমাদের উপকারার্থে) আরো অনেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন, যেগুলো তোমরা জানোই না।[৮] আর যেখানে বাঁকা পথও রয়েছে সেখানে সোজা পথ দেখাবার দায়িত্ব আল্লাহর ওপরই বর্তেছে।[৯] তিনি চাইলে তোমাদের সবাইকে সত্য-সোজা পথে পরিচালিত করতেন।[১০]

আল্লাহ নিজের কাজ সম্পর্কে নিজেই অবগত আছেন। তাঁর কাজের ব্যাপারে তোমাদের কাছ থেকে তাঁর পরামর্শ নেবার প্রয়োজন নেই। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে যাকেই সংগত মনে করেন নিজের কাজের জন্য নির্বাচিত করে নেন।

৫. এই বাক্যের মাধ্যমে এ সত্যটি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে যে, নবুওয়াতের রূহ যেখানেই যে ব্যক্তির ওপর অবতীর্ণ হয়েছে সেখানেই তিনি এ একটিই দাওয়াত নিয়ে এসেছেন যে, সার্বভৌম কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত এবং একমাত্র তাঁকেই

ভয় করতে হবে, তিনি একাই এর হকদার। তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় এমন কোন সত্তা নেই যার অসন্তুষ্টির ভয়, যার শাস্তির আশংকা এবং যার নাফরমানির অশুভ পরিণামের আতংক মানবিক চরিত্র ও নৈতিকতার নিয়ন্ত্রক এবং মানবিক চিন্তা ও কর্মের সমগ্র ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

৬. অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর নবী যে শির্‌ক পরিহার করার এবং তাওহীদ বিশ্বাসী হবার দাওয়াত দেন, পৃথিবী ও আকাশের সমগ্র সৃষ্টি কারখানাই তার সাক্ষ দিয়ে চলছে। এ কারখানা কোন কাল্পনিক গোলক ধাঁধা নয় বরং একটি পুরোপুরি বাস্তব সত্য ব্যবস্থা। এর যেদিকে ইচ্ছা তাকিয়ে দেখো কোথাও থেকে শির্‌কের সাক্ষ–প্রমাণ পাওয়া যাবে না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর সার্বভৌম কর্তৃত্ব কোথাও প্রতিষ্ঠিত দেখা যাবে না। কোন বস্তুর গঠন প্রণালী একথা প্রমাণ করবে না যে, তার অস্তিত্ব অন্য কারোর দান। কাজেই যেখানে এ বাস্তব সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা নির্ভেজাল তাওহীদের নীতিতে পরিচালিত হচ্ছে সেখানে তোমার এ শির্‌কের চিন্তাধারা—যার মধ্যে ধারণা ও অনুমান ছাড়া বাস্তব সত্যের গন্ধমাত্রও নেই—কোথায় জারী হতে পারে? এরপর বিশ্বজগতের নিদর্শনাবলী এবং স্বয়ং মানুষের নিজের অস্তিত্ব থেকে এমন সব সাক্ষ–প্রমাণ পেশ করা হয় যা একদিকে তাওহীদ এবং অন্যদিকে রিসালাতের প্রমাণ পেশ করে।

৭. এর দুই অর্থ হতে পারে এবং সম্ভবত এখানে এ দুই অর্থই প্রযোজ্য। একটি অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহ একটি তুচ্ছ শুক্রবিন্দু থেকে এমন মানুষ তৈরী করেছেন যে বিতর্ক ও যুক্তি প্রদর্শন করার যোগ্যতা রাখে এবং নিজের বক্তব্য ও দাবীর পক্ষে সাক্ষ–প্রমাণ পেশ করতে পারে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, যে মানুষকে আল্লাহ শুক্রবিন্দুর মত নগণ্য জিনিস থেকে তৈরী করেছেন তার অহংকারের বাড়াবাড়িটা দেখো, সে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার মোকাবিলায় নিজেকে পেশ করার জন্য বিতর্কে নেমে এসেছে। প্রথম অর্থটির প্রেক্ষিতে সামনের দিকে একের পর এক কয়েকটি আয়াতে যে দলীল পেশ করা হয়েছে এ আয়াতটি তারই একটি সূত্র। (এ বর্ণনা ধারার শেষ পর্যায়ে আমরা এর ব্যাখ্যা করবো) আর দ্বিতীয় অর্থটির প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি মানুষকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয় যে, বড় বড় বুলি আওড়ানোর আগে নিজের সত্তার দিকে একবার তাকাও। কোন্ আকারে কোথা থেকে বের হয়ে তুমি কোথায় এসে পৌছেছো? কোথায় তোমার প্রতিপালনের সূচনা হয়েছিল? তারপর কোন্ পথ দিয়ে বের হয়ে তুমি দুনিয়ায় এসেছো? তারপর কোন্ কোন্ পর্যায় অতিক্রম করে তুমি যৌবন বয়সে পৌছেছো এবং এখন নিজেকে বিস্মৃত হয়ে কার মুখের ওপর কথার তুবড়ি ছোটাচ্ছো?

৮. অর্থাৎ বিপুল পরিমাণ জিনিস এমন আছে যা মানুষের উপকার করে যাচ্ছে। অথচ কোথায় কত সেবক তার সেবা করে যাচ্ছে এবং কি সেবা করছে সে সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না।

৯. তাওহীদ, রহমত ও রবুবীয়াতের যুক্তি পেশ করতে গিয়ে এখানে ইংগিতে নবুওয়াতের পক্ষেও একটি যুক্তি পেশ করা হয়েছে। এ যুক্তির সংক্ষিপ্তসার হচ্ছেঃ

দুনিয়ায় মানুষের জন্য চিন্তা ও কর্মের অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন পথ থাকা সম্ভব এবং কার্যত আছেও। এসব পথ তো আর একই সংগে সত্য হতে পারে না। সত্য একটিই এবং যে জীবনাদর্শটি এ সত্য অনুযায়ী গড়ে ওঠে সেটিই একমাত্র সত্য জীবনাদর্শ। অন্যদিকে

কর্মেরও অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন পথ থাকা সম্ভব এবং এ পথগুলোর মধ্যে যেটি সঠিক জীবনাদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় সেটিই একমাত্র সঠিক পথ।

এ সঠিক আদর্শ ও সঠিক কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। বরং এটিই তার আসল মৌলিক প্রয়োজন। কারণ অন্যান্য সমস্ত জিনিস তো মানুষের শুধুমাত্র এমন সব প্রয়োজন পূর্ণ করে যা একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রাণী হওয়ার কারণে তার জন্য অপরিহার্য হয়। কিন্তু এ একটিমাত্র প্রয়োজন শুধুমাত্র মানুষ হবার কারণে তার জন্য অপরিহার্য হয়। এটি যদি পূর্ণ না হয় তাহলে এর মানে দাঁড়ায় এই যে, মানুষের সমস্ত জীবনটাই নিষ্ফল ও ব্যর্থ হয়ে গেছে।

এখন ভেবে দেখো, যে আল্লাহ তোমাদের অস্তিত্বদান করার আগে তোমাদের জন্য এতসব সাজ সরঞ্জাম প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং যিনি অস্তিত্ব দান করার পর তোমাদের প্রাণী-জীবনের প্রত্যেকটি প্রয়োজন পূর্ণ করার এমন সূক্ষ্ম ও ব্যাপকতর ব্যবস্থা করেছেন, তোমরা কি তাঁর কাছে এটা আশা করো যে, তিনি তোমাদের মানবিক জীবনের এই সবচেয়ে বড় ও আসল প্রয়োজনটি পূর্ণ করার ব্যবস্থা না করে থাকবেন?

নবুওয়াতের মাধ্যমে এ ব্যবস্থাটিই তো করা হয়েছে। যদি তুমি নবুওয়াত না মানো তাহলে বলো তোমার মতে মানুষের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ অন্য কি ব্যবস্থা করেছেন? এর জবাবে তুমি একথা বলতে পারো না যে, পথের সন্ধান করার জন্য আল্লাহ আমাদের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি দিয়ে রেখেছেন। কারণ মানবিক বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি ইতিপূর্বেই এমন অসংখ্য পথ উদ্ভাবন করে ফেলেছে যা তার সত্য-সরল পথের সঠিক উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তার ব্যর্থতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আবার তুমি একথাও বলতে পারো না যে, আল্লাহ আমাদের পথ দেখাবার কোন ব্যবস্থা করেননি। কারণ আল্লাহর ব্যাপারে এরচেয়ে বড় আর কোন কুধারণা হতেই পারে না যে, প্রাণী হবার দিক দিয়ে তোমাদের প্রতিপালন ও বিকাশ লাভের এতসব বিস্তারিত ও পূর্ণাংগ ব্যবস্থা তিনি করে রেখেছেন অথচ মানুষ হবার দিক দিয়ে তোমাদের একেবারে অন্ধকারের বুকে পথ হারিয়ে উদভ্রান্তের মতো ছুটে বেড়াবার ও পদে পদে ঠোকর খাবার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। (আরো বেশী জানার জন্য সূরা আর রহমানের ২-৩ টীকা দেখুন)।

১০. অর্থাৎ যদিও আল্লাহ সমস্ত মানুষকে অন্যান্য সকল ক্ষমতাসীন সৃষ্টির মতো জন্মগতভাবে সঠিক পথে পরিচালিত করে নিজের এ দায়িত্বটি (যা তিনি মানুষকে পথ দেখাবার জন্য নিজেই নিজের ওপর আরোপ করে নিয়েছিলেন) পালন করতে পারতেন। কিন্তু এটি তিনি চাননি। তিনি চেয়েছিলেন এমন একটি স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন সৃষ্টির উদ্ভব ঘটানো যে নিজের পছন্দ ও যাছ-বিচারের মাধ্যমে সঠিক ও ভ্রান্ত সব রকমের পথে চলার স্বাধীনতা রাখে। এ স্বাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করার জন্য তাকে জ্ঞানের উপকরণ, বুদ্ধি ও চিন্তার যোগ্যতা এবং ইচ্ছা ও সংকল্পের শক্তি দান করা হয়েছে। তাকে নিজের ভিতরের ও বাইরের অসংখ্য জিনিস ব্যবহার করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।। তার ভিতরে ও বাইরে সবদিকে এমন সব অসংখ্য কার্যকারণ ছড়িয়ে রাখা হয়েছে যা তার জন্য সঠিক পথ পাওয়া ও ভুল পথে পরিচালিত হওয়া উভয়টিরই কারণ হতে পারে। যদি তাকে জন্মগতভাবে

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ
فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ﴿١٠﴾ يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ
وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ
يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١١﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۭ
وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿١٢﴾
وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً
لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾

২ রুকূ'

তিনিই আকাশ থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেন, যা পান করে তোমরা নিজেরাও পরিতৃপ্ত হও এবং যার সাহায্যে তোমাদের পশুদের জন্যও খাদ্য উৎপন্ন হয়। এ পানির সাহায্যে তিনি শস্য উৎপন্ন করেন এবং জয়তুন, খেজুর, আংগুর ও আরো নানাবিধ ফল জন্মান। এর মধ্যে যারা চিন্তা-ভাবনা করে তাদের জন্য রয়েছে একটি বড় নিদর্শন।

তিনি তোমাদের কল্যাণের জন্য রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে বশীভূত করে রেখেছেন এবং সমস্ত তারকাও তাঁরই হুকুমে বশীভূত রয়েছে। যারা বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগায় তাদের জন্য রয়েছে এর মধ্যে প্রচুর নিদর্শন। আর এই যে বহু রং বেরংয়ের জিনিস তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করে রেখেছেন এগুলোর মধ্যেও অবশ্যি নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

সঠিক পথানুসারী করে দেয়া হতো তাহলে এসবই অর্থহীন হয়ে যেতো এবং উন্নতির এমন সব উচ্চতম পর্যায়ে পৌছানো মানুষের পক্ষে কখনো সম্ভব হতো না, যা কেবলমাত্র স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমেই মানুষ লাভ করতে পারে। তাই মহান আল্লাহ মানুষকে পথ দেখাবার জন্য জোরপূর্বক সঠিক পথে পরিচালিত করার পদ্ধতি পরিহার করে রিসালাতের পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এভাবে মানুষের স্বাধীনতা যেমন অক্ষুণ্ন থাকবে, তেমনি তার পরীক্ষার উদ্দেশ্যও পূর্ণ হবে এবং সত্য-সরল পথ ও সর্বোত্তম যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে তার সামনে পেশ করে দেয়া যাবে।

وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ
حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٤﴾ وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ
وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥﴾ وَعَلٰمٰتٍ ۗ وَبِالنَّجْمِ هُمْ
يَهْتَدُوْنَ ﴿١٦﴾

তিনিই তোমাদের জন্য সাগরকে করায়ত্ব করে রেখেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তরতাজা গোশ্ত নিয়ে খাও এবং তা থেকে এমন সব সৌন্দর্য সামগ্রী আহরণ করো যা তোমরা অংগের ভূষণরূপে পরিধান করে থাকো। তোমরা দেখছো, সমুদ্রের বুক চিরে নৌযান চলাচল করে। এসব এ জন্য, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো[১১] এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো।

তিনি পৃথিবীতে পাহাড়সমূহ গেঁড়ে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে হেলে না পড়ে।[১২] তিনি নদী প্রবাহিত করেছেন এবং প্রাকৃতিক পথনির্মাণ করেছেন,[১৩] যাতে তোমরা গন্তব্যে পৌঁছতে পারো। তিনি ভূপৃষ্ঠে পথনির্দেশক চিহ্নসমূহ রেখে দিয়েছেন[১৪] এবং তারকার সাহায্যেও মানুষ পথনির্দেশ পায়।[১৫]

১১. অর্থাৎ হালাল পথে নিজের রিযিক সংগ্রহ করার চেষ্টা করো।

১২. এ থেকে জানা যায়, ভূপৃষ্ঠে পর্বত শ্রেণী স্থাপনের উপকারিতা হচ্ছে, এর ফলে পৃথিবীর আবর্তন ও গতি সুষ্ঠু ও সুশৃংখল হয়। কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় পাহাড়ের এ উপকারিতা সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, পাহাড়ের অন্য যে সমস্ত উপকারিতা আছে সেগুলো একেবারেই গৌণ। মূলত মহাশূন্যে আবর্তনের সময় পৃথিবীকে আন্দোলিত হওয়া থেকে রক্ষা করাই ভূপৃষ্ঠে পাহাড় স্থাপন করার মুখ্য উদ্দেশ্য।

১৩. অর্থাৎ নদ–নদীর সাথে যে পথ তৈরী হয়ে যেতে থাকে। বিশেষ করে পার্বত্য এলাকাসমূহে এসব প্রাকৃতিক পথের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। অবশ্যি সমতল ভূমিতেও এগুলোর গুরুত্ব কম নয়।

১৪. অর্থাৎ আল্লাহ সমগ্র পৃথিবীটাকে একই ধারায় সৃষ্টি করেননি। বরং প্রত্যেকটি এলাকাকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট দ্বারা চিহ্নিত করেছেন। এর অন্যান্য বিভিন্ন উপকারিতার মধ্যে একটি অন্যতম উপকারিতা হচ্ছে এই যে, মানুষ নিজের পথ ও গন্তব্য আলাদাভাবে চিনে নেয়। এ নিয়ামতের মর্যাদা মানুষ তখনই অনুধাবন করতে পারে যখন ঘটনাক্রমে এমন

কোন বালুকাময় মরু প্রান্তরে তাকে যেতে হয় যেখানে এ ধরনের বৈশিষ্টমূলক চিহ্নের প্রায় কোন অস্তিত্বই থাকে না এবং মানুষ প্রতি মুহূর্তে পথ হারিয়ে ফেলার ভয় করতে থাকে। সামুদ্রিক সফরে মানুষ এর চেয়ে আরো বেশী মারাত্মকভাবে এ বিরাট নিয়ামতটি অনুভব করতে থাকে। কারণ সেখানে পথের নিশানী প্রায় একেবারেই থাকে না। কিন্তু মরুভূমি ও সমুদ্রের বুকেও আল্লাহ মানুষের পথ দেখাবার জন্য একটি প্রাকৃতিক ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সেখানে প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্তও মানুষ তারকার সাহায্যে পথের সন্ধান করে আসছে।

এখানে আবার তাওহীদ, রহমত ও রবুবীয়াতের যুক্তির মাঝখানে রিসালাতের যুক্তির দিকে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত করা হয়েছে। এ স্থানটি পড়তে গিয়ে মন আপনা আপনি এই বিষয়বস্তুর প্রতি নিবিষ্ট হয়ে যায় যে, যে আল্লাহ তোমাদের বস্তুগত জীবনে পথনির্দেশনার জন্য এতসব ব্যবস্থা করে রেখেছেন তিনি কি তোমাদের নৈতিক জীবনের ব্যাপারে এতই বেপরোয়া হয়ে যেতে পারেন যে, এখানে তোমাদের পথ দেখাবার কোন ব্যবস্থাই করবেন না? একথা সুস্পষ্ট, বস্তুগত জীবনে পথভ্রষ্ট হবার সবচেয়ে বড় ক্ষতি নৈতিক জীবনে পথভ্রষ্ট হবার ক্ষতির তুলনায় অতি সামান্যই বিবেচিত হয়। এ ক্ষেত্রে বলা যায়, মহান করুণাময় রব যখন আমাদের বৈষয়িক জীবনকে সহজ ও সফল করার জন্য পাহাড়ের মধ্যে আমাদের জন্য পথ তৈরী করেন, সমতল ক্ষেত্রে পথের চিহ্ন স্থাপন করেন, মরুভূমি ও সাগরের বুকে আমাদের দিকনির্দেশনার জন্য আকাশে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখেন তখন তাঁর সম্পর্কে আমরা কেমন করে এ কুধারণা পোষণ করতে পারি যে, তিনি আমাদের নৈতিক সাফল্য ও কল্যাণের জন্য কোন পথই তৈরী করেননি, সেই পথকে সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য কোন চিহ্নও দাঁড় করাননি এবং তাকে পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেবার জন্য কোন উজ্জ্বল প্রদীপও জ্বালাননি?

১৫. এ পর্যন্ত বিশ্বজাহান ও প্রাণী জগতের বহু নিশানী একের পর এক বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ তার নিজের সত্তা থেকে নিয়ে আসমান ও যমীনের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সর্বত্রই যেদিকে চায় দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখুক, সেখানে প্রত্যেকটি জিনিসই নবীর বর্ণনার সত্যতা প্রমাণ করছে এবং কোথাও থেকেও শিরক ও নাস্তিক্যবাদের সমর্থনে একটি সাক্ষ–প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে না। এই যে তিনি নগণ্য একটি ফোঁটা থেকে বাকশক্তিসম্পন্ন এবং যুক্তি–প্রমাণ উপস্থাপন করে বিতর্ককারী মানুষ তৈরী করেছেন, তার প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করার জন্য এমন বহু জীব–জানোয়ার সৃষ্টি করেছেন যাদের চুল, চামড়া, রক্ত, দুধ, গোশ্‌ত ও পিঠের মধ্যে মানবিক প্রকৃতির বহুতর চাহিদা এমনকি তার সৌন্দর্যপ্রিয়তার দাবী পূরণেরও উপাদান রয়ে গেছে। এই যে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করার এবং ভূপৃষ্ঠে নানা জাতের ফুল, ফল, শস্য ও উদ্ভিদ উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছেন, যার অসংখ্য বিভাগ পরস্পরের সাথে মিলেমিশে অবস্থান করে এবং সেগুলো মানুষের প্রয়োজনও পূর্ণ করে। এ রাত ও দিনের নিয়মিত আসা যাওয়া এবং চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজির চরম নিয়ন্ত্রিত ও সুশৃংখল আবর্তন, পৃথিবীর উৎপন্ন ফসল ও মানুষের জীবন–জীবিকার সাথে যার গভীরতম সম্পর্ক বিদ্যমান। এই যে পৃথিবীতে সমুদ্রের অস্তিত্ব এবং তার মধ্যে মানুষের বহু প্রাকৃতিক ও সৌন্দর্য প্রীতির চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা রয়েছে। এই যে পানির কতিপয় বিশেষ আইনের শৃংখলে বাঁধা থাকা এবং তারপর

أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ
اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ
وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا
وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ ۙ أَيَّانَ
يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾

তাহলে ভেবে দেখতো যিনি সৃষ্টি করেন এবং যে কিছুই সৃষ্টি করে না তারা উভয় কি সমান?[১৬] তোমরা কি সজাগ হবে না? যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গুণতে চাও তাহলে গুণতে পারবে না। আসলে তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[১৭] অথচ তিনি তোমাদের প্রকাশ্যও জানেন এবং গোপনও জানেন।[১৮]

আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য যেসব সত্তাকে লোকেরা ডাকে তারা কোন একটি জিনিসেরও স্রষ্টা নয় বরং তারা নিজেরাই সৃষ্টি। তারা মৃত, জীবিত নয় এবং তারা কিছুই জানেনা তাদেরকে কবে (পুনর্বার জীবিত করে) উঠানো হবে।[১৯]

তার এ উপকারিতা যে মানুষ সমুদ্রের মতো ভয়াবহ বস্তুর বুক চিরে তার মধ্যে নিজের জাহাজ চালায় এবং দেশ থেকে দেশান্তরে সফর ও বাণিজ্য করে। এই যে পৃথিবীর বুকে উঁচু উঁচু পাহাড়ের সারি এবং মানুষের অস্তিত্বের জন্য তাদের অপরিহার্যতা। এই যে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে অসীম মহাশূন্যের বুক পর্যন্ত অসংখ্য চিহ্ন ও বিশেষ নিশানীর বিস্তার এবং তারপর এসব মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকা। এসব জিনিসই পরিষ্কার সাক্ষ দিচ্ছে যে, একটি সত্তাই এ পরিকল্পনা তৈরী করেছেন। তিনি একাই নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী এসবের ডিজাইন তৈরী করেছেন। তিনিই এ ডিজাইন অনুযায়ী তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই প্রতি মুহূর্তে এ দুনিয়ায় নিত্য নতুন জিনিস তৈরী করে করে এমনভাবে সামনে আনছেন যার ফলে সমগ্র পরিকল্পনা ও তার নিয়ম-শৃংখলায় সামান্যতম ফারাকও আসছে না। আর তিনি একাই পৃথিবী থেকে নিয়ে আকাশ পর্যন্ত এ সুবিশাল কারখানাটি চালাচ্ছেন। একজন নির্বোধ বা হঠকারী ছাড়া আর কে-ইবা একথা বলতে পারে যে, এসব কিছুই একটি আকস্মিক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়? অথবা এ চরম সুশৃংখল, সুসংবদ্ধ ও ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্বজাহানের বিভিন্ন কাজ বা বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন খোদার সৃষ্ট এবং বিভিন্ন খোদার পরিচালনাধীন?

১৬. অর্থাৎ যদি তোমরা একথা মানো (যেমন বাস্তবে মক্কার কাফেররাও এবং দুনিয়ার অন্যান্য মুশরিকরাও মানতো) যে, একমাত্র আল্লাহই সব কিছুর স্রষ্টা এবং এ বিশ্বজগতে তোমাদের উপস্থাপিত শরীকদের একজনও কোন কিছুই সৃষ্টি করেনি, তাহলে স্রষ্টার সৃষ্টি করা ব্যবস্থায় অস্রষ্টাদের মর্যাদা কেমন করে স্রষ্টার সমান অথবা কোনভাবেই তাঁর মতো

হতে পারে? নিজের সৃষ্ট জগতে স্রষ্টা যেসব ক্ষমতা-ইখ্‌তিয়ারের অধিকারী অ-স্রষ্টারাও তার অধিকারী হবে এবং স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিলোকের ওপর যেসব অধিকার রাখেন অ-স্রষ্টারাও তাই রাখবে, এটা কেমন করে সম্ভব? স্রষ্টা ও অ-স্রষ্টার গুণাবলী একই রকম হবে অথবা তারা একই প্রজাতিভুক্ত হবে, এমনকি তাদের মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক হবে, এটা কেমন করে কল্পনা করা যেতে পারে?

১৭. প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যের মধ্যে একটি বিরাট অকথিত কাহিনী রয়ে গেছে, যা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণ হচ্ছে, সেটি এতই সুস্পষ্ট যে, এখানে তার জের টানার কোন প্রয়োজন নেই। তার প্রতি এ সামান্যমাত্র ইংগিত করে দেয়াই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে, আল্লাহর অপরিসীম অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করার পরপরই তাঁর ক্ষমাশীল ও করুণাময় হবার কথা উল্লেখ করতে হবে। এ থেকে জানা যায়, যে মানুষের সমগ্র সত্তা ও সারাটা জীবন আল্লাহর অনুগ্রহের সূতোয় বাঁধা সে কেমন সব অকৃতজ্ঞতা, অবিশ্বস্ততা, বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহাত্মক আচরণের মাধ্যমে নিজের উপকারীর উপকার ও অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহের জবাব দিয়ে যাচ্ছে? অন্যদিকে তার এ উপকারী ও অনুগ্রহদাতা এমন ধরনের করুণাশীল ও সহিষ্ণু যে, এমন সব কার্যকলাপের পরও তিনি বছরের পর বছর একজন অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে এবং শত শত বছর একটি বিদ্রোহী ও নাফরমান জাতিকে নিজের অনুগ্রহদানে আপ্লুত করে চলেছেন। এখানে দেখা যাবে, এক ব্যক্তি প্রকাশ্যে স্রষ্টার অস্তিত্বই অস্বীকার করে এবং তারপরও তার প্রতি প্রবল ধারায় অনুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে। অন্যদিকে আবার এক ব্যক্তি স্রষ্টার সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকার সব কিছুতেই অ-স্রষ্টা সত্তাদেরকে শরীক করে চলছে এবং দানের জন্য দানকারীর পরিবর্তে অ-দানকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে এরপরও এখানে দেখা যাবে দাতা-হস্ত দান করতে বিরত হচ্ছে না। এখানে এ দৃশ্যও দেখা যাবে যে, এক ব্যক্তি স্রষ্টাকে স্রষ্টা ও অনুগ্রহদাতা হিসেবে মেনে নেয়ার পরও তাঁর মোকাবিলায় বিদ্রোহ ও নাফরমানী করা নিজের অভ্যাসে পরিণত এবং তাঁর আনুগত্যের শৃংখল গলায় থেকে নামিয়ে দেয়াকে নিজের নীতি ও বিধি হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং এরপরও সারাজীবন স্রষ্টার অপরিসীম অনুগ্রহের ধারায় সে আপ্লুত হয়ে চলেছে।

১৮. অর্থাৎ আল্লাহকে অস্বীকার এবং শিরক ও গোনাহের কাজ করা সত্ত্বেও আল্লাহর অনুগ্রহের সিলসিলা বন্ধ না হওয়ার কারণ আল্লাহ লোকদের কার্যকলাপের কোন খবর রাখেন না,—কোন নির্বোধ যেন একথা মনে না করে বসে। এটা অজ্ঞতার কারণে আন্দাজে ভাগ বাঁটোয়ারা করার বা ভুলে কাউকে দান করে দেবার ব্যাপার নয়। এটা তো সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার ব্যাপার। অপরাধীদের গোপন ভেদ বরং তাদের মনের গহনে লুকিয়ে থাকা সংকল্পগুলোর বিস্তারিত চেহারা জানার পরও এ ধরনের সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা প্রদর্শন করা হচ্ছে। এটা এমন পর্যায়ের সৌজন্য, দানশীলতা ও ঔদার্য যে একমাত্র রব্বুল আলামীনের পক্ষেই এটা শোভা পায়।

১৯. এ শব্দগুলো পরিষ্কার একথা ঘোষণা করছে যে, এখানে বিশেষভাবে যেসব বানোয়াট মাবুদদের প্রতিবাদ করা হচ্ছে তারা ফেরেশতা, জিন, শয়তান বা কাঠ-পাথরের মূর্তি নয় বরং তারা হচ্ছে কবরবাসী। কারণ ফেরেশতা ও শয়তানরা তো জীবিত আছে, তাদের প্রতি اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ (জীবিত নয় মৃত) শব্দাবলী প্রযোজ্য হতে পারে না। আর

إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ
وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوا
أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ
أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٢٥﴾

৩ রুকূ'

এক ইলাহই তোমাদের আল্লাহ। কিন্তু যারা আখেরাত মানে না তাদের অন্তরে অস্বীকৃতি বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং তারা অহংকারে ডুবে গেছে।[২০] নিসন্দেহে আল্লাহ তাদের সমস্ত কার্যকলাপ জানেন, যা তারা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে। তিনি তাদেরকে মোটেই পছন্দ করেন না যারা আত্মগরিমায় ডুবে থাকে।

আর[২১] যখন কেউ তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের রব এ কী জিনিস নাযিল করেছেন? তারা বলে, "জ্বী, ওগুলো তো আগের কালের বস্তাপচা গপ্‌পো।"[২২] এসব কথা তারা এজন্য বলছে যে, কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের বোঝা পুরোপুরি উঠাবে আবার সাথে সাথে তাদের বোঝাও কিছু উঠাবে যাদেরকে তারা অজ্ঞতার কারণে পথভ্রষ্ট করছে। দেখো, কেমন কঠিন দায়িত্ব, যা তারা নিজেদের মাথায় নিয়ে নিচ্ছে।

কাঠ–পাথরের মূর্তির ক্ষেত্রে তো মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই مَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (তারা জানে না তাদের কবে পুনরুজ্জীবিত করা হবে) ধরনের শব্দাবলীর ব্যবহার তাদেরকেও আলোচনার বাইরে রেখে দেয়। এখন এ আয়াতে الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ (আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য যেসব সত্তাকে লোকেরা ডাকে) এর মধ্যে নিশ্চিতভাবে নবী, আউলিয়া, শহীদ, সৎ ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্য অসাধারণ লোকদের কথাই বলা হয়েছে। অতি ভক্তের দল এসব সত্তাকে সংকট নিরসনকারী, অভিযোগের প্রতিকারকারী, দরিদ্রের সহায়, ধনদাতা এবং নাজানি আরো কত কিছু মনে করে নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ডাকতে থাকে। এর জবাবে যদি কেউ বলেন, আরবে এ ধরনের মাবুদ বা দেব–দেবী পাওয়া যেতো না তাহলে আমি বলবো এটা তার আরবীয় জাহেলিয়াতের ইতিহাস না জানার প্রমাণ। লেখাপড়া জানা লোকদের কে–ইবা একথা জানে না যে, বারী'আহ, কাল্‌ব, তাগ্‌লাব, কুদা'আহ, কিনানাহ, হার্‌স, কা'ব, কিন্‌দাহ ইত্যাদি বহু আরব গোত্রে বিপুল সংখ্যক খৃষ্টান ও ইহুদী ছিল। আর এ দু'টি

قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ
فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ
لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ
الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ۭ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ
الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْۗءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝

৪ রুকূ'

তাদের আগেও বহু লোক (সত্যকে খাটো করে দেখাবার জন্য) এমনি ধরনের চক্রান্ত করেছিল। তবে দেখে নাও, আল্লাহ তাদের চক্রান্তের ইমারত সমূলে উৎপাটিত করেছেন এবং তার ছাদ ওপর থেকে তাদের মাথার ওপর ধ্বসে পড়ছে এবং এমন দিক থেকে তাদের ওপর আযাব এসেছে যেদিক থেকে তার আসার কোন ধারণাই তাদের ছিল না। তারপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং তাদেরকে বলবেন, "বলো, এখন কোথায় গেলো আমার সেই শরীকরা যাদের জন্য তোমরা (সত্যপন্থীদের সাথে) ঝগড়া করতে?"—যারা[২৩] দুনিয়ায় জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিল তারা বলবে, "আজ কাফেরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা ও দুর্ভাগ্য।"

ধর্মের লোকেরা ব্যাপকভাবে নবী, আউলিয়া ও শহীদদের পূজা করতো। তাছাড়া মৃত লোকরাই ছিল আরব মুশরিকদের অধিকাংশের না হলেও বহু লোকের উপাস্য। পরবর্তী প্রজন্ম পূর্ববর্তী মৃত লোকদেরকে নিজেদের খোদা বানিয়ে নিয়েছিল। ইমাম বুখারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ ওয়াদ্দা, সুওয়া, ইয়াগূস, ইয়াউক, নাস্‌র—এগুলো ছিল পূর্বকালের সৎলোকদের নাম। পরবর্তীকালের লোকেরা তাদের দেব মূর্তি নির্মাণ করে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ ইসাফ ও নায়েলাহ উভয়ই মানুষ ছিল। এ ধরনের বর্ণনা লাত, মানাত ও উয্‌যা সম্পর্কেও পাওয়া যায়। হাদীসে মুশরিকদের এ আকীদাও বর্ণিত হয়েছে যে, লাত ও উয্‌যা আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ফলে তিনি শীতকালটি লাতের কাছে এবং গ্রীষ্মকালটি উয্‌যার কাছে কাটাতেন। سُبْحٰنَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ (আল্লাহর প্রতি তারা যে দোষারোপ করে তা থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র)।

২০. অর্থাৎ আখেরাত অস্বীকৃতি তাদেরকে এতই দায়িত্বহীন, বেপরোয়া ও পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসে মত্ত করে দিয়েছে যে এখন যে কোন সত্য অস্বীকার করতে তারা কুণ্ঠিত হয় না। তাদের কাছে কোন সত্যের কদর নেই। তারা নিজেরা কোন নৈতিক বাঁধন

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۠ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا
نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ۭ بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ فَادْخُلُوْٓا
اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝

হ্যাঁ,[২৪] এমন কাফেরদের জন্য, যারা নিজেদের ওপর জুলুম করতে থাকা অবস্থায় যখন ফেরেশতাদের হাতে পাকড়াও হয়[২৫] তখন সংগে সংগেই (অবাধ্যতা ত্যাগ করে) আত্মসমর্পণ করে এবং বলে, "আমরা তো কোন দোষ করছিলাম না।" ফেরেশতারা জবাব দেয়, "কেমন করে দোষ করছিলে না! তোমাদের কার্যকলাপ আল্লাহ খুব ভালো করেই জানেন। এখন যাও, জাহান্নামের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ো, ওখানেই তোমাদের থাকতে হবে চিরকাল।"[২৬] সত্য বলতে কি, অহংকারীদের এই ঠিকানা বড়ই নিকৃষ্ট।

মেনে চলতে প্রস্তুত নয়। তারা যে পথে চলছে সেটি সত্য ও ন্যায়সঙ্গত কিনা এ বিষয়টি অনুসন্ধান করে দেখা ও বিচার-বিশ্লেষণ করার কোন পরোয়াই তাদের নেই।

২১. এখান থেকে ভাষণের মোড় অন্যদিকে ফিরে গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের মোকাবিলায় মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে যেসব শয়তানী কাজ-কারবার চালানো হচ্ছিল, তাঁর বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হচ্ছিল, ঈমান না আনার জন্য যেসব বাহানাবাজী করা হচ্ছিল, তাঁর বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি আনা হচ্ছিল, —সবগুলোকে এক একটি করে পর্যালোচনা হয়েছে এবং সে সম্পর্কে উপদেশ দান, ভয় দেখানো ও নসিহত করা হয়েছে।

২২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের চর্চা যখন চারদিকে হতে লাগলো তখন মক্কার লোকেরা যেখানেই যেতো সেখানেই তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হতো, তোমাদের ওখানে যে ব্যক্তি নবী হয়ে এসেছেন তিনি কি শিক্ষা দেন? কুরআন কোন্ ধরনের কিতাব তার মধ্যে কি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে? ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে মক্কার কাফেররা সবসময় এমন সব শব্দ প্রয়োগ করতো যাতে প্রশ্নকারীর মনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তিনি যে কিতাবটি এনেছেন সে সম্পর্কে কোন না কোন সন্দেহ জাগতো অথবা কমপক্ষে তার মনে নবীর বা তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারে সকল প্রকার আগ্রহ খতম হয়ে যেতো।

২৩. আগের বাক্যটি এবং এ বাক্যটির মাঝখানে একটি সূক্ষ্মতর ফাঁক রয়ে গেছে। শ্রোতা নিজেই সামান্য চিন্তা-ভাবনা করে এ ফাঁকটুকু পূর্ণ করতে পারে। এর বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে, মহান আল্লাহ যখন এ প্রশ্ন করবেন তখন হাশরের ময়দানে চারদিকে গভীর নীরবতা বিরাজ করবে। কাফের ও মুশরিকদের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যাবে। তাদের কাছে এ প্রশ্নের কোন জবাব থাকবে না। তাই তারা নির্বাক হয়ে যাবে এবং তত্ত্ব-জ্ঞানীরা পরস্পর এসব কথা বলাবলি করতে থাকবে।

২৪. তত্ত্ব-জ্ঞানীদের উক্তির সাথে একথাটি বাড়িয়ে দিয়ে আল্লাহ নিজেই ব্যাখ্যামূলকভাবে বলছেন। যারা এটাকেও তত্ত্ব-জ্ঞানীদের উক্তি মনে করেছেন তাদের এক্ষেত্রে বড়ই জটিল ব্যাখ্যা তৈরী করতে হয়েছে এবং তারপরও তাদের কথা পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারেনি।

২৫. অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যখন ফেরেশতারা তাদের রূহগুলো তাদের দেহ পিঞ্জর থেকে বের করে নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে নেয়।

২৬. এ আয়াত এবং এর পরবর্তী যে আয়াতে মৃত্যুর পর মুত্তাকী ও ফেরেশতাদের আলাপ আলোচনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো কুরআন মজীদের এমন ধরনের আয়াতের অন্যতম যেগুলো সুস্পষ্টভাবে কবরের আযাব ও সওয়াবের প্রমাণ পেশ করে। হাদীসে "আলমে বরযখ"-এর জন্য কবর শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে এর অর্থ হয় এমন একটি জগত যেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মৃত্যু লাভ করার পর থেকে নিয়ে পরবর্তী পুনরুত্থান লাভ করার প্রাক্কালে প্রথম ধাক্কা খাওয়া পর্যন্ত মানবিক রূহগুলো অবস্থান করবে। হাদীস অস্বীকারকারীদের জোর বক্তব্য হচ্ছে, এ জগতটি একটি নিরেট শূন্যতার জগত ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে কারো কোন অনুভূতি ও চেতনা থাকবে না এবং কোন আযাব বা সওয়াবও কারো হবে না। কিন্তু এখানে দেখুন, কাফেরদের মৃত্যু হবার পর তাদের রূহগুলো মৃত্যু পারের জগতে গিয়ে সেখানকার অবস্থা নিজেদের প্রত্যাশার বিপরীত পেয়ে হতবাক হয়ে যায় এবং সংগে সংগেই ফেরেশতাদেরকে অভিবাদন করে এ মর্মে নিশ্চয়তা দান করার চেষ্টা করতে থাকে যে, তারা কোন খারাপ কাজ করছিল না। জবাবে ফেরেশতারা তাদেরকে ধমক দেন এবং তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করার আগাম খবর দিয়ে দেন। অন্যদিকে মুত্তাকীদের মৃত্যুর পর ফেরেশতারা তাদের রূহকে সালাম করেন এবং তাদেরকে জান্নাতী হবার জন্য আগাম মোবারকবাদ দেন। বরযখের জীবন, অনুভূতি, চেতনা, আযাব ও সওয়াবের জন্য কি এরচেয়ে বেশী প্রমাণের প্রয়োজন আছে? সূরা নিসার ৯৭ নম্বর আয়াতে প্রায় এ একই ধরনের বিষয়বস্তুর আলোচনা এসেছে। সেখানে যেসব মুসলমান হিজরত করেনি তাদের মৃত্যুর পর তাদের রূহের সাথে ফেরেশতাদের কথাবার্তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। আবার সূরা মু'মিনের ৪৫-৪৬ আয়াতে এসবের চাইতে বেশী সুস্পষ্ট ভাষায় বরযখের আযাবের কথা বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ ফেরাউন ও ফেরাউনের পরিবারবর্গ সম্পর্কে বলেছেন, "একটি কঠিন আযাব তাদেরকে ঘিরে রেখেছে। অর্থাৎ সকাল-সাঁঝে তাদেরকে আগুনের সামনে নিয়ে আসা হয়। তারপর যখন কিয়ামতের সময় এসে যাবে তখন হুকুম দেয়া হবে—ফেরাউনের পরিবারবর্গকে কঠিনতম আযাবের মধ্যে ঠেলে দাও।"

মৃত্যু ও কিয়ামতের মাঝখানের অবস্থাটি সম্পর্কে আসলে কুরআন ও হাদীস উভয় থেকে একই চিত্র পাওয়া যায়। এ চিত্রটি হচ্ছে ঃ মৃত্যু নিছক দেহ ও রূহের আলাদা হয়ে যাবার নাম,—সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার নাম নয়। দেহ থেকে আলাদা হয়ে যাবার পর রূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না বরং দুনিয়াবী জীবনের অভিজ্ঞতা এবং মানসিক ও নৈতিক উপার্জনের মাধ্যমে যে ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হয়েছিল তার সবটুকু সহকারে জীবিত থাকে। এ অবস্থায় রূহের চেতনা অনুভূতি, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার অবস্থা অনেকটা স্বপ্নের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। একটি অপরাধী রূহকে ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসাবাদ, তারপর তার আযাব ও

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۭ قَالُوْا خَيْرًا ۭ لِلَّذِيْنَ
اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۭ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ۭ وَلَنِعْمَ
دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ۝ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاۗءُوْنَ ۭ كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ۝

অন্যদিকে যখন মুত্তাকীদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে কী নাযিল হয়েছে, তারা জবাব দেয়, "সর্বোত্তম জিনিস নাযিল হয়েছে।"[২৭] এ ধরনের সৎকর্মশীলদের জন্য এ দুনিয়াতেও মংগল রয়েছে এবং আখেরাতের আবাস তো তাদের জন্য অবশ্যি উত্তম। বড়ই ভালো আবাস মুত্তাকীদের, চিরন্তন অবস্থানের জান্নাত, যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, পাদদেশে প্রবাহিত হতে থাকবে নদী এবং সব কিছুই সেখানে তাদের কামনা অনুযায়ী থাকবে।[২৮] এ পুরস্কার দেন আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে।

যন্ত্রণার মধ্যে পড়ে যাওয়া এবং তাকে দোযখের সামনে উপস্থাপিত করা —এসব কিছু এমন একটি অবস্থার সাথে সাদৃশ্য রাখে যা একজন খুনের আসামীকে ফাঁসী দেবার তারিখের একদিন আগে একটি ভয়ংকর স্বপ্নের আকারে তার কাছে উপস্থিত হয়। অনুরূপভাবে একটি পবিত্র পরিচ্ছন্ন ও নিষ্কলুষ রূহের সম্বর্ধনা, তারপর তার জান্নাতের সুখবর শোনা এবং জান্নাতের বাতাস ও খোশ্‌বুতে আপ্লুত হওয়া—এসব কিছুও এমন একজন কর্মচারীর স্বপ্নের সাথে মিলে যায় যে সুচারুরূপে নিজের কাজ সম্পন্ন করার পর সরকারের ডাকে হেড কোয়ার্টারে হাযির হয় এবং সাক্ষাতকারের জন্য চূড়ান্তবদ্ধ তারিখের একদিন আগে ভবিষ্যত পুরস্কারের প্রত্যাশাদীপ্ত একটি মধুর স্বপ্ন দেখে। শিংগার দ্বিতীয় ফুৎকারে এ স্বপ্ন হঠাৎ ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে। এবং অকস্মাত নিজেদেরকে দেহ ও রূহ সহকারে হাশরের ময়দানে জীবিত অবস্থায় পেয়ে অপরাধীরা অবাক হয়ে বলবে, يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا (আরে, আমাদের শয়নগৃহ থেকে আমাদের উঠিয়ে আনলো কে?)। কিন্তু ঈমানদাররা পূর্ণ নিশ্চিন্ততার সাথে বলবে, هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ (করুণাময় আল্লাহ এ জিনিসেরই ওয়াদা করেছিলেন এবং রসূলদের বর্ণনা সঠিক ছিল)। অপরাধীদের তাৎক্ষণিক অনুভূতি তখন এ হবে যে, তারা নিজেদের শয়নগৃহে (দুনিয়ায় মৃত্যুর বিছানায় যেখানে তারা প্রাণ ত্যাগ করেছিল) সম্ভবত ঘন্টাখানেকের মতো সময় শয়ন করে থাকবে এবং হঠাৎ এ দুর্ঘটনায় চোখ খোলার সাথে সাথেই কোথাও দৌড়ে চলছে। অন্যদিকে ঈমানদাররা পূর্ণ মানসিক ধৈর্য সহকারে বলবে :

لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ
كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا
الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٢﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ
اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ۭ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ وَمَا ظَلَمَهُمُ
اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٣٣﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا
وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٤﴾

এমন মুত্তাকীদেরকে, যাদের পবিত্র থাকা অবস্থায় ফেরেশতারা যখন মৃত্যু ঘটায় তখন বলে, "তোমাদের প্রতি শান্তি, যাও নিজেদের কর্মকাণ্ডের বদৌলতে জান্নাতে প্রবেশ করো।"

হে মুহাম্মাদ! এখন যে এরা অপেক্ষা করছে, এ ক্ষেত্রে এখন ফেরেশ্‌তাদের এসে যাওয়া অথবা তোমার রবের ফায়সালা প্রকাশিত হওয়া ছাড়া আর কী বাকি রয়ে গেছে?[২৯] এ ধরনের হঠকারিতা এদের আগে আরো অনেক লোক করেছে। তারপর তাদের সাথে যা কিছু হয়েছে তা তাদের ওপর আল্লাহর জুলুম ছিল না বরং তাদের নিজেদেরই জুলুম ছিল যা তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর করেছিল। তাদের কৃতকর্মের অনিষ্টকারিতা শেষপর্যন্ত তাদের ওপরই আপতিত হয়েছে এবং যেসব জিনিসকে তারা ঠাট্টা করতো সেগুলোই তাদের ওপর চেপে বসেছে।

"আল্লাহর দফতরে তোমরা তো হাশরের দিন পর্যন্ত অবস্থান করতে থেকেছো, আর এ সেই হাশরের দিন কিন্তু তোমরা এ জিনিসটি জানতে না।"

২৭. অর্থাৎ মক্কার বাইরের লোকেরা যখন আল্লাহর ভয়ে ভীত সত্যনিষ্ঠ লোকদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তিনি যে শিক্ষা এনেছেন সে সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন তাদের জবাব মিথ্যুক ও অবিশ্বাসী কাফেরদের জবাব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়। তারা মিথ্যা প্রচারণা চালায় না। তারা জনগণকে ধোঁকা দেবার ও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে না। তারা নবীর এবং তিনি যে শিক্ষা এনেছেন তার প্রশংসা করে এবং সঠিক পরিস্থিতি লোকদেরকে জানায়।

২৮. এ হচ্ছে জান্নাতের আসল সংজ্ঞা। সেখানে মানুষ যা চাইবে তা পাবে। তার ইচ্ছা ও পছন্দ বিরোধী কোন কাজই সেখানে হবে না। দুনিয়ায় কোন প্রধান ব্যক্তি, কোন প্রধান নেতা এবং কোন বিশাল রাজ্যের অধিকারী বাদশাহও কোন দিন এ নিয়ামত লাভ করেনি। দুনিয়ায় এ ধরনের নিয়ামত লাভের কোন সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু

وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ
نَّحْنُ وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ
بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ
فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ؕ فَسِيْرُوْا فِي
الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٦﴾

৫ রুকূ'

এ মুশরিকরা বলে, "আল্লাহ চাইলে তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদাত আমরাও করতামনা, আমাদের বাপ-দাদারাও করতো না এবং তাঁর হুকুম ছাড়া কোন জিনিসকে হারামও গণ্য করতো না।"[৩০] এদের আগের লোকেরাও এমনি ধরনের বাহানাবাজীই চালিয়ে গেছে।[৩১] তাহলে কি রসূলদের ওপর সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোন দায়িত্ব আছে? প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমি একজন রসূল পাঠিয়েছি এবং তার মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি যে, "আল্লাহর বন্দেগী করো এবং তাগূতের বন্দেগী পরিহার করো।"[৩২] এরপর তাদের মধ্য থেকে কাউকে আল্লাহ সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন এবং কারোর ওপর পথভ্রষ্টতা চেপে বসেছে।[৩৩] তারপর পৃথিবীর বুকে একটু ঘোরাফেরা করে দেখে নাও যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে।[৩৪]

জান্নাতের প্রত্যেক অধিবাসীই সেখানে আনন্দ ও উপভোগের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। তার জীবনে সর্বক্ষণ সবদিকে সবকিছু হবে তার ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী। তার প্রত্যেকটি আশা সফল হবে, প্রত্যেকটি কামনা ও বাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং প্রত্যেকটি ইচ্ছা ও আকাংখা বাস্তবায়িত হবে।

২৯. উপদেশ ও সতর্কবাণী হিসেবে একথা কয়টি বলা হচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে, যতদূর বুঝাবার ব্যাপার ছিল তুমি তো প্রত্যেকটি সত্যকে উন্মুক্ত করে বুঝিয়ে দিয়েছো। যুক্তির সাহায্যে তার সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছো। বিশ্বজাহানের সমগ্র ব্যবস্থা থেকে এর পক্ষে সাক্ষ উপস্থাপন করেছো। কোন বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য শিরকের ওপর অবিচল থাকার কোন অবকাশই রাখোনি। এখন এরাই একটি সরল সোজা কথা মেনে নেবার

ব্যাপারে ইতস্তত করছে কেন? এরা কি মউতের ফেরেশতার অপেক্ষায় আছে? এ ফেরেশতা সামনে এসে গেলে তখন জীবনের শেষ মুহূর্তে কি এরা তা মেনে নেবে? অথবা আল্লাহর আযাব সামনে এসে গেলে তার প্রথম আঘাতের পর তা মেনে নেবে?

৩০. সূরা আন'আমের ১৪৮—১৪৯ আয়াতেও মুশরিকদের এ যুক্তি উত্থাপন করে এর জবাব দেয়া হয়েছে। সেই আয়াতগুলো এবং সেখানে বর্ণিত টীকা সামনে থাকলে এ বিষয়টি অনুধাবন করা বেশী সহজ হবে। (দেখুন সূরা আন'আম ১২৪—১২৬ টীকা)।

৩১. অর্থাৎ এটা কোন নতুন কথা নয়। আজ তোমরা আল্লাহর ইচ্ছাকে নিজেদের ভ্রষ্টতা ও অসৎকর্মের কারণ হিসেবে পেশ করছো। এটা অতি পুরাতন যুক্তি। বিভ্রান্ত লোকেরা নিজেদের বিবেককে ধোঁকা দেবার এবং উপদেশদাতাদের মুখ বন্ধ করার জন্য এ যুক্তি আউড়ে আসছে। এটা হচ্ছে মুশরিকদের যুক্তির প্রথম জবাব। এ জবাবটির পরিপূর্ণ সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে হলে একথা অবশ্যি মনে রাখতে হবে যে, মাত্র এখনই কয়েক লাইন আগেই "জ্বী ওগুলো তো পুরাতন যুগের বস্তাপচা কাহিনী" বলে কুরআনের বিরুদ্ধে মুশরিকদের প্রচারণার উল্লেখ এসে গেছে। অর্থাৎ নবীর বিরুদ্ধে তাদের যেন এ আপত্তি ছিল যে, ইনি আবার নতুন কথাই বা কি বলছেন, সেই পুরানো কথাই তো বলে চলছেন। নূহের প্লাবনের পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত হাজার বার একথা বলা হয়েছে। এর জবাবে তাদের যুক্তি (যাকে তারা বড়ই শক্তিশালী যুক্তি হিসেবে পেশ করতো) উদ্ধৃত করার পর এ সূক্ষ্ম ইংগিত করা হয়েছে যে, মহোদয়গণ! আপনারাই বা কোন্ অত্যাধুনিক? আপনারা এই যে চমৎকার যুক্তির অবতারণা করেছেন এতেও আদতেই কোন অভিনবত্ব নেই। এটিও বহুকালের বাসি-বস্তাপচা খোঁড়া যুক্তি। হাজার বছর থেকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টরা এ একই গীত গেয়ে আসছে। আপনারাও সেই পচা গীতটিই গেয়ে উঠেছেন।

৩২. অর্থাৎ তোমরা নিজেদের শিরক এবং নিজেদের তৈরী হালাল-হারামের বিধানের পক্ষে আমার ইচ্ছাকে কেমন করে বৈধতার ছাড়পত্র দানকারী হিসেবে পেশ করতে পারো? আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যে নিজের রসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের মাধ্যমে লোকদেরকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছি যে, তোমাদের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র আমার বন্দেগী করা। তাগুতের বন্দেগী করার জন্য তোমাদের পয়দা করা হয়নি। এভাবে আমি যখন পূর্বাহ্নেই ন্যায়সংগত পদ্ধতিতে তোমাদের জানিয়ে দিয়েছি যে, তোমাদের এসব বিভ্রান্ত কাজ কারবারের পক্ষে আমার সমর্থন নেই তখন এরপর আমার ইচ্ছাকে ঢাল বানিয়ে তোমাদের নিজেদের ভ্রষ্টতাকে বৈধ গণ্য করা পরিষ্কারভাবে একথাই ব্যক্ত করছে যে, তোমরা চাচ্ছিলে আমি উপদেশদাতা রসূল পাঠাবার পরিবর্তে এমন রসূল পাঠাতাম যিনি তোমাদের হাত ধরে ভুল পথ থেকে টেনে সরিয়ে নিতেন এবং জোর করে তোমাদেরকে সত্য সঠিক পথে পরিচালিত করতেন। (আল্লাহর অনুমতিদান ও পছন্দ করার মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করার জন্য সূরা আন'আমের ৮০ এবং সূরা যুমারের ২০ টীকা দেখুন)।

৩৩. অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর আগমনের পর তাঁর জাতি দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। একদল তাঁর কথা মেনে নিয়েছে (আল্লাহ তাদেরকে এ মেনে নেয়ার তাওফীক দিয়েছিলেন) এবং অন্য দলটি নিজেদের গোমরাহীর ওপর অবিচল থেকেছে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আন'আম ২৮ টীকা)।

إِنْ تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَىٰهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ
مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٣٧﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ
يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾
لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ
كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ
فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

হে মুহাম্মাদ! তুমি এদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেবার জন্য যতই আগ্রহী হও না কেন, আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে আর সঠিক পথে পরিচালিত করেন না আর এ ধরনের লোকদের সাহায্য কেউ করতে পারে না।

এরা আল্লাহর নামে শক্ত কসম খেয়ে বলে, "আল্লাহ কোন মৃতকে পুনর্বার জীবিত করে উঠাবেন না।"—কেন উঠাবেন না? এতো একটি ওয়াদা, যেটি পুরা করা তিনি নিজের ওপর ওয়াজিব করে নিয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না, আর এটি হওয়া এ জন্য প্রয়োজন যে, এরা যে সত্যটি সম্পর্কে মতবিরোধ করছে আল্লাহ সেটি এদের সামনে উন্মুক্ত করে দেবেন এবং সত্য অস্বীকারকারীরা জানতে পারবে যে, তারাই ছিল মিথ্যাবাদী।[৩৫] (এর সম্ভাবনার ব্যাপারে বলা যায়) কোন জিনিসকে অস্তিত্বশীল করার জন্য এর চেয়ে বেশী কিছু করতে হয় না যে, তাকে হুকুম দিই "হয়ে যাও" এবং তা *হয়ে যায়।*

৩৪. অর্থাৎ নিশ্চয়তা লাভ করার জন্য অভিজ্ঞতার চাইতে আর কোন বড় নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড নেই। এখন তুমি নিজেই দেখে নাও, মানব ইতিহাসের একের পর এক অভিজ্ঞতা কি প্রমাণ করছে? আল্লাহর আযাব কার ওপর এসেছে– ফেরাউন ও তার দলবলের ওপর, না মূসা ও বনী ইসরাঈলের ওপর? সালেহকে যারা অস্বীকার করেছিল তাদের ওপর, না তাঁকে যারা মেনে নিয়েছিল তাদের ওপর? হূদ, নূহ ও অন্যান্য নবীদেরকে যারা অমান্য করেছিল তাদের ওপর, না মু'মিনদের ওপর? এই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাগুলোর ফল কি এই দাঁড়িয়েছে যে, আমার ইচ্ছার কারণে যারা শিরক করার ও শরীয়াত গঠনের সুযোগ লাভ করেছিল তাদের প্রতি আমার সমর্থন ছিল? বরং বিপরীত পক্ষে এ ঘটনাবলী সুস্পষ্টভাবে একথা প্রমাণ করছে যে, উপদেশ ও অনুশাসন সত্ত্বেও যারা এসব গোমরাহীর ওপর ক্রমাগত জোর দিয়ে চলেছে। আমার ইচ্ছাশক্তি

তাদেরকে অপরাধ করার অনেকটা সুযোগ দিয়েছে। তারপর তাদের নৌকা পাপে ভরে যাবার পর ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে।

৩৫. এ বক্তব্য থেকে মৃত্যুর পরের জীবন এবং শেষ বিচারের দিনের প্রতিষ্ঠার বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক অপরিহার্যতা প্রমাণিত হচ্ছে। দুনিয়ায় যখন থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, সত্য সম্পর্কে অসংখ্য মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। এসব মতবিরোধের ভিত্তিতে বংশ, গোত্র, জাতি ও পরিবারের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এগুলোরই ভিত্তিতে বিভিন্ন মতাদর্শের ধারকরা নিজেদের জন্য আলাদা আলাদা ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতা তৈরী অথবা গ্রহণ করে নিয়েছে। এক একটি মতাদর্শের সমর্থন ও পক্ষপাতিত্বে হাজার হাজার লাখো লাখো লোক বিভিন্ন সময় ধন, প্রাণ, ইজ্জত-আবরু সব কিছু কুরবানী করে দিয়েছে। আর এ মতাদর্শের সমর্থকদের মধ্যে বহু সময় এমন মারাত্মক সংঘর্ষ হয়েছে যে, তারা একদল অন্যদলকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবার চেষ্টা করেছে এবং যারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল তারা এ অবস্থায়ও নিজেদের দৃষ্টিভংগী পরিহার করেনি। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর মননশীল মতবিরোধের ক্ষেত্রে বিবেকের দাবী এই যে, এক সময় না এক সময় সঠিক ও নিশ্চিতভাবে প্রতিভাত হোক যথার্থই তাদের মধ্যে হক কি ছিল এবং বাতিল কি ছিল, কে সত্যপন্থী ছিল এবং কে মিথ্যাপন্থী। এ দুনিয়ায় এ যবনিকা সরে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না। এ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনাই এমন যে, এখানে সত্য কোনদিন পরদার বাইরে আসতে পারে না। কাজেই বিবেকের এ দাবী পূরণ করার জন্য ভিন্ন আরেকটি জগতের প্রয়োজন।

আর এটি শুধুমাত্র বিবেক-বুদ্ধির দাবীই নয় বরং নৈতিকতারও দাবী। কেননা, এসব মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে বহুদল অংশ নিয়েছে। কেউ জুলুম করেছে এবং কেউ জুলুম সহ্য করেছে। কেউ কুরবানী দিয়েছে এবং কেউ সেই কুরবানী আদায় করে নিয়েছে। প্রত্যেকে নিজের মতাদর্শ অনুযায়ী একটি নৈতিক দর্শন ও একটি নৈতিক দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করেছে এবং তা থেকে কোটি কোটি মানুষের জীবন ভালো বা মন্দ প্রভাব গ্রহণ করেছে। শেষ পর্যন্ত এমন একটি সময় অবশ্যি হওয়া উচিত যখন এদের সবার নৈতিক ফলাফল ভালো বা মন্দের আকারে প্রকাশিত হবে। এ দুনিয়ার ব্যবস্থা যদি সঠিক ও পূর্ণাংগ নৈতিক ফলাফলের প্রকাশকে ধারণ করতে অপারগ হয় তাহলে অবশ্যি অন্য একটি দুনিয়া সৃষ্টি হওয়া উচিত যেখানে এ ফলাফলের প্রকাশ সম্ভব হতে পারে।

৩৬. অর্থাৎ লোকেরা মনে করে, মরার পর মানুষকে পুনরবার সৃষ্টি করা এবং সামনের পেছনের সমগ্র মানব-কূলকে একই সংগে পুনরুজ্জীবিত করা বড়ই কঠিন কাজ। অথচ আল্লাহর ক্ষমতা অসীম। নিজের কোন সংকল্প পূর্ণ করার জন্য তাঁর কোন সাজ-সরঞ্জাম, উপায়-উপকরণ ও পরিবেশের আনুকূল্যের প্রয়োজন হয় না। তাঁর প্রত্যেকটি ইচ্ছা শুধুমাত্র তাঁর নির্দেশেই পূর্ণ হয়। তাঁর নির্দেশই সাজ-সরঞ্জামের জন্ম দেয়। তাঁর নির্দেশেই উপায়-উপকরণের উদ্ভব হয়। তাঁর নির্দেশই তাঁর উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিবেশ তৈরী করে। বর্তমানে যে দুনিয়ার অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে, এটিও নিছক হুকুম থেকেই অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং অন্য দুনিয়াটিও মুহূর্তকালের মধ্যে শুধুমাত্র একটি হুকুমেই জন্ম লাভ করতে পারে।

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى الدُّنْيَا
حَسَنَةً ۭ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا
وَعَلٰي رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ
اِلَيْهِمْ فَسْـَٔـلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٣﴾

৬ রুকূ'

যারা জুলুম সহ্য করার পর আল্লাহর খাতিরে হিজরত করে গেছে তাদেরকে আমি দুনিয়াতেই ভালো আবাস দেবো এবং আখেরাতের পুরস্কার তো অনেক বড়।[৩৭] হায়! যে মজলুমরা সবর করেছে এবং যারা নিজেদের রবের ওপর ভরসা করে কাজ করছে তারা যদি জানতো (কেমন চমৎকার পরিণাম তাদের জন্য অপেক্ষা করছে)।

হে মুহাম্মাদ! তোমার আগে আমি যখনই রসূল পাঠিয়েছি, মানুষই পাঠিয়েছি, যাদের কাছে আমি নিজের অহী প্রেরণ করতাম।[৩৮] যদি তোমরা নিজেরা না জেনে থাকো তাহলে বাণীওয়ালাদেরকে জিজ্ঞেস করো।[৩৯]

৩৭. যেসব মুহাজির কাফেরদের অসহনীয় জুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে মক্কা থেকে হাবশায় (ইথিয়োপিয়া) হিজরত করেছিলেন এখানে তাদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। আখেরাত অস্বীকারকারীদের কথার জবাব দেবার পর অকস্মাত হাবশার মুহাজিরদের প্রসংগ উথাপন করার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বিষয় নিহিত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মক্কার কাফেরদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা যে, ওহে জালেমের দল! এ ধরনের জুলুম নির্যাতন চালাবার পর এখন তোমরা মনে করছো তোমাদেরকে কখনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না এবং মজলুমদের প্রতিশোধ নেবার সময় কখনো আসবে না।

৩৮. এখানে মক্কার মুশরিকদের একটি আপত্তি উদ্ধৃত না করেই তার জবাব দেয়া হচ্ছে। এ আপত্তিটি ইতিপূর্বে সকল নবীর বিরুদ্ধে উথাপন করা হয়েছিল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীনরাও তাঁর কাছে বারবার এ আপত্তি জানিয়েছিল। এ আপত্তিটি ছিল এই যে, আপনি আমাদের মতই একজন মানুষ, তাহলে আল্লাহ আপনাকে নবী করে পাঠিয়েছেন আমরা একথা কেমন করে মেনে নেবো?

৩৯. "বাণী ওয়ালা" অর্থাৎ আহলি কিতাবদের আলেম সমাজ এবং আরো এমন সব লোক যারা নাম-করা আলেম না হলেও মোটামুটি আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষা এবং পূর্ববর্তী নবীগণের জীবন বৃত্তান্ত জানেন।

بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ؕ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ
اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٤﴾ اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ
اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ
لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٤٥﴾

আগের রসূলদেরকেও আমি উজ্জ্বল নিদর্শন ও কিতাব দিয়ে পাঠিয়েছিলাম এবং এখন এ বাণী তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি লোকদের সামনে সেই শিক্ষার ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করে যেতে থাকো। যা তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে [৪০] এবং যাতে লোকেরা (নিজেরাও) চিন্তা–ভাবনা করে।

তারপর যারা (নবীর দাওয়াতের বিরোধিতায়) নিকৃষ্টতম চক্রান্ত করছে তারা কি এ ব্যাপারে একেবারে নির্ভয় হয়ে গেছে যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূগর্ভে প্রোথিত করে দেবেন না অথবা এমন দিক থেকে তাদের ওপর আযাব আসবে না যেদিক থেকে তার আসার ধারণা–কল্পনাও তারা করেনি?

৪০. ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ শুধু মুখে নয় বরং নিজের কাজের মাধ্যমেও এবং নিজের নেতৃত্বে একটি মুসলিম সমাজ গঠন করেও আর এই সংগে 'আল্লাহর যিকির' তথা কিতাবের উদ্দেশ্য অনুযায়ী এ সমাজ পরিচালনা করেও।

এভাবে একজন মানুষকেই নবী বানিয়ে পাঠানোর পেছনে যে নিগূঢ় যৌক্তিকতা নিহিত ছিল মহান আল্লাহ সে যৌক্তিকতাও বর্ণনা করে দিয়েছেন। 'যিকির' বা আল্লাহর বাণী ফেরেশতাদের মাধ্যমেও পাঠানো যেতো। সরাসরি ছাপিয়ে প্রত্যেকটি মানুষের হাতেও পৌছানো যেতে পারতো। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ স্বীয় সুগভীর প্রজ্ঞা, করুণা ও সার্বভৌম কর্তৃত্বের আলোকে এ যিকির বা ওহী অবতারণের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে যে উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছিলেন শুধুমাত্র ছাপানো একখানা গ্রন্থ বা পুস্তিকা পাঠিয়ে দিলেই সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারতো না। এ উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য যা অপরিহার্য ছিল তা হলো একজন যোগ্যতম মানুষ তা সাথে করে নিয়ে আসবেন, তিনি তাকে একটু একটু করে লোকদের সামনে পেশ করবেন। যারা এর কোন কথা বুঝতে পারবে না তাদেরকে তার অর্থ বুঝিয়ে দেবেন। যাদের এর কোন ব্যাপারে সন্দেহ থাকবে তাদের সন্দেহ দূর করে দেবেন। যাদের কোন ব্যাপারে আপত্তি ও প্রশ্ন থাকবে তাদের আপত্তি ও প্রশ্নের জবাব দিয়ে দেবেন। যারা একে মেনে নিতে অস্বীকার করবে এবং এর বিরোধিতা করতে ও একে বাধা দিতে এগিয়ে আসবে তাদের মোকাবিলায় তিনি এমন মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করবেন, যা এই যিকির বা আল্লাহর বাণীর ধারকদের উপযোগী। যারা মেনে নেবে তাদের জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগ সম্পর্কে পথনির্দেশনা দান করবেন।

নিজের জীবনকে তাদের সামনে আদর্শ হিসেবে পেশ করবেন। তাদেরকে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যায়ে অনুশীলন দান করে সারা দুনিয়ার সামনে এমন একটি সমাজকে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরবেন যার সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থা হবে "যিকির" এর উদ্দেশ্যের বাস্তব ব্যাখ্যা।

যেসব নবুওয়াত অস্বীকারকারী আল্লাহর "যিকির" মানুষের মাধ্যমে আসাকে মেনে নিতে পারেনি তাদের জবাব হিসেবে এ আয়াতটি যেমন চূড়ান্ত তেমনি যেসব হাদীস অস্বীকারকারী নবীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া শুধুমাত্র "যিকির"-কে গ্রহণ করতে চায় তাদের জন্যও এটি চূড়ান্ত জবাব। তাদের দাবি যদি এ হয়ে থাকে যে, নবী কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেননি, শুধুমাত্র যিকির পেশ করেছিলেন, অথবা নবীর ব্যাখ্যা নয় শুধুমাত্র যিকিরই গ্রহণযোগ্য, কিংবা এখন আমাদের জন্য শুধুমাত্র যিকির যথেষ্ট, নবীর ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই, অথবা এখন একমাত্র 'যিকির'ই নির্ভরযোগ্য অবস্থায় টিকে রয়েছে, নবীর ব্যাখ্যা টিকে নেই আর টিকে থাকলেও তা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়— এ চারটি বক্তব্যের মধ্যে যে কোনটিতেই তারা বিশ্বাসী হোক না কেন তাদের এ মতবাদ কুরআনের এ আয়াতের সাথে সংঘর্ষশীল।

যদি তারা প্রথম মতটির প্রবক্তা হয় তাহলে এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, যে উদ্দেশ্যে যিকিরকে ফেরেশতাদের হাত দিয়ে পাঠাবার বা সরাসরি লোকদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার পরিবর্তে নবীকে প্রচারের মাধ্যম করা হয়েছিল সে উদ্দেশ্যই তিনি ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

আর যদি তারা দ্বিতীয় বা তৃতীয় মতটির প্রবক্তা হয় তাহলে তার অর্থ হবে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ নিজেই নিজের "যিকির" একজন নবীর মাধ্যমে পাঠিয়ে একটা বাজে কাজ করেছেন। কারণ যিকিরকে শুধুমাত্র মুদ্রিত আকারে নবী ছাড়াই সরাসরি পাঠালে যে ফল হতো নবী আগমনের ফলও তার চাইতে ভিন্ন কিছু নয়।

আর যদি তারা চতুর্থ কথাটির প্রবক্তা হয় তাহলে এটি আসলে কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত উভয়টিকেই নাকচ করে দেবার ঘোষণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এরপর যারা একটি নতুন নবুওয়াত ও নতুন অহীর প্রবক্তা একমাত্র তাদের মতবাদ ছাড়া আর কোন যুক্তিসংগত মতামত থাকে না। কারণ এ আয়াতে আল্লাহ নিজেই কুরআন মজীদের নাযিলের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য নবীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে অপরিহার্য গণ্য করছেন আবার নবী যিকিরের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করবেন একথা বলে নবীর প্রয়োজন প্রমাণ করছেন। এখন যদি হাদীস অস্বীকারকারীরা একথা বলে যে, নবীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দুনিয়ার বুকে বিদ্যমান নেই তাহলে স্পষ্টতই এ বক্তব্য থেকে দু'টো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রথম সিদ্ধান্তটি হচ্ছে, অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত খতম হয়ে গেছে এবং এখন আমাদের সম্পর্ক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শুধুমাত্র তেমন পর্যায়ের রয়ে গেছে যেমন আছে হূদ (আ), সালেহ (আ) ও শোআইব (আ)-এর সাথে। আমরা তাঁদেরকে সত্য নবী বলে মানি তাঁদের প্রতি ঈমান আনি কিন্তু তাঁদের এমন কোন অনুকরণীয় আদর্শ আমাদের কাছে নেই যা আমরা মেনে চলতে পারি। এ যুক্তি মেনে নিলে একটি নতুন নবুওয়াতের প্রয়োজন আপনা থেকেই প্রমাণিত হয়ে যায়। এরপর কেবলমাত্র একজন নির্বোধই খতমে নবুওয়াতের জন্য পীড়াপীড়ি করতে পারে। এর দ্বিতীয় ফলটি হচ্ছে,

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ
تَخَوُّفٍ ۖ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٧﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ
اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ
وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن
فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾ (سجدা)

অথবা আচমকা চলাফেরার মধ্যে তাদেরকে পাকড়াও করবেন না? কিংবা এমন অবস্থায় তাদেরকে পাকড়াও করবেন না যখন তারা নিজেরাই আগামী বিপদের জন্য উৎকণ্ঠায় দিন কাটাবে এবং তার হাত থেকে বাঁচার চিন্তায় সতর্ক হবে? তিনি যাই কিছু করতে চান তারা তাঁকে নিষ্ক্রিয় করার ক্ষমতা রাখে না। আসল ব্যাপার হচ্ছে, তোমাদের রব বড়ই কোমল হৃদয় ও করুণাময়।

আর তারা কি আল্লাহর সৃষ্ট কোন জিনিসই দেখে না, কিভাবে তার ছায়া ডাইনে বাঁয়ে ঢলে পড়ে আল্লাহকে সিজদা করছে?[৪১] সবাই এভাবে দীনতার প্রকাশ করে চলছে। পৃথিবী ও আকাশে যত সৃষ্টি আছে প্রাণসত্তা সম্পন্ন এবং যত ফেরেশতা আছে তাদের সবাই রয়েছে আল্লাহর সামনে সিজদাবনত।[৪২] তারা কখনো অবাধ্যতা প্রকাশ করে না। ভয় করে নিজেদের রবকে যিনি তাদের ওপরে আছেন এবং যা কিছু হুকুম দেয়া হয় সেই অনুযায়ী কাজ করে।

যেহেতু নবীর ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ ছাড়া কুরআন একা তার প্রেরণকারীর বক্তব্য অনুযায়ী পথপ্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট নয়, তাই কুরআনের ভক্তরা যতই জোরেশোরে চিৎকার করে শুধুমাত্র একাকী কুরআনকে যথেষ্ট বলুক না কেন, মূল দাবীদারের দাবী যখন দুর্বল, তখন সাক্ষীদের সাক্ষ যত সবলই হোক না কেন, তা কোন কাজেই লাগতে পারে না। এ অবস্থায় স্বতস্ফূর্তভাবে একটি নতুন কিতাব নাযিল হবার প্রয়োজন কুরআনের দৃষ্টিতেই প্রমাণ হয়ে যায়। আল্লাহ এহেন উদ্ভট বক্তব্যের প্রবক্তাদেরকে ধ্বংস করুন। এভাবে তারা হাদীস অস্বীকারের মতবাদ প্রচারের মাধ্যমে মূলত দীন ইসলামের শিকড় কাটছে।

৪১. অর্থাৎ দেহ বিশিষ্ট সমস্ত জিনিসের ছায়া থেকে এ আলামতই জাহির হচ্ছে যে, পাহাড়–পর্বত, গাছ–পালা, জন্তু–জানোয়ার বা মানুষ সবাই একটি বিশ্বজনীন আইনের

وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّايَ
فَارْهَبُوْنِ ﴿٥١﴾ وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ۗ
اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ
الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ ﴿٥٣﴾

৭ রুকূ'

আল্লাহর ফরমান হলো, দুই ইলাহ গ্রহণ করো না,[৪৩] ইলাহ তো মাত্র একজন, কাজেই তোমরা আমাকেই ভয় করো। সবকিছুই তাঁরই, যা আকাশে আছে এবং যা আছে পৃথিবীতে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে একমাত্র তাঁরই দীন (সমগ্র বিশ্ব জাহানে) চলছে।[৪৪] এরপর কি তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ভয় করবে?[৪৫]

তোমরা যে নিয়ামতই লাভ করেছো তাতো আল্লাহরই পক্ষ থেকে, তারপর যখন তোমরা কোন কঠিন সময়ের মুখোমুখি হও তখন তোমরা নিজেরাই নিজেদের ফরিয়াদ নিয়ে তাঁরই দিকে দৌড়াতে থাকো।[৪৬]

শৃংখলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। সবার কপালে আঁকা আছে বন্দেগী ও দাসত্বের টিকা। আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার ক্ষেত্রে কারোর সামান্যতম অংশও নেই। কোন জিনিসের ছায়া থাকলে বুঝতে হবে, সেটি একটি জড় বস্তু। আর জড় বস্তু হওয়ার অর্থ হলো, সেটি একটি সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্তার অনুগত গোলাম। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

৪২. অর্থাৎ শুধু পৃথিবীরই নয়, আকাশেরও এমন সব বস্তু, পিণ্ড বা সত্ত্বা যাদেরকে প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মানুষ দেব-দেবী এবং আল্লাহর আত্মীয়-স্বজন গণ্য করে এসেছে, তারা আসলে গোলাম ও তাবেদার ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের মধ্যেও কারোর আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতায় কোন অংশ নেই।

পরোক্ষভাবে এ আয়াত থেকে এদিকে একটি ইংগিত এসেছে যে, প্রাণসত্তা সম্পন্ন সৃষ্টি কেবলমাত্র দুনিয়াতেই নয় বরং মহাশূন্যের অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহেও আছে। একথাটিই সূরা শূরার ২৯ আয়াতেও বলা হয়েছে।

৪৩. দুই ইলাহ বা খোদা নাকচ করে দেবার মধ্য দিয়ে দু'য়ের অধিক ইলাহকেও আপনা আপনিই নাকচ করা হয়ে যায়।

৪৪. অন্য কথায় তাঁর প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতেই এ সৃষ্টি জগতের সমগ্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে।

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾
لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَجْعَلُونَ لِمَا
لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾
وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ۙ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا بُشِّرَ
أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ
الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ
أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۖ
وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾

কিন্তু যখন আল্লাহ সেই সময়কে হটিয়ে দেন তখন সহসাই তোমাদের একটি দল নিজেদের রবের সাথে অন্যকে (এ অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে) শরীক করতে থাকে,[৪৭] যাতে আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করা যায়। বেশ, ভোগ করে নাও শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।

এরা যাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানেনা,[৪৮] আমার দেয়া রিযিক থেকে তাদের অংশ নির্ধারণ করে [৪৯]—আল্লাহর কসম, অবশ্যি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, কেমন করে তোমরা এ মিথ্যা রচনা করেছিলে?

এরা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে কন্যা সন্তান,[৫০] সুবহানাল্লাহ! এবং নিজেদের জন্য নির্ধারণ করে তাদের কাছে যা কাংখিত[৫১] যখন এদের কাউকে কন্যা সন্তান জন্মের সুখবর দেয়া হয় তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে ভিতরে ভিতরে গুমরে মরতে থাকে। লোকদের থেকে লুকিয়ে ফিরতে থাকে, কারণ এই দুঃসংবাদের পর সে লোকদের মুখ দেখাবে কেমন করে। ভাবতে থাকে, অবমাননার সাথে মেয়েকে রেখে দেবে, না তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে? —দেখো, কেমন খারাপ কথা যা এরা আল্লাহর ওপর আরোপ করে।[৫২] যারা আখেরাত বিশ্বাস করে না তারাই তো খারাপ গুণের অধিকারী হবার যোগ্য। আর আল্লাহর জন্য তো রয়েছে মহত্তম গুণাবলী, তিনিই তো সবার ওপর পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানের দিক দিয়ে পূর্ণতার অধিকারী।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ
يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ
سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٦١﴾ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ
اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ۭ لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ
وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ﴿٦٢﴾

৮ রুকূ'

আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের বাড়াবাড়ি করার জন্য সংগে সংগে পাকড়াও করতেন তাহলে ভূপৃষ্ঠে কোন একটি জীবকেও ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি সবাইকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন। তারপর যখন সেই সময়টি এসে যায় তখন তা থেকে এক মুহূর্তও আগে পিছে হতে পারে না। আজ এরা দু'টি জিনিস আল্লাহর জন্য স্থির করছে যা এরা নিজেদের জন্য অপছন্দ করে। আর এদের কণ্ঠ মিথ্যা উচ্চারণ করে যে, এদের জন্য শুধু মংগলই মংগল। এদের জন্য তো শুধু একটি জিনিসই আছে এবং তা হচ্ছে দোযখের আগুন। নিশ্চয়ই এদেরকে সবার আগে তার মধ্যে পৌঁছানো হবে।

৪৫. অন্য কথায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর ভীতি এবং অন্য কারোর অসন্তোষ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার প্রবণতা কি তোমাদের জীবন ব্যবস্থার ভিত্তি হবে?

৪৬. অর্থাৎ তোমাদের নিজেদের মধ্যে বিরাজমান এটি তাওহীদের একটি সুস্পষ্ট সাক্ষ। কঠিন বিপদের মুহূর্তে যখন সমস্ত মনগড়া চিন্তা-ভাবনার রঙীন প্রলেপ অন্তর্হিত হয় তখন কিছুক্ষণের জন্য তোমাদের যে আসল প্রকৃতি আল্লাহকে ছাড়া কাউকে ইলাহ, রব, মালিক ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারের অধিকারী বলে মানে না তা স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা আন'আমের ২৯ ও ৪১ টীকা এবং সূরা ইউনুসের ৩১ টীকা)।

৪৭. অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার সাথে সাথে কোন বুযর্গ বা দেব-দেবীর প্রতি কৃতজ্ঞতারও নযরানা পেশ করতে থাকে এবং নিজেদের প্রত্যেকটি কথা থেকে একথা প্রকাশ করতে থাকে যে, তাদের মতে আল্লাহর এ মেহেরবানীর মধ্যে উক্ত

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ
وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ
اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا ۭ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٥﴾

আল্লাহর কসম, হে মুহাম্মাদ! তোমার আগেও বহু জাতির মধ্যে আমি রসূল পাঠিয়েছি। (এর আগেও এ রকমই হতো) শয়তান তাদের খারাপ কার্যকলাপকে তাদের সামনে সুশোভন করে দেখিয়েছে (এবং রসূলদের কথা তারা মানেনি)। সেই শয়তানই আজ এদেরও অভিভাবক সেজে বসে আছে এবং এরা মর্মন্তুদ শাস্তির উপযুক্ত হচ্ছে। আমি তোমার প্রতি এ কিতাব এ জন্য অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি এ মতভেদের তাৎপর্য এদের কাছে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরো। যার মধ্যে এরা ডুবে আছে। এ কিতাব পথনির্দেশ ও রহমত হয়ে নাযিল হয়েছে তাদের জন্য যারা একে মেনে নেবে।[৫৩]

(তুমি দেখছো প্রত্যেক বর্ষাকালে) আল্লাহ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন এবং তার বদৌলতে তিনি সহসাই মৃত জমিতে প্রাণ সঞ্চার করেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটি নিদর্শন রয়েছে যারা শোনে তাদের জন্য।[৫৩ক]

বুযর্গ বা দেব–দেবীর মেহেরবানীও অন্তরভুক্ত ছিল বরং তারাই মেহেরবানী করে আল্লাহকে মেহেরবানী করতে উদ্বুদ্ধ না করলে আল্লাহ কখনোই মেহেরবানী করতেন না।

৪৮. অর্থাৎ যাদের সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের মাধ্যমে তারা এ নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেনি যে, আল্লাহ সত্যি তাদেরকে তাঁর শরীক করে রেখেছেন এবং নিজের প্রভুত্বের কিছু কাজ অথবা নিজের রাজ্যের কিছু এলাকা তাদের হাতে সোপর্দ করেছেন।

৪৯. অর্থাৎ তাদের জন্য নযরানা, ভেঁট ও অর্ঘ-পেশ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের উপার্জন ও কৃষি উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট অংশ আলাদা করে রাখতো।

৫০. আরব মুশরিকদের মাবুদদের মধ্যে দেবতাদের সংখ্যা ছিল কম, দেবীদের সংখ্যা ছিল বেশী। আর এ দেবীদের সম্পর্কে তাদের আকীদা ছিল এই যে, তারা আল্লাহর মেয়ে। এভাবে ফেরেশতাদেরকেও তারা আল্লাহর মেয়ে গণ্য করতো।

৫১. অর্থাৎ পুত্র।

৫২. অর্থাৎ যে কন্যা সন্তানকে তারা নিজেদের জন্য এত বেশী লজ্জাজনক মনে করে থাকে, সেই কন্যা সন্তানকে আল্লাহর জন্য মনোনীত করতে তাদের কোনই দ্বিধা হয় না। অথচ আল্লাহর আদৌ কোন সন্তান থাকতে পারে এরূপ ধারণা করা একটি মহামূর্খতা ও চরম বেয়াদবী ছাড়া আর কিছুই নয়। আরব মুশরিকদের এ কর্মনীতিকে এখানে একটি বিশেষ দিক দিয়ে সমালোচনা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য আল্লাহ সম্পর্কে তাদের নিম্নমুখী চিন্তা-ভাবনাকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা এবং তাদেরকে একথা বলে দেয়া যে, মুশরিকী আকীদা-বিশ্বাস আল্লাহর ব্যাপারে তাদেরকে দুঃসাহসী ও ঔদ্ধত্যশালী বানিয়ে দিয়েছে, যার ফলে তারা এতই বিকারগ্রস্ত ও অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছে যে, এ ধরনের কথা বলা তারা একটুও দোষণীয় মনে করে না।

৫৩. অন্য কথায় এ কিতাব নাযিল হওয়ার কারণে এরা একটি সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেছে। কল্পনা, ভাব-বিলাস, কুসংস্কার ও অন্ধ অনুকরণের ভিত্তিতে যে অসংখ্য ও বিভিন্ন মতবাদ ও ধর্মে এরা বিভক্ত হয়ে গেছে সেগুলোর পরিবর্তে সবাই একমত হতে পারে সত্যের এমন একটি স্থায়ী বুনিয়াদ এদের নাগালের ভেতরে এসে গেছে। এখন এ নিয়ামতটি এসে যাওয়ার পরও যারা অতীতের অবস্থাকেই প্রাধান্য দিয়ে যাওয়ার মত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিচ্ছে তাদের পরিণাম ধ্বংস ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছু নয়। এখন যারা এ কিতাবকে মেনে নেবে একমাত্র তারাই সত্য-সরল পথ পাবে এবং তারাই অঢেল বরকত ও রহমতের অধিকারী হবে।

৫৩ ক. অর্থাৎ প্রতি বছর তোমাদের চোখের সামনে এ ধরনের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যে, পৃথিবী একটি নিরস বিশুষ্ক প্রান্তরের মত পড়ে আছে। সেখানে জীবনের স্পন্দন নেই। ঘাস-লতা-গুল্ম-ফুল-পাতা-সবুজের চিহ্নই নেই। নেই কোন ধরনের পোকা মাকড়ের অস্তিত্ব। এ সময় এসে গেলো বর্ষার মওসুম। দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি আকাশ থেকে নেমে আসতেই এ মরা যমীনের বুক চিরে জীবনের তরংগ জেগে উঠতে থাকে। যমীনের বিভিন্ন স্তরে জমে থাকা অসংখ্য বীজ সহসাই জেগে ওঠে। তাদের প্রত্যেকের মধ্য থেকে গত বর্ষায় জন্মলাভ করার পর মরে যাওয়া উদ্ভিদগুলো আবার মাথা চাড়া দেয়। গরমের মওসুমে নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে গিয়েছিল এমন সব অগণিত মৃত্তিকার কীট অকস্মাত আবার দেখা যায় যেমন বিগত বর্ষায় দেখা গিয়েছিল। নিজেদের জীবনে তোমরা এসব বারবার দেখতে থাকো। এরপরও নবীর মুখ থেকে একথা শুনে অবাক হয়ে যাও যে, আল্লাহ মৃত্যুর পর সমস্ত মানুষকে পুনরবার জীবিত করবেন। এ অবাক হওয়ার কারণ এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, তোমাদের পর্যবেক্ষণ বুদ্ধি-জ্ঞানহীন পশুদের পর্যবেক্ষণের মতই। তোমরা বিশ্বজাহানের বিস্ময়কর চমৎকারিত্ব দেখো কিন্তু তার পেছনে স্রষ্টার ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার নিদর্শনগুলো দেখো না। অন্যথায় নবীর বর্ণনা শোনার পর তোমাদের মন অনিবার্যভাবে চিৎকার করে বলে উঠতো যে, 'এসব নিদর্শন যথার্থই নবীর বর্ণনাকে সমর্থন করে'।

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ
بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾ وَمِنْ ثَمَرَاتِ
النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ
فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ
أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾

৯ রুকূ'

আর তোমাদের জন্য গবাদি পশুর মধ্যেও একটি শিক্ষা রয়েছে। তাদের পেট থেকে গোবর ও রক্তের মাঝখানে বিদ্যমান একটি জিনিস আমি তোমাদের পান করাই, অর্থাৎ নির্ভেজাল দুধ,[৫৪] যা পানকারীদের জন্য বড়ই সুস্বাদু ও তৃপ্তিকর।

(অনুরূপভাবে) খেজুর গাছ ও আংগুর লতা থেকেও আমি একটি জিনিস তোমাদের পান করাই, যাকে তোমরা মাদকেও পরিণত করো এবং পবিত্র খাদ্যেও।[৫৫] বুদ্ধিমানদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে একটি নিশানী।

আর দেখো তোমার রব মৌমাছিদেরকে একথা অহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন ঃ[৫৬] তোমরা পাহাড়-পর্বত, গাছপালা ও মাচার ওপর ছড়ানো লতাগুল্মে নিজেদের চাক নির্মাণ করো।

৫৪. "গোবর ও রক্তের মধ্যস্থিত"-এর অর্থ হচ্ছে, পশু যে খাদ্য খায় তা থেকে তো একদিকে রক্ত তৈরী হয় এবং অন্যদিকে তৈরী হয় মলমূত্র। কিন্তু এ পশুদের স্ত্রী জাতির মধ্যে আবার এ একই খাদ্য থেকে তৃতীয় একটি জিনিসও তৈরী হয়। বর্ণ, গন্ধ, গুণ, উপকারিতা ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে আগের দু'টি থেকে এটি সম্পূর্ণ আলাদা। তারপর বিশেষ করে গবাদি পশুর মধ্যে এর উৎপাদন এত বেশী হয় যে, তারা নিজেদের সন্তানদের প্রয়োজন পূর্ণ করার পর মানুষের জন্যও এ উৎকৃষ্টতম খাদ্য বিপুল পরিমাণে সরবরাহ করতে থাকে।

৫৫. এখানে আনুসংগিকভাবে এ ব্যাপারেও একটি পরোক্ষ আভাস দেয়া হয়েছে যে, ফলের এ রসের মধ্যে এমন উপাদানও রয়েছে যা মানুষের জন্য জীবনদায়ী খাদ্যে পরিণত হতে পারে, আবার এমন উপাদানও আছে যা পচে মাদক দ্রব্যে পরিণত হয়। এখন মানুষ এ উৎসটি থেকে পাকপবিত্র রিযিক গ্রহণ করবে, না বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিকে বিনষ্টকারী মদ গ্রহণ করবে, তা তার নিজের নির্বাচন ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। শরাব বা মদ যে পাক-পবিত্র রিযিক নয়, এখানে তাও জানা গেলো এবং এটি তার হারাম হওয়ার দিকে আর একটি পরোক্ষ ইংগিত।

ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ
مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ
فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۚ
وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾

তারপর সব রকমের ফলের রস চোসো এবং নিজের রবের তৈরী করা পথে চলতে থাকো।[৫৭] এ মাছির ভেতর থেকে একটি বিচিত্র রংগের শরবত বের হয়, যার মধ্যে রয়েছে নিরাময় মানুষের জন্য।[৫৮] অবশ্যি এর মধ্যেও একটি নিশানী রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।[৫৯]

আর দেখো, আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যুদান করেন,[৬০] আবার তোমাদের কাউকে নিকৃষ্টতম বয়সে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়, যখন সবকিছু জানার পরেও যেন কিছুই জানে না।[৬১] প্রকৃত সত্য হচ্ছে, আল্লাহই জ্ঞানেও পরিপূর্ণ এবং ক্ষমতায়ও।

৫৬. অহীর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, এমন সূক্ষ্ম ও গোপন ইশারা, যা ইশারাকারী ও ইশারা গ্রহণকারী ছাড়া তৃতীয় কেউ টের পায় না। এ সম্পর্কের ভিত্তিতে এ শব্দটি 'ইল্‌কা' (মনের মধ্যে কোন কথা নিক্ষেপ করা) ও ইল্‌হাম (গোপনে শিক্ষা ও উপদেশ দান করা) অর্থে ব্যবহৃত হয়। মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে যে শিক্ষা দান করেন তা যেহেতু কোন মক্‌তব, স্কুল বা শিক্ষায়তনে দেয়া হয় না বরং এমন সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে দেয়া হয় যে, বাহ্যত কাউকে শিক্ষা দিতে এবং কাউকে শিক্ষা নিতে দেখা যায় না, তাই একে কুরআনে অহী, ইল্‌কা ও ইল্‌হাম শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখন এ তিনটি শব্দ আলাদা আলাদা পরিভাষায় পরিণত হয়েছে। অহী শব্দটি নবীদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। ইল্‌হামকে আউলিয়া ও বিশেষ বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আর ইল্‌কা শব্দটি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক অর্থবোধক এবং সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

কিন্তু কুরআনে এ পারিভাষিক অর্থের পার্থক্যটা পাওয়া যায় না। এখানে আকাশের ওপরও অহী নাযিল হয় এবং সেই অনুযায়ী তার সব ব্যবস্থা পরিচালিত হয় (وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا - حٰمٓ السجدة) পৃথিবীর ওপরও অহী নাযিল হয় এবং এর ইংগিত পাওয়ার সাথে সাথেই সে নিজের কাহিনী শুনাতে থাকে (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا - الزلزال) ফেরেশ্‌তাদের ওপরও অহী নাযিল হয় এবং সেই মোতাবেক

(اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰئِكَةِ اَنِّى مَعَكُمْ - الانفال) তারা কাজ করে মৌমাছিদেরকে তাদের সমস্ত কাজ অহীর (প্রকৃতিগত শিক্ষা) মাধ্যমে শেখানো হয়। আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়টিই দেখা যাচ্ছে। আর এই অহী কেবলমাত্র মৌমাছি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নেই বরং মাছের সাঁতার কাটা, পাখির উড়ে চলা, নবজাত শিশুর দুধ পান করার বিষয়টাও আল্লাহর অহীই শিক্ষা দান করে। তাছাড়া চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-অনুসন্ধান ছাড়াই একজন মানুষকে যে অব্যর্থ কৌশল বা নির্ভুল মত অথবা চিন্তা ও কর্মের সঠিক পথ বুঝানো হয় তাও অহী। (وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ - القصص) এ অহী থেকে কোন একজন মানুষও বঞ্চিত নয়। দুনিয়ায় যত নতুন নতুন উদ্ভাবন ও কল্যাণকর আবিষ্কার হয়েছে যত বড় বড় শাসক, বিজেতা, চিন্তানায়ক ও লেখক যুগান্তকারী ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী কর্ম সম্পাদন করেছেন তার সবের পেছনেই এ অহীর কার্যকারিতা দেখা যায়। বরং সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় তা হচ্ছে এই যে, কখনো বসে বসে একটি কথা মনে হলো অথবা কোন কৌশল মাথায় এলো কিংবা স্বপ্নে কিছু দেখা গেলো এবং পরবর্তী সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেলো যে, অদৃশ্য থেকে পাওয়া সেটি তার জন্য একটি সঠিক পথনির্দেশনা ছিল।

এ বিভিন্ন ধরনের অহীর মধ্যে নবীদেরকে যে অহী করা হতো সেটি ছিল একটি বিশেষ ধরনের অহী। এ অহীটির বৈশিষ্ট অন্যান্য অহী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এতে যাকে অহী করা হয় সে এ অহী আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ও নিশ্চিত থাকে। এ অহী হয় আকীদা-বিশ্বাস, বিধি-বিধান, আইন-কানুন ও নির্দেশাবলী সংক্রান্ত। আর নবী এ অহীর মাধ্যমে মানব সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ দেবেন এটিই হয় এর নাযিল করার উদ্দেশ্য।

৫৭. 'রবের তৈরী করা পথে' বলে মৌমাছিদের একটি দল যে ব্যবস্থা ও কর্মপদ্ধতির আওতাধীনে কাজ করে সেই সমগ্র ব্যবস্থা ও কর্মপদ্ধতির দিকে ইংগিত করা হয়েছে। মৌচাকের আকৃতি ও কাঠামো তাদের দল গঠন প্রক্রিয়া, তাদের বিভিন্ন কর্মীর মধ্যে কর্মবন্টন, তাদের আহার সংগ্রহের জন্য অবিরাম যাওয়া আসা এবং তাদের নিয়ম মাফিক মধু তৈরী করে তা ক্রমাগত গুদামে সঞ্চয় করতে থাকা—এসব হচ্ছে সেই পথ যা তাদের রব তাদের কাজ করার জন্য এমনভাবে সুগম করে দিয়েছেন যে, তাদের কখনো এ ব্যাপারে নিজেদের চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন হয় না। এটা একটা নির্ধারিত ব্যবস্থা। এরি ভিত্তিতে একটি বাঁধাধরা নিয়মে এ অগণিত চিনিকলগুলো হাজার হাজার বছর ধরে কাজ করে চলেছে।

৫৮. মধু যে একটি উপকারী ও সুস্বাদু খাদ্য তা কারোর অজানা নেই। তাই একথাটি এখানে উল্লেখ করা হয়নি। তবে তার মধ্যে যে রোগ নিরাময় শক্তি আছে একথাটা তুলনামূলকভাবে একটি অজানা বিষয়। এ জন্য একথাটা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। মধু প্রথমত কোন কোন রোগে এমনিতেই উপকারী। কেননা, তার মধ্যে রয়েছে ফুল ও ফলের রস এবং তাদের উন্নত পর্যায়ের গ্লুকোজ। তারপর মধুর একটা বৈশিষ্ট হচ্ছে, তা নিজে কখনো পচে না এবং অন্য জিনিসকেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত নিজের মধ্যে পচন থেকে সংরক্ষিত রাখে। এর ফলে ঔষধ তৈরী করার জন্য তার সাহায্য গ্রহণ করার মত যোগ্যতা তার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায়। এ জন্যই ঔষধ নির্মাণ শিল্পে আল-কোহলের পরিবর্তে মধুর ব্যবহার

শত শত বছর থেকে চলে আসছে। তাছাড়া মৌমাছি যদি এমন কোন এলাকায় কাজ করে যেখানে কোন বিশেষ ধরনের বনৌষধি বিপুল পরিমাণ পাওয়া যায় তাহলে সেই এলাকার মধু নিছক মধুই হয় না বরং তা ঐ ঔষধির সর্বোত্তম উপাদান ধারণ করে এবং যে রোগের ঔষধ আল্লাহ ঐ ঔষধির মধ্যে তৈরী করেছেন তার জন্যও তা উপকারী হয়। যদি যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী মৌমাছিদের সাহায্যে এ কাজ করানো হয় এবং বিভিন্ন ঔষধি বৃক্ষের উপাদান তাদের সাহায্যে বের করে তাদের মধু আলাদা আলাদাভাবে সংরক্ষিত হয় তাহলে আমাদের মতে এ মধু ল্যাবরেটরীতে তৈরী উপাদানের চেয়ে বেশী উপকারী প্রমাণিত হবে।

৫৯. এ গোটা বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের দ্বিতীয় অংশের সত্যতা সপ্রমাণ করা। দুটি কারণেই কাফের ও মুশরিকরা তাঁর বিরোধিতা করতো। এক, তিনি পরকালীন জীবনের ধারণা পেশ করেন। এ ধারণা চরিত্র ও নৈতিকতার সমগ্র নকশাটাই বদলে দেয়। দুই, তিনি কেবলমাত্র এক আল্লাহকেই মাবুদ, আনুগত্য করার যোগ্য, সংকট থেকে উদ্ধারকারী ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী গণ্য করেন। এর ফলে শিরক ও নাস্তিক্যবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমগ্র জীবন ব্যবস্থাটাই ভ্রান্ত গণ্য হয়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের উপরোক্ত দুটি অংশকে সত্য প্রমাণ করার জন্য এখানে বিশ্বজাহানের নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে। বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, নিজের চারপাশের জগতের দিকে তাকিয়ে দেখো, সর্বত্র এই যে চিহ্নগুলো পাওয়া যাচ্ছে এগুলো কি নবীর বর্ণনার সত্যতা প্রমাণ করছে, না তোমাদের কাল্পনিক চিন্তা–ভাবনা ও কুসংস্কারকে সত্য প্রমাণ করছে? নবী বলেন, মরার পর তোমাদের আবার জীবিত করা হবে। তোমরা নবীর একথাকে একটি অসম্ভব কথা বলে গণ্য করছো। কিন্তু প্রতি বর্ষাকালে পৃথিবী এর প্রমাণ পেশ করে। সৃষ্টির পুনরাবর্তন কেবল সম্ভবই নয় বরং প্রতি বর্ষাকালে তোমাদের চোখের সামনে ঘটছে। নবী বলেন, এ বিশ্বজাহান আল্লাহ বিহীন নয়। তোমাদের নাস্তিকরা একথাকে একটি প্রমাণহীন দাবী মনে করছে। কিন্তু গবাদি পশুর গঠনাকৃতি, খেজুর ও আংগুরের উৎপাদন এবং মৌমাছিদের সৃষ্টি কৌশল একথার সাক্ষ দিচ্ছে যে, একজন প্রাজ্ঞ ও করুণাময় রব এ জিনিসগুলোর নকশা তৈরী করেছেন। অন্যথায় এতগুলো পশু, এতসব গাছপালা এবং এত বিপুল সংখ্যক মৌমাছি মিলেমিশে মানুষের জন্য এ নানাবিধ উন্নতমানের, উৎকৃষ্ট, সুস্বাদু ও লাভজনক জিনিস প্রতিদিন যথা নিয়মে তৈরী করে যাচ্ছে, এটা কেমন করে সম্ভব ছিল? নবী বলেন, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কেউ উপাস্য, মাবুদ এবং প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা লাভের হকদার নেই। তোমাদের মুশরিকরা একথায় নাক সিটকায় এবং নিজেদের বহু সংখ্যক উপাস্যের পূজাবেদীতে অর্ঘ ও উপঢৌকনাদি নিবেদন করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু তোমরা নিজেরাই বলো, এ দুধ, খেজুর, আংগুর ও মধু এগুলো তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য, এ নিয়ামতগুলো আল্লাহ ছাড়া আর কে তোমাদের দান করেছেন? কোন্ দেবী, দেবতা বা অলী তোমাদের আহার পৌছাবার এ ব্যবস্থা করেছেন?

৬০. অর্থাৎ আসল ব্যাপার শুধু এতটুকুই নয় যে, তোমাদের প্রতিপালন ও খাদ্য সংস্থানের এ সমগ্র ব্যবস্থাপনাটিই আল্লাহর হাতে রয়েছে বরং প্রকৃত সত্য এটাও যে, তোমাদের জীবন ও মৃত্যু দু'টোই আল্লাহর ক্ষমতার অধীন। অন্য কেউ তোমাদের জীবনও দান করতে পারে না, আর মৃত্যুও ঘটাতে পারে না।

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ۭ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٧١﴾

১০ রুকূ'

আর দেখো, আল্লাহ তোমাদের একজনকে আর একজনের ওপর রিযিকের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তারপর যাদেরকে এ শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে তারা এমন নয় যে নিজেদের রিযিক নিজেদের গোলামদের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে থাকে, যাতে উভয়ে এ রিযিকে সমান অংশীদার হয়ে যায়। তাহলে কি এরা শুধু আল্লাহরই অনুগ্রহ মেনে নিতে অস্বীকার করে?[৬২]

৬১. অর্থাৎ এ জ্ঞানবত্তা যা নিয়ে তোমরা গর্ব ও অহংকার করে বেড়াও এবং যার বদৌলতে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীর ওপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়েছে, তাও আল্লাহর দান। তোমরা নিজেদের চোখে নিজেদের জীবনের একটি বিস্ময়কর শিক্ষণীয় দৃশ্য দেখে থাকো। যখন কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ দীর্ঘায়ু দান করেন, অনেক বেশী বয়স হয়ে যায়, তখন এ ব্যক্তিই যে কখনো তার যৌবনকালে অন্যকে জ্ঞান দিতো, সে কেমন একটা লোলচর্ম বৃদ্ধে এবং অথর্ব-অক্ষম একটা নিরেট মাংস পিণ্ডে পরিণত হয়, যার কোন হুঁশ-জ্ঞান থাকে না।

৬২. বর্তমানকালে এ আয়াত থেকে বড়ই অদ্ভুত ও উদ্ভট অর্থ বের করা হয়েছে। কুরআনের আয়াতকে তার প্রেক্ষাপট ও পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক একটি আয়াতের আলাদা আলাদা অর্থ করলে কেমন অন্তহীন অপব্যাখ্যার দরজা খুলে যায় এটা হচ্ছে তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা এ আয়াতটিকে ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনের বুনিয়াদ এবং অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা গণ্য করেছেন। তাদের মতে আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, যাদেরকে আল্লাহ রিযিকের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তাদের নিজেদের রিযিক নিজেদের গোলাম ও চাকর বাকরদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া উচিত। যদি বিলিয়ে দেয়া না হয় তাহলে তারা আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকারকারী বলে গণ্য হবে। অথচ এ সমগ্র আলোচনার মধ্যে কোথাও অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা বর্ণনার আদৌ কোন সুযোগই নেই। প্রথম থেকে সমগ্র ভাষণটিই চলছে শিরককে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও তাওহীদকে সত্য প্রমাণ করার জন্য এবং সামনের দিকেও এ একই বিষয়বস্তুই একের পর এক এগিয়ে চলছে। এ আলোচনার মাঝখানে হঠাৎ অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার একটি ধারা বর্ণনা করার কোন সুযোগই কি এখানে আছে? আয়াতকে তার প্রেক্ষাপট ও পূর্বাপর আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে রেখে বিচার করলে পরিষ্কার বুঝা যাবে যে, এখানে এর সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়বস্তুরই আলোচনা চলছে। এখানে একথা

প্রমাণ করা হয়েছে যে, তোমরা নিজেদের ধন-সম্পদে যখন নিজেদের গোলাম ও চাকর বাকরদেরকে সমান মর্যাদা দাও না—অথচ এ সম্পদ আল্লাহর দেয়া—তখন তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে আল্লাহর সাথে তাঁর ক্ষমতাহীন গোলামদেরকেও শরীক করা এবং ক্ষমতা ও অধিকারের ক্ষেত্রে আল্লাহর এ গোলামদেরকেও তাঁর সাথে সমান অংশীদার গণ্য করাকে তোমরা কেমন করে সঠিক মনে করো?

সূরা রূমের ২৮ আয়াতে এ একই যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। সেখানে এর শব্দগুলো হচ্ছে ঃ

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلاً مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ط هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِىْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ط كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

"আল্লাহ তোমাদের সামনে একটি উপমা তোমাদের সত্তা থেকেই পেশ করেন। আমি তোমাদের যে রিযিক দিয়েছি তাতে কি তোমাদের গোলাম তোমাদের সাথে শরীক আছে? আর এভাবে শরীক বানিয়ে তোমরা ও তারা কি সমান সমান হয়ে গিয়েছ? এবং তোমরা কি তাদেরকে ঠিক তেমনি ভয় পাও যেমন তোমাদের সমপর্যায়ের লোকদেরকে ভয় পাও? এভাবে আল্লাহ খুলে খুলে নিশানী বর্ণনা করেন তাদের জন্য যারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।"

দু'টি আয়াতের তুলনামূলক আলোচনা করলে পরিষ্কার জানা যায়, উভয় স্থানেই একই উদ্দেশ্যে একই উপমা বা দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এদের একটি অন্যটির ব্যাখ্যা করছে।

সম্ভবত اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ বাক্যাংশ থেকেই ঐ বুদ্ধিজীবীরা বিভ্রান্ত হয়েছেন। উপমা বর্ণনার পর সাথে সাথেই এ বাক্যাংশটি দেখে তারা মনে করেছে নিশ্চয়ই এর অর্থ এই হবে যে অধীনস্থদের মধ্যে রিযিক বিলিয়ে না দেয়াটাই মূলত আল্লাহর নিয়ামতের অস্বীকৃতি। অথচ যে ব্যক্তি কুরআনে সামান্য পারদর্শিতাও রাখেন তিনিই জানেন যে আল্লাহর নিয়ামতের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য সত্তাকে কৃতজ্ঞতা জানানো এ কিতাবের দৃষ্টিতে আল্লাহর নিয়ামতের অস্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ বিষয়টির কুরআনে এত বেশী পুনরাবৃত্তি হয়েছে যে, তিলাওয়াত ও চিন্তা-গবেষণায় অভ্যস্ত লোকেরা এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন না। অবশ্যি সূচীপত্রের সাহায্যে নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ রচনাকারীগণ এ ব্যাপারটি নাও জানতে পারেন।

আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকৃতির এই তাৎপর্যটি অনুধাবন করার পর এ বাক্যাংশের অর্থ পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, এরা যখন প্রভু ও গোলামের পার্থক্য ভাল করেই জানে এবং নিজেদের জীবনে সর্বক্ষণ এ পার্থক্যের দিকে নজর রাখে তখন একমাত্র আল্লাহর ব্যাপারেই কি এরা এত অবুঝ হয়ে গেছে যে, তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর সাথে শরীক ও তাঁর সমকক্ষ মনে করার এবং তাঁর কাছ থেকে এরা যেসব নিয়ামত লাভ করেছে সেগুলোর জন্য তাঁর বান্দাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানানোকে জরুরী মনে করে?

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ
بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ
وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ
لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٧٣﴾ فَلَا
تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٧٤﴾

আর আল্লাহই তোমাদের জন্য তোমাদের সমজাতীয় স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই এ স্ত্রীদের থেকে তোমাদের পুত্র-পৌত্রাদি দান করেছেন এবং ভাল ভাল জিনিস তোমাদের খেতে দিয়েছেন। তারপর কি এরা (সবকিছু দেখার ও জানার পরও) বাতিলকে মেনে নেয়[৬৩] এবং আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করে? আর তারা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তার পূজা করে যাদের না আকাশ থেকে তাদের কিছু রিযিক দেবার ক্ষমতা ও অধিকার আছে, না পৃথিবী থেকে[৬৪]? কাজেই আল্লাহর জন্য সদৃশ তৈরী করো না,[৬৫] আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।

৬৩. 'বাতিলকে মেনে নেয়' অর্থাৎ এ ভিত্তিহীন ও অসত্য বিশ্বাস পোষণ করে যে, তাদের ভাগ্য ভাঙা-গড়া, আশা-আকাংখা পূর্ণ করা, সন্তান দেয়া, রুজি-রোজগার দেয়া, বিচার-আচার ও মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভ করানো এবং রোগ-শোক থেকে বাঁচানোর ব্যাপারটি কতিপয় দেব-দেবী, জিন এবং অতীতের বা পরবর্তীকালের কোন মহাপুরুষের হাতে রয়েছে।

৬৪. এসব নিয়ামত আল্লাহর দেয়া, একথা যদিও মক্কার মুশরিকরা অস্বীকার করতো না এবং এসব নিয়ামতের ব্যাপারে আল্লাহর অনুগ্রহ মেনে নিতেও তারা গররাযী ছিল না কিন্তু তারা যে ভুলটা করতো সেটা ছিল এ যে, এই নিয়ামতগুলোর ব্যাপারে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সাথে সাথে তারা নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে এমন বহু সত্তার কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো যাদেরকে তারা কোন প্রকার প্রমাণ ও সনদপত্র ছাড়াই এ নিয়ামতগুলো প্রদানের ক্ষেত্রে অংশীদার বানিয়ে নিয়েছিল। এ জিনিসটিকেই কুরআন "আল্লাহর অনুগ্রহের অস্বীকৃতি" বলে গণ্য করছে। যে উপকার করলো, তার উপকারের জন্য যে উপকার করেনি তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মূলত উপকারীর উপকার অস্বীকৃতিরই নামান্তর, কুরআনে এ কথাটিকে একটি সাধারণ নীতি হিসেবে পেশ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে কুরআন একথাটিকেও একটি মূলনীতি হিসেবে বর্ণনা করছে যে, বিনা যুক্তি-প্রমাণে উপকারী সম্পর্কে ধারণা করা যে, তিনি নিজ অনুগ্রহ ও দয়ার বশে এ উপকার করেননি বরং অমুক ব্যক্তির অছিলায় বা অমুক ব্যক্তির সুবিধার্থে

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ
مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ؕ هَلْ يَسْتَوٗنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ
بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾

আল্লাহ একটি উপমা দিচ্ছেন।[৬৬] একজন হচ্ছে গোলাম, যে অন্যের অধিকারভুক্ত এবং নিজেও কোন ক্ষমতা রাখে না। দ্বিতীয়জন এমন এক ব্যক্তি যাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে ভাল রিযিক দান করেছি এবং সে তা থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে খুব খরচ করে। বলো, এরা দু'জন কি সমান? —আলহামদুল্লিাহ,[৬৭] কিন্তু অধিকাংশ লোক (এ সোজা কথাটি) জানে না।[৬৮]

অথবা অমুক ব্যক্তির সুপারিশক্রমে কিংবা অমুকের হস্তক্ষেপ করার কারণে এ উপকার করেছেন, এটাও মূলত তার উপকারের প্রতি অস্বীকৃতিরই শামিল।

ইনসাফ ও সাধারণ বিবেক–বুদ্ধি এ মৌলিক কথা দু'টিকে পুরোপুরি সমর্থন করে। সামান্য চিন্তা–ভাবনা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিই এর যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পারে। মনে করুন, কোন অভাবী ব্যক্তির প্রতি করুণা করে আপনি তাকে সাহায্য করলেন এবং সে তখনই উঠে দাঁড়িয়ে এমন এক ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো যার এ সাহায্যে কোন হাতই ছিল না। এ অবস্থায় আপনি নিজের উদার মনোবৃত্তির কারণে তার এ অবাঞ্ছিত আচরণকে যতই উপেক্ষা করুন না কেন এবং আগামীতে নিজের সাহায্য যতই জারী রাখুন না কেন, তবুও মনে মনে নিশ্চয়ই ভাববেন, এ লোকটি আসলে বড়ই নির্লজ্জ ও অকৃতজ্ঞ। তারপর জিজ্ঞাসাবাদ করে যদি আপনি জানতে পারেন, তার এ কাজটি করার কারণ এই ছিল যে, সে মনে করে, আপনি তাকে যা কিছু সাহায্য করেছেন তার পেছনে আপনার সততা ও দানশীলতার মনোবৃত্তি কার্যকর ছিল না বরং সবকিছু করেছিলেন ঐ ব্যক্তির খাতিরে, অথচ আসল ঘটনা তা ছিল না, তাহলে এ ক্ষেত্রে আপনি নিশ্চয়ই একে নিজের অপমান মনে করবেন। আপনার কাছে তার এ উদ্ভট ব্যাখ্যার অর্থ এ হবে যে, সে আপনার সম্পর্কে বড়ই ভুল ধারণা রাখে এবং আপনাকে দয়ার্দ্র ও স্নেহশীল মানুষ বলে মনে করে না। বরং আপনাকে মনে করে একজন বন্ধু বৎসল লোক। বন্ধুর কথায় আপনি ওঠা বসা করেন। কয়েকজন পরিচিত বন্ধুর মাধ্যমে যদি কেউ এসে যায় তাহলে আপনি সংশ্লিষ্ট বন্ধুদের খাতিরে তাকে সাহায্য করেন অন্যথায় আপনার আঙুলের ফাঁক দিয়ে দানের একটা সিকিও গলতে পারে না।

৬৫. 'আল্লাহর জন্য সদৃশ তৈরী করো না'— অর্থাৎ আল্লাহকে দুনিয়ার রাজা–মহারাজা ও বাদশাহ–শাহানশাহদের সমপর্যায়ে রেখে বিচার করো না। রাজা–বাদশাহদের অনুচর, সভাসদ ও মোসাহেবদের মাধ্যম ছাড়া তাদের কাছে কেউ নিজের আবেদন নিবেদন পৌঁছাতে পারে না। ঠিক তেমনি আল্লাহর ব্যাপারেও তোমরা এ ধারণা করতে থাকো যে, তিনি নিজের শাহী মহলে ফেরেশতা, আউলিয়া ও অন্যান্য সভাসদ পরিবৃত হয়ে বিরাজ করছেন এবং এদের মাধ্যমে ছাড়া তাঁর কাছে কারোর কোন কাজ সম্পন্ন হতে পারে না।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ
كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ۭ هَلْ يَسْتَوِيْ
هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٧٦

আল্লাহ আর একটি উপমা দিচ্ছেন। দু'জন লোক। একজন বধির ও বোবা, কোন কাজ করতে পারে না। নিজের প্রভুর ঘাড়ে বোঝা হয়ে চেপে আছে। যেদিকেই তাকে পাঠায় কোন ভাল কাজ তার দ্বারা হয়ে ওঠে না। দ্বিতীয়জন ইনসাফের হুকুম দেয় এবং নিজে সত্য সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত আছে। বলো, এরা দু'জন কি সমান?[৬৯]

৬৬. অর্থাৎ যদি উপমার সাহায্যে কথা বুঝতে হয় তাহলে আল্লাহ সঠিক উপমা দিয়ে তোমাদের সত্য বুঝিয়ে দেন। তোমরা যেসব উপমা দিচ্ছো সেগুলো ভুল। তাই তোমরা সেগুলো থেকে ভুল ফলাফল গ্রহণ করে থাকো।

৬৭. প্রশ্ন ও আলহাম্‌দুলিল্লাহ এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ফাঁক রয়ে গেছে। এ ফাঁক পূরণ করার জন্য আলহাম্‌দুলিল্লাহ এর মধ্যেই একটি তাৎপর্যময় ইংগিত রয়ে গেছে। একথা সুস্পষ্ট যে, নবীর মুখ থেকে একথা শুনে মুশরিকদের পক্ষে এ দু'টি সমান এ ধরনের জবাব দেয়া কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। নিশ্চয়ই এর জবাবে কেউ না কেউ পরিষ্কারভাবে একথা স্বীকার করে থাকতে পারে যে, আসলে দু'টি সমান নয়, আবার কেউ এ ভয়ে নীরবতা অবলম্বন করে থাকতে পারে যে, স্বীকারোক্তিমূলক জবাব দেবার মাধ্যমে তার অনিবার্য ফলাফলকেও স্বীকার করে নিতে হবে এবং এর ফলে স্বতস্ফূর্তভাবেই তাদের শিরক বাতিল হয়ে যাবে। কাজেই নবী উভয়ের জবাব পেয়ে বললেন, আলহাম্‌দুলিল্লাহ। স্বীকারকারীদের স্বীকারোক্তির পরও আলহামদুলিল্লাহ এবং নীরবতা পালনকারীদের নীরবতার ওপরও আলহামদুলিল্লাহ। প্রথম অবস্থাটিতে এর অর্থ হয়, "আল্লাহর শোকর, অন্তত এতটুকু কথা তো তোমরা বুঝতে পেরেছো।" দ্বিতীয় অবস্থায় এর অর্থ হয়, "নীরব হয়ে গেছে? আলহাম্‌দুলিল্লাহ, নিজেদের সমস্ত হঠকারিতা সত্ত্বেও দুটি অবস্থা সমান বলে দেবার হিম্মত তোমাদেরও নেই।"

৬৮. অর্থাৎ যদিও তারা মানুষের মধ্যে ক্ষমতাহীন ও ক্ষমতাধরের মধ্যকার পার্থক্য অনুভব করে এবং এ পার্থক্য সামনে রেখেই প্রত্যেকের সাথে আলাদা আলাদা আচরণ করে, তবুও তারা এমনি মূর্খ ও অবুঝ সেজে আছে যে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার পার্থক্য তারা বুঝতে পারে না। স্রষ্টার সত্তা, গুণাবলী, অধিকার, শক্তিমত্তা সবকিছুতেই তারা সৃষ্টিকে শরীক মনে করছে এবং সৃষ্টির সাথে এমন আচরণ করছে যা একমাত্র স্রষ্টার সাথেই করা যেতে পারে। উপায় উপকরণের ওপর নির্ভরশীল এ জগতে কারোর কাছে কোন জিনিস চাইতে হলে আমরা গৃহস্বামীর কাছেই চেয়ে থাকি, চাকর বাকরদের কাছে চাই না। কিন্তু সমগ্র দয়া-দাক্ষিণ্যের উৎস যেই সত্তা, তার কাছ থেকে নিজের প্রয়োজন

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ
الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٧٧﴾

১১ রুকূ'

আর আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় গোপন সত্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই আছে[৭০] এবং কিয়ামত সংঘটিত হবার ব্যাপারটি মোটেই দেরী হবে না, চোখের পলকেই ঘটে যাবে বরং তার চেয়েও কম সময়ে।[৭১] আসলে আল্লাহ সবকিছুই করতে পারেন।

পূর্ণ করার জন্য যখন সচেষ্ট হই, তখন সমগ্র বিশ্বজাহানের মালিককে বাদ দিয়ে তাঁর বান্দাদের কাছে হাত পাতি।

৬৯. প্রথম উপমায় আল্লাহ ও বানোয়াট মাবুদদের পার্থক্যটা কেবলমাত্র ক্ষমতা ও অক্ষমতার দিক দিয়ে সুস্পষ্ট করা হয়েছিল। এখন এ দ্বিতীয় উপমায় সেই পার্থক্যটিকে আরো বেশী সুস্পষ্ট করে গুণাবলীর দৃষ্টিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ ও এ বানোয়াট মাবুদদের মধ্যে ফারাক শুধুমাত্র এতটুকুই নয় যে, একজন ক্ষমতাধর মালিক এবং অন্যজন ক্ষমতাহীন গোলাম বরং এ ছাড়াও তাদের মধ্যে এ ফারাকটিও রয়েছে যে, এ গোলাম তোমাদের ডাকও শোনে না, তার জবাবও দিতে পারে না এবং নিজের ক্ষমতাবলে কোন একটা কাজও করতে পারে না। তার নিজের সারাটি জীবন তার মালিক ও প্রভুর সত্তার ওপর নির্ভরশীল। আর প্রভু যদি তার ওপর কোন কাজ ছেড়ে দেয় তাহলে সে কিছুই করতে পারে না। অন্যদিকে প্রভুর অবস্থা হচ্ছে এই যে, তিনি কেবল বক্তাই নন বরং জ্ঞানী বক্তা। তিনি দুনিয়াকে ইনসাফের হুকুম দেন। তিনি কেবল কাজ করার ক্ষমতাই রাখেন না বরং যা করেন তা সঠিক ও ন্যায়সংগতভাবেই করেন, সততা ও নির্ভুলতার সাথে করেন। তাহলে বলো, এ ধরনের প্রভু ও গোলামকে তোমরা সমান মনে করো কেমন করে? এটা তোমাদের কোন্ ধরনের বুদ্ধিমত্তা?

৭০. পরবর্তী বাক্য থেকে বুঝা যায়, এটি আসলে মক্কার কাফেরদের একটি প্রশ্নের জবাব। তারা প্রায়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করতো, তুমি আমাদের যে কিয়ামতের আগমনের খবর দিচ্ছো তা যদি সত্যি সত্যিই আসে, তাহলে তা কবে কোন্ তারিখে আসবে? এখানে তাদের প্রশ্ন উদ্ধৃত না করে তার জবাব দেয়া হচ্ছে।

৭১. অর্থাৎ কিয়ামত আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে কোন দীর্ঘ কালীন পর্যায়ে সংঘটিত হবে না। তার আসার আগে তোমরা দূর থেকে তাকে আসতে দেখবে না এবং এর মাঝখানে তোমরা নিজেদেরকে সামলে নিয়ে তার জন্য কিছু প্রস্তুতিও করতে পারবে না। যেকোন দিন যেকোন মুহূর্তে চোখের পলকে বা তার চেয়েও কম সময়ে তা এসে যাবে। কাজেই যে চিন্তা-ভাবনা করতে চায় তার গুরুত্ব সহকারে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত এবং নিজের

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ
لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾
اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِىْ جَوِّ السَّمَآءِ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا
اللّٰهُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٧٩﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ
بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا
يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ
اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٨٠﴾

আল্লাহ তোমাদের মায়ের পেট থেকে তোমাদের বের করেছেন এমন অবস্থায় যখন তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের কান দিয়েছেন, চোখ দিয়েছেন, চিন্তা-ভাবনা করার মত হৃদয় দিয়েছেন,[৭২] যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।[৭৩]

এরা কি কখনো পাখিদের দেখেনি, আকাশ নিঃসীমে কিভাবে তারা নিয়ন্ত্রিত রয়েছে? আল্লাহ ছাড়া কে তাদেরকে ধরে রেখেছে? এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে যারা ঈমান আনে তাদের জন্য।

আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের ঘরগুলোকে বানিয়েছেন শান্তির আবাস। তিনি পশুদের চামড়া থেকে তোমাদের জন্য এমনসব ঘর তৈরী করে দিয়েছেন[৭৪] যেগুলোকে তোমরা সফর ও স্বগৃহে অবস্থান উভয় অবস্থায়ই সহজে বহন করতে পারো।[৭৫] তিনি পশুদের পশম, লোম ও চুল থেকে তোমাদের জন্য পরিধেয় ও ব্যবহার-সামগ্রীসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যা জীবনের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তোমাদের কাজে লাগবে।

মনোভাব ও কর্মনীতি সম্পর্কে যে ফায়সালাই করতে হয় শীঘ্রই করা দরকার। "এখন তো কিয়ামত অনেক দূরে, যখন তা আসতে থাকবে তখনই আল্লাহর সাথে একটা মিটমাট করে নেবো," কারো এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা করে তার ওপর ভরসা করে বসে থাকা উচিত নয়। তাওহীদ সম্পর্কে ভাষণ দিতে দিতে তার মাঝখানে হঠাৎ এভাবে কিয়ামতের আলোচনা করার কারণ হচ্ছে এই যে, লোকেরা যেন তাওহীদ ও শিরকের মাঝখানে কোন

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا
وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ؕ
كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ﴿٨١﴾

তিনি নিজের সৃষ্ট বহু জিনিস থেকে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন, পাহাড়ে তোমাদের জন্য আশ্রয় তৈরী করেছেন এবং তোমাদের এমন পোশাক দিয়েছেন, যা তোমাদের গরম থেকে বাঁচায়[৭৬] আবার এমন কিছু অন্যান্য পোশাক তোমাদের দিয়েছেন যা পারস্পরিক যুদ্ধে তোমাদের হেফাজত করে।[৭৭] এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর নিয়ামতসমূহ সম্পূর্ণ করেন,[৭৮] হয়তো তোমরা অনুগত হবে।

একটি আকীদা নির্বাচন করার ব্যাপারটিকে নিছক একটি তাত্ত্বিক ব্যাপার মনে না করে বসে। তাদের এ অনুভূতি থাকা উচিত যে, কোন অজ্ঞাত মুহূর্তে যে কোন সময় হঠাৎ একটি ফায়সালার সময় এসে যাবে এবং সে সময় এ নির্বাচনের সঠিক বা ভুল হওয়ার ওপর মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করবে। এ সতর্কবাণীর পর আবার আগে থেকে চলে আসা সেই একই আলোচনা শুরু হয়ে যায়।

৭২. অর্থাৎ এমনসব উপকরণ যার সাহায্যে তোমরা দুনিয়ায় সব রকমের জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহ করে দুনিয়ার যাবতীয় কাজ কাম চালাবার যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছো। জন্মকালে মানব সন্তান যত বেশী অসহায় ও অজ্ঞ হয় এমনটি অন্য কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে হয় না। কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উপকরণাদির (শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি, বিবেক ও চিন্তাশক্তি) সাহায্যেই সে উন্নতি লাভ করে পৃথিবীর সকল বস্তুর ওপর প্রাধান্য বিস্তার এবং তাদের ওপর রাজত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করে।

৭৩. অর্থাৎ যে আল্লাহ তোমাদের এসব অগণিত নিয়ামত দান করেছেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। এ নিয়ামতগুলোর ব্যাপারে এর চেয়ে বেশী অকৃতজ্ঞতা আর কি হতে পারে যে, এ কান দিয়ে মানুষ সব কিছু শোনে কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহর কথা শোনে না, এ চোখ দিয়ে সবকিছু দেখে কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখে না এবং এ মস্তিষ্ক দিয়ে সবকিছু চিন্তা করে কিন্তু শুধুমাত্র একথা চিন্তা করে না যে, আমার যে অনুগ্রহকারী আমার প্রতি এসব অনুগ্রহ করেছেন তিনি কে?

৭৪. অর্থাৎ পশুচর্মের তাঁবু। আরবে এর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে।

৭৫. অর্থাৎ যখন কোথাও রওয়ানা হয়ে যেতে চাও তখন তাকে সহজে গুটিয়ে ভাঁজ করে নিয়ে বহন করতে পারো। আবার যখন কোথাও অবস্থান করতে চাও তখন অতি সহজেই ভাঁজ খুলে খাটিয়ে ঘর বানিয়ে ফেলতে পারো।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٨٢﴾ يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ
اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٣﴾

এখন যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে হে মুহাম্মাদ! পরিষ্কারভাবে সত্যের পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া তোমার আর কোন দায়িত্ব নেই। এরা আল্লাহর অনুগ্রহ জানে, কিন্তু সেগুলো অস্বীকার করে,[৭৯] আর এদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক এমন যারা সত্যকে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

৭৬. ঠাণ্ডা থেকে বাঁচাবার কথা না বলার কারণ হচ্ছে এই যে, গরমের সময় কাপড়ের ব্যবহার মানব সভ্যতার পূর্ণতার পর্যায়ভুক্ত। আর পূর্ণতার পর্যায়ের উল্লেখ করার পর তার নিম্নবর্তী প্রাথমিক পর্যায়গুলোর উল্লেখের কোন প্রয়োজন থাকে না। অথবা একথাটি বিশেষভাবে বলা হয়েছে। এ জন্য যে, যেসব দেশে অত্যন্ত মারাত্মক ধরনের লূ-হাওয়া চলে সেখানে শীতকালীন পোশাকের পরিবর্তে গ্রীষ্মকালীন পোশাকের গুরুত্ব হয় বেশী। এসব দেশে লোকেরা যদি মাথা, ঘাড়, কান ও সারা দেহ ভালভাবে না ঢেকে বাইরে বের হয় তাহলে গরম বাতাসে তাদের শরীর ঝলসে যাবে। বরং কোন কোন সময় তো তাদের শুধুমাত্র চোখ দু'টো বাদ দিয়ে সমস্ত চেহারাটাই ঢেকে নিতে হয়।

৭৭. অর্থাৎ বর্ম।

৭৮. নিয়ামত পূর্ণ বা সম্পূর্ণ করার মানে হচ্ছে এই যে, মহান আল্লাহ জীবনের প্রতিটি বিভাগে মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন এবং তারপর এক একটি প্রয়োজন পূর্ণ করার ব্যবস্থা করেন। যেমন এ বিষয়টিই ধরা যায়। বাইরের প্রভাব থেকে মানুষের দেহ সংরক্ষণ কাম্য ছিল। তাই আল্লাহ কোন্ কোন্ দিক থেকে কেমন ধরনের কি পরিমাণ উপকরণ তৈরী করে দিয়েছেন তার বিস্তারিত বিবরণ যদি কেউ লিখতে বসে তাহলে একটি বই তৈরী হয়ে যাবে। এটি যেন পোশাক ও বাসস্থানের দিক দিয়ে আল্লাহর নিয়ামতের পূর্ণতা। অথবা যেমন খাদ্যোপকরণের ব্যাপারটিই ধরা যায়। এ জন্য কত বিশাল পর্যায়ে কত বৈচিত্র সহকারে কেমন ধরনের সব ছোটখাটো প্রয়োজনের প্রতিও নজর রেখে মহান আল্লাহ অসংখ্য অগণিত উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। যদি কেউ এগুলো পর্যালোচনা করতে চায় তাহলে হয়তো শুধুমাত্র খাদ্যের প্রকারভেদ এবং খাদ্য বস্তুগুলোর তালিকা তৈরী করার জন্য একটি বিপুলাকার গ্রন্থের প্রয়োজন হবে। এটি যেন খাদ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লাহর নিয়ামতের পূর্ণতা। এভাবে মানব জীবনের এক একটি ক্ষেত্র ও বিভাগ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ও বিভাগে আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছেন।

৭৯. অস্বীকার বলতে সেই একই আচরণের কথা বুঝানো হয়েছে, যার উল্লেখ আমরা আগেই করে এসেছি। মক্কার কাফেররা একথা অস্বীকার করতো না যে, এ সমস্ত অনুগ্রহ আল্লাহ তাদের প্রতি করেছেন। কিন্তু তাদের আকীদা ছিল, তাদের বুযর্গ ও দেবতাদের

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٤﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ
عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨٥﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ
قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ ۖ
فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٦﴾ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ
يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٧﴾

১২ রুকূ'

(সেদিন কি ঘটবে, সে ব্যাপারে এদের কি কিছুমাত্র হুঁশও আছে) যেদিন আমি উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী[৮০] দাঁড় করাবো, তারপর কাফেরদের যুক্তি–প্রমাণ ও সাফাই পেশ করার সুযোগও দেয়া হবে না।[৮১] আর তাদের কাছে তাওবা ও ইস্‌তিগ্‌ফারেরও দাবী জানানো হবে না।[৮২] জালেমরা যখন একবার আযাব দেখে নেবে তখন তাদের আযাব আর হাল্‌কা করা হবে না এবং তাদেরকে এক মুহূর্তের জন্য বিরামও দেয়া হবে না। আর দুনিয়ায় যারা শির্‌ক করেছিল তারা যখন নিজেদের তৈরী করা শরীকদেরকে দেখবে তখন বলবে, "হে আমাদের রব! এরাই হচ্ছে আমাদের তৈরী করা শরীক, যাদেরকে আমরা তোমাকে বাদ দিয়ে ডাকতাম।" একথায় তাদের ঐ মাবুদরা তাদের পরিষ্কার জবাব দিয়ে বলবে, "তোমরা মিথ্যুক।"[৮৩] সে সময় এরা সবাই আল্লাহর সামনে ঝুঁকে পড়বে এবং এদের সমস্ত মিথ্যা উদ্ভাবন হাওয়া হয়ে যাবে, যা এরা দুনিয়ায় করে বেড়াতো।[৮৪]

হস্তক্ষেপের ফলে তাদের প্রতি এসব অনুগ্রহ করা হয়েছে। আর একারণেই তারা এসব অনুগ্রহের জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সময় ঐসব বুযর্গ ও দেবতাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো বরং তাদের প্রতি কিছুটা বেশী করেই প্রকাশ করতো। একাজটিকেই আল্লাহ নিয়ামত অস্বীকৃতি এবং অকৃতজ্ঞতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

৮০. অর্থাৎ সেই উম্মতের নবী বা এমন কোন ব্যক্তি নবীর তিরোধানের পর যিনি সেই উম্মতকে তাওহীদ ও আল্লাহর আনুগত্যের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তাদেরকে শিরক ও মুশরিকী চিন্তা–ভাবনা, ভ্রষ্টাচার ও কুসংস্কার সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন এবং কিয়ামতের ময়দানে জবাবদিহি করার ব্যাপারে সজাগ করে দিয়েছিলেন। তিনি এ মর্মে সাক্ষ দেবেন

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ۝

যারা নিজেরাই কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়েছে তাদেরকে আমি আযাবের পর আযাব দেবো,[৮৫] দুনিয়ায় তারা যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো তার বদলায়।

যে, তিনি তাদের কাছে সত্যের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই যাকিছু তারা করেছে তা অজ্ঞতার কারণে নয় বরং জেনে বুঝেই করেছে।

৮১. এর অর্থ এ নয় যে, তাদেরকে সাফাই পেশ করার অনুমতি দেয়া হবে না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তাদের অপরাধগুলো এমন অকাট্য ও অনস্বীকার্য সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেয়া হবে যে, তাদের সাফাই পেশ করার আর কোন অবকাশই থাকবে না।

৮২. অর্থাৎ সে সময় তাদেরকে একথা বলা হবে না যে, এখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি—অপরাধগুলোর জন্য ক্ষমা চেয়ে নাও। কারণ সেটা হবে ফায়সালার সময়। ক্ষমা চাওয়ার সময় তার আগে শেষ হয়ে যাবে। কুরআন ও হাদীস উভয় সূত্রই একথা পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে যে, এ দুনিয়াতেই তাওবা ও ইস্‌তিগ্‌ফার করতে হবে, আখেরাতে নয়। আবার দুনিয়াতেও এর সুযোগ শুধুমাত্র ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ মৃত্যুর চিহ্নগুলো ফুটে না ওঠে, যখন মানুষের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, তার শেষ সময় পৌঁছে গেছে। এ সময় তার তওবা গ্রহণীয় নয়। মৃত্যুর সীমান্তে পৌঁছার সাথে সাথেই মানুষের কর্মের অবকাশ খতম হয়ে যায় এবং তখন শুধুমাত্র পুরস্কার ও শাস্তি দানের পাট বাকি থেকে যায়।

৮৩. এর মানে এই নয় যে, তারা মূল ঘটনাটি অস্বীকার করবে এবং বলবে যে, মুশরিকরা তাদেরকে সংকট উত্তরণকারী ও প্রয়োজন পূর্ণকারী বলে ডাকত না। বরং তারা আসলে এ ঘটনা সম্পর্কে তাদের নিজেদের জানা ও অবহিত থাকা এবং এর প্রতি তাদের সম্মতি ও দায়িত্ব অস্বীকার করবে। তারা বলবে, আমরা কখনো তোমাদের একথা বলিনি যে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদের ডাকো এবং তোমাদের এ কাজের প্রতি আমরা কখনো সন্তুষ্টও ছিলাম না। বরং তোমরা যে আমাদের ডেকে চলছো তাতো আমরা জানতামই না। তোমরা যদি প্রার্থনা শ্রবণকারী, প্রার্থনা পূরণকারী, হস্ত ধারণকারী ও সংকট নিরসনকারী বলে আমাদের মনে করে থেকে থাকো তাহলে তো এটা ছিল তোমাদের মনগড়া একটা সর্বৈব মিথ্যা কথা। কাজেই এর সব দায়-দায়িত্বই তোমাদের। এখন এ দায়িত্বের বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করছো কেন?

৮৪. অর্থাৎ তা সবই মিথ্যা প্রমাণিত হবে। দুনিয়ায় তারা যেসব নির্ভর বানিয়ে নিয়েছিল এবং তাদের ওপর ভরসা করতো, সেসব অদৃশ্য হয়ে যাবে। কোন অভিযোগের

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ
وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا
لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ۝٨٩

(হে মুহাম্মাদ! এদেরকে সেই দিন সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দাও) যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজন সাক্ষী দাঁড় করিয়ে দেবো, যে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবে এবং এদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবার জন্য আমি তোমাকে নিয়ে আসবো। (আর এ সাক্ষের প্রস্তুতি হিসেবে) আমি এ কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যা সব জিনিস পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে[৮৬] এবং যা সঠিক পথনির্দেশনা, রহমত ও সুসংবাদ বহন করে তাদের জন্য যারা আনুগত্যের শির নত করে দিয়েছে। ৮৭

প্রতিকারকারীকে সেখানে অভিযোগের প্রতিকার করার জন্য পাবে না। কোন সংকট নিরসনকারীকে তাদের সংকট নিরসন করার জন্য সেখানে পাওয়া যাবে না। কেউ সেখানে এগিয়ে এসে একথা বলবে না যে, এ ব্যক্তিকে কিছু বলো না এ আমার লোক ছিল।

৮৫. অর্থাৎ একটা আযাব হবে কুফরী করার জন্য এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয়ার জন্য হবে আর একটা আযাব।

৮৬. অর্থাৎ এমন প্রত্যেকটি জিনিস পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে, যার ওপর হিদায়াত ও গোমরাহী এবং লাভ ও ক্ষতি নির্ভর করে, যা জানা সঠিক পথে চলার জন্য একান্ত প্রয়োজন এবং যার মাধ্যমে হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভুলক্রমে কিছু কিছু তাফসীর লেখক تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ বাক্যাংশটি এবং এর সম-অর্থবোধক আয়াতগুলোর অর্থ করে এভাবে যে, কুরআনে সবকিছু বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর তারা নিজেদের এ বক্তব্য সত্য প্রমাণ করার জন্য কুরআন থেকে বিজ্ঞান ও টেকনোলজির অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয়বস্তু টেনে বের করতে থাকে।

৮৭. অর্থাৎ যারা আজ এ কিতাবটি মেনে নেবে এবং আনুগত্যের পথ অবলম্বন করবে এ কিতাব জীবনের সব ক্ষেত্রে তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবে, একে অনুসরণ করে চলার কারণে তাদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে এবং এ কিতাব তাদেরকে এ সুসংবাদ দেবে যে, চূড়ান্ত ফায়সালার দিন আল্লাহর আদালত থেকে তারা সফলকাম হয়ে বের হয়ে আসবে। অন্যদিকে যারা এ কিতাব মানবে না তারা যে কেবল হিদায়াত ও রহমত থেকে বঞ্চিত হবে তাই নয় বরং কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহর নবী তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে দাঁড়াবেন তখন এ দলীলটিই হবে তাদের একটি জবরদস্ত প্রমাণ। কারণ নবী একথা প্রমাণ করে দেবেন যে, তিনি তাদেরকে এমন জিনিস দিয়েছিলেন যার মধ্যে হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছিল।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

১৩ রুকূ'

আল্লাহ ন্যায়নীতি, পরোপকার ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করার হুকুম দেন[৮৮] এবং অশ্লীলতা-নির্লজ্জতা ও দুষ্কৃতি এবং অত্যাচার-বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেন।[৮৯] তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষালাভ করতে পারো।

৮৮. এ ছোট্ট বাক্যটিতে এমন তিনটি জিনিসের হুকুম দেয়া হয়েছে যেগুলোর ওপর সমগ্র মানব সমাজের সঠিক অবকাঠামোতে ও চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকা নির্ভরশীল।

প্রথম জিনিসটি হচ্ছে আদল বা ন্যায়পরতা। দু'টি স্থায়ী সত্যের সমন্বয়ে এর ধারণাটি গঠিত। এক, লোকদের মধ্যে অধিকারের ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও সমতা থাকতে হবে। দুই, প্রত্যেককে নির্দ্বিধায় তার অধিকার দিতে হবে। আমাদের ভাষায় এ অর্থ প্রকাশ করার জন্য "ইনসাফ" শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ শব্দটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এ থেকে অনর্থক এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, দু' ব্যক্তির মধ্যে "নিস্‌ফ" "নিস্‌ফ" বা আধাআধির ভিত্তিতে অধিকার বন্টিত হতে হবে। তারপর এ থেকেই আদল ও ইনসাফের অর্থ মনে করা হয়েছে সাম্য ও সমান সমান ভিত্তিতে অধিকার বন্টন। এটি সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিরোধী। আসলে "আদল" সমতা বা সাম্য নয় বরং ভারসাম্য ও সমন্বয় দাবী করে। কোন কোন দিক দিয়ে "আদল" অবশ্যই সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সাম্য চায়। যেমন নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে। কিন্তু আবার কোন কোন দিক দিয়ে সাম্য সম্পূর্ণ "আদল" বিরোধী। যেমন পিতা মাতা ও সন্তানদের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক সাম্য এবং উচ্চ পর্যায়ের কর্মজীবী ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মজীবীদের মধ্যে বেতনের সাম্য। কাজেই আল্লাহ যে জিনিসের হুকুম দিয়েছেন তা অধিকারের মধ্যে সাম্য নয় বরং ভারসাম্য ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা। এ হুকুমের দাবী হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইনগত, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার পূর্ণ ঈমানদারীর সাথে আদায় করতে হবে।

দ্বিতীয় জিনিসটি হচ্ছে ইহ্‌সান বা পরোপকার তথা সদাচার, ঔদার্যপূর্ণ ব্যবহার, সহানুভূতিশীল আচরণ, সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা, পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধা দান, একজন অপর জনের মর্যাদা রক্ষা করা, অন্যকে তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশী দেয়া এবং নিজের অধিকার আদায়ের বেলায় কিছু কমে রাযী হয়ে যাওয়া —এ হচ্ছে আদলের অতিরিক্ত এমন একটি জিনিস যার গুরুত্ব সামষ্টিক জীবনে আদলের চাইতেও বেশী। আদল যদি হয় সমাজের বুনিয়াদ তাহলে ইহ্‌সান হচ্ছে তার সৌন্দর্য ও পূর্ণতা। আদল যদি সমাজকে কটুতা ও তিক্ততা থেকে বাঁচায় তাহলে ইহ্‌সান তার মধ্যে সমাবেশ ঘটায় মিষ্ট মধুর স্বাদের। কোন সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বক্ষণ তার অধিকার কড়ায় গণ্ডায় মেপে মেপে

আদায় করতে থাকবে এবং তারপর ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ অধিকার আদায় করে নিয়েই তবে ক্ষান্ত হবে, আবার অন্যদিকে অন্যদের অধিকারের পরিমাণ কি তা জেনে নিয়ে কেবলমাত্র যতটুকু প্রাপ্য ততটুকুই আদায় করে দেবে, এরূপ কট্টর নীতির ভিত্তিতে আসলে কোন সমাজ টিকে থাকতে পারে না। এমনি ধরনের একটি শীতল ও কাঠখোট্টা সমাজে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত থাকবে না ঠিকই কিন্তু ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা, ঔদার্য, ত্যাগ, আন্তরিকতা, মহানুভবতা ও মংগলাকাংখার মত জীবনের উন্নত মূল্যবোধগুলোর সৌন্দর্য সুষমা থেকে সে বঞ্চিত থেকে যাবে। আর এগুলোই মূলত এমন সব মূল্যবোধ যা জীবনে সুন্দর আবহ ও মধুর আমেজ সৃষ্টি করে এবং সামষ্টিক মানবীয় গুণাবলীকে বিকশিত করে।

তৃতীয় যে জিনিসটির এ আয়াতে হুকুম দেয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করা এবং তাদের সাথে সদাচার করা। এটি আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ইহ্‌সান করার একটি বিশেষ ধরন নির্ধারণ করে। এর অর্থ শুধু এই নয় যে, মানুষ নিজের আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, দুঃখে ও আনন্দে তাদের সাথে শরীক হবে এবং বৈধ সীমানার মধ্যে তাদের সাহায্যকারী ও সহায়ক হবে। বরং এও এর অর্থের অন্তরভুক্ত যে, প্রত্যেক সমর্থ ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদের ওপর শুধুমাত্র নিজের ও নিজের সন্তান-সন্ততির অধিকার আছে বলে মনে করবে না বরং একই সংগে নিজের আত্মীয়-স্বজনদের অধিকারও স্বীকার করবে। আল্লাহর শরীয়াত প্রত্যেক পরিবারের সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেছে যে, তাদের পরিবারের অভাবী লোকেরা যেন অভুক্ত ও বস্ত্রহীন না থাকে। তার দৃষ্টিতে কোন সমাজের এর চেয়ে বড় দুর্গতি আর হতেই পারে না যে, তার মধ্যে বসবাসকারী এক ব্যক্তি প্রাচুর্যের মধ্যে অবস্থান করে বিলাসী জীবন যাপন করবে এবং তারই পরিবারের সদস্য তার নিজের জ্ঞাতি ভাইয়েরা ভাত-কাপড়ের অভাবে মানবেতর জীবন যাপন করতে থাকবে। ইসলাম পরিবারকে সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান গণ্য করে এবং এ ক্ষেত্রে এ মূলনীতি পেশ করে যে, প্রত্যেক পরিবারের গরীব ব্যক্তিবর্গের প্রথম অধিকার হয় তাদের পরিবারের সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের ওপর, তারপর অন্যদের ওপর তাদের অধিকার আরোপিত হয়। আর প্রত্যেক পরিবারের সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের ওপর প্রথম অধিকার আরোপিত হয় তাদের গরীব আত্মীয়-স্বজনদের, তারপর অন্যদের অধিকার তাদের ওপর আরোপিত হয়। এ কথাটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাই বিভিন্ন হাদীসে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে, মানুষের ওপর সর্বপ্রথম অধিকার তার পিতামাতার, তারপর স্ত্রী-সন্তানদের, তারপর ভাই-বোনদের, তারপর যারা তাদের পরে নিকটতর এবং তারপর যারা তাদের পরে নিকটতর। এ নীতির ভিত্তিতেই হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি ইয়াতীম শিশুর চাচাত ভাইদেরকে তার লালন পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি অন্য একজন ইয়াতীমের পক্ষে ফায়সালা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, যদি এর কোন দূরতম আত্মীয়ও থাকতো তাহলে আমি তার ওপর এর লালন পালনের দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিতাম। অনুমান করা যেতে পারে, যে সমাজের প্রতিটি পরিবার ও ব্যক্তি (Unit) এভাবে নিজেদের ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব নিজেরাই নিয়ে নেয় সেখানে কতখানি অর্থনৈতিক

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾ وَلَا
تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ۚ
تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ
إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

আল্লাহর অংগীকার পূর্ণ করো যখনই তোমরা তাঁর সাথে কোন অংগীকার করো এবং নিজেদের কসম দৃঢ় করার পর আবার তা ভেঙে ফেলো না যখন তোমরা আল্লাহকে নিজের ওপর সাক্ষী বানিয়ে নিয়েছো। আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত। তোমাদের অবস্থা যেন সেই মহিলাটির মত না হয়ে যায় যে নিজ পরিশ্রমে সূতা কাটে এবং তারপর নিজেই তা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে।[৯০] তোমরা নিজেদের কসমকে পারস্পরিক ব্যাপারে ধোকা ও প্রতারণার হাতিয়ারে পরিণত করে থাকো, যাতে এক দল অন্য দলের তুলনায় বেশী ফায়দা হাসিল করতে পারো। অথচ আল্লাহ এ অংগীকারের মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষার মুখোমুখি করেন।[৯১] আর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তিনি তোমাদের সমস্ত মত-বিরোধের রহস্য উন্মোচিত করে দেবেন।[৯২]

সচ্ছলতা, কেমন ধরনের সামাজিক মাধুর্য এবং কেমনতর নৈতিক ও চারিত্রিক পূতঃ পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে।

৮৯. ওপরের তিনটি সৎ কাজের মোকাবিলায় আল্লাহ তিনটি অসৎ কাজ করতে নিষেধ করেন। এ অসৎকাজগুলো ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যক্তিবর্গকে এবং সামষ্টিক পর্যায়ে সমগ্র সমাজ পরিবেশকে খারাপ করে দেয়।

প্রথম জিনিসটি হচ্ছে অশ্লীলতা-নির্লজ্জতা (فحشاء) । সব রকমের অশালীন, কদর্য ও নির্লজ্জ কাজ এর অন্তরভুক্ত। এমন প্রত্যেকটি খারাপ কাজ যা স্বভাবতই কুৎসিত, নোংরা, ঘৃণ্য ও লজ্জাকর। তাকেই বলা হয় অশ্লীলতা। যেমন কৃপণতা, ব্যভিচার, উলংগতা, সমকামিতা, মুহাররাম আত্মীয়কে বিয়ে করা, চুরি, শরাব পান, ভিক্ষাবৃত্তি, গালাগালি করা, কটু কথা বলা ইত্যাদি। এভাবে সর্ব সমক্ষে বেহায়াপনা ও খারাপ কাজ করা এবং খারাপ কাজকে ছড়িয়ে দেয়াও অশ্লীলতা-নির্লজ্জতার অন্তরভুক্ত। যেমন মিথ্যা

প্রচারণা, মিথ্যা দোষারোপ, গোপন অপরাধ জন সমক্ষে বলে বেড়ানো, অসৎকাজের প্ররোচক গল্প, নাটক ও চলচ্চিত্র, উলংগ চিত্র, মেয়েদের সাজগোজ করে জনসমক্ষে আসা, নারী-পুরুষ প্রকাশ্যে মেলামেশা এবং মঞ্চে মেয়েদের নাচগান করা ও তাদের শারীরিক অংগভংগীর প্রদর্শনী করা ইত্যাদি।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে দুষ্কৃতি (منكر) । এর অর্থ হচ্ছে এমন সব অসৎ কাজ যেগুলোকে মানুষ সাধারণভাবে খারাপ মনে করে থাকে, চিরকাল খারপ বলে আসছে এবং আল্লাহর সকল শরীয়াত যে কাজ করতে নিষেধ করেছে।

তৃতীয় জিনিসটি জুলুম-বাড়াবাড়ি (بغى) । এর মানে হচ্ছে, নিজের সীমা অতিক্রম করা এবং অন্যের অধিকার তা আল্লাহর হোক বা বান্দার হোক লংঘন করা ও তার ওপর হস্তক্ষেপ করা।

৯০. এখানে পর্যায়ক্রমে তিন ধরনের অংগীকারকে তাদের গুরুত্বের প্রেক্ষিতে আলাদা আলাদাভাবে বর্ণনা করে সেগুলো মেনে চলার হুকুম দেয়া হয়েছে। এক, মানুষ আল্লাহর সাথে যে অংগীকার করেছে। এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। দুই, একজন বা একদল মানুষ অন্য একজন বা একদল মানুষের সাথে যে অংগীকার করেছে। এর ওপর আল্লাহর কসম খেয়েছে। অথবা কোন না কোনভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে নিজের কথার দৃঢ়তাকে নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করেছে। এটি দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ। তিন, আল্লাহর নাম না নিয়ে যে অংগীকার করা হয়েছে। এর গুরুত্ব উপরের দু' প্রকার অংগীকারের পরবর্তী পর্যায়ের। তবে উল্লিখিত সব কয়টি অংগীকারই পালন করতে হবে এবং এর মধ্য থেকে কোনটি ভেঙে ফেলা বৈধ নয়।

৯১. এখানে বিশেষ করে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের অংগীকার ভংগের নিন্দা করা হয়েছে। এ ধরনের অংগীকার ভংগ দুনিয়ায় বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উচ্চ পর্যায়ের বড় বড় লোকেরাও একে সৎ কাজ মনে করেই করে এবং এর মাধ্যমে নিজেদের জাতি ও সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বাহ্‌বা কুড়ায়। জাতি ও দলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সংঘাতের ক্ষেত্রে প্রায়ই এমনটি হতে দেখা যায়। এক জাতির নেতা এক সময় অন্য জাতির সাথে একটি চুক্তি করে এবং অন্য সময় শুধুমাত্র নিজের জাতীয় স্বার্থের খাতিরে তা প্রকাশ্যে ভংগ করে অথবা পর্দান্তরালে তার বিরুদ্ধাচরণ করে অবৈধ স্বার্থ উদ্ধার করে। নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে খুবই সত্যনিষ্ঠ বলে যারা পরিচিত, তারাই সচরাচর এমনি ধরনের কাজ করে থাকে। তাদের এসব কাজের বিরুদ্ধে শুধু যে সমগ্র জাতির মধ্য থেকে কোন নিন্দাবাদের ধ্বনি ওঠে না তা নয় বরং সব দিক থেকে তাদেরকে বাহ্‌বা দেয়া হয় এবং এ ধরনের ঠগবাজী ও ধূর্তামীকে পাকাপোক্ত ডিপ্লোমেসী মনে করা হয়। আল্লাহ এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলছেন, প্রত্যেকটি অংগীকার আসলে অংগীকারকারী ব্যক্তি ও জাতির চরিত্র ও বিশ্বস্ততার পরীক্ষা স্বরূপ। যারা এ পরীক্ষায় ব্যর্থ হবে তারা আল্লাহর আদালতে জবাবদিহির হাত থেকে বাঁচতে পারবে না।

৯২. অর্থাৎ যেসব মতবিরোধের কারণে তোমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলছে সেগুলোর ব্যাপারে কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী তার ফায়সালা তো কিয়ামতের দিন হবে। কিন্তু যে কোন অবস্থায়ই কেউ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এবং তার প্রতিপক্ষ

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ
مَنْ يَّشَاءُ ۭ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ
دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْۗءَ بِمَا
صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

যদি (তোমাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ না হোক) এটাই আল্লাহর ইচ্ছা হতো তাহলে তিনি তোমাদের সবাইকে একই উম্মতে পরিণত করতেন।[৯৩] কিন্তু তিনি যাকে চান গোমরাহীর মধ্যে ঠেলে দেন এবং যাকে চান সরল সঠিক পথ দেখান।[৯৪] আর অবশ্যই তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

(আর হে মুসলমানরা!) তোমরা নিজেদের কসমসমূহকে পরস্পরকে ধোকা দেবার মাধ্যমে পরিণত করো না। কোন পদক্ষেপ একবার দৃঢ় হবার পর আবার যেন পিছলে না যায় এবং তোমরা লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করেছো এই অপরাধে যেন তোমরা অশুভ পরিণামের সম্মুখীন না হও এবং কঠিন শাস্তি ভোগ না করো।[৯৫]

পুরোপুরি গোমরাহ ও মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকলেও তার জন্য কখনো কোনভাবে নিজের গোমরাহ প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় অংগীকার ভংগ, মিথ্যাচার ও প্রতারণার অস্ত্র ব্যবহার করা বৈধ হতে পারে না। যদি সে এ পথ অবলম্বন করে তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর পরীক্ষায় সে অকৃতকার্য প্রমাণিত হবে। কারণ সততা ও ন্যায়নিষ্ঠতা কেবলমাত্র আদর্শ ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রেই সত্যবাদিতার দাবী করে না বরং কর্মপদ্ধতি ও উপায় উপকরণের ক্ষেত্রেও সত্য পথ অবলম্বন করতে বলে। বিশেষ করে যেসব ধর্মীয় গোষ্ঠী প্রায়ই এ ধরনের অহমিকা পোষণ করে থাকে যে, তারা যেহেতু আল্লাহর পক্ষের লোক এবং তাদের বিরোধী পক্ষ আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, তাই সম্ভাব্য যেকোন পদ্ধতিতেই হোক না কেন প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার অধিকার তাদের রয়েছে, তাদেরকে সতর্ক করার জন্য এখানে একথা বলা হচ্ছে। তারা মনে করে থাকে, আল্লাহর অবাধ্য লোকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময় সততা ও বিশ্বস্ততার পথ অবলম্বন এবং অংগীকার পালনের কোন প্রয়োজন পড়ে না, এটা তাদের অধিকার। আরবের ইহুদীরাও ঠিক একথাই বলতো। তারা বলতো لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ অর্থাৎ আরবের মুশরিকদের ব্যাপারে আমাদের হাত পা কোন বিধি-নিষেধের শৃংখলে বাঁধা নেই। তাদের সাথে সব রকমের বিশ্বাসঘাতকতা করা যেতে পারে। যে ধরনের কৌশল অবলম্বন করে আল্লাহর প্রিয় পাত্রদের স্বার্থ উদ্ধার এবং কাফেরদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যায়

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ اللّٰهِ بَاقٍ ۗ
وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ
حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

আল্লাহর অংগীকারকে[৯৬] সামান্য লাভের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়ো না।[৯৭] যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে তা তোমাদের জন্য বেশী ভাল, যদি তোমরা জানতে। তোমাদের কাছে যা কিছু আছে খরচ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে তাই স্থায়ী হবে এবং আমি অবশ্যই যারা সবরের পথ অবলম্বন করবে[৯৮] তাদের প্রতিদান তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুযায়ী দেবো। পুরুষ বা নারী যে-ই সৎকাজ করবে, সে যদি মুমিন হয়, তাহলে তাকে আমি দুনিয়ায় পবিত্র-পরিচ্ছন্ন জীবন দান করবো[৯৯] এবং (আখেরাতে) তাদের প্রতিদান দেবো তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুসারে।[১০০]

তা অবলম্বন করা সম্পূর্ণ বৈধ। এ জন্য তাদের কোন জিজ্ঞাসাবাদ ও জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে না বলে তারা মনে করতো।

৯৩. এটা পূর্ববর্তী বক্তব্যের আরো একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা। এর অর্থ হচ্ছে, যদি কেউ নিজেকে আল্লাহর পক্ষের লোক মনে করে ভাল-মন্দ উভয় পদ্ধতিতে নিজের ধর্মের (যাকে সে আল্লাহর প্রেরিত ধর্ম মনে করছে) প্রসার এবং অন্যের ধর্মকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালায়, তাহলে তার এ প্রচেষ্টা হবে সরাসরি আল্লাহর ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য বিরোধী। কারণ মানুষের ধর্মীয় মতবিরোধের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে যদি সমস্ত মানুষকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় একটি ধর্মের অনুসারী বানানোই আল্লাহর উদ্দেশ্য হতো তাহলে এ জন্য আল্লাহর নিজের "তথাকথিত" পক্ষের লোকদের লেলিয়ে দেয়ার এবং তাদের নিকৃষ্ট অস্ত্রের সাহায্য নেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এ কাজ তো তিনি নিজের সৃজনী ক্ষমতার মাধ্যমে করতে পারতেন। তিনি সবাইকে মুমিন ও অনুগত হিসেবে সৃষ্টি করতেন এবং তাদের থেকে কুফরী ও গোনাহ করার ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতেন। এরপর ঈমান ও আনুগত্যের পথ থেকে একচুল পরিমাণ সরে আসার ক্ষমতা কারো থাকতো না।

৯৪. অর্থাৎ আল্লাহ নিজেই মানুষকে নির্বাচন ও গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। তাই দুনিয়ায় মানুষদের পথ বিভিন্ন। কেউ গোমরাহীর দিকে যেতে চায় এবং আল্লাহ গোমরাহীর

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾
إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾
إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾

তারপর যখন তোমরা কুরআন পড়ো তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর শরণ নিতে থাকো।[১০১] যারা ঈমান আনে এবং নিজেদের রবের প্রতি আস্থা রাখে তাদের ওপর তার কোন আধিপত্য নেই। তার আধিপত্য ও প্রতিপত্তি চলে তাদের ওপর যারা তাকে নিজেদের অভিভাবক বানিয়ে নেয় এবং তার প্ররোচনায় শিরক করে।

সমস্ত উপকরণ তার জন্য তৈরী করে দেন। কেউ সত্য–সঠিক পথের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে এবং আল্লাহ তাকে সঠিক পথনির্দেশনা দানের ব্যবস্থা করেন।

৯৫. অর্থাৎ কোন ব্যক্তি একবার ইসলামের সত্যতা মেনে নেবার পর নিছক তোমাদের অসৎ আচরণের কারণে এ দীন থেকে সরে যাবে এবং মুমিনদের দলের অন্তরভুক্ত হতে সে শুধুমাত্র এ জন্য বিরত থাকবে যে, যাদের সাথে তার ওঠাবসা হয়েছে তাদেরকে সে আচার-আচরণ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে কাফেরদের থেকে কিছুটা ভিন্নতর পায়নি।

৯৬. অর্থাৎ যে অংগীকার তোমরা করেছো আল্লাহর নামে অথবা আল্লাহর দীনের প্রতিনিধি হিসেবে।

৯৭. এর অর্থ এ নয় যে, বড় লাভের বিনিময়ে তা বিক্রি করতে পারো। বরং এর অর্থ হচ্ছে, দুনিয়ার যে কোন লাভ বা স্বার্থ আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকারের তুলনায় সামান্যতম মূল্যের অধিকারী। তাই ঐ তুচ্ছ জিনিসের বিনিময়ে এ মূল্যবান সম্পদটি বিক্রি করা যে কোন অবস্থায়ই ক্ষতির ব্যবসায় ছাড়া আর কিছুই নয়।

৯৮. "সবরের পথ অবলম্বন কারীদেরকে" অর্থাৎ এমন সব লোকদেরকে যারা সকল প্রকার লোভ–লালসা ও কামনা–বাসনার মোকাবিলায় সত্য ও সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ দুনিয়ায় সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন করলে যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় তা সবই যারা বরদাশ্‌ত করে নেয়। দুনিয়ায় অবৈধ পন্থা অবলম্বন করলে যেসব লাভ পাওয়া যেতে পারে তা সবই যারা দূরে নিক্ষেপ করে। যারা ভাল কাজের সুফল লাভ করার জন্য সে সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে প্রস্তুত থাকে, যে সময়টি বর্তমান পার্থিব জীবনের অবসান ঘটার পর অন্য জগতে আসবে।

৯৯. এ আয়াতে মুমিন ও কাফের উভয় দলের এমন সব সংকীর্ণচেতা ও বেসবর লোকদের ভুল ধারণা দূর করা হয়েছে, যারা মনে করে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতা–পরিচ্ছন্নতার পথ অবলম্বন করলে মানুষের পরকালে সাফল্য অর্জিত হলেও তার পার্থিব জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের জবাবে আল্লাহ বলছেন, তোমাদের এ ধারণা ভুল। এ সঠিক পথ অবলম্বন করলে শুধু পরকালীন জীবনই সুগঠিত হয় না, দুনিয়াবী জীবনও সুখী সমৃদ্ধিশালী হয়। যারা প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার, পবিত্র–পরিচ্ছন্ন এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ও সৎ তাদের পার্থিব জীবন ও বেঈমান ও অসৎকর্মশীল লোকদের তুলনায় সুস্পষ্টভাবে ভাল ও উন্নত হয়। নিজেদের নিষ্কলংক চরিত্রের কারণে তারা যে প্রকৃত সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন তা অন্যেরা লাভ করতে পারে না। যেসব পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন ও উত্তম সাফল্য তারা লাভ করে থাকেন তাও অন্যেরা লাভ করতে পারে না। কারণ অন্যদের প্রতিটি সাফল্য হয় নোংরা ও ঘৃণিত পদ্ধতি অবলম্বনের ফসল। সৎলোকেরা ছেঁড়া কাঁথায় শয়ন করেও যে মানসিক প্রশান্তি ও চিন্তার স্থৈর্য লাভ করেন তার সামান্যতম অংশও প্রাসাদবাসী বেঈমান দুষ্কৃতিকারী লাভ করতে পারে না।

১০০. আখেরাতে তাদের মর্যাদা তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত হবে। অন্য কথায় যে ব্যক্তি দুনিয়ায় ছোট বড় সব রকমের সৎকাজ করে থাকবে তাকে তার সবচেয়ে বড় সৎকাজের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চতম মর্যাদা দান করা হবে।

১০১. এর অর্থ কেবল এতটুকুই নয় যে, মুখে শুধুমাত্র اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ উচ্চারণ করলেই হয়ে যাবে। বরং এ সংগে কুরআন পড়ার সময় যথার্থই শয়তানের বিভ্রান্তিকর প্ররোচনা থেকে মুক্ত থাকার বাসনা পোষণ করতে হবে এবং কার্যত তার প্ররোচনা থেকে নিষ্কৃতি লাভের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ভুল ও অনর্থক সন্দেহ–সংশয়ে লিপ্ত হওয়া যাবে না। কুরআনের প্রত্যেকটি কথাকে তার সঠিক আলোকে দেখতে হবে এবং নিজের মনগড়া মতবাদ বা বাইর থেকে আমদানী করা চিন্তার মিশ্রণে কুরআনের শব্দাবলীর এমন অর্থ করা যাবে না যা আল্লাহর ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এই সংগে মানুষের মনে এ চেতনা এবং উপলব্ধিও জাগ্রত থাকতে হবে যে, মানুষ যাতে কুরআন থেকে কোন পথনির্দেশনা লাভ করতে না পারে সে জন্যই শয়তান সবচেয়ে বেশী তৎপর থাকে। এ কারণে মানুষ যখনি এ কিতাবটির দিকে ফিরে যায় তখনি শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করার এবং পথনির্দেশনা লাভ থেকে বাধা দেবার এবং তাকে ভুল চিন্তার পথে পরিচালিত করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। তাই এ কিতাবটি অধ্যয়ন করার সময় মানুষকে অত্যন্ত সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে যাতে শয়তানের প্ররোচনা ও সূক্ষ্ম অনুপ্রবেশের কারণে সে এ হেদায়াতের উৎসটির কল্যাণকারিতা থেকে বঞ্চিত না হয়ে যায়। কারণ যে ব্যক্তি এখান থেকে সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে পারেনি সে অন্য কোথা থেকেও সৎপথের সন্ধান পাবে না। আর যে ব্যক্তি এ কিতাব থেকে ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে দুনিয়ার অন্য কোন জিনিস তাকে বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

এ আয়াতটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে। সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে এই যে, সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে এমনসব আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে যেগুলো মক্কার মুশরিকরা কুরআন মজীদের বিরুদ্ধে উত্থাপন করতো। তাই প্রথমে ভূমিকা স্বরূপ বলা

وَإِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْٓا
اِنَّمَآ اَنْتَ مُفْتَرٍ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠١﴾ قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ
الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى
وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٠٢﴾

১৪ রুকূ'

যখন আমি একটি আয়াতের জায়গায় অন্য একটি আয়াত নাযিল করি—আর আল্লাহ ভাল জানেন তিনি কি নাযিল করবেন—তখন এরা বলে, তুমি নিজেই এ কুরআন রচনা কর।[১০২] আসলে এদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না। এদেরকে বলো, একে তো রূহুল কুদুস ঠিক ঠিকভাবে তোমার রবের পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছে,[১০৩] যাতে মুমিনদের ঈমান সুদৃঢ় করা যায়,[১০৪] অনুগতদেরকে জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে সোজা পথ দেখানো যায়[১০৫] এবং তাদেরকে সাফল্য ও সৌভাগ্যের সুসংবাদ দান করা যায়।[১০৬]

হয়েছে, কুরআনকে তার যথার্য আলোকে একমাত্র সেই ব্যক্তিই দেখতে পারে যে শয়তানের বিভ্রান্তিকর প্ররোচনা থেকে সজাগ–সতর্ক থাকে এবং তা থেকে নিজেকে সংরক্ষিত রাখার জন্য আল্লাহর কাছে পানাহ চায়। অন্যথায় শয়তান কখনো সোজাসুজি কুরআন ও তার বক্তব্যসমূহ অনুধাবন করার সুযোগ মানুষকে দেয় না।

১০২. এক আয়াতের জায়গায় অন্য এক আয়াত নাযিল করার অর্থ একটি হুকুমের পরে অন্য একটি হুকুম পাঠানোও হতে পারে। কারণ কুরআন মজীদের বিধানগুলো পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়েছে এবং বহুবার একই ব্যাপারে কয়েক বছর পরপর ধারাবাহিকভাবে, একটি করে, দুটি করে বা তিনটি করে হুকুম পাঠানো হয়েছে। যেমন মদের ব্যাপারে বা যিনার শাস্তির ব্যাপারে ঘটেছে। কিন্তু এ অর্থ গ্রহণ করতে আমি ইতস্তত করছি এ জন্য যে, সূরা নাহ্‌লের এ আয়াতটি মক্কী যুগে নাযিল হয়। আর যতদূর আমি জানি সে সময় নাযিলকৃত বিধিসমূহে এ পর্যায়ক্রমিক ধারা অবলম্বনের কোন দৃষ্টান্ত নেই। তাই আমি এখানে "এক আয়াতের জায়গায় অন্য এক আয়াত নাযিল করা"র অর্থ এই মনে করি যে, কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে কখনো একটি বিষয়বস্তুকে একটি উপমা বা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝানো হয়েছে আবার কখনো ঐ একই বিষয়বস্তু বুঝাবার জন্য অন্য একটি দৃষ্টান্ত বা উপমার সাহায্য নেয়া হয়েছে। একই কাহিনী বারবার এসেছে এবং প্রত্যেক বারই তাকে ভিন্ন শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। একটি বিষয়ের কখনো একটি দিক পেশ করা হয়েছে এবং কখনো সেই একই বিষয়ের অন্য একটি দিক সামনে আনা হয়েছে। একটি কথার জন্য কখনো একটি যুক্তি পেশ করা হয়েছে আবার কখনো পেশ করা হয়েছে অন্য

একটি যুক্তি। একটি কথা এক সময় সংক্ষেপে বলা হয়েছে এবং অন্য সময় বলা হয়েছে বিস্তারিতভাবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, নাউযুবিল্লাহ, নিজেই এ কুরআন রচনা করেন বলে মক্কার কাফেররা যে কথা বলতো—এ জিনিসটিকেই তারা তার প্রমাণ গণ্য করতো। তাদের যুক্তি ছিল, আল্লাহর জ্ঞান যদি এ বাণীর উৎস হতো, তাহলে সব কথা একই সংগে বলে দেয়া হতো। আল্লাহ তো মানুষের মত অপরিপক্ক ও কম জ্ঞানের অধিকারী নন। কাজেই তিনি কেন চিন্তা করে করে কথা বলবেন, ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে তথ্য জ্ঞান লাভ করতে থাকবেন এবং একটি কথা সঠিকভাবে খাপখেয়ে না বসতে পারলে অন্য এক পদ্ধতিতে কথা বলবেন? তোমার এ বাণীর মধ্যে তো মানবিক জ্ঞানের দুর্বলতা ধরা পড়ছে।

১০৩. "রূহুল কুদুস" এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে 'পবিত্র রূহ' বা 'পবিত্রতার রূহ।' পারিভাষিকভাবে এ উপাধিটি দেয়া হয়েছে হযরত জিব্রীল আলাইহিস সালামকে। এখানে অহী বাহক ফেরেশতার নাম না নিয়ে তার উপাধি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রোতাদেরকে এ সত্যটি জানানো যে, এমন একটি রূহ এ বাণী নিয়ে আসছেন যিনি সকল প্রকার মানবিক দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি মুক্ত। তিনি এমন পর্যায়ের অবিশ্বস্ত নন যে, আল্লাহ যা পাঠান, তিনি নিজের পক্ষ থেকে তার সাথে অন্য কিছু মিশিয়ে দিয়ে তাকে অন্য কিছু বানিয়ে দেন। তিনি কোন দুরভিসন্ধিকারী বা কূচক্রী নন যে, নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থে ধোকাবাজী ও প্রতারণার আশ্রয় নেবেন। তিনি একটি নিখাদ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রূহ। আল্লাহর কালাম পূর্ণ আমানতদারীর সাথে পৌঁছিয়ে দেয়াই তাঁর কাজ।

১০৪. অর্থাৎ তার পর্যায়ক্রমে এ বাণী নিয়ে আসার এবং একই সময় সবকিছু না নিয়ে আসার কারণ এ নয় যে, আল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মধ্যে কোন ত্রুটি আছে, যেমন তোমরা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে বুঝে নিয়েছো। বরং এর কারণ হচ্ছে এই যে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, বোধশক্তি ও গ্রহণ শক্তির মধ্যে ত্রুটি রয়েছে, যে কারণে একই সংগে সে সমস্ত কথা বুঝতে পারে না এবং একই সময় বুঝানো সমস্ত কথা তার মনে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূলও হতে পারে না। তাই মহান আল্লাহ আপন প্রজ্ঞা বলে এ ব্যবস্থা করেন যে, রূহুল কুদুস এ কালামকে সামান্য সামান্য করে আনবেন। কখনো সংক্ষেপে আবার কখনো বিস্তারিত বর্ণনার আশ্রয় নেবেন। কখনো এক পদ্ধতিতে বুঝাবেন আবার কখনো অন্য পদ্ধতিতে। কখনো এক বর্ণনা রীতি অবলম্বন করবেন আবার কখনো অবলম্বন করবেন অন্য বর্ণনা রীতি। একই কথাকে বারবার বিভিন্ন পদ্ধতিতে হৃদয়ংগম করার চেষ্টা করবে, যাতে বিভিন্ন যোগ্যতা সম্পন্ন সত্যানুসন্ধানীরা ঈমান আনতে পারে এবং ঈমান আনার পর তাদের জ্ঞান, বিশ্বাস, প্রত্যয়, বোধ ও দৃষ্টি পাকাপোক্ত হতে পারে।

১০৫. এটি হচ্ছে এ পর্যায়ক্রমিক কার্যক্রমের দ্বিতীয় উপযোগিতা ও স্বার্থকতা। অর্থাৎ যারা ঈমান এনে আনুগত্যের পথে অগ্রসর হচ্ছে তাদেরকে ইসলামী দাওয়াতের কাজে এবং জীবন সমস্যার ক্ষেত্রে যে সময় যে ধরনের পথনির্দেশনার প্রয়োজন হবে তা যথা সময়ে দেয়া হবে। একথা সুস্পষ্ট যে, ঠিক সময়ের আগে তাদেরকে এ পথনির্দেশনা দেয়া সংগত হতে পারে না এবং একই সংগে সমস্ত পথনির্দেশনা দেয়া তাদের জন্য উপকারীও হবে না।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۗ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ
إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٠٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ ۙ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي
الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾
مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

আমি জানি এরা তোমার সম্পর্কে বলে, এ ব্যক্তিকে একজন লোক শিক্ষা দেয়।[১০৭] অথচ এরা যে ব্যক্তির দিকে ইংগিত করে তার ভাষা তো আরবী নয়। আর এটি হচ্ছে পরিষ্কার আরবী ভাষা। আসলে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ মানে না আল্লাহ কখনো তাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার সুযোগ দেন না এবং এ ধরনের লোকদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (নবী মিথ্যা কথা তৈরী করে না বরং) মিথ্যা তারাই তৈরী করছে যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ মানে না,[১০৮] তারাই আসলে মিথ্যেবাদী।

যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুফরী করে, (তাকে যদি) বাধ্য করা হয় এবং তার অন্তর ঈমানের ওপর নিশ্চিন্ত থাকে (তাহলে তো ভাল কথা), কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্ণ মানসিক তৃপ্তিবোধ ও নিশ্চিন্ততা সহকারে কুফরীকে গ্রহণ করে নিয়েছে তার ওপর আল্লাহর গযব আপতিত হয় এবং এ ধরনের সব লোকদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।[১০৯]

১০৬. এটি হচ্ছে তার তৃতীয় স্বার্থকতা। অর্থাৎ অনুগতদের যেসব বাধা বিপত্তি ও বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, যেভাবে তাদেরকে নির্যাতন করা ও কষ্ট দেয়া হচ্ছে এবং ইসলামী দাওয়াতের কাজে সমস্যা ও সংকটের যেসব পাহাড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে সবের কারণে বারবার সুসংবাদের মাধ্যমে তাদের হিম্মত ও সাহস বাড়ানো এবং শেষ পরিণতিতে তাদেরকে সুনিশ্চিত সফলতার আশ্বাস দেয়া অপরিহার্য হয়ে ওঠে, যাতে তারা আশাদীপ্ত হতে পারে এবং হতাশ ও বিষণ্ন বদনে তাদের দিন কাটাতে না হয়।

১০৭. হাদীসে বিভিন্ন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে, মক্কার কাফেররা তাদের মধ্য থেকে কারো সম্পর্কে এ ধারণা করতো। এক হাদীসে তার নাম বলা হয়েছে 'জাবার।' সে ছিল আমের আল হাদ্‌রামীর রোমীয় ক্রীতদাস। অন্য এক হাদীসে খুয়াইতিব ইবনে আবদুল উয্‌যার এক গোলামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তার নাম ছিল 'আইশ বা ইয়া'ঈশ। তৃতীয় এক হাদীসে ইয়াসারের নাম নেয়া হয়েছে। তার ডাকনাম ছিল আবু ফুকাইহাহ্। সে ছিল মক্কার এক মহিলার ইহুদী গোলাম। অন্য একটি হাদীসে বাল্'আন বা বাল্'আম নামক এক রোমীয় গোলামের কথা বলা হয়েছে। মোটকথা এদের মধ্য থেকে যেই হোক না কেন, মক্কার কাফেররা শুধুমাত্র এক ব্যক্তি তাওরাত ও ইন্‌জীল পড়ে এবং তার সাথে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতও হয়েছে শুধুমাত্র এটা দেখেই নিসংকোচে এ অপবাদ তৈরী করে ফেললো যে, আসলে এ ব্যক্তিই এ কুরআন রচনা করছে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নাম নিয়ে নিজের পক্ষ থেকে এটিই পেশ করছেন। এ থেকে নবী করীমের (স) বিরোধিরা তাঁর ওপর দোষারোপ করার ব্যাপারে কত নির্লজ্জ নির্ভীক ছিল, কেবল তাই অনুমিত হয় না বরং নিজেদের সমকালীনদের মূল্য ও মর্যাদা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে মানুষ যে কতটা ন্যায়নীতিহীন ও ইনসাফ বিবর্জিত হয়ে থাকে সে শিক্ষাও পাওয়া যায়। তাদের সামনে ছিল মানব ইতিহাসের এমন এক বিরাট ব্যক্তিত্ব যার নজির সে সময় সারা দুনিয়ায় কোথাও ছিল না এবং আজ পর্যন্তও কোথাও পাওয়া যায়নি। কিন্তু সেই কাণ্ডজ্ঞানহীন নির্বোধরা সামান্য কিছু তাওরাত ও ইনজীল পড়তে পারতো এমন একজন অনারব গোলামকে এ মহান ব্যক্তিত্বের মোকাবিলায় যোগ্যতর বিবেচনা করছিল। তারা ধারণা করছিল, এ দুর্লভ রত্নটি ঐ কয়লা খণ্ড থেকেই দ্যুতি লাভ করছে।

১০৮. এ আয়াতের দ্বিতীয় অনুবাদ এও হতে পারে "মিথ্যা তো তারাই তৈরী করে যারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি ঈমান আনে না।"

১০৯. এ আয়াতে এমন সব মুসলমানদের কথা আলোচনা করা হয়েছে যাদের ওপর সে সময় কঠোর নির্যাতন চালানো হচ্ছিল এবং যাদেরকে অসহনীয় কষ্ট ও যন্ত্রণা দিয়ে কুফরী করতে বাধ্য করা হচ্ছিল। তাদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা যদি কখনো জুলুম-নিপীড়নের চাপে বাধ্য হয়ে নিছক প্রাণ বাঁচাবার জন্য কুফরী কথা মুখে উচ্চারণ করো এবং তোমাদের অন্তর কুফরী আকীদা মুক্ত থাকে তাহলে তোমাদের মাফ করে দেয়া হবে। কিন্তু যদি অন্তরে তোমরা কুফরী গ্রহণ করে নিয়ে থাকো তাহলে দুনিয়ায় প্রাণে বেঁচে গেলেও আখেরাতে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে পারবে না।

এর অর্থ এ নয় যে, প্রাণ বাঁচাবার জন্য কুফরী কথা বলা বাঞ্ছনীয়। বরং এটি নিছক একটি "রুখ্‌সাত" তথা সুবিধা দান ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি অন্তরে ঈমান অক্ষুণ্ন রেখে মানুষ বাধ্য হয়ে এ ধরনের কথা বলে তাহলে তাকে কোন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে না। অন্যথায় 'আযীমাত' তথা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ঈমানের পরিচয়ই হচ্ছে এই যে, মানুষের এ রক্তমাংসের শরীরটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললেও সে যেন সত্যের বাণীরই ঘোষণা দিয়ে যেতে থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক যুগে এ উভয় ধরনের ঘটনার নজির পাওয়া যায়। একদিকে আছেন খাব্বাব ইবনে আরত (রা) তাঁকে জ্বলন্ত অংগারের ওপর শোয়ানো হয়। এমনকি তাঁর শরীরের চর্বি গলে

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ
لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠٧﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ
وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٠٨﴾ لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ
فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٠٩﴾ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ
مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٠﴾

এটা এ জন্য যে, তারা আখেরাতের মোকাবিলায় দুনিয়ার জীবন পছন্দ করে নিয়েছে এবং আল্লাহর নিয়ম হলো, তিনি এমনসব লোককে মুক্তির পথ দেখান না যারা তাঁর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়। এরা হচ্ছে এমনসব লোক যাদের অন্তর, কান ও চোখের ওপর আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন। এরা গাফলতির মধ্যে ডুবে গেছে। নিসন্দেহে আখেরাতে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত[১১০] পক্ষান্তরে যাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, (ঈমান আনার কারণে) যখন তারা নির্যাতিত হয়েছে, তারা বাড়িঘর ত্যাগ করেছে, হিজরাত করেছে, আল্লাহর পথে কষ্ট সহ্য করেছে এবং সবর করেছে,[১১১] তাদের জন্য অবশ্যই তোমার রব ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

পড়ার ফলে আগুন নিভে যায়। কিন্তু এরপরও তিনি দৃঢ়ভাবে ঈমানের ওপর অটল থাকেন। বিলাল হাবশীকে (রা) লোহার বর্ম পরিয়ে দিয়ে কাঠফাটা রোদে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়। তারপর উত্তপ্ত বালুকা প্রান্তরে শুইয়ে দিয়ে তার ওপর দিয়ে তাঁকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তিনি 'আহাদ' 'আহাদ' শব্দ উচ্চারণ করে যেতেই থাকেন। আর একজন সাহাবী ছিলেন হাবীব ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম (রা)। মুসাইলামা কায্‌যাবের হুকুমে তাঁর শরীরের প্রত্যেকটি অংগ-প্রত্যংগ কাটা হচ্ছিল এবং সেই সাথে মুসাইলামাকে নবী বলে মেনে নেবার জন্য দাবী করা হচ্ছিল। কিন্তু প্রত্যেক বারই তিনি তার নবুওয়াত দাবী মেনে নিতে অস্বীকার করছিলেন। এভাবে ক্রমাগত অংগ-প্রত্যংগ কাটা হতে হতেই তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। অন্যদিকে আছেন আম্মার (রা) ইবনে ইয়াসির (রা)। আম্মারের (রা) চোখের সামনে তাঁর পিতা ও মাতাকে কঠিন শাস্তি দিয়ে দিয়ে শহীদ করা হয়। তারপর তাঁকে এমন কঠিন অসহনীয় শাস্তি দেয়া হয় যে, শেষ পর্যন্ত নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য তিনি কাফেরদের চাহিদা মত সবকিছু বলেন। এরপর তিনি কাঁদতে কাঁদতে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হন এবং আরয করেন ঃ

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تُرِكْتُ حَتّٰى سَبَبْتُكَ وَذَكَرْتُ اٰلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ

"হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে মন্দ এবং তাদের উপাস্যদেরকে ভাল না বলা পর্যন্ত তারা আমাকে ছেড়ে দেয়নি।"

يَوْمَ تَأْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ
مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١١١﴾ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ
اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ
بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا
يَصْنَعُوْنَ ﴿١١٢﴾ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ
الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١١٣﴾

১৫ রুকূ'

(এদের সবার ফায়সালা সেদিন হবে) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মরক্ষার চিন্তায় মগ্ন থাকবে এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান পুরোপুরি দেয়া হবে আর কারো প্রতি সামান্যতমও জুলুম করা হবে না।

আল্লাহ একটি জনপদের দৃষ্টান্ত দেন। সেটি শান্তি ও নিরাপত্তার জীবন যাপন করছিল এবং সবদিক দিয়ে সেখানে আসছিল ব্যাপক রিযিক, এ সময় তাঁর অধিবাসীরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ অস্বীকার করলো। তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করালেন এভাবে যে, ক্ষুধা ও ভীতি তাদেরকে গ্রাস করলো। তাদের কাছে তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে একজন রসূল এলো। কিন্তু তারা তাকে অমান্য করলো। শেষ পর্যন্ত আযাব তাদেরকে পাকড়াও করলো, যখন তারা জালেম হয়ে গিয়েছিল।[১১২]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ ؟ "তোমার মনের অবস্থা কি?" জবাব দিলেন, مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ "ঈমানের ওপর পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ত।" একথায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ اِنْ عَادُوْا فَعُدْ "যদি তারা আবারো এ ধরনের জুলুম করে তাহলে তুমি তাদেরকে আবারো এসব কথা বলে দিয়ো।"

১১০. যারা সত্যের পথ কঠিন দেখে ঈমান থেকে ফিরে গিয়েছিল এবং তারপর নিজেদের কাফের ও মুশরিক জাতির সাথে মিশে গিয়েছিল তাদের জন্য এ বাক্যাংশটি বলা হয়েছে।

১১১. এখানে হাবশার (ইথিয়োপিয়া) মুহাজিরদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ
كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١١٤﴾ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ
الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ
فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٥﴾ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ
هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ
يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿١١٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۠ وَّلَهُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١١٧﴾

কাজেই হে লোকেরা! আল্লাহ তোমাদের যা কিছু পাক-পবিত্র ও হালাল রিযিক দিয়েছেন তা খাও এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো,[১১৩] যদি তোমরা সত্যিই তাঁর বন্দেগী করতে বদ্ধপরিকর হয়ে থাকো [১১৪] আল্লাহ যা কিছু তোমাদের ওপর হারাম করেছেন তা হচ্ছে ঃ মৃতদেহ, রক্ত, শূয়োরের গোশ্‌ত এবং যে প্রাণীর ওপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নাম নেয়া হয়েছে। তবে যদি কেউ আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধাচরণ করার ইচ্ছা পোষণ না করে অথবা প্রয়োজনের সীমা না ছাড়িয়ে ক্ষুধার জ্বালায় বাধ্য হয়ে এসব খেয়ে নেয় তাহলে নিশ্চিতই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[১১৫] আর এই যে, তোমাদের কণ্ঠ ভুয়া হুকুম জারী করে বলতে থাকে এটি হালাল এবং ওটি হারাম, এভাবে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না।[১১৬] যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তারা কখনোই সফলকাম হবে না। দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ মাত্র কয়েকদিনের এবং পরিশেষে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১১২. এখানে যে জনপদের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে তাকে চিহ্নিত করা হয়নি। মুফাস্‌সিরগণও এ জনপদটির স্থান নির্দেশ করতে পারেননি। বাহ্যত ইবনে আব্বাসের (রা) এ উক্তি সঠিক মনে হয় যে, এখানে নাম না নিয়ে মক্কাকেই দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বিচার করলে এখানে ভীতি ও ক্ষুধা দ্বারা জনপদটির আক্রান্ত হবার যে কথা বলা হয়েছে সেটি হবে মক্কার দুর্ভিক্ষ, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতলাভের পর বেশ কিছুকাল পর্যন্ত মক্কাবাসীদের ওপর জেঁকে বসেছিল।

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ
وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا
السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن
بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٩﴾

ইতিপূর্বে[১১৭] আমি তোমাকে যেসব জিনিসের কথা বলেছি সেগুলো আমি বিশেষ করে ইহুদীদের জন্য হারাম করেছিলাম।[১১৮] আর এটা তাদের প্রতি আমার জুলুম ছিল না বরং তাদের নিজেদেরই জুলুম ছিল, যা তারা নিজেদের ওপর করছিল। তবে যারা অজ্ঞতার কারণে খারাপ কাজ করেছে এবং তারপর তাওবা করে নিজেদের কাজের সংশোধন করে নিয়েছে, নিশ্চিতভাবেই তোমার রব তাওবা ও সংশোধনের পর তাদের জন্য ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

১১৩. এ থেকে জানা যায়, ওপরে যে দুর্ভিক্ষের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে এ সূরা নাযিলের সময় তা খতম হয়ে গিয়েছিল।

১১৪. অর্থাৎ যদি সত্যিই তোমরা আল্লাহর বন্দেগীর স্বীকৃতি দিয়ে থাকো, যেমন তোমরা দাবী করছো, তাহলে তোমরা নিজেরাই কোন জিনিসকে হালাল ও কোন জিনিসকে হারাম করার অধিকার গ্রহণ করো না। বরং যে রিযিককে স্বয়ং আল্লাহ হালাল ও পবিত্র ঘোষণা করেছেন তা খাও এবং তাঁর শোকর করো। আর যা কিছু আল্লাহর আইনে হারাম, অপবিত্র ও কলুষিত তা থেকে দূরে থাকো।

১১৫. এ হুকুমটি ইতিপূর্বে সূরা বাকারার ৩, সূরা মায়েদার ১৭৩ এবং সূরা আন'আমের ৩৫ আয়াতেও এসেছে।

১১৬. এ আয়াতটি পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে, হালাল ও হারাম করার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। অথবা অন্য কথায়, একমাত্র আল্লাহই আইন প্রণেতা। অন্য যে ব্যক্তিই বৈধতা ও অবৈধতার ফায়সালা করার ধৃষ্টতা দেখাবে। সে নিজের সীমালংঘন করবে। তবে যদি সে আল্লাহর আইনকে অনুমতিপত্র হিসেবে মেনে নিয়ে তার ফরমানসমূহ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে বলে, অমুক জিনিসটি অথবা কাজটি বৈধ এবং অমুকটি অবৈধ তাহলে তা হতে পারে। এভাবে নিজের হালাল ও হারাম করার স্বাধীন ক্ষমতাকে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ বলে অভিহিত করার কারণ হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি এ ধরনের বিধান তৈরী করে তার এ কাজটি দু'টি অবস্থার বাইরে যেতে পারে না। হয় সে দাবী করছে যে, যে জিনিসকে সে আল্লাহর কিতাবের অনুমোদন ছাড়াই বৈধ বা অবৈধ বলছে তাকে আল্লাহ বৈধ বা অবৈধ করেছেন। অথবা তার দাবী হচ্ছে, আল্লাহ

নিজের হালাল ও হারাম করার ক্ষমতা প্রত্যাহার করে মানুষকে স্বাধীনভাবে তার নিজের জীবনের শরীয়াত তৈরী করার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। এ দুঁটি দাবীর মধ্য থেকে যেটিই সে করবে তা নিশ্চিতভাবেই মিথ্যাচার এবং আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ ছাড়া আর কিছুই হবে না।

১১৭. ওপরে উল্লেখিত হুকুমের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হচ্ছিল তার জবাবে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। মক্কার কাফেরদের প্রথম আপত্তি ছিল ঃ তুমি যেসব জিনিস হালাল করে রেখেছো বনী ইসরাঈলদের শরীয়তে তো তেমনি ধরনের আরো বহু জিনিস হারাম হয়ে আছে। যদি ঐ শরীয়াতটি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত হয়ে থাকে তাহলে তুমি নিজেই তার বিরুদ্ধাচরণ করছো। যদি ঐ শরীয়াতটি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত হয়ে থাকে এবং তোমার শরীয়াতও আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় তাহলে উভয়ের মধ্যে এ বিরোধ কেন? দ্বিতীয় আপত্তিটি ছিলঃ বনী ইসরাঈলের শরীয়াতে শনিবারের সমস্ত দুনিয়াবী কাজ কারবার হারাম হবার যে আইনটি ছিল তাকেও তুমি উড়িয়ে দিয়েছো। এটা কি তোমার স্বেচ্ছাকৃত কাজ, না আল্লাহ নিজেই তাঁর দুঁটি শরীয়াতে দু' ধরনের পরস্পর বিরোধী হুকুম রেখেছেন?

১১৮. এখানে সূরা "আন'আম"-এর ১৪৬ আয়াত ঃ

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ ج الايه

—এর দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ আয়াতে ইহুদীদের নাফরমানির কারণে বিশেষ করে কোন্ কোন্ জিনিস তাদের জন্য হারাম করা হয়েছিল তা বলা হয়েছে।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। সূরা নাহ্‌লের এ আয়াতে সূরা আন'আমের একটি আয়াতের বরাত দেয়া হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, সূরা আন'আম এ সূরার আগে নাযিল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সূরা আন'আমে এক জায়গায় বলা হয়েছে,

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ – (ايت : ١١٩)

এখানে সূরা নাহ্‌লের দিকে সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে। কারণ মক্কী সূরাগুলোর মধ্যে আন'আম ছাড়া এই একটিমাত্র সূরাতেই হারাম জিনিসগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, এর মধ্যে কোন্ সূরাটি আগে নাযিল হয়েছিল এবং কোন্‌টি পরে? আমাদের মতে এর সঠিক জবাব হচ্ছে এই যে, প্রথমে নাযিল হয়েছিল সূরা নাহ্‌ল। সূরা আন'আমের উপরোল্লিখিত আয়াতে এরই বরাত দেয়া হয়েছে। পরে কোন এক সময় মক্কার কাফেররা সূরা নাহ্‌লের এ আয়াতগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের ইতিপূর্বে বর্ণিত আপত্তিগুলো উত্থাপন করে। সে সময় সূরা আন'আম নাযিল হয়ে গিয়েছিল। তাই তাদেরকে জবাব দেয়া হয়েছে, আমরা পূর্বেই অর্থাৎ সূরা আন'আমে বলে এসেছি যে, ইহুদীদের জন্য কয়েকটি জিনিস বিশেষভাবে হারাম করা হয়েছিল। আর যেহেতু এ আপত্তি সূরা নাহ্‌লের বিরুদ্ধে করা হয়েছিল তাই এর জবাবও সূরা নাহ্‌লেই প্রাসংগিক বাক্য হিসেবে সংযোজিত হয়েছে।

إِنَّ إِبْرٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيفًا ۚ وَلَمْ يَكُ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبٰهُ وَهَدٰهُ إِلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾ وَآتَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۚ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ
الصّٰلِحِينَ ﴿١٢٢﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ
اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيمَا
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾

১৬ রুকূ'

প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম নিজেই ছিল একটি পরিপূর্ণ উম্মত,[১১৯] আল্লাহর হুকুমের অনুগত এবং একনিষ্ঠ। সে কখনো মুশরিক ছিল না। সে ছিল আল্লাহর নিয়ামতের শোকরকারী। আল্লাহ তাকে বাছাই করে নেন এবং সরল সঠিক পথ দেখান। দুনিয়ায় তাকে কল্যাণ দান করেন এবং আখেরাতে নিশ্চিতভাবেই সে সৎকর্মশীলদের অন্তরভুক্ত হবে। তারপর আমি তোমার কাছে এ মর্মে অহী পাঠাই যে, একাগ্র হয়ে ইবরাহীমের পথে চলো এবং সে মুশরিকদের দলভুক্ত ছিল না।[১২০] বাকী রইলো শনিবারের ব্যাপারটি, সেটি আসলে আমি এমনসব লোকের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলাম যারা এর বিধানের মধ্যে মতবিরোধ করেছিল।[১২১] আর নিশ্চয়ই তারা যেসব ব্যাপারে মতবিরোধ করেছে তোমার রব কিয়ামতের দিন সেসব ব্যাপারে ফায়সালা দিয়ে দেবেন।

১১৯. অর্থাৎ তিনি একাই ছিলেন একটি উম্মতের সমান। যখন দুনিয়ায় কোন মুসলমান ছিল না তখন একদিকে তিনি একাই ছিলেন ইসলামের পতাকাবাহী এবং অন্যদিকে সারা দুনিয়ার মানুষ ছিল কুফরীর পতাকাবাহী। আল্লাহর এ একক বান্দাই তখন এমন কাজ করেন যা করার জন্য একটি উম্মতের প্রয়োজন ছিল। তিনি এক ব্যক্তিমাত্র ছিলেন না, ব্যক্তির মধ্যে তিনি ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান।

১২০. এটি হচ্ছে আপত্তিকারীদের প্রথম আপত্তিটির পূর্ণাংগ জবাব। এ জবাবের দুটি অংশ। একটি হচ্ছে, আল্লাহর শরীয়াতে বৈপরীত্য নেই, যেমনটি তুমি ইহুদীদের ধর্মীয়

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٢٥﴾

হে নবী! প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং সদুপদেশ সহকারে তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও[১২২] এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে।[১২৩] তোমার রবই বেশী ভাল জানেন কে তাঁর পথচ্যুত হয়ে আছে এবং কে আছে সঠিক পথে।

আইন ও মুহাম্মাদী শরীয়াতের বাহ্যিক পার্থক্য দেখে ধারণা করেছো। বরং আসলে ইহুদীদেরকে বিশেষ করে তাদের নাফরমানীর কারণে কতিপয় নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এ নিয়ামতগুলো থেকে অন্যদেরকে বঞ্চিত করার কোন কারণ ছিল না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে পদ্ধতি অনুসরণের হুকুম দেয়া হয় তা হচ্ছে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পদ্ধতি, আর তোমরা জানো ইহুদীদের জন্য যেসব জিনিস হারাম ছিল মিল্লাতে ইবরাহীমীর জন্য সেগুলো হারাম ছিল না। যেমন ইহুদীরা উটের গোশ্‌ত খায় না। কিন্তু মিল্লাতে ইবরাহীমীর জন্য এ গোশ্‌ত হালাল ছিল, ইহুদীদের শরীয়াতে উটপাখী, হাঁস, খরগোশ ইত্যাদি হারাম কিন্তু মিল্লাতে ইবরাহীমীতে এসব জিনিস হালাল ছিল। এ জবাবের সাথে সাথে মক্কার কাফেরদেরকে এ মর্মেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের যেমন ইবরাহীমের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, তেমনি ইহুদীদের সাথেও নেই। কারণ তোমরা উভয় দলই শিরক করছো। মিল্লাতে ইবরাহীমীর যদি কেউ সঠিক অনুসারী থেকে থাকে তবে তিনি হচ্ছেন এই নবী মুহাম্মাদ (সা) এবং তাঁর সংগী সাথীগণ। এদের আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডে শিরকের নামগন্ধও নেই।

১২১. এটি হচ্ছে মক্কার কাফেরদের দ্বিতীয় আপত্তির জবাব। শনিবার ইহুদীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল এবং ইবরাহীমী মিল্লাতে শনিবারের কোন ধারণাই ছিল না, একথা বলার এখানে কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ মক্কার কাফেররাও একথা জানতো। তাই এখানে শুধুমাত্র এতটুকু ইংগিত দেয়াই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে, ইহুদীদের আইনে তোমরা যে কঠোরতা দেখছো তা তাদের প্রাথমিক বিধানে ছিল না বরং পরবর্তীকালে ইহুদীদের দুষ্কৃতি এবং আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচরণের কারণে তাদের ওপর এগুলো আরোপিত হয়েছিল। একদিকে বাইবেলের যেসব অধ্যায়ে শনিবারের বিধান বর্ণিত হয়েছে সেগুলো অধ্যয়ন না করা (যেমন যাত্রা পুস্তক ২০ ঃ ৮-১১, ২৩ ঃ ১২ ও ১৩, ৩১ ঃ ১২-১৭, ৩৫ ঃ ২ ও ৩, গণনা পুস্তক ১৫ ঃ ৩২-৩৬) এবং অন্যদিকে শনিবারের বিধি-নিষেধ ভাঙার জন্য ইহুদীরা যেসব অপচেষ্টা চালিয়েছিল সেগুলো না জানা পর্যন্ত (যেমন যিরমিয় ১৭ ঃ ২১-২৭

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ
لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ
عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ
اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

আর যদি তোমরা প্রতিশোধ নাও, তাহলে ঠিক ততটুকু নাও যতটুকু তোমাদের ওপর বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা সবর করো তাহলে নিশ্চিতভাবেই এটা সবরকারীদের পক্ষে উত্তম। হে মুহাম্মাদ! সবর অবলম্বন করো—আর তোমার এ সবর আল্লাহরই সুযোগ দানের ফলমাত্র—এদের কার্যকলাপে দুঃখ করো না এবং এদের চক্রান্তের কারণে মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না। আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।[১২৪]

এবং যিহিষ্কেল ২০ ঃ ১২–২৪) কোন ব্যক্তি কুরআন মজীদের এ ইংগিতগুলো ভালভাবে বুঝতে পারবেন না।

১২২. অর্থাৎ দাওয়াত দেবার সময় দুটি জিনিসের প্রতি নজর রাখতে হবে। এক, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং দুই, সদুপদেশ।

জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার মানে হচ্ছে, নির্বোধদের মত চোখ বন্ধ করে দাওয়াত প্রচার করবে না। বরং বুদ্ধি খাটিয়ে যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তার মন–মানস, যোগ্যতা ও অবস্থার প্রতি নজর রেখে এবং এ সংগে পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে কথা বলতে হবে। একই লাঠি দিয়ে সবাইকে তাড়িয়ে নেয়া যাবে না। যে কোন ব্যক্তি বা দলের মুখোমুখি হলে প্রথমে তার রোগ নির্ণয় করতে হবে, তারপর এমন যুক্তি–প্রমাণের সাহায্যে তার রোগ নিরসনের চেষ্টা করতে হবে যা তার মন–মস্তিষ্কের গভীরে প্রবেশ করে তার রোগের শিকড় উপড়ে ফেলতে পারে।

সদুপদেশের দুই অর্থ হয়। এক, যাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে তাকে শুধুমাত্র যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তৃপ্ত করে দিয়ে ক্ষান্ত হলে চলবে না বরং তার আবেগ–অনুভূতির প্রতিও আবেদন জানাতে হবে। দুষ্কৃতি ও ভ্রষ্টতাকে শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে বাতিল করলে হবে না বরং মানুষের প্রকৃতিতে এসবের বিরুদ্ধে যে জন্মগত ঘৃণা রয়েছে তাকেও উদ্দীপিত করতে হবে এবং সেগুলোর অশুভ পরিণতির ভয় দেখাতে হবে। ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ ও সৎকাজে আত্মনিয়োগ শুধু যে ন্যায়সংগত ও মহৎ গুণ, তা যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করলে চলবে না বরং সেগুলোর প্রতি আকর্ষণও সৃষ্টি করতে হবে। দুই, উপদেশ এমনভাবে দিতে হবে যাতে আন্তরিকতা ও মংগলাকাংখা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যাকে উপদেশ দান করা হচ্ছে সে যেন একথা মনে না করে যে, উপদেশদাতা তাকে তাচ্ছিল্য

করছে এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতির স্বাদ নিচ্ছে। বরং সে অনুভব করবে উপদেশদাতার মনে তার সংশোধনের প্রবল আকাংখা রয়েছে এবং আসলে সে তার ভাল চায়।

১২৩. অর্থাৎ এটি যেন নিছক বিতর্ক, বুদ্ধির লড়াই ও মানসিক ব্যায়াম পর্যায়ের না হয়। এ আলোচনায় পেঁচিয়ে কথা বলা, মিথ্যা দোষারোপ ও রূঢ় বাক্যবাণে বিদ্ধ করার প্রবণতা যেন না থাকে। প্রতিপক্ষকে চুপ করিয়ে দিয়ে নিজের গলাবাজী করে যেতে থাকা এর উদ্দেশ্য হবে না। বরং এ বিতর্ক আলোচনায় মধুর বাক্য ব্যবহার করতে হবে। উন্নত পর্যায়ের ভদ্র আচরণ করতে হবে। যুক্তি–প্রমাণ হতে হবে ন্যায়সংগত ও হৃদয়গ্রাহী। যাকে উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে তার মনে যেন জিদ, একগুঁয়েমী এবং কথার প্যাঁচ সৃষ্টি হবার অবকাশ না দেখা দেয়। সোজাসুজি তাকে কথা বুঝাবার চেষ্টা করতে হবে এবং যখন মনে হবে যে, সে কূটতর্কে লিপ্ত হতে চাচ্ছে তখনই তাকে তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দিতে হবে, যাতে ভ্রষ্টতার নোংরা কাঁদামাটি সে নিজের গায়ে আরো বেশী করে মেখে নিতে পারে।

১২৪. অর্থাৎ যারা আল্লাহকে ভয় করে সব ধরনের খারাপ পথ থেকে দূরে থাকে এবং সর্বদা সৎকর্মনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। অন্যেরা তাদের সাথে যতই খারাপ আচরণ করুক না কেন তারা দুষ্কৃতির মাধ্যমে তার জবাব দেয় না বরং জবাব দেয় সুকৃতির মাধ্যমে।

বনী ইস্‌রাঈল

১৭

নামকরণ

চার নম্বর আয়াতের অংশ বিশেষ وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِىٓ اِسْرَآئِيْلَ فِى الْكِتٰبِ থেকে বনী ইস্‌রাঈল নাম গৃহীত হয়েছে। বনী ইস্‌রাঈল এই সূরার আলোচ্য বিষয় নয়। বরং এ নামটিও কুরআনের অধিকাংশ সূরার মতো প্রতীক হিসেবেই রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

প্রথম আয়াতটিই একথা ব্যক্ত করে দেয় যে, মি'রাজের সময় এ সূরাটি নাযিল হয়। হাদীস ও সীরাতের অধিকাংশ কিতাবের বর্ণনা অনুসারে হিজরাতের এক বছর আগে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। তাই এ সূরাটিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কায় অবস্থানের শেষ যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত।

পটভূমি

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদের আওয়াজ বুলন্দ করার পর তখন ১২ বছর অতীত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর পথ রুখে দেবার জন্য তাঁর বিরোধীরা সব রকমের চেষ্টা করে দেখেছিল। তাদের সকল প্রকার বাধা বিপত্তির দেয়াল টপকে তাঁর আওয়াজ আরবের সমস্ত এলাকায় পৌঁছে গিয়েছিল। আরবের এমন কোন গোত্র ছিল না যার দু'চারজন লোক তাঁর দাওয়াতে প্রভাবিত হয়নি। মক্কাতেই আন্তরিকতা সম্পন্ন লোকদের এমন একটি ছোট্ট দল তৈরী হয়ে গিয়েছিল যারা এ সত্যের দাওয়াতের সাফল্যের জন্য প্রত্যেকটি বিপদ ও বাধা–বিপত্তির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। মদীনায় শক্তিশালী আওস ও খাযরাজ গোত্র দু'টির বিপুল সংখ্যক লোক তার সমর্থকে পরিণত হয়েছিল। এখন তাঁর মক্কা থেকে মদীনায় স্থানান্তরিত হয়ে বিক্ষিপ্ত মুসলমানদেরকে এক জায়গায় একত্র করে ইসলামের মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার সময় ঘনিয়ে এসেছিল এবং অতিশীঘ্রই তিনি এ সুযোগ লাভ করতে যাচ্ছিলেন।

এহেন অবস্থায় মি'রাজ সংঘটিত হয়। মি'রাজ থেকে ফেরার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াবাসীকে এ পয়গাম শুনান।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

এ সূরায় সতর্ক করা, বুঝানো ও শিক্ষা দেয়া এ তিনটি কাজই একটি আনুপাতিক হারে একত্র করে দেয়া হয়েছে।

সতর্ক করা হয়েছে মক্কার কাফেরদেরকে। তাদেরকে বলা হয়েছে, বনী ইস্‌রাঈল ও অন্য জাতিদের পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। আল্লাহর দেয়া যে অবকাশ খতম হবার সময় কাছে এসে গেছে তা শেষ হবার আগেই নিজেদেরকে সামলে নাও। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনের মাধ্যমে যে দাওয়াত পেশ করা হচ্ছে তা গ্রহণ করো। অন্যথায় তোমাদের ধ্বংস করে দেয়া হবে এবং তোমাদের জায়গায় অন্য লোকদেরকে দুনিয়ায় আবাদ করা হবে। তাছাড়া হিজরাতের পর যে বনী ইস্‌রাঈলের উদ্দেশ্যে শীঘ্রই অহী নাযিল হতে যাচ্ছিল পরোক্ষভাবে তাদেরকে এভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, প্রথমে যে শাস্তি তোমরা পেয়েছো তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো এবং এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর তোমরা যে সুযোগ পাচ্ছো তার সদ্ব্যবহার করো। এ শেষ সুযোগটিও যদি তোমরা হারিয়ে ফেলো এবং এরপর নিজেদের পূর্বতন কর্মনীতির পুনরাবৃত্তি করো তাহলে ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হবে।

মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের ভিত্তি আসলে কোন্ কোন্ জিনিসের ওপর রাখা হয়েছে, তা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে বুঝানো হয়েছে। তাওহীদ, পরকাল, নবুওয়াত ও কুরআনের সত্যতার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে এ মৌলিক সত্যগুলোর ব্যাপারে যেসব সন্দেহ-সংশয় পেশ করা হচ্ছিল সেগুলো দূর করা হয়েছে। দলীল-প্রমাণ পেশ করার সাথে সাথে মাঝে মাঝে অস্বীকারকারীদের অজ্ঞতার জন্য তাদেরকে ধমকানো ও ভয় দেখানো হয়েছে।

শিক্ষা দেবার পর্যায়ে নৈতিকতা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির এমনসব বড় বড় মূলনীতির বর্ণনা করা হয়েছে যেগুলোর ওপর জীবনের সমগ্র ব্যবস্থাটি প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের প্রধান লক্ষ্য। এটিকে ইসলামের ঘোষণাপত্র বলা যেতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এক বছর আগে আরববাসীদের সামনে এটি পেশ করা হয়েছিল। এতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, এটি একটি নীল নক্‌শা এবং এ নীল নক্‌শার ভিত্তিতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দেশের মানুষের এবং তারপর সমগ্র বিশ্ববাসীর জীবন গড়ে তুলতে চান।

এসব কথার সাথে সাথেই আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেদায়াত করা হয়েছে যে, সমস্যা ও সংকটের প্রবল ঘূর্ণাবর্তে মজবুতভাবে নিজের অবস্থানের ওপর টিকে থাকো এবং কুফরীর সাথে আপোশ করার চিন্তাই মাথায় এনো না। তাছাড়া মুসলমানরা যাদের মন কখনো কখনো কাফেরদের জুলুম, নিপীড়ন, কূটতর্ক এবং লাগাতার মিথ্যাচার ও মিথ্যা দোষারোপের ফলে বিরক্তিতে ভরে উঠতো, তাদেরকে ধৈর্য ও নিশ্চিন্ততার সাথে অবস্থার মোকাবিলা করতে থাকার এবং প্রচার ও সংশোধনের কাজে নিজেদের আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উপদেশ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আত্মসংশোধন ও আত্মসংযমের জন্য তাদেরকে নামাযের ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এটি এমন একটি জিনিস যা তোমাদের সত্যের পথের মুজাহিদদের যেসব উন্নত গুণাবলীতে বিভূষিত হওয়া উচিত তেমনি ধরনের গুণাবলীতে ভূষিত করবে। হাদীস থেকে জানা যায়, এ প্রথম পাঁচ ওয়াক্ত নামায মুসলমানদের ওপর নিয়মিতভাবে ফরয করা হয়।

আয়াত ১১১ **সূরা বনী ইসরাঈল – মক্কী** রুকূ' ১২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى
الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ۭ اِنَّهٗ
هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ①

পবিত্র তিনি যিনি নিয়ে গেছেন এক রাতে নিজের বান্দাকে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্‌সা পর্যন্ত, যার পরিবেশকে তিনি বরকতময় করেছেন, যাতে তাকে নিজের কিছু নিদর্শন দেখান।[১] আসলে তিনিই সবকিছুর শ্রোতা ও দ্রষ্টা।

১. এ ঘটনাটিই আমাদের পরিভাষায় "মি'রাজ" বা "ইস্‌রা" নামে পরিচিতি লাভ করেছে। অধিকাংশ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের বর্ণনা অনুসারে এ ঘটনাটি হিজরাতের এক বছর আগে সংঘটিত হয়। হাদীস ও সীরাতের বইগুলোতে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। বিপুল সংখ্যক সাহাবী এ ঘটনা বর্ণনায় শামিল হয়েছেন। এঁদের সংখ্যা ২৫ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এঁদের মধ্য থেকে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা), হযরত মালিক ইবনে সা'সা (রা), হযরত আবু যার গিফারী (রা) ও হযরত আবু হুরাইরা (রা)। এঁরা ছাড়াও হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা), হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা), হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) এবং আরো বিভিন্ন সাহাবী থেকেও এ ঘটনার অংশ বিশেষ বর্ণিত হয়েছে।

কুরআন মজীদ এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুধুমাত্র মসজিদে হারাম (অর্থাৎ বায়তুল্লাহ তথা কাবা শরীফ) থেকে মসজিদে আক্‌সা (অর্থাৎ বায়তুল মাক্‌দিস) পর্যন্ত যাওয়ার কথা বর্ণনা করছে। এ সফরের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলছে, আল্লাহ তাঁর বান্দাকে তাঁর নিজের কিছু নিশানী দেখাতে চাচ্ছিলেন। কুরআনে এর বেশী কিছু বিস্তারিত বলা হয়নি। হাদীসে এর যে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে তার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছেঃ রাতে জিব্রীল আলাইহিস সালাম তাঁকে উঠিয়ে বুরাকের পিঠে চড়িয়ে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আক্‌সা পর্যন্ত নিয়ে যান। সেখানে তিনি আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের সাথে নামায পড়েন। তারপর জিব্রীল (আ) তাঁকে উর্ধ জগতের নিয়ে চলেন এবং সেখানে

আকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন বিপুল মর্যাদাশালী নবীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। অবশেষে উচ্চতার সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছে তিনি নিজের রবের সামনে হাযির হন। এ উপস্থিতির সময় অন্যান্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ছাড়াও তাঁকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার সংক্রান্ত আদেশ জানানো হয়। এরপর তিনি আবার বায়তুল মাক্‌দিসের দিকে ফিরে আসেন। সেখান থেকে মসজিদে হারামে ফিরে আসেন। এ প্রসংগে বর্ণিত বিপুল সংখ্যক হাদীস থেকে জানা যায়, তাঁকে জান্নাত ও জাহান্নামও দেখানো হয়। তাছাড়া বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদীসে একথাও বলা হয়েছে যে, পরের দিন যখন তিনি লোকদের সামনে এ ঘটনা বর্ণনা করেন তখন মক্কার কাফেররা তাঁকে ব্যাপকভাবে বিদ্রূপ করতে থাকে এবং মুসলমানদের মধ্যেও কারোর কারোর ঈমানের ভিত নড়ে ওঠে।

হাদীসের এ বাড়তি বিস্তারিত বিবরণ কুরআনের বিরোধী নয়, বরং তার বর্ণনার সম্প্রসারিত রূপ। আর একথা সুস্পষ্ট যে, সম্প্রসারিত রূপকে কুরআনের বিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে না। তবুও যদি কোন ব্যক্তি হাদীসে উল্লেখিত এ বিস্তারিত বিবরণের কোন অংশ না মানে তাহলে তাকে কাফের বলা যেতে পারে না। তবে কুরআন যে ঘটনার বিবরণ দিচ্ছে তা অস্বীকার করা অবশ্যই কুফরী।

এ সফরের ধরনটা কেমন ছিল? এটা কি স্বপ্নযোগে হয়েছিল, না জাগ্রত অবস্থায়? আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি সশরীরে মি'রাজ সফর করেছিলেন, না নিজের জায়গায় বসে বসে নিছক রূহানী পর্যায়ে তাঁকে সবকিছু দেখানো হয়েছিল? কুরআন মজীদের শব্দাবলীই এসব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। বলা হয়েছে سُبْحٰنَ الَّذِیْٓ اَسْرٰی এ শব্দগুলো দিয়ে বর্ণনা শুরু করায় একথা প্রমাণ করে যে, এটি প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রমধর্মী একটি অতি বড় ধরনের অসাধারণ তথা অলৌকিক ঘটনা ছিল, যা মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতায় সংঘটিত হয়। একথা সুস্পষ্ট যে, স্বপ্নের মধ্যে কোন ব্যক্তির এ ধরনের কোন জিনিস দেখে নেয়া অথবা কাশ্‌ফ হিসেবে দেখা কোন ক্ষেত্রে এমন গুরুত্ব রাখে না, যা বলার জন্য এ ধরনের ভূমিকা ফাঁদতে হবে যে, সকল প্রকার দুর্বলতা ও ত্রুটিমুক্ত হচ্ছে সেই সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে এ স্বপ্ন দেখিয়েছেন অথবা কাশ্‌ফের মাধ্যমে এসব দেখিয়েছেন। তারপর "এক রাতে নিজের বান্দাকে নিয়ে যান" এ শব্দাবলীও দৈহিক সফরের কথাই সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। স্বপ্নযোগে সফর বা কাশ্‌ফের মধ্যে সফরের জন্য নিয়ে যাওয়া শব্দাবলী কোনক্রমেই উপযোগী হতে পারে না। সুতরাং আমাদের জন্য একথা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই যে, এটি নিছক একটি রূহানী তথা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ছিল না। বরং এটি ছিল পুরোদস্তুর একটি দৈহিক সফর এবং চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ। আল্লাহ নিজেই তাঁর নবীকে এ সফর ও পর্যবেক্ষণ করান।

এখন যদি এক রাতে উড়োজাহাজ ছাড়া মক্কা থেকে বায়তুল মাক্‌দিস যাওয়া আল্লাহর ক্ষমতায় সম্ভবপর হয়ে থাকে, তাহলে হাদীসে যেসব বিস্তারিত বিবরণ এসেছে সেগুলোকেই বা কেমন করে অসম্ভব বলে প্রত্যাখ্যান করা যায়? সম্ভব ও অসম্ভবের বিতর্ক তো একমাত্র তখনই উঠতে পারে যখন কোন সৃষ্টির নিজের ক্ষমতায় কোন অসাধারণ কাজ করার ব্যাপার আলোচিত হয়। কিন্তু যখন আল্লাহর কথা আলোচনা হয়, আল্লাহ অমুক কাজ করেছেন, তখন সম্ভাব্যতার প্রশ্ন একমাত্র সে-ই উঠাতে পারে যে আল্লাহকে সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করে না। এ ছাড়াও অন্যান্য যেসব বিস্তারিত বিবরণ

হাদীসে এসেছে সেগুলোর বিরুদ্ধে হাদীস অস্বীকারকারীদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করা হয়। কিন্তু এগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র দু'টি আপত্তিই কিছুটা গুরত্বসম্পন্ন।

এক ঃ এর আগেই আল্লাহর একটি বিশেষ স্থানে অবস্থান করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। অন্যথায় বান্দার সফর করে একটি বিশেষ স্থানে গিয়ে তাঁর সামনে হাযির হবার কি প্রয়োজন ছিল?

দুই ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেমন করে বেহেশ্‌ত ও দোযখ এবং অন্যান্য কিছু লোকের শাস্তিলাভের দৃশ্য দেখিয়ে দেয়া হলো? অথচ এখনো বান্দাদের স্থান ও মর্যাদার কোন ফায়সালাই হয়নি। শাস্তি ও পুরস্কারের ফায়সালা তো হবে কিয়ামতের পর কিন্তু কিছু লোকের শাস্তি এখনই দেয়া হয়ে গেলো, এ আবার কেমন কথা?

কিন্তু এ দুটি আপত্তিই আসলে স্বল্প চিন্তার ফল। প্রথম আপত্তিটি ভুল হবার কারণ হচ্ছে এই যে, স্রষ্টার সত্তা নিসন্দেহে অসীমতার গুণাবলী সম্পন্ন, কিন্তু সৃষ্টির সাথে আচরণ করার সময় তিনি নিজের কোন দুর্বলতার কারণে নয় বরং সৃষ্টির দুর্বলতার জন্য সীমাবদ্ধতার আশ্রয় নেন। যেমন সৃষ্টির সাথে কথা বলার সময় তিনি কথা বলার এমন সীমাবদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করেন যা একজন মানুষ শুনতে ও বুঝতে পারে। অথচ তাঁর কথা মূলতই অসীমতার গুণ সম্পন্ন। অনুরূপভাবে যখন তিনি নিজের বান্দাকে নিজের রাজ্যের বিশাল মহিমান্বিত নিশানীসমূহ দেখাতে চান তখন বান্দাকে নিয়ে যান এবং যেখানে যে জিনিসটি দেখাবার দরকার সেখানেই সেটি দেখিয়ে দেন। কারণ বান্দা সমগ্র সৃষ্টিলোককে একই সময় ঠিক তেমনিভাবে দেখতে পারে না যেমনিভাবে আল্লাহ দেখতে পারেন। কোন জিনিস দেখার জন্য আল্লাহকে কোথাও যাওয়ার দরকার হয় না। কিন্তু বান্দাকে যেতে হয়। স্রষ্টার সামনে হাযির হওয়ার ব্যাপারটিও এ একই পর্যায়ের। অর্থাৎ স্রষ্টা নিজস্বভাবে কোথাও সমাসীন নন। কিন্তু তাঁর সাথে দেখা করার জন্য বান্দা নিজেই একটি জায়গার মুখাপেক্ষী। সেখানে তার জন্য স্রষ্টার জ্যোতির ঝলকসমূহ কেন্দ্রীভূত করতে হয়। নয়তো সীমাবদ্ধ বান্দার জন্য তাঁর অসীম সত্তার সাথে সাক্ষাত লাভ সম্ভব নয়।

আর দ্বিতীয় আপত্তিটির ভ্রান্তিও সুস্পষ্ট। কারণ মি'রাজের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামকে এমন অনেক জিনিস দেখানো হয়েছিল যার অনেকগুলোই ছিল আসল সত্যের প্রতীকী রূপ। যেমন একটি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বিষয়ের প্রতীকী রূপ ছিল এই যে, একটি ক্ষুদ্রতম ছিদ্রের মধ্য থেকে একটি মোটা সোটা ষাঁড় বের হলো এবং তারপর আর তার মধ্যে ফিরে যেতে পারলো না। অথবা যিনাকারীদের প্রতীকী রূপ ছিল, তাদের কাছে উন্নত মানের তাজা গোশ্‌ত থাকা সত্বেও তারা তা বাদ দিয়ে পচা গোশ্‌ত খাচ্ছে। অনুরূপভাবে খারাপ কাজের যেসব শাস্তি তাঁকে দেখানো হয়েছে সেখানেও পরকালীন শাস্তিকে রূপকভাবে তাঁর সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

মি'রাজের ব্যাপারে যে আসল কথাটি বুঝে নিতে হবে সেটি হচ্ছে এই যে, নবীদের মধ্য থেকে প্রত্যেককে মহান আল্লাহ তাঁদের পদ মর্যাদানুসারে পৃথিবী ও আকাশের অদৃশ্য রাজত্ব দেখিয়ে দিয়েছেন এবং মাঝখান থেকে বস্তুগত অন্তরাল হটিয়ে দিয়ে চর্মচক্ষু দিয়ে এমন সব জিনিস প্রত্যক্ষ করিয়েছেন যেগুলোর ওপর ঈমান বিল গায়েব আনার জন্য

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ
اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ۝٢ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۭ اِنَّهٗ
كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝٣ وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِي الْكِتٰبِ
لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝٤

আমি ইতিপূর্বে মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাকে বনী ইস্‌রাঈলের জন্য পথনির্দেশনার মাধ্যম করেছিলাম[২] এ তাকীদ সহকারে যে, আমাকে ছাড়া আর কাউকে নিজের অভিভাবক করো না।[৩] তোমরা তাদের আওলাদ যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় উঠিয়েছিলাম[৪] এবং নূহ একজন কৃতজ্ঞ বান্দা ছিল। তারপর আমি নিজের কিতাবে[৫] বনী ইস্‌রাঈলকে এ মর্মে সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে, তোমরা দু'বার পৃথিবীতে বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং ভীষণ বিদ্রোহাত্মক আচরণ করবে।[৬]

তাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এভাবে তাঁদের মর্যাদা একজন দার্শনিকের মর্যাদা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবে। দার্শনিক যা কিছু বলেন, আন্দাজ-অনুমান থেকে বলেন। তিনি নিজে নিজের মর্যাদা সম্পর্কে জানলে কখনো নিজের কোন মতের পক্ষে সাক্ষ দেবেন না। কিন্তু নবীগণ যাকিছু বলেন, সরাসরি জ্ঞান ও চাক্ষুষ দর্শনের ভিত্তিতে বলেন। কাজেই তাঁরা জনগণের সামনে এ মর্মে সাক্ষ দিতে পারেন যে, তাঁরা এসব কথা জানেন এবং এসব কিছু তাঁদের স্বচক্ষে দেখা জ্বলজ্যান্ত সত্য।

২. মাত্র একটি আয়াতে মি'রাজের কথা আলোচনা করে তারপর হঠাৎ বনী ইস্‌রাঈলের আলোচনা শুরু করে দেয়া হয়েছে। আপাতদৃষ্টে এটা যেন কেমন বেখাপ্পা মনে হবে। কিন্তু সূরার মূল বক্তব্য ভালভাবে অনুধাবন করলে এ বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ সংযোগ পরিষ্কার উপলব্ধি করা যাবে। সূরার মূল বক্তব্য হচ্ছে মক্কার কাফেরদেরকে সতর্ক করা। যাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তাদের এ মর্মে জানিয়ে দেবার জন্য শুরুতে শুধুমাত্র এ কারণে মি'রাজের আলোচনা করা হয়েছে যে, একথাগুলো এমন এক ব্যক্তি বলছেন যিনি এইমাত্র মহান আল্লাহর বিরাট মহিমান্বিত নিদর্শনসমূহ দেখে আসছেন। এরপর বনী ইস্‌রাঈলের ইতিহাস থেকে এ মর্মে শিক্ষা দেয়া হয় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব লাভকারীরা যখন আল্লাহর মোকাবিলায় ময়দানে নেমে পড়ে তখন দেখো তাদেরকে কেমন ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হয়।

৩. অভিভাবক অর্থাৎ বিশ্বস্ততা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও ভরসার ভিত্তিস্বরূপ যার ওপর নির্ভর করা যায়। নিজের যাবতীয় বিষয় যার হাতে সোপর্দ করে দেয়া যায়। পথনির্দেশনা ও সাহায্য লাভ করার জন্য যার দিকে রুজু করা যায়।

৪. অর্থাৎ নূহ ও তাঁর সাথীদের বংশধর হবার কারণে একমাত্র আল্লাহকেই অভিভাবক করা তোমাদের জন্য শোভা পায়। কারণ তোমরা যার বংশধর তিনি আল্লাহকে নিজের অভিভাবক করার বদৌলতেই প্লাবনের ধ্বংসকারিতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।

৫. কিতাব মানে এখানে তাওরাত নয় বরং আসমানী সহীফাসমূহের সমষ্টি। কুরআনে এ জন্য পারিভাষিক শব্দ হিসেবে "আল কিতাব" কয়েক জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে।

৬. পবিত্র গ্রন্থাদির সমষ্টি বাইবেলে এ সতর্ক বাণী কয়েক জায়গায় পাওয়া যায়। প্রথম বিপর্যয় ও তার অশুভ পরিণতির জন্য বনী ইস্‌রাঈলকে গীতসংহিতা, যিশাইয়র, যিরমিয় ও যিহিষ্কেলে সতর্ক করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বিপর্যয় ও তার কঠিন শাস্তির যে ভবিষ্যদ্বাণী হযরত ঈসা (আ) করেছেন তা মথি ও লূকের ইনজীলে পাওয়া যায়। নিচে আমি এ গ্রন্থগুলোর সংশ্লিষ্ট কথাগুলো উদ্ধৃত করছি। এ থেকে কুরআনের বক্তব্যের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যাবে।

প্রথম বিপর্যয় সম্পর্কে সর্বপ্রথম সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম। তাঁর কথা ছিল নিম্নরূপ ঃ

"তাহারা জাতিগুলিকে ধ্বংস করিল না, যাহা সদাপ্রভূ করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা জাতিগুলির সহিত মিশিয়া গেল, উহাদের কার্যকলাপ শিখিল। আর উহাদের প্রতিমার পূজা করিল, তাহাতে সে সকল তাহাদের ফাঁদ হইয়া উঠিল, ফলে তাহারা আপনাদের পুত্রদিগকে আর আপনাদের কন্যাদিগকে শয়তানদের উদ্দেশ্যে বলিদান করিল। তাহারা নির্দোষদের রক্তপাত, তথা স্ব স্ব পুত্র কন্যাদেরই রক্তপাত করিল, কেনানীয় প্রতিমাগণের উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে বলিদান করিল; দেশ রক্তে অশুদ্ধ হইল। এই রূপে তাহারা আপনাদের কার্যে অশুচি, আপনাদের ক্রিয়ায় ব্যভিচারী হইল। তাহাতে আপন প্রজাদের উপরে সদাপ্রভূর ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিল, তিনি আপন অধিকারকে ঘৃণা করিলেন। তিনি তাহাদিগকে জাতিগণের হস্তে সমর্পণ করিলেন, তাহাতে তাহাদের শত্রুরা তাহাদের শাসক হইয়া গেল।" [গীতসংহিতা ১০৬ ঃ ৩৪-৪১]

যেসব ঘটনা পরে ঘটতে যাচ্ছিল এ বাক্যগুলোয় সেগুলোকে অতীত কালের ক্রিয়াপদে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সেগুলো যেন ঘটে গেছে। এটি হচ্ছে আসমানী কিতাবের একটি বিশেষ বর্ণনারীতি।

তারপর যখন এ বিরাট বিপর্যয় সংঘটিত হয়ে গেল তখন এর ফলে যে ধ্বংস সংঘটিত হলো হযরত ইয়াসঈয়াহ নবী নিজের সহীফায় তার খবর এভাবে দিচ্ছেনঃ

"আহা, পাপিষ্ঠ জাতি, অপরাধে ভারগ্রস্ত লোক, দুষ্কর্মকারীদের বংশ, নষ্টাচারী সন্তানগণ; তাহারা সদাপ্রভূকে ত্যাগ করিয়াছে, ইসরাঈলের পবিত্রাত্মাকে অবজ্ঞা করিয়াছে, বিপথে গিয়াছে, পরাঙ্মুখ হইয়াছে। তোমরা আর কেন প্রহৃত হইবে? হইলে অধিক বিদ্রোহাচরণ করিবে।" [যিশইয় ১ঃ ৪-৫]

"সতী নগরী কেমন বেশ্যা হইয়াছে। সে তো ন্যায় বিচারে পূর্ণা ছিল। ধার্মিকরা তাহাতে বাস করিত, কিন্তু এখন হত্যাকারী লোকেরা থাকে ..... তোমার সরদাররা

বিদ্রোহী ও চোরদের সখা ; তাহাদের প্রত্যেক জন উৎকোচ ভালবাসে ও পারিতোষিকের অনুধাবন করে; তাহার পিতৃহীন লোকের প্রতি ইনসাফ করে না, এবং বিধবার বিবাদ তাহাদের নিকট আসিতে পায় না। এজন্য প্রভু বাহিনীগণের সদাপ্রভু ইসরাঈলের এক বীর কহেন, আহা, আমি আপন বিপক্ষদিগকে (দণ্ড দিয়া) শান্তি পাইব, ও আমার শত্রুদের নিকট হইতে প্রতিশোধ নিব।" [যিশাইয় ১ঃ ২১–২৪]

"তাহারা পূর্বদেশের প্রথায় পরিপূর্ণ ও পলেস্তীয়দের ন্যায় গণক হইয়াছে, এবং বিজাতীয় সন্তানদের হস্তে হস্ত দিয়াছে।.....আর তাহাদের দেশ প্রতিমায় পরিপূর্ণ, তাহারা আপনাদের হস্ত নির্মিত বস্তুর কাছে প্রণিপাত করে, তাহাত তাহাদেরই অংগুলি দ্বারা নির্মিত।" [যিশাইয় ২ ঃ ৬–৮]

"সদাপ্রভু আরো বলিলেন, সিয়োনের কন্যাগণ গর্বিতা, তাহারা গলা বাড়াইয়া কটাক্ষ করিয়া বেড়ায়, লঘুপদ সঞ্চারে চলে, ও চরণে রুনু রুনু শব্দ করে। অতএব প্রভু সিয়োনের কন্যাগণের মস্তক টাক পড়া করিবেন, ও সদাপ্রভু তাহাদের গুহ্যস্থান অনাবৃত করিবেন।.....তোমার পুরুষেরা খড়্গ দ্বারা, ও তোমার বিক্রমীগণ সংগ্রামে পতিত হইবে। তাহার পুরদ্বার সকল ক্রন্দন ও বিলাপ করিবে; আর সে উৎসন্না হইয়া ভূমিতে বসিবে।" [যিশাইয় ৩ ঃ ১৬–২৬]

"এখন দেখ, প্রভু (ফরাৎ) নদীর প্রবল ও প্রচুর জল, অর্থাৎ অশূর–রাজ ও তাহার সমস্ত প্রতাপকে, তাহাদের উপরে আনিবেন; সে ফাঁপিয়া সমস্ত খাল পূর্ণ করিবে, ও সমস্ত তীর ভূমির উপর দিয়া যাইবে।" [যিশাইয় ৮ঃ৭]

"কেননা উহারা বিদ্রোহী জাতি ও মিথ্যাবাদী সন্তান; উহারা সদাপ্রভুর ব্যবস্থা শুনিতে অসম্মত। তাহারা দর্শকদিগকে বলে, তোমরা দর্শন করিও না, নবীগণকে বলে, তোমরা আমাদের কাছে সত্য নবুওয়াত প্রকাশ করিও না, আমাদিগকে স্নিগ্ধ বাক্য বল, মিথ্যা নবুওয়াত প্রকাশ কর, পথ হইতে ফির, রাস্তা ছাড়িয়া দাও, ইসরাঈলের পবিত্রতমকে আমাদের দৃষ্টিপথ হইতে দূর কর। অতএব ইসরাঈলের পবিত্রতম এই কথা কহেন, তোমরা এই বাক্য হেয় জ্ঞান করিয়াছ, এবং উপদ্রবের ও কুটিলতার উপর নির্ভর করিয়াছ, ও তাহা অবলম্বন করিয়াছ, এইহেতু সেই অপরাধ তোমাদের জন্য উচ্চ ভিত্তির পতনশীল দেয়ালের ন্যায় হইবে। যাহার ভংগ হঠাৎ মুহূর্ত মধ্যে উপস্থিত হয়। আর যেমন কুম্ভকারের পাত্র ভাঙ্গা যায়, তেমনি তিনি তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন, চূর্ণ করিবেন, মমতা করিবেন না; যাহাতে চূলা হইতে অগ্নি তুলিতে কিম্বা কূপ হইতে জল তুলিতে একখানা খোলাও পাওয়া যাইবে না।" [৩০ ঃ ৯–১৪]

তারপর যখন বন্যার বাঁধ একেবারেই ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় তখন ইয়ারমিয়াহ (যিরমিয়) নবীর আওয়াজ বুলন্দ হয় এবং তিনি বলেন ঃ

"সদাপ্রভু এই কথা বলেন, তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমার কি অন্যায় দেখিয়াছে যে, তাহারা আমা হইতে দূরে গিয়াছে, অসারতার অনুগামী হইয়া অসার হইয়াছে?.....আমি তোমাদিগকে এই ফলবান দেশে আনিয়াছিলাম যেন তোমরা এখানকার ফল ও উত্তম উত্তম সামগ্রী ভোজন কর। কিন্তু তোমরা প্রবেশ করিয়া আমার দেশ অশুচি করিলে, আমার অধিকার ঘৃণাস্পদ করিলে।.....বস্তুত দীর্ঘকাল হইল

আমি তোমার যোয়ালি ভগ্ন করিয়াছিলাম, তোমার বন্ধন ছিন্ন করিয়াছিলাম; আর তুমি বলিয়াছিলে, আমি দাসত্ব করিব না; বাস্তবিক সমস্ত উচ্চ পর্বতের উপরে ও সমস্ত হরিৎপূর্ণ বৃক্ষের তলে তুমি নত হইয়া ব্যভিচার করিয়া আসিতেছ। (অর্থাৎ প্রত্যেকটি শক্তির সামনে নত হইয়াছ এবং প্রত্যেকটি মূর্তিকে সিজ্‌দা করিয়াছ)।.....চোর ধরা পড়িলে যেমন লজ্জিত হয়, তেমনি ইসরাঈলকুল, আপনারা ও তাহাদের রাজগণ, অধ্যক্ষবর্গ, যাজকগণ ও ভাববাদিগণ লজ্জিত হইয়াছে, বস্তুত তাহারা কাষ্ঠকে বলে, তুমি আমার পিতা, শিলাকে বলে, তুমি আমার জননী, তাহারা আমার প্রতি পৃষ্ঠ ফিরাইয়াছে, মুখ নয়, কিন্তু বিপদকালে তাহারা বলিবে, 'তুমি উঠ, আমাদিগকে রক্ষা কর।' কিন্তু তুমি আপনার জন্য যাহাদিগকে নির্মাণ করিয়াছ, তোমার সেই দেবতারা কোথায়? তাহারাই উঠুক, যদি বিপদকালে তোমাকে রক্ষা করিতে পারে; কেননা হে যিহূদা! তোমার যত নগর তত দেবতা।" [যিরমিয় ২ ঃ ৫-২৮]

"যোশিয় রাজার সময়ে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, বিপথগামিনী ইসরাঈল যাহা করিয়াছে, তাহা কি তুমি দেখিয়াছ? সে প্রত্যেক উচ্চ পর্বতের উপরে ও প্রত্যেক হরিৎপূর্ণ বৃক্ষের তলে গিয়া সেই সকল স্থানে ব্যভিচার করিয়াছে। সে এই সকল কর্ম করিলে পরে আমি কহিলাম, সে আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে কিন্তু সে ফিরিয়া আসিল না, এবং তাহার বিশ্বাসঘাতিনী ভগিনী যিহূদা তাহা দেখিল। আর আমি দেখিলাম, বিপথগামিনী ইসরাঈল ব্যভিচার (অর্থাৎ শির্‌ক) করিয়াছিল, এই কারণ প্রযুক্তই যদ্যপি আমি তাহাকে ত্যাগপত্র দিয়া ত্যাগ করিয়াছিলাম, তথাপি তাহার ভগিনী বিশ্বাসঘাতিনী যিহূদা ভয় করিল না, কিন্তু আপনিও গিয়া ব্যভিচার করিল। তাহার ব্যভিচারের নির্লজ্জতায় দেশ অশুচি হইয়াছিল ; সে প্রস্তর ও কাষ্ঠের সহিত ব্যভিচার (অর্থাৎ মূর্তিপূজা) করিত।" [যিরমিয় ৩ ঃ ৬-৯]

"তোমরা জেরুশালেমের সড়কে সড়কে দৌড়াদৌড়ি কর, দেখ, জ্ঞাত হও এবং তথাকার সকল চকে অন্বেষণ কর, যদি এমন একজনকেও পাইতে পার, যে ন্যায়াচরণ করে, সত্যের অনুশীলন করে, তবে আমি নগরকে ক্ষমা করিব।.....আমি কিরূপে তোমাকে ক্ষমা করিব? তোমার সন্তানগণ আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, অনীশ্বরদের নাম লইয়া শপথ করিয়াছে ; আমি তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিলে তাহারা ব্যভিচার করিল, ও দলে দলে বেশ্যার বাটিতে গিয়া একত্র হইল। তাহারা খাদ্যপুষ্ট অশ্বের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইল, প্রত্যেকজন পরস্ত্রীর প্রতি হ্রেষা করিল। আমি এই সকলের প্রতিফল দিব না, ইহা সদাপ্রভু কহেন, আমার প্রাণ কি এই প্রকার জাতির প্রতিশোধ দিবে না?" [যিরমিয় ৫ ঃ ১-৯]

"হে ইসরাঈল কুল, দেখ, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দূর হইতে এক জাতিকে আনিব ; সে বলবান জাতি, সে প্রাচীন জাতি ; তুমি সেই জাতির ভাষা জান না, তাহারা কি বলে তাহা বুঝিতে পার না। তাহাদের তূন খোলা কবরের ন্যায়, তাহারা সকলে বীর পুরুষ। তাহারা তোমার পক্ক শস্য ও তোমার অন্ন, তোমার পুত্রকন্যাগণের খাদ্য গ্রাস করিবে; তাহারা তোমার মেষপাল ও গোপাল গ্রাস করিবে, তোমার দ্রাক্ষালতা ও ডুমুরবৃক্ষ গ্রাস করিবে, তুমি যেসব প্রাচীরবেষ্টিত নগরে বিশ্বাস করিতেছ, সে সকল তাহারা খড়্গ দ্বারা চূরমার করিবে।" [যিরমিয় ৫ ঃ ১৫-১৭]

"এই জাতির শব আকাশের পক্ষীসমূহের ও ভূমির পশুগণের ভক্ষ্য হইবে, কেহ তাহাদিগকে খেদাইয়া দিবে না। তখন আমি যিহূদার সকল নগরে ও জেরুশালেমের সকল পথে আমাদের রব ও আনন্দের রব, বরের রব ও কন্যার রব নিবৃত্ত করিব; কেননা দেশ ধ্বংসস্থান হইয়া পড়িবে।" [যিরমিয় ৭ ঃ ৩৩–৩৪]

"তুমি আমার সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে বিদায় কর, তাহারা চলিয়া যাউক। আর যদি তাহারা তোমাকে বলে, কোথায় চলিয়া যাইব? তবে তাহাদিগকে বলিও, সদাপ্রভু এইকথা কহেন, মৃত্যুর পাত্র মৃত্যুর স্থানে, খড়্গের পাত্র খড়্গের স্থানে, দুর্ভিক্ষের, পাত্র দুর্ভিক্ষের স্থানে, ও বন্দিত্বের পাত্র বন্দিত্বের স্থানে গমন করুক।" [যিরমিয় ১৫ ঃ ১–৩]

তারপর যথাসময়ে যিহিষ্কেল নবী উঠেন এবং তিনি জেরুশালেমকে উদ্দেশ করে বলেনঃ

"হে নগরী, তুমি নিজের মধ্যে রক্তপাত করিয়া থাকো, যেন তোমার কাল উপস্থিত হয় ; তুমি নিজের জন্য পুত্তলিগণকে নির্মাণ করিয়া থাকো, যেন তুমি অশুচি হও।.....দেখ, ইসরাঈলের অধ্যক্ষগণ, প্রত্যেক আপন আপন ক্ষমতা অনুসারে, তোমার মধ্যে রক্তপাত করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। তোমার মধ্যে পিতামাতাকে তুচ্ছ করা হইয়াছে, তোমার মধ্যে বিদেশীর প্রতি উপদ্রব করা হইয়াছে; তোমার মধ্যে পিতৃহীনের ও বিধবার প্রতি জুলুম করা হইয়াছে। তুমি আমার পবিত্র বস্তুসমূহ অবজ্ঞা করিয়াছ, ও আমার বিশ্রামের দিনগুলিকে অপবিত্র করিয়াছ। রক্তপাত করণার্থে তোমার মধ্যে চোগলখোররা আসিয়াছে ; তোমার মধ্যে লোকে কুকর্ম করিয়াছে; তোমার মধ্যে লোকে পিতার উলঙ্গতা অনাবৃত করিয়াছে ; তোমার মধ্যে লোকে ঋতুমতী অশুচি স্ত্রীকে বলাৎকার করিয়াছে ; তোমার মধ্যে কেহ আপন প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ঘৃণার্হ কাজ করিয়াছে; কেহবা আপন পুত্রবধূকে কুকর্মে অশুচি করিয়াছে; আর কেহ বা তোমার মধ্যে আপনার ভগিনীকে, আপন পিতার কন্যাকে বলাৎকার করিয়াছে। রক্তপাত করণার্থে তোমার মধ্যে লোকে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছে ; তুমি সুদও বৃদ্ধি লইয়াছ, উপদ্রব করিয়া লোভে প্রতিবেশীদের কাছে লাভ করিয়াছ এবং আমাকেই ভুলিয়া গিয়াছ, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।..... তোমার হস্ত কি সবল থাকিবে? আমি সদাপ্রভু ইহা বলিলাম, আর ইহা সিদ্ধ করিব। আমি তোমাকে জাতিগণের মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন ও নানাদেশে বিকীর্ণ করিব এবং তোমার মধ্য হইতে তোমার অশুচিতা দূর করিব। তুমি জাতিগণের সাক্ষাতে আপনার দোষে অপবিত্রীকৃত হইবে, তাহাতে তুমি জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।" [যিহিষ্কেল ২২ ঃ ৩–১৬]

প্রথম মহা বিপর্যয়ের সময় বনী ইস্‌রাঈলকে এই হুশিয়ার বাণীগুলো শুনানো হয়। তারপর দ্বিতীয় মহাবিপর্যয় ও তার ভয়াবহ ফলাফলের সম্মুখীন হবার পর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে সতর্ক করেন। মথি ২৩ অধ্যায়ে তাঁর একটি বিস্তারিত ভাষণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাতে তিনি নিজের জাতির মারাত্মক নৈতিক অধপতনের সমালোচনা করে বলেন ঃ

"হা জেরুশালেম, জেরুশালেম, তুমি ভাববাদিগণকে (নবীগণ) বধ করিয়া থাক, ও তোমার নিকট যাহারা প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে পাথর মারিয়া থাক। কুক্কুটী যেমন

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝

শেষ পর্যন্ত যখন এদের মধ্য থেকে প্রথম বিদ্রোহের সময়টি এলো তখন হে বনী ইস্‌রাঈল! আমি তোমাদের মোকাবিলায় নিজের এমন একদল বান্দার আবির্ভাব ঘটালাম, যারা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তারা তোমাদের দেশে প্রবেশ করে সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এটি একটি প্রতিশ্রুতি ছিল, যা পূর্ণ হওয়াই ছিল অবধারিত।[৭]

আপন শাবকদিগকে পক্ষের নীচে একত্র করে, তদ্রূপ আমিও কতবার তোমার সন্তানদিগকে একত্র করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হইলে না। দেখ, তোমাদের গৃহ তোমাদের জন্য উৎসন্ন পড়িয়া রহিল।" [২৩ ঃ ৩৭–৩৮]

"আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, এই স্থানের একখানি পাথর অন্য পাথরের উপর থাকিবে না, সমস্তই ভূমিস্মাৎ হইবে।" [মথি ২৪ ঃ ২]

তারপর রোমান সরকারের কর্মকর্তারা তাঁকে শূলে চড়াবার (তাদের কথা মতো) জন্য নিয়ে যাচ্ছিল এবং নারীসহ বিপুল সংখ্যক জনতা বিলাপ করতে করতে তাঁর পেছনে পেছনে চলছিল তখন তিনি শেষবার জনতাকে সম্বোধন করে বলেনঃ

"ওগো জেরুশালেমের কন্যাগণ, আমার জন্য কাঁদিওনা, বরং আপনাদের ও আপন আপন সন্তান সন্ততিদের জন্য কাঁদ। কেননা দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যে সময় লোকে বলিবে, ধন্য সেই স্ত্রী লোকেরা, যাহারা বন্ধ্যা, যাহাদের উদর কখনো প্রসব করে নাই, যাহাদের স্তন কখনো দুগ্ধ দেয় নাই। সেই সময় লোকেরা পর্বতগণকে বলিতে আরম্ভ করিবে, আমাদের উপরে পড়; এবং উপপর্বতগণকে বলিবে, আমাদিগকে ঢাকিয়া রাখ।" [লুক ২৩ ঃ ২৮–৩০]

৭. এখানে আসিরীয়াবাসী ও ব্যাবিলনবাসীদের হাতে বনী ইস্‌রাঈলদের ওপর যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ নেমে এসেছিল সে কথাই বলা হয়েছে। এর ঐতিহাসিক পটভূমি অনুধাবন করার জন্য ওপরে আমি নবীগণের সহীফাসমূহ থেকে যে উদ্ধৃতিগুলো দিয়েছি শুধুমাত্র সেটুকু জানাই যথেষ্ট নয়, বরং এখানে একটি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বর্ণনারও প্রয়োজন রয়েছে। এভাবে যেসব কারণে মহান আল্লাহ একটি কিতাবধারী জাতিকে মানব জাতির নেতৃত্বের আসন থেকে সরিয়ে একটি পরাজিত, গোলাম ও অনুন্নত জাতিতে পরিণত করেছিলেন সেই মূল কারণগুলো একজন অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

হযরত মূসার (আ) ইন্তিকালের পর বনী ইসরাঈল যখন ফিলিস্তীনে প্রবেশ করে তখন সেখানে বিভিন্ন জাতি বাস করতো। হিত্তী, আম্মান্তরী, কান্‌আনী, ফিরিয্‌যী, ইয়াবূসী, ফিলিস্তী ইত্যাদি। এসব জাতি মারাত্মক ধরনের শির্‌কে লিপ্ত ছিল। এদের সবচেয়ে বড় মাবুদের নাম ছিল "ঈল"। একে তারা বলতো দেবতাগণের পিতা। আর সাধারণত তারা একে ষাঁড়ের সাথে তুলনা করতো। তার স্ত্রীর নাম ছিল "আশীরাহ"। তার গর্ভজাত সন্তানদের থেকে ঈশ্বর ও ঈশ্বরীদের একটি বিশাল বংশধারা শুরু হয়। এ সন্তানদের সংখ্যা ৭০-এ গিয়ে পৌঁছেছিল। তার সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল বা'ল। তাকে বৃষ্টি ও উৎপাদনের ঈশ্বর এবং পৃথিবী ও আকাশের মালিক মনে করা হতো। উত্তরাঞ্চলে তার স্ত্রীকে 'উনাস' বলা হতো এবং ফিলিস্তীনে বলা হতো 'ইস্‌তারাত'। এ মহিলাদ্বয় ছিল প্রেম ও সন্তান উৎপাদনের দেবী। এরা ছাড়া আরো যেসব দেবতা ছিল তাদের মধ্যে কেউ ছিল মৃত্যুর দেবতা, কেউ ছিল স্বাস্থ্যের দেবী আবার কোন দেবতা দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর আবির্ভাব ঘটাতো এভাবে সমগ্র প্রভুত্বের কাজ কারবার বহু সংখ্যক উপাস্যের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ঐ সব দেব-দেবীকে এমনসব গুণে গুণান্বিত করা হয়েছিল যে, সমাজের নৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দুরাচার ব্যক্তিও তাদের সাথে নিজের নাম জড়িত করে লোকসমক্ষে পরিচিতি লাভ করা পছন্দ করতো না। এখন একথা সুস্পষ্ট, যারা এ ধরনের বদ ও নিকৃষ্ট সত্তাদেরকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে তাদের পূজা-উপাসনা করে, তারা নৈতিকতার নিকৃষ্টস্তরে নেমে যাওয়া থেকে নিজেদেরকে কেমন করে রক্ষা করতে পারে। এ কারণেই প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করার পর তাদের অবস্থার যে চিত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে তা তাদের মারাত্মক ধরনের নৈতিক অধঃপতনের সাক্ষ দিচ্ছে। শিশু বলিদানের ব্যাপারটি তাদের সমাজে সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। তাদের উপাসনালয়গুলো ব্যভিচারের আড্ডায় পরিণত হয়েছিল। মেয়েদেরকে দেবদাসী বানিয়ে উপাসনালয়গুলোতে রাখা এবং তাদের দিয়ে ব্যভিচার করানো ইবাদত ও উপাসনার অংগে পরিণত হয়েছিল। এ ধরনের আরো বহু চরিত্র বিধ্বংসী কাজ তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

তাওরাতে হযরত মূসার (আ) সাহায্যে বনী ইসরাঈলকে যে হেদায়াত দেয়া হয়েছিল তাতে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছিল, তোমরা ঐ সব জাতিকে ধ্বংস করে দিয়ে ফিলিস্তীন ভূখণ্ড তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে এবং তাদের সাথে বসবাস করা থেকে দূরে থাকবে এবং তাদের নৈতিক ও আকীদা-বিশ্বাসগত দোষ-ত্রুটিগুলো এড়িয়ে চলবে।

কিন্তু বনী ইসরাঈল যখন ফিলিস্তীনে প্রবেশ করলো তখন তারা একথা ভুলে গেলো। তারা নিজেদের কোন সংযুক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করলো না। গোত্র প্রীতি ও গোত্রীয় বিদ্বেষে তারা মত্ত হয়ে গেলো। তাদের বিভিন্ন গোত্র বিজিত এলাকার এক একটি অংশ নিয়ে নিজের এক একটি পৃথক রাষ্ট্র কায়েম করাই পছন্দ করলো। এ বিচ্ছিন্নতার কারণে তাদের কোন একটি গোত্রও নিজের এলাকা থেকে মুশরিকদেরকে পুরোপুরি নির্মূল করে দেবার মতো শক্তি অর্জন করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত মুশরিকদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করাটাই তাদের পছন্দ করে নিতে হলো। শুধু এ নয় বরং তাদের বিজিত এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ঐ সব মুশরিক জাতির ছোট ছোট নগর রাষ্ট্রও অক্ষুণ্ন থাকলো। বনী ইস্‌রাঈলরা সেগুলো জয় করতে পারলো না। যাবুরের (গীতসংহিতা) বক্তব্যে এরই অভিযোগ করা হয়েছে। এই সূরার ৬ টীকার শুরুতে আমি এ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি।

হযরত মূসার (আ) পর বনী-ইসরাঈলীরা ফিলিস্তিনের সমগ্র অঞ্চল জয় করিয়া লয় বটে; কিন্তু তাহারা ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত হইয়া নিজেদের কোন একটি সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয় নাই। তাহারা এই গোটা অঞ্চলটিকে বিভিন্ন বনী ইসরাঈল গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে বিভক্ত ও বন্টন করিয়া লয়। ফলে তাহারা নিজেদের ক্ষুদ্রায়তন বহু কয়টি গোত্রীয় রাষ্ট্র কায়েম করে। অত্র চিত্রে দেখানো হইয়াছে যে, ফিলিস্তিনের সংক্ষিপ্ততম অঞ্চলটি বনীইসরাঈলের বনু ইয়াহুদাহ, বনু শামউন, বনু দান, বনু বিনইয়ামিন, বনু আফরায়াম, বনু রুবন, বনু জাদ, বনু মুনাস্সা, বনু আশকার, বনু জুবুলুন, বনু নাফতালী ও বনু আশের—এ গোত্রসমূহের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

এ কারণে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই দুর্বল হইয়া থাকিল। ফলে তাহারা তাওরাত কিতাবের লক্ষ অর্জনে সম্পূর্ণ অক্ষম থাকিয়া গেল; আর সেই লক্ষ ছিল এই অঞ্চলের অধিবাসী মুশরিক জাতিগুলির সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন ও বহিষ্কার।

ইসরাঈলী গোত্রসমূহের অধীন এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে মুশরিক কিনয়ানী জাতিসমূহের বহু কতকগুলি নগর-রাষ্ট্র রীতিমত প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাইবেল পাঠে জানিতে পারা যায় যে, তালূত-এর শাসন আমল পর্যন্ত সাইদা, সূর, দুয়ার ও মুজেদ্দু, বাইতেশান, জজর, জেরুশালেম প্রভৃতি শহরগুলি প্রখ্যাত মুশরিক জাতিগুলির দখলে থাকিয়া গিয়াছিল। আর বনী ইসরাঈলদের উপর এসব শহরে অবস্থিত মুশরিকী সভ্যতার অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার হয়েছিল।

উপরন্তু ইসরাঈলী গোত্রগুলোর অবস্থানের সীমান্ত এলাকায় ফলস্তিয়া, রোমক, মুয়াবী ও আমুনীয়দের অত্যন্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলিও যথারীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাহারা পরবর্তীকালে উপর্যুপরি আক্রমণ চালাইয়া ইসরাঈলীদের দখল হতে বিস্তীর্ণ অঞ্চল কেড়ে নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এ দাঁড়িয়েছিল যে, সমগ্র ফিলিস্তিন হতে ইয়াহুদীদেরকে কান ধরিয়া ও গলা ধাক্কা দিয়া বহিষ্কৃত করা হইত--যদি যথা সময়ে আল্লাহ তায়ালা তালূত-এর নেতৃত্বে ইসরাঈলীদেরকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করিয়া না দিতেন।

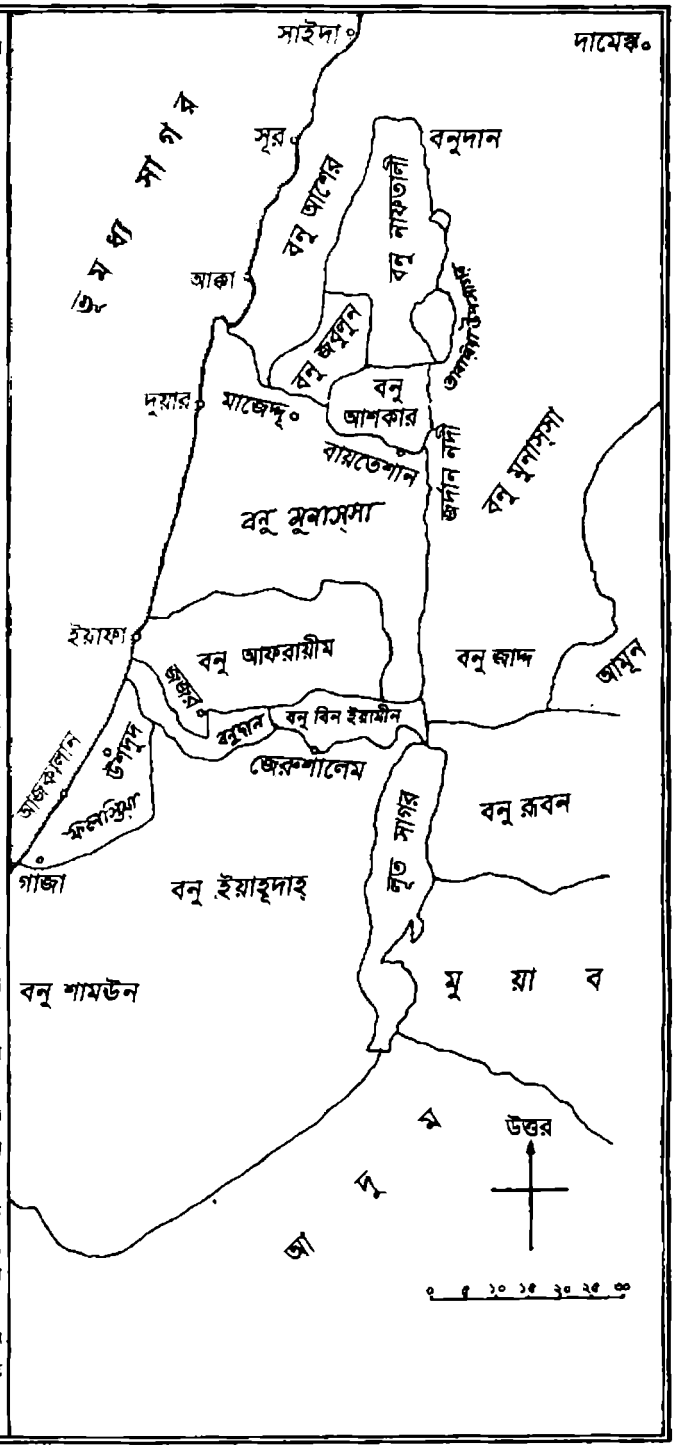

হযরত মূসার (আ) পরবর্তী ফিলিস্তিন

বনী ইস্‌রাঈলকে এর প্রথম দণ্ড ভোগ করতে হলো এভাবে যে, ঐ জাতিগুলোর মাধ্যমে তাদের মধ্যে শিরক অনুপ্রবেশ করলো এবং এ সাথে অন্যান্য নৈতিক অনাচারও ধীরে ধীরে প্রবেশ করার পথ পেয়ে গেলো। বাইবেলের বিচারকর্তৃগণ পুস্তকে এ সম্পর্কে এভাবে অনুযোগ করা হয়েছে ঃ

"ইস্‌রাঈল সন্তানগণ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিতে লাগিল; এবং বাল দেবগণের সেবা করিতে লাগিল। আর যিনি তাহাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, যিনি তাহাদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবগণের, অর্থাৎ আপনাদের চতুর্দিকস্থিত লোকদের দেবগণের অনুগামী হইয়া তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিতে লাগিল, এইরূপে সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করিল। তাহারা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া বাল দেবের ও অষ্টারোৎ দেবীদের সেবা করিত। তাহাতে ইসরাঈলের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হইল।" [বিচারকর্তৃগণ ২ ঃ ১১–১৩]

এরপর তাদের দ্বিতীয় দণ্ড ভোগ করতে হলো। সেটি হচ্ছে, যেসব জাতির নগর রাষ্ট্রগুলোকে তারা ছেড়ে দিয়েছিল তারা এবং ফিলিস্তীয়রা, যাদের সমগ্র এলাকা অবিজিত রয়ে গিয়েছিল, বনী ইস্‌রাঈলদের বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত জোট গঠন করলো এবং লাগাতার হামলা করে ফিলিস্তীনের বৃহত্তম অংশ থেকে তাদেরকে বেদখল করলো। এমনকি তাদের কাছ থেকে সদাপ্রভুর অংগীকারের সিন্দুকও (শান্তির তাবুত) ছিনিয়ে নিল। শেষ পর্যন্ত বনী ইস্‌রাঈলরা অনুভব করলো, তাদের একজন শাসকের অধীনে একটি সংযুক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ফলে তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে শামুয়েল নবী ১০২০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে তালূতকে তাদের বাদশাহ নিযুক্ত করলেন। (সূরা বাকারার ৩২ রুকূতে এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

এ সংযুক্ত রাষ্ট্রের শাসনকর্তা হয়েছিলেন তিনজন। খৃঃপূ ঃ ১০২০ থেকে ১০০৪ সাল পর্যন্ত ছিলেন তালূত, খৃঃ পূঃ ১০০৪ থেকে ৯৬৫ সাল পর্যন্ত হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এবং খৃঃ পূঃ ৯৬৫ থেকে ৯২৬ সাল পর্যন্ত হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের পর বনী ইসরাঈলরা যে কাজটি অসম্পূর্ণ রেখে দিয়েছিল এ শাসনকর্তাগণ সেটি সম্পূর্ণ করেন। শুধুমাত্র উত্তর উপকূলে ফিনিকিয়দের এবং দক্ষিণ উপকূলে ফিলিস্তীয়দের রাষ্ট্র অপরিবর্তিত থেকে যায়। এ রাষ্ট্র দু'টি জয় করা সম্ভব হয়নি। ফলে এদেরকে শুধু করদ রাষ্ট্রে পরিণত করেই ক্ষান্ত হতে হয়।

হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামের পরে বনী ইসরাঈল আবার ভীষণভাবে দুনিয়াদারী ও বৈষয়িক স্বার্থপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়লো। পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে তারা নিজেদের দু'টো পৃথক রাষ্ট্র কায়েম করে নিল। উত্তর ফিলিস্তীন ও পূর্ব জর্দানে ইসরাঈল রাষ্ট্র। শেষ পর্যন্ত সামেরীয়া এর রাজধানী হলো। অন্যদিকে দক্ষিণ ফিলিস্তীন ও আদোন অঞ্চলে কায়েম হলো ইহুদিয়া রাষ্ট্র। জেরুশালেম হলো এর রাজধানী। প্রথম দিন থেকেই এ দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে শুরু হয়ে গেলো মারাত্মক ধরনের রেষারেষি ও সংঘাত–সংঘর্ষ এবং শেষ দিন পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকলো।

এদের মধ্যে ইসরাঈলী রাষ্ট্রের শাসক ও বাসিন্দারাই সর্বপ্রথম প্রতিবেশী জাতিদের মুশরিকী আকীদা–বিশ্বাস ও নৈতিক বিকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হলো। এ রাষ্ট্রের শাসক

আখীয়াব সাইদার মুশরিক শাহজাদী ইসাবেলাকে বিয়ে করার পর এ দুরাবস্থা চরমে পৌঁছে গেলো। এ সময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও উপায়-উপকরণের মাধ্যমে শির্‌ক ও নৈতিক অনাচার বন্যার বেগে ইস্‌রাঈলীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। হযরত ইলিয়াস ও হযরত আল-ইয়াসা' আলাইহিমাস্ সালাম এ বন্যা রুখে দেবার জন্য চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালালেন। কিন্তু এ জাতি যে অনিবার্য পতনের দিকে ছুটে চলছিল তা থেকে আর নিবৃত্ত হলো না। শেষে আশূরীয় বিজেতাদের আকারে আল্লাহর গযব ইস্‌রাঈল রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে এলো এবং খৃষ্টপূর্ব নবম শতক থেকে ফিলিস্তীনের ওপর আশূরীয় শাসকদের উপর্যুপরি হামলা শুরু হয়ে গেলো। এ যুগে আমূস (আমোস্) নবী (খৃঃ পূঃ ৭৮৭-৭৪৭) এবং তারপর হোসী' (হোশেয়) নবী (খৃষ্টপূর্ব ৭৪৭-৭৩৫) ইসরাঈলীদেরকে অনবরত সতর্ক করে যেতে থাকলেন। কিন্তু যে গাফলতির নেশায় তারা পাগল হয়ে গিয়েছিল সতর্কবাণীর তিক্ত রসে তার তীব্রতা আরো বেড়ে গেলো। এমন কি ইসরাঈলী বাদশাহ আমূস নবীকে দেশত্যাগ করার এবং সামেরীয় রাজের এলাকার চতুঃসীমার মধ্যে তাঁর নবুওয়াতের প্রচার বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। এরপর আর বেশীদিন যেতে না যেতেই ইস্‌রাঈলী রাষ্ট্র ও তার বাসিন্দাদের ওপর আল্লাহর আযাব নেমে এলো। খৃষ্টপূর্ব ৭২১ অব্দে আশূরীয়ার দুর্ধর্ষ শাসক সারাগুন সামেরীয়া জয় করে ইস্‌রাঈল রাষ্ট্রের পতন ঘটালো। হাজার হাজার ইস্‌রাঈলী নিহত হলো। ২৭ হাজারেরও বেশী প্রতিপত্তিশালী ইসরাঈলীকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে আশূরীয় রাষ্ট্রের পূর্ব প্রান্তের জেলাসমূহে ছড়িয়ে দেয়া হলো এবং অন্যান্য এলাকা থেকে অইস্‌রাঈলীদেরকে এনে ইসরাঈলী এলাকায় পুনর্বাসিত করা হলো। এদের মধ্যে বসবাস করে ইস্‌রাঈলীদের দলছুট অংশও নিজেদের জাতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি থেকে দিনের পর দিন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকলো।

ইহুদীয়া নামে বনী ইস্‌রাঈলদের যে দ্বিতীয় রাষ্ট্রটি দক্ষিণ ফিলিস্তীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটিও হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের পর অতি শীঘ্রই শির্‌ক ও নৈতিক অনাচারে ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু ইস্‌রাঈলী রাষ্ট্রের তুলনায় তার আকীদাগত এবং নৈতিক অধপতনের গতি ছিল মন্থর। তাই তার অবকাশকালও ছিল একটু বেশী দীর্ঘ। ইস্‌রাঈলী রাষ্ট্রের মত তার ওপরও আশূরীয়রা যদিও উপর্যুপরি হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল, তার নগরগুলো ধ্বংস করে চলছিল এবং তার রাজধানী অবরোধ করে রেখেছিল, তবুও এ রাজ্যটি আশূরীয়দের হাতে পুরোপুরি বিজিত হয়নি, বরং এটি তাদের করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। তারপর যখন হযরত ইয়াসইয়াহ (যিশাইয়) ও হযরত ইয়ারমিয়াহর (যিরমিয়) অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইয়াহুদিয়ার লোকেরা মূর্তি পূজা ও নৈতিক অনাচার ত্যাগ করলো না তখন খৃষ্টপূর্ব ৫৯৮ সালে ব্যবিলনের বাদশাহ বখ্‌তে নসর জেরুশালেমসহ সমগ্র ইয়াহুদিয়া রাজ্য জয় করে নিল এবং ইয়াহুদিয়ার বাদশাহ তার হাতে বন্দী হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলো। ইহুদীদের অপকর্মের ধারা এখানেই শেষ হলো না। হযরত ইয়ারমিয়াহর হাজার বুঝানো সত্ত্বেও তারা নিজেদের চরিত্র কর্ম সংশোধন করার পরিবর্তে ব্যবিলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করার চেষ্টা করতে লাগলো। শেষে ৫৮৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে বখ্‌তে নসর একটি বড় আকারের হামলা চালিয়ে ইয়াহুদিয়ার ছোট বড় সমস্ত শহর ধ্বংস করে দিল এবং জেরুশালেম ও হাইকেলে সুলায়মানীকে এমনভাবে বিধ্বস্ত করলো যে, তার একটি দেয়ালও অক্ষত রইলো না, সবকিছু ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দিল। বিপুল সংখ্যক ইহুদীদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে বিভিন্ন দেশে

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۝٦

এরপর আমি তোমাদেরকে তাদের ওপর বিজয় লাভের সুযোগ করে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে সাহায্য করেছি অর্থ ও সন্তানের সাহায্যে আর তোমাদের সংখ্যা আগের চাইতে বাড়িয়ে দিয়েছি।[৮]

বিতাড়িত করলো। আর যেসব ইহুদী নিজেদের এলাকায় থেকে গেলো তারাও প্রতিবেশী জাতিদের পদতলে নিকৃষ্টভাবে দলিত মথিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকলো।

এটিই ছিল প্রথম বিপর্যয়। বনী ইসরাঈলকে এ বিপর্যয় সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল। আর এটিই ছিল প্রথম শাস্তি। এ অপরাধে তাদেরকে এ শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

৮. এখানে ইহুদীদেরকে (ইয়াহুদিয়াবাসী) ব্যবিলনের দাসত্বমুক্ত হবার পর যে অবকাশ দেয়া হয় সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। সামেরীয়া ও ইস্‌রাঈলের লোকদের সম্পর্কে বলা যায়, আকীদাগত ও নৈতিক পতনের গর্তে পা দেবার পর তারা আর সেখান থেকে উঠতে পারেনি। কিন্তু ইয়াহুদিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে কিছু লোক ছিল, যারা সততা ও ন্যায়নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সুকৃতি ও কল্যাণের দাওয়াত দিয়ে আসছিল। তারা ইয়াহুদিয়ায় যেসব ইহুদী থেকে গিয়েছিল তাদের মধ্যে সংস্কারমূলক কাজ করতে থাকলো এবং ব্যবিলন ও অন্যান্য এলাকায় যাদেরকে বিতাড়িত করা হয়েছিল তাদেরকেও তাওবা ও অনুশোচনা করতে উদ্বুদ্ধ করলো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রহমত তাদের সহায়ক হলো। ব্যবিলন রাষ্ট্রের পতন হলো। খৃষ্টপূর্ব ৫৩৯ সালে ইরানী বিজেতা সাইরাস (খুরস বা খসরু) ব্যবিলন জয় করে এবং তারপরের বছরই এক ফরমান জারী করে। এ ফরমানের সাহায্যে বনী ইস্‌রাঈলকে নিজেদের স্বদেশভূমিতে ফিরে যাবার এবং সেখানে পুনরায় বসবাস করার সাধারণ অনুমতি দেয়া হয়। এরপর ইয়াহুদিয়ার দিকে ইহুদীদের কাফেলার সারি চলতে থাকে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এর সিলসিলা অব্যাহত থাকে। সাইরাস ইহুদীদেরকে হাইকেলে সুলাইমানী পুনর্বার নির্মাণ করারও অনুমতি দেয়। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত এ এলাকায় নতুন বসতিকারী প্রতিবেশী জাতিগুলো এতে বাধা দিতে থাকে। শেষে প্রথম দারায়ুস (দারা) ৫২২ খৃষ্টপূর্বাব্দে ইয়াহুদিয়ার শেষ বাদশাহর নাতি সরুব্বাবিলকে ইয়াহুদিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করে। সে হাজ্জী (হগয়) নবী, যাকারিয়া (সখরিয়) নবী ও প্রধান পুরোহিত যেশূয়ের তত্বাবধানে পবিত্র হাইকেল পুনরনির্মাণ করে। তারপর খৃষ্টপূর্ব ৪৫৮ সালে হযরত উযাইর (ইয়া) ইয়াহুদিয়ায় পৌঁছেন। পারস্যরাজ ইর্‌দশীর এক ফরমান বলে তাঁকে এ মর্মে ক্ষমতা দান করেন ঃ

"হে উযাইর তোমার ঈশ্বর বিষয়ক যে জ্ঞান তোমার করতলে আছে, তদনুসারে নদী পারস্থ সকল লোকের বিচার করিবার জন্য, যাহারা তোমার ঈশ্বরের ব্যবস্থা জানে, এমন শাসনকর্তা ও বিচারকর্তাদিগকে নিযুক্ত কর ; এবং যে তাহা না জানে, তোমরা তাহাকে শিক্ষা দাও। আর যে কেহ তোমার ঈশ্বরের ব্যবস্থা ও রাজার ব্যবস্থা পালন

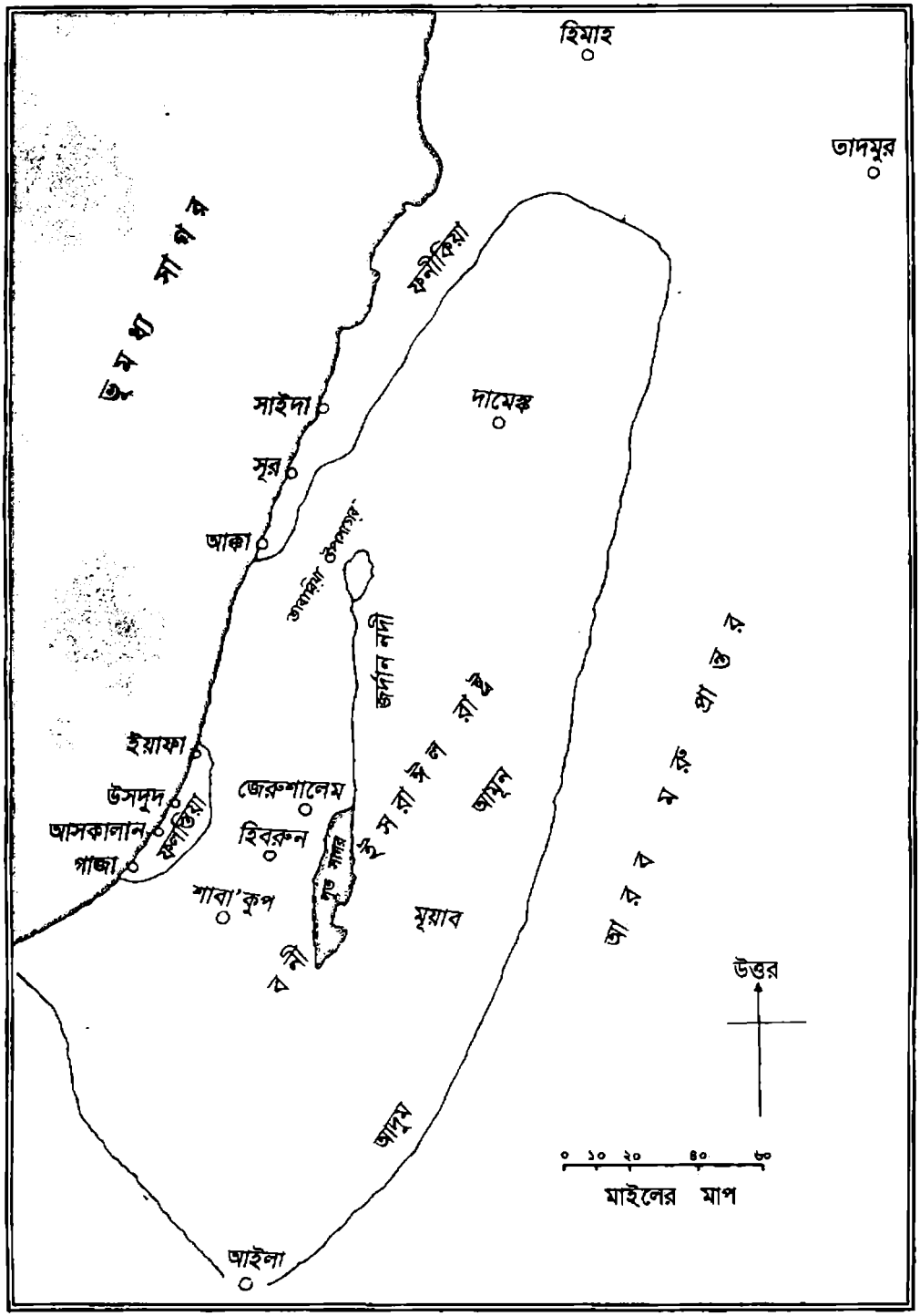

হযরত দাউদ ও সোলাইমানের (আ) সাম্রাজ্য (১০০০–৯৩০ খৃষ্টপূর্ব)

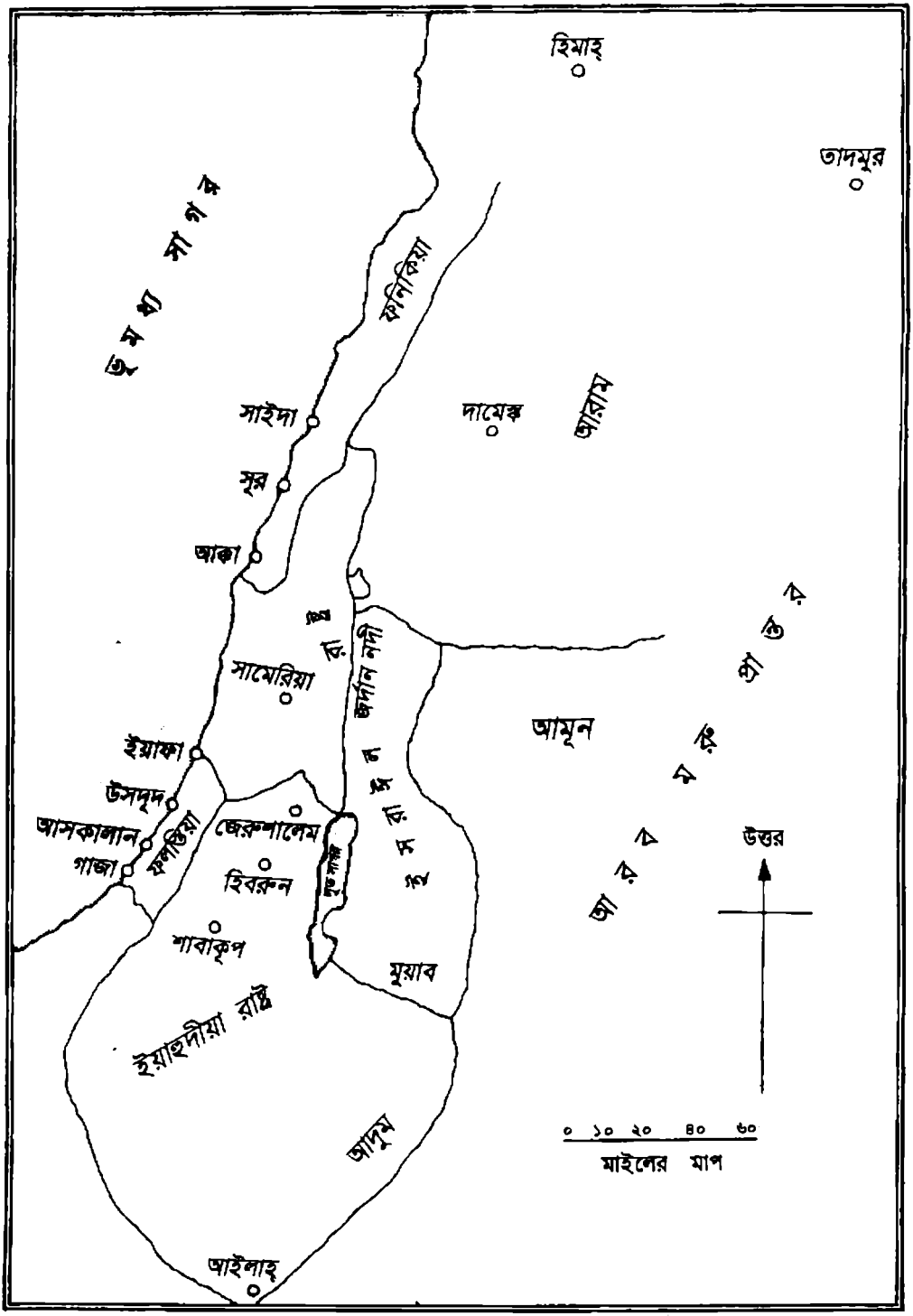

বনী ইসরাঈলদের দুই রাষ্ট্র ইয়াহুদীয়া ও ইসরাইল (খৃষ্টপূর্ব ৮৬০)

করিতে অসম্মত তাহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করা হউক ; তাহার প্রাণদণ্ড, নির্বাসন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কিম্বা কারাদণ্ড হউক।" [ইয়া ৭ ঃ ২৫-২৬]

এ ফরমানের সুযোগ গ্রহণ করে হযরত উযাইর মূসার দীনের পুনরুজ্জীবনের বিরাট দায়িত্ব সম্পাদন করেন। তিনি বিভিন্ন এলাকা থেকে ইহুদী জাতির সকল সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ লোককে একত্র করে একটি শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তাওরাত সম্বলিত বাইবেলের পঞ্চ পুস্তক একত্র সংকলিত ও বিন্যস্ত করে তিনি তা প্রকাশ করেন। ইহুদীদের দীনী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। অন্য জাতিদের প্রভাবে বনী ইস্‌রাঈলদের মধ্যে যেসব আকীদাগত ও চারিত্রিক অনাচারের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল শরীয়াতের আইন জারী করে তিনি সেগুলো দূর করে দিতে থাকেন। ইহুদীরা যেসব মুশরিক মেয়েকে বিয়ে করে তাদেরকে নিয়ে ঘর সংসার করছিল তাদেরকে তালাক দেবার ব্যবস্থা করেন। বনী ইস্‌রাঈলদের থেকে আবার নতুন করে আল্লাহর বন্দেগী করার এবং তাঁর আইন মেনে চলার অংগীকার নেন।

খৃষ্টপূর্ব ৪৪৫ সালে নহিমিয়ের নেতৃত্বে আর একটি বহিষ্কৃত ইহুদী দল ইয়াহুদিয়ায় ফিরে আসে। পারশ্যের রাজা নহিমিয়কে জেরুশালেমের গভর্নর নিযুক্ত করে তাকে এই নগরীর প্রতিরক্ষা প্রাচীর নির্মাণ করার অনুমতি দেয়। এভাবে দেড়শো বছর পরে বায়তুল মাকদিস পুনরায় আবাদ হয় এবং তা ইহুদী ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। কিন্তু সামেরিয়া ও উত্তর ফিলিস্তীনের ইস্‌রাঈলীরা হযরত উযাইরের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন কর্মকাণ্ড থেকে লাভবান হবার কোন সুযোগ গ্রহণ করেনি। বরং বায়তুল মাকদিসের মোকাবিলায় জারযীম পাহাড়ে নিজেদের একটি ধর্মীয় কেন্দ্র নির্মাণ করে তাকে আহলি কিতাবদের কিবলায় পরিণত করার চেষ্টা করে। এভাবে ইহুদী ও সামেরীয়দের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে যেতে থাকে।

পারস্য সাম্রাজ্যের পতন এবং আলেকজাণ্ডারের বিজয় অভিযান ও গ্রীকদের উত্থানের ফলে কিছুকালের জন্য ইহুদীরা অনেকটা পিছিয়ে পড়ে। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তার সাম্রাজ্য তিনটি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। তার মধ্যে সিরিয়ার এলাকা পড়ে সালুকী রাজ্যের অংশে। এর রাজধানী ছিল ইনতাকিয়ায়। এর শাসনকর্তা তৃতীয় এন্টিউকাস খৃষ্টপূর্ব ১৯৮ সালে ফিলিস্তীন দখল করে নেয়। এ গ্রীক বিজেতা ছিল মুশরিক ও নৈতিক চরিত্রহীন। ইহুদী ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতিকে সে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতো। এর মোকাবিলা করার জন্য সে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপের মাধ্যমে গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারে আত্মনিয়োগ করে। এ সংগে ইহুদীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশও তার ক্রীড়নকে পরিণত হয়। এ বাইরের অনুপ্রবেশ ইহুদী জাতির মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। তাদের একটি দল গ্রীক পোশাক, গ্রীক ভাষা, গ্রীক জীবন যাপন পদ্ধতি ও গ্রীক খেলাধূলা গ্রহণ করে নেয় এবং অন্যদল নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরে। খৃষ্টপূর্ব ১৭৫ সালে চতুর্থ এন্টিউকাস (যার উপাধি ছিল এপিফানিস বা আল্লাহর প্রকাশ) সিংহাসনে বসে ইহুদী ধর্ম ও সংস্কৃতিকে সমূলে উৎখাত করার জন্য রাজশক্তির পূর্ণ ব্যবহার করে। বায়তুল মাকদিসের হাইকেলে সে জোরপূর্বক মূর্তি স্থাপন করে এবং সেই মূর্তিকে সিজদা করার জন্য ইহুদীদেরকে বাধ্য করে। ইতিপূর্বে যেখানে কুরবানী করা হতো সেখানে কুরবানী করাও বন্ধ করিয়ে দেয় এবং ইহুদীদেরকে মুশরিকদের কুরবানী করার

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ
وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ
أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿٧﴾

দেখো, তোমরা ভাল কাজ করে থাকলে তা তোমাদের নিজেদের জন্যই ভাল ছিল আর খারাপ কাজ করে থাকলে তোমাদের নিজেদেরই জন্য তা খারাপ প্রমাণিত হবে। তারপর যখন পরবর্তী প্রতিশ্রুতির সময় এসেছে তখন আমি অন্য শত্রুদেরকে তোমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছি, যাতে তারা তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দেয় এবং (বায়তুল মাক্‌দিসের) মসজিদে এমনভাবে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার শত্রুরা ঢুকে পড়েছিল আর যে জিনিসের ওপরই তাদের হাত পড়ে তাকে ধ্বংস করে রেখে দেয়।[৯]

জায়গায় কুরবানী করার হুকুম দেয়। যারা নিজেদের ঘরে তাওরাত রাখে অথবা শনিবারের দিনের বিধান মেনে চলে কিংবা নিজেদের শিশু সন্তানদের খত্‌না করায় তাদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান জারী করে। কিন্তু ইহুদীরা এ শক্তি প্রয়োগের সামনে মাথা নত করেনি। তাদের মধ্যে একটি দুর্বার আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ইতিহাসে এ আন্দোলনটি "মাক্কাবী বিদ্রোহ" নামে পরিচিত। যদিও এ সংঘাত-সংঘর্ষকালে গ্রীক প্রভাবিত ইহুদীদের যাবতীয় সহানুভূতি গ্রীকদের পক্ষেই ছিল এবং তারা কার্যত মাক্কাবী বিদ্রোহ নির্মূল করার জন্য ইনতাকিয়ার জালেমদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করেছিল তবুও সাধারণ ইহুদীদের মধ্যে হযরত উযাইরের দীনী কার্যক্রমের বিপ্লবাত্মক ভাবধারা এতদূর প্রভাব বিস্তার করেছিল যার ফলে তারা সবাই শেষ পর্যন্ত মাক্কাবীদের সাথে সহযোগিতা করে। এভাবে একদিন তারা গ্রীকদের বিতাড়িত করে নিজেদের একটি স্বাধীন দীনী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। এ রাষ্ট্রটি খৃষ্টপূর্ব ৬৭ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ রাষ্ট্রটির সীমানা সম্প্রসারিত হতে হতে ধীরে ধীরে পূর্বতন ইয়াহুদিয়া ও ইসরাঈল রাষ্ট্র দুটির আওতাধীন সমগ্র এলাকার ওপর পরিব্যাপ্ত হয়। বরং ফিলিস্তিয়ার একটি বড় অংশও তার কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে। হযরত দাউদ (আ) এবং হযরত সুলাইমানের (আ) আমলেও এ এলাকাটি বিজিত হয়নি।

কুরআন মজীদের সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো এ ঘটনাবলীর প্রতি ইংগিত করে।

৯. এ দ্বিতীয় বিপর্যয়টি এবং এর ঐতিহাসিক শাস্তির পটভূমি নিম্নরূপ ঃ

মাক্কাবীদের আন্দোলন যে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও দীনী প্রেরণা সহকারে শুরু হয়েছিল তা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যেতে থাকে। নির্ভেজাল বৈষয়িক স্বার্থপূজা ও অন্তসারশূন্য লৌকিকতা তার স্থান দখল করে। শেষে তাদের মধ্যে ভাঙন দেখা দেয়। তারা নিজেরাই রোমক বিজেতা পম্পীকে ফিলিস্তীনে আসার জন্য আহবান জানায়। তাই খৃষ্টপূর্ব ৬৩ সনে

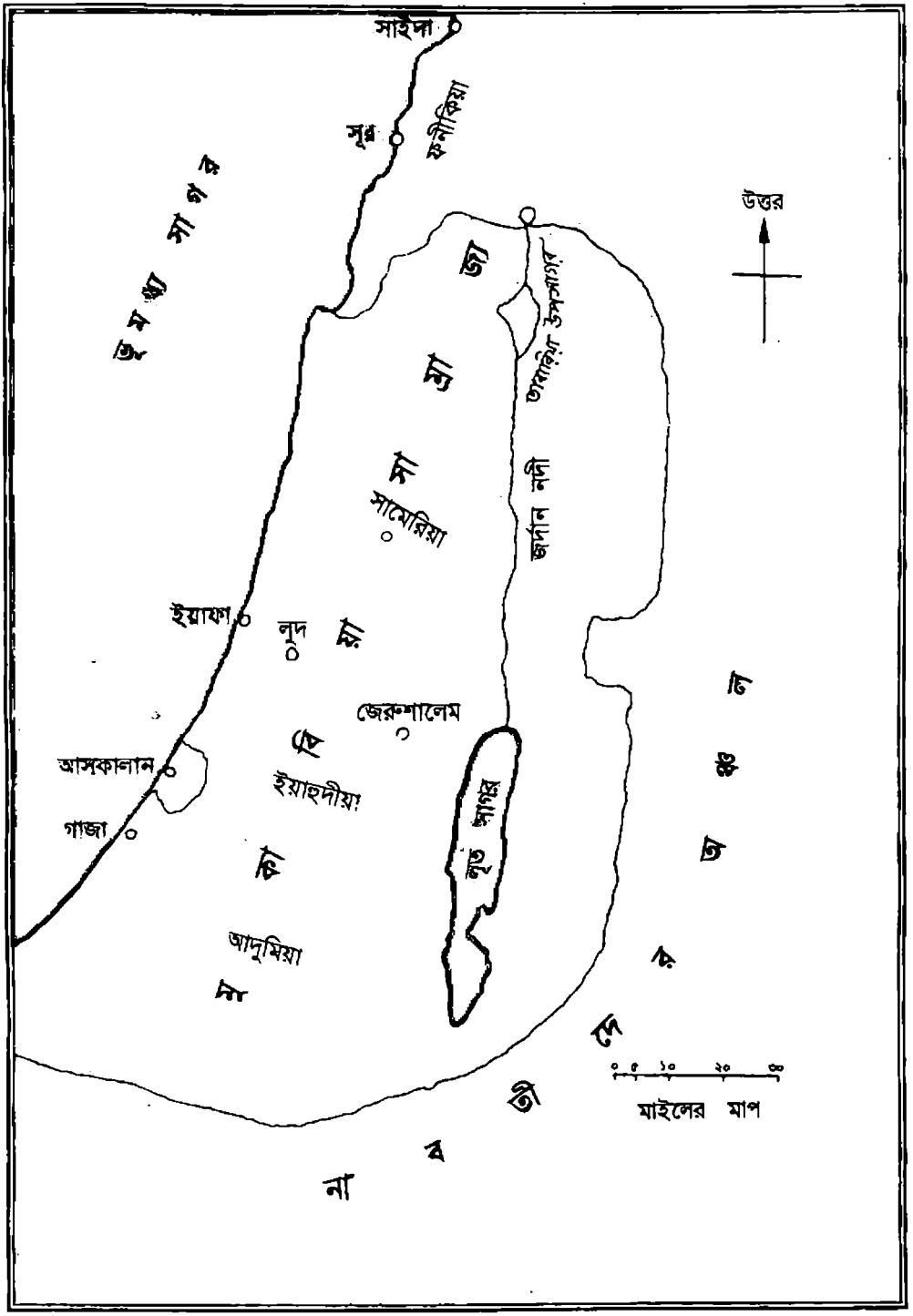

মুকাবিয়া শাসন আমলের ফিলিস্তিন (৯ নং টীকা) (খৃষ্টপূর্ব ১৬৮–৬২)

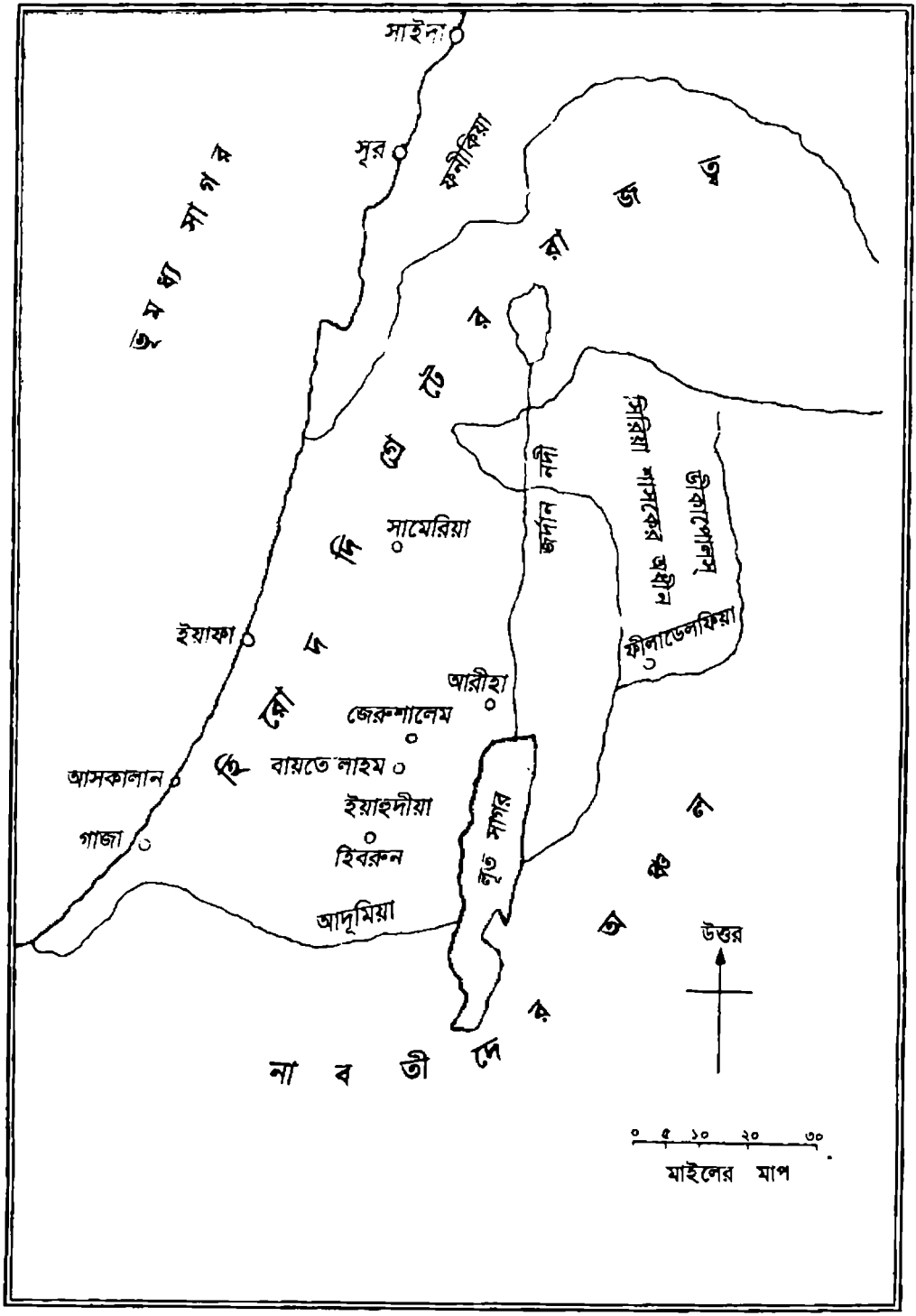

মহান হিরোদ সাম্রাজ্য (খৃষ্টপূর্ব ৪০-৪০)

পম্পী এ দেশের দিকে নজর দেয় এবং বায়তুল মাকদিস জয় করে ইহুদীদের স্বাধীনতা হরণ করে। কিন্তু রোমীয় বিজেতাদের স্থায়ী নীতি ছিল, তারা বিজিত এলাকায় সরাসরি নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতো না। বরং স্থানীয় শাসকদের সহায়তায় আইন শৃংখলা ব্যবস্থা পরিচালনা করে পরোক্ষভাবে নিজেদের কার্যোদ্ধার করা বেশী পছন্দ করতো। তাই তারা নিজেদের ছত্রছায়ায় ফিলিস্তীনে একটি দেশীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। খৃঃপূঃ ৪০ সনে এটি হীরোদ নামক এক সুচতুর ইহুদীর কর্তৃত্বাধীন হয়। ইতিহাসে এ ইহুদী শাসক মহান হীরোদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সমগ্র ফিলিস্তীন ও ট্রান্স জর্দান এলাকায় খৃষ্টপূর্ব ৪০ থেকে ৪ সন পর্যন্ত তার শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে। একদিকে ধর্মীয় নেতা ও পুরোহিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করে সে ইহুদীদেরকে সন্তুষ্ট করে এবং অন্যদিকে রোমান সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করে রোম সাম্রাজের প্রতি নিজের অত্যধিক বিশ্বস্ততার প্রমাণ পেশ করে। এভাবে কাইসারের সন্তুষ্টিও অর্জন করে। এ সময় ইহুদীদের দীনী ও নৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে ঘটতে তার একেবারে শেষ সীমানায় পৌঁছে যায়। হীরোদের পর তার রাষ্ট্র তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে ঃ

তার এক ছেলে আরখালাউস সামেরীয়া, ইয়াহুদিয়া ও উত্তর উদমিয়ার শাসনকর্তা হয়। কিন্তু ৬ খৃষ্টাব্দে রোম সম্রাট আগস্টাস তাকে পদচ্যুত করে তার কর্তৃত্বাধীন সমগ্র এলাকা নিজের গভর্নরের শাসনাধীনে দিয়ে দেয়। ৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এ ব্যবস্থাই অপরিবর্তিত থাকে। এ সময় হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বনী ইস্‌রাঈলের সংস্কারের জন্য নবুওয়াতের দায়িত্ব নিয়ে আবির্ভূত হন। ইহুদীদের সমস্ত ধর্মীয় নেতা ও পুরোহিতরা একজোট হয়ে তাঁর বিরোধিতা করে এবং রোমান গভর্নর পোন্তিসপীলাতিসের সাহায্যে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দান করার প্রচেষ্টা চালায়।

হীরোদের দ্বিতীয় ছেলে হীরোদ এন্টিপাস উত্তর ফিলিস্তীনের গালীল এলাকা ও ট্রান্স জর্দানের শাসনকর্তা হয়। এ ব্যক্তিই এক নর্তকীর ফরমায়েশে হযরত ইয়াহ্‌ইয়া আলাইহিস সালামের শিরশ্ছেদ করে তাকে নযরানা দেয়।

তার তৃতীয় ছেলের নাম ফিলিপ। হারমুন পর্বত থেকে ইয়ারমুক নদী পর্যন্ত সমগ্র এলাকা তার অধিকারভুক্ত ছিল। এ ব্যক্তি রোমীয় ও গ্রীক সংস্কৃতিতে নিজের বাপ ও ভাইদের তুলনায় অনেক বেশী ডুবে গিয়েছিল। তার এলাকায় কোন ভাল কথার বা ভাল কাজের বিকশিত হবার তেমন সুযোগ ছিল না যেমন ফিলিস্তীনের অন্যান্য এলাকায় ছিল।

মহামতি হীরোদ তাঁর নিজের শাসনামলে যেসব এলাকার ওপর কর্তৃত্ব করতেন ৪১ খৃষ্টাব্দে তার নাতি হীরোদাগ্রীপ্পাকে রোমীয়রা সেসব এলাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে। এ ব্যক্তি শাসন কর্তৃত্ব লাভ করার পর ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের ওপর চরম জুলুম-নির্যাতন শুরু করে দেয়। তাঁর হাওয়ারীগণ আল্লাহভীতি ও নৈতিক চরিত্র সংশোধনের যে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন তাকে বিধ্বস্ত করার জন্য সে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এ সময়ের সাধারণ ইহুদী এবং তাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করে যেসব ভাষণ দিয়েছেন সেগুলো পাঠ করলে তাদের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা যাবে। চার ইনজীলে এ ভাষণগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে।

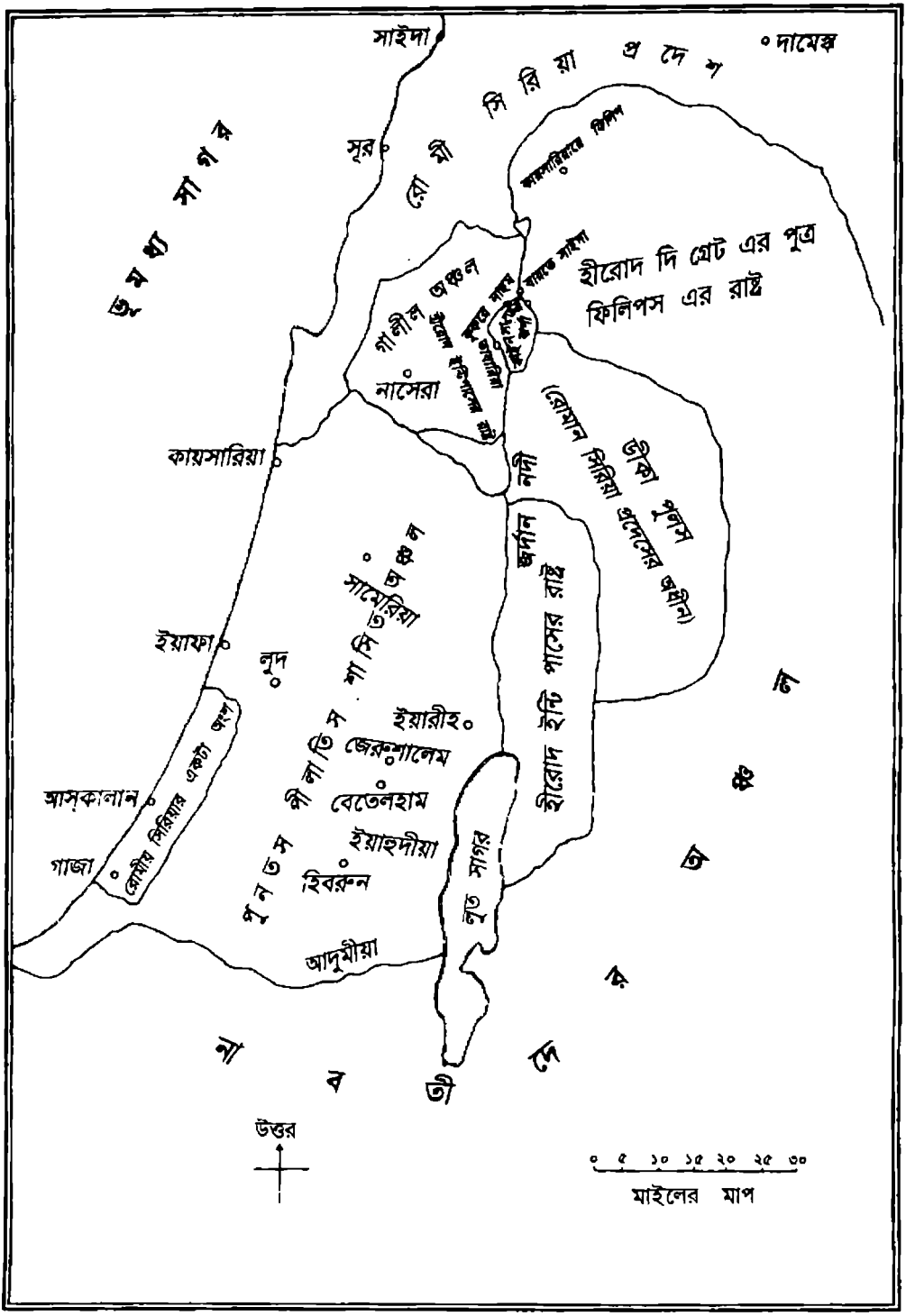

হযরত ঈসার (আ) আমলে ফিলিস্তিন

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ
لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ۝٨ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ۝٩
وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝١٠

এখন তোমাদের রব তোমাদের প্রতি করুণা করতে পারেন। কিন্তু যদি তোমরা আবার নিজেদের আগের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো তাহলে আমিও আবার আমার শাস্তির পুনরাবৃত্তি করবো। আর নিয়ামত অস্বীকারকারীদের জন্য আমি জাহান্নামকে কয়েদখানা বানিয়ে রেখেছি।[১০]

আসলে এ কুরআন এমন পথ দেখায় যা একেবারেই সোজা। যারা একে নিয়ে ভাল কাজ করতে থাকে তাদেরকে সে সুখবর দেয় এ মর্মে যে, তাদের জন্য বিরাট প্রতিদান রয়েছে। আর যারা আখেরাত মানে না তাদেরকে এ সংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।[১১]

তারপর এ সম্পর্কে ধারণা লাভ করার জন্য এ বিষয়টিও যথেষ্ট যে, এ জাতির চোখের সামনে হযরত ইয়াহ্‌ইয়া আলাইহিস সালামের মতো পুন্যাত্মাকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হলো কিন্তু এ ভয়ংকর জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটি আওয়াজও শোনা গেলো না। আবার অন্যদিকে সমগ্র জাতির ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ঈসা আলাইহিস সালামের জন্য মৃত্যুদণ্ড দাবী করলো কিন্তু হাতে গোনা গুটিকয় সত্যাশ্রয়ী লোক ছাড়া জাতির এ দুর্ভাগ্যে দুঃখ করার জন্য আর কাউকে পাওয়া গেল না। জাতীয় দুরাবস্থা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, পোন্তিসপীলাতিস এ দুর্ভাগ্য পীড়িত লোকদেরকে বললো, আজ তোমাদের ঈদের দিন। প্রচলিত নিয়ম মোতাবিক আজ মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত অপরাধীদের একজনকে মুক্তি দেবার অধিকার আমার আছে। এখন তোমরা বলো, আমি ঈসাকে মুক্তি দেবো, না বারাব্বা ডাকাতকে? সমগ্র জনতা এক কণ্ঠে বললো, বারাব্বা ডাকাতকে মুক্তি দাও। এটা যেন ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে এ জাতির গোমরাহীর পক্ষে শেষ প্রমাণ পেশ।

এর কিছুদিন পরেই ইহুদী ও রোমানদের মধ্যে কঠিন সংঘাত-সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেলো। ৬৪ ও ৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ইহুদীরা প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। দ্বিতীয় হীরোদাগ্রিপ্পা ও রোম সম্রাট নিযুক্ত প্রাদেশিক দেওয়ান ফ্লোরাস উভয়ই এ বিদ্রোহ দমন করতে ব্যর্থ হলো। শেষ পর্যন্ত রোম সম্রাট বড় ধরনের সামরিক কার্যক্রমের মাধ্যমে এ বিদ্রোহ নির্মূল করলো। ৭০ খৃষ্টাব্দে টীটুস সেনাবাহিনীর সাহায্যে যুদ্ধ করে জেরুশালেম জয় করলো। এ সময় যে গণহত্যা সংঘটিত হলো তাতে ১ লাখ ৩৩ হাজার লোক মারা

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿١١﴾
وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ
مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

২ রুকূ'

মানুষ অকল্যাণ কামনা করে সেভাবে—যেভাবে কল্যাণ কামনা করা উচিত। মানুষ বড়ই দ্রুতকামী।[১২]

দেখো, আমি রাত ও দিনকে দু'টি নিদর্শন বানিয়েছি। রাতের নিদর্শনকে বানিয়েছি আলোহীন এবং দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকোজ্জ্বল, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ তালাশ করতে পারো এবং মাস ও বছরের হিসেব জানতে সক্ষম হও। এভাবে আমি প্রত্যেকটি জিনিসকে আলাদাভাবে পৃথক করে রেখেছি।[১৩]

গেলো। ৬৭ হাজার লোককে গ্রেফতার করে গোলামে পরিণত করা হলো। হাজার হাজার লোককে পাকড়াও করে মিসরের খনির মধ্যে কাজ করার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হলো। হাজার হাজার লোককে ধরে বিভিন্ন শহরে এম্ফী থিয়েটার ও ক্লসীমুতে ভিড়িয়ে দেয়া হলো। সেখানে তারা বন্য জন্তুর সাথে লড়াই বা তরবারি যুদ্ধের খেলার শিকার হয়। দীর্ঘাংগী সুন্দরী মেয়েদেরকে বিজেতাদের জন্য নির্বাচিত করে নেয়া হলো। সবশেষে জেরুশালেম নগরী ও হাইকেলকে বিধ্বস্ত করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হলো। এরপর ফিলিস্তীন থেকে ইহুদী কর্তৃত্ব ও প্রভাব এমনভাবে নির্মূল হয়ে গেলো যে, পরবর্তী দু'হাজার বছর পর্যন্ত ইহুদীরা আর মাথা উঁচু করার সুযোগ পেলো না। জেরুশালেমের পবিত্র হাইকেলও আর কোনদিন নির্মিত হতে পারেনি। পরবর্তীকালে কাইসার হিড্রিয়ান এ নগরীতে পুনরায় জনবসতি স্থাপন করে কিন্তু তখন এর নাম রাখা হয় ইলিয়া। আর এ ইলিয়া নগরীতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইহুদীদের প্রবেশাধিকার ছিল না।

দ্বিতীয় মহাবিপর্যয়ের অপরাধে ইহুদীরা এ শাস্তি লাভ করে।

১০. এ থেকে এ ধারণা করা ঠিক নয় যে, বনী ইস্‌রাঈলদেরকে উদ্দেশ করে এ সমগ্র ভাষণটি দেয়া হয়েছে। সম্বোধন তো করা হয়েছে মক্কার কাফেরদেরকে। কিন্তু তাদেরকে সতর্ক করার জন্য এখানে বনী ইস্‌রাঈলদের ইতিহাস থেকে কয়েকটি শিক্ষাপ্রদ সাক্ষ প্রমাণ পেশ করা হয়েছিল, তাই একটি প্রসংগ কথা হিসেবে বনী ইস্‌রাঈলকে সম্বোধন করে একথা বলা হয়েছে, যাতে এক বছর পরে মদীনায়

সংস্কারমূলক কার্যাবলী প্রসংগে যেসব ভাষণ দিতে হবে এটি তার ভূমিকা হিসেবে কাজ করতে পারে।

১১. মূল বক্তব্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি বা দল অথবা জাতি এ কুরআনের উপদেশ ও সতর্কবাণীর পর সঠিক পথে না চলে, বনী ইস্‌রাঈলরা যে শাস্তি ভোগ করেছিল তাদের সেই একই শাস্তি ভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

১২. মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বারবার যে কথাটি বলছিল যে, ঠিক আছে তোমার সেই আযাব আনো যার ভয় তুমি আমাদের দেখিয়ে থাকো, এ বাক্যটি তাদের সেই নির্বুদ্ধিতাসূলভ কথার জবাব। ওপরের বক্তব্যের পর সাথে সাথেই এ উক্তি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া যে, নির্বোধের দল, কল্যাণ চাওয়ার পরিবর্তে আযাব চাচ্ছো? তোমাদের কি এ ব্যাপারে কিছু জানা আছে যে, আল্লাহর আযাব যখন কোন জাতির ওপর নেমে আসে তখন তার দশাটা কী হয়?

এ সংগে এ বাক্যে মুসলমানদের জন্যও একটি সূক্ষ্ম সতর্কবাণী ছিল। মুসলমানরা কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন এবং তাদের হঠকারিতায় বিরক্ত ও ধৈর্যহারা হয়ে কখনো কখনো তাদের ওপর আযাব নাযিল হওয়ার দোয়া করতে থাকতো। অথচ এখনো এ কাফেরদের মধ্যে পরবর্তী পর্যায়ে ঈমান এনে সারা দুনিয়ায় ইসলামের ঝান্‌ডা বুলন্দ করার মতো বহু লোক ছিল। তাই মহান আল্লাহ বলেন, মানুষ বড়ই ধৈর্যহারা প্রমাণিত হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে যে জিনিসের প্রয়োজন অনুভূত হয় মানুষ তাই চেয়ে বসে। অথচ পরে অভিজ্ঞতায় সে নিজেই জানতে পারে যে, সে সময় যদি তার দোয়া কবুল হয়ে যেতো তাহলে তা তার জন্য কল্যাণকর হতো না।

১৩. এর অর্থ হচ্ছে, বিরোধ ও বৈষম্যের কারণে ঘাবড়ে গিয়ে সবকিছু সমান ও একাকার করে ফেলার জন্য অস্থির হয়ে পড়ো না। এ দুনিয়ার সমগ্র কারখানাটাই তো বিরোধ, বৈষম্য ও বৈচিত্রের ভিত্তিতে চলছে। এর সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে তোমাদের সামনে প্রতিদিন এ রাত ও দিনের যাওয়া আসা। দেখো, এদের এ বৈষম্য তোমাদের কত বড় উপকার করছে। যদি তোমরা চিরকাল রাত বা চিরকাল দিনের মধ্যে অবস্থান করতে তাহলে কি এ প্রাকৃতিক জগতের সমস্ত কাজ কারবার চলতে পারতো? কাজেই যেমন তোমরা দেখছো বস্তু জগতের মধ্যে পার্থক্য, বিরোধ ও বৈচিত্রের সাথে অসংখ্য উপকার ও কল্যাণ জড়িত রয়েছে অনুরূপভাবে মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি, চিন্তা-ভাবনা ও মেজাজ-প্রবণতার মধ্যে যে পার্থক্য ও বৈচিত্র পাওয়া যায় তাও বিরাট কল্যাণকর। মহান আল্লাহ তাঁর অতিপ্রাকৃত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এ পার্থক্য ও বৈষম্য খতম করে সমস্ত মানুষকে জোরপূর্বক মুমিন ও সৎ বানিয়ে দেবেন অথবা কাফের ও ফাসেকদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে দুনিয়ায় শুধুমাত্র মুমিন ও অনুগত বান্দাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবেন, এর মধ্যে কল্যাণ নেই। এ আশা পোষণ করা ঠিক ততটাই ভুল যতটা ভুল শুধুমাত্র সারাক্ষণ দিনের আলো ফুটে থাকার এবং রাতের আঁধার আদৌ বিস্তার লাভ না করার আশা পোষণ করা। তবে যে জিনিসের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে তা হচ্ছে এই যে, হেদায়াতের আলো যাদের কাছে আছে তারা তাকে নিয়ে গোমরাহীর অন্ধকার দূর করার জন্য অনবরত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকবে এবং যখন রাতের মতো কোন অন্ধকারের যুগ শুরু হয়ে যাবে তখন তারা সূর্যের মতো তার পিছু নেবে যতক্ষণ না উজ্জ্বল দিনের আলো ফুটে বের হয়।

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَٰٓئِرَهُۥ فِى عُنُقِهِۦ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ كِتَٰبًا يَلْقَىٰهُ
مَنشُورًا ﴿١٣﴾ ٱقْرَأْ كِتَٰبَكَ ۖ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾
مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

প্রত্যেক মানুষের ভালমন্দ কাজের নিদর্শন আমি তার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি[১৪] এবং কিয়ামতের দিন তার জন্য বের করবো একটি লিখন, যাকে সে খোলা কিতাবের আকারে পাবে:- পড়ো, নিজের আমলনামা, আজ নিজের হিসেব করার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।

যে ব্যক্তিই সৎপথ অবলম্বন করে, তার সৎপথ অবলম্বন তার নিজের জন্যই কল্যাণকর হয়। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়, তার পথভ্রষ্টতার ধ্বংসকারিতা তার ওপরই বর্তায়।[১৫] কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।[১৬] আর আমি (হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝাবার জন্য) একজন পয়গম্বর না পাঠিয়ে দেয়া পর্যন্ত কাউকে আযাব দেই না।[১৭]

১৪. অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য এবং তার পরিণতির ভাল ও মন্দের কারণগুলো তার আপন সত্তার মধ্যেই বিরাজিত রয়েছে। নিজের গুণাবলী, চরিত্র ও কর্মধারা এবং বাছাই ও নির্বাচন করার এবং সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে সে নিজেই নিজেকে সৌভাগ্যের অধিকারী করে আবার দুর্ভাগ্যেরও অধিকারী করে। নির্বোধ লোকেরা নিজেদের ভাগ্যের ভাল-মন্দের চিহ্নগুলো বাইরে খুঁজে বেড়ায় এবং তারা সব সময় বাইরের কার্যকারণকেই নিজেদের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী করে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তাদের ভাল-মন্দের পরোয়ানা তাদের নিজেদের গলায়ই লটকানো থাকে। নিজেদের কার্যক্রমের প্রতি নজর দিলে তারা পরিষ্কার দেখতে পাবে, যে জিনিসটি তাদেরকে বিকৃতি ও ধ্বংসের পথে এগিয়ে দিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছে, তা হচ্ছে তাদের নিজেদেরই অসৎ গুণাবলী ও অশুভ সিদ্ধান্ত। বাইর থেকে কোন জিনিস এসে জোর পূর্বক তাদের ওপর চেপে বসেনি।

১৫. অর্থাৎ সৎ ও সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন করে কোন ব্যক্তি আল্লাহ, রসূল বা সংশোধন প্রচেষ্টা পরিচালনাকারীদের প্রতি কোন অনুগ্রহ করে না বরং সে তার নিজেরই কল্যাণ করে। অনুরূপভাবে ভুল পথ অবলম্বন করে অথবা তার ওপর অনড় থেকে কোন ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করে না, নিজেরই ক্ষতি করে। আল্লাহ, রসূল ও সত্যের আহবায়কগণ মানুষকে ভুল পথ থেকে বাঁচাবার এবং সঠিক পথ দেখাবার জন্য যে প্রচেষ্টা চালান তা

নিজের কোন স্বার্থে নয় বরং মানবতার কল্যাণার্থেই চালান। বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাজ হচ্ছে, যুক্তি–প্রমাণের মাধ্যমে যখন তার সামনে সত্যের সত্য হওয়া এবং মিথ্যার মিথ্যা হওয়া সুস্পষ্ট করে দেয়া হয় তখন সে স্বার্থান্ধতা ও অন্ধ আত্মপ্রীতি পরিহার করে সোজা মিথ্যা থেকে সরে দাঁড়াবে এবং সত্যকে মেনে নেবে। অন্ধ আত্মপ্রীতি, হিংসা ও স্বার্থান্ধতার আশ্রয় নিলে সে নিজেই নিজের অশুভাকাংখী হবে।

১৬. এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সত্য। কুরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে এ সত্যটি বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ এটি না বুঝা পর্যন্ত মানুষের কার্যধারা কখনো সঠিক নিয়মে চলতে পারে না। এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তির একটি স্বতন্ত্র নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। নিজের ব্যক্তিগত পর্যায়ে আল্লাহর সামনে এ জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। এ ব্যক্তিগত দায়িত্বের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি তার সাথে শরীক নেই। দুনিয়ায় যতই বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ, বিপুল সংখ্যক জাতি, গোত্র ও বংশ একটি কাজে বা একটি কর্মপদ্ধতিতে শরীক হোক না কেন, আল্লাহর শেষ আদালতে তাদের এ সমন্বিত কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত দায়িত্ব আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হবে এবং তার যাকিছু শাস্তি বা পুরস্কার সে লাভ করবে তা হবে তার সেই কর্মের প্রতিদান, যা করার জন্য সে নিজে ব্যক্তিগত পর্যায়ে দায়ী বলে প্রমাণিত হবে। এ ইনসাফের তুলাদণ্ডে অন্যের অসৎকর্মের বোঝা একজনের ওপর এবং তার পাপের ভার অন্যের ওপর চাপিয়ে দেবার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। তাই একজন জ্ঞানী ব্যক্তির অন্যেরা কি করছে তা দেখা উচিত নয়। বরং তিনি নিজে কি করছেন সেদিকেই তাঁর সর্বক্ষণ দৃষ্টি থাকা উচিত। যদি তার মধ্যে নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্বের সঠিক অনুভূতি থাকে, তাহলে অন্যেরা যাই করুক না কেন সে নিজে সাফল্যের সাথে আল্লাহর সামনে যে কর্মধারার জবাবদিহি করতে পারবে তার ওপরই অবিচল থাকবে।

১৭. এটি আর একটি মৌলিক সত্য। কুরআন বারবার বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ সত্যটি মানুষের মনে গেঁথে দেবার চেষ্টা করেছে। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহর বিচার ব্যবস্থায় নবী এক অতীব মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী। নবী এবং তার নিয়ে আসা কর্মসূচীই বান্দার ওপর আল্লাহর দাবী প্রতিষ্ঠার অকাট্য প্রমাণ। এ প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না হলে বান্দাকে আযাব দেয়া হবে ইনসাফ বিরোধী। কারণ এ অবস্থায় সে এ ওজর পেশ করতে পারবে যে, তাকে তো জানানোই হয়নি কাজেই কিভাবে তাকে এ পাকড়াও করা হচ্ছে। কিন্তু এ প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর যারা আল্লাহর পাঠানো পয়গাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অথবা তাকে পাওয়ার পর আবার তা থেকে সরে এসেছে, তাদেরকে শাস্তি দেয়া ইনসাফের দাবী হয়ে দাঁড়াবে। নির্বোধরা এ ধরনের আয়াত পড়ে যাদের কাছে কোন নবীর পয়গাম পৌঁছেনি তাদের অবস্থান কোথায় হবে, এ প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকে। অথচ একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির চিন্তা করা উচিত, তার নিজের কাছে তো পয়গাম পৌঁছে গেছে, এখন তার অবস্থা কি হবে? আর অন্যের ব্যাপারে বলা যায়, কার কাছে, কবে, কিভাবে এবং কি পরিমাণ আল্লাহর পয়গাম পৌঁছেছে এবং সে তার সাথে কি আচরণ করেছে এবং কেন করেছে তা আল্লাহই ভাল জানেন। আলেমুল গায়েব ছাড়া কেউ বলতে পারেন না কার ওপর আল্লাহর প্রমাণ পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কার ওপর হয়নি।

وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ
عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَٰهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنۢ بَعْدِ
نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا ﴿١٧﴾ مَّن كَانَ
يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ ۖ
يَصْلَىٰهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿١٨﴾

যখন আমি কোন জনবসতিকে ধ্বংস করার সংকল্প করি তখন তার সমৃদ্ধিশালী লোকদেরকে নির্দেশ দিয়ে থাকি, ফলে তারা সেখানে নাফরমানী করতে থাকে আর তখন আযাবের ফায়সালা সেই জনবসতির ওপর বলবত হয়ে যায় এবং আমি তাকে ধ্বংস করে দেই।[১৮] দেখো, কত মানব গোষ্ঠী নূহের পরে আমার হুকুমে ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমার রব নিজের বান্দাদের গুনাহ সম্পর্কে পুরোপুরি জানেন এবং তিনি সবকিছু দেখছেন।

যে কেউ আশু লাভের[১৯] আকাংখা করে, তাকে আমি এখানেই যাকিছু দিতে চাই দিয়ে দেই, তারপর তার ভাগে জাহান্নাম লিখে দেই, যার উত্তাপ সে ভুগবে নিন্দিত ও ধিকৃত হয়ে।[২০]

১৮. এ আয়াতে 'নির্দেশ' মানে প্রকৃতিগত নির্দেশ ও প্রাকৃতিক বিধান। অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবে সবসময় এমনটিই হয়ে থাকে। যখন কোন জাতির ধ্বংস হবার সময় এসে যায়, তার সমৃদ্ধিশালী লোকেরা ফাসেক হয়ে যায়। আর ধ্বংস করার সংকল্প মানে এ নয় যে, আল্লাহ এমনিতেই বিনা কারণে কোন নিরপরাধ জনবসতি ধ্বংস করার সংকল্প করে নেন, বরং এর মানে হচ্ছে, যখন কোন জনবসতি অসৎকাজের পথে এগিয়ে যেতে থাকে এবং আল্লাহ তাকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন তখন এ সিদ্ধান্তের প্রকাশ এ পথেই হয়ে থাকে।

মূলত এ আয়াতে যে সত্যটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, একটি সমাজের সচ্ছল, সম্পদশালী ও উচ্চ শ্রেণীর লোকদের বিকৃতিই শেষ পর্যন্ত তাকে ধ্বংস করে। যখন কোন জাতির ধ্বংস আসার সময় হয় তখন তার ধনাঢ্য ও ক্ষমতাশালী লোকেরা ফাসেকী ও নৈতিকতা বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা জুলুম-নির্যাতন ও দুষ্কর্ম-ব্যভিচারে গা ভাসিয়ে দেয়। আর শেষ পর্যন্ত এ বিপর্যয়টি সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করে। কাজেই যে সমাজ নিজেই নিজের ধ্বংসকামী নয় তার ক্ষমতার লাগাম এবং

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ
سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ كُلًّا نُّمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا
كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾ انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ
وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾ لَّا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ
فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ﴿٢٢﴾

আর যে ব্যক্তি আখেরাতের প্রত্যাশী হয় এবং সে জন্য প্রচেষ্টা চালায়, যেমন সে জন্য প্রচেষ্টা চালানো উচিত এবং সে হয় মুমিন, এ ক্ষেত্রে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির প্রচেষ্টার যথোচিত মর্যাদা দেয়া হবে।[২১] এদেরকেও এবং ওদেরকেও, দু'দলকেই আমি (দুনিয়ায়) জীবন উপকরণ দিয়ে যাচ্ছি, এ হচ্ছে তোমার রবের দান এবং তোমার রবের দান রুখে দেবার কেউ নেই।[২২] কিন্তু দেখো, দুনিয়াতেই আমি একটি দলকে অন্য একটির ওপর কেমন শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে রেখেছি এবং আখেরাতে তার মর্যাদা আরো অনেক বেশী হবে এবং তার শ্রেষ্ঠত্বও আরো অধিক হবে।[২৩]

আল্লাহর সাথে দ্বিতীয় কাউকে মাবুদে পরিণত করো না।[২৪] অন্যথায় নিন্দিত ও অসহায়–বান্ধব হারা হয়ে পড়বে।

অর্থনৈতিক সম্পদের চাবিকাঠি যাতে নীচ ও হীনমনা এবং দুশ্চরিত্র ধনীদের হাতে চলে না যায় সেদিকে নজর রাখা উচিত।

১৯. আশু লাভের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, যে জিনিস দ্রুত পাওয়া যায়। কুরআন মজীদ একে পারিভাষিক অর্থে দুনিয়ার জন্য ব্যবহার করেছে, অর্থাৎ যার লাভ ও ফলাফল এ দুনিয়ার জীবনেই পাওয়া যায়। এর বিপরীতার্থক পরিভাষা হচ্ছে "আখেরাত", যার লাভ ও ফলাফল মৃত্যু পরবর্তী জীবন পর্যন্ত বিলম্বিত করা হয়েছে।

২০. এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি আখেরাতে বিশ্বাস করে না অথবা আখেরাত পর্যন্ত সবর করতে প্রস্তুত নয় এবং শুধুমাত্র দুনিয়া এবং দুনিয়াবী সাফল্য ও সমৃদ্ধিকেই নিজের যাবতীয় প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে, সে যা কিছু পাবে এ দুনিয়াতেই পাবে। আখেরাতে সে কিছুই পেতে পারে না। আর শুধু যে আখেরাতে সে সমৃদ্ধি লাভ করবে না, তা নয়। বরং দুনিয়ার বৈষয়িক স্বার্থপূজা ও আখেরাতে জবাবদিহির দায়িত্বের ব্যাপারে বেপরোয়া মনোভাব তার কর্মধারাকে মৌলিকভাবে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করবে, যার ফলে সে উল্টা জাহান্নামের অধিকারী হবে।

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۭ اِمَّا يَبْلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۝ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۝ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ
نُفُوْسِكُمْ ۭ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ۝

৩ রুকূ'

তোমার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন ঃ[২৫]

১) তোমরা কারোর ইবাদাত করো না, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করো।[২৬]

২) পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করো। যদি তোমাদের কাছে তাদের কোন একজন বা উভয় বৃদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহলে তাদেরকে "উহ্" পর্যন্তও বলো না এবং তাদেরকে ধমকের সুরে জবাব দিয়ো না বরং তাদের সাথে মর্যাদা সহকারে কথা বলো। আর দয়া ও কোমলতা সহকারে তাদের সামনে বিনম্র থাকো এবং দোয়া করতে থাকো এই বলে ঃ হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা দয়া, মায়া, মমতা সহকারে শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। তোমাদের রব খুব ভাল করেই জানেন তোমাদের মনে কি আছে। যদি তোমরা সৎকর্মশীল হয়ে জীবন যাপন করো, তাহলে তিনি এমন লোকদের প্রতি ক্ষমাশীল যারা নিজেদের ভুলের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে বন্দেগীর নীতি অবলম্বন করার দিকে ফিরে আসে।[২৭]

২১. অর্থাৎ তার কাজের কদর করা হবে। যেভাবে যতটুকুন প্রচেষ্টা সে আখেরাতের কামিয়াবীর জন্য করে থাকবে তার ফল সে অবশ্যই পাবে।

২২. অর্থাৎ দুনিয়ায় জীবিকা ও জীবন উপকরণ দুনিয়াদাররাও পাচ্ছে এবং আখেরাতের প্রত্যাশীরাও পাচ্ছে। এসব অন্য কেউ নয়, আল্লাহই দান করছেন। আখেরাতের প্রত্যাশীদেরকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা দুনিয়া পূজারীদের নেই এবং দুনিয়া পূজারীদের কাছে আল্লাহর নিয়ামত পৌছার পথে বাধা দেবার ক্ষমতা আখেরাত প্রত্যাশীদেরও নেই।

২৩. অর্থাৎ আখেরাত প্রত্যাশীরা যে দুনিয়া পূজারীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী দুনিয়াতেই এ পার্থক্যটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ পার্থক্য এ দৃষ্টিতে নয় যে, এদের

খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, গাড়ি-বাড়ি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ঠাটবাট ও জৌলুস ওদের চেয়ে বেশী। বরং পার্থক্যটা এখানে যে, এরা যাকিছু পায় সততা, বিশ্বস্ততা ও ঈমানদারীর সাথে পায় আর ওরা যাকিছু লাভ করে জুলুম, নিপীড়ন, ধোঁকা, বেঈমানী এবং নানান হারাম পথ অবলম্বনের কারণে লাভ করে। তার ওপর আবার এরা যাকিছু পায় ভারসাম্যের সাথে খরচ হয়। এ থেকে হকদারদের হক আদায় হয়। এ থেকে বঞ্চিত ও প্রার্থীদের অংশও দেয়া হয়। আবার এ থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে অন্যান্য সৎ-কাজেও অর্থ ব্যয় করা হয়। পক্ষান্তরে দুনিয়া পূজারীরা যাকিছু পায় তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিলাসিতা, বিভিন্ন হারাম এবং নানান ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজে দু' হাতে ব্যয় করা হয়ে থাকে। এভাবে সব দিক দিয়েই আখেরাত প্রত্যাশীদের জীবন আল্লাহভীতি ও পরিচ্ছন্ন নৈতিকতার এমন আদর্শ হয়ে থাকে, যা তালি দেয়া কাপড়ে এবং ঘাস ও খড়ের তৈরী কুঁড়ে ঘরেও এমনই ঔজ্জ্বল্য বিকীরণ করে, যার ফলে এর মোকাবিলায় প্রত্যেক চক্ষুষ্মানের দৃষ্টিতে দুনিয়া পূজারীদের জীবন অন্ধকার মনে হয়। এ কারণেই বড় বড় পরাক্রমশালী বাদশাহ ও ধনাঢ্য আমীরদের জন্যও তাদের সমগোত্রীয় জনগণের হৃদয়ে কখনো নিখাদ ও সাচ্চা মর্যাদাবোধ এবং ভালবাসা ও ভক্তির ভাব জাগেনি। অথচ এর বিপরীতে অভুক্ত, অনাহারী ছিন্ন বস্ত্রধারী, খেজুর পাতার তৈরী কুঁড়ে ঘরের অধিবাসী আল্লাহ ভীরু মর্দে দরবেশের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে দুনিয়া পূজারীরা নিজেরাই বাধ্য হয়েছে। আখেরাতের চিরস্থায়ী সাফল্য এ দু' দলের মধ্যে কার ভাগে আসবে এ সুস্পষ্ট আলামতগুলো সেই সত্যটির প্রতি পরিষ্কার ইংগিত করছে।

২৪. এ বাক্যাংশটির অন্য একটি অনুবাদ এভাবে করা যেতে পারে আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ তৈরী করে নিয়ো না অথবা অন্য কাউকে ইলাহ গণ্য করো না।

২৫. এখানে এমন সব বড় বড় মূলনীতি পেশ করা হয়েছে যার ওপর ভিত্তি করে ইসলাম মানুষের সমগ্র জীবন ব্যবস্থার ইমারত গড়ে তুলতে চায়। একে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আন্দোলনের ঘোষণাপত্র বলা যায়। মক্কী যুগের শেষে এবং আসন্ন মাদানী যুগের প্রারম্ভ লগ্নে এ ঘোষণাপত্র পেশ করা হয়। এভাবে এ নতুন ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের বুনিয়াদ কোন্ ধরনের চিন্তামূলক, নৈতিক, তামাদ্দুনিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত মূলনীতির ওপর রাখা হবে তা সারা দুনিয়ার মানুষ জানতে পারবে। এ প্রসংগে সূরা আন'আমের ১৯ রুকূ' এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট টীকার ওপরও একবার চোখ বুলিয়ে নিলে ভাল হয়।

২৬. এর অর্থ কেবল এতটুকুই নয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো পূজা-উপাসনা করো না বরং এ সংগে এর অর্থ হচ্ছে, বন্দেগী, গোলামী ও দ্বিধাহীন আনুগত্য একমাত্র আল্লাহরই করতে হবে। একমাত্র তাঁরই হুকুমকে হুকুম এবং তাঁরই আইনকে আইন বলে মেনে নাও এবং তাঁর ছাড়া আর কারো সার্বভৌম কর্তৃত্ব স্বীকার করো না। এটি কেবলমাত্র একটি ধর্ম বিশ্বাস এবং ব্যক্তিগত কর্মধারার জন্য একটি পথনির্দেশনাই নয় বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা তাইয়েবায় পৌঁছে কার্যত যে রাজনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও নৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন এটি হচ্ছে সেই সমগ্র ব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তরও। এ ইমারতের বুনিয়াদ রাখা হয়েছিল এ মতাদর্শের ভিত্তিতে যে, মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহই সমগ্র বিশ্বলোকের মালিক ও বাদশাহ এবং তাঁরই শরীয়াত এ রাজ্যের আইন।

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾
اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۭ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ
كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾ وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاۗءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا
فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ﴿٢٨﴾

৩) আত্মীয়কে তার অধিকার দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও তাদের অধিকার দাও।

৪) বাজে খরচ করো না। যারা বাজে খরচ করে তারা শয়তানের ভাই আর শয়তান তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

৫) যদি তাদের থেকে (অর্থাৎ অভাবী, আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও মুসাফির) তোমাকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় এ জন্য যে, এখনো তুমি আল্লাহর প্রত্যাশিত রহমতের সন্ধান করে ফিরছো, তাহলে তাদেরকে নরম জবাব দাও।[২৮]

২৭. এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহর পরে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হক ও অগ্রাধিকার হচ্ছে পিতামাতার। সন্তানকে পিতামাতার অনুগত, সেবা পরায়ণ ও মর্যাদাবোধ সম্পন্ন হতে হবে। সমাজের সামষ্টিক নৈতিক বৃত্তি এমন পর্যায়ের হতে হবে, যার ফলে সন্তানরা বাপমায়ের মুখাপেক্ষীহীন হয়ে পড়বে না, বরং তারা নিজেদেরকে বাপমায়ের অনুগৃহীত মনে করবে এবং বুড়ো বয়সে তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে বাপমায়ের খিদমত করা শেখাবে যেমনিভাবে বাপমা শিশুকালে তাদের পরিচর্যা ও লালন পালন এবং মান-অভিমান বরদাশ্‌ত করে এসেছে। এ আয়াতটিও নিছক একটি নৈতিক সুপারিশ নয় বরং এরি ভিত্তিতে পরবর্তী পর্যায়ে বাপমায়ের জন্য এমনসব শরয়ী অধিকার ও ক্ষমতা নির্ধারণ করা হয়েছে যেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ আমরা হাদীসে ও ফিকাহর কিতাবগুলোতে পাই। তাছাড়া ইসলামী সমাজের মানসিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং মুসলমানদের সাংস্কৃতিক শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে বাপমায়ের প্রতি আচরণ ও আনুগত্য এবং তাদের অধিকারের রক্ষণাবেক্ষণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে অন্তরভুক্ত করা হয়েছে। এ জিনিসগুলো চিরকালের জন্য এ নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্র নিজের আইন কানুন, ব্যবস্থাপনামূলক বিধান ও শিক্ষানীতির মাধ্যমে পরিবার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী ও সংরক্ষিত করার চেষ্টা করবে, দুর্বল করবে না।

২৮. এ তিনটি ধারার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ নিজের উপার্জন ও ধন-দৌলত শুধুমাত্র নিজের জন্যই নির্ধারিত করে নেবে না বরং ন্যায়সংগতভাবে ও ভারসাম্য সহকারে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার পর নিজের আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও অন্যান্য অভাবী লোকদের

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ
فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ
إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾

৬) নিজের হাত গলায় বেঁধে রেখো না এবং তাকে একেবারে খোলাও ছেড়ে দিয়ো না, তাহলে তুমি নিন্দিত ও অক্ষম হয়ে যাবে।[২৯] তোমার রব যার জন্য চান রিযিক প্রশস্ত করে দেন আবার যার জন্য চান সংকীর্ণ করে দেন। তিনি নিজের বান্দাদের অবস্থা জানেন এবং তাদেরকে দেখছেন।[৩০]

অধিকারও আদায় করবে। সমাজ জীবনে সাহায্য-সহযোগিতা, সহানুভূতি এবং অন্যের অধিকার জানা ও তা আদায় করার প্রবণতা সক্রিয় ও সঞ্চারিত থাকবে। প্রত্যেক আত্মীয় অন্য আত্মীয়ের সাহায্যকারী এবং প্রত্যেক সমর্থ ব্যক্তি নিজের আশপাশের অভাবী মানুষদের সাহায্যকারী হবে। একজন মুসাফির যে জনপদেই যাবে নিজেকে অতিথি বৎসল লোকদের মধ্যেই দেখতে পাবে। সমাজে অধিকারের ধারণা এত বেশী ব্যাপক হবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যাদের মধ্যে অবস্থান করে নিজের ব্যক্তি-সত্তা ও ধন-সম্পদের ওপর তাদের সবার অধিকার অনুভব করবে। তাদের খিদমত করার সময় এ ধারণা নিয়েই খিদমত করবে যে, সে তাদের অধিকার আদায় করছে, তাদেরকে অনুগ্রহ পাশে আবদ্ধ করছে না। কারোর খিদমত করতে অক্ষম হলে তার কাছে ক্ষমা চাইবে এবং আল্লাহর বান্দাদের খিদমত করার যোগ্যতা লাভ করার জন্য আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে।

ইসলামের ঘোষণাপত্রের এ ধারাগুলোও শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নৈতিকতার শিক্ষাই ছিল না বরং পরবর্তী সময়ে মদীনা তাইয়েবার সমাজে ও রাষ্ট্রে এগুলোর ভিত্তিতেই ওয়াজিব ও নফল সাদ্‌কার বিধানসমূহ প্রদত্ত হয়, অসিয়ত, মীরাস ও ওয়াকফের পদ্ধতি নির্ধারিত হয়, এতিমের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, প্রত্যেক জনবসতির ওপর মুসাফিরের কমপক্ষে তিনদিন পর্যন্ত মেহমানদারী করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং এ সংগে সমাজের নৈতিক ব্যবস্থা কার্যত এমন পর্যায়ে উন্নীত করা হয় যার ফলে সমগ্র সামাজিক পরিবেশে দানশীলতা, সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব সঞ্চারিত হয়ে যায়। এমনকি লোকরা স্বতস্ফূর্তভাবে আইনগত অধিকারসমূহ দেয়া ছাড়াও আইনের জোরে যেসব নৈতিক অধিকার চাওয়া ও প্রদান করা যায় না সেগুলোও উপলব্ধি ও আদায় করতে থাকে।

২৯. "হাত বাঁধা" একটি রূপককথা। কৃপণতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর "হাত খোলা ছেড়ে দেয়া'র মানে হচ্ছে, বাজে খরচ করা। ৪র্থ ধারার সাথে ৬ষ্ঠ ধারাটির এ বাক্যোংশটি মিলিয়ে পড়লে এর পরিষ্কার অর্থ এই মনে হয় যে, লোকদের মধ্যে এতটুকু ভারসাম্য হতে হবে যাতে তারা কৃপণ হয়ে অর্থের আবর্তন রুখে দেয় এবং অপব্যয়ী

হয়ে নিজের অর্থনৈতিক শক্তি ধ্বংস না করে ফেলে। এর বিপরীত পক্ষে তাদের মধ্যে ভারসাম্যের এমন সঠিক অনুভূতি থাকতে হবে যার ফলে তারা যথার্থ ব্যয় থেকে বিরত হবে না আবার অযথা ব্যয়জনিত ক্ষতিরও শিকার হবে না। অহংকার ও প্রদর্শনেচ্ছামূলক এবং লোক দেখানো খরচ, বিলাসিতা, ফাসেকী ও অশ্লীল কাজে ব্যয় এবং এমন যাবতীয় ব্যয় যা মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনেও কল্যাণমূলক কাজে লাগার পরিবর্তে ধন-সম্পদ ভুল পথে নিয়োজিত করে, তা আসলে আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা এভাবে নিজেদের ধন-দৌলত খরচ করে তারা শয়তানের ভাই।

এ ধারাগুলোও নিছক নৈতিক শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত হেদায়াত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। বরং এদিকে পরিষ্কার ইংগিত করছে যে, একটি সৎ ও সত্যনিষ্ঠ সমাজকে নৈতিক অনুশীলন, সামষ্টিক চাপ প্রয়োগ ও আইনগত বাধা-নিষেধ আরোপের মাধ্যমে অযথা অর্থ ব্যয় থেকে বিরত রাখা উচিত। এ কারণেই পরবর্তীকালে মদীনা রাষ্ট্রে বিভিন্ন কার্যকর পদ্ধতিতে এ উভয় ধারা নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করা হয়। প্রথমত অপব্যয় ও বিলাসিতার বহু নীতি প্রথাকে আইনগতভাবে হারাম করা হয়। দ্বিতীয়ত পরোক্ষভাবে আইনগত কৌশল অবলম্বন করে অযথা অর্থব্যয়ের পথ বন্ধ করা হয়। তৃতীয়ত সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে এমন বহু রসম-রেওয়াজের বিলোপ সাধন করা হয় যেগুলোতে অপব্যয় করা হতো। তারপর রাষ্ট্রকে বিশেষ ক্ষমতা বলে এবং বিশেষ ব্যবস্থাপনা বিধান জারী করে সুস্পষ্ট অপব্যয়ের ক্ষেত্রে বাধা দেয়ার ইখতিয়ার দেয়া হয়। এভাবে যাকাত ও সাদকার বিধানের মাধ্যমে কৃপণতার শক্তিকে গুঁড়িয়ে দেয়া হয় এবং লোকেরা সম্পদ পুঞ্জীভূত করে অর্থের আবর্তনের পথ বন্ধ করে দেবে এ সম্ভাবনাও নির্মূল করে দেয়া হয়। এসব কৌশল অবলম্বন করার সাথে সাথে সমাজে এমন একটি সাধারণ জনমত সৃষ্টি করা হয়, যা দানশীলতা ও অপব্যয়ের মধ্যকার পার্থক্য সঠিকভাবে জানতো এবং কৃপণতা ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যয়ের মধ্যে ভালভাবেই ফারাক করতে পারতো। এ জনমত কৃপণদেরকে লাঞ্ছিত করে, ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষাকারীদেরকে মর্যাদাশালী করে, অপব্যয়কারীদের নিন্দা করে এবং দানশীলদেরকে সমগ্র সমাজের খোশ্‌বুদার ফুল হিসেবে কদর করে। সে সময়ের নৈতিক ও মানসিক প্রশিক্ষণের প্রভাব আজো মুসলিম সমাজে রয়েছে। আজো দুনিয়ার সব দেশেই মুসলমানরা কৃপণ ও সম্পদ পুঞ্জীভূতকারীদেরকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে এবং দানশীলরা আজো তাদের চোখে সম্মানার্হ ও মর্যাদা সম্পন্ন।

৩০. অর্থাৎ মহান আল্লাহ নিজের বান্দাদের মধ্যে রিযিক কমবেশী করার ক্ষেত্রে যে পার্থক্য রেখেছেন তার উপযোগিতা বুঝা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই রিযিক বন্টনের যে প্রাকৃতিক ব্যবস্থা রয়েছে কৃত্রিম মানবিক কৌশলের মাধ্যমে তার মধ্যে হস্তক্ষেপ না করা উচিত। প্রাকৃতিক অসাম্যকে কৃত্রিম সাম্যে পরিবর্তিত করা অথবা এ অসাম্যকে প্রাকৃতিক সীমার চৌহদ্দী পার করিয়ে বেইনসাফীর সীমানায় পৌঁছিয়ে দেয়া উভয়টিই সমান ভুল। একটি সঠিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবস্থান আল্লাহ নির্ধারিত রিযিক বন্টন পদ্ধতির নিকটতরই হয়ে থাকে।

এ বাক্যে প্রাকৃতিক আইনের যে নিয়মটির দিকে পথনির্দেশ করা হয়েছিল তার কারণে মদীনার সংস্কার কর্মসূচীতে এ ধারণাটি আদতে কোন ঠাঁই করে নিতে পারেনি যে, রিযিক ও রিযিকের উপায়-উপকরণগুলোর মধ্যে পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব আসলে এমন কোন

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ۭ
اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ۝٣١ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۭ
وَسَاۗءَ سَبِيْلًا ۝٣٢

৪ রুকূ'

৭) *দারিদ্রের আশংকায় নিজেদের সন্তান হত্যা করো না। আমি তাদেরকেও রিযিক দেবো এবং তোমাদেরকেও। আসলে তাদেরকে হত্যা করা একটি মহাপাপ।*[৩১]

৮) *যিনার কাছেও যেয়ো না, ওটা অত্যন্ত খারাপ কাজ এবং খুবই জঘন্য পথ।*[৩২]

অকল্যাণকর বিষয় নয়, যাকে বিলুপ্ত করা এবং একটি শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করা কোন পর্যায়ে কাংখিত হতে পারে। পক্ষান্তরে সৎকর্মশীলতা ও সদাচারের ভিত্তিতে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ কায়েম করার জন্য মদীনা তাইয়েবায় এক বিশেষ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। সে কর্মপদ্ধতি ছিল এই যে, আল্লাহর প্রকৃতি মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য করে রেখেছে তাকে আসল প্রাকৃতিক অবস্থায় অপরিবর্তিত রাখতে হবে এবং ওপরে প্রদত্ত পথনির্দেশনা অনুযায়ী সমাজের নৈতিকতা, আচার–আচরণ ও কর্মবিধানসমূহ এমনভাবে সংশোধন করে দিতে হবে, যার ফলে জীবিকার পার্থক্য ও ব্যবধান কোন জুলুম ও বেইনসাফির বাহনে পরিণত হবার পরিবর্তে এমন অসংখ্য নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও তামাদ্দুনিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধির বাহনে পরিণত হবে, যে জন্য মূলত বিশ্বজাহানের স্রষ্টা তাঁর বান্দাদের মধ্যে এ পার্থক্য ও ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছেন।

৩১. যেসব অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যুগে যুগে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন আন্দোলন দানা বেঁধেছে, এ আয়াতটি তার ভিত পুরোপুরি ধ্বসিয়ে দিয়েছে। প্রাচীন যুগে দারিদ্র্য ভীতি শিশু হত্যা ও গর্ভপাতের কারণ হতো। আর আজ তা দুনিয়াবাসীকে তৃতীয় আর একটি কৌশল অর্থাৎ গর্ভনিরোধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু ইসলামের ঘোষণাপত্রের এ ধারাটি তাকে অন্নগ্রহণকারীদের সংখ্যা কমাবার ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা ত্যাগ করে এমনসব গঠনমূলক কাজে নিজের শক্তি ও যোগ্যতা নিয়োগ করার নির্দেশ দিচ্ছে যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী রিযিক বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এ ধারাটির দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উপায়–উপকরণের স্বল্পতার আশংকায় মানুষের বারবার সন্তান উৎপাদনের সিলসিলা বন্ধ করে দিতে উদ্যত হওয়া তার বৃহত্তম ভুলগুলোর অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ ধারাটি মানুষকে এ বলে সাবধান করে দিচ্ছে যে, রিযিক পৌছাবার ব্যবস্থাপনা তোমার আয়ত্বাধীন নয় বরং এটি এমন এক আল্লাহর আয়ত্বাধীন যিনি তোমাকে এ যমীনে আবাদ করেছেন। পূর্বে আগমনকারীদেরকে

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

৯) আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করে দিয়েছেন,[৩৩] সত্য ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না।[৩৪] আর যে ব্যক্তি মজলুম অবস্থায় নিহত হয়েছে তার অভিভাবককে আমি কিসাস দাবী করার অধিকার দান করেছি।[৩৫] কাজেই হত্যার ব্যাপারে তার সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়,[৩৬] তাকে সাহায্য করা হবে।[৩৭]

তিনি যেভাবে রুজি দিয়ে এসেছেন তেমনিভাবে তোমাদেরকেও দেবেন। ইতিহাসের অভিজ্ঞতাও একথাই বলে, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি হতে থেকেছে ঠিক সেই পরিমাণে বরং বহুসময় তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে অর্থনৈতিক উপায় উপকরণ বেড়ে গিয়েছে। কাজেই আল্লাহর সৃষ্টি ব্যবস্থাপনায় মানুষের অযথা হস্তক্ষেপ নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ শিক্ষার ফলেই কুরআন নাযিলের যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন যুগে মুসলমানদের মধ্যে জন্ম শাসনের কোন ব্যাপক ভাবধারা জন্ম লাভ করতে পারেনি।

৩২. "যিনার কাছেও যেয়ো না" এ হুকুম ব্যক্তির জন্য এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র সমাজের জন্যও। ব্যক্তির জন্য এ হুকুমের মানে হচ্ছে, সে নিছক যিনার কাজ থেকে দূরে থেকেই ক্ষান্ত হবে না বরং এ পথের দিকে টেনে নিয়ে যায় যিনার এমন সব সূচনাকারী এবং প্রাথমিক উদ্যোগ ও আকর্ষণ সৃষ্টিকারী বিষয় থেকেও দূরে থাকবে। আর সমাজের ব্যাপারে বলা যায়, এ হুকুমের প্রেক্ষিতে সমাজ জীবনে যিনা, যিনার উদ্যোগ–আকর্ষণ এবং তার কারণসমূহের পথ বন্ধ করে দেয়া সমাজের জন্য ফরয হয়ে যাবে। এ উদ্দেশ্যে সে আইন প্রণয়ন, শিক্ষা ও অনুশীলন দান, সামাজিক পরিবেশের সংস্কার সাধন, সমাজ জীবনের যথাযোগ্য বিন্যাস এবং অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

এ ধারাটি শেষ পর্যন্ত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একটি বৃহত্তম অধ্যায়ের বুনিয়াদে পরিণত হয়। এর অভিপ্রায় অনুযায়ী যিনা ও যিনার অপবাদকে ফৌজদারী অপরাধ গণ্য করা হয়। পর্দার বিধান জারী করা হয়। অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার প্রচার কঠোরভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়। মদ্যপান, নাচ, গান ও ছবির (যা যিনার নিকটতম আত্মীয়) ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। আর এ সংগে এমন একটি দাম্পত্য আইন প্রণয়ন করা হয় যার ফলে বিবাহ সহজ হয়ে যায় এবং যিনার সামাজিক কারণসমূহের শিকড় কেটে যায়।

৩৩. "যাকে হত্যা" মানে কেবলমাত্র অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করাই নয়, নিজেকে হত্যা করাও এর অন্তরভুক্ত। কারণ মানুষকে মহান আল্লাহ মর্যাদা সম্পন্ন করেছেন। অন্যের

প্রাণের সাথে সাথে মানুষের নিজের প্রাণও এ সংজ্ঞার অন্তরভুক্ত। কাজেই মানুষ হত্যা যত বড় গুনাহ ও অপরাধ, আত্মহত্যা করাও ঠিক তত বড় অপরাধ ও গুনাহ। মানুষ নিজেকে নিজের প্রাণের মালিক এবং এ মালিকানাকে নিজ ক্ষমতায় খতম করে দেবার অধিকার রাখে বলে মনে করে, এটা তার একটা বিরাট ভুল ধারণা। অথচ তার এ প্রাণ আল্লাহর মালিকানাধীন এবং সে একে খতম করে দেয়া তো দূরের কথা একে কোন অনুপযোগী কাজে ব্যবহার করার অধিকারও রাখে না। দুনিয়ার এ পরীক্ষাগৃহে আল্লাহ যেভাবেই আমাদের পরীক্ষা নেন না কেন, পরীক্ষার অবস্থা ভাল হোক বা মন্দ হোক, সেভাবেই শেষ সময় পর্যন্ত আমাদের পরীক্ষা দিতে থাকা উচিত। আল্লাহর দেয়া সময়কে ইচ্ছা করে খতম করে দিয়ে পরীক্ষাগৃহ থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করা একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার এ পালিয়ে যাবার কাজটিও এমন এক অপরাধের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যাকে আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষায় হারাম গণ্য করেছেন, এটা তো কোনক্রমেই গ্রহণীয় হতে পারে না। অন্য কথায় বলা যায়, দুনিয়ার ছোট ছোট কষ্ট, লাঞ্ছনা ও অপমানের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মানুষ বৃহত্তর ও চিরন্তন কষ্ট ও লাঞ্ছনার দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।

৩৪. পরবর্তীকালে ইসলামী আইন 'সত্য সহকারে হত্যা'কে শুধুমাত্র পাঁচটি ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়। এক, জেনে বুঝে হত্যাকারী থেকে কিসাস নেয়া। দুই, আল্লাহর সত্যদীনের পথে বাধাদানকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। তিন, ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা উৎখাত করার প্রচেষ্টাকারীদের শাস্তি দেয়া, চার, বিবাহিত পুরুষ ও নারীকে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার শাস্তি দেয়া। পাঁচ, মুরতাদকে শাস্তি দেয়া। শুধুমাত্র এ পাঁচটি ক্ষেত্রে মানুষের প্রাণের মর্যাদা তিরোহিত হয় এবং তাকে হত্যা করা বৈধ গণ্য হয়।

৩৫. মূল শব্দ হচ্ছে, "তার অভিভাবককে আমি সুলতান দান করেছি।" এখানে সুলতান অর্থ হচ্ছে "প্রমাণ" যার ভিত্তিতে সে কিসাস দাবী করতে পারে। এ থেকে ইসলামী আইনের এ মূলনীতি বের হয় যে, হত্যা মোকদ্দমার আসল বাদী সরকার নয়। বরং নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণই এর মূল বাদীপক্ষ। তারা হত্যাকারীকে মাফ করে দিতে এবং কিসাসের পরিবর্তে রক্তপণ গ্রহণ করতে সম্মত হতে পারে।

৩৬. হত্যার ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সীমা অতিক্রম করা যেতে পারে। এগুলো সবই নিষিদ্ধ। যেমন প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে উন্মত্তের মতো অপরাধী ছাড়া অন্যদেরকেও হত্যা করা। অথবা অপরাধীকে কষ্ট দিয়ে দিয়ে মেরে ফেলা। কিংবা মেরে ফেলার পর তার লাশের ওপর মনের ঝাল মেটানো। অথবা রক্তপণ নেবার পর আবার তাকে হত্যা করা ইত্যাদি।

৩৭. যেহেতু সে সময় পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তাই কে তাকে সাহায্য করবে, একথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। পরে যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন ফায়সালা করে দেয়া হয় যে, তাকে সাহায্য করা তার গোত্র বা সহযোগী বন্ধু দলের কাজ নয় বরং এটা হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র এবং তার বিচার ব্যবস্থার কাজ। কোন ব্যক্তি বা দল নিজস্বভাবে হত্যার প্রতিশোধ নেবার অধিকার রাখে না। বরং এটা ইসলামী সরকারের দায়িত্ব। ন্যায় বিচার লাভ করার জন্য তার কাছে সাহায্য চাওয়া হবে।

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ
اَشُدَّهٗ ۚ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ﴿٣٤﴾
وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۚ ذٰلِكَ
خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٣٥﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۚ اِنَّ السَّمْعَ
وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ﴿٣٦﴾ وَلَا تَمْشِ
فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿٣٧﴾

১০। এতীমের সম্পত্তির ধারে কাছে যেয়ো না, তবে হ্যাঁ সদুপায়ে, যে পর্যন্ত না সে বয়োপ্রাপ্ত হয়ে যায়।[৩৮]

১১। প্রতিশ্রুতি পালন করো, অবশ্যই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।[৩৯]

১২। মেপে দেবার সময় পরিমাপ পাত্র ভরে দাও এবং ওজন করে দেবার সময় সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো।[৪০] *এটিই ভাল পদ্ধতি এবং পরিণামের দিক দিয়েও এটিই উত্তম।*[৪১]

১৩। এমন কোন জিনিসের পেছনে লেগে যেয়ো না যে সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই। নিশ্চিতভাবেই চোখ, কান ও দিল্ সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[৪২]

১৪। যমীনে দম্ভভরে চলো না। তুমি না যমীনকে চিরে ফেলতে পারবে, না পাহাড়ের উচ্চতায় পৌঁছে যেতে পারবে। ৪৩

৩৮. এটিও নিছক একটি নৈতিক নির্দেশনামা ছিল না। বরং পরবর্তীকালে যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এতিমদের অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য প্রশাসনিক ও আইনগত উভয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা হাদীস ও ফিকাহর কিতাবগুলোতে পাই। তারপর এখান থেকে এ ব্যাপক ভিত্তিক মূলনীতি গ্রহণ করা হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের যেসব নাগরিক নিজেরা তাদের নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা রাখে না রাষ্ট্রই তাদের স্বার্থের সংরক্ষক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : اَنَا وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهٗ (যার কোন অভিভাবক নেই আমিই তার অভিভাবক) এ হাদীসটি এদিকেই ইংগিত করে এবং এ ইসলামী আইন একটি বিস্তৃত অধ্যায়ের ভূমিকা রচনা করে।

৩৯. এটিও নিছক ব্যক্তিগত নৈতিকতারই একটি ধারা ছিল না। বরং যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন একেই সমগ্র জাতির আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রাজনীতর ভিত্তি প্রস্তর গণ্য করা হয়।

৪০. এ নির্দেশটাও নিছক ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক লেনদেন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর হাট, বাজার ও দোকানগুলোতে মাপজোক ও দাঁড়িপাল্লাগুলো তত্বাবধান করা এবং শক্তি প্রয়োগ করে ওজনে ও মাপে কম দেয়া বন্ধ করা রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। তারপর এখান থেকেই এ ব্যাপক মূলনীতি গৃহীত হয় যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সব রকমের বেঈমানী ও অধিকার হরণের পথ রোধ করা সরকারের দায়িত্বের অন্তরভুক্ত।

৪১. অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই। দুনিয়ায় এর শুভ পরিণামের কারণ হচ্ছে এই যে, এর ফলে পারস্পরিক আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতা দু'জন দু'জনের ওপর ভরসা করে, এর ফলে ব্যবসায়ে উন্নতি আসে এবং ব্যাপক সমৃদ্ধি দেখা দেয়। অন্যদিকে আখেরাতে এর শুভ পরিণাম পুরোপুরি নির্ভর করে ঈমান ও আল্লাহ ভীতির ওপর।

৪২. এ ধারাটির অর্থ হচ্ছে, লোকেরা নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ধারণা ও অনুমানের পরিবর্তে "জ্ঞানের" পেছনে চলবে। ইসলামী সমাজে এ ধারাটির প্রয়োগ ব্যাপকভাবে নৈতিক ব্যবস্থায়, আইনে, রাজনীতিতে, দেশ শাসনে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যায় এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় তথা জীবনের সকল বিভাগে সুষ্ঠুভাবে করা হয়েছে। জ্ঞানের পরিবর্তে অনুমানের পেছনে চলার কারণে মানুষের জীবনে যে অসংখ্য দুষ্ট মতের সৃষ্টি হয় তা থেকে চিন্তা ও কর্মকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। নৈতিকতার ক্ষেত্রে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কুধারণা থেকে দূরে থাকো এবং কোন ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অনুসন্ধান ছাড়াই কোন দোষারোপ করো না। আইনের ক্ষেত্রে এ মর্মে একটি স্থায়ী মূলনীতিই স্থির করে দেয়া হয়েছে যে, নিছক সন্দেহ বশত কারোর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে নীতি নির্দেশ করা হয়েছে যে, অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে গ্রেফতার, মারধর বা জেলে আটক করা সম্পূর্ণ অবৈধ। বিজাতিদের সাথে আচার আচরণের ক্ষেত্রে এ নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে যে, অনুসন্ধান ছাড়া কারোর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না এবং নিছক সন্দেহের ভিত্তিতে কোন গুজব ছড়ানোও যাবে না। শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও যেসব তথাকথিত জ্ঞান নিছক আন্দাজ-অনুমান এবং দীর্ঘসূত্রীতাময় ধারণা ও কল্পনা নির্ভর, সেগুলোকেও অপছন্দ করা হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ধারণা, কল্পনা ও কুসংস্কারের মূল উপড়ে ফেলা হয়েছে এবং ঈমানদারদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহ ও রসূল প্রদত্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রমাণিত বিষয় মেনে নেবার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

৪৩. এর মানে হচ্ছে, ক্ষমতাগর্বী ও অহংকারীদের মতো আচরণ করো না। এ নির্দেশটিও ব্যক্তিগত কর্মপদ্ধতি ও জাতীয় আচরণ উভয়ের ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য। এ নির্দেশের বদৌলতেই এ ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে মদীনা তাইয়েবায় যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তার শাসকবৃন্দ, গবর্নর ও সিপাহসালারদের জীবনে ক্ষমতাগর্ব ও অহংকারের

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ﴿٣٨﴾ ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ
رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ
مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿٣٩﴾ اَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ
اِنَاثًا ۗ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ﴿٤٠﴾

এ বিষয়গুলোর মধ্য থেকে প্রত্যেকটির খারাপ দিক তোমার রবের কাছে অপছন্দনীয়।[৪৪] তোমার রব তোমাকে অহীর মাধ্যমে যে হিকমতের কথাগুলো বলেছেন এগুলো তার অন্তরভুক্ত।

আর দেখো, আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবুদ স্থির করে নিয়ো না, অন্যথায় তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে নিন্দিত এবং সব রকমের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত অবস্থায়।[৪৫]—কেমন অদ্ভুত কথা, তোমাদের রব তোমাদের পুত্র সন্তান দিয়ে অনুগৃহীত করেছেন এবং নিজের জন্য ফেরেশ্‌তাদেরকে কন্যা সন্তান বানিয়ে নিয়েছেন?[৪৬] এটা ভয়ানক মিথ্যা কথা, যা তোমরা নিজেদের মুখে উচ্চারণ করছো।

ছিটেফোটাও ছিল না। এমনকি যুদ্ধরত অবস্থায়ও কখনো তাদের মুখ থেকে দম্ভ ও অহংকারের কোন কথাই বের হতো না। তাদের ওঠা বসা, চাল চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি, সওয়ারী ও সাধারণ আচার-আচরণে নম্রতা ও কোমলতা বরং ফকিরী ও দরবেশীর ছাপ স্পষ্ট দেখা যেতো। যখন তারা বিজয়ীর বেশে কোন শহরে প্রবেশ করতেন তখনও দর্প ও অহংকার সহকারে নিজেদের ভীতি মানুষের মনে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন না।

৪৪. অর্থাৎ এগুলোর মধ্য থেকে যেগুলোই নিষিদ্ধ সেগুলো করা আল্লাহ অপছন্দ করেন। অথবা অন্য কথায় বলা যায়, আল্লাহর যে কোন হুকুম অমান্য করা অপছন্দনীয় কাজ।

৪৫. আপাতদৃষ্টে এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের অবস্থায় মহান আল্লাহ নিজের নবীকে সম্বোধন করে যে কথা বলেন তা আসলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলা হয়।

৪৬. ব্যাখ্যার জন্য সূরা নাহ্‌লের ৫৭ থেকে ৫৯ পর্যন্ত আয়াতগুলো টীকাসহকারে দেখুন।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ۭ وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ﴿٤١﴾
قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِي الْعَرْشِ
سَبِيْلًا ﴿٤٢﴾ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ﴿٤٣﴾ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ
السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۭ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ
وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿٤٤﴾

৫ রুকূ'

আমি এ কুরআনে নানাভাবে লোকদেরকে বুঝিয়েছি যেন তারা সজাগ হয়, কিন্তু তারা সত্য থেকে আরো বেশী দূরে সরে যাচ্ছে। হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলো, যদি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহও থাকতো যেমন এরা বলে, তাহলে সে আরশের মালিকের জায়গায় পৌঁছে যাবার জন্য নিশ্চয়ই চেষ্টা করতো।[৪৭] পাক-পবিত্র তিনি এবং এরা যেসব কথা বলছে তিনি তার অনেক উর্ধ্বে। তাঁর পবিত্রতা তো বর্ণনা করছে সাত আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে যা কিছু আছে সব জিনিসই।[৪৮] এমন কোন জিনিস নেই যা তাঁর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে না,[৪৯] কিন্তু তোমরা তাদের পবিত্রতা ও মহিমা কীর্তন বুঝতে পারো না। আসলে তিনি বড়ই সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল।[৫০]

৪৭. অর্থাৎ সে নিজেই আরশের মালিক হবার চেষ্টা করতো। কারণ অনেকগুলো সত্তা আল্লাহর সার্বভৌমত্বে শরীক হলে সেখানে অনিবার্যভাবে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হবে। এক, তারা সবাই হবে প্রত্যেকের জায়গায় স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ইলাহ। দুই, তাদের একজন হবে আসল ইলাহ আর বাদবাকি সবাই হবে তার বান্দা এবং সে তাদেরকে নিজের প্রভুত্ব কর্তৃত্বের কিছু কিছু অংশ সোপর্দ করবে। প্রথম অবস্থাটিতে কোনক্রমেই এসব স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী ইলাহর পক্ষে সবসময় সব ব্যাপারে পরস্পরের ইচ্ছা ও সংকল্পের প্রতি আনুকূল্য বজায় রেখে এ অনন্ত অসীম বিশ্বলোকের আইন-শৃংখলা ব্যবস্থা এতো পরিপূর্ণ ঐক্য, সামঞ্জস্য, সমতা ও তারসাম্য সহকারে পরিচালনা করা সম্ভবপর ছিল না। তাদের পরিকল্পনা ও সংকল্পের প্রতি পদে পদেই সংঘর্ষ বাধা ছিল অনিবার্য। প্রত্যেকেই যখন দেখতো অন্য ইলাহদের সাথে আনুকূল্য ছাড়া তার প্রভুত্ব চলছে না তখন সে একাই সমগ্র বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র মালিক হয়ে যাবার চেষ্টা করতো। আর দ্বিতীয় অবস্থা সম্পর্কে বলা যায়, বান্দার সত্তা প্রভুত্বের ক্ষমতা তো দূরের কথা প্রভুত্বের সামান্যতম ভাবকল্প ও স্পর্শ-গন্ধ ধারণ করার ক্ষমতাও রাখে না। য । কোথাও কোন সৃষ্টির দিকে

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿٤٥﴾ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي
آذَانِهِمْ وَقْرًا

যখন তুমি কুরআন পড়ো তখন আমি তোমার ও যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে না তাদের মাঝখানে একটি পর্দা ঝুলিয়ে দেই এবং তাদের মনের ওপর এমন আবরণ চড়িয়ে দেই যেন তারা কিছুই বুঝে না এবং তাদের কানে তালা লাগিয়ে দেই।(৫১)

সামান্যতম প্রভুত্ব কর্তৃত্ব স্থানান্তরিত করে দেয়া হতো তাহলে তার পায়া ভারি হয়ে যেতো, আর সামান্য ক্ষণের জন্যও সে বান্দা হয়ে থাকতে রাজী হতো না এবং তখনি সে বিশ্বজাহানের ইলাহ হয়ে যাবার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করে দিতো।

যে বিশ্বজাহানে পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত শক্তি মিলে একসাথে কাজ না করলে গমের একটি দানা এবং ঘাসের একটি পাতা পর্যন্তও উৎপন্ন হতে পারে না তার সম্পর্কে শুধুমাত্র একজন নিরেট মূর্খ ও স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন লোকই একথা চিন্তা করতে পারে যে, একাধিক স্বাধীন বা অর্ধ স্বাধীন ইলাহ তার শাসন কার্য পরিচালনা করছে। অন্যথায় যে ব্যক্তিই এ ব্যবস্থার মেজাজ ও প্রকৃতি বুঝবার জন্য সামান্যতম চেষ্টাও করেছে সে এ সিদ্ধান্তে না পৌঁছে থাকতে পারে না যে, এখানে শুধুমাত্র একজনেরই প্রভুত্ব চলছে এবং তাঁর সাথে অন্য কারোর কোন পর্যায়েই কোন প্রকারের শরীক হবার আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই।

৪৮. অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বজাহান এবং তার প্রত্যেকটি জিনিস নিজের সমগ্র অস্তিত্ব নিয়ে এ সত্যের পক্ষে সাক্ষ দিয়ে চলছে যে, যিনি তাকে পয়দা করেছেন এবং তার লালন পালন ও দেখাশুনা করছেন, তাঁর সত্তা সব রকমের দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা মুক্ত এবং প্রভুত্বের ব্যাপারে কেউ তাঁর সাথে শরীক ও সহযোগী নয়।

৪৯. প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার মানে হচ্ছে, প্রত্যেকটি জিনিস কেবলমাত্র নিজের রবের দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা মুক্ত থাকার কথা প্রকাশই করছে না বরং এই সংগে তাঁর যাবতীয় গুণে গুণান্বিত ও যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী হবার কথাও বর্ণনা করছে। প্রত্যেকটি জিনিস তার পরিপূর্ণ অস্তিত্বের মাধ্যমে একথা বর্ণনা করছে যে, তার স্রষ্টা ও ব্যবস্থাপক এমন এক সত্তা, যিনি সমস্ত মহৎ গুণাবলীর সর্বোচ্চ ও পূর্ণতম অবস্থার অধিকারী এবং প্রশংসা যদি থাকে তাহলে একমাত্র তাঁরই জন্য আছে।

৫০. অর্থাৎ তোমরা তাঁর সামনে অনবরত ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে যাচ্ছো এবং তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে চলছো, এরপরও তিনি ক্ষমা করে চলছেন, রিযিক বন্ধ করছেন না, নিজের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিতও করছেন না এবং প্রত্যেক ঔদ্ধত্যকারীকে

সংগে সংগেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে মৃত্যুদণ্ডও দিচ্ছেন না। এসবই তাঁর সহিষ্ণুতা ও অপরূপ ক্ষমাশীলতারই নিদর্শন। তাছাড়া তিনি ব্যক্তিকেও এবং জাতিকেও বুঝবার ও ভুল সংশোধন করার জন্য যথেষ্ট অবকাশ দিচ্ছেন। তাদেরকে উপদেশ ও সঠিক পথনির্দেশনা দেবার জন্য নবী, সংস্কারক ও প্রচারক পাঠিয়ে চলছেন অনবরত। যে ব্যক্তিই নিজের ভুল বুঝতে পেরে সোজা পথ অবলম্বন করে তার অতীতের সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি মাফ করে দেন।

৫১. অর্থাৎ আখেরাতের প্রতি ঈমান না আনার স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে মানুষের মনের দরজায় তালা লেগে যায় এবং কুরআন যে দাওয়াত পেশ করে তার কানে তা প্রবেশ করে না। কুরআনের দাওয়াতের মূল কথাই তো হচ্ছে এই যে, দুনিয়াবী জীবনের বাইরের দিকটি দেখে প্রতারিত হয়ো না। এখানে কোন হিসেব ও জবাব গ্রহণকারীর অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর না হলেও একথা মনে করো না যে, তোমাকে কারোর সামনে নিজের দায়িত্বপালনের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে না। এখানে যদি কুফরী, শিরক, নাস্তিক্যবাদ, তাওহীদ ইত্যাদি সবরকমের মতবাদ স্বাধীনভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে এবং এর ফলে পার্থিব দৃষ্টিতে কোন বিশেষ ফারাক দেখা দেয় না বলে মনে হয়, তাহলে একথা মনে করো না যে, তাদের কোন আলাদা ও স্থায়ী ফলাফলই নেই। এখানে যদি ফাসেকী ও অনাচারমূলক এবং আনুগত্য ও তাকওয়ার সবরকম কর্মনীতি অবলম্বন করা যেতে পারে এবং বাস্তবে এদের মধ্য থেকে কোন একটি কর্মনীতির কোন অনিবার্য ফল দেখা না দেয়, তাহলেও একথা মনে করো না যে, আদতে কোন কার্যকর ও অপরিবর্তনশীল নৈতিক আইন নেই। আসলে হিসেব নেয়া ও জবাবদিহি করা সবকিছুই হবে কিন্তু তা হবে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে। একমাত্র তাওহীদের মতবাদ সত্য ও স্থায়ীত্ব লাভকারী এবং বাদবাকি সব মতবাদই বাতিল। কিন্তু তাদের আসল ও চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ হবে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে এবং এ বাহ্যিক পর্দার পেছনে যে সত্য লুকিয়ে আছে তা সেখানে প্রকাশিত হবে। একটি অনড় ও অপরিবর্তনশীল নৈতিক আইন নিশ্চয়ই আছে যার দৃষ্টিতে পাপাচার মানুষের জন্য ক্ষতিকর এবং আল্লাহর আনুগত্য লাভজনক। কিন্তু সেই আইন অনুযায়ী শেষ ও চূড়ান্ত ফায়সালাও হবে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে। কাজেই তোমরা দুনিয়ার এ সাময়িক জীবনের মোহে মুগ্ধ হয়ে যেয়ো না এবং এর সন্দেহপূর্ণ ফলাফলের ওপর নির্ভর করো না। বরং সবশেষে নিজেদের অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন রবের সামনে তোমাদের যে জবাবদিহি করতে হবে সেদিকে নজর রাখো এবং যে সঠিক আকীদাগত ও নৈতিক দৃষ্টিভংগী তোমাদের আখেরাতের পরীক্ষায় সফলকাম করবে তা অবলম্বন করো।—এ হচ্ছে কুরআনের দাওয়াত। এখন যে ব্যক্তি আদৌ আখেরাতকেই মেনে নিতে প্রস্তুত নয় এবং এ দুনিয়ার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও অভিজ্ঞতালব্ধ যাবতীয় বস্তু বিষয়ের মধ্যেই যার সমস্ত আস্থা ও বিশ্বাস সীমাবদ্ধ, সে কখনো কুরআনের এ দাওয়াতকে বিবেচনাযোগ্য মনে করতে পারে না। এ আওয়াজ হামেশা তার কানের পর্দায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উৎক্ষিপ্ত হতে থাকবে, কখনো মনোরাজ্যে প্রবেশ করার পথ পাবে না। এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক সত্য। সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ মনস্তাত্ত্বিক সত্যকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি আখেরাত মানে না আমি তার অন্তর ও কান কুরআনের দাওয়াতের জন্য বন্ধ করে দিই। অর্থাৎ এটি আমার প্রাকৃতিক আইন। আখেরাত অস্বীকারকারীর ওপর এ আইনটি এভাবে প্রবর্তিত হয়।

وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٦﴾
نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ
نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٤٧﴾
انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٨﴾

আর যখন তুমি কুরআনে নিজের একমাত্র রবের কথা পড়ো তখন তারা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।[৫২] আমি জানি, যখন তারা কান লাগিয়ে তোমার কথা শোনে তখন আসলে কি শোনে এবং যখন বসে পরস্পর কানাকানি করে তখন কি বলে। এ জালেমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, তোমরা এই যে লোকটির পেছনে চলছো এতো একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি।[৫৩] —দেখো, কী সব কথা এরা তোমার ওপর ছুঁড়ে দিচ্ছে, এরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, এরা পথ পায় না।[৫৪]

একথাও মনে থাকা দরকার যে, এটি মক্কার কাফেরদের নিজেদেরই উক্তি ছিল। আল্লাহ তাদের কথাটি তাদের ওপর উল্‌টে দিয়েছেন মাত্র। সূরা 'হা–মীম–সাজদা'য় তাদের এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا
وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ -(ايات : ٥)

অর্থাৎ "তারা বলে, হে মুহাম্মাদ! তুমি যে জিনিসের দিকে দাওয়াত দিচ্ছো, তার জন্য আমাদের মনের দুয়ার বন্ধ, আমাদের কান বধির এবং আমাদের ও তোমার মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি হয়ে গেছে। কাজেই তুমি তোমার কাজ করো, আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি।" (আয়াত ঃ ৫)

এখানে তাদের এ উক্তিটির পুনরাবৃত্তি করে আল্লাহ বলছেন, এই যে অবস্থাটিকে তোমরা নিজেদের প্রশংসার গুণ মনে করে বর্ণনা করছো, এটিতো আসলে একটি অভিশাপ, তোমাদের আখেরাত অস্বীকৃতির বদৌলতে যথার্থ প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী এটি তোমাদের ওপর পড়ছে।

৫২. অর্থাৎ তুমি যে একমাত্র আল্লাহকে নিজের রব গণ্য করো তাদের তৈরী করা রবদের কোন কথা বলো না, এটা তাদের কাছে বড়ই বিরক্তিকর ঠেকে। মানুষ কেবল আল্লাহর মন্ত্র জপ করতে থাকবে, বুযর্গদের কার্যকলাপের কোন কথা বলবে না, মাযার, পবিত্রস্থান ইত্যাদির অনুগ্রহ ও দাক্ষিণ্যলাভের কোন স্বীকৃতি দেবে না এবং তাদের মতে

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٤٩﴾
قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ﴿٥٠﴾ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِيْ
صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ۭ قُلِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ
مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ۭ قُلْ عَسٰٓى
اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ﴿٥١﴾

তারা বলে, "আমরা যখন শুধুমাত্র হাড় ও মাটি হয়ে যাবো তখন কি আমাদের আবার নতুন করে পয়দা করে ওঠানো হবে?"—এদেরকে বলে দাও, "তোমরা পাথর বা লোহাই হয়ে যাও অথবা তার চাইতেও বেশী কঠিন কোন জিনিস, যার অবস্থান তোমাদের ধারণায় জীবনীশক্তি লাভ করার বহুদূরে (তবুও তোমাদের ওঠানো হবেই)। তারা নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে, "কে আমাদের আবার জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনবে?" জবাবে বলো, "তিনিই, যিনি প্রথমবার তোমাদের পয়দা করেন।" তারা মাথা নেড়ে নেড়ে জিজ্ঞেস করবে,[৫৫] "আচ্ছা, তাহলে এটা কবে হবে?" তুমি বলে দাও, "অবাক হবার কিছুই নেই, সে সময়টা হয়তো নিকটেই এসে গেছে।

যেসব ব্যক্তির ওপর আল্লাহ তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ভাগ–বাঁটোয়ারা করে দিয়েছেন তাদের উদ্দেশে কোন প্রশংসা বাণীও নিবেদন করবে না, এ ধরনের 'ওহাবী' আচরণ তাদের একদম পছন্দ নয়। তারা বলে ঃ এ অদ্ভুত ব্যক্তিটির মতে, অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ, ক্ষমতা ও কুদরতের মালিক একমাত্র আল্লাহ এবং অধিকার ও ব্যবহার ক্ষমতার অধিকারীও একমাত্র আল্লাহ। তাহলে আমাদের এ আস্তানা–মাযারের অধিবাসীদের গুরুত্ব কোথায় রইলো! অথচ তাদের ওখান থেকে আমরা সন্তান পাই, রুগীদের রোগ নিরাময় হয়, ব্যবসা–বাণিজ্যে উন্নতি হয় এবং মনের আশা পূর্ণ হয়।

৫৩. মক্কার কাফের সরদাররা পরস্পর যেসব কথা বলাবলি করতো, এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। তাদের অবস্থা ছিল এই যে, তারা লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআন শুনতো এবং তারপর তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতো। অনেক সময় তাদের নিজেদের লোকদের মধ্য থেকে কারো প্রতি তাদের সন্দেহ হতো যে, সে কুরআন শুনে প্রভাবিত হয়েছে। তাই তারা সবাই মিলে তাকে এ বলে বুঝাতো যে, ভাই এ তুমি কার ধোঁকায় পড়ে গেলে? এতো একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি। অর্থাৎ কোন শত্রু এর ওপর যাদু করে দিয়েছে। তাইতো প্ররোচনামূলক কথা বলে চলছে।

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾

যেদিন তিনি তোমাদের ডাকবেন, তোমরা তাঁর প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করতে করতে তাঁর ডাকের জবাবে বের হয়ে আসবে এবং তখন তোমাদের এ ধারণা হবে যে, তোমরা অল্প কিছুক্ষণ মাত্র এ অবস্থায় কাটিয়েছ।[৫৬]

৫৪. অর্থাৎ এরা তোমার সম্পর্কে কোন একটি মত প্রকাশ করছে না। বরং বিভিন্ন সময় সম্পূর্ণ ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী কথা বলছে। কখনো বলছে, তুমি নিজে যাদুকর। কখনো বলছে, তে মাকে কেউ যাদু করেছে। কখনো বলছে, তুমি কবি। কখনো বলছে, তুমি পাগল। এদে:. যে আসল সত্যের খবর নেই, এদের এসব পরস্পর বিরোধী কথাই তার প্রমাণ। নয়তো প্রতিদিন তারা একটা করে নতুন মত প্রকাশ করার পরিবর্তে কোন একটা চূড়ান্ত মত প্রকাশ করতো। তাছাড়া এ থেকে একথাও জানা যায় যে, তারা নিজেরা নিজেদের কোন কথায়ও নিশ্চিত নয়। একটি অপবাদ দেয়ার পর নিজেরাই অনুভব করছে, এটা তো ঠিকমতো খাপ খাচ্ছে না। তাই পরে আর একটা অপবাদ দিচ্ছে। আবার সেটাকেও খাপ খেতে না দেখে তৃতীয় আর একটা অপবাদ তৈরী করছে। এভাবে তাদের প্রত্যেকটা নতুন অপবাদ পূর্বের অপবাদের প্রতিবাদ করে। এ থেকে জানা যায়, সত্য ও সততার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। নিছক শত্রুতা বশত তারা একের পর এক বড় বড় মিথ্যা রচনা করে চলছে।

৫৫. "ইন্‌গাদ" মানে হচ্ছে, ওপর থেকে নিচের দিকে এবং নিচে থেকে ওপরের দিকে মাথা নাড়া। এভাবে মাথা নেড়ে বিস্ময় প্রকাশ বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়।

৫৬.অর্থাৎ দুনিয়ায় মৃত্যুকাল থেকে নিয়ে কিয়ামতের দিনে উত্থান পর্যন্তকার সময়কালটা মাত্র কয়েক ঘন্টার বেশী বলে মনে হবে না। তোমরা তখন মনে করবে, আমরা সামান্য একটু সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তার মধ্যে হঠাৎ এ কিয়ামতের শোরগোল আমাদের জাগিয়ে দিয়েছে।

আর "তোমরা আল্লাহর প্রশংসা করতে, করতে উঠে আসবে।" একথা বলার মাধ্যমে একটি মহাসত্যের দিকে সূক্ষ্মতম ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মুমিন ও কাফের প্রত্যেকের মুখে সে সময় থাকবে আল্লাহর প্রশংসা বাণী। মুমিনের কণ্ঠে এ ধ্বনি হবার কারণ, পূর্ববর্তী জীবনে এরি ওপর ছিল তার বিশ্বাস এবং এটিই ছিল তার জপতপ। আর কাফেরের কণ্ঠে এ ধ্বনি উচ্চারিত হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তার প্রকৃতিতে এ জিনিসটি গচ্ছিত রাখা হয়েছিল কিন্তু নিজের বোকামির কারণে সে এর ওপর আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। এখন নতুন জীবন লাভ করার সাথে সাথেই সমস্ত কৃত্রিম আবরণ খসে পড়বে এবং তার আসল প্রকৃতির সাক্ষ স্বতস্ফূর্তভাবে তার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হবে।

وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ
اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿٥٣﴾ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ۚ اِنْ يَّشَاْ
يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿٥٤﴾

৬ রুকূ'

আর হে মুহাম্মাদ! আমার বান্দাদেরকে[৫৭] বলে দাও, তারা যেন মুখে এমন কথা বলে যা সর্বোত্তম।[৫৮] আসলে শয়তান মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে শয়তান হচ্ছে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।[৫৯] তোমাদের রব তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে বেশী জানেন। তিনি চাইলে তোমাদের প্রতি দয়া করেন এবং চাইলে তোমাদের শাস্তি দেন।[৬০] আর হে নবী! আমি তোমাকে লোকদের ওপর হাবিলদার করে পাঠাইনি।[৬১]

৫৭. অর্থাৎ ঈমানদারদেরকে।

৫৮. অর্থাৎ কাফের ও মুশরিক এবং ইসলাম বিরোধীদের সাথে আলাপ–আলোচনা ও তর্ক–বিতর্ক করার সময় কড়া কথা, বাড়াবাড়ি ও বাহুল্য বর্জন করবে। বিরোধী পক্ষ যতই অপ্রীতিকর কথা বলুক না কেন মুসলমানদের মুখ থেকে কোন ন্যায় ও সত্য বিরোধী কথা বের হওয়া উচিত নয়। ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তাদের আজে বাজে কথা বলা শোভা পায় না। ঠাণ্ডা মাথায় তাদের এমন সব কথা বলতে হবে, যা যাচাই বাছাই করা, মাপাজোকা, ওজন করা, সত্য এবং তাদের দাওয়াতের মর্যাদার সাথে সংগতিশীল।

৫৯. যখনই তোমরা বিরোধীদের কথার জবাব দিতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠছে বলে মনে করবে এবং মন–মেজাজ আকস্মিকভাবে আবেগ–উত্তেজনায় ভরে যেতে দেখতে পাবে তখনই তোমাদের বুঝতে হবে, তোমাদের দীনের দাওয়াতের কাজ নষ্ট করার জন্য এটা শয়তানের উস্কানী ছাড়া আর কিছুই নয়। তার চেষ্টা হচ্ছে, তোমরাও নিজেদের বিরোধীদের মতো সংস্কারের কাজ ত্যাগ করে সে যেভাবে মানব গোষ্ঠীকে বিতর্ক–কলহ ও ফিত্‌না–ফাসাদে মশগুল করে রাখতে চায় সেভাবে তোমরাও তার মধ্যে মশ্‌গুল হয়ে যাও।

৬০. অর্থাৎ আমরা জান্নাতী এবং অমুক ব্যক্তি বা দল জাহান্নামী এ ধরনের দাবী কখনো ঈমানদারদের মুখে উচ্চারিত হওয়া উচিত নয়। এ বিষয়টির ফায়সালা একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। তিনিই সকল মানুষের ভিতর–বাইর এবং বর্তমান–ভবিষ্যত জানেন। কার প্রতি অনুগ্রহ করতে হবে এবং কাকে শাস্তি দিতে হবে—এ ফায়সালা তিনিই করবেন। আল্লাহর কিতাবের দৃষ্টিতে কোন্ ধরনের মানুষ রহমতলাভের অধিকার রাখে এবং কোন্ ধরনের মানুষ শাস্তিলাভের অধিকারী নীতিগত দিক দিয়ে মানুষ অবশ্যি একথা

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ
النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿٥٥﴾ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ
مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ﴿٥٦﴾ أُولٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ۗ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ
مَحْذُوْرًا ﴿٥٧﴾

তোমার রব পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টিসমূহকে বেশী জানেন। আমি কতক নবীকে কতক নবীর ওপর মর্যাদা দিয়েছি[৬২] এবং আমি দাউদকে যাবুর দিয়েছিলাম।[৬৩]

এদেরকে বলো, ডাক দিয়ে দেখো তোমাদের সেই মাবুদদেরকে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ছাড়া (নিজেদের কার্যোদ্ধারকারী) মনে করো, তারা তোমাদের কোন কষ্ট দূর করতে পারবে না এবং তা পরিবর্তন করতেও পারবে না।[৬৪] এরা যাদেরকে ডাকে তারা তো নিজেরাই নিজেদের রবের নৈকট্যলাভের উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে যে, কে তাঁর নিকটতর হয়ে যাবে এবং এরা তাঁর রহমতের প্রত্যাশী এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে ভীত।[৬৫] আসলে তোমার রবের শাস্তি ভয় করার মতো।

বলার অধিকার রাখে। কিন্তু অমুক ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হবে এবং অমুককে মাফ করে দেয়া হবে, একথা বলার অধিকার কারোর নেই।

সম্ভবত এ উপদেশবাণী এ জন্য করা হয়েছে যে, কখনো কখনো কাফেরদের জুলুম ও বাড়াবাড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলমানদের মুখ থেকে এ ধরনের কথা বের হয়ে যেতো যে, তোমরা জাহান্নামে যাবে অথবা আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দেবেন।

৬১. অর্থাৎ নবীর কাজ হচ্ছে দাওয়াত দেয়া। লোকদের ভাগ্য নবীর হাতে দিয়ে দেয়া হয়নি যে, তিনি কারোর ভাগ্যে রহমত এবং কারোর ভাগ্যে শাস্তির ফায়সালা দিয়ে যেতে থাকবেন। এর অর্থ এ নয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের কোন ভুল করেছিলেন এবং সে কারণে আল্লাহ তাঁকে এভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। বরং এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দেয়াই আসল উদ্দেশ্য। তাদেরকে বলা হচ্ছে, নবীই যখন এ মর্যাদার অধিকারী নন তখন তোমরা কিভাবে জান্নাত ও জাহান্নামের ঠিকেদার হয়ে গেলে?

৬২. এ বাক্যটি আসলে মক্কার কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন সমকালীন লোকদের সাধারণ নিয়ম হয়ে থাকে ঠিক সেই একই নিয়মে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন ও সমগোত্রীয় লোকেরা তাঁর মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব দেখতে পাচ্ছিল না। তারা তাঁকে নিজেদের জনপদের একজন সাধারণ মানুষ মনে করছিল। আর যেসব খ্যাতনামা ব্যক্তি কয়েক শতাব্দী আগে অতীত হয়ে গিয়েছিলেন তাদের সম্পর্কে মনে করতো যে, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব কেবল তাদের মধ্যেই ছিল। তাই তাঁর মুখে নবুওয়াতের দাবী শুনে তারা এ বলে আপত্তি জানাতো যে, এ লোকটি তো বেশ লম্ফ ঝম্প মারছে। না জানি নিজেকে কী মনে করে বসেছে। বড় বড় পয়গম্বররা, যাদের শ্রেষ্ঠত্ব সারা দুনিয়ার লোকেরা মানে, তাদের সাথে এ ব্যক্তির কি কোন তুলনাই করা যেতে পারে? আল্লাহ এর সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে বলছেন ঃ পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত সৃষ্টি আমার চোখের সামনে আছে। তোমরা জানো না তাদেরকে কোন্ পর্যায়ের এবং কে কোন্ ধরনের মর্যাদার অধিকারী। নিজের শ্রেষ্ঠত্বের মালিক আমি নিজেই এবং ইতিপূর্বেও আমি বহু নবী পয়দা করেছি যাদের একজন অন্যজনের চাইতে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা সম্পন্ন।

৬৩. এখানে বিশেষভাবে দাউদ আলাইহিস সালামকে যাবুর দান করার কথা সম্ভবত এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, দাউদ আলাইহিস সালাম বাদশাহ ছিলেন এবং বাদশাহ সাধারণত আল্লাহর কাছ থেকে বেশী দূরে অবস্থান করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন লোকেরা যে কারণে তাঁর পয়গম্বরী ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার বিষয়টি মেনে নিতে অস্বীকার করতো তা তাদের নিজেদের বর্ণনা অনুযায়ী এ ছিল যে, সাধারণ মানুষের মতো তাঁর স্ত্রী-সন্তান ছিল, তিনি পানাহার করতেন, হাটে-বাজারে চলাফেরা করে কেনাবেচা করতেন এবং একজন দুনিয়াদার ব্যক্তি নিজের দুনিয়াবী প্রয়োজনাদি পূরণ করার জন্য যেসব কাজ করতো তিনি তা সব করতেন। মক্কার কাফেরদের বক্তব্য ছিল, তুমি একজন দুনিয়াদার ব্যক্তি, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার সাথে তোমার কি সম্পর্ক? আল্লাহর নৈকট্য লাভকারীরা তো হচ্ছে এমন সব লোক, নিজেদের দৈহিক ও মানসিক চাহিদার ব্যাপারে যাদের কোন জ্ঞান থাকে না। তারা তো একটি নির্জন জায়গায় বসে দিনরাত আল্লাহর ধ্যানে ও স্মরণে মশ্‌গুল থাকে। ঘর সংসারের চাল-ডালের কথা ভাববার সময় ও মানসিকতা তাদের কোথায়। এর জবাবে বলা হচ্ছে, পুরোপুরি একটি রাজ্যের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করার চাইতে বড় দুনিয়াদারী আর কি হতে পারে, কিন্তু এরপরও হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে নবুওয়াত ও কিতাবের নিয়ামত দান করা হয়েছিল।

৬৪. এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, কেবল গায়রুল্লাহকে (আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তা) সিজদা করাই শির্‌ক নয় বরং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তার কাছে দোয়া চাওয়া বা তাকে সাহায্য করার জন্য ডাকাও শির্‌ক। দোয়া ও সাহায্য চাওয়া ও মূলতাত্ত্বিক বিচারে ইবাদতেরই অন্তরভুক্ত। কাজেই গায়রুল্লাহর কাছে প্রার্থনাকারী একজন মূর্তি পূজকের সমান অপরাধী। তাছাড়া এ থেকে একথাও জানা যায় যে, আল্লাহ ছাড়া কারোরও কোন সামান্যতম ইখতিয়ার নেই। অন্য কেউ কান আপদ-বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে না এবং কোন খারাপ অবস্থাকে ভাল অবস্থায় পরিবর্তিত করে দিতেও পারে

وَإِنْ مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا
عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾ وَمَا مَنَعَنَا
أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَآتَيْنَا ثَمُودَ
النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾

আর এমন কোন জনপদ নেই, যা আমি কিয়ামতের আগে ধ্বংস করে দেবো না অথবা যাকে কঠোর শাস্তি দেবো না,[৬৬] আল্লাহর লিখনে এটা লেখা আছে।

আর এদের পূর্ববর্তী লোকেরা নিদর্শনসমূহ[৬৭] অস্বীকার করেছে বলেই তো আমি নিদর্শন পাঠানো থেকে বিরত রয়েছি। (যেমন দেখে নাও) সামূদকে আমি প্রকাশ্যে উটনী এনে দিলাম এবং তারা তার ওপর জুলুম করলো।[৬৮] আমি নিদর্শন তো এ জন্য পাঠাই যাতে লোকেরা তা দেখে ভয় পায়।[৬৯]

না। আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কোন সত্তা সম্পর্কে এ ধরনের বিশ্বাস রাখা একটি মুশরিকী বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

৬৫. এ শব্দগুলো নিজেই সাক্ষ দিচ্ছে যে, মুশরিকদের যেসব মাবুদ ও ত্রাণকর্তার কথা এখানে বলা হচ্ছে তারা পাথরের মূর্তি নয় বরং তারা হচ্ছে ফেরেশ্‌তা বা অতীত যুগের আল্লাহর প্রিয় নেক বান্দা। এর অর্থ পরিষ্কার। অর্থাৎ নবী হোক বা আউলিয়া অথবা ফেরেশ্‌তা, কারোই তোমাদের প্রার্থনা শুনার এবং তোমাদের সাহায্য করার ক্ষমতা নেই। তোমরা নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তাদেরকে অসিলায় পরিণত করছো কিন্তু তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা নিজেরাই আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী, তাঁর আযাবের ভয়ে ভীত এবং তাঁর বেশী বেশী নিকটবর্তী হবার জন্য অসিলা ও উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

৬৬. অর্থাৎ কারোর চিরন্তন স্থায়িত্ব নেই। প্রত্যেকটি জনপদকে হয় স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করতে হয় আর নয়তো আল্লাহর আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস হতে হবে। তোমাদের এ জনপদগুলো চিরকাল এমনি প্রাণবন্ত ও জীবন্ত থাকবে এই ভুল ধারণা তোমরা কেমন করে পোষণ করতে পারলে?

৬৭. অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য মু'জিযা সমূহ, যেগুলো সংঘটিত করা বা পাঠানো হয় নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে। মক্কার কাফেররা বারবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এগুলোর দাবী জানিয়ে আসছিল।

৬৮. এখানে বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এ ধরনের মু'জিযা দেখার পর যখন লোকেরা একে মিথ্যা বলতে থাকে তখন তাদের ওপর আযাব নাযিল হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং তখন এ জাতিকে ধ্বংস করা ছাড়া আর কোন পথ থাকে না। মানব জাতির অতীত

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي
أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۚ
وَنُخَوِّفُهُمْ ۖ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾

স্মরণ করো হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে বলে দিয়েছিলাম, তোমার রব এ লোকদেরকে ঘিরে রেখেছেন।[৭০] আর এই যা কিছু এখনই আমি তোমাকে দেখিয়েছি[৭১] একে এবং কুরআনে অভিশপ্ত গাছকে[৭২] আমি এদের জন্য একটি ফিতনা বানিয়ে রেখে দিয়েছি।[৭৩] আমি এদেরকে অনবরত সতর্ক করে যাচ্ছি কিন্তু প্রতিটি সতর্কসংকেত এদের অবাধ্যতা বাড়িয়ে চলছে।

ইতিহাস প্রমাণ করে, বিভিন্ন জাতি সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখে নেবার পরও সেগুলোকে মিথ্যা বলেছে, ফলে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এখন এটা পুরোপুরি আল্লাহর রহমত যে, তিনি এমন ধরনের কোন মু'জিযা আর পাঠাচ্ছেন না। এর মানে হচ্ছে, তিনি তোমাদের বুঝবার ও সংশোধিত হবার অবকাশ দিচ্ছেন। কিন্তু তোমরা এমনি নির্বোধ যে, মু'জিযার দাবী জানিয়ে সামুদ জাতির পরিণাম ভোগ করতে চাচ্ছো।

৬৯. অর্থাৎ কোন ম্যাজিক বা দর্শনীয় খেলা দেখানোর উদ্দেশ্যে কখনো মু'জিযা দেখানো হয় না। সব সময় মু'জিযা এই উদ্দেশ্যে দেখানো হয়েছে যে, লোকেরা তা দেখে সাবধান হয়ে যাবে, তারা বুঝতে পারবে নবীর পেছনে আছে এক সর্বময় শক্তিশালী সত্তার অসীম ক্ষমতা এবং তাঁর নাফরমানীর পরিণাম কি হতে পারে তাও তারা জানতে পারবে।

৭০. অর্থাৎ তোমার নবুওয়াতী দাওয়াতের সূচনালগ্নেই যখন মক্কার এ কাফেররা তোমার বিরোধিতা করতে এবং তোমার পথে প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করাতে শুরু করেছিল তখনই আমি পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছিলাম, আমি এ লোকদেরকে ঘিরে রেখেছি, এরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে দেখে নিক, কোনভাবেই এরা তোমার দাওয়াতের পথ রোধ করতে পারবে না এবং তুমি যে কাজে হাত দিয়েছো সব রকমের বাধা–বিপত্তি সত্ত্বেও সে কাজ সম্পন্ন হবেই। এখন যদি এ লোকদেরকে মু'জিযা দেখিয়ে সতর্ক করতে হয় তাহলে এ মু'জিযা তাদেরকে আগেই দেখানো হয়ে গেছে অর্থাৎ শুরুতে যাকিছু বলা হয়েছিল তা পুরা হয়ে গেছে, এদের কোন বিরোধিতাই ইসলামী দাওয়াতের অগ্রগতি রুখে দিতে পারেনি এবং এদের এ প্রচেষ্টা তোমার এক চুল পরিমাণও ক্ষতি করতে পারেনি। এদের দেখার মতো চোখ থাকলে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এরা নিজেরাই বুঝতে পারে যে, নবীর এ দাওয়াতের পেছনে আল্লাহর হাত সক্রিয় রয়েছে।

আল্লাহ বিরোধীদেরকে ঘিরে রেখেছেন এবং নবীর দাওয়াত আল্লাহর হেফাজতে রয়েছে—একথা মক্কার প্রাথমিক যুগের সূরাগুলোতে বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে। যেমন সূরা বুরুজে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا إِلَّآ إِبْلِيْسَ ۖ قَالَ
ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ﴿٦١﴾ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتَ
عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ إِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦٢﴾ قَالَ
اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ﴿٦٣﴾

৭ রুকূ'

আর স্মরণ করো, যখন আমি ফেরেশ্‌তাদের বললাম, আদমকে সিজদা করো, তখন সবাই সিজদা করলো কিন্তু ইবলীস করলো না।[৭৪] সে বললো, "আমি কি তাকে সিজদা করবো যাকে তুমি বানিয়েছো মাটি দিয়ে?" তারপর সে বললো, "দেখোতো ভাল করে, তুমি যে একে আমার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছো, এ কি এর যোগ্য ছিল? যদি তুমি আমাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দাও তাহলে আমি তার সমস্ত সন্তান সন্ততির মূলোচ্ছেদ করে দেবো,[৭৫] মাত্র সামান্য ক'জনই আমার হাত থেকে নিস্তার পাবে।" আল্লাহ বললেন, "ঠিক আছে, তুমি যাও, এদের মধ্য থেকে যারাই তোমার অনুসরণ করবে তুমিসহ তাদের সবার জন্য জাহান্নামই হবে পূর্ণ প্রতিদান।

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ۙ وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ۚ

"কিন্তু এ কাফেররা মিথ্যা বলার ও অস্বীকার করার কাজে লেগেই আছে এবং আল্লাহ সবদিক থেকে তাদেরকে ঘেরাও করে রেখেছেন।" (আয়াত ঃ ১৯–২০)

৭১. মি'রাজের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। তাই এখানে রু'ইয়া শব্দটি ব্যবহৃত হলেও এর মানে এখানে স্বপ্ন নয় বরং এখানে এর মানে হচ্ছে চোখে দেখা। এটা নিছক স্বপ্ন হলে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের সামনে এটাকে স্বপ্ন হিসেবেই বর্ণনা করলে এটা তাদের জন্য ফিত্‌না হবার কোন কারণই ছিল না। একটার চাইতে একটা বেশী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখা হয় এবং লোকদের সামনে বর্ণনাও করা হয় কিন্তু তা কখনো কারো জন্য এমন সমস্যা হয়ে দেখা দেয় না যে, লোকেরা এ জন্য যে স্বপ্ন দেখেছে তাকে বিদ্রূপ করতে থেকেছে এবং তার প্রতি মিথ্যাচার ও পাগলপনার অপবাদ দিয়েছে।

৭২. অর্থাৎ "যাক্কুম"। এ সম্পর্কে কুরআনে খবর দেয়া হয়েছে, এ গাছটি জাহান্নামের তলদেশে উৎপন্ন হবে এবং জাহান্নামীদের তা খেতে হবে। একে অভিশপ্ত করার মানে হচ্ছে এই যে, আল্লাহর রহমত থেকে এ গাছটি দূরে থাকবে। অর্থাৎ এটি আল্লাহর রহমতের

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ
بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ
وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ
سُلْطَانٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾

তুমি যাকে যাকে পারো তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে পদস্খলিত করো,[৭৬] তাদের ওপর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর আক্রমণ চালাও,[৭৭] ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে তাদের সাথে শরীক হয়ে যাও[৭৮] এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতির জালে আটকে ফেলো,[৭৯] —আর শয়তানের প্রতিশ্রুতি ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়,—নিশ্চিতভাবেই আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোন কর্তৃত্ব অর্জিত হবে না[৮০] এবং ভরসা করার জন্য তোমার রবই যথেষ্ট।[৮১]

নিদর্শন নয়। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে লোকদের আহারের সংস্থান করার জন্য এ গাছটি উৎপন্ন করবেন না বরং এটি হবে তাঁর লানতের নিদর্শন। অভিশপ্ত লোকদের জন্য তিনি এটি উৎপন্ন করবেন। তারা ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে একেই খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করবে। ফলে তাদের কষ্ট আরো বেড়ে যাবে। সূরা "দুখান"-এ এ গাছের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, জাহান্নামীরা যখন তা খাবে, তাদের পেটে আগুন লেগে যাবে, মনে হবে যেন তাদের পেটের মধ্যে গরম পানি টগবগ করে ফুটছে।

৭৩. অর্থাৎ এদের কল্যাণের জন্য আমি তোমাকে মি'রাজের মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিস সরাসরি দেখিয়েছি, যাতে তোমার মতো সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির মাধ্যমে এ লোকেরা যথার্থ সত্যের জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং এভাবে সতর্ক হয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এরা উল্টো এ ঘটনার ভিত্তিতে তোমাকে বিদ্রূপ করেছে। আমি তোমার মাধ্যমে এদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দিয়েছি যে, এখানে হারাম খাওয়ার পরিণামে তোমাদের যাক্কুম খেতে বাধ্য করা হবে। কিন্তু তারা এ বক্তব্যকে বিদ্রূপ করে বলেছে ঃ দেখো, দেখো, এ ব্যক্তির অবস্থা দেখো, একদিকে বলছে, জাহান্নামে আগুন দাউদাউ করে জ্বলবে আবার অন্যদিকে খবর দিচ্ছে, সেখানে গাছ জন্মাবে!

৭৪. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য সূরা আল বাকারার ৪ রুকূ', আন নিসার ১৮ রুকূ', আল হিজ্‌রের ৩ রুকূ' এবং ইবরাহীমের ৪ রুকূ' দেখুন।

এ বক্তব্য প্রসংগে আলোচ্য ঘটনাটা আসলে যে কথা বুঝাবার জন্য বর্ণনা করা হচ্ছে তা হচ্ছে, আল্লাহর মোকাবিলায় কাফেরদের এ অহংকার, সতর্কবাণীর প্রতি তাদের এ উপেক্ষা এবং বাঁকা পথে চলার জন্য তাদের এ অনমনীয় ঔদ্ধত্য ঠিক সেই শয়তানেরই

অনুকরণ যে প্রথম দিন থেকেই মানুষের শত্রুতা করে আসছে। এ কর্মনীতি অবলম্বন করে এরা আসলে এমন একটি জালে জড়িয়ে পড়ছে যে জালে আদমের বংশধরদেরকে জড়িয়ে ধ্বংস করে দেবার জন্য শয়তান মানব ইতিহাসের সূচনা লগ্নেই চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল।

৭৫. "মূলোচ্ছেদ করে দেবো," অর্থাৎ শান্তি ও নিরাপত্তার পথ থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেবো। 'ইহ্‌তিনাক' শব্দের আসল মানে হচ্ছে, কোন জিনিসকে শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলা। যেহেতু মানুষের আসল মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহর খেলাফত এবং এর দাবী হচ্ছে আনুগত্যের ক্ষেত্রে দৃঢ়পদ থাকা, তাই এ মর্যাদা থেকে তার সরে যাওয়া গাছকে শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলারই মতো।

৭৬. মূলে "ইস্‌তিফ্‌যায" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে হাল্‌কা করা। অর্থাৎ দুর্বল বা হাল্‌কা পেয়ে কাউকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া বা তার পা পিছ্‌লিয়ে দেয়া।

৭৭. এ বাক্যাংশে শয়তানকে এমন একটি ডাকাতের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে তার অশ্বারোহী ও পদাতিক ডাকাত বাহিনী নিয়ে একটি জনপদ আক্রমণ করে এবং তাদেরকে হুকুম দিতে থাকে, এদিকে লুটপাট করো, ওদিকে সাঁড়াশী আক্রমণ চালাও এবং সেদিকে ধ্বংস করো। শয়তানের অশ্বারোহী ও পদাতিক বলতে এমনসব অসংখ্য জিন ও মানুষকে বুঝানো হয়েছে, যারা বিভিন্ন আকৃতিতে ও বিভিন্নভাবে ইবলীসের মানব বিধ্বংসী অভিযানে সহযোগিতা করছে।

৭৮. এ বাক্যাংশটি বড়ই অর্থপূর্ণ। এখানে শয়তান ও তার অনুসারীদের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি পূর্ণাংগ ছবি আঁকা হয়েছে। যে ব্যক্তি অর্থ উপার্জন ও তা খরচ করার ব্যাপারে শয়তানের ইংগিতে নড়াচড়া করে, তার সাথে যেন শয়তান বিনা অর্থ ব্যয়ে শরীক হয়ে গেছে। পরিশ্রমে তার কোন অংশ নেই, অপরাধ, পাপ ও দুষ্কর্মের অশুভ পরিণতিতে সে অংশীদার নয়, কিন্তু তার ইংগিতে এ নির্বোধ এমনভাবে চলছে যেন তার ব্যবসায়ে সে সমান অংশীদার বরং বৃহত্তম অংশীদার। এভাবে সন্তান তো হয় মানুষের নিজের এবং তাকে লালন পালন করার জন্য সে নিজের সব যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা ও সম্পদ ব্যয় করে কিন্তু শয়তানের ইংগিতে এ সন্তানকে সে এমনভাবে গোমরাহী ও নৈতিক চরিত্রহীনতার শিক্ষা দেয় যেন মনে হয় সে একা এ সন্তানের বাপ নয় বরং তার পিতৃত্বে শয়তানেরও শরীকানা আছে।

৭৯. অর্থাৎ তাদেরকে মিথ্যা আশার কুহকে ভুলিয়ে রাখো এবং মিথ্যার আকাশ কুসুম রচনা করে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দাও।

৮০. এর দু'টি অর্থ। স্ব স্ব স্থানে দু'টি অর্থই সঠিক। একটি অর্থ হচ্ছে, আমার বান্দা অর্থাৎ মানুষের ওপর তুমি এমন কর্তৃত্ব লাভ করবে না, যার ফলে তুমি তাদেরকে জবরদস্তি নিজের পথে টেনে নিয়ে যেতে পারো। তুমি নিছক প্ররোচিত করতে ও ফুসলাতে এবং ভুল পরামর্শ দিতে ও মিথ্যা ওয়াদা করতে পারো। কিন্তু তোমার কথা গ্রহণ করা বা না করা হবে বান্দার নিজের কাজ। তারা তোমার পথে যেতে চাইলে বা না চাইলেও তুমি হাত ধরে তাদেরকে নিজের পথে টেনে নিয়ে যাবে —তোমার এমন ধরনের কোন কর্তৃত্ব তাদের ওপর থাকবে না। দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, আমার বিশেষ বান্দাদের অর্থাৎ নেক বান্দাদের ওপর তোমার কোন প্রভাব খাটবে না। শক্তিহীন ও দুর্বল সংকল্পধারী লোকেরা

رَبُّكُمُ الَّذِيْ يُزْجِيْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ۭ
اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝ وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ
تَدْعُوْنَ اِلَّآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ۭ وَكَانَ
الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ۝

তোমাদের (আসল) রব তো তিনিই যিনি সমুদ্রে তোমাদের নৌযান পরিচালনা করেন,[৮২] যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ করতে পারো।[৮৩] আসলে তিনি তোমাদের অবস্থার প্রতি বড়ই করুণাশীল। যখন সাগরে তোমাদের ওপর বিপদ আসে তখন সেই একজন ছাড়া আর যাকে তোমরা ডাকো সবাই অন্তর্হিত হয়ে যায়।[৮৪] কিন্তু যখন তিনি তোমাদের রক্ষা করে স্থলদেশে পৌঁছিয়ে দেন তখন তোমরা তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ সত্যিই বড়ই অকৃতজ্ঞ।

নিশ্চয়ই তোমার প্রতিশ্রুতিতে প্রতারিত হবে, কিন্তু যারা আমার বন্দেগীতে অবিচল থাকবে তারা কখনো তোমার নিয়ন্ত্রণে আসবে না।

৮১.অর্থাৎ যারা আল্লাহর ওপর ভরসা করবে এবং যারা তাঁর পথনির্দেশনা, সুযোগ দান ও সাহায্যের ওপর আস্থা রাখবে তাদের এ আস্থা ভুল প্রমাণিত হবে না। তাদের অন্য কোন সহায় ও নির্ভরের প্রয়োজন হবে না। তাদের পথ দেখাবার এবং হাত ধরার ও সাহায্য করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হবেন। তবে যারা নিজেদের শক্তির ওপর ভরসা করে অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ওপর নির্ভর করে তারা এ পরীক্ষা পর্ব সাফল্যের সাথে অতিক্রম করতে পারবে না।

৮২. ওপরের ধারাবাহিক বর্ণনার সাথে এর সম্পর্ক বুঝতে হলে এ রুকূ'র শুরুতে যে বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে তার প্রতি আর একবার নজর বুলাতে হবে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই ইবলীস আদম সন্তানদের পেছনে লেগেছে। সে তাদেরকে আশার ছলনা দিয়ে ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতির জালে জড়িয়ে সঠিক পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে একথা প্রমাণ করতে চায় যে, আল্লাহ তাদেরকে যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তারা তার যোগ্য নয়। এ বিপদ থেকে যদি কোন জিনিস মানুষকে বাঁচাতে পারে তাহলে তা হচ্ছে কেবল এই যে, মানুষকে তার রবের বন্দেগীর ওপর অবিচল থাকতে হবে, পথনির্দেশনা ও সাহায্য লাভের জন্য একমাত্র তাঁরই দিকে রুজু করতে হবে এবং একমাত্র তাঁরই প্রতি নির্ভরশীল হতে হবে। এ ছাড়া দ্বিতীয় যে কোন পথই মানুষ অবলম্বন করবে তার সাহায্যে সে শয়তানের জাল থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না।—এ ভাষণ থেকে আপনা আপনিই একথা বের হয়ে আসে যে, যারা তাওহীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করছে এবং শির্‌কের ওপর জোর দিয়ে চলছে, তারা আসলে নিজেরাই

أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا
ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ
فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ
لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ
فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

আচ্ছা, তাহলে তোমরা কি এ ব্যাপারে একেবারেই নির্ভীক যে, আল্লাহ কখনো স্থলদেশেই তোমাদেরকে যমীনের মধ্যে প্রোথিত করে দেবেন না অথবা তোমাদের ওপর পাথর বর্ষণকারী ঘূর্ণি পাঠাবেন না এবং তোমরা তার হাত থেকে বাঁচার জন্য কোন সহায়ক পাবে না? আর তোমাদের কি এ ধরনের কোন আশংকা নেই যে, আল্লাহ আবার কোন সময় তোমাদের সাগরে নিয়ে যাবেন এবং তোমাদের অকৃতজ্ঞতার দরুন তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘূর্ণি পাঠিয়ে তোমাদের ডুবিয়ে দেবেন এবং তোমরা এমন কাউকে পাবে না যে, তাঁর কাছে তোমাদের এ পরিণতির জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে? —এতো আমার অনুগ্রহ, আমি বনী আদমকে মর্যাদা দিয়েছি এবং তাদেরকে জলে স্থলে সওয়ারী দান করেছি, তাদেরকে পাক-পবিত্র জিনিস থেকে রিযিক দিয়েছি এবং নিজের বহু সৃষ্টির ওপর তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রাধান্য দিয়েছি।[৮৫]

নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছে। এ সম্বন্ধের ভিত্তিতেই এখানে তাওহীদের সত্যতা সপ্রমাণ করা হচ্ছে এবং শির্‌ককে বাতিল করে দেয়া হচ্ছে।

৮৩. অর্থাৎ সামুদ্রিক সফরের মাধ্যমে যেসব অর্থনৈতিক, তামাদ্দুনিক, জ্ঞানগত ও চিন্তাগত কল্যাণ লাভ করা যায় তা লাভ করার জন্য চেষ্টা করো।

৮৪. অর্থাৎ এ থেকে একথাই প্রমাণ হয় যে, তোমাদের আসল স্বভাব প্রকৃতি এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেই রব বলে স্বীকার করে না এবং তোমাদের নিজেদের অন্তরের গভীর তলদেশে এ চেতনা চিরঞ্জীব রয়েছে যে, লাভ ও ক্ষতি করার আসল ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই হাতে রয়েছে। নয়তো যখন আসল সাহায্য করার সময় হয় তখন তোমরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সাহায্যকারী আছে বলে মনে করতে পারো না কেন? এর কারণ কি?

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍۢ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ
يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٧١﴾ وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى
فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٧٢﴾ وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ
عَنِ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ۖ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ﴿٧٣﴾ وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا
قَلِيْلًا ﴿٧٤﴾ اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ
لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ﴿٧٥﴾

৮ রুকূ'

তারপর সেই দিনের কথা মনে করো যেদিন আমি মানুষের প্রত্যেকটি দলকে তার নেতা সহকারে ডাকবো। সেদিন যাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেয়া হবে তারা নিজেদের কার্যকলাপ পাঠ করবে[৮৬] এবং তাদের ওপর সামান্যতমও জুলুম করা হবে না আর যে ব্যক্তি এ দুনিয়াতে অন্ধ হয়ে থাকে সে আখেরাতেও অন্ধ হয়েই থাকবে বরং পথ লাভ করার ব্যাপারে সে অন্ধের চাইতেও বেশী ব্যর্থ।

হে মুহাম্মাদ! তোমার কাছে আমি যে অহী পাঠিয়েছি তা থেকে তোমাকে ফিরিয়ে রাখার জন্য এ লোকেরা তোমাকে বিভ্রাটের মধ্যে ঠেলে দেবার প্রচেষ্টায় কসুর করেনি, যাতে তুমি আমার নামে নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা তৈরী করো।[৮৭] যদি তুমি এমনটি করতে তাহলে তারা তোমাকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো। আর যদি আমি তোমাকে মজবুত না রাখতাম তাহলে তোমার পক্ষে তাদের দিকে কিছু না কিছু ঝুঁকে পড়া অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। কিন্তু যদি তুমি এমনটি করতে তাহলে আমি এ দুনিয়ায় তোমাকে দ্বিগুণ শাস্তির মজা টের পাইয়ে দিতাম এবং আখেরাতেও, তারপর আমার মোকাবিলায় তুমি কোন সাহায্যকারী পেতে না।[৮৮]

৮৫. অর্থাৎ এটা প্রকাশ্য দিবালোকের মতো সত্য যে, কোন জিন, ফেরেশ্‌তা বা গ্রহ-নক্ষত্র মানব জাতিকে পৃথিবী ও তার যাবতীয় বস্তুর ওপর কর্তৃত্ব দান করেনি। কোন

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا
يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٦﴾ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا
وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٧﴾

আর এরা এ দেশ থেকে তোমাকে উৎখাত করার এবং এখান থেকে তোমাকে বের করে দেবার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু যদি এরা এমনটি করে তাহলে তোমার পর এরা নিজেরাই এখানে বেশীক্ষণ থাকতে পারবে না।[৮৯]

এটি আমার স্থায়ী কর্মপদ্ধতি। তোমার পূর্বে আমি যে সব রসূল পাঠয়েছিলাম তাদের সবার ব্যাপারে একর্ম পদ্ধতি আরোপ করেছিলাম।[৯০] আর আমার কর্মপদ্ধতিতে তুমি কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না।

নবী বা অলী তাঁর নিজ সম্প্রদায়কে এ কর্তৃত্ব দান করেনি। নিশ্চিতভাবেই এটা আল্লাহরই দান এবং তাঁর অনুগ্রহ। তারপর মানুষ এহেন মর্যাদা লাভ করার পর আল্লাহর পরিবর্তে তাঁর সৃষ্টির সামনে মাথা অবনত করবে, মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় বোকামী ও মূর্খতা আর কী হতে পারে?

৮৬. কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় একথা বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন নেক লোকদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেয়া হবে এবং তারা সানন্দে তা দেখতে থাকবে বরং অন্যদেরকেও দেখাবে। অন্যদিকে অসৎলোকদের দুষ্কৃতির তালিকা তাদের বাঁ হাতে দেয়া হবে এবং তারা তা পাওয়ার সাথে সাথেই পেছন দিকে লুকাবার চেষ্টা করবে। এ প্রসংগে দেখুন সূরা আল হাক্কাহ ১৯–২৮ এবং ইনশিকাক ৭–১৩ আয়াত।

৮৭. বিগত দশ বারো বছর থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় যে অবস্থার সাথে যুঝছিলেন এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। তিনি যে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করছিলেন মক্কার কাফেররা তাকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। তারা চাচ্ছিল তিনি তাদের শিরক ও জাহেলী রসম রেওয়াজের সাথে কিছু না কিছু সমঝোতা করে নেবেন। এ উদ্দেশ্যে তারা তাঁকে ফিত্‌নার মধ্যে ঠেলে দেবার চেষ্টা করলো। তাঁকে ধোঁকা দিল, লোভ দেখালো, হুমকি দিল এবং মিথ্যা প্রচারণার তুফান ছুটালো। তারা তাঁর প্রতি জুলুম নিপীড়ন চালালো ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করলো। তাঁকে সামাজিকভাবে বয়কট করলো। একটি মানুষের সংকল্পকে ভেংগে গুড়িয়ে দেবার জন্য যা কিছু করা যেতে পারে তা সবই তারা করে ফেললো।

৮৮. এ সমগ্র কার্যবিবরণীর ওপর মন্তব্য প্রসংগে আল্লাহ দু'টি কথা বলেছেন। এক, যদি তুমি সত্যকে সত্য জানার পর মিথ্যার সাথে কোন আপোস করে নিতে তাহলে বিক্ষুব্ধ জাতি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যেতো ঠিকই কিন্তু আল্লাহর গযব তোমার ওপর নেমে পড়তো এবং তোমাকে দুনিয়ায় ও আখেরাত উভয় স্থানেই দ্বিগুণ সাজা দেয়া হতো। দুই,

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۖ
إِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ﴿٧٨﴾

৯ রুকূ'

নামায কায়েম করো[৯১] সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে[৯২] নিয়ে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত[৯৩] এবং ফজরে কুরআন পড়ারও ব্যবস্থা করো।[৯৪] কারণ ফজরের কুরআন পাঠ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।[৯৫]

মানুষ নবী হলেও আল্লাহর সাহায্য ও সুযোগ–সুবিধা তার সহযোগী না হলে শুধুমাত্র নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করে সে মিথ্যার তুফানের মোকাবিলা করতে পারে না। শুধুমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ধৈর্য ও অবিচলতার সাহায্যেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য ও ন্যায়ের ওপর পাহাড়ের মতো অটল থাকেন এবং বিপদের সয়লাব স্রোত তাঁকে একচুলও স্থানচ্যুত করতে পারেনি।

৮৯. এটি একটি সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী। সে সময় এটি তো নিছক একটি হুমকি মনে হচ্ছিল। কিন্তু দশ বারো বছরের মধ্যেই এর সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ হয়ে গেলো। এ সূরা নাযিলের এক বছর পর মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের জন্মভূমি থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করলো এবং এরপর ৮ বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হতে না হতেই তিনি বিজয়ীর বেশে মক্কা মুয়াযযমায় প্রবেশ করলেন। তারপর দু'বছরের মধ্যেই সমগ্র আরব ভূখণ্ড মুশরিক শূন্য করা হলো। এরপর যারাই এ দেশে বসবাস করেছে মুসলমান হিসেবেই বসবাস করেছে, মুশরিক হিসেবে কেউ সেখানে টিকতে পারেনি।

৯০. সকল নবীর ব্যাপারে আল্লাহ এ একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ যে জাতি তাদেরকে হত্যা ও দেশান্তরী করেছে, তারপর সে আর বেশীদিন স্বস্থানে অবস্থান করতে পারেনি। এরপর হয় আল্লাহর আযাব তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে অথবা কোন শত্রু ভাবাপন্ন জাতিকে তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে কিংবা সেই নবীর অনুসারীদের দ্বারা তাকে বিপর্যস্ত ও বিজিত করা হয়েছে।

৯১. পর্বত প্রমাণ সমস্যা ও সংকটের আলোচনা করার পর পরই নামায কায়েম করার হুকুম দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ মর্মে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত করেছেন যে, এ অবস্থায় একজন মুমিনের জন্য যে অবিচলতার প্রয়োজন হয় তা নামায কায়েমের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে।

৯২. دلوك الشمس এর অনুবাদ করেছি "সূর্য ঢলে পড়া।" অবশ্যি কোন কোন সাহাবা ও তাবেঈ "দুলূক" অর্থ নিয়েছেন সূর্যাস্ত। কিন্তু অধিকাংশের মতে এর অর্থ হচ্ছে দুপুরে সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়া। হযরত উমর, ইবনে উমর, আনাস ইবনে মালিক, আবু বারযাতাল আসলামী, হাসান বাস্‌রী, শা'বী, আতা, মুজাহিদ এবং একটি বর্ণনামতে ইবনে

আব্বাসও এ মতের সমর্থক। ইমাম মুহাম্মাদ বাকের ও ইমাম জাফর সাদেক থেকেও এই মত বর্ণিত হয়েছে। বরং কোন কোন হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও دلوك الشمس এর এ ব্যাখ্যাও উদ্ধৃত হয়েছে, যদিও এর সনদ তেমন বেশী শক্তিশালী নয়।

৯৩. غسق الليل এর অর্থ কেউ কেউ নিয়েছেন "রাতের পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যাওয়া।" আবার কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন মধ্যরাত। যদি প্রথম অর্থটি মেনে নেয়া হয় তাহলে এর মানে হবে এশার প্রথম ওয়াক্ত। আর দ্বিতীয় অর্থটি মেনে নিলে এখানে এশার শেষ ওয়াক্তের দিকে ইংগিত করা হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

৯৪. ফজর শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ভোর হওয়া বা প্রভাতের উদয় হওয়া। অর্থাৎ একেবারে সেই প্রথম লগ্নটি যখন প্রভাতের শুভ্রতা রাতের আঁধার চিরে উঁকি দিতে থাকে।

ফজরের কুরআন পাঠ মানে হচ্ছে, ফজরের নামায, কুরআন মজীদে নামাযের প্রতিশব্দ হিসেবে কোথাও 'সালাত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আবার কোথাও তার বিভিন্ন অংশের মধ্য থেকে কোন একটির নাম নিয়ে সমগ্র নামাযটি ধরা হয়েছে। যেমন তাসবীহ, যিকির, হাম্‌দ (প্রশংসা), কিয়াম (দাঁড়ানো) রুকূ', সিজ্‌দাহ ইত্যাদি। অনুরূপভাবে এখানে ফজরের সময় কুরআন পড়ার মানে শুধু কুরআন পাঠ করা নয় বরং নামাযে কুরআন পাঠ করা। এভাবে নামাযের উপাদান ও অংশ কি ধরনের হতে হবে কুরআন মজীদ সেদিকে পরোক্ষ ইংগিত দিয়েছে। আর এ ইংগিতের আলোকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের কাঠামো নির্মাণ করেন। বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে নামাযের এ কাঠামোই প্রচলিত।

৯৫. ফজরের কুরআন পরিলক্ষিত হওয়ার মানে হচ্ছে, আল্লাহর ফেরেশতারা এর সাক্ষী হয়। হাদীসে সুস্পষ্ট ভাষায় একথা বর্ণনা করা হয়েছে যদিও ফেরেশতারা প্রত্যেক নামায ও প্রত্যেক সৎকাজের সাক্ষী তবুও যখন ফজরের নামাযের কুরআন পাঠে তাদের সাক্ষের কথা বলা হয়েছে তখন এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, এ কাজটি একটি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাযে দীর্ঘ আয়াত ও সূরা পড়ার প...ত অবলম্বন করেন। সাহাবায়ে কেরামও তাঁর এ পদ্ধতি অনুসরণ করেন এবং পরবর্তী ইমামগণ একে মুস্‌তাহাব গণ্য করেন।

এ আয়াতে সংক্ষেপে মি'রাজের সময় যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছিল তার সময়গুলো কিভাবে সংগঠিত ও বিন্যস্ত করা হবে তা বলা হয়েছে। নির্দেশ দেয়া হয়েছে, একটি নামায পড়ে নিতে হবে সূর্যোদয়ের আগে। আর বাকি চারটি নামায সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে নিয়ে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত পড়ে নিতে হবে। তারপর এ হুমুকটি ব্যাখ্যা করার জন্য জিব্রীল আলাইহিস সালামকে পাঠানো হয়েছে। তিনি এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযগুলোর সঠিক সময়ের শিক্ষা দান করেছেন। আবু দাউদ ও তিরমিযীতে ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

"জিব্রীল দু'বার আমাকে বায়তুল্লাহর কাছাকাছি জায়গায় নামায পড়ান। প্রথম দিন যোহরের নামায ঠিক এমন সময় পড়ান যখন সূর্য সবেমাত্র হেলে পড়েছিল এবং ছায়া জুতার একটি ফিতার চাইতে বেশী লম্বা হয়নি। তারপর আসরের নামায পড়ান এমন এক সময় যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার দৈর্ঘের সমপরিমাণ ছিল। এরপর মাগরিবের নামায এমন সময় পড়ান যখন রোযাদার রোযা ইফতার করে। অতপর পশ্চিমাকাশের লালিমা খতম হবার পরপরই এশার নামায পড়ান আর ফজরের নামায পড়ান ঠিক যখন রোযাদারের ওপর খাওয়া দাওয়া হারাম হয়ে যায় তেমনি সময়। দ্বিতীয় দিন তিনি আমাকে যোহরের নামায এমন সময় পড়ান যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার দৈর্ঘের সমান ছিল। আসরের নামায পড়ান এমন সময় যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার দৈর্ঘের দ্বিগুণ ছিল। মাগরিবের নামায পড়ান এমন সময় যখন রোযাদার রোযা ইফতার করে। এশার নামায পড়ান এমন সময় যখন রাতের তিনভাগের একভাগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং ফজরের নামায পড়ান আলো চারদিকে ভালভাবে ছড়িয়ে পড়ার পর। তারপর জিব্রীল আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, হে মুহাম্মাদ! এই হচ্ছে নবীদের নামায পড়ার সময় এবং এ দু'টি সময়ের মাঝখানেই হচ্ছে নামাযের সঠিক সময়।" (অর্থাৎ প্রথম দিন প্রত্যেক নামাযের প্রথম সময় এবং দ্বিতীয় দিন শেষ সময় বর্ণনা করা হয়। প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায এ দু'টি সময়ের মাঝখানে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।)

কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায়ও পাঁচটি নামাযের এ ওয়াক্তসমূহের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। যেমন সূরা হূদে বলা হয়েছে ঃ

أَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ

"নামায কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তে (অর্থাৎ ফজর ও মাগরিব) এবং কিছু রাত পার হয়ে গেলে (অর্থাৎ এশা)।" (১১৪ আয়াত)

সূরা 'তা-হা'য়ে বলা হয়েছে ঃ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَاۤئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ –

"আর নিজের রবের হাম্‌দ (প্রশংসা) সহকারে তাঁর তাসবীহ (পবিত্রতা বর্ণনা) করতে থাকো সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজর) ও সূর্যাস্তের পূর্বে (আসর) এবং রাতের সময় আবার তাসবীহ করো (এশা) আর দিনের প্রান্তসমূহে (অর্থাৎ সকাল, যোহর ও মাগরিব)"
[১৩০ আয়াত]

তারপর সূরা রূমে বলা হয়েছে ঃ

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۝

"কাজেই আল্লাহর তাসবীহ করো যখন তোমাদের সন্ধ্যা হয় (মাগরিব) এবং যখন সকাল হয় (ফজর)। তাঁরই জন্য প্রশংসা আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে এবং তাঁর তাসবীহ করো দিনের শেষ অংশে (আসর) এবং যখন তোমাদের দুপুর (যোহর) হয়।"

[১৭-১৮ আয়াত]

নামাযের সময় নির্ধারণ করার সময় যেসব প্রয়োজনীয় দিকে নজর রাখা হয়েছে তার মধ্যে সূর্য পূজারীদের ইবাদাতের সময় থেকে দূরে থাকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সকল যুগেই সূর্য মুশরিকদের সবচেয়ে বড় বা অনেক বড় মাবুদের স্থান দখল করেছে। সূর্য উদয় ও অস্তের সময়টায়ই তারা বিশেষ করে তার পূজা করে থাকে। তাই এসব সময় নামায পড়াকে হারাম করা হয়েছে। তাছাড়া সাধারণত সূর্য উদয়ের পর থেকে নিয়ে মধ্য গগণে পৌঁছার সময়ে তার পূজা করা হয়ে থাকে। কাজেই ইসলামে হুকুম দেয়া হয়েছে, দিনের বেলার নামাযগুলো সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে পড়া শুরু করতে হবে এবং সকালের নামায সূর্য উদিত হবার আগেই পড়ে ফেলতে হবে। এ প্রয়োজনীয় বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে বর্ণনা করেছেন। একটি হাদীসে হযরত আমর ইবনে আবাসাহ (রা) বর্ণনা করছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযের সময় জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ

صل صلوة الصبح ثم اقصر عن الصلوة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرنى الشيطن وحينئذ يسجد له الكفار -

"ফজরের নামায পড়ো এবং সূর্য উদিত হতে থাকলে বিরত হও, সূর্য ওপরে উঠে যাওয়া পর্যন্ত। কারণ সূর্য যখন উদিত হয় তখন শয়তানের শিং দু'টির মাঝখান দিয়ে বের হতে থাকে এবং এ সময় কাফেররা তাকে সিজদা করে।"

তারপর তিনি আসরের নামাযের উল্লেখ করার পর বললেন ঃ

ثم اقصر عن الصلوة حتى تغرب الشمس فانها تغرب بين قرنى الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار -

"তারপর নামায থেকে বিরত হও সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত। কেননা, সূর্য শয়তানের শিং দু'টির মাঝখানে অস্ত যায় এবং এ সময় কাফেররা তার পূজা করে।" (মুসলিম)

এ হাদীসে সূর্যের শয়তানের শিংয়ের মাঝখান দিয়ে উদয় হওয়া ও অস্ত যাওয়াকে একটা রূপক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে এ ধারণা দেয়া হয়েছে যে সূর্যের উদয় ও অস্ত যাবার সময় শয়তান লোকদের জন্য একটি বিরাট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দেয়। লোকেরা যখন সূর্যের উদয় ও অস্ত যাবার সময় তার সামনে সিজদা করে তখন যেন মনে হয় শয়তান তাকে নিজের মাথায় করে এনেছে এবং মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে। রসূল (স) তাঁর নিজের নিম্নোক্ত বাক্য দিয়ে এ রূপকের রহস্য ভেদ করেছেন "এ সময় কাফেররা তার পূজা করে।"

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا
مَّحْمُوْدًا ﴿٧٩﴾ وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ
صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿٨٠﴾

আর রাতে তাহাজ্জুদ পড়ো[৯৬] এটি তোমার জন্য নফল।[৯৭] অচিরেই তোমার রব তোমাকে "প্রশংসিত স্থানে"[৯৮] প্রতিষ্ঠিত করবেন।

আর দোয়া করো ঃ হে আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে যেখানেই তুমি নিয়ে যাও সত্যতার সাথে নিয়ে যাও এবং যেখান থেকেই বের করো সত্যতার সাথে বের করো।[৯৯] এবং তোমার পক্ষ থেকে একটি কর্তৃত্বশীল পরাক্রান্ত শক্তিকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।[১০০]

৯৬. তাহাজ্জুদ মানে ঘুম ভেংগে উঠে পড়া। কাজেই রাতের বেলা তাহাজ্জুদ পড়ো মানে হচ্ছে, রাতের একটি অংশে ঘুমুবার পর উঠে নামায পড়ে নাও।

৯৭. নফল মানে ফরযের অতিরিক্ত। এ থেকে আপনা আপনি এ ইংগিত পাওয়া যায় যে, আগের আয়াতে যে পাঁচটি নামাযের ওয়াক্ত বর্ণনা করা হয়েছিল সেগুলো ফরয এবং এ ষষ্ঠ নামাযটি ফরযের অতিরিক্ত।

৯৮. অর্থাৎ দুনিয়ায় ও আখেরাতে তোমাদেরকে এমন মর্যাদায় পৌঁছে দেবেন যেখানে তোমরা মানুষের কাছে প্রশংসিত হয়ে থাকবে। চারদিক থেকে তোমাদের ওপর প্রশংসার স্রোত প্রবাহিত হতে থাকবে। তোমাদের অস্তিত্ব দুনিয়ায় একটি প্রশংসনীয় অস্তিত্বে পরিণত হবে। আজ তোমাদের বিরোধীরা গালাগালি ও নিন্দাবাদের মাধ্যমে তোমাদের অভ্যর্থনা করছে এবং সারাদেশে তোমাদের বদনাম করার জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের তুফান সৃষ্টি করে রেখেছে। কিন্তু সে সময় দূরে নয় যখন সারা দুনিয়ায় তোমাদের প্রশংসা শ্রুত হবে এবং আখেরাতেও তোমরা সমগ্র সৃষ্টির প্রশংসার অধিকারী হবে। কিয়ামতের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াতকারীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াও এ প্রশংসনীয় মর্যাদারই একটি অংশ।

৯৯. এ দোয়ার নির্দেশ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, হিজরতের সময় তখন একেবারে আসন্ন হয়ে উঠেছিল তাই বলা হয়েছে, তোমাদের এ মর্মে দোয়া করা উচিত যে, সত্যতা ও ন্যায়নিষ্ঠা যেন কোনক্রমেই তোমাদের হাতছাড়া না হয়। যেখান থেকেই বের হও সত্যতা, সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায় পরায়ণতার খাতিরেই বের হও এবং যেখানেই যাও সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে যাও।

১০০ অর্থাৎ তুমি নিজেই আমাকে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দান করো অথবা কোন রাষ্ট্র ক্ষমতাকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও, যাতে তার ক্ষমতা ব্যবহার করে আমি

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾ وَنُنَزِّلُ
مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّٰلِمِينَ
إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَٰنِ أَعْرَضَ وَنَـَٔا بِجَانِبِهِۦ
وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَـُٔوسًا ﴿٨٣﴾ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ ۖ
فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

আর ঘোষণা করে দাও, "সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, মিথ্যার তো বিলুপ্ত হবারই কথা।"[১০১]

আমি এই কুরআনের অবতরণ প্রক্রিয়ায় এমনসব বিষয় অবতীর্ণ করছি যা মুমিনদের জন্য নিরাময় ও রহমত এবং জালেমদের জন্য ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।[১০২] মানুষের অবস্থা হচ্ছে এই যে, যখন আমি তাকে নিয়ামত দান করি তখন সে গর্ব করে ও পিঠ ফিরিয়ে নেয় এবং যখন সামান্য বিপদের মুখোমুখি হয় তখন হতাশ হয়ে যেতে থাকে। হে নবী! এদেরকে বলে দাও, "প্রত্যেকে নিজ নিজ পথে কাজ করছে, এখন একমাত্র তোমাদের রবই ভাল জানেন কে আছে সরল সঠিক পথে।"

দুনিয়ার বিকৃত জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে পারি, অশ্লীলতা ও পাপের সয়লাব রুখে দিতে পারি এবং তোমার ন্যায় বিধান জারি করতে সক্ষম হই। হাসান বাস্‌রী ও কাতাদাহ এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন। ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীরের ন্যায় মহান তাফসীরকারগণও এ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীস থেকেও এরি সমর্থন পাওয়া যায় ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ

"আল্লাহ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে এমনসব জিনিসের উচ্ছেদ ঘটান কুরআনের মাধ্যমে যেগুলোর উচ্ছেদ ঘটান না।"

এ থেকে জানা যায়, ইসলাম দুনিয়ায় যে সংশোধন চায় তা শুধুমাত্র ওয়াজ–নসিহতের মাধ্যমে হতে পারে না বরং তাকে কার্যকর করার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতারও প্রয়োজন হয়। তারপর আল্লাহ নিজেই যখন তাঁর নবীকে এ দোয়া শিখিয়েছেন তখন এ থেকে একথাও প্রমাণ হয় যে, দীন প্রতিষ্ঠা ও শরীয়তী আইন প্রবর্তন এবং আল্লাহ প্রদত্ত দণ্ডবিধি জারী করার জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা হাসিল করার প্রত্যাশা করা এবং এ জন্য প্রচেষ্টা

চালানো শুধু জায়েযই নয় বরং কাংখিত ও প্রশংসিতও এবং অন্যদিকে যারা এ প্রচেষ্টা ও প্রত্যাশাকে বৈষয়িক স্বার্থ পূজা ও দুনিয়াদারী বলে আখ্যায়িত করে তারা ভুলের মধ্যে অবস্থান করছে। কোন ব্যক্তি যদি নিজের জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করতে চায় তাহলে তাকে বৈষয়িক স্বার্থ পূজা বলা যায়। কিন্তু আল্লাহর দীনের জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের প্রত্যাশা করা বৈষয়িক স্বার্থ পূজা নয় বরং আল্লাহর আনুগত্যের প্রত্যক্ষ দাবী।

১০১. এ ঘোষণা এমন এক সময় করা হয়েছিল যখন বিপুল সংখ্যক মুসলমান মক্কা ত্যাগ করে হাবৃশায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং বাদবাকি মুসলমানরা চরম অসহায় ও মজলুম অবস্থার মধ্যে মক্কা ও আশপাশের এলাকায় জীবন যাপন করছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের অবস্থাও সব সময় বিপদ সংকুল ছিল। সে সময় বাহ্যত বাতিলেরই রাজত্ব চলছিল। হকের বিজয়ের কোন দূরবর্তী সম্ভাবনাও কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু এ অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুকুম দেয়া হলো, তুমি বাতিল পন্থীদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দাও যে, হক এসে গেছে এবং বাতিল খতম হয়ে গেছে। এ সময় এ ধরনের ঘোষণা লোকদের কাছে নিছক কথার ফুলঝুরি ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি। তারা একে ঠাট্টা-মস্করা মনে করে উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এরপর মাত্র ৯টি বছর অতিক্রান্ত না হতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজয়ীর বেশে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করলেন এবং কা'বা ঘরে প্রবেশ করে সেখানে তিনশো ষাটটি মূর্তির আকারে যে বাতিলকে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল তাকে খতম করে দিলেন। বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী (স) কা'বার মূর্তিগুলোকে আঘাত করছিলেন এবং বলছিলেন ঃ

جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ○ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ -

১০২. অর্থাৎ যারা এ কুরআনকে নিজেদের পথপ্রদর্শক এবং নিজেদের জন্য আইনের কিতাব বলে মেনে নেয় তাদের জন্য তো এটি আল্লাহর রহমত এবং তাদের যাবতীয় মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক ও তামাদ্দুনিক রোগের নিরাময়। কিন্তু যেসব জালেম একে প্রত্যাখ্যান করে এবং এর পথনির্দেশনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করে এ কুরআন তাদেরকে এর নাযিল হবার বা একে জানার আগে তারা যে অবস্থায় ছিল তার ওপরও টিকে থাকতে দেয় না। বরং তাদেরকে আরো বেশী ক্ষতির মধ্যে ঠেলে দেয়। এর কারণ, যতদিন কুরআন আসেনি অথবা যতদিন তারা কুরআনের সাথে পরিচিত হয়নি ততদিন তাদের ক্ষতি ছিল নিছক মূর্খতা ও অজ্ঞতার ক্ষতি। কিন্তু যখন কুরআন তাদের সামনে এসে গেলো এবং সে হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেখিয়ে দিল তখন তাদের ওপর আল্লাহর দাবী অকাট্যভাবে সঠিক প্রমাণিত হয়ে গেলো। এখন যদি তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করে গোমরাহীর ওপর অবিচল থাকার জন্য জোর দেয় তাহলে এর অর্থ হয় তারা অজ্ঞ নয় বরং জালেম ও বাতিল পন্থী এবং সত্যের প্রতি বিরূপ। এখন তাদের অবস্থা হবে এমন ব্যক্তির মতো যে বিষ ও বিষের প্রতিশেধক উভয়টি দেখে বিষকে বেছে নেয়। নিজেদের গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার জন্য এখন তারা নিজেরাই হয় পুরোপুরি দায়ী এবং এরপর তারা যে কোন পাপ করে তার পূর্ণ শাস্তির অধিকারীও তারাই

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ۭ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ
مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ وَلَىِٕنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ
لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ۝ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۭ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ
عَلَيْكَ كَبِيْرًا ۝ قُلْ لَّىِٕنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا
بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
ظَهِيْرًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ
فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ۝

১০ রুকূ'

এরা তোমাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। বলে দাও, "এই রূহ আমার রবের হুকুমে আসে কিন্তু তোমরা সামান্য জ্ঞানই লাভ করেছো।"[১০৩] আর হে মুহাম্মাদ! আমি চাইলে তোমার কাছ থেকে সবকিছুই ছিনিয়ে নিতে পারতাম, যা আমি অহীর মাধ্যমে তোমাকে দিয়েছি, তারপর তুমি আমার মোকাবিলায় কোন সহায়ক পাবে না, যে তা ফিরিয়ে আনতে পারে। এই যে যা কিছু তুমি লাভ করেছো, এসব তোমার রবের অনুগ্রহ, আসলে তাঁর অনুগ্রহ তোমার প্রতি অনেক বড়।[১০৪] বলে দাও, যদি মানুষ ও জিন সবাই মিলে কুরআনের মতো কোন একটি জিনিস আনার চেষ্টা করে তাহলে তারা আনতে পারবে না, তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়ে গেলেও।[১০৫]

আমি এ কুরআনে লোকদেরকে নানাভাবে বুঝিয়েছি কিন্তু অধিকাংশ লোক অস্বীকার করার ওপরই অবিচল থাকে।

হয়। এটি অজ্ঞতার নয় বরং জেনে শুনে দুষ্টামি ও দুষ্কৃতিতে লিপ্ত হওয়ার ক্ষতি এবং অজ্ঞতার ক্ষতির চাইতে এর পরিমাণ বেশী হওয়া উচিত। একথাটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ছোট্ট তাৎপর্যবহ বাক্যের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : اَلْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَّكَ وَعَلَيْكَ অর্থাৎ কুরআন হয় তোমার সপক্ষে প্রমাণ আর নয়তো তোমার বিপক্ষে প্রমাণ।

১০৩. সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে যে এখানে রূহ মানে প্রাণ। অর্থাৎ লোকেরা জীবনীশক্তি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিল যে,

এর প্রকৃত স্বরূপ কি এবং এর জবাবে বলা হয়েছে, এটি আল্লাহর হুকুমে আসে। কিন্তু এ অর্থ গ্রহণ করতে আমি কোনক্রমেই সম্মত নই। কারণ এ অর্থ একমাত্র তখনই গ্রহণ করা যেতে পারে যখন পূর্বাপর আলোচনার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে এবং বক্তব্য বিষয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে এ আয়াতকে একটি একক বাক্য হিসেবে নেয়া হবে। নয়তো বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় রেখে বিচার করলে রূহকে প্রাণ অর্থে গ্রহণ করার ফলে আয়াতে মারাত্মক ধরনের সম্পর্কহীনতা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং এ বিষয়টির কোন যুক্তিসংগত কারণ বুঝা যায় না যে, যেখানে তিনটি আয়াতে কুরআনের নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র হবার এবং কুরআন অমান্যকারীদের জালেম ও নিয়ামত অস্বীকারকারী হবার কথা বলা হয়েছে এবং যেখানে পরবর্তী আয়াতগুলো আবার কুরআনের আল্লাহর কালাম হবার ওপর প্রমাণ পেশ করা হয়েছে সেখানে কোন্ সম্পর্কের ভিত্তিতে এ বিষয়বস্তু এসে গেছে যে, প্রাণীদের মধ্যে প্রাণ আসে আল্লাহর হুকুমে?

আলোচনার যোগসূত্রের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিচার করলে পরিষ্কার অনুভূত হয়, এখানে রূহ মানে "অহী" বা অহী বহনকারী ফেরেশ্‌তাই হতে পারে। মুশরিকদের প্রশ্ন আসলে এ ছিল যে, কুরআন তুমি কোথায় থেকে আনো? একথায় আল্লাহ বলেন, হে মুহাম্মাদ! তোমাকে লোকেরা রূহ অর্থাৎ কুরআনের উৎস অথবা কুরআন লাভ করার মাধ্যম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তাদেরকে বলে দাও, এ রূহ আসে আমার রবের হুকুমে। কিন্তু তোমাদের জ্ঞান এত কম যে, তোমরা মানুষের বাণী এবং আল্লাহর অহীর মাধ্যমে নাযিলকৃত বাণীর মধ্যে ফারাক করতে পারো না এবং এ বাণীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছো যে, কোন মানুষ এটি তৈরী করছে। শুধু যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ভাষণের সাথে আয়াতের যোগসূত্র রক্ষা করার প্রয়োজনেই এ ব্যাখ্যা প্রাধান্য লাভের যোগ্য তা নয় বরং কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানেও এ বিষয়বস্তুটি প্রায় এসব শব্দ সহকারেই বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা মুমিনে বলা হয়েছে ঃ

يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ

"তিনি নিজের হুকুমে নিজের যে বান্দার ওপর চান রূহ নাযিল করেন, যাতে লোকদের একত্র হবার দিন সম্পর্কে সে সতর্ক করে দিতে পারে।" (১৫ আয়াত)

সূরা শূরায় বলা হয়েছে ঃ

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ۭ مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ

"আর এভাবেই আমি নিজের হুকুমে তোমার প্রতি একটি রূহ পাঠিয়েছি, তুমি জানতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি।" (৫২ আয়াত)

পূর্ববর্তীদের মধ্যে ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদা (র) ও হাসান বাস্‌রীও (র) এ ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছেন। ইবনে জারীর এ ব্যাখ্যাকে কাতাদার বরাত দিয়ে ইবনে আব্বাসের উক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি একটি অদ্ভুত কথা লিখেছেন যে, ইবনে আব্বাস গোপনে এ মত ব্যক্ত করতেন। অন্যদিকে তাফসীরে রূহুল মা'আনী-এর লেখক হাসান ও কাতাদার এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ "রূহ বলতে জিব্রীলকে বুঝানো হয়েছে এবং প্রশ্ন আসলে এ ছিল যে, তা কিভাবে নাযিল হয় এবং কিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে অহী প্রক্ষিপ্ত হয়।"

১০৪. বাহ্যত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে আসলে কাফেরদেরকে কষ্ট দেয়া। কারণ তারা বলতো, কুরআন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের তৈরী বা গোপনে অন্য কোন লোকের কাছ থেকে শেখানো বাণী। তাদেরকে বলা হচ্ছে ঃ এ বাণী পয়গম্বর রচনা করেননি বরং আমি প্রদান করেছি এবং যদি আমি এ বাণী ছিনিয়ে নিই তাহলে এ ধরনের বাণী রচনা করে নিয়ে আসার ক্ষমতা পয়গম্বরের নেই। তাছাড়া দ্বিতীয় কোন শক্তিও নেই যে এ ব্যক্তিকে এ ধরনের মহাশক্তিধর কিতাব পেশ করার যোগ্য করে তুলতে পারে।

১০৫. ইতিপূর্বে কুরআন মজীদের আরো তিন জায়গায় এ চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। সূরা বাকারার ৩ রুকূ', সূরা ইউনুসের ৪ রুকূ' এবং সূরা হূদের ২ রুকূ'তে এ চ্যালেঞ্জ এসেছে। সামনে সূরা তূরের ২ রুকূ'তেও এ বিষয়বস্তু আসছে। এসব জায়গায় কাফেরদের যে অপবাদের জবাবে একথা বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই কুরআন রচনা করেছেন এবং অযথা এটাকে আল্লাহর কালাম বলে পেশ করছেন। এ ছাড়াও সূরা ইউনুসের ১৬ আয়াতে এ অপবাদ খণ্ডন করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ لَّوْشَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

"হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলো, আমি তোমাদের এ কুরআন শুনাবো এটা যদি আল্লাহ না চাইতেন, তাহলে আমি কখনোই শুনাতে পারতাম না বরং তোমাদের এর খবরও দিতে পারতাম না। আমি তো তোমাদের মধ্যেই জীবনের সুদীর্ঘকাল কাটিয়ে আসছি। তোমরা কি এতটুকুও বোঝ না?"

এ আয়াতগুলোতে কুরআন মজীদ আল্লাহর কালাম হবার সপক্ষে যে যুক্তি পেশ করা হয়েছে তা আসলে তিন ধরনের ঃ

এক ঃ এ কুরআন স্বীয় ভাষা, বর্ণনা পদ্ধতি, বিষয়বস্তু, আলোচনা, শিক্ষা ও গায়েবের খবর পরিবেশনের দিক দিয়ে একটি মু'জিযা। এর নজির উপস্থাপন করার ক্ষমতা মানুষের নেই। তোমরা বলছো একজন মানুষ এটা রচনা করেছে। কিন্তু আমি বলছি, সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ মিলেও এ ধরনের একটি কিতাব রচনা করতে পারবে না। বরং মুশরিকরা যে জিনদেরকে নিজেদের মাবুদ বানিয়ে রেখেছে এবং এ কিতাব যাদের মাবুদ হবার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আঘাত হানছে তারাও যদি কুরআন অস্বীকারকারীদেরকে সাহায্য করার জন্য একাট্টা হয়ে যায় তাহলে তারাও এদেরকে এ কুরআনের সমমানের একটি কিতাব রচনা করে দিয়ে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার যোগ্য করতে পারবে না।

দুই ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হঠাৎ তোমাদের মধ্যে বাইর থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেননি। বরং এ কুরআন নাযিলের পূর্বেও ৪০ বছর তোমাদের মধ্যেই বসবাস করেছেন। নবুওয়াত দাবী করার একদিন আগেও কি কখনো তোমরা তাঁর মুখে এই ধরনের কালাম এবং এই ধরনের বিষয়বস্তু ও বক্তব্য সম্বলিত বাণী শুনেছিলে? যদি না শুনে থাকো এবং নিশ্চিতভাবেই শুনোনি তাহলে কোন ব্যক্তির ভাষা, চিন্তাধারা,

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ﴿٩٠﴾ اَوْ تَكُوْنَ
لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ﴿٩١﴾
اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ
قَبِيْلًا ﴿٩٢﴾ اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ ؕ
وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ؕ قُلْ سُبْحَانَ
رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿٩٣﴾

তারা বলে, "আমরা তোমার কথা মানবো না যতক্ষণ না তুমি ভূমি বিদীর্ণ করে আমাদের জন্য একটি ঝরণাধারা উৎসারিত করে দেবে। অথবা তোমার খেজুর ও আংগুরের একটি বাগান হবে এবং তুমি তার মধ্যে প্রবাহিত করে দেবে নদী–নালা। অথবা তুমি আকাশ ভেংগে টুকরো টুকরো করে তোমার হুমকি অনুযায়ী আমাদের ওপর ফেলে দেবে। অথবা আল্লাহ ও ফেরেশ্‌তাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসবে। অথবা তোমার জন্য সোনার একটি ঘর তৈরী হবে। অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে এবং তোমার আরোহণ করার কথাও আমরা বিশ্বাস করবো না যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি একটি লিখিত পত্র আনবে, যা আমরা পড়বো।"— হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলো, পাক–পবিত্র আমার পরওয়ারদিগার, আমি কি একজন বাণীবাহক মানুষ ছাড়া অন্য কিছু?[১০৬]

তথ্যজ্ঞান এবং চিন্তা ও বর্ণনা ভংগীতে হঠাৎ রাতারাতি এ ধরনের পরিবর্তন সাধিত হতে পারে না, একথা কি তোমরা বুঝতে পারছো?

তিন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে কুরআন শুনিয়ে দিয়ে কোথাও অদৃশ্য হয়ে যান না বরং তোমাদের মধ্যেই থাকেন। তোমরা তাঁর মুখে কুরআন শুনে থাকো এবং অন্যান্য আলোচনা ও বক্তৃতাও শুনে থাকো। কুরআনের কালাম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের কালামের ভাষা ও বর্ণনা ভংগীর মধ্যে পার্থক্য এত বেশী যে কোন এক ব্যক্তির এ ধরনের দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্টাইল কোনক্রমে হতেই পারে না। এ পার্থক্যটা শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নিজের দেশের লোকদের মধ্যে বাস করতেন তখনই ছিল না বরং আজো হাদীসের কিতাবগুলোর মধ্যে তাঁর শত শত উক্তি ও ভাষণ অবিকৃত রয়েছে এগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। এগুলোর ভাষা ও বর্ণনাভংগীর সাথে কুরআনের ভাষা ও বর্ণনা–

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ
اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٤﴾ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ
لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٩٥﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٩٦﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ
فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ۖ
وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَأْوَاهُمْ
جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾

১১ রুকূ'

লোকদের কাছে যখনই কোন পথনির্দেশ আসে তখন তাদের একটা কথাই তাদের ঈমান আনার পথ রুদ্ধ করে দেয়। কথাটা এই যে, "আল্লাহ কি মানুষকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন?"[১০৭] তাদেরকে বলো, যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা নিশ্চিন্তভাবে চলাফেরা করতো তাহলে নিশ্চয়ই আমি কোন ফেরেশতাকেই তাদের কাছে রসূল বানিয়ে পাঠাতাম।[১০৮]

হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলে দাও, আমারও তোমাদের শুধু একমাত্র আল্লাহর সাক্ষই যথেষ্ট। তিনি নিজের বান্দাদের অবস্থা জানেন এবং সবকিছু দেখছেন।[১০৯]

যাকে আল্লাহ পথ দেখান সে-ই পথ লাভ করে এবং যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাদের জন্য তুমি তাঁকে ছাড়া আর কোন সহায়ক ও সাহায্যকারী পেতে পারো না।[১১০] এ লোকগুলোকে আমি কিয়ামতের দিন উপুড় করে টেনে আনবো অন্ধ, বোবা ও বধির করে।[১১১] এদের আবাস জাহান্নাম। যখনই তার আগুন স্তিমিত হতে থাকবে আমি তাকে আরো জোরে জ্বালিয়ে দেবো।

ভংগীর এত বেশী পার্থক্য লক্ষণীয় যে, ভাষা ও সাহিত্যের কোন উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ ও সমালোচক এ দু'টিকে এক ব্যক্তির কালাম বলে দাবী করতে পারেন না।

১০৬. মু'জিযা দাবী করার একটি জবাব এর আগে ৬ রুকূ'র وَمَا مَنَعْنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ আয়াতের মধ্যে এসে গেছে। এখানে এ দাবীর দ্বিতীয় জবাব দেয়া হয়েছে। এ

সংক্ষিপ্ত জবাবটির মধ্যে রয়েছে সাহিত্যের অতুলনীয় অলংকার। বিরোধীদের দাবী ছিল, যদি তুমি আল্লাহর নবী হয়ে থাকো তাহলে যমীনের দিকে ইশারা করো এবং তার ফলে অকস্মাৎ একটি ঝরণাধারা প্রবাহিত হোক, অথবা এখনই একটি সবুজ শ্যামল বাগান তৈরী হয়ে যাক এবং তার মধ্যে নদীনালা বয়ে চলুক। আকাশের দিকে ইশারা করো এবং সংগে সংগেই আকাশ ভেংগে চৌচির হয়ে তোমার বিরোধিতাকারীদের ওপর পড়ুক। একটা ফুঁক দাও এবং চোখের পলকে একটি সোনার প্রাসাদ গড়ে উঠুক। একটা আওয়াজ দাও এবং দেখতে না দেখেতেই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা সামনে এসে দাঁড়াক এবং তাঁরা সাক্ষ দিক যে, আমরা মুহাম্মাদকে পয়গম্বর করে পাঠিয়েছি। আমাদের চোখের সামনে আকাশে উঠে যাও এবং আল্লাহর কাছ থেকে একটি পত্র আমাদের নামে লিখিয়ে আনো। এ পত্রটি আমরা হাত দিয়ে স্পর্শ করবো এবং নিজেদের চোখে দেখে পড়বো।—এসব লম্বা চওড়া দাবী দাওয়ার জবাবে একথা বলেই শেষ করে দেয়া হয়েছে যে, "এদেরকে বলে দাও, আমার পরওয়ারদিগার পাক–পবিত্র! আমি একজন বাণীবাহক ছাড়া কি অন্য কিছু?" অর্থাৎ নির্বোধের দল! আমি কি আল্লাহ হবার দাবী করেছিলাম? তাহলে তোমরা কেন আমার কাছে এ দাবী করছো? আমি কবে তোমাদের বলেছিলাম, আমি সর্বশক্তিমান? আমি কবে বলেছিলাম, এ পৃথিবী ও আকাশে আমার শাসন চলছে? আমার দাবী তো প্রথম দিন থেকে এটিই ছিল যে, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বাণী বহনকারী একজন মানুষ। তোমাদের যদি যাচাই করতে হয় তাহলে আমার বাণী যাচাই করো। ঈমান আনতে হলে এ বাণীর সত্যতা ও যৌক্তিকতা যাচাই করে ঈমান আনো। আর অস্বীকার করতে হলে এ বাণীর মধ্যে কোন ত্রুটি বের করে দেখাও। আমার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে হলে একজন মানুষ হিসেবে আমার জীবন, চরিত্র ও কার্যকলাপ দেখো। এ সবকিছু বাদ দিয়ে তোমরা আমার কাছে এ যমীন চিরে ফেলা এবং আকাশ ভেংগে ফেলার কি সব উদ্ভট দাবী নিয়ে এসেছো? নবুওয়াতী কাজের সাথে এগুলোর কি সম্পর্ক?

১০৭. অর্থাৎ প্রত্যেক যুগের অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরা এ ভুল ধারণায় নিমজ্জিত থাকে যে, মানুষ কখনো রসূল হতে পারে না। তাই যখন কোন রসূল এসেছেন এবং তারা দেখেছে তিনি পানাহার করছেন, তাঁর স্ত্রী–সন্তানাদি আছে, তিনি রক্ত–মাংসের মানুষ তখন তারা ফায়সালা দিয়ে বসেছে যে, এ ব্যক্তি রসূল নয়, কারণ এতো মানুষ। আর তিনি চলে যাবার দীর্ঘকাল পর তাঁর ভক্তদের মধ্যে এমনসব লোক জন্ম নিতে থাকে যারা বলতে থাকে, তিনি মানুষ ছিলেন না, কারণ তিনি ছিলেন রসূল। ফলে কেউ তাঁকে আল্লাহ বানিয়েছে, কেউ বানিয়েছে আল্লাহর পুত্র, আবার কেউ বলেছে আল্লাহ তাঁর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিলেন। মোটকথা মানবিক সত্তা ও নবুওয়াতী সত্তার একই সত্তার মধ্যে একত্র হওয়া হামেশা মূর্খদের কাছে একটি হেঁয়ালি হয়েই থেকেছে।

১০৮. অর্থাৎ মানুষের কাছে গিয়ে পয়গাম শুনিয়ে দেয়া হলো, শুধু এতটুকুই নবীর কাজ নয়। বরং এ পয়গাম অনুযায়ী মানব জীবনের সংশোধন করাও তাঁর কাজ। তাঁকে এ পয়গামের মূলনীতিগুলোকে মানবিক অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে প্রয়োগ করতে হয়। নিজের জীবনেও এ নীতিগুলো বাস্তবায়িত করতে হয়। যে অসংখ্য মানুষ এ পয়গাম শুনার ও বুঝার চেষ্টা করে তাদের মনে যেসব জটিল প্রশ্ন জাগে সেগুলোর জবাব তাঁকে

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٩٨﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٩٩﴾ قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ﴿١٠٠﴾

এটা হচ্ছে তাদের এ কাজের প্রতিদান যে, তারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছে এবং বলেছে "যখন আমরা শুধুমাত্র হাড় ও মাটি হয়ে যাবো তখন কি আবার আমাদের নতুন করে পয়দা করে উঠানো হবে?" তারা কি খেয়াল করেনি, যে আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করার অবশ্যই ক্ষমতা রাখেন? তিনি তাদের হাশরের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন, যার আগমন অবধারিত। কিন্তু জালেমরা জিদ ধরেছে যে তারা তা অস্বীকারই করে যাবে।

হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলে দাও, যদি আমার রবের রহমতের ভাণ্ডার তোমাদের অধীনে থাকতো তাহলে তোমরা ব্যয় হয়ে যাবার আশংকায় নিশ্চিতভাবেই তা ধরে রাখতে। সত্যিই মানুষ বড়ই সংকীর্ণমনা।[১১২]

দিতে হয়। যারা এ পয়গাম গ্রহণ করে, এর শিক্ষাবলীর ভিত্তিতে একটি সমাজ গড়ে তোলার জন্য তাদেরকে সংগঠিত করার ও প্রশিক্ষণ দেবার দায়িত্বও তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। বিকৃতি ও ধ্বংসের সমর্থক শক্তিগুলোকে দাবিয়ে দেবার এবং যে সংস্কারের কর্মসূচী দিয়ে আল্লাহ নিজের নবী পাঠিয়েছেন তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তাঁকে অস্বীকার, বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের মোকাবিলায় প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে হয়। এসব কাজ যখন মানুষের মধ্যেই করতে হয় তখন এগুলোর জন্য মানুষ ছাড়া আর কাকে পাঠানো যায়? ফেরেশতা তো বড় জোর এসে পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়ে চলে যেতো। মানুষের মধ্যে মানুষের মতো বসবাস করে মানুষের মতো কাজ করা এবং তারপর আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী মানুষের জীবনে সংস্কার সাধন করে দেখিয়ে দেয়া কোন ফেরেশতার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। একজন মানুষই ছিল এ কাজের উপযোগী।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ﴿١٠١﴾

১২ রুকূ'

আমি মূসাকে নয়টি নিদর্শন দিয়েছিলাম, সেগুলো সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।[১১৩] এখন নিজেরাই তোমরা বনী ইস্‌রাঈলকে জিজ্ঞেস করে দেখে নাও যখন সেগুলো তাদের সামনে এলো তখন ফেরাউন তো একথাই বলেছিল, "হে মূসা! আমার মতে তুমি অবশ্যই একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি।"[১১৪]

১০৯. অর্থাৎ যেসব বহুবিধ পদ্ধতিতে আমি তোমাদের বুঝাচ্ছি এবং তোমাদের অবস্থার সংস্কার সাধনের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছি তাও আল্লাহ জানেন। আর তোমরা আমার বিরুদ্ধে যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছো তাও আল্লাহ দেখছেন। এসব কিছুর পর শেষ পর্যন্ত ফায়সালা তাঁকেই করতে হবে। তাই শুধুমাত্র তাঁর জানা ও দেখাই যথেষ্ট।

১১০. অর্থাৎ যার ভ্রষ্টতা প্রীতি ও হঠকারিতার কারণে আল্লাহ তার জন্য সঠিক পথের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন এবং যাকে আল্লাহ এমনসব ভ্রষ্টতার দিকে ঠেলে দিয়েছেন যেদিকে সে যেতে চাচ্ছিল, তাকে এখন সঠিক পথের দিকে নিয়ে আসার ক্ষমতা আর কার আছে? যে ব্যক্তি সত্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মিথ্যার ওপর নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট হয়ে যেতে চেয়েছে এবং যার এ দুর্মতি দেখে আল্লাহও তার জন্য এমন সব কার্যকারণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যেগুলোর মাধ্যমে সত্যের প্রতি তার ঘৃণা এবং মিথ্যার প্রতি আসক্তি আরো বেশী বেড়ে গেছে, তাকে দুনিয়ার কোন্ শক্তি মিথ্যা থেকে দূরে সরিয়ে নিতে এবং সত্যের ওপর বহাল করতে পারে? যে নিজে ভুল পথে চলতে চায় তাকে জোর করে সঠিক পথে নিয়ে আসা আল্লাহর নিয়ম নয়। আর মানুষের মনের পরিবর্তন সাধন করার ক্ষমতা আল্লাহর ছাড়া আর কারো নেই।

১১১. অর্থাৎ দুনিয়ায় তারা যে অবস্থায় ছিল, সত্যকে দেখতে পেতো না, সত্য কথা শুনতে পেতো না এবং সত্য কথা বলতো না, ঠিক তেমনিভাবেই কিয়ামতেও তাদেরকে উঠানো হবে।

১১২. ইতিপূর্বে ৬ রুকূ'র وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আয়াতে যে বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছিল এখানে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। মক্কার মুশরিকরা যেসব মনস্তাত্বিক কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত অস্বীকার করতো তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এ ছিল যে, এভাবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব তাদের মেনে নিতে হতো। আর সাধারণত মানুষ সমকালীন ও কোন পরিচিত–সহযোগীর শ্রেষ্ঠত্ব খুব কমই মেনে নিতে প্রস্তুত হয়। এ প্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে, যাদের কৃপণতার অবস্থা হচ্ছে এই যে, কারো যথার্থ মর্যাদার স্বীকৃতি দিতেও যারা মনে ব্যথা পায়, তাদের হাতে যদি আল্লাহ নিজের রহমতের চাবিগুলো দিয়ে দেন তাহলে তারা কাউকে একটি কানাকড়িও দেবে না।

১১৩. এখানে আবার মক্কার কাফেরদের মু'জিযা পেশ করার দাবীর জবাব দেয়া হয়েছে এবং এটি তৃতীয় জবাব। কাফেররা বলতো, আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবো না যতক্ষণ না তুমি অমুক অমুক কাজগুলো করে দেখাবে। জবাবে তাদেরকে বলা হচ্ছে, তোমাদের পূর্বে ফেরাউনকে এমনিতর সুস্পষ্ট মু'জিযা এক দু'টি নয় পরপর ৯টি দেখানো হয়েছিল। তারপর তোমরা জানো মেনে নেবার প্রবণতাই যার ছিল না সে এগুলো দেখে কি বললো? আর এটাও জানো যে, মু'জিযা দেখার পরও যখন সে নবীকে অস্বীকার করলো তখন তার পরিণতি কি হলো?

এখানে যে ন'টি নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে এর আগে সূরা আরাফেও সেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ (১) লাঠি, যা সাপে পরিণত হতো। (২) সাদা হাত, যা বগলের ভেতর থেকে বের করার পর সূর্যের মতো চমকাতে থাকতো। (৩) যাদুকরদের যাদুকে প্রকাশ্য জনসমক্ষে পরাভূত করা। (৪) এক ঘোষণা অনুযায়ী সারা দেশ দুর্ভিক্ষ কবলিত হওয়া এবং তারপর একের পর এক (৫) তুফান, (৬) পংগপাল, (৭) শস্যকীট, (৮) ব্যাং এবং (৯) রক্তের আপদ নাযিল হওয়া।

১১৪. মক্কার মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে উপাধি দিতো এটি সেই একই উপাধি। এ সূরার ৫ রুকূ'তে এদের এ উক্তিও এসেছে ঃ

اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا (তোমরা তো একজন যাদুগ্রস্ত লোকের পেছনে ছুটে চলছো।) এখন এদেরকে বলা হচ্ছে, ঠিক এ একই উপাধিতে ফেরাউন মূসা আলাইহিস সালামকে ভূষিত করেছিল।

এখানে আর একটি আনুসংগিক বিষয়ও রয়েছে। সেদিকে ইংগিত করে দেয়া আমি জরুরী মনে করি। বর্তমান যুগে হাদীস অস্বীকারকারী গোষ্ঠী হাদীসের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি উঠিয়েছে তার মধ্যে একটি আপত্তি হচ্ছে এই যে, হাদীসের বক্তব্য মতে একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদুর প্রভাব পড়েছিল। অথচ কুরআনের দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে, একজন যাদু প্রভাবিত ব্যক্তি এটা ছিল কাফেরদের একটি মিথ্যা অপবাদ। হাদীস অস্বীকারকারীরা বলেন, এভাবে হাদীস বর্ণনাকারীগণ কুরআনকে মিথ্যুক এবং মক্কার কাফেরদেরকে সত্যবাদী প্রতিপন্ন করেছেন। কিন্তু এখানে দেখুন কুরআনের দৃষ্টিতে হযরত মূসার ওপরও ফেরাউনের এ একই মিথ্যা দোষারোপ ছিল যে, আপনি একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি। আবার কুরআন নিজেই সূরা ত্বা-হা'য় বলছে ঃ

فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى - فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى -

"যখন যাদুকররা নিজেদের দড়াদড়ি ছুঁড়ে দিল তখন অকস্মাৎ তাদের যাদুর ফলে মূসার মনে হতে লাগলো যে তাদের লাঠি ও দড়িগুলো দৌড়ে চলেছে। কাজেই মূসা মনে মনে ভয় পেয়ে গেলো।"

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ
بَصَآئِرَ ۚ وَإِنِّى لَأَظُنُّكَ يَٰفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿١٠٢﴾

মূসা এর জবাবে বললো, "তুমি খুব ভাল করেই জানো এ প্রজ্ঞাময় নিদর্শনগুলো আকাশ ও পৃথিবীর রব ছাড়া আর কেউ নাযিল করেননি[১১৫] আর আমার মনে হয় হে ফেরাউন! তুমি নিশ্চয়ই একজন হতভাগা ব্যক্তি।[১১৬]

এ শব্দগুলো কি সুস্পষ্টভাবে একথা প্রকাশ করছে না যে, হযরত মূসা সে সময় যাদু প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন? হাদীস অস্বীকারকারীগণ কি এ প্রসংগেও বলতে প্রস্তুত আছেন যে, কুরআন নিজেই নিজেকে মিথ্যা এবং ফেরাউনের মিথ্যা অপবাদকে সত্য প্রতিপন্ন করেছে?

আসলে এ ধরনের আপত্তি উত্থাপনকারীরা জানেন না যে, মক্কার কাফেররা ও ফেরাউন কোন্ অর্থে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত মূসাকে 'যাদুগ্রস্ত' বলতো। তাদের বক্তব্য ছিল, কোন শত্রু যাদু করে তাঁদেরকে পাগল বানিয়ে দিয়েছে এবং এ পাগলামির প্রভাবে তারা নবুওয়াতের দাবী করছেন এবং একটি সম্পূর্ণ অভিনব বাণী শুনাচ্ছেন। কুরআন তাদের এ অপবাদকে মিথ্যা গণ্য করেছে। তবে সাময়িকভাবে কোন ব্যক্তির শরীরে বা শরীরের কোন অনুভূতিতে যাদুর প্রভাব পড়ার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। এটা ঠিক এ রকম ব্যাপার যেমন কারোর গায়ে পাথর মারলে সে আহত হয়। কাফেরদের অপবাদ এ ধরনের ছিল না। কুরআনও এ ধরনের অপবাদের প্রতিবাদ করেনি। এ ধরনের কোন সাময়িক প্রতিক্রিয়ায় নবীর মর্যাদা প্রভাবিত হয় না। নবীর ওপর যদি বিষের প্রভাব পড়তে পারে, নবী যদি আহত হতে পারেন, তাহলে তাঁর ওপর যাদুর প্রভাবও পড়তে পারে। এর ফলে নবুওয়াতের মর্যাদা বিনষ্ট হতে পারে কি কারণে? নবীর মন-মস্তিষ্ক যদি যাদুর প্রভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়ে, এমনকি তিনি যাদুর প্রভাবাধীনেই কথা বলতে ও কাজ করতে থাকেন তাহলেই এর ফলে নবুওয়াতের মর্যাদা বিনষ্ট হতে পারে। সত্য বিরোধীরা হযরত মূসা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে এ অপবাদ দিতো এবং কুরআন এরই প্রতিবাদ করেছে।

১১৫. একথা হযরত মূসা (আ) এ জন্য বলেন যে, কোন দেশে দুর্ভিক্ষ লাগা বা লাখো বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত এলাকায় ধ্বংসের বিভীষিকা নিয়ে পংগপালের মতো ব্যাঙ বের হয়ে আসা অথবা শস্য গুদামগুলোয় ব্যাপকভাবে পোকা লেগে যাওয়া এবং এ ধরনের অন্যান্য জাতীয় দুর্যোগ দেখা দেয়া কোন যাদুকরের যাদুর বলে বা কোন মানুষের ক্ষমতায় সম্ভবপর ছিল না। তারপর যখন প্রত্যেকটি দুর্যোগ শুরু হওয়ার পূর্বে হযরত মূসা ফেরাউনকে এ বলে নোটিশ দিতেন যে, তোমার হঠকারিতা থেকে বিরত না হলে এ দুর্যোগটি তোমার রাজ্যে চেপে বসবে এবং ঠিক তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী সেই দুর্যোগটি সমগ্র রাজ্যকে গ্রাস করে ফেলতো, তখন এ অবস্থায় কেবলমাত্র একজন পাগল ও চরম হঠকারী ব্যক্তিই একথা বলতে পারতো যে, এ বিপদ ও দুর্যোগগুলো পৃথিবী ও আকাশ-মণ্ডলীর একচ্ছত্র অধিপতি ছাড়া অন্য কেউ নাযিল করেছে।

فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾ وَقُلْنَا
مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ
جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٤﴾ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ
وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا ﴿١٠٦﴾ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ۚ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾
وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾

শেষ পর্যন্ত ফেরাউন মূসা ও বনী ইস্‌রাঈলকে দুনিয়ার বুক থেকে উৎখাত করার সংকল্প করলো। কিন্তু আমি তাকে ও তার সংগী-সাথীদেরকে এক সাথে ডুবিয়ে দিলাম এবং এরপর বনী ইস্‌রাঈলকে বললাম, এখন তোমরা পৃথিবীতে বসবাস করো,[১১৭] তারপর যখন আখেরাতের প্রতিশ্রুতির সময় এসে যাবে তখন আমি তোমাদের সবাইকে এক সাথে হাযির করবো।

এ কুরআনকে আমি সত্য সহকারে নাযিল করেছি এবং সত্য সহকারেই এটি নাযিল হয়েছে। আর হে মুহাম্মাদ! তোমাকে আমি এ ছাড়া আর কোন কাজে পাঠাইনি যে, (যে মেনে নেবে তাকে) সুসংবাদ দিয়ে দেবে এবং (যে মেনে নেবে না তাকে) সাবধান করে দেবে।[১১৮] আর এ কুরআনকে আমি সামান্য সামান্য করে নাযিল করেছি, যাতে তুমি থেমে থেমে তা লোকদেরকে শুনিয়ে দাও এবং তাকে আমি (বিভিন্ন সময়) পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি।[১১৯] হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলে দাও, তোমরা একে মানো বা না মানো, যাদেরকে এর আগে জ্ঞান দেয়া হয়েছে[১২০] তাদেরকে যখন এটা শুনানো হয় তখন তারা আনত মস্তকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং বলে ওঠে, "পাক-পবিত্র আমাদের রব, আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি তো পূর্ণ হয়েই থাকে।"[১২১]

১১৬. অর্থাৎ আমি তো যাদুগ্রস্ত নই, তবে তোমার ওপর নিশ্চয়ই দুর্ভাগ্যের পদাঘাত হয়েছে। আল্লাহর এ নিদর্শনগুলো একের পর এক দেখার পরও তোমার নিজের

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ
أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرْ
بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ
لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن
لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾

এবং তারা নত মুখে কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং তা শুনে তাদের দীনতা আরো বেড়ে যায়।[১২২]

হে নবী! এদেরকে বলে দাও, আল্লাহ বা রহমান যে নামেই ডাকো না কেন তাঁর জন্য সবই ভাল নাম।[১২৩] *আর নিজের নামায খুব বেশী উচ্চ কণ্ঠেও পড়বে না, বেশী ক্ষীণ কণ্ঠেও না, বরং এ দু'য়ের মাঝামাঝি মধ্যম পর্যায়ের কণ্ঠস্বর অবলম্বন করবে।*[১২৪] *আর বলো, "সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি কোন পুত্রও গ্রহণ করেননি। তাঁর বাদশাহীতে কেউ শরীকও হয়নি এবং তিনি এমন অক্ষমও নন যে, কেউ তাঁর সাহায্যকারী ও নির্ভর হবে।"*[১২৫] *আর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো, চূড়ান্ত পর্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব।*

হঠকারিতার ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা একথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয় যে, তোমার কপাল পুড়েছে।

১১৭. এটিই হচ্ছে এ কাহিনীটি বর্ণনা করার মূল উদ্দেশ্য। মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদেরকে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরবের মাটি থেকে উৎখাত করার লক্ষে কাজ করে যাচ্ছিল। তাই তাদেরকে শুনানো হচ্ছে, ফেরাউন এসব কিছু করতে চেয়েছিল মূসা ও বনী ইস্‌রাঈলের সাথে। কিন্তু কার্যত হয়েছে এই যে, ফেরাউন ও তার সাগীদেরকে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে এবং পৃথিবীতে মূসা ও তার অনুসারীদেরকে বসবাস করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন তোমরাও যদি এ একই পথ অবলম্বন করো তাহলে তোমাদের পরিণামও এর থেকে ভিন্ন কিছু হবে না।

১১৮. অর্থাৎ তোমাদের একথা বলা হয়নি যে, যারা কুরআনের শিক্ষাবলী যাচাই করে হক ও বাতিলের ফায়সালা করতে প্রস্তুত নয় তাদেরকে তোমরা ঝরণাধারা প্রবাহিত করে, বাগান তৈরী করে এবং আকাশ চিরে কোন না কোনভাবে মুমিন বানাবার চেষ্টা করবে। বরং তোমাদের কাজ শুধুমাত্র এতটুকুই ঃ তোমরা লোকদের সামনে হক কথা

পেশ করে দাও, তারপর তাদেরকে পরিষ্কার জানিয়ে দাও, যে একথা মেনে নেবে সে ভাল কাজ করবে এবং যে মেনে নেবে না সে খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হবে।

১১৯. এটি বিরোধীদের একটি সংশয়ের জবাব। তারা বলতো, আল্লাহর পয়গাম পাঠাবার দরকার হলে সম্পূর্ণ পয়গাম এক সংগে পাঠান না কেন? এভাবে থেমে থেমে সামান্য সামান্য পয়গাম পাঠানো হচ্ছে কেন? আল্লাহকেও কি মানুষের মতো ভেবে চিন্তে কথা বলতে হয়? এ সংশয়ী বক্তব্যের বিস্তারিত জবাব সূরা নাহ্‌লের ১৪ রুকূ'র প্রথম দিকের আয়াতগুলোতে দেয়া হয়েছে। সেখানে আমি এর ব্যাখ্যা করেছি। তাই এখানে এর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন বোধ করছি না।

১২০. অর্থাৎ যে আহলি কিতাব গোষ্ঠী আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষা সম্পর্কে অবগত এবং যারা তার বাচনভংগীর সাথে পরিচিত।

১২১. অর্থাৎ কুরআন শুনার সাথে সাথেই তারা বুঝতে পারে, যে নবীর আগমনের প্রতিশ্রুতি পূর্ববর্তী নবীগণের সহীফাসমূহে দেয়া হয়েছিল তিনি এসে গেছেন।

১২২. আহলি কিতাবদের সত্যনিষ্ঠ ও সৎকর্মশীল লোকদের এ মনোভাব ও প্রতিক্রিয়ার কথা কুরআন মজীদের বহু জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আলে ইমরান ১২ ও ২০ রুকূ' এবং আল মায়েদার ১১ রুকূ' দেখুন।

১২৩. এটি মুশরিকদের একটি আপত্তির জবাব। তারা এ মর্মে আপত্তি জানিয়েছিল যে, স্রষ্টার নাম "আল্লাহ" এটা আমরা শুনেছিলাম কিন্তু এ "রহমান" নাম কোথায় থেকে আনলে? তাদের মধ্যে যেহেতু আল্লাহর এ নামের প্রচলন ছিল না তাই তারা তাঁর রহমান নাম শুনে নাক সিটকাতো।

১২৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মক্কায় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা সাহাবীগণ নামায পড়ার সময় উচ্চকণ্ঠে কুরআন পড়তেন তখন কাফেররা শোরগোল করতো এবং অনেক সময় এক নাগাড়ে গালিগালাজ করতো। এ জন্য হুকুম দেয়া হলো, এমন উচ্চস্বরে পড়ো না যাতে কাফেররা শুনে হৈ-হুল্লোড় করতে পারে আবার এমন নিচু স্বরেও পড়ো না যা তোমাদের নিজেদের সাথীরাও শুনতে না পায়। কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট অবস্থার সাথে এ হুকুম সম্পৃক্ত ছিল। মদীনায় যখন অবস্থা বদলে গেলো তখন আর এ হুকুম কার্যকর থাকেনি। তবে হাঁ, মুসলমানরা যখনই মক্কার মতো অবস্থার সম্মুখীন হয় তখনই তাদের এ নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা উচিত।

১২৫. যেসব মুশরিক বিভিন্ন দেবতা ও জ্ঞানী গুণী মহামানবদের সম্পর্কে বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ নিজের সার্বভৌম কর্তৃত্বের বিভিন্ন বিভাগ এবং নিজের রাজত্বের বিভিন্ন এলাকা তাদের ব্যবস্থাপনায় দিয়ে দিয়েছেন তাদের এ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এ বাক্যে রয়েছে একটি সূক্ষ্ম বিদ্রূপ। এ অর্থহীন বিশ্বাসটির পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ নিজে তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বের বোঝা বহন করতে অক্ষম। তাই তিনি নিজের জন্য কোন সাহায্যকারী ও নির্ভর তালাশ করে বেড়াচ্ছেন। তাই বলা হয়েছে, আল্লাহ অক্ষম নন। তাঁর কোন ডেপুটি, সহকারী ও সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই।

আল কাহ্‌ফ

১৮

নামকরণ

প্রথম রুকূ'র ৯ আয়াত اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এ নাম দেবার মানে হচ্ছে এই যে, এটা এমন একটা সূরা যার মধ্যে আল কাহ্‌ফ শব্দ এসেছে।

নাযিলের সময়-কাল

এখান থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনের তৃতীয় অধ্যায়ে অবতীর্ণ সূরাগুলো শুরু হচ্ছে। মক্কী জীবনকে আমি চারটি বড় বড় অধ্যায়ে ভাগ করেছি। সূরা আন'আমের ভূমিকায় এর বিস্তারিত বিবরণ এসে গেছে। এ বিভাগ অনুযায়ী তৃতীয় অধ্যায়টি প্রায় ৫ নববী সন থেকে শুরু হয়ে ১০ নববী সন পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোর মোকাবিলায় এ অধ্যায়টির বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, পূর্ববর্তী অধ্যায় দু'টিতে কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এবং তাঁর আন্দোলন ও জামায়াতকে বিপর্যস্ত করার জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উপহাস, ব্যাংগ-বিদ্রূপ, আপত্তি, অপবাদ, দোষারোপ, ভীতি প্রদর্শন, লোভ দেখানো ও বিরুদ্ধ প্রচারণার ওপর নির্ভর করছিল। কিন্তু এ তৃতীয় অধ্যায়ে এসে তারা জুলুম, নিপীড়ন, মারধর ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির অস্ত্র খুব কড়াকড়িভাবে ব্যবহার করে। এমনকি বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে দেশ ত্যাগ করে হাবশার দিকে যেতে হয়। আর বাদবাকি মুসলমানদের এবং তাদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবার ও বংশের লোকদের আবু তালেব গিরি গুহায় পূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কটের মধ্যে অবরুদ্ধ জীবন যাপন করতে হয়। তবুও এ যুগে আবু তালেব ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজার (রা) ন্যায় দু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রভাবের ফলে কুরাইশদের দু'টি বড় বড় শাখা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পৃষ্ঠপোষকতা করছিল। ১০ নববী সনে এ দু'জনের মৃত্যুর সাথে সাথেই এ অধ্যায়টির সমাপ্তি ঘটে। এরপর শুরু হয় চতুর্থ অধ্যায়। এ শেষ অধ্যায়ে মুসলমানদের মক্কায় জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমনকি শেষ পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত মুসলমানদের নিয়ে মক্কা ত্যাগ করতে হয়।

সূরা কাহ্‌ফের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করলে বুঝা যায়, মক্কী যুগের এ তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই এ সূরাটি নাযিল হয়ে থাকবে। এ সময় জুলুম, নিপীড়ন, বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু তখনো মুসলমানরা হাবশায় হিজরত করেনি। তখন যেসব মুসলমান নির্যাতিত হচ্ছিল তাদেরকে আসহাবে কাহ্‌ফের কাহিনী শুনানো হয়, যাতে তাদের হিম্মত বেড়ে যায় এবং তারা জানতে পারে যে, ঈমানদাররা নিজেদের ঈমান বাঁচাবার জন্য ইতিপূর্বে কি করেছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

মক্কার মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরীক্ষা নেবার জন্য আহ্‌লি কিতাবদের পরামর্শক্রমে তাঁর সামনে যে তিনটি প্রশ্ন করেছিল তার জবাবে এ সূরাটি নাযিল হয়। প্রশ্ন তিনটি ছিল ঃ এক, আসহাবে কাহ্‌ফ কারা ছিলেন? দুই, খিযিরের ঘটনাটি এবং তার তাৎপর্য কি?[১] তিন, যুলকারনাইনের ঘটনাটি কি? এ তিনটি কাহিনীই খৃষ্টান ও ইহুদীদের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত ছিল। হিজাযে এর কোন চর্চা ছিল না। তাই আহ্‌লি কিতাবরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সত্যিই কোন গায়েবী ইল্‌মের মাধ্যম আছে কিনা তা জানার জন্যই এগুলো নির্বাচন করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাঁর নবীর মুখ দিয়ে কেবল এগুলোর পূর্ণ জবাব দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং এ সংগে এ ঘটনা তিনটিকে সে সময় মক্কায় কুফর ও ইসলামের মধ্যে যে অবস্থা বিরাজ করছিল তার সাথে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে দিয়েছেন।

এক ঃ আসহাবে কাহ্‌ফ সম্পর্কে বলেন, এ কুরআন যে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করছে তারা ছিলেন তারই প্রবক্তা। তাদের অবস্থা মক্কার এ মুষ্টিমেয় মজলুম মুসলমানদের অবস্থা থেকে এবং তাদের জাতির মনোভাব ও ভূমিকা মক্কার কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের ভূমিকা থেকে ভিন্নতর ছিল না। তারপর এ কাহিনী থেকে ঈমানদারদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যদি কাফেররা সীমাহীন ক্ষমতা ও আধিপত্যের অধিকারী হয়ে গিয়ে থাকে এবং তাদের জুলুম-নির্যাতনের ফলে সমাজে একজন মুমিন শ্বাসগ্রহণ করারও অধিকার হারিয়ে বসে তবুও তার বাতিলের সামনে মাথা নত না করা উচিত বরং আল্লাহর ওপর ভরসা করে দেশ থেকে বের হয়ে যাওয়া উচিত। এ প্রসংগে আনুসংগিকভাবে মক্কার কাফেরদেরকে একথাও বলা হয়েছে যে, আসহাবে কাহ্‌ফের কাহিনী আখেরাত বিশ্বাসের নির্ভুলতার একটি প্রমাণ। যেভাবে আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহ্‌ফকে সুদীর্ঘকাল মৃত্যু নিদ্রায় বিভোর করে রাখার পর আবার জীবিত করে তোলেন ঠিক তেমনিভাবে মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন মেনে নিতে তোমরা অস্বীকার করলে কি হবে, তা আল্লাহর ক্ষমতার বাইরে নয়।

দুই ঃ মক্কার সরদার ও সচ্ছল পরিবারের লোকেরা নিজেদের জনপদের ক্ষুদ্র নও মুসলিম জামায়াতের ওপর যে জুলুম নিপীড়ন চালাচ্ছিল এবং তাদের সাথে যে ঘৃণা ও লাঞ্ছনাপূর্ণ আচরণ করছিল আসহাবে কাহ্‌ফের কাহিনীর পথ ধরে সে সম্পর্কে আলোচনা শুরু করা হয়েছে। এ প্রসংগে একদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এ জালেমদের সাথে কোন আপোস করবে না এবং নিজের গরীব সাথীদের মোকাবিলায় এ বড় লোকদেরকে মোটেই গুরুত্ব দেবে না। অন্যদিকে এ ধনী ও সরদারদেরকে এ মর্মে নসীহত করা হয়েছে যে, নিজেদের দু'দিনের আয়েশী জীবনের চাকচিক্য দেখে ফুলে যেয়ো না বরং চিরন্তন ও চিরস্থায়ী কল্যাণের সন্ধান করো।

১. হাদীসে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল রূহ সম্পর্কে। বনী ইসরাঈলের ১০ রুকূ'তে এর জবাব দেয়া হয়েছে। কিন্তু সূরা কাহ্‌ফ ও বনী ইসরাঈলের নাযিলের সময়কালের মধ্যে রয়েছে কয়েক বছরের ব্যবধান। আর সূরা কাহ্‌ফে দু'টির জায়গায় তিনটি কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তাই আমার মতে, দ্বিতীয় প্রশ্নটি হযরত খিযির সম্পর্কেই ছিল, রূহ সম্পর্কে নয়। খোদ কুরআনেই এমনি একটি ইশারা আছে, তা থেকে আমার এ অভিমতের প্রতি সমর্থন পাওয়া যাবে। (দেখুন ৬১ টীকা)।

তিন ঃ এ আলোচনা প্রসংগে খিযির ও মূসার কাহিনীটি এমনভাবে শুনিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাতে কাফেরদের প্রশ্নের জবাবও এসে গেছে এ সংগে মুমিনদেরকেও সরবরাহ করা হয়েছে সান্তনার সরঞ্জাম। এ কাহিনীতে মূলত যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, যেসব উদ্দেশ্য ও কল্যাণকারিতার ভিত্তিতে আল্লাহর এ বিশাল সৃষ্টিজগত চলছে তা যেহেতু তোমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে তাই তোমরা কথায় কথায় অবাক হয়ে প্রশ্ন করো, এমন কেন হলো? এ–কি হয়ে গেলো? এ–তো বড়ই ক্ষতি হলো! অথচ যদি পর্দা উঠিয়ে দেয়া হয় তাহলে তোমরা নিজেরাই জানতে পারবে এখানে যাকিছু হচ্ছে ঠিকই হচ্ছে এবং বাহ্যত যে জিনিসের মধ্যে ক্ষতি দেখা যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত তার ফলশ্রুতিতে কোন না কোন কল্যাণই দেখা যায়।

চার ঃ এরপর যুলকারনাইনের কাহিনী বলা হয়। সেখানে প্রশ্নকারীদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয় যে, তোমরা তো নিজেদের এ সামান্য সরদারীর মোহে অহংকারী হয়ে উঠেছো অথচ যুলকারনাইনকে দেখো। কত বড় শাসক। কত জবরদস্ত বিজেতা। কত বিপুল বিশাল উপায়–উপকরণের মালিক হয়েও নিজের স্বরূপ ও পরিচিতি বিস্মৃত হননি। নিজের স্রষ্টার সামনে সবসময় মাথা হেঁট করে থাকতেন। অন্যদিকে তোমরা নিজেদের এ সামান্য পার্থিব বৈভব ও ক্ষেত–খামারের শ্যামল শোভাকে চিরস্থায়ী মনে করে বসেছো। কিন্তু তিনি দুনিয়ার সবচেয়ে মজবুত ও সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা প্রাচীর নির্মাণ করেও মনে করতেন সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা যেতে পারে, এ প্রাচীরের ওপর নয়। আল্লাহ যতদিন চাইবেন ততদিন এ প্রাচীর শত্রুদের পথ রোধ করতে থাকবে এবং যখনই তাঁর ইচ্ছা ভিন্নতর হবে তখনই এ প্রাচীরে ফাটল ও গর্ত ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

এভাবে কাফেরদের পরীক্ষামূলক প্রশ্নগুলো তাদের ওপরই পুরোপুরি উল্‌টে দেবার পর বক্তব্যের শেষে আবার সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, বক্তব্য শুরু করার সময় যা বলা হয়েছিল। অর্থাৎ তাওহীদ ও আখেরাত হচ্ছে পুরোপুরি সত্য। একে মেনে নেয়া, সে অনুযায়ী নিজেদের সংশোধন করা এবং আল্লাহর সামনে নিজেদের জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করে দুনিয়ায় জীবন যাপন করার মধ্যেই তোমাদের নিজেদের মংগল। এভাবে না চললে তোমাদের নিজেদের জীবন ধ্বংস হবে এবং তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপও নিষ্ফল হয়ে যাবে।

আয়াত ১১০ **সূরা আল কাহ্‌ফ – মক্কী** রুকূ' ১২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۜ ①
قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ
الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ② مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ③ وَّيُنْذِرَ
الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ④ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ
كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ⑤

প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন এবং এর মধ্যে কোন বক্রতা রাখেননি।[১] একদম সোজা কথা বলার কিতাব, যাতে লোকদেরকে আল্লাহর কঠিন শাস্তি থেকে সে সাবধান করে দেয় এবং ঈমান এনে যারা সৎকাজ করে তাদেরকে সুখবর দিয়ে দেয় এ মর্মে যে, তাদের জন্য রয়েছে ভাল প্রতিদান। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আর যারা বলে, আল্লাহ কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণ করেছেন, তাদেরকে ভয় দেখায়।[২] এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের বাপ-দাদারও ছিল না।[৩] তাদের মুখ থেকে বেরুনো একথা অত্যন্ত সাংঘাতিক! তারা নিছক মিথ্যাই বলে।

১. অর্থাৎ এর মধ্যে এমন কোন কথাবার্তা নেই যা বুঝতে পারা যায় না। আবার সত্য ও ন্যায়ের সরল রেখা থেকে বিচ্যুত এমন কোন কথাও নেই যা মেনে নিতে কোন সত্যপন্থী লোক ইতস্তত করতে পারে।

২. অর্থাৎ যারা আল্লাহর সন্তান-সন্ততি আছে বলে দাবী করে। এদের মধ্যে রয়েছে খৃষ্টান, ইহুদী ও আরব মুশরিকরা।

৩. অর্থাৎ তাদের এ উক্তি যে, অমুক আল্লাহর পুত্র অথবা অমুককে আল্লাহ পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এগুলো তারা এ জন্য বলছে না যে, তাদের আল্লাহর পুত্র হবার বা

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ
اَسَفًا ۝٦ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ
عَمَلًا ۝٧ وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ۝٨

হে মুহাম্মাদ! যদি এরা এ শিক্ষার প্রতি ঈমান না আনে, তাহলে দুশ্চিন্তায় তুমি হয়তো এদের পেছনে নিজের প্রাণটি খোয়াবে।[৪] আসলে পৃথিবীতে এ যা কিছু সাজ সরঞ্জামই আছে এগুলো দিয়ে আমি পৃথিবীর সৌন্দর্য বিধান করেছি তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্য থেকে কে ভাল কাজ করে। সবশেষে এসবকে আমি একটি বৃক্ষ-লতাহীন ময়দানে পরিণত করবো।[৫]

আল্লাহর কাউকে পুত্র বানিয়ে নেবার ব্যাপারে তারা কিছু জানে। বরং নিছক নিজেদের ভক্তি শ্রদ্ধার বাড়াবাড়ির কারণে তারা একটি মনগড়া মত দিয়েছে এবং এভাবে তারা যে কত মারাত্মক গোমরাহীর কথা বলছে এবং বিশ্বজাহানের মালিক ও প্রভু আল্লাহর বিরুদ্ধে যে কত বড় বেয়াদবী ও মিথ্যাচার করে যাচ্ছে তার কোন অনুভূতিই তাদের নেই।

৪. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে সে সময় যে মানসিক অবস্থার টানাপোড়ন চলছিল এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, তাঁকে ও তাঁর সাথীদেরকে যেসব কষ্ট দেয়া হচ্ছিল সে জন্য তাঁর মনে কোন দুঃখ ছিল না। বরং যে দুঃখটি তাঁকে ভিতরে ভিতরে কুরে কুরে খাচ্ছিল সেটি ছিল এই যে, তিনি নিজের জাতিকে নৈতিক অধপতন, ভ্রষ্টাচার ও বিভ্রান্তি থেকে বের করে আনতে চাচ্ছিলেন এবং তারা কোনক্রমেই এ পথে পা বাড়াবার উদ্যোগ নিচ্ছিল না। তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, এ ভ্রষ্টতার অনিবার্য ফল ধ্বংস ও আল্লাহর আযাব ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি তাদেরকে এ পরিণতি থেকে রক্ষা করার জন্য দিনরাত প্রাণান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তারা আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তাঁর এ মানসিক অবস্থাকে একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ "আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত এমন এক ব্যক্তির মতো যে আলোর জন্য আগুন জ্বালালো কিন্তু পতংগরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করলো পুড়ে মরার জন্য। সে এদেরকে কোনক্রমে আগুন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে কিন্তু এ পতংগরা তার কোন প্রচেষ্টাকেই ফলবতী করতে দেয় না। আমার অবস্থাও অনুরূপ। আমি তোমাদের হাত ধরে টান দিচ্ছি কিন্তু তোমরা আগুনে লাফিয়ে পড়ছো।" (বুখারী ও মুসলিম। আরও তুলনামূলক আলোচনার জন্য সূরা আশ্ শু'আরা ৩ আয়াত দেখুন)

এ আয়াতে বাহ্যত শুধু এতটুকু কথাই বলা হয়েছে যে, সম্ভবত তুমি এদের পেছনে নিজের প্রাণটি খোয়াবে। কিন্তু এর মাধ্যমে সূক্ষ্মভাবে নবীকে এ মর্মে সান্তনাও দেয়া হয়েছে যে, এদের ঈমান না আনার দায়-দায়িত্ব তোমার ওপর বর্তায় না, কাজেই তুমি

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾
إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً
وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ
سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا
أَمَدًا ﴿١٢﴾

তুমি কি মনে করো গুহা[৬] ও ফলক ওয়ালারা[৭] আমার বিস্ময়কর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল?[৮] যখন ক'জন যুবক গুহায় আশ্রয় নিলো এবং তারা বললো ঃ "হে আমাদের রব! তোমার বিশেষ রহমতের ধারায় আমাদের প্লাবিত করো এবং আমাদের ব্যাপার ঠিকঠাক করে দাও।" তখন আমি তাদেরকে সেই গুহার মধ্যে থাপড়ে থাপড়ে বছরের পর বছর গভীর নিদ্রায় মগ্ন রেখেছি। তারপর আমি তাদেরকে উঠিয়েছি একথা জানার জন্য যে, তাদের দু'দলের মধ্য থেকে কোন্‌টি তার অবস্থান কালের সঠিক হিসেব রাখতে পারে।

কেন অনর্থক নিজেকে দুঃখে ও শোকে দগ্ধীভূত করছো? তোমার কাজ শুধুমাত্র সুখবর দেয়া ও ভয় দেখানো। লোকদেরকে মুমিন বানানো নয়। কাজেই তুমি নিজের প্রচারের দায়িত্ব পালন করে যাও। যে মেনে নেবে তাকে সুখবর দেবে এবং যে মেনে নেবে না তাকে তার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেবে।

৫. প্রথম আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছিল আর এ দু'টি আয়াতে কাফেরদেকে উদ্দেশ করে কথা বলা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি সান্তনা বাক্য শুনিয়ে দেবার পর এখন তাঁর অস্বীকারকারীদেরকে সরাসরি সম্বোধন না করেই একথা শুনানো হচ্ছে যে, পৃথিবী পৃষ্ঠে তোমরা এই যেসব সাজ সরঞ্জাম দেখছো এবং যার মন ভুলানো চাকচিক্যে তোমরা মুগ্ধ হয়েছো, এতো নিছক একটি সাময়িক সৌন্দর্য, নিছক তোমাদের পরীক্ষার জন্য এর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। এসব কিছু আমি তোমাদের আয়েশ আরামের জন্য সরবরাহ করেছি, তোমরা এ ভুল ধারণা করে বসেছো। তাই জীবনের মজা লুটে নেয়া ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যের প্রতি তোমরা ভ্রুক্ষেপই করছো না। এ জন্যই তোমরা কোন উপদেশদাতার কথায় কান দিচ্ছো না। কিন্তু আসলে তো এগুলো আয়েশ আরামের জিনিস নয় বরং পরীক্ষার উপকরণ। এগুলোর মাঝখানে তোমাদের বসিয়ে দিয়ে দেখা হচ্ছে, তোমাদের মধ্য থেকে কে তার নিজের আসল স্বরূপ ভুলে গিয়ে দুনিয়ার এসব মন মাতানো সামগ্রীর মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে এবং কে তার আসল মর্যাদার (আল্লাহর বন্দেগী) কথা মনে রেখে সঠিক নীতি অবলম্বন

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ
وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا
شَطَطًا ﴿١٤﴾ هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ۖ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ
بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾

২ রুকূ'

আমি তাদের সত্যিকার ঘটনা তোমাকে শুনাচ্ছি।[৯] তারা কয়েকজন যুবক ছিল, তাদের রবের ওপর ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের সঠিক পথে চলার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।[১০] আমি সে সময় তাদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম যখন তারা উঠলো এবং ঘোষণা করলো ঃ "আমাদের রব তো কেবল তিনিই যিনি পৃথিবী ও আকাশের রব। আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কোন মাবুদকে ডাকবো না। যদি আমরা তাই করি তাহলে তা হবে একেবারেই অনর্থক।" (তারপর তারা পরস্পরকে বললো ঃ) "এ আমাদের জাতি, এরা বিশ্বজাহানের রবকে বাদ দিয়ে অন্য ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। এরা তাদের মাবুদ হবার সপক্ষে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আনছে না কেন? যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে?

করছে। যেদিন এ পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে সেদিনই ভোগের এসব সরঞ্জাম খতম করে দেয়া হবে এবং তখন এ পৃথিবী একটি লতাগুল্মহীন ধূ ধূ প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

৬. আরবী ভাষায় বড় ও বিস্তৃত গুহাকে 'কাহ্‌ফ' বলা হয় এবং সংকীর্ণ গহ্বরকে বলা হয় 'গার'।

৭. মূল শব্দ হচ্ছে "আর রকীম।" এর বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। কোন কোন সাহাবী ও তাবেঈর বর্ণনা মতে আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনাটি যে জনপদে সংঘটিত হয়েছিল সেই জনপদটির নাম ছিল আর রকীম। এটি "আইলাহ" (অর্থাৎ আকাবাহ) ও ফিলিস্তীনের মাঝামাঝি একটি স্থানে অবস্থিত ছিল। আবার অনেক পুরাতন মুফাস্‌সির বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, এ নাম দিয়ে গুহা মুখে আসহাবে কাহ্‌ফের স্মৃতি রক্ষার্থে যে ফলক বা শিলালিপিটি লাগানো হয়েছিল। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তাঁর 'তরজমানুল কুরআন' তাফসীর গ্রন্থে প্রথম অর্থটিকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন, এ স্থানটিকেই বাইবেলের যিহোশূয় পুস্তকের ১৮ ঃ ২৬ শ্লোকে রেকম বা রাকম বলা হয়েছে। এরপর তিনি একে ফিলিস্তীনের

বিখ্যাত ঐতিহাসিক কেন্দ্র পেট্রা-এর প্রাচীন নাম হিসেবে গণ্য করেছেন। কিন্তু তিনি একথা চিন্তা করেননি যে, যিহোশূয় পুস্তকে রেকম বা রাকমের আলোচনা এসেছে বনী বিন ইয়ামীনের (বিন্যামীন সন্তান) মীরাস প্রসংগে। এ সংশ্লিষ্ট পুস্তকের নিজের বর্ণনামতে এ গোত্রের মীরাসের এলাকা জর্দান নদী ও লূত সাগরের (Dead sca) পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। সেখানে পেট্রার অবস্থানের কোন সম্ভাবনাই নেই। পেট্রার ধ্বংসাবশেষ যে এলাকায় পাওয়া গেছে তার ও বনী বিন ইয়ামীনের মীরাসের এলাকার মধ্যে ইয়াহুদা (যিহোদা) ও আদ্‌মীয়ার পুরো এলাকা অবস্থিত ছিল। এ কারণে আধুনিক যুগের প্রত্নতত্ত্ববিদগণ পেট্রা ও রেকম একই জায়গার নাম এ ধারণার কঠোর বিরোধিতা করেছেন। (দেখুন ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ১৯৪৬ সালে মুদ্রিত, ১৭ খণ্ড, ৬৫৮ পৃষ্ঠা) আমি মনে করি, "আর রকীম" মানে ফলক বা শিলালিপি, এ মতটিই সঠিক।

৮. অর্থাৎ যে আল্লাহ এ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তাঁর শক্তিমত্তার পক্ষে কয়েকজন লোককে দু' তিন শো বছর পর্যন্ত ঘুম পাড়িয়ে রাখা এবং তারপর তাদেরকে ঘুমাবার আগে তারা যেমন তরুণ-তাজা ও সুস্থ-সবল ছিল ঠিক তেমনি অবস্থায় জাগিয়ে তোলা কি তুমি কিছু অসম্ভব বলে মনে করো? যদি চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে তুমি কখনো চিন্তা-ভাবনা করতে তাহলে তুমি একথা মনে করতে না যে, আল্লাহর জন্য এটা কোন কঠিন কাজ।

৯. এ কাহিনীর প্রাচীনতম বিবরণ পাওয়া গেছে জেম্‌স সারোজি নামক সিরিয়ার একজন খৃষ্টান পাদ্‌রীর বক্তৃতামালায়। তার এ বক্তৃতা ও উপদেশবাণী সুরিয়ানী ভাষায় লিখিত। আসহাবে কাহ্‌ফের মৃত্যুর কয়েক বছর পর ৪৫২ খৃষ্টাব্দে তার জন্ম হয়। ৪৭৪ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তিনি নিজের এ বক্তৃতামালা সংকলন করেন। এ বক্তৃতামালায় তিনি আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। আমাদের প্রথম যুগের মুফাস্‌সিরগণ এ সুরিয়ানী বর্ণনার সন্ধান পান। ইবনে জারীর তাবারী তাঁর তাফসীরগ্রন্থে বিভিন্ন সূত্র মাধ্যমে এ কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন। অন্যদিকে এগুলো ইউরোপেও পৌঁছে যায়। সেখানে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় তার অনুবাদ ও সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়। গিবন তার "রোম সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস" গ্রন্থের ৩৩ অধ্যায়ে ঘুমন্ত সাতজন (Seven sleepers) শিরোনামে ঐসব উৎস থেকে এ কাহিনীর যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন তা আমাদের মুফাস্‌সিরগণের বর্ণনার সাথে এত বেশী মিলে যায় যে, উভয় বর্ণনা একই উৎস থেকে গৃহীত বলে মনে হয়। যেমন যে বাদশাহর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আসহাবে কাহ্‌ফ গুহাভ্যন্তরে আশ্রয় নেন আমাদের মুফাস্‌সিরগণ তাঁর নাম লিখেছেন 'দাকয়ানুস' বা 'দাকিয়ানুস' এবং গিবন বলেন, সে ছিল কাইজার 'ডিসিয়াস' (Decius)। এ বাদশাহ ২৪৯ থেকে ২৫১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রোম সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে এবং ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের ওপর নিপীড়ন নির্যাতন চালাবার ব্যাপারে তার আমলই সবচেয়ে বেশী দুর্নাম কুড়িয়েছে। যে নগরীতে এ ঘটনাটি ঘটে আমাদের মুফাস্‌সিরগণ তার নাম লিখেছেন 'আফ্‌সুস' বা 'আস্‌সোস'। অন্যদিকে গিবন তার নাম লিখেছেন 'এফিসুস' (Ephesus)। এ নগরীটি এশিয়া মাইনরের পশ্চিম তীরে রোমীয়দের সবচেয়ে বড় শহর ও বন্দর নগরী ছিল। এর ধ্বংসাবশেষ বর্তমান তুরস্কের 'ইজমীর' (স্মার্ণা) নগরী থেকে ২০-২৫ মাইল দক্ষিণে পাওয়া যায়। (দেখুন ২২২ পৃষ্ঠায়)। তারপর

যে বাদশাহর শাসনামলে আসহাবে কাহ্‌ফ জেগে ওঠেন আমাদের মুফাস্‌সিরগণ তার নাম লিখেছেন 'তেযোসিস' এবং গিবন বলেন, তাদের নিদ্রাভংগের ঘটনাটি কাইজার দ্বিতীয় থিয়োডোসিস (Theodosius) এর আমলে ঘটে। রোম সাম্রাজ্য খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে নেয়ার পর ৪০৮ থেকে ৪৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রোমের কাইজার ছিলেন। উভয় বর্ণনার সাদৃশ্য এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, আসহাবে কাহ্‌ফ ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর তাদের যে সাথীকে খাবার আনার জন্য শহরে পাঠান তার নাম আমাদের মুফাস্‌সিরগণ লিখেছেন 'ইয়াম্‌লিখা' এবং গিবন লিখেছেন 'ইয়াম্‌লিখুস' (Iamblchus) ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের ক্ষেত্রেও উভয় বর্ণনা একই রকমের। এর সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে, কাইজার ডিসিয়াসের আমলে যখন ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের ওপর চরম নিপীড়ন নির্যাতন চালানো হচ্ছিল তখন এ সাতজন যুবক একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারপর কাইজার থিযোডোসিসের রাজত্বের ৩৮তম বছরে অর্থাৎ প্রায় ৪৪৫ বা ৪৪৬ খৃষ্টাব্দে তারা জেগে উঠেছিলেন। এ সময় সমগ্র রোম সাম্রাজ্য ছিল ঈসা আলাইহিস সালামের দীনের অনুসারী। ঐ হিসেবে গুহায় তাদের ঘুমানোর সময় ধরা যায় প্রায় ১৯৬ বছর।

কোন কোন প্রাচ্যবিদ এ কাহিনীটিকে আসহাবে কাহ্‌ফের কাহিনী বলে মেনে নিতে এ জন্য অস্বীকার করেছেন যে, সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে কুরআন তাদের গুহায় অবস্থানের সময় ৩০৯ বছর বলে বর্ণনা করছে। কিন্তু ২৫ টীকায় আমি এর জবাব দিয়েছি।

এ সুরিয়ানী বর্ণনা ও কুরআনের বিবৃতির মধ্যে সামান্য বিরোধও রয়েছে। এরি ভিত্তিতে গিবন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে "অজ্ঞতা"র অভিযোগ এনেছেন। অথচ যে বর্ণনার ভিত্তিতে তিনি এতবড় দুঃসাহস করছেন তার সম্পর্কে তিনি নিজেই স্বীকার করেন যে, সেটি এ ঘটনার তিরিশ চল্লিশ বছর পর সিরিয়ার এক ব্যক্তি লেখেন। আর এত বছর পর নিছক জনশ্রুতির মাধ্যমে একটি ঘটনার বর্ণনা এক দেশ থেকে অন্য দেশে পৌঁছুতে পৌঁছুতে কিছু না কিছু বদলে যায়। এ ধরনের একটি ঘটনার বর্ণনাকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য মনে করা এবং তার কোন অংশের সাথে বিরোধ হওয়াকে নিশ্চিতভাবে কুরআনের ভ্রান্তি বলে মনে করা কেবলমাত্র এমনসব হঠকারী লোকের পক্ষেই শোভা পায় যারা ধর্মীয় বিদ্বেষ বশে বুদ্ধিমত্তার সামান্যতম দাবীও উপেক্ষা করে যায়।

আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনাটি ঘটে আফসোস (Ephesus) নগরীতে। খৃষ্টপূর্ব প্রায় এগারো শতকে এ নগরীটির পত্তন হয়। পরবর্তীকালে এটি মূর্তিপূজার বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানকার লোকেরা চাঁদ বিবির পূজা করতো। তাকে বলা হতো ডায়না (Diana)। এর সুবিশাল মন্দিরটি প্রাচীন যুগের দুনিয়ার অত্যাশ্চর্য বিষয় বলে গণ্য হতো। এশিয়া মাইনরের লোকেরা তার পূজা করতো। রোমান সাম্রাজ্যেও তাকে উপাস্যদের মধ্যে শামিল করে নেয়া হয়।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পর যখন তাঁর দাওয়াত রোম সাম্রাজ্যে পৌঁছুতে শুরু করে তখন এ শহরের কয়েকজন যুবকও শিরক থেকে তাওবা করে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে। খৃষ্টীয় বর্ণনাবলী একত্র করে তাদের ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ গ্রেগরী অব

টুরস (Gregory of Tours) তার গ্রন্থে (Meraculorum Liber) বর্ণনা করেছেন তার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ ঃ

"তারা ছিলেন সাতজন যুবক। তাদের ধর্মান্তরের কথা শুনে কাইজার ডিসিয়াস তাদের নিজের কাছে ডেকে পাঠান। তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের ধর্ম কি? তারা জানতেন, কাইজার ঈসার অনুসারীদের রক্তের পিপাসু। কিন্তু তারা কোন প্রকার শংকা না করে পরিষ্কার বলে দেন, আমাদের রব তিনিই যিনি পৃথিবী ও আকাশের রব। তিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদকে আমরা ডাকি না। যদি আমরা এমনটি করি তাহলে অনেক বড় গুনাহ করবো। কাইজার প্রথমে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, তোমাদের মুখ বন্ধ করো, নয়তো আমি এখনই তোমাদের হত্যা করার ব্যবস্থা করবো। তারপর কিছুক্ষণ থেমে বললেন, তোমরা এখনো শিশু। তাই তোমাদের তিনদিন সময় দিলাম। ইতিমধ্যে যদি তোমরা নিজেদের মত বদলে ফেলো এবং জাতির ধর্মের দিকে ফিরে আসো তাহলে তো ভাল, নয়তো তোমাদের শিরশ্ছেদ করা হবে।"

"এ তিন দিনের অবকাশের সুযোগে এ সাতজন যুবক শহর ত্যাগ করেন। তারা কোন গুহায় লুকাবার জন্য পাহাড়ের পথ ধরেন। পথে একটি কুকুর তাদের সাথে চলতে থাকে। তারা কুকুরটাকে তাদের পিছু নেয়া থেকে বিরত রাখার জন্য বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু সে কিছুতেই তাদের সংগ ত্যাগ করতে রাযী হয়নি। শেষে একটি বড় গভীর বিস্তৃত গুহাকে ভাল আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নিয়ে তারা তার মধ্যে লুকিয়ে পড়েন। কুকুরটি গুহার মুখে বসে পড়ে। দারুন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত থাকার কারণে তারা সবাই সংগে সংগেই ঘুমিয়ে পড়েন। এটি ২৫০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। ১৯৭ বছর পর ৪৪৭ খৃষ্টাব্দে তারা হঠাৎ জেগে ওঠেন। তখন ছিল কাইজার দ্বিতীয় থিয়োডোসিসের শাসনামল। রোম সাম্রাজ্য তখন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং আফসোস শহরের লোকেরাও মূর্তিপূজা ত্যাগ করেছিল।"

"এটা ছিল এমন এক সময় যখন রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে মৃত্যু পরের জীবন এবং কিয়ামতের দিন হাশরের মাঠে জমায়েত ও হিসেব নিকেশ হওয়া সম্পর্কে প্রচণ্ড মতবিরোধ চলছিল। আখেরাত অস্বীকারের ধারণা লোকদের মন থেকে কিভাবে নির্মূল করা যায় এ ব্যাপারটা নিয়ে কাইজার নিজে বেশ চিন্তিত ছিলেন। একদিন তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন যেন তিনি এমন কোন নিদর্শন দেখিয়ে দেন যার মাধ্যমে লোকেরা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। ঘটনাক্রমে ঠিক এ সময়েই এ যুবকরা ঘুম থেকে জেগে ওঠেন।"

"জেগে উঠেই তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করেন, আমরা কতক্ষণ ঘুমিয়েছি? কেউ বলেন একদিন, কেউ বলেন দিনের কিছু অংশ। তারপর আবার একথা বলে সবাই নীরব হয়ে যান যে এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন। এরপর তারা জীন (Jean) নামে নিজেদের একজন সহযোগীকে রূপার কয়েকটি মুদ্রা দিয়ে খাবার আনার জন্য শহরে পাঠান। লোকেরা যাতে চিনতে না পারে এ জন্য তাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেন। তারা ভয় করছিলেন, লোকেরা আমাদের ঠিকানা জানতে পারলে আমাদের ধরে নিয়ে যাবে এবং ডায়নার পূজা করার জন্য আমাদের বাধ্য করবে। কিন্তু জীন শহরে পৌঁছে সবকিছু বদলে

গেছে দেখে অবাক হয়ে যান। তিনি দেখেন সবাই ঈসায়ী হয়ে গেছে এবং ডায়না দেবীর পূজা কেউ করছে না। একটি দোকানে গিয়ে তিনি কিছু রুটি কিনেন এবং দোকানদারকে একটি রূপার মুদ্রা দেন। এ মুদ্রার গায় কাইজার ডিসিয়াসের ছবি ছাপানো ছিল। দোকানদার এ মুদ্রা দেখে অবাক হয়ে যায়। সে জিজ্ঞেস করে, এ মুদ্রা কোথায় পেলে? জীন বলে, এ আমার নিজের টাকা, অন্য কোথাও থেকে নিয়ে আসিনি। এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে বেশ কথা কাটাকাটি হয়। লোকদের ভীড় জমে ওঠে। এমন কি শেষ পর্যন্ত বিষয়টি নগর কোতোয়ালের কাছে পৌছে যায়। কোতোয়াল বলেন, এ গুপ্ত ধন যেখান থেকে এনেছো সেই জায়গাটা কোথায় আমাকে বলো। জীন বলেন, কিসের গুপ্তধন? এ আমার নিজের টাকা। কোন গুপ্তধনের কথা আমার জানা নেই। কোতোয়াল বলেন, তোমার একথা মেনে নেয়া যায় না। কারণ তুমি যে মুদ্রা এনেছো এতো কয়েক শো বছরের পুরানো। তুমি তো সবেমাত্র যুবক, আমাদের বুড়োরাও এ মুদ্রা দেখেনি। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন রহস্য আছে। জীন যখন শোনেন কাইজার ডিসিয়াস মারা গেছে বহুযুগ আগে তখন তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত তিনি কোন কথাই বলতে পারেন না। তারপর আস্তে আস্তে বলেন, এ তো মাত্র কালই আমি এবং আমার ছয়জন সাথী এ শহর থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম এবং ডিসিয়াসের জুলুম থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। জীনের একথা শুনে কোতোয়ালও অবাক হয়ে যান। তিনি তাকে নিয়ে যেখানে তার কথা মতো তারা লুকিয়ে আছেন সেই গুহার দিকে চলেন। বিপুল সংখ্যক জনতাও তাদের সাথী হয়ে যায়। তারা যে যথার্থই কাইজার ডিসিয়াসের আমলের লোক সেখানে পৌছে এ ব্যাপারটি পুরোপুরি প্রমাণিত হয়ে যায়। এ ঘটনার খবর কাইজার ডিসিয়াসের কাছেও পাঠানো হয়। তিনি নিজে এসে তাদের সাথে দেখা করেন এবং তাদের থেকে বরকত গ্রহণ করেন। তারপর হঠাৎ তারা সাতজন গুহার মধ্যে গিয়ে সটান শুয়ে পড়েন এবং তাদের মৃত্যু ঘটে। এ সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখে লোকেরা যথার্থই মৃত্যুর পরে জীবন আছে বলে বিশ্বাস করে। এ ঘটনার পর কাইজারের নির্দেশে গুহায় একটি ইবাদাতখানা নির্মাণ করা হয়।"

খৃষ্টীয় বর্ণনাসমূহে গুহাবাসীদের সম্পর্কে এই যে কাহিনী বিবৃত হয়েছে কুরআন বর্ণিত কাহিনীর সাথে এর সাদৃশ্য এত বেশী যে, এদেরকেই আসহাবে কাহ্‌ফ বলা অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়। এ ব্যাপারে কেউ কেউ আপত্তি তোলেন যে, এ ঘটনাটি হচ্ছে এশিয়া মাইনরের আর আরব ভূখণ্ডের বাইরের কোন ঘটনা নিয়ে কুরআন আলোচনা করে না, কাজেই খৃষ্টীয় কাহিনীকে আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনা বলে চালিয়ে দেয়া কুরআনের পথ থেকে বিচ্যুতি হবে। কিন্তু আমার মতে এ আপত্তি ঠিক নয়। কারণ কুরআন মজীদে আসলে আরববাসীদেরকে শিক্ষা দেবার জন্য এমন সব জাতির ও শক্তির অবস্থা আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে যাদের সম্পর্কে তারা জানতো। তারা আরবের সীমানার মধ্যে থাকুক বা বাইরে তাতে কিছু আসে যায় না। এ কারণে মিসরের প্রাচীন ইতিহাস কুরআনে আলোচিত হয়েছে। অথচ (প্রাচীন) মিসর আরবের বাইরে অবস্থিত ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, মিসরের ঘটনাবলী যদি কুরআনে আলোচিত হতে পারে তাহলে রোমের ঘটনাবলী কেন হতে পারে না? আরববাসীরা যেভাবে মিসর সম্পর্কে জানতো ঠিক তেমনি রোম সম্পর্কেও তো জানতো। রোমান সাম্রাজ্যের সীমানা হিজাযের একেবারে উত্তর সীমান্তের সাথে লাগোয়া ছিল। আরবদের বাণিজ্য কাফেলা দিনরাত রোমীয় এলাকায় যাওয়া আসা করতো। বহু আরব গোত্র

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ
لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ﴿١٦﴾
وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ
وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ۚ
ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ۗ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ
تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ﴿١٧﴾

এখন যখন তোমরা এদের থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে এরা পূজা করে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছো তখন চলো অমুক গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিই।[১১] তোমাদের রব তোমাদের ওপর তাঁর রহমতের ছায়া বিস্তার করবেন এবং তোমাদের কাজের উপযোগী সাজ সরঞ্জামের ব্যবস্থা করবেন।"

তুমি যদি তাদেরকে গুহায় দেখতে,[১২] তাহলে দেখতে সূর্য উদয়ের সময় তাদের গুহা ছেড়ে ডান দিক থেকে ওঠে এবং অস্ত যাওয়ার সময় তাদেরকে এড়িয়ে বাম দিকে নেমে যায় আর তারা গুহার মধ্যে একটি বিস্তৃত জায়গায় পড়ে আছে।[১৩] এ হচ্ছে আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন। যাকে আল্লাহ সঠিক পথ দেখান সে-ই সঠিক পথ পায় এবং যাকে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন তার জন্য তুমি কোন পৃষ্ঠপোষক ও পথপ্রদর্শক পেতে পারো না।

রোমানদের প্রভাবাধীন ছিল। রোম আরবদের জন্য মোটেই অজ্ঞাত দেশ ছিল না। সূরা রূম এর প্রমাণ। এ ছাড়া একথাও চিন্তা করার মতো যে, এ কাহিনীটি আল্লাহ নিজেই স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে কুরআন মজীদে বর্ণনা করেননি। বরং মক্কার কাফেরদের জিজ্ঞাসার জবাবে বর্ণনা করেছেন। আর আহলি কিতাবরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরীক্ষা করার জন্য মক্কার কাফেরদেরকে তাঁর কাছ থেকে এমন ঘটনার কথা জিজ্ঞেস করার পরামর্শ দিয়েছিল যে সম্পর্কে আরববাসীরা মোটেই কিছু জানতো না।

১০. অর্থাৎ যখন তারা সাচ্চা দিলে ঈমান আনলো তখন আল্লাহ তাদের সঠিক পথে চলার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিলেন এবং তাদের ন্যায় ও সত্যের ওপর অবিচল থাকার সুযোগ দিলেন। তারা নিজেদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দেবে কিন্তু বাতিলের কাছে মাথা নত করবে না।

১১. যে সময় এ আল্লাহ বিশ্বাসী যুবকদের জনবসতি ত্যাগ করে পাহাড়ে আশ্রয় নিতে হয় সে সময় এশিয়া মাইনরে এ এফিসুস শহর ছিল মূর্তি পূজা ও যাদু বিদ্যার সবচেয়ে

وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ ۖ وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ
وَذَاتَ الشِّمَالِ ۗ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ۗ لَوِ اطَّلَعْتَ
عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿١٨﴾ وَكَذٰلِكَ
بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ۗ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۗ قَالُوْا لَبِثْنَا
يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۗ فَابْعَثُوْٓا اَحَدَكُمْ
بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ
بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ﴿١٩﴾

৩ রুকূ'

তোমরা তাদেরকে দেখে মনে করতে তারা জেগে আছে, অথচ তারা ঘুমুচ্ছিল। আমি তাদের ডাইনে বাঁয়ে পার্শ্ব পরিবর্তন করাচ্ছিলাম।[১৪] এবং তাদের কুকুর গুহা মুখে সামনের দু'পা ছড়িয়ে বসেছিল। যদি তুমি কখনো উঁকি দিয়ে তাদেরকে দেখতে তাহলে পিছন ফিরে পালাতে থাকতে এবং তাদের দৃশ্য তোমাকে আতংকিত করতো।[১৫]

আর এমনি বিস্ময়করভাবে আমি তাদেরকে উঠিয়ে বসালাম[১৬] যাতে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। তাদের একজন জিজ্ঞেস করলোঃ "বলোতো, কতক্ষণ এ অবস্থায় থেকেছো?" অন্যেরা বললো, "হয়তো একদিন বা এর থেকে কিছু কম সময় হবে।" তারপর তারা বললো, "আল্লাহই ভাল জানেন আমাদের কতটা সময় এ অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে। চলো এবার আমাদের মধ্য থেকে কাউকে রূপার এ মুদ্রা দিয়ে শহরে পাঠাই এবং সে দেখুক সবচেয়ে ভাল খাবার কোথায় পাওয়া যায়। সেখান থেকে সে কিছু খাবার নিয়ে আসুক; আর তাকে একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, আমাদের এখানে থাকার ব্যাপারটা সে যেন কাউকে জানিয়ে না দেয়।

বড় কেন্দ্র। সেখানে ছিল ডায়না দেবীর একটি বিরাট মন্দির। এর খ্যাতি তখন সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। বহু দূরদেশ থেকে লোকেরা ডায়না দেবীর পূজা করার জন্য সেখানে আসতো। সেখানকার যাদুকর, গণক, জ্যোতিষী ও তাবিজ লেখকরা সারা দুনিয়ায়

إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ
وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٢٠﴾ وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ
حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا
ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا ۖ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۗ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ
لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾

যদি কোনক্রমে তারা আমাদের নাগাল পায় তাহলে হয় প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা আমাদের জোর করে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে আর এমন হলে আমরা কখনো সফলকাম হতে পারবো না।"

—এভাবে আমি নগরবাসীদেরকে তাদের অবস্থা জানালাম,[১৭] যাতে লোকেরা জানতে পারে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতের দিন নিশ্চিতভাবেই আসবে।[১৮] (কিন্তু একটু ভেবে দেখো, যখন এটিই ছিল চিন্তার আসল বিষয়) সে সময় তারা পরস্পর এ বিষয়টি নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিল যে, এদের (আসহাবে কাহ্‌ফ) সাথে কি করা যায়। কিছু লোক বললো, "এদের ওপর একটি প্রাচীর নির্মাণ করো, এদের রবই এদের ব্যাপারটি ভাল জানেন।"[১৯] কিন্তু তাদের বিষয়াবলীর ওপর যারা প্রবল ছিল[২০] তারা বললো, "আমরা অবশ্যি এদের ওপর একটি ইবাদাতখানা নির্মাণ করবো।"[২১]

খ্যাতিমান ছিল। সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও মিসর পর্যন্ত তাদের জমজমাট কারবার ছিল। এ কারবারে ইহুদীদের বিরাট অংশ ছিল এবং ইহুদীরা তাদের এ কারবারকে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের আমল থেকে চলে আসা ব্যবসায় মনে করতো। (দেখুন ইনসাইক্লোপিডিয়া বিবলিক্যাল লিটারেচার) শিরক ও কুসংস্কারে ভারাক্রান্ত এ পরিবেশে আল্লাহ বিশ্বাসীরা যে অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছিলেন পরবর্তী রুকূ'তে আসহাবে কাহ্‌ফের নিম্নোক্ত উক্তি থেকে তা অনুমান করা যেতে পারে ঃ "যদি তাদের হাত আমাদের ওপর পড়ে তাহলে তো তারা আমাদের প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা জোরপূর্বক নিজেদের ধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।"

১২. মাঝখানে একথাটি উহ্য রাখা হয়েছে যে, এ পারস্পরিক চুক্তি অনুযায়ী তারা শহর থেকে বের হয়ে পাহাড়গুলোর মধ্যে অবস্থিত একটি গুহায় আত্মগোপন করেন, যাতে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু অথবা জোর করে মুরতাদ বানানোর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন।

১৩. অর্থাৎ তাদের গুহার মুখ ছিল উত্তর দিকে। এ কারণে সূর্যের আলো কোন মওসূমেই গুহার মধ্যে পৌঁছুতো না এবং বাইর থেকে কোন পথ অতিক্রমকারী দেখতে পেতো না গুহার মধ্যে কে আছে।

১৪. অর্থাৎ কেউ বাইর থেকে উঁকি দিয়ে দেখলেও তাদের সাতজনের মাঝে মাঝে পার্শ্বপরিবর্তন করতে থাকার কারণে এ ধারণা করতো যে, এরা এমনিই শুয়ে আছে, ঘুমুচ্ছে না।

১৫. অর্থাৎ পাহাড়ের মধ্যে একটি অন্ধকার গুহায় কয়েকজন লোকের এভাবে অবস্থান করা এবং সামনের দিকে কুকুরের বসে থাকা এমন একটি ভয়াবহ দৃশ্য পেশ করে যে, উঁকি দিয়ে যারা দেখতে যেতো তারাই তাদেরকে ডাকাত মনে করে ভয়ে পালিয়ে যেতো। এটি ছিল একটি বড় কারণ, যে জন্য লোকেরা এত দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে জানতে পারেনি। কেউ কখনো ভিতরে ঢুকে আসল ব্যাপারের খোঁজ খবর নেবার সাহসই করেনি।

১৬. যে অদ্ভুত পদ্ধতিতে তাদেরকে ঘুম পাড়ানো হয়েছিল এবং দুনিয়াবাসীকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে বেখবর রাখা হয়েছিল ঠিক তেমনি সুদীর্ঘকাল পরে তাদের জেগে ওঠাও ছিল আল্লাহর শক্তিমত্তার বিস্ময়কর প্রকাশ।

১৭. গুহাবাসী যুবকদের (আসহাবে কাহ্‌ফ) একজন যখন শহরে খাবার কিনতে গিয়েছিলেন তখন সেখানকার দুনিয়া বদলে গিয়েছিল। মূর্তি পূজারী রোমানরা দীর্ঘদিন থেকে ঈসায়ী হয়ে গিয়েছিল। ভাষা, তাহযীব, তামাদ্দুন, পোশাক-পরিচ্ছদ সব জিনিসেই সুস্পষ্ট পরিবর্তন এসে গিয়েছিল। দু'শো বছরের আগের এ লোকটি নিজের সাজ-সজ্জা, পোশাক, ভাষা ইত্যাদি প্রত্যেকটি ব্যাপারে হঠাৎ এক দর্শনীয় বিষয়ে পরিণত হলেন। তারপর যখন খাবার কেনার জন্য কাইজার ডিসিয়াসের যুগের মুদ্রা পেশ করলেন তখন দোকানদার অবাক হয়ে গেলো। সুরিয়ানী বর্ণনা অনুসারে বলা যায়, দোকানদারের সন্দেহ হলো হয়তো পুরাতন যুগের কোন গুপ্ত ধনের ভাণ্ডার থেকে এ মুদ্রা আনা হয়েছে। কাজেই আশেপাশের লোকদেরকে সেদিকে আকৃষ্ট করলো। শেষ পর্যন্ত তাঁকে নগর শাসকের হাতে সোপর্দ করা হলো। সেখানে গিয়ে রহস্যভেদ হলো যে, দু'শো বছর আগে হযরত ঈসার (আ) অনুসারীদের মধ্য থেকে যারা নিজেদের ঈমান বাঁচাবার জন্য পালিয়েছিলেন এ ব্যক্তি তাদেরই একজন। এ খবর শহরের ঈসায়ী অধিবাসীদের মধ্যে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লো। ফলে শাসকের সাথে বিপুল সংখ্যক জনতাও গুহায় পৌঁছে গেলো। এখন আসহাবে কাহ্‌ফগণ যখন জানতে পারলেন যে, তারা দু'শো বছর ঘুমাবার পর জেগেছেন তখন তারা নিজেদের ঈসায়ী ভাইদেরকে সালাম করে শুয়ে পড়লেন এবং তাদের প্রাণবায়ূ উড়ে গেলো।

১৮. সুরিয়ানী বর্ণনা অনুযায়ী সেকালে সেখানে কিয়ামত ও পরকাল সম্পর্কে বিষম বিতর্ক চলছিল। যদিও রোমান শাসনের প্রভাবে সাধারণ লোক ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং পরকাল এ ধর্মের মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের অংগ ছিল তবুও তখনো রোমীয় শিরক ও মূর্তি পূজা এবং গ্রীক দর্শনের প্রভাব ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। এর ফলে বহু লোক আখেরাত অস্বীকার অথবা কমপক্ষে তার অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতো। আবার এ সন্দেহ ও অস্বীকারকে যে জিনিসটি শক্তিশালী করছিল সেটি ছিল এই যে, এফিসুসে বিপুল সংখ্যক ইহুদী বাস করতো এবং তাদের একটি সম্প্রদায় (যাদেরকে

সাদুকী বলা হতো। প্রকাশ্যে আখেরাত অস্বীকার করতো। তারা আল্লাহর কিতাব (অর্থাৎ তাওরাত) থেকে আখেরাত অস্বীকৃতির প্রমাণ পেশ করতো। এর মোকাবিলা করার জন্য ঈসায়ী আলেমগণের কাছে শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ ছিল না। মথি, মার্ক ও লুক লিখিত ইঞ্জিলগুলোতে আমরা সদ্দুকীদের সাথে ঈসা আলাইহিস সালামের বিতর্কের উল্লেখ পাই। আখেরাত বিষয়ে এ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তিনজন ইঞ্জিল লেখকই ঈসা আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে এমন দুর্বল জবাব সংকলন করেছেন যার দুর্বলতা খোদ খৃষ্টান পণ্ডিতগণই স্বীকার করেন (দেখুন মথি ২২ ঃ ৩২-৩৩, মার্ক ১২ ঃ ১৮-২৭, লুক ২০ ঃ ২৭-৪০)। এ কারণে আখেরাত অস্বীকারকারীদের শক্তি বেড়ে যাচ্ছিল এবং আখেরাত বিশ্বাসীরাও সন্দেহ ও দোটানার মধ্যে অবস্থান করতে শুরু করছিল। ঠিক এ সময় আসহাবে কাহ্‌ফের ঘুম থেকে জেগে ওঠার ঘটনাটি ঘটে এবং এটি মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের স্বপক্ষে এমন চাক্ষুষ প্রমাণ পেশ করে যা অস্বীকার করার কোন উপায় ছিল না।

১৯. বক্তব্যের তাৎপর্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এটি ছিল ঈসায়ী সজ্জনদের উক্তি। তাদের মতে আসহাবে কাহ্‌ফ গুহার মধ্যে যেভাবে শুয়ে আছেন সেভাবেই তাদের শুয়ে থাকতে দাও এবং গুহা মুখ বন্ধ করে দাও। তাদের রবই ভাল জানেন তারা কারা, তাদের মর্যাদা কি এবং কোন্ ধরনের প্রতিদান তাদের উপযোগী।

২০. এখানে রোম সাম্রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ এবং খৃষ্টীয় গীর্জার ধর্মীয় নেতৃবর্গের কথা বলা হয়েছে, যাদের মোকাবিলায় সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের অধিকারী ঈসায়ীদের কথা মানুষের কাছে ঠাঁই পেতো না। পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সাধারণ খৃষ্টানদের মধ্যে বিশেষ করে রোমান ক্যাথলিক গীর্জাসমূহে শিরক, আউলিয়া পূজা ও কবর পূজা পুরো জোরেশোরে শুরু হয়ে গিয়েছিল। বুযর্গদের আস্তানা পূজা করা হচ্ছিল এবং ঈসা, মারয়াম ও হাওয়ারীগণের প্রতিমূর্তি গীর্জাগুলোতে স্থাপন করা হচ্ছিল। আসহাবে কাহ্‌ফের নিদ্রাভংগের মাত্র কয়েক বছর আগে ৪৩১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র খৃষ্টীয় জগতের ধর্মীয় নেতাদের একটি কাউন্সিল এ এফিসুসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আল্লাহ হওয়া এবং হযরত মারয়ামের (আ) "আল্লাহ-মাতা" হওয়ার আকীদা চার্চের সরকারী আকীদা হিসেবে গণ্য হয়েছিল। এ ইতিহাস সামনে রাখলে পরিষ্কার জানা যায়, الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهِمْ বাক্যে যাদেরকে প্রাধান্য লাভকারী বলা হয়েছে তারা হচ্ছে এমনসব লোক যারা ঈসার সাচ্চা অনুসারীদের মোকাবিলায় তৎকালীন খৃষ্টান জনগণের নেতা এবং তাদের শাসকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়াবলী যাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। মূলত এরাই ছিল শিরকের পতাকাবাহী এবং এরাই আসহাবে কাহ্‌ফের সমাধি সৌধ নির্মাণ করে সেখানে মসজিদ তথা ইবাদাতখানা নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

২১. মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোক কুরআন মজীদের এ আয়াতটির সম্পূর্ণ উল্টা অর্থ গ্রহণ করেছে। তারা এ থেকে প্রমাণ করতে চান যে, সাহাবীগণের কবরের ওপর সৌধ ও মসজিদ নির্মাণ জায়েয। অথচ কুরআন এখানে তাদের এ গোমরাহীর প্রতি ইংগিত করছে যে, এ জালেমদের মনে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও পরকাল অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রত্যয় সৃষ্টি

করার জন্য তাদেরকে যে নিদর্শন দেখানো হয়েছিল তাকে তারা শির্‌কের কাজ করার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটি সুযোগ মনে করে নেয় এবং ভাবে যে, ভালই হলো পূজা করার জন্য আরো কিছু আল্লাহর অলী পাওয়া গেলো। তাছাড়া এই আয়াত থেকে "সালেহীন"—সৎলোকদের কবরের ওপর মসজিদ তৈরী করার প্রমাণ কেমন করে সংগ্রহ করা যেতে পারে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিভিন্ন উক্তির মধ্যে এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে ঃ

لعن الله تعالى زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُّرُج

"কবর যিয়ারতকারী নারী ও কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণকারীদের এবং কবরে যারা বাতি জ্বালায় তাদের প্রতি আল্লাহ লানত বর্ষণ করেছেন।" (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

اَلا وان من كان قبلكم كانو يتخذون قبور انبياء هم مساجد فانى انهكم عن ذلك (مسلم)

"সাবধান হয়ে যাও, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবীদের কবরকে ইবাদাতখানা বানিয়ে নিতো। আমি তোমাদের এ ধরনের কাজ থেকে নিষেধ করছি।" (মুসলিম)

لعن الله تعالى اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيآء هم مساجد

"আল্লাহ ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি লানত্ বর্ষণ করেছেন। তারা নিজেদের নবীদের কবরগুলোকে ইবাদাতখানায় পরিণত করেছে।" (আহমদ, বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

اِنَّ اُولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق يوم القيمة –

"এদের অবস্থা এ ছিল যে, যদি এদের মধ্যে কোন সৎলোক থাকতো তাহলে তার মৃত্যুর পর এরা তার কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করতো এবং তার ছবি তৈরী করতো। এরা কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট সৃষ্টি হবে।" (মুসনাদে আহমদ, বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সুস্পষ্ট বিধান থাকার পরও কোন আল্লাহভীরু ব্যক্তি কুরআন মজীদে ঈসায়ী পাদরী ও রোমীয় শাসকদের যে ভ্রান্ত কর্মকাণ্ড কাহিনীচ্ছলে বর্ণনা করা হয়েছে তাকেই ঐ নিষিদ্ধ কর্মটি করার জন্য দলীল ও প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করাবার দুঃসাহস কিভাবে করতে পারে?

এ প্রসংগে আরো বলা দরকার যে, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড আরুনডেল (Arundell) এশিয়া মাইনরের আবিষ্কার (Discoveries in Asia Minor) নামে নিজের যে প্রত্যক্ষ দর্শনের ফলাফল পেশ করেন তাতে তিনি বলেন যে, প্রাচীন শহর এফিসুসের ধ্বংসাবশেষ সংলগ্ন পর্বতের ওপর তিনি হযরত মারয়াম ও "সাত ছেলে"র (অর্থাৎ আসহাবে কাহ্‌ফ) সমাধি সৌধের ধ্বংসাবশেষ পেয়েছেন।

سَيَقُولُونَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ
رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُلْ رَّبِّيْٓ أَعْلَمُ
بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۬ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۖ وَّلَا
تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴿٢٢﴾

কিছু লোক বলবে, তারা ছিল তিনজন আর চতুর্থজন ছিল তাদের কুকুরটি। আবার অন্য কিছু লোক বলবে, তারা পাঁচজন ছিল এবং তাদের কুকুরটি ছিল ষষ্ঠ, এরা সব আন্দাজে কথা বলে। অন্যকিছু লোক বলে, তারা ছিল সাতজন এবং অষ্টমটি তাদের কুকুর।২২ বলো, আমার রবই ভাল জানেন তারা ক'জন ছিল, অল্প লোকই তাদের সঠিক সংখ্যা জানে। কাজেই তুমি সাধারণ কথা ছাড়া তাদের সংখ্যা নিয়ে লোকদের সাথে বিতর্ক করো না এবং তাদের সম্পর্কে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদও করো না।২৩

২২. এ থেকে জানা যায়, এ ঘটনার পৌনে তিনশো বছর পরে কুরআন নাযিলের সময় এর বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে খৃষ্টানদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কাহিনী প্রচলিত ছিল। তবে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি সাধারণ লোকদের জানা ছিল না। আসলে তখন তো ছাপাখানার যুগ ছিল না। কাজেই যেসব বইতে তাদের সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে বেশী সঠিক তথ্যাদি ছিল সেগুলো সাধারণভাবে প্রকাশ করার কোন সুযোগ ছিল না। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মৌখিক বর্ণনার সাহায্যে ঘটনাবলী চারদিকে ছড়িয়ে পড়তো এবং সময় অতিবাহিত হবার সাথে সাথে তাদের বহু বিবরণ গল্পের রূপ নিতো। তবুও যেহেতু তৃতীয় বক্তব্যটির প্রতিবাদ আল্লাহ করেননি তাই ধরে নেয়া যেতে পারে যে, সঠিক সংখ্যা সাতই ছিল।

২৩. এর অর্থ হচ্ছে, তাদের সংখ্যাটি আসল নয় বরং আসল জিনিস হচ্ছে এ কাহিনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। এ কাহিনী থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, একজন সাচ্চা মুমিনের কোন অবস্থায়ও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং মিথ্যার সামনে মাথা নত করে দেবার জন্য তৈরী থাকা উচিত নয়। এ থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মুমিনের ভরসা দুনিয়াবী উপায় উপকরণের উপর নয় বরং আল্লাহর উপর থাকতে হবে এবং সত্যপথানুসারী হবার জন্য বাহ্যত পরিবেশের মধ্যে কোন আনুকূল্যের চিহ্ন না দেখা গেলেও আল্লাহর উপর ভরসা করে সত্যের পথে এগিয়ে যেতে হবে। এ থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, যে "প্রচলিত নিয়ম"কে লোকেরা "প্রাকৃতিক আইন" মনে করে এবং এ আইনের বিরুদ্ধে দুনিয়ায় কিছুই হতে পারে না বলে ধারণা করে, আসলে আল্লাহর মোটেই তা মেনে চলার প্রয়োজন নেই। তিনি যখনই এবং যেখানেই চান এ নিয়ম পরিবর্তন করে যে অস্বাভাবিক কাজ করতে চান করতে পারেন। কাউকে দু'শো বছর ঘুম পাড়িয়ে

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ
وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ
هَٰذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾
قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ
وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾

৪ রুকূ'

—আর দেখো, কোন জিনিসের ব্যাপারে কখনো একথা বলো না, আমি কাল এ কাজটি করবো। (তোমরা কিছুই করতে পারো না) তবে যদি আল্লাহ চান। যদি ভুলে এমন কথা মুখ থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে সংগে সংগেই নিজের রবকে স্মরণ করো এবং বলো, "আশা করা যায়, আমার রব এ ব্যাপারে সত্যের নিকটতর কথার দিকে আমাকে পথ দেখিয়ে দেবেন।"[২৪] —আর তারা তাদের গুহার মধ্যে তিনশো বছর থাকে এবং (কিছু লোক মেয়াদ গণনা করতে গিয়ে) আরো নয় বছর বেড়ে গেছে।[২৫] তুমি বলো, আল্লাহ তাদের অবস্থানের মেয়াদ সম্পর্কে বেশী জানেন। আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় প্রচ্ছন্ন অবস্থা তিনিই জানেন, কেমন চমৎকার তিনি দ্রষ্টা ও শ্রোতা! পৃথিবী ও আকাশের সকল সৃষ্টির তত্বাবধানকারী তিনি ছাড়া আর কেউ নেই এবং নিজের শাসন কর্তৃত্বে তিনি কাউকে শরীক করেন না।

এমনভাবে জাগিয়ে তোলা যে, সে যেন মাত্র কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়েছে এবং তার বয়স, চেহারা–সুরত, পোশাক, স্বাস্থ্য তথা কোনকিছুর ওপর কালের বিবর্তনের কোন প্রভাব না পড়া, এটা তাঁর জন্য কোন বড় কাজ নয়। এ থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মানব জাতির অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত বংশধরদেরকে একই সংগে জীবিত করে উঠিয়ে দেয়া, যে ব্যাপারে নবীগণ ও আসমানী কিতাবগুলো আগাম খবর দিয়েছে, আল্লাহর কুদরতের পক্ষে মোটেই কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। এ থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, অজ্ঞ ও মূর্খ মানুষেরা কিভাবে প্রতি যুগে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে নিজেদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও শিক্ষার সম্পদে পরিণত করার পরিবর্তে উল্টা সেগুলোকে নিজেদের বৃহত্তর ভ্রষ্টতার মাধ্যমে পরিণত করতো। আসহাবে কাহ্‌ফের অলৌকিক ঘটনা আল্লাহ মানুষকে এ জন্য দেখিয়েছিলেন যে, মানুষ তার মাধ্যমে পরকাল বিশ্বাসের উপকরণ লাভ করবে, ঠিক সেই ঘটনাকেই তারা এভাবে গ্রহণ করলো যে, আল্লাহ তাদেরকে পূজা করার জন্য আরো কিছু সংখ্যক অলী ও পূজনীয় ব্যক্তিত্ব দিয়েছেন। –এ কাহিনী থেকে মানুষকে এ আসল

শিক্ষাগুলো গ্রহণ করা উচিত এবং এর মধ্যে এগুলোই দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত বিষয়। এ বিষয়গুলো থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে এ মর্মে অনুসন্ধান ও গবেষণা শুরু করে দেয়া যে, আসহাবে কাহ্‌ফ কতজন ছিলেন, তাদের নাম কি ছিল, তাদের কুকুরের গায়ের রং কি ছিল—এসব এমন ধরনের লোকের কাজ যারা ভেতরের শাঁস ফেলে দিয়ে শুধুমাত্র বাইরের ছাল নিয়ে নাড়াচাড়া করা পছন্দ করে। তাই মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং তাঁর মাধ্যমে মুমিনদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, যদি অন্য লোকেরা এ ধরনের অসংলগ্ন বিতর্কের অবতারণা করেও তাহলে তোমরা তাতে নাক গলাবে না এবং এ ধরনের প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়ে নিজেদের সময় নষ্ট করবে না। বরং কেবলমাত্র কাজের কথায় নিজেদের সময় ক্ষেপন করবে। এ কারণেই আল্লাহ নিজেও তাদের সঠিক সংখ্যা বর্ণনা করেননি। এর ফলে আজে বাজে বিষয়ের মধ্যে নাক গলিয়ে অযথা সময় নষ্ট করতে যারা অভ্যস্ত তারা নিজেদের এ অভ্যাসকে জিইয়ে রাখার মাল মসলা পাবে না।

২৪. এটি একটি প্রাসংগিক বাক্য। পেছনের আয়াতগুলোর বক্তব্যের সাথে সংযোগ রেখে ধারাবাহিক বক্তব্যের মাঝখানে একথাটি বলা হয়েছে। পেছনের আয়াতগুলোতে বলা হয়েছিল ঃ আসহাবে কাহ্‌ফের সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহই জানেন এবং এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানো একটি অপ্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই অনর্থক একটি অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ো না এবং এ ব্যাপারে কারো সাথে বিতর্কও করো না। এ প্রসংগে সামনের দিকের কথা বলার আগে প্রাসংগিক বাক্য হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুমিনদেরকে আরো একটি নির্দেশও দেয়া হয়েছে। সেটি হচ্ছে এই যে, তুমি কখনো দাবী করে একথা বলো না যে, আমি আগামীকাল অমুক কাজটি করবো। তুমি ঐ কাজটি করতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে তুমি কীইবা জানো! তোমার অদৃশ্যের জ্ঞান নেই এবং যা ইচ্ছা তা করতে পারবে নিজের কাজের ব্যাপারে এমন স্বাধীন ক্ষমতাও তোমার নেই। তাই কখনো বেখেয়ালে যদি মুখ থেকে এমন কথা বের হয়ে যায় তাহলে সংগে সংগেই সাবধান হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করো এবং ইনশাআল্লাহ বলে দাও। তাছাড়া তুমি যে কাজটি করতে বলছো সেটাই অপেক্ষাকৃত কল্যাণকর না অন্য কাজ তার চেয়ে ভাল, একথাও তুমি জানো না। কাজেই আল্লাহর ওপর ভরসা করে এভাবে বলো ঃ আশা করা যায় আমার রব এ ব্যাপারে সঠিক কথা অথবা সঠিক কর্মপদ্ধতির দিকে আমাকে চালিত করবেন।

২৫. আমার মতে এ বাক্যটির সংযোগ রয়েছে পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে। অর্থাৎ বাক্যের ধারাবাহিকতা এভাবে রক্ষিত হয়েছে যে, "কিছু লোক বলবে তারা তিনজন ছিল এবং চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর.....আর কিছু লোক বলে, তারা নিজেদের গুহায় তিনশো বছর ঘুমিয়ে ছিলেন এবং কিছু লোক এ মেয়াদ গণনা করতে গিয়ে আরো নয় বছর বেড়ে গেছে।" এ বাক্যে তিনশো ও নয় বছরের যে সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে আমার মতে তা আসলে লোকদের উক্তি যা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, এটা আল্লাহর উক্তি নয়। এর প্রমাণ হচ্ছে, পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ নিজেই বলছেন ঃ তুমি বলো, তারা কতদিন ঘুমিয়েছিল তা আল্লাহই ভাল জানেন। যদি ৩০৯ এর সংখ্যা আল্লাহ নিজেই বলে থাকতেন তাহলে তারপর একথা বলার কোন অর্থ ছিল না। এ প্রমাণের ভিত্তিতেই হযরত আবদুল্লাহ

وَاتْلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ
وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيدُ
زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ
هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

হে নবী![২৬] তোমার রবের কিতাবের মধ্য থেকে যাকিছু তোমার ওপর অহী করা হয়েছে তা (হুবহু) শুনিয়ে দাও। তাঁর বক্তব্য পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই, (আর যদি তুমি কারো স্বার্থে তার মধ্যে পরিবর্তন করো তাহলে) তাঁর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে পালাবার জন্য কোন আশ্রয়স্থল পাবে না।[২৭] আর নিজের অন্তরকে তাদের সংগলাভে নিশ্চিন্ত করো যারা নিজেদের রবের সন্তুষ্টির সন্ধানে সকাল-সাঁঝে তাঁকে ডাকে এবং কখনো তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরাবে না। তুমি কি পার্থিব সৌন্দর্য পছন্দ করো?[২৮] এমন কোন লোকের আনুগত্য করো না[২৯] যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফিল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির কামনা বাসনার অনুসরণ করেছে এবং যার কর্মপদ্ধতি কখনো উগ্র, কখনো উদাসীন।[৩০]

ইবনে আব্বাস (রা)ও এ সদর্থ করেছেন যে, এটি আল্লাহর উক্তি নয় বরং লোকদের উক্তির উদ্ধৃতি মাত্র।

২৬. আসহাবে কাহ্‌ফের কাহিনী শেষ হবার পর এবার এখান থেকে দ্বিতীয় বিষয়বস্তুর আলোচনা শুরু হচ্ছে। এ আলোচনায় মক্কায় মুসলমানরা যে অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিলেন সে সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে।

২৭. এর মানে এ নয় যে, নাউযু বিল্লাহ! সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার কাফেরদের স্বার্থে কুরআনে কিছু পরিবর্তন করার এবং কুরাইশ সরদারদের সাথে কিছু কমবেশীর ভিত্তিতে আপোস করে নেবার কথা চিন্তা করছিলেন এবং আল্লাহ তাঁকে এ কাজ করতে নিষেধ করছিলেন। বরং মক্কার কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করে এর মধ্যে বক্তব্য রাখা হয়েছে, যদিও বাহ্যত সম্বোধন করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কাফেরদেরকে একথা বলা যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কালামের মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু কমবেশী করার অধিকার রাখেন না। তাঁর কাজ শুধু এতটুকুই, আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন

তাকে কোন কিছু কমবেশী না করে হুবহু মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন। তুমি যদি মেনে নিতে চাও তাহলে বিশ্বজাহানের প্রভু আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দীন পেশ করা হয়েছে তাকে পুরোপুরি হুবহু মেনে নাও। আর যদি না মানতে চাও তাহলে সেটা তোমার খুশী তুমি মেনে নিয়ো না। কিন্তু কোন অবস্থায় এ আশা করো না যে, তোমাকে রাজী করার জন্য তোমার খেয়াল-খুশীমতো এ দীনের মধ্যে কোন আংশিক পর্যায়ের হলেও কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হবে। কাফেরদের পক্ষ থেকে বারবার এ মর্মে যে দাবী করা হচ্ছিল যে, আমরা তোমার কথা পুরোপুরি মেনে নেবো এমন জিদ ধরে বসে আছো কেন? আমাদের পৈতৃক দীনের আকীদা-বিশ্বাস ও রীতি-রেওয়াজের সুবিধা দেবার কথাটাও একটু বিবেচনা করো। তুমি আমাদেরটা কিছু মেনে নাও এবং আমরা তোমারটা কিছু মেনে নিই। এর ভিত্তিতে সমঝোতা হতে পারে এবং এভাবে গোত্রীয় সম্প্রীতি ও ঐক্য অটুট থাকতে পারে। এটি হচ্ছে কাফেরদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত এই দাবীর জওয়াব। কুরআনে একাধিক জায়গায় তাদের এ দাবী উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর এ জওয়াবই দেয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ সূরা ইউনুসের ১৫ আয়াতটি দেখুন। বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ط- (يونس - ١٥)

"যখন আমার আয়াত তাদেরকে পরিষ্কার শুনিয়ে দেয়া হয় তখন যারা কখনো আমার সামনে হাযির হবার আকাংখা রাখে না তারা বলে, এ ছাড়া অন্য কোন কুরআন নিয়ে এসো অথবা এর মধ্যে কিছু কাটছাঁট করো।"

২৮. ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনা অনুযায়ী কুরাইশ সরদাররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতো, বেলাল (রা), সোহাইব (রা), আম্মার (রা), খাব্বাব (রা) ও ইবনে মাসউদের (রা) মতো গরীব লোকেরা তোমার সাথে বসে, আমরা ওদের সাথে বসতে পারি না। ওদেরকে হটাও তাহলে আমরা তোমার মজলিসে আসতে পারি এবং তুমি কি বলতে চাও তা জানতে পারি। একথায় মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমার চারদিকে জমায়েত হয়েছে এবং দিনরাত নিজেদের রবকে স্মরণ করছে তাদেরকে তোমার কাছে থাকতে দাও এবং এ ব্যাপারে নিজের মনে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব আসতে দিও না এবং তাদের দিক থেকে কখনো দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না। তুমি কি এ আন্তরিকতা সম্পন্ন লোকদেরকে ত্যাগ করে চাও যে, এদের পরিবর্তে পার্থিব জৌলুসের অধিকারী লোকেরা তোমার কাছে বসুক? এ বাক্যেও বাহ্যত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু আসলে কুরাইশ সরদারদেরকে একথা শুনানোই এখানে মূল উদ্দেশ্য যে, তোমাদের এ লোক দেখানো জৌলুস, যার জন্য তোমরা গর্বিত। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে এগুলোর কোন মূল্য ও মর্যাদা নেই। যেসব গরীব লোকের মধ্যে আন্তরিকতা আছে এবং যারা নিজেদের রবের স্মরণ থেকে কখনো গাফিল হয় না তারা তোমার চাইতে অনেক বেশী মূল্যবান। হযরত নূহ (আ) ও তাঁর সরদারদের মধ্যেও ঠিক এ একই ব্যাপার ঘটেছিল। তারা হযরত নূহকে (আ) বলতো ঃ

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّآ
أَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا
بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ ۚ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۝٢٩

পরিষ্কার বলে দাও, এ হচ্ছে সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে, এখন যে চায় মেনে নিক এবং যে চায় অস্বীকার করুক।[৩১] আমি (অস্বীকারকারী) জালেমদের জন্য একটি আগুন তৈরী করে রেখেছি যার শিখাগুলো তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলেছে।[৩২] সেখানে তারা পানি চাইলে এমন পানি দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করা হবে, যা হবে তেলের তলানির মতো।[৩৩] এবং যা তাদের চেহারা দগ্ধ করে দেবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং কি জঘন্য আবাস!

وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ

"আমরা তো দেখছি আমাদের মধ্যে যারা নিম্ন স্তরের লোক, তারাই না বুঝে সুজে তোমার পেছনে জড়ো হয়েছে।"

হযরত নূহের (আ) জবাব ছিল ঃ مَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا "যারা ঈমান এনেছে আমি তাদের তাড়িয়ে দিতে পারি না।" এবং لَا أَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْ أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا "যাদেরকে তোমরা তাচ্ছিল্যের নজরে দেখো তাদের সম্বন্ধে আমি এ কথা বলতে পারি না যে, আল্লাহ তাদেরকে কোন কল্যাণ দান করেননি।" (হূদ ২৭, ২৯, ৩১ আয়াত, আন'আম ৫২ এবং আল হিজ্‌র ৮৮ আয়াত)।

২৯. অর্থাৎ তার কথা মেনো না, তার সামনে মাথা নত করো না, তার ইচ্ছা পূর্ণ করো না এবং তার কথায় চলো না। এখানে আনুগত্য শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩০. كَانَ أَمْرُهٗ فُرُطًا এর একটি অর্থ তাই যা আমি অনুবাদে গ্রহণ করেছি। এর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, "যে ব্যক্তি সত্যকে পেছনে রেখে এবং নৈতিক সীমারেখা লংঘন করে লাগামহীনভাবে চলে।" উভয় অবস্থায় মূল কথা একই দাঁড়ায়। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভুলে গিয়ে নিজের নফসের বান্দা হয়ে যায় তার প্রত্যেকটি কাজে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং আল্লাহর সীমারেখা সম্পর্কে তার কোন জ্ঞানই থাকে না। এ ধরনের লোকের আনুগত্য করার মানে এ দাঁড়ায় যে, যে আনুগত্য করে সেও আল্লাহর সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ ও অচেতন থেকে যায়, আর যার আনুগত্য করা হয় সে বিভ্রান্ত হয়ে যেখানে যেখানে ঘুরে বেড়ায় আনুগত্যকারীও সেখানে সেখানে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

৩১. এখানে এসে পরিষ্কার বুঝা যায় আসহাবে কাহ্‌ফের কাহিনী শুনাবার পর কোন্ উপলক্ষে এ বাক্যটি এখানে বলা হয়েছে। আসহাবে কাহ্‌ফের যে কাহিনী ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছিল, তাওহীদের প্রতি ঈমান আনার পর তারা কিভাবে

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ
عَمَلًا ﴿٣٠﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ
فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ
وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

তবে যারা মেনে নেবে এবং সৎকাজ করবে, সেসব সৎকর্মশীলদের প্রতিদান আমি কখনো নষ্ট করি না। তাদের জন্য রয়েছে চির বসন্তের জান্নাত, যার পাদদেশে প্রবাহিত হতে থাকবে নদী, সেখানে তাদেরকে সোনার কাঁকনে সজ্জিত করা হবে,[৩৪] সূক্ষ্ম ও পুরু রেশম ও কিংখাবের সবুজ বস্ত্র পরিধান করবে এবং উপবেশন করবে উঁচু আসনে বালিশে হেলান দিয়ে,[৩৫] চমৎকার পুরস্কার এবং সর্বোত্তম আবাস!

দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে দেন, "আমাদের রব তো একমাত্র তিনিই যিনি আকাশ ও পৃথিবীর রব।" তারপর কিভাবে তারা নিজেদের পথভ্রষ্ট জাতির সাথে কোনভাবেই আপোস করতে রাযী হননি বরং পূর্ণ-দৃঢ়তার সাথে বলে দেন, "আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্‌কে ডাকবো না। যদি আমরা এমনটি করি তাহলে তা হবে বড়ই অসংগত ও অন্যায় কথা।" কিভাবে তারা নিজেদের জাতি ও তার উপাস্যদের ত্যাগ করে কোন প্রকার সাহায্য-সহায়তা ও সাজসরঞ্জাম ছাড়াই গুহার মধ্যে লুকিয়ে জীবন যাপন করার ব্যবস্থা করেছিল কিন্তু সত্য থেকে এক চুল পরিমাণও সরে গিয়ে নিজের জাতির সাথে আপোস করতে প্রস্তুত হয়নি। তারপর যখন তারা জেগে উঠলেন তখনও তারা যে বিষয়ে চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন সেটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ না করুন, যদি তাদের জাতি কোনভাবে তাদেরকে নিজেদের ধর্মের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় তাহলে তারা কখনো সাফল্য লাভ করতে পারবে না। এসব ঘটনা উল্লেখ করার পর এখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে—আর আসলে ইসলাম বিরোধীদেরকে শুনাবার উদ্দেশ্যেই তাঁকে বলা হচ্ছে—যে, এ মুশরিক ও সত্য অস্বীকারকারী গোষ্ঠীর সাথে আপোস করার আদৌ কোন প্রশ্নই ওঠে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে তাকে হুবহু তাদের সামনে পেশ করে দাও। যদি তারা মানতে চায় তাহলে মেনে নিক আর যদি না মানতে চায় তাহলে নিজেরাই অশুভ পরিণামের মুখোমুখি হবে। যারা মেনে নিয়েছে তারা কম বয়েসী যুবক অথবা অর্থ ও কপর্দকহীন ফকীর, মিসকীন, দাস বা মজুর যেই হোক না কেন তারাই মহামূল্যবান হীরার টুকরা এবং তাদেরকেই এখানে প্রিয়ভাজন করা হবে। তাদেরকে বাদ দিয়ে এমন সব বড় বড় সরদার ও প্রধানদেরকে কোন কাজেই গ্রাহ্য করা হবে না তারা যত বেশী দুনিয়াবী শান শওকতের অধিকারী হোক না কেন, তারা আল্লাহ থেকে গাফিল এবং নিজেদের প্রবৃত্তির দাস।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ
وَحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۝٣٢ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ أُكُلَهَا
وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا ۙ وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ۝٣٣ وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ
لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّأَعَزُّ نَفَرًا ۝٣٤ وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ
وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ أَبَدًا ۝٣٥

৫ রুকূ'

হে মুহাম্মাদ! এদের সামনে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করে দাও।[৩৬] দু' ব্যক্তি ছিল। তাদের একজনকে আমি দু'টি আংগুর বাগান দিয়েছিলাম এবং সেগুলোর চারদিকে খেজুর গাছের বেড়া দিয়েছিলাম আর তার মাঝখানে রেখেছিলাম কৃষি ক্ষেত। দু'টি বাগানই ভাল ফলদান করতো এবং ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারা সামান্যও ত্রুটি করতো না। এ বাগান দু'টির মধ্যে আমি একটি নহর প্রবাহিত করেছিলাম এবং সে খুব লাভবান হয়েছিল। এসব কিছু পেয়ে একদিন সে তার প্রতিবেশীর সাথে কথা প্রসংগে বললো, "আমি তোমার চেয়ে বেশী ধনশালী এবং আমার জনশক্তি তোমার চেয়ে বেশী।" তারপর সে তার বাগানে প্রবেশ করলো[৩৭] এবং নিজের প্রতি জালেম হয়ে বলতে লাগলো ঃ "আমি মনে করি না এ সম্পদ কোন দিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

৩২. 'সুরাদিক' শব্দের আসল মানে হচ্ছে তাঁবুর চারদিকের ক্যাম্বিস কাপড়ের ঘের। কিন্তু জাহান্নামের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে বিচার করলে মনে হয় 'সুরাদিক' মানে হবে তার লেলিহান শিখার বিস্তার এবং উত্তাপের প্রভাব বাইরের এলাকায় যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে সেই সমগ্র এলাকার সীমানাই হচ্ছে 'সুরাদিক'। আয়াতে বলা হয়েছে, "তার সুরাদিক তাদেরকে ঘিরে নিয়েছে।" কেউ কেউ এটিকে ভবিষ্যত অর্থে নিয়েছে। অর্থাৎ এর মানে এ বুঝেছে যে, পরলোকে জাহান্নামের আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে ঘিরে ফেলবে। কিন্তু আমি মনে করি এর মানে হবে, সত্য থেকে যে জালেম মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে এখান থেকেই জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিশিখার আওতাভুক্ত হয়ে গেছে এবং তার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে পালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

৩৩ 'মুহ্‌ল' শব্দের বিভিন্ন অর্থ আরবী অভিধানগুলোয় বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ কেউ এর মানে লিখেছেন তেলের তলানি। কারোর মতে এ শব্দটি "লাভা" অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, গলিত ধাতু। আবার কারোর মতে এর মানে পুঁজ ও রক্ত।

وَمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا
مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ
مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ وَلَآ اُشْرِكُ
بِرَبِّىْٓ اَحَدًا ﴿٣٨﴾ وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا
بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿٣٩﴾ فَعَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ
خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾

এবং আমি আশা করি না কিয়ামতের সময় কখনো আসবে। তবুও যদি আমাকে কখনো আমার রবের সামনে ফিরিয়েও নেয়া হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমি এর চাইতেও বেশী জাঁকালো জায়গা পাবো।"[৩৮] তার প্রতিবেশী কথাবার্তার মধ্যে তাকে বললো, "তুমি কি কুফরী করছো সেই সত্তার যিনি তোমাকে মাটি থেকে তারপর শুক্র থেকে পয়দা করেছেন এবং তোমাকে একটি পূর্ণাবয়ব মানুষ বানিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন?"[৩৯] আর আমার ব্যাপারে বলবো, আমার রব তো সেই আল্লাহই এবং আমি তার সাথে কাউকে শরীক করি না। আর যখন তুমি নিজের বাগানে প্রবেশ করছিলে তখন তুমি কেন বললে না, "আল্লাহ যা চান তাই হয়, তাঁর প্রদত্ত শক্তি ছাড়া আর কোন শক্তি নেই?[৪০] যদি তুমি সম্পদ ও সন্তানের দিক দিয়ে আমাকে তোমার চেয়ে কম পেয়ে থাকো তাহলে অসম্ভব নয় আমার রব আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে ভাল কিছু দেবেন এবং তোমার বাগানের ওপর আকাশ থেকে কোন আপদ পাঠাবেন যার ফলে তা বৃক্ষলতাহীন প্রান্তরে পরিণত হবে।

৩৪. প্রাচীনকালে রাজা বাদশাহরা সোনার কাঁকন পরতেন। জান্নাতবাসীদের পোশাকের মধ্যে এ জিনিসটির কথা বর্ননা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা জানিয়ে দেয়া যে, সেখানে তাদেরকে রাজকীয় পোশাক পরানো হবে। একজন কাফের ও ফাসেক বাদশাহ সেখানে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে এবং একজন মুমিন ও সৎ মজদুর সেখানে থাকবে রাজকীয় জৌলুসের মধ্যে।

৩৫. 'আরাইক' শব্দটি বহুবচন। এর এক বচন হচ্ছে "আরীকাহ" আরবী ভাষায় আরীকাহ এমন ধরনের আসনকে বলা হয় যার ওপর ছত্র খাটানো আছে। এর মাধ্যমেও

أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿٤١﴾ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ
يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ
يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٤٢﴾ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن
دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿٤٣﴾ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾

অথবা তার পানি ভূগর্ভে নেমে যাবে এবং তুমি তাকে কোনক্রমেই উঠাতে পারবে না।" শেষ পর্যন্ত তার সমস্ত ফসল বিনষ্ট হলো এবং সে নিজের আংগুর বাগান মাচানের ওপর লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে থাকতে দেখে নিজের নিয়োজিত পুঁজির জন্য আফসোস করতে থাকলো এবং বলতে লাগলো, "হায়! যদি আমি আমার রবের সাথে কাউকে শরীক না করতাম।" —সে সময় আল্লাহ ছাড়া তাকে সাহায্য করার মতো কোন গোষ্ঠীও ছিল না, আর সে নিজেও এ বিপদের মোকাবিলা করতে সক্ষম ছিল না। তখন জানা গেলো, কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে ন্যস্ত, যিনি সত্য। আর পুরস্কার সেটাই ভাল, যা তিনি দান করেন এবং পরিণতি সেটাই শ্রেয়, যা তিনি দেখান।

এখানে এ ধারণা দেয়াই উদ্দেশ্য যে, সেখানে প্রত্যেক জান্নাতী রাজকীয় সিংহাসনে বসে থাকবে।

৩৬. এ উদাহরণটির প্রাসংগিক সম্পর্ক বুঝার জন্য পেছনের রুকূ'র বিশেষ আয়াতটি সামনে থাকা দরকার যাতে মক্কার অহংকারী সরদারদের কথার জবাব দেয়া হয়েছিল। সরদাররা বলেছিল, আমরা গরীব মুসলমানদের সাথে বসতে পারি না, তাদেরকে সরিয়ে দিলে আমরা তোমার কাছে গিয়ে বসে তুমি কি বলতে চাও তা শুনতে পারি। সূরা আল কালামের ১৭ থেকে ৩৩ আয়াতে যে উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে তাও এখানে নজরে রাখা উচিত। তাছাড়া সূরা মারয়ামের ৭৩-৭৪ আয়াত, আল মুমিনূনের ৫৫ থেকে ৬১ আয়াত, সাবার ৩৪-৩৬ আয়াত এবং হা-মীম সাজদার ৪৯-৫০ আয়াতের ওপরও একবার নজর বুলিয়ে নেয়া দরকার।

৩৭. অর্থাৎ যে বাগানগুলোকে সে নিজের বেহেশত মনে করছিল। অর্বাচীন লোকেরা দুনিয়ায় কিছু ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও শান-শওকতের অধিকারী হলেই হামেশা এ বিভ্রান্তির শিকার হয় যে, তারা দুনিয়াতেই বেহেশত পেয়ে গেছে। এখন আর এমন কোন্ বেহেশত আছে যা অর্জন করার জন্য তাকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে?

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ
نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ
مُّقْتَدِرًا ۝۴۵ اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ۝۴۶

৬ রুকূ'

আর হে নবী! দুনিয়ার জীবনের তাৎপর্য তাদেরকে এ উপমার মাধ্যমে বুঝাও যে, আজ আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলাম, ফলে ভূ-পৃষ্ঠের উদ্ভিদ খুব ঘন হয়ে গেলো আবার কাল এ উদ্ভিদগুলোই শুকনো ভূষিতে পরিণত হলো, যাকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী।৪১ এ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের একটি সাময়িক সৌন্দর্য-শোভা মাত্র। আসলে তো স্থায়িত্ব লাভকারী সৎকাজগুলোই তোমার রবের কাছে ফলাফলের দিক দিয়ে উত্তম এবং এগুলোই উত্তম আশা-আকাংখা সফল হবার মাধ্যম।

৩৮. অর্থাৎ যদি পরকাল থেকেই থাকে তাহলে আমি সেখানে এখানকার চেয়েও বেশী সচ্ছল থাকবো। কারণ এখানে আমার সচ্ছল ও ধনাঢ্য হওয়া একথাই প্রমাণ করে যে, আমি আল্লাহর প্রিয়।

৩৯. যদিও এ ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করেনি বরং وَلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ এর শব্দাবলী প্রকাশ করছে যে, সে আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করতো, তবুও তার প্রতিবেশী তাকে আল্লাহর সাথে কুফরী করার দায়ে অভিযুক্ত করলো। এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহর কুফরী করা নিছক আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করার নাম নয় বরং অহংকার, গর্ব, দম্ভ ও আখেরাত অস্বীকারও কুফরী হিসেবে গণ্য। যে ব্যক্তি মনে করলো, আমিই সব, আমার ধন-সম্পদ ও শান শওকত কারোর দান নয় বরং আমার শক্তি ও যোগ্যতার ফল এবং আমার সম্পদের ক্ষয় নেই, আমার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেবার কেউ নেই এবং কারোর কাছে আমাকে হিসেব দিতেও হবে না, সে আল্লাহকে মানলেও নিছক একটি অস্তিত্ব হিসেবেই মানে, নিজের মালিক প্রভু এবং শাসনকর্তা হিসেবে মানে না। অথচ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার মানেই হচ্ছে উপরোক্ত ক্ষমতাগুলো একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত বলে স্বীকার করা, আল্লাহকে নিছক একটি অস্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার নাম ঈমান নয়।

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ
أَحَدًا ﴿٤٧﴾ وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ۭ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ
بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾ وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ
مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ
صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً إِلَّآ أَحْصٰهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۭ وَلَا يَظْلِمُ
رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾

সেই দিনের কথা চিন্তা করা দরকার যেদিন আমি পাহাড়গুলোকে চালিত করবো[৪২] এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে সম্পূর্ণ অনাবৃত[৪৩] আর আমি সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে এমনভাবে ঘিরে এনে একত্র করবো যে, (পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্য থেকে) একজনও বাকি থাকবে না।[৪৪] এবং সবাইকে তোমার রবের সামনে লাইনবন্দী করে পেশ করা হবে।—নাও দেখে নাও, তোমরা এসে গেছো তো আমার কাছে ঠিক তেমনিভাবে যেমনটি আমি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম।[৪৫] তোমরা তো মনে করেছিলে আমি তোমাদের জন্য কোন প্রতিশ্রুত ক্ষণ নির্ধারিতই করিনি।—আর সেদিন আমলনামা সামনে রেখে দেয়া হবে। সে সময় তোমরা দেখবে অপরাধীরা নিজেদের জীবন খাতায় যা লেখা আছে সে জন্য ভীত হচ্ছে এবং তারা বলছে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, এটা কেমন খাতা, আমাদের ছোট বড় এমন কোন কিছুই এখানে লেখা থেকে বাদ পড়েনি। তাদের যে যা কিছু করেছিল সবই নিজের সামনে উপস্থিত পাবে এবং তোমার রব কারোর প্রতি জুলুম করবেন না।

৪০. "অর্থাৎ আল্লাহ যা চান তাই হবে। আমাদের ও অন্য কারোর কোন ক্ষমতা নেই। আমাদের যদি কোন জোর চলতে পারে তাহলে তা চলতে পারে একমাত্র আল্লাহরই সুযোগ ও সাহায্য-সহযোগিতা দানের মাধ্যমেই।"

৪১. অর্থাৎ তিনি জীবনও দান করেন আবার মৃত্যুও। তিনি উত্থান ঘটান আবার পতনও ঘটান। তাঁর নির্দেশে বসন্ত আসে এবং পাতা ঝরা শীত মওসুমও তাঁর নির্দেশেই আসে। আজ যদি তুমি সচ্ছল ও আয়েশ আরামের জীবন যাপন করে থাকো তাহলে এ অহংকারে মত্ত হয়ে থেকো না যে, এ অবস্থার পরিবর্তন নেই। যে আল্লাহর হুকুমে তুমি এসব কিছু লাভ করেছো তাঁরই হুকুমে এসব কিছু তোমার কাছ থেকে ছিনিয়েও নেয়া যেতে পারে।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ ۖ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ
فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ ۖ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ
عَدُوٌّۢ ۖ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

৭ রুকূ'

স্মরণ করো যখন আমি ফেরেশ্‌তাদেরকে বলেছিলাম আদমকে সিজদা করো তখন তারা সিজদা করেছিল কিন্তু ইবলীস করেনি।[৪৭] সে ছিল জিনদের একজন, তাই তার রবের হুকুমের আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেলো।[৪৮] এখন কি তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে তাকে এবং তার বংশধরদেরকে নিজেদের অভিভাবক বানিয়ে নিচ্ছো অথচ তারা তোমাদের দুশমন? বড়ই খারাপ বিনিময় জালেমরা গ্রহণ করছে!

৪২. অর্থাৎ যখন যমীনের বাঁধন আলগা হয়ে যাবে এবং পাহাড় ঠিক এমনভাবে চলতে শুরু করবে যেমন আকাশে মেঘেরা ছুটে চলে। কুরআনের অন্য এক জায়গায় এ অবস্থাটিকে এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ۚ

"তুমি পাহাড়গুলো দেখো এবং মনে করো এগুলো অত্যন্ত জমাটবদ্ধ হয়ে আছে কিন্তু এগুলো চলবে ঠিক যেমন মেঘেরা চলে।" (আন্ নামল ঃ ৮৮)।

৪৩. অর্থাৎ এর ওপর কোন শ্যামলতা, বৃক্ষ-তরুলতা এবং ঘরবাড়ি থাকবে না। সারাটা পৃথিবী হয়ে যাবে একটা ধূ ধূ প্রান্তর। এ সূরার সূচনায় এ কথাটিই বলা হয়েছিল এভাবে যে, "এ পৃথিবী পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সেসবই আমি লোকদের পরীক্ষার জন্য একটি সাময়িক সাজসজ্জা হিসেবে তৈরী করেছি। এক সময় আসবে যখন এটি সম্পূর্ণ একটি পানি ও বৃক্ষ লতাহীন মরুপ্রান্তরে পরিণত হবে।"

৪৪. অর্থাৎ আদম থেকে নিয়ে কিয়ামতের পূর্বে শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত যেসব মানুষ জন্ম নেবে, তারা মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে দুনিয়ার বুকে একবার মাত্র নিঃশ্বাস নিলেও, তাদের প্রত্যেককে সে সময় পুনরবার পয়দা করা হবে এবং সবাইকে একই সংগে জমা করে দেয়া হবে।

৪৫. অর্থাৎ সে সময় আখেরাত অস্বীকারকারীদেরকে বলা হবে ঃ দেখো, নবীগণ যে খবর দিয়েছিলেন তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে তো। তারা তোমাদের বলতেন, আল্লাহ যেভাবে তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন ঠিক তেমনি দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করবেন। তোমরা তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলে। কিন্তু এখন বলো, তোমাদের দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা হয়েছে কি না?

৪৬. অর্থাৎ এক ব্যক্তি একটি অপরাধ করেনি কিন্তু সেটি খামাখা তার নামে লিখে দেয়া হয়েছে, এমনটি কখনো হবে না। আবার কোন ব্যক্তিকে তার অপরাধের পাওনা সাজার বেশী সাজা দেয়া হবে না এবং কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে অযথা পাকড়াও করেও শাস্তি দেয়া হবে না।

৪৭. এ বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় আদম ও ইবলীসের কাহিনীর প্রতি ইংগিত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পথভ্রষ্ট লোকদেরকে তাদের এ বোকামির ব্যাপারে সজাগ করে দেয়া যে, তারা নিজেদের স্নেহশীল ও দয়াময় আল্লাহ এবং শুভাকাংখী নবীদেরকে ত্যাগ করে এমন এক চিরন্তন শত্রুর ফাঁদে পা দিচ্ছে যে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই তাদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

৪৮. অর্থাৎ ইবলীস ফেরেশতাদের দলভুক্ত ছিল না। বরং সে ছিল জিনদের একজন। তাই তার পক্ষে আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। ফেরেশতাদের ব্যাপারে কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় বলে, তারা প্রকৃতিগতভাবে অনুগত ও হুকুম মেনে চলে ঃ

لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○

"আল্লাহ তাদেরকে যে হুকুমই দেন না কেন তারা তার নাফরমানী করে না এবং তাদেরকে যা হুকুম দেয়া হয় তাই করে।" (আত্ তাহরীম ঃ ৬)

وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○ يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○

"তারা অবাধ্য হয় না, তাদের রবকে, যিনি তাদের ওপর আছেন, ভয় করে এবং তাদেরকে যা হুকুম দেয়া হয় তাই করে।" (আন্ নহ্‌ল ঃ ৫০)

অন্যদিকে জিন হচ্ছে মানুষের মতো একটি স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন সৃষ্টি। তাদেরকে জন্মগত আনুগত্যশীল হিসেবে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং তাদেরকে কুফর ও ঈমান এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতা উভয়টি করার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। এ সত্যটিই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, ইবলীস ছিল জিনদের দলভুক্ত, তাই সে স্বেচ্ছায় নিজের স্বাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করে ফাসেকীর পথ বাছাই করে নেয়। এ সুস্পষ্ট বক্তব্যটি লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত এক ধরনের ভুল ধারণা দূর করে দেয়। এ ধারণাটি হচ্ছে ঃ ইবলীস ফেরেশ্‌তাদের দলভুক্ত ছিল এবং তাও আবার সাধারণ ও মামুলি ফেরেশ্‌তা নয়, ফেরেশ্‌তাদের সরদার। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন আল হিজর ২৭ এবং আল জিন ১৩–১৫ আয়াত)।

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, যদি ইবলীস ফেরেশ্‌তাদের দলভুক্ত না হয়ে থাকে তাহলে কুরআনের এ বর্ণনা পদ্ধতি কেমন করে সঠিক হতে পারে যে, "আমি ফেরেশ্‌তাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা করো, তখন তারা সবাই সিজদা করলো কিন্তু ইবলীস করলো না?" এর জবাব হচ্ছে, ফেরেশ্‌তাদেরকে সিজদা করার হুকুম দেবার অর্থ এ ছিল যে, ফেরেশ্‌তাদের কর্ম ব্যবস্থাপনায় পৃথিবী পৃষ্ঠে অস্তিত্বশীল সকল সৃষ্টিও মানুষের হুকুমের অনুগত হয়ে যাবে। কাজেই ফেরেশ্‌তাদের সাথে সাথে এ সমস্ত সৃষ্টিও সিজদানত হলো কিন্তু ইবলীস তাদের সাথে সিজদা করতে অস্বীকার করলো। (ইবলীস শব্দের অর্থ জানার জন্য আল মু'মিনুনের ৭৩ টীকা দেখুন)।

مَآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ ۖ وَمَا كُنتُ
مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿٥١﴾ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَآءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ
فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ
فَظَنُّوٓا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾

আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার সময় আমি তাদেরকে ডাকিনি এবং তাদের নিজেদের সৃষ্টিতেও তাদেরকে শরীক করিনি।[৪৯] পথভ্রষ্টকারীদেরকে নিজের সাহায্যকারী করা আমার রীতি নয়।

তাহলে সেদিন এরা কি করবে যেদিন এদের রব এদেরকে বলবে, ডাকো সেই সব সত্তাকে যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করে বসেছিলে?[৫০] এরা তাদেরকে ডাকবে কিন্তু তারা এদেরকে সাহায্য করতে আসবে না এবং আমি তাদের মাঝখানে একটিমাত্র ধ্বংস গহবর তাদের সবার জন্য বানিয়ে দেবো।[৫১] সমস্ত অপরাধীরা সেদিন আগুন দেখবে এবং বুঝতে পারবে যে, এখন তাদের এর মধ্যে পড়তে হবে এবং এর হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা কোন আশ্রয়স্থল পাবে না।

৪৯. এর অর্থ হচ্ছে, এ শয়তানরা তোমাদের আনুগত্য ও বন্দেগী লাভের হকদার হয়ে গেলো কেমন করে? বন্দেগী তো একমাত্র স্রষ্টারই অধিকার হতে পারে। আর এ শয়তানদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, এদের আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্মে শরীক হওয়া তো দূরের কথা এরা নিজেরাই তো সৃষ্টি মাত্র।

৫০. এখানে আবার সেই একই বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে যা ইতিপূর্বে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর বিধান ও তাঁর নির্দেশাবলী অমান্য করে অন্য কারো বিধান ও নেতৃত্ব মেনে চলা আসলে তাকে মুখে আল্লাহর শরীক বলে ঘোষণা না দিলেও আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে তাকে শরীক করারই শামিল। বরং ঐ ভিন্ন সত্তাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেও যদি আল্লাহর হুকুমের মোকাবিলায় তাদের হুকুম মেনে চলা হয় তাহলেও মানুষ শির্‌কের অপরাধে অভিযুক্ত হবে। কাজেই এখানে শয়তানদের ব্যাপারে প্রাকাশ্যে দেখা যাচ্ছে, দুনিয়ায় সবাই তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করছে কিন্তু এ অভিশাপের পরও যারা তাদের অনুসরণ করে কুরআন তাদের সবার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনছে যে, তোমরা শয়তানদেরকে আল্লাহর শরীক করে রেখেছো। এটি বিশ্বাসগত শির্‌ক নয় বরং কর্মগত শির্‌ক এবং কুরআন একেও শির্‌ক বলে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, ১ খণ্ড, আন্ নিসা, টীকা ৯১–১৪৫; আল আন'আম

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۭ وَكَانَ الْاِنْسَانُ
اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَاۗءَهُمُ الْهُدٰى
وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ
قُبُلًا ﴿٥٥﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ وَيُجَادِلُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَمَآ
اُنْذِرُوْا هُزُوًا ﴿٥٦﴾

৮ রুকূ'

আমি এ কুরআনে লোকদেরকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়েছি কিন্তু মানুষ বড়ই বিবাদপ্রিয়। তাদের সামনে যখন পথনির্দেশ এসেছে তখন কোন্ জিনিসটি তাদেরকে তা মেনে নিতে এবং নিজেদের রবের সামনে ক্ষমা চাইতে বাধা দিয়েছে? এ জিনিসটি ছাড়া আর কিছুই তাদেরকে বাধা দেয়নি যে, তারা প্রতীক্ষা করেছে তাদের সাথে তাই ঘটুক যা পূর্ববর্তী জাতিদের সাথে ঘটে গেছে অথবা তারা আযাবকে সামনে আসতে দেখে নিক।[৫২]

রসূলদেরকে আমি সুসংবাদ দান ও সতর্ক করার দায়িত্ব পালন ছাড়া অন্য কোন কাজে পাঠাই না।[৫৩] কিন্তু কাফেরদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা মিথ্যার হাতিয়ার দিয়ে সত্যকে হেয় করার চেষ্টা করে এবং তারা আমার নিদর্শনাবলী এবং যা দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সেসবকে বিদ্রূপের বিষয়ে পরিণত করেছে।

৮৭-১০৭; ২ খণ্ড, আত তাওবাহ্, টীকা ৩১; ইবরাহীম, টীকা ৩২; ৩ খণ্ড, মারয়াম, ৩৭ টীকা; আল মু'মিনুন, ৪১ টীকা; আল ফুরকান ৫৬ টীকা; আল কাসাস, ৮৬ টীকা; ৪ খণ্ড সাবা ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩; ইয়াসীন ৫৩ টীকা; আশ্ শূরা, ৩৮ টীকা; আল-জাসিয়াহ, ৩০ টীকা)।

৫১. মুফাস্‌সিরগণ এ আয়াতের দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। একটি অর্থ আমি অনুবাদে অবলম্বন করেছি এবং দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, "আমি তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করবো।" অর্থাৎ দুনিয়ায় তাদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব ছিল আখেরাতে তা ঘোরতর শত্রুতায় পরিবর্তিত হবে।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ
إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِنْ
تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ
ذُو الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَل لَّهُم
مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ
لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾

আর কে তার চেয়ে বড় জালেম, যাকে তার রবের আয়াত শুনিয়ে উপদেশ দেয়ার পর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং সেই খারাপ পরিণতির কথা ভুলে যায় যার সাজ-সরঞ্জাম সে নিজের জন্য নিজের হাতে তৈরী করেছে? (যারা এ কর্মনীতি অবলম্বন করেছে) তাদের অন্তরের ওপর আমি আবরণ টেনে দিয়েছি, যা তাদেরকে কুরআনের কথা বুঝতে দেয় না এবং তাদের কানে বধিরতা সৃষ্টি করে দিয়েছি। তুমি তাদেরকে সৎপথের দিকে যতই আহবান কর না কেন তারা এ অবস্থায় কখনো সৎপথে আসবে না।[৫৪]

তোমার রব বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করতে চাইলে দ্রুত আযাব পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে একটি প্রতিশ্রুত মুহূর্ত, তা থেকে পালিয়ে যাবার কোন পথই তারা পাবে না।[৫৫]

এ শাস্তিপ্রাপ্ত জনপদগুলো তোমাদের সামনে আছে,[৫৬] এরা জুলুম করলে আমি এদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম এবং এদের প্রত্যেকের ধ্বংসের জন্য আমি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম।

৫২. অর্থাৎ যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে সত্যকে সুস্পষ্ট করে তোলার ব্যাপারে কুরআন কোন ফাঁক রাখেনি। মন ও মস্তিষ্ককে আবেদন করার জন্য যতগুলো প্রভাবশালী পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভবপর ছিল সর্বোত্তম পদ্ধতিতে তা এখানে অবলম্বিত হয়েছে। এখন সত্যকে মেনে নেবার পথে তাদের জন্য কি বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে? শুধুমাত্র এটিই যে তারা আযাবের অপেক্ষা করছে। পিটুনি খাওয়া ছাড়া তারা সোজা হতে চায় না।

৫৩. এ আয়াতেরও দু'টি অর্থ হতে পারে এবং এ দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য ঃ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ
حُقُبًا ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي
الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن
سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ
الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ
فِي الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا ﴿٦٣﴾

৯ রুকূ'

(এদেরকে সেই ঘটনাটি একটু শুনিয়ে দাও যা মূসার সাথে ঘটেছিল) যখন মূসা তার খাদেমকে বলেছিল, "দুই দরিয়ার সংগমস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি সফর শেষ করবো না, অন্যথায় আমি দীর্ঘকাল ধরে চলতেই থাকবো।"[৫৭] সে অনুসারে যখন তারা তাদের সংগমস্থলে পৌঁছে গেলো তখন নিজেদের মাছের ব্যাপারে গাফেল হয়ে গেলো এবং সেটি বের হয়ে সুড়ংগের মতো পথ তৈরী করে দরিয়ার মধ্যে চলে গেলো। সামনে এগিয়ে যাওয়ার পর মূসা তার খাদমকে বললো, "আমাদের নাশ্‌তা আনো, আজকের সফরে তো আমরা ভীষণভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।" খাদেম বললো, "আপনি কি দেখেছেন, কি ঘটে গেছে? যখন আমরা সেই পাথরটার পাশে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম তখন আমার মাছের কথা মনে ছিল না এবং শয়তান আমাকে এমন গাফেল করে দিয়েছিল যে, আমি (আপনাকে) তার কথা বলতে ভুলে গেছি। মাছ তো অদ্ভুতভাবে বের হয়ে দরিয়ার মধ্যে চলে গেছে।"

একটি অর্থ হচ্ছে, রসূলদেরকে আমরা এ জন্য পাঠাই যে, ফায়সালার সময় আসার আগে তারা লোকদেরকে আনুগত্যের ভাল ও নাফরমানির খারাপ পরিণতির ব্যাপারে সজাগ করে দেবেন। কিন্তু এ নির্বোধ লোকেরা আগাম সতর্কবাণী থেকে লাভবান হবার চেষ্টা করছে না এবং রসূল তাদেরকে যে অশুভ পরিণাম থেকে বাঁচাতে চান তারই মুখোমুখি হবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে।

দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, যদি আযাব ভোগ করাই তাদের কাছে কাংখিত হয়ে থাকে তাহলে নবীর কাছে তার দাবী না করা উচিত। কারণ নবীকে আযাব দেবার জন্য নয় বরং আযাব দেবার পূর্বে শুধুমাত্র সাবধান করার জন্য পাঠান হয়।

৫৪. অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি বা দল যুক্তি, প্রমাণ ও শুভেচ্ছামূলক উপদেশের মোকাবিলায় বিতর্ক প্রিয়তায় নেমে আসে, মিথ্যা ও প্রতারণার অস্ত্র দিয়ে সত্যের মোকাবিলা করতে থাকে এবং নিজের কৃতকর্মের খারাপ পরিণতি দেখার আগে কারোর বুঝাবার পর নিজের ভুল মেনে নিতে প্রস্তুত হয় না তখন আল্লাহ তার অন্তরকে তালাবদ্ধ করেন, সত্যের প্রত্যেকটি ধ্বনির জন্য তার কানকে বধির করে দেন। এ ধরনের লোকেরা উপদেশ বাণীর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে না বরং ধ্বংসের গর্তে পড়ে যাবার পরই এদের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, এরা যে পথে এগিয়ে চলছিল সেটিই ছিল ধ্বংসের পথ।

৫৫. অর্থাৎ কেউ কোন দোষ করলে সংগে সংগেই তাকে পাকড়াও করে শাস্তি দিয়ে দেয়া আল্লাহর রীতি নয়। তাঁর দয়াগুণের দাবী অনুযায়ী অপরাধীদেরকে পাকড়াও করার ব্যাপারে তিনি তাড়াহুড়া করেন না এবং তাদের সংশোধিত হবার জন্য সুযোগ দিতে থাকেন দীর্ঘকাল। কিন্তু বড়ই মূর্খ তারা যারা এ ঢিল দেয়াকে ভুল অর্থে গ্রহণ করে এবং মনে করে তারা যাই কিছু করুক না কেন তারেদকে কখনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

৫৬. এখানে সাবা, সামূদ, মাদায়েন ও লূতের জাতির বিরাণ এলাকাগুলোর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। কুরাইশরা নিজেদের বাণিজ্যিক সফরের সময় যাওয়া আসার পথে এসব জায়গা দেখতো এবং আরবের অন্যান্য লোকেরাও এগুলো সম্পর্কে ভালভাবে অবগত ছিল।

৫৭. এ পর্যায়ে কাফের ও মুমিন উভয় গোষ্ঠীকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে সজাগ করাই মূল উদ্দেশ্য। সেই সত্যটি হচ্ছে, দুনিয়ায় যা কিছু ঘটে মানুষের স্থূল দৃষ্টি তা থেকে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ফলাফল গ্রহণ করে। কারণ আল্লাহ যে উদ্দেশ্য ও কল্যাণ সামনে রেখে কাজ করেন তা তার জানা থাকে না। মানুষ প্রতিনিয়ত দেখছে, জালেমরা স্ফীত হচ্ছে, উন্নতি লাভ করছে, নিরপরাধরা কষ্ট ও সংকটের আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে, নাফরমানদের প্রতি অজস্রধারে অনুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে, আনুগত্যশীলদের ওপর বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ছে, অসৎলোকেরা আয়েশ আরামে দিন যাপন করছে এবং সৎলোকদের দূরবস্থার শেষ নেই। লোকেরা নিছক এর গুঢ় রহস্য না জানার কারণে সাধারণভাবে তাদের মনে দোদুল্যমানতা এমন কি বিভ্রান্তিও দেখা দেয়। কাফের ও জালেমরা এ থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায় যে, এ দুনিয়াটা একটা অরাজকতার মুল্লুক। এখানে কোন রাজা নেই। আর থাকলেও তার শাসন শৃংখলা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। এখানে যার যা ইচ্ছা করতে পারে। তাকে জিজ্ঞেস বা কৈফিয়ত তলব করার কেউ নেই। এ ধরনের ঘটনাবলী দেখে মুমিন মনমরা হয়ে পড়ে এবং অনেক সময় কঠিন পরীক্ষাকালে তার ঈমানের ভিতও নড়ে যায়। এহেন অবস্থায় মহান আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালামকে তাঁর নিজের ইচ্ছা জগতের পরদা উঠিয়ে এক ঝলক দেখিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে সেখানে দিনরাত কি হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, কি কারণে হচ্ছে এবং ঘটনার বহিরাংগন তার অভ্যন্তর থেকে কেমন ভিন্নতর হয় তা তিনি জানতে পারেন।

হযরত মূসার (আ) এ ঘটনাটি কোথায় ও কবে সংঘটিত হয়? কুরআনে একথা সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি। হাদীসে অবশ্যি আমরা আওফীর একটি বর্ণনা পাই, যাতে তিনি

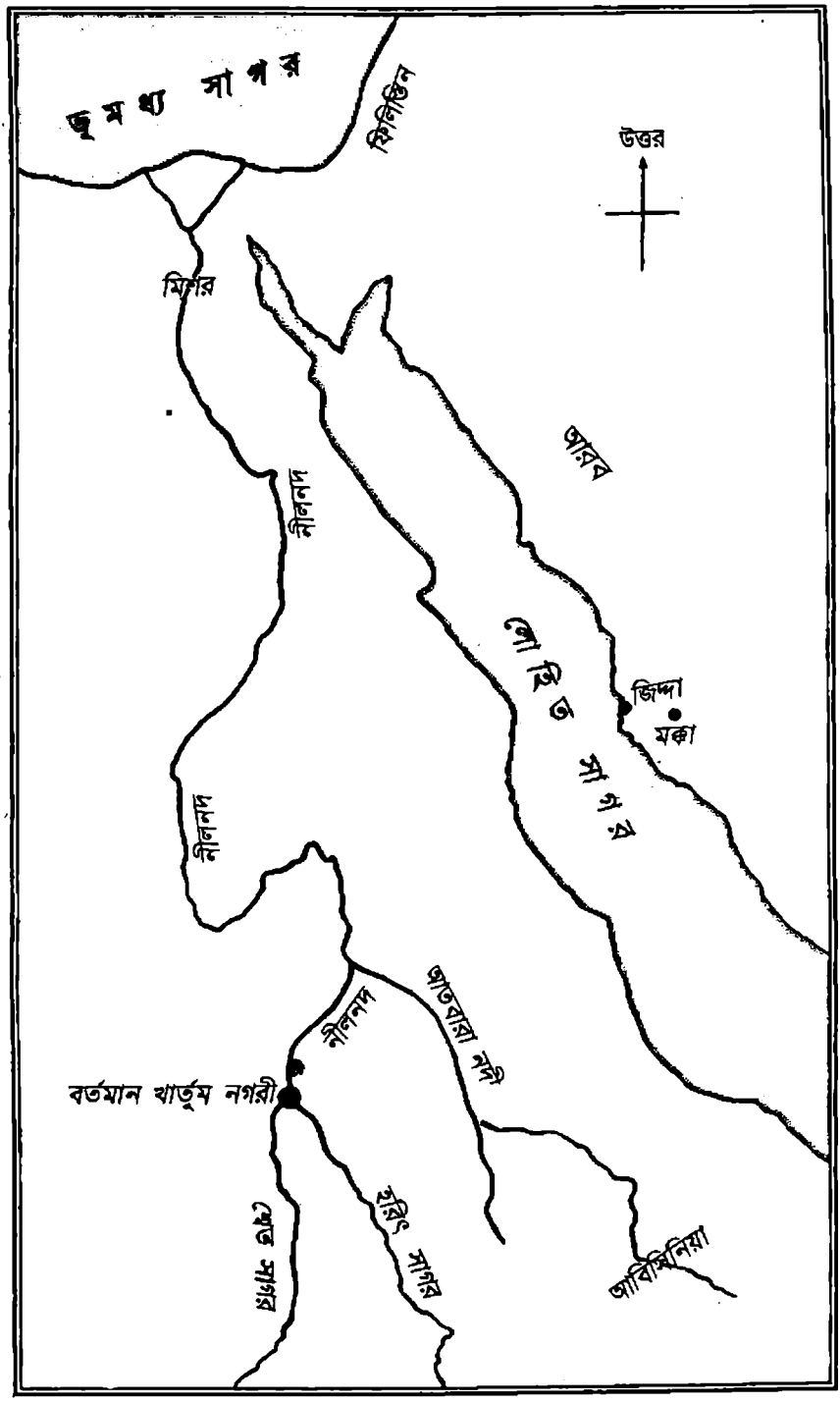

হযরত মূসা (আ) ও খিজিরের (আ) কিসসা সংক্রান্ত মানচিত্র

ইবনে আব্বাসের (রা) একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, ফেরাউনের ধ্বংসের পর হযরত মূসা (আ) যখন মিসরে নিজের জাতির বসতি স্থাপন করেন তখন এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে যে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রেওয়ায়েত উদ্ধৃত হয়েছে তা এ বর্ণনা সমর্থন করে না। তাছাড়া অন্য কোন উপায়েও একথা প্রমাণ হয় না যে, ফেরাউনের ধ্বংসের পর হযরত মূসা (আ) কখনো মিসরে গিয়েছিলেন। বরং কুরআন একথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে যে, মিসর ত্যাগ করার পর তাঁর সমস্তটা সময় সিনাই ও তীহ অঞ্চলে কাটে। কাজেই এ রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দু'টি কথা পরিষ্কার বুঝতে পারি। এক, হযরত মূসাকে (আ) হয়তো তাঁর নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে এ পর্যবেক্ষণ করানো হয়েছিল। কারণ নবুওয়াতের শুরুতেই পয়গম্বরদের জন্য এ ধরনের শিক্ষা ও অনুশীলনের দরকার হয়ে থাকে। দুই, মুসলমানরা মক্কা মু'আয্‌যমায় যে ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল বনী ইসরাঈলও যখন তেমনি ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছিল তখনই হযরত মূসার জন্য এ পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয়ে থাকবে। এ দু'টি কারণে আমাদের অনুমান, (অবশ্য সঠিক কথা একমাত্র আল্লাহ জানেন) এ ঘটনার সম্পর্ক এমন এক যুগের সাথে যখন মিসরে বনী ইস্‌রাঈলদের ওপর ফেরাউনের জুলুমের সিলসিলা জারি ছিল এবং মক্কার কুরাইশ সরদারদের মতো ফেরাউন ও তার সভাসদরাও আযাবে বিলম্ব দেখে ধারণা করছিল যে, তাদের ওপরে এমন কোন সত্তা নেই যার কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে এবং মক্কার মজলুম মুসলমানদের মতো মিসরের মজলুম মুসলমানরাও অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করছিল, হে আল্লাহ! আর কত দিন এ জালেমদেরকে পুরস্কৃত এবং আমাদের ওপর বিপদের সয়লাব-স্রোত প্রবাহিত করা হবে? এমনকি হযরত মূসাও চীৎকার করে উঠেছিলেন ঃ

رَبَّنَا اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالاً فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ-

"হে পরওয়ারদিগার! তুমি ফেরাউন ও তার সভাসদদেরকে দুনিয়ার জীবনে বড়ই শান শওকত ও ধন-দওলত দান করেছো। হে আমাদের প্রতিপালক। এটাকি এ জন্য যে, তারা দুনিয়াকে তোমার পথ থেকে বিপথে পরিচালিত করবে?" (ইউনুস ঃ ৮৮)

যদি আমাদের এ অনুমান সঠিক হয় তাহলে ধারণা করা যেতে পারে যে, সম্ভবত হযরত মূসার (আ) এ সফরটি ছিল সুদানের দিকে। এ ক্ষেত্রে দু' দরিয়ার সংগমস্থল বলতে বুঝাবে বর্তমান খার্তুম শহরের নিকটবর্তী নীল নদের দুই শাখা বাহ্‌রুল আব্‌ইয়াদ (হোয়াইট নীল) ও বাহরুল আযরাক্ব (ব্লু নীল) যেখানে এসে মিলিত হয়েছে (দেখুন ২২১ পৃষ্ঠার চিত্র)। হযরত মূসা (আ) সারা'জীবন যেসব এলাকায় কাটিয়েছেন সেসব এলাকায় এ একটি স্থান ছাড়া আর কোথাও দু'নদীর সংগমস্থল নেই।

এ ঘটনাটির ব্যাপারে বাইবেল একেবারে নীরব। তবে তালমুদে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু সেখানে এ ঘটনাটিকে মূসার (আ) পরিবর্তে 'রাব্বী ইয়াহহানান বিন লাভীর' সাথে সম্পৃক্ত

করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ "হযরত ইলিয়াসের সাথে উল্লেখিত রাব্বীর এ ঘটনাটি ঘটে। হযরত ইলিয়াসকে (আ) দুনিয়া থেকে জীবিত অবস্থায় উঠিয়ে নেয়ার পর ফেরেশতাদের দলভুক্ত করা হয়েছে এবং তিনি দুনিয়ার ব্যাবস্থাপনায় নিযুক্ত হয়েছেন।" (THE TALMUD SELECTIONS BY H. POLANO. PP. 313—16) সম্ভবত বনী ইস্‌রাঈলের মিসর ত্যাগের পূর্বেকার ঘটনাবলীর ন্যায় এ ঘটনাটিও সঠিক অবস্থায় সংরক্ষিত থাকেনি এবং শত শত বছর পরে তারা ঘটনার এক জায়গার কথা নিয়ে আর এক জায়গায় জুড়ে দিয়েছে। তালমুদের এ বর্ণনায় প্রভাবিত হয়ে মুসলমানদের কেউ কেউ একথা বলে দিয়েছেন যে, কুরআনের এ স্থানে যে মূসার কথা বলা হয়েছে তিনি হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নন বরং অন্য কোন মূসা হবেন। কিন্তু তালমুদের প্রত্যেকটি বর্ণনাকে নির্ভুল ইতিহাস গণ্য করা যেতে পারে না। আর কুরআনে কোন অজানা ও অপরিচিত মূসার উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে, এ ধরনের কোন কথা অনুমান করার কোন যুক্তিসংগত প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। তাছাড়া নির্ভরযোগ্য হাদীসমূহে যখন হযরত উবাই ইবনে কা'বের (রা) এ বর্ণনা রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে মূসা বলতে বনী ইস্‌রাঈলের নবী হযরত মূসাকে (আ) নির্দেশ করেছেন। তখন কোন মুসলমানের জন্য তালমুদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হয় না।

পশ্চিমী প্রাচ্যবিদরা তাদের স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতিতে কুরআন মজীদের এ কাহিনীটিরও উৎস সন্ধানে প্রবৃত্ত হবার চেষ্টা করেছেন। তারা তিনটি কাহিনীর প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে বলেছেন যে, এসব জায়গা থেকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটি নকল করেছেন এবং তারপর দাবী করেছেন, আমাকে অহীর মাধ্যমে এ ঘটনা জানানো হয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে গিলগামিশের কাহিনী, দ্বিতীয়টি সুরিয়ানী সিকান্দার নামা এবং তৃতীয়টি হচ্ছে ওপরে যে ইহুদী বর্ণনাটির উল্লেখ আমরা করেছি। কিন্তু এ কুটীল স্বভাব লোকেরা জ্ঞান চর্চার নামে যেসব গবেষণা ও অনুসন্ধান চালান সেখানে পূর্বাহ্নেই এ সিদ্ধান্ত করে নেন যে, কুরআনকে কোনক্রমেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বলে মেনে নেয়া যাবে না। কাজেই এখন যে কোনভাবেই এ বিষয়ের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা কিছু পেশ করেছেন তা অমুক অমুক জায়গা থেকে চুরি করা বিষয়বস্তু ও তথ্যাদি থেকে গৃহীত। এ ন্যক্কারজনক গবেষণা পদ্ধতিতে তারা এমন নির্লজ্জভাবে টানাহেঁচড়া করে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপায় যে, তা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘৃণায় মন রি রি করে ওঠে এবং মানুষ বলতে বাধ্য হয় ঃ যদি এর নাম হয় তাত্বিক গবেষণা তাহলে এ ধরনের তত্ব-জ্ঞান ও গবেষণার প্রতি অভিশাপ। কোন জ্ঞানান্বেষণকারী তাদের কাছে যদি কেবলমাত্র চারটি বিষয়ের জবাব চায় তাহলে তাদের বিদ্বেষমূলক মিথ্যাচারের একেবারেই হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে যাবে ঃ

এক, আপনাদের কাছে এমন কি প্রমাণ আছে, যার ভিত্তিতে আপনারা দু'চারটে প্রাচীন গ্রন্থে কুরআনের কোন বর্ণনার সাথে কিছুটা মিলে যায় এমন ধরনের বিষয় পেয়েই দাবী করে বসেন যে, কুরআনের বর্ণনাটি অবশ্যই এ গ্রন্থগুলো থেকে নেয়া হয়েছে?

দুই, আপনারা বিভিন্ন ভাষার যেসব গ্রন্থকে কুরআন মজীদের কাহিনী ও অন্যান্য বর্ণনার উৎস গণ্য করেছেন সেগুলোর তালিকা তৈরী করলে দস্তুরমতো একটি বড়সড়

قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا
مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾ قَالَ لَهٗ
مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾ قَالَ اِنَّكَ لَنْ
تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ﴿٦٨﴾ قَالَ
سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِىْ لَكَ اَمْرًا ﴿٦٩﴾ قَالَ فَاِنِ
اتَّبَعْتَنِىْ فَلَا تَسْـَٔلْنِىْ عَنْ شَىْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾

মূসা বললো, "আমরা তো এরই খোঁজে ছিলাম।"[৫৮] কাজেই তারা দু'জন নিজেদের পদরেখা ধরে পেছনে ফিরে এলো এবং সেখানে তারা আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এক বান্দাকে পেলো, যাকে আমি নিজের অনুগ্রহ দান করেছিলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলাম।[৫৯]

মূসা তাকে বললো, "আমি কি আপনার সাথে থাকতে পারি, যাতে আপনাকে যে জ্ঞান শেখানো হয়েছে তা থেকে আমাকেও কিছু শেখাবেন?" সে বললো, "আপনি আমার সাথে সবর করতে পারবেন না। আর তাছাড়া যে ব্যাপারের আপনি কিছুই জানেন না সে ব্যাপারে আপনি সবর করবেনই বা কেমন করে।" মূসা বললো, "ইন্‌শাআল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারী হিসেবেই পাবেন এবং কোন ব্যাপারেই আমি আপনার হুকুম অমান্য করবো না।" সে বললো, "আচ্ছা, যদি আপনি আমার সাথে চলেন তাহলে আমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না যতক্ষণ না আমি নিজে সে সম্পর্কে আপনাকে বলি।"

লাইব্রেরীর গ্রন্থ তালিকা তৈরী হয়ে যাবে। এ ধরনের কোন লাইব্রেরী কি সে সময় মক্কায় ছিল এবং বিভিন্ন ভাষার অনুবাদকবৃন্দ সেখানে বসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপাদান সরবরাহ করছিলেন? যদি এমনটি না হয়ে থাকে এবং নবুওয়াত লাভের কয়েক বছর পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবের বাইরে, যে দু'তিনটি সফর করেছিলেন শুধুমাত্র তারই ওপর আপনারা নির্ভর করে থাকেন তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ বাণিজ্যিক সফরগুলোয় তিনি কয়টি লাইব্রেরীর বই অনুলিখন বা মুখস্ত করে এনেছিলেন? নবুওয়াতের ঘোষণার একদিন আগেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তায় এ ধরনের তথ্যের কোন চিহ্ন পাওয়া না যাওয়ার যুক্তিসংগত কারণ কি?

তিন, মক্কার কাফের সম্প্রদায়, ইহুদী ও খৃষ্টান সবাই অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথাগুলো কোথা থেকে আনেন। আপনারা বলতে পারেন নবীর (সা) সমকালীনরা তাঁর এ চুরির কোন খবর পায়নি কেন? এর কারণ কি? তাদেরকে তো বারবারই এ মর্মে চ্যালেঞ্জ দেয়া হচ্ছিল যে, এ কুরআন আল্লাহ নাযিল করছেন, অহী ছাড়া এর দ্বিতীয় কোন উৎস নেই, যদি তোমরা একে মানুষের বাণী বলো তাহলে মানুষ যে এমন বাণী তৈরী করতে পারে তা প্রমাণ করে দাও। এ চ্যালেঞ্জটি নবীর (সা) সমকালীন ইসলামের শত্রুদের কোমর ভেংগে দিয়েছিল। তারা এমন একটি উৎসের প্রতিও অংগুলি নির্দেশ করতে পারেনি যা থেকে কুরআনের বিষয়বস্তু গৃহীত হয়েছে বলে কোন বিবেকবান ব্যক্তি বিশ্বাস করা তো দূরের কথা সন্দেহও করতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, সমকালীনরা এ গোয়েন্দাবৃত্তিতে ব্যর্থ হলো কেন? আর হাজার বারোশো বছর পরে আজ বিরোধী পক্ষ এতে সফল হচ্ছেন কেমন করে?

শেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হচ্ছে, একথার সম্ভাবনা তো অবশ্যি আছে যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এবং এ কিতাবটি বিগত ইতিহাসের এমনসব ঘটনার সঠিক খবর দিচ্ছে যা হাজার হাজার বছর ধরে শ্রুতির মাধ্যমে বিকৃত হয়ে অন্য লোকদের কাছে পৌঁছেছে এবং গল্পের রূপ নিয়েছে। কোন্ ন্যায়সংগত প্রমাণের ভিত্তিতে এ সম্ভাবনাটিকে একদম উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে এবং কেন শুধুমাত্র এ একটি সম্ভাবনাকে আলোচনা ও গবেষণার ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে যে, লোকদের মধ্যে গল্প ও মৌখিক প্রবাদ আকারে যেসব কিস্‌সা কাহিনী প্রচলিত ছিল কুরআন সেগুলো থেকেই গৃহীত হয়েছে? ধর্মীয় বিদ্বেষ ও হঠকারিতা ছাড়া এ প্রাধান্য দেবার অন্য কোন কারণ বর্ণনা করা যেতে পারে কি?

এ প্রশ্নগুলো নিয়ে যে ব্যক্তিই একটু চিন্তা-ভাবনা করবে তারই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকতে পারে না যে, প্রাচ্যবিদরা "তত্ত্বজ্ঞানের" নামে যা কিছু পেশ করেছেন কোন দায়িত্বশীল শিক্ষার্থী ও জ্ঞানানুশীলনকারীর কাছে তার কানাকড়িও মূল্য নেই।

৫৮. অর্থাৎ আমাদের গন্তব্যের এ নিশানীটিই তো আমাকে বলা হয়েছিল। এ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ইংগিতই পাওয়া যায় যে, আল্লাহর ইংগিতেই হযরত মূসা (আ) এ সফর করছিলেন। তাঁর গন্তব্য স্থলের চিহ্ন হিসেবে তাঁকে বলে দেয়া হয়েছিল যে, যেখানে তাঁদের নাশ্‌তার জন্য নিয়ে আসা মাছটি অদৃশ্য হয়ে যাবে সেখানে তাঁরা আল্লাহর সেই বান্দার দেখা পাবেন, যার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছিল।

৫৯. সমস্ত নির্ভরযোগ্য হাদীসে এ বান্দার নাম বলা হয়েছে খিযির। কাজেই ইসরাঈলী বর্ণনায় প্রভাবিত হয়ে যারা হযরত ইলিয়াসের (আ) সাথে এ ঘটনাটি জুড়ে দেন তাদের বক্তব্য মোটেই প্রণিধানযোগ্য নয়। তাদের এ বক্তব্য শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর সাথে সংঘর্ষশীল হবার কারণেই যে ভুল তা নয় বরং এ কারণেও ভুল যে, হযরত ইলিয়াস হযরত মূসার কয়েকশ বছর পরে জন্মলাভ করেছিলেন।

فَانْطَلَقَا ۖ حَتّٰٓى اِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ۭ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ
لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا ﴿٧١﴾ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ
لَا تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا ﴿٧٣﴾ فَانْطَلَقَا ۖ حَتّٰٓى اِذَا
لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ۭ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ﴿٧٤﴾
قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾ قَالَ اِنْ
سَاَلْتُكَ عَنْ شَىْءٍۢ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِىْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّىْ عُذْرًا ﴿٧٦﴾

১০ রুকূ'

অতপর তারা দু'জন রওয়ানা হলো। শেষ পর্যন্ত যখন তারা একটি নৌকায় আরোহণ করলো তখন ঐ ব্যক্তি নৌকা ছিদ্র করে দিল। মূসা বললো, "আপনি কি নৌকার সকল আরোহীকে ডুবিয়ে দেবার জন্য তাতে ছিদ্র করলেন? এতো আপনি বড়ই মারাত্মক কাজ করলেন।" সে বললো, "আমি না তোমাকে বলেছিলাম, তুমি আমার সাথে সবর করতে পারবে না?" মূসা বললো, "ভুল চুকের জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না, আমার ব্যাপারে আপনি কঠোর নীতি অবলম্বন করবেন না।"

এরপর তারা দু'জন চললো। চলতে চলতে তারা একটি বালকের দেখা পেলো এবং ঐ ব্যক্তি তাকে হত্যা করলো। মূসা বললো, "আপনি এক নিরপরাধকে হত্যা করলেন, অথচ সে কাউকে হত্যা করেনি? এটা তো বড়ই খারাপ কাজ করলেন।" সে বললো, "আমি না তোমাকে বলেছিলাম, তুমি আমার সাথে সবর করতে পারবে না?" মূসা বললো, "এরপর যদি আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করি তাহলে আপনি আমাকে আপনার সাথে রাখবেন না। এখন তো আমার পক্ষ থেকে আপনি ওজর পেয়ে গেছেন।"

কুরআনে হযরত মূসার (আ) খাদেমের নামও বলা হয়নি। তবে কোন কোন হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, তিনি ছিলেন হযরত ইউশা' বিন নূন। পরে তিনি হযরত মূসার (আ) খলীফা হন।

فَانْطَلَقَا ۖ حَتّٰٓى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ ِۨاسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا
فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ۭ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ
عَلَيْهِ اَجْرًا ۝ قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا
لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ۝ اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي
الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاۗءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ
غَصْبًا ۝ وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا
وَّكُفْرًا ۝ فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا ۝

তারপর তারা সামনের দিকে চললো। চলতে চলতে একটি জনবসতিতে প্রবেশ করলো এবং সেখানে লোকদের কাছে খাবার চাইলো। কিন্তু তারা তাদের দু'জনের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানালো। সেখানে তারা একটি দেয়াল দেখলো, সেটি পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। সে দেয়ালটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে দিল। মূসা বললো, "আপনি চাইলে এ কাজের পারিশ্রমিক নিতে পারতেন।" সে বললো, "ব্যাস, তোমার ও আমার সংগ শেষ হয়ে গেলো। এখন আমি যে কথাগুলোর ওপর তুমি সবর করতে পারোনি সেগুলোর তাৎপর্য তোমাকে বলবো। সেই নৌকাটির ব্যাপার ছিল এই যে, সেটি ছিল কয়েকজন গরীব লোকের, তারা সাগরে মেহনত মজদুরী করতো। আমি সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দিতে চাইলাম। কারণ সামনের দিকে ছিল এমন বাদশাহর এলাকা যে প্রত্যেকটি নৌকা জবরদস্তি ছিনিয়ে নিতো। আর ঐ বালকটির ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তার বাপ-মা ছিল মুমিন। আমাদের আশংকা হলো, এ বালক তার বিদ্রোহাত্মক আচরণ ও কুফরীর মাধ্যমে তাদেরকে বিব্রত করবে। তাই আমরা চাইলাম তাদের রব তার বদলে তাদেরকে যেন এমন একটি সন্তান দেন যে চরিত্রের দিক দিয়েও তার চেয়ে ভাল হবে এবং যার কাছ থেকে সদয় আচরণও বেশী আশা করা যাবে।

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ
كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ۚ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا
وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ
ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

এবার থাকে সেই দেয়ালের ব্যাপারটি। সেটি হচ্ছে এ শহরে অবস্থানকারী দুটি এতীম বালকের। এ দেয়ালের নীচে তাদের জন্য সম্পদ লুকানো আছে এবং তাদের পিতা ছিলেন একজন সৎলোক। তাই তোমার রব চাইলেন এ কিশোর দু'টি প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যাক এবং তারা নিজেদের গুপ্ত ধন বের করে নিক। তোমার রবের দয়ার কারণে এটা করা হয়েছে। নিজ ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে আমি এটা করিনি। তুমি যেসব ব্যাপারে সবর করতে পারোনি এ হচ্ছে তার ব্যাখ্যা।"[৬০]

৬০. এ কাহিনীটির মধ্যে একটি বিরাট জটিলতা আছে। এটি দূর করা প্রয়োজন। হযরত খিযির যে তিনটি কাজ করেছিলেন তার মধ্যে তৃতীয় কাজটির সাথে শরীয়াতের বিরোধ নেই কিন্তু প্রথম কাজ দু'টি নিসন্দেহে মানব জাতির সূচনালগ্ন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আল্লাহ যতগুলো শরীয়াত নাযিল করেছেন তাদের প্রতিষ্ঠিত বিধানের বিরোধী। কারোর মালিকানাধীন কোন জিনিস নষ্ট করার এবং কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করার অনুমতি কোন শরীয়াত কোন মানুষকে দেয়নি। এমন কি যদি কোন ব্যক্তি ইলহামের মাধ্যমে জানতে পারে যে, সামনের দিকে এক জালেম একটি নৌকা ছিনিয়ে নেবে এবং অমুক বালকটি বড় হয়ে খোদাদ্রোহী ও কাফের হয়ে যাবে তবুও আল্লাহ প্রেরিত শরীয়াতগুলোর মধ্য থেকে কোন শরীয়াতের দৃষ্টিতেই তার জন্য এ তত্বজ্ঞানের ভিত্তিতে নৌকা ছেঁদা করে দেয়া এবং একটি নিরপরাধ বালককে হত্যা করা জায়েয নয়। এর জবাবে একথা বলা যে, হযরত খিযির এ কাজ দু'টি আল্লাহর হুকুমে করেছিলেন আসলে এতে এই জটিলতা একটুও দূর হয় না। প্রশ্ন এ নয় যে, হযরত খিযির কার হুকুমে এ কাজ করেছিলেন। এগুলো যে আল্লাহর হুকুমে করা হয়েছিল তা তো সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। কারণ হযরত খিযির নিজেই বলছেন, তাঁর এ কাজগুলো তাঁর নিজের ক্ষমতা ইখতিয়ারভুক্ত নয় বরং এগুলোর উদ্যোক্তা হচ্ছে আল্লাহর দয়া ও করুণা। আর হযরত খিযিরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ তত্বজ্ঞান দেয়া হয়েছিল বলে প্রকাশ করে আল্লাহ নিজেই এর সত্যতার ঘোষণা দিয়েছেন। কাজেই আল্লাহর হুকুমে যে এ কাজ করা হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে যে আসল প্রশ্ন দেখা দেয় সেটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহর এ বিধান কোন্ ধরনের ছিল? একথা সুস্পষ্ট, এগুলো শরীয়াতের বিধান ছিল না। কারণ কুরআন ও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ থেকে আল্লাহর শরীয়াতের যেসব মূলনীতি প্রমাণিত হয়েছে তার কোথাও কোন ব্যক্তিকে এ সুযোগ দেয়া হয়নি যে, সে

অপরাধ প্রমাণিত হওয়া ছাড়াই কাউকে হত্যা করতে পারবে। তাই নিশ্চিতভাবে এ কথা মেনে নিতে হবে যে, এ বিধানগুলো প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহর এমন সব সৃষ্টিগত বিধানের সাথে সামঞ্জস্যশীল যেগুলোর আওতাধীনে দুনিয়ায় প্রতি মুহূর্তে কাউকে রোগগ্রস্ত করা হয়, কাউকে রোগমুক্ত করা হয়, কাউকে মৃত্যু দান করা হয়, কাউকে জীবন দান করা হয়, কাউকে ধ্বংস করা হয় এবং কারোর প্রতি করুণাধারা বর্ষণ করা হয়। এখন যদি এগুলো সৃষ্টিগত বিধান হয়ে থাকে তাহলে এগুলোর দায়িত্ব একমাত্র ফেরেশতাগণের ওপরই সোপর্দ হতে পারে। তাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে শরীয়াতগত বৈধতা ও অবৈধতার প্রশ্ন ওঠে না। কারণ তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা-ইখতিয়ার ছাড়াই একমাত্র আল্লাহর হুকুম তামিল করে থাকে। আর মানুষের ব্যাপারে বলা যায়, সে অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন সৃষ্টিগত হুকুম প্রবর্তনের মাধ্যমে পরিণত হোক বা ইলহামের সাহায্যে এ ধরনের কোন অদৃশ্য জ্ঞান ও হুকুম লাভ করে তা কার্যকর করুক, সর্বাবস্থায় যে কাজটি সে সম্পন্ন করেছে সেটি যদি শরীয়াতের কোন বিধানের পরিপন্থী হয় তাহলে তার গুনাহগার হওয়া থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। কারণ মানব সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকটি মানুষ শরীয়াতের বিধান মেনে চলতে বাধ্য। কোন মানুষ ইলহামের মাধ্যমে শরীয়াতের কোন বিধানের বিরুদ্ধাচরণের হুকুম লাভ করেছে এবং অদৃশ্য জ্ঞানের মাধ্যমে এ বিরুদ্ধাচরণকে কল্যাণকর বলা হয়েছে বলেই শরীয়াতের বিধানের মধ্য থেকে কোন বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করা তার জন্য বৈধ হয়ে গেছে, শরীয়াতের মূলনীতির মধ্যে কোথাও এ ধরনের কোন সুযোগ রাখা হয়নি।

এটি এমন একটি কথা যার ওপর কেবলমাত্র শরীয়াতের আলেমগণই যে, একমত তাই নয় বরং প্রধান সূফীগণও একযোগে একথা বলেন। আল্লামা আলূসী বিস্তারিতভাবে আবদুল ওয়াহ্‌হাব শি'রানী, মুহীউদ্দিন ইবনে আরাবী, মুজাদ্দিদে আলফিসানি, শায়খ আবদুল কাদের জীলানী, জুনায়েদ বাগদাদী, সাররী সাক্‌তী, আবুল হাসান আন্‌নূরী, আবু সাঈদ আলখাররায্, আবুল আব্বাস আহমদ আদ্‌দাইনাওয়ারী ও ইমাম গায্‌যালীর ন্যায় খ্যাতনামা বুযর্গগণের উক্তি উদ্ধৃত করে একথা প্রমাণ করেছেন যে, তাসাউফপন্থীদের মতেও কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিধান বিরোধী ইল্‌হামকে কার্যকর করা যার প্রতি ইলহাম হয় তার জন্যও বৈধ নয়।

এখন কি আমরা একথা মেনে নেবো যে, এ সাধারণ নিয়ম থেকে মাত্র একজন মানুষকে পৃথক করা হয়েছে এবং তিনি হচ্ছেন হযরত খিযির? অথবা আমরা মনে করবো, খিযির কোন মানুষ ছিলেন না বরং তিনি আল্লাহর এমনসব বান্দার দলভুক্ত ছিলেন যারা আল্লাহর ইচ্ছার আওতাধীনে (আল্লাহর শরীয়াতের আওতাধীনে নয়) কাজ করেন?

প্রথম অবস্থাটি আমরা মেনে নিতাম যদি কুরআন স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতো যে, হযরত মূসাকে যে 'বান্দা'র কাছে অনুশীলন লাভের জন্য পাঠানো হয়েছিল তিনি মানুষ ছিলেন। কিন্তু কুরআন তার মানুষ হবার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখেনি বরং কেবলমাত্র عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا (আমার বান্দাদের একজন) বলে ছেড়ে দিয়েছে। আর একথা সুস্পষ্ট, এ বাক্যাংশ থেকে ঐ বান্দার মানব সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া অপরিহার্য হয় না। কুরআন মজীদে বিভিন্ন জায়গায় ফেরেশতাদের জন্যও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যেমন দেখুন সূরা আম্বিয়া ২৬ আয়াত এবং সূরা যখরুফ ১৯ আয়াত। তাছাড়া কোন সহী হাদীসেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমন কোন বক্তব্য উদ্ধৃত হয়নি যাতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় হযরত

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾
اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾ فَاَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾
حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ
عِنْدَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّآ اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّآ اَنْ تَتَّخِذَ
فِيْهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾ قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ
فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾ وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ۨ
الْحُسْنٰى ۚ وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾

১১ রুকূ'

আর হে মুহাম্মাদ! এরা তোমার কাছে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।[৬১] এদেরকে বলে দাও, আমি তার সম্বন্ধে কিছু কথা তোমাদের শুনাচ্ছি।[৬২]

আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়ে রেখেছিলাম এবং তাকে সবরকমের সাজ-সরঞ্জাম ও উপকরণ দিয়েছিলাম। সে (প্রথমে পশ্চিমে এক অভিযানের) সাজ-সরঞ্জাম করলো। এমন কি যখন সে সূর্যাস্তের সীমানায় পৌঁছে গেলো[৬৩] তখন সূর্যকে ডুবতে দেখলো একটি কালো জলাশয়ে[৬৪] এবং সেখানে সে একটি জাতির দেখা পেলো। আমি বললাম, "হে যুল্‌কারনাইন! তোমার এ শক্তি আছে, তুমি এদেরকে কষ্ট দিতে পারো অথবা এদের সাথে সদাচার করতে পারো।"[৬৫] সে বললো, "তাদের মধ্য থেকে যে জুলুম করবে আমরা তাকে শাস্তি দেবো তারপর তাকে তার রবের দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে এবং তিনি তাকে অধিক কঠিন শাস্তি দেবেন। আর তাদের মধ্য থেকে যে ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তার জন্য আছে ভাল প্রতিদান এবং আমরা তাকে সহজ বিধান দেবো।"

খিযিরকে মানব সম্প্রদায়ের একজন সদস্য গণ্য করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদীসটি সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে, তিনি উবাই ইবনে কা'ব থেকে এবং তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণের নিকট পৌঁছেছে। সেখানে হযরত খিযিরের জন্য শুধুমাত্র رجل (রজুল) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি যদিও মানব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত পুরুষদের জন্য

ব্যবহার করা হয় তবুও শুধুমাত্র মানুষের জন্য ব্যবহার করা হয় না। কাজেই কুরআনে এ শব্দটি জিনদের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সূরা জিনে বলা হয়েছে ঃ وَاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ তাছাড়া এ কথা সুস্পষ্ট যে, জিন বা ফেরেশ্‌তা অথবা অন্য কোন অদৃশ্য অস্তিত্ব যখন মানুষের সামনে আসবে তখন মানুষের আকৃতি ধরেই আসবে এবং এ অবস্থায় তাকে মানুষই বলা হবে। হযরত মারয়ামের সামনে যখন ফেরেশ্‌তা এসেছিল তখন কুরআন এ ঘটনাটিকে এভাবে বর্ণনা করেছে ঃ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি যে "সেখানে তিনি একজন পুরুষকে পেলেন" হযরত খিযিরের মানুষ হবার ব্যাপারটি সুস্পষ্ট করছে না। এরপর এ জটিলতা দূর করার জন্য আমাদের কাছে হযরত খিযিরকে মানুষ নয় ফেরেশতা হিসেবে মেনে নেয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথই থাকে না। অথবা তাঁকে আল্লাহর এমন কোন সৃষ্টি মনে করতে হবে যিনি শরীয়াতের বিধানের আওতাধীন নন বরং আল্লাহর ইচ্ছা পুরনের কাজে নিযুক্ত একজন কর্মী। প্রথম যুগের আলেমগণের কেউ কেউও এমত প্রকাশ করেছেন এবং ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে মাওয়ারদীর বরাত দিয়ে তা উদ্ধৃত করেছেন।

৬১. وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ এ বাক্যটির শুরুতে যে "আর" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তার সম্পর্ক অবশ্যই পূর্ববর্তী কাহিনীগুলোর সাথে রয়েছে। এ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ইংগিত পাওয়া যায় যে, মূসা ও খিযিরের কাহিনীও লোকদের প্রশ্নের জবাবে শোনানো হয়েছে। একথা আমাদের এ অনুমানকে সমর্থন করে যে, এ সূরার এ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী আসলে মক্কার কাফেররা আহলি কিতাবদের পরামর্শক্রমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞেস করেছিল।

৬২. এখানে যে যুলকারনাইনের কথা বলা হচ্ছে তিনি কে ছিলেন, এ বিষয়ে প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে আজো পর্যন্ত মতবিরোধ চলে আসছে। প্রাচীন যুগের মুফাস্‌সিরগণ সাধারণত যুলকারনাইন বলতে আলেকজাণ্ডারকেই বুঝিয়েছেন। কিন্তু কুরআনে তাঁর যে গুণাবলী ও বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে, আলেকজাণ্ডারের সাথে তার মিল খুবই কম। আধুনিক যুগে ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর ভিত্তিতে মুফাসসিরগণের অধিকাংশ এ মত পোষণ করেন যে, তিনি ছিলেন ইরানের শাসনকর্তা খুরস তথা খসরু বা সাইরাস। এ মত তুলনামূলকভাবে বেশী যুক্তিগ্রাহ্য। তবুও এখনো পর্যন্ত সঠিক ও নিশ্চিতভাবে কোন ব্যক্তিকে যুলকারনাইন হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারেনি।

কুরআন মজীদ যেভাবে তার কথা আলোচনা করেছে তা থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে চারটি কথা জানতে পারি ঃ

এক, তার যুলকারনাইন (শাব্দিক অর্থ "দু' শিংওয়ালা") উপাধিটি কমপক্ষে ইহুদীদের মধ্যে, যাদের ইংগিতে মক্কার কাফেররা তার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করেছিল, নিশ্চয়ই পরিচিত হওয়ার কথা তাই একথা জানার জন্য আমাদের ইসরাঈলী সাহিত্যের শরণাপন্ন না হয়ে উপায় থাকে না যে, তারা "দু' শিংওয়ালা" হিসেবে কোন্ ব্যক্তি বা রাষ্ট্রকে জানতো?

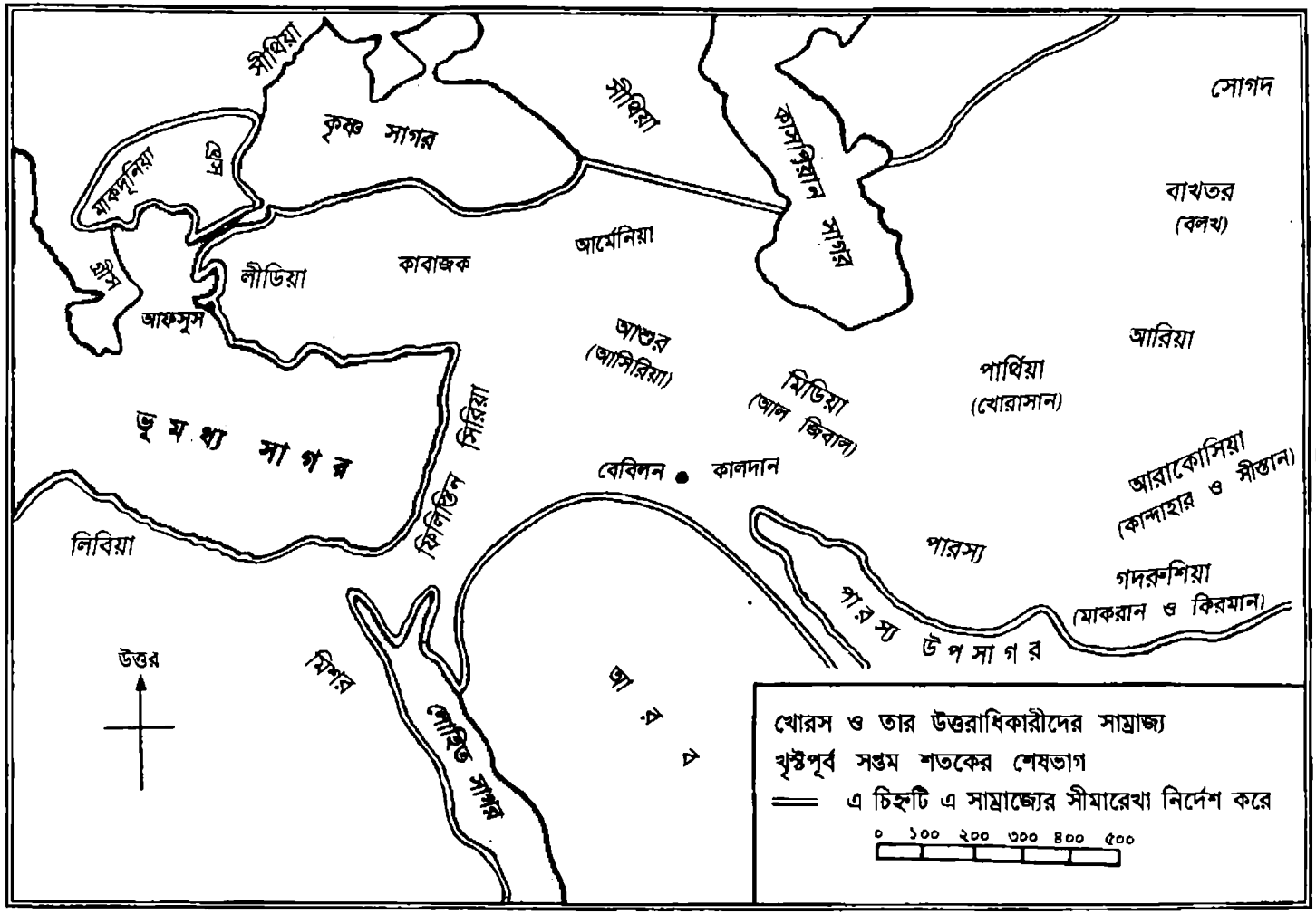

জুলকারনাইন কিস্সা সম্পর্কিত মানচিত্র (সূরা আল-কাহফ ৬২ নং টীকা)

দুই, এ ব্যক্তির অবশ্যই কোন বড় শাসক ও এমন পর্যায়ের বিজেতা হওয়ার কথা যার বিজয় অভিযান পূর্ব থেকে পশ্চিমে পরিচালিত হয়েছিল এবং অন্যদিকে উত্তর–দক্ষিণ দিকেও বিস্তৃত হয়েছিল। কুরআন নাযিলের পূর্বে এ ধরনের কৃতিত্বের অধিকারী মাত্র কয়েকজন ব্যক্তির কথাই জানা যায়। তাই অনিবার্যভাবে তাদেরই কারোর মধ্যে আমাদের তার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য ও বৈশিষ্টও খুঁজে দেখতে হবে।

তিন, তাকে অবশ্যই এমন একজন শাসনকর্তা হতে হবে যিনি নিজের রাজ্যকে ইয়াজুজ মা'জুজের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কোন পার্বত্য গিরিপথে একটি মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করেন। এ বৈশিষ্টটির অনুসন্ধান করার জন্য আমাদের একথাও জানতে হবে যে, ইয়াজুজ মা'জুজ বলতে কোন্ জাতিকে বুঝানো হয়েছে এবং তারপর এও দেখতে হবে যে, তাদের এলাকার সাথে সংশ্লিষ্ট এ ধরনের কোন্ প্রাচীর দুনিয়ায় নির্মাণ করা হয়েছে এবং সেটি কে নির্মাণ করেছে?

চার, তার মধ্যে উপরোক্ত বৈশিষ্টগুলোসহ এ বৈশিষ্টটিও উপস্থিত থাকা চাই যে, তিনি আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল ও ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তা হবেন। কারণ কুরআন এখানে তার এ বৈশিষ্টটিকেই সবচেয়ে বেশী সুস্পষ্ট করেছে।

এর মধ্য থেকে প্রথম বৈশিষ্টটি সহজেই খুরসের (বা সাইরাস) বেলায় প্রযোজ্য। কারণ বাইবেলের দানিয়েল পুস্তকে দানিয়েল নবীর যে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তাতে তিনি ইরানীদের উত্থানের পূর্বে মিডিয়া ও পারস্যের যুক্ত সাম্রাজ্যকে একটি দু' শিংওয়ালা মেষের আকারে দেখেন। ইহুদীদের মধ্যে এ "দু' শিংধারী"র বেশ চর্চা ছিল। কারণ তার সাথে সংঘাতের ফলেই শেষ পর্যন্ত বেবিলনের সাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায় এবং বনী ইসরাঈল দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্তি লাভ করে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল ৮ টীকা)।

দ্বিতীয় চিহ্নটিরও বেশীর ভাগ তার সাথে খাপ খেয়ে যায় কিন্তু পুরোপুরি নয়। তার বিজয় অভিযান নিসন্দেহে পশ্চিমে এশিয়া মাইনর ও সিরিয়ার সমুদ্রসীমা এবং পূর্বে বখ্‌তর (বলখ) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু উত্তরে বা দক্ষিণে তার কোন বড় আকারের অভিযানের সন্ধান এখনো পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়নি। অথচ কুরআন সুস্পষ্টভাবে তার তৃতীয় একটি অভিযানের কথা বর্ণনা করছে। তবুও এ ধরনের একটি অভিযান পরিচালিত হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ ইতিহাস থেকে দেখা যায়, খুরসের রাজ্য উত্তরে ককেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

তৃতীয় চিহ্নটির ব্যাপারে বলা যায়, একথা প্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, ইয়াজুজ মা'জুজ বলতে রাশিয়া ও উত্তর চীনের এমনসব উপজাতিদের বুঝানো হয়েছে যারা তাতারী, মংগল, হূন ও সেথিন নামে পরিচিত এবং প্রাচীন যুগ থেকে সভ্য দেশগুলোর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে আসছিল। তাছাড়া একথাও জানা গেছে যে, তাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ককেশাসের দক্ষিণাঞ্চলে দরবন্দ ও দারিয়ালের মাঝখানে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু খুরসই যে, এ প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন তা এখনো প্রমাণিত হয়নি।

শেষ চিহ্নটি প্রাচীন যুগে একমাত্র খুরসের সাথেই সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। কারণ তার শত্রুরাও তার ন্যায় বিচারের প্রশংসা করেছে। বাইবেলের ইসা পুস্তক একবার সাক্ষ্য বহন করে যে, তিনি নিশ্চয়ই একজন আল্লাহতীরু ও আল্লাহর অনুগত বাদশাহ ছিলেন। তিনি বনী ইসরাঈলকে তাদের আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রিয়তার কারণেই বেবিলনের দাসত্বমুক্ত করেছিলেন এবং এক ও লাশরীক আল্লাহর ইবাদাতের জন্য বাইতুল মাকদিসে পুনরবার হাইকেলে সুলাইমানী নির্মাণ করার হুকুম দিয়েছিলেন।

এ কারণে আমি একথা অবশ্যি স্বীকার করি যে, কুরআন নাযিলের পূর্বে যতজন বিশ্ববিজেতা অতিক্রান্ত হয়েছেন তাদের মধ্য থেকে একমাত্র খুরসের মধ্যেই যুলকারনাইনের আলামতগুলো বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু একেবারে নিশ্চয়তা সহকারে তাকেই যুলকারনাইন বলে নির্দিষ্ট করার জন্য এখনো আরো অনেক সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন রয়েছে। তবুও কুরআনে উপস্থাপিত আলামতগুলো যত বেশী পরিমাণে খুরসের মধ্যে বিদ্যমান, ততটা আর কোন বিজেতার মধ্যে নয়।

ঐতিহাসিক বর্ণনার জন্য এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, খুরস ছিলেন একজন ইরানী শাসনকর্তা। খৃষ্টপূর্ব ৫৪৯ অব্দের কাছাকাছি যুগ থেকে তাঁর উত্থান শুরু হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি মিডিয়া, আর্মেনিয়া এবং লিডিয়া, এশিয়া মাইনরা রাজ্য জয় করার পর ৫৩৯ খৃষ্টপূর্বাব্দে বেবিলন জয় করেন। এরপর তার পথে আর কোন রাজশক্তির বাধা ছিল না। তার বিজয় অভিযান সিন্ধু ও সুগ্দ বর্তমান তুর্কিস্তানা থেকে শুরু করে একদিকে মিসর ও লিবিয়া এবং অন্যদিকে থ্রেস ও ম্যাকডোনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। আবার উত্তর দিকে তার সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে ককেশিয়া ও বাওয়ারিয়াম পর্যন্ত। বলতে গেলে সেকালের সমগ্র সভ্যজগত তাঁর শাসনাধীন ছিল।

৬৩. ইবনে কাসীরের মতে সূর্যাস্তের সীমানা বলতে বুঝাচ্ছে اقصى ما يسلك فيه من الارض من ناحية المغرب অর্থাৎ তিনি পশ্চিম দিকে দেশের পর দেশ জয় করতে করতে স্থলভাগের শেষ সীমানায় পৌঁছে যান, এরপর ছিল সমুদ্র। এটিই হচ্ছে সূর্যাস্তের সীমানার অর্থ। সূর্য যেখানে অস্ত যায় সেই জায়গার কথা এখানে বলা হয়নি।

৬৪. অর্থাৎ সেখানে সূর্যাস্তের সময় মনে হতো যেন সূর্য সমুদ্রের কালো বর্ণের পঙ্কিল পানির মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। যুলকারনাইন বলতে যদি সত্যিই খুরসকেই বুঝানো হয়ে থাকে তাহলে এটি হবে এশিয়া মাইনরের পশ্চিম সমুদ্রতট, যেখানে ঈজিয়ান সাগর বিভিন্ন ছোট ছোট উপসাগরের রূপ নিয়েছে। কুরআন এখানে "বাহর" সমুদ্র শব্দের পরিবর্তে "আয়েন" শব্দ ব্যবহার করেছে, যা সমুদ্রের পরিবর্তে হ্রদ বা উপসাগর অর্থে অধিক নির্ভুলতার সাথে বলা যেতে পারে। একথাটি আমাদের উপরোক্ত অনুমানকে সঠিক প্রমাণ করে।

৬৫. আল্লাহ যে একথাটি সরাসরি অহী বা ইলহামের মাধ্যমে যুলকারনাইনকে সম্বোধন করে বলে থাকবেন এমন হওয়া জরুরী নয়। তেমনটি হলে তাঁর নবী বা এমন ব্যক্তি হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে যার সাথে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছেন। এটি এভাবেও হয়ে থাকতে পারে যে, আল্লাহ সমগ্র পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে তার নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দিয়েছেন। এটিই অধিকতর যুক্তিসংগত বলে মনে হয়। যুলকারনাইন সে সময় বিজয় লাভ করে এ এলাকাটি দখল করে নিয়েছিলেন। বিজিত জাতি তার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ
قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩٣﴾ كَذَٰلِكَ ۖ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا
لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩٤﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٥﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن
دُونِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٦﴾ قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ
إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا
عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٧﴾

তারপর সে (আর একটি অভিযানের) প্রস্তুতি নিল। এমন কি সে সূর্যোদয়ের সীমানায় গিয়ে পৌঁছুলো। সেখানে সে দেখলো, সূর্য এমন এক জাতির ওপর উদিত হচ্ছে যার জন্য রোদ থেকে বাঁচার কোন ব্যবস্থা আমি করিনি।[৬৬] এ ছিল তাদের অবস্থা এবং যুলকারনাইনের কাছে যা ছিল তা আমি জানতাম।

আবার সে (আর একটি অভিযানের) আয়োজন করলো। এমনকি যখন দু' পাহাড়ের মধ্যখানে পৌঁছুলো[৬৭] তখন সেখানে এক জাতির সাক্ষাত পেলো। যারা খুব কমই কোন কথা বুঝতে পারতো।[৬৮] তারা বললো, "হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ[৬৯] এ দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। আমরা কি তোমাকে এ কাজের জন্য কোন কর দেবো, তুমি আমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবে?

এহেন অবস্থায় আল্লাহ তার বিবেকের সামনে এ প্রশ্ন রেখে দেন যে, এটা তোমার পরীক্ষার সময়, এ জাতিটি তোমার সামনে ক্ষমতাহীন ও অসহায়। তুমি জুলুম করতে চাইলে তার প্রতি জুলুম করতে পারো এবং সদাচার করতে চাইলে তাও তোমার আয়ত্বাধীন রয়েছে।

৬৬. অর্থাৎ তিনি দেশ জয় করতে করতে পূর্ব দিকে এমন এলাকায় পৌঁছে গেলেন যেখানে সভ্য জগতের সীমানা শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং সামনের দিকে এমন একটি অসভ্য জাতির এলাকা ছিল, যারা ইমারত নির্মাণ তো দূরের কথা তাঁবু তৈরী করতেও পারতো না।

৬৭. যেহেতু সামনের দিকে বলা হচ্ছে যে, এ দু' পাহাড়ের বিপরীত পাশে ইয়াজুজ মাজুজের এলাকা ছিল তাই ধরে নিতে হয় যে, এ পাহাড় বলতে কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবর্তী সুবিস্তীর্ণ ককেসীয় পর্বতমালাকে বুঝানো হয়েছে।

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ
الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ
عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿٩٧﴾
قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ
وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿٩٨﴾

সে বললো, "আমার রব আমাকে যা কিছু দিয়ে রেখেছেন তাই যথেষ্ট। তোমরা শুধু শ্রম দিয়ে আমাকে সাহায্য করো, আমি তোমাদের ও তাদের মাঝখানে প্রাচীর নির্মাণ করে দিচ্ছি।[৭০] আমাকে লোহার পাত এনে দাও।" তারপর যখন দু' পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা সে পূর্ণ করে দিল তখন লোকেদের বললো, এবার আগুন জ্বালাও। এমনকি যখন এই (অগ্নি প্রাচীর) পুরোপুরি আগুনের মতো লাল হয়ে গেলো তখন সে বললো, "আনো, এবার আমি গলিত তামা এর উপর ঢেলে দেবো।" (এ প্রাচীর এমন ছিল যে) ইয়াজুজ ও মাজুজ এটা অতিক্রম করেও আসতে পারতো না এবং এর গায়ে সুড়ংগ কাটাও তাদের জন্য আরো কঠিন ছিল। যুলকারনাইন বললো, "এ আমার রবের অনুগ্রহ। কিন্তু যখন আমার রবের প্রতিশ্রুতির নির্দিষ্ট সময় আসবে তখন তিনি একে ধূলিস্মাত করে দেবেন[৭১] আর আমার রবের প্রতিশ্রুতি সত্য।"[৭২]

৬৮. অর্থাৎ যুলকারনাইন ও তার সাথীদের জন্য তাদের ভাষা ছিল প্রায়ই অপরিচিত ও দুর্বোধ্য। ভীষণভাবে সভ্যতার আলো বিবর্জিত ও বন্য হওয়ার কারণে তাদের ভাষা কেউ জানতো না এবং তারাও কারোর ভাষা জানতো না

৬৯. ইয়াজুজ মা'জুজ বলতে বুঝায়, যেমন ওপরে ৬২ টীকায় ইশারা করা হয়েছে যে, এশিয়ার উত্তর পূর্ব এলাকার এমন সব জাতি যারা প্রাচীন যুগে সুসভ্য দেশগুলোর ওপর ধ্বংসাত্মক হামলা চালাতে অভ্যস্ত ছিল এবং মাঝে মধ্যে এশিয়া ও ইউরোপ উভয় দিকে সয়লাবের আকারে ধ্বংসের থাবা বিস্তার করতো। বাইবেলের আদি পুস্তকে (১০ অধ্যায়) তাদেরকে হযরত নূহের (আ) পুত্র ইয়াফেসের বংশধর বলা হয়েছে। মুসলিম ঐতিহাসিকগণও এ একই কথা বলেছেন। হিযকিয়েল (যিহিষ্কেল) পুস্তিকায় (৩৮ ও ৩৯

অধ্যায়) তাদের এলাকা বলা হয়েছে রোশ (রুশ), তূবল (বর্তমান তোবলস্ক) ও মিস্‌ক (বর্তমান মস্কো)কে। ইস্‌রাঈলী ঐতিহাসিক ইউসীফুস তাদেরকে সিথীন জাতি মনে করেন এবং তার ধারণা তাদের এলাকা কৃষ্ণসাগরের উত্তর ও পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। জিরোম-এর বর্ণনা মতে মাজুজ জাতির বসতি ছিল ককেশিয়ার উত্তরে কাস্পিয়ান সাগরের সন্নিকটে।

৭০. অর্থাৎ শাসনকর্তা হিসেবে আমার প্রজাদেরকে লুটেরাদের হাত থেকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য। এ কাজের জন্য তোমাদের ওপর আলাদা করে কোন কর বসানো আমার জন্য বৈধ নয়। আল্লাহ দেশের যে অর্থভাণ্ডার আমার হাতে তুলে দিয়েছেন এ কাজ সম্পাদনের জন্য তা যথেষ্ট। তবে শারিরীক শ্রম দিয়ে তোমাদের আমাকে সাহায্য করতে হবে।

৭১. অর্থাৎ যদিও নিজের সামর্থ মোতাবেক আমি অত্যন্ত মজবুত ও সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করেছি তবুও এটি কোন অক্ষয় জিনিস নয়। যতদিন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন এটি প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তারপর এর ধ্বংসের জন্য আল্লাহ যে সময় নির্ধারিত করে রেখেছেন তা যখন এসে যাবে তখন কোন জিনিসই একে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। "প্রতিশ্রুতির সময়"-এর দু' অর্থ হয়। এর অর্থ প্রাচীরটি ধ্বংস হবার সময়ও হয় আবার প্রত্যেকটি জিনিসের মৃত্যু ও ধ্বংসের জন্য আল্লাহ যে সময়টি নির্ধারিত করে রেখেছেন সে সময়টিও হয় অর্থাৎ কিয়ামত।

যুলকারনাইন নির্মীত প্রাচীর সম্পর্কে কিছু লোকের মধ্যে ভুল ধারণা রয়েছে। তারা সুপরিচিত চীনের প্রাচীরকে যুলকারনাইনের প্রাচীর মনে করে। অথচ এ প্রাচীরটি ককেশাসের দাগিস্তান অঞ্চলের দরবন্দ ও দারিয়ালের (Darial) মাঝখানে নির্মীত হয়। ককেশীয় অঞ্চল বলতে বুঝায় কৃষ্ণ সাগর (Black sea) ও কাস্পিয়ান সাগরের (Caspian sea) মধ্যবর্তী এলাকা। এ এলাকায় কৃষ্ণসাগর থেকে দারিয়াল পর্যন্ত রয়েছে সুউচ্চ পাহাড়। এর মাঝখানে যে সংকীর্ণ গিরিপথ রয়েছে কোন দুর্ধর্ষ হানাদার সেনাবাহিনীর পক্ষেও তা অতিক্রম করা সম্ভব নয়। তবে দরবন্দ ও দারিয়ালের মধ্যবর্তী এলাকায় পর্বত শ্রেণীও বেশী উঁচু নয় এবং সেখানকার পার্বত্য পথগুলোও যথেষ্ট চওড়া। প্রাচীন যুগে উত্তরের বর্বর জাতিরা এ দিক দিয়েই দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক আক্রমণ চালিয়ে হত্যা ও লুটতরাজ চালাতো। ইরানী শাসকগণ এ পথেই নিজেদের রাজ্যের ওপর উত্তরের হামলার আশংকা করতেন। এ হামলাগুলো রুখবার জন্য একটি অত্যন্ত মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। এ প্রাচীরটি ছিল ৫০ মাইল লম্বা, ২৯০ ফুট উঁচু এবং ১০ ফুট চওড়া। এখনো পর্যন্ত ঐতিহাসিক গবেষণার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি যে, এ প্রাচীর শুরুতে কে এবং কবে নির্মাণ করেছিল। কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদগণ এটিকেই যুলকারনাইনের প্রাচীর বলে অভিহিত করেছেন। কুরআন মজীদে এ প্রাচীর নির্মাণের যে প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে তার চিহ্নসমূহ এখনো এখানে পাওয়া যায়।

ইবনে জারীর তাবারী ও ইবনে কাসীর তাদের ইতিহাস গ্রন্থে এ ঘটনাটি লিখেছেন। ইয়াকুতী তাঁর মু'জামুল বুলদান গ্রন্থে এরি বরাত দিয়ে লিখেছেন, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহ

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ
جَمْعًا ﴿٩٩﴾ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾ الَّذِينَ كَانَتْ
أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

আর সে দিন[৭৩] আমি লোকদেরকে ছেড়ে দেবো, তারা (সাগর তরংগের মতো) পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে আর শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং আমি সব মানুষকে একত্র করবো। আর সেদিন আমি জাহান্নামকে সেই কাফেরদের সামনে আনবো, যারা আমার উপদেশের ব্যাপারে অন্ধ হয়েছিল এবং কিছু শুনতে প্রস্তুতই ছিল না।

আনহু যখন আজারবাইজান বিজয়ের পর ২২ হিজরীতে সুরাকাহ ইব্‌ন আমরকে বাবুল আবওয়াব (দরবন্দ) অভিযানে রওয়ানা করেন। সুরাকাহ আবদুর রহমান ইব্‌ন রবী'আহকে নিজের অগ্রবর্তী বাহিনীর প্রধানের দায়িত্ব দিয়ে সামনের দিকে পাঠিয়ে দেন। আবদুর রহমান যখন আর্মেনীয়া এলাকায় প্রবেশ করেন তখন সেখানকার শাসক শারবরায় যুদ্ধ ছাড়াই আনুগত্য স্বীকার করেন। এরপর তিনি বাবুল আবওয়াবের দিকে অগ্রসর হবার সংকল্প করেন। এ সময় শারবরায় তাঁকে বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে যুলকারনাইনের প্রাচীর পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য পাঠিয়েছিলাম। সে আপনাকে এর বিস্তারিত বিবরণ শুনাতে পারে। তদানুসারে তিনি আবদুর রহমানের সামনে সেই ব্যক্তিকে হাযির করেন। (তাবারী, ৩ খণ্ড, ২৩৫–৩৩৯ পৃঃ; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ খণ্ড; ১২২–১২৫ পৃঃ এবং মু'জামুল বুলদান, বাবুল আবওয়াব প্রসংগ)।

এ ঘটনার দুশো' বছর পর আব্বাসী খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহ (২২৭–২৩৩ হিঃ) যুলকারনাইনের প্রাচীর পরিদর্শন করার জন্য সাল্লামুত তারজুমানের নেতৃত্বে ৫০ জনের একটি অভিযাত্রী দল পাঠান। ইয়াকুত তাঁর মু'জামুল বুলদান এবং ইব্‌নে কাসীর তার আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তাদের বর্ণনা মতে, এ অভিযাত্রী দলটি সামারুরাহ থেকে টিফ্‌লিস, সেখান থেকে আস্‌সারীর, ওখান থেকে আল্লান হয়ে দীলান শাহ এলাকায় পৌঁছে যায়। তারপর তারা খাযার (কাস্পিয়ান) দেশে প্রবেশ করেন। এরপর সেখান থেকে দরবন্দে পৌঁছে যুলকারনাইনের প্রাচীর পরিদর্শন করে। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২ খণ্ড , ১১১ পৃঃ; ৭ খণ্ড, ১২২–১২৫ পৃ ঃ, মু'জামুল বুলদান, বাবুল আবওয়াব) এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, হিজরী তৃতীয় শতকেও মুসলমানরা ককেশাসের এ প্রাচীরকেই যুলকারনাইনের প্রাচীর মনে করতো।

ইয়াকুত মু'জামুল বুলদানের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টিকেই সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। খাযার শিরোনামে তিনি লিখছেন ঃ

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾

১২ রুকূ'

তাহলে কি[৭৪] যারা কুফরী অবলম্বন করেছে তারা একথা মনে করে যে, আমাকে বাদ দিয়ে আমার বান্দাদেরকে নিজেদের কর্মসম্পাদনকারী হিসেবে গ্রহণ করে নেবে?[৭৫] এ ধরনের কাফেরদের আপ্যায়নের জন্য আমি জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছি।

هى بلاد الترك خلف باب الابواب المعروف بالدربند قريب من سد ذى القرنين –

"এটি তুরস্কের এলাকা। যুলকারনাইন প্রাচীরের সন্নিকটে দরবন্দ নামে খ্যাত বাবুল আবওয়াবের পেছনে এটি অবস্থিত।" এ প্রসংগে তিনি খলীফা মুকতাদির বিল্লাহর দূত আহমদ ইব্‌ন ফুদলানের একটি রিপোর্ট উদ্ধৃত করেছেন। তাতে খাযার রাজ্যের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, খাযার একটি রাজ্যের নাম, এর রাজধানী ইতিল। ইতিল নদী এ শহরের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এ নদীটি রাশিয়া ও বুলগার থেকে এসে খাযার তথা কাস্পিয়ান সাগরে পড়েছে।

বাবুল আবওয়াব শিরোনামে তিনি লিখছেন, তাকে আলবাব এবং দরবন্দও বলা হয়। এটি খাযার (কাস্পিয়ান) সাগর তীরে অবস্থিত। কুফরীর রাজ্য থেকে মুসলিম রাজ্যের দিকে আগমনকারীদের জন্য এ পথটি বড়ই দুর্গম ও বিপদ সংকুল। এক সময় এটি নওশেরেওঁয়ার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ইরানের বাদশাহগণ এ সীমান্ত সংরক্ষণের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন।

৭২. যুলকারনাইনের কাহিনী এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এ কাহিনীটি যদিও মক্কার কাফেরদের পরীক্ষামূলক প্রশ্নের জবাবে শুনানো হয় তবুও আসহাবে কাহ্‌ফ এবং মূসা ও খিযিরের কাহিনীর মতো এ কাহিনিটিকেও কুরআন নিজের রীতি অনুযায়ী নিজের উদ্দেশ্য সাধনে পুরোপুরি ব্যবহার করেছে। এতে বলা হয়েছে, যে যুলকারনাইনের শ্রেষ্ঠত্বের কথা তোমরা আহলি কিতাবদের মুখে শুনেছো সে নিছক একজন বিজেতা ছিল না বরং সে ছিল তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসী মুমিন। সে তার রাজ্যে আদল, ইনসাফ ও দানশীলতার নীতি কার্যকর করেছিল। সে তোমাদের মতো সংকীর্ণচেতা ছিল না। সামান্য সরদারী লাভ করে তোমরা যেমন মনে করো, আমি অদ্বিতীয়, আমার মতো আর কেউ নেই, সে তেমন মনে করতো না।

৭৩. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। কিয়ামতের সত্য প্রতিশ্রুতির প্রতি যুলকারনাইন যে ইংগিত করেছিলেন তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার কথাটি বাড়িয়ে এখানে এ বাক্যাংশটি বলা হচ্ছে।

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَزْنًا ﴿١٠٥﴾

হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলো, আমি কি তোমাদের বলবো নিজেদের কর্মের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত কারা? তারাই, যাদের দুনিয়ার জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম সবসময় সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত থাকতো[৭৬] এবং যারা মনে করতো যে, তারা সব কিছু সঠিক করে যাচ্ছে। এরা এমন সব লোক যারা নিজেদের রবের নিদর্শনাবলী মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর সামনে হাযির হবার ব্যাপারটি বিশ্বাস করেনি। তাই তাদের সমস্ত কর্ম নষ্ট হয়ে গেছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে কোন গুরুত্ব দেবো না।[৭৭]

৭৪. এ হচ্ছে সমস্ত সূরাটার শেষ কথা। তাই যুলকারনাইনের ঘটনার সাথে নয় বরং সূরার সামগ্রিক বিষয়বস্তুর সাথে এর সম্পর্ক সন্ধান করা উচিত। সূরার সামগ্রিক বিষয়বস্তু হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জাতিকে শিরক ত্যাগ করে তাওহীদ বিশ্বাস অবলম্বন করার এবং বৈষয়িক স্বার্থপূজা ত্যাগ করে আখেরাতে বিশ্বাস করার দাওয়াত দিচ্ছিলেন। কিন্তু জাতির প্রধান সমাজপতি ও সরদাররা নিজেদের সম্পদ ও পরাক্রমের নেশায় মত্ত হয়ে কেবল তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত থাকেনি বরং যে গুটিকয় সত্যাশ্রয়ী মানুষ এ দাওয়াত গ্রহণ করেছিলেন তাদের ওপর জুলুম-নিপীড়ন চালাচ্ছিল এবং তাদেরকে অপদস্থ ও হেয়প্রতিপন্ন করছিল। এ অবস্থার ওপর এ সমগ্র ভাষণটি দেয়া হয়েছে। ভাষণটি শুরু থেকে এ পর্যন্ত চলে এসেছে এবং এর মধ্যেই বিরোধীরা পরীক্ষা করার জন্য যে তিনটি কাহিনীর কথা জিজ্ঞেস করেছিল সেগুলোও একের পর এক ঠিক জায়গা মতো নিখুঁতভাবে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন ভাষণ শেষ করতে গিয়ে কথার মোড় আবার প্রথমে যেখান থেকে বক্তব্য শুরু করা হয়েছিল এবং ৪ থেকে ৮ রুকূ' পর্যন্ত যে বিষয় নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা করা হয়েছে সেদিকেই ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে।

৭৫. অর্থাৎ এসব কিছু শোনার পরও কি তারা মনে করে যে, এই নীতি তাদের জন্য লাভজনক হবে?

৭৬. এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। অনুবাদে আমি একটি অর্থ গ্রহণ করেছি। এর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, "যাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ও সাধনা দুনিয়ার জীবনের মধ্যেই হারিয়ে গেছে।" অর্থাৎ তারা যা কিছু করেছে আল্লাহর প্রতি সম্পর্কহীন হয়ে ও আখেরাতের চিন্তা

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا ﴿١٠٦﴾
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ
نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾

যে কুফরী তারা করেছে তার প্রতিফল স্বরূপ এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রসূলদের সাথে যে বিদ্রূপ তারা করতো তার প্রতিফল হিসেবে তাদের প্রতিদান জাহান্নাম। তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের আপ্যায়নের জন্য থাকবে ফিরদৌসের বাগান।[৭৮] সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং কখনো সে স্থান ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে তাদের মন চাইবে না।[৭৯]

না করেই শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্যই করেছে। দুনিয়ার জীবনকেই তারা আসল জীবন মনে করেছে। দুনিয়ার সাফল্য ও সচ্ছলতাকেই নিজেদের উদ্দেশ্যে পরিণত করেছে। আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও তাঁর সন্তুষ্টি কিসে এবং তাঁর সামনে গিয়ে আমাদের কখনো নিজেদের কাজের হিসেব দিতে হবে, এ কথা কখনো চিন্তা করেনি। তারা নিজেদেরকে শুধুমাত্র স্বেচ্ছাচারী ও দায়িত্বহীন বুদ্ধিমান জীব মনে করতো, যার কাজ দুনিয়ার এ চারণ ক্ষেত্র থেকে কিছু লাভ হাতিয়ে নেয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

৭৭. অর্থাৎ এ ধরনের লোকেরা দুনিয়ায় যতই বড় বড় কৃতিত্ব দেখাক না কেন, দুনিয়া শেষ হবার সাথে সাথে সেগুলোও শেষ হয়ে যাবে। নিজেদের সুরম্য অট্টালিকা ও প্রাসাদ, নিজেদের বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ও সুবিশাল লাইব্রেরী, নিজেদের সুবিস্তৃত রাজপথ ও রেলগাড়ী, নিজেদের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনসমূহ, নিজেদের শিল্প ও কলকারখানা, নিজেদের জ্ঞান বিজ্ঞান ও আর্ট গ্যালারী এবং আরো অন্যান্য যেসব জিনিস নিয়ে তারা গর্ভ করে তার মধ্য থেকে কোন একটি জিনিসও তারা আল্লাহর তুলাদণ্ডে ওজন করার জন্য নিজেদের সাথে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হতে পারবে না। সেখানে থাকবে শুধুমাত্র কর্মের উদ্দেশ্য এবং তার ফলাফল। যদি কারোর সমস্ত কাজের উদ্দেশ্য দুনিয়ার জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থেকে থাকে, ফলাফলও সে দুনিয়াতেই চেয়ে থাকে এবং দুনিয়ায় নিজের কাজের ফল দেখেও থাকে, তাহলে তার সমস্ত কার্যকলাপ এ ধ্বংসশীল দুনিয়ার সাথেই ধ্বংস হয়ে গেছে। আখেরাতে যা পেশ করে সে কিছু ওজন পেতে পারে, তা অবশ্যি এমন কোন কর্মকাণ্ড হতে হবে, যা সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য করেছে, তাঁর হুকুম মোতাবেক করেছে এবং যেসব ফলাফল আখেরাতে প্রকাশিত হয় সেগুলোকে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে করেছে। এ ধরনের কোন কাজ যদি তার হিসেবের খাতায় না থাকে তাহলে দুনিয়ায় সে যা কিছু করেছিল সবই নিসন্দেহে বৃথা যাবে।

৭৮. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মুমিনুন, ১০ টীকা।

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ
كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ﴿١١٠﴾

হে মুহাম্মাদ! বলো, যদি আমার রবের কথা[৮০] লেখার জন্য সমুদ্র কালিতে পরিণত হয় তাহলে সেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমার রবের কথা শেষ হবে না। বরং যদি এ পরিমাণ কালি আবারও আনি তাহলে তাও যথেষ্ট হবে না।

হে মুহাম্মাদ! বলো, আমি তো একজন মানুষ তোমাদেরই মতো, আমার প্রতি অহী করা হয় এ মর্মে যে, এক আল্লাহই তোমাদের ইলাহ, কাজেই যে তার রবের সাক্ষাতের প্রত্যাশী তার সৎকাজ করা উচিত এবং বন্দেগীর ক্ষেত্রে নিজের রবের সাথে কাউকে শরীক করা উচিত নয়।

৭৯. অর্থাৎ তার চেয়ে আরামদায়ক কোন পরিবেশ কোথাও থাকবে না। ফলে জান্নাতের জীবন তার সাথে বিনিময় করার কোন ইচ্ছাই তাদের মনে জাগবে না।

৮০. "কথা" বলে বুঝানো হয়েছে তাঁর কাজ, পূর্ণতার গুণাবলী, বিস্ময়কর ক্ষমতা ও বিজ্ঞতা। ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা লুকমান, ৪৮ টীকা।

মারয়াম

১৯

নামকরণ

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ আয়াত থেকে সূরাটির নাম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, এমন সূরা যার মধ্যে হযরত মারয়ামের কথা বলা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

হাবশায় হিজরাতের আগেই সূরাটি নাযিল হয়। বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে জানা যায়, মুসলিম মুহাজিরদেরকে যখন হাবশার শাসক নাজ্জাশীর দরবারে ডাকা হয় তখন হযরত জাফর দরবারে উপস্থিত হয়ে এ সূরাটি তেলাওয়াত করেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

যে যুগে এ সূরাটি নাযিল হয় সে সময়কার অবস্থা সম্পর্কে সূরা কাহফের ভূমিকায় আমি কিছুটা ইংগিত করেছি। কিন্তু এ সূরাটি এবং এ যুগের অন্যান্য সূরাগুলো বুঝার জন্য এতটুকু সংক্ষিপ্ত ইংগিত যথেষ্ট নয়। তাই আমি সে সময়ের অবস্থা একটু বেশী বিস্তারিত আকারে তুলে ধরছি।

কুরাইশ সরদাররা যখন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে, লোভ-লালসা দেখিয়ে এবং ভয়-ভীতি ও মিথ্যা অপবাদের ব্যাপক প্রচার করে ইসলামী আন্দোলনকে দমাতে পারলো না তখন তারা জুলুম-নিপীড়ন, মারপিট ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করার অস্ত্র ব্যবহার করতে লাগলো। প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা নিজ নিজ গোত্রের নওমুসলিমদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করতে থাকলো। তাদেরকে বন্দী করে, তাদের ওপর নানাভাবে নিপীড়ন নির্যাতন চালিয়ে, তাদেরকে অনাহারে রেখে এমনকি কঠোর শারীরিক নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত করে ইসলাম ত্যাগ করার জন্য বাধ্য করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকলো। এ নির্যাতনে ভয়ংকরভাবে পিষ্ট হলো বিশেষ করে গরীব লোকেরা এবং দাস ও দাসত্বের বন্ধনমুক্ত ভৃত্যরা। এসব মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম কুরাইশদের আশ্রিত ও অধীনস্থ ছিল। যেমন বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু, আমের ইবনে ফুহাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, উম্মে 'উবাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিন্নীরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর পিতামাতা প্রমুখ সাহাবীগণ। এদেরকে মেরে মেরে আধমরা করা হলো। কক্ষে আবদ্ধ করে খাদ্য ও পানীয় থেকে বঞ্চিত করা হলো। মক্কার প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত বালুকারাশির ওপর তাদেরকে শুইয়ে দেয়া হতে থাকলো। বুকের ওপর প্রকাণ্ড পাথর চাপা অবস্থায় সেখানে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাতরাতে থাকলো। যারা

পেশাজীবী ছিল তাদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে পারিশ্রমিক দেবার ব্যাপারে পেরেশান করা হতে থাকলো। বুখারী ও মুসলিমে হযরত খাব্বাব ইবনে আরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ

"আমি মক্কায় কর্মকারের কাজ করতাম। আস ইবনে ওয়ায়েল আমার থেকে কাজ করিয়ে নিল। তারপর যখন আমি তার কাছে মুজরী আনতে গেলাম, সে বললো, যতক্ষণ তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করবে না ততক্ষণ আমি তোমার মুজরী দেবো না।"

এভাবে যারা ব্যবসা করতো তাদের ব্যবসা নষ্ট করার প্রচেষ্টা চালানো হতো। যারা সমাজে কিছু মান-মর্যাদার অধিকারী ছিল তাদেরকে সর্বপ্রকারে অপমানিত ও হেয় করা হতো। এ যুগের অবস্থা বর্ণনা প্রসংগে হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বার ছায়ায় বসেছিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, "হে আল্লাহর রসূল ! এখন তো জুলুম সীমা ছাড়িয়ে গেছে, আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন না ?" একথা শুনে তাঁর পবিত্র চেহারা লাল হয়ে গেলো। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী মু'মিনদের ওপর এর চেয়ে বেশী জুলুম নিপীড়ন হয়েছে। তাদের হাড়ের ওপর লোহার চিরুনী চালানো হতো। তাদেরকে মাথার ওপর করাত রেখে চিরে ফেলা হতো। তারপরও তারা নিজেদের দীন ত্যাগ করতো না। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ এ কাজটি সম্পন্ন করে ছাড়বেন, এমনকি এমন এক সময় আসবে যখন এক ব্যক্তি সান'আ থেকে হাদারামাউত পর্যন্ত নিশ্চিন্তে সফর করবে এবং তার আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছো।"–বুখারী

এ অবস্থা যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলো তখন ৪৫ হস্তী বর্ষে (৫ নববী সন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বললেন ঃ

لَوْ خَرَجْتُمْ اِلٰى اَرْضِ الْحَبْشَةِ فَاِنَّ بِهَا مَلِكًا لَايُظْلَمُ عِنْدَهُ اَحَدٌ وَهِىَ اَرْضُ صِدْقٍ حَتّٰى يَجْعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ فَرَجًا مِمَّا اَنْتُمْ فِيْهِ ـ

"তোমরা হাবশায় চলে গেলে ভালো হয়। সেখানে এমন একজন বাদশাহ আছেন যার রাজ্যে কারো প্রতি জুলুম হয় না। সেটি কল্যাণের দেশ। যতদিন পর্যন্ত না আল্লাহ তোমাদের এ বিপদ দূর করে দেন ততদিন তোমরা সেখানে অবস্থান করবে।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বক্তব্যের পর প্রথমে এগারোজন পুরুষ ও চারজন মহিলা হাবশার পথে রওয়ানা হন। কুরাইশদের লোকেরা সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করে যায়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শু'আইবা বন্দরে তাঁরা যথাসময়ে হাবশায় যাওয়ার নৌকা পেয়ে যান। এভাবে তারা গ্রেফতারীর হাত থেকে রক্ষা পান। তারপর কয়েক মাস পরে আরো কিছু লোক হিজরত করেন। এভাবে ৮৩জন পুরুষ, ১১জন মহিলা ও ৭জন অ-কুরাইশী মুসলমান হাবশায় একত্র হয়ে যায়। এ সময় মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মাত্র ৪০জন মুসলমান থেকে গিয়েছিলেন।

এ হিজরতের ফলে মক্কার ঘরে ঘরে কান্নাকাটি শুরু হয়ে যায়। কারণ কুরাইশদের ছোট বড় পরিবারগুলোর মধ্যে এমন কোনো পরিবারও ছিল না যার কোনো একজন এ মুহাজিরদের দলভুক্ত ছিল না। কারোর ছেলে, কারোর জামাতা, কারোর মেয়ে, কারোর ভাই এবং কারোর বোন এ দলে ছিল। এ দলে ছিল আবু জেহেলের ভাই সালামাহ ইবনে হিশাম, তার চাচাত ভাই হিশাম ইবনে আবী হুযাইফা ও আইয়াশ ইবনে আবী রাবী'আহ এবং তার চাচাত বোন হযরত উম্মে সালামাহ, আবু সুফিয়ানের মেয়ে উম্মে হাবীবাহ, উত্‌বার ছেলে ও কলিজা ভক্ষণকারিণী হিন্দার সহোদর ভাই আবু হুযাইফা এবং সোহাইল ইবনে আমেরের মেয়ে সাহ্‌লাহ। এভাবে অন্যান্য কুরাইশ সরদার ও ইসলামের সুপরিচিত শত্রুদের ছেলে মেয়েরা ইসলামের জন্য স্বগৃহ ও আত্মীয় স্বজনদের ত্যাগ করে বিদেশের পথে পাড়ি জমিয়েছিল। তাই এ ঘটনায় প্রভাবিত হয়নি এমন একটি গৃহও ছিল না। এ ঘটনার ফলে অনেক লোকের ইসলাম বৈরিতা আগের চেয়ে বেড়ে যায়। আবার অনেককে এ ঘটনা এমনভাবে প্রভাবিত করে যার ফলে তারা মুসলমান হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম বৈরিতার ওপর এ ঘটনাটিই প্রথম আঘাত হানে। তাঁর একজন নিকটাত্মীয় লাইলা বিনতে হাশ্‌মাহ বর্ণনা করেন ঃ আমি হিজরত করার জন্য নিজের জিনিসপত্র গোছগাছ করছিলাম এবং আমার স্বামী আমের ইবনে রাবী'আহ কোনো কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। এমন সময় উমর এলেন এবং দাঁড়িয়ে আমার ব্যস্ততা ও নিমগ্নতা দেখতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন ঃ "আবদুল্লাহর মা! চলে যাচ্ছো ?" আমি বললাম, "আল্লাহর কসম! তোমরা আমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছো। আল্লাহর পৃথিবী চারদিকে উন্মুক্ত, এখন আমরা এমন কোনো জায়গায় চলে যাবো যেখানে আল্লাহ আমাদের শান্তি ও স্থিরতা দান করবেন।" একথা শুনে উমরের চেহারায় এমন কান্নার ভাব ফুটে উঠলো, যা আমি তার মধ্যে কখনো দেখিনি। তিনি কেবল এতটুকু বলেই চলে গেলেন যে, "আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন।"

হিজরতের পরে কুরাইশ সরদাররা এক জোট হয়ে পরামর্শ করতে বসলো। তারা স্থির করলো, আবদুল্লাহ ইবনে আবী রাবী'আহ (আবু জেহেলের বৈপিত্রেয় ভাই) এবং আমর ইবনে আসকে মূল্যবান উপঢৌকন সহকারে হাবশায় পাঠাতে হবে। এরা সেখানে গিয়ে এ মুসলমান মুহাজিদেরকে মক্কায় ফেরত পাঠাবার জন্য হাবশার শাসনকর্তা নাজ্জাশীকে সম্মত করাবে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা (নিজেই হাবশার মুহাজিরদের দলভুক্ত ছিলেন) এ ঘটনাটি বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ কুরাইশদের এ দু'জন কূটনীতি বিশারদ দূত হয়ে আমাদের পিছনে পিছনে হাবশায় পৌঁছে গেলো। প্রথমে নাজ্জাশীর দরবারের সভাসদদের মধ্যে ব্যাপকহারে উপঢৌকন বিতরণ করলো। তাদেরকে এ মর্মে রাযী করালো যে, তারা সবাই মিলে একযোগে মুহাজিরদেরকে ফিরিয়ে দেবার জন্য নাজ্জাশীর ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। তারপর নাজ্জাশীর সাথে সাক্ষাত করলো এবং তাকে মহামূল্যবান নযরানা পেশ করার পর বললো, "আমাদের শহরের কয়েকজন অবিবেচক ছোকরা পালিয়ে আপনার এখানে চলে এসেছে। জাতির প্রধানগণ তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার আবেদন জানাবার জন্য আপনার কাছে আমাদের পাঠিয়েছেন। এ ছেলেগুলো আমাদের ধর্ম থেকে বের হয়ে গেছে এবং এরা আপনাদের ধর্মেও প্রবেশ করেনি বরং তারা একটি অভিনব ধর্ম উদ্ভাবন করেছে।" তাদের কথা শেষ হবার সাথে সাথেই দরবারের চারদিক থেকে একযোগে আওয়াজ গুঞ্জরিত হলো,

"এ ধরনের লোকদেরকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেয়া উচিত। এদের দোষ সম্পর্কে এদের জাতির লোকেরাই ভালো জানে। এদেরকে এখানে রাখা ঠিক নয়।" কিন্তু নাজ্জাশী রেগে গিয়ে বললেন, "এভাবে এদেরকে আমি ওদের হাতে সোপর্দ করে দেবো না। যারা অন্যদেশ ছেড়ে আমার দেশের প্রতি আস্থাস্থাপন করেছে এবং এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে তাদের সাথে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। প্রথমে আমি এদেরকে ডেকে এ মর্মে অনুসন্ধান করবো যে, ওরা এদের ব্যাপারে যা কিছু বলছে সে ব্যাপারে আসল সত্য ঘটনা কি!" অতপর নাজ্জাশী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদেরকে নিজের দরবারে ডেকে পাঠালেন।

নাজ্জাশীর বার্তা পেয়ে মুহাজিরগণ একত্র হলেন। বাদশাহর সামনে কি বক্তব্য রাখা হবে তা নিয়ে তারা পরামর্শ করলেন। শেষে সবাই একজোট হয়ে ফায়সালা করলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন তাই হুবহু কোনো প্রকার কমবেশী না করে তাঁর সামনে পেশ করবো, তাতে নাজ্জাশী আমাদের থাকতে দেন বা বের করে দেন তার পরোয়া করা হবে না। দরবারে পৌছার সাথে সাথেই নাজ্জাশী প্রশ্ন করলেন, "তোমরা এটা কি করলে, নিজেদের জাতির ধর্মও ত্যাগ করলে আবার আমার ধর্মেও প্রবেশ করলে না, অন্যদিকে দুনিয়ার অন্য কোনো ধর্মও গ্রহণ করলে না ?" এর জবাবে মুহাজিরদের পক্ষ থেকে হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাৎক্ষণিক একটি ভাষণ দিলেন। এ ভাষণে তিনি প্রথমে আরবীয় জাহেলিয়াতের ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক দুষ্কৃতির বর্ণনা দেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করে তিনি কি শিক্ষা দিয়ে চলেছেন তা ব্যক্ত করেন। তারপর কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য গ্রহণকারীদের ওপর যেসব জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিল সেগুলো বর্ণনা করেন এবং সবশেষে একথা বলে নিজের বক্তব্যের উপসংহার টানেন যে, আপনার দেশে আমাদের ওপর কোনো জুলুম হবে না এ আশায় আমরা অন্য দেশের পরিবর্তে আপনার দেশে এসেছি।" নাজ্জাশী এ ভাষণ শুনে বললেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নবীর ওপর যে কালাম নাযিল হয়েছে বলে তোমরা দাবী করছো তা একটু আমাকে শুনাও তো দেখি। জবাবে হযরত জাফর সূরা মারয়ামের গোড়ার দিকের হযরত ইয়াহ্ইয়া ও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে সম্পর্কিত অংশটুকু শুনালেন। নাজ্জাশী তা শুনছিলেন এবং কেঁদে চলছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেলো। যখন হযরত জাফর তেলাওয়াত শেষ করলেন তখন তিনি বললেন, "নিশ্চিতভাবেই এ কালাম এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যা কিছু এনেছিলেন উভয়ই একই উৎস থেকে উৎসারিত। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে ওদের হাতে তুলে দেবো না।"

পরদিন আমর ইবনুল আস নাজ্জাশীকে বললো, "ওদেরকে ডেকে একটু জিজ্ঞেস করে দেখুন, ঈসা ইবনে মারয়াম সম্পর্কে ওরা কি আকীদা পোষণ করে ? তাঁর সম্পর্কে ওরা একটা মারাত্মক কথা বলে ? নাজ্জাশী আবার মুহাজিরদেরকে ডেকে পাঠালেন। আমরের চালবাজীর কথা মুহাজিররা আগেই জানতে পেরেছিলেন। তারা আবার একত্র হয়ে পরামর্শ করলেন যে, নাজ্জাশী যদি ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে প্রশ্ন করেন তাহলে তার কি জবাব দেয়া যাবে। পরিস্থিতি বড়ই নাজুক ছিল। এজন্য সবাই পেরেশান ছিলেন। কিন্তু তবুও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ এ

ফায়সালাই করলেন যে, যা হয় হোক, আমরা তো সেই কথাই বলবো যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল শিখিয়েছেন। কাজেই যখন তারা দরবারে গেলেন এবং নাজ্জাশী আমর ইবনুল আসের প্রশ্ন তাদের সামনে রাখলেন তখন জাফর ইবনে আবু তালেব উঠে দাঁড়িয়ে নির্দ্বিধায় বললেন ঃ

هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ وَرُوْحُهُ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ الْعَذْرَاءَ الْبَتُوْلِ

"তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল এবং তাঁর পক্ষ থেকে একটি রূহ ও একটি বাণী, যা আল্লাহ কুমারী মার্‌য়ামের নিকট পাঠান।"

একথা শুনে নাজ্জাশী মাটি থেকে একটি তৃণখণ্ড তুলে নিয়ে বললেন, "আল্লাহর কসম! তোমরা যা কিছু বললে, হযরত ঈসা তার থেকে এ তৃণখণ্ডের চেয়েও বেশী কিছু ছিলেন না।" এরপর নাজ্জাশী কুরাইশদের পাঠানো সমস্ত উপঢৌকন এই বলে ফেরত দিয়ে দিলেন যে, "আমি ঘুষ নিই না এবং মুহাজিরদেরকে বলে দিলেন, তোমরা পরম নিশ্চিন্তে বসবাস করতে থাকো।"

আলোচ্য বিষয় ও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু

এ ঐতিহাসিক পটভূমির প্রতি দৃষ্টি রেখে যখন আমরা এ সূরাটি দেখি তখন এর মধ্যে সর্বপ্রথম যে কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে আমাদের সামনে আসে সেটি হচ্ছে এই যে, যদিও মুসলমানরা একটি মযলুম শরণার্থী দল হিসেবে নিজেদের স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করে অন্য দেশে চলে যাচ্ছিল তবু এ অবস্থায়ও আল্লাহ তাদেরকে দীনের ব্যাপারে সামান্যতম আপোস করার শিক্ষা দেননি। বরং চলার সময় পাথেয় স্বরূপ এ সূরাটি তাদের সাথে দেন, যাতে ঈসায়ীদের দেশে তারা ঈসা আলাইহিস সালামের একেবারে সঠিক মর্যাদা তুলে ধরেন এবং তাঁর আল্লাহর পুত্র হওয়ার ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করেন।

প্রথম দু' রুকূ'তে হযরত ইয়াহ্‌ইয়া আলাইহিস সালাম ও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কাহিনী শুনাবার পর আবার তৃতীয় রুকূ'তে সমকালীন অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাহিনী শুনানো হয়েছে। কারণ এ একই ধরনের অবস্থায় তিনিও নিজের পিতা, পরিবার ও দেশবাসীর জুলুম নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে স্বদেশ ত্যাগ করেছিলেন। এ থেকে একদিকে মক্কার কাফেরদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আজ হিজরতকারী মুসলমানরা ইবরাহীমের পর্যায়ে রয়েছে এবং তোমরা রয়েছো সেই জালেমদের পর্যায়ে যারা তোমাদের পিতা ও নেতা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে গৃহত্যাগী করেছিল। অন্যদিকে মুহাজিরদের এ সুখবর দেয়া হয়েছে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেমন স্বদেশ ত্যাগ করে ধ্বংস হয়ে যাননি বরং আরো অধিকতর মর্যাদাশালী হয়েছিলেন তেমনি শুভ পরিণাম তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

এরপর চতুর্থ রুকূ'তে অন্যান্য নবীদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীনের বার্তা বহন করে এনেছেন সকল নবীই সেই একই দীনের বার্তাবহ ছিলেন। কিন্তু নবীদের তিরোধানের পর তাঁদের উম্মতগণ বিকৃতির শিকার হতে থেকেছে। আজ বিভিন্ন উম্মতের মধ্যে যেসব গোমরাহী দেখা যাচ্ছে এগুলো সে বিকৃতিরই ফসল।

শেষ দু' রুকূ'তে মক্কার কাফেরদের ভ্রষ্টতার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে এবং কথা শেষ করতে গিয়ে মু'মিনদেরকে এ মর্মে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, সত্যের শত্রুদের যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তোমরা জনগণের প্রিয়ভাজন হবেই।

আয়াত ৯৮ | সূরা মারয়াম–মক্কী | রুকূ' ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

كٓهٰيٰعٓصٓ ﴿١﴾ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ﴿٢﴾ اِذْ نَادٰى
رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ
شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾ وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ
وَّرَآءِىْ وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾
يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾ يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا
نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ِۨاسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾

কা-ফ্ হা-ইয়া–আই-ন্ সা-দ। এটি তোমার রবের অনুগ্রহের বিবরণ,[১] যা তিনি তাঁর বান্দা যাকারিয়ার[২] প্রতি করেছিলেন, যখন সে চুপে চুপে নিজের রবকে ডাকলো।

সে বললো, "হে আমার রব! আমার হাড়গুলো পর্যন্ত নরম হয়ে গেছে, মাথা বার্ধক্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ; হে পরওয়ারদিগার ! আমি কখনো তোমার কাছে দোয়া চেয়ে ব্যর্থ হইনি। আমি আমার পর নিজের স্বজন-স্বগোত্রীয়দের অসদাচরণের আশংকা করি[৩] এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। (তথাপি) তুমি নিজের বিশেষ অনুগ্রহ বলে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান করো, যে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং ইয়াকুব বংশেরও উত্তরাধিকারী হবে।[৪] আর হে পরোয়ারদিগার ! তাকে একজন পসন্দনীয় মানুষে পরিণত করো।"

(জবাব দেয়া হলো) "হে যাকারিয়া ! আমি তোমাকে একটি পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, যার নাম হবে ইয়াহইয়া, এ নামে কোনো লোক আমি এর আগে সৃষ্টি করিনি।"[৫]

قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ
مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝٨ قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ
مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝٩ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّيٓ آيَةً ۚ قَالَ آيَتُكَ
أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝١٠ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ
فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝١١

সে বললো, "হে আমার রব ! আমার ছেলে হবে কেমন করে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি বুড়ো হয়ে শুকিয়ে গেছি ?"

জবাব এলো, "এমনটিই হবে, তোমার রব বলেন, এ তো আমার জন্য সামান্য ব্যাপার মাত্র, এর আগে আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না।"[৬]

যাকারিয়া বললেন, হে আমার রব ! আমার জন্য নিদর্শন স্থির করে দাও।

বললেন, "তোমার জন্য নিদর্শন হচ্ছে, তুমি পরপর তিনদিন লোকদের সাথে কথা বলতে পারবে না।"

কাজেই সে মিহ্‌রাব[৭] থেকে বের হয়ে নিজের সম্প্রদায়ের সামনে এলো এবং ইশারায় তাদেরকে সকাল-সাঁঝে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার নির্দেশ দিল।[৮]

১. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য সূরা আলে ইমরানের ৪ রুকূ' সামনে রাখুন। সেখানে এ ঘটনাটি অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, ১ খণ্ড, ২৪৬-২৫০ পৃষ্ঠা)

২. এখানে যে হযরত যাকারিয়ার কথা আলোচনা করা হচ্ছে তিনি ছিলেন হযরত হারুনের বংশধর। তাঁর মর্যাদা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে বনী ইসরাঈলের যাজক ব্যবস্থা (Priesthood) সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে হবে। ফিলিস্তিন দখল করার পর বনী ইসরাঈল দেশের শাসন ব্যবস্থা এমনভাবে সংগঠিত করেছিল যার ফলে হযরত ইয়াকুব (আ)-এর সন্তানদের ১২টি গোত্রের মধ্যে সমগ্র দেশ বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং ১৩তম গোত্রটি (অর্থাৎ লাভী ইবনে ইয়াকুবের গোত্র) ধর্মীয় কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। আবার বনী লাভীর মধ্যেও যে পরিবারটি বাইতুল মাকদিসে খোদাবন্দের সামনে ধূপ জ্বালাবার দায়িত্ব পালন এবং পবিত্রতম জিনিসসমূহের পবিত্রতা বর্ণনা করার কাজ করতো তারা ছিল হযরত হারুনের বংশধর। বনী লাভীর অন্যান্য

লোকেরা বাইতুল মাকদিসের মধ্যে যেতে পারতো না বরং আল্লাহর গৃহের পরিচর্যার সময় আঙ্গিনায় ও বিভিন্ন কক্ষে কাজ করতো। শনিবার ও ঈদের সময় কুরবানী করতো এবং বাইতুল মাকদিসের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে বনী হারুনকে সাহায্য করতো।

বনী হারুনের চব্বিশটি শাখা ছিল। তারা পালাক্রমে বাইতুল মাকদিসের সেবায় হাযির হতো। এই শাখাগুলোর মধ্যে একটি ছিল আব্‌ইয়াহর শাখা। এর সরদার ছিলেন হযরত যাকারিয়া। নিজের গোত্রের পালার দিন তিনিই মাকদিসে যেতেন এবং আল্লাহর সমীপে ধূপ জ্বালাবার দায়িত্ব পালন করতেন। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন বাইবেলের বংশাবলী-১ পুস্তক ২৩ ও ২৪ অধ্যায়)

৩. এর অর্থ হচ্ছে, আব্‌ইয়াহর পরিবারে আমার পরে এমন কাউকে দেখা যায় না, যে ব্যক্তি দীনি ও নৈতিক দিক দিয়ে আমি যে পদে অধিষ্ঠিত আছি তার যোগ্য হতে পারে। তারপর সামনের দিকে যে প্রজন্ম এগিয়ে আসছে তাদের চালচলন বিকৃত দেখা যাচ্ছে।

৪. অর্থাৎ আমি কেবলমাত্র নিজের উত্তরাধিকারী চাই না বরং ইয়াকুব বংশের যাবতীয় কল্যাণের উত্তরাধিকারী চাই।

৫. এ ক্ষেত্রে লূকের সুসমাচারে যে শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ "আপনার গোষ্ঠীতে তো এ নামের কোনো লোক নেই।" (১ ঃ ৬১)

৬. হযরত যাকারিয়ার এই প্রশ্ন এবং ফেরেশতাদের জবাব সামনে রাখুন। কারণ সামনের দিকে হযরত মারয়ামের কাহিনীতে এ বিষয়বস্তু আবার আসছে এবং এখানে এর যে অর্থ সেখানেও সেই একই অর্থ হওয়া উচিত। হযরত যাকারিয়া বলেন, আমি একজন বৃদ্ধ এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, আমার ছেলে হতে পারে কেমন করে। ফেরেশতারা জবাব দেন, "এমনিই হবে।" অর্থাৎ তোমার বার্ধক্য ও তোমার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব সত্ত্বেও তোমার ছেলে হবে। তারপর ফেরেশতা আল্লাহর কুদরাতের বরাত দিয়ে বলেন, যে আল্লাহ তোমাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তোমার মত খুনখুনে বুড়োর ঔরসে আজীবন বন্ধ্যা এক বৃদ্ধার গর্ভে সন্তান জন্ম দেয়া তাঁর কুদরাতের অসাধ্য নয়।

৭. মিহরাবের ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩৬ টীকা।

৮. লূক লিখিত সুসমাচারে এই ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে তা আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি। এভাবে পাঠকের সামনে কুরআনের পাশাপাশি খৃষ্টীয় বর্ণনাও রাখা যাবে এবং মাঝে মাঝে বন্ধনীর মধ্যে থাকছে আমাদের বক্তব্য ঃ

"যিহূদিয়ার রাজা হেরোদের সময়ে (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, বনী ইসরাঈল, ৯ টীকা) অবিয়ের পালার মধ্যে সখরীয় (যাকারিয়া) নামক একজন যাজক ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী হারোণ বংশীয়া, তাঁহার নাম ইলীশাবেৎ (Elizabeth) তাঁহারা দুইজন ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক ছিলেন, প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি অনুসারে নির্দোষরূপে চলিতেন। তাঁহাদের সন্তান ছিল না, কেননা, ইলীশাবেৎ বন্ধ্যা ছিলেন এবং দুই জনেরই অধিক বয়স হইয়াছিল। একদা যখন সখরীয় (যাকারিয়া) নিজ পালার অনুক্রমে

يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۖ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾ وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا
وَزَكٰوةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾ وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾
وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾

"হে ইয়াহ্ইয়া ! আল্লাহর কিতাবকে মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরো।"[৯]

আমি তাকে শৈশবেই "হুকুম"[১০] দান করেছি এবং নিজের পক্ষ থেকে হৃদয়ের কোমলতা[১১] ও পবিত্রতা দান করেছি, আর সে ছিল খুবই আল্লাহভীরু এবং নিজের পিতামাতার অধিকার সচেতন, সে উদ্ধত ও নাফরমান ছিলো না। শান্তি তার প্রতি যেদিন সে জন্ম লাভ করে এবং যেদিন সে মৃত্যুবরণ করে আর যেদিন তাকে জীবিত করে উঠানো হবে।[১২]

ঈশ্বরের সাক্ষাতে যাজকীয় কার্য করিতেছিলেন, তখন যাজকীয় কার্যের প্রথানুসারে গুলিবাঁট ক্রমে তাঁহাকে প্রভুর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ধূপ জ্বালাইতে হইল। সেই ধূপদাহের সময়ে সমস্ত লোক বাহিরে থাকিয়া প্রার্থনা করিতেছিল। তখন প্রভুর এক দূত ধূপবেদির দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন। দেখিয়া সখরিয় (যাকারিয়া) ত্রাসযুক্ত হইলেন, ভয় তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু দূত তাঁহাকে বলিলেন, সখরিয় ভয় করিও না। কেননা তোমার বিনতি গ্রাহ্য হইয়াছে, [বাইবেলের কোথাও হযরত সখরিয়ার (যাকারিয়ার) দোয়ার উল্লেখ নেই] তোমার স্ত্রী ইলীশাবেৎ তোমার জন্য পুত্র প্রসব করিবেন, ও তুমি তাহার নাম যোহন (অর্থাৎ ইয়াহইয়া) রাখিবে। আর তোমার আনন্দ ও উল্লাস হইবে এবং তাহার জন্মে অনেকে আনন্দিত হইবে। কারণ সে প্রভুর সম্মুখে মহান হইবে, (এ বিষয়টি ব্যক্ত করার জন্য সূরা আলে ইমরানে سَيِّدًا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে) এবং দ্রাক্ষারস কি সুরা কিছুই পান করিবে না, (تَقِيًّا) আর সে মাতার গর্ভ হইতেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইবে ; (وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا) এবং ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে অনেককে তাহাদের ঈশ্বর প্রভুর প্রতি ফিরাইবে। সে তাহার সম্মুখে এলিয়ের (ইলিয়াস আলাইহিস সালাম) আত্মায় ও পরাক্রমে গমন করিবে, যেন পিতৃগণের হৃদয় সন্তানদের প্রতি ও অনাজ্ঞাবহদিগকে ধার্মিকদের বিজ্ঞতায় চলিবার জন্য ফিরাইতে পারে, প্রভুর নিমিত্ত সুসজ্জিত এক প্রজামণ্ডলী প্রস্তুত করিতে পারে।

তখন সখরিয় (যাকারিয়া) দূতকে কহিলেন, কিসে ইহা জানিব ? কেননা আমি বৃদ্ধ এবং আমার স্ত্রীরও অধিক বয়স হইয়াছে। দূত উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমি গাব্রিয়েল (জিব্রীল) ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকি, তোমার সহিত কথা কহিবার ও তোমাকে এ সকল বিষয়ের সুসমাচার দিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি। আর দেখ, এই সকল যেদিন ঘটিবে, সেই দিন পর্যন্ত তুমি নীরব থাকিবে, কথা কহিতে পারিবে না ; যেহেতুক আমার এই যে সকল বাক্য যথাসময়ে সফল হইবে, ইহাতে তুমি বিশ্বাস

করিলে না। (এ বর্ণনাটি কুরআন থেকে ভিন্নতর। কুরআন একে নিদর্শন গণ্য করে এবং লূকের বর্ণনা একে বলে শাস্তি। তাছাড়া কুরআন কেবলমাত্র তিন দিন কথা না বলার কথা বলে এবং লূক বলেন, সেই সময় থেকে হযরত ইয়াহ্ইয়ার জন্ম হওয়া পর্যন্ত হযরত যাকারিয়া নীরব থাকেন)। আর লোক সকল সখরিয়ের অপেক্ষা করিতেছিল ; এবং মন্দিরের মধ্যে তাঁহার বিলম্ব হওয়াতে তাহারা আশ্চর্য জ্ঞান করিতে লাগিল। পরে তিনি বাহিরে আসিয়া তাহাদের কাছে কথা কহিতে পারিলেন না; তখন তাহারা বুঝিল যে, মন্দিরের মধ্যে তিনি কোনো দর্শন পাইয়াছেন আর তিনি তাহাদের নিকটে নানা সংকেত করিতে থাকিলেন এবং বোবা হইয়া রহিলেন।" (লূক ১ঃ ৫-২২)

৯. মাঝখানে এই বিস্তারিত তথ্য পরিবেশিত হয়নি যে, আল্লাহর ফরমান অনুযায়ী হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর জন্ম হয় এবং শৈশব থেকে তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন। এখন বলা হচ্ছে, যখন তিনি জ্ঞানলাভের নির্দিষ্ট বয়ঃসীমায় পৌঁছেন তখন তাঁর ওপর কি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এখানে মাত্র একটি বাক্যে নবুওয়াতের মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত করার সময় তার ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয় তার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি তাওরাতকে সুদৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরবেন এবং বনী ইসরাঈলকে এ পথে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করবেন।

১০. "হুকুম" অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি, ইজতিহাদ করার শক্তি, দীনের গভীর তত্বজ্ঞান, জীবন সমস্যার ক্ষেত্রে সঠিক মত প্রকাশের যোগ্যতা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে ফায়সালা দান করার ক্ষমতা।

১১. আসলে حَنَانًا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি মমতার প্রায় সমার্থক শব্দ। অর্থাৎ একজন মায়ের মনে নিজের সন্তানের জন্য যে চূড়ান্ত পর্যায়ের স্নেহশীলতা থাকে, যার ভিত্তিতে সে শিশুর কষ্টে অস্থির হয়ে পড়ে, আল্লাহর বান্দাদের জন্য হযরত ইয়াহ্ইয়ার মনে এই ধরনের স্নেহ-মমতা সৃষ্টি হয়েছিল।

১২. বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকে হযরত ইয়াহ্ইয়ার জীবনের যে ঘটনাবলী ছড়িয়ে আছে সেগুলো একত্র করে আমি এখানে তাঁর পূতপবিত্র জীবনের একটি চিত্র তুলে ধরছি। এর সাহায্যে সূরা আলে ইমরান এবং এ সূরাটির সংক্ষিপ্ত ইশারা ইংগিতগুলোর ব্যাখ্যা হয়ে যাবে।

লূকের বর্ণনা অনুসারে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) ছিলেন, হযরত ইসা (আ)-এর চেয়ে ৬ মাসের বড়। তাঁর মাতা হযরত ঈসা (আ)-এর মাতার নিকটাত্মীয়া ছিলেন। প্রায় ৩০ বছর বয়সে তিনি কার্যকরভাবে নবুওয়াতের দায়িত্ব লাভ করেন। যোহনের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ট্রান্স জর্ডন এলাকায় আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার কাজ শুরু করেন। তিনি বলতেন ঃ

"আমি প্রান্তরে এক জনের রব যে ঘোষণা করিতেছে তোমর প্রভূর সরল পথ ধর।" (যোহন ১ ঃ ২৩)

মার্কের বর্ণনা মতে তিনি লোকদের পাপের জন্য তাদের তাওবা করাতেন এবং তাওবাকারীদেরকে বাপ্তাইজ করতেন। অর্থাৎ তাওবা করার পর তাদেরকে গোসল করাতেন, যাতে আত্মা ও শরীর উভয়ই পবিত্র হয়ে যায়। ইয়াহুদিয়া (যিহূদা) ও জেরুসালেমের অধিকাংশ লোক তাঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর দ্বারা বাপ্তাইজিত হচ্ছিল। (মার্ক ১ ঃ ৪-৫) এজন্য তিনি বাপ্তাইজক ইয়াহ্ইয়া (Jhon the Baptist) নামে

পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন। সাধারণভাবে বনী ইসরাঈল তাঁর নবুওয়াত স্বীকার করে নিয়েছিল। (মথি ২১ ঃ ২৬) ঈসা আলাইহিস সালামের উক্তি ছিল, "স্ত্রী লোকের গর্ভজাত সকলের মধ্যে যোহন বাপ্তাইজক হইতে মহান কেহই উৎপন্ন হয় নাই।" (মথি ১১ঃ ১১)

তিনি উটের লোমের কাপড় পরতেন, চর্মপটুকা কোমরে বাঁধতেন এবং তাঁর খাদ্য ছিল পঙ্গপাল ও বনমধু। (মথি ৩ ঃ ৪) এই ফকিরী জীবন যাপনের সাথে সাথে তিনি প্রচার করে বেড়াতেন ঃ "মন ফিরাও (অর্থাৎ তাওবা কর) কেননা, স্বর্গ রাজ্য সন্নিকট হইল।" (মথি ৩ ঃ ২) অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াতের দওয়াতের সূচনা হতে যাচ্ছে। এ কারণে তাঁকে সাধারণত হযরত ঈসার (আ) 'আরহাস' বলা হতো। কুরআন মজীদেও তাঁর সম্পর্কে এ কথাই এভাবে বলা হয়েছে ঃ

مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ

"সে আল্লাহর বাণীর সত্যতার সাক্ষদানকারী" (আলে ইমরান ৩৯)

তিনি লোকদের নামায পড়ার ও রোযা রাখার উপদেশ দিতেন (মথি ৯ ঃ ১৪, লূক ৫ ঃ ৩৩, লূক ১১ঃ ১)

তিনি লোকদের বলতেন, "যাহার দুইটি আঙ্গরাখা আছে, সে, যাহার নাই, তাহাকে একটি দিউক ; আর যাহার কাছে খাদ্যদ্রব্য আছে সেও তদ্রূপ করুক।" কর গ্রাহীরাও তাকে জিজ্ঞেস করলো, গুরু আমরা কি করবো ? তাতে তিনি জবাব দেন, "তোমাদের জন্য যাহা নিরূপিত তাহার অধিক আদায় করিও না।" সৈনিকরা জিজ্ঞেস করলো, আমাদের প্রতি কি নির্দেশ ? জবাব দেন, "কাহারও প্রতি দৌরাত্ম্য করিও না, অন্যায় পূর্বক কিছু আদায়ও করিও না এবং তোমাদের বেতনে সন্তুষ্ট থাকিও।" (লূক ৩ ঃ ১০-১৪) বনী ইসরাঈলদের বিপথগামী উলামা, ফরীশী ও সদ্দুকীরা তাঁর কাছে বাপ্তাইজ হবার জন্য এলে তিনি তাদেরকে ধমক দিয়ে বলেন, "হে সর্পের বংশেরা আগামী কোপ হইতে পলায়ন করিতে তোমাদিগকে কে চেতনা দিল ?..... আর ভাবিওনা যে, তোমরা মনে মনে বলিতে পার আব্রাহাম আমাদের পিতা, ... আর এখন গাছগুলোর মূলে কুড়াল লাগান আছে, অতএব যে কোনো গাছে উত্তম ফল ধরে না, তাহা কাটিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া যায়।" (মথি ৩ ঃ ৭-১০)

তাঁর যুগের ইহুদী শাসনকর্তা হীরোদ এন্টিপাসের রাজ্যে তিনি সত্যের দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করছিলেন। এই শাসনকর্তা ছিল আপাদমস্তক রোমীয় সভ্যতার প্রতিভূ। তারই কারণে সারা দেশে দুষ্কৃতি, নৈতিকতা বিরোধী ও আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপ প্রসার লাভ করছিল। সে নিজের ভাই ফিলিপের স্ত্রী হিরোদিয়াসকে নিজের গৃহে রক্ষিতা রেখেছিল। হযরত ইয়াহ্ইয়া এ জন্য হিরোদকে ভর্ৎসনা করেন এবং তার পাপাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। এ অপরাধে হিরোদ তাঁকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠায়। তবুও সে তাঁকে একজন পবিত্রাত্মা ও সৎকর্মশীল মনে করে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতো এবং জনগণের মধ্যে তাঁর প্রভাবের কারণে তাঁকে ভয়ও করতো। কিন্তু হিরোদিয়াস মনে করতো, ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালাম জনগণের মধ্যে যে নৈতিক চেতনা সঞ্চার করছেন তার ফলে জনগণের দৃষ্টিতে তার মতো মেয়েরা ঘৃণিত হয়ে যাচ্ছে। তাই তাঁর

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾
فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ
لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾
قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَتْ أَنَّىٰ
يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذٰلِكِ قَالَ
رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا
مَقْضِيًّا ﴿٢١﴾ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾

২ রুকূ'

আর (হে মুহাম্মাদ!) এ কিতাবে মারয়ামের অবস্থা বর্ণনা করো।[১৩] যখন সে নিজের লোকদের থেকে আলাদা হয়ে পূর্ব দিকে নির্জনবাসী হয়ে গিয়েছিল এবং পর্দা টেনে তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করে নিয়েছিল।[১৪] এ অবস্থায় আমি তার কাছে নিজের রূহকে অর্থাৎ (ফেরেশতাকে) পাঠালাম এবং সে তার সামনে একটি পূর্ণ মানবিক কায়া নিয়ে হাযির হলো।

মারয়াম অকস্মাত বলে উঠলো, "তুমি যদি আল্লাহকে ভয় করে থাকো তাহলে আমি তোমার হাত থেকে করুণাময়ের আশ্রয় চাচ্ছি।"

সে বললো, "আমি তো তোমার রবের দূত এবং আমাকে পাঠানো হয়েছে এ জন্য যে, আমি তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র দান করবো।"

মারয়াম বললো, "আমার পুত্র হবে কেমন করে যখন কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শও করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই ?"

ফেরেশতা বললো, "এমনটিই হবে, তোমার রব বলেন, এমনটি করা আমার জন্য অতি সহজ। আর আমি এটা এজন্য করবো যে, এই ছেলেকে আমি লোকদের জন্য একটি নিদর্শন[১৫] ও নিজের পক্ষ থেকে একটি অনুগ্রহে পরিণত করবো এবং এ কাজটি হবেই।"

মারয়াম এ সন্তানকে গর্ভে ধারণ করলো এবং এ গর্ভসহ একটি দূরবর্তী স্থানে চলে গেলো।[১৬]

প্রাণ সংহারের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত হিরোদের জন্ম বার্ষিকী উৎসবে সে তার কাংখিত সুযোগ পেয়ে যায়। উৎসবে তার মেয়ে মনোমুগ্ধকর নৃত্য প্রদর্শন করে হিরোদের চিত্ত জয় করে। হিরোদ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বলে, কি পুরস্কার চাও বলো। মেয়ে তার ব্যভিচারী মাকে জিজ্ঞেস করে, কি চাইবো ? মা বলে, ইয়াহ্ইয়ার মস্তক চাও। তাই সে হিরোদের সামনে হাতজোড় করে বলে, জাহাঁপনা! আমাকে এখনি ইয়াহ্ইয়া বাপ্তাইজকের মাথা একটি থালায় করে আনিয়ে দিন। হিরোদ একথা শুনে বড়ই বিষণ্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রিয়ার মেয়ের দাবী না মেনে উপায় ছিল না। সে তৎক্ষণাত কারাগার থেকে ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালামের মাথা কেটে আনালো এবং তা একটি থালায় রেখে নর্তকীকে নজরানা দিল।(মথি ১৪ ঃ ৩-১২, মার্ক ৬ ঃ ১৭-১৯ ও লূক ৩ ঃ ১৯-২০)

১৩. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা আলে ইমরান ৪২ ও ৫৫ টীকা এবং সূরা নিসা ১৯০-১৯১ টীকা দেখুন।

১৪. সূরা আলে ইমরানে এ কথা বলা হয়েছে যে, হযরত মারয়ামের মা তাঁর মানত অনুযায়ী তাঁকে বাইতুল মাকদিসে ইবাদাতের জন্য বসিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত যাকারিয়া তাঁর হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সেখানে একথাও বলা হয়েছে যে, হযরত মারয়াম বাইতুল মাকদিসের একটি মিহরাবে ই'তিকাফ করছিলেন। এখন এখানে বলা হচ্ছে, যে মিহরাবটিতে হযরত মারয়াম ই'তিকাফরত ছিলেন সেটি বাইতুল মাকদিসের পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল। সেখানে তিনি ই'তিকাফকারীদের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী একটি চাদর টাঙ্গিয়ে দিয়ে নিজেকে অন্যদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে নিয়েছিলেন। যারা বাইবেলের সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য পূর্বাংশ অর্থে "নাসেরাহ" নিয়েছেন তারা ভুল করেছেন কারণ নাসেরাহ জেরুসালেমের উত্তর দিকে অবস্থিত, পূর্বদিকে নয়।

১৫. ইতোপূর্বে ৬ টীকায় আমরা ইংগিত করেছি, হযরত মারয়ামের বিস্ময়ের জবাবে ফেরেশতার "এমনটিই হবে" একথা বলার কোনোক্রমেই এ অর্থ হতে পারে না যে, মানুষ তোমাকে স্পর্শ করবে এবং তোমার ছেলে হবে। বরং এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে এই যে, কোনো মানুষ তোমাকে স্পর্শ না করা সত্ত্বেও তোমার ছেলে হবে। উপরে এ একই শব্দাবলীর মাধ্যমে হযরত যাকারিয়ার বিস্ময়ও উদ্ধৃত হয়েছে এবং সেখানেও ফেরেশতা সেই একই জবাব দিয়েছে। একথা পরিষ্কার, সেখানে এ জবাবটির যে অর্থ এখানেও তাই। অনুরূপভাবে সূরা যারিয়ার ২৮-৩০ আয়াতে যখন ফেরেশতা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পুত্রের সুসংবাদ দেন এবং হযরত সারাহ বলেন, আমার মতো বুড়ী বন্ধ্যা মেয়েলোকের আবার ছেলে হবে কেমন করে ? তখন ফেরেশতা তাঁকে জবাব দেন, كذلك "এমনটি হবে।" একথা সুস্পষ্ট যে, এর অর্থ হচ্ছে, বার্ধক্য ও বন্ধ্যাত্ব সত্ত্বেও তাদের ছেলে হবেই। তাছাড়া যদি كذلك অর্থ এই নেয়া হয় যে, মানুষ তোমাকে স্পর্শ করবে এবং তোমার ছেলে হবে ঠিক তেমনি ভাবে যেমন সারা দুনিয়ার মেয়েদের ছেলে হয়, তাহলে তো পরবর্তী বাক্য দুটি একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় একথা বলার কি প্রয়োজন থাকে যে, তোমার রব বলছেন, এমনটি করা আমার জন্য অতি সহজ এবং আমি ছেলেটিকে একটি নিদর্শন করতে চাই ? নিদর্শন শব্দটি এখানে সুস্পষ্টভাবে মুজিযা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এ বাক্যটি একথাই প্রকাশ করে যে, "এমনটি করা আমার জন্য বড়ই সহজ।" কাজেই এ উক্তির অর্থ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, আমি এ

فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا
وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿٢٣﴾ فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ
تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾ وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا
جَنِيًّا ﴿٢٥﴾ فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ
فَقُوْلِىْٓ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾ فَاَتَتْ
بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ۚ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾ يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ
مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾

তারপর প্রসব বেদনা তাকে একটি খেজুর গাছের তলে পৌঁছে দিল। সে বলতে থাকলো, "হায়! যদি আমি এর আগেই মরে যেতাম এবং আমার নাম-নিশানাই না থাকতো।"[১৭] ফেরেশতা পায়ের দিক থেকে তাকে ডেকে বললো, "দুঃখ করো না, তোমার রব তোমার নীচে একটি নহর প্রবাহিত করেছেন এবং তুমি এ গাছের কাণ্ডটি একটু নাড়া দাও, তোমার ওপর তরতাজা খেজুর ঝরে পড়বে। তারপর তুমি খাও, পান করো এবং নিজের চোখ জুড়াও। তারপর যদি তুমি মানুষের দেখা পাও তাহলে তাকে বলে দাও, আমি করুণাময়ের জন্য রোযার মানত মেনেছি, তাই আজ আমি কারোর সাথে কথা বলবো না।[১৮]

তারপর সে এ শিশুটিকে নিয়ে নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে এলো। লোকেরা বলতে লাগলো, "হে মারয়াম! তুমি তো মহা পাপ করে ফেলেছো। হে হারুনের বোন![১৯] না তোমার বাপ কোনো খারাপ লোক ছিল, না তোমার মা ছিল কোনো ব্যভিচারিণী।"

ছেলেটির সত্তাকে বনী ইসরাঈলের সামনে একটি মুজিযা হিসেবে পেশ করতে চাই। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সত্তাকে কিভাবে বনী ইরাঈলের সামনে মু'জিযা হিসেবে পেশ করা হয় পরবর্তী বিবরণ নিজেই তা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।

১৬. দূরবর্তী স্থান মানে বাইতুল লাহম। ই'তিকাফ থেকে উঠে সেখানে যাওয়া হযরত মারয়ামের জন্য একটি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। বনী ইসরাঈলের পবিত্রতম ঘরানা হারুন গোত্রের মেয়ে, তিনি আবার বাইতুল মাকদিসে আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য উৎসর্গীত

হয়েছিলেন, তিনি হঠাৎ গর্ভধারণ করলেন। এ অবস্থায় যদি তিনি নিজের ই'তিকাফের জায়গায় বসে থাকতেন এবং লোকেরা তাঁর গর্ভধারণের কথা জানতে পারতো, তাহলে শুধুমাত্র পরিবারের লোকেরাই নয়, সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকেরাও তাঁর জীবন ধারণ কঠিন করে দিতো। তাই তিনি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার পর নীরবে নিজের ই'তিকাফ কক্ষ ত্যাগ করে বাইরে বের হয়ে পড়লেন, যাতে আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নিজ সম্প্রদায়ের তিরস্কার, নিন্দাবাদ ও ব্যাপক দুর্নাম থেকে রক্ষা পান। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম যে পিতা ছাড়াই হয়েছিল এ ঘটনাটি নিজেই তার একটি বিরাট প্রমাণ। যদি তিনি বিবাহিত হতেন এবং স্বামীর ঔরসে তাঁর সন্তান জন্মলাভের ব্যাপার হতো তাহলে তো সন্তান প্রসবের জন্য তার শ্বশুরালয়ে বা পিতৃগৃহে না গিয়ে একাকী একটি দূরবর্তী স্থানে চলে যাওয়ার কোনো কারণই ছিল না।

১৭. এ শব্দগুলো থেকে হযরত মারয়ামের সে সময়কার পেরেশানীও অনুমান করা যেতে পারে। পরিস্থিতির নাজুকতা সামনে রেখে প্রত্যেক ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারেন যে, প্রসব বেদনার কষ্টজনিত কারণে তাঁর মুখ থেকে একথাগুলো বের হয়নি বরং আল্লাহ তাঁকে যে ভয়াবহ পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন তাতে কিভাবে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হবেন এই চিন্তায় তিনি পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন। গর্ভাবস্থাকে এ পর্যন্ত যে কোনো ভাবে গোপন করতে সক্ষম হয়েছেন কিন্তু এখন শিশুটিকে কোথায় নিয়ে যাবেন ? এ পরবর্তী বাক্যাংশ অর্থাৎ ফেরেশতা বললেন, "দুঃখ করো না" মারয়ামের বক্তব্য সুস্পষ্ট করে তুলেছেন যে, তিনি কেন একথা বলেছিলেন। বিবাহিত মেয়ের প্রথম সন্তান জন্মের সময় সে যতই কষ্ট পাক না কেন তার মনে কখনো দুখ ও বেদনাবোধ জাগে না।

১৮. অর্থাৎ শিশুর ব্যাপারে তোমার কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তার জন্মের ব্যাপারে যে কেউ আপত্তি তুলবে তার জবাব দেবার দায়িত্ব এখন আমার। (উল্লেখ্য, বনী ইসরাঈলদের মধ্যে মৌনতা অবলম্বনের রোযা রাখার রীতি ছিল) হযরত মারয়ামের আসল পেরেশানী কি ছিল এ শব্দাবলীও তা পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে। তাছাড়া এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, বিবাহিতা মেয়ের প্রথম সন্তান যদি দুনিয়ার প্রচলিত নিয়মেই জন্মলাভ করে তাহলে তার মৌন ব্রত অবলম্বনের প্রয়োজন দেখা দেবে কেন ?

১৯. এ শব্দগুলোর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, এখানে এগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা যায় এবং এ কথা মনে করা যায় যে, হযরত মারয়ামের হারুন নামে কোনো ভাই ছিল। দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, আরবী বাগধারা অনুযায়ী يَا أُخْتَ هَارُوْنَ মানে হচ্ছে "হারুন পরিবারের মেয়ে।" কারণ আরবীতে এটি একটি প্রচলিত বর্ণনা পদ্ধতি। যেমন মুদার গোত্রের লোককে يَا أَخَا مُضَرَ (হে মুদারের ভাই) এবং হামদান গোত্রের লোককে يَا أَخَا هَمْدَانَ (হে হামাদানের ভাই) বলে ডাকা হয়, প্রথম অর্থটিকে প্রাধান্য দেয়ার পক্ষে যুক্তি হচ্ছে এই যে, কোনো কোনো হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেই এ অর্থটি উদ্ধৃত হয়েছে। আর দ্বিতীয় অর্থটির সমর্থনে যুক্তি হচ্ছে এই যে, পরিবেশ ও পরিস্থিতি এই অর্থটিই দাবী করে। কারণ এ ঘটনার কারণে জাতির মধ্যে যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে বাহ্যত জানা যায় না যে, হারুন নামের এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির কুমারী বোন শিশু সন্তান কোলে নিয়ে চলে এসেছিল। বরং যে জিনিসটি বিপুল সংখ্যক লোকদেরকে হযরত মারয়ামের চারদিকে সমবেত করে দিয়েছিল সেটি এ হতে পারতো যে,

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾ قَالَ
إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۖ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ
مَا كُنتُ ۖ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾ وَبَرًّا
بِوَالِدَتِي ۖ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ
وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾ ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ
الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٤﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ ۖ
سُبْحَانَهُ ۖ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾

মারয়াম শিশুর প্রতি ইশারা করলো।

লোকেরা বললো, "কোলের শিশুর সাথে আমরা কি কথা বলবো ?[২০]

শিশু বলে উঠলো, "আমি আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী করেছেন এবং বরকতময় করেছেন যেখানেই আমি থাকি না কেন আর যতদিন আমি বেঁচে থাকবো ততদিন নামায ও যাকাত আদায়ের হুকুম দিয়েছেন। আর নিজের মায়ের হক আদায়কারী করেছেন এবং আমাকে অহংকারী ও হতভাগা করেননি। শান্তি আমার প্রতি যখন আমি জন্ম নিয়েছি ও যখন আমি মরবো এবং যখন আমাকে জীবিত করে উঠানো হবে।[২১]

এ হচ্ছে মারয়ামের পুত্র ঈসা এবং এ হচ্ছে তার সম্পর্কে সত্য কথা, যে ব্যাপারে লোকেরা সন্দেহ করছে। কাউকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়। তিনি পবিত্র সত্তা। তিনি যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন তখন বলেন, হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে যায়।[২২]

বনী ইসরাঈলের পবিত্রতম ঘরানা হারুন বংশের একটি মেয়েকে এ অবস্থায় পাওয়া গেছে। যদিও একটি মারফূ হাদীসের উপস্থিতিতে অন্য কোনো ব্যাখ্যা ও অর্থ গ্রহণ করা নীতিগতভাবে সঠিক হতে পারে না তবুও মুসলিম, নাসাঈ ও তিরমিযীতে এ হাদীসটি যে সব শব্দসহকারে উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে এ অর্থ বের হয় না যে, এ শব্দগুলোর অর্থ অবশ্যই "হারুনের বোন"ই হবে। মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) বর্ণিত হাদীসে যা কিছু বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, নাজরানের খৃষ্টানরা হযরত মুগীরার সামনে আপত্তি উত্থাপন করে বলে,

কুরআনে হযরত মারয়ামকে হারুনের বোন বলা হয়েছে, অথচ হযরত হারুন তাঁর শত শত বছর আগে দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। হযরত মুগীরা তাদের এ আপত্তির জবাব দিতে পারেননি এবং তিনি এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এ ঘটনাটি বলেন। তাঁর কথা শুনার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তুমি এ জবাব দাওনি কেন যে, বনী ইসরাঈলরা নবী ও সৎ লোকদের সাথে যুক্ত করে নিজেদের নাম রাখতো ?" নবীর (স) এ উক্তি থেকে শুধুমাত্র এতটুকুই বক্তব্য পাওয়া যায় যে, না জওয়াব হওয়ার চাইতে অন্তত এ জওয়াবটি দিয়ে আপত্তি দূর করা যেতে পারতো।

১৯(ক). যারা হযরত ঈসা (আ)-এর অলৌকিক জন্ম অস্বীকার করে তাঁরা একথার কি যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দিতে পারে যে, হযরত মারয়ামকে শিশু সন্তান কোলে করে নিয়ে আসতে দেখে তার জাতির লোকেরা তাঁকে এক নাগাড়ে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করতে লাগলো কেন ?

২০. কুরআনের অর্থ বিকৃতকারীরা এ আয়াতের এ অর্থ নিয়েছে, "কালকের শিশুর সাথে আমরা কি কথা বলবো ?" অর্থাৎ তাদের মতে এ কথাবার্তা হয়েছিল হযরত ঈসার যৌবন কালে। তখন বনী ইসরাঈলের নেতৃ পর্যায়ের বড় বড় লোকেরা বলেছিল, আমরা এ ছেলেটির সাথে কি কথা বলবো যে কালই আমাদের সামনে দোলনায় শুয়েছিল ? কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি ও পূর্বাপর আলোচনার প্রতি লক্ষ রেখে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে যে কোনো ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারবে যে, এটি নিছক একটি বাজে ও অযৌক্তিক ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধুমাত্র অলৌকিকতাকে এড়িয়ে চলার জন্য এ পথ অবলম্বন করা হয়েছে। অন্য কিছু না হলেও এই জাল্লেমরা অন্তত এতটুকু চিন্তা করতো যে, তারা যে বিষয়টির ওপর আপত্তি জানাতে এসেছিল তাতো শিশুর জন্মের সময়কার ব্যাপার, তার কৈশোর বা যৌবনকালের ব্যাপার নয়। তাছাড়া সূরা আলে ইমরানের ৪৬ এবং সূরা মায়েদার ১১০ আয়াত দুটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করছে যে, হযরত ঈসা তাঁর যৌবনে নয় বরং মায়ের কোলে সদ্যজাত শিশু থাকা অবস্থায় একথা বলেছিলেন। প্রথম আয়াতে ফেরেশতা হযরত মারয়ামকে শিশু জন্মের সুসংবাদ দান করে বলছেন সে দোলনায় শায়িত অবস্থায় লোকদের সাথে কথা বলবে এবং যৌবনে পদার্পণ করেও। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ নিজেই হযরত ঈসাকে বলছেন, তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় লোকদের সাথে কথা বলতে এবং যৌবনকালেও।

২০(ক). পিতামাতার হক আদায়কারী বলেননি, শুধুমাত্র মাতার হক আদায়কারী বলেছেন। একথাটিও হযরত ঈসার কোনো পিতা ছিল না একথাই প্রমাণ করে। আর কুরআনের সর্বত্র তাঁকে মারয়াম পুত্র ঈসা বলা হয়েছে, এও এরি একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ।

২১. এটিই সেই নিদর্শন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সত্তার মাধ্যমে যা বনী ইসরাঈলদের সামনে পেশ করা হয়েছিল। বনী ইসরাঈলের অব্যাহত দুষ্কৃতির কারণে আল্লাহ তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়ার আগে তাদের সামনে সত্যকে পুরোপুরি ও চূড়ান্তভাবে পেশ করতে চাচ্ছিলেন। এ জন্য তিনি যে কৌশল অবলম্বন করেন তা হচ্ছে এই যে, হারুন গোত্রের এমন এক মুত্তাকী, ধর্মনিষ্ঠ ও ইবাদাতগুজার মেয়েকে, যিনি বাইতুলমাকদিসে ই'তিকাফরত এবং হযরত যাকারিয়ার প্রশিক্ষণাধীন ছিলেন, তাঁর কুমারী

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾ فَاخْتَلَفَ
الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾
أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ۙ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَٰكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ
مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ ۘ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ
وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَن عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا
يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾

আর (ঈসা বলেছিল) "আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদেরও রব। কাজেই তোমরা তার বন্দেগী করো। এটিই সোজা পথ।"[২৩] কিন্তু তারপর বিভিন্ন দল[২৪] পরস্পর মতবিরোধ করতে থাকলো। যারা কুফরী করলো তাদের জন্য সে সময়টি হবে বড়ই ধ্বংসকর যখন তারা একটি মহাদিবস দেখবে। যখন তারা আমার সামনে হাযির হবে সেদিন তাদের কানও খুব স্পষ্ট শুনবে এবং তাদের চোখও খুব স্পষ্ট দেখবে কিন্তু আজ এ যালেমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত। হে মুহাম্মাদ! যখন এরা গাফেল রয়েছে এবং ঈমান আনছে না তখন এ অবস্থায় এদেরকে সেই দিনের ভয় দেখাও যেদিন ফায়সালা করে দেয়া হবে এবং পরিতাপ করা ছাড়া আর কোনো গতি থাকবে না। শেষ পর্যন্ত আমিই হবো পৃথিবী ও তার সমস্ত জিনিসের উত্তরাধিকারী এবং এ সবকিছু আমারই দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।[২৫]

অবস্থায় গর্ভবতী করে দিলেন। এটা এ জন্য করলেন যে, যখন সে শিশু সন্তান কোলে করে নিয়ে আসবে তখন সমগ্র জাতির মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং আকস্মিকভাবে সবার দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হবে। তারপর এ কৌশল অবলম্বন করার ফলে বিপুল সংখ্যক লোক যখন হযরত মারয়ামের চারদিকে ঘিরে দাঁড়ালো তখন আল্লাহ এই নবজাত শিশুর মুখ দিয়ে কথা বলালেন, যাতে এ শিশু বড় হয়ে যখন নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করবে তখন জাতির হাজার হাজার লোক এ মর্মে সাক্ষ দেয়ার জন্য উপস্থিত থাকে যে, এর ব্যক্তিত্বের মধ্যে তারা আল্লাহর একটি বিস্ময়কর অলৌকিকত্ব দেখেছিল। এরপরও এ জাতি যখন তার নবুওয়াত অস্বীকার করবে এবং তার আনুগত্য করার পরিবর্তে তাকে অপরাধী সাজিয়ে শূলবিদ্ধ করার চেষ্টা করবে তখন তাদেরকে এমন কঠোর শাস্তি দেয়া হবে যা দুনিয়ার কোনো জাতিকে দেয়া হয়নি। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল

কুরআন, আলে ইমরান ৪৪ ও ৫৩, আন নিসা ২১২ ও ২১৩, আল আম্বিয়া ৮৮, ৮৯ ও ৯০ এবং আল মু'মিনূন ৪৩ টীকা)।

২২. এ পর্যন্ত খৃষ্টানদের সামনে যে কথাটি সুস্পষ্ট করা হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র মনে করার যে আকীদা তারা অবলম্বন করছে তা মিথ্যা । যেভাবে একটি মু'জিযার মাধ্যমে হযরত ইয়াহ্ইয়ার জন্মের কারণে তা তাঁকে আল্লাহর পুত্রে পরিণত করেনি ঠিক তেমনিভাবে অন্য একটি মু'জিযার মাধ্যমে হযরত ঈসার জন্মও এমন কোনো জিনিস নয় যে জন্য তাঁকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করতে হবে। খৃষ্টানদের নিজেদের বর্ণনাসমূহেও একথা রয়েছে যে, হযরত ইয়াহ্ইয়া ও হযরত ঈসা উভয়েই এক এক ধরনের মু'জিযার মাধ্যমে জন্ম নিয়েছিলেন। লূক লিখিত সুসমাচারে কুরআনের মতো এ উভয়বিধ মু'জিযার উল্লেখ একই বর্ণনা পরম্পরায় করা হয়েছে। কিন্তু এটি খৃষ্টানদের বাড়াবাড়ি যে, তারা একটি মু'জিযার মাধ্যমে সৃষ্ট ব্যক্তিকে আল্লাহর বান্দা বলে এবং অন্য একটি মু'জিযার মাধ্যমে সৃষ্ট ব্যক্তিকে বলে আল্লাহর পুত্র।

২৩. এখানে খৃষ্টানদেরকে জানানো হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতও তাই ছিল যা অন্য নবীগণ এনেছিলেন। তিনি এছাড়া আর কিছুই শিখাননি যে, কেবলমাত্র এক আল্লাহর বন্দেগী করতে হবে। এখন তোমরা যে তাঁকে বান্দার পরিবর্তে আল্লাহ বানিয়ে নিয়েছো এবং তাঁকে আল্লাহর সাথে ইবাদাতে শরীক করছো এসব তোমাদের নিজেদের উদ্ভট আবিষ্কার। তোমাদের নেতা কখনোই তোমাদের একথা শেখাননি। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আলে ইমরান ৬৮, মায়েদাহ ১০০, ১০১ ও ১৩০ এবং আয যুখরুফ ৫৭ ও ৫৮ টীকা)

২৪. অর্থাৎ খৃষ্টানদের দল।

২৫. খৃষ্টানদের শুনাবার জন্য যে ভাষণ অবতীর্ণ হয়েছিল তা এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই ভাষণের মাহাত্ম্য একমাত্র তখনই অনুধাবন করা যেতে পারে যখন এ সূরার ভূমিকায় আমি যে ঐতিহাসিক পটভূমির অবতারণা করেছি তা পাঠকের দৃষ্টি সমক্ষে থাকবে। এ ভাষণ এমন এক সময় অবতীর্ণ হয়েছিল যখন মক্কার মজলুম মুসলমানরা একটি ঈসায়ী রাষ্ট্রে আশ্রয় নিতে যাচ্ছিল। তখন এটি নাযিল করার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, সেখানে যখন ঈসা সম্পর্কে ইসলামী আকীদার প্রশ্ন উত্থাপিত হবে তখন এই "সরকারী" বিজ্ঞপ্তি ঈসায়ীদেরকে শুনিয়ে দেয়া হবে। ইসলাম যে সত্য ও ন্যায়ের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে কোনো অবস্থায়ও তোষামোদী নীতি অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করেনি, এর সপক্ষে এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে ? তারপর যেসব সাচ্চা মুসলমান হাবশায় হিজরত করে গিয়েছিলেন তাদের ঈমানী শক্তিও ছিল বিস্ময়কর। তারা রাজদরবারে এমন এক নাজুক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এ বক্তৃতা শুনিয়ে দিয়েছিলেন যখন নাজ্জাশীর দরবারে সভাসদরা উৎকোচ গ্রহণ করে তাদেরকে তাদের শত্রুর হাতে তুলে দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। তখন পূর্ণ আশংকা ছিল, খৃষ্টবাদের বুনিয়াদী আকীদার ওপর ইসলামের এ নিরপেক্ষ আলোচনা শুনে নাজ্জাশীও বিরূপ হয়ে উঠবেন এবং এই মজলুম মুসলমানদেরকে কুরাইশ কসাইদের হাতে সোপর্দ করে দেবেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা সত্য কথা বলতে একটুও ইতস্তত করেননি।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۘ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ
يٰٓاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا ﴿٤٢﴾ يٰٓاَبَتِ
اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْٓ اَهْدِكَ صِرَاطًا
سَوِيًّا ﴿٤٣﴾ يٰٓاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾
يٰٓاَبَتِ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ
لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾

৩ রুকূ'

আর এ কিতাবে ইবরাহীমের কথা বর্ণনা করো।[২৬] নিসন্দেহে সে একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষ এবং একজন নবী ছিল (এদেরকে সেই সময়ের কথা একটু স্মরণ করিয়ে দাও) যখন সে নিজের বাপকে বললো, "আব্বাজান! আপনি কেন এমন জিনিসের ইবাদাত করেন, যা শোনেও না, দেখেও না এবং আপনার কোনো কাজও করতে পারে না ? আব্বাজান ! আমার কাছে এমন এক জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি, আপনি আমার অনুসরণ করে চলুন, আমি আপনাকে সোজাপথ দেখিয়ে দেবো। আব্বাজান ! আপনি শয়তানের বন্দেগী করবেন না।[২৭] শয়তান তো করুণাময়ের অবাধ্য। আব্বাজান! আমার ভয় হয় আপনি করুণাময়ের আযাবের শিকার হন কি না এবং শয়তানের সাথী হয়ে যান কি না।"

২৬. এখান থেকে মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করে কথা বলা হচ্ছে। তারা তাদের যুবক পুত্র, ভাই ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদেরকে ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের অপরাধে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল যেমন হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তাঁর বাপ-ভাইয়েরা দেশ থেকে বের করে দিয়েছিল। কুরাইশ বংশের লোকেরা হযরত ইবরাহীমকে নিজেদের নেতা বলে মানতো এবং তাঁর আওলাদ হওয়ার কারণে সারা আরবে গর্ব করে বেড়াতো, এ কারণে অন্য নবীদের কথা বাদ দিয়ে বিশেষ করে হযরত ইবরাহীমের কথা বলার জন্য এখানে নির্বাচিত করা হয়েছে।

২৭. মূল শব্দ হচ্ছে, لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ অর্থাৎ "শয়তানের ইবাদাত করো না।" যদিও হযরত ইবরাহীমের পিতা এবং তাঁর জাতির অন্যান্য লোকেরা মূর্তি পূজা করতো কিন্তু যেহেতু তারা শয়তানের আনুগত্য করছিল তাই হযরত ইবরাহীম তাদের এ শয়তানের আনুগত্যকেও শয়তানের ইবাদাত গণ্য করেন। এ থেকে জানা যায়, ইবাদাত নিছক পূজা

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ
وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿٤٦﴾ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۖ إِنَّهُ كَانَ
بِي حَفِيًّا ﴿٤٧﴾ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي ۖ
عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٨﴾ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾ وَوَهَبْنَا لَهُمْ
مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾

বাপ বললো, "ইবরাহীম! তুমি কি আমার মাবুদদের থেকে বিমুখ হয়েছো ? যদি তুমি বিরত না হও তাহলে আমি পাথরের আঘাতে তোমাকে শেষ করে দেবো। ব্যাস; তুমি চিরদিনের জন্য আমার থেকে আলাদা হয়ে যাও।"

ইবরাহীম বললো, "আপনাকে সালাম। আমি আমার রবের কাছে আপনাকে মাফ করে দেয়ার জন্য দোয়া করবো।[২৭(ক)] আমার রব আমার প্রতি বড়ই মেহেরবান। আমি আপনাদেরকে ত্যাগ করছি এবং আপনারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকেন তাদেরকেও, আমি তো আমার রবকেই ডাকবো। আশা করি আমি নিজের রবকে ডেকে ব্যর্থ হবো না।"

অতপর যখন সে তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদাত করতো তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেলো এবং তখন আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুবের মতো সন্তান দিলাম এবং প্রত্যেককে নবী করলাম। আর তাদেরকে নিজের অনুগ্রহ দান করলাম এবং তাদেরকে দিলাম যথার্থ নাম-যশ।[২৮]

ও উপাসনা আরাধনারই নাম নয় বরং আনুগত্যের নামও। তাছাড়া এ থেকে এও জানা যায়, যদি কোনো ব্যক্তি কারো প্রতি অভিশাপ বর্ষণরত থেকেও তার আনুগত্য করে তাহলে সে তার ইবাদাত করার অপরাধে অপরাধী হয়। কারণ শয়তান কোনো কালেও মানুষের মাবুদ (প্রচলিত অর্থে) ছিল না বরং তার নামে প্রতি যুগে মানুষ অভিশাপ বর্ষণ করেছে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল কাহফ, ৪৯-৫০)

২৭(ক) ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন আত তাওবা, ১১২ টীকা।

২৮ যেসব মুহাজির গৃহ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এগুলো তাদের জন্য সান্ত্বনাবাণী। তাদেরকে বলা হচ্ছে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেমন তাঁর পরিবারবর্গ থেকে

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰٓى ۖ اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥١﴾
وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ
رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ۖ اِنَّهٗ كَانَ
صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ
وَالزَّكٰوةِ ۖ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ۖ اِنَّهٗ
كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾ وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾

৪ রুকূ'

আর এ কিতাবে মূসার কথা স্মরণ করো। সে ছিল এক বাছাই করা ব্যক্তি[২৯] এবং ছিল রাসূল-নবী।[৩০] আমি তাকে তূরের ডান দিক থেকে ডাকলাম[৩১] এবং গোপন আলাপের মাধ্যমে তাকে নৈকট্য দান করলাম।[৩২] আর নিজ অনুগ্রহে তার ভাই হারুনকে নবী বানিয়ে তাকে সাহায্যকারী হিসেবে দিলাম।

আর এ কিতাবে ইসমাঈলের কথা স্মরণ করো। সে ছিল ওয়াদা পালনে সত্যনিষ্ঠ এবং ছিল রাসূল-নবী। সে নিজের পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাতের হুকুম দিতো এবং নিজের রবের কাছে ছিল একজন পসন্দনীয় ব্যক্তি।

আর এ কিতাবে ইদরীসের কথা স্মরণ করো।[৩৩] সে একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষ এবং একজন নবী। আর তাকে আমি উঠিয়েছিলাম উন্নত স্থানে।[৩৪]

বিচ্ছিন্ন হয়ে ধ্বংস হয়ে যান নি বরং উলটা উন্নতশির ও সফলকাম হয়েছিলেন ঠিক তেমনি তোমরাও ধ্বংস হয়ে যাবে না বরং তোমরা এমন মর্যাদা লাভ করবে, জাহেলিয়াতের অন্ধকার আবর্তে মুখ গুজে পড়ে থাকা কুরাইশ বংশীয় কাফেররা যার কল্পনাই করতে পারে না।

২৯. মূলে مُخْلَص শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে "একান্ত করে নেয়া।" অর্থাৎ হযরত মূসা এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যাকে আল্লাহ একান্তভাবে নিজের করে নিয়েছিলেন।

৩০. "রসূল" মানে প্রেরিত। এই মানের দিক দিয়ে আরবী ভাষায় দূত, পয়গম্বর, বার্তাবাহক ও রাজদূতের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। আর কুরআনে এ শব্দটি এমন সব ফেরেশতার জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে যাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ

কাজে নিযুক্ত করা হয় অথবা এমনসব মানুষকে এ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে যাদেরকে আল্লাহ সৃষ্টির কাছে নিজের বাণী পৌছানোর জন্য নিযুক্ত করেন।

"নবী" শব্দটি অর্থের ব্যাপারে অভিধানবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ একে نَبَـا শব্দ থেকে গঠিত বলেন। এ ক্ষেত্রে এর অর্থ হয় খবর। এই মূল অর্থের দিকে দিয়ে নবী মানে হয় "খবর প্রদানকারী।" আবার কেউ কেউ বলেন, نَبُـو ধাতু থেকে নবী শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ উন্নতি ও উচ্চতা। এ অর্থের দিক দিয়ে এর মানে হয় "উন্নত মর্যাদা" ও "সুউচ্চ অবস্থান"। আযহারী কিসায়ী থেকে তৃতীয় একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। সেটি হচ্ছে এই যে, এ শব্দটি মূলত نبى থেকে এসেছে। এর মানে হচ্ছে পথ। আর নবীদেরকে নবী এজন্য বলা হয়েছে যে, তাঁরা হচ্ছেন আল্লাহর দিকে যাবার পথ।

কাজেই কোনো ব্যক্তিকে "রসূল নবী" বলার অর্থ হবে "উন্নত মর্যাদাশালী পয়গম্বর অথবা "আল্লাহর পক্ষ থেকে খবর দানকারী পয়গম্বর" কিংবা "এমন পয়গম্বর যিনি আল্লাহর পথ বাতলে দেন।"

কুরআন মজীদে এ দু'টি শব্দ সাধারণত একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই আমরা দেখি একই ব্যক্তিকে কোথাও শুধু নবী বলা হয়েছে এবং কোথাও শুধু রসূল বলা হয়েছে আবার কোথাও রসূল ও নবী এক সাথে বলা হয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় রসূল ও নবী শব্দ দু'টি এমনভাবেও ব্যবহৃত হয়েছে যা থেকে প্রকাশ হয় যে, এ উভয়ের মধ্যে মর্যাদা বা কাজের ধরনের দিক দিয়ে কোনো পারিভাষিক পার্থক্য রয়েছে। যেমন সূরা হজ্জের ৭ রুকূতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّا ....

"আমি তোমার আগে এমন কোনো রসূলও পাঠাইনি এবং এমন কোনো নবীও পাঠাইনি, যে, ..." একথাগুলো পরিষ্কার প্রকাশ করছে যে, রসূল ও নবী দুটি আলাদা পরিভাষা এবং এদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো আভ্যন্তরীণ পার্থক্য আছে। এরি ভিত্তিতে এ পার্থক্যের ধরনটা কি এ নিয়ে তাফসীরকারদের মধ্যে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। কিন্তু আসলে চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত দলীল প্রমাণের সাহায্যে কেউই রসূল ও নবীর পৃথক মর্যাদা চিহ্নিত করতে পারেননি। বড়জোর এখানে এতটুকু কথা নিশ্চয়তা সহকারে বলা যেতে পারে যে, রসূল শব্দটি নবীর তুলনায় বিশিষ্টতা সম্পন্ন। অর্থাৎ প্রত্যেক রসূল নবী হন কিন্তু প্রত্যেক নবী রসূল হন না। অন্য কথায় নবীদের মধ্যে রসূল শব্দটি এমন সব নবীর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যাদেরকে সাধারণ নবীদের তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। একটি হাদীসও এ বক্তব্য সমর্থন করে। হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন ইমাম আহমদ হযরত আবু উমামাহ থেকে এবং হাকেম হযরত আবু যার (রা) থেকে। এতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রসূলদের সংখ্যার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন, ৩১৩ বা ৩১৫ এবং নবীদের সংখ্যা জিজ্ঞেস করা হলে বলেন, এক লাখ চব্বিশ হাজার। যদিও হাদীসটির সনদ দুর্বল কিন্তু কয়েকটি সনদের মাধ্যমে একই কথার বর্ণনা কথাটির দুর্বলতা অনেকাংশে কমিয়ে দেয়।

৩১. তূর পাহাড়ের ডান দিক থেকে বলতে পূর্ব পাদদেশ বুঝানো হয়েছে। যেহেতু হযরত মূসা (আ) মাদইয়ান থেকে মিসর যাবার পথে এ তূর পাহাড়ের দক্ষিণ পাশের পথ দিয়ে এগিয়ে চলছিলেন এবং দক্ষিণ দিক থেকে কোনো ব্যক্তি তূরকে দেখলে তার ডান দিক হবে পূর্ব এবং বাম দিক হবে পশ্চিম, তাই হযরত মূসার সাথে সম্পর্কিত করে তূরের পূর্ব পাদদেশকে "ডান দিক" বলা হয়েছে। অন্যথায় একথা সুস্পষ্ট যে, পাহাড়ের কোনো ডানদিক বা বাম দিক হয় না।

৩২. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নিসা ২০৬ টীকা।

৩৩. হযরত ইদরীস (আ)-এর ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। কারোর মতে তিনি বনী ইসরাঈলের নবী ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশের মতে তিনি নূহের (আ)-ও পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমন কোনো সহীহ হাদীস আমরা পাইনি যা তাঁর সঠিক পরিচয় নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সাহায্য করতে পারে। তবে হ্যাঁ, কুরআনের একটি ইংগিত এ ধারণার প্রতি সমর্থন যোগায় যে, তিনি নূহ (আ)-এর পূর্বগামী ছিলেন। কারণ পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, এ নবীগণ (উপরে যাদের কথা বলা হয়েছে।) আদমের সন্তান, নূহের সন্তান, ইবরাহীমের সন্তান এবং ইসরাঈলের সন্তান। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, হযরত ইয়াহ্ইয়া, হযরত ঈসা ও হযরত মূসা আলাইহিমুস সালাম বনী ইসরাঈলের অন্তরভুক্ত, হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়াকুব আলাইহিমুস সালাম ইবরাহীমের সন্তানদের অন্তরভুক্ত এবং হযরত ইবরাহীম (আ) নূহের সন্তানদের অন্তরভুক্ত। এরপর থেকে যান কেবলমাত্র হযরত ইদরীস (আ)। তাঁর সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে যে, তিনি আদমের (আ) সন্তানদের অন্তরভুক্ত।

মুফাসসিরগণ সাধারণভাবে একথা মনে করেন যে, বাইবেলে যে মনীষীকে হনোক (Enoch) বলা হয়েছে তিনিই হযরত ইদরীস আলাইহিস সালাম। তাঁর সম্পর্কে বাইবেলের বর্ণনা হচ্ছে ঃ

> "আর হনোক পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে মথুশেলহের জন্ম দিলেন। মথুশেলহের জন্ম দিলে পর হনোক তিন শত বৎসর ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিলেন।....পরে তিনি আর রহিলেন না, কেন না ঈশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।" (আদি পুস্তক ৫ ঃ ২১-২৪)

তালমূদের ইসরাঈলী বর্ণনায় তাঁর অবস্থা আরো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। এই বর্ণনার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে ঃ হযরত নূহের পূর্বে যখন আদম সন্তানদের মধ্যে বিকৃতির সূচনা হলো তখন আল্লাহর ফেরেশতারা হনোককে, যিনি জনসমাজ ত্যাগ করে নির্জনে ইবাদাত বন্দেগী করে জীবন অতিবাহিত করছিলেন, ডেকে বললেন, "হে হনোক! ওঠো, নির্জনবাস থেকে বের হও এবং পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে চলাফেরা এবং তাদের সাথে ওঠাবসা করে যে পথে তাদের চলা উচিত এবং যেভাবে তাদের কাজ করতে হবে তা তাদেরকে জানিয়ে দাও।" এ হুকুম পেয়ে তিনি বের হলেন। তিনি বিভিন্ন জায়গায় লোকদেরকে একত্র করে নসীহত করলেন ও নির্দেশ দিলেন এবং মানব সন্তানরা তাঁর আনুগত্য করে আল্লাহর বন্দেগীর পথ অবলম্বন করলো। হনোক ৩৫৩ বছর পর্যন্ত মানব সম্প্রদায়ের ওপর শাসন কর্তৃত্ব চালান। তাঁর শাসন ছিল ইনসাফ ও সত্যপ্রীতির শাসন। তাঁর শাসনামলে পৃথিবীর ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হতে থাকে।" (The Talmud Salections, pp. 18-21)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ
حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا
وَاجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٥٨﴾ فَخَلَفَ
مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ
يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾

এরা হচ্ছে এমন সব নবী, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন আদম সন্তানদের মধ্য থেকে এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশধরদের থেকে, আর ইবরাহীমের বংশধরদের থেকে ও ইসরাঈলের বংশধরদের থেকে, আর এরা ছিল তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে আমি সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছিলাম এবং বাছাই করে নিয়েছিলাম। এদের অবস্থা এই ছিল যে, যখন করুণাময়ের আয়াত এদেরকে শুনানো হতো তখন কান্নারত অবস্থায় সিজদায় লুটিয়ে পড়তো।

তারপর এদের পর এমন নালায়েক লোকেরা এদের স্থলাভিষিক্ত হলো যারা নামায নষ্ট করলো[৩৫] এবং প্রবৃত্তির কামনার দাসত্ব করলো।[৩৬] তাই শীঘ্রই তারা গোমরাহীর পরিণামের মুখোমুখি হবে। তবে যারা তাওবা করবে, ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের সামান্যতম অধিকারও ক্ষুণ্ন হবে না।

৩৪. এর সোজা অর্থ হচ্ছে আল্লাহ হযরত ইদরীস (আ)-কে উন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন। ইসরাঈলী বর্ণনাসমূহ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে একথা আমাদের এখানেও প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, আল্লাহ হযরত ইদরীস (আ)-কে আকাশে তুলে নিয়েছিলেন, বাইবেলে তো শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, তিনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন কারণ "আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন।" কিন্তু তালমুদে তার সম্পর্কে একটি দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। কাহিনীটি এভাবে শেষ করা হয়েছে যে, "হনোক একটি ঘূর্ণির মধ্যে অগ্নিরথ ও অশ্বসহ আকাশে আরোহণ করলেন।"

৩৫. অর্থাৎ নামায পড়া ত্যাগ করলো অথবা নামায থেকে গাফেল ও বেপরোয়া হয়ে গেলো। এটি প্রত্যেক উম্মতের পতন ও ধ্বংসের প্রথম পদক্ষেপ। নামায আল্লাহর সাথে

جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِیْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَیْبِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ
مَاْتِیًّا ﴿۶۱﴾ لَا یَسْمَعُوْنَ فِیْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ؕ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِیْهَا بُكْرَةً
وَّعَشِیًّا ﴿۶۲﴾ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِیْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِیًّا ﴿۶۳﴾ وَمَا
نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهٗ مَا بَیْنَ اَیْدِیْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَیْنَ ذٰلِكَ ۚ
وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِیًّا ﴿۶۴﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ
وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ؕ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِیًّا ﴿۶۵﴾

তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি করুণাময় নিজের বান্দাদের কাছে অদৃশ্য পন্থায় দিয়ে রেখেছেন।[৩৭] আর অবশ্যই এ প্রতিশ্রুতি পালিত হবেই। সেখানে তারা কোনো বাজে কথা শুনবে না, যা কিছুই শুনবে ঠিকই শুনবে।[৩৮] আর সকাল-সন্ধায় তারা অনবরত নিজেদের রিযিক লাভ করতে থাকবে। এ হচ্ছে সেই জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী করবো আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মুত্তাকীদেরকে।

হে মুহাম্মাদ![৩৯] আমি আপনার রবের হুকুম ছাড়া অবতরণ করি না। যাকিছু আমাদের সামনে ও যাকিছু পেছনে এবং যাকিছু এর মাঝখানে আছে তার প্রত্যেকটি জিনিসের তিনিই মালিক এবং আপনার রব ভুলে যান না। তিনি আসমান ও যমীনের এবং এ দুয়ের মাঝখানে যাকিছু আছে সবকিছুর রব। কাজেই আপনি তার বন্দেগী করুন এবং তার বন্দেগীর ওপর অবিচল থাকুন।[৪০] আপনার জানামতে তাঁর সমকক্ষ কোনো সত্তা আছে কি ?[৪১]

মু'মিনের প্রথম ও প্রধানতম জীবন্ত ও কার্যকর সম্পর্ক জুড়ে রাখে। এ সম্পর্ক তাকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের কেন্দ্র বিন্দু থেকে বিচ্যুত হতে দেয় না। এ বাঁধন ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথেই মানুষ আল্লাহ থেকে দূরে বহুদূরে চলে যায়। এমনকি কার্যকর সম্পর্ক খতম হয়ে গিয়ে মানসিক সম্পর্কেরও অবসান ঘটে। তাই আল্লাহ একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে এখানে একথাটি বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী সকল উম্মতের বিকৃতি শুরু হয়েছে নামায নষ্ট করার পর।

৩৬. এটি আল্লাহর সাথে সম্পর্কের অভাব ও এর শূন্যতার অনিবার্য ফল। নামায ছেড়ে দেয়ার পর যখন আল্লাহর স্মরণ থেকে মন গাফেল হয়ে যেতে থাকে তখন যতই এ

গাফলতি বাড়তে থাকে ততই প্রবৃত্তির কামনার পূজাও বেড়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত নৈতিক চরিত্র ও ব্যবহারিক জীবনের সকল ক্ষেত্র আল্লাহর হুকুমের পরিবর্তে নিজের মনগড়া পদ্ধতির অনুসারী হয়ে যায়।

৩৭. অর্থাৎ যার প্রতিশ্রুতি করুণাময় এমন অবস্থায় দিয়েছেন যখন ঐ জান্নাতসমূহ তাদের দৃষ্টির অগোচরে রয়েছে।

৩৮. মূলে "সালাম" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে দোষ-ত্রুটিমুক্ত। জান্নাতে মানুষ যে সমস্ত নিয়ামত লাভ করবে তার মধ্যে একটি বড় নিয়ামত হবে এই যে, সেখানে কোনো আজেবাজে, অর্থহীন ও কটু কথা শোনা যাবে না। সেখানকার সমগ্র সমাজ হবে পাক-পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও ক্লেদমুক্ত। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতিই হবে ভারসাম্যপূর্ণ। সেখানকার বাসিন্দারা পরনিন্দা, পরচর্চা, গালিগালাজ, অশ্লীল গান ও অন্যান্য অশালীন ধ্বনি একেবারেই শুনবে না। সেখানে মানুষ শুধুমাত্র ভালো, ন্যায়সংগত ও যথার্থ কথাই শুনবে। এ দুনিয়ায় যে ব্যক্তি একটি যথার্থ পরিচ্ছন্ন ও শালীন রুচির অধিকারী একমাত্র সে-ই এ নিয়ামতের কদর বুঝতে পারে। কারণ একমাত্র সে-ই অনুভব করতে পারে যে, মানুষের জন্য এমন একটি পূতিগন্ধময় সমাজে বাস করা কত বড় বিপদ যেখানে কোনো মুহূর্তেই তার কান মিথ্যা, পরনিন্দা, ফিতনা, ফাসাদ, অশ্লীল, অশালীন ও যৌন উত্তেজক কথাবার্তা থেকে সংরক্ষিত থাকে না।

৩৯. এ সম্পূর্ণ প্যারাগ্রাফটি একটি প্রাসংগিক বাক্য। একটি ধারাবাহিক বক্তব্য শেষ করে অন্য একটি ধারাবাহিক বক্তব্য শুরু করার আগে এটি বলা হয়েছে। বক্তব্য উপস্থাপনার ধরন পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে যে, এ সূরাটি দীর্ঘকাল পরে এমন এক সময় নাযিল হয় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ অত্যন্ত দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে সময় অতিবাহিত করছিলেন। নবী (স) ও তাঁর সাহাবীগণ সর্বক্ষণ অহীর অপেক্ষা করতেন। এর সাহায্যে তাঁরা নিজেদের পথের দিশা পেতেন এবং মানসিক প্রশান্তি ও সান্ত্বনাও লাভ করতেন। অহীর আগমনে যতই বিলম্ব হচ্ছিল ততই তাদের অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থায় জিব্রীল আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের সাহচর্যে আগমন করলেন। প্রথমে তিনি তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কিত ফরমান শুনালেন তারপর সামনের দিকে অগ্রসর হবার আগে আল্লাহর ইংগিতে নিজের পক্ষ থেকে একথা ক'টি বললেন। এ কথা ক'টির মধ্যে রয়েছে এত দীর্ঘকাল নিজের গরহাজির থাকার ওজর, আল্লাহর পক্ষ থেকে সান্ত্বনাবাণী এবং এ সংগে সবর ও সংযম অবলম্বন করার উপদেশ ও পরামর্শ।

বক্তব্যের অভ্যন্তর থেকেই শুধু এ সাক্ষের প্রকাশ হচ্ছে না বরং বিভিন্ন হাদীসও এর সমর্থন করছে। ইবনে জারীর, ইবনে কাসীর ও রূহুল মা'আনী ইত্যাদির লেখকগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এ হাদীসগুলো উদ্ধৃত করেছেন।

৪০. অর্থাৎ তাঁর বন্দেগীর পথে মজবুতভাবে এগিয়ে চলো এবং এ পথে যেসব সংকট সমস্যা ও বিপদ আসে সবরের সাথে সেসবের মোকাবিলা করো। যদি তাঁর পক্ষ থেকে স্মরণ করা এবং সাহায্য ও সান্ত্বনা দেয়ার ব্যাপারে কখনো বিলম্ব হয় তাহলে তাতে ভীত হয়ো না। একজন অনুগত বান্দার মতো সব অবস্থায় তাঁর ইচ্ছার ওপর সন্তুষ্ট

وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾ اَوَلَا يَذْكُرُ
الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا ﴿٦٧﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ
وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ
شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ
اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾ وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾
ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

৫ রুকূ'

মানুষ বলে, সত্যিই কি যখন আমি মরে যাবো তখন আবার আমাকে জীবিত করে বের করে আনা হবে ? মানুষের কি স্মরণ হয় না, আমি আগেই তাকে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিল না ? তোমার রবের কসম, আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে এবং তাদের সাথে শয়তানদেরকেও ঘেরাও করে আনবো,[৪২] তারপর তাদেরকে এনে জাহান্নামের চারদিকে নতজানু করে ফেলে দেবো। তারপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে ব্যক্তি করুণাময়ের বেশী অবাধ্য ও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল তাকে ছেঁটে বের করে আনবো।[৪৩] তারপর আমি জানি তাদের মধ্য থেকে কারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবার বেশী হকদার। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, জাহান্নাম অতিক্রম করবে না।[৪৪] এতো একটা স্থিরীকৃত ব্যাপার, যা সম্পন্ন করা তোমার রবের দায়িত্ব। তারপর যারা (দুনিয়ায়) মুত্তাকী ছিল তাদেরকে আমি বাঁচিয়ে নেবো এবং যালেমদেরকে তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত অবস্থায় রেখে দেবো।

থাকো এবং একজন বান্দা ও রসূল হিসেবে তোমার ওপর যে দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছে দৃঢ় সংকল্প সহকারে তা পালন করতে থাকো।

৪১. মূলে سمی শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, "সমনাম"। অর্থাৎ আল্লাহ তো হচ্ছেন ইলাহ, তোমাদের জানা মতে দ্বিতীয় কোনো ইলাহ আছে কি ? যদি না থেকে থাকে এবং তোমরা জানো যে নেই, তাহলে তোমাদের জন্য তাঁরই বন্দেগী করা এবং তাঁরই হুকুমের দাস হয়ে থাকা ছাড়া অন্য কোনো পথ থাকে কি ?

৪২. অর্থাৎ সেসব শয়তানকে, যাদের এরা চেলা হয়ে গেছে, যাদের প্ররোচনায় পড়ে এরা মনে করে নিয়েছে এ জীবনে যা কিছু আছে ব্যস এ দুনিয়ার জীবন পর্যন্ত সব শেষ,

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ
هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا ﴿٧٤﴾ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ
مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ۚ فَسَيَعْلَمُونَ
مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿٧٥﴾ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ
وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٦﴾
أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٧﴾ أَطَّلَعَ
الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾

এদেরকে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত শুনানো হয় তখন অস্বীকারকারীরা ঈমানদারদেরকে বলে, "বলো, আমাদের দু' দলের মধ্যে কে ভালো অবস্থায় আছে এবং কার মজলিসগুলো বেশী জাঁকালো ?"[৪৫] অথচ এদের আগে আমি এমন কত জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি যারা এদের চেয়ে বেশী সাজ-সরঞ্জামের অধিকারী ছিল এবং বাহ্যিক শান-শওকতের দিক দিয়েও ছিল এদের চেয়ে বেশী অগ্রসর। এদেরকে বলো, যে ব্যক্তি গোমরাহীতে লিপ্ত হয় করুণাময় তাকে ঢিল দিতে থাকেন, এমনকি এ ধরনের লোকেরা যখন এমন জিনিস দেখে নেয় যার ওয়াদা তাদের সাথে করা হয়—তা আল্লাহর আযাব হোক বা কিয়ামতের সময়—তখন তারা জানতে পারে, কার অবস্থা খারাপ এবং কার দল দুর্বল! বিপরীত পক্ষে যারা সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদেরকে সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে উন্নতি দান করেন[৪৬] এবং স্থায়িত্বলাভকারী সৎকাজগুলোই তোমার রবের প্রতিদান ও পরিণামের দিক দিয়ে ভালো।

তারপর তুমি কি দেখেছো সে লোককে যে আমার আয়াতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং বলে, আমাকে তো ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করা হতে থাকবেই ?[৪৭] সে কি গায়েবের খবর জেনে গেছে অথবা সে রহমানের থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি নিয়ে রেখেছে ?

كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ
وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾
كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾

—কখ্খনো নয়, সে যাকিছু বলছে তা আমি লিখে নেবো[৪৮] এবং তার জন্য আযাবের পসরা আরো বাড়িয়ে দেবো। যে সাজ-সরঞ্জাম ও জনবলের কথা এ ব্যক্তি বলছে তা সব আমার কাছেই থেকে যাবে এবং সে একাকী আমার সামনে হাযির হয়ে যাবে।

এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের কিছু খোদা বানিয়ে রেখেছে, যাতে তারা এদের পৃষ্ঠপোষক হয়।[৪৯] কেউ পৃষ্ঠপোষক হবে না। তারা সবাই এদের ইবাদাতের কথা অস্বীকার করবে[৫০] এবং উল্টো এদের বিরোধী হয়ে পড়বে।

এরপর আর দ্বিতীয় কোনো জীবন নেই যেখানে আমাদের আল্লাহর সামনে হাযির হতে এবং নিজেদের কাজের হিসেবে দিতে হবে।

৪৩. অর্থাৎ অবাধ্য ও বিদ্রোহী দলের নেতা।

৪৪. অতিক্রম করা মানে কোনো কোনো রেওয়ায়াতে প্রবেশ করা বলা হয়েছে। কিন্তু এই রেওয়ায়াতগুলোর কোনোটির সনদও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পরম্পরায় পৌঁছেনি। আবার একথাটি কুরআন মজীদ এবং বিপুল সংখ্যক সহী হাদীসেরও বিরোধী, যেগুলোতে সৎকর্মশীল মু'মিনদের জাহান্নামে প্রবেশ না করার কথা চূড়ান্তভাবে বলে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া কুরআনে উল্লেখিত মূল শব্দ وُرُود এর আভিধানিক অর্থও প্রবেশ করা নয়। তাই এটিই এর সঠিক অর্থ যে, সবাইকেই জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু যেমন পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, মুত্তাকীদেরকে তা থেকে বাঁচিয়ে নেয়া হবে এবং জালেমদেরকে তার মধ্যে ফেলে দেয়া হবে।

৪৫. অর্থাৎ তাদের যুক্তি ছিল এ রকম ঃ দেখে নাও দুনিয়ায় কার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও নিয়ামত বর্ষণ করা হচ্ছে ? কার গৃহ বেশী জমকালো ? কার জীবন যাত্রার মান বেশী উন্নত ? কার মজলিসগুলো বেশী আড়ম্বরপূর্ণ ? যদি আমরা এসব কিছুর অধিকারী হয়ে থাকি এবং তোমরা এসব থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকো তাহলে তোমরা নিজেরই চিন্তা করে দেখো, এটা কেমন করে সম্ভবপর ছিল যে, আমরা বাতিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেও এভাবে দুনিয়ার মজা লুটে যেতে থাকবো আর তোমরা হকের পথে অগ্রসর হয়েও এ ধরনের ক্লান্তিকর জীবন যাপন করে যেতে থাকবে ? আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল কাহফ ৩৭-৩৮ টীকা।

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴿٨٣﴾ فَلَا تَعْجَلْ
عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ
وَفْدًا ﴿٨٥﴾ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ
إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾

৬ রুকূ'

তুমি কি দেখো না আমি এ সত্য অস্বীকারকারীদের উপর শয়তানদের ছেড়ে রেখেছি, যারা এদেরকে (সত্য বিরোধিতায়) খুব বেশী করে প্ররোচনা দিচ্ছে ? বেশ, তাহলে এখন এদের উপর আযাব নাযিল করার জন্য অস্থির হয়ো না, আমি এদের দিন গণনা করছি।[৫১] সে দিনটি অচিরেই আসবে যেদিন মুত্তাকীদেরকে মেহমান হিসেবে রহমানের সামনে পেশ করবো। এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত পশুর মতো জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবো। সে সময় যে রহমানের কাছ থেকে পরোয়ানা হাসিল করেছে তার ছাড়া আর কারো সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না।[৫২]

৪৬. অর্থাৎ প্রত্যেক পরীক্ষার সময় আল্লাহ তাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার এবং সঠিক পথে চলার সুযোগ দান করেন। তাদেরকে অসৎ কাজ ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে বাঁচান। তাঁর হেদায়াত ও পথ নির্দেশনার মাধ্যমে তারা অনবরত সত্য-সঠিক পথে এগিয়ে চলে।

৪৭. অর্থাৎ সে বলে, তোমরা আমাকে যতই পথভ্রষ্ট ও দুরাচার বলতে এবং আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাতে থাকো না কেন আমি তো আজো তোমাদের চাইতে অনেক বেশী সচ্ছল এবং আগামীতেও আমার প্রতি অনুগ্রহ ধারা বর্ষিত হতে থাকবে। আমার ধন-দৌলত, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও বৈষয়িক ক্ষমতা এবং আমার খ্যাতিমান সন্তানদেরকে দেখো। আমার জীবনের কোথায় তোমরা আমার প্রতি আল্লাহর ক্রোধ ও অভিশাপের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছো ?—এটা মক্কার কোনো একজন মাত্র লোকের চিন্তাধারা ছিল না; বরং মক্কার কাফেরদের প্রত্যেক সরদার ও মাতব্বর এ বিকৃত চিন্তায় ভুগছিল।

৪৮. অর্থাৎ তার অপরাধের ফিরিস্তিতে তার এ দাম্ভিক উক্তিও শামিল করা হবে এবং এর মজাও তাকে টের পাইয়ে দেয়া হবে।

৪৯. মূলে عزا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা এদের জন্য ইজ্জত ও মর্যাদার কারণ হবে। কিন্তু আরবী ভাষায় "ইজ্জত" মানে হচ্ছে কোনো ব্যক্তির এত বেশী শক্তিশালী ও জবরদস্ত হয়ে যাওয়া যার ফলে তার গায়ে কেউ হাত দিতে না পারে। আর এক ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির জন্য ইজ্জতের কারণে পরিণত হওয়ার অর্থ এ হয় যে, প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির এমন সহায়ক হবে যার ফলে তার কোনো বিরোধী তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে না পারে।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿٨٩﴾ تَكَادُ
السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾
أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾
إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَقَدْ
أَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

তারা বলে, রহমান কাউকে পুত্র গ্রহণ করেছেন—মারাত্মক বাজে কথা যা তোমরা তৈরি করে এনেছো। আকাশ ফেটে পড়ার, পৃথিবী বিদীর্ণ হবার এবং পাহাড় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে এজন্য যে, লোকেরা রহমানের জন্য সন্তান থাকার দাবী করেছে ! কাউকে সন্তান গ্রহণ করা রহমানের জন্য শোভন নয়। পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে যাকিছু আছে সবই তাঁর সামনে বান্দা হিসেবে উপস্থিত হবে। সবাইকে তিনি ঘিরে রেখেছেন এবং তিনি সবাইকে গণনা করে রেখেছেন। সবাই কিয়ামতের দিন একাকী অবস্থায় তাঁর সামনে আসবে।

নিসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করছে শীঘ্রই রহমান তাদের জন্য অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।[৫৩]

৫০. অর্থাৎ তারা বলবে, আমরা কখনো এদেরকে বলিনি আমাদের ইবাদাত করো এবং এ আহম্মকের দল যে আমাদের ইবাদাত করছে তাও তো আমরা জানতাম না।

৫১. এর মানে হচ্ছে, এদের বাড়াবাড়ির কারণে তোমরা বে-সবর হয়ো না। এদের দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে এসেছে। পাত্র প্রায় ভরে উঠেছে। আল্লাহর দেয়া অবকাশের মাত্র আর কদিন বাকি আছে। এ দিনগুলো পূর্ণ হতে দাও।

৫২. অর্থাৎ যে পরোয়ানা হাসিল করে নিয়েছে তার পক্ষেই সুপারিশ হবে এবং যে পরোয়ানা পেয়েছে সে-ই সুপারিশ করতে পারবে। আয়াতের শব্দগুলো দু'দিকেই সমানভাবে আলোকপাত করে।

সুপারিশ কেবলমাত্র তার পক্ষেই হতে পারবে, যে রহমান থেকে পরোয়ানা হাসিল করে নিয়েছে, একথার অর্থ হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় ঈমান এনে এবং আল্লাহর সাথে কিছু সম্পর্ক স্থাপন করে নিজেকে আল্লাহর ক্ষমার হকদার বানিয়ে নিয়েছে একমাত্র তার পক্ষেই

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٧﴾
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ ۖ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ
لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

বস্তুত হে মুহাম্মাদ! এ বাণীকে আমি সহজ করে তোমার ভাষায় এজন্য নাযিল করেছি যাতে তুমি মুত্তাকীদেরকে সুখবর দিতে ও হঠকারীদেরকে ভয় দেখাতে পারো। এদের পূর্বে আমি কত জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি। আজ কি কোথাও তাদের নাম-নিশানা দেখতে পাও অথবা কোথাও শুনতে পাও তাদের ক্ষীণতম আওয়াজ ?

সুপারিশ হবে। আর সুপারিশ একমাত্র সে-ই করতে পারবে যে পরোয়ানা লাভ করবে, একথার অর্থ হচ্ছে এই যে, লোকেরা যাদেরকে নিজেদের সুপারিশকারী মনে করে নিয়েছে তাদের সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না ; বরং আল্লাহ নিজেই যাদেরকে অনুমতি দেবেন একমাত্র তারাই সুপারিশ করার জন্য মুখ খুলবেন।

৫৩. অর্থাৎ আজ মক্কার পথেঘাটে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হচ্ছে। কিন্তু এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী নয়। সে সময় নিকটবর্তী যখন তারা সৎকাজ ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের জন্য জনপ্রিয় হয়ে উঠবেই। মানুষের মন তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। দুনিয়াবাসী তাদের পথে ফুল বিছিয়ে দেবে। আল্লাহদ্রোহিতা, পাপ, অশ্লীলতা, ঔদ্ধত্য, অহংকার, মিথ্যা ও লোক দেখানো কার্যকলাপের ভিত্তিতে যে নেতৃত্ব এগিয়ে চলে তা মানুষের মাথা নত করাতে পারে কিন্তু হৃদয় জয় করতে পারে না। অপরদিকে যারা সত্য, ন্যায়নীতি, বিশ্বস্ততা, আন্তরিকতা ও সদাচার সহকারে সত্য-সঠিক পথের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাতে থাকে, দুনিয়াবাসী প্রথম প্রথম তাদের প্রতি যতই বিরূপ থাকুক না কেন শেষ পর্যন্ত তারা মানুষের মন জয় করে নেয় এবং অবিশ্বস্ত ও পাপাচারীদের মিথ্যা বেশীক্ষণ তাদের পথ রোধ করতে পারে না।

❐

ত্বা-হা

২০

নাযিলের সময়-কাল

সূরা মারয়াম যে সময় নাযিল হয় এ সূরাটি তার কাছাকাছি সময়েই নাযিল হয়। সম্ভবত হাবশায় হিজরতকালে অথবা তার পরবর্তীকালে এটি নাযিল হয়। তবে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই যে এটি নাযিল হয় তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

তাঁর ইসলাম গ্রহণ সংক্রান্ত সবচেয়ে বেশী প্রচলিত ও নির্ভরযোগ্য হাদীসটি হচ্ছে ঃ যখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার সংকল্প নিয়ে বের হলেন তখন পথে এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, প্রথমে নিজের ঘরের খবর নাও, তোমার নিজের বোন ও ভগিনীপতি এ নতুন ধর্ম গ্রহণ করে বসে আছে। একথা শুনে হযরত উমর সোজা নিজের বোনের বাড়িতে চলে গেলেন। সেখানে তাঁর বোন ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বিনতে খাত্তাব ও ভগিনীপতি সাঈদ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বসেছিলেন। তাঁরা হযরত খাব্বাব ইবনে আরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে কুরআনের কোনো একটি অংশ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করছিলেন। হযরত উমরের আসার সাথে সাথেই তার ভগিনী ঐ অংশটি লুকিয়ে ফেললেন। কিন্তু হযরত উমর তা পড়ার আওয়াজ শুনে ফেলেছিলেন। তিনি প্রথমে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারপর ভগিনীপতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাঁকে মারতে শুরু করলেন। বোন তাঁকে বাঁচাতে চাইলেন। ফলে তাঁকেও মারলেন। এমনকি তার মাথা ফেটে গেলো। শেষে বোন ও ভগিনীপতি দুজনই বললেন, হাঁ আমরা মুসলমান হয়ে গেছি, তুমি যা করতে পারো করো। নিজের বোনের রক্ত প্রবাহিত হতে দেখে হযরত উমর কিছুটা লজ্জিত হলেন এবং বলতে লাগলেন, ঠিক আছে, তোমরা যা পড়ছিলে তা আমাকে দেখাও। বোন প্রথমে তা ছিঁড়ে না ফেলার জন্য শপথ নিলেন তারপর বললেন, তুমি গোসল না করা পর্যন্ত এ পবিত্র সহীফায় হাত লাগাতে পারবে না। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু গোসল করলেন তারপর সে সহীফা নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। সেখানে এ সূরা ত্বা-হা লেখা ছিল। পড়তে পড়তে হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে পড়লো, "বড় চমৎকার কথা।" একথা শুনতেই হযরত খাব্বাব ইবনে আরত বের হয়ে এলেন। এতক্ষণ তিনি হযরত উমরের আগমনের শব্দ শুনেই লুকিয়ে পড়েছিলেন। হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি আশা করি আল্লাহ তাঁর নবীর দাওয়াত ছড়াবার ক্ষেত্রে তোমার সাহায্যে বিরাট দায়িত্ব সম্পাদন করবেন। গতকালই আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, হে আল্লাহ ! আবুল হাকাম ইবনে হিশাম (আবু জেহেল) অথবা উমর ইবনুল খাত্তাব, এ দু' জনের মধ্য থেকে কোনো একজনকে ইসলামের সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। কাজেই হে উমর ! আল্লাহর দিকে চলো, আল্লাহর দিকে চলো।" ওমরের মনে পরিবর্তন ঘটতে যেটুকু বাকি ছিল খাব্বাবের এ উক্তি তাও পূর্ণ করে দিল। তখনই হযরত

উমর খাত্তাবের সাথে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এটি হাবশায় হিজরত অনুষ্ঠানের কিছুকাল পরের ঘটনা।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

সূরাটি এভাবে শুরু হয়েছে, হে মুহাম্মাদ! অযথা তোমাকে একটি বিপদের সম্মুখীন করার জন্য তোমার ওপর এ কুরআন নাযিল হয়নি। তোমার কাছে এ দাবী করা হয়নি যে, পাথরের বুক চিরে দুধের নহর বের করে আনো, অস্বীকারকারীদেরকে স্বীকার করিয়ে ছাড়ো এবং হঠকারীদের অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দেখিয়ে দাও। এটি তো শুধুমাত্র একটি উপদেশ ও স্মারক, যার ফলে অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগবে এবং তাঁর পাকড়াও থেকে যে নিষ্কৃতি পেতে চায় সে এটি শুনে সংশোধিত হয়ে যাবে। এটি আকাশ ও পৃথিবীর মালিকের কালাম এবং তিনি ছাড়া আর কেউ প্রভুত্বের কর্তৃত্বের অধিকারী নয়। কেউ মানুক না মানুক এ দু'টি কথা চিরন্তন ও অমোঘ সত্য।

এ ভূমিকার পর হঠাৎ হযরত মূসার কাহিনী শুরু করা হয়েছে। বাহ্যত একটি কাহিনী আকারে এটি বর্ণিত হয়েছে। সমকালীন অবস্থার প্রতি কোনো ইংগিতও এতে নেই। কিন্তু যে পরিবেশে এ কাহিনী শুনানো হয়েছে তার অবস্থার সাথে মিলেমিশে এটি মক্কাবাসীদের সাথে কিছু ভিন্নতর কথা বলছে বলে মনে হয়। এর শব্দ ও বাক্যগুলো থেকে নয় বরং দুই বাক্যের মধ্যস্থিত অনুচ্চারিত ভাবার্থ থেকেই সে কথা প্রকাশিত হচ্ছে। সে কথা প্রকাশের আগে আর একটি কথা ভালোভাবে বুঝে নেয়া উচিত যে, আরব দেশে বিপুল সংখ্যক ইহুদীদের উপস্থিতি এবং আরববাসীদের ওপর ইহুদীদের জ্ঞানগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের কারণে, তাছাড়া রোমের ও হাবশার খৃষ্টীয় শাসনের প্রভাবেও আরবদের মধ্যে সাধারণভাবে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর নবী বলে স্বীকার করা হতো। এ সত্যটি দৃষ্টি সমক্ষে রাখার পর এখন আসুন এ কাহিনীর মধ্যে যে অব্যক্ত কথাগুলো মক্কাবাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে সেদিকে দৃষ্টিপাত করি ঃ

এক ঃ কাউকে নবুওয়াত দান করার জন্য আল্লাহ ঢাকঢোল পিটিয়ে বিপুল সংখ্যক জনতাকে একত্র করে যথারীতি একটি উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ ঘোষণাবাণী শুনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেননি যে, আজ থেকে অমুক ব্যক্তিকে আমি তোমাদের জন্য নবী নিযুক্ত করেছি। নবুওয়াত যাকেই দেয়া হয়েছে হযরত মূসার মতো গোপনীয়তা রক্ষা করেই দেয়া হয়েছে। কাজেই আজ তোমরা অবাক হচ্ছো কেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অকস্মাত তোমাদের সামনে নবী হিসেবে হাযির হয়ে গেছেন, আকাশ থেকেও এর ঘোষণাবাণী উচ্চারিত হলো না। আর ফেরেশতারাও পৃথিবীতে এসে ঢাকঢোল পিটিয়ে একথা ঘোষণা করলেন না ? ইতিপূর্বে যাদেরকে নবী নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের নিযুক্তিকালে কবে এ ধরনের ঘোষণা হয়েছিল যে, আজ তা হবে ?

দুই ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজ যে কথা পেশ করছেন (অর্থাৎ তাওহীদ ও আখেরাত) ঠিক একই কথা নবুওয়াতের দায়িত্ব দান করার সময় আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালামকে শিখিয়েছিলেন।

তিন ঃ তারপর আজ যেভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোনো প্রকার সাজসরঞ্জাম ও সৈন্য সামন্ত ছাড়াই কুরাইশদের মুকাবিলায় সত্যের দাওয়াতের পতাকাবাহী করে একাকী দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে মূসা আলাইহিস সালামকেও ফেরাউনের মতো মহাপরাক্রমশালী বাদশাহকে অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের পথ পরিহার করার আহ্বান জানাবার গুরুদায়িত্বে আকস্মিকভাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাঁর সাথেও কোনো সেনাবাহিনী পাঠানো হয়নি। আল্লাহর যাবতীয় কর্মকাণ্ড এমনি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর। তিনি মাদ্‌য়ান থেকে মিসর গমনকারী একজন পথিককে পথ চলাকালে ধরে নিজের কাছে ডেকে নেন এবং বলেন, যাও, সমকালের সবচেয়ে পরাক্রমশালী ও জালেম শাসকের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও। কিছু সাহায্য করে থাকলে এতটুকু করেছেন যে, তাঁর আবেদনক্রমে তাঁর ভাইকে সাহায্যকারী হিসেবে দিয়েছেন। কোনো দুর্দান্ত সেনাবাহিনী এবং হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি দিয়ে এ কঠিন কাজে তাঁকে সাহায্য করা হয়নি।

চার ঃ মক্কাবাসীরা আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ, সংশয়-সন্দেহ, অপবাদ-দোষারোপ, প্রতারণা ও জুলুমের অস্ত্র ব্যবহার করছে ফেরাউন এসব অস্ত্র আরো অনেক বেশী করে মূসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু দেখো কিভাবে তার সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হয়ে গেলো এবং শেষ পর্যন্ত কে বিজয়ী হলো ? আল্লাহর সেই সাজসরঞ্জামহীন নবী, না সৈন্য বলে বলীয়ান ফেরাউন ? এ প্রসংগে মুসলমানদেরকেও একটি অব্যক্ত সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সাজসরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণের ক্ষেত্রে নিজেদের দৈন্য ও কাফেরদের প্রাচুর্যের প্রতি লক্ষ করো না, বরং যে কাজের পেছনে আল্লাহর হাত থাকে শেষ পর্যন্ত তারই বিজয় সূচিত হয়। এ সংগে মুসলমানদের সামনে মিসরের যাদুকরদের দৃষ্টান্তও পেশ করা হয়েছে। যখন সত্য তাদের কাছে আবরণমুক্ত হয়ে গেলো তখন তারা নির্দ্বিধায় তার প্রতি ঈমান আনলো। তারপর ফেরাউনের প্রতিশোধ গ্রহণের ভয় তাদেরকে ঈমানের পথ থেকে এক চুল পরিমাণও সরিয়ে আনতে পারলো না।

পাঁচ ঃ শেষে বনী ইসরাঈলের ইতিহাস থেকে একটি সাক্ষ পেশ করতে গিয়ে দেবতা ও উপাস্য তৈরির সূচনা কেমন হাস্যকর পদ্ধতিতে হয়ে থাকে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নবী কখনো এ ধরনের ঘৃণ্য জিনিসের নামগন্ধও বাকি রাখার পক্ষপাতি হন না। কাজেই আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শির্‌ক ও মূর্তিপূজার বিরোধিতা করছেন তা নবুওয়াতের ইতিহাসের কোনো নতুন ঘটনা নয়।

এভাবে মূসার কাহিনীর মোড়কে এমন সমস্ত বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে যা সে সময় তাদের ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যকার পারস্পরিক সংঘাতের সাথে সম্পর্ক রাখতো। এরপর একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছেঃ এ কুরআন একটি উপদেশ ও স্মারক। তোমাদের নিজেদের ভাষায় তোমাদের বুঝাবার জন্য এটি পাঠানো হয়েছে। এর বক্তব্য শুনলে এবং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে তোমরা নিজেদেরই কল্যাণ করবে। আর এর কথা না মানলে তোমরা অশুভ পরিণামের সম্মুখীন হবে।

তারপর আদম আলাইহিস সালামের কাহিনী বর্ণনা করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা যে পথে এগিয়ে যাচ্ছো এটা হচ্ছে শয়তানের পদাংক অনুসরণ। কখনো সখনো শয়তানের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হওয়া অবশ্যি একটি সাময়িক দুর্বলতা। মানুষের পক্ষে এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু মানুষের জন্য সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, যখনই তার সামনে তার ভুল সুস্পষ্ট করে দেয়া হবে তখনই সে তার পিতা আদমের মতো পরিষ্কার ভাষায় তা স্বীকার করে নেবে, তাওবা করবে এবং আবার আল্লাহর বন্দেগীর দিকে ফিরে আসবে। ভুল করা ও তার ওপর অবিচল থাকা এবং একের পর এক উপদেশ দেবার পরও তা থেকে বিরত না হওয়া নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারার শামিল। এর পরিণাম নিজেকে ভুগতে হবে, অন্যের এতে কোনো ক্ষতি নেই।

সবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদেরকে এ মর্মে বুঝানো হয়েছে যে, এ সত্য অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবেন না এবং বে-সবর হবেন না। আল্লাহর নিয়ম হচ্ছে, তিনি কোনো জাতিকে তার কুফরী ও অস্বীকারের কারণে সাথে সাথেই পাকড়াও করেন না বরং তাকে সংশোধন করার জন্য যথেষ্ট অবকাশ দেন। কাজেই ভীত হবেন না। ধৈর্য সহকারে এদের বাড়াবাড়ি ও জুলুম অত্যাচার বরদাশত করতে এবং উপদেশ দেবার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে যেতে থাকুন।

প্রসংগক্রমে নামাযের ওপর জোর দেয়া হয়েছে, যাতে মু'মিনদের মধ্যে সবর, সংযম, সহিষ্ণুতা, অল্পে তুষ্টি, আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্টি এবং আত্মপর্যালোচনার এমন গুণাবলী সৃষ্টি হয় যা সত্যের দাওয়াত দেবার দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রয়োজন।

❐

আয়াত ১৩৫ | সূরা ত্বা-হা-মক্কী | রুকূ' ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

طٰهٰ ۝١ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ۝٢ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ
يَّخْشٰى ۝٣ تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ۝٤
اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ۝٥ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى
الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ۝٦ وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ
فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى ۝٧ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ لَهُ الْاَسْمَاۗءُ الْحُسْنٰى ۝٨

ত্বা–হা। আমি এ কুরআন তোমার প্রতি এজন্য নাযিল করিনি যে, তুমি বিপদে পড়বে। এ তো একটি স্মারক এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে ভয় করে।[১] যে সত্তা পৃথিবী ও সুউচ্চ আকাশজগত সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে এটি নাযিল করা হয়েছে। তিনি পরম দয়াবান। (বিশ্ব-জাহানের) শাসন কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন।[২] যাকিছু পৃথিবীতে ও আকাশে আছে, যাকিছু পৃথিবী ও আকাশের মাঝখানে আছে এবং যাকিছু ভূগর্ভে আছে সবকিছুর মালিক তিনিই। তুমি যদি নিজের কথা উচ্চকণ্ঠে বলো, তবে তিনি তো চুপিসারে বলা কথা বরং তার চেয়েও গোপনে বলা কথাও জানেন।[৩] তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাঁর জন্য রয়েছে সর্বোত্তম নামসমূহ।[৪]

১. এ বাক্যটি নিজেই পূর্ববর্তী বাক্যের অর্থের ওপর আলোকপাত করছে। উভয় বাক্য মিলিয়ে পড়লে এ পরিষ্কার অর্থটি বুঝা যায় যে, কুরআন নাযিল করে আমি তোমার দ্বারা এমন কোনো কাজ করাতে চাই না যা তোমার পক্ষে করা অসম্ভব। তোমাকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়নি যে, যারা মেনে নিতে চায় না তাদেরকে মানাতেই হবে এবং যাদের অন্তরের দুয়ার ঈমানের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে তাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করাতেই হবে। এটা তো একটা স্মরণ করা ও স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং এটা এজন্য পাঠানো হয়েছে যে, যার মনে আল্লাহর ভয় আছে সে এটা শুনে সজাগ হবে। এখন যদি কিছু লোকের মনে আল্লাহর ভয় একদম না থেকে থাকে এবং তাদের হক ও বাতিলের

وَهَلْ أَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۝ إِذْ رَأٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوْٓا إِنِّيْٓ
آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ آتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝ فَلَمَّآ
أَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى ۝ إِنِّيْٓ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادِ
الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ۝ إِنَّنِيْٓ أَنَا اللّٰهُ
لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ۝ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ
أَكَادُ أُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى ۝

আর তোমার কাছে কি মূসার খবর কিছু পৌঁছেছে ? যখন সে একটি আগুন দেখলো[৫] এবং নিজের পরিবারের লোকদেরকে বললো, "একটু দাঁড়াও, আমি একটি আগুন দেখেছি, হয়তো তোমাদের জন্য এক আধটি অংগার আনতে পারবো অথবা এ আগুনের নিকট আমি কোনো পথের দিশা পাবো।"[৬]

সেখানে পৌঁছলে তাকে ডেকে বলা হলো, "হে মূসা! আমিই তোমার রব, জুতো খুলে ফেলো,[৭] তুমি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় আছো[৮] এবং আমি তোমাকে বাছাই করে নিয়েছি, শোনো যাকিছু অহী করা হয়। আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, কাজেই তুমি আমার ইবাদাত করো এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য নামায কায়েম করো।[৯] কিয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তার সময়টা গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেকটি প্রাণসত্তা তার প্রচেষ্টা অনুযায়ী প্রতিদান লাভ করতে পারে।[১০]

কোনো পরোয়াই না থাকে তাহলে তাদের পেছনে সময় নষ্ট করার কোনো প্রয়োজনই তোমার নেই।

২. অর্থাৎ সৃষ্টি করার পর তিনি কোথাও গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েননি। বরং সৃষ্টিজগতে সমস্ত ব্যবস্থা নিজেই পরিচালনা করছেন। এই সীমাহীন রাজ্যে তিনি নিজেই রাজত্ব করছেন। তিনি কেবল স্রষ্টাই নন, কার্যত শাসকও।

৩. অর্থাৎ তোমার ও তোমার সাথীদের ওপর যেসব জুলুম নিপিড়ন চলছে এবং যেসব দুষ্কৃতি ও শয়তানী কার্যকলাপের মাধ্যমে তোমাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেগুলোর জন্য তোমার উচ্চ কণ্ঠে ফরিয়াদ জানানোর তেমন কোনো দরকার নেই। তুমি কোন ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হয়েছো তা আল্লাহ খুব ভালো করেই জানেন । তিনি তোমাদের অন্তরের ডাকও শুনছেন।

৪. অর্থাৎ তিনি সর্বোত্তম গুণাবলীর অধিকারী।

৫. এটা সে সময়ের কথা যখন হযরত মূসা মাদইয়ানে কয়েক বছর নির্বাসিত জীবন যাপন করার পর নিজের স্ত্রীকে (যার সাথে মাদইয়ানে বিয়ে হয়েছিল) নিয়ে মিসরে ফিরে যাচ্ছিলেন। এর আগের ঘটনা সূরা কাসাসে বর্ণিত হয়েছে। এর সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে ঃ হযরত মূসার হাতে একজন মিসরীয় মারা পড়ার ফলে তিনি নিজের গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার আশংকা করছিলেন। এ সময় তিনি মিসর ত্যাগ করে মাদয়ানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

৬. মনে হচ্ছে তখন সময়টা ছিল শীতকালের একটি রাত। হযরত মূসা সিনাই উপদ্বীপের দক্ষিণ এলাকা অতিক্রম করছিলেন। দূর থেকে একটি আগুন দেখে তিনি মনে করেছিলেন সেখান থেকে কিছু আগুন পাওয়া যাবে যার সাহায্যে শিশু সন্তান ও পরিবারের লোকজনদের সারারাত গরম রাখার ব্যবস্থা হবে অথবা কমপক্ষে সামনের দিকে অগ্রসর হবার পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। তিনি দুনিয়ার পথের সন্ধান পাওয়ার কথা চিন্তা করেছিলেন আর পেয়ে গেলেন সেখানে আখেরাতের পথ।

৭. সম্ভবত এ ঘটনার কারণে ইহুদীরা তাদের শরীয়াতের এ বিধান তৈরি করে নিয়েছে যে, জুতা পায়ে দিয়ে নামায পড়া জায়েয নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিভ্রান্তিটি দূর করার জন্য বলেন ঃ

خالفوا اليهود فانهم لايصلون فى نعالهم ولا خفافهم

"ইহুদীদের বিপরীত কাজ করো। কারণ তারা জুতা ও চামড়ার মোজা পরে নামায পড়ে না।" (আবু দাউদ)

এর অর্থ এ নয় যে, জুতা পরেই নামায পড়তে হবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, এমনটি করা জায়েয। কাজেই উভয়বিধ কাজ করো। আবু দাউদে আমর ইবনে আসের (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উভয় অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছেন। মুসনাদে আহমদ ও আবু দাউদে আবু সাঈদ খুদরীর (রা) রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তাতে নবী (স) বলেছেন ঃ "যখন তোমাদের কেউ মসজিদে আসে, সে যেন তার জুতা পরীক্ষা করে দেখে নেয়। যদি কোনো নাপাকী লেগে থাকে। তাহলে মাটিতে ঘসে পরিষ্কার করো এবং সে জুতা পরে নামায পড়ে নাও।" আবু হুরাইরার (রা) রেওয়ায়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথাগুলো আছে ঃ "যদি তোমাদের কেউ জুতা দিয়ে নাপাকী মাড়িয়ে থাকে তাহলে মাটি তাকে পাক করে দেবার জন্য যথেষ্ট।" আর হযরত উম্মে সালমাহ (রা) বর্ণিত রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে يطهره ما بعده অর্থাৎ "এক জায়গায় নাপাকী লেগে থাকলে অন্য জায়গায় যেতে যেতে মাটি নিজেই তাকে পাক করে দেবে।" এ বিপুল সংখ্যক হাদীসের কারণে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম আওযায়ী ও ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইয়াহ প্রমুখ ফকীহগণ এমত পোষণ করেন যে, জুতা সর্বাবস্থায় যমীনের মাটির সাহায্যে পাক হয়ে যায়। ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেঈর একটি উক্তিও এর সমর্থনে রয়েছে। কিন্তু ইমাম শাফেঈর সর্বজন পরিচিত উক্তি এর বিরোধী। সম্ভবত তিনি জুতা পরে নামায পড়া আদবের বিরোধী মনে করে তা করতে নিষেধ করেন। যদিও একথা মনে করা হয়েছে যে, তাঁর মতে

জুতা মাটিতে ঘসলে পাক হয় না। (এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, মসজিদে নববীতে চাটাইয়ের বিছানাও ছিল না বরং কাঁকর বিছানো ছিল। কাজেই এসব হাদীসের প্রমাণের ভিত্তিতে যদি কোনো ব্যক্তি আজ মসজিদের বিছানার ওপর জুতা পায়ে উঠতে চায় তাহলে তা সঠিক হবে না। তবে ঘাসের ওপর বা খোলা ময়দানে জুতা পায়ে নামায পড়তে পারে। তবে যারা মাঠে-ময়দানে জানাযার নামায পড়ার সময়ও পা থেকে জুতা খুলে ফেলার ওপর জোর দিতে থাকে তারা আসলে শরীয়াতের বিধান জানে না।)

৮. সাধারণত মনে করা হয়ে থাকে যে, "তুওয়া" ছিল এই উপত্যকাটির নাম। কিন্তু কোনো কোনো মুফাসসির "পবিত্র তুওয়া উপত্যকা" অর্থ করেছেন "এমন উপত্যকা যাকে একটি সময়ের জন্য পবিত্র করা হয়েছে।"

৯. এখানে নামাযের মূল উদ্দেশ্যের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। মানুষ যেন আল্লাহ থেকে গাফেল না হয়ে যায়। দুনিয়ার চোখ ধাঁধানো দৃশ্যাবলী যেন তাকে এ সত্য বিমুখ না করে দেয় যে, সে কারো বান্দা এবং সে স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন নয়। এ চিন্তাকে জীবন্ত ও তরতাজা রাখার এবং আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক জড়িত করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে নামায। প্রতিদিন কয়েকবার মানুষকে দুনিয়ার কাজকারবার থেকে সরিয়ে নামায তাকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যায়।

কেউ কেউ এর এ অর্থও নিয়েছেন যে, নামায কায়েম করো যাতে আমি তোমাকে স্মরণ করতে পারি, যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ "আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাকে স্মরণে রাখবো।"

আনুসংগিকভাবে এ আয়াত থেকে এ বিধানটিও বের হয় যে, যে ব্যক্তি ভুলে যায় তার যখনই মনে পড়বে তখনই নামায পড়ে নেয়া উচিত। হাদীসে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

من نسى صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك

"কোনো ব্যক্তি কোনো সময় নামায পড়তে ভুলে গিয়ে থাকলে যখন তার মনে পড়ে যায় তখনই নামায পড়ে নেয়া উচিত। এছাড়া এর আর কোনো কাফফারা নেই। (বুখারী, মুসলিম, আহমদ)

এ অর্থে হযরত আবু হুরাইরার (রা) একটি হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এটি তাঁদের হাদীসগ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। আবু কাতাদাহ (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়, যদি আমরা নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকি তাহলে কি করবো? জবাবে তিনি বলেন, "ঘুমের মধ্যে কোনো দোষ নেই। দোষের সম্পর্ক তো জেগে থাকা অবস্থার সাথে। কাজেই যখন তোমাদের মধ্যে কেউ ভুলে যাবে অথবা ঘুমিয়ে পড়বে তখন জেগে উঠলে বা মনে পড়লে তৎক্ষণাত নামায পড়ে নেবে।" (তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ)

১০. তাওহীদের পরে যে দ্বিতীয় সত্যটি প্রত্যেক যুগে সকল নবীর সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে এবং যার শিক্ষা দেবার জন্য তাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছে সেটি হচ্ছে

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ﴿١٦﴾ وَمَا تِلْكَ
بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ﴿١٧﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلٰى
غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ أُخْرٰى ﴿١٨﴾ قَالَ أَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ﴿١٩﴾ فَأَلْقٰىهَا فَإِذَا هِيَ
حَيَّةٌ تَسْعٰى ﴿٢٠﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۖ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْأُوْلٰى ﴿٢١﴾
وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ ۖ آيَةً
أُخْرٰى ﴿٢٢﴾ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ﴿٢٣﴾ اذْهَبْ إِلٰى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغٰى ﴿٢٤﴾

কাজেই যে ব্যক্তি তার প্রতি ঈমান আনে না এবং নিজের প্রবৃত্তির দাস হয়ে গেছে সে যেন তোমাকে সে সময়ের চিন্তা থেকে নিবৃত্ত না করে। অন্যথায় তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে— "আর হে মূসা! এ তোমার হাতে এটা কি ?"[১১]

মূসা জবাব দিল, "এ আমার লাঠি। এর ওপর ভর দিয়ে আমি চলি, নিজের ছাগলগুলোর জন্য এর সাহায্যে পাতা পাড়ি এবং এর সাহায্যে আরো অনেক কাজ করি।"[১২]

বললেন, "একে ছুঁড়ে দাও হে মূসা।"

সে ছুঁড়ে দিল এবং অকস্মাত সেটা হয়ে গেলো একটা সাপ, যা দৌড়াচ্ছিল।

বললেন, "ধরে ফেলো ওটা এবং ভয় করো না, আমি ওকে আবার ঠিক তেমনটিই করে দেবো যেমনটি সে আগে ছিল। আর তোমার হাতটি একটু বগলের মধ্যে রাখো, তা কোনো প্রকার ক্লেশ ছাড়াই উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে,[১৩] এটা দ্বিতীয় নিদর্শন। এজন্য যে, আমি তোমাকে নিজের বৃহৎ নিদর্শনগুলো দেখাবো। এখন তুমি যাও ফেরাউনের কাছে, সে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।"

আখেরাত। এখানে কেবলমাত্র এ সত্যটি বর্ণনা করাই হয়নি বরং এর উদ্দেশ্যের ওপরও আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রতীক্ষিত সময়টি আসার কারণ হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি দুনিয়ায় যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং যে কাজ করেছে তার প্রতিদান পাবে সে আখেরাতে। তবে পরীক্ষার উদ্দেশ্য পূর্ণ করার লক্ষ্যে সে সময়টি গোপন রাখা হয়েছে। যার আখেরাতের সামান্য চিন্তা থাকবে সে সবসময় এ সময়টির কথা ভাববে এবং এ ভাবনা

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ﴿٢٦﴾ وَاحْلُلْ عُقْدَةً
مِّنْ لِّسَانِيْ ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ﴿٢٨﴾ وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ﴿٢٩﴾
هٰرُوْنَ اَخِي ﴿٣٠﴾ اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ ﴿٣١﴾ وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ ﴿٣٢﴾ كَيْ
نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٣﴾ وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٤﴾ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ﴿٣٥﴾

২ রুকূ'

মূসা বললো, "হে আমার রব! আমার বুক প্রশস্ত করে দাও[১৪] আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার জিভের জড়তা দূর করে দাও, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে।[১৫] আর আমার জন্য নিজের পরিবার থেকে সাহায্যকারী হিসেবে নিযুক্ত করে দাও আমার ভাই হারুনকে।[১৬] তার মাধ্যমে আমার হাত মযবুত করো এবং তাকে আমার কাজে শরীক করে দাও, যাতে আমরা খুব বেশী করে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি এবং খুব বেশী করে তোমার চর্চা করি। তুমি সবসময় আমাদের অবস্থার পর্যবেক্ষক।"

তাকে ভুল পথে চলা থেকে রক্ষা করবে। আর যে ব্যক্তি বৈষয়িক কাজকর্মের মধ্যে হারিয়ে যেতে চাইবে সে এ চিন্তার মধ্যে ডুবে যাবে যে, কিয়ামত এখনো অনেক দূরে বহুদূরে ও তার আসার কোনো চিহ্নই দেখা যায় না।

১১. জ্ঞান লাভ করার বা জানার জন্য এ প্রশ্ন ছিল না। বরং আল্লাহ জানতেন হযরত মূসার হাতে লাঠি আছে। এ ক্ষেত্রে জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য এ ছিল যে, তাঁর হাতে যে লাঠি আছে অন্য কিছু নয় এ ব্যাপারে যেন তিনি নিশ্চিত হয়ে যান এবং এরপর দেখেন আল্লাহর কুদরাতের খেলা কিভাবে শুরু হয়।

১২. যদিও জবাবে শুধুমাত্র এতটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিল যে, জনাব, এটি একটি লাঠি। কিন্তু হযরত মূসা এ প্রশ্নের যে লম্বা জবাব দিলেন তা তাঁর সে সময়কার মানসিক অবস্থার একটা চমৎকার ছবি তুলে ধরেছে। সাধারণত দেখা যায়, মানুষ যখন কোনো বড় ব্যক্তির সাথে কথা বলার সুযোগ পায় তখন নিজের কথা দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করে, যাতে তার সাথে বেশীক্ষণ কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করা যায়।

১৩. সূর্যের আলোর মতো আলো হবে কিন্তু এর ফলে তোমার কোনো কষ্ট হবে না। বাইবেলে সাদা হাতের ভিন্ন একটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সেখান থেকে আমাদের তাফসীরগুলোতেও এর প্রচলন হয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে এই যে, হযরত মূসা যখন বগলে হাত রেখে বাইরে বের করলেন তখন দেখা গেলো পুরো হাতটাই কুষ্ঠরোগীর হাতের মতো সাদা হয়ে গেছে। তারপর আবার যখন তা বগলে রাখলেন তখন আবার আগের মতো হয়ে

গেছে। এ মুজিযাটির এ ব্যাখ্যাই তালমূদেও বর্ণিত হয়েছে এবং এর গূঢ় তত্ত্ব বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে যে, ফেরাউনের কুষ্ঠরোগ ছিল এবং এ রোগ সে লুকিয়ে রেখেছিলে। তাই তার সামনে এ মুজিযা পেশ করে তাকে দেখানো হয়েছে যে, দেখো মুহূর্তের মধ্যে কুষ্ঠরোগ সৃষ্টি করে মুহূর্তের মধ্যেই তা নিরাময় করা যায়। কিন্তু প্রথমত ভারসাম্যপূর্ণ রুচিশীলতা কোনো নবীকে কুষ্ঠরোগের মুজিযা দিয়ে এক বাদশাহর দরবারে পাঠানোর ব্যাপারটিই গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। দ্বিতীয়ত ফেরাউনের যদি অপ্রকাশ্য কুষ্ঠরোগ থেকে থাকে তাহলে কুষ্ঠরোগীর সাদা হাত শুধুমাত্র তার একার জন্য মুজিযা হতে পারে, তার সভাসদদের ওপর এ মুজিযার কী প্রভাব পড়বে ? কাজেই সঠিক কথা এটাই যা আমরা উপরে বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ তাঁর হাত সূর্যলোকের মতো আলোকোজ্জল হয়ে উঠতো এবং চোখ সেদিকে তাকিয়ে থাকতে পারতো না। প্রথম যুগের মুফাসসিরদের অনেকেই এ অর্থ গ্রহণ করেছেন।

১৪. অর্থাৎ আমার মনে এ মহান দায়িত্বভার বহন করার মতো হিম্মত সৃষ্টি করে দাও। আমার উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়িয়ে দাও। যেহেতু হযরত মূসা (আ)-কে একটি অনেক বড় কাজের দায়িত্ব সোপর্দ করা হচ্ছিল যা করার জন্য দুরন্ত সাহসের প্রয়োজন তাই তিনি দোয়া করেন, আমাকে এমন ধৈর্য, ধৃঢ়তা, সংযম, সহনশীলতা, নির্ভীকতা ও দুর্জয় সংকল্প দান করো যা এ কাজের জন্য প্রয়োজন।

১৫. বাইবেলে এর যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, হযরত মূসা বললেনঃ "হায় সদাপ্রভু ! আমি বাকপটু নহি, ইহার পূর্বেও ছিলাম না, বা এই দাসের সহিত তোমার আলাপ করিবার পরেও নহি। কারণ আমি জড়মুখ ও জড় জিহ্বা। (যাত্রা পুস্তক ৪ঃ ১০) কিন্তু তালমূদে এ সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে একথা বলা হয়েছে যে, শৈশবে হযরত মূসা যখন ফেরাউনের গৃহে লালিত পালিত হচ্ছিলেন তখন একদিন তিনি ফেরাউনের মাথার মুকুট নামিয়ে নিজের মাথায় পরে নেন। এতে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এ শিশু এ কাজটি ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে অথবা এটা তা নিছক বালকসুলভ চপলতা। শেষে ঠিক করা হয়, শিশুর সামনে সোনা ও আগুন একসাথে রাখা হবে। সে মোতাবেক দুটি জিনিস এনে একসাথে সামনে রাখা হলো এবং হযরত মূসা আগুন উঠিয়ে মুখে পুরে দিলেন। এতে তিনি কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে গেলেও তার জিহ্বায় চিরকালের জন্য জড়তা সৃষ্টি হয়।

এ কাহিনী ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আমাদের তাফসীর গ্রন্থগুলোতেও লিখিত হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি একথা মেনে নিতে অস্বীকার করে। শিশু যদি আগুনে হাত দিয়েও ফেলে তাহলে এটা কোনোক্রমেই সম্ভব নয় যে, সে অংগার উঠিয়ে নিয়ে মুখের মধ্যে পুরে দেবে। শিশু তো আগুনের জ্বালা অনুভব করার সাথে সাথেই হাত গুটিয়ে নেবে। পোড়া হাতে অংগার নিয়ে সে অংগার মুখে দেবার অবকাশ পাবে কেমন করে ? কুরআনের শব্দাবলী থেকে আমরা যে কথা বুঝতে পারি তা হচ্ছে এই যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নিজের মধ্যে বাগ্মীতার অভাব দেখছিলেন। ফলে তাঁর মনে আশংকা জেগেছিল যে, নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি তাঁর কখনো বক্তৃতা দেবার প্রয়োজন দেখা দেয়

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿٣٧﴾
إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿٣٨﴾ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ
فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ ۚ
وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿٣٩﴾

বললেন, "হে মূসা! তুমি যা চেয়েছো তা তোমাকে দেয়া হলো। আমি আর একবার তোমার প্রতি অনুগ্রহ করলাম।[১৭] সে সময়ের কথা মনে করো যখন আমি তোমার মাকে ইশারা করেছিলাম, এমন ইশারা যা অহীর মাধ্যমে করা হয়, এই মর্মে যে, এ শিশুকে সিন্দুকের মধ্যে রেখে দাও এবং সিন্দুকটি দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও, দরিয়া তাকে তীরে নিক্ষেপ করবে এবং আমার শত্রু ও এ শিশুর শত্রু একে তুলে নেবে। আমি নিজের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করেছিলাম এবং এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।

(এ পর্যন্ত যার কোনো প্রয়োজন তাঁর দেখা দেয়নি) তাহলে তাঁর স্বভাবসুলভ সংকোচ বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। তাই তিনি দোয়া করেন, হে আল্লাহ! আমার জিভের জড়তা দূর করে দাও যাতে আমি নিজের কথা লোকদেরকে ভালোভাবে বুঝাতে পারি। এ বিষয়েই ফেরাউন একবার তাঁকে খোটা দিয়ে বলেছিল। "এ ব্যক্তি তো নিজের কথাই সঠিকভাবে বলতে পারে না" (لَا يَكَادُ يُبِينُ যুখরুফ ৫২) এ দুর্বলতা অনুভব করেই হযরত মূসা নিজের ভাই হারুনকে সাহায্যকারী হিসেবে চান। সূরা কাসাসে তার এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে,

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا

"আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে বাকপটু তাকে সাহায্যকারী হিসেবে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও" (আল কাসাস ঃ আয়াত ৩৪।) পরবর্তী আলোচনায় আরো জানা যায় যে, হযরত মূসার এ দুর্বলতা দূর হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি বেশ জোরদার ভাষণ দিতে শুরু করেছিলেন। কুরআনে ও বাইবেলে তাঁর পরবর্তীকালের যেসব ভাষণ উদ্ধৃত হয়েছে তা উন্নত পর্যায়ের শাব্দিক অলংকার ও বাকপটুতার সাক্ষ দেয়।

জিভে জড়তা আছে এমন একজন তোতলা ব্যক্তিকে আল্লাহ নিজের রসূল নিযুক্ত করবেন, একথা স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি বিরোধী। রসূলরা সবসময় এমন ধরনের লোক হয়েছেন যারা চেহারা, সুরত, ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতার দিকে হয়েছেন সর্বোত্তম, যাদের ভেতর বাইরের প্রতিটি দিক অন্তর ও দৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছে। কোনো রসূলকে এমন কোনো

إِذْ تَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ ۖ فَرَجَعْنَٰكَ إِلَىٰٓ
أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَٰكَ مِنَ ٱلْغَمِّ
وَفَتَنَّٰكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِىٓ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ
قَدَرٍ يَٰمُوسَىٰ ﴿٤٠﴾ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ﴿٤١﴾ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِـَٔايَٰتِى
وَلَا تَنِيَا فِى ذِكْرِى ﴿٤٢﴾ ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُۥ
قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾ قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ
عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿٤٥﴾

স্মরণ করো, যখন তোমার বোন চলছিল, তারপর গিয়ে বললো, "আমি কি তোমাদের তার সন্ধান দেবো, যে এ শিশুকে ভালোভাবে লালন করবে ?" এভাবে আমি তোমাকে আবার তোমার মায়ের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি, যাতে তার চোখ শীতল থাকে এবং সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়। এবং (এটাও স্মরণ করো) তুমি একজনকে হত্যা করে ফেলেছিলে, আমি তোমাকে এ ফাঁদ থেকে বের করেছি এবং তোমাকে বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিয়ে এসেছি, আর তুমি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে কয়েক বছর অবস্থান করেছিলে। তারপর এখন তুমি ঠিক সময়েই এসে গেছো। হে মূসা! আমি তোমাকে নিজের জন্য তৈরি করে নিয়েছি। যাও, তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনগুলোসহ এবং দেখো আমার স্মরণে ভুল করো না। যাও, তোমরা দুজন ফেরাউনের কাছে, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে। তার সাথে কোমলভাবে কথা বলো, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভীত হবে।"[১৮]

উভয়েই[১৮(ক)] বললো, "হে আমাদের রব! আমাদের ভয় হয়, সে আমাদের সাথে বাড়াবাড়ি করবে অথবা আমাদের ওপর চড়াও হবে।"

দোষ সহকারে পাঠানো হয়নি এবং পাঠানো যেতে পারতো না, যে কারণে তিনি লোকদের মধ্যে হাস্যাস্পদ হন অথবা লোকেরা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে।

১৬. বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে হযরত হারুন হযরত মূসার চাইতে তিন বছরের বড় ছিলেন। (যাত্রা পুস্তক ৭ ঃ ৭)

قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِى مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٤٦﴾ فَأْتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ
فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ۖ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَٰكَ بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۖ
وَٱلسَّلَٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰٓ ﴿٤٧﴾ إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ
عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٤٨﴾ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَٰمُوسَىٰ ﴿٤٩﴾ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ
أَعْطَىٰ كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥٠﴾

বললেন, "ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, সবকিছু শুনছি ও দেখছি। যাও তার কাছে এবং বলো, আমরা তোমার রবের প্রেরিত, বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না। আমরা তোমার কাছে নিয়ে এসেছি তোমার রবের নিদর্শন এবং শান্তি তার জন্য যে সঠিক পথ অনুসরণ করে। আমাদের অহীর সাহায্যে জানানো হয়েছে যে, শাস্তি তার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।[১৯]

ফেরাউন[২০] *বললো, "আচ্ছা, তাহলে তোমাদের দুজনের রব কে হে মূসা ?"*[২১]

মূসা জবাব দিল, "আমাদের রব তিনি[২২] *যিনি প্রত্যেক জিনিসকে তার আকৃতি দান করেছেন তারপর তাকে পথনির্দেশ দিয়েছেন।"*[২৩]

১৭. এরপর আল্লাহ হযরত মূসাকে তাঁর জন্ম থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত তাঁর প্রতি যতগুলো অনুগ্রহ করা হয়েছিল, এক এক করে তার সবকটি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন। সূরা কাসাসে এ ঘটনাগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে কেবলমাত্র ইংগিত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে হযরত মূসাকে এ অনুভূতি দান করা যে, এখন যে কাজে তোমাকে নিযুক্ত করা হচ্ছে এ কাজের জন্যই তোমাকে পয়দা করা হয়েছে এবং এ কাজের জন্যই আজ পর্যন্ত বিশেষ সরকারী তত্ত্বাবধানে তুমি প্রতিপালিত হয়ে এসেছো।

১৮. মানুষ দু'ভাবে সঠিক পথে আসে। সে নিজে বিচার-বিশ্লেষণ করে বুঝে-শুনে ও উপদেশবাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করে অথবা অশুভ পরিণামের ভয়ে সোজা হয়ে যায়।

১৮(ক). মনে হচ্ছে এটা এমন সময়ের কথা যখন হযরত মূসা (আ) মিসরে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং হযরত হারুন কার্যত তাঁর সাথে শরীক হয়ে গিয়েছিলেন। সে সময় ফেরাউনের কাছে যাওয়ার আগে উভয়েই আল্লাহর কাছে এ নিবেদন পেশ করে থাকবেন।

১৯. এ ঘটনাটি বাইবেল ও তালমূদে যেভাবে পেশ করা হয়েছে তার ওপর একবার নজর বুলানো দরকার। এর ফলে কুরআন মজীদ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের কথা কেমন মর্যাদা সহকারে বর্ণনা করেছে এবং বনী ইসরাঈলের বর্ণনাসমূহে এর কি চিত্র অংকন করা হয়েছে তা আন্দাজ করা যাবে। বাইবেলের বর্ণনা হচ্ছে, প্রথমবার আল্লাহ যখন মূসাকে বললেন, "এখন আমি তোমাকে ফেরাউনের কাছে পাঠাচ্ছি এ উদ্দেশ্যে যে, তুমি আমার জাতি বনী ইসরাঈলকে মিসর থেকে বের করে আনবে" তখন হযরত মূসা জবাব দিলেন, "ফেরাউনের কাছে যাবার এবং বনী ইসরাঈলকে মিসর থেকে বের করে আনার আমি কে ?" তারপর আল্লাহ হযরত মূসাকে অনেক বুঝালেন, তাঁর মনে শক্তি সঞ্চার করলেন, মুজিযা দান করলেন কিন্তু মূসা আবার একথাই বললেন, "হে আমার প্রভু, বিনয় করি, অন্য যাহার হাতে পাঠাইতে চাও এ বার্তা পাঠাও।" (যাত্রাপুস্তক ৪ ঃ ১৩) তালমূদের বর্ণনা আবার এর চাইতে কয়েক কদম এগিয়ে গেছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃএ ব্যাপারটি নিয়ে আল্লাহ ও হযরত মূসার সাথে সাতদিন পর্যন্ত বাদানুবাদ হতে থাকে। আল্লাহ বলতে থাকেন, নবী হও। কিন্তু মূসা বলতে থাকেন, আমার কণ্ঠই খুলছে না, কাজেই আমি নবী হই কেমন করে। শেষে আল্লাহ বললেন, তুমি নবী হয়ে যাও এতেই আমি খুশী। একথায় হযরত মূসা বললেন, লূতকে বাঁচাবার জন্য আপনি ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন, হাজেরা যখন সারার গৃহ থেকে বের হলেন তখন তার জন্য পাঁচজন ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন, আর এখন নিজের বিশেষ সন্তান (বনী ইসরাঈল)-দেরকে মিসর থেকে বের করে আনার জন্য আপনি আমাকে পাঠাচ্ছেন ? একথায় আল্লাহ অসন্তুষ্ট হলেন এবং তিনি রিসালাতের কাজে তাঁর সাথে হারুনকে শরীক করে দিলেন। আর মূসার সন্তানদের বঞ্চিত করে পৌরহিত্যের দায়িত্ব হারুনের সন্তানদের দিয়ে দিলেন—এগুলোই হচ্ছে প্রাচীন কিতাব এবং নির্লজ্জ লোকেরা এগুলো সম্পর্কে বলে থাকে যে, কুরআনের এ কাহিনীগুলো নাকি এসব কিতাব থেকে নকল করা হয়েছে।

২০. হযরত মূসা কিভাবে ফেরাউনের কাছে পৌছলেন এবং কিভাবে তার সামনে নিজের দাওয়াত পেশ করলেন এসব বিস্তারিত বিবরণ এখানে পরিহার করা হয়েছে। সূরা আরাফের ১৩ রুকূতে এ আলোচনা এসেছে। আর সামনের দিকে সূরা শূআরার ২-৩, সূরা কাসাসের ১৪ এবং সূরা নাযিআতের ১ রুকূতে এ আলোচনা করা হয়েছে।

ফেরাউন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আরাফের ৮৫ টীকা দেখুন।

২১. দুই ভাইয়ের মধ্যে যেহেতু মূল নবী ছিলেন হযরত মূসা (আ) এবং দাওয়াতদানের তিনিই ছিলেন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব তাই ফেরাউন তাঁকে সম্বোধন করে। আর হতে পারে তাঁকে সম্বোধন করার তার আর একটি কারণও থাকতে পারে। অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, সে হযরত হারুনের বাকপটুতা ও উন্নত বাগ্মীতার মুখোমুখি হতে চাচ্ছিল না এবং বাগ্মীতার ক্ষেত্রে হযরত মূসার দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করতে চাচ্ছিল। ইতিপূর্বে এ আলোচনা করা হয়েছে।

ফেরাউনের এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল, তোমরা দুজন আবার কাকে রব বানিয়ে নিয়েছো, মিসর ও মিসরবাসীদের রব তো আমিই। সূরা নাযিআতে তার এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে

যে, اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى হে মিসরবাসীরা! আমি তোমাদের প্রধানতম রব। সূরা যুখরুফে সে দরবারের সমস্ত লোকদেরকে সম্বোধন করে বলে ঃ

يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ

"হে আমার জাতি ! মিসরের রাজত্বের মালিক কি আমি নই ? আর এ নদীগুলো কি আমার নীচে প্রবাহিত হচ্ছে না ?" (৫১ আয়াত) সূরা কাসাসে সে নিজের সভাসদদের সামনে এভাবে হুংকার দিয়ে বলে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ج فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى.

"হে জাতির সরদারগণ! আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ আছে বলে আমি জানি না। হে হামান! কিছু ইট পোড়াও এবং আমার জন্য একটি উঁচু ইমারত নির্মাণ করো। আমি উপরে উঠে একবার দেখি তো এই মূসা কাকে ইলাহ বানাচ্ছে।" (৩৮ আয়াত)

সূরা শূ'আরায় সে হযরত মূসাকে ধমক দিয়ে বলে ঃ

لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ

"যদি আমাকে ছাড়া আর কাউকে ইলাহ বানিয়েছো তাহলে মনে রেখো, তোমাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দেবো।" (২৯ আয়াত)

এর অর্থ এ নয় যে, ফেরাউন তার জাতির একমাত্র মাবুদ ছিল এবং সেখানে তার ছাড়া আর কারো পূজা হতো না। একথা আগেই বলা হয়েছে যে, ফেরাউন নিজেকে সূর্য দেবতার (র' বা রা') অবতার হিসেবে বাদশাহের দাবীদার বলতো। তাছাড়া মিসরের ইতিহাস থেকে একথা প্রমাণিত যে, বহু দেবী ও দেবতার পূজা-উপাসনা করা ছিল এ জাতির ধর্ম। তাই "একমাত্র পূজনীয়" হওয়ার দাবী ফেরাউনের ছিল না। বরং সে কার্যত মিসরের এবং আদর্শগতভাবে সমগ্র মানব জাতির রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের দাবীদার ছিল। সে একথা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না যে, অন্য কোনো সত্তা তার ওপর কর্তৃত্ব করবে, তার প্রতিনিধি এসে তাকে হুকুম দেবে এবং তার কাছে এ হুকুমের আনুগত্য করার দাবী জানাবে। তার আত্মগর্ব ও ঔদ্ধত্যের কারণে কোনো কোনো লোকের ধারণা হয়েছে, সে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো এবং নিজে ইলাহ ও উপাস্য হওয়ার দাবীদার ছিল। কিন্তু একথা কুরআন থেকে প্রমাণিত যে, সে উর্ধ জগতে অন্য কারো শাসন কর্তৃত্ব স্বীকার করতো। সূরা আল মু'মিন ২৮-৩৪ এবং সূরা যুখরুফ ৫৩ আয়াত গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ুন। এ আয়াতগুলো একথা প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ ও ফেরেশতাদের অস্তিত্ব সে অস্বীকার করতো না। তবে তার রাজনৈতিক প্রভুত্বে কেউ হস্তক্ষেপ করবে এবং আল্লাহর কোনো রসূল এসে তার ওপর হুকুম চালাবে, এটা মেনে নিতে সে প্রস্তুত ছিল না। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল কাসাস, ৫৩ টীকা)

২২. অর্থাৎ আমরা সকল অর্থে একমাত্র তাঁকেই রব মানি। প্রতিপালক, প্রভু, মালিক, শাসক ইত্যাকার সকল অর্থেই আমরা তাঁকে ছাড়া আর কাউকেও রব বলে স্বীকার করি না।

২৩. অর্থাৎ দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিস তাঁরই নির্মাণ কৌশলে নির্মিত হয়েছে। প্রত্যেকটি জিনিসকে তিনিই আকার-আকৃতি, গঠনশৈলী, শক্তি, যোগ্যতা, গুণ ও বিশেষত্ব দান করেছেন। দুনিয়ায় কাজ করার জন্য হাতের যে গঠনাকৃতির প্রয়োজন ছিল তা তিনি তাকে দিয়েছেন। পায়ের জন্য যে সর্বাধিক উপযুক্ত গঠনাকৃতির দরকার তা তাকে দিয়েছেন। মানুষ, পশু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ, বাতাস, পানি, আলো প্রত্যেককে তিনি এমন বিশেষ আকৃতি দান করেছেন যা এ বিশ্ব-জাহানে তার নিজের অংশের কাজ ঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন ছিল।

তারপর তিনি প্রত্যেক জিনিসকে কেবল তার বিশেষ আকৃতি দান করেই এমনিভাবে ছেড়ে দেননি। বরং তিনিই সবাইকে পথও দেখিয়েছেন। দুনিয়ায় এমন কোনো জিনিস নেই যাকে তিনি নিজের গঠনাকৃতিকে কাজে লাগাবার এবং নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করার পদ্ধতি শেখাননি। কানকে শুনা ও চোখকে দেখা তিনিই শিখিয়েছেন। মাছকে সাঁতার কাটার ও পাখিকে উড়ার শিক্ষা তিনিই দিয়েছেন। গাছকে ফুল ও ফল দেবার ও মাটিকে উদ্ভিদ উৎপাদন করার নির্দেশ তিনিই দিয়েছেন। মোটকথা তিনি সারা বিশ্ব-জাহান এবং তার সমস্ত জিনিসের শুধুমাত্র স্রষ্টাই নন বরং তাদের শিক্ষক ও পথ প্রদর্শকও।

এ অতুলনীয় ব্যাপক অর্থবহুল ও সংক্ষিপ্ত বাক্যে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম শুধু একথাই বলেননি যে, তাঁর রব কে ? বরং একথাও বলে দিয়েছেন যে, তিনি রব কেন এবং কেন তাঁকে ছাড়া আর কাউকে রব বলে মেনে নেয়া যেতে পারে না। দাবীর সাথে সাথে তার যুক্তি-প্রমাণও এই ছোট্ট বাক্যটির মধ্যে এসে গেছে। একথা সুস্পষ্ট যে, যখন ফেরাউন ও তার প্রত্যেকটি প্রজা তার নিজের বিশেষ অস্তিত্বের জন্য আল্লাহর অনুগৃহীত এবং যখন তাদের এক জনেরও শ্বাসযন্ত্র পাকস্থলী ও হৃদযন্ত্র আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে নিজের কাজ করে না যাওয়া পর্যন্ত সে এক মুহূর্তের জন্যও জীবিত থাকতে পারে না তখন ফেরাউনের নিজেকে লোকদের রব বলে দাবী করা এবং লোকদের কার্যত তাকে নিজেদের রব বলে মেনে নেয়া একটা নির্বুদ্ধিতা ও বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

আবার এ ছোট্ট বাক্যে হযরত মূসা (আ) ইশারায় রিসালাতের যুক্তিও পেশ করে দিয়েছেন। ফেরাউন এই রিসালাত মেনে নিতে অস্বীকার করছিল। হযরত মূসার যুক্তির মধ্যে এ ইংগিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের পথনির্দেশক এবং যিনি প্রত্যেকটি বস্তুকে তার অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে পথ নির্দেশনা দিচ্ছেন, তাঁর পথ নির্দেশনা দেবার বিশ্বজনীন দায়িত্বের অপরিহার্য দাবী হচ্ছে এই যে, তিনি মানুষের সচেতন জীবনের জন্যও পথনির্দেশনা দেবার ব্যবস্থা করবেন। আর মাছ ও মুরগীর জন্য যে ধরনের পথনির্দেশনা উপযোগী, মানুষের সচেতন জীবনের জন্য সে ধরনের পথ নির্দেশনা উপযোগী হতে পারে না। এর সবচেয়ে মানানসই পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, একজন সচেতন মানুষ তাঁর পক্ষ থেকে মানুষদের পথ দেখাবার জন্য নিযুক্ত হবেন এবং তিনি মানুষদের বুদ্ধি ও চেতনার প্রতি আবেদন জানিয়ে তাদেরকে সঠিক-সোজা পথ দেখাবেন।

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْأُوْلٰى ﴿٥١﴾ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ ۚ
لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ﴿٥٢﴾ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ
فِيْهَا سُبُلًا وَّأَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَأَخْرَجْنَا بِهٖٓ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ
شَتّٰى ﴿٥٣﴾ كُلُوْا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۚ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي النُّهٰى ﴿٥٤﴾

ফেরাউন বললো, "আর পূর্ববর্তী বংশধর যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের তাহলে কি অবস্থা ছিল ?"[২৪]

মূসা বললো, "সে জ্ঞান আমার রবের কাছে লিপিবদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। আমার রব ভুলও করেন না, বিস্মৃতও হন না।"[২৫]

—তিনিই[২৬] তোমাদের জন্য যমীনের বিছানা বিছিয়েছেন, তার মধ্যে তোমাদের চলার পথ তৈরি করেছেন এবং ওপর থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর তার মাধ্যমে আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। খাও এবং তোমাদের পশুও চরাও। অবশ্যি এর মধ্যে রয়েছে বুদ্ধিমানের জন্য বহু নিদর্শনাবলী।[২৭]

২৪. অর্থাৎ ব্যাপার যদি এটাই হয়ে থাকে যে, প্রত্যেকটি জিনিসকে আকৃতি দিয়েছেন এবং তাকে দুনিয়ায় কাজ করার পথ বাতলে দিয়েছেন তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো রব নেই, তাহলে এ আমাদের সবার বাপ দাদারা, যারা বংশ পরম্পরায় ভিন্ন প্রভু ও ইলাহর বন্দেগী করে চলে এসেছে তোমাদের দৃষ্টিতে তাদের অবস্থান কোথায় হবে ? তারা সবাই কি গোমরাহ ছিল ? তারা সবাই কি আযাবের হকদার ছিল ? তাদের সবার কি বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছিল ? এ ছিল ফেরাউনের কাছে হযরত মূসার এ যুক্তির জবাব। হতে পারে সে সূর্খতা ও অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে এ জবাব দিয়েছে। আবার দুষ্টামীর কারণেও এ জবাব দিতে পারে। তাছাড়া এ উভয় কারণই এ জবাবের পিছনে সক্রিয় থাকতে পারে। অর্থাৎ সে নিজেও একথায় রাগান্বিত হয়েছে যে, এ ধর্মের কারণে আমাদের সকল বুযর্গ যে পথভ্রষ্ট ছিল তা মেনে নিতে হবে আবার সাথে সাথে নিজের সভাসদ ও সাধারণ মিসরবাসীদের মনে হযরত মূসার দাওয়াতের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করাও এর উদ্দেশ্য হতে পারে। সত্যপন্থীদের সত্য প্রচারের বিরুদ্ধে এ অস্ত্রটি হামেশা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মূর্খদের কাজে ব্যস্ত রাখার জন্য এটা বড়ই প্রভাবশালী প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে যে সময় কুরআনের এ আয়াতগুলো নাযিল হয় সে সময় মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সবচাইতে বেশী এ অস্ত্রটিকেই কাজে লাগানো হয়েছিল। তাই হযরত মূসার মোকাবিলায় ফেরাউনের এ ছলনার উল্লেখ যথার্থই ছিল।

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ﴿٥٥﴾

৩ রুকূ'

এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরই মধ্যে আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো এবং এ থেকেই আবার তোমাদেরকে বের করবো।[২৮]

২৫. এটি হযরত মূসার সে সময় প্রদত্ত একটি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ জবাব। এ থেকে প্রচার কৌশল সম্পর্কে ভালো শিক্ষা লাভ করা যায়। উপরের বর্ণনা অনুসারে ফেরাউনের উদ্দেশ্য ছিল শ্রোতাদের এবং তাদের মাধ্যমে সমগ্র জাতির মনে বিদ্বেষের আগুন জ্বালানো। যদি হযরত মূসা বলতেন, হ্যাঁ, তারা সবাই মূর্খ ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে, তাহলে এটা সত্য কথনের বিরাট আদর্শ হলেও এ জবাব হযরত মূসার পরিবর্তে ফেরাউনের উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতো। তাই তিনি পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা সহকারে এমন জবাব দেন যা ছিল একদিকে যথার্থ সত্য এবং অন্যদিকে ফেরাউনের বিষ দাঁতও উপড়ে ফেলতে সক্ষম। তিনি বলেন, তারা যাই কিছু ছিল, নিজেদের কাজ করে আল্লাহর কাছে পৌঁছে গেছে। তাদের কার্যাবলী এবং কাজের পেছনে নিহিত অন্তরের ইচ্ছাসমূহ জানার কোনো উপায় নেই। কাজেই তাদের ব্যাপারে আমি কোনো সিদ্ধান্ত দিই কেমন করে ? তাদের সমস্ত রেকর্ড আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত আছে। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ও তার কারণসমূহের খবর আল্লাহই জানেন। কোনো জিনিস আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে থাকেনি এবং তাঁর স্মৃতি থেকেও কোনো জিনিস বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। আল্লাহই জানেন তাদের সাথে কি ব্যবহার করতে হবে। তাদের ভূমিকা কি ছিল এবং তাদের পরিণাম কি হবে, তোমার ও আমার একথা চিন্তা করা উচিত নয়। আমাদের চিন্তা করা উচিত আমাদের ভূমিকা কি এবং আমরা কোন ধরনের পরিণামের সম্মুখীন হবো।

২৬. কথার ধরন থেকে বুঝা যাচ্ছে, হযরত মূসার জবাব "বিস্মৃতও হন না"-এ এসে শেষ হয়ে গেছে এবং এখান থেকে শেষ প্যারা পর্যন্ত সমস্ত ভাষ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা ও স্মারক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআনে এ ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। অতীতে ঘটেছে বা আগামীতে ঘটবে এমন কোনো ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে যখন কোনো ব্যক্তির কোনো উক্তি উদ্ধৃত করা হয় তখন তার পরপরই উপদেশ, ব্যাখ্যা বা বিস্তারিত বিবরণ হিসেবে কয়েকটি অতিরিক্ত বাক্য বলা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কথার ধরন থেকেই জানা যায় যে, এগুলো ইতিপূর্বে যে ব্যক্তির কথার আলোচনা চলছিল তার উক্তি নয় বরং আল্লাহর নিজের উক্তি।

উল্লেখ্য এ ভাষ্যের সম্পর্ক কেবলমাত্র নিকটবর্তী বাক্য "আমার রব ভুলও করেন না, বিস্মৃতও হন না"-এর সাথে নেই বরং হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সমগ্র বক্তব্যের সাথে রয়েছে এর সম্পর্ক, যা رَبُّنَا الَّذِيْ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ থেকে শুরু হয়েছে।

২৭. অর্থাৎ যারা ভারসাম্যপূর্ণ সুস্থ বিবেক বুদ্ধি ব্যবহার করে সত্য অনুসন্ধান করতে চান তারা এ নিদর্শনাবলীর সহায়তায় প্রকৃত সত্যের মনযিলে পৌঁছার পথ জানতে পারেন। এ নিদর্শনাবলী তাদেরকে একথা জানিয়ে দেবে যে, এ বিশ্ব-জাহানের একজন রব আছেন

وَلَقَدْ أَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبٰى ﴿٥٦﴾ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا
مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوسٰى ﴿٥٧﴾ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَآ أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾ قَالَ
مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَأَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾ فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ
كَيْدَهٗ ثُمَّ أَتٰى ﴿٦٠﴾

আমি ফেরাউনকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখালাম।[২৯] কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করতে থাকলো এবং মেনে নিল না। বলতে লাগলো, "হে মূসা! তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছো যে, নিজের যাদুর জোরে আমাদের দেশ থেকে আমাদের বের করে দেবে ?[৩০] বেশ, আমরাও তোমার মুকাবিলায় অনুরূপ যাদু আনছি, ঠিক করো কবে এবং কোথায় মুকাবিলা করবে, আমরাও এ চুক্তির অন্যথা করবো না, তুমিও না। খোলা ময়দানে সামনে এসে যাও।"

মূসা বললো, "উৎসবের দিন নির্ধারিত হলো এবং পূর্বাহ্নে লোকদেরকে জড়ো করা হবে।[৩১] ফেরাউন পেছনে ফিরে নিজের সমস্ত কলাকৌশল একত্র করলো এবং তারপর মুকাবিলায় এসে গেলো।[৩২]

এবং সমগ্র রুবুবিয়াত ও এলাহী কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই হাতে কেন্দ্রীভূত। অন্য কোনো রবের জন্য এখানে কোনো অবকাশ নেই।

২৮. অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনিবার্যভাবে তিনটি পর্যায় অতিক্রম করতে হবে। একটি পর্যায় হচ্ছে বর্তমান জগতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, দ্বিতীয় পর্যায়টি মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এবং তৃতীয়টি হচ্ছে কিয়ামতের দিন পুনর্বার জীবিত হবার পরের পর্যায়। এই আয়াতের দৃষ্টিতে এ তিনটি পর্যায়ই অতিক্রান্ত হবে এ যমীনের ওপর।

২৯. অর্থাৎ পৃথিবী ও প্রাণী জগতের যুক্তি-প্রমাণসমূহের নিদর্শনাবলী এবং হযরত মূসাকে (আ) প্রদত্ত যাবতীয় মু'জিযাও। ফেরাউনকে বুঝাবার জন্য হযরত মূসা (আ) যেসব ভাষণ দিয়েছিলেন কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় সেগুলো বর্ণিত হয়েছে এবং তাকে একের পর এক যেসব মুজিযা দেখানো হয়েছিল সেগুলোও কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে।

৩০. যাদু বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে লাঠি ও সাদা হাতকে। সূরা আ'রাফ ও সূরা শূ'আরায় বিস্তারিতভাবে একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত মূসা প্রথম সাক্ষাতের সময় প্রকাশ্য দরবারে একথা পেশ করেছিলেন। এ মু'জিযা দেখে ফেরাউন যেরকম দিশেহারা হয়ে পড়েছিল তা কেবলমাত্র তার এ একটি বাক্য থেকেই আন্দাজ করা যেতে পারে যে,

"তোমার যাদুর জোরে তুমি আমাদের দেশ থেকে আমাদের বের করে দিতে চাও।" কোনো যাদুকর যাদুর জোরে কোনো দেশ জয় করে নিয়েছে, দুনিয়ার ইতিহাসে পূর্বে কখনো এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি এবং পরবর্তীকালেও ঘটতে দেখা যায়নি। ফেরাউনের নিজের দেশে শত শত যাদুকর ছিল, যারা যাদুর খেলা দেখিয়ে পুরস্কার নেবার জন্য হাত পাততো। এ জন্য ফেরাউনের একদিকে হযরত মূসাকে যাদুকর বলা এবং অন্যদিকে তিনি তার রাজ্য ছিনিয়ে নিতে চান বলে আশংকা প্রকাশ করা তার স্পষ্ট দিশেহারা হয়ে যাবার আলামত পেশ করে। আসলে হযরত মূসার ন্যায়সংগত ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা এবং মুজিযাগুলো দেখে সে বুঝতে পেরেছিল যে, শুধুমাত্র তার সভাসদরাই নয় বরং তার সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সকল প্রজাই এ থেকে প্রভাবিত না হয়ে পারবে না। তাই সে মিথ্যা, প্রতারণা ও হিংসার পথে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা শুরু করলো। সে বললো, এসব মু'জিযা নয়, যাদু এবং আমার রাজ্যের প্রত্যেক যাদুকরই এভাবে লাঠিকে সাপ বানিয়ে দেখাতে পারে। সে বললোঃ হে জনতা ! ভেবে দেখো, এ ব্যক্তি তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে পথভ্রষ্ট ও জাহান্নামী গণ্য করছে। সে আরো বললো ঃ হে জনতা ! সাবধান হয়ে যাও, এ ব্যক্তি নবী-টবী কিছুই নয়, এ আসলে ক্ষমতালোভী। এ ব্যক্তি ইউসুফের জামানার মতো আবার বনী ইসরাঈলকে এখানে শাসন কর্তৃত্বে বসিয়ে দিতে এবং কিবতীদের হাত থেকে কর্তৃত্ব ক্ষমতা কেড়ে নিতে চায়। এসব অস্ত্র ব্যবহার করে ফেরাউন সত্যের দাওয়াতকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাচ্ছিল। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আ'রাফ ৮৭, ৮৮ ও ৮৯ টীকা, সূরা ইউনুস ৭৫ টীকা) এ প্রসংগে একথাটিও সামনে রাখতে হবে যে, প্রতি যুগে ক্ষমতাসীন লোকেরা সত্যের আহবায়কদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগই এনেছে যে, তারা ক্ষমতালোভী এবং এ উদ্দেশ্যেই সব কথা বলছে। এর দৃষ্টান্ত দেখুন সূরা আ'রাফের ১১০ ও ১৩৩, সূরা ইউনুসের ৭৮ এবং সূরা আল মু'মিনূনের ২৪ আয়াতসমূহে।

৩১. ফেরাউনের উদ্দেশ্য ছিল, একবার যাদুকরদের লাঠি ও দড়িদড়ার সাহায্যে সাপ বানিয়ে দেখিয়ে দেই তাহলে মূসার মু'জিযার যে প্রভাব লোকদের ওপর পড়ছে তা তিরোহিত হয়ে যাবে। হযরত মূসাও মনেপ্রাণে এটাই চাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এ জন্য কোনো পৃথক দিন ও স্থান নির্ধারণ করার দরকার নেই। উৎসবের দিন কাছেই এসে গেছে। সারা দেশের লোক এদিন রাজধানীতে চলে আসবে। সেদিন যেখানে জাতীয় মেলা অনুষ্ঠিত হবে সেই ময়দানেই এই প্রতিযোগিতা হবে। সমগ্র জাতিই এ প্রতিযোগিতা দেখবে। আর সময়টাও এমন হতে হবে যখন দিনের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, যাতে কারো সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করার কোনো অবকাশই না থাকে।

৩২. ফেরাউন ও তার সভাসদদের দৃষ্টিতে এই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব ছিল অনেক বেশী। তারা এর ফায়সালার সাথে নিজেদের ভাগ্যের ফায়সালা জড়িত মনে করছিল। সারা দেশে লোক পাঠানো হয়। যেখানে যে অভিজ্ঞ-পারদর্শি যাদুকর পাওয়া যায় তাকেই সংগে করে নিয়ে আসার হুকুম দেয়া হয়। এভাবে জনগণকে হাযির করার জন্যও বিশেষভাবে প্রেরণা দান করা হয়। এভাবে বেশী বেশী লোক একত্র হয়ে যাবে এবং তারা স্বচক্ষে যাদুর তেলেসমাতি দেখে মূসার লাঠির ভয় ও প্রভাব থেকে নিজেদেরকে সংরক্ষিত রাখতে পারবে। প্রকাশ্যে বলা হতে লাগলো আমাদের ধর্ম এখন যাদুকরদের তেলেসমাতির

قَالَ لَهُمْ مُّوسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ
وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ﴿٦١﴾ فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ﴿٦٢﴾
قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ
بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ﴿٦٣﴾ فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا
صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ﴿٦٤﴾

মূসা (যথা সময় প্রতিপক্ষ দলকে সম্বোধন করে) বললো,[৩৩] "দুর্ভাগ্যপীড়িতরা ! আল্লাহর প্রতি অপবাদ দিয়ো না,[৩৪] অন্যথায় তিনি কঠিন আযাব দিয়ে তোমাদের ধ্বংস করে দেবেন। যে-ই মিথ্যা রটনা করেছে সে-ই ব্যর্থ হয়েছে।"

একথা শুনে তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে গেলো এবং তারা চুপিচুপি পরামর্শ করতে লাগলো[৩৫] শেষে কিছু লোক বললো,[৩৬] "এরা দুজন তো নিছক যাদুকর, নিজেদের যাদুর জোরে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে উৎখাত করা এবং তোমাদের আদর্শ জীবন যাপন পদ্ধতি ধ্বংস করে দেয়াই এদের উদ্দেশ্য।[৩৭] আজ নিজেদের সমস্ত কলাকৌশল একত্র করে নাও এবং একজোট হয়ে ময়দানে এসো।[৩৮] ব্যস, জেনে রাখো, আজকে যে প্রাধান্য লাভ করবে সেই জিতে গেছে।"

ওপর নির্ভর করছে। তারা জিতলে আমাদের ধর্ম বেঁচে যাবে, নয়তো মূসার ধর্ম চারদিকে ছেয়ে যাবেই। (দেখুন সূরা শূ'আরা ৩ রুকূ)

এ ক্ষেত্রে এ সত্যটিও সামনে থাকা দরকার যে, মিসরের রাজ পরিবার ও অভিজাত শ্রেণীর ধর্ম জনগণের ধর্ম থেকে যথেষ্ট ভিন্ন ছিল। উভয়ের দেবতা ও মন্দির আলাদা ছিল। ধর্মীয় অনুষ্ঠানও এক ধরনের ছিল না। আর মৃত্যুপরের জীবনের ব্যাপারেও মিসরে যার গুরুত্ব ছিল অনেক বেশী, উভয়ের কার্যকর পদ্ধতি ও আদর্শিক পরিণামে অনেক বড় ফারাক পাওয়া যেতো। (দেখুন টয়েনবির লেখা A Study of History বইয়ের ৩১-৩২ পৃষ্ঠা) তাছাড়া মিসরে ইতিপূর্বে যে ধর্মীয় বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার ফলে সেখানকার জনগণের মধ্যে এমন একাধিক গ্রুপ তৈরি হয়ে গিয়েছিল যারা মুশরিকী ধর্মের তুলনায় একটি তাওহীদী ধর্মকে প্রাধান্য দিচ্ছিল অথবা দিতে পারতো। যেমন বনী ইসরাঈল এবং তাদের স্বধর্মীয় লোকেরা। এরা জনসংখ্যার প্রায় এক দশমাংশ ছিল। এ ছাড়াও রাষ্ট্রশক্তির সহযোগিতায় ফেরাউন আমিনোফিস বা আখনাতুন (খৃঃ পূঃ ১৩৭৭-১৩৬০) যে ধর্ম বিপ্লব অনুষ্ঠান করেছিলেন তারপর তখনো পুরো দেড়শ বছরও অতিক্রান্ত হয়নি। এ বিপ্লবের

মাধ্যমে সমস্ত উপাস্যদেরকে খতম করে একমাত্র একক উপাস্য "অতুন"কে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়েছিল। যদিও পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রশক্তির জোরেই এ বিপ্লবের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল তবুও সে তার কিছু না কিছু প্রভাব রেখে গিয়েছিল। এসব অবস্থা সামনে রাখলে সে সময় ফেরাউনের মনে যে ভীতি ও আশংকা জাগছিল তা পুরোপুরি অনুধাবন করা যাবে।

৩৩. হযরত মূসার এ সম্বোধন জনগণের প্রতি ছিল না। কারণ হযরত মূসা মু'জিযা দেখাচ্ছেন, না যাদু দেখাচ্ছেন—তখনো পর্যন্ত জনগণ এ ব্যাপারে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। কাজেই এ সম্বোধন ছিল ফেরাউন ও তার সভাসদদের প্রতি। কারণ তারাই তাঁকে যাদুকর গণ্য করছিল।

৩৪. অর্থাৎ এ মু'জিযাকে যাদু এবং এর নবীকে যাদুকর গণ্য করো না।

৩৫. এ থেকে জানা যায়, এরা মনে মনে নিজেরাই নিজেদের দুর্বলতা অনুভব করছিল। এরা জানতো হযরত মূসা যা কিছু দেখিয়েছেন তা যাদু নয়। এরা প্রথম থেকেই দোটানা মনোভাব ও ভীতি সহকারে এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। তারপর যখন নির্ধারিত সময়ে হযরত মূসা তাদেরকে উচ্চৈস্বরে আহ্বান জানিয়ে সতর্ক করে দিলেন তখন অকস্মাত তাদের দৃঢ় সংকল্প কেঁপে উঠলো। সম্ভবত তারা এ বিষয়ে মতবিরোধ করে থাকবে যে, এত বড় উৎসবে, যেখানে সারা দেশের লোক জমা হয়ে গেছে সেখানে খোলা ময়দানে দিনের উজ্জ্বল আলোকে এ প্রতিযোগিতায় নামা ঠিক হবে কি না। যদি এখানে আমরা পরাজিত হয়ে যাই এবং সবার সামনে যাদু ও মুজিযার ফারাক প্রকাশ হয়ে যায় তাহলে তখন আর করার কিছুই থাকবে না।

৩৬. এ উক্তিকারীরা নিশ্চয়ই হবে ফেরাউনী পার্টির চরমপন্থী গ্রুপ, যারা যে কোনো উপায়ে হযরত মূসার বিরোধিতা করতে প্রস্তুত ছিল। মনে হয়, দূরদর্শী অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ লোকেরা সামনের দিকে এক পা এগিয়ে যেতেও ইতস্তত করছিল। কিন্তু এ চরমপন্থী আবেগমুখর লোকেরা হয়তো বলেছিলঃ অনর্থক দূরের চিন্তা ত্যাগ করো এবং মন স্থির করে প্রতিযোগিতায় নেমে যাও।

৩৭. অর্থাৎ দুটি বিষয় ছিল তাদের মূল প্রতিপাদ্য। এক, যদি যাদুকররাও মূসার মতো লাঠিকে সাপ বানিয়ে দেখিয়ে দেয় তাহলে সাধারণ জন সমাবেশে মূসার যাদুকর হওয়া প্রমাণ হয়ে যাবে। দুই, তারা হিংসার আগুন জ্বালিয়ে শাসক শ্রেণীর মনে অন্ধ আবেগ সৃষ্টি করতে চাচ্ছিল। তাদেরকে এই মর্মে ভয় দেখাচ্ছিল যে, মূসার বিজয় দেশের কর্তৃত্ব ক্ষমতা তোমাদের হস্তচ্যুত হওয়া এবং তোমাদের আদর্শ (Ideal) জীবন যাপন পদ্ধতির অপমৃত্যুর নামান্তর। তারা দেশের প্রভাবশালী শ্রেণীকে ভয় দেখাচ্ছিল এই বলে যে, মূসা যদি দেশের কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে তাহলে তোমাদের এ শিল্প, চারুকলা, সুন্দর ও মোহময় সংস্কৃতি এবং তোমাদের নারী স্বাধীনতা (যার চমৎকার নমুনা হযরত ইউসুফের জামানায় মিসরীয় ললনারা পেশ করেছিল) তথা এমন সবকিছু যেগুলো ছাড়া জীবনের সুখ ও আনন্দ উপভোগ করা যায় না, একেবারেই ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর তো শুরু হবে নিছক "কাঠমোল্লাদের" রাজত্ব যা সহ্য করার চাইতে মরে যাওয়াই ভালো।

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ۝
قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا
تَسْعٰى ۝ فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ۝ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ
اَنْتَ الْاَعْلٰى ۝

যাদুকররা বললো,[৩৯] "হে মূসা! তুমি নিক্ষেপ করবে, না কি আমরাই আগে নিক্ষেপ করবো?"

মূসা বললো, "না, তোমরাই নিক্ষেপ করো।"

অকস্মাত তাদের যাদুর প্রভাবে তাদের দড়িদড়া ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে বলে মূসার মনে হতে লাগলো[৪০] এবং মূসার মনে ভীতির সঞ্চার হলে[৪১] আমি বললাম, "ভয় পেয়ো না, তুমিই প্রাধান্য লাভ করবে।

৩৮. অর্থাৎ এদের মোকাবিলায় সংযুক্ত মোর্চা গঠন করো। এ সময় যদি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ দেখা দেয় এবং প্রতিযোগিতার সংগীন মুহূর্তে সাধারণ জনতার সামনে তোমাদের মধ্যে যদি এ ধরনের কানাকানি ও ইতস্তত ভাব চলতে থাকে তাহলে এখনই পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে এবং লোকেরা মনে করতে থাকবে তোমাদের সত্যপন্থী হবার ব্যাপারে তোমরা নিজেরাই নিশ্চিত নও বরং সংশয় দোলায়িত চিত্তে প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছো।

৩৯. মাঝখানের বিস্তারিত বিবরণ এখানে বর্ণিত হয়নি, যা থেকে জানা যায় যে, উপরোক্ত বক্তব্যের ফলে ফেরাউনের দলের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে এবং প্রতিযোগিতা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে যাদুকরদেরকে প্রকাশ্যে ময়দানে চলে আসার হুকুম দেয়া হয়।

৪০. সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ

"যখন তারা নিজেদের তন্ত্রমন্ত্র ছাড়লো, তখন তা দ্বারা লোকদের দৃষ্টিকে যাদু করলো এবং তাদেরকে আতংকিত করে তুললো।"(১১৬ আয়াত)

এখানে একথা বলা হচ্ছে যে, এ প্রভাব শুধুমাত্র সাধারণ লোকদের ওপর পড়েনি, হযরত মূসাও যাদু প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর চোখই কেবল এটা অনুভব করেনি বরং তাঁর মস্তিষ্কও অনুভব করছিল যে, লাঠি ও দড়িদড়া সাপ হয়ে দৌড়াচ্ছে।

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ
السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ
وَمُوسَىٰ ﴿٧٠﴾ قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي
عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ
فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ۖ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿٧١﴾

ছুঁড়ে দাও তোমার হাতে যাকিছু আছে, এখনি এদের সব বানোয়াট জিনিসগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে,৪২ এরা যাকিছু বানিয়ে এনেছে এতো যাদুকরের প্রতারণা এবং যাদুকর যেভাবেই আসুক না কেন কখনো সফল হতে পারে না।" শেষ পর্যন্ত এই হলো যে, সমস্ত যাদুকরকে সিজদাবনত করে দেয়া হলো৪৩ এবং তারা বলে উঠলো ঃ "আমরা মেনে নিলাম হারুন ও মূসার রবকে।'৪৪

ফেরাউন বললো, "তোমরা ঈমান আনলে, আমি তোমাদের অনুমতি দেবার আগেই ? দেখছি, এ তোমাদের গুরু, এ-ই তোমাদের যাদুবিদ্যা শিখিয়েছিল।৪৫ এখন আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কাটাচ্ছি৪৬ এবং খেজুর গাছের কাণ্ডে তোমাদের শূলিবিদ্ধ করছি৪৭ এরপর তোমরা জানতে পারবে আমাদের দুজনের মধ্যে কার শাস্তি বেশী কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী।'৪৮ (অর্থাৎ আমি না মূসা, কে তোমাদের বেশী কঠিন শাস্তি দিতে পারে।)

৪১. মনে হচ্ছে, যখনই হযরত মূসার মুখ থেকে "নিক্ষেপ করো" শব্দ বের হয়েছে তখনই যাদুকররা অকস্মাত নিজেদের লাঠিসোটা ও দড়িদড়াগুলো তাঁর দিকে ফিঁকে দিয়েছে এবং হঠাৎই তাঁর চোখে ভেসে উঠেছে যেন শত শত সাপ কিলবিল করতে করতে তাঁর দিকে দৌড়ে চলে আসছে। এ দৃশ্য দেখে হযরত মূসা তাৎক্ষণিকভাবে নিজের মধ্যে যদি একটি আশংকার ভাব অনুভব করে থাকেন তাহলে এটা কোনো অবাক হবার কথা নয়। মানুষ তো সর্বাবস্থায় একজন মানুষই। একজন নবী নবী হলেও মানবিক আবেগ-অনুভূতি এবং অন্যান্য মানবিক চাহিদা থেকে তিনি কখনোই মুক্ত নন। তাছাড়া এ সময় হযরত মূসা স্বাভাবিকভাবে এ আশংকাও করে থাকতে পারেন যে, মু'জিযার সাথে এতটা সাদৃশ্যপূর্ণ দৃশ্য দেখে জনসাধারণ নিশ্চয়ই বিভ্রাটে পড়ে যাবে এবং তাদের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়বে।

এখানে একটি কথা অবশ্য উল্লেখযোগ্য। কুরআন এখানে একথার সত্যতা প্রমাণ করছে যে, নবীও যাদু প্রভাবিত হতে পারেন। যদিও যাদুকর তাঁর নবুওয়াত কেড়ে নেবার

অথবা তাঁর প্রতি নাযিলকৃত অহীর মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করার কিংবা যাদুর প্রভাবে তাঁকে পথভ্রষ্ট করার ক্ষমতা রাখে না, তবুও মোটামুটিভাবে কিছুক্ষণের জন্য তাঁর স্নায়ুর ওপর এক ধরনের প্রভাব বিস্তার অবশ্য করতে পারে। এ থেকে যারা হাদীসগ্রন্থগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদুর প্রভাব পড়ার ঘটনাবলী পাঠ করে শুধুমাত্র এ রেওয়ায়াতগুলোকে মিথ্যা বলেই ক্ষান্ত হন না বরং আরো সামনে অগ্রসর হয়ে সমগ্র হাদীস শাস্ত্রকেই অনির্ভরযোগ্য গণ্য করতে থাকেন, তাদের চিন্তাধারার গলদও সামনে এসে যাবে।

৪২. হতে পারে, মু'জিযার মাধ্যমে যে অজগর সৃষ্টি হয়েছিল তা সামনের যেসব লাঠি ও দড়িদড়া সাপের মতো দেখাচ্ছিল সেগুলোকে গিলে ফেলেছিল। কিন্তু এখানে এবং কুরআনের অন্যান্য স্থানে যেসব শব্দের সাহায্যে এ ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে বাহ্যত অনুমিত হয় যে, এ অজগরটি লাঠি ও দড়িগুলো গিলে ফেলেনি বরং যে যাদুর প্রভাবে সেগুলো সাপ বলে মনে হচ্ছিল সে প্রভাবটিই নষ্ট করে দিয়েছিল। সূরা আ'রাফ ও সূরা শূ'আরার শব্দাবলী হচ্ছে ঃ

تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ

"যে মিথ্যা তারা তৈরী করছিল তাকে সে গিলে ফেলছিল।" আর এখানে এ শব্দাবলী হচ্ছে ঃ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا "সে গিলে ফেলবে তা, যা তারা তৈরী করে রেখেছে।" একথা স্পষ্ট যে, তাদের মিথ্যা ও কৃত্রিমতা তাদের লাঠি ও দড়িদড়া ছিল না বরং তা ছিল তাদের যাদু, যার বদৌলতে সেগুলোকে সাপের মতো দেখা যাচ্ছিল। তাই আমাদের মতে এ অজগরটি যেদিকেই গেছে সেদিকেই লাঠি ও দড়িগুলো গিলে নিয়ে এমনভাবে পেছনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে যার ফলে প্রত্যেকটি লাঠি ও দড়ি স্ব স্ব স্থানে পড়ে রয়েছে।

৪৩. অর্থাৎ মূসার লাঠির কৃতিত্ব দেখার সাথে সাথেই তাদের বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, এটি নিশ্চিতভাবেই মু'জিযা, যাদু কোনোক্রমেই নয়। তাই তারা হঠাৎ স্বতস্ফূর্তভাবে সিজদাবনত হয়, যেন কেউ তাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে ফেলে দিয়েছে।

৪৪. এর মানে হচ্ছে সেখানে সবাই জানতো কিসের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা হচ্ছে। সমগ্র জনসমাবেশে একজনও এ ভুল ধারণা পোষণ করতো না যে, মূসার ও যাদুকরদের কলাকৌশলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হচ্ছে এবং কার কৌশল শক্তিশালী সেটিই এখন দেখার বিষয়। সবাই জানতো, একদিকে মূসা নিজেকে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহর নবী হিসেবে পেশ করছেন এবং নিজের নবুওয়াতের প্রমাণস্বরূপ দাবী করছেন যে, তাঁর লাঠি অলৌকিকভাবে অজগরে পরিণত হয়। অন্যদিকে যাদুকরদেরকে জনসমক্ষে আহ্বান করে ফেরাউন একথা প্রমাণ করতে চায় যে, লাঠির অজগরে পরিণত হওয়ার অলৌকিক কর্ম নয় বরং নিছক যাদুর তেলেসমাতি। অন্যকথায়, সেখানে ফেরাউন ও যাদুকর এবং সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সমগ্র দর্শকমণ্ডলী মু'জিযা ও যাদুর পার্থক্য অবগত ছিল। কাজেই সেখানে এ মর্মে পরীক্ষা চলছিল যে, মূসা যা কিছু দেখাচ্ছেন তা যাদুর পর্যায়ভুক্ত, না রব্বুল আলামীনের অসীম কোনো ক্ষমতা ছাড়া অন্য ক্ষমতার সাহায্যে যে মু'জিযা দেখানো যেতে পারে না তার পর্যায়ভুক্ত ? এ কারণে যাদুকররা নিজেদের যাদুকে পরাভূত হতে দেখে

একথা বলেনি, "আমরা মেনে নিলাম, মূসা আমাদের চাইতে বড় যাদুকর।" বরং সংগে সংগেই তাদের বিশ্বাস জন্মে গেছে যে, মূসা যথার্থই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাচ্চা পয়গম্বর। তারা চিৎকার করে বলে উঠেছে, আমরা সে আল্লাহকে মেনে নিয়েছি, যার পয়গম্বর হিসেবে মূসা ও হারুন এসেছেন।

এ থেকে সাধারণ জন সমাবেশে এ পরাজয়ের কি প্রভাব পড়ে থাকবে এবং সারা দেশবাসী এর দ্বারা কি সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকবে তা অনুমান করা যেতে পারে। ফেরাউন দেশের সবচেয়ে বড় কেন্দ্রীয় মেলায় এ প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করেছিল এ আশায় যে, মিসরের সব এলাকা থেকে আগত লোকেরা স্বচক্ষে দেখে নেবে লাঠি দিয়ে সাপ তৈরি করা মূসা একার কোনো অভিনব কৃতিত্ব নয়, প্রত্যেক যাদুকরই এটা করতে পারে। ফলে মূসার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে। কিন্তু তার এ কৌশলের ফাঁদে সে নিজেই আটকে গেছে এবং গ্রাম গ্রামান্তর থেকে আগত লোকদের সামনে যাদুকররাই একযোগে একথার সত্যতা প্রকাশ করেছে যে, মূসা যা কিছু দেখাচ্ছেন তা যাদু নয়, তা হচ্ছে মূলত মু'জিযা। কেবলমাত্র আল্লাহর নবীগণই এ মু'জিযা দেখাতে পারেন।

৪৫. সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا .

"এটি একটি ষড়যন্ত্র, তোমরা রাজধানীতে বসে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে তার মালিকদেরকে হটিয়ে দেবার জন্য এ ষড়যন্ত্র করেছো।"

এখানে এ উক্তিটির বিস্তারিত বর্ণনা আবার এভাবে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে যে শুধু পারস্পরিক যোগসাজশ আছে তাই নয় বরং মনে হচ্ছে এ মূসা তোমাদের দলের চাঁই ও গুরু। তোমরা মু'জিযার কাছে পরাজিত হওনি বরং নিজেদের গুরুর যাদুর পাতানো খেলার কাছে পরাজিত হয়েছো। বুঝা যাচ্ছে, তোমরা নিজেদের মধ্যে এ মর্মে পরামর্শ করে এসেছো যে, নিজেদের গুরুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে এবং একে তার নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে পেশ করে এখানে রাজনৈতিক বিপ্লবের সূচনা করবে।

৪৬. অর্থাৎ একদিকের হাত ও অন্যদিকের পা।

৪৭. শূলিবিদ্ধ করার প্রাচীন পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ ঃ একটি লম্বা কড়িকাঠ মাটিতে গেড়ে দেয়া হতো। অথবা পুরাতন গাছের গুড়ি এ কাজে ব্যবহৃত হতো। এর মাথার ওপর একটি তখ্‌তা আড়াআড়িভাবে বেঁধে দেয়া হতো। অপরাধীকে উপরে উঠিয়ে তার দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে তখ্‌তার গায়ে পেরেক মেরে আটকে দেয়া হতো। এভাবে অপরাধী তখ্‌তার সাথে ঝুলতে থাকতো এবং ঘন্টার পর ঘন্টা কাতরাতে কাতরাতে মৃত্যুবরণ করতো। লোকদের শিক্ষালাভের জন্য শূলিদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে এভাবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হতো।

৪৮. এটা ছিল হেরে যাওয়া খেলায় জয়লাভ করার জন্য ফেরাউনের সর্বশেষ চাল। সে যাদুকরদেরকে ভয়াবহতম শাস্তির ভয় দেখিয়ে তাদের মুখ থেকে এ স্বীকারোক্তি আদায় করতে চাচ্ছিল যে, সত্যি তাদের ও মূসা আলাইহিস সালামের মধ্যে গোপন যোগসাজশ

قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِىْ فَطَرَنَا فَاقْضِ
مَآ اَنْتَ قَاضٍ ؕ اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾ اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا
لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿٧٣﴾
اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ؕ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ﴿٧٤﴾
وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ
الْعُلٰى ﴿٧٥﴾ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ
وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ﴿٧٦﴾

যাদুকররা জবাব দিল, "সেই সত্তার কসম! যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, উজ্জ্বল সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সামনে এসে যাওয়ার পরও আমরা (সত্যের ওপর) তোমাকে প্রাধান্য দেবো, এটা কখনো হতে পারে না।৪৯ তুমি যা কিছু করতে চাও করো। তুমি বড়জোর এ দুনিয়ার জীবনের ফায়সালা করতে পারো। আমরা তো আমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের ভুল-ত্রুটিগুলো মাফ করে দেন এবং এ যাদুবৃত্তিকেও ক্ষমা করে দেন, যা করতে তুমি আমাদের বাধ্য করেছিলে। আল্লাহই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই স্থায়িত্ব লাভকারী।"—প্রকৃতপক্ষে৫০ যে ব্যক্তি অপরাধী হয়ে নিজের রবের সামনে হাযির হবে তার জন্য আছে জাহান্নাম, যার মধ্যে সে না জীবিত থাকবে, না মরবে।৫১ আর যারা তার সামনে মুমিন হিসেবে সৎকাজ করে হাযির হবে তাদের জন্য রয়েছে সুমহান মর্যাদা, চির হরিৎ উদ্যান, যার পাদদেশে প্রবাহিত হবে নদী, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এ হচ্ছে পুরস্কার সেই ব্যক্তির যে পবিত্রতা অবলম্বন করে।

ছিল এবং তারা তাঁর সাথে মিলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিল। কিন্তু যাদুকরদের দৃঢ় সংকল্প ও অবিচল নিষ্ঠা তার এ চাল উল্টে দিল। তারা এ ভয়ংকর শাস্তি বরদাশ্‌ত করতে প্রস্তুত হয়ে সারা দুনিয়ার মানুষকে একথা নিশ্চতভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, নিছক হেরে যাওয়া খেলায় জয়লাভ করার জন্য একটি নির্লজ্জ রাজনৈতিক চাল হিসেবে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য এই যে, তারা সাচ্চা দিলে মূসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াতের প্রতি ঈমান এনেছে।

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا
فِى ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَٰفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿٧٧﴾ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ
بِجُنُودِهِۦ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُۥ
وَمَا هَدَىٰ ﴿٧٩﴾

৪ রুকূ'

আমি[৫২] মূসার কাছে অহী পাঠালাম যে, এবার রাতারাতি আমার বান্দাদের নিয়ে বের হয়ে পড়ো এবং তাদের জন্য সাগরের বুকে শুকনা সড়ক বানিয়ে নাও।[৫৩] কেউ তোমাদের পিছু নেয় কিনা সে ব্যাপারে একটুও ভয় করো না এবং (সাগরের মাঝখান দিয়ে পার হতে গিয়ে) শংকিত হয়ো না।

পিছন থেকে ফেরাউন তার সেনাবাহিনী নিয়ে পৌঁছলো এবং তৎক্ষণাত সমুদ্র তাদের ওপর ছেয়ে গেলো যেমন ছেয়ে যাওয়া সমীচীন ছিল।[৫৪] ফেরাউন তার জাতিকে পথভ্রষ্ট করেছিল, কোনো সঠিক পথ দেখায়নি।[৫৫]

৪৯. এ আয়াতের দ্বিতীয় অনুবাদ এও হতে পারে ঃ "আমাদের সামনে যেসব উজ্জ্বল নিদর্শন এসে গেছে এবং যে সত্তা আমাদের সৃষ্টি করেছেন তার মোকাবিলায় আমরা কোনোক্রমেই তোমাকে প্রাধান্য দিতে পারি না।"

৫০. যাদুকরদের উক্তির সাথে এটা আল্লাহর বাড়তি উক্তি। বক্তব্যের ধরন থেকেই একথা বুঝা যাচ্ছে যে, এ বাক্য যাদুকরদের উক্তির অংশ নয়।

৫১. অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে। পুরোপুরি মৃত্যু হবে না। যার ফলে তার কষ্ট ও বিপদের সমাপ্তি সূচিত হবে না। আবার জীবনকে মৃত্যুর ওপর প্রাধান্য দেবার মতো জীবনের কোনো আনন্দও লাভ করবে না। জীবনের প্রতি বিরূপ হবে কিন্তু মৃত্যু লাভ করবে না। মরতে চাইবে কিন্তু মরতে পারবে না। কুরআন মজীদে জাহান্নামের আযাবের যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে এ অবস্থাটি হচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভয়াবহ। এর কল্পনায়ও হৃদয়-মন কেঁপে ওঠে।

৫২. এরপর দীর্ঘদিন মিসরে অবস্থানকালে যা কিছু ঘটেছিল সেসব আলোচনা মাঝখানে বাদ দেয়া হয়েছে। এ ঘটনাবলী বিস্তারিত জানার জন্য সূরা আ'রাফ ১৫-১৬, সূরা ইউনুস ৯, সূরা মু'মিন ৩-৫ এবং সূরা যুখরুফ ৫ রুকূ' দেখুন।

৫৩. এ সংক্ষিপ্ত কথাটির বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে এই যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ একটি রাত নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এ রাতে সমস্ত ইসরাঈলী ও অইসরাঈলী মুসলমানদের

(যাদের জন্য ব্যাপক অর্থবোধক 'আমার বান্দাদের' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে) মিসরের সকল এলাকা থেকে হিজরত করে বের হয়ে পড়ার কথা ছিল। তারা সবাই একটি পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হয়ে একটি কাফেলার আকারে রওয়ানা হলো। এ সময় সুয়েজ খালের অস্তিত্ব ছিল না। লোহিত সাগর থেকে ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত এলাকাটাই উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু সে এলাকার সকল পথেই ছিল সেনানিবাস। ফলে সেখান দিয়ে নিরাপদে অতিক্রম করা সম্ভবপর ছিল না। তাই হযরত মূসা লোহিত সাগরের পথ ধরলেন। সম্ভবত তাঁর পরিকল্পনা ছিল সাগরের তীর ধরে এগিয়ে গিয়ে সিনাই উপদ্বীপের দিকে চলে যাবেন। কিন্তু সেদিক থেকে ফেরাউন একটি বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে ঠিক এমন সময় পৌঁছে গেলো যখন এ কাফেলা সবেমাত্র সাগরের তীরেই উপস্থিত হয়েছিল। সূরা শূ'আরায় বলা হয়েছে, মুহাজিরদের কাফেলা ফেরাউনের সেনাদল ও সমুদ্র দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ঘেরাও হয়ে গিয়েছিল। ঠিক এমনি সময় মহান আল্লাহ হযরত মূসাকে হুকুম দিলেন اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ "সমুদ্রের ওপর তোমার লাঠি মারো।"

فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ

"তখন সাগর ফেটে গেলো এবং তার প্রত্যেকটি টুকরো একটি বড় পর্বত শৃংগের মতো দাঁড়িয়ে গেলো।"

আর মাঝখান দিয়ে শুধু কাফেলার পার হয়ে যাবার পথ তৈরি হয়ে গেলো না বরং উপরের আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী মাঝখানের এ অংশ শুকিয়ে খটখটে সড়কের আকার ধারণ করলো। এটি সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য মু'জিযার বর্ণনা । এ থেকে যারা একথা বলে থাকেন যে, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বা জোয়ার ভাটার ফলে সমুদ্রের পানি সরে গিয়েছিল তাদের কথার গলদ সহজেই ধরা পড়ে। কারণ এভাবে যে পানি সরে যায় তা দু'দিকে পর্বত শৃংগের মতো খাড়া হয়ে থাকে না এবং মাঝখানের পানি বিহীন অংশ শুকিয়ে রাস্তা তৈরি হয়ে যায় না। (আরো বেশী জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা শূ'আরা ৪৭ টীকা দেখুন।)

৫৪. সূরা শূ'আরায় বলা হয়েছে, মুহাজিরদের সাগর অতিক্রম করার পর পরই ফেরাউন তার সৈন্য সামন্তসহ সমুদ্রের বুকে তৈরি হওয়া এ পথে নেমে পড়লো। (৬৩-৬৪ আয়াত) এখানে বলা হয়েছে, সমুদ্র তাকে ও তার সেনাদেরকে ডুবিয়ে মারলো। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈল সমুদ্রের অন্য তীর থেকে ফেরাউন ও তার সেনাদলকে ডুবে যেতে দেখছিল। (৫০ আয়াত) অন্যদিকে সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে, ডুবে যাবার সময় ফেরাউন চিৎকার করে উঠলো ঃ

اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآئِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"আমি মেনে নিয়েছি যে আর কোনো ইলাহ নেই সেই ইলাহ ছাড়া যাঁর প্রতি বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে এবং আমিও মুসলমানদের অন্তরভুক্ত।"

কিন্তু এ শেষ মুহূর্তের ঈমান গৃহীত হয়নি এবং জবাব দেয়া হলো ঃ

آلْئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ○ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ـ

"এখন ঈমান আনছো ? আর ইতিপূর্বে এমন অবস্থা ছিল যে, নাফরমানীতেই ডুবে ছিলে এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করেই চলছিলে। বেশ, আজ আমি তোমার লাশটাকে রক্ষা করছি, যাতে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে থাকে।"(৯০-৯২ আয়াত)

৫৫. অতি সূক্ষ্মভাবে মক্কার কাফেরদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে এই মর্মে যে, তোমাদের সরদার ও নেতারাও তোমাদের সে একই পথে নিয়ে যাচ্ছে যেপথে ফেরাউন তার জাতিকে নিয়ে যাচ্ছে। এখন তোমরা নিজেরাই দেখে নাও যে, এটা সঠিক পথ নির্দেশনা ছিল না।

এ কাহিনী শেষ করতে গিয়ে মনে হয় বাইবেলের বর্ণনাবলীও পর্যালোচনা করা দরকার। এভাবে যারা বলে থাকে কুরআনের এ কাহিনী বনী ইসরাঈলের থেকে নকল করা হয়েছে তাদের মিথ্যার হাটে হাড়ি ভেঙে যাবে। বাইবেলের যাত্রা পুস্তকে (Exodus) এ কাহিনীর যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে তার নিম্নোক্ত অংশগুলো প্রণিধানযোগ্য ঃ

এক ঃ ৪ অধ্যায়ের ২-৫ শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ লাঠির মু'জিযা হযরত মূসাকে দেয়া হয়েছিল। আবার ১৭ শ্লোকে তাঁকেই এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, "আর তুমি এ যষ্টি হস্তে করিবে, ইহা দ্বারাই তোমাকে সেই সকল চিহ্ন-কার্য করিতে হইবে।" কিন্তু সামনের দিকে গিয়ে জানা গেল না কেমন করে এ লাঠি হযরত হারুনের হাতে চলে গেলো এবং তিনিই এর সাহায্যে মু'জিযা দেখাতে থাকলেন। ৭ অধ্যায় থেকে নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা অনবরত হযরত হারুনকেই লাঠির মু'জিযা দেখাতে দেখি।

দুই ঃ ৫ অধ্যায়ে ফেরাউনের সাথে হযরত মূসার প্রথম সাক্ষাতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আল্লাহর একত্ব ও রুবুবিয়াত সম্পর্কে হযরত মূসা ও ফেরাউনের মধ্যে যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল আদতে তার কোনো উল্লেখই নেই। ফেরাউন বললো; "সদা প্রভূ কে যে, আমি তাহার কথা শুনিয়া ইসরাঈলকে ছাড়িয়া দিব ? আমি সদা প্রভুকে জানি না।" কিন্তু মূসা ও হারুন এর এছাড়া আর কোনো জবাব দিলেন না, "ইব্রীয়দের ঈশ্বর আমাদিগকে দর্শন দিয়াছেন।"(৫ ঃ ২-৩)

তিন ঃ যাদুকরদের সাথে প্রতিযোগিতার সমগ্র কাহিনী নিচের মাত্র এই ক'টি বাক্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

পরে সদাপ্রভু মোশি ও হারোনকে কহিলেন, ফরৌন যখন তোমাদিগকে বলে, তোমরা আপনাদের পক্ষে কোনো অদ্ভুত লক্ষণ দেখাও, তখন তুমি হারোনকে বলিও, তোমার যষ্টি লইয়া ফরৌনের সামনে নিক্ষেপ কর, তাহাতে তাহা সর্প হইবে। তখন মোশি ও হারোন ফেরাউনের নিকট গিয়া সদা প্রভুর আজ্ঞানুসারে কর্ম করিলেন, হারোন ফরৌনের ও তাঁহার দাসগণের সম্মুখে আপন যষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে

তাহা সর্প হইল। তখন ফরৌনও বিদ্বানদিগকে ও গুণীদিগকে ডাক দিলেন, তাহাতে তাহারা অর্থাৎ মিস্রীয় মন্ত্রবেত্তারাও আপনাদের মায়াবলে সেই রূপ করিল। ফলত তাহারা আপন আপন যষ্টি নিক্ষেপ করিলে সে সকল সর্প হইল, কিন্তু হারোনের যষ্টি তাহাদের সকল যষ্টিকে গ্রাস করিল।" (৭ ঃ ৮-১২)

কুরআনের বর্ণনার সাথে এ বর্ণনা মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। মূল কাহিনীর সমগ্র প্রাণশক্তি কি মারাত্মকভাবে এখানে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, উৎসবের দিন খোলা ময়দানে যথারীতি চ্যালেঞ্জের পর প্রতিযোগিতা হওয়া এবং তারপর পরাজয়ের পর যাদুকরদের ঈমান আনা ছিল মূলত এ কাহিনীর প্রাণ। কিন্তু এখানে তার কোনো উল্লেখই করা হয়নি।

চার ঃ কুরআন বলছে, বনী ইসরাঈলদের মুক্তি ও স্বাধীনতাই ছিল হযরত মূসার দাবী। বাইবেল বলছে, তাঁর দাবী কেবল এতটুকুই ছিল ঃ "আমরা বিনয় করি, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করণার্থে আমাদিগকে তিন দিনের পথ প্রান্তরে যাইতে দিউন, (যাত্রা পুস্তক ৫ ঃ ৩)

পাঁচ ঃ মিসর থেকে বের হওয়া এবং ফেরাউনের ডুবে যাওয়ার ঘটনা ১১ থেকে ১৪ অধ্যায়ের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য ও কুরআনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার বিস্তারিত রূপও আমরা দেখতে পাই। আবার এই সংগে অনেকগুলো অদ্ভুত কথাও জানা যায়। যেমন ১৪ অধ্যায়ের ১৫-১৬ শ্লোকে হযরত মূসাকে হুকুম দেয়া হচ্ছে ঃ "তুমি আপন যষ্টি (জি হাঁ, এখন যষ্টি হযরত হারুনের হাত থেকে নিয়ে হযরত মূসার হাতে দেয়া হয়েছে) তুলিয়া সমুদ্রের উপরে হস্ত বিস্তার কর, সমুদ্রকে দুই ভাগ কর ; তাহাতে ইস্রায়েল সন্তানেরা শুষ্ক পথে সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিবে। কিন্তু সামনের দিকে গিয়ে ২১-২২ শ্লোকে বলা হচ্ছে ঃ "মোশি (মূসা) সমুদ্রের উপর আপন হস্ত বিস্তার করিলেন তাহাতে সদা প্রভু সেই সমস্ত রাত্রি ব্যাপি প্রবল পূর্বীয় বায়ু দ্বারা সমুদ্রকে সরাইয়া দিলেন ও তাহা শুষ্ক ভূমি করিলেন, তাহাতে জল দুই ভাগ হইল। আর ইস্রায়েল সন্তানেরা শুষ্ক পথে সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং তাহাদের দক্ষিণে ও বামে জল প্রাচীর স্বরূপ হইল।" বুঝতে পারা গেল না যে, এটা মু'জিযা ছিল, না ছিল প্রাকৃতিক ঘটনা ? যদি মু'জিযা থেকে থাকে তাহলে তা লাঠির আঘাতেই সৃষ্ট হয়ে থাকবে, যেমন কুরআনে বলা হয়েছে। আর যদি সত্যি প্রাকৃতিক ঘটনা হয়ে থাকে তাহলে পূর্বীয় বায়ু সমুদ্রকে মাঝখান থেকে ফেড়ে পানিকে দু'দিকে দেয়ালের মতো দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এবং মাঝখানে শুকনো পথ বানিয়ে দিয়েছে, এটা তো দস্তুরমতো বিস্ময়ের ব্যাপার। প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বাতাস কি কখনো এমনি ধরনের কোনো আযব কাণ্ড ঘটিয়েছে ?

তালমূদের বর্ণনা বাইবেল থেকে তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন এবং কুরআনের অনেকটা কাছাকাছি। কিন্তু উভয়ের মোকাবিলা করলে পরিষ্কার অনুভূত হয়, এক জায়গা সরাসরি অহী জ্ঞানের ভিত্তিতে ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে এবং অন্য জায়গায় শত শত বছরের জনশ্রুতির মাধ্যমে প্রচলিত বর্ণনাই ঘটনার রূপ নিয়েছে। যার ফলে তা যথেষ্ট বিকৃত হয়েছে। দেখুন ঃ The talmud Selcsction, H. Polano, pp, 150-54

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ
الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۝ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ
وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ ۚ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ
هَوٰى ۝ وَاِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ۝

হে বনী ইসরাঈল![৫৬] আমি তোমাদের শত্রুদের হাত থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছি এবং তূরের ডান পাশে[৫৭] তোমাদের উপস্থিতির জন্য সময় নির্ধারণ করেছি[৫৮] আর তোমাদের প্রতি মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ করেছি[৫৯]—খাও আমার দেয়া পবিত্র রিযিক এবং তা খেয়ে সীমালংঘন করো না, অন্যথায় তোমাদের ওপর আমার গযব আপতিত হবে। আর যার ওপর আমার গযব আপতিত হয়েছে তার পতন অবধারিত। তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তারপর সোজা-সঠিক পথে চলতে থাকে তার জন্য আমি অনেক বেশী ক্ষমাশীল।[৬০]

৫৬. মাঝখানে সমুদ্র পার হওয়া থেকে নিয়ে সিনাই পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে যাওয়ার ঘটনা বলা হয়নি। সূরা আ'রাফের ১৬-১৭ রুকূ'তে এর বিস্তারিত বিবরণ এসে গেছে। সেখানে একথাও বলা হয়েছে যে, মিসর থেকে বের হয়েই সিনাই উপদ্বীপে একটি মন্দির দেখে বনী ইসরাঈল নিজেদের জন্য একজন কৃত্রিম খোদার দাবী করে বসেছিল। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা আ'রাফ, ৯৮ টীকা)

৫৭. অর্থাৎ তূর পাহাড়ের পূর্ব পাদদেশে।

৫৮. সূরা বাকারার ৬ রুকূ' ও সূরা আ'রাফের ১৭ রুকূ'তে বলা হয়েছে, আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে শরীয়াতের নির্দেশনা দেবার জন্য চল্লিশ দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করেছিলেন। এর পর মূসা আলাইহিস সালামকে পাথরের ফলকে লিখিত বিধান দেয়া হয়েছিল।

৫৯. মান্না ও সাল্‌ওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা বাকারাহ ৭৩ ও সূরা আ'রাফ ১১৯ টীকা। বাইবেলের বর্ণনা মতে মিসর থেকে বের হবার পর যখন বনী ইসরাঈল সীন মরুভূমিতে ইলীম ও সীনাইর মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল এবং মজুদ খাদ্য খতম হয়ে গিয়ে অনাহার অর্ধাহারের পালা শুরু হয়ে গিয়েছিল তখনই মান্না ও সালওয়ার অবতরণ শুরু হয় এবং ফিলিস্তিনের জনবসতিপূর্ণ এলাকায় পৌঁছে যাওয়া পর্যন্ত পুরো চল্লিশ বছর ধরে এ ধারাবাহিক কার্যক্রম চলতে থাকে। (যাত্রা পুস্তক ১৬ অধ্যায়, গণনা পুস্তক ১১ ঃ ৭-৯, যিহেশূয় ৫ ঃ ১২) যাত্রা পুস্তকে মান্না ও সালওয়ার নিম্নোক্ত অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَٰمُوسَىٰ ﴿٨٣﴾ قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرِى
وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٤﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنۢ
بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِىُّ ﴿٨٥﴾ فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَٰنَ
أَسِفًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ
أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى ﴿٨٦﴾

আর[৬১] কোন্ জিনিসটি তোমাকে তোমার সম্প্রদায়ের আগে নিয়ে এলো হে মূসা ?[৬২]

সে বললো, "তারা তো ব্যস আমার পেছনে এসেই যাচ্ছে। আমি দ্রুত তোমার সামনে এসে গেছি হে আমার রব! যাতে তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও।"

তিনি বললেন, "ভালো কথা, তাহলে শোনো, আমি তোমার পেছনে তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছি এবং সামেরী[৬৩] তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে।"

ভীষণ ক্রোধ ও মর্মজ্বালা নিয়ে মূসা তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এলো। সে বললো, "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমাদের রব কি তোমাদের সাথে ভালো ভালো ওয়াদা করেননি ?[৬৪] তোমাদের কি দিনগুলো দীর্ঘতর মনে হয়েছে ?[৬৫] অথবা তোমরা নিজেদের রবের গযবই নিজেদের উপর আনতে চাচ্ছিলে, যে কারণে তোমরা আমার সাথে ওয়াদা ভংগ করলে ?"[৬৬]

"পরে সন্ধ্যাকালে ভারুই পক্ষী উড়িয়া আসিয়া শিবির স্থান আচ্ছাদন করিল, এবং প্রাতকালে শিবিরের চারিদিকে শিশির পড়িল। পরে পতিত শিশির উর্দ্ধগত হইলে দেখ ভূমিস্থিত নীহারের ন্যায় সরু বীজাকার সূক্ষ্ম বস্তু বিশেষ প্রান্তরের উপর পড়িয়া রহিল। আর তাহা দেখিয়া ইস্রায়েল সন্তানগণ পরস্পর কহিল উহা কি ? কেননা তাহা কি, তাহারা জানিল না।" (১৬ ঃ ১৩-১৫)

"আর ইস্রায়েল কুল ঐ খাদ্যের নাম মান্না রাখিল তাহা ধনিয়া বীজের মত, শুক্ল বর্ণ, এবং তাহার আস্বাদ মধুমিশ্রিত পিষ্টকের ন্যায় ছিল।"(১৬ ঃ ৩১)

গণনা পুস্তকে আরো বেশী বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

"লোকেরা ভ্রমণ করিয়া তাহা কুড়াইত, এবং যাঁতায় পিষিয়া কিংবা উখলিতে চূর্ণ করিয়া বহুগুণাতে সিদ্ধ করিত, ও তদ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিত ; তৈলপক্ক পিষ্টকের

ন্যায় তাহার আস্বাদ ছিল। রাত্রিতে শিবিরের উপরে শিশির পড়িল ঐ মান্না তাহার উপরে পড়িয়া থাকিত।" (১১ ঃ ৮-৯)

এটাও ছিল একটি মু'জিযা। কারণ চল্লিশ বছর পরে বনী ইসরাঈল যখন খাদ্যের প্রাকৃতিক উপায়-উপকরণ লাভ করলো তখন খাদ্য সরবরাহের এ ধারাটি বন্ধ করে দেয়া হলো। এখন ঐ এলাকায় বাবুই পাখির প্রাচুর্য নেই এবং মান্নাও কোথাও পাওয়া যায় না। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী বনী ইসরাঈল যে এলাকায় চল্লিশ বছর মরুচারী জীবন যাপন করেছিল গবেষক ও অনুসন্ধানকারীরা সেই সমগ্র এলাকা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন। কোথাও তারা মান্নার সাক্ষাত পাননি। তবে ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদেরকে বোকা বানাবার জন্য অবশ্যি মান্নার হালুয়া বিক্রি করে থাকে।

৬০. অর্থাৎ মাগফিরাতের জন্য রয়েছে চারটি শর্ত। এক, তাওবা। অর্থাৎ বিদ্রোহ, নাফরমানী অথবা শিরক ও কুফরী থেকে বিরত থাকা। দুই, ঈমান। অর্থাৎ আল্লাহ ও রসূল এবং কিতাব ও আখেরাতকে সাচ্চা দিলে মেনে নেয়া। তিন, সৎকাজ। অর্থাৎ আল্লাহ ও রসূলের বিধান অনুযায়ী ভালো কাজ করা, চার, সত্যপথাশ্রয়ী হওয়া। অর্থাৎ সত্য-সঠিক পথে অবিচল থাকা এবং তারপর ভুল পথে না যাওয়া।

৬১. এই মাত্র উপরে যে ঘটনার কথা বলা হয়েছে এখান থেকে তার সাথে আলোচনা সম্পৃক্ত হচ্ছে। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা তূর পাহাড়ের ডান দিকে অবস্থান করো এবং চল্লিশ দিনের মেয়াদ শেষ হলে তোমাদের নির্দেশনামা দেয়া হবে।

৬২. এ বাক্য থেকে বুঝা যাচ্ছে, নিজ সম্প্রদায়কে পেছনে রেখে হযরত মূসা আল্লাহর সাথে মোলাকাতের আগ্রহের আতিশয্যে আগে চলে গিয়েছিলেন। তূরের ডান পাশের যেখানকার ওয়াদা বনী ইসরাঈলদের সাথে করা হয়েছিল। সেখানে তখনো কাফেলা পৌঁছুতে পারেনি। ততক্ষণ হযরত মূসা একাই রওয়ানা হয়ে গিয়ে আল্লাহর সামনে হাজিরা দিলেন। এ সময় আল্লাহ ও বান্দার সাথে যা ঘটে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে সূরা আ'রাফের ১৭ রুকূ'তে। হযরত মূসার আল্লাহর সাক্ষাতের আবেদন জানানো এবং আল্লাহর একথা বলা যে, তুমি আমাকে দেখতে পারবে না তারপর আল্লাহর একটি পাহাড়ের ওপর সামান্য তাজাল্লি নিক্ষেপ করে তাকে ভেঙে গুড়ো করে দেয়া এবং হযরত মূসার বেহুশ হয়ে পড়ে যাওয়া, আর তারপর পাথরের তখতিতে লেখা বিধান লাভ করা এসব সেই সময়ের ঘটনা। এখানে এ ঘটনার শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলের গো-বৎস পূজার সাথে সম্পর্কিত অংশটুকুই বর্ণনা করা হচ্ছে। একটি জাতির মধ্যে মূর্তিপূজার সূচনা কিভাবে হয় এবং আল্লাহর নবী এ ফিতনাটি দেখে কেমন অস্থির হয়ে পড়েন, মক্কার কাফেরদেরকে একথা জানানোই এ বর্ণনার উদ্দেশ্য।

৬৩. এটা ঐ ব্যক্তির নাম নয়। বরং শব্দের শেষে সম্বন্ধসূচক ইয়া (ى) ব্যবহারের সুস্পষ্ট আলামত থেকে একথা জানা যায় যে, এটা গোত্র, বংশ বা স্থানের সাথে সম্পর্কিত কোনো শব্দ। তারপর আবার কুরআন যেভাবে আসসামেরী বলে তার উল্লেখ করছে তা থেকে একথাও অনুমান করা যায় যে, সেসময় সামেরী গোত্র, বংশ বা স্থানের বহু লোক ছিল এবং তাদের এক বিশেষ ব্যক্তি ছিল বনী ইসরাঈলের মধ্যে স্বর্ণ নির্মিত গো-বৎস পূজার প্রচলনকারী এ সামেরী। কুরআনের এ জায়গার ব্যাখ্যার জন্য প্রকৃতপক্ষে এর চাইতে

বেশী কিছু বর্ণনার দরকার নেই। কিন্তু এ জায়গায় যা বলা হয়েছে তার বিরুদ্ধে খৃষ্টান মিশনারীরা বিশেষ করে পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদরা কুরআনের বিরুদ্ধে ব্যাপক আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তারা বলেন, (নাউযুবিল্লাহ) এটা কুরআন রচয়িতার মারাত্মক অজ্ঞতার প্রমাণ। কারণ এ ঘটনার কয়েকশ বছর পর খৃষ্টপূর্ব ৯২৫ অব্দের কাছাকাছি সময় ইসরাঈল সাম্রাজ্যের রাজধানী "সামেরীয়া" নির্মিত হয়। তারপর এরও কয়েকশ বছর পর ইসরাঈলী ও অইসরাঈলীদের সমন্বয়ে শংকর প্রজন্মের উদ্ভব হয়, যারা "সামেরী" নামে পরিচিত হয়। তাদের মতে এই সামেরীদের মধ্যে অন্যান্য মুশরিকী বিদআতের সাথে সাথে সোনালী বাছুর পূজার রেওয়াজও ছিল এবং ইহুদীদের মাধ্যমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা শুনে নিয়ে থাকবেন। তাই তিনি একে নিয়ে হযরত মূসার যুগের সাথে জুড়ে দিয়েছেন এবং এ কাহিনী তৈরি করেছেন যে, সেখানে সোনার বাছুর পূজার প্রচলনকারী সামেরী নামে এক ব্যক্তি ছিল। এ ধরনের কথা এরা হামানের ব্যাপারেও বলেছে। কুরআন এই হামানকে ফেরাউনের মন্ত্রী হিসেবে পেশ করেছে। অন্যদিকে খৃষ্টান মিশনারী ও প্রাচ্যবিদরা তাকে ইরানের বাদশাহ আখসোয়ার্সের সভাসদ ও উমরাহ "হামান" এর সাথে মিলিয়ে দিয়ে বলেন, এটা কুরআন রচয়িতার অজ্ঞতার আর একটা প্রমাণ। সম্ভবত এ জ্ঞান ও গবেষণার দাবীদারদের ধারণা প্রাচীন যুগে এক নামের একজন লোক, একটি গোত্র অথবা একটি স্থানই হতো এবং এক নামের দু'জন লোক, গোত্র বা দুটি স্থান হবার আদৌ কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। অথচ প্রাচীনকালের একটি অতি পরিচিত জাতি ছিল সুমেরী। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যুগে ইরাক ও তার আশপাশের এলাকায় এ জাতিটি বসবাস করতো আর এ জাতির বা এর কোনো শাখার লোকদেরকে মিসরে সামেরী বলা হতে পারে এর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তারপর এই সামেরীয়ার মূলের দিকেও নজর দিন। এরি সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতেই তো পরবর্তীকালে উত্তর ফিলিস্তীনের লোকদেরকে সামেরী বলা হতে থাকে। বাইবেলের বর্ণনা মতে ইসরাঈল রাজ্যের শাসক উমরী "সামর" (বা শেমর) নামের এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি পাহাড় কিনেছিলেন যার ওপর পরে তিনি নিজের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। যেহেতু পাহাড়ের সাবেক মালিকের নাম সামর ছিল তাই এ শহরের নাম রাখা হয় সামেরী (বা শামরিয়া)। (১-রাজাবলী ১৬-২৪) এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়,সামেরীয়ার অস্তিত্বলাভের পূর্বে "সামর" নামক লোকের অস্তিত্ব ছিল এবং তার সাথে সম্পর্কিত হয়ে তার বংশ বা গোত্রের নাম সামেরী এবং স্থানের নাম সামেরীয়া হওয়া অবশ্যই সম্ভবপর ছিল।

৬৪. এর অনুবাদ "ভালো ওয়াদা করেননি"ও হতে পারে। মূল ইবারতের যে অনুবাদ আমি করেছি তার অর্থ হচ্ছে, আজ পর্যন্ত তোমাদের রব তোমাদের সাথে যেসব কল্যাণের ওয়াদা করেছেন তার সবই তোমরা লাভ করতে থেকেছো। তোমাদের নিরাপদে মিসর থেকে বের করেছেন। দাসত্ব মুক্ত করেছেন। তোমাদের শত্রুকে তছনছ করে দিয়েছেন। তোমাদের জন্য তাই মরুময় ও পার্বত্য অঞ্চলে ছায়া ও খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ সমস্ত ভালো ভালো ওয়াদা কি পূর্ণ হয়নি ? দ্বিতীয় অনুবাদের অর্থ হবে, তোমাদেরকে শরীয়াত ও আনুগত্যনামা দেবার যে ওয়াদা করা হয়েছিল তোমাদের মতে তা কি কোনো কল্যাণ ও হিতসাধনের ওয়াদা ছিল না ?

قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ
الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾ فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا
جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى ۙ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾ اَفَلَا
يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا ۙ وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾

তারা জবাব দিল, "আমরা স্বেচ্ছায় আপনার সাথে ওয়াদা ভংগ করিনি। ব্যাপার হলো, লোকদের অলংকারের বোঝায় আমরা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং আমরা স্রেফ সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম।"[৬৭]—তারপর[৬৮] এভাবে সামেরীও কিছু ছুঁড়ে ফেললো। এবং তাদের জন্য একটি বাছুরের মূর্তি বানিয়ে নিয়ে এলো, যার মধ্য থেকে গরুর মতো আওয়াজ বের হতো। লোকেরা বলে উঠলো, "এ-ই তোমাদের ইলাহ এবং মূসারও ইলাহ, মূসা একে ভুলে গিয়েছে।" তারা কি দেখছিল না যে, সে তাদের কথারও জবাব দেয় না এবং তাদের উপকার ও ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতাও রাখে না ?

৬৫. দ্বিতীয় অনুবাদ এও হতে পারে, "ওয়াদা পূর্ণ হতে কি অনেক বেশী সময় লাগে যে, তোমরা অধৈর্য হয়ে পড়েছো ?" প্রথম অনুবাদের অর্থ হবে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা এই মাত্র যে বিরাট অনুগ্রহ করেছেন, এর পর কি অনেক বেশী সময় অতীত হয়ে গেছে যে, তোমরা তাঁকে ভুলে গেলে ? তোমাদের বিপদের দিনগুলো কি সুদীর্ঘকাল আগে শেষ হয়ে গেছে যে, তোমরা পাগলের মতো বিপথে ছুটে চলেছো ? দ্বিতীয় অনুবাদের পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, পথনির্দেশনা দেবার যে ওয়াদা করা হয়েছিল তা পূর্ণ হতে তো কোনো প্রকার বিলম্ব হয়নি, যাকে তোমরা নিজেদের জন্য ওজর বা বাহানা হিসেবে দাঁড় করাতে পারো।

৬৬. প্রত্যেক জাতি তার নবীর সাথে যে ওয়াদা করে তার কথাই এখানে বলা হয়েছে। এ ওয়াদা হচ্ছেঃ তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর দেয়া নির্দেশের ওপর অবিচল থাকা এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী না করা।

৬৭. যারা সামেরীর ফিতনায় জড়িয়ে পড়েছিল এটি ছিল তাদের ওজর। তাদের বক্তব্য ছিল, আমরা অলংকার ছুড়ে দিয়েছিলাম। বাছুর তৈরী করার নিয়ত আমাদের ছিল না বা তা দিয়ে কি করা হবে তাও আমাদের জানা ছিল না। এরপর যা কিছু ঘটেছে তা আসলে এমন ব্যাপারই ছিল যে, সেগুলো দেখে আমরা স্বতস্ফূর্তভাবে শিরকে লিপ্ত হয়ে গেছি।

"লোকদের অলংকারের বোঝায় আমরা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম"-এ বাক্যের সোজা অর্থ হচ্ছে এই যে, আমাদের পুরুষ ও মেয়েরা মিসরের রীতি অনুযায়ী যেসব ভারী

ভারী গহনা পরেছিল তা এ মরুচারী জীবনে আমাদের জন্য বোঝায় পরিণত হয়েছিল। এ বোঝা আর কতদিন বয়ে বেড়াবো এ চিন্তায় আমরা পেরেশান হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী এ গহনাগুলো মিসর ত্যাগ করার সময় প্রত্যেক ইসরাঈলী নারী ও পুরুষ তাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে নিয়েছিল। এভাবে তারা প্রত্যেকে নিজেদের প্রতিবেশীদেরকে লুট করে রাতারাতি হিজরত করার জন্য বেরিয়ে পড়েছিল। প্রত্যেক ইসরাঈলী নিজেই এ কাজে ব্রতী হয়েছিল, এ নৈতিক কর্মকাণ্ডটি শুধুমাত্র এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং এ মহত কর্মটি আল্লাহর নবী হযরত মূসা (আ) তাদেরকে শিখিয়েছিলেন এবং নবীকেও এ নির্দেশ দিয়েছিলেন আল্লাহ নিজেই। দেখুন বাইবেলের যাত্রাপুস্তক এ ব্যাপারে কি বলে ঃ

"ঈশ্বর মোশিকে কহিলেন, ... তুমি যাও ইস্রায়েলের প্রাচীনগণকে একত্র কর, তাহাদিগকে এই কথা বল, ... তোমরা যাত্রাকালে রিক্তহস্তে যাইবে না, কিন্তু প্রত্যেক স্ত্রী আপন আপন প্রতিবাসিনী কিম্বা গৃহে প্রবাসিনী স্ত্রীর কাছে রৌপ্যালংকার, স্বর্ণালংকার ও বস্ত্র চাহিবে; এবং তোমরা তাহা আপন আপন পুত্রদের ও কন্যাদের গাত্রে পরাইবে, এই রূপে তোমরা মিস্রীয়দের দ্রব্য হরণ করিবে।" (৩ ঃ ১৪-২২)

"আর সদাপ্রভু মোশিকে বলিলেন, ... তুমি লোকদের কর্ণগোচরে বল, আর প্রত্যেক পুরুষ আপন আপন প্রতিবাসী হইতে ও প্রত্যেক স্ত্রী আপন আপন প্রতিবাসিনী হইতে রৌপ্যলংকার ও স্বর্ণালংকার চাহিয়া লউক। আর সদাপ্রভু মিস্রীয়দের দৃষ্টিতে লোকদিগকে অনুগ্রহের পাত্র করিলেন। (১১ ঃ ১-৩)

"আর ইস্রায়েল সন্তানেরা মোশির বাক্যানুসারে কার্য করিল, ফলে তাহারা মিস্রীয়দের কাছে রৌপ্যলংকার, স্বর্ণালংকার ও বস্ত্র চাহিল ; আর সদাপ্রভু মিস্রীয়দের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে অনুগ্রহ পাত্র করিলেন, তাই তাহারা যাহা চাহিল, মিস্রীয়রা তাহাদিগকে তাহাই দিল। এইরূপে তাহারা মিস্রীয়দের ধন হরণ করিল।" (১২ ঃ ৩৫-৩৬)

দুঃখের বিষয় আমাদের মুফাসসিরগণও কুরআনের এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এ বর্ণনা চোখবন্ধ করে উদ্ধৃত করেছেন এবং তাদের এ ভুলের কারণে মুসলমানদের মধ্যে এ চিন্তা ছড়িয়ে পড়েছে যে, অলংকারের এ বোঝা আসলে ছিল লুটের বোঝা।

আয়াতের দ্বিতীয় অংশ "আমরা স্রেফ সেগুলো ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলাম" এর অর্থ আমি যা বুঝেছি তা হচ্ছে এই যে, যখন নিজেদের গহনাপাতির বোঝা বইতে বইতে লোকেরা ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে গেছে তখন পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত হয়ে থাকবে যে, সবার গহনাপাতি এক জায়গায় জমা করা হোক এবং কার সোনা ও রূপা কি পরিমাণ আছে তা লিখে নেয়া হোক, তারপর এগুলো গালিয়ে ইট ও শলাকায় পরিণত করা হোক। এভাবে জাতির সামগ্রীক মালপত্রের সাথে গাধা ও গরুর পিঠে এগুলো উঠিয়ে দেয়া যাবে। কাজেই এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের যাবতীয় অলংকার এনে অলংকারের স্তূপের ওপর নিক্ষেপ করে গিয়ে থাকবে।

৬৮. এখান থেকে এ প্যারার শেষ ইবারত পর্যন্ত চিন্তা করলে পরিষ্কার অনুভব করা যায় যে, জাতির জবাব "ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলাম" পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। পরবর্তী এ বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ নিজেই দিচ্ছেন। এ থেকে যে আসল ঘটনা জানা যায় তা হচ্ছে এই

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ
الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِيْ ﴿٩٠﴾ قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ
عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ﴿٩١﴾ قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ
رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ﴿٩٢﴾ اَلَّا تَتَّبِعَنِ ۭ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ﴿٩٣﴾ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ
بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ
اِسْرَاۗءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ﴿٩٤﴾

৫ রুকূ'

(মূসার আসার) আগেই হারুন তাদেরকে বলেছিল, "হে লোকেরা! এর কারণে তোমরা পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়েছো। তোমাদের রব তো করুণাময়, কাজেই তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার কথা মেনে নাও।" কিন্তু তারা তাকে বলে দিল, "মূসার না আসা পর্যন্ত আমরা তো এরই পূজা করতে থাকবো।"[৬৯]

মূসা (তার সম্প্রদায়কে ধমকাবার পর হারুনের দিকে ফিরে) বললো, "হে হারুন! তুমি যখন দেখলে এরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন আমার পথে চলা থেকে কিসে তোমাকে বিরত রেখেছিল ? তুমি কি আমার হুকুম অমান্য করেছো ?"[৭০]

হারুন জবাব দিল, "হে আমার সহোদর ভাই! আমার দাড়ি ও মাথার চুল ধরে টেনো না।[৭১] আমার আশংকা ছিল, তুমি এসে বলবে যে, তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছো এবং আমার কথা রক্ষা করোনি।"[৭২]

যে; আসন্ন ফিতনা সম্পর্কে বেখবর হয়ে লোকেরা যার যার গহনাপাতি এনে স্তূপীকৃত করে চলেছে এবং সামেরী সাহেবও তাদের মধ্যে শামিল ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে অলংকার গালাবার দায়িত্ব সামেরী সাহেব নিজের কাঁধে নিয়ে নেন এবং এমন কিছু জালিয়াতি করেন যার ফলে ইট বা শলাকা তৈরি করার পরিবর্তে একটি বাছুরের মূর্তি তৈরি হয়ে আসে। তার মুখ থেকে গরুর মতো হাম্বা রব বের হতো। এভাবে সামেরী জাতিকে প্রতারিত করে। তার কথা হচ্ছে আমি তো শুধু সোনা গালাবার দায়িত্ব নিয়েছিলাম কিন্তু তার মধ্য থেকে তোমাদের এ দেবতা নিজেই স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছে।

৬৯. বাইবেল এর বিপরীত হযরত হারুনের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনছে যে, বাছুর বানানো এবং তাকে উপাস্য বানানোর মহা পাপ তিনিই করেছিলেন ঃ

"পর্বত হইতে নামিতে মোশির বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া লোকেরা হারোণের নিকটে একত্র হইয়া তাহাকে কহিল, উঠুন আমাদের অগ্রগামী হইবার জন্য আমাদের নিমিত্ত দেবতা নির্মাণ করুন, কেননা যে মোশি মিসর দেশ হইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, সেই ব্যক্তির কি হইল, তাহা আমরা জানি না। তখন হারোণ তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আপন আপন স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণের কর্ণের সুবর্ণ কুণ্ডল খুলিয়া আমার কাছে আন। তাহাতে সমস্ত লোক তাহাদের কর্ণ হইতে সুবর্ণ কুণ্ডল খুলিয়া হারোণের নিকটে আনিল। তখন তিনি তাহাদের হস্ত হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া শিল্পাস্ত্রে গঠন করিলেন ; এবং একটি ঢালা গো-বৎস নির্মাণ করিলেন, তখন লোকেরা বলিতে লাগিল, হে ইস্রায়েল, এ তোমার দেবতা, যিনি মিসর দেশ হইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। আর হারোণ তাহা দেখিয়া তাহার সম্মুখে এক বেদী নির্মাণ করিলেন এবং হারোণ ঘোষণা করিয়া দিলেন, বলিলেন, কল্য সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে উৎসব হইবে।"

(যাত্রা পুস্তক ৩২ ঃ ১-৬)

বনী ইসরাঈলের সমাজে এ ভুল বর্ণনার খ্যাতিলাভের সম্ভাব্য কারণ এও হতে পারে যে, হয়তো সামেরীর নাম হারুনই ছিল এবং পরবর্তী লোকেরা এই হারুনকে হারুন নবীর সাথে মিশিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আজ খৃস্টান মিশনারী ও পশ্চিমের প্রাচ্যবিদরা জোর দিয়ে একথাই বলতে চায় যে, এখানেও কুরআন নিশ্চয় ভুল করেছে। তাদের পাক-পবিত্র নবী-ই বাছুরকে ইলাহ বানিয়েছিলেন এবং তাঁর গাত্রাবরণ থেকে এ দাগটি তুলে দিয়ে কুরআন একটি উপকার করেনি বরং উল্টো অপরাধ করেছে। এ হচ্ছে তাদের হঠকারিতার অবস্থা। তবে তারা এটা দেখছেন না যে, এ একই অধ্যায়েই মাত্র কয়েক লাইন পরেই বাইবেল কিভাবে নিজেই নিজের ভুল বর্ণনার রহস্য ভেদ করছে। এ অধ্যায়ের শেষ দশটি শ্লোকে বাইবেল বর্ণনা করছে যে, হযরত মূসা (আ) এরপর লেবীর সন্তানদেরকে একত্র করলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর এ হুকুম শুনালেন যে, যারা এ শিরকের মহাপাপে লিপ্ত হয়েছে তাদেরকে হত্যা করতে হবে এবং প্রত্যেক মু'মিন নিজ হাতে নিজের যেসব ভাই, সাথী ও প্রতিবেশী গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়েছিল তাদেরকে হত্যা করবে। এভাবে সেদিন তিন হাজার লোক নিহত হলো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হযরত হারুনকে কেন ছেড়ে দেয়া হলো ? যদি তিনিই এ অপরাধের মূল উদগাতা ও স্রষ্টা হয়ে থাকেন তাহলে তাঁকে এ গণহত্যা থেকে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখা হলো ? লেবীর সন্তানরা কি তাহলে একথা বলতো না যে, হে মূসা! আমাদের তো হুকুম দিচ্ছো নিজেদের গুনাহগার ভাই, সাথী ও প্রতিবেশীদেরকে নিজেদের হাতে হত্যা করার কিন্তু নিজের ভাইয়ের গায়ে হাত উঠাচ্ছো না কেন, অথচ আসল গোনাহগার তো সে-ই ছিল ? সামনের দিকে গিয়ে আরো বলা হয়েছে, মূসা সদাপ্রভুর কাছে গিয়ে আবেদন জানান, এবার বনী ইসরাঈলের গোনাহ মাফ করে দেন, নয়তো তোমার কিতাব থেকে আমার নাম কেটে দাও। একথায় আল্লাহ জবাব দেন, "যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে গোনাহ করেছে আমি তার নাম আমার কিতাব থেকে মুছে ফেলবো।" কিন্তু আমরা দেখছি, হযরত হারুনের নাম মুছে ফেলা হয়নি। বরং তার পরিবর্তে তাঁকে ও তাঁর সন্তান সন্ততিদেরকে বনী ইসরাঈলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পদ অর্থাৎ বনী লেবীর নেতৃত্ব ও বায়তুল মাকদিসের সেবায়েতের দায়িত্ব দান করা হয়। (গণনা পুস্তক ১৮ ঃ ১-৭) বাইবেলের এ আভ্যন্তরীণ সাক্ষ কি তার নিজের পূর্ববর্তী বর্ণনার প্রতিবাদ ও কুরআনের বর্ণনার সত্যতা প্রমাণ করছে না ?

৭০. হুকুম বলতে এখানে পাহাড়ে যাবার সময় এবং নিজের জায়গায় হযরত হারুনকে বনী ইসরাঈলের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করার পূর্ব মুহূর্তে হযরত মূসা তাঁকে যে হুকুম দিয়েছিলেন সে কথাই বুঝানো হয়েছে। সূরা আ'রাফে একে এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ○

"আর মূসা (যাওয়ার সময়) নিজের ভাই হারুনকে বললো, তুমি আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করো এবং দেখো, সংশোধন করবে, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করো না। (১৪২ আয়াত)

৭১. এ আয়াতগুলোর অনুবাদের সময় আমি এ বিষয়টি সামনে রেখেছি যে, হযরত মূসা ছোট ভাই ছিলেন কিন্তু মর্যাদার দিক দিয়ে ছিলেন বড়। অন্যদিকে হযরত হারুন বড় ভাই ছিলেন কিন্তু মর্যাদার দিক দিয়ে ছিলেন ছোট।

৭২. হযরত হারুনের জবাবের অর্থ কখনোই এই নয় যে, জাতির ঐক্যবদ্ধ থাকা তার সঠিক পথে থাকার চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং শিরকের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ থাকা তার এমন অনৈক্যের চেয়ে ভালো যার ভিত্তি গড়ে ওঠে হক ও বাতিলের বিরোধের ওপর। কোনো ব্যক্তি যদি এ আয়াতের এ অর্থ করে তাহলে সে কুরআন থেকে গোমরাহী গ্রহণ করবে। হযরত হারুনের পুরো কথাটা বুঝতে হলে এ আয়াতটিকে সূরা আ'রাফের ১৫০ আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِىْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِىْ ز فَلَا تُشْمِتْ بِىَ الْاَعْدَاۤءَ وَلَا تَجْعَلْنِىْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

"হে আমার সহোদর ভাই ! এ লোকেরা আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল এবং আমাকে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। কাজেই তুমি দুশমনদেরকে আমার প্রতি হাসবার সুযোগ দিয়ো না এবং ঐ জালেম দলের মধ্যে আমাকে গণ্য করো না।"

এখন এ উভয় আয়াত একত্র করে দেখলে যথার্থ ঘটনার এ ছবি সামনে আসে যে, হযরত হারুন লোকদেরকে এ গোমরাহী থেকে রুখবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন কিন্তু তারা তাঁর বিরুদ্ধে মহা বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং তাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়। বাধ্য হয়ে তিনি এই আশংকায় নীরব হয়ে যান যে, হযরত মূসার ফিরে আসার আগেই গৃহযুদ্ধ শুরু না হয়ে যায় এবং তিনি পরে এসে এ অভিযোগ না করে বসেন যে, তোমার যখন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার ক্ষমতা ছিল না তখন তুমি পরিস্থিতিকে এতদূর গড়াতে দিলে কেন ? আমার আসার অপেক্ষা করলে না কেন ? সূরা আ'রাফের আয়াতের শেষ বাক্য থেকেও একথাই প্রতিভাত হয় যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে উভয় ভাইয়ের একদল শত্রু ছিল।

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ۝ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ
قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ ۝

মূসা বললো, "আর হে সামেরী তোমার কি ব্যাপার ?"

সে জবাব দিল, "আমি এমন জিনিস দেখেছি যা এরা দেখেনি, কাজেই আমি রসূলের পদাংক থেকে এক মুঠো তুলে নিয়েছি এবং তা নিক্ষেপ করেছি, আমার মন আমাকে এমনি ধারাই কিছু বুঝিয়েছে।"৭৩

৭৩. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় দুটি দলের পক্ষ থেকে অদ্ভুত ধরনের টানা হেঁচড়া করা হয়েছে।

একটি দলে আছেন প্রাচীন তাফসীরকারগণ এবং প্রাচীন প্রদ্ধতিতে তাফসীরকারীদের বৃহত্তম অংশ। তারা এর অর্থ বর্ণনা করেন, "সামেরী রসূল অর্থাৎ হযরত জিব্রীলকে যেতে দেখে নিয়েছিল এবং তাঁর পদাংক থেকে এক মুঠো মাটি উঠিয়ে নিয়েছিল। আর এই মাটি যখন বাছুরের মূর্তির মধ্যে রাখা হয়েছিল। তখন তার অলৌকিক মহিমায় তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল প্রাণ স্পন্দন এবং একটি জীবন্ত বাছুরের মতা হাম্বা রব তার মুখ থেকে বের হতে শুরু হয়েছিল।" অথচ সত্যিই যে এমনটি হয়েছিল তা অবশ্য কুরআন বলছে না। কুরআন স্রেফ এতটুকু বলছে যে, হযরত মূসার প্রশ্নের জবাবে সামেরী একথা বানিয়ে বলেছিল। এ অবস্থায় আমরা বুঝতে পারছি না, মুফাসসিরগণ কেমন করে একে একটি সত্য ঘটনা এবং কুরআন বর্ণিত যথার্থ সত্য মনে করে বসলেন।

দ্বিতীয় দলটি সামেরীর কথার অন্য একটি অর্থ করেন। তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সামেরী আসলে বলেছিল, "আমি রসূল অর্থাৎ মূসার দীনের মধ্যে এমন দুর্বলতা দেখেছিলাম যা অন্যেরা দেখতে পায়নি। তাই আমি একদিক থেকে তাঁর পদাংক অনুসরণ করেছিলাম কিন্তু পরে তা ত্যাগ করেছিলাম।" এ ব্যাখ্যাটি সম্ভবত সর্বপ্রথম করেন আবু মুসলিম ইসফাহানী। তারপর ইমাম রাযী একে নিজের তাফসীরে উদ্ধৃত করে এর প্রতি নিজের সমর্থন প্রকাশ করেন। বর্তমানে আধুনিক তাফসীরকারদের অধিকাংশই এ অর্থটিকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন। কিন্তু তারা একথা ভুলে গেছেন যে, কুরআন ধাঁধা ও হেয়ালির ভাষায় নাযিল হয়নি বরং পরিষ্কার ও সাধারণের বোধগম্য সহজ সরল আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। একজন সাধারণ আরববাসী নিজের ভাষার প্রচলিত স্বাভাবিক বাগধারা অনুযায়ী এর বক্তব্য বুঝতে সক্ষম। আরবী ভাষার সাধারণ প্রচলিত বাকরীতি ও দৈনন্দিন কথোপকথনের শব্দাবলী সম্পর্কে অবগত কোনো ব্যক্তি কখনো একথা মেনে নিতে পারে না যে, সামেরীর এ মনোভাব প্রকাশ করার জন্য সহজ-সরল আরবী ভাষায় এমন সব শব্দ ব্যবহার করা হবে যা এ আয়াতের তাফসীরকারগণ বলেছেন। অথবা একজন সাধারণ আরবীয় একথাগুলো শুনে কখনো এমন অর্থ গ্রহণ করতে পারে না যা এ তাফসীরকারগণ বর্ণনা করেছেন। অভিধান গ্রন্থ থেকে কোনো একটি শব্দের এমন একাধিক অর্থ গ্রহণ করা যা বিভিন্ন প্রবাদে ব্যবহৃত

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ
مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهُ ۖ وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ
لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾ إِنَّمَا إِلٰهُكُمُ اللَّهُ
الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾ كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ
مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩﴾ مَّنْ أَعْرَضَ
عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾

মূসা বললো, "বেশ, তুই দূর হয়ে যা, এখন জীবনভর তুই শুধু একথাই বলতে থাকবি, 'আমাকে ছুঁয়ো না।'[৭৪] আর তোর জন্য জবাবদিহির একটি সময় নির্ধারিত রয়েছে যা কখনোই তোর থেকে দূরে সরে যাবে না। আর দেখ, তোর এই ইলাহর প্রতি, যার পূজায় তুই মত্ত ছিলি, এখন আমরা তাকে জ্বালিয়ে দেবো এবং তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশগুলো সাগরে ভাসিয়ে দেবো। হে লোকেরা ! এক আল্লাহই তোমাদের ইলাহ, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, প্রত্যেক জিনিসের ওপর তাঁর জ্ঞান পরিব্যাপ্ত।"

হে মুহাম্মাদ![৭৫] এভাবে আমি অতীতে যা ঘটে গেছে তার অবস্থা তোমাকে শুনাই এবং আমি বিশেষ করে নিজের কাছ থেকে তোমাকে একটি 'যিকির' (উপদেশমালা) দান করেছি।[৭৬] যে ব্যক্তি এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে কিয়ামতের দিন কঠিন গোনাহের বোঝা উঠাবে।

হয়ে থাকে এবং তার মধ্য থেকে কোনো একটি অর্থ নিয়ে এমন একটি বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া যেখানে একজন সাধারণ আরব কখনোই এ শব্দটিকে এ অর্থে ব্যবহার করে না—এটাতো ভাষাজ্ঞান হতে পারে না, তবে বাগাড়ম্বর হিসেবে মেনে নিতে আপত্তি নেই। 'ফরহংগে আসেফীয়া' নামক উর্দু অভিধান খানি অথবা 'অক্সফোর্ড ডিকশনারী' হাতে নিয়ে যদি কোনো ব্যক্তি যথাক্রমে তাদের উর্দু ও ইংরেজী রচনাগুলোর মধ্যে এ ধরনের কৃতিত্ব ফলাতে থাকেন, তাহলে সম্ভবত নিজেদের কথার দু-চারটে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুনেই তাদের লেখকরা চিৎকার করে উঠবেন। সাধারণত কুরআনের এ ধরনের ব্যাখ্যা এমন সময় করা হয় যখন এক ব্যক্তি কোনো আয়াতের সহজ সরল অর্থ দেখে নিজে নিজেই একথা মনে করে থাকে যে, এখানে তো আল্লাহ তা'আলা বড়ই অসাবধান হয়ে গেছেন, এসো আমি তাঁর কথা এমনভাবে পেশ করে দিই যার ফলে তাঁর ভুলের পরদা ঢেকে যাবে এবং তাঁর বক্তব্য নিয়ে লোকদের হাসাহাসি করার সুযোগ থাকবে না।

এ বিকৃত চিন্তা পরিহার করে যে ব্যক্তিই এ বক্তব্য পরম্পরায় এ আয়াতটি পড়বে সে সহজে বুঝতে পারবে যে, সামেরী ছিল একজন ফিতনাবাজ ব্যক্তি। সে ভালোভাবে ভেবেচিন্তে ধোঁকা ও প্রতারণার একটি বিরাট পরিকল্পনা তৈরি করেছিল। সে কেবল একটি সোনার বাছুর তৈরি করে যে কোনো কৌশলে তার মধ্যে গো-বৎসের হাম্বা রব সৃষ্টি করে দেয়নি এবং সমগ্র জাতির অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকদের প্রতারিত করেনি বরং সে আরো দুঃসাহসী হয়ে খোদ হযরত মূসা আলাইহিস সালামকেও একটি প্রতারণাপূর্ণ গল্প শুনিয়ে দিল। সে দাবী করলো, আমি এমন কিছু দেখেছি যা অন্যেরা দেখেনি। সাথে সাথে এ গল্পও শুনিয়ে দিল যে, রসূলের পদাংকের এক মুঠো মাটিই এ কেরামতি দেখিয়েছে। রসূল বলে সে জিব্রীলকেও নির্দেশ করতে পারে, যেমন প্রাচীন তাফসীরকারগণ মনে করেছেন। কিন্তু যদি একথা মনে করা হয় যে, রসূল শব্দটি বলে সে হযরত মূসাকে নির্দেশ করেছে, তাহলে এটা তার আর একটা প্রতারণা। সে এভাবে হযরত মূসাকে মানসিক উৎকোচ দিতে চাচ্ছিল, যাতে তিনি এটাকে তাঁর নিজের পদাংকের অলৌকিকতা মনে করে গর্বিত হন এবং নিজের অন্যান্য কেরামতির প্রচারণার জন্য সামেরীর যোগ্যতাকে স্থায়ীভাবে কাজে লাগান। কুরআন এ সমগ্র ব্যাপারটিকে সামেরীর প্রতারণা হিসেবেই পেশ করছে, নিজের পক্ষ থেকে প্রকৃত ঘটনা হিসেবে পেশ করছে না। তাই এতে এমন দূষণীয় কিছু ঘটেনি যে, তা প্রক্ষালনের জন্য অভিধান গ্রন্থগুলোর সাহায্যে অযথা বাগাড়ম্বর করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। বরং পরবর্তী বাক্যগুলোতে হযরত মূসা যেভাবে তাকে ধিক্কার ও অভিশাপ দিয়েছেন এবং তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করেছেন তা থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, তার বানানো এ প্রতারণাপূর্ণ গল্প শোনার সাথে সাথেই তিনি তা তার মুখের উপরে ছুড়ে মেরেছিলেন।

৭৪. অর্থাৎ শুধু এতটুকুই নয় যে, সারাজীবনের জন্য মানব সমাজের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছে এবং তাকে অচ্ছুৎ বানিয়ে রাখা হয়েছে বরং তার ওপর এ দায়িত্বও অর্পিত হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই সে নিজের অচ্ছুৎ হওয়া সম্পর্কে জানিয়ে দেবে এবং দূর থেকেই লোকদেরকে এ মর্মে বলতে থাকবে, "আমি অচ্ছুৎ আমাকে ছুয়ো না।" বাইবেলের লেবীয় পুস্তকে কুষ্ঠরোগীর স্পর্শ থেকে লোকদের বাঁচাবার জন্য যে নিয়ম বাতলানো হয়েছে তার মধ্য থেকে একটি নিয়ম হচ্ছে এই ঃ

> "আর যে কুষ্ঠির ঘা হইয়াছে। তাহার বস্ত্র চেরা যাইবে, ও তার মস্তক মুক্ত কেশ থাকিবে ও সে আপনার ওষ্ঠ বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া 'অশুচি, অশুচি' এ শব্দ করিবে। যতদিন তাহার গাত্রে ঘা থাকিবে, ততদিন সে অশুচি থাকিবে ; সে অশুচি ; সে একাকী বাস করিবে, শিবিরের বাহিরে তাহার বাসস্থান হইবে।" (১৩ ঃ ৪৫-৪৬)

এ থেকে অনুমিত হয়, আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি হিসেবে তাকে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত করা হয়ে থাকবে অথবা তার জন্য এ শাস্তি নির্ধারণ করা হয়ে থাকবে যে, শারীরিকভাবে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে যেভাবে সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা করে দেয়া হয়ে থাকে ঠিক তেমনিভাবে নৈতিক কুষ্ঠে আক্রান্ত রোগীকেও মানুষদের থেকে আলাদা করে দিতে হবে এবং এ ব্যক্তিও কুষ্ঠরোগীর মতো চিৎকার করে করে তার কাছে আগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে বলতে থাকবে ঃ আমি অপবিত্র, আমাকে ছুঁয়ো না।

خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ۭ وَسَاۗءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ۝ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ
وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَىِٕذٍ زُرْقًا ۝ يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ
اِلَّا عَشْرًا ۝ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً
اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ۝

আর এ ধরনের লোকেরা চিরকাল এ দুর্ভাগ্য পীড়িত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য (এ অপরাধের দায়ভার) বড়ই কষ্টকর বোঝা হবে।[৭৭] সেদিন যখন শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে[৭৮] এবং আমি অপরাধীদেরকে এমনভাবে ঘেরাও করে আনবো যে, তাদের চোখ (আতংকে) দৃষ্টিহীন হয়ে যাবে।[৭৯] তারা পরস্পর চুপিচুপি বলাবলি করবে, দুনিয়ায় বড়জোর তোমরা দশটা দিন অতিবাহিত করেছো'[৮০]—আমি[৮১] ভালোভাবেই জানি তারা কিসব কথা বলবে, (আমি এও জানি) সে সময় তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী সতর্ক অনুমানকারী হবে সে বলবে, না, তোমাদের দুনিয়ার জীবনতো মাত্র একদিনের জীবন ছিল।

৭৫. মূসা আলাইহিস সালামের কাহিনী খতম করে আবার ভাষণের মোড় সেদিকে ফিরে যাচ্ছে যা দিয়ে সূরার সূচনা হয়েছিল। সামনে এগিয়ে যাবার আগে আর একবার সূরার সেই প্রারম্ভিক আয়াতগুলো পড়ে নিন .... যেগুলোর পর হঠাৎ হযরত মূসার কাহিনী শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ থেকে ভালোভাবে বুঝা যাবে, সূরার আসল আলোচ্য বিষয় কি, মাঝখানে মূসার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে কেন এবং কাহিনী খতম করে কিভাবে ভাষণটি তার মূল বিষয়বস্তুর দিকে ফিরে আসছে।

৭৬. অর্থাৎ এ সূরার প্রথমে যে কুরআনের কথা বলা হয়েছিল সেটা এমন কোনো বিষয় ছিল না যার মাধ্যমে তোমাদের কোনো অসম্ভব কাজে লিপ্ত করা বা তোমাদের ওপর অনর্থক একটা কষ্টকর কাজ চাপিয়ে দেবার জন্য তা নাযিল করা হয়েছিল। সেটা তো ছিল একটা স্মারক ও উপদেশ (তাযকিরাহ) এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে অন্তরে আল্লাহকে ভয় করে।

৭৭. এখানে প্রথমত বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এ উপদেশবাণী অর্থাৎ কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং তার বিধান ও পথ নির্দেশনা গ্রহণে অস্বীকার করবে সে নিজেরই ক্ষতি সাধন করবে। এর ফলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁকে প্রেরণকারী আল্লাহর কোনো ক্ষতি হবে না। তার এ নির্বুদ্ধিতা হবে তার নিজেরই সাথে শত্রুতারই নামান্তর। দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, যে ব্যক্তির কাছে কুরআনের এ নসীহত পৌঁছে গেছে এবং সে এটা গ্রহণ করতে ছলনার আশ্রয় নিচ্ছে ও ইতস্তত করছে সে আখেরাতে শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। আয়াতের শব্দাবলী ব্যাপক অর্থ প্রকাশক। কোনো দেশ,

জাতি ও সময়ের সাথে সেগুলো বিশেষভাবে সম্পর্কিত নয়। যতদিন এ কুরআন দুনিয়ায় থাকবে, যেখানে, যে দেশে এবং যে জাতি ও ব্যক্তির কাছে এটা পৌঁছে যাবে সেখানে তার জন্যে দুটোই পথ খোলা থাকবে। তৃতীয় কোনো পথ সেখানে থাকবে না। হয় একে মেনে নিয়ে এর আনুগত্য করতে হবে আর নয়তো একে অস্বীকার করে এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে। প্রথম পথ অবলম্বনকারীদের পরিণতি সামনের দিকে বর্ণনা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় পথ অবলম্বনকারীদের পরিণতি এ আয়াতে বাতলে দেয়া হয়েছে।

৭৮. সিংগা মানে রণভেরী, রণতুর্য। আজকাল এর বিকল্প হিসেবে বিউগল বলা যেতে পারে। সেনাদলকে একত্র ও বিক্ষিপ্ত করার এবং নির্দেশ দেবার জন্য বিউগল বাজানো হয়। আল্লাহ তাঁর বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা বুঝাবার জন্য এমন সব শব্দ ও পরিভাষা ব্যবহার করে থাকেন যা মানুষের জীবন ব্যবস্থা পরিচালনায় ব্যবহৃত শব্দের সাথে সাদৃশ্য রাখে। এ শব্দ ও পরিভাষাগুলো ব্যবহার করার মূল লক্ষ হচ্ছে আমাদের ধারণা, কল্পনা ও চিন্তাশক্তিকে আসল জিনিসের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া। আমরা সত্যি সত্যিই আল্লাহর রাজ্যের বিভিন্ন জিনিসকে হুবহু এ সীমিত অর্থে গ্রহণ করবো এবং সেগুলোকে এসব সীমিত আকারের জিনিস মনে করে নেবো যেমন আমাদের জীবনে পাওয়া যায়, এটা কখনোই এর উদ্দেশ্য নয়। প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত লোকদের জমা করার এবং কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা ঘোষণা করার জন্য এমন কোনো না কোনো জিনিস বাজানো বা কোনো কিছুতেই ফুঁক দিয়ে বিকট আওয়াজ সৃষ্টি করা হয় যা রণভেরী, রণতুর্য বা বিউগলের সাথে সাদৃশ্য রাখে। আল্লাহ বলেন, কিয়ামতের দিন এমনি একটি জিনিসে ফুঁক দেয়া হবে (যা আমাদের বিউগলের মতো। একবার তাতে ফুঁক দেয়া হবে,) তখন সবাই মারা পড়বে। দ্বিতীয়বার ফুঁক দেয়া হবে, তখন সবাই জেগে উঠবে এবং পৃথিবীর সব দিক থেকে বের হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে ছুটে আসতে থাকবে। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নামল ১০৬ টীকা।)

৭৯. মূল শব্দ "যুরকান"। এটা হচ্ছে "আযরাক"-এর বহুবচন। কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন যারা 'আযরাক' বা সাদাটে নীলচে ভাব ধারণ করবে। কারণ ভয়ে ও আতংকে তাদের রক্ত শুকিয়ে যাবে এবং তাদের অবস্থা এমন হয়ে যাবে যেন তাদের শরীরে এক বিন্দুও রক্ত নেই। আবার অন্য কিছু লোক এ শব্দকে "আযরাকুল আয়েন" বা নীল চক্ষুওয়ালার অর্থে গ্রহণ করেছেন। তারা এর অর্থ করেন অত্যধিক ভয়ে তাদের চোখের মণি থির হয়ে যাবে। যখন কারোর চোখ আলোহীন হয়ে পড়ে তখন তার চোখের মণি সাদা হয়ে যায়।

৮০. এর আরেকটি মানে এও হতে পারে, "মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত তোমাদের বড় জোর দশ দিন অতিবাহিত হয়ে থাকবে।" কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থান থেকে জানা যায়, কিয়ামতের দিন লোকেরা নিজেদের দুনিয়াবি জীবন সম্পর্কেও আন্দায করে নেবে যে, তা ছিল অতি সামান্য দিনের এবং মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যে সময়কাল অতিবাহিত হয়ে থাকবে সে সম্পর্কেও তাদের এ প্রায় একই ধরনের অনুমান হবে। কুরআনের এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ○ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَادِّيْنَ ○

"আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা পৃথিবীতে কত বছর ছিলে ? জবাব দেবে, একদিন বা দিনের এক অংশ থেকেছি, গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করে নিন।"
(আল মু'মিনূন ঃ ১১২-১১৩)

অন্য জায়গায় বলা হচ্ছে ঃ

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ مَالَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانُوْا يُوْفَكُوْنَ ○ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ ○

"আর যেদিন কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন অপরাধীরা কসম খেয়ে খেয়ে বলবে, আমরা (মৃত অবস্থায়) এক ঘন্টার বেশী সময় পড়ে থাকিনি। এভাবে তারা দুনিয়ায়ও ধোঁকা খেতে থেকেছে। আর যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছিল তারা বলবে, আল্লাহর কিতাবের বক্তব্য অনুযায়ী তোমরা তো পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত পড়ে থেকেছো এবং আজ সে পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা জানতে না।" (আর রূম ঃ ৫৫-৫৬)

এসব সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে প্রমাণ হয় দুনিয়ার জীবন ও আলমে বরযখের (মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত) জীবন উভয়কে তারা সামান্য মনে করবে। দুনিয়ার জীবন সম্বন্ধে তারা একথা এজন্য বলবে যে, নিজেদের আশা-আকাংখার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় একটি চিরন্তন জীবনে যখন তাদের চোখ মেলতে হবে এবং যখন তারা দেখবে এখানকার জন্য তারা কিছুই তৈরি করে আনেনি, তখন চরম আক্ষেপ ও হতাশার সাথে তারা নিজেদের পৃথিবীর জীবনের দিকে ফিরে দেখবে এবং দুঃখ করে বলতে থাকবে, হায় ! মাত্র দু'দিনের আনন্দ ও ভোগ বিলাসের লোভে আমরা চিরকালের জন্য নিজেদের পায়ে কুড়াল মারলাম। মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জীবনকাল তাদের কাছে সামান্য মনে হবে, কারণ মৃত্যুপরের জীবনকে তারা দুনিয়ায় অসম্ভব মনে করতো এবং কুরআন বর্ণিত পরকালীন জগতের ভূগোল কখনোই গুরুত্ব সহকারে তাদের কাছে গৃহীত হয়নি। এ ধারণা-কল্পনা নিয়েই তারা দুনিয়ার জীবনের সচেতন মুহূর্তগুলো নিশেষ করেছিল। আর এখন হঠাৎ চোখ মেলতেই সামনে দেখবে দ্বিতীয় জীবনের সূচনা। এ জীবনের শুরুতেই বিউগলের বিকট আওয়াজে নিজেদের দেখবে মার্চ করতে করতে এগিয়ে যেতে। ভীষণ আতংকের মধ্যে এখন তারা মনে করতে থাকবে ওমুক হাসপাতালে বেহুশ হবার পর অথবা ওমুক জাহাজ থেকে সমুদ্রে ডুবে যাবার পর কিংবা অমুক স্থানে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হবার পর থেকে এ পর্যন্ত কতটুকু সময়ই বা কেটে গেছে। তাদের মগজে একথা আসবেই না যে, দুনিয়ায় তারা মারা পড়েছিল এবং এখন সেই দ্বিতীয় জীবনটিই শুরু হয়েছে, যাকে তারা

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا ۝ فَيَذَرُهَا
قَاعًا صَفْصَفًا ۝ لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا ۝ يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِىَ
لَا عِوَجَ لَهٗ ۚ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ۝ يَوْمَئِذٍ
لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِىَ لَهٗ قَوْلًا ۝ يَعْلَمُ
مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ۝

৬ রুকূ'

—এ লোকেরা[৮২] তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, সেদিন এ পাহাড়গুলো কোথায় চলে যাবে ? বলো, আমার রব তাদেরকে ধূলি বানিয়ে উড়িয়ে দেবেন এবং যমীনকে এমন সমতল প্রান্তরে পরিণত করে দেবেন যে, তার মধ্যে তোমরা কোনো উঁচু নিচু ও ভাঁজ দেখতে পাবে না।[৮৩]—সেদিন সবাই নকীবের আহ্বানে সোজা চলে আসবে, কেউ সামান্য দর্পিত ভংগীর প্রকাশ ঘটাতে পারবে না এবং করুণাময়ের সামনে সমস্ত আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যাবে, মৃদু খস্‌খস্ শব্দ[৮৪] ছাড়া তুমি কিছুই শুনবে না। সেদিন সুপারিশ কার্যকর হবে না, তবে যদি করুণাময় কাউকে অনুমতি দেন এবং তার কথা শুনতে পসন্দ করেন।[৮৫]—তিনি লোকদের সামনের পেছনের সব অবস্থা জানেন এবং অন্যেরা এর পুরো জ্ঞান রাখে না।[৮৬]

একেবারে অর্থহীন ও অযৌক্তিক বলে ঠাট্টা করে হেসে উড়িয়ে দিতো। তাই তাদের প্রত্যেকেই একথা মনে করতে থাকবে, সম্ভবত আমি কয়েক ঘন্টা বা কয়েক দিন বেহুশ হয়ে পড়েছিলাম এবং এখন এমন এক সময় আমার চেতনা ফিরে এসেছে অথবা ঘটনাক্রমে এমন এক জায়গায় আমি পৌঁছে গেছি যেখানে কোনো রকমের দুর্ঘটনার কারণে লোকেরা একদিকে দৌড়ে চলছে। এটাও অসম্ভব মনে হয় না যে, আজকাল যারা মরছে তারা কিয়ামতের শিংগার আওয়াজকে কিছুক্ষণ পর্যন্ত বিমান আক্রমণের পূর্বের সতর্কতামূলক সাইরেন ধ্বনি বলে মনে করতে থাকবে।

৮১. এটি একটি প্রাসঙ্গিক বাক্য। ভাষণের মাঝখানে এর সাহায্যে শ্রোতাদের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। শ্রোতাদের মনে এ সন্দেহ জাগার সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে সময় হাশরের ময়দানে ছুটে চলা লোকেরা চুপিসারে যে আলাপ করবে তা আজ এখানে কেমন করে বর্ণনা করা হচ্ছে ?

৮২. এটিও একটি প্রাসংগিক বাক্য। ভাষণের মাঝখানে কোনো শ্রোতার প্রশ্নের জবাবে এ বাক্যটি বলা হয়েছে। মনে হয় যখন এ সূরাটি একটি ঐশী ভাষণ হিসেবে শুনানো হচ্ছিল তখন কেউ বিদ্রূপ করার জন্য এ প্রশ্নটি উঠিয়েছিল যে, কিয়ামতের যে চিত্র আপনি আঁকছেন তাতে তো মনে হচ্ছে সারা দুনিয়ার লোকেরা কোনো সমতল প্রান্তরের উপর দিয়ে ছুটে চলতে থাকবে। তাহলে এ বিশালাকৃতির পাহাড়াগুলো তখন কোথায় চলে যাবে ? এ প্রশ্নের সুযোগটি বুঝার জন্য যে পরিবেশে এ ভাষণ দেয়া হচ্ছিল সেটি সামনে রাখতে হবে। মক্কা যে স্থানে অবস্থিত তার অবস্থা একটি জলধারের মতো, যার চারদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়ের সারি। প্রশ্নকারী এ পাহাড়গুলোর প্রতি ইংগিত করে একথা বলে থাকবে। অহীর ইশারায় উপস্থিত ক্ষেত্রে তখনই এর জবাব দেয়া হয়েছে যে, এ পাহাড়গুলো ভেঙ্গে বালুকারাশির মতো গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেয়া হবে এবং সেগুলো ধূলোমাটির মতো সারা দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে সমগ্র দুনিয়াকে এমন একটি সমতল প্রান্তরে পরিণত করে দেয়া হবে যেখানে কোনো উঁচু-নীচু, ঢালু বা অসমতল জায়গা থাকবে না। তার অবস্থা এমন একটি পরিষ্কার বিছানার মতো হবে যাতে সামান্যতমও খাঁজ বা ভাঁজ থাকবে না।

৮৩. পরকালীন জগতে পৃথিবী যে নতুন রূপ নেবে কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় তা বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা ইনশিকাকে বলা হয়েছে اِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ "যখন পৃথিবী বিস্তৃত করে দেয়া হবে।" সূরা ইনফিতারে বলা হয়েছে ঃ اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ "যখন সাগর চিরে ফেলা হবে।" এর অর্থ সম্ভবত এই হবে যে, সমুদ্রের তলদেশ ফেটে যাবে এবং সমস্ত পানি পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে চলে যাবে। সূরা তাকবীরে বলা হয়েছে ঃ اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ "যখন সমুদ্র ভরে দেয়া হবে বা সমান করে দেয়া হবে।" এখানে বলা হচ্ছে যে, পাহাড়গুলো ভেংগে গুঁড়ো গুঁড়ো করে সারা পৃথিবীকে একটি সমতল প্রান্তরে পরিণত করা হবে। মনের পাতায় এর যে আকৃতি গড়ে ওঠে তা হচ্ছে এই যে, পরকালীন দুনিয়ায় সমস্ত সমুদ্র ভরাট করে, পাহাড়গুলো ভেংগে উঁচু-নীচু সমান করে, বন-জংগল সাফ করে পুরোপুরি একটি বলের গাত্রাবরণের মতো সমান ও মসৃন করে দেয়া হবে। এ আকৃতি সম্পর্কে সূরা ইবরাহীমের ৪৮ আয়াতে বলা হয়েছে, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ "এমন দিন যখন পৃথিবীকে পরিবর্তিত করে ভিন্ন কিছু করে দেয়া হবে।" এ আকৃতির পৃথিবীর ওপর হাশর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আল্লাহ সেখানে আদালত তথা ন্যায়বিচার কায়েম করবেন। তারপর সবশেষে তাকে যে আকৃতি দান করা হবে সূরা যুমারের ৭৪ আয়াতে তা এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ○

অর্থাৎ মুত্তাকীরা "বলবে, সেই আল্লাহর শোকর যিনি আমাদের দ্বারা তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদের পৃথিবীর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন। আমরা এ জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা নিজেদের জায়গা বানিয়ে নিতে পারি। কাজেই সৎকর্মশীলদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এ থেকে জানা যায়, সবশেষে এ সমগ্র পৃথিবীটিকেই জান্নাতে পরিণত করা হবে এবং আল্লাহর মুত্তাকী ও সৎকর্মশীল বান্দারা হবে এর উত্তরাধিকারী। সে সময় সারা পৃথিবী একটি দেশে পরিণত হবে। পাহাড়-পর্বত, সাগর, নদী, মরুভূমি আজ পৃথিবীকে অসংখ্য দেশে বিভক্ত করে রেখেছে এবং এ সাথে বিশ্বমানবতাকেও বিভক্ত করে দিয়েছে। এগুলোর সেদিন কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। (উল্লেখ্য সাহাবা ও তাবেঈদের মধ্যে ইবনে আব্বাস (রা) ও কাতাদাহও এ মত পোষণ করতেন যে, জান্নাত এ পৃথিবীতেই প্রতিষ্ঠিত হবে। সূরা নাজম-এর عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ○ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى আয়াতের ব্যাখ্যা তারা এভাবে করেন যে, এখানে এমন জান্নাতের কথা বলা হয়েছে যেখানে এখন শহীদদের রূহ রাখা হয়।)

৮৪. মূলে 'হাম্‌স' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি পায়ের আওয়াজ, চপিচুপি কথা বলার আওয়াজ, উটের চলার আওয়াজ এবং আরো এ ধরনের হাল্‌কা আওয়াজের জন্য বলা হয়। এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, সেখানে চলাচলকারীদের পায়ের আওয়াজ ছাড়া চুপিচুপি গুনগুন করে কথা বলার কোনো আওয়াজ শোনা যাবে না। চতুর্দিকে একটি ভয়ংকর ভীতিপ্রদ পরিবেশ বিরাজ করবে।

৮৫. এ আয়াতের দু'টি অনুবাদ হতে পারে। একটি অনুবাদ আমরা অবলম্বন করেছি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, "সেদিন সুপারিশ কার্যকর হবে না তবে যদি কারো পক্ষে করুণাময় এর অনুমতি দেন এবং তার জন্য কথা শুনতে রাজি হয়ে যান।" এখানে এমন ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা উভয় অর্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর প্রকৃত ব্যাপারও এই যে, কিয়ামতের দিন কারো সুপারিশ করার জন্য স্বতপ্রণোদিত হয়ে মুখ খোলা তো দূরের কথা, টুশব্দটি করারও কারোর সাহস হবে না। আল্লাহ যাকে বলার অনুমতি দেবেন একমাত্র সে-ই সুপারিশ করতে পারবে। এ দু'টি কথা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। একদিকে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ.

"কে আছে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সামনে সুপারিশ করতে পারে ?"
(সূরা আল বাকারা ২৫৫ আয়াত)

আরো বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ط لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ـ

"সেদিন যখন রূহ ও ফেরেশতারা সবাই কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে, একটুও কথা বলবে না, শুধুমাত্র সে-ই বলতে পারবে যাকে করুণাময় অনুমতি দেবেন এবং যে ন্যায়সংগত কথা বলবে।" (আন নাবা, ৩৮ আয়াত)

অন্যদিকে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ.

"আর তারা কারোর সুপারিশ করে না সেই ব্যক্তির ছাড়া যার পক্ষে সুপারিশ শোনার জন্য (রহমান) রাজী হবেন এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে থাকে।"

(সূরা আল আম্বিয়া, ২৮ আয়াত)

আরো বলা হয়েছে ঃ

وَكَمْ مِنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَاتُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى -

"কত ফেরেশতা আকাশে আছে, তাদের সুপারিশ কোনোই কাজে লাগবে না, তবে একমাত্র তখন যখন আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি নেবার পর সুপারিশ করা হবে এবং এমন ব্যক্তির পক্ষে করা হবে যার জন্য তিনি সুপারিশ শুনতে চান এবং পছন্দ করেন।" (সূরা আন নাজম, ২৬ আয়াত)

৮৬. সুপারিশের প্রতি এ বিধি-নিষেধ আরোপিত কেন, এর কারণ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। ফেরেশতা, আম্বিয়া বা আউলিয়া যে-ই হোন না কেন কারো রেকর্ড সম্পর্কে এদের কারো কিছুই জানা নেই এবং জানার কোনো ক্ষমতাও এদের নেই। দুনিয়ায় কে কি করতো এবং আল্লাহর আদালতে কে কোন ধরনের ভূমিকা ও কার্যাবলী এবং কেমন দায়িত্বের বোঝা নিয়ে এসেছে তাও কেউ জানে না। অপরদিকে আল্লাহ প্রত্যেকের অতীতের ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড জানেন। তার বর্তমান ভূমিকাও তিনি জানেন। সে সৎ হলে কেমন ধরনের সৎ। অপরাধী হলে কোন্ পর্যায়ের অপরাধী। তার অপরাধ ক্ষমাযোগ্য কি না। সে কি পূর্ণ শাস্তিলাভের অধিকারী অথবা কম শাস্তির। এহেন অবস্থায় কেমন করে ফেরেশতা, নবী ও সৎলোকদেরকে তাদের ইচ্ছামতো যার পক্ষে যে কোনো ধরনের সুপারিশ তারা চায় তা করার জন্য তাদেরকে অবাধ অনুমতি দেয়া যেতে পারে ? একজন সাধারণ অফিসার তার নিজের ক্ষুদ্রতম বিভাগে যদি নিজের প্রত্যেকটি বন্ধু ও আত্মীয়ের সুপারিশ শুনতে শুরু করে দেন তাহলে মাত্র চারদিনেই সমগ্র বিভাগটিকে ধ্বংস করে ছাড়বেন। তাহলে আকাশ ও পৃথিবীর শাসনকর্তার কাছ থেকে কেমন করে আশা করা যেতে পারে যে, তাঁর দরবারে ব্যাপকভাবে সুপারিশ চলতে থাকবে এবং প্রত্যেক বুযর্গ সেখানে গিয়ে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়ে আনবেন। অথচ তাদের কেউই যাদের সুপারিশ তারা করছেন তাদের কার্যকলাপ কেমন তা জানেন না। দুনিয়ায় যে কর্মকর্তা দায়িত্বের সামান্যতম অনুভূতিও রাখেন তার কর্মনীতি এ পর্যায়েরই হয়ে থাকে যে, যদি তার কোনো বন্ধু তার কোনো অধস্তন কর্মচারীর সুপারিশ নিয়ে আসে তাহলে সে তাকে বলে, আপনি জানেন না এ ব্যক্তি কত বড় ফাঁকিবাজ, দায়িত্বহীন, ঘুষখোর ও অত্যাচারী। আমি এর যাবতীয় কীর্তিকলাপের খবর রাখি। কাজেই আপনি মেহেরবানী করে অন্তত আমার কাছে তার সুপারিশ করবেন না। এ ছোট্ট উদাহরণটির ভিত্তিতে অনুমান করা যেতে পারে যে, এ আয়াতে সুপারিশ সম্পর্কে যে নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে তা কতদূর সঠিক, যুক্তি-সংগত ও ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করার দরজা বন্ধ হবে না। আল্লাহর সৎ বান্দারা যারা দুনিয়ায় মানুষের সাথে সহানুভূতিশীল ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিলেন তাদেরকে আখেরাতেও সহানভূতির অধিকার

وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ؕ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ
يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾
وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ
اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ
بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴿١١٤﴾
وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ﴿١١٥﴾

—লোকদের মাথা চিরঞ্জীব ও চির প্রতিষ্ঠিত সত্তার সামনে ঝুঁকে পড়বে, সে সময় যে যুলুমের গোনাহের ভার বহন করবে সে ব্যর্থ হবে। আর যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে এবং সেই সাথে সে মুমিনও হবে তার প্রতি কোনো জুলুম বা অধিকার হরণের আশংকা নেই।[৮৭]

আর হে মুহাম্মাদ! এভাবে আমি একে আরবী কুরআন বানিয়ে নাযিল করেছি[৮৮] এবং এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সতর্কবাণী করেছি হয়তো এরা বক্রতা থেকে বাঁচবে বা এদের মধ্যে এর বদৌলতে কিছু সচেতনতার নিদর্শন ফুটে উঠবে।[৮৯]

কাজেই প্রকৃত বাদশাহ আল্লাহ হচ্ছেন উন্নত ও মহান।[৯০]

আর দেখো, কুরআন পড়ার ব্যাপারে দ্রুততা অবলম্বন করো না যতক্ষণ না তোমার প্রতি তার অহী পূর্ণ হয়ে যায় এবং দোয়া করো, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে আরো জ্ঞান দাও।[৯১]

আমি[৯২] এর আগে আদমকে একটি হুকুম দিয়েছিলাম[৯৩] কিন্তু সে ভুলে গিয়েছে এবং আমি তার মধ্যে দৃঢ় সংকল্প পাইনি।[৯৪]

আদায় করার সুযোগ দেয়া হবে। কিন্তু তারা সুপারিশ করার আগে অনুমতি চেয়ে নেবেন। যার পক্ষে আল্লাহ তাদেরকে বলার অনুমতি দেবেন একমাত্র তার পক্ষেই তারা সুপারিশ করতে পারবেন। আবার সুপারিশ করার জন্যও শর্ত হবে যে, তা সংগত এবং ন্যায়ভিত্তিক হতে হবে যেমন وَقَالَ صَوَابًا (এবং ঠিক কথা বলবে) আল্লাহর এ উক্তিটি পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে যে, সেখানে আজেবাজে সুপারিশ করার কোনো সুযোগ থাকবে না। যেমন একজন দুনিয়ায় শত শত, হাজার হাজার লোকের অধিকার গ্রাস করে এসেছে

কিন্তু কোনো এক বুযর্গ হঠাৎ উঠে তার পক্ষে সুপারিশ করে দিলেন যে, হে আল্লাহ! তাকে পুরস্কৃত করুন, কারণ সে আমার বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন।

৮৭. কারণ সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত গুণাবলীর (Merits) ভিত্তিতে ফায়সালা হবে। যে ব্যক্তি কোনো জুলুমের গোনাহের বোঝা বহন করে নিয়ে আসবে, সে আল্লাহর অধিকারের বিরুদ্ধে জুলুম করুক বা আল্লাহর বান্দাদের অধিকারের বিরুদ্ধে অথবা নিজের নফসের বিরুদ্ধে জুলুম করুক না কেন যে কোনো অবস্থায়ই এগুলো তাকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবে না। অন্যদিকে যারা ঈমান ও সৎকাজ (নিছক সৎকাজ নয় বরং ঈমান সহকারে সৎকাজ এবং নিছক ঈমানও নয় বরং সৎকাজ সহকারে ঈমান) নিয়ে আসবে তাদের ওপর সেখানে জুলুম হবার কোনো আশংকা নেই অর্থাৎ নিরর্থক তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না এবং তাদের যাবতীয় কার্যাবলী একেবারে ধ্বংস করে দেয়া হবে এবং সমস্ত অধিকার গ্রাস করে নেয়া হবে এমন কোনো আশংকাও সেখানে থাকবে না।

৮৮. অর্থাৎ তা এমনিতর বিষয়বস্তু, শিক্ষাবলী ও উপদেশমালায় পরিপূর্ণ। এখানে শুধুমাত্র ওপরের আয়াতগুলোতে বর্ণিত নিকটবর্তী বিষয়বস্তুর প্রতি ইংগিত করা হয়নি। বরং কুরআনে যেসব বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে সেসব দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। আবার কুরআন সম্পর্কে সূরার সূচনায় এবং তারপর মূসার কাহিনীর শেষ পর্যায়ের আয়াতগুলোতে যা বলা হয়েছে এর বর্ণনা পরম্পরা সেগুলোর সাথে সম্পর্কিত হয়। এর অর্থ হচ্ছে, তোমার প্রতি যে "স্মারক" পাঠানো হয়েছে এবং আমার কাছ থেকে বিশেষভাবে আমি যে "স্মরণ" তোমাকে দিয়েছি তা এ ধরনের মর্যাদাসম্পন্ন স্মারক ও স্মরণ।

৮৯. অর্থাৎ এরা নিজেদের গাফলতি থেকে সজাগ হবে, ভুলে যাওয়া শিক্ষাকে কিছুটা স্মরণ করবে এবং পথ ভুলে কোন্ পথে যাচ্ছে আর এই পথ ভুলে চলার পরিণাম কি হবে সে সম্পর্কে এদের মনে বেশ কিছুটা অনুভূতি জাগবে।

৯০. কুরআনে সাধারণত একটি ভাষণ শেষ করতে গিয়ে এ ধরনের বাক্য বলা হয়ে থাকে এবং আল্লাহর কালামের সমাপ্তি তাঁর প্রশংসা বাণীর মাধ্যমে করাই হয় এর উদ্দেশ্য। বর্ণনাভংগী ও পূর্বাপর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এখানে একটি ভাষণ শেষ হয়ে গেছে এবং وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلٰى اٰدَمَ থেকে দ্বিতীয় ভাষণ শুরু হচ্ছে। বেশীর ভাগ সম্ভাবনা এটাই যে, এ দুটি ভাষণ বিভিন্ন সময় নাযিল হয়ে থাকবে এবং পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী দুটিকে এক জায়গায় একত্র করে দিয়ে থাকবেন। একত্র করার কারণ উভয় ভাষণের বিষয়গত সাদৃশ্য। এ বিষয়টি আমি পরবর্তী আলোচনায় সুস্পষ্ট করে দেবো।

৯১. فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ বাক্যেই ভাষণ খতম হয়ে গেছে। এরপর বিদায় নেবার সময় ফেরেশতারা আল্লাহর হুকুমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছেন। অহী নাযিল করার সময় এটা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু মাঝখানে সংশোধন করে দেয়া সংগত মনে করা হয়নি। তাই বাণী পাঠানোর কাজ শেষ হবার পর এখন তার এ সংশোধনী দিচ্ছেন। সতর্কবাণীর শব্দাবলী থেকে একথা প্রকাশ হচ্ছে যে, কি ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছিল। অহীর বাণী গ্রহণ করার সময় নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা স্মরণ রাখার এবং মুখে পুনরাবৃত্তি করার চেষ্টা করে থাকবেন। এ প্রচেষ্টার কারণে তাঁর মনোযোগ বারবার সরে গিয়ে থাকবে। ফলে অহী গ্রহণের ধারাবাহিকতার মধ্যে বাধার সৃষ্টি হয়ে থাকবে। বাণী শোনার প্রতি মনোযোগ পুরোপুরি আকৃষ্ট হয়ে থাকবে। এ অবস্থা দেখে এ প্রয়োজন অনুভব করা হয়েছে যে, তাঁকে অহীর বাণী গ্রহণ করার সঠিক পদ্ধতি বুঝাতে হবে এবং মাঝখানে মাঝখানে স্মরণ রাখার জন্য যে চেষ্টা তিনি করেন তা থেকে তাঁকে বিরত রাখতে হবে।

এ থেকে জানা যায়, সূরা "ত্বা-হা"র এ অংশটি প্রথম যুগের অহীর অন্তরভুক্ত। প্রথম যুগে তখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে অহী গ্রহণ করার অভ্যাস ভালোভাবে গড়ে ওঠেনি। এ অবস্থায় কয়েকবার তিনি এ কাজ করেছেন। প্রত্যেকবার এ ব্যাপারে তাঁকে সতর্ক করে দেবার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো না কোনো বাক্য উচ্চারণ করা হয়েছে। সূরা "কিয়ামাহ" নাযিলের সময়ও এমনটিই হয়েছিল। তাই তখন বাণীর ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে তাঁকে এই বলে সতর্ক করা হয়েছিলঃ

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ○ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ○ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ.

"কুরআনকে দ্রুত স্মরণ করার জন্য তোমার জিহবা বার বার সঞ্চালন করো না। তা স্মরণ করিয়ে ও পড়িয়ে দেবার দায়িত্ব আমার। কাজেই যখন আমি তা শুনাচ্ছি তখন তুমি গভীর মনোযোগ সহকারে তা শুনতে থাকো, তারপর তার অর্থ বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব আমার।"

সূরা আ'লায়েও তাঁকে এ নিশ্চিন্ততা দেয়া হয়েছে যে, "আমি তা পড়িয়ে দেবো এবং তুমি তা ভুলে যাবে না।" سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى —পরে যখন তিনি অহীর বাণী গ্রহণ করার ব্যাপারে ভালোমতো পারদর্শিতা লাভ করেন তখন তিনি আর এ ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হননি। এ কারণে পরবর্তী সূরাগুলোয় এ ধরনের কোনো সতর্কবাণী আমরা দেখি না।

৯২. যেমন এর আগে বলা হয়েছে, এখান থেকে আর একটা আলাদা ভাষণ শুরু হয়েছে। সম্ভবত ওপরের ভাষণের পর কোনো এক সময় এটি নাযিল হয়েছিল এবং বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যের কারণে এর সাথে মিলিয়ে একই সূরার মধ্যে উভয়কে একত্র করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য একাধিক। যেমন ঃ

এক ঃ কুরআন যে ভুলে যাওয়া শিক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তা সেই একই শিক্ষা যা মানব জাতিকে তার সৃষ্টির সূচনায় দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ যা মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন এবং যা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য কুরআনের পূর্বে বারবার "স্মারক" আসতে থেকেছে।

দুই ঃ শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ বারবার এ শিক্ষা ভুলে যায় এবং সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই বরাবর সে এ দুর্বলতা দেখিয়ে আসছে। তাই মানুষ বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে থাকার মুখাপেক্ষী।

তিন ঃ মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য পুরোপুরি নির্ভর করে তার এমন আচরণের ওপর যা আল্লাহ প্রেরিত এই "স্মারকের" সাথে সে করবে। সৃষ্টির সূচনালগ্নে একথা পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছিল। আজ এটা কোনো নতুন কথা বলা হচ্ছে না যে, এর অনুসরণ করলে গোমরাহী ও দুর্ভাগ্য থেকে সংরক্ষিত থাকবে অন্যথায় দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে বিপদে পড়বে।

চার ঃ একটি জিনিস হচ্ছে, ভুল, সংকল্পের অভাব ও ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা। এরি কারণে মানুষ তার চিরন্তন শত্রু শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে এবং ভুল করে বসে। মানুষের মনে ভুলের অনুভূতি জাগার সাথে সাথেই সে যদি নিজের দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি সংশোধন করে নেয় এবং অবাধ্যতা পরিহার করে আনুগত্যের পথে ফিরে আসে তাহলেই সে ক্ষমা লাভ করতে পারে। দ্বিতীয় জিনিসটি হচ্ছে, বিদ্রোহ ও সীমালংঘন এবং ভালোভাবে ভেবে চিন্তে আল্লাহর মোকাবিলায় শয়তানের দাসত্ব করা। ফেরাউন ও সামেরী এ কাজ করেছিল। এর ক্ষমার কোনো সম্ভাবনা নেই। ফেরাউন ও সামেরী নিজেদের যে পরিণতি ভোগ করেছে এর পরিণতিও তাই হবে। যে ব্যক্তি এ কর্মনীতি অবলম্বন করবে সে-ই এ পরিণতির শিকার হবে।

৯৩. আদম আলাইহিস সালামের ঘটনা এর আগে সূরা বাকারাহ, সূরা আ'রাফ (দু'জায়গায়), সূরা হিজর, সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা কাহাফে আলোচিত হয়েছে। এখানে সপ্তমবার এর পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। প্রত্যেক জায়গায় বর্ণনা পরম্পরার সাথে এর সম্পর্ক ভিন্নতর এবং প্রত্যেক জায়গায় এ সম্পর্কের ভিত্তিতেই এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। যে জায়গায় আলোচ্য বিষয়ের সাথে ঘটনার যে অংশের সম্পর্ক রয়েছে সে জায়গায় সেটুকুই বর্ণনা করা হয়েছে, অন্য জায়গায় তা পাওয়া যাবে না অথবা বর্ণনাভংগী সামান্য আলাদা হবে। পুরো ঘটনাটা বা এর পূর্ণ তত্ত্ব অনুধাবন করার জন্যে সংশ্লিষ্ট সব জায়গাগুলোই পড়ে নেয়া উচিত। আমি সব জায়গায়ই এর সম্পর্ক ও সম্বন্ধ এবং এর ফলাফল টীকায় বর্ণনা করে দিয়েছি।

৯৪. অর্থাৎ তিনি পরবর্তী পর্যায়ে এ নির্দেশের সাথে যে আচরণ করেন তা অহংকার ও ইচ্ছাকৃত বিদ্রোহের ভিত্তিতে ছিল না বরং গাফলতি ও ভুলের শিকার হবার এবং সংকল্প ও ইচ্ছার দুর্বলতার কারণে ছিল। তিনি এ ধরনের কোনো চিন্তা ও সংকল্পের ভিত্তিতে আল্লাহর হুকুম অমান্য করেননি যে, আমি আল্লাহর পরোয়া করতে যাবো কেন, তাঁর হুকুম হয়েছে তাতে কি হয়েছে, আমার মন যা চাইবে আমি তা করবো, আল্লাহ আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন কেন ? এর পরিবর্তে বরং তাঁর আল্লাহর হুকুম অমান্য করার কারণ এই ছিল যে, তিনি আল্লাহর হুকুম মনে রাখার চেষ্টা করেননি, তিনি তাঁকে কি বুঝিয়েছিলেন তা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন এবং তার ইচ্ছাশক্তি খুব বেশী মজবুত ছিল না যার ফলে যখন শয়তান তাঁকে প্ররোচিত করতে এলো তখন তিনি পূর্বাহ্নে প্রদত্ত আল্লাহর সতর্কবাণী ও উপদেশ (যার আলোচনা এখনই সামনে আসছে) স্মরণ করতে পারলেন না এবং শয়তান প্রদত্ত লোভ ও লালসার কঠোরভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম হলেন না।

"আমি তার মধ্যে সংকল্প পাইনি" এ বাক্যের অর্থ কেউ কেউ এরূপ নিয়েছেন যে, "আমি তার মধ্যে নাফরমানীর সংকল্প পাইনি" অর্থাৎ তিনি যা কিছু করেছেন ভুল করে করেছেন, নাফরমানী করার সংকল্প নিয়ে করেননি। কিন্তু খামাখা এ ধরনের সংকোচ করার

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا إِلَّآ إِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى ﴿١١٦﴾
فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ إِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ
فَتَشْقٰى ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ﴿١١٨﴾ وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا
وَلَا تَضْحٰى ﴿١١٩﴾ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى
شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ﴿١٢٠﴾

৭ রুকূ'

স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, আদমকে সিজদা করো, তারা সবাই সিজদা করলো কিন্তু একমাত্র ইবলীস অস্বীকার করে বসলো। এ ঘটনায় আমি আদমকে বললাম,[৯৫] দেখো, এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু,[৯৬] এমন যেন না হয় যে, এ তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়[৯৭] এবং তোমরা বিপদে পড়ে যাও। এখানে তো তুমি এ সুবিধে পাচ্ছো যে, তুমি না অভুক্ত ও উলংগ থাকছো এবং না পিপাসার্ত ও রৌদ্রক্লান্ত হচ্ছো।[৯৮] কিন্তু শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল,[৯৯] বলতে থাকলো, "হে আদম! তোমাকে কি এমন গাছের কথা বলে দেবো যা থেকে অনন্ত জীবন ও অক্ষয় রাজ্য লাভ করা যায়?"[১০০]

কোনো প্রয়োজন নেই। একথা বলতে হলে لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا عَلَى الْعِصْيَانِ বলা হতো, শুধুমাত্র لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا বলা হতো না। আয়াতের শব্দাবলী পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, সংকল্পের অভাব মানে হুকুম মেনে চলার সংকল্পের অভাব, নাফরমানী করার সংকল্পের অভাব নয়। তাছাড়া পরিবেশ পরিস্থিতি ও পূর্বাপর বক্তব্যের প্রতি নজর দিলে পরিষ্কার অনুভূত হয় যে, এখানে আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামের ভূমিকা ও মর্যাদা কালিমামুক্ত করার উদ্দেশ্যে এ ঘটনা বর্ণনা করছেন না বরং তিনি একথা বলতে চান যে, তিনি যে মানবিক দুর্বলতার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন এবং যে কারণে শুধু তিনি একাই নন বরং তাঁর সন্তানরাও আল্লাহর আগাম সতর্কবাণী সত্ত্বেও নিজের শত্রুর ফাঁদে পা দিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে দিয়েই চলেছে সেটি কি ছিল। উপরন্তু যে ব্যক্তিই খোলা মনে এ আয়াতটি পড়বে তার মনে প্রথমে এ অর্থটিই ভেসে উঠবে যে, "আমি তার মধ্যে হুকুমের আনুগত্য করার সংকল্প বা মজবুত ইচ্ছাশক্তি পাইনি। দ্বিতীয় অর্থটি তার মনে ততক্ষণ আসবে না যতক্ষণ না সে আদম আলাইহিস সালামের সাথে গোনাহের সম্পর্ক স্থাপন করা অসংগত মনে করে আয়াতের অন্য কোনো অর্থ খোঁজা শুরু করে দেবে। এ অবস্থায় এ অভিমত আল্লামা আলুসীও তাঁর তাফসীরে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

لكن لا يخفى عليك ان هذا التفسير غير متبادر ولا كثير المناسبة للمقام -

"একথা তোমার কাছে গোপন থাকা উচিত নয় যে, আয়াতের শব্দাবলী শুনে এ ব্যাখ্যার সংগে সংগেই মনে উদয় হয় না এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথেও এটা তেমন কোনো সম্পর্ক রাখে না।" (দেখুন রুহুল মা'আনী, ১৬ খণ্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা)

৯৫. আদম আলাইহিস সালামকে যে আসল হুকুমটি দেয়া হয়েছিল তা এখানে বর্ণনা করা হয়নি। সে হুকুমটি হচ্ছে এই যে, "এ বিশেষ গাছটির ফল খেয়ো না।" কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এ হুকুমটি বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে যেহেতু বলার আসল বিষয়টি হচ্ছে শুধুমাত্র এতটুকু যে, মানুষ কিভাবে আল্লাহর আগাম সতর্কবাণী ও উপদেশ দান সত্ত্বেও নিজের পরিচিত শত্রুর কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত হয় এবং তার এ দুর্বলতা কিভাবে তার থেকে এমন কাজ করিয়ে নেয় যা তার নিজের স্বার্থ বিরোধী হয়, তাই আল্লাহ আসল হুকুম উল্লেখ করার পরিবর্তে এখানে কেবল মাত্র তার সাথে হযরত আদমকে (আ) যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল সেটির উল্লেখ করেছেন।

৯৬. শত্রুতার প্রদর্শনী তখনই হয়ে গিয়েছিল। আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম স্বচক্ষে দেখে নিয়েছিলেন ইবলীস তাঁদেরকে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল এবং পরিষ্কার বলে দিয়েছিল ঃ

اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ط خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ

"আমি তার চাইতে ভালো, তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো এবং তাকে সৃষ্টি করেছো মাটি থেকে।" (আ'রাফ ঃ ১২ এবং সাদ ঃ ৭৬)

اَرَاَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ "একটু দেখো তো, এ সত্তাটিকে তুমি আমার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছো।" ءَ اَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا "এখন কি আমি তাকে সিজদা করবো যাকে তুমি বানিয়েছো মাটি থেকে ?" (বনী ইসরাঈলঃ ৬১-৬২) তারপর শুধুমাত্র প্রকাশ্যে নিজের ঈর্ষা প্রকাশ করেই সে ক্ষান্ত থাকেনি বরং আল্লাহর কাছে এই বলে নিজের জন্য অবকাশও চেয়ে নিয়েছিল যে, আমাকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার অযোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ দিন, আমি তাকে পথভ্রষ্ট করে দেখিয়ে দেবো সে আপনার কেমন ধরনের প্রতিনিধি। সূরা আ'রাফ, হিজর ও বনী ইসরাঈলে তার এই চ্যালেঞ্জ উচ্চারিত হয়েছে এবং সামনের দিকে সূরা সাদেও আসছে। তাই আল্লাহ যখন বললেন, এ তোমাদের শত্রু তখন এটা নিছক একটা অজানা সংবাদ ছিল না বরং এমন একটা জিনিস ছিল যা ঠিক সময় মতো স্বামী-স্ত্রী উভয়ই স্বচক্ষে দেখে নিয়েছেন এবং স্বকর্ণে শুনেছেনও।

৯৭. এভাবে উভয়কে একথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, যদি তার প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়ে তোমরা আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করো তাহলে তোমরা এখানে থাকতে পারবে না এবং তোমাদের যেসব নিয়ামত দান করা হয়েছে সেসব তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে।

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ﴿١٢١﴾ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ﴿١٢٢﴾

শেষ পর্যন্ত দুজন (স্বামী-স্ত্রী) সে গাছের ফল খেয়ে বসলো। ফলে তখনই তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং দুজনাই জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেকে ঢাকতে লাগলো।[১০১] আদম নিজের রবের নাফরমানী করলো এবং সে সঠিক পথ থেকে সরে গেল।[১০২] তারপর তার রব তাকে নির্বাচিত করলেন,[১০৩] তার তাওবা কবুল করলেন এবং তাকে পথনির্দেশনা দান করলেন।[১০৪]

৯৮. জান্নাত থেকে বের হবার পর মানুষকে যে বিপদের মুখোমুখি হতে হবে তার বিবরণ এখানে দেয়া হয়েছে। এ সময় জান্নাতের বড় বড় পূর্ণাংগ ও শ্রেষ্ঠ নিয়ামতগুলো উল্লেখ করার পরিবর্তে তার চারটি মৌলিক নিয়ামতের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে তোমাদের জন্য খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও গৃহের ব্যবস্থা সরকারীভাবে করা হচ্ছে। এর কোনো একটি অর্জন করার জন্য তোমাদের পরিশ্রম করতে ও প্রচেষ্টা চালাতে হচ্ছে না। এ থেকে আপনাআপনি একথা আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যদি তারা শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে সরকারী নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহলে জান্নাত থেকে বের হয়ে তারা এখানকার বড় বড় নিয়ামত তো দূরের কথা মৌলিক জীবন উপকরণও লাভ করবে না। নিজেদের প্রাথমিক প্রয়োজনের জন্যও তারা প্রচেষ্টা চালাতে এবং জীবনপাত করতে বাধ্য হবে। মাথার ঘাম পায়ে না ফেলা পর্যন্ত একবেলার আহারেরও সংস্থান করতে পারবে না। দু'বেলা দু'মুঠো আহারের চিন্তা তাদের মনোযোগ, সময় ও শক্তির এমন বৃহত্তম অংশ টেনে বের করে নিয়ে যাবে যে, কোনো উন্নততর উদ্দেশ্যের জন্য কিছু করার অবকাশ ও শক্তি তাদের থাকবে না।

৯৯. এখানে কুরআন পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছে যে, আদম ও হাওয়ার মধ্যে আসলে যাকে শয়তান প্ররোচিত করেছিল তিনি হাওয়া ছিলেন না বরং ছিলেন আদম আলাইহিস সালাম। যদিও সূরা আ'রাফের বক্তব্যে দু'জনকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং সেখানে দু'জনকেই প্ররোচিত বলা হয়েছে কিন্তু শয়তানের প্ররোচনার গতিমুখ ছিল মূলত হযরত আদমেরই দিকে। অন্যদিকে বাইবেলের বর্ণনা মতে সাপ প্রথমে মহিলা অর্থাৎ হযরত হাওয়ার সাথে কথা বলে এবং হাওয়া তার স্বামীকে প্ররোচিত করে তাঁকে গাছের ফল খাওয়ান। (আদি পুস্তক ঃ ৩)

১০০. সূরা আ'রাফে আমরা শয়তানের কথাবার্তার আরো যে বিস্তারিত বিবরণ পাই তা হচ্ছে এই যে,

وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ـ

"আর সে বললো, তোমাদের রব তোমাদেরকে এ গাছটি থেকে শুধুমাত্র এ জন্য বিরত রেখেছেন, যাতে তোমরা দু'জন ফেরেশতা অথবা চিরঞ্জীব না হয়ে যাও।"(২০ আয়াত)

১০১. অন্য কথায় নাফরমানীর প্রকাশ ঘটার সাথে সাথেই সরকারী ব্যবস্থাপনায় তাদেরকে যেসব জীবনোপকরণ দেয়া হয়েছিল সেগুলো তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হলো। আর এর প্রথম প্রকাশ ঘটলো পোশাক ছিনিয়ে নেবার মধ্য দিয়েই। খাদ্য, পানীয় ও বাসস্থান থেকে বঞ্চিত হওয়া তো ছিল পরবর্তীকালের ব্যাপার। ক্ষুধা ও পিপাসা লাগলে তবেই না খাদ্য ও পানীয়ের চাহিদা বুঝা যেতো এবং বাসস্থান থেকে বের করে দেবার ব্যাপারটিও ছিল পরবর্তীকালীন ব্যাপার। কিন্তু নাফরমানীর প্রথম প্রভাব পড়লো সরকারী পোশাকের ওপর। কারণ তা সংগে সংগেই খুলে নেয়া হয়েছিল।

১০২. এখানে আদম আলাইহিস সালামের মাধ্যমে যে মানবিক দুর্বলতার প্রকাশ ঘটেছিল তার প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা উচিত। তিনি আল্লাহকে নিজের স্রষ্টা ও রব বলে জানতেন এবং অন্তর দিয়ে তা মানতেন। জান্নাতে তিনি যেসব জীবনোপকরণ লাভ করেছিলেন সেগুলো সবসময় তাঁর সামনে ছিল। শয়তানের হিংসা ও শত্রুতার জ্ঞানও তিনি সরাসরি লাভ করেছিলেন। আল্লাহ তাঁকে হুকুম দেবার সাথে সাথেই বলে দিয়েছিলেন, এ হচ্ছে তোমার শত্রু, তোমাকে নাফরমানী করতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করবে ফলে এজন্য তোমাকে এ ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। শয়তান তাঁর সামনে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল যে, আমি তাকে পথভ্রষ্ট করবো এবং তার শিকড় উপড়ে ফেলবো। এসব সত্ত্বেও শয়তান যখন তার সামনে স্নেহশীল উপদেশ দাতা ও কল্যাণকামী বন্ধুর বেশে এসে তাঁকে একটি অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থার (চিরন্তন জীবন ও অন্তহীন শাসন কর্তৃত্ব) লোভ দেখালো তখন তার লোভ দেখানোর মোকাবিলায় তিনি নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারলেন না। তাঁর পা পিছলে গেলো। অথচ এখনো আল্লাহর প্রতি তাঁর বিশ্বাসে কোনো পার্থক্য দেখা দেয়নি। এবং তাঁর ফরমান আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়, এ ধরনের কোনো ভাবনাও তাঁর মনে জাগেনি। শয়তানী লালসাবৃত্তির আওতাধীনে যে একটি তাৎক্ষণিক আবেগ তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল তা তাঁকে ভুলের মধ্যে নিক্ষেপ করলো এবং আত্মসংযমের বাঁধন ঢিলে হবার সাথে সাথেই তিনি আনুগত্যের উন্নত স্থান থেকে গোনাহের নিম্নপংকে নেমে গেলেন। এ "ভুল" ও সংকল্প বিহীনতার উল্লেখ কাহিনীর শুরুতেই করা হয়েছিল। এ আয়াতের শুরুতে এরি ফলশ্রুতি হিসেবে নাফরমানী ও ভ্রষ্টতার কথা বলা হয়েছে। সৃষ্টির সূচনাতেই মানুষের এ দুর্বলতার প্রকাশ ঘটেছিল এবং পরবর্তীতে এমন কোনো যুগ আসেনি যখন তার মধ্যে এ দুর্বলতা পাওয়া যায়নি।

১০৩. অর্থাৎ শয়তানের মতো আল্লাহর দরবার থেকে বহিষ্কৃত করেননি। আনুগত্যের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে যেখানে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন সেখানে তাঁকে পড়ে থাকতে দেননি বরং উঠিয়ে আবার নিজের কাছে ডেকে নিয়েছিলেন এবং নিজের খেদমতের জন্য বাছাই করে নিয়েছিলেন। ইচ্ছাকৃতভাবে বিদ্রোহকারী এবং অহংকার ও দাম্ভিকতা প্রকাশকারী ভৃত্যের সাথে এক ধরনের আচরণ করা হয়। শয়তান ছিল এর হকদার এবং এমন প্রত্যেক বান্দাও এর হকদার হয়ে পড়ে যে নিজের রবের নাফরমানী করে এবং তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে সামনে দাঁড়ায়। আর এক ধরনের আচরণ করা হয় এমন বিশ্বস্ত বান্দার সাথে যে নিছক "ভুল" ও

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي
هُدًى ۖ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ
عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾

আর বললেন, "তোমরা (উভয় পক্ষ অর্থাৎ মানুষ ও শয়তান) এখান থেকে নেমে যাও, তোমরা পরস্পরের শত্রু থাকবে। এখন যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোনো নির্দেশনামা পৌঁছে যায় তাহলে যে ব্যক্তি আমার সেই নির্দেশ মেনে চলবে সে বিভ্রান্তও হবে না, দুর্ভাগ্য পীড়িতও হবে না। আর যে ব্যক্তি আমার 'যিকির' (উপদেশমালা) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জন্য হবে দুনিয়ায় সংকীর্ণ জীবন[১০৫] এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে উঠাবো অন্ধ করে।"[১০৬]

"সংকল্পহীনতা"র কারণে অপরাধ করে বসে এবং তারপর সজ্ঞাগ হবার সাথে সাথেই নিজের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়। হযরত আদম ও হাওয়ার সাথে এ আচরণ করা হয়েছিল। কারণ নিজেদের ভুলের অনুভূতি হবার সাথে সাথেই তারা বলে উঠেছিলেন ঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি এবং যদি তুমি আমাদের মাফ না করো এবং আমাদের প্রতি করুণা না করো তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।" (আ'রাফ ঃ ২৩)

১০৪. অর্থাৎ শুধু মাফই করেননি বরং ভবিষ্যতের জন্য সঠিক পথও বাতলে দিয়েছেন এবং তার ওপর চলার পদ্ধতিও শিখিয়েছেন।

১০৫. দুনিয়ায় সংকীর্ণ জীবন হবার মানে এই নয় যে, দুনিয়ায় তাকে অভাব অনটনের মধ্যে জীবন যাপন করতে হবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে এই যে, এখানে মানসিক স্থিরতা লাভ করতে পারবে না। কোটিপতি হলেও মানসিক অস্থিরতায় ভুগবে। সাত মহাদেশের মহাপরাক্রমশালী সম্রাট হলেও মানসিক অস্থিরতা ও অতৃপ্তির হাত থেকে মুক্তি পাবে না। তার পার্থিব সাফল্যগুলো হবে হাজারো ধরনের অবৈধ কলাকৌশল অবলম্বনের ফল। এগুলোর কারণে নিজের বিবেকসহ চারপাশের সমগ্র সামাজিক পরিবেশের প্রত্যেকটি জিনিসের সাথে তার লাগাতার দ্বন্দ্ব চলতে থাকবে। যার ফলে সে কখনো মানসিক প্রশান্তি ও প্রকৃত সুখ লাভ করতে পারবে না।

১০৬. এখানে আদম আলাইহিস সালামের কাহিনী শেষ হয়ে যায়। এ কাহিনী যেভাবে এখানে এবং কুরআনের অন্যান্য স্থানে বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে আমি একথা বুঝেছি যে, (অবশ্য আল্লাহ সঠিক জানেন) আদম আলাইহিস সালামকে

শুরুতে জান্নাতে যা দেয়া হয়েছিল সেটিই ছিল যমীনের আসল খিলাফত। সে জান্নাত সম্ভবত আকাশে বা এ পৃথিবীতেই বানানো হয়েছিল। মোটকথা সেখানে আল্লাহর খলীফা তথা প্রতিনিধিকে এমনভাবে রাখা হয়েছিল যে, তার খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও বাসস্থানের যাবতীয় ব্যবস্থা সরকারের দায়িত্বে ছিল এবং সেবকরা (ফেরেশতাগণ) তার হুকুমের অনুগত ছিলেন।

খিলাফতের বৃহত্তর ও উন্নততর দায়িত্ব পালন করার জন্য তিনি যাতে সচেষ্ট হতে পারেন এজন্য তার নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের আদৌ কোনো চিন্তা তাকে করতে হতো না। কিন্তু প্রার্থীর যোগ্যতার অবস্থা সুস্পষ্ট হবার এবং তার দুর্বলতা ও সবলতাগুলো প্রকাশিত হবার জন্য এ পদে স্থায়ী নিযুক্তির পূর্বে তার পরীক্ষা নেয়া অপরিহার্য মনে করা হয়েছে। সে জন্যই এই পরীক্ষা হয়েছে। এর ফলে যে কথা সুস্পষ্ট হয়েছে তা এই ছিল যে, লোভ ও লালসা প্রদর্শনে প্রভাবিত হয়ে এ প্রার্থীর পা পিছলে যায়। আনুগত্যের সংকল্পের ওপর সে মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেনি। বিস্মৃতি তার জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই পরীক্ষার পর আদম ও তার সন্তানদেরকে স্থায়ী খিলাফতে নিযুক্তির পরিবর্তে পরীক্ষামূলক খিলাফত দান করা হয়েছে এবং এ পরীক্ষার জন্য একটি সময়সীমা (নির্ধারিত সময়সীমা, কিয়ামত পর্যন্ত যার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে) নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। এই পরীক্ষার সময় প্রার্থীদের জন্য জীবন ধারণের সরকারী ব্যবস্থাপনা খতম করে দেয়া হয়েছে। এখন নিজেদের জীবনোপকরণ তাদের নিজেদেরই সংগ্রহ করে নিতে হবে। তবে পৃথিবী ও তার সৃষ্টিসমূহের ওপর তাদের ইখতিয়ার ও ক্ষমতা বহাল রাখা হয়েছে। এখন এরি পরীক্ষা চলছে যে, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা আনুগত্য করে কিনা এবং ভুল হয়ে গেলে অথবা লোভ ও লালসার প্রভাবে পা পিছলে গেলে সতর্কবাণী, স্মারক ও শিক্ষার প্রভাব গ্রহণ করে আবার সঠিক পথে ফিরে আসে কি না ? এবং তাদের শেষ ফায়সালা কি হয়, আনুগত্য না নাফরমানী ? এ পরীক্ষামূলক খিলাফতের যুদ্ধে প্রত্যেকের কর্মধারার রেকর্ড সংরক্ষিত থাকবে এবং যে চিরন্তন জীবন ও অবিনশ্বর রাজত্বের লোভ দেখিয়ে শয়তান হযরত আদম ও হাওয়াকে আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণে প্ররোচিত করেছিল শেষ বিচার ও হিসেবের দিন যারা সফলকাম হবে তাদেরকে আবার সেই স্থায়ী খিলাফত দান করা হবে। সে সময় এ সমগ্র পৃথিবীটিকে জান্নাতে পরিণত করা হবে। আল্লাহর এমন সব সৎ বান্দা এর উত্তরাধিকারী হবে যারা পরীক্ষামূলক খিলাফতের আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে অথবা ভুল করার পর শেষ পর্যন্ত আবার আনুগত্যের দিকে ফিরে এসে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দেবে। জান্নাতের এই জীবনকে যারা নিছক, পানাহার করা ও আয়েশ আরাম করে বুক ফুলিয়ে চলার জীবন মনে করে তাদের ধারণা সঠিক নয়। সেখানে অনবরত উন্নতি হতে থাকবে, অবনতির কোনো ভয় থাকবে না। মানুষ সেখানে আল্লাহর খিলাফতের মহান দায়িত্ব পালন করবে এবং এপথে আবার কোনো প্রকার ব্যর্থতার সম্মুখীন তাকে হতে হবে না। কিন্তু সেই উন্নতি ও সেসব কার্যক্রমের কল্পনা করা আমাদের জন্য ঠিক ততটাই কঠিন যেমন একটি শিশুর জন্য সে বড় হয়ে যখন বিয়ে করবে তখন দাম্পত্য জীবনের অবস্থা কেমন হবে একথা কল্পনা করা কঠিন হয়। এজন্যই কুরআনে জান্নাতের জীবনের শুধুমাত্র এমনসব তৃপ্তি ও স্বাদ-আহলাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোকে দুনিয়ার ভোগ ও স্বাদ-আহলাদের সাথে তুলনা করে সেগুলো সম্পর্কে আমরা কিছুটা আন্দাজ অনুমান করতে পারি।

এ সুযোগে আদম ও হাওয়ার কাহিনী বাইবেলে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তার ওপরও একবার নজর বুলিয়ে নেয়া কম আকর্ষণীয় হবে না। বাইবেলের বর্ণনা হচ্ছে "খোদা পৃথিবীর মাটি দিয়ে আদমকে তৈরী করেন। তার নাসিকায় ফুঁ দিয়ে প্রাণবায়ু প্রবেশ করান। এভাবে মানুষ জীবন লাভ করে। আর খোদা পূর্বদিকে এদনে একটি উদ্যান নির্মাণ করান এবং সেখানে নিজের তৈরি করা মানুষকে রাখেন" "আর উদ্যানের মাঝখানে জীবন বৃক্ষ ও ভালো ও মন্দের জ্ঞানদায়ক বৃক্ষও উৎপন্ন করেন।" "আর খোদা আদমকে হুকুম দেন এবং বলেন, তুমি উদ্যানের প্রতিটি গাছের ফল নির্দ্বিধায় খেতে পারো কিন্তু ভালো মন্দের জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল কখনো খেয়ো না। কারণ যেদিন তুমি ওর মধ্য থেকে খাবে সেদিনই মারা পড়বে।" "আর খোদা আদমের মধ্য থেকে যে পঞ্জর বের করেছিলেন তা থেকে এক নারী সৃষ্টি করে তাকে আদমের কাছে আনেন।" "আর আদম ও তার স্ত্রী উভয়ই উলংগ ছিলেন, তাদের লজ্জাবোধ ছিল না।" "আর ঈশ্বরের নির্মিত ভূচর প্রাণীদের মধ্যে সাপ ছিল সবচেয়ে বেশী খল। সে ঐ নারীকে বললো, ঈশ্বর কি বাস্তবিকই বলেছেন, তোমরা এই উদ্যানের কোনো বৃক্ষের ফল খেয়ো না ?" "সাপ নারীকে বললো, তোমরা কোনোক্রমেই মরবে না, বরং ঈশ্বর জানেন, যেদিন তোমরা তা খাবে, তোমাদের চোখ খুলে যাবে এবং তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ হয়ে ভালো মন্দের জ্ঞানপ্রাপ্ত হবে।" "এ জন্য নারী তার ফল পেড়ে খেয়ে ফেললেন এবং নিজের স্বামীকেও খাওয়ালেন।" "তখন তাদের উভয়ের চোখ খুলে গেলো এবং তারা বুঝতে পারলো যে, তারা উলংগ। আর তারা ডুমুর গাছের পাতা সেলাই করে নিজেদের জন্য ঘাঘরা প্রস্তুত করলেন। আর তারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি দিবাবসানে উদ্যানে গমনাগমন করছিলেন। তাহাতে আদম ও তাঁর স্ত্রী সদাপ্রভু ঈশ্বরের সম্মুখ থেকে উদ্যানের বৃক্ষসমূহের মধ্যে লুকালেন।" "তখন খোদা আদমকে ডেকে বললেন, তুমি কোথায় ? তিনি বললেন, আমি উদ্যানে তোমার আওয়াজ শুনে ভীত হয়েছি এবং লুকিয়েছি, কারণ আমি উলংগ। খোদা বললেন, তুমি যে উলংগ তা তোমাকে কে বললো ? যে বৃক্ষের ফল খেতে তোমাকে বারণ করেছিলাম নিশ্চয়ই তুমি তার ফল খেয়েছো। আদম বললেন, হাওয়া আমাকে তার ফল খাইয়েছে। আর হাওয়া বললো, আমাকে সাপ প্ররোচিত করেছিল। একথায় আল্লাহ সাপকে বললেন, "তুমি এই কাজ করেছো, তাই গ্রাম্য বন্য পশুদের মধ্যে তুমি অধিক শাপগ্রস্ত ; তুমি বুকে হাঁটবে এবং যাবজ্জীবন ধূলি ভোজন করবে। আর আমি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশে ও তার বংশে পরস্পর শত্রুতা সৃষ্টি করবো; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করবে এবং তুমি তার পাদমূল চূর্ণ করবে।" এবং নারীকে এ শাস্তি দিলেন, "আমি তোমার গর্ভবেদনা অত্যন্ত বাড়িয়ে দেবো তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করবে এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকবে ; ও সে তোমার ওপর কর্তৃত্ব করবে।" আর আদমের ব্যাপারে এ ফায়সালা করলেন যে, যেহেতু তুমি নিজের স্ত্রীর কথা মেনে নিয়েছো এবং আমার হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করেছো, "তাই তোমার জন্য ভূমি অভিশপ্ত হলো, তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশে তা ভোগ করবে ..... তুমি ঘর্মাক্ত মুখে আহার করবে।" তারপর "সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম ও তার স্ত্রীর জন্য চামড়ার পোশাক তৈরি করে তাদেরকে তা পরালেন।" "আর সদাপ্রভু ঈশ্বর বললেন, দেখো, মানুষ ভালোমন্দের জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে আমাদের একের মতো হলো ; এখন এমন যেমন না হয় যে, সে হাত বাড়িয়ে জীবন বৃক্ষের ফলও পেড়ে খায় এবং অনন্তজীবী হয়। তাই সদাপ্রভু ঈশ্বর তাকে এদনের উদ্যান থেকে বের করে দিলেন।" (আদি পুস্তক ২ ঃ ৭-২৫, ৩ ঃ ১-২৩)

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذٰلِكَ
اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ﴿١٢٦﴾ وَكَذٰلِكَ
نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ۭ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ
اَشَدُّ وَاَبْقٰى ﴿١٢٧﴾ اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ
يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ﴿١٢٨﴾

—সে বলবে, "হে আমার রব! দুনিয়ায় তো আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম কিন্তু এখানে আমাকে অন্ধ করে উঠালে কেন ?" আল্লাহ বলবেন, "হ্যাঁ, এভাবেই তো। আমার আয়াত যখন তোমার কাছে এসেছিল, তুমি তাকে ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হচ্ছে।"[১০৭]—এভাবেই আমি সীমালংঘনকারী এবং নিজের রবের আয়াত অমান্যকারীকে (দুনিয়ায়) প্রতিফল দিয়ে থাকি[১০৮] এবং আখেরাতের আযাব বেশী কঠিন এবং বেশীক্ষণ স্থায়ী।

তাহলে কি এদের[১০৯] (ইতিহাসের এ শিক্ষা থেকে) কোনো পথনির্দেশ মেলেনি যে, এদের পূর্বে আমি কত জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের (ধ্বংসপ্রাপ্ত) বসতিগুলোতে আজ এরা চলাফেরা করে ? আসলে যারা ভারসাম্যপূর্ণ বুদ্ধি-বিবেকের অধিকারী তাদের জন্য রয়েছে এর মধ্যে বহু নিদর্শন।[১১০]

যারা একথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না যে, কুরআনে এ কাহিনী বনী ইসরাঈল থেকে নকল করা হয়েছে তাদের কাছে বাইবেলের এ বর্ণনা ও কুরআনের বর্ণনাকে একটু পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করার আবেদন জানাই।

১০৭. কিয়ামতের দিন নতুন জীবনের শুরু থেকে নিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করা পর্যন্ত অপরাধীদেরকে যেসব বিচিত্র অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে সেগুলো আলাদা আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি অবস্থা হচ্ছে,

لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ۝

"তুমি এ জিনিস থেকে গাফলতির মধ্যে পড়েছিলে, এখন আমি তোমার সামনে থেকে পরদা সরিয়ে দিয়েছি, আজ তোমার দৃষ্টি বড়ই তীক্ষ্ণ।" (কাফ ঃ ২২)

অর্থাৎ আজ তুমি খুব পরিষ্কার ও স্বচ্ছ দেখতে পাচ্ছো। দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে ঃ

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۝ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا تَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ۔

"আল্লাহ তো তাদের আযাবকে সেদিনের জন্য পিছিয়ে দিচ্ছেন যেদিন অবস্থা এমন হবে যে, দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়েই থেকে যাবে, লোকেরা মাথা তুলে ছুটতেই থাকবে। চোখ উপরে তুলে তাকিয়েই থাকবে এবং মন দিশেহারা হয়ে যাবে।"

(ইবরাহীম ৪২-৪৩)

তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে ঃ

وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ۝ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝

"আর কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য একটি লিখন বের করবো, যাকে সে পাবে উন্মুক্ত কিতাব হিসেবে। পড়ো নিজের আমলনামা আজ নিজের হিসেব করার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।" (বনী ইসরাঈল ঃ ১৩-১৪)

আর আমাদের আলোচ্য আয়াতে এসব অবস্থার মধ্যে একটি অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। মনে হচ্ছে, আল্লাহর অসীম ক্ষমতাবলে তারা আখেরাতের ভয়াবহ দৃশ্য এবং নিজেদের দুষ্কৃতির ফল তো খুব ভালোভাবেই দেখবে কিন্তু তাদের দৃষ্টিশক্তি শুধুমাত্র এগুলোই দেখার যোগ্যতা সম্পন্ন হবে। বাদবাকি অন্যান্য দিক থেকে তাদের অবস্থা হবে এমন অন্ধের মতো যে, নিজের চলার পথ দেখতে পায় না। যার হাতে লাঠিও নেই, হাতড়ে চলার ক্ষমতাও নেই, প্রতি পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে, বুঝতে পারছে না সে কোন্ দিকে যাবে এবং নিজের প্রয়োজন কিভাবে পূর্ণ করবে। নিম্নলিখিত শব্দাবলীর মাধ্যমে এ অবস্থাটিকে তুলে ধরা হয়েছে ঃ "যেভাবে তুমি আমার আয়াতগুলো ভুলে গিয়েছিলে ঠিক তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হচ্ছে।" অর্থাৎ তুমি কোথায় কোথায় হোঁচট খাচ্ছো, আঘাত পাচ্ছো এবং কেমনতর বঞ্চনার শিকার হচ্ছো আজ তার কোনো পরোয়াই করা হবে না। কেউ তোমার হাত ধরবে না। তোমার অভাব ও প্রয়োজন কেউ পূর্ণ করবে না এবং তোমার কোনো রকম দেখাশুনা করা হবে না। তুমি চরম উপেক্ষা, অবজ্ঞা ও বিস্মৃতির অতল তলে নিক্ষিপ্ত হবে।

১০৮. এখানে আল্লাহ "যিকির" অর্থাৎ তাঁর কিতাব ও তাঁর প্রেরিত উপদেশমালা থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের দুনিয়ায় যে "অতৃপ্ত জীবন" যাপন করানো হয় সেদিকে ইশারা করা হয়েছে।

১০৯. সে সময় মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করে বক্তব্য রাখা হয়েছিল এবং এখানে তাদের প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে।

১১০. অর্থাৎ ইতিহাসের এ শিক্ষায় প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের এ পর্যবেক্ষণে, মানব জাতির এ অভিজ্ঞতায়।

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّأَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾
فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ
غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ
تَرْضَىٰ ﴿١٣٠﴾ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾

৮ রুকূ'

যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে আগেই একটি সিদ্ধান্ত না করে দেয়া হতো এবং অবকাশের একটি সময়সীমা নির্ধারিত না করা হতো, তাহলে অবশ্যি এরও ফায়সালা চুকিয়ে দেয়া হতো। কাজেই হে মুহাম্মাদ! এরা যেসব কথা বলে তাতে সবর করো এবং নিজের রবের প্রশংসা ও গুণগান সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো সূর্য উদয়ের আগে ও তার অস্ত যাবার আগে, আর রাত্রিকালেও প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং দিনের প্রান্তগুলোতেও।[১১১] হয়তো এতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।[১১২] আর চোখ তুলেও তাকাবে না দুনিয়াবী জীবনের শান-শওকতের দিকে, যা আমি এদের মধ্য থেকে বিভিন্ন ধরনের লোকদেরকে দিয়ে রেখেছি। এসব তো আমি এদেরকে পরীক্ষার মুখোমুখি করার জন্য দিয়েছি এবং তোমার রবের দেয়া হালাল রিযিকই[১১৩] উত্তম ও অধিকতর স্থায়ী।

১১১. অর্থাৎ যেহেতু মহান আল্লাহ এখনই তাদেরকে ধ্বংস করতে চান না এবং তাদের জন্য একটি অবকাশ সময় নির্ধারিত করে ফেলেছেন, তাই তাঁর প্রদত্ত এ অবকাশ সময়ে তারা তোমার সাথে যে ধরনের আচরণই করুক না কেন তোমাকে অবশ্য তা বরদাশত করতে হবে এবং সবরের সাথে তাদের যাবতীয় তিক্ত ও কড়া কথা শুনেও নিজের সত্যবাণী প্রচার ও স্মরণ করিয়ে দেবার দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। তুমি নামায থেকে এ সবর, সহিষ্ণুতা ও সংযমের শক্তি লাভ করবে। এ নির্ধারিত সময়গুলোতে তোমার প্রতিদিন নিয়মিত এ নামায পড়া উচিত।

"রবের প্রশংসা ও গুণগান সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা" করা মানে হচ্ছে নামায। যেমন সামনের দিকে আল্লাহ নিজেই বলেছেন ঃ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا "নিজের পরিবার পরিজনকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও এবং নিজেও নিয়মিত তা পালন করতে থাকো।"

নামাযের সময়গুলোর প্রতি এখানেও পরিষ্কার ইশারা করা হয়েছে। সূর্য উদয়ের পূর্বে ফজরের নামায। সূর্য অস্তে যাবার আগে আসরের নামায। আর রাতের বেলা এশা ও তাহাজ্জুদের নামায। দিনের প্রান্তগুলো অবশ্যি তিনটিই হতে পারে। একটি প্রান্ত হচ্ছে প্রভাত, দ্বিতীয় প্রান্তটি সূর্য ঢলে পড়ার পর এবং তৃতীয় প্রান্তটি হচ্ছে সন্ধ্যা। কাজেই দিনের প্রান্তগুলো বলতে ফজর, যোহর ও মাগরিবের নামায হতে পারে। আরো বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা হূদ ১১৩, বনী ইসরাঈল ৯১ থেকে ৯৭, আর রূম ২৪ ও আল মু'মিন ৭৪ টীকাগুলো দেখুন।

১১২. এর দু'টি অর্থ হতে পারে এবং সম্ভবত দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্যও। একটি অর্থ হচ্ছে, তুমি নিজের বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকো। এই অবস্থায় নিজের কর্তব্য পালনের কারণে তোমাকে নানা অপ্রীতিকর কথা শুনতে হচ্ছে। তোমার প্রতি যারা অন্যায় বাড়াবাড়ি ও জুলুম করছে তাদেরকে এখনো শাস্তি দেয়া হবে না, তারা সত্যের আহ্বায়ককে কষ্ট দিতেও থাকবে এবং পৃথবীর বুকে বুক ফুলিয়েও চলবে, আল্লাহর এই ফায়সালায় তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তুমি একবার একাজটি করে দেখো। এর এমন ফলাফল সামনে এসে যাবে যাতে তোমার হৃদয় উৎফুল্ল হয়ে উঠবে। এ দ্বিতীয় অর্থটি কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন সূরা বনী ইসরাঈলে নামাযের হুকুম দেবার পর বলা হয়েছে ঃ

عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ـ

"আশা করা যায়, তোমার রব তোমাকে 'মাকামে মাহমুদে' (প্রশংসিত স্থান) পৌঁছিয়ে দেবেন।" (৭৯ আয়াত)

অন্যত্র সূরা 'দু-হা'য় বলা হয়েছে ঃ

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ○ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

"তোমার জন্য পরবর্তী যুগ অবশ্য পূর্ববর্তী যুগের চাইতে ভালো আর শিগ্‌গির তোমার রব তোমাকে এত কিছু দেবেন যার ফলে তুমি খুশী হয়ে যবে।"

১১৩. "রিয্‌ক" শব্দের অনুবাদ আমি করেছি "হালাল রিযিক"। এর কারণ মহান আল্লাহ কোথাও হারাম সম্পদকে "রবের রিযিক" হিসেবে পেশ করেননি। এর অর্থ হচ্ছে, এ ফাসেক ও দুশ্চরিত্র লোকেরা অবৈধ পথে টাকা-পয়সা সংগ্রহ করে নিজেদের জীবনে যে বাহ্যিক চমক সৃষ্টি করে নেয় তোমার ও তোমার মু'মিন সাথীদের তাকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। এ ধন-দওলত ও শান শওকত তোমাদের জন্য মোটেও ঈর্ষণীয় নয়। তোমরা নিজেরা পরিশ্রম করে যে পাক-পবিত্র রিযিক উপার্জন করো তা যতই সামান্য হোক না কেন সত্যনিষ্ঠ ও ঈমানদার লোকদের জন্য তাই ভালো এবং তার মধ্যে এমন কল্যাণ রয়েছে যা দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত বজায় থাকবে।

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ
نَرْزُقُكَ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ۝ وَقَالُوْا لَوْلَا يَأْتِيْنَا بِاٰيَةٍ
مِّنْ رَّبِّهٖ ۖ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُوْلٰى ۝ وَلَوْ أَنَّا
أَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُوْلًا
فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ۝ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ
فَتَرَبَّصُوْا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ أَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ
اهْتَدٰى ۝

নিজের পরিবার পরিজনকে নামায পড়ার হুকুম দাও[১১৪] এবং নিজেও তা নিয়মিত পালন করতে থাকো। আমি তোমার কাছে কোনো রিযিক চাই না, রিযিক তো আমিই তোমাকে দিচ্ছি এবং শুভ পরিণাম তাকওয়ার জন্যই।[১১৫]

তারা বলে, এ ব্যক্তি নিজের রবের পক্ষ থেকে কোনো নিশানী (মু'জিযা) আনে না কেন ? আর এদের কাছে কি আগের সহীফাগুলোর সমস্ত শিক্ষার সুস্পষ্ট বর্ণনা এসে যায়নি ?[১১৬] যদি আমি তার আসার আগে এদেরকে কোনো আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিতাম তাহলে আবার এরাই বলতো, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের কাছে কোনো রাসূল পাঠাওনি কেন, যাতে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবার আগেই তোমার আয়াত মেনে চলতাম ? হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলো, সবাই কাজের পরিণামের প্রতীক্ষায় রয়েছে।[১১৭] কাজেই এখন প্রতিক্ষারত থাকো। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, কারা সোজা-সঠিক পথ অবলম্বনকারী এবং কারা সৎপথ পেয়ে গেছে।

১১৪. অর্থাৎ তোমাদের সন্তানরা যেন নিজেদের অভাব অনটন ও দূরবস্থার মোকাবিলায় এ হারামখোরদের ভোগ বিলাসিতা দেখে মানসিকভাবে হতাশাগ্রস্ত না হয়ে পড়ে। তাদেরকে নামায পড়ার আদেশ দাও। এ জিনিসটি তাদের দৃষ্টিভংগীতে পরিবর্তন ঘটাবে। তাদের মূল্যবোধ বদলে দেবে। তাদের আগ্রহ ও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু পরিবর্তন করে দেবে। তারা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রিযিকের ওপর সবর করবে এবং তাতে পরিতুষ্ট হবে। ঈমান ও তাকওয়ার মাধ্যমে যে কল্যাণ অর্জিত হয় তাকে তারা এমন ভোগের ওপর অগ্রাধিকার দিতে থাকবে, যা ফাসেকী, দুশ্চরিত্রতা ও পার্থিব লোভ লালসা থেকে অর্জিত হয়।

১১৫. আমার কোনো লাভের জন্য আমি তোমাদের নামায পড়তে বলছি না। বরং এতে লাভ তোমাদের নিজেদেরই। সেটি হচ্ছে এই যে, তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হবে। আর এটিই দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে স্থায়ী ও শেষ সাফল্যের মাধ্যম।

১১৬. অর্থাৎ এটা কি কোনো ছোটখাটো মু'জিযা যে, তাদের মধ্য থেকে এক নিরক্ষর ব্যক্তি এমন একটি কিতাব পেশ করেছেন, যাতে শুরু থেকে নিয়ে এ পর্যন্তকার সমস্ত আসমানী কিতাবের বিষয়বস্তু ও শিক্ষাবলীর নির্যাস বের করে রেখে দেয়া হয়েছে ? মানুষের পথ নির্দেশনার জন্য ঐ সমস্ত কিতাবের মধ্যে যা কিছু ছিল তা কেবলমাত্র তার মধ্যে একত্রই করা হয়নি বরং তা এমন উন্মুক্ত করে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে যে, একজন মরুচারী বেদুইনও তা অনুধাবন করে লাভবান হতে পারে।

১১৭. অর্থাৎ যখন থেকে এ দাওয়াতটি তোমাদের শহরে পেশ করা হয়েছে তখন থেকে শুধুমাত্র এ শহরের নয় বরং আশপাশের এলাকারও প্রতিটি লোক এর শেষ পরিণতি দেখার জন্য অপেক্ষা করছে।

❐

আল আম্বিয়া

২১

নামকরণ

কোনো বিশেষ আয়াত থেকে এ সূরার নাম গৃহীত হয়নি। এর মধ্যে যেহেতু ধারাবাহিকভাবে বহু নবীর কথা আলোচিত হয়েছে তাই এর নাম রাখা হয়েছে "আল আম্বিয়া"। এটাও সূরার বিষয়বস্তু ভিত্তিক শিরোনাম নয় বরং নিছক সূরা চিহ্নিত করার একটি আলামত মাত্র।

নাযিলের সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী উভয়ের দৃষ্টিতেই মনে হয় এর নাযিলের সময়-কাল ছিল মক্কী জীবনের মাঝামাঝি অর্থাৎ আমাদের বিভক্তিকরণের দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনের তৃতীয় ভাগে। শেষ ভাগের সূরাগুলোর মধ্যে অবস্থার যে বৈশিষ্ট পাওয়া যায় এর পটভূমিতে তা ফুটে ওঠে না।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরাইশ সরদারদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলছিল এ সূরায় তা আলোচিত হয়েছে। তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের দাবী এবং তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসের দাওয়াতের বিরুদ্ধে যেসব সন্দেহ-সংশয় ও আপত্তি উত্থাপন করতো তার জবাব দেয়া হয়েছে। তাদের পক্ষ থেকে তাঁর মুকাবিলায় যেসব কৌশল অবলম্বন করা হতো সেগুলোর বিরুদ্ধে হুমকি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং তাদের অশুভ ফলাফল জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা যে ধরনের গাফলতি ও ঔদ্ধত্যের মনোভাব নিয়ে তাঁর দাওয়াতকে অগ্রাহ্য করছিল সে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। সবশেষে তাদেরকে একথা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তিকে তোমরা নিজেদের জন্য দুঃখ ও বিপদ মনে করছো তিনি আসলে তোমাদের জন্য রহমত হয়ে এসেছেন।

ভাষণের মধ্যে বিশেষভাবে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হয়েছে সেগুলো নিচে দেয়া হলো ঃ

এক ঃ মানুষ কখনো রসূল হতে পারে না, মক্কার কাফেরদের এ বিভ্রান্তি এবং এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রসূল মেনে নিতে অস্বীকার করাকে— বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে নিরসন ও খণ্ডন করা হয়েছে।

দুই ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ও কুরআনের বিরুদ্ধে তাদের বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী ধরনের আপত্তি উত্থাপন করা এবং কোনো একটি কথার ওপর অবিচল না থাকার—ওপর সংক্ষিপ্তভাবে কিন্তু অত্যন্ত জোরালো ও অর্থপূর্ণ পদ্ধতিতে পাকড়াও করা হয়েছে।

তিনঃ তাদের ধারণা ছিল, জীবন নেহাতই একটি খেলা, কিছুদিন খেলা করার পর তাকে এমনিই খতম হয়ে যেতে হবে, এর কোনো ফল বা পরিণতি ভুগতে হবে না। কোনো প্রকার হিসেব নিকেশ এবং শাস্তি ও পুরস্কারের অবকাশ এখানে নেই।—যে ধরনের গাফলতি ও অবজ্ঞা সহকারে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করছিল, ঐ ধারণাই যেহেতু তার মূল ছিল, তাই বড়ই হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে এর প্রতিকার করা হয়েছে।

চার ঃ শিরকের প্রতি তাদের অবিচল নিষ্ঠা এবং তাওহীদের বিরুদ্ধে অন্ধ বিদ্বেষ ছিল তাদের ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে বিরোধের মূল ভিত্তি।—এর সংশোধনের জন্য শিরকের বিরুদ্ধে ও তাওহীদের পক্ষে সংক্ষিপ্ত কিন্তু মোক্ষম ও চিত্তাকর্ষক যুক্তি প্রদান করা হয়েছে।

পাঁচ ঃ এ ভুল ধারণাও তাদের ছিল যে, নবীকে বারবার মিথ্যা বলা সত্ত্বেও যখন তাদের ওপর কোনো আযাব আসে না তখন নিশ্চয়ই নবী মিথ্যুক এবং তিনি আমাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আযাবের ভয় দেখান তা নিছক অন্তসারশূন্য হুমকি ছাড়া আর কিছুই নয়।—একে যুক্তি ও উপদেশ উভয় পদ্ধতিতে দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এরপর নবীগণের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী থেকে কতিপয় নজির পেশ করা হয়েছে। এগুলো থেকে একথা অনুধাবন করানোই উদ্দেশ্য যে, মানবেতিহাসের বিভিন্ন যুগে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব পয়গম্বর এসেছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন মানুষ। নবুওয়াতের বিশিষ্ট গুণ বাদ দিলে অন্যান্য গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাঁরা দুনিয়ার অন্যান্য মানুষদের মতোই মানুষ ছিলেন। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের গুণাবলী এবং খোদায়ীর সামান্যতম গন্ধও তাদের মধ্যে ছিল না। বরং নিজেদের প্রত্যেকটি প্রয়োজনের জন্য তারা সবসময় আল্লাহর সামনে হাত পাততেন। এই সংগে একই ঐতিহাসিক নজির থেকে আরো দু'টি কথাও সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, নবীদের ওপর বিভিন্ন প্রকার বিপদ-আপদ এসেছে এবং তাঁদের বিরোধীরাও তাঁদেরকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে তাঁদেরকে সাহায্য করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত সকল নবী একই দীনের অনুসারী ছিলেন এবং সেটি ছিল সেই দীন যেটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশ করছেন। এটিই মানব সম্প্রদায়ের আসল ধর্ম। বাদবাকি যতগুলো ধর্ম দুনিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো নিছক পথভ্রষ্ট মানুষদের বিভেদাত্মক প্ররোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সবশেষে বলা হয়েছে, এ দীনের অনুকরণ ও অনুসরণের ওপরই মানুষের নাজাত ও মুক্তি নির্ভরশীল। যারা এ দীন গ্রহণ করবে তারাই আল্লাহর শেষ আদালত থেকে সফলকাম হয়ে বের হয়ে আসবে এবং তারাই হবে এ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী। আর যারা তাকে প্রত্যাখ্যান করবে তারা আখেরাতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট পরিণতির সম্মুখীন হবে। শেষ বিচারের সময় আসার আগেই আল্লাহ নিজের নবীর মাধ্যমে মানুষকে এ সত্য সম্পর্কে

অবহিত করে চলছেন, এটি তাঁর বিরাট মেহেরবানী। এ অবস্থায় নবীর আগমনকে যারা নিজেদের জন্য রহমতের পরিবর্তে ধ্বংস মনে করে তারা অজ্ঞ ও মূর্খ ছাড়া আর কিছুই নয়।

আয়াত ১১২ | সূরা আল আম্বিয়া–মক্কী | রুকূ' ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ۝١

مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۝٢ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ۖ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ هَلْ هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۝٣

মানুষের হিসেব-নিকেশের সময় কাছে এসে গেছে,[১] অথচ সে গাফলতির মধ্যে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আছে।[২] তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে যে উপদেশ আসে,[৩] তা তারা দ্বিধাগ্রস্তভাবে শোনে এবং খেলার মধ্যে ডুবে থাকে,[৪] তাদের মন (অন্য চিন্তায়) আচ্ছন্ন।

আর জালেমরা পরস্পরের মধ্যে কানাকানি করে যে, "এ ব্যক্তি মূলত তোমাদের মতোই একজন মানুষ ছাড়া আর কি, তাহলে কি তোমরা দেখে শুনে যাদুর ফাঁদে পড়বে ?'[৫]

১. এর অর্থ হচ্ছে, কিয়ামত নিকটবর্তী। অর্থাৎ লোকদের নিজেদের কাজের হিসেব দেবার জন্য তাদের রবের সামনে হাজির হবার সময় আর দূরে নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন একথারই আলামত যে, মানব জাতির ইতিহাস বর্তমানে তার শেষ পর্যায়ে প্রবেশ করছে। এখন সে তার সূচনাকালের পরিবর্তে পরিণামের বেশী নিকটবর্তী হয়ে গেছে। সূচনা ও মধ্যবর্তীকালীন পর্যায় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং এবার শেষ পর্যায় শুরু হয়ে গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর একটি হাদীসে একথাই বলেছেন। তিনি নিজের হাতের দু'টি আঙ্গুল পাশাপাশি রেখে বলেনঃ

بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ

"আমার আগমন এমন সময়ে ঘটেছে যখন আমি ও কিয়ামত এ দু'টি আঙ্গুলের মতো অবস্থান করছি।"

অর্থাৎ আমার পরে শুধু কিয়ামতই আছে। মাঝখানে অন্য কোনো নবী আগমনের অবকাশ নেই। যদি সংশোধিত হয়ে যেতে চাও তাহলে আমার দাওয়াত গ্রহণ করে সংশোধিত হও। আর কোনো সুসংবাদদানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী আসবেন না।

২. অর্থাৎ কোনো সতর্ক সংকেত ও সতর্কবাণীর প্রতি দৃষ্টি দেয় না। নিজেরাও পরিণামের কথা ভাবে না, আর যে নবী তাদেরকে সতর্ক করার চেষ্টা করছেন তাঁর কথাও শোনে না।

৩. অর্থাৎ কুরআনের যে নতুন সূরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল হয় এবং তাদেরকে শুনানো হয়।

৪. وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ-এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ ওপরে অনুবাদে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে খেলা মানে হচ্ছে এই জীবনের খেলা। আল্লাহ ও আখেরাতের ব্যাপারে গাফেল লোকেরা এ খেলা খেলছে। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে এই যে, তারা গুরুত্ব ও মনোযোগ সহকারে তা শোনে না বরং খেলা, ঠাট্টা-তামাসা ও কৌতুকচ্ছলে তা শুনে থাকে।

৫. "পড়ে যেতে থাকবে"-ও অনুবাদ হতে পারে এবং দু'টি অর্থই সঠিক। মক্কার যেসব বড় বড় কাফের সরদাররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের মোকাবিলা করার চিন্তায় বড়ই পেরেশান হয়ে পড়েছিল তারাই পরস্পর বসে বসে এই কানাকানি করতো। তারা বলতো, এ ব্যক্তি তো কোনোক্রমে নবী হতেই পারে না। কারণ এতো আমাদেরই মতো মানুষ, খায় দায়, বাজারে ঘুরে বেড়ায়, স্ত্রী-সন্তানও আছে। কাজেই এর মধ্যে এমন নতুন কথা কি আছে যা তাকে আমাদের থেকে বিশিষ্ট করে এবং আমাদের মোকাবিলায় তাঁকে আল্লাহর সাথে একটি অস্বাভাবিক সম্পর্কের অধিকারী করে ? তবে কিনা এ ব্যক্তির কথাবার্তায় এবং এর ব্যক্তিত্বের মধ্যে যাদু আছে। ফলে যে ব্যক্তি এর কথা কান লাগিয়ে শোনে এবং এর কাছে যায়, সে এর ভক্ত হয়ে পড়ে। কাজেই যদি নিজের ভালো চাও তাহলে এর কথায় কান দিয়ো না এবং এর সাথে মেলামেশা করো না। কারণ এর কথা শোনা এবং এর নিকটে যাওয়া সুস্পষ্ট যাদুর ফাঁদে নিজেকে আটকে দেয়ার মতই।

যে কারণে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে "যাদু"র অভিযোগ আনতো তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রাচীন সীরাত লেখক মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (মৃত্যু ১৫২ হিঃ) তাঁর সীরাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, একবার উত্‌বা ইবনে আবী রাবীআহ (আবু সুফিয়ানের শ্বশুর এবং কলিজা খাদক হিন্দার বাপ) কুরাইশ সরদারদেরকে বললো, যদি আপনারা পছন্দ করেন তাহলে আমি গিয়ে মুহাম্মাদের সাথে সাক্ষাত করি এবং তাকে বুঝাবার চেষ্টা করি। এটা ছিল হযরত হামযার (রা) ইসলাম গ্রহণের পরবর্তীকালের ঘটনা। তখন নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছিল এবং এ অবস্থা দেখে কুরাইশ সরদাররা বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। লোকেরা বললো, হে আবুল ওলীদ ! তোমার প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। তুমি অবশ্যই গিয়ে তার সাথে কথা বলো। সে নবী করীম (স)-এর কাছে গিয়ে বললো, "হে ভাতিজা ! আমাদের এখানে তোমার যে মর্যাদা ছিল তা তুমি নিজেই জানো এবং বংশের দিক দিয়েও তুমি

একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। তুমি নিজের জাতির ওপর একটি বিপদ চাপিয়ে দিয়েছো ? তুমি সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করেছো। সমগ্র জাতিকে বোকা ঠাউরেছো। তার ধর্ম ও উপাস্যদের দুর্নাম করেছো। মৃত বাপ-দাদাদের সবাইকে তুমি পথভ্রষ্ট ও কাফের বানিয়ে দিয়েছো। হে ভাতিজা! যদি এসব কথা ও কাজের মাধ্যমে দুনিয়ায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করাই তোমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে এসো আমরা সবাই মিলে তোমাকে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদ দিয়ে দেবো যে, তুমি সবচেয়ে বড় ধনী হয়ে যাবে। নেতৃত্ব চাইলে আমরা তোমাকে নেতা মেনে নিচ্ছি। বাদশাহী চাইলে তোমাকে বাদশাহ বানিয়ে দিচ্ছি। আর যদি তোমার কোনো রোগ হয়ে থাকে যে কারণে সত্যিই তুমি শয়নে-জাগরণে কিছু দেখতে পাচ্ছো, তাহলে আমরা সবাই মিলে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের সহায়তায় তোমার রোগ নিরাময় করবো।" এসব কথা সে বলতে থাকলো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরবে সব শুনতে থাকলেন। যখন সে যথেষ্ট বলে ফেলেছে তখন নবী করীম (স) বললেন," আবুল ওলীদ! আপনি যা কিছু বলতে চান সব বলে শেষ করেছেন, নাকি এখনো কিছু বলার বাকি আছে ?" সে বললো, হাঁ, আমার বক্তব্য শেষ, তখন তিনি বললেন, আচ্ছা, তাহলে এখন আপনি আমার কথা শুনুন,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، حٰمٓ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এরপর কিছুক্ষণ পর্যন্ত তিনি একনাগাড়ে সূরা হা-মীম-আস সাজাদাহ তেলাওয়াত করতে থাকলেন এবং উত্‌বা পেছনে মাটির ওপর হাত ঠেকিয়ে দিয়ে মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকলো। আটতিরিশ আয়াতে পৌঁছে তিনি সিজদা করলেন এবং তারপর মাথা উঠিয়ে উত্‌বাকে বললেন, "হে আবুল ওলীদ! আমার যা কিছু বলার ছিল তা আপনি শুনে নিয়েছেন, এখন আপনার যা করার আপনি করবেন।"

উত্‌বা এখান থেকে উঠে কুরাইশ সরদারদের কাছে ফিরে যেতে লাগলো। লোকেরা তাকে দূর থেকে আসতে দেখে বললো,"আল্লাহর কসম, আবুল ওলীদের চেহারা পাল্টে গেছে। যে চেহারা নিয়ে সে এখান থেকে গিয়েছিল এটা সে চেহারা নয়। তার ফিরে আসার সাথে সাথেই লোকেরা প্রশ্ন করলো, "বলো, হে আবুল ওলীদ! তুমি কি করে এলে ?" সে বললো, "আল্লাহর কসম! আজ আমি এমন কালাম শুনেছি যা এর আগে কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম, এ কবিতা নয়, যাদুও নয়, গণৎকারের ভবিষ্যদ্বাণীও নয়। হে কুরাইশ জনতা! আমার কথা মেনে নাও এবং এ ব্যক্তিকে এর অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও। এর যেসব কথা আমি শুনেছি তা একদিন স্বরূপে প্রকাশিত হবেই। যদি আরবরা তার ওপর বিজয়ী হয় তাহলে তোমাদের ভাইয়ের রক্তপাতের দায় থেকে তোমরা মুক্ত থাকবে। অন্যেরা তার দায়ভার বহন করবে। আর যদি সে আরবদের ওপর বিজয়ী হয় তাহলে তার শাসন কর্তৃত্ব হবে তোমাদেরই শাসন কর্তৃত্ব এবং তার সম্মান তোমাদেরই সম্মানে রূপান্তরিত হবে।" লোকেরা বললো, "আল্লাহর কসম, হে আবুল ওলীদ! তুমিও তার যাদুতে আক্রান্ত হয়েছো।" সে বললো, "এটা আমার ব্যক্তিগত মত। এখন তোমরা নিজেরাই তোমাদের সিদ্ধান্ত নেবে।" (ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৩১৩-৩১৪পৃঃ) ইমাম বায়হাকী এ ঘটনা সম্পর্কে যেসব বর্ণনা সংগ্রহ করেছেন তার একটিতে এতটুকু বাড়িয়ে

বলা হয়েছে যে, যখন নবী করীম (স) সূরা হা-মীম আস সাজদাহ তেলাওয়াত করতে করতে এ আয়াতে পৌঁছে গেলেন—

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ

(তবুও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বলে দাও, আমি তো তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি এমন একটি আকস্মিক আযাবে পতিত হওয়া থেকে, যেমন আযাবে পতিত হয়েছিল আদ ও সামুদ।) তখন উত্‌বাহ স্বতস্ফূর্তভাবে সামনের দিকে এগিয়ে এসে তাঁর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে উঠলো, আল্লাহর দোহাই নিজের জাতির প্রতি করুণা করো।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ইবনে ইসহাক এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ একবার আরাশ গোত্রের একজন লোক কিছু উট নিয়ে মক্কায় এলো। আবু জেহেল তার উটগুলো কিনে নিলো। যখন সে দাম চাইলো তখন আবু জেহেল টালবাহানা করতে লাগলো। আরাশী ব্যক্তি বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত একদিন কা'বার হারমে কুরাইশ সরদারদেরকে ধরলো এবং প্রকাশ্য সমাবেশে ফরিয়াদ করতে থাকলো। অন্যদিকে হারাম শরীফের অন্য প্রান্তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে ছিলেন। কুরাইশ সরদাররা তাকে বললো, "আমরা কিছুই করতে পারবো না। দেখো, ঐ দিকে ঐ কোণে যে ব্যক্তি বসে আছে তাকে গিয়ে বলো। সে তার কাছ থেকে তোমার টাকা আদায় করে দেবে।" আরাশী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। কুরাইশ সরদাররা পরস্পর বলতে লাগলো, "এবার মজা হবে।" আরাশী গিয়ে নবী করীম (স)-এর কাছে নিজের অভিযোগ পেশ করলো, তিনি তখনই উঠে দাঁড়ালেন এবং তাকে নিয়ে আবু জেহেলের গৃহের দিকে রওয়ানা দিলেন। সরদাররা তাদের পেছনে একজন লোক পাঠিয়ে দিল। আবু জেহেলের বাড়ীতে কি ঘটে তা সে সরদারদেরকে জানাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোজা আবু জেহেলের দরজায় পৌঁছে গেলেন এবং শিকল ধরে নাড়া দিলেন। সে জিজ্ঞেস করলো, "কে ?" তিনি জবাব দিলেন, "মুহাম্মাদ।" সে অবাক হয়ে বাইরে বের হয়ে এলো। তিনি তাকে বললেন, "এ ব্যক্তির পাওনা দিয়ে দাও।" সে কোনো দ্বিরুক্তি না করে ভেতরে চলে গেলো এবং উটের দাম এনে তার হাতে দিল। এ অবস্থা দেখে কুরাইশদের প্রতিবেদক হারাম শরীফের দিকে দৌড়ে গেলো এবং সরদারদেরকে সমস্ত ঘটনা শুনাবার পর বললো, আল্লাহর কসম! আজ এমন বিস্ময়কর ব্যাপার দেখলাম, যা এর আগে কখনো দেখিনি। হাকাম ইবনে হিশাম (অর্থাৎ আবু জেহেল) যখন গৃহ থেকে বের হয়ে মুহাম্মাদকে দেখলো তখনই তার চেহারার রং ফিকে হয়ে গেলো এবং যখন মুহাম্মাদ তাকে বললো, তার পাওনা দিয়ে দাও তখন এমন মনে হচ্ছিল যেন হাকাম ইবনে হিশামের দেহে প্রাণ নেই। (ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ২৯-৩০ পৃঃ)

এ ছিল ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের প্রভাব। আবার অন্যদিকে ছিল কালাম ও বাণীর প্রভাব যাকে তারা যাদু মনে করতো এবং অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ লোকদেরকে এ বলে ভয় দেখাতো যে, এ লোকটির কাছে যেয়ো না, কাছে গেলেই তোমাদেরকে যাদু করে দেবে।

قُلْ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ز وَهُوَ السَّمِيْعُ
الْعَلِيْمُ ۝ بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚ
فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ۝ مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ
قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا ۚ اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ۝

রসূল বললো, আমার রব এমন প্রত্যেকটি কথা জানেন যা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে বলা হয়, তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।[৬]

তারা বলে, "বরং এসব বিক্ষিপ্ত স্বপ্ন, বরং এসব তার মনগড়া বরং এ ব্যক্তি কবি।[৭] *নয়তো সে আনুক একটি নিদর্শন যেমন পূর্ববর্তীকালের নবীদেরকে পাঠানো হয়েছিল নিদর্শন সহকারে।" অথচ এদের আগে আমি যেসব জনবসতিকে ধ্বংস করেছি, তাদের কেউ ঈমান আনেনি। এখন কি এরা ঈমান আনবে ?*[৮]

৬. অর্থাৎ নবী কখনো মিথ্যা প্রচারণা ও গুজব রটনার এ অভিযানের (Whispering Campaign) জবাবে এ ছাড়া অন্য কোনো কথা বলেননি যে, "তোমরা যেসব কথা তৈরি করো, সেগুলো জোরে জোরে বলো বা চুপিসারে কানে কানে বলো, আল্লাহ সবই শোনেন ও জানেন।" তিনি কখনো অন্যায়পন্থী শত্রুর সাথে মুখোমুখি বিতর্ক করেন না।

৭. এর পটভূমি হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের প্রভাব যখন ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, মক্কার সরদাররা পরস্পর পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলো যে, তাঁকে মোকাবিলা করার জন্য একটি জোরদার প্রচারাভিযান চালাতে হবে। মক্কায় যিয়ারত করার জন্য যে ব্যক্তিই আসবে তার মনে পূর্বাহ্নেই তাঁর বিরুদ্ধে এত বেশী কুধারণা সৃষ্টি করে দিতে হবে যার ফলে সে তাঁর কোনো কথায় কান দিতে রাজিই হবে না। এমনিতে এ অভিযান বছরের বারো মাসই জারি থাকতো কিন্তু বিশেষ করে হজ্জের মওসুমে বিপুল সংখ্যক লোক চারদিকে ছড়িয়ে দেয়া হতো, তারা বাইর থেকে আগত সকল যিয়ারতকারীর তাঁবুতে গিয়ে তাদেরকে এই বলে সতর্ক করে দিতো যে, এখানে এমন এমন ধরনের একজন লোক আছে, তার ব্যাপারে সাবধান থেকো। এসব আলোচনার সময় নানান ধরনের কথা বলা হতো। কখনো বলা হতো, এ ব্যক্তি যাদুকর। কখনো বলা হতো, সে নিজেই একটা বাণী রচনা করে বলছে এটা আল্লাহর বাণী। কখনো বলা হতো, আরে হাঁ, তা আবার এমন কি বাণী ! ডাহা পাগলের প্রলাপ এবং অগোছালো চিন্তার একটা আবর্জনা স্তুপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কখনো বলা হতো, কিছু কবিত্বমূলক ভাব-কল্পনা ও ছন্দ-গাথাকে সে আল্লাহর বাণী নাম দিয়ে রেখেছে। যেনতেনভাবে লোকদেরকে প্রতারিত করাই ছিল উদ্দেশ্য। কোনো একটি কথার ওপর অবিচল থেকে একটি মাপাজোকা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তারা পেশ করছিল না।

কারণ সত্যের কোনো প্রশ্নই তাদের সামনে ছিল না। কিন্তু এ মিথ্যা প্রচারণার ফল যা হলো তা হচ্ছে এই যে, তারা নিজেরাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিল। মুসলমানদের বছরের পর বছরের প্রচেষ্টায় তার যে প্রচার ও পরিচিতি হওয়া সম্ভবপর ছিল না কুরাইশদের এ বিরোধিতার অভিযানে তা মাত্র সামান্য কিছু সময়ের মধ্যেই হয়ে গেলো। প্রত্যেক ব্যক্তির মনে একটি প্রশ্ন জাগলো, যার বিরুদ্ধে এ বিরাট অভিযান, এ মারাত্মক অভিযোগ, কে সেই ব্যক্তি ? আবার অনেকে ভাবলো তার কথা তো শোনা উচিত। আমরা তো আর দুধের শিশু নই যে, অযথা তার কথায় পথভ্রষ্ট হবো।

এর একটি মজার দৃষ্টান্ত হচ্ছে তোফাইল ইবনে আমর দাওসীর ঘটনা। ইবনে ইসহাক বিস্তারিত আকারে তাঁর নিজের মুখেই এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলছেন ঃ আমি দাওস গোত্রের একজন কবি ছিলাম। কোনো কাজে মক্কায় গিয়েছিলাম। সেখানে পৌঁছতেই কুরাইশদের কয়েকজন লোক আমাকে ঘিরে ফেললো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে আমাকে অনেক কথা বললো। ফলে তাঁর সম্পর্কে আমার মনে খারাপ ধারণা জন্মালো। আমি স্থির করলাম, তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকবো। পর দিন আমি হারাম শরীফে গেলাম। দেখলাম তিনি কা'বা গৃহের কাছে নামায পড়ছেন। তাঁর মুখ নিঃসৃত কয়েকটি বাক্য আমার কানে পড়লো। আমি অনুভব করলাম, বড় চমৎকার বাণী। মনে মনে বললাম, আমি কবি, যুবক, বুদ্ধিমান। আমি কোনো শিশু নই যে, ঠিক ও বেঠিকের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবো না। তাহলে এ ব্যক্তি কি বলেন, এর সংগে কথা বলে জানার চেষ্টা করি না কেন। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শেষ করে চলে যেতে লাগলেন তখন আমি তাঁর পিছু নিলাম। তাঁর গৃহে পৌঁছে তাঁকে বললাম, আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনার সম্পর্কে আমাকে এসব কথা বলেছিল, ফলে আমি আপনার ব্যাপারে এতই খারাপ ধারণা পোষণ করেছিলাম যে, নিজের কানে তুলো ঠেসে দিয়েছিলাম, যাতে আপনার কথা শুনতে না পাই। কিন্তু এখনই যে কয়েকটি বাক্য আমি আপনার মুখ থেকে শুনেছি তা আমার কাছে বড়ই চমৎকার মনে হয়েছে। আপনি কি বলেন, আমাকে একটু বিস্তারিতভাবে জানান। জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কুরআনের একটি অংশ শুনালেন। তাতে আমি এত বেশী প্রভাবিত হয়ে পড়লাম যে, তখনই ইসলাম গ্রহণ করে ফেললাম। সেখান থেকে ফিরে গিয়ে আমি নিজের পিতা ও স্ত্রীকে মুসলমান করলাম। এরপর নিজের গোত্রের মধ্যে অবিরাম ইসলাম প্রচারের কাজ করতে লাগলাম। এমন কি খন্দকের যুদ্ধের সময় পর্যন্ত আমার গোত্রের সত্তর আশিটি পরিবার ইসলাম গ্রহণ করে ফেললো। (ইবনে হিশাম, ২ খণ্ড, ২২-২৪ পৃঃ)

ইবনে ইসহাক যে আর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, কুরাইশ সরদাররা নিজেদের মাহফিলগুলোতে নিজেরাই একথা স্বীকার করতো যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে তারা যেসব কথা তৈরি করে সেগুলো নিছক মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি লিখেছেন ঃ একটি মজলিসে নযর ইবনে হারেস বক্তৃতা প্রসংগে বলে, "তোমরা যেভাবে মুহাম্মাদের মোকাবিলা করছো তাতে কোনো কাজ হবে না। সে যখন যুবক ছিল তখন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সদাচারী ব্যক্তি ছিল। সবচেয়ে বড় সত্যনিষ্ঠ ও সবচেয়ে বেশী বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত ছিল। আর এখন তার চুল সাদা হতে যাচ্ছে, এখন তোমরা বলো কিনা সে যাদুকর, গণক, কবি, পাগল। আল্লাহর কসম,

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ
اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا
كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ۝ ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ
وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ۝ لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ؕ
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

আর হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বেও আমি মানুষদেরকেই রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম, যাদের কাছে আমি অহী পাঠাতাম।[৯] তোমরা যদি না জেনে থাকো তাহলে আহলে কিতাবদেরকে জিজ্ঞেস করো।[১০] সেই রসূলদেরকে আমি এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে, তারা খেতো না এবং তারা চিরজীবিও ছিল না। তারপর দেখে নাও আমি তাদের সাথে আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছি এবং তাদেরকে ও যাকে যাকে আমি চেয়েছি রক্ষা করেছি এবং সীমালংঘনকারীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি।[১১]

হে লোকেরা ! আমি তোমাদের প্রতি এমন একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যার মধ্যে তোমাদেরই কথা আছে, তোমরা কি বুঝ না ?[১২]

সে যাদুকর নয়। আমি যাদুকরদের দেখেছি এবং তাদের ঝাড়ফুঁক সম্পর্কেও জানি। আল্লাহর কসম, সে গণক নয়। আমি গণকদের তন্ত্রমন্ত্র শুনেছি, তারা যেসব রহস্যময় ও বহুমুখী কথা বলে থাকে তা আমি জানি। আল্লাহর কসম, সে কবিও নয়। কবিতার বিভিন্ন প্রকারের সাথে আমি পরিচিত। তার বাণী এর কোনো প্রকারের মধ্যেই পড়ে না। আল্লাহর কসম, সে পাগল নয়। পাগল যে অবস্থায় থাকে এবং সে যে প্রলাপ বকে সে ব্যাপারে কি আমরা কেউ অনভিজ্ঞ ? হে কুরাইশ সরদাররা! অন্য কিছু চিন্তা করো। তোমরা যে বিষয়ের মুখোমুখি হয়েছো এসব ঠুনকো কথায় তাকে পরাজিত করবে, ব্যাপারটা অতটা সহজ নয়।" এরপর সে এই প্রস্তাব পেশ করলো যে, আরবের বাহির থেকে রুস্তম ও ইস্‌ফিন্‌দিয়ারের কাহিনী এনে ছড়াতে হবে। লোকেরা সেদিকে আকৃষ্ট হবে এবং তা তাদের কাছে কুরআনের চাইতেও বেশী বিস্ময়কর মনে হবে। সেই অনুসারে কিছুদিন এই পরিকল্পনা কার্যকর করার কাজ চলতে লাগলো। এবং নযর নিজেই গল্প বলার কাজ শুরু করে দিল। (ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৩২০-৩২১ পৃঃ)

৮. এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে নিদর্শন দেখাবার দাবীর যে জবাব দেয়া হয়েছে তার মধ্যে তিনটি বিষয় রয়েছে। এক, পূর্ববর্তী রসূলদেরকে যে ধরনের নিদর্শন দেয়া হয়েছিল তোমরা তেমনি ধরনের নিদর্শন চাচ্ছো ? কিন্তু তোমরা ভুলে যাচ্ছো হঠকারী লোকেরা সেসব

নিদর্শন দেখেও ঈমান আনেনি। দুই, তোমরা নিদর্শনের দাবী তো করছো কিন্তু একথা মনে রাখছো না যে, সুস্পষ্ট মু'জিযা স্বচক্ষে দেখে নেবার পরও যে জাতি ঈমান আনতে অস্বীকার করেছে তারা এরপর শুধু ধ্বংসই হয়ে গেছে। তিন, তোমাদের চাহিদামতো নিদর্শনাবলী না পাঠানো তো তোমাদের প্রতি আল্লাহর একটি বিরাট মেহেরবানী। কারণ এ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর হুকুম শুধুমাত্র অস্বীকারই করে আসছো কিন্তু এ জন্য তোমাদের ওপর আযাব পাঠানো হয়নি। এখন কি তোমরা নিদর্শন এ জন্য চাচ্ছো যে, যেসব জাতি নিদর্শন দেখার পরও ঈমান আনেনি এবং এ জন্য তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে তোমরাও তাদের মতো একই পরিণতির সম্মুখীন হতে চাও ?

৯. এটি হচ্ছে "এ ব্যক্তি তোমাদের মতই একজন মানুষ" তাদের এ উক্তির জবাব। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মানবিক সত্তাকে তাঁর নবী না হওয়ার বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে পেশ করতো। জবাব দেয়া হয়েছে যে, পূর্ব যুগের যেসব লোককে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে বলে তোমরা মানো তাঁরা সবাইও মানুষ ছিলেন এবং মানুষ থাকা অবস্থায়ই তাঁরা আল্লাহর অহী লাভ করেছিলেন। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইয়াসীন ১১ টীকা)

১০. অর্থাৎ যে ইহুদীরা ইসলাম বৈরিতার ক্ষেত্রে আজ তোমাদের সাথে গলা মিলিয়ে চলছে এবং তোমাদেরকে বিরোধিতা করার কায়দা কৌশল শেখাচ্ছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, মূসা ও বনী ইসরাঈলের অন্যান্য নবীগণ কী ছিলেন ? মানুষ ছিলেন, না অন্য কোনো জীব ?

১১. অর্থাৎ পূর্ববর্তী ইতিহাসের শিক্ষা শুধুমাত্র এতটুকু কথা বলে না যে, পূর্বে যেসব রসূল পাঠানো হয়েছিল তারা মানুষ ছিলেন বরং একথাও বলে যে, তাঁদের সাহায্য ও সমর্থন করার এবং তাদের বিরোধিতাকারীদেরকে ধ্বংস করে দেবার যতগুলো অংগীকার আল্লাহ তাদের সাথে করেছিলেন সবই পূর্ণ হয়েছে এবং যেসব জাতি তাদের প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছিল তারা সবাই ধ্বংস হয়েছে। কাজেই এখন নিজেদের পরিণতি তোমরা নিজেরাই চিন্তা করে নাও।

১২. মক্কার কাফেররা কুরআন ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অবিন্যস্তভাবে যেসব কথা বলে চলছিল যে, তিনি যা এনেছেন তা কবিত্ব, যাদু, বিভ্রান্ত স্বপ্ন, মনগড়া কাহিনী ইত্যাদি। এটি হচ্ছে সেগুলোর একটি সম্মিলিত জবাব। এতে বলা হচ্ছে, এ কিতাবে এমন কি অভিনব কথা বলা হচ্ছে যা তোমরা বুঝতে পারছো না, যে কারণে সে সম্পর্কে তোমরা এত বেশী বিপরীতধর্মী মত গঠন করছো ? এর মধ্যে তো তোমাদের নিজেদের কথাই বলা হয়েছে। তোমাদেরই মনস্তত্ত্ব ও তোমাদেরই বাবহারিক জীবনের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তোমাদেরই স্বভাব, প্রকৃতি, গঠনাকৃতি এবং সূচনা ও পরিণামের কথা বলা হয়েছে। তোমাদেরই পরিবেশ থেকে এমনসব নিদর্শন বাছাই করে করে পেশ করা হয়েছে যা প্রকৃত সত্যের প্রতি ইংগিত করে। তোমাদেরই চারিত্রিক বৈশিষ্টসমূহ থেকে দোষ-গুণের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেখানো হচ্ছে, যা সঠিক বলে তোমাদের নিজেদের বিবেকই সাক্ষ দেয়। এসব কথার মধ্যে কী এমন জটিল বিষয় আছে, যা বুঝতে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি অক্ষম ?

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا
اٰخَرِيْنَ ﴿١١﴾ فَلَمَّآ اَحَسُّوْا بَاْسَنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ ﴿١٢﴾
لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْٓا اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تُسْـَٔلُوْنَ ﴿١٣﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ
دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ﴿١٥﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ
وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿١٦﴾

২ রুকূ'

কত অত্যাচারী জনবসতিকে আমি বিধ্বস্ত করে দিয়েছি এবং তাদের পর উঠিয়েছি অন্য জাতিকে। যখন তারা আমার আযাব অনুভব করলো,[১৩] পালাতে লাগলো সেখান থেকে। (বলা হলো) "পালায়ো না, চলে যাও তোমাদের গৃহে ও ভোগ্য সামগ্রীর মধ্যে, যেগুলোর মধ্যে তোমরা আরাম করছিলে, হয়তো তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"[১৪] বলতে লাগলো, "হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য! নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী ছিলাম।" আর তারা এ আর্তনাদ করতেই থাকে যতক্ষণ আমি তাদেরকে কাটা শস্যে পরিণত না করি, জীবনের একটি স্ফুলিংগও তাদের মধ্যে থাকেনি।

এ আকাশ ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যে যা কিছুই আছে এগুলো আমি খেলাচ্ছলে তৈরি করিনি।[১৫]

১৩. অর্থাৎ যখন আল্লাহর আযাব মাথার ওপর এসে পড়েছে এবং তারা জানতে পেরেছে যে, তাদের ধ্বংস এসে গেছে।

১৪. এটি বড়ই অর্থবহ বাক্য। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যেমন একটু ভালোভাবে এ শাস্তিটি প্রত্যক্ষ করো, যাতে কাল যদি কেউ এর অবস্থা জিজ্ঞেস করে তাহলে যেন ভালোভাবে বলতে পারো। নিজের আগের ঠাটবাট বজায় রেখে সাড়ম্বরে আবার মজলিস গরম করো। হয়তো এখনো তোমাদের চাকরেরা বুকে হাত বেঁধে জিজ্ঞেস করবে, হুজুর, বলুন কি হুকুম। নিজের আগের পরিষদ ও কমিটি নিয়ে বসে যাও, হয়তো এখনো তোমার বুদ্ধিবৃত্তিক পরামর্শ ও জ্ঞানপুষ্ট মতামত থেকে লাভবান হবার জন্য দুনিয়ার লোকেরা তৈরি হয়ে আছে।

لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَٰهُ مِن لَّدُنَّآ ۖ إِن كُنَّا
فَٰعِلِينَ ﴿١٧﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَٰطِلِ فَيَدْمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ
زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾ وَلَهُۥ مَن فِى السَّمَٰوَٰتِ
وَالْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِندَهُۥ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَلَا
يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُونَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾ أَمِ اتَّخَذُوٓا
ءَالِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿٢١﴾

যদি আমি কোনো খেলনা তৈরি করতে চাইতাম এবং এমনি ধরনের কিছু আমাকে করতে হতো তাহলে নিজেরই কাছ থেকে করে নিতাম।[১৬] কিন্তু আমি তো মিথ্যার ওপর সত্যের আঘাত হানি, যা মিথ্যার মাথা গুঁড়িয়ে দেয় এবং সে দেখতে দেখতে নিশ্চিহ্ন হয়। আর তোমাদের জন্য ধ্বংস! যেসব কথা তোমরা তৈরি করো সেগুলোর বদৌলতে।[১৭]

পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে যে সৃষ্টিই আছে তা আল্লাহরই।[১৮] আর যে (ফেরেশতারা) তাঁর কাছে আছে[১৯] তারা না নিজেদেরকে বড় মনে করে তাঁর বন্দেগী থেকে বিমুখ হয় এবং না ক্লান্ত ও বিষণ্ন হয়,[২০] দিন রাত তাঁর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করতে থাকে, বিরাম-বিশ্রাম নেয় না।

এদের তৈরি মাটির দেবতাগুলো কি এমন পর্যায়ের যে, তারা (প্রাণহীনকে প্রাণ দান করে) দাঁড় করিয়ে দিতে পারে?[২১]

১৫. জীবন সম্পর্কে যে দৃষ্টিভংগীর কারণে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতো না এটি হচ্ছে সেই সমগ্র দৃষ্টিভংগির ওপর মন্তব্য। তাদের ধারণা ছিল, মানুষকে দুনিয়ায় এমনিই স্বাধীন ছেড়ে দেয়া হয়েছে। নিজের যা ইচ্ছা সে করবে। যেভাবে চাইবে করবে। তার কোনো কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার কেউ নেই। কারো কাছে তাকে হিসেব দিতে হবে না। ভালো-মন্দ কয়েক দিনের এই জীবন যাপন করে সবাইকে ব্যস এমনিই ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। পরবর্তী কোনো জীবন নেই, যেখানে ভালো কাজের পুরস্কার ও খারাপ কাজের শাস্তি দেয়া হবে। এসব ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা আসলে একথাই ব্যক্ত করছিল যে, বিশ্ব-জাহানের এ সমগ্র ব্যবস্থা নিছক একজন খেলোয়াড়ের খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়, কোনো গুরুগম্ভীর ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও

লক্ষ একে পরিচালিত করছে না। আর এ ধরনের চিন্তা-ভাবনাই তাদের নবীর দাওয়াত অবহেলা করার আসল কারণ ছিল।

১৬. অর্থাৎ যদি আমি খেলা করতেই চাইতাম তাহলে খেলনা বানিয়ে নিজেই খেলতাম। এ অবস্থায় একটি অনুভূতিশীল, সচেতন ও দায়িত্বশীল প্রাণী সৃষ্টি এবং তার মধ্যে সত্য-মিথ্যার এ দ্বন্দ্ব ও টানাহেচড়ার অবতারণা করে নিছক নিজের আনন্দ ও কৌতুক করার জন্য অন্যকে অনর্থক কষ্ট দেবার মতো জুলুম কখনোই করা হতো না। তোমাদের মহান প্রভু আল্লাহ এ দুনিয়াটাকে রোমান সম্রাটদের রংগভূমি (Colosseum) রূপে তৈরি করেননি। এখানে বান্দাদেরকে পরস্পরের মধ্যে লড়াই করিয়ে তাদের শরীরের গোশত ছিঁড়ে উৎক্ষিপ্ত করিয়ে আনন্দের অট্টহাসি হাসা হয় না।

১৭. অর্থাৎ আমি বাজিকর নই। খেলা-তামাসা করা আমার কাজ নয়। আমার এ দুনিয়া একটা বাস্তবানুগ ব্যবস্থা। কোনো মিথ্যা এখানে টিকে থাকতে পারে না। মিথ্যা যখনই এখানে মাথা উঠায় তখনই সত্যের সাথে তার অনিবার্য সংঘাত বাধে এবং শেষ পর্যন্ত মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে থাকে। এ দুনিয়াকে যদি তুমি খেলাঘর মনে করে জীবন অতিবাহিত করো অথবা সত্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা মতবাদের ভিত্তিতে কাজ করে থাকো তাহলে এর ফল হবে তোমার নিজেরই ধ্বংস। মানব জাতির ইতিহাস দেখো, দুনিয়াকে নিছক একটি খেলাঘর, ভোগের সামগ্রীতে পরিপূর্ণ একটি থালা ও একটি ভোগ-বিলাসের লীলাভূমি মনে করে যেসব জাতি এখানে জীবন যাপন করেছে এবং নবীগণ কথিত সত্য বিমুখ হয়ে মিথ্যা মতবাদের ভিত্তিতে কাজ করেছে, তারা একের পর এক কোন্ ধরনের পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। তারপর বুদ্ধিমান যখন বুঝাতে থাকে তখন তাকে বিদ্রূপ করা এবং যখন নিজেদেরই কৃতকর্মের ফল আল্লাহর আযাবের আকারে মাথার ওপর এসে পড়ে তখন "হায় আমাদের দুর্ভাগ্য অবশ্যই আমরা অপরাধী ছিলাম" বলে গলা ফাটানো কোন্ ধরনের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে।

১৮. এখান থেকে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শিরক বাতিলের ব্যাপারে আলোচনা শুরু হচ্ছে। এটিই ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মক্কার মুশরিকদের মধ্যে বিরোধের মূল বিষয়। এখন মুশরিকদেরকে একথা বলা হচ্ছে যে, বিশ্ব-জাহানের এই যে ব্যবস্থার মধ্যে তোমরা জীবন যাপন করছো (যে সম্পর্কে এখনই বলা হলো যে, এটা কোনো খেলোয়াড়ের খেলনা নয়, যে সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে যে, এটা একটা বাস্তবানুগ উদ্দেশ্যমুখীন ও সত্যভিত্তিক ব্যবস্থা এবং যে সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এখানে মিথ্যা সবসময়ে সত্যের সাথে সংঘাত করে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।) এর প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে এই যে, এ সমগ্র ব্যবস্থার স্রষ্টা, মালিক, শাসক ও প্রতিপালক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। অন্যদিকে এ সমগ্র ব্যবস্থাকে বহু ইলাহর মিলিত সাম্রাজ্য মনে করা বা একজন বড় প্রভুর প্রভুত্যের মধ্যে অন্যান্য ছোট ছোট প্রভুদেরও কিছু শরীকানা আছে বলে মনে করে নেয়াই হচ্ছে এ সত্যের মোকাবিলায় মিথ্যা।

১৯. অর্থাৎ আরব মুশরিকরা যেসব ফেরেশতাকে আল্লাহর সন্তান অথবা প্রভুত্ব কর্তৃত্বে শামিল মনে করে মাবুদ বানিয়ে রেখেছিল।

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ
عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٢٢﴾ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ ﴿٢٣﴾ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ
دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ۭ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ۚ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ
مَنْ قَبْلِيْ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَمَآ
اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ
اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ﴿٢٥﴾

যদি আকাশে ও পৃথিবীতে এক আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহ হতো তাহলে (পৃথিবী ও আকাশ) উভয়ের ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যেতো।[২২] কাজেই এরা যেসব কথা বলে বেড়াচ্ছে আরশের রব আল্লাহ[২৩] তা থেকে পাক-পবিত্র। তাঁর কাজের জন্য (কারো সামনে) তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে না বরং তাদেরকেই জবাবদিহি করতে হবে।

তাঁকে বাদ দিয়ে তারা কি অন্য ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে ? হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলো, "তোমাদের প্রমাণ আনো। এ কিতাবও হাজির, যার মধ্যে আছে আমার যুগের লোকদের জন্য উপদেশ এবং সে কিতাবগুলোও হাযির, যেগুলোর মধ্যে ছিল আমার পূর্ববর্তী লোকদের জন্য নসীহত।"[২৪] কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই প্রকৃত সত্য থেকে বেখবর, কাজেই মুখ ফিরিয়ে আছে।[২৫] আমি তোমার পূর্বে যে রাসূলই পাঠিয়েছি তার প্রতি এ অহী করেছি যে, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই কাজেই তোমরা আমারই বন্দেগী করো।

২০. অর্থাৎ আল্লাহর বন্দেগী করা তাদের কাছে বিরক্তিকর নয়। এমন নয় যে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও আল্লাহর বন্দেগী করতে করতে তাদের মনে কোনো প্রকার মলিনতার সৃষ্টি হয়। মূলে لا يستحسرون শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। استحسار এর মধ্যে ক্লান্তির বাহুল্য পাওয়া যায় এবং এর অর্থ হচ্ছে এমন ধরনের ক্লান্তি যা বিরক্তিকর কাজ করার ফলে সৃষ্টি হয়।

২১. মূলে ينشرون শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি انشار থেকে উদ্ভূত। 'ইনশার' মানে হচ্ছে কোনো পড়ে থাকা প্রাণহীন বস্তুকে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়া। যদিও এ শব্দটিকে কুরআন মজীদে সাধারণত মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে তবুও

এর পারিভাষিক অর্থ বাদ দিলে মূল আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে এ শব্দটি নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে দেয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আমরা মনে করি এ শব্দটি এখানে এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে যেসব সত্তাকে তারা ইলাহ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে রেখেছে এবং যাদেরকে নিজেদের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে নিষ্প্রাণ বস্তুর বুকে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে? যদি এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো মধ্যে এ শক্তি না থেকে থাকে আর আরবের মুশরিকরা নিজেরাই একথা স্বীকার করতো যে, এ শক্তি কারো মধ্যে নেই—তাহলে তারা তাদেরকে ইলাহ ও মাবুদ বলে মেনে নিচ্ছে কেন?

২২. এটি একটি সরল ও সোজা যুক্তি আবার গভীর তাৎপর্যপূর্ণও। এটি এত সহজ সরল কথা যে, একজন মরুচারী বেদুঈন, সরল গ্রামবাসী এবং মোটা বুদ্ধির অধিকারী সাধারণ মানুষও বুঝতে পারে। কথাটি হচ্ছে, একটি মামুলি ছোট্ট গৃহের যদি দুজন গৃহকর্তা হয় তাহলে সে গৃহের ব্যবস্থাপনা চারদিনও ভালোভাবে চলতে পারে না। আর গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কথাটি হচ্ছে, বিশ্ব-জাহানের সমগ্র ব্যবস্থা পৃথিবীর ভূগর্ভ স্তর থেকে নিয়ে দূরবর্তী গ্রহ নক্ষত্র পর্যন্ত সবকিছুই একটি বিশ্বজনীন নিয়মের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এর অসংখ্য ও অগণিত জিনিসগুলোর মধ্যে যদি পারস্পরিক সামঞ্জস্য, ভারসাম্য, সমতা, সমঝোতা ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত না থাকতো তাহলে এ ব্যবস্থাটি এক মুহূর্তের জন্যও চলতে পারতো না। আর কোনো প্রবল প্রতাপান্বিত আইন এ অসংখ্য বস্তু ও শক্তিকে পূর্ণ সমতা ও ভারসাম্য সহকারে পারস্পরিক সহযোগিতা করতে বাধ্য না করতে থাকা পর্যন্ত এসব কিছু সম্ভব নয়। এখন এটা কেমন করে ধারণা করা যেতে পারে যে, বহু স্বতন্ত্র স্বাধীন শাসকের রাজ্যে একই আইন এ ধরনের নিয়মানুবর্তিতা সহকারে চলতে পারে? নিয়ম ও শৃংখলা যে বজায় আছে এটাই নিয়ম পরিচালকের একক অস্তিত্বকে অপরিহার্য করে তোলে। আইন ও শৃংখলার ব্যাপকতা ও বিশ্বজনীনতা নিজেই একথার সাক্ষ দেয় যে, ক্ষমতা একই সার্বভৌম কর্তৃত্বে কেন্দ্রীভূত রয়েছে এবং এ সার্বভৌম কর্তৃত্ব বিভিন্ন শাসকদের মধ্যে বিভক্ত নয়। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা বনী ইসরাঈল ৪৭ ও সূরা আল মু'মিনূন ৮৫ টীকা।)

২৩. "রব্বুল আরশ" অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের শাসক ও মালিক।

২৪. প্রথম যুক্তি দু'টি ছিল বুদ্ধিভিত্তিক এবং এখন এ যুক্তিটি হচ্ছে প্রত্যক্ষ দর্শনভিত্তিক ও প্রামাণ্য। এর অর্থ হচ্ছে, আজ পর্যন্ত যতগুলো কিতাবই আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ার কোনো দেশে কোনো জাতির পয়গম্বরের প্রতি নাযিল হয়েছে তার মধ্য থেকে যে কোনো একটি খুলে একথা দেখিয়ে দাও যে, পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ প্রভুত্বের কর্তৃত্বের সামান্যতম অধিকারী এবং অন্য কেউ ইবাদাত ও বন্দেগীর সামান্যতমও হকদার। তাহলে তোমরা এ কোন্ ধরনের ধর্ম তৈরি করে রেখেছো যার সমর্থনে বুদ্ধিবৃত্তিক কোনো প্রমাণ নেই এবং আসমানী কিতাবগুলোও এর স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ পেশ করে না?

২৫. তারা জ্ঞানের নয় অজ্ঞতার কারণে নবীর কথাকে আমল দেয় না। প্রকৃত সত্য তারা জানে না, তাই যারা বুঝাতে চায় তাদের কথার প্রতি দৃষ্টি দেবার দরকারই মনে করে না।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٢٦﴾
لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ
مُشْفِقُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّىْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ
جَهَنَّمَ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾

এরা বলে, "করুণাময় সন্তান গ্রহণ করেন।"[২৬] সুবহানাল্লাহ! তারা তো মর্যাদাশালী বান্দা। তারা তাঁর সামনে অগ্রবর্তী হয়ে কথা বলে না এবং শুধুমাত্র তাঁর হুকুমে কাজ করে। যাকিছু তাদের সামনে আছে এবং যাকিছু আছে তাদের অগোচরে সবই তিনি জানেন। যাদের পক্ষে সুপারিশ শুনতে আল্লাহ সম্মত তাদের পক্ষে ছাড়া আর কারো সুপারিশ তারা করে না এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত।[২৭] আর তাদের মধ্যে যে বলবে, আল্লাহ ছাড়া আমিও একজন ইলাহ, তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি দান করবো, আমার এখানে এটিই যালেমদের প্রতিফল।

২৬. এখানে আবার ফেরেশতাদেরই কথা বলা হয়েছে। আরবের মুশরিকরা তাদেরকে আল্লাহর মেয়ে গণ্য করতো। পরবর্তী ভাষণ থেকে একথা স্বতস্ফূর্তভাবে প্রকাশ হয়ে যায়।

২৭. মুশরিকরা দু'টি কারণে ফেরেশতাদেরকে মাবুদে পরিণত করতো। এক, তাদের মতে তারা ছিল আল্লাহর সন্তান। দুই, তাদেরকে পূজা (খোশামোদ তোশামোদ) করার মাধ্যমে তারা তাদেরকে আল্লাহর কাছে নিজেদের জন্য শাফায়াতকারীতে (সুপারিশকারী) পরিণত করতে চাচ্ছিল। যেমন -

وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ (يونس : ١٨) এবং

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى (الزمر : ٣)

এ আয়াতগুলোতে এ দুটি কারণই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

এ জায়গায় এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, কুরআন সাধারণত শাফায়াতের মুশরিকী আকীদা বিশ্বাস খণ্ডন করতে গিয়ে এ সত্যটির ওপর জোর দিয়ে থাকে যে, যাদেরকে তোমরা শাফায়াতকারী গণ্য করছো তারা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী নয় এবং তাদের গোচরে ও অগোচরে যেসব কথা আছে আল্লাহ সেগুলো জানেন। এ থেকে একথা হৃদয়ংগম করানোই উদ্দেশ্য যে, তারা যখন প্রত্যেক মানুষের সামনের-পেছনেরও গোপন-

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا
فَفَتَقْنٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾
وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ۖ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا
سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ
عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

৩ রুকূ'

যারা (নবীর কথা মেনে নিতে) অস্বীকার করেছে তারা কি চিন্তা করে না যে, এসব আকাশ ও পৃথিবী এক সাথে মিশে ছিল, তারপর আমি তাদেরকে আলাদা করলাম[২৮] এবং পানি থেকে সৃষ্টি করলাম প্রত্যেকটি প্রাণীকে।[২৯] তারা কি (আমার এ সৃষ্টি ক্ষমতাকে) মানে না ? আর আমি পৃথিবীতে পাহাড় বসিয়ে দিয়েছি, যাতে সে তাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে[৩০] এবং তার মধ্যে চওড়া পথ তৈরি করে দিয়েছি,[৩১] হয়তো লোকেরা নিজেদের পথ জেনে নেবে।[৩২] আর আমি আকাশকে করেছি একটি সুরক্ষিত ছাদ,[৩৩] কিন্তু তারা এমন যে, এ নিদর্শনাবলীর[৩৪] প্রতি দৃষ্টিই দেয় না। আর আল্লাহই রাত ও দিন তৈরি করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকেই এক একটি কক্ষপথে সাঁতার কাটছে।[৩৫]

প্রকাশ্য অবস্থা জানে না তখন তারা শাফায়াত করার একচ্ছত্র ও শর্তহীন অধিকার কেমন করে লাভ করতে পারে ? কাজেই ফেরেশতা, নবী, সৎলোক প্রত্যেকের শাফায়াত করার এখতিয়ার অবশ্য আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষ। আল্লাহ তাঁদের কাউকে কোনো ব্যক্তির পক্ষে শাফায়াত করার অনুমতি দিলে তবেই তিনি তার পক্ষে শাফায়াত করতে পারবেন। নিজেই অগ্রণী হয়ে তাঁরা যে কোনো ব্যক্তির শাফায়াত করতে পারেন না। আর যখন শাফায়াত শোনা বা না শোনা এবং তা কবুল করা বা না করা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল তখন এ ধরনের ক্ষমতাহীন শাফায়াতকারীর সামনে মাথা নোয়ানো এবং প্রার্থনার হাত পাতা কিভাবে সমীচীন ও উপযোগী হতে পারে ? (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা-হা ঃ ৮৫-৮৬ টীকা)

২৮. মূলে رَتْق ও فَتْق শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'রত্‌ক' মানে হচ্ছে একত্র হওয়া, একসাথে থাকা, একজন অন্য জনের সাথে জুড়ে থাকা। আর "ফাত্‌ক" মানে

ফেড়ে ফেলা, ছিঁড়ে ফেলা, আলাদা করা। বাহ্যত এ শব্দগুলো থেকে যে কথা বুঝা যায় তা হচ্ছে এই যে, বিশ্ব-জাহান প্রথমে একটি পিণ্ডের (MASS) আকারে ছিল। পরবর্তীকালে তাকে পৃথক পৃথক অংশে বিভক্ত করে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, নীহারিকা ইত্যাদি স্বতন্ত্র জগতে পরিণত করা হয়েছে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা হা-মীম আস সাজদাহ ১৩, ১৪, ১৫ টীকা)।

২৯. এ থেকে যে অর্থ বুঝা যায় তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ পানিকে জীবনের উৎপাদক (Cause of life) ও প্রাণের উৎসে পরিণত করেছেন। এরি মধ্যে এবং এ থেকে করেছেন জীবনের সূচনা। কুরআনের অন্য জায়গায় এ বক্তব্যকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ

"আর আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা নূর ঃ ৪৫)

৩০. সূরা আন নাহল-এর ১২ টীকায় এর ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে

৩১. অর্থাৎ পাহাড়ের মধ্যে এমন গিরিপথ, ঝরণা ও নদী তৈরি করে দিয়েছি যার মাধ্যমে পার্বত্য এলাকা অতিক্রম করার ও পৃথিবীর এক অংশ থেকে আর এক অংশে চলাফেরা করার জন্য রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। এভাবে পৃথিবীর অন্যান্য অংশকে এমনভাবে গঠন করা হয়েছে যার ফলে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাওয়ার পথ তৈরি হয়ে যায় বা তৈরি করে নেয়া যেতে পারে।

৩২. এটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য। এর এ অর্থও হয় যে, লোকেরা পৃথিবীতে চলাফেরা করার পথ পাবে, আবার এ অর্থও হয় যে, তারা এই জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, কলাকৌশল, কারিগরি দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা দেখে মূল সত্যে পৌঁছে যাবার পথ পাবে।

৩৩. ব্যাখ্যার জন্য সূরা আল হিজর ৮, ১০, ১১ ও ১২ টীকা দেখুন।

৩৪. অর্থাৎ আকাশে যে নিদর্শনগুলো আছে সেগুলোর দিকে

৩৫. كُلٌّ ও يَسْبَحُوْنَ শব্দগুলোই একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, এর অর্থ শুধুমাত্র সূর্য ও চন্দ্র নয় বরং মহাশূন্যের অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রও। নয়তো বহুবচনের পরিবর্তে একবচন ব্যবহার করা হতো. فَلَك শব্দটি আমাদের ভাষায় চক্র শব্দের সমার্থক। আরবী ভাষায় এটি আসমান বা আকাশ শব্দের পরিচিত অর্থই প্রকাশ করে। "সবাই এক একটি ফালাকে (কক্ষপথে) সাঁতরে বেড়াচ্ছে"—এ থেকে দু'টি কথা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে। এক, প্রত্যেকের ফালাক বা কক্ষপথ আলাদা। দুই, ফালাক এমন কোনো জিনিস নয় যেখানে এ গ্রহ-নক্ষত্রগুলো খুঁটির মতো প্রোথিত আছে এবং তারা নিজেরাই এ খুঁটিগুলো নিয়ে ঘুরছে। বরং তারা কোনো প্রবহমান অথবা আকাশ ও মহাশূন্য ধরনের কোনো বস্তু যার মধ্যে এই গ্রহ-নক্ষত্রের চলা ও গতিশীলতা সাঁতার কাটার সাথে সামঞ্জস্য রাখে (আরো বেশী ব্যাখার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইয়াসীন ৩৭ টীকা দেখুন।)

প্রাচীন যুগে লোকদের কাছে আকাশ ও পৃথিবীর একত্র হওয়া (رتق) ও পৃথক হয়ে যাওয়া (فتق) পানি থেকে প্রত্যেক সজীব সত্তাকে সৃষ্টি করা এবং গ্রহ নক্ষত্রের এক একটি 'ফালাকে' সাঁতার কাটার ভিন্ন অর্থ ছিল। বর্তমান যুগে পদার্থবিদ্যা (Physics)

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴿٣٤﴾
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا
تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ
أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ ۖ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٦﴾

আর[৩৬] (হে মুহাম্মাদ!) অনন্ত জীবন তো আমি তোমার পূর্বেও কোনো মানুষকে দেইনি ; যদি তুমি মরে যাও তাহলে এরা কি চিরকাল বেঁচে থাকবে ? প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।[৩৭] আর আমি ভালো ও মন্দ অবস্থার মধ্যে ফেলে তোমাদের সবাইকে পরীক্ষা করছি,[৩৮] শেষ পর্যন্ত তোমাদের আমার দিকে ফিরে আসতে হবে।

এ সত্য অস্বীকারকারীরা যখন তোমাকে দেখে, তোমাকে বিদ্রূপের পাত্রে পরিণত করে। বলে, "এ কি সেই ব্যক্তি যে তোমাদের দেবদেবীদের সমালোচনা করে ?"[৩৯] অথচ তাদের নিজেদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা করুণাময়ের যিক্‌রের অস্বীকারকারী।[৪০]

জীববিদ্যা (Biology) ও জ্যোতির্বিদ্যার (Astronomy) অত্যাধুনিক তথ্যাবলী আমাদের কাছে তাদের অর্থ ভিন্নতর করে দিয়েছে। আমরা বলতে পারি না আগামীতে মানুষ যেসব তথ্য সংগ্রহ করবে তার ফলে এ শব্দগুলোর অর্থ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। মোট কথা বর্তমান যুগের মানুষ এ তিনটি আয়াতকে সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক তথ্যাবলী অনুযায়ী পাচ্ছে।

এখানে একথাটি অনুধাবন করে নিতে হবে যে, وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ থেকে নিয়ে أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا থেকে নিয়ে كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِينَ পর্যন্ত ভাষণে শিরক খণ্ডন করা হয়েছে এবং فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে তার মধ্যে তাওহীদের জন্য ইতিবাচক (Positive) যুক্তি দেয়া হয়েছে। মূল বক্তব্য হচ্ছে, তোমাদের সামনে বিশ্ব-জাহানের এই যে ব্যবস্থা আছে, এর মধ্যে কি কোথাও এক আল্লাহ রব্বুল আলামীন ছাড়া আর কারো কোনো সৃষ্টি কৌশল তোমরা দেখতে পাচ্ছো ? একাধিক ইলাহদের কর্মকুশলতায় কি এ ধরনের ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে এবং এমন শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতার সাথে বিশ্ব-জাহান চলতে পারে ? এ জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থাটি সম্পর্কে কি কোনো বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তি একথা কল্পনা করতে পারেন যে, এটা একজন খেলোয়াড়ের খেলা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তিনি নিছক নিজের ফূর্তি ও আনন্দ স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য কয়েকটি পুতুল বানিয়ে নিয়েছেন, কিছুক্ষণ খেলা করার পর আবার সেগুলো ভেঙ্গে মাটিতে মিশিয়ে দেবেন ? এসব কিছু তোমরা নিজেদের

চোখে দেখছো এবং এরপরও নবীর কথা মেনে নিতে অস্বীকার করছো ? তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো না, পৃথিবী ও আকাশের প্রত্যেকটি জিনিস নবী তোমাদের সামনে যে তাওহীদী মতবাদ পেশ করছেন তার সাক্ষ্য দিচ্ছে ? এসব নিদর্শনের উপস্থিতিতে তোমরা বলছো فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ (এ নবী কোনো নিদর্শন নিয়ে আসুক) নবী তাওহীদের দাওয়াতের পক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য এ নিদর্শনগুলো কি যথেষ্ট নয় ?

৩৬. এখান থেকে আবার ভাষণের মোড় ঘুরে যাচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বিরোধীদের মধ্যে যে সংঘাত চলছিল সেদিকে।

৩৭. যে সমস্ত হুমকি ধমকি, বদদোয়া ও হত্যার ষড়যন্ত্রের সাহায্যে সর্বক্ষণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বাগত জানানো হতো এ হচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত জবাব। একদিকে ছিল কুরাইশ নেতারা। তারা প্রতিদিন তাঁর এ প্রচার কার্যের জন্য তাঁকে হুমকি দিতে থাকতো এবং তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক বিরোধী আবার বসে বসে যে কোনোভাবে তাঁকে খতম করে দেবার কথাও ভাবতো। অন্যদিকে যে গৃহের কোনো একজন ইসলাম গ্রহণ করতো সে গৃহের সবাই তার শত্রু হয়ে যেতো। মেয়েরা দাঁতে দাঁত পিশে তাঁকে অভিশাপ দিতো ও বদদোয়া করতো। আর গৃহের পুরষরা তাঁকে ভয় দেখাতো। বিশেষ করে হাবশায় হিজরতের পরে মক্কার ঘরে ঘরে বিলাপ শুরু হয়ে গিয়েছিল। কারণ এমন একটি বাড়ি পাওয়া কঠিন ছিল যেখান থেকে একজন পুরুষ বা মেয়ে হিজরত করেনি। এরা সবাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে অভিযোগ করে বলতো, এ লোকটি আমাদের পরিবার ধ্বংস করে দিয়েছে। এসব কথার জবাব এ আয়াতে দেয়া হয়েছে এবং একই সংগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, ওদের কোনো পরোয়া না করে তুমি নির্ভয়ে নিজের কাজ করে যাও।

৩৮. অর্থাৎ দুঃখ-আনন্দ, দারিদ্র-ধনাঢ্যতা, জয়-পরাজয়, শক্তিমত্তা-দুর্বলতা, সুস্থতা-রুগ্নতা ইত্যাদি সকল অবস্থায় তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে, দেখা হচ্ছে ভালো অবস্থায় তোমরা অহংকারী, জালেম, আল্লাহ বিস্মৃত ও প্রবৃত্তির দাস হয়ে যাও কিনা। খারাপ অবস্থায় হিম্মত ও সাহস কমে যাওয়ায় নিম্নমানের ও অবমাননাকর পদ্ধতি এবং অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে বসো কি না। কাজেই কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির এ রকমারী অবস্থা বুঝার ব্যাপারে ভুল করা উচিত নয়। সে যে অবস্থারই সম্মুখীন হোক, তাকে অবশ্যই পরীক্ষার এ দিকটি সামনে রাখতে হবে এবং সাফল্যের সাথে একে অতিক্রম করতে হবে। কেবলমাত্র একজন বোকা ও সংকীর্ণমনা লোকই ভাল অবস্থায় ফেরাউনে পরিণত হয় এবং খারাপ অবস্থা দেখা দিলে মাটিতে নাক-খত দিতে থাকে।

৩৯. অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে বিরূপ কথা বলে। এখানে আরো এতটুকু কথা বুঝে নিতে হবে যে, এ বাক্যটি তাদের বিদ্রুপের বিষয়বস্তু বর্ণনা করছে না বরং বিদ্রুপ করার কারণ ও ভিত্তিভূমির ওপর আলোকপাত করছে। একথা সুস্পষ্ট যে, এ বাক্যটি মূলত কোনো বিদ্রূপাত্মক বাক্য নয়। বিদ্রুপ তারা অন্যভাবে করে থাকবে এবং এজন্য কোনো অন্য ধরনের ধ্বনি দিয়েও বাক্য উচ্চারণ করে থাকবে, তবে তিনি তাদের মনগড়া উপাস্যদের প্রভুত্ব কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করতেন বলেই তারা এভাবে মনের ঝাল মিটাতো।

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٧﴾
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ لَوْ يَعْلَمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ
ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٣٩﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا
يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٤٠﴾ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ
قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤١﴾

মানুষ দ্রুততাপ্রবণ সৃষ্টি।[৪১] এখনই আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি নিজের নিদর্শনাবলী, আমাকে তাড়াহুড়া করতে বলো না।[৪২]—এরা বলে, "এ হুমকি কবে পূর্ণ হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও ?" হায়! যদি এ কাফেরদের সেই সময়ের কিছু জ্ঞান থাকতো যখন এরা নিজেদের মুখ ও পিঠ আগুন থেকে বাঁচাতে পারবে না এবং এদেরকে কোথাও থেকে সাহায্যও করা হবে না। সে আপদ তাদের ওপর আকস্মিকভাবে এসে পড়বে এবং তাদেরকে হঠাৎ এমনভাবে চেপে ধরবে যে, তারা তার প্রতিরোধও করতে পারবে না। এবং মুহূর্তকালের অবকাশও লাভ করতে সক্ষম হবে না। তোমার পূর্বের রাসূলদেরকেও বিদ্রূপ করা হয়েছে কিন্তু বিদ্রূপকারীরা যা নিয়ে বিদ্রূপ করতো, শেষ পর্যন্ত তারই কবলে তাদেরকে পড়তে হয়েছে।

৪০. অর্থাৎ মূর্তি ও বানোয়াট ইলাহদের বিরোধিতা তাদের কাছে এত বেশী অপ্রীতিকর যে, এর প্রতিশোধ নেবার জন্য তোমার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অবমাননা করে, কিন্তু তারা যে আল্লাহ বিমুখ এবং আল্লাহর নামোল্লেখে তারা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়, নিজেদের এ অবস্থার জন্য তাদের লজ্জাও হয় না।

৪১. মূলে خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক অনুবাদ হয়, "মানুষকে দ্রুততা প্রবণতা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" কিন্তু এই শাব্দিক অর্থ বাক্যের উদ্দেশ্য নয়। আমরা যেমন নিজের ভাষায় বলি, অমুক ব্যক্তি জ্ঞানের সাগর এবং লোকটি পাষাণ হৃদয়, ঠিক তেমনি আরবী ভাষায় বলা হয়, তাকে অমুক জিনিস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এর অর্থ হয়, অমুক জিনিসটি তার প্রকৃতিগত। এখানে خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ বলে যে অর্থ নেয়া হয়েছে অন্য জায়গায় وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا "মানুষ দ্রুততা প্রবণ প্রমাণিত হয়েছে" (বনী ইসরাঈল ঃ ১১) বলে সেই একই অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।

قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ؕ بَلْ هُمْ عَنْ
ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٢﴾ اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ؕ
لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ﴿٤٣﴾ بَلْ مَتَّعْنَا
هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ؕ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى
الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾ قُلْ اِنَّمَآ اُنْذِرُكُمْ
بِالْوَحْيِ ۫ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪ রুকূ'

হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলে দাও, কে তোমাদের রাতে ও দিনে রহমানের হাত থেকে বাঁচাতে পারে ?[৪৩] কিন্তু তারা নিজেদের রবের উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। তাদের কাছে কি এমন কিছু ইলাহ আছে যারা আমার মুকাবিলায় তাদেরকে রক্ষা করবে ? তারা না নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারে, না আমার সমর্থন লাভ করে। আসল কথা হচ্ছে, তাদেরকে ও তাদের পূর্বপুরুষদেরকে আমি জীবনের উপায়-উপকরণ দিয়েই এসেছি। এমনকি তারা দিন পেয়ে গেছে।[৪৪] কিন্তু তারা কি দেখে না, আমি বিভিন্ন দিক থেকে পৃথিবীকে সংকুচিত করে আনছি ?[৪৫] তবুও কি তারা বিজয়ী হবে ?[৪৬] তাদেরকে বলে দাও, "আমি তো অহীর ভিত্তিতে তোমাদেরকে জানাচ্ছি"— কিন্তু বধিররা ডাক শুনতে পায় না, যখন তাদেরকে সতর্ক করা হয়।

৪২. পরবর্তী ভাষণ পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, এখানে "নিদর্শনাবলী" বলতে কি বুঝাচ্ছে। তারা যেসব কথা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো তার মধ্যে আল্লাহর আযাব, কিয়ামত ও জাহান্নামের বিবরণও ছিল। তারা বলতো, এ ব্যক্তি প্রতিদিন আমাদের ভয় দেখায়, বলে, আমাকে অস্বীকার করলে আল্লাহর আযাব আপতিত হবে, কিয়ামতে তোমাদের শাস্তি দেয়া হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত করা হবে। কিন্তু আমরা প্রতিদিন অস্বীকার করছি এবং হেসে কুঁদে বেড়াচ্ছি, কোনো আযাব আসতে দেখা যাচ্ছে না এবং কোনো কিয়ামতও হচ্ছে না। এ আয়াতগুলোয় এরই জবাব দেয়া হয়েছে।

৪৩. অর্থাৎ যদি রাতের বা দিনের কোনো সময় অকস্মাৎ আল্লাহর মহাপরাক্রমশালী হাত তোমাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে তাহলে তখন তাঁর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারে এমন শক্তিশালী সহায়ক ও সাহায্যকারী তোমাদের কে আছে ?

وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا
ظٰلِمِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ
شَيْئًا ۭ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۭ وَكَفٰى بِنَا
حٰسِبِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا
لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ
مُشْفِقُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ أَنْزَلْنٰهُ ۭ أَفَأَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٠﴾

আর যদি তোমার রবের আযাব তাদেরকে সামান্য স্পর্শ করে যায়,[৪৭] তাহলে তারা তৎক্ষণাত চিৎকার দিয়ে উঠবে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, অবশ্যই আমরা অপরাধী ছিলাম।

কিয়ামতের দিন আমি যথাযথ ওযন করার দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করবো। ফলে কোনো ব্যক্তির প্রতি সামান্যতম যুলুম হবে না। যার তিল পরিমাণও কোনো কর্ম থাকবে তাও আমি সামনে আনবো এবং হিসেব করার জন্য আমি যথেষ্ট।[৪৮]

পূর্বে[৪৯] আমি মূসা ও হারুনকে দিয়েছিলাম ফুরকান, জ্যোতি ও 'যিকির'[৫০] এমনসব মুত্তাকীদের কল্যাণার্থে[৫১] যারা না দেখে তাদের রবকে ভয় করে এবং যারা (হিসেবে নিকেশের) সে সময়ের[৫২] ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। আর এখন এ বরকত সম্পন্ন যিকির আমি (তোমাদের জন্য) নাযিল করেছি। তবুও কি তোমরা একে মেনে নিতে অস্বীকার করো ?

৪৪. অর্থাৎ আমার এ মেহেরবানী ও প্রতিপালন থেকে তারা এ বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে যে, এসব কিছু তাদের ব্যক্তিগত অধিকার এবং এগুলো ছিনিয়ে নেবার কেউ নেই। নিজেদের সমৃদ্ধি ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্বকে তারা অক্ষয় ও চিরস্থায়ী মনে করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং এর মধ্যে এমনই মত্ত হয়ে গেছে যে, তাদের মনে কখনো একথা একবারও জাগেনী যে, উপরে আল্লাহ বলে একজন আছেন, যিনি তাদের ভাঙা-গড়ার ক্ষমতা রাখেন।

৪৫. এ বিষয়টি ইতিপূর্বে সূরা রা'আদের ৪১ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে এবং সেখানে আমি এর ব্যাখ্যা করেছি (দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা রা'আদ, ৬০ টীকা)। এখানে এ প্রেক্ষাপটে এটি অন্য একটি অর্থ প্রকাশ করছে। সেটি হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর চারদিকে

একটি বিজয়ী ও পরাক্রান্ত শক্তির কর্মতৎপরতার নিদর্শনাবলী দেখতে পাওয়া যায়। অকস্মাৎ কখনো দুর্ভিক্ষ, কখনো বন্যা, ভূমিকম্প, মহামারী, আবার কখনো প্রচণ্ড শীত বা প্রচণ্ড গরম এবং কখনো অন্য কিছু দেখা দেয়। এভাবে আকস্মিক বিপদ-আপদ মানুষের সমস্ত কীর্তি ও কর্মকাণ্ড ধ্বংস করে দিয়ে যায়। হাজার হাজার, লাখো লাখো লোক মারা যায়। জনবসতী ধ্বংস হয়ে যায়। সবুজ শ্যামল শস্য ক্ষেতগুলো বিধ্বস্ত হয়। উৎপাদন কমে যায়। ব্যবসায় বাণিজ্যে মন্দাভাব দেখা দেয়। মোট কথা মানুষের জীবন ধারণের উপায় উপকরণের কখনো এদিক থেকে আবার কখনো ওদিক থেকে ঘাটতি দেখা দেয়। নিজের সমুদয় শক্তি নিয়োজিত করেও মানুষ এ ক্ষতির পথ রোধ করতে পারে না। (আরো বেশী ব্যাখার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন সূরা আস সাজদাহ ৩৩ টীকা)

৪৬. অর্থাৎ যখন তাদের সমস্ত জীবনোপকরণ আমার হাতে রয়েছে, আমি যে জিনিসটি চাই কমিয়ে দিতে পারি, যেটি চাই বন্ধ করে দিতে পারি, সে ক্ষেত্রে তারা কি আমার মোকাবিলায় বিজয়ী হবার এবং আমার পাকড়াও থেকে নিষ্কৃতি লাভ করার ক্ষমতা রাখে ? এ নিদর্শনাবলী কি তাদেরকে এ মর্মে নিশ্চিন্ততা দান করে যে, তাদের শক্তি চিরস্থায়ী, তাদের আয়েশ-আরাম কোনোদিন নিশেষিত হবে না এবং তাদেরকে পাকড়াও করার কেউ নেই ?

৪৭. সে আযাব যা দ্রুত নিয়ে আসার জন্য তারা জোরেশোরে দাবি জানাচ্ছে এবং বিদ্রূপের স্বরে বলছে, নিয়ে এসো সেই আযাব, কেন তা আমাদের ওপর নেমে আসছে না ?

৪৮. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা আ'রাফ ৮-৯টীকা। এই দাঁড়িপাল্লা কোন ধরনের হবে তা অনুধাবন করা আমাদের জন্য কঠিন। মোটকথা সেটি এমন কোনো জিনিস হবে, যা বস্তু ওজন করার পরিবর্তে মানুষের নৈতিক গুণাবলী, কর্মকাণ্ড ও তার পাপ-পুণ্য ওজন করবে এবং যথাযথ ওজন করার পর নৈতিক দিক দিয়ে কোন্ ব্যক্তি কোন্ ধরনের মর্যাদার অধিকারী তা জানিয়ে দেবে। পুণ্যবান হলে কি পরিমাণ পুণ্যবান এবং পাপী হলে কি পরিমাণ পাপী। মহান আল্লাহ এর জন্যে আমাদের ভাষার অন্যান্য শব্দ বাদ দিয়ে "দাড়িপাল্লা" শব্দ এ জন্য নির্বাচিত করেছেন যে, এর ধরনটি হবে দাঁড়িপাল্লার সাথে সাঞ্জস্যশীল অথবা এ নির্বাচনের উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, একটি দাঁড়িপাল্লার পাল্লাহ যেমন দুটি জিনিসের ওজনের পার্থক্য সঠিকভাবে জানিয়ে দেয়, ঠিক তেমনি আমার ন্যায় বিচারের দাঁড়িপাল্লাহও প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের কাজকর্ম যাচাই করে কোনো প্রকার কমবেশী না করে তার মধ্যে পুণ্যের না পাপের কোন দিকটি প্রবল তা একদম হুবহু বলে দেয়।

৪৯. এখান থেকে নবীদের আলোচনা শুরু হয়েছে। একের পর এক বেশ কয়েক জন নবীর জীবনের সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত ঘটনাবলীর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। যে প্রেক্ষাপটে এ আলোচনা এসেছে সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে নিম্নোক্ত কথাগুলো অনুধাবন করানোই যে এর উদ্দেশ্য তা পরিষ্কার বুঝা যায়।

এক ঃ পূর্বের সকল নবীই মানুষ ছিলেন, তাঁরা কোনো অভিনব সৃষ্টি ছিলেন না। একজন মানুষকে নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে, ইতিহাসে আজ এটা কোনো নতুন ঘটনা নয়।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ۝ اِذْ قَالَ
لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ۝ قَالُوْا
وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ۝ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ
فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ۝

৫ রুকূ'

এরও আগে আমি ইবরাহীমকে শুভ বুদ্ধি ও সত্যের জ্ঞান দান করেছিলাম এবং আমি তাকে খুব ভালোভাবেই জানতাম।[৫৩] সে সময়ের কথা স্মরণ করো[৫৪] যখন, সে তার নিজের বাপকে ও জাতিকে বলেছিল ঃ "এ মূর্তিগুলো কেমন, যেগুলোর প্রতি তোমরা ভক্তিতে গদগদ হচ্ছো ?" তারা জবাব দিল ঃ "আমাদের বাপ-দাদাদেরকে আমরা এদের ইবাদাতরত অবস্থায় পেয়েছি।" সে বললো, "তোমরাও পথভ্রষ্ট এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যেই অবস্থান করছিল।" তারা বললো, "তুমি কি আমাদের সামনে তোমার প্রকৃত মনের কথা বলছো, না নিছক কৌতুক করছো ?"[৫৫]

দুই ঃ আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কাজ করছেন পূর্বে নবীগণও সেই একই কাজ করতে এসেছিলেন। এটিই ছিল তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও শিক্ষা।

তিন ঃ নবীদের সংগে আল্লাহ বিশেষ ব্যবহার করেন ও বিশেষ সম্পর্ক রাখেন। তারা বড় বড় বিপদের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেন। বছরের পর বছর বিপদের মুখোমুখি হতে থাকেন। একক ও ব্যক্তিগত বিপদে এবং বিরোধীদের সৃষ্ট বিপদেও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তা লাভ করেন। তিনি তাঁদের প্রতি নিজের রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। তাঁদের দোয়া কবুল করেন ও কষ্ট দূর করেন। তাঁদের বিরোধীদেরকে পরাজিত করেন এবং অলৌকিক পদ্ধতিতে তাঁদেরকে সাহায্য করেন।

চার ঃ মহান আল্লাহর প্রিয়তম ও তাঁর দরবারে সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় হওয়া সত্ত্বেও এবং তাঁর পক্ষ থেকে বড় বড় বিস্ময়কর ক্ষমতা লাভ করার পরও তাঁরা ছিলেন বান্দা ও মানুষই। তাঁদের কেউই খোদায়ী কর্তৃত্বের অধিকারী হননি। মত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তাঁরা ভুলও করতেন। রোগগ্রস্তও হয়ে পড়তেন। পরীক্ষায়ও তাঁদের ফেলা হতো। এমনকি ভুলচুকও তাঁদের দ্বারা হয়ে যেতো। ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে শুধরে দেয়া হতো।

৫০. এ তিনটি শব্দের মাধ্যমে তাওরাতের পরিচয় দান করা হয়েছে। অর্থাৎ তাওরাত ছিল হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী মানদণ্ড, মানুষকে সত্য-সরল পথ দেখাবার আলোকবর্তিকা এবং মানব জাতিকে তার বিস্মৃত পাঠ স্মরণ করিয়ে দেবার উপদেশ।

৫১. অর্থাৎ যদিও তা পাঠানো হয়েছিল সমগ্র মানব জাতির জন্য কিন্তু তা থেকে কার্যত লাভবান তারাই হতে পারতো যারা ছিল এসব গুণে গুণান্বিত।

৫২. যার আলোচনা এই মাত্র উপরে করা হলো অর্থাৎ কিয়ামত।

৫৩. আমি এখানে "رشد" শব্দের অনুবাদ করেছি "শুভবুদ্ধি ও সত্যের জ্ঞান" রুশদ এর অর্থ হচ্ছে সঠিক ও বেঠিকের মধ্যে পার্থক্য করে সঠিক কথা বা পথ অবলম্বন করা এবং বেঠিক কথা ও পথ থেকে দূরে সরে যাওয়া। এ অর্থের প্রেক্ষিতে "রুশদ" এর অনুবাদ "সত্যনিষ্ঠা"ও হতে পারে। কিন্তু যেহেতু রুশ্‌দ শব্দটি কেবলমাত্র সত্যনিষ্ঠা নয় বরং এমন সত্যজ্ঞানের ভাব প্রকাশ করে যা হয় সঠিক চিন্তা ও ভারসাম্যপূর্ণ সুষ্ঠ বুদ্ধি ব্যবহারের ফলশ্রুতি তাই আমি "শুভবুদ্ধি ও সত্যের জ্ঞান" এই দুটি শব্দকে একত্রে এর অর্থের কাছাকাছি পেয়েছি।

"ইবরাহীমকে তার সত্যজ্ঞান ও শুভবুদ্ধি দান করেছিলাম।" অর্থাৎ সে যে সত্যের জ্ঞান ও শুভবুদ্ধির অধিকারী ছিল তা আমিই তাকে দান করেছিলাম।

"আমি তাকে খুব ভালোভাবে জানতাম।" অর্থাৎ আমি চোখ বন্ধ করে তাকে এ দান করিনি। আমি জানতাম সে কেমন লোক। সব জেনেশুনেই তাকে দান করেছিলাম। اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ "আল্লাহ ভালো জানেন নিজের রিসালাত কাকে সোপর্দ করবেন।" (আনআম ঃ ১২৪) এর মধ্যে কুরাইশ সরদাররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যে আপত্তি করতো তার প্রতি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে। তারা বলতো এ ব্যক্তির মধ্যে এমন কি অসাধারণ বৈশিষ্ট আছে যে, আল্লাহ আমাদের বাদ দিয়ে তাকেই রিসালাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন ? এর জবাব কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে দেয়া হয়েছে। এখানে কেবলমাত্র এতটুকু সূক্ষ্ম ইংগিত করেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে, এ প্রশ্ন ইবরাহীম সম্পর্কেও হতে পারতো। বলা যেতে পারতো যে, সারা ইরাক দেশে একমাত্র ইবরাহীমকেই কেন এ অনুগ্রহে অভিসিক্ত করা হলো ? কিন্তু আমি জানতাম ইবরাহীমের মধ্যে কি যোগ্যতা আছে। তাই তার সমগ্র জাতির মধ্য থেকে একমাত্র তাকেই এ অনুগ্রহ দান করার জন্য বাছাই করা হয়।

ইতিপূর্বে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পবিত্র সীরাতের বিভিন্ন দিক সূরা বাকারার ১২৪ থেকে ১৪১ ও ২৫৮ থেকে ২৬০, আন'আমের ৭৪ থেকে ৮১, তওবার ১১৪, হূদের ৬৯ থেকে ৭৪, ইবরাহীমের ৩৫ থেকে ৪১, আল হিজরের ৫১ থেকে ৬০ এবং আন নহলের ১২০ থেকে ১২৩ আয়াতে আলোচিত হয়ছে। এর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে ভালো হবে।

৫৪. সামনের দিকে যে ঘটনার কথা বলা হচ্ছে, তা পড়ার আগে একথাগুলো মনের মধ্যে তাজা করে নিতে হবে যে, কুরাইশরা হযরত ইবরাহীমের সন্তান ছিল। কাবাঘর তিনিই নির্মাণ করেছিলন। সারা আরবে কাবার কেন্দ্রীয় ভূমিকা তাঁর সাথে সম্পর্কের কারণেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর ইবরাহীমের আওলাদও ইবরাহিমী কাবার খাদেম হবার

قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ۫ وَاَنَا
عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٦﴾ وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ
بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ
اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٨﴾ قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٩﴾
قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٠﴾ قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ
عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿٦١﴾

সে জবাব দিল, "না, বরং আসলে তোমাদের রব তিনিই যিনি পৃথিবী ও আকাশের রব এবং এদের স্রষ্টা। এর স্বপক্ষে আমি তোমাদের সামনে সাক্ষ দিচ্ছি। আর আল্লাহর কসম, তোমাদের অনুপস্থিতিতে আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে অবশ্যি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।"[৫৬] সে অনুসারে সে সেগুলোকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেললো[৫৭] এবং শুধুমাত্র বড়টিকে ছেড়ে দিল, যাতে তারা হয়তো তার দিকে ফিরে আসতে পারে।[৫৮] (তারা এসে মূর্তিগুলোর এ অবস্থা দেখে) বলতে লাগলো, "আমাদের ইলাহদের এ অবস্থা করলো কে, বড়ই জালেম সে।"

(কেউ কেউ) বললো, "আমরা এক যুবককে এদের কথা বলতে শুনেছিলাম, তার নাম ইবরাহীম।" তারা বললো, "তাহলে তাকে ধরে নিয়ে এসো সবার সামনে, যাতে লোকেরা দেখে নেয়" (কিভাবে তাকে শাস্তি দেয়া হয়)।[৫৯]

কারণেই কুরাইশরা যাবতীয় সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। আজ এ যুগে এবং আরবের বহু দূরবর্তী এলাকার পরিবেশে হযরত ইবরাহীমের এ কাহিনী শুধুমাত্র একটি শিক্ষণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবেই দেখা যায় কিন্তু যে যুগে ও পরিবেশে প্রথম প্রথম একথা বলা হয়েছিল, তা দৃষ্টি সমক্ষে রাখলে অনুভূত হবে যে, করাইশদের ধর্ম ও তাদের পৌরহিত্যের ওপর এটা এমন একটা তীক্ষ্ণ কশাঘাত ছিল, যা একেবারে তার মর্মমূলে আঘাত হানতো।

৫৫. এ বাক্যটির শাব্দিক অনুবাদ হবে, 'তুমি কি আমাদের সামনে সত্য পেশ করছো, না খেলা করছো ?" কিন্তু এর আসল অর্থ ওটাই যা উপরে অনুবাদে বলা হয়েছে। নিজেদের ধর্মের সত্যতার প্রতি তাদের বিশ্বাস এত বেশী ছিল যে, তারা গুরুত্ব সহকারে কেউ একথা বলতে পারে বলে কল্পনাও করতে প্রস্তুত ছিল না। তাই তারা বললো, তুমি নিছক ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও খেলা-তামাশা করছো, না কি প্রকৃতপক্ষে এটাই তোমার চিন্তাধারা ?

قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٢﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ
كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٣﴾ فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى
اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى
رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٥﴾

(ইবরাহীমকে নিয়ে আসার পর) তারা জিজ্ঞেস করলো, "ওহে ইবরাহীম! তুমি কি আমাদের ইলাহদের সাথে এ কাণ্ড করেছো?" সে জবাব দিল, "বরং এসব কিছু এদের এ সরদারটি করেছে, এদেরকেই জিজ্ঞেস করো, যদি এরা কথা বলতে পারে।"৬০ একথা শুনে তারা নিজেদের বিবেকের দিকে ফিরলো এবং (মনে মনে) বলতে লাগলো, "সত্যিই তোমরা নিজেরাই যালেম।" কিন্তু আবার তাদের মত পাল্টে গেলো৬১ এবং বলতে থাকলো, "তুমি জানো, এরা কথা বলে না।"

৫৬. অর্থাৎ যদি তোমরা যুক্তির সাহায্যে কথা বুঝতে অপারগ হয়ে থাকো তাহলে আমি তোমাদেরকে কার্যত দেখিয়ে দেবো যে, এরা অসহায়, সামান্যতম ক্ষমতাও এদের নেই এবং এদেরকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা ঠিক নয়। তবে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে একথা তাদের সামনে কেমন করে প্রমাণ করবেন, এর কোনো বিস্তারিত বিবরণ হযরত ইবরাহীম (আ) এ সময় দেননি।

৫৭. অর্থাৎ যে সময় পূজারী ও রক্ষণাবেক্ষণকারীরা উপস্থিত ছিল না সে সময় সুযোগ পেয়েই হযরত ইবরাহীম (আ) তাদের কেন্দ্রীয় ঠাকুরঘরে প্রবেশ করলেন এবং মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেললেন।

৫৮. "তার দিকে" কথাটির মধ্যে যে ইংগিত রয়েছে তা বড় মূর্তিটির দিকেও হতে পারে আবার হযরত ইবরাহীমের দিকেও। যদি প্রথমটি হয় তাহলে এটি হবে হযরত ইবরাহীমের পক্ষ থেকে তাদের আকীদা বিশ্বাসের প্রতি একটি বিদ্রূপাত্মক কটাক্ষের সমার্থক। অর্থাৎ যদি তারা মনে করে থাকে সত্যিই এরা ইলাহ, তাহলে তাদের এ বড় ইলাহটির ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া উচিত যে, সম্ভবত বড় ইলাহ কোনো কারণে ছোট ইলাহদের প্রতি বিরূপ হয়ে গিয়ে তাদের সবাইকে কচুকাটা করে ফেলেছেন। অথবা বড় ইলাহটিকে জিজ্ঞেস করো যে, হুযুর! আপনার উপস্থিতিতে একি ঘটে গেলো? কে এ কাজ করলো? আপনি তাকে বাধা দিলেন না কেন? আর যদি দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করা হয় তাহলে বুঝা যাবে যে, এ কাজের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীমের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, নিজেদের মূর্তিগুলোর এ দুরবস্থা দেখে হয়তো তাদের দৃষ্টি আমার দিকে ফিরে আসবে এবং তারা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, তখন তাদের সাথে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলার সুযোগ আমি পেয়ে যাবো।

৫৯. এভাবে হযরত ইবরাহীমের মনের আশাই যেন পূরণ হলো। কারণ তিনি এটাই চাচ্ছিলেন। ব্যাপারটিকে তিনি শুধু পুরোহিত ও পূজারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাচ্ছিলেন না। বরং তিনি চাচ্ছিলেন, ব্যাপারটা সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ুক। তারাও আসুক, দেখে নিক এই যে মূর্তিগুলোকে তাদের অভাব পূরণকারী হিসেবে রাখা হয়েছে এরা কতটা অসহায় এবং স্বয়ং পুরোহিতরাই এদের সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে। এভাবে এ পুরোহিতরাও ফেরাউনের মতো একই ভুল করলো। ফেরাউন যাদুকরদের সাথে হযরত মূসা (আ)-কে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ করার জন্য সারা দেশের মানুষকে একত্র করেছিল, এরাও হযরত ইবরাহীমের মামলা শোনার জন্য সারা দেশের মানুষকে একত্র করলো। সেখানে হযরত মূসা সবার সামনে একথা প্রমাণ করার সযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি যা কিছু এনেছেন তা যাদু নয় বরং মু'জিযা। এখানে হযরত ইবরাহীমকেও তাঁর শত্রুরাই সুযোগ দিয়ে দিল যেন জনগণের সামনে তাদের ধোঁকাবাজীর তেলেসমাতি ছিন্নভিন্ন করতে পারেন।

৬০. এ শেষ বাক্যটি স্বতই একথা প্রকাশ করছে যে, প্রথম বাক্যে হযরত ইবরাহীম মূর্তি ভাঙ্গার দায় যে বড় মূর্তিটির ঘাড়ে চাপিয়েছেন, তার দ্বারা মিথ্যা বলা তার উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তিনি নিজের বিরোধীদেরকে প্রমাণ দর্শাতে চাচ্ছিলেন। তারা যাতে জবাবে নিজেরাই একথা স্বীকার করে নেয় যে, এ উপাস্যরা একেবারেই অসহায় এবং এদের দ্বারা কোনো উপকারের আশাই করা যায় না। তাই তিনি একথা বলেছিলেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কোনো ব্যক্তি প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য যে বাস্তব ঘটনা বিরোধী কথা বলে তাকে মিথ্যা গণ্য করা যেতে পারে না। কারণ মিথ্যা বলার নিয়তে সে এমন কথা বলে না এবং তার বিরোধীও একে মিথ্যা মনে করে না। বক্তা প্রমাণ নির্দেশ করার জন্য একথা বলে এবং স্রোতাও একে সেই অর্থেই গ্রহণ করে।

দুর্ভাগ্যক্রমে হাদীসের এক বর্ণনায় একথা এসেছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর জীবনে তিনবার মিথ্যা কথা বলেছিলেন। তার মধ্যে এটি একটি "মিথ্যা।" দ্বিতীয় "মিথ্যা" হচ্ছে, সূরা সাফ্ফাতে হযরত ইবরাহীমের اِنِّیْ سَقِیْمٌ কথাটি। আর তৃতীয় "মিথ্যাটি" হচ্ছে তাঁর নিজের স্ত্রীকে বোন বলে পরিচিত করানো। একথাটি কুরআনে নয় বরং বাইবেলের আদি পুস্তকে বলা হয়েছে। এক শ্রেণীর বিদ্বানদের "রেওয়ায়াত" প্রীতির ব্যাপারে সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে, তাদের কাছে বুখারী ও মুসলিমের কতিপয় বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতাই বেশী প্রিয় এবং এর ফলে যে একজন নবীর ওপর মিথ্যা বলা অভিযোগ আরোপিত হচ্ছে, তার কোনো পরোয়াই তাদের নেই। অপর একটি শ্রেণী এই একটিমাত্র হাদীসকে ভিত্তি করে সমগ্র হাদীস শাস্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা শুরু করে দেয় এবং বলতে থাকে, সমস্ত হাদীসের স্তুপ উঠিয়ে দূরে ছুঁড়ে দাও। কারণ এর মধ্যে যতো আজেবাজে ধরনের রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। অথচ কোনো একটি বা কতিপয় হাদীসের মধ্যে কোনো ত্রুটি পাওয়া যাবার কারণে সমস্ত হাদীস অনির্ভরযোগ্য হয়ে যাবে—এমন কোনো কথা হতে পারে না। আর হাদীস শাস্ত্রের দৃষ্টিতে কোনো হাদীসের বর্ণনা পরম্পরা মজবুত হওয়ার ফলে এটা অপরিহার্য হয়ে ওঠে না যে, তার "মতন" (মূল হাদীস) যতই আপত্তিকর হোক না কেন তাকে চোখ বন্ধ করে "সহী" বলে মেনে নিতে হবে। বর্ণনা পরম্পরা সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হবার পরও এমন অনেক কারণ থাকতে পারে, যার

ফলে একটি "মতন" ত্রুটিপূর্ণ আকারে উদ্ধৃত হয়ে যায় এবং এমন সব বিষয়বস্তু সম্বলিত হয় যে, তা থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, একথাগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ নিসৃত হতে পারে না। তাই সনদ তথা বর্ণনা পরম্পরার সাথে সাথে "মতন"-ও দেখা অপরিহার্য। যদি মতনের মধ্যে সত্যিই কোনো দোষ থেকে থাকে তাহলে এরপরও অযথা তার নির্ভুলতার ওপর জোর দেয়া মোটেই ঠিক নয়।

যে হাদীসটিতে হযরত ইবরাহীমের তিনটি "মিথ্যা কথা" বর্ণনা করা হয়েছে সেটি কেবলমাত্র এ কারণে আপত্তিকর নয় যে, এটি একজন নবীকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছে বরং এ কারণেও এটি ত্রুটিপূর্ণ যে, এখানে যে তিনটি ঘটনার কথা বলা হয়েছে সেগুলো সবই বিতর্কিত। এর মধ্যে একটি "মিথ্যার" অবস্থা তো পাঠক এইমাত্র দেখলেন। সামান্য বুদ্ধি জ্ঞানও যার আছে তিনি কখনো এই প্রেক্ষাপটে হযরত ইবরাহীমের এই বক্তব্যকে "মিথ্যা" বলে আখ্যায়িত করতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে নাউযুবিল্লাহ আমরা এমন ধারণা তো করতেই পারি না যে, তিনি এই বক্তব্যের তাৎপর্য বুঝবেন না এবং খামাখাই একে মিথ্যা ভাষণ বলে আখ্যায়িত করবেন। আর اِنِّىْ سَقِيْمٌ সংক্রান্ত ঘটনাটির ব্যাপারে বলা যায়, এটিকে মিথ্যা প্রমাণ করা যেতে পারে না যতক্ষণ না একথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবরাহীম সে সময় সম্পূর্ণ সুস্থ, সবল, রোগমুক্ত ছিলেন এবং তিনি সামান্যতম অসুস্থতায়ও ভুগছিলেন না। একথা কুরআনে কোথাও বলা হয়নি এবং আলোচ্য হাদীসটি ছাড়া আর কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীসেও এ আলোচনা আসেনি। এখন বাকী থাকে স্ত্রীকে বোন বলার ঘটনাটি। এ ব্যাপরটি এত বেশী উদ্ভট যে, কাহিনীটি শোনার পর কোনো ব্যক্তি প্রথমেই বলে বসবে এটা কোনো ঘটনাই হতে পারে না। এটি বলা হচ্ছে তখনকার কাহিনী যখন হযরত ইবরাহীম নিজের স্ত্রী সারাকে নিয়ে মিসরে যান। বাইবেলের বর্ণনামতে তখন হযরত ইবরাহীমের বয়স ৭৫ বছর ও হযরত সারার বয়স ৬৫ বছরের কিছু বেশী ছিল। এ বয়সে হযরত ইবরাহীম ভীত হলেন মিসরের বাদশাহ এ সুন্দরীকে লাভ করার জন্য তাঁকে হত্যা করবেন। কাজেই তিনি স্ত্রীকে বললেন, যখন মিসরীয়রা তোমাকে ধরে বাদশাহর কাছে নিয়ে যেতে থাকবে তখন তুমি আমাকে নিজের ভাই বলবে এবং আমিও তোমাকে বোন বলবো, এর ফলে আমি প্রাণে বেঁচে যাবো। (আদি পুস্তক ঃ ১২ অধ্যায়) হাদীসে বর্ণিত তৃতীয় মিথ্যাটির ভিত্তি এই সুস্পষ্ট বাজে ও উদ্ভট ইসরাঈলী বর্ণনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। যে হাদীসের 'মতন' এ ধরনের উদ্ভট বক্তব্য সম্বলিত তাকেও আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি বলে মেনে নেবো কেমন করে—তা তার 'সনদ' যতই ত্রুটিমুক্তি হোক না কেন ? এ ধরনের একপেশে চিন্তা বিষয়টিকে বিকৃত করে অন্য এক বিভ্রান্তির উদ্ভট ঘটায় যার প্রকাশ ঘটাচ্ছে হাদীস অস্বীকারকারী গোষ্ঠী। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন আমার লিখিত বই রাসায়েল ও মাসায়েল ২ খণ্ড , কতিপয় হাদীসের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও তার জবাব নিবন্ধের ১২ নং জবাব)

৬১. মূলে نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ (মাথা নিচের দিকে উলটিয়ে দেয়া হলো) বলা হয়েছে । কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, তারা লজ্জায় মাথা নত করলো। কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি ও বর্ণনা ভংগী এ অর্থ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। বক্তব্য পরম্পরা ও বক্তব্যের ধরনের প্রতি নজর দিলে যে সঠিক অর্থটি পরিষ্কার বুঝা যায় সেটি হচ্ছে এই যে,

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾
أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا
حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا
وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾
وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾

ইবরাহীম বললো, "তাহলে তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমনসব জিনিসের পূজা করছো যারা তোমাদের না উপকার করতে পারে, না ক্ষতি ? ধিক তোমাদেরকে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব উপাস্যের তোমরা পূজা করছো তাদেরকে। তোমাদের কি একটুও বুদ্ধি নেই ?" তারা বললো, "পুড়িয়ে ফেলো একে এবং সাহায্য করো তোমাদের উপাস্যদেরকে, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।" আমি বললাম ঃ "হে আগুন! ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং নিরাপদ হয়ে যাও ইবরাহীমের জন্য।"[৬২] তারা চাচ্ছিল ইবরাহীমের ক্ষতি করতে, কিন্তু আমি তাদেরকে ভীষণভাবে ব্যর্থ করে দিলাম। আর আমি তাকে ও লূতকে[৬৩] বাঁচিয়ে এমন দেশের দিকে নিয়ে গেলাম যেখানে আমি দুনিয়াবাসীদের জন্য বরকত রেখেছিলাম।[৬৪]

হযরত ইবরাহীমের জবাব শুনে প্রথমেই তারা মনে মনে ভাবলো, প্রকৃতপক্ষে তোমরা নিজেরাই তো জালেম। কেমন অসহায় ও অক্ষম দেবতাদেরকে তোমরা ইলাহ বানিয়ে নিয়েছো, যারা নিজমুখে তাদের ওপর কি ঘটে এবং কে তাদেরকে ভেঙ্গে চুরে রেখে দিয়েছে একথা বলতে পারে না। যারা নিজেরা নিজেদেরকে বাঁচাতে পারে না তারা তোমাদেরকে কিভাবে বাঁচাবে। কিন্তু এর পরপরই আবার তাদের ওপর জিদ ও মূর্খতা চড়াও হয়ে গেলো এবং জিদের বৈশিষ্ট অনুযায়ী তা চড়াও হবার সাথে সাথেই তাদের বুদ্ধি উল্টোমুখী হয়ে গেলো। মস্তিষ্ক সোজা ও সঠিক চিন্তা করতে করতে হঠাৎ উল্টো চিন্তা করতে আরম্ভ করলো।

৬২. শব্দাবলী পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে এবং পূর্বাপর বক্তব্যও এ অর্থ সমর্থন করছে যে, তারা সত্যিই তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করে। অন্যদিকে আগুনের কুণ্ড তৈরি হয়ে যাবার পর তারা যখন হযরত ইবরাহীমকে তার মধ্যে ফেলে দেয় তখন মহান আল্লাহ আগুনকে হুকুম দেন সে যেন ইবরাহীমের জন্য ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং তাঁর কোনো ক্ষতি না করে। বস্তুত কুরআনে সুস্পষ্টভাবে যেসব মু'জিযার বর্ণনা দেয়া হয়েছে এটিও তার অন্তরভুক্ত। এখন কোনো ব্যক্তি যদি এ মু'জিযাগুলোকে সাধারণ ঘটনা প্রমাণ করার জন্য জোড়াতালি

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ ؕ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ﴿٧٢﴾
وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ
وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ﴿٧٣﴾ وَلُوْطًا
اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ تَّعْمَلُ
الْخَبٰٓئِثَ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ﴿٧٤﴾ وَاَدْخَلْنٰهُ فِىْ رَحْمَتِنَا ؕ
اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾

আর তাকে আমি ইসহাককে দান করলাম এবং এর ওপর অতিরিক্ত ইয়াকুব[৬৫] এবং প্রত্যেককে করলাম সৎকর্মশীল। আর আমি তাদেরকে নেতা বানিয়ে দিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথনির্দেশনা দিতো এবং আমি তাদেরকে অহীর মাধ্যমে সৎকাজের, নামায কায়েম করার ও যাকাত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলাম এবং তারা আমার ইবাদাত করতো।[৬৬]

আর লূতকে আমি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম[৬৭] এবং তাকে এমন জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম যার অধিবাসীরা বদ কাজে লিপ্ত ছিল—আসলে তারা ছিল বড়ই দুরাচারী পাপিষ্ঠ জাতি—আর লূতকে আমি নিজের রহমতের আওতায় নিয়ে নিয়েছিলাম, সে ছিল সৎকর্মশীলদের অন্তরভুক্ত।

দিয়ে কৃত্রিম ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়, তবে বুঝতে হবে যে, তার মতে আল্লাহর জন্যও বিশ্ব-জাহানের প্রচলিত নিয়মের বাইরে অস্বাভাবিক কোনো কিছু করা সম্ভবপর নয়। যে ব্যক্তি এরূপ মনে করে, আমি জানতে চাই যে, সে আল্লাহকে মেনে নেয়ার কষ্টই বা করতে যাচ্ছে কেন ? আর যদি সে এ ধরনের জোড়াতালির ব্যাখ্যা এ জন্য করে থাকে যে, আধুনিক যুগের তথাকথিত যুক্তিবাদীরা এ ধরনের কথা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়, তাহলে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করি, জনাব! তথাকথিত সেসব যুক্তিবাদীকে যে কোনোভাবেই হোক স্বীকার করাতেই হবে, এ দায়িত্ব আপনার ঘাড়ে কে চাপিয়ে দিয়েছিল ? কুরআন যেমনটি আছে ঠিক তেমনিভাবে যে তাকে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়, তাকে তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দিন। তার স্বীকৃতি আদায় করার জন্য কুরআনকে তার চিন্তাধারা অনুযায়ী ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করা, যখন কুরআনের মূল বক্তব্যে প্রতিটি শব্দ এ ঢালাইয়ের বিরোধিতা করছে, তখন এটা কোন্ ধরনের প্রচার এবং কোন্ বিবেকবান ব্যক্তি একে বৈধ মনে করতে পারে ? (বেশী বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা আনকাবুত ৩৯ টীকা)

৬৩. বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী নাহূরা ও হারান নামে হযরত ইবরাহীমের দুই ভাই ছিল। হযরত লূত ছিলেন হারানের ছেলে। (আদি পুস্তক ১১ঃ২৬) সূরা আনকাবুতে হযরত ইবরাহীমের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা থেকে বাহ্যত একথাই জানা যায় যে, তাঁদের সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে একমাত্র হযরত লূতই তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। (দেখুন ২৬ আয়াত)

৬৪. অর্থাৎ সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে। তার বরকত তথা সমৃদ্ধি বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় ধরনেরই। বস্তুগত দিক দিয়ে তা দুনিয়ার উর্বরতম এলাকাসমূহের অন্তরভুক্ত। আর আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে দু'হাজার বছর থেকে তা থেকেছে আল্লাহর নবীগণের কর্মক্ষেত্র। দুনিয়ার কোনো এলাকায় এতো বিপুল সংখ্যক নবী আবির্ভূত হয়নি।

৬৫. অর্থাৎ ছেলের পরে পৌত্রকেও নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছি।

৬৬. বাইবেলে হযরত ইবরাহীমের জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির কোনো উল্লেখ নেই। বরং তাঁর জীবনের ইরাকী যুগের কোনো ঘটনাই এ গ্রন্থে স্থান পেতে পারেনি। নমরূদের সাথে তাঁর মুখোমুখি সংঘাত, পিতা ও সম্প্রদায়ের সাথে সংঘর্ষ, মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অগ্নিতে নিক্ষেপের ঘটনা এবং সবশেষে দেশ ত্যাগে বাধ্য হওয়া— এসবের কোনোটিই বাইবেলের আদিপুস্তক লেখকের দৃষ্টিগ্রাহ্য হবার যোগ্যতা লাভ করেনি। তিনি কেবলমাত্র তাঁর দেশ ত্যাগের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাও এমন ভংগীতে যেমন একটি পরিবার পেটের ধান্দায় এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে গিয়ে বসতি গড়ে তোলে। কুরআন ও বাইবেলের বর্ণনায় এর চাইতেও মজার যে পার্থক্য তা হচ্ছে এই যে, কুরআনের বর্ণনা মতে হযরত ইবরাহীমের মুশরিক পিতা তাঁর প্রতি জুলুম করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে বাইবেল বলে, তাঁর পিতা নিজেই পুত্র, পৌত্র ও পুত্রবধূদেরকে নিয়ে হারানে গিয়ে বসতি গড়ে তোলে। (আদি পুস্তক ১১ ঃ ৭-৩২) তারপর অকস্মাত একদিন আল্লাহ হযরত ইবরাহীমকে বলেন, "তুমি হারান ত্যাগ করে কেনানে গিয়ে বসবাস করো এবং "আমি তোমা হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব এবং তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া তোমার নাম মহৎ করিব, তাহাতে তুমি আশীর্বাদের আকর হইবে। যাহারা তোমাকে আশীর্বাদ করিবে, তাহাদিগকে আমি আশীর্বাদ করিব। যে কেহ তোমাকে অভিশাপ দিবে তাহাকে আমি অভিশাপ দিব ; এবং তোমাতে ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে।" (১২ ঃ ১-৩) বুঝতে পারলাম না, হঠাৎ হযরত ইবরাহীমের প্রতি বাইবেল প্রণেতার এমন অনুগ্রহ দৃষ্টি কেমন করে হলো ?

অবশ্য কুরআনের বিভিন্ন স্থানে হযরত ইবরাহীমের জীবনের ইরাকী যুগের যে বিস্তারিত ঘটনাবলী বিবৃত হয়েছে তালমূদে তার বেশীর ভাগ আলোচনা পাওয়া যায়। কিন্তু উভয় বর্ণনা একত্র করলে শুধুমাত্র কাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশেই পার্থক্য দেখা যাবে না বরং একথা পরিষ্কার অনুভব করা যাবে যে, তালমূদের বর্ণনা বহু স্থানে বেখাপ্পা এবং বাস্তবতা ও যুক্তি বিরোধী। অন্যদিকে কুরআন একদম পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীনভাবে হযরত ইবরাহীমের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী পেশ করে। সেখানে কোনো অর্থহীন ও আজেবাজে কথা নেই। বক্তব্য সুস্পষ্ট করার জন্য আমি এখানে তালমূদের কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার পেশ করছি। এর ফলে যারা কুরআনকে বাইবেল ও ইহুদীবাদী সাহিত্যের চর্বিতচর্বণ গণ্য করে থাকেন তাদের বিভ্রান্তির ধূম্রজাল বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

তালমূদের বর্ণনা মতে হযরত ইবরাহীমের জন্মদিনে জ্যোতিষীরা আকাশে একটি আলামত দেখে তারেহ-এর গৃহে যে শিশুর জন্ম হয়েছে তাকে হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিল। তদনুসারে সে তাকে হত্যা করার প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু তারেহ নিজের ক্রীতদাসের পুত্রকে তার বিনিময়ে প্রদান করে তাকে বাঁচায়। এরপর তারেহ নিজের স্ত্রী ও শিশু পুত্রকে একটি পর্বত গুহায় লুকিয়ে রাখে। সেখানে তারা দশ বছর অবস্থান করে। এগার বছর বয়সে হযরত ইবরাহীমকে সে হযরত নূহের কাছে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে উনচল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি হযরত নূহ ও তাঁর পুত্র সামের তত্বাবধানে বাস করতে থাকেন। এ সময়ে হযরত ইবরাহীম তাঁর আপন ভাইয়ের মেয়ে সারাহকে বিয়ে করেন। সারাহ তাঁর চেয়ে বয়সে ৪২ বছরের ছোট ছিল। (বাইবেল একথা স্পষ্ট করে বলেনি যে, সারাহ হযরত ইবরাহীমের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন। তাছাড়া বাইবেলের বর্ণনা মতে তাদের উভয়ের মধ্যে বয়সের পার্থক্য ছিল দশ বছরের। আদি পুস্তক ১১ ঃ ২৯ এবং ১৭ ঃ ১৭)

তারপর তালমূদ বলছে, হযরত ইবরাহীম পঞ্চাশ বছর বয়সে হযরত নূহের গৃহ ত্যাগ করে নিজের পিতার গৃহে চলে আসেন। এখানে তিনি দেখেন পিতা মূর্তিপূজারী এবং গৃহে বারো মাসের হিসেবে বারোটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনি প্রথমে পিতাকে বুঝাবার চেষ্টা করেন। তাকে বুঝাতে অক্ষম হয়ে একদিন ঘরোয়া মূর্তি মন্দিরের মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলেন। তারেহ গৃহে এসে নিজের দেবতাদের এ অবস্থা দেখে সোজা নমরূদের কাছে চলে যায়। সেখানে অভিযোগ করে, পঞ্চাশ বছর আগে আমার গৃহে যে সন্তান জন্মেছিল আজ সে আমার ঘরে এ কাজ করেছে, আপনি এর বিহিত ব্যবস্থা করুন। নমরূদ হযরত ইবরাহীমকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তিনি কঠোর জবাব দেন। নমরূদ তখনই তাঁকে কারাগারে পাঠিয়ে দেয় তারপর শলা-পরামর্শ করে ব্যাপারটির নিষ্পত্তির জন্য নিজের পরিষদের সামনে পেশ করে। পরিষদের সদস্যরা পরামর্শ দেয় এ ব্যক্তিকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হোক। তাই একটি বিরাট আগুনের কুণ্ড তৈরি করা হয় এবং হযরত ইবরাহীমকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। হযরত ইবরাহীমের সাথে তাঁর ভাই ও শ্বশুর হারানকেও নিক্ষেপ করা হয়। কারণ নমরূদ যখন তারেহকে জিজ্ঞেস করে, তোমার এ ছেলেকে তো আমি এর জন্মের দিনেই হত্যা করতে চেয়েছিলাম, তুমি তখন একে বাঁচিয়ে এর বিনিময় অন্য শিশু হত্যা করিয়েছিলে কেন ? এর জবাবে তারেহ বলে, আমি হারানের কথায় এ কাজ করেছিলাম। তাই এ কাজ যে করেছিল তাকে ছেড়ে দিয়ে পরামর্শদাতাকে হযরত ইবরাহীমের সাথে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার সাথে সাথেই হারান জ্বলে পুড়ে কয়লা হয়ে যায় কিন্তু হযরত ইবরাহীমকে লোকেরা দেখে তিনি তার মধ্যে নিশ্চিন্তে আরামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নমরূদকে এ ব্যাপারে জানানো হয়। সে এসে স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখে চিৎকার করে বলে, "ওহে আসমানের ইলাহর বান্দা ! আগুন থেকে বের হয়ে এসো এবং আমার সামনে দাড়াও।" হযরত ইবরাহীম বাইরে আসেন। নমরূদ তার ভক্ত হয়ে পড়ে। তাঁকে বহু মূল্যবান নজরানা দিয়ে বিদায় করে।

এরপর তালমূদের বর্ণনা মতে হযরত ইবরাহীম দু'বছর পর্যন্ত সেখানে থাকেন। তারপর নমরূদ একটি ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে। তার জ্যোতিষীরা এর তাবীর বর্ণনা করে বলে, ইবরাহীম আপনার সাম্রাজ্য ধ্বংসের কারণ হবে কাজেই তাকে হত্যা করুন। সে তাঁকে হত্যা করার জন্য লোক পাঠায়। কিন্তু স্বয়ং নমরূদের প্রদত্ত একজন গোলাম আল ইয়াযার

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ
الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ
إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۖ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ
شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا
مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾

৬ রুকূ'

আর এ একই নিয়ামত আমি নূহকে দান করেছিলাম। স্মরণ করো যখন এদের সবার আগে সে আমাকে ডেকেছিল,[৬৮] আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম এবং তাকে ও তার পরিবারবর্গকে মহাবিপদ[৬৯] থেকে বাঁচিয়েছিলাম। আর এমন সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় তাকে সাহায্য করেছিলাম যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছিল। তারা খুবই খারাপ লোক ছিল, কাজেই আমি তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।

আর এ নিয়ামতই আমি দাউদ ও সুলাইমানকে দান করেছিলাম। স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন তারা উভয়ই একটি শস্য ক্ষেতের মোকদ্দমার ফায়সালা করছিল, যেখানে রাতের বেলা ছড়িয়ে পড়েছিল অন্য লোকদের ছাগল এবং আমি নিজেই দেখছিলাম তাদের বিচার। সে সময় আমি সুলাইমানকে সঠিক ফায়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, অথচ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান আমি উভয়কেই দান করেছিলাম।[৭০]

দাউদের সাথে আমি পর্বতরাজী ও পক্ষীকুলকে অনুগত করে দিয়েছিলাম, যারা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো,[৭১] এ কাজের কর্তা আমিই ছিলাম।

পূর্বাহ্নেই তাকে এ পরিকল্পনার খবর দেয়। ফলে হযরত ইবরাহীম পালিয়ে হযরত নূহের কাছে আশ্রয় নেন। সেখানে তারেহ এসে তাঁর সাথে গোপনে দেখা করতে থাকে। শেষে পিতাপুত্র পরামর্শ করে দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত করা হয়। হযরত নূহ ও সামও এ পরিকল্পনা সমর্থন করেন। এভাবে তারেহ স্বীয় পুত্র ইবরাহীম, পৌত্র লূত এবং পৌত্রি ও পুত্রবধু সারাহকে নিয়ে উর থেকে হারান চলে আসে। (তালমূদ নির্বাচিত অংশ, এইচ, পোলানো লণ্ডন, পৃষ্ঠা ৩০-৪২)

এ বর্ণনা দেখে কোনো বিবেকবান ব্যক্তি কি একথা বলতে পারে যে, এটি কুরআনের উৎস হতে পারে ?

৬৭. মূলে "হুকুম ও ইলম" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন সাধারণত হুকুম ও ইলম দান নবুওয়াত দান করার সমার্থক হয়। "হুকুম" অর্থ প্রজ্ঞাও হয়, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতাও হয়, আবার আল্লাহর পক্ষ থেকে কর্তৃত্ব করার বিধিসংগত অনুমতি (Authority) লাভও হয়। আর "ইলম"-এর অর্থ হচ্ছে এমন সত্য ও যথার্থ ইলম যা অহীর মাধ্যমে দান করা হয়েছে। হযরত লূতের সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন সূরা আ'রাফ ৮০-৮৪, সূরা হুদ ৬৯-৮৩ এবং সূরা আল হিজর ৫৭-৭৬ আয়াত।

৬৮. হযরত নূহের দোয়ার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। সুদীর্ঘকাল নিজের জাতির সংশোধনের অবিরাম প্রচেষ্টা চালাবার পর শেষে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি যে দোয়া করেছিলেন اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ "পরওয়ারদেগার ! আমি হেরে গেছি আমাকে সাহায্য করো।" (আল কামার ঃ ১০) এবং رَبِّ لَاتَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا "হে আমার রব! পৃথিবী পৃষ্ঠে একজন কাফেরকেও ছেড়ে দিয়ো না।" (সূরা নূহ ঃ ২৬)

৬৯. "মহাবিপদ" অর্থ একটি অসৎ কর্মশীল জাতির মধ্যে জীবন যাপন করার বিপদ অথবা মহাপ্লাবন। হযরত নূহের কাহিনী বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা আল আ'রাফ ৫৯ থেকে ৬৪, সূরা ইউনুস ৭১ থেকে ৭৩, সূরা হূদ ২৫-৪৮ এবং বনী ইসরাঈল ৩ আয়াতসমূহ।

৭০. বাইবেলে এ ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়নি। ইহুদী সাহিত্যেও আমরা এর কোনো চিহ্ন দেখি না। মুসলমান তাফসীরকারগণ এর যে ব্যাখ্যা করেছেন তা হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তির শস্যক্ষেতে অন্য এক ব্যক্তির ছাগলগুলো রাতের বেলা ঢুকে পড়ে। সে হযরত দাউদের কাছে অভিযোগ করে। তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তির ছাগলগুলো ছিনিয়ে নিয়ে প্রথম ব্যক্তিকে দিয়ে দেবার ফায়সালা শুনিয়ে দেন। হযরত সুলায়মান এ ব্যাপারে ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। তিনি রায় দেন, ছাগলগুলো ততদিন পর্যন্ত ক্ষেতের মালিকের কাছে থাকবে যতদিন না সে আবার নিজের ক্ষেত শস্যে পূর্ণ করে নিতে পারে। এ সম্পর্কেই আল্লাহ বলছেন, সুলায়মানকে এ ফায়সালাটি আমি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু যেহেতু মোকদ্দমার এ বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে বর্ণিত হয়নি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো হাদীসেও এ বিবরণ আসেনি তাই একথা বলা যেতে পারে না যে, এ ধরনের মামলায় এটিই ইসলামী শরীয়াতের প্রামাণ্য আইন। এ কারণেই হানাফী, শাফেয়ী, মালিকী ও অন্যান্য ইসলামী ফকীহগণের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ হয়েছে যে, যদি কারো ক্ষেত অন্যের পশু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তাকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কিনা এবং দিতে হলে কোন্ অবস্থায় হবে এবং কোন্ অবস্থায় হবে না, তাছাড়া কিভাবে এ ক্ষতিপূরণ করা হবে। ?

এ প্রেক্ষাপটে হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ) এ বিশেষ ঘটনাটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, নবীগণ নবী হবার এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অসাধারণ শক্তি ও যোগ্যতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মানুষই হতেন। আল্লাহর সার্বভৌম

কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার সামান্যতম গন্ধও তাদের মধ্যে থাকতো না। এ মোকদ্দমার ব্যাপারে অহীর মাধ্যমে হযরত দাউদকে সাহায্য করা হয়নি। ফলে তিনি ফায়সালা করার ব্যাপারে ভুলের শিকার হয়েছেন। অন্যদিকে হযরত সুলায়মানকে অহীর মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছে, ফলে তিনি সঠিক ফায়সালা দিয়েছেন। অথচ দু'জনই নবী ছিলেন। সামনের দিকে এ উভয় নবীর যেসব দক্ষতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাও একথা বুঝাবার জন্যে যে, এসব আল্লাহ প্রদত্ত দক্ষতা এবং এ ধরনের দক্ষতার কারণে কেউ আল্লাহর সমকক্ষ হয়ে যায় না।

এ আয়াত থেকে পরোক্ষভাবে ন্যায়বিচারের এ মূলনীতিও জানা যায় যে, দু'জন বিচারপতি যদি একটি মোকদ্দমার ফায়সালা করে এবং দুজনের ফায়সালা বিভিন্ন হয়, তাহলে যদিও একজনের ফায়সালাই সঠিক হবে তুবও দু'জনেই ন্যায়বিচারক বিবেচিত হবেন। তবে এখানে শর্ত হচ্ছে বিচার করার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা উভয়ের মধ্যে থাকতে হবে। তাদের কেউ যেন অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা সহকারে বিচারকের আসনে বসে না যান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে একথা আরো বেশী সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিয়েছেন। বুখারীতে আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر

"যদি বিচারক নিজের সামর্থ অনুযায়ী ফায়সালা করার পূর্ণ প্রচেষ্টা চালান, তাহলে সঠিক ফায়সালা করার ক্ষেত্রে তিনি দু'টি প্রতিদান পাবেন এবং ভুল ফায়সালা করলে পাবেন একটি প্রতিদান।

আবু দাউদ ও ইবনে মাজায় বুরাইদার (রা) রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। সেখানে নবী (স) বলেছেন ঃ "বিচারক তিন প্রকারের। এদের একজন জান্নাতী এবং দু'জন জাহান্নামী। জান্নাতের অধিকারী হচ্ছেন এমন বিচারক, যিনি সত্য চিহ্নিত করতে পারলে সে অনুযায়ী ফায়সালা দেন। কিন্তু যে ব্যক্তি সত্য চিহ্নিত করার পরও সত্য বিরোধী ফায়সালা দেয় সে জাহান্নামী। আর অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি জ্ঞান ছাড়াই লোকদের মোকদ্দমার ফায়সালা করতে বসে যায় সেও জাহান্নামী।"

৭১. মূলে مَعَ دَاوُدَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, لِدَاوُدَ বলা হয়নি। অর্থাৎ "দাউদ আলাইহিস সালামের জন্য" নয় বরং "তাঁর সাথে" পাহাড় ও পাখীদেরকে অনুগত করা হয়েছিল এবং সে কারণে তারাও হযরত দাউদ (আ)-এর সাথে আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করতো। একথাটিই সূরা সাদ-এ বলা হয়েছে ঃ

اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ۝ وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً كُلٌّ لَّهٗ اَوَّابٌ ۝

"আমি তার সাথে পাহাড়গুলোকে অনুগত করে দিয়েছিলাম। সকাল-সাঁঝে তারা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো। আর পাখিদেরকেও অনুগত করা হয়েছিল। তারা একত্র হতো, সবাই তাঁর পবিত্রতা ও মাহিমা ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করতো।"

وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ
اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖۤ اِلَى
الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۭ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ﴿٨١﴾ وَمِنَ
الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا
لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٨٢﴾

আর আমি তাকে তোমাদের উপকারার্থে বর্ম নির্মাণ শিল্প শিখিয়েছিলাম, যাতে তোমাদেরকে পরস্পরের আঘাত থেকে রক্ষা করে,[৭২] তাহলে কি তোমরা কৃতজ্ঞ হবে ?[৭৩] আর সুলাইমানের জন্য আমি প্রবল বায়ু প্রবাহকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যা তার হুকুমে এমন দেশের দিকে প্রবাহিত হতো যার মধ্যে আমি বরকত রেখেছিলাম[৭৪] আমি সব জিনিসের জ্ঞান রাখি। আর শয়তানের মধ্য থেকে এমন অনেককে আমি তার অনুগত করে দিয়েছিলাম যারা তার জন্য ডুবুরীর কাজ করতো এবং এছাড়া অন্য কাজও করতো, আমিই ছিলাম এদের সবার তত্ত্বাবধায়ক।[৭৫]

সূরা সাবায় এর ওপর অতিরিক্ত বলা হয়েছে يَا جِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ "পাহাড়গুলোকে আমি হুকুম দিয়েছিলাম যে, তাঁর সাথে সাথে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করো এবং এই একই হুকুম পাখিদেরকেও দিয়েছিলাম।" এ বক্তব্যগুলো থেকে যে কথা বুঝা যায় তা হচ্ছে এই যে, হযরত দাউদ যখন আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা গীতি গাইতেন তখন তাঁর উচ্চতর ও সুরেলা আওয়াজে পাহাড় গুঞ্জরিত হতো, পাখিরা থেমে যেতো এবং একটা অপূর্ব মূর্ছনার সৃষ্টি হতো। এ অর্থের সমর্থন একটি হাদীস থেকে পাওয়া যায়। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একবার হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। তাঁর কণ্ঠ ছিল অসাধারণ সুরেলা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার আওয়াজ শুনে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনেকক্ষণ শুনতে থাকলেন। তার পড়া শেষ হলে তিনি বললেন لقد اوتى مزمارا من مزامير ال داود অর্থাৎ এ ব্যক্তি দাউদের সুরেলা কণ্ঠের একটা অংশ পেয়েছে।

সূরা সাবায় এর ওপর আরো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِى السَّرْدِ

"আর আমি তার জন্য লোহা নরম করে দিয়েছি (এবং তাকে নির্দেশ দিয়েছি) যে, পূর্ণমাপের বর্ম তৈরি করো এবং বুনন করার ক্ষেত্রে যথাযথ পরিমাণ রক্ষা করো।"

এ থেকে জানা যায়, আল্লাহ হযরত দাউদকে লোহা ব্যবহার করার ক্ষমতা দান করেছিলেন। বিশেষ করে যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য বর্ম নির্মাণের কায়দা কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিলেন। বর্তমান যুগের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্বিক গবেষণা ও অনুসন্ধান থেকে এ আয়াতের অর্থের ওপর যে আলোকপাত হয় তা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীতে লৌহ যুগ (Iron age) শুরু হয় খৃষ্টপূর্ব ১২০০ ও ১০০০ অব্দের মাঝামাঝি সময়ে। আর এটিই ছিল হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের যুগ। প্রথম দিকে সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের হিত্তী (Hittites) জাতি লোহা ব্যবহার করে। ২০০০ থেকে ১২০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত এ জাতির উত্থান দেখা যায়। তারা লোহা গলাবার ও নির্মাণের একটা জটিল পদ্ধতি জানতো। সারা দুনিয়ার দৃষ্টি থেকে তারা একে কঠোরভাবে গোপন রাখে। কিন্তু এ পদ্ধতিতে যে লোহা তৈরি হতো তা সোনা রূপার মতো এত বেশী মূল্যবান হতো যে, তা সাধারণ কাজে ব্যবহার করা যেত না। পরে ফিলিস্তিনীরা এ পদ্ধতি জেনে নেয় এবং তারাও একে গোপন রাখে। তালুতের রাজত্বের পূর্বে হিত্তী ও ফিলিস্তিনীরা বনী ইসরাঈলকে যেভাবে উপর্যুপরী পরাজিত করে ফিলিস্তীন থেকে প্রায় বেদখল করে দিয়েছিল বাইবেলের বর্ণনা মতে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল এই যে, তারা লোহার রথ ব্যবহার করতো এবং তাদের কাছে লোহার তৈরি অন্যান্য অস্ত্রও থাকতো। (যিহোশূয় ১৭ ঃ ১৬, বিচারকর্তৃগণ ১ ঃ ১৯, ৪ ঃ ২-৩) খৃষ্ট পূর্ব ১০২০ অব্দে তালূত যখন আল্লাহর হুকুমে বনী ইসরাঈলদের শাসক পদে অধিষ্ঠিত হন তখন তিনি তাদেরকে পরপর কয়েকবার পরাজিত করে ফিলিস্তীনের বেশীর ভাগ অংশ তাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নেন। তারপর হযরত দাউদ (১০০৪-৯৬৫ খৃঃ পূঃ) শুধুমাত্র ফিলিস্তীন ও ট্রান্স জর্দানই নয় বরং সিরিয়ারও বড় অংশে ইসরাঈলী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় লৌহ নির্মাণ শিল্পের যে গোপন কলাকৌশল হিত্তী ও ফিলিস্তীনদের নিয়ন্ত্রণে ছিল তা উন্মোচিত হয়ে যায় এবং কেবলমাত্র উন্মোচিত হয়েই থেমে যায়নি বরং লৌহ নির্মাণের এমন পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হয় যার ফলে সাধারণ ব্যবহারের জন্য লোহার কম দামের জিনিসপত্রও তৈরি হতে থাকে। ফিলিস্তিনের দক্ষিণে আদূম এলাকা আকরিক লোহায় (Iron ore) সমৃদ্ধ ছিল। সম্প্রতি এ এলাকায় যে প্রত্নতাত্বিক খননকার্য চালানো হয় তার ফলে এমন অনেক জায়গার প্রত্নতাত্বিক নিদর্শনসমূহ পাওয়া গেছে যেখানে লোহা গলাবার চুল্লী বসানো ছিল। আকাবা ও আইলার সাথে সংযুক্ত হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের জামানার বন্দর ইসয়ুন জাবেরের প্রাচীন নিদর্শনগুলোর মধ্যে যে চুল্লী পাওয়া গেছে তা পর্যবেক্ষণের পরে অনুমান করা হয়েছে যে, তার মধ্যে এমনসব পদ্ধতি প্রয়োগ করা হতো যা আজকের অত্যাধুনিক যুগের Blast Furnace এ প্রয়োগ করা হয়। এখন স্বাভাবিকভাবেই হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম সবার আগে ও সবচেয়ে বেশী করে এ নতুন আবিষ্কারকে যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকবেন। কারণ কিছুকাল আগেই আশপাশের শত্রু জাতিরা এ লোহার অস্ত্র ব্যবহার করে তাঁর জাতির জীবন ধারণ কঠিন করে দিয়েছিল।

৭৩. হযরত দাউদ সম্পর্কে আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা আল বাকারাহ ২৫১ আয়াত ও বনী ইসরাঈল ৭, ৬৩ টীকা)

৭৪. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে সূরা সাবায় এভাবে ঃ

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ

"আর সুলায়মানের জন্য আমি বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, সকালে তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত এবং সন্ধ্যায় তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত।"

এর আরো বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে সূরা সাদ-এ। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ يَشَآءُ .

"কাজেই আমি তার জন্য বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যা তার হুকুমে সহজে চলাচল করতো যেদিকে সে যেতে চাইতো।"

এ থেকে জানা যায়, বাতাসকে হযরত সুলায়মানের হুকুমে এভাবে অনুগত করে দেয়া হয়েছিল যে, তাঁর রাজ্যের এক মাস দূরত্বের পথ পর্যন্ত যে কোনো স্থানে তিনি সহজে সফর করতে পারতেন। যাওয়ার সময়ও সবসময় তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী অনুকূল বাতাস পেতেন আবার ফেরার সময়ও। বাইবেল ও আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণা ও অনুসন্ধান থেকে এ বিষয়বস্তুর ওপর যে আলোকপাত হয় তা হচ্ছে এই যে, হযরত সুলায়মান তাঁর রাজত্বকালে নৌবাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটান। একদিকে ইসয়ূন জাবের বন্দর থেকে তাঁর বাণিজ্য বহর লোহিত সাগরে ইয়ামেন এবং অন্যান্য পূর্ব ও দক্ষিণ দেশসমূহে যাতায়াত করতো এবং অন্যদিকে ভূমধ্যসাগরের বন্দরসমূহ থেকে তাঁর নৌবহর (যাকে বাইবেলে তশীশী নৌবহর বলা হয়েছে) পশ্চিম দেশসমূহে যেতো। ইসয়ুন জাবের তাঁর সময়ের যে বিশাল চুল্লী পাওয়া গেছে তার সাথে তুলনীয় কোনো চুল্লী আজ পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে পাওয়া যায়নি। প্রত্নতত্ব বিশেষজ্ঞগণের মতে এখানে আদুমের আরাবাহ এলাকার খনি থেকে আশোধিত লোহা ও তামা আনা হতো এবং এই চুল্লীতে গলাবার পর সেগুলো অন্যান্য কাজ ছাড়া জাহাজ নির্মাণ কাজেও ব্যবহার করা হতো। এ থেকে কুরআন মজীদে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম সম্পর্কে সূরা সাবায় যে কথা বলা হয়েছে وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ (আর আমি তার জন্য গলিত ধাতুর ঝরণা প্রবাহিত করে দিয়েছিলাম) তার ওপর আলোকপাত হয়। তাছাড়া এ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সামনে রাখলে হযরত সুলায়মানের জন্য এক মাসের পথ পর্যন্ত বায়ু প্রবাহকে "বশীভূত" করার অর্থ অনুধাবন করা যায়। সেকালে সামুদ্রিক সফর পুরোপুরি অনুকূল বাতাসের ওপর নির্ভর করতো। মহান আল্লাহ হযরত সুলায়মানের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছিলেন, যার ফলে তাঁর দুটি সামুদ্রিক বহর সবসময় তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী এই অনুকূল বাতাস পেতো। তবুও যদি বাতাসের ওপর হযরত সুলায়মানকে হুকুম চালাবার কোনো কর্তৃত্ব ক্ষমতা দেয়া হয়ে থাকে যেমন تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ (তার হুকুমে চলতো) এর শব্দাবলীর বাহ্যিক অর্থ থেকে মনে হয়, তাহলে আল্লাহর কুদরাতের জন্য এটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তিনি নিজের রাজ্যের মালিক। নিজের যে কোনো বান্দাকে যে কোনো ক্ষমতা তিনি চাইলে দিতে পারেন। তিনি কাউকে কোনো ইখতিয়ার ও ক্ষমতা দান করলে আমাদের মনকষ্টের কোনো কারণ নেই।

৭৫. সূরা সাবা-য় এর বিস্তারিত বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ

وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ط وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ○ يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ط ..... فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ج فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ؕ - سبا : ١٢-١٤

"আর জিনদের মধ্য থেকে এমন জিনকে আমি তার জন্য অনুগত করে দিয়েছিলাম যারা তার রবের হুকুমে তার সামনে কাজ করতো। আর তাদের মধ্য থেকে যে কেউ আমার হুকুম অমান্য করতো আমি তাকে জ্বলন্ত আগুনের স্বাদ আস্বাদন করাতাম। তারা তার জন্য যেমন সে চাইতো প্রাসাদ, মূর্তি, হাউজের মতো বড় আকারের পাত্র এবং দৃঢ় ভাবে স্থাপিত ডেগ নির্মাণ করতো।.....তারপর যখন আমি সুলায়মানকে মৃত্যু দান করলাম, এই জিনদেরকে তার মৃত্যুর কথা জানালো কেবল মাটির পোকা (অর্থাৎ ঘূণ) যারা তার লাঠি খাচ্ছিল। তাই যখন সে পড়ে গেলো তখন জিনেরা বুঝতে পারলো যে, তারা যদি সত্যিই অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকতো তাহলে এ লাঞ্ছনাকর শাস্তিতে এত দীর্ঘ সময় সময় আবদ্ধ থাকতো না।" এ আয়াত থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত সুলায়মানকে যেসব জিনের ওপর কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছিল এবং যারা তাঁর বিভিন্ন কাজ করে দিতো তারা এমন পর্যায়ের জিন ছিল যাদের সম্পর্কে আরব মুশরিকদের বিশ্বাস ছিল এবং তারা নিজেরাও এ ভুল ধারণা পোষণ করতো যে, তারা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে। এখন যে ব্যক্তি সতর্ক দৃষ্টিতে কুরআন মজীদ পড়বে এবং নিজের পূর্বাহ্নের বদ্ধমূল ধ্যান-ধারণার অনুসারী না হয়ে পড়বে, সে নিজেই দেখে নিতে পারে যেখানে কুরআন নির্বিশেষে "শয়তান" ও "জিন" শব্দ ব্যবহার করে সেখানে তার অর্থ হয় কোন্ ধরনের সৃষ্টি এবং আরবের মুশরিকরা যাদেরকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বলে মনে করতো কুরআনের দৃষ্টিতে তারা কোন ধরনের জিন।

আধুনিক যুগের মুফাসসিরগণ একথা প্রমাণ করার জন্য কোমর বেঁধে নেমেছেন যে, হযরত সুলায়মানের জন্য যেসব জিন ও শয়তানকে অনুগত করে দেয়া হয়েছিল তারা মানুষ ছিল এবং আশেপাশের বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে তাদেরকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু কুরআনের শব্দাবলীর মধ্যে তাদের এ ধরনের জটিল অর্থ করার শুধু যে, কোনো অবকাশই নেই তাই নয় বরং কুরআনের যেখানেই এ ঘটনাটি এসেছে সেখানে আগে পিছের আলোচনা ও বর্ণনাভংগীই এ অর্থের পথে পরিষ্কার অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। হযরত সুলায়মানের জন্য ইমারত নির্মাণকারীরা যদি মানুষই হয়ে থাকবে তাহলে তাদের এমন কি বিশেষত্ব ছিল যে, তাদের কথা কুরআন মজীদে এমন বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ?

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ
الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ
أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ﴿٨٤﴾

আর (এ একই বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান) আমি আইয়ুবকে দিয়েছিলাম।[৭৬] স্মরণ করো, যখন সে তার রবকে ডাকলো, "আমি রোগগ্রস্ত হয়ে গেছি এবং তুমি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাকারী।"[৭৭] আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম, তার যে কষ্ট ছিল তা দূর করে দিয়েছিলাম[৭৮] এবং শুধুমাত্র তার পরিবার পরিজনই তাকে দেইনি বরং এই সাথে এ পরিমাণ আরো দিয়েছিলাম, নিজের বিশেষ করুণা হিসেবে এবং এজন্য যে, এটা একটা শিক্ষা হবে ইবাদাতকারীদের জন্য।[৭৯]

মিসরের পিরামিড থেকে শুরু করে নিউইয়র্কের গগণচুম্বী ইমারতগুলো পর্যন্ত কোনটি মানুষ তৈরি করেনি ? অথচ কোনো বাদশাহ, ধনকুবের ও বিশ্বখ্যাত ব্যবসায়ীর জন্য এমন ধরনের "জিন" ও "শয়তান" সরবরাহ করা হয়নি যা হযরত সুলামানের জন্য করা হয়েছিল।

৭৬. হযরত আইয়ুবের (আ) ব্যক্তিত্ব, সময়, জাতীয়তা সব বিষয়েই মতবিরোধ আছে। আধুনিক যুগের মুফাসসিরগণের মধ্য থেকে কেউ তাঁকে ইসরাঈলী গণ্য করেন। কেউ বলেন, তিনি মিসরীয়। আবার কেউ বলেন, আরব ছিলেন। কারো মতে, তিনি ছিলেন হযরত মূসার পূর্ববর্তীকালের লোক। কেউ বলেন, তিনি হযরত দাউদ (আ) ও সুলায়মানের (আ) আমলের লোক। আবার কেউ তাঁকে তাঁদেরও পরবর্তীকালের পুরাতন নিয়মে সংযোজিত ইয়োব তথা আইয়ুবের সিফর বা আইয়ুবের সহীফা। তার ভাষা, বর্ণনা ভংগী ও বক্তব্য দেখে এসব বিভিন্ন মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অন্য কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। এ ইয়োব বা আইয়ুবের সহীফার অবস্থা হচ্ছে এই যে, এর বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে বৈপরিত্য এবং এর বর্ণনা কুরআন মজীদের বর্ণনা থেকে এত বেশী ভিন্নতর যে, উভয়কে একসাথে মেনে নেয়া যেতে পারে না। কাজেই আমরা এর ওপর একটুও নির্ভর করতে পারি না। বড় জোর নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য যদি কিছু হয় তাহলে তা হচ্ছে এই যে, ইয়াসইয়াহ (যিসাই) নবী ও হিযকিইল (যিহিস্কেল) নবীর সহীফায় তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ সহীফা দু'টি ঐতিহাসিক দিক দিয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য। ইয়াসইয়াহ নবী খৃষ্টপূর্ব অষ্টম এবং হিযকীইল নবী খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে অতিক্রান্ত হয়েছেন। তাই নিশ্চয়তা সহকারে বলা যেতে পারে যে, হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম খৃষ্টপূর্ব নবম শতক বা এরও পূর্বের নবী ছিলেন। তাঁর জাতীয়তা সম্পর্কে বলা যেতে পারে, সূরা নিসার ১৬৩ ও সূরা আনআমের ৮৪ আয়াতে যেভাবে তাঁর আলোচনা এসেছে তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তিনি বনী ইসরাঈলের অন্তরভুক্ত ছিলেন। কিন্তু ওহাব

ইবনে মুনাববিহের এ বর্ণনাও একেবারে অযৌক্তিক নয় যে, তিনি হযরত ইসহাকের (আ) পুত্র ঈসূর বংশধর ছিলেন।

৭৭. দোয়ার ধরন অত্যন্ত পবিত্র, সূক্ষ্ম ও নমনীয়। সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে নিজের কষ্টের কথা বলে যাচ্ছেন এবং এরপর একথা বলেই থেমে যাচ্ছেন—"তুমি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" পরে কোনো অভিযোগ ও নালিশ নেই, কোনো জিনিসের দাবী নেই। দোয়ার এই ভংগিমা যে উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন চিত্রটি তুলে ধরে তা হচ্ছে এই যে, কোনো পরম ধৈর্যশীল, অল্পে তুষ্ট, ভদ্র ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি দিনের পর দিন অনাহার ক্লিষ্টতার দুঃসহ জ্বালায় ব্যাকুল হয়ে কোনো পরমদাতা ও দয়ালু ব্যক্তির সামনে কেবলমাত্র এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়ে যায়। "আমি অনাহারে আছি এবং আপনি বড়ই দানশীল।" এরপর সে আর মুখে কিছুই উচ্চারণ করতে পারে না।

৭৮. সূরা সাদের চতুর্থ রুকূতে এর যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাঁকে বলেন ঃ

اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ.

"নিজের পা দিয়ে আঘাত করো, এ ঠাণ্ডা পানি মজুদ আছে গোসল ও পান করার জন্য।"

এ থেকে জানা যায়, মাটিতে পা ঠুকবার সাথে সাথেই আল্লাহ তাঁর জন্য একটি প্রাকৃতিক ঝরণাধারা প্রবাহিত করেন। এ ঝরণার পানির বৈশিষ্ট ছিল এই যে, এ পানি পান ও এতে গোসল করার সাথে সাথেই তিনি রোগমুক্ত হয়ে যান। এ রোগ নিরাময়ে এদিকে ইংগিত করে যে, তাঁর কোনো মারাত্মক চর্মরোগ হয়েছিল। বাইবেলের বর্ণনাও এর সমর্থক। বাইবেল বলছে, তাঁর সমস্ত শরীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ফোঁড়ায় ভরে গিয়েছিল।

(ইয়োব ২ ঃ ৭)

৭৯. এ কাহিনীর মধ্য দিয়ে কুরআন মজীদ হযরত আইয়ুবকে এমনভাবে পেশ করেছে যার ফলে তাঁকে সবরের প্রতিমূর্তি মনে হয়। এরপর কুরআন বলছে, তাঁর জীবন ইবাদাতকারীদের জন্য একটি আদর্শ। অন্যদিকে বাইবেলের আইয়ুবের সহীফা (ইয়োব) পড়লে সেখানে এমন এক ব্যক্তির ছবি ফুটে উঠবে যিনি আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগে সোচ্চার এবং নিজের বিপদের জন্য আপাদমস্তক ফরীয়াদী হয়ে আছেন। বারবার তাঁর মুখ থেকে এ বাক্যটি নিঃসৃত হচ্ছে ঃ "বিলুপ্ত হোক সেদিন যেদিন আমার জন্ম হয়েছিল।" "আমি কেন গর্ভে মরে যাইনি ?" "মায়ের পেট থেকে বের হওয়া মাত্র আমি কেন প্রাণত্যাগ করিনি ?" বারবার তিনি আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন "সর্বশক্তিমানের বান আমার ভিতরে প্রবিষ্ট, আমার আত্মা তাঁরই বিষপান করছে, ঈশ্বরীয় ত্রাসদল আমার বিরুদ্ধে শ্রেণীবদ্ধ।" "হে মনুষ্য দর্শক, আমি যদি পাপ করে থাকি, তবে আমার কর্মে তোমার কি হয় ? তুমি কেন আমাকে তোমার শর লক্ষ করেছো ? আমিতো আপনার ভার আপনি হয়েছি। তুমি আমার অধর্ম ক্ষমা কর না কেন ? আমার অপরাধ দূর কর না কেন ?" "আমি ঈশ্বরকে বলবো আমাকে দোষী করো না ; আমাকে বল আমার সাথে কি কারণে বিবাদ করছো। এটা কি ভাল যে, তুমি উপদ্রব করবে ? তোমার হস্তনির্মিত বস্তু তুমি তুচ্ছ

করবে ? দুষ্টগণের মন্ত্রণায় প্রসন্ন হবে ?" তাঁর তিন বন্ধু এসে তাঁকে সান্ত্বনা দেন এবং ধৈর্য, আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টিলাভ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি কোনো কথা শুনেন না। তিনি তাদের পরামর্শের জবাবে আল্লাহর বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ আনতে থাকেন। এবং তাদের শত বুঝাবার পরও জোর দিয়ে বলতে থাকেন যে, আল্লাহর এ কাজের মধ্যে কোনো প্রজ্ঞা ও কল্যাণ নেই, আছে শুধু একটা জুলুম, যা আমার মতো মুত্তাকী ও ইবাদাতকারী ব্যক্তির প্রতি করা হচ্ছে। তিনি আল্লাহর ব্যবস্থাপনার কঠোর সমালোচনা করেন এই বলে যে, একদিকে দুষ্কৃতকারীদেরকে অনুগৃহীত করা হয় এবং অন্যদিকে সুকৃতিকারীদেরকে জুলুম নির্যাতনে অতিষ্ঠ করা হয়। নিজের সৎকর্মগুলোকে তিনি এক এক করে গণনা করেন তারপর এর প্রতিদানে আল্লাহ তাঁকে যেসব কষ্ট দিয়েছেন সেগুলো বর্ণনা করতে থাকেন এবং এরপর বলেন, আল্লাহর কাছে যদি কোনো জবাব থাকে তাহলে তিনি বলুন কোন্ অপরাধের শাস্তি হিসেবে আমার সাথে এ ব্যবহার করা হয়েছে? নিজের স্রষ্টা ও প্রভুর বিরুদ্ধে তাঁর এ অভিযোগ ধীরে ধীরে এত বেশী বেড়ে যেতে থাকে যে, শেষে তাঁর বন্ধুরা তাঁর কথার জবাব দেয়া বন্ধ করে দেন। তারা চুপ করে যান। তখন চতুর্থ এক ব্যক্তি, যিনি তাঁদের কথা নিরবে শুনছিলেন, মাঝখান থেকে হস্তক্ষেপ করেন এবং আইয়ুবকে এ ব্যাপারে ভীষণভাবে তিরস্কার করতে থাকেন যে, "তিনি তো আল্লাহকে নয় বরং নিজেকে সঠিক গণ্য করছেন।" এ ভাষণ শেষ হবার আগেই মাঝখান থেকে আল্লাহ নিজেই বলে ওঠেন এবং তারপর তাঁর ও আইয়ুবের মধ্যে খুব মুখোমুখী বিতর্ক হতে থাকে। এ পুরো কাহিনীটি পড়তে পড়তে আমরা একবারও অনুভব করি না যে, আমরা এমন এক অতুলনীয় ধৈর্যশীল নবীর অবস্থা ও কথা পড়ছি যার চিত্র কুরআন ইবাদাতকারীদের জন্য শিক্ষণীয় ও আদর্শ হিসেবে পেশ করছে।

বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, এ পুস্তকের প্রথম অংশ এক ধরনের কথা বলে, মাঝখানের অংশ বলে ভিন্ন কথা এবং শেষে ফলাফল দেখা যায় সম্পূর্ণ অন্য কিছু। এ তিন অংশের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য নেই। প্রথম অংশ বলে, আইয়ুব একজন বড়ই সত্যনিষ্ঠ, খোদাভীরু ও কুকর্ম ত্যাগকারী সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। এই সংগে তিনি এতই ধনাঢ্য ছিলেন যে, "পূর্ব দেশের লোকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা বড়লোক।" একদিন আল্লাহর কাছে তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহর নিজের) পুত্রগণ হাজির হন। তাদের সাথে শয়তানও আসে। আল্লাহ সেই মজলিসে তার বান্দা আইয়ুবের জন্য গর্ব করেন। শয়তান বলে, আপনি তাকে যা কিছু দিয়ে রেখেছেন তারপর সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে আর কি করবে ? তার প্রতি যেসব অনুগ্রহ করেছেন সেগুলো একবার ছিনিয়ে নেন তারপর দেখুন সে যদি আপনার মুখের ওপর আপনাকে অস্বীকার না করে থাকে তাহলে আমার নাম শয়তান নয়। আল্লাহ বলেন, ঠিক আছে, তার সব কিছু তোমার হস্তগত করে দেয়া হচ্ছে, শুধুমাত্র তার শারীরীক কোনো ক্ষতি করো না। শয়তান গিয়ে আইয়ুবের সমস্ত ধন-দওলত ও পরিবার পরিজন ধ্বংস করে দেয়। আইয়ুব সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে শুধুমাত্র একাই থেকে যান। কিন্তু এতে আইয়ুবের মনে কোনো দুঃখ ও ক্ষোভ জাগেনি। তিনি আল্লাহকে সিজদা করেন এবং বলেন, "আমি মায়ের গর্ভ থেকে উলংগ এসেছি এবং উলংগই ফিরে যাবো ; খোদাই দিয়েছেন আবার খোদাই নিয়েছেন, খোদার নাম ধন্য হোক।" আবার এক দিন আল্লাহর দরবারে একই ধরনের একটি মজলিস বসে। তাঁর ছেলেরা আসে, শয়তানও আসে। আল্লাহ

শয়তানকে বলেন, আইয়ুব কেমন সত্যনিষ্ঠ প্রমাণিত হয়েছে দেখে নাও। শয়তান বলে, আচ্ছা, জনাব, তার শরীরকে একবার বিপদগ্রস্থ করে দেখুন সে আপনার মুখের ওপর আপনার কুফরী করবে। আল্লাহ বলেন, ঠিক আছে যাও, তাকে তোমার হাতে দেয়া হচ্ছে, তবে তার প্রাণটি যেন সংরক্ষিত থাকে। অতপর শয়তান ফিরে যায়। সে "আইয়ুবকে মাথার চাঁদি থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক ফোড়ায় ভরে দেয়।" তার স্ত্রী তাকে বলে, "এখনো কি তুমি তোমার সত্যনিষ্ঠার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ? আল্লাহকে অমান্য করো এবং প্রাণত্যাগ করো।" তিনি জবাব দেন, "তুমি মূঢ়া স্ত্রীর মতো কথা বলছো। আমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে শুধু সুখ পাবো, দুঃখ পাবো না।"

এ হচ্ছে আইয়ুবের সহীফার (ইয়োব পুস্তক) প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত সার। কিন্তু এরপর তৃতীয় অধ্যায়ে একটি ভিন্নতর বিষয়বস্তু শুরু হয়েছে। এটি বিয়াল্লিশতম অধ্যায় পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। এসব অধ্যায়ে হযরত আইয়ুবের ধৈর্যহীনতা এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ ও দোষারোপের একটি ধারাবাহিক কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তা থেকে একথা পুরোপুরি প্রমাণিত হয়ে যায় যে, হযরত আইয়ুবের সম্পর্কে আল্লাহর অনুমান ভুল ও শয়তানের অনুমান সঠিক ছিল। তারপর বিয়াল্লিশতম অধ্যায়ের শেষের দিকে আল্লাহর সাথে একচোট তর্ক বিতর্ক করার পর ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা ও তাওয়াক্কুলের ভিত্তিতে নয় বরং আল্লাহর তিরস্কার ও ধমক খেয়ে আইয়ুব তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেন এবং তিনি তা গ্রহণ করে তার সমস্ত কষ্ট দূর করে দেন। এরপর তাকে পূর্বের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী সম্পদ দান করেন। এ শেষ অংশটি পড়তে গিয়ে মনে হবে আইয়ুব ও আল্লাহ উভয়েই শয়তানের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছেন। তারপর নেহাত নিজের কথা রাখার জন্যই আল্লাহ ধমক দিয়ে তাকে মাফ চাইতে বাধ্য করেন এবং মাফ চাওয়ার সাথে সাথেই তা গ্রহণ করে নেন, যাতে শয়তানের সামনে তাঁকে লজ্জিত হতে না হয়।

এ পুস্তকটি নিজ মুখেই একথা ঘোষণা করছে যে, এটি আল্লাহর বা হযরত আইয়ুবের বাণী নয়। বরং হযরত আইয়ুবের জামানার বইও নয় এটি। তাঁর ইন্তেকালের শত শত বছর পরে কোনো এক ব্যক্তি আইয়ুবের ঘটনাকে ভিত্তি করে "ইউসুফ যোলায়খা" ধরনের একটি চমকপ্রদ কাহিনী কাব্য রচনা করেন। তাতে আইয়ুব (ইয়োব) তৈমনীয় ইলীফস, শূহীয় বিলদদ, নামাথীয় সোফর, বুষীয় বারখেলের পুত্র ইলীহূ প্রমুখ কয়েকটি চরিত্র উপস্থাপন করে তাদের মুখ দিয়ে বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আসলে তিনি নিজের মনগড়া দর্শন বর্ণনা করেছেন। তার কাব্য প্রতিভা ও চমৎকার বর্ণনা ভংগীর যতই প্রশংসা করতে পারেন করুন কিন্তু তাকে পবিত্র কিতাব ও আসমানী সহীফার অন্তরভুক্ত করার কোনো অর্থ নেই। আইয়ুব আলাইহিস সালামের জীবনী ও সীরাতের সাথে তার সম্পর্ক ঠিক ততটুকু যতটুকু সম্পর্ক আছে "ইউসুফ যোলায়খা"র সাথে ইউসুফ আলাইহিস সালামের। বরং সম্ভবত অতটুকুও নেই। বড়জোর আমরা এতটুকু বলতে পারি যে, এ পুস্তকের প্রথম ও শেষ অংশে যেসব ঘটনা বলা হয়েছে তার মধ্যে সঠিক ইতিহাসের একটি উপাদান পাওয়া যায়। কবি তা শ্রুতি থেকে গ্রহণ করে থাকবেন, যা তাঁর যুগে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল অথবা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য এমন কোনো সহীফাহ থেকে নিয়ে থাকবেন।

وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٨٥﴾
وَأَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَذَا النُّوْنِ إِذْ ذَّهَبَ
مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ أَنْ لَّآ إِلٰهَ
إِلَّآ أَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ
وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾

আর এ নিয়ামতই ইসমাঈল, ইদরীস[৮০] ও যুলকিফ্‌লকে[৮১] দিয়েছিলাম, এরা সবাই সবরকারী ছিল এবং এদেরকে আমি নিজের অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিলাম, তারা ছিল সৎকর্মশীল।

আর মাছওয়ালাকেও আমি অনুগ্রহভাজন করেছিলাম।[৮২] স্মরণ করো যখন সে রাগান্বিত হয়ে চলে গিয়েছিল[৮৩] এবং মনে করেছিল আমি তাকে পাকড়াও করবো না।[৮৪] শেষে সে অন্ধকারের মধ্য থেকে ডেকে উঠলো[৮৫] "তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, পবিত্র তোমার সত্তা, অবশ্যই আমি অপরাধ করেছি।" তখন আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম এবং দুঃখ থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছিলাম, আর এভাবেই আমি মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।

৮০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা রূমের ৩৩ টীকা।

৮১. "যুলকিফ্‌ল"-এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে "ভাগ্যবান" এবং অর্থ হচ্ছে নৈতিক মাহাত্ম ও পরকালীন সওয়াবের দৃষ্টিতে ভাগ্যবান, পার্থিব স্বার্থ ও লাভের দৃষ্টিতে নয়। এটি সংশ্লিষ্ট মনীষীর নাম নয় বরং তাঁর উপাধি। কুরআন মজীদে দু'জায়গায় তাঁর কথা বলা হয়েছে। দু'জায়গায়ই তাঁকে এ উপাধির মাধ্যমে স্মরণ করা হয়েছে, নামের সাহায্যে নয়।

কে এই যুলকিফ্‌ল ? কি তাঁর পরিচয় ? কোন্ দেশ ও জাতির সাথে তাঁর সম্পর্কে ছিল ? তিনি কোন্ যুগের লোক ছিলেন ? এ সম্পর্কে মুফাস্‌সিরগণের উক্তিগুলো বড় বেশী বিক্ষিপ্ত। কেউ বলেন, এটি হযরত যাকারিয়ার (আ) দ্বিতীয় নাম (অথচ এটি একটি সুস্পষ্ট ভুল কথা। কারণ, তাঁর আলোচনা এর পরই সামনের দিকে আসছে)। কেউ বলেন, তিনি হচ্ছেন হযরত ইলিয়াস (আ)। কেউ ইউশা' ইবনে নূনের নাম নেন। কেউ বলেন, তিনি আল ইয়াসা (অথচ এটিও ভুল। কারণ, সূরা সা'দ-এ তাঁর কথাও "যুলকিফ্‌ল"-এর কথা আলাদা আলাদা করে বলা হয়েছে।) কেউ তাঁকে হযরত আল ইয়াসার (আ) খলীফা বলেন। আবার কারোর বক্তব্য হচ্ছে, তিনি ছিলেন হযরত আইয়ুবের ছেলে। হযরত আইয়ুবের (আ)

পরে তিনি নবী হন এবং তাঁর আসল নাম ছিল বিশর। আল্লামা আলূসী তাঁর রূহুল মা'আনী গ্রন্থে লিখেছেন ঃ ইহুদীদের দাবী হচ্ছে, তিনি হিযকিইল (যিহিস্কেল) নবী। বনী ইসরাঈলদের পরাধীনতার (৫৯৭ খৃঃ পূঃ) যুগে তিনি নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিসিক্ত হন এবং খাবুর (কবার) নদীর তীরে একটি জনপদে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।"

এ বিভিন্ন উক্তি ও মতামতের ভিত্তিতে তিনি যথার্থই কোন্ নবী ছিলেন নিশ্চিত নির্ভরতার সাথে বলা যেতে পারে না। বর্তমান যুগের মুফাসসিরগণ হিযকিইল নবীর দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। কিন্তু এ মত গ্রহণের পক্ষে আমি কোনো ন্যায় সংগত যুক্তি-প্রমাণ পেলাম না। তবুও এর সপক্ষে কোনো যথাযথ প্রমাণ পেলে এ মতটিকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। কারণ, বাইবেলের হিযকিইল সহীফাটি দেখলে মনে হয় যথার্থই এ আয়াতে তাঁর যে প্রশংসা করা হয়েছে তিনি তার হকদার অর্থাৎ ধৈর্যশীল ও সৎকর্মপরায়ণ। জেরুসালেম শেষবার ধ্বংস হবার আগে বখতে নসরের হাতে যারা গ্রেফতার হয়েছিল তিনি ছিলেন তাদের একজন। বখতে নসর ইরাকে ইসরাঈলী কয়েদীদের একটি উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল খাবুর (কবার) নদীর তীরে এর নাম ছিল তেলআবীব। এ স্থানেই ৫৯৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে হযরত হিযকিইল নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিসিক্ত হন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩০ বছর। অবিশ্রান্তভাবে ২২ বছর ধরে তিনি একদিকে বিপদগ্রস্ত ইসরাঈলীদেরকে এবং অন্যদিকে জেরুসালেমের গাফেল ও অস্থির-বিহ্বল অধিবাসী ও শাসকদেরকে সজাগ করার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। এ মহান দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁর নিষ্ঠা ও আত্মনিমগ্নতা অবশ্য প্রণিধানযোগ্য। একটি ঘটনা থেকে এ বিষয়টি অনুমান করা যেতে পারে। নবুওয়াতের নবম বছরে তাঁর স্ত্রী, যাকে তিনি নিজেই বলেন, "নয়নের প্রীতি পাত্র" ইন্তিকাল করেন। লোকেরা শোক প্রকাশের জন্য তাঁর বাড়িতে জমায়েত হয়। এদিকে তিনি নিজের মানসিক যন্ত্রণা ও শোকের কথা বাদ দিয়ে নিজের সম্প্রদায়কে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাতে থাকেন। এ আযাব সে সময় তাদের মাথার ওপর ঝুলছিল। (২৪ ঃ ১৫-২৭) বাইবেলের যিহিস্কেল পুস্তক এমন একটি পুস্তক যা পড়ে মনে হয় সত্যি এটি আল্লাহর কালাম।

৮২. অর্থাৎ হযরত ইউনুছ (আ)। কোথাও সরাসরি তাঁর নাম নেয়া হয়েছে আবার কোথাও "যুন্নুন" ও "সাহেবুল হূত" বা মাছওয়ালা উপাধির মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করা হয়েছে। তিনি মাছ ধরতেন বা বেচতেন বলে তাঁকে মাছওয়ালা বলা হতো না বরং আল্লাহর হুকুমে একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলেছিল, তাই তাঁকে বলা হয়েছে মাছওয়ালা। সূরা সাফ্ফাতের ১৪২ আয়াতে একথা বর্ণনা করা হয়েছে। আরো বেশী জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস ৯৮-১০০ এবং আস সাফ্ফাত ৭৭-৮৫ টীকা।

৮৩. অর্থাৎ তিনি নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যান। আল্লাহর পক্ষ থেকে তখনো হিজরত করার হুকুম আসেনি, যার ফলে তাঁর পক্ষে নিজের কর্তব্য ত্যাগ করা জায়েয হতে পারতো।

৮৪. তিনি মনে করেছিলেন, আমার সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহর আযাব এসে যাচ্ছে। এখন আমাকে কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেয়া উচিত। না হলে আমি নিজেও আযাবের মধ্যে ঘেরাও হয়ে যাবো। নীতিগতভাবে এ বিষয়টি তো পাকড়াওযোগ্য ছিল না। কিন্তু নবীর পক্ষে আল্লাহর হুকুম ছাড়া দায়িত্ব ছেড়ে চলে যাওয়া ছিল পাকড়াওযোগ্য।

وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرْنِى فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ
الْوَٰرِثِينَ ﴿٨٩﴾ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَوَهَبْنَا لَهُۥ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُۥ
زَوْجَهُۥٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا
وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا خَٰشِعِينَ ﴿٩٠﴾

আর যাকারিয়ার কথা (স্মরণ করো), যখন সে তার রবকে ডেকে বলেছিল ঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একাকী ছেড়ে দিয়ো না এবং সবচেয়ে ভালো উত্তরাধিকারী তো তুমিই।" কাজেই আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম এবং তাকে ইয়াহ্ইয়া দান করেছিলাম, আর তার স্ত্রীকে তার জন্য যোগ্য করে দিয়েছিলাম।[৮৬] তারা সৎকাজে আপ্রাণ চেষ্টা করতো, আমাকে ডাকতো আশা ও ভীতি সহকারে এবং আমার সামনে ছিল অবনত হয়ে।[৮৭]

৮৫. অর্থাৎ মাছের পেটের মধ্য থেকে সেখানে তো অন্ধকার ছিলই, তার ওপর ছিল সাগরের অন্ধকার।

৮৬. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা আলে ইমরান ৩৭ থেকে ৪১ আয়াত টীকাসহ, সূরা মারয়াম ২ থেকে ১৫ আয়াত টীকাসহ। স্ত্রীকে যোগ্য করে দেয়ার অর্থ হচ্ছে, তার বন্ধাত্ব দূর করে দেয়া এবং বার্ধক্য সত্ত্বেও তাকে গর্ভধারণের উপযোগী করা। "সবচেয়ে ভালো উত্তরাধিকারী তুমিই" মানে হচ্ছে, তুমি সন্তান না দিলে কোনো দুঃখ নেই। তোমার পবিত্র সত্তা-উত্তরাধিকারী হবার জন্য যথেষ্ট।

৮৭. এই প্রেক্ষাপটে যে উদ্দেশ্যে নবীদের উল্লেখ করা হয়েছে তা আবার স্মৃতিপটে জাগিয়ে তুলুন। হযরত যাকারিয়ার (আ) ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা হৃদয়ংগম করানো যে, এ সকল নবীই ছিলেন নিছক বান্দা ও মানুষ। ইলাহী সার্বভৌমত্বের সামান্যতম গন্ধও তাদের মধ্যে ছিল না। তারা অন্যদেরকে সন্তান দান করতেন না বরং নিজেরাই আল্লাহর সামনে সন্তানের জন্য হাত পাততেন। হযরত ইউনুসের কথা এ জন্য বলা হয়েছে যে, একজন মহিমান্বিত নবী হওয়া সত্ত্বেও যখন তিনি ভুল করে বসলেন তখন তাকে পাকড়াও করা হলো এবং যখন তিনি নিজের রবের সামনে অবনত হলেন তখন তাঁর প্রতি অনুগ্রহও এমনভাবে করা হয়েছে যে, মাছের পেট থেকে তাঁকে জীবিত বের করে আনা হয়েছে। হযরত আইয়ুবের উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, নবীর বিপদে পড়া কোনো অভিনব ব্যাপার নয় এবং নবীও যখন বিপদে পড়েন তখন একমাত্র আল্লাহরই সামনে ত্রাণের জন্য হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি অন্যের ত্রাণকারী নন বরং আল্লাহর কাছে ত্রাণ ভিক্ষাকারী। তারপর এসব কথার সাথে সাথে একদিকে এ সত্যটি মনে বদ্ধমূল করতে চাওয়া হয়েছে যে, এ সকল নবীই ছিলেন তাওহীদের প্রবক্তা এবং নিজেদের

وَالَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ
اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّاَنَا رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوْنِ ۝ وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۭ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ۝

আর সেই মহিলা যে নিজের সতীত্ব রক্ষা করেছিল,[৮৮] আমি তার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলাম নিজের রূহ থেকে[৮৯] এবং তাকে ও তার পুত্রকে সারা দুনিয়ার জন্য নিদর্শনে পরিণত করেছিলাম।[৯০]

তোমাদের এ উম্মত আসলে একই উম্মত। আর আমি তোমাদের রব। কাজেই তোমরা আমার ইবাদাত করো। কিন্তু (নিজেদের কার্যকলাপের মাধ্যমে) লোকেরা পরস্পরের মধ্যে নিজেদের দীনকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে।[৯১]—সবাইকে আমার দিকে ফিরে আসতে হবে।

প্রয়োজন তাঁরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোর সামনে পেশ করতেন না আবার অন্যদিকে একথাও বুঝিয়ে দেয়া কাম্য যে, আল্লাহ হামেশা অস্বাভাবিকভাবে নিজের নবীদেরকে সাহায্য করতে থেকেছেন। শুরুতে তাঁরা যতই পরীক্ষার সম্মুখীন হোন না কেনো শেষ পর্যন্ত অলৌকিক পদ্ধতিতে তাঁদের প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে।

৮৮. এখানে হযরত মারয়াম আলাইহিস সালামের কথা বলা হয়েছে।

৮৯. হযরত আদম আলাইহিস সালাম সম্পর্কেও বলা হয়েছে ঃ

اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ○ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ
سٰجِدِيْنَ ○

"আমি মাটি থেকে একটি মানুষ তৈরি করছি। কাজেই (হে ফেরেশতারা!) যখন আমি তাকে পূর্ণরূপে তৈরি করে নেবো এবং তার মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দেবো তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় অবনত হয়ে যাবে।" (সাদ ঃ ৭১-৭২)

একথাই হযরত ঈসা সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে। সূরা নিসায় বলা হয়েছে ঃ

رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗٓ اَلْقٰىهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ

"আল্লাহর রসূল এবং তাঁর ফরমান, যা মারয়ামের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং তার পক্ষ থেকে একটি রূহ।" (১৭১ আয়াত)

সূরা তাহরীমে বলা হয়েছে ঃ

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا

"আর ইমরানের মেয়ে মারয়াম যে নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করেছিল, কাজেই ফুঁকে দিলাম আমি তার মধ্যে নিজের রূহ।" (১২ আয়াত)

এ সংগে এ বিষয়টিও সামনে থাকা দরকার যে, মহান আল্লাহ হযরত ঈসা (আ) ও হযরত আদমের (আ) জন্মকে পরস্পরের সদৃশ গণ্য করেন। তাই সূরা আলে ইমরানে বলেন ঃ

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ، خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

"ঈসার দৃষ্টান্ত আল্লাহর কাছে আদমের মতো, যাকে আল্লাহ মাটি থেকে তৈরি করেন তারপর বলেন, "হয়ে যাও" এবং সে হয়ে যায়।" (৫৯ আয়াত)

এসব আয়াত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে একথা বুঝা যায় যে, স্বাভাবিক সৃষ্টি পদ্ধতির পরিবর্তে যখন আল্লাহ কাউকে নিজের হুকুমের সাহায্যে অস্তিত্বশীল করে জীবন দান করেন তখন একে "নিজের রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছি" শব্দাবলীর সাহায্যে বিবৃত করেন। এ রূহের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে সম্ভবত এ জন্য করা হয়েছে যে, এর ফুঁকে দেওয়াটা অলৌকিক ধরনের। আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা নিসা, ২১২-২১৩ টীকা।

৯০. অর্থাৎ তারা মা ও ছেলে দু'জনের কেউই আল্লাহ বা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে শরীক ছিলেন না বরং আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন ছিলেন। তারা কোন্ অর্থে নিদর্শন ছিলেন ? এর ব্যাখ্যা জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা মারয়াম ২১ এবং সূরা আল মু'মিনূন ৪৩ টীকা।

৯১. এখানে "তোমরা" শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে সমগ্র মানবতাকে। এর অর্থ হচ্ছে, হে মানব জাতি! তোমরা সবাই আসলে একই দল ও একই মিল্লাতের অন্তরভুক্ত। দুনিয়ায় যত নবী এসেছেন তাঁরা সবাই একই দীন ও জীবন বিধান নিয়ে এসেছেন। আর তাঁদের সেই আসল দীন এই ছিল ঃ কেবলমাত্র এক ও একক আল্লাহই মানুষের রব এবং এক আল্লাহরই বন্দেগী ও পূজা করা উচিত। পরবর্তীকালে যতগুলো ধর্ম তৈরী হয়েছে সবগুলো এ দীনেরই বিকৃত রূপ। কেউ এর কোনো একটি জিনিস নিয়েছে, কেউ অন্যটি, আবার কেউ তৃতীয়টি। এদের প্রত্যেকে আবার এই দীনের একটি অংশ নিয়ে তার সাথে নিজের পক্ষ থেকে অনেক কিছু মিশিয়ে দিয়েছে। এভাবে এই অসংখ্য দীন ও মিল্লাতের সৃষ্টি হয়েছে। এখন অমুক নবী অমুক ধর্মের প্রবর্তক, অমুক নবী অমুক ধর্মের ভিত গড়েছেন এবং নবীগণ মানব জাতিকে এই বহুধর্ম ও বহু মিল্লাতে বিভক্ত করেছেন, এ ধরনের কথা নিছক বিভ্রান্ত চিন্তার ফসল ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সব দীন ও মিল্লাত নিজেদেরকে বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন দেশের নবীদের সাথে সম্পৃক্ত করছে বলেই একথা প্রমাণিত হয় না যে, বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় বিভিন্নতা নবীদের সৃষ্টি। আল্লাহর প্রেরিত নবীগণ দশটি বিভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করতে পারে না। তাঁরা এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করা শিক্ষা দিতে পারেন না।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا
لَهٗ كٰتِبُوْنَ ﴿٩٤﴾ وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٩٥﴾
حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ
يَّنْسِلُوْنَ ﴿٩٦﴾ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِىَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا
ظٰلِمِيْنَ ﴿٩٧﴾ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ۗ اَنْتُمْ
لَهَا وٰرِدُوْنَ ﴿٩٨﴾

৭ রুকূ'

কাজেই যে ব্যক্তি মু'মিন থাকা অবস্থায় সৎকাজ করে, তার কাজের অমর্যাদা করা হবে না এবং আমি তা লিখে রাখছি। আর যে জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি তার অধিবাসিরা আবার ফিরে আসবে, এটা সম্ভব নয়।[৯২] এমন কি যখন ইয়াজুজ ও মাজুজকে খুলে দেয়া হবে, প্রতি উচ্চ ভূমি থেকে তারা বের হয়ে পড়বে এবং সত্য ওয়াদা পুরা হবার সময় কাছে এসে যাবে[৯৩] তখন যারা কুফরী করেছিল হঠাৎ তাদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। তারা বলবে, "হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য! আমরা তো এ বিষয়ে গাফেল ছিলাম বরং আমরা দোষী ছিলাম।"[৯৪] অবশ্যই তোমরা এবং তোমাদের যেসব মাবুদকে তোমরা পূজা করো, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন, সেখানেই তোমাদের যেতে হবে।[৯৫]

৯২. এ আয়াতটির তিনটি অর্থ হয় ঃ

এক ঃ যে জাতি একবার আল্লাহর আযাবের মুখোমুখি হয়েছে সে আর কখনো উঠে দাঁড়াতে পারেনি। তার পুনরুত্থান ও নব জীবন লাভ সম্ভব নয়।

দুই ঃ ধ্বংস হয়ে যাবার পর আবার তার এই দুনিয়ায় ফিরে আসা এবং পুনরায় পরীক্ষার সুযোগ লাভ করা তার পক্ষে অসম্ভব। এরপর তো আল্লাহর আদালতেই তার শুনানি হবে।

তিন ঃ যে জাতির অন্যায় আচরণ, ব্যভিচার, বাড়াবাড়ি ও সত্যের পথ নির্দেশনা থেকে দিনের পর দিন মুখ ফিরিয়ে নেয়া এত বেশী বেড়ে যায় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে

তাকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, তাকে আবার ফিরে আসার ও তাওবা করার সুযোগ দেয়া হয় না। গোমরাহী থেকে হেদায়াতের দিকে ফিরে আসা তার পক্ষে আর সম্ভব হতে পারে না।

৯৩. ইয়াজুজ ও মাজুজের ব্যাখ্যা সূরা কাহাফের ৬২ ও ৬৯ টীকায় করা হয়েছে। তাদেরকে খুলে দেয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে, তারা দুনিয়ার ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে যেমন মনে হবে কোনো হিংস্র পশুকে হঠাৎ খাঁচা বা বন্ধন মুক্ত করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। "সত্য ওয়াদা পুরা হবার সময় কাছে এসে যাবে" এর মধ্যে পরিষ্কার এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, ইয়াজুজ ও মাজুজের এ বিশ্বব্যাপী আক্রমণ শেষ জামানায় হবে এবং এর পর দ্রুত কিয়ামত এসে যাবে। এ অর্থকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তিটিও আরো বেশী সুস্পষ্ট করে দেবে যা ইমাম মুসলিম হুযাইফা ইবনে আসীদিল গিফারী থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছেঃ "কিয়ামত হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা তার মধ্য থেকে দশটি আলামত দেখে নেবে ঃ ধোঁয়া, দাজ্জাল, মাটির পোকা, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, ঈসা ইবনে মারয়ামের অবতরণ, ইয়াজুজ মাজুজের আক্রমণ, তিনটি বৃহত্তম ভূমি ধ্বস (Land slide) একটি পূর্বে, অন্যটি পশ্চিমে ও তৃতীয়টি আরব উপদ্বীপে এবং সব শেষে ইয়ামন থেকে একটি ভয়াবহ আগুন উঠবে যা লোকদেরকে হাশরের ময়দানের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে (অর্থাৎ এরপর কিয়ামত এসে যাবে।) অন্য এক হাদীসে ইয়াজুজ মাজুজের উল্লেখ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে সময় কিয়ামত এত বেশী নিকটবর্তী হবে যেন পূর্ণ গর্ভবর্তী মহিলা বলতে পারছে না কখন তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে যাবে, রাতে বা দিনে যে কোনো সময় (كالحامل المتم لايدرى اهلها متى تفجؤهم بولدها ليلا او نهارا) কিন্তু কুরআন মজীদ ও হাদীসসমূহে ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তা থেকে একথা পরিষ্কার হয় না যে, এরা দুয়ে মিলে একজোট হয়ে একসাথে দুনিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। হতে পারে কিয়ামতের নিকটতর যুগে এরা দুয়ে পারস্পরিক লড়াইয়ে লিপ্ত হবে এবং তারপর এদের লড়াই একটি বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ের কারণ হবে।

৯৪. গাফলতির মধ্যে তবুও এক ধরনের ওজর পাওয়া যায়। তাই তারা নিজেদের গাফলতি বর্ণনা করার পর আবার নিজেরাই পরিষ্কার স্বীকার করবে, নবীগণ এসে আমাদের এ দিনটি সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছিলেন, কাজেই মূলত আমরা গাফেল ও বেখবর ছিলাম না বরং দোষী ও অপরাধী ছিলাম।

৯৫. হাদীসে বলা হয়েছে, এ আয়াতের ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনুয যাবারা আপত্তি করে বলেন যে, এভাবে তো কেবলমাত্র আমাদেরই মাবুদরা জাহান্নামে যাবে না বরং ঈসা, উযাইর ও ফেরেশতারাও জাহান্নামে যাবে, কারণ দুনিয়ায় তাদেরও ইবাদাত করা হয়। এর জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

كل من احب ان يعبد من دون الله فهو مع من عبده

"হাঁ, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজে একথা পছন্দ করে যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার বন্দেগী করা হোক সে তাদেরই সাথে হবে যারা তার বন্দেগী করেছে।"

لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ؕ وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ لَهُمْ
فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا
الْحُسْنٰٓى ۙ اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ۝ لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمْ فِيْ
مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ۝ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ
وَتَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۝

যদি তারা সত্যিই আল্লাহ হতো, তাহলে সেখানে যেতো না। এখন সবাইকে চিরদিন তারই মধ্যে থাকতে হবে। সেখানে তারা হাঁসফাঁস করতে থাকবে[৯৬] এবং তাদের অবস্থা এমন হবে যে, তারা কোনো কথা শুনতে পাবে না। তবে যাদের ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে পূর্বাহ্নেই কল্যাণের ফায়সালা হয়ে গিয়েছে তাদেরকে অবশ্যি এ থেকে দূরে রাখা হবে,[৯৭] তার সামান্যতম খস্‌খসানিও তারা শুনবে না এবং তারা চিরকাল নিজেদের মনমতো জিনিসের মধ্যে অবস্থান করবে। সেই চরম ভীতিকর অবস্থা তাদেরকে একটুও পেরেশান করবে না[৯৮] এবং ফেরেশতারা এগিয়ে এসে তাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাবে এই বলে, "এ তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হতো।"

এ থেকে জানা যায়, যারা দুনিয়ায় মানুষকে আল্লাহর বন্দেগী করার শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং লোকেরা তাদেরকেই উপাস্যে পরিণত করে অথবা যারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেখবর যে, দুনিয়ায় তাদের বন্দেগী ও পূজা করা হচ্ছে এবং এ কর্মে তাদের ইচ্ছা ও আকাংখার কোনো দখল নেই, তাদের জাহান্নামে যাবার কোনো কারণ নেই। কারণ, তারা এ শিরকের জন্য দায়ী নয়। তবে যারা নিজেরাই উপাস্য ও পূজনীয় হবার চেষ্টা করে এবং মানুষের এ শিরকে যাদের সত্যি সত্যিই দখল আছে তারা সবাই নিজেদের পূজারী ও উপাসকদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অনুরূপভাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে মাবুদ হিসেবে দাঁড় করায় তারাও জাহান্নামে যাবে। কারণ, এ অবস্থায় তারাই মুশরিকদের আসল মাবুদ হিসেবে গণ্য হবে, এ দুর্বৃত্তরা বাহ্যত যাদেরকে মাবুদ হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল তারা নয়। শয়তানও এর আওতায় এসে যায়। কারণ, তার উদ্যোগে যেসব সত্তাকে উপাস্যে পরিণত করা হয় আসল উপাস্য তারা হয় না। বরং আসল উপাস্য হয় শয়তান নিজেই। কারণ, তার হুকুমের আনুগত্য করে এ কাজটি করা হয়। এ ছাড়াও পাথর, কাঠের মূর্তি ও অন্যান্য পূজা সামগ্রীও মুশরিকদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে, যাতে তারা তাদের ওপর জাহান্নামের আগুন আরো বেশী করে জ্বালিয়ে দিতে সাহায্য করে। যাদের ব্যাপারে তারা আশা পোষণ করছিল যে, তারা তাদের

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ؕ كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ
خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ؕ وَعْدًا عَلَيْنَا ؕ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿١٠٤﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى
الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ ﴿١٠٥﴾
اِنَّ فِىْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ﴿١٠٦﴾ ؕ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً
لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

সেদিন, যখন আকাশকে আমি এমনভাবে গুটিয়ে ফেলবো যেমন বাণ্ডিলের মধ্যে গুটিয়ে রাখা হয় লিখিত কাগজ, যেভাবে আমি প্রথমে সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম ঠিক তেমনিভাবে আবার তার পুনরাবৃত্তি করবো, এ একটি প্রতিশ্রুতি, যা আমার দায়িত্বের অন্তরভুক্ত এবং এ কাজ আমাকে অবশ্যই করতে হবে। আর যবুরে আমি উপদেশের পর একথা লিখে দিয়েছি যে, যমীনের উত্তরাধিকারী হবে আমার নেক বান্দারা। এর মধ্যে একটি বড় খবর আছে ইবাদাতকারী লোকদের জন্য।[৯৯]

হে মুহাম্মাদ! আমি যে তোমাকে পাঠিয়েছি, এটা আসলে দুনিয়াবাসীদের জন্য আমার রহমত।[১০০]

সুপারিশকারী হবে, তারা উলটো তাদের আযাব কঠোরতর করার কারণে পরিণত হয়েছে দেখে তাদের কষ্ট আরো বেড়ে যাবে।

৯৬. মূলে زَفِيْر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ভয়ংকর গরম, পরিশ্রম ও ক্লান্তিকর অবস্থায় মানুষ যখন টানা টানা শ্বাস নিয়ে তাকে সাপের ফোঁসফোঁসানীর মতো করে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে বের করে তখন তাকে "যাফীর" বলা হয়।

৯৭. এখানে এমন সব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা দুনিয়ায় নেকী ও সৌভাগ্যের পথ অবলম্বন করেছে। এ ধরনের লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ পূর্বাহ্নে ওয়াদা করেছেন যে, তারা এর আযাব থেকে সংরক্ষিত থাকবে এবং তাদেরকে নাজাত দেয়া হবে।

৯৮. অর্থাৎ হাশরের দিন এবং আল্লাহর সামনে হাজির হবার সময়, যা সাধারণ লোকদের জন্য হবে চরম ভীতি ও পেরেশানীর সময়, নেকলোকেরা সে সময় একটি মানসিক নিশ্চিন্ততার মধ্যে অবস্থান করবে। কারণ, সবকিছু ঘটতে থাকবে তাদের আশা-আকাংখা ও কামনা-বাসনা অনুযায়ী। ঈমান ও সৎকাজের যে পুঁজি নিয়ে তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিল তা সে সময় পর্যন্ত আল্লাহর মেহেরবানীতে তাদের মানোবল দৃঢ় করবে এবং ভয় ও দুঃখের পরিবর্তে তাদের মনে এ আশার সঞ্চার করবে যে, শীঘ্রই তারা নিজেদের প্রচেষ্টা ও তৎপরতার সুফল লাভ করবে।

৯৯. এ আয়াতের অর্থ অনুধাবন করতে অনেকে ভীষণভাবে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। তারা এর এমন একটি অর্থ বের করে নিয়েছেন যা সমগ্র কুরআনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়ায় এবং দীনের সমগ্র ব্যবস্থাটিকেই শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলে দেয়। তারা আয়াতের অর্থ এভাবে করেন যে, দুনিয়ার বর্তমান জীবনে যমীনের উত্তরাধিকার (অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনা ও শাসন এবং পৃথিবীর বস্তু সম্পদ ও উপকরণাদির ভোগ-ব্যবহার) শুধুমাত্র সৎলোকেরাই লাভ করে থাকে এবং তাদেরকেই আল্লাহ এ নিয়ামত দান করেন। তারপর এ সার্বিক নিয়ম থেকে তারা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান যে, সৎ ও অসতের মধ্যকার ফারাক ও পার্থক্যের মানদণ্ড হচ্ছে এ পৃথিবীর উত্তরাধিকার । যে এ উত্তরাধিকার লাভ করে সে সৎ এবং যে এ থেকে বঞ্চিত হয় সে অসৎ। এরপর তারা সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে দুনিয়ায় ইতিপূর্বে যেসব জাতি পৃথিবীর উত্তরাধিকার লাভ করেছিল এবং যারা আজ উত্তরাধিকারী হয়ে আছে তাদের প্রতি দৃষ্টি দেয়। এখানে কাফের, মুশরিক, নাস্তিক, দুষ্কৃতিকারী সবাই এ উত্তরাধিকার আগেও লাভ করেছে এবং আজো লাভ করছে। কুরআন যেসব গুণকে কুফরী, ফাসেকী, দুষ্কৃতি, পাপ ও অসৎ বলে চিহ্নিত করেছে যেসব জাতির মধ্যে সেগুলো পাওয়া গেছে এবং আজো পাওয়া যাচ্ছে তারা এ উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়নি বরং এটি তাদেরকে দান করা হয়েছে এবং আজো দান করা হচ্ছে। ফেরাউন, নমরূদ থেকে শুরু করে এ যুগের কম্যুনিষ্ট শাসকরা পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক লোক প্রকাশ্যে আল্লাহকে অস্বীকার করে, আল্লাহর বিরোধিতা করে বরং আল্লাহর প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে এবং এর পরেও তারা যমীনের উত্তরাধিকার লাভ করেছে। এ চিত্র দেখে তারা এ মত পোষণ করেন যে, কুরআন বর্ণিত সার্বিক নিয়ম তো ভুল হতে পারে না। কাজেই ভুল যা কিছু তা এ "সৎ" শব্দটির অর্থের মধ্যে রয়ে গেছে। অর্থাৎ মুসলমানরা এ পর্যন্ত "সালেহ" বা "সৎ" শব্দটির যে অর্থ গ্রহণ করে এসেছে তা সম্পূর্ণ ভুল। তাই তারা সৎ শব্দটির একটি নতুন সংজ্ঞা তালাশ করছেন। এ শব্দটির এমন একটি অর্থ তারা চাচ্ছেন যার পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর উত্তরাধিকার লাভকারী সকল ব্যক্তি সমানভাবে "সৎ" গণ্য হতে পারে। তিনি আবু বকর সিদ্দীক ও উমর ফারুক অথবা চেংগীস ও হালাকু যে কেউ হতে পারেন। এ নতুন অর্থ সন্ধান করার ক্ষেত্রে ডারউইনের ক্রমবিবর্তন মতবাদ তাদেরকে সাহায্য করে। ফলে তারা কুরআনের "সৎ" (صلاح)-এর মতবাদকে ডারউইনী "যোগ্যতা" বা Fitness (صلاحیت)-এর মতবাদের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন।

এ সংশ্লিষ্ট তাফসীরের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এই ঃ যে ব্যক্তি বা দল দেশ জয় করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করে, তার ওপর শাসন কর্তৃত্ব চালাবার এবং পৃথিবীর বস্তু সম্পদ ও জীবন যাপনের উপকরণাদি সাফল্যের সাথে ব্যবহার করার যোগ্যতা রাখে সে-ই হচ্ছে "আল্লাহর সৎ বান্দা।" তার এ কর্ম সমস্ত "ইবাদাত গুজার" মানব সমাজের জন্য এমন একটি বাণী যাতে বলা হয়েছে, এ ব্যক্তি ও দল যে কাজটি করছে সেটিই "ইবাদাত"। তোমরা যদি এ ইবাদাত না করো এবং পরিণামে পৃথিবীর উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত থেকে যাও তাহলে তোমাদেরকে "সৎলোক"দের মধ্যে গণ্য করা হবে না এবং তোমাদেরকে আল্লাহর ইবাদাত গুজার বান্দাও বলা যেতে পারে না।

এ অর্থ গ্রহণ করার পর এদের সামনে প্রশ্ন দেখা দিল যে, যদি "সততা" ও "ইবাদাতের" সংজ্ঞা এই হয়ে থাকে তাহলে ঈমান (আল্লাহর প্রতি ঈমান, আখেরাতের প্রতি ঈমান,

রসূলের প্রতি ঈমান ও কিতাবের প্রতি ঈমান) এর অর্থ কি ? ঈমান ছাড়া তো স্বয়ং এ কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর কাছে কোনো সৎকাজ গ্রহণযোগ্য নয়। আর তাছাড়া এরপর কুরআনের এ দাওয়াতের কি অর্থ হবে যেখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর রসূলের মাধ্যমে যে নৈতিক ব্যবস্থা ও জীবন বিধান পাঠিয়েছেন তার আনুগত্য করো ? আবার বারবার কুরআনের একথা বলার অর্থই বা কি যে, রসূলকে যে মানে না এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের যে আনুগত্য করে না সে কাফের, ফাসেক, শাস্তিলাভের অধিকারী এবং আল্লাহর দরবারে ঘৃণিত অপরাধী ? এ প্রশ্নগুলো এমন পর্যায়ের ছিল যে, এরা যদি ঈমানদারীর সাথে এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন তাহলে অনুভব করতেন যে, এ আয়াতের অর্থ অনুধাবন করার এবং সততার একটি নতুন ধারণা সৃষ্টি করার ব্যাপারে তারা ভুল করছেন। কিন্তু তারা নিজেদের ভুল অনুভব করার পরিবর্তে অত্যন্ত দুঃসাহসের সাথে ঈমান, ইসলাম, তাওহীদ, আখেরাত, রিসালাত প্রত্যেকটি জিনিসের অর্থ বদলে দিয়েছেন। শুধুমাত্র এ সবগুলোকে তাদের একটি আয়াতের ব্যাখ্যার সাথে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য। একটিমাত্র জিনিসকে সঠিকভাবে বসাবার জন্য তারা কুরআনের সমস্ত শিক্ষাকে ওলট-পালট করে দিয়েছেন। এর ওপর আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যারা তাদের এ "দীনের মেরামতি"র বিরোধী তাদের বিরুদ্ধে তারা উলটো অভিযোগ আনছেন এই বলে যে, "নিজেরা পরিবর্তিত না হয়ে করছেন কুরআনের পরিবর্তন।" এটি আসলে বস্তুগত উন্নয়নেচ্ছার বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিছু লোক মারাত্মকভাবে এ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এ জন্য তারা কুরআনের অর্থ বিকৃত করতেও দ্বিধা করছেন না।

তাদের এ ব্যাখ্যার প্রথম মৌলিক ভুলটি হচ্ছে এই যে, তারা কুরআনের একটি আয়াতের এমন একটি ব্যাখ্যা করছেন যা কুরআনের সামগ্রিক শিক্ষার বিরোধী। অথচ নীতিগতভাবে কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াতের এমন ব্যাখ্যাই সঠিক হতে পারে যা তার অন্যান্য বর্ণনা ও তার সামগ্রিক চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়। যে ব্যক্তি কুরআনকে অন্তত একবারও বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছেন তিনি একথা না জেনে পারেন না যে, কুরআন যে জিনিসকে নেকী, তা'কওয়া ও কল্যাণ বলছে তা "বস্তুগত উন্নতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতার" সমার্থক নয়। আর "সৎ"-কে যদি "যোগ্যতা সম্পন্ন"-এর অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে এ একটি আয়াত সমগ্র কুরআনের বিরোধী হয়ে ওঠে।

তাদের এ ভুলের দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে এই যে, তারা একটি আয়াতকে তার প্রেক্ষাপট ও পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে আলাদা করে নিয়ে নির্দ্বিধায় ইচ্ছামতো যে কোনো অর্থ তার শব্দাবলী থেকে বের করে নিচ্ছেন। অথচ প্রত্যেকটি আয়াতের সঠিক অর্থ কেবলমাত্র সেটিই হতে পারে যা তার পূর্বাপর সম্পর্কের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। যদি এ ভুলটি তারা না করতেন তাহলে সহজেই দেখতে পেতেন যে, উপর থেকে ধারাবাহিকভাবে যে বিষয়বস্তু চলে আসছে সেখানে আখেরাতের জীবনে সৎকর্মশীল মু'মিন এবং কাফের ও মুশরিকদের পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। এ বিষয়বস্তুর মধ্যে আকস্মিকভাবে দুনিয়ায় যমীনের উত্তরাধিকার ব্যবস্থা কোন্ নিয়মের ভিত্তিতে চলছে একথা বলার সুযোগ কোথায় পাওয়া গেলো ?

কুরআন ব্যাখ্যার সঠিক নীতি অনুসরণ করলে দেখা যাবে আয়াতের অর্থ পরিষ্কার। অর্থাৎ এর আগের আয়াতে যে দ্বিতীয়বার সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে সে সৃষ্টিকালে যমীনের

উত্তরাধিকারী হবে শুধুমাত্র সৎকর্মশীল লোকেরা। সেই চিরন্তন জীবনের ব্যবস্থাপনায় বর্তমানের সাময়িক জীবন ব্যবস্থার অবস্থা বিরাজিত থাকবে না। এখানে বর্তমানে জীবন ব্যবস্থায় তো যমীনে জালেম ও ফাসেকদেরও রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় কিন্তু সেখানে তা হবে না। সূরা মু'মিনূনের ৪-১১ আয়াতে এ বিষয়বস্তুই আলোচিত হয়েছে। এর চাইতেও পরিষ্কার ভাষায় সূরা যুমারের শেষে বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ কিয়ামত এবং প্রথম সিংগাধ্বনি ও দ্বিতীয় সিংগাধ্বনির কথা বলার পর নিজের ন্যায় বিচারের উল্লেখ করেছেন এবং তারপর কুফরীর পরিণাম বর্ণনা করে সৎলোকদের পরিণাম এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ط حَتّٰى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ○ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ج فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ○ ـ الزمر : ٧٣-٧٤

"আর যারা নিজেদের রবের ভয়ে তাকওয়া অবলম্বন করেছিল তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে যখন তারা সেখানে পৌঁছে যাবে, তাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে এবং তার ব্যবস্থাপক তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা খুব ভালো থেকেছো, এখন এসো, এর মধ্যে চিরকাল থাকার জন্য প্রবেশ করো। আর তারা বলবে ঃ প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদের সাথে তার ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদের যমীনের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন। আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা নিজেদের জায়গা তৈরি করে নিতে পারি। কাজেই সর্বোত্তম প্রতিদান হচ্ছে সৎকর্মশীলদের জন্য।" (যুমার ঃ ৭৩-৭৪)

দেখুন এ দু'টি আয়াত একই বিষয় বর্ণনা করছে এবং দু'জায়গায়ই যমীনের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক পরকালীন জগতের সাথে প্রতিষ্ঠিত, ইহকালীন জগতের সাথে নয়।

এখন যবুরের প্রসংগে আসা যাক। আলোচ্য আয়াতে এর বরাত দেয়া হয়েছে। যদিও আমাদের পক্ষে একথা বলা কঠিন যে, বাইবেলের পুরাতন নিয়মে যবুর নামে যে পুস্তকটি বর্তমানে পাওয়া যায় তা তার আসল অবিকৃত অবস্থায় আছে কি নেই। কারণ, এখানে দাউদের গীতের মধ্যে অন্য লোকদের গীতও মিশে একাকার হয়ে গেছে এবং মূল যবুরের কপি কোথাও নেই। তবুও যে যবুর বর্তমানে আছে সেখানেও নেকী, সততা, সত্যনিষ্ঠা ও আল্লাহ নির্ভরতার উপদেশ দেয়ার পর বলা হচ্ছে ঃ

"কারণ দুরাচারগণ উচ্ছিন্ন হইবে, কিন্তু যাহারা সদাপ্রভুর অপেক্ষা করে, তাহারাই দেশের অধিকারী হইবে। আর ক্ষণকাল, পরে দুষ্টলোক আর নাই, তুমি তাহার স্থান তত্ব করিবে, কিন্তু সে আর নাই। কিন্তু মৃদুশীলেরা দেশের অধিকারী হইবে এবং শান্তির বাহুল্যে আমোদ করিবে। ..... তাহাদের অধিকার চিরকাল থাকিবে। ..... ধার্মিকেরা দেশের অধিকারী হইবে, তাহারা নিয়ত তথায় বাস করিবে।" (দাউদের সংগীত ৩৭ ঃ ৯, ১০, ১১, ১৮, ২৯

দেখুন এখানে ধার্মিকদের জন্য যমীনের চিরন্তন উত্তরাধিকারের কথা বলা হয়েছে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, আসমানী কিতাবগুলোর দৃষ্টিতে "খুলূদ", "তথা চির অবস্থান" ও চিরন্তন জীবন আখেরাতেই হয়ে থাকে, এ দুনিয়ায় নয়।

দুনিয়ায় যমীনের সাময়িক উত্তরাধিকার যে নিয়মে বণ্টিত হয় তাকে সূরা আ'রাফে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ

"যমীনের মালিক আল্লাহ, নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন।" (১২৮ আয়াত)

আল্লাহর ইচ্ছার আওতায় মু'মিন ও কাফের, সৎ ও অসৎ এবং হুকুম পালনকারী ও হুকুম অমান্যকারী নির্বিশেষে সবাই এর উত্তরাধিকার লাভ করে। কর্মফল হিসেবে তারা এটা লাভ করে না বরং লাভ করে পরীক্ষা হিসেবে। যেমন এ আয়াতের পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۝

"অতঃ তিনি তোমাদেরকে যমীনে খলীফা করবেন তারপর দেখবেন তোমরা কেমন কাজ করো।" (১২৯ আয়াত)

এ উত্তরাধিকার চিরন্তন নয় এটি নিছক একটি পরীক্ষার ব্যাপার। আল্লাহর একটি নিয়মের আওতায় দুনিয়ায় বিভিন্ন জাতিকে পালাক্রমে এ পরীক্ষায় ফেলা হয়। বিপরীতপক্ষে আখেরাতে এ যমীনেরই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হবে এবং কুরআনের বিভিন্ন সুস্পষ্ট উক্তির আলোকে তা যে নিয়মের ভিত্তিতে হবে তা হচ্ছে এই যে, "যমীনের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তিনি নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে একমাত্র সৎকর্মশীল মু'মিনদেরকে এর উত্তরাধিকারী করবেন। পরীক্ষা করার জন্য নয় বরং দুনিয়ায় তারা যে সৎ প্রবণতা অবলম্বন করেছিল তার চিরন্তন প্রতিদান হিসেবে" (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূর, ৮৩ টীকা)।

১০০. এর আর একটি অনুবাদ হতে পারে, "আমি তোমাকে দুনিয়াবাসীদের জন্য রহমতে পরিণত করেই পাঠিয়েছি।" উভয় অবস্থায়ই এর অর্থ হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন আসলে মানব জাতির জন্য আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ। কারণ, তিনি এসে গাফলতিতে ডুবে থাকা দুনিয়াকে জাগিয়ে দিয়েছেন তাকে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে ফারাক করার জ্ঞান দিয়েছেন। দ্বিধাহীন ও সংশয় বিমুক্ত পদ্ধতিতে তাকে জানিয়ে দিয়েছেন, তার জন্য ধ্বংসের পথ কোন্‌টি এবং শান্তি ও নিরাপত্তার পথ কোন্‌টি। মক্কার কাফেররা নবীর (সা) আগমনকে তাদের জন্য বিপদ ও দুঃখের কারণ মনে করতো। তারা বলতো, এ ব্যক্তি আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, নখ থেকে গোশত আলাদা করে রেখে দিয়েছে। তাদের একথার জবাবে বলা হয়েছে ঃ অজ্ঞের দল! তোমরা যাকে দুঃখ ও কষ্ট মনে করো তা আসলে তোমাদের জন্য আল্লাহর রহমত।

قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنتُم
مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِي
أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ
وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ
إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١١﴾ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ
الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾

এদেরকে বলো, "আমার কাছে যে অহী আসে তা হচ্ছে এই যে, কেবলমাত্র এক ইলাহই তোমাদের ইলাহ, তারপর কি তোমরা আনুগত্যের শির নত করছো ?" যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বলে দাও, "আমি সোচ্চার কণ্ঠে তোমাদের জানিয়ে দিয়েছি। এখন আমি জানি না, তোমাদের সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করা হচ্ছে[১০১] তা আসন্ন, না দূরবর্তী।" আল্লাহ সে কথাও জানেন যা সোচ্চার কণ্ঠে বলা হয় এবং তাও যা তোমরা গোপনে করো।[১০২] আমিতো মনে করি, হয়তো এটা (বিলম্ব) তোমাদের জন্য এটা পরীক্ষা[১০৩] এবং একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত তোমাদের জীবন উপভোগ করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে।

(শেষে) রসূল বললো ঃ "হে আমার রব! তুমি ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করে দাও। আর হে লোকেরা ! তোমরা যেসব কথা তৈরি করছো তার মুকাবিলায় আমাদের দয়াময় রবই আমাদের সাহায্যকারী সহায়ক।"

১০১. অর্থাৎ আল্লাহর পাকড়াও। রিসালাতের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার কারণে যে কোনো ধরনের আযাবের আকারে আল্লাহর যে পাকড়াও আসবে।

১০২. সূরার শুরুতে যেসব বিরোধিতাপূর্ণ কথা, ষড়যন্ত্র ও নীরব কানাকানির কথা বলা হয়েছিল সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। সেখানেও রসূলের মুখ দিয়ে এদের এ জবাব দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা যেসব কথা বলছো সেগুলো সবই আল্লাহ শুনছেন এবং তিনি সেগুলো জানেন। অর্থাৎ এমন মনে করো না যে, এসব বাতাসে উড়ে গেছে এবং এসবের জন্য আর কখনো জবাবদিহি করতে হবে না।

১০৩. অর্থাৎ এ বিলম্বের কারণে তোমরা পরীক্ষার মুখোমুখী হয়েছো। তোমাদের সামলে ওঠার জন্য যথেষ্ট অবকাশ দেবার এবং দ্রুততা অবলম্বন করে সংগে সংগেই

পাকড়াও না করার উদ্দেশ্যে বিলম্ব করা হচ্ছে। কিন্তু এর ফলে তোমরা বিভ্রান্তির শিকার হয়ে গেছো। তোমরা মনে করছো, নবীর সব কথা মিথ্যা। নয়তো ইনি যদি সত্য নবীই হতেন এবং যথার্থ আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসতেন, তাহলে একে মিথ্যা বলার ও অমান্য করার পর আমরা কবেই পাকড়াও হয়ে যেতাম।

আল হাজ্জ

২২

নামকরণ

চতুর্থ রুকূ'র দ্বিতীয় আয়াত وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরায় মক্কী ও মাদানী সূরার বৈশিষ্ট মিলেমিশে আছে। এ কারণে মুফাস্‌সিরগণের মাঝে এর মক্কী বা মাদানী হওয়া নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু আমার মতে এর একটি অংশ মক্কী যুগের শেষের দিকে এবং অন্য অংশটি মাদানী যুগের প্রথম দিকে নাযিল হবার কারণে এর বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগীতে এ বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে। এজন্য উভয় যুগের বৈশিষ্ট এর মধ্যে একক হয়ে গেছে।

গোড়ার দিকের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, এটি মক্কায় নাযিল হয়েছে। এ ব্যাপারে বেশী নিশ্চয়তার সাথে বলা যেতে পারে যে, এ অংশটি মক্কী জীবনের শেষ যুগে হিজরতের কিছু পূর্বে নাযিল হয়েছে। এ অংশটি ২৪ আয়াত وَهُدُوْٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوْٓا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ-এ এসে শেষ হয়ে গেছে।

এরপর اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ থেকে হঠাৎ বিষয়বস্তুর প্রকৃতি পাল্টে গেছে এবং পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, এখান থেকে শেষ পর্যন্তকার অংশটি মদীনা তাইয়েবায় নাযিল হয়েছে। এ অংশটি যে, হিজরতের পর প্রথম বছরেই যিলহজ্জ মাসে নাযিল হয়েছে তা মনে করাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কারণ, ২৫ থেকে ৪১ আয়াত পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে তা একথাই নির্দেশ করে এবং ৩৯-৪০ আয়াতের শানেনুযুল তথা নাযিলের কার্যকারণও এর প্রতি সমর্থন দেয়। সে সময় মুহাজিররা সবেমাত্র নিজেদের জন্মভূমি ও বাড়িঘর ছেড়ে মদীনায় এসেছিলেন। হজ্জের সময় তাদের নিজেদের শহর ও হজ্জের সমাবেশের কথা মনে পড়ে থাকতে পারে। কুরাইশ মুশরিকরা যে তাদের মসজিদে হারামে যাবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে একথা তাদের মনকে মারাত্মকভাবে তোলপাড় করে থাকবে। যে অত্যাচারী কুরাইশ গোষ্ঠী ইতিপূর্বে তাদেরকে নিজেদের ঘর থেকে বের করে দিয়েছে, মসজিদে হারামের যিয়ারত থেকে বঞ্চিত করেছে এবং আল্লাহর পথ অবলম্বন করার জন্য তাদের জীবন পর্যন্ত দুর্বিসহ করে তুলেছে, তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানরা হয়তো যুদ্ধ করারও অনুমতি পাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। এ ছিল এ আয়াতগুলোর নাযিলের যথার্থ মনস্তাত্বিক পটভূমি। এখানে প্রথমে হজ্জের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, দুনিয়ায় একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করার জন্য মসজিদে হারাম নির্মাণ এবং হজ্জের পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছিল। কিন্তু আজ সেখানে

শিরক করা হচ্ছে এবং এক আল্লাহর ইবাদাতকারীদের জন্য তার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এরপর এ দুরাচারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং এদেরকে বেদখল করে দেশে এমন একটি কল্যাণমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুসলমানদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে যেখানে অসৎবৃত্তি প্রদমিত ও সৎবৃত্তি বিকশিত হবে। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, উরওয়াহ ইবনে যুবাইর, যায়েদ ইবনে আসলাম, মুকাতিল ইবনে হাইয়ান, কাতাদাহ ও অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণের মতে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দান সম্পর্কিত এটিই প্রথম আয়াত। অন্যদিকে হাদীস ও সীরাতের বর্ণনাসমূহ থেকে প্রমাণ হয়, এ অনুমতির পরপরই করাইশদের বিরুদ্ধে বাস্তব কর্মতৎপরতা শুরু করা হয় এবং দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে লোহিত সাগরের দিকে প্রথম অভিযান পরিচালনা করা হয়। এটি দাওয়ান যুদ্ধ বা আবওয়া যুদ্ধ নামে পরিচিত।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য

এ সূরায় তিনটি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে ঃ মক্কার মুশরিক সমাজ, দ্বিধাগ্রস্ত ও দোটানায় পড়ে থাকা মুসলিমগণ এবং আপোষহীন সত্যনিষ্ঠ মু'মিন সমাজ।

মুশরিকদেরকে সম্বোধন করার পর্বটি মক্কায় শুরু হয়েছে এবং মদীনায় এর সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। এ সম্বোধনের মাধ্যমে তাদেরকে বজ্রকণ্ঠে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা হঠকারিতা ও জিদের বশবর্তী হয়ে নিজেদের ভিত্তিহীন জাহেলী চিন্তাধারার ওপর জোর দিয়েছো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব মাবুদদের ওপর ভরসা করেছো যাদের কাছে কোনো শক্তি নেই এবং আল্লাহর রসূলকে মিথ্যা বলেছো। এখন তোমাদের পূর্বে এ নীতি অবলম্বনকারীরা যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে তোমাদেরও অনিবার্যভাবে সে একই পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। নবীকে অমান্য করে এবং নিজের জাতির সবচেয়ে সৎলোকদেরকে জুলুম নিপীড়নের শিকারে পরিণত করে তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করেছো। এর ফলে তোমাদের ওপর আল্লাহর যে গযব নাযিল হবে তা থেকে তোমাদের বানোয়াট উপাস্যরা তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না। এ সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের সাথে সাথে বুঝাবার ও উপলব্ধি করাবার কাজও চলছে। সমগ্র সূরার বিভিন্ন জায়গায় স্মরণ করিয়ে দেয়া ও উপদেশ প্রদানের কাজও চলেছে। এ সংগে শিরকের বিরুদ্ধে এবং তাওহীদ ও আখেরাতের পক্ষে শক্তিশালী যুক্তি প্রমাণও পেশ করা হয়েছে।

দ্বিধান্বিত মুসলমানরা, যারা আল্লাহর বন্দেগী গ্রহণ করেছিল ঠিকই কিন্তু তাঁর পথে কোনো প্রকার বিপদের মুকাবিলা করতে রাজি ছিল না, তাদেরকে সম্বোধন করে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা ও ধমক দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, এটা কেমন ঈমান ! আরাম, আয়েশ, আনন্দ ও সুখ লাভ হলে তখন আল্লাহ তোমাদের আল্লাহ থাকে এবং তোমরা তাঁর বান্দা থাকো, কিন্তু যখনই আল্লাহর পথে বিপদ আসে এবং কঠিন সংকটের মুকাবিলা করতে হয় তখনই আল্লাহ আর তোমাদের আল্লাহ থাকে না এবং তোমরাও তাঁর বান্দা থাকো না। অথচ নিজেদের এ নীতি ও কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে তোমরা এমন কোনো বিপদ, ক্ষতি ও কষ্টের হাত থেকে রেহাই পেতে পারবে না, যা আল্লাহ তোমাদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন।

ঈমানদারদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করা হয়েছে দু'টি পদ্ধতিতে। একটি ভাষণে সম্বোধন এমনভাবে করা হয়েছে যার লক্ষ তারা নিজেরাও এবং এ সংগে আরবের সাধারণ জনসমাজও। আর দ্বিতীয় ভাষণটির লক্ষ কেবলমাত্র মু'মিনগণ।

প্রথম ভাষণে মক্কার মুশরিকদের মনোভাব ও কর্মনীতির সমালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে তারা মুসলমানদের জন্য মসজিদে হারামের পথ বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ মসজিদে হারাম তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। কাজেই কাউকে হজ্জ করার পথে বাধা দেবার অধিকার তাদের নেই। এ আপত্তি শুধু যে, যথার্থই ছিল তাই নয় বরং রাজনৈতিক দিক দিয়ে এটি কুরাইশদের বিরুদ্ধে একটি বৃহত্তম অস্ত্রও ছিল। এর মাধ্যমে আরবের অন্যান্য সকল গোত্রের মনে এ প্রশ্ন সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে যে, কুরাইশরা হারাম শরীফের খাদেম, না মালিক ? আজ যদি তারা নিজেদের ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে একটি দলকে হজ্জ করতে বাধা দেয় এবং তাদের এ পদক্ষেপকে মেনে নেয়া হয়, তাহলে কালকেই যে, তারা যার সাথে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে তাকে হারাম শরীফের সীমানায় প্রবেশ করতে বাধা দেবে না এবং তার উমরাহ ও হজ্জ বন্ধ করে দেবে না তার নিশ্চয়তা কোথায় ? এ প্রসংগে মসজিদুল হারামের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে একদিকে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহর হুকুমে এ ঘরটি নির্মাণ করেছিলেন তখন সবাইকে এ ঘরে হজ্জ করার সাধারণ অনুমতি দিয়েছিলেন। প্রথম দিন থেকেই সেখানে স্থানীয় অধিবাসী ও বহিরাগতদের সমান অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। অন্যদিকে বলা হয়েছে, এ ঘরটি শিরক করার জন্য নয় বরং এক আল্লাহর বন্দেগী করার জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। অথচ কী ভয়ংকর কথা ! আজ সেখানে এক আল্লাহর বন্দেগী নিষিদ্ধ কিন্তু মূর্তি ও দেবদেবীর পূজার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

দ্বিতীয় ভাষণে মুসলমানদেরকে কুরাইশদের জুলুমের জবাবে শক্তি প্রয়োগ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ সংগে মুসলমানরা যখন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লাভ করবে তখন তাদের নীতি কি হবে এবং নিজেদের রাষ্ট্রে তাদের কি উদ্দেশ্যে কাজ করতে হবে একথাও তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়টি সূরার মাঝখানে আছে এবং শেষেও আছে। শেষে ঈমানদারদের দলের জন্য "মুসলিম" নামটির যথারীতি ঘোষণা দিয়ে বলা হয়েছে, তোমরাই হচ্ছো ইবরাহীমের আসল স্থলাভিষিক্ত। তোমরা দুনিয়ায় মানব জাতির সামনে সাক্ষদানকারীর স্থানে দাঁড়িয়ে আছো, এ দায়িত্ব পালন করার জন্য তোমাদেরকে বাছাই করে নেয়া হয়েছে। এখন তোমাদের নামায কায়েম, যাকাত দান ও সৎকাজ করে নিজেদের জীবনকে সর্বোত্তম আদর্শ জীবনে পরিণত করা এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হয়ে আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানো উচিত।

এ সুযোগে সূরা বাকারাহ ও সূরা আনফালের ভূমিকার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে ভালো হয়। এতে আলোচ্য বিষয় অনুধাবন করা বেশী সহজ হবে।

আয়াত ৭৮ **সূরা আল হাজ্জ–মাদানী** রুকূ' ১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ۝١
يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ
ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ
عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ۝٢

হে মানবজাতি! তোমাদের রবের গযব থেকে বাঁচো। আসলে কিয়ামতের প্রকম্পন বড়ই (ভয়ংকর) জিনিস।[১] যেদিন তোমরা তা দেখবে, অবস্থা এমন হবে যে, প্রত্যেক দুধদানকারিনী নিজের দুধের বাচ্চাকে ভুলে যাবে,[২] প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং মানুষকে তোমরা মাতাল দেখবে অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। আসলে আল্লাহর আযাবই হবে এমনি কঠিন।[৩]

১. এ প্রকম্পন হবে কিয়ামতের প্রাথমিক অবস্থার প্রকাশ। আর সম্ভবত এটা এমন সময় শুরু হবে যখন যমীন অকস্মাত উল্টে পড়তে শুরু করবে এবং সূর্য পূর্ব দিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। একথাই বর্ণনা করেছেন প্রাচীন তাফসীরকারদের মধ্য থেকে আলকামাহ ও শা'বী। তারা বলেছেন ঃ يكون ذلك عند طلوع الشمس من مغربها ইবনে জারীর, তাবারানী, ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে যে দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তা থেকে একথাটিই জানা যায়। সেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিনবার সিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। এক ফুঁক হবে "ফাযা" তথা ভীতি উৎপাদনকারী, দ্বিতীয় ফুঁক "সা'আক" তথা সংজ্ঞা লোপকারী বিকট গর্জন এবং তৃতীয় ফুঁক হবে "কিয়াম লি-রব্বিল আলামীন" অর্থাৎ রব্বুল আলামীনের সামনে হাজির হবার ফুঁক। প্রথম ফুঁকটি সাধারণ বিভীষিকার সৃষ্টি করবে এবং মানুষ হতভম্ভ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ফুঁকে সবাই মরে পড়ে যাবে। তৃতীয় ফুঁকের পর সবাই জীবিত হয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হবে। তারপর প্রথম ফুঁকের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করে তিনি বলেছেন, সে সময় পৃথিবীর অবস্থা হবে এমন একটি নৌকার মতো যা ঢেউয়ের আঘাতে টলমল করছে অথবা এমন ঝুলন্ত প্রদীপের মতো

যা বাতাসের ঝটকায় প্রচণ্ডভাবে দুলছে। সে সময় পৃথিবী পৃষ্ঠে বসতকারীরা যে অবস্থার সম্মুখীন হবে তার চিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অংকন করা হয়েছে। যেমন ঃ

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ○ وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ○ فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ○

"যখন সিংগায় এক ফুঁক দেয়া হবে এবং যমীন ও পাহাড় তুলে এক আঘাতে ভেঙে দেয়া হবে তখন সে বিরাট ঘটনাটি ঘটে যাবে।" (আল হা-ক্কাহ ১৩-১৫)

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ○ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ○ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا ○

"যখন পৃথিবীকে পুরোপুরি প্রকম্পিত করে দেয়া হবে এবং সে তার পেটের বোঝা বের করে ছুঁড়ে ফেলে দেবে আর মানুষ বলবে, এর কি হলো ?" (আয যিলযাল ১-৩)

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ○ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ○ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ○ اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ○

"যেদিন প্রকম্পনের একটি ঝট্‌কা একেবারে নাড়িয়ে দেবে এবং এরপর আসবে দ্বিতীয় ঝট্‌কা। সেদিন অন্তর কাঁপতে থাকবে এবং দৃষ্টি ভীতি বিহ্বল হবে।" (আন নাযিআত ৬-৯)

اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ○ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ○ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْبَثًّا ○

"যে দিন পৃথিবীকে মারাত্মকভাবে ঝাঁকিয়ে দেয়া হবে এবং পাহাড় গুড়ো গুড়ো হয়ে ধূলির মতো উড়তে থাকবে।" (আল ওয়াকিআহ, আয়াত ৪-৬)

فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ○ السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ ○

"যদি তোমরা নবীর কথা না মানো, তাহলে কেমন করে রক্ষা পাবে সেদিনের বিপদ থেকে, যা বাচ্চাদেরকে বুড়ো করে দেবে এবং যার প্রচণ্ডতায় আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে ?" (আল মুয্‌যাম্মিল, আয়াত ১৭-১৮)

যদিও কোনো কোনো মুফাস্‌সিরের মতে এ কম্পনটি হবে এমন সময়ে যখন মৃতরা জীবিত হয়ে নিজেদের রবের সামনে হাজির হবে, এবং এর সমর্থনে তাঁরা একাধিক হাদীসও উদ্ধৃত করেছেন তবুও কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা এ হাদীস গ্রহণ করার পথে বাধা। কুরআন এর যে সময় বর্ণনা করেছে তা হচ্ছে এমন এক সময় যখন মায়েরা শিশু সন্তানদের দুধ পান করাতে করাতে তাদেরকে ফেলে রেখে পালাতে থাকবে এবং

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ
مَّرِيْدٍ ۙ كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى
عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ
فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ
مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۭ وَنُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَاۗءُ اِلٰٓى
اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ۚ

কতক লোক এমন আছে যারা জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করে[৪] এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করতে থাকে। অথচ তার ভাগ্যেই তো এটা লেখা আছে যে, যে ব্যক্তি তার সাথে বন্ধুত্ব করবে তাকে সে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে এবং জাহান্নামের আযাবের পথ দেখিয়ে দেবে। হে লোকেরা ! যদি তোমাদের মৃত্যু পরের জীবনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে তোমরা জেনে রাখো, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে,[৫] তারপর রক্তপিণ্ড থেকে, তারপর গোশতের টুকরা থেকে, যা আকৃতি বিশিষ্টও হয় এবং আকৃতিহীনও।[৬] (এ আমি বলছি) তোমাদের কাছে সত্যকে সুস্পষ্ট করার জন্য। আমি যে শুক্রকে চাই একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত গর্ভাশয়ে স্থিত রাখি, তারপর একটি শিশুর আকারে তোমাদের বের করে আনি, (তারপর তোমাদের প্রতিপালন করি) যাতে তোমরা নিজেদের পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে যাও।

গর্ভবতীদের গর্ভপাত হয়ে যাবে। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, আখেরাতের জীবনে কোনো মহিলা তার শিশুকে দুধ পান করাবে না এবং কোনো গর্ভবতীর গর্ভপাত হবার কোনো সুযোগও সেখানে থাকবে না। কারণ, কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী সেখানে সবরকমের সম্পর্ক খতম হয়ে যাবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত মর্যাদা নিয়ে আল্লাহর সামনে হিসেব দিতে দাঁড়াবে। কাজেই আমি পূর্বেই যে হাদীস উদ্ধৃত করেছি সেটিই অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য। যদিও তার বর্ণনা পরম্পরা দুর্বল কিন্তু কুরআনের সমর্থন তার দুর্বলতা দূর করে দেয়। অন্যদিকে অন্যান্য হাদীসগুলো বর্ণনা পরম্পরার দিক দিয়ে বেশী শক্তিশালী হলেও কুরআনের বাহ্যিক বর্ণনার সাথে গরমিল থাকায় এগুলোকে দুর্বল করে দেয়।

২. আয়াতে مُضْغَةٌ এর পরিবর্তে مُضْغَةٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষার দিক দিয়ে উভয় শব্দের অর্থের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, مُضْغَةٌ অর্থ হচ্ছে

যে দুধ পান করায়। এবং مُرْضِعَة এমন অবস্থাকে বলা হয় যখন কার্যত সে দুধ পান করাতে থাকে এবং শিশু তার স্তন মুখের মধ্যে নিয়ে থাকে। কাজেই এখানে যে ছবিটি আঁকা হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, যখন কিয়ামতের সে কম্পন শুরু হবে, মায়েরা নিজেদের শিশুসন্তানদেরকে দুধ পান করাতে করাতে ফেলে দিয়ে পালাতে থাকবে এবং নিজের কলিজার টুকরার কি হলো, একথা কোনো মায়ের মনেও থাকবে না।

৩. একথা সুস্পষ্ট যে, এখানে কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করা বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্য নয়। বরং আল্লাহর আযাবের ভয় দেখিয়ে তাঁর গযবের কারণ হয় এমন সব কাজ থেকে দূরে থাকার উপদেশ দেয়াই উদ্দেশ্য। এজন্য কিয়ামতের এ সংক্ষিপ্ত অবস্থা বর্ণনার পর সামনের দিকে আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে।

৪. সামনের দিকের ভাষণ থেকে জানা যায়, এখানে আল্লাহ সম্পর্কে তাদের যে বিতর্কের ওপর আলোচনা করা হচ্ছে তা আল্লাহর সত্তা ও তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কিত নয় বরং তাঁর অধিকার ও ক্ষমতা-ইখতিয়ার এবং তাঁর পাঠানো শিক্ষাবলী সম্পর্কিত ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছ থেকে তাওহীদ ও আখেরাতের স্বীকৃতি চাচ্ছিলেন। এ বিষয়েই তিনি তাদের সাথে বিতর্ক করতেন। এ দু'টি বিশ্বাসের ওপর বিতর্ক শেষ পর্যন্ত যেখানে গিয়ে ঠেকতো তা এই ছিল যে, আল্লাহ কি করতে পারেন এবং কি করতে পারেন না, তাছাড়া এ বিশ্ব-জাহানের প্রভুত্বের কর্তৃত্ব কি শুধুমাত্র এক আল্লাহরই হাতে ন্যস্ত অথবা অন্য কতক সত্তারও এখানে প্রভুত্বের কর্তৃত্ব আছে ?

৫. এর অর্থ হচ্ছে প্রত্যেকটি মানুষ এমন একটি উপাদান থেকে তৈরি হয় যার সবটুকুই গৃহীত হয় মাটি থেকে এবং এ সৃজন প্রক্রিয়ার সূচনা হয় শুক্র থেকে। অথবা মানব প্রজাতির সূচনা হয়েছে আদম আলাইহিস সালাম থেকে। তাঁকে সরাসরি মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তারপর পরবর্তী পর্যায়ে শুক্র থেকেই মানব বংশের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। যেমন সূরা সিজদায় বলা হয়েছে ঃ

وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ○ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ○

"মানুষের সৃষ্টি শুরু করেন মাটি থেকে তারপর তার বংশ-ধারা চালান একটি নির্যাস থেকে যা বের হয় তুচ্ছ পানির আকারে।" (আস সাজদাহ, ৭-৮ আয়াত)

৬. এখানে মাতৃগর্ভে ভ্রূণ ও বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে থাকে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। আজকাল শুধুমাত্র শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাদের বিভিন্ন স্তরের যেসব বিস্তারিত বিষয়াবলী দৃষ্টিগোচর হতে পারে সেগুলো বর্ণনা করা হয়নি। বরং সেকালের সাধারণ বন্দুরাও যেসব বড় বড় সুস্পষ্ট পরিবর্তনের কথা জানতো সেগুলো এখানে বলা হয়েছে। অর্থাৎ শুক্র গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে স্থিতি লাভ করার পর প্রথমে জমাট রক্তের একটি পিণ্ড হয়। তারপর তা একটি গোশতের টুকরায় পরিবর্তিত হয়। এ অবস্থায় কোনো আকৃতি সৃষ্টি হয় না। এরপর সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে মানবিক আকৃতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। গর্ভপাতের বিভিন্ন অবস্থায় যেহেতু মানব সৃষ্টির এসব পর্যায় লোকেরা

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا
يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۚ وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا
عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيْجٍ ۝٥ ذٰلِكَ
بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْىِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ
قَدِيْرٌ ۝٦ وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ
فِى الْقُبُوْرِ ۝٧

আর তোমাদের কাউকে কাউকে তার পূর্বেই ডেকে ফিরিয়ে নেয়া হয় এবং কাউকে হীনতম বয়সের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়, যাতে সবকিছু জানার পর আবার কিছুই না জানে।[৭] আর তোমরা দেখছো যমীন বিশুষ্ক পড়ে আছে তারপর যখনই আমি তার ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি তখনই সে সবুজ শ্যামল হয়েছে, স্ফীত হয়ে উঠেছে এবং সব রকমের সুদৃশ্য উদ্ভিদ উদগত করতে শুরু করেছে। এসব কিছু এজন্য যে, আল্লাহ সত্য,[৮] তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন এবং তিনি সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী। আর এই (একথার প্রমাণ) যে, কিয়ামতের সময় অবশ্যই আসবে, এতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে উঠাবেন যারা কবরে চলে গেছে।[৯]

প্রত্যক্ষ করতো তাই এদিকে ইংগিত করা হয়েছে। এটি বুঝার জন্য সেদিন ভ্রূণতত্ত্বের বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন ছিল না, আজো নেই।

৭. অর্থাৎ এমন বৃদ্ধাবস্থা যখন মানুষের নিজের শরীরের ও অংগ-প্রত্যংগের কোনো খোঁজ-খবর থাকে না। যে ব্যক্তি অন্যদেরকে জ্ঞান দিতো বুড়ো হয়ে সে এমন অবস্থায় পৌঁছে যায়, যাকে শিশুদের অবস্থার সাথে তুলনা করা যায়। যে জ্ঞান জানা শোনা, অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা ছিল তার গর্বের বস্তু তা এমনই অজ্ঞতায় পরিবর্তিত হয়ে যায় যে, একটি ছোট ছেলেও তার কথায় হাসতে থাকে।

৮. এ ধারাবাহিক বক্তব্যের মধ্যে এ বাক্যাংশটির তিনটি অর্থ হয়। এক, আল্লাহই সত্য এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবনদানের কোনো সম্ভাবনা নেই,—তোমাদের এ ধারণা ডাহা মিথ্যা। দুই, আল্লাহর অস্তিত্ব নিছক কাল্পনিক নয়। কতিপয় বুদ্ধিবৃত্তিক জটিলতা দূর করার জন্য এ ধারণা গ্রহণ করা হয়নি। তিনি নিছক দার্শনিকদের চিন্তার আবিষ্কার অনিবার্য সত্তা ও সকল কার্যকারণের প্রথম কারণই (First cause) নয় বরং তিনি প্রকৃত

স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তা, যিনি প্রতি মুহূর্তে নিজের শক্তিমত্তা, সংকল্প, জ্ঞান ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব-জাহান ও এর প্রতিটি বস্তু পরিচালনা করছেন। তিন, তিনি কোনো খেলোয়াড় নন যে, নিছক মন ভুলাবার জন্য খেলনা তৈরী করেন এবং তারপর অযথা তা ভেঙে চুরে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন। বরং তিনি সত্য, তাঁর যাবতীয় কাজ গুরুত্বপূর্ণ, উদ্দেশ্যমূলক ও বিজ্ঞানময়।

৯. এ আয়াতগুলোতে মানুষের জন্মের বিভিন্ন পর্যায়ে মাটির ওপর বৃষ্টির প্রভাব এবং উদ্ভিদ উৎপাদনকে পাঁচটি সত্য নির্ণয়ের প্রমাণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সে সত্যগুলো হচ্ছে ঃ

এক ঃ আল্লাহই সত্য।

দুই ঃ তিনি মৃতকে জীবিত করেন।

তিন ঃ তিনি সর্বশক্তিমান।

চার ঃ কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবেই।

পাঁচ ঃ যারা মরে গেছে আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের সবাইকে জীবিত করে উঠাবেন।

এখন দেখুন এ নিদর্শনগুলো এ পাঁচটি সত্যকে কিভাবে চিহ্নিত করে।

সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থার কথা বাদ দিয়ে মানুষ যদি শুধুমাত্র নিজেরই জন্মের ওপর চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে জানতে পারবে যে, এক একটি মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে আল্লাহর প্রকৃত ও বাস্তব ব্যবস্থাপনা ও কলা-কৌশল সর্বক্ষণ সক্রিয় রয়েছে। প্রত্যেকের অস্তিত্ব, বৃদ্ধি ও বিকাশের প্রতিটি পর্যায়েই তাঁর স্বেচ্ছামূলক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই স্থিরীকৃত হয়। একদল বলে, একটা অন্ধ, বধির এবং জ্ঞান ও সংকল্পহীন প্রকৃতি একটা ধরাবাধা আইনের ভিত্তিতে এসব কিছু চালাচ্ছে। কিন্তু তারা চোখ মেলে তাকালে দেখতে পাবে যে, এক একটি মানুষ যেভাবে অস্তিত্ব লাভ করে এবং তারপর যেভাবে অস্তিত্বের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে, তার মধ্যে একজন অতিশয় জ্ঞানী ও একচ্ছত্র শক্তিশালী সত্তার ইচ্ছামূলক সিদ্ধান্ত কেমন সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মানুষ যে খাদ্য খায়, তার মধ্যে কোথাও মানবিক বীজ লুকিয়ে থাকে না এবং তার মধ্যে এমন কোনো জিনিস থাকে না যা মানবিক প্রাণের বৈশিষ্ট সৃষ্টি করে। এ খাদ্য শরীরে গিয়ে কোথাও চুল, কোথাও গোশত এবং কোথাও হাড়ে পরিণত হয়, আবার একটি বিশেষ স্থানে পৌঁছে এই খাদ্যই এমন শুক্রে পরিণত হয়, যার মধ্যে মানুষে পরিণত হবার যোগ্যতার অধিকারী বীজ থাকে। এ বীজগুলোর সংখ্যা এত অগণিত যে, একজন পুরুষ থেকে একবারে যে শুক্র নির্গত হয় তার মধ্যে কয়েক কোটি শুক্রকীট পাওয়া যায় এবং তাদের প্রত্যেকেই স্ত্রী-ডিম্বের সাথে মিলে মানুষের রূপ লাভ করার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু একজন জ্ঞানী সর্বশক্তিমান ও একচ্ছত্র শাসকের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এ অসংখ্য প্রার্থীদের মধ্য থেকে মাত্র একজনকে কোনো বিশেষ সময় ছাটাই বাছাই করে এনে স্ত্রী-ডিম্বের সাথে মিলনের সুযোগ দেয়া হয় এবং এভাবে গর্ভধারণ প্রক্রিয়া চলে। তারপর গর্ভধারণের সময় পুরুষের শুক্রকীট ও স্ত্রীর ডিম্বকোষের (Egg cell) মিলনের ফলে প্রথমদিকে যে জিনিসটি তৈরি হয় তা এত ছোট হয় যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা সম্ভব নয়। এ ক্ষুদ্র জিনিসটি নয় মাস ও কয়েক দিন

গর্ভাশয়ে লালিত হয়ে যে অসংখ্য স্তর অতিক্রম করে একটি জ্বলজ্যান্ত মানুষের রূপ গ্রহণ করে তার মধ্য থেকে প্রতিটি স্তরের কথা চিন্তা করলে মানুষের মন নিজেই সাক্ষ দেবে যে, এখানে প্রতি মুহূর্তে একজন সদা তৎপর বিচক্ষণ জ্ঞানীর ইচ্ছামূলক সিদ্ধান্ত কাজ করে চলছে। তিনিই সিদ্ধান্ত দেন, কাকে পূর্ণতায় পৌছাবেন এবং কাকে রক্তপিণ্ডে অথবা গোশতের টুকরায় কিংবা অসম্পূর্ণ শিশুর আকারে খতম করে দেবেন। তিনিই সিদ্ধান্ত নেন, কাকে জীবিত বের করবেন এবং কাকে মৃত। কাকে সাধারণ মানবিক আকার আকৃতিতে বের করে আনবেন এবং কাকে অসংখ্য অস্বাভাবিক আকারের মধ্য থেকে কোনো একটি আকার দান করবেন। কাকে পূর্ণাঙ্গ মানবিক অবয়ব দান করবেন আবার কাকে অন্ধ, বোবা, বধির বা লুলা ও পংগু বানিয়ে বের করে আনবেন। কাকে সুন্দর করবেন এবং কাকে কুৎসিত। কাকে পুরুষ করবেন এবং কাকে নারী। কাকে উচ্চ পর্যায়ের শক্তি ও যোগ্যতা দিয়ে পাঠাবেন এবং কাকে নির্বোধ ও বেকুফ করে সৃষ্টি করবেন। সৃজন ও আকৃতিদানের এ কাজটি প্রতিদিন কোটি কোটি নারীর গর্ভাশয়ে চলছে। এর মাঝখানে কোনো সময় কোনো পর্যায়েও এক আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোনো শক্তি সামান্যতমও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বরং কোন্ পেটে কি জিনিস তৈরি হচ্ছে এবং কি তৈরি হয়ে বের হয়ে আসবে এতটুকুও কেউ বলতে পারে না। অথচ মানব সন্তানদের কমপক্ষে শতকারা ৯০ জনের ভাগ্যের ফায়সালা এই স্তরগুলোতেই হয়ে যায় এবং এখানেই কেবল ব্যক্তিদেরই নয় জাতিসমূহেরও এমনকি সমগ্র মানব জাতির ভবিষ্যতের ভাঙাগড়া সম্পন্ন হয়। এরপর যেসব শিশু দুনিয়ায় আসে তাদের কাকে প্রথম শ্বাস নেবার পরই মরে যেতে হবে। কাকে বড় হয়ে যুবক হতে হবে এবং কার যৌবনের পর বার্ধক্যের পাট চুকাতে হবে? তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে কে এ সিদ্ধান্ত নেয় ? এখানেও একটি প্রবল ইচ্ছা কার্যকর দেখা যায়। গভীর মনোযোগ সহকারে চিন্তা করলে অনভুব করা যাবে তাঁর কর্মতৎপরতা কোন্ বিশ্বজনীন ব্যবস্থাপনা ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে এবং এরি ভিত্তিতে তিনি কেবল ব্যক্তিদেরই নয়, জাতির ও দেশের ভাগ্যেরও ফায়সালা করছেন। এসব কিছু দেখার পরও যদি আল্লাহ "সত্য" এবং একমাত্র আল্লাহই "সত্য" এ ব্যাপারে কেউ সন্দেহ পোষণ করে তাহলে নিসন্দেহে সে বুদ্ধিভ্রষ্ট।

দ্বিতীয় যে কথাটি এ নিদর্শনগুলো থেকে প্রমাণিত হয় তা হচ্ছে এই যে, "আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করেন" আল্লাহ কখনো মৃতদেরকে জীবিত করবেন, একথা শুনে লোকেরা অবাক হয়ে যায়। কিন্তু তারা চোখ মেলে তাকালে দেখতে পাবে তিনি তো প্রতি মুহূর্তে মৃতকে জীবিত করছেন। যেসব উপাদান থেকে মানুষের শরীর গঠিত হয়েছে এবং যেসব খাদ্যে সে প্রতিপালিত হচ্ছে সেগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর মধ্যে রয়েছে কয়লা, লোহা, চূন, কিছু লবণজাত উপাদান ও কিছু বায়ু এবং এ ধরনের আরো কিছু জিনিস। এর মধ্যে কোনো জিনিসেও জীবন ও মানবাত্মার বৈশিষ্টের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এসব মৃত নির্জিব উপাদানগুলোই একত্র করে তাকে একটি জীবিত ও প্রাণময় অস্তিত্বে পরিণত করা হয়েছে। তারপর এসব উপাদান সম্বলিত খাদ্য মানুষের দেহে পরিবেশিত হয় এবং সেখানে এর সাহায্যে পুরুষের মধ্যে এমন শুক্রকীট এবং নারীর মধ্যে এমন ডিম্বকোষের সৃষ্টি হয় যাদের মিলনের ফলে প্রতিদিন জীবন্ত ও প্রাণময় মানুষ তৈরি হয়ে বের হয়ে

আসছে। এরপর নিজের আশপাশের মাটির ওপরও একবার নজর বুলিয়ে নিন। পাখি ও বায়ু অসংখ্য জিনিসের বীজ চারদিকে ছড়িয়ে রেখেছিল এবং অসংখ্য জিনিসের মূল এখানে সেখানে মাটির সাথে মিশে পড়েছিল। তাদের কারো মধ্যেও উদ্ভিদ জীবনের সামন্যতম লক্ষণও ছিল না। মানুষের চারপাশের বিশুষ্ক জমি এ লাখো লাখো মৃতের কবরে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু যখনই এদের ওপর পড়লো পানির একটি ফোঁটা অমনি চারদিকে জেগে উঠলো জীবনের বিপুল সমারোহ। প্রত্যেকটি মৃত বৃক্ষমূল তার কবর থেকে মাথা উঁচু করলো এবং প্রত্যেকটি নিষ্প্রাণ বীজ একটি জীবন্ত চারাগাছের রূপ ধারণ করলো। এ মৃতকে জীবিত করার মহড়া প্রত্যেক বর্ষা ঋতুতে মানুষের চোখের সামনে প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এ নিদর্শগুলো পর্যবেক্ষণ থেকে তৃতীয় যে জিনিসটি প্রমাণিত হয় তা হচ্ছে এই যে, "আল্লাহ সর্বশক্তিমান।" সমগ্র বিশ্ব-জাহানের কথা বাদ দিন শুধুমাত্র আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটির কথাই ধরা যাক। আর পৃথিবীরও সমস্ত তত্ত্ব ও ঘটনাবলীর কথা বাদ দিয়ে কেবলমাত্র মানুষ ও উদ্ভিদেরই জীবনধারা বিশ্লেষণ করা যাক। এখানে তাঁর শক্তিমত্তার যে অভাবনীয় কর্মকাণ্ড দেখা যায় সেগুলো দেখার পর কি কোনো বুদ্ধি-বিবেকবান ব্যক্তি একথা বলতে পারেন যে, আজ আমরা আল্লাহকে যা কিছু করতে দেখছি তিনি কেবল অতটুকুই করতে পারেন এবং কাল যদি তিনি কারো কিছু করতে চান তাহলে করতে পারবেন না ? আল্লাহ তো তবুও অনেক বড় ও উন্নত সত্তা, মানুষের সম্পর্কেও বিগত শতক পর্যন্ত লোকদের ধারণা ছিল যে, এরা শুধুমাত্র মাটির ওপর চলাচলকারী গাড়িই তৈরি করতে পারে, বাতাসে উড়ে চলা গাড়ি তৈরি করার ক্ষমতা এর নেই। কিন্তু আজকের উড়োজাহাজ-গুলো জানিয়ে দিয়েছে যে, মানুষের "সম্ভাবনা"র সীমানা নির্ধারণ করার ব্যাপারে তাদের ধারণা কত ভুল ছিল। আজ যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর আজকের কাজগুলো দেখে তাঁর জন্য সম্ভাবনার কিছু সীমানা নির্ধারণ করে দিয়ে বলতে থাকে যে, তিনি যা কিছু করছেন এছাড়া আর কিছু করতে পারেন না, তাহলে সে শুধুমাত্র নিজেরই মনের সংকীর্ণতার প্রমাণ দেয়, আল্লাহর শক্তি তার বেঁধে দেয়া সীমানার মধ্যে আটকে থাকতে পারে না।

চতুর্থ ও পঞ্চম কথা অর্থাৎ "কিয়ামতের দিন আসবেই" এবং "আল্লাহ অবশ্যই মৃত লোকদেরকে জীবিত করে উঠাবেন"—একথা দু'টি উপরে আলোচিত তিনটি কথার যৌক্তিক পরিণতি। আল্লাহর কাজগুলোকে তাঁর শক্তিমত্তার দিক দিয়ে দেখলে মন সাক্ষ দেবে যে, তিনি যখনই চাইবেন সকল মৃতকে আবার জীবিত করতে পারবেন, ইতিপূর্বে যাদের অস্তিত্ব ছিল না, তাদেরকে তিনি অস্তিত্ব দান করেছিলেন। আর যদি তাঁর কার্যাবলীকে তাঁর প্রজ্ঞার দিক দিয়ে দেখা যায় তাহলে বুদ্ধিবৃত্তি সাক্ষ্য দেবে যে, এ দুটি কাজও তিনি অবশ্যই করবেন। কারণ, এগুলো ছাড়া যুক্তির দাবী পূর্ণ হয় না এবং একজন প্রাজ্ঞ সত্তা এ দাবী পূর্ণ করবেন না, এটা অসম্ভব ব্যাপার। মানুষ যে সীমিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভ করছে তার ফল আমরা দেখি যে, সে যখনই নিজের টাকা পয়সা, সম্পত্তি বা ব্যবসা-বাণিজ্য কারো হাতে সোপর্দ করে দেয় তার কাছ থেকে কোনো না কোনো পর্যায়ে হিসেব অবশ্যই নেয়। অর্থাৎ আমানত ও হিসেব-নিকেশের মধ্যে যেন একটি অনিবার্য যৌক্তিক সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের সীমিত প্রজ্ঞাও কোনো অবস্থায় এ সম্পর্ককে উপেক্ষা

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ
مُّنِيْرٍ ۝٨ ثَانِيَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ لَهٗ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ
وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝٩ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ
وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝١٠

আরো কিছু লোক এমন আছে যারা কোনো জ্ঞান[১০] পথনির্দেশনা[১১] ও আলো বিকিরণকারী কিতাব[১২] ছাড়াই ঘাড় শক্ত করে[১৩] আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করে, যাতে লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করা যায়।[১৪] এমন ব্যক্তির জন্য রয়েছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে আগুনের আযাবের জ্বালা আস্বাদন করাবো। এ হচ্ছে তোমার ভবিষ্যত, যা তোমার হাত তোমার জন্য তৈরি করেছে, নয়তো আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।

করতে পারে না। তারপর এ প্রজ্ঞার ভিত্তিতে মানুষ ইচ্ছাকৃত কাজ ও অনিচ্ছাকৃত কাজের মধ্যে ফারাক করে থাকে। ইচ্ছাকৃত কাজের সাথে নৈতিক দায়িত্বের ধারণা সম্পৃক্ত করে। কাজের মধ্যে ভালো-মন্দের পার্থক্য করে। ভালো কাজের ফল হিসেবে প্রশংসা ও পুরস্কার পেতে চায় এবং মন্দ কাজের দরুন শাস্তি দাবী করে। এমনকি এ উদ্দেশ্যে নিজেরাই একটি বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলে। যে স্রষ্টা মানুষের মধ্যে এ প্রজ্ঞা সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজে এ প্রজ্ঞা হারিয়ে ফেলবেন একথা কি কল্পনা করা যেতে পারে ? একথা কি মেনে নেয়া যায় যে, নিজের এতবড় দুনিয়াটা এত বিপুল সাজ-সরঞ্জাম ও ব্যাপক ক্ষমতা সহকারে মানুষের হাতে সোপর্দ করার পর তিনি ভুলে গেছেন এবং এর হিসেব কখনো নেবেন না ? কোনো সুস্থ বোধসম্পন্ন মানুষের বুদ্ধি কি সাক্ষ দিতে পারে যে, মানুষের যে সমস্ত খারাপ কাজ শাস্তির হাত থেকে বেঁচে যায় অথবা যেসব খারাপ কাজের উপযুক্ত শাস্তি তাকে দেয়া যেতে পারেনি, সেগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য কখনো আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং যেসব ভালো কাজ তাদের ন্যায়সংগত পুরস্কার থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে সেগুলো চিরকাল বঞ্চিতই থেকে যাবে ? যদি এমনটি না হয়ে থাকে, তাহলে কিয়ামত ও মৃত্যু পরের জীবন জ্ঞানবান ও প্রাজ্ঞ আল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার একটি অনিবার্য দাবী। এ দাবী পূরণ হওয়া নয় বরং পূরণ না হওয়াটাই সম্পূর্ণ বুদ্ধিবিরোধী ও অযৌক্তিক।

১০. অর্থাৎ ব্যক্তিগত জ্ঞান, যা সরাসরি পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

১১. অর্থাৎ এমন জ্ঞান যা কোনো যুক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়, অথবা কোনো জ্ঞানের অধিকারীর পথনির্দেশনা দানের মাধ্যমে লাভ করা যায়।

১২. অর্থাৎ এমন জ্ঞান, যা আল্লাহর নাযিল করা কিতাব থেকে লাভ করা যায়।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ِۨاطْمَاَنَّ
بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ِۨانْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةَ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ⑪ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ⑫

২ রুকূ'

আর মানুষের মধ্যে এমনও কেউ আছে, যে এক কিনারায় দাঁড়িয়ে আল্লাহর বন্দেগী করে,[১৫] যদি তাতে তার উপকার হয় তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে যায় আর যদি কোনো বিপদ আসে তাহলে পিছনের দিকে ফিরে যায়[১৬] তার দুনিয়াও গেলো এবং আখেরাতও। এ হচ্ছে সুস্পষ্ট ক্ষতি।[১৭] তারপর সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে ডাকে যারা তার না ক্ষতি করতে পারে, না উপকার, এ হচ্ছে ভ্রষ্টতার চূড়ান্ত।

১৩. এর তিনটি অবস্থা রয়েছে ঃ এক, মূর্খতাপ্রসূত জিদ ও হঠকারিতা। দুই, অহংকার ও আত্মম্ভরিতা। তিন, যে ব্যক্তি বুঝায় ও উপদেশ দান করে তার কথায় কর্ণপাত না করা।

১৪. প্রথমে ছিল তাদের কথা যারা নিজেরা পথভ্রষ্ট ছিল। আর এ আয়াতে তাদের কথা বলা হয়েছে, যারা শুধু নিজেরাই পথভ্রষ্ট নয় বরং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করার জন্য উঠে পড়ে লাগে।

১৫. অর্থাৎ দীনি বৃত্তের মধ্যখানে নয় বরং তার এক প্রান্তে বা কিনারায় অথবা অন্য কথায় কুফর ও ইসলামের সীমান্তে দাঁড়িয়ে বন্দেগী করে। যেমন কোনো দো-মনা ব্যক্তি কোনো সেনাবাহিনীর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে। যদি দেখে সেনাদল বিজয়লাভ করছে তাহলে তাদের সাথে মিলে যায় আর যদি দেখে পরাজিত হচ্ছে তাহলে আস্তে আস্তে কেটে পড়ে।

১৬. এখানে এমন সব লোকের কথা বলা হয়েছে যাদের মানসিক গঠন অপরিপক্ক, আকীদা-বিশ্বাস নড়বড়ে এবং যারা প্রবৃত্তির পূজা করে। তারা ইসলাম গ্রহণ করে লাভের শর্তে। তাদের ঈমান এ শর্তের সাথে জড়িত হয় যে, তাদের আকাংখা পূর্ণ হতে হবে, সব ধরনের নিশ্চিন্ততা অর্জিত হতে হবে, আল্লাহর দীন তাদের কাছে কোনো স্বার্থ ত্যাগ দাবী করতে পারবে না এবং দুনিয়াতে তাদের কোনো ইচ্ছা ও আশা অপূর্ণ থাকতে পারবে না। এসব হলে তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তার দীন তাদের কাছে খুবই ভালো। কিন্তু যখনই কোনো আপদ বালাই নেমে আসে অথবা আল্লাহর পথে কোনো বিপদ, কষ্ট ও ক্ষতির শিকার হতে হয় কিংবা কোনো আকাংখা পূর্ণ হয় না তখনই আর আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা, রসূলের রিসালাত ও দীনের সত্যতা কোনোটার ওপরই তারা নিশ্চিত থাকে না।

يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗۤ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ؕ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ
الْعَشِيْرُ ﴿١٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿١٤﴾ مَنْ كَانَ
يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى
السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ ﴿١٥﴾ وَكَذٰلِكَ
اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ﴿١٦﴾

সে তাদেরকে ডাকে যাদের ক্ষতি তাদের উপকারের চেয়ে নিকটতম[১৮] নিকৃষ্ট তার অভিভাবক এবং নিকৃষ্ট তার সহযোগী।[১৯] (পক্ষান্তরে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে[২০] আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত হবে ; আল্লাহ যা চান তাই করেন।[২১] যে ব্যক্তি ধারণা করে, আল্লাহ দুনিয়ায় ও আখেরাতে তাকে কোনো সাহায্য করবেন না তার একটি রশির সাহায্যে আকাশে পৌঁছে গিয়ে ছিদ্র করা উচিত তারপর দেখা উচিত তার কৌশল এমন কোনো জিনিসকে রদ করতে পারে কিনা যা তার বিরক্তি ও ক্ষোভের কারণ।[২২]—এ ধরনেরই সুস্পষ্ট কথা সহযোগে আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আল্লাহ যাকে চান তাকে সৎপথ দেখান।

এরপর তারা এমন প্রতিটি বেদীমূলে মাথা নোয়াতে উদ্যোগী হয় যেখানে তাদের লাভের আশা ও লোকসান থেকে বেঁচে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

১৭. এখানে একটি অনেক বড় সত্যকে কয়েকটি কথায় প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে। আসলে দো-মনা মুসলমানদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ হয়। কাফের যখন নিজের রবের মুখাপেক্ষী না হয়ে এবং পরকাল থেকে বেপরোয়া ও আল্লাহর আইনের আনুগত্য মুক্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে বস্তুগত স্বার্থের পেছনে দৌড়াতে থাকে তখন সে নিজের পরকাল হারালেও দুনিয়ার স্বার্থ কিছু না কিছু হাসিল করেই নেয়। আর মু'মিন যখন পূর্ণ ধৈর্য, অবিচলতা, দৃঢ় সংকল্প ও স্থৈর্য সহকারে আল্লাহর দীনের আনুগত্য করে তখন যদিও পার্থিব সাফল্য শেষ পর্যন্ত তার পদ-চুম্বন করেই থাকে, তবুও যদি দুনিয়া একেবারেই তার নাগালের বাইরে চলে যেতেই থাকে, আখেরাতে তার সাফল্য সুনিশ্চিত হয়। কিন্তু এ দো-মনা মুসলমান নিজের দুনিয়ার স্বার্থও লাভ করতে পারে না এবং আখেরাতেও তার সাফল্যের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তার মন ও মস্তিষ্কের কোনো এক প্রকোষ্ঠে আল্লাহ ও আখেরাতের

অস্তিত্বের যে ধারণা রয়েছে এবং ইসলামের সাথে সম্পর্ক তার মধ্যে নৈতিক সীমারেখা কিছু না কিছু মেনে চলার যে প্রবণতা সৃষ্টি করেছে, দুনিয়ার দিকে দৌড়াতে থাকলে এগুলো তার হাত টেনে ধরে। ফলে নিছক দুনিয়াবী ও বৈষয়িক স্বার্থ অন্বেষার জন্য যে ধরনের দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতার প্রয়োজন তা একজন কাফেরের মতো তার মধ্যে সৃষ্টি হয় না। আখেরাতের কথা চিন্তা করলে দুনিয়ার লাভ ও স্বার্থের লোভ, ক্ষতির ভয় এবং প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে বিধিনিষেধের শৃংখলে বেঁধে রাখার ব্যাপারে মানসিক অস্বীকৃতি সেদিকে যেতে দেয় না বরং বৈষয়িক স্বার্থ পূজা তার বিশ্বাস ও কর্মকে এমনভাবে বিকৃত করে দেয় যে, আখেরাতে তার শাস্তি থেকে নিষ্কৃতিলাভের সম্ভাবনা থাকে না। এভাবে সে দুনিয়া ও আখেরাত দুটোই হারায়।

১৮. প্রথম আয়াতে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মাবুদদের উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে। কারণ, মূলত ও যথার্থই তাদের উপকার ও ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা নেই। দ্বিতীয় আয়াতে তাদের ক্ষতিকে উপকারের চেয়ে নিকটতর বলা হয়েছে। কারণ, তাদের কাছে দোয়া চেয়ে এবং অভাব ও প্রয়োজন পূরণের জন্য তাদের সামনে হাত পাতার মাধ্যমে সে নিজের ঈমান সংগে সংগেই ও নিশ্চিতভাবেই হারিয়ে বসে। তবে যে লাভের আশায় সে তাদেরকে ডেকেছিল তা অর্জিত হবার ব্যাপারে বলা যায়, প্রকৃত সত্যের কথা বাদ দিলেও প্রকাশ্য অবস্থার দৃষ্টিতে সে নিজেও একথা স্বীকার করবে যে, তা অর্জিত হওয়াটা নিশ্চিত নয় এবং বাস্তবে তা সংঘটিত হবার নিকটতর সম্ভাবনাও নেই। হতে পারে, আল্লাহ তাকে আরো বেশী পরীক্ষার সম্মুখীন করার জন্য কোনো আস্তানায় তার মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ করেছেন। আবার এও হতে পারে যে, সে আস্তানায় সে নিজের ঈমানও বিকিয়ে দিয়ে এসেছে এবং মনোবাঞ্ছাও পূর্ণ হয়নি।

১৯. অর্থাৎ মানুষ বা শয়তান যে-ই হোক না কেন, যে তাকে এ পথে এনেছে সে নিকৃষ্টতম কর্মসম্পাদক ও অভিভাবক এবং নিকৃষ্টতম বন্ধু ও সাথী।

২০. অর্থাৎ যাদের অবস্থা উল্লেখিত মতলবী, ধান্দাবাজ, দো-মনা ও দৃঢ় বিশ্বাসহীন মুসলমানের মতো নয় বরং যারা ঠাণ্ডা মাথায় খুব ভালোভাবে ভেবে চিন্তে আল্লাহ, রসূল ও আখেরাতকে মেনে নেবার ফায়সালা করে তারপর ভালো মন্দ যে কোনো অবস্থার সম্মুখীন হতে হোক এবং বিপদের পাহাড় মাথায় ভেঙে পড়ুক বা বৃষ্টিধারার মতো পুরস্কার ঝরে পড়ুক সর্বাবস্থায় দৃঢ়পদে সত্যের পথে এগিয়ে চলে।

২১. অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমতা অসীম। দুনিয়ায় বা আখেরাতে অথবা উভয় স্থানে তিনি যাকে যা চান দিয়ে দেন এবং যার থেকে যা চান ছিনিয়ে নেন। তিনি দিতে চাইলে বাধা দেবার কেউ নেই। না দিতে চাইলে আদায় করারও কেউ নেই।

২২. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বহু মতবিরোধ হয়েছে। বিভিন্ন তাফসীরকার এর ব্যাখ্যায় যা বলেছেন তার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে ঃ

এক ঃ যে মনে করে আল্লাহ তাঁকে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সাহায্য করবেন না সে ছাদের গায়ে দড়ি ঝুলিয়ে আত্মহত্যা করুক।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ
وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ
مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ
وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ
عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ
مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾

যারা ঈমান এনেছে[২৩] ও যারা ইহুদী হয়েছে[২৪] এবং সাবেয়ী,[২৫] খৃষ্টান[২৬] ও অগ্নি পূজারীরা[২৭] আর যারা শিরক করেছে[২৮] তাদের সবার মধ্যে আল্লাহ কিয়ামতের দিন ফায়সালা করবেন।[২৯] সব জিনিসই আল্লাহর দৃষ্টিতে আছে। তুমি কি দেখো না আল্লাহর সামনে সিজদানত[৩০] সবকিছুই যা আছে আকাশে[৩১] ও পৃথিবীতে—সূর্য, চন্দ্র, তারকা, পাহাড়, গাছপালা, জীবজন্তু এবং বহু মানুষ[৩২] ও এমন বহু লোক যাদের প্রতি আযাব অবধারিত হয়ে গেছে ?[৩৩] আর যাকে আল্লাহ লাঞ্ছিত ও হেয় করেন তার সম্মানদাতা কেউ নেই[৩৪] আল্লাহ যাকিছু চান তাই করেন।[৩৫]

দুই ঃ যে মনে করে আল্লাহ তাঁকে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সাহায্য করবেন না সে কোনো দড়ির সাহায্যে আকাশে যাবার ও সাহায্য বন্ধ করার চেষ্টা করে দেখুক।

তিন ঃ যে মনে করে আল্লাহ তাঁকে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সাহায্য করবেন না সে আকাশে গিয়ে অহীর সূত্র কেটে দেবার ব্যবস্থা করুক।

চার ঃ যে মনে করে আল্লাহ তাঁকে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সাহায্য করবেন না, সে আকাশে গিয়ে তার রিযিক বন্ধ করার চেষ্টা করে দেখুক।

পাঁচ ঃ যে মনে করে আল্লাহ তাকে (অর্থাৎ যে নিজেই এ ধরনের চিন্তা করে তাকে) সাহায্য করবেন না সে নিজের গৃহের সাথে দড়ি ঝুলিয়ে আত্মহত্যা করুক।

ছয় ঃ যে মনে করে আল্লাহ তাকে (অর্থাৎ যে নিজেই এ ধরনের চিন্তা করে তাকে) সাহায্য করবেন না সে আকাশে পৌঁছে সাহায্য আনার চেষ্টা করে দেখুক।

এর মধ্যে প্রথম চারটি ব্যাখ্যা তো পূর্বাপর আলোচনার সাথে সম্পর্কহীন। আর শেষ দুটি ব্যাখ্যা যদিও পূর্বাপর আলোচনার বিষয়বস্তুর নিকটতর তবুও বক্তব্যের যথার্থ লক্ষে পৌঁছে না। ভাষণের ধারাবাহিকতার প্রতি দৃষ্টি রাখলে পরিষ্কার জানা যায় যে, কিনারায় দাঁড়িয়ে বন্দেগীকারী ব্যক্তিই একথা মনে করে। যতক্ষণ অবস্থা ভালো থাকে ততক্ষণ সে নিশ্চিন্ত থাকে এবং যখনই কোনো আপদ-বিপদ বা বালা-মসিবত আসে অথবা তাকে এমন কোনো অবস্থার মুখোমুখি হতে হয় যা তার কাছে অপ্রীতিকর, তখনই সে আল্লাহর পথ থেকে সরে যায় এবং সব আস্তানার বেদীমূলে মাথা ঘষতে থাকে। এ ব্যক্তির এ অবস্থা কেন ? এর কারণ সে আল্লাহর ইচ্ছা ও ফায়সালায় সন্তুষ্ট নয়। সে মনে করে ভাগ্য ভাংগা-গড়ার মূল সূত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো হাতেও আছে। তাই সে আল্লাহ থেকে নিরাশ হয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষার ডালি নিয়ে দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দেয়। তাই বলা হচ্ছে, যে ব্যক্তি এ ধরনের চিন্তা করে সে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দেখে নিতে পারে, এমন কি আকাশ চিরে ওপরে ঢুঁ মারতে পারলে তাও করে দেখে নিতে পারে, তার কোনো কৌশল আল্লাহর তাকদীরের এমন কোনো ফায়সালাকে বদলাতে পারে কি না যা তার কাছে অপ্রীতিকর ঠেকে। আকাশে পৌঁছে যাওয়া এবং ছিদ্র করা মানে হচ্ছে মানুষ যত বড় বড় প্রচেষ্টার কথা কল্পনা করতে পারে তার মধ্যে বৃহত্তম প্রচেষ্টা চালানো। এ শব্দগুলোর কোনো শাব্দিক অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়।

২৩. অর্থাৎ "মুসলমান" যারা আপন আপন যুগে আল্লাহর সকল নবীকে ও তাঁর কিতাবসমূহকে মেনে নিয়েছে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যারা পূর্ববর্তী নবীদের সাথে তাঁর প্রতিও ঈমান এনেছে। তাদের মধ্যে সাচ্চা ঈমানদাররাও ছিল এবং তারাও ছিল যারা ঈমানদারদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতো ঠিকই কিন্তু "কিনারায়" অবস্থান করে বন্দেগী করতো এবং কুফর ও ঈমানের মাঝখানে দোদুল্যমান ছিলো।

২৪. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা নিসা, ৭২ টীকা।

২৫. প্রাচীন যুগে সাবেয়ী নামে দুটি সম্প্রদায় সর্বজন পরিচিত ছিল। এদের একটি ছিল হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালামের অনুসারী। তারা ইরাকের উচ্চভূমিতে (অর্থাৎ আল জাযীরা) বিপুল সংখ্যায় বসবাস করতো। হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালামের অনুগামী হিসেবে তারা মাথায় পানি ছিটিয়ে ধর্মান্তরিত হবার পদ্ধতি মেনে চলতো। তারকা পূজারী দ্বিতীয় দলের লোকেরা নিজেদের হযরত শীশ ও হযরত ইদরিস আলাইহিমাস সালামের অনুসারী বলে দাবী করতো। তারা মৌলিক পদার্থের ওপর গ্রহের এবং গ্রহের ওপর ফেরেশতাদের শাসনের প্রবক্তা ছিল। হারান ছিল তাদের কেন্দ্র। ইরাকের বিভিন্ন এলাকায় তাদের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে ছিল। এ দ্বিতীয় দলটি নিজেদের দর্শন, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতার কারণে বেশী খ্যাতি অর্জন করে। কিন্তু এখানে প্রথম দলটির কথা বলা হয়েছে। এ সম্ভাবনাই প্রবল। কারণ সম্ভবত কুরআন নাযিলের সময় দ্বিতীয় দলটি এ নামে অভিহিত ছিল না।

২৬. ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মায়েদাহ, ৩৬ টীকা দেখুন।

২৭. অর্থাৎ ইরানের অগ্নি উপাসকগণ, যারা আলোক ও অন্ধকারের দুজন ইলাহর প্রবক্তা ছিল এবং নিজেদেরকে যরদশতের অনুসারী দাবী করতো। মায্দাকের ভ্রষ্টতা

তাদের ধর্ম ও নৈতিক চরিত্রকে সাংঘাতিকভাবে বিকৃত করে দিয়েছিল। এমন কি তাদের মধ্যে সহোদর বোনের সাথে বিয়ের প্রথাও প্রচলিত ছিল।

২৮. অর্থাৎ আরব ও অন্যান্য দেশের মুশরিকবৃন্দ, যারা ওপরের বিভিন্ন দলীয় নামের মতো কোনো নামে আখ্যায়িত ছিল না। কুরআন মজীদ তাদেরকে অন্যান্য দল থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্য "মুশরিক" ও "যারা শিরক করেছে" ধরনের পারিভাষিক নামে স্মরণ করছে। অবশ্য মু'মিনদের দল ছাড়া বাকি সবার আকীদা ও কর্মধারায় শির্‌ক অনুপ্রবেশ করেছিল!

২৯. অর্থাৎ মানুষদের বিভিন্ন দলের মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কে যে মতবিরোধ ও বিবাদ রয়েছে এ দুনিয়ায় তার কোনো ফায়সালা হবে না। তার ফায়সালা হবে কিয়ামতের দিন। সেখানে তাদের মধ্যে কারা সত্যপন্থী এবং কারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে তার চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেয়া হবে। যদিও এক অর্থে দুনিয়ায় আল্লাহর কিতাবগুলোও এ ফায়সালা করে, কিন্তু এখানে ফায়সালা শব্দটি "বিবাদ মিটানো" এবং দুই পক্ষের মধ্যে ন্যায় সংগত বিচার করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেখানে এক দলের পক্ষে এবং অন্য দলের বিপক্ষে যথারীতি ডিক্রি জারী করা হবে।

৩০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা আর রা'আদ, ২৪ টীকা, সূরা আন্ নহল, ৪১-৪২ টীকা।

৩১. অর্থাৎ ফেরেশতা, নক্ষত্রমণ্ডলী এবং পৃথিবীর বাইরে অন্যান্য জগতে মানুষের মতো বুদ্ধিমান জীব বা পশু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ, বায়ু ও আলোর মতো অ-বুদ্ধিমান ও স্বাধীন ক্ষমতাহীন যাবতীয় সৃষ্টি।

৩২. অর্থাৎ যারা নিছক বাধ্য হয়েই নয় বরং ইচ্ছাকৃতভাবে, সানন্দে ও আনুগত্যশীলতা সহকারেও তাঁকে সিজদা করে। পরবর্তী বাক্যে তাদের মোকাবিলায় মানব সম্প্রদায়ের অন্য যে দলের কথা বলা হচ্ছে তারা স্বেচ্ছায় আল্লাহর সামনে নত হতে অস্বীকার করে। কিন্তু অন্যান্য স্বাধীন ক্ষমতাহীন সৃষ্টির মতো তারাও প্রাকৃতিক আইনের বাঁধন মুক্ত নয় এবং সবার সাথে বাধ্য হয়ে সিজদা করার মধ্যে তারাও রয়েছে। নিজেদের ক্ষমতার পরিসরে বিদ্রোহের নীতি অবলম্বনের কারণে তারা আযাবের অধিকারী হয়।

৩৩. এর অর্থ হচ্ছে, যদিও কিয়ামতের দিনে এসব বিভিন্ন দলের বিরোধের নিষ্পত্তি করে দেয়া হবে তবুও যথার্থ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হলে যে কেউ আজো দেখতে পারে কে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং শেষ ফায়সালা কার পক্ষে হওয়া উচিত। পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত সর্বত্র একই আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব পূর্ণ শক্তিতে ও সর্বব্যাপীভাবে চলছে, সমগ্র বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থা একথারই সাক্ষ দিচ্ছে। পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্রতম ধূলিকণা থেকে শুরু করে আকাশের বড় বড় গ্রহ নক্ষত্র পর্যন্ত সবাই একটি আইনের শৃংখলে বাঁধা রয়েছে এবং তা থেকে এক চুল পরিমাণ এদিক ওদিক নড়ার ক্ষমতা কারোর নেই। মু'মিন তো অন্তর থেকেই তাঁর কাছে মাথা নত করে কিন্তু যে নাস্তিকটি তাঁর অস্তিত্বই অস্বীকার করে এবং যে মুশরিকটি প্রতিটি ক্ষমতাহীন সত্তার সামনে মাথা নত করে সেও বাতাস ও পানির মতো সমানভাবে তার আনুগত্য করতে বাধ্য। কোনো ফেরেশতা, জিন, নবী অলী ও দেবদেবীর মধ্যে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের গুণাবলী ও ক্ষমতার সামান্যতম নামগন্ধও

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ ۚ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ
ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُّصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهٖ
مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا
اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۗ وَذُوْقُوْا عَذَابَ
الْحَرِيْقِ ﴿٢٢﴾

এ দু'টি পক্ষ এদের মধ্যে রয়েছে এদের রবের ব্যাপারে বিরোধ।[৩৬] এদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য আগুনের পোশাক কাটা হয়ে গেছে,[৩৭] তাদের মাথায় ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে, যার ফলে শুধু তাদের চামড়াই নয়, পেটের ভেতরের অংশও গলে যাবে। আর তাদের শাস্তি দেবার জন্য থাকবে লোহার মুগুর। যখনই তারা কাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করবে তখনই আবার তার মধ্যে তাদেরকে ঠেলে দেয়া হবে, বলা হবে, এবার দহন জ্বালার স্বাদ নাও।

নেই। তাদেরকে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ক্ষমতা ও উপাস্য হবার মর্যাদা দান করা অথবা বিশ্ব-জাহানের মালিক ও প্রভুর সম জাতীয় ও সদৃশ গণ্য করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কোনো শাসকবিহীন আইন, স্রষ্টাবিহীন প্রকৃতি ও পরিচালকবিহীন ব্যবস্থার পক্ষে এত বড় বিশ্ব-জাহানকে অস্তিত্ব দান করা, নিজেই তাকে সুষ্ঠ নিয়ম-শৃংখলার সাথে পরিচালনা করা এবং এ বিশ্ব-জাহানের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা ও প্রজ্ঞার বিস্ময়কর কর্মকুশলতা দেখানো কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। বিশ্ব-জাহানের এ উন্মুক্ত গ্রন্থটি সামনে থাকার পরও যে ব্যক্তি নবীদের কথা মানে না এবং বিভিন্ন মনগড়া বিশ্বাস অবলম্বন করে আল্লাহর ব্যাপারে বিরোধে প্রবৃত্ত হয় তার মিথ্যাশ্রয়ী হওয়া ঠিক তেমনিভাবে প্রমাণিত যেমন কিয়ামতের দিন প্রমাণিত হবে।

৩৪. এখানে লাঞ্ছনা ও সম্মান অর্থ সত্য অস্বীকার ও তার অনুসরণ। কারণ, লাঞ্ছনা ও সম্মানের আকারেই এর অনিবার্য ফল দেখা যায়। যে ব্যক্তি চোখ মেলে প্রকাশ্য ও উজ্জল সত্য দেখে না এবং যে তাকে বুঝায় তার কথাও শোনে না সে নিজেই নিজের জন্য লাঞ্ছনা ও অবমাননার ডাক দেয়। সে নিজে যা প্রার্থনা করে আল্লাহ তার ভাগ্যে তাই লিখে দেন। তারপর আল্লাহই যখন তাকে সত্য অনুসরণ করার মর্যাদা দান করেননি তখন তাকে এ মর্যাদায় অভিষিক্ত করার ক্ষমতা আর কার আছে?

৩৫. এখানে তেলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব। সূরা হজ্জের এ সিজদাটির ব্যাপারে সবাই একমত। তেলাওয়াতের সিজদার তত্বজ্ঞান, তাৎপর্য ও বিধান জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আ'রাফ ১৫৭ টীকা।

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ
وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَهُدُوا
إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾

৩ রুকূ'

(অন্যদিকে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত হতে থাকবে। সেখানে তাদেরকে সোনার কাঁকন ও মুক্তো দিয়ে সাজানো হবে[৩৮] এবং তাদের পোশাক হবে রেশমের। তাদেরকে পবিত্র কথা গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে[৩৯] এবং তাদেরকে দেখানো হয়েছে শ্রেষ্ঠ গুণাবলী সম্পন্ন আল্লাহর পথ।[৪০]

৩৬. এখানে আল্লাহ সম্পর্কে বিরোধকারী সমস্ত দলগুলোকে তাদের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও দুটি পক্ষে বিভক্ত করা হয়েছে। একটি পক্ষ নবীদের কথা মেনে নিয়ে আল্লাহর সঠিক বন্দেগীর পথ অবলম্বন করে। দ্বিতীয় পক্ষ নবীদের কথা মানে না এবং তারা কুফরীর পথ অবলম্বন করে। তাদের মধ্যে বহু মতবিরোধ রয়েছে এবং তাদের কুফরীর বিভিন্ন বিচিত্র রূপও পরিগ্রহ করেছে।

৩৭. ভবিষ্যতে যে বিষয়টির ঘটে যাওয়া একেবারে সুনিশ্চিত তার প্রতি জোর দেবার জন্য সেটি এমনভাবে বর্ণনা করা হয় যেন তা ঘটে গেছে। আগুনের পোশাক বলতে সম্ভবত এমন জিনিস বুঝানো হয়েছে যাকে সূরা ইবরাহীমের ৫০ আয়াতে سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ বলা হয়েছে। ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা ইবরাহীম ৫৮ টীকা।

৩৮. তাদেরকে রাজকীয় ও জাঁকালো পোশাক পরানো হবে, এ ধারণা দেওয়াই এখানে উদ্দেশ্য। কুরআন নাযিলের যুগে রাজা-বাদশাহ ও বড় বড় ধনীরা সোনা ও মণি-মুক্তার অলংকার পরতেন। আমাদের যুগেও উপমহাদেশের রাজা-মহারাজা ও নওয়াবরাও এ ধরনের অলংকার পরতেন।

৩৯. যদিও পবিত্র কথা শব্দের অর্থ ব্যাপক কিন্তু এখানে এর অর্থ হচ্ছে সে কালেমায়ে তাইয়েবা ও সৎ আকীদ-বিশ্বাস যা গ্রহণ করে সে মু'মিন হয়েছে।

৪০. যেমন ইতিপূর্বে ভূমিকায় বলা হয়েছে, আমার মতে এখানে সূরার মক্কী যুগে অবতীর্ণ অংশ শেষ হয়ে যায়। এ অংশের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী মক্কী সূরাগুলোর মতো। এর মধ্যে এমন কোনো আলামতও নেই যা থেকে সন্দেহ করা যেতে পারে যে, সম্ভবত

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَنْ يُرِدْ
فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

যারা কুফরী করেছে৪১ এবং যারা (আজ) আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিচ্ছে আর সেই মসজিদে হারামের যিয়ারতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে৪২ যাকে আমি তৈরি করেছি সব লোকের জন্য যাতে স্থানীয় বাসিন্দা ও বহিরাগতদের অধিকার সমান।৪৩ (তাদের নীতি অবশ্যই শাস্তিযোগ্য) এখানে (মসজিদে হারামে) যে-ই সত্যতা থেকে সরে গিয়ে যুলুমের পথ অবলম্বন করবে৪৪ তাকেই আমি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের স্বাদ আস্বাদান করাবো।

এর পুরো অংশটি বা এর কোনো একটি অংশ মাদানী যুগে নাযিল হয়। শুধুমাত্র এ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ (এ দু'টি দল যাদের মধ্যে তাদের রবের ব্যাপারে বিরোধ আছে) আয়াতটির ব্যাপারে কোনো কোনো তাফসীরকার একথা বলেন যে, এটি মাদানী আয়াত। কিন্তু তাদের এ বক্তব্যের ভিত্তি হচ্ছে শুধুমাত্র এই যে, তারা বদর যুদ্ধের দুই পক্ষকে এখানে দুই পক্ষ ধরেছেন। অথচ এটি কোনো মজবুত ভিত্তি নয়। কারণ, এখানে যে দুই পক্ষের দিকে ইংগিত করা হয়েছে এর আগে ও পরে এমন কোনো জিনিস নেই যা থেকে এ ইংগিতকে বদর যুদ্ধের দুই পক্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট করা যায়। শব্দগুলোর অর্থ ব্যাপক এবং পরবর্তী ইবারত পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে, এখানে কুফর ও ঈমানের এমন বিরোধের কথা বলা হয়েছে যা শুরু থেকে চলে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। এর সম্পর্ক যদি বদর যুদ্ধের দুই পক্ষের সাথে থাকতো তাহলে এর জায়গা হতো সূরা আনফালে, এ সূরায় নয় এবং এ বক্তব্য ধারার মধ্যেও নয়। এ তাফসীর পদ্ধতি যদি সঠিক বলে মেনে নেয়া হয় তাহলে এর অর্থ হবে, কুরআনের আয়াতগুলো একেবারে বিক্ষিপ্তভাবে নাযিল হয়েছে এবং তারপর সেগুলোকে কোনো প্রকার সম্পর্ক-সম্বন্ধ ছাড়াই এমনিই যেখানে ইচ্ছা বসিয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ কুরআনের বক্তব্য উপস্থাপনা ও শৃংখলা এ ধারণাকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে।

৪১. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। পরবর্তী বিষয়বস্তু পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে যে, এখানে মক্কার কাফেরদের কথা বলা হচ্ছে।

৪২. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদেরকে হজ্জ ও উমরাহ করতে দেয় না।

৪৩. অর্থাৎ যা কোনো ব্যক্তি, পরিবার বা গোত্রের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। বরং সর্বসাধারণের জন্য ওয়াকফকৃত, যার যিয়ারত থেকে বাধা দেবার অধিকার কারো নেই।

এখানে ফিকাহর দৃষ্টিতে দু'টি প্রশ্ন দেখা দেয়। ফকীহদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে ঃ

প্রথমত মসজিদে হারাম অর্থ কি ? এটা কি শুধু মসজিদকে বুঝাচ্ছে না সমগ্র মক্কা নগরীকে ?

দ্বিতীয়ত এখানে "আকিফ" (অবস্থানকারী) ও "বাদ" (বহিরাগত)-এর অধিকার সমান হবার অর্থ কি ?

এক দলের মতে এর অর্থ শুধু মসজিদ, সমগ্র মক্কা নগরী নয়। কুরআনের শব্দাবলীর বাহ্যিক অর্থ থেকেই এটা সুস্পষ্ট হয়। এখানে অধিকার সমান হবার অর্থ ইবাদাত করার সমান অধিকার। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত উক্তি থেকে জানা যায় ঃ

يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ مَنْ وَلِّىَ مِنْكُمْ مِنْ اُمُوْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَلاَ يَمْنَعَنَّ اَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ اَوْ صَلّٰى اَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ

"হে আবদে মান্নাফের সন্তানগণ ! তোমাদের যে কেউ জনগণের বিষয়াদির ওপর কোনো প্রকার কর্তৃত্বের অধিকারী হবে তার পক্ষে রাতে ও দিনের কোনো সময় কোনো ব্যক্তির কাবাগৃহের তওয়াফ করা অথবা নামায পড়ায় বাধা দেয়া উচিত নয়।"

এ অভিমতের সমর্থকরা বলেন, মসজিদে হারাম বলতে পুরা হারাম শরীফ মনে করা এবং তারপর সেখানে সবদিক দিয়ে স্থানীয় অধিবাসী ও বাইর থেকে আগতদের অধিকার সমান গণ্য করা ভুল। কারণ মক্কার ঘরবাড়ী ও জমি জমার ওপর লোকদের মালিকানা, অধিকার, উত্তরাধিকার এবং কেনা-বেচা ও ইজারা দেবার অধিকার ইসলামপূর্ব যুগ থেকে প্রতিষ্ঠিত এবং ইসলামের আগমনের পরও প্রতিষ্ঠিত ছিল। এমনকি হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আমলে মক্কার কারাগার নির্মাণের জন্য সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার গৃহ চার হাজার দিরহামে কিনে নেয়া হয়। কাজেই এ সাম্য শুধুমাত্র ইবাদাতের ব্যাপারে, অন্য কোনো বিষয়ে নয়। এটি ইমাম শাফেঈ ও তাঁর সমমনা লোকদের উক্তি।

দ্বিতীয় দলটির মতে, মসজিদে হারাম বলতে মক্কার সমগ্র হারাম শরীফকে বুঝনো হয়েছে। এর প্রথম যুক্তি হচ্ছে, এ সংশ্লিষ্ট আয়াতটিতেই মক্কার মুশরিকদেরকে যে বিষয়ে তিরস্কার করা হয়েছে সেটি হচ্ছে মুসলমানদের হজ্জে বাধা হওয়া। তাদের এ কাজকে এ বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, সেখানে সবার অধিকার সমান। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, হজ্জ কেবল মসজিদে হয় না বরং সাফা ও মারওয়া থেকে নিয়ে মিনা, মুযদালিফা, আরাফাত সবই হজ্জ অনুষ্ঠানের স্থানের অন্তরভুক্ত। তারপর কুরআনে শুধু এক জায়গায়ই নয়, অসংখ্য জায়গায় মসজিদে হারাম বলে সমগ্র হারাম শরীফ ধরা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ

"মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয়া এবং তার অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর কাছে হারাম মাসে যুদ্ধ করার চাইতে বড় গুনাহ।"
(আল বাকারাহ ঃ ২১৭ আয়াত)

বলাবাহুল্য, এখানে মসজিদে হারামে যারা নামায পড়ায় রত তাদেরকে বের করা নয় বরং মক্কা থেকে মুসলমান অধিবাসীদেরকে বের করা বুঝানো হয়ছে। অন্য জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

ذَالِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

"এ সুবিধা তার জন্য যার পরিবারবর্গ মসজিদে হারামের বাসিন্দা নয় ।"
(আল বাকারাহ ঃ ১৯৬)

এখানেও মসজিদে হারাম বলতে সমগ্র মক্কার হারাম শরীফ, নিছক মসজিদ নয়। কাজেই "মসজিদে হারাম" সাম্যকে শুধুমাত্র মসজিদের মধ্যে সাম্য গণ্য করা যেতে পারে না বরং এটি হচ্ছে মক্কার হারামের মধ্যে সাম্য।

তারপর এ দলটি আরো বলে, সাম্য ও সমান অধিকার শুধুমাত্র ইবাদাত, সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে নয় বরং মক্কার হারামে সকল প্রকার অধিকারের ক্ষেত্রে রয়েছে। এ দেশটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বসাধারণের জন্য ওয়াকফকৃত। কাজেই এর এবং এর ইমারত-সমূহের ওপর কারো মালিকানা অধিকার নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক জায়গায় অবস্থান করতে পারে। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারে না এবং কোনো উপবেশনকারীকে উঠিয়ে দিতেও পারে না। এর প্রমাণ স্বরূপ তারা অসংখ্য হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের বাণী ও কর্ম পেশ করে থাকেন। যেমন,

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها

"মক্কা মুসাফিরদের অবতরণস্থল, এর জমি বিক্রি করা যাবে না এবং এর গৃহসমূহের ভাড়া আদায় করাও যাবে না।"

ইবরাহীম নাখঈ সাহাবীর নাম উল্লেখ ছাড়াই একটি (মুরসাল) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

مَكَّةُ حَرَّمَهَا اللّٰهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَلَا اِجَارَةُ بُيُوْتِهَا.

"মক্কাকে আল্লাহ হারাম গণ্য করেছেন। এর জমি বিক্রি করা এবং এর গৃহসমূহের ভাড়া আদায় করা হালাল নয়।"

(উল্লেখ করা যেতে পারে, ইবরাহীম নাখঈর মুরসাল তথা সাহাবীর নাম উল্লেখ ছাড়া বর্ণিত হাদীস মারফু' তথা সাহাবীর নাম উল্লেখ সহ বর্ণিত হাদীসের পর্যায়ভুক্ত)। কারণ, তাঁর সর্বজন পরিচিত নিয়ম হচ্ছে, যখন তিনি সাহাবীর নাম উল্লেখ ছাড়াই (মুরসাল) কোনো হাদীস বর্ণনা করেন তখন আসলে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) মাধ্যমেই বর্ণনা

করেন। মুজাহিদও প্রায় এ একই শব্দাবলীর মাধ্যমে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। 'আলকামাহ ইবনে ফাদলাহ বর্ণনা করেছেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর, উমর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমের আমলে মক্কার জমিকে পতিত জমি মনে করা হতো। যার প্রয়োজন হতো এখানে থাকতো এবং প্রয়োজন ফুরালে অন্য কাউকে বসিয়ে দিতো।"

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর (রা) হুকুম দিয়েছিলেন যে, হজ্জের সময় মক্কার কোনো লোক নিজের দরজা বন্ধ করতে পারবে না। বরং মুজাহিদ বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা) মক্কাবাসীদেরকে নিজেদের বাড়ির আঙিনা খোলা রাখার হুকুম দিয়ে রেখেছিলেন এবং আগমনকারীদেরকে তাদের ইচ্ছামতো স্থানে অবস্থান করতে দেয়ার জন্য আঙিনায় দরজা বসাতে নিষেধ করতেন। আতাও এ একই কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, হযরত উমর (রা) একমাত্র সোহাইল ইবনে আমরকে আঙিনায় দরজা বসাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। কারণ, ব্যবসায় ব্যাপদেশে তাঁকে নিজের উট সেখানে আটকে রাখতে হতো।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, যে ব্যক্তি মক্কার গৃহের ভাড়া নেয় সে নিজের পেট আগুন দিয়ে ভরে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) উক্তি হচ্ছে, আল্লাহ মক্কার সমগ্র হারামকে মসজিদ বানিয়ে দিয়েছেন। সেখানে সবার অধিকার সমান। বাইরের লোকদের থেকে ভাড়া আদায় করার কোনো অধিকার মক্কার লোকদের নেই।

উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) মক্কার গভর্ণরের নামে ফরমান জারি করেন যে, মক্কার গৃহের ভাড়া নেয়া যাবে না। কারণ, এটা হারাম।

এসব রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে বিপুল সংখ্যক তাবেঈ এমত পোষণ করেন এবং ফকীহগণের মধ্যে ইমাম মালেক (র), ইমাম আবু হানীফা (র), সুফিয়ান সওয়ারী (র), আহমদ ইবনে হাম্বল (র) ও ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইয়াহও এ মতের অনুসারী হয়েছেন যে, মক্কার জমি বেচা-কেনা করা এবং কমপক্ষে হজ্জ মওসূমে মক্কার গৃহের ভাড়া আদায় করা জায়েয নয়। তবে অধিকাংশ ফকীহ মক্কার গৃহসমূহের ওপর জনগণের মালিকানা অধিকার স্বীকার করেছেন এবং জমি হিসেবে নয়, গৃহ হিসেবে সেগুলো বেচা-কেনা বৈধ গণ্য করেছেন।

এ অভিমতটিই আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নাত ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের কাছাকাছি মনে হয়। কারণ, আল্লাহ দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানদের ওপর হজ্জ এ জন্য ফরয করেননি যে, এটা মক্কার মুসলমানদের উপার্জনের একটা উপায় হবে এবং যেসব মুসলমান ফরয পালনের জন্য বাধ্য হয়ে সেখানে যাবে তাদের কাছ থেকে সেখানকার গৃহমালিক ও জমি মালিকগণ ভাড়া আদায় করে লুটের বাজার গরম করবেন। বরং সেগুলো সকল ঈমানদারের জন্য ব্যাপকভাবে ওয়াকফকৃত। তার জমির ওপর কারোর মালিকানা নেই। প্রত্যেক যিয়ারতকারী তার ইচ্ছামত যে কোনো জায়গায় অবস্থান করতে পারে।

৪৪. এখানে নিছক কোনো বিশেষ কাজ নয় বরং এমন প্রত্যেকটি কাজই বুঝানো হয়েছে যা সত্য থেকে বিচ্যুত এবং জুলুমের সংজ্ঞার আওতায় পড়ে। যদিও সকল অবস্থায়

এ ধরনের কাজ করা পাপ কিন্তু হারাম শরীফে একাজ করা আরো অনেক বেশী মারাত্মক পাপ। মুফাস্‌সিরগণ বিনা প্রয়োজনে কসম খাওয়াকে পর্যন্ত হারাম শরীফের মধ্যে বেদীনী গণ্য করেছেন এবং একে এ আয়াতের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ সমস্ত সাধারণ গোনাহ ছাড়া হারাম শরীফের মর্যাদার সাথে জড়িত যে বিশেষ বিধানগুলো আছে সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করা সুস্পষ্টভাবে গোনাহের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে। যেমন ঃ

হারামের বাইরে যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে অথবা এমন কোনো অপরাধ করে যার ফলে তার ওপর শরীয়াত নির্ধারিত শাস্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং তারপর সে হারাম শরীফে আশ্রয় নেয়, তাহলে যতক্ষণ সে সেখানে থাকে তার ওপর হস্তক্ষেপ করা যাবে না। হারামের এ মর্যাদা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সময় থেকে চলে আসছে। মক্কা বিজয়ের দিন শুধুমাত্র কিছুক্ষণের জন্য এ হুরমত উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল তারপর আবার চিরকালের জন্য তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কুরআন বলেছে ঃ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا "যে এর মধ্যে প্রবেশ করলো সে নিরাপত্তাধীন হয়ে গেলো।" বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াতে হযরত উমর, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে, যদি আমরা নিজেদের পিতৃহন্তাকেও সেখানে পাই তাহলে তার গায়েও হাত দেবো না। এ কারণে অধিকাংশ তাবেঈ, হানাফী, হাম্বলী ও আহলে হাদীস উলামা হারামের বাইরে অনুষ্ঠিত অপরাধের শাস্তি হারামের মধ্যে দেয়া যেতে পারে না বলে মত পোষণ করেন।

সেখানে যুদ্ধ ও রক্তপাত হারাম। মক্কা বিজয়ের পর দ্বিতীয় দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "হে লোকেরা ! আল্লাহ সৃষ্টির শুরু থেকেই মক্কাকে হারাম করেছেন এবং আল্লাহর মর্যাদাদানের কারণে কিয়ামত পর্যন্ত এটি মর্যাদাসম্পন্ন তথা হারাম। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তার জন্য এখানে রক্ত প্রবাহিত করা হালাল নয়।" তারপর তিনি বলেছিলেন, "যদি আমার এ যুদ্ধকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে কোনো ব্যক্তি এখানে রক্তপাত বৈধ করে নেয় তাহলে তাকে বলে দাও, আল্লাহ তাঁর রসূলের জন্য এটা বৈধ করেছিলেন, তোমার জন্য নয়। আর আমার জন্যও এটা মাত্র একটি দিনের একটি সময়ের জন্য হালাল করা হয়েছিল, আবার আজ গতকালের মতই তার হারাম হওয়ার হুকুম সেই একইভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

সেখানকার প্রাকৃতিক গাছপালা কাটা যেতে পারে না। জমিতে স্বতঃ উৎপাদিত ঘাস তুলে ফেলা যেতে পারে না এবং পাখ-পাখালী ও অন্যান্য জন্তু জানোয়ার শিকার করাও যেতে পারে না। হারামের বাইরে শিকার করার জন্য সেখান থেকে প্রাণীদের তাড়িয়ে বাইরে আনাও যেতে পারে না। শুধুমাত্র সাপ, বিছা ইত্যাদি অনিষ্টকারী প্রাণীগুলো এর অন্তরভুক্ত নয়। আর ইযখির (এক ধরনের সুগন্ধি ঘাস) ও শুকনা ঘাসকে স্বতঃউৎপাদিত ঘাস থেকে আলাদা করা হয়েছে। এসব ব্যাপারে সহী হাদীসসমূহে পরিষ্কার বিধান রয়েছে।

সেখানকার পড়ে থাকা জিনিস উঠানো নিষেধ। যেমন আবু দাউদে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُقْطَةِ الْحَاجِّ

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَّطَهِّرْ
بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ
بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَّعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾
لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ
مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

৪ রুকূ'

স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন আমি ইবরাহীমের জন্য এ ঘরের (কাবাঘর) জায়গা নির্ধারণ করেছিলাম (এ নির্দেশনা সহকারে) যে, আমার সাথে কোনো জিনিসকে শরীক করবে না এবং আমার ঘরকে তাওয়াফকারী ও রুকূ'-সিজদা-কিয়ামকারীদের জন্য পবিত্র রাখো[৪৫] এবং লোকদেরকে হজ্জের জন্য সাধারণ হুকুম দিয়ে দাও, তারা প্রত্যেকে দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে ও উটের পিঠে চড়ে[৪৬] তোমার কাছে আসবে,[৪৭] যাতে এখানে তাদের জন্য যে কল্যাণ রাখা হয়েছে তা তারা দেখতে পায়[৪৮] এবং তিনি তাদেরকে যেসব পশু দান করেছেন তার উপর কয়েকটি নির্ধারিত দিনে আল্লাহর নাম নেয়[৪৯] নিজেরাও খাও এবং দুর্দশাগ্রস্ত অভাবীকেও খাওয়াও।[৫০]

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজীদের পড়ে থাকা জিনিস উঠাতে নিষেধ করে দিয়েছেন।"

যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরাহর নিয়তে আসে সে ইহরাম না বেঁধে সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। তবে অন্য কোনো নিয়তে সেখানে প্রবেশকারীর জন্য ইহরাম বাঁধা অপরিহার্য কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। ইবনে আব্বাসের মত হচ্ছে, কোনো অবস্থায়ই ইহরাম না বেঁধে সেখানে প্রবেশ করা যেতে পারে না। ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেঈর একটি করে উক্তিও এ মতের সপক্ষে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে এই যে, একমাত্র তাদের এই ইহরাম বাঁধতে হবে না যাদের নিজেদের কাজের জন্য বারবার সেখানে যাওয়া-আসা করতে হয়। বাকি সবাইকে ইহরাম বাঁধতে হবে। এটি হচ্ছে ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেঈর দ্বিতীয় উক্তি। তৃতীয় মতটি হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি মীকাতের (হারাম শরীফের মধ্যে প্রবেশের সময় যেখান থেকে ইহরাম বাঁধতে হয়) সীমানার মধ্যে বাস করে সে ইহরাম না বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু মীকাতের সীমানার বাইরে অবস্থানকারীরা বিনা ইহরামে মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। এটি ইমাম আবু হানীফার উক্তি।

৪৫. কোনো কোনো মুফাস্‌সির হযরত ইবরাহীমকে (আ) যে ফরমান দেয়া হয়েছিল "পবিত্র রাখো" পর্যন্তই তা শেষ করে দিয়েছেন এবং "হজ্জের জন্য সাধারণ হুকুম দিয়ে দাও" নির্দেশটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে উচ্চারিত হয়েছে বলে মনে করেছেন। কিন্তু বক্তব্যের ধরন পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, এ সম্বোধনও হযরত ইবরাহীমের প্রতিই করা হয়েছে এবং তাঁকে কাবাঘর নির্মাণের সময় যে হুকুম দেয়া হয়েছিল এটি তারই একটি অংশ। এ ছাড়াও এখানে বক্তব্যের মূল লক্ষ হচ্ছে একথা বলা যে, প্রথম দিন থেকেই এ ঘরটি এক আল্লাহর বন্দেগী করার জন্য তৈরী করা হয়েছিল এবং আল্লাহর বন্দেগীকারী সকল মানুষের এখানে আসার সাধারণ অনুমতি ছিল।

৪৬. মূলে ضامر শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি বিশেষ করে শীর্ণ ও ক্ষীণকায় উটের প্রতিশব্দ হিসেবে বলা হয়ে থাকে। এর উদ্দেশ্য এমন সব মুসাফিরের ছবি তুলে ধরা যারা দূর-দূরান্ত থেকে চলে আসছে এবং পথে তাদের উটগুলো খাদ্য ও পানীয় না পাওয়ার কারণে শীর্ণকায় হয়ে গেছে।

৪৭. শুরুতে হযরত ইবরাহীমকে যে হুকুম দেয়া হয়েছিল এখানে তা শেষ হয়ে যাচ্ছে। সামনের দিকে যা বলা হয়েছে তা এর সাথে বাড়তি সংযোজন। অতিরিক্ত ব্যাখ্যা হিসেবে এ সংযোজন করা হয়েছে। আমাদের এ অভিমতের কারণ হচ্ছে এই যে, "এই প্রাচীন গৃহের তাওয়াফ করে" পর্যন্তই এই বক্তব্য শেষ হয়ে গেছে। এটি কাবাঘর নির্মাণের কাজ শেষ হবার সময় বলা হয়ে থাকবে। (হযরত ইবরাহীমের কাবাঘর নির্মাণ সংক্রান্ত আরো বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য দেখুন সূরা বাকারার ১২৫-১২৯, আলে ইমরান ৯৬-৯৭ এবং ইবরাহীম ৩৫-৪১ আয়াত)

৪৮. এখানে কেবলমাত্র দীনী কল্যাণের কথাই বলা হয়নি, এর সাথে পার্থিব কল্যাণও সংযুক্ত রয়েছে। এ কাবাঘর ও হজ্জের বরকতই হযরত ইবরাহীমের (আ) যুগ থেকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ পর্যন্ত আড়াই হাজার বছর ধরে আরবরা একটি ঐক্যকেন্দ্র লাভ করেছে। এটিই তাদের আরবীয় অস্তিত্বকে গোত্রবাদের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা করেছে। কেন্দ্রের সাথে এর সংযুক্তি এবং হজ্জের জন্য প্রতি বছর দেশের সব এলাকা থেকে লোকদের এখানে আসা যাওয়ার কারণে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি এক থাকে, তাদের মধ্যে আরব হবার অনুভূতি জাগ্রত থাকে এবং তারা চিন্তা ও তথ্য সরবরাহ এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পদ্ধতির প্রচার ও প্রসারের সুযোগ লাভ করে। তারপর এ হজ্জের বরকতই আরবের যাবতীয় সন্ত্রাস, বিশৃংখলা ও নিরাপত্তাহীনতা অন্তত চারমাসের জন্য স্থগিত হয়ে যেতো এবং সে সময় এমন ধরনের নিরাপত্তা লাভ করা যেতো যার মধ্যে দেশের সকল এলাকার লোকেরা সফর করতে পারতো এবং বাণিজ্য কাফেলাও নিরাপদে চলাফেরা করতে সক্ষম হতো। এজন্য আরবের অর্থনৈতিক জীবনের জন্যও হজ্জ একটি রহমত ছিল। আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আলে ইমরান ৮০-৮১ এবং আল মায়েদাহ ১১৩ টীকা।

ইসলামের আগমনের পরে হজ্জের দীনী কল্যাণের সাথে সাথে পার্থিব কল্যাণও কয়েকগুণ বেশী হয়ে গেছে। প্রথমে তা ছিল কেবলমাত্র আরবের জন্য রহমত, এখন হয়ে গেছে সারা দুনিয়ার তাওহীদবাদীদের জন্য রহমত।

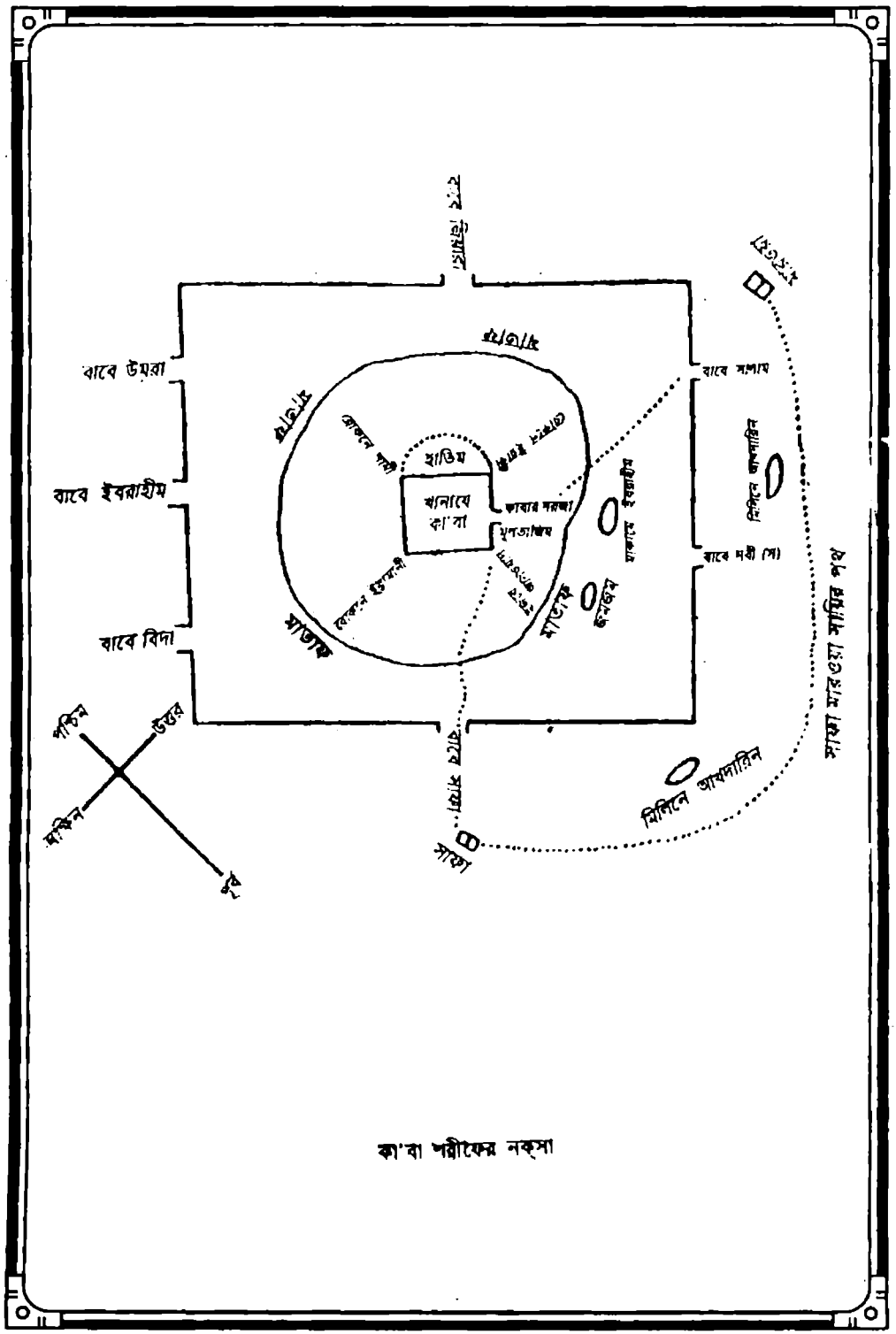
বাবে উমরা
বাবে ইবরাহীম
বাবে বিদা
বাবে সালাম
বাবে নবী (স)
হাতিম
খানাযে কা'বা
কাবার দরজা
মুলতাজিম
মাতাফ
মিলিনে আযদারিন
সাফা মারওয়া সাঈর পথ
পশ্চিম
উত্তর
দক্ষিন
পূব

কা'বা শরীফের নক্সা

৪৯. পশু বলতে এখানে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ উট, গরু, ছাগল, ভেড়া যেমন সূরা আনআমের ১৪২-১৪৪ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

তাদের উপর আল্লাহর নাম নেবার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর নামে এবং তাঁর নাম উচ্চারণ করে তাদেরকে যবেহ করা যেমন পরবর্তী বাক্য নিজেই বলে দিচ্ছে। কুরআন মজীদে কুরবানীর জন্য সাধারণভাবে "পশুর উপর আল্লাহর নাম নেয়া"র পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং সব জায়গায়ই এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নামে পশু যবেহ করা। এভাবে যেন এ সত্যটির ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর নাম না নিয়ে অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে পশু যবেহ করা কাফের ও মুশরিকদের পদ্ধতি। মুসলমান যখনই পশু যবেহ করবে আল্লাহর নাম নিয়ে করবে এবং যখনই কুরবানী করবে আল্লাহর জন্য করবে।

কয়েকটি নির্ধারিত দিন বলতে কোন্ দিনের কথা বুঝানো হয়েছে ? এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। একটি মত হচ্ছে, এর অর্থ, যিলহজ্জের প্রথম দশটি দিন। ইবনে আব্বাস (রা), হাসান বসরী, ইবরাহীম নখ্‌ঈ, কাতাদাহ এবং অন্যান্য বহু সাহাবী ও তাবেঈনের এ মত উদ্ধৃত হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (র)-ও এ মতের পক্ষে। ইমাম শাফেঈ (র) ও ইমাম আহমদেরও (র) একটি উক্তি এর সমর্থনে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে, এর অর্থ, ইয়াওমুন নাহর (অর্থাৎ ১০ যিলহজ্জ) এবং তার পরের তিন দিন। এর সমর্থনে ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে উমর (রা), ইবরাহীম নখ্‌ঈ, হাসান ও আতার উক্তি পেশ করা হয়। ইমাম শাফেঈ (র) ও ইমাম আহমদেরও (র) একটি উক্তি এর সমর্থনে পাওয়া যায়। তৃতীয় মতটি হচ্ছে, এর অর্থ তিন দিন তথা ইয়াওমুন নাহর (কুরবানীর ঈদের দিন) এবং এর পরের দু'দিন। এর সমর্থনে হযরত উমর (রা), আলী (রা), ইবনে উমর (রা), ইবনে আব্বাস (রা), আনাস ইবনে মালিক (রা), আবু হুরাইরাহ (রা), সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব (রা) ও সাঈদ ইবনে জুবায়েরের (রা) উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। ফকীহগণের মধ্য থেকে সুফিয়ান সাওরী (র), ইমাম মালেক (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এ মতটি গ্রহণ করেছেন। হানাফী ও মালেকী মাযহাবে এ মতের ভিত্তিতেই ফতোয়া দেয়া হয়েছে। এছাড়া কিছু একক উক্তি আছে। যেমন কেউ কুরবানীর দিনগুলোকে পহেলা মহররমের দিন পর্যন্ত দীর্ঘ করেছেন। কেউ শুধুমাত্র ইয়াওমুন নাহরের মধ্যেই তাকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। কেউ ইয়াওমুন নাহরের পরে মাত্র আর একদিন কুরবানীর দিন হিসেবে স্বীকার করেছেন। কিন্তু এগুলো দুর্বল উক্তি। এসবের পেছনে শক্তিশালী যুক্তি প্রমাণ নেই।

৫০. কেউ কেউ এ বক্তব্যের এ অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, খাওয়া ও খাওয়ানো উভয়টিই ওয়াজিব। কারণ, এখানে আদেশসূচক ক্রিয়াপদের মাধ্যমে হুকুম দেয়া হয়েছে। অন্য একটি দলের মতে, খাওয়া হচ্ছে মুস্তাহাব এবং খাওয়ানো ওয়াজিব। ইমাম মালিক (র) ও ইমাম শাফেঈ (র) এ মত প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় দল বলেন, খাওয়া ও খাওয়ানো দু'টোই মুস্তাহাব। খাওয়া মুস্তাহাব হবার কারণ হচ্ছে এই যে, জাহেলী যুগে লোকেরা নিজেদের কুরবানীর গোশত নিজেদের খাওয়া নিষেধ মনে করতো। আর খাওয়ানো এজন্য পছন্দনীয় যে, এর মাধ্যমে গরীবদের সাহায্য ও সহযোগিতা করা হয়। এটি ইমাম আবু

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾
ذَٰلِكَ ۖ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتْ
لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ
وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَن
يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ
الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾

তারপর নিজেদের ময়লা দূর করে,[৫১] নিজেদের মানত পূর্ণ করে[৫২] এবং এ প্রাচীন গৃহের তাওয়াফ করে।[৫৩]

এ ছিল (কাবা নির্মাণের উদ্দেশ্য) এবং যে কেউ আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলোকে সম্মান করবে, তার রবের কাছে এ হবে তারই জন্য ভালো।[৫৪]

আর তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু হালাল করে দেয়া হয়েছে,[৫৫] সেগুলো ছাড়া যেগুলো তোমাদের বলে দেয়া হয়েছে।[৫৬] কাজেই মূর্তিসমূহের আবর্জনা থেকে বাঁচো,[৫৭] মিথ্যা কথা থেকে দূরে থাকো,[৫৮] একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ে গেলো। এখন হয় তাকে পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে অথবা বাতাস তাকে এমন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে দেবে যেখানে সে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।[৫৯]

হানীফার (র) মত। হাসান বসরী, আতা, মুজাহিদ ও ইবরাহীম নাখ্‌ঈ থেকে ইবনে জারীর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, فَكُلُوْا مِنْهَا এর মধ্যে আদেশসূচক ক্রিয়াপদ ব্যবহারের কারণে খাওয়া ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। এ হুকুমটি ঠিক তেমনি যেমন বলা হয়েছে وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا "যখন তোমরা ইহরামের অবস্থা থেকে বের হয়ে আসো তখন আবার শিকার করো।" (আল মায়েদাহ ঃ ২) এবং فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ "তারপর যখন শেষ হয়ে যায় তখন আবার পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ো।" (আল জুমআহ ঃ ১০) এর অর্থ এই নয় যে, ইহরাম থেকে বের হয়ে শিকার করা এবং জুমআর নামায শেষে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়া ওয়াজিব। বরং এর অর্থ হচ্ছে ঃ এরপর এমনটি করার পথে কোনো বাধা নেই। অনুরূপভাবে এখানেও যেহেতু

লোকেরা কুরবানীর গোশত নিজেদের খাওয়া নিষিদ্ধ মনে করতো তাই বলা হয়েছে ঃ না, তা খাও অর্থাৎ এটা মোটেই নিষিদ্ধ নয়।

দুর্দশাগ্রস্ত অভাবীকে আহার করানোর ব্যাপারে যা বলা হয়েছে তার অর্থ এ নয় যে, সচ্ছল বা ধনী ব্যক্তিকে আহার করানো যেতে পারে না। বন্ধু, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন অভাবী না হলেও তাদেরকে কুরবানীর গোশত দেয়া জায়েয। এ বিষয়টি সাহাবায়ে কেরামের কার্যাবলী থেকে প্রমাণিত। আলকামা বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আমার হাতে কুরবানীর পশু পাঠান এবং নির্দেশ দেন, কুরবানীর দিন একে যবেহ করবে, নিজে খাবে, মিসকীনদেরকে দেবে এবং আমার ভাইয়ের ঘরে পাঠাবে। ইবনে উমরও (রা) একই কথা বলেছেন। অর্থাৎ একটি অংশ খাও, একটি অংশ প্রতিবেশীদেরকে দাও এবং একটি অংশ মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করো।

৫১. অর্থাৎ ইয়াওমুন নাহরে (১০ যিলহজ্জ) কুরবানীর কাজ শেষ করার পর ইহরাম খুলে ফেলবে, ক্ষৌরকর্ম করবে, গোছল করবে, কাপড়-চোপড় ধুয়ে ফেলবে এবং ইহরাম অবস্থায় যেসব নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছিল সেগুলো খতম করে দেবে। تَفَثَ এর আসল আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সফরকালে যেসব ধূলো-ময়লা মানুষের গায়ে লেগে যায়। কিন্তু হজ্জ প্রসংগে যখন ধূলো-ময়লা দূর করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তখন এর সে একই অর্থ গ্রহণ করা হবে যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, হাজী যতক্ষণ পর্যন্ত হজ্জের আনুষ্ঠানিক কার্যাবলী ও কুরবানীর কাজ শেষ না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি চুল ও নখ কাটতে পারবেন না এবং শরীরের অন্য কোনো পরিচ্ছন্নতার কাজও করতে পারবেন না। (এ প্রসংগে একথা জেনে নেয়া উচিত যে, কুরবানীর কাজ শেষ করার পর অন্যান্য যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যায় কিন্তু স্ত্রীর কাছে যাওয়া ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ হয় না যতক্ষণ না "তাওয়াফে ইফাদাহ" শেষ করা হয়।)

৫২. অর্থাৎ এ সময়ের জন্য যে ব্যক্তি কোনো মানত করে।

৫৩. কাবাঘরের জন্য اَلْعَتِيْقِ। بَيْتُ শব্দ অত্যন্ত অর্থবহ। "আতীক" শব্দটি আরবী ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি অর্থ হচ্ছে প্রাচীন। দ্বিতীয় অর্থ স্বাধীন, যার ওপর কারোর মালিকানা নেই। তৃতীয় অর্থ সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ। এ তিনটি অর্থই এ পবিত্র ঘরটির বেলায় প্রযোজ্য।

তাওয়াফ বলতে "তাওয়াফে ইফাদাহ" অর্থাৎ তাওয়াফে যিয়ারত বুঝানো হয়েছে। ইয়াওমুন নাহরে (কুরবানীর দিন) কুরবানী করার ও ইহরাম খুলে ফেলার পর এ তাওয়াফ করা হয়। এটি হজ্জের রোকন তথা ফরযের অন্তরভুক্ত। আর যেহেতু ধূলা-ময়লা দূর করার হুকুমের সাথে সাথেই এর উল্লেখ করা হয়েছে তাই এ বক্তব্য একথা প্রকাশ করে যে, কুরবানী করার এবং ইহরাম খুলে গোসল করে নেবার পর এ তাওয়াফ করা উচিত।

৫৪. আপাতদৃষ্টিতে এটা একটা সাধারণ উপদেশ। আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত সকল মর্যাদাশালী জিনিসের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য একথা বলা হয়েছে। কিন্তু মসজিদে হারাম, হজ্জ, উমরাহ ও মক্কার হারামের যেসব মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এ বক্তব্যের সেগুলোই প্রধানতম উদ্দেশ্য। তাছাড়া এর মধ্যে এ মর্মে একটি সূক্ষ্ম ইংগিতও রয়েছে যে, কুরাইশরা

হারাম থেকে মুসলমানদেরকে বের করে দিয়ে, তাদের জন্য হজ্জের পথ বন্ধ করে দিয়ে হজ্জের কার্যক্রমের মধ্যে জাহেলী ও মুশরীকী রীতিনীতি অন্তরভুক্ত করে এবং আল্লাহর ঘরকে শিরকের আবর্জনায় দূষিত, কলুষিত করে এমন বহু মর্যাদাশালী জিনিসের মর্যাদা বিনষ্ট করে দিয়েছে যেগুলোর মর্যাদা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সময় থেকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল।

৫৫. এ প্রসংগে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর হালাল হওয়ার কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে দু'টি ভুল ধারণা দূর করা। প্রথমত কুরাইশ ও আরবের মুশরিকরা "বাহীরা", "সায়েবা", "অসীলা" ও "হাম"কেও আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত মর্যাদাসমূহের মধ্য গণ্য করতো। তাই বলা হয়েছে, এগুলো তাঁর প্রতিষ্ঠিত মর্যাদা নয়। বরং তিনি সমস্ত গৃহপালিত পশু হালাল করেছেন। দ্বিতীয়ত ইহরাম অবস্থায় যেভাবে শিকার করা হারাম তেমনিভাবে যেন একথা মনে না করা হয় যে, গৃহপালিত জন্তু যবেহ করা ও খাওয়াও হারাম। তাই বলা হয়েছে, এগুলো আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত মর্যাদাসমূহের মধ্যে গণ্য নয়।

৫৬. সূরা আনআম ও সূরা নাহলে যে হুকুম দেয়া হয়েছে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ যেসব জিনিস হারাম করেছেন সেগুলো হচ্ছে ঃ মৃত, রক্ত, শুয়োরের মাংস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে যবেহ করা পশু। আনআম, ১৪৫ ও নাহল, ১১৫ আয়াত।

৫৭. অর্থাৎ মূর্তিপূজা থেকে এমনভাবে দূরে থাকো যেমন দুর্গন্ধময় ময়লা আবর্জনা থেকে মানুষ নাকে কাপড় দিয়ে দূরে সরে আসে। অন্য কথায় বলা যায়, তা যেন নাপাক ও ময়লা আবর্জনায় পরিপূর্ণ এবং কাছে যাবার সাথে সাথেই মানুষ তার সংস্পর্শ লাভ করে নাপাক ও নোংরা হয়ে যাবে।

৫৮. যদিও শব্দগুলো এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এ থেকে প্রত্যেকটি মিথ্যা, অপবাদ ও মিথ্যা সাক্ষের হারাম হওয়া প্রমাণ হয় তবুও এ আলোচনায় বিশেষভাবে এমনসব বাতিল আকিদা-বিশ্বাস, বিধি-বিধান, রীতি-রেওয়াজ ও কল্পনা-কুসংস্কারের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যেগুলোর ওপর কুফরী ও শিরকের ভিত গড়ে উঠেছে। আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক করা এবং তাঁর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারে তাঁর বান্দাদেরকে অংশীদার করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। এ থেকে এখানে নিষেধ করা হয়েছে। আবার আরবের মুশরিকরা যে মিথ্যার ভিত্তিতে "বাহীরা", "সায়েবা" ও "হাম" ইত্যাদিকে হারাম গণ্য করতো তাও এ ফরমানের সরাসরি আওতাধীনে এসে যায়। যেমন সূরা আন নাহল-এ বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ـ

"আর তোমাদের কণ্ঠ যে মিথ্যা বিধান দিয়ে থাকে যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম, এ ধরনের বিধান দিয়ে আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করো না।" (১১৬ আয়াত)

এ সংগে মিথ্যা সাক্ষ ও মিথ্যা কসমও একই বিধানের আওতায় আসে। যেমন বিভিন্ন সহীহ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেনঃ

عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله

"মিথ্যা সাক্ষ দেওয়াকে আল্লাহর সাথে শিরক করার সমান পর্যায়ে রাখা হয়েছে।"

এরপর তিনি প্রমাণ হিসেবে এ আয়াতটি পেশ করেছেন। ইসলামী আইনে এ অপরাধটি শাস্তিযোগ্য। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদের (র) ফতোয়া হচ্ছে, যে ব্যক্তি আদালতে মিথ্যা সাক্ষদাতা প্রমাণিত হয়ে যাবে তার নাম চারদিকে প্রচার করে দিতে হবে এবং তাকে দীর্ঘকাল অন্তরীণ রাখার শাস্তি দিতে হবে। হযরত উমরও (রা) একথাই বলেছেন এবং কার্যত এ পদক্ষেপই নিয়েছেন। মাকহূলের বর্ণনা হচ্ছে হযরত উমর (রা) বলেন,

يضرب ظهره ويحلق راسه ويسخم وجهه ويطال حبسه

"তার পিঠে চাবুক মারতে হবে, মাথা ন্যাড়া করে দিতে হবে, মুখ কালো করে দিতে হবে এবং দীর্ঘদিন অন্তরীণ রাখার শাস্তি দিতে হবে।"

আবদুল্লাহ ইবনে আমের নিজের পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ হযরত উমরের (রা) আদালতে এক ব্যক্তির সাক্ষ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ফলে তিনি তাকে একদিন প্রকাশ্য জনসমাগমের স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখেন এবং ঘোষণা করে দেন যে, এ ব্যক্তি হচ্ছে ওমুকের ছেলে ওমুক, এ মিথ্যা সাক্ষ দিয়েছে, একে চিনে রাখো। তারপর তাকে কারাগারে আটক করেন। বর্তমান কালে এ ধরনের লোকের নাম খবরের কাগজে ছেপে দিলেই ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে।

৫৯. এ উপমায় আকাশ বলতে বুঝানো হয়েছে মানুষের স্বাভাবিক অবস্থাকে। এ অবস্থায় সে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো বান্দা হয় না এবং তার প্রকৃতি তাওহীদ ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে চেনে না। মানুষ যদি নবী প্রদত্ত পথ-নির্দেশনা গ্রহণ করে তাহলে সে জ্ঞান ও অন্তরদৃষ্টি সহকারে এ প্রাকৃতিক অবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এবং পরবর্তী পর্যায়ে সে নিচের দিকে নয় বরং উপরের দিকে উঠতে থাকে। কিন্তু শিরক (এবং শুধুমাত্র শিরকই নয় বরং জড়বাদ ও নাস্তিক্যবাদও) গ্রহণ করার সাথে সাথেই সে নিজের প্রকৃতির আকাশ থেকে ধপাস করে নিচে পড়ে যায়। তখন সে অনিবার্যভাবে দু'টি অবস্থার যে কোনোটির মুখোমুখি হয়। একটি অবস্থা হচ্ছে, শয়তান ও বিপথে পরিচালনাকারী মানুষ, যাদেরকে এ উপমায় শিকারী পাখির সাথে তুলনা করা হয়েছে, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং প্রত্যেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। আর দ্বিতীয় অবস্থাটি হচ্ছে, তার নিজের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা, তার আবেগ, অনুভূতি ও চিন্তাধারা, যাদেরকে বাতাসের সাথে তুলনা করা হয়েছে, তাকে উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত কোনো গভীর খাদে নিক্ষেপ করে।

মূলে "সহীক" শব্দ বলা হয়েছে এটি 'সাহক' থেকে উৎপন্ন হয়েছে। "সাহক"-এর আসল মানে হচ্ছে পিষ্ট করা। কোনো জায়গাকে এমন অবস্থায় "সাহীক" বলা হয় যখন তা

ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ﴿٣٢﴾ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿٣٣﴾

এ হচ্ছে আসল ব্যাপার (এটি বুঝে নাও), আর যে ব্যক্তি আল্লাহ নির্ধারিত রীতিনীতির[৬০] প্রতি সম্মান দেখায়, তার সে কাজ তার অন্তরের আল্লাহভীতির পরিচায়ক।[৬১]

একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের ঐ সমস্ত (কুরবানীর পশু) থেকে উপকারলাভের অধিকার আছে।[৬২] তারপর ওগুলোর (কুরবানী করার) জায়গা এ প্রাচীন ঘরের নিকটেই।[৬৩]

এতবেশী গভীর হয় যে, তার মধ্যে কোনো জিনিস পড়ে গেলে তা টুকরো টুকরো বা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এখানে চিন্তা ও নৈতিক চরিত্রের অধোপতনকে এমন গভীর খাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে যার মধ্যে পড়ে গিয়ে মানুষের সমস্ত কলকব্জা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

৬০. অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের চিহ্ন এটি কোনো কাজ হতে পারে। যেমন নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি অথবা কোনো জিনিসও হতে পারে যেমন মসজিদ, কুরবানীর জন্য হাজীদের সংগে নেয়া উট ইত্যাদি। আরো বেশী ব্যাখার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মায়েদাহ, ৫ টীকা।

৬১. অর্থাৎ এ সম্মান প্রদর্শন হৃদয় অভ্যন্তরের তাকওয়ার ফল এবং মানুষের মনে যে কিছু না কিছু আল্লাহর ভয় আছে তা এরি চিহ্ন। তাইতো সে তাঁর নিদর্শনসমূহের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করছে। অন্য কথায় যদি কোনো ব্যক্তি জেনে বুঝে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অমর্যাদা করে তাহলে এটা একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তার মনে আল্লাহর ভয় নেই। অথবা সে আল্লাহকে স্বীকারই করে না কিংবা স্বীকার করলেও তাঁর মোকাবিলায় বিদ্রোহাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছে।

৬২. পূর্বের আয়াতে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এবং তাকে মনের তাকওয়ার আলামত হিসেবে চিহ্নিত করার পর এ বাক্যটি একটি বিভ্রান্তি দূর করার জন্য বলা হয়েছে। হাজীদের সাথে আনা কুরবানীর পশুও আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তরভুক্ত। যেমন আরববাসীরা স্বীকার করতো এবং কুরআন নিজেই পরবর্তী পর্যায়ে বলছে ঃ

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ.

"এবং এ সমস্ত কুরবানীর উটকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তরভুক্ত করেছি।"

এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান দেখানোর যে হুকুম উপরে দেয়া হয়েছে তার দাবী কি এই যে, কুরবানীর পশুগুলোকে যখন আল্লাহর ঘরের দিকে

নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাদেরকে কোনোভাবে ব্যবহার করা যাবে না ? তাদের পিঠে চড়া অথবা পিঠে জিনিসপত্র চাপিয়ে দেয়া কিংবা তাদের দুধ পান করা কি আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান দেখাবার বিরোধী নয় ? আরবের লোকেরা একথাই মনে করতো। তারা এ পশুগুলোকে একেবারেই আরোহীশূন্য অবস্থায় সুসজ্জিত করে নিয়ে যেতো। পথে তাদের থেকে কোনো প্রকার লাভবান হওয়া তাদের দৃষ্টিতে ছিল পাপ। এ ভুল ধারণা দূর করার জন্য এখানে বলা হচ্ছে, কুরবানীর জায়গায় পৌঁছে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোমরা এ পশুদের থেকে লাভবান হতে পারো। এটা আল্লার নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিরোধী নয়। একথাটিই এ সম্পর্কিত হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) ও হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়। সেখানে বলা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন এক ব্যক্তি উটের লাগাম ধরে পায়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে এবং সে ভীষণ কষ্টের মধ্যে আছে। তিনি বললেন, "ওর পিঠে সওয়ার হয়ে যাও" সে বললো, এটা হজ্জের সময় কুরবানী করার জন্য নিয়ে যাওয়া উট। বললেন, "তাতে কি, সওয়ার হয়ে যাও।"

মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদাহ, মুজাহিদ, দ্বাহহাক ও আতা খোরাসানী এ মত পোষণ করেছেন যে, এ আয়াতে "একটি নির্দিষ্ট সময়" মানে হচ্ছে "যতক্ষণ" পর্যন্ত পশুকে কুরবানীর জন্য নির্বাচিত ও কুরবানীর পশু নামে আখ্যায়িত না করা হয়।" এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী মানুষ এ পশুগুলো থেকে কেবলমাত্র ততক্ষণ পর্যন্ত লাভবান হতে পারে যতক্ষণ তারা তাদেরকে কুরবানীর পশু নামে আখ্যায়িত করে না। যখনই তারা তাদেরকে কুরবানীর পশু বানিয়ে আল্লাহর ঘরে নিয়ে যাবার নিয়ত করে তখনই তাদের থেকে আর কোনো প্রকার লাভবান হবার অধিকার তাদের থাকে না। কিন্তু এ ব্যাখ্যা মোটেই সঠিক বলে মনে হয় না। প্রথমত এ অবস্থায় ব্যবহার করার ও লাভবান হবার অনুমতি দেয়াটাই অর্থহীন। কারণ কুরবানীর পশু ছাড়া অন্য পশুদের থেকে লাভবান হবার বা না হবার ব্যাপারে কবেই বা সন্দেহ দেখা দিয়েছিল যে, সুস্পষ্ট অনুমতির মাধ্যমে তা দূর করার প্রয়োজন দেখা দেয় ? তারপর আয়াত পরিষ্কার বলছে, এমন সব পশু ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে যাদের ওপর "আল্লাহর নিদর্শন" শব্দ প্রযুক্ত হয়। আর একথা সুস্পষ্ট যে, এটি কেবলমাত্র তখনই হতে পারে যখন তাদেরকে কুরবানীর পশু গণ্য করা হবে।

অন্য তাফসীরকারগণ যেমন উরওয়া ইবনে যুবাইর ও আতা ইবনে আবি রিবাহ বলেন, "নির্দিষ্ট সময়" অর্থ হচ্ছে "কুরবানীর সময়।" কুরবানীর পূর্বে এ কুরবানীর পশুগুলো সওয়ারীর কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে, এদের দুধও পান করা যায়, এদের বাচ্চাও গ্রহণ করা যেতে পারে এবং এদের পশম ও চুল ইত্যাদিও কাটা যেতে পারে। ইমাম শাফেঈ এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। হানাফীগণ যদিও প্রথম ব্যাখ্যাটির সমর্থক তবুও সেখানে এতটুকু অবকাশ বের করেছেন যে, প্রয়োজনের শর্তে লাভবান হওয়া জায়েয।

৬৩. যেমন অন্য জায়গায় هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ (সূরা মায়েদাহ ৯৫ আয়াত) এর অর্থ এই নয় যে, কাবাঘরে বা মসজিদে হারামে কুরবানী করতে হবে বরং সেখানে এর অর্থ হচ্ছে হারামের সীমানার মধ্যে কুরবানী করতে হবে। কুরআন যে কাবা, বায়তুল্লাহ বা মসজিদে হারাম শব্দ উচ্চারণ করে এ থেকে সাধারণত শুধুমাত্র কাবার ইমারত নয় বরং মক্কার হারাম অর্থ গ্রহণ করে, এটি তার আর একটি প্রমাণ।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن
بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ
الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ
مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾

৫ রুকূ'

প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি কুরবানীর একটি নিয়ম ঠিক করে দিয়েছি, যাতে (সে উম্মতের) লোকেরা সে পশুদের ওপর আল্লাহর নাম নেয় যেগুলো তিনি তাদেরকে দিয়েছেন।[৬৪] (এ বিভিন্ন নিয়মের উদ্দেশ্য একই) কাজেই তোমাদের ইলাহও সে একজনই এবং তোমরা তাঁরই ফরমানের অনুগত হয়ে যাও। আর হে নবী! সুসংবাদ দিয়ে দাও বিনয়ের নীতি অবলম্বনকারীদেরকে,[৬৫] যাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে, যে বিপদই তাদের ওপর আসে তার ওপর তারা সবর করে, নামায কায়েম করে এবং যাকিছু রিযিক তাদেরকে আমি দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।[৬৬]

৬৪. এ আয়াত থেকে দু'টি কথা জানা গেছে। এক, কুরবানী ছিল আল্লাহ প্রদত্ত সমস্ত শরীয়াতের ইবাদাত ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অংশ বিশেষ। মানুষ যেসব পদ্ধতিতে গায়রুল্লাহর বন্দেগী করেছে সেগুলো সবাই গায়রুল্লাহর জন্য নিষিদ্ধ করে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে দেয়াই হচ্ছে ইবাদাতের ক্ষেত্রে একত্ববাদের অন্যতম মৌলিক দাবী। যেমন, মানুষ গায়রুল্লাহর সামনে রুকূ' ও সিজদা করেছে। আল্লাহর শরীয়াত একে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। মানুষ গায়রুল্লাহর সামনে আর্থিক নযরানা পেশ করেছে। আল্লাহর শরীয়াত তাকে নিষিদ্ধ করে যাকাত ও সদকা আল্লাহর জন্য ওয়াজিব ঘোষণা করেছে। মানুষ বাতিল উপাস্যদের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা করেছে। আল্লাহর শরীয়াত কোনো একটি স্থানকে পবিত্র বা বায়তুল্লাহ গণ্য করে তার যিয়ারত ও তাওয়াফ করার হুকুম দিয়েছে। মানুষ গায়রুল্লাহর নামে রোযা রেখেছে। আল্লাহর শরীয়াত তাকেও আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। ঠিক এমনিভাবে মানুষ তার নিজের মনগড়া উপাস্যদের জন্য পশু বলি করতে থেকেছে। আল্লাহর শরীয়াত পশু কুরবানীকেও গায়রুল্লাহর জন্য একেবারে হারাম এবং আল্লাহর জন্য ওয়াজিব করে দিয়েছে।

দুই, এ আয়াত থেকে জানা গেছে, আল্লাহর নামে কুরবানী করাই হচ্ছে আসল জিনিস। কুরবানী কখন করা হবে, কোথায় করা হবে, কিভাবে করা হবে—এ নিয়মটির এ বিস্তারিত নিয়মাবলী মোটেই কোনো মৌলিক বিষয় নয়। বিভিন্ন যুগের, জাতির ও দেশের

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا
اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا
وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ۝

আর কুরবানীর উটকে[৬৭] আমি করেছি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্তরভুক্ত ; তোমাদের জন্য রয়েছে তার মধ্যে কল্যাণ।[৬৮] কাজেই তাদেরকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে[৬৯] তাদের ওপর আল্লাহর নাম নাও।[৭০] আর যখন (কুরবানীর পরে) তাদের পিঠ মাটির সাথে লেগে যায়[৭১] তখন তা থেকে নিজেরাও খাও এবং তাদেরকেও খাওয়াও যারা পরিতুষ্ট হয়ে বসে আছে এবং তাদেরকেও যারা নিজেদের অভাব পেশ করে। এ পশুগুলোকে আমি এভাবেই তোমাদের জন্য বশীভূত করেছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।[৭২]

নবীদের শরীয়াতে অবস্থার প্রেক্ষিতে এ বিস্তারিত বিষয়াবলীতে পার্থক্য ছিল। কিন্তু সবার মূল প্রাণশক্তি ও উদ্দেশ্য একই রয়েছে।

৬৫. মূলে مُخْبِتِيْنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো একটি মাত্র শব্দের সাহায্যে এর অন্তরনিহিত অর্থ পুরোপুরি প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এর মধ্যে রয়েছে তিনটি অর্থ ঃ অহংকার ও আত্মম্ভরিতা পরিহার করে আল্লাহর সামনে অক্ষমতা ও বিনয়াবনত ভাব অবলম্বন করা। তাঁর বন্দেগী ও দাসত্বে একাগ্র ও একনিষ্ঠ হয়ে যাওয়া। তাঁর ফায়সালায় সন্তুষ্ট হওয়া।

৬৬. আল্লাহ কখনো হারাম ও নাপাক সম্পদকে নিজের রিযিক হিসেবে আখ্যায়িত করেননি, এর আগে আমরা একথা বলেছি। তাই আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যে পাক-পবিত্র রিযিক ও যে হালাল উপার্জন আমি তাদেরকে দান করেছি তা থেকে তারা খরচ করে। আবার খরচ করা মানেও সব ধরনের যা-তা খরচ নয় বরং নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনদের বৈধ প্রয়োজন পূর্ণ করা, আত্মীয়, প্রতিবেশী ও অভাবীদেরকে সাহায্য করা, জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা এবং আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করা। অযথা খরচ, ভোগ বিলাসিতার জন্য খরচ এবং লোক দেখানো খরচকে কুরআন "খরচ" গণ্য করছে না। বরং কুরআনের পরিভাষায় এ খরচকে অমিতব্যয়িতা ও ফজুল খরচ বলা হয়। অনুরূপভাবে কার্পণ্য ও সংকীর্ণমনতা সহকারে যা খরচ করা হয়, তার ফলে মানুষ নিজের পরিবার পরিজনদেরকেও সংকীর্ণতার মধ্যে রাখে এবং নিজেও নিজের মর্যাদা অনুযায়ী প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে না আর এই সংগে নিজের সামর্থ অনুযায়ী অন্যদেরকে সাহায্য করতেও পিছপা হয়। এ অবস্থায় মানুষ যদিও কিছু না

কিছু খরচ করে কিন্তু কুরআনের ভাষায় এ খরচের নাম "ইনফাক" নয়। কুরআন একে বলে "কৃপণতা" ও মানসিক সংকীর্ণতা।

৬৭. মূলে بُدْن শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটি শুধুমাত্র উটের জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানীর বিধানে গরুকেও উটের সাথে শামিল করেছেন। একটি উট কুরবানী করলে যেমন তা সাতজনের জন্য যথেষ্ট, ঠিক তেমনি সাতজন মিলে একটি গরু কুরবানী দিতে পারে। মুসলিমে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ

اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَشْتَرِكَ فِى الْاَضَاحِى الْبُدْنَةِ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ.

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের হুকুম দিয়েছেন আমরা যেন কুরবানীতে উটের ক্ষেত্রে সাতজন এবং গরুর ক্ষেত্রে সাতজন শরীক হয়ে যাই।"

৬৮. অর্থাৎ তোমরা তা থেকে ব্যাপক হারে কল্যাণ লাভ করে থাকো। তোমাদের সেগুলো কেন করতে হবে সেদিকে এখানে ইংগিত করা হয়েছে। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত যেসব জিনিস থেকে লাভবান হয় তার মধ্য থেকে প্রত্যেকটিই আল্লাহর নামে কুরবানী করা উচিত, শুধুমাত্র নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য নয় বরং আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মালিকানার স্বীকৃতি দেবার জন্যও যাতে মানুষ মনে মনে ও কার্যত একথা স্বীকার করে যে, আল্লাহ আমাকে যা কিছু দিয়েছেন এ সবই তাঁর। ঈমান ও ইসলাম হচ্ছে আত্মত্যাগের নাম। নামায ও রোযা হচ্ছে দেহ ও তার শক্তিসমূহের কুরবানীর নাম। যাকাত হচ্ছে আল্লাহ আমাদের বিভিন্নভাবে যেসব সম্পদ দিয়েছেন সেগুলোর কুরবানী। জিহাদ সময় এবং মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতাসমূহের কুরবানী। আল্লাহর পথে যুদ্ধ প্রাণের কুরবানী। এসব এক এক প্রকার নিয়ামত এবং এক একটি দানের জন্য কৃতজ্ঞতা। এভাবে পশু কুরবানী করার দায়িত্বও আমাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে, যাতে আমরা আল্লাহর এ বিরাট নিয়ামতের জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেই। কারণ, তিনি তাঁর সৃষ্ট বহু প্রাণীকে আমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন। আমরা তাদের পিঠে চড়ি। তাদের সাহায্যে চাষাবাদ ও মাল পরিবহন করি। তাদের গোশত খাই, দুধ পান করি এবং তাদের চামড়া, লোম, পশম, রক্ত, হাড় ইত্যাদি প্রত্যেকটি জিনিস নানাভাবে ব্যবহার করি।

৬৯. উল্লেখ করা যেতে পারে, উটকে দাঁড় করিয়ে যবেহ করা হয়। তার একটি পা বেঁধে দেয়া হয় তারপর কণ্ঠনালীতে সজোরে বল্লম মারা হয়। সেখান থেকে রক্তের একটি ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। তারপর প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়ে গেলে উট মাটির ওপর পড়ে যায়। 'সওয়াফ' বা দাঁড় করিয়ে রাখা বলতে এটিই বুঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ, দ্বাহহাক প্রমুখ ব্যাখ্যাতাগণ এর এ ব্যাখ্যায়ই করেছেন। বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও একথাই উদ্ধৃত হয়েছে। মুসলিম ও বুখারী হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর (রা) এক ব্যক্তিকে তার উটকে বসিয়ে রেখে কুরবানী করতে দেখেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি বলেন ঃ

اَبْعَثُهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةُ اَبِى الْقَاسِمِ ﷺ

"পা বেঁধে তাকে দাঁড় করিয়ে দাও। এটা হচ্ছে আবুল কাশেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত।"

আবু দাউদ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ উটের বাম পা বেঁধে রেখে বাকি তিন পায়ের ওপর তাকে দাঁড় করিয়ে দিতেন। তারপর তার হল্‌কুমে বর্শা নিক্ষেপ করতেন। কুরআন নিজেও এ অর্থের প্রতি ইংগিত করেছে ঃ اِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا "যখন তাদের পিঠ জমিতে ঠেকে যায়" একথা এমন অবস্থায় বলা হয় যখন পশু দাঁড়িয়ে থাকে এবং তারপর জমির ওপর পড়ে যায়। অন্যথায় শুইয়ে দিয়ে কুরবানী করা অবস্থায় পিঠ তো আগে থেকেই জমির সাথে লেগে থাকে।

৭০. এ বাক্যটি আবার একথা প্রমাণ করছে যে, আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে যবেহ করলে কোনো পশু হালাল হয় না। তাই আল্লাহ "তাদেরকে যবেহ করো" না বলে বলছেন, "তাদের ওপর আল্লাহর নাম নাও" এবং এর অর্থ হচ্ছে, পশু যবেহ করো। এ থেকে একথা আপনা আপনিই বের হয়ে আসে যে, ইসলামী শরীয়াতে আল্লাহর নাম না নিয়ে পশু যবেহ করার কোনো অবকাশ নেই।

যবেহ করার সময় بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলার পদ্ধতি এখান থেকেই গৃহীত হয়েছে। ৩৬ আয়াতে বলা হয়েছে فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا "তাদের ওপর আল্লাহর নাম নাও।" আর ৩৭ আয়াতে বলা হয়েছে لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ "যাতে আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াতের ভিত্তিতে তোমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো।"

হাদীসে কুরবানী করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন (১) بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ "আল্লাহর নামে এবং আল্লাহ সবচেয়ে বড়, হে আল্লাহ! তোমারই সম্পদ এবং তোমারই জন্য হাজির।" (২) اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ "আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, হে আল্লাহ! তোমারই সম্পদ এবং তোমারই জন্য হাজির।"

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ـ

(৩) "আমি একনিষ্ঠ হয়ে আমার চেহারা এমন সত্তার দিকে ফিরিয়ে নিয়েছি যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই। অবশ্যই আমার নামায ও কুরবানী এবং আমার বাঁচা ও মরা সবই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমাকে এরই হুকুম দেয়া হয়েছে এবং আমি প্রথম আনুগত্যের শির নতকারীদের অন্তরভুক্ত। হে আল্লাহ! তোমারই সম্পদ এবং তোমারই জন্য হাজির।"

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٧﴾ اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ﴿٣٨﴾

তাদের গোশতও আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, তাদের রক্তও না। কিন্তু তাঁর কাছে পৌঁছে যায় তোমাদের তাকওয়া।[৭৩] তিনি তাদেরকে তোমাদের জন্য এমনভাবে অনুগত করে দিয়েছেন যাতে তাঁর দেয়া পথনির্দেশনার ভিত্তিতে তোমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো।[৭৪] আর হে নবী! সৎকর্মশীলদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও।

নিশ্চয়ই[৭৫] আল্লাহ ঈমানদারদের সংরক্ষণ করেন,[৭৬] নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্নকে পসন্দ করেন না।[৭৭]

৭১. লেগে যাওয়ার মানে শুধু এতটুক নয় যে, তারা মাটিতে পড়ে যায় বরং এ অর্থও এর অন্তরভুক্ত যে, তারা পড়ে গিয়ে স্থির হয়ে যায় অর্থাৎ তড়পানো বন্ধ করে দেয় এবং প্রাণবায়ু পুরোপুরি বের হয়ে যায়। আবু দাউদ, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণী উদ্ধৃত হয়েছে যে,

مَا قُطِعَ (اَوْ مَا بَانَ) مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ

"এখনো জীবিত আছে এমন পশুর যে গোশত কেটে নেয়া হয় তা মৃত পশুর গোশত (এবং হারাম)।"

৭২. কুরবানীর হুকুম কেন দেয়া হয়েছে, এখানে আবার সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে যে নিয়ামত দান করেছেন এ কুরবানী হচ্ছে সে বিরাট নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

৭৩. জাহেলিয়াতের যুগে যেমন আরববাসীরা দেবদেবীর মূর্তিদের জন্য যেসব পশু কুরবানী দিতো সেগুলো নিয়ে গিয়ে আবার তাদেরই বেদীমূলে অর্ঘ দিতো, ঠিক তেমনি আল্লাহর নামে কুরবানী দেয়া জানোয়ারের গোশত কাবাঘরের সামনে এনে রাখতো এবং রক্ত তার দেয়ালে লেপটে দিতো। তাদের মতে, এ কুরবানী যেন আল্লাহর সামনে সংশ্লিষ্ট কুরবানীর গোশত ও রক্ত পেশ করার জন্য করা হতো। এ মূর্খতার পর্দা ছিন্ন করে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহর সামনে যে আসল জিনিস পেশ করা হয় তা পশুর গোশত ও রক্ত নয় বরং তোমাদের তাকওয়া।" যদি তোমরা নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রবণতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে খালেস নিয়তে একমাত্র আল্লাহর জন্য কুরবানী করো,

তাহলে এ প্রবণতা, নিয়ত ও আন্তরিকতার নযরানা তাঁর কাছে পৌঁছে যাবে অন্যথায় রক্ত ও গোশত এখানেই থেকে যাবে। একথাই হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَلاَ اِلٰى اَلْوَانِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ ـ

"আল্লাহ তোমাদের চেহারা-সুরাত ও তোমাদের রঙ দেখেন না বরং তিনি দেখেন তোমাদের মন ও কার্যকলাপ।"

৭৪. অর্থাৎ অন্তরে তাঁর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নাও এবং কাজে তার প্রকাশ ঘটাও ও ঘোষণা দাও। এরপর কুরবানীর হুকুমের উদ্দেশ্য ও কারণের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। পশুদের ওপর আল্লাহ মানুষকে কর্তৃত্ব দান করেছেন, শুধুমাত্র এ নিয়ামতের বিনিময়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য কুরবানী ওয়াজিব করা হয়নি। বরং এ জন্য ওয়াজিব করা হয়েছে যে, এগুলো যাঁর পশু এবং যিনি এগুলোর ওপর আমাদের কর্তৃত্ব দান করেছেন, আমরা অন্তরে ও কাজে-কর্মেও তাঁর মালিকানা অধিকারের স্বীকৃতি দেবো, যাতে আমরা কখনো ভুল করে একথা মনে করে না বসি যে, এগুলো সবই আমাদের নিজেদের সম্পদ। কুরবানী করার সময় যে বাক্যটি উচ্চারণ করা হয় তার মধ্য দিয়ে এ বিষয়বস্তুটিরই প্রকাশ ঘটে। যেমন সেখানে বলা হয় اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ হে আল্লাহ ! তোমারই সম্পদ এবং তোমারই জন্য উপস্থিত।

এ ক্ষেত্রে একথা জেনে নেয়া উচিত যে, এ প্যারায় কুরবানীর যে হুকুম দেয়া হয়েছে তা কেবলমাত্র হাজীদের জন্য নয় এবং শুধুমাত্র মক্কায় হজ্জের সময় কুরবানী করার জন্য নয় বরং প্রত্যেক সমর্থ মুসলমান যেখানেই সে থাকুক না কেন তার জন্য ব্যাপকভাবে এ হুকুম দেয়া হয়েছে, যাতে সে পশুদের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করার নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করার দায়িত্ব পালন করতে এবং এই সংগে নিজের স্থানে হাজীদের অবস্থার সাথে শরীক হয়ে যেতেও পারে। হজ্জ সম্পাদন করার সৌভাগ্য না হলেও কমপক্ষে হজ্জের দিনগুলোতে আল্লাহর ঘরের সাথে জড়িত হয়ে হাজীগণ যেসব কাজ করতে থাকেন সারা দুনিয়ার মুসলমানরা সেসব কাজ করতে থাকবে। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা এসেছে।

এছাড়াও অসংখ্য নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকেও একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা তাইয়্যেবায় অবস্থানের সমগ্র সময়ে নিজেই প্রত্যেক বছর বকরা ঈদের সময় কুরবানী করতেন এবং তাঁরই সুন্নত থেকে মুসলমানদের মধ্যে এ পদ্ধতির প্রচলন হয়। মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজায় হযরত আবু হুরাইরার (রা) এ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا

"যে ব্যক্তি সামর্থ রাখার পরও কুরবানী করে না তার আমাদের ঈদগাহের ধারে কাছে না আসা উচিত।"

এ হাদীসটির সকল রাবীই সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য। মুহাদ্দিসগণ শুধুমাত্র রেওয়ায়াতটির মারফূ' (অর্থাৎ যার বর্ণনার ধারাবাহিকতা সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে) অথবা মওকূপ (যার বর্ণনার ধারাবাহিকতা সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছে শেষ হয়ে গেছে) হবার ব্যাপারে দ্বিতমত ব্যক্ত করেছেন। (হাদীসটির বিশুদ্ধতা নিয়ে কোনো মতভেদ হয়নি) তিরমিযীতে ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَقَامَ رَسُوْلُ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ يُضَحِّىْ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় দশ বছর থাকেন এবং প্রত্যেক বছর কুরবানী করতে থাকেন।"

বুখারীতে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَلْيُعِدْ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَاَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ۔

"যে ব্যক্তি নামাযের আগে যবেহ করলো তার আবার কুরবানী করা উচিত। আর যে ব্যক্তি নামাযের পরে কুরবানী করে তার কুরবানী পূর্ণ হয়েছে এবং সে মুসলমানদের পথ পেয়ে গেছে।"

আর একথা সবার জানা যে, কুরবানীর দিন মক্কায় এমন কোনো নামায হতো না যার পূর্বে কুরবানী করা মুসলমানদের সুন্নাতের বিরোধী হতো এবং পরে করা হতো তার অনুকূল। কাজেই নিশ্চিতরূপেই এ উক্তি হজ্জের সময় মক্কায় নয় বরং মদীনায় করা হয়।

মুসলিমে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় বকরা ঈদের নামায পড়ান এবং কোনো কোনো লোক তিনি কুরবানী করে ফেলেছেন মনে করে নিজেদের কুরবানী করে বসে। এ অবস্থা দেখে তিনি হুকুম দেন, যারা আমার পূর্বে কুরবানী করেছে তাদের আবার কুরবানী করতে হবে।

কাজেই একথা সকল প্রকার সংশয়-সন্দেহের উর্ধে যে, বকরা ঈদের দিন সাধারণ মুসলমানরা সারা দুনিয়ায় যে কুরবানী করে এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবর্তিত সুন্নাত। তবে এখানে এ কুরবানী ওয়াজিব অথবা শুধুমাত্র সুন্নাত নিছক এ বিষয়েই মতবিরোধ দেখা যায়। ইবরাহীম নাখঈ, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম মুহাম্মাদ এবং এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আবু ইউসুফও একে ওয়াজিব মনে করতেন। কিন্তু ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে এটা শুধুমাত্র মুসলমানদের সুন্নাত। সুফিয়ান সাওরীও বলতেন, কেউ কুরবানী না দিলে কোনো ক্ষতি নেই। তবুও উম্মতে মুসলিমার কোনো একজন আলেমও একথা বলেন না যে, মুসলমানরা একমত হয়ে যদি তা পরিহার করে তবুও কোনো ক্ষতি নেই। এ নতুন কথা

শুধুমাত্র আমাদের যুগের কোনো কোনো লোকের উর্বর মস্তিষ্কের উদ্ভাবন যাদের জন্য নিজের প্রবৃত্তিই কুরআন এবং প্রবৃত্তিই সুন্নাত।

৭৫. এখান থেকে অন্য একটি বিষয়বস্তুর দিকে ভাষণটির মোড় ফিরে গেছে। প্রাসংগিক বক্তব্য অনুধাবন করার জন্য একথা স্মরণ করা দরকার যে, এটি এমন এক সময়ের ভাষণ যখন হিজরতের পর প্রথমবার হজ্জের মওসুম এসেছিল। সে সময় একদিকে মুহাজির ও মদীনার আনসারদের কাছে এ বিষয়টি বড়ই কঠিন মনে হচ্ছিল যে, তাদেরকে হজ্জের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং হারম শরীফের যিয়ারতের পথ জোরপূর্বক তাদের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে মক্কায় মুসলমানদের ওপর যেসব জুলুম করা হয়েছিল শুধুমাত্র সেগুলোর আঘাতই তাদের মনে দগদগ করছিল তাই নয় বরং এ ব্যাপারেও তারা অত্যন্ত শোকাহত ছিল যে, ঘরবাড়ি ছেড়ে তারা মক্কা থেকে বের হয়ে এসেছে এরপর এখন মদীনাতেও তাদেরকে নিশ্চিন্তে বাস করতে দেয়া হচ্ছে না। এ সময় যে ভাষণ দেয়া হয় তার প্রথম অংশে কাবাগৃহ নির্মাণ, হজ্জ পালন ও কুরবানীর পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে একথা বলা হয় যে, এসব বিষয়ের আসল উদ্দেশ্য কি ছিল এবং জাহেলীয়াত এগুলোকে বিকৃত করে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেছে। এভাবে মুসলমানদের মধ্যে প্রতিশোধ নেবার সংকল্প নিয়ে নয় বরং সংস্কারের সংকল্প নিয়ে এ অবস্থা পরিবর্তন করার জন্য এগিয়ে আসার প্রেরণা সৃষ্টি করা হয়। তাছাড়া এ সংগে মদীনায় কুরবানীর পদ্ধতি জারি করে মুসলমানদেরকে এ সুযোগ দেয়া হয় যে, হজ্জের সময় নিজ নিজ গৃহেই কুরবানী করে শত্রুরা তাদেরকে যে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করেছে তাতে তারা অংশ গ্রহণ করতে পারবে। আবার হজ্জ থেকে আলাদাভাবে কুরবানীকে একটি স্বতন্ত্র সুন্নাত হিসেবে জারী করে। এর ফলে যারা হজ্জ করার সুযোগ পাবে না তারাও আল্লাহর এ নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার হক আদায় করতে পারবে। এরপর এখন দ্বিতীয় অংশে মুসলমানদেরকে তাদের ওপর যে জুলুম করা হয়েছিল এবং যে জুলুমের ধারা অব্যাহত ছিল তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার অনুমতি দেয়া হচ্ছে।

৭৬. মূলে مدافعت শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর উৎপত্তি হয়েছে دفع থেকে। এ শব্দটির আসল মানে হচ্ছে, কোনো জিনিসকে হটিয়ে দেয়া ও সরিয়ে দেয়া। কিন্তু যখন "দফা" করার পরিবর্তে "মুদাফা'আত" করার কথা বলা হবে তখন এর মধ্যে আরো দুটি অর্থ শামিল হয়ে যাবে। এক, কোনো শত্রুশক্তি আক্রমণ চালাচ্ছে এবং প্রতিরক্ষাকারী তার মোকাবিলা করছে। দুই, এ মোকাবিলা শুধুমাত্র একবারেই শেষ হয়ে যায়নি বরং যখনই আক্রমণকারী আক্রমণ করে তখনই এ প্রতিরক্ষাকারী তার মোকাবিলা করে। এ দুটি অর্থ সামনে রেখে বিচার করলে মু'মিনদের পক্ষ থেকে আল্লাহর "মুদাফা'আত" করার অর্থ এই বুঝা যায় যে, কুফর ও ঈমানের সংঘাতে মুমিনরা একা ও নিসংগ হয় না বরং আল্লাহ নিজেই তাদের সাথে এক পক্ষ হয়ে দাঁড়ান। তিনি তাদেরকে সমর্থন দান করেন। তাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের কৌশল ব্যর্থ করে দেন। অনিষ্টকারকদের অনিষ্টকে তাদের থেকে দূরে সারিয়ে দিতে থাকেন। কাজেই এ আয়াতটি আসলে হকপন্থীদের জন্য একটি বড় রকমের সুসংবাদ। তাদের মনকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার জন্য এর চেয়ে বড় আর কোনো জিনিস হতে পারে না।

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ
لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا
رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ
صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ
وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ
إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

৬ রুকূ'

অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, কেননা তারা মযলুম[৭৮] এবং আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন।[৭৯] তাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে[৮০] শুধুমাত্র এ অপরাধে যে, তারা বলেছিল, "আল্লাহ আমাদের রব।"[৮১] যদি আল্লাহ লোকদেরকে একের মাধ্যমে অন্যকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে যেখানে আল্লাহর নাম বেশী করে উচ্চারণ করা হয় সেসব আশ্রম, গীর্জা, ইবাদাতখানা[৮২] ও মসজিদ ধ্বংস করে দেয়া হতো।[৮৩] আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁকে সাহায্য করবে।[৮৪] আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত। এরা এমন সব লোক যাদেরকে আমি যদি পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করি তাহলে এরা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং খারাপ কাজে নিষেধ করবে।[৮৫] আর সমস্ত বিষয়ের পরিণাম আল্লাহর হাতে।[৮৬]

৭৭. এ সংঘাতে আল্লাহ কেন হকপন্থীদের সাথে একটি পক্ষ হন এটি হচ্ছে তার কারণ। এর কারণ হচ্ছে, হকের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত দ্বিতীয় পক্ষটি বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ এবং নিয়ামত অস্বীকারকারী। আল্লাহ তার কাছে যেসব আমানত সোপর্দ করেছেন তার প্রত্যেকটিতে সে খেয়ানত করেছে এবং তাকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন অকৃতজ্ঞতা, অস্বীকৃতি ও নেমকহারামির মাধ্যমে তার প্রত্যেকটির জবাব দিয়ে চলছে। কাজেই আল্লাহ তাকে অপছন্দ করেন এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত হক-পন্থীদেরকে সাহায্য-সহায়তা দান করেন।

৭৮. যেমন ইতোপূর্বে ভূমিকায় বলা হয়েছে, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা সম্পর্কে অবতীর্ণ এটিই প্রথম আয়াত। এ আয়াতে কেবলমাত্র অনুমতি দেয়া হয়েছিল। পরে সূরা বাকারায় যুদ্ধের আদেশ প্রদান সম্পর্কিত আয়াতটি নাযিল হয়। অর্থাৎ

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ - (ايت : ١٩٠)

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ - (ايت : ١٩١)

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ - (ايت : ١٩٣)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ - (ايت : ٢١٦)

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ - (ايت : ٢٤٤)

অনুমতি ও হুকুম দেয়ার মধ্যে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধান। আমাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী অনুমতি নাযিল হয় হিজরীর প্রথম বছরের যিলহজ্জ মাসে এবং হুকুম নাযিল হয় বদর যুদ্ধের কিছু পূর্বে দ্বিতীয় হিজরীর রজব অথবা শাবান মাসে।

৭৯. অর্থাৎ এরা মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক, এ সত্ত্বেও আল্লাহ এদেরকে আরবের সমগ্র মুশরিক সমাজের ওপর বিজয়ী করতে পারেন। একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যখন এ অস্ত্রধারণ করার অনুমতি দেয়া হচ্ছিল তখন মুসলমানদের সমস্ত শক্তি কেবলমাত্র মদীনার একটি মামুলি ছোট শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সে সময় মুহাজির ও আনসারদের মিলিত শক্তি সর্বসাকুল্যে এক হাজারও ছিল না। এ অবস্থায় কুরাইশদেরকে চ্যালেঞ্জ দেয়া হচ্ছিল। আর কুরাইশরা একা ছিল না বরং আরবের অন্যান্য মুশরিক গোত্রগুলোও তাদের পেছনে ছিল। পরে ইহুদীরাও তাদের সাথে যোগ দেয়। এসময় "আল্লাহ অবশ্য তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে" একথা বলা অত্যন্ত সময়োপযোগী ছিল। এর ফলে এমনসব মুসলমানদের মনেও সাহসের সঞ্চার হয়েছে যাদেরকে সমগ্র আরব শক্তির বিরুদ্ধে তলোয়ার হাতে মোকাবিলার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে এবং কাফেরদেরকেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এই মর্মে যে, তোমাদের মোকাবিলা আসলে আল্লাহর সাথে, ঐ মুষ্টিমেয় মুসলমানদের সাথে নয়। কাজেই যদি আল্লাহর মোকাবিলা করার সাহস থাকে তাহলে সামনে এসো।

৮০. এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, সূরা হজ্জের এ অংশটি অবশ্যই হিজরতের পরে নাযিল হয়েছে।

৮১. এদের ওপর যে ধরনের অত্যাচার করে বের করে দেয়া হয় তা অনুমান করার জন্য নিম্নোক্ত কয়েকটি ঘটনা সামনে রাখতে হবে ঃ

হযরত সোহাইব রূমী (রা) যখন হিজরত করতে থাকেন তখন কুরাইশ বংশীয় কাফেররা তাঁকে বলে, তুমি এখানে এসেছিলে খালি হাতে। এখন অনেক ধনী হয়ে গেছো।

যেতে চাইলে তুমি খালি হাতে যেতে পারো। নিজের ধন-সম্পদ নিয়ে যেতে পারবে না। অথচ তিনি নিজে পরিশ্রম করেই এ ধন-সম্পদ উপার্জন করেছিলেন। কারো দান তিনি খেতেন না। ফলে বেচারা হাত-পা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ান এবং সবকিছু এ জালেমদের হাওয়ালা করে দিয়ে এমন অবস্থায় মদীনায় পৌঁছেন যে, নিজের পরনের কাপড়গুলো ছাড়া তাঁর কাছে আর কিছুই ছিল না।

হযরত উম্মে সালামাহ (রা) ও তাঁর স্বামী আবু সালামাহ (রা) নিজেদের দুধের বাচ্চাটিকে নিয়ে হিজরত করার জন্য বের হয়ে পড়েন। বনী মুগীরাহ (উম্মে সালামাহর পরিবারের লোকেরা) তাদের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। তারা আবু সালামাহকে বলে, তোমার যেখানে ইচ্ছা যেতে পারো কিন্তু আমাদের মেয়েকে নিয়ে যেতে পারো না। বাধ্য হয়ে তিনি স্ত্রীকে রেখে দিয়ে চলে যান। এরপর বনী আবদুল আসাদ (আবু সালামাহর বংশের লোকেরা) এগিয়ে আসে এবং তারা বলে, শিশুটি আমাদের গোত্রের। তাকে আমাদের কাছে দিয়ে দাও। এভাবে মা ও বাপ উভয়ের কাছ থেকে শিশু সন্তানকেও ছিনিয়ে নেয়া হয়। প্রায় এক বছর পর্যন্ত হযরত উম্মে সালামাহ (রা) স্বামী ও সন্তানের শোকে ছটফট করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত বড়ই কঠিন বিপদের মধ্য দিয়ে নিজের শিশু সন্তানটি পুনরুদ্ধার করে মক্কা থেকে এমন অবস্থায় বের হয়ে পড়েন যে, একজন নিসংগ স্ত্রীলোক কোলে একটি ছোট বাচ্চা নিয়ে উটের পিঠে বসে আছেন। এমন পথ দিয়ে তিনি চলছেন যেখান দিয়ে সশস্ত্র কাফেলা যেতে ভয় পেতো।

আইয়াশ ইবনে রাবীআহ আবু জেহেলের বৈপিত্রেয় ভাই ছিলেন। হযরত উমরের (রা) সাথে হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে যান। পিছে পিছে আবু জেহেল নিজের এক ভাইকে সাথে নিয়ে সেখানে পৌঁছে যায়। সে মায়ের নামে মিথ্যা বানিয়ে বলে, আম্মাজান কসম খেয়েছেন আইয়াশের চেহারা না দেখা পর্যন্ত রোদ থেকে ছায়ায় যাবেন না এবং মাথায় চিরুনীও লাগাবেন না। কাজেই তুমি গিয়ে একবার শুধু তাকে চেহারা দেখিয়ে দাও তারপর চলে এসো। তিনি মায়ের প্রতি ভালোবাসা ও মাতৃভক্তির আতিশয্যে তাদের সংগ নেন। পথে দুই ভাই মিলে তাকে বন্দী করে এবং তাকে নিয়ে মক্কায় এমন অবস্থায় প্রবেশ করে যখন তার আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি বাঁধা ছিল এবং দুই ভাই চিৎকার করে যাচ্ছিল, "হে মক্কাবাসীরা ! নিজেদের নালায়েক ছেলেদেরকে এমনিভাবে শায়েস্তা করো যেমন আমরা করেছি।" দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তিনি বন্দী থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত একজন দুঃসাহসী মুসলমান তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে সক্ষম হন।

মক্কা থেকে মদীনায় যারাই হিজরত করেন তাদের প্রায় সবাইকে এ ধরনের জুলুম-নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে আসার সময়ও জালেমরা তাদেরকে নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে বের হয়ে আসতে দেয়নি।

৮২. মূলে صَلَوٰت ও بِيَع، صَوَامِع শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। صومعة এমন জায়গাকে বলা হয় যেখানে খৃষ্টান রাহেব, যোগী, সন্ন্যাসী, সংসার বিরাগী সাধুরা থাকেন। "بيعة" শব্দটি আরবী ভাষায় খৃষ্টানদের ইবাদাতগাহের জন্য ব্যবহার করা হয়। "صلوات" শব্দের অর্থ হচ্ছে ইহুদীদের নামায পড়ার জায়গা। ইহুদীরা নিজেদের ভাষায় একে বলে صلوتا "সলওয়াতা"। এটি আরামীয় ভাষার শব্দ। বিচিত্র নয় যে,

ইংরেজী ভাষার Salute ও Salutation শব্দ এর থেকে বের হয়ে প্রথম ল্যাটিন ও পরে ইংরেজী ভাষায় পৌছে গেছে।

৮৩. অর্থাৎ আল্লাহ কোনো একটি গোত্র বা জাতিকে স্থায়ী কর্তৃত্ব দান করেননি, এটি তাঁর বিরাট অনুগ্রহ। বরং বিভিন্ন সময় দুনিয়ায় একটি দলকে দিয়ে তিনি অন্য একটি দলকে প্রতিহত করতে থেকেছেন। নয়তো কোনো একটি নির্দিষ্ট দল যদি কোথাও স্থায়ী কর্তৃত্ব লাভ করতো তাহলে শুধু দুর্গ, প্রাসাদ এবং রাজনীতি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানই ধ্বংস করে দেয়া হতো না বরং ইবাদাতগাহগুলোও বিধ্বস্ত হওয়ার হাত থেকে রেহাই পেতো না। সূরা বাকারায় এ বিষয়বস্তুকে এভাবে বল হয়েছে ঃ

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْفَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ـ

"যদি আল্লাহ লোকদেরকে একজনের সাহায্যে অন্যজনকে প্রতিহত না করতে থাকতেন তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহ দুনিয়াবাসীদের প্রতি বড়ই করুণাময়।" (২৫১ আয়াত)

৮৪. এ বক্তব্যটি কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় উপস্থাপিত হয়েছে, বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর বান্দাদেরকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করে এবং সত্য দীন কায়েম ও মন্দের জায়গায় ভালোকে বিকশিত করার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালায় তারা আসলে আল্লাহর সাহায্যকারী। কারণ, এটি আল্লাহর কাজ। এ কাজটি করার জন্য তারা আল্লাহর সাথে সহযোগিতা করে। আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন সূরা আলে ইমরান ৫০ টীকা।

৮৫. অর্থাৎ আল্লাহকে সাহায্যকারী এবং তাঁর সাহায্য ও সহায়তালাভের অধিকারী লোকদের গুণাবলী হচ্ছে এই যে, যদি দুনিয়ায় তাদেরকে রাষ্ট্র ও শাসন ক্ষমতা দান করা হয় তাহলে তারা ব্যক্তিগত জীবনে ফাসেকী, দুষ্কৃতি, অহংকার ও আত্মম্ভরিতার শিকার হবার পরিবর্তে নামায কায়েম করবে। তাদের ধন-সম্পদ, বিলাসিতা ও প্রবৃত্তি পূজার পরিবর্তে যাকাত দানে ব্যয়িত হবে। তাদের রাষ্ট্রযন্ত্র সৎকাজকে দাবিয়ে দেবার পরিবর্তে তাকে বিকশিত ও সম্প্রসারিত করার দায়িত্ব সম্পন্ন করবে। তাদের শক্তি অসৎকাজকে ছড়াবার পরিবর্তে দমন করার কাজে ব্যবহৃত হবে। এ একটি বাক্যের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ এবং তার কর্মী ও কর্মকর্তাদের বৈশিষ্টের নির্যাস বের করে দেয়া হয়েছে। কেউ যদি বুঝতে চায় ইসলামী রাষ্ট্র আসলে কোন জিনিসের নাম তাহলে এ একটি বাক্য থেকেই তা বুঝে নিতে পারে।

৮৬. অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা কোন সময় কার হাতে সোপর্দ করতে হবে এ ব্যাপারটির সিদ্ধান্ত আল্লাহ নিজেই নেন। অহংকারী বান্দারা এ ভুল ধারণা করে যে, পৃথিবীতে বসবাসকারীদের ভাগ্যের ফায়সালা তারা নিজেরাই করে। কিন্তু যে শক্তি একটি ছোট্ট বীজকে বিশাল বৃক্ষে এবং একটি বিশাল বৃক্ষকে শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডে পরিণত করে তার মধ্যেই এমন ক্ষমতা রয়েছে যে, যাদের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি দেখে লোকেরা মনে করে

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ﴿٤٢﴾
وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۖ وَكُذِّبَ
مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٤﴾
فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ
عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٥﴾

হে নবী! যদি তারা তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে,[৮৭] তাহলে ইতিপূর্বে নূহের জাতি, আদ, সামূদ, ইবরাহীমের জাতি, লূতের জাতি ও মাদয়ানবাসীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল এবং মূসার প্রতিও মিথ্যা আরোপ করা হয়েছিল। এসব সত্য অস্বীকারকারীকে আমি প্রথমে অবকাশ দিয়েছি তারপর পাকড়াও করেছি।[৮৮] এখন দেখে নাও আমার শাস্তি কেমন ছিল।[৮৯] কত দুষ্কৃতকারী জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি এবং আজ তারা নিজেদের ছাদের ওপর উলটে পড়ে আছে, কত কূয়া[৯০] অচল এবং কত প্রাসাদ ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছে।

এদেরকে নড়াবার সাধ্য কারো নেই, তাদেরকে তিনি এমনিভাবে ভূপাতিত করেন যে, সারা দুনিয়াবাসীর জন্য শিক্ষণীয় হয় এবং যাদেরকে দেখে কেউ কোনোদিন ধারণাই করতে পারে না যে, এরাও কোনোদিন উঠে দাঁড়াবে তাদের মাথা তিনি এমনভাবে উঁচু করে দেন যে, দুনিয়ায় তাদের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ডংকা বাজতে থাকে।

৮৭. অর্থাৎ মক্কার কাফেররা।

৮৮. অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোনো জাতিকেও নবীকে অস্বীকার করার সাথে সাথেই পাকড়াও করা হয়নি। বরং প্রত্যেককে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য যথেষ্ট সময় দেয়া হয়। তাদেরকে তখনই পাকড়াও করা হয় যখন ইনসাফের দাবী পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় মক্কার কাফেররা যেন তাদের দুর্ভাগ্য আসতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে নবীর সতর্কবাণীগুলোকে নিছক অন্তসারশূন্য হুমকি মনে না করে। মূলত এভাবে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য আল্লাহ তাঁর রীতি অনুযায়ী তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন। এ অবকাশের সুযোগ যদি তারা যথাযথভাবে ব্যবহার না করে তাহলে তাদের পরিণামও তাই হবে যা তাদের পূর্ববর্তীদের হয়েছে।

৮৯. মূলে نكير শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শাস্তি বা অন্য কোনো শব্দের মাধ্যমে এর পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ পায় না। এ শব্দের দুটি অর্থ হয়। এক, কোনো ব্যক্তির খারাপ মনোভাব ও মন্দ নীতির বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করা। দুই, তাকে এমন শাস্তি দেয়া যার

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا
أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى
الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن
يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا
تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ
أَخَذْتُهَا ۖ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿٤٨﴾

তারা কি পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করেনি, যার ফলে তারা উপলব্ধিকারী হৃদয় ও শ্রবণকারী কানের অধিকারী হতো ? আসল ব্যাপার হচ্ছে, চোখ অন্ধ হয় না বরং হৃদয় অন্ধ হয়ে যায়, যা বুকের মধ্যে আছে।[৯১]

তারা আযাবের জন্য তাড়াহুড়ো করছে[৯২] আল্লাহ কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতি ভংগ করবেন না। কিন্তু তোমার রবের কাছের একটি দিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান হয়।[৯৩] কতই জনপদ ছিল দুরাচার, আমি প্রথমে তাদেরকে অবকাশ দিয়েছি তারপর পাকড়াও করেছি। আর সবাইকে তো ফিরে আমারই কাছে আসতে হবে।

ফলে তার অবস্থা ওলটপালট হয়ে যায়, চেহারা এমনভাবে বিকৃত হয়ে যায় যেন কেউ দেখে তাকে চিনতে না পারে। এ দুটি অর্থের দৃষ্টিতে এ বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়, "এখন দেখে নাও, তাদের এ নীতির কারণে যখন আমার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হলো তখন আমি তাদের অবস্থা পরিবর্তিত করে দিলাম।"

৯০. আরবে কূয়া ও জনবসতি প্রায় সমার্থক শব্দ। কোনো গোত্রের জনবসতির নাম নিতে হলে বলা হয় ماء بنى فلان অর্থাৎ অমুক গোত্রের কূয়া। একজন আরবের সামনে যখন বলা হবে কূয়াগুলো অকেজো পড়ে আছে তখন সে এর অর্থ এ বুঝবে যে জনবসতিগুলো জনশূণ্য ও পরিত্যক্ত।

৯১. মনে রাখতে হবে, কুরআন বিজ্ঞানের বই নয় বরং সাহিত্যের ভাষায় কথা বলে। এখানে অযথা এ প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই যে, বক্ষস্থিত হৃদয় আবার চিন্তা করে কবে থেকে ? সাহিত্যের ভাষায় আবেগ, অনুভূতি, চিন্তা-ভাবনা বরং প্রায় সবরকমের কাজকেই মস্তিষ্ক, বক্ষদেশ ও হৃদয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। এমনকি কোনো কথা মনে থাকার ব্যাপারটিও এভাবে বলা হয়, "সেটা তো আমার বুকে সংরক্ষিত আছে।"

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَآ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٩﴾ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٥٠﴾ وَالَّذِيْنَ سَعَوْا
فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٥١﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ
قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ
اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ۗ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٢﴾

৭ রুকূ'

হে মুহাম্মাদ! বলে দাও, "ওহে লোকেরা! আমি তো তোমাদের জন্য শুধুমাত্র (খারাপ সময় আসার আগেই) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।[৯৪] কাজেই যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তাদের জন্য রয়েছে মাগফেরাত ও সম্মানজনক জীবিকা।[৯৫] আর যারা আমার আয়াতকে খাটো করার চেষ্টা করবে তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

আর হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বে আমি এমন কোনো রাসূল ও নবী পাঠাইনি[৯৬] (যার সাথে এমন ঘটনা ঘটেনি যে) যখন সে তামান্না করেছে।[৯৭] শয়তান তার তামান্নায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে।[৯৮] এভাবে শয়তান যাকিছু বিঘ্ন সৃষ্টি করে আল্লাহ তা দূর করে দেন এবং নিজের আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন,[৯৯] আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।[১০০]

৯২. অর্থাৎ বারবার চ্যালেঞ্জ করছে। তারা বলছে যদি তুমি সাচ্চা নবী হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহর সত্য নবীকে অস্বীকার করার ফলে যে আযাব আসা উচিত এবং যার ব্যাপারে তুমি বারবার হুমকি দিয়েছো তা আসছে না কেন ?

৯৩. অর্থাৎ মানুষের ইতিহাসে আল্লাহর ফায়সালা তোমাদের সময় নির্ধারক ও পঞ্জিকার হিসেব অনুযায়ী হয় না। যেমন আজকে একটি ভুল বা সঠিক নীতি অবলম্বন করা হলো এবং কালই তার মন্দ বা ভালো ফলাফল প্রকাশ হয়ে গেলো, এমন নয়। কোনো জাতিকে বলা হয়, অমুক কর্মপদ্ধতি অবলম্বনের ফল দাঁড়াবে তোমাদের ধ্বংস। এর জবাবে তারা যদি এ যুক্তি পেশ করে যে, এ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করার পর আমাদের দশ বিশ-পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, এখনো তো আমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি, তাহলে

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ
وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ
فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾

(তিনি এজন্য এমনটি হতে দেন) যাতে শয়তানের নিক্ষিপ্ত অনিষ্টকে পরীক্ষায় পরিণত করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে (মুনাফিকীর) রোগ রয়েছে এবং যাদের হৃদয়বৃত্তি মিথ্যা-কলুষিত— আসলে এ যালেমরা শত্রুতায় অনেক দূরে পৌঁছে গেছে— এবং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা জেনে নেয় যে, তোমার রবের পক্ষ থেকে এটা সত্য এবং তারা এর প্রতি ঈমান আনে এবং এর সামনে তাদের অন্তর ঝুঁকে পড়ে ; যারা ঈমান আনে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ চিরকাল সত্য-সরল পথ দেখিয়ে থাকেন।[১০১]

তারা হবে বড়ই নির্বোধ। ঐতিহাসিক ফলাফলের জন্য দিন, মাস ও বছর তো সামান্য ব্যাপার, শতাব্দীও কোনো বিরাট ব্যাপার নয়।

৯৪. আমি তোমাদের ভাগ্য নির্ণায়ক নই বরং একজন সতর্ককারী মাত্র। সর্বনাশ ঘটার আগে তোমাদের সতর্ক করে দেয়াই আমার কাজ এর বেশী কোনো দায়িত্ব আমার ওপর নেই। পরবর্তী ফায়সালা করা আল্লাহর কাজ। তিনিই সিদ্ধান্ত নেবেন কাকে কতদিন পর্যন্ত অবকাশ দেবেন এবং কবে কোন অবস্থায় শাস্তি দেবেন।

৯৫. "মাগফেরাত" বলতে বুঝানো হয়েছে অপরাধ, পাপ, ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্বলতা উপেক্ষা করা ও এড়িয়ে চলা। আর "সম্মানজনক জীবিকা"র দু'টি অর্থ হয়। প্রথমত উত্তম জীবিকা দেয়া এবং দ্বিতীয়ত মর্যাদার সাথে প্রতিষ্ঠিত করে জীবিকা দেয়া।

৯৬. রসূল ও নবীর মধ্যে পার্থক্যের ব্যাপারটির ব্যাখ্যা সূরা মারয়ামের ৩০ টীকায় আলোচিত হয়েছে।

৯৭. মূল শব্দটি হচ্ছে, تَمَنَّى (তামান্না)। আরবী ভাষায় এ শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি অর্থ হচ্ছে কোনো জিনিসের আশা-আকাংখা করা। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে তেলাওয়াত অর্থাৎ কিছু পাঠ করা।

৯৮. "তামান্না" শব্দটি যদি প্রথম অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, শয়তান ও তার আকাংখা পূর্ণ হবার পথে বাধার সৃষ্টি করে। আর দ্বিতীয় অর্থে গ্রহণ করলে এর অর্থ

হবে, যখনই তিনি লোকদেরকে আল্লাহর বাণী শুনিয়েছেন তখনই শয়তান সে সম্পর্কে লোকদের মনে নানা সন্দেহ-সংশয় ও আপত্তি সৃষ্টি করে দিয়েছে, সেগুলোর অদ্ভুত অদ্ভুত অর্থ তাদের সামনে তুলে ধরেছে এবং একমাত্র সঠিক অর্থটি ছাড়া বাকি সব ধরনের উল্টা-পাল্টা অর্থ লোকদেরকে বুঝিয়েছে।

৯৯. প্রথম অর্থটির দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য হবে এই যে, আল্লাহ শয়তানের বিঘ্ন সৃষ্টি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত নবীর তামান্না তথা আশা-আকাংখা (আর নবীর আশা-আকাংখা এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, তাঁর প্রচেষ্টা ফলবতী এবং মিশন বাস্তবায়িত হবে) পূর্ণ করেন এবং নিজের আয়াতকে (অর্থাৎ নবীর সাথে তিনি যেসব অঙ্গীকার করেছিলেন) পাকাপোক্ত ও মজবুত অঙ্গীকারে পরিণত করেন। দ্বিতীয় অর্থটির দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য হবে, শয়তানের ঢুকানো সন্দেহ-সংশয় ও আপত্তি আল্লাহ দূর করে দেন এবং এক একটি আয়াত সম্পর্কে সে লোকদের মনে যেসব জটিলতা সৃষ্টি করে পরবর্তী কোনো অধিকতর সুস্পষ্ট আয়াতের মাধ্যমে সেগুলো পরিষ্কার করে দেয়া হয়।

১০০. অর্থাৎ তিনি জানেন শয়তান কোথায় কি বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে এবং তার কি প্রভাব পড়েছে। তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শয়তানী ফিতনার প্রতিবিধান করে।

১০১. অর্থাৎ শয়তানের ফিতনাবাজীকে আল্লাহ লোকদের জন্য পরীক্ষা এবং নকল থেকে আসলকে আলাদা করার একটা মাধ্যমে পরিণত করেছেন। বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন লোকেরা এসব জিনিস থেকে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এগুলো তাদের জন্য ভ্রষ্টতার উপকরণে পরিণত হয়। অন্যদিকে স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী লোকেরা এসব কথা থেকে নবী ও আল্লাহর কিতাবের সত্য হবার দৃঢ় প্রত্যয় লাভ করে এবং তারা অনুভব করতে থাকে যে, এগুলো শয়তানের অনিষ্টকর কার্যকলাপ। এ জিনিসটি তাদেরকে একদম নিশ্চিন্ত করে দেয় যে, এটি নির্ঘাত কল্যাণ ও সত্যের দাওয়াত, নয়তো শয়তান এতে এতো বেশী অস্থির হয়ে পড়তো না।

বক্তব্য পরম্পরা সামনে রাখলে এ আয়াতগুলোর অর্থ পরিষ্কার বুঝা যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত এ সময় যে পর্যায়ে ছিল তা দেখে বাহ্যজ্ঞানে সম্পন্ন লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। তারা মনে করছিল তিনি নিজের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েছেন। সাধারণ দর্শকরা এটাই দেখছিল যে, এক ব্যক্তির বিপুল আকাংখা ছিল। তিনি আশা করছিলেন তাঁর জাতি তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। তের বছর ধরে নাউযুবিল্লাহ অনেক মাথা খোড়ার পর তিনি শেষমেষ নিজের মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাথী সাথী নিয়ে প্রিয় স্বদেশভূমি থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হলেন। এ অবস্থায় লোকেরা যখন তাঁর এ বক্তব্য দেখতো যেখানে তিনি বলছেন, আমি আল্লাহর নবী এবং তিনি আমাকে সাহায্য-সহায়তা দান করছেন আর এ সংগে কুরআনের এ ঘোষণাবলীও দেখতো, যাতে বলা হয়েছে, নবীর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী জাতি আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হয় তখন তাদের কাছে তাঁর ও কুরআনের সত্যতা সংশয়িত হয়ে যেতো। তাঁর বিরোধীরা এর ফলে গায়ে পড়ে নানা কথা বলতো। তারা বলতো, কোথায় গেলো সে আল্লাহর সাহায্য সহায়তা ? কি হলো সে শাস্তির ভয় দেখাবার ? আমাদের যে আযাবের ভয় দেখানো হতো তা এখন আসে না কেন ? এর আগের আয়াতগুলোতে এসব কথার জবাব দেয়া হয়েছিল। এবং এরি জবাবে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। আগের আয়াতগুলোতে জবাবের লক্ষ ছিল

কাফেরা এবং এ আয়াতগুলোতে এর লক্ষ হচ্ছে এমন সব লোক যারা কাফেরদের প্রচারণায় প্রভাবিত হচ্ছিল। সমগ্র জবাবের সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে ঃ

"কোনো জাতি কর্তৃক তার নবীর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার ব্যাপারটি ইতিহাসে কোনো নতুন ঘটনা নয়। ইতিপূর্বেও এমনটিই হয়েছে। তারপর এ মিথ্যা আরোপের পরিণামও ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের আকারে তোমাদের সামনে রয়েছে। শিক্ষা নিতে চাইলে এ থেকে নিতে পারো। তবে মিথ্যা আরোপ এবং নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার সাথে সাথেই কুরআনের অসংখ্য আয়াতে যে আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে তা শুরু হয়ে যায়নি কেন, এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, প্রত্যেকটি প্রত্যাখ্যান সংগে সংগেই আযাব নিয়ে আসে একথা কবে বলা হয়েছিল ? আর আযাব নিয়ে আসা নবীর নিজের কাজ এ কথাইবা তিনি কবে বলেছিলেন ? এর ফায়সালা তো আল্লাহ নিজেই করেন এবং তিনি তাড়াহুড়ো করে কাজ করেন না। ইতিপূর্বেও তিনি আযাব নাযিল করার আগে জাতিগুলোকে অবকাশ দিয়ে এসেছেন এবং এখনো দিচ্ছেন। এ অবকাশকাল যদি শত শত বছর পর্যন্তও দীর্ঘ হয় তাহলে এ থেকে নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি আযাব নাযিলের হুমকি দেয়া হয়েছিল তা অন্তরসারশূন্য প্রমাণিত হয় না।

তারপর নবীর আশা-আকাংখা পূর্ণ হবার পথে বাধার সৃষ্টি হওয়া বা তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ এবং বিভিন্ন প্রকার সন্দেহ-সংশয়-আপত্তির প্রবল ঝড় সৃষ্টি হওয়াও কোনো নতুন কথা নয়। পূর্বে সকল নবীর দাওয়াতের মোকাবিলায় এসব কিছুই হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ এসব শয়তানী ফিতনার মূলোচ্ছেদ করেছেন। বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সত্যের দাওয়াত সম্প্রসারিত হয়েছে। সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত আয়াতের মাধ্যমে সন্দেহ-সংশয়ের বিঘ্ন দূরীভূত হয়েছে। শয়তান ও তার সাংগ পাংগরা এসব কৌশল অবলম্বন করে আল্লাহর আয়াতকে মর্যাদাহীন করতে চেয়েছে। কিন্তু আল্লাহ সেগুলোকেই মানুষের মধ্যে আসল ও নকলের পার্থক্য করার মাধ্যমে পরিণত করেছেন। এ পথেই আসল ও নির্ভেজাল মানুষেরা সত্যের দাওয়াতের দিকে এগিয়ে আসে এবং ভেজাল ও মেকী লোকেরা ছাটাই হয়ে আলাদা হয়ে যায়।"

পূর্বাপর বক্তব্যের আলোকে এ হচ্ছে এ আয়াতগুলোর পরিষ্কার ও সহজ সরল অর্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয় একটি রেওয়ায়াত এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যার মধ্যে এমন জটিলতা সৃষ্টি করে দিয়েছে যার ফলে কেবল এদের অর্থেরই আমূল পরিবর্তন ঘটেনি বরং সমগ্র দীনের বুনিয়াদই বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। এখানে আমি এর আলোচনা এজন্য করছি যে, কুরআনের জ্ঞানানুশীলনকারীকে অবশ্যই কুরআনের অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করার ক্ষেত্রে রেওয়ায়াতের সাহায্য গ্রহণ করার সঠিক ও বেঠিক পদ্ধতিগুলোর পার্থক্য ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে এবং তাদের জানতে হবে রেওয়ায়াতের প্রতি মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে অবৈধ বাড়াবাড়ির ফল কি হয় এবং কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা প্রদানকারী রেওয়ায়াত যাচাই করার সঠিক পদ্ধতি কি।

ঘটনা এভাবে বর্ণনা করা হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে আকাংখা জাগে, আহা, যদি কুরআনে এমন কোনো আয়াত নাযিল হতো যার ফলে ইসলামের বিরুদ্ধে কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের ঘৃণা দূর হয়ে যেতো এবং তারা কিছুটা

কাছাকাছি এসে যেতো। অথবা কমপক্ষে তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে এমন কড়া সমালোচনা না হতো যা তাদেরকে উত্তেজিত করে, এ আকাংখা তাঁর মনের মধ্যেই ছিল এমন সময় একদিন কুরাইশদের একটি বড় মজলিসে বসে থাকা অবস্থায় তাঁর ওপর সূরা নজম নাযিল হয় এবং তিনি তা পড়তে শুরু করেন। যখন তিনি اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى আয়াতে পৌঁছেন তখন হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে নাকি বের হয়ে যায় ঃ تِلْكَ الْغَرَانِيْقَةُ الْعُلٰى وَاِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْجٰى এরা সব মহিমান্বিত দেবী, এদের সুপারিশ অবশ্যই কাংখিত। এরপর তিনি সামনের দিকে সূরা নজমের আয়াতগুলো পড়ে যেতে থাকেন। এমনকি সূরা শেষে যখন তিনি সিজদা করেন তখন মুশরিক মুসলিম নির্বিশেষে সবাই সিজদা করে। কুরাইশ বংশীয় কাফেররা বলতে থাকে, এখন আর মুহাম্মাদের সাথে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। আমরাও তো একথাই বলতাম, আল্লাহ হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা আর আমাদের এ দেবদেবীরা তাঁর দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশকারী। সন্ধ্যায় জিব্রীল আসেন। তিনি বলেন, এ আপনি কি করলেন? এ দুটি বাক্য তো আমি নিয়ে আসিনি। এতে তিনি বড়ই দুঃখ ভারাক্রান্ত হন। তখন মহান আল্লাহ সূরা বনী ইসরাঈলের ৮ রুকূর নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ..... ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا

এ বিষয়টি সব সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুঃখ ভারাক্রান্ত করে রেখে। শেষে সূরা হজ্জের এ আয়াতটি নাযিল হয় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ মর্মে সান্ত্বনা দেয়া হয় যে, তোমার পূর্বেও নবীদের সাথে এমনিতর ঘটনা ঘটতে থেকেছে। ওদিকে কুরআন শুনে কুরাইশের লোকেরাও নবীর সাথে সিজদা করেছে এ ঘটনাটি হাবশার মুহাজিরদের কানেও এভাবে পৌঁছে যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মক্কার কাফেরদের সমঝোতা হয়ে গেছে তাই বহু মুহাজির মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু এখানে এসে তারা জানতে পারেন সমঝোতা ও সন্ধির খবরটি ভুল ছিল, ইসলাম ও কুফরের শত্রুতা আগের মতই অপরিবর্তিত আছে

এ ঘটনাটি ইবনে জারীর ও অন্যান্য বহু তাফসীরকার নিজেদের তাফসীর গ্রন্থে, ইবনে সা'দ তাবকাতে ১ম ওয়াহেদী, আসবাবুন নুযুলে, মূসা ইবনে উকবাহ মাগাযীতে- ইবনে ইসহাক সীরাতে এবং ইবনে আবী হাতেম, ইবনুল মুনযির, বাযযার, ইবনে মারদুইয়া ও তাবারানী নিজেদের হাদীস সংকলনে উদ্ধৃত করেছেন। যেসব বর্ণনা পরম্পরায় এ ঘটনাটি উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলো মুহাম্মাদ ইবনে কায়েস, মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরযী, উবাইদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, আবু সালেহ, আবুল আলীয়াহ, সা'ঈদ ইবনে জুবাইর, দাহহাক, আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারেস, কাতাদাহ, মুজাহিদ, সুদ্দী, ইবনে শিহাব, যুহরী ও ইবনে আব্বাস পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। উল্লেখ্য ইবনে আব্বাস ছাড়া এদের মধ্যে আর একজনও সাহাবী নেই। ঘটনাটির বিস্তারিত বর্ণনার ক্ষেত্রে সামান্য ছোট-খাটো বিরোধ ও অসামঞ্জস্য বাদ দিলেও দু'টি বড় বড় বিরোধ দেখা যায়। একটি হচ্ছে, মূর্তির

প্রশংসায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে যেসব শব্দ বেরিয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে তা প্রায় প্রত্যেক বর্ণনায় অন্য বর্ণনা থেকে আলাদা। আমি এগুলো একত্র করার চেষ্টা করেছি। ফলে পনেরটি ইবারতে আলাদা আলাদা শব্দ পেয়েছি। দ্বিতীয় বড় বিরোধটি হচ্ছে, কোন্ বর্ণনার প্রেক্ষিতে এ শব্দগুলো অহীর মাঝখানে শয়তান তাঁর মনে ঢুকিয়ে দেয় এবং তিনি মনে করেন এও বুঝি জিব্রীল এনেছেন। কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে, এ শব্দগুলো নিজের পূর্বের বাসনার প্রভাবে ভুলক্রমে তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে গেছে। কোনোটায় বলা হয়েছে, সে সময় তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন এবং এ অবস্থায় এ শব্দগুলো তাঁর কণ্ঠ থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। কারোর বর্ণনা হচ্ছে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে একথা বলেন এবং অস্বীকারমূলক জিজ্ঞাসা হিসেবেই বলেন। কারো বক্তব্য হচ্ছে, শয়তান তাঁর আওয়াজের সাথে আওয়াজ মিলিয়ে এ শব্দগুলো বলে দেয় এবং মনে করা হয় তিনি এগুলো বলেছেন। আবার কারো মতে মুশরিকদের মধ্যে থেকে কেউ একথা বলে।

ইবনে কাসীর, বাইহাকী, কাযী আইয়ায, ইবনে খুযাইমা, কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী, ইমাম রাযী, করতুবী, বদরুদ্দীন আইনী, শাওকানী, আল্লামা আলূসী প্রমুখ মহোদয়গণ এ ঘটনাটিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা গণ্য করেন। ইবনে কাসীর বলেন, "যতগুলো সনদের মাধ্যমে এ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে সবগুলোই মুরসাল[১] ও মুনকাতে[২]। কোনো সহীহ মুত্তাসিল[৩] সনদের মাধ্যমে এ হাদীসটি আমি পাইনি।" বাইহাকী বলেন, "হাদীস বিচারের যথার্থ পদ্ধতিতে এ ঘটনাটি প্রমাণিত নয়।" ইবনে খুযাইমাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়, তাতে তিনি বলেন, "এটি যিনদিকদের (যরোথুস্ট্রীয়পন্থী নাস্তিক্যবাদী গোষ্ঠী) তৈরি করা।" কাযী আইয়ায বলেন, "এর দুর্বলতা এখান থেকেই সুস্পষ্ট যে, সিহাহে সিত্তার[৪] লেখকদের একজনও নিজের গ্রন্থে একে স্থান দেননি এবং কোনো সহীহ মুত্তাসিল ত্রুটিমুক্ত সনদ সহকারে নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমেও এটি উদ্ধৃত হয়নি।" ইমাম রাযী, কাযী আবু বকর ও আলূসী এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করে শক্তিশালী যুক্তির ভিত্তিতে একে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু অন্যদিকে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীর মতো উচ্চস্তরের মুহাদ্দিস, আবু বকর জাসসাসের ন্যায় খ্যাতিমান ফকীহ, যামাখশারীর মতো যুক্তিবাদী মুফাসসির এবং ইবনে জারীরের ন্যায় তাফসীর, ইতিহাস ও ফিকাহ্র ইমাম একে সহীহ বলে স্বীকার করেন এবং একেই আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা গণ্য করেন। ইবনে হাজারের মুহাদ্দিস সুলভ যুক্তি হচ্ছে ঃ

১. মুরসাল ঃ যে হাদীসের সনদের শেষের দিকে তাবেঈর পরে কোনো রাবী নেই এবং তাবেঈ নিজেই বলেছেন, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন।"

২. মুনকাতে ঃ যে হাদীসের কোনো স্তরে এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়ে যায়।

৩. মুত্তাসিল ঃ যে হাদীসের সনদের কোনো স্তরে কোনো রাবী বাদ পড়েনি এবং সকল রাবীর নাম যথাস্থানে উল্লেখিত হয়েছে।

৪. সিহাহে সিত্তা ঃ ছয়টি সহীহ তথা নির্ভুল হাদীস গ্রন্থ যেমন, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ।

"সাঈদ ইবনে জুবাইরের মাধ্যম ছাড়া বাকি অন্যান্য যেসব মাধ্যমে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, তা হয় যঈফ[৫] আর নয়তো মুনকাতে।" কিন্তু মাধ্যমের সংখ্যাধিক্য একথা প্রকাশ করে যে, এর নিশ্চয়ই কোন মূল আছে। এছাড়াও এটি একটি মাধ্যমে মুত্তাসিল পদ্ধতিতে সহীহ সনদ সহকারেও বর্ণিত হয়েছে। বাযযার এটি উদ্ধৃত করেছেন। (এখানে ইউসুফ ইবনে হাম্মাদ-উমাইয়াহ ইবনে খালেদ থেকে, তিনি শু'বা থেকে, তিনি আবু বিশর থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদীসটির কথা বলা হয়েছে) অন্য দুটি মাধ্যমে যদিও মুরসাল বর্ণিত হয়েছে কিন্তু এর রাবীগণ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী পূর্ণ গুণ সম্পন্ন। তাবারী এ দুটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। একটি উদ্ধৃত হয়েছে ইউনুস ইবনে ইয়াযীদ কর্তৃক ইবনে শিহাব থেকে এবং অন্যটি মুতামির ইবনে সুলাইমান ও হাম্মাদ ইবনে সালামাহ কর্তৃক দাউদ ইবনে আবী হিন্দ থেকে এবং তিনি আবীল আলীয়াহ থেকে।"

সমর্থকদের ব্যাপারে বলা যায়, তারা তো এ হাদীসটিকে সহীহ বলে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু বিরোধীরাও সাধারণভাবে এর বিরুদ্ধে সমালোচনার হক আদায় করেননি। একটি দল একে প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ তাদের দৃষ্টিতে এর সনদ শক্তিশালী নয়। এর অর্থ এই দাঁড়ায়, যদি সনদ শক্তিশালী হতো তাহলে তারা এ কাহিনীটি মেনে নিতেন। দ্বিতীয় দলটি একে এজন্য প্রত্যাখ্যান করেন যে, এর ফলে সমগ্র দীনই সন্দেহযুক্ত হয়ে যায় এবং দীনের প্রত্যেকটি বিষয়ের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেয় যে, নাজানি আরো কোথায় কোথায় শয়তানী কুমন্ত্রণা ও মিশ্রণের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। অথচ এ ধরনের যুক্তি তো কেবল এমনসব লোককে নিশ্চিত করতে পারে যারা আগে থেকে দৃঢ় ও পরিপক্ক ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। কিন্তু যারা প্রথম থেকেই সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে অবস্থান করছেন অথবা যারা এখন গবেষণা-অনুসন্ধানের মাধ্যমে ঈমান আনা বা না আনার ফায়সালা করতে চান তাদের মনে তো যেসব জিনিসের কারণে এ দীন সন্দেহযুক্ত হয়ে যায় সেগুলো প্রত্যাখ্যান করার অনুভূতি জাগতে পারে না। বরং তারা বলবেন, যখন কমপক্ষে একজন প্রখ্যাত সাহাবী এবং বহু তাবেঈ, তাবে'তাবেঈ ও অসংখ্য নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারীদের বর্ণনার মাধ্যমে একটি ঘটনার প্রমাণ হচ্ছে তখন তাকে শুধুমাত্র এজন্যই বা কেন প্রত্যাখ্যান করা হবে যে, এর ফলে আপনার দীন সংশয়পূর্ণ হয়ে যায় ? এর পরিবর্তে আপনার দীনকেই বা সংশয়পূর্ণ মনে করা হবে না কেন যখন এ ঘটনাটি তাকে সংশয়পূর্ণ বলে প্রমাণ করছে।

এখন সমালোচনা ও যাচাই বাছাইয়ের সঠিক পদ্ধতি চিহ্নিত করা দরকার, যার কষ্টিপাথরে যাচাই করে এর সনদ যতই শক্তিশালী বা দুর্বল হোক না কেন একে অগ্রহণযোগ্য গণ্য করা যেতে পারে।

৫. যঈফ ঃ যে হাদীসের রাবীর মধ্যে 'আদালত' ও 'যবৃত' গুণ যে কোনো পর্যায়েই থাকে না। আদালত মানে হচ্ছে (১) তাকওয়া ও পবিত্র গুণ থাকা, (২) মিথ্যা না বলা, (৩) কবীরা গুনাহ না করা (৪) অজ্ঞাতনামা না হওয়া অর্থাৎ দোষগুণ বিচারের জন্য যার জীবনী জানা সম্ভব হয় না এবং (৫) শরীয়াত বিরোধী আকীদা বিশ্বাসের অধিকারী এবং বিদআতীও নয়। অন্যদিকে 'যবৃত' হচ্ছে এমন শক্তি যার সাহায্যে মানুষ শোনা বা লিখিত বিষয়কে ভুলে যাওয়া বা বিনষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে এবং ইচ্ছামতো তাকে সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে।—অনুবাদক

প্রথম জিনিসটি হচ্ছে তার আভ্যন্তরীণ সাক্ষ। এটি তাকে ভুল প্রমাণ করে কাহিনীটিতে বর্ণনা করা হয়েছে, হাবশায় হিজরাত সম্পন্ন হয়ে যাবার পর ঘটনাটি ঘটে এবং এই ঘটনার খবর শুনে হাবশায় হিজরাতকারীদের একটি দল মক্কায় ফিরে আসে। এবার একটু তারিখের পার্থক্য বিবেচনা করুন।

০—নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনার ভিত্তিতে জানা যায় হাবশায় হিজরাত অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চম নববী সালের রজব মাসে। আর হাবশার মুহাজিরদের একটি দল সমঝোতার ভুল খবর শুনে তিন মাস পরে (অর্থাৎ একই বছর প্রায় শওয়াল মাসে) মক্কায় ফিরে আসে। এ থেকে জানা যায়, এটি নির্ঘাত পঞ্চম নববী সনের ঘটনা।

০—সূরা বনী ইসরাঈলের একটি আয়াতের ব্যাপারে বলা হচ্ছে, সেটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কাজের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছিল। সূরা বনী ইসরাঈল মি'রাজের পরে নাযিল হয়। আর নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহের ভিত্তিতে বলা যায়, ১১ বা ১২ নববী সালে মি'রাজ অনুষ্ঠিত হয়। এর অর্থ দাঁড়ায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কাজের পাঁচ ছয় বছর পর আল্লাহ তাঁর অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

০—আর পূর্বাপর বক্তব্যের ভিত্তিতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আলোচ্য আয়াতটি ১ হিজরী সনে নাযিল হয়। অর্থাৎ ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশের পরও যখন আরো দুই আড়াই বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে তখন ঘোষণা করা হয়, এ মিশ্রণ তো শয়তানী কুমন্ত্রণার মাধ্যমে ঘটে গিয়েছিল। আল্লাহ একে রহিত করে দিয়েছেন।

কোনো বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি কি একথা মেনে নিতে পারে যে, মিশ্রণের কাজটি হলো আজ, তার ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করা হলো ৬ বছর পর এবং মিশ্রণটি রহিত করার ঘোষণা হলো ৯ বছর পর ?

তারপর এ ঘটনায় বলা হয়েছে, এ মিশ্রণটি হয়েছিল সূরা নজমে এবং এভাবে হয়েছিল যে, শুরু থেকে নবী (স) আসল সূরার শব্দাবলী পাঠ করে আসছিল। হঠাৎ مَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ। বাক্যাংশে পৌঁছে তিনি নিজেই বা শয়তানী প্ররোচনায় এ বাক্য মিশিয়ে দিলেন এবং তারপর সামনের দিকে আবার সূরা নজমের আসল আয়াত পড়তে থাকলেন। এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, মক্কার কাফেররা এটা শুনে খুশী হয়ে গিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, এখন আমাদের ও মুহাম্মাদের মধ্যে বিরোধ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু সূরা নজমের বক্তব্য পরম্পরায় এ প্রক্ষিপ্ত বাক্যটি সংযুক্ত করে দেখুন তো কি দাঁড়ায় ঃ

"তারপর তোমরা কি একটু চিন্তা করে দেখেছো এই লাত, উযযা ও তৃতীয় একটি (দেবী) মানাত সম্পর্কে ? এরা হচ্ছে উচ্চ মর্যাদাশালিনী দেবী। এদের সুপারিশ অবশ্যই কাংখিত। তোমাদের জন্য হবে পুত্রগণ এবং তার (অর্থাৎ আল্লাহর) জন্য হবে কন্যাগণ ? এতো বড় অন্যায় ভাগ-বাটোয়ারা। আসলে এগুলো কিছুই নয় তবে কতিপয় নাম, যা তোমরা ও তোমাদের বাপদাদারা রেখে দিয়েছে। আল্লাহ এগুলোর জন্য কোনো প্রমাণপত্র অবতীর্ণ করেননি। লোকেরা নিছক অনুমান ও মনগড়া চিন্তার অনুসরণ করে চলছে। অথচ তাদের রবের পক্ষ থেকে সঠিক পথ-নির্দেশনা এসে গেছে।"

দেখুন এ প্রারাগ্রাফটির মধ্যে রেখাচিহ্নিত বাক্যটির বক্তব্য কেমন পরিষ্কার বৈপরীত্য সৃষ্টি করে দিয়েছে। এক কথায় বলে দেয়া হচ্ছে। যথার্থই তোমাদের এ দেবীগুলো উচ্চমর্যাদার অধিকারী, এদের সুপারিশ অবশ্যই আকাংখার বস্তু। অন্য কথায় উল্টা দিকে মুখ করে আবার তাদেরই ওপর আঘাত হানা হচ্ছে এই বলে যে, নির্বোধের দল! তোমরা আল্লাহর জন্য এ মেয়েদেরকে কেমন করে ঠিক করে রাখলে ? ধাপ্পা তো মন্দ নয়, তোমরা নিজেরা তো পেলে পুত্র আর আল্লাহর হিস্সায় কন্যা। এসব তোমাদের মনগড়া। এগুলোর সপক্ষে আল্লাহর কোনো প্রমাণপত্র তোমাদের কাছে নেই। এটি একটি স্রেফ পরস্পর বিরোধী ভাষণ—যা কোনো বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান মানুষের মুখ থেকে বের হতে পারে না। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য এ প্রশ্নটি এড়িয়ে যান। মেনে নিন, শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়ে একথা মুখ দিয়ে বের করিয়েছেন। কিন্তু কুরাইশদের সে সমগ্র জনমণ্ডলী যারা একথা শুনছিল তারা কি একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিল যে, পরবর্তী বাক্যগুলোয় এই প্রশংসাপূর্ণ শব্দগুলোর সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যানের বার্তা শুনেও তারা একথাই মনে করতে থাকলো যে, তাদের দেবীদেরকে যথার্থই প্রশংসা করা হয়েছে ? সূরা নজমের শেষ পর্যন্ত যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে সে সমগ্র বক্তব্যই এ একটি মাত্র প্রশংসামূলক বাক্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। কেমন করে একথা মেনে নেয়া যেতে পারে যে , কুরাইশের লোকেরা এগুলো শেষ পর্যন্ত শোনার পর সবাই মিলে একযোগে এ বলে চিৎকার করে বলে থাকবে যে, চলো আজ আমাদের ও মুহাম্মাদের মধ্যকার বিরোধ খতম হয়ে গেছে ?

এতো হচ্ছে এ ঘটনার আভ্যন্তরীণ সাক্ষ! এর মাধ্যমে ঘটনাটি যে একেবারেই অর্থহীন ও বাজে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে। এরপর দ্বিতীয় যে জিনিসটি দেখার তা হচ্ছে এই যে, এর মধ্যে তিনটি আয়াতের নাযিল হওয়ার যে কার্যকারণ বর্ণনা করা হচ্ছে কুরআনের বিন্যাসও তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত কি না ? ঘটনায় বলা হচ্ছে, সূরা নাজমে মিশ্রণ করা হয়েছিল। আর সূরা নাজম ৫ নববী সনে নাযিল হয়। এ মিশ্রণের বিরুদ্ধে সূরা বনী ইসরাঈলের আয়াতে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। আবার একে রহিত ও ঘটনার ব্যাখ্যা করা হয় সূরা হজ্জের আলোচ্য আয়াতে। এখন অবশ্য দু'টি অবস্থার মধ্যে যে কোনো একটিই হয়ে থাকবে। মিশ্রণের ঘটনা যখন ঘটেছে তখনই ক্রোধ প্রকাশ ও রহিত করার আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে অথবা ক্রোধ সংক্রান্ত আয়াত সূরা বনী ইসরাইলের সাথে এবং রহিত করা সংক্রান্ত আয়াত সূরা হজ্জের সাথে নাযিল হয়েছে। যদি প্রথম অবস্থাটি হয়ে থাকে। তাহলে বলতে হয় বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার। এ আয়াত দু'টি সূরা নাজমে সংযুক্ত করা হলো না বরং ক্রোধ সংক্রান্ত আয়াতকে ছ'বছর পর্যন্ত এমনিভাবেই রেখে দেয়া হলো এবং সূরা বনী ইসরাঈল যখন নাযিল হলো তখনই তাকে এনে তার সাথে জুড়ে দেয়া হলো। তারপর আবার রহিত করা সংক্রান্ত আয়াত আরো দু–আড়াই বছর পর্যন্ত পড়ে রইলো এবং সূরা হজ্জ নাযিল না হওয়া পর্যন্ত তাকে কোথাও সংযুক্ত করা হলো না। কুরআনের বিন্যাস কি এভাবেই হয়েছে, এক সময় যে আয়াতগুলো নাযিল হয় সেগুলো বিক্ষিপ্ত আকারে চারদিকে পড়ে থাকে এবং বছরের পর বছর পার হয়ে যাবার পর তাদের কোনটিকে কোন সূরার সাথে এবং কোন্‌টিকে অন্য সূরার সাথে জুড়ে দেয়া হয় ? কিন্তু যদি দ্বিতীয় অবস্থাটি হয়ে থাকে অর্থাৎ ক্রোধ সংক্রান্ত আয়াত ঘটনার ৬ বছর পর এবং রহিত করা সংক্রান্ত আয়াত আট নয় বছর পর নাযিল হয় তাহলে ইতিপূর্বে আমি যে,

অসামঞ্জস্যের কথা বলে এসেছি তা ছাড়াও এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা হজ্জের মধ্যে এ আয়াতগুলোর নাযিল হওয়ার সুযোগ কোথায় ?

এখানে এসে যথার্থ সমালোচনার তৃতীয় ধারাটি আমাদের সামনে আসে। অর্থাৎ কোনো আয়াতের যে ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে কুরআনের পূর্বাপর বক্তব্যও তা গ্রহণ করে কি না তা দেখতে হবে। সূরা বনী ইসরাঈলের ৮ রুকূ পড়ে দেখুন। তার পূর্বের ও পরের বক্তব্যের ওপর চোখ বুলিয়ে নিন। এ বক্তব্য পরম্পরায় নবীকে ছ'বছর আগের একটি ঘটনার জন্য শাসিয়ে দেবার সুযোগ কোথায় পাওয়া যায় ? إِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ আয়াতে নবীকে কোনো প্রকার শাসানো হচ্ছে কিনা এবং আয়াতের শব্দাবলী কাফেরদের ফিতনায় নবীর জড়িয়ে পড়ার কথা বলছে, না তার প্রতিবাদ করছে—এ প্রশ্ন বাদ দিলেও এভাবে সূরা হজ্জও আপনার সামনে আছে। আলোচ্য আয়াতের পূর্বের বক্তব্যও পড়ুন এবং পরের বক্তব্যও। এ প্রেক্ষাপটে হে নবী ! ৯ বছর পূর্বে কুরআনে মিশ্রণ ঘটাবার যে কাজ তুমি করেছিলে, সে ব্যাপারে ভয় পেয়ো না, ইতিপূর্বেকার নবীদের সাথেও শয়তান এ ব্যবহার করে এসেছে এবং যখনই নবীরা এ ধরনের কাজ করে তখনই আল্লাহ তাকে রহিত করে নিজের আয়াতকে আবার শক্তিশালী ও তরতাজা করে দেন।"—এ ধরনের বক্তব্য কেমন করে এসে গেলো, এর কোনো যুক্তিসংগত কারণ কি আপনি বুঝতে পেরেছেন ?

আমি এর আগেও বার বার বলেছি এবং এখানেও আবার তার পুনরাবৃত্তি করছি যে, কোনো রেওয়ায়াত তার বর্ণনা পরম্পরা যতই সূর্যের চাইতেও উজ্জল হোক না কেন তার 'মতন'[১] যখন তার ভুলের দ্ব্যর্থহীন প্রমাণ পেশ করতে থাকে এবং কুরআনের শব্দাবলী, পূর্বাপর বক্তব্য, বিন্যাস, সবকিছুই তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে থাকে তখন তা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এ যুক্তিগুলো একজন সন্দেহবাদী ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধানীকে অবশ্য নিশ্চিত করে দেবে। তিনি এ কাহিনীটি পুরোপুরি মিথ্যা বলে মেনে নেবেন। আর কোনো মু'মিন তো একে কখনো সত্য বলে মেনে নিতে পারেন না। কারণ তিনি প্রকাশ্য দেখছেন এ রেওয়ায়াতটি কুরআনের একটি নয় বহু আয়াতের সাথে সংঘর্ষশীল। একজন মুসলমানের পক্ষে একথা মেনে নেয়া বড়ই সহজ যে, এ হাদীসটির বর্ণনাকারীদেরকে শয়তান বিভ্রান্ত করেছে। এর তুলনায় তারা কখনো একথা মেনে নিতে পারে না যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো নিজেই নিজের মানসিক আকাংখার তাড়নায় কুরআনে একটি শব্দও মেশাতে পারতেন অথবা তাঁর মনে কখনো মুহূর্তকালের জন্যও এ চিন্তা আসতে পারতো যে, তাওহীদের সাথে শিরকের কিছুটা মিশ্রণ ঘটিয়ে কাফেরদেরকে সন্তুষ্ট করা হোক কিংবা আল্লাহর ফরমানসমূহের ব্যাপারে তিনি কখনো এ আকাংখা পোষণ করতে পারতেন যে, আল্লাহ যেন এমন কোনো কথা বলে না বসেন যার ফলে কাফেররা নারাজ হয়ে যায় অথবা তাঁর কাছে এমন কোনো অসংরক্ষিত ও সংশয়পূর্ণ পদ্ধতিতে অহী আসতো যার ফলে জিব্রীলের সাথে সাথে শয়তানও তাঁর কাছে নিজের কোনো শব্দ প্রক্ষেপ করতো এবং তিনি তাকেও জিব্রীলের নিয়ে আসা শব্দ মনে করার ভুল ধারণায় নিমজ্জিত থাকতেন। এর মধ্যে প্রত্যেকটি কথাই কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য বিরোধী। আমাদের মনে কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যেসব আকীদা-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত আছে এগুলো তারও বিরোধী। এমন

১. বর্ণনা পরম্পরা বাদ দিয়ে হাদীসের মূল ভাষ্য।—অনুবাদক

وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ۝ اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۚ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

অস্বীকারকারীরা তো তার পক্ষ থেকে সন্দেহের মধ্যেই পড়ে থাকবে যতক্ষণ না তাদের ওপর কিয়ামত এসে পড়বে অকস্মাত অথবা নাযিল হয়ে যাবে একটি ভাগ্যাহত[১০২] দিনের শাস্তি। সেদিন বাদশাহী হবে আল্লাহর এবং তিনি তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন। যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল হবে তারা যাবে নিয়ামত পরিপূর্ণ জান্নাতে আর যারা কুফরী করে থাকবে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে থাকবে তাদের জন্য হবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

ধরনের রেওয়ায়াতের পেছনে দৌড়ানো থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই, নিছক সনদের সংযোগ রাবীদের নির্ভরযোগ্যতা কিংবা বর্ণনাসূত্রের আধিক্য দেখে কোনো মুসলমানকে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের ব্যাপারে এমন কঠিন কথাও স্বীকার করে নিতে উদ্বুদ্ধ করে।

এত বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারীকে এ ঘটনাটি বর্ণনা করার সাথে জড়িত থাকতে দেখে মনে যে সন্দেহ জাগে এ প্রসংগে তা দূর করে দেয়া সংগত মনে করি। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করতে পারে, যদি এ ঘটনাটির মূলে কোনো সত্য না-ই থাকে তাহলে নবী ও কুরআনের বিরুদ্ধে এত বড় অপবাদ হাদীসের এত বিপুল সংখ্যক রাবীদের মাধ্যমে যাদের মধ্যে বড় বড় খ্যাতিমান নির্ভরযোগ্য বুযর্গও রয়েছেন, কেমন করে বিস্তার লাভ করলো ? এর জবাব হচ্ছে, হাদীসের বিপুল সম্পদের মধ্যেই আমরা এর কারণ খুঁজে পাই। বুখারী, মুসলিম, আবুদ দাউদ, নাসাঈ ও মুসনাদে আহমদে আসল ঘটনাটি এভাবে এসেছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা নাজম তেলাওয়াত করেন। সূরা শেষে যখন তিনি সিজদা করেন তখন মুসলিম-মুশরিক নির্বিশেষে সকল উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সিজদা করে। আসল ঘটনা শুধু এতটুকুই ছিল। আর এটা কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না। প্রথমত কুরআনের শক্তিশালী বক্তব্য এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী বর্ণনা ভংগী, এর ওপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কণ্ঠে এর যাদুকরী প্রকাশের পর যদি তা শুনে উপস্থিত সমগ্র জনমণ্ডলী বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে তাঁর সাথে সাথে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে তাহলে তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এ জিনিসটির জন্যই তো কুরাইশরা বলতো, এ ব্যক্তি যাদুকর।

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۝ ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝

৮ রুকূ'

আর যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে তারপর নিহত হয়েছে বা মারা গেছে, আল্লাহ তাদেরকে ভালো জীবিকা দেবেন এবং নিশ্চয়ই আল্লাহই সবচেয়ে ভালো রিযিকদাতা। তিনি তাদেরকে এমন জায়গায় পৌঁছিয়ে দেবেন যা তাদেরকে খুশী করে দেবে, নিসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন ও পরম ধৈর্যশীল।[১০৩] এতো হচ্ছে তাদের অবস্থা, আর যে ব্যক্তি প্রতিশোধ নেয় ঠিক যেমন তার সাথে করা হয়েছে তেমনি এবং তারপর তার ওপর বাড়াবাড়িও করা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন,[১০৪] আল্লাহ গোনাহমাফকারী ও ক্ষমাশীল।[১০৫]

তবে মনে হয়, পরে কুরাইশরা নিজেদের এ সাময়িক ভাবাবেগের জন্য কিছুটা লজ্জিত হয়ে থাকবে এবং তাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি অথবা কিছু লোক নিজেদের এ কাজের এ ব্যাখ্যা দিয়ে থাকবে যে, জনাব আমরা তো মুহাম্মাদের মুখ থেকে নিজেদের মাবুদদের প্রশংসায় কিছু কথা শুনেছিলাম, যে কারণে আমরা তার সাথে সিজদায় লুটিয়ে পড়েছিলাম। অন্যদিকে এ ঘটনাটি হাবশার মুহাজিরদের কাছে এভাবে পৌঁছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরাইশদের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেছে। কারণ লোকেরা তাঁকে এবং মুশরিক ও মু'মিনদেরকে একসাথে সিজদা করতে দেখেছিল। এ গুজব এতো বেশী ছড়িয়ে পড়ে যে, প্রায় ৩৩ জন মুহাজির মক্কায় ফিরে আসেন। এক শতাব্দীর মধ্যে এ তিনটি কথা অর্থাৎ কুরাইশদের সিজদা, এ সিজদার এ ব্যাখ্যা এবং হাবশার মুহাজিরদের ফিরে আসা একসাথে মিশে একটি কাহিনীর আকার ধারণ করে এবং অনেক মুত্তাকী, বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য লোকও এ ঘটনা বর্ণনা করতে থাকেন। মানুষ যাই হোক না কেন মূলত মানুষই। বড় বড় সৎকর্মপরায়ণ ও জ্ঞানবান লোকেরাও অনেক সময় ভুল ভ্রান্তি করে বসেন এবং তাদের এ ভুল সাধারণ লোকের ভুলের তুলনায় অনেক বেশী ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। এদের প্রতি সীমাতিরিক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা পোষণকারীরা এদের সঠিক কথার সাথে সাথে ভুল কথাগুলোও চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করে নেয়। আর মন্দ চরিত্রের লোকেরা এদের ভুলগুলো বাছাই করে করে একত্র করে এবং এগুলোকে প্রমাণ হিসেবে

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ
وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ﴿٦١﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ
مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٦٢﴾
اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ
مُخْضَرَّةً ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿٦٣﴾ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٦٤﴾

এসব[১০৬] এজন্য যে, আল্লাহই রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতের মধ্যে[১০৭] এবং তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন।[১০৮] এসব এজন্য যে, আল্লাহই সত্য এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে এরা যাদেরকে ডাকে তারা সবাই মিথ্যা।[১০৯] আর আল্লাহই পরাক্রমশালী ও মহান। তুমি কি দেখো না, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তার বদৌলতে জমি সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে ?[১১০] আসলে তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ।[১১১] যাকিছু আকাশে ও পৃথিবীতে আছে সব তাঁরই। নিসন্দেহে তিনিই অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসার্হ।[১১২]

পেশ করে বলতে থাকে, এদের মাধ্যমে আমাদের কাছে যা কিছু পৌঁছেছে সবই আগুনে পুড়িয়ে ফেলার যোগ্য।

১০২. মূলে আছে عَقِيْمٌ শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে "বন্ধ্যা" দিনকে বন্ধ্যা বলার দুটি অর্থ হতে পারে। এক, এমন ভাগ্য বিড়ম্বিত দিন যার মধ্যে কোনো রকম কলাকৌশল কার্যকর হয় না। প্রত্যেকটা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রত্যেকটা আশা নিরাশায় পরিণত হয়। দুই, এমন দিন যার পরে রাত দেখা আর ভাগ্যে জোটে না। উভয় অবস্থায়ই এর অর্থ হচ্ছে, এমন দিন যেদিন কোনো জাতির ধ্বংসের ফায়সালা হয়ে যায়। যেমন যেদিন নূহের জাতির ওপর তুফান এলো সেদিনটি তাদের জন্য ছিল 'বন্ধ্যা' দিন। এমনিভাবে আদ, সামুদ, লূতের জাতি, মাদয়ানবাসী ও অন্যান্য সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির জন্য আল্লাহর আযাব নাযিলের দিনটি বন্ধ্যা দিনই প্রমাণিত হয়েছে। কারণ "সেদিনের" পরে আর তার "পরের দিন" দেখা যায়নি এবং নিজেদের বিপর্যস্ত ভাগ্যকে সৌভাগ্যে রূপান্তরিত করার কোনো পথই খুঁজে পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

১০৩. মূল শব্দ হচ্ছে عَلِيْمٌ অর্থাৎ তিনি জানেন কে প্রকৃতপক্ষে তাঁর পথে ঘর-বাড়ী ত্যাগ করেছে এবং সে কোন ধরনের পুরস্কার লাভের যোগ্য। মূলে আরো বলা

হয়েছে حَلِيْمٌ অর্থাৎ এ ধরনের ছোট ছোট ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্বলতার কারণে তাদের বড় বড় কর্মকাণ্ড ও ত্যাগকে তিনি বিনষ্ট করে দেবেন না। তিনি সেগুলো উপেক্ষা করবেন এবং তাদের অপরাধ মাফ করে দেবেন।

১০৪. প্রথমে এমন মজলুমদের কথা বলা হয়েছিল যারা জুলুমের জবাবে কোনো পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। আর এখানে এমন মজলুমদের কথা বলা হচ্ছে যারা জুলুমের জবাবে শক্তি ব্যবহার করে।

ইমাম শাফেঈ এ আয়াত থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, জুলুমের কিসাস সেভাবেই নেয়া হবে যেভাবে জুলুম করেছে। যেমন কোনো ব্যক্তি একজনকে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছে এ অবস্থায় তাকেও পানিতে ডুবিয়ে মারা হবে। আবার কোনো ব্যক্তি একজনকে পুড়িয়ে মেরেছে জবাবে তাকেও পুড়িয়ে মারা হবে। কিন্তু হানাফীয়াদের মতে হত্যাকারী যেভাবেই হত্যা করুক না কেন তার থেকে একই পরিচিত পদ্ধতিতেই কিসাস গ্রহণ করা হবে।

১০৫. এ আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে এবং সম্ভবত দুটি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। এক, জুলুমের জবাবে যে রক্তপাত করা হবে আল্লাহর কাছে তা ক্ষমাযোগ্য, যদিও রক্তপাত মূলত ভালো জিনিস নয়। দুই, তোমরা যে আল্লাহর বান্দা তিনি ভুল ত্রুটি মার্জনা করেন ও গোনাহ মাফ করে দেন। তাই তোমাদেরও সামর্থ অনুযায়ী মানুষের ভুলত্রুটি ও অপরাধ মার্জনা করা উচিত। মুমিনরা ক্ষমাশীল, উদার হৃদয় ও ধৈর্যশীল, এগুলো তাদের চরিত্রের ভূষণ। প্রতিশোধ নেবার অধিকার অবশ্যই তাদের আছে। কিন্তু নিছক প্রতিশোধ স্পৃহা ও প্রতিশোধ গ্রহণের মানসিকতা লালন করা তাদের জন্য শোভনীয় নয়।

১০৬. এ প্যারাটি সম্পর্কে শুধুমাত্র নিকটবর্তী শেষ বাক্যটির সাথে নয় বরং উপরের পুরো প্যারাটির সাথে রয়েছে। অর্থাৎ কুফরী ও জুলুমের পথ অবলম্বনকারীদের ওপর আযাব নাযিল করা, মুমিন সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে পুরস্কার দেয়া, সত্যপন্থী, মজলুমদের ফরিয়াদ শোনা এবং শক্তি প্রয়োগ করে জুলুমের মোকাবিলাকারী সত্যপন্থীদের সাহায্য করা, এসবের কারণ কি ? এসবের কারণ হচ্ছে আল্লাহর এই গুণাবলী।

১০৭. অর্থাৎ তিনিই সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থার শাসনকর্তা এবং দিন রাত্রির আবর্তন তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। এই বাহ্যিক অর্থের সাথে সাথে এ বাক্যের মধ্যে এদিকেও একটি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে যে, রাতের অন্ধকার থেকে যে আল্লাহ দিনের আলো বের করে আনেন এবং উজ্জ্বল দিনের ওপর যিনি রাতের অন্ধকার জড়িয়ে দেন তাঁরই এমন ক্ষমতা আছে। যার ফলে আজ যাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সূর্য মধ্যগগনে কিরণ দিচ্ছে তাদের পতন ও সূর্যাস্তের দৃশ্য দ্রুত দুনিয়াবাসী দেখতে পাবে এবং কুফর ও জাহেলিয়াতের যে অন্ধকার আজ সত্য ও ন্যায়ের প্রভাতের উদয়ের পথ রোধ করে আছে তা ক্ষণকালের মধ্যেই তাঁর হুকুমে সরে যাবে এবং এ সংগে সেদিনের উদয় হবে যেদিন সত্য, সততা ও জ্ঞানের আলোকে সারা দুনিয়া আলোকিত হয়ে উঠবে।

১০৮. অর্থাৎ তিনি অন্ধ ও বধির আল্লাহ নন বরং এমন আল্লাহ যিনি দেখতে ও শুনতে পান।

১০৯. অর্থাৎ তিনিই সত্যিকার ক্ষমতার অধিকারী ও যথার্থ রব। তাঁর বন্দেগীকারীরা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে না। আর অন্যান্য সকল মাবুদই আসলে পুরোপুরি অসত্য ও অর্থহীন।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي
الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا
بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٥﴾ وَهُوَ الَّذِي
أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾

৯ রুকূ'

তুমি কি দেখো না, তিনি পৃথিবীর সবকিছুকে তোমাদের জন্য অনুগত করে রেখেছেন এবং তিনিই নৌযানকে নিয়মের অধীন করেছেন যার ফলে তাঁর হুকুমে তা সমুদ্রে বিচরণ করে আর তিনিই আকাশকে এমনভাবে ধরে রেখেছেন যার ফলে তাঁর হুকুম ছাড়া তা পৃথিবীর ওপর পতিত হতে পারে না।[১১৩] আসলে আল্লাহ লোকদের জন্য বড়ই স্নেহশীল ও মেহেরবান। তিনিই তোমাদের জীবন দান করেছেন, তিনিই তোমাদের মৃত্যু দান করেন এবং তিনিই আবার তোমাদের জীবিত করবেন ; সত্য বলতে কি, মানুষ বড়ই সত্য অস্বীকারকারী।[১১৪]

তাদেরকে যেসব গুণাবলী ও ক্ষমতার মালিক মনে করা হয়েছে সেগুলোর মূলত কোনো ভিত্তি নেই। সুতরাং আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের ভরসায় যারা বেঁচে থাকে তারা কখনো সফলতা লাভ করতে পারে না।

১১০. এখানে আবার প্রকাশ্য অর্থের পেছনে একটি সূক্ষ্ম ইশারা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। প্রকাশ্য অর্থ তো হচ্ছে কেবলমাত্র আল্লাহর ক্ষমতা বর্ণনা করা। কিন্তু এর মধ্যে এ সূক্ষ্ম ইশারা রয়েছে যে, আল্লাহ যে বৃষ্টি বর্ষণ করেন তার ছিটেফোঁটা পড়ার সাথে সাথেই যেমন তোমরা দেখো বিশুষ্ক ভূমি অকস্মাৎ সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি আজ যে অহীর শান্তিধারা বর্ষিত হচ্ছে তা শিগগির তোমাদের এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখাবে। তোমরা দেখবে আরবের অনুর্বর বিশুষ্ক মরুভূমি জ্ঞান, নৈতিকতা ও সুসংস্কৃতির গুলবাগীচায় পরিণত হয়ে গেছে।

১১১. মূলে لَطِيفٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, অনুভূত পদ্ধতিতে নিজের ইচ্ছা ও সংকল্প পূর্ণকারী। তিনি এমন কৌশল অবলম্বন করেন যার ফলে লোকেরা তার সূচনায় কখনো তার পরিণামের কল্পনাও করতে পারে না। লাখো লাখো শিশু দুনিয়ায় জন্মলাভ করে। কে জানতে পারে, তাদের মধ্যে কে হবে ইবরাহীম যিনি নেতা হবে দুনিয়ার চার ভাগের তিন ভাগ মানুষের ? আর কে হবে চেংগীজ, যে বিধ্বস্ত করে দেবে এশিয়া ও ইউরোপ ভূখণ্ডকে ? দূরবীন যখন আবিষ্কার হয়েছিল তখন কে ধারণা করতে পেরেছিলে যে, এর ফলে এটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা পর্যন্ত মানুষ পৌঁছে যাবে ? কলম্বাস যখন সফরে বের হচ্ছিল তখন কে জানতো এর মাধ্যমে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ
وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾ وَإِنْ جَادَلُوكَ
فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾

প্রত্যেক[১১৫] উম্মতের জন্য আমি একটি ইবাদাতের পদ্ধতি[১১৬] নির্দিষ্ট করেছি, যা তারা অনুসরণ করে ; কাজেই হে মুহাম্মাদ! এ ব্যাপারে তারা যেন তোমার সাথে ঝগড়া না করে।[১১৭] তুমি তোমার রবের দিকে দাওয়াত দাও। অবশ্যই তুমি সঠিক সরল পথে আছো।[১১৮] আর যদি তারা তোমার সাথে ঝগড়া করে তাহলে বলে দাও, "যাকিছু তোমরা করছো আল্লাহ তা খুব ভালোই জানেন। তোমরা যেসব বিষয়ে মতভেদ করছো আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে সেসব বিষয়ে ফায়সালা করে দেবেন।" তুমি কি জানো না, আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসই আল্লাহ জানেন ? সবকিছু একটি কিতাবে লিখিত আছে। আল্লাহর জন্য এটা মোটেই কঠিন নয়।[১১৯]

ভিত গড়া হচ্ছে ? মোটকথা আল্লাহর পরিকল্পনা এমন সূক্ষ্মতর ও অজ্ঞাত পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত হয় যে, যতক্ষণ তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে না যায় ততক্ষণ কিসের জন্য কাজ চলছে তা কেউ জানতেও পারে না।

মূলে আরো বলা হয়েছে خَبِيرٌ অর্থাৎ তিনি নিজের দুনিয়ার অবস্থা, প্রয়োজন ও উপকরণাদি সম্পর্কে অবগত। নিজের প্রভুত্বের কাজ কিভাবে করতে হয় তিনি জানেন।

১১২. তিনি "অমুখাপেক্ষী" অর্থাৎ একমাত্র তাঁর সত্তাই কারো মুখাপেক্ষী নয়। আর তিনিই "প্রশংসার্হ" অর্থাৎ প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি একমাত্র তাঁরই জন্য এবং কেউ প্রশংসা করুক বা না করুক নিজের সত্তার মধ্যে তিনি নিজেই প্রশংসিত।

১১৩. আকাশ বলতে এখানে সমগ্র ঊর্ধজগতকে বুঝানো হয়েছে, যার প্রত্যেকটি জিনিস নিজ নিজ জায়গায় আটকে আছে।

১১৪. অর্থাৎ এসব কিছু দেখেও আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম যে সত্য পেশ করেছেন তা অস্বীকার করে যেতে থাকে।

১১৫. অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর উম্মত।

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٧١﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ ۗ النَّارُ ۖ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٢﴾

তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর ইবাদাত করে যাদের জন্য না তিনি কোনো প্রমাণ পত্র অবতীর্ণ করেছেন আর না তারা নিজেরাই তাদের ব্যাপারে কোনো জ্ঞান রাখে।[১২০] এ যালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।[১২১] আর যখন তাদেরকে আমার পরিষ্কার আয়াত শুনিয়ে দেয়া হয় তখন তোমরা দেখো সত্য অস্বীকারকারীদের চেহারা বিকৃত হয়ে যাচ্ছে এবং মনে হতে থাকে এ-ই বুঝি যারা তাদেরকে আমার আয়াত শুনায় তাদের ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদেরকে বলো, "আমি কি তোমাদের বলবো, এর চেয়ে খারাপ জিনিস কি ?[১২২] আগুন। আল্লাহ এরই প্রতিশ্রুতি তাদের জন্য দিয়ে রেখেছেন, যারা সত্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং তা বড়ই খারাপ আবাস।"

১১৬. এখানে 'মানসাক' শব্দটি কুরবানী অর্থে নয় বরং সমগ্র ইবাদাত ব্যবস্থা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর আগে এ শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছিল "কুরবানীর নিয়ম" কারণ সেখানে "যাতে লোকেরা ঐ পশুগুলোর ওপর আল্লাহর নাম নেয়, যা তিনি তাদেরকে দিয়েছেন" এ পরবর্তী বাক্যটি তার ব্যাপক অর্থের মধ্য থেকে শুধুমাত্র কুরবানীকেই চিহ্নিত করছিল। কিন্তু এখানে একে নিছক "কুরবানী" অর্থে গ্রহণ করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। বরং ইবাদাতকে যদি পূজা অর্চনার পরিবর্তে "বন্দেগীর" ব্যাপকতার অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে তা মূল উদ্দেশ্যের বেশী নিকটবর্তী হবে। এভাবে শরীয়াত ও মিনহাজের যে অর্থ হয় মান্‌সাকেরও (বন্দেগীর পদ্ধতি) সে একই অর্থ হবে। এটি সূরা মায়েদার বিষয়বস্তুর পুনরাবর্তন হবে, যেখানে বলা হয়েছে–

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

"আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি শরীয়াত ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত করেছি।" (৪৮ আয়াত)

১১৭. অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণ যেমন নিজের যুগের উম্মতের জন্য একটি পদ্ধতি (মান্‌সাক) এনেছিলেন তেমনি এ যুগের উম্মতের জন্যে তুমি একটি পদ্ধতি এনেছো। এখন এ ব্যাপারে তোমার পথে কারোর ঝগড়া করার অধিকার নেই। কারণ এ যুগের জন্য এ পদ্ধতিই সত্য। সূরা জাসীয়ায় এ বিষয়বস্তুটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

"তারপর (বনী ইসরাঈলের নবীদের পরে) হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে দীনের ব্যাপারে একটি শরীয়াতের (পদ্ধতি) ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। কাজেই তার অনুসরণ করো এবং যারা জ্ঞান রাখে না তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।"(১৮ আয়াত)

(বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আশ শুরা ২০ টীকা)

১১৮. পূর্ববর্তী বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসংগে এ মাত্র আমি যে অর্থ বর্ণনা করে এসেছি এ বাক্যটি সে অর্থই পুরোপুরি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরছে।

১১৯. বর্ণনা পরম্পরার সাথে এ প্যারার সম্পর্ক বুঝতে হলে এ সূরার ৫৫ থেকে ৫৭ আয়াত পর্যন্ত দৃষ্টি সমক্ষে রাখতে হবে।

১২০. অর্থাৎ আল্লাহর কোনো কিতাবে বলা হয়নি, "আমি অমুক অমুককে আমার সাথে প্রভুত্বের কর্তৃত্বে শরীক করেছি। কাজেই আমার সাথে তোমরা তাদেরকেও ইবাদাতে শরীক করো।" আর কোনো জ্ঞান মাধ্যমেও তারা একথা জানেনি যে, এরা অবশ্যই প্রভুত্বের কর্তৃত্বে অংশীদার এবং এজন্য এরা ইবাদাত লাভের হকদার। এখন এ যেসব বিভিন্ন ধরনের উপাস্য তৈরি করে এদের গুণাবলী ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের আকীদা তৈরি করে নেয়া হয়েছে এবং এদের আস্তানায় কপাল ঠেকানো হচ্ছে, প্রয়োজন পূরণের জন্য এদের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে, এদের বেদীতে ভেট ও নযরানা চড়ানো হচ্ছে, আস্তানা প্রদক্ষিণ করা হচ্ছে এবং সেখানে উপাসনার জন্য নির্জনবাস করা হচ্ছে—এসব কিছু জাহেলী ধারণার অনুসরণ ছাড়া আর কি হতে পারে ?

১২১. অর্থাৎ এ নির্বোধরা মনে করছে, এ উপাস্যরা দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের সাহায্যকারী হবে। অথচ আসলে তাদের কোনোই সাহায্যকারী নেই, এ উপস্যরাতো নয়ই। কারণ তাদের সাহায্য করার কোনো ক্ষমতা নেই। আর আল্লাহও তাদের সাহায্যকারী নন। কারণ তারা তো তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করেছে। কাজেই নিজেদের এই নির্বুদ্ধিতার কারণে তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করছে।

১২২. অর্থাৎ আল্লাহর কালাম শুনে তোমাদের মনে যে ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে তার চেয়ে মারাত্মক জিনিস অথবা তাঁর আয়াত যারা শুনায় তাদের সাথে যে সবচেয়ে খারাপ ব্যবহার তোমরা করতে পারো তার চেয়েও খারাপ জিনিসের মুখোমুখি তোমাদের হতে হবে।

يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُۥٓ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ
مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُۥ ۖ وَإِن
يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ
وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِىٌّ
عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾ ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ الْمَلَـٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾

১০ রুকূ'

হে লোকেরা! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে শোনো। আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব উপাস্যকে তোমরা ডাকো তারা সবাই মিলে একটি মাছি সৃষ্টি করতে চাইলেও করতে পারবে না। বরং যদি মাছি তাদের কাছ থেকে কোনো জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাহলে তারা তা ছাড়িয়েও নিতে পারবে না। সাহায্য প্রার্থীও দুর্বল এবং যার কাছে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে সেও দুর্বল।[১২৩] তারা আল্লাহর কদরই বুঝলো না যেমন তা বুঝা উচিত। আসল ব্যাপার হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহই শক্তিমান ও মর্যাদাসম্পন্ন।

আসলে আল্লাহ (নিজের ফরমান পাঠাবার জন্য) ফেরেশতাদের মধ্য থেকেও বাণীবাহক বাছাই করেন এবং মানুষদের মধ্য থেকেও।[১২৪] তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন। যাকিছু তাদের সামনে আছে তাও তিনি জানেন এবং যাকিছু আছে তাদের অগোচরে তাও তিনি জানেন[১২৫] এবং যাবতীয় বিষয় তাঁরই দিকে ফিরে আসে।[১২৬]

১২৩. অর্থাৎ সাহায্যপ্রার্থী তো দুর্বল হবার কারণেই তার চাইতে উচ্চতর কোনো শক্তির কাছে সাহায্য চাচ্ছে। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে সে যাদের কাছে সাহায্য চাচ্ছে তাদের দুর্বলতার অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা একটি মাছির কাছেও হার মানে। এখন তাদের দুর্বলতার অবস্থা চিন্তা করো যারা নিজেরাও দুর্বল এবং যাদের ওপর নির্ভর করে তাদের আশা-আকাংখা-কামনা-বাসনাগুলো দাঁড়িয়ে আছে তারাও দুর্বল।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ
وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾ وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ
جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ
مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ
هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى
النَّاسِ ۚ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ
مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿٧٨﴾

হে ঈমানদারগণ! রুকূ' ও সিজদা করো, নিজের রবের বন্দেগী করো এবং নেক কাজ করো, হয়তো তোমাদের ভাগ্যে সফলতা আসবে।১২৭ আল্লাহর পথে জিহাদ করো যেমন জিহাদ করলে তার হক আদায় হয়।১২৮ তিনি নিজের কাজের জন্য তোমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন১২৯ এবং দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি।১৩০ তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও।১৩১ আল্লাহ আগেও তোমাদের নাম রেখেছিলেন "মুসলিম" এবং এর (কুরআন) মধ্যেও (তোমাদের নাম এটিই)১৩২ যাতে রসূল তোমাদের ওপর সাক্ষী হন এবং তোমরা সাক্ষী হও লোকদের ওপর।১৩৩ কাজেই নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাও।১৩৪ তিনি তোমাদের অভিভাবক, বড়ই ভালো অভিভাবক তিনি, বড়ই ভালো সাহায্যকারী তিনি।

১২৪. এর অর্থ হচ্ছে, মুশরিকরা সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে যেসব সত্তাকে উপাস্যে পরিণত করেছে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হচ্ছে ফেরেশতা বা নবী। তারা শুধুমাত্র আল্লাহর বিধান পৌঁছে দেবার মাধ্যম। এর বেশী তাদের অন্য কোনো মর্যাদা নেই। আল্লাহ তাদেরকে শুধুমাত্র এ কাজের জন্যই বাছাই করে নিয়েছেন। নিছক এতটুকুন মর্যাদা তাদেরকে প্রভু বা প্রভুত্বের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে শরীকে পরিণত করে না।

১২৫. কুরআন মাজীদে এ বাক্যটি সাধারণত শাফায়াতের মুশরিকী ধারণা খণ্ডন করার জন্য বলা হয়ে থাকে। কাজেই এ স্থানে একে পেছনের বাক্যের পরে বলার এ অর্থ দাঁড়ায়

যে, ফেরেশতা, নবী ও সৎলোকদেরকে অভাবপূরণকারী ও কার্য উদ্ধারকারী মনে না করেও যদি আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী মনে করেও তোমরা পূজা-অর্চনা করো তাহলে তাও ঠিক নয়। কারণ একমাত্র আল্লাহই সবকিছু দেখেন ও শোনেন। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা একমাত্র তিনিই জানেন। দুনিয়ার প্রকাশ্য ও গোপন কল্যাণ-অকল্যাণের বিষয়াবলী একমাত্র তিনিই জানেন। ফেরেশতা ও নবীসহ কোনো সৃষ্টিও ঠিকভাবে জানেনা কোন্ সময় কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়। কাজেই আল্লাহ তাঁর সবচেয়ে নিকটবর্তী সৃষ্টিকেও এ অধিকার দেননি যে, সে তাঁর অনুমতি ছাড়া নিজের ইচ্ছামতো যে কোনো সুপারিশ করে বসবে এবং তার সুপারিশ গৃহিত হয়ে যাবে।

১২৬. অর্থাৎ বিষয়াবলীর পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান সম্পূর্ণরূপে তাঁর ক্ষমতাধীন। বিশ্ব-জাহানের ছোট বড় কোনো বিষয়ের ব্যবস্থাপক ও পরিচালক অন্য কেউ নয়। কাজেই নিজের আবেদন নিবেদন নিয়ে অন্য কারো কাছে যাবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। প্রত্যেকটি বিষয় ফায়সালার জন্য আল্লাহর সামনেই উপস্থাপিত হয়। কাজেই কোনো কিছুর জন্য আবেদন করতে হলে তাঁর কাছেই করো। যেসব সত্তা নিজেদেরই অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে না তাদের মতো ক্ষমতাহীনদের কাছে কি চাও ?

১২৭. অর্থাৎ এ নীতি অবলম্বন করলে সফলতার আশা করা যেতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি এ নীতি অবলম্বন করবে তার নিজের কার্যক্রমের ব্যাপারে এমন অহংকার থাকা উচিত নয় যে, সে যখন এত বেশী ইবাদাতগুজার ও নেক্কার তখন সে নিশ্চয়ই সফলকাম হবে। বরং তার আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থী হওয়া এবং তাঁরই রহমতের সাথে সমস্ত আশা আকাংখা বিজড়িত করা উচিত। তিনি সফলতা দান করলেই কোনো ব্যক্তি সফলতা পেতে পারে। নিজে নিজেই সফলতা লাভ করার সামর্থ কারো নেই।

"হয়তো তোমাদের ভাগ্যে সফলতা আসবে"—এ বাক্যটি বলার অর্থ এ নয় যে, এ ধরনের সফলতা লাভ করার বিষয়টি সন্দেহপূর্ণ। বরং এটি একটি রাজকীয় বর্ণনা পদ্ধতি। বাদশাহ যদি তাঁর কোনো কর্মচারীকে বলেন, অমুক কাজটি করো, হয়তো তুমি অমুক পদটি পেয়ে যাবে, তখন কর্মচারীর গৃহে খুশীর বাদ্য বাজতে থাকে। কারণ এর মধ্যে রয়েছে আসলে একটি প্রতিশ্রুতির ইংগিত। কোনো সদাশয় প্রভুর কাছ থেকে কখনো এটি আশা করা যেতে পারে না যে, কোনো কাজের পুরস্কার স্বরূপ কাউকে তিনি নিজেই কিছু দান করার আশা দেবেন এবং তারপর নিজের বিশ্বস্ত সেবককে হতাশ করবেন।

ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ—এর মতে সূরা হজ্জের এ আয়াতটিও সিজদার আয়াত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, হাসান বসরী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইবরাহীম নাখ্ঈ ও সুফিয়ান সওরী এ জায়গায় তেলাওয়াতের সিজদার প্রবক্তা নন। উভয় পক্ষের যুক্তি প্রমাণ আমি এখানে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করছি।

প্রথম দলটির প্রথম যুক্তিটির ভিত্তি হচ্ছে আয়াতের বাহ্যিক অর্থ। যাতে সিজদার হুকুম দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় যুক্তি হচ্ছে উকবাহ ইবনে আমেরের (রা) রেওয়ায়াত। আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী এটি উদ্ধৃত করেছেন। বলা হয়েছে ঃ

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُفْضِلَتْ سُوْرَةُ الْحَجِّ عَلٰى سَائِرِ الْقُرْاٰنِ بِسَجْدَتَيْنِ ؟ قَالَ نَعَمْ فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا

"আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! সূরা হজ্জ কি সমগ্র কুরআনের ওপর এ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে যে, তার মধ্যে দু'টি সিজদা আছে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ ; কাজেই যে সেখানে সিজদা করবে না সে যেন তা না পড়ে।"

তৃতীয় যুক্তি হচ্ছে, আবু দাউদ ও ইবনে মাজার হাদীস, যাতে আমর ইবনুল আস (রা) বলছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে সূরা হজ্জের দু'টি সিজদা শিখিয়েছিলেন। চতুর্থ যুক্তি হচ্ছে, হযরত উমর (রা), উসমান (রা), আলী (রা), ইবনে উমর (রা), ইবনে আব্বাস (রা), আবুদ দারদা (রা), আবু মূসা আশআরী (রা) ও আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে একথা উদ্ধৃত হয়েছে যে সূরা হজ্জে দু'টি সিজদা আছে।

দ্বিতীয় দলের যুক্তি হচ্ছে আয়াতে নিছক সিজদার হুকুম নেই বরং একসাথে রুকূ' ও সিজদা করার হুকুম আছে আর কুরআনে যখনই রুকূ' ও সিজদা মিলিয়ে বলা হয়, তখনই এর অর্থ হয় নামায। তাছাড়া রুকূ' ও সিজদার সম্মিলিত রূপ একমাত্র নামাযের মধ্যেই পাওয়া যায়। উকবা ইবনে আমেরের (রা) রেওয়ায়াত সম্পর্কে তারা বলেন, এর সনদ দুর্বল। একে ইবনে লাহীআহ বর্ণনা করেছেন আবুল মাস'আব বাসরী থেকে এবং এরা দু'জনই যঈফ তথা অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। বিশেষ করে আবু মাস'আব তো এমন এক ব্যক্তি যিনি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সাথে ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে কাবা ঘরের ওপর পাথর বর্ষণ করেছিলেন। আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণিত রেওয়ায়াতটিকেও তাঁরা নির্ভরযোগ্য নয় বলে গণ্য করেছেন। কারণ এটি সাঈদুল আতীক রেওয়ায়াত করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে মুনাইন আল কিলাবী থেকে। এরা দু'জনই অপরিচিত। কেউ জানে না এরা কারা এবং কোন্ পর্যায়ের লোক ছিল। সাহাবীদের উক্তি সম্পর্কে তারা বলেন, ইবনে আব্বাস সূরা হজ্জে দু'টি সিজদা হবার এই পরিষ্কার অর্থ বলেছেন যে, الاولى عزمة والاخرة تعليم অর্থাৎ প্রথম সিজদা অপরিহার্য এবং দ্বিতীয়টি শিক্ষামূলক।

১২৮. জিহাদ মানে নিছক রক্তপাত বা যুদ্ধ নয় বরং এ শব্দটি প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, দ্বন্দ্ব এবং চূড়ান্ত চেষ্টা চালানো অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আবার জিহাদ ও মুজাহিদের মধ্যে এ অর্থও রয়েছে যে, বাধা দেবার মতো কিছু শক্তি আছে যেগুলোর মোকাবিলায় এই প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম কাম্য। এই সংগে "ফিল্লাহ" (আল্লাহর পথে) শব্দ এ বিষয়টি নির্ধারিত করে দেয় যে, বাধাদানকারী শক্তিগুলো হচ্ছে এমনসব শক্তি যেগুলো আল্লাহর বন্দেগী, তাঁর সন্তুষ্টি লাভ ও তাঁর পথে চলার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের উদ্দেশ্য হয় তাদের বাধা ও প্রতিবন্ধকতাকে প্রতিহত করে মানুষ নিজেও আল্লাহর যথাযথ বন্দেগী করবে এবং দুনিয়াতেও তাঁর কালেমাকে বুলন্দ এবং কুফর ও নাস্তিক্যবাদের কালেমাকে নিম্নগামী করার জন্য প্রাণপাত করবে। মানুষের নিজের "নফসে আম্মারা" তথা বৈষয়িক ভোগলিপ্সু ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধে এ মুজাহাদা ও প্রচেষ্টার প্রথম অভিযান পরিচালিত হয়। এ নফসে আম্মারা সবসময় আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে

থাকে এবং মানুষকে ঈমান ও আনুগত্যের পথ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা চালায়। তাকে নিয়ন্ত্রিত ও বিজিত না করা পর্যন্ত বাইরে কোনো প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের সম্ভাবনা নেই। তাই এক যুদ্ধ ফেরত গাজীদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ

"তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে এসে গেছো।"

আরো বলেন, مجاهدة العبد هواه "মানুষের নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম।" এরপর সারা দুনিয়াই হচ্ছে জিহাদের ব্যাপকতর ক্ষেত্র। সেখানে কর্মরত সকল প্রকার বিদ্রোহাত্মক, বিদ্রোহোদ্দীপক ও বিদ্রোহোৎপাদক শক্তির বিরুদ্ধে মন, মস্তিষ্ক, শরীর ও সম্পদের সমগ্র শক্তি সহকারে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানোই হচ্ছে জিহাদের হক আদায় করা, যার দাবী এখানে করা হচ্ছে।

১২৯. অর্থাৎ উপরে যে খিদমতের কথা বলা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির মধ্য থেকে তোমাদেরকে তা সম্পাদন করার জন্য বাছাই করে নেয়া হয়েছে। এ বিষয়বস্তুটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা বাকারায় বলা হয়েছে ঃ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا (১৪৩ আয়াত) এবং সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে ঃ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (১১০ আয়াত) এখানে একথাটিও জানিয়ে দেয়া সংগত মনে করি যে, সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা যেসব আয়াতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং যেসব আয়াতের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ ও দোষারোপকারীদের ভ্রান্তি প্রমাণিত হয় এ আয়াতটি সেগুলোর অন্তরভুক্ত। একথা সুস্পষ্ট যে, এ আয়াতে সরাসরি সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করা হয়েছে, অন্য লোকদের প্রতি সম্বোধন মূলত তাঁদেরই মাধ্যমে করা হয়েছে।

১৩০. অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের ফকীহ, ফরিশী ও পাদরীরা তাদের ওপর যেসব অপ্রয়োজনীয় ও অযথা নীতি-নিয়ম চাপিয়ে দিয়েছিল সেগুলো থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। এখানে চিন্তা-গবেষণার ওপর এমন কোনো বাধানিষেধ আরোপ করা হয়নি যা তাত্ত্বিক উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। আবার বাস্তব কর্মজীবনেও এমন বিধি নিষেধের পাহাড় দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়নি যা সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নের পথ রুদ্ধ করে দেয়। তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে একটি সহজ সরল বিশ্বাস ও আইন। এ নিয়ে তোমরা যতদূর এগিয়ে যেতে চাও এগিয়ে যেতে পারো। এখানে যে বিষয়বস্তুটিকে ইতিবাচক ভংগীতে বর্ণনা করা হয়েছে সেটি আবার অন্যত্র উপস্থাপিত হয়েছে নেতিবাচক ভংগীতে। যেমন—

يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ

"এ রসূল তাদেরকে পরিচিত সৎকাজের হুকুম দেয় এবং এমন সব অসৎ কাজ করতে তাদেরকে নিষেধ করেন যেগুলো করতে মানবিক প্রকৃতি অস্বীকার করে আর এমন

সব জিনিস তাদের জন্য হালাল করে যেগুলো পাক পবিত্র এবং এমন সব জিনিস হারাম করে যেগুলো নাপাক ও অপবিত্র। আর তাদের ওপর থেকে এমন ভারী বোঝা নামিয়ে দেয়, যা তাদের ওপর চাপানো ছিল এবং এমন সব শৃংখল থেকে তাদেরকে মুক্ত করে যেগুলোয় তারা আটকে ছিল।" (আ'রাফ ঃ ১৫৭)

১৩১. যদিও ইসলামকে ইবরাহীমের মিল্লাতের ন্যায় নূহের মিল্লাত, মূসার মিল্লাত ও ঈসার মিল্লাত বলা যেতে পারে কিন্তু কুরআন মজীদে বার বার একে ইবরাহীমের মিল্লাত বলে তিনটি কারণে এর অনুসরণ করার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। এক, কুরআনের বক্তব্যের প্রথম লক্ষ ছিল আরবরা, আর তারা ইবরাহীমের সাথে যেভাবে পরিচিত ছিল তেমনটি আর কারো সাথে ছিল না। তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আকীদা-বিশ্বাসে যার ব্যক্তিত্বের প্রভাব সর্বব্যাপী ছিল তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। দুই, হযরত ইবরাহীমই এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যার উন্নত চরিত্রের ব্যাপারে ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান, আরবীয় মুশরিক ও মধ্যপ্রাচ্যের সাবেয়ী তথা নক্ষত্র পূজারীরা সবাই একমত ছিল। নবীদের মধ্যে দ্বিতীয় এমন কেউ ছিলেন না এবং নেই যার ব্যাপারে সবাই একমত হতে পারে। তিন, হযরত ইবরাহীম এসব মিল্লাতের জন্মের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছেন। ইহুদীবাদ, খৃষ্টবাদ ও সাবেয়ীবাদ সম্পর্কে তো সবাই জানে যে, এগুলো পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত হয়েছে আর আরবীয় মুশরিকদের ব্যাপারে বলা যায়, তারা নিজেরাও একথা স্বীকার করতো যে, তাদের সমাজে মূর্তিপূজা শুরু হয় আমর ইবনে লুহাই থেকে। সে ছিল বনী কুযা'আর সরদার। মা'আব (মাওয়াব) এলাকা থেকে সে 'হবুল' নামক মূর্তি নিয়ে এসেছিল। তার সময়টা ছিল বড় জোর ঈসা আলাইহিস সালামের পাঁচ-ছ-শ বছর আগের। কাজেই এ মিল্লাতটিও হযরত ইবরাহীমের শত শত বছর পরে তৈরি হয়েছে। এ অবস্থায় কুরআন যখন বলে এ মিল্লাতগুলোর পরিবর্তে ইবরাহীমের মিল্লাত গ্রহণ করো তখন সে আসলে এ সত্যটি জানিয়ে দেয় যে, যদি হযরত ইবরাহীম সত্য ও হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকেন এবং মিল্লাতগুলোর মধ্য থেকে কোনটিরই অনুসারী না থেকে থাকেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই তাঁর মিল্লাতেই প্রকৃত সত্য মিল্লাত। পরবর্তীকালের মিল্লাতগুলো সত্য নয়। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মিল্লাতের দিকেই দাওয়াত দিচ্ছেন। আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল বাকারা, ১৩৪-১৩৫, সূরা আলে ইমরান, ৫৮, ৭৯ এবং সূরা আন নহল, ১২০ টীকা।

১৩২. "তোমাদের সম্বোধনটি শুধুমাত্র এ আয়াতটি নাযিল হবার সময় যেসব লোক ঈমান এনেছিল অথবা তারপর ঈমানদারদের দলভুক্ত হয়েছিল তাদের উদ্দেশ্যে করা হয়নি বরং মানব ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকেই যারা তাওহীদ, আখেরাত, রিসালাত ও আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী দলভুক্ত থেকেছে তাদের সবাইকেই এখানে সম্বোধন করা হয়েছে। এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে, এ সত্য মিল্লাতের অনুসারীদেরকে কোনোদিন "নূহী" "ইবরাহিমী", 'মূসাভী" বা "মসীহী" ইত্যাদি বলা হয়নি বরং তাদের নাম "মুসলিম" (আল্লাহর ফরমানের অনুগত) ছিল এবং আজো তারা "মুহাম্মাদী" নয় বরং মুসলিম। একথাটি না বুঝার কারণে লোকদের জন্য এ প্রশ্নটি একটি ধাঁধার সৃষ্টি করে রেখেছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদেরকে কুরআনের পূর্বে কোন্ কিতাবে মুসলিম নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল ?

১৩৩. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, ১৪৪ টীকা। এর চাইতেও বিস্তারিত আকারে এ বিষয়টি আমার "সত্যের সাক্ষ" বইতে আলোচনা করেছি।

১৩৪. অথবা অন্য কথায় মজবুতভাবে আল্লাহকে আঁকড়ে ধরো। পথ নির্দেশনা ও জীবন যাপনের বিধান তাঁর কাছ থেকেই নাও। তাঁরই আনুগত্য করো। তাঁকেই ভয় করো। আশা-আকাংখা তাঁরই সাথে বিজড়িত করো। সাহায্যের জন্য তাঁরই কাছে হাত পাতো। তাঁরই সত্তার ওপর নির্ভর করে তাওয়াক্কুল ও আস্থার বুনিয়াদ গড়ে তোলো।

আল মু'মিনূন

২৩

নামকরণ

প্রথম আয়াত قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বর্ণনাভংগী ও বিষয়বস্তু উভয়টি থেকে জানা যায়, এ সূরাটি মক্কী যুগের মাঝামাঝি সময় নাযিল হয়। প্রেক্ষাপটে পরিষ্কার অনুভব করা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কাফেরদের মধ্যে ভীষণ সংঘাত চলছে। কিন্তু তখনো কাফেরদের নির্যাতন নিপীড়ন চরমে পৌঁছে যায়নি। ৭৫–৭৬ আয়াত থেকে পরিষ্কার সাক্ষ পাওয়া যায় যে, মক্কী যুগের মধ্যভাগে আরবে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল বলে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় ঠিক সে সময়ই এ সূরাটি নাযিল হয়। উরওয়াহ ইবনে যুবাইরের একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, এ সূরা নাযিল হওয়ার আগেই হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারীর বরাত দিয়ে হযরত উমরের (রা) এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, এ সূরাটি তাঁর সামনে নাযিল হয়। অহী নাযিলের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা কি রকম হয় তা তিনি স্বচক্ষেই দেখেছিলেন এবং এ অবস্থা অতিবাহিত হবার পর নবী (সা) বলেন, এ সময় আমার ওপর এমন দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে যে, যদি কেউ সে মানদণ্ডে পুরোপুরি উত্তরে যায় তাহলে সে নিশ্চিত জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারপর তিনি এ সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো শোনান।

বক্তব্য ও আলোচ্য বিষয়

রসূলের আনুগত্য করার আহবান হচ্ছে এ সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। এখানে বিবৃত সমগ্র ভাষণটি এ কেন্দ্রের চারদিকেই আবর্তিত।

বক্তব্যের সূচনা এভাবে হয় ঃ যারা এ নবীর কথা মেনে নিয়েছে তাদের মধ্যে অমুক অমুক গুণাবলী সৃষ্টি হচ্ছে এবং নিশ্চিতভাবে এ ধরনের লোকেরাই দুনিয়ায় ও আখেরাতে সাফল্য লাভের যোগ্য হয়।

এরপর মানুষের জন্ম, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাব এবং বিশ্ব-জাহানের অন্যান্য নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া যে, এ নবী তাওহীদ ও আখেরাতের যে চিরন্তন সত্যগুলো তোমাদের মেনে নিতে বলছেন তোমাদের নিজেদের সত্তা এবং এই সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থা সেগুলোর সত্যতার সাক্ষ দিচ্ছে।

তারপর নবীদের ও তাঁদের উম্মতদের কাহিনী শুরু হয়ে গেছে। আপাত দৃষ্টিতে এগুলো কাহিনী মনে হলেও মূলত এ পদ্ধতিতে শ্রোতাদেরকে কিছু কথা বুঝানো হয়েছে ঃ

এক ঃ আজ তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের ব্যাপারে যেসব সন্দেহ পোষণ ও আপত্তি উত্থাপন করছো সেগুলো নতুন কিছু নয়। ইতিপূর্বেও যেসব নবী দুনিয়ায় এসেছিলেন, যাদেরকে তোমরা নিজেরাও আল্লাহর নবী বলে স্বীকার করে থাকো, তাঁদের সবার বিরুদ্ধে তাঁদের যুগে মূর্খ ও অজ্ঞ লোকেরা এ একই আপত্তি করেছিল। এখন দেখো ইতিহাসের শিক্ষা কি, আপত্তি উত্থাপনকারীরা সত্যপথে ছিল, না নবীগণ?

দুই ঃ তাওহীদ ও আখেরাত সম্পর্কে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শিক্ষা দিচ্ছেন এই একই শিক্ষা প্রত্যেক যুগের নবী দিয়েছেন। তার বাইরে এমন কোন অভিনব জিনিস আজ পেশ করা হচ্ছে না যা দুনিয়াবাসী এর আগে কখনো শুনেনি।

তিন ঃ যেসব জাতি নবীদের কথা শোনেনি এবং তাঁদের বিরোধিতার ওপর জিদ ধরেছে তারা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গেছে।

চার ঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যেক যুগে একই দীন এসেছে এবং সকল নবী একই জাতি বা উম্মাহভুক্ত ছিলেন। সেই একমাত্র দীনটি ছাড়া অন্য যেসব বিচিত্র ধর্মমত তোমরা দুনিয়ার চারদিকে দেখতে পাচ্ছো এগুলো সবই মানুষের স্বকপোলকল্পিত। এর কোনটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নয়।

এ কাহিনীগুলো বলার পর লোকদেরকে একথা জানানো হয়েছে যে, পার্থিব সমৃদ্ধি, অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এমন জিনিস নয় যা কোন ব্যক্তি বা দলের সঠিক পথের অনুসারী হবার নিশ্চিত আলামত হতে পারে। এর মাধ্যমে একথা বুঝা যায় না যে, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহশীল এবং তার নীতি ও আচরণ আল্লাহর কাছে প্রিয়। অনুরূপভাবে কারোর গরীব ও দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া একথা প্রমাণ করে না যে, আল্লাহ তার ও তার নীতির প্রতি বিরূপ। আসল জিনিস হচ্ছে মানুষের ঈমান, আল্লাহ ভীতি ও সততা। এরি ওপর তার আল্লাহর প্রিয় অপ্রিয় হওয়া নির্ভর করে। একথাগুলো এজন্যে বলা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের মোকাবিলায় সে সময় যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছিল তার সকল নায়কই ছিল মক্কার বড় বড় নেতা ও সরদার। তারা নিজেরাও এ আত্মম্ভরিতায় ভুগছিল এবং তাদের প্রভাবাধীন লোকেরাও এ ভুল ধারণার শিকার হয়েছিল যে, যাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ধারা বর্ষিত হচ্ছে এবং যারা একনাগাড়ে সামনের দিকে এগিয়েই চলছে তাদের ওপর নিশ্চয়ই আল্লাহ ও দেবতাদের নেক নজর রয়েছে। আর এ বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত লোকেরা যারা মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে আছে এদের নিজেদের অবস্থাই তো একথা প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ এদের সাথে নেই এবং দেবতাদের কোপ তো এদের ওপর পড়েই আছে।

এরপর মক্কাবাসীদেরকে বিভিন্ন দিক দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের ওপর বিশ্বাসী করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাদেরকে জানানো হয়েছে, তোমাদের ওপর এই যে দুর্ভিক্ষ নাযিল হয়েছে এটা একটা সতর্ক বাণী। এ দেখে তোমরা

নিজেরা সংশোধিত হয়ে যাও এবং সরল সঠিক পথে এসে যাও, এটাই তোমাদের জন্য ভালো। নয়তো এরপর আসবে আরো কঠিন শাস্তি, যা দেখে তোমরা আর্তনাদ করতে থাকবে।

তারপর বিশ্ব-জাহানেও তাদের নিজেদের সত্তার মধ্যে যেসব নিদর্শন রয়েছে সেদিকে তাদের দৃষ্টি নতুন করে আকৃষ্ট করা হয়েছে। মূল বক্তব্য হচ্ছে, চোখ মেলে দেখো। এই নবী যে তাওহীদ ও পরকালীন জীবনের তাৎপর্য ও স্বরূপ তোমাদের জানাচ্ছেন চারদিকে কি তার সাক্ষদানকারী নিদর্শনাবলী ছড়িয়ে নেই? তোমাদের বুদ্ধি ও প্রকৃতি কি তার সত্যতা ও নির্ভুলতার সাক্ষ দিচ্ছে না?

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা তোমার সাথে যাই ব্যবহার করে থাকুক না কেন তুমি ভালোভাবে তাদের প্রত্যুত্তর দাও। শয়তান যেন কখনো তোমাকে আবেগ উচ্ছল করে দিয়ে মন্দের জবাবে মন্দ করতে উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ না পায়।

বক্তব্য শেষে সত্য বিরোধীদেরকে আখেরাতে জবাবদিহির ভয় দেখানো হয়েছে। তাদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা সত্যের আহবায়ক ও তাঁর অনুসারীদের সাথে যা করছো সেজন্য তোমাদের কঠোর জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে।

আয়াত ১১৮ | সূরা আল মু'মিনূন–মক্কী | রুকূ' ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝٢
وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝٣ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝٤

নিশ্চিতভাবে সফলকাম হয়েছে মু'মিনরা[১] যারা ঃ
নিজেদের[২] নামাযে বিনয়াবনত[৩] হয়,
বাজে কাজ থেকে দূরে থাকে,[৪]
যাকাতের পথে সক্রিয় থাকে,[৫]

১. মু'মিনরা বলতে এমন লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত গ্রহণ করেছে, তাঁকে নিজেদের নেতা ও পথপ্রদর্শক বলে মেনে নিয়েছে এবং তিনি জীবন যাপনের যে পদ্ধতি পেশ করেছেন তা অনুসরণ করে চলতে রাজি হয়েছে।

মূল শব্দ হচ্ছে 'ফালাহ'। ফালাহ মানে সাফল্য ও সমৃদ্ধি। এটি ক্ষতি, ঘাটতি, লোকসান ও ব্যর্থতার বিপরীত অর্থবোধক শব্দ। যেমন اَفْلَحَ الرَّجُلُ মানে হচ্ছে, অমুক ব্যক্তি সফল হয়েছে, নিজের লক্ষে পৌঁছে গেছে, প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে গেছে, তার প্রচেষ্টা ফলবতী হয়েছে, তার অবস্থা ভালো হয়ে গেছে।

قَدْ اَفْلَحَ "নিশ্চিতভাবেই সফলতা লাভ করেছে।" এ শব্দগুলো দিয়ে বাক্য শুরু করার গুঢ় তাৎপর্য বুঝতে হলে যে পরিবেশে এ ভাষণ দেয়া হচ্ছিল তা চোখের সামনে রাখা অপরিহার্য। তখন একদিকে ছিল ইসলামী দাওয়াত বিরোধী সরদারবৃন্দ। তাদের ব্যবসা–বাণিজ্য উন্নতির পর্যায়ে ছিল। তাদের কাছে ছিল প্রচুর ধন–দওলত। বৈষয়িক সমৃদ্ধির যাবতীয় উপাদান তাদের হাতের মুঠোয় ছিল। আর অন্যদিকে ছিল ইসলামী দাওয়াতের অনুসারীরা। তাদের অধিকাংশ তো আগে থেকেই ছিল গরীব ও দুর্দশাগ্রস্ত। কয়েকজনের অবস্থা সচ্ছল থাকলেও অথবা কাজ–কারবারের ক্ষেত্রে তারা আগে থেকেই সফলকাম থাকলেও সর্বব্যাপী বিরোধিতার কারণে তাদের অবস্থাও এখন খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। এ অবস্থায় যখন "নিশ্চিতভাবেই মু'মিনরা সফলকাম হয়েছে" বাক্যাংশ দিয়ে বক্তব্য শুরু করা হয়েছে তখন এথেকে আপনা আপনি এ অর্থ বের হয়ে এসেছে যে, তোমাদের সাফল্য ও ক্ষতির মানদণ্ড ভুল, তোমাদের অনুমান ত্রুটিপূর্ণ, তোমাদের দৃষ্টি দূরপ্রসারী নয়, তোমাদের নিজেদের যে সাময়িক ও সীমিত সমৃদ্ধিকে সাফল্য মনে করছো

তা আসলে সাফল্য নয়, তা হচ্ছে ক্ষতি এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে অনুসারীদেরকে তোমরা ব্যর্থ ও অসফল মনে করছো তারাই আসলে সফলকাম ও সার্থক। এ সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বরং তারা এমন জিনিস লাভ করেছে যা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় স্থায়ী সমৃদ্ধি দান করবে। আর ওকে প্রত্যাখ্যান করে তোমরা আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ। এর খারাপ পরিণতি তোমরা এখানেও দেখবে এবং দুনিয়ার জীবনকাল শেষ করে পরবর্তী জীবনেও দেখতে থাকবে।

এ হচ্ছে এ সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। এ সূরার সমগ্র ভাষণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ বক্তব্যটিকে মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে দেবার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

২. এখান থেকে নিয়ে ৯ আয়াত পর্যন্ত মু'মিনদের যে গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে তা আসলে মু'মিনরা সফলকাম হয়েছে এ বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তিস্বরূপ। অন্য কথায়, বলা হচ্ছে, যেসব লোক এ ধরনের গুণাবলীর অধিকারী তারা কেনইবা সফল হবে না। এ গুণাবলী সম্পন্ন লোকেরা ব্যর্থ ও অসফল কেমন করে হতে পারে। তারাই যদি সফলকাম না হয় তাহলে আর কারা সফলকাম হবে।

৩. মূল শব্দ হচ্ছে "খুশূ"। এর আসল মানে হচ্ছে কারোর সামনে ঝুঁকে পড়া, দমিত বা বশীভূত হওয়া, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা। এ অবস্থাটার সম্পর্ক মনের সাথে এবং দেহের বাহ্যিক অবস্থার সাথেও। মনের খুশূ' হচ্ছে, মানুষ কারোর ভীতি, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রতাপ ও পরাক্রমের দরুন সন্ত্রস্ত ও আড়ষ্ট থাকবে। আর দেহের খুশূ' হচ্ছে, যখন সে তার সামনে যাবে তখন মাথা নত হয়ে যাবে, অংগ-প্রত্যংগ ঢিলে হয়ে যাবে, দৃষ্টি নত হবে, কণ্ঠস্বর নিম্নগামী হবে এবং কোন জবরদস্ত প্রতাপশালী ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হলে মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক ভীতির সঞ্চার হয় তার যাবতীয় চিহ্ন তার মধ্যে ফুটে উঠবে। নামাযে খুশূ' বলতে মন ও শরীরের এ অবস্থাটা বুঝায় এবং এটাই নামাযের আসল প্রাণ। হাদীসে বলা হয়েছে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলেন এবং সাথে সাথে এও দেখলেন যে, সে নিজের দাড়ি নিয়ে খেলা করছে। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, لو خشع قلبه خشعت جوارحه "যদি তার মনে খুশূ' থাকতো তাহলে তার দেহেও খুশূ'র সঞ্চার হতো।"

যদিও খুশূ'র সম্পর্ক মূলত মনের সাথে এবং মনের খুশূ' আপনা আপনি দেহে সঞ্চারিত হয়, যেমন ওপরে উল্লেখিত হাদীস থেকে এখনই জানা গেলো, তবুও শরীয়াতে নামাযের এমন কিছু নিয়ম-কানুন নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে যা একদিকে মনের খুশূ' (আন্তরিক বিনয়-নম্রতা) সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং অন্যদিকে খুশূ'র হ্রাস-বৃদ্ধির অবস্থায় নামাযের কর্মকাণ্ডকে কমপক্ষে বাহ্যিক দিক দিয়ে একটি বিশেষ মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত রাখে। এই নিয়ম-কানুনগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, নামাযী যেন ডাইনে বামে না ফিরে এবং মাথা উঠিয়ে ওপরের দিকে না তাকায়, (বড়জোর শুধুমাত্র চোখের কিনারা দিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে পারে। হানাফী ও শাফেয়ীদের মতে দৃষ্টি সিজদার স্থান অতিক্রম না করা উচিত। কিন্তু মালেকীগণ মনে করেন দৃষ্টি সামনের দিকে থাকা উচিত।) নামাযের মধ্যে নড়াচড়া করা এবং বিভিন্ন দিকে ঝুঁকে পড়া নিষিদ্ধ। বারবার কাপড় গুটানো অথবা ঝাড়া কিংবা কাপড় নিয়ে খেলা করা জায়েয নয়। সিজদায় যাওয়ার সময় বসার জায়গা বা সিজদা করার জায়গা পরিষ্কার করার চেষ্টা করতেও নিষেধ করা হয়েছে। গর্বিত ভংগীতে

খাড়া হওয়া, জোরে জোরে ধমকের সুরে কুরআন পড়া অথবা কুরআন পড়ার মধ্যে গান গাওয়াও নামাযের নিয়ম বিরোধী; জোরে জোরে আড়মোড়া ভাংগা ও ঢেকুর তোলাও নামাযের মধ্যে বেআদবী হিসেবে গণ্য। তাড়াহুড়া করে টপাটপ নামায পড়ে নেয়াও ভীষণ অপছন্দনীয়। নির্দেশ হচ্ছে, নামাযের প্রত্যেকটি কাজ পুরোপুরি ধীরস্থিরভাবে শান্ত সমাহিত চিত্তে সম্পন্ন করতে হবে। এক একটি কাজ যেমন রুকূ', সিজদা, দাঁড়ানো বা বসা যতক্ষণ পুরোপুরি শেষ না হয় ততক্ষণ অন্য কাজ শুরু করা যাবে না। নামায পড়া অবস্থায় যদি কোন জিনিস কষ্ট দিতে থাকে তাহলে এক হাত দিয়ে তা দূর করে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু বারবার হাত নাড়া অথবা উভয় হাত একসাথে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

এ বাহ্যিক আদবের সাথে সাথে নামাযের মধ্যে জেনে বুঝে নামাযের সাথে অসংশ্লিষ্ট ও অবান্তর কথা চিন্তা করা থেকে দূরে থাকার বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনিচ্ছাকৃত চিন্তা-ভাবনা মনের মধ্যে আসা ও আসতে থাকা মানুষ মাত্রেরই একটি স্বভাবগত দুর্বলতা। কিন্তু মানুষের পূর্ণপ্রচেষ্টা থাকতে হবে নামাযের সময় তার মন যেন আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট থাকে এবং মুখে সে যা কিছু উচ্চারণ করে মনও যেন তারই আর্জি পেশ করে। এ সময়ের মধ্যে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্য চিন্তাভাবনা এসে যায় তাহলে যখনই মানুষের মধ্যে এর অনুভূতি সজাগ হবে তখনই তার মনোযোগ সেদিক থেকে সরিয়ে নিয়ে পুনরায় নামাযের সাথে সংযুক্ত করতে হবে

৪. মূলে لغو শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে এমন প্রত্যেকটি কথা ও কাজ যা অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন ও যাতে কোন ফল লাভও হয় না। যেসব কথায় বা কাজে কোন লাভ হয় না, যেগুলোর পরিণাম কল্যাণকর নয়, যেগুলোর আসলে কোন প্রয়োজন নেই, যেগুলোর উদ্দেশ্যও ভালো নয়—সেগুলো সবই 'বাজে' কাজের অন্তরভুক্ত।

مُعْرِضُونَ শব্দের অনুবাদ করেছি 'দূরে থাকে'। কিন্তু এতটুকুতে সম্পূর্ণ কথা প্রকাশ হয় না। আয়াতের পূর্ণ বক্তব্য হচ্ছে এই যে, তারা বাজে কথায় কান দেয় না এবং বাজে কাজের দিকে দৃষ্টি ফেরায় না। সে ব্যাপারে কোন প্রকার কৌতূহল প্রকাশ করে না। যেখানে এ ধরনের কথাবার্তা হতে থাকে অথবা এ ধরনের কাজ চলতে থাকে সেখানে যাওয়া থেকে দূরে থাকে। তাতে অংশগ্রহণ করতে বিরত হয় আর যদি কোথাও তার সাথে মুখোমুখি হয়ে যায় তাহলে তাকে উপেক্ষা করে, এড়িয়ে চলে যায় অথবা অন্ততপক্ষে তা থেকে সম্পর্কহীন হয়ে যায়। একথাটিকেই অন্য জায়গায় এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

"যখন এমন কোন জায়গা দিয়ে তারা চলে যেখানে বাজে কথা হতে থাকে অথবা বাজে কাজের মহড়া চলে তখন তারা ভদ্রভাবে সে জায়গা অতিক্রম করে চলে যায়।"
(আল ফুরকান, ৭২ আয়াত)

এ ছোট্ট সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে যে কথা বলা হয়েছে তা আসলে মু'মিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলীর অন্তরভুক্ত। মু'মিন এমন এক ব্যক্তি যার মধ্যে সবসময় দায়িত্বানুভূতি সজাগ থাকে, সে মনে করে দুনিয়াটা আসলে একটা পরীক্ষাগৃহ। যে জিনিসটিকে জীবন, বয়স, সময় ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে সেটি আসলে একটি মাপাজোকা মেয়াদ। তাকে পরীক্ষা করার জন্য এ সময়-কালটি দেয়া হয়েছে। যে ছাত্রটি

পরীক্ষার হলে বসে নিজের প্রশ্নপত্রের জবাব লিখে চলছে সে যেমন নিজের কাজকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে পূর্ণ ব্যস্ততা সহকারে তার মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করে দেয়, এ অনুভূতিও ঠিক তেমনি মু'মিনকে গুরুত্ব ও ব্যস্ততা সহকারে নিমগ্ন করে দেয়। সেই ছাত্রটি যেমন অনুভব করে পরীক্ষার এ ঘন্টা ক'টি তার আগামী জীবনের চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণকারী এবং এ অনুভূতির কারণে সে এ ঘন্টাগুলোর প্রতিটি মুহূর্ত নিজের প্রশ্নপত্রের সঠিক জবাব লেখার প্রচেষ্টায় ব্যয় করতে চায় এবং এগুলোর একটি সেকেণ্ডও বাজে কাজে নষ্ট করতে চায় না, ঠিক তেমনি মু'মিনও দুনিয়ার এ জীবনকালকে এমন সব কাজে ব্যয় করে যা পরিণামের দিক দিয়ে কল্যাণকর। এমনকি সে খেলাধূলা ও আনন্দ উপভোগের ক্ষেত্রেও এমন সব জিনিস নির্বাচন করে যা নিছক সময় ক্ষেপণের কারণ হয় না বরং কোন অপেক্ষাকৃত ভালো উদ্দেশ্যপূর্ণ করার জন্য তাকে তৈরি করে। তার দৃষ্টিতে সময় 'ক্ষেপণ' করার জিনিস হয় না বরং ব্যবহার করার জিনিস হয়। অন্য কথায়, সময় কাটানোর জিনিস নয়—কাজে 'খাটানোর' জিনিস।

এ ছাড়াও মু'মিন হয় একজন শান্ত-সমাহিত ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতির অধিকারী এবং পবিত্র-পরিচ্ছন্ন স্বভাব ও সুস্থ রুচিসম্পন্ন মানুষ। বেহুদাপনা তার মেজাজের সাথে কোন রকমেই খাপ খায় না। সে ফলদায়ক কথা বলতে পারে, কিন্তু আজেবাজে গপ্ মারা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। সে ব্যাংগ, কৌতুক, ও হাল্কা পরিহাস পর্যন্ত করতে পারে কিন্তু উচ্ছল ঠাট্টা-তামাসায় মেতে উঠতে পারে না, বাজে ঠাট্টা-মস্করা ও ভাঁড়ামি বরদাশত করতে পারে না এবং আনন্দ-ফূর্তি ও ভাঁড়ামির কথাবার্তাকে নিজের পেশায় পরিণত করতে পারে না। তার জন্য তো এমন ধরনের সমাজ হয় একটি স্থায়ী নির্যাতন কক্ষ বিশেষ, যেখানে কারো কান কখনো গালি-গালাজ, পরনিন্দা, পরচর্চা, অপবাদ, মিথ্যা কথা, কুরুচিপূর্ণ গান-বাজনা ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে নিরাপদ থাকে না। আল্লাহ তাকে যে জান্নাতের আশা দিয়ে থাকেন তার একটি অন্যতম নিয়ামত তিনি এটাই বর্ণনা করেছেন যে, لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً " সেখানে তুমি কোন বাজে কথা শুনবে না।"

৫. "যাকাত দেয়া" ও "যাকাতের পথে সক্রিয় থাকা"র মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে বিরাট ফারাক আছে। একে উপেক্ষা করে উভয়কে একই অর্থবোধক মনে করা ঠিক নয়। এটা নিশ্চয়ই গভীর তাৎপর্যবহ যে, এখানে মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে يُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ এর সর্বজন পরিচিত বর্ণনাভংগী পরিহার করে لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُونَ এর অপ্রচলিত বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। আরবী ভাষায় যাকাত শব্দের দু'টি অর্থ হয়। একটি হচ্ছে "পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা তথা পরিশুদ্ধি" এবং দ্বিতীয়টি "বিকাশ সাধন"—কোন জিনিসের উন্নতি সাধনে যেসব জিনিস প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় সেগুলো দূর করা এবং তার মৌল উপাদান ও প্রাণবস্তুকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করা। এ দু'টি অর্থ মিলে যাকাতের পূর্ণ ধারণাটি সৃষ্টি হয়। তারপর এ শব্দটি ইসলামী পরিভাষায় পরিণত হলে এর দু'টি অর্থ প্রকাশ হয়। এক, এমন ধন-সম্পদ যা পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বের করা হয়। দুই, পরিশুদ্ধ করার মূল কাজটি। যদি يُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ বলা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, তারা পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের সম্পদের একটি অংশ দেয় বা আদায় করে। এভাবে শুধুমাত্র সম্পদ দেবার মধ্যেই ব্যাপারটি সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যদি لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُونَ বলা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, তারা পরিশুদ্ধ করার কাজ করে এবং এ অবস্থায় ব্যাপারটি

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝٥ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝٦ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝٧

নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে,[৬] নিজেদের স্ত্রীদের ও অধিকারভুক্ত বাঁদীদের ছাড়া, এদের কাছে (হেফাজত না করলে) তারা তিরস্কৃত হবে না; তবে যারা এর বাইরে আরো কিছু চাইবে তারাই হবে সীমালংঘনকারী,[৭]

শুধুমাত্র আর্থিক যাকাত আদায় করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং আত্মার পরিশুদ্ধি চরিত্রের পরিশুদ্ধি, জীবনের পরিশুদ্ধি, অর্থের পরিশুদ্ধি ইত্যাদি প্রত্যেকটি দিকের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়বে। আর এছাড়াও এর অর্থ কেবলমাত্র নিজেরই জীবনের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং নিজের চারপাশের জীবনের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়বে। কাজেই অন্য কথায় এ আয়াতের অনুবাদ হবে তারা পরিশুদ্ধির কার্য সম্পাদনকারী লোক।" অর্থাৎ তারা নিজেদেরকেও পরিশুদ্ধ করে এবং অন্যদেরকেও পরিশুদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করে। তারা নিজেদের মধ্যেও মৌল মানবিক উপাদানের বিকাশ সাধন করে এবং বাইরের জীবনেও তার উন্নতির প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এ বিষয়বস্তুটি কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানেও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা আ'লায় বলা হয়েছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

"সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে এবং নিজের রবের নাম স্মরণ করে নামায পড়েছে।"

সূরা শামসে বলা হয়েছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

"সফলকাম হলো সে ব্যক্তি যে আত্মশুদ্ধি করেছে এবং ব্যর্থ হলো সে ব্যক্তি যে তাকে দলিত করেছে।"

কিন্তু এ দু'টির তুলনায় সংশ্লিষ্ট আয়াতটি ব্যাপক অর্থের অধিকারী। কারণ এ দু'টি আয়াত শুধুমাত্র আত্মশুদ্ধির ওপর জোর দেয় এবং আলোচ্য আয়তটি স্বয়ং শুদ্ধিকর্মের গুরুত্ব বর্ণনা করে আর এ কর্মটির মধ্যে নিজের সত্তা ও সমাজ জীবন উভয়েরই পরিশুদ্ধি শামিল রয়েছে।

৬. এর দু'টি অর্থ হয়। এক, নিজের দেহের লজ্জাস্থানগুলো ঢেকে রাখে। অর্থাৎ উলংগ হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে এবং অন্যের সামনে লজ্জাস্থান খোলে না। দুই, তারা নিজেদের সততা ও পবিত্রতা সংরক্ষণ করে। অর্থাৎ যৌন স্বাধীনতা দান করে না এবং

কামশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে লাগামহীন হয় না। (আরো ব্যাখার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূর, ৩০–৩২ টীকা।)

৭. এটি একটি প্রাসংগিক বাক্য। "লজ্জাস্থানের হেফাজত করে" বাক্যাংশটি থেকে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য এ বাক্যটি বলা হয়েছে। দুনিয়াতে পূর্বেও একথা মনে করা হতো এবং আজো বহু লোক এ বিভ্রান্তিতে ভুগছে যে, কামশক্তি মূলত একটি খারাপ জিনিস এবং বৈধ পথে হলেও তার চাহিদা পূরণ করা সৎ ও আল্লাহর প্রতি অনুগত লোকদের জন্য সংগত নয়। যদি কেবল মাত্র "সফলতা লাভকারী মু'মিনরা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে" এতটুকু কথা বলেই বাক্য খতম করে দেয়া হতো তাহলে এ বিভ্রান্তিটি জোরদার হয়ে যেতো। কারণ এর এ অর্থ করা যেতে পারতো যে, তারা মালকোঁচা মেরে থাকে, তারা সন্যাসী ও যোগী এবং বিয়ে–শাদীর ঝামেলায় তারা যায় না। তাই একটি প্রাসংগিক বাক্য বাড়িয়ে দিয়ে এ সত্যটি সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, বৈধ স্থানে নিজের প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করা কোন নিন্দনীয় ব্যাপার নয়। তবে কাম প্রবৃত্তির সেবা করার জন্য এ বৈধ পথ এড়িয়ে অন্য পথে চলা অবশ্যই গোনাহর কাজ।

এ প্রাসংগিক বাক্যটি থেকে কয়েকটি বিধান বের হয়। এগুলো সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ

এক ঃ লজ্জাস্থান হেফাজত করার সাধারণ হুকুম থেকে দু'ধরনের স্ত্রীলোককে বাদ দেয়া হয়েছে। এক, স্ত্রী। দুই, مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ । স্ত্রী (ازواج) শব্দটি আরবী ভাষার পরিচিত ব্যবহার এবং স্বয়ং কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য অনুযায়ী কেবলমাত্র এমনসব নারী সম্পর্কে বলা হয় যাদেরকে যথারীতি বিবাহ করা হয়েছে এবং আমাদের দেশে প্রচলিত "স্ত্রী" শব্দটি এরি সমার্থবোধক। আর مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ বলতে যে বাঁদী বুঝায় আরবী প্রবাদ ও কুরআনের ব্যবহার উভয়ই তার সাক্ষী। অর্থাৎ এমন বাঁদী যার ওপর মানুষের মালিকানা অধিকার আছে। এভাবে এ আয়াত পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় মালিকানাধীন বাঁদীর সাথেও যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা বৈধ এবং বৈধতার ভিত্তি বিয়ে নয় বরং মালিকানা। যদি এ জন্যও বিয়ে শর্ত হতো তাহলে একে স্ত্রী থেকে আলাদা করেও বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না। কারণ বিবাহিত হলে সে ও স্ত্রীর পর্যায়ভুক্ত হতো। বর্তমানকালের কোন কোন মুফাস্সির যারা বাঁদীর সাথে যৌন সম্ভোগ স্বীকার করেননি তারা সূরা নিসার (২৫ আয়াত) وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ আয়াতটি থেকে যুক্তি আহরণ করে একথা প্রমাণ করতে চান যে, বাঁদীর সাথে যৌন সম্ভোগও কেবলমাত্র বিয়ের মাধ্যমেই করা যেতে পারে। কারণ সেখানে হুকুম দেয়া হয়েছে, যদি আর্থিক দুরবস্থার কারণে তোমরা কোন স্বাধীন পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করার ক্ষমতা না রাখো তাহলে কোন বাঁদীকে বিয়ে করো। কিন্তু এসব লোকের একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট লক্ষ করার মতো। এরা একই আয়াতের একটি অংশকে নিজেদের উদ্দেশ্যের পক্ষে লাভজনক দেখতে পেয়ে গ্রহণ করে নেন, আবার সে একই আয়াতের যে অংশটি এদের উদ্দেশ্য বিরোধী হয় তাকে জেনে বুঝে বাদ দিয়ে দেন। এ আয়াতে বাঁদীদেরকে বিয়ে করার নির্দেশ যেসব শব্দের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ঃ

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

"কাজেই এ বাঁদীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও এদের অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে এবং এদেরকে এদের পরিচিত পদ্ধতিতে মোহরানা প্রদান করো।" এ শব্দগুলো পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, এখানে বাঁদীর মালিকের বিষয় আলোচনার বিষয়বস্তু নয় বরং এমন ব্যক্তির বিষয় এখানে আলোচনা করা হচ্ছে, যে স্বাধীন মেয়ে বিয়ে করার ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা রাখে না এবং এ জন্য অন্য কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন বাঁদীকে বিয়ে করতে চায়। নয়তো যদি নিজেরই বাঁদীকে বিয়ে করার ব্যাপার হয় তাহলে তার এ "অভিভাবক" কে হতে পারে যার কাছ থেকে তার অনুমতি নেবার প্রয়োজন হয়? কিন্তু কুরআনের সাথে কৌতুককারীরা কেবলমাত্র فَانْكِحُوْهُنَّ -কে গ্রহণ করেন অথচ তার পরেই যে بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ এসেছে তাকে উপেক্ষা করেন। তাছাড়াও তারা একটি আয়াতের এমন অর্থ বের করেন যা এ একই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কুরআনের অন্যান্য আয়াতের সাথে সংঘর্ষশীল। কোন ব্যক্তি যদি নিজের চিন্তাধারার নয় বরং কুরআন মজীদের অনুসরণ করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যি সূরা নিসার ৩-৩৫, সূরা আহযাবের ৫০-৫২ এবং সূরা মা'আরিজের ৩০ আয়াতকে সূরা মুমিনূনের এ আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে। এভাবে সে নিজেই এ ব্যাপারে কুরআনের বিধান কি তা জানতে পারবে। (এ বিষয়ে আরো বেশী বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা নিসা, ৪৪ টীকা; তাফহীমাত (মওদূদী রচনাবলী) ২য় খণ্ড ২৯০ থেকে ৩২৪ পৃঃ এবং রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খণ্ড, ৩২৪ থেকে ৩৩৩ পৃষ্ঠা)

দুই ঃ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ বাক্যাংশে عَلٰى শব্দটি একথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেয় যে, এ আনুসংগিক বাক্যে আইনের যে ধারা বর্ণনা করা হচ্ছে তার সম্পর্ক শুধু পুরুষদের সংগে। বাকি قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ থেকে নিয়ে خٰلِدُوْنَ পর্যন্ত পুরো আয়াতটিতেই সর্বনাম পুং লিঙ্গে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও পুরুষ ও নারী উভয়েই শামিল রয়েছে। কারণ আরবী ভাষায় পুরুষ ও নারীর সমষ্টির কথা যখন বলা হয় তখন সর্বনামের উল্লেখ পুং লিংগেই করা হয়। কিন্তু এখানে لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ এর হুকুমের বাইরে রেখে عَلٰى শব্দ ব্যবহার করার মাধ্যমে একথা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ ব্যতিক্রমটি পুরুষদের জন্য, মেয়েদের জন্য নয়। যদি "এদের কাছে" না বলে "এদের থেকে" হেফাজত না করলে তাদেরকে নিন্দনীয় নয় বলা হতো, তাহলে অবশ্যই এ হুকুমটিও নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য কার্যকর হতে পারতো। এ সূক্ষ্ম বিষয়টি না বুঝার কারণে হযরত উমরের (রা) যুগে জনৈকা মহিলা তাঁর গোলামের সাথে যৌন সম্ভোগ করে বসেছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে শূরায় যখন তাঁর বিষয়টি পেশ হলো তখন সবাই এক বাক্যে বললেন ঃ تاولت كتاب الله تعالى غير تاويله অর্থাৎ "সে আল্লাহর কিতাবের ভুল অর্থ গ্রহণ করেছে।" এখানে কারোর মনে যেন এ সন্দেহ সৃষ্টি না হয় যে, এ ব্যতিক্রম যদি শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীদের জন্য তাদের স্বামীরা কেমন করে হালাল হলো? এ সন্দেহটি সঠিক না হবার কারণ হচ্ছে এই যে,

যখন স্ত্রীদের ব্যাপারে স্বামীদেরকে পুরুষাংগ হেফাজত করার হুকুমের বাইরে রাখা হয়েছে তখন নিজেদের স্বামীদের ব্যাপারে স্ত্রীরা আপনা আপনিই এ হুকুমের বাইরে চলে গেছে। এরপর তাদের জন্য আর আলাদা সুস্পষ্ট বক্তব্যের প্রয়োজন থাকেনি। এভাবে এ ব্যতিক্রমের হুকুমের প্রভাব কার্যত শুধুমাত্র পুরুষ ও তার মলিকানাধীন নারী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং নারীর জন্য তার গোলামের সাথে দৈহিক সম্পর্ক হারাম গণ্য হয়। নারীর জন্য এ জিনিসটি হারাম গণ্য করার কারণ হচ্ছে এই যে, গোলাম তার প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করতে পারে কিন্তু তার ও তার গৃহের পরিচালক হতে পারে না এবং এর ফলে পারিবারিক জীবনের সংযোগ ও শৃংখল ঢিলা থেকে যায়।

তিন ঃ "তবে যারা এর বাইরে আরো কিছু চাইবে তারাই হবে সীমালংঘনকারী"–এ বাক্যটি ওপরে উল্লেখিত দু'টি বৈধ আকার ছাড়া যিনা বা সমকাম অথবা পশু–সংগম কিংবা কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য অন্য যাই কিছু হোক না কেন সবই হারাম করে দিয়েছে। একমাত্র হস্তমৈথুনের (Masturbation) ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল একে জায়েয গণ্য করেন। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈ একে চূড়ান্ত হারাম বলেন। অন্যদিকে হানাফীদের মতে যদিও এটি হারাম তবুও তারা বলেন, যদি চরম মুহূর্তে কখনো কখনো এ রকম কাজ করে বসে তাহলে আশা করা যায় তা মাফ করে দেয়া হবে।

চার ঃ কোন কোন মুফাস্‌সির মুতা' বিবাহ হারাম হবার বিষয়টিও এ আয়াত থেকে প্রমাণ করেছেন। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে, যে মেয়েকে মুতা' বিয়ে করা হয় সে না স্ত্রীর পর্যায়ভুক্ত, না বাঁদীর। বাঁদী তো সে নয় একথা সুস্পষ্ট, আবার স্ত্রীও নয়। কারণ স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করার জন্য যতগুলো আইনগত বিধান আছে তার কোনটাই তার ওপর আরোপিত হয় না। সে পুরুষের উত্তরাধিকারী হয় না, পুরুষও তার উত্তরাধিকারী হয় না। তার জন্য ইদ্দত নেই, তালাকও নেই, খোরপোশ নেই এবং ঈলা, যিহার ও লি'আন ইত্যাদি কোনটিই নেই। বরং সে চার স্ত্রীর নির্ধারিত সীমানার বাইরে অবস্থান করছে। কাজেই সে যখন "স্ত্রী" ও "বাঁদী" কোনটার সংজ্ঞায় পড়ে না তখন নিশ্চয়ই সে 'এর বাইরে আরো কিছু'র মধ্যে গণ্য হবে। আর এ আরো কিছু যারা চায় তাদেরকে কুরআন সীমালংঘনকারী গণ্য করেছে। এ যুক্তিটি অনেক শক্তিশালী। তবে এর মধ্যে একটি দুর্বলতার দিকও আছে। আর এ দুর্বলতার কারণে এ আয়াতটির বলেই যে, মুতা' হারাম হয়েছে সে কথা বলা কঠিন। এ দুর্বলতাটি হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুতা' হারাম হবার শেষ ও চূড়ান্ত ঘোষণা দেন মক্কা বিজয়ের বছরে। এর পূর্বে অনুমতির প্রমাণ সহী হাদীসগুলোতে পাওয়া যায়। যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, মুতা' হারাম হবার হুকুম কুরআনের এ আয়াতের মধ্যেই এসে গিয়েছিল আর এ আয়াতটির মক্কী হবার ব্যাপারে সবাই একমত এবং এটি হিজরতের কয়েক বছর আগে নাযিল হয়েছিল, তাহলে কেমন করে ধারণা করা যেতে পারে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয় পর্যন্ত একে জায়েয রেখেছিলেন? কাজেই একথা বলাই বেশী নির্ভুল যে, মুতা' বিয়ে কুরআন মজীদের কোন সুস্পষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে নয় বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের মাধ্যমেই হারাম হয়েছে। সুন্নাতের মধ্যে যদি এ বিষয়টির সুস্পষ্ট

ফায়সালা না থাকতো তাহলে নিছক এ আয়াতের ভিত্তিতে এর হারাম হওয়ার ফায়সালা দেয়া কঠিন ছিল। মুতা'র আলোচনা যখন এসে গেছে তখন আরো দু'টি কথা স্পষ্ট করে দেয়া সংগত বলে মনে হয়। এক, এর হারাম হওয়ার বিষয়টি স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেই প্রমাণিত। কাজেই হযরত উমর (রা) একে হারাম করেছেন, একথা বলা ঠিক নয়। হযরত উমর (রা) এ বিধিটির প্রবর্তক বা রচয়িতা ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন কেবলমাত্র এর প্রচারক ও প্রয়োগকারী। যেহেতু এ হুকুমটি রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর আমলের শেষের দিকে দিয়েছিলেন এবং সাধারণ লোকদের কাছে এটি পৌঁছেনি তাই হযরত উমর (রা) এটিকে সাধারণ্যে প্রচার ও আইনের সাহায্যে কার্যকরী করেছিলেন। দুই, শীয়াগণ মুতা'কে সর্বতোভাবে ও শর্তহীনভাবে মুবাহ সাব্যস্ত করার যে নীতি অবলম্বন করেছেন কুরআন ও সুন্নাতের কোথাও তার কোন অবকাশই নেই। প্রথম যুগের সাহাবা, তাবেঈ ও ফকীহদের মধ্যে কয়েকজন যাঁরা এর বৈধতার সমর্থক ছিলেন তাঁরা শুধুমাত্র অনন্যোপায় অবস্থায় অনিবার্য পরিস্থিতিতে এবং চরম প্রয়োজনের সময় একে বৈধ গণ্য করেছিলেন। তাদের একজনও একে বিবাহের মতো শর্তহীন মুবাহ এবং সাধারণ অবস্থায় অবলম্বনযোগ্য বলেননি। বৈধতার প্রবক্তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য হিসেবে পেশ করা হয় হযরত ইবনে আব্বাসের (রা) নাম। তিনি নিজের মত এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ ما هى الا كالميتة لا تحل الا للمضطر (এ হচ্ছে মৃতের মতো, যে ব্যক্তি অনিবার্য ও অনন্যোপায় অবস্থার শিকার হয়েছে তার ছাড়া আর কারোর জন্য বৈধ নয়।) আবার তিনি যখন দেখলেন তাঁর এ বৈধতার অবকাশ-দানমূলক ফতোয়া থেকে লোকেরা অবৈধ স্বার্থ উদ্ধার করে যথেচ্ছভাবে মুতা' করতে শুরু করেছে এবং তাকে প্রয়োজনের সময় পর্যন্ত মুলতবী করছে না তখন তিনি নিজের ফতওয়া প্রত্যাহার করে নিলেন। ইবনে আব্বাস ও তাঁর সমমনা মুষ্টিমেয় কয়েকজন তাঁদের এ মত প্রত্যাহার করেছিলেন কিনা এ প্রশ্নটি যদি বাদ দেয়াও যায় তাহলে তাদের মত গ্রহণকারীরা বড় জোর "ইযতিরার" তথা অনিবার্য ও অনন্যোপায় অবস্থায় একে বৈধ বলতে পারেন। অবাধ ও শর্তহীন মুবাহ এবং প্রয়োজন ছাড়াই মুতা' বিবাহ করা এমন কি বিবাহিত স্ত্রীদের উপস্থিতিতেও মুতা-বিবাহিত স্ত্রীদের সাথে যৌন সম্ভোগ করা এমন একটি স্বেচ্ছাচার যাকে সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ রুচিবোধও কোনদিন বরদাশত করে না। ইসলামী শরীয়াত ও রসূল বংশোদ্ভূত ইমামদেরকে এর সাথে জড়িত মনে করার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমি মনে করি, শীয়াদের মধ্য থেকে কোন ভদ্র ও রুচিবান ব্যক্তিও তার মেয়ের জন্য কেউ বিবাহের পরিবর্তে মুতা'র প্রস্তাব দেবে এটা বরদাশত করতে পারেন না। এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, মুতা'র বৈধতার জন্য সমাজে বারবনিতাদের মতো মেয়েদের এমন একটি নিকৃষ্ট শ্রেণী থাকতে হবে যাদের সাথে মুতা' করার অবাধ সুযোগ থাকে। অথবা মুতা' হবে শুধুমাত্র গরীবদের কন্যা ও ভগিনীদের জন্য এবং তা থেকে ফায়দা হাসিল করার অধিকারী হবে সমাজের ধনিক ও সমৃদ্ধিশালী শ্রেণীর পুরুষেরা। আল্লাহ ও রসূলের শরীয়াত থেকে কি এ ধরনের বৈষম্যপূর্ণ ও ইনসাফবিহীন আইনের আশা করা যেতে পারে? আবার আল্লাহ ও তাঁর রসূল থেকে কি এটাও আশা করা যেতে পারে যে, তিনি এমন কোন কাজকে মুবাহ করে দেবেন যাকে যে কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে নিজের জন্য অমর্যাদাকর এবং বেহায়াপনা মনে করে?

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝٨ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى
صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝٩ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۝١٠ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ
الْفِرْدَوْسَ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝١١

নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে[৮]

এবং নিজেদের নামাযগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করে,[৯]

তারাই এমন ধরনের উত্তরাধিকারী যারা নিজেদের উত্তরাধিকার হিসেবে ফিরদাউস[১০] লাভ করবে এবং সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।[১১]

৮. "আমানত" শব্দটি বিশ্ব-জাহানের প্রভু অথবা সমাজ কিংবা ব্যক্তি যে আমানত কাউকে সোপর্দ করেছেন তা সবগুলোর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর এমন যাবতীয় চুক্তি প্রতিশ্রুতি ও অংগীকারের অন্তরভুক্ত হয় যা মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে অথবা মানুষ ও মানুষের মধ্যে কিংবা জাতি ও জাতির মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে। মু'মিনের বৈশিষ্ট হচ্ছে, সে কখনো আমানতের খেয়ানত করে না এবং কখনো নিজের চুক্তি ও অংগীকার ভংগ করে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই তাঁর ভাষণে বলতেন ঃ

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهٗ

"যার মধ্যে আমানতদারীর গুণ নেই তার মধ্যে ঈমান নেই এবং যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার গুণ নেই তার মধ্যে দীনদারী নেই।" (বাইহাকী, ঈমানের শাখা-প্রশাখাসমূহ)

বুখারী ও মুসলিম একযোগে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "চারটি অভ্যাস যার মধ্যে পাওয়া যায় সে নিখাদ মুনাফিক এবং যার মধ্যে এর কোন একটি পাওয়া যায় সে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে তা মুনাফিকীর একটি অভ্যাস হিসেবেই থাকে। সে চারটি অভ্যাস হচ্ছে, কোন আমানত তাকে সোপর্দ করা হলে সে তার খেয়ানত করে, কখনো কথা বললে মিথ্যা কথা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে ভংগ করে এবং যখনই কারোর সাথে ঝগড়া করে তখনই (নৈতিকতা ও সততার) সমস্ত সীমা লংঘন করে।"

৯. ওপরের খুশূ'র আলোচনায় নামায শব্দ এক বচনে বলা হয়েছিল আর এখানে বহুবচনে "নামাযগুলো" বলা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, সেখানে লক্ষ ছিল মূল নামায আর এখানে পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি ওয়াক্তের নামায সম্পর্কে বক্তব্য দেয়া হয়েছে। "নামাযগুলোর সংরক্ষণ"-এর অর্থ হচ্ছে ঃ সে নামাযের সময়, নামাযের নিয়ম-কানুন, আরকান ও আহকাম মোটকথা নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি জিনিসের

প্রতি পুরোপুরি নজর রাখে। শরীর ও পোশাক পরিচ্ছদ পাক রাখে। অযু ঠিক মতো করে। কখনো যেন বিনা অযুতে নামায না পড়া হয় এদিকে খেয়াল রাখে। সঠিক সময়ে নামায পড়ার চিন্তা করে। সময় পার করে দিয়ে নামায পড়ে না। নামাযের সমস্ত আরকান পুরোপুরি ঠাণ্ডা মাথায় পূর্ণ একাগ্রতা ও মানসিক প্রশান্তি সহকারে আদায় করে। একটি বোঝার মতো তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিয়ে সরে পড়ে না। যা কিছু নামাযের মধ্যে পড়ে এমনভাবে পড়ে যাতে মনে হয় বান্দা তার প্রভু আল্লাহর কাছে কিছু নিবেদন করছে, এমনভাবে পড়ে না যাতে মনে হয় একটি গৎবাঁধা বাক্য আউড়ে শুধুমাত্র বাতাসে কিছু বক্তব্য ফুঁকে দেয়াই তার উদ্দেশ্য।

১০. ফিরদৌস জান্নাতের সবচেয়ে বেশী পরিচিত প্রতিশব্দ। মানব জাতির প্রায় সমস্ত ভাষায়ই এ শব্দটি পাওয়া যায়। সংস্কৃতে বলা হয় পরদেষা, প্রাচীন কুলদানী ভাষায় পরদেসা, প্রাচীন ইরানী (যিন্দা) ভাষায় পিরীদাইজা, হিব্রু ভাষায় পারদেস, আর্মেনীয় ভাষায় পারদেজ, সুরিয়ানী ভাষায় ফারদেসো, গ্রীক ভাষায় পারাডাইসোস, ল্যাটিন ভাষায় প্যারাডাইস এবং আরবী ভাষায় ফিরদৌস। এ শব্দটি এসব ভাষায় এমন একটি বাগানের জন্য বলা হয়ে থাকে যার চারদিকে পাঁচিল দেয়া থাকে, বাগানটি বিস্তৃত হয়, মানুষের আবাসগৃহের সাথে সংযুক্ত হয় এবং সেখানে সব ধরনের ফল বিশেষ করে আংগুর পাওয়া যায়। বরং কোন কোন ভাষায় এর অর্থের মধ্যে একথাও বুঝা যায় যে, এখানে বাছাই করা গৃহপালিত পশু–পাখিও পাওয়া যায়। কুরআনের পূর্বে আরবদের জাহেলী যুগের ভাষায়ও ফিরদৌস শব্দের ব্যবহার ছিল। কুরআনে বিভিন্ন বাগানের সমষ্টিকে ফিরদৌস বলা হয়েছে। যেমন সূরা কাহফে বলা হয়েছে ঃ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا "তাদের আপ্যায়নের জন্য ফিরদৌসের বাগানগুলো আছে।" এ থেকে মনের মধ্যে যে ধারণা জন্মে তা হচ্ছে এই যে, ফিরদৌস একটি বড় জায়গা, যেখানে অসংখ্য বাগ–বাগিচা–উদ্যান রয়েছে।

মু'মিনদের ফিরদৌসের অধিকারী হবার বিষয়টির ওপর সূরা ত্বা–হা (৮৩ টীকা) ও সূরা আল আম্বিয়ায় (৯৯ টীকা) যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে।

১১. এ আয়াতগুলোতে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

এক ঃ যারাই কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মেনে নিয়ে এ গুণাবলী নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করবে এবং এ নীতির অনুসারী হবে তারা যে কোন দেশ, জাতি ও গোত্রেরই হোক না কেন অবশ্যই তারা দুনিয়ায় ও আখেরাতে সফলকাম হবে।

দুই ঃ সফলতা নিছক ঈমানের ঘোষণা, অথবা নিছক সৎচরিত্র ও সৎকাজের ফল নয়। বরং উভয়ের সম্মিলনের ফল। মানুষ যখন আল্লাহর পাঠানো পথনির্দেশ মেনে চলে এবং তারপর সে অনুযায়ী নিজের মধ্যে উন্নত নৈতিকতা ও সৎকর্মশীলতা সৃষ্টি করে তখন সে সফলতা লাভ করে।

তিন ঃ নিছক পার্থিব ও বৈষয়িক প্রাচুর্য ও সম্পদশালিতা এবং সীমিত সাফল্যের নাম সফলতা নয়। বরং তা একটি ব্যাপকতর কল্যাণকর অবস্থার নাম। দুনিয়ায় ও আখেরাতে

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً
فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً
فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ؕ
فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ﴿١٤﴾ ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ
اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ۖ
وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ﴿١٧﴾ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ
فِي الْاَرْضِ ۖ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ﴿١٨﴾

আমি মানুষকে তৈরি করেছি মাটির উপাদান থেকে, তারপর তাকে একটি সংরক্ষিত স্থানে টপকে পড়া ফোঁটায় পরিবর্তিত করেছি, এরপর সেই ফোঁটাকে জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত করেছি, তারপর সেই রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর মাংসপিণ্ডে অস্থি-পঞ্জর স্থাপন করেছি, তারপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢেকে দিয়েছি গোশত দিয়ে,[১২] তারপর তাকে দাঁড় করেছি স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টি রূপে।[১৩] কাজেই আল্লাহ বড়ই বরকত সম্পন্ন,[১৪] সকল কারিগরের চাইতে উত্তম কারিগর তিনি। এরপর তোমাদের অবশ্যই মরতে হবে, তারপর কিয়ামতের দিন নিশ্চিতভাবেই তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে।

আর তোমাদের ওপর আমি সাতটি পথ নির্মাণ করেছি,[১৫] সৃষ্টিকর্ম আমার মোটেই অজানা ছিল না।[১৬] আর আকাশ থেকে আমি ঠিক হিসেব মতো একটি বিশেষ পরিমাণ অনুযায়ী পানি বর্ষণ করেছি এবং তাকে ভূমিতে সংরক্ষণ করেছি।[১৭] আমি তাকে যেভাবে ইচ্ছা অদৃশ্য করে দিতে পারি।[১৮]

স্থায়ী সাফল্য ও পরিতৃপ্তিকেই এ নামে অভিহিত করা হয়। এটি ঈমান ও সৎকর্ম ছাড়া অর্জিত হয় না। পথভ্রষ্টদের সাময়িক সমৃদ্ধি ও সাফল্য এবং সৎ মুমিনদের সাময়িক বিপদ আপদকে এ নীতির সাথে সাংঘর্ষিক গণ্য করা যেতে পারে না।

চার ঃ মুমিনদের এ গুণাবলীকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিশনের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। আবার এ বিষয়বস্তুটিই সামনের দিকের ভাষণের সাথে এ আয়াতগুলোর সম্পর্ক কায়েম করে। তৃতীয় রুকূ'র শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ

ভাষণটির যুক্তির ধারা যেভাবে পেশ করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, শুরুতে আছে অভিজ্ঞতা প্রসূত যুক্তি। অর্থাৎ এ নবীর শিক্ষা তোমাদেরই সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এ বিশেষ ধরনের জীবন, চরিত্র, কর্মকাণ্ড, নৈতিকতা ও গুণাবলী সৃষ্টি করে দেখিয়ে দিয়েছে। এখন তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, এ শিক্ষা সত্য না হলে এ ধরনের কল্যাণময় ফল কিভাবে সৃষ্টি করতে পারতো? এরপর হচ্ছে প্রত্যক্ষ দর্শনলব্ধ যুক্তি। অর্থাৎ মানুষের নিজের সত্তায় ও চারপাশের বিশ্বে যে নিদর্শনাবলী পরিদৃষ্ট হচ্ছে তা সবই তাওহীদ ও আখেরাতের এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদত্ত শিক্ষার সত্যতার সাক্ষ দিচ্ছে। তারপর আসে ঐতিহাসিক যুক্তির কথা। এ যুক্তিগুলোতে বলা হয়েছে, নবী ও তাঁর দাওয়াত অস্বীকারকারীদের সংঘাত আজ নতুন নয় বরং একই কারণে অতি প্রাচীনকাল থেকে তা চলে আসছে। এ সংঘাতের প্রতিটি যুগে একই ফলাফলের প্রকাশ ঘটেছে। এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, উভয় দলের মধ্যে কে সত্য পথে ছিল এবং কে ছিল মিথ্যার পথে।

১২. ব্যাখ্যার জন্য সূরা হজ্জের ৫, ৬ ও ৯ টীকা দেখুন।

১৩. অর্থাৎ কোন মুক্তমনের অধিকারী ব্যক্তি শিশুকে মাতৃগর্ভে লালিত পালিত হতে দেখে একথা ধারণাও করতে পারে না যে, এখানে এমন একটি মানুষ তৈরী হচ্ছে, যে বাইরে এসে জ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তি ও শিল্পকর্মের এসব নৈপুণ্য দেখাবে এবং তার থেকে এ ধরনের বিস্ময়কর শক্তি ও যোগ্যতার প্রকাশ ঘটবে। সেখানে সে হয় হাড় ও রক্ত মাংসের একটি দলা পাকানো পিণ্ডের মতো। তার মধ্যে ভূমিষ্ঠ হবার আগে পর্যন্ত জীবনের প্রারম্ভিক বৈশিষ্টসমূহ ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তার মধ্যে থাকে না শ্রবণ শক্তি, থাকে না দৃষ্টি শক্তি, বাকশক্তি, বুদ্ধি-বিবেচনা ও অন্য কোন গুণ। কিন্তু বাইরে এসেই সে অন্য কিছু হয়ে যায়। পেটে অবস্থানকারী ভ্রূণের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্কই থাকে না। অথচ এখন সে শ্রবণকারী, দর্শনকারী ও বাকশক্তির অধিকারী একটি সত্তা। এখন সে অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে। এখন তার মধ্যে এমন একটি ব্যক্তিসত্তার উন্মেষ ঘটার সূচনা হয় যে জাগ্রত হবার পরপরই প্রথম মুহূর্ত থেকেই নিজের আওতাধীন প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর নিজের কর্তৃত্ব ও শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা চালায়। তারপর সে যতই এগিয়ে যেতে থাকে তার সত্তা থেকে এ "অন্য জিনিস" হবার অবস্থা আরো সুস্পষ্ট ও আরো বিকশিত হতে থাকে। যৌবনে পদার্পণ করে শৈশব থেকে ভিন্ন কিছু হয়ে যায়। পৌঢ়ত্বে পৌঁছে যৌবনের তুলনায় অন্য কিছু প্রমাণিত হয়। বার্ধক্যে উপনীত হবার পর নতুন প্রজন্মের জন্য একথা অনুমান করাই কঠিন হয়ে পড়ে যে, তার শিশুকাল কেমন ছিল এবং যৌবনকালে কি অবস্থা ছিল। এত বড় পরিবর্তন অন্তত এ দুনিয়ার অন্য কোন সৃষ্টির মধ্যে ঘটে না। কোন ব্যক্তি যদি একদিকে কোন বর্ষীয়ান পুরুষের শক্তি, যোগ্যতা ও কাজ দেখে এবং অন্য দিকে একথা কল্পনা করতে থাকে যে, পঞ্চাশ ষাট বছর আগে একদা যে একটি ফোঁটা মায়ের গর্ভকোষে টপ্‌কে পড়েছিল তার মধ্যে এত সবকিছু নিহিত ছিল, তাহলে স্বতস্ফূর্তভাবে সে একই কথা বের হয়ে আসবে যা সামনের দিকের বাক্যের মধ্যে আসছে।

১৪. মূলে تَبٰرَكَ اللّٰهُ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অনুবাদের মাধ্যমে এর সমগ্র গভীর অর্থ বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আভিধানিক ও ব্যবহারিক দিক দিয়ে এর মধ্যে দু'টি অর্থ

পাওয়া যায়। এক, তিনি অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। দুই, তিনি এমনই কল্যাণ ও সদগুণের অধিকারী যে, তাঁর সম্পর্কে তোমরা যতটুকু অনুমান করবে তার চেয়ে অনেক বেশী তাঁকে পাবে। এমনকি তাঁর কল্যাণের ধারা কোথাও গিয়ে শেষ হয় না। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল ফুরকান, ১ ও ১৯ টীকা) এ দু'টি অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করলে একথা বুঝা যাবে যে, মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় বর্ণনা করার পর فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ বাক্যাংশটি নিছক একটি প্রশংসামূলক বাক্যাংশ হিসেবে বর্ণনা করা হয়নি বরং এটি হচ্ছে যুক্তির পরে যুক্তির উপসংহারও। এর মধ্যে যেন একথাই বলা হচ্ছে যে, যে আল্লাহ একটি মাটির টিলাকে ক্রমোন্নত করে একটি পূর্ণ মানবিক মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন তিনি প্রভুত্বের ব্যাপারে তাঁর সাথে কেউ শরীক হবে এ থেকে অনেক বশী পাক–পবিত্র ও উর্ধে। তিনি এ একই মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারেন, কি পারেন না এরূপ সন্দেহ–সংশয় থেকে অনেক বেশী পাক–পবিত্র। আর তিনি একবারই মানুষ সৃষ্টি করে দেবার পর তাঁর সব নৈপুণ্য খতম হয়ে যায় এবং এরপর তিনি আর কিছুই সৃষ্টি করতে পারেন না, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ ক্ষমতা সম্পর্কে এটা বড়ই নিকৃষ্ট ধারণা।

১৫. মূলে طرائق শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে পথও হয় আবার স্তরও হয়। যদি প্রথম অর্থটি গ্রহণ করা হয় তাহলে সম্ভবত এর অর্থ হবে সাতটি গ্রহের আবর্তন পথ। আর যেহেতু সে যুগে মানুষ সাতটি গ্রহ সম্পর্কেই জানতো তাই সাতটি পথের কথা বলা হয়েছে। এর মানে অবশ্যই এ নয় যে, এগুলো ছাড়া আর কোন পথ নেই। আর যদি দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করা হয় তাহলে سَبْعَ طَرَائِقَ এর অর্থ তাই হবে যা سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا (সাতটি আকাশ স্তরে স্তরে) এর অর্থ হয়। আর এই সংগে যে বলা হয়েছে "তোমাদের ওপর" আমি সাতটি পথ নির্মাণ করেছি, এর একটি সহজ সরল অর্থ হবে তাই যা এর বাহ্যিক শব্দগুলো থেকে বুঝা যায়। আর দ্বিতীয় অর্থটি হবে, তোমাদের চাইতে বড় জিনিস আমি নির্মাণ করেছি এ আকাশ। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ

"আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি করার চাইতে অনেক বড় কাজ।"

(আল মুমিন, ৫৭ আয়াত)

১৬. অন্য একটি অনুবাদ এভাবে করা যেতে পারে, "আর সৃষ্টিকূলের পক্ষ থেকে আমি গাফিল ছিলাম না অথবা নই।" মূল বাক্যে যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ হয় ঃ এসব কিছু যা আমি বানিয়েছি এগুলো এমনি হঠাৎ কোন আনাড়ির হাত দিয়ে আন্দাজে তৈরী হয়ে যায়নি। বরং একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ণ জ্ঞান সহকারে প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আইন সক্রিয় রয়েছে। সমগ্র বিশ্ব–জাহানের ছোট থেকে নিয়ে বড় পর্যন্ত সবকিছুর মধ্যে একটি পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। এ বিশাল কর্ম জগতে ও বিশ্ব–জগতের এ সুবিশাল কারখানায় সব দিকেই একটি উদ্দেশ্যমুখিনতা দেখা যাচ্ছে। এসব স্রষ্টার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রমাণ পেশ করছে। দ্বিতীয় অনুবাদটি গ্রহণ করলে এর অর্থ হবে ঃ এ বিশ্ব–জাহানে আমি যা কিছুই সৃষ্টি করেছি

তাদের কারোর কোন প্রয়োজন থেকে আমি কখনো গাফিল এবং কোন অবস্থা থেকে কখনো বেখবর থাকিনি। কোন জিনিসকে আমি নিজের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তৈরী হতে ও চলতে দেইনি। কোন জিনিসের প্রাকৃতিক প্রয়োজন সরবরাহ করতে আমি কখনো কুণ্ঠিত হইনি। প্রত্যেকটি বিন্দু, বালুকণা ও পত্র-পল্লবের অবস্থা আমি অবগত থেকেছি।

১৭. যদিও এর অর্থ হতে পারে মওসুমী বৃষ্টিপাত কিন্তু আয়াতের শব্দ বিন্যাস সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে অন্য একটি অর্থও এখান থেকে বুঝা যায়। সেটি হচ্ছে, সৃষ্টির সূচনাতেই আল্লাহ একই সংগে এমন পরিমিত পরিমাণ পানি পৃথিবীতে নাযিল করেছিলেন যা তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত এ গ্রহটির প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট ছিল। এ পানি পৃথিবীর নিম্ন ভূমিতে রক্ষিত হয়েছে। এর সাহায্যে সাগর ও মহাসাগরের জন্ম হয়েছে এবং ভূগর্ভেও পানি (Sub-soil water) সৃষ্টি হয়েছে। এখন এ পানিই ঘুরে ফিরে উষ্ণতা, শৈত্য ও বাতাসের মাধ্যমে বর্ষিত হতে থাকে। মেঘমালা, বরফাচ্ছাদিত পাহাড়, সাগর, নদী-নালা ঝরণা ও কুয়া এ পানিই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দিয়ে থাকে। অসংখ্য জিনিসের সৃষ্টি ও উৎপাদনে এরি বিশিষ্ট ভূমিকা দেখা যায়। তারপর এ পানি বায়ুর সাথে মিশে গিয়ে আবার তার মূল ভাণ্ডারের দিকে ফিরে যায়। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পানির এ ভাণ্ডার এক বিন্দুও কমেনি এবং এক বিন্দু বাড়াবারও দরকার হয়নি। এর চাইতেও বেশী আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ছাত্রই একথা জানে যে, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এ দু'টি গ্যাসের সংমিশ্রণে পানির উৎপত্তি হয়েছে। একবার এত বিপুল পরিমাণ পানি তৈরী হয়ে গেছে যে, এর সাহায্যে সমুদ্র ভরে গেছে এবং এখন এর ভাণ্ডারে এক বিন্দুও বাড়ছে না। কে তিনি যিনি এক সময় এ বিপুল পরিমাণ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিয়ে এ অথৈ পানির ভাণ্ডার সৃষ্টি করে দিয়েছেন? আবার কে তিনি যিনি এখন আর এ দু'টি গ্যাসকে সে বিশেষ অনুপাতে মিশতে দেন না যার ফলে পানি উৎপন্ন হয়, অথচ এ দু'টি গ্যাস এখনো দুনিয়ার বুকে মওজুদ রয়েছে? আর পানি যখন বাষ্প হয়ে বাতাসে উড়ে যায় তখন কে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনকে আলাদা হয়ে যাওয়া থেকে বাধা দেয়? নাস্তিক্যবাদীদের কাছে কি এর কোন জবাব আছে? আর যারা পানি ও বাতাস এবং উষ্ণতা ও শৈত্যের পৃথক পৃথক সৃষ্টিকর্তার স্বীকৃতি দিয়েছেন তাদের কাছে কি এর কোন জবাব আছে?

১৮. অর্থাৎ তাকে অদৃশ্য করার কোন একটাই পদ্ধতি নেই। অসংখ্য পদ্ধতিতে তাকে অদৃশ্য করা সম্ভব। এর মধ্য থেকে যে কোনটিকে আমরা যখনই চাই ব্যবহার করে তোমাদেরকে জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ উপকরণটি থেকে বঞ্চিত করতে পারি। এভাবে এ আয়াতটি সূরা মুল্‌কের আয়াতটি থেকে ব্যাপকতর অর্থ বহন করে যেখানে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ

"তাদেরকে বলো, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, যমীন যদি তোমাদের এ পানিকে নিজের ভেতরে শুষে নেয়, তাহলে কে তোমাদেরকে বহমান ঝরণাধারা এনে দেবে।"

فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَٰكِهُ
كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنۢبُتُ
بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْءَاكِلِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَٰمِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم
مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا
وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

তারপর এ পানির মাধ্যমে আমি তোমাদের জন্য খেজুর ও আংগুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্যই এ বাগানগুলোয় রয়েছে প্রচুর সুস্বাদু ফল[১৯] এবং সেগুলো থেকে তোমরা জীবিকা লাভ করে থাকো।[২০] আর সিনাই পাহাড়ে যে গাছ জন্মায় তাও আমি সৃষ্টি করেছি[২১] তা তেল উৎপন্ন করে এবং আহারকারীদের জন্য তরকারীও।

আর প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য গবাদি পশুদের মধ্যেও একটি শিক্ষা রয়েছে। তাদের পেটের মধ্যে যাকিছু আছে তা থেকে একটি জিনিস আমি তোমাদের পান করাই[২২] এবং তোমাদের জন্যে তাদের মধ্যে আরো অনেক উপকারিতাও আছে, তাদেরকে তোমরা খেয়ে থাকো এবং তাদের ওপর ও নৌযানে আরোহণও করে থাকো।[২৩]

১৯. অর্থাৎ খেজুর ও আংগুর ছাড়াও আরো নানান ধরনের ফল–ফলাদি।

২০. অর্থাৎ এসব বাগানের উৎপন্ন দ্রব্যাদি, ফল, শস্য, কাঠ এবং অন্যান্য যেসব দ্রব্য তোমরা বিভিন্নভাবে সংগ্রহ করো, এসব থেকে তোমরা নিজেদের জন্য জীবিকা আহরণ করো। مِنْهَا تَأْكُلُونَ (যেগুলো থেকে তোমরা খাও) এর মধ্যে যে "যেগুলো" শব্দটি রয়েছে এটির মাধ্যমে বাগানগুলো বুঝানো হয়েছে, ফল–ফলাদি নয়। আর تَأْكُلُونَ মানে শুধু এই নয় যে, এ বাগানগুলোর ফল তোমরা খাও বরং এ শব্দটি সামগ্রিকভাবে জীবিকা অর্জন করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আমরা বলি, অমুক ব্যক্তি নিজের অমুক কাজের ভাত খাচ্ছে, ঠিক তেমনি আরবী ভাষায়ও বলা হয় فلان ياكل من حرفته (অমুক ব্যক্তি তার শিল্পকর্ম থেকে খাচ্ছে অর্থাৎ তার শিল্পকর্ম থেকে জীবিকা অর্জন করছে)।

২১. এখানে জয়তুনের কথা বলা হয়েছে। ভূমধ্যসাগরের আশপাশের এলাকার উৎপন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। এ গাছগুলো দেড় হাজার দু'হাজার বছর বাঁচে। এমনকি ফিলিস্তিনের কোন কোন গাছের দৈর্ঘ, স্থূলতা ও বিস্তার দেখে অনুমান করা হয়

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ
إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ
مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۖ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً ۖ مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ إِنْ
هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾

২ রুকূ'

আমি নূহকে পাঠালাম তার সম্প্রদায়ের কাছে।[২৪] সে বললো, "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আল্লাহর বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মাবূদ নেই, তোমরা কি ভয় করো না?[২৫] তার সম্প্রদায়ের যেসব সরদার তার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করলো তারা বলতে লাগলো, "এ ব্যক্তি আর কিছুই নয় কিন্তু তোমাদেরই মতো একজন মানুষ।[২৬] এর লক্ষ হচ্ছে তোমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা।[২৭] আল্লাহ পাঠাতে চাইলে ফেরেশতা পাঠাতেন।[২৭(ক)] একথা তো আমরা আমাদের বাপদাদাদের আমলে কখনো শুনিনি (যে, মানুষ রসূল হয়ে আসে)। কিছুই নয়, শুধুমাত্র এ লোকটিকে একটু পাগলামিতে পেয়ে বসেছে; কিছু দিন আরো দেখে নাও (হয়তো পাগলামি ছেড়ে যাবে)।"

যে, সেগুলো হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের যুগ থেকে এখনো চলে আসছে। সিনাই পাহাড়ের সাথে একে সম্পর্কিত করার কারণ সম্ভবত এই যে, সিনাই পাহাড় এলাকার সবচেয়ে পরিচিত ও উল্লেখযোগ্য স্থানই এর আসল স্বদেশ ভূমি।

২২. অর্থাৎ দুধ। এ সম্পর্কে কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, রক্ত ও গোবরের মাঝখানে এটি আর একটি তৃতীয় জিনিস। পশুর খাদ্য থেকে এটি সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

২৩. গবাদি পশু ও নৌযানকে একত্রে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, আরববাসীরা আরোহণ ও বোঝা বহন উভয় কাজের জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উট ব্যবহার করতো এবং উটের জন্য "স্থল পথের জাহাজ" উপমাটি অনেক পুরানো। জাহেলী যুগের কবি যুররুম্মাহ বলেন ঃ

سفينة بر تحت خدى زمامها

"স্থলপথের জাহাজ চলে আমার গণ্ডদেশের নিচে তার লাগামটি।"

২৪. তুলনামূলক আলোচনার জন্য দেখুন আল আ'রাফের ৫৯ থেকে ৬৪; ইউনুসের ৭১ থেকে ৭৩; হূদের ২৫ থেকে ৪৮; বনী ইসরাঈলের ৩ এবং আল আম্বিয়ার ৭৬-৭৭ আয়াত।

২৫. অর্থাৎ নিজেদের আসল ও যথার্থ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের বন্দেগী করতে তোমাদের ভয় লাগে না? যিনি তোমাদের ও সারা জাহানের মালিক, প্রভু ও শাসক তাঁর রাজ্যে বাস করে তাঁর পরিবর্তে অন্যদের বন্দেগী ও আনুগত্য করার এবং অন্যদের সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব স্বীকার করে নেবার ফলাফল কি হবে সে ব্যাপারে কি তোমাদের একটুও ভয় নেই?

২৬. মানুষ নবী হতে পারে না এবং নবী মানুষ হতে পারে না, এ চিন্তাটি সর্বকালের পথভ্রষ্ট লোকদের একটি সম্মিলিত ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। কুরআন বারবার এ জাহেলী ধারণাটির উল্লেখ করে এর প্রতিবাদ করেছে এবং পুরোপুরি জোর দিয়ে একথা বর্ণনা করেছে যে, সকল নবীই মানুষ ছিলেন এবং মানুষদের জন্য মানুষেরই নবী হওয়া উচিত। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আল আ'রাফ, ৬৩-৬৯; ইউনুস, ২; হূদ, ২৭-৩১; ইউসুফ, ১০৯; আর রা'দ, ৩৮; ইবরাহীম, ১০-১১; আন নাম্‌ল, ৪৩; বনী ইসরাঈল, ৯৪-৯৫; আল কাহাফ, ১১০; আল আম্বিয়া, ৩-৩৪; অল মু'মিনূন, ৩৩-৩৪ ও ৪৭; আল ফুরকান, ৭-২০; আশ্‌শুআরা, ১৫৪-১৮৪; ইয়াসীন, ১৫ ও হা-মীম আস্ সাজ্‌দাহ, ৬ আয়াত এবং এই সংগে টীকাগুলোও।)

২৭. এটাও সত্য বিরোধীদের একটি পুরাতন অস্ত্র। যে কেউ সংস্কারমূলক কাজের কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা করে সংগে সংগেই তার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনা হয়। বলা হয়, এর উদ্দেশ্য শুধু ক্ষমতা দখল করা। এ অভিযোগটিই ফেরাউন হযরত মূসা ও হারূনের বিরুদ্ধে এনেছিল। সে বলেছিল, তোমরা দেশে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করার জন্য এসেছো ঃ (يونس : ٧٨) تكـون لكـما الكبرياء فى الارض এ অভিযোগ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধেও আনা হয়েছিল। বলা হয়েছিল ঃ এ ব্যক্তি ইহুদিদের বাদশাহ হতে চায়। আর কুরাইশ সরদাররাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কেও এ একই সন্দেহ পোষণ করতো। এ জন্য কয়েকবারই তারা তাঁর সাথে এভাবে সওদাবাজী করতে চেয়েছে যে, যদি তুমি কর্তৃত্ব লাভ করতে চাও, তাহলে "বিরোধী" দল ছেড়ে দিয়ে "সরকারী" দলে এসে যাও। তোমাকে আমরা বাদশাহ বানিয়ে নেবো। আসলে যারা সারা জীবন দুনিয়া ও তার বৈষয়িক স্বার্থ এবং তার গৌরব ও বাহ্যিক চাকচিক্য লাভ করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকে তাদের পক্ষে একথা কল্পনা করা কঠিন বরং অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় যে, এ দুনিয়ায় এমন কোন মানুষ থাকতে পারে যে সদুদ্দেশ্যে ও নিস্বার্থপরতার সাথে মানবতার কল্যাণার্থেও নিজের প্রাণপাত করতে পারে। তারা নিজেরাই যেহেতু নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য প্রতিদিন হৃদয়গ্রাহী শ্লোগান ও সংস্কারের মিথ্যা দাবী পেশ করতে থাকে তাই এ প্রতারণা ও জালিয়াতী তাদের দৃষ্টিতে হয় একেবারেই একটি স্বাভাবিক জিনিস। তারা মনে করে সংস্কার কথাটা প্রতারণা ও

জালিয়াতি ছাড়া কিছু নয়। সততা ও আন্তরিকতার সাথে কখনো সংস্কারমূলক কোন কাজ করা যেতে পারে না। যে ব্যক্তিই এ নামটি উচ্চারণ করে সে নিশ্চয়ই তাদেরই মত ধোঁকাবাজ। আর মজার ব্যাপার হচ্ছে, সংস্কারকদের বিরুদ্ধে "ক্ষমতা লোভের" এ অপবাদ চিরকাল ক্ষমতাসীন লোকেরা ও তাদের তোষামোদী গোষ্ঠীই লাগিয়ে এসেছে। অর্থাৎ তারা যেন একথা বলতে চায় যে, তারা নিজেরা ও তাদের মহান প্রভুরা যে ক্ষমতা লাভ করেছে তা যেন তাদের জন্মগত অধিকার। তা অর্জন করার ও তা দখল করে রাখার জন্য তারা কোনক্রমে অভিযুক্ত হতে পারে না। তবে এ "খাদ্যে" যাদের জন্মগত অধিকার ছিল না এবং এখন যারা নিজেদের মধ্যে এর "ক্ষুধা" অনুভব করছে তারা চরমভাবে নিন্দাবাদ লাভের যোগ্য। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য ৩৬ টীকা দেখুন)।

এখানে একথাটিও ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, প্রচলিত জীবন ব্যবস্থার দোষ ত্রুটিগুলো দূর করার জন্য যে ব্যক্তিই অগ্রসর হবে এবং এর মোকাবিলায় সংস্কারমূলক মতাদর্শ ও ব্যবস্থা পেশ করবে তার জন্য অবশ্যই সংস্কারের পথে যেসব শক্তিই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে তাদেরকে সরিয়ে দেবার জন্য প্রচেষ্টা চালানো এবং যেসব শক্তি সংস্কারমূলক মতাদর্শ ও ব্যবস্থাকে কার্যত প্রবর্তিত করতে পারবে তাদেরকে ক্ষমতাসীন করা অপরিহার্য হয়ে পড়বে। তাছাড়া এ ধরনের লোকের দাওয়াত যখনই সফল হবে, তার স্বাভাবিক পরিণতিতে সে জনগণের ইমাম ও নেতায় পরিণত হবে এবং নতুন ব্যবস্থায় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের চাবিকাঠি হয় তার নিজের হাতে থাকবে নয়তো তার সমর্থক ও অনুসারীরা জনগণের ওপর কর্তৃত্বশীল হবে। দুনিয়ায় এমন কোন্ নবী ও সংস্কারক ছিলেন যিনি নিজের দাওয়াতকে কার্যত প্রতিষ্ঠিত করা যার প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল না? আর এমন কে আছেন যার দাওয়াতের সাফল্য তাঁকে যথার্থই নেতায় পরিণত করেনি? তারপর এ বিষয়টি কি সত্যিই কারোর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উত্থাপন করার জন্য যথেষ্ট যে, সে আসলে ক্ষমতালোভী ছিল এবং তার আসল উদ্দেশ্য ছিল নেতৃত্ব লাভ এবং তা সে অর্জন করেছিল? অসৎ প্রকৃতির সত্যের দুশমনরা ছাড়া কেউ এ প্রশ্নের জবাবে হাঁ বলবে না। আসলে ক্ষমতার জন্যই ক্ষমতা কাংখিত হওয়া এবং কোন সৎ উদ্দেশ্যে ক্ষমতা কাংখিত হওয়ার মধ্যে রয়েছে যমীন আসমান ফারাক। এটা এত বড় ফারাক যেমন ফারাক আছে ডাক্তারের ছুরি ও ডাকাতের ছুরির মধ্যে। ডাক্তার ও ডাকাত উভয়ই ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষের পেটে ছুরি চালায় এবং এর ফলে অর্থ লাভ করে যদি কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র এ কারণে উভয়কে একাকার করে ফেলে তাহলে এটা হবে নিছক তার নিজেরই চিন্তা বা মনের ভুল। নয়তো উভয়ের নিয়ত, কর্মপদ্ধতি ও সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে এত বেশী পার্থক্য থাকে যে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ডাকাতকে ডাক্তার এবং ডাক্তারকে ডাকাত মনে করার মতো ভুল করতে পারে না।

২৭(ক). নূহের সম্প্রদায় আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না এবং তারা একথাও অস্বীকার করতো না যে, তিনিই বিশ্ব-জাহানের প্রভু এবং সমস্ত ফেরেশতা তাঁর নির্দেশের অনুগত, এ বক্তব্য তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। শিরক বা আল্লাহকে অস্বীকার করা এ জাতির আসল ভ্রষ্টতা ছিল না বরং তারা আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতা এবং তাঁর অধিকারে অন্যকে শরীক করতো।

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ
الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۙ فَاسْلُكْ
فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ
مِنْهُمْ ۚ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٤٠﴾

নূহ বললো, "হে পরওয়ারদিগার! এরা যে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে এ জন্য তুমিই আমাকে সাহায্য করো।"[২৮] আমি তার কাছে অহী করলাম, "আমার তত্ত্বাবধানে এবং আমার অহী মোতাবেক নৌকা তৈরী করো। তারপর যখন আমার হুকুম এসে যাবে এবং চুলা উথলে উঠবে[২৯] তখন তুমি সব ধরনের প্রাণীদের এক একটি জোড়া নিয়ে এতে আরোহণ করো এবং পরিবার পরিজনদেরকেও সংগে নাও, তাদের ছাড়া যাদের বিরুদ্ধে আগেই ফায়সালা হয়ে গেছে এবং জালেমদের ব্যাপারে আমাকে কিছুই বলো না, তারা এখন ডুবতে যাচ্ছে।

২৮. অর্থাৎ আমার প্রতি এভাবে মিথ্যা আরোপ করার প্রতিশোধ নাও। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (القمر : ١٠)

"কাজেই নূহ নিজের রবকে ডেকে বললো ঃ আমাকে দমিত করা হয়েছে, এখন তুমিই এর বদলা নাও।" (আল কামার, ১০)

সূরা নূহে বলা হয়েছে ঃ

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ○ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ
يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

"আর নূহ বললো ঃ হে আমার পরওয়ারদিগার! এ পৃথিবীতে কাফেরদের মধ্য থেকে একজন অধিবাসীকেও ছেড়ে দিও না। যদি তুমি তাদেরকে থাকতে দাও তাহলে তারা তোমার বান্দাদেরকে গোমরাহ করে দেবে এবং তাদের বংশ থেকে কেবল দুষ্কৃতকারী ও সত্য অস্বীকারকারীরই জন্ম হবে।" (২৭ আয়াত)

২৯. কেউ কেউ تنور (তান্নূর) বলতে ভূমি বুঝেছেন। কেউ এর অর্থ করেছেন ভূমির উচ্চতম অংশ। কেউ বলেছেন, فَارَ التَّنُّور মানে হচ্ছে প্রভাতের উদয়। আবার কারোর মতে এটি حمى الوطيس এর মতো একটি উপমা, যার মানে হয় "পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে যাওয়া।" কিন্তু বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করার পথে যখন কোন বাধা নেই তখন কুরআনের

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي
نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ ﴿٢٨﴾ وَقُلْ رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا
وَّأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰتٍ وَّإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾
ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٣١﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ
أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾

তারপর যখন তুমি নিজের সাথীদের নিয়ে নৌকায় আরোহণ করবে তখন বলবে, আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন জালেমদের হাত থেকে।[৩০] আর বলো, হে পরওয়ারদিগার! আমাকে নামিয়ে দাও বরকতপূর্ণ স্থানে এবং তুমি সর্বোত্তম স্থান দানকারী।"[৩১]

এ কাহিনীতে বিরাট নিদর্শনাবলী রয়েছে,[৩২] আর পরীক্ষা তো আমি করেই থাকি।[৩৩]

তাদের পরে আমি অন্য এক যুগের জাতির উত্থান ঘটালাম।[৩৪] তারপর তাদের মধ্যে স্বয়ং তাদের সম্প্রদায়ের একজন রসূল পাঠালাম (যে তাদেরকে দাওয়াত দিল এ মর্মে যে,) আল্লাহর বন্দেগী করো, তোমাদের জন্য তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তোমরা কি ভয় করো না?

শব্দাবলীর কোন প্রকার সম্বন্ধ–সামঞ্জস্য ছাড়াই পরোক্ষ অর্থে গ্রহণ করার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যায় না। এ শব্দাবলী পড়ার পর প্রথমে মনের মধ্যে যে অর্থটির উদয় হয় তা হচ্ছে এই যে, কোন বিশেষ চুলা পূর্ব থেকেই এভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল যে, তার নিম্নদেশ ফেটে পানি উথলে ওঠার মাধ্যমে প্লাবনের সূচনা হবে। অন্য কোন অর্থের কথা চিন্তা করার প্রয়োজন তখনই আসে যখন এত বড় প্লাবন একটি চুলার নিচে থেকে পানি উথলে ওঠার মাধ্যমে শুরু হয়ে থাকবে বলে মানুষ মেনে নিতে রাজি না হয়। কিন্তু আল্লাহর কর্মকাণ্ড বড়ই অদ্ভুত। তিনি যখন কোন জাতিকে ধ্বংস করেন তখন এমন পথে করেন যার কোন কল্পনাই সে করতে পারে না।

৩০. কোন জাতির ধ্বংসের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার হুকুম দেয়া তার চরম অসদাচার, লাম্পট্য ও দুশ্চরিত্রতার প্রমাণ।

৩১. নামিয়ে দেয়া মানে নিছক নামিয়ে দেয়া নয় বরং আরবী প্রবাদ অনুযায়ী এর মধ্যে "আপ্যায়নের" অর্থও রয়েছে। অন্য কথায় এ দোয়ার অর্থ হচ্ছে, হে আল্লাহ! এখন আমরা তোমার মেহমান এবং তুমিই আমাদের আপ্যায়নকারী মেজবান।

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ
وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ
مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا
مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ﴿٣٤﴾ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ
تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾
إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾

৩ রুকূ'

তার সম্প্রদায়ের যেসব সরদার ঈমান আনতে অস্বীকার করেছিল এবং আখেরাতের সাক্ষাতকারকে মিথ্যা বলেছিল, যাদেরকে আমি দুনিয়ার জীবনে প্রাচুর্য দান করেছিলাম,[৩৫] তারা বলতে লাগলো, "এ ব্যক্তি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা যা কিছু খাও তা-ই সে খায় এবং তোমরা যা কিছু পান করো তা-ই সে পান করে। এখন যদি তোমরা নিজেদেরই মতো একজন মানুষের আনুগত্য করো তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৩৬] সে কি তোমাদেরকে একথা জানায় যে, যখন তোমরা সবার পরে মাটিতে মিশে যাবে এবং হাড়গোড়ে পরিণত হবে তখন তোমাদেরকে (কবর থেকে) বের করা হবে? অসম্ভব, তোমাদের সাথে এই যে অংগীকার করা হচ্ছে এটা একেবারেই অসম্ভব। জীবন কিছুই নয়, ব্যস এ পার্থিব জীবনটি ছাড়া; এখানেই আমরা মরি-বাঁচি এবং আমাদের কখ্খনো পুনরুজ্জীবিত করা হবে না।

৩২. অর্থাৎ এর মধ্যে রয়েছে গ্রহণযোগ্য শিক্ষা। এ শিক্ষা হচ্ছে ঃ তাওহীদের দাওয়াত দানকারী নবীগণ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং শিরকপন্থী কাফেররা ছিল মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর আজ মক্কায় সে একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যা এক সময় ছিল হযরত নূহ ও তার জাতির মধ্যে। এর পরিণামও তার চেয়ে কিছু ভিন্ন হবার নয়। আল্লাহর ফায়সালায় যতই বিলম্ব হোক না কেন একদিন অবশ্যই তা হয়েই যায় এবং অনিবার্যভাবে তা হয় সত্যপন্থীদের পক্ষে এবং মিথ্যাপন্থীদের বিপক্ষে।

৩৩. এর অন্য একটি অনুবাদ এও হতে পারে, "পরীক্ষা তো আমি করতেই চেয়েছিলাম" অথবা "পরীক্ষা তো আমাকে করতেই হবে"। তিনটি অবস্থায়ই এ সত্যটি অবগত করানোই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ কোন জাতিকেই নিজের রাজ্যে নিজের অসংখ্য

জিনিসের ওপর কর্তৃত্ব দান করে এমনিই তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দেন না। বরং তাকে পরীক্ষা করেন এবং নিজের কর্তৃত্ব ক্ষমতাকে সে কিভাবে ব্যবহার করছে তা দেখতে থাকেন। নূহের জাতির সাথে যা কিছু ঘটেছে এ নিয়ম অনুযায়ীই ঘটেছে এবং অন্য কোন জাতিই আল্লাহর এত প্রিয় নয় যে, লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাণ্ডার থেকে নিজের ইচ্ছে মতো নেবার জন্য তাকে অবাধ স্বাধীনতা দিবেন। এ ব্যাপারে অবশ্যই সবার সাথে একই ব্যবহার করা হয়।

৩৪. কেউ কেউ এখানে সামূদ জাতির কথা বলা হয়েছে বলে মনে করেছেন। কারণ সামনের দিকে গিয়ে বলা হচ্ছে ঃ এ জাতিকে "সাইহাহ" তথা প্রচণ্ড আওয়াজের আযাবে ধ্বংস করা হয়েছিল এবং কুরআনের অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে, সামূদ এমন একটি জাতি যার ওপর এ আযাব এসেছিল। (হূদ, ৬৭; আল হিজ্‌র, ৮৩ ও আল কামার, ৩১) অন্য কিছু মুফাস্‌সির বলেছেন, এখানে আসলে আদ জাতির কথা বলা হয়েছে। কারণ কুরআনের দৃষ্টিতে নূহের জাতির পরে এ জাতিটিকেই বৃহৎ শক্তিধর করে সৃষ্টি করা হয়েছিল। বলা হয়েছে ঃ

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ (اعراف : ٦٩)

এ দ্বিতীয় কথাটিই সঠিক বলে মনে হচ্ছে। কারণ "নূহের জাতির পরে" শব্দাবলী এ দিকেই ইংগিত করে। আর "সাইহাহ" (প্রচণ্ড আওয়াজ, চিৎকার, শোরগোল, মহাগোলযোগ) এর সাথে যে সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়েছে নিছক এতটুকু সম্বন্ধই এ জাতিকে সামূদ গণ্য করার জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ এ শব্দটি সাধারণ ধ্বংস ও মৃত্যুর জন্য দায়ী বিকট ধ্বনির জন্য যেমন ব্যবহার হয় তেমনি ধ্বংসের কারণ যাই হোক না কেন ধ্বংসের সময় যে শোরগোল ও মহা গোলযোগের সৃষ্টি হয় তার জন্যও ব্যবহার হয়।

৩৫. এখানে বর্ণিত চারিত্রিক বৈশিষ্টগুলো ভেবে দেখার মতো। নবীর বিরোধিতায় যারা এগিয়ে এসেছিল। তারা ছিল জাতির নেতৃস্থানীয় লোক। তাদের সবার মধ্যে যে ভ্রষ্টতা একযোগে কাজ করছিল তা ছিল এই যে, তারা পরকাল অস্বীকার করতো। তাই তাদের মনে আল্লাহর সামনে কোন জবাবদিহি করার আশংকা ছিল না। আর এ জন্যই দুনিয়ার এ জীবনটাই ছিল তাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং "বৈষয়িক কল্যাণ ও সাফল্যের" উর্ধে অন্য কোন মূল্যবোধের স্বীকৃতি তাদের কাছে ছিল না। আবার যে জিনিসটি তাদেরকে এ ভ্রষ্টতার মধ্যে একেবারেই নিমজ্জিত করে দিয়েছিল তা ছিল এমন পর্যায়ের প্রাচুর্য ও সুখ-সম্ভোগ যাকে তারা নিজেদের সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবার প্রমাণ মনে করতো। এ সংগে তারা একথাও মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না যে, যে আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক ব্যবস্থা ও জীবনধারার ভিত্তিতে অগ্রসর হয়ে তারা দুনিয়ায় এসব সাফল্য অর্জন করেছে তা ভুলও হতে পারে। মানুষের ইতিহাস বারবার এ সত্যটির পুনরাবৃত্তি করে চলেছে যে, সত্যের দাওয়াতের বিরোধিতাকারীদের দলে সবসময় এ তিন ধরনের বৈশিষ্টের অধিকারী লোকরাই আসে আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কায় তাঁর সংস্কার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এটিই ছিল সেখানকার পরিস্থিতি।

৩৬. কেউ কেউ ভুল বুঝেছেন যে, তারা নিজেদের মধ্যে এসব কথা বলাবলি করতো। না, বরং সাধারণ লোকদেরকে সম্বোধন করে তারা একথা বলতো। জাতির সরদাররা যখন

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ۢ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾
قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ
نَادِمِينَ ﴿٤٠﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ۚ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٤٢﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ
أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿٤٣﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ۖ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً
رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ۚ فَبُعْدًا
لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٤﴾

এ ব্যক্তি আল্লাহর নামে নিছক মিথ্যা তৈরী করছে৩৬(ক) এবং আমরা কখনো তার কথা মেনে নিতে প্রস্তুত নই।" রসূল বললো, "হে আমার রব! এ লোকেরা যে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো এ ব্যাপারে এখন তুমিই আমাকে সাহায্য করো।" জবাবে বলা হলো, "অচিরেই তারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করবে।" শেষ পর্যন্ত যথাযথ সত্য অনুযায়ী একটি মহা গোলযোগ তাদেরকে ধরে ফেললো এবং আমি তাদেরকে কাদা৩৭ বানিয়ে নিক্ষেপ করলাম—দূর হয়ে যাও জালেম জাতি।

তারপর আমি তাদের পরে অন্য জাতিদের উঠিয়েছি। কোন জাতি তার সময়ের পূর্বে শেষ হয়নি এবং তার পরে টিকে থাকতে পারেনি। তারপর আমি একের পর এক নিজের রসূল পাঠিয়েছি। যে জাতির কাছেই তার রসূল এসেছে সে-ই তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে, আর আমি একের পর এক জাতিকে ধ্বংস করে গেছি এমনকি তাদেরকে স্রেফ কাহিনীই বানিয়ে ছেড়েছি, —অভিসম্পাত তাদের প্রতি যারা ঈমান আনে না।৩৮

আশংকা করলো, জনগণ নবীর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব এবং হৃদয়গ্রাহী কথায় প্রভাবিত হয়ে যাবে এবং তাদের প্রভাবিত হয়ে যাবার পর আমাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আর কাদের ওপর চলবে তখন তারা নিজেদের বক্তৃতার মাধ্যমে এসব কথা জনগণের সামনে তুলে ধরে তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে থাকলো। ওপরে নূহের জাতির আলোচনায় যে কথা বলা হয়েছিল এটি তারই দ্বিতীয় একটি দিক। তারা বলতো, আল্লাহর পক্ষ থেকে এসব নবুয়ত টবুয়ত কিছুই দেয়া হয়নি এটা হচ্ছে আসলে ক্ষমতা লিপ্সা, এরি মোহে অন্ধ হয়ে এ ব্যক্তি এসব আবোল তাবোল বলছে। তারা বলে ঃ ভাইসব! একটু ভেবে দেখো, এ ব্যক্তি কোন্ ব্যাপারে

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٤٥﴾ إِلَىٰ
فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ
لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ﴿٤٧﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا
مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٤٨﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾
وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ
وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾

তারপর আমি মূসা ও তার ভাই হারূনকে নিজের নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণ[৩৯] সহকারে ফেরাউন ও তার রাজ পারিষদদের কাছে পাঠালাম। কিন্তু তারা অহংকার করলো এবং তারা ছিল বড়ই আফালনকারী।[৪০] তারা বলতে লাগলো, "আমরা কি আমাদেরই মতো দু'জন লোকের প্রতি ঈমান আনবো?[৪০(ক)] আর তারা আবার এমন লোক যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাস।"[৪১] কাজেই তারা উভয়কে প্রত্যাখ্যান করলো এবং ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে শামিল হলো।[৪২] আর মূসাকে আমি কিতাব দান করেছি যাতে লোকেরা তার সাহায্যে পথের দিশা পায়।

আর মারয়াম পুত্র ও তার মাকে আমি একটি নিদর্শনে পরিণত করেছিলাম[৪৩] এবং তাদেরকে রেখেছিলাম একটি সুউচ্চ ভূমিতে, সে স্থানটি ছিল নিরাপদ এবং সেখানে স্রোতস্বিনী প্রবহমান ছিল।[৪৪]

তোমাদের থেকে আলাদা? তোমাদের শরীর যেমন রক্ত-মাংসের তারও তাই। তোমাদের ও তার মধ্যে কোন ফারাক নেই। তাহলে কেন সে বড় হবে এবং তোমরা তার ফরমানের আনুগত্য করবে? তাদের এসব ভাষণের মধ্যে যেন একথা নির্বিবাদে স্বীকৃত ছিল যে, তারা যে তাদের নেতা এ নেতৃত্ব তো তাদের লাভ করারই কথা, তাদের শরীরের রক্ত মাংস ও তাদের পানাহারের ধরন ধারণের প্রতি দৃষ্টি দেবার প্রশ্নই দেখা দেয় না, তাদের নেতৃত্ব আলোচ্য বিষয় নয়। কারণ এটা তো আপনা আপনিই প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বজন স্বীকৃত বিষয়। আসলে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এ নতুন নেতৃত্ব, যা এখন প্রতিষ্ঠা লাভের পথে। এভাবে তাদের কথাগুলো নূহের জাতির নেতাদের কথা থেকে কিছু বেশী ভিন্নতর ছিল না। তাদের মতে কোন নতুন আগমনকারীর মধ্যে যে "ক্ষমতা লিপ্সা" অনুভূত হয় অথবা তার মধ্যে এ লিপ্সা থাকার যে সন্দেহ পোষণ করা যেতে পারে সেটিই হচ্ছে নিন্দনীয় ও অপবাদযোগ্য। আর নিজেদের ব্যাপারে তারা মনে করতো যে, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা তাদের

প্রকৃতিগত অধিকার, এ অধিকারের ক্ষেত্রে তারা সীমা ছাড়িয়ে গেলেও তা কোন ক্রমেই নিন্দনীয় ও আপত্তিকর হবার কথা নয়।

৩৬(ক). এ শব্দগুলোর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর অস্তিত্বকে তারাও অস্বীকার করতো না। তাদেরও আসল ভ্রষ্টতা ছিল শিরক। কুরআনের অন্যান্য স্থানেও এ জাতির এ অপরাধই বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন দেখুন আল আ'রাফ, ৭: হূদ, ৫৩–৫৪; হা–মীম আস্‌সাজদাহ, ১৪ এবং আল আহকাফ, ২১–২২ আয়াত।

৩৭. মূলে غُثَاءً শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হয় বন্যার তোড়ে ভেসে আসা ময়লা আবর্জনা, যা পরবর্তী পর্যায়ে কিনারায় আটকে পড়ে পচে যেতে থাকে।

৩৮. অন্য কথায় যারা নবীদের কথা মানে না।

৩৯. নিদর্শনের পরে "সুস্পষ্ট প্রমাণ" বলার অর্থ এও হতে পারে যে, ঐ নিদর্শনাবলী তাঁদের সাথে থাকাটাই একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিল যে, তাঁরা আল্লাহর প্রেরিত পয়গম্বর। অথবা নিদর্শনাবলী বলতে বুঝানো হয়েছে "লাঠি" ছাড়া মিসরে অন্যান্য যেসব মু'জিযা দেখানো হয়েছে সেগুলো সবই, আর "সুস্পষ্ট প্রমাণ" বলতে "লাঠি" বুঝানো হয়েছে। কারণ এর মাধ্যমে যে মু'জিযার প্রকাশ ঘটেছে সেগুলোর পরে তো একথা একেবারেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, এরা দু'ভাই আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত হয়েছেন, (বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা আয যুখরুফ, ৪৩–৪৪ টীকা দেখুন)।

৪০. মূলে وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, তারা ছিল বড়ই আত্মম্ভরী, জালেম ও কঠোর। দুই, তারা নিজেদেরকে অনেক বড় মনে করতো এবং উদ্ধত আস্ফালন করতো।

৪০(ক). ব্যাখ্যার জন্য ২৬ টীকা দেখুন।

৪১. আরবী ভাষায় কারো "ফরমানের অনুগত" হওয়া এবং "তার ইবাদাতগুজার" হওয়া প্রায় একই অর্থে ব্যবহার হয়। যে ব্যক্তি কারোর বন্দেগী–দাসত্ব ও আনুগত্য করে সে যেন তার ইবাদাত করে। এ থেকে "ইবাদাত" শব্দটির অর্থের ওপর এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাঁর ছাড়া বাকি সবার ইবাদাত পরিত্যাগ করার যে আদেশ নবীগণ তাদের দাওয়াতের মধ্যে দিতেন তার পূর্ণ অর্থ কি ছিল তার ওপর বড়ই গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত হয়। তাঁদের কাছে "ইবাদাত" নিছক "পূজা অনুষ্ঠান" ছিল না। তাঁরা এ দাওয়াত দেননি যে, আল্লাহকে কেবল পূজা করো এবং এরপর যাকে ইচ্ছা তার বন্দেগী, দাসত্ব ও আনুগত্য করতে থাকো। বরং তাঁরা মানুষকে আল্লাহর পূজারী করতে চাইতেন এবং একই সংগে তাঁর ফরমানের অনুগতও। আর এ উভয় অর্থের দৃষ্টিতে অন্য কারো ইবাদাত করাকে পথভ্রষ্টতা গণ্য করতেন। (আরো বেশী জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন, আল কাহফ, ৫০ টীকা দেখুন)।

৪২. মূসা ও ফেরাউনের কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য পড়ুন সূরা আল বাকারাহ, ৪৯–৫০; আল আ'রাফ, ১০৩ থেকে ১৩৬; ইউনুস, ৭৫ থেকে ৯২; হূদ, ৯৬ থেকে ৯৯; বনী ইসরাঈল, ১০১ থেকে ১০৪ এবং ত্বা–হা, ৯ থেকে ৮০ আয়াত।

৪৩. একথা বলা হয়নি যে, মারয়াম পুত্র একটি নিদর্শন ছিল এবং স্বয়ং মারয়াম একটি নিদর্শন ছিল। আবার একথাও বলা হয়নি যে, মারয়াম পুত্র ও তার মাকে দু'টি

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ ﴿٥٢﴾
فَتَقَطَّعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾

৪ রুকূ'

হে রসূল!৪৫ পাক-পবিত্র জিনিস খাও এবং সৎকাজ করো।৪৬ তোমরা যা কিছুই করো না কেন আমি তা ভালোভাবেই জানি। আর তোমাদের এ উম্মত হচ্ছে একই উম্মত এবং আমি তোমাদের রব, কাজেই আমাকেই তোমরা ভয় করো।৪৭

কিন্তু পরে লোকেরা নিজেদের দীনকে পরস্পরের মধ্যে টুকরো টুকরো করে নিয়েছে। প্রত্যেক দলের কাছে যা কিছু আছে তার মধ্যেই তারা নিমগ্ন হয়ে গেছে।৪৮

নিদর্শনে পরিণত করেছিলাম। বরং বলা হয়েছে, তাদের দু'জনকে মিলিয়ে একটি নিদর্শনে পরিণত করা হয়েছিল। এর অর্থ এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, পিতা ছাড়া ইবনে মারয়ামের জন্ম হওয়া এবং স্বামীর সাহচর্য ছাড়া মারয়ামের গর্ভধারণ করাই এমন একটি জিনিস যা তাদের দু'জনকে একটি নিদর্শনে পরিণত করে দেয়। যারা পিতা ছাড়া হযরত ঈসার জন্ম অস্বীকার করে তারা মাতা ও পুত্রের একটি নিদর্শন হবার কি ব্যাখ্যা দেবেন? (আরো বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৪৪-৫৩; আন নিসা, ১৯০, ২১২, ২১৩; মারয়াম, ১৫ থেকে ২২ এবং আল আম্বিয়া, ৮৯-৯০ টীকা দেখুন) এখানে দু'টি কথা আরো ব্যাখ্যা যোগ্য। এক, হযরত ঈসা ও তাঁর মাতার ব্যাপারটি মূর্খ লোকদের আর একটি দুর্বলতা চিহ্নিত করছে। ওপরে যে সকল নবীর কথা আলোচনা করা হয়েছে তাদের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারটি তো এ বলে অস্বীকার করা হয়েছে যে, তোমরা তো মানুষ আর মানুষ কি কখনো নবী হতে পারে? কিন্তু লোকেরা যখন হযরত ঈসার ও তাঁর মায়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো এবং তাদের ভক্ত হয়ে গেলো তখন তাদেরকে মানুষের মর্যাদা থেকে উঠিয়ে নিয়ে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিল। দুই, যারা হযরত ঈসার অলৌকিক জন্ম এবং দোলনায় শায়িত অবস্থায় তাঁর ভাষণ শুনে তাঁর মুজিযা হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখে নেয়া সত্ত্বেও ঈমান আনতে অস্বীকার করেছিল এবং হযরত মারয়ামকে অপবাদ দিয়েছিল তাদেরকে এমন শাস্তি দেয়া হয়েছিল যা সমগ্র দুনিয়াবাসীর জন্য চিরকালীন শিক্ষণীয় হয়ে রয়েছে।

৪৪. বিভিন্ন জন এ থেকে বিভিন্ন স্থানের কথা মনে করেছেন। কেউ বলেন, এ স্থানটি ছিল দামেশ্‌ক। কেউ বলেন, আররমলাহ। কেউ বলেন, বাইতুল মাক্‌দিস আবার কেউ বলেন মিসর। খৃষ্টীয় বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মারয়াম হযরত ঈসার জন্মের পর তাঁর

হেফাজতের জন্য দু'বার স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। প্রথমবার বাদশাহ হিরোডিয়াসের আমলে তিনি তাকে মিসরে নিয়ে যান এবং বাদশাহর মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। তারপর আর্খিলাউসের শাসনামলে তাঁকে গালীলের নাসেরাহ শহরে আশ্রয় নিতে হয়। (মথি ২ ঃ ১৩ থেকে ২৩) এখন কুরআন কোন্ স্থানটির প্রতি ইংগিত করছে তা নিশ্চয়তা সহকারে বলা কঠিন। আভিধানিক অর্থে "রাবওয়াহ" এমন সুউচ্চ ভূমিকে বলা হয় যা সমতল এবং আশপাশের এলাকা থেকে উঁচু। অন্যদিকে "যা-তি কারার" (ذات قرار) মানে হচ্ছে এমন জায়গা যেখানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং অবস্থানকারী সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করতে পারে। আর "মাঈন"(معين) মানে হচ্ছে বহমান পানি বা নির্ঝরিণী।

৪৫. আগের ২টি রুকূ'তে বিভিন্ন নবীর কথা বলার পর এখন يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ বলে সকল নবীকে সম্বোধন করার অর্থ এই নয় যে, সকল নবী এক সংগে এক জায়গায় ছিলেন এবং তাঁদেরকে সম্বোধন করে একথা বলা হয়েছে। বরং এ থেকে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, প্রতি যুগে বিভিন্ন দেশে ও জাতির মধ্যে আগমনকারী নবীদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং স্থান-কালের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁদের সবাইকে একই হুকুম দেয়া হয়েছিল। পরের আয়াতে যেহেতু সকল নবীকে এক উম্মত, এক জামায়াত ও এক দলভুক্ত গণ্য করা হয়েছে তাই এখানে এমন বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে যার ফলে চোখের সামনে তাদের সবার এক দলভুক্ত হবার ছবি ভেসে ওঠে। তারা যেন সবাই এক জায়গায় সমবেত আছেন এবং সবাইকে একই নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এ যুগের একদল স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন লোক এ বর্ণনা রীতির সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য অনুধাবন করতে পারেননি এবং তারা এ থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এ সম্বোধনটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে আগমনকারী নবীদেরকে করা হয়েছে এবং এ থেকে তাঁর পরে নবুওয়াতের ধারা পরম্পরা জারি হবার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভাবতে অবাক লাগে যে, যারা ভাষা ও সাহিত্যের সূক্ষ্ম রসবোধ থেকে এত বেশী বঞ্চিত তারা আবার কুরআনের ব্যাখ্যা করার দুঃসাহস করেন।

৪৬. পাক-পবিত্র জিনিস বলে এমন জিনিস বুঝানো হয়েছে যা নিজেও পাক-পবিত্র এবং হালাল পথে অর্জিতও হয়। পবিত্র জিনিস খাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বৈরাগ্যবাদ ও ভোগবাদের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যপন্থার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। মুসলমান বৈরাগী ও যোগীর মতো পবিত্র জীবিকা থেকে যেমন নিজেকে বঞ্চিত করতে পারে না, তেমনি দুনিয়া পূজারী ও ভোগবাদীর মতো হালাল-হারামের পার্থক্য না করে সব জিনিসে মুখও লাগাতে পারে না।

সৎকাজ করার আগে পবিত্র ও হালাল জিনিস খাওয়ার নির্দেশের মধ্যে এদিকে পরিষ্কার ইংগিত রয়েছে যে, হারাম খেয়ে সৎকাজ করার কোন মানে হয় না। সৎকাজের জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে হালাল রিযিক খাওয়া। হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "হে লোকেরা! আল্লাহ নিজে পবিত্র, তাই তিনি পবিত্র জিনিসই পছন্দ করেন।" তারপর তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন এবং তারপর বলেন ঃ

فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ
مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾

—বেশ, তাহলে ছেড়ে দাও তাদেরকে, ডুবে থাকুক নিজেদের গাফিলতির মধ্যে একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত।[৪৯]

তারা কি মনে করে, আমি যে তাদেরকে অর্থ ও সন্তান দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছি, তা দ্বারা আমি তাদেরকে কল্যাণ দানে তৎপর রয়েছি? না, আসল ব্যাপার সম্পর্কে তাদের কোন চেতনাই নেই।[৫০]

اَلرَّجُلُ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَآءِ يَا رَبِّ يَارَبِّ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ

"এক ব্যক্তি আসে সুদীর্ঘ পথ সফর করে। দেহ ধূলি ধূসরিত। মাথার চুল এলোমেলো। আকাশের দিকে হাত তুলে প্রার্থনা করে ঃ হে প্রভু! হে প্রভু! কিন্তু অবস্থা হচ্ছে এই যে, তার খাবার হারাম, পানীয় হারাম, কাপড় চোপড় হারাম এবং হারাম খাদ্যে তার দেহ প্রতিপালিত হয়েছে। এখন কিভাবে এমন ব্যক্তির দোয়া কবুল হবে।" [মুসলিম, তিরমিযী ও আহমাদ, আবু হুরাইরা (রা) থেকে]

৪৭. "তোমাদের উম্মত একই উম্মত"—অর্থাৎ তোমরা একই দলের লোক। "উম্মত" শব্দটি এমন ব্যক্তি সমষ্টির জন্য বলা হয় যারা কোন সম্মিলিত মৌলিক বিষয়ের জন্য একতাবদ্ধ হয়। নবীগণ যেহেতু স্থান-কালের বিভিন্নতা সত্ত্বেও একই বিশ্বাস, একই জীবন বিধান ও একই দাওয়াতের ওপর একতাবদ্ধ ছিলেন, তাই বলা হয়েছে, তাঁদের সবাই একই উম্মত। পরবর্তী বাক্য নিজেই সে মৌলিক বিষয়ের কথা বলে দিচ্ছে যার ওপর সকল নবী একতাবদ্ধ ও একমত ছিলেন। (অতিরিক্ত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আল বাকারাহ, ১৩০ থেকে ১৩৩; আলে ইমরান, ১৯, ২০, ৩৩, ৩৪, ৬৪ ও ৭৯ থেকে ৮৫; আন নিসা, ১৫০ থেকে ১৫২; আল আ'রাফ, ৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫; ইউসুফ, ৩৭ থেকে ৪০; মারয়াম, ৪৯ থেকে ৫৯ এবং আল আম্বিয়া, ৭১ থেকে ৯৩ আয়াত।)

৪৮. এটা নিছক ঘটনার বর্ণনা নয় বরং সূরার শুরু থেকে যে যুক্তিধারা চলে আসছে তার একটি পর্যায়। যুক্তির সারসংক্ষেপ হচ্ছে, নূহ আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সকল নবী যখন এ তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসের শিক্ষা দিয়ে এসেছেন তখন অনিবার্যভাবে এ থেকে প্রমাণ হয়, এ ইসলামই মানব জাতির আসল দীন বা ধর্ম। অন্যান্য যেসব ধর্মের অস্তিত্ব আজ দুনিয়ার বুকে পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো এ দীনেরই বিকৃত রূপ। এর কোন কোন নির্ভুল অংশের চেহারা বিকৃত করে এবং তার মধ্যে অনেক মনগড়া কথা বাড়িয়ে দিয়ে সেগুলো তৈরী করা হয়েছে। এখন যারা এসব ধর্মের ভক্ত-অনুরক্ত তারাই ভ্রষ্টতার মধ্যে অবস্থান করছে। অন্যদিকে যারা এগুলো ত্যাগ করে আসল দীনের দিকে আহবান জানাচ্ছে তারা মোটেই বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার মধ্যে অবস্থান করছে না।

৪৯. প্রথম বাক্য ও দ্বিতীয় বাক্যের মাঝখানে একটি ফাঁক আছে। এ ফাঁকটি ভরে দেয়ার পরিবর্তে শ্রোতার চিন্তা-কল্পনার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কারণ ভাষণের পটভূমি নিজেই তাকে ভরে ফেলছে। এ পটভূমি হচ্ছে, আল্লাহর এক বান্দা পাঁচ ছয় বছর থেকে মানুষকে আসল দীনের দিকে ডাকছেন। যুক্তির সাহায্যে তাদেরকে নিজের কথা বুঝিয়ে বলছেন। ইতিহাসের নজীর পেশ করছেন। তার দাওয়াতের প্রভাব ও ফলাফল কার্যত চোখের সামনে আসছে। তারপর তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রও সাক্ষ দিয়ে চলছে যে, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন ব্যক্তি। কিন্তু এ সত্ত্বেও লোকেরা শুধু যে বাপ-দাদাদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বাতিলের মধ্যে নিমগ্ন রয়েছে তা নয় এবং শুধু যে সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ সহকারে যে সত্য পেশ করা হচ্ছে তাকে মেনে নিতেও তারা প্রস্তুত হয়নি তা নয়। বরং তারা আদাপানি খেয়ে সত্যের আহবায়কের পিছনেও লেগে যায় এবং তাঁর দাওয়াতকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য হঠকারিতা, অপবাদ রটনা, জুলুম, নিপীড়ন, মিথ্যাচার তথা যাবতীয় নিকৃষ্ট ধরনের কৌশল অবলম্বন করার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে থাকছে না। এহেন পরিস্থিতিতে আসল সত্য দীনের একক অস্তিত্ব এবং পরবর্তীতে উদ্ভাবিত ধর্মসমূহের স্বরূপ বর্ণনা করার পর "ছেড়ে দাও তাদেরকে, ডুবে থাকুক তারা নিজেদের গাফিলতির মধ্যে" একথা বলা স্বতস্ফূর্তভাবে এ অর্থ প্রকাশ করে যে, "ঠিক আছে, যদি এরা না মেনে নেয় এবং নিজেদের ভ্রষ্টতার মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে থাকতে চায় তাহলে এদেরকে সেভাবেই থাকতে দাও।" এই "ছেড়ে দাও"-কে একেবারেই শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করে "এখন আর প্রচারই করো না" বলে মনে করা বাকভংগী সম্পর্কে অজ্ঞতাই প্রমাণ করবে। এ ধরনের অবস্থায় একথা প্রচার ও উপদেশ দানে বিরত থাকার জন্য নয় বরং গাফিলদেরকে ঝাঁকুনি দেবার জন্য বলা হয়ে থাকে। তারপর "একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত" শব্দগুলোর মধ্যে রয়েছে একটি গভীর সতর্ক সংকেত। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এ গাফিলতির মধ্যে ডুবে থাকার ব্যাপারটা দীর্ঘক্ষণ চলতে পারবে না। এমন একটি সময় আসবে যখন তারা সজাগ হয়ে যাবে এবং আহবানকারী যে জিনিসের দিকে আহবান করছিল তার স্বরূপ তারা উপলব্ধি করতে পারবে এবং তারা নিজেরা যে জিনিসের মধ্যে ডুবে ছিল তার সঠিক চেহারাও অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।

৫০. এখানে এসে সূরার সূচনা পর্বের আয়াতগুলোর ওপর আর একবার নজর বুলিয়ে নিন। সে একই বিষয়বস্তুকে আবার অন্যভাবে এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। তারা "কল্যাণ", "ভালো" ও "সমৃদ্ধি"র একটি সীমিত বস্তুবাদী ধারণা রাখতো। তাদের মতে, যে ব্যক্তি ভালো খাবার, ভালো পোশাক ও ভালো ঘর-বাড়ি লাভ করেছে, যাকে অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করা হয়েছে এবং সমাজে যে খ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করতে পেরেছে সে সাফল্য লাভ করেছে। আর যে ব্যক্তি এসব থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে ব্যর্থ হয়ে গেছে। এ মৌলিক বিভ্রান্তির ফলে তারা আবার এর চেয়ে অনেক বড় আর একটি বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। সেটি ছিল এই যে, এ অর্থে যে ব্যক্তি কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করেছে সে নিশ্চয়ই সঠিক পথে রয়েছে বরং সে আল্লাহর প্রিয় বান্দা, নয়তো এসব সাফল্য লাভ করা তার পক্ষে কেমন করে সম্ভব হলো। পক্ষান্তরে এ সাফল্য থেকে যাদেরকে আমরা প্রকাশ্যে বঞ্চিত দেখছি তারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে ভুল পথে রয়েছে এবং তারা খোদা বা খোদাদের গযবের শিকার হয়েছে। এ বিভ্রান্তিটি আসলে বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগীর অধিকারী লোকদের ভ্রষ্টতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোর অন্যতম। একে কুরআনের

বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে একে খণ্ডন করা হয়েছে এবং বিভিন্নভাবে প্রকৃত সত্য কি তা বলে দেয়া হয়েছে। (দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন সূরা আল বাকারাহ, ১২৬ ও ২১২; আল আ'রাফ, ৩২; আত্ তাওবাহ, ৫৫, ৬৯ ও ৮৫; ইউনুস, ১৭; হূদ, ৩, ২৭ থেকে ৩১, ৩৮ ও ৩৯; আর রা'আদ, ২৬; আল কাহ্‌ফ, ২৮, ৩২ থেকে ৪৩ ও ১০৩ থেকে ১০৫; মারয়াম, ৭৭ থেকে ৮০; ত্বা-হা, ১৩১ ও ১৩২ ও আল আম্বিয়া, ৪৪ আয়াত এবং এই সংগে টীকাগুলোও)।

এ ক্ষেত্রে এমন পর্যায়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য রয়েছে যেগুলো ভালোভাবে অনুধাবন না করলে চিন্তা ও মন-মানস কখনোই পরিচ্ছন্ন হতে পারে না।

এক ঃ "মানুষের সাফল্য"কে কোন ব্যক্তি, দল বা জাতির নিছক বস্তুবাদী সমৃদ্ধি ও সাময়িক সাফল্য অর্থে গ্রহণ করার চাইতে তা অনেক বেশী ব্যাপক ও উন্নত পর্যায়ের জিনিস।

দুই ঃ সাফল্যকে এ সীমিত অর্থে গ্রহণ করার পর যদি তাকেই সত্য ও মিথ্যা এবং ভালো ও মন্দের মানদণ্ড গণ্য করা হয় তাহলে তা এমন একটি মৌলিক ভ্রষ্টতায় পরিণত হয় যার মধ্য থেকে বাইরে বের না হওয়া পর্যন্ত কোন মানুষ কখনো বিশ্বাস, চিন্তা, নৈতিকতা ও চারিত্রিক ক্ষেত্রে সঠিক পথ লাভ করতেই পারে না।

তিন ঃ দুনিয়াটা আসলে প্রতিদান দেবার জায়গা নয় বরং পরীক্ষাগৃহ। এখানে নৈতিক শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকলেও তা বড়ই সীমিত পর্যায়ের ও অসম্পূর্ণ ধরনের এবং তার মধ্যেও পরীক্ষার দিকটি রয়েছে। এ সত্যটি এড়িয়ে গিয়ে একথা মনে করা যে, এখানে যে ব্যক্তি যে নিয়ামতই লাভ করছে তা লাভ করছে "পুরস্কার" হিসেবেই এবং সেটি লাভ করা পুরস্কার লাভকারীর সত্য, সৎ ও আল্লাহর প্রিয় হবার প্রমাণ আর যার ওপর যে বিপদও আসছে তা হচ্ছে তার "শাস্তি" এবং তা একথাই প্রমাণ করছে যে, শাস্তিলাভকারী মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত, সে অসৎ ও আল্লাহর কাছে অপ্রিয়। আসলে এসব কিছু একটি বিভ্রান্তি বরং নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সম্ভবত আমাদের সত্য সম্পর্কিত ধারণা ও নৈতিকতার মানদণ্ডকে বিকৃত করার ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় আর কোন জিনিস নেই। একজন সত্যসন্ধানীকে প্রথম পদক্ষেপেই একথা অনুধাবন করতে হবে যে, এ দুনিয়াটি মূলত একটি পরীক্ষাগৃহ এবং এখানে অসংখ্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যক্তিদের, জাতিদের ও সমগ্র বিশ্বমানবতার পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। এ পরীক্ষার মাঝখানে লোকেরা যে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয় সেগুলো পুরস্কার ও শাস্তির শেষ পর্যায় নয়। কাজেই সেগুলোকে মতবাদ, চিন্তাধারা, নৈতিকতা ও কর্মকাণ্ডের সঠিক ও বেঠিক হওয়ার মানদণ্ডে পরিণত করা এবং আল্লাহর কাছে প্রিয় ও অপ্রিয় হবার আলামত গণ্য করা যাবে না।

চার ঃ সাফল্যের প্রান্ত নিশ্চিতভাবেই সত্য ও সৎকর্মের সাথে বাঁধা আছে এবং মিথ্যা ও অসৎকর্মের পরিণাম ক্ষতি এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ দুনিয়ায় যেহেতু মিথ্যা ও অসৎকর্মের সাথে সাময়িক ও বাহ্যিক সাফল্য এবং অনুরূপভাবে সত্য ও সৎকর্মের সাথে প্রকাশ্য ও সাময়িক ক্ষতি সম্ভবপর আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ জিনিসটি ধোঁকা বলে প্রমাণিত হয়েছে, তাই সত্য-মিথ্যা ও সৎ-অসৎ যাচাই করার জন্য একটি স্থায়ী ও স্বতন্ত্র

إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ
رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ
يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَٰئِكَ
يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

আসলে কল্যাণের দিকে দৌড়ে যাওয়া ও অগ্রসর হয়ে তা অর্জনকারী লোক[৫০(ক)] তো তারাই যারা নিজেদের রবের ভয়ে ভীত,[৫১] যারা নিজেদের রবের আয়াতের প্রতি ঈমান আনে,[৫২] যারা নিজেদের রবের সাথে কাউকে শরীক করে না[৫৩] এবং যাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, যা কিছুই দেয় এমন অবস্থায় দেয় যে, তাদের অন্তর এ চিন্তায় কাঁপতে থাকে যে, তাদেরকে তাদের রবের কাছে ফিরে যেতে হবে।[৫৪] আমি কোন ব্যক্তির ওপর[৫৪(ক)] তার সাধ্যের বাইরে কোন দায়িত্ব অর্পণ করি না[৫৫] এবং আমার কাছে একটি কিতাব আছে যা (প্রত্যেকের অবস্থা) ঠিকমতো জানিয়ে দেয়[৫৬] আর কোনক্রমেই লোকদের প্রতি জুলুম করা হবে না।[৫৭]

মানদণ্ডের প্রয়োজন, যার মধ্যে প্রতারণার ভয় থাকবে না। নবীগণের শিক্ষা ও আসমানী কিতাবসমূহ আমাদের এ মানদণ্ড সরবরাহ করে। মানুষের সাধারণ জ্ঞান (Common-sense)-এর সঠিক হওয়ার সত্যতা বিধান করে এবং "মারূফ" ও "মুনকার" তথা সৎ-কাজ ও অসৎকাজ সম্পর্কিত মানব জাতির সম্মিলিত মানসিক চিন্তা-অনুভূতি এর সত্যতার সাক্ষ দেয়।

পাঁচ ঃ যখন কোন ব্যক্তি বা জাতি একদিকে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ফাসেকী, অশ্লীল কার্যকলাপ, জুলুম ও সীমালংঘন করতে থাকে এবং অন্যদিকে তার ওপর অনুগ্রহ বর্ষিত হতে থাকে তখন বুঝতে হবে, বুদ্ধি ও কুরআন উভয় দৃষ্টিতে আল্লাহ তাকে কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন এবং তার ওপর আল্লাহর করুণা নয় বরং তাঁর ক্রোধ চেপে বসেছে। ভুলের কারণে যদি তার ওপর আঘাত আসতো তাহলে এর এই অর্থ হতো যে, আল্লাহ এখনো তার প্রতি অনুগ্রহশীল আছেন, তাকে সতর্ক করছেন এবং সংশোধিত হবার সুযোগ দিচ্ছেন। কিন্তু ভুলের জন্য "পুরস্কার" এ অর্থ প্রকাশ করে যে, তাকে কঠিন শাস্তি দেবার ফায়সালা হয়ে গেছে এবং পেট ভরে পানি নিয়ে ডুবে যাওয়ার জন্য তার নৌকাটি ভাসছে। পক্ষান্তরে যেখানে একদিকে থাকে আল্লাহর প্রতি সত্যিকার আনুগত্য, চারিত্রিক পবিত্রতা, পরিচ্ছন্ন লেনদেন, আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি সদাচার, দয়া, স্নেহ

ও মমতা এবং অন্যদিকে তার প্রতি বিপদ–আপদ ও কাঠিন্যের অবিরাম ধারা বর্ষিত হতে থাকে এবং আঘাতের পর আঘাতে সে হতে থাকে জর্জরিত সেখানে তা আল্লাহর ক্রোধের নয় বরং হয় তাঁর অনুগ্রহেরই আলামত। স্বর্ণকার স্বর্ণকে খুব বেশী উত্তপ্ত করতে থাকে যাতে তা খুব বেশী ঝকঝকে তকতকে হয়ে যায় এবং দুনিয়াবাসীর সামনে তার পূর্ণ নিখাদ হওয়া প্রমাণ হয়ে যায়। দুনিয়ার বাজারে তার দাম না বাড়লে কিছু আসে যায় না। স্বর্ণকার নিজেই তার দাম দেবে। বরং নিজের অনুগ্রহে বেশী দিয়ে দেবে। তার বিপদ–আপদে যদি ক্রোধের দিক থেকে থাকে তাহলে তা তার নিজের জন্য নয় বরং তার শত্রুদের জন্য অথবা যে সমাজে সৎকর্মশীলরা উৎপীড়িত হয় এবং আল্লাহর নাফরমানরা হয় অনুগৃহীত সে সমাজের জন্য।

৫০(ক). এখানে আমাদের ভাষায় সহজ ভাব প্রকাশের জন্য আমি ৬১ আয়াতের অনুবাদ আগে করেছি এবং ৫৭ থেকে ৬০ পর্যন্ত আয়াতের অনুবাদ করেছি পরে। কেউ যেন ৬১ আয়াতের অনুবাদ ছুটে গিয়েছে বলে মনে না করেন।

৫১. অর্থাৎ তারা দুনিয়ায় আল্লাহর ব্যাপারে ভীতি শূন্য ও চিন্তামুক্ত জীবন যাপন করে না। যা মনে আসে তাই করে না এবং ওপরে একজন আল্লাহ আছেন তিনি জুলুম ও বাড়াবাড়ি করলে পাকড়াও করেন একথা কখনো ভুলে যায় না। বরং তাদের মন সবসময় তাঁর ভয়ে ভীত থাকে এবং তিনিই তাদেরকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে থাকেন।

৫২. আয়াত বলে দু ধরনের আয়াতই বুঝানো হয়েছে। সেসব আয়াতও যেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবীগণ পেশ করেন আবার সেগুলোও যেগুলো মানুষের নিজের মনের মধ্যে এবং বিশ্ব চরাচরে চারদিকে ছড়িয়ে আছে। কিতাবের আয়াতের প্রতি ঈমান আনা প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর সত্যতার স্বীকৃতি দেয়ারই নামান্তর এবং বিশ্ব চরাচর ও মানব মনের আয়াতের অর্থাৎ নিদর্শনাবলীর প্রতি ঈমান আনা মূলত সেগুলো যেসব সত্য প্রকাশ করছে তার প্রতি ঈমান আনাই প্রমাণ করে।

৫৩. যদিও আয়াতের প্রতি ঈমান আনার অনিবার্য ফল এ দাঁড়ায় যে মানুষ তাওহীদ বিশ্বাসী ও আল্লাহর একক সত্তার প্রবক্তা হবে কিন্তু এ সত্ত্বেও শিরক না করার কথা আলাদাভাবে এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনেক সময় মানুষ আয়াত মেনে নিয়েও কোন না কোনভাবে শিরকে লিপ্ত হয়। যেমন রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা। এটিও এক ধরনের শিরক। অথবা নবী ও অলীগণের শিক্ষার মধ্যে এমন ধরনের বাড়াবাড়ি করা যা শিরক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য সত্তার কাছে প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করা। কিংবা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যান্য রবের বন্দেগী ও আনুগত্য এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য প্রভুর আইন মেনে চলা। কাজেই আল্লাহর আয়াতের প্রতি ঈমান আনার পর আলাদাভাবে শিরক না করার কথা বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, তারা নিজেদের বন্দেগী, আনুগত্য ও দাসত্বকে সম্পূর্ণরূপে একক আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে নেয় এবং তার গায়ে অন্য কারোর বন্দেগীর সামান্যতম গন্ধও লাগায় না।

৫৪. আরবী ভাষায় "দেয়া" (ايتاء) শব্দটি শুধুমাত্র সম্পদ বা কোন বস্তু দেয়া অর্থেই ব্যবহার হয় না বরং বিমূর্ত জিনিস দেয়া অর্থেও বলা হয়। যেমন কোন ব্যক্তির আনুগত্য

গ্রহণ করার জন্য বলা হয় اتيته من نفسى القبول আবার কোন ব্যক্তির আনুগত্য অস্বীকার করার জন্য বলা হয় اتيته من نفسى الاباية কাজেই এ দেয়ার মানে শুধুমাত্র এই নয় যে, তারা আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ দান করে বরং আল্লাহর দরবারে আনুগত্য ও বন্দেগী পেশ করাও এর অর্থের অন্তরভুক্ত।

এ অর্থের দৃষ্টিতে আয়াতের পুরোপুরি মর্ম এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহর হুকুম পালনের ক্ষেত্রে তারা যা কিছু সদাচার, সেবামূলক কাজ ও ত্যাগ করে সে জন্য একটুও অহংকার ও তাকওয়ার বড়াই করে না এবং আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে যাবার অহমিকায় লিপ্ত হয় না। বরং নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী সবকিছু করার পরও এ মর্মে আল্লাহর ভয়ে ভীত হতে থাকে যে, নাজানি এসব তাঁর কাছে গৃহীত হবে কিনা, নিজেদের গোনাহের মোকাবিলায় এগুলো ভারী প্রমাণিত হবে কিনা এবং রবের কাছে মাগফেরাতের জন্য এগুলো যথেষ্ট হবে কিনা। ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম ও জারির বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটিই এ অর্থ প্রকাশ করে। এখানে হযরত আয়েশা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ "হে আল্লাহর রসূল! এর অর্থ কি এই যে, এক ব্যক্তি চুরি, ব্যভিচার ও শরাব পান করার সময়ও আল্লাহকে ভয় করবে?" এ প্রশ্ন থেকে জানা যায়, হযরত আয়েশা একে يَأْتُوْنَ مَا اَتَوْا অর্থে গ্রহণ করছিলেন অর্থাৎ "যা কিছু করে করেই যায়। জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيْقِ وَلٰكِنَّهُ الَّذِىْ يُصَلِّى وَيَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُ وَهُوَ يَخَافُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ -

"না, হে সিদ্দীকের মেয়ে! এর অর্থ হচ্ছে এমন লোক, যে নামায পড়ে, রোযা রাখে, যাকাত দেয় এবং মহান আল্লাহকে ভয় করতে থাকে।"

এ জবাব থেকে জানা যায় যে, আয়াতের সঠিক পাঠ يأتون নয় বরং يُؤْتُوْنَ এবং এ يُؤْتُوْنَ শুধু অর্থ-সম্পদ দান করার সীমিত অর্থে নয় বরং আনুগত্য করার ব্যাপক অর্থে।

একজন মু'মিন কোন্ ধরনের মানসিক অবস্থা সহকারে আল্লাহর বন্দেগী করে এ আয়াতটি তা বর্ণনা করে। হযরত উমরের (রা) অবস্থাই এর পূর্ণ চিত্র প্রকাশ করে। তিনি সারা জীবনের অতুলনীয় কার্যক্রমের পর যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে থাকেন তখন আল্লাহর জবাবদিহির ভয়ে ভীত হতে থাকেন এবং বলে যেতে থাকেন, যদি আখেরাতে সমান সমান হয়ে মুক্তি পেয়ে যাই তাহলেও বাঁচোয়া। হযরত হাসান বাসরী (র) বড়ই চমৎকার বলেছেন ঃ মু'মিন আনুগত্য করে এরপরও ভয় করে এবং মুনাফিক গোনাহ করে তারপরও নির্ভীক ও বেপরোয়া থাকে।

৫৪(ক). উল্লেখ্য, ৬১ আয়াতের অনুবাদ ৫৭ আয়াতের আগে করা হয়েছে। এখান থেকে ৬২ আয়াতের অনুবাদ শুরু হচ্ছে।

৫৫. এ প্রেক্ষাপটে এ বাক্যটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। একে ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। আগের আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে তারা প্রকৃত কল্যাণ আহরণকারী। কারা অগ্রবর্তী

হয়ে তা অর্জন করে এবং তাদের গুণাবলী কি কি। এ আলোচনার পর সংগে সংগেই একথা বলা হলো, আমি কখনো কাউকে তার সামর্থের বাইরে কষ্ট দেই না। এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, এ চরিত্র, নৈতিকতা ও কার্যক্রম কোন অতিমানবিক জিনিস নয়। তোমাদেরই মতো রক্ত-মাংসের মানুষেরাই এ পথে চলে দেখিয়ে দিচ্ছে। কাজেই তোমরা একথা বলতে পারো না যে, তোমাদের কাছে এমন কোন জিনিসের দাবী জানানো হচ্ছে যা মানুষের সাধ্যের বাইরে। তোমরা যে পথে চলছো তার ওপর চলার ক্ষমতা যেমন মানুষের আছে তেমনি তোমাদের নিজেদের জাতির কতিপয় মুমিন যে পথে চলছে তার ওপর চলার ক্ষমতাও মানুষের আছে। এখন এ দু'টি সম্ভাব্য পথের মধ্যে কে কোন্‌টি নির্বাচন করে, শুধুমাত্র তার ওপরই ফায়সালা নির্ভর করে। এ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভুল করে যদি তোমরা আজ তোমাদের সমস্ত শ্রম ও প্রচেষ্টা অকল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করো এবং কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থেকে যাও তাহলে আগামীতে নিজেদের এ বোকামির দণ্ড নিতেই হবে। সে দণ্ড থেকে এ খোঁড়া অজুহাত তোমাদের বাঁচাতে পারবে না যে, কল্যাণ পর্যন্ত পৌঁছা তোমাদের সামর্থের বাইরে ছিল। তখন এ অজুহাত পেশ করলে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে, এ পথ যদি মানুষের সামর্থের বাইরে থেকে থাকে তাহলে তোমাদেরই মতো অনেক মানুষ তার ওপর চলতে সক্ষম হলো কেমন করে?

৫৬. কিতাব বলে এখানে আমলনামাকে বুঝানো হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির এ আমলনামা পৃথক পৃথকভাবে তৈরী হচ্ছে। তার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি নড়াচড়া এমনকি চিন্তা-ভাবনা ও ইচ্ছা-সংকল্পের প্রত্যেকটি অবস্থা পর্যন্ত তাতে সন্নিবেশিত হচ্ছে। এ সম্পর্কেই সূরা কাহ্‌ফে বলা হয়েছে ঃ

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَاعَمِلُوْا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا –

"আর আমলনামা সামনে রেখে দেয়া হবে। তারপর তোমরা দেখবে অপরাধীরা তার মধ্যে যা আছে তাকে ভয় করতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য। এ কেমন কিতাব, আমাদের ছোট বা বড় এমন কোন কাজ নেই যা এখানে সন্নিবেশিত হয়নি। তারা যে যা কিছু করেছিল সবই নিজেদের সামনে হাজির দেখতে পাবে। আর তোমার রব কারোর প্রতি জুলুম করেন না।" (৪৯ আয়াত)

কেউ কেউ এখানে কিতাব অর্থে কুরআন গ্রহণ করে আয়াতের অর্থ উল্‌টে দিয়েছে।

৫৭. অর্থাৎ কারোর বিরুদ্ধে এমন কোন দোষারোপ করা হবে না যে জন্য সে মূলত দায়ী নয়। কারোর এমন কোন সৎকাজ গ্রাস করে ফেলা হবে না যার প্রতিদানের সে প্রকৃতপক্ষে হকদার। কাউকে অনর্থক শাস্তি দেয়া হবে না। কাউকে সত্য অনুযায়ী যথার্থ পুরস্কার থেকে বঞ্চিত রাখাও যাবে না।

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ
لَهَا عَامِلُونَ ﴿٦٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ
يَجْأَرُونَ ﴿٦٤﴾ لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ ۖ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿٦٥﴾ قَدْ كَانَتْ
آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿٦٦﴾

কিন্তু তারা এ ব্যাপারে অচেতন।[৫৮] আর তাদের কার্যাবলীও এ পদ্ধতির (যা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে) বিপরীত। তারা নিজেদের এসব কাজ করে যেতে থাকবে, অবশেষে যখন আমি তাদের বিলাসপ্রিয়দেরকে আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করবো[৫৯] তখন তারা আবার চিৎকার করতে থাকবে[৬০]—এখন বন্ধ করো[৬১] তোমাদের আর্তচিৎকার আমার পক্ষ থেকে এখন কোন সাহায্য দেয়া হবে না। আমার আয়াত তোমাদের শোনানো হতো, তোমরা তো (রসূলের আওয়াজ শুনতেই) পিছন ফিরে কেটে পড়তে,[৬২]

৫৮. অর্থাৎ যা কিছু তারা করছে, বলছে ও চিন্তা-ভাবনা করছে—এসব কিছু অন্য কোথাও সন্নিবেশিত হচ্ছে এবং কখনো এর হিসেব হবে না, এ ব্যাপারে তারা বেখবর।

৫৯. مُتْرَفِيْن শব্দের অনুবাদ এখানে করা হয়েছে "বিলাসপ্রিয়"। "মুত্‌রফীন" আসলে এমনসব লোককে বলা হয় যারা পার্থিব ধন-সম্পদ লাভ করে ভোগ বিলাসে লিপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির অধিকার থেকে গাফিল হয়ে গেছে। "বিলাসপ্রিয়" শব্দটির মাধ্যমে এ শব্দটির সঠিক মর্মকথা প্রকাশ হয়ে যায়, তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে একে শুধুমাত্র প্রবৃত্তির খায়েশ পূর্ণ করার অর্থে গ্রহণ করা যাবে না বরং বিলাস প্রিয়তার ব্যাপকতার অর্থে গ্রহণ করতে হবে।

আযাব বলতে এখানে সম্ভবত আখেরাতের আযাব নয় বরং দুনিয়ার আযাবের কথা বলা হয়েছে। জালেমরা দুনিয়ায়ই এ আযাবের মুখোমুখি হয়।

৬০. মূলে جُؤَار শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অত্যধিক কষ্টের মধ্যে গরুর মুখ দিয়ে যে আওয়াজ বের হয় তাকে 'জুআর' বলে। এ শব্দটি এখানে নেহাত ফরিয়াদ ও কাতর আর্তনাদ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বরং এমন ব্যক্তির আর্তনাদ ও ফরিয়াদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে কোন প্রকার করুণার যোগ্য নয়। এর মধ্যে ব্যাংগ ও তাচ্ছিল্যভাব প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এর মধ্যে এ অর্থ লুকিয়ে রয়েছে যে, "বেশ, এখন নিজের কৃতকর্মের মজা টের পাওয়ার সময় এসেছে, তাই তো জোরে জোরে চিৎকার করছো।"

৬১. অর্থাৎ তখন তাদেরকে একথা বলা হবে।

৬২. অর্থাৎ তাঁর কথা শুনতেই তো প্রস্তুত ছিলে না। তাঁর আওয়াজ কানে পড়ুক এতটুকুও সহ্য করতে না।

مُسْتَكْبِرِينَ ۝٦٧ بِهِۦ سَٰمِرًا تَهْجُرُونَ ۝٦٨ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ
جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ۝٦٩ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُۥ
مُنكِرُونَ ۝٧٠ أَمْ يَقُولُونَ بِهِۦ جِنَّةٌۢ ۚ بَلْ جَآءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ
لِلْحَقِّ كَٰرِهُونَ ۝٧١

অহংকারের সাথে তা অগ্রাহ্য করতে, নিজেদের আড্ডায় বসে তার সম্পর্কে গল্প দিতে[৬৩] ও আজেবাজে কথা বলতে।

তারা কি কখনো এ বাণী সম্পর্কে চিন্তা করেনি?[৬৪] অথবা সে এমন কথা নিয়ে এসেছে যা কখনো তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসেনি?[৬৫] কিংবা তারা নিজেদের রসূলকে কখনো চিনতো না বলেই (অপরিচিত ব্যক্তি হবার কারণে) তাকে অস্বীকার করে?[৬৬] অথবা তারা কি একথা বলে যে, সে উন্মাদ?[৬৭] না, বরং সে সত্য নিয়ে এসেছে এবং সত্যই তাদের অধিকাংশের কাছে অপছন্দনীয়।

৬৩. মূলে سَٰمِرًا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। سمر মানে রাতের বেলা কথাবার্তা বলা, গল্প করা, কথকতা করা ও গল্প-কাহিনী শুনানো। গ্রামীন ও মফস্বল শহরে জীবনে সাধারণত এ রাত্রিকালের গপ্‌সপ্ হয় বৈঠক খানায় ও দহলিজে বসে। মক্কাবাসীদের রীতিও এটাই ছিল।

৬৪. অর্থাৎ তাদের এ মনোভাবের কারণ কি? তারা কি এ বাণী বোঝেইনি, তাই একে মানছে না? মোটেই না, কারণ এটা নয়। কুরআন কোন হেঁয়ালি নয়। কোন দুর্বোধ্য ভাষায় কিতাবটি লেখা হয়নি। কিতাবটিতে এমন সব বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটানো হয়নি যা মানুষের বোধগম্য নয়। তারা এর প্রত্যেকটি কথা ভালোভাবে বোঝে। এরপরও বিরোধিতা করছে। কারণ তারা একে মানতে চায় না। এমন নয় যে, তারা একে বুঝার চেষ্টা করছে কিন্তু বুঝতে পারছে না তাই মানতে চায় না।

৬৫. অর্থাৎ তিনি কি এমন একটি অভিনব কথা পেশ করছেন যা তাদের কান কোনদিন শুনেনি এবং এটিই তাদের অস্বীকারের কারণ? মোটেই না, কারণ এটাও নয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীদের আসা, কিতাবসহকারে আসা, তাওহীদের দাওয়াত দেয়া, আখেরাতের জবাবদিহির ভয় দেখানো এবং নৈতিকতার পরিচিত সৎবৃত্তিগুলো পেশ করা, এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটিও এমন নয় যা ইতিহাসে আজ প্রথমবার দেখা দিয়েছে এবং ইতিপূর্বে আর কখনো এসব কথা শুনা যায়নি। তাদের আশপাশের দেশগুলোয় ইরাকে, সিরিয়ায় ও মিসরে নবীর পর নবী এসেছেন। তাঁরা এসব কথাই বলেছেন। এগুলো তারা জানে না এমন নয়। তাদের নিজেদের দেশেই ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম এসেছেন। হূদ, সালেহ ও শোআইব আলাইহিমুস সালামও এসেছেন। তাঁদের নাম

আজো তাদের মুখে মুখে। তারা নিজেরাই তাঁদেরকে আল্লাহর প্রেরিত বলে মানে। তারা একথাও জানে যে, তাঁরা মুশরিক ছিলেন না বরং এক আল্লাহর বন্দেগীর শিক্ষা দিতেন। তাই প্রকৃতপক্ষে তাদের অস্বীকারের কারণ এই নয় যে, তারা এমন একটি পুরোপুরি আনকোরা নতুন কথা শুনছে যা ইতিপূর্বে কখনো শোনেনি। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন আল ফুরকান, ৮৪; আস্ সাজ্‌দাহ, ৫ ও সাবা ৩৫ টীকা)।

৬৬. অর্থাৎ একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি, যাকে তারা কোনদিনই জানতো না, হঠাৎ তাদের মধ্যে এসে পড়েছেন এবং বলছেন আমাকে মেনে নাও, এটাই কি তাদের অস্বীকারের কারণ? না, একথা মোটেই নয়। যিনি এ দাওয়াত পেশ করছেন তিনি তাদের নিজেদের গোত্রের ও ভ্রাতৃসমাজের লোক। তাঁর বংশগত মর্যাদা তাদের অজানা নয়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন তদের চোখের আড়ালে নেই। তিনি তাদের সামনেই শৈশব থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। তাঁর সততা, সত্যতা, আমানতদারী, বিশ্বস্ততা ও নিষ্কলুষ চরিত্র সম্পর্কে তারা খুব ভালোভাবেই জানে। তারা নিজেরাই তাঁকে আমীন বলতো। তাদের সমগ্র ভ্রাতৃসমাজ তাঁর বিশ্বস্ততার ওপর ভরসা করতো। তার নিকৃষ্টতম শত্রুও একথা স্বীকার করে যে, তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি। সমগ্র যৌবনকালেই তিনি ছিলেন পূতপবিত্র ও পরিচ্ছন্ন চরিত্রের অধিকারী। সবাই জানে তিনি একজন অত্যন্ত সৎ, ভদ্র ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু, সত্যসেবী ও শান্তিপ্রিয় লোক। তিনি ঝগড়া বিবাদ থেকে দূরে থাকেন। পরিচ্ছন্ন লেনদেন করেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তাঁর জুড়ি নেই। নিজে জুলুম করেন না এবং জালেমদের সাথে সহযোগিতাও করেন না। কোন হকদারের হক আদায় করতে তিনি কখনো কুণ্ঠিত হননি। প্রত্যেক বিদপগ্রস্ত, অভাবী ও অসহায়ের জন্য তাঁর দরজা হচ্ছে একজন দয়ার্দ্রচিত্ত, স্নেহ পরায়ণ সহানুভূতিশীলের দরজা। তারপর তারা এও জানতো যে, নবুওয়াতের দাবীর একদিন আগে পর্যন্তও কেউ তাঁর মুখ থেকে এমন কোন কথা শোনেনি যা থেকে এ সন্দেহ করা যেতে পারে যে, তিনি কোন দাবী করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আর যেদিন তিনি দাবী করেন তার পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত একই কথা বলে আসছেন। তিনি কোন মোড় পরিবর্তন করেননি বা ডিগবাজী খাননি। নিজের দাওয়াত ও দাবীর মধ্যে কোন রদবদল করেননি। তাঁর দাবীর মধ্যে এমন কোন পর্যায়ক্রমিক ক্রমবিকাশ দেখা যায়নি যার ফলে এ ধারণা করা যেতে পারে যে, ধীরে ধীরে পা শক্ত করে দাবীর ময়দানে এগিয়ে চলার কাজ চলছে। আবার তাঁর জীবন যাপন প্রণালী সাক্ষ দিচ্ছে যে, অন্যদেরকে তিনি যা কিছু বলেন, তা সবার আগে নিজে পালন করে দেখিয়ে দেন। তাঁর কথায় ও কাজে বৈপরীত্য নেই। তাঁর কাছে হাতির দাঁত নেই, যা দেখাবার জন্য এক রকম এবং খাবার জন্য আবার অন্য রকম। তিনি নেবার জন্য এক পাল্লা এবং দেবার জন্য ভিন্ন পাল্লা ব্যবহার করেন না। এ ধরনের সুপরিচিত ও সুপরীক্ষিত ব্যক্তি সম্পর্কে তারা একথা বলতে পারে না যে, "ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। বড় বড় প্রতারক আসে এবং হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় কথা বলে প্রথম প্রথম আসর জমিয়ে ফেলে, পরে জানা যায় সবই ছিল ধোঁকা। এ ব্যক্তিও কি জানি আসলে কি এবং বানোয়াট পোশাক আশাক নামিয়ে ফেলার পর ভেতর থেকে কে বের হয়ে আসে কি জানি। তাই একে মেনে নিতে আমাদের মনে সংশয় জাগছে।" (এ প্রসংগে আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আন'আম, ২১; ইউনুস, ২১ ও বনী ইসরাঈল, ১০৫ টীকা)

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ
فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧١﴾ أَمْ تَسْئَلُهُمْ
خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِينَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ
إِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ
الصِّرَاطِ لَنٰكِبُونَ ﴿٧٤﴾

—আর সত্য যদি কখনো তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতো তাহলে আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যের সবকিছুর ব্যবস্থাপনা ওলট পালট হয়ে যেতো[৬৮]—না, বরং আমি তাদের নিজেদের কথাই তাদের কাছে এনেছি এবং তারা নিজেদের কথা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।[৬৯]

তুমি কি তাদের কাছে কিছু চাচ্ছো? তোমার জন্য তোমার রব যা দিয়েছেন, সেটাই ভালো এবং তিনি সবচেয়ে ভালো রিযিকদাতা।[৭০] তুমি তো তাদেরকে সহজ সরল পথের দিকে ডাকছো, কিন্তু যারা পরকাল স্বীকার করে না তারা সঠিক পথ থেকে সরে ভিন্ন পথে চলতে চায়।[৭১]

৬৭. অর্থাৎ তাদের অস্বীকার করার কারণ কি এই যে, তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাগল মনে করে? মোটেই না, এটাও আসলে কোন কারণই নয়।

কারণ মুখে তারা যাই বলুক না কেন মনে মনে তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার স্বীকৃতি দিয়ে চলছে। তাছাড়া একজন পাগল ও সুস্থ-সচেতন ব্যক্তির মধ্যকার পার্থক্য এমন কোন অস্পষ্ট বিষয় নয় যে, উভয়কে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। একজন হঠকারী ও নির্লজ্জ ব্যক্তি ছাড়া কে এ বাণী শোনার পর একথা বলতে পারে যে, এটা একজন পাগলের প্রলাপ এবং এ ব্যক্তির জীবনধারা দেখার পর এ অভিমত ব্যক্ত করতে পারে যে, এটা একজন বুদ্ধিভ্রষ্ট উন্মাদের জীবন? বড়ই অদ্ভুত সেই পাগলামি (অথবা পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদদের প্রলাপ অনুযায়ী মৃগীরোগীর সংজ্ঞাহীনতা) যার মধ্যে মানুষের মুখ দিয়ে কুরআনের মতো অলৌকিক সৌন্দর্যময় বাণী বের হয়ে আসে এবং যার মাধ্যমে মানুষ একটি আন্দোলনের এমন সফল পথনির্দেশনা দেয় যার ফলে কেবলমাত্র নিজের দেশেরই নয়, সারা দুনিয়ার ভাগ্য পরিবর্তিত হয়ে যায়।

৬৮. এ ছোট্ট বাক্যটির মধ্যে একটি অনেক বড় কথা বলা হয়েছে। এটি ভালোভাবে বুঝে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে। দুনিয়ায় সাধারণত অজ্ঞ মূর্খ লোকদের নিয়ম এই হয়ে

থাকে যে, তাদের সামনে যে ব্যক্তি সত্য কথাটি বলে দেয় তারা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। প্রকারান্তরে তারা যেন বলতে চায়, যা সত্য ও বাস্তব সম্মত তা না বলে তাদের মনের মতো কথা বলা হোক। অথচ কেউ পছন্দ করুক বা না করুক সত্য সব অবস্থায়ই সত্য থাকে। সারা দুনিয়ার লোকেরা এক জোট হলেও সত্য ও বাস্তবতাকে এক এক ব্যক্তির ইচ্ছা ও বাসনা অনুযায়ী ঢেলে বের করে আনা এবং প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য বিপরীতমুখী বাসনার সাথে একাত্ম হওয়া তো দূরের কথা কোন বাস্তব ঘটনাকে অবাস্তব এবং সত্যকে অসত্যে পরিণত করাও সম্ভবপর নয়। নির্বুদ্ধিতায় আক্রান্ত বুদ্ধিবৃত্তি কখনো একথা চিন্তা করার প্রয়োজনই বোধ করে না যে, সত্য ও তাদের বাসনার মধ্যে যদি বিরোধ থাকে তাহলে এ দোষটা সত্যের নয় বরং তাদের নিজেদের। তার বিরোধিতা করে তারা তার কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না বরং নিজেদেরই ক্ষতি করবে। বিশ্ব-জাহানের এ বিশাল ব্যবস্থা যেসব অবিচল সত্য ও আইনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে তার ছত্রছায়ায় বাস করে মানুষের জন্য নিজের চিন্তা, বাসনা ও কর্মপদ্ধতিকে সত্য অনুযায়ী তৈরী করে নেয়া এবং এ উদ্দেশ্যে সর্বক্ষণ যুক্তি, অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য জানার চেষ্টা করতে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কেবলমাত্র একজন নির্বোধই এখানে যা কিছু সে বোঝে বা যা কিছু হয়ে যাক বলে তার মন চায় অথবা নিজের বিদ্বিষ্ট মনোভাবের কারণে যা কিছু হয়েছে বা হওয়া উচিত বলে সে ধারণা করে নিয়েছে তার ওপর দ্বিধাহীন হয়ে যাওয়া এবং তার বিরুদ্ধে কারোর সবচেয়ে শক্তিশালী ও ন্যায়সংগত যুক্তি-প্রমাণও শুনতে প্রস্তুত না হওয়ার চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে।

৬৯. এখানে 'কথা' শব্দটির তিনটি অর্থ হওয়া সম্ভব এবং তিনটি অর্থই এখানে প্রযোজ্য।

(ক) 'কথা' প্রকৃতির বর্ণনা অর্থে। এ প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ হবে, আমি অন্য কোন জগতের কথা বলছি না। বরং তাদের নিজেদেরই সত্য ও প্রকৃতি এবং তার দাবী-দাওয়া তাদের সামনে পেশ করছি, যাতে তারা নিজেদের এ ভুলে যাওয়া পাঠ মনে করতে পারে। কিন্তু তারা এটা গ্রহণ করতে পিছপাও হচ্ছে। তাদের এ পলায়ন কোন অসংশ্লিষ্ট জিনিস থেকে নয় বরং নিজেদেরই কথা থেকে।

(খ) 'কথা' উপদেশ অর্থে। এ প্রেক্ষিতে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, যা কিছু পেশ করা হচ্ছে তা তাদেরই ভালোর জন্য একটি উপদেশ এবং তাদের এ পলায়ন অন্য কোন জিনিস থেকে নয় বরং নিজেদেরই কল্যাণের কথা থেকে।

(গ) 'কথা' সম্মান ও মর্যাদা অর্থে। এ অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতের অর্থ হবে, আমরা এমন জিনিস তাদের কাছে এনেছি যা তারা গ্রহণ করলে তারাই মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হবে। এ থেকে তাদের এ মুখ ফিরিয়ে নেয়া অন্য কোন জিনিস থেকে নয় বরং নিজেদেরই উন্নতি এবং নিজেদেরই উত্থানের একটি সুবর্ণ সুযোগ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার নামান্তর।

৭০. এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের পক্ষে আর একটি প্রমাণ। অর্থাৎ নিজের এ কাজে আপনি পুরোপুরি নিস্বার্থ। কোন ব্যক্তি সততার সাথে এ দোষারোপ করতে পারে না যে, নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য আপনার সামনে রয়েছে তাই আপনি এ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে আপনার ভালোই উন্নতি হচ্ছিল।

وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿٧٥﴾
وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿٧٦﴾
حَتّٰٓى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴿٧٧﴾

যদি আমি তাদের প্রতি করুণা করি এবং বর্তমানে তারা যে দুঃখ-কষ্টে ভুগছে তা দূর করে দেই, তাহলে তারা নিজেদের অবাধ্যতার স্রোতে একেবারেই ভেসে যাবে।[৭২] তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমি তাদেরকে দুঃখ-কষ্টে ফেলে দিয়েছি, তারপরও তারা নিজেদের রবের সামনে নত হয়নি এবং বিনয় ও দীনতাও অবলম্বন করে না। তবে যখন অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যে, আমি তাদের জন্য কঠিন আযাবের দরজা খুলে দেবো তখন অকস্মাত তোমরা দেখবে যে, এ অবস্থায় তারা সকল প্রকার কল্যাণ থেকে হতাশ হয়ে পড়েছে।[৭৩]

এখন দারিদ্র ও অর্থসংকটের সম্মুখীন হলেন। জাতির মধ্যে আপনাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। লোকেরা মাথায় করে রাখতো। এখন গালাগালি ও মার খাচ্ছেন বরং প্রাণ নাশের পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন। নিজের পরিবার-পরিজন নিয়ে নিশ্চিন্তে সুখে জীবন যাপন করছিলেন। এখন এমন একটি কঠিন দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে পড়ে গেছেন যার ফলে এক মুহূর্তের জন্য নিশ্বাস ফেলতে পারছেন না। এর ওপর আরো সমস্যা হলো এমন বিষয় নিয়ে সামনে এসেছেন যার ফলে সারা দেশের লোক শত্রুতে পরিণত হয়েছে। এমনকি নিজের জ্ঞাতি ভাইরা আপনাকে হত্যা করার জন্য পাগলপারা হয়ে উঠেছে। কে বলতে পারে, এটা একজন স্বার্থবাদী লোকের কাজ? স্বার্থবাদী লোক তো নিজের জাতি ও গোত্রপ্রীতির ঝাণ্ডা উঁচিয়ে নিজের যোগ্যতা ও যোগসাজশের মাধ্যমে নেতৃত্ব লাভ করার প্রচেষ্টা চালাতেন। তিনি কখনো এমন কোন বিষয় নিয়ে আবির্ভূত হতেন না যা কেবলমাত্র সমগ্র জাতীয় ও গোষ্ঠীগত স্বার্থপ্রীতির বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জই নয় বরং আরবের মুশরিকদের মধ্যে তার গোত্রের সরদারী যে জিনিসের বদৌলতে প্রতিষ্ঠিত আছে তার শিকড়ও কেটে দেয়। এটি এমন একটি যুক্তি যা কুরআনে শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই নয় বরং সাধারণভাবে সকল নবীর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে বারবার পেশ করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আল আন'আম, ৯০; ইউনুস, ৭২; হূদ, ২৯ ও ৫১; ইউসুফ, ১০৪; আল ফুরকান, ৫৭; আশ্ শু'আরা, ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৫ ও ১৮০; সাবা ৪৭; ইয়াসীন, ২১; সাদ, ৮৬; আশ্শূরা, ২৩ ও আন্ নাজম্, ৪০ আয়াত এবং এই সংগে টীকাগুলোও দেখুন।

৭১. অর্থাৎ আখেরাত অস্বীকার করার ফলে তারা দায়িত্বহীন হয়ে পড়েছে এবং দায়িত্বের অনুভূতি না থাকায় তারা একেবারেই বেপরোয়া হয়ে গেছে। তাদের এ জীবনের একটা সমাপ্তি ও ফলাফল যে আছে এবং কারোর সামনে এ সমগ্র জীবনকালের

কার্যাবলীর হিসেব যে দিতে হবে, এটাই যখন তারা বুঝে না, তখন সত্য কি ও মিথ্যা কি তা নিয়ে তাদের কিইবা চিন্তা হতে পারে? জন্তু-জানোয়ারের মতো দেহ ও প্রবৃত্তির প্রয়োজন খুব ভালোভাবে পূর্ণ হতে থাকুক এটিই হয় তাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হবার পর সত্য ও মিথ্যার আলোচনা তাদের কাছে নেহাতই অর্থহীন। আর এ উদ্দেশ্য লাভের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি দেখা দিলে বড় জোর তারা এ ত্রুটির কারণ কি এবং কিভাবে একে দূর করা যায় এতটুকুই চিন্তা করবে। এ ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন লোকেরা কোন দিন সঠিক পথ চাইতে পারে না এবং পেতেও পারে না।

৭২. দুর্ভিক্ষের কারণে আরববাসী যে কষ্ট ও বিপদের মধ্যে অবস্থান করছিল সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত হাদীস উদ্ধৃত করতে গিয়ে কেউ কেউ দু'টি দুর্ভিক্ষকে এক সাথে মিশিয়ে ফেলেছেন। এর ফলে এটি হিজরতের আগের না পরের ঘটনা তা বুঝা মানুষের পক্ষে কঠিন হয়ে যায়। আসল ঘটনা হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মক্কাবাসীরা দুবার দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। একবার নবুওয়াতের সূচনার কিছুদিন পর। দ্বিতীয়বার হিজরাতের কয়েক বছর পর যখন সামামাহ ইবনে উসাল ইয়ামামাহ থেকে মক্কার দিকে খাদ্য শস্য রফতানী করা বন্ধ করে দিয়েছিল। এখানে দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষটির নয় প্রথমটির কথা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) এ বর্ণনা পাওয়া যায় যে, যখন কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত অস্বীকার করতেই থাকলো এবং কঠোরভাবে বাধা দিতে শুরু করলো তখন তিনি দোয়া করলেন ঃ

اللهم اعنى عليهم بسبع كسبع يوسف

"হে আল্লাহ! এদের মোকাবিলায় ইউসুফের সাত বছরের দুর্ভিক্ষের মতো সাত বছরব্যাপী দুর্ভিক্ষ দিয়ে আমাকে সাহায্য করো।"

ফলে এমন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেলো যে, মৃতের গোশ্‌ত খাওয়ার ঘটনাও ঘটলো। মক্কী সূরাগুলোতে বহু জায়গায় এ ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন সূরা আল আন'আম, ৪২ থেকে ৪৪; আল আ'রাফ, ৯৪ থেকে ৯৯; ইউনুস, ১১, ১২, ২১; আন নহল, ১১২, ১১৩ ও আদ্ দুখান, ১০ থেকে ১৬ আয়াত এবং এ সংগে সংশ্লিষ্ট টীকাগুলোও।

৭৩. মূলে مُبْلِسُوْنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। হতাশা শব্দটি এর পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না। بَلَس ও اِبْلَاس শব্দের কয়েকটি অর্থ হয়। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাওয়া, ভয়ে ও আতংকে নিথর হয়ে যাওয়া, দুঃখে ও শোকে মনমরা হয়ে যাওয়া, সবদিক থেকে নিরাশ হয়ে সাহস হারিয়ে ফেলা এবং এরি একটি দিক হতাশা ও ব্যর্থতার ফলে মরিয়া (Desperate) হয়ে ওঠা। এ কারণেই শয়তানের নাম ইবলিস রাখা হয়েছে। এ নামের মধ্যে যে অর্থ প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা হলো, হতাশা ও নিরাশার (Frustration) ফলে তার আহত অহমিকা এত বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে, এখন সে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে মরণ খেলায় নামতে এবং সব ধরনের অপরাধ অনুষ্ঠানে উদ্যত হয়েছে।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا
تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾ وَهُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٩﴾
وَهُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ اَفَلَا
تَعْقِلُوْنَ ﴿٨٠﴾ بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ﴿٨١﴾ قَالُوْٓا ءَاِذَا مِتْنَا
وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٨٢﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا
مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨٣﴾ قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ
وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٤﴾

৫ রুকূ'

তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদের শোনার ও দেখার শক্তি দিয়েছেন এবং চিন্তা করার জন্য অন্তঃকরণ দিয়েছেন, কিন্তু তোমরা কমই কৃতজ্ঞ হয়ে থাকো।[৭৪] তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা একত্র হবে। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন, দিন রাতের আবর্তন তাঁরই শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন।[৭৫] একথা কি তোমাদের বোধগম্য হয় না?[৭৬] কিন্তু তারা সে একই কথা বলে যা তাদের পূর্বের লোকেরা বলেছিল। তারা বলে, "যখন আমরা মরে মাটি হয়ে যাবো এবং অস্থি পঞ্জরে পরিণত হবো তখন কি আমাদের পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে? আমরা এ প্রতিশ্রুতি অনেক শুনেছি এবং আমাদের পূর্বে আমাদের বাপ-দাদারাও শুনে এসেছে। এগুলো নিছক পুরাতন কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।"[৭৭]

তাদেরকে জিজ্ঞেস করো ঃ যদি তোমরা জানো তাহলে বলো এ পৃথিবী এবং এর মধ্যে যারা বাস করে তারা কারা?

৭৪. এর অর্থ হচ্ছে, হতভাগারা! এ চোখ, কান, মন ও মস্তিষ্ক তোমাদের কি এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, পশুরা এদেরকে যেসব কাজে লাগায় তোমরাও এদেরকে সেসব কাজে লাগাবে। তোমরা কেবল পশুদের মতো দেহ ও প্রবৃত্তির দাবী পূরণ করার উপায় তালাশ করতে এবং সবসময় নিজের জীবনমান উন্নত করার কৌশল চিন্তা করতে থাকবে, এগুলোর উপযোগিতা কি শুধু এতটুকুই? তোমাদের মানুষ হিসেবে তৈরী করা

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ
وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾

তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহর। বলো, তাহলে তোমরা সচেতন হচ্ছো না কেন?[৭৮] তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, সাত আসমান ও মহান আরশের অধিপতি কে? তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ।[৭৯] বলো, তাহলে তোমরা ভয় করো না কেন?[৮০]

হয়েছিল কিন্তু তোমরা নিছক পশু হয়ে রইলে, এর চেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা কি আর কিছু হতে পারে? যেসব চোখ দিয়ে সবকিছু দেখা যায় কিন্তু শুধুমাত্র সত্যের দিকে পথ নির্দেশক চিহ্নগুলো দেখা যায় না, যেসব কান দিয়ে সবকিছু শোনা যায় কিন্তু একটি শিক্ষণীয় কথাই শুধু শোনা যায় না, যে মন-মস্তিষ্ক দিয়ে সবকিছু চিন্তা করা যায় কিন্তু শুধু এটুকু চিন্তা করা যায় না যে, আমি এ অস্তিত্ব কেমন করে লাভ করলাম, কেন লাভ করলাম এবং আমার জীবনের লক্ষ কি, সেসব চোখ, কান ও মন-মগজ যদি একটি গরুর পরিবর্তে একটি মানুষের দেহ কাঠামোতে অবস্থান করে তাহলে অবশ্যই আফসোস করতে হয়।

৭৫. জ্ঞানের উপকরণগুলো (ইন্দ্রিয়সমূহ ও চিন্তাশক্তি) ও তাদের সঠিক প্রয়োগের ব্যাপারে মানুষের গাফলতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার পর এখন কতকগুলো নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এসব নিদর্শন খোলা চোখে প্রত্যক্ষ করা হলে প্রত্যক্ষ করার পর সঠিকভাবে যুক্তি প্রদান করা হলে অথবা কান খোলা রেখে কোন ন্যায়সংগত যুক্তির কথা শোনা হলে মানুষ সত্যে পৌঁছে যেতে পারে। সে সাথে একথাও জানতে পারে যে, এ অস্তিত্ব জগতটি খোদা বিহীন অথবা বহু খোদার নির্মিত নয়। বরং এটি তাওহীদের তথা একক আল্লাহর সৃষ্টির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আর একথাও জানতে পারে যে, এটি উদ্দেশ্যহীন নয়, নিছক খেলা-তামাসা ও একটি অর্থহীন তেলেসমাতিও নয় বরং এ একটি বিজ্ঞানময় ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় মানুষের মতো স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন জীবের পক্ষে নিজের যাবতীয় কর্মের জবাবদিহি না করে মরে যাওয়ার পর এমনি এমনিই মাটিতে মিশে গিয়ে শেষ হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

৭৬. মনে রাখতে হবে, এখানে তাওহীদ ও মৃত্যু পরের জীবন সম্পর্কে এক সাথে যুক্তি প্রদান করা হচ্ছে এবং সামনের দিকে যেসব নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে সেগুলো থেকে শিরক ও আখেরাত অস্বীকৃতি বাতিল হওয়া সম্পর্কে যুক্তি পেশ করা হচ্ছে।

৭৭. মনে রাখতে হবে, তাদের আখেরাতকে অসম্ভব মনে করা কেবলমাত্র আখেরাতেরই অস্বীকৃতি ছিল না, আল্লাহর শক্তি ও জ্ঞানেরও অস্বীকৃতি ছিল।

৭৮. অর্থাৎ তাহলে একথা বোঝ না কেন যে, তিনি ছাড়া আর কেউ বন্দেগী লাভের অধিকারী নয় এবং তাঁর পক্ষে পৃথিবীর এই জনবসতিকে পুনর্বার সৃষ্টি করাও কোন কঠিন ব্যাপার নয়।

قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ﴿٨٩﴾ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ
بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٩٠﴾ مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ
اِلٰهٍ ۚ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ
اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٩١﴾ عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٩٢﴾

তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, বলো যদি তোমরা জেনে থাকো, কার কর্তৃত্ব[৮১] চলছে প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর? আর কে তিনি যিনি আশ্রয় দেন এবং তাঁর মোকাবিলায় কেউ আশ্রয় দিতে পারে না? তারা নিশ্চয়ই বলবে, এ বিষয়টি তো আল্লাহরই জন্য নির্ধারিত। বলো, তাহলে তোমরা বিভ্রান্ত হচ্ছো কোথায় থেকে?[৮২] যা সত্য তা আমি তাদের সামনে এনেছি এবং এরা যে মিথ্যেবাদী এতে কোন সন্দেহ নেই।[৮৩] আল্লাহ কাউকে নিজের সন্তানে পরিণত করেননি[৮৪] এবং তাঁর সাথে অন্য কোন ইলাহও নেই। যদি থাকতো তাহলে প্রত্যেক ইলাহ নিজের সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেতো। এবং তারপর তারা একজন অন্যজনের ওপর চড়াও হতো।[৮৫] এরা যেসব কথা তৈরী করে তা থেকে আল্লাহ পাক–পবিত্র। প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু তিনি জানেন।[৮৬] এরা যে শিরক নির্ধারণ করে তিনি তার ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

৭৯. মূলে لِلّٰه শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ "এসব জিনিসও আল্লাহর" তবে অনুবাদে নিছক আমাদের ভাষায় সুন্দর করে প্রকাশ করার জন্য সংশ্লিষ্ট বাকরীতি অবলম্বন করা হয়েছে।

৮০. অর্থাৎ তাহলে কেন তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে এবং তাঁর ছাড়া অন্যের বন্দেগী করতে ভয় করো না? কেন তোমরা এ ভয় করো না, আকাশ ও পৃথিবীর বাদশাহ যদি কখনো আমাদের কাছ থেকে হিসেব নেন তাহলে আমরা তাঁর কাছে কি জবাব দেবো?

৮১. মূলে مَلَكُوْت শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে مُلك (বাদশাহী) ও ملك (মালিকানা) উভয়েরই অর্থ। আর এর সংগে রয়েছে চরম আতিশয্যের অর্থও। এ বিস্তারিত বর্ণনার প্রেক্ষিতে আয়াতে পেশকৃত প্রশ্নের পূর্ণ অর্থ হচ্ছে : প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর নিরংকুশ কর্তৃত্ব কার এবং প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর পুরোপুরি মালিকানা ক্ষমতা আছে কার হাতে?"

৮২. মূলে আছে দু'টি শব্দ اَنّٰى تُسْحَرُوْنَ-এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে, "কোথায় থেকে তোমরা যাদুকৃক হচ্ছো ?" যাদু ও তেলেসমাতের স্বরূপ এভাবে বর্ণনা করা যায় যে, একটি জিনিসকে তার আসল অর্থ, তাৎপর্য ও সঠিক চেহারার বিপরীতে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় এবং দর্শকের মনে এরূপ ভুল ধারণা সৃষ্টি করে যে, যাদুকর কৃত্রিমভাবে যা পেশ করছে তা-ই হচ্ছে ঐ জিনিসের আসল স্বরূপ। কাজেই আয়াতে যে প্রশ্ন করা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে, কে তোমাদের ওপর এমন যাদু করে দিয়েছে যার ফলে এসব কথা জানা সত্ত্বেও প্রকৃত সত্য তোমরা বুঝতে পারছো না ? কার যাদু তোমাদেরকে এমন উদভ্রান্ত করে দিয়েছে, যার ফলে যে মালিক নয় তাকে তোমরা মালিক বা তার শরীক হিসেবে দেখছো এবং যারা কোনো কর্তৃত্বের অধিকারী নয় তাদেরকে তোমরা আসল কর্তৃত্বের অধিকারীর মতো বরং তাঁর চাইতেও বেশী বন্দেগীর হকদার মনে করছো ? কে তোমাদের চোখে আবরণ দিয়েছে, যার ফলে যে আল্লাহ সম্পর্কে তোমরা একথা স্বীকার করো যে, তাঁর মোকাবিলায় কোনো আশ্রয়দাতা নেই তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো এবং যারা তাঁর হাত থেকে তোমাদেরকে বাঁচাতে পারে না তাদের আশ্রয়ের ওপর ভরসা করছো ? কে তোমাদেরকে এ প্রতারণার মধ্যে ফেলে দিয়েছে যে, যিনি প্রত্যেকটি জিনিসের মালিক তিনি তোমাদেরকে তাঁর জিনিসগুলো কিভাবে ব্যবহার করেছো সেকথা কখনো জিজ্ঞেস করবেন না এবং যিনি সারা বিশ্ব-জগতের একচ্ছত্র অধিপতি তিনি কখনো তোমাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না যে, তাঁর রাজত্বের মধ্যে তোমরা নিজেদের রাজত্ব চালাবার অথবা অন্যদের রাজত্ব মেনে নেবার অধিকার কোথায় থেকে লাভ করলে ? কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যাদুর অভিযোগ এনেছিল এ বিষয়টি যদি সামনে থাকে তাহলে প্রশ্নের ধরন আরো বেশী অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। অনুরূপভাবে প্রশ্নের এ শব্দাবলীর মধ্যে এ বিষয়বস্তুটিও ফুটে উঠেছে যে, নির্বোধের দল! যিনি তোমাদেরকে আসল সত্যটি (তোমাদের স্বীকৃতি অনুযায়ী যার আসল সত্য হওয়া উচিত) বলেন, তিনি তো তোমাদের চোখে যাদুকর আর যারা রাতদিন তোমাদেরকে সত্য বিরোধী কথা বলে বেড়ায় এমনকি যারা তোমাদেরকে সুস্পষ্ট বুদ্ধি ও যুক্তি বিরোধী, অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ বিরোধী, তোমাদের নিজেদের স্বীকৃত সত্য বিরোধী প্রকাশ্য মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথায় বিশ্বাসী করে দিয়েছে তারাই যে আসল যাদুকর তাদের সম্পর্কে তোমাদের মনে কখনো এ সন্দেহ জাগে না।

৮৩. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সার্বভৌম ক্ষমতার (আল্লাহর গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকার অথবা সেগুলোর কোন অংশ) অধিকারী নিজেদের একথায় তারা মিথ্যেবাদী। আর মৃত্যুর পর পুর্নবার জীবন সম্ভব নয়, একথায়ও মিথ্যেবাদী। তাদের মিথ্যা তাদের নিজেদের স্বীকৃতিগুলো থেকে প্রমাণিত। একদিকে আল্লাহকে পৃথিবী ও আকাশের মালিক ও সব জিনিসের ওপর ক্ষমতাশালী বলে মেনে নেয়া এবং অন্যদিকে একথা বলা যে, তিনিই একমাত্র সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী নন বরং অন্যদেরও (যারা অনিবার্যভাবে তাঁর অধীনই হবে) তাতে কোন অংশ আছে, এ দু'টি কথা সুস্পষ্টভাবে পরস্পর বিরোধী। অনুরূপভাবে একদিকে আমাদেরকে ও এ বিশাল বিশ্ব-জাহানকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন বলে স্বীকার করা এবং অন্যদিকে আল্লাহ তাঁর নিজেরই তৈরী করা সৃষ্টিকে দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করতে পারেন না বলে দাবী করা একেবারেই বুদ্ধি ও যুক্তি বিরোধী কথা। কাজেই তাদের মেনে নেয়া সত্য থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, শিরক করা ও আখেরাত অস্বীকার করা দু'টোই তাদের অবলম্বিত মিথ্যা বিশ্বাস।

৮৪. এখানে কেউ যেন এ ভুল ধারণা না করে বসেন যে, নিছক খৃষ্টবাদের প্রতিবাদে একথা বলা হয়েছে। না, আরবের মুশরিকরাও নিজেদের উপাস্যদেরকে আল্লাহর সন্তান গণ্য করতো। এ ভ্রষ্টতার ব্যাপারে দুনিয়ার অধিকাংশ মুশরিক ছিল তাদের সহযোগী। যেহেতু খৃষ্টানদের "খোদার পুত্র" আকীদাটির প্রচার বেশী হয়ে গেছে তাই কোন কোন শ্রেষ্ঠ মুফাস্সিরও এ ভুল ধারণা প্রকাশ করেছেন যে, এ আয়াতটি তারই প্রতিবাদে নাযিল হয়েছে। অথচ শুরু থেকেই মক্কার কাফেরদেরকে উদ্দেশ করে কথা বলা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তারাই থেকেছে সমগ্র ভাষণটির মূল লক্ষ। এ প্রেক্ষাপটে হঠাৎ বক্তব্য খৃষ্টানদের দিকে মোড় নেয়ার কোন অর্থই হয় না। তবে আনুসংগিকভাবে এর মধ্য দিয়ে খৃষ্টান–মুশরিক নির্বিশেষে যারাই আল্লাহর সাথে নিজেদের উপাস্য ও নেতাদের বংশধারা মিলিয়ে দেয় তাদের সবার আকীদা–বিশ্বাসের খণ্ডন হয়ে যায়।

৮৫. অর্থাৎ বিশ্ব–জাহানের বিভিন্ন শক্তির ও বিভিন্ন অংশের স্রষ্টা ও প্রভু হতো আলাদা আলাদা ইলাহ এবং এরপরও তাদের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা বজায় থাকতো যেমন তোমরা এ সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থার অসংখ্য শক্তি ও বস্তু এবং অগণিত গ্রহ–নক্ষত্রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছো, এটা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। বিশ্ব–জাহানের নিয়ম শৃংখলা ও তার বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক একাত্মতা স্পষ্টতই প্রমাণ করছে যে, এর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একজন একক আল্লাহর হাতে কেন্দ্রীভূত। যদি কর্তৃত্ব বিভক্ত হতো তাহলে কর্তৃত্বশীলদের মধ্যে অনিবার্যভাবে মতবিরোধ সৃষ্টি হতো। আর এ মতবিরোধ তাদের মধ্যে সংঘর্ষ ও যুদ্ধ পর্যন্ত না পৌছে ছাড়তো না। এ বক্তব্যই সূরা আম্বিয়ায় এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا

"যদি পৃথিবী ও আকাশে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ থাকতো তাহলে এ উভয়ের ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতো।" (২২ আয়াত)

সূরা বনী ইসরাঈলেও এ একই যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে ঃ

لَوْ كَانَ مَعَهٗ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا

"যদি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহও থাকতো, যেমন লোকেরা বলে, তাহলে নিশ্চয়ই তারা আরশের মালিকের স্থানে পৌছুবার চেষ্টা করতো।"

(ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন বনী ইসরাঈল, ৪৭ এবং আল আম্বিয়া, ২২ টীকা)।

৮৬. কোন কোন সমাজে একটা বিশেষ ধরনের শিরক দেখতে পাওয়া যায়। এর প্রাথমিক রূপ হলো শাফায়াত বা সুপারিশ করে পরকালের মুক্তি নিশ্চিত করার ক্ষমতা সংক্রান্ত মুশরিকী আকীদা। তারপর আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য কোন কোন সত্তার অদৃশ্য ও ভূত–ভবিষ্যতের জ্ঞান আছে বলে ধারণা করা।

এখানে এ বিশেষ ধরনের শিরকের প্রতি একটি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে, আয়াতটি এ শিরকের উভয় দিককে খণ্ডন করে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, ত্বা–হা, ৮৫ ও ৮৬ এবং আল আম্বিয়া, ২৭ টীকা)।

قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّىْ مَا يُوْعَدُوْنَ ﴿٩٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِىْ فِى الْقَوْمِ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٤﴾ وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ﴿٩٥﴾ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ
هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ۗ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ﴿٩٦﴾ وَقُلْ رَّبِّ
اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٩٧﴾ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ﴿٩٨﴾

৬ রুকূ'

হে মুহাম্মাদ (সা)! দোয়া করো, "হে আমার রব! এদেরকে যে আযাবের হুমকি দেয়া হচ্ছে, তুমি যদি আমার উপস্থিতিতে সে আযাব আনো তাহলে হে পরওয়ারদিগার! আমাকে এ জালেমদের অন্তরভুক্ত করো না।[৮৭] আর আসল ব্যাপার হচ্ছে, তোমার চোখের সামনে আমার সে জিনিস আনার পূর্ণ শক্তি আছে যার হুমকি আমি তাদেরকে দিচ্ছি।

হে মুহাম্মাদ (সা)! মন্দকে দূর করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। তারা তোমার সম্পর্কে যেসব কথা বলে তা আমি খুব ভালো করেই জানি। আর দোয়া করো, হে আমার রব! আমি শয়তানদের উস্কানি থেকে তোমার আশ্রয় চাই। এমনকি হে ! পরওয়ারদিগার, সে আমার কাছে আসুক এ থেকেও তো আমি তোমার আশ্রয় চাই।[৮৮]

৮৭. এর অর্থ এ নয় যে, নাউযুবিল্লাহ! নবী সাল্লাল্লাহু আইলাহি ওয়া সাল্লামের ওপরও সে আযাব আসার কোন আশংকা ছিল অথবা তিনি দোয়া না চাইলে তাঁর ওপর এ আযাব এসে যেতো। বরং এ ধরনের বর্ণনাভংগী অবলম্বন করা হয়েছে কেবল এ ধারণা সৃষ্টি করার জন্য যে, আল্লাহর আযাব অবশ্যি ভয় করার মতো জিনিস। এ আযাব দাবী করে চেয়ে নেবার মতো জিনিস নয় এবং যদি আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ ও ধৈর্যশীলতার কারণে তা নিয়ে আসতে বিলম্ব করে থাকেন তাহলে নিশ্চিন্তে নাফরমানি ও শয়তানির কাজ করে যেতে থাকাও উচিত নয়। আসলে তা এমন ভয়াবহ জিনিস যে, কেবল গোনাহগারদেরই নয়, নেক্কারদেরও নিজেদের সমস্ত নেকী ও সৎকাজ সত্ত্বেও তা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া উচিত। এছাড়াও এর মধ্যে আর একটি দিকও রয়েছে। অর্থাৎ সামষ্টিক গোনাহর ফলে যখন আযাবের গাড়ি চলতে থাকে তখন তার তলায় কেবল খারাপ লোকরাই পিষ্ট হয় না বরং তাদের সাথে সাথে অনেক সময় ভালো লোকও পিষ্ট হয়ে যায়। কাজেই একটি ভ্রষ্ট ও অসৎ সমাজে বাসকারী প্রত্যেক সৎব্যক্তিকে সবসময় আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে থাকা উচিত। কেউ জানে না কবে কোন্ পরিস্থিতিতে জালেমদের ওপর আল্লাহর শাস্তি নাযিল হতে থাকবে এবং কে তার চাকার তলায় পিষ্ট হবে।

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّىْٓ اَعْمَلُ
صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۭ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ۭ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ
اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٠٠﴾

(এরা নিজেদের কৃতকর্ম থেকে বিরত হবে না) এমনকি যখন এদের কারোর মৃত্যু উপস্থিত হবে তখন বলতে থাকবে, "হে আমার রব ! যে দুনিয়াটা আমি ছেড়ে চলে এসেছি সেখানেই আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দাও,[৮৯] আশা করি এখন আমি সৎকাজ করবো।"[৯০] কখনোই নয়,[৯১] এটা তার প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়।[৯২] এখন এ মৃতদের পেছনে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে একটি অন্তরবর্তীকালীন যুগ—বরযখ যা পরবর্তী জীবনের দিন পর্যন্ত থাকবে।[৯৩]

৮৮. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আন'আম, ৭১ ও ৭২; আল আ'রাফ, ১৩৮ ও ১৫০ থেকে ১৫৩; ইউনুস, ৩৯; আল হিজর, ৪৮; আন নাহল, ১২২ থেকে ১২৪; বনী ইসরাঈল, ৫৮ থেকে ৬৩ এবং হা-মীম আস্ সাজ্‌দাহ, ৩৬ থেকে ৪১ টীকা।

৮৯. মূলে رَبِّ ارْجِعُوْنِ শব্দ দু'টি ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহকে সম্বোধন করে বহুবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে আবেদন করার একটি কারণ এ হতে পারে যে, এটি সম্মানার্থে করা হয়েছে যেমন বিভিন্ন ভাষায় এ পদ্ধতির প্রচলন আছে। দ্বিতীয় কারণ কেউ কেউ এও বর্ণনা করেছেন যে, আবেদনের শব্দ বারবার উচ্চারণ করার ধারণা দেবার জন্য এভাবে বলা হয়েছে। যেমন তা ارْجِعْنِىْ ارْجِعْنِىْ ارْجِعْنِىْ (আমাকে ফেরত পাঠাও, আমাকে ফেরত পাঠাও, আমাকে ফেরত পাঠাও) এর অর্থ প্রকাশ করে। এ ছাড়া কোন কোন মুফাস্‌সির এ ধারণা প্রকাশ করেছেন যে, رَبِّ সম্বোধন করা হয়েছে আল্লাহকে এবং ارْجِعُوْنِ শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে এমন সব ফেরেশতাদেরকে যারা সংশ্লিষ্ট অপরাধী আত্মাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। অর্থাৎ কথাটি এভাবে বলা হয়, "হায়! আমার রব, আমাকে ফেরত পাঠাও।"

৯০. কুরআন মজীদের বহু জায়গায় এ বক্তব্যটি উচ্চারিত হয়েছে। অপরাধীরা মৃত্যুর সীমানায় প্রবেশ করার সময় থেকে নিয়ে আখেরাতে প্রবেশ করে জাহান্নামে দাখিল হওয়া পর্যন্ত বরং তার পরও বারবার এ আবেদনই করতে থাকবে : আমাদের আর একবার মাত্র দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হোক। এখন আমরা তাওবা করছি, আর কখনো নাফরমানি করবো না, এবার আমরা সোজা পথে চলবো। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, সূরা আল আন'আম, ২৭ ও ২৮; আল আ'রাফ, ৫৩; ইবরাহীম, ৪৪ ও ৪৫; আল মু'মিনূন, ১০৫ থেকে ১১৫; আশ শু'আরা, ১০২; আস সাজ্‌দাহ, ১২ থেকে ১৪; ফাতের, ৩৭; আয্ যুমার, ৫৮ ও ৫৯; আল মু'মিন, ১০ থেকে ১২ ও আশ্ শূরা, ৪৪ আয়াত এবং এ সংগে টীকাগুলোও)।

৯১. অর্থাৎ ফেরত পাঠানো হবে না। নতুন করে কাজ শুরু করার জন্য তাকে আর দ্বিতীয় কোন সুযোগ দেয়া যেতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে, মানুষকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾
فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ
مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾
تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾

তারপর যখনই শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন তাদের মধ্যে আর কোন আত্মীয়তা বা সম্পর্ক থাকবে না এবং তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেসও করবে না।[৯৪] সে সময় যাদের পাল্লা ভারী হবে[৯৫] তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই হবে এমনসব লোক যারা নিজেদেরকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে।[৯৬] তারা জাহান্নামে থাকবে চিরকাল। আগুন তাদের মুখের চামড়া জ্বালিয়ে দেবে এবং তাদের চোয়াল বাইরে বের হয়ে আসবে।[৯৭] —"তোমরা কি সেসব লোক নও যাদের কাছে আমার আয়াত শুনানো হলেই বলতে এটা মিথ্যা? "

করার জন্য পুনরায় যদি এ দুনিয়ায় ফেরত পাঠানো হয় তাহলে অনিবার্যভাবে দু'টি অবস্থার মধ্য থেকে একটি অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে। মৃত্যুর পর সে যা কিছু করেছে সেসব তার স্মৃতি ও চেতনায় সংরক্ষিত করে রাখতে হবে। অথবা এসব কিছু নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে প্রথমবার যেমন স্মৃতির কোঠা শূন্য করে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল ঠিক তেমনি অবস্থায় আবার তাকে সৃষ্টি করা হবে। উল্লেখিত প্রথম অবস্থায় পরীক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ এ দুনিয়ায় মানুষ সত্যকে প্রত্যক্ষ না করে নিজেই বুদ্ধি-বিবেকের সাহায্যে সত্যকে জেনে তাকে মেনে নেয় কিনা এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতা করার স্বাধীনতা লাভ করা সত্ত্বেও এ দু'টি পথের মধ্য থেকে কোন্‌টি অবলম্বন করে—এরি ভিত্তিতেই হচ্ছে তার পরীক্ষা। এখন যদি তাকে সত্য দেখিয়েও দেয়া হয় এবং গোনাহের পরিণাম বাস্তবে দেখিয়ে দিয়ে গোনাহকে নির্বাচন করার পথই তার জন্য বন্ধ করে দেয়া হয় তাহলে এরপর তাকে পরীক্ষাগৃহে পাঠানোই অর্থহীন হয়ে যায়। এরপর কে ঈমান আনবে না এবং কে আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারবে? আর দ্বিতীয় অবস্থাটি সম্পর্কে বলা যায় যে, এটি পরীক্ষিতকে আবার পরীক্ষা করার মতো অবস্থা। যে ব্যক্তি একবার এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে তাকে আবার সে একই ধরনের আর একটি পরীক্ষায় পাঠানো নিরর্থক। কারণ সে আবার সেই আগের মতোই করবে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল বাকারাহ, ২২৮; আল আন'আম, ৬, ১৩৯ ও ১৪০ এবং ইউনুস, ২৬ টীকা)।

৯২. এ অনুবাদও হতে পারে, "এ তো এখন সে বলবেই।" এর অর্থ হচ্ছে, তার এ কথা ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য নয়। সর্বনাশ হবার পর এখন সে একথা বলবে না তো আর কি বলবে। এ নিছক কথার কথা। ফিরে আসবে যখন তখন আবার সেসব কিছু করবে যা আগে করে এসেছে। কাজেই তাকে প্রলাপ বকতে দাও ফেরার দরজা তার জন্য খোলা যেতে পারে না।

৯৩. "বরযখ" (بَرْزَخ) শব্দটি ফার্সী "পরদা" (پَردہ) শব্দটির আরবীকরণ। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, এখন তাদের ও দুনিয়ার মধ্যে রয়েছে একটি প্রতিবন্ধক। এটি তাদেরকে দুনিয়ায় ফিরে যেতে দেবে না এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারা দুনিয়া ও আখেরাতের মাঝখানের এ যবনিকার আড়ালে অবস্থান করবে।

৯৪. এর মানে এ নয় যে, বাপ আর বাপ থাকবে না এবং ছেলে ছেলে থাকবে না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, সে সময় বাপ ছেলের কোন কাজে লাগবে না এবং ছেলে বাপের কোন কাজে লাগবে না। প্রত্যেকে এমনভাবে নিজের অবস্থার শিকার হবে যে, একজন অন্যজনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা তো দূরের কথা কারোর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার মতো চেতনাও থাকবে না। অন্যান্য স্থানে এ বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا "কোন অন্তরংগ বন্ধু নিজের বন্ধুকে জিজ্ঞেস করবে না।" (আল মা'আরিজ, ১০ আয়াত)

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيْهِ ○ وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ○ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُؤْوِيْهِ ○ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ ثُمَّ يُنْجِيْهِ –

"সেদিন অপরাধীর মন তার নিজের সন্তান, স্ত্রী, ভাই ও নিজের সহায়তাকারী নিকটতম আত্মীয় এবং সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে এবং নিজেকে আযাব থেকে মুক্ত করতে চাইবে।" (আল মা'আরিজ, ১১ থেকে ১৪ আয়াত)।

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ○ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ○ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ○ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ○

"সেদিন মানুষ নিজের ভাই, মা, বাপ, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের থেকে পালাতে থাকবে। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের অবস্থার মধ্যে এমনভাবে লিপ্ত থাকবে যে, তার কারোর কথা মনে থাকবে না।" (আবাসা, ৩৪ থেকে ৩৭)

৯৫. অর্থাৎ যাদের নেক কাজের পাল্লা অসৎকাজের পাল্লা থেকে বেশী ভারী হবে।

৯৬. সূরার শুরুতে এবং তারপর চতুর্থ রুকূ'তে সাফল্য ও ক্ষতির যে মানদণ্ড পেশ করা হয়েছে তাকে আর একবার মনের মধ্যে চাংগা করে নিন।

৯৭. মূলে كَالِحُوْنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। كَالِح আরবী ভাষায় এমন চেহারাকে বলা হয় যার চামড়া আলাদা হয়ে গেছে এবং দাঁত বাইরে বের হয়ে এসেছে। যেমন খাশির

قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا
فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ اخْسَـُٔوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ﴿١٠٨﴾ اِنَّهٗ كَانَ
فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ
خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰٓى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيْ
وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ ﴿١١٠﴾ اِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْٓا اَنَّهُمْ
الْفَآئِزُوْنَ ﴿١١١﴾ قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ﴿١١٢﴾ قَالُوْا لَبِثْنَا
يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ الْعَآدِّيْنَ ﴿١١٣﴾

তারা বলবে, "হে আমাদের রব! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের ওপর ছেয়ে গিয়েছিল, আমরা সত্যিই ছিলাম বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। হে পরওয়ারদিগার! এখন আমাদের এখান থেকে বের করে দাও, আমরা যদি আবার এ ধরনের অপরাধ করি তাহলে আমরা জালেম হবো।" আল্লাহ জবাব দেবেন, "দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে, পড়ে থাকো ওরি মধ্যে এবং কথা বলো না আমার সাথে।[৯৮] তোমরা হচ্ছো তারাই, যখন আমার কিছু বান্দা বলতো, হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের প্রতি করুণা করো, তুমি সকল করুণাশীলের চাইতে বড় করুণাশীল, তখন তোমরা তাদেরকে বিদ্রূপ করতে, এমনকি তাদের প্রতি জিদ তোমাদের আমার কথাও ভুলিয়ে দেয় এবং তোমরা তাদেরকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে থাকতে। আজ তাদের সে সবরের ফল আমি এই দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম।"[৯৯] তারপর আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, "বলো, পৃথিবীতে তোমরা কত বছর থাকলে?" তারা বলবে, "এক দিন বা দিনেরও কিছু অংশে আমরা সেখানে অবস্থান করেছিলাম,[১০০] গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করে নিন।"

ভূনা মাথা। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে (রা) এক ব্যক্তি "কালেহ"–এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ ؟ الم تر الى الراس المشيط অর্থাৎ "তুমি কি ভূনা খাশির কল্লা দেখোনি?"

৯৮. অর্থাৎ নিজের মুক্তির জন্য আবেদন নিবেদন করো না। নিজের ওজর পেশ করো না। চিরকালের জন্য একেবারেই নীরব হয়ে যাও, এ অর্থ নয়। হাদীসের বর্ণনায় বলা হয়েছে,

قَلَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾ أَفَحَسِبْتُمْ
أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ
الْحَقُّ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ
إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾

বলবেন, "অল্পক্ষণই অবস্থান করেছিলে, হায়! যদি তোমরা একথা সে সময় জানতে।[১০১] তোমরা কি মনে করেছিলে আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি[১০২] এবং তোমাদের কখনো আমার দিকে ফিরে আসতে হবে না?"

কাজেই প্রকৃত বাদশাহ আল্লাহ হচ্ছেন উচ্চতর ও উন্নততর,[১০৩] তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, সম্মানিত আরশের তিনিই মালিক এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবূদকে ডাকে, যার পক্ষে তার কাছে কোন যুক্তি প্রমাণ নেই,[১০৪] তার হিসেব রয়েছে তার রবের কাছে।[১০৫] এ ধরনের কাফের কখনো সফলকাম হতে পারে না।[১০৬]

হে মুহাম্মাদ (সা)! বলো, "হে আমার রব! ক্ষমা করো ও করুণা করো এবং তুমি সকল করুণাশীলের চাইতে বড় করুণাশীল।"[১০৭]

এ হবে তাদের শেষ কথাবার্তা। এরপর তাদের কণ্ঠ চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু একথা বাহ্যত কুরআন বিরোধী। কারণ সামনের দিকে কুরআন নিজেই তাদের ও আল্লাহর মধ্যকার কথাবার্তা উদ্ধৃত করছে। কাজেই হয় হাদীসের এ বর্ণনা সঠিক নয় অথবা এর অর্থ হচ্ছে এই যে, এরপর তারা মুক্তির জন্য কোন আবেদন নিবেদন করতে পারবে না।

৯৯. আবার একই বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অর্থাৎ কে হবে সাফল্যের অধিকারী এবং কে ক্ষতির অধিকারী।

১০০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা-হা, ৮০ টীকা।

১০১. অর্থাৎ দুনিয়ায় আমার নবী ক্রমাগতভাবে তোমাদের বলেছেন যে, দুনিয়ার জীবন নিছক হাতে গোনা কয়েকটি পরীক্ষার ঘন্টা মাত্র। একেই আসল জীবন এবং একমাত্র জীবন মনে করে বসো না। আসল জীবন হচ্ছে আখেরাতের জীবন। সেখানে তোমাদের চিরকাল থাকতে হবে। এখানকার সাময়িক লাভ ও স্বাদ-আহলাদের লোভে এমন কাজ

করো না যা আখেরাতের চিরন্তন জীবনে তোমাদের ভবিষ্যত ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু তখন তোমরা তাঁর কথায় কান দাওনি। তোমরা এ আখেরাতের জগত অস্বীকার করতে থেকেছো। তোমরা মৃত্যুপরের জীবনকে একটি মনগড়া কাহিনী মনে করেছো। তোমরা নিজেদের এ ধারণার ওপর জোর দিতে থেকেছো যে, জীবন-মৃত্যুর ব্যাপারটি নিছক এ দুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত এবং এখানে চুটিয়ে মজা লুটে নিতে হবে। কাজেই এখন আর অনুশোচনা করে কী লাভ। তখনই ছিল সাবধান হবার সময় যখন তোমরা দুনিয়ার কয়েক দিনের জীবনের ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে এখানকার চিরন্তন জীবনের লাভ বিসর্জন দিচ্ছিলে।

১০২. মূলে عَبَثًا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর একটি অর্থ হচ্ছে, "খেলাচ্ছলে" এবং দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, "খেলার জন্য"। প্রথম অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে, "তোমরা কি মনে করেছিলে, তোমাদেরকে এমনিই খেলাচ্ছলে আমোদ-আহলাদ করতে করতে তৈরী করা হয়েছে, তোমাদের সৃষ্টির কোন লক্ষ ও উদ্দেশ্য নেই, নিছক একটি উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি হিসেবে তৈরী করে তোমাদের চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন?" দ্বিতীয় অবস্থায় এর অর্থ হবে, "তোমরা কি একথা মনে করতে যে, তোমাদেরকে নিছক খেলাধূলা, আমোদ- আহলাদ, ফূর্তি ও এমন সব আজেবাজে অর্থহীন কাজ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যেগুলোর কোনদিন কোন ফল হবে না?"

১০৩. অর্থাৎ তিনি কোন বাজে কাজ করার উর্ধে অবস্থান করেন এবং তাঁর কোন বান্দা ও গোলাম তাঁর প্রভুত্বের কার্যক্রমে তাঁর সাথে শরীক হবে এরও অনেক উর্ধে তাঁর অবস্থান।

১০৪. এর দ্বিতীয় অনুবাদ এই হতে পারে : "যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে মাবুদ হিসেবে ডাকে তার জন্য তার নিজের এ কাজের সপক্ষে কোন যুক্তি ও প্রমাণ নেই।

১০৫. অর্থাৎ সে জবাবদিহি ও হিসেব-নিকেশ থেকে রক্ষা পেতে পারে না।

১০৬. আবার সে একই বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে অর্থাৎ আসলে কে সাফল্য লাভকারী এবং কে তা থেকে বঞ্চিত?

১০৭. এখানে এ দোয়ার সূক্ষ্ম ও গভীর অর্থ দৃষ্টিসমক্ষে থাকা উচিত। এখনই কয়েক ছত্র ওপরে বলা হয়েছে, আখেরাতে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের দুশমনদেরকে একথা বলে মাফ করে দিতে অস্বীকার করবেন যে, আমার যেসব বান্দা এ দোয়া করতো তোমরা তাদেরকে বিদ্রূপ করতে। এরপর এখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (ও আনুসংগিকভাবে সাহাবায়ে কেরামকেও) এ হুকুম দেয়া হচ্ছে যে, ঠিক সে একই দোয়া করো যার কথা আমি এইমাত্র বলে এসেছি। আমার পরিষ্কার সতর্কবাণী সত্ত্বেও এখন যদি তারা তোমাকে বিদ্রূপ করতে থাকে তাহলে আখেরাতে যেন তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী মোকদ্দমা তৈরী করে দেবে।

আন্ নূর

২৪

নামকরণ

পঞ্চম রুকূ'র প্রথম আয়াত اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরাটি যে বনীল মুস্‌তালিক যুদ্ধের সময় নাযিল হয়, এ বিষয়ে সবাই একমত। কুরআনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত আয়েশার' (রা) বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের ঘটনা প্রসংগে এটি নাযিল হয়। (দ্বিতীয় ও তৃতীয় রুকূ'তে এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে)। আর সমস্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী বনীল মুস্‌তালিক যুদ্ধের সফরের মধ্যে এ ঘটনাটি ঘটে। কিন্তু এ যুদ্ধটি ৫ হিজরী সনে আহযাব যুদ্ধের আগে, না ৬ হিজরীতে আহযাব যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয় সে ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা যায়। আসল ঘটনাটি কি? এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের প্রয়োজন এ জন্য দেখা দিয়েছে যে, পরদার বিধান কুরআন মজীদের দু'টি সূরাতেই বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি সূরা হচ্ছে এটি এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সূরা আহযাব। আর আহযার যুদ্ধের সময় সূরা আহযাব নাযিল হয় এ ব্যাপারে কারোর দ্বিমত নেই। এখন যদি আহযাব যুদ্ধ প্রথমে হয়ে থাকে তাহলে এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, পরদার বিধানের সূচনা হয় সূরা আহযাবে নাযিলকৃত নির্দেশসমূহের মাধ্যমে এবং তাকে পূর্ণতা দান করে এ সূরায় বর্ণিত নির্দেশগুলো। আর যদি বনীল মুস্‌তালিক যুদ্ধ প্রথমে হয়ে থাকে তাহলে বিধানের বিন্যাস পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সূচনা সূরা নূর থেকে এবং তার পূর্ণতা সূরা আহযাবে বর্ণিত বিধানের মাধ্যমে বলে মেনে নিতে হয়। এভাবে হিজাব বা পরদার বিধানে ইসলামী আইন ব্যবস্থার যে যৌক্তিকতা নিহিত রয়েছে তা অনুধাবন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ উদ্দেশ্যে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবার আগে নাযিলের সময়কালটি অনুসন্ধান করে বের করে নেয়া জরুরী মনে করি।

ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন বনীল মুস্‌তালিক যুদ্ধ হিজরী ৫ সনের শাবান মাসে অনুষ্ঠিত হয় এবং তারপর ঐ বছরেরই যিলকাদ মাসে সংঘটিত হয় আহযাব (বা খন্দক) যুদ্ধ। এর সমর্থনে সবচেয়ে বড় সাক্ষ হচ্ছে এই যে, হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের ঘটনা প্রসংগে হযরত আয়েশা (রা) থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর কোন কোনটিতে হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা) ও হযরত সা'দ ইবনে মু'আযের (রা) বিবাদের কথা পাওয়া যায়। আর সমস্ত নির্ভরযোগ্য হাদীস অনুযায়ী হযরত সা'দ ইবনে মু'আযের ইন্তিকাল হয় বনী কুরাইযা যুদ্ধে। আহযাব যুদ্ধের পরপরই এ যুদ্ধটি অনুষ্ঠিত হয়। কাজেই ৬ হিজরীতে তাঁর উপস্থিত থাকার কোন সম্ভাবনাই নেই।

অন্যদিকে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, আহযাব যুদ্ধ ৫ হিজরীর শওয়াল মাসের ঘটনা এবং বনীল মুস্‌তালিকের যুদ্ধ হয় ৬ হিজরীর শাবান মাসে। এ প্রসংগে হযরত আয়েশা (রা) ও অন্যান্য লোকদের থেকে যে অসংখ্য নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলো এর সমর্থন করে। সেগুলো থেকে জানা যায়, মিথ্যা অপবাদের ঘটনার পূর্বে হিজাব বা পরদার বিধান নাযিল হয় আর এ বিধান পাওয়া যায় সূরা আহযাবে। এ থেকে জানা যায়, সে সময় হযরত যয়নবের (রা) সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল এবং এ বিয়ে ৫ হিজরীর যিল্‌কদ মাসের ঘটনা। সূরা আহযাবে এ ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ছাড়া এ হাদীসগুলো থেকে একথাও জানা যায় যে, হযরত যয়নবের (রা) বোন হাম্‌না বিনতে জাহ্‌শ হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে অপবাদ ছড়ানোয় শুধুমাত্র এ জন্য অংশ নিয়েছিলেন যে, হযরত আয়েশা তাঁর বোনের সতিন ছিলেন। আর একথা সুস্পষ্ট যে, বোনের সতিনের বিরুদ্ধে এ ধরনের মনোভাব সৃষ্টি হবার জন্য সতিনী সম্পর্ক শুরু হবার পর কিছুকাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। এসব সাক্ষ ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকে শক্তিশালী করে দেয়।

মিথ্যাচারের ঘটনার সময় হযরত সা'দ ইবনে মু'আযের (রা) উপস্থিতির বর্ণনা থাকাটাই এ বর্ণনাটি মেনে নেবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এ ঘটনা প্রসংগে হযরত আয়েশা (রা) থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার কোনটিতে হযরত সা'দ ইবনে মু'আযের কথা বলা হয়েছে আবার কোনটিতে বলা হয়েছে তাঁর পরিবর্তে হযরত উসাইদ ইবনে হুদ্বাইরের (রা) কথা, এ জিনিসটিই এ সংকট দূর করে দেয়। আর এ দ্বিতীয় বর্ণনাটি এ প্রসংগে হযরত আয়েশা বর্ণিত অন্যান্য ঘটনাবলীর সাথে পুরোপুরি খাপখেয়ে যায়। অন্যথায় নিছক সা'দ ইবনে মু'আযের জীবনকালের সাথে খাপ খাওয়াবার জন্য যদি বনীল মুস্‌তালিক যুদ্ধ ও মিথ্যাচারের কাহিনীকে আহ্‌যাব ও কুরাইযা যুদ্ধের আগের ঘটনা বলে মেনে নেয়া হয়, তাহলে তো হিজাবের আয়াত নাযিল হওয়া ও যয়নবের (রা) বিয়ের ঘটনা তার পূর্বে সংঘটিত হওয়া উচিত ছিল। এ অবস্থায় এ জটিলতার গ্রন্থী উন্মোচন করা কোনক্রমেই সম্ভব হয় না। অথচ কুরআন ও অসংখ্য সহীহ হাদীস উভয়ই সাক্ষ দিচ্ছে যে, যয়নবের (রা) বিয়ে ও হিজাবের হুকুম আহ্‌যাব ও কুরাইযার পরবর্তী ঘটনা। এ কারণেই ইবনে হাযম ও ইবনে কাইয়েম এবং অন্য কতিপয় গবেষক মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকেই সঠিক গণ্য করেছেন এবং আমরাও একে সঠিক মনে করি।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এখন অনুসন্ধানের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হবার পর যে, সূরা নূর ৬ হিজরীর শেষার্ধে সূরা আহ্‌যাবের কয়েক মাস পর নাযিল হয়, যে অবস্থায় এ সূরাটি নাযিল হয় তার ওপর আমাদের একটু নজর বুলিয়ে নেয়া উচিত। বদর যুদ্ধে জয়লাভ করার পর আরবে ইসলামী আন্দোলনের যে উত্থান শুরু হয় খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত পৌছুতে পৌছুতেই তা এত বেশী ব্যাপকতা লাভ করে যার ফলে মুশরিক, ইহুদী, মুনাফিক ও দোমনা সংশয়ী নির্বিশেষে সবাই একথা অনুভব করতে থাকে যে, এ নব উত্থিত শক্তিটিকে শুধুমাত্র অস্ত্র ও সমর শক্তির মাধ্যমে পরাস্ত করা যেতে পারে না। খন্দকের যুদ্ধে তারা এক জোট হয়ে দশ হাজার সেনা নিয়ে মদীনা আক্রমণ করেছিল। কিন্তু মদীনা উপকণ্ঠে এক মাস ধরে মাথা

কুটবার পর শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ মনোরথ হয়ে চলে যায়। তাদের ফিরে যাওয়ার সাথে সাথেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করে দেন ঃ

لَنْ تَغْزُوَكُمْ قُرَيْشٌ بَعْدَ عَامِكُمْ هٰذَا وَلٰكِنَّكُمْ تَغْزُوْنَهُمْ

"এ বছরের পর কুরাইশরা আর তোমাদের ওপর হামলা করবে না বরং তোমরা তাদের ওপর হামলা করবে।" (ইবনে হিশাম ২৬৬ পৃষ্ঠা)।

রসূল (সা)–এর এ উক্তি দ্বারা প্রকারান্তরে একথাই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ইসলাম বিরোধী শক্তির অগ্রগতির ক্ষমতা নিশেষ হয়ে গেছে, এবার থেকে ইসলাম আর আত্মরক্ষার নয় বরং অগ্রগতির লড়াই লড়বে এবং কুফরকে অগ্রগতির পরিবর্তে আত্মরক্ষার লড়াই লড়তে হবে। এটি ছিল অবস্থার একেবারে সঠিক ও বাস্তব বিশ্লেষণ। প্রতিপক্ষও ভালোভাবে এটা অনুভব করছিল।

মুসলমানদের সংখ্যা ইসলামের এ উত্তরোত্তর উন্নতির আসল কারণ ছিল না। বদর থেকে খন্দক পর্যন্ত প্রত্যেক যুদ্ধে কাফেররা তাদের চাইতে বেশী শক্তির সমাবেশ ঘটায়। অন্যদিকে জনসংখ্যার দিক দিয়েও সে সময় মুসলমানরা আরবে বড় জোর ছিল দশ ভাগের এক ভাগ। মুসলমানদের উন্নত মানের অস্ত্রসম্ভারও এ উন্নতির মূল কারণ ছিল না। সব ধরনের অস্ত্র–শস্ত্র ও যুদ্ধের সাজ–সরঞ্জামে কাফেরদের পাল্লা ভারী ছিল। অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির দিক দিয়েও তাদের সাথে মুসলমানদের কোন তুলনাই ছিল না। কাফেরদের কাছে ছিল সমস্ত আরবের আর্থিক উপায় উপকরণ। অন্যদিকে মুসলমানরা অনাহারে মরছিল। কাফেরদের পেছনে ছিল সমগ্র আরবের মুশরিক সমাজ ও আহলি কিতাব গোত্রগুলো। অন্যদিকে মুসলমানরা একটি নতুন জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে পুরাতন ব্যবস্থার সকল সমর্থকের সহানুভূতি হারিয়ে ফেলেছিল। এহেন অবস্থায় যে জিনিসটি মুসলমানদের ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেটি ছিল আসলে তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব। ইসলামের সকল শত্রুদলই এটা অনুভব করছিল। একদিকে তারা দেখছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের নির্মল নিষ্কলুষ চরিত্র। এ চরিত্রের পবিত্রতা, দৃঢ়তা ও শক্তিমত্তা মানুষের হৃদয় জয় করে চলছে। অন্যদিকে তারা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক নৈতিক পবিত্রতা মুসলমানদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্য, শৃংখলা ও সংহতি সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং এর সামনে মুশরিকদের শিথিল সামাজিক ব্যবস্থাপনা যুদ্ধ ও শান্তি উভয় অবস্থায়ই পরাজয় বরণ করে চলছে।

নিকৃষ্ট স্বভাবের লোকদের বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, তাদের চোখে যখন অন্যের গুণাবলী ও নিজেদের দুর্বলতাগুলো পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে এবং তারা এটাও যখন বুঝতে পারে যে, প্রতিপক্ষের সৎগুণাবলী তাকে এগিয়ে দিচ্ছে এবং তাদের নিজেদের দোষ–ত্রুটিগুলো তাদেরকে নিম্নগামী করছে তখন তাদের মনে নিজেদের ত্রুটিগুলো দূর করে প্রতিপক্ষের গুণাবলীর আয়ত্ব করে নেবার চিন্তা জাগে না, বরং তারা চিন্তা করতে থাকে যেভাবেই হোক নিজেদের অনুরূপ দুর্বলতা তার মধ্যেও ঢুকিয়ে দিতে হবে। আর এটা সম্ভব না হলে কমপক্ষে তার বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার চালাতে হবে, যাতে জনগণ বুঝতে পারে যে, প্রতিপক্ষের যত গুণই থাক, সেই সাথে তাদের কিছু না কিছু দোষ–ত্রুটিও আছে। এ হীন

মানসিকতাই ইসলামের শত্রুদের কর্মতৎপরতার গতি সামরিক কার্যক্রমের দিক থেকে সরিয়ে নিকৃষ্ট ধরনের নাশকতা ও আভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টির দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছে। আর যেহেতু এ কাজটি বাইরের শত্রুদের তুলনায় মুসলমানদের ভেতরের মুনাফিকরা সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারতো তাই পরিকল্পিতভাবে বা পরিকল্পনা ছাড়াই স্থিরিকৃত হয় যে, মদীনার মুনাফিকরা ভেতর থেকে গোলমাল পাকাবে এবং ইহুদী ও মুশরিকরা বাইর থেকে তার ফলে যত বেশী পারে লাভবান হবার চেষ্টা করবে।

৫ হিজরী যিলকদ মাসে ঘটে এ নতুন কৌশলটির প্রথম আত্মপ্রকাশ। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব থেকে পালক পুত্র* সংক্রান্ত জাহেলী রীতি নির্মূল করার জন্য নিজেই নিজের পালক পুত্রের [যায়েদ (রা) ইবনে হারেসা] তালাক দেয়া স্ত্রীকে [যয়নব (রা) বিনতে জাহ্‌শ] বিয়ে করেন। এ সময় মদীনার মুনাফিকরা অপপ্রচারের এক বিরাট তাণ্ডব সৃষ্টি করে। বাইর থেকে ইহুদী ও মুশরিকরাও তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মিথ্যা অপবাদ রটাতে শুরু করে। তারা অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প তৈরী করে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে থাকে। যেমন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে তার পালক পুত্রের স্ত্রীকে দেখে তার প্রেমে পড়ে যান (নাউযুবিল্লাহ)। কিভাবে পুত্র তাঁর প্রেমের খবর পেয়ে যায় এবং তার পর নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার ওপর থেকে নিজের অধিকার প্রত্যাহার করে; তারপর কিভাবে তিনি নিজের পুত্রবধূকে বিয়ে করেন। এ গল্পগুলো এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয় যে, মুসলমানরাও এগুলোর প্রভাবমুক্ত থাকতে পারেনি। এ কারণে মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সিরদের একটি দল হযরত যয়নব ও যায়েদের সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলোর মধ্যে আজো ঐসব মনগড়া গল্পের অংশ পাওয়া যায়। পশ্চিমের প্রাচ্যবিদরা খুব ভালো করে লবণ মরিচ মাখিয়ে নিজেদের বইতে এসব পরিবেশন করেছেন। অথচ হযরত যয়নব (রা) ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন ফুফুর (উমাইমাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব) মেয়ে। তাঁর সমগ্র শৈশব থেকে যৌবনকাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখের সামনে অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁকে ঘটনাক্রমে একদিন দেখে নেয়া এবং নাউযুবিল্লাহ তাঁর প্রেমে পড়ে যাওয়ার কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। আবার এ ঘটনার মাত্র এক বছর আগে নবী (সা) নিজেই চাপ দিয়ে তাঁকে হযরত যায়েদকে (রা) বিয়ে করতে বাধ্য করেন। তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাহ্‌শ এ বিয়েতে অসন্তুষ্ট ছিলেন। হযরত যয়নব (রা) নিজেও এতে রাজী ছিলেন না। কারণ কুরাইশদের এক শ্রেষ্ঠ অভিজাত পরিবারের মেয়ে একজন মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামের পত্নী হওয়াকে স্বভাবতই মেনে নিতে পারতো না। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবলমাত্র মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার সূচনা নিজের পরিবার থেকে শুরু করার জন্যই হযরত যয়নবকে (রা) এ বিয়েতে রাজী হতে বাধ্য করেন। এসব কথা বন্ধু ও শত্রু সবাই জানতো। আর এ কথাও সবাই জানতো, হযরত যয়নবের বংশীয় আভিজাত্যবোধই তাঁর ও যায়েদ ইবনে হারেসার মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্ক স্থায়ী হতে দেয়নি এবং শেষ পর্যন্ত তালাক হয়ে যায়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও নির্লজ্জ মিথ্যা অপবাদকারীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর জঘন্য ধরনের নৈতিক দোষারোপ করে এবং এত ব্যাপক আকারে সেগুলো ছড়ায় যে, আজো পর্যন্ত তাদের এ মিথ্যা প্রচারণার প্রভাব দেখা যায়।

* অন্যের পুত্রকে নিজের পুত্র বানিয়ে নেয়া এবং পরিবারের মধ্যে তাকে পুরোপুরি ঔরশজাত সন্তানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা।

এরপর দ্বিতীয় হামলা করা হয় বনীল মুস্‌তালিক যুদ্ধের সময়। প্রথম হামলার চাইতে এটি ছিল বেশী মারাত্মক। বনীল মুস্‌তালিক গোত্রটি বনী খুযা'আর একটি শাখা ছিল। তারা বাস করতো লোহিত সাগর উপকূলে জেদ্দা ও রাবেগের মাঝখানে কুদাইদ এলাকায়। যে ঝরণাধারাটির আশপাশে এ উপজাতীয় লোকেরা বাস করতো তার নাম ছিল মুরাইসী। এ কারণে হাদীসে এ যুদ্ধটিকে মুরাইসী'র যুদ্ধও বলা হয়েছে। চিত্রের মাধ্যমে তাদের সঠিক অবস্থানস্থল জানা যেতে পারে।

৬ হিজরীর শাবান মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর পান, তারা মুসলমানদের ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং অন্যান্য উপাজাতিকেও একত্র করার চেষ্টা করছে। এ খবর পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি ষড়যন্ত্রটিকে অংকুরেই গুঁড়িয়ে দেবার জন্য একটি সেনাদল নিয়ে সেদিকে রওয়ানা হয়ে যান। এ অভিযানে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও বিপুল সংখ্যক মুনাফিকদের নিয়ে তাঁর সহযোগী হয়। ইবনে সা'দের বর্ণনা মতে, এর আগে কোন যুদ্ধেই মুনাফিকরা এত বিপুল সংখ্যায় অংশ নেয়নি। মুরাইসী নামক স্থানে রসূলুল্লাহ (সা) হঠাৎ শত্রুদের মুখোমুখি হন। সামান্য সংঘর্ষের পর যাবতীয় সম্পদ–সরঞ্জাম সহকারে সমগ্র গোত্রটিকে গ্রেফতার করে নেন। এ অভিযান শেষ হবার পর তখনো মুরাইসীতেই ইসলামী সেনা দল অবস্থান করছিল এমন সময় একদিন হযরত উমরের (রা) একজন কর্মচারী (জাহ্‌জাহ ইবনে মাসউদ গিফারী) এবং খাযরাজ গোত্রের একজন সহযোগীর (সিনান ইবনে ওয়াবর জুহানী) মধ্যে পানি নিয়ে বিরোধ বাধে। একজন আনসারদেরকে ডাকে এবং অন্যজন মুহাজিরদেরকে ডাক দেয়। উভয় পক্ষ থেকে লোকেরা একত্র হয়ে যায় এবং ব্যাপারটি মিটমাট করে দেয়া হয়। কিন্তু আনসারদের খাযরাজ গোত্রের সাথে সম্পর্কিত আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তিলকে তাল করে দেয়। সে আনসারদেরকে একথা বলে উত্তেজিত করতে থাকে যে, "এ মুহাজিররা আমাদের ওপর চড়াও হয়েছে এবং আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এবং এ কুরাইশী কাঙালদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যে, কুকুরকে লালন পালন করে বড় করো যাতে সে তোমাকেই কামড়ায়। এসব কিছু তোমাদের নিজেদেরই কর্মফল। তোমরা নিজেরাই তাদেরকে ডেকে এনে নিজেদের এলাকায় জায়গা দিয়েছো এবং নিজেদের ধন–সম্পত্তিতে তাদেরকে অংশীদার বানিয়েছো। আজ যদি তোমরা তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে দেখবে তারা পগার পার হয়ে গেছে।" তারপর সে কসম খেয়ে বলে, "মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর আমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা সম্পন্ন তারা দীন–হীন–লাঞ্ছিতদেরকে বাইরে বের করে দেবে।"* তার এসব কথাবার্তার খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছুলে হযরত উমর (রা) তাঁকে পরামর্শ দেন, এ ব্যক্তিকে হত্যা করা হোক। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ فَكَيْفَ يَا عُمَرُ اِذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ اَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ اَصْحَابَهُ (হে উমর! দুনিয়ার লোকেরা কি বলবে? তারা বলবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিজেরই সংগী–সাথীদেরকে হত্যা করছে।) তারপর তিনি তখনই সে স্থান থেকে রওয়ানা হবার হুকুম দেন এবং দ্বিতীয় দিন দুপুর পর্যন্ত কোথাও থামেননি, যাতে লোকেরা খুব বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং কারোর এক জায়গায় বসে গল্পগুজব করার এবং অন্যদের তা শোনার অবকাশ না থাকে। পথে উসাইদ ইবনে হুদাইর

* সূরা মুনাফিকূনে আল্লাহ নিজেই তার এ উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন।

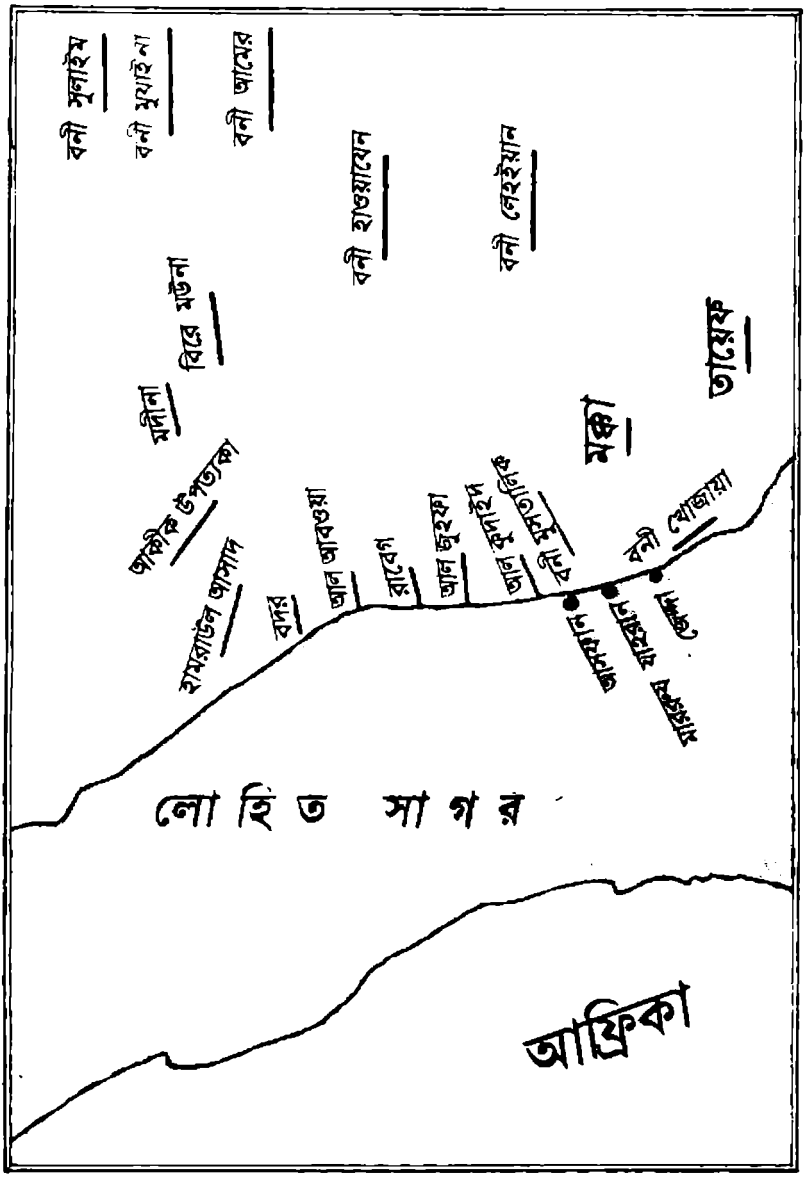

বনিল মুস্তালিক যুদ্ধক্ষেত্রের নক্শা

(রা) বলেন, "হে আল্লাহর নবী! আজ আপনি নিজের স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে অসময়ে রওয়ানা হবার হুকুম দিয়েছেন?" তিনি জবাব দেন, "তুমি শোননি তোমাদের সাথী কিসব কথা বলেছে?" তিনি জিজ্ঞেস করেন, "কোন্ সাথী?" জবাব দেন, "আবদুল্লাহ ইবনে উবাই।" তিনি বলেন, "হে আল্লাহর রসূল! ঐ ব্যক্তির কথা বাদ দিন। আপনি যখন মদীনায় আগমন করেন তখন আমরা তাকে নিজেদের বাদশাহ বানাবার ফায়সালা করেই ফেলেছিলাম এবং তার জন্য মুকুট তৈরী হচ্ছিল। আপনার আগমনের ফলে তার বাড়া ভাতে ছাই পড়েছে। তারই ঝাল সে ঝাড়ছে।"

এ হীন কারসাজির রেশ তখনো মিলিয়ে যায়নি। এরি মধ্যে একই সফরে সে আর একটি ভয়াবহ অঘটন ঘটিয়ে বসে। এ এমন পর্যায়ের ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর নিবেদিত প্রাণ সাহাবীগণ যদি পূর্ণ সংযম ধৈর্যশীলতা এবং জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না দিতেন তাহলে মদীনার এ নবগঠিত মুসলিম সমাজটিতে ঘটে যেতো মারাত্মক ধরনের গৃহযুদ্ধ। এটি ছিল হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের ফিত্না। এ ঘটনার বিবরণ হযরত আয়েশার মুখেই শুনুন। তাহলে যথার্থ অবস্থা জানা যাবে। মাঝখানে যেসব বিষয় ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হবে সেগুলো আমি অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মাধ্যমে ব্রাকেটের মধ্যে সন্নিবেশিত করে যেতে থাকবো। এর ফলে হযরত আয়েশার (রা) বর্ণনার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হবে না। তিনি বলেন ঃ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল, যখনই তিনি সফরে যেতেন তখনই স্ত্রীদের মধ্য থেকে কে তাঁর সংগে যাবে তা ঠিক করার জন্য লটারী করতেন।* বনীল মুস্তালিক যুদ্ধের সময় লটারীতে আমার নাম ওঠে। ফলে আমি তাঁর সাথী হই। ফেরার সময় আমরা যখন মদীনার কাছাকাছি এসে গেছি তখন এক মনযিলে রাত্রিকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেলার যাত্রা বিরতি করেন। এদিকে রাত পোহাবার তখনো কিছু সময় বাকি ছিল এমন সময় রওয়ানা দেবার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। আমি উঠে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য যাই। ফিরে আসার সময় অবস্থান স্থলের কাছাকাছি এসে মনে হলো আমার গলার হারটি ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গেছে। আমি তার খোঁজে লেগে যাই। ইত্যবসরে কাফেলা রওয়ানা হয়ে যায়। নিয়ম ছিল, রওয়ানা হবার সময় আমি নিজের হাওদায় বসে যেতাম এবং চারজন লোক মিলে সেটি উঠিয়ে উটের পিঠে বসিয়ে দিতো। সে যুগে আমরা মেয়েরা কম খাবার কারণে বড়ই হালকা পাত্লা হতাম। আমার হাওদা উঠাবার সময় আমি যে তার মধ্যে নেই একথা লোকেরা অনুভবই করতে পারেনি। তারা না জেনে খালি হাওদাটি উঠিয়ে উটের পিঠে বসিয়ে দিয়ে রওয়ানা হয়ে

* এ লটারীর ধরনটি প্রচলিত লটারীর মতো ছিল না। আসলে সকল স্ত্রীর অধিকার সমান ছিল। তাঁদের একজনকে অন্য জনের ওপর প্রাধান্য দেবার কোন যুক্তিসংগত কারণ ছিল না। এখন যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই কাউকে বেছে নিতেন তাহলে স্ত্রীরা মনে ব্যথা পেতেন এবং এতে পারস্পরিক রেষারেষি ও বিদ্বেষ সৃষ্টির আশংকা থাকতো। তাই তিনি লটারীর মাধ্যমে এর ফায়সালা করতেন। শরীয়াতে এমন সব অবস্থার জন্য লটারী করার সুযোগ রাখা হয়েছে। যখন কতিপয় লোকের বৈধ অধিকার হয় একেবারেই সমান সমান এবং তাদের মধ্য থেকে একজনকে অন্যজনের ওপর অগ্রাধিকার দেবার কোন ন্যায়সংগত কারণ থাকে না অথচ অধিকার কেবলমাত্র একজনকেই দেয়া যেতে পারে।

যায়। আমি হার নিয়ে ফিরে এসে দেখি সেখানে কেউ নেই। কাজেই নিজের চাদর মুড়ি দিয়ে আমি সেখানেই শুয়ে পড়ি। মনে মনে ভাবি, সামনের দিকে গিয়ে আমাকে হাওদার মধ্যে না পেয়ে তারা নিজেরাই খুঁজতে খুঁজতে আবার এখানে চলে আসবে। এ অবস্থায় আমি ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তাল সালামী আমি যেখানে শুয়ে ছিলাম সেখান দিয়ে যেতে থাকেন। তিনি আমাকে দেখতেই চিনে ফেলেন। কারণ পরদার হুকুম নাযিল হবার পূর্বে তিনি আমাকে বহুবার দেখেন। (তিনি ছিলেন একজন বদরী সাহাবী। সকালে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকা ছিল তাঁর অভ্যাস।* তাই তিনিও সেনা শিবিরের কোথাও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং এখন ঘুম থেকে উঠে মদীনার দিকে রওয়ানা দিয়েছিলেন।) আমাকে দেখে তিনি উট থামিয়ে নেন এবং স্বতস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে, انا لله وانا اليه راجعون "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী এখানে রয়ে গেছেন?" তাঁর এ আওয়াজে আমার চোখ খুলে যায় এবং আমি উঠে সংগে সংগেই আমার মুখ চাদর দিয়ে ঢেকে নিই। তিনি আমার সাথে কোন কথা বলেননি, সোজা তাঁর উটটি এনে আমার কাছে বসিয়ে দেন এবং নিজে দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন। আমি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে যাই এবং তিনি উটের রশি ধরে এগিয়ে যেতে থাকেন। দুপুরের কাছাকাছি সময়ে আমরা সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দেই। সে সময় সেনাদল এক জায়গায় গিয়ে সবেমাত্র যাত্রা বিরতি শুরু করেছে। তখনো তারা টেরই পায়নি আমি পেছনে রয়ে গেছি। এ ঘটনায় কুচক্রীরা মিথ্যা অপবাদ রটাতে থাকে এবং এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল সবার আগে। কিন্তু আমার সম্পর্কে কিসব কথাবার্তা হচ্ছে সে ব্যাপারে আমি ছিলাম একেবারেই অজ্ঞ।

[অন্যান্য হাদীসে বলা হয়েছে, যে সময় সফওয়ানের উটের পিঠে চড়ে হযরত আয়েশা (রা) সেনা শিবিরে এসে পৌঁছেন এবং তিনি এভাবে পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন বলে জানা যায় তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই চিৎকার করে ওঠে, "আল্লাহর কসম, এ মহিলা নিষ্কলংক অবস্থায় আসেনি। নাও, দেখো তোমাদের নবীর স্ত্রী আর একজনের সাথে রাত কাটিয়েছে এবং সে এখন তাকে প্রকাশ্যে নিয়ে চলে আসছে।"]

মদীনায় পৌঁছেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং প্রায় এক মাসকাল বিছানায় পড়ে থাকি। শহরে এ মিথ্যা অপবাদের খবর ছড়িয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানেও কথা আসতে থাকে। কিন্তু আমি কিছুই জানতাম না। তবে যে জিনিসটি আমার মনে খচ্‌খচ করতে থাকে তা হচ্ছে এই যে, অসুস্থ অবস্থায় যে রকম দৃষ্টি দেয়া দরকার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি আমার প্রতি তেমন ছিল না। তিনি ঘরে এলে ঘরের লোকদের জিজ্ঞেস করতেন كيف تيكم (ও কেমন আছে?)

* আবু দাউদ ও অন্যান্য সুনান গ্রন্থে এ আলোচনা এসেছে, তাঁর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করেন যে, তিনি কখনো ফজরের নামায যথা সময় পড়েন না। তিনি ওজর পেশ করেন, হে আল্লাহর রসূল! এটা আমার পারিবারিক রোগ। সকালে দীর্ঘসময় পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকার এ দুর্বলতাটি আমি কিছুতেই দূর করতে পারি না। একথায় রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ ঠিক আছে, যখনই ঘুম ভাংবে, সংগে সংগেই নামায পড়ে নেবে। কোন কোন মুহাদ্দিস তাঁর কাফেলার পেছনে থেকে যাওয়ার এ কারণ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অন্য কতিপয় মুহাদ্দিস এর কারণ বর্ণনা করে বলেন, রাতের অন্ধকারে রওয়ানা হবার কারণে যদি কারোর কোন জিনিস পেছনে থেকে গিয়ে থাকে তাহলে সকালে তা খুঁজে নিয়ে আসার দায়িত্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ওপর অর্পণ করেছিলেন।

নিজে আমার সাথে কোন কথা বলতেন না। এতে আমার মনে সন্দেহ হতো, নিশ্চয়ই কোন ব্যাপার ঘটেছে। শেষে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমি নিজের মায়ের বাড়িতে চলে গেলাম, যাতে তিনি আমার সেবা শুশ্রূষা ভালোভাবে করতে পারেন।

এক রাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য আমি মদীনার বাইরে যাই। সে সময় আমাদের বাড়িঘরে এ ধরনের পায়খানার ব্যবস্থা ছিল না। ফলে আমরা পায়খানা করার জন্য বাইরে জংগলের দিকে যেতাম। আমার সাথে ছিলেন মিস্‌তাহ ইবনে উসাসার মা। তিনি ছিলেন আমার মায়ের খালাত বোন। [অন্য হাদীস থেকে জানা যায়, তাদের সমগ্র পরিবারের ভরণপোষণ হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) জিম্মায় ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও মিস্‌তাহ এমন লোকদের দলে ভিড়ে গিয়েছিলেন যারা হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ছড়াচ্ছিল।] রাস্তায় তাঁর পায় ঠোকর লাগে এবং তিনি সংগে সংগে স্বতস্ফূর্তভাবে বলে ওঠেন ঃ "ধ্বংস হোক মিস্‌তাহ।" আমি বললাম, "ভালই মা দেখছি আপনি, নিজের পেটের ছেলেকে অভিশাপ দিচ্ছেন, আবার ছেলেও এমন যে বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছে।" তিনি বলেন, "মা, তুমি কি তার কথা কিছুই জানো না?" তারপর তিনি গড়গড় করে সব কথা বলে যান। তিনি বলে যেতে থাকেন, মিথ্যা অপবাদদাতারা আমার বিরুদ্ধে কিসব কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে। [মুনাফিকরা ছাড়া মুসলমানদের মধ্য থেকেও যারা এ ফিতনায় শামিল হয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে মিস্‌তাহ, ইসলামের প্রখ্যাত কবি হাস্‌সান ইবনে সাবেত ও হযরত যয়নবের (রা) বোন হাম্‌না বিন্‌তে জাহশের অংশ ছিল সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য।] এ কাহিনী শুনে আমার শরীরের রক্ত যেন শুকিয়ে গেল। যে প্রয়োজন পূরণের জন্য আমি বের হয়েছিলাম তাও ভুলে গেলাম। সোজা ঘরে চলে এলাম। সারা রাত আমার কাঁদতে কাঁদতে কেটে যায়।"

সামনের দিকে এগিয়ে হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ "আমি চলে আসার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী (রা) ও উসামাহ ইবনে যায়েদকে (রা) ডাকেন। তাদের কাছে পরামর্শ চান। উসামাহ (রা) আমার পক্ষে ভালো কথাই বলে। সে বলে, 'হে আল্লাহর রসূল! ভালো জিনিস ছাড়া আপনার স্ত্রীর মধ্যে আমি আর কিছুই দেখিনি। যা কিছু রটানো হচ্ছে সবই মিথ্যা ও বানোয়াট ছাড়া আর কিছুই নয়।' আর আলী (রা) বলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! মেয়ের অভাব নেই। আপনি তাঁর জায়গায় অন্য একটি মেয়ে বিয়ে করতে পারেন। আর যদি অনুসন্ধান করতে চান তাহলে সেবিকা বাঁদীকে ডেকে অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করুন।' কাজেই সেবিকাকে ডাকা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হয়। সে বলে, 'সে আল্লাহর কসম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমি তাঁর মধ্যে এমন কোন খারাপ জিনিস দেখিনি যার ওপর অংগুলি নির্দেশ করা যেতে পারে। তবে এতটুকু দোষ তাঁর আছে যে, আমি আটা ছেনে রেখে কোন কাজে চলে যাই এবং বলে যাই, বিবি সাহেবা! একটু আটার দিকে খেয়াল রাখবেন, কিন্তু তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং বকরি এসে আটা খেয়ে ফেলে।' সেদিনই রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবায় বলেন, 'হে মুসলমানগণ! এক ব্যক্তি আমার পরিবারের ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে আমাকে অশেষ কষ্ট দিচ্ছে। তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, তার আক্রমণ থেকে আমার ইজ্জত বাঁচাতে পারে? আল্লাহর কসম, আমি তো আমার স্ত্রীর মধ্যেও কোন খারাপ জিনিস দেখিনি এবং সে ব্যক্তির মধ্যেও কোন খারাপ জিনিস দেখিনি যার সম্পর্কে অপবাদ দেয়া

হচ্ছে।' সে তো কখনো আমার অনুপস্থিতিতে আমার বাড়ীতেও আসেনি।' একথায় উসাইদ ইবনে হুদ্বাইর (কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী `দ ইবনে মু'আয*) উঠে বলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! যদি সে আমাদের গোত্রের লোক হয় তাহলে আমরা তাকে হত্যা করবো আর যদি আমাদের ভাই খাযরাজদের লোক হয় তাহলে আপনি হুকুম দিন আমরা হুকুম পালন করার জন্য প্রস্তুত।' একথা শুনতেই খাযরাজ প্রধান সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা) দাঁড়িয়ে যান এবং বলতে থাকেন, 'মিথ্যা বলছো, তোমরা তাকে কখনোই হত্যা করতে পারো না। তোমরা তাকে হত্যা করার কথা শুধু এ জন্যই মুখে আনছো যে সে খাযরাজদের অন্তরভুক্ত। যদি সে তোমাদের গোত্রের লোক হতো তাহলে তোমরা কখনো একথা বলতে না, আমরা তাকে হত্যা করবো।'** উসাইদ ইবনে হুদাইর জবাব দেন, 'তুমি মুনাফিক, তাই মুনাফিকদের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছো।' একথায় মসজিদে নববীতে একটি হাংগামা শুরু হয়ে যায়। অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে বসে ছিলেন। মসজিদের মধ্যেই আওস ও খাযরাজের লড়াই বেঁধে যাবার উপক্রম হয়েছিল কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে শান্ত করেন এবং তারপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে আসেন।"

হযরত আয়েশার (রা) অবশিষ্ট কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ আমি এতদসংক্রান্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করবো যেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর ত্রুটি মুক্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে আমি যা কিছু বলতে চাই তা হচ্ছে এই যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এ অপবাদ রটিয়ে একই গুলীতে কয়েকটি পাখি শিকার করার প্রচেষ্টা চালায়। একদিকে সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর সিদ্দীকের (রা) ইজ্জতের ওপর

* সম্ভবত নামের ক্ষেত্রে এ বিভিন্নতার কারণ হচ্ছে এই যে, হযরত আয়েশা (রা) নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে আওস সরদার শব্দ ব্যবহার করে থাকবেন। কোন বর্ণনাকারী এ থেকে সা'দ ইবনে মু'আয মনে করেছেন। কারণ নিজের জীবদ্দশায় তিনিই ছিলেন আওস গোত্রের সরদার এবং ইতিহাসে আওস সরদার হিসেবে তিনিই বেশী পরিচিত। অথচ আসলে এ ঘটনার সময় তাঁর চাচাত ভাই উসাইদ ইবনে হুদাইর ছিলেন আওসের সরদার।

** হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ যদিও অত্যন্ত সৎ ও মুখলিস মুসলমান ছিলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করতেন এবং মদীনায় যাদের সাহায্যে ইসলাম বিস্তার লাভ করে তাদের মধ্যে তিনিও একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব তবুও এতসব সৎ গুণ সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে স্বজাতিপ্রীতি ও জাতীয় স্বার্থবোধ (আর আরবে সে সময় জাতি বলতে গোত্রই বুঝাতো) ছিল অনেক বেশী। এ কারণে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর পৃষ্ঠপোষকতা করেন, যেহেতু সে ছিল তাঁর গোত্রের লোক। এ কারণেই মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর মুখ থেকে একথা বের হয়ে যায় : اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمه (আজ হত্যা ও রক্ত প্রবাহের দিন। আজ এখানে হারামকে হালাল করা হবে।) এর ফলে ক্রোধ প্রকাশ করে রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কাছ থেকে সেনাবাহিনীর ঝাণ্ডা ফিরিয়ে নেন। আবার এ কারণেই তিনি রসূলুল্লাহর (সা) ইন্তিকালের পর সাকীফায়ে বনি সায়েদায় খিলাফত আনসারদের হক বলে দাবী করেন। আর যখন তাঁর কথা অগ্রাহ্য করে আনসার ও মুহাজির সবাই সম্মিলিতভাবে হযরত আবু বকরের (রা) হাতে বাইআত করেন তখন তিনি একাই বাই'আত করতে অস্বীকার করেন। আমৃত্যু তিনি কুরাইশী খলীফার খিলাফত স্বীকার করেননি। (দেখুন আল ইসাবাহ লিইবনে হাজার এবং আল ইস্তিআব লিইবনে আবদিল বার এবং সা'দ ইবনে উবাদাহ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১০-১১)

হামলা চালায়। অন্যদিকে ইসলামী আন্দোলনের উন্নততর নৈতিক মর্যাদা ও চারিত্রিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করে। তৃতীয়ত সে এর মাধ্যমে এমন একটি অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করে যে, যদি ইসলাম তার অনুসারীদের জীবন ও চরিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে না ফেলে থাকতো তাহলে মুহাজির ও আনসার এবং স্বয়ং আনসারদেরই দু'টি গোত্র পরস্পর লড়াই করে ধ্বংস হয়ে যেতো।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় বিষয়

এ ছিল সে সময়কার পরিস্থিতি। এর মধ্যে প্রথম হামলার সময় সূরা আহযাবের শেষ ৬টি রুকূ' নাযিল হয় এবং দ্বিতীয় হামলার সময় নাযিল হয় সূরা নূর। এ পটভূমি সামনে রেখে এ দু'টি সূরা পর্যায়ক্রমে অধ্যয়ন করলে এ বিধানগুলোর মধ্যে যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে তা ভালোভাবে অনুধাবন করা যায়।

মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে এমন এক ময়দানে পরাজিত করতে চাচ্ছিল যেটা ছিল তাদের প্রাধান্যের আসল ক্ষেত্র। আল্লাহ তাদের চরিত্র হননমূলক অপবাদ রটনার অভিযানের বিরুদ্ধে একটি ক্রুদ্ধ ভাষণ দেবার বা মুসলমানদেরকে পাল্টা আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে মুসলমানদেরকে এ শিক্ষা দেবার প্রতি তাঁর সার্বিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন যে, তোমাদের নৈতিক অংগনে যেখানে যেখানে শূন্যতা রয়েছে সেগুলো পূর্ণ কর এবং এ অংগনকে আরো বেশী শক্তিশালী করো। একটু আগেই দেখা গেছে যয়নবের (রা) বিয়ের সময় মুনাফিক ও কাফেররা কী হাংগামাটাই না সৃষ্টি করেছিল। অথচ সূরা আহ্যাব বের করে পড়লে দেখা যাবে সেখানে ঠিক সে হাংগামার যুগেই সামাজিক সংস্কার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত নির্দেশগুলো দেয়া হয় ঃ

এক ঃ নবী করীমের (সা) পবিত্র স্ত্রীগণকে হুকুম দেয়া হয় ঃ নিজেদের গৃহমধ্যে মর্যাদা সহকারে বসে থাকো, সাজসজ্জা করে বাইরে বের হয়ো না এবং ভিন পুরুষদের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হলে বিনম্র স্বরে কথা বলো না, যাতে কোন ব্যক্তি কোন অবাঞ্ছিত আশা পোষণ না করে বসে। (৩২ ও ৩৩ আয়াত)

দুই ঃ নবী করীমের (সা) গৃহে ভিন্ পুরুষদের বিনা অনুমতিতে প্রবেশ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং নির্দেশ দেয়া হয়, তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের কাছে কিছু চাইতে হলে পরদার আড়াল থেকে চাইতে হবে। (৫৩ আয়াত)

তিন ঃ গায়ের মাহ্রাম পুরুষ ও মাহ্রাম আত্মীয়দের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং হুকুম দেয়া হয়েছে নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের কেবলমাত্র মাহ্রাম আত্মীয়রাই স্বাধীনভাবে তাঁর গৃহে যাতায়াত করতে পারবেন। (৫৫ আয়াত)

চার ঃ মুসলমানদেরকে বলে দেয়া হয়, নবীর স্ত্রীগণ তোমাদের মা এবং একজন মুসলমানের জন্য তাঁরা চিরতরে ঠিক তার আপন মায়ের মতই হারাম। তাই তাঁদের সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলমানের নিয়ত একদম পাক পবিত্র থাকতে হবে। (৫৩ ও ৫৪ আয়াত)

পাঁচ ঃ মুসলমানদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, নবীকে কষ্ট দেয়া দুনিয়ায় ও আখেরাতে আল্লাহর লানত ও লাঞ্ছনাকর আযাবের কারণ হবে এবং এভাবে

কোন মুসলমানের ইজ্জতের ওপর আক্রমণ করা এবং তার ভিত্তিতে তার ওপর অযথা দোষারোপ করাও কঠিন গোনাহের শামিল। (৫৭ ও ৫৮ আয়াত)

ছয় ঃ সকল মুসলমান মেয়েকে হুকুম দেয়া হয়েছে, যখনই বাইরে বের হবার প্রয়োজন হবে, চাদর দিয়ে নিজেকে ভালোভাবে ঢেকে এবং ঘোমটা টেনে বের হতে হবে। (৫৯ আয়াত)

তারপর যখন হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের ঘটনায় মদীনার সমাজে একটি হাংগামা সৃষ্টি হয়ে যায় তখন নৈতিকতা, সামাজিকতা ও আইনের এমন সব বিধান ও নির্দেশসহকারে সূরা নূর নাযিল করা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত মুসলিম সমাজকে অনাচারের উৎপাদন ও তার বিস্তার থেকে সংরক্ষিত রাখতে হবে এবং যদি তা উৎপন্ন হয়েই যায় তাহলে তার যথাযথ প্রতিকার ও প্রতিরোধ এবং সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ সূরায় এ বিধান ও নির্দেশগুলো যে ধারাবাহিকতা সহকারে নাযিল হয়েছে এখানে আমি সেভাবেই তাদের সংক্ষিপ্তসার সন্নিবেশ করছি। এ দ্বারা কুরআন যথার্থ মনস্তাত্বিক পরিস্থিতিতে মানুষের জীবনের সংশোধন ও সংগঠনের জন্য কি ধরনের আইনগত, নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা ও কৌশল অবলম্বন করার বিধান দেয়, তা পাঠক অনুমান করতে পারবেন ঃ

(১) যিনা, ইতিপূর্বে যাকে সামাজিক অপরাধ গণ্য করা হয়েছিল (সূরা নিসা ঃ ১৫ ও ১৬ আয়াত) এখন তাকে ফৌজদারী অপরাধ গণ্য করে তার শাস্তি হিসেবে একশত বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা হয়।

(২) ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীকে সামাজিকভাবে বয়কট করার হুকুম দেয়া হয় এবং তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে মু'মিনদেরকে নিষেধ করা হয়।

(৩) যে ব্যক্তি অন্যের ওপর যিনার অপবাদ দেয় এবং তারপর প্রমাণস্বরূপ সাক্ষী পেশ করতে পারে না তার শাস্তি হিসেবে ৮০ ঘা বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা হয়।

(৪) স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয় তাহলে তার জন্য "লি'আন"-এর রীতি প্রবর্তন করা হয়।

(৫) হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে মুনাফিকদের মিথ্যা অপবাদ খণ্ডন করে এ নির্দেশ দেয়া হয় যে, যে কোন ভদ্র মহিলা বা ভদ্র লোকের বিরুদ্ধে যে কোন অপবাদ দেয়া হোক, তা চোখবুজে মেনে নিয়ো না এবং তা ছড়াতেও থেকো না। এ ধরনের গুজব যদি রটে যেতে থাকে তাহলে মুখে মুখে তাকে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য না করে তাকে দাবিয়ে দেয়া এবং তার পথ রোধ করা উচিত। এ প্রসংগে নীতিগতভাবে একটি কথা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন ব্যক্তির পবিত্র-পরিচ্ছন্ন নারীর সাথেই বিবাহিত হওয়া উচিত। নষ্টা ও ভ্রষ্টা নারীর আচার-আচরণের সাথে সে দু'দিনও খাপ খাইয়ে চলতে পারবে না। পবিত্র-পরিচ্ছন্ন নারীর ব্যাপারেও একই কথা। তার আত্মা পবিত্র-পরিচ্ছন্ন পুরুষের সাথেই খাপ খাওয়াতে পারে, নষ্ট ও ভ্রষ্ট পুরুষের সাথে নয়। এখন যদি তোমরা রসূলকে (সা) একজন পবিত্র বরং পবিত্রতম ব্যক্তি বলে জেনে থাকো তাহলে কেমন করে একথা তোমাদের বোধগম্য হলো যে, একজন ভ্রষ্টা নারী তার প্রিয়তম জীবন সঙ্গিনী হতে পারতো? যে নারী কার্যত ব্যভিচারে পর্যন্ত লিপ্ত হয়ে যায় তার সাধারণ চালচলন কিভাবে

এমন পর্যায়ের হতে পারে যে, রসূলের মতো পবিত্র ব্যক্তিত্ব তার সাথে এভাবে সংসার জীবন যাপন করেন। কাজেই একজন নীচ ও স্বার্থান্ধ লোক একটি বাজে অপবাদ কারোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেই তা গ্রহণযোগ্য তো হয়ই না, উপরন্তু তার প্রতি মনোযোগ দেয়া এবং তাকে সম্ভব মনে করাও উচিত নয়। আগে চোখ মেলে দেখতে হবে। অপবাদ কে লাগাচ্ছে এবং কার প্রতি লাগাচ্ছে?

(৬) যারা আজেবাজে খবর ও খারাপ গুজব রটায় এবং মুসলিম সমাজে নৈতিকতা বিরোধী ও অশ্লীল কার্যকলাপের প্রচলন করার প্রচেষ্টা চালায় তাদের ব্যাপারে বলা হয় যে, তাদেরকে উৎসাহিত করা যাবে না বরং তারা শাস্তি লাভের যোগ্য।

(৭) মুসলিম সমাজে পারস্পরিক সুধারণার ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্কের ভিত্ গড়ে উঠতে হবে, এটিকে একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পাপ করার কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে না ততক্ষণ প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্দোষ ও নিরপরাধ মনে করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্দোষ হবার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে দোষী মনে করতে হবে, এটা ঠিক নয়।

(৮) লোকদেরকে সাধারণভাবে নির্দেশ দেয়া হয় যে, একজন অন্যজনের গৃহে নিসংকোচে প্রবেশ করো না বরং অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করো।

(৯) নারী ও পুরুষদেরকে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করার নির্দেশ দেয়া হয়। পরস্পরের দিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে ও উঁকিঝুঁকি মারতে এবং আড়চোখে দেখতে নিষেধ করা হয়।

(১০) মেয়েদের হুকুম দেয়া হয়, নিজেদের গৃহে মাথা ও বুক ঢেকে রাখো।

(১১) মেয়েদের নিজেদের মাহ্রাম আত্মীয় ও গৃহপরিচারকদের ছাড়া আর কারোর সামনে সাজগোজ করে না আসার হুকুম দেয়া হয়।

(১২) তাদেরকে এ হুকুমও দেয়া হয় যে, বাইরে বের হলে শুধু যে কেবল নিজেদের সাজসজ্জা লুকিয়ে বের হবে তাই না বরং এমন অলংকার পরিধান করেও বাইরে বের হওয়া যাবে না যেগুলো বাজতে থাকে।

(১৩) সমাজে মেয়েদের ও পুরুষদের বিয়ে না করে আইবুড়ো ও আইবুড়ী হয়ে বসে থাকাকে অপছন্দ করা হয়। হুকুম দেয়া হয়, অবিবাহিতদের বিয়ে দেয়া হোক। এমনকি বাঁদী ও গোলামদেরকেও অবিবাহিত রেখে দেয়া যাবে না। কারণ কৌমার্য ও কুমারিত্ব অশ্লীলতা ও চারিত্রিক অনাচারের প্ররোচনাও দেয়, আবার মানুষকে অশ্লীলতার সহজ শিকারে পরিণত করে। অবিবাহিত ব্যক্তি আর কিছু না হলেও খারাপ খবর শোনার এবং তা ছড়াবার ব্যাপারে আগ্রহ নিতে থাকে।

(১৪) বাঁদী ও গোলাম স্বাধীন করার জন্য "মুকাতাব"–এর পথ বের করা হয়। (মুক্তিপণ দিয়ে স্বাধীন হওয়া) মালিকরা ছাড়া অন্যদেরকেও মুকাতাব বাঁদী ও গোলামদেরকে আর্থিক সাহায্য করার হুকুম দেয়া হয়।

(১৫) বাঁদীদেরকে অর্থোপার্জনের কাজে খাটানো নিষিদ্ধ করা হয়। আরবে বাঁদীদের মাধ্যমেই এ পেশাটি জিইয়ে রাখার রেওয়াজ ছিল। এ কারণে একে নিষিদ্ধ করার ফলে আসলে পতিতাবৃত্তি আইনগতভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

(১৬) পারিবারিক জীবনে গৃহ পরিচারক ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের জন্য নিয়ম করা হয় যে, তারা একান্ত ব্যক্তিগত সময়গুলোয় (অর্থাৎ সকাল, দুপুর ও রাতে) গৃহের কোন পুরুষ ও মেয়ের কামরায় আকস্মিকভাবে ঢুকে পড়তে পারবে না। নিজের সন্তানদের মধ্যেও অনুমতি নিয়ে গৃহে প্রবেশ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

(১৭) বুড়ীদেরকে অনুমতি দেয়া হয়, তারা যদি স্বগৃহে মাথা থেকে ওড়না নামিয়ে রেখে দেয় তাহলে তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু "তাবার্‌রুজ" (নিজেকে দেখাবার জন্য সাজসজ্জা করা) থেকে দূরে থাকার হুকুম দেয়া হয়। তাছাড়া তাদেরকে নসিহত করা হয়েছে, বার্ধক্যাবস্থায়ও তারা যদি মাথায় কাপড় দিয়ে থাকে তাহলে ভালো।

(১৮) অন্ধ, খঞ্জ, পংগু ও রুগ্নকে এ সুবিধা প্রদান করা হয় যে, তারা বিনা অনুমতিতে কোথাও থেকে কোন খাদ্যবস্তু খেয়ে নিলে তাকে চুরি ও আত্মসাতের আওতায় ফেলা হবে না। এ জন্য তাদেরকে পাকড়াও করা হবে না।

(১৯) নিকট আত্মীয় ও অন্তরংগ বন্ধুদেরকে অনুমতি দেয়া হয় যে, তারা বিনা অনুমতিতে পরস্পরের বাড়িতে খেতে পারে এবং এটা এমন পর্যায়ের যেমন তারা নিজেদের বাড়িতে খেতে পারে। এভাবে সমাজের লোকদেরকে পরস্পরের কাছাকাছি করে দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্য থেকেও অচেনা ও সম্পর্কহীনতার বেড়া তুলে দেয়া হয়েছে। ফলে তাদের পরস্পরের মধ্যে স্নেহ-ভালোবাসা-মায়া-মমতা বেড়ে যাবে এবং পারস্পরিক আন্তরিকতার সম্পর্ক এমন সব ছিদ্র বন্ধ করে দেবে যেগুলোর মাধ্যমে কোন কুচক্রী তাদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করতে পারতো।

এসব নির্দেশের সাথে সাথে মুনাফিক ও মু'মিনদের এমনসব সুস্পষ্ট আলামত বর্ণনা করা হয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলমান সমাজে আন্তরিকতা সম্পন্ন মু'মিন কে এবং মুনাফিক কে তা জানতে পারে। অন্যদিকে মুসলমানদের দলগত শৃংখলা ও সংগঠনকে আরো শক্ত করে বেঁধে দেয়া হয়েছে। এ জন্য আরো কতিপয় নিয়ম-কানুন তৈরী করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, কাফের ও মুনাফিকরা যে শক্তির সাথে টক্কর দিতে গিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ফিত্‌না-ফাসাদ সৃষ্টি করে চলছিল তাকে আরো বেশী শক্তিশালী করা।

এ সমগ্র আলোচনায় একটি জিনিস পরিষ্কার দেখার মতো। অর্থাৎ বাজে ও লজ্জাকর হামলার জবাবে যে ধরনের তিক্ততার সৃষ্টি হয়ে থাকে সমগ্র সূরা নূরে তার ছিটেফোটাও নেই। একদিকে যে অবস্থায় এ সূরাটি নাযিল হয় তা দেখুন এবং অন্যদিকে সূরার বিষয়বস্তু ও বাকরীতি দেখুন। এ ধরনের উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে কেমন ঠাণ্ডা মাথায় আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। সংস্কারমূলক বিধান দেয়া হচ্ছে। জ্ঞানগর্ভ নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। সর্বোপরি শিক্ষা ও উপদেশ দানের হক আদায় করা হচ্ছে। এ থেকে শুধুমাত্র এ শিক্ষাই পাওয়া যায় না যে, ফিত্‌নার মোকাবিলায় কঠিন থেকে কঠিনতর উত্তেজক পরিস্থিতিতে আমাদের কেমন ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করে উদার হৃদয়ে বুদ্ধিমত্তা সহকারে এগিয়ে যেতে হবে বরং এ থেকে এ বিষয়েরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এ বাণী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের রচনা নয়, এটা এমন এক সত্তার অবতীর্ণ বাণী যিনি অনেক উচ্চ স্থান থেকে মানুষের অবস্থা ও জীবনাচার প্রত্যক্ষ করছেন এবং নিজ সত্তায় এসব অবস্থা ও জীবনাচারের প্রভাবমুক্ত থেকে নির্জলা পথনির্দেশনা ও বিধান দানের

দায়িত্ব পালন করছেন। যদি এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের বাণী হতো তাহলে তাঁর চরম উদার দৃষ্টি সত্ত্বেও নিজের ইজ্জত আবরুর ওপর জঘন্য আক্রমণের ধারা বিবরণী শুনে একজন সৎ ও ভদ্র লোকের আবেগ অনুভূতিতে অনিবার্যভাবে যে স্বাভাবিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে যায় তার কিছু না কিছু প্রভাব অবশ্যই এর মধ্যে পাওয়া যেতো।

আয়াত ৬৪ **সূরা আন নূর–মাদানী** রুকূ' ৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ ۝١ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ
جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٢

এটি একটি সূরা, আমি এটি নাযিল করেছি এবং একে ফরয করে দিয়েছি আর এর মধ্যে সুস্পষ্ট নির্দেশসমূহ নাযিল করেছি,[১] হয়তো তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী উভয়ের প্রত্যেককে এক শত বেত্রাঘাত করো।[২] আর আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি কোন মমত্ববোধ ও করুণা যেন তোমাদের মধ্যে না জাগে যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনো।[৩] আর তাদেরকে শাস্তি দেবার সময় মু'মিনদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে।[৪]

১. এসব বাক্যাংশের মধ্যে "আমি"র ওপর জোর দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আর কেউ এটি নাযিল করেনি বরং "আমিই" নাযিল করেছি। তাই কোন শক্তিহীন উপদেশকের বাণীর মতো একে হাল্কা জিনিস মনে করে বসো না। ভালো করে জেনে রাখো, এমন এক সত্তা এটি নাযিল করেছেন যার মুঠোর মধ্যে রয়েছে তোমাদের প্রাণ ও কিসমত এবং তোমরা মরেও যার পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না।

দ্বিতীয় বাক্যাংশে বলা হয়েছে, এ সূরায় যেসব কথা বলা হয়েছে সেগুলো "সুপারিশ" পর্যায়ের জিনিস নয়। তোমার ইচ্ছা হলে মেনে নিলে অন্যথায় যা ইচ্ছা তাই করতে থাকলে, ব্যাপারটা তেমন নয়। বরং এটি হচ্ছে অকাট্য ও চূড়ান্ত বিধান। এ বিধান মেনে চলা অপরিহার্য। যদি তুমি মু'মিন ও মুসলিম হয়ে থাকো, তাহলে এ বিধান অনুযায়ী কাজ করা তোমার জন্য ফরয।

তৃতীয় বাক্যাংশে বলা হয়েছে, এ সূরায় যেসব নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই। পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট নির্দেশনামা। এগুলো সম্পর্কে তোমরা এ ওজর পেশ

করতে পারবে না যে, অমুক কথাটি বুঝতে পারিনি কাজেই সেটিকে কেমন করে কার্যকর করতাম?

যে মহান ঘোষণার পরে আইনগত বিধান শুরু হয়ে যায় এটি হচ্ছে তার ভূমিকা (Preamble)। সূরা নূরের বিধানগুলো মহান আল্লাহ কত গুরুত্ব সহকারে পেশ করছেন এ ভূমিকার বর্ণনাভংগী নিজেই তা জানিয়ে দিচ্ছে। আইন-বিধান সম্বলিত অন্য কোন সূরার ভূমিকা এত বেশী জোরদার নয়।

২. এ বিষয়টির অনেকগুলো আইনগত, নৈতিক ও ঐতিহাসিক দিক ব্যাখ্যা সাপেক্ষ রয়ে গেছে। সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা ছাড়া বর্তমান যুগে এক ব্যক্তির জন্য আল্লাহর এ শরীয়াতী বিধান অনুধাবন করা কঠিন। তাই নিচে আমি এর বিভিন্ন দিকের ওপর ধারাবাহিকভাবে আলোকপাত করবো ঃ

এক ঃ যিনা বা ব্যভিচারের যে সাধারণ অর্থটি প্রত্যেক ব্যক্তি জানে সেটি হচ্ছে এই যে, "একটি পুরুষ একটি স্ত্রীলোক নিজেদের মধ্যে কোন বৈধ দাম্পত্য সম্পর্ক ছাড়াই পরস্পর যৌন মিলন করে।" এ কাজটির নৈতিকভাবে খারাপ হওয়া অথবা ধর্মীয় দিক দিয়ে পাপ হওয়া কিংবা সামাজিক দিক দিয়ে দূষণীয় ও আপত্তিকর হওয়া এমন একটি জিনিস যে ব্যাপারে প্রাচীনতম যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সকল মানব সমাজ ঐকমত্য পোষণ করে আসছে। কেবলমাত্র বিভিন্ন কয়েকজন লোক যারা নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিকে নিজেদের প্রবৃত্তি তোষণ নীতির অধীন করে দিয়েছে অথবা যারা নিজেদের উলঙ্গ মস্তিষ্কের অভিনব খেয়ালকে দার্শনিক তত্ত্ব মনে করে নিয়েছে তারা ছাড়া আর কেউই আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে মতবিরোধ প্রকাশ করেনি। এ বিশ্বজনীন ঐকমত্যের কারণ হচ্ছে এই যে, মানুষের প্রকৃতি নিজেই যিনা হারাম হওয়ার দাবী জানায়। মানব জাতির অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব এবং মানবিক সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা উভয়ই এ বিষয়টির ওপর নির্ভর করে যে, নারী ও পুরুষ শুধুমাত্র আনন্দ উপভোগের জন্য মিলিত হবার এবং তারপর আলাদা হয়ে যাবার ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারী হবে না বরং প্রত্যেকটি জোড়ার পারস্পরিক সম্পর্ক এমন একটি স্থায়ী ও স্বতন্ত্র বিশ্বস্ততার অংগীকার ও চুক্তির ভিত্তিতে গড়ে উঠবে যা সমাজের সবাই জানবে এবং সবার কাছে হবে পরিচিত এবং এ সংগে সমাজ তার নিশ্চয়তাও দেবে। এ অংগীকার ও চুক্তি ছাড়া মানুষের বংশধারা এক দিনের জন্যও চলতে পারে না। কারণ মানব শিশু নিজের জীবন ও নিজের বিকাশের জন্য বছরের পর বছরের সহানুভূতিশীল রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা-প্রশিক্ষণের মুখাপেক্ষী হয়। যে পুরুষটি এ শিশুর দুনিয়ায় অস্তিত্ব লাভের কারণ হয়েছে যতক্ষণ না সে নারীর সাথে সহযোগিতা করবে ততক্ষণ কোন নারী একাকী এ বোঝা বহন করার জন্য কখনো তৈরী হতে পারে না। অনুরূপভাবে এ চুক্তি ছাড়া মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতিও টিকে থাকতে পারে না। কারণ সভ্যতা-সংস্কৃতির জন্মই তো একটি পুরুষ ও একটি নারীর সহ অবস্থান করার, গৃহ ও পরিবারের অস্তিত্ব দান করার এবং তারপর পরিবারগুলোর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমেই হয়ে থাকে। যদি নারী ও পুরুষ গৃহ ও পরিবার গঠন না করে নিছক আনন্দ উপভোগের জন্য স্বাধীনভাবে সহ অবস্থান করতে থাকে তাহলে সমস্ত মানুষ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। সমাজ জীবনের ভিত্তি চূর্ণ ও বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির এ ইমারত যে ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে তার অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এসব কারণে নারী

ও পুরুষের যে স্বাধীন সম্পর্ক কোন সুপরিচিত ও সর্বসম্মত বিশ্বস্ততার চুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় তা মূলত মানবিক প্রকৃতির বিরোধী। এসব কারণেই প্রতি যুগে মানুষ একে মারাত্মক দোষ, বড় ধরনের অসদাচার ও ধর্মীয় পরিভাষায় একটি কঠিন গোনাহ মনে করে এসেছে এবং এসব কারণেই প্রতি যুগে মানব সমাজ বিয়ের প্রচলন ও প্রসারের সাথে সাথে যিনা ও ব্যভিচারের পথ বন্ধ করার জন্য কোন না কোনভাবে অবশ্যই প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তবে এ প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইন–কানুন এবং নৈতিক, তামাদ্দুনিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য ছিল। জাতি ও সমাজের জন্য যিনার ক্ষতিকর হবার চেতনা কোথাও কম এবং কোথাও বেশী, কোথাও সুস্পষ্ট আবার কোথাও অন্যান্য সমস্যার সাথে জড়িয়ে অস্পষ্ট রয়ে গেছে।

দুই ঃ যিনার হারাম হবার ব্যাপারে একমত হবার পর যে বিষয়ে মতবিরোধ হয়েছে সেটি হচ্ছে, এর অপরাধ অর্থাৎ আইনগতভাবে শাস্তিযোগ্য হবার ব্যাপারটি। এখান থেকেই ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্ম ও আইনের বিরোধ শুরু হয়। যেসব সমাজ মানব প্রকৃতির কাছাকাছি থেকেছে তারা সবসময় যিনা অর্থাৎ নারী ও পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে একটি অপরাধ হিসেবে দেখে এসেছে এবং এ জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করেছে। কিন্তু সাংস্কৃতিক ধারা যতই সমাজকে খারাপ করে চলেছে এ অপরাধ সম্পর্কে ততই মনোভাব কোমল হয়ে চলেছে।

এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম যে শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয় এবং অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রদর্শন করা হয় সেটি ছিল ঃ "নিছক যিনা" (Fornication) এবং "পর নারীর সাথে যিনা" (Adultery) এর মধ্যে পার্থক্য করে প্রথমটিকে সামান্য ভুল এবং কেবলমাত্র শেষোক্তটিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করা হয়।

নিছক যিনার যে সংজ্ঞা বিভিন্ন আইনে পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে, "কোন অবিবাহিত বা বিবাহিত পুরুষ এমন কোন মেয়ের সাথে সংগম করে যে অন্য কোন পুরুষের স্ত্রী নয়।" এ সংজ্ঞায় মূলত পুরুষের নয় বরং নারীর অবস্থার ওপর নির্ভর করা হয়েছে। নারী যদি স্বামীহীন হয় তাহলে তার সাথে সংগম নিছক যিনা হবে। এ ক্ষেত্রে সংগমকারী পুরুষের স্ত্রী থাক বা না থাক। তাতে কিছু আসে যায় না। প্রাচীন মিসর, ব্যাবিলন, আসিরীয়া ও ভারতের আইনে এর শাস্তি ছিল খুবই হাল্কা পরিমাণের। গ্রীস ও রোমও এ পদ্ধতিই অবলম্বন করে। পরবর্তী পর্যায়ে ইহুদীরাও এ থেকে প্রভাবিত হয়। বাইবেলে একে শুধুমাত্র এমন একটি অন্যায় বলা হয়েছে যার ফলে পুরুষকে কেবলমাত্র অর্থদণ্ডই দিতে হয়। যাত্রা পুস্তকে এ সম্পর্কে যে হুকুম দেয়া হয়েছে তার শব্দাবলী নিম্নরূপ ঃ

"আর কেহ যদি অবাগদত্তা কুমারীকে ভুলাইয়া তাহার সহিত শয়ন করে, তবে সে অবশ্য কন্যাপণ দিয়া তাহাকে বিবাহ করিবে। যদি সেই ব্যক্তির সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিতে পিতা নিতান্ত অসম্মত হয়, তবে কন্যাপণের ব্যবস্থানুসারে তাহাকে রৌপ্য দিতে হইবে।" (২২ঃ১৬–১৭)

"দ্বিতীয় বিবরণে" এ হুকুমটি কিছুটা অন্য শব্দাবলীর সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তারপর বলা হয়েছে, পুরুষের কাছ থেকে পঞ্চাশ শেকল (প্রায় ২০ তোলা) পরিমাণ রৌপ্য

কন্যার পিতাকে জরিমানা দেবে। (২২:২৮–২৯) তবে কোন ব্যক্তি যদি পুরোহিতের মেয়ের সাথে যিনা করে তাহলে তার জন্য ইহুদী আইনে রয়েছে ফাঁসি এবং মেয়েকে জীবিত অগ্নিদগ্ধ করার ব্যবস্থা। (Everyman's Talmud, p. 319-20)

এ চিন্তাটি হিন্দু চিন্তার সাথে কত বেশী সামঞ্জস্যশীল তা অনুমান করার জন্য মনু সংহিতার সাথে একবার মিলিয়ে দেখুন। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

"যে ব্যক্তি নিজের জাতের কুমারী মেয়ের সাথে তার সম্মতিক্রমে যিনা করে সে কোন শাস্তি লাভের যোগ্য নয়। মেয়ের বাপ রাজী থাকলে সে বিনিময় দিয়ে তাকে বিয়ে করে নেবে। তবে মেয়ে যদি উচ্চ বর্ণের হয় এবং পুরুষ হয় নিম্নবর্ণের, তাহলে মেয়েকে গৃহ থেকে বের করে দেয়া উচিত এবং পুরুষের অংগচ্ছেদের শাস্তি দিতে হবে।" (৮ ঃ ৩৬৫–৩৬৬) আর মেয়ে ব্রাহ্মণ হলে এ শাস্তি জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করার শাস্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। (৩৭৭ শ্লোক)।

আসলে এ সমস্ত আইনে পরস্ত্রীর সাথে যিনা করাই ছিল বড় অপরাধ। অর্থাৎ যখন কোন (বিবাহিত বা অবিবাহিত) ব্যক্তি এমন কোন মেয়ের সাথে সংগম করে যে অন্য কোন ব্যক্তির স্ত্রী। এ কর্মটির অপরাধ হবার ভিত্তি এ ছিল না যে, একটি পুরুষ ও একটি নারী যিনা করেছে। বরং তারা দু'জন মিলে তৃতীয় এক ব্যক্তিকে এমন একটি শিশু লালন পালন করার বিপদে ফেলে দিয়েছে যেটি তার নয়, এটিই ছিল এর ভিত্তি। অর্থাৎ যিনা নয় বরং বংশধারা মিশ্রণের আশংকা এবং একের সন্তানকে অন্যের অর্থে প্রতিপালন করা ও তার উত্তরাধিকার হওয়াই ছিল অপরাধের মূল ভিত্তি। এ কারণে পুরুষ ও নারী উভয়েই অপরাধী সাব্যস্ত হতো। মিসরীয়দের সমাজে এর শাস্তি ছিল পুরুষটিকে লাঠি দিয়ে ভালোমতো পিটাতে হবে এবং মেয়েটির নাক কেটে দিতে হবে। প্রায় এ একই ধরনের শাস্তির প্রচলন ছিল ব্যাবিলন, আসিরীয়া ও প্রাচীন ইরানেও। হিন্দুদের মধ্যে নারীর শাস্তি ছিল, তার ওপর কুকুর লেলিয়ে দেয়া হতো এবং পুরুষের শাস্তি ছিল, তাকে উত্তপ্ত লোহার পালংকে শুইয়ে দিয়ে চারদিকে আগুন লাগিয়ে দেয়া হতো। গ্রীস ও রোমে প্রথম দিকে একজন পুরুষের অধিকার ছিল যদি সে নিজের স্ত্রীর সাথে কাউকে যিনা করতে দেখে তাহলে তাকে হত্যা করতে পারতো অথবা ইচ্ছা করলে তার কাছ থেকে অর্থদণ্ড নিতে পারতো। তার পর প্রথম খৃষ্টপূর্বাব্দে সীজার আগষ্টিস এ আইন জারি করেন যে, পুরুষের সম্পত্তির অর্ধাংশ বাজেয়াপ্ত করে তাকে দেশান্তর করে দিতে হবে এবং নারীর অর্ধেক মোহরানা বাতিল এবং এক–তৃতীয়াংশ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাকেও দেশের কোন দূরবর্তী এলাকায় পাঠিয়ে দিতে হবে। কনষ্টান্টিন এ আইনটি পরিবর্তিত করে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করেন। লিও (Leo) ও মারসিয়ানের (Marcian) যুগে এ শাস্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করা হয়। তারপর সীজার জাষ্টিনীন এ শাস্তিটি আরো হাল্কা করে এ নিয়ম জারি করেন যে, মেয়েটিকে বেত্রাঘাত করার পর কোন সন্যাসীর আশ্রমে দিয়ে আসতে হবে এবং তার স্বামীকে এ অধিকার দেয়া হয় যে, সে চাইলে দু'বছর পর তাকে সেখান থেকে বের করে আনতে পারে অন্যথায় সারা জীবন সেখানে ফেলে রাখতে পারে।

ইহুদী আইনে পরস্ত্রীর সাথে যিনা সম্পর্কে যে বিধান পাওয়া যায় তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

"আর মূল্য দ্বারা কিম্বা অন্যরূপে মুক্তা হয় নাই, এমন যে বাগদত্তা দাসী, তাহার সহিত যদি কেহ সংগম করে, তবে তাহারা দণ্ডনীয় হইবে; তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে না, কেননা সে মুক্তা নহে।" (লেবীয় পুস্তক ১৯ ঃ ১৭)

"আর যে ব্যক্তি পরের ভার্যার সহিত ব্যভিচার করে, যে ব্যক্তি প্রতিবাসীর ভার্যার সহিত ব্যভিচার করে, সেই ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনী, উভয়ের প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।" (লেবীয় পুস্তক ২০ ঃ ১০)

"কোন পুরুষ যদি পরস্ত্রীর সহিত শয়নকালে ধরা পড়ে, তবে পরস্ত্রীর সহিত শয়নকারী সেই পুরুষ ও সেই স্ত্রী উভয়ে হত হইবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২২ ঃ ২২)

"যদি কেহ পুরুষের প্রতি বাগদত্তা কোন কুমারীকে নগর মধ্যে পাইয়া তাহার সহিত শয়ন করে, তবে তোমরা সেই দুইজনকে বাহির করিয়া নগরদ্বারের নিকটে আনিয়া প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে, সেই কন্যাকে বধ করিবে, কেননা, নগরের মধ্যে থাকিলেও সে চীৎকার করে নাই, এবং সেই পুরষকে বধ করিবে, কেননা, সে আপন প্রতিবাসীর স্ত্রীকে মানভ্রষ্টা করিয়াছে ঃ এইরূপে তুমি আপনার মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে। কিন্তু যদি কোন পুরুষ বাগদত্তা কন্যাকে মাঠে পাইয়া বলপূর্বক তাহার সহিত শয়ন করে, তবে তাহার সহিত শয়নকারী সেই পুরুষ মাত্র হত হইবে, কিন্তু কন্যার প্রতি তুমি কিছুই করিবে না।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২২ ঃ ২৩-২৬)

কিন্তু হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের যুগের বহু পূর্বে ইহুদী উলামা, ফকীহ, শাসক ও জনতা সবাই এ আইন কার্যত রহিত করে দিয়েছিল। যদিও এ আইন বাইবেলে লিখিত ছিল এবং একেই আল্লাহর হুকুম মনে করা হতো কিন্তু কেউ এর কার্যত প্রচলনের পক্ষপাতি ছিল না। এমনকি এ হুকুমটি কখনো জারি করা হয়েছিল এমন কোন নজিরও ইহুদীদের ইতিহাসে পাওয়া যেতো না। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যখন সত্যের দাওয়াত নিয়ে আবির্ভূত হন এবং ইহুদী আলেমগণ দেখেন এ বন্যা প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থাই কার্যকর হচ্ছে না তখন তারা একটি কৌশল অবলম্বন করেন। তারা এক ব্যভিচারিনীকে তাঁর কাছে ধরে আনেন এবং বলেন, এর ফায়সালা করে দিন। (যোহন ৮ঃ১-১১) এ থেকে তাদের উদ্দেশ্য ছিল হযরত ঈসাকে কুয়া বা খাদ দু'টোর মধ্য থেকে কোন একটিতে লাফিয়ে পড়তে বাধ্য করা। যদি তিনি পাথর মেরে হত্যা (রজম) ছাড়া অন্য কোন শাস্তি নির্ধারণ করেন, তাহলে একথা বলে তাঁর দুর্নাম রটানো হবে যে, দেখো ইনি একজন অভিনব পয়গম্বর এসেছেন, দুনিয়ার ভয়ে আল্লাহর আইন পরিবর্তন করে ফেলেছেন। আর যদি 'রজম' করার হুকুম দেন, তাহলে একদিকে রোমীয় আইনের সাথে তাঁর সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়া হবে আর অন্যদিকে জাতিকে বলা হবে, এ পয়গম্বর সাহেবকে মেনে নাও, দেখে নাও একবার তাওরাতের পুরো শরীয়াত তোমাদের পিঠে ও জীবনের ওপর নিক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম একটি মাত্র বাক্যের মাধ্যমে তাদের কৌশল তাদের মাথার ওপর ছুঁড়ে মারেন। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্য থেকে যে নিজে পাক-পবিত্র-ব্যভিচারমুক্ত সে এগিয়ে এসে এর ওপর পাথর নিক্ষেপ করো। এ কথা শুনতেই ফকীহদের পুরো জমায়েত ফাঁকা হয়ে যায়। প্রত্যেকে মুখ লুকিয়ে কেটে পড়েন এবং আল্লাহর শরীয়াতের বাহকদের নৈতিক অবস্থা একেবারেই নগ্ন হয়ে ধরা পড়ে। তারপর যখন মেয়েটি একাকী দাঁড়িয়ে থাকে তখন তিনি তাকে নসীহত করেন

এবং তাওবা পড়িয়ে বিদায় করে দেন। কারণ তিনি বিচারক ছিলেন না। কাজেই তার মামলার ফায়সালা তিনি করতে পারতেন না। তাছাড়া তার বিরুদ্ধে কোন সাক্ষীও উপস্থাপিত হয়নি। সর্বোপরি আল্লাহর আইন জারি করার জন্য কোন ইসলামী রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

হযরত ঈসার এ ঘটনা এবং বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত তাঁর আরো কতিপয় বিক্ষিপ্ত বাণী থেকে ভুল যুক্তি সংগ্রহ করে ঈসায়ীরা যিনার অপরাধ সম্পর্কে অন্য একটি ধারণা তৈরী করে নিয়েছে। তাদের মতে অবিবাহিত পুরুষ যদি অবিবাহিত মেয়ের সাথে যিনা করে তাহলে এটা যিনা তো হবে ঠিকই কিন্তু শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে না। আর যদি এ কর্মের পুরুষ বা নারী যে কোন এক পক্ষ বিবাহিত হয় অথবা উভয় পক্ষই হয় বিবাহিত, তাহলে এটা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু একে অপরাধে পরিণত করে "চুক্তি ভংগ", নিছক যিনা নয়। তাদের মতে যে ব্যক্তিই বিবাহিত হবার পরও যিনা করে সে গীর্জায় পাদরীর সামনে নিজের স্ত্রী বা স্বামীর সাথে যে বিশ্বস্ততার অংগীকার ও চুক্তি করেছিল তা ভংগ করে ফেলেছে তাই সে অপরাধী। কিন্তু এ অপরাধের এ ছাড়া আর কোন শাস্তি নেই যে, যিনাকারী পুরুষের স্ত্রী তার স্বামীর বিরুদ্ধে অবিশ্বস্ততার দাবী করে বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি লাভ করতে পারবে এবং যিনাকারী স্ত্রীর স্বামী একদিকে নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে অবিশ্বস্ততার দাবী করে বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি লাভ করতে পারবে এবং অন্যদিকে যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে খারাপ করেছে তার কাছ থেকে অর্থদণ্ড লাভ করার অধিকার রাখে। খৃষ্টীয় আইন বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনীকে এ শাস্তিই দিয়ে থাকে। আর সর্বনাশের ব্যাপার হচ্ছে, এ শাস্তি দুধারি তলোয়ারের মতো। যদি কোন স্ত্রী তার বিশ্বাসঘাতক স্বামীর বিরুদ্ধে "অবিশ্বস্ততার" দাবী করে বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি হাসিল করে নেয়, তাহলে তো সে সেই বিশ্বাসঘাতক স্বামীর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে কিন্তু খৃষ্টীয় আইন অনুযায়ী এরপর আর সে জীবনভর দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না। আর যে পুরুষটি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অবিশ্বস্ততার দাবী এনে বিবাহ বিচ্ছেদ করেছিল তার অবস্থাও তাই হবে। কারণ খৃষ্টীয় আইন তাকেও দ্বিতীয় বিয়ে করার অনুমতি দেয় না। এ যেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্য থেকে যে সারা জীবন যোগী হিসেবে থাকতে চাইবে নিজের জীবন সংগী বা সংগিনীর বিরুদ্ধে খৃষ্টীয় আদালতে তার অবিশ্বস্ততার মামলা ঠুকে দিলেই চলবে।

বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য আইন-কানুন এসব বিচিত্র চিন্তাধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত। অধিকাংশ মুসলিম দেশও আজ এসব আইনের ধারা অনুসরণ করে চলছে। এ পাশ্চাত্য আইনের দৃষ্টিতে যিনা করা একটি দোষ, নৈতিক চরিত্রহীনতা বা পাপ যাই কিছু হোক না কেন, মোটকথা এটা কোন অপরাধ নয়। একে যদি কোন জিনিস অপরাধে পরিণত করতে পারে তাহলে তা হচ্ছে এমন ধরনের বল প্রয়োগ যার সাহায্যে দ্বিতীয় পক্ষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সাথে যৌন ক্রিয়া করা হয়। আর কোন বিবাহিত পুরুষের যিনা করার ব্যাপারটি হচ্ছে, তা যদি অভিযোগের কারণ হয়ে থাকে তাহলে তা হয় তার স্ত্রীর জন্য। সে চাইলে তার প্রমাণ দিয়ে তালাক হাসিল করতে পারে। আর যিনার অপরাধী যদি হয় বিবাহিতা নারী, তাহলে তার স্বামীর কেবল তার বিরুদ্ধে নয় বরং যিনাকারী পুরুষের বিরুদ্ধেও অভিযোগ দেখা দেয় এবং উভয়ের বিরুদ্ধে মামলা করে সে স্ত্রী থেকে তালাক এবং যিনাকারী পুরুষ থেকে অর্থদণ্ড নিতে পারে।

তিন ঃ এসব চিন্তার বিপরীতে ইসলামী আইন স্বয়ং যিনাকেই একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করে এবং বিবাহিত হবার পরও যিনা করলে তার দৃষ্টিতে তা অপরাধের মাত্রা আরো বেশী বাড়িয়ে দেয়। এটা এ জন্য নয় যে, অপরাধী কারোর সাথে "চুক্তিভংগ" অথবা অন্য কারো বিছানায় হস্তক্ষেপ করেছে। বরং এ জন্য যে, তার নিজের প্রবৃত্তির কামনা পূরণ করার জন্য একটি বৈধ মাধ্যম ছিল এবং এরপরও সে অবৈধ মাধ্যম অবলম্বন করেছে। ইসলামী আইন যিনাকে যে দৃষ্টিতে দেখে তা হচ্ছে এই যে, এটি এমন একটি কর্ম যাকে স্বাধীনভাবে করার সুযোগ দেয়া হলে একদিকে মানব বংশধারা এবং অন্যদিকে তার সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদ হয়ে যাবে। বংশধারার স্থায়িত্ব ও সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা উভয়ের জন্য নারী ও পুরুষের সম্পর্ক শুধুমাত্র আইন অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা অপরিহার্য। আর তার সাথে সাথে যদি অবাধ যৌন সম্পর্কেরও খোলাখুলি অবকাশ থাকে তাহলে তাকে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। কারণ গৃহ ও পরিবারের দায়িত্বের বোঝা বহন করা ছাড়া যেখানে লোকদের প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করার সুযোগ থাকে সেখানে তাদের থেকে আশা করা যেতে পারে না যে, সেসব প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করার জন্য তারা আবার এত বড় দায়িত্বের বোঝা বহন করতে উদ্যত হবে। এটা ঠিক বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণের স্বাধীনতা থাকার পর রেল গাড়িতে বসার জন্য টিকিটের শর্ত অর্থহীন হয়ে যাওয়ার মতো। টিকিটের শর্ত যদি অপরিহার্য হয়ে থাকে তাহলে তাকে কার্যকর করার জন্য বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। তারপর যদি কোন ব্যক্তি পয়সা না থাকার কারণে বিনা টিকিটে সফর করে তাহলে সে অপেক্ষাকৃত কম পর্যায়ের অপরাধী হবে এবং ধানাঢ্য হবার পরও এ অপরাধ করলে তার অপরাধ আরো কঠিন হয়ে যায়।

চার ঃ ইসলাম মানব সমাজকে যিনার আশংকা থেকে বাঁচাবার জন্য শুধুমাত্র দণ্ডবিধি আইনের অস্ত্রের ওপর নির্ভর করে না বরং তার জন্য ব্যাপক আকারে সংস্কার ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। আর এ দণ্ডবিধি আইনকে নির্ধারণ করেছে নিছক একটি শেষ উপায় হিসেবে। এর উদ্দেশ্য এ নয় যে, লোকেরা এ অপরাধ করে যেতেই থাকুক এবং তাদেরকে বেত্রাঘাত করার জন্য দিনরাত তাদের ওপর নজর রাখা হোক। বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, লোকেরা যেন এ অপরাধ না করে এবং কাউকে শাস্তি দেবার সুযোগই না পাওয়া যায়। সে সবার আগে মানুষের প্রবৃত্তির সংশোধন করে। তার মনের মধ্যে বসিয়ে দেয় অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী এবং সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহর ভয়। তার মধ্যে আখেরাতে জিজ্ঞাসাবাদের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। মরেও মানুষ এ হাত থেকে বাঁচতে পারে না। তার মধ্যে আল্লাহর আইনের আনুগত্য করার প্রেরণা সৃষ্টি করে। এটি হচ্ছে ঈমানের অপরিহার্য দাবী। আর তারপর বারবার তাকে এ মর্মে সতর্ক করে যে, যিনা ও সতীত্বহীনতা এমন বড় বড় গোনাহর অন্তরভুক্ত যেগুলো সম্পর্কে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সমগ্র কুরআনে বারবার এ বিষয়বস্তু সামনে আসতে থাকে। তারপর ইসলাম মানুষের জন্য বিয়ের যাবতীয় সম্ভাব্য সহজ সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এক স্ত্রীতে তৃপ্ত না হলে চারটি পর্যন্ত বৈধ স্ত্রী রাখার সুযোগ করে দেয়। স্বামী-স্ত্রীর মনের মিল না হলে স্বামীর জন্য তালাক ও স্ত্রীর "খুলা"র সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। আর অমিলের সময় পারিবারিক সালিশ থেকে শুরু করে সরকারী আদালতে পর্যন্ত আপীল করার পথ খুলে দেয়, এর ফলে দু'জনের মধ্যে সমঝোতা হয়ে যেতে পারে আর নয়তো স্বামী-স্ত্রী

পরস্পরের বন্ধন মুক্ত হয়ে নিজেদের ইচ্ছা মতো অন্য কোথাও বিয়ে করতে পারে। এসব বিষয় সূরা বাকারাহ, সূরা নিসা ও সূরা তালাকে দেখা যেতে পারে। আর এ সূরা নূরেও দেখা যাচ্ছে পুরুষ ও নারীকে বিয়ে না করে বসে থাকাকে অপছন্দ করা হয়েছে এবং এ ধরনের লোকদের বিয়ে করিয়ে দেবার এমনকি গোলাম ও বাঁদীদেরকেও অবিবাহিত করে না রাখার জন্য পরিষ্কার হুকুম দেয়া হয়েছে।

তারপর ইসলাম সমাজ থেকে এমন সব কার্যকারণ নির্মূল করে দেয় যেগুলো যিনার আগ্রহ ও তার উদ্যোগ সৃষ্টি করে এবং তার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরী করতে পারে। যিনার শাস্তি বর্ণনা করার এক বছর আগে সূরা আহযাবে মেয়েদেরকে গৃহ থেকে বের হতে হলে চাদর মুড়ি দিয়ে এবং ঘোমটা টেনে বের হবার হুকুম দেয়া হয়েছিল। মুসলমান মেয়েদের জন্য যে নবীর গৃহ ছিল আদর্শ গৃহ সেখানে বসবাসকারী মহিলাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, নিজেদের গৃহ মধ্যে মর্যাদা ও প্রশান্তি সহকারে বসে থাকো, নিজেদের সৌন্দর্য ও সাজসজ্জার প্রদর্শনী করে বেড়িও না এবং বাইরের পুরুষরা তোমাদের থেকে কোন জিনিস নিলে যেন পরদার আড়াল থেকে নেয়। দেখতে দেখতে এ আদর্শ সমস্ত মু'মিন মহিলাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের কাছে জাহেলী যুগের নির্লজ্জ মহিলারা নয় বরং নবীর (সা) স্ত্রী ও কন্যাগণই ছিলেন অনুসরণযোগ্য। অনুরূপভাবে ফৌজদারী আইনের শাস্তি নির্ধারণ করার আগে নারী ও পুরুষের অবাধ মিশ্রিত সামাজিকতা বন্ধ করা হয়, নারীদের সাজসজ্জা করে বাইরে বের হওয়া বন্ধ করা হয় এবং যে সমস্ত কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণ যিনার সুযোগ-সুবিধা তৈরী করে দেয় সেগুলোর দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। এসবের পরে যখন যিনার ফৌজদারী তথা অপরাধমূলক শাস্তি নির্ধারণ করা হয় তখন দেখা যায় এর সাথে সাথে এ সূরা নূরেই অশ্লীলতার সম্প্রসারণেও বাধা দেয়া হচ্ছে। পতিতাবৃত্তিকে (Prostitution) আইনগতভাবে বন্ধ করা হচ্ছে। নারী ও পুরুষদের বিরুদ্ধে বিনা প্রমাণে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া এবং তার আলোচনা করার জন্যও কঠোর শাস্তির বিধান দেয়া হচ্ছে। দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করার হুকুম দিয়ে চোখকে প্রহরাধীন রাখা হচ্ছে, যাতে দৃষ্টি বিনিময় সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি এবং সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ কামচর্চায় পৌঁছুতে না পারে। এ সংগে নারীদেরকে নিজেদের ঘরে মাহ্‌রাম ও গায়ের মাহ্‌রাম আত্মীয়দের মধ্যে পার্থক্য করার এবং গায়ের মাহ্‌রামদের সামনে সেজেগুজে না আসার হুকুম দেয়া হচ্ছে। এ থেকে যে সংস্কার পরিকল্পনার একটি অংশ হিসেবে যিনার আইনগত শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে তার সমগ্র অবয়বটি অনুধাবন করা যেতে পারে। ভিতর-বাইরের যাবতীয় সংশোধন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যেসব দুষ্ট প্রকৃতির লোক প্রকাশ্য বৈধ সুযোগ বাদ দিয়ে অবৈধ পথ অবলম্বন করে নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করার ওপর জোর দেয় তাদেরকে চরম শাস্তি দেবার এবং একজন ব্যভিচারীকে শাস্তি দিয়ে সমাজের এ ধরনের প্রবৃত্তির অধিকারী বহু সংখ্যক লোকের মানসিক অপারেশন করার জন্যই এ শাস্তি। এ শাস্তি নিছক একজন অপরাধীর শাস্তি নয় বরং এটি একটি কার্যকর ঘোষণা যে, মুসলিম সমাজ ব্যভিচারীদের অবাধ বিচরণস্থল নয় এবং এটি স্বাদ আস্বাদনকারী পুরুষ ও নারীদের নৈতিক বাঁধন মুক্ত হয়ে যথেচ্ছা আমোদ ফূর্তি করার জায়গাও নয়। এ দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি ইসলামের এ সংস্কার পরিকল্পনা অনুধাবন করতে চাইলে সহজে অনুভব করেন যে, এ সমগ্র পরিকল্পনার একটি অংশকেও তার নিজের জায়গা থেকে সরানো যেতে পারে না এবং এর মধ্যে কোন কমবেশীও করা যেতে পারে

না। এর মধ্যে রদবদল করার চিন্তা করতে পারে এমন একজন অজ্ঞ–নাদান, যে একে অনুধাবন করার যোগ্যতা ছাড়াই এর সংশোধনকারী ও সংস্কারক হয়ে বসেছে অথবা মহাজ্ঞানী আল্লাহ যে উদ্দেশে এ পরিকল্পনাটি দিয়েছেন তা পরিবর্তন করাই যার আসল নিয়ত এমন একজন বিপর্যয় সৃষ্টিকারীই এ চিন্তা করতে পারে।

পাঁচ ঃ তৃতীয় হিজরীতেই তো যিনাকে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করা হয়েছিল। কিন্তু তখনো পর্যন্ত এটি একটি আইনগত অপরাধ ছিল না। রাষ্ট্রীয় পুলিশ ও বিচার বিভাগ এর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতো না। বরং তখন এটি ছিল একটি "সামাজিক" বা "পারিবারিক" অপরাধ। পরিবারের লোকদেরই এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার ইখতিয়ার ছিল। হুকুম ছিল, যদি চার জন সাক্ষী এই মর্মে সাক্ষ দেয় যে, তারা একটি পুরুষ ও একটি মেয়েকে যিনা করতে দেখেছে তাহলে তাদের দু'জনকে মারধর করতে হবে এবং মেয়েটিকে গৃহবন্দী করতে হবে। এ সংগে এ ইশারাও করে দেয়া হয়েছিল যে, "পরবর্তী হুকুম" না দেয়া পর্যন্ত এ হুকুমটি জারি থাকবে। আসল আইন পরে আসছে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নিসা, ১৫ ও ১৬ আয়াত এবং এ সংগে টীকাও) এর আড়াই তিন বছর পর সূরা নূরের এ আয়াত নাযিল হয়। কাজেই এটি আগের হুকুম রহিত করে যিনাকে একটি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ যোগ্য (Cognizable Offence) আইনগত অপরাধ গণ্য করে।

ছয় ঃ এ আয়াতে যিনার যে শাস্তি নির্ধারণ করা হয় তা আসলে "নিছক যিনা"র শাস্তি, বিবাহিতের যিনার শাস্তি নয়। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে এ বিবাহিতের যিনা কঠিনতর অপরাধ। একথা কুরআনের একটি ইশারা থেকে জানা যায় যে, সে এখানে এমন একটি যিনার শাস্তি বর্ণনা করছে যার উভয় পক্ষ অবিবাহিত। সূরা নিসায় ইতিপূর্বে বলা হয় ঃ

وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ .... اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ۝

"তোমাদের নারীদের মধ্য থেকে যারা ব্যভিচারের অপরাধ করবে তাদের ওপর তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে চার জনের সাক্ষ নাও। আর যদি তারা সাক্ষ দিয়ে দেয় তাহলে এরপর তাদেরকে (অপরাধী নারীদেরকে) ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখে দাও, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু এসে যায় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য বের করে দেন কোন পথ।" (১৫ আয়াত)

এরপর কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে বলা হয় ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ... ... فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ط

"আর তোমাদের মধ্যে যারা মু'মিনদের মধ্য থেকে স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার ক্ষমতা রাখে না, তারা তোমাদের মু'মিন বাঁদীদেরকে বিয়ে করবে। ....তারপর যদি (ঐ বাঁদীরা) বিবাহিত হয়ে যাবার পর ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের শাস্তি (এ ধরনের অপরাধে) স্বাধীন নারীদের তুলনায় অর্ধেক দিতে হবে। (২৫ আয়াত)

এর মধ্যে প্রথম আয়াতে আশা দেয়া হয়েছে যে, ব্যভিচারিনীদের জন্য, যাদেরকে আপাতত বন্দী করার হুকুম দেয়া হচ্ছে, আল্লাহ পরে কোন পথ বের করে দেবেন. এ থেকে জানা যায়, সূরা নিসার ওপরে উল্লেখিত আয়াতে যে ওয়াদা করা হয়েছিল এ দ্বিতীয় হুকুমটির মাধ্যমে সে ওয়াদা পূরণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে বিবাহিতা বাঁদীর যিনার শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে একই আয়াতে এবং একই বর্ণনা ধারায় দু'বার "মুহ্সানাত" তথা স্বাধীন নারী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আর উভয় জায়গায়ই এর অর্থ একই, একথা অবশ্য মানতেই হবে এবার শুরুর দিকের বাক্যাংশ দেখুন. সেখানে বলা হচ্ছে, যারা "মুহ্সানাতদের" বিয়ে করার ক্ষমতা রাখে না। অবশ্যই এখানে "মুহসানাত" মানে বিবাহিতা নারী হতে পারে না বরং এর মানে হতে পারে, একটি স্বাধীন পরিবারের অবিবাহিতা নারী। তারপর শেষের বাক্যাংশে বলা হচ্ছে, বাঁদী বিবাহিতা হবার পর যদি যিনা করে, তাহলে এ অপরাধে মুহসানাতের যে শাস্তি হওয়া উচিত তার শাস্তি হবে তার অর্ধেক। পরবর্তী আলোচনা পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে যে, প্রথম বাক্যাংশে "মুহসানাত" অর্থ যা ছিল এ বাক্যাংশেও তার অর্থ সে একই অর্থাৎ বিবাহিতা নারী নয় বরং স্বাধীন পরিবারের পালিতা অবিবাহিতা নারী এভাবে সূরা নিসার এ দু'টি আয়াত একত্র হয়ে এ বিষয়ের প্রতি ইংগিত করে যে, সেখানে অবিবাহিতাদের যিনার শাস্তির কথা বর্ণনার যে ওয়াদা করা হয়েছিল সূরা নূরের এ হুকুমটি সে কথাই বর্ণনা করছে (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা নিসা, ৪৬ টীকা)।

সাত ঃ বিবাহিতের যিনার শাস্তি কি, একথা কুরআন মজীদ থেকে নয় বরং হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি। অসংখ্য নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে প্রমাণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল মুখেই এর শাস্তি রজম (প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু) বর্ণনা করেননি বরং কার্যত বহু সংখ্যক মোকদ্দমায় তিনি এ শাস্তি জারিও করেন. তাঁর পরে চার খোলাফায়ে রাশেদীনও নিজ নিজ যুগে এ শাস্তি জারি করেন এবং আইনগত শাস্তি হিসেবে বারবার এরি ঘোষণা দেন। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ ছিলেন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। কোন এক ব্যক্তিরও এমন একটি উক্তি পাওয়া যায় না যা থেকে একথা প্রমাণ হতে পারে যে, প্রথম যুগে এর প্রমাণিত শরয়ী' হুকুম হবার ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল। তাঁদের পরে সকল যুগের ও দেশের ইসলামী ফকীহগণ এর একটি প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত হবার ব্যাপারে একমত ছিলেন। কারণ এর নির্ভুলতার সপক্ষে এত বিপুল সংখ্যক ও শক্তিশালী প্রমাণ রয়েছে যার উপস্থিতিতে কোন তত্ত্বজ্ঞানী একথা অস্বীকার করতে পারেন না। উম্মতে মুসলিমার সমগ্র ইতিহাসে খারেজী ও কোন কোন মুতাযিলী ছাড়া কেউই একথা অস্বীকার করেননি খারেজী ও মুতাযিলাদের অস্বীকৃতির কারণ এটা নয় যে, তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এর প্রমাণের ক্ষেত্রে কোন প্রকার দুর্বলতা চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন বরং তারা একে কুরআন বিরোধী গণ্য করতেন অথচ এটি ছিল তাঁদের নিজেদের কুরআন অনুধাবনের ত্রুটি তাঁরা বলতেন, কুরআন الزانى والزانية এর একত্র শর্তহীন শব্দ ব্যবহার করে এর শাস্তি বর্ণনা করে একশ' বেত্রাঘাত। কাজেই কুরআনের দৃষ্টিতে সকল প্রকার ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনীর শাস্তি এটিই এবং এ থেকে বিবাহিত ব্যভিচারীকে পৃথক করে তার জন্য কোন ভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থা করা আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধাচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু তাঁরা এ কথা চিন্তা করেননি যে, কুরআনের শব্দাবলীর যে আইনগত গুরুত্ব রয়েছে সে একই

গুরুত্বের অধিকারী হচ্ছে তাদের উদ্ধৃত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যাও। তবে এখানে শর্ত শুধু হচ্ছে এই যে, এ ব্যাখ্যা যে তাঁরই একথা প্রমাণিত হতে হবে। কুরআন এ ধরনেরই ব্যাপক ও একচ্ছত্র অর্থবোধক শব্দের মাধ্যমে السارق والسارقة তথা পুরুষ চোর ও মেয়ে চোরের শাস্তি হিসেবে হাত কাটার বিধান দিয়েছে। এ বিধানকেও যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রমাণিত ব্যাখ্যাসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন না করা হয় তাহলে এর শব্দাবলীর ব্যাপকতার দাবী হচ্ছে এই যে, কোন ব্যক্তি সামান্য একটি সুঁই বা কুল চুরি করলেও তাকে চোর আখ্যা দিয়ে তার হাতটি একেবারে কাঁধের কাছ থেকে কেটে দেয়া হবে। অন্যদিকে লাখ লাখ টাকা চুরি করার পরও যদি এক ব্যক্তি পাকড়াও হয়ে বলে, আমি নিজেকে সংশোধন করে নিয়েছি এবং ভবিষ্যতে আমি আর চুরি করবো না, চুরি থেকে আমি তাওবা করে নিলাম তাহলে এ ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যি ছেড়ে দিতে হবে। কারণ কুরআন বলছে ঃ

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ

"যে ব্যক্তি জুলুম করার পরে তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করে নেন।" (মা-য়েদাহ, ৩৯)

এভাবে কুরআন শুধুমাত্র দুধ-মা ও দুধ বোনকে বিয়ে করা হারাম ঘোষণা করেছে, দুধ-কন্যাকে বিয়ে এ যুক্তির প্রেক্ষিতে কুরআন বিরোধী হওয়া উচিত। কুরআন কেবলমাত্র দুই বোনকে এক সংগে বিয়ে করা নিষেধ করেছে। খালা-ভাগনী এবং ফুফী-ভাইঝিকে একত্রে বিয়ে করাকে যে ব্যক্তি হারাম বলে তার বিরুদ্ধে কুরআন বিরোধী হুকুম দিচ্ছে বলে অভিযোগ আনতে হবে। কুরআন সৎ-মেয়েকে বিয়ে করা শুধুমাত্র তখনই হারাম করে যখন সে তার সৎ-পিতার ঘরে প্রতিপালিত হয়। শর্তহীন ও এচ্ছত্রভাবে এর হারাম হওয়ার বিষয়টি কুরআন বিরোধী গণ্য হওয়া উচিত। কুরআন শুধুমাত্র এমন অবস্থায় 'রেহেন' রাখার অনুমতি দেয় যখন মানুষ বিদেশে সফররত থাকে এবং ঋণ সংক্রান্ত দলিলপত্র লেখার লোক পাওয়া না যায়। দেশে অবস্থানকালে এবং দলিলপত্র লেখার লোক পাওয়া গেলে এ অবস্থায় রেহেন রাখার বৈধতা কুরআন বিরোধী হওয়া উচিত। কুরআন সাধারণ ও ব্যাপক অর্থবোধক শব্দের মাধ্যমে হুকুম দেয় ঃ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ (অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে কেনাবেচা করার সময় সাক্ষী রাখো)।

এ প্রেক্ষিতে আমাদের হাটে-বাজারে-দোকানে দিনরাত বিনা সাক্ষী প্রমাণে যেসব কেনাবেচা হচ্ছে সেসবই অবৈধ হওয়া উচিত। এখানে গুটিকয় মাত্র দৃষ্টান্ত পেশ করলাম। এগুলোর ওপর চোখ বুলালে রজম তথা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডকে যারা কুরআন বিরোধী বলেন, তাদের যুক্তির গলদ চোখের সামনে ভেসে উঠবে। শরীয়াতী ব্যবস্থায় নবীর দায়িত্ব হচ্ছে, তিনি আমাদের কাছে আল্লাহর হুকুম পৌছিয়ে দেবার পর আমাদের জানাবেন তার অর্থ কি, তা কার্যকর করার পদ্ধতি কি, কোন্ কোন্ বিষয়ে তা প্রযোজ্য হবে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রযোজ্য হবে না। ইসলামী শরীয়াতে নবীর এ মর্যাদা অনস্বীকার্য। নবীর এ মর্যাদা ও পদাধিকার অস্বীকার করা শুধুমাত্র দীনের মূলনীতিরই অস্বীকার নয় বরং এর ফলে অগণিত বাস্তব ত্রুটিও দেখা দেয়।

আট ঃ যিনার আইনগত সংজ্ঞা নির্দেশের ক্ষেত্রে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফীগণ এর সংজ্ঞা বর্ণনা করে বলেন, কোন পুরুষের এমন কোন নারীর সাথে সম্মুখ

দ্বার দিয়ে সংগম করা যে তার বিয়ে করা স্ত্রী বা মালিকানাধীন বাঁদী নয় এবং যাকে বিবাহিতা স্ত্রী বা মালিকানাধীন বাঁদী মনে করে সংগম করেছে বলে সন্দেহ পোষণ করার কোন যুক্তিসংগত কারণও যেখানে নেই।" এ সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে পশ্চাদ্বারে সংগম, নৃতের সম্প্রদায়ের কর্ম, পশুর সাথে সংগম ইত্যাদির ওপর যিনার অর্থ প্রযোজ্য হয় না। শুধুমাত্র যখন শরীয়াতে সুস্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট অধিকার ছাড়া নারীর সাথে সম্মুখদ্বার দিয়ে সংগম করা হয় তখনই তা যিনা হিসেবে চিহ্নিত হয়। বিপরীত পক্ষে শাফেঈগণ এর সংজ্ঞা এভাবে বর্ণনা করেন, "লজ্জাস্থানকে এমন লজ্জাস্থানে প্রবেশ করানো যা শরীয়াতের দৃষ্টিতে হারাম কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে যেদিকে আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে।" আর মালেকীদের মতে এর সংজ্ঞা হচ্ছে, "শরীয়াত নির্ধারিত সুস্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট অধিকার ছাড়া সম্মুখদ্বার বা পশ্চাদ্বার দিয়ে পুরুষ বা নারীর সাথে সংগম করা" এ দু'টি সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে নৃতের জাতির কর্মও যিনার অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু সঠিক কথা হচ্ছে, এ দু'টি সংজ্ঞাই যিনা শব্দের পরিচিত ব্যাখ্যার বাইরে পড়ে। কুরআন সবসময় শব্দকে তার পরিচিত ও সাধারণের জন্য সহজবোধ্য অর্থে ব্যবহার করে থাকে। তবে কখনো আবার সে কোন শব্দকে তার বিশেষ পরিভাষায় পরিণত করে এবং এ অবস্থায় সে নিজেই তার বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। এখানে যিনা শব্দটিকে কোন বিশেষ অর্থে ব্যবহার করার কোন লক্ষণ নেই। কাজেই একে পরিচিত অর্থেই গ্রহণ করা হবে। আর এ অর্থটি নারীর সাথে স্বাভাবিক কিন্তু অবৈধ সম্পর্ক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। যৌন কামনা চরিতার্থ করার অন্যান্য উপায় ও অবস্থা পর্যন্ত এটি বিস্তৃত নয়। এ ছাড়া একথাও সবার জানা যে, নৃতের জাতির কুকর্ম তথা সমকামের শাস্তির ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। এ কর্মটিকেও যদি ইসলামী পরিভাষার দৃষ্টিতে যিনার মধ্যে শামিল করা হতো তাহলে একথা সুস্পষ্ট যে, এ ক্ষেত্রে মতবিরোধের কোন অবকাশই থাকতো না।

নয় ঃ আইনগতভাবে একটি যিনা কর্মকে শাস্তিযোগ্য গণ্য করার জন্য কেবলমাত্র পুরুষাংগের অগ্রভাগ প্রবেশ করানোটাই যথেষ্ট, সম্পূর্ণ প্রবেশ বা ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া এ জন্য জরুরী নয়। পক্ষান্তরে যদি পুরুষাংগ প্রবেশ না করে, তাহলে নিছক এক বিছানায় দু'জনকে পাওয়া অথবা জড়াজড়ি করতে দেখা কিংবা উলংগ অবস্থায় পাওয়া কাউকে যিনাকারী গণ্য করার জন্য যথেষ্ট নয়। আবার কোন দু'জন নারী পুরুষকে এ অবস্থায় পেলে তাদের ডাক্তারী পরীক্ষা করার মাধ্যমে যিনার প্রমাণ পেশ করে তাদের বিরুদ্ধে যিনার শাস্তি প্রয়োগ করার কথাও ইসলামী শরীয়াত বলে না। যাদেরকে এ ধরনের অশ্লীল কাজে লিপ্ত পাওয়া যাবে তাদেরকে নিছক এমন ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হবে, যার ফায়সালা করবেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের বিচারপতি নিজেই অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শূরা তাদের জন্য কোন শাস্তি নির্ধারণ করবেন। এ শাস্তি বেত্রাঘাতের আকারে হলে তা দশ ঘা'র বেশী হবে না। কারণ হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে ঃ

لا يجلد فوق عشر جلدات الا فى حد من حدود الله

"আল্লাহ নির্ধারিত শাস্তি ছাড়া অন্য যে কোন অপরাধে দশ বেত্রাঘাতের বেশী শাস্তি দিয়ো না।" (বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ)

আর যদি কোন ব্যক্তি পাকড়াও হয়নি বরং নিজেই লজ্জিত হয়ে এ ধরনের কোন অপরাধের কথা স্বীকার করে, তাহলে তার জন্য শুধুমাত্র তাওবা করার নির্দেশ দেয়াই

যথেষ্ট। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হাযির হয়ে বললেন ঃ "নগরের বাইরে আমি একটি নারীর সাথে সংগম ছাড়া সবকিছু করে ফেলেছি। এখন জনাব আপনি আমাকে যা ইচ্ছা শাস্তি দিন।" হযরত উমর (রা) বললেন ঃ "আল্লাহ যখন গোপন করে দিয়েছিলেন তখন তুমিও গোপন থাকতে দিতে।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবকিছু শোনার পর নীরব থাকলেন এবং সে ব্যক্তি চলে গেলেন। তারপর তিনি তাকে ফিরিয়ে আনলেন এবং এ আয়াতটি পড়লেন ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۭ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ

"নামায কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তে এবং কিছু রাত অতিক্রান্ত হবার পর। অবশ্যই সৎকাজ অসৎকাজগুলোকে দূর করে দেয়।" (হূদ, ১১৪)

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি শুধু তারই জন্য" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "না, সবার জন্য।" (মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী) শুধু এতটুকুই নয়, কোন ব্যক্তি অপরাধের বর্ণনা সুস্পষ্টভাবে না দিয়ে যদি নিজের অপরাধী হবার স্বীকৃতি দেয়, তাহলে এ অবস্থায় অনুসন্ধান চালিয়ে সে কি অপরাধ করেছে তা জানতে চাওয়াটাও শরীয়াত বৈধ করেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে এক ব্যক্তি হাযির হয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! আমি দণ্ডলাভের অধিকারী হয়ে গেছি, আমাকে শাস্তি দিন।" কিন্তু তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন না, তুমি কোন্ দণ্ডলাভের অধিকারী হয়েছো? তারপর নামায শেষ হবার পর ঐ ব্যক্তি আবার উঠে বললেন, "আমি অপরাধী, আমাকে শাস্তি দিন।" রসূললুল্লাহ (সা) বললেন, "তুমি কি এখনি আমাদের সাথে নামায পড়নি?" জবাব দিলেন, "জি হাঁ"। বললেন, "ব্যস, তাহলে আল্লাহ তোমার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন।" (বুখারী, মুসলিম ও আহমাদ)

দশ ঃ কোন ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য কেবলমাত্র সে যিনা করেছে এতটুকু যথেষ্ট নয়। বরং এ জন্য অপরাধীর মধ্যে কিছু শর্ত পাওয়া যেতে হবে। নিছক যিনার ক্ষেত্রে এ শর্তগুলো এক ধরনের এবং বিবাহিতের যিনার ক্ষেত্রে এগুলো আবার ভিন্ন ধরনের।

নিছক যিনার ক্ষেত্রে এ শর্তগুলো হচ্ছে, অপরাধী হবে জ্ঞান সম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক। যদি কোন বুদ্ধিভ্রষ্ট পাগল বা শিশু এ কর্ম করে তাহলে তার ওপর যিনার শাস্তি প্রযুক্ত হবে না।

বিবাহিতের যিনার জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞান সম্পন্ন হবার সাথে সাথে আরো কয়েকটি শর্তও রয়েছে। নিচে আমি এগুলো বর্ণনা করছি ঃ

প্রথম শর্ত হচ্ছে, অপরাধীকে স্বাধীন হতে হবে। এ শর্তটির ব্যাপারে সবাই একমত। কারণ কুরআন নিজেই ইংগিত করছে, গোলামকে রজমের শাস্তি দেয়া যাবে না। একটু আগেই একথা আলোচনা হয়েছে যে, বাঁদী যদি বিয়ের পর যিনায় লিপ্ত হয় তাহলে তাকে অবিবাহিতা স্বাধীন নারীর তুলনায় অর্ধেক শাস্তি দেয়া উচিত। ফকীহগণ স্বীকার করেছেন কুরআনের এ বিধানটিই গোলামের ওপরও প্রযুক্ত হবে।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, অপরাধীকে যথারীতি বিবাহিত হতে হবে। এ শর্তটির ব্যাপারেও সবাই একমত। আর এ শর্তটির প্রেক্ষিতে যে ব্যক্তি নিজের বাঁদীর সাথে যৌন সম্পর্ক

করেছে অথবা যার বিয়ে হয়েছে কোন গর্হিত পদ্ধতিতে, তাকে বিবাহিত গণ্য করা হবে না। অর্থাৎ সে যদি যিনা করে তাহলে তাকে রজম নয় বরং বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হবে।

তৃতীয় শর্তটি হচ্ছে, তার নিছক বিয়েই যথেষ্ট নয় বরং বিয়ের পর সঠিক অর্থে স্বামী-স্ত্রীর নিভৃত মিলনও হতে হবে। নিছক বিবাহ অনুষ্ঠান কোন পুরুষকে বিবাহিত এবং কোন নারীকে বিবাহিতা করে না যার ফলে যিনা করার কারণে তাদেরকে রজম করা যেতে পারে। এ শর্তটির ব্যাপারেও অধিকাংশ ফকীহ একমত। তবে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) এর মধ্যে আরো এতটুকু সংযোজন করেন যে, একজন পুরুষ ও নারীকে কেবলমাত্র তখনই বিবাহিত গণ্য করা হবে যখন বিয়ে ও নিভৃত মিলনের সময় স্বামী স্ত্রী উভয়ই স্বাধীন, প্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞানসম্পন্ন হবে। এ অতিরিক্ত শর্তের ফলে যেটুকু পার্থক্য দেখা দেয় তা হচ্ছে এই যে, যদি একটি পুরুষের বিয়ে একটি বাঁদী, উন্মাদ বা অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ের সাথে হয় তাহলে এ অবস্থায় সে নিজের স্ত্রীর সাথে নিভৃত মিলনের স্বাদ গ্রহণ করলেও এরপর যদি সে যিনায় লিপ্ত হয় তাহলে রজমের শাস্তিলাভের অধিকারী হবে না। নারীর ব্যাপারেও এই একই কথা। সে তার গোলাম, উন্মাদ বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক স্বামীর সাথে যৌন মিলনের স্বাদ গ্রহণ করলেও এর পরে যদি সে যিনায় লিপ্ত হয় তাহলে রজমের শাস্তি লাভের অধিকারী হবে না। ভেবে দেখলে বুঝা যাবে, এই দু'জন বিচক্ষণ প্রতিভাবান ইমামের এই বর্ধিত শর্তটি অত্যন্ত যুক্তিসংগত।

চতুর্থ শর্তটি হচ্ছে, অপরাধীকে মুসলমান হতে হবে। এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফেঈ, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম আহমাদ এ শর্তটি মানেন না। তাঁদের মতে অমুসলিমও যদি বিয়ে করার পর যিনায় লিপ্ত হয় তাহলে তাকে রজম করা হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক এ বিষয়ে একমত যে, একমাত্র মুসলমানকেই বিয়ে করার পর যিনায় লিপ্ত হলে রজমের শাস্তি দেয়া যেতে পারে। এর যেসব যুক্তি তাঁরা দেখিয়েছেন তার মধ্যে সবচেয়ে সংগত ও গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হচ্ছে, এক ব্যক্তিকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুর মতো ভয়াবহ শাস্তি দেবার জন্য অপরিহার্য হচ্ছে এই যে, সে পূর্ণ "বিবাহিত" অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও যিনা থেকে বিরত হয় না। বিবাহিত মানে হচ্ছে "নৈতিক দূর্গ পরিবেষ্টিত।" আর তিনটি প্রাচীর এ পরিবেষ্টনকে পূর্ণতা দান করে। প্রথম প্রাচীর হচ্ছে, মানুষকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হবে। আখেরাতের জবাবদিহির প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে এবং আল্লাহর শরীয়াতকে স্বীকার করতে হবে। দ্বিতীয় প্রাচীর হচ্ছে, তাকে সমাজের স্বাধীন ব্যক্তি হতে হবে। সে কারোর গোলাম হবে না। কারণ মালিকের বিধিনিষেধ মেনে নিয়ে নিজের কামনা পূর্ণ করতে গিয়ে তাকে বৈধ উপায় অবলম্বনে বাধা পেতে হয় এবং এর ফলে অক্ষমতা তাকে গোনাহে লিপ্ত করতে পারে। কোন পরিবারও তার চরিত্র ও মান-সম্মান রক্ষায় সাহায্যকারী হয় না। আর তৃতীয় প্রাচীর হচ্ছে তার বিয়ে হয়ে গেছে এবং নিজের কামনা পূর্ণ করার বৈধ উপায় তার করায়ত্ত আছে। এ তিনটি প্রাচীরের অস্তিত্ব যখন বিদ্যমান থাকে তখনই "দূর্গ পরিবেষ্টন" পূর্ণতা লাভ করে এবং তখনই যে ব্যক্তি অবৈধ যৌন কামনা চরিতার্থ করার জন্য এ ধরনের তিন তিনটি প্রাচীর ভেংগে ফেলে সে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু বরণের যোগ্য গণ্য হতে পারে। কিন্তু যেখানে প্রথম ও সবচেয়ে বড় প্রাচীর অর্থাৎ আল্লাহ, পরকাল ও আল্লাহর আইনের প্রতি বিশ্বাসই উপস্থিত নেই সেখানে নিশ্চিতভাবেই দূর্গ পরিবেষ্টন পূর্ণতা লাভ করেনি এবং এ কারণে

চরিত্রহীনতার অপরাধ এমন মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে যায়নি যা তাকে চরম শাস্তির অধিকারী করে। ইসহাক ইবনে রাহাওয়াহ তাঁর মুসনাদে এবং দারুকুত্নী তাঁর সুনান গ্রন্থে ইবনে উমরের (রা) যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেটি এ যুক্তিকে সমর্থন করে। হাদীসটিতে বলা হয়েছে من اشرك بالله فليس بمحصن "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করেছে সে 'মুহসিন' নয়।" যদিও এ হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তির পুনরাবৃত্তি করেছেন, না নিজের মত ব্যক্ত করেছেন। এ ব্যাপারে মত বিরোধ আছে কিন্তু এ দুর্বলতা সত্ত্বেও মূল অর্থের দিক দিয়ে এর বিষয়বস্তু অত্যন্ত শক্তিশালী। এর জবাবে যদি ইহুদীদের একটি মোকদ্দমা থেকে যুক্তি পেশ করা হয় যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রজম করার বিধান প্রয়োগ করেছিলেন, তাহলে আমি বলবো, এ যুক্তি সঠিক নয়। কারণ ঐ মোকদ্দমা সম্পর্কিত সমস্ত নির্ভরযোগ্য হাদীস একত্র করলে পরিষ্কার জানা যায় যে, সেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ওপর ইসলামের প্রচলিত আইন (Law of the Land) নয়, তাদের নিজেদের ধর্মীয় আইন (Personal law) প্রয়োগ করেছিলেন। বুখারী ও মুসলিম একযোগে এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, যখন এ মোকদ্দমা রসূলের কাছে আনা হলো তখন তিনি ইহুদীদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ ما تجدون فى التوراة فى شان الرجم يا ما تجدون فى كتابكم অর্থাৎ "তোমাদের নিজেদের কিতাব তাওরাতে এর কি বিধান প্রদত্ত হয়েছে?" তারপর যখন একথা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, তাদের সমাজে রজমের বিধান আছে তখন তিনি বললেন ঃ فانى احكم بما فى التوراة "আমি সেই ফায়সালা দিচ্ছি যা তাওরাতে আছে।" অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি এ মোকদ্দমার ফায়সালা দিতে গিয়ে বলেন ঃ اللهم انى اول من احيا امرك اذا ماتوه "হে আল্লাহ! আমি প্রথম ব্যক্তি যে তোমার হুকুমকে জীবিত করেছে যখন তারা তাকে মেরে ফেলেছিল।" (মুসলিম, আবু দাউদ, আহমাদ)

এগার ঃ যিনাকারীকে অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য তার নিজের ইচ্ছায় কাজটি করাও জরুরী। জোর জবরদস্তি যদি কাউকে এ কাজ করতে বাধ্য করা হয়ে থাকে তাহলে সে অপরাধীও নয় এবং শাস্তিরও যোগ্য নয়। এ ব্যাপারে কেবল শরীয়াতের এ সাধারণ নিয়মই প্রযোজ্য হয় না যে, "বলপূর্বক কাউকে দিয়ে কোন কাজ করানো হলে তার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব থেকে সে মুক্ত থাকে" বরং এ সূরায়ই সামনের দিকে গিয়ে কুরআন এমন মেয়েদের ক্ষমার কথা ঘোষণা করছে যাদেরকে যিনা করতে বাধ্য করা হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন হাদীসে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, বলপূর্বক যিনা করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যে বল প্রয়োগ করে যিনা করেছে তাকেই শাস্তি দেয়া হয়েছে এবং যার ওপর বল প্রয়োগ করা হয়েছিল তাকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। তিরমিযী ও আবু দাউদের বর্ণনা হচ্ছে, জনৈকা মহিলা অন্ধকারের মধ্যে নামাযের জন্য বের হন। পথে এক ব্যক্তি তাকে পাকড়াও করে বলপূর্বক তার সতীত্ব হরণ করে। তার চিৎকারে লোকেরা দৌড়ে এসে যিনাকারীকে ধরে ফেলে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে রজম করান এবং মহিলাটিকে মুক্তি দেন। বুখারীর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, হযরত উমরের (রা) খিলাফতকালে এক ব্যক্তি একটি মেয়ের সাথে জোরপূর্বক যিনা করে। তিনি লোকটিকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেন এবং মেয়েটিকে ছেড়ে দেন। এসব প্রমাণের ভিত্তিতে নারীদের ব্যাপারে আইনের

ক্ষেত্রে ঐকমত্য রয়েছে কিন্তু মতবিরোধ দেখা দিয়েছে পুরুষের ক্ষেত্রে। এ ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম হাসান ইবনে সালেহ বলেন, পুরুষকেও যদি যিনা করতে বাধ্য করা হয় তাহলে তাকে মাফ করে দেয়া হবে। ইমাম যুফার বলেন, তাকে মাফ করা হবে না। কারণ সে অঙ্গ সঞ্চালন না করলে এ কর্মটি সংঘটিত হওয়াই সম্ভব নয় এবং তার অঙ্গ সঞ্চালনই একথা প্রমাণ করে যে, তার নিজের যৌন কামনা এ কর্মের উদ্যোক্তা হয়েছিল। ইমাম আবু হানীফা বলেন, যদি সরকার বা তার কোন প্রশাসক কোন ব্যক্তিকে যিনা করতে বাধ্য করে থাকে তাহলে যিনাকারীকে শাস্তি দেয়া হবে না। কারণ যখন সরকারই অপরাধ করতে বাধ্য করছে তখন তার শাস্তি দেবার অধিকার থাকে না। কিন্তু যদি সরকার ছাড়া অন্য কেউ বাধ্য করে থাকে তাহলে যিনাকারীকে শাস্তি দেয়া হবে। কারণ নিজের যৌন কামনা ছাড়া অবশ্যই সে যিনা করতে পারে না এবং যৌন কামনা জোরপূর্বক সৃষ্টি করা যেতে পারে না। এ তিনটি বক্তব্যের মধ্যে প্রথম বক্তব্যটিই সবচেয়ে বেশী সঠিক। এর যুক্তি হচ্ছে, অঙ্গ সঞ্চালন যৌন কামনার প্রমাণ হতে পারে কিন্তু সম্মতি ও মানসিক আকাংখার অপরিহার্য প্রমাণ নয়। মনে করুন, কোন লোকে এক শরীফ ব্যক্তিকে জোর পূর্বক গ্রেফতার করে বন্দী করে এবং তার সাথে একটি সুন্দরী মেয়েকেও উলংগ করে একই কামরায় আটকে রাখে। ঐ মেয়ের সাথে যিনায় লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সে তাকে মুক্তি দেয় না। এ অবস্থায় যদি তারা দুজন যিনায় লিপ্ত হয়ে যায় এবং ঐ লোকের ঘটনার চার জন সাক্ষীসহ তাদেরকে আদালতে হাযির করে, তাহলে তাদের বাস্তব অবস্থা উপেক্ষা করে তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দান অথবা বেত্রাঘাত করার শাস্তি কি ন্যায়সংগত হবে? এমন অবস্থা সৃষ্টি হওয়া যুক্তি ও বাস্তবতা–উভয়ের নিরিখেই সম্ভব যাতে যৌন কামনার উদ্রেক ঘটতে পারে কিন্তু মানুষের নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহ তার সহযোগী হয় না। যদি কোন ব্যক্তিকে বন্দী করে কারাগারে আবদ্ধ রেখে তাকে পান করার জন্য শরাব ছাড়া আর কিছুই দেয়া না হয় এবং এ অবস্থায় সে শরাব পান করে, তাহলে নিছক এ যুক্তিতে কি তাকে শাস্তি দেয়া যেতে পারে যে, তার জন্য তো অবশ্যই বাধ্যবাধকতার অবস্থা ছিল ঠিকই কিন্তু নিজের ইচ্ছা ছাড়া তো গলার মধ্য দিয়ে শরাবের তরল পদার্থ সে নীচের দিকে নামাতে পারতো না? অপরাধ ঘটার জন্য কেবলমাত্র ইচ্ছা থাকা যথেষ্ট নয় বরং এ জন্য স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োজন। যে ব্যক্তিকে জবরদস্তি এমন এক অবস্থার মুখোমুখি করানো হয় যার ফলে সে অপরাধ করার সংকল্প করতে বাধ্য হয়, সে কোন কোন অবস্থায় তো একেবারেই অপরাধী হয় না এবং কোন কোন অবস্থায় তার অপরাধ অতি সামান্যই হয়ে থাকে।

বারো ঃ ইসলামী আইন সরকার ছাড়া আর কাউকেই যিনাকারী ও যিনাকারীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষমতা দেয় না। সে আদালত ছাড়া আর কাউকেই তাদেরকে শাস্তি দেবার অধিকার দেয় না। আলোচ্য আয়াতে "তাদেরকে বেত্রাঘাত করো" শব্দাবলীর মাধ্যমে জনগণকে নয়, বরং রাষ্ট্রীয় শাসকবৃন্দ ও বিচারপতিগণকে সম্বোধন করা হয়েছে, এ ব্যাপারে উম্মতের সকল ফকীহ একমত। তবে গোলামদের ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। তার প্রভু এ ব্যাপারে তাকে শাস্তি দিতে পারে কিনা এ প্রশ্নে সবাই একমত নয়। হানাফী মাযহাবের সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, প্রভু গোলামকে শাস্তি দিতে পারে না। শাফেঈ ইমামগণ বলেন, তাদের সে ক্ষমতা আছে। আর মালেকীগণ বলেন, চুরির অপরাধে

প্রভু গোলামের হাত কাটার অধিকার রাখে না কিন্তু যিনা, সতীসাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ও শরাব পানের শাস্তি দিতে পারে।

তেরো ঃ ইসলামী আইন যিনার শাস্তিকে রাষ্ট্রীয় আইনের একটি অংশ গণ্য করে। তাই মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের ওপর এ আইন জারি হবে। এ ব্যাপারে একমাত্র ইমাম মালেক ছাড়া সম্ভবত ইমামদের মধ্য থেকে আর কেউ দ্বিমত প্রকাশ করেননি। রজমের শাস্তি অমুসলিমদের ওপর প্রয়োগ করার প্রশ্নে ইমাম আবু হানীফার যে মতবিরোধ তার ভিত্তি এ নয় যে, এটি রাষ্ট্রীয় আইন নয়। বরং এ মত বিরোধের ভিত্তি হচ্ছে এই যে, তাঁর মতে রজমের শর্তাবলীর মধ্যে যিনাকারীর "পূর্ণ বিবাহিত" হওয়া হচ্ছে অন্যতম শর্ত। আর পূর্ণ বিবাহিত হওয়া ইসলাম ছাড়া সম্ভব নয়। তাই তিনি অমুসলিম যিনাকারীকে রজমের শাস্তির আওতা বহির্ভূত গণ্য করেন, বিপরীত পক্ষে ইমাম মালেকের মতে এ হুকুমটি মুসলমানদের জন্য প্রদান করা হয়েছে, কাফেরদের জন্য নয়। তাই তিনি যিনার দণ্ডবিধিকে মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইনের (Personal Law) একটি অংশ গণ্য করেন। আর অন্য দেশ থেকে দারুল ইসলামে অনুমতি নিয়ে আশ্রয় গ্রহণকারীর ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম শাফেঈ বলেন, সে যদি দারুল ইসলামে যিনায় লিপ্ত হয়, তাহলে তার ওপর যিনার দণ্ডবিধি জারি করা হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, আমরা তার ওপর যিনার দণ্ডবিধি জারি করতে পারি না।

চৌদ্দ ঃ কোন ব্যক্তি নিজের অপরাধ নিজ মুখে স্বীকার করবে অথবা কারোর যিনার কথা যারা জানতে পারে তারা স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে শাসকের কাছে অবশ্যই তা পৌঁছাবে, ইসলামী আইন এটা অপরিহার্য গণ্য করে না। তবে শাসকরা যখন এ অপরাধের কথা জানতে পারেন তখন আর সেখানে ক্ষমার কোন অবকাশ থাকে না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ اَتَى شَيْئًا مِنْ هٰذِهِ الْقَاذُوْرَاتِ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللّٰهِ فَاِنْ اَبْدٰى لَنَا صَفْحَتَهُ اَقَمْنَا عَلَيْهِ كِتَابَ اللّٰهِ (احكام القران - للجصاص)

"তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই এসব নোংরা অপরাধগুলোর মধ্য থেকে কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে যায়, সে যেন আল্লাহর পরদার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু সে যদি আমাদের সামনে পরদা উঠায়, তাহলে আমরা তার ওপর আল্লাহর কিতাবের আইন প্রয়োগ করেই ছাড়বো।" (আহকামুল কুরআন–জাস্‌সাস)

আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, মাঈয ইবনে মালেক আস্‌লামী অপরাধে জড়িত হয়ে পড়লে হাযযাল ইবনে নু'আইম তাঁকে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করো। তাই তিনি গিয়ে রসূলুল্লাহর (সা) কাছে নিজের অপরাধ বর্ণনা করেন। এর ফলে তিনি একদিকে তাকে রজমের শাস্তি দেন এবং অন্য দিকে হাযযালকে বলেন, لو سترته بثوبك كان خيرا لك "যদি তুমি তার ওপর পরদা ফেলে দিতে, তাহলে তোমার জন্য বেশী ভালো হতো।" আবু দাউদ ও নাসায়ীতে অন্য একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

تَعَافُوا الْحُدُوْدَ فِيْ مَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِيْ مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ

"শাস্তিযোগ্য অপরাধকে নিজেদের মধ্যে ক্ষমা করে দাও। কিন্তু যে অপরাধের ব্যাপারটি আমার কাছে পৌঁছে যাবে তার শাস্তি বিধান করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।"

পনের ঃ ইসলামী আইনে এ অপরাধটি পারস্পরিক আপোসের মাধ্যমে ফায়সালা করে নেবার ব্যাপারও নয়। হাদীসের প্রায় সবক'টি কিতাবে এ ঘটনাটি উদ্ধৃত হয়েছে যে, একটি ছেলে এক ব্যক্তির কাছে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করতো। সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করে বসে। ছেলেটির বাপ একশ ছাগল ও একটি বাঁদি দিয়ে ঐ ব্যক্তিকে রাজি করিয়ে নেয়। কিন্তু এ মামলাটি যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসে তখন তিনি বলেন, اما غنمك وجاريتك فرد عليك "তোমার ছাগল ও তোমার বাঁদি তুমিই ফিরিয়ে নিয়ে যাও।" তারপর তিনি যিনাকারী ও যিনাকারিনী উভয়ের ওপর শরীয়াতের দণ্ডবিধি জারি করেন। এ থেকে কেবল এতটুকুই জানা যায় না যে, এ অপরাধে আপোসে রাজি করিয়ে নেবার কোন অবকাশ নেই। বরং একথাও জানা যায় যে, ইসলামী আইনে অর্থদণ্ডের আকারে সতীত্বের বিনিময় দান করা যেতে পারে না। ইজ্জতের মূল্য প্রদান করার এ ধরনের জঘন্য ভাবধারা পাশ্চাত্য আইনেরই বৈশিষ্ট।

ষোল ঃ কোন ব্যক্তির যিনা করার কোন প্রমাণ না পাওয়া গেলে ইসলামী রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেবে না। অপরাধের প্রমাণ ছাড়া কারোর ব্যভিচার সংক্রান্ত খবর একাধিক উপায়ে শাসকদের কাছে এসে পৌঁছলেও তারা কোনক্রমেই তার ওপর শরীয়াতের দণ্ডবিধি জারি করতে পারেন না। মদীনায় একটি মেয়ে ছিল। তার সম্পর্কে বলা হতো, সে ছিল প্রকাশ্য চরিত্রহীনা। বুখারীর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ كانت تظهر فى الاسلام السوء "সে ইসলামে অসতীপনার প্রকাশ ঘটাচ্ছিল।" অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ كانت قد اعلنت فى الاسلام "সে ইসলামে প্রকাশ্য অসদাচার করছিল।" আবার ইবনে মাজার একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيْبَةُ فِيْ مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يَّدْخُلُ عَلَيْهَا

"মেয়েটির কথায় ও স্বভাব চরিত্রে এবং তার কাছে যারা যাওয়া আসা করতো তাদের থেকে সুস্পষ্ট সন্দেহ জেগে উঠেছিল।"

কিন্তু যেহেতু তার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের প্রমাণ ছিল না তাই তাকে কোন শাস্তি দেয়া হয়নি। অথচ তার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখ থেকেও এ কথা বের হয়ে গিয়েছিল যে, لو كنت راجما احدا بغير بينة لرجمتها "যদি আমি কাউকে প্রমাণ ছাড়া রজম করতাম তাহলে ঐ মেয়েটিকে নিশ্চয়ই রজম করতাম।"

সতের ঃ যিনার অপরাধের প্রথম সম্ভাব্য প্রমাণ হচ্ছে এই যে, তার বিরুদ্ধে সাক্ষ প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এ সংক্রান্ত আইনের গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

(ক) কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে, যিনার জন্য কমপক্ষে চারজন চাক্ষুষ সাক্ষীর প্রয়োজন। সূরা নিসার ১৫ আয়াতে একথা বলা হয়েছে। সামনের দিকে এ সূরা নূরেই দু'জায়গায় একথা আসছে। সাক্ষী ছাড়া কাযী স্বচক্ষে এ অপরাধ সংঘটিত হতে দেখলেও কেবলমাত্র নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে এ ফায়সালা দিতে পারেন না।

(খ) সাক্ষী হতে হবে এমন সব লোক ইসলামের সাক্ষ আইনের দৃষ্টিতে যারা নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। যেমন, ইতিপূর্বে কোন মামলায় তারা মিথ্যা সাক্ষদানকারী প্রমাণিত হয়নি। তারা খেয়ানতকারী নয়। ইতিপূর্বে তারা কখনো শাস্তি পায়নি। অপরাধীর সাথে যাদের কোন শত্রুতা প্রমাণিত হয়নি ইত্যাদি। মোটকথা অনির্ভরযোগ্য সাক্ষের ভিত্তিতে কাউকে রজম করা বা কারোর পিঠে বেত্রাঘাত করা যেতে পারে না।

(গ) সাক্ষীদের একথার সাক্ষ দিতে হবে যে, তারা অভিযুক্ত নারী ও পুরুষকে সংগমরত অবস্থায় চাক্ষুষ দেখেছে অর্থাৎ كالميل فى المكحلة والرشاء فى البئر (এমনভাবে যেমন সুর্মাদানীর মধ্যে সুর্মা তোলার শলাকা এবং কুয়ার মধ্যে রশি)।

(ঘ) সাক্ষীদের কবে, কখন, কোথায়, কাকে, কার সাথে যিনা করতে দেখেছে এ ব্যাপারে একমত হতে হবে। এ মৌলিক বিষয়গুলোতে মতবিরোধ ঘটলে তাদের সাক্ষ বাতিল হয়ে যাবে।

সাক্ষ সম্পর্কিত এ শর্তগুলো স্বতই একথা প্রকাশ করছে যে, গোয়েন্দাবৃত্তি করে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খবর বের করা এবং প্রতিদিন লোকদের পিঠে বেত্রাঘাত করা ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য নয়। বরং সে এমন অবস্থায় এ ধরনের কঠিন শাস্তি দেয় যখন সব ধরনের সংশোধন ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরও ইসলামী সমাজে কোন নারী ও পুরুষ এমন নির্লজ্জ আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে যে, চার চারজন লোক তাদের অপরাধমূলক তৎপরতা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়।

আঠার ঃ স্ত্রীলোকের যখন কোন জানা ও পরিচিত স্বামী বা বাঁদীর অনুরূপ কোন মনিব থাকে না তখন নিছক তার গর্ভবতী হওয়াটাই তার বিরুদ্ধে যিনা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট পারিপার্শ্বিক সাক্ষ কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। হযরত উমরের (রা) মতে এ সাক্ষ যথেষ্ট। মালেকীগণ এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহের মতে, নিছক গর্ভধারণ এতটা মজবুত পারিপার্শ্বিক সাক্ষ নয় যার ভিত্তিতে কাউকে রজম বা কারোর পিঠে একশ বেত্রাঘাত করা যেতে পারে। এত বড় শাস্তির জন্য সাক্ষীর উপস্থিতি অথবা অপরাধের স্বীকৃতি অপরিহার্য। ইসলামী আইনের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে, সন্দেহ শাস্তির নয় বরং ক্ষমার উদ্দীপক হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ اِدْفَعُوا الْحُدُوْدَ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا "শাস্তিসমূহ এড়িয়ে চলো যতদূর সেগুলো এড়িয়ে যাওয়ার অবকাশ থাকে।" (ইবনে মাজাহ) অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَدْرَؤُا الْحُدُوْدَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُ ، فَاِنَّ الْاِمَامَ اَنْ يُّخْطِئَ فِى الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يُّخْطِئَ فِى الْعُقُوْبَةِ

"মুসলমানদের থেকে যতদূর সম্ভব শাস্তি দূরে রাখো। যদি কোন অপরাধীকে শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দেবার কোন পথ পাওয়া যায় তাহলে তাকে ছেড়ে দাও। কারণ শাসকের ক্ষমা করে দেবার ব্যাপারে ভুল করা তার শাস্তি দেবার ব্যাপারে ভুল করার চেয়ে ভালো।" (তিরমিযী)।

এ নিয়ম অনুযায়ী গর্ভবতী হওয়া সন্দেহের জন্য যতই শক্তিশালী ভিত্তি হোক না কেন তা কোনক্রমেই যিনার নিশ্চিত প্রমাণ নয়। কারণ কোন পুরুষের সাথে সংগম ছাড়াও কোন মেয়ের গর্ভাশয়ে কোন পুরুষের শুক্রের কোন অংশ পৌঁছে যাওয়ার এক লাখ ভাগের এক ভাগ সম্ভাবনাও আছে এবং এর ফলে সে গর্ভবতীও হয়ে যেতে পারে। এতটুকু হাল্কা সন্দেহও অপরাধিনীকে ভয়াবহ শাস্তির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যথেষ্ট হতে হবে।

উনিশ ঃ যিনার সাক্ষীদের মধ্যে যদি পার্থক্য দেখা দেয় অথবা অন্য কোন কারণে তাদের সাক্ষের মাধ্যমে অপরাধ প্রমাণিত না হয় তাহলে মিথ্যা অপবাদ দেবার কারণে সাক্ষীরা কি শাস্তি পাবে এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। ফকীহদের একটি দল বলেন, এ অবস্থায় তারা মিথ্যা অপবাদ দানকারী গণ্য হবে এবং তাদেরকে ৮০টি বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হবে। অন্য দলটি বলেন, তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না। কারণ তারা সাক্ষী হিসেবে এসেছে, বাদী হিসেবে আসেনি। যদি এভাবে সাক্ষীদেরকে শাস্তি দেয়া হয়, তাহলে যিনার সাক্ষ দেবার দুয়ার বন্ধ হয়ে যাবে। চারজন সাক্ষীর মধ্য থেকে কেউ বিগড়ে যাবে কিনা এ ব্যাপারে যখন কেউই নিশ্চিত নয় তখন শাস্তির ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সাক্ষ দেবার জন্য এগিয়ে আসবে, কে এমন দায়ে ঠেকেছে? আমার মতে এ দ্বিতীয় মতটিই যুক্তিসংগত। কারণ সন্দেহের ফলে অপরাধীর মতো সাক্ষীদেরও লাভবান হওয়া উচিত। যদি তাদের সাক্ষের দুর্বলতা বিবাদীকে যিনার ভয়াবহ শাস্তি দেবার জন্য যথেষ্ট না হয়ে থাকে, তা হলে তার সাক্ষীদেরকে মিথ্যা অপবাদের ভয়াবহ শাস্তি দেবার জন্যও যথেষ্ট না হওয়া উচিত। তবে যদি তাদের মিথ্যুক হওয়া দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই তারা এ শাস্তি পাবে। প্রথম মতের সমর্থনে দু'টি বড় বড় যুক্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে, কুরআন যিনার মিথ্যা অপবাদকে শাস্তিযোগ্য গণ্য করে। কিন্তু এ যুক্তিটি সঠিক নয়। কারণ কুরআন নিজেই মিথ্যা অপবাদদানকারী (قاذف) ও সাক্ষীর (شاهد) মধ্যে পার্থক্য করে। আর আদালত সাক্ষীর সাক্ষকে অপরাধ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট মনে করেনি, শুধুমাত্র এ কারণেই সাক্ষী মিথ্যা অপবাদদাতা গণ্য হতে পারে না। দ্বিতীয় যুক্তিটি হচ্ছে, মুগীরাহ ইবনে শু'বার (রা) মোকদ্দমায় হযরত উমর (রা) আবু বাক্‌রাহ ও তাঁর দু' সহযোগী সাক্ষীদেরকে মিথ্যা অপবাদ দানের শাস্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু এ মোকদ্দমার বিস্তারিত বিবরণ দেখলে বুঝা যায়, যেসব মোকদ্দমায় অপরাধ প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ অকিঞ্চিত প্রামাণিত হয় সে ধরনের প্রত্যেকটি মোকদ্দমার ওপর এ নজিরটি প্রযোজ্য নয়। মোকদ্দমাটির বিবরণ হচ্ছে ঃ বসরার গবর্নর মুগীরাহ ইবনে শু'বার সাথে আবু বাক্‌রাহর সম্পর্ক আগে থেকেই খারাপ ছিল। উভয়ের গৃহের অবস্থান ছিল একই পথের পাশে মুখোমুখি। একদিন হঠাৎ দমকা বাতাসের ঝটকায় উভয়ের গৃহের জানালা খুলে যায়। আবু বাক্‌রাহ নিজের জানালা বন্ধ করতে ওঠেন। তাঁর দৃষ্টি পড়ে সামনের কামরায়। তিনি হযরত মুগীরাহকে সংগমরত দেখেন। আবু বাক্‌রাহর কাছে বসেছিলেন তার তিন বন্ধু (নাফে' ইবনে কুলাদাহ, যিয়াদ ও শিব্‌ল ইবনে মা'বাদ)। তিনি বলেন, এসো, দেখো এবং মুগীরাহ কি করছে তার সাক্ষী থাকো। বন্ধুরা জিজ্ঞেস করেন, এ মেয়েটি কে? আবু বাক্‌রাহ বলেন, উম্মে জামীল। পরদিন এ সম্পর্কে হযরত উমরের (রা) কাছে অভিযোগনামা পাঠানো হয়। তিনি সংগে সংগেই হযরত মুগীরাহকে সাসপেণ্ড করে হযরত আবু মূসা আশ্'আরীকে বসরার গবর্নর নিযুক্ত করে পাঠিয়ে দেন এবং অভিযুক্তকে

সাক্ষীসহ মদীনায় ডেকে আনেন। খলীফার সামনে পেশ হবার পর আবু বাক্‌রাহ ও দু'জন সাক্ষী বলেন, আমরা মুগীরাহকে উম্মে জামীলের সাথে সংগমরত অবস্থায় দেখেছি। কিন্তু যিয়াদ বলেন, মেয়েটিকে পরিষ্কার দেখা যায়নি এবং আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না সে উম্মে জামীল ছিল। মুগীরাহ ইবনে শু'বা জেরার মাধ্যমে প্রমাণ করে দেন, যেদিক থেকে তারা তাঁদেরকে দেখছিলেন সেদিক থেকে তাদের পক্ষে মেয়েটিকে ভালো করে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি এটাও প্রমাণ করে দেন যে, তাঁর স্ত্রীর ও উম্মে জামীলের মধ্যে চেহারাগত সাদৃশ্য রয়েছে। ঘটনার পারিপার্শ্বিক সাক্ষ পর্যবেক্ষণ করলে বুঝা যায় যে, হযরত উমরের (রা) শাসনামলে একটি প্রদেশের গবর্নরের পক্ষে এটা সম্ভব ছিল না যে, তিনি যে সরকারী গৃহে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন, সেখানে অন্য একটি মেয়েকে ডেকে এনে যিনা করবেন। এ কারণে মুগীরাহ তার নিজের ঘরে নিজের স্ত্রীর পরিবর্তে উম্মে জামীলের সাথে সহবাস করছে, আবু বাক্‌রাহ ও তার সাথীদের এ কথা মনে করা একটি নিতান্ত অবাস্তব কু-ধারণা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এ কারণেই হযরত উমর (রা) কেবলমাত্র অভিযুক্তকেই অভিযোগমুক্ত করে ক্ষান্ত হননি বরং আবু বাক্‌রাহ, নাফে ও শিব্‌লকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তিও প্রদান করেন। এ মামলাটির বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে এ ফায়সালা করা হয়েছিল। এ থেকে এরূপ বিধি প্রণয়ন করা যায় না যে, যখনই সাক্ষের মাধ্যমে যিনার অপরাধ প্রমাণিত হবে না তখনই সাক্ষীদেরকে অবশ্যি মারধর করতে হবে। (মোকদ্দমার বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন আহকামুল কুরআন ইবনুল আরাবী, ২য় খণ্ড, ৮৮-৮৯ পৃষ্ঠা)।

বিশ ঃ সাক্ষ ছাড়া আর যে জিনিসটির মাধ্যমে যিনার অপরাধ প্রমাণিত হতে পারে সেটি হচ্ছে অপরাধীর নিজের স্বীকারোক্তি। যিনার কাজ করা হয়েছে বলে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ স্বীকারোক্তির শব্দাবলী উচ্চারিত হতে হবে। অর্থাৎ তাকে স্বীকার করতে হবে যে, তার জন্য হারাম ছিল এমন একটি নারীর সাথে সে كالميل في المكحلة (সুর্মাদানীর মধ্যে সুর্মা শলাকার মতো) যিনার কাজ করেছে। আদালতেরও এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে হবে যে, অপরাধী কোন প্রকার বাইরের চাপ ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সজ্ঞানে ও সচেতন অবস্থায় এ স্বীকৃতি দিচ্ছে। কোন কোন ফকীহ বলেন, একটি স্বীকারোক্তি যথেষ্ট নয় বরং অপরাধীর চার বার আলাদা আলাদাভাবে স্বীকারোক্তি দেয়া উচিত। (এটি ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমাদ, ইবনে আবী লাইলা, ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ্ ও হাসান ইবনে সালেহর অভিমত) আবার কেউ কেউ বলেন, একটি স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট। (এটি ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, উসমানুল বাত্তা ও হাসান বাসরী প্রমুখ ফকীহগণের অভিমত) তারপর এমন অবস্থায়ও যখন অন্য কোন প্রমাণ ছাড়াই কেবলমাত্র অপরাধীর নিজেরই স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ফায়সালা করা হয়েছে তখন যদি ঠিক শাস্তির মাঝামাঝি সময়েও অপরাধী নিজের স্বীকারোক্তি থেকে সরে আসে তাহলেও তার শাস্তি মুলতবী করে দেয়া উচিত। এমনকি যদি বুঝা যায় যে, মারের কষ্ট সইতে না পেরে সে নিজের স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসছে, তা হলেও তার শাস্তি মুলতবী হওয়া উচিত। হাদীসে যিনার মামলা সংক্রান্ত যেসব নজির পাওয়া যায় সেগুলোই এ সমস্ত আইনের উৎস। সবচেয়ে বড় মামলাটি হচ্ছে মা'ঈয ইবনে মালিক আসলামীর। বিভিন্ন সাহাবী থেকে অসংখ্য বর্ণনাকারী এটি উদ্ধৃত করেছেন। প্রায় সবকটি হাদীসের কিতাবে এ বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। মা'ঈয ছিল আসলাম গোত্রের একটি এতিম

ছেলে। সে হযরত হাযযাল ইবনে নু'আইমের গৃহে লালিত পালিত হয়। সেখানে এক মুক্তিপ্রাপ্তা বাঁদির সাথে যিনা করে বসে। হযরত হাযযাল তাকে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে নিজের এ গোনাহের কথা বলো। হয়তো তিনি তোমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করে দেবেন। মা'ঈয মসজিদে নববীতে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে পবিত্র করে দিন, আমি যিনা করেছি। তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন এবং তারপর বলেন, ويحك ارجع فاستغفر الله وتب اليه "আরে, চলে যাও, আর আল্লাহর কাছে তাওবা ও ইস্তিগফার করো।" কিন্তু ছেলেটি আবার সামনে এসে একই কথা বলে এবং এবারও তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন। ছেলেটি আবার সে কথাই বলে এবং তিনি আবার মুখ ফিরিয়ে নেন। এ অবস্থায় হযরত আবু বকর (রা) তাকে সাবধান করে দিয়ে বলেন, দেখো, যদি তুমি চতুর্থবার স্বীকারোক্তি করো তাহলে রসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে রজম করে দেবেন। কিন্তু সে মানেনি এবং আবার তার কথার পুনরাবৃত্তি করে। এবার নবী (সা) তার দিকে ফেরেন এবং তাকে বলেন, لعلك قبلت او غمزت او نظرت "সম্ভবত তুমি চুমো খেয়েছো বা জড়াজড়ি করেছো অথবা কু–নজর দিয়েছো।" (এবং তুমি মনে করেছো এতেই বুঝি যিনা করা হয়ে গেছে) সে বলে, না। তিনি জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি তার সাথে এক বিছানায় শুয়েছো?" জবাব দেয়, হাঁ। জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি তার সাথে সহবাস করেছো?" জবাব দেয়, হাঁ। জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি তার সাথে সংগম করছো?" জবাব দেয় হাঁ। তারপর তিনি এমন শব্দ উচ্চারণ করেন যা আরবী ভাষায় সংগম করার সুস্পষ্ট প্রতিশব্দ হিসেবে বলা হয়ে থাকে এবং তাকে অশ্লীল মনে করা হয়ে থাকে। এ ধরনের শব্দ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে এর আগে কেউ শোনেনি এবং পরেও আর কখনো শোনা যায়নি। যদি এক ব্যক্তির প্রাণনাশের প্রশ্ন না হতো তাহলে তাঁর মুবারক কণ্ঠে কখনো এ ধরনের শব্দ উচ্চারিত হতে পারতো না। কিন্তু এর জবাবেও সে হাঁ বলে দেয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, حتى غاب ذالك منك فى ذالك منها (এমন কি তোমার সেই অংগ তার সেই অংগের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল?) সে বলে, হাঁ। আবার জিজ্ঞেস করেন,

كَمَا يَغِيْبُ الْمِيْلُ فِى الْمَكْحَلَةِ وَالرِّشَاءُ فِى الْبِئْرِ ؟

(সেটা কি এমনভাবে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল যেমন সুর্মাদানীতে সুর্মাশলাকা এবং কুয়ার মধ্যে রশি?) সে বলে, হাঁ। জিজ্ঞেস করেন, "যিনা কাকে বলে তুমি কি জানো?" সে বলে, "জি হাঁ।" আমি তার সাথে হারাম পদ্ধতিতে এমন কাজ করেছি যা স্বামী হালাল পদ্ধতিতে নিজের স্ত্রীর সাথে করে থাকে।" তিনি জিজ্ঞেস করেন, "তোমার কি বিয়ে হয়েছে?" জবাব দেয়, "জি হাঁ"। জিজ্ঞেস করেন, "তুমি তো মদ পান করনি?" জবাব দেয়, না। এক ব্যক্তি উঠে তার মুখ শুঁকে দেখেন এবং তার কথা সত্যতার সাক্ষ দেন। তারপর তিনি তার মহল্লার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেন, এ ছেলেটি পাগল নয় তো? মহল্লার লোকেরা বলে, আমরা তার বুদ্ধির মধ্যে কোন বিকৃতি দেখিনি। তিনি হাযযালকে বলেন, لو سترته بثوبك كان خيرا لك "যদি তার গোপনীয়তা রক্ষা করতে তাহলে তোমার জন্য ভালো হতো।" তারপর তিনি মা'ঈযকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তাকে নগরীর বাইরে নিয়ে গিয়ে পাথরের আঘাতে মেরে ফেলা হয়। যখন পাথর পড়তে শুরু হয় তখন মা'ঈয দৌড়ে পালাতে থাকে এবং বলতে থাকে "লোকেরা! আমাকে রসূলুল্লাহর (সা)

কাছে ফিরিয়ে নিয়ে চলো। আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করেছে। তারা আমাকে ধোঁকা দিয়েছে তারা বলেছিল, রসূলুল্লাহ (সা) আমাকে হত্যা করবেন না।" কিন্তু যারা পাথর মারছিল তারা তাকে মেরেই ফেলে। পরে যখন নবীকে (সা) এ খবর জানানো হয় তখন তিনি লোকদের বলেন, তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন? তাকে আমার কাছে আনতে। হয়তো সে তাওবা করতো এবং আল্লাহ তার তাওবা কবুল করে নিতেন।"

দ্বিতীয় ঘটনাটি হচ্ছে গামেদীয়ার। গামেদীয়া ছিল গামেদ গোত্রের (জুহাইনীয়া গোত্রের একটি শাখা) একটি মেয়ে। সে এসেও চারবার স্বীকারোক্তি করে যে, সে যিনা করেছে এবং অবৈধ গর্ভধারণ করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেও প্রথম স্বীকারোক্তির সময় বলেন ঃ وَيْحَكَ ارجعى فاستغفرى الى الله وتُوبى اليه (আরে চলে যাও, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তাওবা করো।) কিন্তু সে বলে, "হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আমাকে মা'ঈযের মতো এড়িয়ে যেতে চান? আমি যিনার মাধ্যমে গর্ভবতী হয়েছি।" এখানে যেহেতু স্বীকারোক্তির সাথে গর্ভধারণের ব্যাপারটিও ছিল, তাই তিনি তাকে মা'ঈযের মতো বিস্তারিত জেরার সম্মুখীন করেননি। তিনি বলেন, "ঠিক আছে, যদি একান্তই না শুনতে চাও, তাহলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে এসো।" সন্তান জন্মের পর সে শিশুটিকে কোলে নিয়ে এসে বলে, এবার আমাকে পবিত্র করে দিন। তিনি বলেন, "যাও, একে দুধ পান করাও এবং শিশু দুধ ছাড়ার পরে এসো।" তারপর সে শিশুর দুধ ছাড়ার পরে আসে এবং সাথে এক টুকরা রুটিও নিয়ে আসে। শিশুকে রুটির টুকরা খাইয়ে রসূলুল্লাহকে (সা) দেখান এবং বলেন, হে আল্লাহর রসূল! এখন তো এ দুধ ছেড়ে দিয়েছে এবং দেখুন রুটিও খেতে শুরু করেছে। তখন তিনি শিশুটিকে লালন পালন করার জন্য এক ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করেন এবং তাকে রজম করার হুকুম দেন।

এ দু'টি ঘটনায় সুস্পষ্টভাবে চারটি স্বীকারোক্তির কথা বলা হয়েছে। আর আবু দাউদে হযরত বুরাইদার বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামগণ সাধারণভাবে মনে করতেন যদি মা'ঈয ও গামেদীয়া চারবার করে স্বীকারোক্তি না করতো তাহলে তাদেরকে রজম করা হতো না। তবে তৃতীয় ঘটনাটিতে (যার উল্লেখ আমি ওপরে পনের নম্বরে করেছি) শুধুমাত্র এ শব্দগুলো পাওয়া যায় যে, "যাও তার স্ত্রীকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো। যদি সে স্বীকার করে তাহলে একে রজম করো।" এখানে চারবার স্বীকারোক্তির কথা বলা হয়নি। এ থেকেই ফকীহগণের একটি দল একটি স্বীকারোক্তি যথেষ্ট বলে মত প্রকাশ করেছেন।

একুশ ঃ ওপরে আমি যে তিনটি মামলার নজির পেশ করেছি তা থেকে প্রমাণ হয় যে, স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণকারী অপরাধীকে সে কার সাথে যিনা করেছে সে কথা জিজ্ঞেস করা হবে না। কারণ এভাবে এক জনের পরিবর্তে দু'জনকে শাস্তি দিতে হবে। আর শরীয়াত লোকদেরকে শাস্তি দেবার জন্য উদগ্রীব নয়। তবে অপরাধী নিজেই যদি বলে যে, এ কর্মের অপর পক্ষ অমুক জন, তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। যদি সে ও স্বীকারোক্তি করে তাহলে তাকেও শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু যদি সে অস্বীকার করে তাহলে কেবলমাত্র স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তিকারী অপরাধীই শরীয়াতের শাস্তির যোগ্য হবে। এ দ্বিতীয় অবস্থায় (অর্থাৎ যখন দ্বিতীয় পক্ষ তার সাথে যিনা করার কথা স্বীকার করে না) তাকে যিনার না মিথ্যা অপবাদের (قذف) শাস্তি দেয়া হবে, এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ

রয়েছে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈর মতে তার জন্য যিনার শাস্তি ওয়াজিব হয়ে যাবে। কারণ সে এ অপরাধের কথা স্বীকার করেছে। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আওযা'ঈর মতে তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি দেয়া হবে। কারণ দ্বিতীয় পক্ষের অস্বীকৃতি তার যিনার অপরাধকে সন্দেহযুক্ত করে দিয়েছে। তবে তার মিথ্যা অপবাদের অপরাধ অবশ্যই প্রমাণিত হয়ে গেছে। অন্য দিকে ইমাম মুহাম্মাদের ফত্ওয়া (ইমাম শাফে'ঈর একটি উক্তিও এর সমর্থনে পাওয়া যায়) হচ্ছে এই যে, তাকে যিনার শাস্তিও দিতে হবে এবং মিথ্যা অপবাদের শাস্তিও। কারণ নিজের যিনার অপরাধের স্বীকারোক্তি সে নিজেই করেছে এবং দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে নিজের অভিযোগ সে প্রমাণ করতে পারেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদালতে এ ধরনের একটি মামলা এসেছিল। তার একটি বর্ণনা মুসনাদে আহমাদ ও আবু দাউদে সাহ্ল ইবনে সা'দ থেকে নিম্নোক্ত শব্দাবলী সহকারে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ "এক ব্যক্তি এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে স্বীকারোক্তি করে, সে অমুক মেয়ের সাথে যিনা করেছে। তিনি মেয়েটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন। সে অস্বীকার করে। তিনি লোকটিকে শাস্তি দেন এবং মেয়েটিকে মুক্তি দিয়ে দেন।" এ হাদীসে তিনি কোন্ শাস্তিটি দেন তার সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতটি আবু দাউদ ও নাসাই ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, প্রথমে তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তিনি তাকে যিনার শাস্তি দেন। তারপর মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলে সে অস্বীকার করে এবং এর ফলে লোকটিকে আবার মিথ্যা অপবাদের জন্য বেত্রাঘাত করেন। কিন্তু এ হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে দুর্বল। কারণ এর একজন বর্ণনাকারী কাসেম ইবনে ফাইয়াযকে বহু মুহাদ্দিস অনির্ভরযোগ্য ঘোষণা করেছেন। আবার এ হাদীসটি যুক্তিরও বিরোধী। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আশা করা যেতে পারে না যে, তিনি যিনার জন্য বেত্রাঘাত করার পর মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করবেন। বুদ্ধিবৃত্তি ও ইনসাফের যে সুস্পষ্ট দাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপেক্ষা করতে পারেন না তা ছিল এই যে, লোকটি যখন মেয়েটির নাম নিয়েছিল তখন তিনি মেয়েটিকে ডেকে জিজ্ঞেস না করে মামলার ফায়সালা করতে পারতেন না। সাহ্ল ইবনে সা'দ বর্ণিত রেওয়ায়াতটি কিন্তু একথাই সমর্থন করছে। কাজেই দ্বিতীয় বর্ণনাটি বিশ্বাসযোগ্য নয়।

বাইশ ঃ অপরাধ প্রমাণ হবার পর যিনাকারী ও যিনাকারিনীকে কি শাস্তি দেয়া হবে, এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন ফকীহর মতামত নিচে পেশ করছি ঃ

বিবাহিত পুরুষ ও নারীর যিনার শাস্তি ঃ ইমাম আহমাদ, দাউদ যাহেরী ও ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াইহের মতে এর শাস্তি হচ্ছে একশ বেত্রাঘাত এবং তারপর প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু।

অন্য সকল ফকীহ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, কেবলমাত্র প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুই তাদের শাস্তি। বেত্রাঘাত ও প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুকে একত্র করা যাবে না।

অবিবাহিতদের শাস্তি ঃ ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ, ইসহাক, দাউদ যাহেরী, সুফিয়ান সওরী, ইবনে আবী লাইলা ও হাসান ইবনে সালেহের মতে, নারী ও পুরুষ উভয়ের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের দেশান্তর।

ইমাম মালেক ও ইমাম আওযা'ঈর মতে, পুরুষের জন্য একশ বেত্রাঘাত ও এক বছর দেশান্তর এবং নারীর জন্য শুধুমাত্র একশ বেত্রাঘাত। (তাঁদের সবার মতে দেশান্তর অর্থ হচ্ছে, একটি লোকালয় থেকে বের করে কমপক্ষে এমন এক দূরত্বে পৌঁছে দেয়া যেখানে নামাযে কসর করা ওয়াজিব হয়। কিন্তু যায়েদ ইবনে আলী ও ইমাম জা'ফর সাদেকের মতে কারাগারে বন্দী করলেও দেশান্তরের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়)।

ইমাম আবু হানীফা এবং তাঁর শাগরিদ ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম যুফার ও ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, এ অবস্থায় পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য যিনার শাস্তি হচ্ছে শুধুমাত্র একশ বেত্রাঘাত। এর ওপর কারাদণ্ড বা দেশান্তরের বাড়তি শাস্তি বা অন্য কোন শাস্তি আসলে 'হদ' বা শরিয়াতী দণ্ড নয় বরং 'তাযীর' বা শাসনমূলক দণ্ড। কাযী যদি দেখেন অপরাধীর চালচলন খারাপ অথবা অপরাধী ও অপরাধিনীর সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর তাহলে প্রয়োজন মাফিক তিনি তাদেরকে দেশত্যাগী করতে অথবা কারাদণ্ড দিতে পারেন।

(হদ ও তা'যীরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, হদ একটি নির্ধারিত শাস্তি। অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলী পূর্ণ হবার পর অনিবার্যভাবে এ শাস্তি দেয়া হবে। আর তা'যীর এমন শাস্তিকে বলা হয় যা পরিমাণ ও ধরনের দিক দিয়ে আইনের মধ্যে মোটেই নির্ধারিত করে দেয়া হয়নি। বরং আদালত মামলার অবস্থার প্রেক্ষিতে তার মধ্যে কম-বেশী করতে পারে।)

এসব মতাবলম্বীরা তাঁদের মতামত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসের সহায়তা নিয়েছেন। নীচে আমি সেগুলো উদ্ধৃত করছি ঃ

হযরত উবাদাহ ইবনে সামেতের রেওয়ায়াত। মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী ও ইমাম আহমাদ এটি উদ্ধৃত করেছেন। এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

خُذُوْا عَنِّىْ خُذُوْا عَنِّىْ ، قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً ، اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جِلْدُ مَاةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جِلْدُ مَاةٍ وَالرَّجْمُ (اورمى بالحجارة اورجم بالحجارة)

"আমার কাছ থেকে নাও, আমার কাছ থেকে নাও, আল্লাহ যিনাকারিনীদের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অবিবাহিত পুরুষের অবিবাহিতা মেয়ের সাথে ব্যভিচারের জন্য একশ বেত্রাগাত ও এক বছর দেশান্তর। আর বিবাহিত পুরুষের বিবাহিতা নারীর সাথে ব্যভিচারের জন্য একশ বেত্রাঘাত ও প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু।"

(এ হাদীসটি যদিও বর্ণনা পরম্পরার দিক দিয়ে সহীহ কিন্তু বিপুল সংখ্যক সহীহ হাদীস আমাদের একথা জানাচ্ছে যে, একে নবী ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে কখনো কার্যকর করা হয়নি এবং ফকীহদের একজনও হুবহু এর বক্তব্য অনুযায়ী ফত্ওয়াও দেননি। ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রের এ সংক্রান্ত যে বিষয়ে সবাই একমত সেটি হচ্ছে এই যে, যিনাকারী ও যিনাকারিনীর বিবাহিত ও অবিবাহিত হবার ব্যাপারটির ওপর আলাদা আলাদাভাবে দৃষ্টি দেয়া হবে। অবিবাহিত পুরুষ বিবাহিতা বা অবিবাহিতা যে কোন নারীর

সাথে যিনা করুক না কেন উভয় অবস্থায়ই তার শাস্তি একই হবে। আর বিবাহিত পুরুষ অবিবাহিতা বা বিবাহিতা যে কোন নারীর সাথে যিনা করুকনা কেন উভয় অবস্থায়ই একই শাস্তি হবে। নারীর ব্যাপারেও এ একই কথা। সে বিবাহিতা হলে তার সাথে অবিবাহিত বা বিবাহিত পুরুষ যেই যিনা করুক না কেন উভয় অবস্থায়ই একই শাস্তি হবে। আর সে অবিবাহিতা হলে তার সাথে বিবাহিত বা অবিবাহিত যে কোন পুরুষ যিনা করলেও উভয় অবস্থায়ই তার একই শাস্তি হবে।)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) ও হযরত খালেদ জুহানীর (রা) হাদীস। বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই, ইবনে মাজাহ ও ইমাম আহমাদ এটি উদ্ধৃত করেছেন। এ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ দু'জন গ্রামীন আরব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একটি মামলা নিয়ে আসে। একজন বলে, আমার ছেলে এ ব্যক্তির বাড়িতে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করতো। সে এর স্ত্রীর সাথে জড়িয়ে পড়ে। আমি একে একশ ছাগল ও একটি বাঁদি দিয়ে রাজি করিয়ে নিয়েছি। কিন্তু আলেমগণ বলছেন, এ মীমাংসা আল্লাহর কিতাব বিরোধী। আপনি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিন। অন্যজনও বলে, আপনি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে দিন। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ীই ফায়সালা করবো। ছাগল ও বাঁদি তুমি ফেরত নিয়ে যাও। তোমার ছেলের শাস্তি হচ্ছে, একশ বেত্রাঘাত ও এক বছর দেশান্তর। তারপর তিনি আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে বলেন, হে উনাইস! তুমি গিয়ে এর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করো। যদি সে স্বীকারোক্তি করে তাহলে তাকে রজম করে দাও। দেখা গেলো তার স্ত্রী স্বীকারোক্তি করেছে। ফলে তাকে রজম করা হলো। (এখানে রজম করার আগে বেত্রাঘাতের কোন কথা নেই। আর অবিবাহিত পুরুষকে বিবাহিতা নারীর সাথে ব্যভিচার করার ফলে বেত্রাঘাত ও দেশান্তরের শাস্তি দেয়া হয়।)

মা'ঈয ও গামেদীয়ার মামলার যতগুলো বিবরণী হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে তার কোনটিতেও একথা পাওয়া যায় না যে, রসূলুল্লাহ (সা) রজম করার আগে তাদেরকে একশ বেত্রাঘাত করার ব্যবস্থাও করেছিলেন।

কোন হাদীসে এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না যা থেকে জানা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন মামলায় রজমের সাথে বেত্রাঘাতের শাস্তিও দেন। বিবাহিতের যিনার শাস্তিতে তিনি শুধুমাত্র রজমের শাস্তিই দেন।

হযরত উমর (রা) তাঁর বহুল প্রচারিত ভাষণে বিবাহিতের যিনার শাস্তি রজম বর্ণনা করেছেন। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাই বিভিন্ন বর্ণনা পরম্পরায় এটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম আহমাদও এ থেকে বিভিন্ন বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এর কোন একটি বর্ণনায়ও রজমের সাথে বেত্রাঘাতের উল্লেখ নেই।

খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে একমাত্র হযরত আলী (রা) বেত্রাঘাত ও রজমকে একই শাস্তির আওতায় একত্র করেছেন। ইমাম আহমাদ ও বুখারী আমের শা'বী থেকে এ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন যে, শুরাহাহ নামক এক মহিলা অবৈধ গর্ভের স্বীকারোক্তি করে। হযরত আলী (রা) বৃহস্পতিবার দিন তাকে বেত্রাঘাত করান এবং শুক্রবার রজমের শাস্তি দেন আর তারপর বলেন, আমি আল্লাহর কিতাবের বিধান অনুযায়ী তাকে বেত্রাঘাতের এবং

রসূলের সুন্নাত অনুযায়ী রজমের শাস্তি দিয়েছি। এ একটি ঘটনা ছাড়া খেলাফতে রাশেদার সমগ্র আমলে রজমের সাথে বেত্রাঘাতের শাস্তির পক্ষে দ্বিতীয় কোন ঘটনা পাওয়া যায় না।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহর (রা) একটি রেওয়ায়াত। আবু দাউদ ও নাসাই এটি উদ্ধৃত করেছেন। এতে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি যিনা করে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কেবল বেত্রাঘাতের শাস্তি দেন। তারপর জানা যায়, সে বিবাহিত ছিল। তখন তিনি তাকে রজমের শাস্তি দেন। এ ছাড়াও ইতিপূর্বে আমি বিভিন্ন হাদীস উদ্ধৃত করেছি। সেগুলো থেকে জানা যায়, অবিবাহিত যিনাকারীদেরকে তিনি কেবল বেত্রাঘাতের শাস্তিই দেন। যেন যে ব্যক্তি মসজিদে গমনকারী এক মহিলার সাথে বলপূর্বক যিনা করেছিল এবং যে ব্যক্তি যিনার স্বীকারোক্তি করেছিল এবং মেয়েটি করেছিল অস্বীকার।

হযরত উমর (রা) বারী'আহ ইবনে উমাইয়াহ ইবনে খাল্‌ফকে মদ পানের অপরাধে দেশান্তর করেন এবং সে পালিয়ে গিয়ে রোমানদের সাথে যোগ দেয়। এর ফলে হযরত উমর (রা) বলেন, ভবিষ্যতে আমি আর কাউকে দেশান্তরের শাস্তি দেবো না। অনুরূপভাবে হযরত আলী (রা) অবিবাহিত পুরুষ ও নারীকে যিনার অপরাধে দেশান্তর করতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, এর ফলে ফিত্‌নার আশংকা আছে। (আহকামুল কুরআন–জাস্‌সাস, ৩য় খণ্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

এ সমস্ত হাদীসের প্রতি সামগ্রিকভাবে দৃষ্টি দিলে পরিষ্কার অনুভূত হয়, ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সহযোগীদের অভিমতই সঠিক। অর্থাৎ বিবাহিতের যিনার শাস্তি শুধুমাত্র রজম এবং অবিবাহিতের যিনার শাস্তি শুধুমাত্র একশ বেত্রাঘাত। বেত্রাঘাত ও রজমকে একসাথে নবীর (সা) আমল থেকে হযরত উসমানের (রা) আমল পর্যন্ত কখনো কার্যকর করা হয়নি। আর বেত্রাঘাত ও দেশান্তরের শাস্তিকে কখনো একত্র করা হয়েছে আবার কখনো একত্র করা হয়নি। এ থেকে হানাফী অভিমতের নির্ভুলতা পরিষ্কার প্রমাণিত হয়।

তেইশ ঃ বেত্রাঘাতের ধরন সম্পর্কে প্রথম ইংগিত কুরআনের শব্দ فاجلدوا এর মধ্যে পাওয়া যায়। جَلْد (জাল্‌দ) শব্দটি جِلد (জিল্‌দ অর্থাৎ চামড়া) থেকে গৃহীত। এ থেকে সকল অভিধান বিশারদ ও কুরআন ব্যাখ্যাতা এ অর্থই নিয়েছেন যে, আঘাত এমন হতে হবে যার প্রভাব চামড়ার ওপর থাকে, গোশ্‌তের মধ্যে না পৌঁছে। এমন ধরনের বেত্রাঘাত যার ফলে গোশ্‌তের টুকরা উড়ে যেতে থাকে অথবা চামড়া ফেটে আঘাত ভেতরে পৌঁছে যায়, তা কুরআন বিরোধী।

আঘাত করার জন্য কোড়া বা বেত যাই ব্যবহার করা হোক না কেন উভয় ক্ষেত্রেই তা মাঝারি পর্যায়ের হতে হবে। বেশী মোটা ও বেশী তীক্ষ্ণ অথবা বেশী পাত্‌লা ও বেশী নরম হতে পারবে না। মুআত্তা গ্রন্থে ইমাম মালেক রেওয়ায়াত করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেত্রাঘাতের জন্য কোড়া আনতে বলেন। সেটি বেশী ব্যবহার করার কারণে অনেক বেশী হাল্‌কা পাত্‌লা হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, فوق هذا (এর চাইতে বেশী তীক্ষ্ণ দেখে আনো)। তখন একটি নতুন কোড়া আনা হয়। সেটি তখনো কোন প্রকার ব্যবহারের ফলে নরম হয়ে যায়নি। তিনি বলেন, এ দু'য়ের মাঝামাঝি। তারপর এমন কোড়া আনা হয় যা সওয়ারীর পিঠে ব্যবহার করা হয়েছিল। তা দিয়ে তিনি আঘাত করান। প্রায় একই বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি বর্ণনা আব্ উসমান আন্‌নাহ্‌দী হযরত উমর (রা)

সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি প্রায় মাঝারি ধরনের কোড়া ব্যবহার করতেন। (আহকামুল কুরআন-জাস্‌সাস, ৩য় খণ্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা) গাঁট বাঁধানো কোড়া অথবা দু'চামড়া-তিন চামড়া বা দু'রশি-তিন রশি বাঁধানো কোড়া ব্যবহার করা নিষেধ।

আঘাতও হতে হবে মাঝারি পর্যায়ের। হযরত উমর (রা) আঘাতকারীকে নির্দেশ দিতেন لا ترفع (يالاتخرج) ابطك অর্থাৎ "এমনভাবে মারো যেন তোমার বগল খুলে না যায়।" অর্থাৎ পূর্ণ শক্তিতে হাত উঁচিয়ে মেরো না। (আহকামুল কুরআন-ইবনে আরাবী, ২য় খণ্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা, আহকামুল কুরআন-জাস্‌সাস, ৩য় খণ্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা)। সকল ফকীহ এ ব্যাপারে একমত যে, এ ধরনের আঘাত হবে না যার ফলে ঘা হয়ে যায়। একই জায়গায় মারা যাবে না বরং সারা শরীরে মার ছড়িয়ে দিতে হবে। শুধুমাত্র চেহারা ও লজ্জাস্থান এবং (হানাফীদের মতে মাথাও) অক্ষত রাখতে হবে। বাদবাকি সমস্ত অংগে কিছু না কিছু মার পড়তে হবে। এক ব্যক্তিকে যখন কোড়া মারা হচ্ছিল তখন হযরত আলী (রা) বলেন, "শরীরের প্রত্যেক অংগকে তার প্রাপ্য দাও এবং শুধুমাত্র মুখ ও লজ্জাস্থানকে নিষ্কৃতি দাও।" (আহকামুল কুরআন-জাস্‌সাস, ৩য় খণ্ড, ৩২১ পৃষ্ঠা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ اذا ضرب احدكم فليتق الوجه "তোমাদের কেউ যখন আঘাত করবে তখন মুখে আঘাত করবে না।" (আবু দাউদ)

পুরুষকে দাঁড় করিয়ে ও স্ত্রী লোককে বসিয়ে মারা উচিত। ইমাম আবু হানীফার সময় কূফার কাযী ইবনে আবী লাইলা একটি মেয়েকে দাঁড় করিয়ে মারার ব্যবস্থা করেন। ইমাম আবু হানীফা এর কঠোর সমালোচনা করেন এবং প্রকাশ্যে তার এ কার্যক্রমকে ভুল বলে চিহ্নিত করেন। (এ থেকে আদালতের অমর্যাদা সংক্রান্ত ইমাম আবু হানীফার মতবাদের ওপরও আলোকপাত হয়)। কোড়া মারার সময় স্ত্রীলোক তার পূর্ণ পোশাক পরে থাকবে। বরং তার শরীরের কোন অংশ যাতে বের হয়ে না যায় এ জন্য কাপড় তার সারা শরীরে ভালোভাবে বেঁধে দেয়া হবে। শুধু মোটা কাপড় খুলে নিতে হবে। পুরুষের ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। কোন কোন ফকীহ বলেন, পুরুষ কেবল পাজামা পরে থাকবে। আবার অন্যেরা বলেন, জামাও খোলা যাবে না। হযরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জার্‌রাহ (রা) এক যিনাকারীকে কোড়া মারার হুকুম দেন। সে বলে, "এই শরীরটার ভালোভাবে মার খাওয়া উচিত।" একথা বলে সে জামা খুলতে শুরু করে। হযরত আবু উবাইদাহ বলেন, "তাকে জামা খুলতে দিয়ো না।" (আহকামুল কুরআন-জাস্‌সাস, ৩য় খণ্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা)। হযরত আলীর আমলে এক ব্যক্তি নিজের গায়ে চাদর জড়িয়ে ছিল এ অবস্থায় তাকে কোড়া মারা হয়।

প্রচণ্ড শীত ও প্রচণ্ড গরমের মধ্যে মারা নিষিদ্ধ। শীতকালে গরম সময়ে এবং গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডার মধ্যে মারতে হবে।

বেঁধে মারারও অনুমতি নেই। তবে অপরাধী যদি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে তাহলে বেঁধে মারা যেতে পারে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, لا يحل فى هذه الامة تجريد ولا مد "এই উম্মতের মধ্যে উলংগ করে এবং খুঁটির সংগে বেঁধে মারা জায়েয নয়।"

ফকীহগণ প্রতিদিন অন্ততপক্ষে বিশ ঘা কোড়া মারা বৈধ বলেছেন। কিন্তু একই সংগে সম্পূর্ণ শাস্তি দিয়ে দেয়া উত্তম।

মূর্খ ও হিংস্র ধরনের জল্লাদের সাহায্যে মারার কাজ সম্পন্ন করা উচিত নয়। বরং শিক্ষিত ও মার্জিত জ্ঞানবান লোকদের সাহায্যে এ কাজ সম্পন্ন করা উচিত। যারা জানে শরীয়াতের দাবী পূর্ণ করার জন্য কিভাবে মারা উচিত তারাই এ কাজ করবে। ইবনে কাইয়েম যাদুল মা'আদ গ্রন্থে লিখেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায় হযরত আলী (রা), হযরত যুবাইর (রা), হযরত মিকদাদ ইবনে আমর (রা), হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ (রা), হযরত আসেম ইবনে সামেত ও দ্বাহ্হাক ইবনে সুফিয়ানের ন্যায় সজ্জন ও মর্যাদাশালী লোকেরা জল্লাদের দায়িত্ব পালন করতেন। (১ম খণ্ড, ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা)।

যদি অপরাধী রুগ্ন হয় অথবা তার আরোগ্য লাভ করার কোন আশা না থাকে কিংবা একেবারে বৃদ্ধ হয় তাহলে একশ শাখাওয়ালা একটি ডাল বা শতকাঠিওয়ালা একটি ঝাড়ু দিয়ে তাকে কেবলমাত্র একবার মেরে দেয়াই উচিত, যাতে আইনের দাবী পূর্ণ হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় এক বৃদ্ধ রোগী যিনার অপরাধে পাকড়াও হয়। তিনি তার জন্য এ শাস্তিই নির্ধারণ করেন। (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ) গর্ভবতী নারীকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিতে হলে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর নিফাসের সময় পার হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর তাকে রজম করতে হলে যতক্ষণ তার সন্তান দুধ পান করা পরিত্যাগ না করে ততক্ষণ তাকে শাস্তি দেয়া যেতে পারবে না।

যদি সাক্ষের মাধ্যমে যিনা প্রমাণ হয় তাহলে সাক্ষী মারের সূচনা করবে আর যদি স্বীকারোক্তির মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে কাযী নিজেই সূচনা করবেন, যাতে সাক্ষী নিজের সাক্ষকে এবং বিচারক নিজের বিচারকে খেল-তামাশা মনে না করেন। শুরাহাহর মামলায় যখন হযরত আলী (রা) রজমের ফায়সালা দেন তখন বলেন, "যদি তার অপরাধের কোন সাক্ষী থাকতো তাহলে তাকেই মার শুরু করতে হতো। কিন্তু তাকে স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কাজেই আমি নিজেই শুরু করবো।" হানাফীয়াদের মতে এমনটি করা ওয়াজিব। শাফেঈরা একে ওয়াজিব মনে করেন না। কিন্তু সবাই একে উত্তম মনে করেন।

বেত্রাঘাতের শাস্তির এ বিস্তারিত বিবরণ পড়ুন তারপর যারা এ শাস্তিকে বর্বরোচিত বলে থাকে তাদের ধৃষ্টতার কথা ভাবুন। আজকাল কারাগারে কয়েদীদেরকে যে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হচ্ছে তা তাদের কাছে বড়ই ভদ্রোচিত। বর্তমান আইনের দৃষ্টিতে কেবলমাত্র আদালতই নয়, জেলখানার একজন মামুলি সুপারিনটেনডেন্টও একজন কয়েদীকে হুকুম অমান্য বা গোস্তাখী করার অপরাধে ৩০ ঘা পর্যন্ত বেত্রাঘাতের শাস্তি দেবার অধিকার রাখে। এ বেত্রাঘাত করার জন্য একজন লোককে বিশেষভাবে তৈরী করা হয় এবং সে সবসময় এটা মশক করতে থাকে। এ উদ্দেশ্যে বেতও বিশেষভাবে ভিজিয়ে ভিজিয়ে তৈরী করা হয়, যাতে করে শরীরের ওপর তা ছুরির মতো কেটে বসে যেতে পারে। অপরাধীকে নাংগা করে খুঁটির সাথে বেঁধে দেয়া হয়, যাতে সে একটু নড়াচড়াও করতে না পারে। কেবলমাত্র তার লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য এক টুকরা পাতলা কাপড় তার পাছার সাথে জড়িয়ে দেয়া হয় এবং সেটিকেও টিংচার আইওডিন দিয়ে ভিজিয়ে দেয়া হয়। জল্লাদ দূর থেকে দৌড়ে আসে এবং পূর্ণ শক্তিতে তার ওপর আঘাত করে। শরীরের একটি বিশেষ অংশে (অর্থাৎ পাছায়) বরাবর আঘাত করা হতে থাকে। ফলে সেখান থেকে

গোশ্‌ত কিমা হয়ে উড়ে যেতে থাকে এবং অনেক সময় ভেতর থেকে হাড় দেখা যেতে থাকে। অধিকাংশ সময় এমন হয়, অত্যন্ত বলশালী ও শক্তিধর ব্যক্তিও ৩০ ঘা বেত সম্পূর্ণ হবার আগেই বেহুশ হয়ে পড়ে যায়। এ অবস্থায় তার শরীর ভরাট হতে দীর্ঘ সময় লাগে। তথাকথিত এ ভদ্রজনোচিত শাস্তিকে যারা আজ কারাগারে নিজেরাই প্রবর্তিত করে চলেছে তারা কোন্ মুখে ইসলাম প্রবর্তিত বেত্রাঘাতের শাস্তিকে "বর্বরোচিত" বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে। তারপর তাদের পুলিশ বাহিনী যেসব অপরাধীর অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে তাদেরকে নয় বরং নিছক সন্দেহভাজন লোকদেরকে ধরে এনে অনুসন্ধান চালাবার উদ্দেশ্যে (বিশেষ করে রাজনৈতিক অপরাধ সন্দেহে) যেভাবে শাস্তি দিয়ে থাকে তা আজ আর কারোর দৃষ্টির অগোচরে নেই।

চব্বিশ ঃ রজমের শাস্তির ফলে অপরাধী মারা যাবার পর তার সাথে পুরোপুরি মুসলমানের মতো ব্যবহার করা হবে। তার লাশকে গোসল দিয়ে কাফন পরানো হবে। তার জানাযার নামায পড়া হবে। তাকে মর্যাদা সহকারে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হবে। তার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা হবে। দুর্নাম সহকারে তার কথা আলোচনা করা কারোর জন্য বৈধ হবে না। বুখারীতে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারীর (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, "রজমের ফলে মা'ঈয ইবনে মালেকের মৃত্যু হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুনামের সাথে তাকে স্মরণ করতে থাকেন এবং নিজে তার জানাযার নামায পড়ান।" মুসলিমে হযরত বুরাইদার রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اِسْتَغْفِرُوْا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ اُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ

"মা'ঈয ইবনে মালেকের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো। সে এমন তাওবা করেছে যে, যদি তা সমগ্র উম্মতের ওপর বন্টন করে দেয়া হয়, তাহলে সবার জন্য যথেষ্ট হবে।"

এ হাদীসে একথাও বলা হয়েছে, গামেদীয়া যখন রজম করার ফলে মারা যান তখন নবী করীম (সা) নিজেই তার জানাযার নামায পড়ান। আর হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রা) যখন দুর্নাম সহকারে তার কথা বলতে থাকেন তখন তিনি বলেন ঃ

مَهْلاً يَا خَالِدُ ! فَوَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْتَابَ بِهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَلَهُ -

"হে খালেদ! চুপ করো। সেই সত্তার কসম, যার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, সে এমন তাওবা করেছিল যে, যদি নিপীড়নমূলক কর আদায়কারীও তেমন তাওবা করতো তাহলে তাকেও মাফ করে দেয়া হতো।"

আবু দাউদে হযরত আবু হুরাইরার (রা) রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, মা'ঈযের ঘটনার পর একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দু'জন লোককে মা'ঈযের দুর্নাম করতে শুনলেন। কয়েক পা এগিয়ে গেলে একটি গাধার লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেলো। রসূলুল্লাহ (সা) থেমে গেলেন এবং ঐ

দু'জন লোকের উদ্দেশে বললেন, "তোমরা দু'জন এটা থেকে কিছু খাও।" তারা বললেন, "হে আল্লাহর নবী! ওটা কে খেতে পারে।" তিনি বললেন, "এখনই তো তোমরা তোমাদের ভাইয়ের ইজ্জত–আবরু খাচ্ছিলে। ওটা এর চেয়ে অনেক খারাপ জিনিস ছিল।" মুসলিমে ঈমরান ইবনে হুসাইন বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত উমর (রা) গামেদীয়ার জানাযার নামাযের সময় বলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! এখন কি এই যিনাকারিনীর জানাযার নামায পড়া হবে? তিনি জবাব দেন ঃ

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ

"সে এমন তাওবা করেছে, যা সমগ্র মদীনাবাসীর মধ্যে ভাগ করে দেয়া হলেও তা সবার জন্য যথেষ্ট হবে।"

বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তিকে মদপানের অপরাধে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। তা দেখে একজনের মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে, "আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন।" একথায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "এভাবে বলো না। এর বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করো না।" আবু দাউদে এর ওপর আরো এতটুকু সংযোজন আছে যে, নবী (সা) বলেন, বরং এভাবে বলো ঃ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه "হে আল্লাহ তাকে মাফ করো, হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম করো।" এ হচ্ছে ইসলামে শাস্তির তাৎপর্য। ইসলাম কোন বৃহত্তম অপরাধীকেও শত্রুতার মনোভাব নিয়ে শাস্তি দেয় না। বরং কল্যাণাকাংখার মনোভাব নিয়েই শাস্তি দেয়। আর শাস্তি শেষ হবার পর তার প্রতি স্নেহ ও মমতার দৃষ্টিতে দেখে। আধুনিক সভ্যতাই বর্তমানে এমন এক সংকীর্ণমনতার জন্ম দিয়েছে যার ফলে সরকারী সৈন্য বা পুলিশ যাকে হত্যা করে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের ফলে যাকে হত্যা করা বৈধ গণ্য করা হয় তার লাশ বহন করে নিয়ে যাওয়া বা কারোর মুখে তার প্রশংসা কীর্তিত হওয়াকে কোনক্রমেই পছন্দ করা হয় না। এরপর দুনিয়াবাসীকে সহিষ্ণুতা ও উদারতার নসিহত করে নিজের নৈতিক সাহসের (এটা আধুনিক সভ্যতায় ধৃষ্টতা ও নির্লজ্জতার মার্জিত নাম) পরাকাষ্ঠা দেখানো হয়।

পঁচিশ ঃ মুহাররম নারীদের সাথে যিনার শাস্তি সম্পর্কিত শরীয়াতের আইন তাফহীমুল কুরআনের সূরা নিসার ৩৪ টীকায় এবং লূতের জাতির কর্ম (সমকাম) সংক্রান্ত শরিয়াতী ফায়সালা তাফহীমুল কুরআনের সূরা আ'রাফের ৬৪ থেকে ৬৮ টীকায় বর্ণনা করা হয়েছে। আর পশুর সাথে ব্যভিচার করাকেও কোন কোন ফকীহ যিনার অন্তরভুক্ত করেছেন এবং সে যিনার শাস্তি লাভের যোগ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র), ইমাম মুহাম্মাদ (র), ইমাম যুফার (র), ইমাম মালেক (র) ও ইমাম শাফেঈ (র) একে যিনা বলেন না এবং তাঁরা এ ধরনের কর্মে লিপ্ত ব্যক্তির ওপর "হদ" বা "তা'যীর" কোনটি জারি করার পক্ষপাতি নন। তা'যীর সম্পর্কে আমি আগেই বলে এসেছি যে, এর ফায়সালা করবেন কাযী নিজেই অথবা রাষ্ট্রের মজলিসে শূরা প্রয়োজন বোধ করলে এ জন্য কোন উপযোগী ব্যবস্থা নিজেই প্রবর্তন করতে পারবে।

৩. এ আয়াতে প্রথম উল্লেখযোগ্য জিনিসটি হচ্ছে, এখানে ফৌজদারী আইনকে "আল্লাহর দীন" বলা হচ্ছে। এ থেকে জানা যায়, শুধুমাত্র নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতই

দীন নয় বরং দেশের আইনও দীন। দীন প্রতিষ্ঠার অর্থ শুধু নামায প্রতিষ্ঠা নয় বরং আল্লাহর আইন ও শরীয়াত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাও। যেখানে এসব প্রতিষ্ঠিত হয় না সেখানে নামায প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও যেন অসম্পূর্ণ দীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে বলে মনে করা হবে। যেখানে একে বাদ দিয়ে অন্য কোন আইন অবলম্বন করা হয় সেখানে অন্য কিছু নয় বরং আল্লাহর দীনকেই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

এখানে দ্বিতীয় যে জিনিসটি উল্লেখযোগ্য সেটি হচ্ছে, আল্লাহর এ সতর্কবাণী ঃ যিনাকারী ও যিনাকারিনীর ওপর আমার নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগকালে অপরাধীর জন্য দয়া ও মমতার প্রেরণা যেন তোমাদের হাত টেনে না ধরে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথাটি আরো স্পষ্টভাবে নিম্নোক্ত হাদীসটিতে বলেন ঃ

يُؤْتَى بِوَالٍ نَقَصَ مِنَ الْحَدِّ سَوْطًا فَيُقَالُ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَاكَ ؟ فَيَقُوْلُ رَحْمَةً لِعِبَادِكَ فَيُقَالُ لَهُ اَنْتَ اَرْحَمُ بِهِمْ مِنِّىْ ؟ فَيُؤْمَرُ بِهِ اِلَى النَّارِ – وَيُؤْتَى بِمَنْ زَادَ سَوْطًا فَيُقَالُ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَاكَ ؟ فَيَقُوْلُ لِيَنْتَهُوا عَنْ مَعَاصِيْكَ فَيَقُوْلُ اَنْتَ اَحْكَمُ بِهِمْ مِنِّىْ ؟ فَيُؤْمَرُ بِهِ اِلَى النَّارِ–

" কিয়ামতের দিন একজন শাসককে আনা হবে। সে হদের মধ্যে বেত্রাঘাতের সংখ্যা এক ঘা কমিয়ে দিয়েছিল। জিজ্ঞেস করা হবে, এ কাজ তুমি কেন করেছিলে? জবাব দেবে, আপনার বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহশীল হয়ে। আল্লাহ বলবেন ঃ আচ্ছা, তাহলে তাদের ব্যাপারে তুমি আমার চেয়ে বেশী অনুগ্রহশীল ছিলে? তারপর হুকুম হবে, নিয়ে যাও একে দোজখে। আর একজন শাসককে আনা হবে। সে বেত্রাঘাতের সংখ্যা ১টি বাড়িয়ে দিয়েছিল। জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি এ কাজ করেছিলে কেন? সে জবাব দেবে, যাতে লোকেরা আপনার নাফরমানি করা থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ বলবেন ঃ আচ্ছা, তাদের ব্যাপারে তুমি তাহলে আমার চেয়ে বেশী বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ছিলে? তারপর হুকুম হবে, নিয়ে যাও একে দোজখে। (তাফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা)

দয়া বা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে হদের মধ্যে কম–বেশী করার কাজ চললে এ অবস্থা হবে। কিন্তু কোথাও যদি অপরাধীদের মর্যাদার ভিত্তিতে বিধানের মধ্যে বৈষম্য করা হতে থাকে তাহলে সেটা হবে জঘন্য ধরনের অপরাধ। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আয়েশার (রা) একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ভাষণে বলেন ঃ "হে লোকেরা! তোমাদের পূর্বে যেসব উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে তারা এ জন্য ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তাদের কোন মর্যাদাশালী ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিতো এবং কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তাকে শাস্তি দিতো।" অন্য একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "একটি হদ্ জারি করা দুনিয়াবাসীর জন্য চল্লিশ দিন বৃষ্টি হবার চাইতেও বেশী কল্যাণকর।" (নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)।

কোন কোন তাফসীরকার এ আয়াতের এ অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, অপরাধ প্রমাণ হবার পর অপরাধীকে ছেড়ে দেয়া যাবে না এবং তার শাস্তিও কম করা যাবে না বরং তাকে পুরো একশ কোড়া মারতে হবে। আবার কেউ কেউ এ অর্থ নিয়েছেন যে, অপরাধী

اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

ব্যভিচারী যেন ব্যভিচারিনী বা মুশরিক নারী ছাড়া কাউকে বিয়ে না করে এবং ব্যভিচারিনীকে যেন ব্যভিচারী বা মুশরিক ছাড়া আর কেউ বিয়ে না করে। আর এটা হারাম করে দেয়া হয়েছে মু'মিনদের জন্য।[৫]

যে মারের কোন কষ্ট অনুভব করতে না পারে এমন ধরনের কোন হাল্কা মার মারা যাবে না। আয়াতের শব্দাবলী উভয় ধরনের অর্থ সম্বলিত। বরং উভয় অর্থই প্রযোজ্য মনে হয়। বরঞ্চ সে সাথে এ অর্থও হয় যে, যিনাকারীকে সে শাস্তি দিতে হবে যা আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তাকে অন্য কোন শাস্তিতে পরিবর্তিত করা যাবে না। কোড়া মারার পরিবর্তে যদি অন্য কোন শাস্তি দয়া ও মমতার ভিত্তিতে দেয়া হয়, তাহলে তা হবে গোনাহ। আর যদি কোড়া মারাকে একটি বর্বরোচিত শাস্তি মনে করে অন্য শাস্তি দেয়া হয়, তাহলে তা হবে নির্জলা কুফরী, যা এক মুহূর্তকালের জন্যও ঈমানের সাথে একই বক্ষে একত্র হতে পারে না। আল্লাহকে আল্লাহ বলে মেনে নেয়া আবার (নাউযুবিল্লাহ) তাকে বর্বরও বলা কেবলমাত্র এমন ধরনের লোকের পক্ষে সম্ভব যে জঘন্য পর্যায়ের মুনাফিক।

৪. অর্থাৎ ঘোষণা দিয়ে সাধারণ লোকের সামনে শাস্তি দিতে হবে। এর ফলে একদিকে অপরাধী অপদস্ত হবে এবং অন্যদিকে সাধারণ মানুষ শিক্ষা লাভ করবে। এ থেকে ইসলামের শাস্তি তত্ত্বের ওপর সুস্পষ্ট আলোকপাত হয়। সূরা আল মা-য়েদায় চুরির শাস্তি বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছিল ঃ جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ "তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অপরাধ প্রতিরোধক শাস্তি।" (৩৮ আয়াত) আর এখানে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যিনাকারীকে প্রকাশ্য লোকদের সামনে শাস্তি দিতে হবে। এ থেকে জানা যায়, ইসলামী আইনে শাস্তির তিনটি উদ্দেশ্য। এক, অপরাধী থেকে তার জুলুম ও বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ নিতে হবে এবং সে অন্য ব্যক্তি বা সমাজের প্রতি যে অন্যায় করেছিল তার কিছুটা স্বাদ তাকে আস্বাদন করিয়ে দিতে হবে। দুই, তাকে পুনর্বার অপরাধ করা থেকে বিরত রাখতে হবে। তিন, তার শাস্তিকে শিক্ষণীয় করতে হবে, যাতে সমাজের খারাপ প্রবণতার অধিকারী অন্য লোকদের মগজ ধোলাই হয়ে যায় এবং তারা যেন এ ধরনের কোন অপরাধ করার সাহসই না করতে পারে। এ ছাড়াও প্রকাশ্যে শাস্তি দেবার আর একটি লাভ হচ্ছে এই যে, এ অবস্থায় শাসকরা শাস্তি দেবার ক্ষেত্রে অহেতুক সুবিধা দান বা অহেতুক কঠোরতা প্রদর্শন করার সাহস না দেখাতে পারে।

৫. অর্থাৎ অ-তাওবাকারী ব্যভিচারীর জন্য ব্যভিচারিনীই উপযোগী অথবা মুশরিক নারী। কোন সৎ মু'মিন নারীর জন্য সে মোটেই উপযোগী পুরুষ নয়। আর মু'মিনদের জন্য জেনে বুঝে নিজেদের মেয়েদেরকে এ ধরনের অসচ্চরিত্র লোকদের হাতে সোপর্দ করা হারাম। এভাবে যিনাকারিনী (অ-তাওবাকারী) মেয়েদের জন্য তাদেরই মতো যিনাকারীরা

অথবা মুশরিকরাই উপযোগী। সৎ মু'মিনদের জন্য তারা মোটেই উপযোগী নয়। যেসব নারীর চরিত্রহীনতার কথা মু'মিনরা জানে তাদেরকে বিয়ে করা তাদের জন্য হারাম। যে সমস্ত পুরুষ ও নারী তাদের চরিত্রহীনতার পথে গা ভাসিয়ে দিয়েছে একমাত্র তাদের জন্য এ নিয়ম প্রযোজ্য। তবে যারা তাওবা করে নিজেদের সংশোধন করে নিয়েছে তাদের জন্য এটা প্রযোজ্য নয়। কারণ তাওবা ও সংশোধনের পর "যিনাকারী" হবার দোষ আর তাদের জন্য প্রযুক্ত হয় না।

যিনাকারীর সাথে বিয়ে হারাম হবার অর্থ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এ নিয়েছেন যে, আদতে তার সাথে বিয়ে অনুষ্ঠিতই হয় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সঠিক কথা হচ্ছে, এর অর্থ নিছক নিষেধাজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করে যদি কেউ বিয়ে করে তাহলে আইনগতভাবে তা বিয়েই হবে না এবং এ বিয়ে সত্ত্বেও উভয় পক্ষকে যিনাকারী গণ্য করতে হবে একথা ঠিক নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সার্বজনীন নিয়ম হিসেবে বলেন ঃ الحرام لا يحرم الحلال "হারাম হালালকে হারাম করে দেয় না।" (তাবারানী ও দারুকুত্‌নী) অর্থাৎ একটি বেআইনী কাজ অন্য একটি আইনসংগত কাজকে বেআইনী করে দেয় না। কাজেই কোন ব্যক্তির যিনা করার কারণে সে যদি বিয়েও করে তাহলে তা তাকে যিনায় পরিণত করে দিতে পারে না এবং বিবাহ চুক্তির দ্বিতীয় পক্ষ যে ব্যভিচারী নয় সেও ব্যভিচারী গণ্য হবে না। নীতিগতভাবে বিদ্রোহ ছাড়া কোন অপরাধ এমন নেই, যা অপরাধ সম্পাদনকারীকে নিষিদ্ধ ব্যক্তিতে (Outlaw) পরিণত করে। যার পরে তার আর কোন কাজই আইনসংগত হতে পারে না। এ বিষয়টি সামনে রেখে যদি আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা যায়, তাহলে আসল উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে এই মনে হয় যে, যাদের ব্যভিচারী চরিত্র জনসমক্ষে পরিচিত তাদেরকে বিয়ে করার জন্য নির্বাচিত করা একটি গোনাহর কাজ। মু'মিনদের এ গোনাহ থেকে দূরে থাকা উচিত। কারণ এর মাধ্যমে ব্যভিচারীদের হিম্মত বাড়িয়ে দেয়া হয়। অথচ শরীয়াত তাদেরকে সমাজের অবাঞ্ছিত ও ঘৃণ্য জীব গণ্য করতে চায়।

অনুরূপভাবে এ আয়াত থেকে এ সিদ্ধান্তও টানা যায় না যে, যিনাকারী মুসলিম পুরুষের বিয়ে মুশরিক নারীর সাথে এবং যিনাকারিনী মুসলিম নারীর বিয়ে মুশরিক পুরুষের সাথে সঠিক হবে। আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বলা যে, যিনা একটি চরম নিকৃষ্ট কুকর্ম। যে ব্যক্তি মুসলমান হয়েও এ কাজ করে সে মুসলিম সমাজের সৎ ও পাক-পবিত্র লোকদের সাথে আত্মীয় সম্পর্ক গড়ে তোলার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তার নিজের মতো যিনাকারীদের সাথেই আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত অথবা মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত, যারা আদৌ আল্লাহর বিধানের প্রতি বিশ্বাসই রাখে না।

এ প্রসংগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেসব হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলোই আসলে আয়াতের সঠিক অর্থ প্রকাশ করে। মুসনাদে আহমাদ ও নাসাঈতে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসের (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, উম্মে মাহ্‌যাওল নামে একটি মেয়ে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করেছিল। এক মুসলমান তাকে বিয়ে করতে চায় এবং এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি চায়। তিনি নিষেধ করে এ আয়াতটি পড়েন। তিরমিযী ও আবু দাউদে বলা হয়েছে, মারসাদ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ
فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝٤ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٥

আর যারা সতী-সাধ্বী নারীর ওপর অপবাদ লাগায়, তারপর চারজন সাক্ষী আনে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং তাদের সাক্ষ কখনো গ্রহণ করো না। তারা নিজেরাই ফাসেক। তবে যারা এরপর তাওবা করে এবং শুধরে যায়, অবশ্যই আল্লাহ (তাদের পক্ষে) ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।[৬]

ইবনে আবি মারসাদ একজন সাহাবী ছিলেন। জাহেলী যুগে মক্কার ঈনাক নামক এক ব্যভিচারিনীর সাথে তার অবৈধ সম্পর্ক ছিল। পরে তিনি তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা করেন এবং রসূলুল্লাহর (সা) কাছে অনুমতি চান। দু'বার জিজ্ঞেস করার পরও তিনি নীরব থাকেন। আবার তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করেন, এবার তিনি জবাব দেন ঃ

يامرثد الزانى لا ينكح الا زانية او مشركة فلا تنكحها

"হে মারসাদ! ব্যভিচারী এক ব্যভিচারিনী বা মুশরিক নারী ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না, কাজেই তাকে বিয়ে করো না।"

এ ছাড়াও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ও হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকেও বিভিন্ন হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। সেগুলোতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কোন দাইয়ুস (অর্থাৎ যে ব্যক্তি জানে তার স্ত্রী ব্যভিচারিনী এবং এরপরও সে তার স্বামী থাকে) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না।" (আহমাদ, নাসাঈ, আবু দাউদ) প্রথম দুই খলীফা হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) উভয়ই এ ব্যাপারে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তা ছিল এই যে, তাঁদের আমলে যে অবিবাহিত পুরুষ ও নারী যিনা অভিযোগে গ্রেফতার হতো তাদেরকে তাঁরা প্রথমে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিতেন তারপর তাদেরকেই পরস্পরের সাথে বিয়ে দিয়ে দিতেন। ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, একদিন এক ব্যক্তি বড়ই পেরেশান অবস্থায় হযরত আবু বকরের (রা) কাছে আসে। সে এমনভাবে কথা বলতে থাকে যেন তার মুখে কথা ভালভাবে ফুটছিল না। হযরত আবু বকর (রা) হযরত উমরকে (রা) বলেন, ওকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে একান্তে জিজ্ঞেস করুন ব্যাপারখানা কি? হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করতে সে বলে, তাদের বাড়িতে মেহমান হিসেবে এক ব্যক্তি এসেছিল। সে তার মেয়ের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে বসেছে। হযরত উমর (রা) বলেন ঃ قبحك الله ، الاسترت على ابنتك "তোমার মন্দ হোক, তুমি নিজের মেয়ের আবরণ ঢেকে দিলে না?" শেষ পর্যন্ত পুরুষটি ও মেয়েটির বিরুদ্ধে

মামলা চলে। উভয়কে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হয়। তারপর উভয়কে পরস্পরের সাথে বিয়ে দিয়ে হযরত আবু বকর (রা) এক বছরের জন্য তাদেরকে দেশান্তর করেন। এ ধরনেরই আরো কয়েকটি ঘটনা কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী তাঁর আহকামুল কুরআন গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন (পৃষ্ঠা ৮৬, ২য় খণ্ড)।

৬. এ হুকুমটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজে লোকদের গোপন প্রণয় ও অবৈধ সম্পর্কের আলোচনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া। কারণ এর মাধ্যমে অসংখ্য অসৎকাজ, অসৎবৃত্তি ও অসৎ প্রবণতার প্রসার ঘটে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অসৎবৃত্তিটি হলো, এভাবে সবার অলক্ষে একটি ব্যভিচারমূলক পরিবেশ তৈরী হয়ে যেতে থাকে। একজন নিছক কৌতুকের বশে কারোর সত্য বা মিথ্যা কুৎসিত ঘটনাবলী অন্যের সামনে বর্ণণা করে বেড়ায়। অন্যেরা তাতে লবণ মরিচ মাখিয়ে লোকদের সামনে পরিবেশন করতে থাকে এবং এ সংগে আরো কিছু লোকের ব্যাপারেও নিজেদের বক্তব্য বা কুধারণা বর্ণনা করে। এভাবে কেবলমাত্র যৌন কামনা–বাসনার একটি ব্যাপক ধারাই প্রবাহিত হয় না বরং খারাপ প্রবণতার অধিকারী নারী–পুরুষরা জানতে পারে যে, সমাজের কোথায় কোথায় অবৈধ সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারবে। শরীয়াত প্রথম পদক্ষেপেই এ জিনিসটির পথ রোধ করতে চায়। একদিকে সে হুকুম দেয়, যদি কেউ যিনা করে এবং সাক্ষী–সাবুদের মাধ্যমে তার যিনা প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে এমন চরম শাস্তি দাও যা অন্য কোন অপরাধে দেয়া হয় না। আবার অন্যদিকে সে ফায়সালা করে, যে ব্যক্তি অন্যের বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ আনে সে সাক্ষ–প্রমাণের মাধ্যমে নিজের অভিযোগ প্রমাণ করবে আর যদি প্রমাণ করতে না পারে তাহলে তাকে আশি ঘা বেত্রাঘাত করো, যাতে ভবিষ্যতে আর সে কখনো এ ধরনের কোন কথা বিনা প্রমাণে নিজের মুখ থেকে বের করার সাহস না করে। ধরে নেয়া যাক যদি অভিযোগকারী কাউকে নিজের চোখে ব্যভিচার করতে দেখে তাহলেও তার নীরব থাকা উচিত এবং অন্যদের কাছে একথা না বলা উচিত ফলে ময়লা যেখানে আছে সেখানেই পড়ে থাকবে এবং আশেপাশে ছড়িয়ে যেতে পারবে না। তবে যদি তার কাছে সাক্ষী থাকে তাহলে সমাজে আজেবাজে কথা ছড়াবার পরিবর্তে বিষয়টি শাসকদের কাছে নিয়ে যেতে হবে এবং আদালতে অভিযুক্তের অপরাধ প্রমাণ করে তাকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

এ আইনটি পুরোপুরি অনুধাবন করার জন্য এর বিস্তারিত বিষয়াবলী দৃষ্টি সমক্ষে থাকা উচিত। তাই আমি নীচে এর বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছি ঃ

এক ঃ আয়াতে وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হয় "যেসব লোক অপবাদ দেয়।" কিন্তু পূর্বাপর আলোচনা বলে, এখানে অপবাদ মানে সব ধরনের অপবাদ নয় বরং বিশেষভাবে যিনার অপবাদ। প্রথমে যিনার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে এবং সামনের দিকে আসছে "লি'আন"–এর বিধান। এ দু'য়ের মাঝখানে এ বিধানটির আসা পরিষ্কার ইংগিত দিচ্ছে এখানে অপবাদ বলতে কোন্ ধরনের অপবাদ বুঝানো হয়েছে। তারপর يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ (অপবাদ দেয় সতী মেয়েদেরকে) থেকেও এ মর্মে ইংগিত পাওয়া যায় যে, এখানে এমন অপবাদের কথা বলা হয়েছে যা সতীত্ব বিরোধী। তাছাড়া অপবাদদাতাদের কাছে তাদের অপবাদের প্রমাণস্বরূপ চারজন সাক্ষী আনার দাবী করা হয়েছে। সমগ্র ইসলামী আইন ব্যবস্থায় একমাত্র যিনার সাক্ষদাতাদের জন্য চারজনের

সংখ্যা রাখা হয়েছে। এসব প্রমাণের ভিত্তিতে সমগ্র উম্মতের আলেম সমাজের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এ আয়াতে শুধুমাত্র যিনার অপবাদের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এ জন্য উলামায়ে কেরাম স্বতন্ত্র পারিভাষিক শব্দ "কাযাফ" নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যাতে অন্যান্য অপবাদসমূহ (যেমন কাউকে চোর, শরাবী, সূদখোর বা কাফের বলা) এ বিধানের আওতায় এসে না পড়ে। "কাযাফ" ছাড়া অন্য অপবাদসমূহের শাস্তি কাযী নিজেই নির্ধারণ করতে পারেন অথবা দেশের মজলিসে শূরা প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের জন্য অপমান বা মানহানির কোন সাধারণ আইন তৈরী করতে পারেন।

দুই ঃ আয়াতে يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ (সতী নারীদেরকে অপবাদ দেয়) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, শুধুমাত্র নারীদেরকে অপবাদ দেয়া পর্যন্ত এ বিধানটি সীমাবদ্ধ নয় বরং নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী পুরুষদেরকে অপবাদ দিলেও এ একই বিধান কার্যকর হবে। এভাবে যদিও অপবাদদাতাদের জন্য اَلَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ (যারা অপবাদ দেয়) পুরুষ নির্দেশক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তবুও এর মাধ্যমে শুধুমাত্র পুরুষদেরকেই নির্দেশ করা হয়নি বরং মেয়েরাও যদি "কাযাফ"–এর অপরাধ করে তাহলে তারাও এ একই বিধানের আওতায় শাস্তি পাবে। কারণ অপরাধের ব্যাপারে অপবাদদাতা ও যাকে অপবাদ দেয়া হয় তাদের পুরুষ বা নারী হলে কোন পার্থক্য দেখা দেয় না। কাজেই আইনের আকৃতি হবে এ রকম—যে কোন পুরুষ ও নারী কোন নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী পুরুষ ও নারীর ওপর যিনার অপবাদ চাপিয়ে দেবে তার জন্য হবে এ আইন (উল্লেখ্য, এখানে "মুহসিন" ও "মুহসিনা" মানে বিবাহিত পুরুষ ও নারী নয় বরং নিষ্কলুষ চরিত্র সম্পন্ন পুরুষ ও নারী)।

তিন ঃ অপবাদদাতা যখন কোন নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী পুরুষ ও নারীর বিরুদ্ধে এ অপবাদ দেবে একমাত্র তখনই এ আইন প্রযোজ্য হবে। কোন কলংকযুক্ত ও দাগী চরিত্র সম্পন্ন পুরুষ ও নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ দিলে এটি প্রযুক্ত হতে পারে না। দুশ্চরিত্র বলে পরিচিত ব্যক্তি যদি ব্যভিচারী হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে "অপবাদ" দেবার প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু যদি সে এমন না হয়, তাহলে তার ওপর প্রমাণ ছাড়াই অপবাদদাতার জন্য কাযী নিজেই শাস্তি নির্ধারণ করতে পারেন অথবা এ ধরনের অবস্থার জন্য মজলিসে শূরা প্রয়োজন অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করতে পারে।

চার ঃ কোন মিথ্যা অপবাদ (কাযাফ) দেয়ার কাজটি শাস্তিযোগ্য হবার জন্য শুধুমাত্র এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, একজন অন্য জনের ওপর কোন প্রমাণ ছাড়াই ব্যভিচার করার অপবাদ দিয়েছে। বরং এ জন্য কিছু শর্ত অপবাদদাতার মধ্যে, কিছু শর্ত যাকে অপবাদ দেয়া হচ্ছে তার মধ্যে এবং কিছু শর্ত স্বয়ং অপবাদ কর্মের মধ্যে থাকা অপরিহার্য।

অপবাদদাতার মধ্যে যে শর্তগুলো থাকতে হবে সেগুলো হচ্ছে ঃ প্রথমত তাকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। শিশু যদি অপবাদ দেবার অপরাধ করে তাহলে তাকে আইন–শৃংখলা বিধানমূলক (তা'যীর) শাস্তি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু তার ওপর শরিয়াতী শাস্তি (হদ্) জারি হতে পারে না। দ্বিতীয়ত তাকে মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে। পাগলের ওপর "কাযাফের" শাস্তি জারি হতে পারে না। অনুরূপভাবে হারাম নেশা ছাড়া অন্য কোন ধরনের নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যেমন ক্লোরোফরমের প্রভাবাধীন অপবাদদাতাকেও অপরাধী গণ্য করা যেতে পারে না। তৃতীয়ত সে নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় (ফকীহগণের পরিভাষায় 'তায়েআন') এ কাজ

করবে। কারোর বল প্রয়োগে অপবাদদানকারীকে অপরাধী গণ্য করা যেতে পারে না। চতুর্থত সে যাকে অপবাদ দেয়া হচ্ছে তার নিজের বাপ বা দাদা নয়। কারণ তাদের ওপর অপবাদের হদ জারি হতে পারে না। এগুলো ছাড়া হানাফীদের মতে পঞ্চম আর একটি শর্তও আছে। সেটি হচ্ছে, সে বাকশক্তি সম্পন্ন হবে, বোবা হবে না। বোবা যদি ইশারা ইংগিতে অপবাদ দেয় তাহলে তার ফলে অপবাদের শাস্তি ওয়াজিব হয়ে যাবে না। ইমাম শাফেঈ এ থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, যদি বোবার ইশারা একেবারেই সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হয় এবং তা দেখে সে কি বলতে চায় তা লোকেরা বুঝতে পারে, তাহলে তো সে অপবাদদাতা। কারণ তার ইশারা এক ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত ও বদনাম করে দেবার ক্ষেত্রে কথার মাধ্যমে প্রকাশ করার তুলনায় কোন অংশে কম নয়। পক্ষান্তরে হানাফীদের মতে নিছক ইশারার মাধ্যমে বক্তব্য প্রকাশ এত বেশী শক্তিশালী নয় যার ভিত্তিতে এক ব্যক্তিকে ৮০ ঘা বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া যেতে পারে। তারা তাকে শুধুমাত্র দমনমূলক (তা'যীর) শাস্তি দেবার পক্ষপাতি।

যাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া হয় তার মধ্যেও নিম্নোক্ত শর্তগুলো পাওয়া যেতে হবে। প্রথমত তাকে বুদ্ধি সচেতন হতে হবে। অর্থাৎ তার ওপর এমন অবস্থায় যিনা করার অপবাদ দেয়া হয় যখন সে বুদ্ধি সচেতন ছিল। পাগলের প্রতি (পরে সে বুদ্ধি সচেতন হয়ে গিয়ে থাক বা না থাক) যিনা করার অপবাদ দানকারী 'কাযাফ'–এর শাস্তিলাভের উপযুক্ত নয়। কারণ পাগল তার নিজের চারিত্রিক নিষ্কলুষতা সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করতে পারে না। আর তার বিরুদ্ধে যিনা করার সাক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও সে যিনার শাস্তির উপযুক্ত হয় না এবং তার মর্যাদাও ক্ষুণ্ন হয় না। কাজেই তার প্রতি অপবাদ দানকারীরও কাযাফের শাস্তিলাভের যোগ্য হওয়া উচিত নয়। কিন্তু ইমাম মালেক ও ইমাম লাইস ইবনে সা'দ বলেন, পাগলের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদদানকারী কাযাফের শাস্তিলাভের যোগ্য। কারণ সে একটি প্রমাণ বিহীন অপবাদ দিচ্ছে, এতে সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, তাকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় তার ওপর যিনা করার অপবাদ দেয়া হয়। শিশুর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া অথবা যুবকের বিরুদ্ধে এ মর্মে অপবাদ দেয়া যে, সে শৈশবে এ কাজ করেছিল, এ ধরনের অপবাদের ফলে 'কাযাফ'–এর শাস্তি ওয়াজিব হয় না। কারণ পাগলের মত শিশুও নিজের চারিত্রিক নিষ্কলুষতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে না। ফলে কাযাফ–এর শাস্তি তার ওপর ওয়াজিব হয় না এবং তার মান–সম্মানও নষ্ট হয় না। কিন্তু ইমাম মালেক বলেন, যে ছেলে প্রাপ্ত বয়স্কের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তার বিরুদ্ধে যদি যিনা করার অপবাদ দেয়া হয় তাহলে তো অপবাদদানকারীর ওপর কাযাফ–এর শাস্তি ওয়াজিব হবে না কিন্তু যদি একই বয়সের মেয়ের ওপর যিনা করাবার অভিযোগ আনা হয় যার সাথে সহবাস করা সম্ভব, তাহলে তার প্রতি অপবাদদানকারী কাযাফ–এর শাস্তিলাভের যোগ্য। কারণ এর ফলে কেবলমাত্র মেয়েরই নয় বরং তার পরিবারেরও মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয় এবং মেয়ের ভবিষ্যত অন্ধকার হয়ে যায়। তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, তাকে মুসলমান হতে হবে। অর্থাৎ মুসলিম থাকা অবস্থায় তার বিরুদ্ধে যিনা করার অপবাদ দেয়া হয়। কাফেরের বিরুদ্ধে এ অপবাদ অথবা মুসলিমের বিরুদ্ধে এ অপবাদ যে, সে কাফের থাকা অবস্থায় এ কাজ করেছিল, তার জন্য কাযাফ–এর শাস্তি ওয়াজিব করে দেয় না। চতুর্থ শর্ত হচ্ছে, তাকে স্বাধীন হতে হবে। বাঁদি বা গোলামের বিরুদ্ধে এ অপবাদ অথবা স্বাধীনের বিরুদ্ধে এ অপবাদ যে, সে গোলাম থাকা অবস্থায় এ কাজ করেছিল, তার

জন্য কাযাফ–এর শাস্তি ওয়াজিব করে দেয় না। কারণ গোলামীর অসহায়তা ও দুর্বলতার দরুন তার পক্ষে নিজের চারিত্রিক নিষ্কলুষতার ব্যবস্থা করা সম্ভব নাও হতে পারে। স্বয়ং কুরআনই গোলামীর অবস্থাকে 'ইহ্সান' তথা পূর্ণ বিবাহিত অবস্থা গণ্য করেনি। তাই সূরা নিসায় শব্দটি বাঁদির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু দাউদ যাহেরী এ যুক্তি মানেন না। তিনি বলেন, বাঁদি ও গোলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদদানকারীও কাযাফ–এর শাস্তিলাভের যোগ্য। পঞ্চম শর্ত হচ্ছে, তাকে নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। অর্থাৎ তার জীবন যিনা ও যিনাসদৃশ চালচলন থেকে মুক্ত হবে। যিনা মুক্ত হবার অর্থ হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে কখনো যিনার অপরাধ প্রমাণিত হয়নি। যিনা সদৃশ থেকে মুক্ত হবার অর্থ হচ্ছে, সে বাতিল বিবাহ, গোপন বিবাহ, সন্দেহযুক্ত মালিকানা বা বিবাহ সদৃশ যৌন সংগম করেনি। তার জীবন যাপন এমন ধরনের নয় যেখানে তার বিরুদ্ধে চরিত্রহীনতা ও নির্লজ্জ বেহায়াপনার অভিযোগ আনা যেতে পারে এবং যিনার চেয়ে কম পর্যায়ে চরিত্রহীনতার অভিযোগ তার প্রতি ইতিপূর্বে কখনো প্রমাণিত হয়নি। কারণ এসব ক্ষেত্রেই তার চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ক্ষুণ্ন হয়ে যায় এবং এ ধরনের অনিশ্চিত নিষ্কলুষতার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনকারী ৮০ ঘা বেত্রাঘাতের শাস্তিলাভের যোগ্য হতে পারে না। এমন কি যদি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদের (কাযাফ) শাস্তি জারি হবার আগে যার প্রতি অপবাদ দেয়া হয় তার বিরুদ্ধে কখনো কোন যিনার অপরাধের সাক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলেও মিথ্যা অপবাদ দানকারীকে ছেড়ে দেয়া হবে। কারণ যার প্রতি সে অপবাদ আরোপ করেছিল সে নিষ্কলুষ থাকেনি।

কিন্তু এ পাঁচটি ক্ষেত্রে শরীয়াত নির্ধারিত শাস্তি (হদ্) জারি না হবার অর্থ এ নয় যে, পাগল, শিশু, কাফের, গোলাম বা অনিষ্কলুষ ব্যক্তির প্রতি প্রমাণ ছাড়াই যিনার অপবাদ আরোপকারী দমনমূলক (তা'যীর) শাস্তিলাভের যোগ্যও হবে না।

এবার স্বয়ং মিথ্যা অপবাদ কর্মের মধ্যে যেসব শর্ত পাওয়া যেতে হবে সেগুলোর আলোচনায় আসা যাক। একটি অভিযোগকে দু'টি জিনিসের মধ্য থেকে কোন একটি জিনিস মিথ্যা অপবাদে পরিণত করতে পারে। এক, অভিযোগকারী অভিযুক্তের ওপর এমন ধরনের নারী সংগমের অপবাদ দিয়েছে যা সাক্ষের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তির ওপর যিনার শাস্তি ওয়াজিব হয়ে যাবে। দুই, অথবা সে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জারজ সন্তান গণ্য করেছে। কিন্তু উভয় অবস্থায়ই এ অপবাদটি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হতে হবে। ইশারা–ইংগিত গ্রহণযোগ্য নয়। এর সাহায্যে যিনা বা বংশের নিন্দার অর্থ গ্রহণ করা মিথ্যা অপবাদদাতার নিয়তের ওপর নির্ভরশীল হয়। যেমন কাউকে ফাসেক, পাপী, ব্যভিচারী বা দুশ্চরিত্র ইত্যাদি বলে দেয়া অথবা কোন মেয়েকে বেশ্যা, কসবী বা ছিনাল বলা কিংবা কোন সৈয়দকে পাঠান বলে দেয়া—এসব ইশারা হয়। এগুলোর মাধ্যমে দ্ব্যর্থহীন মিথ্যা অপবাদ প্রমাণ হয় না। অনুরূপভাবে যেসব শব্দ নিছক গালাগালি হিসেবে ব্যবহার হয়, যেমন হারামি বা হারামজাদা ইত্যাদিকেও সুস্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ গণ্য করা যেতে পারে না। তবে 'তা'রীয' (নিজের প্রতি আপত্তিকর বক্তব্য অস্বীকৃতির মাধ্যমে অন্যকে খোঁটা দেয়া) এর ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে এটাও অপবাদ কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। যেমন কেউ অন্যকে সম্বোধন করে বলে, "হাঁ, কিন্তু আমি তো আর যিনাকারী নই" অথবা "আমার মা তো আর যিনা করে আমাকে জন্ম দেয়নি।" ইমাম

মালেক বলেন, এমন কোন "তা'রীয" "কাযাফ" বা যিনার মিথ্যা অপবাদ হিসেবে গণ্য হবে যা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, প্রতিপক্ষকে যিনাকারী বা জারজ সন্তান গণ্য করাই বক্তার উদ্দেশ্য। এ অবস্থায় "হদ" বা কাযাফ–এর শাস্তি ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, তাঁর সাথীগণ এবং ইমাম শাফেঈ, সুফিয়ান সওরী, ইবনে শুবরুমাহ ও হাসান ইবনে সালেহ বলেন, "তা'রীযে'র ক্ষেত্রে অবশ্যই সন্দেহের অবকাশ থাকে এবং সন্দেহ সহকারে কাযাফ–এর শাস্তি জারি হতে পারে না। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াইহ্ বলেন, যদি ঝগড়া–বিবাদের মধ্যে "তা'রীয" করা হয়, তাহলে তা হবে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আর হাসি–ঠাট্টার মধ্যে করা হলে তা ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ হবে না। খলীফাগণের মধ্যে হযরত উমর (রা) ও হযরত আলী (রা) তা'রীযের জন্য কাযাফ–এর শাস্তি দেন। হযরত উমরের আমলে দু'জন লোকের মধ্যে গালিগালাজ হয়। একজন অন্য জনকে বলে, "আমার বাপও যিনাকারী ছিল না, আমার মাও যিনাকারিনী ছিল না।" মামলাটি হযরত উমরের দরবারে পেশ হয়। তিনি উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আপনারা এ থেকে কি মনে করেন? কয়েকজন বলে, "সে নিজের বাপ–মার প্রশংসা করেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তির বাপ–মা'র ওপর আক্রমণ করেনি। "আবার অন্য কয়েকজন বলে," তার নিজের বাপ–মা'র প্রশংসা করার জন্য কি শুধু এ শব্দগুলোই রয়ে গিয়েছিল? এ বিশেষ শব্দগুলোকে এ সময় ব্যবহার করার পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, দ্বিতীয় ব্যক্তির বাপ–মা ব্যভিচারী ছিল।" হযরত উমর (রা) দ্বিতীয় দলটির সাথে একমত হন এবং 'হদ' জারি করেন। (জাস্সাস, ৩য় খণ্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠা) কারোর প্রতি সমকামিতার অপবাদ দেয়া ব্যভিচারের অপবাদ কিনা এ ব্যাপারেও মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈ একে ব্যভিচারের অপবাদ গণ্য করেন এবং 'হদ' জারি করার হুকুম দেন।

পাঁচ ঃ ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ সরাসরি সরকারী হস্তক্ষেপযোগ্য অপরাধ (Cognizable Offence) কিনা এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইবনে আবী লাইলা বলেন, এটি হচ্ছে আল্লাহর হক। কাজেই যার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছে সে দাবী করুক বা নাই করুক মিথ্যা অপবাদদাতার বিরুদ্ধে কাযাফ–এর শাস্তি জারি করা ওয়াজিব। কিন্তু তার বিরুদ্ধে মামলা চালানো, যার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছে, তার দাবীর ওপর নির্ভর করে এবং এদিক দিয়ে এটি ব্যক্তির হক। ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আওযাঈও এ একই মত পোষণ করেছেন। ইমাম মালেকের মতে যদি শাসকের সামনে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয় তাহলে তা হবে সরকারী হস্তক্ষেপযোগ্য অপরাধ অন্যথায় এর বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যার বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হয়েছে তার দাবীর ওপর নির্ভরশীল।

ছয় ঃ ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেবার অপরাধ আপোসে মিটিয়ে ফেলার মতো অপরাধ (Compoundable Offence) নয়। অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির আদালতে মামলা দায়ের না করাটা ভিন্ন ব্যাপার কিন্তু আদালতে বিষয়টি উত্থাপিত হবারপর অপবাদ দানকারীকে তার অপবাদ প্রমাণ করতে বাধ্য করা হবে। আর প্রমাণ করতে না পারলে তার ওপর 'হদ' জারি করা হবে। আদালত তাকে মাফ করতে পারে না, অপবাদ আরোপিত ব্যক্তিও পারে না এবং কোন প্রকার অর্থদণ্ড দিয়েও ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করা

যেতে পারে না। তাওবা করে মাফ চেয়েও সে শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি আগেই আলোচিত হয়েছে ঃ

تَعَافَوْا الْحُدُوْدَ فِيْمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِىْ مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ

"অপরাধকে আপোসে মিটিয়ে দাও কিন্তু যে অপরাধের নালিশ আমার কাছে চলে এসেছে, সেটা ওয়াজিব হয়ে গেছে।"

সাত ঃ হানাফীদের মতে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি দাবী করতে পারে অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি নিজেই অথবা যখন দাবী করার জন্য অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি নিজে উপস্থিত নেই এমন অবস্থায় যার বংশের মর্যাদাহানি হয় সেও দাবী করতে পারে। যেমন বাপ, মা, ছেলেমেয়ে এবং ছেলেমেয়ের ছেলেমেয়েরা এ দাবী করতে পারে। কিন্তু ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈর মতে এ অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে লাভযোগ্য। অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি মারা গেলে তার প্রত্যেক শরয়ী উত্তরাধিকারী হদ্ জারি করার দাবী জানাতে পারে। তবে আশ্চার্য ব্যাপার হচ্ছে, ইমাম শাফেঈ স্ত্রী ও স্বামীকে এর বাইরে গণ্য করছেন। এ ব্যাপারে তাঁর যুক্তি হচ্ছে, মৃত্যুর সাথে সাথেই দাম্পত্য সম্পর্ক খতম হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় স্বামী বা স্ত্রী কোন এক জনের বিরুদ্ধে অপবাদ দিলে অন্যের বংশের কোন মর্যাদাহানি হয় না। অথচ এ দু'টি যুক্তিই দুর্বল। কারণ শাস্তি দাবী করাকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অধিকার বলে মেনে নেবার পর মৃত্যু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্ক খতম করে দিয়েছে বলে স্বামী ও স্ত্রী এ অধিকারটি লাভ করবে না একথা বলা স্বয়ং কুরআনের বক্তব্য বিরোধী। কারণ কুরআন এক জনের মরে যাওয়ার পর অন্যজনকে উত্তাধিকারী গণ্য করেছে। আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্য থেকে কোন একজনের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হলে অন্যজনের বংশের কোন মর্যাদাহানি হয় না একথাটি স্বামীর ব্যাপারে সঠিক হলেও হতে পারে কিন্তু স্ত্রীর ব্যাপারে একদম সঠিক নয়। কারণ যার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হয় তার তো সমস্ত সন্তান সন্ততির বংশধারাও সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়। তাছাড়া শুধুমাত্র বংশের মর্যাদাহানির কারণে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদের শাস্তি ওয়াজিব গণ্য করা হয়েছে, এ চিন্তাও সঠিক নয়। বংশের সাথে সাথে মান-সম্মান-ইজ্জত-আবরুর বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়াও এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন পুরুষ ও নারীর জন্য তার স্বামী বা স্ত্রীকে ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিনী গণ্য করা কম মর্যাদাহানিকর নয়। কাজেই ব্যভিচারের মিথ্যা সাক্ষ দেবার দাবী যদি উত্তরাধিকারিত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে স্বামী-স্ত্রীকে তা থেকে আলাদা করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই।

আট ঃ কোন ব্যক্তি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে একথা প্রমাণ হয়ে যাবার পর কেবলমাত্র নিম্নলিখিত জিনিসটিই তাকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারে। তাকে এমন চারজন সাক্ষী আনতে হবে যারা আদালতে এ মর্মে সাক্ষ দেবে যে, তারা অপবাদ আরোপিত জনকে ওমুক পুরুষ বা মেয়ের সাথে কার্যত যিনা করতে দেখেছে। হানাফীয়াদের মতে এ চারজন সাক্ষীকে একই সংগে আদালতে আসতে হবে এবং একই সংগে তাদের সাক্ষ দিতে হবে। কারণ যদি তারা একের পর এক আসে তাহলে তাদের প্রত্যেকে মিথ্যা অপবাদদাতা হয়ে যেতে থাকবে এবং তার জন্য আবার চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়ে পড়বে। কিন্তু এটি একটি দুর্বল কথা। ইমাম শাফেঈ ও উসমানুল বাত্তি এ ব্যাপারে যে

কথা বলেছেন সেটিই সঠিক। তারা বলেছেন, সাক্ষীদের একসংগে বা একের পর এক আসার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। বরং বেশী ভাল হয় যদি অন্যান্য মামলার মতো এ মামলায়ও সাক্ষীরা একের পর এক আসে এবং সাক্ষ দেয়। হানাফীয়াদের মতে এ সাক্ষীদের "আদেল" তথা ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া জরুরী নয়। যদি অপবাদদাতা চারজন ফাসেক সাক্ষীও আনে তাহলে সে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি থেকে রেহাই পাবে এবং অপবাদ আরোপিত ব্যক্তিও যিনার শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। কারণ সাক্ষী "আদেল" নয়। তবে কাফের, অন্ধ, গোলাম বা মিথ্যা অপবাদের অপরাধে পূর্বাহ্নে শাস্তিপ্রাপ্ত সাক্ষী পেশ করে অপবাদদাতা শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। কিন্তু ইমাম শাফেঈ বলেন, অপবাদদাতা যদি ফাসেক সাক্ষী পেশ করে, তাহলে সে এবং তার সাক্ষী সবাই শরীয়াতের শাস্তির যোগ্য হবে। ইমাম মালেকও একই রায় পেশ করেন। এ ব্যাপারে হানাফীয়াদের অভিমতই নির্ভুলতার বেশী নিকটবর্তী বলে মনে হয়। সাক্ষী যদি "আদেল" (ন্যায়নিষ্ঠ) হয় অপবাদদাতা অপবাদের অপরাধ মুক্ত হয়ে যাবে এবং অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যিনার অপরাধ প্রমাণিত হবে। কিন্তু সাক্ষী যদি "আদেল" না হয়, তাহলে অপবাদদাতার অপবাদ, অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির যিনা ও সাক্ষীদের সত্যবাদিতা ও মিথ্যাচার সবই সন্দেহযুক্ত হয়ে যাবে এবং সন্দেহের ভিত্তিতে কাউকেও শরীয়াতের শাস্তির উপযুক্ত গণ্য করা যেতে পারবে না।

নয় ঃ যে ব্যক্তি এমন সাক্ষ পেশ করতে সক্ষম হবে না, যা তাকে অপবাদের অপরাধ থেকে মুক্ত করতে পারে তার ব্যাপারে কুরআন তিনটি নির্দেশ দেয় ঃ এক, তাকে ৮০ ঘা বেত্রাঘাত করতে হবে। দুই, তার সাক্ষ কখনো গৃহীত হবে না। তিন, সে ফাসেক হিসেবে চিহ্নিত হবে। অতপর কুরআন বলছে ঃ

إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –

"তারা ছাড়া যারা এরপর তাওবা করে ও সংশোধন করে নেয়, কেননা, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (আন নূর–৫)

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয়, এখানে তাওবা ও সংশোধনের মাধ্যমে যে ক্ষমার কথা বলা হয়েছে তার সম্পর্ক ঐ তিনটি নির্দেশের মধ্য থেকে কোন্‌টির সাথে আছে? প্রথম হুকুমটির সাথে এর সম্পর্ক নেই, এ ব্যাপারে ফকীহগণ একমত। অর্থাৎ তাওবার মাধ্যমে 'হদ' তথা শরীয়াতের শাস্তি বাতিল হয়ে যাবে না এবং যে কোন অবস্থায়ই অপরাধীকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হবে। শেষ হুকুমটির সাথে ক্ষমার সম্পর্ক আছে, এ ব্যাপারেও সকল ফকীহ একমত। অর্থাৎ তাওবা করার ও সংশোধিত হবার পর অপরাধী ফাসেক থাকবে না। আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন। (এ ব্যাপারে অপরাধী শুধুমাত্র মিথ্যা অপবাদ দেবার কারণেই ফাসেক হয়, না আদালতের ফায়সালা ঘোষিত হবার পর ফাসেক হিসেবে গণ্য হয়, সে ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফেঈ ও লাইস ইবনে সা'দের মতে, মিথ্যা অপবাদ দেবার কারণেই ফাসেক হয়। এ কারণে তাঁরা সে সময় থেকেই তাকে প্রত্যাখ্যাত সাক্ষী গণ্য করেন। বিপরীতপক্ষে ইমাম আবু হানীফা, তাঁর সহযোগীগণ ও ইমাম মালেক বলেন, আদালতের ফায়সালা জারি হবার পর সে ফাসেক হয়। তাই তাঁরা হুকুম জারি হবার পূর্ব পর্যন্ত তাকে গ্রহণযোগ্য সাক্ষী মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য

হচ্ছে, অপরাধীর আল্লাহর কাছে ফাসেক হওয়ার ব্যাপারটি মিথ্যা অপবাদ দেবার ফল এবং তার মানুষের কাছে ফাসেক হওয়ার বিষয়টি আদালতে তার অপরাধ প্রমাণিত হওয়া এবং তার শাস্তি পাওয়ার ওপর নির্ভর করে।) এখন থেকে যায় মাঝখানের হুকুমটি অর্থাৎ "মিথ্যা অপবাদদাতার সাক্ষ কখনো গ্রহণ করা হবে না।" اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا বাক্যাংশটির সম্পর্ক এ হুকুমটির সাথে আছে কিনা এ ব্যাপারে ফকীহগণের অভিমত ব্যাপকভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে। একদল বলেন, কেবলমাত্র শেষ হুকুমটির সাথে এ বাক্যাংশটির সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাওবা ও সংশোধন করে নেবে সে আল্লাহর সমীপে এবং মানুষের কাছেও ফাসেক থাকবে না। কিন্তু এ সত্ত্বেও প্রথম দু'টি হুকুম অপরিবর্তিত থাকবে। অর্থাৎ অপরাধীর বিরুদ্ধে শরীয়াতের শাস্তি জারি করা হবে এবং তার সাক্ষও চিরকাল প্রত্যাখ্যাত থাকবে। এ দলে রয়েছেন কাযী শুরাইহ্, সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব, সাঈদ ইবনে জুবাইর, হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখঈ', ইবনে সিরীন, মাকহুল, আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ, আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, যুফার, মুহাম্মাদ, সুফ্ইয়ান সওরী ও হাসান ইবনে সালেহর মতো শীর্ষ স্থানীয় ফকীহগণ। দ্বিতীয় দলটি বলেন, اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا এর সম্পর্ক প্রথম হুকুমটির সাথে তো নেই–ই তবে শেষের দু'টো হুকুমের সাথে আছে। অর্থাৎ তাওবার পর মিথ্যা অপবাদে শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীর সাক্ষও গ্রহণ করা হবে এবং সে ফাসেক হিসেবেও গণ্য হবে না। এ দলে রয়েছেন আতা, তাউস, মুজাহিদ, শা'বী, কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ, সালেম, যুহরী, ইকরামাহ, উমর ইবনুল আযীয, ইবনে আবী নুজাইহ্, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার, মাসরূক, দ্বাহ্হাক, মালেক ইবনে আনাস, উসমান আলবাত্তী, লাইস ইবনে সা'দ, শাফেঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল ও ইবনে জারীর তাবারীর মতো শ্রেষ্ঠ ফকীহবৃন্দ। এরা নিজেদের মতের সমর্থনে অন্যান্য যুক্তি–প্রমাণের সাথে সাথে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুগীরাহ ইবনে শু'বার মামলায় যে ফায়সালা দিয়েছিলেন সেটিও পেশ করে থাকেন। কারণ তার কোন কোন বর্ণনায় একথা বলা হয়েছে যে, 'হদ' জারি করার পর হযরত উমর (রা) আবু বাক্‌রাহ ও তার দু' সাথীকে বলেন, যদি তোমরা তাওবা করে নাও (অথবা "নিজেদের মিথ্যাচারিতা স্বীকার করে নাও") তাহলে আমি আগামীতে তোমাদের সাক্ষ গ্রহণ করে নেবো অন্যথায় তা গ্রহণ করা হবে না। সাথী দু'জন স্বীকার করে নেয় কিন্তু আবু বাক্‌রাহ নিজের কথায় অনড় থাকেন। বাহ্যত এটি একটি বড় শক্তিশালী সমর্থন মনে হয়। কিন্তু মুগীরাহ ইবনে শু'বার মামলার যে বিস্তারিত বিবরণী আমি পূর্বেই পেশ করেছি সে সম্পর্কে চিন্তা করলে পরিষ্কার প্রকাশ হয়ে যাবে যে, এ নজিরের ভিত্তিতে এ বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করা ঠিক নয়। সেখানে মূল কাজটি ছিল সর্ববাদী সম্মত এবং স্বয়ং মুগীরাহ ইবনে শু'বাও এটি অস্বীকার করেননি। মেয়েটি কে ছিল, এ নিয়ে ছিল বিরোধ। মুগীরাহ (রা) বলছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁর স্ত্রী, যাকে এরা উম্মে জামীল মনে করেছিলেন। এ সংগে একথাও প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে, হযরত মুগীরার স্ত্রী ও উম্মে জামীলের চেহারায় এতটা সাদৃশ্য ছিল যে, ঘটনাটি যে পরিমাণ আলোয় যতটা দূর থেকে দেখা গেছে তাতে মেয়েটিকে উম্মে জামীল মনে করার মতো ভুল ধারণা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আন্দাজ–অনুমান সবকিছু ছিল মুগীরার পক্ষে এবং বাদীপক্ষের একজন সাক্ষীও একথা স্বীকার করেছিলেন যে, মেয়েটিকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না। এ কারণে হযরত উমর (রা) মুগীরাহ ইবনে শু'বার পক্ষে রায় দেন এবং ওপরে উল্লেখিত হাদীসে যে কথাগুলো উদ্ধৃত হয়েছে আবু বাক্‌রাহকে শাস্তি দেবার পর

সেগুলো বলেন। এসব অবস্থা পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার বুঝা যায়, হযরত ওমরের উদ্দেশ্য ছিল আসলে একথা বুঝানো যে, তোমরা অযথা একটা কুধারণা পোষণ করেছিলে, একথা মেনে নাও এবং ভবিষ্যতে আর কখনো এ ধরনের কুধারণার ভিত্তিতে লোকদের বিরুদ্ধে অপবাদ না দেবার ওয়াদা কর। অন্যথায় ভবিষ্যতে তোমাদের সাক্ষ কখনো গৃহীত হবে না। এ থেকে এ সিদ্ধান্ত টানা যেতে পারে না যে, সুস্পষ্ট মিথ্যাবাদী প্রমাণিত ব্যক্তিও যদি তাওবা করে তাহলে এরপর হযরত উমরের মতে তার সাক্ষ গ্রহণযোগ্য হতে পারতো। আসলে এ বিষয়ে প্রথম দলটির মতই বেশী শক্তিশালী মনে হয়। মানুষের তাওবার অবস্থা অবশ্যই আল্লাহ ছাড়া আর কারোর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আমাদের সামনে যে ব্যক্তি তাওবা করবে আমরা তাকে বড় জোর ফাসেক বলবো না। এতটুকু সুবিধা তাকে আমরা দিতে পারি। কিন্তু যার মুখের কথার ওপর আস্থা একবার খতম হয়ে গেছে সে কেবলমাত্র আমাদের সামনে তাওবা করছে বলে তার মুখের কথাকে আবার দাম দিতে থাকবো, এত বেশী সুবিধা তাকে দেয়া যেতে পারে না। এ ছাড়া কুরআনের আয়াতের বর্ণনাভংগীও একথাই বলছে- اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا (তবে যারা তাওবা করেছে) এর সম্পর্ক শুধুমাত্র اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ (তারাই ফাসেক) এর সাথেই রয়েছে। তাই এ বাক্যের মধ্যে প্রথম দু'টি কথা বলা হয়েছে কেবলমাত্র নির্দেশমূলক শব্দের মাধ্যমে। অর্থাৎ "তাদেরকে আশি ঘা বেত্রাঘাত করো।", "এবং তাদের সাক্ষ কখনো গ্রহণ করো না।" আর তৃতীয় কথাটি বলা হয়েছে খবর পরিবেশন করার ভংগীতে। অর্থাৎ "তারা নিজেরাই ফাসেক।" এ তৃতীয় কথাটির পরে সাথে সাথেই "তারা ছাড়া যারা তাওবা করে নিয়েছে" একথা বলা প্রকাশ করে দেয় যে, এ ব্যতিক্রমের ব্যাপারটি শেষের খবর পরিবেশন সংক্রান্ত বাক্যাংশটির সাথে সম্পর্কিত। পূর্বের দু'টি নির্দেশমূলক বাক্যাংশের সাথে এর সম্পর্ক নেই। তবুও যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, এ ব্যতিক্রমের ব্যাপারটি শেষ বাক্যাংশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, তাহলে এরপর বুঝে আসে না তা "সাক্ষগ্রহণ করো না" বাক্যাংশ পর্যন্ত এসে থেমে গেল কেন, "আশি ঘা বেত্রাঘাত করো" বাক্যাংশ পর্যন্ত পৌঁছে গেল না কেন?

দশ ঃ প্রশ্ন করা যেতে পারে, اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا এর মাধ্যমে ব্যতিক্রম করাটাকে প্রথম হুকুমটির সাথে সম্পর্কিত বলে মেনে নেয়া যায় না কেন? মিথ্যা অপবাদ তো আসলে এক ধরনের মানহানিই। এরপর এক ব্যক্তি নিজের দোষ মেনে নিয়েছে, অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে এবং ভবিষ্যতে আর এ ধরনের কাজ করবে না বলে তাওবা করেছে। তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে না কেন? অথচ আল্লাহ নিজেই হুকুম বর্ণনা করার পর বলছেন, اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا .... فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ আল্লাহ মাফ করে দেবেন কিন্তু বান্দা মাফ করবে না, এটাতো সত্যই বড় অদ্ভুত ব্যাপার হবে। এর জবাব হচ্ছে ঃ তাওবা আসলে ت - و - ب সমন্বিত চার অক্ষরের একটি শব্দ মাত্র নয়। বরং হৃদয়ের লজ্জানুভূতি, সংশোধনের দৃঢ়সংকল্প ও সততার দিকে ফিরে যাওয়ার নাম। আর এ জিনিসটির অবস্থা আর কারোর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তাই তাওবার কারণে পার্থিব শাস্তি মাফ হয় না। বরং শুধুমাত্র পরকালীন শাস্তি মাফ হয়। এ কারণে আল্লাহ বলেননি, যদি তারা তাওবা করে নেয় তাহলে তোমরা তাদেরকে ছেড়ে দাও বরং বলেছেন, যারা তাওবা করে নেবে আমি তাদের জন্য ক্ষমাশীল ও করুণাময়। যদি তাওবার সাহায্যে পার্থিব শাস্তি মাফ হয়ে যেতে থাকে, তাহলে শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তাওবা করবে না এমন অপরাধী কে আছে?

এগার ঃ এ প্রশ্নও করা যেতে পারে, এক ব্যক্তির নিজের অভিযোগের স্বপক্ষে সাক্ষী পেশ করতে না পারার মানে তো এ নয় যে, সে মিথ্যুক। এটা কি সম্ভব নয় যে, তার অভিযোগ যথার্থই সঠিক কিন্তু সে এর স্বপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেনি? তাহলে শুধুমাত্র প্রমাণ পেশ করতে না পারার কারণে তাকে কেবল মানুষের সামনেই নয়, আল্লাহর সামনেও ফাসেক গণ্য করা হবে, এর কারণ কি? এর জবাব হচ্ছে, এক ব্যক্তি নিজের চোখেও যদি কাউকে ব্যভিচার করতে দেখে তাহলেও সে তা নিয়ে আলোচনা করলে এবং সাক্ষী ছাড়া তার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করতে থাকলে গোনাহগার হবে। এক ব্যক্তি যদি কোন ময়লা আবর্জনা নিয়ে এক কোণে বসে থাকে তাহলে অন্য ব্যক্তি উঠে সমগ্র সমাজ দেহে তা ছড়িয়ে বেড়াক আল্লাহর শরীয়াত এটা চায় না। সে যদি এ ময়লা–আবর্জনার খবর জেনে থাকে তাহলে তার জন্য দু'টি পথ থাকে। যেখানে তা পড়ে আছে সেখানে তাকে পড়ে থাকতে দেবে অথবা তার উপস্থিতির প্রমাণ পেশ করবে, যাতে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকগণ তা পরিষ্কার করে ফেলতে পারেন। এ দু'টি পথ ছাড়া তৃতীয় কোন পথ তার জন্য নেই। যদি সে জনগণের মধ্যে এর আলোচনা শুরু করে দেয় তাহলে এক জায়গায় আটকে থাকা আবর্জনাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেবার অপরাধে অভিযুক্ত হবে। আর যদি সে যথেষ্ট পরিমাণ সাক্ষ ছাড়াই বিষয়টি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাছে নিয়ে যায় তাহলে শাসকগণ তা পরিষ্কার করতে পারবেন না। ফলে এ মামলায় ব্যর্থতা আবর্জনা ছড়িয়ে পড়ার কারণও হবে এবং ব্যভিচারীদের মনে তা সাহসের সঞ্চারও করবে। এ জন্য সাক্ষ–প্রমাণ ছাড়া মিথ্যা অভিযোগকারী বাস্তবে যতই সত্যবাদী হোক না কেন সে একজন ফাসেকই।

বার ঃ মিথ্যা অপবাদের 'হদে'র ব্যাপারে হানাফী ফকীহগণের অভিমত হচ্ছে, অপবাদদাতাকে যিনাকারীর তুলনায় হাল্কা মার মারতে হবে। অর্থাৎ ৮০ ঘা বেতই মারা হবে কিন্তু যিনাকারীকে যেমন কঠোরভাবে প্রহার করা হয় তাকে ঠিক ততটা কঠোরভাবে প্রহার করা হবে না। কারণ যে অভিযোগের দরুন তাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে সে ব্যাপারে তার মিথ্যাবাদী হওয়াটা পুরোপুরি নিশ্চিত নয়।

তের ঃ মিথ্যা অপবাদের পুনরাবৃত্তির ব্যাপারে হানাফী ও অধিকাংশ ফকীহের অভিমত হচ্ছে এই যে, অপবাদদাতা শাস্তি পাবার আগে বা মাঝখানে যতবারই এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করুক না কেন 'হদ' তার ওপর একবারই জারি হবে। আর যদি হদ জারি করার পর সে নিজের পূর্ববর্তী অপরাধেরই পুনরাবৃত্তি করতে থাকে তাহলে যে 'হদ' তার বিরুদ্ধে জারি করা হয়েছে তা–ই যথেষ্ট হবে। তবে যদি হদ জারি করার পর সে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে নতুন কোন যিনার অপবাদ দেয় তাহলে আবার নতুন করে মামলা দায়ের করা হবে। মুগীরাহ ইবনে শু'বার (রা) মামলায় শাস্তি পাবার পর আবু বাক্‌রাহ প্রকাশ্যে বলতে থাকেন, "আমি সাক্ষ দিচ্ছি, মুগীরাহ যিনা করেছিল।" হযরত উমর (রা) আবার তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার সংকল্প করেন। কিন্তু যেহেতু তিনি আগের অপবাদেরই পুনরাবৃত্তি করছিলেন, তাই হযরত আলী (রা) তার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মামলা চালানো যেতে পারে না বলে রায় দেন। হযরত উমর তাঁর রায় গ্রহণ করেন। এরপর ফকীহগণ ঐকমত্যে পৌঁছেন যে, শাস্তিপ্রাপ্ত মিথ্যা অপবাদদাতাকে কেবলমাত্র নতুন অপবাদেই পাকড়াও করা যেতে পারে, আগের অপবাদের পুনরাবৃত্তিতে নয়।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ
فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٦
وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٧ وَيَدْرَؤُا
عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٨
وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٩ وَلَوْلَا فَضْلُ
اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ۝١٠

আর যারা নিজেদের স্ত্রীদেরকে অভিযোগ দেয় এবং তাদের কাছে তারা নিজেরা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন সাক্ষী থাকে না, তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির সাক্ষ হচ্ছে (এই যে, সে) চার বার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে সাক্ষ দেবে যে, সে (নিজের অভিযোগে) সত্যবাদী এবং পঞ্চম বার বলবে, তার প্রতি আল্লাহর লা'নত হোক যদি সে (নিজের অভিযোগে) মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে। আর স্ত্রীর শাস্তি এভাবে রহিত হতে পারে যদি সে চার বার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে সাক্ষ দেয় যে, এ ব্যক্তি (তার অভিযোগে) মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলে, তার নিজের ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসুক যদি এ ব্যক্তি (তার অভিযোগে) সত্যবাদী হয়।[৭] তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ বড়ই মনোযোগ দানকারী ও জ্ঞানী না হলে (স্ত্রীদের প্রতি অভিযোগের ব্যাপার তোমাদেরকে বড়ই জটিলতার সম্মুখীন করতো)।

চৌদ্দ ঃ কোন দল বা গোষ্ঠীর ওপর মিথ্যা অপবাদের ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফীরা বলেন, যদি এক ব্যক্তি বহু লোকের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়, যদিও তা একটি শব্দে বা আলাদা আলাদা শব্দে হয়, তাহলেও তার ওপর একটি 'হদ' জারি করা হবে। তবে যদি 'হদ' জারির পর সে আবার কোন নতুন মিথ্যা অপবাদের অবতারণা করে তাহলে সে জন্য পৃথক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। কারণ আয়াতের শব্দের মধ্যে বলা হয়েছে ঃ "যারা সতী সাধ্বী মেয়েদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়।" এ থেকে জানা যায়, এক ব্যক্তির বিরুদ্ধেই নয়, একটি দলের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপকারীও শুধুমাত্র একটি 'হদের' হকদার হয়। এ ব্যাপারে আরো একটি যুক্তি এই যে, যিনার এমন কোন অপবাদই হতে পারে না যা কমপক্ষে দু'ব্যক্তির ওপর আরোপিত হয় না। কিন্তু এ সত্ত্বেও শরীয়াত প্রবর্তক একটি 'হদেরই হুকুম দিয়েছেন। নারীর বিরুদ্ধে অপবাদের জন্য আলাদা

এবং পুরুষের বিরুদ্ধে অপবাদের জন্য আলাদা 'হদ' জারি করার হুকুম দেননি। এর বিপরীতে ইমাম শাফেঈ বলেন, একটি দলের বিরুদ্ধে অপবাদ দানকারী, এক শব্দে বা আলাদা আলাদা শব্দে অপবাদ দান করুক না কেন, সে জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির বাবদ এক একটি পূর্ণ 'হদ' জারি করা হবে। উসমান আলবাত্তীও এ অভিমত প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে ইবনে আবীলাইলার উক্তি, শা'বী ও আওযাঈও যার সাথে অভিন্ন মত পোষণ করেন তা হচ্ছে এই যে, একটি বিবৃতির মাধ্যমে পুরো দলের বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ আরোপকারী একটি হদের হকদার হবে এবং আলাদা আলাদা বিবৃতির মাধ্যমে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ আরোপকারী প্রত্যেকটি অপবাদের জন্য আলাদা আলাদা হদের অধিকারী হবে।

৭. এ আয়াত পেছনের আয়াতের কিছুকাল পরে নাযিল হয়। মিথ্যা অপবাদের বিধান যখন নাযিল হয় তখন লোকদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দেয়, ভিন পুরুষ ও নারীর চরিত্রহীনতা দেখে তো মানুষ সবর করতে পারে, সাক্ষী না থাকলে ঠোঁটে তালা লাগাতে পারে এবং ঘটনাটি উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু নিজের স্ত্রীর চরিত্রহীনতা দেখলে কি করবে? হত্যা করলেতো উল্টো শাস্তিলাভের যোগ্য হয়ে যাবে। সাক্ষী খুঁজতে গেলে তাদের আসা পর্যন্ত অপরাধী সেখানে অপেক্ষা করতে যাবে কেন? আর সবর করলে তা করবেই বা কেমন করে। তালাক দিয়ে স্ত্রীকে বিদায় করে দিতে পারে। কিন্তু এর ফলে না মেয়েটির কোন বস্তুগত বা নৈতিক শাস্তি হলো, না তার প্রেমিকের। আর যদি তার অবৈধ গর্ভসঞ্চার হয়, তাহলে অন্যের সন্তান নিজের গলায় ঝুললো। এ প্রশ্নটি প্রথমে হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ একটি কাল্পনিক প্রশ্নের আকারে পেশ করেন। তিনি এতদূর বলে দেন, আমি যদি আল্লাহ না করুন নিজের ঘরে এ অবস্থা দেখি, তাহলে সাক্ষীর সন্ধানে যাবো না বরং তলোয়ারের মাধ্যমে তখনই এর হেস্তনেস্ত করে ফেলবো। (বুখারী ও মুসলিম) কিন্তু মাত্র কিছুদিন পরেই এমন কিছু মামলা দায়ের হলো যেখানে স্বামীরা স্বচক্ষেই এ ব্যাপার দেখলো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এর অভিযোগ নিয়ে গেলো। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও ইবনে উমরের রেওয়ায়াত অনুযায়ী আনসারদের এক ব্যক্তি (সম্ভবত উওয়াইমির আজ্‌লানী) রসূলের সামনে হাযির হয়ে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! যদি এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সাথে পরপুরুষকে পায় এবং সে মুখ থেকে সে কথা বের করে ফেলে, তাহলে আপনি তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের 'হদ' জারি করবেন, হত্যা করলে আপনি তাকে হত্যা করবেন, নীরব থাকলে সে চাপা ক্রোধে ফুঁসতে থাকবে। শেষমেশ সে করবে কি? একথায় রসূলুল্লাহ (সা) দোয়া করেন ঃ হে আল্লাহ! এ বিষয়টির ফায়সালা করে দাও। (মুসলিম, বুখারী, আবু দাউদ, আহমাদ ও নাসাঈ) ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, হেলাল ইবনে উমাইয়াহ এসে নিজের স্ত্রীর ব্যাপারটি পেশ করেন। তিনি তাকে নিজের চোখে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকতে দেখেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "প্রমাণ আনো, অন্যথায় তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি জারি হবে।" এতে সাহাবীদের মধ্যে সাধারণভাবে পেরেশানী সৃষ্টি হয়ে যায় এবং হেলাল বলেন, সেই আল্লাহর কসম যিনি আপনাকে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন, আমি একদম সঠিক ঘটনাই তুলে ধরছি, আমার চোখ এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে এবং কান শুনেছে। আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ আমার ব্যাপারে এমন হুকুম নাযিল করবেন যা আমার পিঠ বাঁচাবে। এ ঘটনায় এ আয়াত

নাযিল হয়। (বুখারী, আহমাদ ও আবু দাউদ) এখানে মীমাংসার যে পদ্ধতি দেয়া হয়েছে তাকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় "লি'আন" বলা হয়।

এ হুকুম এসে যাবার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব মামলার ফায়সালা দেন সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ হাদীসের কিতাবগুলোতে লিখিত আকারে সংরক্ষিত রয়েছে এবং সেগুলোই লি'আন সংক্রান্ত বিস্তারিত আইনগত কার্যধারার উৎস।

হেলাল ইবনে উমাইয়ার মামলার যে বিস্তারিত বিবরণ সিহাহে সিত্তা ও মুসনাদে আহমাদ এবং তাফসীরে ইবনে জারিরে ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে ঃ এ আয়াত নাযিল হবার পর হেলাল ও তার স্ত্রী দু'জনকে নবীর আদালতে হাযির করা হয়। রসূলুল্লাহ (সা) প্রথমে আল্লাহর হুকুম শুনান। তারপর বলেন, "খুব ভালভাবে বুঝে নাও, আখেরাতের শাস্তি দুনিয়ার শাস্তির চাইতে কঠিন।" হেলাল বলেন, "আমি এর বিরুদ্ধে একদম সত্য অভিযোগ দিয়েছি।" স্ত্রী বলে, "এ সম্পূর্ণ মিথ্যা।" রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "বেশ, তাহলে এদের দু'জনের মধ্যে লি'আন করানো হোক।" তদনুসারে প্রথমে হেলাল উঠে দাঁড়ান। তিনি কুরআনী নির্দেশ অনুযায়ী কসম খাওয়া শুরু করেন। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার বলতে থাকেন, "আল্লাহ জানেন তোমাদের মধ্যে অবশ্যই একজন মিথ্যেবাদী। তারপর কি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তাওবা করবে?" পঞ্চম কসমের পূর্বে উপস্থিত লোকেরা হেলালকে বললো, "আল্লাহকে ভয় করো। দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির চেয়ে হালকা। এ পঞ্চম কসম তোমার ওপর শাস্তি ওয়াজিব করে দেবে।" কিন্তু হেলাল বলেন, যে আল্লাহ এখানে আমার পিঠ বাঁচিয়েছেন তিনি পরকালেও আমাকে শাস্তি দেবেন না। একথা বলে তিনি পঞ্চম কসমও খান। তারপর তার স্ত্রী ওঠে। সেও কসম খেতে শুরু করে। পঞ্চম কসমের পূর্বে তাকেও থামিয়ে বলা হয়, "আল্লাহকে ভয় করো, আখেরাতের আযাবের তুলনায় দুনিয়ার আযাব বরদাশ্‌ত করে নেয়া সহজ। এ শেষ কসমটি তোমার ওপর আল্লাহর আযাব ওয়াজিব করে দেবে।" একথা শুনে সে কিছুক্ষণ থেমে যায় এবং ইতস্তত করতে থাকে। লোকেরা মনে করে নিজের অপরাধ স্বীকার করতে চাচ্ছে। কিন্তু তারপর সে বলতে থাকে, "আমি চিরকালের জন্য নিজের গোত্রকে লাঞ্ছিত করবো না।" তারপর সে পঞ্চম কসমটিও খায়। অতপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করে দেন এবং ফায়সালা দেন, এর সন্তান (যে তখন মাতৃগর্ভে ছিল) মায়ের সাথে সম্পর্কিত হবে। বাপের সাথে সম্পর্কিত করে তার নাম ডাকা হবে না। তার বা তার সন্তানের প্রতি অপবাদ দেবার অধিকার কারোর থাকবে না। যে ব্যক্তি তার বা তার সন্তানের প্রতি অপবাদ দেবে সে মিথ্যা অপবাদের (কাযাফ) শাস্তির অধিকারী হবে। ইদ্দতকালে তার খোরপোশ ও বাসস্থানলাভের কোন অধিকার হেলালের ওপর বর্তায় না। কারণ তাকে তালাক বা মৃত্যু ছাড়াই স্বামী থেকে আলাদা করা হচ্ছে। তারপর তিনি লোকদের বলেন, তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর দেখো সে কার মতো হয়েছে। যদি এ আকৃতির হয় তাহলে হেলালের হবে। আর যদি ঐ আকৃতির হয়, তাহলে যে ব্যক্তির সাথে মিলিয়ে একে অপবাদ দেয়া হয়েছে এ তার হবে। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর দেখা গেলো সে শেষোক্ত ব্যক্তির আকৃতি পেয়েছে। এ অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, لكان لى ولها شان (অথবা বর্ণনান্তরে لولا مضى من كتاب الله لو لا الايمان

অর্থাৎ যদি কসমসমূহ না হতো (অথবা আল্লাহর কিতাব প্রথমেই ফায়সালা না করে দিতো) তাহলে আমি এ মেয়েটির সাথে কঠোর ব্যবহার করতাম।

'উওয়াইমির আজলানীর মামলার বিবরণ পাওয়া যায় বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমাদে। সাহল ইবনে সা'দ সা'ঈদী ও ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে এগুলো বর্ণিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে ঃ উওয়াইমির ও তার স্ত্রী উভয়কে মসজিদে নববীতে ডাকা হয়। তারা নিজেদের ওপর 'লি'আন' করার আগে রসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকেও সতর্ক করে দিয়ে তিনবার বলেন, "আল্লাহ খুব ভালভাবেই জানেন তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তাহলে কি তোমাদের কেউ তাওবা করবে?" দু'জনের কেউ যখন তাওবা করলো না তখন তাদের 'লি'আন' করানো হয়। এরপর 'উওয়াইমির বলেন, "হে আল্লাহর রসূল! যদি আমি এ স্ত্রীকে রেখে দেই তাহলে মিথ্যুক হবো।" একথা বলেই রসূলুল্লাহ (সা) তাকে হুকুম দেয়া ছাড়াই তিনি তিন তালাক দিয়ে দেন। সাহ্‌ল ইবনে সা'দ বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) এ তালাক জারি করেন, তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করে দেন এবং বলেন, "যে দম্পতি লি'আন করবে তাদের জন্য এ ছাড়াছাড়ি।" লি'আনকারী স্বামী–স্ত্রীকে আলাদা করে দেবার এ সুন্নাত কায়েম হয়ে যায়। এরপর তারা আর কখনো একত্র হতে পারবে না। সাহ্‌ল ইবনে সা'দ একথাও বর্ণনা করেন যে, স্ত্রী গর্ভবতী ছিল এবং 'উওয়াইমির বলেন, এ গর্ভ আমার ঔরসজাত নয়। এ জন্য শিশুকে মায়ের সাথে সম্পর্কিত করা হয় এবং এ সুন্নাত জারি হয় যে, এ ধরনের সন্তান মায়ের উত্তরাধিকারী হবে এবং মা তার উত্তরাধিকারী হবে।

এ দু'টি মামলা ছাড়া হাদীসের কিতাবগুলোতে আমরা এমন বহু রেওয়ায়াত পাই যেগুলো থেকে এ মামলাগুলো কাদের সাথে জড়িত ছিল তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। হতে পারে সেগুলোর কোন কোনটি এ দু'টি মামলার সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু কয়েকটিতে অন্য কিছু মামলার কথা বলা হয়েছে এবং সেগুলো থেকে লি'আন আইনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত হয়।

ইবনে উমর একটি মামলার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, স্বামী–স্ত্রী লি'আন শেষ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করে দেন। (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আহমাদ ও ইবনে জারীর) ইবনে উমরের অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মধ্যে লি'আন করানো হয়। তারপর স্বামীটি গর্ভের সন্তান অস্বীকার করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করে দেন এবং ফায়সালা শুনিয়ে দেন, সন্তান হবে শুধুমাত্র মায়ের। (সিহাহে সিত্তা ও আহমাদ) ইবনে উমরেরই আর একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, উভয়ের লি'আন করার পরে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "তোমাদের হিসাব এখন আল্লাহর জিম্মায়। তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যুক।" তারপর তিনি পুরুষটিকে বলেন, لا سبيل لك عليها (অর্থাৎ এখন এ আর তোমার নয়। তুমি এর ওপর নিজের কোন অধিকার দেখাতে পারো না। এর ওপর কোনরকম হস্তক্ষেপও করতে পারো না। অথবা এর বিরুদ্ধে অন্য কোন প্রকার প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার অধিকারও আর তোমার নেই)। পুরুষটি বলে, হে আল্লাহর রসূল! আর আমার সম্পদ? (অর্থাৎ যে মোহরানা আমি তাকে দিয়েছিলাম তা আমাকে ফেরত দেবার ব্যবস্থা করুন)। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

لَا مَالَ لَكَ اِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَاِنْ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ اَبْعَدُ وَاَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا -

"সম্পদ ফেরত নেবার কোন অধিকার তোমার নেই। যদি তুমি তার ওপর সত্য অপবাদ দিয়ে থাকো তাহলে ঐ সম্পদ সে আনন্দ উপভোগের প্রতিদান যা তুমি হালাল করে তার থেকে লাভ করেছো। আর যদি তুমি তার ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকো তাহলে সম্পদ তোমার কাছ থেকে আরো অনেক দূরে চলে গেছে। তার তুলনায় তোমার কাছ থেকে তা বেশী দূরে রয়েছে।" (বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ)।

দারুকুত্নী আলী ইবনে আবু তালেব ও ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমার উক্তি উদ্ধৃত করেছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ "সুন্নাত এটিই নির্ধারিত হয়েছে যে, লি'আনকারী স্বামী–স্ত্রী পরবর্তী পর্যায়ে আর কখনো একত্র হতে পারে না।" (অর্থাৎ দ্বিতীয়বার আর কোনদিন তাদের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না)। আবার এ দারুকুত্নী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এরা দু'জন আর কখনো একত্র হতে পারে না।

কাবীসাহ ইবনে যুওয়াইব বর্ণনা করেছেন, হযরত উমরের আমলে এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর গর্ভের সন্তানকে অবৈধ গণ্য করে তারপর আবার তা নিজের বলে স্বীকার করে নেয়। তারপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর বলতে থাকে, এ শিশু আমার নয়। ব্যাপারটি হযরত উমরের আদালতে পেশ হয়। তিনি তার ওপর কাযাফের শাস্তি জারি করেন এবং ফায়সালা দেন, শিশু তার সাথেই সম্পর্কিত হবে। (দারুকুত্নী, বাইহাকী)।

ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি হাযির হয়ে বলে, আমার একটি স্ত্রী আছে, আমি তাকে ভীষণ ভালবাসি। কিন্তু তার অবস্থা হচ্ছে এই যে, সে কোন স্পর্শকারীর হাত ঠেলে দেয় না। (উল্লেখ্য, এটি একটি রূপক ছিল। এর অর্থ যিনাও হতে পারে আবার যিনার কম পর্যায়ের নৈতিক দুর্বলতাও হতে পারে।) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তালাক দিয়ে দাও। সে বলে, আমি তাকে ছাড়া থাকতে পারি না। জবাব দেন, তুমি তাকে রেখে দাও। (অর্থাৎ তিনি তার কাছ থেকে তার ইংগিতের ব্যাখ্যা নেননি এবং তার উক্তিকে যিনার অপবাদ হিসেবে গণ্য করে লি'আন করার হুকুম দেননি।)–নাসাঈ।

আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, এক ব্যক্তি হাযির হয়ে বলে, আমার স্ত্রী কালো ছেলে জন্ম দিয়েছে। আমি তাকে আমার সন্তান বলে মনে করি না। (অর্থাৎ নিছক শিশু সন্তানের গায়ের রং তাকে সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। নয়তো তার দৃষ্টিতে স্ত্রীর ওপর যিনার অপবাদ লাগাবার অন্য কোন কারণ ছিল না।) রসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেন, তোমার তো কিছু উট আছে? সে বলে, হাঁ, আছে। জিজ্ঞেস করেন, সেগুলোর রং কি? জবাব দেয়, লাল। জিজ্ঞেস করেন, তাদের মধ্যে কোনটা কি খাকি রংয়ের আছে? জবাব দেয়, জি হাঁ, কোন কোনটা এমনও আছে। জিজ্ঞেস করেন, এ রংটি কোথায় থেকে এলো? জবাব দেয়, হয়তো কোন শিরা টেনে নিয়ে গেছে। (অর্থাৎ তাদের বাপ–দাদাদের কেউ এ রংয়ের থেকে থাকবে এবং তার প্রভাব এর মধ্যে এসে গেছে।) তিনি বলেন, "সম্ভবত এ শিশুটিকেও কোন শিরা টেনে নিয়ে গেছে।" তারপর তিনি তাকে সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করার অনুমতি দেননি। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ ও আবু দাউদ।)

আবু হুরাইরার (রা) অন্য একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লি'আন সম্পর্কিত আয়াত আলোচনা প্রসংগে বলেন, "যে স্ত্রী কোন বংশে এমন সন্তান প্রবেশ করায় যে ঐ বংশের নয় (অর্থাৎ হারামের শিশু গর্ভে ধারণ করে স্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়) তার আল্লাহর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তাকে কখ্খনো জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে পুরুষ নিজের সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করে অথচ সন্তান তাকে দেখছে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে পরদা করবেন এবং পূর্বের ও পরের সমস্ত সৃষ্টির সামনে তাকে লাঞ্ছিত করবেন। (আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী।)

লি'আনের আয়াত এবং এ হাদীসগুলো, নজিরসমূহ ও শরীয়াতের সাধারণ মূলনীতি-গুলোই হচ্ছে ইসলামে লি'আনের আইনের উৎস। এগুলোর আলোকে ফকীহগণ লি'আনের বিস্তারিত আইন-কানুন তৈরী করেছেন। এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো হচ্ছে ঃ

এক ঃ যে ব্যক্তি স্ত্রীর ব্যভিচার স্বচক্ষে দেখে লি'আনের পথ অবলম্বন না করে হত্যা করে বসে তার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। একটি দল বলে, তাকে হত্যা করা হবে। কারণ নিজের উদ্যোগে 'হদ' জারি করার তথা আইন হাতে তুলে নেয়ার অধিকার তার ছিল না। দ্বিতীয় দল বলে, তাকে হত্যা করা হবে না এবং তার কর্মের জন্য তাকে জবাবদিহিও করতে হবে না, তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে তার দাবীর সত্যতা প্রমাণিত হতে হবে (অর্থাৎ যথার্থই সে তার যিনার কারণে এ কাজ করেছে)। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াইহ্ বলেন, এটিই হত্যার কারণ এ মর্মে তাকে দু'জন সাক্ষী আনতে হবে। মালেকীদের মধ্যে ইবনুল কাসেম ও ইবনে হাবীব এ মর্মে অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করেন যে, যাকে হত্যা করা হয়েছে সেই যিনাকারীর বিবাহিত হতে হবে। অন্যথায় কুমার যিনাকারীকে হত্যা করলে তার কাছ থেকে কিসাস নেয়া হবে। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহের মতে তাকে কিসাস থেকে শুধুমাত্র তখনই মাফ করা হবে যখন সে যিনার চারজন সাক্ষী পেশ করবে অথবা নিহত ব্যক্তি মরার আগে নিজ মুখে একথা স্বীকার করে যাবে যে, সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করছিল এবং এ সংগে নিহত ব্যক্তিকে বিবাহিতও হতে হবে। (নাইলুল আওতার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা)।

দুই ঃ ঘরে বসে লি'আন হতে পারে না। এ জন্য আদালতে যাওয়া জরুরী।

তিন ঃ লি'আন দাবী করার অধিকার শুধু স্বামীর নয়, স্ত্রীরও। স্বামী যখন তার ওপর যিনার অপবাদ দেয় অথবা তার শিশুর বংশধারা মেনে নিতে অস্বীকার করে তখন স্ত্রী আদালতে গিয়ে লি'আন দাবী করতে পারে।

চার ঃ সব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি লি'আন হতে পারে অথবা এ জন্য তাদের দু'জনের মধ্যে কিছু শর্ত পাওয়া যেতে হবে? এ বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ইমাম শাফেঈ বলেন, যার কসম আইনের দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্য এবং যার তালাক দেবার ক্ষমতা আছে সে লি'আন করতে পারে। অর্থাৎ তার মতে শুধুমাত্র মানসিকভাবে সুস্থ ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়াই লি'আনের যোগ্যতা সম্পন্ন হবার জন্য যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী মুসলিম বা কাফের, গোলাম বা স্বাধীন, গ্রহণযোগ্য সাক্ষের অধিকারী হোক বা না হোক এবং মুসলিম স্বামীর স্ত্রী মুসলমান বা যিম্মী যেই হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। প্রায় একই ধরনের অভিমত ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদেরও। কিন্তু হানাফীগণ

বলেন, লি'আন তখনই এমন স্বাধীন মুসলমান স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হতে পারে যারা কযাযের অপরাধে শাস্তি পায়নি। যদি স্বামী ও স্ত্রী দুজনই কাফের, কিংবা যদি কযাযের অপরাধে পূর্বেই শাস্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে লি'আন হতে পারে না। এ ছাড়াও যদি স্ত্রী এর আগেও কয়েকটি হারাম বা সন্দেহযুক্ত পদ্ধতিতে কোন পুরুষের সাথে মাখামাখি করে থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রেও লি'আন ঠিক হবে না। হানাফীদের এ দৃষ্টিভংগী খণ্ডন করার কারণ হচ্ছে এই যে, তাদের মতে লি'আন ও কযাযের অবস্থার মধ্যে এ ছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই যে, অন্য ব্যক্তি যদি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয় তাহলে তার দণ্ড হয়ে যায় 'হদ' আর স্বামী এ অপবাদ দিলে সে লি'আন করে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। বাকি অন্যান্য সব দিক দিয়ে লি'আন ও কযাযে একই জিনিস। এ ছাড়াও হানাফীদের মতে যেহেতু লি'আনের কসম সাক্ষ্য দেবার মর্যাদা রাখে, তাই সাক্ষ্য দেবার যোগ্যতা নেই এমন কোন ব্যক্তিকে তারা এর অনুমতি দেয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে হানাফীদের অভিমত দুর্বল এবং ইমাম শাফেয়ী যে কথাটি বলেছেন সেটিই সঠিক। এর প্রথম কারণ হচ্ছে, কুরআন স্ত্রীর বিরুদ্ধে কযাযের ব্যাপারটিকে কযাযের অন্যান্য একটি অংগে পরিণত করেনি বরং সে জন্য একটি স্বতন্ত্র বিধান বর্ণনা করেছে। তাই তাকে কযাযের বিধানের অন্তর্ভুক্ত এনে কযাযের জন্য যেসব শর্ত নির্ধারিত হয়েছে সেগুলো সবই তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে না। লি'আনের আয়াতের শব্দাবলী কযাযের আয়াতের শব্দাবলী থেকে আলাদা এবং উভয় হুকুমও ভিন্ন। তাই লি'আনের আয়াত থেকেই লি'আনের বিধান গ্রহণ করা উচিত, কযাযের আয়াত থেকে নয়। যেমন কযাযের আয়াতে শাস্তি লাভের যোগ্য হবে এমন লোক যে সতী সাধ্বী নারীর ওপর মিথ্যা অপবাদ দেবে কিন্তু লি'আনের আয়াতে সতী সাধ্বী স্ত্রীর ওপর আরোপ করা হয়নি একটি মেয়ে কোন সময় হয়তো পাপ কাজ করেছিল, যদি পরবর্তীকালে সে ভালভাবে কোন পুরুষকে বিয়ে করে এবং তারপর তার স্বামী তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়, তাহলে লি'আনের আয়াত একথা বলে না যে, এ মেয়ের স্বামীকে এর বিরুদ্ধে অপবাদ দেবার বা এর সন্তানের বংশধারা সংক্রান্ত করার ব্যাপক অনুমতি দিয়ে দাও, কারণ এ জীবন এক সময় কলুষিত ছিল। দ্বিতীয়ত এবং ঠিক একই পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে এই যে, স্ত্রীর বিরুদ্ধে কযাযে ও অপবিত্রতার বিরুদ্ধে কযাযের মধ্যে এতখানি মৌলিক পার্থক্য আছে এদের উভয়ের ব্যাপারে আইনের প্রকৃতি এক হতে পারে না। পুরুষের সাথে অন্য পুরুষের প্রেম-অনুভূতি, হৃদ্যতা-আন্তরিকতা, সমাজ-সংস্কৃতি ও বংশ-পৌরোহিত কোন সম্পর্ক হতে পারে না। তার চাল-চলনের ব্যাপারে যদি কোন ব্যক্তির খুব বেশী সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে তাহলে তা হবে তার সমাজকে চরিত্রহীনতা মুক্ত দেখার আবেগ থেকে পক্ষান্তরে নিজের স্ত্রীর সাথে মানুষের সম্পর্ক এক ধরনের নয়, কয়েক ধরনের এবং অত্যন্ত গভীর। সে একাধারে তার বংশধারা, ধন-সম্পদ ও গৃহের আমানতদার, তার জীবন সঙ্গিনী, তার গোপনীয়তার সংরক্ষক, তার অত্যন্ত গভীর ও সংবেদনশীল আবেগ-অনুভূতি তার সাথে জড়িত, তার ব্যাপক চাল-চলনে মানুষের আত্মমর্যাদা, ইজ্জত, স্বার্থ ও ভবিষ্যত বংশধরদের ওপর সুদূরপ্রসারী আঘাত আসে। এ দুটি ব্যাপার কোন্ দিক দিয়ে এক, যার ফলে উভয়ের জন্য আইনের একই প্রকৃতি হতে হবে? একজন স্ত্রী, অথবা গোলাম কিংবা সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য তার স্ত্রীর ব্যাপার কি কোন স্বাধীন সাবালকের যোগ্য মুসলমানের ব্যাপার থেকে সামান্যতম ভিন্ন অথবা গুরুত্ব ও মর্যাদার

দিক দিয়ে একটুখানিও কম? সে যদি নিজের চোখে নিজের স্ত্রীকে কারোর সাথে ঢলাঢলি করতে দেখতো অথবা সে যদি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতো যে, তার স্ত্রী অন্য কারোর সংস্পর্শে গর্ভবতী হয়ে গেছে, তাহলে তাকে লি'আন করার অধিকার না দেবার কোন যুক্তিসংগত কারণ আছে কি? আর এ অধিকার তার থেকে ছিনিয়ে নেবার পর আমাদের আইনে তার জন্য আর কি পথ আছে? কুরআন মজীদের উদ্দেশ্য তো পরিষ্কার জানা যায়। বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যে স্ত্রীর যথার্থ ব্যভিচার বা অবৈধ গর্ভধারণের ফলে একজন স্বামী এবং স্বামীর মিথ্যা অপবাদ বা সন্তানের বংশ অযথা অস্বীকারের ফলে একজন স্ত্রী যে জটিল সমস্যায় ভুগতে থাকে কুরআন তাদেরকে তা থেকে উদ্ধার করার জন্য একটি উপায় বের করতে চায়। এ প্রয়োজন শুধুমাত্র সাক্ষদানের যোগ্য স্বাধীন মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট নয় এবং কুরআনের শব্দাবলীর মধ্যেও এমন কোন জিনিস নেই যা এ প্রয়োজনটি শুধুমাত্র তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। তবে কুরআন লি'আনের কসমকে সাক্ষদান হিসেবে গণ্য করেছে তাই সাক্ষদানের শর্তাবলী এখানে আরোপিত হবে, এ যুক্তি পেশ করলে এর দাবী হবে, ন্যায়নিষ্ঠ গ্রহণযোগ্য সাক্ষের অধিকারী স্বামী যদি কসম খায় এবং স্ত্রী কসম খেতে ইতস্তত করে তাহলে স্ত্রীকে রজম করা হবে। কারণ ব্যভিচারের ওপর সাক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কিন্তু বিস্ময়কর হচ্ছে, এ অবস্থায় হানাফীগণ রজম করার হুকুম দেন না। তারা নিজেরাই যে এ কসমগুলোকে হুবহু সাক্ষের মর্যাদা দান করেন না এটা তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ। বরং সত্য বলতে কি স্বয়ং কুরআনও এ কসমগুলোকে সাক্ষ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করলেও এগুলোকে সাক্ষ গণ্য করে না। নয়তো স্ত্রীকে চারটি কসমের পরিবর্তে আটটি কসম খাবার হুকুম দিতো।

পাঁচ ঃ নিছক ইশারা-ইংগিত, রূপক, উপমা বা সন্দেহ-সংশয় প্রকাশের ফলে লি'আন অনবার্য হয়ে পড়ে না। বরং কেবলমাত্র এমন অবস্থায় তা অনিবার্য হয় যখন স্বামী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যিনার অপবাদ দেয় অথবা সুস্পষ্ট ভাষায় সন্তানকে নিজের বলে মেনে নিতে অস্বীকার করে। ইমাম মালেক ও লাইস ইবনে সা'দ এর ওপর আরো এ শর্তটি বাড়ান যে, কসম খাবার সময় স্বামীকে বলতে হবে, সে নিজের চোখে স্ত্রীকে ব্যভিচারে রত থাকতে দেখেছে। কিন্তু এটি একটি ভিত্তিহীন শর্ত। কুরআনে এর কোন ভিত্তি নেই, হাদীসেও নেই।

ছয় ঃ যদি অপবাদ দেবার পর স্বামী কসম খেতে ইতস্তত করে বা ছলনার আশ্রয় নেয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সহযোগীগণ বলেন, তাকে বন্দী করতে হবে এবং যতক্ষণ সে লি'আন না করে অথবা নিজের অপবাদকে মিথ্যা বলে না মেনে নেয় ততক্ষণ তাকে মুক্তি দেয়া হবে না। আর মিথ্যা বলে মেনে নিলে তার বিরুদ্ধে কাযাফের দণ্ড জারি হয়ে যাবে। এর বিপরীতপক্ষে ইমাম মালেক, শাফেঈ, হাসান ইবনে সালেহ ও লাইস ইবনে সা'দের মতে, লি'আন করতে ইতস্তত করার ব্যাপারটি নিজেই মিথ্যার স্বীকারোক্তি। তাই কাযাফের হদ্ ওয়াজিব হয়ে যায়।

সাত ঃ স্বামীর কসম খাওয়ার পর স্ত্রী যদি লি'আন করতে ইতস্তত করে, তাহলে হানাফীদের মতে তাকে বন্দী করতে হবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মুক্তি দেয়া যাবে না যতক্ষণ না সে লি'আন করবে অথবা তারপর যিনার স্বীকারোক্তি না করে নেবে। অন্যদিকে উপরোক্ত ইমামগণ বলেন, এ অবস্থায় তাকে রজম করে দেয়া হবে। তারা কুরআনের ঐ

উক্তি থেকে যুক্তি পেশ করেন যে, একমাত্র কসম খাওয়ার পরই স্ত্রী শাস্তি মুক্ত হবে। এখন যেহেতু সে কসম খাচ্ছে না, তাই নিশ্চিতভাবেই সে শাস্তির যোগ্য হবে। কিন্তু এ যুক্তির দুর্বলতা হচ্ছে, কুরআন এখানে 'শাস্তির' ধরন বলে দেয়নি বরং সাধারণভাবে শাস্তির কথা বলছে। যদি বলা হয়, শাস্তি মানে এখানে যিনার শাস্তিই হতে পারে, তাহলে এর জবাব হচ্ছে, যিনার শাস্তির জন্য কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় চার জন সাক্ষীর শর্ত আরোপ করেছে। নিছক এক জনের চারটি কসম এ শর্ত পূরা করতে পারে না। স্বামীর কসম তো তার নিজের কাযাফের শাস্তি থেকে বেঁচে যাওয়া এবং স্ত্রীর ওপর লি'আনের বিধান প্রবর্তিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট কিন্তু তার মাধ্যমে স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ প্রমাণিত হবার জন্য যথেষ্ট নয়। স্ত্রীর জবাবী কসম খেতে অস্বীকার করার ফলে অবশ্যই সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয় এবং বড়ই গভীর সন্দেহ সৃষ্টি করে সত্য কিন্তু সন্দেহের ভিত্তিতে হদ্ জারি করা যেতে পারে না। এ বিষয়টিকে পুরুষের কাযাফের হদের সাথে তুলনা করা উচিত নয়। কারণ তার কাযাফ তো প্রমাণিত, এ কারণেই তাকে লি'আন করতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু এর বিপরীতে স্ত্রীর ওপর যিনার অপবাদ প্রমাণিত নয়। কারণ তার নিজের স্বীকারোক্তি অথবা চারজন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষকারী সাক্ষীর সাক্ষ ছাড়া তা প্রমাণিত হতে পারে না।

আট ঃ যদি লি'আনের সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকে তাহলে ইমাম আহমাদের মতে স্বামী গর্ভস্থিত সন্তানকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করুক বা না করুক স্বামীর গর্ভস্থিত সন্তানের দায়মুক্ত হবার এবং সন্তান তার ঔরসজাত গণ্য না হবার জন্য লি'আন নিজেই যথেষ্ট। ইমাম শাফেঈ বলেন, স্বামীর যিনার অপবাদ ও গর্ভস্থিত সন্তানের দায়িত্ব অস্বীকার করা এক জিনিস নয়। এ জন্য স্বামী যতক্ষণ গর্ভস্থিত সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার না করবে ততক্ষণ তা যিনার অপবাদ সত্ত্বেও তার ঔরসজাত গণ্য হবে। কারণ স্ত্রী যিনাকারিনী হওয়ার ফলেই বর্তমান গর্ভজাত সন্তানটি যে, যিনার কারণে জন্ম নিয়েছে, এটা অপরিহার্য নয়।

নয় ঃ ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ স্ত্রীর গর্ভধারণকালে স্বামীকে গর্ভস্থিত সন্তান অস্বীকার করার অনুমতি দিয়েছেন এবং এরি ভিত্তিতে লি'আনকে বৈধ বলেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা বলেন, যদি স্বামীর অপবাদের ভিত্তি যিনা না হয়ে থাকে বরং শুধু এটাই হয়ে থাকে যে, সে স্ত্রীকে এমন অবস্থায় গর্ভবতী পেয়েছে যখন তার মতে এ গর্ভস্থিত সন্তান তার হতে পারে না তখন এ অবস্থায় লি'আনের বিষয়টিকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত মূলতবী করে দেয়া উচিত। কারণ অনেক সময় কোন কোন রোগের ফলে গর্ভ সঞ্চার হয়েছে বলে সন্দেহ দেখা দেয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গর্ভসঞ্চার হয় না।

দশ ঃ যদি পিতা সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করে তাহলে লি'আন অনিবার্য হয়ে পড়ে, এ ব্যাপারে সবাই একমত। আবার এ ব্যাপারেও সবাই একমত যে, একবার সন্তানকে গ্রহণ করে নেবার পর (সে গ্রহণ করাটা যে কোন পর্যায়েরই হোক না কেন, সুস্পষ্ট শব্দাবলী ও বাক্যের মাধ্যমে গ্রহণ করা হোক অথবা এমন কাজ করা হোক যাতে মনে হয় শিশুকে গ্রহণ করে নেয়া হয়েছে যেমন, জন্মের পর মোবারকবাদ গ্রহণ করা অথবা শিশুর সাথে পিতৃসুলভ স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করা কিংবা তার প্রতিপালনের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করা) পিতার পক্ষে আর তার বংশধারা অস্বীকার করার অধিকার থাকে না। এ অবস্থায় পিতা বংশধারা অস্বীকার করলে কাযাফের শাস্তির অধিকারী হবে। তবে পিতা

কতক্ষণ পর্যন্ত বংশধারা অস্বীকার করার অধিকার রাখে, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম মালেকের মতে, স্ত্রী যে সময় গর্ভবতী ছিল সে সময় যদি স্বামী গৃহে উপস্থিত থেকে থাকে তাহলে গর্ভসঞ্চারের সময় থেকে নিয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত সময়–কালের মধ্যে স্বামীর জন্য সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করার সুযোগ আছে। এরপর তার অস্বীকার করার অধিকার নেই। তবে এ সময় যদি সে অনুপস্থিত থেকে থাকে এবং তার অসাক্ষাতে সন্তান জন্ম নিয়ে থাকে তাহলে যখনই সে জানবে তখন তাকে অস্বীকার করতে পারে। ইমাম আবু হানীফার মতে, যদি জন্মের এক–দু'দিনের মধ্যে সে অস্বীকার করে তাহলে লি'আন করে সন্তানের দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি এক–দু'বছর পরে অস্বীকার করে তাহলে লি'আন হবে ঠিকই কিন্তু সন্তানের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারবে না। ইমাম আবু ইউসুফের মতে, শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পরে বা জন্ম সম্পর্কে জানার পরে চল্লিশ দিনের মধ্যে পিতার বংশধারা অস্বীকার করার অধিকার আছে। এরপর এ অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু এ চল্লিশ দিনের শর্ত অর্থহীন। সঠিক কথা সেটিই যেটি ইমাম আবু হানীফা বলেছেন। অর্থাৎ জন্মের পর বা জন্মের কথা জানার পর এক–দু'দিনের মধ্যেই বংশধারা অস্বীকার করা যেতে পারে। তবে যদি এ ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকে, যাকে যথার্থ বাধা বলে স্বীকার করে নেয়া যেতে পারে, তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা।

এগার ঃ যদি স্বামী তালাক দেবার পর সাধারণভাবে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ দেয় তাহলে ইমাম আবু হানীফার মতে লি'আন হবে না। বরং তার বিরুদ্ধে কাযাফের মামলা দায়ের করা হবে। কারণ লি'আন হচ্ছে স্বামী–স্ত্রীর জন্য। আর তালাকপ্রাপ্তা নারীটি তার স্ত্রী নয়। তবে যদি রজ'ঈ তালাক হয় এবং রুজু (স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবার) করার সময়–কালের মধ্যে সে অপবাদ দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু ইমাম মালেকের মতে, এটি শুধুমাত্র এমন অবস্থায় কাযাফ হবে যখন কোন গর্ভস্থিত বা ভূমিষ্ঠ সন্তানের বংশধারা গ্রহণ করা বা না করার সমস্যা মাঝখানে থাকবে না। অন্যথায় বায়েন তালাক দেবার পরও পুরুষের লি'আন করার অধিকার থাকে। কারণ সে স্ত্রী লোককে বদনাম করার জন্য নয় বরং নিজেই এমন এক শিশুর দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে লি'আন করছে যাকে সে নিজের বলে মনে করে না। ইমাম শাফেঈও প্রায় এই একই মত দিয়েছেন।

বার ঃ লি'আনের আইনগত ফলাফলের মধ্য থেকে কোনটার ব্যাপারে সবাই একমত আবার কোনটার ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে।

যেসব ফলাফলের ব্যাপারে মতৈক্য হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ঃ স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই কোন শাস্তি লাভের উপযুক্ত হয় না। স্বামী যদি সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করে তাহলে সন্তান হবে একমাত্র মায়ের। সন্তান বাপের সাথে সম্পর্কিত হবে না এবং তার উত্তরাধিকারীও হবে না। মা তার উত্তরাধিকারী হবে এবং সে মায়ের উত্তরাধিকারী হবে। নারীকে ব্যভিচারিনী এবং তার সন্তানকে জারজ সন্তান বলার অধিকার কারোর থাকবে না। যদিও লি'আনের সময় তার অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যার ফলে তার ব্যভিচারিনী হবার ব্যাপারে কারোর মনে সন্দেহ না থাকে তবুও তাকে ও তার সন্তানকে একথা বলার অধিকার থাকবে না। যে ব্যক্তি লি'আনের পরে তার অথবা তার সন্তানের বিরুদ্ধে আগের অপবাদের পুনরাবৃত্তি করবে সে 'হদে'র যোগ্য হবে। নারীর মোহরানা বাতিল হয়ে যাবে না। ইদ্দত পালনকালে নারী পুরুষের থেকে খোরপোশ ও বাসস্থানের সুবিধা লাভের হকদার হবে না। নারী ঐ পুরুষের জন্য হারাম হয়ে যাবে।

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ
بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي
تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ
الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾

২ রুকূ'

যারা এ মিথ্যা অপবাদ তৈরী করে এনেছে[৮] তারা তোমাদেরই ভিতরের একটি অংশ।[৯] এ ঘটনাকে নিজেদের পক্ষে খারাপ মনে করো না বরং এও তোমাদের জন্য ভালই।[১০] যে এর মধ্যে যতটা অংশ নিয়েছে সে ততটাই গোনাহ কামাই করেছে আর যে ব্যক্তি এর দায়দায়িত্বের বড় অংশ নিজের মাথায় নিয়েছে[১১] তার জন্য তো রয়েছে মহাশাস্তি। যখন তোমরা এটা শুনেছিলে তখনই কেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা নিজেদের সম্পর্কে সুধারণা করেনি[১২] এবং কেন বলে দাওনি এটা সুস্পষ্ট মিথ্যা দোষারোপ?[১৩]

দু'টি বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এক, লি'আনের পরে পুরুষ ও নারী কিভাবে আলাদা হবে? দুই, লি'আনের ভিত্তিতে আলাদা হয়ে যাবার পর কি তাদের উভয়ের আবার মিলিত হওয়া সম্ভব? প্রথম বিষয়ে ইমাম শাফেঈ বলেন, যখনই পুরুষ লি'আন শেষ করবে, নারী জবাবী লিআন করুক বা না করুক তখনই সংগে সংগেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। ইমাম মালেক, লাইস ইবনে সা'দ ও যুফার বলেন, পুরুষ ও নারী উভয়েই যখন লি'আন শেষ করে তখন ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। অন্যদিকে ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ বলেন, লি'আনের ফলে ছাড়াছাড়ি আপনা আপনি হয়ে যায় না বরং আদালত ছাড়াছাড়ি করে দেবার ফলেই ছাড়াছাড়ি হয়। যদি স্বামী নিজেই তালাক দিয়ে দেয় তাহলে ভালো, অন্যথায় আদালতের বিচারপতি তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করার কথা ঘোষণা করবেন। দ্বিতীয় বিষয়টিতে ইমাম মালেক, আবু ইউসুফ, যুফার, সুফিয়ান সওরী, ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াইহ্, শাফেঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল ও হাসান ইবনে যিয়াদ বলেন, লি'আনের মাধ্যমে যে স্বামী-স্ত্রী আলাদা হয়ে গেছে তারা এরপর থেকে চিরকালের জন্য পরস্পরের ওপর হারাম হয়ে যাবে। তারা পুনর্বার পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলেও কোন অবস্থাতেই পারবে না। হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদও (রা) এ একই মত পোষণ করেন। বিপরীত পক্ষে সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়েব, ইবরাহীম নাখঈ, শা'বী, সাঈদ ইবনে জুবাইর, আবু হানীফা ও মুহাম্মাদ রাহেমাহুমুল্লাহর মতে, যদি স্বামী নিজের মিথ্যা স্বীকার করে নেয় এবং তার ওপর কাযাফের হদ জারি হয়ে যায় তাহলে তাদের দু'জনের মধ্যে পুনরবার বিয়ে হতে পারে।

তারা বলেন, তাদের উভয়কে পরস্পরের জন্য হারামকারী জিনিস হচ্ছে লি'আন। যতক্ষণ তারা এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততক্ষণ হারামও প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিন্তু যখনই স্বামী নিজের মিথ্যা স্বীকার করে নিয়ে শাস্তি লাভ করবে তখনই লি'আন খতম হয়ে যাবে এবং হারামও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

৮. হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে যে অপবাদ রটানো হয়েছিল সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ অপবাদকে "ইফ্ক" শব্দের মাধ্যমে উল্লেখ করে স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকেই এ অপরাধকে পুরোপুরি খণ্ডন করা হয়েছে। 'ইফ্ক' শব্দের অর্থ হচ্ছে, কথা উল্টে দেয়া, বাস্তব ঘটনাকে বিকৃত করে দেয়া। এ অর্থের দিক দিয়ে এ শব্দটিকে ডাহা মিথ্যা ও অপবাদ দেয়া অর্থে ব্যবহার করা হয়। আর কোন দোষারোপ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করলে তখন এর অর্থ হয় সুস্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ।

এ সূরাটি নাযিলের মূলে যে ঘটনাটি আসল কারণ হিসেবে কাজ করেছিল এখান থেকে তার ওপর আলোচনা শুরু হয়েছে। ভূমিকায় এ সম্পর্কিত প্রারম্ভিক ঘটনা আমি হযরত আয়েশার বর্ণনার মাধ্যমে উদ্ধৃত করেছি। পরবর্তী ঘটনাও তাঁরই মুখে শুনুন। তিনি বলেন ঃ "এ মিথ্যা অপবাদের গুজব কমবেশী এক মাস ধরে সারা শহরে ছড়াতে থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারাত্মক ধরনের মানসিক কষ্টে ভুগতে থাকেন। আমি কাঁদতে থাকি। আমার বাপ-মা চরম পেরেশানী ও দুঃখে-শোকে ভুগতে থাকেন। শেষে একদিন রসূলুল্লাহ (সা) আসেন এবং আমার কাছে বসেন। এ সমগ্র সময়-কালে তিনি কখনো আমার কাছে বসেননি। হযরত আবু বকর (রা) ও উম্মে রুমান (হযরত আয়েশার মা) অনুভব করেন আজ কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকর কথা হবে। তাই তাঁরা দু'জনও কাছে এসে বসেন। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আয়েশা! তোমার সম্পর্কে আমার কাছে এ খবর পৌঁছেছে। যদি তুমি নিরপরাধ হয়ে থাকো তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তোমার অপরাধ মুক্তির কথা প্রকাশ করে দেবেন। আর যদি তুমি সত্যিই গোনাহে লিপ্ত হয়ে থাকো তাহলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো এবং ক্ষমা চাও। বান্দা যখন তার গোনাহ স্বীকার করে নিয়ে তাওবা করে তখন আল্লাহ তা মাফ করে দেন। একথা শুনে আমার চোখের পানি শুকিয়ে যায়। আমি আমার পিতাকে বলি, আপনি রসূলুল্লাহর কথার জবাব দিন। তিনি বলেন ঃ "মা, আমি কিছু বুঝতে পারছি না, কি বলবো।" আমি আমার মাকে বললাম, "তুমিই কিছু বলো" তিনিও একই কথা বলেন, "আমি কি বলবো বুঝতে পারছি না।" একথায় আমি বলি, আপনাদের কানে একটা কথা এসেছে এবং তা মনের মধ্যে জমে বসে গেছে। এখন আমি যদি বলি, আমি নিরপরাধ—এবং আল্লাহ সাক্ষী আছেন আমি নিরপরাধ—তাহলে আপনারা তা মেনে নেবেন না। আর যদি এমন একটি কথা আমি স্বীকার করে নিই যা আমি করিনি—আর আল্লাহ জানেন আমি করিনি—তাহলে আপনারা তা মেনে নেবেন। আমি সে সময় হযরত ইয়াকুবের (আ) নাম স্মরণ করার চেষ্টা করি কিন্তু নামটি মনে করতে পারিনি। শেষে আমি বলি, এ অবস্থায় আমার জন্য এ ছাড়া আর কি উপায় থাকে যে, আমি সেই একই কথা বলি যা হযরত ইউসুফের বাপ বলেছিলেন فَصَبْرٌ جَمِيلٌ (এখানে সে ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যখন হযরত ইয়াকুবের সামনে তার ছেলে বিন ইয়ামিনের বিরুদ্ধে চুরির অপবাদের কথা বর্ণনা করা হয়েছিল ঃ সূরা ইউসুফ ১০ রুকূ'তে একথা আলোচিত হয়েছে)। একথা বলে আমি শুয়ে পড়ি এবং অন্যদিকে পাশ ফিরি। সে

সময় আমি মনে মনে বলছিলাম, আল্লাহ জানেন আমি গোনাহ করিনি, তিনি নিশ্চয়ই সত্য প্রকাশ করে দেবেন। যদিও একথা আমি কল্পনাও করিনি যে, আমার স্বপক্ষে অহী নাযিল হবে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হতে থাকবে। আল্লাহ নিজেই আমার পক্ষ সমর্থন করবেন। এ থেকে নিজেকে আমি অনেক নিম্নতর মনে করতাম। কিন্তু আমার ধারণা ছিল, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন স্বপ্ন দেখবেন, যার মাধ্যমে আল্লাহ আমার নির্দোষিতার কথা জানিয়ে দেবেন। এরি মধ্যে রসূলুল্লাহর (সা) ওপর এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেলো যা অহী নাযিল হবার সময় হতো, এমন কি তীব্র শীতের দিনেও তাঁর মুবারক চেহারা থেকে মুক্তোর মতো স্বেদবিন্দু টপ্‌কে পড়তে থাকতো। আমরা সবাই চুপ করে গেলাম। আমি তো ছিলাম একদম নির্ভীক, কিন্তু আমার বাপ-মার অবস্থা ছিল যেন কাটলে শরীর থেকে একফোঁটা রক্তও পড়বে না। তারা ভয় পাচ্ছিল, না জানি আল্লাহ কি সত্য প্রকাশ করেন। যখন সে অবস্থা খতম হয়ে গেলো তখন রসূলুল্লাহ (সা) হলেন অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি হেসে প্রথমে যে কথাটি বলেন, সেটি ছিল ঃ মুবারক হোক আয়েশা! আল্লাহ তোমার নির্দোষিতার কথা নাযিল করেছেন এবং এরপর নবী (সা) দশটি আয়াত শুনান (অর্থাৎ ১১ নম্বর আয়াত থেকে ২০ নম্বর পর্যন্ত)। আমার মা বলেন, ওঠো এবং রসূলুল্লাহর (সা) প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আমি বললাম, "আমি তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো না, তোমাদের দু'জনের প্রতিও না। বরং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি আমার নির্দোষিতার কথা নাযিল করেছেন। তোমরা তো এ মিথ্যা অপবাদ অস্বীকারও করনি।" (উল্লেখ্য, এটি কোন একটি বিশেষ হাদীসের অনুবাদ নয় বরং হাদীস ও সীরাতের কিতাবগুলোতে এ সম্পর্কিত যতগুলো বর্ণনা হযরত আয়েশার (রা) উদ্ধৃত হয়েছে সবগুলোর সার নির্যাস আমি এখানে পরিবেশন করেছি।)

এ প্রসংগে আরো একটি সূক্ষ্ম কথা অনুধাবন করতে হবে। হযরত আয়েশার (রা) নিরপরাধ হবার কথা বর্ণনা করার আগে পুরো একটি রুকূ'তে যিনা, কাযাফ ও লি'আনের বিধান বর্ণনা করে মহান আল্লাহ প্রকৃতপক্ষে এ সত্যটির ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করে দিয়েছেন যে, যিনার অপবাদ দেবার ব্যাপারটি কোন ছেলেখেলা নয়, নিছক কোন মাহফিলে হাস্যরস সৃষ্টি করার জন্য একে ব্যবহার করা যাবে না। এটি একটি মারাত্মক ব্যাপার। অপবাদদাতার অপবাদ যদি সত্য হয় তাহলে তাকে সাক্ষী আনতে হবে। যিনাকারী ও যিনাকারিনীকে ভয়াবহ শাস্তি দেয়া হবে। আর অপবাদ যদি মিথ্যা হয় তাহলে অপবাদদাতা ৮০ ঘা বেত্রাঘাত খাওয়ার যোগ্য, যাতে ভবিষ্যতে সে আর এ ধরনের কোন কাজ করার দুঃসাহস না করে। এ অভিযোগ যদি স্বামী দিয়ে থাকে তাহলে আদালতে লি'আন করে তাকে ব্যাপারটি পরিষ্কার করে নিতে হবে। একথাটি একবার মুখে উচ্চারণ করে কোন ব্যক্তি ঘরে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারে না। কারণ এটা হচ্ছে একটা মুসলিম সমাজ। সারা দুনিয়ায় কল্যাণ ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য এ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এখানে যিনা কোন আনন্দদায়ক বিষয়ে পরিণত হতে পারে না এবং এর আলোচনাও হাস্য রসালাপের বিষয়বস্তুতে পরিণত হতে পারে না।

৯. হাদীসে মাত্র কয়েকজন লোকের নাম পাওয়া যায়। তারা এ গুজবটি ছড়িয়েছিল। তারা হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, যায়েদ ইবনে রিফা'আহ (এ ব্যক্তি সম্ভবত রিফা'আহ ইবনে যায়েদ ইহুদী মুনাফিকের ছেলে), মিস্‌তাহ ইবনে উসাসাহ, হাস্‌সান ইবনে সাবেত

ও হামনা বিনতে জাহশ এর মধ্যে প্রথম দু'জন ছিল মুনাফিক এবং বাকি তিনজন মু'মিন। মু'মিন তিন জন বিভ্রান্তি ও দুর্বলতার কারণে এ চক্রান্তের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এরা ছাড়া আর যারা কমবেশী এ গোনাহে জড়িয়ে পড়েছিলেন তাদের নাম হাদীস ও সীরাতের কিতাবগুলোতে আমার নজরে পড়েনি।

১০. এর অর্থ হচ্ছে, ভয় পেয়ো না। মুনাফিকরা মনে করছে তারা তোমাদের ওপর একটা বিরাট আঘাত হেনেছে। কিন্তু ইনশাআল্লাহ এটি উল্টো তাদের ওপরই পড়বে এবং তোমাদের জন্য ভালো প্রমাণিত হবে। যেমন আমি ইতিপূর্বে ভূমিকায় বর্ণনা করে এসেছি, মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের যে আসল ময়দান ছিল মুনাফিকরা সেখানেই তাদেরকে পরাস্ত করার জন্য এ প্রপাগাণ্ডা শুরু করে. অর্থাৎ নৈতিকতার ময়দান। এখানে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করার কারণে তারা প্রত্যেকটি ময়দানে নিজেদের প্রতিপক্ষের ওপর বিজয় লাভ করে চলছিল। আল্লাহ তাকেও মুসলমানদের কল্যাণের উপকরণে পরিণত করে দিলেন। এ সময় একদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, অন্যদিকে হযরত আবু বকর ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং তৃতীয় দিকে সাধারণ মু'মিনগণ যে কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেন তা থেকে একথা দিবালোকের মতো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, তাঁরা অসৎকর্ম থেকে কত দূরে অবস্থান করেন, কতটা সংযম ও সহিষ্ণুতার অধিকারী, কেমন ন্যায়নিষ্ঠ ও কি পরিমাণ ভদ্র ও রুচিশীল মানসিকতার ধারক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইজ্জতের ওপর যারা আক্রমণ চালিয়েছিল তাঁর একটি মাত্র ইংগিতই তাদের শিরশ্চেদের জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এক মাস ধরে তিনি সবরের সাথে সবকিছু বরদাশ্‌ত করতে থাকেন এবং আল্লাহর হুকুম এসে যাবার পর কেবলমাত্র যে তিনজন মুসলমানের বিরুদ্ধে কাযাফ তথা যিনার মিথ্যা অপবাদের অপরাধ প্রমাণিত ছিল তাদের ওপর 'হদ' জারি করেন। এরপরও তিনি মুনাফিকদেরকে কিছুই বলেননি। হযরত আবু বকরের নিজের আত্মীয়, যার নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণ তিনি করতেন, সেও তাঁদের কলিজায় তীর বিঁধিয়ে দিতে থাকে কিন্তু এর জবাবে আল্লাহর এ নেক বান্দাটি না তার সাথে আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করেন, না তার পরিবার-পরিজনকে সাহায্য–সহায়তা দেয়া বন্ধ করেন। নবীর পবিত্র স্ত্রীগণের একজনও সতীনের দুর্নাম ছড়াবার কাজে একটুও অংশ নেননি। বরং কেউ এ অপবাদের প্রতি নিজের সামান্যতমও সন্তোষ, পছন্দ অথবা মেনে নেয়ার মনোভাবও প্রকাশ করেননি। এমনকি হযরত যয়নবের সহোদর বোন হাম্‌না বিনতে জাহ্‌শ নিছক নিজের বোনের জন্য তাঁর সতীনের দুর্নাম রটাচ্ছিলেন কিন্তু তিনি স্বয়ং সতীনের পক্ষে ভালো কথাই বলেন। হযরত আয়েশার নিজের বর্ণনা, রসূলের স্ত্রীগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আড়ি চলতো আমার যয়নবের সাথে। কিন্তু "ইফ্‌ক"–এর ঘটনা প্রসংগে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাকে জিজ্ঞেস করেন, আয়েশা সম্পর্কে তুমি কি জানো? তখন এর জবাবে তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম, আমি তার মধ্যে ভালো ছাড়া আর কিছুই জানি না। হযরত আয়েশার নিজের ভদ্রতা ও রুচিশীলতার অবস্থা এই ছিল যে, হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবেত তাঁর দুর্নাম রটাবার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি সবসময় তাঁর প্রতি সম্মান ও বিনয়পূর্ণ ব্যবহার করেছেন। লোকেরা স্মরণ করিয়ে দেয়, ইনি তো সেই ব্যক্তি যিনি আপনার বিরুদ্ধে দুর্নাম রটিয়েছিলেন। কিন্তু এ জবাব দিয়ে তিনি তাদের মুখ বন্ধ করে দেন যে, এ ব্যক্তি ইসলামের শত্রু কবি গোষ্ঠীকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও

ইসলামের পক্ষ থেকে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন। এ ঘটনার সাথে যাদের সরাসরি সম্পর্ক ছিল, এ ছিল তাদের অবস্থা। আর সাধারণ মুসলমানদের মানসিকতা কতদূর পরিচ্ছন্ন ছিল তা এ ঘটনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর স্ত্রী যখন তাঁর কাছে এ গুজবগুলোর কথা বলেন তখন তিনি বলেন, "আইয়ুবের মা! যদি সে সময় আয়েশার জায়গায় তুমি হতে, তাহলে তুমি কি এমন কাজ করতে?" তিনি বলেন, "আল্লাহর কসম, আমি কখনো এমন কাজ করতাম না।" হযরত আবু আইয়ুব বলেন, "তাহলে আয়েশা তোমার চেয়ে অনেক বেশী ভালো। আর আমি বলি কি, যদি সাফওয়ানের জায়গায় আমি হতাম, তাহলে এ ধরনের কথা কল্পনাই করতে পারতাম না। সাফওয়ান তো আমার চেয়ে ভালো মুসলমান।" এভাবে মুনাফিকরা যা কিছু চেয়েছিল ফল হলো তার একেবারে উল্টো এবং মুসলমানদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব আগের তুলনায় আরো বেশী সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

এ ছাড়া এ ঘটনার মধ্যে কল্যাণের আর একটি দিকও ছিল। সেটি ছিল এই যে, এ ঘটনাটি ইসলামের আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও তামাদ্দুনিক নীতি-নিয়মের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনের উপলক্ষে পরিণত হয়। এর বদৌলতে মুসলমানরা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সব নির্দেশ লাভ করে যেগুলো কার্যকর করে মুসলিম সমাজকে চিরকালের জন্য অসৎকর্মের উৎপাদন ও সেগুলোর সম্প্রসারণ থেকে সংরক্ষিত রাখা যেতে পারে আর অসৎকর্ম উৎপাদিত হয়ে গেলেও যথাসময়ে তার পথ রোধ করা যেতে পারে।

এ ছাড়াও এর মধ্যে কল্যাণের আর একটি দিকও ছিল। মুসলমানরা সকলেই একথা ভালোভাবে জেনে যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী নন। যা কিছু আল্লাহ জানান তাই তিনি জানেন। এর বাইরে তাঁর জ্ঞান ততটুকুই যতটুকু জ্ঞান একজন মানুষের থাকতে পারে। একমাস পর্যন্ত হযরত আয়েশার (রা) ব্যাপারে তিনি ভীষণ পেরেশান থাকেন। কখনো চাকরানীকে জিজ্ঞেস করতেন, কখনো পবিত্র স্ত্রীগণকে, কখনো হযরত আলীকে (রা), কখনো হযরত উসামাকে (রা)। শেষ পর্যন্ত হযরত আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞেস করলেও এভাবে জিজ্ঞেস করেন যে, যদি তুমি এ গোনাহটি করে থাকো, তাহলে তাওবা করো আর না করে থাকলে আশা করা যায় আল্লাহ তোমার নিরপরাধ হওয়া প্রমাণ করে দেবেন। যদি তিনি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হতেন তাহলে এ পেরেশানী, এ জিজ্ঞাসাবাদ এবং এ তাওবার উপদেশ কেন? তবে আল্লাহর অহী যখন সত্য কথা জানিয়ে দেয় তখন সারা মাসে তিনি যা জানতেন না তা জানতে পারেন। এভাবে আকীদার অন্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে সাধারণত লোকেরা নিজেদের নেতৃবর্গের ব্যাপারে যে বাড়াবাড়ি ও আতিশয্যের শিকার হয়ে থাকে তা থেকে আল্লাহ সরাসরি অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করেন। বিচিত্র নয়, এক মাস পর্যন্ত অহী না পাঠাবার পেছনে আল্লাহর এ উদ্দেশ্যটাও থেকে থাকবে। প্রথম দিনেই অহী এসে গেলে এ ফায়দা লাভ করা যেতে পারতো না। (আরো বেশী বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন্ নামল, ৮৩ টীকা।)

১১. অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। সে ছিল এ অপবাদটির মূল রচয়িতা এবং এ কদর্য প্রচারাভিযানের আসল নায়ক। কোন কোন হাদীসে ভুলক্রমে হযরত হাস্সান ইবনে সাবেতকে (রা) এ আয়াতের লক্ষ বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এটা মূলত বর্ণনাকারীদের নিজেদেরই বিভ্রান্তির ফল। নয়তো হযরত হাস্সানের (রা) দুর্বলতা এর চেয়ে বেশী কিছু

ছিল না যে, তিনি মুনাফিকদের ছড়ানো এ ফিত্নায় জড়িয়ে পড়েন। হাফেয ইবনে কাসীর যথার্থ বলেছেন, এ হাদীসটি যদি বুখারী শরীফে উদ্ধৃত না হতো, তাহলে এ প্রসংগটি আলোচনাযোগ্যই হতো না। এ প্রসংগে সবচেয়ে বড় মিথ্যা বরং মিথ্যা অপবাদ হচ্ছে এই যে, বনী উমাইয়াহ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুকে এ আয়াতের লক্ষ মনে করে। বুখারী, তাবারানী ও বাইহাকীতে হিশাম ইবনে আবদুল মালিক উমুবীর উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, الذى تولى كبره অর্থ হচ্ছে আলী ইবনে আবু তালেব। অথচ এ ফিত্নায় হযরত আলীর (রা) গোড়া থেকেই কোন অংশ ছিল না। ব্যাপার শুধু এতটুকু ছিল, যখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুব বেশী পেরেশান দেখেন তখন নবী (সা) তাঁর কাছে পরামর্শ চাওয়ায় তিনি বলেন, আল্লাহ এ ব্যাপারে আপনাকে কোন সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ রাখেননি, বহু মেয়ে আছে, আপনি চাইলে আয়েশাকে তালাক দিয়ে আর একটি বিয়ে করতে পারেন। এর অর্থ কখনোই এটা ছিল না যে, হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে যে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হচ্ছিল হযরত আলী তাকে সত্য বলেছিলেন। বরং শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেরেশানী দূর করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

১২. অন্য একটি অনুবাদ এও হতে পারে, নিজেদের লোকদের অথবা নিজেদের সমাজের লোকদের ব্যাপারে ভালো ধারণা করোনি কেন? আয়াতের শব্দাবলী দু'ধরনের অর্থের অবকাশ রাখে। আর এ দ্ব্যর্থবোধক বাক্য ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে একটি গভীর তত্ত্ব। এটি ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে। হযরত আয়েশা (রা) ও সাফ্ওয়ান ইবনে মু'আত্তালের (রা) মধ্যে যে ব্যাপারটি ঘটে গিয়েছিল তা তো এই ছিল যে, কাফেলার এক ভদ্র মহিলা (তিনি নবী পত্নী ছিলেন একথা বাদ দিলেও) ঘটনাক্রমে পেছনে থেকে গিয়েছিলেন। আর কাফেলারই এক ব্যক্তি যিনি ঘটনাক্রমে পেছনে থেকে গিয়েছিলেন, তিনি তাঁকে নিজের উটের পিঠে বসিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এখন যদি কেউ বলে, নাউযুবিল্লাহ এরা দুজন নিজেদেরকে একান্তে পেয়ে গোনাহে লিপ্ত হয়ে গেছেন, তাহলে তার একথার বাহ্যিক শব্দাবলীর আড়ালে আরো দু'টো কাল্পনিক কথাও রয়ে গেছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, বক্তা (পুরুষ হোক বা নারী) যদি নিজেই ঐ জায়গায় হতেন, তাহলে কখনোই গোনাহ না করে থাকতেন না। কারণ তিনি যদি গোনাহ থেকে বিরত থেকে থাকেন তাহলে এটা শুধু এ জন্য যে, বিপরীত লিংগের কেউ এ পর্যন্ত এভাবে একান্তে তার নাগালে আসেনি নয়তো এমন সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাবার লোক তিনি নন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যে সমাজের তিনি একজন সদস্য, তার নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তার ধারণা হচ্ছে, এখানে এমন একজন নারী ও পুরুষ নেই যিনি এ ধরনের সুযোগ পেয়ে গোনাহে লিপ্ত হননি। এতো শুধুমাত্র তখনকার ব্যাপার যখন বিষয়টি নিছক একজন পুরুষ ও একজন নারীর সাথে জড়িত থাকে। আর ধরুন যদি সে পুরুষ ও নারী উভয়ই একই জায়গার বাসিন্দা হন এবং যে মহিলাটি ঘটনাক্রমে কাফেলা থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন তিনি ঐ পুরুষটির কোন বন্ধু, আত্মীয় বা প্রতিবেশীর স্ত্রী, বোন বা মেয়ে হয়ে থাকেন, তাহলে ব্যাপারটি আরো গুরুতর হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, বক্তা নিজেই নিজের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে এবং নিজের সমাজ সম্পর্কেও এমন জঘন্য ধারণা পোষণ করেন যার সাথে ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধের দূরতম সম্পর্কও নেই। কে এমন সজ্জন আছেন যিনি একথা চিন্তা করতে পারেন যে, তার কোন বন্ধু, প্রতিবেশী বা পরিচিত ব্যক্তির গৃহের কোন মহিলার সাথে বিপদগ্রস্ত অবস্থায় তার পথে দেখা হয়ে যাবে এবং

প্রথম অবস্থায়ই তিনি তার ইজ্জত লুটে নেবার কাজ করবেন তারপর তাকে গৃহে পৌঁছিয়ে দেবার কথা চিন্তা করবেন! কিন্তু এখানে তো ব্যাপার ছিল এর চেয়ে হাজার গুণ গুরুতর মহিলা অন্য কেউ ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী, যাঁদেরকে প্রত্যেকটি মুসলমান নিজের মায়ের চেয়েও বেশী সম্মানের যোগ্য মনে করতো এবং যাঁদেরকে আল্লাহ নিজেই প্রত্যেক মুসলমানের ওপর নিজের মায়ের মতই হারাম গণ্য করেছিলেন পুরুষটি কেবলমাত্র ঐ কাফেলার একজন সদস্য, ঐ সেনাদলের একজন সৈন্য এবং ঐ শহরের একজন অধিবাসীই ছিলেন না বরং তিনি মুসলমানও ছিলেন ঐ মহিলার স্বামীকে তিনি আল্লাহর রসূল এবং নিজের নেতা ও পথপ্রদর্শক বলে মেনে নিয়েছিলেন আর তাঁর হুকুমে প্রাণ উৎসর্গ করে দেয়ার জন্য বদরের যুদ্ধের মতো ভয়াবহ জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন এ অবস্থায় তো এ উক্তির মানসিক প্রেক্ষাপট হীনন্যতার এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায় যার চেয়ে নোংরা ও ঘৃণ্য কোন প্রেক্ষাপটের কথা চিন্তাই করা যায় না তাই মহান আল্লাহ বলছেন, মুসলিম সমাজের যেসব ব্যক্তি একথা তাদের কণ্ঠে উচ্চারণ করেছে অথবা কমপক্ষে একে সন্দেহযোগ্য মনে করেছে তারা নিজেদের মন-মানসিকতারও খুবই খারাপ ধারণা দিয়েছে এবং নিজেদের সমাজের লোকদেরকেও অত্যন্ত হীন চরিত্র ও নিকৃষ্ট নৈতিকবৃত্তির অধিকারী মনে করেছে।

১৩. অর্থাৎ একথাতো বিবেচনার যোগ্যই ছিল না একথা শোনার সাথে সাথেই প্রত্যেক মুসলমানের একে সুস্পষ্ট মিথ্যাচার, মিথ্যা ও বানোয়াট কথা ও অপবাদ আখ্যা দেয়া উচিত ছিল সম্ভবত কেউ এখানে প্রশ্ন করতে পারে, একথাই যদি ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুই বা প্রথম দিনই একে মিথ্যা বলে দিলেন না কেন? কেন তারা একে এতটা গুরুত্ব দিলেন? এর জবাব হচ্ছে, স্বামী ও পিতার অবস্থা সাধারণ লোকদের তুলনায় ভিন্ন ধরনের হয়। যদিও স্ত্রীকে স্বামীর চেয়ে বেশী কেউ চিনতে বা জানতে পারে না এবং একজন সৎ, ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত স্ত্রী সম্পর্কে কোন সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন স্বামী লোকদের অপবাদের কারণে খারাপ ধারণা করতে পারে না, তবুও যদি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হয় তাহলে তখন সে এমন এক ধরনের সংকটের মুখোমুখি হয় যার ফলে সে একে মিথ্যা অপবাদ বলে প্রত্যাখ্যান করলেও প্রচারণাকারীদের মুখ বন্ধ হবে না বরং তারা নিজেদের কণ্ঠ আরো এক ডিগ্রী উঁচুতে চড়িয়ে বলতে থাকবে, দেখো, কত কেমন স্বামীর বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সবকিছু করে যাচ্ছে তবু স্বামী মনে করছে আমার স্ত্রী বড়ই সতী সাধ্বী এ ধরনের সংকট মা-বাপের ক্ষেত্রেও দেখা দেয় সে বেচারারা নিজেদের মেয়ের সতীত্বের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদে যদি মুখ খোলেও তাহলে মেয়ের অবস্থান পরিষ্কার হয় না প্রচারণাকারীরা একথাই বলবে, মা-বাপ তো, কাজেই নিজের মেয়ের পক্ষ সমর্থন করবে না তো আর কি করবে! এ জিনিসটিই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবু বকর ও উম্মে রুমানকে ভিতরে ভিতরে শোকে-দুঃখে জর্জরিত ও বিহবল করে চলছিল। নয়তো আসলে তাদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামতো তাঁর ভাষণে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন, আমি আমার স্ত্রীর মধ্যে কোন খারাপ জিনিস দেখিনি এবং যে ব্যক্তির সম্পর্কে এ অপবাদ দেয়া হচ্ছে তার মধ্যেও না।

لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ
عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٣﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٤﴾ اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ
بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ
هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ﴿١٥﴾

তারা (নিজেদের অপবাদের প্রমাণ স্বরূপ) চারজন সাক্ষী আনেনি কেন? এখন যখন তারা সাক্ষী আনেনি তখন আল্লাহর কাছে তারাই মিথ্যুক।[১৪] যদি তোমাদের প্রতি দুনিয়ায় ও আখেরাতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হতো তাহলে যেসব কথায় তোমরা লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলে সেগুলোর কারণে তোমাদের ওপরে মহাশাস্তি নেমে আসতো। (একটু ভেবে দেখো তো, সে সময় তোমরা কেমন মারাত্মক ভুল করছিলে) যখন তোমরা এক মুখ থেকে আর এক মুখে এ মিথ্যা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছিলে এবং তোমরা নিজেদের মুখে এমন সব কথা বলে যাচ্ছিলে যা সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না। তোমরা একে একটা মামুলি কথা মনে করছিলে অথচ আল্লাহর কাছে এটা ছিল গুরুতর বিষয়।

১৪. "আল্লাহর কাছে" অর্থাৎ আল্লাহর আইনে অথবা আল্লাহর আইন অনুযায়ী। নয়তো আল্লাহ তো জানতেন ঐ অপবাদ ছিল মিথ্যা। তারা সাক্ষী আনেনি বলেই তা মিথ্যা, আল্লাহর কাছে তার মিথ্যা হবার জন্য এর প্রয়োজন নেই।

এখানে যেন কেউ এ ভুল ধারণার শিকার না হন যে, এ ক্ষেত্রে নিছক সাক্ষীদের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিকে অপবাদের মিথ্যা হবার যুক্তি ও ভিত্তি গণ্য করা হচ্ছে এবং মুসলমানদের বলা হচ্ছে যেহেতু অপবাদদাতা চার জন সাক্ষী আনেনি তাই তোমরাও শুধুমাত্র এ কারণেই তাকে সুস্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ গণ্য করো। বাস্তবে সেখানে যা ঘটেছিল তার প্রতি দৃষ্টি না দিলে এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়। অপবাদদাতারা এ কারণে অপবাদ দেয়নি যে, তারা তাদের মুখ দিয়ে যা কিছু বলে যাচ্ছিল তারা সবাই বা তাদের কোন একজন স্বচক্ষে তা দেখেছিল। বরং হযরত আয়েশা (রা) কাফেলার পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন এবং হযরত সাফ্ওয়ান পরে তাঁকে নিজের উটের পিঠে সওয়ার করে কাফেলার মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন শুধুমাত্র এরি ভিত্তিতে তারা এতবড় অপবাদ তৈরী করে ফেলেছিল। কোন বুদ্ধি-বিবেকবান ব্যক্তি এ অবস্থায় হযরত আয়েশার এভাবে পিছনে থেকে যাওয়াকে নাউযুবিল্লাহ কোন ষড়যন্ত্রের ফল ছিল বলে ভাবতে পারতেন না। সেনা প্রধানের স্ত্রী চুপিচুপি কাফেলার পিছনে এক ব্যক্তির সাথে থেকে যাবে তারপর ঐ ব্যক্তিই তাকে নিজের

وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَٰنَكَ هَٰذَا
بُهْتَٰنٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُوا۟ لِمِثْلِهِۦٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾
وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ
أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۙ فِى ٱلدُّنْيَا
وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

একথা শোনার সাথে সাথেই তোমরা বলে দিলে না কেন, "এমন কথা মুখ দিয়ে বের করা আমাদের শোভা পায় না, সুবহানাল্লাহ! এ তো একটি জঘন্য অপবাদ।" আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দেন, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো, তাহলে ভবিষ্যতে কখনো এ ধরনের কাজ করো না। আল্লাহ তোমাদের পরিষ্কার নির্দেশ দেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞানময়।[১৫]

যারা চায় মু'মিনদের সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক তারা দুনিয়ায় ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।[১৬] আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।[১৭] যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর করুণা তোমাদের প্রতি না হতো এবং আল্লাহ যদি স্নেহশীল ও দয়ার্দ্র না হতেন (তাহলে যে জিনিস এখনই তোমাদের মধ্যে ছড়ানো হয়েছিলো তার পরিণাম হতো অতি ভয়াবহ।)।

উটের পিঠে বসিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে ঠিক দুপুরের সময় সবার চোখের সামনে দিয়ে সেনা ছাউনিতে পৌঁছে যাবে, কোন ষড়যন্ত্রকারী এভাবে ষড়যন্ত্র করে না। স্বয়ং এ অবস্থাটাই তাদের উভয়ের নিরপরাধ ও নিষ্পাপ হওয়ার প্রমাণ পেশ করছে। এ অবস্থায় যদি অপবাদদাতারা নিজেদের চোখে কোন ঘটনা দেখতো তাহলে কেবলমাত্র তারি ভিত্তিতে অপবাদ দিতে পারতো। অন্যথায় যেসব লক্ষণের ওপর কুচক্রীরা অপবাদের ভিত্তি রেখেছিল সেগুলোর ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

১৫. এ আয়াতগুলো এবং বিশেষ করে আল্লাহর এ বাণী "মু'মিন পুরুষ ও নারীরা নিজেদের লোকদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করে না কেন" থেকে এ মূলনীতির উৎপত্তি হয় যে, মুসলিম সমাজে সকল ব্যবহারিক বিষয়ের ভিত্তি সুধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কুধারণা কেবলমাত্র এমন অবস্থায় পোষণ করা উচিত যখন তার জন্য কোন ইতিবাচক ও প্রমাণসূচক ভিত্তি থাকবে। এ ব্যাপারে নীতি হচ্ছে ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি নির্দোষ,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ
الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ ۭ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ
وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢١﴾ وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ
اَنْ يُّؤْتُوْٓا اُولِي الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۠
وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ۭ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢﴾

৩ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে চলো না। যে কেউ তার অনুসরণ করবে তাকে সে অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ করার হুকুম দেবে। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না থাকতো তাহলে তোমাদের একজনও পবিত্র হতে পারতো না।[১৮] কিন্তু আল্লাহই যাকে চান তাকে পবিত্র করে দেন এবং আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞাত।[১৯]

তোমাদের মধ্য থেকে যারা প্রাচুর্য ও সামর্থের অধিকারী তারা যেন এ মর্মে কসম খেয়ে না বসে যে, তারা নিজেদের আত্মীয়-স্বজন, গরীব-মিসকীন ও আল্লাহর পথে গৃহত্যাগকারীদেরকে সাহায্য করবে না। তাদেরকে ক্ষমা করা ও তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি চাও না আল্লাহ তোমাদের মাফ করেন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীলতা ও দয়া গুণে গুণান্বিত।[২০]

যতক্ষণ তার অপরাধী হবার বা তার প্রতি অপরাধের সন্দেহ করার কোন যুক্তিসংগত কারণ না থাকে আর প্রত্যেক ব্যক্তিই সত্যবাদী, যতক্ষণ তার অনির্ভরযোগ্য হবার কোন প্রমাণ না থাকে।

১৬. পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আয়াতের প্রত্যক্ষ অর্থ হচ্ছে, যারা এ ধরনের অপবাদ তৈরী করে ও তা প্রচার করে মুসলিম সমাজে চরিত্রহীনতার প্রসার ঘটাবার এবং উম্মতে মুসলিমার চরিত্র হননের চেষ্টা করছে তারা শাস্তিলাভের যোগ্য। কিন্তু আয়াতের শব্দাবলী অশ্লীলতা ছড়াবার যাবতীয় অবস্থার অর্থবোধক। কার্যত ব্যভিচারের আড্ডা কায়েম করার ওপরও এগুলো প্রযুক্ত হয়। আবার চরিত্রহীনতাকে উৎসাহিত করা এবং সে জন্য আবেগ-অনুভূতিকে উদ্দীপিত ও উত্তেজিতকারী কিস্‌সা-কাহিনী, কবিতা, গান, ছবি

ও খেলাধূলার ওপরও প্রযুক্ত হয়। তাছাড়া এমন ধরনের ক্লাব, হোটেল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও এর আওতায় এসে যায় যেখানে নারী-পুরুষের মিলিত নৃত্য ও মিলিত আমোদ ফূর্তির ব্যবস্থা করা হয়। কুরআন পরিষ্কার বলছে, এরা সবাই অপরাধী। কেবল আখেরাতেই নয়, দুনিয়ায়ও এদের শাস্তি পাওয়া উচিত। কাজেই অশ্লীলতার এসব উপায় উপকরণের পথ রোধ করা একটি ইসলামী রাষ্ট্রের অপরিহার্য কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন এখানে যে সমস্ত কাজকে জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধ গণ্য করছে এবং যেগুলো সম্পাদনকারীকে শাস্তিলাভের যোগ্য বলে ফায়সালা দিচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের দণ্ডবিধি আইনে সে সমস্ত কাজ শাস্তিযোগ্য ও পুলিশের হস্তক্ষেপলাভের উপযোগী হতে হবে।

১৭. অর্থাৎ তোমরা জানো না এ ধরনের এক একটি কাজের প্রভাব সমাজে কোথায় কোথায় পৌঁছে যায়, কতলোক এগুলোতে প্রভাবিত হয় এবং সামরিকভাবে এর কি পরিমাণ ক্ষতি সমাজ জীবনকে বরদাশত করতে হয়। এ বিষয়টি আল্লাহই খুব ভালোভাবে জানেন। কাজেই আল্লাহর ওপর নির্ভর করো এবং তিনি যেসব অসৎকাজ চিহ্নিত করেছেন পূর্ণ শক্তিতে সেগুলোকে নিশ্চিহ্ন করার ও দাবিয়ে দেবার চেষ্টা করো। এগুলো ছোট ছোট বিষয় নয় যে, এগুলোর প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে হবে। আসলে এগুলো অনেক বড় বিষয়। কাজেই যারা এসব কাজ করবে তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত।

১৮. অর্থাৎ শয়তান তো তোমাদের মায়ে অসৎকাজের নাপাকী মাখিয়ে দেবার জন্য এমন উন্মুখ হয়ে বসে আছে যে, যদি আল্লাহ নিজেই অনুগ্রহ ও দয়া করে তোমাদের সততা ও অসততার পার্থক্য না শেখান এবং তোমাদের সংশোধনের শিক্ষা ও সুযোগলাভের সৌভাগ্য দান না করেন, তাহলে তোমাদের একজনও নিজেদের শক্তি-সামর্থের জোরে পবিত্র ও পাপ পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হতে পারো না।

১৯. অর্থাৎ আল্লাহ চোখ বন্ধ করে, আন্দাজে যাকে তাকে পবিত্রতা দান করেন না এবং নিজের নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে দান করেন। আল্লাহ জানেন কে কল্যাণ চায় এবং কে অকল্যাণ আকাংখী। প্রত্যেক ব্যক্তি একান্তে যেসব কথা বলে আল্লাহ তা সবই শুনে থাকেন। প্রত্যেক ব্যক্তি মনে মনে যা চিন্তা করে আল্লাহ তা থেকে মোটেই বেখবর থাকেন না। এ সরাসরি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ ফায়সালা করেন, কাকে পবিত্রতা দান করবেন ও কাকে পবিত্রতা দান করবেন না।

২০. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, ওপরে বর্ণিত আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ যখন আমার নির্দোষিতার কথা ঘোষণা করেন তখন হযরত আবু বকর (রা) কসম খেয়ে বসেন, তিনি আগামীতে মিস্‌তাহ ইবনে উসাসাকে সাহায্য করা বন্ধ করে দেবেন। কারণ মিস্‌তাহ আত্মীয়-সম্পর্কের কোন পরোয়া করেননি এবং তিনি সারা জীবন তার ও তার সমগ্র পরিবারের যে উপকার করে এসেছেন সে জন্য একটুও লজ্জা অনুভব করেননি। এ ঘটনায় এ আয়াত নাযিল হয় এবং এ আয়াত শুনেই হযরত আবু বকর (রা) সংগে সংগেই বলেন, بلى والله انا نحب ان تغفر لنا يا ربنا "আল্লাহর কসম, অবশ্যই আমরা চাই, হে আমাদের রব! তুমি আমাদের ভুল-ভ্রান্তি মাফ করে দেবে।" কাজেই তিনি আবার মিস্‌তাহকে সাহায্য করতে থাকেন এবং এবার আগের চেয়ে বেশী করে করতে থাকেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনা হচ্ছে, হযরত আবু বকর ছাড়া আরো কয়েকজন সাহাবীও এ কসম খেয়েছিলেন যে, যারা মিথ্যা অপবাদ ছড়াতে অংশ নিয়েছিল

তাদেরকে তাঁরা আর কোন সাহায্য সহায়তা দেবেন না। এ আয়াতটি নাযিল হবার পর তারা সবাই নিজেদের কসম ভেঙ্গে ফেলেন। এভাবে এ ফিত্‌নার ফলে মুসলিম সমাজে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তা এক মুহূর্তেই দূর হয়ে যায়।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়, যদি কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম খেয়ে বসে তারপর সে জানতে পারে এতে কোন কল্যাণ নেই এবং এর ফলে কসম ভেঙ্গে ফেলে যে বিষয়ে কল্যাণ আছে তা অবলম্বন করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে তাকে কসম ভাঙ্গার কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে কি না। এক দল ফকীহ বলেন, কল্যাণের পথ অবলম্বন করাই কাফ্‌ফারা, এ ছাড়া আর কোন কাফ্‌ফারার প্রয়োজন নেই। তারা এ আয়াত থেকে যুক্তি দিয়ে থাকেন যে, আল্লাহ হযরত আবু বকরকে কসম ভেঙ্গে ফেলার হুকুম দেন এবং কাফ্‌ফারা আদায় করার হুকুম দেননি। এ ছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত উক্তিটিকেও তারা যুক্তি হিসেবে পেশ করেন ঃ

مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ -

"যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম খেয়ে বসে তারপর সে জানতে পারে অন্য বিষয়টি তার চেয়ে ভালো, এ অবস্থায় তার ভালো বিষয়টি গ্রহণ করা উচিত এবং এই ভালো বিষয়টি গ্রহণ করাই তার কাফ্‌ফারা।"

অন্য দলটি বলেন, কসম ভাঙ্গার জন্য আল্লাহ কুরআন মজীদে একটি পরিষ্কার ও স্বতন্ত্র হুকুম নাযিল করেছেন (আল বাকারাহ ২২৫ ও আল মায়েদাহ ৮৯ আয়াত)। এ আয়াতটি ঐ হুকুম রহিত করেনি এবং পরিষ্কারভাবে এর মধ্যে কোন সংশোধনও করেনি। কাজেই ঐ হুকুম স্বস্থানে অপরিবর্তিত রয়েছে। আল্লাহ এখানে হযরত আবু বকরকে অবশ্যি কসম ভেঙ্গে ফেলতে বলেছেন কিন্তু তাঁকে তো এ কথা বলেননি যে, তোমার ওপর কোন কাফ্‌ফারা ওয়াজিব নয়। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তিটির অর্থ হচ্ছে শুধু এই যে, একটি ভুল ও অসংগত বিষয়ের কসম খেয়ে ফেললে যে গুনাহ হয় সঠিক ও সংগত পন্থা অবলম্বন তার অপনোদন হয়ে যায়। কসমের কাফ্‌ফারা রহিত করা এর উদ্দেশ্য নয়। বস্তুতঃ অন্য একটি হাদীস–এর ব্যাখ্যা করে দেয়। তাতে নবী করীম (সা) বলেন ঃ

مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ -

"যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম খেয়ে বসে তারপর সে জানতে পারে অন্য বিষয় তার চেয়ে ভালো, তার যে বিষয়টি ভালো সেটিই করা উচিত এবং নিজের কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করা উচিত।"

এ থেকে জানা যায়, কসম ভাঙ্গার কাফ্‌ফারা আলাদা জিনিস এবং ভালো কাজ না করার গোনাহের কাফ্‌ফারা অন্য জিনিস। ভালো কাজ করা হচ্ছে একটি জিনিসের কাফ্‌ফারা

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ
وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ
الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ
وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۚ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ
أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

যারা সতী সাধ্বী, সরলমনা[২১] মু'মিন মহিলাদের প্রতি অপবাদ দেয় তারা দুনিয়ায় ও আখেরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। তারা যেন সেদিনের কথা ভুলে না যায় যেদিন তাদের নিজেদের কণ্ঠ এবং তাদের নিজেদের হাত-পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ দেবে।[২১(ক)] সেদিন তারা যে প্রতিদানের যোগ্য হবে, তা আল্লাহ তাদেরকে পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহই সত্য এবং সত্যকে সত্য হিসেবে প্রকাশকারী।

দুশ্চরিত্রা মহিলারা দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষরা দুশ্চরিত্রা মহিলাদের জন্য। সচ্চরিত্রা মহিলারা সচ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষরা সচ্চরিত্রা মহিলাদের জন্য। লোকে যা বলে তা থেকে তারা পূত-পবিত্র।[২২] তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও মর্যাদাপূর্ণ জীবিকা।

এবং দ্বিতীয় জিনিসের কাফ্ফারা কুরআন নিজেই নির্ধারিত করে দিয়েছে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাদের ব্যাখ্যা, ৪৬ টীকা)।

২১. মূলে غافلات (গাফেলাত) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, সরলমনা ও ভদ্র মহিলারা, যারা ছল-চাতুরী জানে না, যাদের মন নির্মল, কলুষমুক্ত ও পাক-পবিত্র, যারা অসভ্যতা ও অশ্লীল আচরণ কি ও কিভাবে করতে হয় তা জানে না এবং কেউ তাদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেবে একথা যারা কোনদিন কল্পনাও করতে পারে না। হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিষ্কলুষ-সতী-সাধ্বী মহিলাদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া সাতটি "সর্বনাশা" কবীরাহ গোনাহের অন্তরভুক্ত। তাবারানীতে হযরত হুযাইফার বর্ণনায় বলা হয়েছে, নবী (সা) বলেছেন :

قذف المحصنة يهدم عمل مائة سنة

"একজন নিরপরাধ সতী সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া একশ বছরের সৎকাজ ধ্বংস করে দেবার জন্য যথেষ্ট।"

২১(ক). ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইয়াসীন, ৫৫ এবং সূরা হা-মীম আস্ সাজ্‌দাহ, ২৫ টীকা।

২২. এ আয়াতে একটি নীতিগত কথা বুঝানো হয়েছে। সেটি হচ্ছে ঃ দুশ্চরিত্ররা দুশ্চরিত্রদের সাথেই জুটি বাঁধে এবং সচ্চরিত্র ও পাক-পবিত্র লোকেরা স্বাভাবিকভাবেই সচ্চরিত্র ও পাক-পবিত্র লোকদের সাথেই মানানসই। একজন দুষ্কৃতকারী শুধু একটিমাত্র দুষ্কৃতি করে না। সে আর সব দিক দিয়ে একদম ভালো এবং শুধুমাত্র একটি দুষ্কর্মে লিপ্ত—ব্যাপারটা মোটেই এ রকম নয়। তার চলাফেরা, আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র সবকিছুর মধ্যে নানান অসৎপ্রবণতা লুকিয়ে থাকে এবং এগুলো তার একটি বড় অসৎপ্রবণতাকে সহায়তা দান ও প্রতিপালন করে। কোন ব্যক্তির মধ্যে হঠাৎ একটি অসৎপ্রবণতা কোন অদৃশ্য গোলার মতো বিস্ফোরিত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, অথচ এর কোন আলামত ইতিপূর্বে তার চালচলন ও আচার-আচরণে দেখা যায়নি, এটা কোনক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। মানব জীবনে প্রতিনিয়ত এ মনস্তাত্ত্বিক সত্যটির প্রদর্শনী হচ্ছে। একজন পাক-পবিত্র মানুষ, যার সমগ্র জীবন সবার সামনে সুস্পষ্ট, সে একটি ব্যভিচারী নারীর সাথে ঘর সংসার করে এবং বছরের পর বছর তাদের মধ্যে গভীর প্রেম ও প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক থাকে, একথা কিভাবে বোধগম্য হয়? একথা কি চিন্তা করা যেতে পারে যে, কোন নারী এমনও হতে পারে যে ব্যভিচারিনী হবে এবং তারপর তার চলন-বলন, অংগভংগী, আচার-ব্যবহার কোন জিনিস থেকেও তার এসব অসৎবৃত্তির কোন লক্ষণই ফুটে উঠবে না? অথবা কোন ব্যক্তি পবিত্র হৃদয়বৃত্তির অধিকারী ও উন্নত চরিত্রবানও হবে আবার সে এমন নারীর প্রতি সন্তুষ্টও থাকবে যার মধ্যে এসব লক্ষণ দেখা যাবে? একথা এখানে বুঝাবার কারণ হচ্ছে এই যে, ভবিষ্যতে যদি কারোর প্রতি এ অপবাদ দেয়া হয়, তাহলে লোকেরা যেন অন্ধের মতো তা শুনেই বিশ্বাস করে না নেয়, বরং তারা যেন চোখ খুলে দেখে নেয় কার বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হচ্ছে, কি অপবাদ দেয়া হচ্ছে এবং তা কোনভাবে সেখানে খাপ খায় কি না? কথা যদি জুতসই হয়, তাহলে মানুষ এক পর্যায় পর্যন্ত তা বিশ্বাস করতে পারে অথবা কমপক্ষে সম্ভব মনে করতে পারে। কিন্তু উদ্ভট ও অপরিচিত কথা, যার সত্যতার স্বপক্ষে একটি চিহ্নও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, তা শুধুমাত্র কোন নির্বোধ বা দুর্জনের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে বলেই তাকে কেমন করে মেনে নেয়া যায়?

কোন কোন মুফাস্‌সির এ আয়াতের এ অর্থও করেছেন যে, খারাপ কথা খারাপ লোকদের জন্য (অর্থাৎ তারা এর হকদার) এবং ভালো কথা ভালো লোকদের জন্য, আর ভালো লোকদের সম্পর্কে দুর্মুখেরা যেসব কথা বলে তা তাদের প্রতি প্রযুক্ত হওয়া থেকে তারা মুক্ত ও পবিত্র। অন্য কিছু লোক এর অর্থ করেছেন এভাবে, খারাপ কাজ খারাপ লোকদের পক্ষেই সাজে এবং ভালো কাজ ভালো লোকদের জন্যই শোভনীয়, ভালো লোকেরা খারাপ কাজের অপবাদ বহন থেকে পবিত্র। ভিন্ন কিছু লোক এর অর্থ নিয়েছেন এভাবে, খারাপ কথা খারাপ লোকদেরই বলার মতো এবং ভালো লোকেরা ভালো কথাই বলে থাকে, অপবাদদাতারা যে ধরনের কথা বলছে ভালো লোকেরা তেমনি ধরনের কথা বলা

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾

৪ রুকূ

হে ঈমানদারগণ!২৩ নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না গৃহবাসীদের সম্মতি লাভ করো২৪ এবং তাদেরকে সালাম করো। এটি তোমাদের জন্য ভালো পদ্ধতি, আশা করা যায় তোমরা এদিকে নজর রাখবে।২৫

থেকে পবিত্র এসব কথাগুলো বাদ্যযন্ত্রে সুরের তালে তালে গাওয়ার মধ্যে আসে কিনা এ প্রশ্নগুলো পড়ে প্রত্যেক সে ব্যক্তির মনের মধ্যে খটকা বাধে যে এর মর্ম অনুধাবন করে এসেছে এবং পরিবেশ পরিস্থিতির দিক দিয়েও তার মধ্যে যে তাৎপর্য রয়েছে সেগুলোর মধ্যে তা নেই।

২৩. সূরার শুরুতে যেসব বিধান দেয়া হয়েছে সেগুলো দ্বারা সমাজে অশ্লীলতা ও অনাচারের উদ্ভব হলে কিভাবে তার প্রতিরোধ করতে হবে তা বলা হয়নি। এখানে যেসব বিধান দেয়া হচ্ছে সেগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজে অসৎবৃত্তির উৎপত্তিরোধ করা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে করে এসব অসঙ্গতার সৃষ্টির পথ বন্ধ হয়ে যায়। এসব বিধান বুঝবার জন্য আগে দুটি কথা ভালোভাবে মনের মধ্যে গেঁথে নিতে হবে :

এক : অপবাদের ঘটনার পরপরই এ বিধান বর্ণনা করা পরিষ্কারভাবে একথাই ব্যক্ত করে যে, রসূলের স্ত্রীর নামে মহান ও উন্নত ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে এত বড় একটি ভয়াবহ অপবাদের এভাবে সমাজের অভ্যন্তরে ব্যাপক চর্চা-আলোচনা হওয়ার পেছনে একটি যৌন কামনাতাড়িত পরিবেশের উপস্থিতির বড় বড় ভূমিকা রয়েছে। আল্লাহর দৃষ্টিতে এ যৌন কামনা তাড়িত পরিবেশকে বন্ধ করার একমাত্র উপায় এটাই ছিল যে, লোকদের পরস্পরের গৃহে নিসংকোচে যাওয়া বন্ধ করতে হবে, অপরিচিত নারী-পুরুষদের পরস্পর দেখা সাক্ষাত ও অবাধভাবে মেলামেশার পথ রোধ করতে হবে, মেয়েদের একটি অতি নিকট পরিবেশের লোক ছাড়া গৃহের মুরুব্বীদের সাথীদের-স্বজন ও অপরিচিতদের সামনে সাজসজ্জা করে যাওয়া নিষিদ্ধ করতে হবে, পতিতাবৃত্তির পেশাকে চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে, পুরুষদের ও নারীদের দৃষ্টিকে অবনমিত রাখা যাবে না, এমনকি চোখের ও কানের জিনাও বন্ধ করতে হবে। অন্য কথায় বলা যায়, মেয়েদের পরদাহীনতা ও সমাজে বিপুল সংখ্যক লোকের অবিবাহিত থাকাই হচ্ছে এমন এক মনুষ্যসৃষ্ট এমন সব মৌলিক কার্যকারণ যেগুলোর মাধ্যমে সামাজিক পরিবেশে একটি অনুকূল যৌন কামনা সর্বক্ষণ প্রবহমান থাকে এবং এ যৌন কামনার শিকার হয়ে লোকদের চোখ, কান, কণ্ঠ, মন-মানস সবকিছুই কোন বাস্তব বা কাল্পনিক কেলেংকারিতে (Scandal) জড়িত হবার জন্য সবসময় তৈরী থাকে। এ দোষ ও ত্রুটি সংশোধন করার জন্য আলোচ্য পরদার বিধিসমূহের চেয়ে বেশী নির্ভুল, উপযোগী ও প্রভাবশালী অন্য কোন

কর্মপন্থা আল্লাহর জ্ঞান-ভাণ্ডারে ছিল না। নয়তো তিনি এগুলো বাদ দিয়ে অন্য বিধান দিতেন।

দুই ঃ এ সুযোগে দ্বিতীয় যে কথাটি বুঝে নিতে হবে সেটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহর শরীয়াত কোন অসৎকাজ নিছক হারাম করে দিয়ে অথবা তাকে অপরাধ গণ্য করে তার জন্য শাস্তি নির্ধারিত করে দেয়াই যথেষ্ট মনে করে না বরং যেসব কার্যকারণ কোন ব্যক্তিকে ঐ অসৎকাজে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করে অথবা তার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় কিংবা তাকে তা করতে বাধ্য করে, সেগুলোকেও নিশ্চিহ্ন করে দেয়। তাছাড়া শরীয়াত অপরাধের সাথে সাথে অপরাধের কারণ, অপরাধের উদ্যোক্তা ও অপরাধের উপায়-উপকরণাদির ওপরও বিধি নিষেধ আরোপ করে। এভাবে আসল অপরাধের ধারে কাছে পৌছার আগেই অনেক দূর থেকেই মানুষকে রুখে দেয়া হয়। মানুষ সবসময় অপরাধের কাছ দিয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকবে এবং প্রতিদিন পাকড়াও হতে ও শাস্তি পেতে থাকবে, এটাও সে পছন্দ করে না। সে নিছক একজন অভিযোক্তাই (Prosecutor) নয় বরং একজন সহানুভূতিশীল সহযোগী, সংস্কারকারী ও সাহায্যকারীও। তাই সে মানুষকে অসৎকাজ থেকে নিষ্কৃতিলাভের ক্ষেত্রে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই সকল প্রকার শিক্ষামূলক, নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

২৪. মূলে حتى تستانسوا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। লোকেরা সাধারণত একে حتى تستاذنوا (অর্থাৎ যতক্ষণ না অনুমতি নাও) অর্থে ব্যবহার করে। কিন্তু আসলে উভয় ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। একে উপেক্ষা করা চলে না। حتى تستاذنوا বললে আয়াতের অর্থ হতো ঃ "কারোর বাড়িতে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না অনুমতি নিয়ে নাও।" এ প্রকাশ ভংগী পরিহার করে আল্লাহ حتى تستانسوا শব্দ ব্যবহার করেছেন। استيناس শব্দ انس ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আমাদের ভাষায় এর মানে হয় পরিচিতি, অন্তরংগতা, সম্মতি ও প্রীতি। এ ধাতু থেকে উৎপন্ন تستانسوا শব্দ যখনই বলা হবে তখনই এর মানে হবে, সম্মতি আছে কি না জানা অথবা নিজের সাথে অন্তরংগ করা। কাজেই আয়াতের সঠিক অর্থ হবে ঃ "লোকদের গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তাদেরকে অন্তরংগ করে নেবে অথবা তাদের সম্মতি জেনে নেবে।" অর্থাৎ একথা না জেনে নেবে যে, গৃহমালিক তোমার আসাকে অপ্রীতিকর বা বিরক্তিকর মনে করছে না এবং তার গৃহে তোমার প্রবেশকে সে পছন্দ করছে। এ জন্য আমি অনুবাদে "অনুমতি নেবা'র পরিবর্তে 'সম্মতি লাভ' শব্দ ব্যবহার করেছি। কারণ এ অর্থটি মূলের নিকটতর।

২৫. জাহেলী যুগে আরববাসীদের নিয়ম ছিল, তারা حُيِّيتُم صَبَاحًا، حُيِّيتُم مساءً (সুপ্রভাত, শুভ সন্ধ্যা) বলতে বলতে নিসংকোচে সরাসরি একজন অন্যজনের গৃহে প্রবেশ করে যেতো। অনেক সময় বহিরাগত ব্যক্তি গৃহ মালিক ও তার বাড়ির মহিলাদেরকে বেসামাল অবস্থায় দেখে ফেলতো। আল্লাহ এর সংশোধনের জন্য এ নীতি নির্ধারণ করেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির যেখানে সে অবস্থান করে সেখানে তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা (Privacy) রক্ষা করার অধিকার আছে এবং তার সম্মতি ও অনুমতি ছাড়া তার এ গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করা অন্য ব্যক্তির জন্য জায়েয নয়। এ হুকুমটি নাযিল হবার পর

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমাজে যেসব নিয়ম ও রীতিনীতির প্রচলন করেন আমি নীচে সেগুলো বর্ণনা করছি ঃ

এক ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিগত গোপনীয়তার এ অধিকারটিকে কেবলমাত্র গৃহের চৌহদ্দীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং একে একটি সাধারণ অধিকার গণ্য করেন। এ প্রেক্ষিতে অন্যের গৃহে উঁকি ঝুঁকি মারা, বাইর থেকে চেয়ে দেখা এমন কি অন্যের চিঠি তার অনুমতি ছাড়া পড়ে ফেলা নিষিদ্ধ। হযরত সওবান (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আজাদ করা গোলাম) বর্ননা করেছেন, নবী করীম (সা) বলেন ঃ

اذا دخل البصر فلا اذن

"দৃষ্টি যখন একবার প্রবেশ করে গেছে তখন আর নিজের প্রবেশ করার জন্য অনুমতি নেবার দরকার কি?" (আবু দাউদ)

হযরত হুযাইল ইবনে শুরাহবীল বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের কাছে এলেন এবং ঠিক তাঁর দরজার ওপর দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইলেন। নবী (সা) তাকে বললেন, هكذا عنك ، فانما الاستيذان من النظر "পিছনে সরে গিয়ে দাঁড়াও, যাতে দৃষ্টি না পড়ে সে জন্যই তো অনুমতি চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" (আবু দাউদ) নবী করীমের (সা) নিজের নিয়ম ছিল এই যে, যখন কারোর বাড়িতে যেতেন, দরজার ঠিক সামনে কখনো দাঁড়াতেন না। কারণ সে যুগে ঘরের দরজায় পরদা লটকানো থাকতো না। তিনি দরজার ডান পাশে বা বাম পাশে দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইতেন। (আবু দাউদ) রসূলুল্লাহর (সা) খাদেম হযরত আনাস বলেন, এক ব্যক্তি বাইরে থেকে রসূলের (সা) কামরার মধ্যে উঁকি দিলেন। রসূলুল্লাহর (সা) হাতে সে সময় একটি তীর ছিল। তিনি তার দিকে এভাবে এগিয়ে এলেন যেন তীরটি তার পেটে ঢুকিয়ে দেবেন। (আবু দাউদ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ননা করেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ نَظَرَ فِيْ كِتَابِ اَخِيْهِ بِغَيْرِ اِذْنِهٖ فَاِنَّمَا يَنْظُرُ فِيْ النَّارِ

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া তার পত্রে চোখ বুলালো সে যেন আগুনের মধ্যে দৃষ্টি ফেলছে।" (আবু দাউদ)

বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে, নবী (সা) বলেছেন ঃ

لَوْ اَنَّ امْرَأً اِطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَاكَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ -

"যদি কোন ব্যক্তি তোমার গৃহে উঁকি মারে এবং তুমি একটি কাঁকর মেরে তার চোখ কানা করে দাও, তাহলে তাতে কোন গোনাহ হবে না।"

এ বিষয়বস্তু সম্বলিত অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

مَنِ اطَّلَعَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَفَقَئُوْا عَيْنَهُ فَقَدْ هَدَرَتْ عَيْنَهُ

"যে ব্যক্তি কারোর ঘরে উঁকি মারে এবং ঘরের লোকেরা তার চোখ ছেঁদা করে দেয়, তবে তাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না।"

ইমাম শাফেঈ এ হাদীসটিকে একদম শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং তিনি কেউ ঘরের মধ্যে উঁকি দিলে তার চোখ ছেঁদা করে দেবার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু হানাফীগণ এর অর্থ নিয়েছেন এভাবে যে, নিছক দৃষ্টি দেবার ক্ষেত্রে এ হুকুমটি দেয়া হয়নি। বরং এটি এমন অবস্থায় প্রযোজ্য যখন কোন ব্যক্তি বিনা অনুমতিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, গৃহবাসীদের বাধা দেয়ায়ও সে নিরস্ত হয় না এবং গৃহবাসীরা তার প্রতিরোধ করতে থাকে। এ প্রতিরোধ ও সংঘাতের মধ্যে যদি তার চোখ ছেঁদা হয়ে যায় বা শরীরের কোন অংগহানি হয় তাহলে এ জন্য গৃহবাসীরা দায়ী হবে না। (আহকামুল কুরআন-জাস্‌সাস, ৩য় খণ্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা)

দুই ঃ ফকীহগণ শ্রবণ শক্তিকেও দৃষ্টিশক্তির হুকুমের অন্তরভুক্ত করেছেন। যেমন অন্ধ ব্যক্তি যদি বিনা অনুমতিতে আসে তাহলে তার দৃষ্টি পড়বে না ঠিকই কিন্তু তার কান তো গৃহবাসীদের কথা বিনা অনুমতিতে শুনে ফেলবে। এ জিনিসটিও দৃষ্টির মতো ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারে অবৈধ হস্তক্ষেপ।

তিন ঃ কেবলমাত্র অন্যের গৃহে প্রবেশ করার সময় অনুমতি নেবার হুকুম দেয়া হয়নি বরং নিজের মা-বোনদের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি নিতে হবে। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি আমার মায়ের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি চাইবো? জবাব দিলেন, হাঁ। সে বললো, আমি ছাড়া তাঁর সেবা করার আর কেউ নেই। এ ক্ষেত্রে কি আমি যতবার তাঁর কাছে যাবো প্রত্যেকবার অনুমতি নেবো? জবাব দিলেন, اتحب ان تراها عريانة "তুমি কি তোমার মাকে উলংগ অবস্থায় দেখতে পছন্দ কর?" (ইবনে জারীর এ মুরসাল হাদীসটি আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের উক্তি হচ্ছে, عليكم ان تستاذنوا على امهاتكم واخواتكم "নিজেদের মা-বোনদের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি নিয়ে যাও।" (ইবনে কাসীর) বরং ইবনে মাসউদ তো বলেন, নিজের ঘরে নিজের স্ত্রীর কাছে যাবার সময়ও অন্ততপক্ষে গলা খাঁকারী দিয়ে যাওয়া উচিত। তাঁর স্ত্রী যয়নবের বর্ণনা হচ্ছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ যখনই গৃহে আসতে থাকতেন তখনই আগেই এমন কোন আওয়াজ করে দিতেন যাতে তিনি আসছেন বলে জানা যেতো। তিনি হঠাৎ ঘরের মধ্যে এসে যাওয়া পছন্দ করতেন না। (ইবনে জারীর)

চার ঃ শুধুমাত্র এমন অবস্থায় অনুমতি চাওয়া জরুরী নয় যখন কারোর ঘরে হঠাৎ কোন বিপদ দেখা দেয়। যেমন, আগুন লাগে অথবা কোন চোর ঢোকে। এ অবস্থায় সাহায্য দান করার জন্য বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা যায়।

পাঁচ ঃ প্রথম প্রথম যখন অনুমতি চাওয়ার বিধান জারি হয় তখন লোকেরা তার নিয়ম কানুন জানতো না। একবার এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসে

এবং দরজা থেকে চিৎকার করে বলতে থাকে الج (আমি কি ভেতরে ঢুকে যাবো?) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বাঁদী রওযাহকে বলেন, এ ব্যক্তি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। একটু উঠে গিয়ে তাকে বলে এসো, السلام عليكم ادخل ؟ (আসসালামু আলাইকুম, আমি কি ভিতরে আসতে পারি?) বলতে হবে। (ইবনে জারির ও আবু দাউদ) জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমি আমার বাবার ঋণের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম এবং দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম, আমি। তিনি দু-তিনবার বললেন, "আমি? আমি?" অর্থাৎ এখানে আমি বললে কে কি বুঝবে যে, তুমি কে? (আবু দাউদ) কালাদাহ ইবনে হাম্বল নামে এক ব্যক্তি কোন কাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলেন। সালাম ছাড়াই এমনিই সেখানে গিয়ে বসলেন। তিনি বললেন, বাইরে যাও এবং আস্‌সালামু আলাইকুম বলে ভেতরে এসো। (আবু দাউদ) অনুমতি চাওয়ার সঠিক পদ্ধতি ছিল, মানুষ নিজের নাম বলে অনুমতি চাইবে। হযরত উমরের (রা) ব্যাপারে বর্ণিত আছে, নবী করীমের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে তিনি বলতেন ঃ

السلام عليكم يارسول الله ايدخل عمر ؟

"আস্‌সালামু আলাইকুম, হে আল্লাহর রসূল! উমর কি ভেতরে যাবে?" (আবু দাউদ)

অনুমতি নেবার জন্য নবী করীম (সা) বড় জোর তিনবার ডাক দেবার সীমা নির্দেশ করেছেন এবং বলেছেন যদি তিনবার ডাক দেবার পরও জবাব না পাওয়া যায়, তাহলে ফিরে যাও। (বুখারী মুসলিম, আবু দাউদ) নবী (সা) নিজেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। একবার তিনি হযরত সা'দ ইবনে উবাদার বাড়ীতে গেলেন এবং আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলে দু'বার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু ভেতর থেকে জবাব এলো না। তৃতীয় বার জবাব না পেয়ে তিনি ফিরে গেলেন। হযরত সা'দ ভেতর থেকে দৌড়ে এলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার আওয়াজ শুনছিলাম। কিন্তু আমার মন চাচ্ছিল আপনার মুবারক কণ্ঠ থেকে আমার জন্য যতবার সালাম ও রহমতের দোয়া বের হয় ততই ভালো, তাই আমি খুব নীচুস্বরে জবাব দিচ্ছিলাম। (আবু দাউদ ও আহমাদ) এ তিনবার ডাকা একের পর এক হওয়া উচিত নয় বরং একটু থেমে থেমে হতে হবে। এর ফলে ঘরের লোকেরা যদি কাজে ব্যস্ত থাকে এবং সে জন্য তারা জবাব দিতে না পারে তাহলে সে কাজ শেষ করে জবাব দেবার সুযোগ পাবে।

ছয় ঃ গৃহমালিক বা গৃহকর্তা অথবা এমন এক ব্যক্তির অনুমতি গ্রহণযোগ্য হবে যার সম্পর্কে মানুষ যথার্থই মনে করবে যে, গৃহকর্তার পক্ষ থেকে সে অনুমতি দিচ্ছে। যেমন, গৃহের খাদেম অথবা কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। কোন ছোট শিশু যদি বলে, এসে যান, তাহলে তার কথায় ভেতরে প্রবেশ করা উচিত নয়।

সাত ঃ অনুমতি চাওয়ার ব্যাপারে অযথা পীড়াপীড়ি করা অথবা অনুমতি না পাওয়ায় দরজার ওপর অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জায়েয নয়। যদি তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর গৃহকর্তার পক্ষ থেকে অনুমতি না পাওয়া যায় বা অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়, তাহলে ফিরে যাওয়া উচিত।

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن
قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾
لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا
مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

তারপর যদি সেখানে কাউকে না পাও, তাহলে তাতে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তোমাদের অনুমতি দেয়া হয়।[২৬] আর যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও তাহলে ফিরে যাবে, এটিই তোমাদের জন্য বেশী শালীন ও পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি[২৭] এবং যা কিছু তোমরা করো আল্লাহ তা খুব ভালোভাবেই জানেন। তবে তোমাদের জন্য কোন ক্ষতি নেই যদি তোমরা এমন গৃহে প্রবেশ করো যেখানে কেউ বাস করে না এবং তার মধ্যে তোমাদের কোন কাজের জিনিস আছে[২৮] তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো ও যা কিছু গোপন করো আল্লাহ সবই জানেন।

হে নবী! মু'মিন পুরুষদের বলে দাও তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে[২৯] এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করে।[৩০] এটি তাদের জন্য বেশী পবিত্র পদ্ধতি। যা কিছু তারা করে আল্লাহ তা জানেন।

২৬. অর্থাৎ কারোর শূন্য গৃহে প্রবেশ করা জায়েয নয়। তবে যদি গৃহকর্তা নিজেই প্রবেশকারীকে তার খালি ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়ে থাকে, তাহলে প্রবেশ করতে পারে। যেমন গৃহকর্তা আপনাকে বলে দিয়েছেন, যদি আমি ঘরে না থাকি, তাহলে আপনি আমার কামরায় বসে যাবেন। অথবা গৃহকর্তা অন্য কোন জায়গায় আছেন এবং আপনার আসার খবর পেয়ে তিনি বলে পাঠিয়েছেন, আপনি বসুন, আমি এখনই এসে যাচ্ছি। অন্যথায় গৃহে কেউ নেই অথবা ভেতর থেকে কেউ বলছে না নিছক এ কারণে বিনা অনুমতিতে ভেতরে ঢুকে যাওয়া কারোর জন্য বৈধ নয়।

২৭. অর্থাৎ এ জন্য নারাজ হওয়া বা মন খারাপ করা উচিত নয়। কোন ব্যক্তি যদি কারো সাথে দেখা করতে না চায় তাহলে তার অস্বীকার করার অধিকার আছে। অথবা কোন কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে সে অক্ষমতা জানিয়ে দিতে পারে। ফকীহগণ ارجعوا (ফিরে যাও) এর হুকুমের এ অর্থ নিয়েছেন যে, এ অবস্থায় দরজার সামনে গ্যাঁট হয়ে

দাঁড়িয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই বরং সেখান থেকে সরে যাওয়া উচিত। অন্যকে সাক্ষাত দিতে বাধ্য করা অথবা তার দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে তাকে বিরক্ত করতে থাকার অধিকার কোন ব্যক্তির নেই।

২৮. এখানে মূলত হোটেল, সরাইখানা, অতিথিশালা, দোকান, মুসাফির খানা ইত্যাদি যেখানে লোকদের জন্য প্রবেশের সাধারণ অনুমতি আছে সেখানকার কথা বলা হচ্ছে।

২৯. মূল শব্দগুলো হচ্ছে يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ এখানে غَضٌّ মানে হচ্ছে, কোন জিনিস কম করা, হ্রাস করা ও নিচু করা। غض بصر এর অনুবাদ সাধারণত করা হয়, "দৃষ্টি নামিয়ে নেয়া বা রাখা।" কিন্তু আসলে এ হুকুমের অর্থ সবসময় দৃষ্টি নিচের দিকে রাখা নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, পূর্ণ দৃষ্টিভরে না দেখা এবং দেখার জন্য দৃষ্টিকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে না দেয়া। "দৃষ্টি সংযত রাখা" থেকে এ অর্থ ভালোভাবে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ যে জিনিসটি দেখা সংগত নয় তার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে হবে। এ জন্য দৃষ্টি নত করাও যায় আবার অন্য কোন দিকে নজর ঘুরিয়েও নেয়া যায়। مِنْ اَبْصَارِهِمْ এর মধ্যে مِنْ (মিন) "কিছু" বা "কতক" অর্থ প্রকাশ করছে। অর্থাৎ সমস্ত দৃষ্টি সংযত করার হুকুম দেয়া হয়নি বরং কোন কোন দৃষ্টি সংযত করতে বলা হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, আল্লাহর উদ্দেশ্য এ নয় যে, কোন জিনিসই পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয় বরং তিনি কেবলমাত্র একটি বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে দৃষ্টির ওপর এ বিধি-নিষেধ আরোপ করতে চান। এখন পূর্বাপর আলোচনা থেকে জানা যায়, এ বিধি-নিষেধ যে জিনিসের ওপর আরোপ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে, পুরুষদের মহিলাদেরকে দেখা অথবা অন্যদের লজ্জাস্থানে দৃষ্টি দেয়া কিংবা অশ্লীল দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকা।

আল্লাহর কিতাবের এ হুকুমটির যে ব্যাখ্যা হাদীস করেছে তার বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেয়া হলো ঃ

এক ঃ নিজের স্ত্রী বা মুহাররাম নারীদের ছাড়া কাউকে নজর ভরে দেখা মানুষের জন্য জায়েয নয়। একবার হঠাৎ নজর পড়ে গেলে ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় মনে হলে সেখানে আবার দৃষ্টিপাত করা ক্ষমাযোগ্য নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের দেখাকে চোখের যিনা বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মানুষ তার সমগ্র ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যিনা করে। দেখা হচ্ছে চোখের যিনা, ফুসলানো কণ্ঠের যিনা, তৃপ্তির সাথে কথা শোনা কানের যিনা, হাত লাগানো ও অবৈধ উদ্দেশ্য নিয়ে চলা হাত ও পায়ের যিনা। ব্যভিচারের এ যাবতীয় ভূমিকা যখন পুরোপুরি পালিত হয় তখন লজ্জাস্থানগুলো তাকে পূর্ণতা দান করে অথবা পূর্ণতা দান থেকে বিরত থাকে। (বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ) হযরত বুরাইদাহ বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলীকে (রা) বলেন ঃ

يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَاِنَّ لَكَ الْاُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ

"হে আলী! এক নজরের পর দ্বিতীয় নজর দিয়ো না। প্রথম নজর তো ক্ষমাপ্রাপ্ত কিন্তু দ্বিতীয় নজরের ক্ষমা নেই।" (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী)

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ চোখ পড়ে গেলে কি করবো? বললেন, চোখ ফিরিয়ে নাও অথবা নামিয়ে নাও। (মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রেওয়ায়াত করেছেন, নবী (সা) আল্লাহর উক্তি বর্ণনা করেছেন ঃ

اِنَّ النَّظْرَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ مَسْمُوْمٌ مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِىْ اَبْدَلْتُهُ اِيْمَانًا يَجِدُ حَلاَوَتَهُ فِىْ قَلْبِهِ -

"দৃষ্টি হচ্ছে ইবলীসের বিষাক্ত তীরগুলোর মধ্য থেকে একটি তীর, যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে তা ত্যাগ করবে আমি তার বদলে তাকে এমন ঈমান দান করবো যার মিষ্টি সে নিজের হৃদয়ে অনুভব করবে"। (তাবারানী)

আবু উমামাহ রেওয়ায়াত করেছেন, নবী (সা) বলেন ঃ

مَامِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ اِلَى مَحَاسِنِ اَمْرَاَةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ اِلاَّ اَخْلَفَ اللّٰهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلاَوَتَهَا -

"যে মুসলমানের দৃষ্টি কোন মেয়ের সৌন্দর্যের ওপর পড়ে এবং সে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, এ অবস্থায় আল্লাহ তার ইবাদাতে বিশেষ স্বাদ সৃষ্টি করে দেন।" (মুসনাদে আহমাদ)

ইমাম জা'ফর সাদেক তাঁর পিতা ইমাম মুহাম্মাদ বাকের থেকে এবং তিনি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারীর থেকে রেওয়ায়াত করেছেন ঃ বিদায় হজ্জের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাত ভাই ফযল ইবনে আব্বাস (তিনি সে সময় ছিলেন একজন উঠতি তরুণ) মাশ'আরে হারাম থেকে ফেরার পথে নবী করীমের (সা) সাথে তাঁর উটের পিঠে বসেছিলেন। পথে মেয়েরা যাচ্ছিল। ফযল তাদেরকে দেখতে লাগলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখের ওপর হাত রাখলেন এবং তাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন। (আবু দাউদ) এ বিদায় হজ্জেরই আর একটি ঘটনা। খাস্'আম গোত্রের একজন মহিলা পথে রসূলুল্লাহকে (সা) থামিয়ে দিয়ে হজ্জ সম্পর্কে একটি বিধান জিজ্ঞেস করছিলেন। ফযল ইবনে আব্বাস তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখ ধরে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন। (বুখারী, তিরমিযী, আবু দাউদ)

দুই ঃ এ থেকে কেউ যেন এ ভুল ধারণা করে না বসেন যে, নারীদের মুখ খুলে চলার সাধারণ অনুমতি ছিল তাইতো চোখ সংযত করার হুকুম দেয়া হয়। অন্যথায় যদি চেহারা ঢেকে রাখার হুকুম দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে আবার দৃষ্টি সংযত করার বা না করার প্রশ্ন আসে কেন? এ যুক্তি বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়েও ভুল এবং ঘটনার দিক দিয়েও সঠিক নয়। বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে এর ভুল হবার কারণ হচ্ছে এই যে, চেহারার পরদা সাধারণভাবে প্রচলিত হয়ে যাবার পরও হঠাৎ কোন নারী ও পুরুষের সামনাসামনি হয়ে যাবার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। আর একজন পরদানশীন মহিলারও কখনো মুখ খোলার

প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। অন্যদিকে মুসলমান মহিলারা পরদা করা সত্ত্বেও অমুসলিম নারীরা তো সর্বাবস্থায় পরদার বাইরেই থাকবে। কাজেই নিছক দৃষ্টি সংযত করার হুকুমটি মহিলাদের মুখ খুলে ঘোরাফেরা করাকে অনিবার্য করে দিয়েছে, এ যুক্তি এখানে পেশ করা যেতে পারে না। আর ঘটনা হিসেবে এটা ভুল হবার কারণ এই যে, সূরা আহযাবে হিজাবের বিধান নাযিল হবার পরে মুসলিম সমাজে যে পরদার প্রচলন করা হয়েছিল চেহারার পরদা তার অন্তরভুক্ত ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক যুগে এর প্রচলন হবার ব্যাপারটি বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অপবাদের ঘটনা সম্পর্কে হযরত আয়েশার হাদীস অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত। তাতে তিনি বলেন, জংগল থেকে ফিরে এসে যখন দেখলাম কাফেলা চলে গেছে তখন আমি বসে পড়লাম এবং ঘুম আমার দু'চোখের পাতায় এমনভাবে জেঁকে বসলো যে, আমি ওখানেই ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তাল সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। দূর থেকে কাউকে ওখানে পড়ে থাকতে দেখে কাছে এলেন।

فَعَرَفَنِىْ حِيْنَ رَأَنِىْ وَكَانَ قَدْ رَآنِىْ قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِىْ فَخَمَّرْتُ وَجْهِىْ بِجِلْبَابِىْ -

"তিনি আমাকে দেখতেই চিনে ফেললেন। কারণ পরদার হুকুম নাযিল হবার আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে চিনে ফেলে যখন তিনি 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন' পড়লেন তখন তাঁর আওয়াজে আমার চোখ খুলে গেলো এবং নিজের চাদরটি দিয়ে মুখ ঢেকে নিলাম।" (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, ইবনে জারীর, সীরাতে ইবনে হিশাম)

আবু দাউদের কিতাবুল জিহাদে একটি ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে উম্মে খাল্লাদ নাম্নী এক মহিলার ছেলে এক যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছিল। তিনি তার সম্পর্কে জানার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। কিন্তু এ অবস্থায়ও তার চেহারা নেকাব আবৃত ছিল। কোন কোন সাহাবী অবাক হয়ে বললেন, এ সময়ও তোমার মুখ নেকাবে আবৃত? অর্থাৎ ছেলের শাহাদাতের খবর শুনে তো একজন মায়ের শরীরের প্রতি কোন নজর থাকে না, বেহুঁশ হয়ে পড়ে অথচ তুমি এক দম নিশ্চিন্তে নিজেকে পরদাবৃত করে এখানে হাজির হয়েছো ! জবাবে তিনি বলতে লাগলেন : ان ارزا ابنى فلن ارزا حيائى "আমি পুত্র তো হারিয়েছি ঠিকই কিন্তু লজ্জা তো হারাইনি"। আবু দাউদেই হযরত আয়েশার হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, এক মহিলা পরদার পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন পেশ করেন। রসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেন, এটা মহিলার হাত না পুরুষের? মহিলা বলেন, মহিলারই হাত। বলেন, "নারীর হাত হলে তো কমপক্ষে নখ মেহেদী রঞ্জিত হতো।" আর হজ্জের সময়ের যে দু'টি ঘটনার কথা আমরা ওপরে বর্ণনা করে এসেছি সেগুলো নববী যুগে চেহারা খোলা রাখার পক্ষে দলীল হতে পারে না। কারণ ইহ্‌রামের পোশাকে নেকাব ব্যবহার নিষিদ্ধ। তবুও এ অবস্থায়ও সাবধানী মেয়েরা ভিন্ পুরুষদের সামনে চেহারা খোলা রাখা পছন্দ করতেন না। হযরত আয়েশার বর্ণনা, বিদায় হজ্জের সফরে আমরা ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় মক্কার দিকে যাচ্ছিলাম। মুসাফিররা যখন

আমাদের কাছ দিয়ে যেতে থাকতো তখন আমরা মেয়েরা নিজেদের মাথা থেকে চাদর টেনে নিয়ে মুখ ঢেকে নিতাম এবং তারা চলে যাবার পর মুখ আবরণমুক্ত করতাম। (আবু দাউদ, অধ্যায় ঃ মুখ আবৃত করা যেখানে হারাম)

তিন ঃ যেসব অবস্থায় কোন স্ত্রীলোককে দেখার কোন যথার্থ প্রয়োজন থাকে কেবলমাত্র সেগুলোই দৃষ্টি সংযত করার হুকুমের বাইরে আছে। যেমন কোন ব্যক্তি কোন মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। এ উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র মেয়েটিকে দেখার অনুমতি আছে। বরং দেখাটা কমপক্ষে মুস্তাহাব তো অবশ্যই। মুগীরাহ ইবনে শু'বা বর্ণনা করেন, আমি এক জায়গায় বিয়ের প্রস্তাব দেই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, মেয়েটিকে দেখে নিয়েছো তো? আমি বলি, না। বলেন ঃ

انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما

"তাকে দেখে নাও। এর ফলে তোমাদের মধ্যে অধিকতর একাত্মতা সৃষ্টি হওয়ার আশা আছে।" (আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারেমী)

আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি কোথাও বিয়ের পয়গাম দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ انظر اليها فان فى اعين الانصار شيئا "মেয়েটিকে দেখে নাও। কারণ আনসারদের চোখে কিছু দোষ থাকে।" (মুসলিম, নাসাঈ, আহমাদ)

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَقَدَرَ اَنْ يَّرٰى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوْهُ اِلٰى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ -

"তোমাদের কেউ যখন কোন মেয়েকে বিয়ে করার ইচ্ছা করে তখন যতদূর সম্ভব তাকে দেখে নিয়ে এ মর্মে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত যে, মেয়েটির মধ্যে এমন কোন গুণ আছে যা তাকে বিয়ে করার প্রতি আকৃষ্ট করে।" (আহমাদ ও আবু দাউদ)

মুসনাদে আহমাদে আবু হুমাইদাহর বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) এ উদ্দেশ্যে দেখার অনুমতিকে فلاجناح عليه শব্দগুলোর সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ এমনটি করায় ক্ষতির কিছু নেই। তাছাড়া মেয়েটির অজান্তেও তাকে দেখার অনুমতি দিয়েছেন। এ থেকেই ফকীহগণ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অন্যভাবে দেখার বৈধতার বিধানও উদ্ভাবন করেছেন। যেমন অপরাধ অনুসন্ধান প্রসংগে কোন সন্দেহজনক মহিলাকে দেখা অথবা আদালতে সাক্ষ দেবার সময় কাযীর কোন মহিলা সাক্ষীকে দেখা কিংবা চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের রুগিনীকে দেখা ইত্যাদি।

চার ঃ দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশের এ অর্থও হতে পারে যে, কোন নারী বা পুরুষের সতরের প্রতি মানুষ দৃষ্টি দেবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ اِلٰى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ اِلٰى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ -

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ

আর হে নবী! মু'মিন মহিলাদের বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে[৩১] এবং তাদের লজ্জাস্থানগুলোর হেফাজত করে[৩২] আর[৩৩] তাদের সাজসজ্জা না দেখায়,[৩৪] যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় তা ছাড়া।[৩৫] আর তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল দিয়ে তাদের বুক ঢেকে রাখে।[৩৬]

"কোন পুরুষ কোন পুরুষের লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দেবে না এবং কোন নারী কোন নারীর লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দেবে না।" (আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

হযরত আলী (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, নবী করীম (সা) আমাকে বলেন ঃ لاتنظر الى فخذ حى ولا ميت "কোন জীবিত বা মৃত মানুষের রানের ওপর দৃষ্টি দিয়ো না।" (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

৩০. লজ্জাস্থানের হেফাজত অর্থ নিছক প্রবৃত্তির কামনা থেকে দূরে থাকা নয় বরং নিজের লজ্জাস্থানকে অন্যের সামনে উন্মুক্ত করা থেকে দূরে থাকাও বুঝায়। পুরুষের জন্য সতর তথা লজ্জাস্থানের সীমানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ عورة الرجل مابين سرتة الى ركبته "পুরুষের সতর হচ্ছে তার নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত।" (দারকুতনী ও বাইহাকী) শরীরের এ অংশ স্ত্রী ছাড়া আর কারোর সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে খোলা হারাম। আসহাবে সুফ্ফার দলভুক্ত হযরত জারহাদে আসলামী বর্ণনা করেছেন, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে আমার রান খোলা অবস্থায় ছিল। নবী করীম (সা) বললেন ঃ اما علمت ان الفخذ عورة ؟ "তুমি কি জানো না, রান ঢেকে রাখার জিনিস?" (তিরমিযী, আবু দাউদ, মুআত্তা) হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ لا تبرز (يا لا تكشف) فخذك "নিজের রান কখনো খোলা রাখবে না।" (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) কেবল অন্যের সামনে নয়, একান্তেও উলংগ থাকা নিষিদ্ধ। তাই নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

اِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّىَ فَاِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَايُفَارِقُكُمْ اِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِيْنَ يُفْضِى الرَّجُلُ اِلَى اَهْلِهٖ فَاسْتَحْيُوْهُمْ وَاَكْرِمُوْهُمْ -

"সাবধান, কখনো উলংগ থেকো না। কারণ তোমাদের সাথে এমন সত্তা আছে যারা কখনো তোমাদের থেকে আলাদা হয় না (অর্থাৎ কল্যাণ ও রহমতের ফেরেশতা),

তোমরা যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দাও অথবা স্ত্রীদের কাছে যাও সে সময় ছাড়া। কাজেই তাদের থেকে লজ্জা করো এবং তাদেরকে সম্মান করো।" (তিরমিযী)

অন্য একটি হাদীসে নবী করীম (সা) বলেন ঃ

احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك

"নিজের স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া বাকি সবার থেকে নিজের সতরের হেফাজত করো।"

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, আর যখন আমরা একাকী থাকি? জবাব দেন ঃ فالله تبارك وتعالى احق ان يستحيا منه "এ অবস্থায় আল্লাহ থেকে লজ্জা করা উচিত, তিনিই এর বেশী হকদার।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)।

৩১. নারীদের জন্যও পুরুষদের মতো দৃষ্টি সংযমের একই বিধান রয়েছে। অর্থাৎ তাদের ইচ্ছা করে ভিন্ পুরুষদের দেখা উচিত নয়। ভিন্ পুরুষদের প্রতি দৃষ্টি পড়ে গেলে ফিরিয়ে নেয়া উচিত এবং অন্যদের সতর দেখা থেকে দূরে থাকা উচিত। কিন্তু পুরুষদের পক্ষে মেয়েদেরকে দেখার তুলনায় মেয়েদের পক্ষে পুরুষদেরকে দেখার ব্যাপারে কিছু ভিন্ন বিধান রয়েছে। একদিকে হাদীসে আমরা এ ঘটনা পাচ্ছি যে, হযরত উম্মে সালামাহ ও হযরত উম্মে মাইমূনাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসেছিলেন এমন সময় হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম এসে গেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় স্ত্রীকে বললেন, احتجبا منه "তার থেকে পরদা করো।" স্ত্রীরা বললেন ঃ

يا رسول الله اليس اعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا

"হে আল্লাহর রসূল! তিনি কি অন্ধ নন? তিনি আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না এবং চিনতেও পাচ্ছেন না।" বললেন ঃ افعميا وان انتما الستما تبصرانه "তোমরা দুজনও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছো না?" হযরত উম্মে সালামাহ (রা) পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, ذالك بعد ان امر بالحجاب "এটা যখন পরদার হুকুম নাযিল হয়নি সে সময়কার ঘটনা"। (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী) এবং মুআত্তার একটি রেওয়ায়াত এর সমর্থন করে, যাতে বলা হয়েছে ঃ হযরত আয়েশার কাছে একজন অন্ধ এলেন এবং তিনি তার থেকে পরদা করলেন। বলা হলো, আপনি এর থেকে পরদা করছেন কেন? এ-তো আপনাকে দেখতে পারে না। উম্মুল মু'মিনীন (রা) এর জবাবে বললেন ঃ لكنى انظر اليه "কিন্তু আমি তো তাকে দেখছি।" অন্যদিকে আমরা হযরত আয়েশার একটি হাদীস পাই, তাতে দেখা যায়, ৭ হিজরী সনে হাবশীদের প্রতিনিধি দল মদীনায় এলো এবং তারা মসজিদে নববীর চত্বরে একটি খেলার আয়োজন করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে হযরত আয়েশাকে এ খেলা দেখালেন। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ) তৃতীয় দিকে আমরা দেখি, ফাতেমা বিনতে কায়েসকে যখন তাঁর স্বামী তিন তালাক দিলেন তখন প্রশ্ন দেখা দিল তিনি কোথায় ইদ্দত পালন করবেন। প্রথমে নবী করীম (সা) বললেন, উম্মে শরীক আনসারীয়ার কাছে থাকো। তারপর বললেন, তার কাছে আমার সাহাবীগণ অনেক বেশী যাওয়া আশা করে (কারণ তিনি ছিলেন একজন বিপুল ধনশালী ও দানশীলা মহিলা। বহু লোক তাঁর বাড়িতে মেহমান থাকতেন এবং তিনি তাদের মেহমানদারী

করতেন।) কাজেই তুমি ইবনে উম্মে মাকতুমের ওখানে থাকো। সে অন্ধ। তুমি তার ওখানে নিসংকোচে থাকতে পারবে।" (মুসলিম ও আবু দাউদ)

এসব বর্ণনা একত্র করলে জানা যায়, পুরুষদেরকে দেখার ব্যাপারে মহিলাদের ওপর তেমন বেশী কড়াকড়ি নেই যেমন মহিলাদেরকে দেখার ব্যাপারে পুরুষদের ওপর আরোপিত হয়েছে। এক মজলিসে মুখোমুখি বসে দেখা নিষিদ্ধ। পথ চলার সময় অথবা দূর থেকে কোন কোন জায়েয খেলা দেখতে গিয়ে পুরুষদের ওপর দৃষ্টি পড়া নিষিদ্ধ নয়। আর কোন যথার্থ প্রয়োজন দেখা দিলে একই বাড়িতে থাকা অবস্থায়ও দেখলে কোন ক্ষতি নেই। ইমাম গাযযালী ও ইবনে হাজার আসকালানীও হাদীসগুলো থেকে প্রায় এ একই ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। শাওকানী নাইলুল আওতারে ইবনে হাজারের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, "এ থেকেও বৈধতার প্রতি সমর্থন পাওয়া যায় যে, মেয়েদের বাইরে বের হবার ব্যাপারে সবসময় বৈধতাকেই কার্যকর করা হয়েছে। মসজিদে, বাজারে এবং সফরে মেয়েরা তো মুখে নেকাব দিয়ে যেতো, যাতে পুরুষরা তাদেরকে না দেখে। কিন্তু পুরুষদেরকে কখনো এ হুকুম দেয়া হয়নি যে, তোমরাও নেকাব পরো, যাতে মেয়েরা তোমাদেরকে না দেখে। এ থেকে জানা যায়, উভয়ের ব্যাপারে হুকুমের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে।" (৬ষ্ঠ খণ্ড, ১০১ পৃষ্ঠা) তবুও মেয়েরা নিশ্চিন্তে পুরুষদেরকে দেখবে এবং তাদের সৌন্দর্য উপভোগ করতে থাকবে, এটা কোনক্রমেই জায়েয নয়।

৩২. অর্থাৎ অবৈধ যৌন উপভোগ থেকে দূরে থাকে এবং নিজের সতর অন্যের সামনে উন্মুক্ত করাও পরিহার করে। এ ব্যাপারে মহিলাদের ও পুরুষদের জন্য একই বিধান, কিন্তু নারীদের সতরের সীমানা পুরুষদের থেকে আলাদা। তাছাড়া মেয়েদের সতর মেয়েদের ও পুরুষদের জন্য আবার ভিন্ন ভিন্ন।

পুরুষদের জন্য মেয়েদের সতর হাত ও মুখ ছাড়া তার সারা শরীর। স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষ এমন কি বাপ ও ভাইয়ের সামনেও তা খোলা উচিত নয়। মেয়েদের এমন পাতলা বা চোস্ত পোশাক পরা উচিত নয় যার মধ্য দিয়ে শরীর দেখা যায় বা শরীরের গঠন কাঠামো ভেতর থেকে ফুটে উঠতে থাকে। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, তাঁর বোন হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আসেন। তখন তিনি পাতলা কাপড় পরে ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সা) সংগে সংগেই মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন ঃ

يَا اَسْمَاءُ اِنَّ الْمَرْاَةَ اِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ يَصْلُحْ لَهَا اَنْ يُّرٰى مِنْهَا اِلاَّ وَهٰذَا وَاَشَارَ اِلٰى وَجْهِهٖ وَكَفَّيْهِ -

"হে আসমা! কোন মেয়ে যখন বালেগ হয়ে যায় তখন তার মুখ ও হাত ছাড়া শরীরের কোন অংশ দেখা যাওয়া জায়েয নয়।" (আবু দাউদ)

এ ধরনের আর একটি ঘটনা ইবনে জারীর হযরত আয়েশা থেকে উদ্ধৃত করেছেন ঃ তাঁর কাছে তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই আবদুল্লাহ ইবনুত তোফায়েলের মেয়ে আসেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহে প্রবেশ করে তাকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নেন। হযরত আয়েশা বলেন, হে আল্লাহর রসূল! এ হচ্ছে আমার ভাইয়ের মেয়ে। তিনি বলেন ঃ

اِذَا عَرَكَتِ الْمَرْاَةُ لَمْ يَحِلَّ لَهَا اَنْ تُظْهِرَ اِلاَّ وَجْهَهَا وَالاَّ مَا دُوْنَ هٰذَا وَقَبَضَ عَلٰى ذِرَاعِ نَفْسِهِ وَتَرَكَ بَيْنَ قَبْضَتِهِ وَبَيْنَ الْكَفِّ مِثْلَ قَبْضَةٍ اُخْرٰى –

"মেয়ে যখন বালেগ হয়ে যায় তখন তার জন্য নিজের মুখ ও হাত ছাড়া আর কিছু বের করে রাখা হালাল নয়, আর নিজের কব্জির ওপর হাত রেখে হাতের সীমানা তিনি এভাবে বর্ণনা করেন যে, তাঁর মুঠি ও হাতের তালুর মধ্যে মাত্র এক মুঠি পরিমাণ জায়গা খালি থাকে।"

এ ব্যাপারে শুধুমাত্র এতটুকু সুযোগ আছে যে, ঘরের কাজকর্ম করার জন্য মেয়েদের শরীরের যতটুকু অংশ খোলার প্রয়োজন দেখা দেয় নিজেদের মুহাররাম আত্মীয়দের (যেমন বাপ–ভাই ইত্যাদি) সামনে মেয়েরা শরীরের কেবলমাত্র ততটুকু অংশই খুলতে পারে। যেমন আটা মাখাবার সময় হাতের আস্তিন গুটানো অথবা ঘরের মেঝে ধুয়ে ফেলার সময় পায়ের কাপড় কিছু ওপরের দিকে তুলে নেয়া।

আর মহিলাদের জন্য মহিলাদের সতরের সীমারেখা হচ্ছে পুরুষদের জন্য পুরুষদের সতরের সীমারেখার মতই। অর্থাৎ নাভি ও হাঁটুর মাঝখানের অংশ। এর অর্থ এ নয় যে, মহিলাদের সামনে মহিলারা অর্ধ উলংগ থাকবে। বরং এর অর্থ শুধুমাত্র এই যে, নাভি ও হাঁটুর মাঝখানের অংশটুকু ঢাকা হচ্ছে ফরয এবং অন্য অংশগুলো ঢাকা ফরয নয়।

৩৩. এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর শরীয়াত নারীদের কাছে শুধুমাত্র এতটুকুই দাবী করে না যতটুকু পুরুষদের কাছে করে। অর্থাৎ দৃষ্টি সংযত করা এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করা। বরং তাদের কাছ থেকে আরো বেশী কিছু দাবী করে। এ দাবী পুরুষদের কাছে করেনি। পুরুষ ও নারী যে এ ব্যাপারে সমান নয় তা এ থেকে পরিষ্কার প্রকাশ হয়।

৩৪. আমি زِيْنَت শব্দের অনুবাদ করেছি "সাজসজ্জা"। এর দ্বিতীয় আর একটি অনুবাদ হতে পারে প্রসাধন। তিনটি জিনিসের ওপর এটি প্রযুক্ত হয়। সুন্দর কাপড়, অলংকার এবং মাথা, মুখ, হাত, পা ইত্যাদির বিভিন্ন সাজসজ্জা, যেগুলো সাধারণত মেয়েরা করে থাকে। আজকের দুনিয়ায় এ জন্য "মেকআপ" (Makeup) শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ সাজসজ্জা কাকে দেখানো যাবে না এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা সামনের দিকে আসছে।

৩৫. তাফসীরগুলোর বিভিন্ন বর্ণনা এ আয়াতটির অর্থ যথেষ্ট অস্পষ্ট করে তুলেছে। অন্যথায় কথাটি মোটেই অস্পষ্ট নয়, একেবারেই পরিষ্কার। প্রথম বাক্যাংশে বলা হয়েছে لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ অর্থাৎ "তারা যেন নিজেদের সাজসজ্জা ও প্রসাধন প্রকাশ না করে।" আর দ্বিতীয় বাক্যাংশে اِلَّا শব্দটি বলে এ নিষেধাজ্ঞায় যেসব জিনিসকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার মধ্যে যাকে আলাদা তথা নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে তা হচ্ছে, مَا ظَهَرَ مِنْهَا "যা কিছু এ সাজসজ্জা থেকে আপনা আপনি প্রকাশ হয় বা প্রকাশ হয়ে যায়।" এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, মহিলাদের নিজেদের স্বেচ্ছায় এগুলো প্রকাশ ও এসবের প্রদর্শনী না করা উচিত। তবে যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় (যেমন চাদর বাতাসে উড়ে যাওয়া এবং কোন আভরণ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া) অথবা যা নিজে নিজে প্রকাশিত (যেমন ওপরে যে

চাদরটি জড়ানো থাকে, কারণ কোনক্রমেই তাকে লুকানো তো সম্ভব নয় আর নারীদের শরীরের সাথে লেপটে থাকার কারণে মোটামুটিভাবে তার মধ্যেও স্বতস্ফূর্তভাবে একটি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যায়) সে জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন জবাবদিহি নেই। এ আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করেছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন ও ইবরাহীম নাখঈ। পক্ষান্তরে কোন কোন মুফাসসির ما ظهر منها এর অর্থ নিয়েছেন ঃ ما يظهره الانسان على العادة الجارية (মানুষ স্বাভাবিকভাবে যা প্রকাশ করে দেয়) এবং তারপর তারা এর মধ্যে শামিল করে দিয়েছেন মুখ ও হাতকে তাদের সমস্ত সাজসজ্জাসহ। অর্থাৎ তাদের মতে মহিলারা তাদের গালে রুজ পাউডার, ঠোঁটে লিপষ্টিক ও চোখে সুরমা লাগিয়ে এবং হাতে আংটি, চুড়ি ও কংকন ইত্যাদি পরে তা উন্মুক্ত রেখে লোকদের সামনে চলাফেরা করবে। ইবনে আব্বাস (রা) ও তাঁর শিষ্যগণ এ অর্থ বর্ণনা করেছেন। হানাফী ফকীহদের একটি বিরাট অংশও এ অর্থ গ্রহণ করেছেন। (আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস, ৩য় খণ্ড, ৩৮৮–৩৮৯ পৃষ্ঠা) কিন্তু আরবী ভাষার কোন্ নিয়মে ما ظهر কে ما يظهر এর অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে তা আমি বুঝতে অক্ষম। "প্রকাশ হওয়া" ও "প্রকাশ করার" মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এবং আমরা দেখি কুরআন স্পষ্টভাবে "প্রকাশ করা" থেকে বিরত রেখে "প্রকাশ হওয়া"র ব্যাপারে অবকাশ দিচ্ছে। এ অবকাশকে "প্রকাশ করা" পর্যন্ত বিস্তৃত করা কুরআনেরও বিরোধী এবং এমন সব হাদীসেরও বিরোধী যেগুলো থেকে প্রমাণ হয় যে, নববী যুগে হিজাবের হুকুম এসে যাবার পর মহিলারা মুখ খুলে চলতো না, হিজাবের হুকুমের মধ্যে চেহারার পরদাও শামিল ছিল এবং ইহরাম ছাড়া অন্যান্য সব অবস্থায় নেকাবকে মহিলাদের পোশাকের একটি অংশে পরিণত করা হয়েছিল। তারপর এর চাইতেও বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এ অবকাশের পক্ষে যুক্তি হিসেবে একথা পেশ করা হয় যে, মুখ ও হাত মহিলাদের সতরের অন্তরভুক্ত নয়। অথচ সতর ও হিজাবের মধ্যে যমীন আসমান ফারাক। সতর মুহাররাম পুরুষদের সামনে খোলাও জায়েয নয়। আর হিজাব তো সতরের অতিরিক্ত একটি জিনিস, যাকে নারীদের ও গায়ের মুহাররাম পুরুষদের মাঝখানে আটকে দেয়া হয়েছে এবং এখানে সতরের নয় বরং হিজাবের বিধান আলোচ্য বিষয়।

৩৬. জাহেলী যুগে মহিলারা মাথায় এক ধরনের আঁটসাঁট বাঁধন দিতো। মাথার পেছনে চুলের খোঁপার সাথে এর গিরো বাঁধা থাকতো। সামনের দিকে বুকের একটি অংশ খোলা থাকতো। সেখানে গলা ও বুকের ওপরের দিকের অংশটি পরিষ্কার দেখা যেতো। বুকে জামা ছাড়া আর কিছুই থাকতো না। পেছনের দিকে দুটো তিনটে খোঁপা দেখা যেতো। (তাফসীরে কাশ্‌শাফ, ২য় খণ্ড, ৯০ পৃষ্ঠা, ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড ২৮৩–২৮৪ পৃষ্ঠা) এ আয়াত নাযিল হবার পর মুসলমান মহিলাদের মধ্যে ওড়নার প্রচলন করা হয়। আজকালকার মেয়েদের মতো তাকে ভাঁজ করে পেঁচিয়ে গলার মালা বানানো এর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এটি শরীরে জড়িয়ে মাথা, কোমর, বুক ইত্যাদি সব ভালোভাবে ঢেকে নেয়া ছিল এর উদ্দেশ্য। মু'মিন মহিলারা কুরআনের এ হুকুমটি শোনার সাথে সাথে যেভাবে একে কার্যকর করে হযরত আয়েশা (রা) তার প্রশংসা করে বলেন ঃ সূরা নূর নাযিল হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে তা শুনে লোকেরা ঘরে ফিরে আসে এবং নিজেদের স্ত্রী, মেয়ে ও বোনদের আয়াতগুলো শোনায়। আনসারদের মেয়েদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যে وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ বাক্যাংশ শোনার

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ
غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ
النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

তারা যেন তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে, তবে নিম্নোক্তদের সামনে ছাড়া[৩৭] স্বামী, বাপ, স্বামীর বাপ,[৩৮] নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে,[৩৯] ভাই,[৪০] ভাইয়ের ছেলে,[৪১] বোনের ছেলে,[৪২] নিজের মেলামেশার মেয়েদের,[৪৩] নিজের মালিকানাধীনদের,[৪৪] অধীনস্থ পুরুষদের যাদের অন্য কোন রকম উদ্দেশ্য নেই[৪৫] এবং এমন শিশুদের সামনে ছাড়া যারা মেয়েদের গোপন বিষয় সম্পর্কে এখনো অজ্ঞ।[৪৬] তারা যেন নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা লুকিয়ে রেখেছে তা লোকদের সামনে প্রকাশ করে দেবার উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে।[৪৭]

হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো,[৪৮] আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।[৪৯]

পর নিজের জায়গায় চুপটি করে বসে ছিল। প্রত্যেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল। অনেকে নিজের কোমরে বাঁধা কাপড় খুলে নিয়ে আবার অনেকে চাদর তুলে নিয়ে সংগে সংগেই ওড়না বানিয়ে ফেলল এবং তা দিয়ে শরীর ঢেকে ফেললো। পরদিন ফজরের নামাযের সময় যতগুলো মহিলা মসজিদে নববীতে হাজির হয়েছিল তাদের সবাই দোপাট্টা ও ওড়না পরা ছিল। এ সম্পর্কিত অন্য একটি হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) আরো বিস্তারিত বর্ণনা করে বলেন : মহিলারা পাত্‌লা কাপড় পরিত্যাগ করে নিজেদের মোটা কাপড় বাছাই করে তা দিয়ে ওড়না তৈরী করে। (ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ২৮৪ পৃঃ এবং আবু দাউদ, পোশাক অধ্যায়)

ওড়না পাত্‌লা কাপড়ের না হওয়া উচিত। এ বিধানগুলোর মেজাজ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করলে এ বিষয়টি নিজে নিজেই উপলব্ধি করা যায়। কাজেই আনসারদের মহিলারা হুকুম শুনেই বুঝতে পেরেছিল কোন্ ধরনের কাপড় দিয়ে ওড়না তৈরী করলে এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। কিন্তু শরীয়াত প্রবর্তক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথাটিকে শুধুমাত্র লোকদের বোধ ও উপলব্ধির ওপর ছেড়ে দেননি বরং তিনি নিজেই এর ব্যাখ্যা করে

দিয়েছেন। দেহ্ইয়াহ কাল্বী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মিসরের তৈরী সূক্ষ্ম মল্মল্ (কাবাতী) এলো। তিনি তা থেকে একটুকরা আমাকে দিলেন এবং বললেন, এখান থেকে কেটে এক খণ্ড দিয়ে তোমার নিজের জামা তৈরী করে নাও এবং এক অংশ দিয়ে তোমার স্ত্রীর দোপাট্টা বানিয়ে দাও, কিন্তু তাকে বলে দেবে تجعل تحته ثوبا لا يصفها এর নিচে যেন আর একটি কাপড় লাগিয়ে নেয়, যাতে শরীরের গঠন ভেতর থেকে দেখা না যায়।" (আবু দাউদ, পোশাক অধ্যায়)।

৩৭. অর্থাৎ যাদের মধ্যে একটি মহিলা তার পূর্ণ সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা সহকারে স্বাধীনভাবে থাকতে পারে এসব লোক হচ্ছে তারাই। এ জনগোষ্ঠীর বাইরে আত্মীয় বা অনাত্মীয় যে-ই থাক না কেন কোন নারীর তার সামনে সাজগোজ করে আসা বৈধ নয়। ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها বাক্যে যে হুকুম দেয়া হয়েছিল তার অর্থ এখানে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে এভাবে যে, এ সীমিত গোষ্ঠীর বাইরে যারাই আছে তাদের সামনে নারীর সাজসজ্জা ইচ্ছাকৃত বা বেপরোয়াভাবে নিজেই প্রকাশ করা উচিত নয়, তবে তার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অথবা তার ইচ্ছা ছাড়াই যা প্রকাশ হয়ে যায় অথবা যা গোপন করা সম্ভব না হয় তা আল্লাহর কাছে ক্ষমাযোগ্য।

৩৮. মূলে ابناء শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ শুধু বাপ নয় বরং দাদা ও দাদার বাপ এবং নানা ও নানার বাপও এর অন্তরভুক্ত। কাজেই একটি মহিলা যেভাবে তার বাপ ও শ্বশুরের সামনে আসতে পারে ঠিক তেমনিভাবে আসতে পারে তার বাপের ও নানার বাড়ির এসব মুরব্বীদের সামনেও।

৩৯. ছেলের অন্তরভুক্ত হবে নাতি, নাতির ছেলে, দৌহিত্র ও দৌহিত্রের ছেলে সবাই। আর এ ব্যাপারে নিজের ও সতীনের মধ্যে কোন ফারাক নেই। নিজের সতীন পুত্রদের সন্তানদের সামনে নারীরা ঠিক তেমনি স্বাধীনভাবে সাজসজ্জার প্রকাশ করতে পারে যেমন নিজের সন্তানদের ও সন্তানদের সন্তানদের সামনে করতে পারে।

৪০. ভাইয়ের মধ্যে সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই এবং বৈপিত্রেয় ভাই সবাই শামিল।

৪১. ভাইবোনদের ছেলে বলতে তিন ধরনের ভাই বোনদের সন্তান বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাদের নাতি, নাতির ছেলে এবং দৌহিত্র ও দৌহিত্রের ছেলে সবাই এর অন্তরভুক্ত।

৪২. এখানে যেহেতু আত্মীয়দের গোষ্ঠী খতম হয়ে যাচ্ছে তাই সামনের দিকে অনাত্মীয় লোকদের কথা বলা হচ্ছে। এ জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যাবার আগে তিনটি বিষয় ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। কারণ এ বিষয়গুলো না বুঝলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়।

প্রথম বিষয়টি হচ্ছে, কেউ কেউ সাজসজ্জা প্রকাশের স্বাধীনতাকে কেবলমাত্র এমন সব আত্মীয় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ মনে করেন যাদের নাম এখানে উচ্চারণ করা হয়েছে। বাকি সবাইকে এমনকি আপন চাচা ও আপন মামাকেও যেসব আত্মীয়দের থেকে পরদা করতে হবে তাদের মধ্যে গণ্য করেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে, এদের নাম কুরআনে বলা হয়নি। কিন্তু একথা সঠিক নয়। আপন চাচা ও মামা তো দূরের কথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো দুধ চাচা ও দুধ মামা থেকেও পরদা করতে হযরত আয়েশাকে অনুমতি

দেননি। সিহাহেসিত্তা ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আয়েশা বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ আবুল কু'আইসের ভাই আফ্লাহ তাঁর কাছে এলেন এবং ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। যেহেতু তখন পরদার হুকুম নাযিল হয়ে গিয়েছিল, তাই হযরত আয়েশা অনুমতি দিলেন না। তিনি বলে পাঠালেন, তুমি তো আমার ভাইঝি, কারণ তুমি আমার ভাই আবুল কু'আইসের স্ত্রীর দুধপান করেছো। কিন্তু এ সম্পর্কটা কি এমন পর্যায়ের যেখানে পরদা উঠিয়ে দেয়া জায়েয এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। ইত্যবসরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে গেলেন। তিনি বললেন, সে তোমার কাছে আসতে পারে। এ থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এ আয়াতকে এ অর্থে নেননি যে, এর মধ্যে যেসব আত্মীয়ের কথা বলা হয়েছে কেবল তাদের থেকে পরদা করা হবে না এবং বাকি সবার থেকে পরদা করা হবে। বরং তিনি এ থেকে এ নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, যেসব আত্মীয়ের সাথে একটি মেয়ের বিয়ে হারাম তারা সবাই এ আয়াতের হুকুমের অন্তরভুক্ত। যেমন চাচা, মামা, জামাতা ও দুধ সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজন। তাবে'ঈদের মধ্যে হযরত হাসান বসরীও এ মত প্রকাশ করেছেন এবং আল্লামা আবু বকর জাস্সাস আহকামুল কুরআনে এর প্রতিই সমর্থন জানিয়েছেন। (৩য় খণ্ড, ৩৯০ পৃষ্ঠা)।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, যেসব আত্মীয়ের সাথে চিরন্তন হারামের সম্পর্ক নয় (অর্থাৎ যাদের সাথে একজন কুমারী বা বিধবার বিয়ে বৈধ) তারা মুহাররাম আত্মীয়দের অন্তরভুক্ত নয়। মেয়েরা নিসংকোচে সাজসজ্জা করে তাদের সামনে আসবে না। আবার একেবারে অনাত্মীয় অপরিচিতদের মতো তাদের থেকে তেমনি পূর্ণ পরদাও করবে না যেমন ভিন পুরুষদের থেকে করে। এ দুই প্রান্তিকতার মাঝামাঝি কি দৃষ্টিভংগী হওয়া উচিত তা শরীয়াতে নির্ধারিত নেই। কারণ এটা নির্ধারিত হতে পারে না। এর সীমানা বিভিন্ন আত্মীয়ের ব্যাপারে তাদের আত্মীয়তা, বয়স, পারিবারিক সম্পর্ক ও সম্বন্ধ এবং উভয়পক্ষের অবস্থার (যেমন এক গৃহে বা আলাদা আলাদা বাস করা) প্রেক্ষিতে অবশ্যি বিভিন্ন হবে এবং হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের নিয়ম ও কর্মপদ্ধতি যা কিছু ছিল তা থেকে আমরা এ দিকনির্দেশনাই পাই। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্যালিকা। বহু হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, তিনি রসূলের (সা) সামনে আসতেন এবং শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে কমপক্ষে চেহারা ও হাতের ক্ষেত্রে কোন পরদা ছিল না। বিদায় হজ্জ অনুষ্ঠিত হয় নবীর (সা) ইন্তিকালের মাত্র কয়েক মাস আগে এবং সে সময়ও এ অবস্থাই বিরাজিত ছিল (দেখুন আবু দাউদ, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মুহাররাম তার গোলামকে আদব শিক্ষা দেবে)। অনুরূপভাবে হযরত উম্মেহানী ছিলেন আবু তালেবের মেয়ে ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাত বোন। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি নবী করীমের (সা) সামনে আসতেন এবং কমপক্ষে তাঁর সামনে কখনো নিজের মুখ ও চেহারার পরদা করেননি। মক্কা বিজয়ের সময়ের একটি ঘটনা তিনি নিজেই বর্ণনা করছেন। এ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। (দেখুন আবু দাউদ, কিতাবুস সওম, বাবুন ফীন নীয়্যাত ফিস সওমে ওয়ার রুখসাতে ফকীহ।) অন্যদিকে আমরা দেখি, হযরত আব্বাস তার ছেলে ফযলকে এবং রাবী'আহ ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন চাচাত ভাই) তাঁর ছেলে আবদুল মুত্তালিবকে নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ বলে পাঠালেন যে, এখন তোমরা যুবক হয়ে গেছো, তোমরা রোজগারের ব্যবস্থা করতে না পারলে তোমাদের বিয়ে হতে পারে না, কাজেই তোমরা রসূলের (সা) কাছে গিয়ে কোন চাকরির দরখাস্ত করো। তারা দু'জন হযরত যয়নবের গৃহে গিয়ে রসূলুল্লাহর খিদমতে হাযির হলেন। হযরত যয়নব ছিলেন ফযলের আপন ফুপাত বোন আর আবদুল মুত্তালিব ইবনে রাবী'আর বাপের সাথেও তাঁর ফযলের সাথে যেমন তেমনি আত্মীয় সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তিনি তাদের দু'জনের সামনে হাযির হলেন না এবং রসূলের (সা) উপস্থিতিতে পরদার পেছন থেকে তাদের সাথে কথা বলতে থাকলেন। (আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ) এ দু'ধরনের ঘটনাবলী মিলিয়ে দেখলে ওপরে আমি যা বর্ণনা করে এসেছি বিষয়টির সে চেহারাই বোধগম্য হবে।

তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে, যেখানে আত্মীয়তা সন্দেহপূর্ণ হয়ে যায় সেখানে মুহাররাম আত্মীয়দের থেকেও সতর্কতা হিসেবে পরদা করা উচিত। বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদে উদ্ধৃত হয়েছে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত সওদার (রা) এক ভাই ছিল বাঁদিপুত্র (অর্থাৎ তাঁর পিতার ক্রীতদাসীর গর্ভজাত ছিল)। তাঁর সম্পর্কে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসকে (রা) তাঁর ভাই উত্‌বা এ মর্মে অসীয়াত করেন যে, এ ছেলেকে নিজের ভাতিজা মনে করে তার অভিভাবকত্ব করবে কারণ সে আসলে আমার ঔরসজাত। এ মামলাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো। তিনি হযরত সা'দের দাবী এই বলে নাকচ করে দিলেন যে, "যার বিছানায় সন্তানের জন্ম হয়েছে সে-ই সন্তানের পিতা। আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর।" কিন্তু সাথে সাথেই তিনি হযরত সওদাকে বলে দিলেন, এ ছেলেটি থেকে পরদা করবে (احتجبى منه) কারণ সে যে সত্যিই তার ভাই এ ব্যাপারে নিসন্দেহ হওয়া যায়নি।

৪৩. মূলে نسائهن শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে, "তাদের মহিলারা" এখানে কোন্ মহিলাদের কথা বলা হয়েছে সে বিতর্কে পরে আসা যাবে। এখন সবার আগে যে কথাটি উল্লেখযোগ্য এবং যেদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত সেটি হচ্ছে, এখানে নিছক "মহিলারা" (النساء) বলা হয়নি, যার ফলে মুসলমান মহিলার জন্য সমস্ত মহিলাদের এবং সব ধরনের মেয়েদের সামনে বেপরদা হওয়া ও সাজসজ্জা প্রকাশ করা জায়েয হয়ে যেতো। বরং نسائهن বলে মহিলাদের সাথে তার স্বাধীনতাকে সর্বাবস্থায় একটি বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। সে গণ্ডী যে কোন পর্যায়েরই হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। এখন প্রশ্ন থেকে যায়, এটা কোন্ গণ্ডী এবং সে মহিলারাই বা কারা যাদের ওপর نساء هن শব্দ প্রযুক্ত হয়? এর জবাব হচ্ছে, এ ব্যাপারে ফকীহ ও মুফাস্‌সিরগণের উক্তি বিভিন্ন :

একটি দল বলেন, এখানে কেবলমাত্র মুসলমান মেয়েদের কথা বলা হয়েছে। যিম্মী বা অন্য যে কোন ধরনের অমুসলিম মেয়েরাই হোক না কেন মুসলমান মেয়েদেরকে তাদের থেকে পুরুষদের থেকে যেমন করা হয় তেমনি পরদা করা উচিত। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও জুরাইজ এ মত পোষণ করেন। এঁরা নিজেদের সমর্থনে এ ঘটনাটিও পেশ করে থাকেন যে, হযরত উমর (রা) হযরত আবু উবাইদাহকে লেখেন, "আমি শুনেছি কিছু কিছু মুসলিম নারী অমুসলিম নারীদের সাথে হাম্মামে যাওয়া শুরু করেছে। অথচ যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য তার শরীরের ওপর তার মিল্লাতের অন্তরভুক্তদের

ছাড়া অন্য কারোর দৃষ্টি পড়া হালাল নয়।" এ পত্র যখন হযরত আবু উবাইদাহ পান তখন তিনি হঠাৎ ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং বলতে থাকেন, "হে আল্লাহ! যেসব মুসলমান মহিলা নিছক ফর্সা হবার জন্য এসব হাম্মামে যায় তাদের মুখ যেন আখেরাতে কালো হয়ে যায়।" (ইবনে জারীর, বায়হাকী ও ইবনে কাসীর)

দ্বিতীয় দলটি বলেন, এখানে সব নারীদের কথা বলা হয়েছে। ইমাম রাযীর দৃষ্টিতে এ মতটিই সঠিক। কিন্তু একথা বোধগম্য নয় যে, যদি সত্যিই আল্লাহর উদ্দেশ্য এটিই হয়ে থাকে তাহলে আবার نسائهن বলার অর্থ কি? এ অবস্থায় তো শুধু النساء বলা উচিত ছিল।

তৃতীয় মতটিই যুক্তিসংগত এবং কুরআনের শব্দের নিকটতরও। সেটি হচ্ছে, যেসব নারীদের সাথে তারা মেলামেশা করে, যাদের সাথে তাদের জানাশোনা আছে, যাদের সাথে তারা সম্পর্ক রাখে এবং যারা তাদের কাজে কর্মে অংশ নেয় তাদের কথা এখানে বলা হয়েছে। তারা মুসলিমও হতে পারে আবার অমুসলিমও। অপরিচিত মহিলাদের যাদের স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণের অবস্থা জানা নেই অথবা যাদের বাইরের অবস্থা সন্দেহজনক এবং যারা নির্ভরযোগ্য নয়, তাদেরকে এ গণ্ডীর বাইরে রাখাই এর উদ্দেশ্য। কিছু সহীহ হাদীস থেকে এ মতের প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীসগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের কাছে যিম্মী মহিলাদের উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে যে আসল জিনিসটির প্রতি দৃষ্টি দেয়া হবে সেটি ধর্মীয় বিভিন্নতা নয় বরং নৈতিক অবস্থা। অমুসলিম হলেও পরিচিত ও নির্ভরযোগ্য পরিবারের ভদ্র, লজ্জাশীলা ও সদাচারী মহিলাদের সাথে মুসলিম মহিলারা পুরোপুরি নিসংকোচে মেলামেশা করতে পারে। কিন্তু মুসলমান মেয়েরাও যদি বেহায়া, বেপরদা ও অসদাচারী হয় তাহলে প্রত্যেক শরীফ ও ভদ্র পরিবারের মহিলার তাদের থেকে পরদা করা উচিত। কারণ নৈতিকতার জন্য তাদের সাহচর্য ভিন পুরুষদের সাহচর্যের তুলনায় কম ক্ষতিকর নয়। আর অপরিচিত মহিলারা যাদের অবস্থা জানা নেই, তাদের সাথে মেলামেশা করার সীমানা আমাদের মতে গায়ের মুহাররাম আত্মীয়দের সামনে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার সর্বাধিক সীমানার সমপরিমাণ হতে পারে। অর্থাৎ তাদের সামনে মহিলারা কেবলমাত্র মুখ ও হাত খুলতে পারে, বাকি সারা শরীর ও অংগসজ্জা ঢেকে রাখতে হবে।

৪৪. এ নির্দেশটির অর্থ বুঝার ব্যাপারেও ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। একটি দল এর অর্থ করেছেন এমন সব বাঁদী যারা কোন মহিলার মালিকানাধীন আছে। তাদের মতে, আল্লাহর উক্তির অর্থ হচ্ছে, বাঁদী মুশরিক বা আহলি কিতাব যে দলেরই অন্তরভুক্ত হোক না কেন মুসলিম মহিলা মালিক তার সামনে তো সাজসজ্জা প্রকাশ করতে পারে কিন্তু মহিলার নিজেরই মালিকানাধীন গোলামের থেকেও পরদা করার ব্যাপারটি অপরিচিত স্বাধীন পুরুষের থেকে পরদার সমপর্যায়ের। এটি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), মুজাহিদ, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, সা'ঈদ ইবনে মুসাইইব, তাউস ও ইমাম আবু হানীফার মত। ইমাম শাফেঈ'র একটি উক্তিও এর সমর্থনে পাওয়া যায়। এ মনীষীদের যুক্তি হচ্ছে, গোলামের জন্য তার মহিলা মালিক মুহাররাম নয়। যদি সে স্বাধীন হয়ে যায়, তাহলে তার আগের মহিলা মালিককে বিয়েও করতে পারে। কাজেই নিছক গোলামী এমন কোন কারণ হতে পারে না যার ফলে মহিলারা তাদের সামনে এমন স্বাধীনভাবে

চলাফেরা করবে যার অনুমতি মুহাররাম পুরুষদের সামনে চলাফেরা করার জন্য দেয়া হয়েছে। এখন বাকী থাকে এ প্রশ্নটি যে, ما ملكت ايمانهن শব্দাবলী ব্যাপক অর্থবোধক, গোলাম ও বাঁদী উভয়ের জন্য ব্যবহার হয়, তাহলে আবার বিশেষভাবে বাঁদীদের জন্য একে ব্যবহার করার যুক্তি কি? এর জবাব তারা এভাবে দেন যে, এ শব্দাবলী যদিও ব্যাপক অর্থবোধক তবুও পরিবেশ ও পরিস্থিতি এগুলোর অর্থকে মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ করছে। প্রথমে نِسَاءِهِنَّ বলা হয় তারপর বলা হয় مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ প্রথমে نساءهن শব্দ শুনে সাধারণ মানুষ মনে করতে পারতো এখানে এমন নারীদের কথা বলা হয়েছে যারা কোন নারীর পরিচিত মহলের বা আত্মীয়-স্বজনদের অন্তরভুক্ত হবে। এ থেকে হয়তো বাঁদীরা এর অন্তরভুক্ত নয়, এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা ছিল। তাই ما ملكت ايمانهن বলে দিয়ে একথা পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে যে, স্বাধীন মেয়েদের মতো বাঁদীদের সামনেও সাজসজ্জার প্রদর্শনী করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় দলের মতে এ অনুমতিতে বাঁদী ও গোলাম উভয়ই রয়েছে। এটি হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত উম্মে সালামাহ (রা) ও অন্য কতিপয় আহলে বায়েত ইমামের অভিমত। ইমাম শাফে'ঈর একটি বিখ্যাত উক্তিও এর সপক্ষে রয়েছে। তাদের যুক্তি শুধুমাত্র ماملكت ايمانهن এর ব্যাপক অর্থ থেকে নয় বরং তারা সুন্নাতে রসূল থেকেও এর সমর্থনে প্রমাণ পেশ করেন। যেমন এ ঘটনাটি ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে মাস্আদাতিল ফাযারী নামক এক গোলামকে নিয়ে হযরত ফাতেমার বাড়িতে গেলেন। তিনি সে সময় এমন একটি চাদর গায়ে দিয়ে ছিলেন যা দিয়ে মাথা ঢাকতে গেলে পা খুলে যেতো এবং পা ঢাকতে গেলে মাথা খুলে যেতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হতবিহ্বল ভাব দেখে বললেন, ليس عليك باس انما هو ابوك وغلامك "কোন দোষ নেই, এখানে আছে তোমার বাপ ও তোমার গোলাম।" (আবু দাউদ, আহমাদ ও বায়হাকী আনাস ইবনে মালেকের উদ্ধৃতি থেকে। ইবনে আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ফাতেমাকে এ গোলামটি দিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি একে লালন পালন করেছিলেন এবং তারপর মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ উপকারের প্রতিদান সে এভাবে দিয়েছিল যে, সিফ্ফীনের যুদ্ধের সময় হযরত আলীর প্রতি চরম শত্রুতার প্রকাশ ঘটিয়ে আমীর মু'আবিয়ার একান্ত সমর্থকে পরিণত হয়েছিল।) অনুরূপভাবে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তিটি থেকেও যুক্তি প্রদর্শন করেন—

اذا كان لاحد اكن مكاتب وكان له ما يودى فلتحتجب منه

"যখন তোমাদের কেউ তার গোলামের সাথে "মুকাতাবাত" তথা অর্থ আদায়ের বিনিময়ে মুক্তি দেবার লিখিত চুক্তি করে এবং সে চুক্তিকৃত অর্থ আদায় করার ক্ষমতা রাখে তখন তার সে গোলাম থেকে পরদা করা উচিত।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ উম্মে সালামার রেওয়ায়াত থেকে)

৪৫. মূলে التابعين غير اولى الاربه من الرجال শব্দাবলী বলা হয়েছে। এর শাব্দিক অনুবাদ হবে, "পুরুষদের মধ্য থেকে এমন সব পুরুষ যারা অনুগত, কামনা রাখে

না।* এ শব্দগুলো থেকে প্রকাশ হয়, মুহাররাম পুরুষদের ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সামনে একজন মুসলমান মহিলা কেবলমাত্র এমন অবস্থায় সাজসজ্জার প্রকাশ করতে পারে, যখন তার মধ্যে দু'টি গুণ পাওয়া যায়, এক, সে অনুগত অর্থাৎ অধীনস্থ ও কর্তৃত্বের অধীন। দুই, তার মধ্যে কামনা নেই। অর্থাৎ নিজের বয়স, শারিরীক অসামর্থ, বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বলতা, দারিদ্র ও অর্থহীনতা অথবা অন্যের পদানত হওয়া ও গোলামীর কারণে তার মনে গৃহকর্তার স্ত্রী, মেয়ে, বোন বা মা সম্পর্কে কোন কুসংকল্প সৃষ্টি হবার শক্তি বা সাহস থাকে না। এ হুকুমকে যে ব্যক্তিই নাফরমানীর অবকাশ অনুসন্ধানের নিয়েতে নয় বরং আনুগত্য করার নিয়তে পড়বে সে প্রথম দৃষ্টিতেই অনুভব করবে যে, আজকালকার বেয়ারা, খানসামা, শোফার ও অন্যান্য যুবক কর্মচারীরা অবশ্যি এ সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে না। মুফাস্‌সির ও ফকীহগণ এর যে ব্যাখ্যা করেছেন তার ওপর একবার নজর বুলালে জ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞগণ এ শব্দগুলোর কি অর্থ বুঝেছেন তা জানা যেতে পারে ঃ

ইবনে আব্বাস ঃ এর অর্থ হচ্ছে এমন সব সাদাসিধে বোকা ধরনের লোক যারা মহিলাদের ব্যাপারে আগ্রহী নয়।

কাতাদাহ ঃ এমন পদানত ব্যক্তি যে নিজের পেটের খাবার যোগাবার জন্য তোমার পেছনে পড়ে থাকে।

মুজাহিদ ঃ এমন লোক যে ভাত চায়, মেয়েলোক চায় না। থাকে।

শা'বী ঃ যে ব্যক্তি গৃহকর্তার অনুগত তার পদানত এবং যার মধ্যে মেয়েদের প্রতি তাকাবার হিম্মত নেই।

ইবনে যায়েদ ঃ যে ব্যক্তি কোন পরিবারের সাথে লেগে থাকে। এমনকি তাদের ঘরের লোকে পরিণত হয় এবং সে পরিবারে প্রতিপালিত হয়ে বড় হয়। ঘরের মেয়েদের প্রতি সে নজর দেয় না এবং এ ধরনের নজর দেবার হিম্মতই করতে পারে না। পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই সে তাদের সাথে লেগে থাকে।

তাউস ও যুহ্‌রী ঃ নির্বোধ ব্যক্তি, যার মধ্যে মেয়েদের প্রতি উৎসাহ নেই এবং এর হিম্মতও নেই।

(ইবনে জারীর, ১৮ খণ্ড, ৯৫–৯৬ পৃষ্ঠা এবং ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা)।

এ ব্যাখ্যাগুলোর চাইতেও বেশী স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় একটি ঘটনা থেকে। এটি ঘটেছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায়। বুখারী, মুসলিম আবু দাউদ, নাসাঈ ও আহমাদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এটি হযরত আয়েশা (রা) ও উম্মে সালামাহ (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। ঘটনাটি হচ্ছে ঃ মদীনা তাইয়েবায় ছিল এক নপুংশক হিজড়ে। নবীর পবিত্র স্ত্রীগণ ও অন্য মহিলারা তাকে غير اولى الاربة এর মধ্যে গণ্য করে নিজেদের কাছে আসতে দিতেন। একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামাহর কাছে গেলেন। সেখানে তিনি তাকে উম্মে সালামার (রা) ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়ার সাথে কথা বলতে শুনলেন। সে বলছিল, কাল যদি তায়েফ জয় হয়ে যায়, তাহলে আপনি গাইলান সাকাফির মেয়ে বাদীয়াকে না নিয়ে

ক্ষান্ত হবেন না। তারপর সে বাদীয়ার সৌন্দর্য ও তার দেহ সৌষ্ঠবের প্রশংসা করতে থাকলো এমনকি তার গোপন অংগসমূহের প্রশংসামূলক বর্ণনাও দিয়ে দিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা শুনে বললেন, "ওরে আল্লাহর দুশমন! তুই তো তাকে খুবই দক্ষ করে দেখেছিস বলে মনে হয়।" তারপর তিনি হুকুম দিলেন, তার সাথে পরদা করো এবং ভবিষ্যতে যেন সে গৃহে প্রবেশ করতে না পারে। এরপর তিনি তাকে মদীনা থেকে বের করে দিলেন এবং অন্যান্য নপুংশক পুরুষদেরকেও অন্যের গৃহে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করে দিলেন। কারণ তাদেরকে নপুংশক মনে করে মেয়েরা তাদের সামনে সতর্কতা অবলম্বন করতো না এবং তারা এক ঘরের মেয়েদের অবস্থা অন্য ঘরের পুরুষদের কাছে বর্ণনা করতো। এ থেকে জানা যায়, কারো غير اولى الاربة (কামনাহীন) হবার জন্য কেবলমাত্র এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, সে শারীরিক দিক দিয়ে ব্যভিচার করতে সমর্থ নয় যদি তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন যৌন কামনা থেকে থাকে এবং সে মেয়েদের ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হয় তাহলে অবশ্যি সে অনেক রকমের বিপদের কারণ হতে পারে।

৪৬. অর্থাৎ যাদের মধ্যে এখনো যৌন কামনা সৃষ্টি হয়নি। বড় জোর দশ-বারো বছরের ছেলেদের ব্যাপারে একথা বলা যেতে পারে। এর বেশী বয়সের ছেলেরা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলেও তাদের মধ্যে যৌন কামনার উন্মেষ হতে থাকে।

৪৭. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হুকুমটিকে কেবলমাত্র অলংকারের ঝংকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং এ থেকে এ নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, দৃষ্টি ছাড়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলোকে উত্তেজিতকারী জিনিসগুলোও আল্লাহ তা'আলা মহিলাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যের প্রকাশনী করতে নিষেধ করেছেন তার বিরোধী। তাই তিনি মহিলাদেরকে খোশবু লাগিয়ে বাইরে বের না হবার হুকুম দিয়েছেন। হযরত আবু হুরাইরার (রা) রেওয়ায়াত হচ্ছে, রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

لَا تَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ وَلْكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ

"আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে আসতে নিষেধ করো না। কিন্তু তারা যেন খোশবু লাগিয়ে না আসে।" (আবু দাউদ ও আহমাদ)

একই বক্তব্য সম্বলিত অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, একটি মেয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল। হযরত আবু হুরাইরা (রা) তার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। তিনি অনুভব করলেন মেয়েটি খোশবু মেখেছে। তিনি তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর দাসী! তুমি কি মসজিদ থেকে আসছো?" সে বললো হাঁ। বললেন, "আমি আমার প্রিয় আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে মেয়ে মসজিদে খোশবু মেখে আসে তার নামায ততক্ষণ কবুল হয় না যতক্ষণ না সে বাড়ি ফিরে ফরয গোসলের মত গোসল করে।" (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, আহমাদ, নাসাঈ)। আবু মূসা আশআরী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْاَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوْا رِيْحَهَا فَهِىَ كَذَا وَكَذَا قَالَ قَوْلاً شَدِيْدًا –

"যে নারী আতর মেখে পথ দিয়ে যায়, যাতে লোকেরা তার সুবাসে বিমোহিত হয়, সে এমন ও এমন। তিনি তার জন্য খুবই কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন।" (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ) তাঁর নির্দেশ ছিল, মেয়েদের এমন খোশ্‌বু ব্যবহার করা উচিত, যার রং প্রগাঢ় কিন্তু সুবাস হাল্‌কা। (আবু দাউদ)।

অনুরূপভাবে নারীরা প্রয়োজন ছাড়া নিজেদের আওয়াজ পুরুষদেরকে শোনাবে এটাও তিনি অপছন্দ করতেন। প্রয়োজনে কথা বলার অনুমতি কুরআনেই দেয়া হয়েছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণ নিজেরাই লোকদেরকে দীনী মাসায়েল বর্ণনা করতেন। কিন্তু যেখানে এর কোন প্রয়োজন নেই এবং কোন দীনী বা নৈতিক লাভও নেই সেখানে মহিলারা নিজেদের আওয়াজ ভিন্ পুরুষদেরকে শুনাবে, এটা পছন্দ করা হয়নি। কাজেই নামাযে যদি ইমাম ভুলে যান তাহলে পুরুষদের সুব্‌হানাল্লাহ বলার হুকুম দেয়া হয়েছে কিন্তু মেয়েদেরকে এক হাতের ওপর অন্য এক হাত মেরে ইমামকে সতর্ক করে দেবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। اَلتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)।

৪৮. অর্থাৎ এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত যেসব ভুল-ভ্রান্তি তোমরা করেছো তা থেকে তাওবা করো এবং ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূল যেসব নির্দেশ দিয়েছেন সে অনুযায়ী নিজেদের কর্মপদ্ধতি সংশোধন করে নাও।

৪৯. প্রসংগত এ বিধানগুলো নাযিল হবার পর কুরআনের মর্মবাণী অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামী সমাজে অন্য যেসব সংস্কারমূলক বিধানের প্রচলন করেন সেগুলোর একটি সংক্ষিপ্তসারও এখানে বর্ণনা করা সংগত মনে করছি ঃ

এক ঃ মুহাররাম আত্মীয়ের অনুপস্থিতিতে তিনি অন্য লোকদেরকে (আত্মীয় হলেও) কোন মেয়ের সাথে একাকী সাক্ষাত করতে ও তার কাছে নির্জনে বসতে নিষেধ করেছেন। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর রেওয়ায়াত হচ্ছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَا تَلِجُوْا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنْ اَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ

"যেসব নারীর স্বামী বাইরে গেছে তাদের কাছে যেয়ো না। কারণ শয়তান তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের রক্ত ধারায় আবর্তন করছে।" (তিরমিযী)

হযরত জাবের থেকে অন্য একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতে রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِاِمْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا فَاِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ -

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন কখনো কোন মেয়ের সাথে নির্জনে সাক্ষাত না করে যতক্ষণ না ঐ মেয়ের কোন মুহাররাম তার সাথে থাকে। কারণ সে সময় তৃতীয়জন থাকে শয়তান।" (আহমাদ)

প্রায় এ একই ধরনের বিষয়বস্তু সম্বলিত তৃতীয় একটি হাদীস ইমাম আহমাদ আমের ইবনে রাবীআহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহর (সা) নিজের সতর্কতা এমন

পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, একবার রাতের বেলা তিনি হযরত সাফিয়ার সাথে তাঁর গৃহের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে দু'জন আনসারী তাঁর পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি তাদেরকে থামিয়ে বললেন, আমার সাথের এ মহিলা হচ্ছে আমার স্ত্রী সাফিয়া। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহর রসূল! আপনার সম্পর্কেও কি কোন কুধারণা হতে পারে? বললেন, শয়তান মানুষের মধ্যে রক্তের মতো চলাচল করে। আমার আশংকা হলো সে আবার তোমাদের মনে কোন কুধারণা সৃষ্টি না করে বসে। (আবু দাউদ, সওম অধ্যায়)।

দুই ঃ কোন পুরুষের হাত কোন গায়ের মুহাররাম মেয়ের গায়ে লাগুক এটাও তিনি বৈধ করেননি। তাই তিনি পুরুষদের হাতে হাত রেখে বাই'আত করতেন। কিন্তু মেয়েদের আই'আত নেবার সময় কখনো এ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন না। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত কখনো কোন ভিন্ মেয়ের শরীরে লাগেনি। তিনি মেয়েদের থেকে শুধুমাত্র মৌখিক শপথ নিতেন এবং শপথ নেয়া শেষ হলে বলতেন, যাও তোমাদের বাই'আত হয়ে গেছে।" (আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ)।

তিন ঃ তিনি মেয়েদের মুহাররাম ছাড়া একাকী অথবা গায়ের মুহাররামের সাথে সফর করতে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। বুখারী ও মুসলিমে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) খুতবায় বলেন ঃ

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ اِلَّا وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ اِلَّا مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ -

"কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার সাথে একান্তে সাক্ষাত না করে যতক্ষণ তার সাথে তার মুহাররাম না থাকে এবং কোন মহিলা যেন সফর না করে যতক্ষণ না তার কোন মুহাররাম তার সাথে থাকে।"

এক ব্যক্তি উঠে বললো, আমার স্ত্রী হজ্জে যাচ্ছে এবং আমার নাম অমুক অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে লেখা হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, فانطلق فحج مع امرأتك "বেশ, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জে চলে যাও।" এ বিষয়বস্তু সম্বলিত বহু হাদীস ইবনে উমর, আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাবগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোতে শুধুমাত্র সফরের সময়সীমা অথবা সফরের দূরত্বের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা আছে কিন্তু এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী মু'মিন মহিলার পক্ষে মুহাররাম ছাড়া সফর করা বৈধ নয়। এর মধ্যে কোন হাদীসে ১২ মাইল বা এর চেয়ে বেশী দূরত্বের সফরের ওপর বিধি-নিষেধের কথা বলা হয়েছে। কোনটিতে একদিন, কোনটিতে এক দিন এক রাত, কোনটিতে দু'দিন আবার কোনটিতে তিন দিনের সীমা নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু এ বিভিন্নতা এ হাদীসগুলোর নির্ভরযোগ্যতা খতম করে দেয় না এবং এ কারণে এর মধ্য থেকে কোন একটি হাদীসকে অন্য সব হাদীসের ওপর প্রাধান্য দিয়ে এ হাদীসে বর্ণিত সীমারেখাকে আইনগত পরিমাপ গণ্য করার চেষ্টা করাও আমাদের জন্য অপরিহার্য হয় না। কারণ এ বিভিন্নতার একটি যুক্তিসংগত কারণ বোধগম্য হতে পারে। অর্থাৎ বিভিন্ন সময় ঘটনার যেমন যেমন অবস্থা রসূলের (সা) সামনে এসেছে সে অনুযায়ী তিনি তার হুকুম

বর্ণনা করেছেন। যেমন কোন মহিলা যাচ্ছেন তিন দিনের দূরত্বের সফরে এবং এ ক্ষেত্রে তিনি মুহাররাম ছাড়া তাকে যেতে নিষেধ করেছেন। আবার কেউ এক দিনের দূরত্বের সফরে যাচ্ছেন এবং তিনি তাকেও থামিয়ে দিয়েছেন। এখানে বিভিন্ন প্রশ্নকারীর বিভিন্ন অবস্থা এবং তাদের প্রত্যেককে তাঁর পৃথক পৃথক জবাব আসল জিনিস নয়। বরং আসল জিনিস হচ্ছে ওপরে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতে যে নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে সেটি। অর্থাৎ সফর, সাধারণ পরিভাষায় যাকে সফর বলা হয় কোন মেয়ের মুহাররাম ছাড়া এ ধরনের সফর করা উচিত নয়।

চার ঃ রসূলুল্লাহ (সা) মৌখিকভাবে এবং কার্যতও নারী ও পুরুষের মেলামেশা রোধ করার প্রচেষ্টা চালান। ইসলামী জীবনে জুম'আ ও জামা'আতের গুরুত্ব কোন ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির অজানা নয়। জুমুআকে আল্লাহ নিজেই ফরয করেছেন। আর জামা'আতের সাথে নামায পড়ার গুরুত্ব এ থেকেই অনুধাবন করা যেতে পারে যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রকার অক্ষমতা ছাড়াই মসজিদে হাজির না হয়ে নিজ গৃহে নামায পড়ে নেয় তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি অনুযায়ী তার নামায গৃহীতই হয় না। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারুকুত্নী ও হাকেম ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে) কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুম'আর নামায ফরয হওয়া থেকে মেয়েদেরকে বাদ রেখেছেন। (আবু দাউদ উম্মে আতীয়্যার রেওয়ায়াতের মাধ্যমে দারুকুত্নী ও বাইহাকী জাবেরের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে এবং আবু দাউদ ও হাকেম তারেক ইবনে শিহাবের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে) আর জামা'আতের সাথে নামাযে শরীক হওয়াকে মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক তো করেনইনি। বরং এর অনুমতি দিয়েছেন এভাবে যে, যদি তারা আসতে চায় তাহলে তাদেরকে বাধা দিয়ো না। তারপর এ সাথে একথাও বলে দিয়েছেন যে, তাদের জন্য ঘরের নামায মসজিদের নামাযের চেয়ে ভালো। ইবনে উমর (রা) ও আবু হুরাইরার (রা) রেওয়ায়াত হচ্ছে, নবী করীম (সা) বলেছেনঃ لا تمنعوا اماء الله مساجد الله "আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে যেতে বাধা দিয়ো না।" (আবু দাউদ) অন্য রেওয়ায়াতগুলো বর্ণিত হয়েছে ইবনে উমর থেকে নিম্নোক্ত শব্দাবলী এবং এর সাথে সামঞ্জস্যশীল শব্দাবলী সহকারে ঃ

ائذنوا للنساء الى المساجد بالليل

"মহিলাদেরকে রাতের বেলা মসজিদে আসার অনুমতি দাও।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ)

অন্য একটি রেওয়ায়াতের শব্দাবলী হচ্ছে ঃ

لا تمنعوا نسائكم المساجد وبيوتهن خير لهن

"তোমাদের নারীদেরকে মসজিদে আসতে বাধা দিয়ো না, তবে তাদের ঘর তাদের জন্য ভালো।" (আহমাদ, আবু দাউদ)

উম্মে হুমাইদ সায়েদীয়া বলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনার পেছনে নামায পড়তে আমার খুবই ইচ্ছা হয়। তিনি বললেন, "তোমার নিজের কামরায় নামায পড়া বারান্দায় নামায পড়ার চাইতে ভালো, তোমার নিজের ঘরে নামায পড়া নিজের মহল্লার মসজিদে

নামায পড়ার চাইতে ভালো এবং তোমার মহল্লার মসজিদে নামায পড়া জামে মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে ভালো।" (আহমাদ ও তাবারানী) প্রায় এই একই ধরনের বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস আবু দাউদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর হযরত উম্মে সালামার (রা) রেওয়ায়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শব্দাবলী হচ্ছে ঃ خير مساجد النساء قعر بيوتهن "মহিলাদের জন্য তাদের ঘরের অভ্যন্তর ভাগ হচ্ছে সবচেয়ে ভালো মসজিদ।" (আহমদ, তাবারানী) কিন্তু হযরত আয়েশা (রা) বনী উমাইয়া আমলের অবস্থা দেখে বলেন, "যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের আজকের অবস্থা দেখতেন তাহলে তাদের মসজিদে আসা ঠিক তেমনিভাবে বন্ধ করতেন যেমনভাবে বনী ইসরাঈলদের নারীদের আসা বন্ধ করা হয়েছিল। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ) মসজিদে নববীতে নারীদের প্রবেশের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দরজা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা) নিজের শাসনামলে এ দরজা দিয়ে পুরুষদের যাওয়া আসা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছিলেন। (আবু দাউদ ই'তিযালুন নিসা ফিল মাসাজিদ ও মা জাআ ফী খুরুজিন নিসা ইলাল মাসাজিদ অধ্যায়) জামা'আতে মেয়েদের লাইন রাখা হতো পুরুষদের লাইনের পেছনে এবং নামায শেষে রসূলুল্লাহ (সা) সালাম ফেরার পর কিছুক্ষণ বসে থাকতেন, যাতে পুরুষদের ওঠার আগে মেয়েরা উঠে চলে যেতে পারে। (আহমাদ, বুখারী উম্মে সালামার রেওয়ায়াতের মাধ্যমে) রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, পুরুষদের সর্বোত্তম লাইন হচ্ছে তাদের সর্বপ্রথম লাইনটি এবং নিকৃষ্টতম লাইনটি হচ্ছে সবার পেছনের (অর্থাৎ মেয়েদের নিকটবর্তী) লাইনটি। আর মহিলাদের সর্বোত্তম লাইন হচ্ছে সবচেয়ে পেছনের লাইন এবং নিকৃষ্টতম লাইন হচ্ছে সবার আগের (অর্থাৎ পুরুষদের নিকটবর্তী) লাইন। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও আহমাদ) দুই ঈদের নামাযে মেয়েলোকেরা শরীক হতো কিন্তু তাদের জায়গা ছিল পুরুষদের থেকে দূরে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবার পরে মেয়েলোকদের দিকে গিয়ে তাদেরকে পৃথকভাবে সম্বোধন করতেন। (আবু দাউদ, জাবের ইবনে আবদুল্লাহর বর্ণনার মাধ্যমে বুখারী ও মুসলিম ইবনে আব্বাসের বর্ণনার মাধ্যমে) একবার মসজিদে নববীর বাইরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন, পথে নারী–পুরুষ এক সাথে মিশে গেছে। এ অবস্থা দেখে তিনি নারীদেরকে বললেন,

اِسْتَأْخِرْنَ فَاِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ اَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيْقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيْقِ –

"থেমে যাও, তোমাদের পথের মাঝখান দিয়ে চলা ঠিক নয়, কিনারা দিয়ে চলো।" এ কথা শুনতেই মহিলারা এক পাশে হয়ে গিয়ে একেবারে দেয়ালের পাশ দিয়ে চলতে লাগলো। (আবু দাউদ)

এসব নির্দেশ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, নারী–পুরুষের মিশ্র সমাবেশাদি ইসলামের প্রকৃতির সাথে কত বেশী বেখাপ্পা! যে দীন আল্লাহর ঘরে ইবাদাত করার সময়ও উভয় গোষ্ঠীকে পরস্পর মিশ্রিত হতে দেয় না তার সম্পর্কে কে ধারণা করতে পারে যে, সে স্কুল–কলেজ, অফিস–আদালত, ক্লাব–রেস্তরাঁ ও সভা–সমিতিতে তাদের মিশ্রিত হওয়াকে বৈধ করে দেবে?

পাঁচ ঃ নারীদেরকে ভারসাম্য সহকারে সাজসজ্জা করার তিনি কেবল অনুমতিই দেননি বরং অনেক সময় নিজেই এর নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করা থেকে কঠোরভাবে বাধা দিয়েছেন। সেকালে আরবের মহিলা সমাজে যে ধরনের সাজসজ্জার প্রচলন ছিল তার মধ্য থেকে নিম্নোক্ত জিনিসগুলোকে তিনি অভিসম্পাতযোগ্য এবং মানব জাতির ধ্বংসের কারণ হিসেবে গণ্য করেছেন ঃ

- নিজের চুলের সাথে পরচুলা লাগিয়ে তাকে বেশী লম্বা ও ঘন দেখাবার চেষ্টা করা।
- শরীরের বিভিন্ন জায়গায় উল্কি আঁকা ও কৃত্রিম তিল বসানো।
- ভ্রূর চুল উপড়ে ফেলে বিশেষ আকৃতির ভ্রূ নির্মাণ করা এবং লোম ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখ পরিষ্কার করা।
- দাঁত ঘসে ঘসে সুঁচালো ও পাতলা করা অথবা দাঁতের মাঝখানে কৃত্রিম ছিদ্র তৈরী করা।
- জাফরান ইত্যাদি প্রসাধনীর মাধ্যমে চেহারায় কৃত্রিম রং তৈরী করা।

এসব বিধান সিহাহে সিত্তা ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আয়েশা (রা), হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও আমীর মুআবীয়া (রা) থেকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পরম্পরায় উদ্ধৃত হয়েছে।

আল্লাহ ও রসূলের এসব পরিষ্কার নির্দেশ দেখার পর একজন মু'মিনের জন্য দু'টোই পথ খোলা থাকে। এক, সে এর অনুসরণ করবে এবং নিজের ও নিজের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে এমনসব নৈতিক অনাচার থেকে পবিত্র করবে, যেগুলোর পথ রোধ করার জন্য আল্লাহ কুরআনে এবং তাঁর রসূল সুন্নাতে এমন বিস্তারিত বিধান দিয়েছেন। দুই, যদি সে নিজের মানসিক দুর্বলতার কারণে এগুলোর বা এগুলোর মধ্য থেকে কোনটির বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহলে কমপক্ষে গোনাহ মনে করে করবে ও তাকে গোনাহ বলে স্বীকার করে নেবে এবং অনর্থক অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে গোনাহকে সওয়াবে পরিণত করার চেষ্টা করবে না। এ দু'টি পথ পরিহার করে যারা কুরআন ও সুন্নাতের সুস্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে কেবল পাশ্চাত্য সমাজের পদ্ধতি অবলম্বন করেই ক্ষান্ত থাকে না বরং এরপর সেগুলোকেই যথার্থ ইসলাম প্রমাণ করার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করে দেয় এবং ইসলামে আদৌ পরদার কোন বিধান নেই বলে প্রকাশ্যে দাবী করতে থাকে তারা গোনাহ ও নাফরমানীর সাথে সাথে মূর্খতা ও মুনাফিকসুলভ ধৃষ্টতাও দেখিয়ে থাকে। দুনিয়ায় কোন ভদ্র ও মার্জিত রুচি সম্পন্ন ব্যক্তি এর প্রশংসা করতে পারে না এবং আখেরাতে আল্লাহর কাছ থেকেও এর আশা করা যেতে পারে না। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে মুনাফিকদের চাইতেও দু'কদম এগিয়ে আছে এমন সব লোক যারা আল্লাহ ও রসূলের এসব বিধানকে ভুল প্রতিপন্ন করে এবং এমন সব পদ্ধতিকে সঠিক ও সত্য মনে করে যা তারা অমুসলিম জাতিসমূহের কাছ থেকে শিখেছে। এরা আসলে মুসলমান নয়। কারণ এরপরও যদি তারা মুসলমান থাকে তাহলে ইসলাম ও কুফর শব্দ দু'টি একেবারেই অর্থহীন হয়ে যায়। যদি তারা নিজেদের নাম বদলে নিতো এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে ইসলাম থেকে বের হয়ে যেতো, তাহলে আমরা কমপক্ষে তাদের নৈতিক সাহসের স্বীকৃতি দিতাম। কিন্তু তাদের

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

তোমাদের মধ্যে যারা একা ও নিসংগ[৫০] এবং তোমাদের গোলাম ও বাঁদীদের মধ্যে যারা সৎ[৫১] ও বিয়ের যোগ্য তাদের বিয়ে দাও।[৫২] যদি তারা গরীব হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ আপন মেহেরবানীতে তাদেরকে ধনী করে দেবেন,[৫৩] আল্লাহ বড়ই প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।

অবস্থা হচ্ছে, এ ধরনের চিন্তা পোষণ করেও তারা মুসলমান সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের চেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের মানুষ সম্ভবত দুনিয়ায় আর কোথাও পাওয়া যায় না। এ ধরনের চরিত্র ও নৈতিকতার অধিকারী লোকদের থেকে যে কোন প্রকার জালিয়াতী, প্রতারণা, দাগাবাজী, আত্মসাত ও বিশ্বাসঘাতকতা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়।

৫০. মূলে ایامی শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। একে সাধারণত লোকেরা নিছক বিধবা শব্দের অর্থে গ্রহণ করে থাকে। অথচ আসলে এ শব্দটি এমন সকল পুরুষ ও নারীর জন্য ব্যবহৃত হয় যারা স্ত্রী বা স্বামীহীন। ایامی শব্দটি اَیِّم এর বহুবচন। আর اَیِّم এমন প্রত্যেক পুরুষকে বলা হয় যার কোন স্ত্রী নেই এবং এমন প্রত্যেক নারীকে বলা হয় যার কোন স্বামী নেই। তাই আমি এর অনুবাদ করেছি "একা" ও নিসংগ।"

৫১. অর্থাৎ তোমাদের প্রতি যাদের মনোভাব ও আচরণ ভালো এবং যাদের মধ্যে তোমরা দাম্পত্য জীবন যাপনের যোগ্যতাও দেখতে পাও। যে গোলাম ও বাঁদীর আচরণ মালিকের সাথে সঠিক নয় এবং যার মেজায দেখে বিয়ের পরে জীবন সংগীর সাথে তার বনিবনা হবে বলে আশাও করা যায় না তাকে বিবাহ দেবার দায়িত্ব মালিকের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়নি। কারণ এ অবস্থায় সে অন্য এক ব্যক্তির জীবন নষ্ট করে দেবার জন্য দায়ী হবে। এ শর্তটি স্বাধীন লোকদের ব্যাপারে আরোপ করা হয়নি। কারণ স্বাধীন ব্যক্তির বিয়েতে অংশগ্রহণকারীর দায়িত্ব আসলে একজন পরামর্শদাতা, সহযোগী ও পরিচিত করাবার মাধ্যমের বেশী কিছু হয় না। বিবাহকারী ও বিবাহকারিনীর সম্মতির মাধ্যমে আসল দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু গোলাম ও বাঁদীর মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে তোলার পূর্ণ দায়িত্ব হয় মালিকের। সে যদি জেনে বুঝে কোন হতভাগিনীকে একজন বদস্বভাব ও বদচরিত্রসম্পন্ন লোকের হাতে তুলে দেয় তাহলে এর সমস্ত দায়ভার তাকেই বহন করতে হবে।

৫২. বাহ্যত এখানে আদেশমূলক ক্রিয়াপদ দেখে একদল আলেম মনে করেছেন, এ কাজটি করা ওয়াজিব। অথচ বিষয়টির ধরন নিজেই বলছে, এ আদেশটি ওয়াজিব অর্থে হতে পারে না। একথা সুস্পষ্ট, কোন ব্যক্তির বিয়ে করানো অন্যদের ওপর ওয়াজিব হতে পারে না। কার সাথে কার বিয়ে করানো ওয়াজিব? ধরা যাক, যদি ওয়াজিব হয়ও তাহলে যার বিয়ে হতে হবে তার অবস্থা কি? অন্য লোকেরা যার সাথেই তার বিয়ে দিতে চায় তার সাথে বিয়ে কি তার মেনে নেয়া উচিত? এটি যদি তার ওপর ফরয হয়ে থাকে তাহলে

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ
وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ
عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۖ وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ؕ

আর যারা বিয়ে করার সুযোগ পায় না তাদের পবিত্রতা ও সাধুতা অবলম্বন করা উচিত, যতক্ষণ না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন।[৫৪]

আর তোমাদের মালিকানাধীনদের মধ্য থেকে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তির আবেদন করে[৫৫] তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হও[৫৬] যদি তাদের মধ্যে কল্যাণের সন্ধান পাও।[৫৭] আর আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তাদেরকে দাও।[৫৮]

বুঝতে হবে তার বিয়ে তার নিজের আয়ত্বে নেই। আর যদি তার অস্বীকার করার অধিকার থাকে তাহলে যাদের ওপর এ কাজ ওয়াজিব তারা কিভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করবে? এসব দিক ভালোভাবে বিবেচনা করে অধিকাংশ ফকীহ এ রায় দিয়েছেন যে, আল্লাহর এ উক্তি এ কাজটিকে ওয়াজিব নয় বরং "মান্‌দুব" বা পছন্দনীয় গণ্য করে। অর্থাৎ এর মানে হবে, মুসলমানদের সাধারণভাবে চিন্তা হওয়া উচিত তাদের সমাজে যেন লোকেরা অবিবাহিত অবস্থায় না থাকে। পরিবারের সাথে জড়িত লোকেরা, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী সবাই এ ব্যাপারে আগ্রহ নেবে এবং যার কেউ নেই তার এ কাজে সাহায্য করবে রাষ্ট্র।

৫৩. এর অর্থ এ নয় যে, যারই বিয়ে হবে আল্লাহ তাকেই ধনাঢ্য করে দেবেন। বরং এখানে বক্তব্য হচ্ছে, লোকেরা যেন এ ব্যাপারে খুব বেশী হিসেবী না বনে যায়। এর মধ্যে মেয়ে পক্ষের জন্যও নির্দেশ রয়েছে। বলা হয়েছে, সৎ ও ভদ্র রুচিশীল ব্যক্তি যদি তাদের কাছে পয়গাম পাঠায়, তাহলে নিছক তার দারিদ্র দেখেই যেন তা প্রত্যাখ্যান না করা হয়। ছেলে পক্ষকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কোন যুবককে নিছক এখনো খুব বেশী আয়-রোজগার করছে না বলে যেন আইবুড়ো করে না রাখা হয়। আর যুবকদেরকেও উপদেশ দেয়া হচ্ছে, বেশী সচ্ছলতার অপেক্ষায় বসে থেকে নিজেদের বিয়ের ব্যাপারকে অযথা পিছিয়ে দিয়ো না। সামান্য আয় রোজগার হলেও আল্লাহর ওপর ভরসা করে বিয়ে করে নেয়া উচিত। অনেক সময় বিয়ে নিজেই মানুষের আর্থিক সচ্ছলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। স্ত্রীর সহায়তায় খরচপাতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। দায়িত্ব মাথার ওপর এসে পড়ার পর মানুষ নিজেও আগের চাইতেও বেশী পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। অর্থকরী কাজে স্ত্রী সাহায্য করতে পারে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ভবিষ্যতে কার জন্য কি লেখা আছে তা কেউ জানতে পারে না। ভালো অবস্থা খারাপ অবস্থায়ও পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে এবং খারাপ অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে ভালো অবস্থায়। কাজেই মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হিসেবী হওয়া উচিত নয়।

৫৪. এ প্রসংগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলোই এ আয়াতগুলোর সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা করতে পারে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"হে যুবকগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যে বিয়ে করতে পারে তার বিয়ে করে নেয়া উচিত। কারণ এটি হচ্ছে চোখকে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচাবার এবং মানুষের সততা ও সতিত্ব রক্ষার উৎকৃষ্ট উপায়। আর যার বিয়ে করার ক্ষমতা নেই তার রোযা রাখা উচিত। কারণ রোযা মানুষের দেহের উত্তাপ ঠাণ্ডা করে দেয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُمُ النَّاكِحُ يُرِيْدُ الْعَفَافَ وَالْمُكَاتَبُ يُرِيْدُ الْاَدَاءَ وَالْغَازِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ –

"তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব। এক ব্যক্তি হচ্ছে, যে চারিত্রিক বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য বিয়ে করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে, মুক্তিলাভের জন্য যে গোলাম লিখিতভাবে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং তার মুক্তিপণ দেয়ার নিয়ত রাখে। আর তৃতীয় ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়।" (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আহমাদ। এছাড়া আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নিসা, ২৫ আয়াত।)

৫৫. মূল শব্দ হচ্ছে مُكَاتَبَت এর শাব্দিক অর্থ লিপিবদ্ধ। কিন্তু পারিভাষিক দিক দিয়ে এ শব্দটি তখন বলা হয় যখন কোন গোলাম বা বাঁদী নিজের মুক্তির জন্য নিজের প্রভুকে একটি মূল্য দেবার প্রস্তাব দেয় এবং প্রভু সে প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয় তখন উভয়ের মধ্যে এর শর্তাবলী লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। ইসলামে গোলামদের মুক্ত করার জন্য যেসব পথ তৈরী করা হয়েছে এটি তার অন্যতম। এ মূল্য অর্থ বা সম্পদের আকারে দেয়া অপরিহার্য নয়। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে প্রভুর জন্য কোন বিশেষ কাজ করে দেয়াও মূল্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। চুক্তি হয়ে যাবার পর কর্মচারীর স্বাধীনতায় অনর্থক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার অধিকার প্রভুর থাকে না। মূল্য বাবদ দেয় অর্থ সংগ্রহের জন্য সে তাকে কাজ করার সুযোগ দেবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে গোলাম যখনই তার দেয় অর্থ বা তার ওপর আরোপিত কাজ সম্পন্ন করে দেবে তখনই সে তাকে মুক্ত করে দেবে। হযরত উমরের আমলের ঘটনা। একটি গোলাম তার কর্ত্রীর সাথে নিজের মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করে এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে চুক্তিতে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে তার কাছে নিয়ে যায়। কর্ত্রী বলে, আমিতো সমুদয় অর্থ এক সাথে নেবো না। বরং বছরে বছরে মাসে মাসে বিভিন্ন কিস্তিতে নেবো। গোলাম হযরত উমরের (রা) কাছে অভিযোগ করে। তিনি বলেন, এ অর্থ বায়তুল মালে দাখিল করে দাও এবং চলে যাও তুমি স্বাধীন। তারপর কর্ত্রীকে বলে পাঠান, তোমার অর্থ এখানে জমা হয়ে গেছে, এখন তুমি চাইলে এক

সাথেই নিয়ে নিতে পারো অথবা আমরা বছরে বছরে মাসে মাসে তোমাকে দিতে থাকবো। (দারুকুত্নী, আবু সাঈদ মুকবেরীর রেওয়ায়াতের মাধ্যমে)।

৫৬. একদল ফকীহ এ আয়াতের এ অর্থ নিয়েছেন যে, যখন কোন বাঁদী বা গোলাম মূল্য দানের বিনিময়ে মুক্তিলাভের লিখিত চুক্তি করার আবেদন জানায় তখন তা গ্রহণ করা প্রভুর জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়। এটি আতা, আমর ইবনে দীনার, ইবনে সীরীন, মাসরূক, দ্বাহ্হাক, 'ইক্রামাহ, যাহেরীয়্যা ও ইবনে জারীর তাবারীর অভিমত। ইমাম শাফে'ঈও প্রথমে এরই প্রবক্তা ছিলেন। দ্বিতীয় দলটি বলেন, এটি ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব ও মান্দুব তথা পছন্দনীয়। এ দলে শা'বী, মুকাতিল ইবনে হাইয়ান, হাসান বাস্রী, আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ, সুফিয়ান সওরী, আবু হানীফা, মালেক ইবনে আনাসের মতো মনীষীগণ আছেন। শেষের দিকে ইমাম শাফে'ঈও এ মতের প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলেন। প্রথম দলটির মতের সমর্থন করতো দু'টো জিনিস। এক, আয়াতের শব্দ كَاتِبُوهُمْ "তাদের সাথে লিখিত চুক্তি করো।" এ শব্দাবলী পরিষ্কার প্রকাশ করে যে, এটি আল্লাহর হুকুম। দুই, নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত থেকে প্রমাণ হয়, প্রখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের পিতা সীরীন যখন তাঁর প্রভু হযরত আনাসের (রা) কাছে মূল্যের বিনিময়ে গোলামী মুক্ত হবার লিখিত চুক্তি করার আবেদন জানায় এবং তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন তখন সীরীন হযরত উমরের (রা) কাছে নালিশ করে। তিনি ঘটনা শুনে দোর্রা নিয়ে হযরত আনাসের (রা) ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং বলেন, আল্লাহর হুকুম হচ্ছে, "গোলামী মুক্তির লিখিত চুক্তি করো।" (বুখারী) এ ঘটনা থেকে যুক্তি পেশ করা হয় ঃ এটি হযরত উমরের ব্যক্তিগত কাজ নয় বরং সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে তিনি এ কাজ করেছিলেন এবং কেউ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাননি, কাজেই এটি এ আয়াতের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা। দ্বিতীয় দলটির যুক্তি হচ্ছে, আল্লাহ শুধুমাত্র كَاتِبُوهُمْ বলেননি, বলেন فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا "তাদের সাথে লিখিত চুক্তি করো যদি তাদের মধ্যে কল্যাণের সন্ধান পাও।" এ কল্যাণের সন্ধান পাওয়াটা এমন একটি শর্ত নির্ভর করে এক মাত্র মালিকের রায়ের ওপর। এর এমন কোন নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই যার ভিত্তিতে কোন আদালত এটা যাচাই–পর্যালোচনা করতে পারে। আইনগত বিধানের রীতি এ নয়। তাই এ হুকুমটিকে উপদেশের অর্থেই গ্রহণ করা হবে, আইনগত হুকুমের অর্থে নয়। আর সীরীনের যে নজির পেশ করা হয়েছে তার জবাব তারা এভাবে দেন ঃ সেকালে তো আর লিখিত চুক্তির আবেদনকারী গোলাম একজন ছিল না। নবীর যুগে ও খেলাফতে রাশেদার আমলে হাজার হাজার গোলাম ছিল এবং তাদের বিপুল সংখ্যক মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করেছিল। কিন্তু কেবলমাত্র সীরীনের ঘটনাটি ছাড়া কোন প্রভুকে আদালতের হুকুমের মাধ্যমে গোলামী মুক্তির লিখিত চুক্তি করতে বাধ্য করার আর একটিও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। কাজেই হযরত উমরের এ কাজটিকে আদালতের ফায়সালা মনে করার পরিবর্তে আমরা একে এ অর্থে গ্রহণ করতে পারি যে, তিনি মুসলমানদের মাঝখানে কেবল কাযীর ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ছিলেন না বরং ব্যক্তি ও সমাজের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল পিতা ও সন্তানের মতো। অনেক সময় তিনি এমন অনেক বিষয়েও হস্তক্ষেপ করতেন যাতে একজন পিতাতো হস্তক্ষেপ করতে পারেন কিন্তু একজন বিচারক পারেন না।

৫৭. কল্যাণ বলতে তিনটি জিনিস বুঝানো হয়েছে ঃ

এক ঃ চুক্তিবদ্ধ অর্থ আদায় করার ক্ষমতা গোলামের আছে। অর্থাৎ সে উপার্জন বা পরিশ্রম করে নিজের মুক্তি লাভের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করতে পারে। যেমন একটি মুরসাল হাদীসে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

ان علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم كلا على الناس

"যদি তোমরা জানো তারা উপার্জন করতে পারে তাহলে লিখিত চুক্তি করে নাও। তাদেরকে যেন লোকদের কাছে ভিক্ষা করতে ছেড়ে দিয়ো না।" (ইবনে কাসীর, আবু দাউদের বরাত দিয়ে)

দুই ঃ তার কথায় বিশ্বাস করে তার সাথে চুক্তি করা যায়, এতটুকু সততা ও বিশ্বস্ততা তার মধ্যে আছে। এমন যেন না হয় যে, লিখিত চুক্তি করার পর সে মালিকের খিদমত করা থেকে ছুটিও পেয়ে গেলো। আবার এ সময়ের মধ্যে যা কিছু আয়-রোজগার করে তাও খেয়ে পরে শেষ করে ফেললো।

তিন ঃ মালিক তার মধ্যে এমন কোন খারাপ নৈতিক প্রবণতা অথবা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতার এমন কোন তিক্ত আবেগ-অনুভূতি পাবে না যার ভিত্তিতে এ আশংকা হয় যে, তার স্বাধীনতা মুসলিম সমাজের জন্য ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক হবে। অন্য কথায় তার ব্যাপারে আশা করা যেতে পারে যে, সে মুসলিম দেশের ও সমাজের একজন ভালো ও স্বাধীন নাগরিক হতে পারবে, কোন বিশ্বাসঘাতক ও ঘরের শত্রু আস্তিনের সাঁপে পরিণত হবে না। এ প্রসংগে একথা সামনে রাখতে হবে যে, বিষয়টি ছিল যুদ্ধবন্দী সংক্রান্তও এবং তাদের সম্পর্কে অবশ্যি এ ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন ছিল।

৫৮. এটি একটি সাধারণ হুকুম। প্রভু, সাধারণ মুসলমান এবং ইসলামী হুকুমাত সবাইকে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে।

প্রভুদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তির আবেদনকারীদের দেয় অর্থ থেকে কিছু না কিছু মাফ করে দাও। কাজেই বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে প্রমাণ হয় সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের চুক্তিবদ্ধ গোলামদের দেয় অর্থ থেকে বেশ একটা বড় পরিমাণ অর্থ মাফ করে দিতেন। এমন কি হযরত আলী (রা) হামেশা এক-চতুর্থাংশ মাফ করেছেন এবং এরি উপদেশ দিয়েছেন। (ইবনে জারীর)

সাধারণ মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যে কোন লিখিত চুক্তিবদ্ধ গোলাম তার দেয় অর্থ আদায় করার জন্য তাদের কাছে আবেদন জানাবে, তাদেরকে যেন প্রাণ খুলে সাহায্য করে। কুরআন মজীদে যাকাতের যে ব্যয় ক্ষেত্র বর্ণনা করা হয়েছে فى الرقاب তার মধ্যে একটি। অর্থাৎ "দাসত্বের জোয়াল থেকে গর্দানমুক্ত করা।" (সূরা তওবা, ৬০ আয়াত) আর আল্লাহর নিকট فك رقبه "গর্দানের বাঁধন খোলা" একটি বড় নেকীর কাজ। (সূরা বালাদ, ১৩ আয়াত) হাদীসে বলা হয়েছে ঃ এক গ্রামীন ব্যক্তি এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, আমাকে এমন কাজ বলুন যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করবো। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "তুমি অতি সংক্ষেপে অনেক বড় কথা জিজ্ঞেস

করেছো। গোলামকে মুক্ত করে দাও, গোলামদের স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করো, কাউকে পশু দান করলে অত্যধিক দুধেল পশু দান করো এবং তোমার যে আত্মীয় তোমার প্রতি জুলুম করে তুমি তার সাথে সৎ ব্যবহার করো। আর যদি তা না করতে পারো, তাহলে অভুক্তকে আহার করাও, পিপাসার্তকে পানি পান করাও, মানুষকে ভালো কাজ করার উপদেশ দাও এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করো। আর যদি এও না করতে পারো, তাহলে নিজের মুখ বন্ধ করে রাখো। মুখ খুললে ভালোর জন্য খুলবে আর নয়তো বন্ধ করে রাখবে।" (বায়হাকী ফী শু'আবিল ঈমান, আনিল বারাআ ইবনে আযিব।)

ইসলামী রাষ্ট্রকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে, বায়তুল মালে যে যাকাত জমা হয় তা থেকে লিখিত চুক্তিবদ্ধ গোলামদের মুক্তির জন্য একটি অংশ ব্যয় করো।

এ প্রসংগে উল্লেখ্য, প্রাচীন যুগে তিন ধরনের গোলাম হতো। এক, যুদ্ধবন্দী। দুই, স্বাধীন ব্যক্তিকে ধরে গোলাম বানানো হতো এবং তারপর তাকে বিক্রি করা হতো। তিন, যারা বংশানুক্রমিকভাবে গোলাম হয়ে আসছিল, তাদের বাপ-দাদাকে কবে গোলাম বানানো হয়েছিল এবং ওপরে উল্লেখিত দু' ধরনের গোলামের মধ্যে তারা ছিল কোন্ ধরনের তা জানার কোন উপায় ছিল না। ইসলামের আগমনের সময় আরব ও আরবের বাইরের জগতের মানব সমাজ এ ধরনের গোলামে পরিপূর্ণ ছিল। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা শ্রমিক ও চাকর বাকরদের চাইতে এ ধরনের গোলামদের ওপর বেশী নির্ভরশীল ছিল। ইসলামের সামনে প্রথম প্রশ্ন ছিল, পূর্ব থেকে এই যে গোলামদের ধারা চলে আসছে এদের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেয়া যায়। দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, আগামীর জন্য গোলামী সমস্যার কি সমাধান দেয়া যায়? প্রথম প্রশ্নের জবাবে ইসলাম কোন আকস্মিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। প্রাচীনকাল থেকে গোলামদের যে বংশানুক্রমিক ধারা চলে আসছিল হঠাৎ তাদের সবার ওপর থেকে মালিকানা অধিকার খতম করে দেয়নি। কারণ এর ফলে শুধু যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়তো তাই নয় বরং আরবকে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের চাইতেও অনেক বেশী কঠিন ও ধ্বংসকর গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হতে হতো। এরপরও মূল সমস্যার কোন সমাধান হতো না, যেমন আমেরিকায় হয়নি এবং কালোদের (Negroes) লাঞ্ছনার সমস্যা সেখানে রয়েই গেছে। এ নির্বোধ সুলভ ও অবিবেচনা-প্রসূত সংস্কারের পথ পরিহার করে ইসলাম فَكُّ رَقَبَةٍ তথা দাসমুক্তির একটি শক্তিশালী নৈতিক আন্দোলন শুরু করে এবং উপদেশ, উৎসাহ-উদ্দীপনা, ধর্মীয় বিধি-বিধান ও দেশজ আইন-কানুনের মাধ্যমে লোকদেরকে গোলাম আজাদ করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাদেরকে আখেরাতে নাজাত লাভ করার জন্য স্বেচ্ছায় গোলাম আজাদ করার অথবা নিজের গোনাহের কাফ্ফারা দেবার জন্য গোলামদেরকে মুক্তি দানের কিংবা অর্থের বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দেবার ব্যাপারে উৎসাহিত করে। এ আন্দোলনের আওতাধীনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে ৬৩ জন গোলামকে মুক্ত করে দেন। তাঁর স্ত্রীগণের মধ্য থেকে একমাত্র হযরত আয়েশারই (রা) আজাদকৃত গোলামদের সংখ্যা ছিল ৬৭। রসূলুল্লাহর (সা) চাচা হযরত আব্বাস (রা) নিজের জীবনে ৭০ জন গোলামকে স্বাধীন করে দেন। হাকিম ইবনে হিযাম ১০০, আবদুল্লাহ ইবনে উমর ১০০০, যুল কিলাহ হিম্ইয়ারী ৮ হাজার এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফ ৩০ হাজার গোলামকে আজাদ করে দেন। এমনি ধরনের ঘটনা অন্যান্য সাহাবীদের জীবনেও ঘটেছে। এদের মধ্যে হযরত আবু বকর

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَإِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكُمْ ءَايٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ
خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾

আর তোমাদের বাঁদীরা যখন নিজেরাই সতী সাধ্বী থাকতে চায় তখন দুনিয়াবী স্বার্থলাভের উদ্দেশ্যে তাদেরকে দেহ বিক্রয়ে বাধ্য করো না।[৫৯] আর যে তাদেরকে বাধ্য করে, তবে এ জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

আমি ব্যর্থহীন পথনির্দেশক আয়াত তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি, তোমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত জাতিদের শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তও তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেছি এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশও দিয়েছি।[৬০]

(রা) ও হযরত উমরের (রা) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি-লাভের একটি সাধারণ প্রেরণা। এ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লোকেরা ব্যাপকভাবে নিজেদের গোলামদেরকেও মুক্ত করে দিতেন এবং অন্যদের গোলাম কিনে নিয়েও তাদেরকে আজাদ করে দিতে থাকতেন। এভাবে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ শেষ হবার আগেই পূর্ব যুগের প্রায় সমস্ত গোলামই মুক্তিলাভ করেছিল।

এখন প্রশ্ন হলো ভবিষ্যতে কি হবে। এ ব্যাপারে ইসলাম কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে গোলাম বানানো এবং তার কেনা বেচা করার ধারাকে পুরোপুরি হারাম ও আইনগতভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। তবে যুদ্ধবন্দীদেরকে শুধুমাত্র এমন অবস্থায় গোলাম বানিয়ে রাখার অনুমতি (আদেশ নয় বরং অনুমতি) দেয় যখন তাদের সরকার আমাদের যুদ্ধবন্দীদের সাথে তাদের যুদ্ধবন্দীদের বিনিময় করতে রাজী হয় না এবং তারা নিজেরাও নিজেদের মুক্তিপণ আদায় করে না। তারপর এ গোলামদের জন্য একদিকে তাদের মালিকদের সাথে লিখিত চুক্তির মাধ্যমে মুক্তি লাভ করার পথ খোলা রাখা হয় এবং অন্যদিকে প্রাচীন গোলামদের ব্যাপারে যেসব নির্দেশ ছিল তা সবই তাদের পক্ষে বহাল থাকে, যেমন নেকীর কাজ মনে করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া অথবা গোনাহর কাফ্ফারা আদায় করার জন্য তাদেরকে আজাদ করা কিংবা কোন ব্যক্তির নিজের জীবদ্দশায় গোলামকে গোলাম হিসেবে রাখা এবং পরবর্তীকালের জন্য অসিয়ত করে যাওয়া যে, তার মৃত্যুর পরই সে আজাদ হয়ে যাবে (ইসলামী ফিকাহর পরিভাষায় একে বলা হয় তাদবীর এবং এ ধরনের গোলামকে "মুদাব্বার" বলা হয়)। অথবা কোন ব্যক্তি নিজের বাঁদীর সাথে সংগম করা এবং তার গর্ভে সন্তান জন্মলাভ করা,

এ অবস্থায় মালিক অসিয়ত করুক বা না করুক মালিকের মৃত্যুর সাথে সাথেই সে নিজে নিজেই স্বাধীন হয়ে যাবে। ইসলাম গোলামী সমস্যার এ সমাধান দিয়েছে। অজ্ঞ আপত্তিকারীরা এগুলো না বুঝে আপত্তি করে বসেন। পক্ষান্তরে ওজর পেশকারীগণ ওজর পেশ করতে করতে শেষ পর্যন্ত এ বাস্তব সত্যটাকেই অস্বীকার করে বসেন যে, ইসলাম গোলামীকে কোন না কোন আকারে টিকিয়ে রেখেছিল। (তা যে কারণেই হোক না কেন।)

৫৯. এর অর্থ এ নয় যে, বাঁদীরা নিজেরা যদি সতীসাধ্বী না থাকতে চায়, তাহলে তাদেরকে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করা যেতে পারে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, বাঁদী যদি স্বেচ্ছায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে নিজের অপরাধের জন্য সে নিজেই দায়ী, তার অপরাধের জন্য আইন তাকেই পাকড়াও করবে। কিন্তু যদি তার মালিক জোর করে তাকে এ পেশায় নিয়োগ করে, তাহলে এ জন্য মালিক দায়ী হবে এবং সে পাকড়াও হবে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, জোর করার প্রশ্ন তখনই দেখা দেয় যখন কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে বাধ্য করা হয়। আর "দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে" বাক্যাংশটি দ্বারা এ কথা বুঝানো হয়নি যে, যদি মালিক তার উপার্জন না খায় তাহলে বাঁদীকে দেহ বিক্রয়ে বাধ্য করার কারণে সে অপরাধী হবে না বরং বুঝানো হয়েছে যে, এ অবৈধ বল প্রয়োগের মাধ্যমে অর্জিত উপার্জনও হারামের শামিল।

কিন্তু এ নিষেধাজ্ঞাটির পূর্ণ উদ্দেশ্য নিছক এর শব্দাবলী ও পূর্বাপর আলোচনা থেকে বুঝা যেতে পারে না। একে ভালোভাবে বুঝতে হলে যে পরিস্থিতিতে এ হুকুমটি নাযিল হয় সেগুলোও সামনে রাখা জরুরী। সেকালে আরব দেশে দু'ধরনের পতিতাবৃত্তির প্রচলন ছিল। এক, ঘরোয়া পরিবেশে গোপন বেশ্যাবৃত্তি এবং দুই, যথারীতি বেশ্যাপাড়ায় বসে বেশ্যাবৃত্তি।

ঘরোয়া বেশ্যাবৃত্তিতে লিপ্ত থাকতো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাঁদীরা, যাদের কোন পৃষ্ঠপোষক ছিল না। অথবা এমন ধরনের স্বাধীন মেয়েরা, কোন পরিবার বা গোত্র যাদের পৃষ্ঠপোষক ছিল না। তারা কোন গৃহে অবস্থান করতো এবং একই সংগে কয়েকজন পুরুষের সাথে তাদের এ মর্মে চুক্তি হয়ে যেতো যে, তারা তাকে সাহায্য করবে ও তার ব্যয়ভার বহন করবে এবং এর বিনিময়ে পুরুষরা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করতে থাকবে। সন্তান জন্ম নিলে মেয়েরা যে পুরুষ সম্পর্কে বলে দিতো যে, এ সন্তান অমুকের। সে-ই সন্তানের পিতা হিসেবে স্বীকৃত হতো। এটি যেন ছিল জাহেলী সমাজের একটি স্বীকৃত প্রথা। জাহেলিয়াতের যুগে লোকেরা একে এক ধরনের 'বিয়ে' মনে করতো। ইসলাম এসে বিয়ের জন্য 'এক মেয়ের এক স্বামী' এ একমাত্র পদ্ধতিকেই চালু করলো। এ ছাড়া বাদবাকি সমস্ত পদ্ধতি আপনা আপনিই যিনা হিসেবে গণ্য হয়ে অপরাধে পরিণত হয়ে গেলো; (আবু দাউদ, বাবুন ফী অজুহিন নিকাহ আল্লাতী কানা ইয়াতানাকিহু আহলুল জাহেলিয়াহ)।

দ্বিতীয় অবস্থাটি অর্থাৎ প্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োগ করা হতো বাঁদীদেরকেই। এর দু'টি পদ্ধতি ছিল। প্রথমত লোকেরা নিজেদের যুবতী বাঁদীদের ওপর একটি নির্দিষ্ট অংক চাপিয়ে দিতো। অর্থাৎ প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে তাদেরকে দিতে হবে। ফলে তারা দেহ বিক্রয় করে তাদের এ দাবী পূর্ণ করতো। এ ছাড়া অন্য কোন

পথে তারা এ পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতেও পারতো না। আর তারা কোন পবিত্র উপায়ে এ পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে এনেছে বলে তাদের মালিকরাও মনে করতো না। যুবতী বাঁদীদের ওপর সাধারণ মজুরদের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী রোজগার করার বোঝা চাপিয়ে দেবার এ ছাড়া আর কোন যুক্তিসংগত কারণ ছিল না। দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল, লোকেরা নিজেদের সুন্দরী যুবতী বাঁদীদেরকে আলাদা ঘরে বসিয়ে রাখতো এবং তাদের দরজায় ঝাণ্ডা গেড়ে দিতো। এ চিহ্ন দেখে দূর থেকেই "ক্ষুধার্তরা" বুঝতে পারতো কোথায় তাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে হবে। এ মেয়েদেরকে বলা হতো "কালীকীয়াত" এবং এদের গৃহগুলো "মাওয়াখীর" নামে পরিচিত ছিল। বড় বড় গণ্যমান্য সমাজপতিরা এ ধরনের বেশ্যালয় পরিচালনা করতো। স্বয়ং আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (মুনাফিক প্রধান, যাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে মদীনাবাসীরা নিজেদের বাদশাহ করার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিল এবং যে হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ রটানোর কাজে সবার আগে ছিল) মদীনায় এ ধরনের একটি বেশ্যালয়ের মালিক ছিল। সেখানে ছিল ছয়জন সুন্দরী বাঁদী। তাদের মাধ্যমে সে কেবলমাত্র অর্থই উপার্জন করতো না বরং আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত নামী দামী মেহমানদের আদর আপ্যায়নও তাদের দিয়েই করাতো। তাদের অবৈধ সন্তানদের সাহায্যে সে নিজের পাইক, বরকন্দাজ ও লাঠিয়ালের সংখ্যা বাড়াতো। এ বাঁদীদেরই একজনের নাম ছিল মু'আযাহ। সে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল এবং এ পেশা থেকে তাওবা করতে চাচ্ছিল। ইবনে উবাই তার ওপর জোর জবরদস্তি করলো। সে গিয়ে হযরত আবু বকরের (রা) কাছে নালিশ করলো। তিনি ব্যাপারটি রসূলের (সা) কাছে পৌছে দিলেন। রসূলুল্লাহ (সা) জালেমের কব্জা থেকে বাঁদীটিকে বের করে আনার হুকুম দিলেন। (ইবনে জারীর, ১৮ খণ্ড, ৫৫-৫৮ এবং ১০৩-১০৪ পৃষ্ঠা, আল ইস্তি'আব লি ইবনি আবদিল বার, ২ খণ্ড, ৭৬২ পৃষ্ঠা, ইবনে কাসীর, ৩ খণ্ড, ২৮৮-২৮৯ পৃষ্ঠা)। এ সময়েই আল্লাহর পক্ষ থেকে এ আয়াত নাযিল হয়। এ পটভূমি দৃষ্টি সমক্ষে রাখলে পরিষ্কার জানা যাবে, শুধুমাত্র বাঁদীদেরকে যিনার অপরাধে জড়িত হতে বাধ্য করার পথে বাধা সৃষ্টি করাই নয় বরং ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে বেশ্যাবৃত্তির (Prostitution) ব্যবসায়কে সম্পূর্ণরূপে আইন বিরোধী গণ্য করা এবং এই সংগে যেসব মেয়েকে জোর জবরদস্তি এ ব্যবসায়ে নিয়োগ করা হয় তাদের জন্য ক্ষমা ঘোষণাও এখানে এর মূল উদ্দেশ্য।

আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ফরমান এসে যাবার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন لا مساعاة فى الاسلام "ইসলামে বেশ্যাবৃত্তির কোন অবকাশই নেই।" (আবু দাউদ, ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে, বাবুন ফী ইদ্দিআয়ে ওয়ালাদিয যিনা) দ্বিতীয় যে হুকুমটি তিনি দেন সেটি ছিল এই যে, যিনার মাধ্যমে অর্জিত অর্থ হারাম, নাপাক ও পুরোপুরি নিষিদ্ধ। রাফে' ইবন খাদীজের রেওয়ায়াত হচ্ছে, নবী করীম (সা) مهر البغى অর্থাৎ যিনার বিনিময়ে অর্জিত অর্থকে নষ্ট, সর্বাধিক অকল্যাণমূলক উপার্জন, অপবিত্র ও নিকৃষ্টতম আয় গণ্য করেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ) আবু হুজাইফা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) كسب البغى অর্থাৎ দেহ বিক্রয়লব্ধ অর্থকে হারাম গণ্য করেছেন। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ) আবু মাস'উদ উকবাহ ইবনে আমরের রেওয়ায়াত হচ্ছে, রসূলুল্লাহ (সা) مهر البغى তথা যিনার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থের লেনদেনকে নিষিদ্ধ গণ্য করেছেন। (সিহাহে সিত্তা ও আহমদ) তৃতীয় যে হুকুমটি তিনি দিয়েছিলেন তা

ছিল এই যে, বাঁদীর কাছ থেকে বৈধ পন্থায় কেবলমাত্র হাত ও পায়ের শ্রম গ্রহণ করা যেতে পারে এবং মনিব তার ওপর এমন পরিমাণ কোন অর্থ চাপিয়ে দিতে বা তার কাছ থেকে আদায় করতে পারে না যে সম্পর্কে সে জানে না এ অর্থ সে কোথা থেকে ও কিভাবে উপার্জন করে। রাফে' ইবনে খাদীজ বলেন ঃ

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْاَمَةِ حَتّٰى يُعْلَمُ مِنْ اَيْنَ هُوَ -

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাঁদীর মাধ্যমে কোন উপার্জন নিষিদ্ধ গণ্য করেন যতক্ষণ না একথা জানা যায় যে, এ অর্থ কোথা থেকে অর্জিত হয়।" (আবু দাউদ, কিতাবুল ইজারাহ)

রাফে' ইবনে রিফা'আহ আনসারীর বর্ণনায় এর চাইতেও সুস্পষ্ট হুকুম পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

نَهَانَا نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْاَمَةِ اِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا وَقَالَ هٰكَذَا بِاَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخُبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْشِ -

"আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাঁদীর সাহায্যে অর্থোপর্জন করতে আমাদের নিষেধ করেছেন, তবে হাতের সাহায্যে পরিশ্রম করে সে যা কিছু কামাই করে তা ছাড়া। এবং তিনি হাতের ইশারা করে দেখান যেমন এভাবে রুটি তৈরি করা, সূতা কাটা বা উল ও তুলা ধোনা।" (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, কিতাবুল ইজারাহ)

একই বক্তব্য সম্বলিত একটি হাদীস আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাতে كسب الاماء (বাঁদীর কামাই) ও مهر البغى (ব্যভিচারের উপার্জন) গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এ আয়াতের উদ্দেশ্য অনুযায়ী সেকালে আরবে প্রচলিত বেশ্যাবৃত্তির সকল পদ্ধতিকে ধর্মীয় দিক দিয়ে অবৈধ ও আইনগত দিক দিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। বরং আরো অগ্রসর হয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর বাঁদী মু'আযার ব্যাপারে যা কিছু সিদ্ধান্ত তিনি দেন তা থেকে জানা যায়, যে বাঁদীকে তার মালিক জোর করে এ পেশায় নিয়োগ করে তার ওপর থেকে তার মালিকের মালিকানা সত্বও খতম হয়ে যায়। এটি ইমাম যুহ্‌রীর রেওয়ায়াত। ইবনে কাসীর মুসনাদে আবদুর রায্‌যাকের বরাত দিয়ে তাঁর গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন।

৬০. এ আয়াতটির সম্পর্ক কেবলমাত্র ওপরের শেষ আয়াতটির সাথে নয়। বরং সূরার শুরু থেকে এখান পর্যন্ত যে বর্ণনা ধারা চলে এসেছে তার সবের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। দ্ব্যর্থহীন পথ নির্দেশক আয়াত বলতে এমনসব আয়াত বুঝানো হয়েছে যেগুলোতে যিনা, কাযাফ ও লি'আনের আইন বর্ণনা করা হয়েছে, ব্যভিচারী পুরুষ ও মহিলার সাথে মু'মিনদের বিয়েশাদী না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সৎ চরিত্রবান ও সম্ভ্রান্ত লোকদের ওপর ভিত্তিহীন অপবাদ দেয়া এবং সমাজে দুষ্কৃতি ও অশ্লীলতার প্রচার ও প্রসারের পথ বন্ধ

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ
اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ
شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ
وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ؕ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ
وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٣٥﴾

৫ রুকূ'

আল্লাহ[৬১] আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর আলো।[৬২] (বিশ্ব-জাহানে) তাঁর আলোর উপমা যেন একটি তাকে একটি প্রদীপ রাখা আছে, প্রদীপটি আছে একটি চিমনির মধ্যে, চিমনিটি দেখতে এমন যেন মুক্তোর মতো ঝকমকে নক্ষত্র; আর এ প্রদীপটি যয়তূনের এমন একটি মুবারক[৬৩] গাছের তেল দিয়ে উজ্জ্বল করা হয়, যা পূর্বেরও নয়, পশ্চিমেরও নয়।[৬৪] যার তেল আপনা আপনিই জ্বলে ওঠে, চাই আগুন তাকে স্পর্শ করুক বা না করুক। (এভাবে) আলোর ওপরে আলো (বৃদ্ধির সমস্ত উপকরণ একত্র হয়ে গেছে।)[৬৫] আল্লাহ যাকে চান নিজের আলোর দিকে পথনির্দেশ করেন।[৬৬] তিনি উপমার সাহায্যে লোকদের কথা বুঝান। তিনি প্রত্যেকটি জিনিস খুব ভালো করেই জানেন।[৬৭]

করা হয়েছে, পুরুষ ও নারীকে দৃষ্টিসংযত ও যৌনাংগ হেফাজত করার তাগিদ দেয়া হয়েছে, নারীদের জন্য পরদার সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, বিবাহযোগ্য লোকদের বিবাহ না করে একাকী জীবন যাপনকে অপছন্দ করা হয়েছে, গোলামদের আজাদীর জন্য লিখিত চুক্তি করার নিয়ম প্রবর্তন করতে বলা হয়েছে এবং সমাজকে বেশ্যাবৃত্তির অভিশাপ মুক্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এসব কথা বলার পর বলা হচ্ছে, আল্লাহকে ভয় করে সহজ সরল পথ অবলম্বনকারীদেরকে যেভাবে শিক্ষা দেয়া দরকার তাতো আমি দিয়েছি, এখন যদি তোমরা এ শিক্ষার বিপরীত পথে চলো, তাহলে এর পরিষ্কার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, তোমরা এমন সব জাতির মতো নিজেদের পরিণাম দেখতে চাও যাদের ভয়াবহ ও শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত আমি এ কুরআনে তোমাদের সামনে পেশ করেছি।—সম্ভবত একটি নির্দেশনামার উপসংহারে এর চেয়ে কড়া সতর্কবাণী আর হতে পারে না। কিন্তু অবাক হতে হয় এমন জাতির কার্যকলাপ দেখে যারা এ নির্দেশনামা তেলাওয়াতও করে আবার এ ধরনের কড়া সাবধান বাণীর পরও এর বিপরীত আচরণও করতে থাকে!

৬১. এখান থেকে শুরু হয়েছে মুনাফিকদের প্রসংগ। ইসলামী সমাজের মধ্যে অবস্থান করে তারা একের পর এক গোলযোগ ও বিভ্রাট সৃষ্টি করে চলছিল এবং ইসলাম,

ইসলামী আন্দোলন, ইসলামী রাষ্ট্র ও দলকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ব্যাপারে ঠিক তেমনিভাবে তৎপর ছিল যেমন বাইরের প্রকাশ্য কাফের ও দুশমনরা তৎপর ছিল। তারা ছিল ঈমানের দাবীদার। মুসলমানদের অন্তরভুক্ত ছিল তারা। মুসলমানদের বিশেষ করে আনসারদের সাথে ছিল তাদের আত্মীয়তা ও ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক। এ জন্য তারা মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা বিস্তারের সুযোগও বেশী পেতো এবং কোন কোন আন্তরিকতা সম্পন্ন মুসলমানও নিজের সরলতা বা দুর্বলতার কারণে তাদের ক্রীড়নক ও পৃষ্ঠপোষকেও পরিণত হয়ে যেতো। কিন্তু আসলে বৈষয়িক স্বার্থ তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছিল এবং ঈমানের দাবী সত্ত্বেও কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বদৌলতে দুনিয়ায় যে আলো ছড়িয়ে পড়ছিল তা থেকে তারা ছিল একেবারেই বঞ্চিত। এ সুযোগে তাদেরকে সম্বোধন না করে তাদের সম্পর্কে যা কিছু বলা হচ্ছে তার পেছনে রয়েছে তিনটি উদ্দেশ্য। প্রথমত তাদেরকে উপদেশ দেয়া। কারণ আল্লাহর রহমত ও রবুবিয়াতের প্রথম দাবী হচ্ছে, পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত মানুষকে তার সকল নষ্টামি ও দুষ্কৃতি সত্ত্বেও শেষ সময় পর্যন্ত বুঝাবার চেষ্টা করতে হবে। দ্বিতীয়ত ঈমান ও মুনাফিকির পার্থক্যকে পরিষ্কার ও খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করে দেয়া। এভাবে কোন বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য মুসলিম সমাজে মু'মিন ও মুনাফিকের মধ্যে ফারাক করা কঠিন হবে না। আর এ ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত বর্ণনার পরও যে ব্যক্তি মুনাফিকদের ফাঁদে জড়িয়ে পড়বে অথবা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করবে সে তার নিজের এ কাজের জন্য পুরোপুরি দায়ী হবে। তৃতীয়ত মুনাফিকদেরকে পরিষ্কার ভাষায় সতর্ক করে দেয়া। তাদেরকে এ মর্মে জানিয়ে দেয়া যে, মুমিনদের জন্য আল্লাহর যে ওয়াদা রয়েছে তা কেবলমাত্র তাদের জন্য যারা সাচ্চা দিলে ঈমান আনে এবং তারপর এ ঈমানের দাবী পূরণ করে। এ প্রতিশ্রুতি এমন লোকদের জন্য নয় যারা নিছক আদম শুমারীর মাধ্যমে মুসলমানদের দলে ভিড়ে গেছে। কাজেই মুনাফিক ও ফাসিকদের এ প্রতিশ্রুতির মধ্য থেকে কিছু অংশ পাওয়ার আশা করা উচিত নয়।

৬২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী শব্দ সাধারণভাবে কুরআন মজীদে "বিশ্ব-জাহান" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই অন্য কথায় আয়াতের অনুবাদ এও হতে পারে ঃ আল্লাহ সমগ্র বিশ্ব-জাহানের আলো।

আলো বলতে এমন জিনিস বুঝানো হয়েছে যার বদৌলতে দ্রব্যের প্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ যে নিজে নিজে প্রকাশিত হয় এবং অন্য জিনিসকেও প্রকাশ করে দেয়। মানুষের চিন্তায় নূর ও আলোর এটিই আসল অর্থ। কিছুই না দেখা যাওয়ার অবস্থাকে মানুষ অন্ধকার নাম দিয়েছে। আর এর বিপরীতে যখন সবকিছু দেখা যেতে থাকে এবং প্রত্যেকটি জিনিস প্রকাশ হয়ে যায় তখন মানুষ বলে আলো হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলার জন্য "নূর" তথা আলো শব্দটির ব্যবহার এ মৌলিক অর্থের দিক দিয়েই করা হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ তিনি এমন কোন আলোকরশ্মি নন যা সেকেণ্ডে ১ লাখ ৮৬ হাজার মাইল বেগে চলে এবং আমাদের চোখের পরদায় পড়ে মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রকে প্রভাবিত করে, আলোর এ ধরনের কোন অর্থ এখানে নেই। মানুষের মস্তিষ্ক যে অর্থের জন্য এ শব্দটি উদ্ভাবন করেছে, আলোর এ বিশেষ অবস্থা সে অর্থের মৌল তত্ত্বের অন্তরভুক্ত নয়। বরং তার ওপর এ শব্দটি আমরা এ বস্তুজগতে আমাদের অভিজ্ঞতায় যে আলো ধরা দেয় তার দৃষ্টিতে প্রয়োগ করি। মানুষের ভাষায় প্রচলিত যতগুলো শব্দ আল্লাহর জন্য বলা হয়ে থাকে সেগুলো তাদের

আসল মৌলিক অর্থের দৃষ্টিতে বলা হয়ে থাকে, তাদের বস্তুগত অর্থের দৃষ্টিতে বলা হয় না। যেমন আমরা তাঁর জন্য দেখা শব্দটি ব্যবহার করি। এর অর্থ এ হয় না যে, তিনি মানুষ ও পশুর মতো চোখ নামক একটি অংগের মাধ্যমে দেখেন। আমরা তাঁর জন্য শোনা শব্দ ব্যবহার করি। এর মানে এ নয় যে, তিনি আমাদের মতো কানের সাহায্যে শোনেন। তাঁর জন্য আমরা পাকড়াও ও ধরা শব্দ ব্যবহার করি। এর অর্থ এ নয় যে, তিনি হাত নামক একটি অংগের সাহায্যে ধরেন। এসব শব্দ সবসময় তাঁর জন্য একটি প্রায়োগিক মর্যাদায় বলা হয়ে থাকে এবং একমাত্র একজন স্বল্প বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এ ভুল ধারণা করতে পারে যে, আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় শোনা, দেখা ও ধরার যে সীমাবদ্ধ ও বিশেষ আকৃতি রয়েছে তার বাইরে এগুলোর অন্য কোন আকৃতি ও ধরন হওয়া অসম্ভব। অনুরূপভাবে "নূর" বা আলো সম্পর্কেও একথা মনে করা নিছক একটি সংকীর্ণ চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, এর অর্থের ক্ষেত্র শুধুমাত্র এমন রশ্মিরই আকারে পাওয়া যেতে পারে যা কোন উজ্জ্বল অবয়ব থেকে বের হয়ে এসে চোখের পরদায় প্রতিফলিত হয়। এ সীমিত অর্থে আল্লাহ আলো নন বরং ব্যাপক, সার্বিক ও আসল অর্থে আলো। অর্থাৎ এ বিশ্ব-জাহানে তিনিই একক আসল "প্রকাশের কার্যকারণ", বাকি সবই এখানে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যান্য আলোক বিতরণকারী জিনিসগুলোও তাঁরই দেয়া আলো থেকে আলোকিত হয় ও আলো দান করে। নয়তো তাদের কাছে নিজের এমন কিছু নেই যার সাহায্যে তারা এ ধরনের বিস্ময়কর কাণ্ড করতে পারে।

আলো শব্দের ব্যবহার জ্ঞান অর্থেও হয় এবং এর বিপরীতে অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতাকে অন্ধকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এ অর্থেও আল্লাহ বিশ্ব-জাহানের আলো। কেননা, এখানে সত্যের সন্ধান ও সঠিক পথের জ্ঞান একমাত্র তাঁর মাধ্যমেই এবং তার কাছ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। তাঁর দান গ্রহণ করা ছাড়া মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার এবং তার ফলশ্রুতিতে ভ্রষ্টতা ও গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়।

৬৩. মুবারক অর্থাৎ বহুল উপকারী, বহুমুখী কল্যাণের ধারক।

৬৪. অর্থাৎ যা খোলা ময়দানে বা উঁচু জায়গায় অবস্থান করে। যেখানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার ওপর রোদ পড়ে। তার সামনে পেছনে কোন আড় থাকে না যে, কেবল সকালের রোদটুকু বা বিকালের রোদটুকু তার ওপর পড়ে। এমন ধরনের যয়তুন গাছের তেল বেশী স্বচ্ছ হয় এবং বেশী উজ্জ্বল আলো দান করে। নিছক পূর্ব বা নিছক পশ্চিম অঞ্চলের যয়তুন গাছ তুলনামূলকভাবে অস্বচ্ছ তেল দেয় এবং প্রদীপে তার আলোও হালকা থাকে।

৬৫. এ উপমায় প্রদীপের সাথে আল্লাহর সত্তাকে এবং তাকের সাথে বিশ্ব-জাহানকে তুলনা করা হয়েছে। আর চিমনি বলা হয়েছে এমন পরদাকে যার মধ্যে মহাসত্যের অধিকারী সমস্ত সৃষ্টিকুলের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করে রেখেছেন, অর্থাৎ এ পরদাটি যেন গোপন করার পরদা নয় বরং প্রবল প্রকাশের পরদা। সৃষ্টির দৃষ্টি যে তাঁকে দেখতে অক্ষম এর কারণ এটা নয় যে, মাঝখানে অন্ধকার আছে, বরং আসল কারণ হচ্ছে, মাঝখানের পরদা স্বচ্ছ এবং এ স্বচ্ছ পরদা অতিক্রম করে আগত আলো এত বেশী তীক্ষ্ণ, তীব্র, অবিমিশ্র ও পরিবেষ্টনকারী যে, সীমিত শক্তি সম্পন্ন চক্ষু তা দেখতে অক্ষম হয়ে গেছে। এ দুর্বল চোখগুলো কেবলমাত্র এমন ধরনের সীমাবদ্ধ আলো দেখতে পারে যার

মধ্যে কমবেশী হতে থাকে, যা কখনো অন্তরহিত আবার কখনো উদিত হয়, যার বিপরীতে কোন অন্ধকার থাকে এবং নিজের বিপরীতধর্মীর সামনে এসে সে সমুজ্জ্বল হয়। কিন্তু নিরেট, ভরাট ও ঘন আলো, যার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিযোগীই নেই, যা কখনো অন্তরহিত ও নিশ্চিহ্ন হয় না এবং যা সবসময় একইভাবে সব দিক আচ্ছন্ন করে থাকে তাকে পাওয়া ও তাকে দেখা এদের সাধ্যের বাইরে।

আর "এ প্রদীপটি যয়তুনের এমন একটি মুবারক গাছের তেল দিয়ে উজ্জ্বল করা হয় যা পূর্বেরও নয় পশ্চিমের নয়।" এ বক্তব্য কেবলমাত্র প্রদীপের আলোর পূর্ণাভা ও তার তীব্রতার ধারণা দেবার জন্য বলা হয়েছে। প্রাচীন যুগে যয়তুনের তেলের প্রদীপ থেকেই সর্বাধিক পরিমাণ আলোক লাভ করা হতো। এর মধ্যে আবার উঁচু ও খোলা জায়গায় বেড়ে ওঠা যয়তুন গাছগুলো থেকে যে তেল উৎপন্ন হতো সেগুলোর প্রদীপের আলো হতো সবচেয়ে জোরালো। উপমায় এ বিষয়বস্তুর বক্তব্য এই নয় যে, প্রদীপের সাথে আল্লাহর যে সত্তার তুলনা করা হয়েছে তা অন্য কোন জিনিস থেকে শক্তি (Energy) অর্জন করছে। বরং একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, উপমায় কোন মামুলি ধরনের প্রদীপ নয় বরং তোমাদের দেখা উজ্জ্বলতম প্রদীপের কথা চিন্তা করো। এ ধরনের প্রদীপ যেমন সারা ঘর বাড়ি আলোকোজ্জল করে ঠিক তেমনি আল্লাহর সত্তাও সারা বিশ্ব-জাহানকে আলোক নগরীতে পরিণত করে রেখেছে।

আর এই যে বলা হয়েছে, "তার তেল আপনা আপনিই জ্বলে ওঠে আগুন তাকে স্পর্শ না করলেও", এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রদীপের আলোকে অত্যধিক তীব্র করার ধারণা দেয়া। অর্থাৎ উপমায় এমন সর্বাধিক তীব্র আলো দানকারী প্রদীপের কথা চিন্তা করো যার মধ্যে এ ধরনের স্বচ্ছ ও চরম উত্তেজক তেল রয়েছে। এ তিনটি জিনিস অর্থাৎ যয়তুন, তার পূরবীয় ও পশ্চিমী না হওয়া এবং আগুনের স্পর্শ ছাড়াই তার তেলের আপনা আপনি জ্বলে ওঠা উপমার স্বতন্ত্র অংশ নয় বরং উপমার প্রথম অংশের অর্থাৎ প্রদীপের আনুসংগিক বিষয়াদির অন্তরভুক্ত। উপমার আসল অংশ তিনটি ঃ প্রদীপ, তাক ও স্বচ্ছ চিমনি বা কাঁচের আবরণ।

আয়াতের "তাঁর আলোর উপমা যেমন" এ বাক্যাংশটিও উল্লেখযোগ্য। "আল্লাহ আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর আলো" আয়াতের একথাগুলো পড়ে কারোর মনে যে ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারতো ওপরের বাক্যাংশটির মাধ্যমে তা দূর হয়ে যায়। এ থেকে জানা যায়, আল্লাহকে "আলো" বলার মানে এ নয় যে, নাউযুবিল্লাহ, আলোই তাঁর স্বরূপ। আসলে তিনি তো হচ্ছেন একটি পরিপূর্ণ ও পূর্ণাংগ সত্তা। তিনি জ্ঞানী, শক্তিশালী, প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ ইত্যাদি হবার সাথে সাথে আলোর অধিকারীও। কিন্তু তাঁর সত্তাকে আলো বলা হয়েছে নিছক তাঁর আলোকোজ্জলতার পূর্ণতার কারণে। যেমন কারোর দানশীলতা গুণের পূর্ণতার কথা বর্ণনা করার জন্য তাকেই "দান" বলে দেয়া অথবা তার সৌন্দর্যের পূর্ণতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে স্বয়ং তাকেই সৌন্দর্য আখ্যা দেয়া।

৬৬. যদিও আল্লাহর এ একক ও একচ্ছত্র আলো সমগ্র বিশ্ব-জাহান আলোকিত করছে কিন্তু তা দেখার, জানার ও উপলব্ধি করার সৌভাগ্য সবার হয় না। তা উপলব্ধি করার সুযোগ এবং তার দানে অনুগৃহীত হবার সৌভাগ্য আল্লাহই যাকে চান তাকে দেন। নয়তো অন্ধের জন্য যেমন দিনরাত সমান ঠিক তেমনি অবিবেচক ও অদূরদর্শী মানুষের জন্য

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا
بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ
وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ
الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ
مِّنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

(তাঁর আলোর পথ অবলম্বনকারী) ঐ সব ঘরে পাওয়া যায়, যেগুলোকে উন্নত করার ও যেগুলোর মধ্যে নিজের নাম স্মরণ করার হুকুম আল্লাহ দিয়েছেন।[৬৮] সেগুলোতে এমন সব লোক সকাল সাঁঝে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। যারা ব্যবসায় ও বেচাকেনার ব্যস্ততার মধ্যেও আল্লাহর স্মরণ এবং নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফিল হয়ে যায় না। তারা সেদিনকে ভয় করতে থাকে যেদিন হৃদয় বিপর্যস্ত ও দৃষ্টি পাথর হয়ে যাবার উপক্রম হবে। (আর তারা এসব কিছু এ জন্য করে) যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেন এবং তদুপরি নিজ অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ যাকে চান বেহিসেব দান করেন।[৬৯]

বিজলী, সূর্য, চাঁদ ও তারার আলো তো আলোই, কিন্তু আল্লাহর নূর ও আলো সে ঠাহর করতে পারে না। এ দিক থেকে এ দুর্ভাগার জন্য বিশ্ব-জাহানে সবদিকে অন্ধকারই অন্ধকার। দুঁচোখ অন্ধ। তাই নিজের একান্ত কাছের জিনিসই সে দেখতে পারে না। এমনকি তার সাথে ধাক্কা খাওয়ার পরই সে জানতে পারে এ জিনিসটি এখানে ছিল। এভাবে ভিতরের চোখ যার অন্ধ অর্থাৎ যার অন্তরদৃষ্টি নেই সে তার নিজের পাশেই আল্লাহর আলোয় যে সত্য জ্বলজ্বল করছে তাকেও দেখতে পায় না। যখন সে তার সাথে ধাক্কা খেয়ে নিজের দুর্ভাগ্যের শিকলে বাঁধা পড়ে কেবলমাত্র তখনই তার সন্ধান পায়।

৬৭. এর দু'টি অর্থ হয়। এক, তিনি জানেন কোন্ সত্যকে কোন্ উপমার সাহায্যে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে বুঝানো যেতে পারে। দুই, তিনি জানেন কে এ নিয়ামতের হকদার এবং কে নয়। যে ব্যক্তি সত্যের আলোর সন্ধানী নয়, যে ব্যক্তি সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে নিজের পার্থিব স্বার্থেরই মধ্যে বিলীন হয়ে যায় এবং বস্তুগত স্বাদ ও স্বার্থের সন্ধানে নিমগ্ন থাকে তাকে জোর করে সত্যের আলো দেখাবার আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। যার সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, সে এর সন্ধানী ও ঐকান্তিক সন্ধানী সে-ই এ দান লাভের যোগ্য।

৬৮. কোন কোন মুফাস্‌সির এ "ঘরগুলো"কে মসজিদ অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং এগুলোকে উন্নত করার অর্থ নিয়েছেন এগুলো নির্মাণ ও এগুলোকে মর্যাদা প্রদান করা। আবার অন্য কতিপয় মুফাস্‌সির এর অর্থ নিয়েছেন মু'মিনদের ঘর এবং সেগুলোকে উন্নত

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۢ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ
حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ
وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾ اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ
فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَآ
اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ﴿٤٠﴾

কিন্তু যারা কুফরী করে[৭০] তাদের কর্মের উপমা হলো পানিহীন মরুপ্রান্তরে মরীচিকা, তৃষ্ণাতুর পথিক তাকে পানি মনে করেছিল, কিন্তু যখন সে সেখানে পৌঁছুলো কিছুই পেলো না বরং সেখানে সে আল্লাহকে উপস্থিত পেলো, যিনি তার পূর্ণ হিসেব মিটিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর হিসেব নিতে দেরী হয় না।[৭১] অথবা তার উপমা যেমন একটি গভীর সাগর বুকে অন্ধকার। ওপরে ছেয়ে আছে একটি তরংগ, তার ওপরে আর একটি তরংগ আর তার ওপরে মেঘমালা অন্ধকারের ওপর অন্ধকার আচ্ছন্ন। মানুষ নিজের হাত বের করলে তাও দেখতে পায় না।[৭২] যাকে আল্লাহ আলো দেন না তার জন্য আর কোন আলো নেই।[৭৩]

করার অর্থ তাঁদের মতে সেগুলোকে নৈতিক দিক দিয়ে উন্নত করা। "সেগুলোর মধ্যে নিজের নাম স্মরণ করার আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন" এ শব্দগুলো বাহ্যত মসজিদ সংক্রান্ত ব্যাখ্যার বেশী সমর্থক দেখা যায়। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে জানা যাবে এটি প্রথম ব্যাখ্যাটির মতো এ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিরও সমান সমর্থক। কারণ আল্লাহর শরীয়াত বৈরাগ্যবাদগ্রস্ত ধর্মের ন্যায় ইবাদাতকে কেবল ইবাদাতখানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে না। পুরোহিত বা পূজারী শ্রেণীর কোন ব্যক্তির নেতৃত্ব ছাড়া সেখানে বন্দেগী ও পূজা–অর্চনা করা যেতে পারে না। বরং এখানে মসজিদের মতো গৃহ ও ইবাদাতখানা এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজের পুরোহিত। কাজেই এ সূরায় সকল প্রকার ঘরোয়া জীবন যাপনকে উচ্চ ও সমুন্নত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি পরিবেশ ও পরিস্থিতির দিক দিয়ে বেশী উপযোগী বলে আমাদের মনে হচ্ছে, যদিও প্রথম ব্যাখ্যাটিকে রদ করে দেবার কোন যুক্তিসংগত কারণ আমাদের কাছে নেই। বিচিত্র নয়, এর অর্থ হচ্ছে মু'মিনদের গৃহ ও মসজিদ দু'টোই।

৬৯. আল্লাহর আসল আলো উপলব্ধি ও তার ধারায় অবগাহন করার জন্য যেসব গুণের প্রয়োজন এখানে সেগুলোর ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ অন্ধ বন্টনকারী নন। যাকে ইচ্ছা এমনি বিনা কারণে তার পাত্র এমনভাবে ভরে দেবেন যে, উপচে পড়ে যেতে থাকবে আবার যাকে ইচ্ছা গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবেন, এটা আল্লাহর বন্টন নীতি নয়। তিনি

যাকে দেন, দেখেশুনেই দেন। সত্যের নিয়ামত দান করার ব্যাপারে তিনি যা কিছু দেখেন তা হচ্ছে ঃ মানুষের মনে তাঁর প্রতি ভালোবাসা, আগ্রহ, আকর্ষণ, ভয় এবং তাঁর পুরস্কার গ্রহণের আকাংখা ও ক্রোধ থেকে বাঁচার অভিলাষ আছে। সে পার্থিব স্বার্থ পূজায় নিজেকে বিলীন করে দেয়নি। বরং যাবতীয় কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তার সমগ্র হৃদয়-মন আচ্ছন্ন করে থাকে তার মহান প্রতিপালকের স্মৃতি। সে রসাতলে যেতে চায় না বরং কার্যত এমন উচ্চমার্গে উন্নীত হতে চায় যেদিকে তার মালিক তাকে পথ দেখাতে চায়। সে এ দু'দিনের জীবনের লাভের প্রত্যাশী হয় না বরং তার দৃষ্টি থাকে আখেরাতের চিরন্তন জীবনের ওপর। এসব কিছু দেখে মানুষকে আল্লাহর আলোয় অবগাহন করার সুযোগ দেবার ফায়সালা করা হয়। তারপর যখন আল্লাহ দেবার জন্য এগিয়ে আসেন তখন এত বেশী দিয়ে দেন যে, মানুষের নিজের নেবার পাত্র সংকীর্ণ থাকলে তো ভিন্ন কথা, নয়তো তাঁর দেবার ব্যাপারে কোন সীমাবদ্ধতা এবং শেষ সীমানা নেই।

৭০. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবীগণ এবং সে সময় আল্লাহর নবী সাইয়েদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সত্যের শিক্ষা দিচ্ছিলেন সরল মনে তা মেনে নিতে অস্বীকার করে। ওপরের আয়াত নিজেই বলে দিচ্ছে, আল্লাহর আলো লাভকারী বলতে সাচ্চা ও সৎ মুমিনদেরকে বুঝানো হয়েছে। তাই এখন তাদের মোকাবিলায় এমন সব লোকের অবস্থা জানানো হচ্ছে যারা এ আলো লাভের আসল ও একমাত্র মাধ্যম অর্থাৎ রসূলকেই মেনে নিতে ও তাঁর আনুগত্য করতে অস্বীকার করে। মন থেকে অস্বীকার করুক অথবা নিছক মৌখিক অস্বীকৃতির ঘোষণা দিক কিংবা মনে ও মুখে উভয়ভাবে অস্বীকৃতি জানাক তাতে কিছু আসে যায় না।

৭১. এ উপমায় এমনসব লোকের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যারা কুফরী ও মুনাফিকী সত্ত্বেও বাহ্যত সৎকাজও করে এবং মোটামুটিভাবে আখেরাতকেও মানে আবার এ অসার চিন্তাও পোষণ করে যে, সাচ্চা ঈমান ও মুমিনের গুণাবলী এবং রসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ ছাড়া এ কার্যাবলী তাদের জন্য আখেরাতে কোন কাজে লাগবে না। উপমার আকারে তাদেরকে জানানো হচ্ছে, তোমরা নিজেদের যেসব বাহ্যিক ও প্রদর্শনীমূলক সৎ-কাজের মাধ্যমে আখেরাতে লাভবান হবার আশা রাখো সেগুলো নিছক মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। মরুভূমিতে দূর থেকে চিকচিক করা বালুকারাশি দেখে যেমন পিপাসার্ত তাকে একটি তরংগায়িত পানির দরিয়া মনে করে নিজের পিপাসা নিবৃত্তির জন্য উর্ধশ্বাসে সেদিকে দৌড়াতে থাকে, ঠিক তেমনি তোমরা এসব কর্মের ওপর মিথ্যা ভরসা করে মৃত্যু মনযিলের পথ অতিক্রম করে চলছো। কিন্তু যেমন মরীচিকার দিকে ছুটে চলা ব্যক্তি যখন যে স্থানে পানির দরিয়া আছে মনে করেছিল সেখানে পৌঁছে কিছুই পায় না ঠিক তেমনি তোমরা যখন মৃত্যু মনযিলে প্রবেশ করবে তখন জানতে পারবে সেখানে এমন কোন জিনিস নেই যা থেকে তোমরা লাভবান হতে পারবে। বরং এর বিপরীত দেখবে তোমাদের কুফরী ও মুনাফিকী এবং লোকদেখানো সৎকাজের সাথে তোমরা যেসব খারাপ কাজ করছিলে সেগুলোর হিসেব নেবার এবং পুরোপুরি প্রতিদান দেবার জন্য আল্লাহ সেখানে উপস্থিত রয়েছেন।

৭২. এ উপমায় সকল কাফের মুনাফিকের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। লোক দেখানো সৎকাজকারীরাও এর অন্তরভুক্ত। এদের সবার সম্পর্কে বলা হচ্ছে, জাগতিক পরিভাষায়

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰفّٰتٍ ۖ
كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي
سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ
مِنْ خِلٰلِهِ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ
بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ
بِالْأَبْصَارِ ﴿٤٣﴾

৬ রুকূ'

তুমি[৭৪] কি দেখ না, আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছে যারা আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তারা সবাই এবং যে পাখিরা ডানা বিস্তার করে আকাশে ওড়ে? প্রত্যেকেই জানে তার নামাযের ও পবিত্রতা বর্ণনা করার পদ্ধতি। আর এরা যা কিছু করে আল্লাহ তা জানেন। আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই এবং তাঁরই দিকে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

তুমি কি দেখ না, আল্লাহ মেঘমালাকে ধীর গতিতে সঞ্চালন করেন, তারপর তার খণ্ডগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করেন, তারপর তাকে একত্র করে একটি ঘন মেঘে পরিণত করেন, তারপর তুমি দেখতে পাও তার খোল থেকে বৃষ্টি বিন্দু একাধারে ঝরে পড়ছে। আর তিনি আকাশ থেকে তার মধ্যে সমুন্নত পাহাড়গুলোর বদৌলতে[৭৫] শিলা বর্ষণ করেন, তারপর যাকে চান এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করেন এবং যাকে চান এর হাত থেকে বাঁচিয়ে নেন। তার বিদ্যুৎচমক চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

তারা মহাপণ্ডিত ও জ্ঞান সাগরের মহান দিশারী হলেও হতে পারে কিন্তু নিজেদের সমগ্র জীবন যাপন করছে তারা চরম ও পূর্ণ মূর্খতার মধ্যে। তারা হচ্ছে এমন ব্যক্তির মতো যে এমন কোন জায়গায় আবদ্ধ হয়ে আছে যেখানে পুরোপুরি অন্ধকারের রাজত্ব, আলোর সামান্যতম শিখাও যেখানে পৌঁছুতে পারে না। তারা মনে করে আনবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, শব্দের চেয়ে দ্রুত গতি সম্পন্ন বিমান এবং চাঁদে ও গ্রহান্তরে পাড়ি দেবার জন্য মহাশূন্য যান তৈরী করার নাম জ্ঞান। তাদের মতে, খাদ্য নীতি, অর্থনীতি,

يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ﴿٤٤﴾
وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ
اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٥﴾ لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ
مُّبَيِّنٰتٍ ۚ وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٦﴾ وَيَقُوْلُوْنَ
اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ
ذٰلِكَ ۚ وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾

তিনিই রাত-দিনের পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন। দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে একটি শিক্ষা।

আর আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণ বিশিষ্টকে এক ধরনের পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্য থেকে কেউ চলছে পেটে ভর দিয়ে, কেউ চলছে দু'পায়ে হেঁটে আবার কেউ চারপায়ে ভর দিয়ে। যা কিছু তিনি চান পয়দা করেন, তিনি প্রত্যেক জিনিসের ওপর শক্তিশালী।

আমি পরিষ্কার সত্য বিবৃতকারী আয়াত নাযিল করে দিয়েছি তবে আল্লাহই যাকে চান সত্য সরল পথ দেখান।

তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ ও রসূলের প্রতি এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করেছি কিন্তু এরপর তাদের মধ্য থেকে একটি দল (আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ ধরনের লোকেরা কখনোই মু'মিন নয়।[৭৬]

আইন শাস্ত্র ও দর্শনে পারদর্শিতা অর্জন করার নাম জ্ঞান। কিন্তু আসল জ্ঞান এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিসের নাম। তার স্পর্শ থেকে তারা অনেক দূরে রয়ে গেছে। সেই জ্ঞানের দৃষ্টিতে তারা নিছক মূর্খ ও অজ্ঞ ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যদিকে একজন অশিক্ষিত গেঁয়ো যদি সত্যকে চেনে ও উপলব্ধি করে তাহলে সে জ্ঞানবান।

৭৩. এখানে পৌঁছে আসল কথা পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে। এর সূচনা করা হয়েছিল اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এর বিষয়বস্তু থেকে। বিশ্ব-জাহানে যখন মূলত আল্লাহর আলো ছাড়া আর কোন আলো নেই এবং সে আলো থেকেই হচ্ছে যাবতীয় সত্যের

وَإِذَا دُعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم
مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوٓا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾ أَفِى
قُلُوبِهِم مَّرَضٍ أَمِ ٱرْتَابُوٓا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ
وَرَسُولُهُۥ ۚ بَلْ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٥٠﴾

যখন তাদেরকে ডাকা হয় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে, যাতে রসূল তাদের পরস্পরের মোকদ্দমার ফায়সালা করে দেন[৭৭] তখন তাদের মধ্যকার একটি দল পাশ কাটিয়ে যায়।[৭৮] তবে যদি সত্য তাদের অনুকূল থাকে, তাহলে বড়ই বিনীত হয়ে রসূলের কাছে আসে।[৭৯] তাদের মনে কি (মুনাফিকীর) রোগ আছে? না তারা সন্দেহের শিকার হয়েছে? না তারা ভয় করছে আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদের প্রতি যুলুম করবেন? আসলে তারা নিজেরাই যালেম।[৮০]

প্রকাশ তখন যে ব্যক্তি আল্লাহর আলো পাবে না সে পূর্ণ ও নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে থাকবে না তো আর কি হবে? আর কোথাও তো আলো নেই। কাজেই অন্য কোথাও থেকে আলোর একটি শিখাও লাভ করার সম্ভাবনা কারো নেই।

৭৪. ওপরে বলা হয়েছে, আল্লাহ সমগ্র বিশ্ব-জাহানের আলো কিন্তু একমাত্র সৎ মুমিনরাই এ আলো লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন, বাদবাকি সব লোকেরাই এ পূর্ণাংগ আলোর দ্বারা পরিবেষ্টিত থেকেও ঘোর অন্ধকারে অন্ধের মতো হাতড়ে মরে। এখন এ আলোর দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে নমুনা স্বরূপ মাত্র কয়েকটি এখানে পেশ করা হচ্ছে। মনের চোখ খুলে কেউ সেগুলোর দিকে তাকালে সবসময় সবদিকে আল্লাহকেই সক্রিয় দেখতে পাবে। কিন্তু যাদের মনের চোখ অন্ধ তারা কপালের দুটো চোখ কিফারিত করে দেখলেও জীববিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যার বিভিন্ন রকম বিদ্যা তাদের চোখে ভালোমতোই সক্রিয় রয়েছে বলে তাদের চোখে ঠেকবে কিন্তু আল্লাহকে কোথাও সক্রিয় দেখতে পাবে না।

৭৫. এর অর্থ ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া মেঘপুঞ্জও হতে পারে রূপক অর্থে একেই হয়তো আকাশের পাহাড় বলা হয়েছে। আবার পৃথিবীর পাহাড়ও হতে পারে, যা শূন্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এগুলোর চূড়ায় জমে থাকা বরফের প্রভাবে অনেক সময় বাতাস এত বেশী ঠাণ্ডা হয়ে যায় যে, মেঘমালা জমে গিয়ে শিলা বৃষ্টি হতে থাকে।

৭৬. অর্থাৎ আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়াই তাদের ঈমানের দাবী মিথ্যা প্রমাণ করে দেয়। তাদের এহেন কার্যকলাপ থেকে বুঝা যায় যে, তারা যখন বলেছে আমরা ঈমান এনেছি ও আনুগত্য স্বীকার করেছি তখন তারা অসত্য বলেছে।

৭৭. এ শব্দগুলো পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে, রসূলের ফায়সালা হচ্ছে আল্লাহর ফায়সালা এবং তাঁর হুকুম আল্লাহরই হুকুমের নামান্তর মাত্র। রসূলের দিকে আহবান করা নিছক রসূলের দিকেই আহবান করা নয় বরং আল্লাহ ও রসূল উভয়েরই দিকে আহবান করা। তাছাড়া এ আয়াতটি এবং ওপরের আয়াতটি থেকে একথা নিসন্দেহে পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য ছাড়া ঈমানের দাবী অর্থহীন এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের এ ছাড়া আর কোন অর্থ নেই যে, মুসলমান ব্যক্তি ও জাতি হিসেবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দেয়া আইনের অনুগত হবে। সে যদি এ কর্মনীতি অবলম্বন না করে, তাহলে তার ঈমানের দাবী একটি মুনাফিকী দাবী ছাড়া আর কিছুই নয়। (তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য সূরা নিসা ৫৯–৬১ আয়াত ৮৯–৯২ টীকা সহকারে দেখুন)

৭৮. উল্লেখ্য, এ ব্যাপারটি কেবল মাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনেরই জন্য ছিল না বরং তাঁর পর যিনিই ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারকের পদে আসীন থাকেন এবং আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত অনুযায়ী ফায়সালা দেন তাঁর আদালতের সমন হচ্ছে আসলে আল্লাহ ও রসূলের আদালতের সমন এবং যে ব্যক্তি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে মূলত তা থেকে নয় বরং আল্লাহ ও রসূল থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি মুরসাল হাদীসে এ বিষয় এ ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে। হাসান বসরী রহমাতুল্লাহে আলাইহে এ হাদীসটি রেওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি হচ্ছে ঃ

مَنْ دُعِيَ اِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

"যে ব্যক্তিকে মুসলমানদের আদালতের বিচারপতিদের মধ্য থেকে কোন বিচারপতির কাছে ডাকা হয় এবং সে হাজির হয় না সে জালেম, তার কোন অধিকার নেই।" (আহকামুল কুরআন জাস্সাস, ৩ খণ্ড, ৪০৫ পৃষ্ঠা)

অন্য কথায় এ ধরনের লোক শাস্তিলাভের যোগ্য আবার এ সংগে তাকে অন্যায়কারী প্রতিপন্ন করে তার বিরুদ্ধে একতরফা ফায়সালা দিয়ে দেয়াও ন্যায়সংগত।

৭৯. এ আয়াতটি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করছে যে, শরীয়াতের লাভজনক কথাগুলোকে যে ব্যক্তি সানন্দে গ্রহণ করে নেয় কিন্তু আল্লাহর শরীয়াতে যা কিছু তার স্বার্থ ও আশা–আকাংখার বিরোধী হয় তাকে সে প্রত্যাখ্যান করে এবং তার মোকাবিলায় দুনিয়ার অন্যান্য আইনকে প্রাধান্য দেয়, সে মু'মিন নয় বরং মুনাফিক। তার ঈমানের দাবী মিথ্যা। কারণ সে আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমান রাখে না বরং ঈমান রাখে নিজের স্বার্থ ও প্রবৃত্তির ওপর। এ নীতি অবলম্বন করে এর সাথে সাথে সে যদি আল্লাহর শরীয়াতের কোন অংশকে মেনেও নেয়, তাহলে আল্লাহর দৃষ্টিতে এ ধরনের মেনে নেয়ার কোন মূল্য ও মর্যাদা নেই।

৮০. অর্থাৎ মানুষের এ কর্মনীতি অবলম্বনের পেছনে তিনটি সম্ভাব্য কারণই থাকতে পারে। এক, যে মানুষটি ঈমানের দাবীদার সে আসলে ঈমানই আনেনি এবং মুনাফিকী পদ্ধতিতে নিছক ধোঁকা দেবার এবং মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে অবৈধ স্বার্থলাভের জন্য মুসলমান হয়েছে। দুই, ঈমান আনা সত্ত্বেও তার মনে এ মর্মে সন্দেহ রয়ে গেছে যে, রসূল

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ
بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَنْ
يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُلْ لَا تُقْسِمُوا ۖ
طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ۖ
وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

৭ রুকূ'

মুমিনদের কাজই হচ্ছে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ডাকা হয়, যাতে রসূল তাদের মোকদ্দমার ফায়সালা করেন, তখন তারা বলেন, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। এ ধরনের লোকেরাই সফলকাম হবে। আর সফলকাম তারাই যারা আল্লাহ ও রসূলের হুকুম মেনে চলে এবং আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর নাফরমানী করা থেকে দূরে থাকে।

এ মুনাফিকরা আল্লাহর নামে শক্ত কসম খেয়ে বলে, "আপনি হুকুম দিলে আমরা অবশ্যই ঘর থেকে বের হয়ে পড়বো।" তাদেরকে বলো, "কসম খেয়ো না, তোমাদের আনুগত্যের অবস্থা জানা আছে।[৮১] তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ বেখবর নন।"[৮২] বলো, "আল্লাহর অনুগত হও এবং রসূলের হুকুম মেনে চলো। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। তাহলে ভালোভাবে জেনে রাখো, রসূলের ওপর যে দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে সে জন্য রসূলই দায়ী এবং তোমাদের ওপর যে দায়িত্বের বোঝা চাপানো হয়েছে সে জন্য তোমরাই দায়ী। তাঁর আনুগত্য করলে তোমরা নিজেরাই সৎ পথ পেয়ে যাবে, অন্যথায় পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হুকুম শুনিয়ে দেয়া ছাড়া রসূলের আর কোন দায়িত্ব নেই।"

আসলে আল্লাহর রসূল কি না, কুরআন আল্লাহর কিতাব কি না এবং কিয়ামত সত্যিসত্যিই অনুষ্ঠিত হবে কি না অথবা এগুলো সবই নিছক মুখরোচক গালগল্প বরং আসলে আল্লাহর অস্তিত্ব আছে কি অথবা এটাও নিছক একটা কল্পনা, কোন বিশেষ স্বার্থোদ্ধারের

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ
الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ۭ يَعْبُدُوْنَنِيْ
لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـــًٔا ۭ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝۵۵
وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝۵۶
لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۭ
وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝۵۷

আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনবে ও সৎ কাজ করবে তাদেরকে তিনি পৃথিবীতে ঠিক তেমনিভাবে খিলাফত দান করবেন যেমন তাদের পূর্বে অতিক্রান্ত লোকদেরকে দান করেছিলেন, তাদের জন্য তাদের দীনকে মজবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন, যাকে আল্লাহ তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা শুধু আমার বন্দেগী করুক এবং আমার সাথে কাউকে যেন শরীক না করে।[৮৩] আর যারা এর পর কুফরী করবে[৮৪] তারাই ফাসেক। নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রসূলের আনুগত্য করো, আশা করা যায়, তোমাদের প্রতি করুণা করা হবে। যারা কুফরী করছে তাদের সম্পর্কে এ ভুল ধারণা পোষণ করো না যে, তারা পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করে দেবে। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম এবং তা বড়ই নিকৃষ্ট আশ্রয়।

উদ্দেশ্যে এ কাল্পনিক বিষয়টি তৈরী করে নেয়া হয়েছে। তিন, সে আল্লাহকে আল্লাহ এবং রসূলকে রসূল বলে মেনে নেবার পরও তাঁদের পক্ষ থেকে জুলুমের আশংকা করে। সে মনে করে আল্লাহর কিতাব অমুক হুকুমটি দিয়ে তো আমাদের বিপদে ফেলে দিয়েছে এবং আল্লাহর রসূলের অমুক উক্তি বা অমুক পদ্ধতি আমাদের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। এ তিনটি কারণের মধ্যে যেটিই সত্য হোক না কেন, মোটকথা এ ধরনের লোকদের জালেম হবার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এ ধরনের চিন্তা সহকারে যে ব্যক্তি মুসলমানদের দলভুক্ত হয়, ঈমানের দাবী করে এবং মুসলিম সমাজের একজন সদস্য সেজে এ সমাজ থেকে

বিভিন্ন ধরনের অবৈধ স্বার্থ হাসিল করতে থাকে, সে একজন বড় দাগাবাজ, বিশ্বাসঘাতক, খেয়ানতকারী ও জালিয়াত। সে নিজের ওপরও জুলুম করে। রাত দিন মিথ্যাচারের মাধ্যমে নিজেকে সে সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্বভাবের মানুষে পরিণত করতে থাকে। সে এমন ধরনের মুসলমানদের প্রতিও যুলুম করে যারা তার বাহ্যিক কালেমায়ে শাহাদাত পাঠের ওপর নির্ভর করে তাকে এ মিল্লাতের একটি অংশ বলে মেনে নেয় এবং তারপর তার সাথে নানান ধরনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

৮১. দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে, মু'মিনদের থেকে কাংখিত আনুগত্য হচ্ছে এমন পরিচিত ধরনের আনুগত্য যা সকল প্রকার সন্দেহ–সংশয়ের উর্ধে থাকে তা এমন ধরনের আনুগত্য নয় যার নিশ্চয়তা দেবার জন্য কসম খাবার প্রয়োজন হয় এবং এর পরও তার প্রতি অবিশ্বাস থাকে। যারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আদেশের অনুগত হয় তাদের মনোভাব ও কর্মনীতি গোপন থাকে না। প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের কার্যধারা দেখে অনুভব করে, এরা আনুগত্যশীল লোক। তাদের ব্যাপারে এমন কোন সন্দেহ সংশয়ের অবকাশই নেই যে, তা দূর করার জন্য কসম খাবার প্রয়োজন দেখা দেবে।

৮২. অর্থাৎ সৃষ্টির মোকাবিলায় এ প্রতারণা হয়তো সফল হয়ে যেতে পারে কিন্তু আল্লাহর মোকাবিলায় কেমন করে সফল হতে পারে? তিনি তো প্রকাশ্য ও গোপন সকল অবস্থা বরং মনের প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা, চিন্তা ও আশা–আকাংখাও জানেন।

৮৩. এ বক্তব্যের শুরুতেই আমি ইংগিত করেছি, এ উক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফিকদেরকে এ মর্মে সতর্ক করা যে, আল্লাহ মুসলমানদের খিলাফত দান করার যে প্রতিশ্রুতি দেন তা নিছক আদম শুমারীর খাতায় যাদের নাম মুসলমান হিসেবে লেখা হয়েছে তাদের জন্য নয় বরং এমন মুসলমানদের জন্য যারা সাচ্চা ঈমানদার, চরিত্র ও কর্মের দিক দিয়ে সৎ, আল্লাহর পছন্দনীয় দীনের আনুগত্যকারী এবং সব ধরনের শিরক মুক্ত হয়ে নির্ভেজাল আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্বকারী। যাদের মধ্যে এসব গুণ নেই, নিছক মুখে ঈমানের দাবীদার, তারা এ প্রতিশ্রুতিলাভের যোগ্য নয় এবং তাদের জন্য এ প্রতিশ্রুতি দানও করা হয়নি। কাজেই তারা যেন এর অংশীদার হবার আশা না রাখে।

কেউ কেউ খিলাফতকে নিছক রাষ্ট্র ক্ষমতা, রাজ্য শাসন, প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি অর্থে গ্রহণ করেন। তারপর আলোচ্য আয়াত থেকে তারা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, দুনিয়ায় যে ব্যক্তিই এ শক্তি অর্জন করে সে মু'মিন, সৎ, আল্লাহর পছন্দনীয় দীনের অনুসারী, আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্বকারী এবং শিরক থেকে দূরে অবস্থানকারী। এরপর তারা নিজেদের এ ভুল সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রতিপন্ন করার জন্য ঈমান, সৎকর্মশীলতা, সত্যদীন, আল্লাহর ইবাদাত ও শিরক তথা প্রত্যেকটি জিনিসের অর্থ বিকৃত করে তাকে এমন কিছু বানিয়ে দেন যা তাদের এ মতবাদের সাথে খাপ খেয়ে যায়। এটা কুরআনের নিকৃষ্টতম অর্থগত বিকৃতি। এ বিকৃতি ইহুদী ও খৃষ্টানদের বিকৃতিকেও ম্লান করে দিয়েছে। এ বিকৃতির মাধ্যমে কুরআনের একটি আয়াতের এমন একটি অর্থ করা হয়েছে যা সমগ্র কুরআনের শিক্ষাকে বিকৃত করে দেয় এবং ইসলামের কোন একটি জিনিসকেও তার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকতে দেয় না। খিলাফতের এ সংজ্ঞা বর্ণনা করার পর নিশ্চিতভাবে এমন সব লোকের ওপর এ আয়াত প্রযোজ্য হয় যারা কখনো দুনিয়ায় প্রাধান্য ও রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করেছে অথবা বর্তমানে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে। তারা আল্লাহ, অহী, রিসালাত,

আখেরাত সবকিছু অস্বীকারকারী হতে পারে এবং ফাসেকী ও অশ্লীলতার এমন সব মলিনতায় আপ্লুতও হতে পারে যেগুলোকে কুরআন কবীরা গুনাহ তথা বৃহত পাপ গণ্য করেছে, যেমন সূদ, ব্যভিচার, মদ, জুয়া। এখন যদি এসব লোক সৎমুমিন হয়ে থাকে এবং এ জন্যই তাদেরকে খিলাফতের উন্নত আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়ে থাকে, তাহলে এরপর ঈমানের অর্থ প্রাকৃতিক আইন মেনে নেয়া এবং সৎকর্মশীলতা অর্থ এ আইনগুলোকে সাফল্যের সাথে ব্যবহার করা ছাড়া আর কি হতে পারে? আর আল্লাহর পছন্দনীয় দীন বলতে প্রাণী বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করে শিল্প, কারিগরী, বাণিজ্য ও রাজনীতিতে ব্যাপক উন্নতি লাভ করা ছাড়া আর কি হতে পারে? এরপর আল্লাহর বন্দেগী বলতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে সাফল্য লাভ করার জন্য যেসব নিয়ম কানুন মেনে চলা প্রকৃতিগতভাবে লাভজনক ও অপরিহার্য হয়ে থাকে সেগুলো মেনে চলা ছাড়া আর কি হতে পারে? তারপর এ লাভজনক নিয়ম কানুনের সাথে কোন ব্যক্তি বা জাতি কিছু ক্ষতিকর পদ্ধতি অবলম্বন করলে তাকেই শিরক নামে অভিহিত করা ছাড়া আর কাকে শিরক বলা যাবে? কিন্তু যে ব্যক্তি কখনো দৃষ্টি ও মন আচ্ছন্ন না রেখে বুঝে কুরআন পড়েছে সে কি কখনো একথা মেনে নিতে পারে যে, সত্যিই কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী ঈমান, সৎকাজ, সত্য দীন, আল্লাহর ইবাদাত এবং তাওহীদ ও শিরকের এ অর্থই হয়? যে ব্যক্তি কখনো পুরো কুরআন বুঝে পড়েনি এবং কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন কিছু আয়াত নিয়ে সেগুলোকে নিজের চিন্তা-কল্পনা ও মতবাদ অনুযায়ী সাজিয়ে নিয়েছে সে-ই কেবল এ অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অথবা এমন এক ব্যক্তি এ কাজ করতে পারে, যে কুরআন পড়ার সময় এমন সব আয়াতকে একেবারেই অর্থহীন ও ভুল মনে করেছে যেগুলোতে আল্লাহকে একমাত্র রব ও ইলাহ, তাঁর নাযিল করা অহীকে পথনির্দেশনার একমাত্র উপায় এবং তাঁর পাঠানো প্রত্যেক নবীকে চূড়ান্ত পর্যায়ে অপরিহার্যভাবে মেনে নেবার ও নেতা বলে স্বীকার করে অনুসরণ করার আহবান জানানো হয়েছে। আর এই সংগে বর্তমান দুনিয়াবী জীবনের শেষে দ্বিতীয় আর একটি জীবন কেবল মেনে নেবারই দাবী করা হয়নি বরং একথাও পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে যে, যারা এ জীবনে নিজেদের জবাবদিহির কথা অস্বীকার করে বা এ ব্যাপারে সকল প্রকার চিন্তা বিমুক্ত হয়ে নিছক এ দুনিয়ায় সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করবে তারা চূড়ান্ত সাফল্য থেকে বঞ্চিত থাকবে। কুরআনে এ বিষয়বস্তুগুলো এত বেশী পরিমাণে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে এবং সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বারবার বলা হয়েছে যে, খিলাফতলাভ সম্পর্কিত এ আয়াতের এ নতুন ব্যাখ্যাতাগণ এ ব্যাপারে যে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন, যথার্থ সততা ও আন্তরিকতার সাথে এ কিতাব পাঠকারী কোন ব্যক্তি কখনো তার শিকার হতে পারেন, একথা মেনে নেয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ খিলাফত ও খিলাফতলাভের যে অর্থের ওপর তারা নিজেদের চিন্তার এ বিশাল ইমারত নির্মাণ করেছেন তা তাদের নিজেদের তৈরী। কুরআনের জ্ঞান রাখে এমন কোন ব্যক্তি কখনো এ আয়াতের এ অর্থ করতে পারেন না।

আসলে কুরআন খিলাফত ও খিলাফতলাভকে তিনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে। প্রত্যেক জায়গায় পূর্বাপর আলোচ্য বিষয় থেকে কোথায় এ শব্দটি কি অর্থে বলা হয়েছে তা জানা যায়।

এর একটি অর্থ হচ্ছে, "আল্লাহর দেয়া ক্ষমতার অধিকারী হওয়া।" এ অর্থ অনুসারে সারা দুনিয়ার সমস্ত মানব সন্তান পৃথিবীতে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত।

দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, "আল্লাহর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে তাঁর শরীয়াতী বিধানের (নিছক প্রাকৃতিক বিধানের নয়) অধীনে খিলাফতের ক্ষমতা ব্যবহার করা।" এ অর্থে কেবলমাত্র সৎমুমিনই খলীফা গণ্য হয়। কারণ সে সঠিকভাবে খিলাফতের হক আদায় করে। বিপরীত পক্ষে কাফের ও ফাসেক খলীফা নয় বরং বিদ্রোহী। কারণ তারা আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাকে নাফরমানীর পথে ব্যবহার করে।

তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, "এক যুগের বিজয়ী ও ক্ষমতাশালী জাতির পরে অন্য জাতির তার স্থান দখল করা।" খিলাফতের প্রথম দু'টি অর্থ গৃহীত হয়েছে "প্রতিনিধিত্ব" শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ থেকে আর এ শেষ অর্থটি "স্থলাভিষিক্ত" শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। এ শব্দটির এ দু'টি অর্থ আরবী ভাষায় সর্বজন পরিচিত।

এখন যে ব্যক্তিই এখানে এ প্রেক্ষাপটে খিলাফতলাভের আয়াতটি পাঠ করবে সে এক মুহূর্তের জন্যও এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না যে, এখানে খিলাফত শব্দটি এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা আল্লাহর শরীয়াতী বিধান অনুযায়ী (নিছক প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী নয়) তাঁর প্রতিনিধিত্বের যথাযথ হক আদায় করে। এ কারণেই কাফের তো দূরের কথা ইসলামের দাবীদার মুনাফিকদেরকেও এ প্রতিশ্রুতিতে শরীক করতে অস্বীকৃতি জানানো হচ্ছে। তাই বলা হচ্ছে, একমাত্র ঈমান ও সৎকর্মের গুণে গুণান্বিত লোকেরাই হয় এর অধিকারী। এ জন্য খিলাফত প্রতিষ্ঠার ফল হিসেবে বলা হচ্ছে, আল্লাহর পছন্দনীয় দীন অর্থাৎ ইসলাম মজবুত বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। আর এ জন্য এ পুরস্কার দানের শর্ত হিসেবে বলা হচ্ছে, নির্ভেজাল আল্লাহর বন্দেগীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। এ বন্দেগীতে যেন শিরকের সামান্যতমও মিশেল না থাকে। এ প্রতিশ্রুতিকে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে আন্তর্জাতিক ময়দানে পৌঁছিয়ে দেয়া এবং আমেরিকা থেকে নিয়ে রাশিয়া পর্যন্ত যারই শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপ-পতিপত্তির ডংকা দুনিয়ায় বাজতে থাকে তারই সমীপে একে নজরানা হিসেবে পেশ করা চূড়ান্ত মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ শক্তিগুলো যদি খিলাফতের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থেকে থাকে তাহলে ফেরাউন ও নমরূদ কি দোষ করেছিল, আল্লাহ কেন তাদেরকে অভিশাপলাভের যোগ্য গণ্য করেছেন? (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আম্বিয়া, ৯৯ টীকা)।

এখানে আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালের মুসলমানদের জন্য এ প্রতিশ্রুতি পরোক্ষভাবে পৌঁছে যায়। প্রত্যক্ষভাবে এখানে এমন সব লোককে সম্বোধন করা হয়েছিল যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ছিলেন। প্রতিশ্রুতি যখন দেয়া হয়েছিল তখন সত্যিই মুসলমানরা ভয়-ভীতির মধ্যে অবস্থান করছিল এবং দীন ইসলাম তখনো হিজাযের সরজমিনে মজবুতভাবে শিকড় গেড়ে বসেনি। এর কয়েক বছর পর এ ভয়ভীতির অবস্থা কেবল নিরাপত্তায় বদলে যায়নি বরং ইসলাম আরব থেকে বের হয়ে এশিয়া ও আফ্রিকার বৃহত্তর অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার শিকড় কেবল তার জন্মভূমিতেই নয়, বহির্বিশ্বেও মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আল্লাহ তাঁর এ প্রতিশ্রুতি আবু বকর সিদ্দীক, উমর ফারুক ও উসমান গনী রাদিয়াল্লাহু আনহুমের জামানায় পুরা

করে দেন, এটি একথার একটি ঐতিহাসিক প্রমাণ। এরপর এ তিন মহান ব্যক্তির খিলাফতকে কুরআন নিজেই সত্যায়িত করেছে এবং আল্লাহ নিজেই এদের সৎমুমিন হবার সাক্ষ দিচ্ছেন, এ ব্যাপারে কোন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে সন্দেহ পোষণ করা কঠিন। এ ব্যাপারে যদি কারোর মনে সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে তাঁর "নাহ্জুল বালাগায়" সাইয়েদুনা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাষণ পাঠ করা দরকার। হযরত উমরকে ইরানীদের বিরুদ্ধে সশরীরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য তিনি এ ভাষণটি দিয়েছিলেন। এতে তিনি বলেন ঃ এ কাজের বিস্তার বা দুর্বলতা সংখ্যায় বেশী হওয়া ও কম হওয়ার ওপর নির্ভরশীল নয়। এ হচ্ছে আল্লাহর দীন। তিনি একে বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত করেছেন। আর আল্লাহর সেনাদলকে তিনি সাহায্য–সহায়তা দান করেছেন। শেষ পর্যন্ত উন্নতি লাভ করে তা এখানে পৌঁছে গেছে। আল্লাহ নিজেই আমাদের বলেছেন ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ ... ...

আল্লাহ নিশ্চয়ই এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন এবং নিশ্চয়ই নিজের সেনানীদেরকে সাহায্য করবেন। মোতির মালার মধ্যে সূতোর যে স্থান, ইসলামে কাইয়েম তথা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকারীও সে একই স্থানে অবস্থান করছেন। সূতো ছিড়ে গেলেই মোতির দানাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং শৃংখলা বিনষ্ট হয়। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার পর আবার একত্র হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে সন্দেহ নেই, আরবরা সংখ্যায় অল্প। কিন্তু ইসলাম তাদেরকে বিপুল সংখ্যায় পরিণত করেছে এবং সংঘবদ্ধতা তাদেরকে শক্তিশালী করে দিয়েছে। আপনি কেন্দ্রীয় পরিচালক হিসেবে এখানে শক্ত হয়ে বসে থাকুন, আরবের যাঁতাকে নিজের চারদিকে ঘুরাতে থাকুন এবং এখানে বসে বসেই যুদ্ধের আগুন জ্বালাতে থাকুন। নয়তো আপনি যদি একবার এখান থেকে সরে যান তাহলে সবদিকে আরবীয় ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে শুরু করবে এবং অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছুবে যে, আপনাকে সামনের শত্রুর তুলনায় পেছনের বিপদের কথা বেশী করে চিন্তা করতে হবে। আবার ওদিকে ইরানীরা আপনার ওপর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করবে। তারা মনে করবে, এই তো আরবের মূল গ্রন্থী, একে কেটে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। কাজেই আপনাকে খতম করে দেবার জন্য তারা নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। আর আজমবাসীরা এ সময় বিপুল সংখ্যায় এসে ভীড় জমিয়েছে বলে যে কথা আপনি বলেছেন এর জবাবে বলা যায়, এর আগেও আমরা তাদের সাথে লড়েছি, তখনো সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে লড়িনি বরং আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তাই আজ পর্যন্ত আমাদের সফলকাম করেছে।"

জ্ঞানী পর্যবেক্ষক নিজেই দেখতে পারেন হযরত আলী (রা) এখানে কাকে খিলাফতলাভের ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করছেন।

৮৪. এখানে কুফরী করা মানে নিয়ামত অস্বীকার করাও হতে পারে আবার সত্য অস্বীকার করাও। প্রথম অর্থের দৃষ্টিতে এর ক্ষেত্র হবে এমন সব লোক যারা খিলাফতের নিয়ামত লাভ করার পর সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়। আর দ্বিতীয় অর্থের দৃষ্টিতে এর ক্ষেত্র হবে মুনাফিকবৃন্দ, যারা আল্লাহর এ প্রতিশ্রুতি শুনার পরও নিজের মুনাফিকী মনোভাব ও কর্মনীতি পরিহার করে না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ
لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ
تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ
عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّافُونَ
عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

৮ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ!৮৫ তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসী৮৬ এবং তোমাদের এমন সব সন্তান যারা এখনো বুদ্ধির সীমানায় পৌঁছেনি,৮৭ তাদের অবশ্যি তিনটি সময়ে অনুমতি নিয়ে তোমাদের কাছে আসা উচিত : ফজরের নামাযের আগে, দুপুরে যখন তোমরা পোশাক ছেড়ে রেখে দাও এবং এশার নামাযের পর। এ তিনটি তোমাদের গোপনীয়তার সময়।৮৮ এরপরে তারা বিনা অনুমতিতে এলে তোমাদের কোন গুনাহ নেই এবং তাদেরও না।৮৯ তোমাদের পরস্পরের কাছে বারবার আসতেই হয়।৯০ এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিজের বাণী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং তিনি সবকিছু জানেন ও বিজ্ঞ।

৮৫. এখান থেকে আবার সামাজিক বিধানের ধারাবাহিক বর্ণনা শুরু হচ্ছে। সূরা নূরের এ অংশটি ওপরের ভাষণের কিছুকাল পরে নাযিল হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

৮৬. অধিকাংশ মুফাস্‌সির ও ফকীহের মতে "মালিকানাধীন" বলতে দাসদাসী উভয়কে বুঝানো হয়েছে। কারণ এখানে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু ইবনে উমর ও মুজাহিদ এ আয়াতে মামলূক তথা মালিকানাধীন শব্দটি কেবলমাত্র দাস অর্থে নিয়েছেন। তাঁরা দাসীকে এর বাইরে রেখেছেন। অথচ সামনের দিকে যে হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দিলে এ বিশেষ অর্থের কোন কারণ দেখা যায় না। একান্তে অবস্থান করার সময় যেমন নিজের ছেলেমেয়েদের অকস্মাত এসে যাওয়া সংগত নয় তেমনি দাসী–চাকরানীর এসে যাওয়াও অসংগত।

এ আয়াতের আদেশ প্রাপ্ত বয়স্ক–অপ্রাপ্ত বয়স্ক উভয় ধরনের দাসদাসীর জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য, এ ব্যাপারে সবাই একমত।

৮৭. দ্বিতীয় অনুবাদ হতে পারে, "প্রাপ্ত বয়স্কদের মতো স্বপ্ন দেখার বয়সে পৌঁছেনি।" এ থেকেই ফকীহগণ স্বপ্নদোষকে ছেলেদের বয়ঃপ্রাপ্ত হবার সূচনা বলে মেনে নিয়েছেন। এ ব্যাপারে সবাই একমত। কিন্তু আমি নিজে মূল অনুবাদে যে অর্থ করেছি তা অগ্রগণ্য হবার কারণ হচ্ছে এই যে, এ হুকুমটি ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য। অন্যদিকে স্বপ্নদোষকে বয়ঃপ্রাপ্ত হবার আলামত হিসেবে গণ্য করার পর হুকুমটি শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। কারণ মেয়েদের প্রাপ্ত বয়স্ক হবার সূচনা হচ্ছে মাসিক ঋতুস্রাব, স্বপ্নদোষ নয়। কাজেই আমার মতে হুকুমের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যতদিন ঘরের ছেলে মেয়েরা যৌন চেতনা জাগ্রত হবার বয়সে পৌঁছে না ততদিন তারা এ নিয়ম মেনে চলবে। এরপর যখনই তারা এ নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছে যাবে তখনই তাদের যে হুকুম মেনে চলতে হবে তা সামনে আসছে।

৮৮. মূলে عورات (আওরাত) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "এ তিনটি সময় তোমাদের জন্য আওরাত।" আওরাত বলতে আমাদের ভাষায় মেয়েলোক বা নারী জাতি বুঝায়। কিন্তু আরবী ভাষায় এর মানে হয় বাধা ও বিপদের জায়গা এবং যে জিনিসের খুলে যাওয়া মানুষের জন্য লজ্জার ব্যাপার এবং যার প্রকাশ হয়ে পড়া তার জন্য বিরক্তিকর হয় এমন জিনিসের জন্যও এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া কোন জিনিসের অসংরক্ষিত হওয়া অর্থেও এর ব্যবহার হয়। এ অর্থগুলো সবই পরস্পর নিকট সম্পর্কযুক্ত এবং আয়াতের অর্থের সাথে কোন না কোন পর্যায়ে সংযুক্ত। এর অর্থ হচ্ছে এ সময়গুলোতে তোমরা একাকী বা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে এমন অবস্থায় থাকো যে অবস্থায় গৃহের ছেলেমেয়ে বা চাকর বাকরদের হঠাৎ তোমাদের কাছে চলে যাওয়া সংগত নয়। কাজেই এ তিন সময়ে তারা যখন তোমাদের নির্জন স্থানে আসতে চায় তখন তাদের পূর্বাহ্নে অনুমতি নেবার নির্দেশ দাও।

৮৯. অর্থাৎ এ তিন সময় ছাড়া অন্য সময় নাবালক ছেলেমেয়েরা এবং গৃহস্বামীর ও গৃহকর্ত্রীর মালিকানাধীন গোলাম ও বাঁদীরা সবসময় নারী ও পুরুষদের কাছে তাদের কামরায় বা নির্জন স্থানে বিনা অনুমতিতে যেতে পারে। এ সময় যদি তোমরা কোন অসতর্ক অবস্থায় থাকো এবং তারা অনুমতি ছাড়াই এসে যায় তাহলে তাদের হুমকি ধমকি দেবার অধিকার তোমাদের নেই। কারণ কাজের সময় নিজেদেরকে এ ধরনের অসতর্ক অবস্থায় রাখা তোমাদের নিজেদেরই বোকামী ছাড়া তো আর কিছুই নয়। তবে যদি তোমাদের শিক্ষা দীক্ষা সত্ত্বেও নির্জনবাসের এ তিন সময় তারা অনুমতি ছাড়াই আসে তাহলে তারা দোষী হবে। অন্যথায় তোমরা নিজেরাই যদি তোমাদের সন্তান ও গোলাম–বাঁদীদের এ আদব–কায়দা ও আচার–আচরণ শিক্ষা না দিয়ে থাকো, তাহলে তোমরা নিজেরাই গোনাহগার হবে।

৯০. উপরোক্ত তিনটি সময় ছাড়া অন্য সবসময় ছোট ছেলেমেয়ে ও গোলাম–বাঁদীদের বিনা হুকুমে আসার সাধারণ অনুমতি দেবার এটিই হচ্ছে কারণ। এ থেকে উসূলে ফিকাহর এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শরীয়াতের বিধানসমূহ কোন না কোন প্রয়োজন ও উপযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেক হুকুমের পেছনে নিশ্চিতভাবেই কোন না কোন কার্যকারণ আছেই, তা বিবৃত হোক বা না হোক।

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾
وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن
يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

আর যখন তোমাদের সন্তানরা বুদ্ধির সীমানায় পৌঁছে যায়[৯১] তখন তাদের তেমনি অনুমতি নিয়ে আসা উচিত যেমন তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে থাকে। এভাবে আল্লাহ তাঁর আয়াত তোমাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং তিনি সবকিছু জানেন ও বিজ্ঞ।

আর যেসব যৌবন অতিক্রান্ত মহিলা[৯২] বিয়ের আশা রাখে না, তারা যদি নিজেদের চাদর নামিয়ে রেখে দেয়,[৯৩] তাহলে তাদের কোন গোনাহ নেই, তবে শর্ত হচ্ছে তারা সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী হবে না।[৯৪] তবু তারাও যদি লজ্জাশীলতা অবলম্বন করে তাহলে তা তাদের জন্য ভালো এবং আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।

৯১. অর্থাৎ সাবালক হয়ে যায়, যেমন ৮৭ টীকায় বলা হয়েছে ছেলেদের ক্ষেত্রে স্বপ্নদোষ ও মেয়েদের ক্ষেত্রে মাসিক ঋতুস্রাব থেকেই তাদের সাবালকত্ব শুরু হয়। কিন্তু যেসব ছেলেমেয়ে কোন কারণে বেশী বয়স পর্যন্ত এসব পরিবর্তন মুক্ত থাকে তাদের ব্যাপারে ফকীহগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম শাফেঈ, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আহমাদের মতে এ অবস্থায় ১৫ বছরের ছেলেমেয়েকে সাবালক মনে করা হবে। ইমাম আবু হানীফার একটি উক্তি এর সমর্থন করে কিন্তু ইমামের বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে এ অবস্থায় ১৭ বছরের মেয়ে ও ১৮ বছরের ছেলেকে সাবালক গণ্য করা হবে। কুরআন ও হাদীসের কোন বক্তব্য এ দু'টি উক্তির ভিত্তি নয় বরং এর ভিত্তি গড়ে উঠেছে ফিকাহভিত্তিক ইজতিহাদের ওপর। কাজেই সারা দুনিয়ায় চিরকালই যেসব ছেলের স্বপ্নদোষ হয়নি ও যেসব মেয়ের ঋতুস্রাব দেখা দেয়নি তাদের সাবালকত্বের জন্য ১৫ বা ১৮ বছর বয়সকেই যে সীমানা হিসেবে মেনে নেয়া হবে এমন কোন কথা নেই। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন যুগে শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের অবস্থা বিভিন্ন হয়। আসলে, সাধারণত কোন দেশে যেসব বয়সের ছেলেমেয়েদের স্বপ্নদোষ ও মাসিক ঋতুস্রাব হওয়া শুরু হয় তাদের গড়পড়তা পার্থক্য বের করে নিতে হবে, তারপর যেসব ছেলেমেয়ের মধ্যে কোন অস্বাভাবিক কারণে এ চিহ্নগুলো যথাযথ উপযোগী সময়ে প্রকাশিত না হয় তাদের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ বয়সের ওপর এ গড়পড়তার বৃদ্ধি ধরে

তাকে সাবালকত্বের বয়স গণ্য করতে হবে। যেমন কোন দেশে সাধারণত কমপক্ষে ১২ এবং বেশীর পক্ষে ১৫ বছর বয়সের ছেলের স্বপ্নদোষ হয়। এ ক্ষেত্রে গড়পড়তা পার্থক্য হবে দেড় বছর। আর অস্বাভাবিক ধরনের ছেলেদের জন্য আমরা সাড়ে ষোল বছর বয়ঃসীমাকে সাবালকত্বের বয়স গণ্য করতে পারবো। এ নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের আইনবিদগণ নিজেদের এলাকার অবস্থার প্রেক্ষিতে একটি সীমা নির্ধারণ করতে পারেন।

১৫ বছরের সীমার পক্ষে একটি হাদীস পেশ করা হয়। এটি ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, "আমার বয়স ছিল চৌদ্দ, সে সময় ওহোদ যুদ্ধে অংশ নেবার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আমাকে পেশ করা হয়। তিনি আমাকে যুদ্ধে অংশ নেবার অনুমতি দেননি। তারপর খন্দকের যুদ্ধের সময় আমাকে আবার পেশ করা হয়। তখন আমার বয়স হয় ১৫ বছর। এ সময় তিনি আমাকে অনুমতি দেন।" (সিহাহে সিত্তা ও মুসনাদে আহমাদ) কিন্তু দু'টি কারণে এ হাদীসটি থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করা যেতে পারে না। এক, ওহোদ যুদ্ধ ৩ হিজরীর শওয়াল মাসের ঘটনা এবং খন্দকের যুদ্ধ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের কথামত ৫ হিজরীর শওয়াল এবং ইবনে সা'দের বক্তব্য মতে ৫ হিজরীর যিলকদ মাসে সংঘটিত হয়। দুটো যুদ্ধের মধ্যে পুরো দু'বছর বা তার চেয়ে বেশী দিনের ব্যবধান রয়েছে। এখন যদি ওহোদ যুদ্ধের সময় ইবনে উমরের বয়স হয় ১৪ বছর তাহলে কেমন করে খন্দকের যুদ্ধের সময় তা শুধুমাত্র ১৫ বছর হয়?" হতে পারে তিনি ১৩ বছর ১১ মাস বয়সে ১৪ বছর এবং ১৫ বছর ১১ মাসকে ১৫ বছর বলেছেন। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, যুদ্ধের জন্য সাবালক হওয়া এক জিনিস এবং সামাজিক ব্যাপারের জন্য আইনগতভাবে সাবালক হওয়া অন্য জিনিস। এ দুয়ের মধ্যে কোন অনিবার্যতার সম্পর্ক নেই। কাজেই এদের একটিকে অন্যটির জন্য প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো যেতে পারে না। তাই যেসব ছেলের স্বপ্নদোষ হয়নি তাদের সাবালকত্বের জন্য ১৫ বছর বয়ঃসীমা নির্ধারণ করা একটি আনুমানিক ও ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত, কুরআন ও হাদীসের হুকুম নয়, এ ব্যাপারে এটিই সঠিক কথা।

৯২. মূলে বলা হয়েছে قواعد من النساء অর্থাৎ "মহিলাদের মধ্য থেকে যারা বসে পড়েছে" অথবা "বসে পড়া মহিলারা।" এর অর্থ হচ্ছে, হতাশার বয়স অর্থাৎ মহিলাদের এমন বয়সে পৌঁছে যাওয়া যে বয়সে আর তাদের সন্তান জন্ম দেবার যোগ্যতা থাকে না। যে বয়সে তার নিজের যৌন কামনা মৃত হয়ে যায় এবং তাকে দেখে পুরুষদের মধ্যেও কোন যৌন আবেগ সৃষ্টি হতে পারে না। পরবর্তী বাক্য এ অর্থের দিকেই ইংগিত করছে।

৯৩. মূল শব্দ হচ্ছে يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ "নিজেদের কাপড় নামিয়ে রাখে।" কিন্তু এর অর্থ সমস্ত কাপড় নামিয়ে উলংগ হয়ে যাওয়া তো হতে পারে না। তাই সকল মুফাস্‌সির ও ফকীহ্ সর্বসম্মতভাবে এর অর্থ নিয়েছেন এমন চাদর যার সাহায্যে সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখার হুকুম সূরা আহযাবের يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ আয়াতে দেয়া হয়েছিল।

৯৪. মূল শব্দ হচ্ছে غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ "সৌন্দর্য সহকারে সাজসজ্জা প্রকাশকারী হয় না। تَبَرُّج মানে হচ্ছে প্রকাশ ও প্রদর্শনী করা। بَارِج বলা হয় এমন খোলা নৌকা বা জাহাজকে যার ওপরে ছাদ হয় না। এ অর্থে মহিলাদের জন্য এ শব্দটি তখনই বলা হয় যখন তারা পুরুষদের সামনে তাদের নিজেদের সৌন্দর্য ও সাজসজ্জার প্রদর্শনী করে। কাজেই

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ
حَرَجٌ وَّلَا عَلَىٰٓ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أٰبَآئِكُمْ
أَوْ بُيُوْتِ أُمَّهٰتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أَخَوٰتِكُمْ
أَوْ بُيُوْتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ
بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ أَوْ صَدِيْقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوْا جَمِيْعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلَىٰٓ
أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ
الْأٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦١﴾

কোন অন্ধ, খঞ্জ বা রুগ্ন (যদি কারোর গৃহে খেয়ে নেয় তাহলে) কোন ক্ষতি নেই, আর তোমাদের কোন ক্ষতি নেই নিজেদের গৃহে খেলে অথবা নিজেদের বাপ-দাদার গৃহে, নিজেদের মা-নানীর গৃহে, নিজেদের ভাইয়ের গৃহে, নিজেদের বোনের গৃহে, নিজেদের চাচার গৃহে, নিজেদের ফুফুর গৃহে, নিজেদের মামার গৃহে, নিজেদের খালার গৃহে অথবা এমন সব গৃহে যার চাবি তোমাদের হাতে সোপর্দ করে দেয়া হয়েছে কিংবা নিজেদের বন্ধুদের গৃহে।[৯৫] তোমরা এক সাথে খাও বা আলাদা আলাদা, তাতে কোন ক্ষতি নেই।[৯৬] তবে গৃহে প্রবেশ করার সময় তোমরা নিজেদের লোকদের সালাম করো, আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়েছে কল্যাণের দোয়া, বড়ই বরকতপূর্ণ ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ তোমাদের সামনে আয়াত বর্ণনা করেন, আশা করা যায় তোমরা বুঝে শুনে কাজ করবে।

আয়াতের অর্থ হচ্ছে, চাদর নামিয়ে দেবার এ অনুমতি এমন সব বৃদ্ধাদেরকে দেয়া হচ্ছে যাদের সাজসজ্জা করার ইচ্ছা ও শখ খতম হয়ে গেছে এবং যাদের যৌন আবেগ শীতল হয়ে গেছে। কিন্তু যদি এ আগুনের মধ্যে এখনো একটি স্ফুলিংগ সজীব থেকে থাকে এবং তা সৌন্দর্যের প্রদর্শনীর রূপ অবলম্বন করতে থাকে তাহলে আর এ অনুমতি থেকে লাভবান হওয়া যেতে পারে না।

৯৫. এ আয়াতটি বুঝতে হলে তিনটি কথা বুঝে নেয়া প্রয়োজন। প্রথমত এ আয়াতটির দু'টি অংশ। প্রথম অংশটি রুগ্ন, খঞ্জ, অন্ধ ও অনুরূপ অন্যান্য অক্ষমদের ব্যাপারে এবং দ্বিতীয়

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ
جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ
شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾

৯.রুকূ'

মু'মিন[৯৭] তো আসলে তারাই যারা অন্তর থেকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মানে এবং যখন কোন সামষ্টিক কাজে রসূলের সাথে থাকে তখন তার অনুমতি ছাড়া চলে যায় না।[৯৮] যারা তোমার কাছে অনুমতি চায় তারাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাসী। কাজেই তারা যখন তাদের কোন কাজের জন্য তোমার কাছে অনুমতি চায়[৯৯] তখন যাকে চাও তুমি অনুমতি দিয়ে দাও[১০০] এবং এ ধরনের লোকদের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাতের দোয়া করো।[১০১] আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

অংশটি সাধারণ লোকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত কুরআনের নৈতিক শিক্ষাবলীর মাধ্যমে আরববাসীদের মন-মানসে যে বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়েছিল সে কারণে হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েযের পার্থক্যের ব্যাপারে তাদের অনুভূতি হয়ে উঠেছিল চরম সংবেদনশীল। ইবনে আব্বাসের উক্তি অনুযায়ী আল্লাহ যখন তাদের হুকুম দিলেন : لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ (একে অন্যের সম্পদ নাজায়েয পথে খেয়ো না) তখন লোকেরা একে অন্যের বাড়িতে খাবার ব্যাপারেও খুব বেশী সতর্কতা অবলম্বন করতে লাগলো। এমনকি যতক্ষণ গৃহ মালিকের দাওয়াত ও অনুমতি একেবারে আইনগত শর্ত অনুযায়ী না হতো ততক্ষণ তারা মনে করতো কোন আত্মীয় ও বন্ধুর বাড়িতে খাওয়াও জায়েয নয়। তৃতীয়ত এখানে নিজেদের গৃহে খাবার যে কথা বলা হয়েছে তা অনুমতি দেবার জন্য নয় বরং একথা মনের মধ্যে বসিয়ে দেবার জন্য যে, নিজের আত্মীয় ও বন্ধুদের বাড়িতে খাওয়াও ঠিক তেমনি যেমন নিজের বাড়িতে খাওয়া। অন্যথায় একথা সবাই জানে, নিজের বাড়িতে খাবার জন্য কারোর অনুমতি নেবার প্রয়োজন ছিল না। এ তিনটি কথা বুঝে নেয়ার পর আয়াতের এ অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, অক্ষম ব্যক্তি নিজের ক্ষুধা নিবারণ করার জন্য প্রত্যেক গৃহে ও প্রত্যেক জায়গায় খেতে পারে। তার অক্ষমতাই সমগ্র সমাজে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। তাই যেখান থেকেই সে খাবার জিনিস পাবে তা তার জন্য জায়েয হবে। আর সাধারণ লোকের ব্যাপারে বলা যায়, তাদের জন্য

তাদের নিজেদের গৃহ এবং যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের গৃহ সমান। তার মধ্যে যেখানেই তারা খাক না কেন সে জন্য গৃহস্বামীর যথারীতি অনুমতি পেলে তবে খাবে, অন্যথায় তা অবিশ্বস্ততা ও আত্মসাত বলে গণ্য হবে, এ ধরনের কোন শর্তের প্রয়োজন নেই। লোকেরা যদি তাদের মধ্য থেকে কারোর গৃহে যায়, সেখানে গৃহস্বামী উপস্থিত না থাকে এবং তার স্ত্রী–ছেলেমেয়েরা কিছু খাবার নিয়ে আসে তাহলে তারা নিসংকোচে তা খেতে পারে।

যেসব আত্মীয়–পরিজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে সন্তানদের উল্লেখ এ জন্য করা হয়নি যে, সন্তানদের গৃহ নিজেরই গৃহ হয়ে থাকে।

বন্ধুদের ব্যাপারে মনে রাখতে হবে, অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কথা বলা হয়েছে, যাদের অনুপস্থিতিতে অতিথি বন্ধুরা যদি তাদের সবকিছু খেয়েও চলে যায় তাহলে তারা নারাজ হওয়া তো দূরের কথা উলটো আরো খুশিই হবে।

৯৬. প্রাচীন আরবের কোন কোন গোত্রের আচার ও রীতিনীতি এই ছিল যে, তারা প্রত্যেকে নিজের জন্য খাবার নিয়ে আলাদা বসে খেতো। তারা সবাই মিলে এক জায়গায় বসে খাওয়াটা খারাপ মনে করতো। যেমন হিন্দুরা আজো এটা খারাপ মনে করে। অন্য দিকে কোন কোন গোত্র আবার একাকী খাওয়া খারাপ মনে করতো। এমন কি সাথে কেউ খেতে না বসলে তারা অভুক্ত থাকতো। এ আয়াতটি এ ধরনের বিধি–নিষেধ খতম করার জন্য নাযিল করা হয়েছে।

৯৭. মুসলমানদের জামায়াতের নিয়ম–শৃংখলা আগের তুলনায় আরো বেশী শক্ত করে দেবার জন্য এ শেষ নির্দেশাবলী দেয়া হচ্ছে।

৯৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে তাঁর স্থলাভিষিক্তগণ এবং ইসলামী জামায়াত ব্যবস্থার আমীরগণের জন্যও এ একই বিধান। কোন সামগ্রিক উদ্দেশ্যে যুদ্ধ বা শান্তি যে কোন সময় মুসলমানদের যখন একত্র করা হয় তখন আমীরের অনুমতি ছাড়া তাদের ফিরে যাওয়া বা ছড়িয়ে পড়া কোনক্রমেই জায়েয নয়।

৯৯. এর মধ্যে এ সতর্কবাণী রয়েছে যে, কোন যথার্থ প্রয়োজন ছাড়া অনুমতি চাওয়া তো আদতেই অবৈধ। বৈধতা কেবল তখনই সৃষ্টি হয় যখন যাবার জন্য কোন প্রকৃত প্রয়োজন দেখা দেয়।

১০০. অর্থাৎ প্রয়োজন বর্ণনা করার পরও অনুমতি দেয়া বা না দেয়া রসূলের এবং রসূলের পর জামায়াতের আমীরের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। যদি তিনি মনে করেন সামগ্রিক প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ তাহলে অনুমতি না দেবার পূর্ণ অধিকার তিনি রাখেন। এ অবস্থায় একজন মু'মিনের এর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকা উচিত নয়।

১০১. এখানে আবার সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, অনুমতি চাওয়ার মধ্যে যদি সামান্যতম বাহানাবাজীরও দখল থাকে অথবা সামগ্রিক প্রয়োজনের ওপর ব্যক্তিগত প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেবার প্রবণতা সক্রিয় থাকে, তাহলে এ হবে একটি গোনাহ। কাজেই রসূল ও তাঁর স্থলাভিষিক্তের শুধুমাত্র অনুমতি দিয়েই ক্ষান্ত হলে চলবে না বরং যাকেই অনুমতি দেবেন সংগে সংগে একথাও বলে দেবেন যে, আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন।

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ
اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ
عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾ اَلَآ
اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ قَدْ يَعْلَمُ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ ۗ وَيَوْمَ
يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٤﴾

হে মুসলমানরা! রসূলের আহবানকে তোমাদের মধ্যে পরস্পরের আহবানের মতো মনে করো না।[১০২] আল্লাহ তাদেরকে ভালো করেই জানেন যারা তোমাদের মধ্যে একে অন্যের আড়ালে চুপিসারে সটকে পড়ে।[১০৩] রসূলের হুকুমের বিরুদ্ধাচারণকারীদের ভয় করা উচিত যেন তারা কোন বিপর্যয়ের শিকার না হয়[১০৪] অথবা তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক আযাব না এসে পড়ে। সাবধান হয়ে যাও, আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। তোমরা যে নীতিই অবলম্বন করো আল্লাহ তা জানেন। যেদিন লোকেরা তাঁর দিকে ফিরে যাবে সেদিন তিনি তাদের বলে দেবেন তারা কি সব করে এসেছে। তিনি সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন।

১০২. মূলে دُعَاء শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ ডাকা ও আহবান করা হয় আবার দোয়া করাও হয়। তাছাড়া دعاء الرسول এর মানে রসূলের ডাক বা দোয়াও হতে পারে আবার রসূলের আহবানও হতে পারে। এসব বিভিন্ন অর্থের প্রেক্ষিতে আয়াতের তিনটি অর্থ হতে পারে এবং তিনটি অর্থই সঠিক ও যুক্তিসংগত।

এক ঃ "রসূলের আহবানকে কোন সাধারণ মানুষের আহবানের মতো মনে করো না।" অর্থাৎ রসূলের আহবান অস্বাভাবিক গুরুত্বের অধিকারী। অন্য কারোর আহবানে সাড়া দেয়া না দেয়ার স্বাধীনতা আছে কিন্তু রসূলের আহবানে না গেলে বা মনে ক্ষীণতম সংকীর্ণতা অনুভব করলে ঈমান বিপন্ন হয়ে পড়বে।

দুই ঃ "রসূলের দোয়াকে সাধারণ মানুষের দোয়ার মতো মনে করো না" তিনি খুশী হয়ে দোয়া করলে তোমাদের জন্য এর চেয়ে বড় আর কোন নিয়ামত নেই আর নারাজ হয়ে বদদোয়া করলে তার চেয়ে বড় আর কোন দুর্ভাগ্য তোমাদের জন্য থাকবে না।

তিন ঃ "রসূলকে ডাকা সাধারণ মানুষের একজনের অন্য এক জনকে ডাকার মতো হওয়া উচিত নয়।" অর্থাৎ তোমরা সাধারণ লোকদেরকে যেভাবে তাদের নাম নিয়ে উচ্চস্বরে ডাকো সেভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডেকো না। এ ব্যাপারে তাঁর প্রতি চরম শিষ্টাচার ও মর্যাদা প্রদর্শন করতে হবে। কারণ তাঁর প্রতি

সামান্যতম বেআদবীর জন্যও আল্লাহর কাছে জবাবদিহির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না।

১০৩. মুনাফিকদের আর একটি আলামত হিসেবে একথাটি বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, ইসলামের সামগ্রিক কাজের জন্য যখন ডাকা হয় তখন তারা এসে যায় ঠিকই কিন্তু এ উপস্থিতি তাদের কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর ও অপছন্দনীয় হয়, ফলে কোন রকম গা ঢাকা দিয়ে তারা সরে পড়ে।

১০৪. ইমাম জাফর সাদেক (র) বিপর্যয় অর্থ করেছেন "জালেমদের কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি।" অর্থাৎ যদি মুসলমানরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহলে তাদের ওপর জালেম ও স্বৈরাচারী শাসক চাপিয়ে দেয়া হবে। মোটকথা এটাও এক ধরনের বিপর্যয় হতে পারে। আর এ ছাড়াও আরো অসংখ্য ধরনের বিপর্যয় হওয়া সম্ভবপর। যেমন পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা, গৃহযুদ্ধ, নৈতিক অবক্ষয়, জামা'আতী ব্যবস্থায় বিশৃংখলা, আভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য, রাজনৈতিক ও বস্তুগত শক্তি ভেঙ্গে পড়া, বিজাতির অধীন হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

আল ফুরকান

২৫

নামকরণ

প্রথম আয়াত تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে। কুরআনের অধিকাংশ সূরার মতো এ নামটিও বিষয়বস্তু ভিত্তিক শিরোনাম নয় বরং আলামত হিসেবে সন্নিবেশিত হয়েছে। তবুও সূরার বিষয়বস্তুর সাথে নামটির একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সামনের দিকের আলোচনা থেকে একথা জানা যাবে।

নাযিলের সময়-কাল

বর্ণনাভংগী ও বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার মনে হয়, এ সূরাটিও সূরা মু'মিনূন ইত্যাদি সূরাগুলোর সমসময়ে নাযিল হয়। অর্থাৎ সময়টি হচ্ছে, রসূলের (সা) মক্কায় অবস্থানকালের মাঝামাঝি সময়। ইবনে জারীর ও ইমাম রাযী যাহ্হাক ইবনে মুযাহিম ও মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, এ সূরাটি সূরা নিসার ৮ বছর আগে নাযিল হয়। এ হিসেবেও এর নাযিল হবার সময়টি হয় মক্কী যুগের মাঝামাঝি সময়। (ইবনে জারীর, ১৯ খণ্ড, ২৮–৩০ পৃষ্ঠা ও তাফসীরে কবীর, ৬ খণ্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা)

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়

কুরআন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত এবং তাঁর পেশকৃত শিক্ষার বিরুদ্ধে মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে যেসব সন্দেহ ও আপত্তি উত্থাপন করা হতো সেগুলো সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি যথাযথ জবাব দেয়া হয়েছে এবং সাথে সাথে সত্যের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার খারাপ পরিণামও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শেষে সূরা মু'মিনূনের মতো মু'মিনদের নৈতিক গুণাবলীর একটি নকশা তৈরি করে সেই মানদণ্ডে যাচাই করে খাঁটি ও ভেজাল নির্ণয় করার জন্য সাধারণ মানুষের সামনে রেখে দেয়া হয়েছে। একদিকে রয়েছে এমন চরিত্র সম্পন্ন লোকেরা যারা এ পর্যন্ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে এবং আগামীতে যাদেরকে তৈরি করার প্রচেষ্টা চলছে। অন্যদিকে রয়েছে এমন নৈতিক আদর্শ যা সাধারণ আরববাসীদের মধ্যে পাওয়া যায় এবং যাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য জাহেলিয়াতের পতাকাবাহীরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন আরববাসীরা এ দু'টি আদর্শের মধ্যে কোন্‌টি পছন্দ করবে তার ফায়সালা তাদের নিজেদেরকেই করতে হবে। এটি ছিল একটি নিরব প্রশ্ন। আরবের প্রত্যেকটি অধিবাসীর সামনে এ প্রশ্ন রেখে দেয়া হয়। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ছাড়া বাকি সমগ্র জাতি এর যে জবাব দেয় ইতিহাসের পাতায় তা অম্লান হয়ে আছে।

আয়াত ৭৭ **সূরা আল ফুরকান–মক্কী** রুকূ' ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا ۝١
الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ
شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ۝٢

বড়ই বরকত সম্পন্ন[১] তিনি যিনি এ ফুরকান[২] তাঁর বান্দার ওপর নাযিল করেছেন[৩], যাতে সে সারা বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হয়।[৪] যিনি পৃথিবী ও আকাশের রাজত্বের মালিক,[৫] যিনি কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি,[৬] যাঁর সাথে রাজত্বে কেউ শরীক নেই,[৭] যিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন তারপর তার একটি তাক্‌দীর নির্ধারিত করে দিয়েছেন।[৮]

১. মূলে تَبَارَكَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর পূর্ণ অর্থ এক শব্দে তো দূরের কথা এক বাক্যে বর্ণনা করাও কঠিন। এর শব্দমূলে রয়েছে ب – ر – ك অক্ষরত্রয়। এ থেকে بَرَكَة ও بُرُوك দু'টি ধাতু নিষ্পন্ন হয়। بَرَكَة এর মধ্যে রয়েছে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, বিপুলতা, প্রাচুর্যের ধারণা। আর بُرُوك এর মধ্যে স্থায়িত্ব, দৃঢ়তা, অটলতা ও অনিবার্যতার ধারণা রয়েছে। তারপর এ ধাতু থেকে যখন تَبَارَكَ এর ক্রিয়াপদ তৈরি করা হয় তখন تفاعل এর বৈশিষ্ট হিসেবে এর মধ্যে বাড়াবাড়ি, অতিরঞ্জন ও পূর্ণতার প্রকাশের অর্থ শামিল হয়ে যায়। এ অবস্থায় এর অর্থ দাঁড়ায় চরম প্রাচুর্য, বর্ধমান প্রাচুর্য ও চূড়ান্ত পর্যায়ের স্থায়ীত্ব। এ শব্দটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপে কোন জিনিসের প্রাচুর্য বা তার দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য বলা হয়ে থাকে। যেমন কখনো এর অর্থ হয় উচ্চতায় অনেক বেশী এগিয়ে যাওয়া। বলা হয়, تبارکت النخلة অর্থাৎ ওমুক খেজুর গাছটি অনেক উঁচু হয়ে গেছে। আস্‌মায়ী বলেন, এক বন্ধু একটি উঁচু টিলায় উঠে পড়ে এবং নিজের সাথীদেরকে বলতে থাকে تَبَارَكْتُ عَلَيْكُمْ "আমি তোমাদের চাইতে উঁচু হয়ে গেছি।" কখনো মর্যাদায় ও শ্রেষ্ঠত্বে বেশী অগ্রসর হবার ক্ষেত্রে এ শব্দটি বলা হয়। কখনো একে ব্যবহার করা হয় দয়া ও সমৃদ্ধি পৌঁছানো এবং শুভ ও কল্যাণের ক্ষেত্রে অগ্রসরতার জন্য। কখনো এ থেকে পবিত্রতার পূর্ণতা ও চূড়ান্ত বিশুদ্ধতার অর্থ গ্রহণ করা হয়। এর স্থায়িত্ব ও অনিবার্যতার অর্থের অবস্থাও একই। পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং পূর্বাপর বক্তব্যই

বলে দেয় কোথায় একে কোন্ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে সামনের দিকে যে বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে তাকে দৃষ্টি সমক্ষে রাখলে বুঝা যায়, এ ক্ষেত্রে আল্লাহর জন্য تَبَارَكَ শব্দটি এক অর্থে নয় বরং বহু অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ঃ

এক ঃ মহা অনুগ্রহকারী ও সর্বজ্ঞ। কারণ, তিনি নিজের বান্দাকে ফুরকানের মহান নিয়ামত দান করে সারা দুনিয়াকে জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

দুই ঃ বড়ই মর্যাদাশালী ও সম্মানীয়। কারণ, পৃথিবী ও আকাশে তাঁরই রাজত্ব চলছে।

তিন ঃ বড়ই পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। কারণ, তাঁর সত্তা সকল প্রকার শির্কের গন্ধমুক্ত। তাঁর সমজাতীয় কেউ নেই। ফলে আল্লাহর সত্তার সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন নজির ও সমকক্ষ নেই। তাঁর কোন ধ্বংস ও পরিবর্তন নেই। কাজেই তাঁর স্থলাভিষিক্তের জন্য কোন পুত্রের প্রয়োজন নেই।

চার ঃ বড়ই উন্নত ও শ্রেষ্ঠ। কারণ, সমগ্র রাজত্ব তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। তাঁর ক্ষমতায় অংশীদার হবার যোগ্যতা ও মর্যাদা কারো নেই।

পাঁচ ঃ শক্তির পূর্ণতার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ, তিনি বিশ্ব-জাহানের প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টিকারী ও তার ক্ষমতা নির্ধারণকারী। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল মু'মিনূন ১৪ ও আল ফুরকান ১৯ টীকা)

২. অর্থাৎ কুরআন মজীদ। فُرْقَان শব্দটি ধাতুগত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এর শব্দমূল হচ্ছে ف-ر-ق অক্ষরত্রয়। এর অর্থ হচ্ছে দু'টি জিনিসকে আলাদা করা। অথবা একই জিনিসের অংশ আলাদা আলাদা হওয়া। কুরআন মজীদের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে পার্থক্যকারী হিসেবে অথবা যার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে অর্থে। অথবা এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অতিরঞ্জন। অর্থাৎ পৃথক করার ব্যাপারে এর পারদর্শিতা এতই বেশী যেন সে নিজেই পৃথক। যদি একে প্রথম ও তৃতীয় অর্থে নেয়া হয় তাহলে এর সঠিক অনুবাদ হবে মানদণ্ড, সিদ্ধান্তকর জিনিস ও নির্ণায়ক (CRITERION)। আর যদি দ্বিতীয় অর্থে নেয়া হয় তাহলে এর অর্থ হবে পৃথক পৃথক অংশ সম্বলিত এবং পৃথক পৃথক সময়ে আগমনকারী অংশ সম্বলিত জিনিস। কুরআন মজীদকে এ দু'টি দিক দিয়েই আল ফুরকান বলা হয়েছে।

৩. মূলে نَزَّلَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হয় ক্রমান্বয়ে ও সামান্য সামান্য করে নাযিল করা। এ মুখবন্ধসূচক বিষয়বস্তুর সম্পর্ক সামনের দিকে ৩২ আয়াত (৩ রুকূ') অধ্যয়নকালে জানা যাবে। সেখানে "এ কুরআন সম্পূর্ণটা একই সময় নাযিল করা হয়নি কেন" মক্কার কাফেরদের এ আপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. অর্থাৎ সাবধান বাণী উচ্চারণকারী এবং গাফিলতি ও ভ্রষ্টতার অশুভ ফলাফলের ভীতি প্রদর্শনকারী। এ ভীতি প্রদর্শনকারী ফুরকানও হতে পারে আবার যে বান্দার ওপর ফুরকান নাযিল করা হয়েছে তিনিও হতে পারেন। শব্দটি এমন ব্যাপক অর্থবোধক যে, উভয় অর্থই এখানে প্রযোজ্য হতে পারে। আর প্রকৃত অর্থে যেহেতু উভয়ই এক এবং উভয়কে একই কাজে পাঠানো হয়েছে তাই বলা যায়, উভয় অর্থই এখানে লক্ষ। তারপর সারা বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হবার যে কথা এখানে বলা হয়েছে এ থেকে জানা যায় যে, কুরআনের দাওয়াত ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত কোন

একটি দেশের জন্য নয় বরং সারা দুনিয়ার জন্য এবং কেবলমাত্র নিজেরই যুগের জন্য নয় বরং ভবিষ্যতের সকল যুগের জন্য। এ বিষয়বস্তুটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিবৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ـ

"হে মানুষেরা! আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত।"

–সূরা আল আ'রাফ, ১৫৮ আয়াত

وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ ـ

"আমার কাছে এ কুরআন পাঠানো হয়েছে যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমাদের এবং যাদের কাছে এটা পৌঁছে যায় তাদের সতর্ক করে দেই।"

–সূরা আল আন'আম, ৯ আয়াত

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ـ

"আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে পাঠিয়েছি।"–সূরা সাবা, ২৮ আয়াত

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

"আর আমি তোমাকে সারা দুনিয়াবাসীর জন্য রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছি।"

–সূরা আল আম্বিয়া, ১০৭ আয়াত

এ বিষয়বস্তুটিকে আরো সুস্পষ্টভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে বার বার বর্ণনা করেছেন ঃ بعثت الى الاحمر والاسود "আমাকে সাদা-কালো সবার কাছে পাঠানো হয়েছে।"

كان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة

"প্রথমে একজন নবীকে বিশেষ করে তাঁর নিজেরই জাতির কাছে পাঠানো হতো এবং আমাকে সাধারণভাবে সমগ্র মানব জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে।"

–বুখারী ও মুসলিম

وارسلت الى الخلق كافة وختم بى النبيون ـ

"আমাকে সমস্ত সৃষ্টির কাছে পাঠানো হয়েছে এবং আমার আগমনে নবীদের ধারাবাহিক আগমন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।"–মুসলিম

৫. অন্য অনুবাদ এও হতে পারে, "আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই জন্য।" অর্থাৎ এটা তাঁরই অধিকার এবং তাঁর জন্যই এটা নির্দিষ্ট। অন্য কারো এ অধিকার নেই এবং এর মধ্যে কারো কোন অংশও নেই।

৬. অর্থাৎ কারো সাথে তার কোন বংশীয় সম্পর্ক নেই এবং কাউকে তিনি দত্তকও নেননি। বিশ্ব-জাহানে এমন কোন সত্তা নেই, আল্লাহর সাথে যার বংশগত সম্পর্ক বা

দত্তক সম্পর্কের কারণে সে মাবুদ হবার অধিকার লাভ করতে পারে। তাঁর সত্তা একান্ত একক। কেউ নেই তাঁর সমজাতীয়। আল্লাহর কোন বংশধর নেই যে, নাউযুবিল্লাহ এক আল্লাহর ঔরস থেকে কোন প্রজন্ম চালু হবে এবং একের পর এক বহু আল্লাহর জন্ম নিতে থাকবে। কাজেই যে মুশরিক সমাজ ফেরেশতা, জিন বা কোন কোন মানুষকে আল্লাহর সন্তান মনে করে তাদেরকে দেবতা ও উপাস্য গণ্য করেছে তারা পুরোপুরি মূর্খ, অজ্ঞ ও পথভ্রষ্ট। এভাবে যারা বংশীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে না হলেও কোন বৈশিষ্টের ভিত্তিতে একথা মনে করে নিয়েছে যে, বিশ্ব-জাহানের প্রভূ আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে নিজের পুত্র বানিয়ে নিয়েছেন তারাও নিরেট মূর্খতা ও ভ্রষ্টতার মধ্যে অবস্থান করছে। "পুত্র করে নেবার" এ ধারণাটিকে যেদিক থেকেই বিশ্লেষণ করা যাবে অত্যন্ত অযৌক্তিক মনে হবে। এর কোন বাস্তব ও ন্যায়সংগত বিষয় হবার প্রশ্নই ওঠে না। যারা এ ধারণাটি উদ্ভাবন বা অবলম্বন করে তাদের নিকৃষ্ট মানসিকতা ইলাহী সত্তার শ্রেষ্ঠত্ব কল্পনায় অক্ষম ছিল। তারা এ অমুখাপেক্ষী ও অসমকক্ষ সত্তাকে মানুষের মতো মনে করে, যে একাকীত্ব ও নির্জনতার ভয়ে ভীত হয়ে অন্য কারো শিশুকে কোলে নিয়ে নেয় অথবা স্নেহ-ভালোবাসার আবেগে উদ্বেল হয়ে কাউকে নিজের ছেলে করে নেয় কিংবা সবার পরে কেউ তার উত্তরাধিকারী হবে এবং তার নাম ও কাজকে জীবিত রাখবে তাই দত্তক নেবার প্রয়োজন অনুভব করে। এ তিনটি কারণেই মানুষের মনে দত্তক নেবার চিন্তা জাগে। এর মধ্য থেকে যে কারণটিকেই আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে তা অবশ্যই মহামূর্খতা, বেআদবী ও স্বল্পবুদ্ধিতাই প্রমাণ করবে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস, ৬৬-৬৮ টীকা)

৭. মূলে ملك শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটি বাদশাহী, রাজত্ব, সর্বময় কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের (Sovereignty) অর্থে বলা হয়ে থাকে। এর অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহই এ বিশ্ব-জাহানের সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক এবং তাঁর শাসন ক্ষমতায় কারো সমান্যতমও অংশ নেই। একথার স্বতঃস্ফূর্ত ও অনিবার্য ফল এই যে, তাহলে তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। কারণ, মানুষ যাকেই মাবুদে পরিণত করে একথা মনে করেই করে যে, তার কাছে কোন শক্তি আছে যে কারণে সে আমাদের উপকার বা ক্ষতি করতে পারে এবং আমাদের ভাগ্যের ওপর ভালো-মন্দ প্রভাব ফেলতে পারে। শক্তিহীন ও প্রভাবহীন সত্তাদেরকে আশ্রয়স্থল করতে কোন একান্ত নির্বোধ ব্যক্তিও রাজি হতে পারে না। এখন যদি একথা জানা যায় যে, মহান আল্লাহ ছাড়া এ বিশ্ব-জাহানে আর কারো কোন শক্তি নেই তাহলে বিনয়-নম্রতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য কোন মাথা তাঁর ছাড়া আর কারো সামনে ঝুঁকবে না, কোন হাতও তাঁর ছাড়া আর কারো সামনে নজরানা পেশ করার জন্য এগিয়ে যাবে না, কোন কণ্ঠও তাঁর ছাড়া আর কারো প্রশংসা গীতি গাইবে না বা কারো কাছে প্রার্থনা করবে না ও ভিক্ষা চাইবে না এবং দুনিয়ার কোন নিরেট মূর্খ ও অজ্ঞ ব্যক্তিও কখনো নিজের প্রকৃত ইলাহ ছাড়া আর কারো আনুগত্য ও বন্দেগী করার মতো বোকামী করবে না অথবা কারো স্বয়ংসম্পূর্ণ শাসনাধিকার মেনে নেবে না। "আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই এবং তাঁরই জন্য" ওপরের এ বাক্যাংশটি থেকে এ বিষয়বস্তুটি আরো বেশী শক্তি অর্জন করে।

৮. অন্য অনুবাদ এও হতে পারে যে, "প্রত্যেকটি জিনিসকে একটি বিশেষ পরিমাণ অনুযায়ী রেখেছেন।" অথবা প্রত্যেক জিনিসের জন্য যথাযথ পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন।

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُورًا ۝

লোকেরা তাঁকে বাদ দিয়ে এমন সব উপাস্য তৈরি করে নিয়েছে যারা কোন জিনিস সৃষ্টি করে না বরং নিজেরাই সৃষ্ট,[৯] যারা নিজেদের জন্যও কোন উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখে না, যারা না জীবন-মৃত্যু দান করতে পারে আর না মৃতদেরকে আবার জীবিত করতে পারে।[১০]

কিন্তু যে কোন অনুবাদই করা হোক না কেন তা থেকে পূর্ণ অর্থ প্রকাশ হয় না। এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ বিশ্ব-জাহানের প্রত্যেকটি জিনিসের কেবল অস্তিত্বই দান করেননি বরং তিনিই প্রত্যেকটি জিনিসকে তার সত্তার সাথে সম্পর্কিত আকার-আকৃতি, দেহ সৌষ্ঠব, শক্তি, যোগ্যতা, গুণাগুণ, বৈশিষ্ট, কাজ ও কাজের পদ্ধতি, স্থায়িত্বের সময়-কাল, উত্থান ও ক্রমবিকাশের সীমা এবং অন্যান্য যাবতীয় বিস্তারিত বিষয় নির্ধারণ করেছেন। তারপর যেসব কার্য-কারণ, উপায়-উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধার বদৌলতে প্রত্যেকটি জিনিস এখানে নিজ পরিসরে নিজের ওপর আরোপিত কাজ করে যাচ্ছে তা বিশ্ব-জগতে তিনিই সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

তাওহীদের সমগ্র শিক্ষা এ একটি আয়াতের মধ্যেই ভরে দেয়া হয়েছে। এটি কুরআন মজীদের সর্বাত্মক তাৎপর্যবহ আয়াতগুলোর মধ্যে একটি মহান মর্যাদাপূর্ণ আয়াত। এর মাত্র কয়েকটি শব্দের মধ্যে এত বিশাল বিষয়বস্তু ভরে দেয়া হয়েছে যে, এর ব্যাপ্তি পরিবেষ্টন করার জন্য পুরোপুরি একটি কিতাব যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا افصح الغلام من بنى عبد المطلب علمه هذه الاية -

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল, তাঁর বংশের কোন শিশু যখন কথা বলা শুরু করতো তখন তিনি তাকে এ আয়াতটি শিখিয়ে দিতেন।" (মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ও মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ। আমর ইবনে শু'আইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

এ থেকে জানা যায়, মানুষের মনে তাওহীদের পুরোপুরি ধারণা বসিয়ে দেবার জন্য এ আয়াতটি একটি উত্তম মাধ্যম। প্রত্যেক মুসলমানের সন্তানের শৈশবে যখন বুদ্ধির প্রাথমিক উন্মেষ ঘটে তখনই তার মন-মগজে শুরুতেই এ নকশাটি বসিয়ে দেয়া উচিত।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ِۨافْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ
اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ۝٤ وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ
اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝٥ قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ
السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝٦

যারা নবীর কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা বলে, এ ফুরকান একটি মনগড়া জিনিস, যাকে এ ব্যক্তি নিজেই তৈরি করেছে এবং অপর কিছু লোক তার এ কাজে তাকে সাহায্য করেছে। বড়ই জুলুম[১১] ও ডাহা মিথ্যায় তারা এসে পৌঁছেছে। বলে, এসব পুরাতন লোকদের লেখা জিনিস—যেগুলো এ ব্যক্তি লিখিয়ে নিয়েছে এবং তা তাকে সকাল-সাঁঝে শুনানো হয়। হে মুহাম্মাদ! বলো, "একে নাযিল করেছেন তিনিই যিনি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর রহস্য জানেন।"[১২] আসলে তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ার্দ্র।[১৩]

৯. এ শব্দগুলো ব্যাপক ও পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে এবং এ থেকে সব ধরনের মনগড়া মাবুদ ও উপাস্য বুঝায়। আল্লাহর অনেক সৃষ্টিকে মানুষ মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে, যেমন ফেরেশতা, জিন, নবী, আউলিয়া, সূর্য, চাঁদ, গ্রহ-নক্ষত্র, নদ-নদী, গাছ-পালা, পশু ইত্যাদি। আবার মানুষ নিজেই কিছু জিনিস থেকে তৈরি করে তাদেরকে মাবুদ ও উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, যেমন পাথর, কাঠ ও মাটির তৈরি মূর্তি।

১০. বক্তব্যের সার নির্যাস হচ্ছে মহান আল্লাহ তাঁর এক বান্দার কাছে প্রকৃত সত্য কি তা দেখিয়ে দেবার জন্য এ ফুরকান নাযিল করেন কিন্তু লোকেরা তা থেকে গাফেল হয়ে এ গোমরাহিতে লিপ্ত হয়েছে। কাজেই সতর্ককারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী করে এক বান্দাকে পাঠানো হয়েছে। তিনি লোকদেরকে এ বোকামির অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করবেন। তাঁর প্রতি পর্যায়ক্রমে এ ফুরকান নাযিল করা শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে তিনি হককে বাতিল থেকে এবং আসলকে নকল থেকে আলাদা করে দেখিয়ে দেবেন।

১১. অন্য অনুবাদ "বড়ই অন্যায় ও বেইনসাফির কথা"ও হতে পারে।

১২. বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদরা কুরআন মজীদের বিরুদ্ধে এ আপত্তিটিই উত্থাপন করে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন বৈরী সমাজের একজনও একথা বলেনি যে, শিশুকালে খৃষ্টীয় যাজক বুহাইরার সাথে যখন তোমার দেখা হয়েছিল তখন তার কাছ থেকে এ সমস্ত বিষয় তুমি শিখে নিয়েছিলে। তাদের কেউ একথাও বলেনি যে, যৌবনকালে বাণিজ্যিক সফরে তুমি যখন বাইরে যেতে সে সময় খৃষ্টীয় পাদ্রী ও ইহুদি রাব্বীদের কাছ তেকে তুমি এসব তথ্য সংগ্রহ করেছিলে। কারণ এসব সফরের অবস্থা তাদের জানা ছিল। তিনি একাকী এসব

সফর করেননি। বরং তাদের নিজস্ব কাফেলার সাথে সফর করেছিলেন। তারা জানতো, এগুলোর সাথে জড়িত করে বাইর থেকে কিছু শিখে আসার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপন করলে তাদের নিজেদের শহরের হাজার হাজার লোক তাদের মিথ্যুক বলবে। তাছাড়া মক্কার প্রত্যেক সাধারণ লোক জিজ্ঞেস করবে, যদি এসব তথ্য এ ব্যক্তি বারো তেরো বছর বয়সেই বুহাইরা থেকে লাভ করে থাকে অথবা ২৫ বছর বয়সে যখন থেকে তার বাণিজ্যিক সফর শুরু হয় তখন থেকেই লাভ করতে থাকে, তাহলে এ ব্যক্তি তো বাইরে কোথাও থাকতো না, আমাদের এ শহরে আমাদের মধ্যেই বাস করতো, এ অবস্থায় চল্লিশ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত তার এসব জ্ঞান অপ্রকাশ থাকলো কেমন করে? কখনো তার মুখ থেকে এমন একটি শব্দও বের হলো না কেমন করে যার মাধ্যমে তার এ জ্ঞানের প্রকাশ ঘটতো? এ কারণেই মক্কার কাফেররা এ ধরনের ডাহা মিথ্যার আশ্রয় নেয়নি। এটা তারা ছেড়ে দিয়েছিল পরবর্তীকালের আরো বেশী নির্লজ্জ লোকদের জন্য। নবুওয়াত পূর্বকাল সম্পর্কে কোন কথা তারা বলতো না। তাদের কথা ছিল নবুওয়াত দাবীর সময়ের সাথে সম্পর্কিত। তারা বলতো, এ ব্যক্তি তো নিরক্ষর, নিজে পড়াশুনা করে নতুন জ্ঞান আহরণ করতে পারে না। ইতিপূর্বে কিছু শেখেনি। আজ এর মুখ থেকে যেসব কথা বের হচ্ছে চল্লিশ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত এগুলোর কোন কথাই সে জানতো না। তাহলে এখন হঠাৎ এসব জ্ঞান আসছে কোথা থেকে? এগুলোর উৎস নিশ্চয়ই আগের যুগের লোকদের কিছু কিতাব। রাতের বেলা চুপিসারে সেগুলো থেকে কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করিয়ে লেখানো হয়। কাউকে দিয়ে তার অংশবিশেষ পড়িয়ে এ ব্যক্তি শুনতে থাকে তারপর সেগুলো মুখস্থ করে নিয়ে দিনের বেলা আমাদের শুনিয়ে দেয়। হাদীস থেকে জানা যায়, এ প্রসংগে তারা বেশ কিছু লোকের নামও নিতো। তারা ছিল আহলি কিতাব। তারা লেখাপড়া জানতো এবং মক্কায় বাস করতো। অর্থাৎ আদ্দাস (হুওয়াইতিব ইবনে আবদুল উয্যার আজাদকৃত গোলাম), ইয়াসার (আলা আল-হাদরামির আজাদ করা গোলাম) এবং জাবর (আমের ইবনে রাবী'আর আজাদকৃত গোলাম)।

আপাতদৃষ্টিতে এটা বড়ই শক্তিশালী অভিযোগ মনে হয়। অহীর দাবী নাকচ করার জন্য নবী কোথা থেকে জ্ঞান অর্জন করেন তা চিহ্নিত করার চাইতে বড় ওজনদার আপত্তি আর কি হতে পারে। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে মানুষ এ ব্যাপারটি দেখে অবাক হয়ে যায় যে, এর জবাবে আদৌ কোন যুক্তিই পেশ করা হয়নি বরং কেবলমাত্র একথা বলেই শেষ করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা সত্যের প্রতি জুলুম করছো, পরিষ্কার বেইনসাফির কথা বলছো, ডাহা মিথ্যার বেসাতি করছো। এতো এমন আল্লাহর কালাম যিনি আকাশ ও পৃথিবীর গোপন রহস্য জানেন। এ ধরনের কঠোর বিরোধিতার পরিবেশে এমনিতর কঠিন অভিযোগ পেশ করা হয় এবং তাকে এভাবে তাচ্ছিল্যভরে রদ করে দেয়া হয়, এটা কি বিস্ময়কর নয়? সত্যিই কি এটা এমনি ধরনের তুচ্ছ ও নগণ্য অভিযোগ ছিল? এর জবাবে কি শুধুমাত্র "মিথ্যা ও জুলুম" বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিল? এ সংক্ষিপ্ত জবাবের পর সাধারণ মানুষ আর কোন বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট জবাবের দাবী করেনি, নতুন মু'মিনদের মনেও কোন সন্দেহ দেখা দেয়নি এবং বিরোধীদের কেউও একথা বলার হিম্মত করেনি যে, দেখো, আমাদের এ শক্তিশালী অভিযোগের জবাব দিতে পারছে না, নিছক "মিথ্যা ও জুলুম" বলে একে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা চালানো হচ্ছে, এর কারণ কি?

ইসলাম বিরোধীরা যে পরিবেশে এ অভিযোগ করেছিল সেখানেই আমরা এ সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবো ঃ

প্রথম কথা ছিল, মক্কার যেসব জালেম সরদার মুসলমানদের মারপিট করছিল ও কষ্ট দিচ্ছিল তারা যেসব লোক সম্পর্কে বলতো যে, তারা পুরাতন কিতাব থেকে অনুবাদ করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুখস্থ করাচ্ছে তাদের গৃহ এবং নবীর (সা) গৃহ অবরোধ করে তাদের নিজেদের কথামত এ কাজের জন্য যেসব বই ও কাগজপত্র জমা করা হয়েছিল সেসব আটক করা তাদের পক্ষে মোটেই কঠিন ব্যাপার ছিল না। ঠিক যে সময় এ কাজ করা হচ্ছিল তখনই তারা সেখানে অতর্কিত হামলা চালিয়ে মূল প্রমাণপত্র লোকদের দেখাতে পারতো এবং বলতে পারতো, দেখো, এ তোমাদের নবুওয়াতের প্রস্তুতি চলছে। বেলালকে যারা মরুভূমির তপ্ত বালুর বুকে পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে ফিরছিল তাদের পক্ষে এ কাজ করার পথে কোন নিয়ম ও আইন-কানুন বাধ্য ছিল না। এ পদক্ষেপ গ্রহণ করে তারা চিরকালের জন্য মুহাম্মাদী নবুওয়াতের বিপদ দূর করতে পারতো। কিন্তু তারা কেবল মুখেই অভিযোগ করতে থাকে। কোনদিনও এ ধরনের চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে আসেনি।

দ্বিতীয় কথা ছিল, এ প্রসংগে তারা যেসব লোকের নাম নিতো তারা কেউ বাইরের লোক ছিল না। সবাই ছিল এ মক্কা শহরেরই বাসিন্দা। তাদের যোগ্যতা গোপন ছিল না। সামান্য বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিও দেখতে পারতো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা পেশ করছেন তা কোন্ পর্যায়ের, তার ভাষা কত উচ্চ পর্যায়ের, সাহিত্য মর্যাদা কত উন্নত, শব্দ ও বাক্য কেমন শিল্পসমৃদ্ধ এবং সেখানে কত উন্নত পর্যায়ের চিন্তা ও বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। অন্যদিকে মুহাম্মাদ (সা) যাদের থেকে এসব কিছু হাসিল করছেন বলে তারা দাবী করছে তারা কোন্ পর্যায়ের লোক। এ কারণে এ অভিযোগকে কেউই এক কানাকড়ি গুরুত্ব দেয়নি। প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করতো, এসব কথায় মনের জ্বালা মেটানো হচ্ছে, নয়তো এ কথার মধ্যে সন্দেহ করার মতো একটুও প্রাণশক্তি নেই। যারা এসব লোককে জানতো না তারাও শেষমেষ এতটুকুন কথাও চিন্তা করতে পারতো যে, যদি তারা এতই যোগ্যতা সম্পন্ন হয়ে থাকতো, তাহলে তারা নিজেরাই নিজেদের পাণ্ডিত্যের প্রদীপ জ্বালালো না কেন? অন্য একজনের প্রদীপে তেল যোগান দেবার কি প্রয়োজন তাদের পড়েছিল? তাও আবার চুপিসারে, যাতে এ কাজের খ্যাতির সামান্যতম অংশও তাদের ভাগে না পড়ে?

তৃতীয় কথা ছিল, এ প্রসংগে যেসব লোকের নাম নেয়া হচ্ছিল তারা সবাই ছিল বিদেশাগত গোলাম। তাদের মালিকরা তাদেরকে স্বাধীন করে দিয়েছিল। সেকালের আরবের গোত্রীয় জীবনে কোন ব্যক্তিও কোন শক্তিশালী গোত্রের সাহায্য-সমর্থন ছাড়া বাঁচতে পারতো না। গোলাম স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পরও তার সাবেক মালিকের পৃষ্ঠপোষকতায় বসবাস করতো। তার সাহায্য-সমর্থনই হতো স্বাধীনতাপ্রাপ্ত গোলামের জীবনের সহায়ক। তখন একথা সুস্পষ্ট ছিল, যদি বলা হয়, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বদৌলতে নাউযুবিল্লাহ একটি মিথ্যা নবুওয়াতের দোকান চালাচ্ছিলেন, তাহলে এ লোকগুলো তো কোন প্রকার আন্তরিকতা ও সদুদ্দেশ্যে এ ষড়যন্ত্রে তাঁর সাথে অংশগ্রহণ করতে পারতো না। এমন এক ব্যক্তি যে রাতের বেলা তাদের কাছ থেকে কিছু

কথা শিখে নিতো এবং দিনের বেলা সারা দুনিয়ার মানুষের সামনে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপর সেগুলো অহী হিসেবে নাযিল হয়েছে বলে পেশ করতো, তার আন্তরিক সহযোগী ও অন্ধ ভক্ত তারা কেমন করে হতে পারতো? তাই তাদের অংশগ্রহণ হতে পারতো কোন লোভ ও স্বার্থের ভিত্তিতে। কিন্তু কোন সচেতন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি একথা চিন্তা করতে পারতো যে, এরা নিজেদের পৃষ্ঠপোষকদেরকে নারাজ করে দিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এ ষড়যন্ত্রে শরীক হয়ে গিয়ে থাকবে? কি এমন লোভ হতে পারতো যেজন্য তারা সমগ্র জাতির ক্রোধ ও তিরস্কারের লক্ষবস্তু এবং সমগ্র জাতি যাকে শত্রু বলে চিহ্নিত করেছে তার সাথে সহযোগিতা করতো এবং এ ধরনের বিপদগ্রস্ত লোকের কাছ থেকে কোন লাভের আশায় নিজের পৃষ্ঠপোষকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ক্ষতি বরদাশ্‌ত করতো? তারপর তাদের মারধর করে ঐ ব্যক্তির সাথে তাদের ষড়যন্ত্রের স্বীকারোক্তি আদায় করার সুযোগ তাদের পৃষ্ঠপোষকদের তো ছিলই, এটাও চিন্তা করার ব্যাপার ছিল। তারা এ সুযোগ ব্যবহার করেনি কেন? কেনই বা তারা সমগ্র জাতির সামনে তাদের নিজেদের মুখে এ স্বীকৃতি প্রকাশ করেনি যে, তাদের কাছ থেকে শিখে ও জ্ঞান নিয়ে নবুওয়াতের এ দোকান জমজমাট করা হচ্ছে?

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল এই যে, তারা সবাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনে এবং সাহাবায়ে কেরাম রসূলের পবিত্র সত্তার প্রতি যে নজিরবিহীন ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করতেন তারাও তার অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। বানোয়াট ও ষড়যন্ত্রমূলক নবুওয়াত তৈরির পেছনে যারা নিজেরাই মাল-মশলা যুগিয়েছে তারাই আবার তার প্রতি ঈমান আনবে এবং প্রাণঢালা শ্রদ্ধা সহকারে ঈমান আনবে এটা কি সম্ভব? আর ধরে নেয়া যাক যদি এটা সম্ভব হয়ে থেকেও থাকে, তাহলে মু'মিনদের জামায়াতে তাদের তো কোন উল্লেখযোগ্য মর্যদা লাভ করা উচিত ছিল। আব্বাস, ইয়াসার ও জাবুরের শক্তির ওপর নির্ভর করে নবুওয়াতের কাজ-কারবার চলবে আর নবীর দক্ষিণ হস্ত হবেন আবু বকর, উমর ও আবু উবাইদাহ, এটা কেমন করে সম্ভব হলো?

অনুরূপভাবে এ ব্যাপারটিও ছিল বড়ই অবাক করার মতো, যদি কয়েকজন লোকের সহায়তায় রাতের বেলা বসে নবুওয়াতের এ ব্যবসায়ের কাগজ-পত্র তৈরি করা সম্ভব হয়ে থেকে থাকে তাহলে যায়েদ ইবনে হারেসা, আলী ইবনে আবু তালেব, আবু বকর সিদ্দীক ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিবারাত্রের সহযোগী অন্যান্য লোকদের থেকে তা কিভাবে গোপন থাকতে পারতো? এ অভিযোগের মধ্যে যদি সত্যের সামান্যতম গন্ধও থাকতো, তাহলে এ লোকগুলো কেমন করে এ ধরনের আন্তরিকতা সহকারে নবীর প্রতি ঈমান আনলো এবং তাঁর সমর্থনে সব ধরনের বিপদ-আপদ ও ক্ষতি কিভাবে বরদাশ্‌ত করলো? এটা কি কোনক্রমেই সম্ভব ছিল? এসব কারণে প্রত্যেক শ্রোতার কাছে এ অভিযোগ এমনিতেই ছিল অর্থহীন ও অযৌক্তিক। তাই কোন গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের জবাব দেবার জন্য কুরআনে একে উদ্ধৃত করা হয়নি বরং একথা বলার জন্য উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, দেখো, সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষেত্রে এরা কেমন অন্ধ হয়ে গেছে এবং কেমন ডাহা মিথ্যা, অন্যায় ও বেইনসাফির আশ্রয় নিয়েছে।

১৩. এখানে এ বাক্যাংশটি বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। এর মানে হচ্ছে, আল্লাহ কি অপরূপ দয়া ও ক্ষমার আধার! যারা সত্যকে অপদস্ত করার জন্য এমন সব মিথ্যার পাহাড় সৃষ্টি করে

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ ؕ
لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ۝٧ اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ
اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ؕ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا
مَّسْحُوْرًا ۝٨

তারা বলে, "এ কেমন রসূল, যে খাবার খায় এবং হাটে বাজারে ঘুরে বেড়ায়?[১৪] কেন তার কাছে কোন ফেরেশতা পাঠানো হয়নি, যে তার সাথে থাকতো এবং (অস্বীকারকারীদেরকে)[১৫] ধমক দিতো? অথবা আর কিছু না হলেও তার জন্য অন্তত কিছু ধন-সম্পদ অবতীর্ণ করা হতো অথবা তার কাছে থাকতো অন্তত কোন বাগান, যা থেকে সে (নিশ্চিন্তে) রুজি সংগ্রহ করতো?"[১৬] আর জালেমরা বলে, " তোমরা তো একজন যাদুগ্রস্ত[১৭] ব্যক্তির অনুসরণ করছো।"

তাদেরকেও তিনি অবকাশ দেন এবং তাদের অপরাধের কথা শুনার সাথে সাথেই তাদের ওপর আযাব নাযিল করা আরম্ভ করেন না। এ সাবধান বাণীর সাথে সাথে এর মধ্যে উপদেশেরও একটি দিক আছে। সেটি যেন ঠিক এমনি ধরনের যেমন, "হে জালেমরা! এখনো যদি নিজেদের হিংসা-দ্বেষ থেকে বিরত হও এবং সত্য কথাকে সোজাভাবে মেনে নাও তাহলে আজ পর্যন্ত যা কিছু করতে থেকেছো সবই ক্ষমা করা যেতে পারে।"

১৪. অর্থাৎ প্রথমত মানুষের রসূল হওয়াটাই তো অদ্ভুত ব্যাপার। আল্লাহর পয়গাম নিয়ে যদি কোন ফেরেশতা আসতো তাহলে না হয় বুঝতাম। কিন্তু একজন রক্ত-মাংসের মানুষ জীবিত থাকার জন্য যে খাদ্যের মুখাপেক্ষী সে কেমন করে আল্লাহর পয়গাম নিয়ে আসে! যাহোক তবুও যদি মানুষকেই রসূল করা হয়ে থাকে তবে তাকে তো অন্তত বাদশাহ ও দুনিয়ার বড় লোকদের মতো উন্নত পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব হওয়া উচিত ছিল। তাকে দেখার জন্য চোখ উন্মুখ হয়ে থাকতো এবং তার দরবারে হাজির হবার সৌভাগ্য হতো অনেক দেন-দরবার ও সাধ্য-সাধনার পর। কিন্তু তা না হয়ে এমন এক জন সাধারণ লোককে কিভাবে পয়গম্বর করে দেয়া হয় যে, বাজারের মধ্যে ঘুরে ঘুরে জুতোর তলা ক্ষয় করতে থাকে? পথ চলতি মানুষ যাকে প্রতিদিন দেখে এবং কোন দিক দিয়েই যার মধ্যে কোন অসাধারণত্বের সন্ধান পায় না, কে তাকে গ্রাহ্য করবে? অন্য কথায় রসূলের প্রয়োজন থাকলে তা সাধারণ মানুষকে পথনির্দেশনা দেবার জন্য ছিল না বরং ছিল বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটাবার এবং ঠাটবাট দেখাবার ও ভীতি প্রদর্শন করার জন্য। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল মু'মিনূন, ২৬ টীকা)

১৫. অর্থাৎ যদি মানুষকেই নবী করা হয়ে থাকে তাহলে একজন ফেরেশতাকে তার সংগে দেয়া হতো। তিনি সব সময় একটি চাবুক হাতে নিয়ে ঘুরতেন এবং লোকদের

أُنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝٩

দেখো, কেমন সব উদ্ভট ধরনের যুক্তি তারা তোমার সামনে খাড়া করেছে, তারা এমন বিভ্রান্ত হয়েছে যে, কোন কাজের কথাই তাদের মাথায় আসছে না।[১৮]

বলতেন, "এ ব্যক্তির কথা মেনে নাও, নয়তো এখনই আল্লাহর আযাব বর্ষণ করার ব্যবস্থা করছি।" বিশ্বজাহানের সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক এক ব্যক্তিকে নবুওয়াতের মহান মর্যাদাসম্পন্ন দায়িত্ব প্রদান করে এমনি একাকী ছেড়ে দেবেন লোকদের গালিগালাজ ও দ্বারে দ্বারে ধাক্কা খাবার জন্য এটা তো বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার।

১৬. এটা যেন ছিল তাদের শেষ দাবী। অর্থাৎ আল্লাহ অন্তত এতটুকুই করতেন যে, নিজের রসূলের গ্রাসাচ্ছাদনের কোন ভালো ব্যবস্থা করে দিতেন। এ কেমন ব্যাপার, আল্লাহর রসূল আমাদের একজন সাধারণ পর্যায়ের ধনী লোকের চেয়েও খারাপ অবস্থায় থাকেন! নিজের খরচ চালাবার মতো ধন-সম্পদ নেই, ফল ফলারি খাবার মতো বাগান নেই একটিও, আবার দাবী করেন তিনি রব্বুল আলামীন আল্লাহর নবী।

১৭. অর্থাৎ পাগল। আরবদের দৃষ্টিতে পাগলামির কারণ ছিল দু'টো। কারো ওপর জিনের ছায়া পড়লে সে পাগল হয়ে যেতো অথবা যাদু করে কাউকে পাগল করা হতো। তাদের দৃষ্টিতে তৃতীয় আরো একটি কারণও ছিল। সেটি ছিল এই যে, কোন দেবদেবীর বিরুদ্ধে কেউ বেআদবী করলে তার অভিশাপ তার ওপর পড়তো এবং তার ফলে সে পাগল হয়ে যেতো। মক্কার কাফেররা প্রায়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে এ কারণগুলো বর্ণনা করতো। কখনো বলতো, এ ব্যক্তির ওপর কোন জিন চেপে বসেছে। কখনো বলতো, বেচারার ওপর কোন দুশমন যাদু করে দিয়েছে। আবার কখনো বলতো, আমাদের কোন দেবতার সাথে বেআদবী করার খেসারত এ বেচারা ভুগছে। কিন্তু এই সংগে তাঁকে আবার এতটা বুদ্ধিমান ও ধীশক্তি সম্পন্নও মনে করতো যে, এ ব্যক্তি একটি অনুবাদ ভবন কায়েম করেছে এবং সেখানে পুরাতন সব গ্রন্থাদি সংগ্রহ করে তার অংশবিশেষ বাছাই করে করে মুখস্থ করছে। এছাড়াও তারা তাঁকে যাদুকরও বলতো। অর্থাৎ তিনি নিজে যাদুকরও ছিলেন আবার অন্যের যাদুতে প্রভাবিতও ছিলেন। এর পর আর একটি বাড়তি দোষারোপ এও ছিল যে, তিনি কবিও ছিলেন।

১৮. এ আপত্তি ও অভিযোগগুলোও এখানে মূলত জবাব দেবার জন্য নয় বরং অভিযোগকারীরা হিংসা ও বিদ্বেষে কি পরিমাণ অন্ধ হয়ে গেছে তা বুঝবার জন্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। উপরে তাদের যেসব কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে তার মধ্যে কোন একটিও গুরুত্বসহকারে আলোচনা করার মতো নয়। তাদের শুধুমাত্র উল্লেখ করাই একথা বলার জন্য যথেষ্ট যে, বিরোধীদের কাছে ন্যায়সংগত যুক্তির অভাব অত্যন্ত প্রকট এবং নেহাতই বাজে ও বস্তাপচা কথার সাহায্যে তার একটি যুক্তি সিদ্ধ ও নীতিগত দাওয়াতের মোকাবিলা করছে। এক ব্যক্তি বলছেন, হে লোকেরা! এই যে শিরকের ওপর তোমরা নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি-সভ্যতার বুনিয়াদ কায়েম করে রেখেছো এ তো একটি মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং এর মিথ্যা ও ভ্রান্ত হবার পেছনে এ যুক্তি কাজ করছে। জবাবে শিরকের সত্যতার সপক্ষে কোন যুক্তি পেশ করা হয় না বরং শুধুমাত্র এভাবে একটি

تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ﴿١٠﴾ بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۣ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿١١﴾

২য় রুকূ'

বড়ই বরকত সম্পন্ন তিনি[১৯] যিনি চাইলে তাঁর নির্ধারিত জিনিস থেকে অনেক বেশী ও উৎকৃষ্টতর জিনিস তোমাকে দিতে পারেন, (একটি নয়) অনেকগুলো বাগান যেগুলোর পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বড় বড় প্রাসাদ।

আসল কথা হচ্ছে, এরা " সে সময়টিকে"[২০] মিথ্যা বলেছে[২১] এবং যে সে সময়কে মিথ্যা বলে তার জন্য আমি জ্বলন্ত আগুন তৈরি করে রেখেছি।

বিরূপ ধ্বনি উঠানো হয় যে, আরে এ লোকের ওপর তো যাদু করা হয়েছে। তিনি বলছেন, বিশ্ব-জাহানের সমগ্র ব্যবস্থা চলছে তাওহীদের ভিত্তিতে এবং এইসব বিভিন্ন সত্য এর সাক্ষ দিচ্ছে। জবাবে বড় গলায় ধ্বনিত হচ্ছে—এ ব্যক্তি যাদুকর। তিনি বলছেন, দুনিয়ায় তোমাদের লাগামহীন উটের মতো ছেড়ে দেয়া হয়নি বরং তোমাদের রবের কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে, পরবর্তী জীবনে তোমাদের এ জীবনের সমস্ত কাজকর্মের হিসেব দিতে হবে এবং এসব বিবিধ নৈতিক, ঐতিহাসিক এবং যুক্তি ও তথ্যগত বিষয় এ সত্যটি প্রমাণ করছে। জবাবে বলা হচ্ছে, আরে এতো একজন কবি। তিনি বলছেন, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছি সত্যের শিক্ষা নিয়ে এবং সে শিক্ষাটি হচ্ছে এই। জবাবে এ শিক্ষার ওপর কোন আলোচনা সমালোচনা করা হয় না বরং প্রমাণ ছাড়াই একটি দোষারোপ করা হয় এই মর্মে যে, এসব কিছুই কোথাও থেকে নকল করা হয়েছে। নিজের রিসালাতের প্রমাণ স্বরূপ তিনি আল্লাহর অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বাণী পেশ করছেন। নিজের জীবন ও নিজের চরিত্র ও কার্যাবলী পেশ করছেন এবং তার প্রভাবে তার অনুসারীদের জীবনে যে নৈতিক বিপ্লবের সূচনা হচ্ছিল তাও পেশ করছেন। কিন্তু বিরোধিতাকারীরা এর কোনটিও দেখে না। তারা কেবল জিজ্ঞেস করছে, তুমি খাও কেন? বাজারে চলাফেরা করো কেন? কোন ফেরেশতাকে তোমার আরদালী হিসেবে দেয়া হয়নি কেন? তোমার কাছে কোন অর্থভাণ্ডার বা বাগান নেই কেন? এ পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং কে এর মোকাবিলায় অক্ষম হয়ে আজেবাজে ও উদ্ভট কথা বলে চলছে এসব কথা আপনাআপনিই তা প্রমাণ করে দিচ্ছিল।

১৯. এখানে আবার সেই একই تبارك শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং পরবর্তী বিষয়বস্তু থেকে একথা জানা যাচ্ছে যে, এখানে এর মানে হচ্ছে "বিপুল সম্পদ ও উপকরণাদির অধিকারী," "সীমাহীন শক্তিধর" এবং "কারো কোন কল্যাণ করতে চাইলে করতে পারেন না, এর অনেক উর্ধে।"

২০. মূলে الساعة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ساعة মানে মুহূর্ত ও সময় এবং তার সাথে ال সংযোগ করার ফলে এর অর্থ হয়, সেই নির্দিষ্ট সময় যা আসবে এবং যে সম্পর্কে আমি পূর্বাহ্নেই তোমাকে খবর দিয়েছি। কুরআনে বিভিন্ন স্থানে এ শব্দটি একটি পারিভাষিক অর্থে এমন একটি বিশেষ সময়ের জন্য বলা হয়েছে যখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, পূর্বের ও পরের সবাইকে নতুন করে জীবিত করে উঠানো হবে, সবাইকে একত্র করে আল্লাহ হিসেব নেবেন এবং সবাইকে তার বিশ্বাস ও কর্ম অনুযায়ী পুরস্কার ও শাস্তি দেবেন।

২১. অর্থাৎ তারা যেসব কথা বলছে তার কারণ এ নয় যে, সত্যিসত্যিই কোন সংগত ভিত্তিতে তাদের মনে এ সন্দেহ জেগেছে যে, কুরআন অন্য কোথাও থেকে নকল করা বাণীর সমষ্টি অথবা তারা যথার্থই ধারণা করে যেসব আজাদ করা গোলামের নাম তারা রটিয়ে থাকে তারাই তোমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেয় কিংবা তুমি আহার করো ও বাজারে চলাফেরা করো কেবলমাত্র এ জিনিসটিই তোমার রিসালাত মেনে নেবার ব্যাপারে তাদের জন্য বাধার সৃষ্টি করছে অথবা তোমার সত্যের শিক্ষা মেনে নিতে তারা তৈরিই ছিল কিন্তু তোমার সাথে আরদালী হিসেবে কোন ফেরেশতা ছিল না এবং তোমার জন্য কোন অর্থভাণ্ডারও অবতীর্ণ করা হয়নি শুধুমাত্র এ জন্যই তারা পিছিয়ে গিয়েছে। এগুলোর কোনটিই আসল কারণ নয়। বরং আখেরাত অস্বীকারই হচ্ছে এর আসল কারণ, যা হক ও বাতিলের ব্যাপারে তাদেরকে একেবারেই দায়িত্বহীন বানিয়ে দিয়েছে। এরি ফলশ্রুতিতে তারা আদতে কোন গভীর চিন্তা–ভাবনা ও গবেষণা অনুসন্ধানের প্রয়োজনই অনুভব করে না এবং তোমার যুক্তিসংগত দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার জন্য এমনই সব হাস্যকর যুক্তি পেশ করতে উদ্যত হয়েছে। এ জীবনের পরে আর একটি জীবনও আছে যেখানে আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে তাদের সমস্ত কার্যকলাপের জবাবদিহি করতে হবে, এ চিন্তা তাদের মাথায় আসেই না। তারা মনে করে, এ দু'দিনের জীবনের পরে সবাইকে মরে গিয়ে মাটিতে মিশে যেতে হবে। মূর্তিপূজারীও যেমন মাটিতে মিশে যাবে, তেমনি আল্লাহতে বিশ্বাসী এবং আল্লাহতে অবিশ্বাসীও। কোন জিনিসেরও কোন পরিণাম ফল নেই। তাহলে মুশরিক হিসেবে মরা এবং তাওহীদবাদী বা নাস্তিক হিসেবে মরার মধ্যে ফারাক কোথায়? তাদের দৃষ্টিতে সত্য ও অসত্যের মধ্যকার ফারাকের যদি কোন প্রয়োজন থেকে থাকে তাহলে তা থাকে এ দুনিয়ার সাফল্য ও ব্যর্থতার দিক দিয়ে, অন্য কোন দিক দিয়ে নয়। এখানে তারা দেখে, কোন বিশ্বাস বা নৈতিক মূলনীতিরও কোন নির্ধারিত ফলাফল নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রতিটি মনোভাব ও কর্মনীতির ব্যাপারে পূর্ণ সমতা সহকারে এ ফলাফল প্রকাশিত হয় না। নাস্তিক, অগ্নিউপাসক, খৃষ্টান, ইহূদী ও নক্ষত্রপূজারী সবাই ভালো ও মন্দ উভয় ধরনের অবস্থার মুখোমুখি হয়। এমন কোন একটি বিশ্বাস নেই যে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা একথা বলে যে, এ বিশ্বাস অবলম্বনকারী অথবা তা প্রত্যাখ্যানকারী এ জগতে চিরকাল নিশ্চিত সচ্ছল বা নিশ্চিত অসচ্ছল অবস্থায় থাকে। অসৎকর্মশীল এবং সৎকর্মশীলও এখানে চিরকাল নিজের কর্মকাণ্ডের একই নির্ধারিত ফল ভোগ করে না। একজন অসৎকর্মশীল আরাম আয়েশ করে যাচ্ছে এবং অন্যজন শাস্তি পাচ্ছে। একজন সৎকর্মশীল বিপদসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং অন্যজন সম্মানীয় ও মর্যাদাশালী হয়ে বসে আছে। কাজেই পার্থিব ফলাফলের দিক দিয়ে কোন বিশেষ নৈতিক মনোভাব ও কর্মনীতি সম্পর্কেও আখেরাত অস্বীকারকারীরা তার কল্যাণ বা অকল্যাণ হবার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾ وَإِذَا أُلْقُوا
مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾ لَّا تَدْعُوا الْيَوْمَ
ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾ قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ
الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿١٥﴾ لَّهُمْ فِيهَا
مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا ﴿١٦﴾

আগুন যখন দূর থেকে এদের দেখবে[২২] তখন এরা তার ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত চিৎকার শুনতে পাবে। আর যখন এরা শৃংখলিত অবস্থায় তার মধ্যে একটি সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে তখন নিজেদের মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে। (তখন তাদের বলা হবে) আজ একটি মৃত্যুকে নয় বরং বহু মৃত্যুকে ডাকো।

এদের বলো, এ পরিণাম ভালো অথবা সেই চিরন্তন জান্নাত যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে? সেটি হবে তাদের কর্মফল এবং তাদের সফরের শেষ মনযিল। সেখানে তাদের প্রত্যেকটি ইচ্ছা পূর্ণ হবে। তার মধ্যে তারা থাকবে চিরকাল। তা প্রদান করা হবে তোমার রবের দায়িত্বের অন্তরভুক্ত একটি অবশ্য পালনীয় প্রতিশ্রুতি।[২৩]

হতে পারে না। এহেন পরিস্থিতিতে যখন কোন ব্যক্তি তাদেরকে একটি বিশ্বাস ও একটি নৈতিক নিয়ম শৃংখলার দিকে আহবান জানায় তখন সে যতই গুরুগম্ভীর ও ন্যায়সংগত যুক্তির সাহায্যে নিজের দাওয়াত পেশ করুক না কেন একজন আখেরাত অস্বীকারকারী কখনো গুরুত্ব সহকারে তা বিবেচনা করবে না বরং বালসুলভ ওজর–আপত্তি জানিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করবে।

২২. আগুন কাউকে দেখবে–একথাটা সম্ভবত রূপক অর্থে বলা হয়েছে। যেমন আমরা বলি, ঐ জামে মসজিদের মিনার তোমাকে দেখছে। আবার এটা প্রকৃত অর্থেও হতে পারে। অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের মতো চেতনাহীন হবে না বরং ভালোভাবে দেখে শুনে জ্বালাবে।

২৩. মূল শব্দ হচ্ছে وعدا مسئولا অর্থাৎ এমন প্রতিশ্রুতি যা পূর্ণ করার দাবী করা যেতে পারে। এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারে, জান্নাতের এ প্রতিশ্রুতি ও জাহান্নামের এ ভীতি প্রদর্শন এমন এক ব্যক্তির ওপর কি প্রভাব ফেলতে পারে যে পূর্ব থেকেই কিয়ামত, শেষ বিচারের দিন এবং জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাস করে না? এদিক দিয়ে বিচার করলে বাহ্যত এটি পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে অসংগতিশীল একটি বাণী বলে মনে হবে। কিন্তু একটু

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾

আর সেদিনই (তোমার রব) তাদেরও ঘিরে আনবেন এবং তাদের উপাস্যদেরও[২৪] আল্লাহকে বাদ দিয়ে আজ তারা যাদের পূজা করছে। তারপর তিনি তাদের জিজ্ঞেস করবেন, " তোমরা কি আমার এ বান্দাদের গোমরাহ করেছিলে? অথবা এরা নিজেরাই সহজ সরল সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল?"[২৫]

গভীরভাবে চিন্তা করলে একথাটা সহজেই বোধগম্য হবে। ব্যাপার যদি এমন হয় যে, আমি একটি কথা স্বীকার করাতে চাই এবং অন্যজন তা স্বীকার করতে চায় না, তাহলে এক্ষেত্রে আলোচনা ও বিতর্কের ধরন হবে এক রকম। কিন্তু যদি আমি নিজের শ্রোতার সাথে এমনভাবে আলাপ করতে থাকি যে, আমার কথা মানা না মানার ব্যাপারটা আলোচ্য নয় বরং শ্রোতার স্বার্থ ও লাভক্ষতিই হচ্ছে আলোচ্য বিষয়, তাহলে এক্ষেত্রে শ্রোতা যতই হঠকারী হোক না কেন একবার অবশ্যই চিন্তা করতে বাধ্য হবে। এখানে কথা বলার ও বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য এ দ্বিতীয় ভংগীটিই অবলম্বিত হয়েছে। এ অবস্থায় শ্রোতাকে তার নিজের কল্যাণের জন্য একথা ভাবতে হয় যে, পরকালীন জীবন অনুষ্ঠিত হবার প্রমাণ যদি নাই বা থাকে তাহলে তার অনুষ্ঠিত না হবারও তো কোন প্রমাণ নেই। আর সম্ভাবনা উভয়টিরই আছে। এখন যদি পরকালীন জীবন না থেকে থাকে, যেমনটি আমরা মনে করছি, তাহলে আমাদেরও মরে মাটির সাথে মিশে যেতে হবে এবং পরকালীন জীবন স্বীকারকারীদেরও। এ অবস্থায় উভয়ে সমান পর্যায়ে অবস্থান করবে। কিন্তু যদি এ ব্যক্তি যে কথা বলছে তা–ই সত্য হয়ে যায় তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমাদের বাঁচোয়া নেই। এভাবে এ বাচনভংগী শ্রোতার হঠকারিতার দেয়ালে ফাটল ধরিয়ে দেয়। এ ফাটল আরো বেশী বেড়ে যায় যখন কিয়ামত, শেষ বিচার, হিসেব–নিকেশ, দোজখ ও বেহেশতের এমন বিস্তারিত নক্‌শা পেশ করা হয় যেমন কেউ সেখানকার স্বচক্ষে দেখা ঘটনাবলী বর্ণনা করছে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, হা–মীম আস্ সাজদাহ, ৫২ আয়াত, ৬৯ টীকা এবং আল আহকাফ, ১০ আয়াত।)

২৪. সামনের দিকের আলোচনা স্বতই প্রকাশ করছে যে, এখানে উপাস্য বলতে মূর্তি নয় বরং ফেরেশতা, নবী, রসূল, শহীদ ও সৎলোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। বিভিন্ন জাতির মুশরিক সম্প্রদায় তাদেরকে উপাস্যে পরিণত করে রেখেছে। আপাতদৃষ্টিতে এক ব্যক্তি وما يعبدون শব্দাবলী পড়ে এর অর্থ মূর্তি বলে মনে করে। কেননা, আরবী ভাষায় সাধারণত ما শব্দটি নিষ্প্রাণ ও নির্বোধ জীবের জন্য এবং من শব্দটি বুদ্ধিমান জীবের জন্য বলা হয়ে থাকে। আমরা যেমন অনেক সময় কোন মানুষ সম্পর্কে তাচ্ছিল্যভরে বলি "সে কি" এবং এ থেকে এ অর্থ গ্রহণ করি যে, তার কোন সামান্যতমও মর্যাদা নেই, সে কোন বিরাট বড় ব্যক্তিত্ব নয়। ঠিক আরবী ভাষাতেও তেমনি বলা হয়ে থাকে। যেহেতু আল্লাহর মোকাবিলায় তাঁর সৃষ্টিকে উপাস্যে পরিণত করার ব্যাপার এখানে বক্তব্য আসছে, তাই ফেরেশতাদের ও বড় বড় মনীষীদের মর্যাদা যতই উচ্চতর হোক না কেন আল্লাহর

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِيْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ
اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوْا
قَوْمًۢا بُوْرًا ﴿١٨﴾ فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ ۙ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا
وَّلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا ﴿١٩﴾

তারা বলবে, "পাক-পবিত্র আপনার সত্তা! আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে আমাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করার ক্ষমতাও তো আমাদের ছিল না কিন্তু আপনি এদের এবং এদের বাপ-দাদাদের খুব বেশী জীবনোপকরণ দিয়েছেন, এমনকি এরা শিক্ষা ভুলে গিয়েছে এবং দুর্ভাগ্যপীড়িত হয়েছে।[২৬] এভাবে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে তারা (তোমাদের উপাস্যরা) তোমাদের কথাগুলোকে যা আজ তোমরা বলছো,[২৭] তারপর না তোমরা নিজেদের দুর্ভাগ্যকে ঠেকাতে পারবে, না পারবে কোথাও থেকে সাহায্য লাভ করতে এবং তোমাদের মধ্য থেকে যে-ই জুলুম করবে [২৮] তাকে আমি কঠিন শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো।

মোকাবিলায় তা যেন কিছুই নয়। এজন্যই পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এখানে من এর পরিবর্তে ما শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

২৫. কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়বস্তুটি এসেছে। যেমন সূরা সাবার ৪০-৪১ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَهٰٓؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا
يَعْبُدُوْنَ ○ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ
الْجِنَّ ۚ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ○

"যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্র করবেন তারপর ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করবেন, এরা কি তোমাদেরই বন্দেগী করতো? তারা বলবে ঃ পাক-পবিত্র আপনার সত্তা, আমাদের সম্পর্ক তো আপনার সাথে, এদের সাথে নয়। এরা তো জিনদের (অর্থাৎ শয়তান) ইবাদাত করতো। এদের অধিকাংশই তাদের প্রতিই ঈমান এনেছিল।"

অনুরূপভাবে সূরা মায়েদার শেষ রুকূতে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ
اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ

وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ
وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۗ أَتَصْبِرُونَ ۚ
وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বে যে রসূলই আমি পাঠিয়েছি তারা সবাই আহার করতো ও বাজারে চলাফেরা করতো।[২৯] আসলে আমি তোমাদের পরস্পরকে পরস্পরের জন্য পরীক্ষার মাধ্যমে পরিণত করেছি।[৩০] তোমরা কি সবর করবে?[৩১] তোমাদের রব সবকিছু দেখেন।[৩২]

بِحَقٍّ ..... مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ
رَبِّي وَرَبَّكُمْ

"আর যখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, হে মারয়ামের ছেলে ঈসা! তুমি কি লোকদের বলেছিলে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার মাকে উপাস্যে পরিণত করো? সে বলবে, পাক-পবিত্র আপনার সত্তা, যে কথা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার জন্য কবে শোভন ছিল?.....আমি তো এদেরকে এমন সব কথা বলেছিলাম যা বলার হুকুম আপনি আমাকে দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহর বন্দেগী করো, যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব।"

২৬. অর্থাৎ তারা ছিল সংকীর্ণমনা ও নীচ প্রকৃতির লোক। তিনি রিযিক দিয়েছিলেন যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কিন্তু তারা সবকিছু খেয়েদেয়ে নিমকহারাম হয়ে গেছে এবং তাঁর প্রেরিত নবীগণ তাদেরকে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন তা ভুলে গেছে।

২৭. অর্থাৎ তোমাদের এ ধর্ম যাকে তোমরা সত্য মনে করে বসেছো তা একেবারেই ভিত্তিহীন প্রমাণিত হবে এবং তোমাদের যে উপাস্যদের ওপর তোমাদের বিপুল আস্থা, তোমরা মনে করো তারা হবে আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশকারী তারাই উল্টো তোমাদের দোষী সাব্যস্ত করে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তোমরা নিজেদের উপাস্যদের যাইকিছু গণ্য করেছো তা সব তোমাদের নিজেদেরই কার্যক্রম, তাদের কেউ তোমাদের একথা বলেনি যে, তাদের এভাবে মেনে চলতে হবে এবং তাদের জন্য এভাবে নযরানা দিতে হবে আর তাহলে তারা আল্লাহর দরবারে তোমাদের জন্য সুপারিশ করার দায়িত্ব নিয়ে নেবে। কোন ফেরেশতা বা কোন মনীষীর পক্ষ থেকে এমনি ধরনের কোন উক্তি এখানে তোমাদের কাছে নেই। এ কথা তোমরা কিয়ামতের দিন প্রমাণও করতে পারবে না। বরং তারা সবাই তোমাদের চোখের সামনে এসব কথার প্রতিবাদ করবে এবং তোমরা নিজেদের কানে সেসব প্রতিবাদ শুনবে।

২৮. এখানে জুলুম বলতে সত্য ও ন্যায়ের ওপর জুলুম বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুফরী ও শিরক। পূর্বাপর আলোচ্য বিষয় নিজেই একথা প্রকাশ করছে যে, নবীকে অস্বীকারকারী, আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের উপাসনাকারী এবং আখেরাত অস্বীকারকারীদের "জুলুম"কারী গণ্য করা হচ্ছে।

২৯. মক্কার কাফেরদের এ বক্তব্য যে, এ কেমন রসূল যে আহার করে এবং বাজারে চলাফেরা করে, এর জবাবে একথা বলা হয়েছে। এ প্রসংগে মনে রাখতে হবে, মক্কার কাফেররা হযরত নূহ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ইসমাইল (আ), হযরত মূসা (আ) এবং অন্যান্য বহু নবী সম্পর্কে কেবল যে জানতো তা নয় বরং তাদের রিসালাতও স্বীকার করতো। তাই বলা হয়েছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে এ অভিনব আপত্তি জানানো হচ্ছে কেন? ইতিপূর্বে এমন কোন্ নবী এসেছেন যিনি আহার করতেন না ও বাজারে চলাফেরা করতেন না? অন্যদের কথা দূরে থাক, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম, যাকে খৃষ্টানরা আল্লাহর পুত্রে পরিণত করেছে (এবং যার মূর্তি মক্কার কাফেররাও কাবাগৃহের মধ্যে স্থাপন করেছিল) তিনিও ইনজীলের বর্ণনা অনুযায়ী আহারও করতেন এবং বাজারে চলাফেরাও করতেন।

৩০. অর্থাৎ অস্বীকারকারীরা রসূল ও মু'মিনদের জন্য পরীক্ষা এবং রসূল ও মু'মিনরা অস্বীকারকারীদের জন্য। অস্বীকারকারীরা জুলুম, নিপীড়ন ও জাহেলী শত্রুতার যে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে রেখেছে সেটিই এমন একটি মাধ্যম যা থেকে প্রমাণ হবে রসূল ও তাঁর সাচ্চা ঈমানদার অনুসারীরা খাঁটি সোনা। যার মধ্যে ভেজাল থাকবে সে সেই আগুনের কুণ্ড নিরাপদে অতিক্রম করতে পারবে না। এভাবে নির্ভেজাল ঈমানদারদের একটি ছাঁটাই বাছাই করা গ্রুপ বের হয়ে আসবে। তাদের মোকাবিলায় এরপর দুনিয়ার আর কোন শক্তিই দাঁড়াতে পারবে না। এ আগুনের কুণ্ড জ্বলতে না থাকলে সবরকমের খাঁটি ও ভেজাল লোক নবীর চারদিকে জমা হতে থাকবে এবং দীনের সূচনাই হবে একটি অপরিপক্ক দল থেকে। অন্যদিকে অস্বীকারকারীদের জন্যও রসূল ও রসূলের সাহাবীগণ হবেন একটি পরীক্ষা। নিজেদেরই বংশ-গোত্রের মধ্য থেকে একজন সাধারণ লোককে হঠাৎ নবী বানিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়া, তাঁর অধীনে কোন বিরাট সেনাদল ও ধন-সম্পদ না থাকা, আল্লাহর বাণী ও নির্মল চরিত্র ছাড়া তাঁর কাছে বিস্ময়কর কিছু না থাকা, বেশীরভাগ গরীব-মিসকীন, গোলাম ও নব্য কিশোর যুবাদের তাঁর প্রাথমিক অনুসারী দলের অন্তরভুক্ত হওয়া এবং আল্লাহর এ মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোককে যেন নেকড়ে ও হায়েনাদের মধ্যে অসহায়ভাবে ছেড়ে দেয়া— এ সবই হচ্ছে এমন একটি ছাঁকনি যা অসৎ ও অনভিপ্রেত লোকদের দীনের দিকে আসতে বাধা দেয় এবং কেবলমাত্র এমন সব লোককে ছাঁটাই বাছাই করে সামনের দিকে নিয়ে চলে যারা সত্যকে জানে, চেনে ও মেনে চলে। এ ছাঁকনি যদি না বসানো হতো এবং রসূল বিরাট শান-শওকতের সাথে এসে সিংহাসনে বসে যেতেন, অর্থভাণ্ডারের মুখ তাঁর অনুসারীদের জন্য খুলে দেয়া হতো এবং সবার আগে বড় বড় সরদার ও সমাজপতির অগ্রসর হয়ে তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করতো, তাহলে দুনিয়া পূজারী ও স্বার্থবাদী মানুষদের মধ্যে তাঁর প্রতি ঈমান এনে তাঁর অনুগত ভক্তের দলে শামিল হতো না এমন নির্বোধ কোন লোক পাওয়া সম্ভব ছিল কি? এ অবস্থায় তো সত্যপ্রিয় লোকেরা সবার পেছনে থেকে যেতো এবং বৈষয়িক স্বার্থ পূজারীরা এগিয়ে যেতো।

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ
أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿٢١﴾
يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا
مَحْجُورًا ﴿٢٢﴾ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴿٢٣﴾

৩ রুকূ'

যারা আমার সামনে হাজির হবার আশা করে না তারা বলে, " কেন আমাদের কাছে ফেরেশতা পাঠানো হয় না?[৩৩] অথবা আমরা আমাদের রবকে দেখি না কেন?[৩৪] বড়ই অহংকার করে তারা নিজেদের মনে মনে[৩৫] এবং সীমা অতিক্রম করে গেছে তারা অবাধ্যতায়। যেদিন তারা ফেরেশতাদের দেখবে সেটা অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদের দিন হবে না।[৩৬] চিৎকার করে উঠবে তারা, " হে আল্লাহ! বাঁচাও, বাঁচাও" এবং তাদের সমস্ত কৃতকর্ম নিয়ে আমি ধূলোর মতো উড়িয়ে দেবো।[৩৭]

৩১. অর্থাৎ এ কল্যাণকর উপযোগিতাটি উপলব্ধি করার পর এখন কি তোমরা ধৈর্য ধারণ করতে পারছো? যে কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা কাজ করছো তার জন্য পরীক্ষার এ অবস্থার অতীব প্রয়োজন বলে কি তোমরা মনে করছো? এ পরীক্ষার সময় যেসব অবধারিত আঘাত লাগবে সেগুলোর মুখোমুখি হতে কি এখন তোমরা প্রস্তুত?

৩২. এর দু'টি অর্থ এবং সম্ভবত এখানে দু'টিই প্রযোজ্য। এক, তোমাদের রব যা কিছু করছেন দেখে-শুনেই করছেন। তাঁর দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে কোন অন্যায়, বেইনসাফী ও গাফলতি নেই। দুই, যে ধরনের আন্তরিকতা ও সত্যনিষ্ঠা নিয়ে তোমরা এ কঠিন কাজটি করছো তাও তোমাদের রবের চোখের সামনে আছে এবং যে ধরনের জুলুম, নির্যাতন ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে তোমাদের কল্যাণ প্রচেষ্টার মোকাবিলা করা হচ্ছে তাও তাঁর অগোচরে নেই। কাজেই তোমাদের নিজেদের কাজের মর্যাদালাভ থেকে তোমরা বঞ্চিত হবে না এবং নিজেদের জুলুম ও বাড়াবাড়ির বিপদ থেকেও নিস্কৃতি পাবে না, এ ব্যাপারে তোমরা পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকো।

৩৩. অর্থাৎ যদি সত্যিই আল্লাহর ইচ্ছা হয়ে থাকে আমাদের কাছে তাঁর পয়গাম পৌছাবেন, তাহলে একজন নবীকে মাধ্যমে পরিণত করে তার কাছে ফেরেশতা পাঠানো যথেষ্ট নয় বরং প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে একজন করে ফেরেশতা পাঠানো উচিত। ফেরেশতা এসে তাকে বলবে, তোমার রব তোমার কাছে এ পয়গাম পাঠাচ্ছেন। অথবা ফেরেশতাদের একটি প্রতিনিধিদল প্রকাশ্য জনসমাবেশে সবার সামনে এসে যাবে এবং সবাইকে আল্লাহর পয়গাম শুনিয়ে দেবে। সূরা আন'আমেও তাদের এ আপত্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে এভাবে ঃ

أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّأَحْسَنُ مَقِيْلًا ﴿٢٤﴾ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ
السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ﴿٢٥﴾ اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ۨ الْحَقُّ
لِلرَّحْمٰنِ ۭ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ﴿٢٦﴾

সেদিন যারা জান্নাতের অধিকারী হবে তারাই উৎকৃষ্ট স্থানে অবস্থান করবে এবং দুপুর কাটাবার জন্য চমৎকার জায়গা পাবে।[৩৮] আকাশ ফুঁড়ে একটি মেঘমালার সেদিন উদয় হবে এবং ফেরেশতাদের দলে দলে নামিয়ে দেয়া হবে। সেদিন প্রকৃত রাজত্ব হবে শুধুমাত্র দয়াময়ের[৩৯] এবং সেটি হবে অস্বীকারকারীদের জন্য বড়ই কঠিন দিন।

وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ ۘ
اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ –

"যখন কোন আয়াত তাদের সামনে পেশ হতো, তারা বলতো আমরা কখ্খনো মেনে নেবো না যতক্ষণ না আমাদের সেসব কিছু দেয়া হবে যা আল্লাহর রসূলদের দেয়া হয়েছে। অথচ আল্লাহই ভালো জানেন কিভাবে তাঁর পয়গাম পৌঁছাবার ব্যবস্থা করবেন।" (১২৪ আয়াত)

৩৪. অর্থাৎ আল্লাহ নিজে আসবেন এবং বলবেন, হে আমার বান্দারা! তোমাদের কাছে এ হচ্ছে আমার অনুরোধ।

৩৫. অন্য অনুবাদ এও হতে পারে ঃ "নিজেদের জ্ঞানে তারা নিজেদেরকে অনেক বড় কিছু মনে করে নিয়েছে।"

৩৬. এ একই বিষয়বস্তু সূরা আন'আমের ৮ আয়াতে এবং সূরা হিজ্‌রের ৭–৮ এবং ৫১–৬৪ আয়াতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়াও সূরা বনী ইসরাঈলের ৯০ থেকে ৯৫ পর্যন্ত আয়াতেও কাফেরদের অনেকগুলো অদ্ভূত ও অভিনব দাবীর সাথে এগুলোর উল্লেখ করে তার জবাব দেয়া হয়েছে।

৩৭. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইবরাহীম ৩৫ ও ৩৬ টীকা।

৩৮. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে জান্নাতের হকদার লোকদের সাথে অপরাধীদের থেকে ভিন্নতর ব্যবহার করা হবে। তাদের সম্মানের সাথে বসানো হবে। হাশরের দিনের কঠিন দুপুর কাটাবার জন্য তাদের আরাম করার জায়গা দেয়া হবে। সেদিনের সবরকমের কষ্ট ও কঠোরতা হবে অপরাধীদের জন্য। সৎকর্মশীলদের জন্য নয়। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ
سَبِيْلًا ﴿٢٧﴾ يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ
الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ﴿٢٩﴾ وَقَالَ
الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ﴿٣٠﴾

জালেমরা সেদিন নিজেদের হাত কামড়াতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, "হায়! যদি আমি রসূলের সহযোগী হতাম। হায়! আমার দুর্ভাগ্য, হায়! যদি আমি অমুক লোককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করতাম। তার প্ররোচনার কারণে আমার কাছে আসা উপদেশ আমি মানিনি। মানুষের জন্য শয়তান বড়ই বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হয়েছে।[৪০] আর রসূল বলবে, " হে আমার রব! আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা এ কুরআনকে হাসি-ঠাট্টার লক্ষবস্তুতে পরিণত করেছিল।"[৪১]

والذى نفسى بيده انه ليخفف على المؤمن حتى يكون اخف
عليه من صلوة مكتوبة يصليها فى الدنيا

"সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ আবদ্ধ, কিয়ামতের মহা ও ভয়াবহ দিবস একজন মু'মিনের জন্য অনেক সহজ করে দেয়া হবে। এমনকি তা এতই সহজ করে দেয়া হবে, যেমন একটি ফরয নামায পড়ার সময়টি হয়।" (মুসনাদে আহমদ, আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত)

৩৯. অর্থাৎ যে সমস্ত নকল রাজত্ব ও রাজ্যশাসন দুনিয়ায় মানুষকে প্রতারিত করে তা সবই খতম হয়ে যাবে। সেখানে কেবলমাত্র একটি রাজত্বই বাকি থাকবে এবং তা হবে এ বিশ্ব-জাহানের যথার্থ শাসনকর্তা আল্লাহর রাজত্ব। সূরা মু'মিনে বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ ؕ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ
الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ -

"সেদিন যখন এরা সবাই প্রকাশ হয়ে যাবে, আল্লাহর কাছে এদের কোন জিনিস গোপন থাকবে না, জিজ্ঞেস করা হবে—আজ রাজত্ব কার? সবদিক থেকে জবাব আসবে, একমাত্র আল্লাহর যিনি সবার ওপর বিজয়ী।" (১৬ আয়াত)

হাদীসে এ বিষয়বস্তুকে আরো বেশী স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ এক হাতে পৃথিবী ও অন্য হাতে আকাশ নিয়ে বলবেন ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ۗ وَكَفٰى بِرَبِّكَ
هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ﴿٣١﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً
وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ﴿٣٢﴾

হে মুহাম্মাদ! আমি তো এভাবে অপরাধীদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রুতে পরিণত করেছি[৪২] এবং তোমার জন্য তোমার রবই পথ দেখানোর ও সাহায্য দানের জন্য যথেষ্ট।[৪৩]

অস্বীকারকারীরা বলে, "এ ব্যক্তির কাছে সমগ্র কুরআন একই সাথে নাযিল করা হলো না কেন?"[৪৪] —হাঁ, এমন করা হয়েছে এজন্য, যাতে আমি একে ভালোভাবে তোমার মনে গেঁথে দিতে থাকি[৪৫] এবং (এ উদ্দেশ্যে) একে একটি বিশেষ ক্রমধারা অনুযায়ী আলাদা আলাদা অংশে সাজিয়ে দিয়েছি।

انا الملك ، انا الديان ، اين ملوك الارض ؟ اين الجبارون ؟ اين المتكبرون ؟

"আমিই বাদশাহ, আমিই শাসনকর্তা। এখন সেই পৃথিবীর বাদশাহরা কোথায়? কোথায় স্বৈরাচারী একনায়কের দল? অহংকারী ক্ষমতাদর্পীরা কোথায়? (মুসনাদে আহমদ, বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদে সামান্য শাব্দিক হেরফের সহকারে এ হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে।

৪০. এটিও কাফেরদের উক্তির একটি অংশ হতে পারে। আবার এও হতে পারে যে, তাদের উক্তির উপর এটি আল্লাহর নিজের উক্তি। দ্বিতীয় অবস্থায় এর যথার্থ উপযোগী অনুবাদ হবে, "আর ঠিক সময়ে মানুষকে প্রতারণা করার জন্য শয়তান তো আছেই।"

৪১. মূল শব্দ مهجورا –এর কয়েকটি অর্থ হয়। যদি একে هجر থেকে গঠিত ধরা হয় তাহলে অর্থ হবে পরিত্যক্ত। অর্থাৎ তারা কুরআনের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে বলে মনেই করেনি, তাকে গ্রহণ করেনি এবং তার থেকে কোনভাবে প্রভাবিতও হয়নি। আর যদি একে هجر থেকে গঠিত ধরা হয় তাহলে এর দু'টি অর্থ হতে পারে ঃ এক, তারা একে প্রলাপ ও অর্থহীন বাক্য মনে করেছে। দুই, তারা একে নিজেদের প্রলাপ ও অর্থহীন বাক্য প্রয়োগের লক্ষস্থলে পরিণত করেছে এবং একে নানান ধরনের বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে থেকেছে।

৪২. অর্থাৎ আজ তোমার সাথে যে শত্রুতা করা হচ্ছে এটা কোন নতুন ব্যাপার নয়। আগেও এমনটি হয়ে এসেছে। যখনই কোন নবী সত্য ও সততার দাওয়াত নিয়ে এগিয়ে এসেছেন তখনই অপরাধজীবী লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে আদাপানি খেয়ে লেগেছে। এ বিষয়বস্তুটি সূরা আন'আমের ১১২–১১৩ আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

আর "আমি তাদের শত্রুতে পরিণত করে দিয়েছি।" মর্মে যে কথাটি বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে এই যে, আমার প্রাকৃতিক আইন এ রকমই। কাজেই আমার এ ইচ্ছার ওপর সবর করো এবং প্রাকৃতিক আইনের আওতায় যেসব অবস্থার সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য ঠাণ্ডা মাথায় দৃঢ় সংকল্প সহকারে সেগুলোর মোকাবিলা করতে থাকো। একদিকে তুমি সত্যের দাওয়াত দেবার সাথে সাথেই দুনিয়ার বিরাট অংশ তা গ্রহণ করার জন্য দৌড়ে আসবে এবং সকল দুষ্কৃতকারী নিজের যাবতীয় দুষ্কৃতি ত্যাগ করে সত্যের দাওয়াতকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরবে এমনটি আশা করো না।

৪৩. পথ দেখানো অর্থ কেবলমাত্র সত্যজ্ঞান দান করাই নয় বরং ইসলামী আন্দোলনকে সাফল্যের সাথে চালানো এবং শত্রুদের কৌশল ব্যর্থ করার জন্য যথাসময়ে সঠিক ব্যবস্থা অবলম্বন করার পথও দেখিয়ে দেয়া বুঝায়। আর সাহায্য মানে হচ্ছে সব ধরনের সাহায্য। যতগুলো ময়দানে হক ও বাতিলের সংঘাত হয় তার প্রত্যেকটিতে হকের সমর্থনে সাহায্য পৌঁছানো আল্লাহর কাজ। যুক্তির লড়াই হলে তিনিই সত্যপন্থীদেরকে সঠিক ও পূর্ণশক্তিশালী যুক্তি সরবরাহ করেন। নৈতিকতার লড়াই হলে তিনিই সবদিক থেকে সত্যপন্থীদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। সংগঠন–শৃংখলার মোকাবিলা হলে তিনিই বাতিলপন্থীদের হৃদয় ছিন্নভিন্ন এবং হকপন্থীদের হৃদয় সংযুক্ত করেন। মানবিক শক্তির মোকাবিলা হলে তিনিই প্রতিটি পর্যায়ে যোগ্য ও উপযোগী ব্যক্তিবর্গ ও গ্রুপসমূহ সরবরাহ করে হকপন্থীদের দলের শক্তি বৃদ্ধি করেন। বস্তুগত উপকরণের প্রয়োজন হলে তিনিই সত্যপন্থীদের সামান্য ধন ও উপায়–উপকরণে এমন বরকত দান করেন যার ফলে বাতিলপন্থীদের উপকরণের প্রাচুর্য তার মোকাবিলায় নিছক একটি প্রতারণাই প্রমাণিত হয়। মোটকথা সাহায্য দেয়া ও পথ দেখানোর এমন কোন দিক নেই যেখানে সত্যপন্থীদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট নন এবং তাদের অন্য কারো সাহায্য–সহায়তা নেবার প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, আল্লাহর তাদের জন্য যথেষ্ট হওয়ার ওপর তাদের বিশ্বাস ও আস্থা থাকতে হবে এবং তারা কোন প্রকার প্রচেষ্টা না চালিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকতে পারবে না। বরং তৎপরতা সহকারে বাতিলের মোকাবিলায় হকের মাথা উঁচু রাখার জন্য লড়ে যেতে হবে।

একথা মনে রাখতে হবে, আয়াতের এ দ্বিতীয় অংশটি না হলে প্রথম অংশ হতো বড়ই হতাশাব্যঞ্জক। এক ব্যক্তিকে বলা হচ্ছে, আমি জেনে বুঝে তোমাকে এমন একটি কাজের দায়িত্ব দিয়েছি যা শুরু করার সাথে সাথেই দুনিয়ার যত কুকুর ও নেকড়ে তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে—এর চেয়ে বড় উৎসাহ ভংগকারী জিনিস তার জন্য আর কী হতে পারে। কিন্তু এ ঘোষণার সমস্ত ভীতি এ সান্ত্বনাবাণী শুনে দূর হয়ে যায় যে, এ প্রাণান্তকর সংঘাতের ময়দানে নামিয়ে দিয়ে তোমাকে আমি একাকী ছেড়ে দেইনি বরং তোমার সাহায্যার্থে আমি নিজেই রয়েছি। অন্তরে ঈমান থাকলে এর চেয়ে বেশী সাহস সঞ্চারী কথা আর কি হতে পারে যে, সারা বিশ্ব–জাহানের মালিক আল্লাহ নিজেই আমাদের সাহায্যদান ও পথ দেখাবার দায়িত্ব নিচ্ছেন। এরপর তো শুধুমাত্র একজন হতোদ্যম কাপুরুষই ময়দানে এগিয়ে যেতে ইতস্তত করতে পারে।

৪৪. এই আপত্তিটাই ছিল মক্কার কাফেরদের খুবই প্রিয় ও যুৎসই। তাদের মতে এ আপত্তিটি ছিল খুবই শক্তিশালী। এজন্যে বারবার তারা এর পুনরাবৃত্তি করতো। কুরআনেও

বিভিন্ন স্থানে এটি উদ্ধৃত করে এর জবাব দেয়া হয়েছে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নমল ১০১–১০৬ ও বনী ইসরাঈল ১১৯ টীকা) তাদের প্রশ্নের অর্থ ছিল, যদি এ ব্যক্তি নিজে চিন্তা–ভাবনা করে অথবা কারো কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে এবং বিভিন্ন কিতাব থেকে নকল করে এসব বিষয়বস্তু না এনে থাকে বরং যদি সত্যিসত্যিই এটি আল্লাহর কিতাব হয়, তাহলে সমগ্র কিতাবটি একই সময় একই সংগে নাযিল হচ্ছে না কেন? আল্লাহ যা বলতে চান তা তো তিনি ভালো করেই জানেন। যদি তিনি এগুলোর নাযিলকারী হতেন তাহলে সব কথা এক সাথেই বলে দিতেন। এই যে চিন্তা–ভাবনা করে বিভিন্ন সময় কিছু কিছু বিষয় আনা হচ্ছে এগুলো একথার সুস্পষ্ট আলামত যে, অহী উপর থেকে নয় বরং এখানেই কোথাও থেকে আহরণ করা হচ্ছে অথবা নিজেই তৈরী করে সরবরাহ করার কাজ চলছে।

৪৫. অন্য অনুবাদ এও হতে পারে ঃ "এর মাধ্যমে আমি তোমার অন্তরকে শক্তিশালী করি" অথবা "তোমার বুকে হিম্মত সঞ্চার করি।" শব্দগুলোর মধ্যে উভয় অর্থই রয়েছে এবং উভয় অর্থই এখানে প্রযোজ্য। এভাবে একই বাক্যে কুরআন পর্যায়ক্রমে নাযিল করার বহুতর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

এক ঃ স্মৃতির ভাণ্ডারে একে হুবহু ও অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। লেখার আকারে নয় বরং একজন নিরক্ষর নবীর মাধ্যমে নিরক্ষর মানব গোষ্ঠীর মধ্যে মৌখিক ভাষণের আকারে এর প্রচার ও প্রসার হচ্ছে।

দুই ঃ এর শিক্ষাগুলো ভালোভাবে হৃদয়ংগম করা যেতে পারে। এজন্য থেমে থেমে সামান্য সামান্য কথা বলা এবং একই কথা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করাই বেশী উপযোগী হয়।

তিন ঃ এ কিতাব যে জীবন পদ্ধতির কথা বলেছে তার ওপর মন স্থির হয়ে যেতে থাকে। এজন্য নির্দেশ ও বিধানসমূহ পর্যায়ক্রমে নাযিল হওয়াটাই বেশী যুক্তিসংগত। অন্যথায় যদি সমস্ত আইন–কানুন এবং সমগ্র জীবন ব্যবস্থা একই সংগে বর্ণনা করে তা প্রতিষ্ঠিত করার হুকুম দেয়া হতো তা হলে চেতনা বিশৃংখল হয়ে যেতো। তাছাড়া এটাও বাস্তব সত্য যে, প্রত্যেকটি হুকুম যদি যথাযথ ও উপযুক্ত সময়ে দেয়া হয় তাহলে তার জ্ঞানবত্তা ও প্রাণসত্তা বেশী ভালোভাবে অনুধাবন করা যায়। অন্যদিকে সমস্ত বিধান, ধারা ও উপধারা অনুসারে সাজিয়ে একই সংগে দিয়ে দিলে এ ফল পাওয়া যেতে পারে না।

চার ঃ ইসলামী আন্দোলন চলাকালীন সময়ে যখন হক ও বাতিলের লাগাতার সংঘাত চলে সে সময় নবী ও তাঁর অনুসারীদের মনে সাহস সঞ্চার করে যেতে হবে। এ জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একবার একটি লম্বা–চওড়া নির্দেশনামা পাঠিয়ে দিয়ে সারা জীবন সমগ্র দুনিয়ার যাবতীয় বাধাবিপত্তির মোকাবিলা করার জন্য তাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেবার তুলনায় বার বার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাদের কাছে পয়গাম আসা বেশী কার্যকর হয়ে থাকে। প্রথম অবস্থায় মানুষ মনে করে সে প্রবল বাত্যা বিক্ষুব্ধ তরংগের মুখে পড়ে গেছে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় মানুষ অনুভব করে, যে আল্লাহ তাকে এ কাজে নিযুক্ত করেছেন তিনি তার প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন। তার কাজে আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তার অবস্থা দেখছেন, তার সমস্যা ও সংকটে তাকে পথ দেখাচ্ছেন এবং প্রত্যেকটি

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾ الَّذِينَ
يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾

আর (এর মধ্যে এ কল্যাণকর উদ্দেশ্যও রয়েছে যে) যখনই তারা তোমার সামনে কোন অভিনব কথা (অথবা অদ্ভুত ধরনের প্রশ্ন) নিয়ে এসেছে তার সঠিক জবাব যথাসময়ে আমি তোমাকে দিয়েছি এবং সর্বোত্তম পদ্ধতিতে বক্তব্য স্পষ্ট করে দিয়েছি।৪৬—যাদেরকে উপুড় করে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়া হবে তাদের অবস্থান বড়ই খারাপ এবং তাদের পথ সীমাহীন ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ।৪৭

প্রয়োজনের সময় তাকে তাঁর সামনে হাজির হবার ও সম্বোধন করার সৌভাগ্য দান করে তার সাথে নিজের সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করতে থেকেছেন। এ জিনিসটি তার উৎসাহ বৃদ্ধি এবং সংকল্প সুদৃঢ় করে।

৪৬. এটি হচ্ছে পর্যায়ক্রমে কুরআন নাযিল করার পদ্ধতি অবলম্বনের আর একটি কারণ। কুরআন মজীদ নাযিল করার কারণ এ নয় যে, আল্লাহ "বিধানাবলী" সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করতে চান এবং এর প্রচারের জন্য নবীকে তাঁর এজেন্ট নিয়োগ করেছেন। আসল ব্যাপার যদি এটাই হতো, তাহলে পুরো বইটি লেখা শেষ করে একই সময় এজেন্টের হাতে সম্পূর্ণ বইটি তুলে দেয়ার দাবী যথার্থ হতো। কিন্তু আসলে এর নাযিলের কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ কুফরী, জাহিলীয়াত ও ফাসেকীর মোকাবিলায় ঈমান, ইসলাম, আনুগত্য ও আল্লাহভীতির একটি আন্দোলন পরিচালনা করতে চান এবং এ উদ্দেশ্যে তিনি একজন নবীকে আহবায়ক ও নেতা হিসেবে সামনে এনেছেন। এ আন্দোলন চলাকালে একদিকে যদি তিনি আহবায়ক ও তার অনুসারীদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা ও নির্দেশনা দেয়া নিজের দায়িত্বের অন্তরভুক্ত করে নিয়ে থাকেন তাহলে অন্যদিকে এটাও নিজ দায়িত্বের অন্তরভুক্ত করে নিয়েছেন যে, বিরোধীরা যখনই কোন আপত্তি বা সন্দেহ অথবা জটিলতা পেশ করবে তখনই তিনি তা পরিষ্কার করে দেবেন এবং যখনই তারা কোন কথার ভুল অর্থ করবে তখনই তিনি তার সঠিক ব্যাখ্যা করে দেবেন। এরূপ রকমারি প্রয়োজনের জন্য যেসব ভাষণ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হচ্ছে সেগুলোর সমষ্টির নাম কুরআন। এটি কোন আইন, নৈতিকতা বা দর্শনের কিতাব নয় বরং একটি আন্দোলনের কিতাব। আর এর প্রতিষ্ঠার সঠিক প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, আন্দোলনের সূচনা পর্ব থেকে তা শুরু হবে এবং শেষ পর্ব পর্যন্ত যেভাবে আন্দোলন চলতে থাকবে এও সাথে সাথে সুযোগ ও প্রয়োজন অনুযায়ী নাযিল হতে থাকবে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, ৯–২০ পৃষ্ঠা)

৪৭. অর্থাৎ যারা সোজা কথাকে উল্টোভাবে চিন্তা করে এবং উলটো ফলাফল বের করে তাদের বুদ্ধি উল্টোমুখো হয়েছে। এ কারণেই তারা কুরআনের সত্যতা প্রমাণ পেশকারী প্রকৃত সত্যগুলোকে তাদের মিথ্যা হবার প্রমাণ গণ্য করছে। আর এজন্যই তাদেরকে নিম্নমুখী করে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗۤ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ﴿٣٥﴾
فَقُلْنَا اذْهَبَاۤ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ﴿٣٦﴾
وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ؕ وَاَعْتَدْنَا
لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٣٧﴾

৪ রুকূ'

আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম[৪৮] এবং তার সাথে তার ভাই হারুনকে সাহায্যকারী হিসেবে লাগিয়েছিলাম আর তাদের বলেছিলাম, যাও সেই সম্প্রদায়ের কাছে যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলেছে।[৪৯] শেষ পর্যন্ত তাদের আমি ধ্বংস করে দিলাম। একই অবস্থা হলো নূহের সম্প্রদায়েরও যখন তারা রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো,[৫০] আমি তাদের ডুবিয়ে দিলাম এবং সারা দুনিয়ার লোকদের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয়ে পরিণত করলাম, আর এ জালেমদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ঠিক করে রেখেছি।[৫১]

৪৮. এখানে কিতাব বলে সম্ভবত তাওরাত নামে পরিচিত গ্রন্থটিকে বুঝানো হচ্ছে না, যা মিসর থেকে বনী ইসরাঈলদের নিয়ে বের হবার সময় হযরত মূসাকে দেয়া হয়েছিল। বরং এখানে এমন সব নির্দেশের কথা বলা হচ্ছে, যেগুলো নবুওয়াতের দায়িত্বে নিয়োজিত হবার সময় থেকে নিয়ে মিসর থেকে বের হওয়া পর্যন্ত হযরত মূসাকে দেয়া হয়েছিল। এর অন্তরভুক্ত রয়েছে ফেরাউনের দরবারে হযরত মূসা যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটি এবং ফেরাউনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার সময় যে সব নির্দেশ তাঁকে দেয়া হয়েছিল সেগুলোও। কুরআন মজীদের বিভিন্নস্থানে এগুলোর উল্লেখ আছে। কিন্তু যতদূর মনে হয় তাওরাতে এগুলো অন্তরভুক্ত করা হয়নি। দশটি বিধানের মাধ্যমে তাওরাতের সূচনা হয়েছে। বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর ত্যাগ করার সময় সিনাই এলাকার তূর পাহাড়ে প্রস্তর ফলকে লিখিত আকারে তাঁকে এগুলো দেয়া হয়েছিল।

৪৯. অর্থাৎ হযরত ইয়াকুব (আ) ও হযরত ইউসুফের (আ) মাধ্যমে যেসব আয়াত তাদের কাছে পৌঁছেছিল এবং পরবর্তীকালে বনী ইসরাঈলের সৎকর্মশীলরা তাদের কাছে যেগুলো প্রচার করেছিলেন।

৫০. যেহেতু মানুষ কখনো নবী হতে পারে একথা মেনে নিতে তারা অস্বীকার করেছিল, তাই তাদের এ মিথ্যাচার কেবলমাত্র হযরত নূহের বিরুদ্ধেই ছিল না বরং মূলত নবুওয়াতের পদকেই তারা অস্বীকার করেছিল।

৫১. অর্থাৎ আখেরাতের শাস্তি।

وَعَادًا وَّثَمُوْدَا وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ﴿٣٨﴾ وَكُلًّا
ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ۖ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيْٓ
اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ۭ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ
نُشُوْرًا ﴿٤٠﴾ وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ۭ اَهٰذَا الَّذِيْ
بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ﴿٤١﴾ اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۭ
وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٤٢﴾

এভাবে আদ ও সামূদ এবং আসহাবুর রস্[৫২] ও মাঝখানের শতাব্দীগুলোর বহু লোককে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তাদের প্রত্যেককে আমি (পূর্বে ধ্বংস প্রাপ্তদের) দৃষ্টান্ত দিয়ে দিয়ে বুঝিয়েছি এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যেককে ধ্বংস করে দিয়েছি। আর সেই জনপদের ওপর দিয়ে তো তারা যাতায়াত করেছে যার ওপর নিকৃষ্টতম বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিল।[৫৩] তারা কি তার অবস্থা দেখে থাকেনি? কিন্তু তারা মৃত্যুর পরের জীবনের আশাই করে না।[৫৪]

তারা যখন তোমাকে দেখে, তোমাকে বিদ্রূপের পাত্রে পরিণত করে। (বলে), "এ লোককে আল্লাহ রসূল করে পাঠিয়েছেন? এতো আমাদের পথভ্রষ্ট করে নিজেদের দেবতাদের থেকেই সরিয়ে দিতো যদি না আমরা তাদের প্রতি অটল বিশ্বাসী হয়ে থাকতাম।[৫৫] বেশ, সে সময় দূরে নয় যখন শাস্তি দেখে তারা নিজেরাই জানবে ভ্রষ্টতায় কে দূরে চলে গিয়েছিল।

৫২. আসহাবুর রস্ কারা ছিল, এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়নি। তাফসীরকারগণ এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাদের কোন বর্ণনাই সন্তোষজনক নয়। বড় জোর এতটুকু বলা যেতে পারে, তারা এমন এক সম্প্রদায় ছিল যারা তাদের নবীকে কূয়ার মধ্যে ফেলে দিয়ে বা ঝুলিয়ে রেখে হত্যা করেছিল। আরবী ভাষায় "রাস্‌স" বলা হয় পুরাতন বা অন্ধ কূপকে।

৫৩. অর্থাৎ লূত জাতির জনপদ। নিকৃষ্টতম বৃষ্টি মানে পাথর বৃষ্টি। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় একথা বলা হয়েছে। হিজায বাসীদের বাণিজ্য কাফেলা ফিলিস্তিন ও সিরিয়া যাবার পথে এ এলাকা অতিক্রম করতো। সেখানে তারা কেবল ধ্বংসাবশেষ দেখতো না বরং আশপাশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুখে লূত জাতির শিক্ষণীয় ধ্বংস কাহিনীও শুনতো।

أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ ۖ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾ أَمْ
تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَٰمِ ۖ
بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

কখনো কি তুমি সেই ব্যক্তির অবস্থা ভেবে দেখেছো, যে তার নিজের প্রবৃত্তির কামনাকে প্রভু রূপে গ্রহণ করেছে?[৫৬] তুমি কি এহেন ব্যক্তিকে সঠিক পথে নিয়ে আসার দায়িত্ব নিতে পারো? তুমি কি মনে করো তাদের অধিকাংশ লোক শোনে ও বোঝে? তারা পশুর মতো বরং তারও অধম।[৫৭]

৫৪. অর্থাৎ যেহেতু তারা পরকাল বিশ্বাস করে না তাই নিছক একজন দর্শক হিসেবে এ ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করেছে। এ থেকে কোন শিক্ষা নেয়নি। এ থেকে জানা যায়, পরকাল বিশ্বাসী ও পরকাল অবিশ্বাসীর দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে কত বড় ফারাক। একজন নিছক ঘটনা বা কীর্তিকলাপ দেখে অথবা বড়জোর ইতিহাস রচনা করে। কিন্তু অন্যজন ঐসব জিনিস থেকেই নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করে এবং জীবনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন প্রকৃত সত্যের নাগাল পায়।

৫৫. কাফেরদের এ দু'টি কথা পরস্পর বিরোধী। প্রথম কথাটি থেকে জানা যায়, তারা নবীকে (সা) তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে এবং তাঁকে বিদ্রূপ করে তাঁর মর্যাদা হ্রাস করতে চাচ্ছে। তারা যেন বলতে চাচ্ছে, নবী (সা) তাঁর মর্যাদার চাইতে অনেক বেশী বড় দাবী করেছেন। দ্বিতীয় কথা জানা যায়, তারা তাঁর যুক্তির শক্তি ও ব্যক্তিত্বের ক্ষমতা মেনে নিচ্ছে এবং স্বতস্ফূর্তভাবে স্বীকার করে নিচ্ছে যে, তারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হঠকারিতার আশ্রয় নিয়ে নিজেদের আরাধ্য দেবতাদের বন্দনায় অবিচল না থাকলে এ ব্যক্তি তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নিতেন। ইসলামী আন্দোলন তাদেরকে কি পরিমাণ আতংকিত করে তুলেছিল এই পরস্পর বিরোধী কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বেহায়ার মতো যখন তামাসা–বিদ্রূপ করতো তখন হীনমন্যতা বোধের পীড়নে অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের মুখ থেকে এমন সব কথা বের হয়ে যেতো যা থেকে এ শক্তিটি তাদের মনে কি পরিমাণ আতংক সৃষ্টি করেছে তা স্পষ্ট বুঝা যেতো।

৫৬. প্রবৃত্তির কামনাকে খোদায় পরিণত করার মানে হচ্ছে, তার পূজা করা। আসলে এটাও ঠিক মূর্তি পূজা করা বা কোন সৃষ্টিকে উপাস্যে পরিণত করার মতই শিরক। হযরত আবু উমামাহ রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

ما تحت ظل السماء من اله يعبد من دون اللّٰه تعالى اعظم عند اللّٰه عزوجل من هوى يتبع –

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا
الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾

৫ রুকূ'

তুমি কি দেখ না কিভাবে তোমার রব ছায়া বিস্তার করেন? তিনি চাইলে একে চিরন্তন ছায়ায় পরিণত করতেন। আমি সূর্যকে করেছি তার পথ-নির্দেশক।[৫৮] তারপর (যতই সূর্য উঠতে থাকে) আমি এ ছায়াকে ধীরে ধীরে নিজের দিকে গুটিয়ে নিতে থাকি।[৫৯]

"এ আকাশের নিচে যতগুলো উপাস্যেরই উপাসনা করা হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট উপাস্য হচ্ছে এমন প্রবৃত্তির কামনা যার অনুসরণ করা হয়।" (তাবারানী) [আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন আল কাহাফ ৫০ টীকা।]

যে ব্যক্তি নিজের কামনাকে বুদ্ধির অধীনে রাখে এবং বুদ্ধি ব্যবহার করে নিজের জন্য ন্যায় ও অন্যায়ের পথের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়, সে যদি কোন ধরনের শিরকী বা কুফরী কর্মে লিপ্ত হয়েও পড়ে তাহলে তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সঠিক পথে আনা যেতে পারে এবং সে সঠিক পথ অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর তার ওপর অবিচল থাকবে এ আস্থাও পোষণ করা যেতে পারে। কিন্তু প্রবৃত্তির দাস হচ্ছে একটি লাগামহীন উট। তার কামনা তাকে যেদিকে নিয়ে যাবে সে পথহারা হয়ে সেদিকেই দৌড়াতে থাকবে। তার মনে ন্যায় ও অন্যায় এবং হক ও বাতিলের মধ্যে ফারাক করার এবং একটিকে ত্যাগ করে অন্যটিকে গ্রহণ করার কোন চিন্তা আদৌ সক্রিয় থাকে না। তাহলে কে তাকে বুঝিয়ে সঠিক পথে আনতে পারে? আর ধরে নেয়া যাক, যদি সে মেনেও নেয় তাহলে তাকে কোন নৈতিক বিধানের অধীন করে দেয়া কোন মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়।

৫৭. অর্থাৎ গরু-ছাগলের দল যেমন জানে না তাদের যারা হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা তাদের চারণক্ষেত্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, না কসাইখানার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তারা কেবল চোখ বন্ধ করে যারা হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের ইশারায় চলতেই থাকে, ঠিক তেমনি এ জনসাধারণও তাদের নিজেদের শয়তানী প্রবৃত্তি ও পথ ভ্রষ্টকারী নেতাদের ইশারায় চোখ বন্ধ করে চলতেই থাকছে। তারা জানে না তাদের হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কল্যাণের দিকে, না ধ্বংসের দিকে। এ পর্যন্ত তাদের অবস্থা গরু-ছাগলের সাথে তুলনীয়। কিন্তু গরু-ছাগলকে আল্লাহ বুদ্ধিজ্ঞান ও চেতনা শক্তি দান করেননি। তারা যদি চারণক্ষেত্র ও কসাইখানার মধ্যে কোন পার্থক্য না করে থাকে তাহলে এতে অবাক হবার কিছু নেই। তবে অবাক হতে হয় যখন দেখা যায় একদল মানুষ যাদের আল্লাহ বুদ্ধি-জ্ঞান ও চেতনা শক্তি দান করেছেন এবং তারপরও তারা গরু-ছাগলের মতো অসচেতনতা ও গাফলতির মধ্যে ডুবে রয়েছে।

কেউ যেন প্রচার-প্রচারণাকে অর্থহীন গণ্য করা এ ভাষণের উদ্দেশ্য বলে মনে না করেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে এ কথাগুলো এজন্য

বলা হচ্ছে না যে তিনি যেন লোকদেরকে অনর্থক বুঝাবার চেষ্টা ত্যাগ করেন। আসলে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যেই এ বক্তব্য রাখা হয়েছে, যদিও বাহ্যত সম্বোধন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আসলে তাদের এ কথা শুনানো উদ্দেশ্য যে, ওহে গাফেলরা! তোমাদের এ অবস্থা কেন? আল্লাহ কি তোমাদের বুদ্ধি-বিবেক এজন্য দিয়েছেন যে, তোমরা দুনিয়ায় পশুদের মতো জীবন যাপন করবে?

৫৮. মূলে "দলীল" (دليل) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক এমন একটি অর্থে যে অর্থে ইংরেজী ভাষায় Pilot শব্দটির ব্যবহার হয়। মাঝি-মাল্লাদের পরিভাষায় "দলীল" এমন এক ব্যক্তিকে বলা হয় যে নৌকাকে পথ-নির্দেশনা দিয়ে চালাতে থাকে। ছায়ার ওপর সূর্যকে দলীল করার অর্থ হচ্ছে এই যে, ছায়ার ছড়িয়ে পড়া ও সংকুচিত হওয়া সূর্যের উপরে ওঠা ও নেমে যাওয়া এবং তার উদয় হওয়া ও অস্তে যাওয়ার ওপর নির্ভরশীল এবং তার আলামত।

ছায়া অর্থ আলোক ও অন্ধকারের মাঝামাঝি এমন অবস্থা যা সকাল বেলা সূর্য ওঠার আগে হয় এবং সারাদিন ঘরের মধ্যে, দেয়ালের পেছনে ও গাছের নিচে থাকে।

৫৯. নিজের দিকে গুটিয়ে নেয়া মানে হচ্ছে, অদৃশ্য ও বিলীন করে দেয়া। কারণ যে কোন জিনিস ধ্বংস হয় তা আল্লাহরই দিকে ফিরে যায়। প্রত্যেকটি জিনিস তাঁর দিক থেকেই আসে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যায়।

এ আয়াতের দু'টি দিক। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক। বাহ্যিক দিক থেকে আয়াতটি মুশরিকদের বলছে, যদি তোমরা পৃথিবীতে পশুর মতো জীবন ধারণ না করতে এবং কিছুটা বুদ্ধি-বিবেচনা ও সচেতনতার সাথে এগিয়ে চলতে, তাহলে প্রতিনিয়ত তোমরা এই যে ছায়া দেখতে পাচ্ছো এটিই তোমাদের এ শিক্ষা দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, নবী তোমাদের যে তাওহীদের শিক্ষা দিচ্ছেন তা যথার্থই সত্য ও সঠিক। তোমাদের সারা জীবন এ ছায়ার জোয়ার-ভাটার সাথে বিজড়িত। যদি চিরন্তন ছায়া হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীতে কোন প্রাণী এমন কি উদ্ভিদও জীবিত থাকতে পারে না। কারণ সূর্যের আলো ও উত্তাপের ওপর তাদের সবার জীবন নির্ভর করে। ছায়া যদি একেবারেই না থাকে তাহলেও জীবন অসাধ্য। কারণ সর্বক্ষণ সূর্যের মুখোমুখি থাকার এবং তার রশ্মি থেকে কোন আড়াল না পাওয়ার ফলে কোন প্রাণী এবং কোন উদ্ভিদও বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারে না। বরং পানিও উধাও হয়ে যাবে। রোদ ও ছায়ার মধ্যে যদি হঠাৎ করে পরিবর্তন হতে থাকে তাহলে পৃথিবীর সৃষ্টিকূল পরিবেশের এসব আকস্মিক পরিবর্তন বেশীক্ষণ বরদাশ্‌ত করতে পারবে না। কিন্তু একজন মহাজ্ঞানী স্রষ্টা ও সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন সত্তা পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে এমন একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন যার ফলে স্থায়ীভাবে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে ধীরে ধীরে ছায়া পড়ে ও হ্রাস-বৃদ্ধি হয় এবং রোদ ক্রমান্বয়ে বের হয়ে আসে এবং বাড়তে ও কমতে থাকে। এ ধরনের বিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা কোন অন্ধ প্রকৃতির হাতে আপনাআপনি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। অথবা বহুসংখ্যক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রভুও একে প্রতিষ্ঠিত করে এভাবে একটি ধারাবাহিক নিয়ম-শৃংখলা সহকারে চালিয়ে আসতে পারে না।

কিন্তু এসব বাহ্যিক শব্দের অভ্যন্তর থেকে আর একটি সূক্ষ্ম ইংগিতও পাওয়া যায়। সেটি হচ্ছে, বর্তমানে এই যে কুফরী ও শিরকের অজ্ঞতার ছায়া চতুরদিকে ছেয়ে আছে

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ﴿٤٧﴾
وَهُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ
مَآءً طَهُوْرًا ﴿٤٨﴾ لِّنُحْيِيَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا
وَّاَنَاسِيَّ كَثِيْرًا ﴿٤٩﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۖ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ
اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٥٠﴾

আর তিনিই রাতকে তোমাদের জন্য পোশাক,[৬০] ঘুমকে মৃত্যুর শান্তি এবং দিনকে জীবন্ত হয়ে ওঠার সময়ে পরিণত করেছেন।[৬১]

আর তিনিই নিজের রহমতের আগেভাগে বাতাসকে সুসংবাদদাতারূপে পাঠান। তারপর আকাশ থেকে বর্ষণ করেন বিশুদ্ধ পানি[৬২] একটি মৃত এলাকাকে তার মাধ্যমে জীবন দান করার এবং নিজের সৃষ্টির মধ্য থেকে বহুতর পশু ও মানুষকে তা পান করাবার জন্য।[৬৩] এ বিস্ময়কর কার্যকলাপ আমি বার বার তাদের সামনে আনি[৬৪] যাতে তারা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে কিন্তু অধিকাংশ লোক কুফরী ও অকৃতজ্ঞতা ছাড়া অন্য কোন মনোভাব পোষণ করতে অস্বীকার করে।[৬৫]

এটা কোন স্থায়ী জিনিস নয়। কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আকারে হেদায়াতের সূর্য উদিত হয়েছে। বাহ্যত ছায়া বিস্তার লাভ করেছে দূর দূরান্তে। কিন্তু এ সূর্য যতই উপরে উঠতে থাকবে ততই ছায়া সংকুচিত হতে থাকবে। তবে একটু সবরের প্রয়োজন। আল্লাহর আইন কখনো আকস্মিক পরিবর্তন আনে না। বস্তুজগতে যেমন সূর্য ধীরে ধীরে ওপরে ওঠে এবং ছায়া ধীরে ধীরে সংকুচিত হয় ঠিক তেমনি চিন্তা ও নৈতিকতার জগতেও হেদায়াতের সূর্যের উত্থান ও ভ্রষ্টতার ছায়ার পতন ধীরে ধীরেই হবে।

৬০. অর্থাৎ ঢাকবার ও লুকাবার জিনিস।

৬১. এ আয়াতের তিনটি দিক রয়েছে। একদিক থেকে এখানে তাওহীদের যুক্তি পেশ করা হচ্ছে। দ্বিতীয় দিক থেকে নিত্যদিনকার মানবিক অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে মৃত্যুর পরের জীবনের সম্ভাবনার যুক্তি পেশ করা হচ্ছে। তৃতীয় দিক থেকে সূক্ষ্মভাবে সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, জাহেলীয়াতের রাত শেষ হয়ে গেছে, এখন জ্ঞান, চেতনা ও হেদায়াতের উজ্জ্বল দিবালোকের স্ফূরণ ঘটেছে এবং শিগগির বা দেরীতে যেমনি করেই হোক নিদ্রিতরা জেগে উঠবেই। তবে যাদের জন্য রাতের ঘুম ছিল মৃত্যু ঘুম তারা আর জাগবে না এবং তাদের না জেগে ওঠা হবে তাদের নিজেদের জন্যই জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া, দিনের কাজ কারবার তাদের কারণে বন্ধ হয়ে যাবে না।

৬২. অর্থাৎ এমন পানি যা সব ধরনের পংকিলতা থেকেও মুক্ত হয় আবার কোন প্রকার বিষাক্ত পদার্থ ও জীবানুও তার মধ্যে থাকে না। যার সাহায্যে নাপাকি ধুয়ে সাফ করা যায় এবং মানুষ, পশু, পাখি, উদ্ভিদ সবাই জীবনী শক্তি লাভ করে।

৬৩. উপরের আয়াতটির মতো এ আয়াতটিরও তিনটি দিক রয়েছে। এর মধ্যে তাওহীদের যুক্তি রয়েছে, পরকালের যুক্তিও রয়েছে এবং এ সংগে এ সূক্ষ বিষয়বস্তুটিও এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, জাহেলীয়াতের যুগ ছিল মূলত খরা ও দুর্ভিক্ষের যুগ। সে যুগে মানবিকতার ভূমি অনুর্বর ও অনাবাদী থেকে গিয়েছিল। এখন আল্লাহ অনুগ্রহ করে নবুওয়াতের রহমতের মেঘমালা পাঠিয়েছেন। তা থেকে অহী জ্ঞানের নির্ভেজাল জীবনবারি বর্ষিত হচ্ছে। সবাই না হলেও আল্লাহর বহু বান্দা তার স্বচ্ছ ধারায় অবগাহন করতে পারবেই।

৬৪. মূল শব্দগুলো হচ্ছে وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ –এর তিনটি অর্থ হতে পারে। এক, বারিধারা বর্ষণের এ বিষয়বস্তুটি আমি কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বারবার বর্ণনা করে প্রকৃত সত্য বুঝাবার চেষ্টা করেছি। দুই, আমি বারবার গ্রীষ্ম ও খরা, মওসূমী বায়ু, মেঘ, বৃষ্টি এবং তা থেকে সৃষ্ট বিচিত্র জীবন–উপকরণসমূহ তাদের দেখাতে থেকেছি। তিন, আমি বৃষ্টিকে আবর্তিত করতে থাকি। অর্থাৎ সব সময় সব জায়গায় সমান বৃষ্টিপাত হয় না। বরং কখনো কোথাও চলে একদম খরা, কোথাও কম বৃষ্টিপাত হয়, কোথাও চাহিদা অনুযায়ী বৃষ্টিপাত হয়, কোথাও ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার আবির্ভাব হয় এবং এসব অবস্থায় বিভিন্ন বিচিত্র ফলাফল সামনে আসতে থাকে।

৬৫. যদি প্রথম দিক থেকে (অর্থাৎ তাওহীদের যুক্তির দৃষ্টিতে) দেখা যায়, তাহলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়ঃ লোকেরা যদি চোখ মেলে তাকায় তাহলে নিছক বৃষ্টির ব্যবস্থাপনারই মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর গুণাবলী এবং তাঁর একক রব্বুল আলামীন হবার প্রমাণ স্বরূপ এত বিপুল সখ্যক নিদর্শন দেখতে পাবে যে, একমাত্র সেটিই নবীর তাওহীদের শিক্ষা সত্য হবার পক্ষে তাদের নিশ্চিন্ত করতে পারে। কিন্তু আমি বারবার এ বিষয়বস্তুর প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও এবং দুনিয়ায় পানি বন্টনের এ কার্যকলাপ নিত্যনতুনভাবে একের পর এক তাদের সামনে আসতে থাকলেও এ জালেমরা কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না। তারা সত্য ও ন্যায়নীতিকে মেনে নেয় না। তাদের আমি বুদ্ধি ও চিন্তার যে নিয়ামত দান করেছি তার জন্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে না। এমন কি তারা নিজেরা যা কিছু বুঝতো না তা তাদের বুঝাবার জন্য কুরআনে বার বার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে–এ অনুগ্রহের জন্য শোকর গুজারীও করে না।

দ্বিতীয় দিক থেকে (অর্থাৎ আখেরাতের যুক্তির দৃষ্টিতে) দেখলে এর অর্থ দাঁড়ায় ঃ প্রতি বছর তাদের সামনে গ্রীষ্ম ও খরায় অসংখ্য সৃষ্টির মৃত্যুমুখে পতিত হবার এবং তারপর বর্ষার বদৌলতে মৃত উদ্ভিদ ও কীটপতংগের জীবিত হয়ে ওঠার নাটক অভিনীতি হতে থাকে। কিন্তু সবকিছু দেখেও এ নির্বোধের দল মৃত্যুপরের জীবনকে অসম্ভব বলে চলছে। বারবার সত্যের এ দ্ব্যর্থহীন নিদর্শনের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় কিন্তু কুফরী ও অস্বীকৃতির অচলায়তন কোনক্রমেই টলে না। তাদের বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তির যে অতুলনীয় নিয়ামত দান করা হয়েছে তার অস্বীকৃতির ধারা কোনক্রমে খতমই হয় না। শিক্ষা ও উপদেশ দানের যে অনুগ্রহ তাদের প্রতি করা হয়েছে তার প্রতি অকৃতজ্ঞ মনোভাব তাদের চিরকাল অব্যাহত রয়েছে।

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ
وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا
عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا
مَّحْجُورًا ﴿٥٣﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ
وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

যদি আমি চাইতাম তাহলে এক একটি জনবসতিতে এক একজন ভীতিপ্রদর্শনকারী পাঠাতে পারতাম।[৬৬] কাজেই হে নবী, কাফেরদের কথা কখনো মেনে নিয়ো না এবং এ কুরআন নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বৃহত্তম জিহাদ করো।[৬৭]

আর তিনিই দুই সাগরকে মিলিত করেছেন। একটি সুস্বাদু ও মিষ্ট এবং অন্যটি লোনা ও খার। আর দু'য়ের মাঝে একটি অন্তরাল রয়েছে, একটি বাধা তাদের একাকার হবার পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে রেখেছে।[৬৮]

আর তিনিই পানি থেকে একটি মানুষ তৈরি করেছেন, আবার তার থেকে বংশীয় ও শ্বশুরালয়ের দু'টি আলাদা ধারা চালিয়েছেন।[৬৯] তোমার রব বড়ই শক্তি সম্পন্ন।

যদি তৃতীয় দিকটি (অর্থাৎ খরার সাথে জাহেলীয়াতের এবং রহমতের বারিধারার সাথে অহী ও নবুওয়াতের তুলনাকে) সামনে রেখে দেখা হয় তাহলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় ঃ মানব জাতির ইতিহাসে এ দৃশ্য বার বার সামনে এসেছে যে, যখনই এ দুনিয়া নবী ও আল্লাহর কিতাবের কল্যাণসুধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে তখনই মানবতা বন্ধ্যা হয়ে গেছে এবং চিন্তা ও নৈতিকতার ভূমিতে কাঁটাগুল্ম ছাড়া আর কিছুই উৎপন্ন হয়নি। আর যখনই অহী ও রিসালাতের জীবন বারি এ পৃথিবীতে পৌঁছে গেছে তখনই মানবতার উদ্যান ফলেফুলে সুশোভিত হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান মূর্খতা ও জাহেলীয়াতের স্থান দখল করেছে। জুলুম-নিপীড়ণের জায়গায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফাসেকী ও অশ্লীলতার জায়গায় নৈতিক ও চারিত্রিক মাহাত্মের ফুল ফুটেছে। যেদিকে তার দান যতটুকু পৌঁছেছে সেদিকেই অসদাচার কমে গেছে এবং সদাচার বেড়ে গেছে। নবীদের আগমন সবসময় একটি শুভ ও কল্যাণকর চিন্তা ও নৈতিক বিপ্লবের সূচনা করেছে। কখনো এর ফল খারাপ হয়নি। আর নবীদের বিধান ও নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করে বা তা থেকে বঞ্চিত হয়ে মানব জাতি সব সময় ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছে। কখনো এর ফল ভালো হয়নি। ইতিহাস এ দৃশ্য বারবার দেখিয়েছে এবং কুরআনও বার বার এদিকে ইশারা করেছে। কিন্তু এরপরও

লোকেরা শিক্ষা নেয় না। এটি একটি অমোঘ সত্য। হাজার বছরের মানবিক অভিজ্ঞতার ছাপ এর গায়ে লেগে আছে। কিন্তু একে অস্বীকার করা হচ্ছে। আর আজ নবী ও কিতাবের নিয়ামত দান করে আল্লাহ যে জনপদকে ধন্য করেছেন সে এর শোকর গুজারী করার পরিবর্তে উলটো অকৃতজ্ঞ মনোভাব প্রকাশের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৬৬. অর্থাৎ এমনটি করা আমার ক্ষমতার বাইরে ছিল না। চাইলে আমি বিভিন্ন স্থানে নবীর আবির্ভাব ঘটাতে পারতাম। কিন্তু তা আমি করিনি। বরং সারা দুনিয়ার জন্য মাত্র একজন নবী পাঠিয়েছি। একটি সূর্য যেমন সারা দুনিয়ার জন্য যথেষ্ট ঠিক তেমনি সঠিক পথ প্রদর্শনের এ একমাত্র সূর্যই সারা দুনিয়াবাসীর জন্য যথেষ্ট।

৬৭. বৃহত্তম জিহাদের তিনটি অর্থ। এক, চূড়ান্ত প্রচেষ্টা, অর্থাৎ চেষ্টা ও প্রাণপাত করার ব্যাপারে মানুষের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া। দুই, বড় আকারের প্রচেষ্টা। অর্থাৎ নিজের সমস্ত উপায়-উপকরণ তার মধ্যে নিয়োজিত করা। তিন, ব্যাপক প্রচেষ্টা। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রচেষ্টার কোন দিক এবং মোকাবিলার কোন ময়দান ছেড়ে না দেয়া। প্রতিপক্ষের শক্তি যেসব ময়দানে কাজ করছে সেসব ময়দানে নিজের শক্তি নিয়োজিত করা এবং সত্যের শির উঁচু করার জন্য যেসব দিক থেকে কাজ করার প্রয়োজন হয় সেসব দিক থেকে কাজ করা। কণ্ঠ ও কলমের জিহাদ, ধন ও প্রাণের জিহাদ এবং বন্দুক ও কামানের যুদ্ধ সবই এর অন্তরভুক্ত।

৬৮. যেখানে কোন বড় নদী এসে সাগরে পড়ে এমন প্রত্যেক জায়গায় এ অবস্থা হয়। এছাড়া সমুদ্রের মধ্যেও বিভিন্ন জায়গায় মিঠা পানির স্রোত পাওয়া যায়। সমুদ্রের ভীষণ লবণাক্ত পানির মধ্যেও সে তার মিষ্টতা পুরোপুরি বজায় রাখে। তুর্কী নৌসেনাপতি সাইয়েদী আলী রইস তাঁর ষোড়শ শতকে লেখিত "মিরআতুল মামালিক" গ্রন্থে পারস্য উপসাগরে এমনিধারার একটি স্থান চিহ্নিত করেছেন। তিনি লিখেছেন, সেখানে লবণাক্ত পানির নিচে রয়েছে মিঠা পানির স্রোত। আমি নিজে আমাদের নৌসেনাদের জন্য সেখান থেকে পানি সংগ্রহ করেছি। বর্তমান যুগে আমেরিকান কোম্পানী যখন সউদী আরবে তেল উত্তোলনের কাজ শুরু করে তখন তারাও শুরুতে পারস্য উপসাগরের এসব স্রোত থেকে পানি সংগ্রহ করতে থাকে। পরে দাহরানের কাছে পানির কূয়া খনন করা হয় এবং তা থেকে পানি উঠানো হতে থাকে। বাহরাইনের কাছেও সমুদ্রের তলায় মিঠা পানির স্রোত রয়েছে। সেখান থেকে লোকেরা কিছুদিন আগেও মিঠা পানি সংগ্রহ করতে থেকেছে।

এ হচ্ছে আয়াতের বাহ্যিক বিষয়বস্তু। আল্লাহর শক্তিমত্তার একটি প্রকাশ থেকে এটি তাঁর একক ইলাহ ও একক রব হবার প্রমাণ পেশ করে। কিন্তু এর শব্দাবলীর অভ্যন্তর থেকে একটি সূক্ষ্ম ইশারা অন্য একটি বিষয়বস্তুর সন্ধান দেয়। সেটি হচ্ছে, মানব সমাজের সমুদ্র যতই লোনা ও খার হয়ে থাক না কেন আল্লাহ যখনই চান তার তলদেশ থেকে একটি সৎকর্মশীল দলের মিঠা স্রোত বের করে আনতে পারেন এবং সমুদ্রের লোনা পানির তরংগগুলো যতই শক্তি প্রয়োগ করুক না কেন তারা এই স্রোত গ্রাস করতে সক্ষম হবে না।

৬৯. অর্থাৎ নগণ্য এক ফোঁটা পানি থেকে মানুষের মতো এমনি ধরনের একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি তৈরি করাটা তো সামান্য কৃতিত্বের ব্যাপার ছিল না কিন্তু তার উপর আরো

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾

এক আল্লাহকে বাদ দিয়ে লোকেরা এমন সব সত্তার পূজা করছে যারা না তাদের উপকার করতে পারে, না অপকার। আবার অতিরিক্ত হচ্ছে এই যে, কাফের নিজের রবের মোকাবিলায় প্রত্যেক বিদ্রোহীর সাহায্যকারী হয়ে আছে।[৭০]

কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, তিনি মানুষের একটি নয় বরং দু'টি আলাদা আলাদা নমুনা (নর ও নারী) তৈরি করেছেন। তারা মানবিক গুণাবলীর দিক দিয়ে একই পর্যায়ভুক্ত হলেও দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্টের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিভিন্নতা অনেক বেশী। কিন্তু এ বিভিন্নতার কারণে তারা পরস্পর বিরোধী ও বিপরীতমুখী নয় বরং পরস্পরের পুরোপুরি জোড়ায় পরিণত হয়েছে। তারপর এ জোড়াগুলো মিলিয়ে তিনি অদ্ভুত ভারসাম্য সহকারে (যার মধ্যে অন্যের কৌশল ও ব্যবস্থাপনার সামান্যতম দখলও নেই) দুনিয়ায় পুরুষও সৃষ্টি করছেন আবার নারীও। তাদের থেকে একদিকে পুত্র ও নাতিদের একটি ধারা চলছে। তারা অন্যের ঘর থেকে বিয়ে করে স্ত্রী নিয়ে আসছে। আবার অন্যদিকে কন্যা ও নাতনীদের একটি ধারা চলছে। তারা স্ত্রী হয়ে অন্যের ঘরে চলে যাচ্ছে। এভাবে এক পরিবারের সাথে অন্য পরিবার মিশে সারা দেশ এক বংশ ও এক সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত হয়ে যাচ্ছে।

এখানেও এ বিষয়বস্তুর দিকে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত আছে যে, এ সমগ্র জীবন ক্ষেত্রে যে কর্মকৌশলটি সক্রিয় রয়েছে তার কর্মধারাই কিছুটা এমনি ধরনের যার ফলে এখানে বিভিন্নতা ও বিরোধ এবং তারপর বিভিন্ন বিরোধীয় পক্ষের জোড়া থেকেই যাবতীয় ফলাফলের উদ্ভব ঘটে। কাজেই তোমরা যে বিভিন্নতা ও বিরোধের মুখোমুখি হয়েছো তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। এটিও একটি ফলদায়ক জিনিস।

৭০. আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত ও তাঁর আইন বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দুনিয়ার যেখানে যা কিছু প্রচেষ্টা চলছে কাফেরের সমবেদনা তার প্রতি হবে না বরং তার সমবেদনা হবে এমন সব লোকদের প্রতি যারা সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। অনুরূপভাবে কাফেরের সমস্ত আগ্রহ আল্লাহর হুকুম মেনে চলার ও তাঁর আনুগত্য করার সাথে সম্পৃক্ত হবে না বরং তাঁর হুকুম অমান্য করার সাথে সম্পৃক্ত হবে। আল্লাহর হুকুম অমান্য করার কাজ যে যেখানেই করবে কাফের যদি কার্যত তার সাথে শরীক না হতে পারে তাহলে অন্ততপক্ষে জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়েই দেবে। এভাবে সে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের বুকে সাহস যোগাবে। অপরদিকে, যদি কেউ আল্লাহর হুকুম পালন করতে থাকে তাহলে কাফের তাকে বাধা দেবার ব্যাপারে একটুও ইতস্তত করবে না। নিজে বাধা দিতে না পারলে তাকে হিম্মতহারা করার জন্য যাকিছু সে করতে পারে তা করে ফেলবে। এমনকি যদি তার শুধুমাত্র নাক সিটকাবার ক্ষমতা বা সুযোগ থাকে তাহলে তাও করবে। আল্লাহর হুকুম অমান্য করার প্রতিটি খবর তার জন্য হবে হৃদয়

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٥٦﴾ قُلْ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٥٧﴾

হে মুহাম্মাদ! তোমাকে তো আমি শুধুমাত্র একজন সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী করে পাঠিয়েছি।[৭১] এদের বলে দাও, "এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান চাই না, যে চায় সে তার নিজের রবের পথ অবলম্বন করুক, এটিই আমার প্রতিদান।"[৭১(ক)]

জুড়ানো সুখবর। অন্যদিকে আল্লাহর হুকুম মেনে চলার প্রতিটি খবর যেন তার কলিজায় তীরের মতো বিঁধবে।

৭১. অর্থাৎ কোন ঈমানদারকে পুরস্কার এবং কোন অস্বীকারকারীকে শাস্তি দেয়া তোমার কাজ নয়। কাউকে জোর করে ঈমানের দিকে টেনে আনা এবং কাউকে জবরদস্তি অস্বীকার করা থেকে দূরে রাখার কাজেও তুমি নিযুক্ত হওনি। যে ব্যক্তি সত্য-সঠিক পথ গ্রহণ করবে তাকে শুভ পরিণামের সুসংবাদ দেবে এবং যে ব্যক্তি নিজের কু পথে অবিচল থাকবে তাকে আল্লাহর পাকড়াও ও শাস্তির ভয় দেখাবে, তোমার দায়িত্ব এতটুকুই, এর বেশী নয়।

কুরআন মজীদের যেখানেই এ ধরনের উক্তি এসেছে সেখানেই তার বক্তব্যের মূল লক্ষ হচ্ছে কাফের সমাজ। সেখানে এ কথা বলাই তাদের উদ্দেশ্য যে, নবী হচ্ছেন একজন নিস্বার্থ সংস্কারক, যিনি আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণার্থে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়ে থাকেন এবং তাদের শুভ ও অশুভ পরিণাম সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন। তিনি জোরপূর্বক তোমাদের এ পয়গাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেন না। এভাবে বাধ্য করলে তোমরা অনর্থক বিক্ষুব্ধ হয়ে সংঘাত সংঘর্ষে লিপ্ত হতে। তোমরা যদি মেনে নাও তা হলে এতে তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণ হবে, তাঁর দু' পয়সা লাভ হবে না। আর যদি না মানো তাহলে নিজেদেরই ক্ষতি হবে, তাঁর কোন ক্ষতি হবে না। পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েই তাঁর দায়িত্ব শেষ, এখন আমার সাথে তোমাদের ব্যাপার জড়িত হয়ে পড়েছে।—একথা না বুঝার কারণে অনেক সময় লোকেরা এ বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়ে যে, মুসলমানদের ব্যাপারেও বুঝি নবীর কাজ শুধুমাত্র আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া এবং শুভ পরিণামের সুসংবাদ শুনিয়ে দিয়েই শেষ। অথচ কুরআন বিভিন্ন স্থানে বার বার সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছে যে, মুসলমানদের জন্য নবী কেবল সুসংবাদদাতাই নন বরং শিক্ষক, পরিশুদ্ধকারী এবং কর্মের আদর্শও। মুসলমানদের জন্য তিনি শাসক, বিচারক এবং এমন আমীরও যার আনুগত্য করতে হবে। তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে আসা প্রতিটি ফরমান তাদের জন্য আইনের মর্যাদা রাখে। সর্বান্তকরণে তাদের এ আইন মেনে চলতে হবে। কাজেই যারা وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ও مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ এবং এ ধরনের বিষয়বস্তু সম্বলিত অন্যান্য আয়াতকে নবী ও মু'মিনদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেন তারা বিরাট ভুল করে যাচ্ছেন।

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ
بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۛ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ
خَبِيرًا ﴿٥٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ
أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿٦٠﴾

হে মুহাম্মাদ! ভরসা করো এমন আল্লাহর প্রতি যিনি জীবিত এবং কখনো মরবেন না। তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করো। নিজের বান্দাদের গোনাহের ব্যাপারে কেবল তাঁরই জানা যথেষ্ট। তিনিই ছয়দিনে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের মাঝখানে যা কিছু আছে সব তৈরি করে রেখে দিয়েছেন, তারপর তিনিই (বিশ্ব-জাহানের সিংহাসন) আরশে সমাসীন হয়েছেন,[৭২] তিনিই রহমান, যে জানে তাকে জিজ্ঞেস করো তাঁর অবস্থা সম্পর্কে।

তাদেরকে যখন বলা হয়, এই রহমানকে সিজদা করো তখন তারা বলে, "রহমান কি? তুমি যার কথা বলবে তাকেই কি আমরা সিজদা করতে থাকবো"?[৭৩] এ উপদেশটি উল্টো তাদের ঘৃণা আরো বাড়িয়ে দেয়।[৭৪]

৭১(ক). ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মু'মিনূন ৭০ টীকা।

৭২. মহান আল্লাহর আরশের ওপর সমাসীন হবার বিষয়টির ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আরাফ ৪১-৪২, ইউনূস ৪ এবং হূদ ৭ টীকা।

পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী ছ'দিনে তৈরি করার বিষয়টি মুতাশাবিহাতের অন্তরভুক্ত। এর অর্থ নির্ধারণ করা কঠিন। হতে পারে একদিন অর্থ একটি যুগ, আবার এও হতে পারে, দুনিয়ায় আমরা একদিন বলতে যে সময়টুকু বুঝি একদিন অর্থ সেই পরিমাণ সময়। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা হা-মীম-আস্ সাজ্‌দাহ ১১-১৫ টীকা)।

৭৩. একথা তারা বলতো আসলে নিছক কাফের সুলভ ঔদ্ধত্য ও গোয়ার্তুমির বশে। যেমন ফেরাউন হযরত মূসাকে বলেছিল وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ "রব্বুল আলামীন আবার কি?" অথচ মক্কার কাফেররা রহমান তথা দয়াময় আল্লাহ সম্পর্কে বেখবর ছিল না এবং ফেরাউনও রব্বুল আলামীন সম্পর্কে অনবহিত ছিল না। কোন কোন মুফাস্‌সির এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, আরবদের মধ্যে আল্লাহর "রহমান" নামটি বেশী প্রচলিত ছিল না, তাই তারা এ আপত্তি করেছে। কিন্তু আয়াতের প্রকাশ ভংগী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, না

تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ﴿٦١﴾
وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ
شُكُوْرًا ﴿٦٢﴾ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا
خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٣﴾ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا
وَّقِيَامًا ﴿٦٤﴾

৬ রুকূ'

অসীম বরকত সম্পন্ন তিনি যিনি আকাশে বুরুজ নির্মাণ করেছেন[৭৫] এবং তার মধ্যে একটি প্রদীপ[৭৬] ও একটি আলোকময় চাঁদ উজ্জ্বল করেছেন। তিনিই রাত ও দিনকে পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে শিক্ষা গ্রহণ করতে অথবা কৃতজ্ঞ হতে চায়।[৭৭]

রহমানের (আসল) বান্দা তারাই[৭৮] যারা পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে চলাফেরা করে[৭৯] এবং মূর্খরা তাদের সাথে কথা বলতে থাকলে বলে দেয়, তোমাদের সালাম।[৮০] তারা নিজেদের রবের সামনে সিজদায় অবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে রাত কাটিয়ে দেয়।[৮১]

জানার কারণে এ আপত্তি করা হয়নি বরং করা হয়েছিল জাহেলীয়াতের প্রাবল্যের কারণে। নয়তো এজন্য পাকড়াও করার পরিবর্তে আল্লাহ নরমভাবে তাদের বুঝিয়ে দিতেন যে, এটাও আমারই একটি নাম, এতে অবাক হবার কিছু নেই। তা ছাড়া একথা ঐতিহাসিকভাবেও প্রমাণিত যে, আরবে প্রাচীনকাল থেকে রহমান শব্দটি আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং এটা বহুল প্রচলিত ও পরিচিত শব্দ ছিল। দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আস সাজদাহ–৫ ও সাবা ৩৫ টীকা।

৭৪. এখানে তেলাওয়াতের সিজদা করার ব্যাপারে সকল আলেম একমত। প্রত্যেক কুরআন পাঠক ও শ্রোতার এ জায়গায় সিজদা করা উচিত। তাছাড়া যখনই কেউ এ আয়াতটি শুনবে জবাবে বলবে, زَادَنَا اللّٰهُ خُضُوْعًا مَا زَادَ لِلْاَعْدَاءِ نُفُوْرًا "আল্লাহ করুন, ইসলামের দুশমনদের ঘৃণা যত বাড়ে আমাদের আনুগত্য ও বিনয় যেন ততই বাড়ে।" এটি একটি সুন্নাত।

৭৫. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হিজর ৮–১২ টীকা।

৭৬. অর্থাৎ সূর্য। যেমন সূরা নূহে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (আর সূর্যকে প্রদীপ বানিয়েছেন) [১৬ আয়াত]

৭৭. এ দু'টি ভিন্ন ধরনের মর্যাদা কিন্তু স্বভাবের দিক দিয়ে এরা পরস্পরের জন্য অপরিহার্য। দিন–রাত্রির আবর্তন ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করার ফলে মানুষ প্রথমে এ থেকে তাওহীদের শিক্ষা লাভ করে এবং আল্লাহ থেকে গাফেল হয়ে গিয়ে থাকলে সংগে সংগেই সজাগ হয়ে যায়। এর দ্বিতীয় ফল হয়, আল্লাহর রবুবীয়াতের অনুভূতি জাগ্রত হয়ে মানুষ আল্লাহর সমীপে মাথা নত করে এবং কৃতজ্ঞতার প্রতিমূর্তিতে পরিণত হয়।

৭৮. অর্থাৎ যে রহমানকে সিজদা করার জন্য তোমাদের বলা হচ্ছে এবং তোমরা তা অস্বীকার করছো, সবাই তো তাঁর জন্মগত বান্দা কিন্তু সচেতনতা সহকারে বন্দেগীর পথ অবলম্বন করে যারা এসব বিশেষ গুণাবলী নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করে তারাই তাঁর প্রিয় ও পছন্দনীয় বান্দা। তাছাড়া তোমাদের যে সিজদা করার দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তার ফলাফল তাঁর বন্দেগীর পথ অবলম্বনকারীদের জীবনে দেখা যাচ্ছে এবং তা অস্বীকার করার ফলাফল তোমাদের নিজেদের জীবন থেকে পরিস্ফুট হচ্ছে। এখানে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্র নৈতিকতার দু'টি আদর্শের তুলনা করা। একটি আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছিল এবং দ্বিতীয় আদর্শটি জাহেলীয়াতের অনুসারী লোকদের মধ্যে সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু এ তুলনামূলক আলোচনার জন্য শুধুমাত্র প্রথম আদর্শ চরিত্রের সুস্পষ্ট বৈশিষ্টগুলো সামনে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় আদর্শকে প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ও চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে, যাতে সে নিজেই প্রতিপক্ষের ছবি দেখে নেয় এবং নিজেই উভয়ের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে। তার চিত্র পৃথকভাবে পেশ করার প্রয়োজন ছিল না। কারণ চারপাশের সকল সমাজে তার সোচ্চার উপস্থিতি ছিল।

৭৯. অর্থাৎ অহংকারের সাথে বুক ফুলিয়ে চলে না। গর্বিত স্বৈরাচারী ও বিপর্যয়কারীর মতো নিজের চলার মাধ্যমে নিজের শক্তি প্রকাশ করার চেষ্টা করে না। বরং তাদের চালচলন হয় একজন ভদ্র, মার্জিত ও সৎস্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তির মতো। নম্রভাবে চলার মানে দুর্বল ও রুগীর মতো চলা নয় এবং একজন প্রদর্শন অভিলাষী নিজের বিনয় প্রদর্শন করার বা নিজের আল্লাহ ভীতি দেখাবার জন্য যে ধরনের কৃত্রিম চলার ভংগী সৃষ্টি করে সে ধরনের কোন চলাও নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে চলার সময় এমন শক্তভাবে পা ফেলতেন যেন মনে হতো ওপর থেকে ঢালুর দিকে নেমে যাচ্ছেন। হযরত উমরের ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি এক যুবককে দুর্বলভাবে হেঁটে যেতে দেখে তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি অসুস্থ? সে বলে, না। তিনি ছড়ি উঠিয়ে তাকে ধমক দিয়ে বলেন, শক্ত হয়ে সবল ব্যক্তির মতো চলো। এ থেকে জানা যায়, নম্রভাবে চলা মানে, একজন ভালো মানুষের স্বাভাবিকভাবে চলা। কৃত্রিম বিনয়ের সাহায্যে যে চলার ভংগী সৃষ্টি করা হয় অথবা যে চলার মধ্য দিয়ে বানোয়াট দীনতা ও দুর্বলতার প্রকাশ ঘটানো হয় তাকে নম্রভাবে চলা বলে না।

কিন্তু চিন্তার বিষয় হচ্ছে, মানুষের চলার মধ্যে এমন কি গুরুত্ব আছে যে কারণে আল্লাহর সৎ বান্দাদের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ প্রসংগে সর্বপ্রথম এর কথা বলা হয়েছে? এ প্রশ্নটিকে যদি একটু গভীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে বুঝা যায় যে, মানুষের চলা শুধুমাত্র তার হাঁটার একটি ভংগীর নাম নয় বরং আসলে এটি হয় তার মন–মানস, চরিত্র ও নৈতিক কার্যাবলীর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন। একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির চলা,

একজন গুণ্ডা ও বদমায়েশের চলা, একজন স্বৈরাচারী ও জালেমের চলা, একজন আত্মম্ভরী অহংকারীর চলা, একজন সভ্য-ভব্য ব্যক্তির চলা, একজন দরিদ্র-দীনহীনের চলা এবং এভাবে অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের লোকদের চলা পরস্পর থেকে এত বেশী বিভিন্ন হয় যে, তাদের প্রত্যেককে দেখে কোন্ ধরনের চলার পেছনে কোন্ ধরনের ব্যক্তিত্ব কাজ করছে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। কাজেই আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে, রহমানের বান্দাদের তোমরা সাধারণ লোকদের মধ্যে চলাফেরা করতে দেখেই তারা কোন্ ধরনের লোক পূর্ব পরিচিতি ছাড়াই আলাদাভাবে তা চিহ্নিত করতে পারবে। এ বন্দেগী তাদের মানসিকতা ও চরিত্র যেভাবে তৈরী করে দিয়েছে তার প্রভাব তাদের চালচলনেও সুস্পষ্ট হয়। এক ব্যক্তি তাদের দেখে প্রথম দৃষ্টিতেই জানতে পারে, তারা ভদ্র, ধৈর্যশীল ও সহানুভূতিশীল হৃদয়বৃত্তির অধিকারী, তাদের দিক থেকে কোন প্রকার অনিষ্টের আশংকা করা যেতে পারে না। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল ৪৩, সূরা লোকমান ৩৩ টীকা)

৮০. মূর্খ মানে অশিক্ষিত বা লেখাপড়া নাজানা লোক নয় বরং এমন লোক যারা জাহেলী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবার উদ্যোগ নিয়েছে এবং কোন ভদ্রলোকের সাথে অশালীন ব্যবহার করতে শুরু করেছে। রহমানের বান্দাদের পদ্ধতি হচ্ছে, তারা গালির জবাবে গালি এবং দোষারোপের জবাবে দোষারোপ করে না। এভাবে প্রত্যেক বেহুদাপনার জবাবে তারাও সমানে বেহুদাপনা করে না। বরং যারাই তাদের সাথে এহেন আচরণ করে তাদের সালাম দিয়ে তারা অগ্রসর হয়ে যায়, যেমন কুরআনের অন্য জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجَاهِلِيْنَ - (القصص : ٥٥)

"আর যখন তারা কোন বেহুদা কথা শোনে, তা উপেক্ষা করে যায়। বলে, আরে ভাই, আমাদের কাজের ফল আমরা পাবো এবং তোমাদের কাজের ফল তোমরা পাবে। সালাম তোমাদের, আমরা জাহেলদের সাথে কথা বলি না।" (আল কাসাস ঃ ৫৫) [ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল কাসাস ৭২ ও ৭৮ টীকা]

৮১. অর্থাৎ ওটা ছিল তাদের দিনের জীবন এবং এটা হচ্ছে রাতের জীবন। তাদের রাত আরাম আয়েশে, নাচগানে, খেলা-তামাশায়, গপ-সপে এবং আড্ডাবাজী ও চুরি-চামারিতে অতিবাহিত হয় না। জাহেলীয়াতের এসব পরিচিত বদ কাজগুলোর পরিবর্তে তারা এ সমাজে এমন সব সৎকর্ম সম্পাদনকারী যাদের রাত কেটে যায় আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে দোয়া ও ইবাদাত করার মধ্য দিয়ে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে তাদের জীবনের এ দিকগুলো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন সূরা সাজদায় বলা হয়েছে ঃ

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا -

"তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা থাকে, নিজেদের রবকে ডাকতে থাকে আশায় ও আশংকায়।" (১৬ আয়াত)

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ
غَرَامًا ۝ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۝ وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ
يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ۝ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ
مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا ۝

তারা দোয়া করতে থাকে ঃ " হে আমাদের রব! জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও, তার আযাব তো সর্বনাশা। আশ্রয়স্থল ও আবাস হিসেবে তা বড়ই নিকৃষ্ট জায়গা।"[৮২] তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না বরং উভয় প্রান্তিকের মাঝামাঝি তাদের ব্যয় ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।[৮৩] তারা আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্যকে ডাকে না, আল্লাহ যে প্রাণকে হারাম করেছেন কোন সংগত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না।[৮৪]—এসব যে-ই করে সে তার গোনাহের শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তাকে উপর্যুপরি শাস্তি দেয়া হবে[৮৫] এবং সেখানেই সে পড়ে থাকবে চিরকাল লাঞ্ছিত অবস্থায়।

সূরা যারিয়াতে বলা হয়েছে ঃ

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ○ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ○

"এ সকল জান্নাতবাসী ছিল এমন সব লোক যারা রাতে সামান্যই ঘুমাতো এবং ভোর রাতে মাগফিরাতের দোয়া করতো।" (১৭-১৮ আয়াত)

সূরা যুমারে বলা হয়েছে ঃ

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا يَّحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ
رَبِّهٖ -

"যে ব্যক্তি হয় আল্লাহর হুকুম পালনকারী, রাতের বেলা সিজদা করে ও দাঁড়িয়ে থাকে, আখেরাতকে ভয় করে এবং নিজের রবের রহমতের প্রত্যাশা করে তার পরিণাম কি মুশরিকের মতো হতে পারে?" (৯ আয়াত)

৮২. অর্থাৎ এ ইবাদাত তাদের মধ্যে কোন অহংকারের জন্ম দেয় না। আমরা তো আল্লাহর প্রিয়, কাজেই আগুন আমাদের কেমন করে স্পর্শ করতে পারে, এ ধরনের আত্মগর্বও তাদের মনে সৃষ্টি হয় না। বরং নিজেদের সমস্ত সৎকাজ ও ইবাদাত-বন্দেগী সত্ত্বেও তারা এ ভয়ে কাঁপতে থাকে যে, তাদের কাজের ভুল-ত্রুটিগুলো বুঝি তাদের আযাবের সম্মুখীন করলো। নিজেদের তাকওয়ার জোরে জান্নাত জয় করে নেবার অহংকার তারা করে না। বরং নিজেদের মানবিক দুর্বলতাগুলো মনে করে এবং এজন্যও নিজেদের কার্যাবলীর ওপর নয় বরং আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের ওপর থাকে তাদের ভরসা।

৮৩. অর্থাৎ তাদের অবস্থা এমন নয় যে, আরাম-আয়েশ, বিলাসব্যসন, মদ-জুয়া, ইয়ার-বন্ধু, মেলা-পার্বন ও বিয়েশাদীর পেছনে অঢেল পয়সা খরচ করছে এবং নিজের সামর্থের চেয়ে অনেক বেশী করে নিজেকে দেখাবার জন্য খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাড়ি-গাড়ি, সাজগোজ ইত্যাদির পেছনে নিজের টাকা-পয়সা ছড়িয়ে চলছে। আবার তারা একজন অর্থলোভীর মতো নয় যে, এক একটা পয়সা গুণে গুণে রাখে। এমন অবস্থাও তাদের নয় যে, নিজেও খায় না, নিজের সামর্থ অনুযায়ী নিজের ছেলেমেয়ে ও পরিবারের লোকজনদের প্রয়োজনও পূর্ণ করে না এবং প্রাণ খুলে কোন ভালো কাজে কিছু ব্যয়ও করে না। আরবে এ দু'ধরনের লোক বিপুল সংখ্যায় পাওয়া যেতো। একদিকে ছিল একদল লোক যারা প্রাণ খুলে খরচ করতো। কিন্তু প্রত্যেকটি খরচের উদ্দেশ্য হতো ব্যক্তিগত বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশ অথবা গোষ্ঠীর মধ্যে নিজেকে উঁচু মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং নিজের দানশীলতা ও ধনাঢ্যতার ডংকা বাজানো। অন্যদিকে ছিল সর্বজন পরিচিত কৃপণের দল। ভারসাম্যপূর্ণ নীতি খুব কম লোকের মধ্যে পাওয়া যেতো। আর এই কম লোকদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ।

এ প্রসংগে অমিতব্যয়িতা ও কার্পণ্য কি জিনিস তা জানা উচিত। ইসলামের দৃষ্টিতে তিনটি জিনিসকে অমিতব্যয়িতা বলা হয়। এক, অবৈধ কাজে অর্থ ব্যয় করা, তা একটি পয়সা হলেও। দুই, বৈধ কাজে ব্যয় করতে গিয়ে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। এ ক্ষেত্রে সে নিজের সামর্থের চাইতে বেশী ব্যয় করে অথবা নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী যে অর্থসম্পদ সে লাভ করেছে তা নিজেরই বিলাসব্যসনে ও বাহ্যিক আড়ম্বর অনুষ্ঠানে ব্যয় করতে পারে। তিন, সৎকাজে ব্যয় করা। কিন্তু আল্লাহর জন্য নয় বরং অন্য মানুষকে দেখাবার জন্য। পক্ষান্তরে কার্পণ্য বলে বিবেচিত হয় দু'টি জিনিস। এক, মানুষ নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনদের প্রয়োজন পূরণের জন্য নিজের সামর্থ ও মর্যাদা অনুযায়ী ব্যয় করে না। দুই, ভালো ও সৎকাজে তার পকেট থেকে পয়সা বের হয় না। এ দু'টি প্রান্তিকতার মাঝে ইসলামই হচ্ছে ভারসাম্যের পথ। এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

من فقه الرجل قصده فى معيشته

"নিজের অর্থনৈতিক বিষয়াদিতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা মানুষের ফকীহ (জ্ঞানবান) হবার অন্যতম আলামত।" (আহমদ ও তাবারানী, বর্ণনাকারী আবুদ্ দার্‌দা)

৮৪. অর্থাৎ আরববাসীরা যে তিনটি বড় গোনাহের সাথে বেশী করে জড়িত থাকে সেগুলো থেকে তারা দূরে থাকে। একটি হলো শিরক, দ্বিতীয়টি অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং তৃতীয়টি যিনা। এ বিষয়বস্তুটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিপুল সংখ্যক হাদীসে বর্ণনা করেছেন। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীস। তাতে বলা হয়েছে ঃ একবার নবীকে (সা) জিজ্ঞেস করা হলো, সবচেয়ে বড় গোনাহ কি? তিনি বললেন ঃ ان تجعل لله ندا وهو خلقك "তুমি যদি কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করাও। অথচ আল্লাহই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর? বললেন ঃ ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك "তুমি যদি তোমার সন্তানকে হত্যা কর এই ভয়ে যে সে তোমার সাথে আহারে অংশ নেবে।" জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর? বললেন ঃ ان تزنى حليلة جارك "তুমি যদি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা কর।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আহমদ) যদিও আরো অনেক কবীরা গোনাহ আছে কিন্তু সেকালের আরব সমাজে এ তিনটি গোনাহই সবচেয়ে বেশী জেঁকে বসেছিল। তাই এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের এ বৈশিষ্ট সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছিল যে, সমগ্র আরব সমাজে মাত্র এ গুটিকয় লোকই এ পাপগুলো থেকে মুক্ত আছে।

এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে, মুশরিকদের দৃষ্টিতে তো শিরক থেকে দূরে থাকা ছিল একটি মস্ত বড় দোষ, এক্ষেত্রে একে মুসলমানদের একটি প্রধান গুণ হিসেবে তাদের সামনে তুলে ধরার যৌক্তিকতা কি ছিল? এর জবাব হচ্ছে আরববাসীরা যদিও শিরকে লিপ্ত ছিল এবং এ ব্যাপারে তারা অত্যন্ত বিদ্বিষ্ট মনোভাবের অধিকারী ছিল কিন্তু আসলে এর শিকড় উপরিভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল, গভীর তলদেশে পৌঁছেনি। দুনিয়ার কোথাও কখনো শিরকের শিকড় মানব প্রকৃতির গভীরে প্রবিষ্ট থাকে না। বরঞ্চ নির্ভেজাল আল্লাহ বিশ্বাসের মহত্ব তাদের মনের গভীরে শিকড় গেড়ে বসেছিল। তাকে উদ্দীপিত করার জন্য শুধুমাত্র উপরিভাগে একটুখানি আঁচড় কাটার প্রয়োজন ছিল। জাহেলিয়াতের ইতিহাসের বহুতর ঘটনাবলী এ দু'টি কথার সাক্ষ দিয়ে থাকে। যেমন আবরাহার হামলার সময় কুরাইশদের প্রত্যেকটি শিশুও জানতো যে, কাবাগৃহে রক্ষিত মূর্তিগুলো এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না বরং একমাত্র এ গৃহের মালিক আল্লাহই এ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন। হাতি সেনাদের ধ্বংসের পর সমকালীন কবিরা যে সব কবিতা ও কাসীদা পাঠ করেছিলেন এখনো সেগুলো সংরক্ষিত আছে। সেগুলোর প্রতিটি শব্দ সাক্ষ দিচ্ছে, তারা এ ঘটনাকে নিছক মহান আল্লাহর শক্তির প্রকাশ মনে করতো এবং এতে তাদের উপাস্যদের কোন কৃতিত্ব আছে বলে ভুলেও মনে করতো না। এ সময় কুরাইশ ও আরবের সমগ্র মুশরিক সমাজের সামনে শিরকের নিকৃষ্টতম পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শিত হয়েছিল। আবরাহা মক্কা যাওয়ার পথে তায়েফের কাছাকাছি পৌঁছে গেলে তায়েফবাসীরা আবরাহা কর্তৃক তাদের "লাত" দেবতার মন্দির বিধ্বস্ত হওয়ার আশংকায় তাকে কাবা ধ্বংসের কাজে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছিল এবং পার্বত্য পথে তার সৈন্যদের নিরাপদে মক্কায় পৌঁছিয়ে দেবার জন্য পথ প্রদর্শকও দিয়েছিল। এ ঘটনার তিক্ত স্মৃতি কুরাইশদেরকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মানসিকভাবে পীড়ন করতে থাকে এবং বছরের পর বছর তারা তায়েফের পথ প্রদর্শকের কবরে প্রস্তর নিক্ষেপ করতে থাকে। তাছাড়া কুরাইশ ও অন্যান্য আরববাসীরা নিজেদের দীনকে হযরত ইবরাহীমের আনীত দীন মনে করতো। নিজেদের বহু ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি এবং বিশেষ করে হজ্জের নিয়মকানুন ও রসম

রেওয়াজকে ইবরাহীমের দীনের অংশ গণ্য করতো। তারা একথাও মানতো যে, হযরত ইবরাহীম একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করতেন এবং তিনি কখনো মূর্তি পূজা করেননি। তাদের মধ্যে যেসব কথা ও কাহিনী প্রচলিত ছিল তাতে মূর্তি পূজার প্রচলন তাদের দেশে কবে থেকে শুরু হয়েছিল এবং কোন্ মূর্তিটি কে কবে কোথায় থেকে এনেছিল তার বিস্তারিত বিবরণ সংরক্ষিত ছিল। একজন সাধারণ আরবের মনে নিজের উপাস্য দেবতাদের প্রতি যে ধরনের ভক্তি–শ্রদ্ধা ছিল তা এভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে, কখনো তার প্রার্থনা ও আশা–আকাংখা বিরোধী কোন ঘটনা ঘটে গেলে অনেক সময় নিজের উপাস্য দেবতাদেরকেই সে তিরস্কার করতো, তাদেরকে অপমান করতো এবং তাদের সামনে নযরানা পেশ করতো না। একজন আরব নিজের পিতার হত্যাকারী থেকে প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছিল। 'যুল খালাসাহ' নামক ঠাকুরের আস্তানায় গিয়ে সে ধর্না দেয় এবং এ ব্যাপারে তার ভবিষ্যত কর্মপন্থা জানতে চায়। সেখান থেকে এ ধরনের কাজ না করার জবাব আসে। এতে আরবটি ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে থাকে ঃ

لو كنت يا ذا الخلص الموتورا مثلى وكان شيخك المقبورا

لم تنه عن قتل العداة زورا

অর্থাৎ " হে যুল খালাসা! তুমি যদি হতে আমার জায়গায়
নিহত হতো যদি তোমার পিতা
তাহলে কখনো তুমি মিথ্যাচারী হতে না
বলতে না প্রতিশোধ নিয়ো না জালেমদের থেকে।"

অন্য একজন আরব তার উটের পাল নিয়ে যায় সা'দ নামক দেবতার আস্তানায় তাদের জন্য বরকত লাভ করার উদ্দেশ্যে। এটি ছিল একটি লম্বা ও দীর্ঘ মূর্তি। বলির পশুর চাপ চাপ রক্ত তার গায়ে লেপ্টেছিল। উটেরা তা দেখে লাফিয়ে ওঠে এবং চারদিকে ছুটে পালিয়ে যেতে থাকে। আরবটি তার উটগুলোকে এভাবে চারদিকে বিশৃংখলভাবে ছুটে যেতে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সে মূর্তিটির গায়ে পাথর মারতে মারতে বলতে থাকে ঃ "আল্লাহ তোর সর্বনাশ করুক। আমি এসেছিলাম বরকত নেবার জন্য কিন্তু তুই তো আমার এই বাকি উটগুলোকেও ভাগিয়ে দিয়েছিস।" অনেক মূর্তি ছিল যেগুলো সম্পর্কে বহু ন্যাক্কারজনক গল্প প্রচলিত ছিল। যেমন ছিল আসাফ ও নায়েলার ব্যাপারে। এ দু'টি মূর্তি রক্ষিত ছিল সাফা ও মারওয়ার ওপর। এদের সম্পর্কে প্রচলিত ছিল যে, এরা দু'জন ছিল মূলত একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক। এরা কাবাঘরের মধ্যে যিনা করে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে পাথরে পরিণত করে দেন। যেসব দেবতার এ হচ্ছে আসল রূপ, তাদের পূজারী ও ভক্তদের মনে তাদের কোন যথার্থ মর্যাদা থাকতে পারে না। এসব দিক সামনে রাখলে এ কথা সহজে অনুধাবন করা যায় যে, আল্লাহর প্রতি নির্ভেজাল আনুগত্যের একটি সুগভীর মূল্যবোধ তাদের অন্তরের অন্তস্থলে বিরাজিত ছিল। কিন্তু একদিকে অন্ধ রক্ষণশীলতা তাকে দমিয়ে রেখেছিল এবং অন্যদিকে কুরাইশ পুরোহিতরা এর বিরুদ্ধে হিংসা ও বিদ্বেষ উদ্দীপিত করে তুলছিল। কারণ তারা আশংকা করছিল দেবতাদের প্রতি ভক্তি–শ্রদ্ধা খতম হয়ে গেলে আরবে তাদের যে কেন্দ্রীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তা

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾

তবে তারা ছাড়া যারা (ঐসব গোনাহের পর) তাওবা করেছে এবং ঈমান এনে সৎকাজ করতে থেকেছে।[৮৬] এ ধরনের লোকদের অসৎ কাজগুলোকে আল্লাহ সৎকাজের দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন[৮৭] এবং আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

খতম হয়ে যাবে এবং তাদের অর্থোপার্জনও বাধাগ্রস্ত হবে। এসব উপাদানের ভিত্তিতে যে মুশরিকী ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল তা তাওহীদের দাওয়াতের মোকাবিলায় কোন গুরুত্ব ও মর্যাদা সহকারে দাঁড়াতে পারতো না। তাই কুরআন নিজেই মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে উদাত্ত কণ্ঠে বলেছে ঃ তোমাদের সমাজে যেসব কারণে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে, তারা শিরকমুক্ত এবং নির্ভেজাল আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এদিক থেকে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বকে মুশরিকরা মুখে মেনে নিতে না চাইলেও মনে মনে তারা এর ভারীত্ব অনুভব করতো।

৮৫. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, এ শাস্তির ধারা খতম হবে না বরং একের পর এক জারী থাকবে। দুই, যে ব্যক্তি কুফরী, শিরক বা নাস্তিক্যবাদের সাথে হত্যা ও অন্যান্য গোনাহের বোঝা মাথায় নিয়ে যাবে সে বিদ্রোহের শাস্তি আলাদাভাবে ভোগ করবে এবং অন্যান্য প্রত্যেকটি অপরাধের শাস্তি ভোগ করবে আলাদা আলাদাভাবে। তার ছোট বড় প্রত্যেকটি অপরাধ শুমার করা হবে। কোন একটি ভুলও ক্ষমা করা হবে না। হত্যার জন্য একটি শাস্তি দেয়া হবে না বরং হত্যার প্রত্যেকটি কর্মের জন্য পৃথক পৃথক শাস্তি দেয়া হবে। যিনার শাস্তিও একবার হবে না বরং যতবারই সে এ অপরাধটি করবে প্রত্যেকবারের জন্য পৃথক পৃথক শাস্তি পাবে। তার অন্যান্য অপরাধ ও গোনাহের শাস্তিও এ রকমই হবে।

৮৬. যারা ইতিপূর্বে নানা ধরনের অপরাধ করেছে এবং এখন সংশোধন প্রয়াসী হয়েছে তাদের জন্য এটি একটি সুসংবাদ। এটি ছিল সাধারণ ক্ষমার (General Amnesty) একটি ঘোষণা। এ ঘোষণাটিই সেকালের বিকৃত সমাজের লাখো লাখো লোককে স্থায়ী বিকৃতি থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে। এটিই তাদেরকে আশার আলো দেখায় এবং অবস্থা সংশোধনে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যথায় যদি তাদেরকে বলা হতো, তোমরা যে পাপ করেছো তার শাস্তি থেকে এখন কোন প্রকারেই নিষ্কৃতি পেতে পারো না, তাহলে এটি তাদেরকে হতাশ করে চিরকালের জন্য পাপ সাগরে ডুবিয়ে দিতো এবং তাদের সংশোধনের আর কোন সম্ভাবনাই থাকতো না। অপরাধীকে একমাত্র ক্ষমার আশাই অপরাধের শৃংখল থেকে মুক্ত করতে পারে। নিরাশ হবার পর সে ইবলীসে পরিণত হয়। তাওবার এ নিয়ামতটি আরবের বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট লোকদেরকে কিভাবে সঠিক পথে এনেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা থেকে তা অনুমান করা

যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইবনে জারীর ও তাবারানী এ ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, একদিন আমি মসজিদে নববী থেকে এশার নামায পড়ে ফিরছি এমন সময় দেখি এক ভদ্রমহিলা আমার দরজায় দাঁড়িয়ে। আমি তাকে সালাম দিয়ে আমার কামরায় চলে গেলাম এবং দরজা বন্ধ করে নফল নামায পড়তে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর সে দরজার কড়া নাড়লো। আমি উঠে দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কি চাও? সে বলতে লাগলো, আমি আপনার কাছে একটি প্রশ্ন করতে এসেছি। আমি যিনা করেছি। আমার পেটে অবৈধ সন্তান ছিল। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে আমি তাকে মেরে ফেলেছি। এখন আমি জানতে চাই আমার গোনাহ মাফ হবার কোন পথ আছে কি না? আমি বললাম, না কোনক্রমেই মাফ হবে না। সে বড়ই আক্ষেপ সহকারে হা-হুতাশ করতে করতে চলে গেলো। সে বলতে থাকলো ঃ "হায়! এ সৌন্দর্য আগুনের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল।" সকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে নামায শেষ করার পর আমি তাঁকে রাতের ঘটনা শুনালাম। তিনি বললেন ঃ আবু হুরাইরা, তুমি বড়ই ভুল জবাব দিয়েছো। তুমি কি কুরআনে এ আয়াত পড়নি-

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ..... اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا (الفرقان : ٦٨-٧٠)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ জবাব শুনে আমি সংগে সংগেই বের হয়ে পড়লাম। মহিলাটিকে খুঁজতে লাগলাম। রাতে এশার সময়ই তাকে পেলাম। আমি তাকে সুখবর দিলাম। তাকে বললাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার প্রশ্নের এ জওয়াব দিয়েছেন। শোনার সাথেসাথেই সে সিজদানত হলো এবং বলতে থাকলো, সেই আল্লাহর শোকর যিনি আমার জন্য ক্ষমার দরজা খুলে দিয়েছেন। তারপর সে গোনাহ থেকে তাওবা করলো এবং নিজের বাঁদীকে তার পুত্রসহ মুক্ত করে দিল। হাদীসে প্রায় একই ধরনের অন্য একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেটি একটি বৃদ্ধের ঘটনা। তিনি এসে রসূলুল্লাহর (সা) কাছে আরজ করছিলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! সারা জীবন গোনাহের মধ্যে কেটে গেলো। এমন কোনো গোনাহ নেই যা করিনি। নিজের গোনাহ যদি দুনিয়ার সমস্ত লোকদের মধ্যে ভাগ করে দেই তাহলে সবাইকে গোনাহের সাগরে ডুবিয়ে দেবে। এখনো কি আমার ক্ষমার কোন পথ আছে? জবাব দিলেন ঃ তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছো? বৃদ্ধ বললেন ঃ আমি সাক্ষ দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রসূল। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ যাও, আল্লাহ গোনাহ মাফ করবেন এবং তোমার গোনাহগুলোকে নেকীতে পরিণত করে দেবেন। বৃদ্ধ বললেন ঃ আমার সমস্ত অপরাধ ও পাপ কি ক্ষমা করবেন? জবাব দিলেন ঃ হাঁ, তোমার সমস্ত অপরাধ ও পাপ ক্ষমা করে দেবেন। (ইবনে কাসীর, ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে)

৮৭. এর দু'টি অর্থ হয়। এক, যখন তারা তাওবা করবে তখন ইতিপূর্বে কুফরী জীবনে তারা যে সমস্ত খারাপ কাজ করতো তার জায়গায় এখন ঈমান আনুগত্যের জীবনে মহান আল্লাহ তাদের সৎকাজ করার সুযোগ দেবেন এবং তারা সৎকাজ করতে থাকবে। ফলে সৎকাজ তাদের অসৎ কাজের জায়গা দখল করে নেবে। দুই, তাওবার ফলে কেবল তাদের আমলনামা থেকে তারা কুফরী ও গোনাহগারির জীবনে যেসব অপরাধ করেছিল সেগুলো

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾ وَالَّذِينَ
لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ۙ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾ وَالَّذِينَ إِذَا
ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾

যে ব্যক্তি তাওবা করে সৎকাজের পথ অবলম্বন করে, সে তো আল্লাহর দিকে ফিরে আসার মতই ফিরে আসে।[৮৮] —(আর রহমানের বান্দা হচ্ছে তারা) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না[৮৯] এবং কোন বাজে জিনিসের কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাকলে ভদ্রলোকের মতো অতিক্রম করে যায়।[৯০] তাদের যদি তাদের রবের আয়াত শুনিয়ে উপদেশ দেয়া হয় তাহলে তারা তার প্রতি অন্ধ বধির হয়ে থাকে না।[৯১]

কেটে দেয়া হবে না বরং তার পরিবর্তে প্রত্যেকের আমলনামায় এ নেকী লেখা হবে যে, এ হচ্ছে সেই বান্দা যে বিদ্রোহ ও নাফরমানির পথ পরিহার করে আনুগত্য ও হুকুম মেনে চলার পথ অবলম্বন করেছে। তারপর যতবারই সে নিজের পূর্ববর্তী জীবনের খারাপ কাজগুলো স্মরণ করে লজ্জিত হয়ে থাকবে এবং নিজের প্রভূ রব্বুল আলামীনের কাছে তাওবা করে থাকবে ততটাই নেকী তার ভাগে লিখে দেয়া হবে। কারণ ভুলের জন্য লজ্জিত হওয়া ও ক্ষমা চাওয়াই একটি নেকীর কাজ। এভাবে তার আমলনামায় পূর্বেকার সমস্ত পাপের জায়গা দখল করে নেবে পরবর্তীকালের নেকীসমূহ এবং কেবলমাত্র শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার মধ্যেই তার পরিণাম সীমিত থাকবে না বরং উল্টো তাকে পুরস্কৃতও করা হবে।

৮৮. অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবে তাঁর দরবারই বান্দার আসল ফিরে আসার জায়গা এবং নৈতিক দিক দিয়েও তাঁর দরবারই এমন একটি জায়গা যেদিকে তার ফিরে আসা উচিত। আবার ফলাফলের দিক দিয়েও তাঁর দরবারের দিকে ফিরে আসা লাভজনক। নয়তো দ্বিতীয় এমন কোন জায়গা নেই যেখানে এসে মানুষ শাস্তি থেকে বাঁচতে অথবা পুরস্কার পেতে পারে। এছাড়া এর অর্থ এও হয় যে, সে এমন একটি দরবারের দিকে ফিরে যায় যেখানে সত্যি ফিরে যাওয়া যেতে পারে, যেটি সর্বোত্তম দরবার, সমস্ত কল্যাণ যেখান থেকে উৎসারিত হয়, যেখান থেকে লজ্জিত অপরাধীকে খেদিয়ে দেওয়া হয় না বরং ক্ষমা ও পুরস্কৃত করা হয়, যেখানে ক্ষমা প্রার্থনাকারীর অপরাধ গণনা করা হয় না বরং দেখা হয় সে তাওবা করে নিজের কতটুকু সংশোধন করে নিয়েছে এবং যেখানে বান্দা এমন প্রভুর সাক্ষাত পায় যিনি প্রতিশোধ নেবার জন্য উঠেপড়ে লাগেন না বরং নিজের লজ্জাবনত গোলামের জন্য রহমতের দরজা খুলে দেন।

৮৯. এরও দু'টি অর্থ হয়। এক, তারা কোন মিথ্যা সাক্ষ দেয় না এবং এমন কোন জিনিসকে প্রকৃত ঘটনা ও সত্য হিসেবে গণ্য করে না যাকে প্রকৃত ঘটনা ও সত্য বলে তারা জানে না। অথবা তারা যাকে প্রকৃত ঘটনা ও সত্যের বিরোধী ও বিপরীত বলে নিশ্চিতভাবে

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّ
اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾ أُولٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا
وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ﴿٧٥﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا
وَّمُقَامًا ﴿٧٦﴾ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ
فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

তারা প্রার্থনা করে থাকে, " হে আমাদের রব! আমাদের নিজেদের স্ত্রীদের ও নিজেদের সন্তানদেরকে নয়ন শীতলকারী বানাও[৯২] এবং আমাদের করে দাও মুত্তাকীদের ইমাম।[৯৩]—এরাই নিজেদের সবরের[৯৪] ফল উন্নত মনজিলের আকারে পাবে।[৯৫] অভিবাদন ও সালাম সহকারে তাদের সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে। তারা সেখানে থাকবে চিরকাল। কী চমৎকার সেই আশ্রয় এবং সেই আবাস!

হে মুহাম্মাদ! লোকদের বলো, "আমার রবের তোমাদের কি প্রয়োজন, যদি তোমরা তাঁকে না ডাকো।[৯৬] এখন যে তোমরা মিথ্যা আরোপ করেছো, শিগ্‌গীর এমন শাস্তি পাবে যে, তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব হবে না।"

জানে। দুই, তারা মিথ্যা প্রত্যক্ষ করে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিথ্যাচার দেখে না এবং তা দেখার সংকল্প করে না। এ দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে মিথ্যা শব্দটি বাতিল ও অকল্যাণের সমার্থক। খারাপ কাজের গায়ে শয়তান যে বাহ্যিক স্বাদ চাকচিক্য ও লাভের প্রলেপ লাগিয়ে রেখেছে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই মানুষ সেদিকে যায়। এ প্রলেপ অপসৃত হলে প্রত্যেকটি অসৎ কাজ মিথ্যা ও কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ দেখা যায়। এ ধরনের মিথ্যার জন্য মানুষ কখনো প্রাণপাত করতে পারে না। কাজেই প্রত্যেকটি বাতিল, গোনাহ ও খারাপ কাজ এদিক দিয়ে মিথ্যা যে, তা মিথ্যা চাকচিক্যের কারণে মানুষকে নিজের দিকে টেনে নেয়। মু'মিন যেহেতু সত্যের পরিচয় লাভ করে তাই এ মিথ্যা যতই হৃদয়গ্রাহী যুক্তি অথবা দৃষ্টিনন্দন শিল্পকারিতা কিংবা শ্রুতিমধুর সুকণ্ঠের পোশাক পরিহিত হয়ে আসুক না কেন এসব যে তার নকল রূপ, তা সে চিনে ফেলে।

৯০. এখানে মূলে لغو শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। উপরে যে মিথ্যার ব্যাখ্যা করা হয়েছে لغو শব্দটি তার ওপরও প্রযুক্ত হয় এবং এই সংগে সমস্ত অর্থহীন, আজেবাজে ফালতু কথাবার্তা ও কাজও এর অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহর সৎ বান্দাদের বৈশিষ্ট হচ্ছে, তারা জেনে শুনে এ ধরনের কথা ও কাজ দেখতে বা শুনতে অথবা তাতে অংশ গ্রহণ করতে যায় না। আর যদি কখনো তাদের পথে এমন কোন জিনিস এসে যায়, তাহলে

তার প্রতি একটা উড়ো নজর না দিয়েও তারা এভাবে সে জায়গা অতিক্রম করে যেমন একজন অত্যন্ত সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি কোন ময়লার স্তূপ অতিক্রম করে চলে যায়। ময়লা ও পচা দুর্গন্ধের ব্যাপারে একজন কুরুচিসম্পন্ন ও নোংরা ব্যক্তিই আগ্রহ পোষণ করতে পারে কিন্তু একজন সুরুচিসম্পন্ন ভদ্রলোক বাধ্যতামূলক পরিস্থিতির শিকার হওয়া ছাড়া কখনো তার ধারে কাছে যাওয়াও বরদাশত করতে পারে না। দুর্গন্ধের স্তূপের কাছে বসে আনন্দ পাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল মু'মিনূন ৪ টীকা।)

৯১. মূল শব্দগুলো হচ্ছে لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا এর শাব্দিক তরজমা হচ্ছে, "তারা তার ওপর অন্ধ ও বোবা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। কিন্তু এখানে "ঝাঁপিয়ে পড়া" আভিধানিক অর্থে নয় বরং পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আমরা কথায় বলি, "জিহাদের হুকুম শুনে বসে রইলো।" এখানে বসে থাকা শব্দটি আভিধানিক অর্থে নয় বরং জিহাদের জন্য না ওঠা ও নড়চড়া না করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তারা এমন লোক নয় যারা আল্লাহর আয়াত শুনে একটুও নড়ে না বরং তারা তার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোতে যেসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা সেগুলো মেনে চলে। যেটি ফরয করা হয়েছে তা অবশ্য পালন করে। যে কাজের নিন্দা করা হয়েছে তা থেকে বিরত থাকে। যে আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে তার কল্পনা করতেই তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে।

৯২. অর্থাৎ তাদেরকে ঈমান ও সৎকাজের তাওফীক দান করো এবং পবিত্র–পরিচ্ছন্ন চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী করো কারণ একজন মু'মিন তার স্ত্রী ও সন্তানদের দৈহিক সৌন্দর্য ও আয়েশ–আরাম থেকে নয় বরং সদাচার ও সচ্চরিত্রতা থেকেই মানসিক প্রশান্তি লাভ করে। দুনিয়ায় যারা তার সবচেয়ে প্রিয় তাদেরকে দোজখের ইন্ধনে পরিণত হতে দেখার চাইতে বেশী কষ্টকর জিনিস তার কাছে আর কিছুই নেই। এ অবস্থায় স্ত্রীর সৌন্দর্য ও সন্তানদের যৌবন ও প্রতিভা তার জন্য আরো বেশী মর্মজ্বালার কারণ হবে। কারণ সে সব সময় এ মর্মে দুঃখ করতে থাকবে যে, এরা সবাই নিজেদের এসব যোগ্যতা ও গুণাবলী সত্ত্বেও আল্লাহর আযাবের শিকার হবে।

এখানে বিশেষ করে এ বিষয়টি দৃষ্টিসমক্ষে রাখা উচিত যে, এ আয়াতটি যখন নাযিল হয় তখন মক্কার মুসলমানদের মধ্যে এমন একজনও ছিলেন না যার প্রিয়তম আত্মীয় কুফরী ও জাহেলিয়াতের মধ্যে অবস্থান করছিল না। কোন স্বামী ঈমান এনে থাকলে তার স্ত্রী তখনো কাফের ছিল। কোন স্ত্রী ঈমান এনে থাকলে তার স্বামী তখনো কাফের ছিল। কোন যুবক ঈমান এনে থাকলে তার মা–বাপ, ভাই, বোন সবাই তখনো কাফের ছিল। আর কোন বাপ ঈমান এনে থাকলে তখনো তার যুবক পুত্ররা কুফরীর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ অবস্থায় প্রত্যেকটি মুসলমান একটি কঠিন আত্মিক যন্ত্রণা ভোগ করছিল এবং তার অন্তর থেকে যে দোয়া বের হচ্ছিল তার সর্বোত্তম প্রকাশ এ আয়াতে করা হয়েছে। "চোখের শীতলতা" শব্দ দু'টি এমন একটি অবস্থার চিত্র অংকন করেছে যা থেকে বুঝা যায়, নিজের প্রিয়জনদেরকে কুফরী ও জাহেলিয়াতের মধ্যে ডুবে থাকতে দেখে এক ব্যক্তি

এতই কষ্ট অনুভব করছে যেন তার চোখ ব্যথায় টনটন করছে এবং সেখানে খচখচ করে কাঁটার মতো বিঁধছে। দীনের প্রতি তারা যে ঈমান এনেছে তা যে পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারেই এনেছে—একথাই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের অবস্থা এমন লোকদের মতো নয় যাদের পরিবারের লোকেরা বিভিন্ন ধর্মীয় দল ও উপদলে যোগ দেয় এবং সব ব্যাপকে আমাদের কিছু না কিছু পুঁজি আছে এই ভেবে সবাই নিশ্চিন্ত থাকে।

৯৩. অর্থাৎ তাকওয়া–আল্লাহভীতি ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ক্ষেত্রে আমরা সবার চেয়ে এগিয়ে যাবো। কল্যাণ ও সৎকর্মশীলতার ক্ষেত্রে সবার অগ্রগামী হবো। নিছক সৎকর্মশীলই হবো না বরং সৎকর্মশীলদের নেতা হবো এবং আমাদের বদৌলতে সারা দুনিয়ায় কল্যাণ ও সৎকর্মশীলতা প্রসারিত হবে। একথার মর্মার্থ এই যে, এরা এমন লোক যারা ধন–দৌলত ও গৌরব–মাহাত্মের ক্ষেত্রে নয় বরং আল্লাহভীতি ও সৎকর্মশীলতার ক্ষেত্রে পরস্পরের অগ্রবর্তী হবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের যুগে কিছু লোক এ আয়াতটিকেও নেতৃত্ব লাভের জন্য প্রার্থী হওয়া ও রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের জন্য অগ্রবর্তী হওয়ার বৈধতার প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছে। তাদের মতে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, " হে আল্লাহ! মুত্তাকীদেরকে আমাদের প্রজা এবং আমাদেরকে তাদের শাসকে পরিণত করো।" বস্তুত, ক্ষমতা ও পদের প্রার্থীরা ছাড়া আর কারো কাছে এ ধরনের ব্যাখ্যা প্রশংসনীয় হতে পারে না।

৯৪. সবর শব্দটি এখানে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সত্যের শত্রুদের জুলুম–নির্যাতনের মোকাবিলা সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার সাথে করা। সত্য দীনকে প্রতিষ্ঠিত ও তার মর্যাদা সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে সব ধরনের বিপদ–আপদ ও কষ্ট বরদাশত করা। সব রকমের ভীতি ও লোভ–লালসার মোকাবিলায় সঠিক পথে দৃঢ়পদ থাকা। শয়তানের সমস্ত প্ররোচনা ও প্রবৃত্তির যাবতীয় কামনা সত্ত্বেও কর্তব্য সম্পাদন করা। হারাম থেকে দূরে থাকা এবং আল্লাহ নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করা। গোনাহের যাবতীয় স্বাদ ও লাভ প্রত্যাখ্যান করা এবং সৎকাজ ও সঠিক পথে অবস্থানের প্রত্যেকটি ক্ষতি ও তার বদৌলতে অর্জিত প্রতিটি বঞ্চনা মেনে নেওয়া। মোটকথা এ একটি শব্দের মধ্যে দীন এবং দীনী মনোভাব, কর্মনীতি ও নৈতিকতার একটি বিশাল জগত আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

৯৫. মূলে غُرْفَة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে উঁচু দালান। সাধারণত এর অনুবাদে "বালাখানা" শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এ থেকে একতলা বা দোতলা কক্ষের ধারণা মনের পাতায় ভেসে ওঠে। অথচ সত্য বলতে কি দুনিয়ায় মানুষ যতই বৃহদাকার ও উচ্চতম ইমারত তৈরি করুক না কেন এমন কি মানুষের অবচেতন মনে জান্নাতের ইমারতের যেসব নক্‌শা সংরক্ষিত আছে তারতের তাজমহল ও আমেরিকার আকাশচুম্বী ইমারতগুলো (sky-scrapers)ও তার কাছে নিছক কতিপয় কদাকার কাঠামো ছাড়া আর কিছুই নয়।

৯৬. অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা না করো, তার ইবাদাত না করো এবং নিজেদের প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য তাঁকে সাহায্যের জন্য না ডাকো, তাহলে আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের কোন গুরুত্বই নেই। এ কারণে তিনি নগণ্য তৃণখণ্ডের সমানও তোমাদের পরোয়া করবেন না। নিছক সৃষ্টি হবার দিক দিয়ে তোমাদের ও পাথরের মধ্যে

কোন ফারাক নেই। আল্লাহর কোন প্রয়োজন পূরণ করতে হলে তোমাদের ওপর নির্ভর করতে হয় না। তোমরা বন্দেগী না করলে তাঁর কোন কাজ ব্যাহত হবে না। তোমাদের তাঁর সামনে হাত পাতা এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করাই তাঁর দৃষ্টিকে তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট করে। এ কাজ না করলে তোমরা নিক্ষিপ্ত হবে ময়লা আবর্জনার মতো।

আশ্শু'আরা

২৬

নামকরণ

২২৪ আয়াতের وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ থেকে সূরার নামটি গৃহীত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী থেকে বুঝা যাচ্ছে এবং হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে যে, এ সূরাটির নাযিলের সময়-কাল হচ্ছে মক্কার মধ্যবর্তীকালীন যুগ। ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনামতে প্রথমে সূরা তা-হা নাযিল হয়, তারপর ওয়াকি'আহ এবং এরপর সূরা আশ্ শু'আরা। (রূহুল মাআনী, ১৯ খণ্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা) আর সূরা তা-হা সম্পর্কে জানা আছে, এটি হযরত উমরের (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নাযিল হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

ভাষণের পটভূমি হচ্ছে, মক্কার কাফেররা লাগাতার অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত ও তাবলীগের মোকাবিলা করছিল। এ জন্য তারা বিভিন্ন রকমের বাহানাবাজীর আশ্রয় নিচ্ছিল। কখনো বলতো, তুমি তো আমাদের কোন চিহ্ন দেখালে না, তাহলে আমরা কেমন করে তোমাকে নবী বলে মেনে নেবো। কখনো তাঁকে কবি ও গণক আখ্যা দিয়ে তাঁর শিক্ষা ও উপদেশাবলীকে কথার মারপ্যাঁচে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতো। আবার কখনো তাঁর মিশনকে হালকা ও গুরুত্বহীন করে দেবার জন্য বলতো, কয়েকজন মূর্খ ও অর্বাচীন যুবক অথবা সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোক তাঁর অনুসারী হয়েছে, অথচ এ শিক্ষা যদি তেমন প্রেরণাদায়ক ও প্রাণপ্রবাহে পূর্ণ হতো তাহলে জাতির শ্রেষ্ঠ লোকেরা, পণ্ডিত, জ্ঞানী-গুণী ও সরদাররা একে গ্রহণ করে নিতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলিষ্ঠ যুক্তি সহকারে তাদের আকীদা-বিশ্বাসের ভ্রান্তি এবং তাওহীদ ও আখেরাতের সত্যতা বুঝাবার চেষ্টা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু তারা হঠকারিতার নিত্য নতুন পথ অবলম্বন করতে কখনোই ক্লান্ত হতো না। এ জিনিসটি রসূলুল্লাহর (সা) জন্য অসহ্য মর্মযাতনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এ দুঃখে তিনি চরম মানসিক পীড়ন অনুভব করছিলেন।

এহেন অবস্থায় এ সূরাটি নাযিল হয়। বক্তব্যের সূচনা এভাবে হয় ঃ তুমি এদের জন্য ভাবতে ভাবতে নিজের প্রাণ শক্তি ধ্বংস করে দিচ্ছো কেন? এরা কোন নিদর্শন দেখেনি,

এটাই এদের ঈমান না আনার কারণ নয়। বরং এর কারণ হচ্ছে, এরা একগুয়ে ও হঠকারী। এরা বুঝালেও বুঝে না। এরা এমন কোন নিদর্শনের প্রত্যাশী, যা জোরপূর্বক এদের মাথা নুইয়ে দেবে। আর এ নিদর্শন যথাসময়ে যখন এসে যাবে তখন তারা নিজেরাই জানতে পারবে, যে কথা তাদেরকে বুঝানো হচ্ছিল তা একেবারেই সঠিক ও সত্য ছিল। এ ভূমিকার পর দশ রুকূ' পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে যে বিষয়বস্তুটি বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, সত্য প্রত্যাশীদের জন্য আল্লাহর দুনিয়ায় সর্বত্র নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। সেগুলো দেখে তারা সত্যকে চিনতে পারে। কিন্তু হঠকারীরা কখনো বিশ্ব-জগতের নিদর্শনাদি এবং নবীদের মু'জিযাসমূহ তথা কোন জিনিস দেখেও ঈমান আনেনি। যতক্ষণ না আল্লাহর আযাব এসে তাদরেকে পাকড়াও করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের গোমরাহীর ওপর অবিচল থেকেছে। এ সম্বন্ধের প্রেক্ষিতে এখানে ইতিহাসের সাতটি জাতির অবস্থা পেশ করা হয়েছে। মক্কার কাফেররা এ সময় যে হঠকারী নীতি অবলম্বন করে চলছিল ইতিহাসের এ সাতটি জাতিও সেকালে সেই একই নীতির আশ্রয় নিয়েছিল। এ ঐতিহাসিক বর্ণনার আওতাধীনে কতিপয় কথা মানস পটে অংকিত করে দেয়া হয়েছে।

এক ঃ নিদর্শন দু' ধরনের। এক ধরনের নিদর্শন আল্লাহর যমীনে চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। সেগুলো দেখে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি নবী যে জিনিসের দিকে আহবান জানাচ্ছেন সেটি সত্য হতে পারে কিনা সে সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণা করতে পারে। দ্বিতীয় ধরনের নিদর্শন ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় দেখেছে, নূহের সম্প্রদায় দেখেছে, আদ ও সামূদ দেখেছে, লূতের সম্প্রদায় ও আইকাবাসীরাও দেখেছে। এখন কাফেররা কোন্ ধরনের নিদর্শন দেখতে চায় এটা তাদের নিজেদের সিদ্ধান্তের ব্যাপার।

দুই ঃ সকল যুগে কাফেরদের মনোভাব একই রকম ছিল। তাদের যুক্তি ছিল একই প্রকার। তাদের আপত্তি ছিল একই। ঈমান না আনার জন্য তারা একই বাহানাবাজীর আশ্রয় নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা একই পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। অন্যদিকে প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক নবীর শিক্ষা একই ছিল। তাদের চরিত্র ও জীবননীতি একই রঙে রঞ্জিত ছিল। নিজেদের বিরোধীদের মোকাবিলায় তাঁদের যুক্তি-প্রমাণের ধরন ছিল একই। আর তাঁদের সবার সাথে আল্লাহর রহমতও ছিল একই ধরনের। এ দু'টি আদর্শের উপস্থিতি ইতিহাসের পাতায় রয়েছে। কাফেররা নিজেরাই দেখতে পারে তাদের নিজেদের কোন্ ধরনের ছবি পাওয়া যায় এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিসত্তায় কোন্ ধরনের আদর্শের নিদর্শন পাওয়া যায়।

তৃতীয় যে কথাটির বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে সেটি হচ্ছে আল্লাহ একদিকে যেমন অজেয় শক্তি, পরাক্রম ও ক্ষমতার অধিকারী অপরদিকে তেমনি পরম করুণাময়ও। ইতিহাসে একদিকে রয়েছে তাঁর ক্রোধের দৃষ্টান্ত এবং অন্যদিকে রহমতেরও। এখন লোকদের নিজেদেরকেই এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তারা নিজেদের তাঁর রহমতের যোগ্য বানাবে না ক্রোধের।

শেষ রুকূ'তে এ আলোচনাটির উপসংহার টানতে গিয়ে বলা হয়েছে, তোমরা যদি নিদর্শনই দেখতে চাও, তাহলে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলো যেসব ভয়াবহ নিদর্শন দেখেছিল সেগুলো দেখতে চাও কেন? এ কুরআনকে দেখো। এটি তোমাদের নিজেদের ভাষায় রয়েছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখো। তাঁর সাথীদেরকে দেখো।

এটি কি কোন শয়তান বা জিনের বাণী হতে পারে? এ বাণীর উপস্থাপককে কি তোমাদের গণৎকার বলে মনে হচ্ছে? মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীদেরকে কি তোমরা কবি ও তাদের সহযোগী ও সমমনারা যেমন হয় তেমনি ধরনের দেখেছো? জিদ ও হঠকারিতার কথা আলাদা। কিন্তু নিজেদের অন্তরের অন্তস্থলে উঁকি দিয়ে দেখো সেখানে কি এর সমর্থন পাওয়া যায়? যদি মনে মনে তোমরা নিজেরাই জানো গণকবৃত্তি ও কাব্যচর্চার সাথে তাঁর দূরতম কোন সম্পর্ক নেই, তাহলে এই সাথে একথাও জেনে নাও, তোমরা জুলুম করছো, কাজেই জালেমের পরিণামই তোমাদের ভোগ করতে হবে।

আয়াত ২২৭ **সূরা আশ শু'আরা–মক্কী** রুকূ' ১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

طٰسٓمٓ ① تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ② لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا
يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ③ اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ
اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ④

তা–সীন–মীম। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।[১] হে মুহাম্মাদ! এ লোকেরা ঈমান আনছে না বলে তুমি যেন দুঃখে নিজের প্রাণ বিনষ্ট করে দিতে বসেছ।[২] আমি চাইলে আকাশ থেকে এমন নিদর্শন অবতীর্ণ করতে পারতাম যার ফলে তাদের ঘাড় তার সামনে নত হয়ে যেতো।[৩]

১. অর্থাৎ এ সূরার যে আয়াতগুলো পেশ করা হচ্ছে এগুলো এমন একটি কিতাবের আয়াত যা তার বক্তব্য পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণনা করেছে। এগুলো পড়ে বা শুনে যে কোন ব্যক্তি বুঝতে পারে এগুলো কোন্ জিনিসের দিকে আহবান জানাচ্ছে, কোন্ জিনিস থেকে বিরত রাখছে, কাকে সত্য বলছে এবং কাকে মিথ্যা গণ্য করছে। মেনে নেয়া বা না মেনে নেয়া আলাদা কথা কিন্তু এর শিক্ষা বুঝা যায়নি এবং এ কিতাব কি ত্যাগ করার এবং কি গ্রহণ করার আহবান জানাচ্ছে এ থেকে তা জানতেই পারা যায়নি এমন কথা বলার অবকাশ কোন ব্যক্তির নেই।

কুরআনকে "আল কিতাবুল মুবীন" বা সুস্পষ্ট কিতাব বলার আরো একটি অর্থও আছে। সেটি হচ্ছে, এটি যে আল্লাহর কিতাব সে ব্যাপারটি সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত। এর ভাষা, বর্ণনা, বিষয়বস্তু এবং এর উপস্থাপিত সত্য ও এর নাযিল হবার অবস্থা সবকিছু পরিষ্কার বলে দিচ্ছে—এটি বিশ্ব–জগতের প্রভুরই কিতাব। এদিক দিয়ে বিচার করলে এ কিতাবের প্রত্যেকটি বাক্যই একটি নিদর্শন ও মু'জিযা। কোন ব্যক্তি নিজের বুদ্ধি–বিবেক ব্যবহার করলে তার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য পৃথক কোন নিদর্শনের প্রয়োজনই হয় না। সুস্পষ্ট কিতাবের এ "আয়াত" তথা নিদর্শন তাকে নিশ্চিন্ত করার জন্য যথেষ্ট।

সামনের দিকে এ সূরায় যে বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে এ ছোট্ট প্রারম্ভিক বাক্যটি নিজের দ্বিবিধ অর্থের দৃষ্টিতে তার সাথে পুরোপুরি সম্পর্ক রাখে। মক্কার কাফেররা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মু'জিযার দাবী জানাচ্ছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, এ মু'জিযা দেখে তিনি যে সত্যিই আল্লাহর পক্ষ থেকে এ পয়গাম এনেছেন সে ব্যাপারে তারা নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারবে। বলা হয়েছে, সত্যিই যদি ঈমান আনার জন্য কেউ নিদর্শনের দাবী করে থাকে, তাহলে তো "কিতাবুল মুবীন" তথা সুস্পষ্ট কিতাবের এ আয়াতগুলোই সে জন্য যথেষ্ট। অনুরূপভাবে কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে দোষারোপ করতো এ মর্মে যে, তিনি কবি বা গণক। বলা হয়েছে, এ কিতাবটি তো কোন হেঁয়ালী বা ধাঁধা নয়। কিতাবটি পরিষ্কারভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিজের শিক্ষা পেশ করছে। নিজেই দেখে নাও, এ শিক্ষা কি কোন কবি বা গণকের হতে পারে? (তারা তো সচরাচর হেঁয়ালীপূর্ণ কথা বলতে অভ্যস্ত)

২. কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ অবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সূরা কাহ্‌ফে বলা হয়েছেঃ

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

"এরা এ শিক্ষার প্রতি ঈমান না আনলে সম্ভবত তুমি এদের পেছনে ঘুরতে ঘুরতে ও আক্ষেপ করতে করতে মারা যাবে।" (৬ আয়াত)

আবার সূরা ফাতের–এ বলা হয়েছেঃ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ "তাদের অবস্থার প্রতি দুঃখ ও আক্ষেপ করে যেন তোমার প্রাণ ধ্বংস না হয়ে যায়।" (৮ আয়াত) এ থেকে সে যুগে নিজের জাতির পথভ্রষ্টতা, তার নৈতিক অবক্ষয় ও গোয়ার্তুমি শুধরানোর জন্য তাঁর সকল প্রচেষ্টার প্রবল বিরোধিতা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন হৃদয়বিদারক ও কষ্টকর অবস্থায় তাঁর দিবারাত্র অতিবাহিত করতেন তা আন্দাজ করা যায়। بخع শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, পুরোপুরি জবেহ করা। باخع نفسك এর আভিধানিক অর্থ হয়, তুমি নিজেই নিজেকে হত্যা করে ফেলছো।

৩. অর্থাৎ এমন কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করা যার ফলে সমগ্র কাফেরকুল ঈমান ও আনুগত্যের নীতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়, এটা আল্লাহর জন্য কোন কঠিন ব্যাপার ছিল না। যদি তিনি এমনটি না করে থাকেন তাহলে তার কারণ এ নয় যে, এ কাজটি তাঁর শক্তির বাইরে বরং এর কারণ হচ্ছে, এভাবে জোরপূর্বক ঈমান আদায় করে নিতে তিনি চান না। তিনি চান লোকেরা বুদ্ধি–বিবেক ব্যবহার করে এমন সব আয়াতের মাধ্যমে সত্যকে চিনে নিক, যেগুলো আল্লাহর কিতাবে পেশ করা হয়েছে, যেগুলো সমগ্র বিশ্ব জগতে চারদিকে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে রয়েছে এবং যেগুলো তাদের নিজেদের সত্তার মধ্যেই বিরাজিত রয়েছে। তারপর যখন তাদের অন্তর এ মর্মে সাক্ষ দেবে যে, নবীগণ যা পেশ করেছেন তাই যথার্থ সত্য এবং তার বিরুদ্ধে যেসব আকীদা–বিশ্বাস ও পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে তা মিথ্যা, তখন তারা জেনে বুঝে মিথ্যা ত্যাগ করে সত্যকে গ্রহণ করবে। আল্লাহ মানুষের কাছ থেকে এ স্বেচ্ছাকৃত ঈমান, মিথ্যা পরিহার ও সত্য অনুসৃতিই চান। এ জন্য তিনি মানুষকে ইচ্ছা ও সংকল্পের স্বাধীনতা দান করেছেন। এ জন্যই তিনি মানুষকে সঠিক–বেঠিক যে পথেই সে যেতে চায় সে পথে চলার স্বাধীনতা দিয়েছেন। এ জন্যই তিনি মানুষের মধ্যে ভালো ও মন্দ উভয় প্রবণতাই রেখে দিয়েছেন। অশ্লীলতা ও তাকওয়া উভয় পথই তার সামনে খুলে দিয়েছেন। শয়তানকে পথভ্রষ্ট করার স্বাধীনতা দান করেছেন।

وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿٥﴾
فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦﴾

তাদের কাছে দয়াময়ের পক্ষ থেকে যে নতুন নসীহতই আসে, তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। এখন যখন তারা মিথ্যা আরোপ করেছে, তখন তারা যে জিনিসের প্রতি বিদ্রূপ করে চলেছে, অচিরেই তার প্রকৃত স্বরূপ (বিভিন্ন পদ্ধতিতে) তারা অবগত হবে।[৪]

সঠিক পথ দেখাবার জন্য নবুওয়াত, অহী ও কল্যাণের প্রতি আহবানের ধারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পথ বাছাই করে নেবার জন্য মানুষকে সময়োপযোগী যাবতীয় যোগ্যতা দিয়ে তাকে পরীক্ষার স্থলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন—সে চাইলে কুফরী ও ফাসেকীর পথ অথবা ঈমান ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করতে পারে। যদি আল্লাহ এমন কোন কৌশল ও ব্যবস্থা অবলম্বন করেন যা মানুষকে ঈমান আনতে ও আনুগত্য করতে বাধ্য করে দেয়, তাহলে এ পরীক্ষার সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। বাধ্যতামূলক ঈমানই যদি কাংখিত হতো, তাহলে নিদর্শন অবতীর্ণ করার কি প্রয়োজন ছিল? আল্লাহ মানুষকে এমন প্রকৃতি ও কাঠামোয় সৃষ্টি করতে পারতেন যেখানে কুফরী, নাফরমানী ও অসৎকর্মের কোন সম্ভাবনাই থাকতো না। বরং ফেরেশতাদের মতো মানুষও জন্মগত বিশ্বস্ত ও অনুগত হতো। কুরআন মজীদের বিভিন্নস্থানে এ সত্যটির প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ○

"যদি তোমার রব চাইতেন, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ঈমান আনতো। এখন তুমি কি লোকদের ঈমান আনতে বাধ্য করবে?" (ইউনুস ৯৯ আয়াত)

আরো বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ

"যদি তোমার রব চাইতেন, তাহলে সমস্ত মানুষকে একই উম্মতে পরিণত করে দিতে পারতেন। তারা তো বিভিন্ন পথেই চলতে থাকবে এবং একমাত্র তারাই পথভ্রষ্ট হবে না যাদের প্রতি রয়েছে তোমার রবের অনুগ্রহ, এ জন্যই তো তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন।" (হূদ, ১১৮ ও ১১৯ আয়াত)

(আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস ১০১ ও ১০২ এবং সূরা হূদ ১১৬ টীকা)

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝٧ إِنَّ
فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝٨ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ ۝٩

আর তারা কি কখনো পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি? আমি কত রকমের কত বিপুল পরিমাণ উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ তার মধ্যে সৃষ্টি করেছি? নিশ্চয়ই তার মধ্যে একটি নিদর্শন রয়েছে,[৫] কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়। আর যথার্থই তোমার রব পরাক্রান্তও এবং অনুগ্রহশীলও।[৬]

৪. অর্থাৎ যাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, যুক্তিসহকারে তাদেরকে কিছু বুঝাবার ও সঠিক পথ দেখাবার যে কোন চেষ্টাই করা হলে তারা প্রত্যাখ্যান ও অনাগ্রহের মাধ্যমে তার জবাব দেয়, তাদের অন্তরে জোরপূর্বক ঈমান স্থাপন করার জন্য আকাশ থেকে নিদর্শন অবতীর্ণ করে তাদের চিকিৎসা করা যায় না বরং এ ধরনের লোকদের যখন একদিকে পুরোপুরি বুঝানো হয়ে গিয়ে থাকে এবং অন্যদিকে তারা প্রত্যাখ্যানের পর্যায় অতিক্রম করে চূড়ান্ত ও প্রকাশ্য মিথ্যা আরোপ করতে এবং সেখান থেকেও অগ্রসর হয়ে প্রকৃত সত্যের প্রতি বিদ্রূপ করতে শুরু করে তখন তাদের অশুভ পরিণাম দেখিয়ে দেয়াই উচিত। এ অশুভ পরিণাম তাদেরকে এভাবেও দেখানো যেতে পারে যে, দুনিয়ায় যে সত্যের প্রতি তারা বিদ্রূপ করতো তাদের সকল বাধা–বিপত্তি উপেক্ষা করে তা বিজয় লাভ করবে। এ পরিণাম এভাবেও দেখানো যেতে পারে যে, তাদের ওপর একটি যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাযিল হবে এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। এ পরিণাম এভাবেও তাদের সামনে আসতে পারে যে, কয়েক বছর নিজেদের ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত থাকার পর তারা অনিবার্য মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে এবং অবশেষে তাদের কাছে একথা প্রমাণ হয়ে যাবে যে, যে পথে তারা নিজেদের জীবনের সমস্ত পুঁজি নিয়োগ করেছিল সেটি ছিল পুরোপুরি মিথ্যা এবং নবীগণ যে পথ পেশ করতেন এবং যার প্রতি তারা সারা জীবন ঠাট্টা–বিদ্রূপ করে এসেছে। সেটিই ছিল সত্য। এ অশুভ পরিণাম সামনে আসার যেহেতু অনেকগুলো পথ ছিল এবং বিভিন্ন লোকের সামনে তা বিভিন্ন আকারে আসতে পারে এবং চিরকালই এসেছে। তাই আয়াতে একবচনে نباء এর পরিবর্তে বহুবচনে انباء শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ যে জিনিসের প্রতি এরা বিদ্রূপ করছে তার প্রকৃত অবস্থা বিভিন্ন আকারে তারা জানতে পারবে।

৫. অর্থাৎ সত্যের অনুসন্ধানের জন্য কারো নিদর্শনের প্রয়োজন হলে তার দূরে যাবার প্রয়োজন নেই। এ পৃথিবীর শ্যামল প্রকৃতির প্রতি একবার চোখ মেলে দেখুক। সে জানতে পারবে, বিশ্ব ব্যবস্থার যে স্বরূপ নবীগণ পেশ করেন (অর্থাৎ আল্লাহর একত্ব) এবং মুশরিক বা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারীরা যে মতবাদ পেশ করে তার মধ্যে কোন্‌টি সঠিক। পৃথিবীর মাটিতে যেসব রকমারি জিনিস যে বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হচ্ছে, যেসব উপাদান

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ
أَلَا يَتَّقُونَ ﴿١١﴾

২ রুকূ'

তাদেরকে সে সময়ের কথা শুনাও যখন তোমার রব মূসাকে ডেকে বলেছিলেন,[৭] "জালেম সম্প্রদায়ের কাছে যাও—ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কাছে[৮]— তারা কি ভয় করে না?"[৯]

ও শক্তির বদৌলতে উৎপন্ন হচ্ছে, যেসব নিয়মের আওতায় উৎপাদিত হচ্ছে, তারপর তাদের বৈশিষ্ট ও গুণাবলীতে এবং অসংখ্য সৃষ্টির অসংখ্য প্রয়োজনের মধ্যে যে সুস্পষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান, সেসব জিনিস দেখে কেবলমাত্র একজন নির্বোধই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে যে, এসব কিছু কোন মহাকৌশলীর কৌশল, কোন জ্ঞানীর জ্ঞান, কোন শক্তিমানের শক্তি এবং কোন স্রষ্টার সৃষ্টি পরিকল্পনা ছাড়া শুধুমাত্র এমনিই আপনাআপনি হচ্ছে, অথবা কোন একজন খোদা এ সমগ্র পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচালনা করছেন না বরং বহু খোদার কৌশল ও ব্যবস্থাপনাই পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র এবং বায়ু ও পানির মধ্যে এ সামঞ্জস্য এবং এসব উপাদান থেকে সৃষ্ট উদ্ভিদ ও বিভিন্ন শ্রেণীর অসংখ্য প্রাণীর প্রয়োজনের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে রেখেছে। একজন বিবেক-বুদ্ধিমান মানুষ, সে যদি কোন প্রকার হঠকারী ও পূর্ব-বিদ্বেষ পোষণকারী না হয়ে থাকে, তাহলে এ দৃশ্য দেখে স্বতস্ফূর্তভাবে এই বলে চিৎকার করে উঠবে, নিশ্চয়ই এগুলো আল্লাহর অস্তিত্বের এবং এক ও একক আল্লাহর অস্তিত্বের সুস্পষ্ট আলামত। এসব নিদর্শন থাকতে আবার কোন্ ধরনের মু'জিযার প্রয়োজন, যা না দেখলে মানুষ তাওহীদের সত্যতায় বিশ্বাস করতে পারে না?

৬. অর্থাৎ তিনি এমন শক্তিধর যে, যদি কাউকে শাস্তি দিতে চান, তাহলে মুহূর্তের মধ্যেই ধ্বংস করে দেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও শাস্তি দেবার ব্যাপারে তিনি কখনো তাড়াহুড়ো করেন না, এটা তাঁর দয়ার মূর্ত প্রকাশ। বছরের পর বছর এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী কাল ধরে ঢিল দিতে থাকেন। চিন্তা করার, বুঝার ও সামলে নেবার সুযোগ দিয়ে যেতে থাকেন। সারা জীবনের সমস্ত নাফরমানী একটিমাত্র তাওবায় মাফ করে দেবার জন্য প্রস্তুত থাকেন।

৭. ভূমিকার আকারে ওপরের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর এবার ঐতিহাসিক বর্ণনার সূচনা হচ্ছে। হযরত মূসা ও ফেরাউনের কাহিনী দিয়ে এ বর্ণনার শুরু। এর মাধ্যমে বিশেষভাবে যে শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য তা নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত হযরত মূসাকে যেসব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব অবস্থার মুখোমুখি ছিলেন তার তুলনায় ছিল অনেক বেশী কঠিন। হযরত মূসা ছিলেন একটি দাস জাতির সদস্য। ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় এ জাতিকে মারাত্মকভাবে দাবিয়ে রেখেছিল। অন্যদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ছিলেন কুরাইশ সম্প্রদায়ের সদস্য। তাঁর বংশ ও পরিবার কুরাইশদের অন্যান্য বংশ ও পরিবারের সাথে পুরোপুরি সমান মর্যদায় অবস্থান করছিল। হযরত মূসা নিজেই সেই ফেরাউনের গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন এবং একটি হত্যা অভিযোগে দশ বছর আত্মগোপন করে থাকার পর তাঁকে আবার সেই বাদশাহর দরবারে গিয়ে দাঁড়াবার হুকুম দেয়া হয়েছিল যার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে তিনি প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের কোন নাজুক অবস্থার মুখোমুখি হননি। তাছাড়া ফেরাউনের সাম্রাজ্য ছিল সে সময় দুনিয়ার সবচেয়ে বড় শক্তিশালী সাম্রাজ্য। তার সাথে কুরাইশদের শক্তির কোন তুলনাই ছিল না। এ সত্ত্বেও ফেরাউন হযরত মূসার কোন ক্ষতিই করতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর সাথে সংঘর্ষ বাধিয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এ থেকে আল্লাহ কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের এ শিক্ষা দিতে চান যে, আল্লাহ যার পৃষ্ঠপোষক থাকেন তার সাথে মোকাবিলা করে কেউ জিততে পারে না। ফেরাউনই যখন মূসার মোকাবিলায় কিছুই করতে পারেনি তখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোকাবিলায় তোমাদের জয়লাভের কথা কল্পনাই করা যায় না।

দ্বিতীয়ত হযরত মূসার মাধ্যমে ফেরাউনকে যেসব নিদর্শন দেখানো হয়েছে তার চেয়ে বেশী সুস্পষ্ট নিদর্শন আর কী হতে পারে? তারপর হাজার হাজার লোকের সমাবেশে ফেরাউনেরই চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে যাদুকরদের সাথে মোকাবিলা করে একথা প্রমাণও করে দেয়া হয়েছে যে, হযরত মূসা যাকিছু দেখাচ্ছেন তা যাদু নয়। যেসব যাদুশিল্প বিশেষজ্ঞগণ ফেরাউনের নিজের সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং যাদেরকে ফেরাউন নিজেই ডেকেছিল, তারা নিজেরাই এ সত্য স্বীকার করে নিয়েছে যে, হযরত মূসার লাঠি যে অজগরে পরিণত হয়েছিল, সে ব্যাপারটি ছিল যথার্থ ও অকৃত্রিম এবং শুধুমাত্র আল্লাহর মু'জিযার মাধ্যমেই এমনটি হতে পারে, যাদুর সাহায্যে এমনটি হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। যাদুকররা ঈমান এনে এবং নিজেদের প্রাণকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশই রাখেনি যে, হযরত মূসার পেশকৃত নিদর্শন সত্যিই মু'জিযা, যাদু নয়। কিন্তু এ ব্যাপারেও যারা হঠকারিতায় লিপ্ত ছিল তারা নবীর সত্যতা স্বীকার করেনি। এখন তোমরা কেমন করে একথা বলতে পারো যে, তোমাদের ঈমান আনা আসলে কোন ইন্দ্রিয়ানুভূত মু'জিযা ও বস্তুগত নিদর্শন দেখার ওপর নির্ভরশীল? জাতীয় ও বংশগত স্বার্থ, জাহেলী বিদ্বেষ ও স্বার্থপূজার উর্ধে উঠে মানুষ খোলা মনে হক ও বাতিলের পার্থক্য অনুধাবন করে অসত্য কথা পরিহার করে সত্য ও সঠিক কথা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলে এ কিতাবে, এ কিতাব উপস্থাপনকারীর জীবনে এবং আল্লাহর বিশাল বিশ্ব-জগতে প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তি সর্বক্ষণ যেসব নিদর্শন দেখতে পায়ে তাই তার জন্য যথেষ্ট হয়। নয়তো এমন একজন হঠকারী ব্যক্তি যে সত্যের সন্ধান করে না এবং প্রবৃত্তির স্বার্থ পূজায় নিজেকে নিয়োজিত রাখে, যে তার স্বার্থে আঘাত লাগে এমন কোন সত্য গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেয়, সে যতই নিদর্শন দেখুক না কেন তার সামনে আকাশ ও পৃথিবী উল্টে দিলেও সে ঈমান আনবে না।

তৃতীয়ত এ হঠকারিতার যে পরিণাম ফেরাউন দেখেছে তা এমন কোন পরিণাম নয় যা দেখার জন্য অন্য লোকেরা পাগল হয়ে গেছে। নিজের চোখে আল্লাহর শক্তিমত্তার নিদর্শন দেখে নেবার পর যে তা মানে না সে এমনি ধরনের পরিণতিরই সম্মুখীন হয়। এখন তোমরা কি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার পরিবর্তে এর স্বাদ আস্বাদন করা পছন্দ করছো?

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ
لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ﴿١٣﴾ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾
قَالَ كَلَّا ۖ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا ۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾

সে বললো, " হে আমার রব! আমার ভয় হয় তারা আমাকে মিথ্যা বলবে, আমার বক্ষ সংকুচিত হচ্ছে এবং আমার জিহবা সঞ্চালিত হচ্ছে না। আপনি হারুনের প্রতি রিসালাত পাঠান![১০] আর আমার বিরুদ্ধে তো তাদের একটি অভিযোগও আছে। তাই আমার আশংকা হয় তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।"[১১] আল্লাহ বললেন, "কখ্খনো না, তোমরা দু'জন যাও আমার নিদর্শনগুলো নিয়ে,[১২] আমি তোমাদের সাথে সবকিছু শুনতে থাকবো।

তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আ'রাফ ১০৩ থেকে ১৩৭, সূরা ইউনুস ৭৫ থেকে ৯২, সূরা বনী ইসরাঈল ১০১ থেকে ১০৪ এবং সূরা তা–হা ৯ থেকে ৭৯ আয়াত।

৮. এ বর্ণনাভংগী ফেরাউনের সম্প্রদায়ের চরম নির্যাতনের কথা প্রকাশ করছে। "জালেম সম্প্রদায়" হিসেবে তাদেরকে পরিচিত করানো হচ্ছে। যেন তাদের আসল নামই হচ্ছে জালেম সম্প্রদায় এবং ফেরাউনের সম্প্রদায় হচ্ছে তার তরজমা ও ব্যাখ্যা।

৯. অর্থাৎ হে মূসা। দেখো কেমন অদ্ভুত ব্যাপার, এরা নিজেদেরকে সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করে দুনিয়ায় জুলুম–নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে এবং ওপরে আল্লাহ আছেন, তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, এ ভয় তাদের নেই।

১০. সূরা তা–হা–এর ২ এবং সূরা কাসাস–এর ৪ রুকূ'তে এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। সেই আলোচনাগুলোকে এর সাথে মিলিয়ে দেখলে জানা যায়, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম প্রথমত এত বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজে একাকী যেতে ভয় পাচ্ছিলেন। (আমার বক্ষ সংকুচিত হচ্ছে বাক্যটি একথাই প্রকাশ করছে) দ্বিতীয়ত তাঁর মধ্যে এ অনুভূতি ছিল, তিনি বাকপটু নন এবং অনর্গল ও দ্রুত কথা বলার ক্ষমতা তাঁর নেই। তাই তিনি হযরত হারুনকে সাহায্যকারী হিসেবে নবী বানিয়ে তাঁর সাথে পাঠাবার জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন জানান। কারণ হযরত হারুন অত্যন্ত বাকপটু, প্রয়োজনে তিনি হযরত মূসাকে সমর্থন দেবেন এবং তাঁর বক্তব্যকে সত্য প্রমাণ করে তাঁর হাত শক্তিশালী করবেন। হতে পারে, প্রথম দিকে হযরত মূসা তাঁর পরিবর্তে হযরত হারুনকে এ দায়িত্বে নিযুক্ত করার আবেদন জানান, কিন্তু পরে যখন তিনি অনুভব করেন আল্লাহ তাঁকেই নিযুক্ত করতে চান তখন আবার তাঁকে নিজের সাহায্যকারী করার আবেদন জানান। এ সন্দেহ হবার কারণ হচ্ছে, হযরত মূসা এখানে তাঁকে সাহায্যকারী করার আবেদন জানাচ্ছেন না বরং বলছেন ঃ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ "আপনি হারুনের কাছে রিসালাত পাঠান।" আর সূরা তা–হা–এ তিনি আবেদন জানান ঃ

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي
إِسْرَاءِيلَ ﴿١٧﴾ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ
سِنِينَ ﴿١٨﴾ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَٰفِرِينَ ﴿١٩﴾

ফেরাউনের কাছে যাও এবং তাকে বলো, রব্বুল আলামীন আমাদের পাঠিয়েছেন যাতে তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দাও সে জন্য।"[১৩]

ফেরাউন বললো, "আমরা কি তোমাকে আমাদের এখানে প্রতিপালন করিনি যখন ছোট্ট শিশুটি ছিলে?[১৪] তুমি নিজের জীবনের বেশ ক'টি বছর আমাদের এখানে কাটিয়েছো এবং তারপর তুমি যে কর্মটি করেছ তাতো করেছোই[১৫] তুমি বড়ই অকৃতজ্ঞ।"

وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَٰرُونَ أَخِي

"আমার জন্য আমার পরিবার থেকে একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত করে দিন, আমার ভাই হারুনকে।"

এ ছাড়া সূরা কাসাসে তিনি আবেদন জানান ঃ

وَأَخِي هَٰرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي –

"আর আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে বেশী বাকপটু, কাজেই আপনি তাকে সাহায্যকারী হিসেবে আমার সাথে পাঠিয়ে দিন, যাতে সে আমার সত্যতা প্রমাণ করে।"

এ থেকে মনে হয়, সম্ভবত এই পরবর্তী আবেদন দু'টি পরে করা হয়েছিল এবং এ সূরায় হযরত মূসা থেকে যে কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে সেটিই ছিল প্রথম কথা।

বাইবেলের বর্ণনা এ থেকে ভিন্ন। বাইবেল বলছে, ফেরাউনের জাতি তাকে মিথ্যুক বলে প্রত্যাখ্যান করতে পারে এ ভয় এবং নিজের কণ্ঠের জড়তার ওজর পেশ করে হযরত মূসা এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পুরোপুরি অস্বীকারই করে দিয়েছিলেন ঃ " হে প্রভু, বিনয় করি, অন্য যাহার হাতে পাঠাইতে চাও, এ বার্তা পাঠাও।" তারপর আল্লাহ নিজেই হযরত হারুনকে তাঁর জন্য সাহায্যকারী নিযুক্ত করে তাঁকে এ মর্মে রাজী করান যে, তাঁরা দু'ভাই মিলে ফেরাউনের কাছে যাবেন। (যাত্রা পুস্তক ৪ঃ১–১৭) আরো বেশী জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা তা–হা, ১৯ টীকা।

১১. সূরা কাসাসের ২ রুকূ'তে যে ঘটনার কথা বলা হয়েছে এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। হযরত মূসা ফেরাউনের সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিকে একজন ইসরাঈলীর সাথে

قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذًا وَّأَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ
فَوَهَبَ لِيْ رَبِّيْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢١﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ
تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ ﴿٢٢﴾

মূসা জবাব দিল, "সে সময় অজ্ঞতার মধ্যে? আমি সে কাজ করেছিলাম।[১৬] তারপর তোমাদের ভয়ে আমি পালিয়ে গেলাম। এরপর আমার রব আমাকে "হুকুম" দান করলেন[১৭] এবং আমাকে রসূলদের অন্তরভুক্ত করে নিলেন। আর তোমার অনুগ্রহের কথা যা তুমি আমার প্রতি দেখিয়েছো, তার আসল কথা হচ্ছে এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করেছিলে।"[১৮]

লড়তে দেখে একটি ঘুষি মেরেছিলেন। এতে সে মারা গিয়েছিল। তারপর হযরত মূসা যখন জানতে পারলেন, এ ঘটনার খবর ফেরাউনের সম্প্রদায়ের লোকেরা জানতে পেরেছে এবং তারা প্রতিশোধ নেবার প্রস্তুতি চালাচ্ছে তখন তিনি দেশ ছেড়ে মাদ্‌য়ানের দিকে পালিয়ে গেলেন। এখানে আট–দশ বছর আত্মগোপন করে থাকার পর যখন তাঁকে হুকুম দেয়া হলো তুমি রিসালাতের বার্তা নিয়ে সেই ফেরাউনের দরবারে চলে যাও, যার ওখানে আগে থেকেই তোমার বিরুদ্ধে হত্যার মামলা ঝুলছে, তখন যথার্থই হযরত মূসা আশংকা করলেন, বার্তা শুনাবার সুযোগ আসার আগেই তারা তাঁকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার করে ফেলবে।

১২. নিদর্শনাদি বলতে এখানে লাঠি ও সাদা হাতের কথা বলা হয়েছে। সূরা আ'রাফ ১৩, ১৪, তা–হা ১, নামল ১ ও কাসাসের ৪ রুকূ'তে এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে।

১৩. হযরত মূসা ও হারুনের দাওয়াতের দু'টি অংশ ছিল। একটি ছিল ফেরাউনকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে আহবান করা। সকল নবীর দাওয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল এটিই। দ্বিতীয়টি ছিল বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনের গোলামীর বন্ধন মুক্ত করা। এটি ছিল বিশেষভাবে কেবলমাত্র তাঁদের দু'জনেরই আল্লাহর পক্ষ হতে অর্পিত দায়িত্ব। কুরআন মজীদে কোথাও শুধুমাত্র প্রথম অংশটির উল্লেখ করা হয়েছে (যেমন সূরা নাযি'আতে) আবার কোথাও শুধুমাত্র দ্বিতীয় অংশটির।

১৪. এ থেকে হযরত মূসা যে ফেরাউনের গৃহে লালিত পালিত হয়েছিলেন, এ ফেরাউন যে সে ব্যক্তি নয়, এ চিন্তার প্রতি সমর্থন মেলে। বরং এ ফেরাউন ছিল তার পুত্র। এ যদি সে ফেরাউন হতো, তাহলে বলতো, আমি তোকে লালন–পালন করেছিলাম। কিন্তু এ বলছে, আমাদের এখানে তুমি ছিলে। আমরা তোমাকে লালন–পালন করেছিলাম। (এ বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আ'রাফ ৮৫–৯৩ টীকা)

১৫. হযরত মূসার মাধ্যমে যে হত্যা কার্য সংঘটিত হয়েছিল সেই ঘটনার প্রতি এখানে ইংগিত করা হয়েছে।

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا ۗ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٢٤﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗۤ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَ
رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٦﴾ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْۤ اُرْسِلَ
اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٢٧﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ
اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾

ফেরাউন বললো,[১৯] "রব্বুল আলামীন আবার কে?"[২০]

মূসা জবাব দিল, "আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রব এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে যা কিছু আছে তাদেরও রব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপনকারী হও।"[২১]

ফেরাউন তার আশপাশের লোকদের বললো, "তোমরা শুনছো তো?"

মূসা বললো, " তোমাদেরও রব এবং তোমাদের বাপ-দাদাদেরও রব যারা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।"[২২]

ফেরাউন (উপস্থিত লোকদের) বললো, "তোমাদের কাছে প্রেরিত তোমাদের এ রসূল সাহেবটি তো দেখছি একেবারেই পাগল।"

মূসা বললো, "পূর্ব ও পশ্চিম এবং যা কিছু তার মাঝখানে আছে সবার রব, যদি তোমরা কিছু বুদ্ধি-জ্ঞানের অধিকারী হতে।"[২৩]

১৬. মূলে وَاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ "আমি তখন গোমরাহীর মধ্যে অবস্থান করছিলাম।" অথবা "আমি সে সময় এ কাজ করেছিলাম পথভ্রষ্ট থাকা অবস্থায়।" এ ضلالت শব্দটি অবশ্যই গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতারই সমার্থক। বরং আরবী ভাষায় এ শব্দটি অজ্ঞতা, অজ্ঞানতা, ভুল, ভ্রান্তি, বিস্মৃতি ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সূরা কাসাসে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কে চিন্তা করলে এখানে ضلالت শব্দটিকে অজ্ঞতা অর্থে গ্রহণ করাই বেশী সঠিক হবে। হযরত মূসা সেই কিবতীকে একজন ইসরাঈলীর ওপর জুলুম করতে দেখে শুধুমাত্র একটি ঘুঁষি মেরেছিলেন। সবাই জানে, ঘুঁষিতে সাধারণত মানুষ মরে না। আর তিনি হত্যা করার উদ্দেশ্যেও ঘুঁষি মারেননি। ঘটনাক্রমে এতেই সে মরে গিয়েছিল। তাই সঠিক ঘটনা এ ছিল যে, এটি ইচ্ছাকৃত হত্যা ছিল না বরং ছিল ভুলক্রমে হত্যা। হত্যা নিশ্চয়ই হয়েছে কিন্তু ইচ্ছা করে হত্যা করার সংকল্প করে হত্যা করা হয়নি। হত্যা করার জন্য যেসব অস্ত্র বা উপায় ও কায়দা ব্যবহার করা

হয় অথবা যেগুলোর সাহায্যে হত্যাকার্য সংঘটিত হতে পারে তেমন কোন অস্ত্র, উপায় বা কায়দাও ব্যবহার করা হয়নি।

১৭. অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং নবুওয়াতের পরোয়ানা। "হুকুম" অর্থ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা হয় আবার আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীকে কর্তৃত্ব করার অনুমতিও (Authority) হয়। এরি ভিত্তিতে তিনি ক্ষমতা সহকারে কথা বলেন।

১৮. অর্থাৎ তোমরা যদি বনী ইসরাঈলের প্রতি জুলুম-নিপীড়ন না চালাতে তাহলে আমি প্রতিপালিত হবার জন্য তোমাদের গৃহে কেন আসতাম? তোমাদের জুলুমের কারণেই তো আমার মা আমাকে ঝুড়িতে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। নয়তো আমার লালন-পালনের জন্য কি আমার নিজের গৃহ ছিল না? তাই এ লালন-পালনের জন্য অনুগৃহীত করার খোটা দেয়া তোমার মুখে শোভা পায় না।

১৯. হযরত মূসাকে ফেরাউনের কাছে যে বাণী পৌঁছাবার জন্য পাঠানো হয়েছিল তিনি নিজেকে রব্বুল আলামীনের রসূল হিসেবে পেশ করে তা তাকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন, এ বিস্তারিত বিবরণটি এখানে বাদ দেয়া হয়েছে। একথা স্বতস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত যে, যে বাণী পৌঁছিয়ে দেবার জন্য নবীকে নিযুক্ত করা হয়েছিল তিনি নিশ্চয়ই তা পৌঁছিয়ে দিয়ে থাকবেন। তাই তা উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। সেটি বাদ দিয়ে এবার এমন সংলাপ উদ্ধৃত করা হয়েছে যা এ বাণী প্রচারের পর ফেরাউন ও মূসার মধ্যে হয়েছিল।

২০. এ প্রশ্নটি করা হয় হযরত মূসার উক্তির ওপর ভিত্তি করে। তিনি বলেন, আমি রব্বুল আলামীনের (সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মালিক, প্রভু ও শাসকের) পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি এবং এ জন্য প্রেরিত হয়েছি যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে আমার সাথে যেতে দেবে। এটি ছিল সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য। এর পরিষ্কার অর্থ ছিল, হযরত মূসা যাঁর প্রতিনিধিত্বের দাবীদার তিনি সারা বিশ্ব-জাহানের সকল সৃষ্টির ওপর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও শাসনের অধিকারী এবং তিনি ফেরাউনকে নিজের অনুগত গণ্য করে তার শাসন কর্তৃত্বের পরিসরে একজন উর্ধতন শাসনকর্তা হিসেবে কেবল হস্তক্ষেপই করছেন না বরং তার নামে এ ফরমানও পাঠাচ্ছেন যে, তোমার প্রজাদের একটি অংশকে আমার মনোনীত প্রতিনিধির হাতে সোপর্দ করো, যাতে সে তাদেরকে তোমার রাষ্ট্রসীমার বাইরে বের করে আনতে পারে। একথায় ফেরাউন জিজ্ঞেস করছে, এ সারা বিশ্ব-জাহানের মালিক ও শাসনকর্তাটি কে? যিনি মিসরের বাদশাহকে তার প্রজাকূলের অন্তরভুক্ত সামান্য এক ব্যক্তির মাধ্যমে এ ফরমান পাঠাচ্ছেন?

২১. অর্থাৎ আমি পৃথিবীতে বসবাসকারী কোন সৃষ্টি ও ধ্বংসশীল শাসন কর্তৃত্বের দাবীদারের পক্ষ থেকে আসিনি বরং এসেছি আকাশ ও পৃথিবীর মালিকের পক্ষ থেকে। যদি তোমরা বিশ্বাস করো এ বিশ্ব-জাহানের কোন স্রষ্টা-মালিক ও শাসনকর্তা আছেন তাহলে বিশ্ববাসীর রব কে একথা বুঝা তোমাদের পক্ষে কঠিন হবার কথা নয়।

২২. হযরত মূসা (আ) ফেরাউনের দরবারীদেরকে সম্বোধন করে এ ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে ফেরাউন বলেছিল, তোমরা শুনছো? হযরত মূসা তাদেরকে বলেন, আমি এমন সব মিথ্যা রবের প্রবক্তা নই যারা আজ আছে, কাল ছিল না এবং কাল ছিল কিন্তু আজ নেই। তোমাদের এ ফেরাউন যে আজ তোমাদের রবে পরিণত হয়েছে সে

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ
أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣١﴾

ফেরাউন বললো, "যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ বলে মেনে নাও, তাহলে কারাগারে যারা পচে মরছে তোমাকেও তাদের দলে ভিড়িয়ে দেবো।"২৪

মূসা বললো, "আমি যদি তোমার সামনে একটি সুস্পষ্ট জিনিস আনি তবুও?"২৫

ফেরাউন বললো, " বেশ, তুমি আনো যদি তুমি সত্যবাদী হও।"২৬

কাল ছিল না এবং কাল তোমাদের বাপ-দাদারা যেসব ফেরাউনকে রবে পরিণত করেছিল তারা আজ নেই। আমি কেবলমাত্র সেই রবের সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও শাসনাধিকার স্বীকার করি যিনি আজও তোমাদের এবং এই ফেরাউনের রব এবং এর পূর্বে তোমাদের ও এর যে বাপ-দাদারা চলে গেছেন তাদের সবারও রব ছিলেন।

২৩. অর্থাৎ আমাকে পাগল গণ্য করা হচ্ছে। কিন্তু আপনারা যদি বুদ্ধিমান হয়ে থাকেন, তাহলে নিজেরাই ভেবে দেখুন, প্রকৃতপক্ষে কি এ বেচারা ফেরাউন যে পৃথিবীর সামান্য একটু ভূখণ্ডের বাদশাহ হয়ে বসেছে সে রব? অথবা পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক এবং মিসরসহ পূর্ব ও পশ্চিম দ্বারা পরিব্যাপ্ত প্রত্যেকটি জিনিসের মালিক যিনি তিনি রব? আমি তো তাঁরই শাসন কর্তৃত্ব মানি এবং তাঁরই পক্ষ থেকে এ হুকুম তাঁর এক বান্দার কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি।

২৪. এ কথোপকথনটি বুঝতে হলে এ বিষয়টি সামনে থাকতে হবে যে, আজকের মতো প্রাচীন যুগেও "উপাস্য"-এর ধারণা কেবলমাত্র ধর্মীয় অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ উপাস্য শুধুমাত্র পূজা, আরাধনা, মানত ও নযরানা লাভের অধিকারী। তার অতি প্রাকৃতিক প্রাধান্য ও কর্তৃত্বের কারণে মানুষ নিজের ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে তার কাছে সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের জন্য প্রার্থনা করবে, এ মর্যাদাও তার আছে। কিন্তু কোন উপাস্য আইনগত ও রাজনৈতিক দিক দিয়েও প্রাধান্য বিস্তার করার এবং পার্থিব বিষয়াদিতে তার ইচ্ছামতো যে কোন হুকুম দেবে আর তার বিধি-নিষেধকে উচ্চতর আইন হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে তার সামনে মানুষকে মাথা নত করতে হবে। এ কথা পৃথিবীর ভুয়া শাসনকর্তারা আগেও কখনো মেনে নেয়নি এবং আজো মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। তারা সবসময় একথা বলে এসেছে, দুনিয়ার বিভিন্ন ব্যাপারে আমরা পূর্ণ স্বাধীন। কোন উপাস্যের আমাদের রাজনীতিতে ও আইনে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। এটিই ছিল পার্থিব রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যসমূহের সাথে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও

তাঁদের অনুসারী সংস্কারকদের সংঘাতের আসল কারণ। তাঁরা এদের কাছ থেকে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করেছেন এবং এরা এর জবাবে যে কেবলমাত্র নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের দাবী পেশ করতে থেকেছে তাই নয় বরং এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে অপরাধী ও বিদ্রোহী গণ্য করেছে, যে তাদের ছাড়া অন্য কাউকে আইন ও রাজনীতির ময়দানে উপাস্য হিসেবে মেনে নিয়েছে। এ ব্যাখ্যা থেকে ফেরাউনের এ কথাবার্তার সঠিক মর্ম ভালোভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে। যদি কেবলমাত্র পূজা-অর্চনা ও নযরানা-মানত পেশ করার ব্যাপার হতো, তাহলে হযরত মূসা অন্য দেবতাদের বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে এর হকদার মনে করেন এটা তার কাছে কোন আলোচনার বিষয়ই হতো না। যদি কেবলমাত্র এ অর্থেই মূসা আলাইহিস সালাম তাকে ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাওহীদমুখী হবার দাওয়াত দিতেন তাহলে তার ক্রোধোন্মত্ত হবার কোন কারণই ছিল না। বড়জোর সে যদি কিছু করতো তাহলে নিজের পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকার করতো অথবা হযরত মূসাকে বলতো, আমার ধর্মের পণ্ডিতদের সাথে বিতর্ক করে নাও। কিন্তু যে জিনিসটি তাঁকে ক্রোধোন্মত্ত করে দিয়েছে সেটি ছিল এই যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম রব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে পেশ করে তাকে এমনভাবে একটি রাজনৈতিক হুকুম পৌঁছিয়ে দিয়েছেন যেন সে একজন অধীনস্থ শাসক এবং একজন উর্ধতন শাসনকর্তার দূত এসে তার কাছে এ হুকুমের প্রতি আনুগত্য করার দাবী করছেন। এ অর্থে সে নিজের ওপর কোন রাজনৈতিক ও আইনগত প্রাধান্য মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। বরং তার কোন প্রজা তাকে ছাড়া অন্য কাউকে উর্ধতন শাসনকর্তা হিসেবে মেনে নেবে, এটাও সে বরদাশত করতে পারতো না। তাই সে প্রথমে চ্যালেঞ্জ করলো "রব্বুল আলামীনে"র পরিভাষাকে। কারণ তাঁর পক্ষ থেকে যে বার্তা নিয়ে আসা হয়েছিল তার মধ্যে শুধুমাত্র ধর্মীয় উপাসনার নয় বরং সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ভাবধারা সুস্পষ্ট ছিল। তারপর হযরত মূসা যখন বারবার ব্যাখ্যা করে বললেন, তিনি যে রব্বুল আলামীনের বার্তা এনেছেন তিনি কে? তখন সে পরিষ্কার হুমকি দিল, মিসর দেশে তুমি যদি আমার ছাড়া অন্য কারো সার্বভৌম কর্তৃত্বের নাম উচ্চারণ করবে তাহলে তোমাকে জেলখানার ভাত খেতে হবে।

২৫. অর্থাৎ যদি আমি সত্যিই সমগ্র বিশ্ব-জাহানের, আকাশ ও পৃথিবীর এবং পূর্ব ও পশ্চিমের রবের পক্ষ থেকে যে আমাকে পাঠানো হয়েছে এর সপক্ষে সুস্পষ্ট আলামত পেশ করি, তাহলে এ অবস্থায়ও কি আমার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করা হবে এবং আমাকে কারাগারে পাঠানো হবে?

২৬. হযরত মূসার প্রশ্নের জবাবে ফেরাউনের এ উক্তি স্বতস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করে যে, প্রাচীন ও আধুনিক কালের মুশরিকদের থেকে তার অবস্থা ভিন্নতর ছিল না। অন্য সব মুশরিকদের মতোই সে আল্লাহকে অতিপ্রাকৃত অর্থে সকল উপাস্যের উপাস্য বলে বিশ্বাস করতো এবং তাদের মতো একথাও স্বীকার করতো যে, বিশ্ব-জাহানে সকল দেবতার চাইতে

فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿٣٢﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿٣٣﴾

(তার মুখ থেকে একথা বের হতেই) মূসা নিজের লাঠিটি ছুড়ে মারলো। তৎক্ষণাৎ সেটি হলো একটি সাক্ষাত অজগর।[২৭] তারপর সে নিজের হাত (বগলের ভেতর থেকে) টেনে বের করলো এবং তা সকল প্রত্যক্ষদর্শীর সামনে চক্‌মক্ করছিল।[২৮]

তাঁর শক্তি বেশী। তাই হযরত মূসা তাঁকে বলেন, যদি তুমি আমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত বলে বিশ্বাস না করো, তাহলে আমি এমন সব নিদর্শন পেশ করবো যা থেকে আমি যে তাঁর প্রেরিত তা প্রমাণ হয়ে যাবে। আর এ কারণে সে-ও জবাব দেয়, ঠিক আছে যদি তোমার দাবী সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আনো তোমার নিদর্শন। অন্যথায় সোজা কথা, যদি সে আল্লাহর অস্তিত্ব অথবা তাঁর বিশ্ব-জাহানের মালিক হবার ব্যাপারেই সন্দিহান হতো, তাহলে নিদর্শনের প্রশ্নই উঠতে পারতো না। নিদর্শনের প্রশ্ন তো তখনই সামনে আসতে পারে যখন আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হওয়া স্বীকৃত হয় কিন্তু হযরত মূসা তাঁর প্রেরিত কি না এ ব্যাপারে প্রশ্ন দেখা দেয়।

২৭. কুরআন মজীদে কোন জায়গায় এ জন্য حَيَّةٌ (সাপ) আবার কোথাও جان (সাধারণত ছোট ছোট সাপকে বলা হয়) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর এখানে বলা হচ্ছে ثعبان (অজগর)। ইমাম রাযী এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন حية আরবী ভাষায় সর্পজাতির সাধারণ নাম। তা ছোট সাপও হতে পারে আবার বড় সাপও হতে পারে। আর ثعبان শব্দ ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, দৈহিক আয়তন ও স্থূলতার দিক দিয়ে তা ছিল অজগরের মতো। অন্যদিকে جان শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ছোট সাপের মতো তার ক্ষীপ্রতা ও তেজস্বীতার জন্য।

২৮. কোন কোন তাফসীরকার ইহুদীদের বর্ণনায় প্রভাবিত হয়ে بيضاء এর অর্থ করেছেন "সাদা" এবং এর অর্থ এভাবে নিয়েছেন, বগল থেকে বের হতেই স্বাভাবিক রোগমুক্ত হাত ধবল কুষ্ঠরোগীর মতো সাদা হয়ে গেলো? কিন্তু ইবনে জারীর, ইবনে কাসীর, যামাখ্‌শারী, রাযী, আবুস সাউদ ঈমাদী, আলূসী ও অন্যান্য বড় বড় মুফাস্‌সিরগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, এখানে بيضاء মানে হচ্ছে, উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময়। যখনই হযরত মূসা বগল থেকে হাত বের করলেন তখনই অকস্মাত সমগ্র পরিবেশ আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং অনুভূত হতে লাগলো যেন সূর্য উদিত হয়েছে।

(আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা তা-হা, ১৩ টীকা)।

قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهٗٓ إِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ
أَرْضِكُم بِسِحْرِهٖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾ قَالُوٓا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ
فِي الْمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ ﴿٣٦﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ
لِمِيقَٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾

৩ রকূ'

ফেরাউন তার চারপাশে উপস্থিত সরদারদেরকে বললো, "এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই একজন দক্ষ যাদুকর। নিজের যাদুর জোরে সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়।[২৯] এখন বলো তোমরা কী হুকুম দিচ্ছো?"[৩০]

তারা বললো, "তাকে ও তার ভাইকে আটক করো এবং শহরে শহরে হরকরা পাঠাও। তারা প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে তোমার কাছে নিয়ে আসুক।"

তাই একদিন নির্দিষ্ট সময়ে[৩১] যাদুকরদেরকে একত্র করা হলো।

২৯. মু'জিযা দু'টির শ্রেষ্ঠত্ব এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে। মাত্র এক মুহূর্ত আগে নিজের এক সাধারণ প্রজাকে দরবারের মধ্যে রিসালাতের কথাবার্তা ও বনী ইসরাঈলের মুক্তির দাবী করতে দেখে ফেরাউন তাকে পাগল ঠাউরিয়েছিল। (কারণ তার দৃষ্টিতে একটি গোলাম জাতির কোন ব্যক্তির পক্ষে তার মতো পরাক্রমশালী বাদশাহর সামনে এ ধরনের দুসাহস করা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।) এবং এই বলে ধমক দিচ্ছিল, যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য হিসেবে মেনে নাও, তাহলে তোমাকে কারাগারে আটকে মারবো। আর এখন মাত্র এক মুহূর্ত পরে এ নিদর্শনগুলো দেখার সাথে সাথেই তার মধ্যে এমন ভীতির সঞ্চার হলো যে, নিজের বাদশাহী ও রাজ্য হারাবার ভয়ে সে ভীত হয়ে পড়লো এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে প্রকাশ্য দরবারে নিজের অধস্তন কর্মচারীদের সামনে সে যে কেমন অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে চলছে সে অনুভূতিই সে হারিয়ে ফেললো। বনী ইসরাঈলের মতো একটি নির্যাতিত-নিপীড়িত জাতির দু'টি লোক যুগের সবচেয়ে বড় শক্তিশালী বাদশাহর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাদের সাথে কোন লোক-লস্কর ছিল না। তাদের জাতির মধ্যে কোন সক্রিয়তা ও প্রাণশক্তি ছিল না। দেশের কোথাও বিদ্রোহের সামান্যতম আলামতও ছিল না। দেশের বাইরের অন্য কোন রাষ্ট্রীয় শক্তিও তাদের পৃষ্ঠপোষক ছিল না। এ অবস্থায় শুধুমাত্র একটি লাঠিকে সর্পে পরিণত হতে ও একটি হাতকে ঔজ্জ্বল্য বিকীরণ করতে দেখে অকস্মাত তার এই বলে চিৎকার করে ওঠা যে, এ দু'টি সহায়-সম্বলহীন লোক আমাকে সিংহাসনচ্যুত করবে এবং সমগ্র শাসক শ্রেণীকে ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে বেদখল করে দেবে—একথার কী অর্থ হতে পারে? এ ব্যক্তি যাদুবলে এসব করে ফেলবে— একথা বলাও তার অত্যধিক হতবুদ্ধি হওয়ারই

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا
هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿٤٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن
كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ لَهُم
مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٤٣﴾

এবং লোকদের বলা হলো, "তোমরাও কি সমাবেশে যাবে?[৩২] হয়তো আমরা যাদুকরদের ধর্মের অনুসরণের ওপরই বহাল থাকবো, যদি তারা বিজয়ী হয়।"[৩৩]

যখন যাদুকররা ময়দানে এলো, তারা ফেরাউনকে বললো, "আমরা কি পুরস্কার পাবো, যদি আমরা বিজয়ী হই?"[৩৪]

সে বললো, "হাঁ, আর তোমরা তো সে সময় নিকটবর্তীদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে।"[৩৫]

মূসা বললো, " তোমাদের যা নিক্ষেপ করার আছে নিক্ষেপ করো।"

প্রমাণ। যাদুবলে দুনিয়ায় কখনো কোথাও কোন রাজনৈতিক বিপ্লব সাধিত হয়নি, কোন দেশ বিজিত হয়নি, কোন যুদ্ধ জয়ও হয়নি। যাদুকররা তো তার নিজের দেশেই ছিল এবং তারা বড় বড় তেলেসমাতি দেখাতে পারতো। কিন্তু সে নিজে জানতো, ভেল্কিবাজীর খেলা দেখিয়ে পুরস্কার নেয়া ছাড়া তাদের আর কোন কৃতিত্ব নেই। রাজ্য তো দূরের কথা, সে বেচারারা তো রাজ্যের একজন সামান্য পুলিশ কনস্টেবলকেও চ্যালেঞ্জ করার হিম্মত রাখতো না।

৩০. ফেরাউন যে অত্যধিক হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল, এ বাক্যাংশটি সে কথাই প্রকাশ করে। সে নিজেকে উপাস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিল এবং এদের সবাইকে করে রেখেছিল নিজের গোলাম। কিন্তু এখন উপাস্য সাহেব ভয়ের চোটে অস্থির হয়ে বান্দাদের কাছেই জিজ্ঞেস করছে তোমরা কি হুকুম দাও। অন্য কথায় বলা যায়, সে যেন বলতে চাচ্ছে, আমার বুদ্ধি তো এখন বিকল হয়ে গেছে, তোমরাই বলো আমি কিভাবে এ বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

৩১. সূরা তা-হা-এ উল্লেখিত হয়েছে, কিবতীদের জাতীয় ঈদের দিনকে (يوم الزينة) এ প্রতিদ্বন্দ্বীতার দিন হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে উৎসব ও মেলা উপলক্ষে আগত সমস্ত লোকেরা এ বিরাট প্রতিযোগিতা দেখতে পাবে এটাই ছিল উদ্দেশ্য। এ জন্য সময় নির্ধারিত করা হয়েছিল সূর্য আকাশে উঠে চারদিকে আলো ছড়িয়ে পড়ার পর। এভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে সবার চোখের সামনে উভয় পক্ষের শক্তির প্রদর্শনী হবে এবং আলোর অভাবে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হবার অবকাশ থাকবে না।

৩২. অর্থাৎ শুধুমাত্র ঘোষণা ও বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করা হয়নি বরং জনগণকে উদ্দীপিত ও উত্তেজিত করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখার জন্য ময়দানে হাজির করার উদ্দেশ্যে লোকও নিয়োগ করা হয়। এ থেকে জানা যায়, প্রকাশ্য দরবারে হযরত মূসা যেসব মু'জিযা দেখিয়েছিলেন সেগুলোর খবর সাধারণ লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং দেশের লোকেরা এতে প্রভাবিত হতে চলেছে বলে ফেরাউনের মনে আশংকা দেখা দিয়েছিল। তাই সে চাচ্ছিল বেশী বেশী জনসমাগম হোক এবং লোকেরা দেখে নিক লাঠির সাপে পরিণত হওয়া কোন বড় কথা নয়, আমাদের দেশের প্রত্যেক যাদুকরও এ ভেল্কিবাজী দেখাতে পারে।

৩৩. এ বাক্যাংশটি প্রমাণ করছে যে, ফেরাউনের দরবারের যেসব লোক হযরত মূসার মু'জিযা দেখেছিল এবং দরবারের বাইরের যেসব লোকের কাছে এর নির্ভরযোগ্য খবর পৌঁছে গিয়েছিল, নিজেদের পিতৃপুরুষের ধর্মের ওপর তাদের বিশ্বাসের ভিত্ নড়ে যাচ্ছিল এবং এখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যে কাজ করেছেন তাদের যাদুকররাও কোনক্রমে তা করিয়ে দেখিয়ে দিক, এরি ওপর তাদের ধর্মের টিকে থাকা নির্ভর করছিল। ফেরাউন ও তার রাজ্যের কর্মকর্তাগণ একে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকর মোকাবিলা মনে করছিল। তাদের প্রেরিত লোকেরা সাধারণ মানুষের মগজে এ চিন্তা প্রবেশ করাবার চেষ্টা করছিল যে, যাদুকররা যদি কামিয়াব হয়ে যায়, তাহেল মূসার ধর্ম গ্রহণ করার হাত থেকে আমরা বেঁচে যাবো, অন্যথায় আমাদের ধর্ম ও বিশ্বাসের অপমৃত্যু ঘটবে।

৩৪. এ ছিল মুশরিকী ধর্মের রক্ষকদের অবস্থা। মূসা আলাইহিস সালামের হামলা থেকে তারা নিজেদের ধর্মকে বাঁচাতে চাচ্ছিল। এ জন্য চূড়ান্ত মোকাবিলার সময় তাদের মধ্যে যে পবিত্র আবেগের সঞ্চার হয়েছিল তা ছিল এই যে, তারা বাজী জিততে পারলে সরকার বাহাদুর থেকে কিছু পুরস্কার পাওয়া যাবে।

৩৫. আর এ ছিল সমকালীন বাদশাহর পক্ষ থেকে ধর্ম ও জাতির খিদমতগারদেরকে প্রদান করার মতো সবচেয়ে বড় ইনাম। অর্থাৎ কেবল টাকা পয়সাই পাওয়া যাবে না, দরবারে আসনও পাওয়া যাবে। এভাবে ফেরাউন ও তার যাদুকররা প্রথম পর্যায়েই নবী ও যাদুকরের বিরাট নৈতিক পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। একদিকে ছিল উন্নত মনোবল। বনী ইসরাঈলের মতো একটি নিগৃহীত জাতির এক ব্যক্তি দশ বছর যাবত নরহত্যার অভিযোগে আত্মগোপন করে থাকার পর ফেরাউনের দরবারে বুক টান করে এসে দাঁড়াচ্ছেন। নির্ভীক কণ্ঠে বলে যাচ্ছেন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাকে পাঠিয়েছেন, বনী ইসরাঈলকে আমার হাতে সোপর্দ করে দাও। ফেরাউনের সাথে মুখোমুখি বিতর্ক করতে তিনি সামান্যতম সংকোচ অনুভব করছেন না। তার হুমকি ধমকিকে তিলার্ধও গুরুত্ব দিচ্ছেন না। অন্যদিকে হীন মনোবলের প্রকাশ। বাপ–দাদার ধর্মকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে যাদুকরদেরকে ফেরাউনের দরবারেই ডেকে পাঠানো হচ্ছে। এরপরও হাত জোড় করে তারা বলছে, জনাব! কিছু ইনাম তো মিলবে? আর জবাবে অর্থ পুরস্কার ছাড়াও রাজ নৈকট্যও লাভ করা যাবে শুনে খুশীতে বাগেবাগ। নবী কোন্ প্রকৃতির মানুষ এবং তাঁর মোকাবিলায় যাদুকররা কেমন ধরনের লোক, এ দু'টি বিপরীত চরিত্র আপনা আপনি একথা প্রকাশ করে দিচ্ছে। কোন ব্যক্তি নির্লজ্জতার সকল সীমালংঘন না করলে নবীকে যাদুকর বলার দুসাহস দেখাতে পারে না।

فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾
فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ
سَاجِدِينَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿٤٨﴾

তারা তখনই নিজেদের দড়িদড়া ও লাঠিসোঁটা নিক্ষেপ করলো এবং বললো, "ফেরাউনের ইজ্জতের কসম, আমরাই বিজয়ী হবো।"৩৬ তারপর মূসা নিজের লাঠিটি নিক্ষেপ করলো। অকস্মাত সে তাদের কৃত্রিম কীর্তিগুলো গ্রাস করতে থাকলো। তখন সকল যাদুকর স্বতস্ফূর্তভাবে সিজদাবনত হয়ে পড়লো এবং বলে উঠলো, "মেনে নিলাম আমরা রব্বুল আলামীনকে — মূসা ও হারুনের রবকে।"৩৭

৩৬. এখানে এ আলোচনা বাদ দেয়া হয়েছে যে, হযরত মূসার মুখে এ বাক্য উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই যখন যাদুকররা নিজেদের দড়িদড়া ও লাঠিসোঁটা ছুঁড়ে দিল তখন অকস্মাত সেগুলোকে বহু সাপের আকারে কিলবিল করতে করতে হযরত মূসার দিকে দৌড়ে যেতে দেখা গেলো। কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এর বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

"যখন তারা নিজেদের মন্ত্র নিক্ষেপ করলো তখন লোকদের দৃষ্টিকে যাদুগ্রস্ত করে দিল, সবাইকে আতংকিত করে ফেললো এবং বিরাট যাদু বানিয়ে নিল।"

সূরা তা-হা-এ এমন এক সময়ের চিত্র আঁকা হয়েছে যখন ঃ

فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ○
فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ ○

"সহসা তাদের যাদুর ফলে হযরত মূসার মনে হলো যেন তাদের রশি ও লাঠিগুলো দৌড়ে চলে আসছে। এতে মূসা মনে মনে ভয় পেয়ে গেলো।"

৩৭. এটা হযরত মূসার মোকাবিলায় তাদের পক্ষ থেকে নিছক পরাজয়ের স্বীকৃতি ছিল না। ব্যাপারটা এমন ছিল না যে, কেউ বলতো, আরে ছেড়ে দাও, একজন বড় যাদুকর ছোট যাদুকরদেরকে হারিয়ে দিয়েছে। বরং তাদের সিজদানত হয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আনা যেন প্রকাশ্যে সর্ব সমক্ষে হাজার হাজার মিসরবাসীর সামনে একথার স্বীকৃতি ও ঘোষণা দিয়ে দেয়া যে, মূসা যা কিছু এনেছেন তা আমাদের যাদু শিল্পের অন্তরগত নয়, এ কাজ তো একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কুদরতেই হতে পারে।

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ
فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّ
لَاُوصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٩﴾

ফেরাউন বললো, "তোমরা মূসার কথা মেনে নিলে আমি তোমাদের অনুমতি দেবার আগেই। নিশ্চয়ই এ তোমাদের প্রধান, যে তোমাদের যাদু শিখিয়েছে।[৩৮] বেশ, এখনই তোমরা জানবে। আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করাবো এবং তোমাদের সবাইকে শূলবিদ্ধ করবো।"[৩৯]

৩৮. এখানে যেহেতু বক্তব্য পরম্পরার সাথে সম্পর্ক রেখে কেবলমাত্র এতটুকু দেখানো উদ্দেশ্য যে, কোন জেদী ও হঠকারী ব্যক্তি একটি সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখার এবং তার মু'জিযা হবার সপক্ষে স্বয়ং যাদুকরদের সাক্ষ শুনার পরও কিভাবে তাকে যাদু আখ্যা দিয়ে যেতে থাকে, তাই ফেরাউনের শুধুমাত্র এতটুকু উক্তি এখানে উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু সূরা আ'রাফে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا –

"এ একটি ষড়যন্ত্র, যা তোমরা সবাই মিলে এ রাজধানী নগরে তৈরি করেছো, যাতে এর মালিকদেরকে কর্তৃত্ব থেকে বেদখল করে দাও।"

এভাবে ফেরাউন সাধারণ জনতাকে একথা বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করে যে, যাদুকরদের এ ঈমান মু'জিযার কারণে নয় বরং এটি নিছক একটি যোগসাজশ। এখানে আসার আগে মূসার সাথে এদের এ মর্মে সমঝোতা হয়ে গিয়েছিল যে, এখানে এসে এরা মূসার মোকাবিলায় পরাজয় বরণ করে নেবে এবং এর ফলে যে রাজনৈতিক বিপ্লব সাধিত হবে তার সুফল এরা উভয় গোষ্ঠী মিলে ভোগ করবে।

৩৯. যাদুকররা আসলে মূসা আলাইহিস সালামের সাথে যোগসাজশ করে প্রতিযোগিতায় নেমেছিল, নিজের এ অভিমতকে সফল করে তোলার জন্য ফেরাউন এ ভয়ংকর হুমকি দিয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল, এভাবে এরা প্রাণ বাঁচাবার জন্য ষড়যন্ত্র স্বীকার করে নেবে এবং এর ফলে পরাজিত হবার সাথে সাথে তাদের সিজদাবনত হয়ে ঈমান আনার ফলে হাজার হাজার দর্শকের ওপর যে নাটকীয় প্রভাব পড়েছিল তা নির্মূল হয়ে যাবে। এ দর্শকবৃন্দ স্বয়ং ফেরাউনের আমন্ত্রণে এ চূড়ান্ত মোকাবিলা উপভোগ করার জন্য সমবেত হয়েছিল। তার প্রেরিত লোকেরাই তাদেরকে এ ধারণা দিয়েছিল যে, মিসরীয় জাতির ধর্ম বিশ্বাস এখন এ যাদুকরদের সহায়তার ওপর নির্ভরশীল রয়েছে। এরা সফলকাম হলে জাতি তার পূর্বপুরুষের ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে, অন্যথায় মূসার দাওয়াতের সয়লাব তাকে ও তার সাথে ফেরাউনের রাজত্বকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

قَالُوا لَا ضَيْرَ ۖ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا
أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾

তারা জবাব দিল, "কোন পরোয়া নেই, আমরা নিজেদের রবের কাছে পৌঁছে যাবো। আর আমরা আশা করি আমাদের রব আমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন, কেননা, সবার আগে আমরা ঈমান এনেছি।"[৪০]

৪০. অর্থাৎ আমাদের একদিন তো আমাদের রবের কাছে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। এখন যদি তুমি আমাদের হত্যা করো, তাহলে এর ফলে যেদিনটি আসবার ছিল সেটি আজ এসে যাবে, এর বেশী আর কিছু হবে না। এ অবস্থায় ভয় পাওয়ার প্রশ্ন কেন উঠবে? বরং উল্টো আমাদের তো মাগফেরাত পাওয়ার ও গোনাহ মাফের আশা আছে। কারণ আজ এখানে সত্য প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই আমরা তা মেনে নেবার ক্ষেত্রে এক মুহূর্তও দেরী করিনি এবং এ বিশাল সমাবেশে আমরাই প্রথমে অগ্রবর্তী হয়ে ঈমান এনেছি।

ফেরাউন ঢেঁড়া পিটিয়ে যে জনগোষ্ঠীকে সমবেত করেছিল তাদের সবার সামনে যাদুকরদের এ জবাব দু'টি কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে ঃ

এক ঃ ফেরাউন একজন মহা মিথ্যুক, হঠকারী ও প্রতারক। সে নিজে ফায়সালা করার জন্য যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল তাতে মূসা আলাইহিস সালামের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বিজয়কে সোজাভাবে মেনে নেবার পরিবর্তে এখন সে সহসা একটি মিথ্যা ষড়যন্ত্রের গল্প ফেঁদে বসেছে এবং হত্যা ও শাস্তির হুমকি দিয়ে জোরপূর্বক তার স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করছে। এ গল্প যদি সামান্যও সত্য হতো, তাহলে যাদুকররা হাত-পা কাটাবার ও শূলবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দেবার জন্য এত হন্যে হয়ে যেতো না। এ ধরনের কোন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যদি কোন রাজত্ব লাভের লোভ থেকে থাকতো, তাহলে এখন তো আর তার কোন অবকাশ নেই। কারণ রাজত্ব এখন যাদের ভাগ্যে আছে তারাই তা ভোগ করবে, এ ভাগ্যাহতরা তো এখন শুধুমাত্র নিহত হওয়া ও শাস্তি লাভ করার জন্য রয়ে গেছে। এ ভয়াবহ বিপদ মাথায় নিয়েও এ যাদুকরদের নিজেদের ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা পরিষ্কারভাবে একথা প্রমাণ করে যে, তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। বরং এ ক্ষেত্রে সত্য কথা হচ্ছে, যাদুকররা নিজেদের যাদুবিদ্যায় পারদর্শী হবার কারণে যথার্থই জানতে পেরেছে যে, মূসা আলাইহিস সালাম যা কিছু দেখিয়েছেন তা কোনক্রমেই যাদু নয় বরং প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কুদরতের প্রকাশ।

দুই ঃ এ সময় দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত হাজার হাজার জনতার সামনে যে কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সেটি ছিল এই যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথেই এ যাদুকরদের চরিত্রে কেমন নৈতিক বিপ্লব সাধিত হয়ে গেলো। ইতিপূর্বে তাদের অবস্থা ছিল ঃ তারা পূর্বপুরুষদের ধর্মকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিল এবং এ জন্য ফেরাউনের সামনে হাত জোড় করে ইনাম চাইছিল। আর এখন

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴿٥٢﴾ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ
فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِنَّهُمْ
لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴿٥٦﴾

৪ রুকূ'

আমি ৪১ মূসার কাছে অহী পাঠিয়েছি এই মর্মে ঃ "রাতারাতি আমার বান্দাদের নিয়ে বের হয়ে যাও, তোমাদের পিছু নেয়া হবে।"৪২ এর ফলে ফেরাউন (সৈন্য একত্র করার জন্য) নগরে নগরে নকীব পাঠালো (এবং বলে পাঠালো ঃ) এরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক, এরা আমাদের নারাজ করেছে এবং আমরা একটি দল, সদা-সতর্ক থাকাই আমাদের রীতি।"৪৩

মুহূর্তের মধ্যে তাদের হিম্মত ও সংকল্পের বলিষ্ঠতা এমনি উন্নত পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যার ফলে সেই ফেরাউন তাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল, তার সমগ্র রাজশক্তিকে তারা হেয় প্রতিপন্ন করেছিল এবং নিজেদের ঈমানের খাতিরে মৃত্যু ও নিকৃষ্টতম শারীরিক শাস্তি বরদাশ্‌ত করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। এ নাজুক মনস্তাত্বিক পরিবেশে মিসরীয়দের মুশরিকী ধর্মের লাঞ্ছনা এবং মূসা আলাইহিস সালাম প্রচারিত সত্য দীনের বলিষ্ঠ প্রচারণা সম্ভবত এর চাইতে বেশী আর হতে পারতো না।

৪১. ওপরে বর্ণিত ঘটনার পর হিজরতের কথা শুরু করার কারণে কারো মনে এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয় যে, এর পরপরই হযরত মূসাকে বনী ইসরাঈলসহ মিসর থেকে বের হয়ে আসার হুকুম দেয়া হয়। আসলে এখানে মাঝখানে কয়েক বছরের ইতিহাস আলোচনা করা হয়নি। সূরা আ'রাফের ১৫-১৬ এবং সূরা ইউনুসের ৯ রুকূ'তে এ আলোচনা এসেছে। এর একটি অংশ সামনের দিকে সূরা মু'মিনের ২-৫ ও সূরা যুখরুফের ৫ রুকূ'তেও আসছে। এখানে যেহেতু বক্তব্য পরম্পরার সাথে সম্পর্ক রেখে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ দেখে নেবার পরও যে ফেরাউন হঠকারিতার পথ অবলম্বন করেছিল তার পরিণতি কি হয়েছিল এবং যে দাওয়াতের পেছনে আল্লাহর শক্তি নিয়োজিত ছিল তা কিভাবে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌছে গেলো সেকথা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য, তাই ফেরাউন ও হযরত মূসার সংঘাতের প্রাথমিক পর্যায় বর্ণনা করার পর এখন ঘটনা সংক্ষেপ করে এর শুধুমাত্র শেষ দৃশ্য দেখিয়ে দেয়া হচ্ছে।

৪২. উল্লেখ্য, বনী ইসরাঈলের জনবসতি মিসরের কোন এক জায়গায় একসাথে ছিল না। বরং দেশের সমস্ত শহরে ও পল্লীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। বিশেষ করে মামফিস (MAMPHIS) থেকে রাম্‌সিস পর্যন্ত এলাকায় তাদের বৃহত্তর অংশ বসবাস করতো। এ এলাকা জুশান নামে পরিচিত ছিল। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা আ'রাফ, বনী ইসরাঈলের নির্গমন পথের নকশা) কাজেই হযরত মূসাকে যখন হুকুম দেয়া হয়েছিল যে,

فَأَخْرَجْنٰهُم مِّن جَنّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾ كَذٰلِكَ وَأَوْرَثْنٰهَا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿٥٩﴾

এভাবে আমি তাদেরকে বের করে এনেছি তাদের বাগ-বাগীচা, নদী-নির্ঝরিনী, ধন-ভাণ্ডার ও সুরম্য আবাসগৃহসমূহ থেকে।[৪৪] এসব ঘটেছে তাদের সাথে আর (অন্যদিকে) আমি বনী ইসরাঈলকে ঐ সব জিনিসের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছি।[৪৫]

তোমাকে এবার বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর থেকে বের হয়ে যেতে হবে, তখন সম্ভবত তিনি দেশের সমস্ত বনী ইসরাঈলী বসতিতে সবাইকে নিজ নিজ জায়গা থেকে হিজরত করার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ জন্য হয়তো একটি রাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। সে রাতে প্রত্যেক জনপদের মুহাজিরদের বের হয়ে পড়তে হবে। রাতের বেলা হিজরত করার জন্য বের হবার নির্দেশ কেন দেয়া হয়েছিল "তোমাদের পিছু নেয়া হবে" উক্তি থেকে তার ইংগিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ ফেরাউনের সেনাবাহিনী তোমাদের পিছনে ধাওয়া করার আগে রাতের মধ্যে তোমরা নিজেদের পথে অন্তত এত দূর অগ্রসর হয়ে যাওয়ার ফলে তারা অনেক পিছনে পড়ে যায়।

৪৩. একথাগুলো ফেরাউনের মনের গোপন ভীতি প্রকাশ করে। লোক দেখানো নির্ভীকতার মোড়কে সেই ভীতিকে সে ঢেকে রেখেছিল। একদিকে তাৎক্ষণিক সাহায্যের জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে সে সৈন্য তলব করছিল। এ থেকে মনে হয় যে, সে বনী ইসরাঈলের দিক থেকে বিপদের আশংকা করছিল। অন্যদিকে আবার একথাটিও গোপন করতে চাচ্ছিল যে, একটি দীর্ঘকালের নিগৃহীত-নিষ্পেষিত এবং চরম লাঞ্ছনা ও দাসত্বের জীবন যাপনকারী জাতির দিক থেকে ফেরাউনের মতো মহাশক্তিধর শাসক কোন আশংকা অনুভব করছে, এমনকি ত্বরিত সাহায্যের জন্য সেনাবাহিনী তলব করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তাই নিজের বার্তা সে এমনভাবে পাঠাচ্ছে যেন মনে হচ্ছে, বেচারা বনী ইসরাঈল তো সামান্য ব্যাপার মাত্র, মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক, তারা আমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না কিন্তু তারা এমন সব কাজ করেছে যা আমাদের ক্রোধ উৎপাদন করেছে। তাই আমরা তাদেরকে শাস্তি দিতে চাই। কোন আশংকার কারণে আমরা সেনা সমাবেশ করছি না। বরং এটি নিছক একটি সতর্কতামূলক পদক্ষেপ মাত্র। বিপদের কোন দূরতম সম্ভাবনা হলেও যথাসময়ে তার মূলোৎপাটনে প্রস্তুত থাকাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

৪৪. অর্থাৎ ফেরাউনের মতে দূরতম এলাকা থেকে সেনাবাহিনী তলব করে বনী ইসরাঈলকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা করে সে খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। কিন্তু আল্লাহ এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন যার ফলে তার নিজের কৌশলে সে নিজেই ফেঁসে গেলো। অর্থাৎ ফেরাউনী রাজ্যের শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তারা নিজ নিজ জায়গা ছেড়ে এমন এক জায়গায়

সমবেত হলো যেখানে তাদের সবাইকে এক সাথে সলিলসমাধি লাভ করতে হবে। যদি তারা বনী ইসরাঈলের পিছু না নিতো, তাহলে এর ফল কেবল এতটুকুই হতো যে, একটি জাতি দেশ ত্যাগ করে চলে যেতো। এর চেয়ে বেশী তাদের আর কোন ক্ষতি হতো না, ফলে তারা আগের মতোই বিলাস কুঞ্জে বসে আয়েশী জীবন যাপন করতো। কিন্তু তারা বুদ্ধিমত্তার পরম পরাকাষ্ঠা দেখনোর জন্য বনী ইসরাঈলকে নিরাপদে চলে না যেতে দেবার ফায়সালা করলো। শুধু তাই নয়, মুহাজির কাফেলাগুলোর ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে চিরকালের জন্য তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইলো। এ উদ্দেশ্যে তাদের শাহজাদাবৃন্দ, বড় বড় সরদার ও রাজকর্মচারীরা তাদের শক্তিমদমত্ত বাদশাহকে সংগে নিয়ে নিজেদের প্রাসাদসমূহ থেকে বের হয় পড়লো। তাদের এহেন বুদ্ধিমত্তার এ দ্বিবিধ ফলও দেখা গেলো যে, বনী ইসরাঈল মিসর থেকে বের হয়েও গেলো আবার মিসরের জালেম ফেরাউনী সাম্রাজ্যের প্রধান জনশক্তি (cream) সাগরে বিসর্জিত হলো।

৪৫. কোন কোন তাফসীরকার এ আয়াতের অর্থ এভাবে গ্রহণ করেছেন ঃ যেসব উদ্যান, নদী, ধনভাণ্ডার ও উন্নত আবাসগৃহ ত্যাগ করে এ জালেমরা বের হয়েছিল মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে সেগুলোরই ওয়ারিশ বানিয়ে দেন। এ অর্থ যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলে অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, ফেরাউনের ডুবে মরার পর বনী ইসরাঈল আবার মিসরে পৌঁছে যাবে এবং ফেরাউনের বংশধরদের সমস্ত ধন-দৌলত এবং শক্তি, পরাক্রম ও গৌরবের অধিকারী হবে। কিন্তু এ জিনিসটি প্রথমত ইতিহাস থেকেও প্রমাণিত নয় এবং দ্বিতীয়ত কুরআনের অন্যান্য জায়গার বিস্তারিত বিবরণও আয়াতের এ অর্থ গ্রহণের অনুকূল নয়। সূরা বাকারাহ, মায়েদাহ, আ'রাফ ও তা-হা-তে যে ইতিবৃত্ত বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে পরিষ্কার জানা যায়, ফেরাউনের ডুবে মরার পর বনী ইসরাঈল মিসরে ফিরে আসার পরিবর্তে নিজেদের অভীষ্ট মনজিলের (ফিলিস্তীন) দিকেই এগিয়ে যেতে থাকে। তারপর থেকে হযরত দাউদের আমল (খৃঃ পূঃ ৯০৩-১০১৩) পর্যন্ত তাদের ইতিহাসের সব ঘটনাই আজকের পৃথিবীতে সিনাই উপদ্বীপ, উত্তর আরব, পূর্ব জর্দান (ট্রান্সজর্ডান) ও ফিলিস্তীন নামে পরিচিত এলাকায় ঘটেছে। তাই আমাদের মতে, যেসব উদ্যান, নদ-নদী, ধনভাণ্ডার ও সুরম্য অট্টালিকা থেকে ফেরাউনকে ও তার জাতির সরদারদেরকে বের করা হয়েছিল মহান আল্লাহ সেগুলোই বনী ইসরাঈলকে দান করেন, এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। বরং এর সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহ একদিকে ফেরাউনের বংশধরদেরকে এসব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করেন এবং অন্যদিকে বনী ইসলাঈলকে এসব নিয়ামতই দান করেন। অর্থাৎ তারা ফিলিস্তীন ভূখণ্ডে বাগ-বাগিচা, নদ-নদী, ধনভাণ্ডার ও উত্তম আবাসিক ভবন সমূহের অধিকারী হয়। সূরা আরাফের নিম্নোক্ত আয়াতে এ ব্যাখ্যার প্রতি সমর্থন পাওয়া যায় ঃ

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ○ وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِى بٰرَكْنَا فِيْهَا ،

فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا
لَمُدْرَكُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ
أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾
وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ﴿٦٤﴾ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ
أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿٦٦﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾

সকাল হতেই তারা এদের পিছু নিয়ে বের হয়ে পড়লো। দু'দল যখন পরস্পরকে দেখতে পেলো তখন মূসার সাথিরা চিৎকার করে উঠলো, "আমরা তো পাকড়াও হয়ে গেলাম।" মূসা বললো, "কখ্খনো না, আমার সাথে আছেন আমার রব, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে পথ দেখাবেন।[৪৬] আমি মূসাকে অহীর মাধ্যমে হুকুম দিলাম, "মারো তোমার লাঠি সাগরের বুকে।" সহসাই সাগর দীর্ণ হয়ে গেলো এবং তার প্রত্যেকটি টুকরা হয়ে গেলো এক একটি বিশাল পাহাড়ের মতো।[৪৭] এ জায়গায়ই আমি দ্বিতীয় দলটিকেও নিকটে আনলাম।[৪৮] মূসা ও তার সমস্ত লোককে যারা তার সংগে ছিল আমি উদ্ধার করলাম এবং অন্যদেরকে ডুবিয়ে দিলাম।

এ ঘটনার মধ্যে আছে একটি নিদর্শন।[৪৯] কিন্তু এদের অধিকাংশ মান্যকারী নয়। আর প্রকৃতপক্ষে তোমার রব পরাক্রমশালীও আবার দয়াময়ও।

"তখন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা আখ্যায়িত করেছিল এবং তা থেকে বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল। আর তাদের পরিবর্তে আমি যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তাদেরকে এমন একটি দেশের পূর্ব ও পশ্চিমের ওয়ারিস বানিয়ে দিলাম যাকে আমি সমৃদ্ধিতে ভরে দিয়েছিলাম।" (১৩৬-১৩৭ আয়াত)

এ সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ দেশের উপমা কুরআন মজীদে সাধারণত ফিলিস্তীনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। যখন কোন এলাকার নাম না নিয়ে এ গুণটি বর্ণনা করা হয় তখন এ থেকে এ এলাকার কথা বলা হয়েছে বলে মনে করা হয়। যেমন সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে ঃ

إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ

এবং সূরা আম্বিয়ায়ে বলা হয়েছে ঃ

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ

আরো বলা হয়েছে ঃ

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا -

এভাবে সূরা সাবা—এ বলা হয়েছে اَلْقُرَى الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا এ সবগুলো আয়াতে বরকত শব্দ ফিলিস্তীনের জনপদগুলোর সম্পর্কেই ব্যবহৃত হয়েছে।

৪৬. অর্থাৎ এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার পথ আমাকে জানাবেন।

৪৭. মূলে كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় বড় পাহাড়কে طود (তওদ) বলা হয়। লিসানুল আরব গ্রন্থে বলা হয়েছে الطود – الجبل العظيم অর্থাৎ 'তওদ' মানে বিশাল পাহাড়। কাজেই এর পরে আবার عظيم গুণবাচক শব্দটি ব্যবহার করার অর্থ দাঁড়ায়—পানি উভয় দিকে খুব উঁচু উঁচু পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তারপর আমরা এ বিষয়টিও চিন্তা করি যে, হযরত মূসার লাঠির আঘাতে সমুদ্রে ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল। এ কাজটি একদিকে বনী ইসরাঈলের সমগ্র কাফেলাটির সাগর অতিক্রম করার জন্য করা হয়েছিল এবং অন্যদিকে এর উদ্দেশ্য ছিল ফেরাউনের সমস্ত সৈন্য সামন্তকে ডুবিয়ে দেয়া। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, লাঠির আঘাতে পানি বিশাল উঁচু পাহাড়ের আকারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং এতটা সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিল, যতটা সময় লেগেছিল হাজার হাজার লাখো লাখো বনী ইসরাঈল তার মধ্য দিয়ে সাগর অতিক্রম করতে। তারপর ফেরাউনের সমগ্র সেনাবাহিনী তার মাঝখানে পৌঁছে গিয়েছিল। একথা সুস্পষ্ট, সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে যে ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত হয় তা যতই তীব্র ও বেগবান হোক না কেন তার প্রভাবে কখনো সাগরের পানি এভাবে বিশাল পাহাড়ের মতো এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকে না। এরপর আরো সূরা তা-হা-এ বলা হয়েছে ঃ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا "তাদের জন্য সমুদ্রের বুকে শুকনো পথ তৈরি করে দাও।"

এর অর্থ দাঁড়ায়, সাগরের ওপর লাঠির আঘাত করার কারণে কেবল সাগরের পানি ফাঁক হয়ে গিয়ে দু'দিকে পাহাড় সমান উঁচু হয়ে যায়নি বরং মাঝখানে যে পথ বের হয় তা শুকনো খটখটেও হয়ে যায় এবং কোথাও এমন কোন কাদা থাকেনি যার ওপর দিয়ে হেঁটে চলা সম্ভব নয়। এ সংগে সূরা দু'খানের ২৪ আয়াতের এ শব্দগুলোও প্রণিধানযোগ্য যেখানে আল্লাহ হযরত মূসাকে নির্দেশ দেন, সমুদ্র অতিক্রম করার পর "তাকে এ অবস্থার ওপরই ছেড়ে দাও, ফেরাউনের সেনাদল এখানে নিমজ্জিত হবে।" এ থেকে বুঝা যায় যে, হযরত মূসা সমুদ্রের অপর পারে উঠে যদি সমুদ্রের ওপর লাঠির আঘাত করতেন, তাহলে উভয় দিকে খাড়া পানির দেয়াল ভেংগে পড়তো এবং সাগর সমান হয়ে যেতো। তাই আল্লাহ তাঁকে এরূপ করতে নিষেধ করেন, যাতে ফেরাউনের সেনাদল এ পথে নেমে আসে এবং তারপর পানি দু'দিক থেকে এসে তাদেরকে ডুবিয়ে দেয়। এটি একটি সুস্পষ্ট ও

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا
نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ﴿٧١﴾

৫ রুকূ'

আর তাদেরকে ইবরাহীমের কাহিনী শুনিয়ে দাও,[৫০] যখন সে তার বাপ ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করেছিল, "তোমরা কিসের পূজা করো?"[৫১] তারা বললো, "আমরা কতিপয় মূর্তির পূজা করি এবং তাদের সেবায় আমরা নিমগ্ন থাকি।"[৫২]

ব্যর্থহীন মু'জিযার বর্ণনা। যারা সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের আওতায় এ ঘটনাটির ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন তাদের চিন্তার গলদ এ থেকে একেবারেই সুস্পষ্ট হয়ে যায়। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা তা-হা, ৫৩ টীকা)

৪৮. অর্থাৎ ফেরাউন ও তার সেনাদলকে।

৪৯. অর্থাৎ কুরাইশদের জন্য রয়েছে এর মধ্যে শিক্ষা। এ শিক্ষাটি হচ্ছে ঃ হঠকারী লোকেরা প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট মু'জিযাসমূহ দেখেও কিভাবে ঈমান আনতে অস্বীকার করে যেতে থাকে এবং তারপর এ হঠকারিতার ফল কেমন ভয়াবহ হয়। ফেরাউন ও তার জাতির সমস্ত সরদার ও হাজার হাজার সেনার চোখে এমন পট্টি বাঁধা ছিল যে, বছরের পর বছর ধরে যেসব নিদর্শন তাদেরকে দেখিয়ে আসা হয়েছে সেগুলো তারা উপেক্ষা করে এসেছে, সবশেষে পানিতে ডুবে যাবার সময়ও তারা একথা বুঝলো না যে, সমুদ্র ঐ কাফেলার জন্য ফাঁক হয়ে গেছে, পানি পাহাড়ের মতো দু'দিকে খাড়া হয়ে আছে এবং মাঝখানে শুকনা রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। এ সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখেও তাদের জ্ঞানোদয় হলো না যে, মূসা আলাইহিস সালামের সাথে আল্লাহর সাহায্য রয়েছে এবং এহেন শক্তির সাথে তারা লড়াই করতে যাচ্ছে। তাদের চেতনা জাগ্রত হলো এমন এক সময় যখন পানি দু'দিক থেকে তাদেরকে চেপে ধরেছিল এবং তারা আল্লাহর গযবের মধ্যে ঘেরাও হয়ে গিয়েছিল। সে সময় ফেরাউন চিৎকার করে উঠলো ঃ

آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"আমি ঈমান আনলাম এই এই মর্মে যে, বনী ইসরাঈল যে আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তরভুক্ত।" (ইউনুস ৯০ আয়াত)

অন্যদিকে ঈমানদারদের জন্যও এর মধ্যে রয়েছে নিদর্শন। সেটি হচ্ছে, জুলুম ও তার শক্তিগুলো বাহ্যত যতই সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী হয়ে দেখা দিক না কেন শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য-সহায়তায় সত্য এভাবেই বিজয়ী এবং মিথ্যার শির এভাবেই নত হয়ে যায়।

৫০. এখানে হযরত ইবরাহীমের পবিত্র জীবনের এমন এক যুগের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে যখন নবুওয়াত লাভ করার পর শিরক ও তাওহীদের বিষয় নিয়ে তাঁর নিজের পরিবার ও নিজের সম্প্রদায়ের সাথে সংঘাত শুরু হয়েছিল। সে যুগের ইতিহাসের বিভিন্ন

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا
بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾

সে জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা যখন তাদেরকে ডাকো তখন কি তারা তোমাদের কথা শোনে? অথবা তোমাদের কি কিছু উপকার বা ক্ষতি করে?" তারা জবাব দিল, "না, বরং আমরা নিজেদের বাপ-দাদাকে এমনটিই করতে দেখেছি।"[৫৩]

ঘটনা কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত সূরাগুলোতে বর্ণিত হয়েছে ঃ আল বাকারাহ ৩৫ রুকূ', আল আন'আম ৯ রুকূ', মারয়াম ৩ রুকূ', আল আম্বিয়া ৫ রুকূ', আস্ সাফ্ফাত ৩ রুকূ' এবং আল মুমতাহিনাহ ১ রুকূ'।

হযরত ইবরাহীমের জীবনের এ যুগের ইতিহাস কুরআন মজীদ বিশেষভাবে বারবার সামনে এনেছে। এর কারণ হচ্ছে, আরবের লোকেরা সাধারণভাবে এবং কুরাইশরা বিশেষভাবে নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অনুসারী মনে করতো। তারা বলতো এবং দাবী করতো, ইবরাহীমের ধর্মই তাদের ধর্ম। আরবের মুশরিকরা ছাড়াও ইহুদি ও খৃষ্টানরাও হযরত ইবরাহীমকে তাদের ধর্মীয় নেতা বলে দাবী করতো। এ জন্য কুরআন মজীদ বিভিন্ন জায়গায় তাদেরকে এ মর্মে সতর্ক করেছে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যে দীন নিয়ে এসেছিলেন তা ছিল সেই একই নির্ভেজাল দীন ইসলাম যা আরবীয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এনেছেন এবং যার সাথে তোমরা আজ সংঘাতে লিপ্ত হয়েছো। তিনি মুশরিক ছিলেন না। বরং শিরকের বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর সংগ্রাম এবং এ সংগ্রামের কারণে তাকে নিজের বাপ, পরিবার, জাতি ও দেশ সবকিছু ত্যাগ করে সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও হিজাযে প্রবাসীর জীবন যাপন করতে হয়েছিল। অনুরূপভাবে তিনি ইহুদী ও খৃষ্টানও ছিলেন না। বরং ইহুদিবাদ ও খৃষ্টবাদ তো তাঁর বহু শতাব্দী পরে জন্ম নিয়েছিল। এ ঐতিহাসিক যুক্তির কোন জবাব মুশরিক, ইহুদী ও খৃষ্টান কারো কাছে ছিল না। কারণ মুশরিকরাও স্বীকার করতো, আরবে মূর্তি পূজার প্রচলন হয়েছিল হযরত ইবরাহীমের কয়েক শত বছর পরে। অন্যদিকে ইহুদিবাদ ও খৃষ্টবাদের জন্মের বহু পূর্বে হযরত ইবরাহীমের যুগ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল, একথা ইহুদী ও খৃষ্টানরা অস্বীকার করতো না। এর স্বতঃস্ফূর্ত ফল স্বরূপ বলা যায়, যেসব বিশেষ আকীদা বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের ওপর তারা নিজেদের দীনের ভিত্তি স্থাপন করে তা প্রথম থেকে প্রচলিত প্রাচীন দীনের অংশ নয় এবং এসব মিশ্রণ মুক্ত নির্ভেজাল আল্লাহর আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত দীনই সঠিক দীন। এরি ভিত্তিতে কুরআন বলছে ঃ

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ۖ وَمَا
كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا
النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ

قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ
عَدُوٌّ لِّىٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٧٧﴾ ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾

একথায় ইবরাহীম বললো, "কখনো কি তোমরা (চোখ মেলে) সেই জিনিসগুলো দেখেছো যাদের বন্দেগী তোমরা ও তোমাদের অতীত পূর্বপুরুষেরা করতে অভ্যস্ত?[৫৪] এরা তো সবাই আমার দুশমন[৫৫] একমাত্র রব্বুল আলামীন ছাড়া,[৫৬] যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন,[৫৭] তারপর তিনিই আমাকে পথ দেখিয়েছেন।

"ইবরাহীম ইহুদিও ছিল না এবং খৃষ্টানও ছিল না বরং সে তো একজন একনিষ্ঠ মুসলিম ছিল। আর সে মুশরিকও ছিল না। আসলে ইবরাহীমের সাথে সম্পর্ক রাখার সবচেয়ে বেশী অধিকার তাদের, যারা তার পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং (এখন এ অধিকার) এ নবীর এবং এর সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদের।"

(আলে ইমরান ঃ ৬৭–৬৮)

৫১. তারা কিসের পূজা করছে তা জানা হযরত ইবরাহীমের প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ সেখানে তারা যেসব মূর্তির পূজা করতো তা তিনি নিজে দেখতেন। কাজেই তাঁর প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। তিনি তাদের দৃষ্টি ও চিন্তা এদিকে আকৃষ্ট করতে চাচ্ছিলেন যে, তোমরা যেসব উপাস্যের সামনে ষষ্ঠাংগে প্রণিপাত করছো তাদের স্বরূপ কি? সূরা আম্বিয়াতে এ প্রশ্নটিকে এভাবে করা হয়েছে ঃ

"এসব কেমন প্রতিমা যেগুলোর প্রতি ভক্তিতে তোমরা গদগদ হচ্ছো?"

৫২. আমরা কিছু মূর্তির পূজা করি, এ জবাবও নিছক একটা সংবাদ জানিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বলা হয়নি। কারণ প্রশ্নকর্তা ও জবাবদাতা উভয়ের সামনে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট ছিল। নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি তাদের অবিচলতাই ছিল এ জবাবের আসল প্রাণসত্তা। অর্থাৎ তারা আসলে বলতে চাচ্ছিল, হাঁ, আমরাও জানি এগুলো কাঠ ও পাথরের তৈরি প্রতিমা। আমরা এগুলোর পূজা করি। কিন্তু আমরা এ গুলোরই পূজা ও সেবা করে যাবো, এটিই আমাদের ধর্ম ও বিশ্বাস।

৫৩. অর্থাৎ এরা আমাদের প্রার্থনা, মুনাজাত ও ফরিয়াদ শোনে অথবা আমাদের উপকার বা ক্ষতি করে মনে করে আমরা এদের পূজা করতে শুরু করেছি তা নয়। আমাদের এ পূজা-অর্চনার কারণ এটা নয়। বরং আমাদের এ পূজা–অর্চনার আসল কারণ হচ্ছে, আমাদের বাপ–দাদার আমল থেকে তা এভাবেই চলে আসছে। এভাবে তারা নিজেরাই একথা স্বীকার করে নিয়েছে যে, তাদের ধর্মের পেছনে তাদের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর কোন প্রমাণ নেই। অন্য কথায় তারা যেন বলছিল, তুমি আমাদের কি এমন নতুন কথা বলবে? আমরা নিজেরা দেখছি না এগুলো কাঠ ও পাথরের মূর্তি? আমরা কি জানি না, কাঠ শোনে না এবং পাথর কারো ইচ্ছা পূর্ণ করতে বা ব্যর্থ করে দিতে পারে না? কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধেয় পূর্বপুরুষরা শত শত বছর ধরে বংশ পরম্পরায় এদের পূজা

করে আসছে। তোমার মতে তারা সবাই কি বোকা ছিল? তারা এসব নিষ্প্রাণ মূর্তিগুলোর পূজা করতো, নিশ্চয়ই এর কোন কারণ থাকবে। কাজেই আমরাও তাদের প্রতি আস্থাশীল হয়ে এ কাজ করছি।

৫৪. অর্থাৎ ব্যস, স্রেফ বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসছে বলেই তাকে সত্য ধর্ম বলে মেনে নিতে হবে, একটি ধর্মের সত্যতার জন্য শুধুমাত্র এতটুকু যুক্তিই কি যথেষ্ট? চোখ বন্ধ করে প্রজন্মের পর প্রজন্ম গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাবে এবং কেউ একবার চোখ খুলে দেখবেও না যাদের বন্দেগী-পূজা-অর্চনা করা হচ্ছে তাদের মধ্যে সত্যিই আল্লাহর গুণাবলী পাওয়া যায় কি না এবং আমাদের ভাগ্যের ভাংগা-গড়ার ক্ষেত্রে তারা কোন ক্ষমতা রাখে কি না?

৫৫. অর্থাৎ চিন্তা করলে আমি দেখতে পাই, যদি আমি এদের পূজা করি তাহলে আমার দুনিয়া ও আখেরাত দু'টোই বরবাদ হয়ে যাবে। আমি এদের ইবাদাত করাকে শুধুমাত্র অলাভজনক ও অক্ষতিকরই মনে করি না বরং উল্টা ক্ষতিকর মনে করি। তাই আমার মতে তাদেরকে পূজা করা এবং শত্রুকে পূজা করা এক কথা। তাছাড়া হযরত ইবরাহীমের এ উক্তির মধ্যে সূরা মারয়ামে যে কথা বলা হয়েছে সেদিকেও ইংগিত করা হয়েছে। সূরা মারয়ামে বলা হয়েছে ঃ

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ○ كَلَّا سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, যাতে তারা তাদের জন্য শক্তির মাধ্যম হয়। কখ্খনো না, শিগগির সে সময় আসবে যখন তারা তাদের পূজা-ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং উল্টা তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।" (৮১-৮২ আয়াত)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তারা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবে এবং পরিষ্কার বলে দেবে, আমরা কখনো তাদেরকে আমাদের পূজা করতে বলিনি এবং তারা আমাদের পূজা করতো একথা আমরা জানিও না।

এখানে প্রচার কৌশলের একটি বিষয়ও প্রণিধানযোগ্য। হযরত ইবরাহীম একথা বলেননি যে, এরা তোমাদের শত্রু বরং বলছেন এরা আমার শত্রু। যদি তিনি বলতেন এরা তোমাদের শত্রু, তাহলে প্রতিপক্ষের হঠকারী হয়ে ওঠার বেশী সুযোগ থাকতো। তারা তখন বিতর্ক শুরু করতো এরা কেমন করে আমাদের শত্রু হয় বলো। পক্ষান্তরে যখন তিনি বললেন তারা আমার শত্রু তখন প্রতিপক্ষের জন্যও চিন্তা করার সুযোগ হলো। তারাও ভাবতে পারলো, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেমন নিজের ভালো-মন্দের চিন্তা করছেন তেমনি আমাদেরও নিজেদের ভালো-মন্দের চিন্তা করা উচিত। এভাবে হযরত ইবরাহীম (আ) যেন প্রত্যেক ব্যক্তির স্বভাবজাত আবেগ-অনুভূতির কাছে আবেদন জানিয়েছেন, যার ভিত্তিতে তারা নিজেরাই হয় নিজেদের শুভাকাংখী এবং জেনে শুনে কখনো নিজেদের মন্দ চায় না। তিনি তাদেরকে বললেন, আমি তো এদের ইবাদাত করার মধ্যে আগাগোড়াই ক্ষতি দেখি এবং জেনে বুঝে আমি নিজেই নিজের পায়ে কুড়াল মারতে

وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ﴿٨٠﴾
وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِيْ أَطْمَعُ أَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْٓئَتِيْ
يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٨٢﴾

তিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন।[৫৮] তিনি আমাকে মৃত্যু দান করবেন এবং পুনর্বার আমাকে জীবন দান করবেন। তাঁর কাছে আমি আশা করি, প্রতিদান দিবসে তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন।[৫৯]

পারি না। কাজেই দেখে নাও আমি নিজে তাদের ইবাদাত-পূজা-অর্চনা থেকে পুরোপুরি দূরে থাকছি। এরপর প্রতিপক্ষ স্বাভাবিকভাবেই একথা চিন্তা করতে বাধ্য ছিল যে, তাদের লাভ কিসে এবং জেনে বুঝে তারা নিজেদের অমংগল চাচ্ছে না তো।

৫৬. অর্থাৎ পৃথিবীতে যেসব উপাস্যের বন্দেগী ও পূজা করা হয় তাদের মধ্যে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনই আছেন যার বন্দেগীর মধ্যে আমি নিজের কল্যাণ দেখতে পাই এবং যাঁর ইবাদাত আমার কাছে শত্রুর নয় বরং একজন প্রকৃত পৃষ্ঠপোশকের ইবাদাত বলে বিবেচিত হয়। এরপর হযরত ইবরাহীম একমাত্র রব্বুল আলামীনই ইবাদাতের হকদার কেন, এর কারণগুলো কয়েকটি বাক্যে বর্ণনা করেছেন। এভাবে তিনি নিজের প্রতিপক্ষের মনে এ অনুভূতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন যে, তোমাদের কাছে তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যান্য উপাস্যদের পূজা করার স্বপক্ষে বাপ-দাদার অনুকরণ ছাড়া বর্ণনা করার মতো আর কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই কিন্তু আমার কাছে একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করার জন্য অত্যন্ত যুক্তিসংগত কারণ আছে, যা তোমরাও অস্বীকার করতে পারো না।

৫৭. এটি প্রথম কারণ, যার ভিত্তিতে আল্লাহ এবং একমাত্র আল্লাহই ইবাদাতের হকদার। প্রতিপক্ষও এ সত্যটি জানতো এবং মেনেও নিয়েছিল যে, আল্লাহ তাদের সৃষ্টিকর্তা। তাদের সৃষ্টিতে অন্য কারো কোন অংশ নেই, একথাও তারা স্বীকার করতো। এমন কি তাদের উপাস্যরা নিজেরাও যে আল্লাহর সৃষ্টি এ ব্যাপারে হযরত ইবরাহীমের জাতিসহ সকল মুশারিকদের বিশ্বাস ছিল। নাস্তিকরা ছাড়া বাকি দুনিয়ার আর কোথাও কেউ একথা অস্বীকার করেনি। আল্লাহ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা তাই হযরত ইবরাহীমের প্রথম যুক্তি ছিল, আমি একমাত্র তাঁর ইবাদাতকে সঠিক ও যথার্থ মনে করি যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অন্য কোন সত্তা কেমন করে আমার ইবাদাতের হকদার হতে পারে, যেহেতু আমাকে সৃষ্টি করার ব্যাপারে তার কোন অংশ নেই। প্রত্যেক সৃষ্টি অবশ্যি তার নিজের স্রষ্টার বন্দেগী করবে। যে তার স্রষ্টা নয়, তার বন্দেগী করবে কেন?

৫৮. একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করার স্বপক্ষে এটি হচ্ছে দ্বিতীয় যুক্তি। যদি তিনি মানুষকে কেবল সৃষ্টি করেই ছেড়ে দিতেন এবং সামনের দিকে তার দুনিয়ায় জীবন যাপনের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক না রাখতেন তাহলেও মানুষের তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কারো সহায়তা চাওয়ার কোন যুক্তিসংগত কারণ থাকতো। কিন্তু তিনি তো সৃষ্টি করার সাথে সাথে পথনির্দেশনা, প্রতিপালন, দেখাশুনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজন পূর্ণ করার দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন। যে মুহূর্তে মানুষ দুনিয়ায় পদার্পণ করে তখনই তার মায়ের বুকে দুধের ধারা সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে কোন অদৃশ্য শক্তি তাকে স্তন চোষার ও গলা দিয়ে দুধ নিচের দিকে নামিয়ে নেবার কায়দা শিখিয়ে দেয়। তারপর এ প্রতিপালন, প্রশিক্ষণ ও পথ প্রদর্শনের কাজ প্রথম দিন থেকে শুরু হয়ে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বরাবর চালু থাকে। জীবনের প্রতি পর্যায়ে মানুষের নিজের অস্তিত্ব, বিকাশ, উন্নয়ন ও স্থায়ীত্বের জন্য যেসব ধরনের সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় তা সবই তার স্রষ্টা পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত সর্বত্রই সঠিকভাবে যোগান দিয়ে রেখেছেন। এ সাজ-সরঞ্জাম থেকে লাভবান হবার এবং একে কাজে লাগাবার জন্য তার যে ধরনের শক্তি ও যোগ্যতার প্রয়োজন তা সবও তার আপন সত্তায় সমাহিত রাখা হয়েছে। জীবনের প্রতিটি বিভাগে তার যে ধরনের পথনির্দেশনার প্রয়োজন হয় তা দেবার পূর্ণ ব্যবস্থাও তিনি করে রেখেছেন। এ সংগে তিনি মানবিক অস্তিত্বের সংরক্ষণের এবং তাকে বিপদ-আপদ, রোগ-শোক, ধ্বংসকর জীবাণু ও বিষাক্ত প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য তার নিজের শরীরের মধ্যে এমন শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন মানুষের জ্ঞান এখনো যার পুরোপুরি সন্ধান লাভ করতে পারেনি। আল্লাহর এ শক্তিশালী প্রাকৃতিক ব্যবস্থা যদি না থাকতো, তাহলে সামান্য একটি কাঁটা শরীরের কোন অংশে ফুটে যাওয়াও মানুষের জন্য ধ্বংসকর প্রমাণিত হতো এবং নিজের চিকিৎসার জন্য মানুষের কোন প্রচেষ্টাই সফল হতো না। স্রষ্টার এ সর্বব্যাপী অনুগ্রহ ও প্রতিপালন কর্মকাণ্ড যখন প্রতি মুহূর্তে সকল দিক থেকে মানুষকে সাহায্য করছে তখন মানুষ তাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন সত্তার সামনে মাথা নত করবে এবং প্রয়োজন পূরণ ও সংকট উত্তরণের জন্য অন্য কারো আশ্রয় গ্রহণ করবে, এর চেয়ে বড় মূর্খতা ও বোকামী এবং এর চেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা আর কী হতে পারে?

৫৯. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত যে ঠিক নয় এ হচ্ছে তার তৃতীয় কারণ। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক কেবলমাত্র এ দুনিয়া এবং এখানে সে যে জীবন যাপন করে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অস্তিত্বের সীমানায় পা রাখার পর থেকে শুরু করে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার সাথে সাথেই তা খতম হয়ে যায় না। বরং এরপর তার পরিণামও পুরোপুরি আল্লাহরই হাতে আছে। আল্লাহই তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। সবশেষে তিনি তাকে দুনিয়া থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। দুনিয়ায় এমন কোন শক্তি নেই যা মানুষের এ ফিরে যাওয়ার পথ রোধ করতে পারে। যে হাতটি মানুষকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যায় আজ পর্যন্ত কোন ঔষধ, চিকিৎসক দেব-দেবীর হস্তক্ষেপ তাকে পাকড়াও করতে পারেনি। এমন কি মানুষেরা যে একদল মানুষকে উপাস্য বানিয়ে পূজা-আরাধনা করেছে তারা নিজেরাও নিজেদের মৃত্যুকে এড়াতে পারেনি। একমাত্র আল্লাহই ফায়সালা করেন, কোন্ ব্যক্তিকে কখন এ দুনিয়া থেকে ফিরিয়ে নেবেন এবং যখন যার তাঁর কাছ থেকে চলে যাবার সমন এসে যায় তখন ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাকে চলে যেতেই হয়। তারপর আল্লাহ একাই ফায়সালা করেন, দুনিয়ায় যেসব মানুষ জন্ম নিয়েছিল তাদের সবাইকে

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَّأَلْحِقْنِي بِالصّٰلِحِينَ ﴿٨٣﴾ وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ
فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ
كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ
وَّلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾

(এরপর ইবরাহীম দোয়া করলো ঃ) "হে আমার রব! আমাকে প্রজ্ঞা দান করো [৬০] এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে শামিল করো।[৬১] আর পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে আমার সত্যিকার খ্যাতি ছড়িয়ে দিও[৬২] এবং আমাকে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতের অধিকারীদের অন্তরভুক্ত করো। আর আমার বাপকে মাফ করে দাও, নিসন্দেহে তিনি পথভ্রষ্টদের দলভুক্ত[৬৩] ছিলেন এবং সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত করো না যেদিন সবাইকে জীবিত করে উঠানো হবে,[৬৪] যেদিন অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে লাগবে না, তবে যে বিশুদ্ধ অন্তকরণ নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হবে।"[৬৫]

কখন পুনর্বার জীবন দান করবেন এবং তাদের পৃথিবীর জীবনের কাজ-কারবারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তখনো মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন থেকে কাউকে রেহাই দেয়া বা নিজে রেহাই পাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। প্রত্যেককে তাঁর হুকুমে উঠতেই হবে এবং তাঁর আদালতে হাজির হতেই হবে। তারপর সেই আল্লাহ একাই সেই আদালতের বিচারপতি হবেন। তাঁর ক্ষমতায় কেউ সামান্যতমও শরীক হবে না। শাস্তি দেয়া বা মাফ করা উভয়টিই হবে সম্পূর্ণ তাঁর ইখতিয়ারভুক্ত। তিনি যাকে শাস্তি দিতে চান কেউ তাকে ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখে না। অথবা তিনি কাউকে ক্ষমা করতে চাইলে কেউ তাকে শাস্তি দিতে পারবে না। দুনিয়ায় যাদেরকে ক্ষমা করিয়ে নেবার ইখতিয়ার আছে বলে মনে করা হয় তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষমার জন্য তাঁরই অনুগ্রহ ও দয়ার দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে বসে থাকবে। এসব জাজ্বল্যমান সত্যের উপস্থিতিতে যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী করে সে নিজেই নিজের অশুভ পরিণামের ব্যবস্থা করে। দুনিয়া থেকে নিয়ে আখেরাত পর্যন্ত মানুষের ভাগ্য পুরোপুরি ন্যস্ত থাকে আল্লাহর হাতে। আর সেই ভাগ্য গড়ার জন্য মানুষ এমন সব সত্তার আশ্রয় নেবে যাদের হাতে কিছুই নেই, এরচেয়ে বড় ভাগ্য বিপর্যয় আর কী হতে পারে?

৬০. "হুক্‌ম" অর্থ এখানে নবুওয়াত গ্রহণ করা সঠিক হবে না। কারণ এটা যে সময়ের দোয়া সে সময় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে নবুওয়াত দান করা হয়ে গিয়েছিল। আর ধরে নেয়া যাক যদি এ দোয়া তার আগেরও হয়ে থাকে, তাহলে নবুওয়াত কেউ চাইলে তাকে দান করা হয় না বরং এটি এমন একটি দান যা আল্লাহ নিজেই যাকে চান

তাকে দান করেন। তাই এখানে 'হুক্ম' অর্থ জ্ঞান, হিকমত, প্রজ্ঞা, সঠিক বুঝ-বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত করার শক্তি গ্রহণ করাই সঠিক হবে। হযরত ইবরাহীমের (আ) এ দোয়াটি প্রায় সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে অর্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ দোয়া উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন اَرِنَا الْاَشْيَاءَ كَمَاهِىَ অর্থাৎ আমাদের এমন যোগ্যতা দাও যাতে আমরা প্রত্যেকটি জিনিসকে তার যথার্থ স্বরূপে দেখতে পারি এবং প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যা তার প্রকৃত স্বরূপের প্রেক্ষিতে গ্রহণ করা উচিত।

৬১. অর্থাৎ দুনিয়ায় আমাকে সৎ সমাজ-সংসর্গ দান করো এবং আখেরাতের ময়দানে সৎলোকদের সাথে আমাকে সমবেত করো। আখেরাত সম্পর্কে বলা যায়, আখেরাতের ময়দানে সৎলোকদের সাথে কারো সমবেত হওয়া তার মুক্তি লাভ করার সমার্থক হয়ে থাকে। তাই মৃত্যু পরের জীবন ও কিয়ামতের ময়দানে কর্মের প্রতিফল দানের ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিরই এ দোয়া করা উচিত। কিন্তু দুনিয়াতেও পবিত্র জীবনের অধিকারী সৎকর্মশীল ব্যক্তির অন্তরের আকাংখাই এই হয়ে থাকে যে, আল্লাহ যেন তাকে একটি ফাসেক, নোংরা ও অসুস্থ সমাজে জীবন যাপন করার বিপদ থেকে নিষ্কৃতি দেন এবং সৎলোকদের সাথে ওঠা-বসা ও চলা-ফেরা করার সুযোগ দান করেন। সামাজিক বিকৃতি ও অসুস্থতা যেখানে চারদিকে বিস্তার লাভ করে সেখানে কেবলমাত্র এটাই সর্বক্ষণ একজন লোককে মানসিক পীড়া দেয় না যে, তার চারদিকে সে কেবল নোংরামীই নোংরামী দেখছে বরং তার নিজের পবিত্র জীবন যাপন করা এবং দূষিত আবর্জনার ছিটা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলাও তার পক্ষে কঠিন হয়ে থাকে। তাই একজন সৎলোক ততক্ষণ পর্যন্ত অস্থির থাকে যতক্ষণ না তার নিজের সমাজ পবিত্র ও সুস্থ হয়ে যায় অথবা সে এ সমাজ থেকে বের হয়ে সত্য ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত অন্য একটি সমাজের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়।

৬২. অর্থাৎ ভবিষ্যত প্রজন্ম যেন মর্যাদা ও শুভেচ্ছা সহকারে আমার নাম স্মরণ করে। দুনিয়ায় যেন আমি এমন কাজ না করে যাই যার ফলে ভবিষ্যত বংশধররা আমার পরে আমাকে এমন সব জালেমদের দলভুক্ত করে যারা নিজেরাও ছিল অসৎ ও বিকৃত চরিত্রের অধিকারী এবং দুনিয়াকেও অসৎ ও বিকৃতির পথে চালিয়ে গেছে। বরং আমি যেন এমন সব কাজ করে যাই যার ফলে কিয়ামত পর্যন্ত আমার জীবন মানুষের জন্য আলোক বর্তিকার কাজ করে এবং আমাকে মানব হিতৈষী ও মানব জাতির সেবক গণ্য করা হয়। এটি নিছক লোক দেখানো খ্যাতি ও সুনাম অর্জনের দোয়া নয় বরং প্রকৃত সুখ্যাতি ও যথার্থ সুনাম অর্জনের দোয়া। নিশ্চিত খাঁটি জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম ও সেবাকর্মের ফলে এ সুখ্যাতি অর্জিত হয়। কোন ব্যক্তির এ জিনিস অর্জিত হলে দু'টো লাভ ও উপকার হয়। দুনিয়ায় এর ফলে মানব জাতির ভবিষ্যত বংশধররা খারাপ আদর্শের পরিবর্তে একটি ভালো আদর্শ পেয়ে যায়। এ থেকে তারা ভালো দৃষ্টান্ত লাভ করে এবং ভালো দৃষ্টান্ত থেকে পায় ভালো হবার শিক্ষা। প্রত্যেক সৎব্যক্তি এর মাধ্যমে সত্য-সঠিক পথে চলার প্রেরণা লাভ করে। আর আখেরাতে এর ফলে এক ব্যক্তির ভালো কর্মকাণ্ড অনুসরণ করে যত জন লোকই সৎপথের সন্ধান লাভ করে তাদের সওয়াব সে ও লাভ করবে এবং কিয়ামতের দিন তার নিজের কর্মকাণ্ডের সাথে সাথে কোটি কোটি মানুষের সাক্ষ্যও তার

সপক্ষে উপস্থিত থাকবে যাতে বলা হবে, সে দুনিয়ায় কল্যাণ ও সৎকর্মের এমন স্রোত ধারা প্রবাহিত করে এসেছিল যে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম যুগ যুগ ধরে সে ধারায় অবগাহন করেছে।

৬৩. কোন কোন মুফাস্সির হযরত ইবরাহীমের মাগফেরাতের দোয়ার ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, তাঁর এ মাগফেরাত কামনা ছিল ইসলামের শর্তসাপেক্ষে। কাজেই তাঁর নিজের পিতার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করাটা ছিল যেন আল্লাহ তাঁকে ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক দান করেন, এ ধরনের একটি দোয়া। কিন্তু কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তা সংশ্লিষ্ট মুফাস্সিরগণের এ ব্যাখ্যার সাথে মেলে না। কুরআন বলছে, হযরত ইবরাহীম নিজের পিতার জুলুম সইতে না পেরে যখন ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন তখন বলেন ঃ

سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ ۖ اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا ○

"আপনাকে সালাম, আমি আপনাকে ক্ষমা করার জন্য নিজের রবের কাছে দোয়া করবো। তিনি আমার প্রতি বড়ই মেহেরবান।" (মারয়াম, ৪৭ আয়াত)

এ প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে তিনি এ মাগফেরাতের দোয়া করেন কেবলমাত্র নিজের পিতার জন্য নয় বরং অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে মাতা ও পিতা উভয়ের জন্য করেন ঃ رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ "হে আমাদের রব! আমার গোনাহ মাফ করো এবং আমার মাতা-পিতারও।" (ইবরাহীম, ৪১ আয়াত) কিন্তু পরে তিনি নিজেই অনুভব করেন, একজন সত্যের দুশমন একজন মু'মিনের পিতা হলেও মাগফেরাতের দোয়ার হকদার হয় না।

مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ۭ

"ইবরাহীমের নিজের পিতার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করা নিছক তার প্রতিশ্রুতির কারণে ছিল, যা সে করেছিল। কিন্তু সে যে আল্লাহর দুশমন, একথা যখন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল তখন সে তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করলো।"

(আত্ তাওবা, ১১৪ আয়াত)

৬৪. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমাকে এমন অপমানকর অবস্থার সম্মুখীন করো না যেখানে হাশরের ময়দানে পূর্বের ও পরের সমগ্র জনগোষ্ঠী একত্র হবে সেখানে তাদের সবার সামনে ইবরাহীমের পিতা শাস্তি পেতে থাকবে এবং ইবরাহীম তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে।

৬৫. এ বাক্যাংশ দু'টি কি হযরত ইবরাহীমের (আ) দোয়ার অংশ অথবা আল্লাহ তাঁর বক্তব্যের সাথে নিজে এটুকু বাড়িয়ে যোগ করে দিয়েছেন, একথা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। যদি প্রথম কথাটি মেনে নেয়া হয়, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায়, হযরত ইবরাহীম (আ) নিজের পিতার জন্য এ দোয়া করার সময় নিজেই এ সত্য সম্পর্কে সজাগ ছিলেন।

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩٠﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٩١﴾ وَقِيلَ لَهُمْ
أَيْنَمَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴿٩٣﴾
فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا وَهُمْ
فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُم
بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾

—(সেদিন[৬৬]) জান্নাত মুত্তাকীদের কাছাকাছি নিয়ে আসা হবে এবং জাহান্নাম পথভ্রষ্টদের সামনে খুলে দেয়া হবে।[৬৭] আর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, "আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদাত করতে তারা এখন কোথায়? তারা কি এখন তোমাদের কিছু সাহায্য করছে অথবা আত্মরক্ষা করতে পারে?" তারপর সেই উপাস্যদেরকে এবং এই পথভ্রষ্টদেরকে আর ইবলীসের বাহিনীর সবাইকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে।[৬৮] সেখানে এরা সবাই পরস্পর ঝগড়া করবে এবং পথভ্রষ্টরা (নিজেদের উপাস্যদেরকে) বলবে, "আল্লাহর কসম আমরা তো স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে ছিলাম, যখন তোমাদের দিচ্ছিলাম রব্বুল আলামীনের সমকক্ষের মর্যাদা। আর এ অপরাধীরাই আমাদের ভ্রষ্টতায় লিপ্ত করেছে।[৬৯]

আর দ্বিতীয় কথাটি মেনে নেয়া হলে এর অর্থ হবে, তাঁর দোয়ার ওপর মন্তব্য প্রসংগে আল্লাহ একথা বলছেন যে, কিয়ামতের দিন যদি কোন জিনিস মানুষের কাজে লাগতে পারে, তাহলে তা তার ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি নয় বরং একমাত্র প্রশান্ত চিত্ত এমন একটি অন্তর যা কুফরী, শিরক, নাফরমানী, ফাসেকী ও অশ্লীল কার্যকলাপ মুক্ত। ধনসম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিও প্রশান্ত ও নির্মল অন্তরের সাথেই উপকারী হতে পারে। প্রশান্ত অন্তরকে বাদ দিয়ে এদের কোন উপকারিতা নেই। ধন সেখানে কেবলমাত্র এমন অবস্থায় উপকারী হবে যখন মানুষ দুনিয়ায় ঈমান ও অন্তরিকতা সহকারে তা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। নয়তো কোটিপতি ও বিলিয়ন বিলিয়ন সম্পদের মালিকরাও সেখানে পথের ভিখারীই হবে। সন্তানদেরও দুনিয়ায় মানুষ নিজের সামর্থ অনুযায়ী ঈমান ও সৎ-কর্মের শিক্ষা দিলে তবেই তারা সেখানে কাজে লাগতে পারে। অন্যথায় পুত্র যদি নবীও হয়ে থাকেন, তাহলে যে পিতা কুফরী ও গোনাহের মধ্যে নিজের জীবনকাল শেষ করেছে এবং সন্তানের সৎকাজে যার কোন অংশ নেই তার শাস্তি পাওয়া থেকে কোন নিষ্কৃতি নেই।

৬৬. এখান থেকে শেষ প্যারাগ্রাফ পর্যন্ত সমস্ত বাক্য হযরত ইবরাহীমের (আ) উক্তির অংশ মনে হয় না বরং এর বক্তব্য থেকে পরিষ্কার মনে হয় যে, এগুলো আল্লাহর উক্তি।

৬৭. অর্থাৎ একদিকে মুত্তাকিরা জান্নাতে প্রবেশ করার আগেই দেখতে থাকবে, আল্লাহর মেহেরবানীতে কেমন নিয়ামতে পরিপূর্ণ জায়গায় তারা যাবে। অন্যদিকে পথভ্রষ্টরা তখনো হাশরের ময়দানেই অবস্থান করবে। যে জাহান্নামে তাদের গিয়ে থাকতে হবে তার ভয়াবহ দৃশ্য তাদের সামনে উপস্থাপিত করা হবে।

৬৮. মূলে كُبْكِبُوْا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে দু'টি অর্থ নিহিত। এক, একজনের ওপর অন্য একজনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হবে। দুই, তারা জাহান্নামের গর্তের তলদেশ পর্যন্ত গড়িয়ে যেতে থাকবে।

৬৯. ভক্ত-অনুরক্তদের পক্ষ থেকে এভাবে তাদের খাতির তোয়াজ করা হবে। অথচ এ ভক্ত-অনুরক্তরাই দুনিয়ায় এদেরকে বুজর্গ, গুরু ও নেতা বলে মেনে নিয়েছিল। এদের হাতে-পায়ে চুমো দেয়া হতো। এদের কথা ও কাজকে প্রামাণ্য ও আদর্শ বলে স্বীকার করা হতো। এদের সমীপে নজরানা ও মানত পেশ করা হতো। পরকালে গিয়ে যখন সত্য প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং অনুসারীবৃন্দ জানতে পারবে অগ্রবর্তীরা কোথায় চলে এসেছে এবং তাদেরকে কোথায় নিয়ে এসেছে তখন এ ভক্ত-অনুরক্তের দল তাদেরকে অপরাধী গণ্য করবে এবং অভিশাপ দেবে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে পরকালীন জগতের এ শিক্ষনীয় চিত্র অংকন করা হয়েছে, যাতে দুনিয়ায় অন্ধ অনুসারীদের চোখ খুলে যায় এবং কারো পেছনে চলার আগে তারা দেখে নিতে পারে অগ্রবর্তীরা সঠিক পথে যাচ্ছে কিনা। সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে ঃ

كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۚ حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ أُخْرٰهُمْ لِأُوْلٰهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ أَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۚ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ○

"প্রত্যেকটি দল যখন জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন তার নিজের সাথী দলের ওপর অভিশাপ দিতে দিতে যাবে। এমন কি যখন সবাই সেখানে একত্র হয়ে যাবে তখন প্রত্যেক পরবর্তী দল পূর্ববর্তী দল সম্পর্কে বলবে, হে আমাদের রব! এরাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল, এখন এদেরকে দ্বিগুণ আগুনের শাস্তি দাও। রব বলবেন, সবার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি কিন্তু তোমরা জানো না।" (৩৮ আয়াত)

সূরা হা-মীম আস্ সাজদায় বলা হয়েছে ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْأَسْفَلِيْنَ ○

"আর কাফেররা সে সময় বলবে, হে আমাদের রব! জিন ও মানুষদের মধ্য থেকে তাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসেন যারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল, যাতে আমরা তাদেরকে পায়ের তলায় পিষে ফেলতে পারি এবং তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়।" (২৯ আয়াত)

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

এখন আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই[৭০] এবং কোন অন্তরংগ বন্ধুও নেই।[৭১] হায় যদি আমাদের আবার একবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ মিলতো, তাহলে আমরা মু'মিন হয়ে যেতাম![৭২]

নিসন্দেহে এর মধ্যে একটি বড় নিদর্শন রয়েছে,[৭৩] কিন্তু এদের অধিকাংশ মু'মিন নয়। আর প্রকৃতপক্ষে তোমার রব পরাক্রমশালীও এবং করুণাময়ও।

এ বিষয়বস্তুটিই সূরা আহযাবে বলা হয়েছে ঃ

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ۝ رَبَّنَا
آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ۝

"আর তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের সরদারদের ও বড়দের আনুগত্য করেছি এবং তারা আমাদের সোজা পথ থেকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে। হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দাও এবং তাদের প্রতি কঠোর লানত বর্ষণ করো।" (৬৭-৬৮ আয়াত)

৭০. অর্থাৎ যাদেরকে আমরা দুনিয়ায় সুপারিশকারী মনে করতাম এবং যাদের সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, তাদের পক্ষপুটে যে আশ্রয় নিয়েছে, সে বেঁচে গেছে। তাদের কেউ সুপারিশ করার জন্য মুখ খুলবে না।

৭১. অর্থাৎ এমন কেউ নেই, যে আমাদের দুঃখে দুঃখ অনুভব করে এবং আমাদের ব্যথায় সমব্যথী হয়। অন্তত আমাদের ছাড়িয়ে নিতে না পারলেও আমাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করবে এমনও কেউ নেই। কুরআন মজীদ বলছে, আখেরাতে একমাত্র মুমিনদের মধ্যে বন্ধুত্ব অব্যাহত থাকবে। অন্যদিকে পথভ্রষ্টরা দুনিয়ায় যতই গভীর ও আন্তরিক বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ থেকে থাক না কেন সেখানে পৌঁছে তারা পরস্পরের প্রাণের শত্রুতে পরিণত হবে। তারা পরস্পরকে অপরাধী গণ্য করবে এবং পরস্পরকে পরস্পরের ধ্বংস ও সর্বনাশের জন্য দায়ী করে একে অন্যকে বেশী শাস্তি দান করাবার চেষ্টা করবে।

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ –

"বন্ধুরা সেদিন হবে একে অন্যের শত্রু কিন্তু মুত্তাকীদের বন্ধুত্ব অপরিবর্তিত থাকবে।" (আয্ যুখ্রুফঃ ৬৭ আয়াত)

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ ِالْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾

৬ রুকূ'

নূহের[৭৪] সম্প্রদায় রসূলদেরকে মিথ্যুক বললো।[৭৫] স্মরণ করো যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলেছিল, "তোমরা কি ভয় করো না?[৭৬]

৭২. এ আকাংখার জবাবও কুরআনে দেয়া হয়েছে ঃ

وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ

"যদি তাদেরকে পূর্ববর্তী জীবনে ফিরিয়ে দেয়া হয় তাহলে তারা তাই করতে থাকবে যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।" (আন'আম ঃ ২৮ আয়াত)

যেসব কারণে তাদেরকে ফিরে যাবার সুযোগ দেয়া হবে না তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে তাফহীমুল কুরআন সূরা মু'মিনুনের ৯০ থেকে ৯২ টীকায়।

৭৩. হযরত ইবরাহীমের এ কাহিনীতে নিদর্শনের তথা শিক্ষার দু'টি দিক রয়েছে। একটি দিক হচ্ছে, আরবের মুশরিকরা একদিকে হযরত ইবরাহীমের (আ) অনুসারী হবার দাবী করতো এবং তাঁর সাথে নিজেদের সম্পর্ক দেখিয়ে গর্ব করতো। কিন্তু অন্যদিকে তারা সেই একই শিরূকে লিপ্ত রয়েছে যার বিরুদ্ধে তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন এবং তিনি যে দীনের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন আজ যে নবী তা পেশ করছেন তার বিরুদ্ধে তারা ঠিক তাই করছে যা হযরত ইবরাহীমের জাতি তাঁর সাথে করেছিল। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যে, হযরত ইবরাহীম তো ছিলেন শিরূকের শত্রু ও তাওহীদের দাওয়াতের পতাকাবাহী। তোমরা নিজেরাও জানো, হযরত ইবরাহীম মুশরিক ছিলেন না। কিন্তু এরপরও তোমরা নিজেদের জিদ বজায় রেখে চলছো। এ কাহিনীতে নিদর্শনের দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে, ইবরাহীমের জাতি দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যে, কোথাও তাদের নাম নিশানাও নেই। তাদের মধ্য থেকে যদি কারো বেঁচে থাকার সৌভাগ্য হয়ে থাকে তাহলে তারা হচ্ছেন কেবলমাত্র হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর দুই ছেলের (ইসমাঈল ও ইসহাক) বংশধরগণ। হযরত ইবরাহীম তাঁর জাতির মধ্য থেকে বের হয়ে যাবার পর তাদের ওপর যে আযাব আসে কুরআন মজীদে যদিও তার উল্লেখ নেই কিন্তু আযাব প্রাপ্ত জাতিদের মধ্যে তাদেরকে গণনা করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ - (التوبة : ٧٠)

৭৪. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন আল আরাফ ৫৯–৬৪, ইউনুস ৭১–৭৩, হূদ ২৫–৪৮, বনী ইসরাঈল ৩, আল আম্বিয়া ৭৬–৭৭, আল মু'মিনূন ২৩–৩০, আল ফুরকান ৩৭ আয়াত এবং এছাড়া নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾

আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রসূল।[৭৭] কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।[৭৮] একাজে আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদানের প্রত্যাশী নই। আমাকে প্রতিদান দেবার দায়িত্ব তো রব্বুল আলামীনের।[৭৯]

নিম্নোক্ত স্থানগুলোও সামনে রাখুনঃ আল আনকাবূত ১৪-১৫, আস্ সাফ্ফাত ৭৫-৮২, আল কামার ৯-১৫ আয়াত এবং সূরা নূহ সম্পূর্ণ।

৭৫. যদিও তারা একজন মাত্র রসূলকে অস্বীকার করেছিল কিন্তু যেহেতু রসূলকে অস্বীকার করা আসলে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে পয়গাম নিয়ে এসেছেন তাকে অস্বীকার করা হয়, তাই যে ব্যক্তি বা দল কোন একজন রসূলকেও অস্বীকার করে সে আল্লাহর দৃষ্টিতে সকল রসূলকে অস্বীকারকারীতে পরিণত হয়। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সত্য। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে একথা বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি তাদেরকেও কাফের গণ্য করা হয়েছে যারা কেবলমাত্র একজন নবীকে অস্বীকার করতো এবং অন্যান্য সকল নবীকে মানতো। এর কারণ হচ্ছে, যে ব্যক্তি রিসালাতের মূল পয়গাম মেনে নেয় সে অনিবার্যভাবে প্রত্যেক রসূলকে মেনে নেবে। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন একজন রসূলকে অস্বীকার করে সে যদি অন্য সকল রসূলকে মানেও তাহলে কোন গোত্র, দল বা সংকীর্ণ স্বার্থপ্রীতি অথবা পূর্ব পুরুষদের অনুসৃতির কারণেই মানে, রিসালাতের মূল পয়গামকে মানে না। অন্যথায় একই সত্য একজন পেশ করলে মেনে নেবে এবং অন্যজন পেশ করলে অস্বীকার করবে, এটা কখনো সম্ভব ছিল না।

৭৬. অন্যান্য স্থানে হযরত নূহ তাঁর নিজের জাতিকে যে প্রাথমিক সম্বোধন করেছিলেন তার শব্দাবলী নিম্নরূপ ঃ

اُعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○

"আল্লাহর বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই, তাহলে তোমরা কি ভয় করো না?" (আল মু'মিনূন ২৩ আয়াত)

اُعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ○

"আল্লাহর বন্দেগী করো, তাঁকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।"
(নূহ ৩ আয়াত)

তাই এখানে হযরত নূহের এ উক্তির অর্থ নিছক ভীতি নয় বরং আল্লাহ ভীতি। অর্থাৎ তোমাদের কি আল্লাহর ভয় নেই? তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের বন্দেগী করার সময় তোমরা একটুও ভেবে দেখো না, এ বিদ্রোহাত্মক নীতির পরিণাম কি হবে?

দাওয়াতের সূচনায় ভয় দেখাবার কারণ হচ্ছে এই যে, যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি বা দলকে তার ভুল নীতির অশুভ পরিণামের ভীতি অনুভব করানো যায় ততক্ষণ সে সঠিক কথা ও তার যুক্তির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতে উদ্যোগী হয় না, মানুষের মনে সঠিক পথের অনুসন্ধিৎসা তখনই জন্ম নেয় যখন তার মনে এ চিন্তা জাগে যে, সে কোন বাঁকা পথে যাচ্ছে না তো, যেখানে ধ্বংসের কোন আশংকা আছে।

৭৭. এর দু'টি অর্থ হয়। এক, আমি নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বানিয়ে বা কমবেশী করে বলি না বরং যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার ওপর নাযিল হয় তাই হুবহু বর্ণনা করি। দুই, আমি এমন একজন রসূল যাকে তোমরা আগে থেকেই একজন সত্যবাদী ও আমানতদার হিসেবে জানো। মানুষের ব্যাপারে যখন আমি আমানতের খেয়ানত করি না তখন আল্লাহর ব্যাপারে কেমন করে আমানতের খেয়ানত করতে পারি। কাজেই তোমাদের জানা উচিত, আমি যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে পেশ করছি সে ব্যাপারে আমি ঠিক তেমনিই আমানতদার যেমন দুনিয়ার ব্যাপারে আজ পর্যন্ত তোমরা আমাকে পেয়েছো।

৭৮. অর্থাৎ আমার আমানতদার রসূল হবার অনিবার্য দাবী হচ্ছে এই যে, তোমরা অন্য সবার আনুগত্য পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার আনুগত্য করবে এবং আমি তোমাদের যে বিধান দেবো তা সর্বান্তঃকরণে মেনে নেবে। কারণ আমি বিশ্ব-জাহানের প্রভুর ইচ্ছার প্রতিনিধি। আমার আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের সমান। আর আমার নাফরমানী করা নিছক আমার সত্তার নাফরমানী করা নয় বরং সরাসরি আল্লাহর নাফরমানীর নামান্তর। অন্য কথায় এর অর্থ দাঁড়ায়, রসূলের অধিকার শুধুমাত্র এতটুকুন নয় যে, যাদের কাছে তাঁকে রসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে তারা তাঁর সত্যবাদিতা মেনে নেবে এবং তাঁকে সত্য রসূল হবার স্বীকৃতি দেবে। বরং তাঁকে আল্লাহর সত্য রসূল বলে মেনে নেবার সাথে সাথেই তাঁর আনুগত্য করা এবং অন্য সমস্ত আইন পরিহার করে একমাত্র তিনি যে আইন এনেছেন তার আনুগত্য করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। রসূলকে রসূল বলে স্বীকার না করা অথবা রসূল বলে স্বীকার করার পর তাঁর আনুগত্য না করা উভয় অবস্থাই আসলে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নামান্তর এবং উভয়েরই ফল হয় আল্লাহর গযবের আওতায় চলে আসা। তাই ঈমান ও আনুগত্যের দাবীর আগে "আল্লাহকে ভয় করো" এর সতর্কতামূলক বাক্য উচ্চারণ করা হয়েছে, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি ভালোভাবে কান খুলে রসূলের রিসালাত স্বীকার না করা অথবা তাঁর আনুগত্য গ্রহণ না করার ফল কি হবে তা শুনে নিতে পারে।

৭৯. এটি হচ্ছে হযরত নূহের সত্যতার সপক্ষে দ্বিতীয় যুক্তি। প্রথম যুক্তি ছিল, নবুওয়াত দাবীর পূর্বে আমার সমগ্র জীবন তোমাদের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। আজ পর্যন্ত তোমরা আমাকে একজন আমানতদার হিসেবেই জানো। আর দ্বিতীয় যুক্তিটি হচ্ছে, আমি একজন নিস্বার্থপর ব্যক্তি। একাজের মাধ্যমে আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার হচ্ছে অথবা নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভ করার জন্য আমি প্রচেষ্টা চালাচ্ছি, এমন কোন ব্যক্তিগত লাভ বা স্বার্থ তোমরা চিহ্নিত করতে পারবে না। এহেন নিস্বার্থভাবে কোন ব্যক্তিগত লাভ ছাড়াই যখন আমি এ সত্যের দাওয়াতের কাজে দিনরাত প্রাণপাত করে যাচ্ছি, নিজের

সময় ও শ্রম নিয়োগ করছি এবং সকল প্রকার কষ্ট বরদাশ্‌ত করছি তখন তোমাদের জানা উচিত, আমি আন্তরিকতা সহকারে একাজ করে যাচ্ছি। ঈমানদারীর সাথে যে জিনিসকে সত্য মনে করি এবং যার আনুগত্যের মধ্যে আল্লাহর বান্দাদের কল্যাণ ও সাফল্য দেখি তাই পেশ করছি। আমার একাজের পেছনে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্যোগ নেই। এ স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য মিথ্যা বলে লোকদের ধোকা দেবার কোন প্রয়োজন আমার নেই।

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ কুরআন মজীদ বারবার এ যুক্তি দু'টি পেশ করেছে এবং এ দু'টিকে নবুওয়াত যাচাই করার মানদণ্ড গণ্য করেছে। নবুওয়াত লাভ করার আগে যে ব্যক্তি একটি সমাজে বছরের পর বছর জীবনযাপন করেছেন এবং লোকেরা সবসময় সব ব্যাপারে তাঁকে সত্যবাদী, নিখাদ ও ন্যায়নিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে পেয়েছে তার সম্পর্কে কোন নিরপেক্ষ মানুষ এরূপ সন্দেহ করতে পারে না যে, তাঁকে নবী না করা সত্ত্বেও তিনি বলবেন, আল্লাহ আমাকে নবী করে পাঠিয়েছেন। সারা জীবনে একটিবারও যে ব্যক্তি মিথ্যা বলেনি। সে হঠাৎ আল্লাহর নামে এত বড় একটি মিথ্যা বলতে উদ্যত হবে, তা কোন নিরাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে ধারণা করা বড়ই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তারপর দ্বিতীয় কথাটা আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ সে কথাটি হচ্ছে, কোন ব্যক্তি সদুদ্দেশ্যে এতবড় ডাহা মিথ্যা তৈরি করে না। নিশ্চিতভাবে কোন সংকীর্ণ স্বার্থই এরূপ শঠতা ও প্রতারণার প্ররোচনা দিয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি যখন নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এহেন প্রতারণামূলক কাজ করে তখন গোপন করার যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তার চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিজের কাজ কারবার বাড়াবার ও সম্প্রসারিত করার জন্য তাকে নানা ধরনের উপায় অবলম্বন করতে হয়। এসবের কুৎসিত দিকগুলো হাজার চেষ্টা করলেও আশপাশের সমাজে লুকিয়ে রাখা যায় না। তাছাড়া নিজের আধ্যাত্মবাদের ব্যবসায় ফেঁদে তার নিজের কিছু না কিছু লাভ হতে দেখা যায়। ভক্তদের থেকে নজরানা নেয়া হয়। লংগরখানা খোলা হয়। জমিজমা কেনা হয়। অলংকারাদি তৈরি করা হয়। ফকিরির আস্তানা দেখতে দেখতে বাদশাহের দরবারে পরিণত হয়। কিন্তু যেখানে এর বিপরীত নবুওয়াত দাবীকারীর ব্যক্তিগত জীবন এমন সব নৈতিক গুণাবলীতে পরিপূর্ণ দেখা যায়, যার মধ্যে প্রতারণামূলক উপায়ের নাম-নিশানাও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না এবং এ কাজের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভ তো দূরের কথা বরং এ সেবামূলক কাজের জন্য সে নিজের সবকিছু বিলিয়ে দেয়, সেখানে মিথ্যাচারের সন্দেহ করার কোন সুস্থ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয় না। কোন বুদ্ধিমান ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি একথা কল্পনাও করতে পারে না যে, একজন নিশ্চিন্ত জীবন যাপনকারী ভালো লোক কেন বিনা কারণে একটি মিথ্যা দাবী নিয়ে দাঁড়াবেন, যখন এ দাবীর মাধ্যমে তার কোন স্বার্থোদ্ধার হচ্ছে না বরং উল্‌টো নিজের ধন-দৌলত, সময় ও শক্তিসামর্থ-শ্রম সবকিছু একাজে নিয়োগ করে এর বদলে সে সারা দুনিয়ার লোকদের শত্রুতা মাথা পেতে নিয়েছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়া মানুষের আন্তরিক হবার সবচেয়ে বেশী সুস্পষ্ট প্রমাণ। বছরের পর বছর ধরে যখন কোন ব্যক্তি এ ধরনের ত্যাগ স্বীকার করে যেতে থাকে তখন যে ব্যক্তি নিজেই অসৎ সংকল্পকারী একমাত্র সে-ই তার প্রতি অসৎসংকল্পকারী বা স্বার্থপর হবার দোষারোপ করতে পারে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল মু'মিনূন ৭০ টীকা)

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١١٠﴾ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ﴿١١١﴾

কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং (নির্দ্বিধায়) আমার আনুগত্য করো।[৮০] তারা জবাব দিল, "আমরা কি তোমাকে মেনে নেবো, অথচ নিকৃষ্টতম লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে?[৮১]

৮০. অকারণে এ বাক্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। আগে এটি বলা হয়েছিল এক প্রেক্ষিতে, এখানে পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে ভিন্ন প্রেক্ষিতে। উপরে اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ এর সাথে فَاتَّقُوا اللّٰهَ বাক্যাংশের সম্পর্ক এ ছিল যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ব্যক্তি হচ্ছেন একজন আমানতদার রসূল, যার আমানতদারীর গুণ সম্পর্কে তোমরা নিজেরাই অবগত, তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করতে গিয়ে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আর এখানে مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ এর সাথে এ বাক্যের সম্পর্ক হচ্ছে এই যে, নিজের কোন ব্যক্তিগত লাভ ছাড়াই যে ব্যক্তি নিছক মানুষের সংস্কার সাধনের জন্য পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে কাজ করছে তার উদ্দেশ্যকে অসৎ আখ্যায়িত করতে গিয়ে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। এ কথাটির ওপর এত বেশী জোর দেবার কারণ ছিল এই যে, জাতির সরদাররা হযরত নূহের আন্তরিকতাপূর্ণ সত্যের দাওয়াতের মধ্যে খুঁত বের করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে এ মর্মে অভিযোগ আনছিল যে, তিনি নিজের বড়াই করার জন্য এতসব প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ঃ

يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ - (المؤمنون : ٢٤)

"সে তোমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায়।"

৮১. হযরত নূহের দাওয়াতের এ জবাব যারা দিয়েছিল তারা ছিল তার সম্প্রদায়ের সরদার, মাতব্বর ও গণ্য মান্য ব্যক্তি। যেমন অন্যান্য জায়গায় এ কাহিনী বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ

فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّاْىِ ۚ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ

"সে জাতির কাফের সরদাররা বললো, আমরা তো তোমাকে এ ছাড়া আর কিছুই দেখছি না যে, তুমি নিছক একজন মানুষ আমাদেরই মতো এবং আমরা দেখছি একমাত্র এমন সব লোকেরা না বুঝেই তোমার অনুসারী হয়েছে যারা আমাদের এখানে নিম্ন শ্রেণীর লোক। আর আমরা এমন কোন জিনিসই দেখি না যার বলে তোমরা আমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ।" (হূদ ঃ ২৭ আয়াত)

এ থেকে জানা যায়, হযরত নূহের প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদের অধিকাংশ ছিল গরীব ও ক্ষুদ্র পেশাদার অথবা এমন পর্যায়ের যুবক জাতির মধ্যে যাদের কোন মর্যাদা ছিল না। অন্যদিকে ছিল উচ্চ শ্রেণীর বিত্তশালী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোকেরা। তারা আদাপানি খেয়ে তাঁর বিরোধিতায় নেমেছিল এবং তারাই জাতির সাধারণ লোকদেরকে

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ
تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١١٥﴾
قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنَّ
قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾

নূহ বললো, "তাদের কাজ কেমন, আমি কেমন করে জানবো। তাদের হিসেব গ্রহণ করা তো আমার প্রতিপালকের কাজ। হায়! যদি তোমরা একটু সচেতন হতে।[৮২] যে ঈমান আনে তাকে তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়। আমি তো মূলত একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।[৮৩] তারা বললো, "হে নূহ! যদি তুমি বিরত না হও, তাহলে তুমি অবশ্যই বিপর্যস্ত লোকদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে।[৮৪] নূহ দোয়া করলো, "হে আমার রব! আমার জাতি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে।[৮৫]

নানাভাবে প্রতারিত করে নিজেদের দলভুক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। এ প্রসংগে তারা হযরত নূহের বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি প্রমাণ পেশ করছিল তার মধ্যে একটি যুক্তি ছিল নিম্নরূপ ঃ যদি নূহের দাওয়াতের কোন গুরুত্ব থাকতো, তাহলে জাতির প্রধানগণ, উলামায়ে কেরাম, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, সম্ভ্রান্ত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গ তা গ্রহণ করতো। কিন্তু তাদের কেউ তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি। জাতির হীনবল ও নিম্ন শ্রেণীর কিছু অবুঝ লোক তাঁর দলে ভিড়েছে। এ অবস্থায় আমাদের মতো উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন লোকেরা কি এসব অজ্ঞ ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের দলে শামিল হয়ে যাবে?

এ একই কথা কুরাইশ বংশীয় কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলতো। তারা বলতো, দাস ও দরিদ্র লোকেরা অথবা কয়েকজন অবুঝ ছোক্‌রাই তো এঁর অনুসারী। জাতির প্রধান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কেউ এঁর সাথে নেই। আবু সুফিয়ান হিরাকলের প্রশ্নের জবাবেও একথাই বলেছিলেন ঃ تبعه منا الضعفاء والمساكين (আমাদের গরীব ও দুর্বল লোকেরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী হয়েছে।) তাদের চিন্তাধারা যেন এধরনের ছিলঃ জাতির প্রধানরা যাকে সত্য বলে মনে করে তা–ই একমাত্র সত্য। কারণ একমাত্র তারাই বুদ্ধি-জ্ঞানের অধিকারী। আর ছোট লোকদের ব্যাপারে বলা যায়, তাদের ছোট হওয়াই একথা প্রমাণ করে যে, তারা বুদ্ধিহীন ও দুর্বল সিদ্ধান্তের অধিকারী। তাই তাদের কোন কথা মেনে নেয়া এবং বড় লোকদের কথা প্রত্যাখ্যান করার পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে এই যে, সেটি একটি গুরুত্বহীন কথা। বরং মক্কার কাফেররা তো এর চাইতেও অগ্রসর হয়ে এ মর্মে যুক্তি পেশ করতো যে, কোন মামুলী ও সাধারণ লোক নবী হতে পারে না। আল্লাহ যদি সত্যিই কোন নবী পাঠাতে চাইতেন তাহলে কোন বড় সমাজপতিকে নবী করে পাঠাতেন ঃ

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ○

"তারা বলে, এ কুরআন আমাদের দু'টি বড় নগরীর (মক্কা ও তায়েফ) কোন প্রভাবশালী লোকের প্রতি নাযিল করা হলো না কেন?" (আয্ যুখরুফঃ ৩১আয়াত)।

৮২. এটি তাদের আপত্তির প্রথম জবাব। যেমন উপরে বলা হয়েছে, তাদের আপত্তির ভিত্তি ছিল একটি কাল্পনিক সিদ্ধান্তের ওপর। সেটি ছিল ঃ গরীব, শ্রমজীবী এবং যারা নিম্নশ্রেণীর কাজ করে অথবা যারা সমাজের নিম্নশ্রেণীর সাথে যুক্ত। তাদের কোন বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা থাকে না। তারা জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক শূন্য হয়। তাই তাদের ঈমান কোন চিন্তা ও দূরদৃষ্টির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাদের আকীদা বিশ্বাস নির্ভরযোগ্য নয়। তাদের কর্মকাণ্ডের কোন গুরুত্ব নেই। হযরত নূহ এর জবাবে বলেন, যে ব্যক্তি আমার কাছে এসে ঈমান আনে এবং একটি আকীদা গ্রহণ করে সে অনুযায়ী কাজ করতে থাকে তার একাজের পেছনে কোন্ ধরনের উদ্যোগ কাজ করছে এবং তা কতটুকু মূল্য ও মর্যাদার অধিকারী তা জানার কোন মাধ্যম আমার কাছে নেই। এ বিষয়গুলো দেখা এবং এগুলোর হিসেব রাখা আল্লাহর কাজ, আমার ও তোমাদের নয়।

৮৩. এটি তাদের আপত্তির দ্বিতীয় জবাব। তাদের আপত্তির মধ্যে একথা প্রচ্ছন্ন ছিল যে, হযরত নূহের চারদিকে মু'মিনদের যে দলটি সমবেত হচ্ছে তারা যেহেতু আমাদের সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোক, তাই উচ্চ শ্রেণীর কোন ব্যক্তি এ দলে শামিল হতে পারে না। অন্যকথায় তারা যেন একথা বলছিল, হে নূহ! তোমার প্রতি ঈমান এনে আমরা কি নিজেদেরকেও নিম্নশ্রেণীর নির্বোধদের দলভুক্ত করবো? আমরা কি দাস, চাকর-বাকর, শ্রমিক ও কায়িক পরিশ্রমকারীদের লাইনে এসে বসে যাবো? হযরত নূহ এর জবাব এভাবে দেন, যারা আমার কথা মানে না আমি তাদের পেছনে দৌড়াতে থাকবো এবং যারা আমার কথা মেনে নেয় তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবো, এ ধরনের অযৌক্তিক কর্মনীতি আমি কেমন করে অবলম্বন করতে পারি! আমার অবস্থা এমন এক ব্যক্তির মতো যে দাঁড়িয়ে সোচ্চার কণ্ঠে একথা ঘোষণা করে দিয়েছে যে, তোমরা মিথ্যা ও বাতিলের পথে চলছো। এ পথে চলার পরিণাম ধ্বংস। আমি তোমাদের যে পথ দেখাচ্ছি তার মধ্যেই রয়েছে তোমাদের সবার সাফল্য ও মুক্তি। এখন যে চাও আমার এ সতর্কবাণী গ্রহণ করে সোজা পথে চলে এসো এবং যে চাও চোখ বন্ধ করে ধ্বংসের পথে চলতে থাকো। আমি তো এমন কোন কর্মনীতি অবলম্বন করতে পারি না যার ফলে যে সমস্ত আল্লাহর বান্দা আমার এ সতর্কবাণী শুনে সঠিক সোজা পথ অবলম্বন করার জন্য আমার কাছে আসবে আমি তাদের জাতি, গোত্র, বংশ, পেশা জিজ্ঞেস করবো এবং যদি তারা তোমাদের দৃষ্টিতে "নিম্নশ্রেণীর" হয়, তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়ে "অভিজাত" লোকেরা কবে ধ্বংসের পথ ছেড়ে দিয়ে নাজাতের পথে এগিয়ে আসবে সে আশায় বসে থাকবো।

ঠিক এ একই ব্যাপার চলছিল এ আয়াতগুলো নাযিল হবার সময় মক্কার কাফের সমাজ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে। এ জিনিসটি সামনে রাখলে হযরত নূহ ও তাঁর জাতির সরদারদের এ কথোপকথন এখানে শুনানো হচ্ছে কেন তা বুঝা যেতে পারে। মক্কার কাফেরদের বড় বড় সরদার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতো, আমরা এই বেলাল, আম্মার, সুহাইবের মতো গোলাম এবং শ্রমজীবী মানুষদের সাথে

কেমন করে বসতে পারি। তাদের কথার অর্থ যেন এ ছিল যে, মুমিনদের দল থেকে যদি এ গরীবদেরকে বের করে দেয়া হয় তাহলেই না এ অভিজাতদের ওদিক মুখো হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে। অন্যথায় সুলতান মাহমুদ ও তার ভৃত্য আয়াযের এক কাতারে দাঁড়ানো কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এ অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরিষ্কার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ নির্দেশ দেয়া হয়, যারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এমন সব অহংকারীদের জন্য ঈমান গ্রহণকারী গরীবদেরকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া যেতে পারে নাঃ

أَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۝ فَأَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۝ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكّٰى ۝ وَأَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ۝ وَهُوَ يَخْشٰى ۝ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۝ كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ ۝

"হে মুহাম্মাদ! যে বেপরোয়া ভাব দেখালো তুমি তার প্রতি মনোযোগী হলে? অথচ যদি সে সংশোধিত না হয়, তাহলে তোমার ওপর তার কি দায়িত্ব আছে? আর যে ব্যক্তি মনে আল্লাহর ভয় নিয়ে তোমার কাছে ছুটে আসে তুমি তাকে অবজ্ঞা করছো? কখ্খনো না, এতো একটি উপদেশ, যার মন চায় একে গ্রহণ করে নেবে।" (সূরা আবাসাঃ ৫–১২ আয়াত)

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ط مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا أَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا ط أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ۝

"যারা দিনরাত নিজেদের রবকে ডাকছে নিছক তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদেরকে দূরে নিক্ষেপ করো না। তোমার ওপর তাদের কোন দায়দায়িত্ব নেই এবং তাদের ওপরও তোমার কোন দায়দায়িত্ব নেই। এরপরও যদি তুমি তাদেরকে দূরে নিক্ষেপ করো তাহলে তুমি জালেমদের মধ্যে গণ্য হবে। আমি তো এভাবে তাদের মধ্য থেকে কতককে কতকের মাধ্যমে পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিয়েছি, যাতে তারা বলেঃ 'আমাদের মধ্যে কি কেবল এ লোকেরাই অবশিষ্ট ছিল, যাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে?' হাঁ, আল্লাহ নিজের কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে কি এরচেয়ে বেশী জানেন না?" (আল আন'আমঃ ৫২ আয়াত)

৮৪. মূল শব্দগুলো হচ্ছে, لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ –এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, তোমাকে 'রজম' করা হবে। অর্থাৎ পাথর মেরে তোমাকে মেরে ফেলা হবে।

فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِي وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾
فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾

এখন আমার ও তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট ফায়সালা করে দাও এবং আমার সাথে যেসব মু'মিন আছে তাদেরকে রক্ষা করো।"[৮৬] শেষ পর্যন্ত আমি একটি বোঝাই করা নৌযানে তাকে ও তার সাথিদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম,[৮৭] তারপর অবশিষ্ট লোকদেরকে ডুবিয়ে দিলাম।

নিশ্চিতভাবে এর মধ্যে রয়েছে একটি নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। আর আসল ব্যাপার হচ্ছে, তোমার রব পরাক্রমশালী এবং করুণাময়ও।

আর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, চারদিক থেকে তোমাকে গালাগালি করা হবে। যেখানেই যাবে, অভিশাপ দেয়া হবে এবং অপদস্ত করে তাড়িয়ে দেয়া হবে। আরবী বাগধারা অনুযায়ী এ শব্দগুলো থেকে এ দু'টি অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮৫. অর্থাৎ চূড়ান্ত ও শেষ পর্যায়ে মিথ্যা বলে দিয়েছে ও প্রত্যাখ্যান করেছে। এরপরে আর কোন প্রকার সত্যায়ন করার ও ঈমান আনার আশা থাকে না। আলোচনার বাইরের চেহারা দেখে কেউ যেন এ সন্দেহ পোষণ না করে যে, নবী ও তাঁর সম্প্রদায়ের সরদারদের মধ্যে উপরের কথোপকথন হয় এবং তাদের পক্ষ থেকে প্রথম প্রত্যাখ্যানের পর নবী আল্লাহর কাছে এ মর্মে রিপোর্ট পেশ করেন যে, তারা আমার নবুওয়াত মানছে না কাজেই এখন আপনি আমার ও তাদের সমস্যার ফায়সালা করে দিন। হযরত নূহের (আ) দাওয়াত এবং তাঁর সম্প্রদায়ের কুফরীর ওপর অবিচল থাকার মধ্যে যে শত শত বছর ধরে সুদীর্ঘকালীন সংঘাত চলেছে কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে তা আলোচিত হয়েছে। সূরা আনকাবূতে বলা হয়েছে, সাড়ে নয় শত বছর ধরে এ সংঘাত চলেঃ

فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا –

"তারপর তিনি তাদের মধ্যে বসবাস করেন সাড়ে নয় শত বছর।" (১৪ আয়াত)

এ দীর্ঘ সময়ে হযরত নূহ বংশ পরম্পরায় তাদের সামাজিক কার্যক্রম দেখে বুঝতে পারেন যে, কেবল তাদের মধ্যেই সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা খতম হয়ে যায়নি। বরং তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যেও সৎ ও ঈমানদার মানুষের জন্ম হবার আশা নেই।

كَذَّبَتْ عَادُ ِۨ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾ اِنِّيْ
لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٢٦﴾ وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ
اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٧﴾ اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ﴿١٢٨﴾
وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ﴿١٢٩﴾ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ
جَبَّارِيْنَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٣١﴾

৭ রুকূ'

আদ জাতি রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো।[৮৮] স্মরণ করো যখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বলেছিল,[৮৯] "তোমরা ভয় করছো না? আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রসূল। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। আমি এ কাজে তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান দেবার দায়িত্ব তো রব্বুল আলামীনের। তোমাদের এ কি অবস্থা, প্রত্যেক উঁচু জায়গায় অনর্থক একটি ইমারত বানিয়ে ফেলছো[৯০] এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছো, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে?[৯১] আর যখন কারো ওপর হাত ওঠাও প্রবল একনায়ক হয়ে হাত ওঠাও।[৯২] কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ○

"হে পরওয়ারদিগার! যদি তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও, তাহলে তারা তোমার বান্দাদেরকে গোমরাহ করবে এবং তাদের বংশে যে-ই জন্ম নেবে সে-ই হবে চরিত্রহীন ও কঠোর সত্য অস্বীকারকারী।" (নূহ, ২৭ আয়াত)

আল্লাহ নিজেও হযরত নূহের এ অভিমতকে সঠিক বলে স্বীকার করেন এবং নিজের পূর্ণ ও নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে বলেনঃ

لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ○

"তোমার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া এখন আর ঈমান আনার মত কেউ নেই। কাজেই এখন তাদের কার্যকলাপের জন্য দুঃখ করা থেকে বিরত হও।" (হূদ, ৩৬ আয়াত)

৮৬. অথাৎ কেবল কে সত্য ও কে মিথ্যা এতটুকু ফায়সালা করে দিলে হবে না বরং এ ফায়সালাকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করো যাতে মিথ্যাপন্থীকে ধ্বংস করে দেয়া যায়

এবং সত্যপন্থীকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। "আমার ও আমার মুমিন সাথীদেরকে রক্ষা করো" এ শব্দগুলো স্বতস্ফূর্তভাবে এ অর্থ প্রকাশ করছে যে, অবশিষ্ট লোকদের প্রতি আযাব নাযিল করো এবং ধরার বুক থেকে তাদেরকে চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দাও।

৮৭. "বোঝাই করা নৌযান" অর্থ হচ্ছে, এ নৌকাটি সকল মু'মিন ও সকল প্রাণীতে পরিপূর্ণ ছিল। পূর্বেই এ প্রাণীদের এক একটি জোড়া সংগে নেবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা হূদ ৪০ আয়াত।

৮৮. তুলনামূলক অধ্যায়নের জন্য দেখুন আল আ'রাফ ৬৫–৭২ ও হূদ ৫০–৬০ আয়াত। এ ছাড়া এ কাহিনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত স্থানগুলো পড়ুন ঃ হা–মীম আস্ সাজ্দাহ ১৩–১৬, আল আহকাফ ২১–২৬, আয্ যারিয়াত ৪১–৪৫, আল কামার ১৮–২২, আল হাক্কাহ ৪–৮ এবং আল ফজর ৬–৮ আয়াত।

৮৯. হযরত হূদের এ ভাষণটি অনুধাবন করার জন্য এ জাতিটি সম্পর্কিত তথ্যাবলী আমাদের সামনে থাকা প্রয়োজন। কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে আমাদের কাছে এ তথ্য পরিবেশন করেছে। এতে বলা হয়েছে, নূহের জাতির ধ্বংসের পর দুনিয়ায় যে জাতির উত্থান ঘটানো হয়েছিল তারা ছিল এই আদ জাতি ঃ

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ –

"স্মরণ করো (আল্লাহর অনুগ্রহ ও দানের কথা) তিনি নূহের জাতির পরে তোমাদেরকে খলীফা তথা প্রতিনিধি নিয়োগ করেন।" (আল আ'রাফ ৬৯ আয়াত)

শারীরিক দিক দিয়ে তারা ছিল অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ঠ জাতি।

وَزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْۜطَةً –

"আর শারীরিক গঠন শৈলীতে তোমাদেরকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করি।" (আল আ'রাফ ৬৯ আয়াত)

সেকালে তারা ছিল নজিরবিহীন জাতি। তাদের সমকক্ষ অন্য কোন জাতিই ছিল নাঃ

اَلَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ –

"তাদের সমকক্ষ কোন জাতি দেশে সৃষ্টি করা হয়নি।" (আল ফজর ৮ আয়াত)

তাদের সভ্যতা ছিল বড়ই উন্নত ও গৌরবোজ্জ্বল। সুউচ্চ ইমারত নির্মাণ করা ছিল তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট এবং এজন্য তদানীন্তন বিশ্বে তারা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ – اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ –

"তুমি কি দেখোনি তোমাদের রব কি করেছেন সুউচ্চ স্তম্ভের অধিকারী ইরমের আদদের সাথে?" (আল ফজর ৬–৭ আয়াত)

এ বস্তুগত উন্নতি ও শারীরিক শক্তি তাদেরকে অহংকারী করে দিয়েছিল এবং নিজেদের শক্তির গর্বে তারা মত্ত হয়ে উঠেছিলঃ

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً –

"আর আদ জাতি, তারা তো পৃথিবীতে সত্যের পথ থেকে সরে গিয়ে অহংকার করতে থাকে এবং বলতে থাকে, কে আছে আমাদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী?" (হা–মীম আস্ সাজদাহ ১৫ আয়াত)

তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল কয়েকজন বড় বড় জালেম একনায়কের হাতে। তাদের সামনে কেউ টু শব্দটিও করতে পারতো নাঃ

وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ –

"আর তারা প্রত্যেক সত্যের দুশমন জালেম একনায়কের হুকুম পালন করে।"
(হূদ ৫৯ আয়াত)

ধর্মীয় দিক থেকে তারা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না বরং শির্‌কে লিপ্ত ছিল। বন্দেগী একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হওয়া উচিত, একথা তারা অস্বীকার করতোঃ

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا –

"তারা (হুদ আলাইহিস সালামকে) বললো, তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছো যে, আমরা একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করবো এবং আমাদের বাপদাদারা যাদের ইবাদাত করতো তাদেরকে বাদ দেবো?" (আল আ'রাফ ৭০ আয়াত)

এ বৈশিষ্টগুলো সামনে রাখলে হযরত হূদের দাওয়াতের এ ভাষণ ভালোভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে।

৯০. অর্থাৎ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও সমৃদ্ধির প্রদর্শনী করার উদ্দেশ্যে এমনসব বিশাল সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করছো; যেগুলোর কোন প্রয়োগ ক্ষেত্র ও প্রয়োজনীয়তা নেই এবং নিছক তোমাদের সম্পদশালিতা ও শানশওকতের প্রদর্শনীর নিদর্শন হিসেবে এগুলো টিকে থাকবে, এছাড়া যেগুলোর কোন উপযোগিতাও নেই।

৯১. অর্থাৎ তোমাদের অন্যান্য ইমারতগুলো ব্যবহারের জন্য নির্মিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেগুলোকে সুরম্য, কারুকার্যময় ও সুদৃঢ় করার ব্যাপারে তোমরা এতবেশী অর্থ, শ্রম ও যোগ্যতা নিয়োগ করছো যেন তোমরা এ দুনিয়ায় চিরকাল বসবাস করার ব্যবস্থা করছো, যেন শুধুমাত্র এখানকার আয়েশ আরামের ব্যবস্থা করাই তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ এবং এছাড়া আর কোন কথাই চিন্তা করার নেই।

এ প্রসংগে একথাও মনে রাখতে হবে যে, অপ্রয়োজনে বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করা এমন কোন বিচ্ছিন্ন কর্মকাণ্ড নয়, যার প্রকাশ কোন জাতির মধ্যে এভাবে হতে পারে যে, তার অন্য সমস্ত কাজ কারবার তো ভালোই শুধুমাত্র এ একটি খারাপ ও ভুল কাজ সে করেছে। এ অবস্থা একটি জাতির মধ্যে সৃষ্টিই হয় এমন এক সময় যখন একদিকে তার মধ্যে দেখা দেয় সম্পদের প্রাচুর্য এবং অন্যদিকে প্রবৃত্তি পূজা ও

وَاتَّقُوا الَّذِيٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمَدَّكُم بِأَنْعَٰمٍ وَبَنِينَ ﴿١٣٣﴾
وَجَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾ قَالُوا
سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَٰعِظِينَ ﴿١٣٦﴾ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا خُلُقُ
ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿١٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَٰهُمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ
لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾

তাঁকে ভয় করো যিনি এমন কিছু তোমাদের দিয়েছেন যা তোমরা জানো। তোমাদের দিয়েছেন পশু, সন্তান-সন্ততি, উদ্যান ও পানির প্রস্রবনসমূহ। আমি ভয় করছি তোমাদের ওপর একটি বড়দিনের আযাবের।" তারা জবাব দিল, "তুমি উপদেশ দাও বা না দাও, আমাদের জন্য এ সবই সমান। এ ব্যাপারগুলো তো এমনিই ঘটে চলে আসছে[৯৩] এবং আমরা আযাবের শিকার হবো না।" শেষ পর্যন্ত তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করলো এবং আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম।[৯৪]

নিশ্চিতভাবেই এর মধ্যে আছে একটি নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মেনে নেয়নি। আর প্রকৃতপক্ষে তোমার রব যেমন পরাক্রমশালী তেমন করুণাময়ও।

বৈষয়িক স্বার্থপরতা প্রবল হতে হতে উন্মত্ততার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। যখন কোন জাতির মধ্যে এ অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় তখন তার সভ্যতা-সংস্কৃতির সমগ্র ব্যবস্থাটিই পচে দুর্গন্ধময় হয়ে পড়ে। হযরত হূদ (আ) তাঁর জাতির ইমারত নির্মাণের যে সমালোচনা করেন তার উদ্দেশ্য এ ছিল না যে, তিনি শুধুমাত্র তাদের এ ইমারত নির্মাণকেই আপত্তিকর মনে করতেন বরং তিনি সামগ্রিকভাবে তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকৃতির সমালোচনা করছিলেন এবং এ ইমারতগুলোর কথা তিনি এমনভাবে উচ্চারণ করেছিলেন যেন সারা দেশে সর্বত্র এ বড় বড় ফোড়াগুলো সেই বিকৃতির সবচেয়ে সুস্পষ্ট আলামত হিসেবে পরিদৃষ্ট হচ্ছে।

৯২. অর্থাৎ নিজেদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করার ক্ষেত্রে তোমরা এত বেশী সীমা-লংঘন করে গেছো যার ফলে মনে হয়েছে তোমাদের বাসগৃহ নয়, সুদৃশ্য মহল ও প্রাসাদের প্রয়োজন। আর এতেও পরিতৃপ্ত না হয়ে তোমরা অপ্রয়োজনে সুউচ্চ নয়নাভিরাম ইমারতসমূহ নির্মাণ করছো। শক্তি ও সম্পদের প্রদর্শনী ছাড়া এগুলোর আর কোন স্বার্থকতা নেই। কিন্তু তোমাদের মনুষ্যত্বের মানদণ্ড এত নিচে নেমে গেছে, যার ফলে দুর্বলদের জন্য তোমাদের অন্তরে একটুও দয়া মায়া নেই। গরীবদের জন্য তোমাদের দেশে কোন ইনসাফ নেই। আশপাশের দুর্বল জাতিগুলো হোক বা তোমাদের নিজেদের দেশের পশ্চাতপদ শ্রেণীগুলো, সবাই তোমাদের জুলুম নিপীড়নের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছে এবং তোমাদের নির্মম নির্যাতনের হাত থেকে কেউ রেহাই পাচ্ছে না।

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾ إِنِّي
لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٤٤﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ ﴿١٤٦﴾ فِي
جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ
بُيُوتًا فَارِهِينَ ﴿١٤٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٥٠﴾

৮ রুকূ'

সামূদ জাতি রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো।[৯৫] স্মরণ করো যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বললোঃ "তোমরা কি ভয় করো না? আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রসূল।[৯৬] কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদানের প্রত্যাশী নই। আমার প্রতিদান দেবার দায়িত্ব তো রব্বুল আলামীনের। এখানে যেসব জিনিস আছে সেগুলোর মাঝখানে কি তোমাদের এমনিই নিশ্চিন্তে থাকতে দেয়া হবে?[৯৭] এসব উদ্যান ও প্রস্রবনের মধ্যে? এসব শস্যক্ষেত ও রসাল গুচ্ছ বিশিষ্ট খেজুর বাগানের মধ্যে?[৯৮] তোমরা পাহাড় কেটে তার মধ্যে সগর্বে ইমারত নির্মাণ করছো।[৯৯] আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

৯৩. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, যা কিছু আমরা করছি এগুলো কোন নতুন জিনিস নয়, শত শত বছর থেকে আমাদের বাপ-দাদারা এসব করে আসছে। এসবই ছিল তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, চরিত্রনীতি ও ব্যবহারিক জীবনধারা। তাদের ওপর এমন কি বিপদ নেমে এসেছিল যে, আজ আমাদের ওপর তা নেমে আসার আশংকা করবো? এ জীবন ধারায় যদি কোন অন্যায় ও দুষ্কৃতির অংশ থাকতো, তাহলে তুমি যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছো তা আগেই নেমে আসতো। দুই, তুমি যেসব কথা বলছো এমনি ধারার কথা ইতিপূর্বেও বহু ধর্মীয় উন্মাদ এবং যারা নৈতিকতার বুলি আওড়ায় তারা আওড়িয়ে এসেছে। কিন্তু দুনিয়ার রীতি অপরিবর্তিত রয়েছে। তোমাদের মতো লোকদের কথা না মানার ফলে কখনো এক ধাক্কায় এ রীতির মধ্যে ওলট পালট হয়ে যায়নি।

৯৪. এ জাতির ধ্বংসের যে বিস্তারিত বিবরণ কুরআন মজীদে এসেছে তা হচ্ছে এইঃ হঠাৎ প্রবল ঘূর্ণিঝড় ওঠে। লোকেরা দূর থেকে নিজেদের উপত্যকার দিকে এ ঘূর্ণিঝড় আসতে দেখে মনে করে মেঘ ছেয়ে যাচ্ছে। তারা আনন্দে উতলা হয়ে ওঠে। কারণ জোর বৃষ্টিপাত হবে। কিন্তু তা ছিল আল্লাহর আযাব। আট দিন ও সাত রাত পর্যন্ত এমন ঝড়ো

হাওয়া অনবরত বইতে থাকে যার ফলে প্রত্যেকটি জিনিসই ধ্বংস হয়ে যায়। হাওয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়ে মানুষজনকে উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে চতুরদিকে নিক্ষেপ করতে থাকে। বাতাস এত বেশী গরম ও শুকনা ছিল যে, যার ওপর দিয়ে তা একবার প্রবাহিত হয় তাকে নড়বড়ে ও অকেজো করে দিয়ে যায়। এ জালেম জাতির প্রত্যেকটি লোক খতম না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এ ঝড় থামেনি। তাদের জনপদের ধ্বংসাবশেষগুলোই শুধু তাদের পরিণামের কাহিনী শুনাবার জন্য টিকে আছে। আর আজ এ ধ্বংসাবশেষও নেই। আহকাফের সমগ্র এলাকা একটি ভয়াবহ মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আহকাফ ২৫ টীকা)।

৯৫. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন সূরা আল আ'রাফ ৭৩-৭৯ আয়াত, হূদ ৬১-৬৮ আয়াত, আল হিজর ৮০-৮৪ আয়াত এবং বনী ইসরাঈল ৫৯ আয়াত। আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত স্থানগুলোঃ আন্ নমল ৪৫-৫৯, আয্ যারিয়াত ৪৩-৪৫, আল কামার ২৩-৩১, আল হাক্কাহ ৪-৫, আল ফজর ৯ এবং আশ্ শাম্স ১১ আয়াত।

এ জাতিটি সম্পর্কে কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে জানা যায়, আদ জাতির পরে দুনিয়ায় এ সামুদ জাতিই উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। جعلكم خلفاء من بعد عاد – (الاعراف : ٧٤) । কিন্তু তাদের সভ্যতার অগ্রগতিও শেষ পর্যন্ত আদ জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির মতো একই রূপ পরিগ্রহ করে। অর্থাৎ জীবন যাত্রার মান উন্নত থেকে উন্নততর এবং মনুষ্যত্বের মান নিম্নতর থেকে নিম্নতর হতে থাকে। এক দিকে সমতল এলাকায় সুউচ্চ ও সুরম্য প্রাসাদোপম অট্টালিকা এবং পার্বত্য এলাকায় অজন্তা-ইলোরার পর্বত গুহার মতো সুরম্য প্রাসাদ নির্মিত হতে থাকে। আর অন্যদিকে সমাজে শিরক ও মূর্তি পূজার প্রবল জোয়ার চলতে থাকে এবং পৃথিবী পৃষ্ঠ ভরে উঠতে থাকে জুলুম-নিপীড়নের প্রাবল্যে। জাতির সবচেয়ে অসৎ দুষ্কৃতিকারীরা তার নেতৃত্বের আসনে বসেছিল। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মত্ত ছিল। হযরত সালেহের সত্যের দাওয়াত কেবলমাত্র নিম্নশ্রেণীর দুর্বল লোকদেরকেই প্রভাবিত করছিল। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা শুধুমাত্র একারণেই তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল যে, انا بالذى امنتم به كفرون "যে বিষয়ের প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছো তা আমরা মেনে নিতে পারি না।"

৯৬. হযরত সালেহের বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী এবং অসাধারণ যোগ্যতার সাক্ষ তাঁর জাতির লোকদের মুখ দিয়ে কুরআন মজীদের ভাষায় নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত হয়েছেঃ

قَالُوْا يٰصَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا –

"তারা বললো, হে সালেহ! এর আগে তুমি আমাদের মধ্যে এমন লোক ছিলে যার ওপর আমাদের অনেক আশা ভরসা ছিল।" (হূদ ৬২ আয়াত)

৯৭. অর্থাৎ তোমরা কি মনে করো, তোমাদের এ আয়েশ আরাম স্থায়ী ও চিরন্তন? এসব কোনদিন বিনষ্ট হবে না? তোমাদের থেকে কখনো এসব নিয়ামতের হিসেব নেয়া হবে না? তোমরা যেসব কাজ কারবার করে যাচ্ছো কখনো এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না?

৯৮. মূলে هَضِيْم শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে খেজুরের এমন কাঁদি যা ফলভারে নূয়ে পড়েছে এবং যার ফল পেকে যাবার পর রসাল ও কোমল হবার কারণে ফেটে যায়।

৯৯. আদ জাতির সভ্যতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট ছিল, তারা উঁচু উঁচু স্তম্ভ বিশিষ্ট ইমারত নির্মাণ করতো। ঠিক তেমনি সামূদ জাতির সভ্যতা তার যে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টের জন্য প্রাচীনকালের জাতিসমূহের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছিল, তা ছিল এই যে, তারা পাহাড় কেটে তার মধ্যে ইমারত নির্মাণ করতো। তাই সূরা 'আল ফজ্‌রে' যেভাবে আদকে 'যাতুল ইমাদ' (ذات العماد) অর্থাৎ স্তম্ভের অধিকারী পদবী দেয়া হয়েছে ঠিক তেমনি সামূদ জাতির বর্ণনা একথার মাধ্যমে করা হয়েছেঃ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ "এমনসব লোক যারা উপত্যকায় পাহাড় কেটেছে।" এ ছাড়া কুরআনে একথাও বলা হয়েছে যে, তারা নিজেদের দেশের সমতলভূমিতে বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করতোঃ

تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا - (الاعراف : ٧٤)

এসব গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি ছিল? فَرِهِيْنَ শব্দের মাধ্যমে কুরআন-এর ওপর আলোকপাত করে। অর্থাৎ এসব কিছু ছিল তাদের নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব, সম্পদ, শক্তি ও প্রযুক্তির নৈপুণ্যের প্রদর্শনী। কোন যথার্থ প্রয়োজনের তাগিদ এর পেছনে কার্যকর ছিল না। একটি বিকৃত ও ভ্রষ্ট সভ্যতার ধরন এমনিই হয়ে থাকে। একদিকে সমাজের গরীব লোকেরা মাথা গোঁজারও ঠাঁই পায় না আর অন্যদিকে ধনী নেতৃস্থানীয় লোকেরা থাকার জন্য যখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রাসাদ নির্মাণ করে ফেলে তখন প্রয়োজন ছাড়াই নিছক লোক দেখাবার জন্য স্মৃতিস্তম্ভসমূহ নির্মাণ করতে থাকে।

সামূদ জাতির এ ইমারতগুলোর কিছু সংখ্যক এখনো টিকে আছে। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি নিজে এগুলো দেখেছি। পাশের পৃষ্ঠায় এগুলোর কিছু ছবি দেয়া হলো। এ জায়গাটি মদীনা তাইয়েবা ও তাবুকের মধ্যবর্তী হিজাযের বিখ্যাত আল'উলা নামক স্থান (যাকে নবীর জমানায় 'ওয়াদিউল কুরা' বলা হতো) থেকে কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত। স্থানীয় লোকেরা আজো এ জায়গাকে 'আল্ হিজ্‌র' ও 'মাদ্‌য়ানে সালেহ' নামে স্মরণ করে থাকে। এ এলাকায় 'আল্‌উলা' এখনো একটি শস্যশ্যামল উপত্যকা। এখানে রয়েছে বিপুল সংখ্যক পানির নহর ও বাগিছা। কিন্তু আল্ হিজ্‌রের আশেপাশে বড়ই নির্জন ও ভীতিকর পরিবেশ বিরাজমান। লোকবসতি নামমাত্র। সবুজের উপস্থিতি ক্ষীণ। কূয়া আছে কয়েকটি। এরই মধ্য থেকে একটি কূয়ার ব্যাপারে স্থানীয় লোকদের মধ্যে একথা প্রচলিত আছে যে, হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের উটনী সেখান থেকে পানি পান করতো। বর্তমানে এটি তুর্কী আমলের একটি বিরান ক্ষুদ্র সামরিক চৌকির মধ্যে অবস্থিত। কূয়াটি একেবারেই শুকনা। (এর ছবিও পাশের পাতায় দেখানো হয়েছে)। এ এলাকায় প্রবেশ করে আলউলা'র কাছাকাছি পৌঁছুতেই আমরা সর্বত্র এমনসব পাহাড় দেখলাম যা একেবারেই ভেংগে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। পরিষ্কার মনে হচ্ছিল, কোন ভয়াবহ ভূমিকম্প এগুলোকে নিচে থেকে ওপর পর্যন্ত ঝাঁকানি দিয়ে ফালি ফালি করে দিয়ে গেছে। (এ পাহাড়গুলোরও কিছু ছবি পাশের পাতাগুলোয় দেয়া হয়েছে)। এ ধরনের

আল আলা পাহাড়

মাদয়ানে সালেহ (আ) পাহাড়

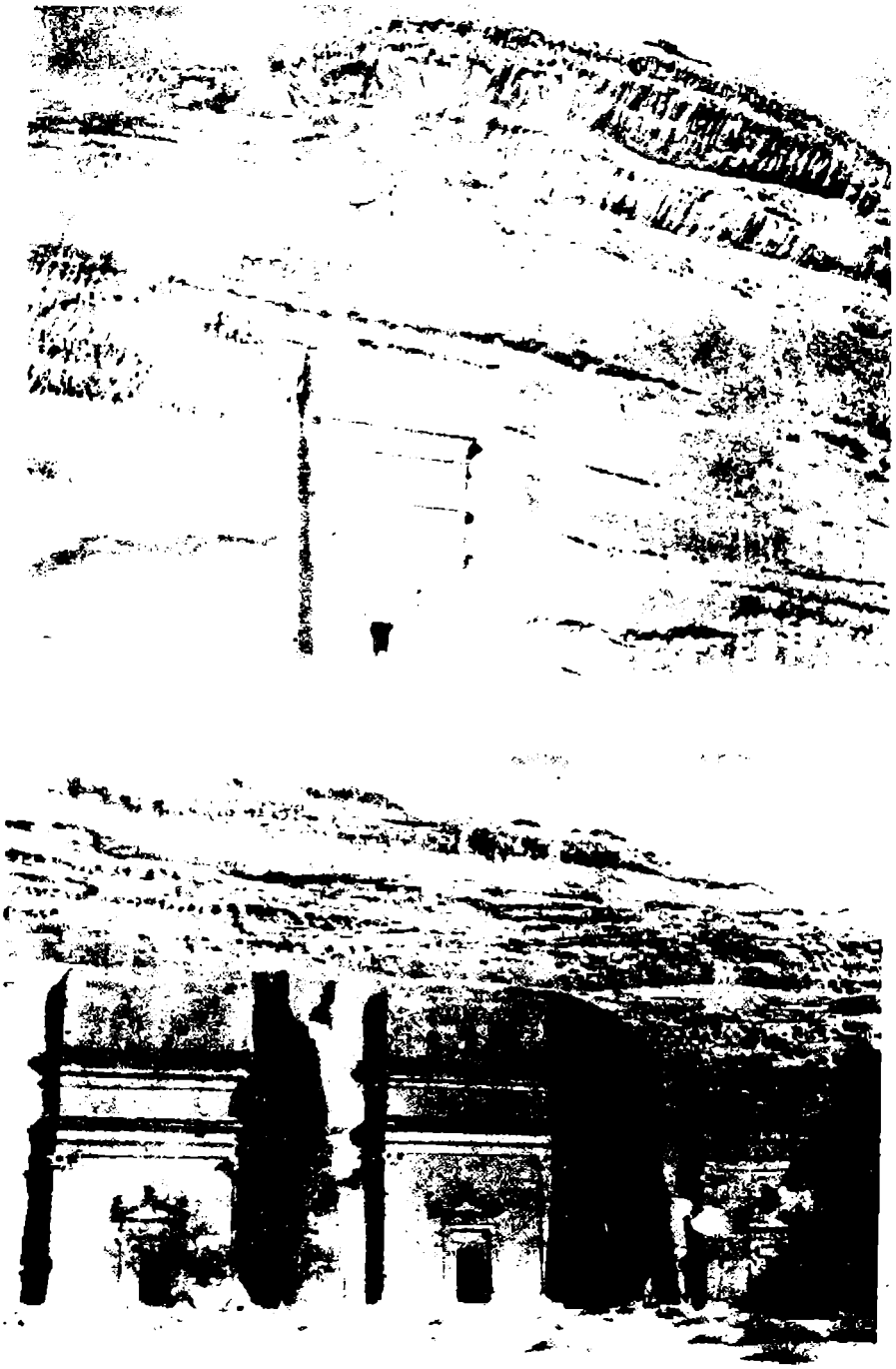

মাদয়ানে সালেহ (আ)-এর কিছু সংখ্যক সামূদীয় অট্টালিকা

মাদয়ানে সালেহ (আ)-এর সামুদীয় অট্টালিকা

পেট্রায় নিবতী পদ্ধতির একটি অট্টালিকা

// ১১২

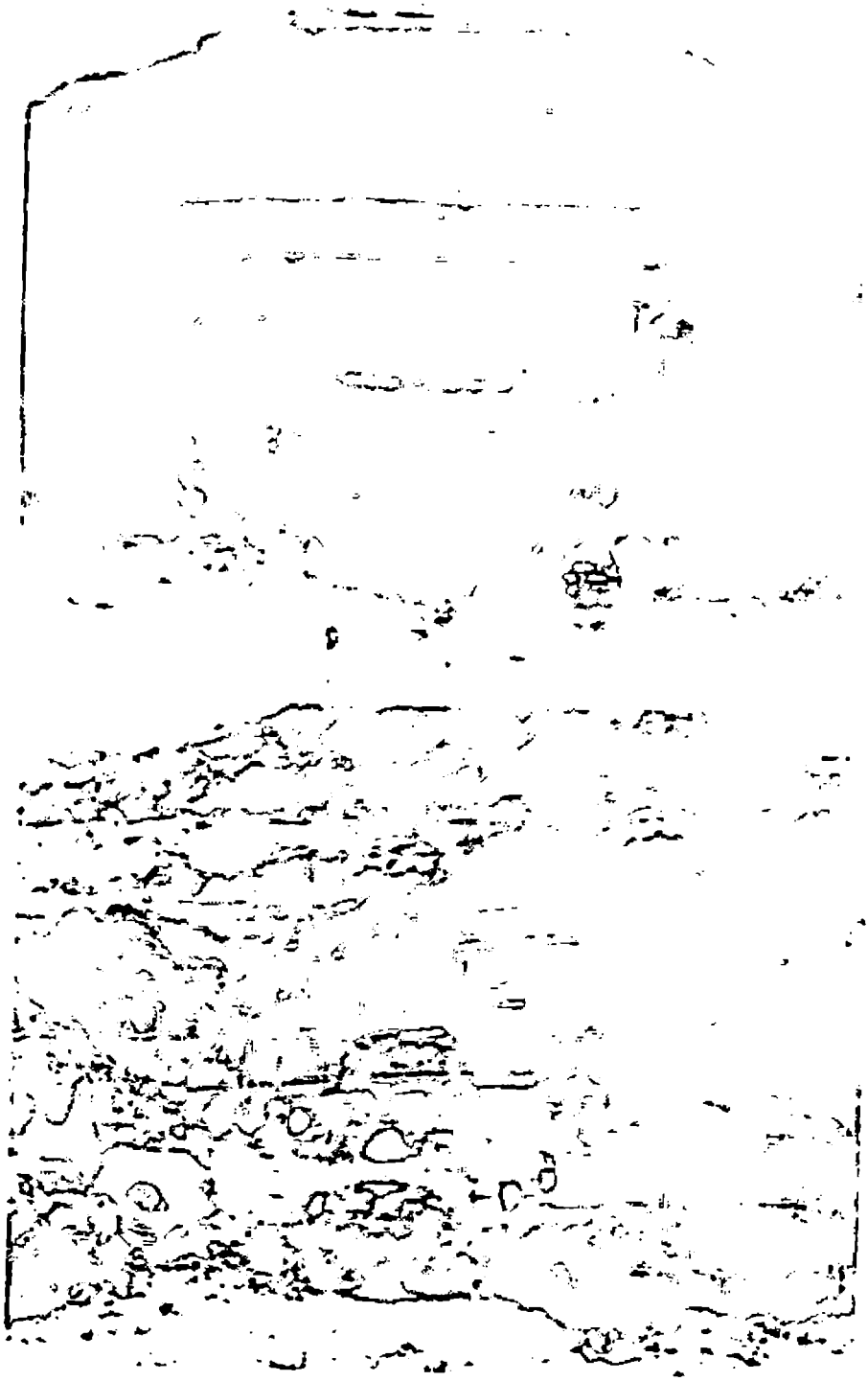

তা-১০/১৫— পেটায় নিবতী পদ্ধতির একটি অট্টালিকা

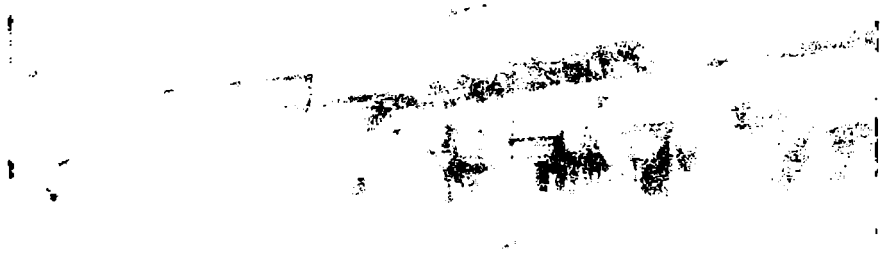

মাদয়ানে সামূদীয় পদ্ধতির একটি অট্টালিকা

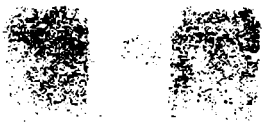

মাদয়ানে সালেহ (আ)-এর উষ্ট্রী যে কূপে পানি পান করত

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا
يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا
فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٤﴾ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ
شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾
فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ﴿١٥٧﴾ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾

যেসব লাগামহীন লোক পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং কোন সংস্কার সাধন করে না তাদের আনুগত্য করো না।"[১০০] তারা জবাব দিল, "তুমি নিছক একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি।[১০১] তুমি আমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কি? কোন নিদর্শন আনো, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো।"[১০২] সালেহ বললো, "এ উটনীটি রইলো।[১০৩] এর পানি পান করার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট এবং তোমাদের সবার পানি পান করার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট রইলো।[১০৪] একে কখনো পীড়ন করো না, অন্যথায় একটি মহা দিবসের আযাব তোমাদের ওপর আপতিত হবে।" তারা তার পায়ের গিঁঠের রগ কেটে দিল[১০৫] এবং শেষে অনুতপ্ত হতে থাকলো। আযাব তাদেরকে গ্রাস করলো।[১০৬]

নিশ্চিতভাবেই এর মধ্যে রয়েছে একটি নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মান্যকারী নয়। আর প্রকৃতপক্ষে তোমার রব হচ্ছেন পরাক্রমশালী এবং দয়াময়ও।

পাহাড় আমরা দেখতে দেখতে গিয়েছি পূর্বের দিকে আল'উলা থেকে খয়বর যাবার সময় প্রায় ৫০ মাইল পর্যন্ত এবং উত্তর দিকে জর্দান রাজ্যের সীমানার মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ মাইল অভ্যন্তর পর্যন্ত। এর অর্থ দাঁড়ায়, তিন চারশো মাইল দীর্ঘ ও একশো মাইল প্রস্থ বিশিষ্ট একটি এলাকা ভূমিকম্পে একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

আল হিজ্‌রে আমরা সামূদ জাতির যেসব ইমারত দেখেছিলাম ঠিক একই ধরনের কতিপয় ইমারত আমরা পেলাম আকাবা উপসাগরের কিনারে মাদ্‌য়ানে এবং জর্দান রাজ্যের পেট্রা (PETRA) নামক স্থানেও। বিশেষ করে পেট্রায় সামূদী প্যাটার্নের ইমারত এবং নিবতীদের তৈরি করা অট্টালিকা পাশাপাশি দেখা গেছে। এগুলোর আকৃতি, কারুকাজ ও নির্মাণ পদ্ধতিতে এত সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই এক নজর

দেখার সাথে সাথেই বুঝতে পারবে এগুলো এক যুগেরও নয় এবং একই জাতির স্থাপত্যের নিদর্শনও নয়। (এগুলোরও আলাদা আলাদা ছবি আমি পাশের পৃষ্ঠায় দিয়েছি। ইংরেজ প্রাচ্যবিদ ডটি (Daughty) কুরআনকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আল হিজ্‌রের ইমারত সম্পর্কে দাবী করেছেন, এগুলো সামূদের নির্মিত নয় বরং নিবতীদের তৈরী ইমারত। কিন্তু উভয় জাতির স্থাপত্য পদ্ধতির মধ্যে বিস্তর ও সুস্পষ্ট ফারাক দেখা যায়। ফলে কেবলমাত্র একজন অন্ধই এগুলোকে একই জাতির নির্মিত বলে দাবী করতে পারে। আমার অনুমান, পাহাড় কেটে তার মধ্যে গৃহ নির্মাণ কৌশল সামূদই উদ্ভাবন করে এবং এর হাজার হাজার বছর পরে নিবতীরা খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতকে একে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছিয়ে দেয়। অতপর ইলোরায় (পেট্রার প্রায় সাতশো বছর পরে নির্মিত গুহা) এ শিল্পটির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়।

১০০. অর্থাৎ তোমাদের যেসব রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ এবং শাসকদের নেতৃত্বে এ ভ্রান্ত বিকৃত জীবন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে তাদের আনুগত্য পরিহার করো। এরা সব লাগাম ছাড়া। নৈতিকতার সমস্ত সীমা–লংঘন করে এরা লাগামহীন পশুতে পরিণত হয়েছে। এদের দ্বারা সমাজ–সভ্যতার কোন সংস্কার হতে পারে না। এরা যে ব্যবস্থা পরিচালনা করবে তার মধ্যে বিকৃতিই ছড়িয়ে পড়বে। তোমাদের জন্য কল্যাণের কোন পথ যদি থাকে তাহলে তা কেবলমাত্র এই একটিই। অর্থাৎ তোমরা নিজেদের মধ্যে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করো এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের আনুগত্য পরিহার করে আমার আনুগত্য করো। কারণ আমি আল্লাহর রসূল। আমার আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তোমরা পূর্ব থেকেই অবগত আছো। আমি একজন নিস্বার্থ ব্যক্তি। নিজের কোন ব্যক্তিগত লাভের জন্য আমি এ সংস্কারমূলক কাজে হাত দেইনি–এ ছিল হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের ঘোষণাপত্রের সংক্ষিপ্তসার। নিজের জাতির সামনে তিনি এটি পেশ করেছিলেন। এর মধ্যে শুধু ধর্মীয় প্রচারণাই ছিল না বরং একই সঙ্গে তামাদ্দুনিক ও নৈতিক সংস্কার এবং রাজনৈতিক বিপ্লবের দাওয়াতও ছিল।

১০১. "যাদুগ্রস্ত" অর্থাৎ দিওয়ানা ও পাগল তথা যার বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেছে। প্রাচীনকালের ধারণা অনুযায়ী জিনের বা যাদুর প্রভাবে পাগলামি দেখা দেয়। তাই তারা যাকে পাগল বলতে চাইতো তাকে বলতো "মাজ্‌নুন" (জিনগ্রস্ত) বা "মাস্‌হুর" (যাদুগ্রস্ত) ও মুসাহ্‌হার।

১০২. অর্থাৎ আমরা তোমাকে আল্লাহর প্রেরিত বলে মেনে নেব বাহ্যত তোমার ও আমাদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্যমূলক চিহ্ন তো আমরা দেখছি না। কিন্তু যদি তুমি নিজেকে আল্লাহর নিযুক্ত ও তাঁর প্রেরিত বলে দাবী কর এবং সেই দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে এমন কোন চাক্ষুস মু'জিযা পেশ করো, যা থেকে এ বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা এবং পৃথিবী ও আকাশের মালিক মহান আল্লাহ যে তোমাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন সে ব্যাপারে আমাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যায়।

১০৩. মু'জিযার দাবীর জবাবে উটনী হাজির করার ফলে পরিষ্কার বুঝা যায়, সেটি নিছক সেখানে সাধারণ আরবদের কাছে যেমন উটনী পাওয়া যেতো সে ধরনের একটি সাধারণ উটনী ছিল না। বরং মু'জিযা দেখাবার দাবীর জবাবে পেশ করা যায় এমন কোন জিনিস নিশ্চয়ই তার জন্ম ও প্রকাশ বা সৃষ্টির মধ্যে ছিল। যদি হযরত সালেহ তাদের দাবীর জবাবে এমনই কোন একটি সাধারণ উটনী ধরে এনে দাঁড় করিয়ে দিতেন তাহলে

এটা হতো অবশ্যই একটি অর্থহীন কাজ। কোন নবী তো দূরের কথা একজন সাধারণ বিবেকবান ব্যক্তির কাছ থেকেও এ ধরনের আচরণ আশা করা যেতে পারে না। এখানে তো একথা শুধুমাত্র বক্তব্যের প্রেক্ষাপট থেকেই অনুধাবন করা যায়। কিন্তু অন্যান্য স্থানে কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় এ উটনীর অস্তিত্বকে মু'জিযা গণ্য করা হয়েছে। সূরা আ'রাফ ও সূরা হূদে বলা হয়েছেঃ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً "এ হলো আল্লাহর উটনী, তোমাদের জন্য রইলো নিদর্শন হিসেবে।" আর সূরা বনী ইসরাঈলে এর চাইতেও বেশী বলিষ্ঠ ভাষায় বলা হয়েছেঃ

وَمَا مَنَعَنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّآ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا –

"পূর্ববর্তী লোকদের নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন পাঠানো থেকে বিরত রাখে। সামূদদের সামনে আমি চোখে দেখা উটনী নিয়ে আসি। তবুও তারা তার ওপর জুলুম করে। নিদর্শন তো আমি পাঠাই ভয় দেখাবার জন্য (তামাসা দেখাবার জন্য পাঠাই না)।" (৫৯ আয়াত)

উটনীকে মাঠে ময়দানে ছেড়ে দেবার পর এ কাফের জাতিকে যে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয় তা ছিল এর অতিরিক্ত। কেবলমাত্র একটি মু'জিযা পেশ করেই এ ধরনের একটি চ্যালেঞ্জ দেয়া যেতে পারে।

১০৪. অর্থাৎ পালাক্রমে একদিন এ উটনীটি একাই তোমাদের কূয়া ও প্রস্রবনগুলো থেকে পানি পান করবে এবং একদিন জাতির সমস্ত লোকজন ও জন্তু-জানোয়ার পানি পান করবে। সাবধান, তার পানি পান করার দিন যেন কোন ব্যক্তি পানি নেবার জায়গায় না যায়। এটি ছিল একটি অত্যন্ত কঠিন চ্যালেঞ্জ। কিন্তু আরবের বিশেষ অবস্থায় কোন ব্যক্তির জন্য এর চেয়ে বড় আর কোন চ্যালেঞ্জ হতে পারতো না। সেখানে তো পানিই ছিল জীবনের মুখ্য বিষয় এবং এ বিষয়টি নিয়ে ঝগড়া ঝাঁটি করে খুনাখুনি হয়ে যেতো। গোত্রগুলো পারস্পরিক যুদ্ধে লিপ্ত হতো। তারপর প্রাণের বিনিময়ে কেউ কোন ঝরণা বা কূয়া থেকে পানি নেবার অধিকার লাভ করতো। সেখানে জাতির এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে দিলেন, একদিন শুধুমাত্র আমার উটনী একাই সমস্ত কূয়া ও ঝরণা থেকে পানি পান করবে এবং জাতির সমস্ত লোক ও জন্তু-জানোয়াররা কেবলমাত্র দ্বিতীয় দিনেই পানি নিতে পারবে। তাঁর একথা বলার ছিল এই যে, তিনি যেন সমগ্র জাতিকে যুদ্ধ করার জন্য চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন। একটি বিরাট ও পরাক্রমশালী সেনাবাহিনী ছাড়া আরবে কোন ব্যক্তি এ ধরনের কথা মুখে উচ্চারণ করতে পারতো না। অন্যদিকে কোন জাতি যতক্ষণ না স্বচক্ষে দেখতে পেতো, চ্যালেঞ্জদানকারীর পেছনে এত বিপুল সংখ্যক তরবারিধারী ও এতবড় তীরন্দাজ বাহিনী রয়েছে যারা প্রতিপক্ষের যে কোন পদক্ষেপকে পিষে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। ততক্ষণ তারা একথা শুনতে প্রস্তুত হতো না। কিন্তু হযরত সালেহ (আ) কোন সেনাবাহিনীর শক্তি ছাড়াই একাকী দাঁড়িয়ে নিজের জাতিকে এ চ্যালেঞ্জ দিলেন এবং জাতি কেবল কান পেতে তা শুনলই না বরং বহুদিন পর্যন্ত ভয়ে ভয়ে তা পালনও করতে থাকলো।

সূরা আ'রাফ ও সূরা হূদে এর ওপর আরো এতটুকু বাড়ানো হয়েছেঃ

هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ –

"এ হচ্ছে আল্লাহর উটনী তোমাদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ। একে আল্লাহর যমীনে চরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দাও। কখনো খারাপ মতলবে এর গায়ে হাত দিয়ো না।"

অর্থাৎ চ্যালেঞ্জ কেবল এতটুকুই ছিল না যে, কেবল একদিন পর পর উটনীটি একাই হবে সারাদিন সমস্ত এলাকার পানির ইজারাদার বরং এর ওপর বাড়তি চ্যালেঞ্জ ছিল এই যে, সে সারাদিন তোমাদের ক্ষেতে-খামারে, ফলের বাগানে, খেজুর উদ্যানে ও চারণক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে চরে বেড়াবে, যেখানে চাইবে যাবে, যা ইচ্ছা খাবে, খবরদার! তোমরা কেউ তার গায়ে হাত দিতে পারবে না।

১০৫. এর অর্থ এ নয় যে, হযরত সালেহের এ চ্যালেঞ্জ শোনার সাথে সাথেই তারা উটনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তার পায়ের রগ কেটে দেয়। বরং দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ উটনীটি সমগ্র জাতির জন্য একটি সমস্যা হয়ে থাকে। লোকেরা মনে মনে এর বিরুদ্ধে ফুঁসতে থাকে। পরামর্শ করতে থাকে। শেষমেষ জাতিকে এ আপদমুক্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন সরদার। সূরা আশ্ শাম্সে এ ব্যক্তির উল্লেখ এভাবে করা হয়েছেঃ اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰهَا "যখন এ জাতির সবচেয়ে বড় পাপিষ্ঠ লোকটি উদ্যোগী হলো" এবং সূরা আল কামারে বলা হয়েছেঃ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ "তারা নিজেদের সাথীকে আহবান জানালো, শেষ পর্যন্ত সে একাজটি নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিল এবং সে গিঁঠের রগ কেটে দিল।"

১০৬. কুরআনের অন্যান্য স্থানে এ ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে তা হচ্ছে এই যে, উটনীকে মেরে ফেলার পর হযরত সালেহ ঘোষণা করেনঃ تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ "তিনদিন নিজেদের গৃহে আয়েশ আরাম করে নাও।" (হূদ ৬৫ আয়াত) এ বিজ্ঞপ্তির মিয়াদ শেষ হবার পর রাতের শেষ প্রহরে ভোরের কাছাকাছি সময়ে একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। এ সংগে সংঘটিত হয় ভয়াবহ ভূমিকম্প। ফলে মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র জাতি ধ্বংস হয়ে যায়। সকাল হবার পর চারদিকে লাশের পর লাশ এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল যেন মনে হচ্ছিল, শুকনো লতাগুল্ম জন্তু-জানোয়ারের পদদলনে বিধ্বস্ত ও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। তাদের সুরম্য প্রাসাদ এবং পার্বত্য গৃহাগুলো তাদেরকে এ ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ (القمر: ٣١)

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ (اعراف: ٧٨)

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ – فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (الحجر: ٨٣ – ٨٤)

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ ۨ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ
الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ
قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

৯ রুকূ'

লূতের জাতি রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো।[১০৭] স্মরণ করো যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বলেছিল, তোমরা কি ভয় করো না? আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদানের প্রত্যাশী নই। আমার প্রতিদান দেবার দায়িত্ব তো আমার রব্বুল আলামীনের। তোমরা কি গোটা দুনিয়ার মধ্যে পুরুষদের কাছে যাও[১০৮] এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে তোমাদের রব তোমাদের জন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা পরিহার করে থাকো?[১০৯] বরং তোমরা তো সীমা-ই অতিক্রম করে গেছো।"[১১০]

১০৭. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন সূরা আল আ'রাফ ৮০-৮৪, হূদ ৭৪-৮৩, আল হিজ্‌র ৫৭-৭৭, আল আম্বিয়া ৭১-৭৫, আন্ নামল ৫৪-৫৮, আল আনকাবুত ২৮-৩৫, আস্ সাফ্‌ফাত ১৩৩-১৩৮ এবং আল কামার ৩৩-৩৯ আয়াত।

১০৮. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, সমগ্র সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে তোমরা শুধুমাত্র পুরুষদেরকে বাছাই করে নিয়েছো নিজেদের যৌন ক্ষুধা চরিতার্থ করার জন্য, অথচ দুনিয়ায় বিপুল সংখ্যক মেয়ে রয়েছে। দুই, সারা দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র তোমরাই যৌন ক্ষুধা মেটাবার জন্য পুরুষদের কাছে যাও। নয়তো মানব জাতির মধ্যে এমন দল দ্বিতীয়টি নেই। বরং পশুদের মধ্যেও কেউ এ কাজ করে না। সূরা আ'রাফ ও সূরা আনকাবুতে এ দ্বিতীয় অর্থটিকে আরো সুস্পষ্ট করে এভাবে তুলে ধরা হয়েছেঃ

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ -

"তোমরা কি এমন নির্লজ্জতার কাজ কর, যা দুনিয়ার সৃষ্টিকুলের মধ্যে তোমাদের আগে কেউ করেনি?"

১০৯. এরও দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, এ ক্ষুধা পরিতৃপ্তির জন্য আল্লাহ যে স্ত্রী জাতির সৃষ্টি করেছিলেন তাদেরকে বাদ দিয়ে তোমরা অস্বাভাবিক উপায়ে অর্থাৎ পুরুষদেরকে এ

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ اِنِّيْ لِعَمَلِكُمْ
مِّنَ الْقَالِيْنَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِيْ وَاَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٩﴾ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ
اَجْمَعِيْنَ ﴿١٧٠﴾ اِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٧٢﴾ وَاَمْطَرْنَا
عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٣﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ
اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٤﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٧٥﴾

তারা বললো, "হে লূত! যদি তুমি এসব কথা থেকে বিরত না হও, তাহলে আমাদের জনপদগুলো থেকে যেসব লোককে বের করে দেয়া হয়েছে তুমিও নির্ঘাত তাদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে।"[১১১] সে বললো, "তোমাদের এসব কৃতকর্মের জন্য যারা দুঃখবোধ করে আমি তাদের অন্তরভুক্ত। হে আমার রব! আমাকে ও আমার পরিবার পরিজনকে এদের কুকর্ম থেকে মুক্তি দাও।"[১১২] শেষে আমি তাকে ও তার সমস্ত পরিবার পরিজনকে রক্ষা করলাম, এক বৃদ্ধা ছাড়া, যে পেছনে অবস্থানকারীদের দলভুক্ত ছিল।[১১৩] তারপর অবশিষ্ট লোকদেরকে আমি ধ্বংস করে দিলাম এবং তাদের ওপর বর্ষণ করলাম একটি বৃষ্টিধারা, যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল তাদের ওপর বর্ষিত এ বৃষ্টি ছিল বড়ই নিকৃষ্ট।[১১৪]

নিশ্চিতভাবেই এর মধ্যে রয়েছে একটি নিদর্শন। কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই মান্যকারী নয়। আর প্রকৃতপক্ষে তোমার রব পরাক্রমশালী এবং করুণাময়ও।

উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছো। দুই, আল্লাহ এ স্ত্রীদের মধ্যে এ ক্ষুধা পরিতৃপ্তির যে স্বাভাবিক পথ রেখেছিলেন তা বাদ দিয়ে তোমরা অস্বাভাবিক পথ অবলম্বন করছো। এই দ্বিতীয় অর্থটি থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, এ জালেমরা নিজেদের স্ত্রীদেরকেও প্রকৃতি বিরোধী পথে ব্যবহার করতো। হতে পারে পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এ কাজ করেছে।

১১০. অর্থাৎ তোমাদের কেবলমাত্র এ একটিই অপরাধ নয়। তোমাদের জীবনের সমস্ত রীতিই সীমাতিরিক্ত ভাবে বিগড়ে গেছে। কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে তাদের এ সাধারণ অবস্থা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ –

"তোমাদের অবস্থা কি এমন হয়ে গেছে যে, চোখে দেখে অশ্লীল কাজ করছো?
(আন্ নামল ঃ ৫৪)

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ

"তোমরা কি এমনই বিকৃত হয়ে গেছো যে, পুরুষদের সাথে সংগম করছো, রাজপথে দস্যুতা করছো এবং নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে খারাপ কাজ করছো?"

(আল আনকাবুত ঃ ২৯ আয়াত)

[আরো বেশী বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল হিজর ৩৯ টীকা]।

১১১. অর্থাৎ তুমি জানো এর আগে যে ব্যক্তিই আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছে অথবা আমাদের কাজের প্রতিবাদ করেছে কিংবা আমাদের ইচ্ছা বিরোধী কাজ করেছে তাকেই আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। এখন যদি তুমি এসব কথা বলতে থাকো, তাহলে তোমার পরিণামও অনুরূপই হবে। সূরা আ'রাফ ও সূরা নাম্‌লে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত লূতকে (আ) এ নোটিশ দেবার আগে এ পাপাচারী জাতির লোকেরা নিজেদের মধ্যে ফায়সালা করে নিয়েছিল ঃ

أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

"লূত ও তার পরিবারের লোকদের এবং সাথীদেরকে নিজেদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা বড়ই পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে। এ 'নেককারদের'কে বাইরের পথ দেখিয়ে দাও।"

১১২. এর এ অর্থও হতে পারে, তাদের খারাপ কাজের খারাপ পরিণাম থেকে আমাদের বাঁচাও। আবার এ অর্থও হতে পারে, এই অসৎ লোকদের জনপদে যেসব নৈতিক আবর্জনা ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের সন্তান সন্ততিদের গায়ে যেন সেগুলোর স্পর্শ লেগে না যায়। ঈমানদারদের নিজেদের বংশধররা যেন নোংরা পরিবেশে প্রভাবিত না হয়ে পড়ে। কাজেই হে আমাদের রব! এ কলুষিত সমাজে জীবন যাপন করার ফলে আমরা যে সার্বক্ষণিক আযাবে লিপ্ত হচ্ছি তার হাত থেকে আমাদের বাঁচাও।

১১৩. এখানে হযরত লূতের (আ) স্ত্রীর কথা বলা হচ্ছে। সূরা তাহরীমে হযরত নূহ (আ) ও হযরত লূতের (আ) স্ত্রীদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا –

"এ মহিলা দু'টি আমার দু'জন সৎ বান্দার গৃহে ছিল। কিন্তু তারা তাঁদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।" (১০ আয়াত)

অর্থাৎ তারা উভয়ই ছিল ঈমান শূন্য এবং নিজেদের সৎ স্বামীদের সাথে সহযোগিতা করার পরিবর্তে তারা তাদের কাফের জাতির সহযোগী হয়। এজন্য আল্লাহ যখন লূতের জাতির ওপর আযাব নাযিল করার ফায়সালা করলেন এবং হযরত লূতকে নিজের পরিবার পরিজনদের নিয়ে এ এলাকা ত্যাগ করার হুকুম দিলেন তখন সাথে সাথে নিজের স্ত্রীকে সংগে না নেবার হুকুমও দিলেনঃ

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ –

"কাজেই কিছু রাত থাকতেই তুমি নিজের পরিবার-পরিজনদেরকে সাথে নিয়ে বের হয়ে যাও এবং তোমাদের কেউ যেন পেছন ফিরে না তাকায়। কিন্তু তোমার স্ত্রীকে সংগে করে নিয়ে যাবে না। তাদের ভাগ্যে যা ঘটবে তারও তাই ঘটবে।"

(হূদ ঃ ৮১ আয়াত)

১১৪. এ বৃষ্টি বলতে এখানে পানির বৃষ্টি নয় বরং পাথর বৃষ্টির কথা বুঝানো হয়েছে। কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এ আযাবের যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, হযরত লূত যখন রাতের শেষ প্রহরে নিজের সন্তান-পরিজনদের নিয়ে বের হয়ে গেলেন তখন ভোরের আলো ফুটতেই সহসা একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হলো (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ) একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প তাদের জনপদকে ওলট পালট করে দিয়ে গেলো। (جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا) একটি ভয়ংকর আগ্নেয়গিরির অগ্নোৎপাতের মাধ্যমে তাদের ওপর পোড়ামাটির পাথর বর্ষণ করা হলোঃ (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ) এবং একটি ঝড়ো হাওয়ার মাধ্যমেও তাদের ওপর পাথর বর্ষণ করা হয়েছে ঃ (إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا)

বাইবেলের বর্ণনাসমূহ, প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন রচনাবলী, আধুনিক ভূমিস্তর গবেষণা এবং প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ থেকে এ আযাবের বিস্তারিত বিবরণের ওপর যে আলোকপাত হয় তার সংক্ষিপ্ত সার নিচে বর্ণনা করছি ঃ

মরু সাগরের (Dead sea) দক্ষিণ ও পশ্চিমে যে এলাকাটি বর্তমানে একেবারেই বিরান ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে সেখানে বিপুল সংখ্যক পুরাতন জনপদের ঘর বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো প্রমাণ করে যে, এটি এক সময় ছিল অত্যন্ত জনবহুল এলাকা। আজ সেখানে শত শত ধ্বংস প্রাপ্ত পল্লীর চিহ্ন পাওয়া যায়। অথচ বর্তমানে এ এলাকাটি আর তেমন শস্যশ্যামল নয়। ফলে এ পরিমাণ জনবসতি লালন করার ক্ষমতা তার নেই। প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞগণের ধারণা, খৃষ্টপূর্ব ২৩০০ থেকে খৃষ্টপূর্ব ১৯০০ সাল পর্যন্ত এটি ছিল বিপুল জনবসতি ও প্রাচুর্যপূর্ণ এলাকা। আর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আমল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের অনুমান, সেটি ছিল খৃষ্টপূর্ব দু'হাজার সালের কাছাকাছি সময়। এদিক দিয়ে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের সাক্ষ একথা সমর্থন করে যে, এ এলাকাটি হযরত ইবরাহীম ও তাঁর ভাতিজা হযরত লূতের সময় ধ্বংস হয়েছিল।

বাইবেলে যে এলাকাটিকে বলা হয়েছে 'সিদ্দিমের উপত্যকা' সেটিই ছিল এখানকার সবচেয়ে জনবহুল ও শস্য-শ্যামল এলাকা। এ এলাকাটি সম্পর্কে বাইবেলে বলা হয়েছেঃ যর্দ্দনের সমস্ত অঞ্চল সোয়র পর্যন্ত সর্বত্র সজল, সদাপ্রভুর উদ্যানের ন্যায়, মিসর দেশের ন্যায়, কেননা তৎকালে সদাপ্রভু সদোম ও ঘমোরা বিনষ্ট করেন নাই।" (আদিপুস্তক ১৩ঃ১০) বর্তমান কালের গবেষকদের অধিকাংশের মত হচ্ছে, সে উপত্যকাটি বর্তমানে মরুসাগরের বুকে জলমগ্ন আছে। বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষের সাক্ষ-প্রমাণ থেকে এ মত গঠন

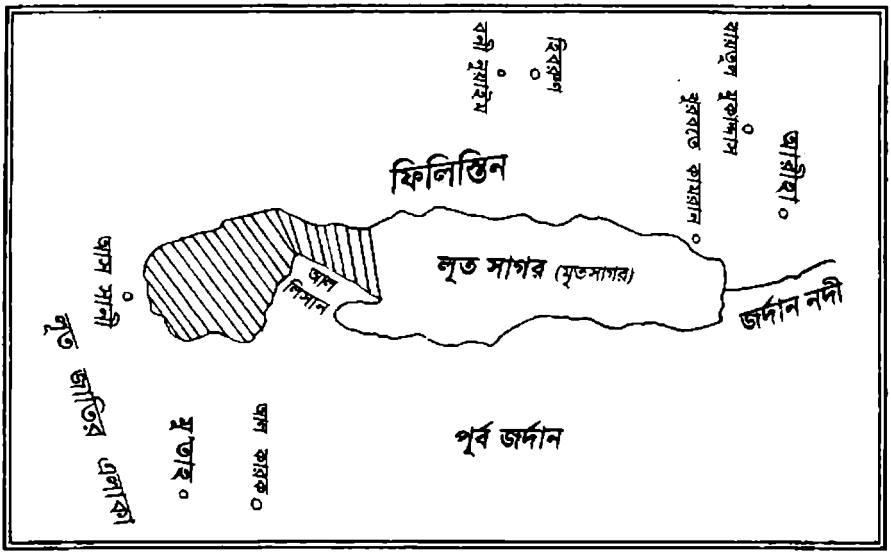

করা হয়েছে। প্রাচীনকালে মরুসাগর দক্ষিণ দিকে আজকের মতো এতটা বিস্তৃত ছিল না। ট্রান্স জর্দানের বর্তমান শহর 'আল করক'–এর সামনে পশ্চিম দিকে এ হ্রদের মধ্যে 'আল লিসান' নামক একটি ব–দ্বীপ দেখা যায়। প্রাচীনকালে এখানেই ছিল পানির শেষ প্রান্ত। এর নিম্নাঞ্চলে বর্তমানে পানি ছড়িয়ে গেছে (সংশ্লিষ্ট নকশায় পার্শ্বরেখা দিয়ে একে সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি)। পূর্বে এটি উর্বর শস্যশ্যামল এলাকা হিসেবে জনবসতিপূর্ণ ছিল। এটিই ছিল সিদ্দিম উপত্যকা এবং এখানেই ছিল লূতের জাতির সদোম, ঘমোরা, অদমা, সবোয়ীম ও সুগার–এর মতো বড় বড় শহরগুলো। খৃষ্টপূর্ব দু'হাজার বছরের কাছাকাছি এক সময় একটি ভয়াবহ ভূমিকম্পে এ উপত্যকাটি ফেটে ভূগর্ভে প্রোথিত হয়ে যায় এবং মরুসাগরের পানি একে নির্মজ্জিত করে ফেলে। আজো এটি হ্রদের সবচেয়ে অগভীর অংশ। কিন্তু বাইজানটাইন শাসকদের যুগে এ অংশটি এত বেশী অগভীর ছিল যে, লোকেরা আল লিসান থেকে পশ্চিম তীর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে পানি পার হয়ে যেতো। তখনো দক্ষিণ তীরের লাগোয়া এলাকায় পানির মধ্যে ডুবন্ত বনাঞ্চল পরিষ্কার দেখা যেতো। বরং পানির মধ্যে কিছু দালান কোঠা ডুবে আছে বলে সন্দেহ করা হতো।

বাইবেল ও পুরাতন গ্রীক ও ল্যাটিন রচনাবলী থেকে জানা যায়, এ এলাকায় বিভিন্ন স্থানে নাফাত (পেট্রোল) ও স্ফল্টের কূয়া ছিল। অনেক জায়গায় ভূগর্ভ থেকে অগ্নিউদ্দীপক গ্যাসও বের হতো। এখনো সেখানে ভূগর্ভে পেট্রোল ও গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। ভূ–স্তর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুমান করা হয়েছে, ভূমিকম্পের প্রচণ্ড ঝাকুনীর সাথে পেট্রোল, গ্যাস ও স্ফল্ট ভূ–গর্ভ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে জ্বলে ওঠে এবং সমগ্র এলাকা ভস্মীভূত হয়ে যায়। বাইবেলের বর্ণনা মতে, এ ধ্বংসের খবর পেয়ে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম হিব্রোন থেকে এ উপত্যকার অবস্থা দেখতে আসেন। তখন মাটির মধ্য থেকে কামারের ভাটির ধোঁয়ার মতো ধোঁয়া উঠছিল। (আদিপুস্তক ১৯ ঃ ২৮)।

كَذَّبَ أَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٧٩﴾ وَمَا أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ
أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿١٨٠﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا
مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ
وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨٤﴾

১০ রুকূ'

আইকাবাসীরা রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো।১১৫ যখন শো'আইব তাদেরকে বলেছিল, "তোমরা কি ভয় করো না? আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রসূল। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। আমি এ কাজে তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদানের প্রত্যাশী নই। আমার প্রতিদান দেবার দায়িত্ব তো রব্বুল আলামীনের। তোমরা মাপ পূর্ণ করে দাও এবং কাউকে কম দিয়ো না। সঠিক পাল্লায় ওজন করো এবং লোকদেরকে তাদের জিনিস কম দিয়ো না। যমীনে বিপর্যয় ছড়িয়ে বেড়িও না এবং সেই সত্ত্বাকে ভয় করো যিনি তোমাদের ও অতীতের প্রজন্মকে সৃষ্টি করেছেন।"

১১৫. আইকাবাসীদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইতিপূর্বে সূরা আল হিজ্‌রের ৭৮–৮৪ আয়াতে করা হয়েছে। এখানে করা হচ্ছে তার বিস্তারিত আলোচনা। মাদ্‌য়ান ও আইকাবাসীরা দু'টি আলাদা জাতি অথবা একটি জাতির দু'টি পৃথক নাম, এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। একদল মনে করেন, তারা দু'টি পৃথক জাতি। এজন্য তাদের সবচেয়ে বড় যুক্তি হচ্ছে, সূরা আ'রাফে হযরত শো'আইবকে মাদ্‌য়ানবাসীদের ভাই বলা হয়েছেঃ (وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا) আর এখানে আইকাবাসীদের উল্লেখ করতে গিয়ে শুধুমাত্র বলা হয়েছে إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ (যখন শু'আইব তাদেরকে বললো)। এখানে তাদের ভাই (أَخُوهُمْ) শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। পক্ষান্তরে কোন কোন মুফাস্‌সির উভয়কে একই জাতি গণ্য করেছেন। কারণ সূরা আ'রাফ ও সূরা হূদে মাদ্‌য়ানবাসীদের যেসব রোগ ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে এখানে আইকাবাসীদের সে একই রোগ ও গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে। হযরত শো'আইবের দাওয়াত ও উপদেশও একই এবং শেষে তাদের পরিণতির মধ্যেও কোন ফারাক নেই।

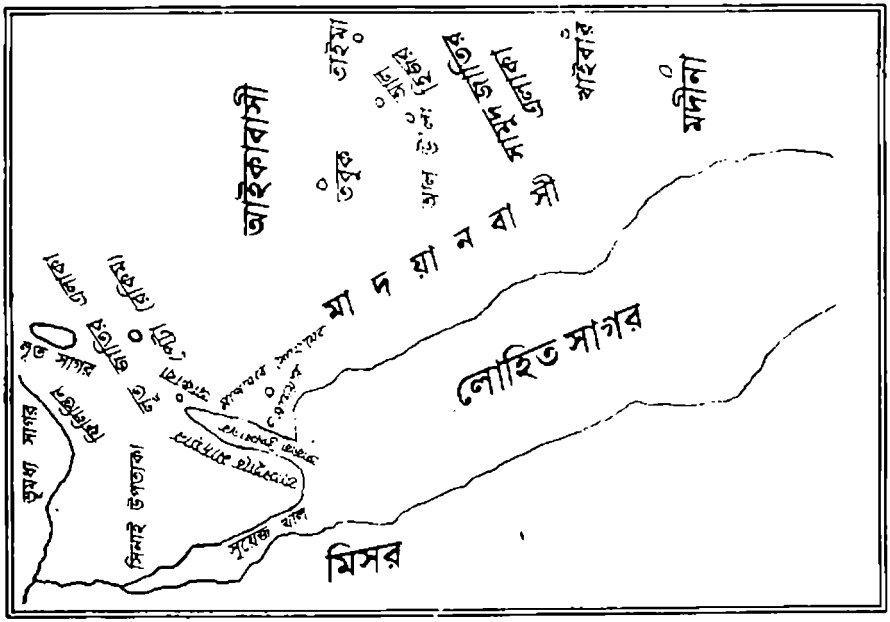

গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা যায়, এ দু'টি উক্তি মূলতঃ সঠিক। সন্দেহাতীতভাবে মাদ্‌য়ানবাসী ও আইকাবাসীরা দু'টি আলাদা গোত্র। কিন্তু মূলত তারা একই বংশধারার দু'টি পৃথক শাখা। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্ত্রী বা দাসী কাতুরার গর্ভজাত সন্তানরা আরব ও ইসরাঈলী ইতিহাসে বনী কাতুরা নামে পরিচিত। এদের একটি গোত্র সবচেয়ে বেশী খ্যাতি লাভ করে। মাদ্‌য়ান ইবনে ইবরাহীমের বংশোদ্ভূত হবার ফলে তাদেরকে মাদ্‌য়ানী বা মাদ্‌য়ান বাসী বলা হয়। এদের বসতি উত্তর হেজায থেকে ফিলিস্তীনের দক্ষিণ পর্যন্ত এবং সেখান থেকে সিনাই বদ্বীপের শেষ কিনারা পর্যন্ত লোহিত সাগর ও আকাবা উপসাগরের উপকূল এলাকায় বিস্তৃত হয়। এর কেন্দ্রস্থল ছিল মাদ্‌য়ান শহর। আবুল ফিদার মতে এটি আকাবা উপসাগরের পশ্চিম উপকূলে আইলা (বর্তমান আকাবা) থেকে পাঁচ দিনের দূরত্বে অবস্থিত। বনী কাতুরার অন্যান্য গোত্রের মধ্যে বনী দীদান (Dedanties) তুলনামূলকভাবে বেশী পরিচিত। উত্তর আরবে তাইমা, তাবুক ও আল'উলার মাঝামাঝি স্থানে তারা বসতি গড়ে। তাদের কেন্দ্রীয় স্থান ছিল তাবুক। প্রাচীনকালে একে আইকা বলা হতো। (মু'জামুল বুলদান গ্রন্থে ইয়াকূত আইকা শব্দের আলোচনায় বলেছেন, এটি তাবুকের পুরাতন নাম এবং তাবুকবাসীদের মধ্যে একথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে, এ স্থানটিই এক সময় আইকা নামে পরিচিত ছিল।)

মাদ্‌য়ানবাসী ও আইকাবাসীদের জন্য একজন রসূল পাঠাবার কারণ সম্ভবত এছিল যে, তারা একই বংশধারার সাথে সম্পর্কিত ছিল, একই ভাষায় কথা বলতো এবং তাদের এলাকাও পরস্পরের সাথে সংযুক্ত ছিল। বরং বিচিত্র নয়, কোন কোন এলাকায় তাদের বসতি একই সংগে গড়ে উঠেছিল এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়ে সমাজে তারা মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া বনী কাতুরার এ দু'শাখার লোকদের পেশাও ছিল ব্যবসায়। তাদের মধ্যে একই ধরনের ব্যবসায়িক অসততা

قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٨٥﴾ وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ
لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿١٨٦﴾ فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٨٧﴾
قَالَ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۭ
اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٨٩﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۭ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٩٠﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٩١﴾

তারা বললো, "তুমি নিছক একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি এবং তুমি আমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও। আর আমরা তো তোমাকে একেবারেই মিথ্যুক মনে করি। যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি টুকরা ভেংগে আমাদের ওপর ফেলে দাও।" শো'আইব বললো, আমার রব জানেন তোমরা যা কিছু করছো।"[১১৬] তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলো। শেষ পর্যন্ত ছাতার দিনের আযাব তাদের ওপর এসে পড়লো[১১৭] এবং তা ছিল বড়ই ভয়াবহ দিনের আযাব।

নিশ্চয়ভাবেই এর মধ্যে রয়েছে একটি নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশ মান্যকারী নয়। আর প্রকৃতপক্ষে তোমার রব পরাক্রমশালী এবং দয়াময়ও।

এবং ধর্মীয় ও চারিত্রিক দোষ পাওয়া যেতো। বাইবেলের প্রথম দিকের পুস্তকগুলোতে বিভিন্ন জায়গায় এ আলোচনা পাওয়া যায় যে, এরা বা'লে ফুগূরের পূজা করতো। বনী ইসরাঈল যখন মিসর থেকে বের হয়ে এদের এলাকায় আসে তখন তাদের মধ্যেও এরা শিরক ও ব্যভিচারের রোগ ছড়িয়ে দেয়। (গণনা পুস্তক ২৫ঃ ১–৫ এবং ৩১ঃ ১৬–১৭) তাছাড়া দু'টি বড় বড় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথের ওপর এদের বসতি গড়ে উঠেছিল। এপথ দু'টি ইয়ামন থেকে সিরিয়া এবং পারস্য উপসাগর থেকে মিসরের দিকে চলে গিয়েছিল। এ দু'টি রাজপথের ধারে বসতি হবার কারণে এদের লূটতরাজ ও রাহাজানির কারবার ছিল খুবই রমরমা। অন্যসব জাতির বাণিজ্য কাফেলাকে বিপুল পরিমাণ কর না দিয়ে তারা এ এলাকা অতিক্রম করতে দিতো না। নিজেরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথ দখল করে রাখার ফলে পথের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে রেখেছিল। কুরআন মজীদে তাদের এ অবস্থানকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ اِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ এ জাতি দু'টি (লূতের জাতি ও আইকাবাসী) প্রকাশ্য রাজপথের ওপর বসবাস করতো।" এদের রাহাজানির কথা সূরা আ'রাফে এভাবে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ "আর প্রত্যেক পথের ওপর লোকদেরকে ভয় দেখাবার জন্য বসে যেয়ো না।" এ সমস্ত কারণে আল্লাহ এ উভয় সম্প্রদায়ের জন্য একই নবী পাঠিয়েছিলেন এবং তাদেরকে একই ধরনের শিক্ষা দিয়েছিলেন।

হযরত শো'আইব ও মাদ্‌য়ানবাসীদের কাহিনী বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন আল আ'রাফের ৮৫–৯৩, হূদের ৮৪–৯৫ এবং আল আনকাবুতের ৩৬–৩৭ আয়াত।

১১৬. অর্থাৎ আযাব নাযিল করা আমার কাজ নয়। এটা তো আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ক্ষমতার অন্তরভুক্ত এবং তিনি তোমাদের কার্যকলাপ দেখছেন। যদি তিনি তোমাদেরকে এ আযাবের উপযুক্ত মনে করেন তাহলে তিনি নিজেই আযাব পাঠাবেন। আইকাবাসীদের এ দাবী ও হযরত শো'আইবের এ জবাবের মধ্যে কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের জন্য একটি সতর্কবাণী ছিল। অর্থাৎ তারাও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ একই দাবী করছিলঃ

اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا

"অথবা ফেলে দাও আমাদের ওপর আকাশের একটি টুক্‌রা যেমন তুমি দাবী করছো" (বনী ইসরাঈলঃ ৯২)

তাই তাদেরকে বলা হচ্ছে, এ ধরনের দাবী আইকাবাসীরাও তাদের নবীর কাছে করেছিল, তার যে জবাব তারা পেয়েছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে তোমাদের দাবীর জন্যও রয়েছে সেই একই জবাব।

১১৭. এ আযাবের কোন বিস্তারিত বিবরণ কুরআন মজীদে বা কোন সহীহ হাদীসে উল্লেখিত হয়নি। শব্দের বাহ্যিক অর্থ থেকে যা বুঝা যায় তা হচ্ছে এই যে, তারা যেহেতু আসমানী আযাব চেয়েছিল তাই আল্লাহ তাদের ওপর পাঠিয়ে দিলেন একটি মেঘমালা। এ মেঘমালাটি আযাবের বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদেরকে পুরোপুরি ধ্বংস করে না দেয়া পর্যন্ত ছাতার মতো তাদের ওপর ছেয়ে রইলো। কুরআন থেকে একথা পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, মাদ্‌য়ানবাসীদের আযাবের ধরন আইকাবাসীদের আযাব থেকে আলাদা ছিল। যেমন এখানে বলা হয়েছে এরা ছাতার দিনের আযাবে ধ্বংস হয়েছিল। আর তাদের ওপর আযাব এসেছিল একটি বিস্ফোরণ ও ভূমিকম্পের মাধ্যমে।

(فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ এবং

وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ)

তাই এদের উভয় সম্প্রদায়কে মিলিয়ে একটি কাহিনী বানিয়ে দেবার চেষ্টা করা ঠিক নয়। কোন কোন তাফসীরকার "ছাতার দিনের আযাব"–এর কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তাদের এসব তথ্যের উৎস আমাদের জানা নেই। ইবনে জারীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেনঃ

مَنْ حَدَّثَكَ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَا عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ فَكَذِّبْهُ –

"আলেমদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই ছাতার দিনের আযাব কি ছিল সে সম্পর্কে তোমাকে কোন তথ্য জানাবে, তা সঠিক বলে মেনে নিয়ো না।"

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ
لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ
الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٧﴾

১১ রুকূ'

এটি[১১৮] রব্বুল আলামীনের নাযিল করা জিনিস।[১১৯] একে নিয়ে আমানতদার রূহ[১২০] অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি তাদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাও যারা (আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর সৃষ্টির জন্য) সতর্ককারী হয়, পরিষ্কার আরবী ভাষায়।[১২১] আর আগের লোকদের কিতাবেও একথা আছে।[১২২] এটা কি এদের (মক্কাবাসীদের) জন্য কোন নিদর্শন নয় যে, বনী ইসরাঈলের আলেম সমাজ একে জানে?[১২৩]

১১৮. ঐতিহাসিক বর্ণনা শেষ করে এবার আলোচনার ধারা ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে এমন এক বিষয়ের দিকে যার মাধ্যমে সূরার সূচনা করা হয়েছিল। এ বিষয়টি বুঝতে হলে আর একবার পেছন ফিরে প্রথম রুকূ'টি দেখে নেয়া উচিত।

১১৯ . অর্থাৎ এ "সুস্পষ্ট কিতাব" টি যার আয়াত এখানে শোনানো হচ্ছে এবং এ "কথা" যা থেকে লোকেরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এটা কোন মানুষের মনগড়া জিনিস নয়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে রচনা করেননি। বরং রব্বুল আলামীন নাযিল করেছেন।

১২০. অর্থাৎ জিব্রীল আলাইহিস সালাম, যেমন কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ –

"বলে দাও, যে ব্যক্তি জিব্রীলের সাথে শত্রুতা রাখে তার জানা উচিত, সে–ই এ কুরআন আল্লাহর হুকুমে তোমার অন্তরে নাযিল করেছে।" (আল বাকারাহ ঃ ৯৭)

এখানে তাঁর নাম না নিয়ে তাঁর জন্য "রূহুল আমীন" (আমানতদার বা বিশ্বস্ত রূহ) পদবী ব্যবহার করে একথা ব্যক্ত করতে চাওয়া হয়েছে যে, রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এ নাযিলকৃত জিনিসটি নিয়ে কোন বস্তুগত শক্তি আসেনি, যার মধ্যে পরিবর্তন ও অবক্ষয়ের সম্ভাবনা আছে বরং এসেছে একটি নির্ভেজাল রূহ। তার মধ্যে বস্তুবাদিতার কোন গন্ধ নেই। তিনি পুরোপুরি আমানতদার। আল্লাহর বাণী যেভাবে তাঁকে সোপর্দ করে দেয়া হয় ঠিক তেমনি হুবহু তিনি তা পৌঁছিয়ে দেন। নিজের পক্ষ থেকে কিছু বাড়ানো বা কমানো অথবা নিজেই কিছু রচনা করে নেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

১২১. এ বাক্যটির সম্পর্ক "আমানতদার রূহ অবতরণ করেছে" এর সাথেও হতে পারে আবার "যারা সতর্ককারী হয়" এর সাথেও হতে পারে। প্রথম অবস্থায় এর অর্থ হবে, সেই আমানতদার রূহ তাকে এনেছেন পরিষ্কার আরবী ভাষায় এবং দ্বিতীয় অবস্থায় এর অর্থ হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনসব নবীদের অন্তরভুক্ত যাদেরকে আরবী ভাষার মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। এ নবীগণ ছিলেন হূদ, সালেহ, ইসমাঈল ও শো'আইব আলাইহিমুস সালাম। উভয় অবস্থায় বক্তব্যের উদ্দেশ্য একই এবং তা হচ্ছে রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এ শিক্ষা কোন মৃত ভাষায় বা জিনদের ভাষায় আসেনি এবং এর মধ্যে ধাঁধা বা হেঁয়ালি মার্কা কোন গোলমেলে ভাষা ব্যবহার করা হয়নি। বরং এটা এমন প্রাঞ্জল, পরিষ্কার ও উন্নত বাগধারা সম্পন্ন আরবী ভাষায় রচিত, যার অর্থ ও বক্তব্য প্রত্যেক আরবী ভাষাভাষী ও আরবী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি অতি সহজে ও স্বাভাবিকভাবে অনুধাবন করতে পারে। তাই যারা এর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে তারা এর শিক্ষা বুঝতে পারেনি তাদের দিক থেকে এ ধরনের ওজর পেশ করার কোন সুযোগ নেই। বরং তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়া ও অস্বীকার করার কারণ হচ্ছে শুধুমাত্র এই যে, তারা মিসরের ফেরাউন, ইবরাহীমের জাতি, নূহের জাতি, লূতের জাতি, আদ ও সামূদ জাতি এবং আইকাবাসীদের মতো একই রোগে ভূগছিল।

১২২. অর্থাৎ একথা, এ অবতীর্ণ বিষয় এবং এ আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষা ইতিপূর্বেকার আসমানী কিতাবগুলোতে রয়েছে। এক আল্লাহর বন্দেগীর একই আহবান, পরকালের জীবনের এই একই বিশ্বাস, নবীদের পথ অনুসরণের একই পদ্ধতি সেসব কিতাবেও পেশ করা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব কিতাব এসেছে সেগুলো শিরকের নিন্দাই করে। সেগুলো বস্তুবাদী জীবনাদর্শ ত্যাগ করে এমন সত্য জীবনাদর্শ গ্রহণের আহবান জানায় যেগুলোর ভিত্তি আল্লাহর সামনে মানুষের জবাবদিহির ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সে সকল কিতাবের অভিন্ন দাবী এই যে, মানুষ নিজের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি ও ক্ষমতা পরিত্যাগ করে নবীদের আনীত আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে চলুক। এসব কথার মধ্যে কোনটাই নতুন নয়। দুনিয়ায় কুরআনই প্রথমবার একথাগুলো পেশ করছেনা। কোন ব্যক্তি বলতে পারবে না, তোমরা এমনসব কথা বলছো যা পূর্বের ও পরের কেউ কখনো বলেনি।

ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি পুরাতন অভিমতের সপক্ষে যেসব যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে এ আয়াতটি তার অন্যতম। ইমাম সাহেবের মতটি হচ্ছে ঃ

যদি কোন ব্যক্তি নামাযে কুরআনের অনুবাদ পড়ে নেয় সে আরবীতে কুরআন পড়তে সক্ষম হলেও বা না হলেও, তার নামায হয়ে যায়। আল্লামা আবু বকর জাস্সাসের ভাষায় এ যুক্তির ভিত্তি হলো, আল্লাহ এখানে বলছেন, এ কুরআন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোর মধ্যেও ছিল। আর একথা সুস্পষ্ঠ, সে কিতাবগুলোতে কুরআন আরবী ভাষার শব্দ সমন্বয়ে ছিল না। অন্য ভাষায় কুরআনের বিষয়বস্তু উদ্ধৃত করে দেয়া সত্ত্বেও তা কুরআনই থাকে। কুরআন হওয়াকে বাতিল করে দেয় না। (আহকামুল কুরআন, তৃতীয় খণ্ড, ৪২৯ পৃষ্ঠা) কিন্তু এ যুক্তির দুর্বলতা একেবারেই সুস্পষ্ট। কুরআন মজীদ বা অন্য কোন আসমানী কিতাবের কোনটিরও নাযিল হবার ধরন এমন ছিল না যে, আল্লাহ নবীর

অন্তরে কেবল অর্থই সঞ্চার করে দিয়েছেন এবং তারপর নবী তাকে নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। বরং প্রত্যেকটি কিতাব যে ভাষায় এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে শব্দ ও বিষয়বস্তু উভয়টি সহকারেই এসেছে। পূর্ববর্তী যেসব কিতাবে কুরআনের শিক্ষা ছিল মানবিক ভাষা সহকারে নয় বরং আল্লাহর ভাষা সহকারেই ছিল এবং সেগুলোর কোনটির অনুবাদকেও আল্লাহর কিতাব বলা যেতে পারে না এবং তাকে আসলের স্থলাভিষিক্ত করাও সম্ভব নয়। আর কুরআন সম্পর্কে বার বার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে, তার প্রতিটি শব্দ আরবী ভাষায় হুবহু নাযিল হয়েছে ঃ (يوسف : ٢) اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا "নিশ্চিতভাবেই আমি তা নাযিল করেছি কুরআন আকারে আরবী ভাষায়।" وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا "আর এভাবে আমি তা নাযিল করেছি একটি নির্দেশ আরবী ভাষায়।" (আর্ রা'দ ঃ ৩৭) (الزمر : ٢٨) قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِىْ عِوَجٍ "আরবী ভাষায় এ কুরআন বক্রতামুক্ত" (আয্ যুমার ঃ ২৮) তারপর আলোচ্য আয়াতের সাথে সংযুক্ত পূর্ববর্তী আয়াতেই বলা হয়েছে, রুহুল আমীন আরবী ভাষায় একে নিয়ে নাযিল হয়েছেন। এখন তার সম্পর্কে কেমন করে একথা বলা যেতে পারে যে, কোন মানুষ অন্য ভাষায় তার যে অনুবাদ করেছে তাও কুরআনই হবে এবং তার শব্দাবলী আল্লাহর শব্দাবলীর স্থলাভিষিক্ত হবে? মনে হচ্ছে যুক্তির এ দুর্বলতাটি মহান ইমাম পরবর্তী সময়ে উপলব্ধি করে থাকতে পারেন। তাই নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় একথা উদ্ধৃত হয়েছে যে, এ বিষয়ে নিজের অভিমত পরিবর্তন করে তিনি ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মত গ্রহণ করে নিয়েছিলেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি আরবী ভাষায় কিরাআত তথা কুরআন পড়তে সক্ষম নয় সে ততক্ষণ পর্যন্ত নামাযে কুরআনের অনুবাদ পড়তে পারে যতক্ষণ সে আরবী শব্দ উচ্চারণ করার যোগ্যতা অর্জন না করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আরবীতে কুরআন পড়তে পারে সে যদি কুরআনের অনুবাদ পড়ে তাহলে তার নামায হবে না। আসলে ইমামদ্বয় এমন সব আজমী তথা অনারব নওমুসলিমদেরকে এ সুযোগটি দেবার প্রস্তাব করেছিলেন যারা ইসলাম গ্রহণ করার পরপরই আরবী ভাষায় নামায পড়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারতো না। এ ব্যাপারে কুরআনের অনুবাদও কুরআন এটা তাদের যুক্তির ভিত্তি ছিল না। বরং তাদের যুক্তি ছিল, ইশারায় রুকূ সিজদা করা যেমন রুকূ-সিজদা করতে অক্ষম ব্যক্তির জন্য জায়েয ঠিক তেমনি আরবী ছাড়া অন্যভাষায় নামায পড়াও এমন ব্যক্তির জন্য জায়েয যে আরবী হরফ উচ্চারণ করতে অক্ষম। অনুরূপভাবে যেমন অক্ষমতা দূর হবার পর ইশারায় রুকূ-সিজদাকারীর নামায হবে না ঠিক তেমনি কুরআন পড়ার ক্ষমতা অর্জন করার পর অনুবাদ পাঠকারীর নামাযও হবে না। (এ বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সারখ্সী লিখিত মাবসূত, প্রথম খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা এবং ফাতহুল কাদীর ও শারহে ইনায়াহ আলাল হিদায়াহ প্রথম খণ্ড, ১৯০-২০১ পৃষ্ঠা)

১২৩. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের আলেমরা একথা জানে যে, কুরআন মজীদে যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা ঠিক সেই একই শিক্ষা যা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোতে দেয়া হয়েছিল। মক্কাবাসীরা কিতাবের জ্ঞান না রাখলেও আশেপাশের এলাকায় বনী ইসরাঈলের বিপুল সংখ্যক আলেম ও বিদ্বান রয়েছে। তারা জানে, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আজ প্রথমবার তাদের সামনে কোন অভিনব ও অদ্ভুত "কথা" রাখেননি বরং হাজার হাজার

বছর থেকে আল্লাহর নবীগণ এই একই কথা বারবার এনেছেন। এ নাযিলকৃত বিষয়ও সেই একই রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এসেছে যিনি পূর্ববর্তী কিতাবগুলো নাযিল করেছিলেন, এ কথাটি কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ততা অর্জন করার জন্য যথেষ্ট নয়?

সীরাতে ইবনে হিশাম থেকে জানা যায়, এ আয়াতগুলো নাযিল হবার কাছাকাছি সময়ে হাব্শা (বর্তমানে ইথিয়োপিয়া) থেকে হযরত জা'ফর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দাওয়াত শুনে ২০ জনের একটি প্রতিনিধিদল মক্কায় আসে। তারা মসজিদে হারামে কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের সামনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মোলাকাত করে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন আপনি কি শিক্ষা নিয়ে এসেছেন? তিনি জবাবে কুরআনের কিছু আয়াত শুনান। এগুলো শুনে তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে এবং তারা তখনই তাঁকে সত্য রসূল হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে তাঁর প্রতি ঈমান আনে। তারপর যখন তারা তাঁর কাছ থেকে উঠে যায় তখন আবু জেহেল কয়েকজন কুরাইশীকে সাথে নিয়ে তাদের সাথে দেখা করে এবং তাদেরকে কঠোরভাবে তিরস্কার করে। সে বলে, "তোমাদের চেয়ে বেশী নির্বোধ কোন কাফেলা কখনো এখানে আসেনি। হে হতভাগার দল! তোমাদের দেশের লোকেরা তোমাদের এখানে পাঠিয়েছিল এ ব্যক্তির অবস্থা অনুসন্ধান করে তাদের কাছে সঠিক তথ্য নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু তোমরা তো তার সাক্ষাত করার সাথে সাথেই নিজেদের ধর্ম বিসর্জন দিয়ে বসলে।" তারা ছিল ভদ্র ও শরীফ লোক। আবু জেহেলের এ নিন্দাবাদ ও ভর্ৎসনায় বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে তারা সালাম দিয়ে সরে গেলো এবং বলতে থাকলো ঃ আমরা আপনার সাথে বিতর্ক করতে চাই না। আপনার ধর্ম আপনার ইচ্ছা ও ক্ষমতার আওতাধীন এবং আমাদের ধর্মও আমাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতার আওতাধীন। যে জিনিসের মধ্যে নিজেদের কল্যাণ দেখেছি সেটিই আমরা গ্রহণ করে নিয়েছি। (দ্বিতীয় খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা) সূরা কাসাসে এ ঘটনার আলোচনা এভাবে এসেছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ○ وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ..... وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ز سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ز لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ -

"এর আগে যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম তারা এ কুরআনের প্রতি ঈমান আনে এবং যখন তাদেরকে তা শুনানো হয় তখন বলে, আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি। এ হচ্ছে আমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য। আমরা এর আগেও এই দীন ইসলামের ওপর ছিলাম। ..... আর যখন তারা অর্থহীন কথাবার্তা শুনলো তখন বিতর্ক এড়িয়ে গেলো এবং বললো আমাদের কাজ আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য। তোমাদের সালাম জানাই। আমরা মূর্খদের পদ্ধতি পছন্দ করিনা। (অর্থাৎ তোমরা আমাদের দু'টি কথা শোনালে জবাবে আমরাও তোমাদের দু'টি কথা শুনালাম)

وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ ﴿١٩٨﴾ فَقَرَاَهٗ عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١٩٩﴾
كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِىْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا
الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ
مُنْظَرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾

(কিন্তু এদের হঠকারিতা ও গোয়ার্তুমি এতদূর গড়িয়েছে যে) যদি আমি এটা কোন অনারব ব্যক্তির ওপর নাযিল করে দিতাম এবং সে এই (প্রাঞ্জল আরবীয় বাণী) তাদেরকে পড়ে শোনাতো তবুও এরা মেনে নিতো না।[১২৪] অনুরূপভাবে একে (কথা) আমি অপরাধীদের হৃদয়ে বিদ্ধ করে দিয়েছি।[১২৫] তারা এর প্রতি ঈমান আনে না যতক্ষণ না কঠিন শাস্তি দেখে নেয়।[১২৬] তারপর যখন তা অসচেতন অবস্থায় তাদের ওপর এসে পড়ে তখন তারা বলে, "এখন আমরা কি অবকাশ পেতে পারি"?[১২৭]

১২৪. অর্থাৎ এখন তাদেরই জাতির এক ব্যক্তি পরিষ্কার আরবী ভাষায় এ কালাম পড়ে শুনাচ্ছেন। এতে তারা বলছে, এ ব্যক্তি নিজেই এ কালাম রচনা করেছে। আরবী ভাষীর মুখ থেকে আরবী ভাষণ উচ্চারিত হবার মধ্যে অলৌকিকতার কি আছে যে, তাকে আল্লাহর কালাম বলে মেনে নিতে হবে? কিন্তু এ উচ্চাংগের আরবী কালাম যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন অনারব ব্যক্তির ওপর অলৌকিক কার্যক্রম হিসেবে নাযিল করা হতো এবং সে এসে আরবদের কাছে অত্যন্ত নির্ভুল আরবীয় কায়দায় তা পড়ে শোনাতো তাহলে তারা ঈমান না আনার জন্য অন্য কোন বাহানা তালাশ করতো। তখন তারা বলতো, এর ওপর কোন জিন ভর করেছে, সে আজমীর কণ্ঠে আরবী বলে যাচ্ছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা হা-মীম আস্ সাজ্‌দাহ, ৫৪-৫৮ টীকা) আসল জিনিস হচ্ছে, সত্য প্রিয় ব্যক্তির সামনে যে কথা পেশ করা হয় সে তার ওপর চিন্তা করে এবং ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে কথাটা ন্যায় সংগত কিনা সে ব্যাপারে অভিমত প্রতিষ্ঠিত করে। আর যে ব্যক্তি হঠকারী হয়, না মেনে নেয়ার ইচ্ছাই যে প্রথম থেকে লালন করে রেখেছে সে আসল বিষয়বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দেয়না বরং তা প্রত্যাখান করার জন্য নানান টালবাহানা তালাশ করতে থাকে। তার সামনে কথা যেভাবেই পেশ করা হোক না কেন সে প্রত্যাখ্যান করার জন্য কোন না কোন ওজুহাত বা ছুতো তৈরি করে নেবেই। কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের এই হঠকারিতার পরদা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় উন্মোচন করা হয়েছে এবং তাদেরকে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে, তোমরা কোন্ মুখে ঈমান আনার জন্য মুজি'যা দেখাবার শর্ত আরোপ করছো? তোমরা তো এমন লোক যাদেরকে যে কোন জিনিস দেখিয়ে দেয়া হলেও তারা তা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য কোন না কোন বাহানা তালাশ করে নেবেই। কারণ তোমাদের মধ্যে সত্য কথা মেনে নেবার প্রবণতা নেই ঃ

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَٰهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا
كَانُوا۟ يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٧﴾ وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ
إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ﴿٢٠٩﴾ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَٰطِينُ ﴿٢١٠﴾
وَمَا يَنۢبَغِى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿٢١٢﴾

এরা কি আমার আযাব ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছে? তুমি কি কিছু ভেবে দেখেছো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগ বিলাস করার অবকাশও দিই এবং তারপর আবার সেই একই জিনিস তাদের ওপর এসে পড়ে যার ভয় তাদেরকে দেখানো হচ্ছে, তাহলে জীবন যাপনের এ উপকরণগুলো যা তারা এ যাবত পেয়ে আসছে এগুলো তাদের কোন্ কাজে লাগবে?[১২৮]

(দেখো) আমি কখনো কোন জনপদকে তার জন্য উপদেশ দেয়ার যোগ্য সতর্ককারী না পাঠিয়ে ধ্বংস করিনি এবং আমি জালেম ছিলাম না।[১২৯]

এ (সুস্পষ্ট কিতাবটি) নিয়ে শয়তানরা অবতীর্ণ হয়নি।[১৩০] এ কাজটি তাদের শোভাও পায় না।[১৩১] এবং তারা এমনটি করতেই পারে না।[১৩২] তাদেরকে তো এর শ্রবন থেকেও দূরে রাখা হয়েছে।[১৩৩]

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ –

"যদি আমি তোমাদের ওপর কোন কাগজে লেখা কিতাব নাযিল করে দিতাম এবং এরা হাত দিয়ে তা ছুঁয়েও দেখে নিতো, তাহলেও যাদের না মানার তারা বলতো, এতো পরিষ্কার যাদু। (আল আনআম ঃ ৭)

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ –

"আর যদি আমি তাদের ওপর আকাশের কোন দরজাও খুলে দিতাম এবং তারা তার মধ্যে চড়তে থাকতো, তাহলে তারা বলতো আমাদের চোখ প্রতারিত হচ্ছে বরং আমাদের ওপর যাদু করা হয়েছে।" (আল হিজর ঃ ১৪-১৫)

১২৫. অর্থাৎ এটা সত্যপন্থীদের দিলে যেমন আত্মিক প্রশান্তি ও হৃদয়ের সান্তনা হয়ে দেখা দেয় তাদের দিলে এর প্রতিক্রিয়া ঠিক সেভাবে হয় না। বরং একটি গরম লোহার

শলাকা হয়ে এটা তাদের হৃদয়ে এমনভাবে বিদ্ধ হয় যে, তারা অস্থির হয়ে ওঠে এবং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার পরিবর্তে তার প্রতিবাদ করার উপায় খুঁজতে থাকে।

১২৬. ঠিক তেমনি আযাব যেমন বিভিন্ন জাতি দেখেছে বলে এ সূরায় ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

১২৭. অর্থাৎ আযাব সামনে দেখেই অপরাধীরা বিশ্বাস করতে থাকে যে, নবী যা বলেছিলেন তা ছিল যথার্থই সত্য। তখন তারা আক্ষেপ সহকারে হাত কচলাতে থাকে এবং বলতে থাকে, হায় যদি আমরা এখন কিছু অবকাশ পাই। অথচ অবকাশের সময় পার হয়ে গেছে।

১২৮. এ বাক্যটি ও এর আগের বাক্যটির মাঝখানে একটি সূক্ষ্ম শূন্যতা রয়ে গেছে। শ্রোতা একটু চিন্তা ভাবনা করলে নিজেই এ শূন্যতা ভরে ফেলতে পারে। আযাব আসার কোন আশংকা তারা করতো না, তাই তারা তাড়াতাড়ি আযাব আসার জন্য হৈ চৈ করছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, যেমন সুখের বাঁশি এ পর্যন্ত তারা বাজিয়ে এসেছে তেমনি চিরকাল বাজাতে থাকবে। এ ভরসায় তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চ্যালেঞ্জ দিতো এ মর্মে যে, যদি সত্যি আপনি আল্লাহর রসূল হন এবং আমরা আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে আল্লাহর আযাবের হকদার হয়ে থাকি, তাহলে নিন আমরা তো আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলাম, এবার নিয়ে আসুন সেই আযাব যার ভয় আমাদের দেখিয়ে আসছেন। এ কথায় বলা হচ্ছে, ঠিক আছে, যদি ধরে নেয়া যায় তাদের এ ভরসা সঠিকই হয়ে থাকে, যদি তাদের ওপর তাৎক্ষণিকভাবে আযাব না আসে, যদি দুনিয়ায় আয়েশী জীবন যাপন করার জন্য তারা একটি সুদীর্ঘ অবকাশই পেয়ে যায়, যার আশায় তারা বুক বেঁধেছে, তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, যখনই তাদের ওপর আদ, সামূদ বা লূতের জাতি অথবা আইকাবাসীদের মতো কোন আকস্মিক বিপর্যয় আপতিত হবে, যার হাত থেকে, নিরাপদ থাকার নিশ্চয়তা কারো কাছে নেই অথবা অন্য কিছু না হলেও অন্তত মৃত্যুর শেষ মুহূর্তই এসে পৌছুবে, যার বেষ্টনী ভেদ করে পালাবার সাধ্য কারোর নেই, তাহলে সে সময় দুনিয়ার আয়েশ আরাম করার এ কয়েকটি বছর তাদের জন্য কি লাভজনক প্রমাণিত হবে?

১২৯. অর্থাৎ যখন তারা সতর্ককারীদের সতর্কবাণী এবং উপদেশ দাতাদের উপদেশ গ্রহণ করেনি এবং আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম তখন একথা সুস্পষ্ট যে, এটা আমার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কোন জুলুম ছিল না। ধ্বংস করার আগে তাদেরকে বুঝিয়ে সঠিক পথে আনার চেষ্টা না করা হলে অবশ্য তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে একথা বলা যেতো।

১৩০. প্রথমে এ বিষয়টির ইতিবাচক দিকের কথা বলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, এটি রব্বুল আলামীনের নাযিলকৃত কিতাব এবং রুহুল আমীন এটি নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। এখন নেতিবাচক দিক বর্ণনা করা হচ্ছে। বলা হয়েছে, শয়তানরা একে নিয়ে অবতীর্ণ হয়নি, যেমন সত্যের দুশমনরা দোষারোপ করছে। কুরাইশ বংশীয় কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য যে মিথ্যার

অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিল সেখানে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছিল এই যে, কুরআনের আকারে যে বিস্ময়কর বাণী মানুষের সামনে আসছিল এবং তাদের হৃদয়ের গভীরে অনুপ্রবেশ করে চলছিল তার কি ব্যাখ্যা করা যায়। এ বাণী মানুষের কাছে পৌঁছাবার পথ বন্ধ করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। লোকদের মনে এ সম্পর্কে কুধারণার সৃষ্টি করা এবং এর প্রভাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, এটাই ছিল এখন তাদের জন্য একটি পেরেশানীর ব্যাপার। এ পেরেশানীর অবস্থার মধ্যে তারা জনগণের মধ্যে যেসব অপবাদ ছড়িয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল এই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাউযুবিল্লাহ একজন গণৎকার এবং সধারণ গণৎকারদের মতো তাঁর মনের মধ্যেও এ বাণী শয়তানরা সঞ্চার করে দেয়। এ অপবাদটিকে তারা নিজেদের সবচেয়ে বেশী কার্যকর হাতিয়ার মনে করতো। তাদের ধারণা ছিল, এ বাণী কোন ফেরেশতা নিয়ে আসে না শয়তান, কারো কাছে একথা যাচাই করার কি মাধ্যমই বা থাকতে পারে এবং শয়তান মনের মধ্যে সঞ্চার করে দেয়, এ অভিযোগের প্রতিবাদ যদি কেউ করতে চায় তাহলে কিভাবে করবে?

১৩১. অর্থাৎ এ বাণী এবং এ বিষয়বস্তু শয়তানের মুখে তো সাজেই না। যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজেই বুঝতে পারে, কুরআনে যেসব কথা বর্ণনা করা হচ্ছে সেগুলো কি শয়তানের পক্ষ থেকে হতে পারে? তোমাদের জনপদগুলোতে কি গণৎকার নেই এবং শয়তানদের সাথে যোগসাজস করে যেসব কথা এ ব্যক্তি বলছেন তা কখনো তোমরা কোথাও শুনেছো? তোমরা কি কখনো শুনেছো, কোন শয়তান কোন গণৎকারের মাধ্যমে লোকদেরকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও আল্লাহকে ভয় করার শিক্ষা দিয়েছে? শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে বিরত রেখেছে? পরকালে জিজ্ঞাসাবাদ করার ভয় দেখিয়েছে? জুলুম-নিপীড়ন, অসৎ-অশ্লীল কাজ ও নৈতিকতা বিগর্হিত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে? সৎপথে চলা, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন এবং আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সদাচার করার উপদেশ দিয়েছে? শয়তানরা এ প্রকৃতি কোথায় পাবে? তাদের স্বভাব হচ্ছে, তারা মানুষের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে অসৎকাজে উৎসাহিত করে। তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী গণকদের কাছে লোকেরা যে কথা জিজ্ঞেস করতে যায় তা হচ্ছে এই যে, প্রেমিক তার প্রেমিকাকে পাবে কি না? জুয়ায় কোন্ দাঁওটা মারলে লাভ হবে? শত্রুকে হেয় করার জন্য কোন্ চালটা চালতে হবে? অমুক ব্যক্তির উট কে চুরি করেছে? এসব সমস্যা ও বিষয় বাদ দিয়ে গণক ও তার পৃষ্ঠপোষক শয়তানরা আবার কবে থেকে আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণ ও সংস্কারের শিক্ষা এবং অসৎ কাজে বাধা দেবার ও সেগুলো উৎখাত করার চিন্তা-ভাবনা করেছে?

১৩২. অর্থাৎ শয়তানরা করতে চাইলেও একাজ করার ক্ষমতাই তাদের নেই। সামান্য সময়ের জন্যও নিজেদেরকে মানুষের যথার্থ শিক্ষক ও প্রকৃত অত্মশুদ্ধিকারীর স্থানে বসিয়ে কুরআন যে নির্ভেজাল সত্য ও নির্ভেজাল কল্যাণের শিক্ষা দিচ্ছে সে শিক্ষা দিতে তারা সক্ষম নয়। প্রতারণা করার জন্যও যদি তারা এ কৃত্রিম রূপে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে তাদের কাজ এমন মিশ্রনমুক্ত হতে পারে না, যাতে তাদের মূর্খতা ও তাদের মধ্যে লুকানো শয়তানী স্বভাবের প্রকাশ হবে না। যে ব্যক্তি শয়তানদের 'ইল্হাম' তথা আসমানী প্রেরণা লাভ করে নেতা হয়ে বসে তার জীবনেও তার শিক্ষার মধ্যে অনিবার্যভাবে নিয়তের

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ﴿٢١٣﴾ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ
الْاَقْرَبِيْنَ ﴿٢١٤﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢١٥﴾
فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢١٦﴾

কাজেই হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবুদকে ডেকো না, নয়তো তুমিও শাস্তি লাভকারীদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে।[১৩৪] নিজের নিকটতম আত্মীয়-পরিজনদেরকে ভয় দেখাও[১৩৫] এবং মু'মিনদের মধ্য থেকে যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের সাথে বিনম্র ব্যবহার করো। কিন্তু যদি তারা তোমার নাফরমানী করে তাহলে তাদেরকে বলে দাও, তোমরা যাকিছু করো আমি তা থেকে দায়মুক্ত।[১৩৬]

ত্রুটি, সংকল্পের অপবিত্রতা ও উদ্দেশ্যের মালিন্য দেখা দেবেই। নির্ভেজাল সততা ও নির্ভেজাল সৎকর্মশীলতা কোন শয়তান মানুষের মনে সঞ্চার করতে পারে না এবং শয়তানের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী কখনো এর ধারক হতে পারে না। এরপর আছে শিক্ষার উন্নত মান ও পবিত্রতা এবং এর ওপর বাড়তি সুনিপুন বাগধারা ও সাহিত্য-অলংকার এবং গভীর তত্বজ্ঞান, যা কুরআনে পাওয়া যায়। এরি ভিত্তিতে কুরআনে বারবার চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, মানুষ ও জিনেরা মিলে চেষ্টা করলেও এ কিতাবের মতো কিছু একটা রচনা করে আনতে পারবে না ঃ

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ
لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا (بنى اسرائيل : ٨٨)

قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ
كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (يونس : ٣٨)

১৩৩. অর্থাৎ কুরআনের বাণী হৃদয়ে সঞ্চার করার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা তো দূরের কথা যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে রুহুল আমীন তা নিয়ে চলতে থাকেন এবং যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনোরাজ্যে তিনি তা নাযিল করেন তখন এ সমগ্র ধারাবাহিক কার্যক্রমের কোন এক জায়গায়ও শয়তানদের কান লাগিয়ে শোনারও কোন সুযোগ মেলে না। আশেপাশে কোথাও তাদের ঘুরে বেড়াবার কোন অবকাশই দেয়া হয়না। কোথাও থেকে কোনভাবে কিছু শুনে টুনে দু'একটি কথা চুরি করে নিয়ে গিয়ে তারা নিজেদের বন্ধু বান্ধবদের বলতে পারতো না যে, আজ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ বাণী শুনাবেন অথবা তাঁর ভাষণে অমুক কথা বলা হবে। (আরো বেশী

জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল হিজ্‌র ৮–১২ ও আস্ সাফ্‌ফাত ৫–৭ টীকা এবং সূরা আল জিন ৮– ৯ ও ২৭ আয়াত)

১৩৪. এর অর্থ এ নয়, নাউযুবিল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শিরকের অপরাধ সংঘটিত হবার ভয় ছিল এবং এজন্য তাঁকে ধমক দিয়ে এ থেকে বিরত রাখা হয়েছে। আসলে কাফের ও মুশরিকদেরকে সতর্ক করাই এর উদ্দেশ্য। বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে, কুরআন মজীদে যে শিক্ষা পেশ করা হচ্ছে। তা যেহেতু বিশ্ব–জাহানের শাসনকর্তার পক্ষ থেকে নির্ভেজাল সত্য এবং তার মধ্যে শয়তানী মিশ্রণের সামান্যও দখল নেই, তাই এখানে সত্যের ব্যাপারে কাউকে কোন প্রকার সুযোগ–সুবিধা দেবার কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় যদি কেউ হতে পারেন তবে তিনি হচ্ছেন তাঁর রসূল। কিন্তু ধরে নেয়া যাক যদি তিনিও বন্দেগীর পথ থেকে এক তিল পরিমাণ সরে যান এবং এক আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ হিসেবে ডাকেন তাহলে পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবেন না। এক্ষেত্রে অন্যেরা তো ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য নয়। এ ব্যাপারে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই যখন কোন সুবিধা দেয়া হয়নি তখন আর কোন্ ব্যক্তি আছে যে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতায় কাউকে শরীক করার পর আবার এ আশা করতে পারে যে, সে রক্ষা পেয়ে যাবে অথবা কেউ তাকে রক্ষা পেতে সাহায্য করবে।

১৩৫. অর্থাৎ আল্লাহর এ পবিত্র পরিচ্ছন্ন দীনের মধ্যে যেমন নবীকে কোন সুবিধা দেয়া হয়নি ঠিক তেমনি নবীর পরিবার ও তাঁর নিকটতম আত্মীয়–বান্ধবদের জন্যও কোন সুবিধার অবকাশ রাখা হয়নি। এখানে যার সাথেই কিছু করা হয়েছে তার গুণাগুণের (Merits) প্রেক্ষিতেই করা হয়েছে। কারো বংশ মর্যাদা বা কারো সাথে কোন ব্যক্তির সম্পর্ক কোন উপকার করতে পারে না। পথ ভ্রষ্টতা ও অসৎকর্মের জন্য আল্লাহর আযাবের ভয় সবার জন্য সমান। এমন নয় যে, অন্য সবাই তো এসব জিনিসের জন্য পাকড়াও হবে কিন্তু নবীর আত্মীয়রা রক্ষা পেয়ে যাবে। তাই হুকুম দেয়া হয়েছে, নিজের নিকটতম আত্মীয়দেরকেও পরিষ্কার ভাষায় সতর্ক করে দাও। যদি তারা নিজেদের আকীদা–বিশ্বাস ও কার্যকলাপ পরিচ্ছন্ন না রাখে তাহলে তারা যে নবীর আত্মীয় একথা তাদের কোন কাজে লাগবেনা।

নির্ভরযোগ্য হাদীসে বলা হয়েছে, এ আয়াত নাযিল হবার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার আগে নিজের দাদার সন্তানদের ডাকলেন এবং তাদের একেকজনকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، يَا عَبَّاسُ ، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ، اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، فَاِنِّيْ لَا اَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ، سَلُوْنِيْ مِنْ مَالِيْ مَا شِئْتُمْ –

"হে বনী আবদুল মুত্তালিব, হে আব্বাস, হে আল্লাহর রসূলের ফুফী সফীয়াহ, হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা, তোমরা আগুনের আযাব থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার

চিন্তা করো। আমি আল্লাহর আযাব থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারবো না। তবে হাঁ, আমার ধন-সম্পত্তি থেকে তোমরা যা চাও চাইতে পারো।"

তারপর তিনি অতি প্রত্যুষে সাফা পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় উঠে দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন ঃ يا صباحاه (হায়, সকালের বিপদ!) হে কুরাইশের লোকেরা! হে বনী কা'ব ইবনে লুআই! হে বনী মুর্‌রা! হে কুসাইর সন্তান সন্ততিরা! হে বনী আবদে মান্নাফ! হে বনী আব্‌দে শাম্‌স! হে বনী হাশেম, হে বনী আবদুল মুত্তালিব! এভাবে কুরাইশদের প্রত্যেকটি গোত্র ও পরিবারের নাম ধরে ধরে তিনি আওয়াজ দেন। আরবে একটি প্রচলিত নিয়ম ছিল, অতি প্রত্যুষে যখন কোন বহিশত্রুর হামলার আশংকা দেখা দিতো, ওয়াকিফহাল ব্যক্তি এভাবেই সবাইকে ডাকতো এবং লোকেরা তার আওয়াজ শুনতেই চারদিক থেকে দৌড়ে যেতো। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ আওয়াজ শুনে লোকেরা যার যার ঘর থেকে বের হয়ে এলো। তখন তিনি বললেন ঃ "হে লোকেরা! যদি আমি বলি, এ পাহাড়ের পেছনে একটি বিশাল সেনাবাহিনী তোমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য ওৎ পেতে আছে। তাহলে কি তোমরা আমার কথা সত্য বলে মেনে নেবে?" সবাই বললো, হ্যাঁ আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, তুমি কখনো মিথ্যা বলনি। তিনি বললেন, "বেশ, তাহলে আমি আল্লাহর কঠিন আযাব আসার আগে তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি। তাঁর পাকড়াও থেকে নিজেদের বাঁচাবার চিন্তা করো। আল্লাহর মোকাবিলায় আমি তোমাদের কোন কাজে লাগতে পারবোনা। কিয়ামতের দিন কেবলমাত্র মুত্তাকীরাই হবে আমার আত্মীয়। এমন যেন না হয়, অন্য লোকেরা সৎকাজ নিয়ে আসবে এবং তোমরা দুনিয়ার জঞ্জাল মাথায় করে নিয়ে উপস্থিত হবে। সে সময় তোমরা ডাকবে, হে মুহাম্মাদ! কিন্তু আমি তোমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হবো। তবে দুনিয়ায় আমার সাথে তোমাদের রক্তের সম্পর্ক এবং এখানে আমি তোমাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবো।" এ বিষয়বস্তু সম্বলিত অনেকগুলো হাদীস বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, তাফসীরে ইবনে জারীরে হযরত আয়েশা, হযরত আবু হুরাইরা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্‌বাস, হযরত যুহাইর ইবনে আমর ও হযরত কুবাইসাহ ইবনে মাহারিক থেকে বর্ণিত হয়েছে।

কুরআনে وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ -এর হুকুম হলো এবং নবী (সা) তাঁর আত্মীয়দেরকে একত্র করে একথা জানিয়ে দিয়ে সে হুকুম তামিল করলেন, ব্যাপারটির এখানেই শেষ নয়। আসলে এর মধ্যে যে মূলনীতি সুস্পষ্ট করা হয়েছিল তা ছিল এই যে, দীনের মধ্যে নবী ও তাঁর বংশের জন্য এমন কোন বিশেষ সুবিধা নেই যা থেকে অন্যরা বঞ্চিত। যে জিনিসটি প্রাণ সংহারক বিষ সেটি সবারই জন্য প্রাণ সংহারক। নবীর কাজ হচ্ছে সবার আগে নিজে তা থেকে বাঁচবেন এবং নিজের নিকবর্তী লোকদেরকে তার ভয় দেখাবেন। তারপর সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সবাইকে এ মর্মে সতর্ক করে দেবেন যে, এটি যে-ই খাবে সে-ই মারা পড়বে। আর যে জিনিসটি লাভজনক তা সবার জন্য লাভজনক। নবীর দায়িত্ব হচ্ছে, সবার আগে তিনি নিজে সেটি অবলম্বন করবেন এবং নিজের আত্মীয়দেরকে সেটি অবলম্বন করার উপদেশ দেবেন। এর ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি দেখে নেবে এ ওয়াজ-নসিহত শুধুমাত্র অন্যের জন্য নয় বরং নিজের

দাওয়াতের ব্যাপারে নবী আন্তরিক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা জীবন এ পদ্ধতি অবলম্বন করে গেছেন। মক্কা বিজয়ের দিন যখন তিনি শহরে প্রবেশ করলেন তখন ঘোষণা করে দিলেন ঃ

كُلُّ رِبَافِى الْجَاهِلِيَةِ مَوْضُوْعٌ تَحْتَ قَدَمَىَّ هَاتَيْنِ وَاَوَّلُ مَا اَضَعُهُ رِبَا الْعَبَّاسِ -

"লোকদের কাছে অনাদায়কৃত জাহেলী যুগের প্রত্যেকটি সুদ আমার এ দু'পায়ের তলে পিষ্ট করা হয়েছে। আর সবার আগে যে সূদকে আমি রহিত করে দিচ্ছি তা হচ্ছে আমার চাচা আব্বাসের পাওনা সূদ।"

(উল্লেখ্য, সূদ হারাম হবার আগে হযরত আব্বাস (রা) সূদে টাকা খাটাতেন এবং সে সময় পর্যন্ত লোকদের কাছে তাঁর বহু টাকার সূদ পাওনা ছিল) একবার চুরির অভিযোগে তিনি কুরাইশদের ফাতিমা নামের একটি মেয়ের হাত কাটার হুকুম দিলেন। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) তার পক্ষে সুপারিশ করলেন। এতে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করতো তাহলে আমি তার হাত কেটে দিতাম।

১৩৬. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, তোমার আত্মীয় পরিজনদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনে তোমার অনুসরণ করবে তাদের সাথে কোমল, স্নেহপূর্ণ ও বিনম্র ব্যবহার করো। আর যারা তোমার কথা মানবে না তাদের দায়মুক্ত হবার কথা ঘোষণা করে দাও। দুই, যেসব আত্মীয়কে সতর্ক করার হুকুম দেয়া হয়েছিল এ উক্তি কেবলমাত্র তাদের সাথে সম্পর্কিত নয় বরং এটি ব্যাপকভাবে সবার জন্য। অর্থাৎ যারা ঈমান এনে তোমার আনুগত্য করে তাদের সাথে বিনম্র আচরণ করো এবং যারাই তোমার নাফরমানি করে তাদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দাও যে, তোমাদের কার্যকলাপের সমস্ত দায় দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত।

এ আয়াত থেকে জানা যায়, সে সময় কুরাইশ ও তার আশেপাশের আরববাসীদের মধ্যে এমন কিছু লোকও ছিল যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছিল কিন্তু কার্যত তারা তাঁর আনুগত্য করছিল না বরং তারা যথারীতি তাঁদের ভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত সমাজ কাঠামোর মধ্যে ঠিক তেমনিভাবে জীবন যাপন করে যাচ্ছিল যেমন অন্যান্য কাফেররা করছিল। আল্লাহ এ ধরনের স্বীকৃতি দানকারীদেরকে এমন সব মু'মিনদের থেকে আলাদা গণ্য করেছিলেন যাঁরা নবীর (সা) স্বীকৃতি দান করার পর তাঁর আনুগত্যের নীতি অবলম্বন করেছিল। বিনম্র ব্যবহার করার হুকুম শুধুমাত্র এ শেষোক্ত দলটির জন্য দেয়া হয়েছিল। আর যারা নবীর (সা) আনুগত্য করা থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিল, যার মধ্যে তাঁর সত্যতা স্বীকারকারীও এবং তাঁকে অস্বীকারকারীও ছিল, তাদের সম্পর্কে নবীকে (সা) নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা প্রকাশ করে দাও এবং পরিষ্কার বলে দাও, নিজেদের কর্মকাণ্ডের ফলাফলে তোমরা নিজেরাই ভুগবে এবং তোমাদের সতর্ক করে দেবার পর এখন আর তোমাদের কোন কাজের দায়-দায়িত্ব আমার ওপর নেই।

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِي
السَّاجِدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾

আর সেই পরাক্রান্ত ও দয়াময়ের ওপর নির্ভর করো[১৩৭] যিনি তোমাকে দেখতে থাকেন যখন তুমি ওঠো[১৩৮] এবং সিজ্‌দাকারীদের মধ্যে তোমার ওঠা-বসা ও নড়া চড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখেন।[১৩৯] তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।

১৩৭. অর্থাৎ দুনিয়ার বৃহত্তম শক্তিরও পরোয়া করো না এবং মহাপরাক্রমশালী ও দয়াময় সত্তার ওপর নির্ভর করে কাজ করে যাও। তাঁর পরাক্রমশালী হওয়াই একথার নিশ্চয়তা বিধান করে যে, যার পেছনে তাঁর সমর্থন আছে তাকে দুনিয়ায় কেউ হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে না। আর তাঁর দয়াময় হওয়া এ নিশ্চিন্ততার জন্য যথেষ্ট যে, তাঁর জন্য যে ব্যক্তি সত্যের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার কাজে জীবন উৎসর্গ করবে তার প্রচেষ্টাকে তিনি কখনো নিষ্ফল হতে দেবেন না।

১৩৮. ওঠার অর্থ রাতে নামাযের জন্য ওঠাও হতে পারে, আবার রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য ওঠাও হতে পারে।

১৩৯. এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, আপনি যখন জামায়াতের সাথে নামায পড়ার সময় নিজের মুকতাদীদের সাথে ওঠা-বসা ও রুকূ'-সিজ্‌দা করেন তখন আল্লাহ আপনাকে দেখতে থাকেন। দুই, রাতের বেলা উঠে যখন নিজের সাথিরা (যাদের বৈশিষ্টসূচক গুণ হিসেবে "সিজ্‌দাকারী" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে) তাদের পরকাল গড়ার জন্য কেমন তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে তা দেখার উদ্দেশ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকেন তখন আপনি আল্লাহর দৃষ্টির আড়ালে থাকেন না। তিন, আপনি নিজের সিজ্‌দাকারী সাথিদেরকে সংগে নিয়ে আল্লাহর বান্দাদের সংশোধন করার জন্য যেসব প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও সাধনা চালিয়ে যাচ্ছেন আল্লাহ তা অবগত আছেন। চার, সিজ্‌দাকারী লোকদের দলে আপনার যাবতীয় তৎপরতা আল্লাহর নজরে আছে। তিনি জানেন আপনি কিভাবে তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, কিভাবে ও কেমন পর্যায়ে তাদের আত্মশুদ্ধি করছেন এবং কিভাবে ভেজাল সোনাকে খাঁটি সোনায় পরিণত করেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের এসব গুণের উল্লেখ এখানে যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে তার সম্পর্ক ওপরের বিষয়বস্তুর সাথেও এবং সামনের বিষয়বস্তুর সাথেও আছে। ওপরের বিষয়বস্তুর সাথে তার সম্পর্ক হচ্ছে এই যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রহমত ও তাঁর শক্তিশালী সমর্থনলাভের যোগ্য। কারণ আল্লাহ কোন অন্ধ ও বধির মাবুদ নন বরং একজন চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন শাসক। তাঁর পথে আপনার সংগ্রাম-সাধনা এবং সিজদাকারী সাথিদের মধ্যে আপনার তৎপরতা সবকিছু তাঁর দৃষ্টিতে আছে। পরবর্তী বিষয়বস্তুর সাথে এর সম্পর্ক হচ্ছে এই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো যে ব্যক্তির জীবন এবং যার সাথিদের গুণাবলী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথিদের মতো, তার ওপর শয়তান অবতীর্ণ

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾
يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾
أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾

হে লোকেরা! আমি কি তোমাদের জানাবো শয়তানরা কার ওপর অবতীর্ণ হয়? তারা তো প্রত্যেক জালিয়াত বদকারের ওপর অবতীর্ণ হয়।[১৪০] শোনা কথা কানে ঢুকিয়ে দেয় এবং এর বেশীর ভাগই হয় মিথ্যা।[১৪১]

আর কবিরা! তাদের পেছনে চলে পথভ্রান্ত যারা।[১৪২] তুমি কি দেখো না তারা উপত্যকায় উপত্যকায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায়[১৪৩] এবং এমনসব কথা বলে যা তারা করে না?[১৪৪]

হয় অথবা সে কবি—একথা কেবলমাত্র একজন বুদ্ধিভ্রষ্ট ব্যক্তিই বলতে পারে। শয়তান যেসব গণকের কাছে আসে তাদের এবং কবি ও তাদের সাথি সহযোগীদের আচার আচরণ কেমন হয়ে থাকে তা কি কারো অজানা? তোমাদের নিজেদের সমাজে এ ধরনের লোক বিপুল সংখ্যায় পাওয়া যায়। কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কি ঈমানদারীর সাথে একথা বলতে পারে, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথিদের জীবন এবং কবি ও গণকদের জীবনের মধ্যে কোন ফারাক দেখে না? এখন এর চেয়ে বড় বেহায়াপনা আর কি হতে পারে যে, আল্লাহর এ বান্দাদেরকে প্রকাশ্যে কবি ও গণৎকার বলে পরিহাস করা হচ্ছে অথচ কেউ একটু লজ্জাও অনুভব করছে না।

১৪০. এখানে গণৎকার, জ্যোতিষী, ভবিষ্যত বক্তা, "আমলকারী" ইত্যাদি লোক, যারা ভবিষ্যতের খবর জানে বলে ভণ্ড প্রতারকের অভিনয় করে অথবা যারা দ্ব্যর্থবোধক শব্দগুচ্ছ উচ্চারণ করে মানুষের ভাগ্য গণনা করে কিংবা ধড়িবাজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে জিন, আত্মা ও মক্কেলদের সহায়তায় মানুষের সংকট নিরসনের ব্যবসায় করে থাকে তাদের কথা বলা হয়েছে।

১৪১. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, শয়তানরা কিছু শুনেটুনে নিয়ে নিজেদের চেলাদেরকে জানিয়ে দেয় এবং তাতে সামান্যতম সত্যের সাথে বিপুল পরিমাণ মিথ্যার মিশ্রণ ঘটায়। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, মিথ্যুক-প্রতারক গণৎকাররা শয়তানের কাছ থেকে কিছু শুনে নেয় এবং তারপর তার সাথে নিজের পক্ষ থেকে অনেকটা মিথ্যা মিশিয়ে মানুষের কানে ফুঁকে দিতে থাকে। একটি হাদীসে এর আলোচনা এসেছে। হাদীসটি বুখারী শরীফে হযরত আয়েশার (রা) বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ কোন কোন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গণকদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। জবাবে তিনি বলেন, ওসব কিছুই নয়। তারা বলে, হে আল্লাহর রসূল! কখনো কখনো তারা তো আবার ঠিক সত্যি কথাই বলে দেয়। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, সত্যি

কথাটা কখনো কখনো জিনেরা নিয়ে আসে এবং তাদের বন্ধুদের কানে ফুঁকে দেয় তারপর তারা তার সাথে নানা রকম মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে একটি কাহিনী তৈরি করে।

১৪২. অর্থাৎ কবিদের সাথে যারা থাকে ও চলাফেরা করে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যাদেরকে চলাফেরা করতে তোমরা দেখছো তাদের থেকে স্বভাবে-চরিত্রে, চলনে-বলনে, অভ্যাসে-মেজাজে সম্পূর্ণ আলাদা। উভয় দলের ফারাকটা এতই সুস্পষ্ট যে, এক নজর দেখার পর যে কোন ব্যক্তি উভয় দলের কোন্‌টি কেমন তা চিহ্নিত করতে পারে। একদিকে আছে একান্ত ধীর-স্থির ও শান্ত শিষ্ঠ আচরণ, ভদ্র ও মার্জিত রুচি এবং সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও আল্লাহভীতি। প্রতিটি কথায় ও কাজে আছে দায়িত্বশীলতার অনুভূতি। আচার-ব্যবহারে মানুষের অধিকারের প্রতি সজাগ দৃষ্টি। লেনদেনে চূড়ান্ত পর্যায়ের আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা। কথা যখনই বলা হয় শুধুমাত্র কল্যাণ ও ন্যায়ের জন্যই বলা হয়, অকল্যাণ বা অন্যায়ের একটি শব্দও কখনো উচ্চারিত হয় না। সবচেয়ে বড় কথা, এদেরকে দেখে পরিষ্কার জানা যায়, এদের সামনে রয়েছে একটি উন্নত ও পবিত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ, এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ অর্জনের নেশায় এরা রাতদিন সংগ্রাম করে চলছে এবং এদের সমগ্র জীবন একটি উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত হয়েছে। অন্যদিকে অবস্থা হচ্ছে এই যে, সেখানে কোথাও প্রেম চর্চা ও শরাব পানের বিষয় আলোচিত হচ্ছে এবং শ্রোতৃবর্গ লাফিয়ে লাফিয়ে তাতে বাহবা দিচ্ছে। কোথাও কোন দেহপশারিণী অথবা কোন পুরনারী বা গৃহ-ললনার সৌন্দর্যের আলোচনা চলছে এবং শ্রোতারা খুব স্বাদ নিয়ে নিয়ে তা শুনছে "কোথাও অশ্লীল কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে এবং সমগ্র সমাবেশের ওপর যৌন কামনার প্রেত চড়াও হয়ে বসেছে। কোথাও মিথ্যা ও ভাঁড়ামির আসর বসেছে এবং সমগ্র মাহফিল ঠাট্টা-তামাশায় মশগুল হয়ে গেছে। কোথাও কারো দুর্নাম গাওয়া ও নিন্দাবাদ করা হচ্ছে এবং লোকেরা তাতে বেশ মজা পাচ্ছে। কোথাও কারো অযথা প্রশংসা করা হচ্ছে এবং শাবাশ ও বাহবা দিয়ে তাকে আরো উসকিয়ে দেয়া হচ্ছে। আবার কোথাও কারো বিরুদ্ধে শত্রুতা ও প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং তা শুনে মানুষের মনে আগুন লেগে যাচ্ছে। এসব মজলিসে কবির কবিতা শোনার জন্য যে বিপুল সংখ্যক লোক জমায়েত হয় এবং বড় বড় কবিদের পেছনে যেসব লোক ঘুরে বেড়ায় তাদেরকে দেখে কোন ব্যক্তি একথা অনুভব না করে থাকতে পারে না যে, এরা হচ্ছে নৈতিকতার বন্ধনমুক্ত, আবেগ ও কামনার স্রোতে ভেসে চলা এবং ভোগ ও পাপ-পংকিলতার পূজারী অর্ধ-পাশবিক একটি নরগোষ্ঠী দুনিয়ায় মানুষের যে কোন উন্নত জীবনাদর্শ ও লক্ষও থাকতে পারে—এ চিন্তা কখনো এদের মন-মগজ স্পর্শও করতে পারে না। এ দু'দলের সুস্পষ্ট পার্থক্য ও ফারাক যদি কারো নজরে না পড়ে তাহলে সে অন্ধ। আর যদি সবকিছু দেখার পরও কোন ব্যক্তি নিছক সত্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ঈমানকে বেমালুম হজম করে একথা বলতে থাকে যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর আশেপাশে যারা সমবেত হয়েছে তারা কবি ও কবিদের সাংগোপাংগদের মতো, তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে তারা মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে নির্লজ্জতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করে গেছে।

১৪৩. অর্থাৎ তাদের নিজস্ব চিন্তার ও বাকশক্তি ব্যবহার করার কোন একটি নির্ধারিত পথ নেই। বরং তাদের চিন্তার পাগলা ঘোড়া বল্‌গাহারা অশ্বের মতো পথে বিপথে মাঠে

ঘাটে সর্বত্র উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে বেড়ায়। আবেগ, কামনা-বাসনা বা স্বার্থের প্রতিটি নতুন ধারা তাদের কণ্ঠ থেকে একটি নতুন বিষয়ের রূপে আবির্ভূত হয়। চিন্তা ও বর্ণনা করার সময় এগুলো সত্য ও ন্যায়সংগত কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখার কোন প্রয়োজনই অনুভব করা হয় না। কখনো একটি তরংগ জাগে, তখন তার স্বপক্ষে জ্ঞান ও নীতিকথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে দেয়া হয়। আবার কখনো দ্বিতীয় তরংগ জাগে, সেই একই কণ্ঠ থেকে এবার একেবারেই পূতিগন্ধময় নীচ, হীন ও নিম্নমুখী আবেগ উৎসারিত হতে থাকে। কখনো কারোর প্রতি সন্তুষ্ট হলে তাকে আকাশে চড়িয়ে দেয়া হয় আবার কখনো নারাজ হলে সেই একই ব্যক্তিকেই পাতালের গভীর গর্ভে ঠেলে দেয়া হয়। কোন কুজুশকে হাতেম এবং কোন কাপুরুষকে বীর রুস্তম গণ্য করতে তাদের বিবেকে একটুও বাধে না যদি তার সাথে তাদের কোন স্বার্থ জড়িত থাকে। পক্ষান্তরে কেউ যদি তাদেরকে কোন দুঃখ দিয়ে থাকে তাহলে তার পবিত্র জীবনকে কলংকিত করার এবং তার ইজ্জত-আবরু ধূলায় মিশিয়ে দেবার বরং তার বংশধারার নিন্দা করার ব্যাপারে তারা একটুও লজ্জা অনুভব করে না। আল্লাহ বিশ্বাস ও নাস্তিক্যবাদ, বস্তুবাদিতা ও আধ্যাত্মিকতা, সদাচার ও অসদাচার, পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা ও অপবিত্রতা-অপরিচ্ছন্নতা, গাম্ভীর্য ও হাস্য-কৌতুক এবং প্রশংসা ও নিন্দাবাদ সবকিছু একই কবির একই কাব্যে পাশাপাশি দেখা যাবে। কবিদের এ পরিচিত বৈশিষ্ট যারা জানে তারা কেমন করে এ কুরআনের বাহককে কবিত্বের অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পারে? কারণ তাঁর ভাষণ মাপাজোকা, তাঁর বক্তব্য দ্ব্যর্থহীন, তাঁর পথ একেবারে সুস্পষ্ট ও নির্ধারিত এবং সত্য, সততা, ন্যায় ও কল্যাণের দিকে আহবান করা ছাড়া তাঁর কণ্ঠ থেকে অন্য কোন কথাই বের হয়নি।

কুরআন মজীদের অন্য এক জায়গায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, কবিত্বের সাথে তাঁর প্রকৃতি ও মেজাজের আদৌ কোন সম্পর্কই নেই ঃ

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ -

"আমি তাকে কবিতা শিখাইনি এবং এটা তার করার মতো কাজও নয়।"

(ইয়াসীন, ৬৯)

এটি এমন একটি সত্য ছিল, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন তাঁরা সবাই একথা জানতেন। নির্ভরযোগ্য হাদীসে বলা হয়েছে ঃ কোন একটি কবিতাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুরোপুরি মুখস্ত ছিল না। কথাবার্তার মাঝখানে কোন কবির ভালো কবিতার চরণ তাঁর মুখে এলেও তা অনুপযোগীভাবে পড়ে যেতেন অথবা তার মধ্যে শব্দের হেরফের হয়ে যেতো। হযরত হাসান বাসরী বলেন, একবার ভাষণের মাঝখানে তিনি এক কবির কবিতার চরণ এভাবে পড়লেন ঃ

كفى بالاسلام والشيب للمرء ناهيا -

হযরত আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! চরণটি হবে এ রকম,

كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا -

একবার তিনি আব্বাস ইবনে মিরদাস সুলামীকে জিজ্ঞেস করলেন, এ কবিতাটা কি তোমার ঃ

اَتَجْعَلُ نَهْبِى وَنَهْبَ الْعَبِيْدِ وَبَيْنَ الْاَقْرَعِ وَعُيَيْنَهِ –

আব্বাস বললেন, শেষ বাক্যাংশটি ওভাবে নয় বরং এভাবে হবে ঃ بين عيينة والاقرع একথায় রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কিন্তু অর্থ তো উভয়ের এক।

হযরত আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞেস করা হয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি কখনো নিজের ভাষণের মধ্যে কবিতা ব্যবহার করতেন? তিনি বলেন, কবিতার চেয়ে বেশী তিনি কোন জিনিসকে ঘৃণা করতেন না। তবে কখনো কখনো তিনি বনী কায়েসের কবিতা পড়তেন। কিন্তু প্রথমটা শেষে এবং শেষেরটা প্রথম দিকে পড়ে ফেলতেন। হযরত আবু বকর (রা) বলতেন, হে আল্লাহর রসূল! এভাবে নয় বরং এভাবে। তখন তিনি বলতেন, "আমি কবি নই এবং কবিতা পাঠ করা আমার কাজ নয়।" আরবের কবিতা অংগনে যে ধরনের বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটেছিল তা ছিল যৌন আবেদন ও অবৈধ প্রেমচর্চা অথবা শরাব পান কিংবা গোত্রীয় ঘৃণা, বিদ্বেষ ও যুদ্ধবিগ্রহ বা বংশীয় ও বর্ণগত অহংকার। কল্যাণ ও সুকৃতির কথার স্থান সেখানে অতি অল্পই ছিল। এ ছাড়া মিথ্যা, অতিরঞ্জন, অপবাদ, নিন্দাবাদ, অযথা প্রশংসা, আত্মগর্ব, তিরস্কার, দোষারোপ, পরিহাস ও মুশরিকী অশ্লীল পৌরানিকতা তো এ কাব্যধারার শিরায় শিরায় প্রবাহিত ছিল। তাই এ কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রায় ছিল ঃ

لَاَنْ يَّمْتَلِئَ جَوْفُ اَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَّمْتَلِئَ شِعْرًا

"তোমাদের কারো পেট পুঁজে ভরা থাকা কবিতায় ভরা থাকার চেয়ে ভালো। তবুও যে কবিতায় কোন ভালো কথা থাকতো তিনি তার প্রশংসা করতেন। তাঁর উক্তি ছিল ঃ امن شعره وكفر قلبه "তার কবিতা মু'মিন কিন্তু অন্তর কাফের।" একবার একজন সাহাবী একশোটা ভালো ভালো কবিতা তাঁকে শুনান এবং তিনি বলে যেতে থাকলে বলেন ঃ هيه অর্থাৎ "আরো শুনাও।"

১৪৪. এটি হচ্ছে কবিদের আরেকটি বৈশিষ্ট। এটি ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামের কর্মধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। নবী (সা) সম্পর্কে তাঁর প্রত্যেক পরিচিত জন জানতেন, তিনি যা বলতেন তাই করতেন এবং যা করতেন তাই বলতেন। তাঁর কথা ও কর্মের সামঞ্জস্য এমনই একটি জাজ্বল্যমান সত্য ছিল যা তাঁর আশেপাশের সমাজের কেউ অস্বীকার করতে পারতো না। অথচ সাধারণ কবিদের সম্পর্কে সবাই জানতো যে, তারা বলতেন এক কথা এবং করতেন অন্য কিছু। তাদের কবিতায় দানশীলতার মাহাত্ম এমন উচ্চ কণ্ঠে প্রচারিত হবে যেন মনে হবে তাদের চেয়ে বড় আর কোন দাতা নেই। কিন্তু তাদের কাজ দেখলে বুঝা যাবে তারা বড়ই কৃপণ। বীরত্বের কথা তারা বলবেন কিন্তু নিজেরা হবেন কাপুরুষ। অমুখাপেক্ষিতা, অল্পে তুষ্টি ও আত্মমর্যাদাবোধ হবে তাদের কবিতার বিষয়বস্তু কিন্তু নিজেরা লোভ, লালসা ও আত্ম বিক্রয়ের শেষ সীমানাও পার হয়ে যাবেন। অন্যের সামান্যতম দুর্বলতাকেও কঠোরভাবে পাকড়াও করবেন কিন্তু নিজেরা চরম দুর্বলতার মধ্যে হাবুডুবু খাবেন।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

তারা ছাড়া যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে আর তাদের প্রতি জুলুম করা হলে শুধুমাত্র প্রতিশোধ নেয়।[১৪৫]— আর জুলুমকারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের পরিণাম কি।[১৪৬]

১৪৫. ওপরে সাধারণভাবে কবিদের প্রতি যে নিন্দাবাদ উচ্চারিত হয়েছে তা থেকে এমন সব কবিদেরকে এখানে আলাদা করা হয়েছে যাদের মধ্যে রয়েছে চারটি বৈশিষ্ট।

এক ঃ যারা মু'মিন অর্থাৎ আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাবগুলো যারা মানেন এবং আখেরাত বিশ্বাস করেন।

দুই ঃ নিজেদের কর্মজীবনে যারা সৎ, যারা ফাসেক, দুষ্কৃতকারী ও বদকার নন। নৈতিকতার বাঁধন মুক্ত হয়ে যারা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় না দেন।

তিন ঃ আল্লাহকে যারা বেশী বেশী করে স্মরণ করেন নিজেদের সাধারণ অবস্থায়, সাধারণ সময়ে এবং নিজেদের রচনায়ও। তাদের ব্যক্তি জীবনে আল্লাহভীতি ও আল্লাহর আনুগত্য রয়েছে কিন্তু তাদের কবিতা পাপ-পংকিলতা, লালসা ও কামনা রসে পরিপূর্ণ, এমন যেন না হয়। আবার এমনও যেন না হয়, কবিতায় বড়ই প্রজ্ঞা ও গভীর তত্ত্বকথা আওড়ানো হচ্ছে কিন্তু ব্যক্তি জীবনে আল্লাহর স্মরণের কোন চিহ্নই নেই। আসলে এ দু'টি অবস্থা সমানভাবে নিন্দনীয়। তিনিই একজন পছন্দনীয় কবি যার ব্যক্তিজীবন যেমন আল্লাহর স্মরণে পরিপূর্ণ তেমনি নিজের সমগ্র কাব্য প্রতিভাও এমন পথে উৎসর্গীকৃত যা আল্লাহ থেকে গাফিল লোকদের নয় বরং যারা আল্লাহকে জানে, আল্লাহকে ভালোবাসে ও আল্লাহর আনুগত্য করে তাদের পথ।

চতুর্থ বৈশিষ্টটি বর্ণনা করা হয়েছে এমন সব ব্যতিক্রমধর্মী কবিদের যারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে কারোর নিন্দা করে না এবং ব্যক্তিগত, বংশীয় বা গোত্রীয় বিদ্বেষে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধের আগুন জ্বালায় না। কিন্তু যখন জালেমের মোকাবিলায় সত্যের প্রতি সমর্থন দানের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন তার কণ্ঠকে সেই একই কাজে ব্যবহার করে যে কাজে একজন মুজাহিদ তার তীর ও তরবারিকে ব্যবহার করে। সবসময় আবেদন নিবেদন করতেই থাকা এবং বিনীতভাবে আর্জি পেশ করেই যাওয়া মু'মিনের রীতি নয়। এ সম্পর্কেই হাদীসে বলা হয়েছে, কাফের ও মুশরিক কবিরা ইসলাম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অভিযোগ, দোষারোপ ও অপবাদের যে তাণ্ডব সৃষ্টি করতো এবং ঘৃণা ও বিদ্বেষের যে বিষ ছড়াতো তার জবাব দেবার জন্য নবী (সা) নিজে ইসলামী কবিদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন ও সাহস যোগাতেন। তাই তিনি কা'ব ইবনে মালেককে (রা) বলেন ঃ

اَهْجُهُمْ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَهُوَ اَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبْلِ -

"ওদের নিন্দা করো, কারণ সেই আল্লাহর কসম, যার হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ আবদ্ধ, তোমার কবিতা ওদের জন্য তীরের চেয়েও বেশী তীক্ষ্ণ ও ধারালো।"

হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন ঃ

اهجهم وجبريل معك وقل وروح القدس معك এবং

"তাদের মিথ্যাচারের জবাব দাও এবং জিব্রীল তোমার সঙ্গে আছে।" এবং "বলো এবং পবিত্র আত্মা তোমার সংগে আছে।"

তাঁর উক্তি ছিল ঃ

ان المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه –

"মু'মিন তলোয়ার দিয়েও লড়াই করে এবং কণ্ঠ দিয়েও।"

১৪৬. জুলুমকারী বলতে এখানে এমনসব লোকদের কথা বুঝানো হয়েছে যারা সত্যকে খাটো ও হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সম্পূর্ণ হঠকারিতার পথ অবলম্বন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর কবি, গণক, যাদুকর ও পাগল হবার অপবাদ দিয়ে বেড়াতো। এ ধরনের অপবাদ দেবার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, যারা তাঁর সম্পর্কে জানে না তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে তাদের মনে কু-ধারণা সৃষ্টি করা এবং তাঁর শিক্ষার প্রতি যাতে তারা আকৃষ্ট না হয় সে ব্যবস্থা করা।

আন নাম্‌ল

২৭

নামকরণ

দ্বিতীয় রুকূ'র চতুর্থ আয়াতে وادِ النمل –এর কথা বলা হয়েছে। সূরার নাম এখান থেকেই গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এমন সূরা যাতে নাম্‌ল এর কথা বলা হয়েছে। অথবা যার মধ্যে নাম্‌ল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগীর দিক দিয়ে এ সূরা মক্কার মধ্যযুগের সূরাগুলোর সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য রাখে। হাদীস থেকেও এর সমর্থন মেলে। ইবনে আব্বাস (রা) ও জাবের ইবনে যায়েদের (রা) বর্ণনা হচ্ছে, "প্রথমে নাযিল হয় সূরা আশ্‌ শু'আরা তারপর আন নাম্‌ল এবং তারপর আল কাসাস।"

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

এ সূরায় দু'টি ভাষণ সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম ভাষণটি শুরু হয়েছে সূরার সূচনা থেকে চতুর্থ রুকূ'র শেষ পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় ভাষণটি পঞ্চম রুকূ'র শুরু থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রথম ভাষণটিতে বলা হয়েছে, কুরআনের প্রথম নির্দেশনা থেকে একমাত্র তারাই লাভবান হতে পারে এবং তার সুসংবাদসমূহ লাভের যোগ্যতা একমাত্র তারাই অর্জন করতে পারে যারা এ কিতাব যে সত্যসমূহ উপস্থাপন করে সেগুলোকে এ বিশ্ব-জাহানের মৌলিক সত্য হিসেবে স্বীকার করে নেয়। তারপর এগুলো মেনে নিয়ে নিজেদের বাস্তব জীবনেও আনুগত্য ও অনুসরণের নীতি অবলম্বন করে। কিন্তু এ পথে আসার ও চলার ক্ষেত্রে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশী প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে সেটি হচ্ছে আখেরাত অস্বীকৃতি। কারণ এটি মানুষকে দায়িত্বহীন, প্রবৃত্তির দাস ও দুনিয়াবী জীবনের প্রেমে পাগল করে তোলে। এরপর মানুষের পক্ষে আল্লাহর সামনে নত হওয়া এবং নিজের প্রবৃত্তির কামনার ওপর নৈতিকতার বাঁধন মেনে নেয়া আর সম্ভব থাকে না। এ ভূমিকার পর তিন ধরনের চারিত্রিক আদর্শ পেশ করা হয়েছে।

একটি আদর্শ ফেরাউন, সামূদ জাতির সরদারবৃন্দ ও লূতের জাতির বিদ্রোহীদের। তাদের চরিত্র গঠিত হয়েছিল পরকাল চিন্তা থেকে বেপরোয়া মনোভাব এবং এর ফলে সৃষ্ট প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে। তারা কোন নিদর্শন দেখার পরও ঈমান আনতে প্রস্তুত হয়নি।

পক্ষান্তরে যারা তাদেরকে কল্যাণ ও সুকৃতির প্রতি আহবান জানিয়েছে তাদেরই তারা শত্রু হয়ে গেছে। যেসব অসৎকাজের জঘন্যতা ও কদর্যতা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে প্রচ্ছন্ন নয় সেগুলোকেও তারা আকড়ে ধরেছে। আল্লাহর আযাবে পাকড়াও হবার এক মুহূর্ত আগেও তাদের চেতনা হয়নি।

দ্বিতীয় আদর্শটি হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের। আল্লাহ তাঁকে অর্থ–সম্পদ, রাষ্ট্র–ক্ষমতা, পরাক্রম, মর্যাদা ও গৌরব এত বেশী দান করেছিলেন যে মক্কার কাফেররা তার কল্পনাও করতে পারতো না। কিন্তু এতসব সত্বেও যেহেতু তিনি আল্লাহর সামনে নিজকে জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করতেন এবং তাঁর মধ্যে এ অনুভূতিও ছিল যে, তিনি যা কিছুই লাভ করেছেন সবই আল্লাহর দান তাই তাঁর মাথা সবসময় প্রকৃত নিয়ামত দানকারীর সামনে নত হয়ে থাকতো এবং আত্ম অহমিকার সামান্যতম গন্ধও তাঁর চরিত্র ও কার্যকলাপে পাওয়া যেতো না।

তৃতীয় আদর্শ সাবার রানীর। তিনি ছিলেন আরবের ইতিহাসের বিপুল খ্যাতিমান ধনাঢ্য জাতির শাসক। একজন মানুষকে অহংকার মদমত্ত করার জন্য যেসব উপকরণের প্রয়োজন তা সবই তাঁর ছিল। যেসব জিনিসের জোরে একজন মানুষ আত্মম্ভরী হতে পারে তা কুরাইশ সরদারদের তুলনায় হাজার লক্ষগুণ বেশী তাঁর আয়ত্বাধীন ছিল। তাছাড়া তিনি ছিলেন একটি মুশরিক জাতির অন্তরভুক্ত। পিতৃপুরুষের অনুসরণের জন্যও এবং নিজের জাতির মধ্যে নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখার উদ্দেশ্যেও তাঁর পক্ষে শিরক ত্যাগ করে তাওহীদের পথ অবলম্বন করা সাধারণ একজন মুশরিকের জন্য যতটা কঠিন হতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন ছিল। কিন্তু যখনই তাঁর সামনে সত্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে তখনই তিনি সত্যকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। এ পথে কেউ বাধা দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। কারণ তাঁর মধ্যে যে ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তি ছিল নিছক একটি মুশরিকী পরিবেশে চোখ মেলার ফলেই তা সৃষ্টি হয়েছিল। প্রবৃত্তির উপাসনা ও কামনার দাসত্ব করার রোগ তাঁকে পেয়ে বসেনি। তাঁর বিবেক আল্লাহর সামনে জবাবদিহির অনুভূতি শূন্য ছিল না।

দ্বিতীয় ভাষণে প্রথমে বিশ্ব–জাহানের কয়েকটি সুস্পষ্ট ও অকাট্য সত্যের প্রতি ইংগিত করে মক্কার কাফেরদেরকে একের পর এক প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ বলো, যে শিরকে তোমরা লিপ্ত হয়েছো এ সত্যগুলো কি তার সাক্ষ দেয় অথবা এ কুরআনে যে তাওহীদের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তার সাক্ষ দেয়? এরপর কাফেরদের আসল রোগের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে জিনিসটি তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছে, যে কারণে তারা সবকিছু দেখেও কিছুই দেখে না এবং সবকিছু শুনেও কিছুই শোনে না সেটি হচ্ছে আসলে আখেরাত অস্বীকৃতি। এ জিনিসটিই তাদের জন্য জীবনের কোন বিষয়েই কোন গভীরতা ও গুরুত্বের অবকাশ রাখেনি। কারণ তাদের মতে শেষ পর্যন্ত সবকিছুই যখন ধ্বংস হয়ে মাটিতে মিশে যাবে এবং দুনিয়ার জীবনের এসব সংগ্রাম-সাধনার কোন ফলাফল প্রকাশ পাবে না তখন মানুষের জন্য সত্য ও মিথ্যা সব সমান। তার জীবন ব্যবস্থা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত না অসত্যের ওপর, এ প্রশ্নের মধ্যে তার জন্য আদতে কোন গুরুত্বই থাকে না।

কিন্তু আসলে এ আলোচনার উদ্দেশ্য হতাশা নয়। অর্থাৎ তারা যখন গাফিলতির মধ্যে ডুবে আছে তখন তাদেরকে দাওয়াত দেয়া নিষ্ফল, এরূপ মনোভাব সৃষ্টি এ আলোচনার

উদ্দেশ্য নয়। বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আসলে নিদ্রিতদেরকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগানো। তাই ষষ্ঠ ও সপ্তম রুকূ'তে একের পর এক এমন সব কথা বলা হয়েছে যা লোকদের মধ্যে আখেরাতের চেতনা জাগ্রত করে, তার প্রতি অবহেলা ও গাফিলতি দেখানোর ফলাফল সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে এবং তার আগমনের ব্যাপারে তাদেরকে এমনভাবে নিশ্চিত করে যেমন এক ব্যক্তি নিজের চোখে দেখা ঘটনা সম্পর্কে যে তা চোখে দেখেনি তাকে নিশ্চিত করে।

বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে কুরআনের আসল দাওয়াত অর্থাৎ এক আল্লাহর বন্দেগীর দাওয়াত অতি সংক্ষেপে কিন্তু অত্যন্ত প্রভাবশালী ভংগীতে পেশ করে লোকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ দাওয়াত গ্রহণ করলে তোমাদের নিজেদের লাভ এবং একে প্রত্যাখ্যান করলে তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে। একে মেনে নেবার জন্য যদি আল্লাহর এমন সব নিদর্শনের অপেক্ষা করতে থাকো যেগুলো এসে যাবার পর আর না মেনে কোন গত্যন্তর থাকবে না, তাহলে মনে রেখো সেটি চূড়ান্ত মীমাংসার সময়। সে সময় মেনে নিলে কোন লাভই হবে না।

আয়াত ৯৩ **সূরা আন নাম্‌ল–মক্কী** রুকূ' ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۝١ هُدًى وَّبُشْرٰى
لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٢ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ
بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٣ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ
اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ۝٤

ত্বা–সীন। এগুলো কুরআনের ও এক সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত[১], পথনির্দেশ ও সুসংবাদ[২] এমন মুমিনদের জন্য যারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়[৩] এবং তারা এমন লোক যারা আখেরাতে পুরোপুরি বিশ্বাস করে[৪] আসলে যারা আখেরাত বিশ্বাস করে না তাদের জন্য আমি তাদের কৃতকর্মকে সুদৃশ্য করে দিয়েছি, ফলে তারা দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়।[৫]

১. "সুস্পষ্ট কিতাবের" একটি অর্থ হচ্ছে. এ কিতাবটি নিজের শিক্ষা, বিধান ও নির্দেশগুলোর একেবারে দ্ব্যর্থহীন পদ্ধতিতে বর্ণনা করে দেয়। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এটি সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট পদ্ধতিতে তুলে ধরে। আর এর তৃতীয় একটি অর্থ এই হয় যে, এটি যে আল্লাহর কিতাব সে ব্যাপারটি সুস্পষ্ট। যে ব্যক্তি চোখ খুলে এ বইটি পড়বে, এটি যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের তৈরী করা কথা নয় তা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

২. অর্থাৎ এ আয়াতগুলো হচ্ছে পথনির্দেশ ও সুসংবাদ। "পথনির্দেশকারী" ও "সুসংবাদদানকারী" বলার পরিবর্তে এগুলোকেই বলা হয়েছে "পথনির্দেশ" ও "সুসংবাদ" এর মাধ্যমে পথনির্দেশনা ও সুসংবাদ দানের গুণের ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণতার প্রকাশই কাম্য। যেমন কাউকে দাতা বলার পরিবর্তে 'দানশীলতার প্রতিমূর্তি' এবং সুন্দর বলার পরিবর্তে 'আপাদমস্তক সৌন্দর্য' বলা।

৩. অর্থাৎ কুরআন মজীদের এ আয়াতগুলো কেবলমাত্র এমনসব লোকদেরই পথ–নির্দেশনা দেয় এবং শুভ পরিণামের সুসংবাদও একমাত্র এমনসব লোকদের দান করে যাদের মধ্যে দু'টি বৈশিষ্ট ও গুণাবলী পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে, তারা ঈমান আনে। ঈমান

আনার অর্থ হচ্ছে তারা কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত গ্রহণ করে। এক আল্লাহকে নিজেদের একমাত্র উপাস্য ও রব বলে মেনে নেয়। কুরআনকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে স্বীকার করে নেয়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য নবী বলে মেনে নিয়ে নিজেদের নেতা রূপে গ্রহণ করে। এ সংগে এ বিশ্বাসও পোষণ করে যে, এ জীবনের পর দ্বিতীয় আর একটি জীবন আছে, সেখানে আমাদের নিজেদের কাজের হিসেব দিতে এবং প্রত্যেকটি কাজের প্রতিদান লাভ করতে হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তারা এ বিষয়গুলো কেবলমাত্র মেনে নিয়েই বসে থাকে না বরং কার্যত এগুলোর অনুসরণ ও আনুগত্য করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এ উদ্বুদ্ধ হবার প্রথম আলামত হচ্ছে এই যে, তারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়। এ দু'টি শর্ত যারা পূর্ণ করবে কুরআন মজীদের আয়াত তাদেরকেই দুনিয়ায় সত্য সরল পথের সন্ধান দেবে। এ পথের প্রতিটি পর্যায়ে তাদেরকে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ এবং ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য বুঝিয়ে দেবে। তার প্রত্যেকটি চৌমাথায় তাদেরকে ভুল পথের দিকে অগ্রসর হবার হাত থেকে রক্ষা করবে। তাদেরকে এ নিশ্চয়তা দান করবে যে, সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন করার ফল দুনিয়ায় যাই হোক না কেন শেষ পর্যন্ত তারই বদৌলতে চিরন্তন সফলতা তারাই অর্জন করবে এবং তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সৌভাগ্য লাভে সক্ষম হবে। এটা ঠিক তেমনি একটি ব্যাপার যেমন একজন শিক্ষকের শিক্ষা থেকে কেবলমাত্র এমন এক ব্যক্তি লাভবান হতে পারে যে তার প্রতি আস্থা স্থাপন করে যথার্থই তার ছাত্রত্ব গ্রহণ করে নেয় এবং তার নির্দেশ অনুযায়ী কাজও করতে থাকে। একজন ডাক্তার থেকে উপকৃত হতে পারে একমাত্র এমনই একজন রোগী যে তাকে নিজের চিকিৎসক হিসেবে গ্রহণ করে এবং ঔষধপত্র ও পথ্যাদির ব্যাপারে তার ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী কাজ করে। একমাত্র এ অবস্থায়ই একজন শিক্ষক ও ডাক্তার মানুষকে তার কাংখিত ফলাফল লাভ করার নিশ্চয়তা দান করতে পারে।

কেউ কেউ এ আয়াতে يُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ বাক্যাংশের অর্থ গ্রহণ করেছেন, যারা চারিত্রিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা লাভ করবে। কিন্তু কুরআন মজীদে নামায কায়েম করার সাথে যাকাত আদায় করার শব্দ যেখানেই ব্যবহার করা হয়েছে সেখানেই এর অর্থ হয়েছে যাকাত দান করা। নামাযের সাথে এটি ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ। এ ছাড়াও যাকাতের জন্য ايتاء শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি সম্পদের যাকাত দান করার সুনির্দিষ্ট অর্থ ব্যক্ত করে। কারণ আরবী ভাষায় পবিত্রতা অর্জন করার ক্ষেত্রে تزكى শব্দ বলা হয়ে থাকে, ايتاء زكوة বলা হয় না। আসলে এখানে যে কথাটি মনে বদ্ধমূল করে দেয়া উদ্দেশ্য সেটি হচ্ছে এই যে, কুরআনের পথনির্দেশনা থেকে লাভবান হবার জন্য ঈমানের সাথে কার্যত আনুগত্য ও অনুসরণের নীতি অবলম্বন করাও জরুরী। আর মানুষ যথার্থই আনুগত্যের নীতি অবলম্বন করেছে কিনা নামায কায়েম ও যাকাত দান করাই হচ্ছে তা প্রকাশ করার প্রথম আলামত। এ আলামত যেখানেই অদৃশ্য হয়ে যায় সেখানেই বুঝা যায় যে, মানুষ বিদ্রোহী হয়ে গেছে, শাসককে সে শাসক বলে মেনে নিলেও তার হুকুম মেনে চলতে রাজী নয়।

৪. যদিও আখেরাত বিশ্বাস ঈমানের অংগ এবং এ কারণে মু'মিন বলতে এমনসব লোক বুঝায় যারা তাওহীদ ও রিসালাতের সাথে সাথে আখেরাতের প্রতিও ঈমান আনে

কিন্তু এটি আপনা আপনি ঈমানের অন্তরভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এ বিশ্বাসটির গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য বিশেষ জোর দিয়ে একে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, যারা পরকাল বিশ্বাস করে না তাদের জন্য এ কুরআন উপস্থাপিত পথে চলা বরং এর ওপর পা রাখাও সম্ভব নয়। কারণ এ ধরনের চিন্তাধারা যারা পোষণ করে তারা স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের ভালমন্দের মানদণ্ড কেবলমাত্র এমন সব ফলাফলের মাধ্যমে নির্ধারিত করে থাকে যা এ দুনিয়ায় প্রকাশিত হয় বা হতে পারে। তাদের জন্য এমন কোন পথনির্দেশনা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না যা পরকালের পরিণাম ফলকে লাভ–ক্ষতির মানদণ্ড গণ্য করে ভালো ও মন্দ নির্ধারণ করে। এ ধরনের লোকেরা প্রথমত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের শিক্ষায় কর্ণপাত করে না। কিন্তু যদি কোন কারণে তারা মুমিন দলের মধ্যে শামিল হয়েও যায় তাহলে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস না থাকার ফলে তাদের জন্য ঈমান ও ইসলামের পথে এক পা চলাও কঠিন হয়। এ পথে প্রথম পরীক্ষাটিই যখন অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ইহকালীন লাভ ও পরকালীন ক্ষতির দাবী তাদেরকে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন দিকে টানতে থাকবে তখন মুখে যতই ঈমানের দাবী করতে থাকুক না কেন নিসংকোচে তারা ইহকালীন লাভের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং পরকালীন ক্ষতির সামান্যতমও পরোয়া করবে না।

৫. অর্থাৎ এটি আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়ম আর মানবিক মনস্তত্বের স্বাভাবিক যুক্তিবাদিতাও একথাই বলে যে, যখন মানুষ জীবন এবং তার কর্ম ও প্রচেষ্টার ফলাফলকে কেবলমাত্র এ দুনিয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ মনে করবে, যখন সে এমন কোন আদালত স্বীকার করবে না যেখানে মানুষের সারা জীবনের সমস্ত কাজ যাচাই–পর্যালোচনা করে তার দোষ–গুণের শেষ ও চূড়ান্ত ফায়সালা করা হবে, এবং যখন সে মৃত্যুর পরে এমন কোন জীবনের কথা স্বীকার করবে না যেখানে দুনিয়ার জীবনের কর্মকাণ্ডের প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা অনুযায়ী যথাযথ পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে তখন অনিবার্যভাবে তার মধ্যে একটি বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগী বিকাশ লাভ করবে। তার কাছে সত্য ও মিথ্যা, শিরক ও তাওহীদ, পাপ ও পুণ্য এবং সচ্চরিত্র ও অসচ্চরিত্রের যাবতীয় আলোচনা একেবারেই অর্থহীন মনে হবে। এ দুনিয়ায় যা কিছু তাকে ভোগ, আয়েশ–আরাম, বস্তুগত উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং শক্তি ও কর্তৃত্ব দান করবে, তা কোন জীবন দর্শন, জীবন পদ্ধতি ও নৈতিক ব্যবস্থা হোক না কেন, তার কাছে তাই হবে কল্যাণকর। প্রকৃত তত্ব ও সত্যের ব্যাপারে তার কোন মাথাব্যথা থাকবে না। তার মৌল আকাংখা হবে কেবলমাত্র দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য ও সাফল্য। এগুলো অর্জন করার চিন্তা তাকে সকল পথে বিপথে টেনে নিয়ে যাবে। এ উদ্দেশ্যে সে যা কিছুই করবে তাকে নিজের দৃষ্টিতে মনে করবে বড়ই কল্যাণকর এবং যারা এ ধরনের বৈষয়িক স্বার্থোদ্ধারে ডুব দেয়নি এবং চারিত্রিক সততা ও অসততা থেকে বেপরোয়া হয়ে স্বেচ্ছাচারীর মত কাজ করে যেতে পারেনি তাদেরকে সে নির্বোধ মনে করবে।

কারো অসৎকার্যাবলীকে তার জন্য শোভন বানিয়ে দেবার এ কাজকে কুরআন মজীদে কখনো আল্লাহর কাজ আবার কখনো শয়তানের কাজ বলা হয়েছে। যখন বলা হয় যে, অসৎকাজগুলোকে আল্লাহ শোভন করে দেন তখন তার অর্থ হয়, যে ব্যক্তি এ দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করে তার কাছে স্বভাবতই জীবনের এ সমতল পথই সুদৃশ্য অনুভূত হতে থাকে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿٥﴾
وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي
آنَسْتُ نَارًا ۖ سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ
تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ
حَوْلَهَا ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾

এদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট শাস্তি[৬] এবং আখেরাতে এরাই হবে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত। আর (হে মুহাম্মাদ) নিসন্দেহে তুমি এ কুরআন লাভ করছো এক প্রাজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ থেকে।[৭]

(তাদেরকে সেই সময়ের কথা শুনাও) যখন মূসা তার পরিবারবর্গকে বললো[৮] "আমি আগুনের মতো একটা বস্তু দেখেছি। এখনি আমি সেখান থেকে কোন খবর আনবো অথবা খুঁজে আনবো কোন অংগার, যাতে তোমরা উষ্ণতা লাভ করতে পারো।"[৯] সেখানে পৌঁছুবার পর আওয়াজ এলো[১০] "ধন্য সেই সত্তা যে এ আগুনের মধ্যে এবং এর চারপাশে রয়েছে, পাক–পবিত্র আল্লাহ সকল বিশ্ববাসীর প্রতিপালক।[১১]

আর যখন বলা হয় যে, শয়তান ওগুলোকে সুদৃশ্য করে দেয়। তখন এর অর্থ হয়, এ চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি অবলম্বনকারী ব্যক্তির সামনে শয়তান সবসময় একটি কাল্পনিক জান্নাত পেশ করতে থাকে এবং তাকে এই বলে ভালোভাবে আশ্বাস দিতে থাকে, শাবাশ। বেটা খুব চমৎকার কাজ করছ।

৬. এ নিকৃষ্ট শাস্তিটি কিভাবে, কখন ও কোথায় হবে। তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। কারণ এ দুনিয়া ও বিভিন্ন ব্যক্তি, দল ও জাতি নানাভাবে এ শাস্তি লাভ করে থাকে। এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার সময় একেবারে মৃত্যুর দ্বারদেশেও জালেমরা এর একটি অংশ লাভ করে। মৃত্যুর পরে "আলমে বরযখে"ও (মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পূর্ববর্তী সময়) মানুষ এর মুখোমুখি হয়। আর তারপর হাশরের ময়দানে এর একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে এবং তারপর এক জায়গায় গিয়ে তা আর কোনদিন শেষ হবে না।

৭. অর্থাৎ এ কুরআনে যেসব কথা বলা হচ্ছে এগুলো কোন উড়ো কথা নয়। এগুলো কোন মানুষের আন্দাজ অনুমান ও মতামত ভিত্তিকও নয়। বরং এক জ্ঞানবান প্রাজ্ঞ সত্তা এগুলো নাযিল করছেন। তিনি নিজের সৃষ্টির প্রয়োজন ও কল্যাণ এবং তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে পুরোপুরি জানেন। বান্দাদের সংশোধন ও পথনির্দেশনার জন্য তাঁর জ্ঞান সর্বোত্তম কৌশল ও ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

৮. এটা তখনকার ঘটনা যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম মাদ্‌য়ানে আট দশ বছর অবস্থান করার পর নিজের পরিবারপরিজন নিয়ে কোন বাসস্থানের সন্ধানে বের হয়েছিলেন। মাদ্‌য়ান এলাকাটি অবস্থিত ছিল আকাবা উপসাগরের তীরে আরব ও সিনাই উপদ্বীপের উপকূলে (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আশ্‌ শু'আরা, ১১৫ টীকা)। সেখান থেকে যাত্রা করে হযরত মূসা সিনাই উপদ্বীপের দক্ষিণ অংশে পৌছেন। এ অংশের যে স্থানটিতে তিনি পৌছেন বর্তমানে তাকে সিনাই পাহাড় ও মূসা পর্বত বলা হয়। কুরআন নাযিলের সময় এটি তূর নামে পরিচিত ছিল। এখানে যে ঘটনাটির কথা বলা হয়েছে সেটি এরি পাদদেশে সংঘটিত হয়েছিল।

এখানে যে ঘটনাটি বর্ণনা করা হচ্ছে তার বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে সূরা "ত্বা–হা"–এর প্রথম রুকূতে উল্লেখিত হয়েছে এবং সামনের দিকে সূরা কাসাসেও (চতুর্থ রুকূ') আসছে।

৯. আলোচনার প্রেক্ষাপট থেকে মনে হয় যে, এটা ছিল শীতকালের একটি রাত। হযরত মূসা একটি অপরিচিত এলাকা অতিক্রম করছিলেন। এ এলাকার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ জানাশোনা ছিল না। তাই তিনি নিজের পরিবারের লোকদের বললেন, আমি সামনের দিকে গিয়ে একটু জেনে আসি আগুন জ্বলছে কোন্ জনপদে, সামনের দিকে পথ কোথায় কোথায় গিয়েছে এবং কাছাকাছি কোন্ কোন্ জনপদ আছে। তবুও যদি দেখা যায়, ওরাও আমাদেরই মতো চলমান মুসাফির, যাদের কাছ থেকে কোন তথ্য সংগ্রহ করা যাবে না, তাহলেও অন্ততপক্ষে ওদের কাছ থেকে কিছু অংগার তো আনা যাবে। এ থেকে আগুন জ্বালিয়ে তোমরা উত্তাপ লাভ করতে পারবে।

হযরত মূসা (আ) যেখানে কুঞ্জবনের মধ্যে আগুন লেগেছে বলে দেখেছিলেন সে স্থানটি তূর পাহাড়ের পাদদেশে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট ওপরে অবস্থিত। রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম খৃষ্টান বাদশাহ কনষ্টানটাইন ৩৬৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ঠিক যে জায়গায় এ ঘটনাটি ঘটেছিল সেখানে একটি গীর্জা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এর দু'শো বছর পরে সম্রাট জাষ্টিনিয়ান এখানে একটি আশ্রম (Monastery) নির্মাণ করেন। কনষ্টান্টাইনের গীর্জাকেও এর অন্তরভুক্ত করা হয়। এ আশ্রম ও গীর্জা আজো অক্ষুন্ন রয়েছে। এটি গ্রীক খৃষ্টীয় গীর্জার (Greek Orthodox Church) পাদ্‌রী সমাজের দখলে রয়েছে। আমি ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসে এ জায়গাটি দেখি। পাশের পাতায় এ জায়গার কিছু ছবি দেয়া হলো।

১০. সূরা কাসাসে বলা হয়েছে, আওয়াজ আসছিল একটি বৃক্ষ থেকে ঃ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ এ থেকে ঘটনাটির যে দৃশ্য সামনে ভেসে ওঠে তা হচ্ছে এই যে, উপত্যাকার এক কিনারে আগুনের মতো লেগে গিয়েছিল কিন্তু কিছু জ্বলছিল না এবং ধোঁয়াও উড়ছিল না। আর এ আগুনের মধ্যে একটি সবুজ শ্যামল গাছ দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকে সহসা এ আওয়াজ আসতে থাকে।

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সাথে এ ধরনের অদ্ভুত ব্যাপার ঘটা চিরাচরিত ব্যাপার। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রথম বার নবুওয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন তখন হেরা গিরিগুহায় একান্ত নির্জনে সহসা একজন ফেরেশতা আসেন। তিনি তাঁর কাছে



তূর পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত সেন্ট ক্যাথারাইন গীর্জা

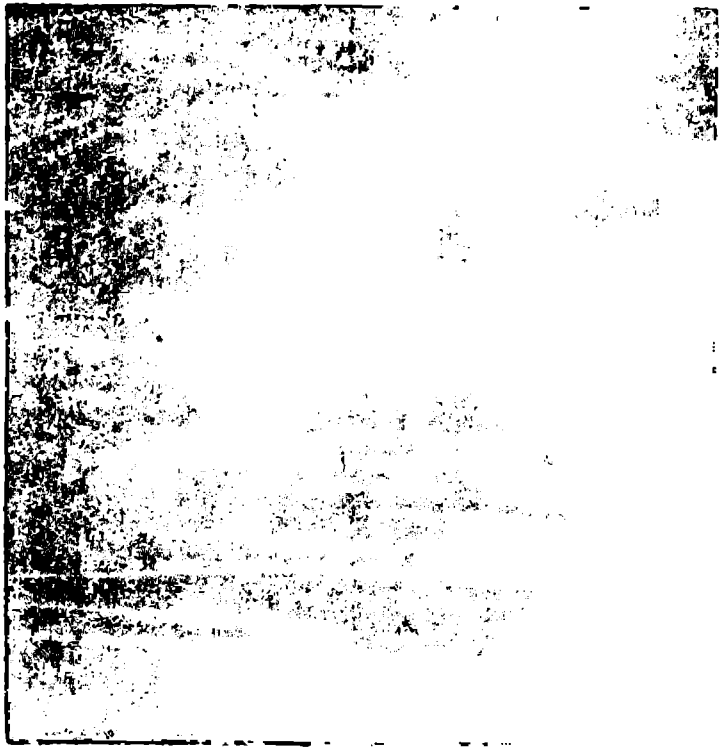

তূর পাহাড়ে সেন্ট ক্যাথারাইন গীর্জা যেখানে হযরত মূসা (আ) বৃক্ষকুঞ্জে প্রজ্জ্বলিত আগুন দেখেছিলেন



স্থানীয় বর্ণনানুসারে এ বৃক্ষের ওপর হতে হযরত মূসা (আ) আল্লাহর বাণী শুনেছেন। যুগ যুগ ধরে এ বৃক্ষের সবুজতার কথা বংশ পরম্পরায় গীর্জায় চলে আসছে

يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٩ وَاَلْقِ عَصَاكَ ۭ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ
كَاَنَّهَا جَاۗنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۭ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ ڰ اِنِّىْ
لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ ۝١٠ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا بَعْدَ
سُوْۗءٍ فَاِنِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١١ وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاۗءَ
مِنْ غَيْرِ سُوْۗءٍ ڰ فِيْ تِسْعِ اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا
قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝١٢

হে মূসা! এ আর কিছু নয়, স্বয়ং আমি আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী এবং তুমি তোমার লাঠিটি একটু ছুঁড়ে দাও।" যখনই মূসা দেখলো লাঠি সাপের মতো মোচড় খাচ্ছে[১২] তখনই পেছন ফিরে ছুটতে লাগলো এবং পেছন দিকে ফিরেও দেখলো না। "হে মূসা! ভয় পেয়ো না, আমার সামনে রসূলরা ভয় পায় না।[১৩] তবে হ্যাঁ, যদি কেউ ভুল-ত্রুটি করে বসে।[১৪] তারপর যদি সে দুষ্কৃতির পরে সুকৃতি দিয়ে (নিজের কাজ) পরিবর্তিত করে নেয় তাহলে আমি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[১৫] আর তোমার হাতটি একটু তোমার বক্ষস্থলের মধ্যে ঢুকাও তো, তা উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে কোন প্রকার ক্ষতি ছাড়াই। এ (দু'টি নিদর্শন) ন'টি নিদর্শনের অন্তরভুক্ত ফেরাউন ও তার জাতির কাছে (নিয়ে যাবার জন্য)[১৬] তারা বড়ই বদকার।"

আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাতে থাকেন। হযরত মূসার ব্যাপারেও একই ঘটনা ঘটে। এক ব্যক্তি সফরকালে এক জায়গায় অবস্থান করছেন। দূর থেকে আগুন দেখে পথের সন্ধান নিতে বা আগুন সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে আসেন। অকস্মাত সকল প্রকার আন্দাজ অনুমানের উর্ধে অবস্থানকারী স্বয়ং আল্লাহ তাঁকে সম্বোধন করেন। এসব সময় আসলে এমন একটি অস্বাভাবিক অবস্থা বাইরেও এবং নবীগণের মনের মধ্যেও বিরাজমান থাকে যার ভিত্তিতে তাঁদের মনে এরূপ প্রত্যয় জন্মে যে, এটা কোন জিন বা শয়তানের কারসাজী অথবা তাদের নিজেদের কোন মানসিক ভাবান্তর নয় কিংবা তাঁদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিও কোন প্রকার প্রতারিত হচ্ছে না বরং প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব-জাহানের মালিক ও প্রভু অথবা তাঁর ফেরেশ্‌তাই তাঁদের সাথে কথা বলছেন। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নাজম, ১০ টীকা)

১১. এ অবস্থায় "পাক-পবিত্র আল্লাহ" বলার মাধ্যমে আসলে হযরত মূসাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা হচ্ছে যে, বিভ্রান্ত চিন্তা ও বিশ্বাস থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়েই এ

ঘটনাটি ঘটছে। অর্থাৎ এমন নয় যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ গাছের ওপর বসে আছেন অথবা এর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এসেছেন কিংবা তাঁর একচ্ছত্র নূর তোমাদের দৃষ্টিসীমায় বাঁধা পড়েছে বা কারো মুখে প্রবিষ্ট কোন জিহবা নড়াচড়া করে এখানে কথা বলছে। বরং এ সমস্ত সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন থেকে সেই সত্তা নিজেই তোমার সাথে কথা বলছেন।

১২. সূরা আ'রাফ ও সূরা শু'আরাতে এ জন্য ثعبان (অজগর) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এখানে একে جان শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে। "জান" শব্দটি বলা হয় ছোট সাপ অর্থে। এখানে "জান" শব্দ ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, দৈহিক দিক দিয়ে সাপটি ছিল অজগর কিন্তু তার চলার দ্রুততা ছিল ছোট সাপদের মতো। সূরা তা-হা-য় حية تسعى (ছুটন্ত সাপ) এর মধ্যেও এ অর্থই বর্ণনা করা হয়েছে।

১৩. অর্থাৎ আমার কাছে রসূলদের ক্ষতি হবার কোন ভয় নেই। রিসালাতের মহান মর্যাদায় অভিসিক্ত করার জন্য যখন আমি কাউকে নিজের কাছে ডেকে আনি তখন আমি নিজেই তার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে থাকি। তাই যে কোন প্রকার অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটলেও রসূলকে নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত থাকা উচিত। আমি তার জন্য কোন প্রকার ক্ষতিকারক হবো না।

১৪. আরবী ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে এ বাক্যাংশের দু'রকম অর্থ হতে পারে। প্রথম অর্থ হলো, ভয়ের কোন যুক্তিসংগত কারণ যদি থাকে তাহলে তা হচ্ছে এই যে, রসূল কোন ভুল করেছেন। আর দ্বিতীয় অর্থ হলো, যতক্ষণ কেউ ভুল না করে ততক্ষণ আমার কাছে তার কোন ভয় নেই।

১৫. অর্থাৎ অপরাধকারীও যদি তাওবা করে নিজের নীতি সংশোধন করে নেয় এবং খারাপ কাজের জায়গায় ভালো কাজ করতে থাকে, তাহলে আমার কাছে তার জন্য উপেক্ষা ও ক্ষমা করার দরজা খোলাই আছে। প্রসংগক্রমে একথা বলার উদ্দেশ্য ছিল একদিকে সতর্ক করা এবং অন্যদিকে সুসংবাদ দেয়াও। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম অজ্ঞতাবশত একজন কিবতীকে হত্যা করে মিসর থেকে বের হয়েছিলেন। এটি ছিল একটি ত্রুটি। এদিকে সূক্ষ্ম ইংগিত করা হয়। এ ত্রুটিটি যখন অনিচ্ছাকৃতভাবে তার দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল তখন তিনি পরক্ষণেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন এই বলে ঃ

رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْلِیْ

"হে আমার রব! আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমাকে মাফ করে দাও।"

আল্লাহ সংগে সংগেই তাঁকে মাফ করে দিয়েছিলেন ঃ فَغَفَرَلَه আল্লাহ তাঁকে মাফ করে দিলেন। (আল কাসাস, ১৬) এখানে সেই ক্ষমার সুসংবাদ তাঁকে দেয়া হয়। অর্থাৎ এ ভাষণের মর্ম যেন এই দাঁড়ালো ঃ হে মূসা ! আমার সামনে তোমার ভয় পাওয়ার একটি কারণ তো অবশ্যই ছিল। কারণ তুমি একটি ভুল করেছিলে। কিন্তু তুমি যখন সেই দুষ্কৃতিকে সুকৃতিতে পরিবর্তিত করেছো তখন আমার কাছে তোমার জন্য আর মাগফিরাত ও রহমত ছাড়া আর কিছুই নেই। এখন আমি তোমাকে কোন শাস্তি দেবার জন্য ডেকে পাঠাইনি বরং বড় বড় মু'জিযা সহকারে তোমাকে এখন আমি একটি মহান দায়িত্ব সম্পাদনে পাঠাবো।

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ وَجَحَدُوا
بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾

কিন্তু যখন আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ তাদের সামনে এসে গেলো তখন তারা বলল, এতো সুস্পষ্ট যাদু। তারা একেবারেই অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্যের সাথে সেই নিদর্শনগুলো অস্বীকার করলো অথচ তাদের মন মগজ সেগুলোর সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল।[১৭] এখন এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল দেখে নাও।

১৬. সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে মূসাকে আমি সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয় এমন ধরনের নয়টি নিদর্শন (تِسْعَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ) দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। সূরা আ'রাফে এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ (১) লাঠি, যা অজগর হয়ে যেতো (২) হাত, যা বগলে রেখে বের করে আনলে সূর্যের মতো ঝিকমিক করতো। (৩) যাদুকরদের প্রকাশ্য জনসমক্ষে পরাজিত করা (৪) হযরত মূসার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সারা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়া। (৫) বন্যা ও ঝড় (৬) পংগপাল (৭) সমস্ত শস্য গুদামে শস্যকীট এবং মানুষ–পশু নির্বেশেষে সবার গায়ে উকুন। (৮) ব্যাংয়ের আধিক্য (৯) রক্ত। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আয্ যুখরুফ, ৪৩ টীকা)

১৭. কুরআনের অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে যে. যখন মূসা আলাইহিস সালামের ঘোষণা অনুযায়ী মিসরের ওপর কোন সাধারণ বালা–মুসীবত নাযিল হতো তখন ফেরাউন হযরত মূসাকে বলতো, আপনার আল্লাহর কাছে দোয়া করে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন তারপর আপনি যা বলবেন তা মেনে নেবো। কিন্তু যখন সে বিপদ সরে যেতো তখন ফেরাউন আবার তার আগের হঠকারিতায় ফিরে যেতো। (সূরা আরাফ, ১৩৪ এবং আয্ যুখরুফ, ৪৯–৫০ আয়াত) বাইবেলেও এ আলোচনা এসেছে (যাত্রা পুস্তক ৮ থেকে ১০ অধ্যায়) তাছাড়া এমনিতেও একটি দেশের সমগ্র এলাকা দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও ঘূর্ণি কবলিত হওয়া, সারা দেশের ওপর পংগপাল ঝাঁপিয়ে পড়া এবং ব্যাং ও শস্যকীটের আক্রমণ কোন যাদুকরের তেলসমাতি হতে পারে বলে কোনক্রমেই ধারণা করা যেতে পারে না। এগুলো এমন প্রকাশ্য মু'জিযা ছিল যেগুলো দেখে একজন নিরেট বোকাও বুঝতে পারতো যে, নবীর কথায় এ ধরনের দেশ ব্যাপী বালা–মুসীবতের আগমন এবং আবার তাঁর কথায় তাদের চলে যাওয়া একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনেরই হস্তক্ষেপের ফল হতে পারে। এ কারণে হযরত মূসা ফেরাউনকে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন ঃ

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

"তুমি খুব ভালো করেই জানো, এ নিদর্শনগুলো পৃথিবী ও আকাশের মালিক ছাড়া আর কেউ নাযিল করেনি।" (বনী ইসরাঈল, ১০২)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا عَلٰى
كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ
عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ ۚ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ
الْمُبِيْنُ ﴿١٦﴾ وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ
يُوْزَعُوْنَ ﴿١٧﴾

২য় রুকূ'

(অন্যদিকে) আমি দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করলাম[১৮] এবং তারা বললো, সেই আল্লাহর শোকর যিনি তাঁর বহু মু'মিন বান্দার ওপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।[১৯] আর দাউদের উত্তরাধিকারী হলো সুলাইমান[২০] এবং সে বললো, "হে লোকেরা আমাকে শেখানো হয়েছে পাখিদের ভাষা[২১] এবং আমাকে দেয়া হয়েছে সবরকমের জিনিস।[২২] অবশ্যই এ (আল্লাহর) সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।" সুলাইমানের জন্য জিন, মানুষ ও পাখিদের সৈন্য সমবেত করা হয়েছিল[২৩] এবং তাদেরকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা হতো।

কিন্তু যে কারণে ফেরাউন ও তার জাতির সরদাররা জেনে বুঝে সেগুলো অস্বীকার করে তা এই ছিল ঃ

اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ –

"আমরা কি আমাদের মতই দু'জন লোকের কথা মেনে নেবো, অথচ তাদের জাতি আমাদের গোলাম?" (আল ম'মিনূন, ৪৭)

১৮. অর্থাৎ সত্যের জ্ঞান। আসলে তাদের কাছে নিজস্ব কোন জ্ঞান নেই, যা কিছু আছে তা আল্লাহর দেয়া এবং তা ব্যবহার করার যে ক্ষমতা তাদেরকে দেয়া হয়েছে তাকে আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী ব্যবহার করা উচিত। আর এ ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার ও অপব্যবহারের জন্য তাদেরকে প্রকৃত মালিকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ফেরাউন যে মূর্খতায় নিমজ্জিত ছিল এ জ্ঞান তার বিপরীতধর্মী। ফেরাউনী অজ্ঞতা ও মূর্খতার ফলে যে চরিত্র গড়ে উঠেছিল তার নমুনা ওপরে আলোচিত হয়েছে। এ জ্ঞান কোন্ ধরনের নৈতিক চরিত্রের আদর্শ পেশ করে এখন তা বলা হচ্ছে। শাসন ক্ষমতা ধন–সম্পদ, মান–মর্যাদা, শক্তি দু'পক্ষেরই সমান। ফেরাউনও এগুলো লাভ করেছিল এবং দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালামও লাভ করেছিলেন। কিন্তু অজ্ঞতা তাদের মধ্যে কত বড় ব্যবধান সৃষ্টি করে দিয়েছে।

১৯. অর্থাৎ অন্য মু'মিন বান্দাও এমন ছিল যাদেরকে খেলাফত দান করা যেতে পারতো। কিন্তু এটা আমাদের কোন ব্যক্তিগত গুণ নয় বরং নিছক আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের এ রাজ্যের শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনার জন্য নির্বাচিত করেছেন।

২০. উত্তরাধিকার বলতে ধন ও সম্পদ–সম্পত্তির উত্তরাধিকার বুঝানো হয়নি। বরং নবুওয়াত ও খিলাফতের ক্ষেত্রে হযরত দাউদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সম্পদ–সম্পত্তির উত্তরাধিকার যদি ধরে নেয়াও যায় তা স্থানান্তরিত হয়, তাহলে তা এককভাবে হযরত, সুলাইমানের দিকেই স্থানান্তরিত হতে পারতো না। কারণ হযরত দাউদের অন্যান্য সন্তানরাও ছিল। তাই এ আয়াত দ্বারা নবী (সা) এর নিম্নোক্ত হাদীস দু'টিকে খণ্ডন করা যায় না ঃ لا نورث ما تركنا صدقة "আমাদের নবীদের উত্তরাধিকার বন্টন করা হয় না, যা কিছু আমরা পরিত্যাগ করে যাই তা হয় সাদকা" (বুখারী, খুমুস প্রদান করা ফরয অধ্যায়) এবং

اِنَّ النَّبِىَّ لَا يُوْرَثُ اِنَّمَا مِيْرَاثُهُ فِىْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمَسَاكِيْنَ

"নবীর কোন উত্তরাধিকারী হয় না। যা কিছু তিনি ত্যাগ করে যান তা মুসলমানদের গরীব ও মিসকিনদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়।" (মুসনাদে আহমাদ, আবু বকর সিদ্দীক বর্ণিত ৬০ ও ৭৮ নম্বর হাদীস)।

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত দাউদের (আ) সবচেয়ে ছোট ছেলে। তাঁর আসল ইবরানী নাম ছিল সোলোমোন। এটি ছিল "সলীম" শব্দের সমার্থক। খৃষ্ট পূর্ব ৯৬৫ অব্দে তিনি হযরত দাউদের স্থলাভিষিক্ত হন এবং খৃঃ পূঃ ৯২৬ পর্যন্ত প্রায় ৪০ বছর শাসন কার্য পরিচালনা করেন। (তাঁর বিস্তারিত বৃত্তান্ত জানার জন্য পড়ুন তাফহীমুল কুরআন আল হিজর ৭ টীকা, আল আম্বিয়া ৭৪–৭৫ টীকা।) তাঁর রাজ্যসীমা সম্পর্কে আমাদের মুফাস্‌সিরগণ অতি বর্ণনের আশ্রয় নিয়েছেন অনেক বেশী। তারা তাঁকে দুনিয়ার অনেক বিরাট অংশের শাসক হিসেবে দেখিয়েছেন। অথচ তাঁর রাজ্য কেবলমাত্র বর্তমান ফিলিস্তীন ও জর্দান রাষ্ট্র সমন্বিত ছিল এবং সিরিয়ার একটি অংশ এর অন্তরভুক্ত ছিল। (দেখুন বাদশাহ সুলাইমানের রাজ্যের মানচিত্র, তাফহীমুল কুরআন সূরা বনী ইসরাঈল)

২১. হযরত সুলাইমানকে (আ) যে পশু–পাখির ভাষা শেখানো হয়েছিল, বাইবেলে সে কথা আলোচিত হয়নি। কিন্তু বনী ইসরাঈলের বর্ণনাসমূহে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। (জুয়িশ ইনসাইক্লোপেডিয়া, ১১ খণ্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা)

২২. অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া সবকিছু আমার কাছে আছে। একথাটিকে শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করা ঠিক নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর দেয়া ধন–দৌলত ও সাজ–সরঞ্জামের আধিক্য। হযরত সুলাইমান অহংকারে স্ফীত হয়ে একথা বলেননি। বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর দান ও দাক্ষিণ্যের শোকর আদায় করা।

২৩. জিনেরা যে হযরত সুলাইমানের সেনাবাহিনীর অংশ ছিল এবং তিনি তাদের কাজে নিয়োগ করতেন, বাইবেলে একথারও উল্লেখ নেই। কিন্তু তালমূদে ও রাব্বীদের বর্ণনায় এর বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। (জুয়িশ ইনসাইক্লোপেডিয়া, ১১ খণ্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা)

حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٨﴾ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩﴾

(একবার সে তাদের সাথে চলছিল) এমন কি যখন তারা সবাই পিঁপড়ের উপত্যকায় পৌঁছুল তখন একটি পিঁপড়ে বললো, "হে পিঁপড়েরা! তোমাদের গর্তে ঢুকে পড়ো। যেন এমন না হয় যে, সুলাইমান ও তার সৈন্যরা তোমাদের পিশে ফেলবে এবং তারা তা টেরও পাবে না।"[২৪] সুলাইমান তার কথায় মৃদু হাসলো এবং বললো,– "হে আমার রব! আমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো,[২৫] আমি যেন তোমার এ অনুগ্রহের শোকর আদায় করতে থাকি যা তুমি আমার প্রতি ও আমার পিতা–মাতার প্রতি করেছো এবং এমন সৎকাজ করি যা তুমি পছন্দ করো এবং নিজ অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের দলভুক্ত করো।"[২৬]

বর্তমান যুগের কোন কোন ব্যক্তি একথা প্রমাণ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন যে, জিন ও পাখি বলে আসলে জিন ও পাখির কথা বুঝানো হয়নি বরং মানুষের কথা বুঝানো হয়েছে। মানুষরাই হযরত সুলাইমানের সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত ছিল। তারা বলেন, জিন মানে পার্বত্য উপজাতি। এদের ওপর হযরত সুলাইমান বিজয় লাভ করেছিলেন। তাঁর অধীনে তারা বিস্ময়কর শক্তি প্রয়োগের ও মেহনতের কাজ করতো। আর পাখি মানে অশ্বারোহী সেনাবাহনী। তারা পদাতিক বাহিনীর তুলনায় অনেক বেশী দ্রুততা সম্পন্ন ছিল। কিন্তু এটি কুরআন মজীদের শব্দের অযথা বিকৃত অর্থ করার নিকৃষ্টতম প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। কুরআন এখানে জিন, মানুষ ও পাখি তিনটি আলাদা আলাদা প্রজাতির সেনাদলের কথা বর্ণনা করছে এবং তিনের ওপর ال (আলিফ লাম) বসানো হয়েছে তাদের পৃথক পৃথক প্রজাতিকে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে। তাই আল জিন (জিন জাতি) ও আত্‌তাইর (পাখি জাত) কোনক্রমেই আল ইন্‌স (মানুষ জাতি)–এর অন্তরভুক্ত হতে পারে না। বরং তারা তার থেকে আলাদা দু'টি প্রজাতিই হতে পারে। তাছাড়া যে ব্যক্তি সামান্য আরবী জানে সে–ও কখনো একথা কল্পনা করতে পারে না যে, এ ভাষায় নিছক জিন শব্দ বলে তার মাধ্যমে মানুষদের কোন দল বা নিছক পাখি (তাইর) শব্দ বলে তার মাধ্যমে অশ্বারোহী বাহিনী অর্থ করা যেতে পারে এবং কোন আরব এ শব্দগুলো শুনে তার এ অর্থ বুঝতে পারে। নিছক প্রচলিত বাগধারা অনুযায়ী কোন

মানুষকে তার অস্বাভাবিক কাজের কারণে জিন অথবা কোন মেয়েকে তার সৌন্দর্যের কারণে পরী কিংবা কোন দ্রুতগতি সম্পন্ন পুরুষকে পাখি বলা হয় বলেই এর অর্থ এ হয় না যে, এখন জিন মানে শক্তিশালী লোক, পরী মানে সুন্দরী মেয়ে এবং পাখি মানে দ্রুতগতি সম্পন্ন মানুষই হবে। এ শব্দগুলোর এসব অর্থ তো তাদের রূপক অর্থ, প্রকৃত অর্থ নয়। আর কোন বাক্যের মধ্যে কোন শব্দকে তার প্রকৃত অর্থ বাদ দিয়ে রূপক অর্থে তখনই ব্যবহার করা হয় বা শ্রোতা তার রূপক অর্থ তখনই গ্রহণ করে যখন আশেপাশে এমন কোন সুস্পষ্ট প্রসংগ ও পূর্বাপর সামঞ্জস্য থাকে যা তার রূপক অর্থের দবী জানায়। এখানে এমন কি প্রসংগ ও সামঞ্জস্য পাওয়া যায় যার ভিত্তিতে এ ধারণা করা যেতে পারে যে, জিন ও পাখি শব্দ দু'টি তাদের প্রকৃত অর্থে নয় বরং রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? বরং সামনের দিকে ঐ দু'টি দলের প্রত্যেক ব্যক্তির যে অবস্থা ও কাজ বর্ণনা করা হয়েছে তা এ পেঁচালো ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ বিরোধী অর্থ প্রকাশ করছে। কুরআনের কথায় কোন ব্যক্তির মন যদি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে না পারে, তাহলে তার পরিষ্কার বলে দেয়া উচিত আমি একথা মানি না। কিন্তু মানুষ কুরআনের পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন শব্দগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে নিজের মনের মতো অর্থের ছাঁচে সেগুলো ঢালাই করবে এবং একথা প্রকাশ করতে থাকবে যে, সে কুরআনের বর্ণনা মানে, অথচ আসলে কুরআন যা কিছু বর্ণনা করেছে সে তাকে নয় বরং নিজের জোর করে তৈরী করা অর্থই মানে— এটি মানুষের একটি মস্তবড় চারিত্রিক কাপুরুষতা ও তাত্ত্বিক খেয়ানত ছাড়া আর কী হতে পারে।

২৪. আজকালকার কোন কোন মুফাস্‌সির এ আয়াতটিরও পেঁচালো ব্যাখ্যা করেছেন। তারা বলেন, "ওয়াদী-উন্‌-নাম্‌ল" মানে পিঁপড়ের উপত্যকা নয় বরং এটি ছিল সিরীয় এলাকায় অবস্থিত একটি উপত্যকার নাম। আর "নাম্‌লাহ্‌ মানে একটি পিঁপড়ে নয় বরং এটি একটি গোত্রের নাম। এভাবে তারা এ আয়াতের অর্থ বর্ণনা করে বলেন, "যখন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম নাম্‌ল উপত্যকায় পৌঁছেন তখন একজন নাম্‌লী বললো, "হে নাম্‌ল গোত্রের লোকেরা .....।" কিন্তু এটিও এমন একটি পেঁচালো ব্যাখ্যা কুরআনের শব্দ যার সহযোগী হয় না। ধরে নেয়া যাক, "ওয়াদিউন নাম্‌ল" বলতে যদি ঐ উপত্যকা মনে করা হয় এবং সেখানে বনী নাম্‌ল নামে কোন গোত্র বাস করতো বলে যদি ধরে নেয়া যায়, তাহলেও নাম্‌ল গোত্রের এক ব্যক্তিকে "নাম্‌লাহ" বলা আরবী ভাষার বাকরীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। যদিও পশুদের নামে আরবে বহু গোত্রের নাম রয়েছে, যেমন কাল্‌ব (কুকুর), আসাদ (সিংহ) ইত্যাদি কিন্তু কোন আরববাসী কাল্‌ব গোত্রের কোন ব্যক্তি সম্পর্কে قَالَ كَلْبٌ (একজন কুকুর একথা বললো) এবং আসাদ গোত্রের কোন ব্যক্তি সম্পর্কে قَالَ اَسَدٌ (একজন সিংহ বললো) কখনো বলবে না। তাই বনী নাম্‌লের এক ব্যক্তি সম্পর্কে এভাবে বলা, قَالَتْ نَمْلَةٌ (একজন পিঁপড়ে একথা বললো) পুরোপুরি আরবী বাগ্‌ধারা ও আরবী বাক্য প্রয়োগ রীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তারপর নাম্‌ল গোত্রের এক ব্যক্তির বনী নাম্‌লকে চিৎকার করে একথা বলা, "হে নাম্‌ল গোত্রীয় লোকেরা! নিজ নিজ গৃহে ঢুকে পড়ো। এমন যেন না হয়, সুলাইমানের সৈন্যরা তোমাদের পিষে ফেলবে এবং তারা জানতেও পারবে না," একেবারেই অর্থহীন। কারণ মানুষের কোন সেনাদল মানুষের কোন দলকে অজ্ঞাতসারে পদদলিত করে না। যদি তারা তাদেরকে

আক্রমণ করার সংকল্প নিয়ে এসে থাকে, তাহলে তাদের নিজেদের ঘরে ঢুকে পড়া অর্থহীন। আক্রমণকারীরা ঘরের মধ্যে ঢুকে ভালোভাবে তাদেরকে কচুকাটা করবে। আর যদি তারা নিছক কুচকাওয়াজ করতে করতে অতিক্রম করে থাকে, তাহলে তো তাদের জন্য শুধুমাত্র পথ ছেড়ে দেয়াই যথেষ্ট। কুচকাওয়াজকারীদের আওতায় এলে মানুষের ক্ষতি অবশ্যই হতে পারে কিন্তু চলাচলকারী মানুষ অজ্ঞাতসারে মানুষকে দলে পিষে রেখে যাবে এমনটি তো হতে পারে না। কাজেই বনী নাম্‌ল যদি কোন মানবিক গোত্র হতো এবং তাদের কোন ব্যক্তি নিজের গোত্রকে সতর্ক করতে চাইতো, তাহলে আক্রান্ত হবার আশংকার প্রেক্ষিতে সে বলতো, "হে নাম্‌ল গোত্রীয়রা! পালাও; পালাও; পাহাড়ের মধ্যে আশ্রয় নাও, যাতে সুলাইমানের সৈন্যরা তোমাদের ধ্বংস করে না দেয়।" আর আক্রমণের আশংকা না থাকলে সে বলতো, "হে নাম্‌ল গোত্রীয়রা! পথ থেকে সরে যাও, যাতে তোমাদের কেউ সুলায়মানের সেনাদলের সামনে না পড়ে।"

এ পেঁচালো ব্যাখ্যার মধ্যে আরবী ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তো এ ভুল ছিল। এখন নাম্‌ল উপত্যকা এবং সেখানে বনী নাম্‌ল নামক একটি গোত্রের বাস সম্পর্কে বলা যায়, এটি আসলে একটি কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর পেছনে আদৌ কোন তাত্ত্বিক প্রমাণ নেই। যারা একে উপত্যকার নাম বলেছেন তারা নিজেরাই এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, পিঁপড়ের আধিক্যের কারণে একে এ নামে অভিহিত করা হয়েছিল। কাতাদাহ ও মুকাতিল বলেন, واد بارض الشام كثير النمل "সেটি সিরিয়া দেশের একটি উপত্যকা এবং সেখানে পিঁপড়ের আধিক্য রয়েছে। কিন্তু ইতিহাস ও ভূগোলের কোন বইতে এবং পুরাতত্ত্বের কোন গবেষণায়ও এ উপত্যকায় বনী নাম্‌ল নামক কোন উপজাতির কথা উল্লেখিত হয়নি। এটি নিছক একটি মনগড়া কথা। নিজেদের কল্পিত ব্যাখ্যাকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য এটি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

বনী ইসরাঈলের বর্ণনাসমূহেও এ কাহিনী পাওয়া যায়। কিন্তু তার শেষাংশ কুরআনের বর্ণনার বিপরীত এবং হযরত সুলাইমানের মর্যদারও বিরোধী। সেখানে বলা হয়েছে, হযরত সুলাইমান যখন এমন একটি উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন যেখানে খুব বেশী পিঁপড়ে ছিল তখন তিনি শুনলেন একটি পিঁপড়ে চিৎকার করে অন্য পিঁপড়েদেরকে বলছে, "নিজেদের ঘরে ঢুকে পড়ো, নয়তো সুলাইমানের সৈন্যরা তোমাদের পিষে ফেলবে।" একথা শুনে হযরত সুলাইমান (আ) সেই পিঁপড়ের সামনে বড়ই আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করলেন। এর জবাবে পিঁপড়েটি তাকে বললো, তুমি কোথাকার কে? তুমি তো নগণ্য একটি ফোঁটা থেকে তৈরী হয়েছো। একথা শুনে সুলাইমান লজ্জিত হলেন। (জুয়িশ ইনসাইক্লোপিডিয়া ১১ খণ্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা) এথেকে অনুমান করা যায়, কুরআন কিভাবে বনী ইসরাঈলের বর্ণনাসমূহ সংশোধন করেছে এবং তারা নিজেদের নবীদের চরিত্রে যেসব কলংক লেপন করেছিল কিভাবে সেগুলো দূর করেছে। এসব বর্ণনা থেকে কুরআন সবকিছু চুরি করেছে বলে পশ্চিমী প্রাচ্যবিদরা নির্লজ্জভাবে দাবী করে।

একটি পিঁপড়ের পক্ষে নিজের সমাজের সদস্যদেরকে কোন একটি আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া এবং এ জন্য তাদের নিজেদের গর্তে ঢুকে যেতে বলা

বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে মোটেই কোন অস্বাভবিক ব্যাপার নয়। এখন হযরত সুলাইমান একথাটি কেমন করে শুনতে পেলেন এ প্রশ্ন থেকে যায়। এর জবাবে বলা যায়, যে ব্যক্তির শ্রবনেন্দ্রিয় আল্লাহর কালামের মতো সূক্ষ্মতর জিনিস আহরণ করতে পারে তার পক্ষে পিঁপড়ের কথার মতো স্থূল (Crude) জিনিস আহরণ করা কোন কঠিন ব্যাপার হতে যাবে কেন।

২৫. মূল শব্দ হচ্ছে رَبِّ اَوْزِعْنِىْ এখানে আরবী ভাষায় وزع এর আসল অর্থ হচ্ছে রুখে দেয়া। এ সময় হযরত সুলাইমানের একথা বলা اَوْ زِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ (আমাকে রুখে দাও, আমি তোমার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো)। আমাদের কাছে আসলে এ অর্থ প্রকাশ করে যে, হে আমার রব! তুমি আমাকে যে বিরাট শক্তি ও যোগ্যতা দান করেছো তা এমন যে, যদি আমি সামান্য গাফিল হয়ে যাই তাহলে নাজানি বন্দেগীর সীমানা থেকে বের হয়ে আমি নিজের অহংকারে মত্ত হয়ে কোথা থেকে কোথায় চলে যাই। তাই হে আমার পরওয়ারদিগার! তুমি আমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো, যাতে আমি অনুগ্রহ অস্বীকারকারীর পরিবর্তে অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীতে পরিণত হতে পারি।

২৬. সৎকর্মশীল বান্দাদের দলভুক্ত করার অর্থ সম্ভবত এ হবে যে, আখেরাতে আমার পরিণতি যেন সৎকর্মশীল লোকদের সাথে হয় এবং আমি যেন তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। কারণ মানুষ যখন সৎকাজ করবে তখন সৎকর্মশীল তো সে আপনা আপনিই হয়ে যাবে। তবে আখেরাতে কারো জান্নাতে প্রবেশ করা নিছক তার সৎকর্মের ভিত্তিতে হতে পারে না বরং এটি আল্লাহর রহমতের ওপর নির্ভর করে। হাদীসে বলা হয়েছে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, لن يدخل احدكم الجنة عمله "তোমাদের কারো নিছক আমল তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না।" বলা হলো, ولا انت يا رسول الله "আপনার বেলায়ও কি একথা খাটে?" জবাব দিলেন, ولا انا الا ان يتغمدنى الله تعالى برحمته "হ্যাঁ, আমিও নিছক আমার আমলের জোরে জান্নাতে প্রবেশ করবো না, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর রহমত দিয়ে আমাকে ঢেকে নেবেন।"

যদি 'আন নাম্‌ল, মানে হয় মানুষদের একটি উপজাতি এবং 'নাম্‌লাহ' মানে হয় নাম্‌ল উপজাতির এক ব্যক্তি তাহলে সুলাইমান আলাইহিস সালামের এ দোয়া এ সময় একেবারেই নিরর্থক হয়ে যায়। এক বাদশাহর পরাক্রমশালী সেনাবাহিনীর ভয়ে কোন মানবিক গোত্রের এক ব্যক্তির নিজের গোত্রকে বিপদ সম্পর্কে সজাগ করা এমন কোন্ ধরনের অস্বাভাবিক কথা যে, এমন একজন সুমহান মর্যাদাশালী পরাক্রান্ত বাদশাহ এ জন্য আল্লাহর কাছে এ দোয়া চাইবেন। তবে এক ব্যক্তির দূর থেকে একটু পিঁপড়ের আওয়াজ শুনার এবং তার অর্থ বুঝার মতো জবরদস্ত শ্রবণ ও জ্ঞান শক্তির অধিকারী হওয়াটা অবশ্যই এমন একটি বিষয় যার ফলে মানুষের আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এ ধরনের অবস্থায় হযরত সুলাইমানের এ দোয়া যথার্থ ও যথাযথ।

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿٢٠﴾
لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاْذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾

(আর একবার) সুলাইমান পাখিদের খোঁজ-খবর নিল[২৭] এবং বললো, "কি ব্যাপার, আমি অমুক হুদহুদ পাখিটিকে দেখছিনা যে! সে কি কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেছে? আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেবো অথবা জবাই করে ফেলবো, নয়তো তাকে আমার কাছে যুক্তিসংগত কারণ দর্শাতে হবে।"[২৮]

২৭. অর্থাৎ এমনসব পাখিদের খোঁজ-খবর যাদের সম্পর্কে ওপরে বলা হয়েছে যে, জিন ও মানুষের মতো তাদের সেনাদলও হযরত সুলাইমানের সেনাবাহিনীর অন্তরভুক্ত ছিল। সম্ভবত হযরত সুলাইমান তাদের মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদান, শিকার এবং এ ধরনের অন্যান্য কাজ করতেন।

২৮. বর্তমান যুগের কোন কোন লোকও বলেন, আরবী ও আমাদের দেশীয় ভাষায় যে পাখিটিকে হুদহুদ পাখি বলা হয় হুদহুদ বলে আসলে সে পাখিটিকে বুঝানো হয়নি। বরং এটি এক ব্যক্তির নাম। সে ছিল হযরত সুলাইমানের (আ) সেনাবাহিনীর একজন অফিসার। এ দাবীর ভিত্তি এ নয় যে, ইতিহাসে তারা হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের সেনাবাহিনীতে হুদহুদ নামে একজন অফিসারের সন্ধান পেয়েছেন। বরং শুধুমাত্র এ যুক্তির ভিত্তিতে এ দাবী খাড়া করা হয়েছে যে, প্রাণীদের নামে মানুষের নামকরণ করার রীতি দুনিয়ার সকল ভাষার মতো আরবীতেও প্রচলিত আছে এবং হিব্রু ভাষাতেও ছিল। তাছাড়া সামনের দিকে হুদহুদের যে কাজ বর্ণনা করা হয়েছে এবং হযরত সুলাইমানের (আ) সাথে তার যে কথাবার্তা উল্লেখিত হয়েছে তা তাদের মতে একমাত্র একজন মানুষই করতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কুরআন মজীদের পূর্বাপর আলোচনা দেখলে মানুষ পরিষ্কার জানতে পারে যে, এটা কুরআনের তাফসীর নয় বরং তার বিকৃতি এবং এর চেয়ে অগ্রসর হয়ে বলা যায়, তার প্রতি মিথ্যাচারিতা। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির সাথে কুরআনের কি কোন শত্রুতা আছে? সে বলতে চায়, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের সেনাবাহনী বা পল্টন অথবা তথ্য বিভাগের একব্যক্তি অনুপস্থিত ছিল। তিনি তার খোঁজ করছিলেন। সে হাজির হয়ে এই এই খবর দিল। হযরত সুলাইমান তাকে এই এই কাজে পাঠালেন। একথাটা বলতে গিয়ে কুরআন অনবরত এমন হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করছে যা পাঠ করে একজন পাঠক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাকে পাখিই মনে করতে বাধ্য হচ্ছে। এ প্রসংগে কুরআনের বর্ণনা বিন্যাসের প্রতি একটু দৃষ্টি দিন ঃ

প্রথমে বলা হয়, হযরত সুলাইমান আল্লাহর এ অনুগ্রহের জন্য এভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, "আমাকে পাখির ভাষার জ্ঞান দেয়া হয়েছে" এ বাক্যে তো প্রথমত পাখি শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার ফলে প্রত্যেকটি আরব ও আরবী জানা লোক এ শব্দটিকে পাখি অর্থে গ্রহণ করবে। কারণ এখানে এমন কোন পূর্বাপর প্রসংগ বা সম্পর্ক নেই যা এ শব্দটিকে রূপক বা অপ্রকৃত অর্থে ব্যবহার করার পথ সুগম করতে পারে।

দ্বিতীয়ত এ মূলে ব্যবহৃত "তাইর" শব্দের অর্থ পাখি না হয়ে যদি মানুষের কোন দল হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য "মান্‌তিক" (বুলি) শব্দ না বলে "লুগাত" বা "লিসান" (অর্থাৎ ভাষা) শব্দ বলা বেশী সঠিক হতো। আর তাছাড়া কোন ব্যক্তির অন্য কোন মানব গোষ্ঠীর ভাষা জানাটা এমন কোন বিরাট ব্যাপার নয় যে, বিশেষভাবে সে তার উল্লেখ করবে। আজকাল আমাদের মধ্যে হাজার হাজার লোক অনেক বিদেশী ভাষা জানে ও বোঝে। এটা এমন কি কৃতিত্ব যে জন্য একে মহান আল্লাহর অস্বাভাবিক দান ও অনুগ্রহ গণ্য করা যেতে পারে?

এরপর বলা হয়, "সুলাইমানের জন্য জিন, মানুষ ও পাখি সেনাদল সমবেত করা হয়েছিল।" এ বাক্যে প্রথমত জিন, মানুষ ও পাখি তিনটি পরিচিত জাতির নাম ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এ তিনটি শব্দ তিনটি বিভিন্ন ও সর্বজন পরিচিত জাতির জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তারপর এ শব্দগুলো ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এদের কোনটির রূপক ও অপ্রকৃত অর্থে বা উপমা হিসেবে ব্যবহারের সপক্ষে কোন পূর্বাপর প্রাসংগিক সূত্রও নেই। ফলে ভাষার পরিচিত অর্থগুলোর পরিবর্তে অন্য অর্থে কোন ব্যক্তি এগুলোকে ব্যবহার করতে পারে না। তাছাড়া "মানুষ" শব্দটি "জিন" ও "পাখি" শব্দ দু'টির মাঝখানে বসেছে, যার ফলে জিন ও পাখি আসলে মানুষ প্রজাতিরই দু'টি দল ছিল এ অর্থ গ্রহণ করার পথে সুস্পষ্ট বাধার সৃষ্টি হয়েছে। যদি এ ধরনের অর্থ গ্রহণ করা উদ্দেশ্য হতো তাহলে من الجن والانس والطير না বলে বলা হতো الجن والطير من الانس –

সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে বলা হয়, হযরত সুলাইমান পাখির খোঁজ খবর নিচ্ছেলেন। এ সময় হুদ্‌হুদকে অনুপস্থিত দেখে তিনি একথা বলেন। যদি এ পাখি মানুষ হয়ে থাকে এবং হুদ্‌হুদও কোন মানুষের নাম হয়ে থাকে তাহলে কমপক্ষে তিনি এমন কোন শব্দ বলতেন যা থেকে বেচারা পাঠক তাকে প্রাণী মনে করতো না। দলের নাম বলা হচ্ছে পাখি এবং তার একজন সদস্যের নাম বলা হচ্ছে হুদ্‌হুদ, এরপরও আমরা স্বতস্ফূর্তভাবে তাকে মানুষ মনে করে নেব, আমাদের কাছে এ আশা করা হচ্ছে।

তারপর হযরত সুলাইমান বলেন, হুদহুদ হয় তার নিজের অনুপস্থিত থাকার যুক্তি সংগত কারণ বলবে আর নয়তো আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেবো অথবা জবাই করে ফেলবো। মানুষকে হত্যা করা হয়, ফাঁসি দেয়া হয়, মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, জবাই করে কে? কোন ভয়ংকর পাষাণ হৃদয় ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ প্রতিশোধ স্পৃহায় পাগল হয়ে গেলে হয়তো কাউকে জবাই করে ফেলে। কিন্তু আল্লাহর নবীর কাছেও কি আমরা এ আশা করবো যে, তিনি নিজের সেনাদলের এক সদস্যকে নিছক তার গরহাজির (Deserter) থাকার অপরাধে জবাই করার কথা ঘোষণা করে দেবেন এবং আল্লাহর প্রতি এ সুধারণা পোষণ করবো যে, তিনি এ ধরনের একটি মারাত্মক কথার উল্লেখ করে তার নিন্দায় একটি শব্দও বলবেন না?

আর একটু সামনের দিকে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে, হযরত সুলাইমান এ হুদ্‌হুদের কাছে সাবার রাণীর নামে পত্র দিয়ে পাঠাচ্ছেন এবং সেটি তাদের কাছে ফেলে দিতে বা নিক্ষেপ করতে বলছেন (القه اليهم) । বলা নিষ্প্রয়োজন, এ নির্দেশ পাখিদের প্রতি দেয়া যেতে পারে কিন্তু কোন মানুষকে রাষ্ট্রদূত করে পাঠিয়ে তাকে এ ধরনের নিক্ষেপ

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ
بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

কিছুক্ষণ অতিবাহিত না হতেই সে এসে বললো, "আমি এমন সব তথ্য লাভ করেছি যা আপনি জানেন না। আমি সাবা সম্পর্কে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি।[২৯] আমি সেখানে এক মহিলাকে সে জাতির শাসকরূপে দেখেছি। তাকে সবরকম সাজ সরঞ্জাম দান করা হয়েছে এবং তার সিংহাসন খুবই জমকালো।

করার নির্দেশ দেয়া একেবারে অসংগত হয়। কেউ বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে থাকলে সে একথা মেনে নেবে যে, এক দেশের বাদশাহ অন্য দেশের রাণীর নামে পত্র দিয়ে নিজের রাষ্ট্রদূতকে এ ধরনের নির্দেশ সহকারে পাঠাতে পারে যে, পত্রটি নিয়ে রাণীর সামনে ফেলে দাও বা নিক্ষেপ করো। আমাদের মতো মামুলি লোকেরাও নিজেদের প্রতিবেশীর কাছে নিজের কোন কর্মচারীকে পাঠাবার ক্ষেত্রেও ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের যে প্রাথমিক রীতি মেনে চলি হযরত সুলাইমানকে কি তার চেয়েও নিম্নমানের মনে করতে হবে? কোন ভদ্রলোক কি কখনো নিজের কর্মচারীকে বলতে পারে, যা আমার এ পত্রটি অমুক সাহেবের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে আয়?

এসব নিদর্শন ও চিহ্ন পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে, এখানে হুদ্‌হুদ আভিধানিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সে মানুষ নয় বরং একটি পাখি ছিল। এখন যদি কোন ব্যক্তি একথা মেনে নিতে প্রস্তুত না হয় যে, কুরআন হুদ্‌হুদের বলা যেসব কথা উদ্ধৃত করছে একটি হুদ্‌হুদ তা বলতে পারে, তাহলে তার পরিষ্কার বলে দেয়া উচিত আমি কুরআনে এ কথাটি মানি না। কুরআনের স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন শব্দগুলোর মনগড়া অর্থ করে তার আড়ালে নিজের অবিশ্বাসকে লুকিয়ে রাখা জঘন্য মুনাফিকী ছাড়া আর কিছুই নয়।

২৯. সাবা ছিল আরবের দক্ষিণ এলাকার একটি বিখ্যাত ব্যবসাজীবী জাতি। তাদের রাজধানী মারিব বর্তমান ইয়ামনের রাজধানী সান্‌আ থেকে ৫৫ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত ছিল। তাঁর উত্থানের যুগ মাঈনের রাষ্ট্রের পতনের পর প্রায় খৃষ্টপূর্ব ১১০০ অব্দে শুরু হয়। এরপর থেকে প্রায় এক হাজার বছর পর্যন্ত। আরব দেশে তাদের দোর্দণ্ড প্রতাপ অব্যাহত থাকে। তারপর ১১৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে দক্ষিণ আরবের দ্বিতীয় খ্যাতিমান জাতি হিম্‌য়ার তাদের স্থান দখল করে। আরবে ইয়ামন ও হাদরামউত এবং আফ্রিকায় হাবশা (ইথিয়োপিয়া) পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পূর্ব আফ্রিকা, হিন্দুস্তান, দূর প্রাচ্য এবং আরবের যত বাণিজ্য মিসর, সিরিয়া, গ্রীস ও ইতালীর সাথে হতো তার বেশীর ভাগ ছিল এ সাবায়ীদের হাতে। এ জন্য এ জাতিটি প্রাচীনকালে নিজের ধনাঢ্যতা ও সম্পদশালীতার জন্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বরং গ্রীক ঐতিহাসিকরা তো তাদেরকে দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী জাতি বলে উল্লেখ করেছেন। ব্যবসায় ছাড়া তাদের সমৃদ্ধির বড় কারণটি ছিল এই যে, তারা

وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ
الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٢٤﴾ اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ
الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ
وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿٢٥﴾ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٦﴾ (সাজদা)

আমি তাকে ও তার জাতিকে আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যের সামনে সিজ্‌দা করতে দেখেছি"[৩০] —শয়তান[৩১] তাদের কার্যাবলী তাদের জন্য শোভন করে দিয়েছে[৩২] এবং তাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে দিয়েছে এ কারণে তারা সোজা পথ পায় না। (শয়তান তাদেরকে বিপথগামী করেছে এ জন্য) যাতে তারা সেই আল্লাহকে সিজ্‌দা না করে যিনি আকাশ ও পৃথিবীর গোপন জিনিসসমূহ বের করেন[৩৩] এবং সে সবকিছু জানেন যা তোমরা গোপন করো ও প্রকাশ করো।[৩৪] আল্লাহ, ছাড়া আর কেউ ইবাদাতের হকদার নয় তিনি মহান আরশের মালিক।[৩৫]

দেশের জায়গায় জায়গায় বাঁধ নির্মাণ করে পানি সেচের উন্নততর ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। ফলে তাদের সমগ্র এলাকা সবুজ শ্যামল উদ্যানে পরিণত হয়েছিল। তাদের দেশের এ অস্বাভাবিক শস্য শ্যামলিমার কথা গ্রীক ঐতিহাসিকেরাও উল্লেখ করেছেন এবং কুরআন মজীদও সূরা সাবার দ্বিতীয় রুকূ'তে এদিকে ইংগিত করেছে।

হুদ্‌হুদের একথা, "আমি এমন তথ্য সংগ্রহ করেছি যা আপনি জানেন না" বলার অর্থ এ নয় যে, হযরত সুলাইমান সাবার ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। একথা সুস্পষ্ট ফিলিস্তীন ও সিরিয়ার যে শাসকের রাজ্য লোহিত সাগরের উত্তর তীর (আকাবা উপসাগর) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তিনি সেই লোহিত সাগরের দক্ষিণ কিনারে (ইয়ামন) বসবাসরত এমন একটি জাতি সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ থাকতে পারেন না যারা আন্তরজাতিক বাণিজ্য পথের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ন্ত্রণ করতো। তাছাড়া যাবুর থেকে জানা যায়, হযরত সুলাইমানেরও পূর্বে তাঁর মহান পিতা হযরত দাউদ (আ) সাবা সম্পর্কে জানতেন। যাবুরে আমরা তার দোয়ার এ শব্দগুলো পাই ঃ

> "হে ইশ্বর, তুমি রাজাকে (অর্থাৎ স্বয়ং হযরত দাউদকে) আপনার শাসন, রাজপুত্রকে (অর্থাৎ সুলাইমানকে) আপনার ধর্মশীলতা প্রদান কর.....। তর্শীশ ও দ্বীপগণের রাজগণ নৈবেদ্য আনিবেন। শিবা (অর্থাৎ সাবার ইয়ামনী ও হাবশী শাখাসমূহ) সাবার রাজগণ উপহার দিবেন।" (গীত সংহিতা ৭২ ঃ ১–২, ১০–১১)

তাই হুদ্‌হুদের কথার অর্থ মনে হয় এই যে, সাবা জাতির কেন্দ্রস্থলে আমি স্বচক্ষে যা দেখে এসেছি তার কোন খবর এখনো পর্যন্ত আপনার কাছে পৌঁছেনি।

৩০. এ থেকে জানা যায়, সেকালে এ জাতিটি সূর্য দেবতার পূজা করতো। আরবের প্রাচীন বর্ণনাগুলো থেকেও এ জাতির এ একই ধর্মের কথা জানা যায়। ইবনে ইসহাক কুলজি বিজ্ঞান (Genealogies) অভিজ্ঞদের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন, সাবা জাতির প্রাচীনতম পূর্ব পুরুষ হলো আব্‌দে শাম্‌স (অর্থাৎ সূর্যের দাস বা সূর্য উপাসক) এবং উপাধি ছিল সাবা। বনী ইসরাঈলের বর্ণনাও এর সমর্থক। সেখানে বলা হয়েছে, হুদ্‌হুদ যখন হযরত সুলাইমানের (আ) পত্র নিয়ে পৌঁছে যায় সাবার রাণী তখন সূর্য দেবতার পূজা করতে যাচ্ছিলেন। হুদ্‌হুদ পথেই পত্রটি রাণীর সামনে ফেলে দেয়।

৩১. বক্তব্যের ধরন থেকে অনুমিত হয় যে, এখান থেকে শেষ প্যারা পর্যন্তকার বাক্যগুলো হুদ্‌হুদের বক্তব্যের অংশ নয়। বরং "সূর্যের সামনে সিজদা করে" পর্যন্ত তার বক্তব্য শেষ হয়ে যায়। এরপর এ উক্তিগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে সংযোজন করা হয়েছে। এ অনুমানকে যে জিনিস শক্তিশালী করে তা হচ্ছে এ বাক্যটি وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ "আর তিনি সবকিছু জানেন, যা তোমরা লুকাও ও প্রকাশ করো।" এ শব্দগুলো থেকে প্রবল ধারণা জন্মে যে, বক্তা হুদ্‌হুদ এবং শ্রোতা হযরত সুলাইমান ও তার দরবারীগণ নন বরং বক্তা হচ্ছেন আল্লাহ এবং তিনি সম্বোধন করছেন মক্কার মুশরিকদেরকে, যাদেরকে নসিহত করার জন্যই এ কাহিনী শুনানো হচ্ছে। মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে রূহুল মা'আনী–এর লেখক আল্লামা আলূসীও এ অনুমানকে অগ্রগণ্য মনে করেছেন।

৩২. অর্থাৎ দুনিয়ার ধন–সম্পদ উপার্জন এবং নিজের জীবনকে অত্যধিক জাঁকালো ও বিলাসী করার যে কাজে তারা নিমগ্ন ছিল, শয়তান তাদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে, বুদ্ধি ও চিন্তার এটিই একমাত্র নিয়োগ ক্ষেত্র এবং দৈহিক ও মানসিক শক্তিসমূহ প্রয়োগের একমাত্র উপযুক্ত স্থান। তাই এ পার্থিব জীবন ও তার আরাম আয়েশ ছাড়া আর কোন জিনিস সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা–ভাবনা করার দরকার নেই। এ আপাতদৃষ্ট পার্থিব জীবনের পিছনে কোন্ বাস্তব সত্য নিহিত রয়েছে এবং তোমাদের প্রচলিত ধর্ম, নৈতিকতা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবন ব্যবস্থার ভিত্তিসমূহ এ সত্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখে, না পুরোপুরি তার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে— সেসব নিয়ে অযথা মাথা ঘামাবার দরকার নেই বলে শয়তান তাদেরকে নিশ্চিন্ত করে দেয় যে, তোমরা যখন ধন–দৌলত, শক্তি–সামর্থ ও শান–শওকতের দিক দিয়ে দুনিয়ায় অগ্রসর হয়েই যাচ্ছো তখন আবার তোমাদের প্রচলিত আকিদা–বিশ্বাস ও মতবাদকে সঠিক কিনা, তা চিন্তা করার প্রয়োজনই বা কি। এসব সঠিক হবার সপক্ষে তো এই একটি প্রমাণই যথেষ্ট যে, তোমরা আরামে ও নিশ্চিন্তে অর্থ ও বিত্তের পাহাড় গড়ে তুলছ। এবং আয়েশী জীবন যাপন করছো।

৩৩. যিনি প্রতিমুহূর্তে এমন সব জিনিসের উদ্ভব ঘটাচ্ছেন যেগুলো জন্মের পূর্বে কোথায় কোথায় লুকিয়ে ছিল কেউ জানে না। ভূ–গর্ভ থেকে প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য উদ্ভিদ এবং নানা ধরনের খনিজ পদার্থ বের করছেন। উর্ধ জগত থেকে প্রতিনিয়ত এমন সব জিনিসের আবির্ভাব ঘটাচ্ছেন, যার আবির্ভাব না ঘটলে মানুষের ধারণা ও কল্পনায়ও কোনদিন আসতে পারতো না।

৩৪. অর্থাৎ সকল জিনিসই তাঁর জ্ঞানের আওতাধীন। তাঁর কাছে গোপন ও প্রকাশ্য সব সমান। সবকিছুই তার সামনে সমুজ্জ্বল ও উন্মুক্ত।

قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ اذْهَب بِّكِتَابِي
هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَتْ يَا أَيُّهَا
الْمَلَؤُا إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾

সুলাইমান বললো, "এখনই আমি দেখছি তুমি সত্য বলছো অথবা মিথ্যাবাদীদের অন্তরভুক্ত। আমার এ পত্র নিয়ে যাও এবং এটি তাদের প্রতি নিক্ষেপ করো, তারপর সরে থেকে দেখো তাদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হয়।"৩৬

রাণী বললো, "হে দরবারীরা! আমার প্রতি একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ পত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে। তা সুলাইমানের পক্ষ থেকে এবং আল্লাহ রহমানুর রহীমের নামে শুরু করা হয়েছে।" বিষয়বস্তু হচ্ছে ঃ "আমার অবাধ্য হয়ো না এবং মুসলিম হয়ে আমার কাছে হাজির হয়ে যাও।"৩৭

নমুনা হিসেবে মহান আল্লাহর এ দু'টি গুণ বর্ণনা করার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, যদি তারা শয়তানের প্রতারণা জালে আবদ্ধ না হতো তাহলে এ সোজা পথটি পরিষ্কার দেখতে পেতো যে, সূর্যনামের একটি জ্বলন্ত জড় পদার্থ, যার নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেই কোন অনুভূতি নেই, সে কোন ইবাদাতের হকদার নয় বরং একমাত্র সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী মহান সত্তা যাঁর অসীম শক্তি প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন অভাবনীয় কৃতির উদ্ভব ঘটাচ্ছে, তিনিই এর হকদার।

৩৫. এখানে সিজদা করা ওয়াজিব। কুরআনের যেসব জায়গায় সিজদা করা ওয়াজিব বলে ফকীহগণ একমত, এটি তার অন্যতম । এখানে সিজদা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, একজন মু'মিনের সূর্যপূজারীদের থেকে নিজেকে সচেতনভাবে পৃথক করা এবং নিজের কর্মের মাধ্যমে একথার স্বীকৃতি দেয়া ও একথা প্রকাশ করা উচিত যে, সে সূর্যকে নয় বরং একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনকেই নিজের সিজদার ও ইবাদাতের উপযোগী এবং যোগ্য মনে করে।

৩৬. এখানে এসে হুদ্‌হুদের ভূমিকা শেষ হয়ে যায়। যুক্তিবাদের প্রবক্তারা যে কারণে তাকে পাখি বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে সেটি হচ্ছে এই যে, তাদের মতে একটি পাখি এতটা পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, বিচার ক্ষমতা ও বাকশক্তি সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। সে একটা দেশের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় বুঝে ফেলবে যে, এটি সাবা জাতির দেশ, এদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা এ ধরনের, এর শাসক অমুক মহিলা, এদের ধর্ম সূর্যপূজা, এদের এক আল্লাহর পূজারী হওয়া উচিত ছিল কিন্তু এরা ভষ্টতায় লিপ্ত রয়েছে ইত্যাদি, আর সে এসে হযরত সুলাইমানের সামনে নিজের এসব উপলব্ধি এত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এটা

তাদের দৃষ্টিতে একটি অসম্ভব ব্যাপার। এসব কারণে কট্টর নাস্তিকরা কুরআনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বলে, কুরআন "কালীলাহ ও দিমনা" (পশু পাখির মুখ দিয়ে বর্ণিত উপদেশমূলক কল্পকাহিনী) ধরনের কথাবার্তা বলে। আর কুরআনের যুক্তিবাদী তাফসীর যারা করেন তারা তার শব্দগুলোকে তাদের প্রত্যক্ষ অর্থ থেকে সরিয়ে নিয়ে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, এই হুদ্‌হুদ তো আসলে কোন পাখিই ছিল না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, এ ভদ্র মহোদয়গণের কাছে এমন কি বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী আছে যার ভিত্তিতে তারা চূড়ান্তভাবে একথা বলতে পারেন যে, পশু পাখি ও তাদের বিভিন্ন প্রজাতি এবং বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট পাখির শক্তি, দক্ষতা, নৈপুন্য, ও ধীশক্তি কতটুকু এবং কতটুকু নয়? যে জিনিসগুলোকে তারা অর্জিত জ্ঞান মনে করছেন সেগুলো আসলে প্রাণীদের জীবন ও আচার আচরণের নিছক অকিঞ্চিত ও ভাসাভাসা পর্যবেক্ষণ ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীরা কে কি জানে, শোনে ও দেখে, কি অনুভব করে, কি চিন্তা করে ও বোঝে এবং তাদের প্রত্যেকের মন ও বুদ্ধিশক্তি কিভাবে কাজ করে, এসব সম্পর্কে মানুষ আজ পর্যন্ত কোন নিশ্চিত উপায়ে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি। এরপরও বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর জীবনের যে সামান্যতম পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে তা থেকে তাদের বিস্ময়কর যোগ্যতা ও ক্ষমতার সন্ধান পাওয়া গেছে। এখন মহান আল্লাহ যিনি এসব প্রাণীর স্রষ্টা তিনি যদি আমাদের বলেন, তিনি তাঁর একজন নবীকে এসব প্রাণীর ভাষা বুঝার এবং এদের সাথে কথা বলার যোগ্যতা দান করেছিলেন এবং সেই নবীর কাছে প্রতিপালিত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবার কারণে একটি হুদ্‌হুদ পাখি এমনি যোগ্যতা সম্পন্ন হয়েছিল যার ফলে ভিন দেশ থেকে এই এই বিষয় দেখে এসে নবীকে সে তার খবর দিতো, তাহলে আল্লাহর এ বর্ণনার আলোকে আমাদের কি প্রাণীজগত সম্পর্কে নিজেদের এ পর্যন্তকার যৎসামান্য জ্ঞান ও বিপুল সংখ্যক অনুমানের পুনরবিবেচনা করা উচিত ছিল না? তা না করে নিজেদের এ অকিঞ্চিত জ্ঞানকে মানদণ্ড হিসেবে ধরে নিয়ে আল্লাহর এ বর্ণনার প্রতি মিথ্যা আরোপ অথবা তার মধ্যে সূক্ষ্ম অর্থগত বিকৃতি সাধন করা আমাদের কোন্ ধরনের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক?

৩৭. অর্থাৎ কয়েকটি কারণে পত্রটি গুরুত্বপূর্ণ। এক, পত্রটি এসেছে অদ্ভুত ও অস্বাভিক পথে। কোন রাষ্ট্রদূত এসে পত্র দেয়নি। বরং তার পরিবর্তে এসেছে একটি পাখি। সে পত্রটি আমার কাছে ফেলে দিয়েছে। দুই, পত্রটি হচ্ছে, ফিলিস্তীন ও সিরিয়ার মহান শাসক সুলাইমানের (আ) পক্ষ থেকে। তিন, এটি শুরু করা হয়েছে আল্লাহ রহমানুর রহীমের নামে। অথচ দুনিয়ার কোথাও চিঠিপত্র লেখার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় না। তারপর সকল দেবতাকে বাদ দিয়ে একমাত্র মহান ও শ্রেষ্ঠ আল্লাহর নামে পত্র লেখাও আমাদের দুনিয়ায় একটি অস্বাভাবিক ও অভিনব ব্যাপার। সর্বোপরি যে বিষয়টি এর গুরুত্ব আরো বেশী বাড়িয়ে দিয়েছে তা হচ্ছে এই যে, পত্রে আমাকে একেবারে পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দাওয়াত দেয়া হয়েছে, আমি যেন অবাধ্যতার পথ পরিহার করে আনুগত্যের পথ অবলম্বন করি এবং হুকুমের অনুগত বা মুসলমান হয়ে সুলাইমানের সামনে হাজির হয়ে যাই।

"মুসলিম" হয়ে হাজির হবার দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, অনুগত হয়ে হাজির হয়ে যাও। দুই, দীন ইসলাম গ্রহণ করে হাজির হয়ে যাও। প্রথম হুকুমটি হযরত সুলাইমানের

قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْٓ اَمْرِيْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى
تَشْهَدُوْنِ ﴿٣٢﴾ قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ وَّالْاَمْرُ
اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ﴿٣٣﴾ قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً
اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَاِنِّيْ
مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌ ۢ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩ রুকূ'

(পত্র শুনিয়ে) রাণী বললো, "হে জাতীয় নেতৃবৃন্দ! আমার উদ্ভূত সমস্যায় তোমরা পরামর্শ দাও। তোমাদের বাদ দিয়ে তো আমি কোন বিষয়ের ফায়সালা করি না।"[৩৮] তারা জবাব দিল, "আমরা শক্তিশালী ও যোদ্ধা জাতি, তবে সিদ্ধান্ত আপনার হাতে, আপনি নিজেই ভেবে দেখুন আপনার কি আদেশ দেয়া উচিত। রাণী বললো, কোন বাদশাহ যখন কোন দেশে ঢুকে পড়ে তখন তাকে বিপর্যস্ত করে এবং সেখানকার মর্যাদাশালীদেরকে লাঞ্ছিত করে[৩৯] এ রকম কাজ করাই তাদের রীতি।[৪০] আমি তাদের কাছে একটি উপঢৌকন পাঠাচ্ছি তারপর দেখছি আমার দূত কি জবাব নিয়ে ফেরে।"

শাসকসুলভ মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। দ্বিতীয় হুকুমটি সামঞ্জস্য রাখে তাঁর নবীসুলভ মর্যাদার সাথে। সম্ভবত এই ব্যাপক অর্থবোধক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে পত্রে উভয় উদ্দেশ্য অন্তরভুক্ত থাকার কারণে। ইসলামের পক্ষ থেকে স্বাধীন জাতি ও সরকারদেরকে সবসময় এ মর্মে দাওয়াত দেয়া হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর সত্য দীন গ্রহণ করো এবং আমাদের সাথে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সমান অংশীদার হয়ে যাও অথবা নিজেদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা পরিত্যাগ করে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অধীনতা গ্রহণ করো এবং নিসংকোচে জিযিয়া দাও।

৩৮. মূল শব্দ হচ্ছে حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ –যতক্ষণ না তোমরা উপস্থিত হও অথবা তোমরা সাক্ষী না হও। অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির ফায়সালা করার সময় আমার নিকট তোমাদের উপস্থিতি জরুরী হয়ে পড়ে। তাছাড়া আমি যে ফায়সালাই করি না কেন তার সঠিক হবার ব্যাপারে তোমাদের সাক্ষ দিতে হয়। এ থেকে যে কথা প্রকাশিত হয় তা হচ্ছে এই যে, সাবা জাতির মধ্যে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলন থাকলেও তা কোন স্বৈরতান্ত্রিক মেজাজের ছিল না বরং তদানীন্তন শাসনকর্তা রাষ্ট্রের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শ করেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ের ফায়সালা করতেন।

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَآ اٰتٰنِيَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ
بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴿٣٦﴾ اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ
لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٣٧﴾ قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا
اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عِفْرِيْتٌ
مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ
لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ﴿٣٩﴾

যখন সে (রাণীর দূত) সুলাইমানের কাছে পৌঁছুলো, সে বললো, "তোমরা কি অর্থ দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তা তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশী।[৪১] তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে তোমরাই খুশী থাকো। (হে দূত!) ফিরে যাও নিজের প্রেরণকারীদের কাছে, আমি তাদের বিরুদ্ধে এমন সেনাদল নিয়ে আসবো[৪২] যাদের তারা মোকাবিলা করতে পারবে না এবং আমি তাদেরকে এমন লাঞ্ছিত করে সেখান থেকে বিতাড়িত করবো যে, তারা ধিকৃত ও অপমাণিত হবে।"

সুলাইমান বললো,[৪৩] "হে সভাসদগণ! তারা অনুগত হয়ে আমার কাছে আসার আগে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমার কাছে নিয়ে আসতে পারে?"[৪৪] এক বিশালকায় জিন বললো, আপনি নিজের জায়গা ছেড়ে ওঠার আগেই আমি তা এনে দেবো।[৪৫] আমি এ শক্তি রাখি এবং আমি বিশ্বস্ত।[৪৬]

৩৯. এ একটি বাক্যের মাধ্যমে রাজতন্ত্র এবং তার প্রভাব ও ফলাফলের ওপর পূর্ণাংগ মন্তব্য করা হয়েছে। রাজ–রাজড়াদের দেশ জয় এবং বিজেতা জাতি কর্তৃক অন্য জাতির ওপর হস্তক্ষেপ ও কর্তৃত্ব কখনো সংশোধন ও মংগলাকাংখ্যার উদ্দেশ্যে হয় না। এর উদ্দেশ্য হয়, অন্য জাতিকে আল্লাহ যে রিযিক এবং উপায় উপকরণ দিয়েছেন তা থেকে নিজেরা লাভবান হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট জাতিকে এতটা ক্ষমতাহীন করে দেয়া যার ফলে সে আর কখনো মাথা উঁচু করে নিজের অংশটুকু চাইতে না পারে। এ উদ্দেশ্যে সে তার সমৃদ্ধি, শক্তি ও মর্যাদার যাবতীয় উপায়–উপকরণ খতম করে দেয়। তার যেসব লোকের মধ্যে আত্ম–মর্যাদাবোধের লেশমাত্র সঞ্জীবিত থাকে তাদেরকে দলিত মথিত করে। তার লোকদের মধ্যে তোষামোদ প্রিয়তা পরস্পরের মধ্যে হানাহানি, কাটাকাটি, একে অন্যের গোয়েন্দাগিরি করা, বিজয়ী শক্তির অন্ধ অনুকরণ করা, নিজের সভ্যতা–সংস্কৃতিকে হেয়

মনে করা, হানাদারদের সভ্যতা–সংস্কৃতিকে গোলামী দান করা এবং এমনিতর অন্যান্য নীচ ও ঘৃণিত গুণাবলী সৃষ্টি করে দেয়। এ সংগে তাদেরকে এমন স্বভাবের অধিকারী করে তোলে যার ফলে তারা নিজেদের পবিত্রতম জিনিসও বিক্রি করে দিতে ইতস্তত করে না এবং পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যাবতীয় ঘৃণিত কাজ করে দিতেও প্রস্তুত হয়ে যায়।

৪০. এ বাক্যাংশের বক্তা কে, সে ব্যাপারে দু'টি সমান সমান সম্ভাবনা রয়েছে। একটি হচ্ছে, এটি সাবার রাণীরই উক্তি এবং তিনি তাঁর পূর্বের উক্তিটির ওপর জোর দিয়ে এটুকু সংযোজন করেন। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি হচ্ছে, এটি মহান আল্লাহরই উক্তি। রাণীর বক্তব্য সমর্থন করার জন্য প্রাসংগিক বাক্য হিসেবে তিনি একথা বলেন।

৪১. অহংকার ও দাম্ভীকতার প্রকাশ এ কাজের উদ্দেশ্য নয়। আসল বক্তব্য হচ্ছে, তোমাদের অর্থ–সম্পদ আমার লক্ষ নয় বরং তোমরা ঈমান আনো এটাই আমার কাম্য। অথবা কমপক্ষে যে জিনিস আমি চাই তা হচ্ছে, তোমরা একটি সৎজীবন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুসারী হয়ে যাও। এ দু'টি জিনিসের মধ্যে কোন একটিই যদি তোমরা না চাও, তাহলে ধন-সম্পদের উৎকোচ গ্রহণ করে তোমাদেরকে এই শির্‌ক ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী নোংরা জীবন ব্যবস্থার ব্যাপারে স্বাধীন ছেড়ে দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমাদের সম্পদের তুলনায় আমার রব আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তা ঢের বেশী। কাজেই তোমাদের সম্পদের প্রতি আমার লোভাতুর হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

৪২. প্রথম বাক্য এবং এ বাক্যটির মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ফাঁক রয়ে গেছে। বক্তব্যটি সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে এটি আপনা আপনিই অনুধাবন করা যায়। অর্থাৎ পুরো বক্তব্যটি এমন ঃ হে দূত এ উপহার এর প্রেরকের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তাকে হয় আমার প্রথম কথাটি মেনে নিতে হবে অর্থাৎ মুসলিম হয়ে আমার কাছে হাজির হয়ে যেতে হবে আর নয়তো আমি সেনাদল নিয়ে তার ওপর আক্রমণ করবো।

৪৩. মাঝখানের ঘটনা উহ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ সাবার রাণীর দূত তার উপঢৌকন ফেরত নিয়ে দেশে পৌঁছে গেলো এবং যা কিছু সে শুনেছিল ও দেখেছিল সব আনুপূর্বিক বর্ণনা করলো। রাণী তার কাছ থেকে হযরত সুলাইমান সম্পর্কে যা শুনলেন তা থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য তিনি নিজেই বায়তুল মাকদিসে যাবেন। কাজেই তিনি রাজকীয় জৌলুশ ও সাজ–সরঞ্জাম সহকারে ফিলিস্তীনের পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং হযরত সুলাইমানের দরবারে খবর পাঠালেন এই বলে ঃ আপনার দাওয়াত আপনার মুখে শুনার এবং সরাসরি আপনার সাথে আলোচনা করার জন্য আমি নিজেই আসছি। এসব বিস্তারিত ঘটনা বাদ দিয়ে এখন শুধুমাত্র রাণী যখন বাইতুল মাকদিসের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং তার মাত্র এক–দু'দিনের পথ বাকি ছিল তখনকার ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে।

৪৪. অর্থাৎ সেই সিংহাসনটি যে সম্পর্কে হুদ্‌হুদ পাখি বলেছিল যে, "তার সিংহাসনটি বড়ই জমকালো।" কোন কোন মুফাস্‌সির রাণীর আগমনের পূর্বে তাঁর সিংহাসন উঠিয়ে নিয়ে আসার কারণ হিসেবে এরূপ অদ্ভুত উক্তি করেছেন যে, হযরত সুলাইমান এটি দখল

করে নিতে চাচ্ছিলেন এবং তিনি আশংকা করেছিলেন, রাণী যদি ইসলাম গ্রহণ করে বসেন, তাহলে তাঁর সম্পদ তাঁর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি ছাড়া দখল করা হারাম হয়ে যাবে। তাই তিনি তাঁর আসার আগেই সাত তাড়াতাড়ি তাঁর সিংহাসনটি নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। কারণ এ সময় পর্যন্ত রাণীর সম্পদ–সম্পত্তি মুবাহ ছিল। আস্‌তাগ্‌ ফিরুল্লাহ একজন নবীর নিয়ত সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা বড়ই বিস্ময়কর মনে হয়। একথা মনে করা হয় না কেন যে, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে রাণী ও তার সভাসদদেরকে একটি মু'জিযাও দেখাতে চাচ্ছিলেন? এভাবে তারা জানতে পারতো, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর নবীদেরকে কেমন সব অস্বাভাবিক শক্তি দান করেন এবং এভাবে তারা নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পারতো যে, হযরত সুলাইমান (আ) যথার্থই আল্লাহর নবী। কোন কোন আধুনিক তাফসীরকার এর চেয়েও মারাত্মক অশালীন ও অনাকাংখিত কথা বলেছেন। তারা আয়াতের তরজমা এভাবে করেছেন ঃ "তোমাদের মধ্য থেকে কে আমাকে রাণীর জন্য একটি সিংহাসন এনে দেবে"? অথচ কুরআন يا تيني بعرش لها নয় বরং بعرشها বলছে। এর অর্থ হচ্ছে, "তার সিংহাসন, তার জন্য একটি সিংহাসন নয়। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম যেহেতু রাণীরই সিংহাসন ইয়ামন থেকে উঠিয়ে বাইতুল মাকদিসে নিয়ে আসতে চাচ্ছিলেন এবং তাও আবার রাণীর এসে পড়ার আগেভাগেই, শুধুমাত্র এ কারণে এ ধরনের মনগড়া কথা তৈরি করা হয়েছে আর যে কোনভাবে কুরআনের বর্ণনাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য।

৪৫. এ থেকে হযরত সুলাইমানের কাছে যেসব জিন ছিল তারা বর্তমান যুগের কোন কোন যুক্তিবাদী তাফসীরকারের মতানুযায়ী মানব বংশজাত ছিল অথবা সাধারণ প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী জিন নামে পরিচিত অদৃশ্য সৃষ্টি ছিল, একথা জানা যেতে পারে। বলা নিষ্প্রয়োজন, হযরত সুলাইমানের দরবারের অধিবেশন বড় জোর তিন চার ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল বলে মনে হয়। বাইতুল মাক্‌দিস থেকে সাবার রাজধানী মায়ারিবের দূরত্বও পাখির উড়ে চলার পথের হিসেবে কমপক্ষে দেড় হাজার মাইল ছিল। এতদূর দেশ থেকে এক সম্রাজ্ঞীর সিংহাসন এত কম সময়ে উঠিয়ে নিয়ে আসা কোন মানুষের কাজ হতে পারতো না। সে আমালিকা বংশোদ্ভূত যতই হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ব্যক্তিই হোক না কেন তার পক্ষে এটা সম্ভব পর ছিলা না। আধুনিক জেট বিমানগুলোও তো এ কাজ সম্পাদন করতে অক্ষম। বিষয়টা এমন নয় যে, সিংহাসন কোন বনে–জংগলে রাখা আছে এবং শুধুমাত্র সেখান থেকে উঠিয়ে আনতে হবে। বরং ব্যাপার হচ্ছে, সিংহাসন রয়েছে এক রাণীর মহলের অভ্যন্তরে। নিশ্চয়ই তার চারদিকে রয়েছে কড়া পাহারা। আবার রাণীর অনুপস্থিতিতে নিশ্চয়ই তা আরো সংরক্ষিত জায়গায় রাখা হয়েছে। মানুষ যদি তা উঠিয়ে আনতে যায় তাহলে তার সাথে একটি ছোট খাট তড়িৎগতি সম্পন্ন সেনাদলও থাকতে হবে। হাতাহাতি লড়াই করে পাহারাদারদের পরাজিত করে তাদের হাত থেকে তা ছিনিয়ে আনতে হবে। দরবার শেষ হবার আগে এসব কাজ কেমন করে করা যেতে পারতো। বিষয়টির এ দিকটি ভেবে দেখলে এ কাজটি একমাত্র একজন প্রকৃত জিনের পক্ষেই করা সম্ভবপর ছিল বলে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে।

৪৬. অর্থাৎ আপনি আমার প্রতি আস্থা রাখতে পারেন, আমি নিজে তা উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবো না অথবা তার কোন মূল্যবান জিনিস চুরি করে নেব না।

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ
طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي ۖ لِيَبْلُوَنِي
ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ
رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾

কিতাবের জ্ঞান সম্পন্ন অপর ব্যক্তি বললো, "আমি আপনার চোখের পলক ফেলার আগেই আপনাকে তা এনে দিচ্ছি।"[৪৭] যখনই সুলাইমান সেই সিংহাসন নিজের কাছে রক্ষিত দেখতে পেলো, অমনি সে চিৎকার করে উঠলো, "এ আমার রবের অনুগ্রহ, আমি শোকরগুযারী করি না নাশোকরী করি, তা তিনি পরীক্ষা করতে চান।"[৪৮] আর যে ব্যক্তি শোকরগুযারী করে তার শোকর তার নিজের জন্যই উপকারী। অন্যথায় কেউ অকৃতজ্ঞ হলে, আমার রব কারো ধার ধারেন না এবং তিনি আপন সত্তায় আপনি মহীয়ান।[৪৯]

৪৭. এ ব্যক্তি কে ছিল, তার কাছে কোন্ বিশেষ ধরনের জ্ঞান ছিল এবং যে কিতাবের জ্ঞান তার আয়ত্বাধীন ছিল সেটি কোন্ কিতাব ছিল, এ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত ও নিশ্চিত কথা বলা সম্ভবপর নয়। কুরআনে বা কোন সহীহ হাদীসে এ বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করা হয়নি। তাফসীরকারদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলেন, সে ছিল একজন ফেরেশতা আবার কেউ কেউ বলেন, একজন মানুষই ছিল। তারপর সে মানুষটিকে চিহ্নিত করার ব্যাপারেও তাদের মধ্যে মতদ্বৈধতা রয়েছে। কেউ আসফ ইবনে বরখিয়াহ (Asaf- B-Barchiah) -এর নাম বলেন। ইহুদী রাব্বীদের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ছিলেন মানব প্রধান (Prince of Men) কেউ বলেন, তিনি ছিলেন খিযির। কেউ অন্য কারোর নাম নেন। আর ইমাম রাযী এ ব্যাপারে জোর দিয়ে বলতে চান যে, তিনি ছিলেন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম নিজেই। কিন্তু এদের কারো কোন নির্ভরযোগ্য উৎস নেই। আর ইমাম রাযীর বক্তব্য তো কুরআনের পূর্বাপর আলোচনার সাথে কোন সামঞ্জস্য রাখে না। এভাবে কিতাব সম্পর্কেও মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করেছেন। কেউ বলেন, এর অর্থ লাওহে মাহফুজ এবং কেউ বলেন, শরীয়াতের কিতাব। কিন্তু এগুলো সবই নিছক অনুমান। আর কিতাব থেকে ঐ ব্যক্তির অর্জিত জ্ঞান সম্পর্কেও বিনা যুক্তি–প্রমাণে ঐ একই ধরনের অনুমানের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। আমরা কেবলমাত্র কুরআনে যতটুকু কথা বলা হয়েছে অথবা তার শব্দাবলী থেকে যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে ততটুকু কথাই জানি ও মানি। ঐ ব্যক্তি কোনক্রমেই জিন প্রজাতির অন্তরভুক্ত ছিলেন না এবং তার মানব প্রজাতির অন্তরভুক্ত হওয়াটা মোটেই অসম্ভব ও অস্বাভাবিক নয়। তিনি কোন অস্বভাবিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তার এ জ্ঞান আল্লাহর কোন কিতাব থেকে সংগৃহীত ছিল। জিন নিজের দৈহিক শক্তি বলে

কয়েক ঘন্টার মধ্যে এ সিংহাসন উঠিয়ে আনার দাবী করছিল। কিন্তু এ ব্যক্তি আসমানী কিতাবের শক্তিবলে মাত্র এক লহমার মধ্যে তা উঠিয়ে আনলেন।

৪৮. কুরআন মজীদের বর্ণনাভংগী এ ব্যাপারে একদম পরিষ্কার। এ বর্ণনা অনুসারে, সেই দানবাকৃতির জিনের মতো এ ব্যক্তির দাবী নিছক দাবীই ছিল না। বরং প্রকৃতপক্ষে তিনি দাবী করার পরপরই মাত্র এক মুহূর্তের মধ্যেই দেখা গেলো সিংহাসনটি হযরত সুলাইমানের (আ) সামনে রাখা আছে। এ শব্দগুলোর ওপর একবার নজর বুলিয়ে নিন।

"সেই ব্যক্তি বললো, আমি চোখের পলক ফেলতেই তা নিয়ে আসছি। তখনই সুলাইমান তা তাঁর নিজের কাছে রক্ষিত দেখতে পেলো।"

ঘটনাটি কেমন অদ্ভুত ও বিস্ময়কর সে কথা মন থেকে বের করে দিয়ে যে ব্যক্তি এ বাক্যাংশটি পড়বে, সে এ থেকে এ অর্থই গ্রহণ করবে যে, ঐ ব্যক্তির একথা বলার সাথে সাথেই সে যা দাবী করেছিল তা ঘটে গেলো। এ সোজা সরল কথাটিকে অনর্থক টানা হেঁচড়া করে এর ভিন্ন অর্থ করার কি দরকার ছিল? তারপর সিংহাসন দেখতেই হযরত সুলাইমানের একথা বলা : "এ আমার রবের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি অথবা অনুগ্রহ অস্বীকারকারী হয়ে যাই" — এমন এক অবস্থায় এটা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা হলে তবেই যথাযথ হতে পারে। অন্যথায় যদি ঘটনা এমনটিই হতো, তাঁর একজন চালাক-চতুর ও করিতকর্মা কর্মচারী রাণীর জন্য অতিদ্রুত একটি সিংহাসন তৈরি করে বা তৈরি করিয়ে নিয়ে আসতো, তাহলে বলা নিষ্প্রয়োজন যে তা এমন কোন অভিনব ব্যাপার হতো না যে, এ জন্য হযরত সুলাইমান বে এখতিয়ার هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي (এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ) বলে চিৎকার করে উঠতেন এবং তাঁর মনে আশংকা জাগতো যে, এত দ্রুত সম্মানীয় অতিথির জন্য সিংহাসন তৈরি হবার কারণে আমি আবার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে তাঁর নিয়ামত অস্বীকারকারী হয়ে যাই। সামান্য এতটুকু ঘটনায় একজন মু'মিন শাসনকর্তার এত বেশী অহংকার ও আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত হয়ে যাবার কী এমন আশংকা হতে পারে, বিশেষ করে যখন তিনি একজন সাধারণ ও মামুলি পর্যায়ের মু'মিন নন বরং আল্লাহর নবী?

এরপর যে প্রশ্নটির নিষ্পত্তি বাকী থাকে তা এই যে, চোখের পলক ফেলতেই দেড় হাজার মাইল দূর থেকে একটি সিংহাসন কেমন করে উঠে এলো? এর সংক্ষিপ্ত জবাব হচ্ছে, স্থান-কাল এবং বস্তু ও গতি সম্পর্কে যে ধারণা আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তৈরী করে রেখেছি সেসবের যাবতীয় সীমারেখা কেবল মাত্র আমাদের নিজেদের জন্যই সংগত। আল্লাহর জন্য এসব ধারণা সঠিক নয় এবং তিনি এসব সীমানার মধ্যে আবদ্ধও নন। তিনি নিজের অসীম ক্ষমতাবলে একটি নিতান্ত মামুলি সিংহাসন তো দূরের কথা সূর্য এবং তার চাইতেও বড় বড় গ্রহ-নক্ষত্রকেও মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করাতে পারেন। যে আল্লাহর একটি মাত্র হুকুমে এ বিশাল বিশ্ব-জগতের জন্ম হয়েছে। তাঁর সামান্য একটি ইশারায়ই সাবার রাণীর সিংহাসনকে আলোকের গতিতে চালিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। আল্লাহ তাঁর

এক বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক রাতে মক্কা থেকে বাইতুল মাকদিসে নিয়ে গিয়ে আবার ফিরিয়েও এনেছিলেন, একথা তো কুরআনেই উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৯. অর্থাৎ তিনি কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মুখাপেক্ষী নন। কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ফলে তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্ব সামান্য পরিমাণও বৃদ্ধি পায় না আবার কারো অকৃতজ্ঞতার ফলে তাতে এক চুল পরিমাণ কমতিও হয় না। তিনি নিজস্ব শক্তি বলে সর্বময় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে যাচ্ছেন। বান্দাদের মানা না মানার ওপর তাঁর খোদায়ী কর্তৃত্ব নির্ভরশীল নয়। কুরআন মজীদে একথাটিই এক জায়গায় হযরত মূসার মুখ দিয়ে উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ

اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ –

"যদি তোমরা এবং সারা দুনিয়াবাসীরা মিলে কুফরী করো তাহলেও তাতে আল্লাহর কিছু এসে যায় না এবং আপন সত্তায় আপনি প্রশংসিত।" (ইবরাহীম, ৮)

সহীহ মুসলিমের নিম্নোক্ত হাদীসে কুদসীতেও এ একই বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে ঃ

يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا عِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَتْقٰى قَلْبِ رَجُلٍ مِّنْكُمْ مَازَادَ ذَالِكَ فِىْ مُلْكِىْ شَيْئًا – يَا عِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَالِكَ فِىْ مُلْكِىْ شَيْئًا – يَا عِبَادِىْ اِنَّمَا هِىْ اَعْمَالُكُمْ اُحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ اُوَفِّيْكُمْ اِيَّاهَا – فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَالِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ –

"মহান আল্লাহ বলেন, হে আমার বান্দারা যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা সকল মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী ব্যক্তির হৃদয়ের মতো হয়ে যাও, তাহলে তার ফলে আমার বাদশাহী ও শাসন কর্তৃত্বে কিছুমাত্র বৃদ্ধি ঘটে না। হে আমার বান্দারা। যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা সকল মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে বেশী বদকার ব্যক্তিটির হৃদয়ের মতো হয়ে যাও, তাহলে এর ফলে আমার বাদশাহীতে কোন কমতি দেখা যাবে না। হে আমার বান্দারা। এগুলো তোমাদের নিজেদেরই কর্ম, তোমাদের হিসেবের খাতায় আমি এগুলো গণনা করি, তারপর এগুলোর পুরোপুরি প্রতিদান আমি তোমাদের দিয়ে থাকি। কাজেই যার ভাগ্যে কিছু কল্যাণ এসেছে তার আল্লাহর শোকরগুজারী করা উচিত এবং যে অন্যকিছু লাভ করেছে তার নিজেকে ভর্ৎসনা করা উচিত।"

قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِيْٓ أَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ
لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ أَهٰكَذَا عَرْشُكِ ۭ قَالَتْ كَأَنَّهٗ هُوَ ۚ
وَأُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ﴿٤٢﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ
تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٤٣﴾

সুলাইমান[৫০] বললো, "সে চিনতে না পারে এমনভাবে সিংহাসনটি তার সামনে রেখে দাও, দেখি সে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায় কিনা অথবা যারা সঠিক পথ পায় না তাদের অন্তরভুক্ত হয়।"[৫১] রাণী যখন হাজির হলো, তাকে বলা হলো, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? সে বলতে লাগলো, "এ তো যেন সেটিই।[৫২] আমরা তো আগেই জেনেছিলাম এবং আমরা আনুগত্যের শির নত করে দিয়েছিলাম। (অথবা আমরা মুসলিম হয়ে গিয়েছিলাম।)[৫৩] আল্লাহর পরিবর্তে যেসব উপাস্যের সে পূজা করতো তাদের পূজাই তাকে ঈমান আনা থেকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। কারণ সে ছিল একটি কাফের জাতির অন্তরভুক্ত।[৫৪]

৫০. রাণী কিভাবে বাইতুল মাকদিসে পৌঁছে গেলেন এবং কিভাবে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হলো সে ঘটনা মাঝখানে উহ্য রাখা হয়েছে। এ ঘটনার কথা আলোচনা না করে এবার এখানে যখন তিনি হযরত সুলাইমানের সাথে সাক্ষাত করার জন্য তাঁর মহলে পৌঁছে গেলেন তখনকার কথা আলোচনা করা হচ্ছে।

৫১. তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য। এর অর্থ হচ্ছে, হঠাৎ তিনি স্বদেশ থেকে এত দূরে নিজের সিংহাসন দেখে একথা বুঝতে পারেন কি না যে এটা তাঁরই সিংহাসন এবং এটা উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। আবার এ বিস্ময়কর মু'জিযা দেখে তিনি সত্য-সঠিক পথের সন্ধান পান অথবা নিজের ভ্রষ্টতার মধ্যে অবস্থান করতে থাকেন কি না— এ অর্থও এর মধ্যে নিহিত রয়েছে।

যারা বলেন, হযরত সুলাইমান (আ) এ সিংহাসন হস্তগত করতে চাচ্ছিলেন, এ থেকে তাদের ধারণার ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়। এখানে তিনি নিজেই প্রকাশ করছেন, রাণীকে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্যই তিনি এ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।

৫২. এথেকে তাদের চিন্তার ভ্রান্তিও প্রমাণিত হয়, যারা ঘটনাটিকে কিছুটা এভাবে চিত্রিত করেছেন যেন হযরত সুলাইমান তাঁর সম্মানীয় মেহমানের জন্য একটি সিংহাসন তৈরি করতে চাচ্ছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি টেণ্ডার তলব করলেন। একজন বলিষ্ঠ সুঠামদেহী কারিগর কিছু বেশী সময় নিয়ে সিংহাসন তৈরি করে দেবার প্রস্তাব দিল। কিন্তু অন্য একজন পারদর্শী ওস্তাদ কারিগর বললো, আমি অতি দ্রুত অতি অল্প সময়ের মধ্যে

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ
سَاقَيْهَا ۚ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ
نَفْسِىْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٤﴾

তাকে বলা হলো, প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করো। যেই সে দেখলো মনে করলো বুঝি কোন জলাধার এবং নামার জন্য নিজের পায়ের নিম্নাংশের বস্ত্র উঠিয়ে নিল। সুলাইমান বললো, এতো কাঁচের মসৃণ মেঝে।[৫৫] একথায় সে বলে উঠলো, "হে আমার রব! (আজ পর্যন্ত) আমি নিজের ওপর বড়ই জুলুম করে এসেছি এবং এখন আমি সুলাইমানের সাথে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের আনুগত্য গ্রহণ করছি।"[৫৬]

দেখতে না দেখতেই তৈরি করে দিচ্ছি। একটি মাত্র কথাই এসব জল্পনা–কল্পনার অবসান ঘটাতে সক্ষম সেটি এই যে, হযরত সুলাইমানের (আ) নিজেই রানীর সিংহাসনটিই আনার কথা বলেছিলেন (اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِىْ بِعَرْشِهَا অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসনটি আমার কাছে এনে দিতে পারে?) সিংহাসনটি নিয়ে আসার পর তিনি তারই সিংহাসন অপরিচিত পদ্ধতিতে তারই সামনে উপস্থাপিত করার জন্য কর্মচারীদেরকে হুকুম দিয়েছিলেন نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا । তারপর যখন তিনি এলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সিংহাসন কি এ রকম (اَهٰكَذَا عَرْشُكِ) ? তিনি জাববে বললেন, এটা যেন সেটাই (كَاَنَّهٗ هُوَ) । এ ধরনের সুস্পষ্ট বর্ণনার উপস্থিতিতে ঐসব জল্পনা কল্পনার অবকাশ কোথায়? এরপরও যদি কারো সন্দেহ থাকে তাহলে পরবর্তী বাক্য তাঁকে নিশ্চিন্ত করার জন্য যথেষ্ট।

৫৩. অর্থাৎ এ মু'জিযা দেখার আগেই সুলাইমান আলাইহিস সালামের যেসব গুণাবলী ও বিবরণ আমরা জেনেছিলাম তার ভিত্তিতে আমাদের বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, তিনি নিছক একটি রাজ্যের শাসনকর্তা নন বরং আল্লাহর একজন নবী। যদি এটা মনে করে নেয়া হয় যে, হযরত সুলাইমান (আ) তার জন্য একটি সিংহাসন তৈরী করে রেখে দিয়েছিলেন, তাহলে সিংহাসন দেখার এবং "যেন এটা সেটাই" বলার পর এ বাক্যটি জুড়ে দেয়ার কি স্বার্থকতা থাকে? ধরে নেয়া যাক, যদি রাণীর সিংহাসনের অনুরূপ ঐ সিংহাসনটি তৈরী করা হয়ে থাকে তাহলেও তার মধ্যে এমন কি মাহাত্ম ছিল যার ফলে একজন সূর্য পূজারিনী রাণী তা দেখে বলে উঠলেন اُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ "আমাদের আগেই এ জ্ঞানলাভের সৌভাগ্য হয়েছিল এবং আমরা মুসলিম হয়ে গিয়ে ছিলাম।"

৫৪. এ বাক্যাংশটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর অবস্থান সুস্পষ্ট করার জন্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর মধ্যে জিদ ও একগুয়েমী ছিল না। শুধুমাত্র কাফের জাতির মধ্যে জন্ম নেয়ার কারণেই তিনি তখনো পর্যন্ত কাফের ছিলেন। সচেতন বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী হবার পর থেকেই যে জিনিসের সামনে সিজদানত হবার অভ্যাস তার মধ্যে গড়ে উঠেছিল সেটিই

ছিল তার পথের প্রতিবন্ধক। হযরত সুলাইমানের (আ) মুখোমুখি হবার পর যখন তার চোখ খুলে তখন এ প্রতিবন্ধক দূর হতে এক মুহূর্তও দেরী হয়নি।

৫৫. এটি ছিল রাণীর সামনে প্রকৃত সত্য উদঘাটনকারী সর্বশেষ উপকরণ। প্রথম উপকরণটি ছিল হযরত সুলাইমানের পত্র। সাধারণ বাদশাহী রীতি এড়িয়ে আল্লাহ রহমানুর রহীমের নামে তা শুরু করা হয়েছিল। দ্বিতীয় উপকরণটি ছিল মূল্যবান উপহার সামগ্রী প্রত্যাখ্যান। এ থেকে রাণী বুঝতে পারলেন যে, ইনি এক অসাধারণ রাজা। তৃতীয় উপকরণটি ছিল রাণীর দূতের বর্ণনা। এ থেকে তিনি হযরত সুলাইমানের তাকওয়া ভিত্তিক জীবন, তাঁর প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং তাঁর সত্যের দাওয়াত সম্পর্কে অবহিত হন। এ জিনিসটিই তাঁকে অগ্রণী হয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে উদ্বুদ্ধ করে। নিজের একটি উক্তির মাধ্যমে তিনি এদিকেই ইংগিত করেন। এ উক্তিতে তিনি বলেন ঃ আমরা তো আগেই জেনেছিলাম এবং আমরা মুসলিম হয়ে গিয়েছিলাম। চতুর্থ উপকরণটি ছিল এ মহান মূল্যবান সিংহাসনটির মুহূর্তকালের মধ্যে মায়ারিব থেকে বাইতুল মাকদিসে পৌঁছে যাওয়া। এর ফলে রাণী জানতে পারেন এ ব্যক্তির পেছনে সর্বশক্তিমান আল্লাহর শক্তি রয়েছে। আর এখন সর্বশেষ উপকরণটি ছিল এই যে, রাণী দেখলেন যে ব্যক্তি এহেন আরাম আয়েশ ও পার্থিব ভোগের সামগ্রীর অধিকারী এবং এমন নয়নাভিরাম ও জাঁকালো প্রাসাদে বাস করেন তিনি আত্মগরিমা ও আত্মম্ভরিতা থেকে কত দূরে অবস্থান করেন, তিনি কেমন আল্লাহকে ভয় করেন, কেমন সৎ হৃদয়বৃত্তির অধিকারী, কেমন কথায় কথায় কৃতজ্ঞতায় আল্লাহর সামনে মাথা নত করে দেন এবং পৃথিবী পূজারী লোকদের জীবন থেকে তার জীবন কত ভিন্নতর। এ জিনিসই এমন সব কথা তাঁর মুখ থেকে উচ্চারণ করতে তাঁকে বাধ্য করেছিল, যা সামনের দিকে তাঁর মুখ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

৫৬. হযরত সুলাইমান (আ) ও সাবার রাণীর এ কাহিনী বাইবেলের পুরাতন ও নূতন নিয়মে এবং ইহুদী বর্ণনাবলীতে সব জায়গায় বিভিন্ন ভংগীতে এসেছে। কিন্তু কুরআনের বর্ণনা এদের সবার থেকে আলাদা। পুরাতন নিয়মে এ কাহিনী এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

"আর শিবার রাণী সদাপ্রভুর নামের পক্ষে শলোমনের কীর্তি শুনিয়া গূঢ়বাক্য দ্বারা তাঁহার পরীক্ষা করিতে আসিলেন। তিনি অতি বিপুল ঐশ্বর্যসহ, সুগন্ধি দ্রব্য, অতি বিস্তর স্বর্ণ ও মণিবাহক উষ্ট্রগণ সংগে লইয়া যিরুশালেমে আসিলেন, এবং শলোমনের নিকটে আসিয়া নিজের মনে যাহা ছিল, তাঁহাকে সমস্তই কহিলেন। আর শলোমন তাঁহার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করিলেন;.....এই প্রকারে শিবার রাণী শলোমনের সমস্ত জ্ঞান ও তাঁহার নির্মিত গৃহ, এবং তাঁহার মেজের খাদ্য দ্রব্য ও তাঁহার সেবকদের উপবেশন ও দণ্ডায়মান পরিচারকদের শ্রেণী ও তাহাদের পরিচ্ছদ এবং তাঁহার পানপাত্র বাহকগণ ও সদাপ্রভুর গৃহে উঠিবার জন্য তাঁহার নির্মিত সোপান, এই সকল দেখিয়া হত জ্ঞান হইলেন। আর তিনি রাজাকে কহিলেন, আমি আপন দেশে থাকিয়া আপনার বাক্য ও জ্ঞানের বিষয় যেকথা শুনিয়াছিলাম, তাহা সত্য। কিন্তু আমি যাবৎ আসিয়া স্বচক্ষে না দেখিলাম, তাবৎ সেই কথায় আমার বিশ্বাস হয় নাই; আর দেখুন, অর্ধেকও আমাকে বলা হয় নাই; আমি যে খ্যাতি শুনিয়াছিলাম, তাহা হইতেও আপনার জ্ঞান ও মঙ্গল অধিক। ধন্য আপনার লোকেরা, ধন্য আপনার

এই দাসেরা, যাহারা নিয়ত আপনার সম্মুখে দাঁড়ায়, যাহারা আপনার জ্ঞানের উক্তি শুনে। ধন্য আপনার ইশ্বর সদাপ্রভু, যিনি আপনাকে ইসরাঈলের সিংহাসনে বসাইবার জন্য আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন.....পরে তিনি বাদশাহকে একশত বিশ তালন্ত স্বর্ণ ও অতি প্রচুর সুগন্ধি দ্রব্য ও মণি উপঢৌকন দিলেন, শিবার রাণী শলোমন রাজাকে যত সুগন্ধি দ্রব্য দিলেন, তত প্রচুর সুগন্ধি দ্রব্য আর কখনো আসে নাই।.....আর শলোমন রাজা শিবার রাণীর বাসনা অনুসারে তাঁহার যাবতীয় বাঞ্ছিত দ্রব্য দিলেন, তাহা ছাড়া শলোমন আপন রাজকীয় দানশীলতা অনুসারে তাঁহাকে আরও দিলেন। পরে তিনি ও তাঁহার দাসগণ স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন।" (১-রাজাবলী ১০ঃ১-১৩ প্রায় একই বিষয়বস্তু সম্বলিত কথা ২-বংশাবলী ৯ঃ১-১২ তেও এসেছে।)

নতুন নিয়মে হযরত ঈসার ভাষণের শুধুমাত্র একটি বাক্য সাবার রাণী সম্পর্কে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

"দক্ষিণ দেশের রাণী বিচারে এই কালের লোকদের সহিত উঠিয়া ইহাদিগকে দোষী করিবেন; কেননা শলোমনের জ্ঞানের কথা শুনিবার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত হইতে আসিয়াছিলেন, আর দেখ শলোমন হইতে মহান এক ব্যক্তি এখানে আছেন।" (মথি ১২ঃ৪২ এবং লূক ১১ঃ৩১)

ইহুদী রব্বীরা হযরত সুলাইমান ও সাবার রাণীর যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন তার বেশীর ভাগ বিস্তারিত বিবরণ কুরআনের সাথে মিলে যায়। হুদ্‌হুদ পাখির অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, তারপর ফিরে এসে তার সাবার রাণীর অবস্থা বর্ণনা করা, তার মাধ্যমে হযরত সুলাইমানের পত্র পাঠানো, হুদ্‌হুদের পত্রটি ঠিক তখনই রাণীর সামনে ফেলে দেয়া যখন তিনি সূর্য পূজা করতে যাচ্ছিলেন, পত্রটি দেখে রাণীর মন্ত্রীপরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠান করা, তারপর রাণীর একটি মূল্যবান উপঢৌকন সুলাইমানের কাছে পাঠানো, নিজে জেরুসালেমে এসে তাঁর সাথে সাক্ষাত করা, তাঁর সুলাইমানের মহলে এসে বাদশাহ জলাধারের মধ্যে বসে আছেন বলে মনে করা এবং তাতে নেমে পড়ার জন্য নিজের পরণের কাপড় হাঁটুর কাছে উঠিয়ে নেয়া— এসব সে বর্ণনাগুলোতে কুরআনে যেমনি আছে ঠিক তেমনিভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু এ উপঢৌকন লাভ করার পর হযরত সুলাইমানের জবাব, রাণীর সিংহাসন উঠিয়ে আনা, প্রত্যেকটি ঘটনায় তাঁর আল্লাহর সামনে মাথা নত করা এবং সবশেষে তাঁর হাতে রাণীর ঈমান আনা—এসব কথা এমনকি আল্লাহর আনুগত্য ও তাওহীদের সমস্ত কথাই এ বর্ণনাগুলোতে অনুপস্থিত। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হচ্ছে, এই জালেমরা হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন যে, তিনি সাবার রাণীর সাথে নাউযুবিল্লাহ ব্যভিচার করেন। আর এর ফলে যে জারজ সন্তানটি জন্মলাভ করে সে-ই হয় পরবিতীকালে বাইতুল মাকদিস ধ্বংসকারী ব্যবিলনের বাদশাহ বখ্‌তে নাস্‌সার। (জুয়িশ ইনসাইক্লোপিডিয়া, ১১ খণ্ড ৪৪৩ পৃষ্ঠা) আসল ব্যাপার হচ্ছে, ইহুদী আলেমদের একটি দল হযরত সুলাইমানের কঠোর বিরোধী ছিল। তারা তাঁর বিরুদ্ধে তাওরাতের বিধানের বিরুদ্ধাচরণ, রাষ্ট্র পরিচালনায় আত্মম্ভরিতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অহংকার, নারী আসক্তি, বিলাসী জীবন যাপন এবং শির্‌ক ও মূর্তি পূজার জঘন্য অভিযোগ এনেছেন। (জুয়িশ ইনসাইক্লোপিডিয়া, ১১ খণ্ড, ৪৩৯-৪৪১ পৃষ্ঠা) এ প্রচারনার প্রভাবে বাইবেল তাঁকে নবীর পরিবর্তে নিছক একজন বাদশাহ হিসেবেই উল্লেখ করেছে।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ
يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۖ
لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾

৪ রুকূ'

আর আমি[৫৭] সামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে (এ পয়গাম সহকারে) পাঠালাম যে, আল্লাহর বন্দেগী করো এমন সময় সহসা তারা দু'টি বিবদমান দলে বিভক্ত হয়ে গেলো।[৫৮] সালেহ বললো, "হে আমার জাতির লোকেরা! ভালোর পূর্বে তোমরা মন্দকে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছো কেন?[৫৯] আল্লাহর কাছে মাগফেরাত চাচ্ছো না কেন? হয়তো তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা যেতে পারে।"

আবার বাদশাহও এমন যিনি নাউযুবিল্লাহ আল্লাহর হুকুমের বরখেলাফ মুশরিক মেয়েদের প্রেমে মত্ত হয়ে গেছেন। যাঁর অন্তর আল্লাহ বিমুখ হয়ে গেছে এবং যিনি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য মাবুদদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। (১ রাজাবলী ১১ঃ ১–১১) এসব দেখে বুঝা যায় কুরআন বনী ইসরাঈলদের প্রতি কত বড় অনুগ্রহ করেছে। নিজেদের জাতীয় মনীষীদের জীবন ও চরিত্রকে তারা নিজেরাই কলুষিত করেছে এবং কুরআন সেই কলুষ কালিমা ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে। অথচ এ বনী ইসরাঈল কতই অকৃতজ্ঞ জাতি, এরপরও তারা কুরআন ও তার বাহককে নিজেদের সবচেয়ে বড় দুশমন মনে করে।

৫৭. তুলনামূলক অধ্যায়নের জন্য সূরা আল আ'রাফের ৭৩ থেকে ৭৯, হূদের ৬১ থেকে ৬৮, আশ্ শু'আরার ৪১ থেকে ৫৯, আল কামারের ২৩ থেকে ৩২ এবং আশ্ শামসের ১১ থেকে ১৫ আয়াত পড়ুন।

৫৮. অর্থাৎ হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের দাওয়াত শুরু হবার সাথে সাথেই তাঁর জাতি দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে গেলো। একটি দল মু'মিনদের এবং অন্যটি অস্বীকারকারীদের এ বিভক্তির সাথে সাথেই তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতও শুরু হয়ে গেলো। যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ
مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ ۚ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ
مُؤْمِنُونَ ۝ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ –

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ۚ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ﴿٤٧﴾

তারা বললো, "আমরা তো তোমাকে ও তোমার সাথিদেরকে অমংগলের নিদর্শন হিসেবে পেয়েছি।"[৬০] সালেহ জবাব দিল, তোমাদের মংগল অমংগলের উৎস তো আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ, আসলে তোমাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে।"[৬১]

"তার জাতির শ্রেষ্ঠত্বের গর্বে গর্বিত সরদাররা দলিত ও নিষ্পেষিত জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে বললো, সত্যই কি তোমরা জানো, সালেহ তার রবের পক্ষ থেকে পাঠানো একজন নবী? তারা জবাব দিল, তাকে যে জিনিস সহকারে পাঠানো হয়েছে আমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান রাখি। এ অহংকারীরা বললো, তোমরা যে জিনিসের প্রতি ঈমান এনেছো আমরা তা মানি না।" (আ'রাফ ৭৫–৭৬ আয়াত)

মনে রাখতে হবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের সাথে সাথে মক্কায়ও এ একই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তখনও জাতি দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছিল এবং সাথে সাথেই তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাই যে অবস্থার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল তার সাথে এ কাহিনী আপনা থেকেই খাপ খেয়ে যাচ্ছিল।

৫৯. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে কল্যাণ চাওয়ার পরিবর্তে অকল্যাণ চাওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছো কেন? অন্য জায়গায় সালেহের জাতির সরদারদের এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ

يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ –

"হে সালেহ! আনো সেই আযাব আমাদের ওপর, যার হুমকি তুমি আমাদের দিয়ে থাকো, যদি সত্যি তুমি রসূল হয়ে থাকো।" (আল আ'রাফ ঃ ৭৭)

৬০. তাদের উক্তির একটি অর্থ হচ্ছে এই যে, তোমার এ আন্দোলন আমাদের জন্য বড়ই অমংগলজনক প্রমাণিত হয়েছে। যখন থেকে তুমি ও তোমার সাথীরা পূর্বপুরুষদের ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে দিয়েছো তখন থেকেই নিত্যদিন আমাদের ওপর কোন না কোন বিপদ আসছে। কারণ আমাদের উপাস্যরা আমাদের প্রতি নারাজ হয়ে গেছে। এ অর্থের দিক দিয়ে আলোচ্য উক্তিটি সেই সব মুশরিক জাতির উক্তির সাথে সামঞ্জস্যশীল, যারা নিজেদের নবীদেরকে অপয়া গণ্য করতো। সূরা ইয়াসীনে একটি জাতির কথা বলা হয়েছে। তারা তাদের নবীদেরকে বললো ঃ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ "আমরা তোমাদের অপয়া পেয়েছি" (১৮ আয়াত) হযরত মূসা সম্পর্কে ফেরাউনের জাতি এ কথাই বলতো ঃ

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ –

"যখন তাদের সুসময় আসতো, তারা বলতো আমাদের এটাই প্রাপ্য এবং যখন কোন বিপদ আসতো তখন মুসা ও তার সাথিদের কুলক্ষুণে হওয়াটাকে এ জন্য দায়ী মনে করতো।" (আল আ'রাফঃ ১৩০ আয়াত)

প্রায় একই ধরনের কথা মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কেও বলা হতো।

এ উক্তিটির দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমার আসার সাথে সাথেই আমাদের জাতির মধ্যে বিভেদ দেখা দিয়েছে। পূর্বে আমরা ছিলাম এক জাতি। এক ধর্মের ভিত্তিতে আমরা সবাই একত্র সংঘবদ্ধ ছিলাম। তুমি এমন অপয়া ব্যক্তি এলে যে, তোমার আসার সাথে সাথেই ভাই-ভাইয়ের দুশমন হয়ে গেছে এবং পুত্র-পিতা থেকে আলাদা হয়ে গেছে। এভাবে জাতির মধ্যে আর একটি নতুন জাতির উত্থানের পরিণাম আমাদের চোখে ভালো ঠেকছে না। এ অভিযোগটিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে বারবার পেশ করতো। তাঁর দাওয়াতের সূচনাতেই কুরাইশ সরদারদের যে প্রতিনিধি দলটি আবু তালেবের নিকট এসেছিল তারা এ কথাই বলেছিল ঃ "আপনার এ ভাতিজাকে আমাদের হাতে সোপর্দ করে দিন। সে আপনার ও আপনার বাপদাদার ধর্মের বিরোধিতা করছে, আপনার জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং সমগ্র জাতিকে বেকুব গণ্য করেছে।" ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা) হজ্জের সময় মক্কার কাফেরদের যখন আশংকা হলো যে, বাইরের যিয়ারতকারীরা এসে যেন আবার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে যেতে পারে। তখন তারা পরস্পর পরামর্শ করার পর আরব গোত্রগুলোকে একথা বলার সিদ্ধান্ত নেয় ঃ

"এ ব্যক্তি একজন যাদুকর। এর যাদুর প্রভাবে পুত্র-পিতা থেকে, ভাই-ভাই থেকে, স্ত্রী-স্বামী থেকে এবং মানুষ তার সমগ্র পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।" (ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড ২৮৯ পৃষ্ঠা)

৬১. অর্থাৎ তোমরা যা মনে করছো আসল ব্যাপার তা নয়। আসল ব্যাপারটি তোমরা এখনো বুঝতে পারোনি। সেটি হচ্ছে, আমার আসার ফলে তোমাদের পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। যতদিন আমি আসিনি ততদিন তোমরা নিজেদের মূর্খতার পথে চলছিলে। তোমাদের সামনে হক ও বাতিলের কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য-রেখা ছিল না। ভেজাল ও নির্ভেজাল যাচাই করার কোন মানদণ্ড ছিল না। অত্যধিক নিকৃষ্ট লোকেরা উঁচুতে উঠে যাচ্ছিল এবং সবচেয়ে ভালো যোগ্যতা সম্পন্ন লোকেরা মাটিতে মিশে যাচ্ছিল। কিন্তু এখন একটি মানদণ্ড এসে গেছে। তোমাদের সবাইকে এখানে যাচাই ও পরখ করা হবে। এখন মাঠের মাঝখানে একটি তুলাদণ্ড রেখে দেয়া হয়েছে। এ তুলাদণ্ড প্রত্যেককে তার ওজন অনুযায়ী পরিমাপ করবে। এখন হক ও বাতিল মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। যে হককে গ্রহণ করবে সে ওজনে ভারী হয়ে যাবে, চাই এ যাবত তার মূল্য কানাকড়িও না থেকে থাকুক। আর যে বাতিলের ওপর অবিচল থাকবে তার ওজন এক রত্তিও হবে না। চাই এ যাবত সে সর্বোচ্চ নেতার পদেই অধিষ্ঠিত থেকে থাকুক না কেন। কে কোন্ পরিবারের লোক, কার সহায় সম্পদ কি পরিমাণ আছে এবং কে কতটা শক্তির অধিকারী তার ভিত্তিতে এখন আর কোন ফায়সালা হবে না। বরং কে সোজাভাবে সত্যকে গ্রহণ করে এবং কে মিথ্যার সাথে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়ে দেয়- এরি ভিত্তিতে ফায়সালা হবে।

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا
يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ
مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا
مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا
دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ۗ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا
يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾

সে শহরে ছিল ন'জন দল নায়ক[৬২] যারা দেশের বিপর্যয় সৃষ্টি করতো এবং কোন গঠনমূলক কাজ করতো না। তারা পরস্পর বললো, "আল্লাহর কসম খেয়ে শপথ করে নাও, আমরা সালেহ ও তার পরিবার পরিজনদের ওপর নৈশ আক্রমণ চালাবো এবং তারপর তার অভিভাবককে[৬৩] বলে দেবো আমরা তার পরিবারের ধ্বংসের সময় উপস্থিত ছিলাম না, আমরা একদম সত্য কথা বলছি।"[৬৪] এ চক্রান্ত তো তারা করলো এবং তারপর আমি একটি কৌশল অবলম্বন করলাম, যার কোন খবর তারা রাখতো না।[৬৫] অবশেষে তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হলো দেখে নাও। আমি তাদেরকে এবং তাদের সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করে দিলাম। ঐ যে তাদের গৃহ তাদের জুলুমের কারণে শূন্য পড়ে আছে, তার মধ্যে রয়েছে একটি শিক্ষনীয় নিদর্শন যারা জ্ঞানবান তাদের জন্যে।[৬৬] আর যারা ঈমান এনেছিল এবং নাফরমানী থেকে দূরে অবস্থান করতো তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি।

৬২. অর্থাৎ ন'জন উপজাতীয় সরদার। তাদের প্রত্যেকের সাথে ছিল একটি বিরাট দল।

৬৩. অর্থাৎ হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের গোত্রের সরদারকে। প্রাচীন গোত্রীয় রেওয়াজ অনুযায়ী তাঁকে হত্যা করার বিরুদ্ধে তাঁর গোত্রীয় সরদারেরই রক্তের দাবী পেশ করার অধিকার ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায় তার চাচা আবু তালেবেরও এ একই অধিকার ছিল। কুরাইশ বংশীয় কাফেররাও এ আশংকায় পিছিয়ে আসতো যে, যদি তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করে ফেলে তাহলে বনু হাশেমের সরদার আবু তালেব নিজের গোত্রের পক্ষ থেকে তাঁর খুনের বদলা নেবার দাবী নিয়ে এগিয়ে আসবে।

৬৪. হুবহু এ একই ধরনের চক্রান্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে করার জন্য মক্কার গোত্রীয় সরদাররা চিন্তা করতো। অবশেষে হিজরতের সময় তারা নবীকে (সা) হত্যা করার জন্য এ চক্রান্ত করলো। অর্থাৎ তারা সব গোত্রের লোক একত্র হয়ে তাঁর ওপর হামলা করবে। এর ফলে বনু হাশেম কোন একটি বিশেষ গোত্রকে অপরাধী গণ্য করতে পারবে না এবং সকল গোত্রের সাথে একই সংগে লড়াই করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

৬৫. অর্থাৎ তারা নিজেদের স্থিরীকৃত সময়ে হযরত সালেহের ওপর নৈশ আক্রমণ করার পূর্বেই আল্লাহ তাঁর আযাব নাযিল করলেন এবং এর ফলে কেবলমাত্র তারা নিজেরাই নয় বরং তাদের সমগ্র সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেলো। মনে হয়, উটনীর পায়ের রগ কেটে ফেলার পর তারা এ চক্রান্তটি করেছিল। সূরা হূদে বলা হয়েছে, যখন তারা উটনীকে মেরে ফেললো তখন হযরত সালেহ তাদেরকে নোটিশ দিলেন। তাদেরকে বললেন, ব্যস, আর মাত্র তিন দিন ফূর্তি করে নাও, তারপর তোমাদের ওপর আযাব এসে যাবে (فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ، ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ) একথায় সম্ভবত তারা চিন্তা করেছিল, সালেহের (আ) কথিত আযাব আসুক বা না আসুক আমরা উটনীর সাথে তারও বা দফা রফা করে দিই না কেন। কাজেই খুব সম্ভবত নৈশ আক্রমণ করার জন্য তারা সেই রাতটিই বেছে নেয়, যে রাতে আযাব আসার কথা ছিল এবং হযরত সালেহের গায়ে তারা হাত দেবার আগেই আল্লাহর জবরদস্ত হাত তাদেরকে পাকড়াও করে ফেললো।

৬৬. অর্থাৎ মূর্খদের ব্যাপার আলাদা। তারা তো বলবে, সামূদ জাতি যে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয় তার সাথে হযরত সালেহ ও তাঁর উটনীর কোন সম্পর্ক নেই। এসব তো প্রাকৃতিক কারণে হয়ে থাকে। এ এলাকায় কে সৎকাজ করতো এবং কে অসৎকাজ করতো আর কে কার ওপর জুলুম করেছিল এবং কে করেছিল অনুগ্রহ, ভূমিকম্প ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসার ওপর এসব বিষয়ের কোন দখল নেই। অমুক শহর বা অমুক এলাকা ফাসেকী ও অশ্লীল কার্যকলাপে ভরে গিয়েছিল তাই সেখানে বন্যা এসেছিল বা ভূমিকম্প দ্বারা সে এলাকাটিকে ওলট পালট করে দেয়া হয়েছিল। কিংবা কোন আকস্মিক মহা প্রলয় তাকে বিধ্বস্ত করেছিল, এসব নিছক ওয়াজ নসিহতকারীদের গালভরা বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু চিন্তাশীল ও জ্ঞানবান লোক মাত্রই জানেন, কোন অন্ধ ও বধির আল্লাহ এ বিশ্ব-জাহানের ওপর রাজত্ব করছেন না বরং এক সর্বজ্ঞ ও পরম বিজ্ঞ সত্তা এখানে সকলের ভাগ্যের নিষ্পত্তি করছেন। তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ প্রাকৃতিক কার্যকারণের অধীন নয় বরং প্রাকৃতিক কার্যকারণসমূহ তাঁর ইচ্ছার অধীন। তিনি চোখ বন্ধ করে জাতিসমূহের উত্থান-পতনের ফায়সালা করেন না বরং বিজ্ঞতা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে করেন। একটি প্রতিদান ও প্রতিশোধের আইনও তাঁর আইনগ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ আইনের দৃষ্টিতে নৈতিক ভিত্তিতে এ দুনিয়াতেও জালেমকে শাস্তি দেয়া হয়। এ সত্যগুলো সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তিরা কখনো ঐ ভূমিকম্পকে প্রাকৃতিক কারণ প্রসূত বলে এড়িয়ে যেতে চাইবে না। তারা তাকে নিজেদের জন্য সতর্কীকরণ মূলক বেত্রাঘাত মনে করবে। তা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে। স্রষ্টা যেসব নৈতিক কারণের ভিত্তিতে নিজের সৃষ্ট একটি সমৃদ্ধ বিকাশমান জাতিকে ধ্বংস করে দেন তারা তার নৈতিক কারণসমূহ অনুধাবন করার

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَئِنَّكُمْ
لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾
فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ
إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا
مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿٥٨﴾

আর[৬৭] লূতকে আমি পাঠালাম। স্মরণ করো তখনকার কথা যখন সে তার জাতিকে বললো, "তোমরা জেনে বুঝে বদকাম করছো?[৬৮] তোমাদের কি এটাই রীতি, কাম-তৃপ্তির জন্য তোমরা মেয়েদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছে যাও? আসলে তোমরা ভয়ানক মূর্খতায় লিপ্ত হয়েছো।"[৬৯] কিন্তু সে জাতির এছাড়া আর কোন জবাব ছিল না যে, তারা বললো, "লূতের পরিবারবর্গকে তাদের নিজেদের জনপদ থেকে বের করে দাও, এরা বড় পাক-পবিত্র সাজতে চাচ্ছে।" শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে বাঁচিয়ে নিলাম তবে তার স্ত্রীকে নয়। কারণ তার পেছনে থেকে যাওয়াটাই আমি স্থির করে দিয়েছিলাম।[৭০] আর বর্ষণ করলাম তাদের ওপর একটি বৃষ্টি, বড়ই নিকৃষ্ট ছিল সেই বৃষ্টি যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের জন্য।

চেষ্টা করবে। তারা নিজেদের কর্মনীতিকে এমন পথ থেকে সরিয়ে আনবে যে পথে আল্লাহর গযব আসে এবং এমন পথে তাকে পরিচালিত করবে যে পথে তাঁর রহমত নাযিল হয়।

৬৭. তুলনামূলক অধ্যায়নের জন্য দেখুন আল আ'রাফ ৮০ থেকে ৮৪, হূদ ৭৪ থেকে ৮৩, আল হিজর ৫৭ থেকে ৭৭, আল আম্বিয়া ৭১ থেকে ৭৫, আশ্ শু'আরা ১৬০ থেকে ১৭৪, আল আনকাবুত ২৮-৭৫, আস্ সাফ্‌ফাত ১৩৩ থেকে ১৩৮ এবং আল কামার ৩৩ থেকে ৩৯ আয়াত।

৬৮. এ উক্তির কয়েকটি অর্থ হতে পারে। সম্ভবত এ সবগুলো অর্থই এখানে প্রযোজ্য। এক, এ কাজটি যে অশ্লীল ও খারাপ তা তোমরা জানো না এমন নয়। বরং জেনে বুঝে তোমরা এ কাজ করো। দুই, একথাটিও তোমাদের অজানা নেই যে, পুরুষের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য পুরুষকে সৃষ্টি করা হয়নি বরং এজন্য নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পুরুষ ও নারীর পার্থক্য এমন নয় যে, তা তোমাদের চোখে ধরা পড়ে না বরং তোমরা চোখে দেখেই এ জ্বলজ্যান্ত মাছি গিলে ফেলছো। তিন, তোমরা প্রকাশ্যে এ অশ্লীল কাজ করে

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ؕ آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝٥٩

৫ রুকূ'

(হে নবী!)[৭১] *বলো, প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং সালাম তাঁর এমনসব বান্দাদের প্রতি যাদেরকে তিনি নির্বাচিত করেছেন।*

(তাদেরকে জিজ্ঞেস করো) আল্লাহ ভালো অথবা সেই সব মাবুদরা ভালো যাদেরকে তারা তাঁর শরীক করছে?[৭২]

যাচ্ছো। অন্যদিকে চক্ষুষ্মান লোকেরা তোমাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করছে, যেমন সামনের দিকে সূরা আনকাবুতে বলা হয়েছে ঃ

وَتَاْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ –

"আর তোমরা নিজেদের মজলিসে বদকাম করে থাকো" (২৯ আয়াত)

৬৯. মূলে জিহালত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে এখানে নির্বুদ্ধিতা ও বোকামি। গালি গালাজ ও বেহুদা কাজ কারবার করলেও তাকে জাহেলী কাজ বলা হয়। আরবী ভাষাতে শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا (الفرقان : ٦٣)

কিন্তু যদি এ শব্দটিকে জ্ঞানহীনতা অর্থে ব্যবহার করা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে, তোমরা নিজেদের এ খারাপ কাজটির পরিণাম জানো না। তোমরা তো একথা জানো, তোমরা যা অর্জন করছো তা প্রবৃত্তিকে তৃপ্তি দান করে। কিন্তু তোমরা জানো না এ চরম অপরাধমূলক ও জঘন্য ভোগ লিপ্সার জন্য শীঘ্রই তোমাদের কেমন কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহর আযাব তোমাদের ওপর অতর্কিতে নেমে পড়ার জন্য তৈরি হয়ে আছে। অথচ তোমরা পরিণামের কথা না ভেবে নিজেদের এ জঘন্য খেলায় মত্ত হয়ে আছো।

৭০. অর্থাৎ পূর্বেই হযরত লূতকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তিনি যেন এ মহিলাকে নিজের সহযোগী না করেন। কারণ তার নিজের জাতির সাথেই তাকে ধ্বংস হতে হবে।

৭১. এখান থেকে দ্বিতীয় ভাষণ শুরু হচ্ছে। এ বাক্যটি হচ্ছে তার ভূমিকা। এ ভূমিকার মাধ্যমে মুসলমানরা কিভাবে তাদের বক্তৃতা শুরু করবে তা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এরি ভিত্তিতেই সঠিক ইসলামী চিন্তা ও মানসিকতা সম্পন্ন লোকেরা সব সময় আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁর সৎ বান্দাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার দোয়া করে তাদের বক্তৃতা শুরু করে থাকেন। কিন্তু আজকাল একে মোল্লাকী মনে করা হয়ে থাকে। এবং এ যুগের মুসলিম বক্তারা তো এর মাধ্যমে বক্তৃতা শুরু করার কথা কল্পনাই করতে পারেন না অথবা এভাবে বক্তৃতা শুরু করতে তারা লজ্জা অনুভব করেন।

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ
مَاءً ۚ فَأَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْۢبِتُوا
شَجَرَهَا ۗ أَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ۝

কে তিনি যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন তারপর তার সাহায্যে সুদৃশ্য বাগান উৎপাদন করেছেন, যার গাছপালা উৎপন্ন করাও তোমাদের আয়ত্বাধীন ছিল না? আল্লাহর সাথে কি (এসব কাজে অংশীদার) অন্য ইলাহও আছে?[৭৩] (না,) বরং এরাই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে এগিয়ে চলছে।

৭২. আল্লাহ ভালো না এসব মিথ্যা মাবুদ ভালো, এ প্রশ্নটি আপাত দৃষ্টিতে বড়ই অদ্ভুত মনে হয়। প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা উপাস্যদের মধ্যে তো আদৌ কোন ভালাই নেই যে, আল্লাহর সাথে তাদের তুলনা করা যেতে পারে। মুশরিকরাও আল্লাহর সাথে এ উপাস্যদের তুলনা করা যেতে পারে এমন কথা ভাবতো না। কিন্তু তারা যাতে নিজেদের ভুলের ব্যাপারে সতর্ক হয় সেজন্য এ প্রশ্ন তাদের সামনে রাখা হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট, কোন ব্যক্তি দুনিয়ায় ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কাজ করে না যতক্ষণ না সে তার নিজের দৃষ্টিতে তার মধ্যে কোন কল্যাণ বা লাভের সন্ধান পায় এখন এ মুশরিকরা আল্লাহর ইবাদাতের পরিবর্তে ঐ উপাস্যদের ইবাদাত করতো, আল্লাহর পরিবর্তে তাদের কাছে নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য দোয়া করতো এবং তাদের সামনে নজরানা পেশ করতো। অথচ ঐ উপাস্যদের মধ্যে যখন কোন কল্যাণ নেই তখন তাদের এসব করার কোন অর্থই ছিল না। তাই তাদের সামনে পরিষ্কার ভাষায় এ প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, বলো, আল্লাহ ভালো না তোমাদের ঐসব উপাস্যরা? কারণ এ দ্ব্যর্থহীন প্রশ্নের সম্মুখীন হবার হিম্মত তাদের ছিল না। তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে কট্টর মুশরিকও একথা বলার সাহস করতে পারতো না যে, আমাদের উপাস্যরা ভালো। আর আল্লাহ ভালো একথা মেনে নেবার পর তাদের ধর্মের পুরো ভিত্তিটাই ধ্বসে পড়তো, কারণ এরপর ভালোকে বাদ দিয়ে মন্দকে গ্রহণ করা পুরোপুরি অযৌক্তিক হয়ে দাঁড়াতো।

এভাবে কুরআন তার ভাষণের প্রথম বাক্যেই বিরোধীদেরকে লা জবাব ও অসহায় করে দিয়েছে। এরপর এখন আল্লাহর শক্তিমত্তা এবং তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি বৈচিত্রের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, এটা কার কাজ বলো? আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহও কি এ কাজে শরীক আছে? যদি না থেকে থাকে তাহলে তোমরা এই যাদেরকে উপাস্য করে রেখেছো এদের কি স্বার্থকতা আছে?

হাদীসে বলা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আয়াতটি তেলাওয়াত করতেন তখন সংগে সংগেই এর জবাবে বলতেন ঃ

بَلِ اللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى وَاَجَلُّ وَاَكْرَمُ -

"বরং আল্লাহই ভালো এবং তিনিই চিরস্থায়ী, মর্যাদা সম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠ।"

৭৩. মুশরিকদের একজনও একথার জবাবে বলতে পারতো না, একাজ আল্লাহর নয়, অন্য কারো অথবা আল্লাহর সাথে অন্য কেউ তাঁর একাজে শরীক আছে। কুরআন মজীদে অন্যান্য স্থানে মক্কার কাফের সমাজ ও আরব মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ -

"যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, পৃথিবী ও আকাশসমূহ কে সৃষ্টি করেছে? তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, মহা পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী সত্তাই এসব সৃষ্টি করেছেন।"

(আয্ যুখরুফ ঃ ৯)

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ -

"আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ। (আয্ যুখরুফ-৮৭)

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ -

"আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছে এবং মৃত পতিত জমি কে জীবিত করেছে? তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে আল্লাহ।"

(আনকাবুতঃ ৬৩ আয়াত)

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ..... وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ -

"তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবিকা দান করেন? এ শ্রবণ ও দর্শনের শক্তি কার নিয়ন্ত্রণাধীন? কে সজীবকে নির্জীব এবং নির্জীবকে সজীব করেন? কে এ বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন? তারা নিশ্চয়ই বলবে আল্লাহ। (ইউনুস ঃ ৩১ আয়াত)

আরবের মুশরিকরা এবং সারা দুনিয়ার মুশরিকরা সাধারণত একথা স্বীকার করতো এবং আজো স্বীকার করে যে, আল্লাহই বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা এবং বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনাকারী। তাই কুরআন মজীদের এ প্রশ্নের জবাবে তাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি নিতান্ত হঠকারিতা ও গোয়ার্তমীর আশ্রয় নিয়েও নিছক বিতর্কের খাতিরেও বলতে পারতো না যে, আমাদের উপাস্য দেবতারা আল্লাহর সাথে এসব কাজে শরীক আছে। কারণ যদি তারা

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ أَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ
بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

আর তিনি কে, যিনি পৃথিবীকে করেছেন অবস্থানলাভের উপযোগী[৭৪] এবং তার মধ্যে প্রবাহিত করেছেন নদ-নদী এবং তার মধ্যে গেড়ে দিয়েছেন (পর্বতমালার) পেরেক, আর পানির দু'টি ভাণ্ডারের মাঝখানে অন্তরাল সৃষ্টি করে দিয়েছেন।[৭৫] আল্লাহর সাথে (এসব কাজে শরীক) অন্য কোন ইলাহ আছে কি? না, বরং এদের অধিকাংশই অজ্ঞ।

একথা বলতো তাহলে তাদের নিজেদের জাতির হাজার হাজার লোক তাদেরকে মিথ্যুক বলতো এবং তারা পরিষ্কার বলে দিতো, এটা আমাদের আকীদা নয়।

এ প্রশ্ন এবং এর পরবর্তী প্রশ্নগুলোতে শুধুমাত্র শিরকই বাতিল করা হয়নি বরং নাস্তিক্যবাদকেও বাতিল করে দেয়া হয়েছে। যেমন এ প্রথম প্রশ্নেই জিজ্ঞেস করা হয়েছে ঃ এই বৃষ্টি বর্ষণকারী এবং এর সাহায্যে সবরকম উদ্ভিদ উৎপাদনকারী কে? এখন চিন্তা করুন, অজস্র রকমের উদ্ভিদের জীবনের জন্য যে ধরনের উপাদান প্রয়োজন, ভূমিতে তার ঠিক উপরিভাগে অথবা উপরিভাগের কাছাকাছি এসব জিনিসের মজুত থাকা এবং পানির মধ্যে ঠিক এমন ধরনের গুণাবলী থাকা যা প্রাণী ও উদ্ভিদ জীবনের প্রয়োজন পূর্ণ করে এবং এ পানিকে অনবরত সমুদ্র থেকে উঠানো এবং জমির বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময় যথানিয়মে বর্ষণ করা আর মাটি, বাতাস, পানি ও তাপমাত্রা ইত্যাদি বিভিন্ন শক্তির মধ্যে এমন পর্যায়ের আনুপাতিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা যার ফলে উদ্ভিদ জীবন বিকাশ লাভ করতে পারে এবং সব রকমের জৈব জীবনের জন্য তার অসংখ্য প্রয়োজন পূর্ণ করতে সক্ষম হয়, এসব কিছু কি একজন জ্ঞানবান সত্তার পরিকল্পনা ও সুবিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা এবং প্রবল শক্তি ও সংকল্প ছাড়াই আপনা আপনি হয়ে যেতে পারে? আর এ ধরনের আকস্মিক ঘটনা কি অনবরত হাজার বছর বরং লাখো কোটি বছর ধরে যথা নিয়মে ঘটে যাওয়া সম্ভবপর? প্রবল আক্রোস ও বিদ্বেষে অন্ধ একজন চরম হঠকারী ব্যক্তিই কেবল একে একটি আকস্মিক ঘটনা বলতে পারে। কোন সত্য প্রিয় বুদ্ধি ও বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষে এ ধরনের অযৌক্তিক ও অর্থহীন দাবী করা এবং তা মেনে নেয়া সম্ভব নয়।

৭৪. পৃথিবী যে, অজস্র ধরনের বিচিত্র সৃষ্টির আবাসস্থল ও অবস্থান স্থল হয়েছে এটাও কোন সহজ ব্যাপার নয়। যে বৈজ্ঞানিক সমতা ও সামঞ্জস্যশীলতার মাধ্যমে এ গ্রহটিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিষয়াবলী সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করলে মানুষ বিস্ময়াভিভূত না হয়ে পারে না। সে অনুভব করতে থাকে, এমন ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যশীলতা একজন জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ ও পূর্ণ শক্তি সম্পন্ন সত্তার ব্যবস্থাপনা ছাড়া প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। এ ভূ-গোলকটি মহাশূন্যে ঝুলছে। কারো ওপর ভর দিয়ে অবস্থান করছে না। কিন্তু এ সত্ত্বেও এর মধ্যে কোন কম্পন ও অস্থিরতা নেই। পৃথিবীর কোথাও মাঝে মধ্যে সীমিত পর্যায়ে ভূমিকম্প হলে তার যে ভয়াবহ চিত্র আমাদের

সামনে আসে তাতে গোটা পৃথিবী যদি কোন কম্পন বা দোদুল্যমানতার শিকার হতো তাহলে এখনো মানব বসতি সম্ভবপর হতো না। এ গ্রহটি নিয়মিতভাবে সূর্যের সামনে আসে আবার পেছন ফেরে। এর ফলে দিনরাতের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যদি এর একটি দিক সব সময় সূর্যের দিকে ফেরানো থাকতো এবং অন্য দিকটা সব সময় থাকতো আড়ালে তাহলে এখানে কোন প্রাণী বসবাস করতে পারতো না। কারণ একদিকের সার্বক্ষণিক শৈত্য ও আলোকহীনতা উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্মলাভের উপযোগী হতো না এবং অন্যদিকের ভয়াবহ দাবদাহ প্রচণ্ড উত্তাপ তাকে পানিহীন, উদ্ভিদহীন ও প্রাণীহীন করে দিতো। এ ভূ-মণ্ডলের পাঁচশো মাইল উপর পর্যন্ত বাতাসের একটি পুরু স্তর দিয়ে ঢেকে দয়া হয়েছে। উল্‌কা পতনের ভয়াবহ প্রভাব থেকে তা পৃথিবীকে রক্ষা করে। অন্যথায় প্রতিদিন কোটি কোটি উল্‌কাপিণ্ড সেকেণ্ডে ৩০ মাইল বেগে পৃথিবী পৃষ্ঠে আঘাত হানতো। ফলে এখানে যে ধ্বংস লীলা চলতো তাতে মানুষ, পশু-পাখি, গাছ-পালা কিছুই জীবিত থাকতো না। এ বাতাসই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, সমুদ্র থেকে মেঘ উঠিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে এবং মানুষ, পশু ও উদ্ভিদের জীবনে প্রয়োজনীয় গ্যাসের যোগান দেয়। এ বাতাস না হলে এ পৃথিবী কোন বসতির উপযোগী অবস্থান স্থলে পরিণত হতে পারতো না। এ ভূ-মণ্ডলের ভূ-ত্বকের কাছাকাছি বিভিন্ন জায়গায় খনিজ ও বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ বিপুল পরিমাণে স্তূপীকৃত করা হয়েছে। উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের জীবনের জন্য এগুলো একান্ত অপরিহার্য। যেখানে এ জিনিসগুলো থাকে না সেখানকার ভূমি জীবন ধারনের উপযোগী হয় না। এ গ্রহটিতে সাগর, নদী, হ্রদ, ঝরণা ও ভূগর্ভস্থ স্রোতধারার আকারে বিপুল পরিমাণ পানির ভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছে। পাহাড়ের ওপরও এর বিরাট ভাণ্ডার ঘনীভূত করে এবং পরে তা গলিয়ে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ধরনের ব্যবস্থাপনা ছাড়া এখানে জীবনের কোন সম্ভাবনা ছিল না। আবার এ পানি, বাতাস এবং পৃথিবীতে অন্যান্য যেসব জিনিস পাওয়া যায় সেগুলোকে একত্র করে রাখার জন্য এ গ্রহটিতে অত্যন্ত উপযোগী মাধ্যাকর্ষণ (Granitation) সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। এ মধ্যাকর্ষণ যদি কম হতো, তাহলে বাতাস ও পানি উভয়কে এখানে আটকে রাখা সম্ভব হতো না এবং তাপমাত্রা এত বেশী বেড়ে যেতো যে, জীবনের টিকে থাকা এখানে কঠিন হয়ে উঠতো। এ মধ্যাকর্ষণ যদি বেশী হতো, তাহলে বাতাস অনেক বেশী ঘন হয়ে যেতো, তার চাপ অনেক বেশী বেড়ে যেতো এবং জলীয়বাষ্প সৃষ্টি হওয়া কঠিন হয়ে পড়তো ফলে বৃষ্টি হতো না, ঠাণ্ডা বেড়ে যেতো, ভূ-পৃষ্টের খুব কম এলাকাই বাসযোগ্য হতো বরং ভারীত্বের আকর্ষণ অনেক বেশী হলে মানুষ ও পশুর শারীরিক দৈর্ঘ-প্রস্থ কম হতো কিন্তু তাদের ওজন এত বেড়ে যেতো যে তাদের পক্ষে চলাফেরা করা কঠিন হয়ে যেতো। তাছাড়া এ গ্রহটিকে সূর্য থেকে জনবসতির সবচেয়ে উপযোগী একটি বিশেষ দূরত্বে রাখা হয়েছে। যদি এর দূরত্ব বেশী হতো, তাহলে সূর্য থেকে সে কম উত্তাপ লাভ করতো, শীত অনেক বেশী হতো, এবং অন্যান্য অনেক জিনিস মিলেমিশে পৃথিবী নামের এ গ্রহটি আর মানুষের মতো সৃষ্টির বসবাসের উপযোগী থাকতো না।

এ গুলো হচ্ছে বাসোপযোগিতার কয়েকটি দিক মাত্র। এগুলোর বদৌলতে ভূ-পৃষ্ঠ তার বর্তমান মানব প্রজাতির জন্য অবস্থান স্থলে পরিণত হয়েছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই এসব বিষয় সামনে রেখে চিন্তাভাবনা করলে এক মুহূর্তের জন্যও একথা ভাবতে পারে না যে, কোন পূর্ণ জ্ঞানময় স্রষ্টার পরিকল্পনা ছাড়া এসব উপযোগিতা ও ভারসাম্য নিছক

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ
الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ
اللَّهِ ۚ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾ أَمَّن يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ
هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾

কে তিনি যিনি আর্তের ডাক শোনেন যখন সে তাঁকে ডাকে কাতরভাবে এবং কে তার দুঃখ দূর করেন?[৭৬] আর (কে) তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন?[৭৭] আল্লাহর সাথে কি আর কোন ইলাহও কি (একাজ করছে)? তোমরা সামান্যই চিন্তা করে থাকো। আর কে জল-স্থলের অন্ধকারে তোমাদের পথ দেখান[৭৮] এবং কে নিজের অনুগ্রহের পূর্বাহ্নে বাতাসকে সুসংবাদ দিয়ে পাঠান?[৭৯] আল্লাহর সাথে কি অন্য ইলাহও (একাজ করে)? আল্লাহ অনেক উর্ধ্বে এ শির্‌ক থেকে যা এরা করে।

আর তিনি কে যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন এবং তারপর আবার এর পুনরাবৃত্তি করেন?[৮০] আর কে তোমাদের জীবিকা দেন আকাশ ও পৃথিবী থেকে?[৮১] আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহও কি (একাজে অংশীদার) আছে? বলো, আনো তোমাদের যুক্তি, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।[৮২]

একটি আকস্মিক ঘটনার ফলে আপনা আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং একথাও ধারণা করতে পারে না যে, এ মহা সৃষ্টি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং একে বাস্তব রূপদান করার ব্যাপারে কোন দেব-দেবী বা জিন অথবা নবী-ওলী কিংবা ফেরেশতার কোন হাত আছে।

৭৫. অর্থাৎ মিঠা ও নোনা পানির ভাণ্ডার। এ ভাণ্ডার এ পৃথিবীতেই রয়েছে কিন্তু তারা কখনো পরস্পর মিশে যায় না। ভূ-গর্ভের পানির স্রোতও কখনো একই এলাকায় মিঠা পানির স্রোত আলাদা এবং নোনা পানির স্রোত আলাদা দেখা যায়। নোনা পানির সাগরেও দেখা যায় কোথাও মিঠা পানির স্রোত আলাদা প্রবাহিত হচ্ছে। সাগর যাত্রীরা সেখান থেকে তাদের খাবার পানি সংগ্রহ করেন। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল ফুরকান, ৬৮ টীকা)

৭৬. আরবের মুশরিকরা ভালোভাবেই জানে এবং স্বীকারও করে যে, একমাত্র আল্লাহই বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করেন। তাই কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যখন তোমরা কোন কঠিন সময়ের মুখোমুখি হও তখন আল্লাহরই কাছে ফরিয়াদ করতে থাকো কিন্তু যখন সে সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায় তখন আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করতে থাকো। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা আল আন'আম, ২৯-৪১ টীকা, সূরা ইউনুস ২১-২২ আয়াত, ও ৩১ টীকা, সূরা আন্ নাহল ৪৬ টীকা, সূরা বনী ইসরাঈল ৮৪ টীকা) এ বিষয়টি কেবল আরব মুশরিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সারা দুনিয়ার মুশরিকদেরও সাধারণভাবে এ একই অবস্থা। এমনকি রাশিয়ার নাস্তিকরা যারা আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর হুকুম মেনে চলার বিরুদ্ধে যথারীতি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে, তারাও যখন বিগত বিশ্ব মহাযুদ্ধে জার্মান সেনাদলের অবরোধ কঠিন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল তখন তারা আল্লাহকে ডাকার প্রয়োজন অনুভব করেছিল।

৭৭. এর দু'টি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে, এক প্রজন্মের পর আর এক প্রজন্মকে এবং এক জাতির পর আর এক জাতির উত্থান ঘটান। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, পৃথিবীর সম্পদ ব্যবহার এবং এখানে রাজত্ব করার ক্ষমতা দেন।

৭৮. অর্থাৎ যিনি তারকার সাহায্যে এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যার ফলে তোমরা রাতের অন্ধকারেও নিজেদের পথের সন্ধান করতে পারো। মানুষ জলে-স্থলে যেসব সফর করে, সেখানে তাকে পথ দেখাবার জন্য আল্লাহ এমন সব উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার সাহায্যে সে নিজের গন্তব্য স্থলের দিকে নিজের চলার পথ নির্ধারণ করে নিতে পারে। দিনে ভূ-প্রকৃতির বিভিন্ন আলামত এবং সূর্যের উদয়াস্তের দিক তাকে সাহায্য করে এবং অন্ধকার রাতে আকাশের তারকারা তাকে পথ দেখায়। এ সবই আল্লাহর জ্ঞানগর্ভ ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনারই একটি অংশ। সূরা নাহলে এসবগুলোকে আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

وَعَلٰمٰتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ (ايت : ١٦)

৭৯. রহমত বা অনুগ্রহ বলতে বৃষ্টিধারা বুঝানো হয়েছে। এর আগমনের পূর্বে বাতাস এর আগমনী সংবাদ দেয়।

৮০. একটি সহজ সরল কথা। একটি বাক্যে কথাটি বলে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে এত বেশী খুটিনাটি বিষয় রয়েছে যে, মানুষ এর যত গভীরে নেমে যেতে থাকে ততই আল্লাহর অস্তিত্ব ও আল্লাহর একত্বের প্রমাণ সে লাভ করে যেতে থাকে। প্রথমে সৃষ্টি কর্মটিই দেখা যাক। জীবনের উৎপত্তি কোথা থেকে এবং কেমন করে হয়, মানুষের জ্ঞান আজো এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি। নির্জীব বস্তুর নিছক রাসায়নিক মিশ্রণের ফলে প্রাণের স্বতস্ফূর্ত উন্মেষ ঘটতে পারে না, এ পর্যন্ত এটিই সর্বস্বীকৃত বৈজ্ঞানিক সত্য। প্রাণ সৃষ্টির জন্য যতগুলো উপাদানের প্রয়োজন সে সবগুলো যথাযথ আনুপাতিক হারে একেবারে আকস্মিকভাবে একত্র হয়ে গিয়ে আপনা আপনি জীবনের উন্মেষ ঘটে যাওয়া অবশ্যই নাস্তিক্যবাদীদের একটি অ-তাত্ত্বিক কল্পনা। কিন্তু যদি অংকশাস্ত্রের আকস্মিক ঘটনার নিয়ম (Law of chance) এর ওপর প্রয়োগ করা হয়, তাহলে এ ধরনের ঘটনা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায় নেমে যায়। এ পর্যন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতিতে

বিজ্ঞান গবেষণাগারসমূহে (Laboratories) নিষ্প্রাণ বস্তু থেকে প্রাণবান বস্তু সৃষ্টি করার যতগুলো প্রচেষ্টাই চলেছে, সম্ভাব্য সব ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বনের পরও তা সবই চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে। বড় জোর যা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে তা হচ্ছে কেবলমাত্র এমন বস্তু যাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় D. N. A. বলা হয়। এটি এমন বস্তু যা জীবিত কোষসমূহে পাওয়া যায়। এটি অবশ্যই জীবনের উপাদান কিন্তু নিজে জীবন্ত নয়। জীবন আজো একটি অলৌকিক ব্যাপার। এটি একজন স্রষ্টার হুকুম, ইচ্ছা ও পরিকল্পনার ফল, এছাড়া এর আর কোন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করা যেতে পারে না।

এরপর সামনের দিকে দেখা যাক। জীবন নিছক একটি একক অমিশ্রিত অবস্থায় নেই বরং অসংখ্য বিচিত্র আকৃতিতে তাকে পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রাণীর মধ্যে প্রায় দশ লাখ এবং উদ্ভিদের মধ্যে প্রায় দু'লাখ প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। এ লাখো লাখো প্রজাতি নিজেদের আকার-আকৃতি ও শ্রেণী বৈশিষ্টের ক্ষেত্রে পরস্পর থেকে এত সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত পার্থক্যের অধিকারী এবং জানা ইতিহাসের প্রাচীনতম যুগ থেকে তারা নিজেদের পৃথক শ্রেণী আকৃতিকে অনবরত এমনভাবে অক্ষুন্ন রেখে আসছে যার ফলে এক আল্লাহর সৃষ্টি পরিকল্পনা (Design) ছাড়া জীবনের এ মহা বৈচিত্রের অন্য কোন যুক্তি সংগত ব্যাখ্যা করা কোন ডারউইনের পক্ষেই সম্ভব নয়। আজ পর্যন্ত কোথাও দু'টি প্রজাতির মাঝখানে এমন এক শ্রেণীর জীব পাওয়া যায়নি যারা এক প্রজাতির কাঠামো, আকার-আকৃতি ও বৈশিষ্ট ভেদ করে বের হয়ে এসেছে এবং এখনো অন্য প্রজাতির কাঠামো, আকার-আকৃতি ও বৈশিষ্ট পর্যন্ত পৌঁছুবার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কংকালের (Fossils) সমগ্র বিবরণীতে এ পর্যন্ত এর কোন নজির পাওয়া যায়নি এবং বর্তমান প্রাণী জগতে কোথাও এ ধরনের 'হিজড়া' শ্রেণী পাওয়া কঠিন। আজ পর্যন্ত সর্বত্রই সকল প্রজাতির সদস্যকেই তার পূর্ণ শ্রেণীগত বৈশিষ্ট সহকারেই পাওয়া গেছে। মাঝে-মধ্যে কোন হারিয়ে যাওয়া শ্রেণী সম্পর্কে যেসব কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়, কিছুকাল অতিবাহিত হবার পর প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হয়ে তার অসারতা ফাঁস করে দেয়। বর্তমানে এটি একটি অকাট্য সত্য যে, একজন সুবিজ্ঞ কারিগর, একজন সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা ও চিত্রকরই জীবনকে এত সব বৈচিত্রময় রূপদান করেছেন।

এ তো গেলো সৃষ্টির প্রথম অবস্থার কথা। এবার সৃষ্টির পুনরাবৃত্তির কথাটা একবার চিন্তা করা যাক। সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেক প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের গঠনাকৃতি ও গঠন প্রণালীর মধ্যে এমন বিস্ময়কর কর্মপদ্ধতি (Mechanism) রেখে দিয়েছেন যা তার অসংখ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে ঠিক একই শ্রেণীর আকৃতি, স্বভাব ও বৈশিষ্ট সম্পন্ন হাজারো প্রজন্মের জন্ম দিয়ে যেতে থাকে। কখনো মিছামিছিও এ কোটি কোটি ছোট ছোট কারখানায় এ ধরনের ভুলচুক হয় না, যার ফলে একটি প্রজাতির কোন বংশ বৃদ্ধি কারখানায় অন্য প্রজাতির কোন নমুনা উৎপাদন করতে থাকে। আধুনিক বংশ তত্ত্ব (Genetics) পর্যবেক্ষণ এ ব্যাপারে বিস্ময়কর সত্য উদ্‌ঘাটন করে। প্রত্যেকটি চারাগাছের মধ্যে এমন যোগ্যতা রাখা হয়েছে যার ফলে সে তার নিজের প্রজন্মকে পরবর্তী বংশধরদের পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এমন পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা করে যাতে পরবর্তী বংশধররা তার যাবতীয় প্রজাতিক বৈশিষ্ট, আচরণ ও গুণের অধিকারী হয় এবং তার প্রত্যেক ব্যক্তি সত্তাই অন্যান্য সকল প্রজাতির ব্যক্তিবর্গ থেকে শ্রেণীগত বিশিষ্টতা অর্জন করে। এ প্রজাতি ও প্রজন্ম রক্ষার সরঞ্জাম প্রত্যেকটি চারার প্রতিটি কোষের (Cell) একটি অংশে

সংরক্ষিত থাকে। অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে একে দেখা যেতে পারে। এ ক্ষুদ্র প্রকৌশলীটি পূর্ণ সুস্থতা সহকারে চারার সার্বিক বিকাশকে চূড়ান্তভাবে তার শ্রেণীগত আকৃতির স্বাভাবিক পথে পরিচালিত করে। এরি বদৌলতে একটি গম বীজ থেকে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে যেখানেই যত গমের চারা উৎপন্ন হয়েছে তা সব গমই উৎপাদন করেছে। কোন আবহাওয়ায় এবং কোন পরিবেশে কখনো ঘটনাক্রমে একটি গম বীজের বংশ থেকে একটি যব উৎপন্ন হয়নি। মানুষ ও পশুর ব্যাপারেও এই একই কথা। অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে কারো সৃষ্টিই একবার হয়েই থেমে যায়নি। বরং কল্পনাতীত ব্যাপকতা নিয়ে সর্বত্র সৃষ্টির পুনরাবর্তনের একটি বিশাল কারখানা সক্রিয় রয়েছে। এ কারখানা অনবরত প্রতিটি শ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদ থেকে একই শ্রেণীর অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদ উ ৎপাদন করে চলছে। যদি কোন ব্যক্তি সন্তান উৎপাদন ও বংশ বিস্তারের এ অণুবীক্ষণীয় বীজটি দেখে, যা সকল প্রকার শ্রেণীগত বৈশিষ্ট ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গুণাবলীকে নিজের ক্ষুদ্রতম অস্তিত্বেরও নিছক একটি অংশে ধারণ করে থাকে এবং তারপর দেখে অংগ প্রত্যংগের এমন একটি চরম নাজুক ও জটিল ব্যবস্থা এবং চরম সূক্ষ্ম ও জটিল কর্মধারা (Progresses), যার সাহায্যে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক ব্যক্তির বংশধারার বীজ একই শ্রেণীর নবতর ব্যক্তিকে উৎপন্ন করে, তাহলে একথা সে এক মুহূর্তের জন্যও কল্পনা করতে পারে না যে, এমন নাজুক ও জটিল কর্মব্যবস্থা কখনো আপনা আপনি গড়ে উঠতে পারে, এবং তারপর বিভিন্ন শ্রেণীর শত শত কোটি ব্যক্তির মধ্যে তা আপনা আপনি যথাযথভাবে চালুও থাকতে পারে। এ জিনিসটি কেবল নিজের সূচনার জন্যই একজন বিজ্ঞ স্রষ্টা চায় না বরং প্রতি মুহূর্তে নিজের সঠিক ও নির্ভুল পথে চলতে থাকার জন্যও একজন পরিচালক, ব্যবস্থাপক ও চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী সত্তার প্রত্যাশী হয়, যিনি এক মুহূর্তের জন্যও এ কারখানাগুলোর দেখা–শুনা, রক্ষণা–বেক্ষণ ও সঠিক পথে পরিচালনা থেকে গাফিল থাকবেন না।

এ সত্যগুলো যেমন একজন নাস্তিকের আল্লাহকে অস্বীকার করার প্রবণতার মূলোচ্ছেদ করে তেমনি একজন মুশরিকের শির্ককেও সমূলে উৎপাটিত করে দেয়। এমন কোন নির্বোধ আছে কি যে একথা ধারণা করতে পারে যে, আল্লাহর বিশ্ব পরিচালনার এ কাজে কোন ফেরেশতা, জিন, নবী বা অলী সামান্যতমও অংশীদার হতে পারে? আর কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিদ্বেষ ও স্বার্থশূন্য মনে একথা বলতে পারে যে, এ সমগ্র সৃষ্টি কারখানা ও সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি এ ধরনের পরিপূর্ণ বিজ্ঞতা ও নিয়ম–শৃংখলা সহকারে ঘটনাক্রমেই শুরু হয় এবং আপনা আপনিই চলছে?

৮১. এ সংক্ষিপ্ত শব্দগুলোকে অগভীরভাবে পড়ে কোন ব্যক্তি রিযিক দেবার ব্যাপারটি যেমন সহজ সরল ভাবে অনুভব করে আসলে ব্যাপার কিন্তু তেমন সহজ সরল নয়। এ পৃথিবীতে পশু ও উদ্ভিদের লাখো লাখো শ্রেণী পাওয়া যায়। তাদের প্রত্যেকের সংখ্যা শত শত কোটি হবে এবং তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা খাদ্যের প্রয়োজন। স্রষ্টা তাদের প্রত্যেক শ্রেণীর খাদ্যবস্তু এত বিপুল পরিমাণে এবং প্রত্যেকের আহরণ ক্ষমতার এত কাছাকাছি রেখে দিয়েছেন যার ফলে কোন শ্রেণীর কোন একজনও খাদ্য থেকে বঞ্চিত থাকে না। তারপর এ ব্যবস্থাপনায় পৃথিবী ও আকাশের এত বিচিত্র শক্তি মিলেমিশে কাজ করে যাদের সংখ্যা গণনা করা কঠিন। তাপ, আলো, বাতাস, পানি ও মাটির বিভিন্ন

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهُ ۚ وَمَا
يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾ بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ ۖ بَلْ هُمْ
فِي شَكٍّ مِّنْهَا ۖ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾

তাদেরকে বলো, আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীতে ও আকাশে কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না।[৮৩] এবং তারা জানে না ক'বে তাদেরকে উঠিয়ে নেয়া হবে[৮৪] বরং আখেরাতের জ্ঞানই তাদের থেকে হারিয়ে গেছে। উপরন্তু তারা সে ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। আসলে তারা সে ব্যাপারে অন্ধ।[৮৫]

উপাদানের মধ্যে যদি ঠিকমতো আনুপাতিক হারে সহযোগিতা না থাকে তাহলে এক বিন্দু পরিমাণ খাদ্যও উৎপন্ন হতে পারে না।

কে কল্পনা করতে পারে, এ বিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা একজন ব্যবস্থাপকের ব্যবস্থাপনা ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছাড়া এমনিই ঘটনাক্রমে হতে পারে? এবং বুদ্ধি সচেতন অবস্থায় কে একথা চিন্তা করতে পারে যে, এ ব্যবস্থাপনায় কোন জিন, ফেরেশতা বা কোন মহা মনীষীর আত্মার কোন হাত আছে?

৮২. অর্থাৎ এসব কাজে সত্যিই অন্য কেউ শরীক আছে, এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ আনো অথবা যদি তা না পারো তাহলে কোন যুক্তিসংগত প্রমাণের সাহায্যে একথা বুঝিয়ে দাও যে, এ সমস্ত কাজ তো একমাত্র আল্লাহরই কিন্তু বন্দেগী ও উপাসনা লাভের অধিকার লাভ করবে তিনি ছাড়া অন্য কেউ অথবা তাঁর সাথে অন্যজনও।

৮৩. উপরে সৃষ্টিকর্ম, ব্যবস্থাপনা ও জীবিকাদানের দিক দিয়ে এই মর্মে যুক্তি পেশ করা হয়েছিল যে, আল্লাহই একমাত্র ইলাহ (অর্থাৎ একমাত্র ইলাহ ও ইবাদাত লাভের একমাত্র অধিকারী) এবার আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ অর্থাৎ জ্ঞানের দিক দিয়ে জানানো হচ্ছে যে, এ ব্যাপারেও মহান আল্লাহ হচ্ছেন লা-শরীক। পৃথিবী ও আকাশে ফেরেশতা, জিন, নবী, আউলিয়া অথবা মানুষ ও অ-মানুষ যে কোন সৃষ্টি হোক না কেন সবারই জ্ঞান সীমাবদ্ধ। কিছু না কিছু জিনিস সবার কাছ থেকে গোপন রয়েছে। সব কিছুর জ্ঞান যদি কারো থাকে তাহলে তিনি হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ এ বিশ্ব-জাহানের কোন জিনিস এবং কোন কথা তাঁর কাছে গোপন নেই। তিনি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সব কিছু জানেন।

এখানে মূলে "গায়েব" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। গায়েব মানে প্রচ্ছন্ন লুকানো অদৃশ্য বা আবৃত। পারিভাষিক অর্থে গায়েব হচ্ছে এমন জিনিস যা অজানা এবং যাকে জানার উপায়-উপকরণগুলো দ্বারা আয়ত্ব করা যায় না। দুনিয়ায় এমন বহু জিনিস আছে যা এককভাবে কোন কোন লোক জানে এবং কোন কোন লোক জানে না। আবার এমন অনেক জিনিস আছে যা সামগ্রিকভাবে সমগ্র মানব জাতি কখনো জানতো না, আজকেও

জানে না এবং ভবিষ্যতেও কখনো জানবে না। জিন, ফেরেশতা ও অন্যান্য সৃষ্টির ব্যাপারেও এই একই কথা। কতক জিনিস তাদের কারো কাছে প্রচ্ছন্ন এবং কারো কাছে প্রকাশিত। আবার অসংখ্য জিনিস এমন আছে যা তাদের সবার কাছে প্রচ্ছন্ন ও অজানা। এ সব ধরনের অদৃশ্য জিনিস একমাত্র একজনের কাছে দৃশ্যমান। তিনি হচ্ছেন মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ। তাঁর কাছে কোন জিনিস অদৃশ্য নয়। সবকিছুই তাঁর কাছে সুস্পষ্টভাবে পরিদৃশ্যমান।

উপরে বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা, ব্যবস্থাপক এবং খাদ্য যোগানদাতা হিসেবে আল্লাহর গুণাবলী বর্ণনা করার জন্য প্রশ্নের যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, আল্লাহর অদৃশ্য জ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য বর্ণনা করার জন্য সে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়নি। এর কারণ হচ্ছে, পূর্বোক্ত গুণগুলো প্রত্যেকটি মানুষ দেখছে, সেগুলোর চিহ্ন একদম সুস্পষ্ট। কাফের ও মুশরিকরাও সেগুলো সম্পর্কে আগেও একথা মানতো এবং এখনো মানে যে, এসব একমাত্র আল্লাহরই কাজ। তাই সেখানে যুক্তি প্রদানের পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ ঃ এ সমস্ত কাজ যখন আল্লাহরই এবং তাদের কেউ যখন এ সব কাজে তাঁর অংশীদার নয়, তখন তোমরা কেমন করে সার্বভৌম কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে অন্যদেরকে অংশীদার করে নিয়েছো এবং কিসের ভিত্তিতেই বা তারা ইবাদাত লাভের অধিকারী হয়ে গেছে? কিন্তু আল্লাহর সর্বজ্ঞতা সংক্রান্ত গুণটির এমন কোন অনুভব যোগ্য আলামত নেই, যা আংগুল দিয়ে দেখানো যায়। এ বিষয়টি শুধুমাত্র চিন্তা-ভাবনা করেই বুঝতে পারা যেতে পারে। তাই একে প্রশ্নের পরিবর্তে দাবী আকারে পেশ করা হয়েছে। এখন প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির একথা ভেবে দেখা উচিত যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে এ কথা কি বোধগম্য? অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানে যেসব অবস্থা, বস্তু ও সত্য কখনো ছিল বা এখন আছে কিংবা ভবিষ্যতে হবে, সেগুলো কি আল্লাহ চাড়া অন্য কারো জানা সম্ভব! আর যদি অন্য কেউ অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী না হয়ে থাকে এবং সে জ্ঞান লাভের ক্ষমতা ও যোগ্যতা আর কারো না থেকে থাকে তাহলে যারা প্রকৃত সত্য ও অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত নয় তাদের মধ্য থেকে কেউ বান্দাদের ফরিয়াদ শ্রবণকারী, অভাব মোচনকারী ও সংকট নিরসনকারী হতে পারে, একথা কি বুদ্ধি সম্মত?

ইবাদাত-উপাসনা ও সার্বভৌম কতৃত্বের অধিকারী হওয়া এবং অদৃশ্য জ্ঞানের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ জন্য অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষ যার ভেতরেই উপাস্য বা দেবতা বা বিশ্ববিধাতা সুলভ সর্বময় কর্তৃত্বের কোন গন্ধ ও অনুমান করেছে তার সম্পর্কে একথা অবশ্যই ভেবেছে যে, তার কাছে সবকিছুই সুস্পষ্ট ও আলোকিত এবং কোন জিনিস তার অগোচরে নেই। অর্থাৎ মানুষের মন এ সত্যটি সুস্পষ্টভাবে জানে যে, ভাগ্যের ভাংগা-গড়া, ফরিয়াদ শোনা, প্রয়োজন পূর্ণ করা এবং প্রত্যেক সাহায্য প্রার্থীকে সাহায্য করা কেবলমাত্র এমন এক সত্তার কাজ হতে পারে যিনি সব কিছু জানেন এবং যার কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। এ কারণে তো মানুষ যাকেই সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পন্ন মনে করে তাকে অবশ্যই অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারীও মনে করে। কারণ তার বুদ্ধি নিসন্দেহে সাক্ষ দেয়, জ্ঞান ও ক্ষমতা পরস্পর অংগাংগীভাবে সম্পর্কিত একটির জন্য অন্যটি অনিবার্য। এখন যদি এটি সত্য হয়ে থাকে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ স্রষ্টা, ব্যবস্থাপক, ফরিয়াদ শ্রবণকারী ও রিযিকদাতা নেই, যেমন উপরের আয়াতে প্রমাণিত হয়েছে, তাহলে সাথে সাথে এটিও সত্য যে, আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোন সত্তা অদৃশ্য

জ্ঞানের অধিকারীও নয়। কোন্ বুদ্ধি সচেতন ব্যক্তি একথা কল্পনা করতে পারে যে, কোন ফেরেশতা, জিন, নবী, অলী বা কোন সৃষ্টি সাগরের বুকে, বাতাসের মধ্যে এবং মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তরে ও তার উপরিভাগে কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ প্রকারের কত প্রাণী আছে ? মহাশূন্যের অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রের সঠিক সংখ্যা কত তাদের প্রত্যেকের মধ্যে কোন্ কোন্ ধরনের সৃষ্টি বিরাজ করছে এবং এ সৃষ্টিগুলোর প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অবস্থান কোথায় এবং তার প্রয়োজনসমূহ কি কি তা জানে? এসব কিছু আল্লাহর অপরিহার্যভাবে জানা থাকতে হবে। কারণ তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁকেই তাদের যাবতীয় ব্যাপার পরিচালনা এবং তাদের যাবতীয় অবস্থা দেখা-শুনা করতে হয় আর তিনিই তাদের জীবিকা সরবরাহকারী। কিন্তু অন্য কেউ তার নিজের সীমাবদ্ধ অস্তিত্বের মধ্যে এই ব্যাপক ও সর্বময় জ্ঞান কেমন করে রাখতে পারে? সৃষ্টি ও জীবিকাদানের কর্মের সাথে তার কি কোন সম্পর্ক আছে যে, সে এসব জিনিস জানবে?

আবার অদৃশ্য জ্ঞানের গুণটি বিভাজ্যও নয়। উদাহরণস্বরূপ কেবলমাত্র পৃথিবীর সীমানা পর্যন্ত এবং শুধুমাত্র মানুষের ব্যাপারে কোন মানুষ অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হবে-এটা সম্ভব নয়। আল্লাহর সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, স্থিতিস্থাপক ও প্রতিপালক হওয়ার গুণগুলো যেমন বিভক্ত হতে পারে না। তেমনি এ গুণটিও বিভক্ত হতে পারে না। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত যতগুলো মানুষ দুনিয়ায় জন্ম নিয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম নেবে মাতৃ জরায়ুতে গর্ভসঞ্চার হওয়ার সময় থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের সবার সকল অবস্থা ও পরিস্থিতি জানতে পারে এমন মানুষটি কে হতে পারে? সে মানুষটি কেমন করে এবং কেন তা জানবে? সে কি এ সীমা সংখ্যাহীন সৃষ্টিকূলের স্রষ্টা? সে কি তাদের পিতৃপুরুষদের বীর্যে তাদের বীজানু উৎপন্ন করেছিল? সে কি তাদের মাতৃগর্ভে তাদের আকৃতি নির্মাণ করেছিল? মাতৃগর্ভের সেই মাংসপিণ্ডটি জীবিত ভূমিষ্ট হওয়ার নিশ্চিত ব্যবস্থা কি সে করেছিল? সে কি তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগ্য তৈরি করেছিল? সে কি তাদের জীবন-মৃত্যু, রোগ-স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি, দারিদ্র ও উত্থান পতনের ফায়সালা করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল? এসব কাজ কবে থেকে তার দায়িত্বে এসেছে? তার নিজের জন্মের আগে, না পরে? আর কেবল মানুষের মধ্যে এ দায়িত্ব সীমাবদ্ধ হতে পারে কেমন করে? একাজ তো অনিবার্যভাবে পৃথিবী ও আকাশের বিশ্বজনীন ব্যবস্থাপনার একটি অংশ। যে সত্তা সমগ্র বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন তিনিই তো মানুষের জন্ম-মৃত্যু, তাদের জীবিকার সংকীর্ণতা ও স্বচ্ছলতার এবং তাদের ভাগ্যের ভাংগা গড়ার জন্য দায়িত্বশীল হতে পারেন।

তাই আল্লাহ ছাড়া আর কেউ অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী নয়, এটি ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান যতটুকু চান জ্ঞান দান করেন। কোন অদৃশ্য বা কতগুলো অদৃশ্য জিনিসকে তার সামনে উন্মুক্ত করে দেন। কিন্তু অদৃশ্য জ্ঞান সামগ্রিকভাবে কেউ লাভ করতে পারে না এবং "আলেমুল গায়েব" অদৃশ্য জ্ঞানী উপাধি একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাথে সংশ্লিষ্ট।

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ -

"আর তাঁর কাছেই আছে অদৃশ্যের চাবিগুলো, সেগুলো তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।" (আন'আম ৫৯ আয়াত)

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ ؕ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ؕ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ -

"একমাত্র আল্লাহই রাখেন কিয়ামতের জ্ঞান। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনিই জানেন মাতৃগর্ভে কি (লালিত) হচ্ছে, কোন প্রাণী জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কোন প্রাণী জানে না কোন্ ভূমিতে তার মৃত্যু হবে।" (লুকমান ৩৪ আয়াত)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ -

"তিনি জানেন যা কিছু সৃষ্টির সামনে আছে এবং যা কিছু আছে তাদের অগোচরে। আর তাঁর জ্ঞানের কিছুমাত্র অংশও তারা আয়ত্ব করতে পারে না, তবে তিনি যে জিনিসটির জ্ঞান তাদেরকে দিতে চান, দেন।" (আল বাকারাহ ২৫৫ আয়াত)

কোন সৃষ্টি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে এ ধারণা কুরআন সর্বতোভাবে নাকচ করে দেয়। এমনকি বিশেষভাবে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারেও এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয় যে, তিনি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী নন এবং তাঁকে অদৃশ্যের কেবলমাত্র ততটুকু জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে যতটুকু রিসালাতের দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রয়োজন ছিল। সূরা আন'আম ৫০ আয়াত, সূরা আ'রাফ ১৮৭ আয়াত, সূরা তাওবাহ ১০১ আয়াত, সূরা হূদ ৩১ আয়াত, সূরা আহযাব ৬৩ আয়াত, সূরা আহকাফ ৯ আয়াত, সূরা তাহরীম ৩ আয়াত এবং সূরা জিন ২৬ আয়াত এ ব্যাপারে কোন প্রকার অনিশ্চয়তা ও সংশয়ের অবকাশই রাখেনি।

কুরআনের এ সমস্ত সুস্পষ্ট ভাষণ আলোচ্য আয়াতটির বক্তব্য সমর্থন ও ব্যাখ্যা করে এর পর এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী মনে করা এবং যা কিছু আছে ও যা কিছু হবে এর জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো আছে—একথা মনে করা পুরোপুরি একটি অনৈসলামী বিশ্বাস। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইমাম আহমদ, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম নির্ভুল বর্ণনা পরম্পরায় হযরত আয়েশা (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন ঃ

مَنْ زَعَمَ اَنَّهٗ (اى النبى صلى اللّٰه عليه وسلم) يَعْلَمُ مَا يَكُوْنُ فِىْ غَدٍ فَقَدْ اَعْظَمَ عَلَى اللّٰهِ الْفَرْيَةَ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ -

"যে ব্যক্তি দাবী করে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগামী কাল কি হবে তা জানেন, সে আল্লাহর প্রতি মহা মিথ্যা আরোপ করে। কারণ আল্লাহ তো বলেন, হে নবী! তুমি বলে দাও আল্লাহ ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে আর কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না।"

ইবনুল মুনযির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) প্রখ্যাত শিষ্য হযরত ইকরামা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, "হে মুহাম্মাদ! কিয়ামত কবে আসবে? আমাদের দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকায় বৃষ্টি কবে হবে? আর আমার গর্ভবতী স্ত্রী ছেলে না মেয়ে প্রসব করবে? আর আজ আমি কি উপার্জন করেছি তাতো আমি জানি কিন্তু আগামীকাল আমি কি উপার্জন করবো? আর আমি কোথায় জন্মেছি তাতো আমি জানি কিন্তু আমি মরবো কোথায়?" এ প্রশ্নগুলোর জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতিপূর্বে আমাদের উল্লেখিত সূরা লুকমানের আয়াতটি শুনিয়ে দেন। এছাড়া বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের একটি বহুল পরিচিত হাদীসও এর সমর্থন করে, যাতে বলা হয়েছে ঃ সাহাবীগণের সমাবেশে হযরত জিব্রীল মানুষের বেশে এসে নবীকে যে প্রশ্ন করেছিলেন তার একটি এও ছিল যে, কিয়ামত কবে হবে? নবী (সা) জবাব দিয়েছিলেন,

مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ –

"যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সে জিজ্ঞেসকারীর চেয়ে এ ব্যাপারে বেশী জানে না।"

তারপর বলেন, এ পাঁচটি জিনিসের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। এ সময় তিনি উল্লেখিত আয়াতটি পাঠ করেন।

৮৪. অর্থাৎ অন্যরা, যাদের সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে, তারা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী এবং এ জন্য যাদেরকে তোমরা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে শরীক করে নিয়েছো, তারা নিজেরা তো নিজেদেরই ভবিষ্যতের খবর রাখে না। তারা জানে না, কিয়ামত কবে আসবে যখন আল্লাহ পুনর্বার তাদেরকে উঠিয়ে দাঁড় করাবেন!

৮৫. 'ইলাহ'র গুণাবলীর ব্যাপারে তাদের আকীদার মৌলিক ত্রুটিগুলো সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার পর এখন একথা জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তারা যে এ মারাত্মক গোমরাহীর মধ্যে পড়ে আছে এর কারণ এ নয় যে, চিন্তা–ভাবনা করার পর তারা কোন যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে ভিন্ন সত্তাদের শরীকানা আছে। বরং এর আসল কারণ হচ্ছে, তারা কখনো গুরুত্ব সহকারে চিন্তা–ভাবনা করেনি। যেহেতু তারা আখেরাত সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা সন্দেহের মধ্যে রয়েছে কিংবা তা থেকে চোখ বন্ধ করে রেখেছে, তাই আখেরাত চিন্তা থেকে বেপরোয়া ভাব তাদের মধ্যে পুরোপুরি একটি অ–দায়িত্বশীল মনোভাব সৃষ্টি করে দিয়েছে। তারা এ বিশ্ব–জাহান এবং নিজেদের জীবনের প্রকৃত সমস্যাবলীর প্রতি আদতে কোন গুরুত্বই আরোপ করে না। প্রকৃত সত্য কি এবং তাদের জীবন দর্শন তার সাথে সামঞ্জস্য রাখে কিনা এর কোন পরোয়াই তারা করে না। কারণ তাদের মতে শেষ পর্যন্ত মুশরিক, নাস্তিক, একত্ববাদী ও সংশয়বাদী সবাইকেই মরে গিয়ে মাটিতে মিশে যেতে হবে এবং কোন জিনিসেরই কোন চূড়ান্ত ফলাফল নেই।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾
لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

৬ রুকূ'

এ অস্বীকারকারীরা বলে থাকে, "যখন আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা মাটি হয়ে যাবো তখন আমাদের সত্যিই কবর থেকে বের করা হবে নাকি? এ খবর আমাদেরও অনেক দেয়া হয়েছে এবং ইতিপূর্বে আমাদের বাপ দাদাদেরকেও অনেক দেয়া হয়েছিল, কিন্তু এসব নিছক কল্প-কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়, যা আগের জামানা থেকে শুনে আসছি।" বলো, পৃথিবী পরিভ্রমণ করে দেখো অপরাধীদের পরিণতি কি হয়েছে।[৮৬] *হে নবী! তাদের অবস্থার জন্য দুঃখ করো না এবং তাদের* চক্রান্তের জন্য মনঃক্ষুন্নও হয়ো না।[৮৭]

আখেরাত সংক্রান্ত এ বক্তব্যটি এর আগের আয়াতের নিম্নোক্ত বাক্যাংশ থেকে বের হয়েছে ঃ "তারা জানে না, কবে তাদেরকে উঠানো হবে।" এ বাক্যাংশে একথা বলে দেয়া হয়েছিল যে, যাদেরকে উপাস্য করা হয়—আর ফেরেশ্‌তা, জিন, নবী, অলী সবাই এর অন্তরভুক্ত—তাদের কেউই আখেরাত কবে আসবে জানে না। এরপর এখন সাধারণ কাফের ও মুশরিকদের সম্পর্কে তিনটি কথা বলা হয়েছে। প্রথমত আখেরাত কোনদিন আদৌ হবে কিনা তা তারা জানেই না। দ্বিতীয়ত তাদের এ অজ্ঞতা এ জন্য নয় যে, তাদেরকে কখনো এ ব্যাপারে জানানো হয়নি। বরং এর কারণ হচ্ছে, তাদেরকে যে খবর দেয়া হয়েছে তা তারা বিশ্বাস করেনি বরং তার নির্ভুলতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে থেকেছে। তৃতীয়ত আখেরাত অনুষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে যেসব যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে তারা কখনো সেগুলো যাচাই করার প্রয়াস চালায়নি। বরং তারা সেদিক থেকে চোখ বন্ধ করে থাকাকেই প্রাধান্য দিয়েছে।

৮৬. এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে আখেরাতের পক্ষে দু'টি মোক্ষম যুক্তি রয়েছে এবং উপদেশও।

প্রথম যুক্তিটি হচ্ছে, দুনিয়ার যেসব জাতি আখেরাতকে উপেক্ষা করেছে তারা অপরাধী না হয়ে পারেনি। তারা দায়িত্ব জ্ঞান বর্জিত হয়ে গেছে। জুলুম নির্যাতনে অভ্যস্ত হয়েছে। ফাসেকী ও অশ্লীল কাজের মধ্যে ডুবে গেছে। নৈতিক চরিত্র বিনষ্ট হবার ফলে শেষ পর্যন্ত তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। এটি মানুষের ইতিহাসের একটি ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা। দুনিয়ার

দিকে দিকে বিধ্বস্ত জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষগুলো এর সাক্ষ দিচ্ছে। এগুলো পরিষ্কারভাবে একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, আখেরাত মানা ও না মানার সাথে মানুষের মনোভাব ও কর্মনীতি সঠিক কিনা, তার অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাকে মেনে নিলে এ মনোভাব ও কর্মনীতি সঠিক থাকে এবং তাকে না মানলে তা ভুল ও অশুদ্ধ হয়ে যায়। একে মেনে নেয়া যে প্রকৃত সত্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল, এটি এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। এ কারণে একে মেনে নিলেই মানুষের জীবন সঠিক পথে চলতে থাকে। আর একে অস্বীকার করলে প্রকৃত সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করাই হয়। ফলে রেলগাড়ি তার বাঁধানো রেলপথ থেকে নেমে পড়ে।

দ্বিতীয় যুক্তি হচ্ছে, ইতিহাসের এ সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় অপরাধীর কাঠগড়ায় প্রবেশকারী জাতিসমূহের ধ্বংস হয়ে যাওয়া এ চিরায়ত সত্যটিই প্রকাশ করছে যে, এ বিশ্ব–জাহানে চেতনাহীন শক্তিসমূহের অন্ধ ও বধির শাসন চলছে না বরং এটি বিজ্ঞ ও বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থা, যার মধ্যে সক্রিয় রয়েছে একটি অভ্রান্ত প্রতিদান ও প্রতিবিধানমূলক আইন। বিশ্বের বিভিন্ন জাতির ওপর পুরোপুরি নৈতিকতার ভিত্তিতে সে তার শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। কোন জাতিকে এখানে অসৎ কাজ করার জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয় না। একবার কোন জাতির উত্থান হবার পর সে এখানে চিরকাল আয়েশ আরাম করতে থাকবে এবং অবাধে জুলুম নিপীড়ন চালিয়ে যেতে থাকবে এমন ব্যবস্থা এখানে নেই। বরং একটি বিশেষ সীমায় পৌঁছে যাবার পর একটি মহা শক্তিশালী হাত এগিয়ে এসে তাকে পাকড়াও করে লাঞ্ছনা ও অপমানের গভীরতম গহ্বরে নিক্ষেপ করে। যে ব্যক্তি এ সত্যটি অনুধাবন করবে সে কখনো এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না যে, এ প্রতিদান ও প্রতিবিধানের আইনই এ দুনিয়ার জীবনের পরে অন্য একটি জীবনের দাবী করে। সেখানে ব্যক্তিবর্গ ও জাতিসমূহ এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র বিশ্ব মানবতার প্রতি ইনসাফ করা হবে। কারণ শুধুমাত্র একটি জালেম জাতি ধ্বংস হয়ে গেলেই ইনসাফের সমস্ত দাবী পূর্ণ হয়ে যায় না। এর ফলে যেসব মজলুমের লাশের ওপর সে তার মর্যাদার প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল তাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের কোন প্রতিবিধান হয় না। ধ্বংস আসার পূর্বে যেসব জালেম লাগামহীন জীবন উপভোগ করে গেছে তারাও কোন শাস্তি পায় না। যেসব দুষ্কৃতকারী বংশ পরম্পরায় নিজেদের পরে আগত প্রজন্মের জন্য বিভ্রান্তি ও ব্যভিচারের উত্তরাধিকার রেখে চলে গিয়েছিল তাদের সে সব অসৎকাজেরও কোন জবাবদিহি হয় না। দুনিয়ায় আযাব পাঠিয়ে শুধুমাত্র তাদের শেষ বংশধরদের আরো বেশী জুলুম করার সূত্রটি ছিন্ন করা হয়েছিল। আদালতের আসল কাজ তো এখনো হয়ইনি। প্রত্যেক জালেমকে তার জুলুমের প্রতিদান দিতে হবে। প্রত্যেক মজলুমের প্রতি জুলুমের ফলে যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তাকে তার ক্ষতিপূরণ করে দিতে হবে। আর যেসব লোক অসৎকাজের এ দুর্বার স্রোতের মোকাবিলায় ন্যায়, সত্য ও সততার পথে অবিচল থেকে সৎকাজ করার জন্য সর্বক্ষণ তৎপর থেকেছে এবং সারাজীবন এপথে কষ্ট সহ্য করেছে তাদেরকে পুরস্কার দিতে হবে। অপরিহার্যভাবে এসব কাজ কোন এক সময় হতেই হবে। কারণ দুনিয়ায় প্রতিদান ও প্রতিবিধান আইনের নিরবিচ্ছিন্ন কার্যকারিতা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, মানুষের কার্যাবলীকে তার নৈতিক মূল্যমানের ভিত্তিতে ওজন করা এবং পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করাই বিশ্ব পরিচালনার চিরন্তন রীতি ও পদ্ধতি।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧١﴾ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ
رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ
عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ
مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٧٥﴾

—তারা বলে, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে এ হুমকি কবে সত্য হবে?"[৮৮] বলো বিচিত্র কি যে, আযাবের ব্যাপারে তোমরা ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছো তার একটি অংশ তোমাদের নিকটবর্তী হয়ে যাবে।[৮৯] আসলে তোমার রব তো মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহকারী কিন্তু অধিকাংশ লোক শোকর গুযারী করে না।[৯০] নিসন্দেহে তোমার রব ভালোভাবেই জানেন যা কিছু তাদের অন্তর নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখে এবং যা কিছু তারা প্রকাশ করে।[৯১] আকাশ ও পৃথিবীর এমন কোন গোপন জিনিস নেই যা একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিখিত আকারে নেই।[৯২]

এ দু'টি যুক্তির সাথে সাথে আলোচ্য আয়াতে আরো একটি উপদেশ রয়েছে। সেটি এই যে, পূর্ববর্তী অপরাধীদের পরিণতি দেখে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো এবং আখেরাত অস্বীকার করার যে নির্বোধসূলভ বিশ্বাস তাদেরকে অপরাধীতে পরিণত করেছিল তার ওপর টিকে থাকার চেষ্টা করো না।

৮৭. অর্থাৎ তুমি তোমার বুঝাবার দায়িত্ব পালন করেছো। এখন যদি তারা না মেনে নেয় এবং নিজেদের নির্বোধসূলভ কর্মকাণ্ডের ওপর জিদ ধরে আল্লাহর আযাবের ভাগী হতে চায়, তাহলে অনর্থক তাদের অবস্থার জন্য হৃদয় দুঃখ ভারাক্রান্ত করে নিজেকে কষ্ট দাও কেন। আবার তারা সত্যের সাথে লড়াই এবং তোমার সংশোধন প্রচেষ্টাবলীকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য যেসব হীন চক্রান্ত করছে সেজন্য তোমার মনঃকষ্ট পাবার কোন কারণ নেই। তোমার পেছনে আছে আল্লাহর শক্তি। তারা তোমার কথা না মানলে তাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে, তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

৮৮. উপরের আয়াতের মধ্যে যে হুমকি প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার কথাই এখানে বলা হয়েছে। এর অর্থ ছিল এই যে, এ আয়াতে পরোক্ষভাবে আমাদের শাস্তি দেবার যে কথা বলা হচ্ছে, তা কবে কার্যকর হবে? আমরা তো তোমার আহবান প্রত্যাখ্যান করেছি এবং তোমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যও আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তাহলে এখন আমাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে না কেন?

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي
بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى
الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا
وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾ وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ
إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

যথার্থই এ কুরআন বনী ইসরাঈলকে বেশির ভাগ এমন সব কথার স্বরূপ বর্ণনা করে যেগুলোতে তারা মতভেদ করে।[৯৩] আর এ হচ্ছে পথ নির্দেশনা ও রহমত মু'মিনদের জন্য।[৯৪] নিশ্চয়ই (এভাবে) তোমার রব তাদের মধ্যেও[৯৫] নিজের হুকুমের মাধ্যমে ফায়সালা করে দেবেন, তিনি পরাক্রমশালী ও সবকিছু জানেন।[৯৬] কাজেই হে নবী! আল্লাহর উপর ভরসা করো, নিশ্চয়ই তুমি সুস্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছো। তুমি মৃতদেরকে শুনাতে পারো না।[৯৭] যেসব বধির পেছন ফিরে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে তাদের কাছে নিজের আহবান পৌঁছাতে পারো না[৯৮] এবং অন্ধদেরকে পথ বাতলে দিয়ে বিপথগামী হওয়া থেকে বাঁচাতে পারো না।[৯৯] তুমি তো নিজের কথা তাদেরকে শুনাতে পারো যারা আমার আয়াতের প্রতি ঈমান আনে এবং তারপর অনুগত হয়ে যায়।

৮৯. এটি একটি রাজসিক বাকভংগীমা। সর্বশক্তিমানের বাণীর মধ্যে যখন "সম্ভবত", "বিচিত্র কি" এবং "অসম্ভব কি" ধরনের শব্দাবলী এসে যায় তখন তার মধ্যে সন্দেহের কোন অর্থ থাকে না বরং তার মাধ্যমে একটি বেপরোয়া ভাব ফুটে ওঠে। অর্থাৎ তাঁর শক্তি এতই প্রবল ও প্রচণ্ড যে, তাঁর কোন জিনিস চাওয়া এবং তা হয়ে যাওয়া যেন একই ব্যাপার। তিনি কোন কাজ করতে চান এবং তা করা সম্ভব হলো না এমন কোন কথা কল্পনাও করা যেতে পারে না। এজন্য তাঁর পক্ষে "এমন হওয়া বিচিত্র কি" বলা এ অর্থ প্রকাশ করে যে, যদি তোমরা সোজা না হও তাহলে এমনটি হবেই। সামান্য একজন দারোগাও যদি পল্লীর কোন অধিবাসীকে বলে তোমার দুর্ভাগ্য হাতছানি দিচ্ছে। তাহলে তার রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি কাউকে বলেন, তোমার দুঃসময় তেমন দূরে নয়, তাহলে এরপরও সে কিভাবে নির্ভয়ে দিন কাটায়।

৯০. অর্থাৎ লোকেরা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেন না বরং তাদের সামলে নেবার সুযোগ দেন, এটা তো রব্বুল আলামীনের অনুগ্রহ।

কিন্তু অধিকাংশ লোক এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এ সুযোগ ও অবকাশকে নিজেদের সংশোধনের জন্য ব্যবহার করে না। বরং পাকড়াও হতে দেরী হচ্ছে দেখে মনে করে এখানে কোন পাকড়াওকারী নেই, কাজেই যা মন চায় করে যেতে থাকো এবং যে বুঝাতে চায় তার কথা বুঝতে যেয়ো না।

৯১. অর্থাৎ তিনি যে শুধু তাদের প্রকাশ্য কর্মতৎপরতাই জানেন তাই নয় বরং তারা মনের মধ্যে যেসব মারাত্মক ধরনের হিংসা–বিদ্বেষ লুকিয়ে রাখে এবং যে সব চক্রান্ত ও কূট কৌশলের কথা মনে মনে চিন্তা করতে থাকে, সেগুলোও তিনি জানেন। তাই যখন তাদের সর্বনাশের সময় এসে যাবে তখন তাদেরকে পাকড়াও করা যেতে পারে এমন একটি জিনিসও বাদ রাখা হবে না। এটি ঠিক এমন এক ধরনের বর্ণনা ভংগী যেমন একজন শাসক নিজ এলাকার কোন বদমায়েশকে বলে, তোমার সমস্ত কীর্তিকলাপের খবর আমি রাখি। এর অর্থ কেবল এতটুকুই হয় না যে, তিনি যে সবকিছুই জানেন একথা তাকে শুধু জানিয়েই দিচ্ছেন বরং এই সংগে এ অর্থও হয় যে, তুমি নিজের তৎপরতা থেকে বিরত হও, নয়তো মনে রেখো, যখন পাকড়াও হবে তখন প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য তোমাকে পুরোপুরি শাস্তি দেয়া হবে।

৯২. এখানে কিতাব মানে কুরআন নয় বরং মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহর রেকর্ড, যাতে ছোট বড় ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সবকিছু রক্ষিত আছে।

৯৩. পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় বক্তব্যের সাথে একথাটির সম্পর্ক রয়েছে। পূর্ববর্তী বক্তব্যের সাথে এর সম্পর্ক হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ এই অদৃশ্যজ্ঞানী আল্লাহর জ্ঞানের একটি প্রকাশ হচ্ছে এই যে, একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ থেকে এ কুরআনে এমন সব ঘটনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হচ্ছে যা বনী ইসরাঈলের ইতিহাসে ঘটেছে। অথচ বনী ইসরাঈলের আলেমদের মধ্যেও তাদের নিজেদের ইতিহাসের এসব ঘটনার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে (এর নজির এ সূরা নামলের প্রথম দিকের রুকূ'গুলোতেই পাওয়া যাবে, যেমন আমরা টীকায় বলেছি)। আর পরবর্তী বিষয়বস্তুর সাথে এর সম্পর্ক হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ যেভাবে মহান আল্লাহ ঐসমস্ত মত বিরোধের ফায়সালা করে দিয়েছেন অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বিরোধীদের মধ্যেও যে মতবিরোধ চলছে তারও ফায়সালা করে দেবেন। তাদের মধ্যে কে সত্যপন্থী এবং কে মিথ্যাপন্থী তা তিনি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেবেন। কার্যত এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর মাত্র কয়েক বছর অতিক্রান্ত হতেই এ ফায়সালা দুনিয়ার সামনে এসে গেলো। গোটা আরব ভূমিতে এবং সমগ্র কুরাইশ গোত্রে এমন এক ব্যক্তি ছিল না যে একথা মেনে নেয়নি যে, আবু জেহেল ও আবু লাহাব নয় বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের নিজেদের সন্তানরাও একথা মেনে নিয়েছিল যে, তাদের বাপদাদারা ভুল ও মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

৯৪. অর্থাৎ তাদের জন্য যারা এ কুরআনের দাওয়াত গ্রহণ করে এবং কুরআন যা পেশ করছে তা মেনে নেয়। এ ধরনের লোকেরা তাদের জাতি যে গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে তা থেকে রক্ষা পাবে। এ কুরআনের বদৌলতে তারা জীবনের সহজ সরল পথ লাভ করবে এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হবে। কুরাইশ বংশীয় কাফেররা এর কল্পনাও আজ করতে পারে না। এ অনুগ্রহের বারিধারাও মাত্র কয়েক বছর পরই দুনিয়াবাসী দেখে

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾

আর যখন আমার কথা সত্য হবার সময় তাদের কাছে এসে যাবে[১০০] তখন আমি তাদের জন্য মৃত্তিকা গর্ভ থেকে একটি জীব বের করবো। সে তাদের সাথে কথা বলবে যে, লোকেরা আমাদের আয়াত বিশ্বাস করতো না।[১০১]

নিয়েছে। দুনিয়াবাসী দেখেছে, যেসব লোক আরব মরুর এক অখ্যাত অজ্ঞাত এলাকায় অবহেলিত জীবন যাপন করছিল এবং কুফরী জীবনে বড়জোর একদল সফল নিশাচর দস্যু হতে পারতো তারাই এ কুরআনের প্রতি ঈমান আনার পর সহসাই সারা দুনিয়ার নেতা, জাতি সম্পদের পরিচালক, মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিক্ষক এবং দুনিয়ার একটি বিশাল ভূখণ্ডের শাসনকর্তায় পরিণত হয়ে গেছে।

৯৫. অর্থাৎ কুরাইশ বংশীয় কাফের ও মু'মিনদের মধ্যে।

৯৬. অর্থাৎ তাঁর ফায়সালা প্রবর্তন করার পথে কোন শক্তি বাধা দিতে পারে না এবং তাঁর ফায়সালার মধ্যে কোন ভুলের সম্ভাবনাও নেই।

৯৭. অর্থাৎ এমন ধরনের লোকদেরকে, যাদের বিবেক মরে গেছে এবং জিদ এক গুয়েমী ও রসমপূজা যাদের মধ্যে সত্য মিথ্যার পার্থক্য উপলব্ধি করার কোন প্রকার যোগ্যতাই বাকি রাখেনি।

৯৮. অর্থাৎ যারা তোমার কথা শুনবে না বলে শুধু কান বন্ধ করেই ক্ষান্ত হয় না বরং যেখানে তোমার কথা তাদের কানে প্রবেশ করতে পারে বলে তারা আশংকা করে সেখান থেকে তারা পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

৯৯. অর্থাৎ তাদের হাত ধরে জোর করে সোজা পথে টেনে আনা এবং তাদেরকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলা তোমার কাজ নয়। তুমি তো কেবলমাত্র মুখের কথা এবং নিজের চারিত্রিক উদাহরণের মাধ্যমেই জানাতে পারো যে, এটি সোজা পথ এবং এসব লোক যে পথে চলছে সেটি ভুল পথ। কিন্তু যে নিজের চোখ বন্ধ করে নিয়েছে এবং যে একদম দেখতেই চায় না তাকে তুমি কেমন করে পথ দেখাতে পারো।

১০০. অর্থাৎ কিয়ামত নিকটবর্তী হবে, যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হচ্ছে।

১০১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের (রা) বক্তব্য হচ্ছে, যখন দুনিয়ার বুকে সৎকাজের আদেশ দেয়া ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার মতো কোন লোক থাকবে না তখনই এ ঘটনা ঘটবে। ইবনে মারদুইয়াহ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলছেন, তিনি একথাটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছিলেন। এ থেকে জানা যায়, যখন মানুষ সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন করবে না তখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহ একটি জীবের মাধ্যমে শেষ মামলা দায়ের করবেন। এটি একটিই জীব হবে অথবা একটি বিশেষ ধরনের প্রজাতির জীব বহু সংখ্যায় সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে, একথা সুস্পষ্ট নয়।

دابة من الارض — শব্দগুলোর মধ্যে দু'ধরনের অর্থের সম্ভাবনা আছে। মোটকথা সে যে কথা বলবে তা হবে এই ঃ আল্লাহর যেসব আয়াতের মাধ্যমে কিয়ামত আসার ও আখেরাত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার খবর দেয়া হয়েছিল লোকেরা সেগুলো বিশ্বাস করেনি, কাজেই এখন দেখো সেই কিয়ামতের সময় এসে গেছে এবং জেনে রাখো, আল্লাহর আয়াত সত্য ছিল। "আর লোকেরা আমাদের আয়াত বিশ্বাস করতো না" এ বাক্যাংশটি সেই জীবের নিজের উক্তির উদ্ধৃতি হতে পারে অথবা হতে পারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উক্তির বর্ণনা। যদি এটি তার কথার উদ্ধৃতি হয়ে থাকে, তাহলে এখানে "আমাদের" শব্দটি সে ঠিক তেমনিভাবে ব্যবহার করবে যেমন প্রত্যেক সরকারী কর্মচারী "আমরা" অথবা "আমাদের" শব্দ ব্যবহার করে থাকে। অর্থাৎ সে সরকারের পক্ষ থেকে কথা বলছে, ব্যক্তিগতভাবে নিজের পক্ষ থেকে বলছে না। দ্বিতীয় অবস্থায় কথা একেবারে সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তার কথাকে যেহেতু নিজের ভাষায় বর্ণনা করছেন, তাই তিনি "আমাদের আয়াত" শব্দ ব্যবহার করেছেন।

এ জীব কখন বের হবে? এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে এবং একদিন দিন দুপুরে এ জানোয়ার বের হয়ে আসবে। এর মধ্যে যে নিদর্শনটিই আগে দেখা যাবে সেটির প্রকাশ ঘটবে অন্যটির কাছাকাছিই।" (মুসলিম) মুসলিম, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থগুলোতে অন্য যে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দাজ্জালের আবির্ভাব। ভূগর্ভের প্রাণীর প্রকাশ, ধোঁয়া ও সূর্যের পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া— এগুলো এমন সব নিদর্শন যা একের পর এক প্রকাশ হতে থাকবে।

এ জীবের সারবস্তু (Quiddity) ও আকৃতি-প্রকৃতি কি, কোথায় থেকে এর প্রকাশ ঘটবে এবং এ ধরনের অন্যান্য অনেক বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার বক্তব্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো পরস্পর বিভিন্ন ও বিপরীতধর্মী। এগুলোর আলোচনা কেবলমাত্র মানসিক অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য সৃষ্টিতে সাহায্য করবে এবং এগুলো জেনে কোন লাভও নেই। কারণ কুরআনে যে উদ্দেশ্যে এর উল্লেখ করা হয়েছে এ বিস্তারিত বর্ণনার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।

এখন ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ব্যাপার হলো, একটি প্রাণী এভাবে মানুষের সাথে মানুষের ভাষায় কথা বলার হেতু কি? আসলে এটি আল্লাহর অসীম শক্তির একটি নিদর্শন। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে বাকশক্তি দান করতে পারেন। কিয়ামতের পূর্বে তিনি তো শুধুমাত্র একটি প্রাণীকে বাকশক্তি দান করবেন কিন্তু যখন কিয়ামত কায়েম হয়ে যাবে তখন আল্লাহর আদালতে মানুষের চোখ, কান ও তার গায়ের চামড়া পর্যন্ত কথা বলতে থাকবে। যেমন কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

حَتّٰٓى اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ..... وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِىْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَىْءٍ (حم السجدة : ٢١-٢٠)

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ
يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا
بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ
لَا يَنطِقُونَ ﴿٨٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾

৭ রুকূ'

আর সেদিনের কথা একবার চিন্তা করো, যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে এমন সব লোকদের এক একটি দলকে ঘেরাও করে আনবো যারা আমার আয়াত অস্বীকার করতো। তারপর তাদেরকে (তাদের শ্রেণী অনুসারে স্তরে স্তরে) বিন্যস্ত করা হবে। অবশেষে যখন সবাই এসে যাবে তখন (তাদের রব তাদেরকে) জিজ্ঞেস করবেন, "তোমরা আমার আয়াত অস্বীকার করেছো অথচ তোমরা জ্ঞানগতভাবে তা আয়ত্ত করোনি?[১০২] যদি এ না হয়ে থাকে তাহলে তোমরা আর কি করছিলে"[১০৩] আর তাদের জুলুমের কারণে আযাবের প্রতিশ্রুতি তাদের ওপর পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তারা কিছুই বলতে পারবে না। তারা কি অনুধাবন করতে পারেনি, আমি তাদের প্রশান্তি অর্জন করার জন্য রাত তৈরি করেছিলাম এবং দিনকে উজ্জ্বল করেছিলাম?[১০৪] এরি মধ্যে ছিল অনেকগুলো নির্দশন যারা ঈমান আনতো তাদের জন্য।[১০৫]

১০২. অর্থাৎ কোন তাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে তোমরা এ আয়াতগুলোর মিথ্যা হবার কথা জানতে পেরেছিলে, এ আয়াতগুলো অস্বীকার করার পেছনে তোমাদের এ কারণ কখনোই ছিল না। তোমরা কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-অনুসন্ধান ছাড়াই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিলে।

১০৩. অর্থাৎ যদি এমন না হয়, তাহলে কি তোমরা একথা প্রমাণ করতে পারবে যে, গবেষণা-অনুসন্ধানের পর তোমরা এ আয়াতগুলোকে মিথ্যা পেয়েছিলে এবং সত্যিই কি তোমরা এ আয়াতগুলোয় যা বর্ণনা করা হয়েছে তা প্রকৃত সত্য নয়, এ ধরনের কোন জ্ঞান লাভ করেছিলে?

১০৪. অর্থাৎ অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে এ দু'টি নিদর্শন এমন যে, তারা হরহামেশা তা দেখে আসছিল। তারা প্রতি মুহূর্তে এগুলোর সাহায্যে লাভবান হচ্ছিল। কোন অন্ধ, বধির ও বোবার কাছেও এ দু'টি গোপন ছিল না। কেন তারা রাতের বেলা আরাম করার মুহূর্তে

وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ
إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴿٨٧﴾ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا
جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ
شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

আর কি হবে সেদিন যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং ভীত-বিহবল হয়ে পড়বে আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই[১০৬]—তারা ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ এ ভীতি-বিহবলতা থেকে রক্ষা করতে চাইবেন—আর সবাই তাঁর সামনে হাজির হবে কান চেপে ধরে। আজ তুমি দেখছো পাহাড়গুলোকে এবং মনে করছো ভালই জমাটবদ্ধ হয়ে আছে, কিন্তু সে সময় এগুলো মেঘের মতো উড়তে থাকবে। এ হবে আল্লাহর কুদরতের মূর্ত প্রকাশ, যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে বিজ্ঞতা সহকারে সুসংবদ্ধ করেছেন। তিনি ভালোভাবেই জানেন তোমরা কি করছো।[১০৭]

এবং দিনের সুযোগে লাভবান হবার সময় একথা চিন্তা করেনি যে, এক মহাবিজ্ঞ ও বিজ্ঞানময় সত্তা এ ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন এবং তিনি তাদের যথাযথ প্রয়োজন অনুযায়ী পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছেন? এটি কোন আকস্মিক ঘটনা হতে পারে না। কারণ এর মধ্যে উদ্দেশ্যমুখীনতা, বিজ্ঞানময়তা ও পরিকল্পনা গঠনের ধারা প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে। এগুলো কোন অন্ধ প্রাকৃতিক শক্তির গুণাবলীও হতে পারে না। আবার এগুলো বহু খোদার কার্যপ্রণালীও নয়। কারণ নিসন্দেহে এ ব্যবস্থা এমন কোন এক জনই স্রষ্টা, মালিক ও পরিচালক-ব্যবস্থাপক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যিনি পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য সকল গ্রহ-নক্ষত্রের ওপর কর্তৃত্ব করছেন। কেবলমাত্র এ একটি জিনিস দেখেই তারা জানতে পারতো যে, সেই একক স্রষ্টা তাঁর রসূল ও কিতাবের মাধ্যমে যে সত্য বর্ণনা করেছেন এ রাত ও দিনের আবর্তন তারই সত্যতা প্রমাণ করছে।

১০৫. অর্থাৎ এটি কোন দুর্বোধ্য কথাও ছিল না। তাদেরই ভাই-বন্ধু তাদেরই বংশ ও গোত্রের লোক এবং তাদেরই মত মানুষরাই তো এ নিদর্শনগুলো দেখে স্বীকার করেছিল যে, নবী যে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও তাওহীদের দিকে আহবান জানাচ্ছেন তা প্রকৃত সত্যের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল।

১০৬. শিংগার ফুৎকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন'আম ৪৭, সূরা ইবরাহীম ৫৭, সূরা তা-হা ৭৮, সূরা হজ্জ ১, সূরা ইয়াসীন ৪৬-৪৭ এবং সূরা যুমার ৭৯ টীকা।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ﴿٨٩﴾
وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ ۭ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا
مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ
الَّذِيْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ ۡ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩١﴾
وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ
وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿٩٢﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ
سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ۭ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে সে তার চেয়ে বেশী ভালো প্রতিদান পাবে[১০৮] এবং এ ধরনের লোকেরা সেদিনের ভীতি-বিহবলতা থেকে নিরাপদ থাকবে।[১০৯] আর যারা অসৎকাজ নিয়ে আসবে, তাদের সবাইকে অধোমুখে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা কি যেমন কর্ম তেমন ফল—ছাড়া অন্য কোন প্রতিদান পেতে পারো?[১০৯(ক)]

("হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলো) আমাকে তো হুকুম দেয়া হয়েছে, আমি এ শহরের রবের বন্দেগী করবো, যিনি একে হারামে পরিণত করেছেন এবং যিনি সব জিনিসের মালিক।[১১০] আমাকে মুসলিম হয়ে থাকার এবং এ কুরআন পড়ে শুনাবার হুকুম দেয়া হয়েছে।" এখন যে হেদায়াত অবলম্বন করবে সে নিজেরই ভালোর জন্য হেদায়াত অবলম্বন করবে এবং যে গোমরাহ হবে তাকে বলে দাও, আমি তো কেবলমাত্র একজন সতর্ককারী। তাদেরকে বলো, প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, শিগ্‌গির তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে দেবেন এবং তোমরা তা চিনে নেবে। আর তোমরা যেসব কাজ করো তা থেকে তোমার রব বেখবর নন।

১০৭. এ ধরনের গুণ সম্পন্ন আল্লাহর কাছে আশা করো না যে, তাঁর দুনিয়ায় তোমাদের বুদ্ধি-জ্ঞান, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করার যোগ্যতা এবং তাঁর প্রদত্ত সম্পদ ব্যবহার করার ক্ষমতা দান করার পর তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বেখবর থাকবেন। তাঁর যমীনে বসবাস করে তোমরা তাঁর প্রদত্ত ক্ষমতা-ইখতিয়ার কিভাবে ব্যবহার করছো তা তিনি দেখবেন না, এমনটি হতে পারে না।

১০৮. অর্থাৎ এদিক দিয়েও সে ভালো অবস্থায় থাকবে যে, যতটুকু সৎকাজ সে করবে তার তুলনায় বেশী পুরস্কার তাকে দেয়া হবে। আবার এদিক দিয়েও যে, তার সৎকাজ তো ছিল সাময়িক এবং তার প্রভাবও দুনিয়ায় সীমিত কালের জন্য ছিল কিন্তু তার পুরস্কার হবে চিরন্তন ও চিরস্থায়ী।

১০৯. অর্থাৎ কিয়ামত, হাশর ও বিচারের দিনের ভয়াবহতা সত্য অস্বীকারকারীদেরকে ভীত, সন্ত্রস্ত, হত-বিহবল ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় করে দিতে থাকবে এবং তাদের মাঝখানে এ সৎকর্মশীল লোকেরা নিশ্চিন্তে অবস্থান করবে। কারণ এসব কিছু ঘটবে তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী। ইতিপূর্বেই আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের দেয়া খবর অনুযায়ী তারা ভালোভাবেই জানতো, কিয়ামত হবে, আর একটি ভিন্ন জীবনধারা শুরু হয়ে যাবে এবং সেখানে এসব কিছুই হবে। তাই যারা মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এ বিষয়গুলো অস্বীকার করে এসেছে এবং এগুলো থেকে গাফিল থেকেছে তারা যে ধরনের আতংকিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, এ সৎকর্মশীলরা তেমনটি হবে না। তারপর তাদের নিশ্চিন্ততার আরো কারণ হবে এই যে, তারা এ দিনটির প্রত্যাশা করে এর জন্য প্রস্তুতির কথা চিন্তা করেছিল এবং এখানে সফলতা লাভ করার জন্য কিছু সাজ-সরঞ্জামও দুনিয়া থেকে সংগে করে এনেছিল। তাই তারা তেমন কোন আতংকের শিকার হবে না যেমন আতংকের শিকার হবে এমনসব লোক যারা নিজেদের জীবনের সমস্ত পুঁজি ও উপায়-উপকরণ দুনিয়াবী কামিয়াবী হাসিলের পেছনে লাগিয়ে দিয়েছিল এবং কখনো একথা চিন্তা করেনি যে, পরকাল বলে একটি জীবন আছে এবং সেখানকার জন্য কিছু সাজ সরঞ্জামও তৈরী করতে হবে। অস্বীকারকারীদের বিপরীতে এ মু'মিনরা এখন নিশ্চিন্ত হবে। তারা মনে করবে, যেদিনের জন্য আমরা অবৈধ লাভ ও আনন্দ ত্যাগ করেছিলাম এবং বিপদ ও কষ্ট বরদাশ্‌ত করেছিলাম সে দিনটি এসে গেছে, কাজেই এখন এখানে আমাদের পরিশ্রমের ফল নষ্ট হবে না।

১০৯(ক). কুরআন মজীদের বহু জায়গায় একথা সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, আখেরাতে অসৎ কাজের প্রতিদান ঠিক ততটাই দেয়া হবে যতটা কেউ অসৎ কাজ করেছে এবং সৎকাজের প্রতিদান আল্লাহ মানুষের প্রকৃত কাজের তুলনায় অনেক বেশী দেবেন। এ সম্পর্কিত আরো বেশী দৃষ্টান্তের জন্য দেখুন সূরা ইউনুস ২৬-২৭, আল কাসাস ৮৪, আনকাবুত ৭, সাবা ৩৭-৩৮ এবং আল মু'মিন ৪০ আয়াত।

১১০. এ সূরা যেহেতু এমন এক সময় নাযিল হয়েছিল যখন ইসলামের দাওয়াত কেবলমাত্র মক্কা মু'আয্‌যমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং এ দাওয়াতে কেবলমাত্র মক্কার অধিবাসীদেরকেই সম্বোধন করা হচ্ছিল। তাই বলা হয়েছে ঃ "আমাকে এ শহরের রবের বন্দেগী করার হুকুম দেয়া হয়েছে।" এ সংগে এ রবের যে বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, তিনি একে সুরক্ষিত ও পবিত্রতম স্থানে পরিণত করেছেন। এর উদ্দেশ্য মক্কার কাফেরদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া যে, চরম অশান্তি, হানাহানি, যুদ্ধবিগ্রহ, ও রক্তপাত বিধ্বস্ত আরব ভূখণ্ডের এ শহরকে শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করে যে আল্লাহ তোমাদের প্রতি এ বিপুল অনুগ্রহ করেছেন এবং যাঁর অনুগ্রহে তোমাদের এ শহর সমগ্র আরব দেশে ভক্তি ও শ্রদ্ধার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, তোমরা তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে চাইলে হতে পারো কিন্তু আমাকে তো হুকুম দেয়া হয়েছে আমি যেন তার

কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হই এবং তাঁরই সামনে নিজের বিনয় ও নম্রতার শির নত করি। তোমরা যাদেরকে উপাস্য বানিয়েছ তাদের কারো এ শহরকে হারামে পরিণত করার এবং আরবের যুদ্ধপ্রিয় ও লুটেরা গোত্রগুলোকে এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য করার ক্ষমতা ছিল না। কাজেই আসল অনুগ্রহকারীকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তার সামনে মাথা নত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় যাদের আমার প্রতি সামান্যতমও অনুগ্রহ ও অবদান নেই।

আল কাসাস

২৮

নামকরণ

২৫ আয়াতের وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ বাক্যাংশ থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে সূরায় القَصَص শব্দটি এসেছে। আভিধানিক অর্থে কাসাস বলতে ধারাবাহিকভাবে ঘটনা বর্ণনা করা বুঝায়। এ দিক দিয়ে এ শব্দটি অর্থের দিক দিয়েও এ সূরার শিরোনাম হতে পারে। কারণ এর মধ্যে হযরত মূসার কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

সূরা নাম্‌লের ভূমিকায় আমি ইবনে আব্বাস (রা) ও জাবের ইবনে যায়দের (রা) একটি উক্তি উদ্ধৃত করে এসেছি। তাতে বলা হয়েছিল, সূরা শু'আরা, সূরা নাম্‌ল ও সূরা কাসাস একের পর এক নাযিল হয়। ভাষা, বর্ণনাভংগী ও বিষয়বস্তু থেকেও একথাই অনুভূত হয় যে, এ তিনটি সূরা প্রায় একই সময় নাযিল হয়। আবার এদিক দিয়েও এদের মধ্যে নিকটতম সম্পর্ক রয়েছে যে, এ সূরাগুলোতে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাহিনীর যে বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো পরস্পর মিলিত আকারে একটি পূর্ণ কাহিনীতে পরিণত হয়ে যায়। সূরা শু'আরায় নবুওয়াতের দায়িত্ব গ্রহণ করার ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করে হযরত মূসা বলেন ঃ "ফেরাউনী জাতির বিরুদ্ধে একটি অপরাধের জন্য আমি দায়ী। এ কারণে আমার ভয় হচ্ছে, সেখানে গেলেই তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।" তারপর হযরত মূসা যখন ফেরাউনের কাছে যান তখন সে বলে ঃ "আমরা কি তোমাকে আমাদের এখানে ছোট্ট শিশুটি থাকা অবস্থায় লালন পালন করিনি? এবং তুমি আমাদের এখানে কয়েক বছর থাকার পর যা করে গেছো তাতো করেছই।" এ দু'টি কথার কোন বিস্তারিত বর্ণনা সেখানে নেই। এ সূরায় তার বিস্তারিত বিবরণ এসে গেছে। অনুরূপভাবে সূরা নাম্‌লে এ কাহিনী সহসা একথার মাধ্যমে শুরু হচ্ছে যে, হযরত মূসা তাঁর পরিবার পরিজনদের নিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় হঠাৎ তিনি একটি আগুন দেখলেন। এটা কোন্ ধরনের সফর ছিল, তিনি কোথায় থেকে আসছিলেন এবং কোথায় যাচ্ছিলেন এর কোন বিবরণ সেখানে নেই। এর বিস্তারিত বিবরণ এ সূরায় পাওয়া যায়। এভাবে এ তিনটি সূরা মিলে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাহিনীকে পূর্ণাঙ্গ রূপদান করেছে।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের বিরুদ্ধে যেসব সন্দেহ ও আপত্তি উত্থাপন করা হচ্ছিল সেগুলো দূর করা এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে যেসব ওজুহাত পেশ করা হচ্ছিল সেগুলো নাকচ করে দেয়া।

এ উদ্দেশ্যে প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে হযরত মূসার কাহিনী। সূরা নাযিলের সময়কালীন অবস্থার সাথে মিলে এ কাহিনী স্বতস্ফূর্তভাবেই শ্রোতার মনে কতিপয় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে দেয় ঃ

এক ঃ আল্লাহ যা কিছু করতে চান সে জন্য তিনি সবার অলক্ষ্যে কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করে দেন। যে শিশুর হাতে শেষ পর্যন্ত ফেরাউনের রাজত্বের অবসান ঘটবার কথা, তাকে আল্লাহ স্বয়ং ফেরাউনের গৃহে তার নিজের হাতেই প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেন এবং ফেরাউন জানতে পারেনি সে কাকে প্রতিপালন করছেন। সেই আল্লাহর ইচ্ছার সাথে কে লড়াই করতে পারে এবং তাঁর মোকবিলায় কার কৌশল সফল হতে পারে।

দুই ঃ কোন বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করে এবং আকাশ ও পৃথিবীতে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার মাধ্যমে কাউকে এ নবুওয়াত দান করা হয় না। তোমরা অবাক হচ্ছো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথা থেকে চুপিচুপি এ নবুওয়াত লাভ করলেন এবং ঘরে বসে বসে তিনি কেমন করে নবী হয়ে গেলেন। কিন্তু তোমরা নিজেরাই যে মূসা আলাইহিস সালামের বরাত দিয়ে থাক যে, لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ (৪৮ আয়াত) তিনিও এভাবে পথে চলার সময় নবুওয়াত লাভ করেছিলেন এবং সেদিন সিনাই পাহাড়ের নিঝুম উপত্যকায় কি ঘটনা ঘটে গেলো তা ঘূণাক্ষরেও কেউ জানতে পারলো না। মূসা নিজেও এক সেকেণ্ড আগে জানতেন না তিনি কি জিনিস পেতে যাচ্ছেন। যাচ্ছিলেন আগুন আনতে, পেয়ে গেলেন পয়গম্বরী।

তিন ঃ যে বান্দার সাহায্যে আল্লাহ কোন কাজ নিতে চান, কোন দলবল-সেনাবাহিনী ও সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই তার উত্থান ঘটে থাকে। কেউ তাঁর সাহায্যকারী হয় না। বাহ্যত তার কাছে কোন শক্তির বহর থাকে না। কিন্তু বড় বড় দলবল, সেনাবাহিনী ও সাজ-সরঞ্জাম ওয়ালারা শেষ পর্যন্ত তার মোকাবিলায় ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে যায়। তোমরা আজ তোমাদের ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে যে আনুপাতিক পার্থক্য দেখতে পাচ্ছো তার চেয়ে অনেক বেশী পার্থক্য ছিল মূসা আলাইহিস সালাম ও ফেরাউনের শক্তির মধ্যে। কিন্তু দেখে নাও কে জিতলো এবং কে হারলো।

চার ঃ তোমরা বার বার মূসার বরাত দিয়ে থাকো। তোমরা বলে থাকো, মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল তা মুহাম্মাদকে দেয়া হলো না কেন? অর্থাৎ লাঠি, সাদা হাত ও অন্যান্য প্রকাশ্য মু'জিযাসমূহ। ভাবখানা এ রকম যেন তোমরা ঈমান আনার জন্য তৈরি হয়েই বসে আছো, এখন শুধু তোমাদেরকে সেই মু'জিযাগুলো দেখাতে হবে যা মূসা ফেরাউনকে দেখিয়েছিলেন। তোমরা তার অপেক্ষায় রয়েছো। কিন্তু যাদেরকে এসব মু'জিযা দেখানো হয়েছিল তারা কি করেছিল তা কি তোমরা জানো? তারা এগুলো দেখেও ঈমান আনেনি। তারা নির্দ্বিধায় বলেছিল, এসব জাদু। কারণ তারা সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও হঠকারিতায় লিপ্ত হয়েছিল। এই একই রোগে আজ তোমরাও ভুগছো। তোমরা কি ঐ ধরনের মু'জিযা দেখে ঈমান আনবে? তারপর তোমরা কি এ খবরও রাখো, যারা ঐ মু'জিযা দেখে সত্যকে অস্বীকার করেছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল? শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এখন তোমরাও কি একই প্রকার হঠকারিতা সহকারে মু'জিযার দাবী জানিয়ে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনতে চাচ্ছো?

মক্কার কুফরী ভারাক্রান্ত পরিবেশে যে ব্যক্তি হযরত মূসার এ কাহিনী শুনতো তার মনে কোন প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই আপনা আপনিই একথাগুলো বদ্ধমূল হয়ে যেতো। কারণ সেসময় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মক্কার কাফেরদের মধ্যে ঠিক তেমনি ধরনের একটি দ্বন্দ্ব–সংঘাত চলছিল যেমন ইতিপূর্বে চলেছিল ফেরাউন ও হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মধ্যে। এ অবস্থায় এ কাহিনী শুনাবার অর্থ ছিল এই যে, এর প্রত্যেকটি অংশ সম সাময়িক অবস্থার ওপর আপনা আপনি প্রযুক্ত হয়ে যেতে থাকবে। যদি এমন একটি কথাও না বলা হয়ে থাকে যার মাধ্যমে কাহিনীর কোন্ অংশটি সে সময়ের কোন্ অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল তা জানা যায়, তাহলেও তাতে কিছু এসে যায় না।

এরপর পঞ্চম রুকূ' থেকে মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে সরাসরি আলোচনা শুরু হয়েছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মী তথা নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও দু'হাজার বছর আগের ঐতিহাসিক ঘটনা একেবারে হুবহু শুনিয়ে যাচ্ছেন, অথচ তাঁর শহর ও তাঁর বংশের লোকেরা ভালোভাবেই জানতো, তাঁর কাছে এসব তথ্য সংগ্রহ করার জন্য উপযুক্ত কোন উপায় উপকরণ ছিল না। প্রথমে এ বিষয়টিকে তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

তারপর তাঁকে নবুওয়াত দান করার ব্যাপারটিকে তাদের পক্ষে আল্লাহর রহমত হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ তারা গাফিলতির মধ্যে ডুবে গিয়েছিল এবং আল্লাহ তাদের সৎপথ দেখাবার জন্য এ ব্যবস্থা করেন।

তারপর তারা বারবার "এই নবী এমন সব মু'জিযা আনছেন না কেন? যা ইতিপূর্বে মূসা এনেছিলেন।" এ মর্মে যে অভিযোগ করছিল তার জবাব দেয়া হয়। তাদেরকে বলা হয়, মূসার ব্যাপারে তোমরা স্বীকার করছো যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মু'জিযা এনেছিলেন। কিন্তু তাঁকেই বা তোমরা কবে মেনে নিয়েছিলে? তাহলে এখন এ নবীর মু'জিযার দাবী করছো কেন? তোমরা যদি প্রবৃত্তির কামনা–বাসনার দাসত্ব না করো, তাহলে সত্য এখনো তোমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য হতে পারে। কিন্তু তোমরা যদি এ রোগে ভুগতে থাকো, তাহলে যে কোন মু'জিযা আসুক না কেন তোমাদের চোখ খুলবে না।

তারপর সে সময়কার একটি ঘটনার ব্যাপারে মক্কার কাফেরদেরকে শিক্ষা ও লজ্জা দেয়া হয়েছে। ঘটনাটি ছিল ঃ সে সময় বাইর থেকে কিছু খৃষ্টান মক্কায় আসেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে কুরআন শুনে ঈমান আনেন। কিন্তু মক্কার লোকেরা নিজেদের গৃহের এ নিয়ামত থেকে লাভবান তো হলোই না। উপরন্তু আবু জেহেল প্রকাশ্যে তাদেরকে লাঞ্ছিত করে।

সবশেষে মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা না মানার জন্য তাদের পক্ষ থেকে যে আসল ওযর পেশ করতো সে প্রসংগ আলোচিত হয়েছে। তারা বলতো, যদি আরববাসীদের প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম ত্যাগ করে আমরা এ নতুন তাওহীদী ধর্ম গ্রহণ করি, তাহলে সহসাই এদেশ থেকে আমাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্ব খতম হয়ে যাবে। তখন আমাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌছুবে যার ফলে আমরা আরবের সবচেয়ে বেশী প্রভাবশালী গোত্রের মর্যাদা হারিয়ে বসবো এবং এ

ভূ-খণ্ডে আমাদের জন্য কোন আশ্রয়স্থলও থাকবে না। এটিই ছিল কুরাইশ সরদারদের সত্য বৈরিতার মূল উদ্যোক্তা। অন্যান্য সমস্ত সন্দেহ, অভিযোগ, আপত্তি ছিল নিছক বাহানাবাজী। জনগণকে প্রতারিত করার জন্য তারা সেগুলো সময়মতো তৈরী করে নিতো। তাই আল্লাহ সূরার শেষ পর্যন্ত এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং এক একটি দিকের ওপর আলোকপাত করে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এমন সমস্ত মৌলিক রোগের চিকিৎসা করেছেন যেগুলোর কারণে তারা পার্থিব ও বৈষয়িক স্বার্থের দৃষ্টিতে সত্য ও মিথ্যার ফায়সালা করতো।

আয়াত ৮৮ **সূরা আল কাসাস–মক্কী** রুকূ' ৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

طٰسٓمٓ ﴿١﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾ نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى
وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٣﴾ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ
وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ
وَيَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤﴾

তা–সীন–মীম। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। আমি মূসা ও ফেরাউনের কিছু যথাযথ বৃত্তান্ত তোমাকে শুনাচ্ছি[১] এমনসব লোকদের সুবিধার্থে যারা ঈমান আনে।[২]

প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, ফেরাউন পৃথিবীতে বিদ্রোহ করে[৩] এবং তার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেয়।[৪] তাদের মধ্য থেকে একটি দলকে সে লাঞ্ছিত করতো, তাদের ছেলেদের হত্যা করতো এবং মেয়েদের জীবিত রাখতো।[৫] আসলে সে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তরভুক্ত ছিল।

১. তুলনামূলক অধ্যায়নের জন্য দেখুন আল বাকারাহ ৬ রুকূ', আল আ'রাফ ১৩–১৬ রুকূ', ইউনুস ৮–৯ রুকূ', হূদ ৯ রুকূ', বনী ইসরাঈল ১২ রুকূ', মারয়াম ৪ রুকূ', তা–হা ১–৪ রুকূ, আল মু'মিনুন ৩ রুকূ', আশ্ শু'আরা ২–৪ রুকূ', আন নাম্‌ল ১ রুকূ', আল আনকাবুত ৪ রুকূ, আল মুমিন ৩–৫ রুকূ, আয্ যুখ্‌রুফ ৫ রুকূ', আদ্ দুখান ১ রুকূ', আয্ যারিয়াত ২ রুকূ, এবং আন্‌নাযিআ'ত ১ রুকূ'।

২. অর্থাৎ যারা কথা মেনে নিতে প্রস্তুত নয় তাদেরকে কথা শুনানো তো অর্থহীন। তবে যারা মনের দুয়ারে এক গুঁয়েমীর তালা ঝুলিয়ে রাখে না। এ আলোচনায় তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে।

৩. মূলে عَلَا فِى الْاَرْضِ শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, সে পৃথিবীতে মাথা উঠিয়েছে, বিদ্রোহাত্মক নীতি অবলম্বন করেছে, নিজের আসল মর্যাদা অর্থাৎ দাসত্বের স্থান থেকে উঠে স্বেচ্ছাচারী ও প্রভুর রূপ ধারণ করেছে, অধীন হয়ে

থাকার পরিবর্তে প্রবল হয়ে গেছে এবং স্বৈরাচারী ও অহংকারী হয়ে জুলুম করতে শুরু করেছে।

৪. অর্থাৎ তার রাজ্য শাসনের নীতি অনুযায়ী আইনের চোখে দেশের সকল অধিবাসী সমান থাকেনি এবং সবাইকে সমান অধিকারও দেয়া হয়নি। বরং সে সভ্যতা–সংস্কৃতি ও রাজনীতির এমন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে যার মাধ্যমে রাজ্যের অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেয়া হয়। একদলকে সুযোগ সুবিধা ও বিশেষ অধিকার দিয়ে শাসক দলে পরিণত করা হয় এবং অন্যদলকে অধীন করে পদানত, পর্যুদস্ত, নিষ্পেষিত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হয়।

এখানে কারো এ ধরনের সন্দেহ করার অবকাশ নেই যে, ইসলামী রাষ্ট্রেও তো মুসলিম ও জিম্মীর মধ্যে ফারাক করা হয় এবং তাদের অধিকার ও ক্ষমতাও সকল দিক দিয়ে সমান রাখা হয়নি। এ সন্দেহ এজন্য সঠিক নয় যে, ফেরাউনী বিধানে যেমন বংশ, বর্ণ, ভাষা বা শ্রেণীগত বিভেদের ওপর বৈষম্যের ভিত্ রাখা হয়েছে ইসলামী বিধানে ঠিক তেমনটি নয়। বরং ইসলামী বিধানে নীতি ও মতবাদের ওপর এর ভিত রাখা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যিম্মী ও মুসলমানের মধ্যে আইনগত অধিকারের ক্ষেত্রে মোটেই কোন ফারাক নেই। সকল পার্থক্য একমাত্র রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে। আর এ পার্থক্যের কারণ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, একটি আদর্শিক রাষ্ট্রে শাসকদল একমাত্র তারাই হতে পারে যারা হবে রাষ্ট্রের মূলনীতির সমর্থক। এদলে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি শামিল হতে পারে যে এ মূলনীতি মেনে নেবে এবং এমন প্রত্যেক ব্যক্তি এর বাইরে অবস্থান করবে যে এ মূলনীতি মেনে নেবে না। এ পার্থক্য ও ফেরাউনী ধরনের পার্থক্যের মধ্যে কোন মিল নেই। কারণ, ফেরাউনী পার্থক্যের ভিত্তিতে পরাধীন প্রজন্মের কোন ব্যক্তি কখনো শাসক দলে শামিল হতে পারে না। সেখানে পরাধীন প্রজন্মের লোকেরা রাজনৈতিক ও আইনগত অধিকার তো দূরের কথা মৌলিক মানবিক অধিকারও লাভ করে না। এমন কি জীবিত থাকার অধিকারও তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। সেখানে কখনো পরাধীনদের জন্য কোন অধিকারের জামানত দেয়া হয় না। সব ধরনের স্বার্থ, মুনাফা, সুযোগ–সুবিধা ও মর্যাদা একমাত্র শাসক সমাজের জন্য নির্দিষ্ট থাকে এবং এ বিশেষ অধিকার একমাত্র শাসক জাতির মধ্যে জন্মলাভকারী ব্যক্তিই লাভ করে।

৫. বাইবেলে এর নিম্নরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ঃ "পরে মিসরের উপরে এক নতুন রাজা উঠিলেন, তিনি যোষেফকে জানিতেন না। তিনি আপন প্রজাদিগকে কহিলেন, দেখ, আমাদের অপেক্ষা ইস্রায়েল–সন্তানদের জাতি বহ সংখ্যক ও বলবান; আইস, আমরা তাহাদের সহিত বিবেচনা পূর্বক ব্যবহার করি, পাছে তাহারা বাড়িয়া উঠে,এবং যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহারাও শত্রুপক্ষে যোগ দিয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করে, এবং এদেশ হইতে প্রস্থান করে। অতএব তাহারা ভার বহন দ্বারা উহাদিগকে দুঃখ দিবার জন্য উহাদের উপরে কার্য্য শাসকদিগকে নিযুক্ত করিল। আর উহারা ফরৌণের নিমিত্ত ভাণ্ডারের নগর পিথোম ও রামিষেষ গাঁথিল। কিন্তু উহারা তাহাদের দ্বারা যত দুঃখ পাইল, ততই বৃদ্ধি পাইতে ও ব্যাপ্ত হইতে লাগিল; তাই ইস্রায়েল সন্তানদের বিষয়ে তাহারা অতিশয়

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً
وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ۝ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ
وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ۝

আমি সংকল্প করেছিলাম, যাদেরকে পৃথিবীতে লাঞ্ছিত করে রাখা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবো, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করবো,[৬] তাদেরকেই উত্তরাধিকারী করবো,[৭] পৃথিবীতে তাদেরকে কর্তৃত্ব দান করবো। এবং তাদের থেকে ফেরাউন, হামান[৮] ও তার সৈন্যদেরকে সে সবকিছুই দেখিয়ে দেবো, যার আশংকা তারা করতো।

উদ্বিগ্ন হইল। আর মিশ্রীয়েরা নির্দয়তা পূর্বক ইস্রায়েল সন্তানদিগকে দাস্যকর্ম করাইল, তাহারা কর্দম, ইষ্টক ও ক্ষেত্রের সমস্ত কার্যে কঠিন দাস্যকর্ম দ্বারা উহাদের প্রাণ তিক্ত করিতে লাগিল। তাহারা উহাদের দ্বারা যে যে দাস্যকর্ম–করাইত, সে সমস্ত নির্দয়তা পূর্বক করাইত। পরে মিসরের রাজা শিফ্রা নামে ও পুয়া নামে দুই ইব্রীয়া ধাত্রীকে একথা কহিলেন, যে সময়ে তোমরা ইব্রীয় স্ত্রীলোকদের ধাত্রী কার্য করিবে ও তাহাদিগকে প্রসব আধারে দেখিবে, যদি পুত্র সন্তান হয়, তাহাকে বধ করিবে; আর যদি কন্যা হয়, তাহাকে জীবিত রাখিবে।" (যাত্রাপুস্তক ১ ঃ ৮–১৬)

এ থেকে জানা যায়, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের যুগ অতিক্রান্ত হবার পর মিসরে একটি জাতীয়তাবাদী বিপ্লব সাধিত হয়েছিল এবং কিবতীদের হাতে যখন পুনর্বার শাসন ক্ষমতা এসেছিল তখন নতুন জাতীয়তাবাদী সরকার বনী ইসরাঈলের শক্তি নির্মূল করার পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। এ ব্যাপারে শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলকে লাঞ্ছিত ও পদদলিত এবং তাদেরকে নিকৃষ্ট ধরনের সেবা কর্মের জন্য নির্দিষ্ট করেই ক্ষান্ত থাকা হয়নি বরং এ থেকে আরো অগ্রসর হয়ে তাদের ছেলেদের হত্যা করে কেবলমাত্র মেয়েদের জীবিত রাখার নীতি অবলম্বন করা হয়, যাতে করে তাদের মেয়েরা ধীরে ধীরে কিব্‌তীদের কর্তৃত্বাধীনে এসে যেতে থাকে এবং তাদের থেকে ইসরাঈলের পরিবর্তে কিবতীদের বংশ বিস্তার লাভ করে। তালমূদ এর আরো বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দিয়েছে যে, হযরত ইউসুফের ইন্তিকালের সময় থেকে একশতকের কিছু বেশী সময় অতিক্রান্ত হবার পর এ বিপ্লব আসে। সেখানে বলা হয়েছে, নতুন জাতীয়তাবাদী সরকার প্রথমে বনী ইসরাঈলকে তাদের উর্বর কৃষিক্ষেত, বাসগৃহ ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে। তারপর তাদেরকে বিভিন্ন সরকারী পদ থেকে বেদখল করে দেয়। এরপরও যখন কিব্‌তী শাসকরা অনুভব করে যে, বনী ইসরাঈল ও তাদের সমধর্মাবলম্বী মিসরীয়রা যথেষ্ট শক্তিশালী তখন তারা ইসরাঈলীদেরকে লাঞ্ছিত ও হীনবল করতে থাকে এবং তাদের থেকে কঠিন পরিশ্রমের কাজ সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বা বিনা পারিশ্রমিকেই নিতে থাকে। কুরআনে এক

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي
الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ
الْمُرْسَلِينَ ۝ فَالْتَقَطَهُۥٓ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ
إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَٰنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَٰطِـِٔينَ ۝ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ
فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ ۖ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ
وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

আমি[৯] মূসার মাকে ইশারা করলাম, "একে স্তন্যদান করো, তারপর যখন এর প্রাণের ভয় করবে তখন একে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবে এবং কোন ভয় ও দুঃখ করবে না, তাকে তোমারই কাছে ফিরিয়ে আনবো এবং তাকে রসূলদের অন্তরভুক্ত করবো।"[১০] শেষ পর্যন্ত ফেরাউনের পরিবারবর্গ তাকে (দরিয়া থেকে) উঠিয়ে নিল, যাতে সে তাদের শত্রু এবং তাদের দুঃখের কারণ হয়।[১১] যথার্থই ফেরাউন, হামান ও তার সৈন্যরা (তাদের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে) ছিল বড়ই অপরাধী। ফেরাউনের স্ত্রী (তাকে) বললো, "এ শিশুটি আমার ও তোমার চোখ জুড়িয়েছে। কাজেই একে হত্যা করো না, বিচিত্র কি সে আমাদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসেবেই গ্রহণ করতে পারি।"[১২] আর তারা (এর পরিণাম) জানতো না।

জায়গায় বলা হয়েছে যে, "তারা মিসরের অধিবাসীদের একটি গোষ্ঠীকে লাঞ্ছিত ও হীনবল করতো" এ বক্তব্য সেই উক্তির ব্যাখ্যা বিবেচিত হতে পারে। আর সূরা আল বাকারায় আল্লাহ যে বলেছেন, ফেরাউনের বংশধররা বনী ইসরাঈলকে কঠোর শাস্তি দিতো। يسومونكم سوء العذاب এরও ব্যাখ্যা এটিই।

কিন্তু বাইবেল ও কুরআনে এ ধরনের কোন আলোচনা নেই যাতে বলা হয়েছে যে, কোন জোতিষী ফেরাউনকে বলেছিল, বনী ইসরাঈলে একটি শিশু জন্ম নেবে, তার হাতে ফেরাউনী কর্তৃত্বের মৃত্যু ঘটবে এবং এ বিপদের পথ রোধ করার জন্য ফেরাউন ইসরাঈলীদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল। অথবা ফেরাউন কোন ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেছিল এবং তার তা'বীর এভাবে দেয়া হয়েছিল যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে এ ধরনের বিশেষ গুণ বিশিষ্ট শিশু জন্ম নেবে। তালমূদ ও অন্যান্য ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে এ কাহিনী আমাদের মুফাস্‌সিরগণ উদ্ধৃত করেছেন। (দেখুন জুয়িশ ইনসাইক্লোপেডিয়া, নিবন্ধ "মূসা" এবং The Talmud selections. P.123-24)

৬. অর্থাৎ তাদেরকে দুনিয়ায় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দান করবো।

৭. অর্থাৎ তাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকার দান করবো এবং তারা হবে রাষ্ট্র পরিচালক ও শাসনকর্তা।

৮. পশ্চিমা প্রাচ্যবিদরা এ বিষয়টি নিয়ে বেশ ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছেন যে, হামান তো ছিল ইরানের বাদশাহ আখ্‌সোবীরাস অর্থাৎ খাশিয়ারশার (Xerxes) দরবারের একজন আমীর। আর এ বাদশাহর আমল হযরত মূসার শত শত বছর পরে খৃঃ পূঃ ৪৮৬ ও ৪৬৫ সালে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কুরআন তাকে মিসরে নিয়ে গিয়ে ফেরাউনের মন্ত্রী বানিয়ে দিয়েছে। তাদের বিবেকবুদ্ধি যদি বিদ্বেষের আবরণে আচ্ছাদিত না থাকতো, তাহলে তারা নিজেরাই এ বিষয়টি ভেবে দেখতে পারতো। আখসোবীরাসের সভাসদ হামানের পূর্বে দুনিয়ায় এ নামে আর কোন ব্যক্তি কোথাও ছিল কিনা এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে বলার মতো তাদের কাছে কি এমন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে? যে ফেরাউনের আলোচনা এখানে হচ্ছে যদি তার সমস্ত মন্ত্রী, আমীর-উমরাহ ও সভাসদদের কোন পূর্ণাঙ্গ তালিকা একেবারে নির্ভরযোগ্য সূত্রে কোন প্রাচ্যবিদ সাহেব পেয়ে গিয়ে থাকেন, যাতে হামানের নাম নেই, তাহলে তিনি তা লুকিয়ে রেখেছেন কেন? এখনই তার ফটোকপি তাঁর ছাপিয়ে দেয়া উচিত। কারণ কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য এর চেয়ে বড় প্রভাবশালী অস্ত্র আর তিনি পাবেন না।

৯. মাঝখানে এ আলোচনা উহ্য রাখা হয়েছে যে, এ অবস্থায় এক ইসরাইলী পরিবারে একটি শিশুর জন্ম হয়, সারা দুনিয়া যাকে মূসা আলাইহিস সালাম বলে জানে। বাইবেল ও তালমুদের বর্ণনা অনুযায়ী এটি ছিল হযরত ইয়াকুবের পুত্র লাভীর সন্তানদের মধ্য থেকে কাহোর পরিবার। ঐ গ্রন্থ দু'টিতে হযরত মূসার পিতার নাম বলা হয়েছে ঈমরাম। কুরআন একেই ঈমরান শব্দের মাধ্যমে উচ্চারণ করেছে। মূসা আলাইহিস সালামের জন্মের পূর্বে তাঁদের আরো দু'টি সন্তান হয়েছিল। সবচেয়ে বড় মেয়েটির নাম ছিল মারয়াম (Miriam)। তার আলোচনা সামনের দিকে আসছে। তার ছোট ছিল হযরত হারুন। সম্ভবত বনী ইসরাঈলী পরিবারে কোন পুত্র সন্তান জন্ম নিলে তাকে হত্যা করতে হবে—এই ফেরাউনী নির্দেশনামা জারী হবার পূর্বে হযরত হারুনের জন্ম হয়েছিল। তাই তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। এরপর এ আইন জারী হয় এবং ভয়ংকর পরিবেশে তৃতীয় সন্তানের জন্ম হয়।

১০. অর্থাৎ জন্মের সাথে সাথেই সাগরে ভাসিয়ে দেবার হুকুম দেয়া হয়নি। বরং বলা হয়, যতক্ষণ ভয়ের কারণ না থাকে শিশুকে স্তন্য দান করতে থাকো। যখন গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে গেছে বলে মনে হবে এবং আশংকা দেখা দেবে শিশুর আওয়াজ শুনে বা অন্য কোনভাবে শত্রুরা তার জন্মের কথা জানতে পারবে অথবা স্বয়ং বনী ইসরাঈলীদের কোন নীচ ব্যক্তি গোয়েন্দাগিরী করবে, তখন নির্ভয়ে ও নিশংকচিত্তে একটি বাক্সের মধ্যে রেখে তাকে সাগরে ভাসিয়ে দেবে। বাইবেলের বর্ণনা মতে জন্মের পর তিন মাস পর্যন্ত হযরত মূসার মা তাকে লুকিয়ে রাখেন। তালমুদ এর ওপর আরো বাড়তি খবর দিয়েছে যে, ফেরাউন সরকার সে সময় নারী গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছিল। তারা নিজেদের সাথে ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে ইসরাঈলী পরিবারে যেতো এবং কোন না কোনভাবে তাদেরকে সেখানে কাঁদাতো। এর ফলে কোন ইসরাঈলী যদি সেখানে কোন শিশুকে লুকিয়ে রেখে থাকতো, তাহলে অন্য শিশুর কান্না শুনে সেও কাঁদতো। এই নতুন ধরনের গোয়েন্দাগিরী

হযরত মূসার মাকে পেরেশান করে দেয়। তিনি নিজ পুত্রের প্রাণ বাঁচাবার জন্য জন্মের তিন মাস পরে তাকে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেন। এ পর্যন্ত এ দু'টি গ্রন্থের বর্ণনা কুরআনের সাথে মিলে যায়। আর দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবার অবস্থাও তারা ঠিক একই ধরনের বর্ণনা করেছে যা কুরআনে বলা হয়েছে। সূরা তা-হা এ বলা হয়েছে ঃ اقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ "শিশুকে একটি সিন্দুকে রেখে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও।" বাইবেল ও তালমূদ এরি সমর্থন করে। তাদের বর্ণনা হচ্ছে, হযরত মূসার মাতা নলখাগড়ার একটি ঝুড়ি বানিয়ে তার গায়ে তৈলাক্ত মাটি ও আলকাতরা লেপন করে তাদের পানি থেকে সংরক্ষিত করে। তারপর হযরত মূসাকে তার মধ্যে শায়িত করে নীল নদের বুকে ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যা কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে তার কোন উল্লেখ ইসরাঈলী বর্ণনাগুলোতে নেই। অর্থাৎ হযরত মূসার মাতা আল্লাহর ইশারায় এ কাজ করেছিলেন এবং আল্লাহ পূর্বেই তাঁকে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ততা দান করেছিলেন যে, এভাবে কাজ করলে শুধু তোমার পুত্রের প্রাণের কোন আশংকাই থাকবে না তাই নয় বরং আমি শিশুকে আবার তোমার কাছেই ফিরিয়ে আনবো এবং তোমার এ শিশু ভবিষ্যতে রসূলের মর্যাদা লাভ করবে।

১১. এটা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না বরং এ ছিল তাদের কাজের পরিণাম। যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল। তারা এমন এক শিশুকে উঠাচ্ছিল যার হাতে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ধ্বংস হতে হবে।

১২. এ বর্ণনা থেকে বিষয়টির যে চিত্র স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে তা হচ্ছে এই যে, সিন্দুক বা ঝুড়ি নদীতে ভাসতে ভাসতে যখন ফেরাউনের প্রাসাদের কাছে চলে আসে তখন ফেরাউনের চাকর বাকররা তা ধরে ফেলে এবং উঠিয়ে নিয়ে বাদশাহ ও বেগমের সামনে পেশ করে। সম্ভবত বাদশাহ ও বেগম সে সময় নদীর কিনারে পরিভ্রমণ রত ছিলেন এমন সময় ঝুড়িটি তাদের চোখে পড়ে এবং তাদের হুকুমে সেটিকে নদী থেকে উঠানো হয়। তার মধ্যে একটি শিশু রাখা আছে দেখে অতি সহজে এ অনুমান করা যেতে পারতো যে, নিসন্দেহে এটি কোন ইসরাঈলীর সন্তান হবে। কারণ ইসরাঈলী জনবসতির দিক থেকে ঝুড়িটি আসছিল এবং সে সময় তাদের পুত্র সন্তানদেরকেই হত্যা করা হচ্ছিল। তাদের সম্পর্কেই ধারণা করা যেতে পারতো যে, কেউ তার সন্তানকে লুকিয়ে কিছুদিন লালন পালন করার পর এখন যখন দেখছে আর লুকানো যাবে না তখন এ আশায় তাকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে যে, হয়তো এ ভাবে সে প্রাণে বেঁচে যাবে এবং কেউ তাকে উঠিয়ে নিয়ে লালন পালন করবে। এ কারণে কিছু অতি বিশ্বস্ত গোলাম পরামর্শ দেয় যে, হুজুর! একে এখনই হত্যা করুন, এটাও তো কোন সাপেরই বাচ্চা। কিন্তু ফেরাউনের স্ত্রী তো ছিলেন একজন নারীই এবং হয়তো তিনি নিসন্তান ছিলেন। তারপর শিশুও ছিল বড়ই মিষ্টি চেহারার। যেমন সূরা তা-হা-য় আল্লাহ নিজেই হযরত মূসাকে বলছেন ঃ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ (আমি নিজের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করে দিয়েছিলাম) অর্থাৎ তোমাকে এমন প্রিয় দর্শন ও মনোমুগ্ধকর চেহারা দান করেছিলাম যে, দর্শনকারীরা স্বতস্ফূর্তভাবে তোমাকে আদর করতো। তাই মহিলা আত্ম সম্বরণ করতে পারেননি। তিনি বলে ওঠেন, একে হত্যা করো না বরং উঠিয়ে নিয়ে প্রতিপালন করো। সে যখন আমাদের এখানে প্রতিপালিত হবে এবং আমরা তাকে নিজের পুত্র করে

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَٰرِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا
أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ
قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ
الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ
لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿١٢﴾ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ
وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

ওদিকে মূসার মায়ের মন অস্থির হয়ে পড়েছিল। সে তার রহস্য প্রকাশ করে দিতো যদি আমি তার মন সুদৃঢ় না করে দিতাম, যাতে সে (আমার অংগীকারের প্রতি) বিশ্বাস স্থাপনকারীদের একজন হয়। সে শিশুর বোনকে বললো, এর পিছনে পিছনে যাও। কাজেই সে তাদের (শত্রুদের) অজ্ঞাতসারে তাকে দেখতে থাকলো।[১৩] আর আমি পূর্বেই শিশুর জন্য স্তন্য দানকারিনীদের স্তন পান হারাম করে রেখেছিলাম।[১৪] (এ অবস্থা দেখে) সে মেয়েটি তাদেরকে বললো, "আমি তোমাদের এমন পরিবারের সন্ধান দেবো যারা এর প্রতিপালনের দায়িত্ব নেবে এবং এর কল্যাণকামী হবে?"[১৫] এভাবে আমি মূসাকে[১৬] তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে আনলাম, যাতে তার চোখ শীতল হয়, সে দুঃখ ভারাক্রান্ত না হয় এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য বলে জেনে নেয়।[১৭] কিন্তু অধিকাংশ লোক একথা জানে না।

নেবো তখন সে যে ইসরাঈলী সেকথা সে আর কেমন করে জানবে। সে নিজেকে ফেরাউন বংশেরই একজন মনে করবে এবং তার যোগ্যতাগুলো বনী ইসরাঈলের পরিবর্তে আমাদের কাজে লাগবে।

বাইবেল ও তালমূদের বর্ণনা মতে যে ভদ্রমহিলা হযরত মূসাকে লালন পালন করা ও পুত্রে পরিণত করার বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন তিনি ফেরাউনের স্ত্রী নন বরং তাঁর কন্যা ছিলেন। কিন্তু কুরআন পরিষ্কার ভাষায় তাকে বলছে امراة فرعون (ফেরাউনের স্ত্রী)। আর একথা সুস্পষ্ট যে, শত শত বছর পরে মুখে মুখে রটে যাওয়া লোক কাহিনীর তুলনায় সরাসরি আল্লাহর বর্ণিত ঘটনাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য হতে পারে। অযথা ইসরাঈলী বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য আরবী পরিভাষা ও প্রচলিত বাকরীতির বিরুদ্ধে امراة فرعون এর অর্থ "ফেরাউনী পরিবারের মেয়ে" করার কোন কারণ দেখি না।

১৩. অর্থাৎ মেয়েটি এমনভাবে ঝুড়ির ওপর নজর রাখে যার ফলে ভাসমান ঝুড়ির সাথে সাথে সে চলতেও থাকে এবং তার প্রতি নজর রাখতেও থাকে। আবার শত্রু যাতে না বুঝতে পারে তার কোন সম্পর্ক ঝুড়ির শিশুটির সাথে আছে সেদিকেও খেয়াল রাখে। ইসরাঈলী বর্ণনা অনুযায়ী সে সময় হযরত মূসার বোনের বয়স ছিল দশ বারো বছর। সে বড়ই সতর্কতার সাথে ভাইয়ের অনুসরণ করে এবং সে যে ফেরাউনের মহলে পৌঁছে গেছে তা বুঝতে পারে, এ থেকে তার বুদ্ধিমত্তা আন্দাজ করা যায়।

১৪. অর্থাৎ ফেরাউনের স্ত্রী যে ধাত্রীকে স্তন্যদান করার জন্য ডাকতেন শিশু তার স্তনে মুখ লাগাতো না।

১৫. এ থেকে জানা যায়, ভাই ফেরাউনের মহলে পৌঁছে যাবার পর বোন ঘরে বসে থাকেনি। বরং সে একই প্রকার সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে মহলের আশেপাশে চক্কর দিতে থাকে। তারপর যখন জানতে পারে শিশু কারো স্তন মুখে নিচ্ছে না এবং বাদশাহ–বেগম শিশুর পছন্দনীয় ধাত্রীর সন্ধানলাভের জন্য পেরেশান হয়ে পড়েছে তখন সেই বুদ্ধিমতী মেয়ে সোজা রাজমহলে পৌঁছে যায় এবং ঘটনাস্থলে গিয়ে বলে, আমি একজন ভালো ধাত্রীর সন্ধান দিতে পারি, যে বড়ই স্নেহ ও মমতা সহকারে এ শিশুর লালন পালন করতে পারবে।

এ প্রসংগে একথাও বুঝে নিতে হবে, প্রাচীন কালে বড় ও অভিজাত বংশীয় লোকেরা নিজেদের শিশু সন্তান নিজেদের কাছে লালন পালন করার পরিবর্তে সাধারণত ধাত্রীদের হাতে সোপর্দ করে দিতো এবং তারাই নিজেদের কাছে রেখেই তাদের লালন পালন করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন কাহিনীতেও এ কথার উল্লেখ আছে যে, মক্কার আশপাশের মহিলারা মাঝে মাঝে মক্কায় আসতো ধাত্রীর সেবা দান করার জন্য এবং সরদারদের সন্তানদেরকে মোটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দুধপান করাবার জন্য নিয়ে যেতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও হালীমা সা'দীয়ার গৃহে মরুভূমির বুকে প্রতিপালিত হয়েছেন। মিসরেও ছিল এই একই রেওয়াজ। এ কারণে হযরত মূসার বোন একথা বলেননি, "আমি একজন ভালো ধাত্রী এনে দিচ্ছি" বরং বলেন, এমন গৃহের সন্ধান দিচ্ছি যার অধিবাসীরা এর প্রতিপালনের দায়িত্ব নেবে এবং তারা কল্যাণকামিতার সাথে একে লালন পালন করবে।"

১৬. বাইবেল ও তালমূদ থেকে জানা যায়, শিশুর মূসা নাম ফেরাউনের গৃহেই রাখা হয়। এটি হিব্রু নয় বরং কিবৃতী ভাষার শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে, আমি তাকে পানি থেকে বের করলাম। প্রাচীন মিসরীয় ভাষা থেকেও হযরত মূসার নামের এ অর্থকরণ সঠিক প্রমাণিত হয়। সে ভাষায় 'মু' মানে পানি এবং 'উশা' এর মানে হয় উদ্ধার প্রাপ্ত।

১৭. আর আল্লাহর এ কুশলী ব্যবস্থার ফলে এ লাভটিও হয় যে, হযরত মূসা প্রকৃতপক্ষে ফেরাউনের শাহজাদা হতে পারেননি বরং নিজের মা-বাপ-ভাই-বোনদের মধ্যে প্রতিপালিত হবার কারণে নিজের আসল পরিচয় তিনি ভালোভাবেই অবহিত থাকতে পেরেছেন। নিজের পারিবারিক ঐতিহ্য ও পিতৃ পুরুষের ধর্ম এবং নিজের জাতি থেকে তাঁর সম্পর্কচ্যুতি ঘটতে পারেনি। তিনি ফেরাউন পরিবারের একজন সদস্য হওয়ার পরিবর্তে নিজের মানসিক আবেগ, অনুভূতি ও চিন্তাধারার দিক দিয়ে পুরোপুরিভাবে বনী ইসরাঈলেরই একজন সদস্যে পরিণত হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি হাদীসে বলেছেন ঃ

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا
رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي
مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ
قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

২ রুকূ'

মূসা যখন পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে গেলো এবং তার বিকাশ পূর্ণতা লাভ করলো[১৮] তখন আমি তাকে হুকুম ও জ্ঞান দান করলাম,[১৯] সৎলোকদেরকে আমি এ ধরনেরই প্রতিদান দিয়ে থাকি। (একদিন) সে শহরে এমন সময় প্রবেশ করলো যখন শহরবাসীরা উদাসীন ছিল।[২০] সেখানে সে দেখলো দু'জন লোক লড়াই করছে। একজন তার নিজের সম্প্রদায়ের এবং অন্যজন তার শত্রু সম্প্রদায়ের। তার সম্প্রদায়ের লোকটি শত্রু সম্প্রদায়ের লোকটির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করার জন্য ডাক দিল। মূসা তাকে একটি ঘুঁষি মারলো[২১] এবং তাকে মেরে ফেললো। (এ কাণ্ড ঘটে যেতেই) মূসা বললো, "এটা শয়তানের কাজ, সে ভয়ংকর শত্রু এবং প্রকাশ্য পথভ্রষ্টকারী।"[২২]

مثل الذى يعمل ويحتسب فى صنعته الخير كمثل ام موسى ترضع ولدها وتاخذ اجرها -

"যে ব্যক্তি নিজের রুজি রোজগারের জন্য কাজ করে এবং সে কাজে লক্ষ থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, তার দৃষ্টান্ত হযরত মূসার মায়ের মতো ঃ তিনি নিজেরই সন্তানকে দুধ পান করান আবার তার বিনিময়ও লাভ করেন।" অর্থাৎ এ ধরনের লোক যদিও নিজের ও নিজের সন্তানদের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দেয়ার জন্য কাজ করে কিন্তু যেহেতু সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ঈমানদারীর সাথে কাজ করে, যার সাথেই কাজ কারবার করে তার হক যথাযথভাবে আদায় করে এবং হালাল রিজিকের মাধ্যমে নিজের ও নিজের পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণকে আল্লাহর ইবাদাত মনে করে, তাই নিজের জীবিকা উপার্জনের জন্যও সে আল্লাহর কাছে পুরস্কারলাভের অধিকারী হয়। অর্থাৎ একদিকে জীবিকা ও উপার্জন করা হয় এবং অন্যদিকে আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব ও প্রতিদানও লাভ করা হয়।

১৮. অর্থাৎ যখন তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সম্পূর্ণ হয়ে গেলো। ইহুদী বিবরণসমূহে এ সময় হযরত মূসার বিভিন্ন বয়সের কথা বলা হয়েছে। কোথাও ১৮, কোথাও ২০ আবার কোথাও ৪০ বছরও বলা হয়েছে। বাইবেলের নূতন নিয়মে ৪০ বছর বলা হয়েছে (প্রেরিতদের কার্য বিবরণ ৭ ঃ ২৩) কিন্তু কুরআন কোন বয়স নির্দেশ করেনি। যে উদ্দেশ্যে কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে সেজন্য কেবলমাত্র এতটুকু জেনে নেয়াই যথেষ্ট যে, সামনের দিকে যে ঘটনার কথা বলা হচ্ছে তা এমন এক সময়ের, যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম পূর্ণ যৌবনে পৌছে গিয়েছিলেন।

১৯. হুক্‌ম অর্থ হিকমত, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা–ধী–শক্তি ও বিচারবুদ্ধি। আর জ্ঞান বলতে বুঝানো হয়েছে দীনী ও দুনিয়াবী উভয় ধরনের তত্ত্বজ্ঞান। কারণ নিজের পিতামাতার সাথে সম্পর্ক–সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে তিনি নিজের বাপ–দাদা তথা হযরত ইউসুফ, ইয়াকুব ও ইসহাক আলাইহিমুস সালামের শিক্ষার সাথে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। আবার তদানীন্তন বাদশাহর পরিবারে রাজপুত্র হিসেবে প্রতিপালিত হবার কারণে সমকালীন মিসরবাসীদের মধ্যে প্রচলিত জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ হুক্‌ম ও জ্ঞানদান অর্থ নবুওয়াত দান নয়। কারণ নবুওয়াত তো হযরত মূসাকে এর কয়েক বছর পরে দান করা হয়। সামনের দিকে একথা বর্ণনা করা হয়েছে। ইতিপূর্বে সূরা শু'আরায়ও (২১ আয়াত) এ বর্ণনা এসেছে।

এ রাজপুত্র থাকাকালীন সময়ের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে বাইবেলের নূতন নিয়মের প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে বলা হয়েছে ঃ "আর মোশি মিস্রীয়দের সমস্ত বিদ্যায় শিক্ষিত হইলেন, এবং তিনি বাক্যে ও কার্যে পরাক্রমী ছিলেন।" (৭ঃ২২) তালমূদের বর্ণনা মতে মূসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনের গৃহে একজন সুদর্শন যুবা পুরুষ হিসেবে বড় হয়ে ওঠেন। রাজপুত্রদের মতো পোশাক পরতেন। রাজপুত্রের মতো বসবাস করতেন। লোকেরা তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো। তিনি প্রায়ই জুশান এলাকায় যেতেন। সেখানে ছিল ইসরাঈলীদের বসতি, তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের সাথে কিবতী সরকারের কর্মচারীরা যেসব দুর্ব্যবহার ও বাড়াবাড়ি করতো সেসব নিজের চোখে দেখতেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ফেরাউন ইসরাঈলীদের জন্য সপ্তাহে একদিন ছুটির বিধান করে। তিনি ফেরাউনকে বলেন, চিরকাল দিনের পর দিন অবিশ্রান্ত কাজ করতে থাকলে এরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং এর ফলে সরকারেরই কাজের ক্ষতি হবে। এদের শক্তির পুনর্বহালের জন্য সপ্তাহে একদিন বিশ্রাম নেবার ব্যবস্থা করা দরকার। এভাবে নিজের বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে তিনি এমনি আরো বহু কাজ করেছিলেন যার ফলে সারা মিসর দেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। (তালমূদের বিবরণ ১২৯ পৃঃ)

২০. হতে পারে এটা ছিল একেবারে ভোর বেলা অথবা গরমকালের দুপুরের সময় কিংবা শীতকালে রাতের বেলা। মোটকথা, তখন সময়টা এমন ছিল যখন পথঘাট ছিল জন কোলাহল মুক্ত এবং সারা শহর ছিল নীরব নিঝুম।

"শহরে প্রবেশ করলো" এ শব্দগুলো থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, রাজপ্রাসাদ সাধারণ জনবসতি থেকে দূরে অবস্থিত ছিল। হযরত মূসা যেহেতু রাজপ্রাসাদে থাকতেন তাই শহরে বের হলেন, না বলে বলা হয়েছে, শহরে প্রবেশ করলেন।

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾
فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ
بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۚ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾

তারপর সে বলতে লাগলো, "হে আমার রব! আমি নিজের ওপর জুলুম করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দাও?"[২৩] তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন তিনি ক্ষমাশীল মেহেরবান।[২৪] মূসা শপথ করলো, "হে আমার রব! তুমি আমার প্রতি এই যে অনুগ্রহ করেছো[২৫] এরপর আমি আর অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না"।[২৬]

দ্বিতীয় দিন অতি প্রত্যুষে সে ভয়ে ভয়ে এবং সর্বদিক থেকে বিপদের আশংকা করতে করতে শহরের মধ্যে চলছিল। সহসা দেখলো কি, সেই ব্যক্তি যে গতকাল সাহায্যের জন্য তাকে ডেকেছিল আজ আবার তাকে ডাকছে। মূসা বললো, "তুমি তো দেখছি স্পষ্টতই বিভ্রান্ত।"[২৭]

২১. মূলে وكز শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ চড় মারাও হতে পারে আবার ঘুঁষি মারাও হতে পারে। চড়ের তুলনায় ঘুষির আঘাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা বেশী। তাই আমি এখানে অনুবাদে ঘুষি শব্দ গ্রহণ করেছি।

২২. এ থেকে অনুমান করা যায়, ঘুষি খেয়ে মিসরীয়টি যখন পড়ে গেলো এবং পড়ে গিয়ে মারা গেলো তখন কী ভীষণ লজ্জা ও শংকার মধ্যে হযরত মুসার মুখ থেকে কথাগুলো বের হয়ে গিয়ে থাকবে! হত্যা করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। হত্যা করার উদ্দেশ্যে ঘুঁষি মারাও হয়নি। কেউ এটা আশাও করে না, একটি ঘুষি খেয়েই একজন সুস্থ সবল লোক মারা যাবে। তাই হযরত মূসা বললেন, এটা শয়তানের কোন খারাপ পরিকল্পনা বলে মনে হচ্ছে। সে একটি বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটাবার জন্য আমার হাত দিয়ে একাজ করিয়েছে। ফলে আমার বিরুদ্ধে একজন ইসরাঈলীকে সাহায্য করার জন্য একজন কিব্‌তীকে হত্যা করার অভিযোগ আসবে এবং শুধু আমার বিরুদ্ধে নয় বরং সমগ্র ইসরাঈলী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মিসরে একটি বিরাট হাংগামা সৃষ্টি হবে। এ ব্যাপারে বাইবেলের বর্ণনা কুরআন থেকে ভিন্ন। বাইবেল হযরত মূসার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাকৃত হত্যার অভিযোগ এনেছে। তার বর্ণনা মতে মিসরীয় ও ইসরাঈলীকে লড়াই করতে দেখে হযরত মূসা "এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাওয়াতে ঐ মিস্রীয়কে বধ করিয়া বালির মধ্যে পুঁতিয়া রাখিলেন।" (যাত্রা পুস্তক ২ঃ১২) তালমূদেও একই কথা বলা হয়েছে। এখন বনী ইসরাঈল কিভাবে নিজেদের মনীষীদের চরিত্রে নিজেরাই কলংক লেপন করেছে

এবং কুরআন কিভাবে তাঁদের ভূমিকা পরিচ্ছন্ন ও কলংকমুক্ত করেছে তা যে কোন ব্যক্তি বিচার করতে পারে। সাধারণ বিবেক বুদ্ধিও এ কথাই বলে, একজন জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ব্যক্তি, পরবর্তীকালে যাঁকে হতে হবে একজন মহিমান্বিত পয়গম্বর এবং মানুষকে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির একটি মর্যাদাশালী আইন ব্যবস্থা দান করা হবে যাঁর দায়িত্ব, তিনি এমন একজন অন্ধ জাতীয়তাবাদী হতে পারেন না যে, নিজের জাতির একজনকে অন্য জাতির কোন ব্যক্তির সাথে মারামারি করতে দেখে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে স্বেচ্ছায় বিপক্ষীয় ব্যক্তিকে মেরে ফেলবেন। ইসরাঈলীকে মিসরীয়দের কব্‌জায় দেখে তাকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য হত্যা করা যে, বৈধ হতে পারে না, তা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

২৩. মূল শব্দ হচ্ছে "মাগফিরাত" এর অর্থ ক্ষমা করা ও মাফ করে দেয়াও হয় আবার গোপনীয়তা রক্ষা করাও হয়। হযরত মূসার (আ) দোয়ার অর্থ ছিল, আমার এ গোনাহ (যা তুমি জানো, আমি জেনে-বুঝে করিনি) তুমি মাফ করে দাও এবং এর ওপর আবরণ দিয়ে ঢেকে দাও, যাতে শত্রুরা জানতে না পারে।

২৪. এরও দুই অর্থ এবং দু'টিই এখানে প্রযোজ্য। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর এ ত্রুটি মাফ করে দেন এবং হযরত মূসার গোপনীয়তাও রক্ষা করেন। অর্থাৎ কিব্‌তী জাতির কোন ব্যক্তি এবং কিব্‌তী সরকারের কোন লোকের সে সময় তাদের আশেপাশে বা ধারে কাছে গমনাগমন হয়নি। ফলে তারা কেউ এ হত্যাকাণ্ড দেখেনি। এভাবে হযরত মূসার পক্ষে নির্বিঘ্নে ঘটনাস্থল থেকে সরে পড়ার সুযোগ ঘটে।

২৫. অর্থাৎ আমার কাজটি যে গোপন থাকতে পেরেছে, শত্রু জাতির কোন ব্যক্তি যে আমাকে দেখতে পায়নি এবং আমার সরে যাওয়ার যে সুযোগ ঘটেছে, এই অনুগ্রহ।

২৬. হযরত মুসার এ অংগীকার অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক শব্দাবলীর মাধ্যমে সাধিত হয়েছে। এর অর্থ কেবল এই নয় যে, আমি কোন অপরাধীর সহায়ক হবো না বরং এর অর্থ এটাও হয় যে, আমার সাহায্য-সহায়তা কখনো এমন লোকদের পক্ষে থাকবে না যারা দুনিয়ায় জুলুম ও নিপীড়ন চালায়। ইবনে জারীর এবং অন্য কয়েকজন তাফসীরকার এভাবে এর একেবারে সঠিক অর্থ নিয়েছেন যে, সেই দিনই হযরত মূসা ফেরাউন ও তার সরকারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার অংগীকার করেন। কারণ ফেরাউনের সরকার ছিল একটি জালেম সরকার এবং সে আল্লাহর এ সরযমীনে একটি অপরাধমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিল। তিনি অনুভব করেন, কোন ঈমানদার ব্যক্তি একটি জালেম সরকারের হাতিয়ারে পরিণত হতে এবং তার শক্তি ও পরাক্রম বৃদ্ধির কাজে সহায়তা করতে পারে না।

মুসলিম আলেমগণ সাধারণভাবে হযরত মূসার এ অংগীকার থেকে একথা প্রমাণ করেছেন যে, একজন মু'মিনের কোন জালেমকে সাহায্য করা থেকে পুরোপুরি দূরে থাকা উচিত। সে জালেম কোন ব্যক্তি, দল, সরকার বা রাষ্ট্র যেই হোক না কেন। প্রখ্যাত তাবেঈ হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহর কাছে এক ব্যক্তি বলে, আমার ভাই বনী উমাইয়া সরকারের অধীনে কূফার গভর্ণরের কাতিব (সচিব), বিভিন্ন বিষয়ের ফায়সালা করা তার কাজ নয়, তবে যেসব ফায়সালা করা হয় সেগুলো তার কলমের সাহায্যেই জারী হয়। এ চাকরী না করলে সে ভাতে মারা যাবে। হযরত আতা জবাবে এ আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন, তোমার ভাইয়ের নিজের কলম ছুঁড়ে ফেলে দেয়া উচিত, রিযিকদাতা হচ্ছেন আল্লাহ।

فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِىْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۙ قَالَ يٰمُوْسٰٓى
اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًۢا بِالْاَمْسِ ۚ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ
تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٩﴾
وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى ۙ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنَّ الْمَلَاَ
يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّىْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢٠﴾
فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ۙ قَالَ رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢١﴾

তারপর মূসা যখন শত্রু সম্প্রদায়ের লোকটিকে আক্রমণ করতে চাইলো[২৮] তখন সে চিৎকার করে উঠলো,[২৯] "হে মূসা! তুমি কি আজকে আমাকে ঠিক তেমনিভাবে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছো যেভাবে গতকাল একজনকে হত্যা করেছিলে? তুমি তো দেখছি এদেশে স্বেচ্ছাচারী হয়ে থাকতে চাও, সংস্কারক হতে চাও না? এরপর এক ব্যক্তি নগরীর দূর প্রান্ত থেকে ছুটে এলো[৩০] এবং বললো, "হে মূসা! সরদারদের মধ্যে তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ চলছে। এখান থেকে বের হয়ে যাও। আমি তোমার মঙ্গলাকাংখী।" এ খবর শুনতেই মূসা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লো এবং সে দোয়া করলো, "হে আমার রব! আমাকে জালেমদের হাত থেকে বাঁচাও।"

আর একজন কাতিব 'আমের শা'বীকে জিজ্ঞেস করেন, "হে আবু 'আমর! আমি শুধুমাত্র হুকুমনামা লিখে তা জারী করার দায়িত্ব পালন করি মূল ফায়সালা করার দায়িত্ব আমার নয়। এ জীবিকা কি আমার জন্য বৈধ?" তিনি জবাব দেন, "হতে পারে কোন নিরাপরাধ ব্যক্তিকে হত্যার ফায়সালা করা হয়েছে এবং তোমার কলম দিয়ে তা জারী হবে। হতে পারে, কোন সম্পদ নাহক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে অথবা কারো গৃহ ধসানোর হুকুম দেয়া হয়েছে এবং তা তোমার কলম দিয়ে জারী হচ্ছে"। তারপর ইমাম এ আয়াতটি পাঠ করেন। আয়াতটি শুনেই কাতিব বলে ওঠেন, "আজকের পর থেকে আমার কলম বনী উমাইয়ার হুকুমনামা জারী হবার কাজে ব্যবহৃত হবে না।" ইমাম বললেন, "তাহলে আল্লাহও তোমাকে রিযিক থেকে বঞ্চিত করবেন না।"

আবদুর রহমান ইবনে মুসলিম যাহ্হাককে শুধুমাত্র বুখারায় গিয়ে সেখানকার লোকদের বেতন বন্টন করে দেবার কাজে পাঠাতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি সে দায়িত্ব গ্রহণ

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ
السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ
وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا
لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾

৩ রুকূ'

(মিসর থেকে বের হয়ে) যখন মূসা মাদ্‌য়ানের দিকে রওয়ানা হলো[৩১] তখন সে বললো, "আশা করি আমার রব আমাকে সঠিক পথে চালিত করবেন।"[৩২] আর যখন সে মাদ্‌য়ানের কুয়ার কাছে পৌঁছুল,[৩৩] সে দেখলো, অনেক লোক তাদের পশুদের পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের থেকে আলাদা হয়ে একদিকে দু'টি মেয়ে নিজেদের পশুগুলো আগলে রাখছে। মূসা মেয়ে দু'টিকে জিজ্ঞেস করলো, "তোমাদের সমস্যা কি?" তারা বললো, "আমরা আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করাতে পারি না যতক্ষণ না এ রাখালেরা তাদের জানোয়ারগুলো সরিয়ে নিয়ে যায়, আর আমাদের পিতা একজন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি।"[৩৪]

করতেও অস্বীকার করেন। তাঁর বন্ধুরা বলেন, এতে ক্ষতি কি? তিনি বলেন, আমি জালেমদের কোন কাজেও সাহায্যকারী হতে চাই না। (রুহুল মা'আনী ৩ খণ্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা)

ইমাম আবু হানীফার একটি ঘটনা তাঁর নির্ভরযোগ্য জীবনীকারগণ আল মুওয়াফ্‌ফাক আল মক্কী, ইবনুল বায্‌যার আল কারওয়ারী, মুল্লা আলী কারী প্রমুখ সবাই তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। বলা হয়েছে, তারই পরামর্শক্রমে বাদশাহ মনসূরের প্রধান সেনাপতি হাসান ইবনে কাহ্‌তুবাহ একথা বলে নিজের পদ থেকে ইস্তেফা দেন যে, আজ পর্যন্ত আমি আপনার রাষ্ট্রের সমর্থনে যা কিছু করেছি এ যদি আল্লাহর পথে হয়ে থাকে তাহলে এতটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু এ যদি জুলুমের পথে হয়ে থাকে তাহলে আমার আমল নামায় আমি আর কোন অপরাধের সংখ্যা বাড়াতে চাই না।

২৭. অর্থাৎ তুমি ঝগড়াটে স্বভাবের বলে মনে হচ্ছে। প্রতিদিন কারো না কারো সাথে তোমার ঝগড়া হতেই থাকে। গতকাল একজনের সাথে ঝগড়া বাধিয়েছিলে, আজ আবার আর একজনের সাথে বাধিয়েছো।

২৮. বাইবেলের বর্ণনা এখানে কুরআন থেকে আলাদা। বাইবেল বলে, দ্বিতীয় দিনের ঝগড়া ছিল দু'জন ইসরাঈলীর মধ্যে। কিন্তু কুরআন বলছে, এ ঝগড়াও ইসরাঈলী ও মিসরীয়ের মধ্যে ছিল। এ দ্বিতীয় বর্ণনাটিই যুক্তি সংগত বলে মনে হয়। কারণ প্রথম দিনের হত্যা রহস্য প্রকাশ হবার যে কথা সামনের দিকে আসছে মিসরীয় জাতির একজন লোক

সে ঘটনা জানতে পারলেই তা প্রকাশ পাওয়া সম্ভব হতো। একজন ইসরাঈলী তা জানতে পারলে সে সঙ্গে সঙ্গেই নিজের জাতির পালক–রাজপুত্রের এত বড় অপরাধের খবর ফেরাউনী সরকারের গোচরীভূত করবে এটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

২৯. যে ইসরাঈলীকে সাহায্য করার জন্য হযরত মূসা এগিয়ে গিয়েছিলেন, এ ছিল তারই চিৎকার। তাকে ধমক দেবার পর যখন তিনি মিসরীয়টিকে মারতে উদ্যত হলেন তখন ইসরাঈলীটি মনে করলো হযরত মূসা বুঝি তাকে মারতে আসছেন। তাই সে চিৎকার করতে থাকলো এবং নিজের বোকামির জন্য গতকালের হত্যা রহস্যও প্রকাশ করে দিল।

৩০. অর্থাৎ এ দ্বিতীয় ঝগড়ার ফলে হত্যা রহস্য প্রকাশ হয়ে যাবার পর সংশ্লিষ্ট মিসরীয়টি যখন গিয়ে সরকারকে জানিয়ে দিল তখন এ পরামর্শের ঘটনা ঘটে।

৩১. হযরত মূসার মিসর থেকে বের হয়ে মাদ্‌য়ানের দিকে যাবার ব্যাপারে বাইবেলের বর্ণনা কুরআনের সাথে মিলে যায়। কিন্তু তালমূদ এ প্রসংগে এক ভিত্তিহীন কাহিনী বর্ণনা করেছে। সেটি এই যে, হযরত মূসা মিসর থেকে হাবশায় পালিয়ে যান এবং সেখানে গিয়ে বাদশাহর পারিষদে পরিণত হন। তারপর বাদশাহর মৃত্যুর পর লোকেরা তাঁকেই নিজেদের বাদশাহের সিংহাসনে বসায় এবং বাদশাহর বিধবা স্ত্রীর সাথে তাঁর বিয়ে দেন। ৪০ বছর তিনি সেখানে রাজত্ব করেন। কিন্তু এ সুদীর্ঘ সময়কালে তিনি কখনো নিজের হাবশী স্ত্রীর নিকটবর্তী হননি। ৪০ বছর অতিক্রান্ত হবার পর ঐ ভদ্র মহিলা হাবশার জনগণের কাছে এ মর্মে অভিযোগ করে যে, চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত এ ব্যক্তি আমার সাথে স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্ক রক্ষা করেনি এবং কখনো হাবশার দেবতাদের পূজা করেনি। এ কথায় রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কর্মকর্তারা তাঁকে পদচ্যুত করে বিপুল পরিমাণ ধন–সম্পদ দিয়ে সসম্মানে বিদায় করে দেয়। তখন তিনি হাবশা ত্যাগ করে মাদ্‌য়ানে পৌঁছে যান এবং সেখানে সামনে যেসব ঘটনার কথা বলা হয়েছে সেগুলো ঘটে। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৭ বছর।

এ কাহিনীটি যে ভিত্তিহীন এর একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে এই যে, এতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এসময় আসিরীয়ায় (উত্তর ইরাক) হাবশার শাসন চলছিল এবং আসিরীয়বাসীদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য হযরত মূসা ও তাঁর পূর্ববর্তী বাদশাহরাও সামরিক অভিযান চালান। সামান্যতম ইতিহাস–ভূগোল জ্ঞান যার আছে সে পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে একটু নজর দিলেই দেখতে পাবে যে, আসিরীয়ার ওপর হাবশার শাসন বা হাবশী সেনাদলের আক্রমণের ব্যাপারটি কেবলমাত্র তখনই ঘটতে পারতো যখন মিসর, ফিলিস্তীন ও সিরিয়া তার দখলে থাকতো অথবা সমগ্র আরব দেশ তার কর্তৃত্বাধীন হতো কিংবা হাবশার নৌবাহিনী এতই শক্তিশালী হতো যে, তা ভারত মহাসাগর ও পারস্য উপসাগর অতিক্রম করে ইরাক দখল করতে সক্ষম হতো। এদেশগুলোয় কখনো হাবশীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অথবা তাদের নৌশক্তি কখনো এত বিপুল শক্তির অধিকারী ছিল এ ধরনের কোন কথা ইতিহাসে নেই। এ থেকে বুঝা যায় যে, নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে বনী ইসরাঈলের জ্ঞান কতটা অপরিপক্ক ছিল এবং কুরআন তাদের ভুলগুলো সংশোধন করে কেমন সুস্পষ্ট আকারে সঠিক ঘটনাবলী পেশ করছে। কিন্তু

ইহুদী ও খৃষ্টান প্রাচ্যবিদগণ একথা বলতে লজ্জা অনুভব করেন না যে, কুরআন এসব কাহিনী বনী ইসরাঈল থেকে সংগ্রহ করেছে।

৩২. অর্থাৎ এমন পথ যার সাহায্যে সহজে মাদ্‌য়ানে পৌঁছে যাবো।

উল্লেখ্য, সে সময় মাদ্‌য়ান ছিল ফেরাউনের রাজ্য-সীমার বাইরে। সমগ্র সিনাই উপদ্বীপে মিসরের কর্তৃত্ব ছিল না। বরং তার কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ ছিল পশ্চিম ও দক্ষিণ এলাকা পর্যন্ত। আকাবা উপসাগরের পূর্ব ও পশ্চিম তীরে ছিল বনী মাদ্‌য়ানের বসতি এবং এ এলাকা ছিল মিসরীয় প্রভাব ও কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এ কারণে হযরত মূসা মিসর থেকে বের হয়েই মাদ্‌য়ানের পথ ধরেছিলেন। কারণ এটাই ছিল নিকটতম জনবসতিপূর্ণ স্বাধীন এলাকা। কিন্তু সেখানে যেতে হলে তাঁকে অবশ্যই মিসর অধিকৃত এলাকা দিয়েই এবং মিসরীয় পুলিশ ও সেনা-চৌকিগুলোর নজর এড়িয়ে যেতে হতো। তাই তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, আমাকে এমন পথে নিয়ে যাও যেপথ দিয়ে আমি সহি-সালামতে মাদ্‌য়ান পৌঁছে যেতে পারি।

৩৩. এ স্থানটি, যেখানে হযরত মূসা পৌঁছেছিলেন, এটি ছিল আরবীয় বর্ণনা অনুযায়ী আকাবা উপসাগরের পশ্চিম তীরে মানকা থেকে কয়েক মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত। বর্তমানে এ জায়গাটিকে আল বিদ্‌'আ বলা হয়। সেখানে একটি ছোট মতো শহর গড়ে উঠেছে। আমি ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তাবুক থেকে আকাবায় যাওয়ার পথে এ জায়গাটি দেখেছি। স্থানীয় অধিবাসীরা আমাকে জানিয়েছে, বাপ-দাদাদের আমল থেকে আমরা শুনে আসছি মাদ্‌য়ান এখানেই অবস্থিত ছিল। ইউসিফুস থেকে নিয়ে বার্টন পর্যন্ত প্রাচীন ও আধুনিক পরিব্রাজক ও ভূগোলবিদগণও সাধারণভাবে এ স্থানটিকেই মাদ্‌য়ান বলে চিহ্নিত করেছেন। এর সন্নিকটে সামান্য দূরে একটি স্থানকে বর্তমানে "মাগায়েরে শু'আইব" বা "মাগারাতে শু'আইব" বলা হয়। সেখানে সামূদী প্যাটার্নের কিছু ইমারত রয়েছে। আর এর প্রায় এক মাইল দু' মাইল দূরে কিছু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এর মধ্যে আমরা দেখেছি দু'টি অন্ধকূপ। স্থানীয় লোকেরা আমাদের জানিয়েছে, নিশ্চিতভাবে আমরা কিছু বলতে পারি না, তবে আমাদের এখানে একথাই প্রচলিত যে, এদু'টি কূয়ার মধ্য থেকে একটি কূয়ায় হযরত মূসা তাঁর ছাগলদের পানি পান করিয়েছেন। একথাটিই আবুল ফিদা (মৃত্যু ৭৩২ হিঃ) তাকবীমুল বুলদানে এবং ইয়াকুত মু'জামুল বুলদানে আবু যায়েদ আনসারীর (মৃত্যু ২১৬ হিঃ) বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এ এলাকার অধিবাসীরা এ স্থানেই হযরত মূসার ঐ কূয়াটি চিহ্নিত করে থাকে। এ থেকে জানা যায়, এ বর্ণনাটি শত শত বছর থেকে সেখানকার লোকদের মুখে মুখে বংশানুক্রমে চলে আসছে এবং এরি ভিত্তিতে দৃঢ়তার সাথে বলা যেতে পারে, কুরআন মজীদে যে স্থানটির কথা বলা হয়েছে এটা সেই স্থান। পাশের পাতায় এ স্থানটির কিছু ছবি দেখতে পাবেন।

৩৪. অর্থাৎ আমরা মেয়েমানুষ। এ রাখালদের সাথে টক্কর দিয়ে ও সংঘর্ষ বাধিয়ে নিজেদের জানোয়ারগুলোকে আগে পানি পান করাবার সামর্থ আমাদের নেই। অন্যদিকে আমাদের পিতাও এত বেশী বয়োবৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন যে, তিনি নিজে আর কষ্টের কাজ করতে পারেন না। আমাদের পরিবারে আর দ্বিতীয় কোন পুরুষ নেই। তাই আমরা মেয়েরাই এ কাজ করতে বের হয়েছি। সব রাখালদের তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে নিয়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়। মেয়ে দু'টি শুধুমাত্র



মাদয়ান উপত্যকা



একটি কূপ। কথিত আছে যে, মূসা (আ) এ কূপে ছাগলকে পানি পান করান

একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে এ সমস্ত বক্তব্য উপস্থাপন করে। এ থেকে একদিকে তাদের লজ্জাশীলতার প্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ একজন পর পুরুষের সাথে তারা বেশী কথা বলতেও চাচ্ছিল না। আবার এটাও পছন্দ করছিল না যে, এ ভিন দেশী অপরিচিত লোকটি তাদের ঘরানা সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা পোষণ করুক এবং মনে মনে ভাবুক যে, এরা কেমন লোক যাদের পুরুষরা ঘরে বসে রয়েছে আর ঘরের মেয়েদেরকে একাজ করার জন্য বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে।

এ মেয়েদের বাপের ব্যাপারে আমাদের এখানে একথা প্রচার হয়ে গেছে যে, তিনি ছিলেন হযরত শু'আইব আলাইহিস সালাম। কিন্তু কুরআন মজীদে ইশারা ইংগিতে কোথাও এমন কথা বলা হয়নি যা থেকে বুঝা যেতে পারে তিনি শু'আইব আলাইহিস সালাম ছিলেন। আথচ শু'আইব আলাইহিস সালাম কুরআনের একটি পরিচিত ব্যক্তিত্ব। এ মেয়েদের পিতা যদি তিনিই হতেন তাহলে এখানে একথা সুস্পষ্ট না করে দেয়ার কোন কারণই ছিল না। নিসন্দেহে কোন কোন হাদীসে তাঁর নাম স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। কিন্তু আল্লামা ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর উভয়ে এ ব্যাপারে একমত যে, এগুলোর কোনটিরও সনদ তথা বর্ণনা সূত্র নির্ভুল নয়। তাই ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, আবু উবাইদাহ ও সাঈদ ইবনে জুবাইরের ন্যায় বড় বড় তাফসীরকার বনী ইসরাঈলের বর্ণনার ওপর নির্ভর করে তালমূদ ইত্যাদি গ্রন্থে এ মনীষীর যে নাম উল্লেখিত হয়েছে সেটিই বলেছেন। অন্যথায় বলা নিষ্প্রয়োজন, যদি নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হযরত শু'আইবের নাম স্পষ্ট করে বলা হতো তাহলে তাঁরা কখনো অন্য নাম উল্লেখ করতেন না।

বাইবেলের এক জায়গায় এ মণীষীর নাম বলা হয়েছে রূয়েল এবং অন্য জায়গায় বলা হয়েছে যিথ্রো। এবং বলা হয়েছে তিনি মাদ্‌য়ানের যাজক ছিলেন। (যাত্রা পুস্তক ২ ঃ ১৬-১৮, ৩ ঃ ১ এবং ১৮ ঃ ৫) তালমূদীয় সাহিত্যে রূয়েল, যিথ্রো ও হবাব তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নাম বলা হয়েছে। আধুনিক ইহুদী আলেমগণের মতে যিথ্রো ছিল 'হিজ এক্সেলেন্সী' এর সমার্থক একটি উপাধী এবং আসল নাম ছিল রূয়েল বা হবাব। অনুরূপভাবে কাহেন বা যাজক (Kohen Midian) শব্দটির ব্যাখ্যার ব্যাপারেও ইহুদী আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ একে পুরোহিত (Priest) এর সমার্থক হিসেবে নিয়েছেন আবার কেউ কেউ রইস বা আমীর (Prince) অর্থে নিয়েছেন।

তালমূদে তাঁর যে জীবনবৃতান্ত বর্ণনা করা হয়েছে তাহচ্ছে এই যে, হযরত মূসার জন্মের পূর্বে ফেরাউনের কাছে তাঁর যাওয়া-আসা ছিল। ফেরাউন তাঁর জ্ঞানও বিচক্ষণতার প্রতি আস্থা রাখতো। কিন্তু যখন বনী ইসরাঈলের ওপর জুলুম-শোষণ চালাবার জন্য মিসরের রাজ পরিষদে পরামর্শ হতে লাগলো এবং তাদের সন্তানদের জন্মের পরপরই হত্যা করার সিদ্ধান্ত হলো তখন তিনি ফেরাউনকে এ অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য বহু প্রচেষ্টা চালালেন। তাকে এ জুলুমের অশুভ পরিণামের ভয় দেখালেন। তিনি পরামর্শ দিলেন, এদের অস্তিত্ব যদি আপনার কাছে এতই অসহনীয় হয়ে থাকে তাহলে এদেরকে মিসর থেকে বের করে এদের পিতৃ পুরুষের দেশ কেনানের দিকে পাঠিয়ে দিন। তাঁর এ ভূমিকায় ফেরাউন তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে অপদস্থ করে নিজের দরবার থেকে বের করে দিয়েছিল। সে সময় থেকে তিনি নিজের দেশ মাদ্‌য়ানে চলে এসে সেখানেই অবস্থান করছিলেন।

فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰٓى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ
مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿١٨﴾ فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ز
قَالَتْ اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ط فَلَمَّا جَآءَهٗ
وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ۡ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾

একথা শুনে মূসা তাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করিয়ে দিল। তারপর সে একটি ছায়ায় গিয়ে বসলো এবং বললো, "হে আমার প্রতিপালক! যে কল্যাণই তুমি আমার প্রতি নাযিল করবে আমি তার মুখাপেক্ষী।" (বেশিক্ষণ অতিবাহিত হয়নি এমন সময়) ঐ দু'টি মেয়ের মধ্য থেকে একজন লজ্জাজড়িত পদ বিক্ষেপে তার কাছে এলো[৩৫] এবং বলতে লাগলো, "আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, আপনি আমাদের জানোয়ারগুলোকে যে পানি পান করিয়েছেন আপনাকে তার পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য।"[৩৬] মূসা যখন তার কাছে পৌঁছুল এবং নিজের সমস্ত কাহিনী তাকে শুনালো তখন সে বললো, "ভয় করো না, এখন তুমি জালেমদের হাত থেকে বেঁচে গেছো।"

তাঁর ধর্ম সম্পর্কে অনুমান করা হয়, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মতো তিনিও ইবরাহীমী দীনের অনুসারী ছিলেন। কেননা, যেভাবে হযরত মূসা ছিলেন ইসহাক ইবনে ইবরাহীমের (আলাইহিমাস সালাম) আউলাদ ঠিক তেমনি তিনিও ছিলেন মাদ্‌য়ান ইবনে ইবরাহীমের বংশধর। এ সম্পর্কের কারণেই সম্ভবত তিনি ফেরাউনকে বনী ইসরাঈলের ওপর জুলুম-নির্যাতন-নিপীড়ন করতে নিষেধ করেন এবং তার বিরাগভাজন হন। কুরআন ব্যাখ্যাতা নিশাপুরী হযরত হাসান বাসরীর বরাত দিয়ে লিখেছেন ঃ

اِنَّهٗ كَانَ رَجُلًا مُسْلِمًا قَبِلَ الدِّيْنَ مِنْ شُعَيْبٍ

"তিনি একজন মুসলমান ছিলেন। হযরত শু'আইবের দীন তিনি গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।"

তালমূদে বলা হয়েছে, তিনি মাদ্‌য়ানবাসীদের মূর্তি পূজাকে প্রকাশ্যে নির্বুদ্ধিতা বলে সমালোচনা করতেন। তাই মাদ্‌য়ানবাসীরা তাঁর বিরোধী হয়ে গিয়েছিল।

৩৫. হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ বাক্যাংশটির এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

جائت تمشى على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليست
بسلفع من النساء دلاجة ولاجة خراجة -

قَالَتْ إِحْدٰىهُمَا يٰٓأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ
هَاتَيْنِ عَلٰىٓ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ
عِندِكَ ۚ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِيٓ إِنْ شَآءَ اللَّهُ
مِنَ الصّٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ
قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۖ وَاللَّهُ عَلٰى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾

মেয়ে দু'জনের একজন তার পিতাকে বললো, "আব্বাজান! একে চাকরিতে নিয়োগ করো, কর্মচারী হিসেবে এমন ব্যক্তিই উত্তম হতে পারে যে বলশালী ও আমানতদার।"[৩৭] তার পিতা (মূসাকে) বললো,[৩৮] "আমি আমার এ দু'মেয়ের মধ্য থেকে একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই। শর্ত হচ্ছে, তোমাকে আট বছর আমার এখানে চাকরি করতে হবে। আর যদি দশ বছর পুরো করে দাও, তাহলে তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমার ওপর কড়াকড়ি করতে চাই না। তুমি ইনশাআল্লাহ আমাকে সৎলোক হিসেবেই পাবে। মূসা জবাব দিল, "আমার ও আপনার মধ্যে একথা স্থিরীকৃত হয়ে গেলো, এ দু'টি মেয়াদের মধ্য থেকে যেটাই আমি পূরণ করে দেবো তারপর আমার ওপর যেন কোন চাপ দেয়া না হয়। আর যা কিছু দাবী ও অঙ্গীকার আমরা করছি আল্লাহ তার তত্ত্বাবধায়ক।"[৩৯]

"সে নিজের মুখ ঘোমটার আড়ালে লুকিয়ে লজ্জাজড়িত পায়ে হেঁটে এলো। সেই সব ধিংগি চপলা মেয়েদের মতো হন হন করে ছুটে আসেনি, যারা যেদিকে ইচ্ছা যায় এবং যেখানে খুশী ঢুকে পড়ে।"

এ বিষয়বস্তু সম্বলিত কয়েকটি রেওয়ায়াত সাঈদ ইবনে মানসুর, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনুল মুনযির নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে হযরত উমর থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, সাহাবায়ে কেরামের যুগে কুরআন ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বদৌলতে এ মনীষীগণ লজ্জাশীলতার ইসলামী ধারণা লাভ করেছিলেন তা অপরিচিত ও ভিন্ পুরুষদের সামনে চেহারা খুলে রেখে ঘোরাফেরা করা এবং বেপরোয়াভাবে ঘরের বাইরে চলাফেরা করার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। হযরত উমর (রা) পরিষ্কার ভাষায় এখানে চেহারা ঢেকে রাখাকে লজ্জাশীলতার চিহ্ন এবং তা ভিন পুরুষের সামনে উন্মুক্ত রাখাকে নির্লজ্জতা গণ্য করেছেন।

৩৬. একথাও সে বলে লজ্জা-শরমের কারণে। কেননা, নির্জনে একজন ভিন পুরুষের কাছে একাকী আসার কোন কারণ বলা জরুরী ছিল। অন্যথায় একথা সুস্পষ্ট, একজন ভদ্রলোক যদি কোন মেয়ে মানুষকে পেরেশান দেখে তাকে কোন সাহায্য করে থাকে, তাহলে তার প্রতিদান দেবার কথা বলা কোন ভালো কথা ছিল না। তারপর এ প্রতিদানের নাম শোনা সত্ত্বেও হযরত মূসার মতো একজন মহানুভব ব্যক্তির উঠে এগিয়ে যাওয়া একথা প্রমাণ করে যে, তিনি সে সময় চরম দুরবস্থায় পতিত ছিলেন। একেবারে খালি হাতে অকস্মাত মিসর থেকে বের হয়ে পড়েছিলেন। মাদ্‌য়ান পর্যন্ত পৌঁছতে কমপক্ষে আটদিন লাগার কথা। ক্ষুধা, পিপাসা এবং সফরের ক্লান্তিতে অবস্থা কাহিল না হয়ে পারে না। বিদেশে-পরবাসে কোন থাকার জায়গা পাওয়া যায় কিনা এবং এমন কোন সমব্যথী পাওয়া যায় কিনা যার কাছে আশ্রয় নেয়া যেতে পারে, এ চিন্তা সম্ভবত তাকে সবচেয়ে বেশী পেরেশান করে দিয়েছিল। এ অক্ষমতার কারণেই এত সামান্য সেবা কর্মের পারিশ্রমিক দেবার জন্য ডাকা হচ্ছে শুনে হযরত মূসা যাওয়ার ব্যাপারে ইতস্তত করেননি। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে, আল্লাহর কাছে এখনই আমি যে দোয়া করেছি তা কবুল করার এ ব্যবস্থা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়েছে, তাই এখন অনর্থক আত্মমর্যাদার ভান করে আল্লাহর দেয়া আতিথ্যের আহবান প্রত্যাখ্যান করা সংগত নয়।

৩৭. হযরত মূসার সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময় মেয়েটি তার বাপকে একথা বলেছিল কিনা এটা নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে বেশির ভাগ সম্ভাবনা এটাই যে, তার বাপ অপরিচিত মুসাফিরকে দু-একদিন নিজের কাছে রেখে থাকবেন এবং এ সময়ের মধ্যে কখনো মেয়ে তার বাপকে এ পরামর্শ দিয়ে থাকবে। এ পরামর্শের অর্থ ছিল, আপনার বার্ধক্যের কারণে বাধ্য হয়ে আমাদের মেয়েদের বিভিন্ন কাজে বাইরে বের হতে হয়। বাইরের কাজ করার জন্য আমাদের কোন ভাই নেই। আপনি এ ব্যক্তিকে কর্মচারী নিযুক্ত করুন। সুঠাম দেহের অধিকারী বলশালী লোক। সবরকমের পরিশ্রমের কাজ করতে পারবে। আবার নির্ভরযোগ্যও। নিছক নিজের ভদ্রতা ও আভিজাত্যের কারণে সে আমাদের মতো মেয়েদেরকে অসহায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমাদের সাহায্য করেছে এবং আমাদের দিকে কখনো চোখ তুলে তাকায়ওনি।

৩৮. একথাও জরুরী নয় যে, মেয়ের কথা শুনেই বাপ সংগে সংগেই হযরত মূসাকে একথা বলে থাকবেন। সম্ভবত তিনি মেয়ের পরামর্শ সম্পর্কে ভালোভাবে চিন্তা ভাবনা করার পর এই মত স্থির করেছিলেন যে, লোকটি ভদ্র ও অভিজাত, একথা ঠিক। কিন্তু ঘরে যেখানে জোয়ান মেয়ে রয়েছে সেখানে একজন জোয়ান, সুস্থ, সবল লোককে এমনি কর্মচারী হিসেবে রাখা ঠিক নয়। এ ব্যক্তি যখন ভদ্র, শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান ও অভিজাত বংশীয় (যেমন হযরত মূসার মুখে তাঁর কাহিনী শুনে তিনি মনে করে থাকবেন) তখন একে জামাতা করেই ঘরে রাখা হোক। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর কোন উপযুক্ত সময়ে তিনি হযরত মূসাকে একথা বলে থাকবেন।

এখানে দেখুন বনী ইসরাঈলের আর একটি কীর্তি। তারা তাদের মহান মর্যাদাসম্পন্ন নবী এবং নিজেদের সবচেয়ে বড় হিতকারী ও জাতীয় হিরোর কী দুর্গতি করেছে। তালমূদে বলা হয়েছে, "মূসা রূয়েলের বাড়িতে অবস্থান করতে থাকেন। তিনি নিজের মেজবানের মেয়ে সাফুরার প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি দিচ্ছিলেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে বিয়ে করলেন।" আর একটি ইহুদী বর্ণনা জুয়িশ ইনসাইক্লোপিডিয়ায় উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে

বলা হয়েছে, "হযরত মূসা যখন যিথ্রোকে সমস্ত ঘটনা শুনালেন তখন তিনি বুঝতে পারলেন এ ব্যক্তির হাতেই ফেরাউনের রাজ্য ধ্বংস হবার ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছিল। তাই তিনি সংগে সংগেই হযরত মূসাকে বন্দী করে ফেললেন, যাতে তাঁকে ফেরাউনের হাতে সোপর্দ করে দিয়ে পুরস্কার লাভ করতে পারেন। সাত বা দশ বছর পর্যন্ত তিনি তার বন্দীশালায় থাকলেন। ভূ-গর্ভস্থ একটি অন্ধকার কুঠরিতে তিনি বন্দী ছিলেন। কিন্তু যিথ্রোর মেয়ে যাফূরা (বা সাফূরা), যার সাথে কূয়ার পাড়ে তাঁর প্রথম সাক্ষাত হয়েছিল, চুপি চুপি তাঁর সাথে কারাগৃহে সাক্ষাত করতে থাকে। সে তাকে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করতো। তাদের দু'জনের মধ্যে বিয়ের গোপন চুক্তি হয়ে গিয়েছিল। সাত বা দশ বছর পরে যাফূরা তার বাপকে বললো, এত দীর্ঘকাল হয়ে গেলো আপনি এক ব্যক্তিকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন এবং তারপর তার কোন খবরও নেননি। এতদিন তার মরে যাওয়ারই কথা। কিন্তু যদি জীবিত থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সে কোন আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি। যিথ্রো তার একথা শুনে কারাগারে গেলেন। সেখানে হযরত মূসাকে জীবিত থাকতে দেখে তার মনে বিশ্বাস জন্মালো অলৌকিকতার মাধ্যমে এ ব্যক্তি জীবিত আছে। তখন তিনি যাফূরার সাথে তাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন।"

যেসব পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদ কুরআনী কাহিনীগুলোর উৎস খুঁজে বেড়ান, কুরআনী বর্ণনা ও ইসরাঈলী বর্ণনার মধ্যে এই যে সুস্পষ্ট পার্থক্য এখানে দেখা যাচ্ছে তা কি কখনো তাদের চোখে পড়ে?

৩৯. কেউ কেউ হযরত মূসার সাথে মেয়ের বাপের এ কথাবার্তাকে বিয়ের ইজাব কবুল মনে করে নিয়েছেন। এ প্রসংগে তাঁরা এ প্রশ্ন উথাপন করেছেন যে, বাপের সেবা মেয়ের বিয়ের মোহরানা হিসেবে গণ্য হতে পারে কিনা? এবং বিয়ে অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ ধরনের বাইরের শর্ত শামিল হতে পারে কি? অথচ আলোচ্য আয়াতের ভাষ্য থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, এটি বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল না। বরং এটি ছিল প্রাথমিক কথাবার্তা, বিয়ের পূর্বে বিয়ের প্রস্তাব আসার পর সাধারণভাবে দুনিয়ায় যে ধরনের কথাবার্তা হয়ে থাকে। এটা কেমন করে বিয়ের ইজাব কবুল হতে পারে যখন একথাই স্থিরীকৃত হয়নি দু'টি মেয়ের মধ্য থেকে কোন্‌টির সাথে বিয়ে দেয়া হচ্ছে? কথাবার্তা শুধু এতটুকু হয়েছিল যে ঃ "আমার মেয়েদের মধ্য থেকে একটির সাথে আমি তোমার বিয়ে দিতে চাই। তবে শর্ত হচ্ছে, তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, আট দশ বছর আমার এখানে থেকে আমার কাজে সাহায্য করতে হবে। কারণ এ আত্মীয়তা সম্পর্ক স্থাপনের পেছনে আমার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি বৃদ্ধ লোক কোন ছেলে সন্তান আমার নেই, যে আমার সম্পত্তি দেখাশুনা ও ব্যবস্থাপনা করতে পারে। আমার আছে মেয়ে। বাধ্য হয়ে তাদেরকে আমি বাইরে পাঠাই। আমি চাই আমার জামাতা আমার দক্ষিণ হস্ত হয়ে থাকবে। এ দায়িত্ব যদি তুমি পালন করতে পারো এবং বিয়ের পরেই স্ত্রীকে নিয়ে চলে যাওয়ার ইচ্ছা না থাকে তাহলে আমার মেয়ের বিয়ে আমি তোমার সাথে দেবো। হযরত মূসা নিজেই এসময় একটি আশ্রয়ের সন্ধানে ছিলেন। তিনি এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, বিয়ের পূর্বে বর পক্ষ ও কণে পক্ষের মধ্যে যেসব চুক্তি হয়ে থাকে এটি ছিল সে ধরনের একটি চুক্তি। এরপর যথারীতি আসল বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকবে এবং তাতে মোহরানাও নির্ধারিত হয়ে থাকবে। সে বিয়েতে সেবা কর্মের কোন শর্ত শামিল হওয়ার কোন কারণ ছিল না।

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖٓ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ
نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا
بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ
شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰٓى
اِنِّيْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٠﴾

৪ রুকূ'

মূসা যখন মেয়াদ পূর্ণ করে দিল।[৪০] এবং নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে চললো তখন তূর পাহাড়ের দিক থেকে একটি আগুন দেখতে পেলো।[৪১] সে তার পরিবারবর্গকে বললো, "থামো, আমি একটি আগুন দেখেছি, হয়তো আমি সেখান থেকে কোন খবর আনতে পারি অথবা সেই আগুন থেকে কোন অংগারই নিয়ে আসতে পারি যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো।" সেখানে পৌঁছার পর উপত্যকার ডান কিনারায় [৪২] পবিত্র ভূখণ্ডে [৪৩] একটি বৃক্ষ থেকে আহবান এলো, "হে মূসা! আমিই আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের অধিপতি।"

৪০. হযরত হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, হযরত মূসা (আ) আট বছরের জায়গায় দশ বছরের মেয়াদ পুরা করেছিলেন। ইবনে আববাসের বর্ণনা মতে এ বক্তব্যটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, قضى موسى اتم الاجلين واطيبهما عشرسنين অর্থাৎ "মূসা আলাইহিস সালাম দু'টি মেয়াদের মধ্য থেকে যেটি বেশী পরিপূর্ণ এবং তাঁর শ্বশুরের জন্য বেশী সন্তোষজনক সেটি পূর্ণ করেছিলেন অর্থাৎ দশ বছর।"

৪১. এ সফরে হযরত মূসার তূর পাহাড়ের দিকে যাওয়া দেখে অনুমান করা যায় তিনি পরিবার পরিজন নিয়ে সম্ভবত মিসরের দিকে যেতে চাচ্ছিলেন। কারণ মাদ্‌য়ান থেকে মিসরের দিকে যে পথটি গেছে তূর পাহাড় তার ওপর অবস্থিত। সম্ভবত হযরত মূসা মনে করে থাকবেন, দশটি বছর চলে গেছে, যে ফেরাউনের শাসনামলে তিনি মিসর থেকে বের হয়েছিলেন সে মারা গেছে, এখন যদি আমি নীরবে সেখানে চলে যাই এবং নিজের পরিবারের লোকজনদের সাথে অবস্থান করতে থাকি তাহলে হয়তো আমার কথা কেউ জানতেই পারবে না।

ঘটনা বিন্যাসের দিক দিয়ে বাইবেলের বর্ণনা এখানে কুরআন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বাইবেল বলে, হযরত মূসা তাঁর শ্বশুরের ছাগল চরাতে চরাতে "প্রান্তরের পশ্চাদভাগে

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ
يُعَقِّبْ ۚ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣١﴾ اسْلُكْ
يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۖ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ
جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَٰنِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
وَمَلَئِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٣٢﴾

আর (হুকুম দেয়া হলো) ছুঁড়ে দাও তোমার লাঠিটি। যখনই মূসা দেখলো লাঠিটি সাপের মতো মোচড় খাচ্ছে তখনই সে পেছন ফিরে ছুটতে লাগলো এবং একবার ফিরেও তাকালো না। বলা হলো, "হে মূসা! ফিরে এসো এবং ভয় করো না, তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। তোমার হাত বগলে রাখো উজ্জল হয়ে বের হয়ে আসবে কোন প্রকার কষ্ট ছাড়াই।[৪৪] এবং ভীতিমুক্ত হবার জন্য নিজের হাত দু'টি চেপে ধরো।[৪৫] এ দু'টি উজ্জল নিদর্শন তোমার রবের পক্ষ থেকে ফেরাউন ও তার সভাসদদের সামনে পেশ করার জন্য, তারা বড়ই নাফরমান।"[৪৬]

মেষপাল লইয়া গিয়া হোরেবে ঈশ্বরের পর্বতে" চলে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি নিজের শ্বশুরের কাছে ফিরে গিয়েছিলেন। এবং তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিজের সন্তান সন্ততি সহকারে মিসরের পথে যাত্রা করেছিলেন। (যাত্রা পুস্তক ৩ ঃ ১ এবং ৪ ঃ ১৮) অপর দিকে কুরআন বলে, হযরত মূসা মেয়াদ পুরা করার পর নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে মাদ্‌য়ান থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন এবং এ সফরে আল্লাহর সাথে কথাবার্তা এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব লাভ করার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল।

বাইবেল ও তালমূদের সম্মিলিত বর্ণনা হচ্ছে, যে ফেরাউনের পরিবারে হযরত মূসা প্রতিপালিত হয়েছিলেন তাঁর মাদ্‌য়ানে অবস্থানকালে সে মারা গিয়েছিল এবং তারপর অন্য একজন ফেরাউন ছিল মিসরের শাসক।

৪২. অর্থাৎ হযরত মূসার ডান হাতের দিকে যে কিনারা ছিল সেই কিনারায়।

৪৩. অর্থাৎ আল্লাহর দ্যুতির আলোকে যে ভূখণ্ড আলোকিত হচ্ছিল।

৪৪. এ মু'জিযা দু'টি তখন হযরত মূসাকে দেখানোর কারণ হচ্ছে, প্রথমত যাতে তার মনে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে যে, প্রকৃতপক্ষে যে সত্তা বিশ্ব-জাহানের সমগ্র ব্যবস্থার স্রষ্টা, অধিপতি, শাসক ও পরিচালক তিনিই তাঁর সাথে কথা বলছেন। দ্বিতীয়ত এ মু'জিযাগুলো দেখে তিনি এ মর্মে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন যে, তাঁকে ফেরাউনের কাছে যে ভয়াবহ দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হচ্ছে সেখানে তিনি একেবারে খালি হাতে তার মুখোমুখি হবেন না বরং প্রচণ্ড শক্তিশালী অস্ত্র নিয়ে যাবেন।

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَأَخِي
هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ
أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا
فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴿٣٥﴾

মূসা নিবেদন করলো, "হে আমার প্রভু! আমি যে তাদের একজন লোককে হত্যা করে ফেলেছি, ভয় হচ্ছে, তারা আমাকে মেরে ফেলবে।[৪৭] আর আমার ভাই হারূন আমার চেয়ে বেশী বাকপটু, তাকে সাহায্যকারী হিসেবে আমার সাথে পাঠাও, যাতে সে আমাকে সমর্থন দেয়, আমার ভয় হচ্ছে, তারা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে"। বললেন, তোমার ভাইয়ের সাহায্যে আমি তোমার শক্তি বৃদ্ধি করবো এবং তোমাদের দু'জনকে এমনই প্রতিপত্তি দান করবো যে, তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমার নিদর্শনগুলোর জোরে তোমরা ও তোমাদের অনুসারীরাই বিজয় লাভ করবে।"[৪৮]

৪৫. অর্থাৎ যখন কোন ভয়াবহ মুহূর্ত আসে, যার ফলে তোমার মনে ভীতির সঞ্চার হয় তখন নিজের বাহু চেপে ধরো। এর ফলে তোমার মন শক্তিশালী হবে এবং ভীতি ও আশংকার কোন রেশই তোমার মধ্যে থাকবে না।

বাহু বা হাত বলতে সম্ভবত ডান হাত বুঝানো হয়েছে। কারণ সাধারণভাবে হাত বললে ডান হাতই বুঝানো হয়। চেপে ধরা দু'রকম হতে পারে। এক, হাত পার্শ্বদেশের সাথে লাগিয়ে চাপ দেয়া। দুই, এক হাতকে অন্য হাতের বগলের মধ্যে রেখে চাপ দেয়া। এখানে প্রথম অবস্থাটি প্রযোজ্য হবার সম্ভাবনা বেশী। কারণ এ অবস্থায় অন্য কোন ব্যক্তি অনুভব করতে পারবে না যে, এ ব্যক্তি মনের ভয় দূর করার জন্য কোন বিশেষ কাজ করছে।

হযরত মূসাকে যেহেতু একটি জালেম সরকারের মোকাবিলা করার জন্য কোন সৈন্য সামন্ত ও পার্থিব সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই পাঠানো হচ্ছিল তাই তাঁকে এ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলা হয়। বারবার এমন ভয়ানক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল যাতে একজন মহান দৃঢ়চেতা নবীও আতংকমুক্ত থাকতে পারতেন না। মহান আল্লাহ বলেন, এ ধরনের কোন অবস্থা দেখা দিলে তুমি স্রেফ এ কাজটি করো, ফেরাউন তার সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করেও তোমার মনের জোর শিথিল করতে পারবে না।

৪৬. এ শব্দগুলোর মধ্যে এ বক্তব্য নিহিত রয়েছে যে, এ নিদর্শনগুলো নিয়ে ফেরাউনের কাছে যাও এবং আল্লাহর রসূল হিসেবে নিজেকে পেশ করে তাকে ও তার রাষ্ট্রীয় প্রশাসকবৃন্দকে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের আনুগত্য ও বন্দেগীর দিকে আহবান

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۝ وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۭ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

তারপর মূসা যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে পৌঁছুলো তখন তারা বললো, এসব বানোয়াট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।[৪৯] আর এসব কথা তো আমরা আমাদের বাপ দাদার কালে কখনো শুনিনি।[৫০] মূসা জবাব দিল, "আমার রব তার অবস্থা ভালো জানেন, যে তার পক্ষ থেকে পথ নির্দেশনা নিয়ে এসেছে এবং কার শেষ পরিণতি ভালো হবে তাও তিনিই ভালো জানেন, আসলে জালেম কখনো সফলকাম হয় না।"[৫১]

জানাও। তাই এখানে তাঁর এ নিযুক্তির বিষয়টি সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত বলা হয়নি। তবে কুরআনের অন্যান্য স্থানে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা ত্বা-হা ও সূরা নাযি'আতে বলা হয়েছে اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى "ফেরাউনের কাছে যাও, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে।" সূরা আশ্ শু'আরায় বলা হয়েছে ঃ

اِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ

"যখন তোমার রব মূসাকে ডেকে বললেন, যাও জালেম জাতির কাছে, ফেরাউনের জাতির কাছে।"

৪৭. এর অর্থ এ ছিল না যে, এ ভয়ে আমি সেখানে যেতে চাই না। বরং অর্থ ছিল, আপনার পক্ষ থেকে এমন কোন ব্যবস্থা থাকা উচিত যার ফলে আমার সেখানে পৌঁছার সাথে সাথেই কোন প্রকার কথাবার্তা ও রিসালাতের দায়িত্বপালন করার আগেই তারা যেন আমাকে হত্যার অপরাধে গ্রেফতার করে না নেয়। কারণ এ অবস্থায় তো আমাকে যে উদ্দেশ্যে এ অভিযানে সেখানে পাঠানো হচ্ছে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। পরবর্তী ইবারত থেকে একথা স্বতস্ফূর্তভাবে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত মূসার এ আবেদনের উদ্দেশ্য মোটেই এরূপ ছিল না যে, তিনি ভয়ে নবুওয়াতের দায়িত্ব গ্রহণ এবং ফেরাউনের কাছে যেতে অস্বীকার করতে চাচ্ছিলেন।

৪৮. আল্লাহর সাথে হযরত মূসার এ সাক্ষাত ও কথাবার্তার অবস্থা এর চাইতেও বিস্তারিতভাবে সূরা ত্বা-হার ৯ থেকে ৪৮ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন মজীদ এ ব্যাপারে যে বর্ণনা দিয়েছে তাকে যে ব্যক্তি বাইবেলের যাত্রা পুস্তকের ৩ ও ৪ অধ্যায়ের

এতদসংক্রান্ত বর্ণনার সাথে তুলনা করবে, সে যদি কিছুটা তারসাম্য পূর্ণ রুচির অধিকারী হয়ে থাকে তাহলে এ দু'য়ের মধ্য থেকে কোন্‌টি আল্লাহর কালাম এবং কোন্‌টিকে মানুষের তৈরি গল্প বলা যাবে তা সে নিজেই উপলব্ধি করতে পারবে। তাছাড়া কুরআনের এ বর্ণনা নাউযুবিল্লাহ বাইবেল ও ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে নকল করা হয়েছে, না যে আল্লাহ হযরত মূসাকে তাঁর সাথে সাক্ষাত করিয়েছিলেন তিনি নিজেই আসল ঘটনা বর্ণনা করছেন, এ ব্যাপারেও সে সহজে নিজের মত স্থির করতে পারবে। (আরো বেশী জানতে হলে দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা-হা, ১৯ টীকা)

৪৯. মূলে বলা হয়েছে سِحْرٌ مُّفْتَرًى "বানোয়াট যাদু।" এ বানোয়াটকে যদি মিথ্যা অর্থে ধরা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, এ লাঠির সাপে পরিণত হওয়া এবং হাতের ঔজ্জ্বল্য বিকীরণ করা মূল জিনিসের মধ্যে প্রকৃত পরিবর্তন নয় বরং এটা হচ্ছে নিছক একটি লোক দেখানো প্রতারণামূলক কৌশল, একে মু'জিযা বলে এ ব্যক্তি আমাদের ধোকা দিচ্ছে। আর যদি একে বানোয়াট অর্থে গ্রহণ করা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে, এ ব্যক্তি কোন কৌশল অবলম্বন করে এমন একটি জিনিস তৈরি করে এনেছে, যা দেখতে লাঠির মতো কিন্তু যখন সে সেটাকে ছুঁড়ে দেয় তখন সাপের মতো দেখায়। আর নিজের হাতেও সে এমন কিছু জিনিস মাখিয়ে নিয়েছে যার ফলে তা বগল থেকে বের হবার পর হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এ কৃত্রিম যাদু সে নিজেই তৈরি করেছে কিন্তু আমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছে এ বলে যে, এটি আল্লাহ প্রদত্ত একটি মু'জিযা।

৫০. রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হযরত মূসা যেসব কথা বলেছিলেন সে দিকে ইংগিত করা হয়েছে। কুরআনের অন্যান্য জায়গায় এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। আন-নাযি'আতে বলা হয়েছে, হযরত মূসা তাকে বলেন ঃ

هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ○ وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى-

"তুমি কি পবিত্র-পরিচ্ছন্ন নীতি অবলম্বন করতে আগ্রহী? এবং আমি তোমাকে তোমার রবের পথ বাতলে দিলে কি তুমি ভীত হবে?" (আন-নাযি'আত-১৮-১৯)

সূরা ত্বা-হায়ে বলা হয়েছে ঃ

قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ؕ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ○ اِنَّا قَدْ اُوْحِىَ اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى -(طٰهٰ : ٤٧-٤٨)

"আমরা তোমার কাছে তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আর যে ব্যক্তি সঠিক পথের অনুসারী হয় তার জন্য রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা। আমাদের প্রতি অহী নাযিল করা হয়েছে এ মর্মে যে, শাস্তি তার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।" আর اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ "আমরা তোমার রবের পয়গম্বর, তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও।" এ কথাগুলো সম্পর্কেই ফেরাউন বলে, আমাদের বাপ দাদারাও কখনো একথা শোনেনি যে, মিসরের ফেরাউনের উপরেও কোন কর্তৃত্বশালী সত্তা আছে, যে তাকে হুকুম করার ক্ষমতা রাখে, তাকে শাস্তি দিতে পারে, তাকে নির্দেশ দেবার জন্য কোন লোককে তার দরবারে পাঠাতে

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ ۚ فَاَوْقِدْ لِىْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى ۙ وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣٨﴾

আর ফেরাউন বললো, "হে সভাসদবর্গ! তো আমি নিজেকে ছাড়া তোমাদের আর কোন প্রভু আছে বলে জানি না।৫২ ওহে হামান! আমার জন্য ইঁট পুড়িয়ে একটি উঁচু প্রাসাদ তৈরি করো, হয়তো তাতে উঠে আমি মূসার প্রভুকে দেখতে পাবো, আমিতো তাকে মিথ্যুক মনে করি।।"৫৩

পারে এবং যাকে ভয় করার জন্য মিসরের বাদশাহকে উপদেশ দেয়া যেতে পারে। এ সম্পূর্ণ অভিনব কথা আমরা আজ এক ব্যক্তির মুখে শুনছি।

৫১. অর্থাৎ তুমি আমাকে যাদুকর ও মিথ্যুক গণ্য করছো কিন্তু আমার রব আমার অবস্থা ভালো জানেন। তিনি জানেন তাঁর পক্ষ থেকে যাকে রসূল নিযুক্ত করা হয়েছে সে কেমন লোক। পরিণামের ফায়সালা তাঁরই হাতে রয়েছে। আমি মিথ্যুক হলে আমার পরিণাম খারাপ হবে এবং তুমি মিথ্যুক হলে ভালোভাবে জেনে রাখো তোমার পরিণাম ভালো হবে না। মোট কথা জালেমের মুক্তি নেই, এ সত্য অপরিবর্তনীয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর রসূল নয় এবং মিথ্যা রসূল সেজে নিজের কোন স্বার্থোদ্ধার করতে চায় সেও জালেম এবং সেও মুক্তি ও সাফল্য থেকে বঞ্চিত থাকবে। আর যে ব্যক্তি নানা ধরনের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সত্য রসূলকে মিথ্যা বলে এবং ধোকাবাজদের সাহায্যে সত্যকে দমন করতে চায় সেও জালেম এবং সেও কখনো মুক্তি ও সাফল্য লাভ করবে না।

৫২. এ উক্তির মাধ্যমে ফেরাউন যে বক্তব্য পেশ করেছে তার অর্থ এ ছিল না এবং এ হতেও পারতো না যে, আমিই তোমাদের এবং পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা। কারণ কেবলমাত্র কোন পাগলের মুখ দিয়েই এমন কথা বের হতে পারতো। অনুরূপভাবে এ অর্থ এও ছিল না এবং হতে পারতো না যে, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন মাবুদ নেই। কারণ মিসরবাসীরা বহু দেবতার পূজা করতো এবং স্বয়ং ফেরাউনকেই যেভাবে উপাস্যের মর্যাদা দেয়া হয়েছিল তাও শুধুমাত্র এই ছিল যে, তাকে সূর্য দেবতার অবতার হিসেবে স্বীকার করা হতো। সবচেয়ে বড় সাক্ষী কুরআন মজীদ নিজেই। কুরআনে বলা হয়েছে ফেরাউন নিজে বহু দেবতার পূজারী ছিল ঃ

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ –

"আর ফেরাউনের জাতির সরদাররা বললো, তুমি কি মূসা ও তার জাতিকে অবাধ ছাড়পত্র দিয়ে দেবে যে, তারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করুক এবং তোমাকে ও তোমার উপাস্যদেরকে ত্যাগ করুক?" (আল আ'রাফ ঃ ১২৭)

তাই ফেরাউন এখানে অবশ্যই "ইলাহ" শব্দটি নিজের জন্য স্রষ্টা ও উপাস্য অর্থে নয় বরং সার্বভৌম ও স্বয়ং সম্পূর্ণ শাসক এবং তাকে আনুগত্য করতে হবে, এ অর্থে ব্যবহার করেছিল। তার বলার উদ্দেশ্য ছিল, আমিই মিসরের এ সরযমীনের মালিক। এখানে আমারই হুকুম চলবে। আমারই আইনকে এখানে আইন বলে মেনে নিতে হবে। আমারই সত্তাকে এখানে আদেশ ও নিষেধের উৎস বলে স্বীকার করতে হবে। এখানে অন্য কেউ তার হুকুম চালাবার অধিকার রাখে না। এ মূসা কে? সে রব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি সেজে দাঁড়িয়েছে এবং আমাকে এমনভাবে হুকুম শুনাচ্ছে যেন সে আসল শাসনকর্তা এবং আমি তার হুকুমের অধীন? এ কারণে সে তার দরবারের লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছিল ঃ

يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ

"হে আমার জাতি! মিসরের বাদশাহী কি আমারই নয় এবং এ নদীগুলো কি আমার অধীনে প্রবাহিত নয়?" (আয্ যুখ্রুফঃ ৫১)

আর এ কারণেই সে বারবার হযরত মূসাকে বলছিল ঃ

اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ –

"তুমি কি এসেছো আমাদের বাপ-দাদাদের আমল থেকে যে পদ্ধতি চলে আসছে তা থেকে আমাদের সরিয়ে দিতে এবং যাতে এদেশে তোমাদের দু'ভাইয়ের আধিপত্য ও কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়?" (ইউনুস ঃ৭৮)

اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى –

"হে মূসা ! তুমি কি নিজের যাদুবলে আমাদের ভূখণ্ড থেকে আমাদের উৎখাত করতে এসেছো? (ত্বা-হা ঃ ৫৭)

اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ –

"আমি ভয় করছি এ ব্যক্তি তোমাদের দীন পরিবর্তিত করে দেবে অথবা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।" (আল মু'মিন ঃ ২৬)

এদিক দিয়ে চিন্তা করলে যেসব রাষ্ট্র আল্লাহর নবী প্রদত্ত শরীয়াতের অধীনতা প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের তথাকথিত রাজনৈতিক ও আইনগত সার্বভৌমত্বের দাবীদার, ফেরাউনের অবস্থা তাদের থেকে ভিন্নতর ছিল না। তারা আইনের উৎস এবং আদেশ নিষেধের কর্তা হিসেবে অন্য কোন বাদশাকে মানুক অথবা জাতির ইচ্ছার আনুগত্য

করুক, যতক্ষণ তারা এরূপ নীতি অবলম্বন করে চলবে যে, দেশে আল্লাহ ও তার রসূলের নয় বরং আমাদের হুকুম চলবে, ততক্ষণ তাদের ও ফেরাউনের নীতি ও ভূমিকার মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য থাকবে না। এটা ভিন্ন কথা যে, অবুঝ লোকেরা একদিকে ফেরাউনকে অভিসম্পাত করতে থাকে, অন্যদিকে ফেরাউনী রীতিনীতির অনুসারী এসব শাসককে বৈধতার ছাড়পত্র দিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্যের জ্ঞান রাখে, সে শব্দ ও পরিভাষা নয়, অর্থ ও প্রাণশক্তি দেখবে। ফেরাউন নিজের জন্য "ইলাহ" শব্দ ব্যবহার করেছিল এবং এরা সেই একই অর্থে "সার্বভৌমত্বের" পরিভাষা ব্যবহার করছে, এতে এমন কী পার্থক্য সৃষ্টি হয়। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা-হা ২১ টীকা)

৫৩. বর্তমান যুগের রুশীয় কম্যুনিষ্টরা একই ধরনের মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়ে যাচ্ছে। তারা স্পুটনিক ও লুনিকে চড়ে মহাশূন্যে উঠে দুনিয়াবাসীকে খবর দিচ্ছে, আমাদের মহাশূন্য যাত্রীরা উপরে কোথাও আল্লাহর সন্ধান পায়নি।* ওদিকে এ নির্বোধটিও মিনারে উঠে আল্লাহকে দেখতে চাচ্ছিল। এ থেকে জানা যায়, বিভ্রান্ত লোকদের মানসিকতা সাড়ে তিন হাজার বছর আগে যেমনটি ছিল আজও তেমনটিই আছে। এদিক দিয়ে তারা এক ইঞ্চি পরিমাণও উন্নতি করতে পারেনি। জানিনা কোন্ আহাম্মক তাদেরকে এ খবর দিয়েছিল যে, আল্লাহ বিশ্বাসী লোকেরা যে রব্বুল আলামীনকে মানে তিনি তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী উপরে কোথাও বসে আছেন। আর এ কুলকিনারাহীন মহাবিশ্বে কয়েক হাজার ফুট বা কয়েক লাখ মাইল উপরে উঠে যদি তারা তাঁর সাক্ষাত না পায় তাহলে যেন এ কথা পুরোপুরি প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, তিনি কোথাও নেই।

কুরআন এখানে একথা বলছে না যে, ফেরাউন সত্যিসত্যিই একটি ইমারত এ উদ্দেশ্যে বানিয়েছিল এবং তাতে উঠে আল্লাহকে দেখার চেষ্টা করেছিল। বরং কুরআন শুধুমাত্র তার এ উক্তি উদ্ধৃত করছে। এ থেকে আপাত দৃষ্টে মনে হয় সে কার্যত এ বোকামি করেনি। এ কথাগুলোর মাধ্যমে কেবলমাত্র মানুষকে বোকা বানানোই ছিল তার উদ্দেশ্য।

ফেরাউন সত্যিই বিশ্ব-জাহানের মালিক ও প্রভূ আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো, না নিছক জিদ ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে নাস্তিক্যবাদী কথা বার্তা বলতো, তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। তার উক্তিগুলো থেকে ঠিক একই ধরনের মানসিক অস্থিরতার সন্ধান পাওয়া যায় যেমন রুশ কম্যুনিষ্টদের কথাবার্তায় পাওয়া যায়। কখনো সে আকাশে উঠে দুনিয়াবাসীকে জানাতে চাইতো, আমি উপরে সব দেখে এসেছি, মূসার আল্লাহ কোথাও নেই। আবার কখনো বলতো-

فَلَوْلَآ أُلْقِىَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ

"যদি সত্যিই মূসা আল্লাহর প্রেরিত হয়ে থাকে, তাহলে কেন তার জন্য সোনার কাঁকন অবতীর্ণ হয়নি অথবা ফেরেশতারা তার আরদালী হয়ে আসেনি কেন?"

* অবশ্য ১৯৯১ তে এসে রুশী কম্যুনিষ্টদের আর আল্লাহর সন্ধানে স্পুটনিকে ও লুনিকে চড়তে হচ্ছে না। এখন বাস্তবতার প্রচণ্ড আঘাতে তারা কম্যুনিজম ত্যাগ করে আল্লাহকে স্বীকৃতি দেবার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। -অনুবাদক

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا
لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
لَا يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم
مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾

সে এবং তার সৈন্যরা পৃথিবীতে কোন সত্য ছাড়াই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করলো [৫৪] এবং মনে করলো তাদের কখনো আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না।[৫৫] শেষে আমি তাকে ও তার সৈন্যদেরকে পাকড়াও করলাম এবং সাগরে নিক্ষেপ করলাম।[৫৬] এখন এ জালেমদের পরিণাম কি হয়েছে দেখে নাও। তাদেরকে আমি জাহান্নামের দিকে আহবানকারী নেতা করেছিলাম[৫৭] এবং কিয়ামতের দিন তারা কোথাও থেকে কোন সাহায্য লাভ করতে পারবে না। এ দুনিয়ায় আমি তাদের পেছনে লাগিয়ে দিয়েছি অভিসম্পাত এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে বড়ই ঘৃণার্হ ও ধিকৃত।[৫৮]

এ কথাগুলো রাশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রুশ্চেভের কথা থেকে মোটেই ভিন্নতর নয়। তিনি কখনো আল্লাহকে অস্বীকার করতেন আবার কখনো বারবার আল্লাহর নাম নিতেন এবং তাঁর নামে কসম খেতেন। আমাদের অনুমান, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও তাঁর খলীফাদের যুগ শেষ হবার পর মিসরে কিবৃতী জাতীয়তাবাদের শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং স্বদেশপ্রীতির ভিত্তিতে দেশে রাজনৈতিক বিপ্লব সাধিত হয়। এ সময় নতুন নেতৃত্ব জাত্যাভিমানের আবেগে আল্লাহর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হযরত ইউসুফ ও তাঁর অনুসারী ইসরাঈলী এবং মিসরীয় মুসলমানরা তাদেরকে আল্লাহকে মেনে চলার দাওয়াত দিয়ে আসছিলেন। তারা মনে করলো, আল্লাহকে মেনে নিয়ে আমরা ইউসুফীয় সংস্কৃতির প্রভাব মুক্ত হতে পারবো না এবং এ সংস্কৃতি জীবিত থাকলে আমাদের রাজনৈতিক প্রভাবও শক্তিশালী হতে পারবে না। তারা আল্লাহকে স্বীকৃতি দেবার সাথে মুসলিম কর্তৃত্বকে অংগাংগীভাবে জড়িত মনে করছিল। তাই একটির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য অন্যটিকে অস্বীকার করা তাদের জন্য জরুরী ছিল, যদিও তার অস্বীকৃতি তাদের অন্তরের ভেতর থেকে বের হয়েও বের হচ্ছিল না।

৫৪. অর্থাৎ এ বিশ্ব-জাহানে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। কিন্তু ফেরাউন এবং তার সৈন্যরা পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র অংশে সামান্য একটু কর্তৃত্বের

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى
بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٣﴾ وَمَا كُنْتَ
بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ
الشّٰهِدِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَلٰكِنَّآ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ
ثَاوِيًا فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٤٥﴾

৫ রুকূ'

পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলোকে ধ্বংস করার পর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম লোকদের জন্য আত্মজ্ঞান লাভের সহায়ক। পথনির্দেশনা ও রহমত হিসেবে, যাতে লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করে।[৫৯] (হে মুহাম্মাদ!) তুমি সে সময় পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না[৬০] যখন আমি মূসাকে এ শরীয়াত দান করেছিলাম এবং তুমি সাক্ষীদের অন্তরভুক্তও ছিলে না।[৬১] বরং এরপর (তোমার যুগ পর্যন্ত) আমি বহু প্রজন্মের উদ্ভব ঘটিয়েছি এবং তাদের ওপর অনেক যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।[৬২] তুমি মাদ্‌য়ানবাসীদের মধ্যেও উপস্থিত ছিলে না, যাতে তাদেরকে আমার আয়াত শুনাতে পারতে[৬৩] কিন্তু আমি সে সময়কার এসব তথ্য জানাচ্ছি।

অধিকারী হয়ে মনে করে বসলো এখানে একমাত্র তারাই শ্রেষ্ঠ এবং তাদেরই সর্বময় কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিরাজিত।

৫৫. অর্থাৎ তারা নিজেদের ব্যাপারে মনে করলো তাদেরকে কোথাও জিজ্ঞাসিত হতে হবে না। আর তাদেরকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না মনে করে তারা স্বেচ্ছাচারমূলক কাজ করতে লাগলো।

৫৬. এ শব্দগুলোর মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাদের মিথ্যা অহমিকার মোকাবিলায় তাদের নিকৃষ্টতা ও হীনতার চিত্র তুলে ধরেছেন। তারা নিজেদেরকে অনেক বড় কিছু মনে করে বসেছিল। কিন্তু সঠিক পথে আসার জন্য আল্লাহ তাদেরকে যে অবকাশ দিয়েছিলেন তা যখন খতম হয়ে গেলো তখন তাদেরকে এমনভাবে সাগরে নিক্ষেপ করা হলো যেমন খড়কুটা ও ময়লা–আবর্জনা নিক্ষেপ করা হয়।

৫৭. অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তারা একটি দৃষ্টান্ত কায়েম করে গেছে। জুলুম কিভাবে করা হয়, সত্য অস্বীকার করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার ওপর কিভাবে অবিচল থাকা যায় এবং সত্যের মোকাবিলায় বাতিলের জন্য লোকেরা কেমন ধরনের অস্ত্র ব্যবহার

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ إِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ
لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٦﴾

আর তুমি তূর পাহাড়ের পাশেও তখন উপস্থিত ছিলে না যখন আমি (মূসাকে প্রথমবার) ডেকেছিলাম। কিন্তু এটা তোমার রবের অনুগ্রহ (যার ফলে তোমাকে এসব তথ্য দেয়া হচ্ছে)[৬৪] যাতে তুমি তাদেরকে সতর্ক করো যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি,[৬৫] হয়তো তারা সচেতন হয়ে যাবে।

করতে পারে, এসব তারা করে দেখিয়ে দিয়ে গেছে। দুনিয়াবাসীকে এসব পথ দেখিয়ে দিয়ে তারা জাহান্নামের দিকে এগিয়ে গেছে। এখন তাদের উত্তরসূরীরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে সেই মনযিলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।

৫৮. মূলে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন তারা "মাকবূহীন"দের অন্তরভুক্ত হবে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। তারা হবে প্রত্যাখ্যাত ও বহিস্কৃত। আল্লাহর রহমত থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হবে। তাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় করে দেয়া হবে। তাদের চেহারা বিকৃত করে দেয়া হবে।

৫৯. অর্থাৎ পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলো যখন পূর্বের নবীদের শিক্ষাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার অশুভ পরিণাম ভোগ করেছিল এবং ফেরাউন ও তার সৈন্যরা যে পারিণতি দেখেছিল তাই হলো তাদের শেষ পরিণতি। তখন তার পরে মূসা আলাইহিস সালামকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, যাতে মানব জাতির একটি নব যুগের সূচনা হয়।

৬০. পশ্চিম প্রান্ত বলতে সিনাই উপদ্বীপের যে পাহাড়ে হযরত মূসাকে শরীয়াতের বিধান দেয়া হয়েছিল সেই পাহাড় বুঝানো হয়েছে। এ এলাকাটি হেজাযের পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

৬১. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের সত্তর জন প্রতিনিধি যাদেরকে শরীয়াতের বিধান মেনে চলার অংগীকার করার জন্য হযরত মূসার সাথে ডাকা হয়েছিল। (সূরা আ'রাফের ১৫৫ আয়াতে এ প্রতিনিধিদের ডেকে নেবার কথা উল্লেখিত হয়েছে এবং বাইবেলের যাত্রা পুস্তকের ২৪ অধ্যায়েও এর আলোচনা করা হয়েছে।)

৬২. অর্থাৎ সরাসরি এ তথ্যগুলো লাভ করার কোন উপায় তোমাদের ছিল না। আজ দু'হাজার বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে যাবার পরও যে, তোমরা এ ঘটনাবলীকে এমনভাবে বর্ণনা করছো যেন তোমাদের চোখে দেখা ঘটনা, আল্লাহর অহীর মাধ্যমে এসব তথ্য তোমাদের সরবরাহ করা হচ্ছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া এর আর কোন কারণ নেই।

৬৩. অর্থাৎ যখন হযরত মূসা মাদ্‌য়ানে পৌছেন, তাঁর সাথে সেখানে যা কিছু ঘটে এবং দশ বছর অতিবাহিত করে যখন তিনি সেখান থেকে রওয়ানা দেন তখন সেখানে কোথাও তোমার কোন পাত্তাই ছিল না। তুমি আজ মক্কার অলিতে গলিতে যে কাজ করে

বেড়াচ্ছো সে সময় মাদ্‌য়ানের জনবসতিগুলোতে সে কাজ করতে না। তুমি চোখে দেখে এ ঘটনাবলীর উল্লেখ করছো না বরং আমার অহীর মাধ্যমেই তোমারা এ জ্ঞানও লাভ করছো।

৬৪. এ তিনটি কথাই পেশ করা হয়েছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে। যখন একথাগুলো পেশ করা হয়েছিল তখন মক্কার সমস্ত সরদার ও সাধারণ কাফেররা কোন প্রকারে তাঁকে অ–নবী এবং নাউযুবিল্লাহ নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। তাদেরকে সাহায্য করার জন্য ইয়াহুদী উলামা ও খৃষ্টান 'রাহিব' তথা সংসারত্যাগী–যোগী সন্ন্যাসীরাও হেজাযের জনপদগুলোতে উপস্থিত ছিল। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও কোন মহাশূন্য থেকে এসে কুরআন শুনিয়ে যেতেন না। বরং তিনি ছিলেন সেই মক্কারই বাসিন্দা। তাঁর জীবনের কোন একটি দিকও তাঁর জনপদ ও গোত্রের লোকদের কাছে গোপন ছিল না। এ কারণেই যখন এ প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের আকারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের প্রমাণ স্বরূপ এ তিনটি কথা বলা হলো তখন মক্কা, হেজায এবং সারা আরবের কোন এক ব্যক্তিও উঠে এমন বেহুদা কথা বলেনি যা আজকের পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদরা বলছেন। যদিও মিথ্যা তৈরি করার ব্যাপারে তারা এদের চেয়ে কম যেতো না তবুও যে ডাহা মিথ্যা এক মুহূর্তের জন্যও চলতে পারে না তা তারা বলতো কেমন করে। তারা কেমন করে বলতো, হে মুহাম্মাদ, তুমি অমুক অমুক ইহুদী আলেম ও খৃষ্টান রাহেবের কাছ থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করে এনেছো! কারণ সারা দেশে এ উদ্দেশ্যে তারা কোন একজনেরও নাম নিতে পারতো না। তারা কারো নাম নেবার সাথে সাথেই প্রমাণ হয়ে যেতো যে, নবী (সা) তার কাছ থেকে কোন তথ্য সংগ্রহ করেননি। তারা কেমন করে বলতো, হে মুহাম্মাদ! বিগত ইতিহাস এবং সাহিত্য ও যাবতীয় বিদ্যার গ্রন্থরাজি সম্বলিত একটি লাইব্রেরী তোমার আছে! সেই গ্রন্থরাজির সহায়তায় তুমি এসব বক্তৃতা দিচ্ছো। কারণ লাইব্রেরী তো দূরের কথা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আশে পাশে কোথাও থেকে তারা এসব তথ্য সম্বলিত একটি কাগজের টুকরোও বের করতে সক্ষম ছিল না। মক্কার প্রতিটি শিশুও জানতো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লেখাপড়া জানা লোক নন। আবার কেউ একথাও বলতে পারতো না যে, তিনি কিছু অনুবাদক নিযুক্ত করে রেখেছেন, তারা হিব্রু, সুরিয়ানী ও গ্রীক গ্রন্থরাজী থেকে তরজমা করে তাঁকে দেয়। তারপর তাদের সবচেয়ে বড় বেহায়া লোকটিও এ দাবী করার সাহস করতো না যে, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের বাণিজ্য সফরে গিয়ে আপনি এ তথ্যাবলী সংগ্রহ করে এনেছিলেন। কারণ এ সফরে তিনি একা ছিলেন না। মক্কারই বাণিজ্যিক কাফেলা প্রত্যেক সফরে তাঁর সাথে থাকতো। যদি তখন কেউ এ ধরনের দাবী করতো তাহলে শত শত জীবিত সাক্ষী এ সাক্ষ দিতো যে, সেখানে তিনি কারো কাছ থেকে কোন পাঠ নেননি। আর তাঁর ইন্তিকালের পর তো দু'বছরের মধ্যেই রোমানদের সাথে মুসলমানরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। যদি মিথ্যামিথ্যাই সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে কোন খৃষ্টান রাহেব বা ইহুদী রব্বির সাথে নবী (সা) কোন আলাপ আলোচনা করে থেকে থাকতেন তাহলে রোমান সরকার তিলকে তাল করে দিতো এবং এ প্রপাগাণ্ডা করতে একটুও পিছপাও হতো না যে, মুহাম্মাদ (সা) (নাউযুবিল্লাহ) সবকিছু এখান থেকে শিখে গেছেন এবং এখান থেকে মক্কায় গিয়ে নবী সেজে বসেছেন। মোটকথা যে যুগে কুরআনের

এ চ্যালেঞ্জ কুরাইশদের কাফের ও মুশরিকদের জন্য মৃত্যুর বারতা ঘোষণা করতো এবং তাকে মিথ্যা বলার প্রয়োজন বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদদের তুলনায় তাদের জন্য ছিল অনেক বেশী, সে যুগে কোন ব্যক্তিও কোথাও থেকে এমন কোন উপাদান সংগ্রহ করে আনতে পারেনি যা থেকে একথা প্রমাণ হতে পারতো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অহী ছাড়া এ তথ্যগুলো সংগ্রহ করার দ্বিতীয় এমন কোন মাধ্যম আছে যার উল্লেখ করা যেতে পারে।

একথাও জেনে রাখা উচিত, কুরআন এই চ্যালেঞ্জ শুধু এখানেই দেয়নি বরং বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কাহিনী প্রসঙ্গে দিয়েছে। হযরত যাকারিয়া ও হযরত মারয়ামের কাহিনী বর্ণনা করে বলেছে ঃ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۭ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۠ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ -

"এ হচ্ছে অদৃশ্য খবরের অন্তরভুক্ত, যা আমি অহীর মাধ্যমে তোমাকে দিচ্ছি। তুমি তাদের আশেপাশে কোথাও ছিলে না যখন তারা মারয়ামের তত্বাবধানের দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে একথা জানার জন্য তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল। তুমি তখনও উপস্থিত ছিলে না যখন তারা ঝগড়া করছিল। (আলে ইমরান ঃ ৪৪)

হযরত ইউসুফের কাহিনী বর্ণনা করার পর বলা হচ্ছে ঃ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ -

"এ হচ্ছে গায়েবের খবরের অন্তরভুক্ত, যা আমি অহীর মাধ্যমে তোমাকে দিচ্ছি। তুমি তাদের (অর্থাৎ ইউসুফের ভাইদের) আশেপাশে কোথাও উপস্থিত ছিলে না যখন তারা নিজেদের করণীয় সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করেছিল এবং যখন তারা ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিল।" (ইউসুফ ঃ ১০২)

অনুরূপভাবে হযরত নূহের বিস্তারিত কাহিনী বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا -

"এ কথাগুলো গায়েবের খবরের অন্তরভুক্ত, যা আমি তোমাকে অহীর মাধ্যমে জানিয়েছি। তোমার ও তোমার জাতির ইতিপূর্বে এর কোন জ্ঞান ছিল না।"

(হূদ ঃ ৪৯)

এ জিনিসটির বারবার পুনরাবৃত্তি থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মজীদ যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া কিতাব এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا
لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾
فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ
مُوْسٰى ؕ اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرٰنِ
تَظٰهَرَا ۫ وَقَالُوْٓا اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٨﴾

(আর এ আমি এজন্য করেছি যাতে) এমনটি যেন না হয় যে, তাদের নিজেদের কৃতকর্মের বদৌলতে কোন বিপদ তাদের ওপর এসে যায়, আর তারা বলে, "হে আমাদের রব! তুমি কেন আমাদের কাছে কোন রসূল পাঠাওনি? তাহলে তো আমরা তোমার আয়াত মেনে চলতাম এবং ঈমানদারদের অন্তরভুক্ত হতাম।[৬৬]

কিন্তু যখন আমার কাছ থেকে সত্য তাদের কাছে পৌঁছে গেলো তখন তারা বলতে লাগলো, মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল কেন তাকে সে সব দেয়া হলো না?[৬৭] *এর আগে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল তা কি তারা অস্বীকার করেনি?*[৬৮] *তারা বললো, "দু'টোই যাদু,*[৬৯] *যা একে অন্যকে সাহায্য করে।" আর বললো, "আমরা কোনটাই মানি না।"*

যে, আল্লাহর রসূল তার একটি প্রধান যুক্তি এই ছিল যে, শত শত হাজার হাজার বছর আগে যেসব ঘটনা ঘটে গেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা আসছে একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ থেকে। অহী ছাড়া সেগুলো জানার কোন উপায় তাঁর করায়ত্ব নেই। যেসব গুরুত্বপূর্ণ কারণের ভিত্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন লোকেরা বিশ্বাস করতে চলেছিল যে, যথার্থই তিনি আল্লাহর নবী এবং তাঁর কাছে আল্লাহর অহী আসে এ জিনিসটি ছিল তার অন্যতম। এখন যে কোন ব্যক্তি নিজেই ধারণা করতে পারে, ইসলামী আন্দোলনের বিরোধীদের জন্য সে যুগে এ চ্যালেঞ্জের প্রতিবাদ করা কতটা গুরুত্বহ হয়ে থাকতে পারে এবং তারা এর বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করার জন্য কিভাবে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে থাকতে পারে। তাছাড়া এটাও অনুমান করা যেতে পারে যে, যদি এ চ্যালেঞ্জের মধ্যে সামান্যতমও কোন দুর্বলতা থাকতো তাহলে তাকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ–প্রমাণ সংগ্রহ করা সমকালীন লোকদের জন্য কঠিন হতো না।

৬৫. আরবে হযরত ইসমাঈল ও হযরত শো'আইব আলাইহিমাস সালাম ছাড়া আর কোন নবী আসেননি। প্রায় দু'হাজার বছরের এ সুদীর্ঘ সময়ে বাইরের নবীদের দাওয়াত অবশ্যই সেখানে পৌঁছেছে। যেমন হযরত মূসা, হযরত সুলাইমান ও হযরত ঈসা আলাইহিমুস সালামের দাওয়াত। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কোন নবীর আবির্ভাব সেখানে ঘটেনি।

قُلْ فَأْتُوا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَآ اَتَّبِعْهُ اِنْ
كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ
اَهْوَآءَهُمْ ۭ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ۭ اِنَّ
اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٠﴾

(হে নবী?) তাদেরকে বলো, "বেশ, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে আনো আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন কিতাব, যা এ দু'টির চাইতে বেশী হিদায়াতদানকারী হবে; আমি তারই অনুসরণ করবো।"[৮০] এখন যদি তারা তোমার এ দাবী পূর্ণ না করে, তাহলে জেনে রাখো, তারা আসলে নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হিদায়াত ছাড়াই নিছক নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে হবে? আল্লাহ এ ধরনের জালেমদেরকে কখনো হিদায়াত দান করেন না।

৬৬. এ জিনিসটিকেই কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে রসূল পাঠাবার কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছে। কিন্তু এ থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌছানো সঠিক হবে না যে, এ উদ্দেশ্যে সব সময় প্রত্যেক জায়গায় একজন রসূল আসা উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ায় একজন রসূলের পয়গাম তার সঠিক আকৃতিতে বিদ্যমান থাকে এবং লোকদের কাছে তা পৌছে যাবার মাধ্যমও অপরিবর্তিত থাকে ততক্ষণ কোন নতুন রসূলের প্রয়োজন হয় না। তবে যদি আগের নবীর আনীত শরীয়াতের মধ্যে কোন কিছু বৃদ্ধি করার এবং কোন নতুন বিধান দেবার প্রয়োজন হয় তাহলে নতুন রসূল আসেন। অবশ্যই যখন নবীদের পয়গাম বিলুপ্ত হয়ে যায় অথবা গোমরাহীর মধ্যে এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে যায় যে, তা থেকে হিদায়াত লাভের কোন উপায় থাকে না। তখন লোকদের জন্য এ ওজর পেশ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, আমাদের হক ও বাতিলের পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন করার ও সঠিক পথ দেখাবার কোন ব্যবস্থাই আদতে ছিল না, এ অবস্থায় আমরা কেমন করে হিদায়াত লাভ করতে পারতাম। এ অজুহাত দেখানোর পথ বন্ধ করার জন্য মহান আল্লাহ এ ধরনের অবস্থায় নবী পাঠান, যাতে এর পর যে ব্যক্তিই ভুল পথে চলবে তাকে সে জন্য দায়ী করা সম্ভব না হয়।

৬৭. অর্থাৎ হযরত মূসাকে (আ) যেসব মু'জিযা দেয়া হয়েছিল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সে সবগুলো দেয়া হলো না কেন? ইনিও লাঠিকে সাপ বানিয়ে আমাদের দেখাতেন। এঁর হাতও বগল থেকে বের করার পর সূর্যের মতো উজ্জ্বল্য বিকীরণ করতো। এঁর ইশারায়ও অস্বীকারকারীদের ওপর একের পর এক তুফান এবং আকাশ ও পৃথিবীর বালা-মুসীবত নাযিল হতো। ইনিও পাথরের গায়ে লিখিত বিধান এনে আমাদের দিতেন।

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ
الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا
بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾

৬ রুকূ'

আর আমি তো অনবরত তাদের কাছে (উপদেশ বাণী) পৌঁছিয়ে দিয়েছি, যাতে তারা গাফলতি থেকে সজাগ হয়ে যায়।[৭১]

যাদেরকে আমি এর আগে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এর (কুরআন) প্রতি ঈমান আনে।[৭২] *আর যখন তাদেরকে এটা শুনানো হয়, তারা বলে, "আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, এটি যথার্থই সত্য আমাদের রবের পক্ষ থেকে, আমরা তো আগে থেকেই মুসলিম।"*[৭৩]

৬৮. এ হচ্ছে তাদের অভিযোগের জবাব। এর অর্থ হচ্ছে, এসব মু'জিযা সত্ত্বেও তোমরা কি মূসার (আ) প্রতি ঈমান এনেছিলে? তাহলে আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সেগুলোর দাবী করছো কেন? তোমরা নিজেরাই বলছো, মূসাকে এসব মু'জিযা দেয়া হয়েছিল কিন্তু তার পরও তোমরা তাঁকে নবী বলে মেনে নিয়ে কোনদিন তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করোনি। সূরা সাবার ৩১ আয়াতেও মক্কার কাফেরদের এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ "আমরা এই কুরআনও মানবো না, এর আগের কিতাবগুলোকেও মানবো না।"

৬৯. অর্থাৎ কুরআন ও তাওরাত।

৭০. অর্থাৎ আমাকে তো হিদায়াতের অনুসরণ করতে হবে। তবে শর্ত হচ্ছে, তা কারো মনগড়া হলে হবে না। বরং হতে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকৃত ও যথার্থ হিদায়াত। যদি তোমাদের কাছে এমন কোন কিতাব থাকে যা কুরআন ও তাওরাতের চাইতে ভালো পথ নির্দেশনা দিতে পারে তাহলে তোমরা তাকে লুকিয়ে রেখেছো কেন? তাকে সবার সামনে নিয়ে এসো। আমি বিনা দ্বিধায় তার বিধান মেনে চলবো।

৭১. অর্থাৎ উপদেশের ব্যাপারে আমি কোন কসুর করিনি। এ কুরআনে আমি অনবরত উপদেশ বিতরণ করে এসেছি। কিন্তু যে জিদ ও একগুঁয়েমী পরিহার করে হৃদয়কে বিদ্বেষমুক্ত রেখে সত্যকে সোজাসুজি গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে যায় সে-ই একমাত্র হিদায়াত লাভ করতে পারে।

৭২. এর অর্থ এটা নয় যে, সমস্ত আহ্‌লি কিতাব (ইহুদী ও ঈসায়ী) এর প্রতি ঈমান আনে। বরং এ সূরা নাযিল হবার সময় যে ঘটনা ঘটেছিল এখানে আসলে সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মক্কাবাসীদেরকে এই মর্মে লজ্জা দেয়াই উদ্দেশ্য যে, তোমাদের

নিজেদের গৃহে যে নিয়ামত এসেছে তাকে তোমরা প্রত্যাখ্যান করছো। অথচ দূর দেশ থেকে লোকেরা এর খবর শুনে আসছে এবং এর মূল্য অনুধাবন করে এ থেকে লাভবান হচ্ছে।

ইবনে হিশাম ও বাইহাকী এবং অন্যরা এ ঘটনাকে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ আবিসিনিয়ায় হিজরাতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তি এবং তার দাওয়াতের খবর যখন সেই দেশে ছড়িয়ে পড়লো তখন সেখান থেকে প্রায় ২০ জনের একটি খৃষ্টান প্রতিনিধি দল প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য মক্কা মু'আয্যমায় এলো। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মসজিদে হারামে সাক্ষাত করলো। কুরাইশদের বহু লোকও এ ব্যাপার দেখে আশপাশে দাঁড়িয়ে গেলো। প্রতিনিধি দলের লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু প্রশ্ন করলেন। তিনি সেগুলোর জবাব দিলেন। তারপর তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং কুরআন মজীদের আয়াত তাদের সামনে পাঠ করলেন। কুরআন শুনে তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। তারা একে আল্লাহর বাণী বলে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করলেন এবং নবীর (সা) প্রতি ঈমান আনলেন। মজলিস শেষ হবার পর আবু জেহেল ও তার কয়েকজন সাথী প্রতিনিধিদলের লোকদেরকে পথে ধরলো এবং তাদেরকে যাচ্ছে তাই বলে তিরস্কার করলো। তাদেরকে বললো, "তোমাদের সফরটাতো বৃথাই হলো। তোমাদের স্বধর্মীয়রা তোমাদেরকে এজন্য পাঠিয়েছিল যে, এ ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে তোমরা যথাযথ অনুসন্ধান চালিয়ে প্রকৃত ও যথার্থ ঘটনা তাদেরকে জানাবে। কিন্তু তোমরা সবেমাত্র তার কাছে বসেছিলে আর এরি মধ্যেই নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে তার প্রতি ঈমান আনলে? তোমাদের চেয়ে বেশী নির্বোধ কখনো আমরা দেখিনি।" একথায় তারা জবাব দিল, "ভাইয়েরা, তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা তোমাদের সাথে জাহেলী বিতর্ক করতে চাই না। আমাদের পথে আমাদের চলতে দাও এবং তোমরা তোমাদের পথে চলতে থাকো। আমরা জেনেবুঝে কল্যাণ থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করতে পারি না।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা এবং আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৩ খণ্ড, ৮২ পৃষ্ঠা। আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা শূ'আরা, ১২৩ টীকা)

৭৩. অর্থাৎ এর আগেও আমরা নবীদের ও আসমানী কিতাবের আনুগত্য করে এসেছি। তাই ইসলাম ছাড়া আমাদের অন্য কোন দীন ছিল না। এখন যে নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব এনেছেন তাকেও আমরা মেনে নিয়েছি। কাজেই মূলত আমাদের দীনের কোন পরিবর্তন হয়নি। বরং আগেও যেমন আমরা মুসলমান ছিলাম তেমনি এখনও মুসলমান আছি।

একথা থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীনের দাওয়াত দিয়েছেন কেবলমাত্র তার নামই ইসলাম নয় এবং "মুসলিম" পরিভাষাটি শুধুমাত্র নবী করীমের (সা) অনুসারীগণ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। বরং সব সময় এ ইসলামই ছিল সকল নবীর দীন এবং সব জামানায় তাঁদের সবার অনুসারীগণ মুসলমানই ছিলেন। এ মুসলমানরা যদি কখনো পরবর্তীকালে আগত কোন সত্য নবীকে মানতে অস্বীকার করে থাকে তাহলে কেবল তখনই তারা কাফের হয়ে গিয়ে থাকবে।

কিন্তু যারা পূর্বের নবীকে মানতো এবং পরে আগত নবীকেও মেনে নিয়েছে তাদের ইসলামে কোন ছেদ পড়েনি। তারা পূর্বেও যেমন মুসলমান ছিল, পরেও তেমনি থেকেছে।

আশ্চর্যের কথা, বড় বড় জ্ঞানীগুণী ও আলেমদের মধ্যেও কেউ কেউ এ সত্যটি অনুধাবন করতে অক্ষম হয়েছেন। এমনকি এ সুস্পষ্ট আয়াতটি দেখেও তাঁরা নিশ্চিন্ত হননি। আল্লামা সুয়ুতী "মুসলিম" পরিভাষাটি কেবলমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের সাথেই বিশেষভাবে জড়িত এ মর্মে বিস্তারিত আলোচনা সম্বলিত একটি বই লিখেছেন। তারপর যখন এ আয়াতটি সামনে এসেছে তখন নিজেই বলেছেন, এখন তো আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে। কিন্তু এরপর বলছেন, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম এ মর্মে যে, এ ব্যাপারে আমার হৃদয় প্রসারিত করে দাও। শেষে নিজের অভিমত প্রত্যাহার করার পরিবর্তে তিনি তারই ওপর জোর দিয়েছেন এবং এ আয়াতটির কয়েকটি ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। এ ব্যাখ্যাগুলোর একটি অন্যটির চেয়ে বেশী ওজনহীন। যেমন তাঁর একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে ঃ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আমরা কুরআন আসার আগেই মুসলিম হয়ে যাবার সংকল্প পোষণ করতাম। কারণ আমাদের কিতাবসমূহ থেকে আমরা এর আসার খবর পেয়ে গিয়েছিলাম এবং আমাদের সংকল্প ছিল, তিনি আসলেই আমরা ইসলাম গ্রহণ করে নেবো। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হচ্ছে, এ বাক্যাংশে مُسْلِمِيْنَ শব্দের পরে بِهٖ শব্দ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ আগে থেকেই আমরা কুরআন মানতাম। কারণ আমরা তাঁর আগমনের আশা পোষণ করতাম এবং পূর্বাহ্নেই তাঁর প্রতি ঈমান এনে বসেছিলাম। তাই তাওরাত ও ইন্‌জিল মানার ভিত্তিতে নয় বরং কুরআনকে তার নাযিল হবার পূর্বে যথার্থ সত্য বলে মেনে নেবার জন্যই আমরা মুসলিম ছিলাম। তৃতীয় ব্যাখ্যা হচ্ছে ঃ আল্লাহর তাকদীরে পূর্বেই আমাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনের আগমনে আমরা ইসলাম গ্রহণ করে নেবো। তাই আসলে আমরা আগে থেকেই মুসলিম ছিলাম। এই ব্যাখ্যাগুলোর মধ্য থেকে কোনটি দেখেও আল্লাহ প্রদত্ত হৃদয়ের প্রশস্ততার কোন প্রভাব সেখানে আছে বলে মনে হচ্ছে না।

প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, কুরআন কেবলমাত্র এই একটি স্থানেই নয় বরং অসংখ্য জায়গায় এ সত্যটি বর্ণনা করেছে। কুরআন বলছে, আসল দীন হচ্ছে একমাত্র "ইসলাম" (আল্লাহর আনুগত্য) এবং আল্লাহর বিশ্ব-জাহানে আল্লাহর সৃষ্টির জন্য এছাড়া দ্বিতীয় কোন দীন ও ধর্ম হতে পারে না। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে যে নবীই মানুষকে পথ নির্দেশ দেবার জন্য এসেছেন তিনি এ দীন নিয়েই এসেছেন। আর নবীগণ হামেশাই নিজেরা মুসলিম থেকেছেন, নিজেদের অনুসারীদেরকে মুসলিম হয়ে থাকার তাকিদ করেছেন এবং তাঁদের যেসব অনুসারী নবুওয়াতের মাধ্যমে আগত আল্লাহর ফরমানের সামনে আনুগত্যের শির নত করে দিয়েছেন তারাও প্রতি যুগে মুসলিমই ছিলেন। এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত স্বরূপ শুধুমাত্র গুটিকয় আয়াত পেশ করছি ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

"আসলে আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র দীন।" (আলে ইমরান ঃ ১৯)

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ –

"আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন অবলম্বন করে তা কখনো গৃহীত হবে না।" (আলে ইমরান ঃ ৮৫)

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম বলেন ঃ

اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ ۙ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ –

"আমার প্রতিদান দেবার দায়িত্ব তো আল্লাহর এবং আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে আমি যেন মুসলিমদের মধ্যে শামিল হয়ে যাই।" (ইউনুস ঃ ৭২)

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর সন্তানদের সম্পর্কে বলা হয় ঃ

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ –

"যখন তার রব তাকে বললেন, মুসলিম (ফরমানের অনুগত) হয়ে যাও, সে বললো আমি মুসলিম হয়ে গেলাম রব্বুল আলামীনের জন্য। আর এ জিনিসটিরই অসিয়াত করে ইবরাহীম তার সন্তানদেরকে এবং ইয়াকুবও ঃ হে আমার সন্তানরা! আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দীনটিই পছন্দ করেছেন। কাজেই মুসলিম না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ করো না। তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকূবের মৃত্যুর সময় এসে গিয়েছিল, যখন সে তার পুত্রদেরকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমার মৃত্যুর পর তোমরা কার বন্দেগী করবে? তারা জবাব দিয়েছিল আমরা বন্দেগী করবো আপনার মাবুদের এবং আপনার বাপ–দাদা ইবরাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকের মাবুদের তাঁকে একক মাবুদ হিসেবে মেনে নিয়ে। আর আমরা তাঁরই অনুগত– মুসলিম।" (আল বাকারাহ ঃ ১৩১–১৩৩)

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ

"ইবরাহীম ইহুদী ছিল না, খৃষ্টানও ছিল না বরং ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম।"
(আলে ইমরান ঃ ৬৭)

হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) নিজেই দোয়া করেন ঃ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ –

"হে আমাদের রব! আমাকে তোমার মুসলিম (অনুগত) করো এবং আমাদের বংশ থেকে একটি উম্মত সৃষ্টি করো যে হবে তোমার মুসলিম।" (আল বাকারাহ ঃ ১২৮)

হযরত লূতের কাহিনীতে বলা হচ্ছে ঃ

فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"আমরা লূতের জাতির জনপদে একটি ঘর ছাড়া মুসলমানদের আর কোন ঘর পাইনি।" (আয্-যারিয়াত ঃ ৩৬)

হযরত ইউসুফ (আ) মহিমান্বিত রবের দরবারে নিবেদন করেন ঃ

تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ -

"আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দান করো এবং সৎকর্মশীলদের সাথে মিলিয়ে দাও।" (ইউসুফ ঃ ১০১)

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর নিজের জাতিকে বলেন ঃ

يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ -

"হে আমার জাতি! যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাকো, তাহলে তাঁরই ওপর ভরসা করো যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাকো।" (ইউনুস ঃ ৮৪)

বনী ইসরাঈলের আসল ধর্ম ইহুদীবাদ নয় বরং ইসলাম ছিল। বন্ধু ও শত্রু সবাই একথা জানতো। কাজেই ফেরাউন সাগরে ডুবে যেতে যেতে যে শেষ কথাটি বলে তা হচ্ছে ঃ

اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآئِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"আমি মেনে নিলাম বনী ইসরাইল যার প্রতি ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তরভুক্ত।" (ইউনুস ঃ ৯০)

বনী ইসরাঈলদের সকল নবীর দীনও ছিল এ ইসলাম ঃ

اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا ،

"আমি তাওরাত নাযিল করেছি, যাতে ছিল হিদায়াত ও আলো, সে অনুযায়ী সে নবীগণ যারা মুসলিম ছিল তাদের বিষয়াদির ফায়সালা করতো যারা ইহুদী হয়ে গিয়েছিল।" (আল মায়েদাহ ঃ ৪৪)

এটিই ছিল হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের দীন। সেজন্য সাবার রাণী তাঁর প্রতি ঈমান আনতে গিয়ে বলছেন ঃ

اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"আমি সুলাইমানের সাথে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মুসলিম হয়ে গেলাম"
(আন্ নাম্‌ল ঃ ৪৪)

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ
السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ
وَقَالُوا لَنَا أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي
الْجَٰهِلِينَ ﴿٥٥﴾ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي
مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

তারা এমন লোক যাদেরকে দু'বার পারিশ্রমিক দেয়া হবে[৭৪] এমন অবিচলতার প্রতিদানে যা তারা দেখিয়েছে।[৭৫] তারা ভালো দিয়ে মন্দের মোকাবিলা করেছে[৭৬] এবং আমি তাদেরকে যা কিছু রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।[৭৭] আর যখন তারা বাজে কথা শুনেছে,[৭৮] একথা বলে তা থেকে আলাদা হয়ে গেছে যে, "আমাদের কর্মকাণ্ড আমাদের জন্য এবং তোমাদের কর্মকাণ্ড তোমাদের জন্য, তোমাদের প্রতি সালাম, আমরা মূর্খদের মতো পথ অবলম্বন করতে চাই না।" হে নবী! তুমি যাকে চাও তাকে হিদায়াত দান করতে পারো না কিন্তু আল্লাহ যাকে চান তাকে হিদায়াত দান করেন এবং যারা হিদায়াত গ্রহণ করে তাদেরকে তিনি খুব ভাল করেই জানেন।[৭৯]

আর এটিই ছিল হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর হাওয়ারীদের (সহযোগী) দীন ঃ

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ۖ قَالُوا ءَامَنَّا وَاشْهَدْ
بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ -

"আর যখন আমি হওয়ারীদের কাছে অহী পাঠালাম এ মর্মে যে, ঈমান আনো আমার প্রতি এবং আমার রসূলের প্রতি তখন তারা বললো, আমরা ঈমান এনেছি এবং সাক্ষী থাকো আমরা মুসলিম।" (আল মায়েদাহ ঃ ১১১)

যদি সন্দেহ পোষণ করা হয় যে, আরবী ভাষার "ইসলাম" ও "মুসলিম" শব্দ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ভাষায় কেমন করে ব্যবহৃত হতে পারতো, তাহলে বলতে হয় যে, এটা নিছক একটা অজ্ঞতাপ্রসূত কথা। কারণ এ আরবী শব্দগুলো আসল বিবেচ্য নয়, আরবী ভাষায় এ শব্দগুলো যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সেটিই মূল বিবেচ্য বিষয়। আসলে এ আয়াতগুলোতে যে কথাটি বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে

প্রকৃত দীনটি এসেছে তা খৃষ্টবাদ, মূসাবাদ বা মুহাম্মাদবাদ নয় বরং তা হচ্ছে নবীগণ ও আসমানী কিতাবসমূহের মাধ্যমে আগত আল্লাহর ফরমানের সামনে আনুগত্যের শির নত করে দেয়া এবং এ নীতি আল্লাহর যে বান্দা যেখানেই যে যুগেই অবলম্বন করেছে সে হয়েছে একই বিশ্বজনীন, আদি ও চিরন্তন সত্যদীনের অনুসারী। যারা এ দীনকে যথার্থ সচেতনতা ও আন্তরিকতা সহকারে গ্রহণ করেছে তাদের জন্য মূসার পরে ঈসাকে এবং ঈসার পরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মেনে নেয়া ধর্ম পরিবর্তন করা হবে না বরং হবে প্রকৃত ও আসল ধর্মের অনুসরণ করার স্বাভাবিক ও ন্যায়সংগত দাবী। পক্ষান্তরে যারা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের উম্মতের মধ্যে না জেনে বুঝে ঢুকে পড়েছে অথবা তাঁদের দলে জন্ম নিয়েছে এবং জাতীয় ও বংশীয় স্বার্থপ্রীতি যাদের জন্য আসল ধর্মে পরিণত হয়ে গেছে তারা ইহুদী ও খৃষ্টান হয়ে রয়ে গেছে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনে তাদের মূর্খতা ও অজ্ঞতার হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে গেছে। কারণ তারা আল্লাহর শেষ নবীকে অস্বীকার করেছে। আর এটা করে তারা শুধু যে নিজেদের ভবিষ্যতে মুসলিম হয়ে থাকাকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাই নয় বরং নিজেদের এ কার্যকলাপের মাধ্যমে তারা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, তারা আসলে ইতিপূর্বেও "মুসলিম" ছিল না নিছক একজন নবীর বা কয়েকজন নবীর ব্যক্তিত্বের ভক্ত ও অনুরক্ত ছিল। অথবা পিতা–প্রপিতার অন্ধ অনুকরণকে ধর্মীয় আচারে পরিণত করে রেখেছিল।

৭৪. অর্থাৎ একটি পারিশ্রমিক দেয়া হবে সাইয়েদিনা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি ইতিপূর্বে যে ঈমান রাখতো সেজন্য এবং দ্বিতীয় পারিশ্রমিকটি দেয়া হবে এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনার জন্য। একথাটিই একটি হাদীসে ব্যক্ত করা হয়েছে। হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

ثلثه لهم اجران ، رجل من اهل الكتاب امن بنبيه و امن بمحمد....

"তিন ব্যক্তি দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে। তাদের একজন হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে আহ্‌লি কিতাবের আন্তরভুক্ত ছিল এবং নিজের নবীর প্রতি ঈমান রাখতো, তারপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিও ঈমান আনে।"

৭৫. অর্থাৎ তাদের এ দ্বিগুণ প্রতিদান লাভ করার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা জাতীয়, বংশীয়, দলীয় ও স্বদেশের স্বার্থপ্রীতি মুক্ত থেকে সত্য দীনের ওপর অবিচল ছিল এবং নতুন নবীর আগমনে যে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাতে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, আসলে তারা ঈসা পূজারী নয় বরং আল্লাহ পূজারী ছিল। তারা ব্যক্তি ঈসার ভক্ত–অনুরক্ত ছিল না বরং ছিল "ইসলামের" আনুগত্যকারী। একারণে ঈসার পর যখন অন্য নবী ঈসার মত সেই একই ইসলাম নিয়ে এলেন তখন তারা দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁর নেতৃত্বে ইসলামের পথ অবলম্বন করলো এবং যারা খৃষ্টবাদের ওপর অবিচল ছিল তাদের পথ পরিহার করলো।

৭৬. অর্থাৎ তারা মন্দের জবাব মন্দ দিয়ে নয় বরং ভালো দিয়ে দেয়। মিথ্যার মোকাবিলায় মিথ্যা নয় বরং সত্য নিয়ে আসে। জুলুমকে জুলুম দিয়ে নয় বরং ইনসাফ দিয়ে প্রতিরোধ করে। দুষ্টামির মুখোমুখি দুষ্টামির সাহায্যে নয় বরং ভদ্রতার সাহায্যে হয়।

৭৭. অর্থাৎ তারা সত্যের পথে সম্পদ উৎসর্গও করে। সম্ভবত এখানে এদিকেও ইংগিত করা হয়েছে যে, তারা নিছক সত্যের সন্ধানে হাবৃশা থেকে সফর করে মক্কায় এসেছিল। এ পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ের পেছনে তাদের কোন বৈষয়িক লাভের উদ্দেশ্য ছিল না। তারা যখন শুনলো মক্কায় এক ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করেছেন তখন তারা নিজেরা সশরীরে এসে অনুসন্ধান চালানো জরুরী মনে করলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, এভাবে অনুসন্ধানের পর যদি প্রমাণিত হয় তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত একজন সত্য নবী, তাহলে তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর থেকে পথ-নির্দেশনা লাভ করা থেকে বঞ্চিত থাকবে না।

৭৮. আবু জেহেল ও তার সাথীরা হাবৃশার খৃষ্টান প্রতিনিধিদলের সাথে যেসব আজে বাজে কথা বলেছিল সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। উপরে ৭২ টীকায় এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

৭৯. আলোচনার প্রেক্ষাপট থেকে একথা প্রকাশিত হয় যে, হাবৃশার খৃষ্টানদের ঈমান ও ইসলামের কথা উল্লেখ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে একথা বলা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিল আসলে মক্কার কাফেরদেরকে লজ্জা দেয়া। বক্তব্য ছিল ঃ অভাগার দল! তোমরা নিজেদের কপাল কিভাবে পুড়াচ্ছ তা ভেবে দেখো। অন্যেরা কোথায় কোন্ দূরদেশ থেকে এসে এ নিয়ামতের কল্যাণ লাভে ধন্য হচ্ছে আর তোমরা তোমাদের নিজেদের গৃহ অভ্যন্তরে এই যে কল্যাণের স্রোতধারা প্রবাহিত হচ্ছে এ থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছো। কিন্তু কথাটা এভাবে বলা হয়েছে ঃ হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তুমি চাচ্ছো তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, তোমার ভাই-বন্ধু, বান্ধবরা, তোমার আত্মীয়-স্বজনরা এই আবেহায়াতের সঞ্জীবনী ধারায় লাভবান হোক কিন্তু তুমি চাইলে কি হবে, হিদায়াত তো আল্লাহর হাতে, যেসব লোকের মধ্যে তিনি এ হিদায়াত গ্রহণ করার আগ্রহ দেখতে পান তাদেরকেই এ কল্যাণ ধারায় অবগাহন করান। তোমার আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে যদি এই আগ্রহ না দেখা যায় তাহলে এ কল্যাণ তাদের ভাগ্যে কেমন করে জুটতে পারে।

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা অনুসারে এ আয়াতটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবু তালেবের প্রসংগে নাযিল হয়। তাঁর শেষ সময় উপস্থিত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সামর্থ মোতাবেক কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর প্রতি তাঁর ঈমান আনাবার জন্য চূড়ান্ত চেষ্টা চালান। তিনি চাচ্ছিলেন তাঁর চাচা ঈমানের মধ্য দিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করুন। কিন্তু চাচা তা গ্রহণ না করে আবদুল মুত্তালিবের অনুসৃত ধর্মের মধ্যে অবস্থান করে জীবন দেয়াকে অগ্রাধিকার দেন। এ ঘটনায় আল্লাহ বলেন, انك لا تهدى من احببت "তুমি যাকে ভালোবাসো তাকে হিদায়াত করতে পারো না।" কিন্তু মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরগণের পরিচিত পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, একটি আয়াত নবীর জামানায় যে বিশেষ ঘটনা বা ব্যাপারের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয় তাকে তাঁরা আয়াতটির শানে নুযুল বা নাযিল হওয়ার উপলক্ষ ও কার্যকারণ হিসেবে বর্ণনা করেন। তাই এ হাদীসটি এবং এ বিষয়বস্তু সম্বলিত তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদ ইত্যাদিতে আবু হুরাইরাহ (রা), ইবনে আব্বাস (রা) ইবনে উমর (রা), প্রমুখ সাহাবীগণ বর্ণিত অন্যান্য হাদীসগুলো থেকে অনিবার্যভাবে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় না যে, সূরা আল

وَقَالُوْٓا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا ۭ اَوَلَمْ نُمَكِّنْ
لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍۢ بَطِرَتْ
مَعِيْشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا ۭ
وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٥٨﴾

তারা বলে, "যদি আমরা তোমার সাথে এ হেদায়াতের অনুসরণ করি তাহলে নিজেদের দেশ থেকে আমাদেরকে উৎখাত করে দেয়া হবে।"[৮০]

এটা কি সত্য নয়, একটি নিরাপদ হারমকে আমি তাদের জন্য অবস্থান স্থলে পরিণত করেছি, যেদিকে সব ধরনের ফলমূল চলে আসে আমার পক্ষ থেকে রিযিক হিসেবে? কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।[৮১]

আর এমন কত জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি যেখানকার লোকেরা তাদের সম্পদ-সম্পত্তির দম্ভ করতো। কাজেই দেখে নাও, ঐসব তাদের ঘরবাড়ি পড়ে আছে, যেগুলোর মধ্যে তাদের পরে কদাচিত কেউ বসবাস করেছে, শেষ পর্যন্ত আমিই হয়েছি উত্তরাধিকারী।[৮২]

কাসাসের এ আয়াতটি আবু তালেবের ইন্তেকালের সময় নাযিল হয়েছিল। বরং এ থেকে শুধুমাত্র এতটুকু জানা যায় যে, এ আয়াতের বিষয়বস্তুর সত্যতা ও বাস্তবতা এ ঘটনার সময়ই সবচেয়ে বেশী প্রকাশিত হয়। যদিও আল্লাহর প্রত্যেকটি বান্দাকে সঠিক পথে নিয়ে আসা ছিল নবী করীমের (সা) আন্তরিক ইচ্ছা, তথাপি কোন ব্যক্তির কুফরীর উপর মৃত্যু বরণ করা যদি তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশী কষ্টকর হতো এবং ব্যক্তিগত ভালোবাসা ও সম্পর্কের ভিত্তিতে যদি কোন ব্যক্তির হিদায়াত লাভ করার তিনি সবচেয়ে বেশী আগ্রহ ও আকাংখা পোষণ করতেন তাহলে তিনি ছিলেন আবু তালেব। কিন্তু তাঁকেই হিদায়াত দান করার শক্তি যখন তিনি লাভ করলেন না তখন একথা একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, কাউকে হিদায়াত দান করা এবং কাউকে তা থেকে বঞ্চিত করা নবীর কাজ নয়। এ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে। আর আল্লাহর কাছ থেকে এ সম্পদটি কোন আত্মীয়তা ও পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নয় বরং মানুষের সত্যানুরাগ, সত্যপ্রীতি ও সত্যাগ্রহী মানসিকতার ভিত্তিতেই দান করা হয়।

৮০. কুরাইশ বংশীয় কাফেররা ইসলাম গ্রহণ না করার ওজুহাত হিসেবে একথাটি বলতো। গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে জানা যাবে, এটিই ছিল তাদের কুফরীর সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কারণ। একথাটি যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হলে আমাদের দেখতে হবে ঐতিহাসিকভাবে সেসময় কুরাইশদের কি মর্যাদা ছিল, যার ওপর আঘাত আসার আশংকা ছিল।

শুরুতে আরবে যে জিনিসটির জন্য কুরাইশ গোষ্ঠী গুরুত্ব লাভ করে, সেটি হচ্ছে তাদের হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশধর হওয়ার বিষয়টি আরবীয় বংশধারার দিক দিয়ে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত ছিল। এ কারণে তাদের বংশটি ছিল আরবদের দৃষ্টিতে পীরজাদার বংশ। তারপর যখন কুসাই ইবনে কিলাবের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার কারণে তারা কাবা গৃহের মুতাওয়াল্লী ও পরিচালকে পরিণত হলো এবং মক্কায় তাদের আবাস গড়ে উঠলো তখন তাদের গুরুত্ব আগের চেয়ে অনেক বেশী বেড়ে গেলো। কারণ এখন তারা ছিল আরবের সবচেয়ে বড় তীর্থ স্থানের পরিচালক। আরবের সকল গোত্রের মধ্যে তারা ধর্মীয় পুরোহিতের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর হজ্জের কারণে আরবের এমন কোন গোত্র ছিল না যারা তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতো না। এ কেন্দ্রীয় মর্যাদাকে পুঁজি করে কুরাইশরা ক্রমান্বয়ে ব্যবসায়িক উন্নতি লাভ করতে থাকে। সৌভাগ্যক্রমে রোম ও ইরানের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব তাদেরকে আন্তরজাতিক বাণিজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দান করে। সেসময় রোম, গ্রীস, মিসর ও সিরিয়ার যত প্রকার বাণিজ্য চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার সাথে চলতো তার সমস্ত পথই ইরান বন্ধ করে দিয়েছিল। লোহিত সাগরের পথটিই ছিল সর্বশেষ পথ। একমাত্র এ পথটিই খোলা ছিল। পরে ইরান যখন ইয়ামন দখল করে নিল, তখন সে এ পথটিও বন্ধ করে দিল। এখন আরব বণিকরা একদিকে রোম অধিকৃত এলাকার পণ্য সম্ভার আরব সাগর ও পারস্য উপসাগরের বন্দরসমূহে পৌঁছিয়ে দিতে লাগলো এবং অন্যদিকে একই বন্দরসমূহ থেকে পূর্বদেশীয় বাণিজ্যপণ্য নিয়ে রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছাতে থাকলো। এছাড়া এ বাণিজ্যটি চালু রাখার আর কোন পথ খোলা ছিল না। এ অবস্থার ফলে মক্কা আন্তরজাতিক বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হলো। এ সময় কুরাইশরাই বলতে গেলে এ ব্যবসায়ের ইজারাদারী লাভ করে বসেছিল। কিন্তু যেসব উপজাতীয় এলাকার মধ্য দিয়ে এ বাণিজ্য পথগুলো গিয়েছিল তাদের সাথে আরবদের গভীর বন্ধুত্ব সম্পর্ক ছাড়া আরবের রাজনৈতিক অরাজকতার পরিবেশে এ ব্যবসায়িক আদান প্রদান সম্ভবপর ছিল না। এ উদ্দেশ্যে কুরাইশ সরদাররা শুধুমাত্র নিজেদের ধর্মীয় প্রভাবের ওপর নির্ভর করতে পারতো না। এজন্য তারা সকল উপজাতির সাথে সন্ধিচুক্তি সাক্ষর করে রেখেছিল। ব্যবসায়িক মুনাফায়ও তাদেরকে অংশীদার করতো। উপজাতীয় শেখ ও প্রভাবশালী সদারদেরকে মূল্যবান তোহ্ফা দিয়েও তুষ্ট করতো। এই সংগে পাতা ছিল সূদী ব্যবসায়ের জাল। এতে জড়িয়ে পড়েছিল প্রায় সকল প্রতিবেশী উপজাতীয় ব্যবসায়ী ও সরদারবৃন্দ।

এ অবস্থায় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদের দাওয়াত সম্প্রসারিত হতে লাগলো তখন বাপ-দাদার ধর্মের প্রতি অন্ধপ্রীতির চাইতে বড় হয়ে যে জিনিসটি কুরাইশদেরকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে ওঠার কারণ হয়ে দেখা দিল সেটি ছিল এই যে, এ দাওয়াতের ফলে তারা নিজেদের স্বার্থহানির আশংকা করছিল। তারা মনে করছিল, যুক্তিপূর্ণ দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে শিরক ও মূর্তিপূজা মিথ্যা এবং তাওহীদ সঠিক প্রমাণিত হয়ে গেলেও তো তাকে পরিত্যাগ করে একে গ্রহণ করে নেয়া আমাদের জন্য ধ্বংসকর হবে। এমনটি করার সাথে সাথেই সমগ্র আরবের অধিবাসীরা আমাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে

ফেটে পড়বে। কাবাগৃহের পরিচালনার দায়িত্ব থেকে আমাদের সরিয়ে দেবে। সন্ধি চুক্তির ফলে মূর্তিপূজক উপজাতিগুলোর সাথে আমাদের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, যার ভিত্তিতে আমাদের বাণিজ্য কাফেলা দিনরাত আরবের বিভিন্ন অংশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা সবই ছিন্ন হয়ে যাবে। এভাবে এ দীনটি আমাদের ধর্মীয় প্রভাব–প্রতিপত্তি এবং এই সাথে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিরও অবসান ঘটাবে। বরং বিচিত্র নয় যে, আরবের সমস্ত উপজাতি মিলে আমাদের মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য করবে।

এখানে এসে দুনিয়া পূজারীদের প্রজ্ঞা ও অন্তরদৃষ্টির অভাবের এক বিস্ময়কর চিত্র মানুষের সামনে ফুটে ওঠে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার তাদেরকে এ নিশ্চয়তা দান করছিলেন যে, তোমাদের সামনে আমি যে কালেমা পেশ করছি তা মেনে নাও, আরব ও আজম তোমাদের পদানত হয়ে যাবে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সা'দ, ভূমিকা ঃ ঐতিহাসিক পটভূমি) কিন্তু তারা এর মধ্যে নিজেদের মৃত্যু দেখছিল। তারা মনে করছিল, আমরা আজ যে সম্পদ ও প্রভাব–প্রতিপত্তি লাভ করেছি এও খতম হয়ে যাবে। তারা আশংকা করছিল, এ কালেমা গ্রহণ করার সাথে সাথেই আমরা এ সরযমীনে এমনই বন্ধু–বান্ধব ও সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়বো যে, চিল–কাকেরা আমাদের গায়ের গোশ্‌ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টির কারণে তারা এ দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিল না যে, মাত্র কয়েক বছর পরেই সমগ্র আরব ভূখণ্ড মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার আওতাভুক্ত হতে যাচ্ছিল। তারপর এ একই প্রজন্মের জীবনকালেই ইরান, ইরাক, সিরিয়া, মিসর সব দেশই এক এক করে এ রাষ্ট্র ব্যবস্থার আওতাধীন হতে চলছিল। আর এ উক্তির পরে এক শতক অতিক্রান্ত হবার আগেই কুরাইশ বংশীয় খলিফাগণই সিন্ধু থেকে স্পেন এবং কাফ্‌কাজ থেকে ইয়ামনের উপকূলীয় এলাকা পর্যন্ত দুনিয়ার একটি বৃহত্তম অংশের শাসন পরিচালনা করতে যাচ্ছিল।

৮১. এটি হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের আপত্তির প্রথম জবাব। এর অর্থ হচ্ছে, যে হারমের শান্তি ও নিরাপত্তা এবং কেন্দ্রীয় গুরুত্বের বদৌলতে আজ তোমরা এমন যোগ্যতার অধিকারী হয়েছো, যার ফলে সারা দুনিয়ার বাণিজ্যপণ্যের স্রোত এহেন অনুর্বর ধূলিবিবর্ণ উপত্যকায় চলে আসছে, তার এই নিরাপদ ও কেন্দ্রীয় মর্যাদা কি তোমাদের কোন কৌশল অবলম্বনের ফলে অর্জিত হয়েছে? আড়াই হাজার বছর আগে আল্লাহর এক বান্দা জনশূন্য পাহাড়ের মাঝখানে এ পানি ও বৃক্ষলতাহীন উপত্যকায় তাঁর স্ত্রী ও দুধের বাচ্চাকে নিয়ে এখানে আসেন। তিনি এখানে পাথর ও কাদা দিয়ে একটি কক্ষ নির্মাণ করেন এবং ডাক দিয়ে বলেন, আল্লাহ একে হারমে পরিণত করেছেন, এসো এ ঘরের দিকে এবং একে প্রদক্ষিণ করো। এখন ২৫ শত বছর থেকে এ জায়গাটি আরবের কেন্দ্র হয়ে রয়েছে, মারাত্মক ধরনের নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশে দেশের এ একটিমাত্র স্থানে নিরাপত্তা লাভ করা যায়, আরবের আবালবৃদ্ধবণিতা একে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে এবং প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ একে প্রদক্ষিন করার জন্য চলে আসে। এসব আল্লাহ প্রদত্ত বরকত ও সমৃদ্ধি নয়তো আর কি হতে পারে? এ নিয়ামত লাভের ফলেই তো তোমরা আরবের সরদার হয়ে গেছো এবং বিশ্ব বাণিজ্যের একটি বড় অংশ তোমাদের করতলগত হয়েছে। এখন কি তোমরা মনে করো, যে আল্লাহ তোমাদেরকে এ নিয়ামত দান করেছেন তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তোমরা সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠবে আর তাঁর দীনের অনুগত হয়ে চললেই ধ্বংস হয়ে যাবে?

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا
يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى الْقُرٰٓى اِلَّا وَاَهْلُهَا
ظٰلِمُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ
وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٠﴾

আর তোমার রব জনপদগুলো ধ্বংস করেন না যতক্ষণ না তাদের কেন্দ্রে একজন রসূল পাঠান, যে তাদের কাছে আমার আয়াত শুনায়। আর আমি জনপদগুলো ধ্বংস করি না যতক্ষণ না সেগুলোর বাসিন্দারা জালেম হয়ে যায়।৮৩

তোমাদের যা কিছুই দেয়া হয়েছে তা নিছক দুনিয়ার জীবনের সাজ-সরঞ্জাম এবং তার সৌন্দর্য-শোভা আর যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে তা হচ্ছে তার চেয়ে ভালো এবং অধিকতর স্থায়ী। তোমরা কি বিবেচনা করবে না?

৮২. এটি তাদের আপত্তির দ্বিতীয় জবাব। এর অর্থ হচ্ছে, যে ধনদৌলত ও সমৃদ্ধির জন্য তোমরা অহংকারী হয়ে উঠেছো এবং যার বিলুপ্ত হয়ে যাবার আশংকায় বাতিলের উপরে টিকে থাকতে ও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছো সেই জিনিসই এক সময় আদ, সামূদ, সাবা, মাদ্‌য়ান ও লূতের জাতির লোকদেরকে দেয়া হয়েছিল। এ জিনিস কি তাদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পেরেছিল? মোট কথা জীবন যাপনের উন্নত মানই তো একমাত্র কাম্যবস্তু নয়, যে মানুষ সত্য-মিথ্যার পরোয়া না করে শুধুমাত্র তারই পেছনে পড়ে থাকবে এবং এ সঠিক পথ অবলম্বন করলে এ ইপ্সিত মুক্তোখণ্ডটি হস্তচ্যুত হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে বলেই তা অবলম্বন করতে অস্বীকার করবে। যেসব অসৎ ও ভ্রষ্টতামূলক কাজ অতীতের সমৃদ্ধিশালী জাতিগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে তার ওপর টিকে থাকার প্রচেষ্টা চালিয়ে তোমরা রক্ষা পেয়ে যাবে এবং তাদের মতো তোমাদের ওপর কখনো ধ্বংস নেমে আসবে না এর কোন গ্যারান্টি কি তোমাদের কাছে আছে?

৮৩. এটি হচ্ছে তাদের আপত্তির তৃতীয় জবাব। পূর্বে যেসব জাতি ধ্বংস হয়েছিল তাদের লোকেরা জালেম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করার পূর্বে নিজের রসূল পাঠিয়ে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। রসূলদের সতর্ক করে দেবার পরও যখন তারা বাঁকা পথে চলা থেকে বিরত হয়নি তখন তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তোমরা এখন এ একই অবস্থায় পতিত হয়েছো। তোমরাও জালেম হয়ে গেছো। একজন রসূল তোমাদেরকেও সতর্ক করার জন্য এসেছেন। এখন তোমরা কুফরী ও অস্বীকারের নীতি অবলম্বন করে নিজেদের আয়েশ-আরাম ও সমৃদ্ধিকে রক্ষা করতে পারবে না বরং উল্টা বিপদের মুখে ঠেলে দেবে। যে ধ্বংসের আশংকা তোমরা করছো তা ঈমান আনার জন্য নয় বরং অস্বীকার করার কারণে তোমাদের ওপর আপতিত হবে।

أَفَمَن وَعَدْنَٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَٰقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَٰهُ مَتَٰعَ الْحَيَوٰةِ
الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ
فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾

৭ রুকূ'

আচ্ছা, যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং সে তা পেতে যাচ্ছে, সে ব্যক্তি কি কখনো এমন ব্যক্তির মতো হতে পারে, যাকে আমি কেবলমাত্র দুনিয়ার জীবনের সাজ-সরঞ্জাম দিয়েছি এবং তারপর কিয়ামতের দিনের শাস্তির জন্য তাকে হাজির করা হবে ?[৮৪]

আর (তারা যেন ভুলে না যায়) সে দিনটি যখন তিনি তাদেরকে ডাকবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, "কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা আমার শরীক বলে মনে করতে ?"[৮৫]

৮৪. এটা হচ্ছে তাদের আপত্তির চতুর্থ জবাব। এর জবাবটি বুঝতে হলে প্রথমে দু'টি কথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে ঃ

এক ঃ দুনিয়ার বর্তমান জীবন। এর সময়কাল কারো জন্যই কতকগুলো বছরের বেশী হয় না। এটি নিছক একটি সফরের সাময়িক পর্যায় মাত্র। আসল জীবনটি হবে চিরস্থায়ী। সেটি সামনের দিকে আসছে। বর্তমান সাময়িক জীবনে মানুষ যতই সহায়-সম্পদ জমা করুক না কেন এবং কয়েক বছরের এ জীবনে যতই আয়েশ আরাম করুক, এ জীবন একদিন শেষ হয়ে যাবেই এবং এখানকার সমস্ত বিত্ত-বৈভব সবকিছুই এখানে রেখেই তাকে চলে যেতে হবে। এ সংক্ষিপ্ত জীবনকালের আয়েশ আরামের বিনিময়ে যদি মানুষকে আগামীর অন্তহীন জীবনে চিরকালীন দুরবস্থা ও বিপদের মধ্যে কাটাতে হয়, তাহলে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ ক্ষতির সওদা করতে পারে না। এর মোকাবিলায় একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এখানে কয়েক বছর বিপদ আপদের মধ্যে জীবন কাটিয়ে দেয়াকে প্রাধান্য দেবে। সে এর মাধ্যমে এমন সব কল্যাণ ও নেকী উপার্জন করতে চাইল, যা পরবর্তী অন্তহীন জীবনে তার চিরকালীন আয়েশ আরামের কারণ হবে।

দুই ঃ আল্লাহর দীন মানুষের কাছে দাবী করে না যে, সে এ দুনিয়ার জীবনোপকরণ থেকে লাভবান হতে পারবে না এবং এখানকার রূপ সৌন্দর্য অযথা পদদলিত করে তাকে এগিয়ে যেতে হবে। তার দাবী শুধু এতটুকু যে, এ দুনিয়ার জীবনের ওপর তাকে আখেরাতকে প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ দুনিয়া ধ্বংসশীল এবং আখেরাত চিরস্থায়ী। দুনিয়ার ভোগ-তৃপ্তি নিম্ন পর্যায়ের। পক্ষান্তরে আখেরাতের ভোগ-তৃপ্তি উচ্চ ও উন্নত পর্যায়ের। তাই মানুষকে দুনিয়ার এমন সম্পদ ও সৌন্দর্য করায়ত্ত করতে হবে যা আখেরাতের চিরন্তন জীবনে তাকে সফলকাম করবে অথবা কমপক্ষে সেখানকার চিরন্তন ক্ষতির সাগরে তাকে

قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ۚ
اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ﴿٦٣﴾
وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا
الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿٦٤﴾

এ উক্তি যাদের ওপর প্রযোজ্য হবে[৮৬] তারা বলবে "হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই এ লোকদেরকেই আমরা গোমরাহ করেছিলাম। এদেরকে ঠিক সেভাবেই গোমরাহ করেছিলাম যেভাবে আমরা নিজেরা গোমরাহ হয়েছিলাম। আমরা আপনার সামনে দায় মুক্তির কথা প্রকাশ করছি।[৮৭] এরা তো আমাদের বন্দেগী করতো না।[৮৮] তারপর তাদেরকে বলা হবে, এবার তোমরা যাদেরকে শরীক বানিয়েছিলে তাদেরকে ডাকো।[৮৯] এরা তাদেরকে ডাকবে কিন্তু তারা এদের কোন জবাব দেবে না এবং এরা আযাব দেখে নেবে। হায়! এরা যদি হিদায়াত গ্রহণকারী হতো!

ভাসিয়ে দেবে না। কিন্তু যেখানে মোকাবিলার ব্যাপার এসে যায় অর্থাৎ দুনিয়ার সাফল্য ও আখেরাতের সাফল্য পরস্পর বিরোধী হয়ে দাঁড়ায় সেখানে মানুষের কাছে সত্য দীনের দাবী এবং ভারসাম্যপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তির দাবীও এটিই যে, মানুষ দুনিয়াকে আখেরাতের জন্য উৎসর্গ করে দিক এবং এ দুনিয়ার সাময়িক সম্পদ সৌন্দর্যের জন্য সে কখনো এমন পথ অবলম্বন না করুক যার ফলে তার পরকাল চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে যায়।

এ দু'টি কথা সামনে রেখে দেখুন উপরের বাক্যগুলোতে আল্লাহ মক্কার কাফেরদেরকে কি বলছেন। তিনি একথা বলছেন না যে, তোমরা নিজেদের ব্যবসায় গুটিয়ে নাও, কারবার খতম করে দাও এবং আমার নবীকে মেনে নিয়ে ফকির দরবেশ হয়ে যাও। বরং তিনি বলছেন, দুনিয়ার যে ধন সম্পদের জন্য তোমরা পাগল পারা তা অতি সামান্য সম্পদ এবং দুনিয়ার জীবনে মাত্র সামান্য ক'দিনের জন্য তোমরা তা থেকে লাভবান হতে পারো। অন্য দিকে আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে তা এর তুলনায় গুণগত ও পরিমাণগত (Quality and Quantity) দিক দিয়েও ভালো এবং চিরন্তন স্থায়ীত্বের অধিকারী। তাই যদি তোমরা এ সাময়িক জীবনের সীমাবদ্ধ নিয়ামত দ্বারা লাভবান হবার উদ্দেশ্যে এমন নীতি অবলম্বন করো যার ফল আখেরাতে চিরন্তন ক্ষতির আকারে ভোগ করতে হয়, তাহলে এর চেয়ে বড় বোকামি আর কী হতে পারে? এক ব্যক্তি কঠোর পরিশ্রম করে নিজের রবের খিদমত করে এবং তারপর চিরকালের জন্য তাঁর পুরস্কার লাভ করে ধন্য হয়। আর এক ব্যক্তি গ্রেফতার হয়ে আল্লাহর আদালতে অপরাধী হিসেবে আনীত হয় এবং গ্রেফতারীর পূর্বে সে নিছক কয়েকদিন হারাম সম্পদের মজা লুটবার সুযোগ পায়। এ দু'জনের মধ্যে কে সফলকাম হলো? তোমরা নিজেরাই তুলনা করে দেখে নাও।

৮৫. এ ভাষণটিও চতুর্থ জবাবের সাথেই সংশ্লিষ্ট। উপরের আয়াতের শেষ অংশের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। তাতে বলা হচ্ছে, নিছক নিজেদের পার্থিব স্বার্থের খাতিরে শিরক, মূর্তিপূজা ও নবুওয়াত অস্বীকারের যে গোমরাহীর ওপর তারা জোর দিচ্ছে, তার জন্য আখেরাতের চিরন্তন জীবনে তাদের কেমন অশুভ পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে। যে অনুভূতি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এ কথা বলা হয়েছে তাহচ্ছে এই যে, মনে করো, দুনিয়ায় তোমাদের কোন বিপদের সম্মুখীন হতে না হলেও এবং এখানকার সংক্ষিপ্ত জীবনকালে তোমরা দুনিয়ার জীবনের সম্পদ ও সৌন্দর্য খুব বেশী উপভোগ করলেও যদি আখেরাতে এর পরিণাম খারাপ হওয়াই নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাহলে নিজেই ভেবে দেখো তোমরা যা কিছু করছো তা লাভজনক ব্যবসায় না পুরোপুরি ক্ষতির ব্যবসায়?

৮৬. এখানে জিন ও মানব জাতির শয়তানদের কথা বলা হয়েছে, যাদেরকে দুনিয়ায় আল্লাহর সাথে শরীক করা হয়েছিল, যাদের কথার মোকাবিলায় আল্লাহ ও রসূলের কথা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং যাদের ওপর ভরসা করে সরল সঠিক পথ পরিত্যাগ করে জীবনের ভুল পথ অবলম্বন করা হয়েছিল। এ ধরনের লোকদেরকে কেউ ইলাহ ও রব বলুক বা না বলুক মোট কথা যখন তাদের আনুগত্য এমনভাবে করা হয়েছে যেমন আল্লাহর আনুগত্য হওয়া উচিত। তখন অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে শরীক করা হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল কাহ্‌ফ ৫০ টীকা)

৮৭. আমরা জোর করে এদেরকে গোমরাহ করিনি। আমরা এদের দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি ছিনিয়ে নিইনি। এদের চিন্তা ও অনুধাবন শক্তিও কেড়ে নিইনি এবং এমন অবস্থারও সৃষ্টি করিনি যে, এরা সঠিক পথের দিকে যেতে চাচ্ছিল কিন্তু আমরা হাত ধরে টেনে জোর করে ভুল পথে নিয়ে গিয়েছিলাম। বরং আমরা যেমন স্বেচ্ছায় ভুল পথ অবলম্বন করেছিলাম, তেমনি এদের সামনেও আমরা ভুল পথ পেশ করেছিলাম এবং এরা স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ করেছিল। কাজেই আমরা এদের দায়িত্ব গ্রহণ করছি না। আমরা নিজেদের কাজের জন্য দায়ী এবং এরা এদের নিজেদের কাজের জন্য দায়ী।

এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় প্রণিধানযোগ্য। সেটি হচ্ছে আল্লাহ যদিও প্রশ্ন করবেন যারা শরীক করতো তাদেরকে। কিন্তু তারা কিছু বলার আগেই জবাব দিতে আরম্ভ করবে তাদের সেই উপাসিতরা যাদেরকে শরীক করা হয়েছিল। এর কারণ হচ্ছে, যখন সাধারণ মুশরিকদেরকে এ প্রশ্ন করা হবে তখন তাদের নেতৃবর্গ অনুভব করবে, এবার আমাদের সর্বনাশের পালা এসে গেছে এবং আমাদের সাবেক অনুসারীরা নিশ্চয়ই এবার বলতে শুরু করবে এরাই আমাদের পথভ্রষ্টতার জন্য মূলত দায়ী। তাই অনুসারীদের বলার আগেই তারা নিজেরাই এগিয়ে গিয়ে নিজেদের সাফাই পেশ করতে থাকবে।

৮৮. অর্থাৎ এরা আমাদের নয় বরং এদের নিজেদেরই প্রবৃত্তির গোলাম হয়ে গিয়েছিল।

৮৯. অর্থাৎ তাদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকো, দুনিয়ায় তোমরা তাদের প্রতি নির্ভর করে আমার কথা রদ করে দিয়েছিলে। এখন এখানে তাদেরকে আসতে, তোমাদের সাহায্য করতে বলো এবং তোমাদেরকে আযাব থেকে বাঁচাতে বলো।

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ
الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ
مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾

আর তারা (যেন না ভুলে যায়) সেদিনের কথা যেদিন তিনি ডাকবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, "যে রসূল পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে তোমরা কি জবাব দিয়েছিলে?" সেদিন তাদের কোন জবাব থাকবে না, তারা নিজেদের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না। তবে যে ব্যক্তি আজ তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে সে-ই সাফল্যলাভের আশা করতে পারে।

তোমার রব যা চান সৃষ্টি করেন এবং (তিনি নিজেই নিজের কাজের জন্য যাকে চান) নির্বাচিত করে নেন। এ নির্বাচন তাদের কাজ নয়।[৯০] আল্লাহ পবিত্র এবং তারা যে শিরক করে তার অনেক উর্ধে। তোমার রব জানেন যা কিছু তারা মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখে এবং যা কিছু তারা প্রকাশ করে।[৯১]

৯০. আসলে শিরককে খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে এ উক্তি করা হয়েছে। মুশরিকরা আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টিকে তাদের উপাস্যে পরিণত করেছে। নিজেদের পক্ষ থেকে তাদেরকে বিভিন্ন মর্যাদা, পদ ও গুণাবলী দান করেছে। এর প্রতিবাদ করে আল্লাহ বলছেন, আমার সৃষ্ট মানুষ, ফেরেশতা, জিন ও অন্যান্য বান্দাদের মধ্য থেকে আমি নিজেই যাকে যেমন চেয়েছি গুণাবলী, যোগ্যতা ও শক্তি দান করেছি এবং যার মাধ্যমে যে কাজ নিতে চাই নিয়ে থাকি। কাজেই আমার বান্দাদের মধ্য থেকে কাউকে নিজেদের ইচ্ছামতো বিপদ থেকে উদ্ধারকারী, অন্নদাতা ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী ইত্যাদি মনে করার অধিকার মুশরিকরা কেমন করে ও কোথা থেকে লাভ করলো? কিভাবে তারা যাকে ইচ্ছা তাকে বৃষ্টি বর্ষণ, রুজি-রোজগার ও সন্তান দান এবং রোগ ও রোগ নিরাময় করার ক্ষমতা অর্পণ করে? কেমন করে তারা যাকে ইচ্ছা তাকে আমার সার্বভৌম কর্তৃত্বাধীন এলাকার একটি অংশের শাসনকর্তা নিয়োগ করে? আমার ক্ষমতার মধ্য থেকে যা কিছু যাকে চায় তাকে তারা কেমন করে সোপর্দ করে। কেউ ফেরেশতা, জিন, নবী বা অলী যাই কিছু থাক আমার সৃষ্টির কারণেই আছে। যে গুণাবলীই যে কেউ লাভ করেছে তা আমারই দান। যাকে আমি যে কাজে লাগাতে চেয়েছি লাগিয়ে দিয়েছি। তাদেরকে বিভিন্ন কাজের জন্য এভাবে নির্বাচিত করার এ অর্থ কেমন করে হয়ে গেলো যে, এ বান্দাদেরকে বন্দেগীর স্থান থেকে

وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۖ وَلَهُ الْحُكْمُ
وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٧٠﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا
اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ﴿٧١﴾
قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٧٢﴾
وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا
مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾

তিনিই এক আল্লাহ যিনি ছাড়া ইবাদাতের আর কোন হকদার নেই। তাঁরই জন্য প্রশংসা দুনিয়ায়ও, আখেরাতেও। শাসন কর্তৃত্ব তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে। হে নবী! তাদেরকে বলো, তোমরা কি কখনো চিন্তা করেছো, আল্লাহ যদি কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের ওপর চিরকালের জন্য রাত্রিকে অব্যাহত রাখেন, তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোন্ মাবুদ আছে তোমাদের আলো এনে দেবে? তোমরা কি শুনছো না? তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, আল্লাহ যদি কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের ওপর চিরকালের জন্য দিবস অব্যাহত রাখেন তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোন্ মাবুদ আছে তোমাদের রাত্রি এনে দেবে, যাতে তোমরা তার মধ্যে বিশ্রাম করতে পারো? তোমরা কি ভেবে দেখছো না? এটা ছিল তাঁরই অনুগ্রহ, তিনি তোমাদের জন্য তৈরী করেছেন রাত ও দিন, যাতে তোমরা (রাতে) শান্তি এবং (দিনে) নিজের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো, হয়তো তোমরা শোকরগুজার হবে।

উঠিয়ে খোদায়ীর মর্যাদায় অভিসিক্ত করতে হবে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের সামনে আনুগত্যের শির নত করে দিতে হবে, তাদেরকে সাহায্য দান করার জন্য ডাকতে হবে, অভাব পূরণ করার জন্য তাদের কাছে আবেদন জানাতে হবে, তাদেরকে ভাগ্য ভাঙাগড়ার মালিক এবং আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের গুণাবলী ও ক্ষমতার অধিকারী আখ্যায়িত করতে হবে?

৯১. চলমান ভাষণের মধ্যে যে উদ্দেশ্যে একথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, কোন ব্যক্তি বা দল দুনিয়ার মানুষের সামনে এ দাবী করতে পারে যে, সে যে গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েছে

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾
وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا
أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾

(তারা যেন স্মরণ রাখে) সেদিনের কথা যখন তিনি তাদেরকে ডাকবেন, তারপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, "কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করতে? আর আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন সাক্ষী বের করে আনবো[৯২] তারপর বলবো।" আনো এবার তোমাদের প্রমাণগুলো।"[৯৩] সেসময় তারা জানবে, সত্য রয়েছে আল্লাহর কাছে এবং তারা যা কিছু মিথ্যা বানিয়ে রেখেছিল তা সবই উধাও হয়ে যাবে।

বলে মনে করা হয়। তার ভ্রান্তিহীনতার ব্যাপারে অত্যন্ত যুক্তিসংগত কারণে সে নিশ্চিন্ত এবং তার বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে সে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। আর এ গোমরাহীকে সে কোন অসৎ উদ্দেশ্যে নয় বরং পুরোপুরি সৎ উদ্দেশ্যে অবলম্বন করেছে এবং তার সামনে কখনো এমন কোন জিনিস আসেনি যার সাহায্যে তার ভুল তার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু আল্লাহর সামনে তার এ দাবী চলতে পারে না। তিনি কেবল বাইরেরটা দেখেন না। তাঁর সামনে তো মানুষের মন ও মস্তিষ্কের এক একটি অংশ উন্মুক্ত হয়ে আছে। তিনি তার জ্ঞান, অনুভূতি, আবেগ, আকাংখা, সংকল্প, বিবেক তথা প্রত্যেকটি জিনিস সরাসরি জানেন। তিনি জানেন, কোন্ ব্যক্তিকে কোন্ কোন্ সময় কোন্ কোন্ পন্থায় সতর্ক করা হয়েছে, কোন্ কোন্ পথে তার কাছে সত্য পৌঁছেছে এবং কোন্ কোন্ পথে বাতিলের বাতিল হওয়ার বিষয়টি তার কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে মূল কারণগুলোর ভিত্তিতে সে হক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের গোমরাহীকে প্রাধান্য দিয়েছিল সেগুলো কি ছিল তাও তিনি জানেন।

৯২. অর্থাৎ নবী, যিনি সংশ্লিষ্ট উম্মতকে সতর্ক করেছিলেন। অথবা নবীদের অনুসারীদের মধ্য থেকে এমন কোন হিদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তি যিনি সংশ্লিষ্ট উম্মতের মধ্যে সত্য প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কিংবা কোন প্রচার মাধ্যম যার সাহায্যে সংশ্লিষ্ট উম্মতের কাছে সত্যের পয়গাম পৌঁছেছিল।

৯৩. অর্থাৎ নিজেদের সাফাইয়ের মধ্যে এমন কোন প্রমাণ পেশ করো যার ভিত্তিতে তোমাদের মাফ করে দেয়া যেতে পারে। অথবা তোমরা যে শিরক এবং যে আখেরাত ও নবুওয়াত অস্বীকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলে তা সঠিক ছিল এবং তোমরা যুক্তি সংগত কারণে এ পথ অবলম্বন করেছিলে একথা প্রমাণ করো। কিংবা এ না হলেও কমপক্ষে একথাই প্রমাণ করো যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে এ ভুলের জন্য সতর্ক করে দেবার এবং তোমাদের কাছে সঠিক কথা পৌঁছাবার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি।

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ
الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ
قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ
الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ
اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

৮ রুকূ'

একথা সত্য,[৯৪] কারূণ ছিল মূসার সম্প্রদায়ের লোক, তারপর সে নিজের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো।[৯৫] আর আমি তাকে এতটা ধনরত্ন দিয়ে রেখেছিলাম যে, তাদের চাবিগুলো বলবান লোকদের একটি দল বড় কষ্টে বহন করতে পারতো।[৯৬] একবার যখন এ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে বললো, "অহংকার করো না, আল্লাহ অহংকারকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা দিয়ে আখেরাতের ঘর তৈরি করার কথা চিন্তা করো এবং দুনিয়া থেকেও নিজের অংশ ভুলে যেয়ো না। অনুগ্রহ করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"

৯৪. সাতান্ন আয়াত থেকে মক্কার কাফেরদের যে আপত্তি সম্পর্কে লাগাতার ভাষণ চলছে এ ঘটনাটিও তারই জবাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসংগে এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের কারণে জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত হবার ভয় প্রকাশ করেছিল তারা আসলে ছিল মক্কার বড় বড় শেঠ, মহাজন ও পুঁজিপতি। আন্তরজাতিক বাণিজ্য ও সূদী কারবার তাদেরকে সমকালীন কারূণে পরিণত করেছিল। তারাই মনে করছিল বেশী বেশী করে ধন সম্পদ আহরণ করাই হচ্ছে আসল সত্য। এ উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে গিয়ে যে জিনিস থেকেই কিছু ক্ষতি হবার আশংকা থাকে তা সরাসরি বাতিল করতে হবে। কোন অবস্থাতেই তা গ্রহণ করা যেতে পারে না। অন্যদিকে সাধারণ মানুষ ধন–সম্পদের এ উঁচু স্তম্ভগুলোকে আকাংখার দৃষ্টিতে দেখতো এবং তাদের চূড়ান্ত কামনা হতো, যে উচ্চতায় এরা পৌঁছেছে হায়। যদি আমাদের সেখানে পৌঁছুবার সৌভাগ্য হতো। চলমান অর্থ গৃধনুতার পরিবেশে এ যুক্তি বড়ই শক্তিশালী মনে করা হচ্ছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তাওহীদ, আখেরাত ও নৈতিক বিধিবন্ধনের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন তা মেনে নেয়া হলে কুরাইশদের উচ্চ মর্যাদার গগনচুম্বী প্রাসাদ ধূলায় লুটিয়ে পড়বে এবং এ ক্ষেত্রে ব্যবসা বাণিজ্য তো দূরের কথা জীবন ধারণই কঠিন হয়ে পড়বে।

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ
مِن قَبْلِهِۦ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْـَٔلُ
عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ فِى زِينَتِهِۦ ۖ قَالَ ٱلَّذِينَ
يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِىَ قَٰرُونُ ۙ إِنَّهُۥ
لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ
خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا ۚ وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّٰبِرُونَ ﴿٨٠﴾

এতে সে বললো, "এসব কিছু তো আমি যে জ্ঞান লাভ করেছি তার ভিত্তিতে আমাকে দেয়া হয়েছে।"[৯৭]—সে কি এ কথা জানতো না যে, আল্লাহ এর পূর্বে এমন বহু লোককে ধ্বংস করে দিয়েছেন যারা এর চেয়ে বেশী বাহু বল ও জনবলের অধিকারী ছিল?[৯৮] অপরাধীদেরকে তো তাদের গোনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় না।[৯৯]

একদিন সে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হলো পূর্ণ জাঁকজমক সহকারে। যারা দুনিয়ার জীবনের ঐশ্বর্যের জন্য লালায়িত ছিল তারা তাকে দেখে বললো, "আহা! কারূণকে যা দেয়া হয়েছে তা যদি আমরাও পেতাম! সে তো বড়ই সৌভাগ্যবান।" কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলতে লাগলো, "তোমাদের ভাবগতিক দেখে আফসোস হয়। আল্লাহর সওয়াব তার জন্য ভালো যে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আর এ সম্পদ সবরকারীরা ছাড়া আর কেউ লাভ করে না।"[১০০]

৯৫. বাইবেল ও তালমূদে কারূনকে কোরহ (Korah) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সে ছিল হযরত মূসা আলাইহিস সালামের চাচাত ভাই। বাইবেলের যাত্রাপুস্তকে (৬ অধ্যায় ১৮–২১ শ্লোক) যে বংশধারা বর্ণনা করা হয়েছে, তার দৃষ্টিতে বলা যায় হযরত মূসা ও কারূনের পিতা উভয়ে ছিল পরস্পর সহোদর ভাই। কুরআন মজীদের অন্য স্থানে বলা হয়েছে, এ ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের অন্তরভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ফেরাউনের সাথে হাত মিলিয়েছিল এবং তার নৈকট্য লাভ করে এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, মূসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতের মোকাবিলায় ফেরাউনের পরে বিরোধিতার ক্ষেত্রে যে দু'জন প্রধান দলপতি বেশী অগ্রসর ছিল তাদের একজন ছিল এ কারূন ঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا وَسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ۝ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَٰمَٰنَ
وَقَٰرُونَ فَقَالُوا۟ سَٰحِرٌ كَذَّابٌ –

"আমি মূসাকে আমার নিদর্শনসমূহ এবং সুস্পষ্ট যুক্তি সহকারে ফেরাউন, হামান ও কারূণের কাছে পাঠালাম। কিন্তু তারা বলল, এ একজন যাদুকর ডাহা মিথ্যুক।"

(আল-মুমিন ঃ ২৩-২৪)

এ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়, কারূন নিজের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ করে এমন শত্রু শক্তির ধামাধরায় পরিণত হয়েছিল, যে বনী ইসরাঈলকে শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। আর এ জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার বদৌলতে ফেরাউনের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সে এমন গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদায় অভিসিক্ত হয়েছিল যে, হযরত মূসা ফেরাউন ছাড়া আর যে দু'জন বড় বড় সত্ত্বার কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের দু'জনের একজন ছিল ফেরাউনের মন্ত্রী হামান এবং অন্যজন এ ইসরাঈলী শেঠ। বাকি রাষ্ট্রের অন্য সভাসদ ও কর্মকর্তারা ছিল অপেক্ষাকৃত নিম্ন পর্যায়ের। কাজেই তদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল না। কারূনের এ মর্যাদাটিই সূরা আনকাবূতের ৩৯ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

৯৬. বাইবেলে (গণনা পুস্তকের ১৬ অধ্যায়) তার যে কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে এ ব্যক্তির ধন-দৌলতের কোন কথা বলা হয়নি। কিন্তু ইহুদী বর্ণনাসমূহ থেকে জানা যায়, এ ব্যক্তি অগাধ ধন-সম্পদের মালিক ছিল, এমন কি তার ধনাগারের চাবিগুলো বহন করার জন্য তিনশো খচ্চরের প্রয়োজন হতো। (জুয়িশ ইনসাইক্লোপেডিয়া, ৭ খণ্ড, ৫৫৬ পৃষ্ঠা) এ বর্ণনাটি যদিও অনেক বেশী অতিরঞ্জিত তবুও এ থেকে এতটুকু জানা যায় যে, ইসরাঈলী বর্ণনাবলীর দৃষ্টিতেও কারূন ছিল তৎকালের সবচেয়ে বড় ধনী ব্যক্তি।

৯৭. আসল শব্দগুলো হচ্ছে اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, আমি যা কিছু পেয়েছি নিজের যোগ্যতার বলে পেয়েছি। এটা কোন অনুগ্রহ নয়। অধিকার ছাড়াই নিছক দয়া করে কেউ আমাকে এটা দান করেনি। তাই আমাকে এখন এজন্য এভাবে কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই যে, যেসব অযোগ্য লোককে কিছুই দেয়া হয়নি তাদেরকে দয়া ও অনুগ্রহ হিসেবে আমি এর মধ্য থেকে কিছু দেবো অথবা আমার কাছ থেকে এ সম্পদ যাতে ছিনিয়ে নিয়ে না নেয়া হয় সেজন্য কিছু দান খয়রাত করে দেবো। এর দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, আমার মতে আল্লাহ এই যে সম্পদরাজি আমাকে দিয়েছেন এটি তিনি আমার গুণাবলী সম্পর্কে জেনেই দিয়েছেন। যদি তাঁর দৃষ্টিতে আমি একজন পছন্দনীয় মানুষ না হতাম, তাহলে তিনি এসব আমাকে কেন দিলেন? আমার প্রতি তাঁর নিয়ামত বর্ষিত হওয়াটাই প্রমাণ করে আমি তাঁর প্রিয় পাত্র এবং আমার নীতিপদ্ধতি তিনি পছন্দ করেন।

৯৮. অর্থাৎ এ ব্যক্তি যে নিজেকে বড় পণ্ডিত, জ্ঞানী, গুণী ও চতুর বলে দাবী করে বেড়াচ্ছে এবং নিজের যোগ্যতার অহংকারে মাটিতে পা ফেলছে না, সে কি জানে না যে, তার চাইতেও বেশী অর্থ, মর্যাদা, প্রতিপত্তি,শক্তি ও শান শওকতের অধিকারী লোক ইতিপূর্বে দুনিয়ায় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং আল্লাহ শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন? যোগ্যতা ও নৈপূণ্যই যদি পার্থিব উন্নতির রক্ষাকবচ হয়ে থাকে তাহলে যখন তারা ধ্বংস হয়েছিল তখন তাদের এ যোগ্যতাগুলো কোথায় গিয়েছিল? আর যদি কারো পার্থিব উন্নতি লাভ অনিবার্যভাবে একথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তার কর্ম ও গুণাবলী পছন্দ করেন তাহলে তাদের সর্বনাশ হলো কেন?

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ ۫ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۫ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ۝٨١ وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا
مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ۚ لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ؕ
وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۝٨٢

শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ও তার গৃহকে ভূগর্ভে পুতে ফেললাম। তখন আল্লাহর মোকাবিলায় তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসার মতো সাহায্যকারীদের কোন দল ছিল না এবং সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে পারলো না। যারা আগের দিন তার মতো মর্যাদালাভের আকাংখা পোষণ করছিল তারা বলতে লাগলো, "আফসোস, আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার রিযিক প্রসারিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে সীমিত রিযিক দেন।[১০১] যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তাহলে আমাদেরও ভূগর্ভে পুতে ফেলতেন। আফসোস, আমাদের মনে ছিল না, কাফেররা সফলকাম হয় না।[১০২]

৯৯. অর্থাৎ অপরাধীরা তো এ দাবীই করে থাকে যে, তারা বড়ই ভালো লোক। তাদের কোন দোষ আছে একথা তারা কবেই বা স্বীকার করে। কিন্তু তাদের শাস্তি তাদের স্বীকারোক্তির ওপর নির্ভর করে না। তাদেরকে যখন পাকড়াও করা হয় একথা জিজ্ঞেস করে পাকড়াও করা হয় না যে, তোমরা কি কি অপরাধ করেছ।

১০০. অর্থাৎ এ চরিত্র, চিন্তা পদ্ধতি এবং আল্লাহর পুরস্কার দান কেবলমাত্র এমন লোকদের জন্য নির্ধারিত যাদের মধ্যে এতটা ধৈর্য ও দৃঢ়তা থাকে যার ফলে তারা হালাল পথে অর্থোপার্জন করার জন্য অবিচল সংকল্পবদ্ধ হয়। চাই তাতে তাদের ভাগ্যে শুধুমাত্র নুনভাতই জুটুক, কিংবা তারা কোটিপতি হয়ে যাবার সৌভাগ্য লাভ করুক। সারা দুনিয়ার সুখ ও সুবিধা অর্জিত হবার সুযোগ দেখা দিলেও তারা হারাম পথের দিকে একটুও ঝুঁকে পড়ে না। এ আয়াতে আল্লাহর পুরস্কার বলতে এমন মর্যাদা সম্পন্ন রিযক বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করে প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে অর্জন করে। আর সবর অর্থ হচ্ছে, নিজের আবেগ-অনুভূতি ও কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। লোভ-লালসার মোকাবিলায় ঈমানদারী ও বিশ্বস্ততার ওপর অবিচল থাকা। সততা, ন্যায় পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার ফলে যে ক্ষতি হয় অথবা যে লাভ হাত ছাড়া হয়ে যায় তা বরদাশ্‌ত করে নেয়া। অবৈধভাবে তদবীর-তাগাদা করে যে লাভ হতে পারে তা প্রত্যাখ্যান করা। হালাল রোজগার তা যত সামান্যই হোক না কেন

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ
وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۖ
وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

৯ রুকূ'

সে আখেরাতের [১০৩] গৃহ তো আমি তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেবো যারা পৃথিবীতে নিজেদের বড়াই চায় না[১০৪] এবং চায় না বিপর্যয় সৃষ্টি করতে।[১০৫] আর শুভ পরিণাম রয়েছে মুত্তাকীদের জন্যই।[১০৬] যে কেউ ভাল কাজ নিয়ে আসবে তার জন্য রয়েছে তার চেয়ে ভাল ফল এবং যে কেউ খারাপ কাজ নিয়ে আসে তার জানা উচিৎ যে, অসৎ কর্মশীলরা যেমন কাজ করতো ঠিক তেমনটিই প্রতিদান পাবে।

তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। হারামখোরদের জাকজমক দেখে মনের মধ্যে ঈর্ষা ও কামনা বাসনার জ্বালায় অস্থির হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে তার প্রতি ভ্রুক্ষেপমাত্র না করা এবং ঠাণ্ডা মাথায় একথা অনুধাবন করা যে, ঈমানদারের জন্য এ চাকচিক্যময় আবর্জনার তুলনায় এমন নিরাভরণ পবিত্রতাই ভালো যা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাকে দান করেছেন। "সবরকারীরা ছাড়া আর কেউ এ সম্পদ লাভ করে না" উক্তিতে উল্লেখিত সম্পদ অর্থ আল্লাহর সওয়াবও হতে পারে এবং এমন পবিত্র–পরিচ্ছন্ন মানসিকতাও হতে পারে যার ভিত্তিতে মানুষ ঈমান ও সৎকর্ম সহকারে অনাহার ও অভুক্ত থাকাকে বেঈমানীর পথ অবলম্বন করে কোটিপতি হয়ে যাওয়ার চাইতে ভালো মনে করে।

১০১. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক প্রসারিত বা সংকুচিত করা যেটাই ঘটুক না কেন তা ঘটে তাঁর ইচ্ছাক্রমেই। এ ইচ্ছার মধ্যে তাঁর ভিন্নতর উদ্দেশ্য সক্রিয় থাকে। কাউকে বেশী রিযিক দেবার অর্থ নিশ্চিত ভাবে এ নয় যে, আল্লাহ তার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট তাই তাকে পুরস্কার দিচ্ছেন। অনেক সময় কোন ব্যক্তি হয় আল্লাহর কাছে বড়ই ঘৃণিত ও অভিশপ্ত কিন্তু তিনি তাকে বিপুল পরিমাণ ধন–দৌলত দিয়ে যেতে থাকেন। এমনকি এ ধন শেষ পর্যন্ত তার ওপর আল্লাহর কঠিন আযাব নিয়ে আসে। পক্ষান্তরে যদি কারো রিযিক সংকুচিত হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে তার এ অর্থ হয় না যে, আল্লাহ তার প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন এবং তাকে শাস্তি দিচ্ছেন। অধিকাংশ সৎলোক আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়া সত্ত্বেও আর্থিক অভাব অনটনের মধ্যে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় এ অভাব অনটন তাঁদের জন্য আল্লাহর রহমতে পরিণত হয়েছে। এ সত্যটি না বোঝার ফলে যারা আসলে আল্লাহর গযবের অধিকারী হয় তাদের সমৃদ্ধিকে মানুষ ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখে।

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ قُل رَّبِّي
أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾ وَمَا كُنتَ
تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ
ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾

হে নবী! নিশ্চিত জেনো, যিনি এ কুরআন তোমার ওপর ন্যস্ত করেছেন[১০৭] তিনি তোমাকে একটি উত্তম পরিণতিতে পৌঁছিয়ে দেবেন।[১০৮] তাদেরকে বলে দাও, "আমার রব ভালো করেই জানেন কে হিদায়াত নিয়ে এসেছে এবং কে প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে।" তুমি মোটেই আশা করোনি যে, তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করা হবে। এতো নিছক তোমার রবের মেহেরবানী (তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে)[১০৯], কাজেই তুমি কাফেরদের সাহায্যকারী হয়ো না।[১১০]

১০২. অর্থাৎ আমাদের এ ভুল ধারণা ছিল যে, পার্থিব সমৃদ্ধি ও ধনাঢ্যতাই সফলতা। এ কারণে আমরা মনে করে বসেছিলাম কারূন বড়ই সাফল্য অর্জন করে চলছে। কিন্তু এখন বুঝলাম, আসল সাফল্য অন্য কোন জিনিসের নাম এবং তা কাফেরদের ভাগ্যে জোটে না।

কারূনের ঘটনার এ শিক্ষনীয় দিকটি কেবলমাত্র কুরআনেই বর্ণিত হয়েছে। বাইবেল ও তালমূদে এর কোন উল্লেখ নেই। তবে এ দু'টি কিতাবে যে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে তা থেকে জানা যায়, বনী ইসরাঈল যখন মিসর থেকে বের হয় তখন এ ব্যক্তিও নিজের দলবলসহ তাদের সাথে বের হয়। তারপর সে হযরত মুসা ও হারূনের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র করে। আড়াইশ' লোক এ ষড়যন্ত্রে তার সাথে শরীক ছিল। শেষ পর্যন্ত তার ওপর আল্লাহর গযব নাযিল হয় এবং সে নিজের গৃহ ও ধন-সম্পদসহ মাটির মধ্যে প্রোথিত হয়ে যায়।

১০৩. এখানে জান্নাতের কথা বলা হয়েছে, যা প্রকৃত সাফল্যের স্থান হিসেবে চিহ্নিত।

১০৪. অর্থাৎ যারা আল্লাহর যমীনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশী নয়। যারা বিদ্রোহী, স্বৈরাচারী ও দাম্ভিক হয়ে নয় বরং বান্দা হয়ে থাকে এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজেদের বান্দা করে রাখার চেষ্টা করে না।

১০৫. 'ফাসাদ' বা বিপর্যয় হচ্ছে মানব জীবন ব্যবস্থার এমন একটি বিকৃতি যা সত্য বিচ্যুত হবার ফলে অনিবার্যভাবে দেখা দেয়। আল্লাহর বন্দেগী এবং তাঁর আইন কানুনের আনুগত্যের সীমানা অতিক্রম করে মানুষ যা কিছুই করে সবই হয় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তই বিপর্যয়। এর একটি অংশ হচ্ছে এমন ধরনের বিপর্যয়, যা হারাম পথে ধন আহরণ এবং হারাম পথে তা ব্যয় করার ফলে সৃষ্টি হয়।

১০৬. অর্থাৎ তাদের জন্য যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং তার নাফরমানী করা থেকে দূরে থাকে।

১০৭. অর্থাৎ এই কুরআনকে আল্লাহর বান্দাদের কাছে পৌছাবার, তাদেরকে এর শিক্ষা দান করার এবং এর পথ নির্দেশনা অনুযায়ী বিশ্ব সংস্কার করার দায়িত্ব তোমার প্রতি অর্পণ করেছেন।

১০৮. আসল শব্দ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ অর্থাৎ তোমাকে একটি মা'আদের দিকে পৌছিয়ে দেবেন। মা'আদ–এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে এমন স্থান যেদিকে মানুষকে ফিরে যেতে হবে। এ শব্দটিকে অনির্দিষ্ট বাচক পদ হিসেবে ব্যবহার করার কারণে এর দ্বারা আপনা আপনি এ অর্থ বুঝানো হয় যে, এ স্থানটি বড়ই মহিমান্বিত ও মর্যাদা সম্পন্ন। কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ করেছেন জান্নাত। কিন্তু একে শুধুমাত্র জান্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়ার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। আল্লাহ শব্দটিকে যেমন ব্যাপক অর্থে বর্ণনা করেছেন তেমনি ব্যাপক অর্থে একে ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। এর ফলে এ প্রতিশ্রুতি দুনিয়া ও আখরাত উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যাবে। আয়াতের পূর্ববর্তী আলোচনাও এ কথাই দাবী করে যে, একে কেবলমাত্র আখেরাতেই নয় বরং দুনিয়াতেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিরাট শান শওকত এবং মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করার প্রতিশ্রুতি মনে করা হোক। মক্কার কাফেরদের যে উক্তি নিয়ে ৫৭ আয়াত থেকে এ পর্যন্ত লাগাতার আলোচনা চলছে তাতে তারা বলেছিল, হে মুহাম্মাদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তুমি নিজের সাথে আমাদেরকেও নিয়ে ডুবতে চাও। যদি আমরা তোমার সাথে সহযোগিতা করি এবং এ ধর্ম গ্রহণ করে নিই, তাহলে আরবের সরযমীনে আমাদের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে যাবে। এর জবাবে আল্লাহ তাঁর নবীকে বললেন, হে নবী! যে আল্লাহ এ কুরআনের পতাকা বহন করার দায়িত্ব তোমার ওপর অর্পণ করেছেন তিনি তোমাকে ধ্বংস করে দেবেন না। বরং তিনি তোমাকে এমন উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে চান যার কল্পনাও আজ এরা করতে পারে না। আর প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ মাত্র কয়েক বছর পর নবী করীমকে (সা) এ দুনিয়ায় এদেরই চোখের সামনে সমগ্র আরব দেশে এমন নিরংকুশ কর্তৃত্ব দান করলেন যে, তাঁকে বাধাদানকারী কোন শক্তিই সেখানে টিকতে পারলো না এবং তাঁর দীন ছাড়া অন্য কোন দীনের জন্য সেখানে কোন অবকাশই থাকলো না। আরবের ইতিহাসে এর আগে সমগ্র আরব উপদ্বীপে কোন এক ব্যক্তির একচ্ছত্র আধিপত্যের এ ধরনের কোন নজীর সৃষ্টি হয়নি, যার ফলে সারা দেশে তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকেনি, তার হুকুমের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করার ক্ষমতা কেউ রাখেনি এবং লোকেরা কেবল রাজনৈতিকভাবেই তার দলভুক্ত হয়নি বরং সমস্ত দীনকে বিলুপ্ত করে দিয়ে সেই এক ব্যক্তি সবাইকে তার দীনের অনুসারীও করে নিয়েছে।

কোন কোন মুফাসসির এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সূরা কাসাসের এ আয়াতটি মক্কা থেকে মদীনার দিকে হিজরাত করার সময় পথে নাযিল হয়েছিল। তাদের মতে এতে আল্লাহ তাঁর নবীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি আবার তাঁকে মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু প্রথমত এর শব্দাবলীর মধ্যে "মা'আদ" কে "মক্কা" অর্থে গ্রহণ করার কোন সুযোগই নেই। দ্বিতীয়ত বিষয়বস্তু ও আভ্যন্তরীণ সাক্ষ–প্রমাণের দিক দিয়ে বিচার করলে এ সূরাটি হচ্ছে হাবশায় হিজরাতের নিকটবর্তী সময়ের এবং একথা বুঝা যাচ্ছে না যে,

কয়েক বছর পরে মদীনায় হিজরাতের সময় পথে যদি এ আয়াতটি নাযিল হয়ে থাকে তাহলে কোন্ সম্পর্কের ভিত্তিতে এখানে এ ধারাবাহিক আলোচনার মধ্যে একে এনে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। তৃতীয়ত এ প্রেক্ষাপটে মক্কার দিকে নবী করীমের (সা) ফিরে যাবার আলোচনা একেবারেই বেমানান ঠেকে। আয়াতের এ অর্থ গ্রহণ করা হলে এটা মক্কার কাফেরদের কথার জবাব হবে না বরং তাদের ওজরকে শক্তিশালী করা হবে। এর অর্থ হবে, অবশ্যই হে মক্কাবাসীরা! তোমরা ঠিকই বলছো, মুহাম্মাদ (সা) কে এ শহর থেকে বের করে দেয়া হবে কিন্তু তিনি স্থায়ীভাবে নির্বাসিত হবেন না বরং শেষ পর্যন্ত আমি তাকে আবার এখানে ফিরিয়ে আনবো। এ হাদীসটি যদিও বুখারী, নাসাঈ, ইবনে জারীর ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন কিন্তু আসলে এটি ইবনে আব্বাসের নিজস্ব অভিমত। এটি সরাসরি রসূল (সা) এর বক্তব্য সম্বলিত কোন মারফূ হাদীস নয় যে, একে মেনে নিতেই হবে।

১০৯. একথাটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হচ্ছে। মূসা আলাইহিস সালাম এ কথা মোটেই জানতেন না যে, তাঁকে নবী করা হচ্ছে এবং বিরাট দায়িত্ব সম্পাদনে নিযুক্ত করা হচ্ছে। তিনি কখনো কল্পনায়ও এ ইচ্ছা বা আশা পোষণ করা তো দূরের কথা কখনো এ বিষয়টি কামনাও করেননি। হঠাৎ পথ চলার সময় তাঁকে ডেকে নেয়া হয় এবং নবীর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে তাঁর থেকে বিস্ময়কর কাজ নেয়া হয়, যার সাথে তার পূর্ববর্তী জীবনের কাজের কোন সাদৃশ্যই ছিল না। ঠিক একই ঘটনা ঘটে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেও। মক্কার লোকেরা নিজেরাই জানতো, হেরা গিরিগুহা থেকে যেদিন তিনি নবুওয়াতের পয়গাম নিয়ে নেমে আসেন তার মাত্র একদিন আগে পর্যন্ত তাঁর জীবন কি ছিল, তিনি কি কাজ করতেন, কেমন কথাবার্তা বলতেন, তাঁর কথাবার্তার বিষয়বস্তু কি হতো, কোন্ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল এবং তাঁর তৎপরতা ছিল কোন্ ধরনের। তাঁর এ সমগ্র জীবন অবশ্যই সত্যতা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ও পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতায় পরিপূর্ণ ছিল। সেখানে পরিপূর্ণ ভদ্রতা, শালীনতা, শান্তিপ্রিয়তা, প্রতিশ্রুতি পালন, অধিকার প্রদান ও জনসেবার ভাবধারা অসাধারণ ঔজ্জ্বল্যে দেদীপ্যমান ছিল। কিন্তু সেখানে এমন কোন জিনিস ছিল না যার ভিত্তিতে কেউ একথা কল্পনাও করতে পারে যে, এ সদাচারী লোকটি আগামীকাল নবুওয়াতের দাবী নিয়ে এগিয়ে আসবেন। তাঁর সাথে যারা নিকটতম সম্পর্ক রাখতো এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে একজনও একথা বলতে পারেনি যে, তিনি পূর্ব থেকেই নবী হবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। হেরা গিরিগুহার সেই বৈপ্লবিক মুহূর্তের পরে অকস্মাত যেসব বিষয়বস্তু, সমস্যাবলী ও প্রসংগ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য বিবৃতি ও ভাষণ দান শুরু হয়ে যায় ইতিপূর্বে কেউ তাঁর কণ্ঠ থেকে কখনো তার একটি বর্ণও শোনেনি। কুরআনের আকারে অকস্মাত তাঁর মুখ থেকে যে বিশেষ ভাষা, শব্দ ও পরিভাষা লোকেরা শুনতে থাকে ইতিপূর্বে কখনো তারা তা শোনেনি। ইতিপূর্বে কখনো তিনি কোথাও বক্তৃতা ও ওয়াজ-নসিহত করতে দাঁড়াননি। কখনো দাওয়াত দিতে ও আন্দোলনের বাণী নিয়ে এগিয়ে আসেননি। বরং কখনো তাঁর কোন কর্মতৎপরতা থেকে এ ধারণাই জন্মাতে পারেনি যে, তিনি সামাজিক সমস্যা সমাধান অথবা ধর্মীয় সংশোধন কিংবা নৈতিক ও চারিত্রিক সংস্কার সাধনের জন্য কোন কাজ শুরু করার চিন্তা-ভাবনা করছেন। এ বৈপ্লবিক মুহূর্ত সমাগত হবার একদিন আগেও তাঁর জীবন ছিল

একজন ব্যবসায়ীর জীবন। সাদামাটা ও বৈধ পথে রুজী-রোজগার করা, নিজের সন্তান-পরিজনদের সাথে হাসিখুশির জীবন যাপন করা, অতিথি আপ্যায়ন করা, দুঃখী-দরিদ্র জনদের সাহায্য সেবা করা এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা আর কখনো কখনো ইবাদাত করার জন্য একান্তে বসে যাওয়া– এই ছিল তাঁর স্বাভাবিক জীবন। এ ধরনের একজন লোকের হঠাৎ একদিন বিশ্ব কাঁপানো বাগ্মীতা নিয়ে ময়দানে নেমে আসা, একটি বিপ্লবাত্মক দাওয়াতের কাজ শুরু করে দেয়া, একটি অভিনব সাহিত্য সৃষ্টি করা এবং একটি স্বতন্ত্র জীবন দর্শন চিন্তাধারা ও নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিধান নিয়ে সামনে এগিয়ে আসা, এতবড় একটি পরিবর্তন, যা মানবিক মনস্তত্বের দৃষ্টিতে কোন প্রকার কৃত্রিমতা, প্রস্তুতি ও ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কখনোই আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। কারণ এ ধরনের প্রত্যেকটি প্রচেষ্টা ও প্রস্তুতি অবশ্যই পর্যায়ক্রমিক ক্রমোন্নতির স্তর অতিক্রম করে এবং যাদের মধ্যে মানুষ রাত্রি-দিন জীবন-যাপন করে এ পর্যায় ও স্তর কখনো তাদের চোখের আড়ালে থাকতে পারে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন যদি এ পর্যায়গুলো অতিক্রম করে থাকতো তাহলে মক্কার হাজার হাজার লোক বলতো, আমরা না আগেই বলেছিলাম এ ব্যক্তি একদিন কোন বড় আকারের দাবী করে বসবে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, মক্কার কাফেররা তাঁর বিরুদ্ধে সব ধরনের অভিযোগ আনলেও এ অভিযোগটি তাদের একজনও উত্থাপন করেনি।

তারপর তিনি নিজেও নবুওয়াতের প্রত্যাশী ছিলেন না। অথবা তা কামনা করতেন না এবং সেজন্য অপেক্ষাও করছিলেন না। বরং সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে অকস্মাত তিনি এ বিষয়টির মুখোমুখি হলেন। বিভিন্ন হাদীসে অহীর সূত্রপাতের অবস্থা বর্ণনা প্রসংগে যে ঘটনা উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। জিব্রীলের সাথে প্রথম সাক্ষাত এবং সূরা আলাকের প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর তিনি হেরা গুহা থেকে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গৃহে পৌঁছেছিলেন। গৃহের লোকদের বলেছিলেন, "আমাকে ঢেকে দাও, আমাকে ঢেকে দাও।" কিছুক্ষণ পরে ভীতির অবস্থা কিছুটা দূর হয়ে গেলে নিজের জীবন সঙ্গিনীকে সব অবস্থা খুলে বললেন। এ প্রসঙ্গে তাঁকে বললেন, "আমি নিজের প্রাণের ভয় করছি।" স্ত্রী সংগে সংগেই জবাব দিলেন, "মোটেই না, আল্লাহ আপনাকে কখনো কষ্ট দেবেন না। আপনি আত্মীয়দের হক আদায় করেন। অসহায়কে সাহায্য করেন। অভাবী দরিদ্রকে সহায়তা দেন। অতিথি আপ্যায়ন করেন। প্রত্যেক ভালো কাজে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকেন।" তারপর তিনি তাঁকে নিয়ে নিজের চাচাত ভাই ও আহলে কিতাবদের একজন অভিজ্ঞ আলেম ও সদাচারী ব্যক্তি ওয়ারাকাহ ইবনে নওফালের কাছে গেলেন। তাঁর কাছ থেকে পুরো ঘটনা শোনার পর ওয়ারাকাহ বললেন, "আপনার কাছে যিনি এসেছিলেন তিনি ছিলেন সেই আসমানী দূত বা নামুস (বিশেষ কাজে নিযুক্ত নির্দিষ্ট ফেরেশ্‌তা) যিনি মূসার (আ) কাছে এসেছিলেন। হায় ! যদি আমি যুবক হতাম এবং সে সময় পর্যন্ত জীবিত থাকতাম যখন আপনার সম্প্রদায় আপনাকে বহিষ্কার করবে।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এরা কি আমাকে বের করে দেবে ?" জবাব দিলেন, "হাঁ আজ পর্যন্ত এক ব্যক্তিও এমন অতিক্রান্ত হননি, যিনি এ ধরনের বাণী বহন করে ছেন, এবং লোকেরা তাঁর দুশমনে পরিণত হয়নি।

এ সমগ্র ঘটনাটি এমন একটি অবস্থার ছবি তুলে ধরে, যা একজন সরল মানুষ একটি অপ্রত্যাশিত ও চরম অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলে তার জীবনে দেখা দিতে পারে। যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম থেকেই নবী হবার চিন্তা করতেন, নিজের সম্পর্কে চিন্তা করতেন যে, তাঁর মতো মানুষের নবী হওয়া উচিত এবং কবে কোন্ ফেরেশতা তাঁর কাছে পয়গাম নিয়ে আসবে তারি প্রতীক্ষায় ধ্যান সাধনা করে নিজের মনের ওপর চাপ প্রয়োগ করতেন, তাহলে হেরা গুহার ঘটনা সংঘটিত হবার সাথে সাথেই তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন এবং বলিষ্ঠ মনোবল নিয়ে বিরাট দাবী সহকারে পাহাড় থেকে নামতেন, তারপর সোজা নিজের সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে পৌঁছে নিজের নবুওয়াতের ঘোষণা দিতেন। কিন্তু এখানে এর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। তিনি যা কিছু দেখেন তাতে বিস্মিত ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েন। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে পৌঁছেন। লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েন। মনটা একটু শান্ত হলে চুপিচুপি স্ত্রীকে বলেন, আজ গুহার নিসংগতায় এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটে গেছে। জানি না কি হবে। আমার প্রাণ নিরাপদ নয় মনে হচ্ছে। নবুওয়াত প্রার্থীর অবস্থা থেকে এ অবস্থা কত ভিন্নতর।

তারপর স্বামীর জীবন, তার অবস্থা ও চিন্তাধারা সম্পর্কে স্ত্রীর চেয়ে বেশী আর কে জানতে পারে? যদি তিনি পূর্বাহ্নেই এ অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকতেন যে, তাঁর স্বামী হচ্ছেন নবুওয়াতের প্রার্থী, তিনি সর্বক্ষণ ফেরেশতার আগমনের প্রতীক্ষা করছেন, তাহলে তাঁর জবাব কখনো হযরত খাদীজার (রা) জবাবের অনুরূপ হতো না। বরং তিনি বলতেন ঃ হে স্বামী! ভয় পাও কেন? দীর্ঘদিন থেকে যে জিনিসের প্রত্যাশী ছিলে তা পেয়ে গেছো। চলো, এবার পীর গিরির দোকান পাঠ সাজাও। আমি মানত, নজরানা ইত্যাদি সামলানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু পনের বছরের দাম্পত্য জীবনে তিনি স্বামীর জীবনের যে চেহারা দেখেছিলেন তার ভিত্তিতে এ কথা বুঝতে তাঁর এক মুহূর্তও দেরী হয়নি যে, এমন সৎ, ত্যাগী ও নির্লোভ ব্যক্তির কাছে শয়তান আসতে পারে না, আল্লাহ তাঁকে কোন বড় পরীক্ষার সম্মুখীনও করতে পারেন না বরং তিনি যা কিছু দেখেছেন তা নির্জলা সত্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

ওয়ারাকাহ ইবনে নওফালের ব্যাপারেও একই কথা। তিনি কোন বাইরের লোক ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন নবী করীমের (সা) ভ্রাতৃসমাজের অন্তরভুক্ত এবং নিকটতম আত্মীয়তার প্রেক্ষিতে তাঁর শ্যালক। তারপর একজন ঈসায়ী আলেম হবার ফলে নবুওয়াত, কিতাব ও অহীকে কৃত্রিমতা ও বানোয়াট থেকে বাছাই করার ক্ষমতা রাখতেন। বয়সে অনেক বড় হবার কারণে নবীর (সা) শৈশব থেকে সে সময় পর্যন্তকার সমগ্র জীবন তাঁর সামনে ছিল। তিনিও তাঁর মুখ থেকে হেরা গুহার সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক শোনার পর সংগে সংগেই বলে ওঠেন, এ আগমনকারী নিশ্চিতভাবেই সেই একই ফেরেশতা হবেন যিনি হযরত মূসার (আ) কাছে অহী নিয়ে আসতেন। কারণ হযরত মূসার (আ) সাথে যা ঘটেছিল এখানেও সেই একই ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ একজন অত্যন্ত পবিত্র পরিচ্ছন্ন চরিত্রের অধিকারী সহজ সরল মানুষ, মাথায় কোন প্রকার পূর্ব চিন্তা বা পরিকল্পনা নেই, নবুওয়াতের চিন্তায় ডুবে থাকা তো দূরের কথা তা অর্জন করার কল্পনাও কোনদিন

মনে জাগেনি এবং অকস্মাত তিনি পূর্ণ সচেতন অবস্থায় প্রকাশ্যে এ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। এ জিনিসটি তাঁকে দুই আর দু'ইয়ে চারের মতো নির্দ্বিধায় নিশ্চিতভাবেই এ সিদ্ধান্তে পৌছিয়ে দেয় যে, এখানে কোন প্রবৃত্তির প্ররোচনা বা শয়তানী ছল চাতুরী নেই। বরং এ সত্যাশ্রয়ী মানুষটি নিজের কোন প্রকার ইচ্ছা-আকাংখা ছাড়াই যা কিছু দেখেছেন তা আসলে প্রকৃত সত্যদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়।

এটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের এমন একটি সুস্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান প্রমাণ যে, একজন সত্যপ্রিয় মানুষের পক্ষে একে অস্বীকার করা কঠিন। তাই কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় এ জিনিসটিকে নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। যেমন সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ لَوْشَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ –

"হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, যদি আল্লাহ এটা না চাইতেন, তাহলে আমি কখনো এ কুরআন তোমাদের শুনাতাম না বরং এর খবরও আমি তোমাদের দিতাম না। ইতিপূর্বে আমি তোমাদের মধ্যে আমার জীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছি, তোমরা কি এতটুকু কথাও বোঝো না?" (ইউনুস ঃ ১৬ আয়াত)

আর সূরা আশ্-শূরায় বলা হয়েছে,

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا –

"হে নবী! তুমি তো জানতেও না কিতাব কি এবং ঈমানই কি। কিন্তু আমি এ অহীকে একটি আলোয় পরিণত করে দিয়েছি। যার সাহায্যে আমি নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চাই তাকে পথ দেখাই।" (আশ্-শূরা ঃ ৫২ আয়াত)।

[আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস ২১, আনকাবুত ৮৮-৯২ এবং শূরা ৮৪ টীকা।]

১১০. অর্থাৎ আল্লাহ যখন না চাইতেই তোমাদের এ নিয়ামত দান করেছেন তখন তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে, তোমাদের সমস্ত শক্তি ও শ্রম এর পতাকা বহন করার এবং এর প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্যয় করবে এ কাজে ত্রুটি ও গাফলতি করার মানে হবে তোমরা সত্যের পরিবর্তে সত্য অস্বীকারকারীদেরকে সাহায্য করেছো। এর অর্থ এ নয়, নাউযুবিল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ধরনের কোন ভুলের আশংকা ছিল। বরং এভাবে আল্লাহ কাফেরদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে নিজের নবীকে এ হিদায়াত দান করছেন যে, এদের শোরগোল ও বিরোধীতা সত্ত্বেও তুমি নিজের কাজ করে যাও এবং তোমার এ দাওয়াতের ফলে সত্যের দুশমনরা তাদের জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত হবার যেসব আশংকা প্রকাশ করে তার পরোয়া করার কোন প্রয়োজন নেই।

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ
وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝٨٧ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ۭ لَهُ الْحُكْمُ
وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝٨٨

আর এমনটি যেন কখনো না হয় যে, আল্লাহর আয়াত যখন তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয় তখন কাফেররা তোমাকে তা থেকে বিরত রাখে।[১১১] নিজের রবের দিকে দাওয়াত দাও এবং কখনো মুশরিকদের অন্তরভুক্ত হয়ো না এবং আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদদেরকে ডেকো না। তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। সব জিনিসই ধ্বংস হবে কেবলমাত্র তাঁর সত্ত্বা ছাড়া। শাসন কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই[১১২] এবং তাঁরই দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

১১১. অর্থাৎ সেগুলোর প্রচার ও প্রসার থেকে এবং সে অনুযায়ী কাজ করা থেকে।

১১২. এ অর্থও হতে পারে, শাসন কর্তৃত্ব তাঁরই জন্য অর্থাৎ একমাত্র তিনিই তার অধিকার রাখেন।

আল 'আনকাবূত

২৯

নামকরণ

একচল্লিশ আয়াতের অংশবিশেষ مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ থেকে সূরাটির নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ যে সূরার মধ্যে 'আনকাবূত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, এটি সে সূরা।

নাযিল হবার সময়-কাল

৫৬ থেকে ৬০ আয়াতের মধ্যে যে বক্তব্য এসেছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, এ সূরাটি হাবশায় হিজরাতের কিছু আগে নাযিল হয়েছিল। অধিকন্তু বিষয়বস্তুগুলোর আভ্যন্তরীণ সাক্ষও একথাই সমর্থন করে। কারণ, পশ্চাতপটে সে যুগের অবস্থার চিত্র ঝলকে উঠতে দেখা যায়। যেহেতু এর মধ্যে মুনাফিকদের আলোচনা এসেছে এবং মুনাফিকীর প্রকাশ হয় মদীনায়, সেহেতু কোন কোন মুফাস্‌সির ধারণা করে নিয়েছেন যে, সূরাটির প্রথম দশটি আয়াত হচ্ছে মাদানী এবং বাকি সমস্ত সূরাটি মক্কী। অথচ এখানে যেসব লোকের মুনাফিকীর কথা বলা হয়েছে তারা কেবল কাফেরদের জুলুম, নির্যাতন ও কঠোর শারীরিক নিপীড়নের ভয়ে মুনাফিকী অবলম্বন করছিল। আর একথা সুস্পষ্ট, এ ধরনের মুনাফিকীর ঘটনা মক্কায় ঘটতে পারে, মদীনায় নয়। এভাবে এ সূরায় মুসলমানদেরকে হিজরাত করার উপদেশ দেয়া হয়েছে, এ বিষয়টি দেখেও কোন কোন মুফাস্‌সির একে মক্কায় নাযিলকৃত শেষ সূরা গণ্য করেছেন। অথচ মদীনায় হিজরাতের আগে মুসলমানগণ হাবশায়ও হিজরাত করেছিলেন। এ ধারণাগুলো আসলে কোন হাদীসের ভিত্তিতে নয়। বরং শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ সাক্ষের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। আর সমগ্র সূরার বিষয়বস্তুর ওপর সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিপাত করলে এ আভ্যন্তরীণ সাক্ষ মক্কার শেষ যুগের নয় বরং এমন এক যুগের অবস্থার প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে যে যুগে মুসলমানদের হাবশায় হিজরাত সংঘটিত হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় বক্তব্য

সূরাটি পড়লে মনে হবে এটি যখন নাযিল হচ্ছিল তখন মক্কায় মুসলমানরা মহা বিপদ-মুসিবতের মধ্যে অবস্থান করছিল। কাফেরদের পক্ষ থেকে পূর্ণ শক্তিতে চলছিল ইসলামের বিরোধিতা এবং মু'মিনদের ওপর চালানো হচ্ছিল কঠোর জুলুম-নিপীড়ন। এহেন অবস্থায় মহান আল্লাহ একদিকে সাচ্চা ঈমানদারদের মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা, সাহস ও অবিচলতা সৃষ্টি করার এবং অন্যদিকে দুর্বল ঈমানদারদেরকে লজ্জা দেবার জন্য

এ সূরাটি নাযিল করেন। এই সাথে এর মধ্যে মক্কার কাফেরদেরকেও এ মর্মে কঠোর ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, নিজেদের জন্য এমন পরিণতি ডেকে এনো না সত্যের সাথে শত্রুতা পোষণকারীরা প্রতি যুগে যার সম্মুখীন হয়ে এসেছে।

সে সময় কিছু কিছু যুবক যেসব প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছিলেন এ প্রসংগে তারও জবাব দেয়া হয়েছে। যেমন তাঁদের পিতা-মাতারা তাঁদের ওপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীন ত্যাগ করে তাদের দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য চাপ প্রয়োগ করতো। তাঁদের পিতা-মাতারা বলতো, যে কুরআনের প্রতি তোমরা ঈমান এনেছো তাতেও তো একথাই লেখা আছে যে, মা-বাপের হক সবচেয়ে বেশী। কাজেই আমরা যাকিছু বলছি তাই তোমরা মেনে নাও। নয়তো তোমরা নিজেদের ঈমান বিরোধী কাজে লিপ্ত হবে। ৮ আয়াতে এর জবাব দেয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে কোন কোন নওমুসলিমকে তাদের গোত্রের লোকেরা বলতো, তোমরা আমাদের কথা মেনে নাও এবং ঐ ব্যক্তি থেকে আলাদা হয়ে যাও, এ জন্য আযাব-সওয়াব যাই হোক, তার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করছি। যদি এ জন্য আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করেন তাহলে আমরা অগ্রবর্তী হয়ে বলে দেবো ঃ জনাব, এ বেচারাদের কোন দোষ নেই। আমরাই এদেরকে ঈমান ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলাম। কাজেই আমাদের পাকড়াও করুন। এর জবাব দেয়া হয়েছে ১২-১৩ আয়াতে।

এ সূরায় যে কাহিনীগুলো বর্ণনা করা হয়েছে সেখানেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এ দিকটিই সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী নবীদেরকে দেখো, তাঁরা কেমন কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। কত দীর্ঘকাল ধরে তাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন। তারপর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সাহায্য করা হয়েছে। কাজেই ভয় পেয়ো না। আল্লাহর সাহায্য নিশ্চয়ই আসবে কিন্তু পরীক্ষার একটি সময়-কাল অতিবাহিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। মুসলমানদেরকে এ শিক্ষা দেবার সাথে সাথে মক্কার কাফেরদেরকেও এ কাহিনীগুলোতে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে পাকড়াও হতে দেরী হয়, তাহলে তাতে আর কোনদিন পাকড়াও হবেই না বলে মনে করে নিয়ো না। অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর চিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষ তোমাদের সামনে রয়েছে। দেখে নাও, শেষ পর্যন্ত তাদের সর্বনাশ হয়েই গেছে এবং আল্লাহ তাঁর নবীদেরকে সাহায্য করেছেন।

তারপর মুসলমানদের এভাবে পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, জুলুম-নির্যাতন যদি তোমাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তাহলে ঈমান পরিত্যাগ করার পরিবর্তে তোমরা ঘরবাড়ি ত্যাগ করে বের হয়ে যাও। আল্লাহর যমীন অনেক প্রশস্ত। যেখানে আল্লাহর বন্দেগী করার সুযোগ আছে সেখানে চলে যাও।

এসব কথার সাথে সাথে কাফেরদেরকে বুঝাবার দিকটিও বাদ দেয়া হয়নি। তাওহীদ ও আখেরাত উভয় সত্যকে যুক্তিসহকারে তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। শির্ককে খণ্ডন করা হয়েছে। বিশ্ব-জাহানের নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদেরকে জানানো হয়েছে যে, আমার নবী তোমাদের সামনে যে শিক্ষা পেশ করছেন এ নিদর্শনাবলী তার সত্যতা প্রমাণ করছে।

আয়াত ৬৯ **সূরা আল আনকাবূত–মক্কী** রুকূ' ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

الٓمّٓ ۝١ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ
لَا يُفْتَنُوْنَ ۝٢ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۝٣

আলিফ–লাম–মীম। লোকেরা কি মনে করে রেখেছে, "আমরা ঈমান এনেছি" কেবলমাত্র একথাটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর পরীক্ষা করা হবে না?[১] অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের সবাইকে পরীক্ষা করে নিয়েছি[২] আল্লাহ অবশ্যই দেখবেন[৩] কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যুক।

১. যে অবস্থায় একথা বলা হয় তা ছিল এই যে, মক্কা মু'আয্যমায় কেউ ইসলাম গ্রহণ করলেই তার ওপর বিপদ আপদ ও জুলুম–নিপীড়নের পাহাড় ভেঙ্গে পড়তো। কোন গোলাম বা গরীব মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে ভীষণভাবে মারপিট এবং কঠোর নির্যাতন–নিপীড়নের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত করা হতো। সে যদি কোন দোকানদার বা কারিগর হতো তাহলে তার রুজি–রোজগারের পথ বন্ধ করে দেয়া হতো। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাকে অনাহারে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে হতো। সে যদি কোন প্রভাবশালী পরিবারের কোন ব্যক্তি হতো, তাহলে তার নিজের পরিবারের লোকেরা তাকে নানাভাবে বিরক্ত করতো ও কষ্ট দিতো এবং এভাবে তার জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলতো। এ অবস্থা মক্কায় একটি মারাত্মক ভীতি ও আতংকের পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। এ কারণে লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার স্বীকৃতি দেয়া সত্ত্বেও ঈমান আনতে ভয় করতো এবং কিছু লোক ঈমান আনার পর ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হলে সাহস ও হিম্মতহারা হয়ে কাফেরদের সামনে নতজানু হয়ে যেতো। এ পরিস্থিতি যদিও দৃঢ় ঈমানের অধিকারী সাহাবীগণের অবিচল নিষ্ঠার মধ্যে কোন প্রকার দোদুল্যমানতা সৃষ্টি করেনি তবুও মানবিক প্রকৃতির তাগিদে অধিকাংশ সময় তাদের মধ্যেও একটা মারাত্মক ধরনের চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে যেতো। এ ধরনের অবস্থার একটা চিত্র পেশ করে হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত বর্ণিত একটি হাদীস। হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন বুখারী, আবু দাউদ ও নাসাঈ তাঁদের গ্রন্থে। তিনি বলেন, যে সময় মুশরিকদের কঠোর নির্যাতনে আমরা ভীষণ দুরবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছিলাম সে সময় একদিন আমি দেখলাম নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বাঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসে রয়েছেন। আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করেন না? একথা শুনে তাঁর চেহারা আবেগে-উত্তেজনায় রক্তিমবর্ণ ধারণ করলো এবং তিনি বললেন, "তোমাদের পূর্বে যেসব মু'মিনদল অতিক্রান্ত হয়েছে তারা এর চাইতেও বেশী নিগৃহীত হয়েছে। তাদের কাউকে মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে বসিয়ে দেয়া হতো এবং তারপর তার মাথার ওপর করাত চালিয়ে দু'টুকরা করে দেয়া হতো। কারো অংগ-প্রত্যংগের সন্ধিস্থলে লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়ানো হতো, যাতে তারা ঈমান প্রত্যাহার করে। আল্লাহর কসম, এ কাজ সম্পন্ন হবেই, এমন কি এক ব্যক্তি সান'আ থেকে হাদ্বারামাউত পর্যন্ত নিশংকে চিত্তে সফর করবে এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ভয় তার মনে থাকবে না।"

এ চিত্তচাঞ্চল্যকে অবিচল ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায় রূপান্তরিত করার জন্য মহান আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে বুঝান, ইহ্কালীন ও পরকালীন সাফল্য অর্জনের জন্য আমার যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি রয়েছে কোন ব্যক্তি নিছক মৌখিক ঈমানের দাবীর মাধ্যমে তার অধিকারী হতে পারে না। বরং প্রত্যেক দাবীদারকে অনিবার্যভাবে পরীক্ষার চুল্লী অতিক্রম করতে হবেই। তাকে এভাবে নিজের দাবীর সত্যতার প্রমাণ পেশ করতে হবে। আমার জান্নাত এত সস্তা নয় এবং দুনিয়াতেও আমার বিশেষ অনুগ্রহ এত আয়াসলব্ধ নয় যে, তোমরা কেবলি মুখে আমার প্রতি ঈমান আনার কথা উচ্চারণ করবে আর অমনিই আমি তোমাদেরকে সেসব কিছুই দান করে দেবো। এসবের জন্য তো পরীক্ষার শর্ত রয়েছে। আমার জন্য কষ্ট বরদাশত করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করতে হবে, বিপদ-মুসীবত ও সংকটের মোকাবিলা করতে হবে। ভীতি ও আশংকা দিয়েও পরীক্ষা করা হবে এবং লোভ-লালসা দিয়েও। এমন প্রত্যেকটি জিনিস যা ভালোবাসো ও পছন্দ করো, আমার সন্তুষ্টির জন্য তাকে উৎসর্গ করতে হবে। আর এমন প্রত্যেকটি কষ্ট যা তোমাদের অনভিপ্রেত এবং তোমরা অপছন্দ করে থাকো, আমার জন্য তা অবশ্যই বরদাশ্‌ত করতে হবে। তারপরেই তোমরা আমাকে মানার যে দাবী করেছিলে তার সত্য-মিথ্যা যাচাই হবে। কুরআন মজীদের এমন প্রত্যেকটি জায়গায় যেখানে বিপদ-মুসীবত ও নিগ্রহ-নিপীড়নের সর্বব্যাপী আক্রমণে মুসলমানদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারের অবস্থা হয়ে গেছে সেখানেই একথা বলা হয়েছে। হিজরাতের পরে মদীনায় মুসলমানদের জীবনের প্রথমাবস্থায় যখন অর্থনৈতিক সংকট, বাইরের বিপদ এবং ইহুদী ও মুনাফিকদের ভিতরের দুষ্কৃতি মু'মিনদেরকে ভীষণভাবে পেরেশান করে রেখেছিল তখন আল্লাহ বলেনঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

"তোমরা কি মনে করেছো তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, অথচ এখনো তোমরা সে অবস্থার সম্মুখীন হওনি, যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী

(ঈমানদার) গণ? তারা সম্মুখীন হয়েছিল নির্মমতা ও দুঃখ-ক্লেশের এবং তাদেরকে অস্থির করে তোলা হয়েছিল। এমনকি রসূল ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা চিৎকার করে বলে উঠেছিল আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? (তখনই তাদেরকে সুখবর দেয়া হয়েছিল এই মর্মে যে) জেনে রাখো, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।"

(আল বাকারাহ, ২১৪)

অনুরূপভাবে ওহোদ যুদ্ধের পর যখন মুসলমানদের ওপর আবার বিপদ-মুসীবতের একটি দুর্যোগপূর্ণ যুগের অবতারণা হয় তখন বলা হয় ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

"তোমরা কি মনে করে নিয়েছো, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, অথচ এখনো আল্লাহ দেখেনইনি যে, তোমাদের মধ্য থেকে কে জিহাদে প্রাণ উৎসর্গকারী এবং কে সবরকারী?" (আলে ইমরান, ১৪২)

প্রায় একই বক্তব্য সূরা আলে ইমরানের ১৭৯, সূরা তাওবার ১৬ এবং সূরা মুহাম্মাদের ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে। এসব বক্তব্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মুসলমানদের মনে এ সত্যটি গেঁথে দিয়েছেন যে, পরীক্ষাই হচ্ছে এমন একটি মানদণ্ড যার মাধ্যমে ভেজাল ও নির্ভেজাল যাচাই করা যায়। ভেজাল নিজে নিজেই আল্লাহর পথ থেকে সরে যায় এবং নির্ভেজালকে বাছাই করে নিয়ে নেয়া হয়। এভাবে সে আল্লাহর এমনসব পুরস্কার লাভের যোগ্য হয়, যেগুলো কেবলমাত্র সাচ্চা ঈমানদারদের জন্যই নির্ধারিত।

২. অর্থাৎ তোমাদের সাথে যা কিছু হচ্ছে, তা কোন নতুন ব্যাপার নয়। ইতিহাসে হরহামেশা এমনটিই হয়ে এসেছে। যে ব্যক্তিই ঈমানের দাবী করেছে তাকে অবশ্যই পরীক্ষার অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে দগ্ধ করা হয়েছে। আর অন্যদেরকেও যখন পরীক্ষা না করে কিছু দেয়া হয়নি তখন তোমাদের এমন কি বিশেষত্ব আছে যে, কেবলমাত্র মৌখিক দাবীর ভিত্তিতেই তোমাদেরকে দেয়া হবে?

৩. মূল শব্দ হচ্ছে فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ এর শাব্দিক অনুবাদ হবে, "আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন" একথায় কেউ প্রশ্ন করতে পারে, আল্লাহ্ তো সত্যবাদীর সত্যবাদিতা এবং মিথ্যুকের মিথ্যাচার ভালোই জানেন, পরীক্ষা করে আবার তা জানার প্রয়োজন কেন? এর জবাব হচ্ছে, যতক্ষণ এক ব্যক্তির মধ্যে কোন জিনিসের কেবলমাত্র যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতাই থাকে, কার্যত তার প্রকাশ হয় না ততক্ষণ ইনসাফ ও ন্যায়নীতির দৃষ্টিতে সে কোন পুরস্কার বা শাস্তির অধিকারী হতে পারে না। যেমন এক ব্যক্তির মধ্যে আমানতদার হবার যোগ্যতা আছে এবং অন্যজনের মধ্যে যোগ্যতা আছে আত্মসাত করার। এরা দু'জন যতক্ষণ না পরীক্ষার সম্মুখীন হয় এবং একজনের থেকে আমানতদারী এবং অন্যজনের থেকে আত্মসাতের কার্যত প্রকাশ না ঘটে ততক্ষণ নিছক নিজের অদৃশ্য জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ একজনকে আমানতদারীর পুরস্কার দিয়ে দেবেন এবং অন্যজনকে আত্মসাতের শাস্তি দিয়ে দেবেন, এটা তাঁর ইনসাফের বিরোধী। তাই মানুষের ভালো কাজ ও মন্দ কাজ করার আগে তাদের কর্মযোগ্যতা ও ভবিষ্যত কর্মনীতি সম্পর্কে আল্লাহর যে পূর্ব

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤﴾
مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿٥﴾ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ
عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

আর যারা খারাপ কাজ করছে[৪] তারা কি মনে করে বসেছে তারা আমার থেকে এগিয়ে চলে যাবে?[৫] বড়ই ভুল সিদ্ধান্ত তারা করছে।

যে কেউ আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করার আশা করে (তার জানা উচিত), আল্লাহর নির্ধারিত সময় আসবেই।[৬] আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।[৭] যে ব্যক্তিই প্রচেষ্টা-সংগ্রাম করবে সে নিজের ভালোর জন্যই করবে।[৮] আল্লাহ অবশ্যই বিশ্ববাসীদের প্রতি মুখাপেক্ষিতাহীন।[৯]

জ্ঞান আছে তা ইনসাফের দাবী পূরণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। অমুক ব্যক্তির মধ্যে চুরির প্রবণতা আছে, সে চুরি করবে অথবা করতে যাচ্ছে, এ ধরনের জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ্ বিচার করেন না। বরং সে চুরি করেছে—এ জ্ঞানের ভিত্তিতে তিনি বিচার করেন। এভাবে অমুক ব্যক্তি উন্নত পর্যায়ের মু'মিন ও মুজাহিদ হতে পারে অথবা হবে এ জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ্ তার ওপর অনুগ্রহ ও নিয়ামত বর্ষণ করেন না বরং অমুক ব্যক্তি নিজের কাজের মাধ্যমে তার সাচ্চা ঈমানদার হবার কথা প্রমাণ করে দিয়েছে এবং আল্লাহর পথে জীবন সংগ্রাম করে দেখিয়ে দিয়েছে—এরি ভিত্তিতে বর্ষণ করেন। তাই আমি এ আয়াতের অনুবাদ করেছি "আল্লাহ্ অবশ্যই দেখবেন।"

৪. যদিও আল্লাহ্র নাফরমানীতে লিপ্ত সকলের উদ্দেশ্যে এখানে বলা হতে পারে তবুও বিশেষভাবে এখানে বক্তব্যের লক্ষ হচ্ছে, কুরাইশদের সেই জালেম নেতৃবর্গ যারা ইসলামের বিরোধিতায় নেমে ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর নিগ্রহ চালাবার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী ছিল, যেমন ওলীদ ইবনে মুগীরাহ, আবু জেহেল, উতবাহ, শাইবাহ, উক্‌বাহ ইবনে আবু মু'আইত, হানযালা ইবনে ওয়াইল এবং আরো অনেকে। এখানে পূর্বাপর বক্তব্যের স্বতস্ফূর্ত দাবী এই যে, পরীক্ষা তথা বিপদ-মুসীবত ও জুলুম-নিপীড়নের মোকাবিলায় মুসলমানদেরকে সবর ও দৃঢ়তা অবলম্বন করার নির্দেশ দেবার পর এ সত্যপন্থীদের ওপর যারা জুলুম-নিপীড়ন চালাচ্ছিল তাদেরকে সম্বোধন করে ভীতি ও হুমকিমূলক কিছু কথাও বলা হোক।

৫. এ অর্থও হতে পারে, "আমার পাকড়াও এড়িয়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে পারবে।" মূল শব্দ হচ্ছে يَسْبِقُونَا অর্থাৎ আমার থেকে এগিয়ে যাবে। এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে, যা কিছু আমি করতে চাই (অর্থাৎ আমার রসূলের মিশনের

সাফল্য) তা করতে আমার সফল না হওয়া এবং যা কিছু তারা করতে চায় (অর্থাৎ আমার রসূলকে হেয়প্রতিপন্ন করা) তা করতে তাদের সফল হওয়া। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তাদের বাড়াবাড়ির জন্য আমি তাদেরকে পাকড়াও করতে চাই এবং তারা পালিয়ে আমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যায়।

৬. অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরকালীন জীবনে বিশ্বাসই করে না এবং মনে করে, কারো সামনে নিজের কাজের জবাবদিহি করতে হবে না এবং এমন কোন সময় আসবে না যখন নিজের জীবনের যাবতীয় কাজের কোন হিসেব-নিকেশ দিতে হবে, তার কথা আলাদা। সে নিজের গাফলতির মধ্যে পড়ে থাকুক এবং নিশ্চিন্তে যা করতে চায় করে যাক। নিজের আন্দাজ-অনুমানের বিপরীত নিজের পরিণাম সে নিজেই দেখে নেবে। কিন্তু যারা আশা রাখে, এক সময় তাদেরকে তাদের মা'বূদের সামনে হাজির হতে হবে এবং নিজের কর্ম অনুযায়ী পুরস্কার ও শাস্তি পেতে হবে, তাদের এ ভুল ধারণায় ডুবে থাকা উচিত নয় যে, মৃত্যুর সময় অনেক দূরে। তাদের তো মনে করা উচিত, সে সময় অতি নিকটেই এসে গেছে এবং কাজের অবকাশ খতম হবারই পথে। তাই নিজের শুভ পরিণামের জন্য তারা যা কিছু করতে চায় করে ফেলুক। দীর্ঘ জীবন-কালের ভিত্তিহীন নির্ভরতার ওপর ভরসা করে নিজের সংশোধনে বিলম্ব করা উচিত নয়।

৭. অর্থাৎ তাদের এ ভুল ধারণাও পোষণ করা উচিত নয় যে, এমন কোন বাদশাহর সাথে তাদের ব্যাপার জড়িত, যিনি বিভিন্ন ব্যাপারের কোন খোঁজ খবর রাখেন না। যে আল্লাহর সামনে তাদের জবাবদিহি করার জন্য হাজির হতে হবে তিনি বেখবর নন বরং সবকিছু শোনেন ও জানেন। তাঁর কাছে তাদের কোন কথা গোপন নেই।

৮. "মুজাহাদা" শব্দটির মূল অর্থ হচ্ছে, কোন বিরোধী শক্তির মোকাবিলায় দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম, প্রচেষ্টা ও সাধনা করা। আর যখন কোন বিশেষ বিরোধী শক্তি চিহ্নিত করা হয় না বরং সাধারণভাবে "মুজাহাদা" শব্দ ব্যবহার করা হয় তখন এর অর্থ হয় একটি সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী দ্বন্দ্ব-সংঘাত। মু'মিনকে এ দুনিয়ায় যে দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম করতে হয় তা হচ্ছে এ ধরনের। তাকে শয়তানের সাথেও লড়াই করতে হয়, যে তাকে সর্বক্ষণ সৎকাজের ক্ষতির ভয় দেখায় এবং অসৎকাজের লাভ ও স্বাদ উপভোগের লোভ দেখিয়ে বেড়ায়। তাকে নিজের নফসের বা কুপ্রবৃত্তির সাথেও লড়তে হয়, যে তাকে সর্বক্ষণ নিজের খারাপ ইচ্ছা-আকাংখার দাসে পরিণত করে রাখার জন্য জোর দিতে থাকে। নিজের গৃহ থেকে নিয়ে বিশ্ব-সংসারের এমন সকল মানুষের সাথে তাকে লড়তে হয় যাদের আদর্শ, মতবাদ, মানসিক প্রবণতা, চারিত্রিক নীতি, রসম-রেওয়াজ, সাংস্কৃতিক ধারা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধান সত্য দীনের সাথে সংঘর্ষশীল। তাকে এমন রাষ্ট্রের সাথেও লড়তে হয় যে আল্লাহর আনুগত্যমুক্ত থেকে নিজের ফরমান জারী করে এবং সততার পরিবর্তে অসততাকে বিকশিত করার জন্য শক্তি নিয়োগ করে। এ প্রচেষ্টা-সংগ্রাম এক-দু'দিনের নয়, সারাজীবনের। দিন-রাতের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে প্রতি মুহূর্তের। কোন একটি ময়দানে নয় বরং জীবনের প্রত্যেকটি ময়দানে ও প্রতি দিকে। এ সম্পর্কেই হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন ঃ

ان الرجل ليجاهد وماضرب يوما من الدهر بسيف

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ①

আর যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তাদের দুষ্কৃতিগুলো আমি তাদের থেকে দূর করে দেবো এবং তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কাজগুলোর প্রতিদান দেবো।[১০]

"মানুষ যুদ্ধ করে চলে, যদিও কখনো একবারও তাকে তলোয়ার চালাতে হয় না।"

৯. অর্থাৎ আল্লাহ্ এ জন্য তোমাদের কাছে এ দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের দাবী করছেন না যে, নিজের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার ও প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন এবং তোমাদের এ যুদ্ধ ছাড়া তাঁর ইলাহী শাসন চলবে না, বরং এটিই তোমাদের উন্নতি ও অগ্রগতির পথ, তাই তিনি তোমাদের এ দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে লিপ্ত হবার নির্দেশ দিচ্ছেন। এ পথেই তোমরা দুষ্কৃতি ও ভ্রষ্টতার ঘূর্ণাবর্ত থেকে বের হয়ে সৎকর্মশীলতা ও সত্যতার পথে চলতে পারবে। এ পথে অগ্রসর হয়ে তোমরা এমন শক্তির অধিকারী হতে পারো যার ফলে দুনিয়ায় তোমরা কল্যাণ ও সুকৃতির ধারক এবং পরকালে আল্লাহর জান্নাতের অধিকারী হবে। এ সংগ্রাম ও যুদ্ধ চালিয়ে তোমরা আল্লাহ্র কোন উপকার করবে না বরং তোমরা নিজেরাই উপকৃত হবে।

১০. ঈমান অর্থ এমন সব জিনিসকে আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া, যেগুলো মেনে নেবার জন্য আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাব দাওয়াত দিয়েছে। আর সৎকাজ হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা। মানুষের চিন্তাধারা, ধারণা-কল্পনা ও ইচ্ছার পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাই হচ্ছে মন ও মস্তিকের সৎকাজ। খারাপ কথা না বলা এবং হক-ইনসাফ ও সত্য-সততা অনুযায়ী সব কথা বলাই হচ্ছে কণ্ঠের সৎকাজ। আর মানুষের সমগ্র জীবন আল্লাহ্র আনুগত্য ও বন্দেগীর মধ্যে এবং তাঁর বিধানসমূহ মেনে চলে অতিবাহিত করাই হচ্ছে অংগ-প্রত্যংগ ও ইন্দ্রিয়ের সৎকাজ। এ ঈমান ও সৎকাজের দু'টি ফল বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

এক ঃ মানুষের দুষ্কৃতি ও পাপগুলো তার থেকে দূর করে দেয়া হবে।

দুই ঃ তার সর্বোত্তম কাজসমূহের সর্বোত্তম পুরস্কার তাকে দেয়া হবে।

পাপ ও দুষ্কৃতির কয়েকটি অর্থ হয়। একটি অর্থ হচ্ছে ঈমান আনার আগে মানুষ যতই পাপ করে থাকুক না কেন ঈমান আনার সাথে সাথেই তা সব মাফ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, ঈমান আনার পর মানুষ বিদ্রোহ প্রবণতা সহকারে নয় বরং মানবিক দুর্বলতা বশত যেসব ভুল-ত্রুটি করে থাকে, তার সৎকাজের প্রতি নজর রেখে সেগুলো উপেক্ষা করা হবে। তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, ঈমান ও সৎকর্মশীলতার জীবন অবলম্বন করার কারণে আপনা আপনিই মানুষের নফসের সংশোধন হয়ে যাবে এবং তার অনেকগুলো দুর্বলতা দূর হয়ে যাবে।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٨ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ
فِي الصَّالِحِينَ ۝٩

আমি মানুষকে নিজের পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু যদি তারা তোমার ওপর চাপ দেয় যে, তুমি এমন কোন (মা'বুদকে) আমার সাথে শরীক করো যাকে তুমি (আমার শরীক হিসেবে) জানো না, তাহলে তাদের আনুগত্য করো না।[১১] আমার দিকেই তোমাদের সবাইকে ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তোমাদের জানাবো তোমরা কি করছিলে।[১২] আর যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করে থাকবে তাদেরকে আমি নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলদের অন্তরভুক্ত করবো।

ঈমান ও সৎকাজের প্রতিদান সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ

لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

এর দু'টি অর্থ হয়। একটি হচ্ছে ঃ মানুষের সৎকাজগুলোর মধ্যে যেটি হবে সবচেয়ে ভালো সৎকাজ, তাকে সামনে রেখে তার জন্য প্রতিদান ও পুরস্কার নির্ধারণ করা হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মানুষ তার কার্যাবলীর দৃষ্টিতে যতটা পুরস্কারের অধিকারী হবে তার চেয়ে বেশী ভালো পুরস্কার তাকে দেয়া হবে। একথাটি কুরআনের অন্যান্য স্থানেও বলা হয়েছে। যেমন সূরা আন'আমে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

"যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে তাকে তার থেকে দশগুণ বেশী দেয়া হবে।"
(১৬০ আয়াত)

সূরা আল কাসাসে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا

"যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে তাকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে।"

সূরা নিসায় বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا

"আল্লাহ্ তো কণামাত্রও জুলুম করেন না এবং সৎকাজ হলে তাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেন।"

১১. এ আয়াতটি সম্পর্কে মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসাঈর বর্ণনা হচ্ছে, এটি হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস-এর ব্যাপারে নাযিল হয়। তাঁর বয়স যখন আঠারো উনিশ বছর তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর মা হামনা বিনতে সুফিয়ান (আবু সুফিয়ানের ভাইঝি) যখন জানতে পারে যে, তার ছেলে মুসলমান হয়ে গেছে তখন সে বলে, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মাদকে অস্বীকার করবে ততক্ষণ আমি কিছুই পানাহার করবো না এবং ছায়াতেও বসবো না। মায়ের হক আদায় করা তো আল্লাহর হুকুম। কাজেই তুমি আমার কথা না মানলে আল্লাহরও নাফরমানী করবে। একথায় হযরত সা'দ অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়েন। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন। এ ঘটনায় এ আয়াত নাযিল হয়। মক্কা মুআয্যমার প্রথম যুগে যেসব যুবক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হতে পারে তারাও একই ধরনের অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিলেন। তাই সূরা লুকমানেও পূর্ণ শক্তিতে এ বক্তব্যটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। (দেখুন ১৫ আয়াত)

আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানুষের ওপর মা-বাপের হক হচ্ছে সবচেয়ে বেশী। কিন্তু সেই মা-বাপই যদি মানুষকে শিরক করতে বাধ্য করে তাহলে তাদের কথা মেনে নেয়া উচিত নয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে অন্য কারো কথায় মানুষের এ ধরনের শিরক করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তারপর শব্দগুলি হচ্ছে : وَإِنْ جَاهَدَاكَ "যদি তারা দু'জন তোমাকে বাধ্য করার জন্য তাদের পূর্ণশক্তি নিয়োগ করে" এ থেকে জানা গেলো, কম পর্যায়ের চাপ প্রয়োগ বা বাপ-মায়ের মধ্য থেকে কোন একজনের চাপ প্রয়োগ আরো সহজে প্রত্যাখ্যান করার যোগ্য। এই সংগে مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (যাকে তুমি আমার শরীক হিসেবে জানো না) বাক্যাংশটিও অনুধাবনযোগ্য। এর মধ্যে তাদের কথা না মানার সপক্ষে একটি শক্তিশালী যুক্তি প্রদান করা হয়েছে। অবশ্যই এটা পিতা-মাতার অধিকার যে, ছেলেমেয়েরা তাদের সেবা করবে, তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে এবং বৈধ বিষয়ে তাদের কথা মেনে চলবে। কিন্তু তাদেরকে এ অধিকার দেয়া হয়নি যে, মানুষ নিজের জ্ঞানের বিরুদ্ধে তাদের অন্ধ অনুসরণ করবে। শুধুমাত্র বাপ-মায়ের ধর্ম বলেই তাদের ছেলে বা মেয়ের সেই ধর্ম মেনে চলার কোন কারণ নেই। সন্তান যদি এ জ্ঞান লাভ করে যে, তার বাপ-মায়ের ধর্ম ভুল ও মিথ্যা তাহলে তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে তার সঠিক ধর্ম গ্রহণ করা উচিত এবং তাদের চাপ প্রয়োগের পরও যে পথের ভ্রান্তি তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে সে পথ অবলম্বন করা তার উচিত নয়। বাপ-মায়ের সাথে যখন এ ধরনের ব্যবহার করতে হবে তখন দুনিয়ার প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেও এ ব্যবহার করা উচিত। যতক্ষণ না কোন ব্যক্তির সত্য পথে থাকা সম্পর্কে জানা যাবে ততক্ষণ তার অনুসরণ করা বৈধ নয়।

১২. অর্থাৎ এ দুনিয়ার আত্মীয়তা এবং আত্মীয়দের অধিকার কেবলমাত্র এ দুনিয়ার সীমা-ত্রিসীমা পর্যন্তই বিস্তৃত। সবশেষে পিতা-মাতা ও সন্তান সবাইকে তাদের স্রষ্টার কাছে ফিরে যেতে হবে। সেখানে তাদের প্রত্যেকের জবাবদিহি হবে তাদের ব্যক্তিগত দায়িত্বের ভিত্তিতে। যদি পিতা-মাতা সন্তানকে পথভ্রষ্ট করে থাকে তাহলে তারা পাকড়াও

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِىَ فِى اللّٰهِ جَعَلَ
فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ؕ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ
اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ؕ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِىْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ۝١٠
وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ۝١١

লোকদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি[১৩] কিন্তু যখন সে আল্লাহর ব্যাপারে নিগৃহিত হয়েছে তখন লোকদের চাপিয়ে দেয়া পরীক্ষাকে আল্লাহর আযাবের মতো মনে করে নিয়েছে।[১৪] এখন যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্য এসে যায়, তাহলে এ ব্যক্তিই বলবে, "আমরা তো তোমাদের সাথে ছিলাম।"[১৫] বিশ্ববাসীদের মনের অবস্থা কি আল্লাহ্ ভালোভাবে জানেন না? আর আল্লাহ্ তো অবশ্যই দেখবেন কারা ঈমান এনেছে এবং কারা মুনাফিক।[১৬]

হবে। যদি সন্তান পিতা–মাতার জন্য পথ ভ্রষ্টতা গ্রহণ করে থাকে তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। আর সন্তান যদি সঠিক পথ অবলম্বন করে থাকে এবং পিতা–মাতার বৈধ অধিকার আদায় করার ক্ষেত্রেও কোন প্রকার ত্রুটি না করে থাকে কিন্তু পিতা–মাতা কেবলমাত্র পথভ্রষ্টতার ক্ষেত্রে তাদের সহযোগী না হবার কারণে তাকে নির্যাতন করে থাকে, তাহলে তারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না।

১৩. যদিও বক্তা এক ব্যক্তিমাত্র কিন্তু সে "আমি ঈমান এনেছি" বলার পরিবর্তে বলছে, "আমরা ঈমান এনেছি।" ইমাম রাযী এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম অর্থের প্রতি ইংগিত করেছেন। তিনি বলেন, মুনাফিক সবসময় নিজেকে মু'মিনদের মধ্যে শামিল করার চেষ্টা করে থাকে এবং নিজের ঈমানের উল্লেখ এমনভাবে করে থাকে যাতে মনে হয় সেও ঠিক অন্যদের মতই মু'মিন। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন কোন কাপুরুষ যদি কোন সেনাদলের সাথে গিয়ে থাকে এবং সেনাদলের অসম সাহসী সৈনিকেরা লড়াই করে শত্রুদলকে বিতাড়িত করে দিয়ে থাকে তাহলে কাপুরুষটি নিজে কোন কাজে অংশ গ্রহণ না করে থাকলেও সে এসে লোকদেরকে বলবে, আমরা গিয়েছি, আমরা ভীষণ যুদ্ধ করেছি এবং শত্রুকে পরাস্ত করেছি। অর্থাৎ সেও যেন সেই অমিত সাহসী যোদ্ধাদের সাথে মিলে যুদ্ধ করেছিল।

১৪. অর্থাৎ আল্লাহর আযাবের ভয়ে যেমন কুফরী ও গোনাহ থেকে বিরত থাকা উচিত এ ব্যক্তি ঠিক তেমনি বান্দা প্রদত্ত নির্যাতন–নিগ্রহের ভয়ে ঈমান ও সৎকাজ থেকে বিরত হয়েছে। ঈমান আনার পর যখন সে কাফেরদের হুমকি, মারধর ও কারানির্যাতনের সম্মুখীন হয় তখন সে মনে করে মরে যাবার পর কুফরীর অপরাধে যে জাহান্নামের আযাব

ভোগ করতে হবে আল্লাহর সেই জাহান্নামের আযাব কিছুটা এ ধরনেরই হবে। তাই সে সিদ্ধান্ত করে, সে আযাব তো পরে ভোগ করবো কিন্তু এখন এ নগদ আযাব যা পাচ্ছি তার হাত থেকে নিস্তার লাভ করার জন্য আমাকে ঈমান ত্যাগ করে কুফরীর মধ্যে চলে যাওয়া উচিত। এভাবে দুনিয়ার জীবনটাতো নিশ্চিন্তে আরামের মধ্য দিয়ে কেটে যাবে।

১৫. অর্থাৎ আজ সে নিজেকে বাঁচাবার জন্য কাফেরদের সাথে যোগ দিয়েছে এবং মু'মিনদের পক্ষ ত্যাগ করেছে। কারণ সত্য দীনের সম্প্রসারণের জন্য নিজের গায়ে আঁচড়টি লাগাতেও সে প্রস্তুত নয় কিন্তু যখন এ দীনের জন্য জীবন উৎসর্গকারীদেরকে আল্লাহ সাফল্য ও বিজয়-দান করবেন তখন এ ব্যক্তি বিজয়ের ফল ভাগ করে নেবার জন্য এসে যাবে এবং মুসলমানদের বলবে, আমি তো মনে প্রাণে তোমাদেরই সাথে ছিলাম, তোমাদের সাফল্যের জন্য দোয়া করছিলাম এবং তোমাদের প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও কুরবানীকে আমি বিরাট মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখেছি।

এ প্রসংগে আরো এতটুকু কথা জেনে রাখতে হবে যে, অসহনীয় নিপীড়ন, ক্ষতি বা মারাত্মক ভীতিজনক অবস্থায় কোন ব্যক্তির কুফরী কথা বলে নিজেকে রক্ষা করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে জায়েয। তবে এ জন্য শর্ত হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আন্তরিকতা সহকারে ঈমানের ওপর অবিচল থাকতে হবে। কিন্তু যে আন্তরিকতা সম্পন্ন মুসলমানটি অক্ষম অবস্থায় প্রাণ বাঁচাবার জন্য কুফরীর প্রকাশ করে এবং যে সুবিধাবাদী লোকটি আদর্শ ও মতবাদ হিসেবে ইসলামকে সত্য জানে এবং সে হিসেবে তাকে মানে কিন্তু ঈমানী জীবনধারার বিপদ ও বিঘ্ন-বিপত্তি দেখে কাফেরদের সাথে হাত মিলায় তাদের দু'জনের মধ্যে ফারাকটি অনেক বড়। আপাত দৃষ্টিতে তাদের দু'জনের অবস্থা পরস্পর থেকে কিছু বেশী ভিন্ন মনে হবে না কিন্তু আসলে যে জিনিসটি তাদের মধ্যে আকাশ পাতালের ব্যবধান সৃষ্টি করে সেটি হচ্ছে এই যে, বাধ্য হয়ে কুফরীর প্রকাশকারী আন্তরিকতা সম্পন্ন মুসলমানটি কেবলমাত্র আকীদার দিক দিয়ে ইসলামের ভক্ত থাকে না বরং কার্যতও তার আন্তরিক সহানুভূতি ইসলাম ও মুসলমানদের সাথেই থাকে। তাদের সাফল্যে সে খুশী হয় এবং তাদের ব্যর্থতা তাকে অস্থির করে তোলে। অক্ষম অবস্থায়ও সে মুসলমানদের সাহায্য করার প্রত্যেকটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। তার ওপর ইসলামের শত্রুদের বাঁধন যখনই ঢিলে হয়ে যায় সংগে সংগেই সে মুসলমানদের সাথে যোগ দেয়, এ সুযোগের অপেক্ষায়ই থাকে সে। পক্ষান্তরে সুযোগ সন্ধানী লোক যখনই দেখে ইসলামের পথ কঠিন হয়ে গেছে এবং খুব ভালভাবে মাপজোক করে দেখে নেয়, ইসলামের সহযোগী হবার ক্ষতি কাফেরদের সাথে সহযোগিতা করার লাভের চেয়ে বেশী তখনই সে নিছক নিরাপত্তা ও লাভের খাতিরে ইসলাম ও মুসলমানদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষে তাদের জন্য এমন কোন কাজ করতে সে পিছপাও হয় না যা ইসলামের মারাত্মক বিরোধী এবং মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কিন্তু এই সাথে হয়তো কোন সময় ইসলামের বিজয় সাধিত হতে পারে, এ সম্ভাবনার দিক থেকেও সে একেবারে চোখ বন্ধ করে রাখে না। তাই যখনই মুসলমানদের সাথে কথা বলার সুযোগ হয় তখনই সে তাদের আদর্শকে সত্য বলে মেনে নেবার, তাদের সামনে নিজের ঈমানের অংগীকার করার এবং সত্যের পথে ত্যাগ ও কুরবানীর জন্য তাদেরকে বাহবা দেবার ব্যাপারে একটুও কার্পণ্য করে না। এ মৌখিক

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ
خَطٰيٰكُمْ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۭ اِنَّهُمْ
لَكٰذِبُوْنَ ۝ وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ۡ
وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

এ কাফেররা মু'মিনদেরকে বলে, তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ করো এবং আমরা তোমাদের গোনাহখাতাগুলো নিজেদের ওপর চাপিয়ে নেবো,[১৭] অথচ তাদের গোনাহখাতার কিছুই তারা নিজেদের ওপর চাপিয়ে নেবে না,[১৮] তারা ডাহা মিথ্যা বলছে। হাঁ নিশ্চয়ই তারা নিজেদের বোঝাও বইবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে অন্য অনেক বোঝাও।[১৯] আর তারা যে মিথ্যাচার চালিয়ে এসেছে কিয়ামতের দিন নিশ্চয়ই তাদেরকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[২০]

স্বীকৃতিকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করে প্রয়োজনের সময় সে তাকে কাজে লাগাতে চায়। কুরআন মজীদ অন্য এক জায়গায় মুনাফিকদের এ বেনিয়া মানসিকতাকে এভাবে বর্ণনা করেছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ
مَّعَكُمْ ۠ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ
عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

"এরা হচ্ছে এমন সব লোক যারা তোমাদের ব্যাপারে অপেক্ষা করছে (অর্থাৎ দেখছে অবস্থা কোন্‌দিকে মোড় নেয়)। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের বিজয় হয়, তাহলে এসে বলবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? আর যদি কাফেরদের পাল্লা ভারী থাকে, তাহলে তাদেরকে বলবে, আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম ছিলাম না এবং এরপরও তোমাদেরকে মুসলমানদের হাত থেকে বাঁচাইনি?
(আন নিসা, ১৪১)

১৬. অর্থাৎ মু'মিনদের ঈমান ও মুনাফিকদের মুনাফিকির অবস্থা যাতে উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং যার মধ্যে যাকিছু লুকিয়ে আছে সব সামনে এসে যায় সে জন্য আল্লাহ্ বারবার পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। একথাটিই সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে ঃ

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰي مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ
مِنَ الطَّيِّبِ

"আল্লাহ মু'মিনদেরকে কখনো এমন অবস্থায় থাকতে দেবেন না, যে অবস্থায় এখন তোমরা আছো (অর্থাৎ সাচ্চা ঈমানদার ও মুনাফিক সবাই মিশ্রিত হয়ে আছো)। তিনি পবিত্র লোকদেরকে অপবিত্র লোকদের থেকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা করে দেবেন।" (১৭৯ আয়াত)

১৭. তাদের এ উক্তির অর্থ ছিল, প্রথমত মৃত্যু পরবর্তী জীবন, হাশর–নশর, হিসেব ও শাস্তি–পুরস্কারের এসব কথা একদম বাজে ও উদ্ভট। কিন্তু ধরে নেয়া যাক যদি পরকালের কোন জীবন এবং সেখানে জবাবদিহির কোন বিষয় থেকেই থাকে, তাহলে তার দায়ভার আমরা গ্রহণ করছি। আল্লাহর সামনে সমস্ত শাস্তি ও পুরস্কারের বোঝা আমরা মাথা পেতে নেবো। আমাদের কথায় তোমরা এ নতুন ধর্ম পরিত্যাগ করো এবং নিজেদের পিতৃ পুরুষের ধর্মের দিকে ফিরে এসো। হাদীসে বিভিন্ন কুরাইশ সরদার সম্পর্কে বলা হয়েছে, প্রথমদিকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের সাথে সাক্ষাত করে এ সরদাররা এমনি ধরনের কথা বলতো। তাই হযরত উমর (রা) সম্পর্কে বলা হয়েছে, যখন তিনি ঈমান আনেন, আবু সুফিয়ান ও হারব্ ইবনে উমাইয়াহ ইবনে খাল্‌ফও তাঁর সাথে সাক্ষাত করে একথাই বলেছিল।

১৮. অর্থাৎ প্রথমত এটা সম্ভব নয়। কোন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে অন্যের দায়–দায়িত্ব নিজের ওপর নিতে পারে না এবং কারো বলার কারণে গোনাহকারী নিজের গোনাহের শাস্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। কারণ সেখানে তো প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে। لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না) কিন্তু ধরে নেয়া যাক যদি এমনটি হয়ও, তাহলে যে সময় কুফরী ও শিরকের পরিণতি একটি প্রজ্জ্বলিত জাহান্নামের আকারে সামনে এসে যাবে তখন কার এত বড় বুকের পাটা হবে যে, সে দুনিয়ায় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার মর্যাদা রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসে বলবে, জনাব! আমার কথায় যে ব্যক্তি ঈমান ত্যাগ করে মুরতাদ হয়েছিল আপনি তাকে মাফ করে জান্নাতে পাঠিয়ে দিন এবং আমি জাহান্নামে নিজের কুফরীর সাথে সাথে তার কুফরীর শাস্তিও ভোগ করতে প্রস্তুত আছি।

১৯. অর্থাৎ আল্লাহর সামনে যদিও তারা নিজেদের বোঝার সাথে অন্যের বোঝা বইবে না কিন্তু দ্বিগুণ বোঝা উঠানোর হাত থেকে নিষ্কৃতিও পাবে না। তাদের ওপর চাপবে তাদের নিজেদের গোমরাহ হবার একটি বোঝা। আর দ্বিতীয় একটি বোঝাও তাদের ওপর চাপানো হবে অন্যদের গোমরাহ করার। একথাটিকে এভাবে বলা যায়, এক ব্যক্তি নিজেও চুরি করে এবং অন্য ব্যক্তিকেও তার সাথে এ কাজে অংশ নিতে বলে। এখন যদি এ দ্বিতীয় ব্যক্তি তার কথায় চুরি করায় অংশ নেয়, তাহলে অন্যের কথায় অপরাধ করেছে বলে কোন আদালত তাকে ক্ষমা করে দেবে না। চুরির শাস্তি অবশ্যই সে পাবে। ন্যায় বিচারের কোন নীতি অনুযায়ী তাকে রেহাই দিয়ে তার পরিবর্তে এ শাস্তি সেই প্রথম চোরটি যে তাকে ধোঁকা দিয়ে চৌর্যবৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাকে দেয়া কোনক্রমেই ঠিক হবে না। কিন্তু সেই প্রথম চোরটি তার নিজের অপরাধের সাথে সাথে অন্যজনকে চোরে পরিণত করার অপরাধের শাস্তিও পাবে। কুরআন মজীদের অন্য এক জায়গায় এ নিয়মটিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ

"যাতে কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের বোঝাও পুরোপুরি বহন করে এবং এমনসব লোকদের বোঝার একটি অংশও বহন করে যাদেরকে তারা জ্ঞান ছাড়াই গোমরাহ করে।" (আন নাহল, ২৫)

আর এ নিয়মটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত হাদীসটিতে বর্ণনা করেছেন ঃ

من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا

"যে ব্যক্তি সঠিক পথের দিকে আহবান জানায় সে তাদের সমান প্রতিদান পাবে যারা তার আহবানে সাড়া দিয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করে, এ জন্য তাদের প্রাপ্য কোন কমতি করা হবে না। আর যে ব্যক্তি গোমরাহীর দিকে আহবান জানায় সে তাদের সবার সমান গোনাহের ভাগী হবে যারা তার অনুসরণ করে এবং এ জন্য তাদের গোনাহের মধ্যে কোন কমতি করা হবে না।" (মুসলিম)

২০. 'মিথ্যাচার' মানে এমন সব মিথ্যা কথা যা কাফেরদের নিম্নোক্ত উক্তির মধ্যে লুকিয়ে ছিল ঃ "তোমরা আমাদের অনুসরণ করো এবং তোমাদের গোনাহখাতাগুলো আমরা নিজেদের ওপর চাপিয়ে নেবো।" আসলে দু'টি বানোয়াট চিন্তার ভিত্তিতে তারা একথা বলতো। একটি হচ্ছে, তারা যে শিরকীয় ধর্মের অনুসরণ করে চলছে তা সত্য এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদী ধর্ম মিথ্যা। আর দ্বিতীয় বানোয়াট চিন্তাটি হচ্ছে, কোন কিয়ামত টিয়ামত হবে না এবং পরকালের জীবনের এ ধ্যান-ধারণা যার কারণে একজন মুসলমান কুফরী করতে ভয় পায়, এটা একেবারেই অর্থহীন ও ভিত্তিহীন। এ বানোয়াট চিন্তা নিজেদের মনে পোষণ করার পর তারা একজন মুসলমানকে বলতো, ঠিক আছে, তোমাদের মতে কুফরী করা যদি গোনাহই হয় এবং কোন কিয়ামতও যদি অনুষ্ঠিত হবার থাকে যেখানে এ গোনাহের কারণে তোমাদের জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে, তাহলে আমরা তোমাদের এ গোনাহ নিজেদের মাথায় নিয়ে নিচ্ছি, আমাদের দায়িত্বে তোমরা মুহাম্মাদের ধর্ম ত্যাগ করে তোমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মে ফিরে এসো। এ ব্যাপারের সাথে আরো দু'টি মিথ্যা কথাও জড়িত ছিল। তার একটি হচ্ছে, যে ব্যক্তি অন্যের কথায় কোন অপরাধ করে সে নিজের অপরাধের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে এবং যার কথায় সে এ অপরাধ করে সে এর পূর্ণ দায়ভার উঠাতে পারে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে তাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তারা যথার্থই তাদের দায়ভার মাথায় তুলে নেবে, যারা তাদের কথায় ঈমান পরিত্যাগ করে কুফরীর দিকে ফিরে গিয়েছিল। কারণ, যখন কিয়ামত সত্যি সত্যি কায়েম হয়ে যাবে

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾

২ রুকূ'

আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠাই[২১] এবং সে তাদের মধ্যে থাকে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর।[২২] শেষ পর্যন্ত তূফান তাদেরকে ঘিরে ফেলে এমন অবস্থায় যখন তারা জালেম ছিল।[২৩] তারপর আমি নূহকে ও নৌকা আরোহীদেরকে[২৪] রক্ষা করি এবং একে বিশ্ববাসীর জন্য একটি শিক্ষণীয় নিদর্শন করে রাখি।[২৫]

এবং তাদের আশা-আকাংখার বিরুদ্ধে জাহান্নাম তাদের চোখের সামনে বিরাজ করবে। তখন তারা কখনোই নিজেদের কুফরীর শাস্তি পাওয়ার সাথে সাথে যাদেরকে তারা দুনিয়ায় ধোঁকা দিয়ে গোমরাহ করতো তাদের গোনাহের সমস্ত বোঝাও নিজেদের ওপর চাপিয়ে নিতে রাজি হবে না।

২১. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন সূরা আলে ইমরান, ৩৩-৩৪; আন নিসা, ১৬৩; আল আন'আম, ৮৪; আল আ'রাফ, ৫৯ থেকে ৬৪; ইউনুস, ৭১ ও ৭৩; হূদ, ২৫ ও ৪৮; আল আম্বিয়া, ৭৬ ও ৭৭; আল মু'মিনূন, ২৩ ও ৩০; আল ফুরকান, ৩৭; আশ্ শূআরা, ১০৫ থেকে ১২৩; আস্ সাফ্ফাত, ৭৫ ও ৮২; আল কামার, ৯০; আল হাক্কাহ, ১১ ও ১২ আয়াত এবং সূরা নূহ সম্পূর্ণ।

যে পটভূমিতে এখানে এ কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে তা অনুধাবন করতে হলে সূরার প্রথমদিকের আয়াতগুলো সামনে রাখতে হবে। সেখানে একদিকে মু'মিনদেরকে বলা হয়েছে, তোমাদের আগে যেসব মু'মিন অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে আমি পরীক্ষার সম্মুখীন করেছি। অন্যদিকে জালেম কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা আমাকে ছাড়িয়ে চলে যাবে এবং আমার পাকড়াও থেকে বেঁচে যাবে, এ ভুল ধারণা পোষণ করো না। এ দু'টি কথা উপলব্ধি করার জন্য এ ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে।

২২. এর অর্থ এ নয় যে, হযরত নূহের বয়স ছিল সাড়ে ন'শো বছর। বরং এর অর্থ হচ্ছে, নবুওয়াতের দায়িত্বলাভ করার পর থেকে মহাপ্লাবন পর্যন্ত সাড়ে ন'শো বছর হযরত নূহ এই জালেম ও গোমরাহ জাতির সংশোধনের প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন এবং এ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাদের জুলুম-নির্যাতন বরদাশ্ত করার পরও তিনি হিম্মতহারা হননি। এখানে এ জিনিসটি বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যে, মু'মিনদেরকে বলা হচ্ছে, তোমরা তো মাত্র পাঁচ বছর থেকে জুলুম-নির্যাতন সহ্য করছো এবং একটি গোমরাহ জাতির হঠকারিতা

বরদাশত করে চলছো কিন্তু আমার এ বান্দা যে অনবরত সাড়ে ন'শো বছর ধরে এসবের মোকাবিলা করেছে তার সবর ও দৃঢ়তার কথা ভেবে দেখো।

হযরত নূহের বয়সের ব্যাপারে কুরআন মজীদ ও বাইবেলের বর্ণনায় পার্থক্য রয়েছে। বাইবেল বলে, তাঁর বয়স ছিল সাড়ে ন'শো বছর। তাঁর বয়স যখন ছ'শো বছর তখন প্লাবন আসে। এরপর তিনি আর সাড়ে তিনশো বছর জীবিত থাকেন। (আদি পুস্তক ৭ ঃ ৬, ৯ ঃ ২৮–২৯) কিন্তু কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বয়স অন্তত এক হাজার বছর হওয়া উচিত। কারণ সাড়ে ন'শো বছর তো হচ্ছে শুধুমাত্র নবুওয়াতের দায়িত্বে আসীন হবার পর থেকে নিয়ে প্লাবন শুরু হওয়া পর্যন্তকার সময়টি। এ সময়–কালটি তিনি ব্যয় করেন দীনের দাওয়াত দেবার ও তার প্রচারের কাজে। একথা সুস্পষ্ট, জ্ঞান ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি পরিপক্কতা অর্জন করেছেন এমন এক বয়সেই তিনি নবুওয়াত লাভ করেন এবং প্লাবনের পরও তিনি কিছুকাল জীবিত থেকে থাকবেন।

এত দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু আল্লাহর এ বিশ্বে বিস্ময়কর ঘটনাবলীর অভাব নেই। যেদিকেই তাকানো যাবে তাঁর অসীম ক্ষমতার নিদর্শন অস্বাভাবিক ঘটনাবলীর আকারে দৃষ্টিগোচর হবে। কিছু ঘটনা ও অবস্থার প্রথমত একটি বিশেষ আকারে আত্মপ্রকাশ করে যেতে থাকাটা এমন কোন যুক্তি পেশ করে না যার ফলে একথা মনে করা যেতে পারে যে, অন্য কোন অস্বাভাবিক অবস্থায় ভিন্নধর্মী কোন ঘটনা আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। এ পর্যায়ের ধারণাগুলোর ভিত ধসিয়ে দেবার জন্য বিশ্ব–জাহানের বিভিন্ন স্থানে এবং সৃষ্টির প্রত্যেকটি প্রজাতির মধ্যে অস্বাভাবিক অবস্থা ও ঘটনাবলীর একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। বিশেষ করে যে ব্যক্তির মনে আল্লাহর অসীম শক্তিশালী হবার সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে সে কখনো জীবন মৃত্যুর স্রষ্টা আল্লাহর পক্ষে কোন মানুষকে এক হাজার বছর বা তার চেয়ে কম–বেশী বয়স দান করা সম্ভব নয়, এ ধরনের কোন ভুল ধারণা পোষণ করতে পারে না। আসলে মানুষ নিজে চাইলেও এক মুহূর্তের জন্যও জীবিত থাকতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ চাইলে যতদিন যত বছর চান তাকে জীবিত রাখতে পারেন।

২৩. অর্থাৎ তারা নিজেদের জুলুম–নিপীড়ন চালিয়ে যেতে থাকা অবস্থায় মহাপ্লাবনের গ্রাসে পরিণত হয়। অন্য কথায়, যদি মহাপ্লাবন আসার আগে তারা নিজেদের জুলুম–নিপীড়ন থেকে বিরত হতো তাহলে আল্লাহ তাদের ওপর এ আযাব পাঠাতেন না।

২৪. অর্থাৎ যারা হযরত নূহের (আ) প্রতি ঈমান এনেছিলেন এবং যাদেরকে আল্লাহ নৌকায় আরোহণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। সূরা হূদে এর সুস্পষ্ট বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ۭ وَمَآ اٰمَنَ مَعَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلٌ –

وَإِبْرٰهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ ۖ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ أَوْثَانًا
وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُونَ
لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ۖ
وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾

আর ইবরাহীমকে পাঠাই[২৬] যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলে, "আল্লাহর বন্দেগী করো এবং তাঁকে ভয় করো।[২৭] এটা তোমাদের জন্য ভালো যদি তোমরা জানো। তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে পূজা করছো তারাতো নিছক মূর্তি আর তোমরা একটি মিথ্যা তৈরি করছো।[২৮] আসলে আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা পূজা করো তারা তোমাদের কোন রিযিকও দেবার ক্ষমতা রাখে না, আল্লাহর কাছে রিযিক চাও, তাঁরই বন্দেগী করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।[২৯] আর যদি তোমরা মিথ্যা আরোপ করো, তাহলে পূর্বে বহু জাতি মিথ্যা আরোপ করেছে[৩০] এবং রসূলের ওপর পরিষ্কারভাবে পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোন দায়িত্ব নেই।"

"শেষ পর্যন্ত যখন আমার হুকুম এসে গেলো এবং চুলা উথলে উঠলো তখন আমি বললাম, (হে নূহ) এতে উঠিয়ে নাও প্রত্যেক শ্রেণীর (প্রাণীদের) এক এক জোড়া এবং নিজের পরিবার পরিজনদেরকে। তবে যাদেরকে সংগে না নেবার জন্য পূর্বেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের কথা আলাদা। আর তার সাথে ঈমান এনেছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন।" (৪০ আয়াত)

২৫. এর অর্থ এও হতে পারে যে, এ ভয়াবহ শাস্তি অথবা এ যুগান্তকারী ঘটনাটিকে পরবর্তীকালের লোকদের জন্য শিক্ষণীয় করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে এবং সূরা কামারে একথাটি যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে একথাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নৌকাটিই ছিল শিক্ষণীয় নিদর্শন। শত শত বছর ধরে সেটি পর্বত শৃংগে অবস্থান করছিল। এর মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছিয়ে যেতে থেকেছে যে, এ ভূখণ্ডে এক সময় এমন ভয়াবহ প্লাবন এসেছিল যার ফলে এ নৌকাটি পাহাড়ের মাথায় উঠে যায়। সূরা আল কামারে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ۙ تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ۝ وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَا اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝

"আর নূহকে আমি আরোহণ করালাম তখতা ও পেরেকের তৈরি নৌকায়। তা চলছিল আমার তত্ত্বাবধানে সেই ব্যক্তির জন্য পুরস্কার স্বরূপ যাকে অস্বীকার করা হয়েছিল। আর আমি তাকে ছেড়ে দিলাম একটি নিদর্শনে পরিণত করে; কাজেই আছে কি কেউ শিক্ষা গ্রহণকারী?" (১৩–১৫ আয়াত)

সূরা আল কামারের এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে জারীর কাতাদার এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন : সাহাবীগণের আমলে মুসলমানরা যখন আল জাযীরায় যায় তখন তারা জূদী পাহাড়ের ওপর (অন্য একটি বর্ণনা মতে বাকেরওয়া নামক জনবসতির কাছে) এ নৌকাটি দেখে। বর্তমানকালে মাঝে মাঝে এ ধরনের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে দেখা গেছে যে, নূহের নৌকা অনুসন্ধান করার জন্য অভিযাত্রী দল পাঠানো হচ্ছে। এর কারণ বর্ণনা করে বলা হয়, অনেক সময় বিমান আরারাতের পার্বত্য এলাকা অতিক্রম করার সময় আরোহীরা একটি পর্বতশৃংগে একটি নৌকার মতো জিনিস দেখেছে। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আ'রাফ, ৪৭ এবং হূদ, ৪৬ টীকা)

২৬. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন, সূরা আল বাকারাহ, ১৫, ১৬ ও ৩৫; আলে ইমরান, ৭; আল আন'আম, ৯; হূদ, ৭; ইবরাহীম, ৬; আল হিজর, ৪; মারয়াম, ৩; আল আম্বিয়া, ৫; আশ শূ'আরা, ৫; আস্ সাফ্ফাত, ৩; আয্ যুখ্রুফ, ৩ এবং আয্ যারিয়াত, ২ রুকূ'সমূহ।

২৭. অর্থাৎ তাঁর সাথে কাউকে শরীক এবং তার নাফরমানী করতে ভয় করো।

২৮. অর্থাৎ তোমরা এ মূর্তি তৈরি করছো না বরং মিথ্যা তৈরি করছো। এ মূর্তিগুলোর অস্তিত্ব নিজেই একটি মূর্তিমান মিথ্যা। তার ওপর তোমাদের এ আকীদা–বিশ্বাস যে, এরা দেব–দেবী, আল্লাহর অবতার, তাঁর সন্তান, আল্লাহর সান্নিধ্যে অবস্থানকারী ও তাঁর কাছে শাফা'আতকারী অথবা এদের মধ্য থেকে কেউ রোগ নিরাময়কারী আবার কেউ সন্তান–দাতা এবং কেউ রিযিকদাতা—এসবই মিথ্যা কথা। তোমরা নিজেদের ধারণা ও কল্পনার মাধ্যমে এসব রচনা করেছো। আসল সত্য এছাড়া আর কিছুই নয় যে, এগুলো নিছক হাতে গড়া নিষ্প্রাণ মূর্তি এবং এদের কোন ক্ষমতা ও প্রভাব নেই।

২৯. এ কয়েকটি বাক্যের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ) মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে সমস্ত যুক্তি একত্র করেছেন। কাউকে মাবূদ বা আরাধ্য করতে হলে এ জন্য যুক্তিসংগত কারণ থাকতে হবে। একটি যুক্তিসংগত কারণ এ হতে পারে যে, তার নিজের সত্তার মধ্যে মাবূদ হবার কোন অধিকার থাকে। দ্বিতীয় কারণ হতে পারে, সে মানুষের স্রষ্টা এবং মানুষ নিজের অস্তিত্বের জন্য তার কাছে অনুগৃহীত। তৃতীয় কারণ হতে পারে, সে মানুষের লালন–পালনের ব্যবস্থা করে। তাকে রিযিক তথা জীবন ধারণের উপকরণ সরবরাহ করে। চতুর্থ কারণ হতে পারে, মানুষের ভবিষ্যত তার অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল এবং মানুষ আশংকা করে তার অসন্তুষ্টি অর্জন করলে তার নিজের পরিণাম অশুভ হবে। হযরত ইবরাহীম বলেন, এ চারটি কারণের কোন একটিও মূর্তি পূজার পক্ষে নয়। বরং এর

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى
اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ
ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾
يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا
أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ
اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾

এরা[৩১] কি কখনো লক্ষ করেনি আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন তারপর তার পুনরাবৃত্তি করেন? নিশ্চয়ই এ (পুনরাবৃত্তি) আল্লাহর জন্য সহজতর।[৩২] এদেরকে বলো, পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করো এবং দেখো তিনি কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর আল্লাহ দ্বিতীয়বারও জীবন দান করবেন। অবশ্যই আল্লাহ সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী।[৩৩] যাকে চান শাস্তি দেন এবং যার প্রতি চান করুণা বর্ষণ করেন, তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তোমরা না পৃথিবীতে অক্ষমকারী, না আকাশে[৩৪] এবং আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করার মতো কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী তোমাদের নেই।[৩৫]

প্রত্যেকটিই নির্ভেজাল আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের দাবী করে। "এ নিছক মূর্তিপূজা" বলে তিনি প্রথম কারণটিকে বিলুপ্ত করে দেন। কারণ নিছক মূর্তি মাবূদ হবার ব্যক্তিগত কি অধিকার লাভ করতে পারে? তারপর "তোমরা তাদের স্রষ্টা" একথা বলে দ্বিতীয় কারণটিকে বিলুপ্ত করেন। এরপর তারা তোমাদের কোন প্রকারের কোন রিযিক দান করতে পারে না, একথা বলে তৃতীয় কারণটিকে বিলুপ্ত করেন। আর সবশেষে বলেন, তোমাদের তো আল্লাহর দিকে ফিরে যেতেই হবে, এ মূর্তিগুলোর দিকে ফিরে যেতে হবে না। কাজেই তোমাদের পরিণাম ও পরকালকে সমৃদ্ধ বা ধ্বংস করার ক্ষমতাও এদের নেই। এ ক্ষমতা আছে একমাত্র আল্লাহর হাতে। এভাবে শিরককে পুরোপুরি বাতিল করে দিয়ে তিনি তাদের ওপর একথা সুস্পষ্ট করে দেন যে, মানুষ যে সমস্ত কারণে কাউকে মাবূদ বা আরাধ্য গণ্য করতে পারে তার কোনটাই এক ও লা-শারীক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইবাদাত করার দাবী করে না।

৩০. অর্থাৎ যদি তোমরা আমার তাওহীদের দাওয়াতকে এবং তোমাদের নিজেদের রবের দিকে ফিরে যেতে হবে এবং নিজেদের সমস্ত কাজের হিসেব দিতে হবে—এসব

কথাকে মিথ্যা বলো, তাহলে এটা কোন নতুন কথা নয়। ইতিহাসে এর পূর্বেও বহু নবী (যেমন নূহ, হূদ, সালেহ আলাইহিমুস সালাম প্রমুখগণ) এ একই দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁদের জাতিরাও তাঁদেরকে এমনিভাবেই মিথ্যুক বলেছে। এখন তারা এ নবীদেরকে মিথ্যুক বলে তাঁদের কোন ক্ষতি করতে পেরেছে, না নিজেদের পরিণাম ধ্বংস করেছে, এটা তোমরা নিজেরাই দেখে নাও।

৩১. এখান থেকে নিয়ে لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি) পর্যন্ত আয়াতগুলো মূল আলোচনার মাঝখানে স্বতন্ত্র প্রাসংগিক বিষয় হিসেবে আনা হয়েছে। হযরত ইবরাহীমের কাহিনীর ধারা বর্ণনা ছিন্ন করে আল্লাহ মক্কার কাফেরদেরকে সম্বোধন করে একথাগুলো বলেছেন। এ বিষয়ের সাথে এ প্রাসংগিক ভাষণের সম্পর্ক হচ্ছে এই যে, মক্কার যে কাফেরদেরকে শিক্ষা দেবার জন্য এ ভাষণ দেয়া হচ্ছে তারা দু'টি মৌলিক গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল। একটি ছিল শিরক ও মূর্তিপূজা এবং অন্যটি ছিল আখেরাত অস্বীকৃতি। এর মধ্য থেকে প্রথম গোমরাহীকে বাতিল করা হয়েছে হযরত ইবরাহীমের ওপরে উদ্ধৃত ভাষণের মাধ্যমে। এখন দ্বিতীয় গোমরাহীটিকে বাতিল করার জন্য আল্লাহ তাঁর নিজের পক্ষ থেকে এ বাক্য কয়টি বলছেন। এভাবে একই বক্তব্যের ধারাবাহিকতার মধ্যে দু'টি বিষয়কেই বাতিল করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩২. অর্থাৎ একদিকে অসংখ্য বস্তু অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভ করে এবং অন্যদিকে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের বিলুপ্তির সাথে সাথে আবার নতুন ব্যক্তিবর্গ অস্তিত্ব লাভ করতে থাকে। মুশরিকরা এসব কিছুকে আল্লাহর সৃষ্টি ও উদ্ভাবন গুণের ফল বলে মানতো। আজকের যুগের মুশরিকরা যেমন আল্লাহর স্রষ্টা হবার কথা অস্বীকার করে না তেমনি তারাও একথা অস্বীকার করতো না। তাই তাদের স্বীকৃত কথার ওপর এ প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে, তোমাদের দৃষ্টিতে যে আল্লাহ বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেন এবং তারপর মাত্র একবার সৃষ্টি করে শেষ করেন না বরং তোমাদের চোখের সামনে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া জিনিসগুলোর জায়গায় আবার একই জিনিস অনবরত সৃষ্টি করে চলেন, তাঁর সম্পর্কে তোমরা কেমন করে একথা ভাবতে পারলে যে, তোমাদের মরে যাবার পর তিনি আর পুনর্বার তোমাদের জীবিত করে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন না? (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আন নামল, ৮০ টীকা)

৩৩. অর্থাৎ যখন আল্লাহর শিল্পকারিতার বদৌলতে প্রথমবারের সৃষ্টি তোমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করছো তখন তোমাদের বুঝা উচিত, একই আল্লাহর শিল্পকারিতার মাধ্যমে দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি হবে। এ ধরনের কাজ করা তাঁর ক্ষমতার আওতা বহির্ভূত নয় এবং আওতা বহির্ভূত হতেও পারে না।

৩৪. অর্থাৎ তোমরা পালিয়ে এমন কোন জায়গায় চলে যেতে পারো না যেখানে গিয়ে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারো। তোমরা ভূগর্ভের তলদেশে কোথাও নেমে যাও অথবা আকাশের কোন উচ্চ মার্গে পৌঁছে যাও না কেন সব জায়গা থেকেই তোমাদেরকে ধরে আনা হবে এবং নিজেদের রবের সামনে হাজির করা হবে। সূরা আর রাহমানে এ কথাটিই জিন ও মানুষকে সম্বোধন করে চ্যালেঞ্জের সুরে এভাবে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও শাসন থেকে বের হয়ে যেতে পারো তাহলে একটু

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖٓ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِىْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٣﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٢٤﴾

৩ রুকূ'

যারা আল্লাহর আয়াত এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত অস্বীকার করে, তারা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ে গেছে[৩৬] এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

তারপর[৩৭] সেই জাতির জবাব এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তারা বললো, "একে হত্যা করো অথবা পুড়িয়ে ফেলো।[৩৮] শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে আগুন থেকে রক্ষা করেন।[৩৯] অবশ্যই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে এমন লোকদের জন্য যারা ঈমান আনে।[৪০]

বের হয়ে দেখিয়ে দাও। তা থেকে বের হবার জন্য শক্তির প্রয়োজন এবং সে শক্তি তোমাদের নেই। কাজেই তোমরা কোনক্রমেই বের হতে পারো না :

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ - الرحمن : ٣٣

৩৫. অর্থাৎ আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেদের শক্তির জোরে রক্ষা পাওয়ার ক্ষমতা তোমাদের নেই এবং তোমাদের এমন কোন অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক বা সাহায্যকারীও নেই যে আল্লাহর মোকাবিলায় তোমাদের আশ্রয় দিতে পারে এবং তাঁর কাছে জবাবদিহি থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারে। যারা শিরক ও কুফরী করেছে, আল্লাহর বিধানের সামনে নত হতে অস্বীকার করেছে এবং বুক ফুলিয়ে আল্লাহর নাফরমানী করেছে এং তাঁর যমীনে ব্যাপকভাবে জুলুম ও বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে, সমগ্র বিশ্ব-জাহানে তাদের সাহায্য ও সহায়তা দানকারী হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবার এবং আল্লাহর আযাবের ফায়সালাকে তাদের ওপর কার্যকর হওয়া থেকে ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা কারো নেই। অথবা সমগ্র বিশ্ব-জগতে এমন একজনও নেই যে আল্লাহর আদালতে দাঁড়িয়ে একথা বলার সাহস রাখে যে, এরা আমার লোক কাজেই এরা যা কিছু করেছে তা মাফ করে দেয়া হোক।

৩৬. অর্থাৎ আমার রহমতে তাদের কোন অংশ নেই। আমার অনুগ্রহের অংশ লাভের আশা করার কোন অবকাশ তাদের জন্য নেই। একথা সুস্পষ্ট যখন তারা আল্লাহর আয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করলো তখন আল্লাহ ঈমানদারদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা

থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে তাদের লাভবান হবার অধিকার প্রত্যাহার করে নিলেন। তারপর যখন তারা আখেরাত অস্বীকার করলো এবং কখনো তাদেরকে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে একথা স্বীকারই করলো না তখন এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, তারা আল্লাহর দান ও মাগফেরাতের সাথে কোন প্রকার আশার সম্পর্ক রাখেনি। এরপর যখন নিজেদের প্রত্যাশার বিরুদ্ধে তারা আখেরাতের জগতে চোখ খুলবে এবং আল্লাহর যেসব আয়াতকে তারা মিথ্যা বলেছিল সেগুলোকেও সত্য হিসেবে স্বচক্ষে দেখে নেবে তখন সেখানে আল্লাহর রহমতের অংশ লাভের প্রার্থী হবার কোন কারণ তাদের থাকতে পারে না।

৩৭. এখান থেকে বর্ণনা আবার হযরত ইবরাহীমের কাহিনীর দিকে মোড় নিচ্ছে।

৩৮. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীমের ন্যায়সংগত যুক্তির কোন জবাব তাদের কাছে ছিল না। তাদের যদি কোন জবাব থেকে থাকে তাহলে তা এই ছিল যে, হক কথা বলছে যে কণ্ঠটি সেটি স্তব্ধ করে দাও এবং যে ব্যক্তি আমাদের ভুল আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরছে এবং তা থেকে আমাদের বিরত থাকতে বলছে তাকে জীবন্ত রেখো না। "হত্যা করো ও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারো" শব্দাবলী থেকে একথা প্রকাশিত হচ্ছে যে, সমগ্র জনতা হযরত ইবরাহীমকে মেরে ফেলার ব্যাপারে একমত ছিল তবে মেরে ফেলার পদ্ধতির ব্যাপারে ছিল বিভিন্ন মত। কিছু লোকের মত ছিল, তাঁকে হত্যা করা হোক। আবার কিছু লোকের মত ছিল, জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হোক, এর ফলে ভবিষ্যতে যারা এ ভূখণ্ডে হক কথা বলার পাগলামী করতে চাইবে এটা তাদের জন্য একটা শিক্ষা হয়ে থাকবে।

৩৯. এ থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে একথা প্রকাশ হয় যে, তারা শেষ পর্যন্ত হযরত ইবরাহীমকে পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত করেছিল। তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এখানে শুধুমাত্র এতটুকু কথা বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ তাঁকে আগুনের হাত থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু সূরা আল আম্বিয়ায় পরিষ্কার করে বলা হয়েছে : আল্লাহর নির্দেশে আগুন হযরত ইবরাহীমের জন্য ঠাণ্ডা ও নিরাপদ বস্তু হয়ে যায়, قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ "আমি বললাম, হে আগুন! ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং শান্তি ও নিরাপত্তা হয়ে যাও ইবরাহীমের প্রতি।" (৬৯ আয়াত) একথা বলা নিষ্প্রয়োজন, তাঁকে যদি আগুনের মধ্যে নিক্ষেপই না করা হয়ে থাকতো তাহলে আগুনকে ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং তাঁর প্রতি শান্তি ও নিরাপত্তা হয়ে যাও এ হুকুম দেবার কোন অর্থই হয় না। এ থেকে একথা পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত বস্তুর ধর্ম বা প্রকৃতি মহান আল্লাহর হুকুমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি যখনই চান যে কোন বস্তুর ধর্ম ও বিশেষত্ব পরিবর্তন করতে পারেন। সাধারণভাবে আগুনের ধর্ম হচ্ছে জ্বালানো এবং দগ্ধীভূত হবার মতো প্রত্যেকটি জিনিসকে পুড়িয়ে ফেলা। কিন্তু আগুনের এ ধর্ম তার নিজের প্রতিষ্ঠিত নয় বরং আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত। তার এ ধর্মটি আল্লাহকে এমনভাবে বেঁধে ফেলেনি যে, তিনি এর বিরুদ্ধে কোন হুকুম দিতে পারেন না। তিনি নিজের আগুনের মালিক। যে কোন সময় তিনি তাকে জ্বালাবার কাজ পরিত্যাগ করার হুকুম দিতে পারেন। কোন সময় নিজের এক ইংগিতে তিনি অগ্নিকুণ্ডকে ফুল বাগানে পরিণত করতে পারেন। এ অস্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয় তাঁর রাজ্যে প্রতিদিন হয় না। কোন বড় রকমের তাৎপর্যবহ শিক্ষা ও প্রয়োজনের খাতিরেই হয়ে থাকে। কিন্তু নিয়মমাফিক যেসব জিনিস প্রতিদিন দেখতে আমরা অভ্যস্ত সেগুলোকে কোনক্রমেই এর স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে খাড়া করা যেতে পারে না যে, সেগুলোর

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا ۖ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ
وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٥﴾
فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ ۘ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾

আর সে বললো,[৪১] "তোমরা দুনিয়ার জীবনে তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তিগুলোকে নিজেদের মধ্যে প্রীতি-ভালোবাসার মাধ্যমে পরিণত করে নিয়েছো।[৪২] কিন্তু কিয়ামতের দিন তোমরা পরস্পরকে অস্বীকার এবং পরস্পরের প্রতি অভিসম্পাত করবে[৪৩] আর আগুন তোমাদের আবাস হবে এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী হবে না।" সে সময় লূত তাকে মেনে নেয়[৪৪] এবং ইবরাহীমকে বলে, আমি আমার রবের দিকে হিজরাত করছি,[৪৫] তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।[৪৬]

মধ্যে তাঁর শক্তি আবদ্ধ হয়ে গেছে এবং নিয়ম বিরোধী কোন ঘটনা আল্লাহর হুকুমেও সংঘটিত হতে পারে না।

৪০. এর মধ্যে ঈমানদারদের জন্য এ মর্মে নিদর্শন রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পরিবার, বংশ, জাতি ও দেশের ধর্ম পরিত্যাগ করে যে সত্য জ্ঞানের ভিত্তিতে তিনি শিরকের অসারতা ও তাওহীদের সত্যতা জানতে পেরেছিলেন তারই অনুসরণ করেন। আবার এ মর্মেও নিদর্শন রয়েছে যে, তিনি নিজ জাতির হঠকারিতা ও কঠোর জাতীয় স্বার্থ প্রীতি ও বিদ্বেষ অগ্রাহ্য করে তাকে মিথ্যার পথ থেকে সরিয়ে আনার ও সত্য গ্রহণ করার জন্য অনবরত প্রচার কার্য চালিয়ে যেতে থাকেন। তাছাড়া এ ব্যাপারেও নিদর্শন রয়েছে যে, তিনি আগুনের ভয়াবহ শাস্তি মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে যান এবং সত্য ও ন্যায়ের পথ পরিহার করতে প্রস্তুত হননি। নিদর্শন এ ব্যাপারেও রয়েছে যে, মহান আল্লাহ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকেও পরীক্ষার পুলসেরাত পার না করিয়ে ছাড়েননি। আবার এ ব্যাপারেও যে, হযরত ইবরাহীমকে আল্লাহ যে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন তাতে তিনি সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন, তবেই আল্লাহর সাহায্য তাঁর জন্য আসে এবং এমন অলৌকিক পদ্ধতিতে আসে যে, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড তাঁর জন্য ঠাণ্ডা করে দেয়া হয়।

৪১. বক্তব্যের ধারাবাহিকতা থেকে বুঝা যায়, আগুনের মধ্য থেকে নিরাপদে বের হয়ে আসার পর হযরত ইবরাহীম (আ) লোকদেরকে একথা বলেন।

৪২. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের পরিবর্তে মূর্তিপূজার ভিত্তিতে নিজেদের সামাজিক জীবন গড়ে তুলেছো। এ ব্যবস্থা দুনিয়ার জীবনের সীমানা পর্যন্ত তোমাদের জাতীয় সত্তাকে একত্র করে রাখতে পারে। কারণ এখানে সত্য-মিথ্যা নির্বিশেষে যে কোন আকীদার ভিত্তিতে লোকেরা একত্র হতে পারে। আর যত বড় মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর আকীদার ভিত্তিতেই যে কোন ঐক্য ও সমাজ গড়ে উঠুক না কেন তা পারস্পরিক বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, ভ্রাতৃত্ব ও অন্যান্য সকল ধর্মীয়, সামাজিক, তামাদ্দুনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হতে পারে।

৪৩. অর্থাৎ মিথ্যা আকীদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তোমাদের এ সামাজিক কাঠামো আখেরাতে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। সেখানে পারস্পরিক প্রীতি-ভালোবাসা, সহযোগিতা, আত্মীয়তা এবং আকীদা-বিশ্বাস ও কামনা-বাসনার কেবলমাত্র এমন ধরনের সম্পর্ক বজায় থাকতে পারে যা দুনিয়ায় এক আল্লাহর বন্দেগী এবং সৎকর্মশীলতা ও আল্লাহভীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। কুফরী ও শিরক এবং ভুল পথ ও কুপথের সাথে জড়িত যাবতীয় সম্পর্ক সেখানে ছিন্ন হয়ে যাবে। সকল ভালোবাসা শত্রুতায় পরিণত হবে। সমস্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি ঘৃণায় রূপান্তরিত হবে। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, পীর-মুরীদ পর্যন্ত একে অন্যের ওপর লানত বর্ষণ করবে এবং প্রত্যেকে নিজের গোমরাহীর দায়-দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে বলবে, এই জালেম আমাকে ধ্বংস করেছে, কাজেই একে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হোক। একথা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে। যেমন সূরা যুখরুফে বলা হয়েছে ঃ

اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ

"বন্ধুরা সেদিন পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে, মুত্তাকীরা ছাড়া।" (৬৭ আয়াত)

সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে ঃ

كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ۚ حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا قَالَتْ اُخْرٰهُمْ لِاُوْلٰهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ

"প্রত্যেকটি দল যখন জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন তার কাছের দলের প্রতি লানত বর্ষণ করতে করতে প্রবেশ করবে, এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন সবাই সেখানে একত্র হয়ে যাবে তখন প্রত্যেক পরবর্তী দল পূর্ববর্তী দলের পক্ষে বলবে ঃ হে আমাদের রব ! এ লোকেরাই আমাদের পথভ্রষ্ট করে, কাজেই এদেরকে দ্বিগুণ আগুনের শাস্তি দিন।" (৩৮ আয়াত)

সূরা আহযাবে বলা হয়েছে ঃ

وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ۝

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾

আর আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব (এর মতো সন্তান) দান করি[৪৭] এবং তার বংশধরদের মধ্যে রেখে দিই নবুওয়াত ও কিতাব[৪৮] এবং তাকে দুনিয়ায় এর প্রতিদান দিই আর আখেরাতে সে নিশ্চিতভাবেই সৎকর্মশীলদের অন্তরভুক্ত হবে।[৪৯]

"আর তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের সরদারদের ও বড়দের আনুগত্য করেছি এবং তারা আমাদের বিপথগামী করেছে। হে আমাদের রব! তুমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদের ওপর বড় রকমের লানত বর্ষণ করো।"

(৬৭–৬৮ আয়াত)

৪৪. বক্তব্যের বিন্যাস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যখন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আগুন থেকে বের হয়ে আসেন এবং তিনি ওপরে উল্লেখিত কথাগুলো বলেন, তখন সমগ্র সমবেত জনতার মধ্য থেকে একমাত্র হযরত লূত (আ) তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেন। হতে পারে সে সময় আরো বহুলোক মনে মনে হযরত ইবরাহীমের সত্যতা স্বীকার করে থাকবে। কিন্তু সমগ্র জাতি ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ইবরাহীমের দীনের বিরুদ্ধে যে ক্রোধ ও আক্রোশ প্রবণতার প্রকাশ সে সময় সবার চোখের সামনে হয়েছিল তা প্রত্যক্ষ করে কোন ব্যক্তি এ ধরনের ভয়ংকর সত্য মেনে নেবার এবং তার সাথে সহযোগিতা করার সাহস করতে পারেনি। এ সৌভাগ্য মাত্র এক ব্যক্তিরই হয়েছিল এবং তিনি হচ্ছেন হযরত ইবরাহীমেরই ভাতিজা হযরত লূত (আ)। শেষে তিনি হিজরাতকালেও নিজের চাচা ও চাচীর (হযরত সারাহ) সহযোগী হয়েছিলেন।

এখানে একটি সন্দেহ দেখা দেয় এবং এ সন্দেহটি নিরসন করার প্রয়োজন রয়েছে। অর্থাৎ এক ব্যক্তি প্রশ্ন করতে পারে যে, তাহলে এ ঘটনার পূর্বে কি হযরত লূত কাফের ও মুশরিক ছিলেন এবং আগুন থেকে হযরত ইবরাহীমের নিরাপদে বের হয়ে আসার অলৌকিক কাণ্ড দেখার পর তিনি ঈমানের নিয়ামত লাভ করেন? যদি একথা সত্য হয়ে থাকে, তাহলে নবুওয়াতের আসনে কি এমন কোন ব্যক্তি সমাসীন হতে পারেন যিনি পূর্বে মুশরিক ছিলেন? এর জবাব হচ্ছে, কুরআন এখানে فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ শব্দগুলো ব্যবহার করেছে। এ থেকে অনিবার্য হয়ে ওঠে না যে, ইতিপূর্বে হযরত লূত বিশ্ব-জাহানের প্রভু আল্লাহকে না মেনে থাকবেন বা তাঁর সাথে অন্য মাবুদদেরকেও শরীক করে থাকবেন বরং এ থেকে কেবলমাত্র এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, এ ঘটনার পর তিনি হযরত ইবরাহীমের রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করেন এবং তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করেন। ঈমানের

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ۖ مَا سَبَقَكُمْ
بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٨﴾ اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ
وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙ وَتَاْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ۭ فَمَا كَانَ
جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ
الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٣٠﴾

আর আমি লূতকে পাঠাই[৫০] যখন সে তার সম্প্রদায়কে বললো, "তোমরা তো এমন অশ্লীল কাজ করছো যা তোমাদের পূর্বে বিশ্ববাসীদের মধ্যে কেউ করেনি। তোমাদের অবস্থা কি এ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তোমরা পুরুষদের কাছে যাচ্ছো,[৫১] রাহাজানি করছো এবং নিজেদের মজলিসে খারাপ কাজ করছো?"[৫২] তারপর তার সম্প্রদায়ের কাছে এ ছাড়া আর কোন জবাব ছিল না যে, তারা বললো, "নিয়ে এসো আল্লাহর আযাব যদি তুমি সত্যবাদী হও।" লূত বললো, "হে আমার রব! এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো।"

সাথে যখন লাম (لام) শব্দ ব্যবহার করা হয় তখন এর অর্থ হয় কোন ব্যক্তির কথা মেনে নেয়া এবং তার আনুগত্য করা। হতে পারে হযরত লূত তখন ছিলেন একজন উঠতি বয়সের তরুণ এবং সচেতনভাবে নিজের চাচার শিক্ষার সাথে তিনি এ প্রথমবার পরিচিত হবার এবং তাঁর রিসালাত সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করে থাকবেন।

৪৫. অর্থাৎ আমার রবের জন্য হিজরাত করছি। এখন আমার রব আমাকে যেখানে নিয়ে যাবেন আমি সেখানে যাবো।

৪৬. অর্থাৎ তিনি আমাকে সহায়তা দান ও হেফাজত করার ক্ষমতা রাখেন এবং আমার পক্ষে তিনি যে ফায়সালা করবেন তা বিজ্ঞজনোচিতই হবে।

৪৭. হযরত ইসহাক (আ) ছিলেন তাঁর পুত্র এবং হযরত ইয়াকূব ছিলেন পৌত্র। এখানে হযরত ইবরাহীমের (আ) অন্যান্য পুত্রদের উল্লেখ না করার কারণ হচ্ছে এই যে, ইবরাহীম সন্তানদের মাদ্‌য়ানী শাখায় কেবলমাত্র হযরত শো'আইব আলাইহিস সালামই নবুওয়াত লাভ করেন এবং ইসমাঈলী শাখায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভ পর্যন্ত আড়াই হাজার বছরে আর কোন নবী আসেননি। পক্ষান্তরে হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম থেকে যে শাখাটি চলে তার মধ্যে একের পর এক হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত নবুওয়াত ও কিতাবের নিয়ামত প্রদত্ত হতে থাকে।

৪৮. হযরত ইবরাহীমের (আ) পরে যেসব নবীর আবির্ভাব হয় সবাই এর মধ্যে এসে গেছেন।

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مُهْلِكُوْٓا
اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝ قَالَ اِنَّ فِيْهَا
لُوْطًا ۭ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا ۡ لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا
امْرَاَتَهٗ ۡ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝

৪ রুকূ'

আর যখন আমার প্রেরিতগণ ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে পৌঁছুলো,[৫৩] তারা তাকে বললো, "আমরা এ জনপদের লোকদেরকে ধ্বংস করে দেবো,[৫৪] এর অধিবাসীরা বড়ই জালেম হয়ে গেছে।" ইবরাহীম বললো "সেখানে তো লূত আছে।"[৫৫] তারা বললো, "আমরা ভালোভাবেই জানি সেখানে কে কে আছে, আমরা তাকে ও তার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবো তার স্ত্রীকে ছাড়া;" সে ছিল পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তরভুক্ত।[৫৬]

৪৯. এখানে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, ব্যবিলনের যেসব শাসক, পণ্ডিত ও পুরোহিত হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দাওয়াতকে হেয়প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল এবং সেখানকার যে সকল মুশরিক অধিবাসী চোখ বন্ধ করে ঐ জালেমদের আনুগত্য করেছিল তারা সবাই দুনিয়ার বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং এমনভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে যে, আজ দুনিয়ার কোথাও তাদের কোন নাম নিশানাও নেই। কিন্তু যে ব্যক্তিকে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার অপরাধে তারা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চেয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত যাকে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় স্বদেশভূমি ত্যাগ করতে হয়েছিল তাঁকে আল্লাহ এমন সফলতা দান করেন যে, চার হাজার বছর থেকে দুনিয়ার বুকে তাঁর নাম সমুজ্জ্বল রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। দুনিয়ার সকল মুসলমান, খৃষ্টান ও ইহুদী রব্বুল আলামীনের সেই খলীল তথা বন্ধুকে একযোগে নিজেদের নেতা বলে স্বীকার করে। এ চল্লিশ'শ বছরে দুনিয়া একমাত্র সেই পাক-পবিত্র ব্যক্তি এবং তাঁর সন্তানদের থেকেই যা কিছু হিদায়াতের আলোক বর্তিকা লাভ করতে পেরেছে। আখেরাতে তিনি যে মহাপুরস্কার লাভ করবেন তাতো তাঁর জন্য নির্ধারিত হয়েই আছে কিন্তু এ দুনিয়ায়ও তিনি যে মর্যাদা লাভ করেছেন তা দুনিয়ার বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার প্রচেষ্টায় জীবনপাতকারীদের একজনও আজ পর্যন্ত লাভ করতে পারেনি।

৫০. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন সূরা আল আ'রাফ, ১০; হূদ, ৭; আল হিজর, ৪-৫; আল আম্বিয়া, ৫; আশ শু'আরা, ৯; আন নাম্‌ল, ৪; আস্ সাফ্‌ফাত, ৪ ও আল কামার, ২ রুকূ'।

৫১. অর্থাৎ তাদের সাথে যৌন কর্মে লিপ্ত হচ্ছো, যেমন সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّكُم لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ

"তোমরা যৌন কামনা পূর্ণ করার জন্য মহিলাদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছে গিয়ে থাকো।"

৫২. অর্থাৎ এ অশ্লীল কাজটি লুকিয়ে চাপিয়েও করো না বরং প্রকাশ্যে নিজেদের মজলিসে পরস্পরের সামনে করে থাকো। একথাটিই সূরা আন নাম্‌লে এভাবে বলা হয়েছে ঃ

اَتَاتُونَ الفَاحِشَةَ وَاَنتُم تُبصِرُونَ

"তোমরা কি এমনই বিগড়ে গিয়েছো যে, প্রকাশ্যে দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষেই অশ্লীল কাজ করে থাকো?"

৫৩. সূরা হূদ ও সূরা হিজ্‌রে এর যে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে তা হচ্ছে এই যে, লূতের জাতির ওপর আযাব নাযিল করার জন্য যেসব ফেরেশতাকে পাঠানো হয়েছিল তারা প্রথমে হযরত ইবরাহীমের কাছে হাজির হন এবং তাঁকে হযরত ইসহাকের এবং তাঁর পর হযরত ইয়াকূবের জন্মের সুসংবাদ দেন তারপর বলেন, লূতের জাতিকে ধ্বংস করার জন্য আমাদের পাঠানো হয়েছে।

৫৪. "এ জনপদ" বলে লূত জাতির সমগ্র এলাকাকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ) এ সময় ফিলিস্তিনের জাবরুন (বর্তমান আল খলীল) শহরে থাকতেন। এ শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কয়েক মাইল দূরে মরুসাগরের (Dead Sea) অংশ রয়েছে। সেখানে পূর্বে বাস করতো লূত জাতির লোকেরা এবং বর্তমানে এ সমগ্র এলাকা রয়েছে সাগরের পানির তলায়। এ এলাকাটি নিম্নভূমির দিকে অবস্থিত এবং জাবরুনের উঁচু উঁচু পর্বতগুলো থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। তাই ফেরেশতারা সেদিকে ইংগিত করে হযরত ইবরাহীমকে বলেন, "আমরা এ জনপদটি ধ্বংস করে দেবো।" (দেখুন সূরা আশ্ শু'আরা, ১১৪ টীকা)

৫৫. সূরা হূদে এ কাহিনীর প্রারম্ভিক অংশ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ) ফেরেশ্‌তাদেরকে মানুষের আকৃতিতে দেখে ভয় পেয়ে যান। কারণ এ আকৃতিতে ফেরেশতাদের আগমন কোন ভয়াবহ অভিযানের পূর্বাভাস দেয়। তারপর যখন তাঁরা তাঁকে সুসংবাদ দান করেন এবং তাঁর ভীতি দূর হয়ে যায় তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, লূতের জাতি হচ্ছে এ অভিযানের লক্ষ। তাই সে জাতির জন্য তিনি করুণার আবেদন জানাতে থাকেন ঃ

فَلَمَّا ذَهَبَ عَن اِبرَاهِيمَ الرَّوعُ وَجَاءَتهُ البُشرٰى يُجَادِلُنَا فِى قَومِ لُوطٍ اِنَّ اِبرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيبٌ

কিন্তু তাঁর এ আবেদন গৃহীত হয়নি এবং বলা হয় এ ব্যাপারে এখন আর কিছু বলো না। তোমার রবের ফায়সালা হয়ে গেছে এ আযাবকে এখন আর ফেরানো যাবে না ঃ

وَلَمَّآ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا
لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ق اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ
كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٣٣﴾ اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰٓى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ
السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةًۢ بَيِّنَةً
لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٣٥﴾

তারপর যখন আমার প্রেরিতগণ লূতের কাছে পৌঁছুলো তাদের আগমনে সে অত্যন্ত বিব্রত ও সংকুচিত হৃদয় হয়ে পড়লো।[৫৭] তারা বললো, "ভয় করো না এবং দুঃখও করো না।[৫৮] আমরা তোমাকে ও তোমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবো, তোমার স্ত্রীকে ছাড়া, সে পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তরভুক্ত। আমরা এ জনপদের লোকদের ওপর আকাশ থেকে আযাব নাযিল করতে যাচ্ছি তারা যে পাপাচার করে আসছে তার কারণে।" আর আমি সে জনপদের একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি[৫৯] তাদের জন্য যারা বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করে।[৬০]

يٰٓاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ
غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ۔

এ জবাবের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন বুঝতে পারেন লূত জাতির জন্য আর কোন অবকাশের আশা নেই তখনই তাঁর মনে জাগে হযরত লূতের চিন্তা। তিনি যা বলেন তা এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেন "সেখানে তো লূত রয়েছে।" অর্থাৎ এ আযাব যদি লূতের উপস্থিতিতে নাযিল হয় তাহলে তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ তা থেকে কেমন করে নিরাপদ থাকবেন।

৫৬. এ মহিলা সম্পর্কে সূরা তাহরীমে (১০ আয়াত) বলা হয়েছে ঃ হযরত লূতের এই স্ত্রী তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না। এ জন্য তার ব্যাপারে এ ফায়সালা করা হয় যে, একজন নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাকে আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে।

সম্ভবত হিজরাত করার পর হযরত লূত জর্দান এলাকায় বসতি স্থাপন করে থাকবেন এবং তখনই তিনি এ জাতির মধ্যে বিয়ে করে থাকবেন। কিন্তু তাঁর সাহচর্যে জীবনের একটি বিরাট অংশ পার করে দেবার পরও এ মহিলা ঈমান আনেনি এবং তার সকল সহানুভূতি ও আকর্ষণ নিজের জাতির ওপরই কেন্দ্রীভূত থাকে। যেহেতু আল্লাহর কাছে আত্মীয়তা ও রক্ত সম্পর্কের কোন গুরুত্ব নেই, প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাপারে ফায়সালা হয়

তার ঈমান ও চরিত্রের ভিত্তিতে, তাই নবীর স্ত্রী হওয়ায় তার কোন লাভ হয়নি। তার পরিণাম তার স্বামীর অনুরূপ হয়নি বরং যে জাতির ধর্ম ও চরিত্র সে গ্রহণ করে রেখেছিল তার অনুরূপ হয়।

৫৭. এ বিব্রতবোধ ও সংকুচিত হৃদয় হবার কারণ এই ছিল যে, ফেরেশতারা উঠতি বয়সের সুন্দর ও সুঠাম দেহের অধিকারী তরুণদের রূপ ধরে এসেছিলেন। হযরত লূত নিজের জাতির চারিত্রিক ও নৈতিক প্রবণতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই তাদের আসা মাত্রই তিনি পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন এ জন্য যে, তিনি যদি এ মেহমানদেরকে অবস্থান করতে দেন তাহলে ঐ ব্যভিচারী জাতির হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে আর যদি অবস্থান করতে না দেন তাহলে সেটা হবে বড়ই অভদ্র আচরণ। তাছাড়া এ আশংকাও আছে, তিনি যদি এ মুসাফিরদেরকে আশ্রয় না দেন তাহলে অন্য কোথাও তাদের রাত কাটাতে হবে এবং এর অর্থ হবে যেন তিনি নিজেই তাদেরকে নেকড়ের মুখে ঠেলে দিলেন। এর পরের ঘটনা আর এখানে বর্ণনা করা হয়নি। সূরা হূদ ও কামারে এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, এ কিশোরদের আগমন সংবাদ শুনে শহরের বহু লোক হযরত লূতের গৃহে এসে ভীড় জমালো। তারা ব্যভিচার কর্মে লিপ্ত হবার উদ্দেশে মেহমানদেরকে তাদের হাতে সোপর্দ করার জন্য চাপ দিতে লাগলো।

৫৮. অর্থাৎ আমাদের ব্যাপারে। এরা আমাদের কোন ক্ষতি করবে এ ভয়ও করো না এবং এদের হাত থেকে কিভাবে আমাদের বাঁচাবে সে চিন্তাও করো না। এ সময়ই ফেরেশতারা হযরত লূতের কাছে এ রহস্য ফাঁস করেন যে, তারা মানুষ নন বরং ফেরেশ্‌তা এবং এ জাতির ওপর আযাব নাযিল করার জন্য তাদেরকে পাঠানো হয়েছে। সূরা হূদে এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দেয়া হয়েছে, লোকেরা যখন একনাগাড়ে লূতের গৃহে প্রবেশ করে চলছিল এবং তিনি অনুভব করছিলেন এখন আর কোনক্রমেই নিজের মেহমানদেরকে তাদের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন না তখন তিনি পেরেশান হয়ে চিৎকার করে বলেন ঃ

لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ

"হায়। আমার যদি শক্তি থাকতো তোমাদের সোজা করে দেবার অথবা কোন শক্তিশালীর সহায়তা আমি লাভ করতে পারতাম।"

এ সময় ফেরেশ্‌তারা বলেন ঃ

يَا لُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْا اِلَيْكَ

"হে লূত। আমরা তোমার রবের প্রেরিত ফেরেশ্‌তা। এরা কখ্‌খনো তোমার কাছে পৌঁছুতে পারবে না।

৫৯. এই সুস্পষ্ট নিদর্শনটি হচ্ছে মরুসাগর। একে লূত সাগরও বলা হয়। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে মক্কার কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, এই জালেম জাতিটির ওপর তার কৃতকর্মের বদৌলতে যে আযাব নাযিল হয়েছিল তার একটি চিহ্ন আজো প্রকাশ্য রাজপথে বর্তমান রয়েছে। তোমরা সিরিয়ার দিকে নিজেদের বাণিজ্য সফরে যাবার সময় দিনরাত এ চিহ্নটি দেখে থাকো।

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۙ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا
الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾ فَكَذَّبُوهُ
فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَعَادًا
وَثَمُودَا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ ۖ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾

আর মাদ্‌য়ানের দিকে আমি পাঠালাম তাদের ভাই শু'আইবকে।[৬১] সে বললো, "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আল্লাহর বন্দেগী করো, শেষ দিনের প্রত্যাশী হও[৬২] এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হয়ে বাড়াবাড়ি করে বেড়িও না।" কিন্তু তারা তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো।[৬৩] শেষে একটি প্রচণ্ড ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করলো এবং তারা নিজেদের ঘরের মধ্যে[৬৪] মরে পড়ে থাকলো।

আর আদ ও সামূদকে আমি ধ্বংস করেছি। তারা যেখানে থাকতো সেসব জায়গা তোমরা দেখেছো[৬৫] তাদের কার্যাবলীকে শয়তান তাদের জন্য সুদৃশ্য বানিয়ে দিল এবং তাদেরকে সোজা পথ থেকে বিচ্যুত করলো অথচ তারা ছিল বুদ্ধি সচেতন।[৬৬]

وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ (الحجر) وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ
وَبِاللَّيْلِ (الصافات)

বর্তমান যুগে একথাটি প্রায় নিশ্চয়তা সহকারেই স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে যে, মরুসাগরের দক্ষিণ অংশটি একটি ভয়াবহ ভূমিকম্পজনিত ভূমিধ্বসের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং এ ধ্বসে যাওয়া অংশেই অবস্থিত ছিল লূত জাতির কেন্দ্রীয় নগরী সাদোম (Sodom)। এ অংশে পানির মধ্যে কিছু ডুবন্ত জনপদের ধ্বংসাবশেষও দেখা যায়। সাম্প্রতিক কালে অত্যাধুনিক ডুবুরী সরঞ্জামের সহায়তায় কিছু লোকের নীচে নেমে ঐসব ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধান প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। কিন্তু এখনো এ প্রচেষ্টাগুলোর ফলাফল জানা যায়নি। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা শু'আরা, ১১৪ টীকা)

৬০. লূতের জাতির কর্মের শরীয়াতবিহিত শাস্তির জন্য দেখুন, 'তাফহীমুল কুরআন' সূরা আ'রাফ, ৬৮ টীকা।

৬১. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন সূরা আ'রাফ, ১১; হূদ, ৮ এবং আশ্ শু'আরা, ১০ রুকূ'।

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ
فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ۖ ﴿٣٩﴾ فَكُلًّا أَخَذْنَا
بِذَنبِهِ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ
الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ۚ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

আর কারূন, ফেরাউন ও হামানকে আমি ধ্বংস করি। মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসে কিন্তু তারা পৃথিবীতে অহংকার করে অথচ তারা অগ্রগমনকারী ছিল না।[৬৭] শেষ পর্যন্ত প্রত্যেককে আমি তার গোনাহের জন্য পাকড়াও করি। তারপর তাদের মধ্য থেকে কারো ওপর আমি পাথর বর্ষণকারী বাতাস প্রবাহিত করি[৬৮] এবং কাউকে একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ আঘাত হানে[৬৯] আবার কাউকে আমি ভূগর্ভে প্রোথিত করি[৭০] এবং কাউকে ডুবিয়ে দিই।[৭১] আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলেন না কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করছিল।[৭২]

৬২. এর দু'টো অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, আখেরাতের আগমন কামনা করো। একথা মনে করো না, যা কিছু আছে ব্যস এ দুনিয়ার জীবন পর্যন্তই এবং এরপর আর এমন কোন জীবন নেই যেখানে তোমাদের নিজেদের যাবতীয় কাজ-কর্মের হিসেব দিতে হবে এবং তার পুরস্কার ও শাস্তি লাভ করতে হবে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এমন কাজ করো যার ফলে তোমরা আখেরাতে ভালো পরিণতি লাভের আশা করতে পারো।

৬৩. অর্থাৎ একথা স্বীকার করলো না যে, আল্লাহর রসূল হযরত শু'আইব (আ), যে শিক্ষা তিনি দিচ্ছেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং একে না মানলে তাদেরকে আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হতে হবে।

৬৪. ঘর বলতে এখানে এই জাতি যে এলাকায় বসবাস করতো সেই সমগ্র এলাকাকে বুঝানো হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট, যখন পুরোপুরি একটি জাতির কথা আলোচনা করা হচ্ছে তখন তার দেশই তার ঘর হতে পারে।

৬৫. আরবের যেসব এলাকায় এ দু'টি জাতির বসতি ছিল আরবের প্রতিটি শিশুও তা জানতো। দক্ষিণ আরবের যেসব এলাকা বর্তমানে আহকাফ, ইয়ামন ও হাদ্‌রা মাউত নামে পরিচিত প্রাচীনকালে সে এলাকাগুলোতে ছিল আদ জাতির বাস। আরবের লোকেরা একথা জানতো। হিজাযের দক্ষিণ অংশে রাবেগ থেকে আকাবাহ পর্যন্ত এবং মদীনা ও

খায়বর থেকে তাইমা ও তাবুক পর্যন্ত সমগ্র এলাকা আজো সামূদ জাতির ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ দেখা যায়। কুরআন নাযিল হবার যুগে এ ধ্বংসাবশেষগুলোর অবস্থা বর্তমানের তুলনায় আরো কিছু বেশী সুস্পষ্ট থেকে থাকবে।

৬৬. অর্থাৎ অজ্ঞ ও মূর্খ ছিল না। তারা ছিল তদানীন্তন যুগের শ্রেষ্ঠ সুসভ্য ও প্রগতিশীল লোক। নিজেদের দুনিয়ার কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যাপারে তারা পূর্ণ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতো। তাই একথা বলা যাবে না যে, শয়তান তাদের চোখে ঠুলি বেঁধে দিয়ে এবং বুদ্ধি বিনষ্ট করে দিয়ে নিজের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। বরঞ্চ তারা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে ও খোলা চোখে শয়তান যে পথ দেখিয়েছিল এবং যে পথে তারা বড়ই লাভ ও ভোগের সন্ধান পেয়েছিল সে পথে পাড়ি জমিয়েছিল এবং এমন পথ পরিহার করেছিল যা তাদের কাছে নীরস, বিস্বাদ এবং নৈতিক বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ হবার কারণে কষ্টকর মনে হচ্ছিল।

৬৭. অর্থাৎ পালিয়ে আল্লাহর পাকড়াও থেকে আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা ছিল না। আল্লাহর কৌশল ব্যর্থ করে দেবার ক্ষমতা তাদের ছিল না।

৬৮. অর্থাৎ আদ জাতি। তাদের ওপর অবিরাম সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত ভয়াবহ তুফান চলতে থাকে। (সূরা আল হাক্কাহ, ৭ আয়াত)

৬৯. অর্থাৎ সামূদ।

৭০. অর্থাৎ কারূন।

৭১. ফেরাউন ও হামান।

৭২. এ পর্যন্ত যেসব কাহিনী শুনানো হলো সেগুলোর বক্তব্যের লক্ষ ছিল দু'টি। একদিকে এগুলো মু'মিনদেরকে শোনানো হয়েছে, যাতে তারা হিম্মতহারা, ভগ্ন হৃদয় ও হতাশ না হয়ে পড়ে এবং বিপদ ও সংকটের কঠিন আবর্তেও ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা সহকারে সত্য ও ন্যায়ের ঝাণ্ডা উঁচু করে রাখে এবং আল্লাহর ওপর আস্থা রাখে যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর সাহায্য অবশ্যই এসে যাবে, তিনি জালেমদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং সত্যের ঝাণ্ডা উঁচু করে দেবেন। অন্যদিকে এগুলো এমন জালেমদেরকেও শুনানো হয়েছে যারা তাদের ধারণা মতে ইসলামী আন্দোলনকে সমূলে উচ্ছেদ করে দেবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিল। তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর সংযম ও সহিষ্ণুতার ভুল অর্থ গ্রহণ করছো। তোমরা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বকে একটি অরাজক রাজত্ব মনে করেছো। তোমাদের যদি এখন পর্যন্ত বিদ্রোহ, সীমালংঘন, জুলুম, নিপীড়ন ও অসৎকাজের জন্য পাকড়াও না করা হয়ে থাকে এবং সংশোধিত হবার জন্য অনুগ্রহ করে দীর্ঘ অবকাশ দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা নিজে নিজেই একথা মনে করে বসো না যে, এখানে আদতে কোন ইনসাফকারী শক্তিই নেই এবং এ ভূখণ্ডে লাগামহীনভাবে অনন্তকাল পর্যন্ত যাচ্ছে তাই করে যেতে পারবে। এ বিভ্রান্তি শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে এমন পরিণতির সম্মুখীন করবেই ইতিপূর্বে নূহের জাতি, লূতের জাতি ও শু'আইবের জাতি যার সম্মুখীন হয়েছিল, আদ ও সামূদ জাতিকে যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল এবং কারূন ও ফেরাউন যে পরিণতি স্বচক্ষে দেখে নিয়েছিল।

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ
اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ۭ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ
لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝٤١

যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে তাদের দৃষ্টান্ত হলো মাকড়সা। সে নিজের একটি ঘর তৈরি করে এবং সব ঘরের চেয়ে বেশী দুর্বল হয় মাকড়সার ঘর। হায় যদি এরা জানতো।[৭৩]

৭৩. ওপরে যতগুলো জাতির কথা বলা হয়েছে তারা সবাই শিরকে লিপ্ত ছিল। নিজেদের উপাস্যের ব্যাপারে তাদের আকীদা ছিল ঃ এরা আমাদের সহায়ক সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক (Guardians) এরা আমাদের ভাগ্য ভাংগা গড়ার ক্ষমতা রাখে। এদের পূজা করে এবং এদেরকে মানত ও নজরানা পেশ করে যখন আমরা এদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবো তখন এরা আমাদের কাজ করে দেবে এবং সব ধরনের বিপদ-আপদ থেকে আমাদের বাঁচাবে। কিন্তু যেমন ওপরের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে দেখানো হয়েছে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন তাদের ধ্বংসের ফায়সালা করা হয় তখন তাদের উপরোল্লিখিত সমস্ত আকীদা-বিশ্বাস ও ধারণা-কল্পনা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। সে সময় তারা যেসব দেব-দেবী, অবতার, অলী, আত্মা, জিন বা ফেরেশ্‌তাদের পূজা করতো তাদের একজনও তাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি এবং নিজেদের মিথ্যা আশার ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে তারা মাটির সাথে মিশে গেছে। এসব ঘটনা বর্ণনা করার পর এখন মহান আল্লাহ মুশরিকদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলছেন, বিশ্ব-জাহানের প্রকৃত মালিক ও শাসনকর্তাকে বাদ দিয়ে একেবারে অক্ষম বান্দা ও সম্পূর্ণ কাল্পনিক উপাস্যদের ওপর নির্ভর করে যে আশার আকাশ কুসুম তোমরা রচনা করেছো তার প্রকৃত অবস্থা মাকড়শার জালের চাইতে বেশী কিছু নয়। মাকড়শার জাল যেমন আঙ্গুলের সামান্য একটি টোকাও বরদাশ্‌ত করতে পারে না, তেমনি তোমাদের আশার অট্টালিকাও আল্লাহর ব্যবস্থার সাথে প্রথম সংঘাতেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। তোমরা যে কল্পনা বিলাসের এমন এক চক্করের মধ্যে পড়ে আছো, এটা নিছক তোমাদের মূর্খতার কারসাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। সত্যের যদি সামান্যতম জ্ঞানও তোমাদের থাকতো, তাহলে তোমরা এসব ভিত্তিহীন সহায় ও নির্ভরের ওপর কখনো জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না। সত্য কেবলমাত্র এতটুকুই, এ বিশ্ব-জাহানে ক্ষমতার মালিক একমাত্র রব্বুল আলামীন ছাড়া আর কেউ নেই এবং একমাত্র তাঁরই ওপর নির্ভর করা যেতে পারে।

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى
لَا انْفِصَامَ لَهَا ۭ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا
إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾

এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে জিনিসকেই ডাকে আল্লাহ তাকে খুব ভালোভাবেই জানেন এবং তিনিই পরাক্রান্ত ও জ্ঞানী।[৭৪] মানুষকে উপদেশ দেবার জন্য আমি এ দৃষ্টান্তগুলো দিয়েছি কিন্তু এগুলো একমাত্র তারাই বুঝে যারা জ্ঞান সম্পন্ন। আল্লাহ আসমান ও যমীনকে সত্য-ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন,[৭৫] প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে একটি নিদর্শন রয়েছে মু'মিনদের জন্য।[৭৬]

"যে ব্যক্তি তাগুতকে (আল্লাহ বিরোধী শক্তিকে) অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সে এমন মজবুত নির্ভরকে আঁকড়ে ধরেছে যা কখনো ছিন্ন হবার নয়। বস্তুত আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।" (আল বাকারাহ, ২৫৬ আয়াত)

৭৪. অর্থাৎ যেসব জিনিসকে এরা মাবূদে পরিণত করেছে এবং যাদেরকে সহায্যের জন্য আহবান করে তাদের প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন। তাদের কোন ক্ষমতাই নেই। একমাত্র আল্লাহই ক্ষমতার মালিক এবং তাঁরই বিচক্ষণ কর্মকুশলতা ও জ্ঞান এ বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থা পরিচালনা করছে।

এ আয়াতের আর একটি অনুবাদ এও হতে পারে, "আল্লাহ খুব ভালোভাবেই জানেন, তাঁকে বাদ দিয়ে এরা যাদেরকে ডাকে তারা কিছুই নয় (অর্থাৎ ভিত্তিহীন ও ক্ষমতাহীন) এবং একমাত্র তিনিই পরাক্রম ও জ্ঞানের অধিকারী।

৭৫. অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের এ ব্যবস্থা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, মিথ্যার ওপর নয়। পরিষ্কার মন-মানসিকতা নিয়ে যে ব্যক্তিই এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে তার কাছে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ পৃথিবী ও আকাশ ধারণা কল্পনার ওপর নয় বরং প্রকৃত সত্য ও বাস্তব ঘটনার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু বুঝবে ও উপলব্ধি করবে এবং নিজের ধারণা ও কল্পনার ভিত্তিতে যে দর্শনই তৈরি করবে তা যে এখানে যথাযথভাবে খাপ খেয়ে যাবে, তার কোন সম্ভাবনাই নেই। এখানে তো একমাত্র এমন জিনিসই সফলকাম হতে এবং স্থিরতা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, যা হয় প্রকৃত সত্য ও বাস্তব ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যশীল। বাস্তব ঘটনা বিরোধী ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে যে ইমারতই দাঁড় করানো হবে তা শেষ পর্যন্ত প্রকৃত সত্যের সাথে সংঘাত বাধিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। বিশ্ব-জাহানের এ ব্যবস্থা পরিষ্কার সাক্ষ দিচ্ছে যে, এক আল্লাহ্ হচ্ছেন এর স্রষ্টা, এক আল্লাহ্ই এর মালিক ও পরিচালক। এ বাস্তব বিষয়টির

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ۭ اِنَّ
الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ ۭ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ
مَا تَصْنَعُوْنَ ۝۴۵

৫ রুকূ'

(হে নবী!) তোমার প্রতি অহির মাধ্যমে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তা তেলাওয়াত করো এবং নামায কায়েম করো,[৭৭] নিশ্চিতভাবেই নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।[৭৮] আর আল্লাহর স্মরণ এর চাইতেও বড় জিনিস।[৭৯] আল্লাহ জানেন তোমরা যা কিছু করো।

বিরুদ্ধে যদি কোন ব্যক্তি এ ধারণা নিয়ে কাজ করতে থাকে যে, এ দুনিয়ার কোন আল্লাহ নেই অথবা এ ধারণা করে চলতে থাকে যে, এর বহু খোদা আছে, যারা মানত ও নজরানার জিনিস খেয়ে নিজেদের ভক্ত-অনুরক্তদের এখানে সবকিছু করার স্বাধীনতা এবং নিশ্চিন্তে নিরাপদে থাকার নিশ্চয়তা দিয়ে দেয়, তাহলে তার এ ধারণার কারণে প্রকৃত সত্যের মধ্যে সামান্যতমও পরিবর্তন ঘটবে না বরং সে নিজেই যে কোন সময় একটি বিরাট আঘাতের সম্মুখীন হবে।

৭৬. অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টির মধ্যে তাওহীদের সত্যতা এবং শির্ক ও নাস্তিক্যবাদের মিথ্যা হবার ওপর একটি পরিষ্কার সাক্ষ-প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু এ সাক্ষ প্রমাণের সন্ধান একমাত্র তারাই পায় যারা নবীগণের শিক্ষা মেনে নেয়। নবীগণের শিক্ষা অস্বীকারকারীরা সবকিছু দেখার পরও কিছুই দেখে না।

৭৭. আপাত দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু আসলে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে উদ্দেশ করেই বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। তাদের ওপর সে সময় যেসব জুলুম-নিপীড়ন চালানো হচ্ছিল এবং ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য তাদের যেসব কঠিন সমস্যা ও সংকটের মুখোমুখি হতে হচ্ছিল সে সবের মোকাবিলা করার জন্য পিছনের চার রুকূ'তে অনবরত সবর, দৃঢ়তা ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার উপদেশ দেবার পর এখন তাদেরকে বাস্তব ব্যবস্থা হিসেবে কুরআন তেলাওয়াত ও নামায কায়েম করার কথা বলা হচ্ছে। কারণ এ দু'টি জিনিসই মু'মিনকে, এমন সুগঠিত চরিত্র ও উন্নততর যোগ্যতার অধিকারী করে যার সাহায্যে সে বাতিলের প্রবল বন্যা এবং দুষ্কৃতির ভয়াবহ ঝন্‌ঝার মোকাবিলায় শুধু মাত্র টিকে থাকতে নয় বরং তার গতি ফিরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু কুরআন তেলাওয়াত ও নামাযের মাধ্যমে এ শক্তি মানুষ তখনই অর্জন করতে পারে যখন সে কুরআনের শুধুমাত্র শব্দগুলো পাঠ করেই ক্ষান্ত হয় না বরং তার শিক্ষাগুলোও সঠিকভাবে অনুধাবন করে হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীতে সেগুলোকে সঞ্চারিত করে যেতে থাকে এবং তার নামায কেবলমাত্র শারীরিক কসরতের

মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তার অন্তরের প্রতিধ্বনি এবং চরিত্র ও কর্মের সক্রিয় শক্তিতে পরিণত হয়। সামনের দিকের বক্তব্যে কুরআন মজীদ নিজেই নামাযের কাংখিত গুণ বর্ণনা করছে। আর কুরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে এতটুকু জানা দরকার যে, মানুষের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে তার হৃদয়তন্ত্রীতে যে তেলাওয়াত আঘাত হানতে পারে না তা তাকে কুফরীর বন্যা প্রবাহের মোকাবিলায় শক্তি তো দূরের কথা ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার শক্তিও দান করতে পারে না। যেমন হাদীসে একটি দল সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

يقرأون القران ولا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية

"তারা কুরআন পড়বে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নীচে নামবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন শর ধনুক থেকে বরে হয়ে যায়।" (বুখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা)

আসলে যে তেলাওয়াতের পরে মানুষের মন-মানস, চিন্তা-চেতনা ও চরিত্র-কর্মনীতিতেও কোন পরিবর্তন আসে না বরং কুরআন পড়ার পরও কুরআন যা নিষেধ করে মানুষ তা সব করে যেতে থাকে তা একজন মু'মিনের কুরআন তেলাওয়াত হতেই পারে না। এ সম্পর্কে তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার বলেন ঃ ما امن بالقران من استحل محارمه "কুরআনের হারামকৃত জিনিসকে যে হালাল করে নিয়েছে সে কুরআনের প্রতি ঈমান আনেনি।" (তিরমিযী এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছে হযরত সুহাইব রূমী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে) এ ধরনের তেলাওয়াত মানুষের আত্মিক সংশোধন এবং তার আত্মায় শক্তি সঞ্চার করার পরিবর্তে তাকে আল্লাহর মোকাবিলায় আরো বেশী বিদ্রোহী এবং নিজের বিবেকের মোকাবিলায় আরো বেশী নির্লজ্জ করে তোলে। এ অবস্থায় তার মধ্যে চরিত্র বলে কোন জিনিসেরই আর অস্তিত্ব থাকে না। কারণ যে ব্যক্তি কুরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে মেনে নেয়, তা পাঠ করে তার মধ্যে আল্লাহ তাকে কি নির্দেশ দিয়েছেন তা জানতেও থাকে এবং তারপর তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে যেতে থাকে, তার ব্যাপারটা তো দাঁড়ায় এমন একজন অপরাধীর মতো যে আইন না জানার কারণে নয় বরং আইন সম্পর্কে ভালোভাবে জানার পর অপরাধমূলক কাজ করে। এ অবস্থাটিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ছোট্ট বাক্যের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত চমৎকারভাবে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন ঃ القران حجة لك او عليك "কুরআন তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ।" (মুসলিম) অর্থাৎ যদি কুরআনকে যথাযথভাবে অনুসরণ করে চলা হয় তাহলে তা তোমার জন্য সাক্ষ ও প্রমাণ হবে। দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত যেখানেই তোমাকে জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে সেখানেই তুমি নিজের সাফাই হিসেবে কুরআনকে পেশ করতে পারবে। অর্থাৎ তুমি বলতে পারবে, আমি যা কিছু করেছি এ কিতাব অনুযায়ী করেছি। যদি তোমার কাজ যথার্থই কুরআন অনুযায়ী হয়ে থাকে তাহলে দুনিয়ায় ইসলামের কোন বিচারক তোমাকে শাস্তি দিতে পারবেন না এবং আখেরাতে হাশরের ময়দানেও তোমাকে পাকড়াও করা হবে না। কিন্তু যদি এ কিতাব তোমার কাছে পৌছে গিয়ে থাকে এবং তা পড়ে তুমি জেনে নিয়ে থাকো তোমার রব তোমাকে কি বলতে চান, তোমাকে কোন্ কাজের হুকুম দেন, কোন্ কাজ

করতে নিষেধ করেন এবং আবার তুমি তার বিরোধী কর্মনীতি অবলম্বন করো, তাহলে এ কিতাব তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবে। আল্লাহর অদালতে এ কিতাব তোমার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলাকে আরো বেশী জোরদার করে দেবে। এরপর না জানার ওজর পেশ করে শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অথবা হাল্কা শাস্তি লাভ করা তোমার জন্য সম্ভব হবে না।

৭৮. নামাযের বহু গুণের মধ্যে এটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গুণ। পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এটিকে সুস্পষ্ট করে এখানে পেশ করা হয়েছে। মক্কার বিরুদ্ধ পরিবেশে মুসলমানরা যে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার মোকাবিলা করার জন্য তাদের বস্তুগত শক্তির চাইতে বেশী প্রয়োজন ছিল নৈতিক শক্তির। এ নৈতিক শক্তির উদ্ভব ও তার বিকাশ সাধনের জন্য প্রথমে দু'টি ব্যবস্থা অবলম্বন করার কথা বলা হয়েছে। একটি হচ্ছে কুরআন তেলাওয়াত করা এবং দ্বিতীয়টি নামায কায়েম করা। এরপর এখন এখানে বলা হচ্ছে, নামায কায়েম করা হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে তোমরা এমনসব দুষ্কৃতি থেকে মুক্ত হতে পারো ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে যেগুলোতে তোমরা নিজেরাই লিপ্ত ছিলে এবং যেগুলোতে বর্তমানে লিপ্ত আছে তোমাদের চারপাশের আরবীয় ও অনারবীয় জাহেলী সমাজ।

এ পর্যায়ে নামাযের এই বিশেষ উপকারিতার কথা বলা হয়েছে কেন, একটু চিন্তা করলে একথা অতি সহজে অনুধাবন করা যেতে পারে। একথা সুস্পষ্ট যে, নৈতিক দুষ্কৃতিমুক্ত চরিত্রের অধিকারী লোকেরা এর মাধ্যমে কেবলমাত্র দুনিয়ায় ও আখেরাতেই লাভবান হয় না বরং এর ফলে তারা অনিবার্যভাবে এমন সব লোকদের ওপর ব্যাপক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে যারা নানান নৈতিক দুষ্কৃতির শিকার হয়ে গেছে এবং এসব দুষ্কৃতির লালনকারী জাহেলিয়াতের পূতিগন্ধময় অপবিত্র ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অশ্লীল ও অসৎকাজ বলতে যেসব দুষ্কৃতি বুঝায় মানুষের প্রকৃতি সেগুলোকে খারাপ বলে জানে এবং সবসময় সকল জাতি ও সকল সমাজের লোকেরা, কার্যত তারা যতই বিপথগামী হোক না কেন, নীতিগতভাবে সেগুলোকে খারাপই মনে করে এসেছে। কুরআন নাযিল হওয়ার সময় আরবের সমাজ মানসও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না। সে সমাজের লোকেরাও নৈতিকতার পরিচিত দোষ-গুণ সম্পর্কে সচেতন ছিল। তারা অসৎকাজের মোকাবিলায় সৎকাজের মূল্য জানতো। কদাচিত হয়তো এমন কোন লোকও তাদের মধ্যে থেকে থাকবে যে অসৎকাজকে ভালো কাজ মনে করে থাকবে এবং ভালো কাজকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে থাকবে। এ অবস্থায় এ বিকৃত সমাজের মধ্যে যদি এমন কোন আন্দোলন সৃষ্টি হয় যার সাথে জড়িত হওয়ার সাথে সাথেই সংশ্লিষ্ট সমাজের ব্যক্তিবর্গ নিজেরাই নৈতিক দিক দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং নিজেদের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে নিজেদের সমকালীন লোকদের থেকে সুস্পষ্ট উন্নতি লাভ করে, তাহলে অবশ্যই সে তার প্রভাব বিস্তার না করে থাকতে পারে না। এটা কোনক্রমেই সম্ভবপর ছিল না যে, আরবের সাধারণ লোকেরা অসৎকাজ নির্মূলকারী এবং সৎ ও পবিত্র-পরিচ্ছন্ন মানুষ গঠনকারী এ আন্দোলনের নৈতিক প্রভাব মোটেই অনুভব করবে না এবং এর মোকাবিলায় নিছক জাহেলিয়াত প্রীতির অন্তসারশূন্য শ্লোগানের ভিত্তিতে এমনসব লোকদের সাথে সহযোগিতা করে যেতে থাকবে যারা নিজেরাই নৈতিক

দুষ্কৃতিতে লিপ্ত ছিল এবং জাহেলিয়াতের যে ব্যবস্থা শত শত বছর থেকে সে দুষ্কৃতিগুলো লালন করে চলছিল তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। এ কারণেই কুরআন এ অবস্থায় মুসলমানদের বস্তুগত উপকরণাদি ও শক্তিমত্তা সংগ্রহ করার পরামর্শ দেবার পরিবর্তে নামায কায়েম করার নির্দেশ দিচ্ছে। এর ফলে মুষ্টিমেয় মানুষের এ দলটি এমন চারিত্রিক শক্তির অধিকারী হবে যার ফলে তারা মানুষের মন জয় করে ফেলবে এবং তীর ও তরবারির সাহায্য ছাড়াই শত্রুকে পরাজিত করবে।

এ আয়াতে নামাযের যে গুণ বর্ণনা করা হয়েছে তার দু'টি দিক রয়েছে। একটি তার অনিবার্য গুণ। অর্থাৎ সে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। আর দ্বিতীয়টি তার কাংখিত গুণ। অর্থাৎ নামায আদায়কারী কার্যক্ষেত্রে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখুক। বিরত রাখার ব্যাপারে বলা যায়, নামায অবশ্যই এ কাজ করে। যে ব্যক্তিই নামাযের ধরনের ব্যাপারে সামান্য চিন্তা করবে সে-ই স্বীকার করবে, মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য যত ধরনের ব্রেক লাগানো সম্ভব তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী কার্যকর ব্রেক নামাযই হতে পারে। এরচেয়ে বড় প্রভাবশালী নিরোধক আর কী হতে পারে যে, মানুষকে প্রতিদিন পাঁচবার আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য আহবান করা হবে এবং তার মনে একথা জাগিয়ে দেয়া হবে যে, তুমি এ দুনিয়ায় স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী নও বরং এক আল্লাহর বান্দা এবং তোমার আল্লাহ হচ্ছেন তিনি যিনি তোমার প্রকাশ্য ও গোপন সকল কাজ এমনকি তোমার মনের ইচ্ছা ও সংকল্পও জানেন এবং এমন একটি সময় অবশ্যই আসবে যখন তোমাকে আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে নিজের যাবতীয় কাজের জবাবদিহি করতে হবে। তারপর কেবলমাত্র একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত থাকলে চলবে না বরং কার্যত প্রত্যেক নামাযের সময় যাতে লুকিয়ে লুকিয়েও সে আল্লাহর কোন হুকুম অমান্য না করে তার অনুশীলনও করতে হবে। নামাযের জন্য ওঠার পর থেকে শুরু করে নামায খতম করা পর্যন্ত মানুষকে অনবরত এমনসব কাজ করতে হয় যেগুলো করার সময় সে আল্লাহর হুকুম মেনে চলছে অথবা তার বিরুদ্ধাচরণ করছে একথা সে এবং তার আল্লাহ ছাড়া তৃতীয় কোন সত্তা জানতে পারে না। যেমন, যদি করো অযু ভেঙ্গে গিয়ে থাকে এবং সে নামায পড়তে দাঁড়ায়, তাহলে তার যে অযু নেই একথা সে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কে-ই বা জানতে পারবে। মানুষ যদি নামাযের নিয়তই না করে এবং বাহ্যত রুকু', সিজদা ও উঠা-বসা করে নামাজের সূরা-কেরাত, দোয়া-দরূদ ইত্যাদি পড়ার পরিবর্তে নিরবে গজল পড়তে থাকে তাহলে সে যে আসলে নামায পড়েনি সে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কে এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারবে? এ সত্ত্বেও যখন মানুষ শরীর ও পোশাকের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন থেকে শুরু করে নামাযের আরকান ও সূরা-কেরাত-দোয়া-দরূদ পর্যন্ত সবকিছু সম্পন্ন করে আল্লাহ নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী প্রতিদিন পাঁচবার নামায পড়ে তখন তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ নামাযের মাধ্যমে প্রতিদিন কয়েকবার তার বিবেকে প্রাণ সঞ্চার করা হচ্ছে, তার মধ্যে দায়িত্বের অনুভূতি সৃষ্টি করা হচ্ছে, তাকে দায়িত্বশীল মানুষে পরিণত করা হচ্ছে এবং যে আইনের প্রতি সে ঈমান এনেছে তা মেনে চলার জন্য বাইরে কোন শক্তি থাক বা না থাক এবং বিশ্ববাসী তার কাজের অবস্থা জানুক বা না জানুক নিজের আনুগত্য প্রবণতার প্রভাবাধীনে গোপনে ও প্রকাশ্যে সকল অবস্থায় সে সেই আইন মেনে চলবে—কার্যত তাকে এরি অনুশীলন করানো হচ্ছে।

এ দৃষ্টিতে বিচার করলে একথা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় থাকে না যে, নামায কেবলমাত্র মানুষকে অশ্লীল ও অসৎকাজ থেকেই বিরত রাখে না বরং আসলে দুনিয়ায় দ্বিতীয় এমন কোন অনুশীলন পদ্ধতি নেই যা মানুষকে দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে এত বেশী প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করতে পারে। এখন প্রশ্ন থেকে যায়, মানুষ নিয়মিত নামায পড়ার পর কার্যতও দুষ্কৃতি থেকে দূরে থাকে কি না। জবাবে বলা যায়, এটা নির্ভর করে যে ব্যক্তি আত্মিক সংশোধন ও পরিশুদ্ধির অনুশীলন করছে তার ওপর। সে যদি এ থেকে উপকৃত হবার সংকল্প করে এবং এ জন্য প্রচেষ্টা চালায়, তাহলে নামাযের সংশোধনমূলক প্রভাব তার ওপর পড়বে। অন্যথায় দুনিয়ার কোন সংশোধন ব্যবস্থা এমন ব্যক্তির ওপর কার্যকর হতে পারে না যে তার প্রভাব গ্রহণ করতে প্রস্তুতই নয় অথবা জেনে বুঝে তার প্রভাবকে দূরে সরিয়ে দিতে থাকে। এর দৃষ্টান্ত যেমন দেহের পরিপুষ্টি ও প্রবৃদ্ধি হচ্ছে খাদ্যের অনিবার্য বিশেষত্ব। কিন্তু এ ফল তখনই লাভ করা সম্ভবপর হতে পারে যখন মানুষ তাকে শরীরের অংশে পরিণত হবার সুযোগ দেবে। যদি কোন ব্যক্তি প্রত্যেক বারে খাবার পরে বমি করে সমস্ত খাবার বের করে দিতে থাকে তাহলে এ ধরনের আহার তার জন্য মোটেই উপকারী হতে পারে না। এ ধরনের কোন ব্যক্তিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখিয়ে যেমন একথা বলা চলে না যে, খাদ্য দ্বারা দেহের পরিপুষ্টি হয় না। কারণ, দেখা যাচ্ছে অমুক ব্যক্তি আহার করার পরও শুকিয়ে যাচ্ছে। এভাবে এমন একজন নামাযী যে অসৎকাজ করে যেতেই থাকে, তার দৃষ্টান্ত পেশ করেও একথা বলা যেতে পারে না যে, নামায অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে না। কারণ, ওমুক ব্যক্তি নামায পড়ার পরও খারাপ কাজ করে। এ ধরনের নামাযী সম্পর্কে তো একথা বলাই বেশী যুক্তিযুক্ত হবে যে, সে আসলে নামায পড়ে না যেমন যে ব্যক্তি আহার করে বমি করে তার সম্পর্কে একথা বলা বেশী যুক্তিযুক্ত যে, সে আসলে আহার করে না।

ঠিক একথাই বিভিন্ন হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অনেক নেতৃস্থানীয় সাহাবী ও তাবেঈগণ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। ইমরান ইবনে হুসাইন বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له "যার নামায তাকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখেনি তার নামাযই হয়নি।" (ইবনে আবী হাতেম) ইবনে আব্বাস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে,

من لم تنهه صلوته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله الا بعدا

"যার নামায তাকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখেনি তাকে তার নামায আল্লাহ থেকে আরো দূরে সরিয়ে দিয়েছে।" (ইবনে আবী হাতেম ও তাবারানী)

হাসান বাসরী (র) একই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুরসাল রেওয়ায়াতের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। (ইবনে জারীর ও বাইহাকী) ইবনে মাসউদ (রা) থেকে নবী করীমের (সা) এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে :

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٤٦﴾

আর[৮০] উত্তম পদ্ধতিতে ছাড়া আহলে কিতাবের সাথে বিতর্ক করো না[৮১] তবে তাদের মধ্যে যারা জালেম[৮২] তাদেরকে বলো, "আমরা ঈমান এনেছি আমাদের প্রতি যা পাঠানো হয়েছে তার প্রতি এবং তোমাদের প্রতি যা পাঠানো হয়েছিল তার প্রতিও, আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ একজনই এবং আমরা তাঁরই আদেশ পালনকারী।"[৮৩]

لا صلوة لمن لم يطع الصلوة وطاعة الصلوة ان تنهى عن الفحشاء والمنكر

"যে ব্যক্তি নামাযের আনুগত্য করেনি তার নামাযই হয়নি আর নামাযের আনুগত্য হচ্ছে, মানুষ অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে।" (ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম)

একই বক্তব্য সম্বলিত একাধিক উক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হাসান বাসরী, কাতাদাহ, আ'মাশ ও আরো অনেকের থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। ইমাম জাফর সাদেক বলেন, যে ব্যক্তি তার নামায কবুল হয়েছে কিনা একথা জানতে চায় তার দেখা উচিত তার নামায তাকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে কি পরিমাণ বিরত রেখেছে। যদি নামাযের বাধা দেবার পর সে খারাপ কাজ করা থেকে বিরত হয়ে থাকে, তাহলে তার নামায কবুল হয়ে গেছে। (রূহুল মা'আনী)

৭৯. এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, আল্লাহর যিকির (অর্থাৎ নামায) এর চেয়ে বড়। এর প্রভাব কেবল নেতিবাচকই নয়। শুধুমাত্র অসৎকাজ থেকে বিরত রেখেই সে ক্ষান্ত থাকে না। বরং সামনে অগ্রসর হয়ে সে সৎকাজে উৎসাহিত এবং সুকৃতি সম্পাদনের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী হবার জন্য মানুষকে উদ্যোগী করে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর স্মরণ নিজেই অনেক বড় জিনিস, সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। মানুষের কোন কাজ এর চেয়ে বেশী ভালো নয়। এর তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমার আল্লাহকে স্মরণ করার চাইতে আল্লাহর তোমাকে স্মরণ করা অনেক বেশী বড় জিনিস। কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন ঃ فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ "তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাদের স্মরণ করবো।" (আল বাকারাহ ১৫২ আয়াত) কাজেই বান্দা যখন নামাযে আল্লাহকে স্মরণ করবে তখন অবশ্যই আল্লাহও তাকে স্মরণ করবেন। আর বান্দার আল্লাহকে স্মরণ করার তুলনায় আল্লাহর বান্দাকে স্মরণ করা অনেক বেশী উচ্চমানের। এ তিনটি অর্থ ছাড়া আরো একটি

সূক্ষ্ম অর্থও এখানে হয়। হযরত আবুদ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সম্মানিতা স্ত্রী এ অর্থটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহর স্মরণ নামায পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং তার সীমানা এর চাইতেও বহুদূর বিস্তৃত। যখন মানুষ রোযা রাখে, যাকাত দেয় বা অন্য কোন সৎকাজ করে তখন অবশ্যই সে আল্লাহকে স্মরণই করে, তবেই তো তার দ্বারা ঐ সৎকাজটি সম্পাদিত হয়। অনুরূপভাবে যখন কোন ব্যক্তি কোন অসৎকাজ করার সুযোগ পাওয়ার পর তা থেকে দূরে থাকে তখন এটাও হয় আল্লাহর স্মরণেরই ফল। এ জন্য আল্লাহর স্মরণ একজন মু'মিনের সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়।

৮০. উল্লেখ্য, সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে এ সূরায় হিজরাত করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। সে সময় হাবশাই ছিল মুসলমানদের পক্ষে হিজরাত করে যাবার জন্য একমাত্র নিরাপদ জায়গা। আর হাবশায় সে সময় ছিল খৃষ্টানদের প্রাধান্য। তাই আহলে কিতাবের মুখোমুখি হলে দীনের ব্যাপারে তাদের সাথে কোন্ ধরনের ও কিভাবে আলাপ আলোচনা করতে হবে আয়াতগুলোতে সেসব উপদেশ দেয়া হয়েছে।

৮১. অর্থাৎ বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনা উপযুক্ত যুক্তি-প্রমাণ সহকারে, ভদ্র ও শালীন ভাষায় এবং বুঝবার ও বুঝাবার ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে করতে হবে। এর ফলে যার সাথে আলোচনা হয় তার চিন্তার সংশোধন হবে। প্রচারকের চিন্তা করা উচিত, তিনি শ্রোতার হৃদয় দুয়ার উন্মুক্ত করে সত্যকথা তার মধ্যে বসিয়ে দেবেন এবং তাকে সঠিক পথে আনবেন। একজন পাহলোয়ানের মতো তার লড়াই করা উচিত নয়, যার উদ্দেশ্যই হয় প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেয়া। বরং একজন ডাক্তারের মতো তাকে সবসময় উদ্বিগ্ন থাকতে হবে, যিনি তার রোগীর চিকিৎসা করার সময় একথাকে গুরুত্ব দেন যে, তাঁর নিজের কোন ভুলের দরুন রোগীর রোগ যেন আরো বেশী বেড়ে না যায় এবং সর্বাধিক কম কষ্ট সহ্য করে যাতে তাঁর রোগীর রোগ নিরাময় হওয়া সম্ভব হয় এ জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আহলি কিতাবের সাথে বিতর্ক-আলোচনা করার ব্যাপারে এ নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু এটা কেবলমাত্র বিশেষভাবে আহ্‌লি কিতাবদের জন্য নয় বরং দীনের প্রচারের ক্ষেত্রে এটি একটি সাধারণ নির্দেশ। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এর উল্লেখ রয়েছে। যেমন ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ -

"আহবান করো নিজের রবের পথের দিকে প্রজ্ঞা ও উৎকৃষ্ট উপদেশের মাধ্যমে এবং লোকদের সাথে উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক-আলোচনা করো।" (আন নাহল, ১২৫)

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ -

"সুকৃতি ও দুষ্কৃতি সমান নয়। (বিরোধীদের আক্রমণ) প্রতিরোধ করো উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে। তুমি দেখবে এমন এক ব্যক্তি যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে এমন হয়ে গেছে যেমন তোমার অন্তরংগ বন্ধু।" (হা-মীম আস্ সাজদাহ, ৩৪)

ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ط نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ

"তুমি উত্তম পদ্ধতিতে দুষ্কৃতি নির্মূল করো। আমি জানি (তোমার বিরুদ্ধে) তারা যেসব কিছু তৈরি করে।" (আল মু'মিনূন, ৯৬)

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ -

"ক্ষমার পথ অবলম্বন করো, ভালো কাজ করার নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলো। আর যদি (মুখে মুখে জবাব দেবার জন্য) শয়তান তোমাকে উস্কানী দেয় তাহলে আল্লাহর আশ্রয় চাও।" (আল আ'রাফ, ১৯৯-২০০)

৮২. অর্থাৎ যারা জুলুমের নীতি অবলম্বন করে তাদের সাথে তাদের জুলুমের প্রকৃতি বিবেচনা করে ভিন্ন নীতিও অবলম্বন করা যেতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে, সবসময় সব অবস্থায় সব ধরনের লোকদের মোকাবিলায় নরম ও সুমিষ্ট স্বভাবের হয়ে থাকলে চলবে না। যেন মানুষ সত্যের আহবায়কের ভদ্রতাকে দুর্বলতা ও অসহায়তা মনে না করে বসে। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে অবশ্যই ভদ্রতা, বিনয়, শালীনতা ও যুক্তিবাদিতার শিক্ষা দেয় কিন্তু হীনতা ও দীনতার শিক্ষা দেয় না। তাদেরকে প্রত্যেক জালেমের জুলুমের সহজ শিকারে পরিণত হবার শিক্ষা দেয় না।

৮৩. এ বাক্যগুলোতে মহান আল্লাহ নিজেই উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে বিতর্ক-আলোচনার পথ-নির্দেশ দিয়েছেন। সত্য প্রচারের দায়িত্ব যারা গ্রহণ করেছেন তাদের এ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। এখানে শেখানো হয়েছে, যে ব্যক্তির সাথে তোমাকে বিতর্ক করতে হবে তার ভ্রষ্টতাকে আলোচনার সূচনা বিন্দুতে পরিণত করো না। বরং সত্য ও ন্যায়-নীতির যে অংশগুলো তোমার ও তার মধ্যে সমভাবে বিরাজ করছে সেগুলো থেকে আলোচনা শুরু করো। অর্থাৎ বিরোধীয় বিন্দু থেকে আলোচনা শুরু না করে ঐক্যের বিন্দু থেকে শুরু করতে হবে। তারপর সেই সর্বসম্মত বিষয়াবলী থেকে যুক্তি পেশ করে শ্রোতাকে একথা বুঝাবার চেষ্টা করতে হবে যে, তোমার ও তার মধ্যে যেসব বিষয়ে বিরোধ রয়েছে সেগুলোতে তোমার অভিমত সর্বসম্মত ভিত্তিগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রাখে এবং তার অভিমত হচ্ছে তার বিপরীতধর্মী।

এ প্রসংগে মনে রাখতে হবে, আহলি কিতাব আরবের মুশরিকদের মতো অহী, রিসালাত ও তাওহীদ অস্বীকারকারী ছিল না। বরং তারা মুসলমানদের মতো এ সত্যগুলো স্বীকার করতো। এ মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করার পর যদি তাদের মধ্যে মতবিরোধের বড় কোন ভিত্তি হতে পারতো তাহলে তা হতো এই যে, তাদের কাছে যেসব আসমানী কিতাব এসেছে মুসলমানরা সেগুলো মানছে না এবং মুসলমানদের নিজেদের কাছে যে আসমানী কিতাব এসেছে তাদেরকে তার প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছে আর তা গ্রহণ না করলে তাদেরকে কাফের গণ্য করছে। বিরোধের জন্য এটি খুবই শক্তিশালী ভিত্তি হতে পারতো। কিন্তু মুসলমানদের অবস্থান ছিল এ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আহলি কিতাবের কাছে যেসব কিতাব ছিল সেসবকেই তারা সত্য বলে মানতো এবং এ

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ۭ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰٓؤُلَاۗءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ۭ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ۝۴۷

(হে নবী) আমি এভাবেই তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি,[৮৪] এ জন্য যাদেরকে আমি প্রথমে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে[৮৫] এবং এদের অনেকেও এতে বিশ্বাস করছে[৮৬] আর আমার আয়াত একমাত্র কাফেররাই অস্বীকার করে।[৮৭]

সংগে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যে অহী নাযিল হয়েছিল তার প্রতি তারা ঈমান এনেছিল। এরপর কোন্ যুক্তিসংগত কারণে আহলি কিতাব এক আল্লাহরই নাযিল করা একটি কিতাব মানে এবং অন্যটি মানে না একথা বলার দায়িত্ব ছিল তাদের নিজেদেরই। এ জন্য আল্লাহ এখানে মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন, যখনই আহলি কিতাবদের মুখোমুখি হবে সবার আগে তাদের কাছে ইতিবাচকভাবে নিজেদের এ অবস্থানটি তুলে ধরো। তাদেরকে বলো, তোমরা যে আল্লাহকে মানো আমরাও তাঁকেই মানি এবং আমরা তাঁর হুকুম পালন করি। তাঁর পক্ষ থেকে যে বিধান, নির্দেশ ও শিক্ষাবলীই এসেছে, তা তোমাদের ওখানে বা আমাদের এখানে যেখানেই আসুক না কেন, সেসবের সামনে আমরা মাথা নত করে দেই। আমরা তো হুকুমের দাস। দেশ, জাতি ও বংশের দাস নই। আল্লাহর হুকুম এক জায়গায় এলে আমরা মেনে নেবো এবং এই একই আল্লাহর হুকুম অন্য জায়গায় এলে আমরা তা মানবো না, এটা আমাদের রীতি নয়। একথা কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বার বার বলা হয়েছে। বিশেষ করে আহলি কিতাবের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে তো জোর দিয়ে এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন দেখুন, সূরা আল বাকারার ৪, ১৩৬, ১৭৭; আলে ইমরানের ৮৪; আন্ নিসার ১৩৬, ১৫০–১৫২, ১৬২–১৬৪ এবং আশ্ শুরার ১৩ আয়াত।

৮৪. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, যেভাবে পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি আমি কিতাব নাযিল করেছিলাম ঠিক তেমনিভাবে এ কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি। দুই, আমি এই শিক্ষা সহকারেই একে নাযিল করেছি যে, আমার পূর্ববর্তী কিতাবগুলো অস্বীকার করে নয় বরং সেগুলো সব স্বীকার করে নিয়েই একে মানতে হবে।

৮৫. পূর্বাপর বিষয়বস্তু নিজেই একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, এখানে সমস্ত আহলি কিতাবের কথা বলা হয়নি। বরং এমন সব আহলি কিতাবের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহর কিতাবের সঠিক জ্ঞান ও উপলব্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যারা কেবলমাত্র এ কিতাব বহনকারী চতুষ্পদ জীবের মতো নিছক কিতাবের বোঝা বহন করে বেড়াতেন না বরং প্রকৃত অর্থেই ছিলেন কিতাবধারী। তাদের সামনে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ববর্তী কিতাবগুলোকে সত্যায়িত করে এ শেষ কিতাবটি এলো তখন তারা কোন

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ
اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٤٨﴾ بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ
اُوْتُوا الْعِلْمَ ۭ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٩﴾

(হে নবী) ইতিপূর্বে তুমি কোন কিতাব পড়তে না এবং স্বহস্তে লিখতেও না, যদি এমনটি হতো, তাহলে মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করতে পারতে।[৮৮] আসলে এগুলো হচ্ছে উজ্জ্বল নিদর্শন এমন লোকদের মনের মধ্যে যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে[৮৯] এবং জালেমরা ছাড়া আর কেউ আমার আয়াত অস্বীকার করে না।

প্রকার জিদ, হঠকারিতা ও সংকীর্ণ স্বার্থ প্রীতির আশ্রয় নিলেন না এবং তাকেও ঠিক তেমনি আন্তরিকতা সহকারে স্বীকার করে নিলেন যেমন পূর্ববর্তী কিতাবগুলোকে স্বীকার করতেন।

৮৬. "এদের" শব্দের মাধ্যমে আরববাসীদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, সত্যপ্রিয় লোকেরা, তারা আহলি কিতাব বা অ-আহলি কিতাব যারাই হোক না কেন, সর্বত্রই এর প্রতি ঈমান আনছে।

৮৭. এখানে তাদেরকে কাফের বলা হয়েছে যারা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ প্রীতি ত্যাগ করে সত্য কথা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। অথবা যারা নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও অবাধ স্বাধীনতার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করার ব্যাপারে পিছটান দেয় এবং এরি ভিত্তিতে সত্য অস্বীকার করে।

৮৮. এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের সপক্ষে একটি যুক্তি। ইতিপূর্বে সূরা ইউনুস ও সূরা কাসাসে এ যুক্তি আলোচিত হয়েছে (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস, ২১ টীকা এবং সূরা কাসাস, ৬৪ ও ১০৯ টীকা। এ বিষয়বস্তুর আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা নাহল, ১০৭; বনী ইসরাঈল, ১০৫; আল মু'মিনূন, ৬৬; আল ফুরকান, ১২ এবং আশ্ শূরা, ৮৪ টীকাগুলো অধ্যয়নও সহায়ক হবে)।

এ আয়াতে যুক্তির ভিত্তি হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন নিরক্ষর। তাঁর স্বদেশবাসী ও আত্মীয়-বান্ধবগণ, যাদের মধ্যে তিনি শৈশব থেকে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত জীবনকাল অতিবাহিত করেছিলেন, সবাই ভালোভাবে জানতো তিনি সারা জীবন কখনো কোন বই পড়েননি এবং কলম হাতে ধরেননি। এ সত্য ঘটনাটি পেশ করে মহান আল্লাহ বলছেন, এটি একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষাবলী, পূর্ববর্তী নবীগণের অবস্থা, বিভিন্ন ধর্ম ও দীনের আকীদা-বিশ্বাস, প্রাচীন জাতিসমূহের ইতিহাস এবং সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মানবিক জীবন যাপনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী সম্পর্কে যে গভীর ও ব্যাপক জ্ঞানের প্রকাশ এ নিরক্ষর নবীর কণ্ঠ থেকে হচ্ছে তা তিনি অহী ছাড়া অন্য

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۭ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ
عِنْدَ اللّٰهِ ۭ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ
يُّؤْمِنُوْنَ ۝

এরা বলে, "কেনই বা এই ব্যক্তির ওপর নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ করা হয়নি[৯০] এর রবের পক্ষ থেকে?" বলো, "নিদর্শনাবলী তো রয়েছে আল্লাহর কাছে এবং আমি কেবলমাত্র পরিষ্কারভাবে সতর্ককারী।" আর এদের জন্য কি এ (নিদর্শন) যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদেরকে পড়ে শুনানো হয়?[৯১] আসলে যারা ঈমান আনে তাদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে রহমত ও নসিহত।[৯২]

কোন উপায়ে অর্জন করতে পারতেন না। যদি তিনি লেখাপড়া জেনে থাকতেন এবং লোকেরা কখনো তাঁকে বই পড়তে এবং অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে দেখতো তাহলে তো অবশ্যই বাতিলপন্থীদের জন্য এ ধরনের সন্দেহ পোষণ করার কোন ভিত্তি থাকতো যে, এসব জ্ঞান অহীর মাধ্যমে নয় বরং জাগতিক মেধা, প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর নিরক্ষরতা তো তাঁর সম্পর্কে নামমাত্র কোন সন্দেহ পোষণ করার সুযোগ ও ভিত্তিও অবশিষ্ট রাখেনি। এখন নিছক হঠকারিতা ছাড়া তাঁর নবুওয়াত স্বীকার করার আর এমন কোন কারণই নেই যাকে কোন পর্যায়েও যুক্তিসঙ্গত বলা যেতে পারে।

৮৯. অর্থাৎ একজন নিরক্ষরের পক্ষে কুরআনের মতো একটি কিতাব পেশ করা এবং সহসা এমনসব অসাধারণ বিস্ময়কর ঘটনাবলীর প্রকাশ ঘটানো যেগুলোর জন্য পূর্বাহ্নে প্রস্তুতি গ্রহণ করার কোন উদ্যোগ আয়োজন কখনো কারো চোখে পড়েনি, এগুলোই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকদের দৃষ্টিতে তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ পেশকারী উজ্জ্বলতম নিদর্শন। দুনিয়ার ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের মধ্য থেকে যারই অবস্থা পর্যালোচনা করা যাবে, তাঁরই নিজস্ব পরিবেশে মানুষ এমনসব উপাদানের সন্ধান লাভ করতে পারবে যেগুলো তার ব্যক্তিত্ব গঠনে এবং তার অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকাশের জন্য তাকে প্রস্তুত করার ব্যাপারে সক্রিয় ছিল। তার পরিবেশ ও তার ব্যক্তিত্ব গঠনের উপাদানের মধ্যে একটা পরিষ্কার সম্পর্ক পাওয়া যায়। কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্বে যেসব বিস্ময়কর গুণাবলী ও কৃতিত্বের প্রকাশ ঘটেছিল তার কোন উৎস তাঁর পরিবেশে খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর ছিল না। এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্ব গঠনের উপাদানের সাথে কোন প্রকার দূরবর্তী সম্পর্ক রাখে এমনসব উপাদান সেকালে আরবীয় সমাজের এবং আশপাশে যেসব দেশের সাথে আরবদের সম্পর্ক ছিল তাদের সমাজের কোথাও থেকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। এ বাস্তবতার ভিত্তিতেই এখানে বলা

হয়েছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্তা একটি নিদর্শনের নয় বরং বহু নিদর্শনের সমষ্টি। মূর্খ এর মধ্যে কোন নিদর্শন দেখতে পায় না, এটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু জ্ঞানীরা এ নিদর্শনগুলো দেখে মনে মনে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, কেবলমাত্র একজন নবীই এ কৃতিত্বের অধিকারী হতে পারেন।

৯০. অর্থাৎ মু'জিযা, যেগুলো দেখে বিশ্বাস করা যায় সত্যই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর নবী।

৯১. অর্থাৎ নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের প্রতি কুরআনের মতো একটি কিতাব নাযিল হওয়া, এটি তোমাদের রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য যথেষ্ট হবার মতো বড় মু'জিযা নয় কি? এর পরও কি আর কোন মু'জিযার প্রয়োজন থাকে? অন্য মু'জিযাগুলোতো যারা দেখেছে তাদের জন্য মু'জিযা ছিল কিন্তু এ মু'জিযাটি তো সর্বক্ষণ তোমাদের সামনে রয়েছে, প্রতিদিন তোমাদের পড়ে শুনানো হচ্ছে। তোমরা সবসময় তা দেখতে পারো।

কুরআন মজীদের এ যুক্তি–প্রমাণ পেশ করার পরও যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাক্ষর প্রমাণ করার চেষ্টা করে তাদের দুঃসাহস দেখে অবাক হতে হয়। অথচ এখানে কুরআন পরিষ্কার ভাষায় নবী করীমের (সা) নিরক্ষর হবার বিষয়টিকে তাঁর নবুওয়াতের সপক্ষে একটি শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে পেশ করছে। যেসব হাদীসের ভিত্তিতে নবী করীম (সা) সাক্ষর ছিলেন অথবা পরে লেখাপড়া শিখেছিলেন বলে দাবী করা হয়, সেগুলো তো প্রথম দৃষ্টিতেই প্রত্যাখ্যান করার যোগ্য। কারণ কুরআন বিরোধী কোন হাদীসই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তারপর এগুলো নিজেই এত দুর্বল যে, এগুলোর ওপর কোন যুক্তির ভিত্ খাড়া করা যেতে পারে না। এগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে বুখারীর একটি হাদীস। তাতে বলা হয়েছে : হুদাইবিয়ার চুক্তি সংঘটিত হওয়ার সময় যখন চুক্তিনামা লেখা হচ্ছিল তখন মক্কার কাফেরদের প্রতিনিধিরা রসূলে করীমের (সা) নামের সাথে রসূলুল্লাহ লেখার ওপর আপত্তি জানায়। তখন নবী (সা) চুক্তি লেখককে (অর্থাৎ হযরত আলী) নির্দেশ দেন, ঠিক আছে 'রসূলুল্লাহ' শব্দটি কেটে দিয়ে তার জায়গায় লেখো 'মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ'। হযরত আলী (রা) 'রসূলুল্লাহ' শব্দ কেটে দিতে অস্বীকার করেন। নবী করীম (সা) তাঁর হাত থেকে কলম নিয়ে নিজেই শব্দটি কেটে দেন এবং 'মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ' লিখে দেন।

কিন্তু এ হাদীসটি বারাআ ইবনে আযিব থেকে বুখারীতে চার জায়গায় এবং মুসলিমে দু'জায়গায় উদ্ধৃত হয়েছে। প্রত্যেক জায়গায় এর শব্দাবলী বিভিন্ন।

এক : বুখারী চুক্তি অধ্যায়ে এর শব্দগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

قال لعلى امحه فقال على ما انا بالذى امحاه فمحاه رسول الله بيده –

"নবী করীম (সা) আলীকে বললেন এ শব্দগুলো কেটে দাও। আলী বললেন, আমি তো কেটে দিতে পারি না। শেষে নবী করীম (সা) নিজ হাতে তা কেটে দেন।"

দুই : এ কিতাবে অন্য একটি হাদীসের শব্দাবলী হচ্ছে :

ثم قال لعلى امح رسول الله قال لا والله لا امحوك ابدا فاخذ رسول الله الكتاب فكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله

"তারপর আলীকে বললেন, রসূলুল্লাহ শব্দ কেটে দাও। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি কখনো আপনার নাম কাটবো না। শেষে নবী করীম (সা) দলীলটি নিয়ে লিখলেন, "এটি সেই চুক্তি যা আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ সম্পাদন করেছেন।"

তিন : তৃতীয় হাদীসও বারাআ ইবনে আযিব থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম বুখারী এটি জিযিয়া অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন :

وكان لا يكتب فقال لعلى امح رسول الله فقال على والله لا امحاه ابدا قال فارنيه قال فاراه اياه فمحاه النبى صلى الله عليه وسلم بيده -

"নবী করীম (সা) নিজে লিখতে পারতেন না। তিনি হযরত আলীকে বললেন, রসূলুল্লাহটা কেটে দাও। আলী বললেন, আল্লাহর কসম, আমি এ শব্দগুলো কখনোই কাটবো না। একথায় নবী করীম (সা) বলেন, যেখানে এ শব্দগুলো লেখা আছে সে জায়গাটা আমাকে দেখিয়ে দাও। তিনি তাঁকে জায়গাটি দেখিয়ে দিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের হাতে সে শব্দগুলো কেটে দিলেন।

চার : চতুর্থ হাদীসটি বুখারীর যুদ্ধবিগ্রহ অধ্যায়ে এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে :

فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قاضى محمد بن عبد الله

"কাজেই নবী করীম (সা) সে দলীলটি নিয়ে নিলেন অথচ তিনি লিখতে জানতেন না এবং তিনি লিখলেন। এটি সেই চুক্তি যেটি স্থির করেছেন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ।"

পাঁচ : একই বর্ণনাকারী বারাআ ইবনে আযিব থেকে মুসলিমের কিতাবুল জিহাদে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেটি হচ্ছে, নবী করীম (সা) আলীর অস্বীকৃতির কারণে নিজের হাতে "আল্লাহর রসূল" শব্দ কেটে দেন।

ছয় : এ কিতাবে অন্য একটি হাদীস একই বর্ণনাকারী থেকেই বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলীকে বলেন, রসূলুল্লাহ শব্দ কোথায় লেখা আছে আমাকে দেখিয়ে দাও। হযরত আলী তাঁকে জায়গাটি দেখিয়ে দিলেন এবং তিনি সেটি বিলুপ্ত করে আবদুল্লাহর পুত্র লিখে দেন।

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۗ وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى
لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ۗ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٣﴾ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ
بِالْعَذَابِ ۗ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ ۙ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَغْشٰىهُمُ
الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا
مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٥﴾

৬ রুকূ'

(হে নবী!) বলো, "আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মধ্যে সবকিছু জানেন। যারা বাতিলকে মানে ও আল্লাহকে অমান্য করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"

এরা তোমার কাছে দাবী করছে আযাব দ্রুত আনার জন্য।[৯৩] যদি একটি সময় নির্ধারিত না করে দেয়া হতো, তাহলে তাদের ওপর আযাব এসেই যেতো এবং নিশ্চিতভাবেই (ঠিক সময় মতো) তা অকস্মাত এমন অবস্থায় এসে যাবেই যখন তারা জানতেও পারবে না। এরা তোমার কাছে আযাব দ্রুত আনার দাবী করছে অথচ জাহান্নাম এ কাফেরদেরকে ঘেরাও করে নিয়েছে (এবং এরা জানতে পারবে) সেদিন যখন আযাব এদেরকে ওপর থেকে ঢেকে ফেলবে এবং পায়ের নিচে থেকেও আর বলবে, যেসব কাজ তোমরা করতে এবার তার মজা বোঝো।

উল্লেখিত হাদীসগুলোর বর্ণনার মধ্যে যে অস্থিরতা ফুটে উঠেছে তা পরিষ্কারভাবে একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, মাঝখানের বর্ণনাকারীরা হযরত বারাআ ইবনে আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শব্দগুলো হুবহু উদ্ধৃত করেননি। তাই তাদের কারো একজনের বর্ণনার ওপর নির্ভর করে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে একথা বলা যেতে পারে না যে, নবী করীম (সা) "মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ" শব্দগুলো নিজ হাতেই লেখেন। হতে পারে, সঠিক ঘটনা হয়তো এ রকম ছিল ঃ যখন হযরত আলী "রসূলুল্লাহ" শব্দ কেটে দিতে অস্বীকার করেন তখন তিনি তাঁর কাছ থেকে সে জায়গাটি জিজ্ঞেস করে নিয়ে নিজের হাতে সেটি

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾
كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٥٨﴾ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا
وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا
اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٠﴾

হে আমার বান্দারা, যারা ঈমান এনেছো। আমার যমীন প্রশস্ত, কাজেই তোমরা আমারই বন্দেগী করো।[৯৪] প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ পেতে হবে। তারপর তোমাদের সবাইকে আমার দিকে ফিরিয়ে আনা হবে[৯৫] যারা ঈমান এনেছে এবং যারা সৎকাজ করেছে তাদেরকে আমি জান্নাতের উঁচু ও উন্নত ইমারতের মধ্যে রাখবো, যেগুলোর নিচে দিয়ে নদী বয়ে যেতে থাকবে। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। কতইনা উত্তম প্রতিদান কর্মশীলদের জন্য[৯৬] —তাদের জন্য যারা সবর করেছে[৯৭] এবং যারা নিজেদের রবের প্রতি আস্থা রাখে।[৯৮] কত জীব-জানোয়ার আছে যারা নিজেদের জীবিকা বহন করে না। আল্লাহই তাদেরকে জীবিকা দেন এবং তোমাদের জীবিকাদাতাও তিনিই, তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।[৯৯]

কেটে দেন এবং তারপর তাঁর সাহায্যে বা অন্য কোন লেখকের সহায়তায় মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ শব্দ লিখে দিয়ে থাকবেন। অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায়, এ সময় দু'জন লেখক চুক্তিনামা লেখার কাজে নিয়োজিত ছিলেন, এদের একজন ছিলেন হযরত আলী (রা) এবং অন্যজন ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ (ফাতহুল বারি, ৫ খণ্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা)। কাজেই একজন লেখক যে কাজ করেননি দ্বিতীয়জন যে তা করেছেন, এটা মোটেই অসম্ভব নয়। তবুও যদি বাস্তবেই এটা ঘটে থাকে যে, নবী করীম (সা) নিজের নাম নিজের পবিত্র হাতে লিখে দিয়েছেন, তাহলে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। দুনিয়ায় এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, একজন নিরক্ষর লোক শুধুমাত্র নিজের নামটি লেখা শিখে নিয়েছে, এ ছাড়া আর কিছুই লিখতে পড়তে পারে না।

অন্য যে হাদীসটির ভিত্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাক্ষর দাবী করা হয়ে থাকে সেটি মুজাহিদ থেকে ইবনে আবী শাইবা এবং আমর ইবনে শুবাহ উদ্ধৃত করেছেন। তার শব্দাবলী হচ্ছে ঃ

ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ

"ইন্তিকালের পূর্বে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লিখতে ও পড়তে শিখেছিলেন।"

কিন্তু প্রথমত সনদের দিক দিয়ে এটি অত্যন্ত দুর্বল রেওয়ায়াত, যেমন হাফেয ইবনে কাসীর বলেন, فضعيف لا اصل له (অর্থাৎ এটি দুর্বল রেওয়ায়াত, এর কোন ভিত্তি নেই।)। দ্বিতীয়ত এর দুর্বলতাও সুস্পষ্ট। অর্থাৎ যদি নবী করীম (সা) পরবর্তী পর্যায়ে লেখাপড়া শিখে থাকেন, তাহলে এটা সাধারণ্যে প্রচারিত হবার কথা। বহু সংখ্যক সাহাবী এ বিষয়টি বর্ণনা করতেন। এই সংগে নবী করীম (সা) কার কাছে বা কার কার কাছে লেখাপড়া শিখেছেন তাও জানা যেতো। কিন্তু একমাত্র মুজাহিদ যার কাছ থেকে একথা শুনেন সেই আওন ইবনে আবদুল্লাহ ছাড়া আর কেউ একথা বর্ণনা করেননি। আর এই আওনও সাহাবী নন। বরং তিনি একজন তাবেঈ। কোন্ সাহাবী বা কোন্ কোন্ সাহাবী থেকে তিনি একথা শুনেছেন তাও তিনি ঘুণাক্ষরেও বলেননি। একথা সুস্পষ্ট, এ ধরনের দুর্বল রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে এমন কোন কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না যা অত্যন্ত সুপরিচিত ও ব্যাপকভাবে প্রচারিত ঘটনার বিরোধিতা করে।

৯২. অর্থাৎ নিসন্দেহে এ কিতাব অবতীর্ণ হওয়া আল্লাহর মহা অনুগ্রহ স্বরূপ। এর মধ্যে রয়েছে বান্দার জন্য বিপুল পরিমাণ উপদেশ ও নসিহত। কিন্তু এ থেকে একমাত্র তারাই উপকৃত হতে পারে যারা এর প্রতি ঈমান আনে।

৯৩. অর্থাৎ বারবার চ্যালেঞ্জের কণ্ঠে দাবী জানাচ্ছে, যদি তুমি রসূল হয়ে থাকো এবং আমরা যথার্থই সত্যের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে থাকি, তাহলে তুমি যে আযাবের ভয় আমাদের দেখিয়ে থাকো তা নিয়ে আসছো না কেন?

৯৪. এখানে হিজরাতের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, যদি মক্কায় আল্লাহর বন্দেগী করা কঠিন হয়ে থাকে, তাহলে দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাও। আল্লাহর পৃথিবী সংকীর্ণ নয়। যেখানেই তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে বসবাস করতে পারো সেখানে চলে যাও। তোমাদের জাতি ও দেশের নয় বরং আল্লাহর বন্দেগী করা উচিত। এ থেকে জানা যায়, আসল জিনিস জাতি ও দেশ নয় বরং আল্লাহর বন্দেগী। যদি কখনো জাতি ও দেশ প্রেমের দাবী এবং আল্লাহর বন্দেগীর দাবীর মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে তাহলে সেটিই হয় মু'মিনের ঈমানের পরীক্ষার সময়। যে সাচ্চা মু'মিন হবে, সে আল্লাহর বন্দেগী করবে এবং দেশ ও জাতিকে পরিত্যাগ করবে। আর যে মিথ্যা ঈমানের দাবীদার হবে, সে ঈমান পরিত্যাগ করবে এবং নিজের দেশ ও জাতিকে আঁকড়ে ধরবে। এ আয়াতটি এ ব্যাপারে একেবারে সুস্পষ্ট যে, একজন সত্যিকার আল্লাহর অনুগত ব্যক্তি দেশ ও জাতি প্রেমিক হতে পারে কিন্তু দেশ ও জাতি পূজারী হতে পারে না। তার কাছে আল্লাহর বন্দেগী হয় সব জিনিসের চেয়ে প্রিয় এবং দুনিয়ার সমস্ত জিনিসকে সে এর কাছে বিকিয়ে দেয় কিন্তু দুনিয়ার কোন জিনিসের কাছে একে বিকিয়ে দেয় না।

৯৫. অর্থাৎ প্রাণের কথা ভেবো না। এ তো কখনো না কখনো চলে যাবেই। চিরকাল থাকার জন্য কেউই দুনিয়ায় আসেনি। কাজেই এ দুনিয়ায় কিভাবে প্রাণ বাঁচিয়ে চলতে হবে এটা তোমাদের জন্য কোন চিন্তাযোগ্য বিষয় নয়। বরং আসল চিন্তাযোগ্য বিষয় হচ্ছে,

ঈমান কেমন করে বাঁচানো যাবে এবং আল্লাহর আনুগত্যের দাবী কিভাবে পূরণ করা যাবে। শেষ পর্যন্ত তোমাদের ফিরে আমার দিকে আসতে হবে। যদি দুনিয়ায় প্রাণ বাঁচাবার জন্য ঈমান হারিয়ে চলে আসো তাহলে এর ফল হবে ভিন্ন কিছু। আর ঈমান বাঁচাবার জন্য যদি প্রাণ হারিয়ে চলে আসো তাহলে এর পরিণাম হবে অন্য রকম। কাজেই আমার কাছে যখন ফিরে আসবে তখন কি নিয়ে ফিরে আসবে, কেবল একথাটিই চিন্তা করো। প্রাণের জন্য উৎসর্গীত ঈমান, না ঈমানের জন্য উৎসর্গীত প্রাণ নিয়ে?

৯৬. অর্থাৎ ধরে নেয়া যাক যদি ঈমান ও নেকীর পথে চলে তোমরা দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামত থেকে বঞ্চিতও হয়ে যাও এবং পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে পুরোপুরি ব্যর্থতার মৃত্যু বরণও করে থাকো তাহলে বিশ্বাস করো অবশ্যই এ ক্ষতিপূরণ হবে এবং নিছক ক্ষতিপূরণই হবে না বরং সর্বোত্তম প্রতিদানও পাওয়া যাবে।

৯৭. অর্থাৎ যারা সব রকমের সমস্যা, সংকট, বিপদ-আপদ, ক্ষতি ও কষ্টের মোকাবিলায় ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যারা ঈমান আনার বিপদ নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। ঈমান ত্যাগ করা, উপকারিতা ও মুনাফা যারা নিজের চোখে দেখেছে এবং এরপরও তার প্রতি সামান্যতমও ঝুঁকে পড়েনি। যারা কাফের ও ফাসেকদেরকে নিজেদের সামনে ফুলে ফেঁপে উঠতে দেখেছে এবং তাদের ধন-দৌলত ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তির দিকে ভুলেও নজর দেয়নি।

৯৮. অর্থাৎ যারা নিজেদের সহায়-সম্পত্তি, কাজ-করবার ও বংশ-পরিবারের ওপর ভরসা করেনি বরং নিজেদের রবের ওপর ভরসা করেছে। যারা দুনিয়াবী উপায়-উপাদানের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে নিছক নিজেদের রবের ভরসায় ঈমানের খাতিরে প্রত্যেকটি বিপদ সহ্য করার এবং প্রয়োজনে প্রত্যেকটি শক্তির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার জন্য তৈরি হয়ে যায় এবং সময় এলে বাড়িঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়ে। যারা নিজেদের রবের প্রতি এতটুকু আস্থা রাখে যে, ঈমান ও নেকীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতিদান তাঁর কাছে কখনো নষ্ট হবে না এবং বিশ্বাস রাখে যে, তিনি নিজের মু'মিন ও সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে এ দুনিয়ায় সহায়তা দান করবেন এবং আখেরাতেও তাদের কার্যক্রমের সর্বোত্তম প্রতিদান দেবেন।

৯৯. অর্থাৎ হিজরাত করার ব্যাপারে তোমাদের প্রাণের চিন্তার মতো জীবিকার চিন্তায়ও পেরেশান হওয়া উচিত নয়। তোমাদের চোখের সামনে এই যে অসংখ্য পশুপাখি ও জলজপ্রাণী জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, এদের মধ্য থেকে কে তার জীবিকা বহন করে ফিরছে? আল্লাহই তো এদের সবাইকে প্রতিপালন করছেন। যেখানেই যায় আল্লাহর অনুগ্রহে এরা কোন না কোন প্রকারে জীবিকা লাভ করেই থাকে। কাজেই তোমরা একথা ভেবে সাহস হারিয়ে বসো না যে, যদি ঈমান রক্ষার জন্য বাড়িঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়ি তাহলে খাবো কি? আল্লাহ যেখান থেকে তাঁর অসংখ্য সৃষ্টিকে রিযিক দিচ্ছেন সেখান থেকে তোমাদেরও দেবেন। ঠিক একথা সাইয়িদিনা মসীহ আলাইহিস সালাম তাঁর সাথীদেরকে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

"কেহই দুই কর্ত্তার দাসত্ব করিতে পারে না, কেননা সে হয়ত একজনকে দ্বেষ করিবে, আর একজনকে প্রেম করিবে, নয় ত একজনের প্রতি অনুরক্ত হইবে, আর একজনকে

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ۚ فَأَنّٰى يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾ اللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۚ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَئِنْ
سَأَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ
مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

যদি[৬০] তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো পৃথিবী ও আকাশসমূহ কে সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র ও সূর্যকে কে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন তাহলে অবশ্যই তারা বলবে আল্লাহ, এরপর এরা প্রতারিত হচ্ছে কোন্ দিক থেকে? আল্লাহই তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা রিযিক প্রসারিত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চিতভাবে আল্লাহ সব জিনিস জানেন। আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে মৃত পতিত ভূমিকে সঞ্জীবিত করেছেন, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ। বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য[৬১] কিন্তু অধিকাংশ লোক বোঝে না।

তুচ্ছ করিবে; তোমরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসত্ব করিতে পার না। এইজন্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, 'কি ভোজন করিব, কি পান করিব' বলিয়া প্রাণের বিষয়ে, কিম্বা 'কি পরিব' বলিয়া শরীরের বিষয়ে ভাবিত হইও না; ভক্ষ্য হইতে প্রাণ ও বস্ত্র হইতে শরীর কি বড় বিষয় নয়? আকাশের পক্ষীদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর? তাহারা বুনেওনা, কাটেওনা, গোলাঘরে সঞ্চয়ও করে না, তথাপি তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহাদিগকে আহার দিয়া থাকেন; তোমরা কি তাহাদের চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ নও? আর তোমাদের মধ্যে কে ভাবিত হইয়া আপন বয়স এক হস্ত মাত্র বৃদ্ধি করিতে পারে? আর বস্ত্রের নিমিত্ত কেন ভাবিত হও? ক্ষেত্রের কানুড় পুষ্পের বিষয়ে বিবেচনা কর, সেগুলি কেমন বাড়ে, সে সকল শ্রম করে না, সূতাও কাটেনা; তথাপি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, শলোমনও আপনার সমস্ত প্রতাপে ইহার একটির ন্যায় সুসজ্জিত ছিলেন না। ভাল ক্ষেত্রের যে তৃণ আজ আছে ও কাল চুলায় ফেলিয়া দেওয়া যাইবে, তাহা যদি ঈশ্বর এরূপ বিভূষিত করেন, তবে হে অল্প বিশ্বাসীরা, তোমাদিগকে কি আরও অধিক নিশ্চয় বিভূষিত করিবেন না? অতএব ইহা বলিয়া ভাবিত হইও না যে, 'কি ভোজন করিব?' বা কি 'পান করিব?' বা 'কি পরিব?' কেননা পরজাতীয়েরাই এ সকল বিষয় চেষ্টা করিয়া থাকে; তোমাদের স্বর্গীয় পিতা-ত জানেন যে, এই সকল দ্রব্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۭ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ
لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝ فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ
دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ
يُشْرِكُوْنَ ۝ لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۙ وَلِيَتَمَتَّعُوْا ۣ فَسَوْفَ
يَعْلَمُوْنَ ۝

৭ রুকূ'

আর এ দুনিয়ার জীবন একটি খেলা ও মন ভুলানোর সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।[১০২] আসল জীবনের গৃহতো হচ্ছে পরকালীন গৃহ, হায়! যদি তারা জানতো।[১০৩] যখন তারা নৌযানে আরোহণ করে তখন নিজেদের দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে নিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে ভিড়িয়ে দেন তখন সহসা তারা শিরক করতে থাকে, যাতে আল্লাহ প্রদত্ত নাজাতের ওপর তাঁর অনুগ্রহ অস্বীকার করতে এবং দুনিয়ার জীবনের মজা ভোগ করতে পারে।[১০৪] বেশ, শিগ্‌গীর তারা জেনে যাবে।

রাজ্য ও তাঁহার ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া হইবে। অতএব কল্যকার নিমিত্ত ভাবিত হইও না, কেননা কল্য আপনার বিষয় আপনি ভাবিত হইবে; দিনের কষ্ট দিনের জন্যই যথেষ্ট।"

(মথি ৬ ঃ ২৪–৩৪)

কুরআন ও বাইবেলের এ উক্তিগুলোর পটভূমি অভিন্ন। সত্যের দাওয়াতের পথে এমন একটি পর্যায় এসে যায় যখন একজন সত্যপ্রিয় মানুষের জন্য উপকরণের জগতের সমস্ত সহায় ও নির্ভরতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিছক আল্লাহর ওপর ভরসা করে প্রাণপণ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এ অবস্থায় যারা অংক কষে ভবিষ্যত সম্ভাবনা বিচার করে এবং পা বাড়াবার আগে প্রাণরক্ষা ও জীবিকা উপার্জনের নিশ্চয়তা খুঁজে বেড়ায় তারা কিছুই করতে পারে না। আসলে এ ধরনের অবস্থা পরিবর্তিত হয় এমন সব লোকের শক্তির জোরে যারা প্রতিমুহূর্তে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সব ধরনের বিপদ মাথা পেতে নেবার জন্য নির্দ্বিধায় এগিয়ে যায়। তাদেরই ত্যাগ ও কুরবানীর ফলে শেষ পর্যন্ত এমন সময় আসে যখন আল্লাহর কালেমা বুলন্দ হয়ে যায় এবং তার মোকাবিলায় অন্য সমস্ত মত পথ অবনমিত হয়।

১০০. এখান থেকে আবার মক্কার কাফেরদের প্রতি বক্তব্যের মোড় ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ
افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي
جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

তারা কি দেখে না, আমি একটি নিরাপদ হারম বানিয়ে দিয়েছি, অথচ তাদের আশেপাশে লোকদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়?[১০৫] এরপরও কি তারা বাতিলকে মেনে নেবে এবং আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করবে? তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা সত্যকে মিথ্যা বলে, যখন তা তার সামনে এসে গেছে?[১০৬] জাহান্নামই কি এ ধরনের কাফেরদের আবাস নয়? যারা আমার জন্য সংগ্রাম-সাধনা করবে তাদেরকে আমি আমার পথ দেখাবো।[১০৭] আর অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরই সাথে আছেন।

১০১. এখানে "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য" শব্দগুলোর দু'টি অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে। একটি অর্থ হচ্ছে, এসব যখন আল্লাহরই কাজ তখন একমাত্র তিনিই প্রশংসার অধিকারী। অন্যেরা প্রশংসালাভের অধিকার অর্জন করলো কোথায় থেকে? দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, আল্লাহর শোকর, তোমরা নিজেরাও একথা স্বীকার করছো।

১০২. অর্থাৎ এর বাস্তবতা শুধুমাত্র এতটুকুই যেমন ছোট ছেলেরা কিছুক্ষণের জন্য নেচে গেয়ে আমোদ করে এবং তারপর যার যার ঘরে চলে যায়। এখানে যে রাজা হয়ে গেছে সে আসলে রাজা হয়ে যায়নি বরং শুধুমাত্র রাজার অভিনয় করছে। এক সময় তার এ খেলা শেষ হয়ে যায়। তখন সে ঠিক তেমনি দীনহীন অবস্থায় রাজ সিংহাসন থেকে বিদায় নেয় যেভাবে এ দুনিয়ার বুকে এসেছিল। অনুরূপভাবে জীবনের কোন একটি আকৃতিও এখানে স্থায়ী ও চিরন্তন নয়। যে যে অবস্থায়ই আছে সাময়িকভাবে একটি সীমিত সময়কালের জন্যই আছে। মাত্র কয়েকদিনের জীবনের সাফল্যের জন্য যারা প্রাণপাত করে এবং এরি জন্য বিবেক ও ঈমান বিকিয়ে দিয়ে সামান্য কিছু আয়েশ আরামের উপকরণ ও শক্তি-প্রতিপত্তির জৌলুস করায়ত্ত করে নেয়, তাদের এ সমস্ত কাজ মন ভুলানো ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব খেলনার সাহায্যে তারা যদি দশ, বিশ বা ষাট সত্তর বছর মন ভুলানোর কাজ করে থাকে এবং তারপর শূন্য হাতে মৃত্যুর দরোজা অতিক্রম করে এমন জগতে পৌঁছে যায় যেখানকার স্থায়ী ও চিরন্তন জীবনে তাদের এ খেলা এক প্রতিকারহীন রোগে পরিণত হয়, তাহলে এ ছেলে ভুলানোর লাভ কি?

১০৩. অর্থাৎ যদি তারা একথা জানতো, এ দুনিয়ার জীবন একটি পরীক্ষার অবকাশ মাত্র এবং মানুষের জন্য আসল জীবন, যা চিরকাল স্থায়ী হবে, তা হচ্ছে আখেরাতের জীবন, তাহলে তারা এখানে পরীক্ষার সময়-কালকে খেলা-তামাশায় নষ্ট না করে এর প্রতিটি মুহূর্ত এমনসব কাজে ব্যবহার করতো যা সেই চিরন্তন জীবনের জন্য উৎকৃষ্ট ফলদায়ক হতো।

১০৪. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আন'আম , ২৯ ও ৪১; সূরা ইউনুস, ২৯ ও ৩১ এবং সূরা বনী ইসরাঈল, ৮৪ টীকা।

১০৫. অর্থাৎ তারা যে মক্কা শহরে বাস করে, যে শহরে তারা পূর্ণ নিরাপদ জীবন যাপন করছে, কোন লাত বা হুবল কি একে হারম তথা নিরাপদ স্থানে পরিণত করেছে? আরবের আড়াই হাজার বছরের চরম অশান্তি ও নৈরাজ্যের পরিবেশে এ স্থানটিকে সকল প্রকার বিশৃংখলা ও বিপর্যয় মুক্ত রাখা কি কোন দেবতা বা দেবীর সাধ্যায়ত্ত ছিল? আমি ছাড়া আর কে এর মর্যাদা রক্ষাকারী ছিল?

১০৬. অর্থাৎ নবী রিসালাতের দাবী করেছেন এবং তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছো। এখন বিষয়টি দু'টি অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। নবী যদি আল্লাহর নাম নিয়ে মিথ্যা দাবী করে থাকেন, তাহলে তার চেয়ে বড় জালেম আর কেউ নেই। আর যদি তোমরা সত্য নবীর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে থাকো, তাহলে তোমাদের চেয়ে বড় জালেম আর কেউ নেই।

১০৭. "সংগ্রাম-সাধনার" ব্যাখ্যা এ সূরা আনকাবুতের ৮ টীকায় করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছিল, যে ব্যক্তি সংগ্রাম-সাধনা করবে সে নিজের ভালোর জন্য করবে (৬ আয়াত)। এখানে এ নিশ্চিন্ততা দান করা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহর পথে আন্তরিকতা সহকারে সারা দুনিয়ার সাথে সংঘর্ষের বিপদ মাথা পেতে নেয় তাদেরকে মহান আল্লাহ তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেন না। বরং তিনি তাদের হাত ধরেন, তাদেরকে পথ দেখান এবং তাঁর দিকে যাওয়ার পথ তাদের জন্য খুলে দেন। তারা তাঁর সন্তুষ্টি কিভাবে লাভ করতে পারে তা তিনি প্রতি পদে পদে তাদেরকে জানিয়ে দেন। পথের প্রতিটি বাঁকে তিনি তাদেরকে আলো দেখান। যার ফলে কোন্‌টা সঠিক পথ ও কোন্‌টা ভুল পথ তা তারা দেখতে পায়। তাদের নিয়ত যতই সৎ ও সদিচ্ছা প্রসূত হয় ততই আল্লাহর সাহায্য, সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও হিদায়াতও তাদের সহযোগী হয়।

আর রূম

৩০

নামকরণ

প্রথম আয়াত غُلِبَتِ الرُّوْمُ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

শুরুতেই যে ঐতিহাসিক ঘটনার কথা বলা হয়েছে তা থেকে নাযিলের সময়-কাল চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়। এখানে বলা হয়েছে যে, "নিকটবর্তী দেশে রোমীয়রা পরাজিত হয়েছে।" সে সময় আরবের সন্নিহিত রোম অধিকৃত এলাকা ছিল জর্দান, সিরিয়া ও ফিলিস্তীন। এসব এলাকায় রোমানদের ওপর ইরানীদের বিজয় ৬১৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ণতা লাভ করেছিল। এ থেকে পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে বলা যেতে পারে যে, এ সূরাটি সে বছরই নাযিল হয় এবং হাবশায় হিজরাতও এ বছরই অনুষ্ঠিত হয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এ সূরার প্রথম দিকের আয়াতগুলোতে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা কুরআন মজীদের আল্লাহর কালাম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্য রসূল হবার সুস্পষ্ট প্রমাণগুলোর অন্যতম। এটি অনুধাবন করার জন্য এ আয়াতগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর একটু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের ৮ বছর আগের একটি ঘটনা। রোমের কায়সার মরিসের (Mauric) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়। ফোকাস (Phocas) নামক এক ব্যক্তি রাজ সিংহাসন দখল করে। সে প্রথমে কায়সারের চোখের সামনে তাঁর পাঁচ পুত্রকে হত্যা করায় তারপর নিজে কায়সারকে হত্যা করে পিতা ও পুত্রদের কর্তিত মস্তকগুলো কনস্ট্যান্টিনোপলে প্রকাশ্য রাজপথে টাঙিয়ে দেয়। এর কয়েকদিন পর সে কায়সারের স্ত্রী ও তার তিন কন্যাকেও হত্যা করে। এ ঘটনার ফলে ইরানের বাদশাহ খসরু পারভেজ রোম আক্রমণ করার চমৎকার নৈতিক ওজুহাত খুঁজে পান। কায়সার মরিস ছিলেন তাঁর অনুগ্রাহক। তাঁর সহায়তায় পারভেজ ইরানের সিংহাসন দখল করেন। তাই তিনি তাঁকে নিজের পিতা বলতেন। এ কারণে তিনি ঘোষণা করেন, বিশ্বাসঘাতক ফোকাস আমার পিতৃতুল্য ব্যক্তি ও তাঁর সন্তানদের প্রতি যে জুলুম করেছে আমি তার প্রতিশোধ নেবো। ৬০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন এবং কয়েক বছরের মধ্যে ফোকাসের সেনাবাহিনীকে একের পর এক পরাজিত করে একদিকে এশিয়া মাইনরের

এডেসার (বর্তমান উরফা) এবং অন্যদিকে সিরিয়ার হালব ও আন্তাকিয়ায় পৌঁছে যান। রোমের রাজ পরিষদ যখন দেখলো ফোকাস দেশ রক্ষা করতে পারছে না তখন তারা আফ্রিকার গবর্নরের সাহায্য চাইলো। গবর্নর তার পুত্র হিরাক্লিয়াসকে (Heraclius) একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী সহকারে কনষ্টান্টিনোপলে পাঠান। তার সেখানে পৌঁছে যাবার সাথে সাথেই ফোকাসকে পদচ্যুত করা হয়। তার পরিবর্তে হিরাক্লিয়াসকে কায়সার পদে অভিসিক্ত করা হয়। তিনি ক্ষমতাসীন হয়েই ফোকাসের সাথে একই ব্যবহার করেন যা সে ইতিপূর্বে মরিসের সাথে করেছিল। এটি ছিল ৬১০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা এবং এ বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াত লাভ করেন।

খসরু পারভেজ যে নৈতিক বাহানাবাজীর ভিত্তিতে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন ফোকাসের পদচ্যুতি ও তার হত্যার পর তা খতম হয়ে গিয়েছিল। যদি সত্যিই বিশ্বাসঘাতক ফোকাসের থেকে তার জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করাই তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকতো তাহলে তার নিহত হবার পর নতুন কায়সারের সাথে পারভেজের সন্ধি করে নেয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি এরপরও যুদ্ধ জারী রাখেন। বরং এরপর তিনি এ যুদ্ধকে অগ্নি উপাসক ও খৃষ্টবাদের মধ্যে ধর্মীয় যুদ্ধের রূপ দেন। খৃষ্টানদের যেসব সম্প্রদায়কে ধর্মচ্যুত ও নাস্তিক গণ্য করে রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় গীর্জা বছরের পর বছর ধরে তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে আসছিল (অর্থাৎ নাস্তুরী, ইয়াকূবী ইত্যাদি) তারাও আক্রমণকারী অগ্নি উপাসকদের প্রতি সর্বাত্মক সহানুভূতি দেখাতে থাকে। এদিকে ইহুদিরাও অগ্নি উপাসকদেরকে সমর্থন দেয়। এমন কি খসরু পারভেজের সেনাবাহিনীতে অংশ গ্রহণকারী ইহুদী সৈন্যদের সংখ্যা ২৬ হাজারে পৌঁছে যায়।

হিরাক্লিয়াস এসে এ বাঁধ ভাংগা স্রোত রোধ করতে পারেননি। সিংহাসনে আরোহণের পরপরই পূর্বদেশ থেকে প্রথম যে খবরটি তাঁর কাছে পৌঁছে সেটি ছিল ইরানীদের হাতে আন্তাকিয়ার পতন। তারপর ৬১৩ খৃষ্টাব্দে তারা দামেশক দখল করে। ৬১৪ খৃষ্টাব্দে বায়তুল মাকদিস দখল করে ইরানীরা সমগ্র খৃষ্টান জগতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ৯০ হাজার খৃষ্টানকে এই শহরে হত্যা করা হয়। তাদের সবচেয়ে পবিত্র আল কিয়ামাহ গীর্জা (Holy Scpulchre) ধ্বংস করে দেয়া হয়। আসল ক্রুশ দণ্ডটি, যে সম্পর্কে খৃষ্টানদের বিশ্বাস হযরত মসীহকে তাতেই শূলীবিদ্ধ করা হয়েছিল, ইরানীরা ছিনিয়ে নিয়ে মাদায়েন পৌঁছিয়ে দেয়। আর্চবিশপ যাকারিয়াকেও পাকড়াও করা হয় এবং শহরের সমস্ত বড় বড় গীর্জা তারা ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। খসরু পারভেজ বিজয়ের নেশায় যেভাবে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন তা বায়তুল মাকদিস থেকে হিরাক্লিয়াসকে তিনি যে পত্রটি লিখেছিলেন তা থেকে আন্দাজ করা যায়। তাতে তিনি বলেন ঃ

"সকল খোদার বড় খোদা, সমগ্র পৃথিবীর অধিকারী খসরুর পক্ষ থেকে তার নীচ ও মূর্খ অজ্ঞ বান্দা হিরাক্লিয়াসের নামে—

"তুমি বলে থাকো, তোমার খোদার প্রতি তোমার আস্থা আছে। তোমার খোদা আমার হাত থেকে জেরুশালেম রক্ষা করলেন না কেন?"

এ বিজয়ের পর এক বছরের মধ্যে ইরানী সেনাদল জর্দান, ফিলিস্তীন ও সমগ্র সিনাই উপদ্বীপ দখল করে পারশ্য সাম্রাজ্যের সীমানা মিসর পর্যন্ত বিস্তৃত করে। এটা এমন এক

সময় ছিল যখন মক্কা মু'আয্যমায় এর চাইতে আরো অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ চলছিল। এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বাধীনে তাওহীদের পতাকাবাহীরা কুরাইশ সরদারদের নেতৃত্বে শিরকের পতাকাবাহীদের সাথে যুদ্ধরত ছিল। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, ৬১৫ খৃষ্টাব্দে বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে স্বদেশ ত্যাগ করে হাবশার খৃষ্টান রাজ্যে (রোম সাম্রাজ্যের মিত্র দেশ) আশ্রয় নিতে হয়। এ সময় রোম সাম্রাজ্যে ইরানের বিজয় অভিযানের কথা ছিল সবার মুখেমুখে, মক্কার মুশরিকরা এসব কথায় আহলাদে আটখানা হয়ে উঠছিল। তারা মুসলমানদের বলতো, দেখো, ইরানের অগ্নি উপাসকরা বিজয়লাভ করেছে এবং অহী ও নবুওয়াত অনুসারী খৃষ্টানরা একের পর এক পরাজিত হয়ে চলছে। অনুরূপভাবে আমরা আরবের মূর্তিপূজারীরাও তোমাদেরকে এবং তোমাদের দীনকে ধ্বংস করে ছাড়বো।

এ অবস্থায় কুরআন মজীদের এ সূরাটি নাযিল হয় এবং এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় : "নিকটবর্তী দেশে রোমানরা পরাজিত হয়েছে কিন্তু এ পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যেই আবার তারা বিজয়ী হবে। আর সেটি এমন দিন হবে যেদিন আল্লাহর দেয়া বিজয়ে মু'মিনরা খুশী হয়ে যাবে।" এর মধ্যে একটির পরিবর্তে দু'টি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। একটি হচ্ছে, রোমানরা জয় লাভ করবে এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মুসলমানরাও একই সময় বিজয় লাভ করবে। আপাতদৃষ্টে এ দু'টি ভবিষ্যদ্বাণীর কোন একটিরও কয়েক বছরের মধ্যে সত্য প্রমাণিত হবার কোন দূরতম সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছিল না। একদিকে ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমান। তারা মক্কায় নির্যাতিত হয়ে চলছিল। এ ভবিষ্যদ্বাণীর পরও আট বছর পর্যন্ত কোনদিক থেকে তাদের বিজয় লাভের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। অন্যদিকে রোমের পরাজয়ের বহর দিনের পর দিন বেড়েই চলছিল। ৬১৯ সাল পর্যন্ত সমগ্র মিশর পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে চলে এসেছিল। অগ্নি উপাসক সেনাদল ত্রিপোলির সন্নিকটে পৌঁছে তাদের পতাকা গেঁড়ে দিয়েছিল। এশিয়া মাইনরে ইরানী সেনাদল রোমানদের বিতাড়িত ও বিধ্বস্ত করতে করতে বসফোরাস প্রণালীতে পৌঁছে গিয়েছিল ৬১৭ সালে তারা কনষ্ট্যান্টিনোপলের সামনে খিল্‌কদুন (Chalcedon : বর্তমান কাযীকোই) দখল করে নিয়েছিল। কায়সার খসরুর কাছে দূত পাঠিয়ে অত্যন্ত বিনয় ও দীনতা সহকারে আবেদন করলেন, আমি যে কোন মূল্যে সন্ধি করতে প্রস্তুত। কিন্তু তিনি জবাব দিলেন, "এখন আমি কায়সারকে ততক্ষণ পর্যন্ত নিরাপত্তা দেবো না যতক্ষণ না তিনি শৃংখলিত অবস্থায় আমার সামনে হাজির হন এবং তাঁর শূলীবিদ্ধ ঈশ্বরকে ত্যাগ করে অগ্নি খোদার উপাসনা করেন।" অবশেষে কায়সার এমনই পরাজিত মনোভাব সম্পন্ন হয়ে পড়লেন যে, তিনি কনষ্ট্যান্টিনোপল ত্যাগ করে কার্থেজে (Carthage : বর্তমান টিউনিস) চলে যাবার পরিকল্পনা করলেন। মোটকথা ইংরেজ ঐতিহাসিক গিবনের বক্তব্য অনুযায়ী কুরআন মজীদের এ ভবিষ্যদ্বাণীর পরও সাত আট বছর পর্যন্ত অবস্থা এমন ছিল যার ফলে রোমানরা ইরানীদের ওপর বিজয় লাভ করবে এ ধরনের কোন কথা কোন ব্যক্তি কল্পনাও করতে পারতো না। বরং বিজয় তো দূরের কথা তখন সামনের দিকে এ সাম্রাজ্য আর টিকে থাকবে এ আশাও কারো ছিল না।*

* Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, vol. ii. P. 788, Modern Library, New York.

কুরআন মজীদের এ আয়াত নাযিল হলে মক্কার কাফেররা এ নিয়ে খুবই ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে থাকে। উবাই ইবনে খাল্‌ফ হযরত আবু বকরের (রা) সাথে বাজী রাখে। সে বলে, যদি তিন বছরের মধ্যে রোমানরা জয়লাভ করে তাহলে আমি তোমাকে দশটা উট দেবো অন্যথায় তুমি আমাকে দশটা উট দেবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বাজীর কথা জানতে পেরে বলেন, কুরআনে বলা হয়েছে فِي بِضْعِ سِنِيْنَ আর আরবী ভাষায় بِضْع শব্দ বললে দশের কম বুঝায়। কাজেই দশ বছরের শর্ত রাখো এবং উটের সংখ্যা দশ থেকে বাড়িয়ে একশো করে দাও। তাই হযরত আবু বকর (রা) উবাইর সাথে আবার কথা বলেন এবং নতুনভাবে শর্ত লাগানো হয় যে, দশ বছরের মধ্যে উভয় পক্ষের যার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হবে সে অন্যপক্ষকে একশোটি উট দেবে।

৬২২ সালে একদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরাত করে মদীনা তাইয়েবায় চলে যান অন্যদিকে কায়সার হিরাক্লিয়াস নীরবে কষ্ট্যান্টিনোপল থেকে বের হয়ে কৃষ্ণসাগরের পথে ত্রাবিজুনের দিকে রওয়ানা দেন। সেখানে গিয়ে তিনি পেছন দিক থেকে ইরানের ওপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এই প্রতি-আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য কায়সার গীর্জার কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানান। ফলে খৃষ্টীয় গীর্জার প্রধান বিশপ সারজিয়াস (Sergius) খৃষ্টবাদকে মাজুসীবাদের (অগ্নিপূজা) হাত থেকে রক্ষা করার জন্য গীর্জাসমূহে ভক্তদের নজরানা বাবদ প্রদত্ত অর্থ সম্পদ সূদের ভিত্তিতে ঋণ দেন। হিরাক্লিয়াস ৬২৩ খৃষ্টাব্দে আর্মেনিয়া থেকে নিজের আক্রমণ শুরু করেন। দ্বিতীয় বছর ৬২৪ সালে তিনি আজারবাইজানে প্রবেশ করে জরথুষ্টের জন্মস্থান আরমিয়াহ (Clorumia) ধ্বংস করেন এবং ইরানীদের সর্ববৃহৎ অগ্নিকুণ্ড বিধ্বস্ত করেন। আল্লাহর মহিমা দেখুন, এই বছরেই মুসলমানরা বদর নামক স্থানে মুশরিকদের মোকাবিলায় প্রথম চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে। এভাবে সূরা রূমে উল্লেখিত দু'টি ভবিষ্যদ্বাণীই দশ বছরের সময়সীমা শেষ হবার আগেই একই সংগে সত্য প্রমাণিত হয়।

এরপর রোমান সৈন্যরা অনবরত ইরানীদেরকে পর্যুদস্ত করে যেতেই থাকে। ৬২৭ খৃষ্টাব্দে নিনেভার যুদ্ধে তারা পারস্য সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়। এরপর পারস্য সম্রাটদের আবাসস্থল বিধ্বস্ত করে। হিরাক্লিয়াসের সৈন্যদল সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে এবং তারা তদানীন্তন ইরানের রাজধানী তায়াসফুনের (Ctesiphon) দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। ৬২৮ সালে খসরু পারভেজের পরিবারে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তাকে বন্দী করা হয়। তার চোখের সামনে তার ১৮ জন পুত্র সন্তানকে হত্যা করা হয়। কয়েক দিন পরে কারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তিনি নিজেও মৃত্যুবরণ করেন। এ বছরই হুদাইবিয়ার চুক্তি সম্পাদিত হয়, যাকে কুরআন মহা বিজয় নামে আখ্যায়িত করেছে এবং এ বছরই খসরুর পুত্র দ্বিতীয় কুবাদ সমস্ত রোম অধিকৃত এলাকার ওপর থেকে অধিকার ত্যাগ করে এবং আসল ক্রুশ ফিরিয়ে দিয়ে রোমের সাথে সন্ধি করে। ৬২৯ সালে "পবিত্র ক্রুশ"কে স্বস্থানে স্থাপন করার জন্য কায়সার নিজে "বায়তুল মাকদিস" যান এবং এ বছরই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাযা উমরাহ আদায় করার জন্য হিজরাতের পর প্রথম বার মক্কা মু'আয্যমায় প্রবেশ করেন।

এ পর কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী যে, পুরোপুরি সত্য ছিল এ ব্যাপারে কারো সামান্যতম সন্দেহের অবকাশই ছিল না। আরবের বিপুল সংখ্যক মুশরিক এর প্রতি ঈমান আনে।

উবাই ইবনে খাল্‌ফের উত্তরাধিকারীদের পরাজয় মেনে নিয়ে হযরত আবু বকরকে (রা) বাজীর একশো উট দিয়ে দিতে হয়। তিনি সেগুলো নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হন। নবী (সা) হুকুম দেন, এগুলো সাদকা করে দাও। কারণ বাজী যখন ধরা হয় তখন শরীয়াতে জুয়া হারাম হবার হুকুম নাযিল হয়নি। কিন্তু এখন তা হারাম হবার হুকুম এসে গিয়েছিল। তাই যুদ্ধের ম..মে বশ্যতা স্বীকারকারী কাফেরদের থেকে বাজীর অর্থ নিয়ে নেয়ার অনুমতি তো দিয়ে দেয়া হয়েছে কিন্তু এই সংগে হুকুম দেয়া হয়, তা নিজে ভোগ না করে সাদকা করে দিতে হবে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরায় বক্তব্য এভাবে শুরু করা হয়েছে, আজ রোমানরা পরাজিত হয়েছে এবং সমগ্র বিশ্ববাসী মনে করছে এ সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন। কিন্তু কয়েক বছর অতিবাহিত হতে না হতেই সবকিছুর পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং আজ যে পরাজিত সেদিন সে বিজয়ী হয়ে যাবে।

এ ভূমিকা থেকে একথা প্রকাশিত হয়েছে যে, মানুষ নিজের বাহ্য দৃষ্টির কারণে শুধুমাত্র তাই দেখে যা তার চোখের সামনে থাকে। কিন্তু এ বাহ্যিক পর্দার পেছনে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। এ বাহ্যদৃষ্টি যখন দুনিয়ার সামান্য সামান্য ব্যাপারে বিভ্রান্তি ও ভ্রান্ত অনুমানের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং যখন শুধুমাত্র "আগামীকাল কি হবে" এতটুকু কথা না জানার কারণে মানুষ ভুল হিসেব করে বসে তখন সামগ্রিকভাবে সমগ্র জীবনের ব্যাপারে ইহকালীন বাহ্যিক জীবনের ওপর নির্ভরশীলতা এবং এরি ভিত্তিতে নিজের সমগ্র জীবন পুঁজিকে বাজী রাখা মস্ত বড় ভুল, তাতে সন্দেহ নেই।

এভাবে রোম ও ইরানের বিষয় থেকে ভাষণ আখেরাতের বিষয়ের দিকে মোড় নিয়েছে এবং ক্রমাগত তিন রুকূ' পর্যন্ত বিভিন্নভাবে একথা বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, আখেরাতের জীবন সম্ভব, যুক্তিসংগত এবং এর প্রয়োজনও আছে। মানুষের জীবন ব্যবস্থাকে সুস্থ ও সুন্দর করে রাখার স্বার্থেও তার জন্য আখেরাতে বিশ্বাস করে বর্তমান জীবনের কর্মসূচী নেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় বাহ্যদৃষ্টির ওপর নির্ভর করে কর্মসূচী গ্রহণ করার যে পরিণাম হয়ে থাকে তাই হতে বাধ্য।

এ প্রসংগে আখেরাতের পক্ষে যুক্তি পেশ করতে গিয়ে বিশ্ব-জগতের যেসব নিদর্শনকে সাক্ষ-প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে সেগুলো তাওহীদেরও প্রমাণ পেশ করে। তাই চতুর্থ রুকূ'র শুরু থেকে তাওহীদকে সত্য ও শিরককে মিথ্যা প্রমাণ করাই ভাষণের লক্ষ হয়ে দাঁড়ায় এবং বলা হয়, মানুষের জন্য পুরোপুরি একনিষ্ঠ হয়ে এক আল্লাহর বন্দেগী করা ছাড়া আর কোন প্রাকৃতিক ধর্ম নেই। শিরক বিশ্ব প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির বিরোধী। তাই যেখানেই মানুষ এ ভ্রষ্টতার পথ অবলম্বন করেছে সেখানেই বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগে আবার সেই মহা বিপর্যয়ের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যা সে সময় দুনিয়ার দু'টি সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধের কারণে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। বলা হয়েছে, এ বিপর্যয়ও শিরকের অন্যতম ফল এবং মানব জাতির অতীত ইতিহাসে যতগুলো জাতি বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে তারা সবাই ছিল মুশরিক।

বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে উপমার মাধ্যমে লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যেমন মৃত পতিত যমীন আল্লাহ প্রেরিত বৃষ্টির স্পর্শে সহসা জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং জীবন ও ফসলের ভাণ্ডার উদ্‌গীরণ করতে থাকে, ঠিক তেমনি আল্লাহ প্রেরিত অহী ও নবুওয়াতও মৃত পতিত মানবতার পক্ষে রহমতের বারিধারা স্বরূপ এবং এর নাযিল হওয়া তার জন্য জীবন, বৃদ্ধি, বিকাশ এবং কল্যাণের উৎসের কারণ হয়। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে আরবের এ অনুর্বর ভূমি আল্লাহর রহমতে শস্য শ্যামল হয়ে উঠবে এবং সমস্ত কল্যাণ হবে তোমাদের নিজেদেরই জন্য। আর এর সদ্ব্যবহার না করলে নিজেদেরই ক্ষতি করবে। তারপর অনুশোচনা করেও কোন লাভ হবে না এবং ক্ষতিপূরণ করার কোন সুযোগই পাবে না।

আয়াত ৬০ **সূরা আর রূম-মক্কী** রুকূ' ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

الٓمّٓ ۝١ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۝٢ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ
سَيَغْلِبُوْنَ ۝٣ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۭ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ۭ وَيَوْمَىِٕذٍ
يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝٤ بِنَصْرِ اللّٰهِ ۭ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ
الرَّحِيْمُ ۝٥ وَعْدَ اللّٰهِ ۭ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٦

আলিফ-লাম-মীম। রোমানরা নিকটবর্তী দেশে পরাজিত হয়েছে এবং নিজেদের এ পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যে তারা বিজয় লাভ করবে।[১] ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আগেও আল্লাহরই ছিল। পরেও তাঁরই থাকবে।[২] আর সেদিনটি হবে এমন দিন যেদিন আল্লাহ প্রদত্ত বিজয়ে মুসলমানরা আনন্দে উৎফুল্ল হবে।[৩] আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী ও মেহেরবান। আল্লাহ এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ কখনো নিজের প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধাচরণ করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

১. ইবনে আব্বাস (রা) এবং অন্যান্য সাহাবী ও তাবেঈগণের বর্ণনা থেকে জানা যায়, রোম ও ইরানের এ যুদ্ধে মুসলমানদের সহানুভূতি ছিল রোমের পক্ষে এবং মক্কার কাফেরদের সহানুভূতি ছিল ইরানের পক্ষে। এর কয়েকটি কারণ ছিল। এক, ইরানীরা এ যুদ্ধকে খৃষ্টবাদ ও অগ্নি পূজার মতবাদের যুদ্ধের রূপ দিয়েছিল। তারা দেশ জয়ের উদ্দেশ্য অতিক্রম করে একে অগ্নি পূজার মতবাদ বিস্তারের মাধ্যমে পরিণত করছিল। বায়তুল মাকদিস জয়ের পর খসরু পারভেজ রোমের কায়সারের কাছে যে পত্র লিখেছিলেন তাতে পরিষ্কারভাবে নিজের বিজয়কে তিনি অগ্নি উপাসনাবাদের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করেছিলেন। নীতিগতভাবে অগ্নি উপাসনাবাদের সাথে মক্কার মুশরিকদের ধর্মের মিল ছিল। কারণ, তারাও ছিল তাওহীদ অস্বীকারকারী। তারা দুই খোদাকে মানতো এবং আগুনের

পূজা করতো। তাই মুশরিকরা ছিল তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাদের মোকাবিলায় খৃষ্টানরা যতই শিরকে লিপ্ত হয়ে যাক না কেন তবুও তারা তাওহীদকে ধর্মের মূল ভিত্তি বলে স্বীকার করতো। তারা আখেরাতে বিশ্বাস করতো এবং অহী ও রিসালাতকে হিদায়াতের উৎস হিসেবে মানতো। তাই তাদের ধর্ম তার আসল প্রকৃতির দিক থেকে মুসলমানদের ধর্মের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। এ জন্য মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল এবং তাদের ওপর মুশরিক জাতির বিজয়কে তারা অপছন্দ করতো। দ্বিতীয় কারণটি ছিল, এক নবীর আগমনের পূর্বে পূর্ববর্তী নবীকে যারা মানতো নীতিগতভাবে তারা মুসলমানের সংজ্ঞারই আওতাভুক্ত হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী আগমনকারী নবীর দাওয়াত তাদের কাছে না পৌঁছে এবং তারা তা অস্বীকার না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মুসলমানদের মধ্যেই গণ্য হতে থাকে। (দেখুন সূরা কাসাস, ৭৩ টীকা) সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর মাত্র পাঁচ-ছয় বছর অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর দাওয়াত তখনো বাইরে পৌঁছেনি। তাই মুসলমানরা খৃষ্টানদেরকে কাফেরদের মধ্যে গণ্য করতো না। তবে ইহুদীরা তাদের দৃষ্টিতে ছিল কাফের। কারণ তারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াত অস্বীকার করতো। তৃতীয় কারণ ছিল, ইসলামের সূচনায় খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের সাথে সহানুভূতি পূর্ণ ব্যবহার করা হয়েছিল। যেমন সূরা কাসাসের ৫২ থেকে ৫৫ এবং সূরা মায়েদার ৮২ থেকে ৮৫ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। বরং তাদের মধ্য থেকে বহু লোক খোলা মন নিয়ে সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করছিল। তারপর হাবশায় হিজরাতের সময় খৃষ্টান বাদশাহ মুসলমানদেরকে আশ্রয় দেন এবং তাদের ফেরত পাঠাবার জন্য মক্কার কাফেরদের দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। এরও দাবী ছিল মুসলমানরা অগ্নি পূজারীদের মোকাবিলায় খৃষ্টানদের কল্যাণকামী হোক।

২. অর্থাৎ পূর্বে যখন ইরানীরা জয়লাভ করে তখন নাউযুবিল্লাহ তার অর্থ এটা ছিল না যে, বিশ্ব-জাহানের প্রভু আল্লাহ তাদের মোকাবিলায় পরাজিত হয়ে গেছেন এবং পরে যখন রোমীয়রা জয়লাভ করবে তখন এর অর্থ এ হবে না যে, আল্লাহ তাঁর হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পাবেন। সর্ব অবস্থায় শাসন কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহরই জন্য নির্ধারিত। পূর্বে যে বিজয় লাভ করে তাকে আল্লাহই বিজয় দান করেন এবং পরে যে জয় লাভ করবে সেও আল্লাহরই হুকুমে জয়লাভ করবে। তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বে কেউ নিজের শক্তির জোরে প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। তিনি যাকে উঠান সে-ই ওঠে এবং যাকে নামিয়ে দেন সে-ই নেমে যায়।

৩. ইবনে আব্বাস (রা) আবু সাঈদ খুদরী (রা), সুফিয়ান সওরী (র), সুদ্দী প্রমুখ মনীষীগণ বর্ণনা করেন, ইরানীদের ওপর রোমীয়রা এবং বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের ওপর মুসলমানরা একই সময় বিজয় লাভ করেন। এ জন্য মুসলমানরা দ্বিগুণ আনন্দিত হয়। ইরান ও রোমের ইতিহাস থেকেও একথাই প্রমাণিত হয়। ৬২৪ সালে বদরের যুদ্ধ হয়। এ বছরই রোমের কায়সার অগ্নি উপাসনাবাদের প্রবর্তক যরথুষ্ট্রের জন্মস্থান ধ্বংস করেন এবং ইরানের সবচেয়ে বড় অগ্নিকুণ্ড বিধ্বস্ত করেন।

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ ۝٧
اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ
رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ۝٨

লোকেরা দুনিয়ার কেবল বাহ্যিক দিকটাই জানে এবং আখেরাত থেকে তারা নিজেরাই গাফিল।[৪] তারা কি কখনো নিজেদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করেনি?[৫] আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলী এবং তাদের মাঝখানে যা কিছু আছে সবকিছু সঠিক উদ্দেশ্যে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন।[৬] কিন্তু অনেকেই তাদের রবের সাক্ষাতে বিশ্বাস করে না।[৭]

৪. অর্থাৎ যদিও আখেরাতের প্রমাণ পেশ করার মতো বহু সাক্ষ ও নিদর্শন রয়েছে এবং সেগুলো থেকে গাফিল হবার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। তবুও এরা নিজেরাই গাফিল থাকছে। অন্য কথায় এটা তাদের নিজেদের ত্রুটি। দুনিয়ার জীবনের এ বাহ্যিক পর্দার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তারা বসে রয়েছে। এর পেছনে যা কিছু আসছে সে সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। নয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে জানাবার ব্যাপারে কোন প্রকার ত্রুটি করা হয়নি।

৫. এটি আখেরাতের পক্ষে একটি স্বতন্ত্র যুক্তি। এর অর্থ হচ্ছে যদি এরা বাইরে কোথাও দৃষ্টি দেবার পূর্বে নিজেদের অস্তিত্বের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতো তাহলে নিজেদের মধ্যেই এমন সব যুক্তি পেয়ে যেতো যা বর্তমান জীবনের পরে আর একটি জীবনের প্রয়োজনের সত্যতা প্রমাণ করতো। মানুষের এমন তিনটি বৈশিষ্ট রয়েছে যা তাকে পৃথিবীর অন্যান্য জিনিস থেকে আলাদা করে :

এক : পৃথিবী ও তার পরিবেশের অসংখ্য জিনিস তার বশীভূত করে দেয়া হয়েছে এবং সেগুলো ব্যবহার করার ব্যাপক ক্ষমতা তাকে দান করা হয়েছে।

দুই : নিজের জীবনের পথ বেছে নেবার জন্য তাকে স্বাধীন ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। ঈমান ও কুফরী, আনুগত্য ও বিদ্রোহ এবং সুকৃতি ও দুষ্কৃতির পথের মধ্য থেকে যে কোন পথেই নিজের ইচ্ছামতো সে চলতে পারে। সত্য ও মিথ্যা এবং সঠিক ও বেঠিক যে কোন পথই সে অবলম্বন করতে পারে। প্রত্যেকটি পথে চলার সুযোগ তাকে দেয়া হয়েছে এবং এ চলার জন্য সে আল্লাহর সরবরাহকৃত উপায়-উপকরণ ব্যবহার করতে পারে তা আল্লাহর আনুগত্যের বা তাঁর নাফরমানির যে কোন পথই হোক না কেন।

তিন ঃ তার মধ্যে জন্মগতভাবে নৈতিকতার অনুভূতি রেখে দেয়া হয়েছে। এর ভিত্তিতে সে ইচ্ছাকৃত কাজ ও অনিচ্ছাকৃত কাজের মধ্যে ফারাক করে, ইচ্ছাকৃত কাজকে সৎকাজ ও অসৎকাজ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং স্বতস্ফূর্তভাবে এই মত অবলম্বন করে যে, সৎকাজ পুরস্কার লাভের এবং অসৎকাজ শাস্তি লাভের যোগ্য হওয়া উচিত।

মানুষের নিজের সত্তার মধ্যে এই যে তিনটি বৈশিষ্ট পাওয়া যায় এগুলো একথাই প্রমাণ করে যে, এমন কোন সময় আসা উচিত যখন মানুষের সমস্ত কাজের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। যখন তাকে জিজ্ঞস করা হবে, তাকে দুনিয়ায় যা কিছু দেয়া হয়েছিল তা ব্যবহার করার ক্ষমতাকে সে কিভাবে কাজে লাগিয়েছে? যখন দেখা যাবে, নিজের নির্বাচনের স্বাধীনতাকে ব্যবহার করে সে সঠিক পথ অবলম্বন করেছে, না ভুল পথ? যখন তার ঐচ্ছিক কার্যাবলী যাচাই করা হবে এবং সৎকাজে পুরস্কার ও অসৎকাজে শাস্তি দেয়া হবে। একথা সুনিশ্চিত যে, মানুষের জীবনের কার্যাবলী শেষ হবার এবং তার কর্মদপ্তর বন্ধ হয়ে যাবার পরই এ সময়টি আসতে পারে, তার আগে আসতে পারে না। আর এ সময়টি অবশ্যই এমন সময় আসা উচিত যখন এক ব্যক্তি বা একটি জাতির নয় বরং সমগ্র মানবজাতির কর্মদপ্তর বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ, কোন ব্যক্তি বা জাতির নিজের কার্যাবলীর মাধ্যমে দুনিয়ার বুকে যেসব প্রভাব বিস্তার করে যায় উক্ত ব্যক্তি বা জাতির মৃত্যুতে তার ধারাবাহিকতা খতম হয়ে যায় না। তার রেখে যাওয়া ভালো বা মন্দ প্রভাবও তো তার আমলনামায় লিখিত হওয়া উচিত। এ প্রভাবগুলো যে পর্যন্ত না পুরোপুরি প্রকাশ হয়ে যায় সে পর্যন্ত ইনসাফ অনুযায়ী পুরোপুরি হিসেব-নিকেশ করা এবং পুরোপুরি পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া কেমন করে সম্ভব? এভাবে মানুষের নিজের অস্তিত্ব একথার সাক্ষ পেশ করে এবং পৃথিবীতে মানুষকে যে মর্যাদা দান করা হয়েছে তা স্বতস্ফূর্তভাবে এ দাবী করে যে, দুনিয়ার বর্তমান জীবনের পরে আর একটি জীবন এমন হতে হবে যেখানে আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে, ইনসাফ সহকারে মানুষের জীবনের সমস্ত কার্যাবলীর হিসেব-নিকেশ করা হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্ম অনুসারে প্রতিদান দেয়া হবে।

৬. এ বাক্যে আখেরাতের সপক্ষে আরো দু'টি যুক্তি পেশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, মানুষ যদি নিজের অস্তিত্বের বাইরে বিশ্ব ব্যবস্থাকে গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে তাহলে দু'টি সত্য সুস্পষ্টভাবে তার দৃষ্টিগোচর হবে ঃ

এক ঃ এ বিশ্ব-জাহানকে যথার্থ সত্যের ভিত্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা কোন শিশুর খেলা নয়। নিছক মন ভুলাবার জন্য নিজের খেয়ালখুশী মতো সে উল্টা পাল্টা ধরনের যে কোন রকমের একটা ঘর তৈরি করেনি যা তৈরি করা ও ভেঙে ফেলা দুটোই তার কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। বরং এটি একটি দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা। এর প্রতিটি অণু পরমাণু এ কথারই সাক্ষ দিয়ে চলছে যে, একে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা সহকারে তৈরী করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে একটি আইন সক্রিয় রয়েছে। এর প্রত্যেকটি জিনিসই উদ্দেশ্যমূখী। মানুষের সমগ্র সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থ ব্যবস্থা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান একথারই সাক্ষবহ। দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিসের পেছনে সক্রিয় নিয়ম-নীতি উদ্ভাবন করে এবং প্রত্যেকটি বস্তু যে উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছে তা অনুসন্ধান করেই মানুষ এখানে এ সবকিছু তৈরী করতে পেরেছে। অন্যথায় যদি একটি অনিয়মতান্ত্রিক ও উদ্দেশ্যহীন খেলনার

মধ্যে একটি পুতুলের মতো তাকে রেখে দেয়া হতো, তাহলে কোন প্রকার বিজ্ঞান, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা কল্পনাই করা যেতো না। এখন যে জ্ঞানবান সত্তা এহেন প্রজ্ঞা ও উদ্দেশ্যমুখীতা সহকারে এ দুনিয়া তৈরি করেছেন এবং এর মধ্যে মানুষের মতো একটি সৃষ্টিকে সর্ব পর্যায়ের বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক শক্তি, ক্ষমতা ও ইখতিয়ার, স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা ও নৈতিক অনুভূতি দিয়ে নিজের দুনিয়ার অসংখ্য সাজ-সরঞ্জাম তার হাতে সঁপে দিয়েছেন, তিনি মানুষকে উদ্দেশ্যবিহীন সৃষ্টি করেছেন একথা কেমন করে তোমাদের বোধগম্য হলো? তোমরা কি দুনিয়ায় ভাঙা ও গড়া, সুকৃতি ও দুষ্কৃতি, জুলুম ও ইনসাফ এবং ন্যায় ও অন্যায়ের যাবতীয় কাজ কারবার করার পর এমনিই মরে মাটিতে মিশে যাবে এবং তোমাদের কোন ভালো বা মন্দ কাজের কোন ফলাফল দেখা যাবে না? তোমরা কি নিজেদের এক একটি কাজের মাধ্যমে তোমাদের ও তোমাদের মতো হাজার হাজার মানুষের জীবনের ওপর এবং দুনিয়ার অসংখ্য জিনিসের ওপর বহুতর শুভ ও অশুভ প্রভাব বিস্তার করে চলে যাবে এবং তোমাদের মৃত্যুর পর পরই এই সমগ্র কর্মদপ্তরকে এমনি গুটিয়ে নদীতে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে?

এ বিশ্ব ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করার পর দ্বিতীয় যে সত্যটি পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে সেটি হচ্ছে, এখানে কোন জিনিসই চিরস্থায়ী নয়। প্রত্যেকটি জিনিসের একটি নির্ধারিত জীবনকাল রয়েছে। সেখানে পৌঁছে যাবার পর তা শেষ হয়ে যায়। সামগ্রিকভাবে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের ব্যাপারেও একথাই সত্য। এখানে যতগুলো শক্তিই কাজ করছে তারা সবই সীমাবদ্ধ। একটি সময় পর্যন্ত তারা কাজ করছে। কোন এক সময় তারা অবশ্যই নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং এ ব্যবস্থাটি খতম হয়ে যাবে। প্রাচীনকালে যেসব দার্শনিক ও বিজ্ঞানী দুনিয়াকে আদি ও চিরন্তন বলে প্রচার করতো তাদের বক্তব্য তবুও তো সর্বব্যাপী অজ্ঞতা ও মূর্খতার দরুন কিছুটা স্বীকৃতি লাভ করতো কিন্তু দীর্ঘকাল ব্যাপী নাস্তিক্যবাদী ও আল্লাহ বিশ্বাসীদের মধ্যে বিশ্ব-জগতের নশ্বরতা ও অবিনশ্বরতা নিয়ে যে বিতর্ক চলে আসছিল, আধুনিক বিজ্ঞান প্রায় চূড়ান্তভাবেই সে ক্ষেত্রে নিজের ভোটটি আল্লাহ বিশ্বাসীদের পক্ষে দিয়ে দিয়েছে। কাজেই বর্তমানে নাস্তিক্যবাদীদের পক্ষে বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নাম নিয়ে এ দাবী উত্থাপন করার কোন অবকাশই নেই যে, এ দুনিয়া চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে এবং কিয়ামত কোনদিন আসবে না। পুরাতন বস্তুবাদিতার যাবতীয় ভিত্তি এ চিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, বস্তুর বিনাশ নেই, কেবলমাত্র রূপান্তর ঘটতে পারে। তখনকার চিন্তা ছিল, প্রত্যেক পরিবর্তনের পর বস্তু বস্তুই থেকে যায় এবং তার পরিমাণে কোন কম বেশী হয় না। এরি ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত শুনানো হতো যে, এ বস্তুজগতের কোন আদি-অন্ত নেই। কিন্তু বর্তমানে আনবিক শক্তি (Atomic Energy) আবিষ্কারের ফলে এ সমগ্র চিন্তার ধারাই উল্টে গেছে। এখন একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, শক্তি বস্তুতে রূপান্তরিত হয় এবং বস্তু আবার শক্তিরূপে আত্ম প্রকাশ করে, এমন কি শেষ পর্যন্ত তার আকৃতিও থাকে না। ভৌতিক অবস্থানও থাকে না। এখন তাপের গতির দ্বিতীয় আইন (Second law of thermo-Dynamics) একথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এ বস্তুজগত না অনাদি হতে পারে, না অনন্ত। অবশ্যই এক সময় এর শুরু এবং এক সময় শেষ হতে হবে। তাই বিজ্ঞানের ভিত্তিতে বর্তমানে কিয়ামত অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আর একথা সুস্পষ্ট যে, বিজ্ঞান যদি আত্মসমর্পন করে তবে দর্শন কিসের ভিত্তিতে কিয়ামত অস্বীকার করবে?

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ
مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ
وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا
السُّوأَىٰ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٠﴾

আর এরা কি কখনো পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তাহলে এদের পূর্বে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের পরিণাম এরা দেখতে পেতো।[৮] তারা এদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী ছিল, তারা জমি কর্ষণ করেছিল খুব ভালো করে[৯] এবং এত বেশী আবাদ করেছিল যতটা এরা করেনি।[১০] তাদের কাছে তাদের রসূল আসে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী নিয়ে।[১১] তারপর আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলেন না কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করছিল।[১২] শেষ পর্যন্ত যারা অসৎকাজ করেছিল তাদের পরিণাম হয়েছিল বড়ই অশুভ, কারণ তারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলেছিল এবং তারা সেগুলোকে বিদ্রূপ করতো।

৭. অর্থাৎ মৃত্যুর পর নিজের রবের সামনে হাজির হতে হবে, একথা বিশ্বাস করে না।

৮. আখেরাতের পক্ষে এটি একটি ঐতিহাসিক যুক্তি। এর অর্থ হচ্ছে, কেবল দুনিয়ার দু'চারজন লোকই তো আখেরাত অস্বীকার করেনি বরং মানব ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিপুল সংখ্যক মানুষকে এ রোগে আক্রান্ত হতে দেখা গেছে। বরং অনেক জাতির সমস্ত লোকই আখেরাত অস্বীকার করেছে অথবা তা থেকে গাফিল হয়ে গেছে কিংবা মৃত্যু পরের জীবন সম্পর্কে এমন মিথ্যা বিশ্বাস উদ্ভাবন করে নিয়েছে যার ফলে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস অর্থহীন হয়ে গেছে। তারপর ইতিহাসের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা একথা জানিয়ে দিয়েছে যে, যেভাবেই আখেরাত অস্বীকার করা হোক না কেন, তার অনিবার্য ফল স্বরূপ মানুষের নৈতিক চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। তারা নিজেদেরকে দায়িত্বহীন মনে করে লাগামহীন ও স্বেচ্ছাচারীতে পরিণত হয়েছে। তারা জুলুম, বিপর্যয়, ফাসেকী ও অশ্লীল আচরণের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এ জিনিসটির বদৌলতে জাতিসমূহ একের পর এক ধ্বংস হতে থেকেছে। হাজার বছরের ইতিহাসে মানব বংশ একের পর এক যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তা কি একথা প্রমাণ করে না যে, আখেরাত একটি সত্য, যা অস্বীকার করা মানুষের জন্য ধ্বংসাত্মক ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বস্তুকে সবসময় মাটির দিকে নেমে আসতে দেখেছে বলেই সে ভারী জিনিসের আকর্ষণ স্বীকার করে। যে বিষ খেয়েছে সে-ই মারা পড়েছে, এ জন্যই মানুষ

বিষকে বিষ বলে মানে। অনুরূপভাবে আখেরাত অস্বীকার যখন চিরকাল মানুষের নৈতিক বিকৃতির কারণ প্রমাণিত হয়েছে তখন এ অভিজ্ঞতা কি এ শিক্ষা দেবার জন্য যথেষ্ট নয় যে, আখেরাত একটি জাজ্বল্যমান সত্য এবং তাকে বাদ দিয়ে দুনিয়ায় জীবন যাপন করা ভুল?

৯. মূল শব্দ হচ্ছে أَثَارُوا الْأَرْضَ কৃষিকাজ করার জন্য লাঙ্গল দেয়া অর্থেও এ শব্দের ব্যবহার হতে পারে আবার মাটি খুঁড়ে ভূগর্ভ থেকে পানি উঠানো, খাল খনন এবং খনিজ পদার্থ ইত্যাদি বের করাও হয়।

১০. যারা নিছক বস্তুগত উন্নতিকে একটি জাতির সৎ হবার আলামত মনে করে এখানে তাদের যুক্তির জবাব রয়েছে। তারা বলে যারা পৃথিবীর উপায়-উপকরণকে এত বিপুল পরিমাণে ব্যবহার (Exploit) করেছে তারা দুনিয়ায় বিরাট উন্নয়নমূলক কাজ করেছে এবং একটি মহিমান্বিত সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। কাজেই মহান আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত করবেন এটা কেমন করে সম্ভব। কুরআন এর জবাব এভাবে দিয়েছে "এমন উন্নয়নমূলক কাজ" পূর্বেও বহু জাতি বিরাট আকারে করেছে। তারপর কি তোমরা দেখনি সে জাতিগুলো তাদের নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি সহকারে ধূলায় মিশে গেছে এবং তাদের "উন্নয়নের' আকাশচুম্বী প্রাসাদ ভূলুণ্ঠিত হয়েছে? যে আল্লাহর আইন ইহজগতে সত্যের প্রতি বিশ্বাস ও সৎ চারিত্রিক গুণাবলী ছাড়া নিছক বস্তুগত নির্মাণের এরূপ মূল্য দিয়েছে সে একই আল্লাহর আইন কি কারণে পারলৌকিক জগতে তাকে জাহান্নামে স্থান দেবে না?

১১. অর্থাৎ এমন নিদর্শনাবলী নিয়ে যা তাদেরকে সত্য নবী হবার নিশ্চয়তা দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল। এখানকার পূর্বাপর আলোচনার প্রেক্ষাপটে নবীদের আগমনের কথা উল্লেখ করার অর্থ হচ্ছে এই যে, একদিকে মানুষের নিজের অস্তিত্বের মধ্যে, এর বাইরে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থায় এবং মানুষের ইতিহাসের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতায় আখেরাতের সাক্ষ বিদ্যমান ছিল। অন্যদিকে একের পর এক নবীগণ এসেছেন। তাঁদের সাথে তাঁদের নবুওয়াত সত্য হবার সুস্পষ্ট আলামত পাওয়া যেতো এবং যথার্থই আখেরাতের আগমন সম্পর্কে তাঁরা মানুষকে সতর্কও করতেন।

১২. অর্থাৎ এরপর এ জাতিগুলো যে ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে তা তাদের ওপর আল্লাহর জুলুম ছিল না বরং তা ছিল তাদের নিজেদের জুলুম। এসব জুলুম তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর করেছিল। যে ব্যক্তি বা দল নিজে সঠিক চিন্তা করে না এবং অন্যের বুঝিয়ে দেবার পরও সঠিক নীতি অবলম্বন করে না সে নিজেই নিজের অশুভ পরিণামের জন্য দায়ী হয়। এ জন্য আল্লাহকে দোষারোপ করা যেতে পারে না। আল্লাহ নিজের কিতাব ও নবীগণের মাধ্যমে মানুষকে সত্যের জ্ঞান দেবার ব্যবস্থাও করেছেন এবং তাকে এমন বুদ্ধিবৃত্তিক ও তাত্ত্বিক উপকরণাদিও দিয়েছেন যেগুলো ব্যবহার করে সে সবসময় নবী ও আসমানী কিতাব প্রদত্ত জ্ঞানের সত্যতা যাচাই করতে পারে। এ পথনির্দেশনা এবং এ উপকরণাদি থেকে আল্লাহ যদি মানুষকে বঞ্চিত করে থাকতেন এবং সে অবস্থায় মানুষকে ভুল পথে যাবার ফল পেতে হতো তাহলে নিসন্দেহে আল্লাহর বিরুদ্ধে জুলুমের দোষারোপ করার অবকাশ সৃষ্টি হতে পারতো।

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ
يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٢﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا
بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٣﴾

২ রকূ'

আল্লাহ সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই তার পুনরাবৃত্তি করবেন।[১৩] তারপর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে। আর যখন সে সময়টি[১৪] সমাগত হবে, সেদিন অপরাধী বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যাবে।[১৫] তাদের বানানো শরীকদের মধ্য থেকে কেউ তাদের সুপারিশ করবে না[১৬] এবং তারা নিজেদের শরীকদেরকে অস্বীকার করবে।[১৭]

১৩. কথাটি দাবীর ভংগীতে বলা হলেও দাবীর স্বপক্ষে যুক্তিও এর মধ্যে রয়ে গেছে। সুস্পষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি একথার সাক্ষ দিয়ে থাকে যে, সৃষ্টির সূচনা করা যার পক্ষে সম্ভবপর তার পক্ষে একই সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি করা আরো ভালোভাবেই সম্ভবপর। সৃষ্টির সূচনা তো একটি বাস্তব সত্য, বিষয়টি সবার সামনেই রয়েছে। কাফের ও মুশরিকরাও এটাকে আল্লাহর কাজ বলে স্বীকার করে। এরপর যে আল্লাহ এ সৃষ্টির সূচনা করেন তিনি এর পুনরাবৃত্তি করতে পারেন না, তাদের এ চিন্তা একেবারেই অর্থহীন ও অযৌক্তিক।

১৪. অর্থাৎ আল্লাহর দিকে ফিরে যাবার এবং তাঁর সামনে উপস্থিত হবার সময়।

১৫. মূল শব্দ হচ্ছে ابلاس –এর অর্থ হচ্ছে চরম হতাশা ও দুঃখ-বেদনার কারণে কোন ব্যক্তির একেবারে হতবাক ও স্তব্ধ হয়ে যাওয়া। আশার সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে দেখে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে যাওয়া এবং কোন যুক্তি ও সমর্থন না পাওয়ার কারণে রুদ্ধশ্বাস হওয়া। এ শব্দটি যখন অপরাধীর জন্য ব্যবহার করা হয় তখন মনের পাতায় তার যে ছবি ভেসে ওঠে তা হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তিকে অপরাধ করার সময় হাতে নাতে পাকড়াও করা হয়েছে। সে পালাবার কোন পথ পাচ্ছে না এবং নিজের সাফাই গাইবার জন্য কোন জিনিস পেশ করে বের হয়ে আসার আশাও রাখে না। তাই তার কণ্ঠরুদ্ধ এবং চরম হতাশা ও মনমরা অবস্থায় সে অবাক বিস্ময়ে থ হয়ে গেছে।

প্রসঙ্গত একথাটাও উপলব্ধি করতে হবে যে, এখানে অপরাধী বলতে কেবল দুনিয়ায় যারা হত্যা, চুরি, ডাকাতি ও এ ধরনের অন্যান্য অপরাধ করে তাদের কথা বলা হয়নি বরং এমন সব লোকের কথা এখানে বলা হয়েছে যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাঁর রসূলদের শিক্ষা ও পথনির্দেশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে এবং আখেরাতে জবাবদিহি করার কথা অস্বীকার করে অথবা সে ব্যাপারে নির্বিকার থেকে এবং দুনিয়ায় আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের অথবা নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব করতে থেকেছে। এ মূল ভ্রষ্টতার

সাথে সাধারণ্যে অপরাধ বলা হয়ে থাকে এমন কাজ তারা করলেও বা না করলেও কিছু আসে যায় না। এ ছাড়াও এমনসব লোকও এর অন্তরভুক্ত হয়ে থাকে যারা আল্লাহকে মেনে নিয়ে তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান এনে আখেরাতকে স্বীকার করে নিয়ে তারপর আবার জেনে বুঝে নিজেদের রবের নাফরমানী করেছে এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেদের বিদ্রোহীনীতিতে অবিচল থেকেছে। এরা নিজেদের প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিপরীতে আখেরাতের জগতে হঠাৎ করে জেগে উঠবে এবং দেখবে, সত্যিই তো এখানে সেই পরবর্তী জীবন শুরু হয়ে গেছে, যা অস্বীকার করে অথবা যাকে উপেক্ষা করে তারা দুনিয়ায় কাজ করতো। তখন তাদের বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে যাবে এবং তাদের ওপর এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যাবে يبلس المجرمون বাক্যাংশে যার ছবি অংকন করা হয়েছে।

১৬. তিন ধরনের সত্তার ওপর শরীক শব্দটির প্রয়োগ হয়। এক, ফেরেশতা, নবী, আউলিয়া, শহীদ ও পুণ্যবান লোক। মুশরিকরা বিভিন্ন যুগে এদেরকে আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতার অধিকারী গণ্য করে এদের সামনে বন্দেগী ও পূজার যাবতীয় অনুষ্ঠান পালন করতো। কিয়ামতের দিন তারা পরিষ্কার বলে দেবে, এসব কিছু করেছো তোমরা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বরং আমাদের শিক্ষা ও পথনির্দেশের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করে। তাই তোমাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। তোমাদের শাফায়াতের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে আমরা কিছু আবেদন নিবেদন করবো, এ আশা আমাদের ব্যাপারে করো না। দুই, এমন সব জিনিস যেগুলোর চেতনা নেই অথবা প্রাণ নেই। যেমন ঃ চাঁদ, সূর্য, তারকা, গাছ, পাথর, পশু ইত্যাদি। মুশরিকরা তাদেরকে খোদায় পরিণত করে, এদের পূজা-উপাসনা করে এবং এদের কাছে প্রার্থনা নিবেদন করে। কিন্তু এই জড় ও নির্জীব জিনিসগুলো একথা জানতেই পারে না যে, আল্লাহর প্রতিনিধি মানুষ এসব নজরানা তাদের জন্য উৎসর্গ করছে। একথা সুস্পষ্ট যে, এদের মধ্য থেকে একজনও তাদের সুপারিশের জন্য সামনে অগ্রসর হবে না। তিন, এমন সব বড় বড় অপরাধী যারা নিজেরাই চেষ্টা করে, ধোঁকা ও প্রতারণার পথ অবলম্বন করে, মিথ্যার জাল ছড়িয়ে দিয়ে অথবা শক্তি প্রয়োগ করে দুনিয়ায় আল্লাহর বান্দাদের থেকে নিজেদের বন্দেগী ও পূজা আদায় করে নিয়েছে। যেমন শয়তান, ভণ্ড ধর্মীয় নেতা এবং জালেম ও স্বৈরাচারী শাসনকর্তা ইত্যাদি। এরা সবাই সেখানে বিপদের শৃংখলে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত থাকবে। নিজেদের এ ভক্তবৃন্দের সুপারিশের উদ্দেশ্যে সামনে অগ্রসর হওয়া তো দূরের কথা বরং তারা নিজেদের আমলনামার বোঝা হালকা করার চেষ্টা করতে থাকবে। হাশরের ময়দানে তারা একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করতে থাকবে যে, এদের অপরাধের জন্য এরা নিজেরাই দায়ী এবং এদের পথভ্রষ্টতার জন্য আমাদের দুর্ভোগ পোহানো উচিত নয়। এভাবে মুশরিকরা সেখানে কোন দিক থেকে কোন প্রকার শাফায়াত লাভ করতে সক্ষম হবে না।

১৭. অর্থাৎ সে সময় মুশরিকরা একথা স্বীকার করবে যে, তাদেরকে আল্লাহর শরীক করে তারা ভুল করেছিল। প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্য থেকে কারো আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে কোন অংশ নেই, এ সত্যটি তখন তাদের সামনে উন্মোচিত হয়ে যাবে। তাই দুনিয়ায় আজ তারা যে শিরকের ওপর টিকে থাকার জন্য চাপ দিচ্ছে আখেরাতে তাকেই অস্বীকার করবে।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ﴿١٤﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ﴿١٥﴾

যেদিন সেই সময়টি সমাগত হবে সেদিন (সমস্ত মানুষ) পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে যাবে।[১৮] যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা একটি বাগানে[১৯] আনন্দে থাকবে।[২০]

১৮. অর্থাৎ দুনিয়ায় আজ জাতি, বংশ, গোত্র, স্বদেশ, ভাষা, পরিবার এবং অর্থনৈতিক রাজনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট যতগুলো দলীয় বিভক্তি রয়েছে এসবই সেদিন ভেঙ্গে পড়বে। নির্ভেজাল আকীদা–বিশ্বাস ও নৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে নতুন করে এখন ভিন্নতর দল গঠিত হবে। একদিকে সমগ্র মানব জাতির পূর্বের ও পরের সমগ্র প্রজন্মের মধ্য থেকে মু'মিন ও সৎ লোকদেরকে ছেঁটে আলাদা করে নেয়া হবে এবং তাদের সবাই হবে একটি দলভুক্ত। অন্যদিকে এক ধরনের ভ্রান্ত মতবাদ ও বিশ্বাস পোষণকারী এবং এক এক ধরনের অপরাধজীবী মানুষদেরকে সেই বিশাল জনসমুদ্র থেকে ছাঁটাই বাছাই করে আলাদা করে নেয়া হবে এবং তাদের পৃথক পৃথক দল সৃষ্টি হয়ে যাবে। অন্য কথায় এভাবে বলা যায়, ইসলাম যেসব জিনিসকে এ দুনিয়ায় বিভেদ অথবা ঐক্যের ভিত্তি গণ্য করে এবং যেগুলোকে জাহেলিয়াত পন্থীরা এখানে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, আখেরাতে তারই ভিত্তিতে বিভেদও হবে আবার ঐক্যও।

ইসলাম বলে, মানুষদেরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করার এবং পরস্পরের সাথে জুড়ে দেবার আসল জিনিস হচ্ছে তার আকীদা–বিশ্বাস ও নৈতিক চরিত্র। যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর নির্দেশের ওপর তাদের জীবন ব্যবস্থার ভিত গড়ে তোলে তারা সবাই একই দলভুক্ত। তাদের সম্পর্ক বিভিন্ন বংশ ও দেশের সাথেও হতে পারে। অন্যদিকে কুফরী ও ফাসেকীর পথ অবলম্বনকারীরা অন্য একটি দলভুক্ত। তাদের সম্পর্ক যে কোন বংশ ও দেশের সাথেও হতে পারে। এদের উভয়ের জাতীয়তা এক হতে পারে না। এরা দুনিয়ায় সম্মিলিতভাবে একক জীবনপথ নির্মাণ করে তার ওপর একসাথে চলতে পারে না। ওদিকে আখেরাতেও তাদের পরিণাম একই রকম হতে পারে না। দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত তাদের পথ ও মনযিল পরস্পর থেকে আলাদা হয়। পক্ষান্তরে জাহেলিয়াতপন্থীরা প্রত্যেক যুগে এ ব্যাপারে জোর দিতে থেকেছে এবং আজো তারা এ ব্যাপারে অবিচল যে, বংশ, দেশ ও ভাষার ভিত্তিতে মানুষের দলবদ্ধ হওয়া উচিত। যাদের মধ্যে এ ভিত্তিগুলোর ব্যাপারে একাত্মতা রয়েছে তাদের ধর্ম ও আকীদা–বিশ্বাসের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক জাতিতে পরিণত হয়ে এমনি ধরনের অন্যান্য জাতির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়া উচিত এবং এ জাতীয়তাবাদের এমন একটি জীবন ব্যবস্থা থাকা উচিত যেখানে তাওহীদ, শিরক ও নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসীরা সবাই একসাথে চলতে পারে। এটিই ছিল আবু জেহেল, আবু লাহাব ও কুরাইশ সরদারদের চিন্তাধারা। তারা বারবার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছিল যে, এ ব্যক্তি এসে আমাদের জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে কুরআন মজীদ এখানে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করছে যে, এ

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ
فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ
تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ
تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾

আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও পরলোকের সাক্ষাতকারকে মিথ্যা বলেছে[২১] তাদেরকে আযাবে হাজির রাখা হবে।

কাজেই[২২] আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো[২৩] যখন তোমাদের সন্ধ্যা হয় এবং যখন তোমাদের সকাল হয়। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে তাঁর জন্যই প্রশংসা এবং (তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো) তৃতীয় প্রহরে এবং যখন তোমাদের কাছে এসে যায় যোহরের সময়।[২৪] তিনি জীবিত থেকে মৃত্যুকে বের করেন এবং মৃত থেকে জীবিতকে বের করে আনেন এবং ভূমিকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন।[২৫] অনুরূপভাবে তোমাদেরকেও (মৃত অবস্থা থেকে) বের করে নিয়ে যাওয়া হবে।

দুনিয়ায় মিথ্যার ভিত্তিতে তোমরা এই যেসব দল গঠন করেছো এগুলো সবই শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়বে। ইসলাম দুনিয়ার এ জীবনে যে বিশ্বাস, জীবনাদর্শ ও নৈতিক চরিত্রের ভিত্তিতে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায় মানব জাতির মধ্যে তারি ভিত্তিতে স্থায়ী পার্থক্য গড়ে উঠবে। যাদের গন্তব্য এক নয় তাদের জীবনের পথই বা কেমন করে এক হতে পারে।

১৯. 'একটি বাগান' কথাটি এখানে বাগানের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষার মতো আমাদের ভাষায়ও একটি পরিচিত বর্ণনাভংগী রয়েছে। কোন ব্যক্তি কাউকে কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে বলে এবং এই সংগে একথাও বলে, যদি তুমি একাজটি করে দাও তাহলে আমি তোমাকে একটি জিনিস দেবো। এখানে একটি জিনিসের অর্থ এ হয় না যে, সংখ্যার দিক দিয়ে তা একটিই হবে। বরং এর উদ্দেশ্য হয়, এর পুরস্কারস্বরূপ তোমাকে একটি অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস দেবো, যা পেয়ে তুমি আনন্দে উৎফুল্ল হবে।

২০. এখানে মূলে يحبرون শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আনন্দ, স্বাদ, আড়ম্বর, জাঁকজমক ও মর্যাদার ধারণা এর অর্থের অন্তরভুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ সেখানে অত্যন্ত মর্যাদা

সহকারে রাখা হবে, আনন্দে ও আরাম-আয়েশে থাকবে এবং সব রকম ভোগে পরিতৃপ্ত হবে।

২১. একথাটি অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য যে, ঈমানের সাথে সৎকাজের কথা বলা হয়েছে, যার ফলে মানুষ মহান মর্যাদা সম্পন্ন পরিণামফল ভোগ করবে। কিন্তু কুফরীর অশুভ পরিণাম বর্ণনা প্রসংগে অসৎকাজের কোন বর্ণনা দেয়া হয়নি। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় যে, মানুষের পরিণাম নষ্ট করার জন্য কুফরীই যথেষ্ট। অসৎকাজের সাথে তার শামিল হওয়ায় বা না হওয়ায় কিছু যায় আসে না।

২২. এখানে "কাজেই" শব্দটি এ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে যে, যখন তোমরা জানতে পারলে ঈমান ও সৎকাজের এহেন পরিণাম হবে এবং কুফরী ও মিথ্যা আরোপের এহেন পরিণাম হবে তখন তোমাদের এ ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। তাছাড়া "কাজেই" শব্দটির এ অর্থও হয় যে, মুশরিক ও কাফেররা পরকালীন জীবনকে অসম্ভব গণ্য করে আল্লাহকে মূলত অক্ষম ও অপারগ ঘোষণা করছে। কাজেই এর মোকাবিলায় তুমি আল্লাহর প্রশংসা করো, তাঁর মহিমা প্রচার করো এবং এ দুর্বলতা থেকে তিনি মুক্ত একথা ঘোষণা করে দাও। এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাঁর মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে সমগ্র মু'মিন সমাজকে।

২৩. আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করার অর্থ হচ্ছে এই যে, মুশরিকরা নিজেদের শিরক ও আখেরাত অস্বীকারের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি যেসব দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা আরোপ করে থাকে সেই অনন্য মহামহিম সত্ত্বাকে তা থেকে পাক-পবিত্র ঘোষণা করা এবং একথা প্রকাশ করা। এ ঘোষণা ও প্রকাশের সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে নামায। এরি ভিত্তিতে ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ, ইবনে যায়েদ ও অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণ বলেন, এখানে "তাসবীহ পাঠ" তথা মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করার অর্থ নামায পড়া। এ তাফসীরের স্বপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ কুরআনের এ আয়াতের মধ্যেই রয়ে গেছে অর্থাৎ এখানে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করার জন্য কয়েকটি বিশেষ সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট, আল্লাহ সমস্ত দোষ-ত্রুটিমুক্ত—এ আকীদা পোষণ করাই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে এ জন্য আবার সকাল-সাঁঝে এবং দুপুরে (জোহর) ও রাতের ('ঈশা) নামাযের সময় নির্ধারণের প্রশ্নই উঠতো না। কারণ এ আকীদা তো মুসলমানদের সবসময়ই পোষণ করতে হবে। এভাবে যদি শুধুমাত্র মুখেই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলেও এ সময়গুলো নির্ধারণ করার কোন অর্থ হয় না। কারণ মুসলমানকে তো সবসময় এ আকীদা প্রকাশ করতে হবে। এভাবে যদি নিছক কণ্ঠের মাধ্যমে আল্লাহর পবিত্রতা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলেও এ সময়গুলো নির্ধারণ করা অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারণ মুসলমানকে তো সর্বক্ষণ একথা প্রকাশ করতে হবে। তাই সময় নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে আল্লাহর গুণ ও মহিমা প্রচার করার হুকুম নিসন্দেহে তার একটি বিশেষ কার্যকর কাঠামোর প্রতিই ইংগিত করে। আর এ কার্যকর কাঠামোটি নামায ছাড়া আর কিছুই নয়।

২৪. এ আয়াতে নামাযের চারটি সময়ের প্রতি ইশারা করা হয়েছে ঃ ফজর, মাগরিব, আসর ও যোহর। এ ছাড়াও নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে কুরআন মজিদে আরো যেসব ইশারা করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ

"নামায কায়েম করো সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত এবং ফজরের সময় কুরআন পাঠ করো।" (বনী ইসরাঈল, ৭৮)

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ

"আর নামায কায়েম করো দিনের দুই মাথায় এবং রাতের কিছু অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর।" (হূদ, ১১৪ আয়াত)

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَاۤئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ ـ

"আর তোমার রবের প্রশংসা সহকারে তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো সূর্য উদিত হবার আগে এবং তার অস্ত যাবার আগে। আর রাতের কিছু সময়ও আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং দিনের প্রান্তভাগেও।" (ত্বা-হা, ১৩০ আয়াত)

এর মধ্য থেকে প্রথম আয়াতটি বলছে ঃ নামাযের সময়সীমা হচ্ছে সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে ঈশা পর্যন্ত এবং এরপর হচ্ছে ফজরের সময়। দ্বিতীয় আয়াতে দিনের দুই প্রান্ত অর্থ ফজর ও মাগরিবের সময় এবং কিছু রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পরের সময়টি হচ্ছে ঈশার ওয়াক্ত। তৃতীয় আয়াতে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে অর্থ জফরের সময় এবং অস্তমিত হওয়ার পূর্বে অর্থ আসরের সময়। রাতের সময়ের মধ্যে মাগরিব ও ঈশা উভয়ই অন্তরভুক্ত। আর দিনের প্রান্ত হচ্ছে তিনটি ঃ এক, সকাল, দুই, সূর্য ঢলে পড়া এবং তিন, মাগরিব। এভাবে সারা দুনিয়ার মুসলমানরা আজ যে পাঁচটি সময়ে নামায পড়ে থাকে কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে সে সময়গুলোর প্রতি ইংগিত করেছে। কিন্তু একথা স্পষ্ট শুধুমাত্র এ আয়াতগুলো পাঠ করে কোন ব্যক্তিও নামাযের সময় নির্ধারণ করতে পারতো না। মহান আল্লাহর নিযুক্ত কুরআনের শিক্ষক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে এ ব্যাপারে তাদেরকে পথনির্দেশনা না দিলে তাদের পক্ষে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর ছিল না।

এখানে একটু থেমে হাদীস অস্বীকারকারীদের ধৃষ্টতার কথা ভাবুন। তারা "নামায পড়া" কে বিদ্রূপ করে এবং বলে, মুসলমানরা বর্তমানে যে নামায পড়ছে এটা আদতে সে জিনিসই নয় কুরআনে যার হুকুম দেয়া হয়েছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, কুরআন তো নামায কায়েম করার হুকুম দেয় এবং তার অর্থ নামায পড়া নয় বরং "রবুবিয়াতের ব্যবস্থা" কায়েম করা। এখন তাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করুন, রবুবিয়াতের এ অভিনব ব্যবস্থাটি কোন্ ধরনের যাকে সূর্য উদিত হবার পূর্বেই কায়েম করা যেতে পারে অথবা আবার সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে কিছু রাত অতিবাহিত হওয়া পর্যন্তও কায়েম করা যায় ? আর কোন্ ধরনের রবুবিয়াত ব্যবস্থা বিশেষ করে জুমার দিন কায়েম করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে ?

اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ

আর বিশেষ ধরনের এমন কি রবুবিয়াত ব্যবস্থা আছে যা কায়েম করার জন্য মানুষ যখন অগ্রসর হয় তখন প্রথমে মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধুয়ে নেয় এবং পা ধুয়ে ফেলে গাঁট পর্যন্ত আর এই সাথে মাথাও মসেহ করে নেয়, অন্যথায় তাকে কায়েম করা যেতে পারে না?

اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ

আর রবুবিয়াত ব্যবস্থার মধ্যে এমন কি বিশেষত্ব আছে, যার ফলে যদি মানুষ নাপাকির অবস্থায় থাকে, তাহলে যতক্ষণ গোসল না করে নেয় ততক্ষণ তাকে কায়েম করতে পারে না?

لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ ..... وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا

আর এটাই বা কেমন ব্যাপার, যদি কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে মিলন করে এবং সেখানে পানি না পাওয়া যায় তাহলে এ অদ্ভুত রবুবিয়াত ব্যবস্থাকে কায়েম করার জন্য পাক-পবিত্র মাটিতে হাত ঘসে নিয়ে সেই হাত মুখমণ্ডলের ওপর ঘসতে হবে?

اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ -

আর এ কেমন ধরনের অদ্ভুত রবুবিয়াত ব্যবস্থা যে, যদি কখনো সফর করতে হয় তাহলে মানুষ তাকে পুরোপুরি কায়েম করার পরিবর্তে অর্ধেকটাই কায়েম করে?

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ

আর এটা কোন্ ধরনের কৌতুকপ্রদ ব্যাপার যে, যদি মুসলিম সেনাদল শত্রুর সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত থাকে, তাহলে সেনাদলের অর্ধেক সিপাহী অস্ত্র সজ্জিত হয়ে ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে "রবুবিয়াত ব্যবস্থা" কায়েম করতে থাকবে এবং বাকি অর্ধেক ময়দানে শত্রুর মোকাবিলা করতে থাকবে? তারপর যখন প্রথম দলটি ইমামের পেছনে রবুবিয়াত ব্যবস্থা কায়েম করতে গিয়ে একটি সিজদা করে নেবে তখন উঠে দাঁড়িয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দলটি তাদের জায়গায় এসে ইমামের পেছনে "রবুবিয়াত ব্যবস্থা" কায়েম করতে থাকবে?

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا اَسْلِحَتَهُمْ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ -

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ
تَنْتَشِرُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا
اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

৩ রুকূ'

তাঁর[২৬] নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে তারপর সহসা তোমরা হলে মানুষ, (পৃথিবীর বুকে) ছড়িয়ে পড়ছো।[২৭]

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই জাতি থেকে সৃষ্টি করেছেন স্ত্রীগণকে,[২৮] যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো[২৯] এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।[৩০] অবশ্যই এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

কুরআন মজীদের এ আয়াতগুলো একথা পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছে যে নামায কায়েম করার অর্থ হচ্ছে এমন ধরনের নামায কায়েম করা যা সারা দুনিয়ার মুসলমানরা পড়ে থাকে। কিন্তু হাদীস অস্বীকারকারীদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা নিজেরা পরিবর্তিত না হয়ে ইসলামকে পরিবর্তিত করার জন্য চাপ দিয়ে চলছে। আসলে যতক্ষণ কোন ব্যক্তি মহান আল্লাহর মোকাবিলায় একেবারেই শংকাহীন ও নির্লজ্জ না হয়ে যায় ততক্ষণ সে তাঁর বাণীর সাথে এ বিদ্রূপাত্মক আচরণ করতে পারে না, যা এরা করছে। অথবা এমন এক ব্যক্তি কুরআনের সাথে এ তামাশা করতে পারে যে নিজের মনে কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে স্বীকৃতি দেয় না এবং নিছক ধোঁকা দেবার জন্য কুরআন কুরআন বলে চিৎকার করে মুসলমানদেরকে গোমরাহ করতে চায়। (এ প্রসঙ্গে সামনের দিকে ৫০ টীকাও দেখে নিন)

২৫. অর্থাৎ যে আল্লাহ প্রতি মুহূর্তে তোমাদের সামনে এ কাজ করছেন তিনি মানুষের মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে অক্ষম হতে পারেন কেমন করে? তিনি সবসময় জীবিত মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারদের মধ্য থেকে বর্জ্য পদার্থ (Waste Matter) বের করছেন যেগুলোর মধ্যে জীবনের সামান্যতম গন্ধও নেই। তিনি প্রতি মুহূর্তে নিষ্প্রাণ বস্তুর (Dead Matter) মধ্যে জীবন সঞ্চার করে অসংখ্য পশু, উদ্ভিদ ও মানুষ সৃষ্টি করে চলছেন। অথচ যেসব উপাদান থেকে এ জীবন্ত সত্তাগুলোর শরীর গঠিত হচ্ছে তাদের মধ্যে সামান্যতমও জীবনের চিহ্ন নেই। তিনি প্রতি মুহূর্তে তোমাদের এ দৃশ্য দেখিয়ে চলছেন যে, অনুর্বর, অনুন্নত, অনাবাদি পতিত জমিতে বৃষ্টির পানি পড়ার সাথে সাথেই সহসা সেখানে প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের বিপুল সমারোহ দেখা যায়। এ সবকিছু দেখার পরও যদি কোন ব্যক্তি

মনে করে সৃষ্টির এ কারখানা পরিচালনাকারী আল্লাহ মানুষের মৃত্যুর পর তাকে পুনরায় জীবিত করতে অক্ষম, তাহলে আসলে তার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। তার বাইরের চোখ দু'টি যে বাহ্যিক দৃশ্যাবলী দেখে থাকে, তার বুদ্ধির চোখ তার মধ্যে দৃশ্যমান উজ্জ্বল সত্য দেখতে পায় না।

২৬. মনে রাখতে হবে, এখান থেকে রুকূ'র শেষ অবদি মহান আল্লাহর যেসব নিদর্শন বর্ণনা করা হচ্ছে, সেগুলো তো একদিকে বক্তব্য পরম্পরার সাথে সম্পর্ক রেখে পরকালীন জীবনের সম্ভাবনা ও অস্তিত্বশীলতার কথা প্রমাণ করে এবং অন্যদিকে এ নিদর্শনগুলোই প্রমাণ করে যে, এ বিশ্ব-জাহান ইলাহ বিহীন নয় এবং এর ইলাহও বহু নয় বরং এক ও একক ইলাহই এর স্রষ্টা, পরিচালক, মালিক ও শাসক। তিনি ছাড়া মানুষের আর কোন মাবুদ হওয়া উচিত নয়। অনুরূপভাবে এ রুকূ'টি বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে পূর্বের ও পরের উভয় ভাষণের সাথে সম্পৃক্ত।

২৭. অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টি রহস্য এ ছাড়া আর কি যে, কয়েকটি নিষ্প্রাণ উপাদানের সমাহার, যেগুলো এ পৃথিবীর বুকে পাওয়া যায়। যেমন কিছু কার্বন, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম এবং এ ধরনের আরো কিছু উপাদান। এগুলোর রাসায়নিক সংযোগের মাধ্যমে মানুষ নামক একটি বিস্ময়কর সত্ত্বা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে আবেগ, অনুভূতি, চেতনা, বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তা-কল্পনার এমন সব অদ্ভুত শক্তি যাদের কোন একটির উৎসও তার মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে না। তারপর শুধু এতটুকুই নয় যে, হঠাৎ একজন মানুষ এমনি ধরনের এক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে বরং তার মধ্যে এমন সব অদ্ভুত প্রজনন শক্তিও সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে যার বদৌলতে কোটি কোটি মানুষ সে একই কাঠামো এবং যোগ্যতার অধিকারী হয়ে অসংখ্য উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং সীমাসংখ্যাহীন ব্যক্তিগত বৈশিষ্টের ধারক হিসেবে বের হয়ে আসছে। তোমার বুদ্ধি কি এ সাক্ষ দেয়, এ চূড়ান্ত জ্ঞানময় সৃষ্টি কোন জ্ঞানী স্রষ্টার সৃষ্টিকর্ম ছাড়াই আপনা আপনিই অস্তিত্বশীল হয়েছে? তুমি কি সজ্ঞানে ও সচেতন অবস্থায় একথা বলতে পারো, মানুষ সৃষ্টির মতো মহত্তম পরিকল্পনা, তাকে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা এবং পৃথিবী ও আকাশের সংখ্যাতীত শক্তিকে মানব জীবন গঠনের উপযোগী করে দেয়া, এগুলো কি বহু ইলাহর চিন্তা ও ব্যবস্থাপনার ফল হতে পারে? আর তোমরা যখন মনে করতে থাকো, যে আল্লাহ মানুষকে নিরেট অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন তিনি সেই মানুষকে মৃত্যু দান করার পর পুনরায় জীবিত করতে পারবেন না, তখন তোমাদের মস্তিষ্ক কি সঠিক অবস্থায় থাকে?

২৮. অর্থাৎ স্রষ্টার প্রজ্ঞার পূর্ণতা হচ্ছে এই যে, তিনি মানুষকে শুধুমাত্র একটি জাতি (Sexes) সৃষ্টি করেননি বরং তাকে দু'টি জাতির আকারে সৃষ্টি করেছেন। মানবিকতার দিক দিয়ে তারা একই পর্যায়ভুক্ত। তাদের সৃষ্টির মূল ফরমুলাও এক। কিন্তু তারা উভয়ই পরস্পর থেকে ভিন্ন শারীরিক আকৃতি, মানসিক ও আত্মিক গুণাবলী এবং আবেগ-অনুভূতি ও উদ্যোগ নিয়ে জন্মলাভ করে। আবার তাদের মধ্যে এমন বিস্ময়কর সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে যার ফলে তারা প্রত্যেকে পুরোপুরি অন্যের জোড়ায় পরিণত হয়েছে। প্রত্যেকের শরীর এবং প্রবৃত্তি ও উদ্যোগসমূহ অন্যের শারীরিক ও প্রবৃত্তির দাবীসমূহের পরিপূর্ণ জবাব। এ ছাড়াও সেই প্রাজ্ঞ স্রষ্টা এ উভয় জাতির

লোকদেরকে সৃষ্টির সূচনা থেকেই বরাবর এ আনুপাতিক হারে সৃষ্টি করে চলবেন। আজ পর্যন্ত কখনো দুনিয়ার কোন জাতির মধ্যে বা কোন এলাকায় কেবলমাত্র পুত্র সন্তানই জন্মলাভ করছে, এমনটি দেখা যায়নি। অথবা কোথাও কেবলমাত্র কন্যা সন্তানই জন্মলাভ করে চলছে এমন কথাও শোনা যায়নি। এটা এমন একটা জিনিস যার মধ্যে কোন মানুষের হস্তক্ষেপ বা বুদ্ধি-কৌশল প্রয়োগের সামান্যতম অবকাশই নেই। মানুষ এ ব্যাপারে সামান্যতমও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না যে, মেয়েরা অনবরত এমন মেয়েলী বৈশিষ্ট এবং ছেলেরা অনবরত এমন পুরুষালী বৈশিষ্ট নিয়ে জন্মলাভ করতে থাকবে যা তাদের পরস্পরকে যথার্থ জোড়ায় পরিণত করবে। আর নারী ও পুরুষদের জন্ম এমনি ধারাবাহিকভাবে একটি আনুপাতিক হারে হয়ে যেতে থাকবে, এ ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করার কোন মাধ্যম তার নেই। হাজার হাজার বছর থেকে কোটি কোটি মানুষের জন্মলাভে এ কৌশল ও ব্যবস্থার এমনই সুসামঞ্জস্য পদ্ধতিতে কার্যকর থাকা কখনো নিছক আকস্মিক ঘটনা হতে পারে না আবার বহু ইলাহর সম্মিলিত ব্যবস্থাপনার ফলও এটা নয়। এ জিনিসটি সুস্পষ্টভাবে একথা প্রমাণ করে যে, একজন বিজ্ঞানী আর শুধুমাত্র একজন মহা বিজ্ঞানী স্রষ্টাই তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান ও শক্তির মাধ্যমে শুরুতে পুরুষ ও নারীর একটি সর্বাধিক উপযোগী ডিজাইন তৈরি করেন। তারপর তিনি এ ডিজাইন অনুযায়ী অসংখ্য পুরুষ ও অসংখ্য নারীর তাদের পৃথক ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট সহকারে সারা দুনিয়ায় একটি আনুপাতিক হারে জন্মলাভ করার ব্যবস্থা করেন।

২৯. অর্থাৎ এটা কোন অপরিকল্পিত ব্যবস্থা নয়। বরং স্রষ্টা নিজেই পরিকল্পিতভাবে এ ব্যবস্থা করেছেন, যার ফলে পুরুষ তার প্রাকৃতিক দাবী নারীর কাছে এবং নারী তার প্রাকৃতিক চাহিদা পুরুষের কাছে লাভ করবে এবং তারা উভয়ে পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত থেকেই প্রশান্তি ও সুখ লাভ করবে। এ বিজ্ঞানময় ব্যবস্থাপনাকে স্রষ্টা একদিকে মানব বংশধারা অব্যাহত থাকার এবং অন্যদিকে মানবিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অস্তিত্ব দান করার মাধ্যমে পরিণত করেছেন। যদি এ দু'টি জাতিকে নিছক দু'টি পৃথক ডিজাইনে তৈরি করা হতো এবং তাদের মধ্যে এমন অস্থিরতা সৃষ্টি না করা হতো, যা তাদের পারস্পরিক সংযোগ ও সম্পর্ক ছাড়া প্রশান্তিতে পরিণত হতে পারতো না তাহলে সম্ভবত ছাগল-ভেড়ার মতো মানুষের বংশ ধারাও এগিয়ে যেতো কিন্তু তাদের সাহায্যে কোন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব লাভের কোন সম্ভাবনাই থাকতো না। স্রষ্টা নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাহায্যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে পরস্পরের জন্য এমন চাহিদা, তৃষ্ণা ও অস্থিরতার অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছেন যার ফলে তারা উভয়ে মিলে একসাথে না থাকলে শান্তি ও সুখ লাভ করতে পারে না। সমগ্র প্রাণীজগতের বিপরীতে মানব জাতির মধ্যে এটিই হচ্ছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্মেষ ও বিকাশ লাভের মৌলিক কারণ। এ শান্তির অন্বেষাই তাদেরকে একত্রে ঘর বাঁধতে বাধ্য করে। এরি বদৌলতে পরিবার ও গোত্র অস্তিত্ব লাভ করে। এর ফলে মানুষের জীবনে সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে। এ বিকাশে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা অবশ্যই সহায়ক হয়েছে। কিন্তু তা তার আসল উদ্দোক্তা নয়। আসল উদ্দোক্তা হচ্ছে এ অস্থিরতা, যাকে পুরুষ ও নারীর অস্তিত্বের মধ্যে সংস্থাপিত করে তাদেরকে "ঘর" বাঁধতে বাধ্য করা হয়েছে। কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথা ভাবতে পারেন যে, এ বিপুল প্রজ্ঞা প্রকৃতির অন্ধ শক্তিসমূহ থেকে হঠাৎ এমনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে? অথবা বহু সংখ্যক ইলাহ কি এমনি ধরনের একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারতো, যার ফলে তারা

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ؕ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَّسْمَعُوْنَ ﴿٢٣﴾

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি[৩১] এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের পার্থক্য।[৩২] অবশ্যই তার মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য।

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তোমাদের রাতে ও দিনে ঘুমানো এবং তোমাদের তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করা।[৩৩] অবশ্যই এর মধ্যে রয়েছে বহু নিদর্শন এমনসব লোকদের জন্য যারা (গভীর মনোযোগ সহকারে) শোনে।

এ গভীর জ্ঞানময় উদ্দেশ্য সামনে রেখে হাজার হাজার বছর থেকে অনবরত অসংখ্য পুরুষ ও নারীকে এ বিশেষ অস্থিরতা সহকারে সৃষ্টি করে যেতে থাকতো? এ তো একজন জ্ঞানীর এবং মাত্র একজন জ্ঞানীরই প্রজ্ঞার সুস্পষ্ট নিদর্শন। কেবলমাত্র বুদ্ধিভ্রষ্ট ব্যক্তিই এটি দেখতে অস্বীকার করতে পারে।

৩০. ভালোবাসা বলতে এখানে কামসিক্ত ভালোবাসার (Sexual Love) কথা বলা হয়েছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে এটি আকর্ষণের প্রাথমিক উদ্দোক্তায় পরিণত হয়। তারপর তাদেরকে পরস্পরের সাথে সংলগ্ন করে রাখে। আর "রহমত" তথা দয়া মানে হচ্ছে এমন একটি আত্মিক সম্পর্ক, যা স্বামী-স্ত্রীর জীবনে পর্যায়ক্রমে বিকাশ লাভ করে। এর বদৌলতে তারা দু'জনে দু'জনার কল্যাণাকাংখী, দু'জনের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং উভয়ের সুখে-দুখে শরীক হয়ে যায়। এমনকি এমন এক সময় আসে যখন কামসিক্ত ভালোবাসা পেছনে পড়ে থাকে এবং বার্ধক্যে এ জীবনসাথী যৌবনকালের চাইতে অনেক বেশী অগ্রসর হয়ে পরস্পরের জন্য দয়া, স্নেহ ও মমতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে থাকে। মানুষের মধ্যে শুরুতেই যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল তাকে সাহায্য করার জন্য স্রষ্টা মানুষের মধ্যে এ দু'টি ইতিবাচক শক্তি সৃষ্টি করে দেন। এ অস্থিরতা তো শুধুমাত্র শান্তির প্রত্যাশী এবং এর সন্ধানে সে নারী ও পুরুষকে পরস্পরের দিকে নিয়ে যায়। এরপর এ দু'টি শক্তি অগ্রসর হয়ে তাদের মধ্যে স্থায়ী বন্ধুত্বের এমন একটি সম্পর্ক জুড়ে দেয় যা দু'টি পৃথক পরিবেশে লালিত আগন্তুকদেরকে একসাথে মিলিয়ে গভীরভাবে সংযুক্ত করে দেয়। এ সংযোগের ফলে সারা জীবন তারা মাঝ দরিয়ায় নিজেদের নৌকা একসাথে চালাতে থাকে। একথা সুস্পষ্ট, কোটি কোটি মানুষ তাদের জীবনে এই যে ভালোবাসা ও দয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করছে এগুলো কোন নিরেট বস্তু নয়। এগুলোকে ওজন ও পরিমাপ

করা যেতে পারে না। মানুষের শারীরিক গঠনে যেসব উপাদানের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে তাদের মধ্যে কোথাও এদের উৎস চিহ্নিত করা যেতে পারে না। কোন ল্যাবরেটরীতেও এদের জন্ম ও বিকাশ সাধনের কারণসমূহ অনুসন্ধান করা যেতে পারে না। এ ছাড়া এর আর কোন ব্যাখ্যাই করা যেতে পারে না যে, একজন প্রাজ্ঞ স্রষ্টা স্বেচ্ছাকৃতভাবে একটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে পূর্ণ সামঞ্জস্য সহকারে মানুষের মধ্যে তা সংস্থাপন করে দিয়েছেন।

৩১. অর্থাৎ তাদের অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভ করা, একটি অপরিবর্তনীয় নিয়মের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং অসংখ্য শক্তির পরম সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য সহকারে কাজ করা—এগুলো নিজের অভ্যন্তরে এ বিষয়ের এমন বহু নিদর্শন রাখে যা থেকে জানা যায় যে, এ সমগ্র বিশ্ব-জাহানকে মাত্র একজন স্রষ্টাই অস্তিত্ব দান করেছেন এবং তিনিই এ বিশাল ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন। একদিকে যদি একথা চিন্তা করা যায় যে, এ প্রাথমিক শক্তি (Energy) কোথা থেকে এলে বস্তুর আকার ধারণ করেছে? বস্তুর এ বিভিন্ন উপাদান কেমন করে গঠিত হয়েছে এ উপাদানগুলোকে এহেন বৈজ্ঞানিক কৌশলে সংমিশ্রিত করে বিস্ময়কর সামঞ্জস্য সহকারে এ অত্যদ্ভুত বিশ্বব্যবস্থা গঠিত হয়েছে কেমন করে? এখন কোটি কোটি বছর ধরে একটি মহাপরাক্রমশালী প্রাকৃতিক আইনের আওতাধীনে এ ব্যবস্থাটি কিভাবে চলছে? এ অবস্থায় প্রত্যেক নিরপেক্ষ বুদ্ধিবৃত্তি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুবে যে, এসব কিছু একজন সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানীর প্রবল ইচ্ছাশক্তি ছাড়া নিছক ঘটনাক্রমে বা অকস্মাত ঘটতে পারে না। আবার অন্যদিকে যদি দেখা যায় যে, পৃথিবী থেকে নিয়ে বিশ্ব-জাহানের দূরবর্তী নক্ষত্রগুলো পর্যন্ত সবাই একই ধরনের উপাদানে গঠিত এবং একই প্রাকৃতিক আইনের নিয়ন্ত্রণে তারা চলছে, তাহলে হঠকারিতামুক্ত প্রতিটি বুদ্ধিবৃত্তিই নিসন্দেহে একথা স্বীকার করবে যে, এ সবকিছু বহু ইলাহর কর্মকুশলতা নয় বরং একজন ইলাহ এ সমগ্র বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক।

৩২. অর্থাৎ যদিও তোমাদের বাকশক্তি সমান নয়, মুখ ও জিহবার গঠনেও কোন ফারাক নেই এবং মস্তিষ্কের গঠনাকৃতিও একই রূপ তবুও পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে তোমাদের ভাষা বিভিন্ন হয়ে গেছে। তারপর একই ভাষায় যারা কথা বলে তাদের বিভিন্ন শহর ও জনপদের ভাষাও আলাদা। আবার আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তির বলার রীতি, শব্দের উচ্চারণ এবং আলাপ-আলোচনার পদ্ধতি আলাদা। অনুরূপভাবে তোমাদের সৃষ্টি উপাদান এবং তোমাদের গঠনসূত্র একই। কিন্তু তোমাদের বর্ণ এত বেশী বিভিন্ন যে, একেক জাতির কথা না হয় বাদই দিলাম কিন্তু একই বাপ-মায়ের দু'টি সন্তানের বর্ণও সম্পূর্ণ একই হয় না। এখানে নমুনা হিসেবে কেবলমাত্র দু'টি জিনিসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু এদিক দিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে দেখুন, দুনিয়ায় সকল দিকেই আপনি এত বেশী বৈচিত্র (VARAITY) দেখতে পাবেন যে, তাদের সবগুলোকে একত্র করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। মানুষ, পশু, উদ্ভিদ এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিসের যে কোন একটি শ্রেণীকে নেয়া হোক, দেখা যাবে তাদের প্রতিটি এককের মধ্যে মৌলিক একাত্মতা সত্ত্বেও অসংখ্য বিভিন্নতা বিরাজ করছে। এমন কি কোন এক শ্রেণীর একটি এককও অন্য একটি এককের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল নয়। এমন কি একটি গাছের দু'টি পাতার মধ্যেও পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। এ জিনিসটি পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে যে, এ দুনিয়ায় এমন কোন কারখানা নেই যেখানে স্বয়ংক্রিয় মেশিনপত্র চলছে এবং

বিপুল উৎপাদনের (Massproduction) পদ্ধতিতে সব রকমের জিনিসের এক একটি ছাঁচ থেকে ঢালাই হয়ে একই ধরনের জিনিস বের হয়ে আসছে। বরং এখানে এমন একজন জবরদস্ত কারিগর কাজ করছেন যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে পূর্ণ ব্যক্তিগত আগ্রহ ও উদ্যোগ সহকারে একটি নতুন ডিজাইনে, নতুন নকশায় ও কারুকাজে, নতুন সৌষ্ঠবে এবং নতুন গুণাবলী সহকারে তৈরি করেন। তাঁর তৈরি করা প্রত্যেকটি জিনিস স্বকীয় বৈশিষ্টের অধিকারী। তাঁর উদ্ভাবন ক্ষমতা সবসময় সব জিনিসের একটি নতুন মডেল বের করে চলেছে। তাঁর শিল্পকারিতা একটি ডিজাইনকে দ্বিতীয়বার সামনে নিয়ে আসাকে নিজের পূর্ণতার জন্য অবমাননাকর মনে করে। যে ব্যক্তিই এ বিস্ময়কর দৃশ্য চোখ মেলে দেখবে সে কখনো এ ধরনের মূর্খতা সুলভ ধারণা পোষণ করতে পারে না যে, এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা একবার এ কারখানাটি চালিয়ে দিয়ে তারপর নিজে কোথাও গিয়ে ঘুমাচ্ছেন, তিনি যে প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি করে যাচ্ছেন এবং নিজের সৃষ্ট প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর ব্যক্তিগত দৃষ্টি দিচ্ছেন, এতো একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

৩৩. অনুগ্রহ সন্ধান করা অর্থ জীবিকার জন্য সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা চালানো। মানুষ যদিও সাধারণত রাতের বেলা ঘুমায় এবং দিনের বেলায় জীবিকার জন্য চেষ্টা-মেহনত করে তবুও শতকরা একশো ভাগ লোক এমনটি করে না। বরং বহুলোক দিনের বেলায় ঘুমায় এবং রাতে জীবিকা উপার্জনের জন্য মেহনত করে। তাই রাত দিনকে একসাথে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এ দু'টি সময়ে তোমরা ঘুমাও এবং নিজেদের জীবিকা উপার্জনের জন্য প্রচেষ্টাও চালিয়ে থাকো।

এটিও এমন ধরনের নিদর্শনাবলীর অন্যতম যেগুলো থেকে একজন মহাজ্ঞানী স্রষ্টার ব্যবস্থাপনার সন্ধান পাওয়া যায়। বরং এ ছাড়াও এ জিনিসটি এও চিহ্নিত করে যে, তিনি নিছক স্রষ্টা নন বরং নিজের সৃষ্টির প্রতি তিনি বড়ই করুণাশীল ও স্নেহময় এবং তার প্রয়োজন ও কল্যাণের জন্য তার চেয়ে বেশী তিনি চিন্তা করেন। মানুষ দুনিয়ায় অনবরত পরিশ্রম করতে পারে না। বরং প্রত্যেকবার কয়েক ঘন্টা মেহনতের পর তাকে কয়েক ঘন্টা বিশ্রাম নিতে হয়। এভাবে আবার সে কয়েক ঘন্টা মেহনত করার শক্তি পাবে। এ উদ্দেশ্যে মহাজ্ঞানী ও করুণাময় স্রষ্টা মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র ক্লান্তির অনুভূতি এবং কেবলমাত্র বিশ্রামের আকাংখা সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি বরং "নিদ্রা"র এমন একটি জবরদস্ত চাহিদা তার অস্তিত্বের মধ্যে রেখে দিয়েছেন যার ফলে তার ইচ্ছা ছাড়াই এমন কি তার বিরোধিতা সত্ত্বেও আপনা আপনিই কয়েক ঘন্টার জাগরণ ও মেহনতের পর তা তাকে পাকড়াও করে, কয়েক ঘন্টা বিশ্রাম নিতে তাকে বাধ্য করে এবং প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে আপনা আপনিই তাকে ত্যাগ করে। এ নিদ্রার স্বরূপ ও অবস্থা এবং এর মৌল কারণগুলো আজো মানুষ অনুধাবন করতে পারেনি। এটি অবশ্যই জন্মগতভাবে মানুষের প্রকৃতিতে এবং তার কাঠামোয় রেখে দেয়া হয়েছে। এটি যে যথাযথভাবে মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী হয়ে থাকে, এটা একথার সাক্ষ পেশ করার জন্য যথেষ্ট যে, এটি কোন আকস্মিক ঘটনা নয় বরং কোন মহাজ্ঞানী সত্তা একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে এ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। এর মধ্যে একটি বিরাট জ্ঞান, কল্যাণ ও উদ্দেশ্যমুখীতা পরিষ্কার সক্রিয় দেখা যায়। এ ছাড়াও এ নিদ্রা একথারও সাক্ষবহ যে, যিনি মানুষের মধ্যে এ বাধ্যতামূলক উদ্যোগ রেখে দিয়েছেন তিনি নিজেই মানুষের জন্য তার চেয়ে বেশী

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ
مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٤﴾

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্তরভুক্ত হচ্ছে, তিনি তোমাদের দেখান বিদ্যুৎচমক ভীতি ও লোভ সহকারে।[৩৪] আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তারপর এর মাধ্যমে জমিকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন।[৩৫] অবশ্যই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে এমন লোকদের জন্য যারা বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করে।

কল্যাণকামী। অন্যথায় মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে নিদ্রার বিরোধিতা করে এবং জোরপূর্বক জেগে থেকে এবং অনবরত কাজ করে কেবল নিজের কর্মশক্তিই নয় জীবনী শক্তিও ক্ষয় করে।

তারপর জীবিকার অন্বেষণের জন্য "আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান" শব্দাবলীর ব্যবহার করার মাধ্যমে নিদর্শনাবলীর অন্য একটি ধারাবাহিকতার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। যদি পৃথিবী ও আকাশের বিপুল ও অগণিত শক্তি সম্ভারকে জীবিকার কার্যকারণ ও উপায় উপকরণ সৃষ্টি করার কাজে না লাগিয়ে দেয়া হতো এবং পৃথিবীতে মানুষের জন্য জীবিকার অসংখ্য উপায়-উপকরণ সৃষ্টি না করা হতো, তাহলে মানুষ এ জীবিকার সন্ধানইবা কোথায় করতে পারতো। শুধুমাত্র এতটুকুই নয় বরং জীবিকার এ অনুসন্ধান এবং তা উপার্জন এমন অবস্থায়ও সম্ভব হতো না যদি এ কাজের জন্য মানুষকে সর্বাধিক উপযোগী অংগ-প্রত্যংগ এবং দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা না দান করা হতো, কাজেই মানুষের মধ্যে জীবিকা অন্বেষণের যোগ্যতা এবং তার অস্তিত্বের বাইরে জীবিকার উপকরণাদি বিদ্যমান থাকা পরিষ্কারভাবে একজন দয়াশীল ও মর্যাদাবান সত্তার অস্তিত্বের সন্ধান দেয়। বুদ্ধিবৃত্তি অসুস্থ না হলে কখনো কেউ এ ধারণা করতে পারতো না যে, এ সবকিছু অকস্মাত হয়ে গেছে অথবা এসব বহু ইলাহর ইলাহিত্বের ফল কিংবা কোন নির্দয় অন্ধশক্তি এ অনুগ্রহ ও দানের উৎস।

৩৪. অর্থাৎ তার মেঘ গর্জন ও বিদ্যুৎচমক থেকে তো একদিকে আশা হয় বৃষ্টি হবে এবং মাঠ শস্যে ভরে যাবে। কিন্তু সাথে সাথে এ ভয়ও জাগে যে, কোথাও বিজলী পড়ে বা অঝোর ধারায় বৃষ্টি হয়ে বানের তোড়ে সবকিছু ভাসিয়ে না নিয়ে যায়।

৩৫. এ জিনিসটি একদিকে মৃত্যু পরের জীবনের দিকে অংগুলি নির্দেশ করে এবং অন্যদিকে এ জিনিসটিই একথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ আছেন এবং এক আল্লাহই পৃথিবী ও আকাশের পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। জমি থেকে যা উৎপন্ন হয় তার ওপর নির্ভর করে পৃথিবীর অসংখ্য সৃষ্টির খাদ্য। এ উৎপাদন নির্ভর করে জমির উর্বরতা ও শস্য উৎপাদন ক্ষমতার ওপর। আবার এ উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে বৃষ্টিপাতের ওপর। সরাসরি জমির ওপর এ বৃষ্টিপাত হতে পারে। অথবা পানির বিশাল ভাণ্ডার জমির উপরিভাগে স্থান লাভ করতে পারে। কিংবা ভূগর্ভস্থ ঝরণা ও কূপের রূপলাভ করতে পারে। অথবা পাহাড়ের ওপর বরফের আকারে জমাট বদ্ধ হয়ে নদ-নদীর সাহায্যে প্রবাহিত হতে পারে। তারপর এ বৃষ্টিপাত আবার নির্ভর করে সূর্যের উত্তাপ, মওসুম পরিবর্তন,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ؕ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖ
مِّنَ الْاَرْضِ ۖ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ
وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ؕ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ
وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, আকাশ ও পৃথিবী তাঁর হুকুমে প্রতিষ্ঠিত আছে।[৩৬] তারপর যখনই তিনি পৃথিবী থেকে তোমাদের আহবান জানিয়েছেন তখনই একটি মাত্র আহবানেই সহসা তোমরা বের হয়ে আসবে।[৩৭] আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছুই আছে সবই তাঁর বান্দা, সবাই তাঁর হুকুমের তাঁবেদার। তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই আবার তার পুনরাবর্তন করবেন এবং এটি তাঁর জন্য সহজতর।[৩৮] আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে তাঁর গুণাবলী শ্রেষ্ঠ মর্যাদা সম্পন্ন এবং তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।

মহাশূন্যের তাপমাত্রা ও শৈত্য, বাতাসের আবর্তন এবং এমন বিদ্যুতের ওপর যা মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করে। এই সংগে বৃষ্টির পানির মধ্যে এক ধরনের প্রাকৃতিক লবণাক্ততাও সৃষ্টি করে দেয়। পৃথিবী থেকে নিয়ে আকাশ পর্যন্ত এসব বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া, তারপর এসবের অসংখ্য ও বিচিত্র ধরনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের জন্য সুস্পষ্টভাবে উপযোগী হওয়া এবং হাজার হাজার লাখো লাখো বছর পর্যন্ত এদের পূর্ণ একাত্মতা সহকারে অনবরত সহযোগিতার ভূমিকা পালন করে যেতে থাকা, এ সবকিছু কি নিছক ঘটনাক্রমিক হতে পারে? এ সবকিছু কি একজন স্রষ্টার জ্ঞানবত্তা, তাঁর সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং শক্তিশালী কৌশল ও ব্যবস্থাপনা ছাড়াই হয়ে গেছে? এ সবকিছু কি একথার প্রমাণ নয় যে, পৃথিবী, সূর্য, বাতাস, পানি, উত্তাপ ও শৈত্য এবং পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টির স্রষ্টা ও রব একজনই?

৩৬. অর্থাৎ তাঁর হুকুমে একবার অস্তিত্ব লাভ করেছে শুধু এতটুকু নয় বরং তাদের সবসময় প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং তাদের মধ্যে একটি বিশাল নির্মাণ কারখানার প্রতিনিয়ত সচল থাকাও তাঁরই হুকুমের বদৌলতে সম্ভব হয়েছে। এক মুহূর্তের জন্যও যদি তার হুকুম তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত না রাখে, তাহলে এ সমগ্র ব্যবস্থা এক নিমেষেই ওলট পালট হয়ে যাবে।

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم
مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ
أَنفُسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ
ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَا لَهُم
مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٩﴾

৪ রুকূ'

তিনি নিজেই তোমাদের জন্য[৩৯] তোমাদের আপন সত্তা থেকে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন। তোমাদের যেসব গোলাম তোমাদের মালিকানাধীন আছে তাদের মধ্যে কি এমন কিছু গোলাম আছে যারা আমার দেয়া ধন-সম্পদে তোমাদের সাথে সমান অংশীদার এবং তোমরা তাদেরকে এমন ভয় করো যেমন পরস্পরের মধ্যে সমকক্ষদেরকে ভয় করে থাকো?[৪০]—যারা বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করে তাদের জন্য আমি এভাবে আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করি। কিন্তু এ জালেমরা না জেনে বুঝে নিজেদের চিন্তা-ধারণার পেছনে ছুটে চলছে। এখন আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন কে তাকে পথ দেখাতে পারে?[৪১] এ ধরনের লোকদের কোন সাহায্যকারী হতে পারে না।

৩৭. অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও পরিচালকের পক্ষে তোমাদেরকে পুনর্বার জীবিত করে উঠিয়ে নিয়ে আসা তেমন কোন বড় কাজ নয়। এ জন্য তাঁকে কোন বড় রকমের প্রস্তুতি নিতে হবে না। বরং তাঁর মাত্র একটি আহবানেই সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যতগুলো মানুষ দুনিয়ায় জন্মলাভ করেছে এবং ভবিষ্যতে জন্ম নেবে তারা সবাই একসাথে পৃথিবীর সকল দিক থেকে বের হয়ে আসতে থাকবে।

৩৮. প্রথমবার সৃষ্টি করাটা যদি তাঁর জন্য কঠিন না হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা কেমন করে ধারণা করতে পারলে যে, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁর জন্য কঠিন হবে? প্রথমবারের সৃষ্টির মধ্যে তো তোমরা সশরীরেই উপস্থিত আছো। তাই এটা যে কঠিন নয় তা তো সুস্পষ্ট। এখন এটি একটি সহজ বুদ্ধির ব্যাপার যে, একবার যিনি কোন একটি জিনিস তৈরি করেন সে জিনিসটি পুনর্বার তৈরি করা তার জন্য তুলনামূলকভাবে আরো অনেক বেশী সহজ হওয়ার কথা।

৩৯. এ পর্যন্ত তাওহীদ ও আখেরাতের বর্ণনা মিলেমিশে চলছিল। এর মধ্যে যেসব নিদর্শনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে তাওহীদের প্রমাণও রয়েছে এবং এ প্রমাণগুলো আখেরাতের আগমন যে অসম্ভব নয় সে কথা প্রমাণ করে। এরপর সামনের দিকে নির্ভেজাল তাওহীদ সম্পর্কে আলোচনা আসছে।

৪০. পৃথিবী ও আকাশ এবং তাদের মধ্যকার যাবতীয় জিনিসের স্রষ্টা ও মালিক হচ্ছেন আল্লাহ, মুশরিকরা একথা স্বীকার করার পর তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে কাউকে আল্লাহর সার্বভৌম সত্তার গুণাবলী ও ক্ষমতার অংশীদার গণ্য করতো। তাদের কাছে প্রার্থনা করতো তাদের সামনে মানত ও নাযরানা পেশ করতো এবং বন্দেগী ও পূজার অনুষ্ঠান করতো। এসব বানোয়াট শরীকদের ব্যাপারে তাদের মূল আকীদার সন্ধান পাওয়া যায় তাদের কা'বা ঘর তাওয়াফ করার সময় পঠিত "তালবীয়াহ" থেকে। এ সময় তারা বলতো ঃ

لبيك اللهم لبيك لا شريك لك الا شريكا هولك تملكه وماملك

"আমি হাজির আছি, হে আমার আল্লাহ আমি হাজির আছি। তোমার কোন শরীক নেই তোমার নিজের শরীক ছাড়া। তুমি তারও মালিক এবং যা কিছু তার মালিকানায় আছে তারও মালিক তুমি।" (তাবারানী ঃ ইবনে আব্বাস বর্ণিত)

এ আয়াতটিতে মহান আল্লাহ এ শিরকটিই খণ্ডন করছেন। এখানে দৃষ্টান্তটির অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদে কখনো আল্লাহরই সৃষ্টি যে মানুষ ঘটনাক্রমে তোমার দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছে তোমার অংশীদার গণ্য হতে পারে না। কিন্তু তোমরা অদ্ভুত ধান্দাবাজী শুরু করেছো, আল্লাহর সৃষ্ট বিশ্ব-জাহানে আল্লাহর সৃষ্টিকে নির্দ্বিধায় তাঁর সাথে তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বে শরীক গণ্য করছো। এ ধরনের নির্বোধ জনোচিত কথাগুলো চিন্তা করার সময় তোমাদের বুদ্ধি-জ্ঞান কি একেবারে বিনষ্ট হয়ে যায়? (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন সূরা আন নাহল, ৬২ টীকা)

৪১. অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি সহজ-সরল বুদ্ধির কথা নিজেও চিন্তা করে না এবং অন্যের বুঝাবার পরও বুঝতে চায় না তখন তার বুদ্ধির ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হয়। এরপর এমন প্রত্যেকটি জিনিস, যা কোন নিষ্ঠাবান ও বিবেকবান ব্যক্তিকে সত্যকথা পর্যন্ত পৌছাতে সাহায্য করে, তা এ হঠকারী মূর্খতাপ্রিয় ব্যক্তিকে আরো বেশী গোমরাহীতে লিপ্ত করতে থাকে। এ অবস্থাটিকেই প্রকাশ করা হয়েছে "পথ ভ্রষ্টতা" শব্দের মাধ্যমে। সত্যপ্রিয় মানুষ যখন আল্লাহর কাছে সঠিক পথনির্দেশ লাভের সুযোগ চায় তখন আল্লাহ তার সত্য আকাংখা অনুযায়ী তার জন্য বেশী করে সঠিক পথনির্দেশের কার্যকারণসমূহ সৃষ্টি করে দেন। আর গোমরাহী প্রিয় মানুষ যখন গোমরাহীর ওপর টিকে থাকার জন্য জোর দিতে থাকে তখন আল্লাহ তার জন্য আবার এমন সব কার্যকারণ সৃষ্টি করে যেতে থাকেন যা তাকে বিপথগামী করে দিনের পর দিন সত্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে থাকে।

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

কাজেই[৪২] (হে নবী এবং নবীর অনুসারীবৃন্দ) একনিষ্ঠ হয়ে নিজের চেহারা এ দীনের[৪৩] দিকে স্থির নিবদ্ধ করে দাও।[৪৪] আল্লাহ মানুষকে যে প্রকৃতির ওপর সৃষ্টি করেছেন তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও।[৪৫] আল্লাহর তৈরি সৃষ্টি কাঠামো পরিবর্তন করা যেতে পারে না।[৪৬] এটিই পুরোপুরি সঠিক ও যথার্থ দীন।[৪৭] কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

৪২. এখানে "কাজেই" শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে, সত্য যখন তোমাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেছে এবং তোমরা যখন জানতে পেরেছো এ বিশ্ব-জাহানের ও মানুষের স্রষ্টা, মালিক ও সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন শাসনকর্তা এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয় তখন এরপর অপরিহার্যভাবে তোমাদের কার্যধারা এ ধরনের হওয়া উচিত।

৪৩. কুরআন "দীন" শব্দটিকে যে বিশেষ অর্থে পেশ করছে "দীন" শব্দটি এখানে সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে বন্দেগী, ইবাদাত ও আনুগত্য লাভের অধিকার একমাত্র লা-শরীক আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। এতে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব, গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারে কাউকে তাঁর সাথে সামান্যতমও শরীক করা যায় না। এখানে মানুষ নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহ সহকারে একথা মেনে নেয় যে, সে তার সমস্ত জীবনে আল্লাহর পথনির্দেশ এবং তাঁর আইন মেনে চলবে।

৪৪. "একনিষ্ঠ হয়ে নিজের চেহারা এদিকে স্থির নিবদ্ধ করো" অর্থাৎ এরপর আবার অন্যদিকে ফিরো না। জীবনের জন্য এ পথটি গ্রহণ করে নেবার পর অন্য কোন পথের দিকে দৃষ্টিও দেয়া যাবে না। তারপর তোমাদের চিন্তা-ভাবনা হবে মুসলমানের মতো এবং তোমাদের পছন্দ অপছন্দও হবে মুসলমানদের মতো। তোমাদের মূল্যবোধ ও মানদণ্ড হবে তাই যা ইসলাম তোমাদের দেয়। তোমাদের স্বভাব-চরিত্র এবং জীবন ও কার্যক্রমের ছাঁচ ইসলামের চাহিদা অনুযায়ী হবে। ইসলাম যে পথে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনধারা চালাবার বিধান দিয়েছে তোমাদের সে পথেই নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন পরিচালিত করতে হবে।

৪৫. অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতিকে এ প্রকৃতির ওপর সৃষ্টি করা হয়েছে যে, এক আল্লাহ ছাড়া তাদের আর কোন স্রষ্টা, রব, মাবুদ ও আনুগত্য গ্রহণকারী নেই। এ প্রকৃতির ওপর তোমাদের প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া উচিত। যদি স্বেচ্ছাচারীভাবে চলার নীতি অবলম্বন করো তাহলে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করবে। আর যদি অন্যের বন্দেগীর শিকল নিজের গলায় পরে নাও তাহলেও নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করবে।

এ বিষয়বস্তুটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহু হাদীসে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। যেমন ঃ

ما من مولود يولد الا على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء

"মাতৃগর্ভ থেকে জন্মলাভকারী প্রত্যেকটি শিশু আসলে মানবিক প্রকৃতির ওপরই জন্ম লাভ করে। তারপর তার মা-বাপই তাকে পরবর্তীকালে ইহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজারী হিসেবে গড়ে তোলে।"

এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন প্রত্যেকটি পশুর পেট থেকে পুরোপুরি নিখুঁত ও সুস্থ পশুই বের হয়ে আসে। কোন একটা বাচ্চাও কান কাটা অবস্থায় বের হয়ে আসে না। পরে মুশরিকরা নিজেদের জাহেলী কুসংস্কারের কারণে তার কান কেটে দেয়।

মুসনাদে আহমাদ ও নাসায়ীতে আর একটি হাদীস আছে, তাতে বলা হয়েছে ঃ এক যুদ্ধে মুসলমানরা শত্রুদের শিশু সন্তানদেরকেও হত্যা করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ খবর পৌঁছে যায়। তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন ঃ

ما بال اقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية

"লোকদের কি হয়ে গেছে, আজ তারা সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবং শিশুদেরকেও হত্যা করেছে?"

একজন জিজ্ঞেস করলো, এরা কি মুশরিকদের সন্তান ছিল না? জবাবে তিনি বলেন ঃ

انها خياركم ابناء المشركين

"তোমাদের সর্বোত্তম লোকেরা তো মুশরিকদেরই আওলাদ।" তারপর বলেন ঃ

كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانها فابواها يهودانها او ينصرانها -

"প্রত্যেক প্রাণসত্তা প্রকৃতির ওপর জন্ম নেয়, এমনকি যখন কথা বলতে শেখে তখন তার বাপ-মা তাকে ইহুদী খৃষ্টানে পরিণত করে।"

অন্য একটি হাদীসে ইমাম আহমাদ (র) ঈযায ইবনে হিমার আল মুজাশি'য়ী থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ভাষণের মাঝখানে বলেন ঃ

ان ربى يقول انى خلقت عبادى حنفاء كلهم وانهم اتتهم الشياطين فاضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بى ما لم انزل به سلطانا -

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾
مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ
فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

(প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও একথার ওপর) আল্লাহ অভিমুখী হয়ে[৪৮] এবং তাঁকে ভয় করো,[৪৯] আর নামায কায়েম করো[৫০] এবং এমন মুশরিকদের অন্তরভুক্ত হয়ে যেয়ো না যারা নিজেদের আলাদা আলাদা দীন তৈরি করে নিয়েছে আর বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। প্রত্যেক দলের কাছে যা কিছু আছে তাতেই তারা মশগুল হয়ে আছে।[৫১]

"আমার রব বলেন, আমার সমস্ত বান্দাদেরকে আমি একনিষ্ঠ সত্যপথাশ্রয়ী করে সৃষ্টি করেছিলাম, তারপর শয়তানরা এসে তাদেরকে দীন থেকে বিপথগামী করে এবং তাদের জন্য আমি যা কিছু হালাল করে দিয়েছিলাম সেগুলোকে হারাম করে নেয় এবং তাদেরকে হুকুম দেয়, আমার সাথে এ জিনিসগুলোকে শরীক গণ্য করো, যেগুলোকে শরীক করার জন্য আমি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করিনি।"

৪৬. অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে নিজের বান্দায় পরিণত করেছেন। কেউ চাইলেও এ কাঠামোয় কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। মানুষ বান্দা থেকে অ-বান্দা হতে পারে না এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ বানিয়ে নিলেও প্রকৃতপক্ষে সে মানুষের ইলাহ হতে পারে না। মানুষ নিজের জন্য যতগুলো উপাস্য তৈরি করে নিক না কেন, মানুষ যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো বান্দা নয় এ বাস্তব সত্যটি অকাট্য ও অবিচল রয়ে গেছে। মানুষ নিজের মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে যাকে ইচ্ছা আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতার ধারক গণ্য করতে পারে এবং যাকে চায় তাকে নিজের ভাগ্য ভাঙা-গড়ার মালিক মনে করতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ও বাস্তব সত্য এটিই যে, সার্বভৌম কর্তৃত্বের গুণাবলীর অধিকারী একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়। কেউ তাঁর মতো ক্ষমতার অধিকারী নয় এবং মানুষের ভাগ্য ভাঙা-গড়ার শক্তিও আল্লাহ ছাড়া কারো নেই।

এ আয়াতটির আর একটি অনুবাদ এও হতে পারে ঃ "আল্লাহর তৈরি কাঠামোয় পরিবর্তন করা যাবে না।" অর্থাৎ আল্লাহ যে প্রকৃতির ওপর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাকে বিকৃত করা ও ভেঙে ফেলা উচিত নয়।

৪৭. অর্থাৎ শান্ত সমাহিত ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকাই সঠিক ও সহজ পথ।

৪৮. আল্লাহ অভিমুখী হওয়ার অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তিই স্বেচ্ছাচারিতার নীতি অবলম্বন করে নিজের প্রকৃত মালিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অথবা যে ব্যক্তিই অন্যের বন্দেগীর পথ অবলম্বন করে নিজের প্রকৃত রবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার এ নীতি

পরিহার করতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে যে আল্লাহর বান্দা হিসেবে সে জন্মলাভ করেছে সেই এক আল্লাহর বন্দেগীর দিকে তাকে ফিরে যেতে হবে।

৪৯. অর্থাৎ তোমাদের মনে এ ভয় জাগরুক থাকতে হবে যে, যদি আল্লাহর জন্মগত বান্দা হওয়া সত্ত্বেও তোমরা তার মোকাবিলায় স্বাধীনতার নীতি অবলম্বন করে থাকো, অথবা তাঁর পরিবর্তে অন্য কারো বন্দেগী করে থাকো, তাহলে এ বিশ্বাসঘাতকতা ও নিমকহারামির জন্য তোমাদের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই তোমাদের এমন নীতি ও মনোভাব থেকে দূরে থাকা উচিত যা তোমাদের জন্য আল্লাহর আযাব ভোগ করাকে অবধারিত করে তোলে।

৫০. আল্লাহর দিকে ফেরা এবং তাঁর গযবের ভয় করা—এ দু'টিই মানসিক কর্ম। এ মানসিক অবস্থাটির প্রকাশ এবং এর সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠার জন্য অনিবার্যভাবে এমন কোন দৈহিক কর্মের প্রয়োজন যার মাধ্যমে বাইরেও প্রত্যেক ব্যক্তি জানবে ওমুক ব্যক্তি যথার্থই এক ও লা–শরীক আল্লাহর বন্দেগীর দিকে ফিরে এসেছে। মানুষের নিজের মনের মধ্যেও এ আল্লাহ ভীতির দিকে ফিরে আসার অবস্থাটি একটি কার্যকর পরীক্ষা–নিরীক্ষার মাধ্যমে অনবরত বিকাশ লাভ করতে থাকবে। তাই মহান আল্লাহ এই মানসিক পরিবর্তনের হুকুম দেবার পর সাথে সাথেই এ দৈহিক কর্ম অর্থাৎ নামায কায়েম করার হুকুম দেন। মানুষের মনে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন চিন্তা নিছক চিন্তার পর্যায়েই থাকে ততক্ষণ তার মধ্যে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব সৃষ্টি হয় না। এ চিন্তায় ভাটা পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে এবং চিন্তায় পরিবর্তন আসারও সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যখন সে সেই অনুযায়ী কাজ করতে থাকে তখন তার মধ্যে এ চিন্তা শিকড় গেড়ে বসে যেতে থাকে এবং যতই সে তদনুযায়ী কাজ করতে থাকে ততই তার শক্তিমত্তা ও দৃঢ়তা বেড়ে যেতে থাকে। এমনকি এ আকীদা ও চিন্তা পরিবর্তিত হওয়া এবং এতে ভাটা পড়ে যাওয়া ক্রমেই দুষ্কর হয়ে যেতে থাকে। এ দৃষ্টিতে বিচার করলে আল্লাহ অভিমুখী হওয়া এবং আল্লাহ ভীতিকে শক্তিশালী করার জন্য প্রতিদিন নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার চাইতে বেশী কার্যকর আর কোন কাজ নেই। কারণ অন্য যে কোন কাজই হোক না কেন তা বিলম্বে আসে অথবা নামায এমন একটি কাজ যা নিয়মিতভাবে কয়েক ঘন্টা পরপর একটি নির্দিষ্ট আকৃতিতে মানুষকে স্থায়ীভাবে পালন করতে হয়। কুরআন ঈমান ও ইসলামের পূর্ণাংগ যে পাঠ মানুষকে দিয়েছে তা যাতে সে ভুলে না যায় এ জন্য বারবার মানুষকে তার পুনরাবৃত্তি করতে হয়। তাছাড়া মানবগোষ্ঠীর মধ্য থেকে কারা বিদ্রোহের নীতি পরিহার করে রবের প্রতি আনুগত্যের নীতি অবলম্বন করেছে, কাফের ও মুমিন সমাজ উভয়ের সামনে একথা প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। মু'মিনদের কাছে একথা এ জন্য প্রকাশ হওয়া দরকার যে, এর ফলে তাদের একটি সমাজ ও দল গঠিত হতে পারে। তারা আল্লাহর পথে পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করতে পারে। ঈমান ও ইসলামের সাথে যখনই তাদের দলের কোন ব্যক্তির সম্পর্ক ঢিলা হয়ে যেতে থাকে তখনই কোন সুস্পষ্ট আলামত সংগে সংগেই সমগ্র মু'মিন সমাজকে তার অবস্থা জানিয়ে দেয়। কাফেরদের কাছে এর প্রকাশ হওয়া এ জন্য প্রয়োজন যে, এর ফলে তাদের হৃদয় অভ্যন্তরে ঘুমিয়ে থাকা প্রকৃতি তার নিজের শ্রেণী মানুষদেরকে আসল ইলাহ রব্বুল আলামীনের দিকে বারবার ফিরে আসতে দেখে জেগে উঠবে এবং যতক্ষণ তারা জাগবে না ততক্ষণ আল্লাহর অনুগতদের কর্ম তৎপরতা দেখে তাদের মধ্যে ভীতি ও

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم
مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا
آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ
يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾

লোকদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, যখন তারা কোন কষ্ট পায় তখন নিজেদের রবের দিকে ফিরে তাঁকে ডাকতে থাকে[৫২] তারপর যখন তিনি নিজের দয়ার কিছু স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান তখন সহসা তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক শিরকে লিপ্ত হয়ে যায়,[৫৩] যাতে আমার অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়। বেশ, ভোগ করে নাও, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। আমি কি তাদের কাছে কোন প্রমাণপত্র ও দলীল অবতীর্ণ করেছি, যা তাদের শিরকের সত্যতার সাক্ষ দেয়?[৫৪]

আতংক সৃষ্টি হতে থাকবে। এ দু'টি উদ্দেশ্যের জন্যও নামায কায়েম করাই হবে সবচেয়ে বেশী উপযোগী মাধ্যম।

এ প্রসংগে একথাটিও সামনে রাখতে হবে যে, নামায কায়েম করার এ হুকুমটি মক্কা মু'আয্যমায় এমন এক যুগে দেয়া হয় যখন মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমানের ক্ষুদ্র দলটি কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের জুলুম ও নিপীড়নের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছিল এবং এরপরও ন' বছর পর্যন্ত এ নিষ্পেষণের ধারা অব্যাহত ছিল। সে সময় দূরের কোথাও ইসলামী রাষ্ট্রের নাম নিশানা ছিল না। যদি ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া নামায অর্থহীন হয়ে থাকে, যেমন কতিপয় নাদান মনে করে থাকেন, অথবা ইকামতে সালাত অর্থ আদতে নামায কায়েম করা না হয়ে থাকে বরং "রবুবিয়াত ব্যবস্থা" পরিচালনা হয়ে থাকে, যেমন হাদীস অস্বীকারকারীরা দাবী করে থাকেন, তাহলে এ অবস্থায় কুরআন মজীদের এ ধরনের হুকুম দেয়ার অর্থ কি? আর এ হুকুম আসার পর ৯ বছর পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানরা এ হুকুমটি কিভাবে পালন করতে থাকেন?

৫১. ওপরে যে প্রাকৃতিক দীনের কথা বলা হয়েছে মানব জাতির আসল দীনই হচ্ছে সেই প্রাকৃতিক দীন, এখানে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে। এ দীন মুশরিকী ধর্ম থেকে ক্রম-বিবর্তনের মাধ্যমে তাওহীদ পর্যন্ত পৌঁছেনি। যেমন আন্দাজ অনুমানের মাধ্যমে একটি ধর্মীয় দর্শন রচনাকারীরা মনে করে থাকেন। বরং দুনিয়ায় যতগুলো ধর্ম পাওয়া যায় এ সবেরই উৎপত্তি হয়েছে এ আসল দীনের মধ্যে বিকৃতি সাধনের মাধ্যমে। এ বিকৃতি আসার কারণ হলো এই যে, বিভিন্ন ব্যক্তি প্রাকৃতিক সত্যের ওপর নিজেদের নতুন নতুন কথা বাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের জন্য এক একটি আলাদা ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে। তাদের প্রত্যেকেই মূল সত্যের পরিবর্তে এ বর্ধিত জিনিসেরই ভক্ত অনুরক্ত হয়ে গেছে। যার ফলে তারা

وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا۟ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

যখন আমি লোকদেরকে দয়ার স্বাদ আস্বাদন করাই তখন তারা তাতে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে এবং যখন তাদের নিজেদের কৃতকর্মের ফলে তাদের ওপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন সহসা তারা হতাশ হয়ে যেতে থাকে।[৫৫] এরা কি দেখে না আল্লাহই যাকে চান তার রিযিক সম্প্রসারিত করেন এবং সংকীর্ণ করেন (যাকে চান)? অবশ্যই এর মধ্যে রয়েছে বহু নিদর্শনাবলী এমন লোকদের জন্য যারা ঈমান আনে।[৫৬]

অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে একটি স্বতন্ত্র ফিরকায় পরিণত হয়েছে। এখন সঠিক পথনির্দেশনা লাভ করতে চাইলে যে প্রকৃত সত্য ছিল সত্য দীনের মূল ভিত্তি, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সেদিকে ফিরে যেতে হবে। পরবর্তীকালের যাবতীয় বর্ধিত অংশ থেকে এবং তাদের ভক্ত-অনুরক্তদের দল থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে একেবারেই আলাদা হয়ে যেতে হবে। তাদের সাথে তারা যে সম্পর্ক সূত্রই কায়েম রাখবে সেটিই তাদের দীনের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টির কারণ হবে।

৫২. তাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে তাওহীদের প্রমাণ রয়ে গেছে একথাটিই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। যেসব সহায়কের ভিত্তিতে আশার প্রাসাদ গড়ে উঠেছিল যখনই সেগুলো ভেঙে পড়তে থাকে তখনই তাদের অন্তর ভেতর থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বলে চিৎকার করতে থাকে যে, বিশ্ব-জাহানের মালিকই আসল শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী এবং তাঁরই সাহায্যে তারা নিজেদের ধ্বংসরোধ ও ক্ষতিপূরণ করতে পারে।

৫৩. অর্থাৎ অন্যান্য উপাস্যদেরকে মানত ও নযরানা পেশ করার কাজ শুরু হয়ে যায়। এই সংগে একথাও বলা হতে থাকে যে, ওমুক হযরতের বদৌলতে এবং ওমুক মাজারের অনুগ্রহে এ বিপদ সরে গেছে।

৫৪. অর্থাৎ কোন্ যুক্তির ভিত্তিতে তারা একথা জানতে পারলো যে, আপদ-বিপদ থেকে আল্লাহ রক্ষা করেন না বরং এসব বানোয়াট উপাস্যরা রক্ষা করে থাকে? বুদ্ধিবৃত্তি কি এর সাক্ষ দেয়? অথবা আল্লাহর এমন কোন কিতাব আছে কি যার মধ্যে তিনি বলেছেন, আমি আমার সার্বভৌম কর্তৃত্ব অমুক অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে দিয়েছি, এখন থেকে তারাই তোমাদের সমস্ত কাজ করে দেবে?

৫৫. ওপরের আয়াতে মানুষের মূর্খতা ও অজ্ঞতা, এবং তার অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাকে পাকড়াও করা হয়েছিল। এ আয়াতে মানুষের হীন প্রবৃত্তি ও তার সংকীর্ণমনতার জন্য তাকে পাকড়াও করা হয়েছে। এ হীনচেতা কাপুরুষটি যখন

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ
لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۫ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَمَآ اٰتَيْتُمْ
مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ
مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٣٩﴾

কাজেই (হে মু'মিন!) আত্মীয়দেরকে তাদের অধিকার দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকে (দাও তাদের অধিকার)।[৫৭] এ পদ্ধতি এমন লোকদের জন্য ভালো যারা চায় আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তারাই সফলকাম হবে।[৫৮] যে সূদ তোমরা দিয়ে থাকো, যাতে মানুষের সম্পদের সাথে মিশে তা বেড়ে যায়, আল্লাহর কাছে তা বাড়ে না।[৫৯] আর যে যাকাত তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দিয়ে থাকো, তা প্রদানকারী আসলে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করে।[৬০]

দুনিয়ায় কিছু ধন–সম্পদ, শক্তি ও মর্যাদা লাভ করে এবং দেখে তার কাজ খুব ভালোভাবে চলছে তখন এ সবকিছু যে মহান আল্লাহর দান, একথা আর তার একদম মনে থাকে না। তখন সে মনে করতে থাকে, তার মধ্যে অসাধারণ কিছু আছে যার ফলে সে এমন কিছু লাভ করেছে যা থেকে অন্যেরা বঞ্চিত হয়েছে। এ বিভ্রান্তির মধ্যে অহংকার ও আত্মগরিমার নেশায় সে এমনই বিভোর হয়ে যায় যার ফলে সে আল্লাহ ও সৃষ্টি কাউকেও ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করে না। কিন্তু যখনই সৌভাগ্য মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে হিম্মত হারিয়ে ফেলে এবং দুর্ভাগ্যের একটিমাত্র আঘাতই তার হৃদয়বৃত্তি ভেঙে চুরমার করে দেয়। তখন এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, হীনতম কাজ করতেও সে কুণ্ঠিত হয় না, এমন কি শেষ পর্যন্ত সে আত্মহত্যাও করে বসে।

৫৬. অর্থাৎ মানুষের নৈতিক চরিত্রের ওপর কুফরী ও শিরক কি প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং এর বিপরীত পক্ষে আল্লাহর প্রতি ঈমানের নৈতিক পরিণাম কি, মু'মিনরা এ থেকে সে শিক্ষা লাভ করতে পারে। যে ব্যক্তিই নিষ্ঠা সহকারে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁকেই রিযিকের সমুদয় ভাণ্ডারের মালিক মনে করে, সে কখনো আল্লাহকে ভুলে থাকা লোকদের মতো সংকীর্ণ হৃদয়বৃত্তির পরিচয় দিতে পারে না। সে প্রসারিত রিযিক লাভ করলে অহংকারে মত্ত হয় না। বরং আল্লাহর শোকর আদায় করে, আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি মমতা ও ঔদার্যপূর্ণ ব্যবহার করে এবং আল্লাহর সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করে না। সংকীর্ণ জীবিকা লাভ করুক বা অনাহারে থাকুক সর্বাবস্থায় সে সবর করে, কখনো বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ও আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেয় না এবং শেষ সময় পর্যন্ত আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের আশায় বসে থাকে। কোন নাস্তিক বা মুশরিক এ নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না।

৫৭. আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও মুসাফিরকে দান-খয়রাত করার কথা বলা হয়নি। বরং বলা হচ্ছে, এ তার অধিকার এবং অধিকার মনে করেই তোমাদের এটা দেয়া উচিত। এ অধিকার দিতে গিয়ে যেন তোমার মনে এ ধারণা না জন্মে যে, তার প্রতি তুমি অনুগ্রহ করছো এবং তুমি কোন মহান দানশীল সত্তা আর সে কোন একটি সামান্য ও নগণ্য সৃষ্টি, তোমার অনুগ্রহের কণা ভক্ষণ করেই সে জীবিকা নির্বাহ করে। বরং একথা ভালোভাবে তোমার মনে গেঁথে যাওয়া উচিত যে, সম্পদের আসল মালিক যদি তোমাকে বেশী এবং অন্য বান্দাদেরকে কম দিয়ে থাকেন, তাহলে এ বর্ধিত সম্পদ হচ্ছে এমন সব লোকের অধিকার যাদেরকে তোমার আওতাধীনে তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য দেয়া হয়েছে। তুমি তাদেরকে এ অধিকার দান করছো কি করছো না এটা তোমার মালিক দেখতে চান।

আল্লাহর এ ভাষণ এবং এর আসল প্রাণসত্তা সম্পর্কে যে ব্যক্তিই চিন্তা-ভাবনা করবে সে একথা অনুভব না করে থাকতে পারে না যে, কুরআন মজীদ মানুষের জন্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির যে পথ নির্ধারণ করে সে জন্য একটি মুক্ত সমাজ ও মুক্ত অর্থনীতি (Free Economy) অপরিহার্য। এ উন্নতি এমন কোন সামাজিক পরিবেশে সম্ভবপর নয় যেখানে মানুষের মালিকানা অধিকার খতম করে দেয়া হয়, রাষ্ট্র সমস্ত উৎপাদন উপকরণের একচ্ছত্র মালিক হয়ে যায় এবং ব্যক্তিবর্গের মধ্যে জীবিকা বন্টনের যাবতীয় ব্যবস্থা সরকারী কর্মকর্তাদের করায়ত্ব থাকে। এমন কি কোন ব্যক্তি নিজের ওপর অন্যের কোন অধিকার চিহ্নিত করার পরও তা তাকে দিতে পারে না এবং অন্য ব্যক্তি কারো থেকে কিছু গ্রহণ করে তার জন্য নিজের মনের মধ্যে কোন শুভেচ্ছার অনুভূতি লালন করতে পারে না। এভাবে নির্ভেজাল কমিউনিষ্ট সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আজকাল আমাদের দেশে "কুরআনী রবুবীয়াত ব্যবস্থা"র গালভরা নাম দিয়ে জবরদস্তি কুরআনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চলছে। এটা কুরআনের নিজস্ব পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ এর মধ্যে ব্যক্তিগত নৈতিক বৃত্তির বিকাশ ও উন্মেষ এবং ব্যক্তি চরিত্র গঠন ও উন্নয়নের দুয়ার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। কুরআনের পরিকল্পনা এমন জায়গায় কার্যকর হতে পারে যেখানে ব্যক্তিরা সম্পদের কিছু উপায়-উপকরণের মালিক হয়, সেগুলো স্বাধীনভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা রাখে এবং এরপর স্বেচ্ছায় ও স্বাগ্রহে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের অধিকার আন্তরিকতা সহকারে প্রদান করে। এ ধরনের সমাজে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি লোকের মধ্যে একদিকে সহানুভূতি, দয়া-মায়া, মমতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, সত্যনিষ্ঠা ও সত্য পালন করার উন্নততর গুণাবলী সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং অন্যদিকে যেসব লোকের সাথে সদাচার করা হয় তাদের মনে সদাচারীদের জন্য শুভেচ্ছা ও অনুগৃহীত হবার মনোভাব এবং অনুগ্রহের বিনিময়ে অনুগ্রহ করার পবিত্র অনুভূতি বিকাশ লাভ করে। শেষ পর্যন্ত এমন একটি আদর্শ ও মহৎ পরিবেশের সৃষ্টি হয়ে যায় যেখানে অন্যায়ের পথ রুদ্ধ হওয়া এবং ন্যায়ের পথ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া কোন স্বৈরাচারী শক্তির ওপর নির্ভরশীল হয় না বরং লোকেরা নিজেদের আত্মিক শুদ্ধতা ও সদিচ্ছাবশেই এ দায়িত্ব মাথা পেতে নেয়।

৫৮. এর দ্বারা একথা বুঝানো হচ্ছে না যে, কেবলমাত্র মিসকীন, মুসাফির ও আত্মীয়-স্বজনদের অধিকার দিয়ে দিলেই সাফল্য লাভ করা যাবে এবং এ ছাড়া সাফল্য লাভ করার জন্য আর কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই। বরং এর অর্থ হচ্ছে, যেসব লোক এ

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ یُمِیْتُكُمْ ثُمَّ یُحْیِیْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ یَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَیْءٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿۴۰﴾

আল্লাহই[৬১] তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদের রিযিক দিয়েছেন।[৬২] তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন, এরপর তিনি তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের বানানো শরীকদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে এ কাজও করে?[৬৩] পাক-পবিত্র তিনি এবং এরা যে শিরক করে তার বহু উর্ধে তাঁর অবস্থান।

অধিকারগুলো জানে না এবং এগুলো প্রদান করে না তারা সাফল্য লাভ করবে না। বরং সাফল্য লাভ করবে এমনসব লোক যারা একান্তভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অধিকারগুলো জানে এবং এগুলো প্রদান করে।

৫৯. সুদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপনসূচক কুরআনের এটিই প্রথম আয়াত। এখানে শুধুমাত্র এতটুকু কথা বলা হয়েছে যে, তোমরা তো একথা মনে করে সুদ দিয়ে থাকো যে, যাকে আমি এ অতিরিক্ত সম্পদ দিচ্ছি তার ধন-দওলত বেড়ে যাবে। কিন্তু আসলে আল্লাহর কাছে সুদের মাধ্যমে ধন-দওলত বৃদ্ধি হয় না বরং যাকাতের মাধ্যমে বৃদ্ধি হয়। সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে যখন মদীনা তাইয়েবায় সুদ হারাম হবার হুকুম নাযিল করা হয় তখন সেখানে অতিরিক্ত একথা বলা হয়, يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ "আল্লাহ সুদকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন এবং সাদকাকে বিকশিত করেন।" (পরবর্তী বিধানের জন্য দেখুন সূরা আলে ইমরান, ১৩০ আয়াত এবং আল বাকারাহ, ২৭৫ থেকে ২৮১ আয়াত)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণ দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেছেন। একদল বলেন, এখানে রিবা শব্দের মাধ্যমে এমন সুদের কথা বলা হয়নি যাকে শরীয়াতের দৃষ্টিতে হারাম করা হয়েছে বরং এমন ধরনের দান, তোহ্‌ফা ও হাদিয়াকে সুদ বলা হয়েছে যা গ্রহীতা পরবর্তীকালে ফেরত দেবার সময় তা বর্ধিত আকারে ফেরত দেবে, এরূপ সংকল্প সহকারে দেয়া হয়। অথবা একথা মনে করে দেয়া হয় যে, তা দাতার কোন ভালো কাজে লাগবে অথবা তার আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করা দাতার নিজের জন্য ভালো হবে। এটি ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ (রা), দ্বাহ্‌হাক (রা), কাতাদাহ, ইকরামাহ, মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল কুরাযী ও শা'বীর উক্তি। আর সম্ভবত তাঁরা এ ব্যাখ্যা এ জন্য করেছেন যে, আয়াতে এ কর্মের ফল হিসেবে কেবলমাত্র এতটুকু বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কাছে এ সম্পদের মধ্যে কোন বৃদ্ধি হবে না। অথচ শরীয়াত যে সুদকে হারাম করে দিয়েছে যদি ব্যাপারটি তার সাথে সংশ্লিষ্ট হতো তাহলে ইতিবাচকভাবে বলা হতো, আল্লাহর দরবারে তাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

দ্বিতীয় দলটি বলেন, না, শরীয়াত যে রিবাকে হারাম গণ্য করেছে এখানে তার কথাই বলা হয়েছে। এ মত প্রকাশ করেছেন হযরত হাসান বাসরী ও সুদ্দী এবং আল্লামা আলূসীর

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم
مُّشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

৫ রুকূ'

মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, যার ফলে তাদেরকে তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করানো যায়, হয়তো তারা বিরত হবে।৬৪ (হে নবী!) তাদেরকে বলে দাও, পৃথিবীর বুকে পরিভ্রমণ করে দেখো পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম কি হয়েছে! তাদের অধিকাংশই মুশরিক ছিল।৬৫

মতে আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এটিই। কারণ আরবী ভাষায় রিবা শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। মুফাস্‌সির নিশাপূরীও এ ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেছেন।

আমার মতেও এ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই সঠিক। কারণ পরিচিত অর্থ পরিত্যাগ করার জন্য ওপরে প্রথম ব্যাখ্যার সপক্ষে যে যুক্তি দেখানো হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। সূরা রূম যে সময় নাযিল হয় সে সময় কুরআন মজীদ সুদ হারাম হওয়ার কথা ঘোষণা করেনি। তার কয়েক বছর পর একথা ঘোষিত হয়। এ জন্য সে পূর্ব থেকেই মন-মানসিকতা তৈরি করার কাজে লিপ্ত হয়। মদের ব্যাপারেও পূর্বে শুধুমাত্র এতটুকু বলা হয়েছিল যে, এটা পবিত্র রিযিক নয় (আন্ নাহ্‌ল, ৬৭ আয়াত)। তারপর বলা হয়, এর ক্ষতি এর লাভের চেয়ে বেশী (আল বাকারাহ, ২১৯)। এরপর হুকুম দেয়া হয়, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের ধারে কাছে যেয়ো না (আন নিসা ৪৩)। তারপর এটিকে পুরোপুরি হারাম করার ঘোষণা দেয়া হয়। অনুরূপভাবে এখানে সুদের ব্যাপারেও কেবলমাত্র এতটুকু বলেই থেমে যাওয়া হয়েছে যে, এটা এমন জিনিস নয় যার মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি হয় বরং সম্পদ প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি হয় যাকাতের মাধ্যমে। এরপর চক্রবৃদ্ধি হারে সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে (আলে ইমরান, ১৩০) এবং সবশেষে সুদকেই চূড়ান্তভাবে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে (আল বাকারাহ, ২৭৫)

৬০. এ বৃদ্ধির কোন সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। যে ধরনের ঐকান্তিক সংকল্প, গভীর ত্যাগের অনুভূতি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের প্রবল আকাংখা সহকারে কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করবে অনুরূপভাবেই আল্লাহ তাকে বেশী বেশী প্রতিদানও দেবেন। তাই একটি সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি খেজুরও দান করে তাহলে আল্লাহ তাকে বাড়িয়ে ওহোদ পাহাড়ের সমান করে দেন।

৬১. এখান থেকে আবার মুশরিকদেরকে বুঝাবার জন্য বক্তব্যের ধারা তাওহীদ ও আখেরাতের বিষয়বস্তুর দিকে ফিরে এসেছে।

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ
مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾

কাজেই (হে নবী!) এই সত্য দীনে নিজের চেহারাকে মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করো আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দিনের হটে যাওয়ার কোন পথ নেই তার আগমনের পূর্বে,[৬৬] সেদিন লোকেরা বিভক্ত হয়ে পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যাবে। যে কুফরী করেছে তার কুফরীর শাস্তি সে-ই ভোগ করবে[৬৭] আর যারা সৎকাজ করেছে তারা নিজেদেরই জন্য সাফল্যের পথ পরিষ্কার করছে, যাতে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদেরকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। অবশ্যই তিনি কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না।

৬২. অর্থাৎ পৃথিবীতে তোমাদের রিযিকের জন্য যাবতীয় উপায়-উপকরণ সরবরাহ করেছেন এবং এমন ব্যবস্থা করেছেন যার ফলে রিযিকের আবর্তনের মাধ্যমে প্রত্যেকে কিছু না কিছু অংশ পেয়ে যায়।

৬৩. অর্থাৎ তোমাদের তৈরি করা উপাস্যদের মধ্যে কেউ কি সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা? জীবন ও মৃত্যু দান করা কি কারো ক্ষমতার আওতাভুক্ত আছে? অথবা মরার পর সে আবার কাউকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা রাখে? তাহলে তাদের কাজ কি? তোমরা তাদেরকে উপাস্য বানিয়ে রেখেছো কেন?

৬৪. এখানে আবার রোম ও ইরানের মধ্যে যে যুদ্ধ চলছিল এবং যার আগুন সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। "লোকদের স্বহস্তের উপার্জন" বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে, ফাসেকী, অশ্লীলতা, জুলুম ও নিপীড়নের এমন একটি ধারা যা শিরক ও নাস্তিক্যবাদের আকীদা-বিশ্বাস অবলম্বন ও আখেরাতকে উপেক্ষা করার ফলে অনিবার্যভাবে মানবিক নৈতিক গুণাবলী ও চরিত্রের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে। "হয়তো তারা বিরত হবে" এর অর্থ হচ্ছে, আখেরাতে শাস্তি লাভ করার পূর্বে আল্লাহ এ দুনিয়ায় মানুষের সমস্ত নয় বরং কিছু খারাপ কাজের ফল এ জন্য ভোগ করান যে, এর ফলে সে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করবে এবং নিজের চিন্তাধারার ভ্রান্তি অনুধাবন করে নবীগণ সবসময় মানুষের সামনে যে সঠিক বিশ্বাস উপস্থাপন করে এসেছেন এবং যা গ্রহণ না করলে মানুষের কর্মধারাকে সঠিক বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার দ্বিতীয় কোন পথ নেই সেদিকে ফিরে আসবে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে, এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ
وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٤٦﴾
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ
فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ؕ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾

তাঁর নিদর্শনাবলীর একটি হচ্ছে এই যে, তিনি বাতাস পাঠান সুসংবাদ দান করার জন্য[৬৮] এবং তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহে আপ্লুত করার জন্য। আর এ উদ্দেশ্যে যাতে নৌযানগুলো তাঁর হুকুমে চলে[৬৯] এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করো[৭০] আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমি তোমার পূর্বে রসূলদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠাই এবং তাঁরা তাদের কাছে আসে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী নিয়ে।[৭১] তারপর যারা অপরাধ করে[৭২] তাদের থেকে আমি প্রতিশোধ নিই আর মু'মিনদেরকে সাহায্য করা ছিল আমার দায়িত্বের অন্তরভুক্ত।

যেমন দেখুন, আত্ তাওবা, ১২৬; আর রা'আদ, ২১; আস্ সাজদাহ, ২১ এবং আত তূর, ৪৭ আয়াত।

৬৫. অর্থাৎ রোম ও ইরানের ধ্বংসকর যুদ্ধ আজ কোন নতুন দুর্ঘটনা নয়। বড় বড় জাতিসমূহের ধ্বংসের কাহিনী অতীত ইতিহাসের বিরাট অংশ জুড়ে আছে। আর যে দোষগুলো সেসব জাতির ধ্বংসের মূলে কাজ করেছে সেগুলোর মূলে ছিল এ শিরক এবং আজ এ শিরক থেকে দূরে থাকার জন্য তোমাদের বলা হচ্ছে।

৬৬. অর্থাৎ আল্লাহ নিজে যাকে হটাবেন না এবং তিনি কারো জন্য এমন কোন তদবির করার অবকাশও রাখেননি যার ফলে তা হটে যেতে পারে।

৬৭. এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। একজন কাফের নিজের কুফরীর কারণে যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে এ বাক্যের মধ্যে তার সবগুলোরই সমাবেশ ঘটেছে। ক্ষতিকারক বস্তুর অন্য কোন বিস্তারিত তালিকাই এতটা ব্যাপক হতে পারে না।

৬৮. অর্থাৎ অনুগ্রহের বারিধারা বর্ষণের সুসংবাদ দেবার জন্য।

৬৯. এটি জাহাজ চলাচলে সহায়তা দানকারী অন্য এক ধরনের বাতাসের আলোচনা। প্রাচীনকালে বাতাসের সহায়তায় চলাচলকারী নৌযান ও জাহাজসমূহের সফর তো বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অনুকূল বাতাসের ওপরই নির্ভরশীল ছিল। প্রতিকূল বাতাস তাদের জন্য ছিল ধ্বংসের সূচনা। তাই বৃষ্টি বহনকারী বাতাসের পর ঐ বাতাসের উল্লেখ করা হয়েছে একটি বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে।

اَللّٰهُ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیٰحَ فَتُثِیْرُ سَحَابًا فَیَبْسُطُهٗ فِی السَّمَآءِ كَیْفَ یَشَآءُ
وَیَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَاۤ اَصَابَ بِهٖ
مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اِذَا هُمْ یَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿۴۸﴾ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ
اَنْ یُّنَزَّلَ عَلَیْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِیْنَ ﴿۴۹﴾ فَانْظُرْ اِلٰۤى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ
كَیْفَ یُحْیِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْیِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ
عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۵۰﴾

আল্লাহই বাতাস পাঠান ফলে তা মেঘ উঠায়, তারপর তিনি এ মেঘমালাকে আকাশে ছড়িয়ে দেন যেভাবেই চান সেভাবে এবং তাদেরকে খণ্ড-বিখণ্ড করেন, তারপর তুমি দেখো বারিবিন্দু মেঘমালা থেকে নির্গত হয়েই চলছে। এ বারিধারা যখন তিনি নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে যার ওপর চান বর্ষণ করেন তখন তারা আনন্দোৎফুল্ল হয়। অথচ তার অবতরণের পূর্বে তারা হতাশ হয়ে যাচ্ছিল। আল্লাহর অনুগ্রহের ফলগুলো দেখো, মৃত পতিত ভূমিকে তিনি কিভাবে জীবিত করেন,[৭৩] অবশ্যই তিনি মৃতদেরকে জীবন দান করেন এবং তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর শক্তিশালী।

৭০. অর্থাৎ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সফর করো।

৭১. অর্থাৎ এক ধরনের নিদর্শনাবলী তো বিশ্ব-প্রকৃতির সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। মানুষের জীবনের দৈনন্দিন কাজে কর্মে প্রায় সর্বত্রই সেগুলোর সাথে মানুষের সংযোগ ঘটে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে বায়ু চলাচল ব্যবস্থা। ওপরের আয়াতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অন্য এক ধরনের নিদর্শনাবলী আল্লাহর নবীগণ মু'জিযা, আল্লাহর বাণী, নিজেদের অসাধারণ পবিত্র চরিত্র এবং মানব সমাজে নিজেদের জীবনদায়ী প্রভাবের আকারে নিয়ে এসেছেন। এ দু'ধরনের নিদর্শন আসলে একটি সত্যের প্রতিই ইংগিত করে। তা হচ্ছে, নবীগণ যে তাওহীদের শিক্ষা দিচ্ছেন তাই সঠিক। তার মধ্যে প্রত্যেকটি নিদর্শনই অন্যটির সমর্থক। বিশ্ব-জাহানের নিদর্শনাবলী নবীগণের বর্ণনার সত্যতা প্রমাণ করে এবং নবীগণ যেসব নিদর্শন এনেছেন সেগুলো বিশ্ব-জাহানের নিদর্শনাবলী যে সত্যের প্রতি ইংগিত করছে সেগুলোকে উন্মুক্ত করে দেয়।

৭২. অর্থাৎ এ দু'টি নিদর্শন থেকে চোখ বন্ধ করে তাওহীদ অস্বীকার করার ওপর অবিচল থাকে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহই করে যেতে থাকে।

وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾ فَإِنَّكَ
لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَا
أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم
مُّسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾

আর যদি আমি এমন একটি বাতাস পাঠাই যার প্রভাবে তারা দেখে তাদের শস্য পীতবর্ণ ধারণ করেছে[৭৪] তাহলে তো তারা কুফরী করতে থাকে।[৭৫] (হে নবী!) তুমি মৃতদেরকে শুনাতে পারো না,[৭৬] এমন বধিরদেরকেও নিজের আহবান শুনাতে পারো না যারা মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে[৭৭] এবং অন্ধদেরকেও তাদের ভ্রষ্টতা থেকে বের করে সঠিক পথ দেখাতে পারো না।[৭৮] তুমি তো একমাত্র তাদেরকেই শুনাতে পারো যারা আমার আয়াতের প্রতি ঈমান আনে এবং আনুগত্যের শির নত করে।

৭৩. এখানে যেভাবে একের পর এক নবুওয়াত ও বৃষ্টির আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে এ সত্যটির প্রতি একটি সূক্ষ্ম ইংগিতও পাওয়া যায় যে, নবীর আগমনও মানুষের নৈতিক জীবনের জন্য ঠিক তেমনি অনুগ্রহস্বরূপ যেমন বৃষ্টির আগমন তার বৈষয়িক জীবনের জন্য অনুগ্রহ হয়ে দেখা দেয়। আকাশ থেকে বারিধারা নেমে আসার ফলে যেমন মৃত পতিত জমি অকস্মাত জীবিত হয়ে ওঠে এবং তার চতুর্দিক শস্য শ্যামলিমায় ভরে যায়, ঠিক তেমনি আসমানী অহী অবতীর্ণ হওয়ার ফলে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার বিরাণ দুনিয়া সজীব হয়ে ওঠে এবং সেখানে শ্রেষ্ঠ গুণাবলী ও প্রশংসিত আচার আচরণের উদ্যানগুলো পত্র-পুষ্পে সুশোভিত হতে থাকে। এটা কাফেরদের দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এ নিয়ামত যখনই তাদের কাছে আসে, তারা তা অস্বীকার করে এবং তাকে নিজেদের জন্য রহমতের সুসংবাদ মনে করার পরিবর্তে মৃত্যুর বারতা মনে করতে থাকে।

৭৪. অর্থাৎ রহমতের বারিধারার পরে যখন শস্যক্ষেত সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে তখন যদি এমন কোন কঠিন শৈত্য বা উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ চলে, যার ফলে পাকা শস্য একেবারে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

৭৫. অর্থাৎ তখন তারা আল্লাহর কুৎসা গাইতে এবং তাঁকে দোষারোপ করতে থাকে এই বলে যে, আমাদের ওপর এ কেমন বিপদ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ যখন আল্লাহ তাদের ওপর তাঁর অনুগ্রহধারা বর্ষণ করে চলছিলেন তখন তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে তাঁর অমর্যাদা করেছিল। এখানে আবার এ বিষয়বস্তুর প্রতি একটি সূক্ষ্ম ইংগিত দেয়া হয়েছে যে, যখন আল্লাহর রসূল তাঁর পক্ষ থেকে রহমতের পয়গাম নিয়ে আসেন

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ
جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَّشَیْبَةً ؕ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِیْمُ
الْقَدِیْرُ ﴿۵۴﴾ وَیَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ یُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا لَبِثُوْا غَیْرَ سَاعَةٍ ؕ
كَذٰلِكَ كَانُوْا یُؤْفَكُوْنَ ﴿۵۵﴾ وَقَالَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِیْمَانَ لَقَدْ
لَبِثْتُمْ فِیْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰی یَوْمِ الْبَعْثِ ۚ فَهٰذَا یَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ
كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۵۶﴾ فَیَوْمَئِذٍ لَّا یَنْفَعُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ
وَلَا هُمْ یُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿۵۷﴾

৬ রুকূ'

আল্লাহই দুর্বল অবস্থা থেকে তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করেন তারপর এ দুর্বলতার পরে তোমাদের শক্তি দান করেন, এ শক্তির পরে তোমাদেরকে আবার দুর্বল ও বৃদ্ধ করে দেন; তিনি যা চান সৃষ্টি করেন।[৭৯] আর তিনি সবকিছু জানেন, সব জিনিসের ওপর তিনি শক্তিশালী। আর যখন সেই সময় শুরু হবে,[৮০] যখন অপরাধীরা কসম খেয়ে খেয়ে বলবে, আমরা তো মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করিনি।[৮১] এভাবে তারা দুনিয়ার জীবনে প্রতারিত হতো।[৮২] কিন্তু যাদেরকে ঈমান ও জ্ঞানের সম্পদ দান করা হয়েছিল তারা বলবে, তোমরা তো আল্লাহর লিখিত বিধানে হাশরের দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছো, কাজেই এটিই সেই হাশরের দিন কিন্তু তোমরা জানতে না। কাজেই সেদিন জালেমদের কোন ওজর-আপত্তি কাজে লাগবে না এবং তাদেরকে ক্ষমা চাইতেও বলা হবে না।[৮৩]

তখন লোকেরা তাঁর কথা মেনে নেয় না এবং সেই নিয়ামত প্রত্যাখ্যান করে। তারপর যখন তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ জালেম ও স্বৈরাচারী একনায়কদেরকে তাদের ওপর চাপিয়ে দেন এবং তারা জুলুম-নিপীড়নের যাঁতাকলে তাদেরকে পিষ্ট করতে এবং মানবতার নিকুচি করতে থাকে তখন তারাই আল্লাহকে গালি দিতে থাকে এবং তিনি এ কেমন জুলুমে পরিপূর্ণ দুনিয়া তৈরি করেছেন বলে দোষারোপও করতে থাকে।

৭৬. এখানে এমনসব লোককে মৃত বলা হয়েছে। যাদের বিবেক মরে গেছে, যাদের মধ্যে নৈতিক জীবনের ছিটেফোটাও নেই এবং যাদের আপন প্রবৃত্তির দাসত্ব, জিদ ও

একগুঁয়েমি সেই মানবীয় গুণপনার অবসান ঘটিয়েছে যা মানুষকে হক কথা বুঝার ও গ্রহণ করার যোগ্য করে তোলে।

৭৭. বধির হচ্ছে এমনসব লোক যারা নিজেদের মনের দুয়ার এমনভাবে অর্গলবদ্ধ করেছে যে, সবকিছু শুনেও তারা কিছুই শুনে না। তারপর এ ধরনের লোকেরা যখন এমন প্রচেষ্টাও চালায় যাতে সত্যের আহবানের ধ্বনি তাদের কানে পৌছুতেই না পারে এবং আহবায়কের চেহারা দেখতেই দূরে সরে যেতে থাকে তখন আর কে তাদেরকে শুনাবে এবং কী-ই বা শুনাবে?

৭৮. অর্থাৎ অন্ধদের হাত ধরে তাদেরকে সারা জীবন সঠিক পথে চালানো তো নবীর কাজ নয়। তিনি তো কেবল সঠিক পথ দেখিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু যাদের দেখার চোখ অন্ধ হয়ে গেছে এবং নবী তাদেরকে যে পথ দেখাতে চাচ্ছেন তা যারা দেখতেই পায় না তাদেরকে পথ দেখানোর ক্ষমতা নবীর নেই।

৭৯. অর্থাৎ শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য। এসব অবস্থা তাঁরই সৃষ্ট। তিনি যাকে চান দূর্বল করে সৃষ্টি করেন, যাকে চান তাকে শক্তিশালী করেন, যাকে চান তাকে শৈশব থেকে যৌবনে পদার্পণ করতে দেন না, যাকে চান তাকে যৌবনে মৃত্যু দান করেন, যাকে চান তাকে দীর্ঘ বয়স দান করার পরও সুস্থ সবল রাখেন, যাকে চান তাকে গৌরবান্বিত যৌবনকালের পরে বার্ধক্যে এমন কষ্টকর পরিণতি দান করেন যার ফলে দুনিয়াবাসী শিক্ষালাভ করে, এসবই তাঁর ইচ্ছা। মানুষ নিজের জায়গায় বসে যতই অহংকারে মত্ত হয়ে উঠুক না কেন আল্লাহর শক্তির শৃংখলে সে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা যে, আল্লাহ তাকে যে অবস্থায়ই রাখুন না কেন তার মধ্যে কোন পরিবর্তন আনা তার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়।

৮০. অর্থাৎ কিয়ামত যার আসার খবর দেয়া হচ্ছে।

৮১. অর্থাৎ মৃত্যুকাল থেকে কিয়ামতের এই সময় পর্যন্ত। এ দু'টি সময়ের মধ্যে দশ বিশ হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও তারা মনে করবে তারা যেন এই মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে ঘুমিয়েছিল এবং এখন অকস্মাত একটি দুর্ঘটনা তাদেরকে জাগিয়ে দিয়েছে।

৮২. অর্থাৎ দুনিয়াতেও তারা এমনিই ভুল আন্দাজ-অনুমান করতো। সেখানেও সত্য অনুধাবন করতে পারতো না। এ জন্যই বলে বেড়াতো, কোন কিয়ামত টিয়ামত হবে না, মরার পরে আর কোন জীবন নেই এবং কোন আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে না।

৮৩. এর অন্য অনুবাদ এও হতে পারে যে, "তাদের কাছে চাওয়া হবে না যে, তোমাদের রবকে সন্তুষ্ট করো" কারণ তাওবা, ঈমান ও সৎকাজের দিকে ফিরে আসার সকল সুযোগই তারা হারিয়ে বসবে এবং পরীক্ষার সময় পার হয়ে গিয়ে এখনি ফল প্রকাশের সময় সমাগত হবে।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ
بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ﴿٥٨﴾ كَذٰلِكَ
يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٩﴾ فَاصْبِرْ اِنَّ
وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٦٠﴾

আমি এ কুরআনে লোকদেরকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়েছি। তুমি যে কোন নিদর্শনই আনো না কেন, অবিশ্বাসীরা একথাই বলবে, তোমরা মিথ্যাশ্রয়ী। এভাবে যারা জ্ঞানহীন তাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দেন। কাজেই (হে নবী!) সবর করো, অবশ্যই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য[৮৪] এবং যারা বিশ্বাস করে না তারা যেন কখনোই তোমাকে গুরুত্বহীন মনে না করে।[৮৫]

৮৪. ওপরে ৪৭ আয়াতে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। সেখানে মহান আল্লাহ নিজের এ নিয়ম বর্ণনা করেছেন যে, যারাই আল্লাহর রসূলদের নিয়ে আসা এসব সুস্পষ্ট নিদর্শনের মোকাবিলা করেছে মিথ্যাচার, হাসি-তামাশা ও হঠকারিতার মাধ্যমে, আল্লাহ অবশ্যই এ ধরনের অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছেন। فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا আর আল্লাহ মু'মিনদের সাহায্য করবেন এটা তার ওপর মু'মিনদের অধিকার وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ।

৮৫. অর্থাৎ শত্রুরা যেন তোমাদের এতই দুর্বল না পায় যে, তাদের হৈ চৈ ও শোরগোলে তোমরা দমিত হবে অথবা তাদের মিথ্যাচার ও দোষারোপ করার অভিযান দেখে তোমরা ভীত হয়ে যাও কিংবা হাসি-তামাশা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ হয়ে তোমরা হিম্মত হারিয়ে ফেলো অথবা তাদের হুমকি-ধমকি ও শক্তি প্রকাশে এবং জুলুম নির্যাতনে তোমরা ভীত হয়ে যাও কিংবা তাদের ফেলা লালসার টোপে তোমরা আটকা পড়ে যাও অথবা জাতীয় স্বার্থের নামে তারা তোমাদের কাছে যে আবেদন জানাচ্ছে তার ভিত্তিতে তোমরা তাদের সাথে সমঝোতা করে নিতে উদ্যত হও। এর পরিবর্তে তারা তোমাকে নিজেদের উদ্দেশ্য সচেতনতায় এত বেশী সতর্ক এবং নিজেদের বিশ্বাস ও ঈমানে এত বেশী পাকাপোক্ত এবং এ সংকল্পে এত বেশী দৃঢ়চেতা এবং নিজেদের চরিত্রে এতবেশী মজবুত পাবে যে, কোন ভয়ে তোমাদের ভীত করা যাবে না, কোন মূল্যে তোমাদের কেনা যাবে না, কোন প্রতারণা জালে তোমাদের আবদ্ধ করা যাবে না, কোন ক্ষতি, কষ্ট বা বিপদে ফেলে তোমাদেরকে পথ থেকে সরানো যাবে না এবং দীনের ব্যাপারে কোন প্রকার আপোষ বা লেনদেনের কারবারও তোমাদের সাথে করা যেতে পারে না। "অবিশ্বাসীরা যেন তোমাকে গুরুত্বহীন মনে না করে"— আল্লাহর এ ছোট্ট একটি বাণীর আলংকারিক বাক-বিন্যাসের মধ্যেই এ সমস্ত বিষয়বস্তু লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

আল্লাহ তাঁর শেষ নবীকে যেমন শক্তিশালী ও গুরুত্ববহ দেখতে চাচ্ছিলেন তিনি ঠিক তেমনটি হতে পেরেছিলেন কিনা এখন ইতিহাসই তা প্রমাণ করবে। তাঁর সাথে যে ব্যক্তিই যে ময়দানে শক্তি পরীক্ষা করেছে সেই ময়দানেই সে হেরে গেছে। শেষ পর্যন্ত এ মহান ব্যক্তিত্ব এমন বিপ্লব সৃষ্টি করেন যার পথরোধ করার জন্য আরবের কাফের ও মুশরিক সমাজ তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ ও সমস্ত কলা-কৌশল প্রয়োগ করেও পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে গেছে।

লুক্‌মান

৩১

নামকরণ

এ সূরার দ্বিতীয় রুকূ'তে লুকমান হাকীমের উপদেশাবলী উদ্ধৃত করা হয়েছে। তিনি নিজের পুত্রকে এ উপদেশ দিয়েছিলেন। এই সুবাদে এ সূরার লুকমান নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে পরিষ্কার বুঝা যায়, এটি এমন সময় নাযিল হয় যখন ইসলামের দাওয়াতের কণ্ঠরোধ এবং তার অগ্রগতির পথরোধ করার জন্য জুলুম-নিপীড়নের সূচনা হয়ে গিয়েছিল এবং এ জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হচ্ছিল। কিন্তু তখনও বিরোধিতার তোড়জোড় ষোলকলায় পূর্ণ হয়নি। ১৪ ও ১৫ আয়াত থেকে এর আভাস পাওয়া যায়। সেখানে নতুন ইসলাম গ্রহণকারী যুবকদের বলা হয়েছে, পিতা-মাতার অধিকার যথার্থই আল্লাহর পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তারা যদি তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করার পথে বাধা দেয় এবং শিরকের দিকে ফিরে যেতে বাধ্য করে তাহলে তাদের কথা কখনোই মেনে নেবে না। একথাটাই সূরা আনকাবূতেও বলা হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, দু'টি সূরাই একই সময় নাযিল হয়। কিন্তু উভয় সূরার বর্ণনা রীতি ও বিষয়বস্তুর কথা চিন্তা করলে অনুমান করা যায় সূরা লুকমান প্রথমে নাযিল হয়। কারণ এর পশ্চাতভূমে কোন তীব্র আকারের বিরোধিতার চিহ্ন পাওয়া যায় না। বিপরীত পক্ষে সূরা আনকাবূত পড়লে মনে হবে তার নাযিলের সময় মুসলমানদের ওপর কঠোর জুলুম নিপীড়ন চলছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরায় লোকদের বুঝানো হয়েছে, শিরকের অসারতা ও অযৌক্তিকতা এবং তাওহীদের সত্যতা ও যৌক্তিকতা। এই সংগে আহবান জানানো হয়েছে এই বলে যে, বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ ত্যাগ করো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে যে শিক্ষা পেশ করছেন সে সম্পর্কে উন্মুক্ত হৃদয়ে চিন্তা-ভাবনা করো এবং উন্মুক্ত দৃষ্টিতে দেখো, বিশ্ব-জগতের চারদিকে এবং নিজের মানবিক সত্তার মধ্যেই কেমন সব সুস্পষ্ট নিদর্শন এর সত্যতার সাক্ষ দিয়ে চলছে।

এ প্রসংগে একথাও বলা হয়েছে, দুনিয়ায় বা আরবদেশে এই প্রথমবার মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি আওয়াজ উঠানো হয়নি। আগেও লোকেরা বুদ্ধি-জ্ঞানের অধিকারী ছিল এবং তারা একথাই বলতো যা আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন। তোমাদের নিজেদের দেশেই ছিলেন মহাজ্ঞানী লুকমান। তাঁর জ্ঞান-গরিমার কাহিনী তোমাদের এলাকায় বহুল প্রচলিত। তোমরা নিজেদের কথাবার্তায় তাঁর প্রবাদ বাক্য ও জ্ঞানগর্ভ কথা উদ্ধৃত করে থাকো। তোমাদের কবি ও বাগ্মীগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার কথা বলেন। এখন তোমরা নিজেরাই দেখো তিনি কোন্ ধরনের আকীদা-বিশ্বাস ও কোন্ ধরনের নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা দিতেন।

আয়াত ৩৪ **সূরা লুকমান–মক্কী** রুকূ' ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

الٓمّٓ ① تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ② هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ③
الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ
يُوْقِنُوْنَ ④ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ⑤

আলিফ লাম মীম। এগুলো জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত।[১] পথনির্দেশনা ও অনুগ্রহ সৎকর্মশীলদের জন্য[২] যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আখেরাতে বিশ্বাস করে।[৩] এরাই তাদের রবের পক্ষ থেকে সঠিক পথে রয়েছে এবং এরাই সাফল্য লাভ করবে।[৪]

১. অর্থাৎ এমন কিতাবের আয়াত যা জ্ঞানে পরিপূর্ণ, যার প্রত্যেকটি কথা জ্ঞানগর্ভ।

২. অর্থাৎ এ আয়াতগুলো সঠিক পথনির্দেশক এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহের রূপলাভ করে এসেছে। কিন্তু এ পথনির্দেশনা ও অনুগ্রহ থেকে লাভবান হয় একমাত্র তারাই যারা সৎকাজ করার পথ অবলম্বন করে, সৎ হতে চায়, কল্যাণ ও ন্যায়ের সন্ধান করে এবং অসৎকাজ সম্পর্কে যখনই সতর্ক করে দেয়া হয় তখনই তা পরিহার করে এবং কল্যাণ ও ন্যায়ের পথ যখনই সামনে খুলে রেখে দেয়া হয় তখনই সে পথে চলতে শুরু করে। আর যারা অসৎকাজ করে ও অসৎ মনোবৃত্তির অধিকারী তারা এ পথনির্দেশনা থেকে লাভবান হবে না এবং এ অনুগ্রহেরও কোন অংশ পাবে না।

৩. যাদেরকে সৎকর্মশীল বলা হয়েছে তারা কেবলমাত্র এ তিনটি গুণাবলীর অধিকারী, একথা বলা হয়নি। আসলে প্রথমে 'সৎকর্মশীল' শব্দটি ব্যাপক অর্থে বর্ণনা করে এদিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, এ কিতাব যেসব অপকর্মে বাধা দেয় এ সৎকর্মশীলরা সেসবগুলো থেকেই বিরত থাকে। আর এ কিতাব যেসব সৎকাজ করার হুকুম দেয় এরা সেসবগুলোই করে। তারপর এ "সৎকর্মশীলদের" তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে একথা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য যে, বাদবাকি সমস্ত সৎকাজ কিন্তু এ তিনটি সদগুণের ওপরই নির্ভর করবে। তারা নামায কায়েম করে। এর ফলে আল্লাহর হুকুম মেনে চলা ও আল্লাহর ভয়ে ভীত হওয়া তাদের স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তারা যাকাত দেয়। এর ফলে আত্মত্যাগের প্রবণতা তাদের মধ্যে সুদৃঢ়

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝ وَاِذَا تُتْلٰى
عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ
فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ
جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

আর মানুষদেরই মধ্যে এমনও কেউ আছে,[৫] যে মনোমুগ্ধকর কথা[৬] কিনে আনে লোকদেরকে জ্ঞান ছাড়াই[৭] আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য এবং এ পথের আহবানকে হাসি-ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেয়।[৮] এ ধরনের লোকদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব।[৯] তাকে যখন আমার আয়াত শুনানো হয় তখন সে বড়ই দর্পভরে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন সে তা শুনেইনি, যেন তার কান কালা। বেশ, সুখবর শুনিয়ে দাও তাকে একটি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের। তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত,[১০] যেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এ হচ্ছে আল্লাহর অকাট্য প্রতিশ্রুতি এবং তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়।[১১]

ও শক্তিশালী হয়, পার্থিব সম্পদের প্রতি মোহ প্রদমিত হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আকাংখা জেগে ওঠে। তারা আখেরাতে বিশ্বাস করে। এর ফলে তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহি করার অনুভূতি জাগে। এর বদৌলতে তারা এমন জন্তু-জানোয়ারের মতো হয় না যারা চারণক্ষেত্রে বাঁধনহারা হয়ে এদিক ওদিক চরে বেড়ায়। বরং তারা এমন মানুষদের মতো হয়ে যায় যারা নিজেদেরকে স্বেচ্ছাচারী মনে করে না। মনে করে, তারা কোন প্রভুর গোলাম এবং নিজেদের সমস্ত কাজের জন্য প্রভুর সামনে জবাবদিহি করতে বাধ্য। এ তিনটি বিশেষত্বের কারণে এ "সৎকর্মশীলরা" ঠিক তেমনি ধরনের সৎকর্মশীল থাকে না যারা ঘটনাক্রমে কোন সৎকাজ করে বসে এবং তাদের অসৎকাজও তেমনি সৎকাজের মতো একই ধারায় অনুষ্ঠিত হতে পারে। পক্ষান্তরে এ বিশেষত্বগুলো তাদের মধ্যে একটি চিন্তা ও নৈতিক ব্যবস্থার জন্ম দেয় যার ফলে তাদের সৎকাজগুলো একটি ধরা বাঁধা নিয়মানুসারে অনুষ্ঠিত হতে থাকে এবং অসৎকাজ যদি কখনো হয়ে যায়ই তাহলে তা হয় ঘটনাক্রমে। তাদের কোন গভীর চিন্তা ও নৈতিক উদ্যোগ তাদেরকে নিজেদের প্রাকৃতিক চাহিদা অনুসারে অসৎপথে নিয়ে যায় না।

৪. যে সময় এ আয়াত নাযিল হয় তখন মক্কার কাফেররা মনে করতো এবং প্রকাশ্যে বলতো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর এ দাওয়াত গ্রহণকারী

লোকেরা নিজেদের জীবন ধ্বংস করে চলছে। তাই একেবারে নির্দিষ্ট করে এবং পুরোপুরি জোর দিয়ে বলা হয়েছে, "এরাই সফলকাম হবে।" অর্থাৎ এরা ধ্বংস হবে না, যেমন বাজে ও উদ্ভট চিন্তার মাধ্যমে তোমরা মনে করে বসেছো। বরং এরাই আসলে সফলকাম হবে এবং যারা এপথ অবলম্বন করতে অস্বীকার করেছে তারাই হবে অকৃতকার্য।

এখানে যে ব্যক্তি সাফল্যকে শুধুমাত্র এ দুনিয়ার চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং তাও আবার বৈষয়িক প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি অর্থে গ্রহণ করবে, কুরআনের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করার ব্যাপারে সেও মারাত্মক ভুল করবে। সাফল্যের কুরআনী ধারণা জানার জন্য নিম্নলিখিত আয়াতগুলো তাফহীমুল কুরআনের ব্যাখ্যা সহকারে গভীরভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। আল বাকারা, ২-৫; আলে ইমরান, ১০৩, ১৩০ ও ২০০; আল মা-য়েদাহ, ৩৫ ও ৯০; আল আন'আম, ২১; আল 'আরাফ, ৭-৮ ও ১৫৭; আত্ তাওবাহ, ৮৮; ইউনুস, ১৭; আন্ নাহ্‌ল, ১১৬; আল হাজ্জ, ৭৭; আল মু'মিনূন, ১ ও ১১৭; আন নূর, ৫১; এবং আর রূম, ৪৮ আয়াত।

৫. অর্থাৎ একদিকে তো আল্লাহর পক্ষ থেকে এ পথনির্দেশনা ও অনুগ্রহ এসেছে, যা থেকে কিছু লোক লাভবান হচ্ছে। অন্যদিকে ঐ সমস্ত সৌভাগ্যবান লোকদের পাশাপাশি এমন দুর্ভাগা লোকেরাও রয়ে গেছে যারা আল্লাহর আয়াতের মোকাবিলায় এ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছে।

৬. আসল শব্দ হচ্ছে "লাহ্‌ওয়াল হাদীস" অর্থাৎ এমন কথা যা মানুষকে আত্ম-সমাহিত করে অন্য প্রত্যেকটি জিনিস থেকে গাফিল করে দেয়। শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে এ শব্দগুলোর মধ্যে নিন্দার কোন বিষয় নেই। কিন্তু খারাপ, বাজে ও অর্থহীন কথা অর্থে শব্দটির ব্যবহার হয়। যেমন গালগল্প, পুরাকাহিনী, হাসি-ঠাট্টা, কথা-কাহিনী, গল্প, উপন্যাস, গান বাজনা এবং এ জাতীয় আরো অন্যান্য জিনিস।

'লাহ্‌ওয়াল হাদীস' কিনে নেয়ার এ অর্থও হতে পারে যে, ঐ ব্যক্তি সত্য কথা বাদ দিয়ে মিথ্যা কথা গ্রহণ করে এবং সঠিক পথনির্দেশনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এমন কথার প্রতি আগ্রহান্বিত হয় যার মাধ্যমে তার জন্য দুনিয়াতেও কোন মংগল নেই এবং আখেরাতেও নেই। কিন্তু এটি এই বাক্যাংশটির রূপক অর্থ। এর প্রকৃত অর্থ এই যে, মানুষ তার নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে কোন বাজে জিনিস কিনে। এ ব্যাখ্যার সমর্থনে বহু হাদীসও রয়েছে। ইবনে হিশাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, মক্কার কাফেরদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যখন এ দাওয়াত সম্প্রসারিত হয়েই চলছিল তখন নদ্বর ইবনে হারেস কুরাইশ নেতাদেরকে বললো, তোমরা যেভাবে এ ব্যক্তির মোকাবিলা করছো, তাতে কোন কাজ হবে না। এ ব্যক্তি তোমাদের মধ্যেই জীবন যাপন করে শৈশব থেকে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছে। আজ পর্যন্ত নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে সে ছিল তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে সত্যবাদী ও সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোক। এখন তোমরা বলছো, সে গণক, যাদুকর, কবি, পাগল। একথা কে বিশ্বাস করবে? যাদুকর কোন্ ধরনের তুক্‌তাক কারবার চালায় তা কি লোকেরা জানে না? গণকরা কি সব কথাবার্তা বলে তা কি লোকদের জানতে বাকি আছে? লোকেরা কি কবি ও কবিতা চর্চার ব্যাপারে অনভিজ্ঞ? পাগলরা কেমন কেমন করে তাকি লোকেরা জানে না? এ দোষগুলোর মধ্য থেকে কোন্‌টি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর

প্রযোজ্য হয় যে, সেটি বিশ্বাস করার জন্য তোমরা লোকদেরকে আহবান জানাতে পারবে? থামো, এ রোগের চিকিৎসা আমিই করবো। এরপর সে মক্কা থেকে ইরাক চলে গেলো। সেখান থেকে অনারব বাদশাহদের কিস্‌সা কাহিনী এবং রুস্তম ও ইসফিন্দিয়ারের গল্পকথা সংগ্রহ করে এনে গল্প বলার আসর জমিয়ে তুলতে লাগলো। তার উদ্দেশ্য ছিল, এভাবে লোকেরা কুরআনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং এসব গল্প-কাহিনীর মধ্যে ডুবে যাবে। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৩২০-৩২১ পৃঃ) আসবাবুন নযুলের মধ্যে এ বর্ণনাটি ওয়াহেদী কাল্‌বী ও মুকাতিল থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) এর ওপর আরো এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, নদ্বর এ উদ্দেশ্যে গায়িকা বাঁদীদেরকেও কিনে এনেছিল। কোন ব্যক্তি সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথায় প্রভাবিত হতে চলেছে বলে তার কাছে খবর এলেই সে তার জন্য নিজের একজন বাঁদী নিযুক্ত করতো এবং তাকে বলে দিতো ওকে খুব ভালো করে পানাহার করাও ও গান শুনাও এবং সবসময় তোমার সাথে জড়িয়ে রেখে ওদিক থেকে ওর মন ফিরিয়ে আনো। বিভিন্ন জাতির বড় বড় অপরাধীরা প্রত্যেক যুগে যেসব ধূর্তামী ও চালবাজীর আশ্রয় নিয়ে এসেছে এ প্রায় সে একই ধরনের চালবাজী ছিল। তারা জনগণকে খেলা-তামাশা ও নাচগানে (কালচার) মশগুল করতে থাকে। এভাবে তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতি নজর দেবার চেতনাই থাকে না এবং এ অস্তিত্ব জগতের মধ্যে তারা একথা অনুভবই করতে পারে না যে, তাদেরকে এক ভয়াবহ ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

লাহ্‌ওয়াল হাদীসের এ ব্যাখ্যাই বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেঈ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে (রা) জিজ্ঞেস করা হয়, এ আয়াতে যে লাহ্‌ওয়াল হাদীস শব্দ এসেছে এর তাৎপর্য কি? তিনি তিনবার জোর দিয়ে বলেন, هو والله الغناء "আল্লাহর কসম এর অর্থ হচ্ছে গান।" (ইবনে জারীর, ইবনে আবি শাইবাহ, হাকেম, বায়হাকী) প্রায় এ একই ধরনের উক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, মুজাহিদ, ইকরামাহ, সাঈদ ইবনে জুবাইর, হাসান বাসরী ও মাকহূল থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতেম ও তিরমিযি হযরত আবু উমামাহ বাহেলীর (রা)' হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤ هن ولا التجارة فيهن ولا اثمانهن

"গায়িকা মেয়েদের কেনাবেচা ও তাদের ব্যবসায় করা হালাল নয় এবং তাদের দান নেয়াও হালাল নয়।"

অন্য একটি হাদীসে শেষ বাক্যটির শব্দাবলী হচ্ছে ঃ اكل ثمنهن حرام "তাদের মূল্য খাওয়া হারাম।" অন্য একটি হাদীসে একই আবু উমামাহ থেকে নিম্নোক্ত শব্দাবলী উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن ولا شراؤ هن وثمنهن حرام

"বাঁদীদেরকে গান-বাজনা করার শিক্ষা দেয়া এবং তাদের বেচা-কেনা করা হালাল নয় এবং তাদের দাম হারাম।"

এ তিনটি হাদীসে একথা সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, من يشترى لهو الحديث আয়াতটি এ ব্যাপারেই নাযিল হয়। কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী 'আহকামুল কুরআনে' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ও ইমাম মালেকের বরাত দিয়ে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

من جلس الى قينة يسمع منها صب فى اذنيه الانك يوم القيمة

"যে ব্যক্তি গায়িকা বাঁদীর মাহফিলে বসে তার গান শুনবে, কিয়ামতের দিন তার কানে গরম শীসা ঢেলে দেয়া হবে।"

(এ প্রসংগে একথা জেনে নেয়া উচিত যে, সে যুগে গান-বাজনার "সংস্কৃতি" বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বরং পুরোপুরি বাঁদীদের বদৌলতেই জীবিত ছিল। স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত মেয়েরা সেকালে "আর্টিষ্ট" হননি। তাই নবী (সা) গায়িকাদের কেনা-বেচার কথা বলেছেন, দাম শব্দের সাহায্যে তাদের "ফী"র ধারণা দিয়েছেন এবং গায়িকা মেয়েদের জন্য "কাইনা" শব্দ ব্যবহার করেছেন। আরবী ভাষায় বাঁদীদের জন্য এ শব্দটি বলা হয়।)

৭. "জ্ঞান ছাড়াই" শব্দের সম্পর্ক "কিনে আনে" এর সাথেও হতে পারে আবার "বিচ্যুত করে" -এর সাথেও হতে পারে। যদি প্রথম বাক্যাংশের সাথে এর সম্পর্ক মেনে নেয়া হয়, তাহলে এর অর্থ হবে, সেই মূর্খ অজ্ঞ লোক এই মনোমুগ্ধকর জিনিসটি কিনে নেয় এবং সে জানে না কেমন মূল্যবান জিনিস বাদ দিয়ে সে কেমন ধ্বংসকর জিনিস কিনে নিচ্ছে। একদিকে আছে জ্ঞান ও সঠিক পথনির্দেশনা সমৃদ্ধ আল্লাহর আয়াত। বিনামূল্যে সে তা লাভ করছে কিন্তু তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। অন্যদিকে রয়েছে সব অর্থহীন ও বাজে জিনিস। সেগুলো চিন্তা ও চরিত্রশক্তি ধ্বংস করে দেয়। নিজের টাকা পয়সা খরচ করে সে সেগুলো লাভ করছে। আর যদি একে দ্বিতীয় বাক্যাংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত মনে করা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে যে, সে জ্ঞান ছাড়াই লোকদের পথ দেখাচ্ছে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে সে যে নিজের ঘাড়ে কত বড় জুলুমের দায়ভাগ চাপিয়ে নিচ্ছে, তা সে জানে না।

৮. অর্থাৎ এ ব্যক্তি লোকদেরকে কিস্‌সা-কাহিনী ও গান-বাজনায় মশ্‌গুল করে আল্লাহর আয়াতের প্রতি বিদ্রূপ করতে চায়। সে কুরআনের এ দাওয়াতকে ঠাট্টা-তামাশার মধ্যে উড়িয়ে দিতে চায়। আল্লাহর দীনের সাথে লড়াই করার জন্য সে যুদ্ধের এমনসব নকশা তৈরি করতে চায় যেখানে একদিকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর আয়াত শোনাতে বের হবেন, অন্যদিকে কোন সুশ্রী ও সুকণ্ঠী গায়িকার মাহফিল গুলজার হতে থাকবে, আবার কোথাও কোন বাচাল কথক ইরান-তুরানের কাহিনী শুনাতে থাকবে এবং লোকেরা এসব সাংস্কৃতিক তৎপরতায় আকণ্ঠ ডুবে গিয়ে আল্লাহ, আখেরাত ও নৈতিক চরিত্রনীতির কথা শোনার মুডই হারিয়ে ফেলবে।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ
تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۭ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً
فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ۝١٠ هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ
الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ۭ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝١١

তিনি[১২] আকাশসমূহ সৃষ্টি করেছেন স্তম্ভ ছাড়াই, যা তোমরা দেখতে পাও।[১৩] তিনি পৃথিবীতে পাহাড় গেড়ে দিয়েছেন, যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে।[১৪] তিনি সব ধরনের জীব-জন্তু পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি এবং জমিতে নানা ধরনের উত্তম জিনিস উৎপন্ন করি। এতো হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি, এখন আমাকে একটু দেখাও তো দেখি অন্যেরা কি সৃষ্টি করেছে?[১৫]—আসল কথা হচ্ছে এ জালেমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে।[১৬]

৯. এ শাস্তি তাদের অপরাধের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই নির্ধারিত। তারা আল্লাহর দীন, তাঁর আয়াত ও তাঁর রসূলকে লাঞ্ছিত করতে চায়। এর বদলায় আল্লাহ তাকে কঠিন লাঞ্ছনাকর আযাব দেবেন।

১০. তাদের জন্য জান্নাতের নিয়ামতসমূহ রয়েছে, একথা বলেননি। বরং বলেছেন, তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত। যদি প্রথম কথাটি বলা হতো, তাহলে এর অর্থ হতো, তারা এ নিয়ামতসমূহ উপভোগ করবে ঠিকই কিন্তু এ জান্নাতগুলো তাদের নিজেদের হবে না। এর পরিবর্তে "তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতসমূহ" একথা বলায় আপনা-আপনি একথা প্রকাশ হয়ে গেছে যে, জান্নাত পুরোটাই তাদের হাওয়ালা করে দেয়া হবে এবং তারা তার নিয়ামতসমূহ এমনভাবে ভোগ করতে থাকবে যেমন একজন মালিক তার মালিকানাধীন জিনিস ভোগ করে থাকে। মালিকানা অধিকার ছাড়াই কাউকে কোন জিনিস থেকে নিছক লাভবান হবার সুযোগ দিলে যেভাবে তা ভোগ করা হয় সেভাবে নয়।

১১. অর্থাৎ নিজের প্রতিশ্রুতি পালন থেকে কোন জিনিসই তাঁকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না এবং তিনি যা কিছু করেন ঠিকমতো জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতার দাবী অনুযায়ীই করেন। "এটা আল্লাহর অকাট্য প্রতিশ্রুতি"—একথা বলার পর আল্লাহর উপরোক্ত দু'টি বিশেষ গুণের কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, একথা বলা যে, মহান আল্লাহ ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না এবং এ বিশ্ব-জাহানে এমন কোন শক্তিই নেই যে তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যাপারে তাঁর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই ঈমান ও সৎকাজের বিনিময়ে আল্লাহ যা কিছু দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা কারো না পাওয়ার আশংকা নেই। তা ছাড়া আল্লাহর পক্ষ থেকে এ পুরস্কারের ঘোষণা পুরোপুরি তাঁর জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতার

ওপর নির্ভরশীল। সেখানে হকদারকে বঞ্চিত করে নাহকদারকে দান করার কোন কারবার নেই। প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোকেরাই এ পুরস্কারের হকদার এবং আল্লাহ এ পুরস্কার তাদেরকেই দেবেন।

১২. ওপরের প্রস্তাবনা ও প্রারম্ভিক বাক্যগুলোর পর এখন আসল বক্তব্য অর্থাৎ শিরক খণ্ডন করে তাওহীদের দাওয়াত দেবার জন্য বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে।

১৩. মূল শব্দ হচ্ছে, بغير عمد ترونها এর দু'টি মানে হতে পারে। একটি হচ্ছে, "তোমরা নিজেরাই দেখছো, স্তম্ভ ছাড়াই তা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।" দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, "এমন সব স্তম্ভের ওপর সেগুলো প্রতিষ্ঠিত যা চোখে দেখা যায় না" ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ এর দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করেছেন। আবার মুফাস্‌সিরগণের অন্য একটি দল এর প্রথম অর্থটি নেন। বর্তমান যুগের পদার্থ বিদ্যার দৃষ্টিতে যদি এর অর্থ বর্ণনা করা হয় তাহলে বলা যেতে পারে, সমগ্র আকাশ জগতে এ সীমা-সংখ্যাহীন বিশাল গ্রহ-নক্ষত্রপুঞ্জকে যার যার গতিপথে অদৃশ্য স্তম্ভের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। কোন তারের সাহায্যে তাদের পরস্পরকে সংযুক্ত করে রাখা হয়নি। কোন পেরেকের সাহায্যে তাদের একটির অন্যটির ওপর উল্টে পড়ে যাওয়াকে ঠেকিয়ে রাখা হয়নি। একমাত্র মাধ্যাকর্ষণ শক্তিই এ ব্যবস্থাকে সচল রেখেছে। আমাদের আজকের জ্ঞানের ভিত্তিতে এটিই আমাদের ব্যাখ্যা। হতে পারে আগামীকাল আমাদের জ্ঞান আরো কিছু বেড়ে যেতে পারে। তখন এর আরো কোন বেশী মানানসই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

১৪. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন্ নাহ্‌ল, ১২ টীকা।

১৫. অর্থাৎ যেসব সত্ত্বাকে তোমরা নিজেদের উপাস্য করে নিয়েছো, যাদেরকে তোমরা নিজেদের ভাগ্যবিধাতা করে নিয়েছো এবং যাদের বন্দেগী ও পূজা করার জন্য তোমরা এত হন্যে হয়ে লেগেছো।

১৬. অর্থাৎ যখন এরা এ বিশ্ব-জাহানে আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন সৃষ্টি চিহ্নিত করতে পারেনি এবং একথা সুস্পষ্ট যে, তারা তা করতে পারে না তখন তাদের যারা স্রষ্টা নয় এমন সত্ত্বাকে আল্লাহর একচ্ছত্র ও সার্বভৌম কর্তৃত্বে শরীক করা, তাদের সামনে আনুগত্যের শির নত করা এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করা ও অভাব মোচন করার জন্য আবেদন জানানোকে সুস্পষ্ট নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে। যতক্ষণ কোন ব্যক্তি একেবারেই উন্মাদ হয়ে না যায় ততক্ষণ সে এত বড় নির্বুদ্ধিতা করতে পারে না যে, সে কারো সামনে নিজেই নিজের উপাস্যদেরকে সৃষ্টিকর্মে অক্ষম বলে এবং একমাত্র আল্লাহকে স্রষ্টা বলে স্বীকার করে নেবার পরও তাদেরকে উপাস্য বলে মেনে নেবার জন্য জিদ ধরবে। যার ঘটে একটুখানিও বুদ্ধি আছে সে কখনো চিন্তা করবে না, কোন জিনিস সৃষ্টি করার ক্ষমতাই যার নেই এবং পৃথিবী ও আকাশের কোন জিনিসের সৃষ্টিতে যার নামমাত্র অংশও নেই সে কেন আমাদের উপাস্য হবে? কেন আমরা তার সামনে সিজদানত হবো? অথবা তার পদচুম্বন করবো এবং তার আস্তানায় গিয়ে ষষ্ঠাংগ প্রণিপাত করবো? আমাদের ফরিয়াদ শোনার এবং আমাদের অভাব পূরণ করার কী ক্ষমতা তার আছে? তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম, সে আমাদের প্রার্থনা শুনছে কিন্তু তার জবাবে সে নিজে কি পদক্ষেপ নিতে পারে, যখন তার নিজের কিছু করার ক্ষমতা নেই?

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ۭ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝ وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۭ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ۝

২ রুকূ'

আমি[১৭] লুকমানকে দান করেছিলাম সূক্ষ্মজ্ঞান। যাতে সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়।[১৮] যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তার কৃতজ্ঞতা হবে তার নিজেরই জন্য লাভজনক। আর যে ব্যক্তি কুফরী করবে, সে ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী এবং নিজে নিজেই প্রশংসিত।[১৯]

স্মরণ করো যখন লুকমান নিজের ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছিল, সে বললো, "হে পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না।[২০] যথার্থই শিরক অনেক বড় জুলুম।"[২১]

যে কিছু করতে পারে সে–ই তো কিছু ভেঙ্গে যাওয়া জিনিস গড়তে পারে কিন্তু যার আদতে করারই কোন ক্ষমতা নেই সে আবার কেমন করে ভেঙে যাওয়া জিনিস গড়তে পারবে।

১৭. একটি শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমে শিরকের অসারতা প্রমাণ করার পর এখন আরবের লোকদেরকে একথা জানানো হচ্ছে যে, এ যুক্তিসংগত কথা প্রথমবার তোমাদের সামনে তোলা হচ্ছে না বরং পূর্বেও বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীরা একথাই বলে এসেছেন এবং তোমাদের নিজেদের বিখ্যাত জ্ঞানী লুকমান আজ থেকে বহুকাল আগে একথাই বলে গেছেন। তাই শিরক যদি কোন অযৌক্তিক বিশ্বাস হয়ে থাকে তাহলে ইতিপূর্বে কেউ একথা বলেনি কেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের জবাবে তোমরা একথা বলতে পারো না।

একজন বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হিসেবে আরবে লুকমান বহুল পরিচিত ব্যক্তিত্ব। জাহেলী যুগের কবিরা যেমন ইমরাউল কায়েস, লবীদ, আ'শা, তারাফাহ প্রমুখ তাদের কবিতায় তার কথা বলা হয়েছে। আরবের কোন কোন লেখাপড়া জানা লোকের কাছে "সহীফা লুকমান" নামে তাঁর জ্ঞানগর্ভ উক্তির একটি সংকলন পাওয়া যেতো। হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, হিজরাতের তিন বছর পূর্বে মদীনার সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতে প্রভাবিত হন তিনি ছিলেন সুওয়াইদ ইবনে সামেত। তিনি হজ্জ সম্পাদন করার জন্য মক্কায় যান। সেখানে নবী করীম (সা) নিজের নিয়ম মতো বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত হাজীদের আবাসস্থলে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। এ প্রসংগে সুওয়াইদ যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তৃতা শুনেন, তাঁকে বলেন, আপনি যে ধরনের কথা বলছেন তেমনি ধরনের একটি

জিনিস আমার কাছেও আছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, সেটা কি? জবাব দেন সেটা লুকমানের পুস্তিকা। তারপর নবী করীমের (সা) অনুরোধে তিনি তার কিছু অংশ পাঠ করে তাঁকে শুনান। তিনি বলেন, এটা বড়ই চমৎকার কথা। তবে আমার কাছে এর চেয়েও বেশী চমৎকার কথা আছে। এরপর কুরআন শুনান। কুরআন শুনে সুওয়াইদ অবশ্যই স্বীকার করেন, নিসন্দেহে এটা লুকমানের পুস্তিকার চেয়ে ভালো। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২ খণ্ড, ৬৭–৬৯ পৃঃ; উসুদুল গাবাহ, ২ খণ্ড, ৩৭৮ পৃষ্ঠা) ঐতিহাসিকগণ বলেন, এই সুওয়াইদ ইবনে সামেত তাঁর যোগ্যতা, বীরত্ব, সাহিত্য ও কাব্য মনীষা এবং বংশ মর্যাদার কারণে মদীনায় "কামেল" নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাতের পর যখন তিনি মদীনায় ফিরে যান তার কিছুদিন পর বুয়াসের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং তাতে তিনি মারা যান। তাঁর গোত্রের লোকদের সাধারণভাবে এ ধারণা ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাতের পর তিনি মুসলমান হয়ে যান।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে লুকমানের ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে ব্যাপক মতবিরোধ দেখা যায়। জাহেলিয়াতের অন্ধকার যুগে কোন লিখিত ইতিহাসের অস্তিত্ব ছিল না। শত শত বছর থেকে মুখে মুখে শ্রুত যেসব তথ্য স্মৃতির ভাণ্ডারে লোককাহিনী–গল্প–গাথার আকারে সংগৃহীত হয়ে আসছিল সেগুলোর ওপর ছিল এর ভিত্তি। এসব বর্ণনার প্রেক্ষিতে কেউ কেউ হযরত লুকমানকে আদ জাতির অন্তরভুক্ত ইয়ামনের বাদশাহ মনে করতো। মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদবী এসব বর্ণনার ওপর নির্ভর করে তাঁর 'আরদুল কুরআন' গ্রন্থে এ মত প্রকাশ করেছেন যে, আদ জাতির ওপর আল্লাহর আযাব নাযিল হবার পর হযরত হূদের (আ) সাথে তাদের যে ঈমানদার অংশটি বেঁচে গিয়েছিল লুকমান ছিলেন তাঁদেরই বংশোদ্ভূত। ইয়ামনে এ জাতির যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তিনি ছিলেন তার অন্যতম শাসক ও বাদশাহ। কিন্তু কতিপয় প্রবীণ সাহাবী ও তাবেঈদের মাধ্যমে প্রাপ্ত অন্য বর্ণনাগুলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, লুকমান ছিলেন একজন হাবশী গোলাম। হযরত আবু হুরাইরা (রা), মুজাহিদ, ইকরিমাহ ও খালেদুর রাব'ঈও একথাই বলেন। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রা) বলেন, তিনি ছিলেন নূবার অধিবাসী। সাঈদ ইবনে মুসাইয়েবের উক্তি হচ্ছে, তিনি মিসরের কালো লোকদের অন্তরভুক্ত ছিলেন। এ তিনটি বক্তব্য প্রায় কাছাকাছি অবস্থান করছে। কারণ আরবের লোকেরা কালো বর্ণের মানুষদেরকে সেকালে প্রায়ই হাবশী বলতো। আর নূবা হচ্ছে মিসরের দক্ষিণে এবং সূদানের উত্তরে অবস্থিত একটি এলাকা। তাই তিনটি উক্তিতে একই ব্যক্তিকে নূবী, মিসরীয় ও হাবশী বলা কেবলমাত্র শাব্দিক বিরোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থের দিক দিয়ে এখানে কোন বিরোধ নেই। তারপর রওদাতুল আনাফে সুহাইলির ও মুরূজুয যাহাবে মাস'উদীর বর্ণনা থেকে এ সূদানী গোলামের কথা আরবে কেমন করে ছড়িয়ে পড়লো এ প্রশ্নের ওপরও আলোকপাত হয়। এ উভয় বর্ণনায় বলা হয়েছে, এ ব্যক্তি আসলে ছিলেন নূবী। কিন্তু তিনি বাসিন্দা ছিলেন মাদ্‌য়ান ও আইল (বর্তমান আকাবাহ) এলাকার। এ কারণে তাঁর ভাষা ছিল আরবী এবং তাঁর জ্ঞানের কথা আরবে ছড়িয়ে পড়ে। তা ছাড়া সুহাইলী আরো বিস্তারিতভাবে বলেছেন যে, লুকমান হাকীম ও লুকমান ইবনে আদ দু'জন আলাদা ব্যক্তি। তাদেরকে এক ব্যক্তি মনে করা ঠিক নয়। (রওদুল আনাফ, ১ম খণ্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা এবং মাসউদী, ১ম খণ্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা)

এখানে একথাটিও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে দেয়া প্রয়োজন যে, প্রাচ্যবিদ ডিরেনবুর্গ (Derenbourg) প্যারিস লাইব্রেরীর যে আরবী পাণ্ডুলিপিটি "লুকমান হাকীমের গাথা" (Fables De Loqman Lo Sage) নামে প্রকাশ করেছেন সেটি আসলে বানোয়াট। "লুকমানের সহীফা"র সাথে তার দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। ত্রয়োদশ ঈসায়ী শতকে এ গাথাগুলো কেউ সংকলন করেছিলেন। তাঁর আরবী সংস্করণ বড়ই ত্রুটিপূর্ণ। সেগুলো পড়লে পরিষ্কার অনুভব করা যাবে যে, আসলে অন্যকোন ভাষা থেকে অনুবাদ করে গ্রন্থকার নিজের পক্ষ থেকে সেগুলোর সম্পর্ক লুকমান হাকীমের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। প্রাচ্যবিদরা এ ধরনের জাল ও বানোয়াট জিনিসগুলো বের করে যে উদ্দেশ্যে সামনে আনেন তা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, কুরআন বর্ণিত কাহিনীগুলোকে যে কোনভাবেই অনৈতিহাসিক কাহিনী প্রমাণ করে অনির্ভরযোগ্য গণ্য করা। যে ব্যক্তিই ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলামে "লুকমান" শিরোনামে (B. Heller) হেলারের নিবন্ধটি পড়বেন তাঁর কাছেই তাদের মনোভাব অস্পষ্ট থাকবে না।

১৮. অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত এ জ্ঞান ও অন্তরদৃষ্টির প্রাথমিক চাহিদা এই ছিল যে, মানুষ তার রবের মোকাবিলায় কৃতজ্ঞ ও অনুগৃহীত হবার নীতি অবলম্বন করবে, অনুগ্রহ অস্বীকার করার ও বিশ্বাসঘাতকতার নীতি অবলম্বন করবে না। আর তার কৃতজ্ঞতা নিছক মৌখিক হিসেব-নিকেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং চিন্তা, কথা ও কাজ তিন পর্যায়েই পরিব্যাপ্ত হবে। আমি যা কিছু লাভ করেছি সবই আল্লাহর দান, নিজের হৃদয় ও মস্তিষ্কের গভীরে তার এ বিশ্বাস ও চেতনাও সঞ্চারিত হবে। তার কণ্ঠে সদা সর্বদা আল্লাহর অনুগ্রহের স্বীকৃতিও উচ্চারিত হবে। কার্যক্ষেত্রেও সে আল্লাহর হুকুম মেনে চলে, তাঁর হুকুম অমান্য করা থেকে দূরে থেকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য প্রচেষ্টা ও সাধনা করতে থেকে, তাঁর দেয়া নিয়ামতসমূহ তাঁর বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে একথা প্রমাণ করে দেবে যে, প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুগৃহীত।

১৯. অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুফরী করে তার কুফরী তার নিজের জন্য ক্ষতিকর। এতে আল্লাহর কোন ক্ষতি হয় না। তিনি অমুখাপেক্ষী। কারো কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন। কারো কৃতজ্ঞতা তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বে কোন বৃদ্ধি ঘটায় না। বান্দার যাবতীয় নিয়ামত যে একমাত্র তাঁরই দান কারো অকৃতজ্ঞতা ও কুফরী এ জাজ্বল্যমান সত্যে কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। কেউ তাঁর প্রশংসা করুক বা নাই করুক তিনি আপনা আপনিই প্রশংসিত। বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি অণু-কণিকা তাঁর পূর্ণতা ও সৌন্দর্য এবং তাঁর স্রষ্টা ও অন্নদাতা হবার সাক্ষ দিচ্ছে এবং প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তু নিজের সমগ্র সত্তা দিয়ে তাঁর প্রশংসা গেয়ে চলছে।

২০. লুকমানের পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপদেশমালা থেকে এ বিশেষ উপদেশ বাণীটিকে এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে দু'টি বিশেষ সম্পর্কের ভিত্তিতে। এক, তিনি নিজ পুত্রকে এ উপদেশটি দেন। আর একথা সুস্পষ্ট, মানুষ যদি দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশী কারো ব্যাপারে আন্তরিক হতে পারে তাহলে সে হচ্ছে তার নিজের সন্তান। এক ব্যক্তি অন্যকে ধোঁকা দিতে পারে, তার সাথে মুনাফিকী আচরণ করতে পারে কিন্তু সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোকটিও নিজ পুত্রকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা কখনই করতে পারে না। তাই লুকমানের তার নিজ পুত্রকে এ

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

—আর[২২] প্রকৃতপক্ষে আমি মানুষকে তার পিতা–মাতার হক চিনে নেবার জন্য নিজেই তাকিদ করেছি। তার মা দুর্বলতার পর দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের গর্ভে ধারণ করে এবং দু'বছর লাগে তার দুধ ছাড়তে।[২৩] (এ জন্য আমি তাকে উপদেশ দিয়েছি) আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং নিজের পিতা–মাতার প্রতিও, আমার দিকেই তোমাকে ফিরে আসতে হবে।

নসীহত করা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, তাঁর মতে শিরক যথার্থই একটি নিকৃষ্ট কাজ এবং এ জন্যই তিনি সর্বপ্রথম নিজের প্রাণাধিক পুত্রকে এ গোমরাহীটি থেকে দূরে থাকার উপদেশ দেন। দুই, মক্কার কাফেরদের অনেক পিতা–মাতা সে সময় নিজের সন্তানদেরকে শিরকী ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার জন্য বাধ্য করছিল। সামনের দিকের একথা বর্ণনা করা হয়েছে। তাই সেই অজ্ঞদেরকে শুনানো হচ্ছে, তোমাদের দেশেরই বহুল পরিচিত জ্ঞানী পণ্ডিত তো তাঁর নিজের পুত্রের মংগল করার দায়িত্বটা তাকে শিরক থেকে দূরে থাকার নসিহত করার মাধ্যমেই পালন করেন। এখন তোমরা যে তোমাদের সন্তানদেরকে শিরক করতে বাধ্য করছো, এটা কি তাদের প্রতি শুভেচ্ছা না তাদের অমংগল কামনা?

২১. জুলুমের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, কারো অধিকার হরণ করা এবং ইনসাফ বিরোধী কাজ করা। শিরক এ জন্য বৃহত্তর জুলুম যে, মানুষ এমন সব সত্তাকে তার নিজের স্রষ্টা, রিযিকদাতা ও নিয়ামতদানকারী হিসেবে বরণ করে নেয়, তার সৃষ্টিতে যাদের কোন অংশ নেই তাকে রিযিক দান করার ক্ষেত্রে যাদের কোন দখল নেই এবং মানুষ এ দুনিয়ায় যেসব নিয়ামত লাভে ধন্য হচ্ছে সেগুলো প্রদান করার ব্যাপারে যাদের কোন ভূমিকাই নেই। এটা এত বড় অন্যায়, যার চেয়ে বড় কোন অন্যায়ের কথা চিন্তাই করা যায় না। তারপর মানুষ একমাত্র তার স্রষ্টারই বন্দেগী ও পূজা–অর্চনা করবে, এটা মানুষের ওপর তার স্রষ্টার অধিকার। কিন্তু সে অন্যের বন্দেগী ও পূজা–অর্চনা করে তাঁর অধিকার হরণ করে। তারপর স্রষ্টা ছাড়া অন্য সত্তার বন্দেগী ও পূজা করতে গিয়ে মানুষ যে কাজই করে তাতে সে নিজের দেহ ও মন থেকে শুরু করে পৃথিবী ও আকাশের বহু জিনিস ব্যবহার করে। অথচ এ সমস্ত জিনিস এক লা–শরীক আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এবং এর মধ্যে কোন জিনিসকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগীতে ব্যবহার করার অধিকার তার নেই। তারপর মানুষ নিজেকে লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগের মধ্যে ঠেলে দেবে না, তার নিজের ওপর এ অধিকার রয়েছে। কিন্তু সে স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির বন্দেগী করে নিজেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিতও করে এবং এই সংগে শাস্তির যোগ্যও বানায়। এভাবে একজন মুশরিকের সমগ্র জীবন একটি সর্বমুখী ও সার্বক্ষণিক জুলুমে পরিণত হয়। তার কোন একটি মুহূর্তও জুলুমমুক্ত নয়।

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ
إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

কিন্তু যদি তারা তোমার প্রতি আমার সাথে এমন কাউকে শরীক করার জন্য চাপ দেয় যাকে তুমি জানো না,[২৪] তাহলে তুমি তাদের কথা কখনোই মেনে নিয়ো না। দুনিয়ায় তাদের সাথে সদাচার করতে থাকো কিন্তু মেনে চলো সে ব্যক্তির পথ যে আমার দিকে ফিরে এসেছে। তারপর তোমাদের সবাইকে ফিরে আসতে হবে আমারই দিকে।[২৫] সে সময় তোমরা কেমন কাজ করছিলে তা আমি তোমাদের জানিয়ে দেবো।[২৬]

২২. এখান থেকে প্যারার শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৪ ও ১৫ আয়াত দু'টি প্রসংগক্রমে বলা হয়েছে। আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে লুকমানের উক্তির অতিরিক্ত ব্যাখ্যা হিসেবে একথা বলেছেন।

২৩. এ শব্দগুলো থেকে ইমাম শাফে'ঈ (র), ইমাম আহমাদ (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) এ অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, শিশুর দুধ পান করার মেয়াদ ২ বছরে পূর্ণ হয়ে যায়। এ মেয়াদকালে কোন শিশু যদি কোন স্ত্রীলোকের দুধপান করে তাহলে দুধ পান করার "হুরমাত" (অর্থাৎ দুধপান করার কারণে স্ত্রীলোকটি তার মায়ের মর্যাদায় উন্নীত হয়ে যাওয়া এবং তার জন্য তার সাথে বিবাহ হারাম হয়ে যাওয়া) প্রমাণিত হয়ে যাবে। অন্যথায় পরবর্তীকালে কোন প্রকার দুধ পান করার ফলে কোন "হুরমাত" প্রতিষ্ঠিত হবে না। এ উক্তির স্বপক্ষে ইমাম মালেকেরও একটি বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করার উদ্দেশ্যে এ মেয়াদকে বাড়িয়ে আড়াই বছর করার অভিমত ব্যক্ত করেন। এই সংগে ইমাম সাহেব একথাও বলেন, যদি দু'বছর বা এর চেয়ে কম সময়ে শিশুর দুধ ছাড়িয়ে দেয়া হয় এবং খাদ্যের ব্যাপারে শিশু কেবল দুধের ওপর নির্ভরশীল না থাকে, তাহলে এরপর কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করার ফলে কোন দুধপান জনিত হুরমাত প্রমাণিত হবে না। তবে যদি শিশুর আসল খাদ্য দুধই হয়ে থাকে তাহলে অন্যান্য খাদ্য কম বেশী কিছু খেয়ে নিলেও এ সময়ের মধ্যে দুধ পানের কারণে হুরমাত প্রমাণিত হয়ে যাবে। কারণ শিশুকে অপরিহার্যভাবে দু'বছরেই দুধপান করাতে হবে, আয়াতের উদ্দেশ্য এটা নয়। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

"মায়েরা শিশুদেরকে পুরো দু'বছর দুধ পান করাবে, তার জন্য যে দুধপান করার মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়।" (২৩৩ আয়াত)

يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ
اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ
خَبِيْرٌ ۝١٦ يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ
عَلٰي مَآ اَصَابَكَ ۭ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝١٧

(আর লুকমান[২৭] বলেছিল) "হে পুত্র! কোন জিনিস যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা লুকিয়ে থাকে পাথরের মধ্যে, আকাশে বা পৃথিবীতে কোথাও, তাহলে আল্লাহ তা বের করে নিয়ে আসবেন।[২৮] তিনি সূক্ষ্মদর্শী এবং সবকিছু জানেন। হে পুত্র! নামায কায়েম করো, সৎকাজের হুকুম দাও, খারাপ কাজে নিষেধ করো এবং যা কিছু বিপদই আসুক সে জন্য সবর করো।[২৯] একথাগুলোর জন্য বড়ই তাকিদ করা হয়েছে।[৩০]

ইবনে আব্বাস (রা) এ শব্দগুলো থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এবং উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে তাঁর সাথে একমত হয়েছেন যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদ ছ'মাস। কারণ কুরআনের অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে, وَحَمْلُهٗ وَفِصَالُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا "তার পেটের মধ্যে অবস্থান করা ও দুধ ছেড়ে দেয়ার কাজ হয় ৩০ মাসে।" (আল আহকাফ, আয়াত ১৫) এটি একটি সূক্ষ্ম আইনগত বিধান এবং এর ফলে বৈধ ও অবৈধ গর্ভের অনেক বিতর্কের অবসান ঘটে।

২৪. অর্থাৎ তোমার জানা মতে যে আমার সাথে শরীক নয়।

২৫. অর্থাৎ সন্তান ও পিতা-মাতা সবাইকে।

২৬. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনকাবূত, ১১ ও ১২ টীকা।

২৭. লুকমানের অন্যান্য উপদেশমালার উল্লেখ এখানে একথা বলার জন্য করা হচ্ছে যে, আকীদা-বিশ্বাসের মতো নৈতিকতার যে শিক্ষা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশ করছেন তাও আরবে নতুন ও অজানা কথা নয়।

২৮. অর্থাৎ আল্লাহর জ্ঞান ও তাঁর পাকড়াও-এর বাইরে কেউ যেতে পারে না। পাথরের মধ্যে ছোট্ট একটি কণা তোমার দৃষ্টির অগোচরে থাকতে পারে কিন্তু তাঁর কাছে তা সুস্পষ্ট। আকাশ মণ্ডলে একটি ক্ষুদ্রতম কণিকা তোমার থেকে বহু দূরবর্তী হতে পারে কিন্তু তা আল্লাহর বহু নিকটতর। ভূমির বহু নিম্ন স্তরে পতিত কোন জিনিস তোমার কাছে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। কিন্তু তাঁর কাছে তা রয়েছে উজ্জ্বল আলোর মধ্যে। কাজেই তুমি কোথাও কোন অবস্থায়ও এমন কোন সৎ বা অসৎ কাজ করতে পারো না যা আল্লাহর অগোচরে থেকে যায়। তিনি কেবল তা জানেন তাই নয় বরং যখন হিসেব-নিকেশের

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ
مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

আর মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলো না,[৩১] পৃথিবীর বুকে চলো না উদ্ধত ভংগীতে, আল্লাহ পছন্দ করেন না আত্মম্ভরী ও অহংকারীকে।[৩২] নিজের চলনে ভারসাম্য আনো[৩৩] এবং নিজের আওয়াজ নীচু করো। সব আওয়াজের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে গাধার আওয়াজ।[৩৪]

সময় আসবে তখন তিনি তোমাদের প্রত্যেকটি কাজের ও নড়াচড়ার রেকর্ড সামনে নিয়ে আসবেন।

২৯. এর মধ্যে এদিকে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে যে, সৎকাজের হুকুম দেয়া এবং অসৎকাজে নিষেধ করার দায়িত্ব যে ব্যক্তিই পালন করবে তাকে অনিবার্যভাবে বিপদ আপদের মুখোমুখি হতে হবে। এ ধরনের লোকের পেছনে দুনিয়া কোমর বেঁধে লেগে যাবে এবং সব ধরনের কষ্টের সম্মুখীন তাকে হতেই হবে।

৩০. এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, এটি বড়ই হিম্মতের কাজ। মানবতার সংশোধন এবং তার সংকট উত্তরণে সাহায্য করার কাজ কম হিম্মতের অধিকারী লোকদের পক্ষে সম্ভব নয়। এসব কাজ করার জন্য শক্ত বুকের পাটা দরকার।

৩১. মূল শব্দগুলো হচ্ছে لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ "সা'আর" বলা হয় আরবী ভাষায় একটি রোগকে। এ রোগটি হয় উটের ঘাড়ে। এ রোগের কারণে উট তার ঘাড় সবসময় একদিকে ফিরিয়ে রাখে। এ থেকেই فلان صعر خده "অমুক ব্যক্তি উটের মতো তার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।" অর্থাৎ অহংকারপূর্ণ ব্যবহার করলো এবং মুখ ফিরিয়ে কথা বললো। এ ব্যাপারেই তাগলাব গোত্রের কবি আমর ইবনে হাই বলেন ঃ

وكنا اذا الجبار صعر خده

اقمنا له من ميله فتقوما

"আমরা এমন ছিলাম যখন কোন দাম্ভিক স্বৈরাচারী আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বললো তখন আমরা তার বক্রতার এমন দফারফা করলাম যে একেবারে সোজা হয়ে গেলো"

৩২. মূল শব্দগুলো হচ্ছে مختال ও فخور —'মুখতাল' মানে হচ্ছে, এমন ব্যক্তি যে নিজেই নিজেকে কোন বড় কিছু মনে করে। আর ফাখূর তাকে বলে, যে নিজের বড়াই করে অন্যের কাছে। মানুষের চালচলনে অহংকার, দম্ভ ও ঔদ্ধত্যের প্রকাশ তখনই

অনিবার্য হয়ে ওঠে, যখন তার মাথায় নিজের শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস ঢুকে যায় এবং সে অন্যদেরকে নিজের বড়াই ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করাতে চায়।

৩৩. কোন কোন মুফাস্‌সির এর এই অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, "দ্রুতও চলো না এবং ধীরেও চলো না বরং মাঝারি চালে চলো।" কিন্তু পরবর্তী আলোচনা থেকে পরিষ্কার জানা যায়, এখানে ধীরে বা দ্রুত চলা আলোচ্য বিষয় নয়। ধীরে বা দ্রুত চলার মধ্যে কোন নৈতিক গুণ বা দোষ নেই এবং এ জন্য কোন নিয়মও বেঁধে দেয়া যায় না। কাউকে দ্রুত কোন কাজ করতে হলে সে দ্রুত ও জোরে চলবে না কেন। আর যদি নিছক বেড়াবার জন্য চলতে থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে ধীরে চলায় ক্ষতি কি? মাঝারি চালে চলার যদি কোন মানদণ্ড থেকেই থাকে, তাহলে প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাকে একটি সাধারণ নিয়মে পরিণত করা যায় কেমন করে? আসলে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রবৃত্তির এমন অবস্থার সংশোধন যার প্রভাবে চলার মধ্যে দম্ভ অথবা দীনতার প্রকাশ ঘটে। বড়াই করার অহমিকা যদি ভেতরে থেকে যায় তাহলে অনিবার্যভাবে তা একটি বিশেষ ধরনের চাল-চলনের মাধ্যমে বের হয়ে আসে। এ অবস্থা দেখে লোকটি যে কেবল অহংকারে মত্ত হয়েছে, একথাই জানা যায় না, বরং তার চাল-চলনের রং ঢং তার অহংকারের স্বরূপটিও তুলে ধরে। ধন-দওলত, ক্ষমতা-কর্তৃত্ব, সৌন্দর্য, জ্ঞান, শক্তি এবং এ ধরনের অন্যান্য যতো জিনিসই মানুষের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করে তার প্রত্যেকটির দম্ভ তার চাল-চলনে একটি বিশেষ ভংগী ফুটিয়ে তোলে। পক্ষান্তরে চাল-চলনে দীনতার প্রকাশ ও কোন না কোন দুষণীয় মানসিক অবস্থার প্রভাবজাত হয়ে থাকে। কখনো মানুষের মনের সুপ্ত অহংকার একটি লোক দেখানো বিনয় এবং কৃত্রিম দরবেশী ও আল্লাহ প্রেমিকের রূপ লাভ করে এবং এ জিনিসটি তার চাল-চলনে সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। আবার কখনো মানুষ যথার্থই দুনিয়া ও তার অবস্থার মোকাবিলায় পরাজিত হয় এবং নিজের চোখে নিজেই হেয় হয়ে দুর্বল চালে চলতে থাকে। লুকমানের উপদেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিজের মনের এসব অবস্থার পরিবর্তন করো এবং একজন সোজা-সরল-যুক্তিসংগত ভদ্রলোকের মতো চলো, যেখানে নেই কোন অহংকার ও দম্ভ এবং কোন দুর্বলতা, লোক দেখানো বিনয় ও ত্যাগ।

এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের রুচি যে পর্যায়ের গড়ে উঠেছিল তা এ ঘটনাটি থেকেই অনুমান করা যেতে পারে। হযরত উমর (রা) একবার এক ব্যক্তিকে মাথা হেঁট করে চলতে দেখলেন। তিনি তাকে ডেকে বললেন, "মাথা উঁচু করে চলো। ইসলাম রোগী নয়।" আর একজনকে তিনি দেখলেন সে কুঁকড়ে চলছে। তিনি বললেন, "ওহে জালেম! আমাদের দীনকে মেরে ফেলছো কেন?" এ দু'টি ঘটনা থেকে জানা যায়, হযরত উমরের কাছে দীনদারির অর্থ মোটেই এটা ছিল না যে, পথ চলার সময় রোগীর মতো আচরণ করবে এবং অযথা নিজেকে দীনহীন করে মানুষের সামনে পেশ করবে। কোন মুসলমানকে এভাবে চলতে দেখে তাঁর ভয় হতো, এভাবে চললে অন্যদের সামনে ইসলামের ভুল প্রতিনিধিত্ব করা হবে এবং মুসলমানদের মধ্যেই নিস্তেজ ভাব সৃষ্টি হয়ে যাবে। এমনি ঘটনা হযরত আয়েশার (রা) ব্যাপারে একবার ঘটে। তিনি দেখলেন একজন লোক কুঁকড়ে মুকড়ে রোগীর মতো চলছে। জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? বলা হলো, ইনি একজন কারী (অর্থাৎ কুরআন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন এবং শিক্ষাদান ও ইবাদাত করার মধ্যে মশগুল থাকেন) একথা শুনে হযরত আয়েশা (রা) বললেন. "উমর ছিলেন

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتٰبٍ مُنِيرٍ ﴿٢٠﴾

৩ রুকূ'

তোমরা কি দেখো না, আল্লাহ যমীন ও আসমানের সমস্ত জিনিস তোমাদের জন্য অনুগত ও বশীভূত করে রেখেছেন[৩৫] এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও গোপন নিয়ামতসমূহ[৩৬] সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন? এরপর অবস্থা হচ্ছে এই যে, মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে,[৩৭] তাদের নেই কোন প্রকার জ্ঞান, পথনির্দেশনা বা আলোক প্রদর্শনকারী কিতাব।[৩৮]

কারীদের নেতা। কিন্তু তাঁর অবস্থা ছিল, পথে চলার সময় জোরে জোরে হাঁটতেন। যখন কথা বলতেন, জোরে জোরে বলতেন। যখন মারধর করতেন খুব জোরেশোরে মারধর করতেন।" (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, বনী ইসরাঈল, ৪৩ টীকা এবং সূরা আল ফুরকান, ৭৯ টীকা।)

৩৪. এর মানে এ নয় যে, মানুষ সবসময় আস্তে নীচু স্বরে কথা বলবে এবং কখনো জোরে কথা বলবে না। বরং গাধার আওয়াজের সাথে তুলনা করে কোন্ ধরনের ভাব-ভঙ্গিমা ও কোন্ ধরনের আওয়াজে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে তা পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে। ভংগী ও আওয়াজের এক ধরনের নিম্নগামিতা ও উচ্চগামিতা এবং কঠোরতা ও কোমলতা হয়ে থাকে স্বাভাবিক ও প্রকৃত প্রয়োজনের খাতিরে। যেমন কাছের বা কম সংখ্যক লোকের সাথে কথা বললে আস্তে ও নীচু স্বরে বলবেন। দূরের অথবা অনেক লোকের সাথে কথা বলতে হলে অব্যশই জোরে বলতে হবে। উচ্চারণভংগীর ফারাকের ব্যাপারটাও এমনি স্থান-কালের সাথে জড়িত। প্রশংসা বাক্যের উচ্চারণভংগী নিন্দা বাক্যের উচ্চারণভংগী থেকে এবং সন্তোষ প্রকাশের কথার ঢং এবং অসন্তোষ প্রকাশের কথার ঢং বিভিন্ন হওয়াই উচিত। এ ব্যাপারটা কোন অবস্থায়ই আপত্তিকর নয়। হযরত লুকমানের নসীহতের অর্থ এ নয় যে, এ পার্থক্যটা উঠিয়ে দিয়ে মানুষ সবসময় একই ধরনের নীচু স্বরে ও কোমল ভংগীমায় কথা বলবে। আসলে আপত্তিকর বিষয়টি হচ্ছে অহংকার প্রকাশ, ভীতি প্রদর্শন এবং অন্যকে অপমানিত ও সন্ত্রস্ত করার জন্য গলা ফাটিয়ে গাধার মতো বিকট স্বরে কথা বলা।

৩৫. কোন জিনিসকে কারো জন্য অনুগত করে দেয়ার অর্থ হচ্ছে ঃ এক, জিনিসটিকে তার অধীন ও ব্যবহারোপযোগী করে দেয়া হবে। তাকে যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় ও ব্যবহার করার ক্ষমতা তাকে দেয়া হবে। দুই, জিনিসটিকে কোন নিয়মের অধীন করে দেয়া হবে। ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য তা উপকারী ও লাভজনক হয়ে যাবে এবং এতে তার স্বার্থ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার আনুগত্য করো তখন তারা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে যে রীতির ওপর পেয়েছি তার আনুগত্য করবো। শয়তান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের দিকেও আহবান করতে থাকে তবুও কি তারা তারই আনুগত্য করবে?[৩৯]

উদ্ধার হবে। পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত জিনিসকে মহান আল্লাহ একই অর্থে মানুষের জন্য অনুগত করে দেননি। বরং কোন জিনিসকে প্রথম অর্থে এবং কোনটিকে দ্বিতীয় অর্থে অনুগত করে দিয়েছেন। যেমন পানি, মাটি, আগুন, উদ্ভিদ, খনিজ পদার্থ, গবাদি পশু ইত্যাদি আমাদের জন্য প্রথম অর্থে এবং চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদিকে দ্বিতীয় অর্থে আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন।

৩৬. যেসব নিয়ামত কোন না কোনভাবে মানুষ অনুভব করে এবং তার জ্ঞানে ধরা দেয় সেগুলো প্রকাশ্য নিয়ামত। আর যেসব নিয়ামত মানুষ জানে না এবং অনুভবও করে না সেগুলো গোপন নিয়ামত। মানুষের নিজের শরীরে এবং তার বাইরে দুনিয়ায় তার স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে এমন অগণিত ও অসংখ্য জিনিস রয়েছে কিন্তু মানুষ জানেও না যে, তার স্রষ্টা তার হেফাযত ও সংরক্ষণের জন্য, তাকে জীবিকা দান করার জন্য, তার বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনের জন্য এবং তার কল্যাণার্থে কত রকমের সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করে রেখেছেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মানুষ যতই গবেষণা করছে ততই তার সামনে আল্লাহর এমনসব নিয়ামতের দরোজা উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে যা পূর্বে তার সম্পূর্ণ অগোচরে ছিল। আবার আজ পর্যন্ত যেসব নিয়ামতের জ্ঞান মানুষ লাভ করতে পেরেছে সেগুলো এমনসব নিয়ামতের তুলনায় তুচ্ছ যেগুলোর ওপর থেকে এখনো গোপনীয়তার পর্দা ওঠেনি।

৩৭. অর্থাৎ ঝগড়া ও বিতর্ক রে এমন ধরনের বিষয়াদি নিয়ে যেমন, আল্লাহ আছে কিনা? আল্লাহ কি একা, না আরো আল্লাহ আছেন? তাঁর গুণাবলী কি এবং তিনি কেমন? নিজের সৃষ্টিকুলের সাথে তাঁর সম্পর্ক কোন্ পর্যায়ের? ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩৮. অর্থাৎ তাদের কাছে জ্ঞানের এমন কোন মাধ্যম নেই যার সাহায্যে তারা সরাসরি সত্যকে দেখতে বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার সন্ধান পেতে পারে অথবা এমন কোন পথপ্রদর্শকের পথনির্দেশনাও তাদের কাছে নেই যিনি নিজে সত্যকে দেখে তাদেরকে সে সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। কিংবা আল্লাহর এমন কোন কিতাব তাদের কাছে নেই যার ওপর তারা এ বিশ্বাসের ভিত্তি রাখতে পারে।

৩৯. অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির, পরিবারের ও ব্যক্তির বাপ-দাদারা অবশ্যই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, এমন কোন কথা নেই। পদ্ধতিটির বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসাই তার সত্য হবার প্রমাণ নয়। বাপ-দাদা যদি পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে, তাহলেও চোখ বন্ধ করে

وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقٰى ۭ وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ۭ
اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٣﴾
نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٢٤﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে[৪০] এবং কার্যত সে সৎকর্মশীল,[৪১] সে তো বাস্তবিকই শক্ত করে আঁকড়ে ধরে একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয়।[৪২] আর যাবতীয় বিষয়ের শেষ ফায়সালা রয়েছে আল্লাহরই হাতে। এরপর যে কুফরী করে তার কুফরী যেন তোমাকে বিষণ্ন না করে।[৪৩] তাদেরকে ফিরে তো আসতে হবে আমারই দিকে। তখন আমি তাদেরকে জানিয়ে দেবো তারা কিসব কাজ করে এসেছে। অবশ্যই আল্লাহ অন্তরের গোপন কথাও জানেন। আমি স্বল্পকাল তাদেরকে দুনিয়ায় ভোগ করার সুযোগ দিচ্ছি, তারপর তাদেরকে টেনে নিয়ে যাবো একটি কঠিন শাস্তির দিকে।

তাদেরই পথে পাড়ি জমানো হবে এবং কখনো এ পথটি কোন্ দিকে গিয়েছে এ ব্যাপারে কোন প্রকার অনুসন্ধান করার প্রয়োজনই অনুভব করা হবে না, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো এমন অজ্ঞতার কাজ করতে পারে না।

৪০. অর্থাৎ নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহর বন্দেগীতে নিয়োজিত করে। নিজের কোন জিনিসকে আল্লাহর বন্দেগীর বাইরে রাখে না। নিজের সমস্ত বিষয় আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দেয় এবং তাঁর প্রদত্ত পথনির্দেশকে নিজের সারা জীবনের আইনে পরিণত করে।

৪১. অর্থাৎ মুখে নিজেকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করার ঘোষণা দেয়া হবে কিন্তু কার্যত আল্লাহর অনুগত বান্দার নীতি অবলম্বন করা হবে না, এমনটি যেন না হয়।

৪২. অর্থাৎ সে এ ভয়ও করবে না যে, সে ভুল পথনির্দেশ পাবে এবং আল্লাহর বন্দেগী করলে তার পরিণাম ধ্বংস হবে, এ আশংকাও করবে না।

৪৩. সম্বোধন করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। অর্থ হচ্ছে, হে নবী! যে ব্যক্তি তোমার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করে, সে তো নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে একথা মনে করে যে, ইসলামকে প্রত্যাখ্যান এবং কুফরীকে মেনে নিয়েও তার ওপর জোর দিয়ে সে তোমাকে অপমানিত করেছে কিন্তু আসলে সে নিজেই নিজেকে অপমানিত করেছে। সে তোমার কোন ক্ষতি করেনি বরং নিজেই নিজের ক্ষতি করেছে। কাজেই সে যদি তোমার কথা না মানে তাহলে তার পরোয়া করার প্রয়োজন নেই।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ
لِلّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ
هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ
يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ۚ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ
بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾

যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী কে সৃষ্টি করেছেন, তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে আল্লাহ। বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।[৪৪] কিন্তু তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশ লোক জানে না।[৪৫] আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই।[৪৬] নিসন্দেহে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও নিজে নিজেই প্রশংসিত।[৪৭] পৃথিবীতে যত গাছ আছে তা সবই যদি কলম হয়ে যায় এবং সমুদ্র (দোয়াত হয়ে যায়), তাকে আরো সাতটি সমুদ্র কালি সরবরাহ করে তবুও আল্লাহর কথা (লেখা) শেষ হবে না।[৪৮] অবশ্যই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানী। তোমাদের সমগ্র মানবজাতিকে সৃষ্টি করা এবং তারপর পুনর্বার তাদেরকে জীবিত করা (তাঁর জন্য) নিছক একটিমাত্র প্রাণী (সৃষ্টি করা এবং তাকে পুনরুজ্জীবিত) করার মতই ব্যাপার। আসলে আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন।[৪৯]

৪৪. অর্থাৎ তোমরা যে এতটুকু কথা জানো ও স্বীকার করো এ জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। কিন্তু এটাই যখন প্রকৃত সত্য তখন প্রশংসা সমস্তই একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হওয়া উচিত। বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টিতে যখন অন্য কোন সত্তার কোন অংশ নেই তখন সে প্রশংসার হকদার হতে পারে কেমন করে?

৪৫. অর্থাৎ অধিকাংশ লোক জানে না যে, যদি আল্লাহকে বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা বলে না মেনে নেয়া হয় তাহলে এর অনিবার্য ফল ও দাবী কি হয় এবং কোন্ কথাগুলো এর বিরুদ্ধে চলে যায়। যখন এক ব্যক্তি একথা মেনে নেয় যে, একমাত্র আল্লাহই পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা তখন অনিবার্যভাবে তাকে একথাও মেনে নিতে হবে যে, ইলাহ ও রবও একমাত্র আল্লাহই। ইবাদাত ও আনুগত্যের হকদারও একমাত্র তিনিই। একমাত্র তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করতে এবং তাঁরই প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করতে হবে। তিনি ছাড়া আর কারো কাছে প্রার্থনা করা যেতে পারে না। নিজের সৃষ্টির জন্য আইন প্রণেতা ও শাসক তিনি

ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। একজন হবেন স্রষ্টা অন্যজন হবেন মাবুদ, এটা সম্পূর্ণ বুদ্ধি বিরোধী ও বিপরীতমুখী কথা। মূর্খতার মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে আছে একমাত্র এমন ব্যক্তিই একথা বলতে পারে। তেমনিভাবে একজনকে স্রষ্টা বলে মেনে নেয়া এবং তারপর অন্য বিভিন্ন সত্তার মধ্য থেকে একজনকে প্রয়োজন পূর্ণকারী ও সংকট নিরসনকারী, অন্যজনের সামনে ষষ্ঠাংগ প্রণিপাত হওয়া এবং তৃতীয় একজনকে ক্ষমতাসীন শাসকের স্বীকৃতি দেয়া ও তার আনুগত্য করা—এসব পরস্পর বিরোধী কথা। কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এসব কথা মেনে নিতে পারে না।

৪৬. অর্থাৎ কেবল এতটুকুই সত্য নয় যে, পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর স্রষ্টা আল্লাহ বরং পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে যেসব জিনিস পাওয়া যায় তিনিই এসবের মালিক। আল্লাহ তাঁর এ বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করে একে এমনিই ছেড়ে দেননি যে, যে কেউ চাইলেই এর বা এর কোন অংশের মালিক হয়ে বসবে। নিজের সৃষ্টির তিনি নিজেই মালিক। এ বিশ্ব-জাহানে যা কিছু আছে সবই তাঁর মালিকানাধীন। এখানে তাঁর ছাড়া আর কারো সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হবার ইখতিয়ার নেই।

৪৭. এর ব্যাখ্যা এসে গেছে ১৯ টীকায়।

৪৮. 'আল্লাহর কথা' মানে তাঁর সৃষ্টিকর্ম এবং তাঁর শক্তি ও জ্ঞানের নিদর্শন। এ বিষয়বস্তুটি সূরা আল কাহ্‌ফের ১০৯ আয়াতে এর থেকে আরো একটু ভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টে এক ব্যক্তি ধারণা করবে, বোধ হয় এ বক্তব্যে বাড়াবাড়ি বা অতিকথন আছে। কিন্তু সামান্য চিন্তা করলে এক ব্যক্তি অনুভব করবে, এর মধ্যে তিল পরিমাণও অতিকথা নেই। এ পৃথিবীর গাছগুলো কেটে যতগুলো কলম তৈরি করা যেতে পারে এবং পৃথিবীর বর্তমান সাগরের পানির সাথে আরো তেমনি সাতটি সাগরের পানিকে কালিতে পরিণত করলে তা দিয়ে আল্লাহর শক্তি, জ্ঞান ও সৃষ্টির কথা লিখে শেষ করা তো দূরের কথা হয়তো পৃথিবীতে যেসব জিনিস আছে সেগুলোর তালিকা তৈরি করাই সম্ভবপর হবে না। শুধুমাত্র এ পৃথিবীতেই যেসব জিনিসের অস্তিত্ব রয়েছে সেগুলোই গণনা করা কঠিন, তার ওপর আবার এই অথৈ মহাবিশ্বের সৃষ্টির বিবরণ লেখার তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

এ বর্ণনা থেকে আসলে এ ধরনের একটি ধারণা দেয়াই উদ্দেশ্য যে, এত বড় বিশ্ব-জাহানকে যে আল্লাহ অস্তিত্ব দান করেছেন এবং আদি থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত এর যাবতীয় আইন-শৃংখলা ব্যবস্থা পরিচালনা করে চলেছেন তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে তোমরা যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্তাকে উপাস্যে পরিণত করে বসেছো তাদের গুরুত্ব ও মর্যাদাই বা কি! এই বিরাট-বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করা তো দূরের কথা এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান এবং নিছক জ্ঞানটুকু পর্যন্ত লাভ করার ক্ষমতা কোন সৃষ্টির নেই। তাহলে কেমন করে এ ধারণা করা যেতে পারে যে, সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে কেউ এখানে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ক্ষমতার কোন অংশও লাভ করতে পারে, যার ভিত্তিতে সে ভাগ্য ভাঙা গড়ার ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসে?

৪৯. অর্থাৎ তিনি একই সময় সমগ্র বিশ্ব-জাহানের আওয়াজ আলাদা আলাদাভাবে শুনছেন এবং কোন আওয়াজ তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয়কে এমনভাবে দখল করে বসে না যার ফলে

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ ۙ
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾

তুমি কি দেখো না, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আসেন এবং দিনকে রাতের মধ্যে? তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মের অধীন করে রেখেছেন,[৫০] সবই চলছে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।[৫১] আর (তুমি কি জানো না) তোমরা যা কিছুই কর না কেন আল্লাহ তা জানেন। এ সবকিছু এ কারণে যে, আল্লাহই হচ্ছেন সত্য[৫২] এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য যেসব জিনিসকে এরা ডাকে তা সবই মিথ্যা,[৫৩] আর (এ কারণে যে,) আল্লাহই সমুচ্চ ও শ্রেষ্ঠ।[৫৪]

একটি শুনতে গিয়ে অন্যগুলো শুনতে না পারেন। অনুরূপভাবে তিনি একই সময় সমগ্র বিশ্ব-জাহানকে তার প্রত্যেকটি জিনিস ও ঘটনা সহকারে বিস্তারিত আকারেও দেখছেন এবং কোন জিনিস দেখার ব্যাপারে তাঁর দর্শনেন্দ্রিয় এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ে না যে, একটিকে দেখতে গিয়ে তিনি অন্যগুলো দেখতে অপারগ হয়ে পড়েন। মানবকুলের সৃষ্টি এবং তাদের পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারটিও ঠিক এই একই পর্যায়ের। সৃষ্টির প্রারম্ভকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যতগুলো মানুষ জন্ম নিয়েছে এবং আগামীতে কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম নেবে তাদের সবাইকে তিনি আবার মাত্র এক মুহূর্তেই সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা একটি মানুষের সৃষ্টিতে এমনভাবে লিপ্ত হয়ে পড়ে না যে, সে একই সময়ে তিনি অন্য মানুষদের সৃষ্টি করতে অপারগ হয়ে পড়েন। একজন মানুষ সৃষ্টি করা বা কোটি কোটি মানুষ সৃষ্টি করা দু'টোই তাঁর জন্য সমান।

৫০. অর্থাৎ রাত ও দিনের যথারীতি নিয়মিত আসাই একথা প্রকাশ করে যে, সূর্য ও চন্দ্র একটি নিয়মের নিগড়ে বাঁধা। সূর্য ও চন্দ্রের উল্লেখ এখানে নিছক এ জন্য করা হয়েছে যে, এ দু'টি মহাশূন্যের সবচেয়ে দৃশ্যমান জিনিস এবং মানুষ অতি প্রাচীনকাল থেকে এদেরকে উপাস্যে পরিণত করে আসছে এবং আজো বহুলোক এদেরকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। অন্যথায় প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ পৃথিবীসহ বিশ্ব-জাহানের সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রকে একটি অনড় নিয়ম-শৃংখলা ও আইনের নিগড়ে বেঁধে রেখেছেন। এ থেকে এক চুল পরিমাণ এদিক ওদিক করার ক্ষমতা তাদের নেই।

৫১. প্রত্যেকটি জিনিসের যে বয়স তথা সময়-কাল নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে সেই সময় পর্যন্ত তা চলছে। চন্দ্র, সূর্য বা বিশ্ব-জাহানের অন্য কোন গ্রহ-নক্ষত্র কোনটাই চিরন্তন ও চিরস্থায়ী নয়। প্রত্যেকের একটি সূচনাকাল আছে। তার পূর্বে তার অস্তিত্ব ছিল

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ ۚ إِنَّ
فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا
اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۖ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ ۚ
وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾

৪ রুকূ'

তুমি কি দেখো না সমুদ্রে নৌযান চলে আল্লাহর অনুগ্রহে, যাতে তিনি তোমাদের দেখাতে পারেন তাঁর কিছু নিদর্শন।[৫৫] আসলে এর মধ্যে রয়েছে বহু নিদর্শন প্রত্যেক সবর ও শোকরকারীর জন্য।[৫৬] আর যখন (সমুদ্রে) একটি তরংগ তাদেরকে ছেয়ে ফেলে ছাউনির মতো তখন তারা আল্লাহকে ডাকে নিজেদের আনুগত্যকে একদম তাঁরই জন্য একান্ত করে নিয়ে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলদেশে পৌঁছিয়ে দেন তখন তাদের কেউ কেউ মাঝপথ বেছে নেয়,[৫৭] আর প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ ছাড়া আর কেউ আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে না।[৫৮]

না। আবার প্রত্যেকের আছে একটি সমাপ্তিকাল। তারপর আর তার অস্তিত্ব থাকবে না। এ আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, এ ধরনের ধ্বংসশীল ও ক্ষমতাহীন বস্তু ও সত্তাগুলো উপাস্য হতে পারে কেমন করে?

৫২. অর্থাৎ প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতাধর কর্তা, সৃষ্টি ও পরিচালনা ব্যবস্থাপনার আসল ও একচ্ছত্র মালিক।

৫৩. অর্থাৎ তারা সবাই নিছক তোমাদের কাল্পনিক খোদা। তোমরা কল্পনার জগতে বসে ধারণা করে নিয়েছো যে, অমুকজন আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার অংশীদার এবং অমুক মহাত্মা সংকট নিরসন ও অভাব মোচন করার ক্ষমতা রাখেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের কেউ কোন কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না।

৫৪. অর্থাৎ প্রত্যেকটি জিনিসের উর্ধে এবং সবার শ্রেষ্ঠ। তাঁর সামনে সব জিনিসই নিচু। প্রত্যেকের চেয়ে তিনি বড় এবং সবাই তাঁর সামনে ছোট।

৫৫. অর্থাৎ এমন নিদর্শনাবলী দেখাতে চান যা থেকে জানা যায় একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহই সমস্ত ক্ষমতার মালিক। মানুষ যতই বিপুল ক্ষমতাসম্পন্ন ও সমুদ্র যাত্রার উপযোগী জাহাজ নির্মাণ করুক এবং জাহাজ পরিচালনা বিদ্যা ও তার সাথে সম্পর্কিত তথ্য জ্ঞান-অভিজ্ঞতায় যতই পারদর্শী হোক না কেন সমুদ্রে তাকে যেসব ভয়ংকর শক্তির সম্মুখীন হতে হয় আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া সেগুলোর মোকাবিলায় সে একা নিজের দক্ষতা

ও কৌশলের ভিত্তিতে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে সফর করতে পারে না। তাঁর অনুগ্রহদৃষ্টি সরে যাবার সাথে সাথেই মানুষ জানতে পারে তার উপায়-উপকরণ ও কারিগরী পারদর্শিতা কতটা অর্থহীন ও অকেজো। অনুরূপভাবে নিরাপদ ও নিশ্চিত অবস্থায় মানুষ যতই কট্টর নাস্তিক ও মুশরিক হোক না কেন সমুদ্রে তুফানে যখন তার নৌযান ডুবে যেতে থাকে তখন নাস্তিকও জানতে পারে আল্লাহ আছেন এবং মুশরিকও জেনে ফেলে আল্লাহ মাত্র একজনই।

৫৬. অর্থাৎ যাদের মধ্যে এ দু'টি গুণ পাওয়া যায় তারা যখন এ নিদর্শনগুলোর মাধ্যমে সত্যকে চিনতে পারে তখন তারা চিরকালের জন্য তাওহীদের শিক্ষা গ্রহণ করে তাকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে। প্রথম গুণটি হচ্ছে, তাদের বড়ই সবরকারী (صبار) তথা অত্যন্ত ধৈর্যশীল হতে হবে। তারা অস্থিরমতি হবে না বরং তাদের পদক্ষেপে দৃঢ়তা থাকবে। সহনীয় ও অসহনীয়, কঠিন ও কোমল এবং ভালো ও মন্দ সকল অবস্থায় তারা একটি সৎ ও সুস্থ বিশ্বাসের ওপর অটল থাকবে। তাদের মধ্যে এ ধরনের কোন দুর্বলতা থাকবে না যে, দুঃসময়ের মুখোমুখি হলে আল্লাহর সামনে নতজানু হয়ে কান্নাকাটি করতে থাকবে আর সুসময় আসার সাথে সাথেই সবকিছু ভুলে যাবে। অথবা এর বিপরীত ভালো অবস্থায় আল্লাহকে মেনে চলতে থাকবে এবং বিপদের একটি আঘাতেই আল্লাহকে গালি দিতে শুরু করবে। দ্বিতীয় গুণটি হচ্ছে তাদেরকে বড়ই শোকরকারী (شكور) তথা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হতে হবে। তারা নিমকহারাম ও বিশ্বাসঘাতক হবে না, উপকারীর উপকার ভুলে যাবে না। বরং অনুগ্রহের কদর করবে এবং অনুগ্রহকারীর জন্য একটি স্বতন্ত্র কৃতজ্ঞতার অনুভূতি হর-হামেশা নিজের মনের মধ্যে জাগ্রত রাখবে।

৫৭. এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। মাঝপথকে যদি সরল ও সঠিক পথের অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, তাদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই হয় যারা তুফানে ঘেরাও হবার পর যে তাওহীদের স্বীকৃতি দিয়েছিল সে সময় অতিক্রান্ত হবার পরও তার ওপর অবিচল থাকে এবং এ শিক্ষাটি তাদেরকে চিরকালের জন্য সত্য ও সঠিক পথযাত্রীতে পরিণত করে। আর যদি মাঝপথের অর্থ করা হয় মধ্যমপন্থা ও তারসাম্য, তাহলে এর একটি অর্থ হবে, তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক এ অভিজ্ঞতা লাভের আগের সময়ের মতো নিজেদের শিরক ও নাস্তিক্যবাদী চিন্তা-বিশ্বাসে আর তেমন একনিষ্ঠ ও শক্তভাবে টিকে থাকে না। এর দ্বিতীয় অর্থ হবে, সে সময় অতিক্রান্ত হবার পর তাদের মধ্য থেকে কিছু লোকের মধ্যে আন্তরিকতার যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তা স্তিমিত হয়ে পড়ে। আল্লাহ এখানে এ দ্ব্যর্থক বাক্যাংশটি এ তিনটি অবস্থার প্রতি ইংগিত করার জন্যই ব্যবহার করেছেন, এটারই সম্ভাবনা বেশী। তবে উদ্দেশ্য সম্ভবত একথা বলা যে, সামুদ্রিক ঝড়ের সময় সবার টনক নড়ে যায় এবং বুদ্ধি ঠিকমত কাজ করে। তখন তারা শিরক ও নাস্তিক্যবাদ পরিহার করে সবাই এক আল্লাহকে ডাকতে থাকে সাহায্যের জন্য। কিন্তু নিরাপদে উপকূলে পৌঁছে যাবার পর স্বল্পসংখ্যক লোকই এ অভিজ্ঞতা থেকে কোন স্থায়ী শিক্ষা লাভ করে। আবার এ স্বল্প সংখ্যক লোকেরাও তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল, যারা চিরকালের জন্য শুধরে যায়। দ্বিতীয় দলের কৃফরীর মধ্যে কিছুটা সমতা আসে। তৃতীয় দলটি এমন পর্যায়ের যাদের মধ্যে উক্ত সাময়িক ও জরুরী সময়কালীন আন্তরিকতার কিছু না কিছু বাকি থাকে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْا۟ يَوْمًا لَّا يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿٣٣﴾

হে মানুষেরা! তোমাদের রবের ক্রোধ থেকে সতর্ক হও এবং সেদিনের ভয় করো যেদিন কোন পিতা নিজের পুত্রের পক্ষ থেকে প্রতিদান দেবে না এবং কোন পুত্রই নিজের পিতার পক্ষ থেকে কোন প্রতিদান দেবে না।[৫৯] প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।[৬০] কাজেই এ দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদের প্রতারিত না করে[৬১] এবং প্রতারক যেন তোমাকে আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারিত করতে সক্ষম না হয়।[৬২]

৫৮. এর আগের আয়াতে যে দু'টি গুণের বর্ণনা এসেছে তার মোকাবিলায় এখানে এ দু'টি দোষের উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বাসঘাতক এমন এক ব্যক্তি যে মারাত্মক রকমের বেঈমানী করে এবং নিজের প্রতিশ্রুতি ও অংগীকার পালন করে না। আর অকৃতজ্ঞ হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যার প্রতি যতই অনুগ্রহ করা হোক না কেন সে তা কখনোই স্বীকার করে না এবং নিজের অনুগ্রহকারীর প্রতি আগ্রাসী আচরণ করে। এসব দোষ যাদের মধ্যে পাওয়া যায় তারা বিপদ উত্তীর্ণ হবার পর নিসংকোচে নিজেদের কুফরী, নাস্তিকতা ও শিরকের দিকে ফিরে যায়। ঝড়-তুফানের সময় তারা আল্লাহর অস্তিত্বের এবং একক আল্লাহর অস্তিত্বের কিছু চিহ্ন ও নিদর্শন বাইরে ও নিজেদের মনের মধ্যেও পেয়েছিল এবং এ সত্যের স্বতস্ফূর্ত অনুভূতিই তাদেরকে আল্লাহর শরণাপন্ন হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল একথা তারা মানতে চায় না। তাদের মধ্যে যারা নাস্তিক তারা তাদের এ কাজের যে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে তা হচ্ছে এই যে, এ তো ছিল একটা দুর্বলতা। কঠিন বিপদের সময় অস্বাভাবিক অবস্থায় আমরা এ দুর্বলতার শিকার হয়েছিলাম। নয়তো আসলে আল্লাহ বলতে কিছুই নেই। ঝড়-তুফানের মুখ থেকে কোন আল্লাহ আমাদের বাঁচায়নি। অমুক অমুক কারণে ও উপায়ে আমরা বেঁচে গেছি। আর মুশরিকরা তো সাধারণভাবেই বলে থাকে, অমুক অমুক সাধুবাবা অথবা দেবী ও দেবতার ছায়া আমাদের মাথার ওপর ছিল। তাঁদের কল্যাণেই আমরা এ যাত্রায় রক্ষা পেয়েছি। কাজেই তীরে পৌঁছেই তারা নিজেদের মিথ্যা উপাস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে এবং তাদের দরজায় গিয়ে শিন্নী চড়াতে থাকে। তাদের মনে এ চিন্তার উদয়ই হয় না যে, যখন সবদিকের সব আশা-ভরসা-সহায় ছিন্ন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল তখন একমাত্র এক লা-শরীক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ছিল না এবং তাঁরই শরণাপন্ন তারা হয়েছিল।

৫৯. অর্থাৎ বন্ধু, নেতা, পীর এবং এ পর্যায়ের অন্যান্য লোকেরা তবুতো দূর সম্পর্কের। দুনিয়ায় সবচেয়ে নিকট সম্পর্ক হচ্ছে সন্তান ও পিতামাতার মধ্যে। কিন্তু সেখানে অবস্থা হবে যদি পুত্র পাকড়াও হয়, তাহলে পিতা এগিয়ে গিয়ে একথা বলবে না যে, তার গোনাহের জন্য আমাকে পাকড়াও করো। অন্যদিকে পিতার দুর্ভোগ শুরু হয়ে গেলে পুত্রের

একথা বলার হিম্মত হবে না যে, তাঁর বদলে আমাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দাও। এ অবস্থায় নিকট সম্পর্কহীন তিন ব্যক্তিরা সেখানে পরস্পরের কোন কাজে লাগবে এ আশা করার কি অবকাশই বা থাকে ! কাজেই যে ব্যক্তি দুনিয়ায় পরের জন্য নিজের পরকাল ঝরঝরে করে অথবা অন্যের ওপর ভরসা করে নিজে ভ্রষ্টতা ও পাপের পথ অবলম্বন করে সে একটা গণ্ডমূর্খ। এ প্রসংগে ১৫ আয়াতের বিষয়বস্তুও সামনে রাখা উচিত। সেখানে সন্তানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, দুনিয়াবী জীবনের বিভিন্ন কাজে-কারবারে অবশ্যই পিতা-মাতার সেবা করতে ও তাদের কথা মেনে চলতে হবে কিন্তু ধর্ম ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার কথায় গোমরাহীর পথ অবলম্বন কোনমতেই ঠিক নয়।

৬০. আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বলতে কিয়ামতের প্রতিশ্রুতির কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ একদিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। তখন আল্লাহর আদালত প্রতিষ্ঠিত হবেই। সেখানে প্রত্যেককে তার নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

৬১. দুনিয়ার জীবন স্থূলদর্শী লোকদেরকে নানা রকমের ভুল ধারণায় নিমজ্জিত করে। কেউ মনে করে, বাঁচা-মরা যা কিছু শুধুমাত্র এ দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এরপর আর দ্বিতীয় কোন জীবন নেই। কাজেই যা কিছু করার এখানেই করে নাও। কেউ অর্থ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও প্রাচুর্যের নেশায় মত্ত হয়ে নিজের মৃত্যুর কথা ভুলে যায় এবং এ ভুল ধারণা পোষণ করতে থাকে যে, তার এ আরাম-আয়েশ ও কর্তৃত্ব চিরস্থায়ী, এর ক্ষয় নেই। কেউ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে কেবলমাত্র বৈষয়িক লাভ ও স্বাদ-আহলাদকে একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করে নেয় এবং "জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন" ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যকে কোন গুরুত্বই দেয় না। এর ফলে তার মনুষ্যত্বের মান যত নিচে নেমে যেতে থাক না কেন তার কোন পরোয়াই সে করে না। কেউ মনে করে বৈষয়িক সমৃদ্ধিই ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-মিথ্যার আসল মানদণ্ড। এ সমৃদ্ধি যে পথেই অর্জিত হবে তাই সত্য এবং তার বিপরীত সবকিছুই মিথ্যা। কেউ এ সমৃদ্ধিকেই আল্লাহর দরবারে অনুগৃহীত হবার আলামত মনে করে। এর ফলে সে সাধারণভাবে মনে করতে থাকে, যদি দেখা যায় যে কোন উপায়েই হোক না কেন একজন লোক বিপুল সম্পদের অধিকারী হতে চলেছে, তাহলে সে আল্লাহর প্রিয়পাত্র এবং যার বৈষয়িক অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, তা হক পথে থাকা ও সৎনীতি অবলম্বন করার কারণেই হোক না কেন তার পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেছে। এ ধারণা এবং এ ধরনের যত প্রকার ভুল ধারণা আছে সবগুলোকেই মহান আল্লাহ এ আয়াতে "দুনিয়ার জীবনের প্রতারণা" বলে উল্লেখ করেছেন।

৬২. الغرور (প্রতারক) শয়তানও হতে পারে আবার কোন মানুষ বা একদল মানুষও হতে পারে, মানুষের নিজের মন ও প্রবৃত্তিও হতে পারে এবং অন্য কোন জিনিসও হতে পারে। কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ বস্তু নির্ধারণ না করে এ বহুমুখী অর্থের অধিকারী শব্দটিকে তার সাধারণ ও সার্বজনীন অর্থে ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন লোকের কাছে প্রতারিত হবার মূল কারণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি বিশেষ করে যে উপায়েই এমন প্রতারণার শিকার হয়েছে যা সঠিক দিক থেকে ভুল দিকে তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। তা-ই তার জন্য "আল গারূর" তথা প্রতারক।

"আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারিত করা" শব্দগুলোও অনেক ব্যাপক অর্থের অধিকারী। বিভিন্ন ধরনের প্রতারণা এর অন্তরভুক্ত হয়। কাউকে তার "প্রতারক" এ নিশ্চয়তা দেয় যে,

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

একমাত্র আল্লাহই সেই সময়ের জ্ঞান রাখেন। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনিই জানেন মাতৃগর্ভে কি লালিত হচ্ছে। কোন প্রাণসত্তা জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কোন ব্যক্তির জানা নেই তার মৃত্যু হবে কোন্ যমীনে। আল্লাহই সকল জ্ঞানের অধিকারী এবং তিনি সবকিছু জানেন।[৬৩]

আল্লাহ আদতেই নেই। কাউকে বুঝায়, আল্লাহ এ দুনিয়া সৃষ্টি করে হাত-পা গুটিয়ে বসে গেছেন এবং এখন এ দুনিয়া তিনি বান্দাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। কাউকে এ ভুল ধারণা দেয় যে, আল্লাহর এমন কিছু প্রিয়পাত্র আছে, যাদের নৈকট্য অর্জন করে নিলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। তুমি নিশ্চিতভাবেই ক্ষমার অধিকারী হবে। কাউকে এভাবে প্রতারণা করে যে, আল্লাহ তো ক্ষমাশীল ও করুণাময়। তোমরা পাপ করতে থাকো, তিনি ক্ষমা করে যেতে থাকবেন। কাউকে বুঝায়, মানুষ তো নিছক একটা অক্ষম জীব ছাড়া আর কিছুই নয়। তার মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করে দেয় এই বলে যে, তোমাদের তো হাত-পা বাঁধা, যা কিছু খারাপ কাজ তোমরা করো সব আল্লাহই করান। ভালো কাজ থেকে তোমরা দূরে সরে যাও, কারণ আল্লাহ তা করার তাওফীক তোমাদের দেন না। নাজানি আল্লাহর ব্যাপারে এমনিতর কত বিচিত্র প্রতারণার শিকার মানুষ প্রতিদিন হচ্ছে। যদি বিশ্লেষণ করে দেখা হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি গোমরাহী, গোনাহ ও অপরাধের মূল কারণ হিসেবে দেখা যাবে, মানুষ আল্লাহর ব্যাপারে কোন না কোন প্রতারণার শিকার হয়েছে এবং তার ফলেই তার বিশ্বাসে দেখা দিয়েছে বিভ্রান্তি অথবা সে নৈতিক চরিত্রহীনতার শিকার হয়েছে।

৬৩. এটি আসলে একটি প্রশ্নের জবাব। কিয়ামতের কথা ও আখেরাতের প্রতিশ্রুতি শুনে মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বারবার এ প্রশ্নটি করতো। প্রশ্নটি ছিল, সে সময়টি কবে আসবে? কুরআন মজীদে কোথাও তাদের এ প্রশ্নটি উদ্ধৃত করে জবাব দেয়া হয়েছে আবার কোথাও উদ্ধৃত না করেই জবাব দেয়া হয়েছে। কারণ শ্রোতাদের মনে এ প্রশ্ন জাগরুক ছিল। এ আয়াতটিতেও প্রশ্নের উল্লেখ ছাড়াই জবাব দেয়া হয়েছে।

"একমাত্র আল্লাহই সে সময়ের জ্ঞান রাখেন" এ প্রথম বাক্যটিই মূল প্রশ্নের জবাব। তার পরের চারটি বাক্য এ জবাবের স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে পেশ করা হয়েছে। যুক্তির সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে, যেসব বিষয়ের প্রতি মানুষ নিকটতম আকর্ষণ অনুভব করে সেগুলো সম্পর্কেও তার কোন জ্ঞান নেই। তাহলে সারা দুনিয়ার শেষ ক্ষণটি কবে ও কখন আসবে, একথা জানা তার পক্ষে কেমন করে সম্ভব? তোমাদের সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা

বিরাটভাবে নির্ভর করে বৃষ্টির ওপর। কিন্তু আল্লাহর হাতে রয়েছে এর পুরো যোগসূত্র। যেখানে যখন যতটুকু চান বর্ষণ করান এবং যখনি চান থামিয়ে দেন। কেউ একটুও জানে না কোথায় কখন কতটুকু বৃষ্টি হবে এবং কোন্ ভূখণ্ড তা থেকে বঞ্চিত হবে অথবা কোন্ ভূখণ্ডে বৃষ্টি উল্টো ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে। তোমাদের বীর্যে তোমাদের স্ত্রীদের গর্ভসঞ্চার হয় এবং এর সাথে তোমাদের বংশধারার ভবিষ্যত জড়িত। কিন্তু তোমরা জানো না এ গর্ভে কি লালিত হচ্ছে এবং কোন্ আকৃতিতে ও কোন্ ধরনের কল্যাণ বা অকল্যাণ নিয়ে তা বের হয়ে আসবে। আগামীকাল তোমাদের কি হবে তা-ও তোমরা জানো না।

একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা তোমাদের ভাগ্য বদলে দিতে পারে। কিন্তু এক মিনিট আগেও তোমরা তার খবর পাও না। তোমরা এও জানো না, তোমাদের এ জীবনের সমাপ্তি ঘটবে কোথায় কি অবস্থায়। এ সমস্ত তথ্যজ্ঞান আল্লাহ নিজেরই কাছে রেখেছেন এবং এর কোন একটির জ্ঞানও তোমাদের দেননি। এর মধ্যে প্রত্যেকটি জিনিসই এমন যে সম্পর্কে তোমরা পূর্বাহ্নেই কিছু জানতে চাও যাতে এ জ্ঞানের সাহায্যে তোমরা আগেভাগেই কিছু পদক্ষেপ নিতে পারো। কিন্তু সেসব ব্যাপারে আল্লাহর নিজস্ব ব্যবস্থাপনা এবং তাঁর ফায়সালার ওপর ভরসা করো। এভাবে দুনিয়ার শেষক্ষণটির ব্যাপারেও আল্লাহর ফায়সালার প্রতি আস্থা স্থাপন করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এর জ্ঞানও কাউকে দেয়া হয়নি এবং দেয়া যেতে পারে না।

এখানে আর একটি কথাও ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার। সেটি হচ্ছে, যেসব বিষয় আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না তেমনি ধরনের গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়াবলীর কোন তালিকা এখানে দেয়া হয়নি। এখানে তো কেবলমাত্র হাতের কাছের কিছু জিনিস উদাহরণ স্বরূপ পেশ করা হয়েছে। যেগুলোর প্রতি মানুষের গভীরতম ও নিকটতম আকর্ষণ ও আগ্রহ রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। এ থেকে এ সিদ্ধান্ত টানা ঠিক হবে না যে, মাত্র এ পাঁচটি বিষয়ই গায়েবের অন্তরভুক্ত, যে সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কিছুই জানে না। অথচ গায়েব এমন জিনিসকে বলা হয় যা সৃষ্টির অগোচরে এবং একমাত্র আল্লাহর দৃষ্টি সমক্ষে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এ গায়েবের কোন সীমা পরিসীমা নেই। (এ বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নাহ্‌ল, ৮৩ টীকা)

আস্ সাজদাহ

৩২

নামকরণ

১৫ আয়াতে সাজদাহর যে বিষয়বস্তু এসেছে তাকেই এ সূরার শিরোনাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হবার সময়-কাল

বর্ণনাভংগী থেকে বুঝা যায়, এর নাযিল হবার সময়টা হচ্ছে মক্কার মধ্যযুগ এবং তারও একেবারে শুরুর দিকে। কারণ পরবর্তী যুগে নাযিলকৃত সূরাগুলোর পশ্চাতভূমিতে যেমন জুলুম-নিপীড়নের প্রচণ্ডতা দেখা যায় এ সূরাটির পটভূমিতে সে ধরনের প্রচণ্ডতা অনুপস্থিত।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে, তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত সম্পর্কে লোকদের সন্দেহ দূর করা এবং এ তিনটি সত্যের প্রতি ঈমান আনার জন্য তাদেরকে আহবান জানানো। মক্কার কাফেরদের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা চলছিল যে, এ ব্যক্তি অদ্ভুত সব কথা বানিয়ে বানিয়ে শুনাচ্ছে। কখনো মরার পরের খবরও দেয় এবং বলে মরে পঁচে মাটিতে মিশে যাবার পর তোমাদের আবার উঠানো হবে। সবার হিসেব-নিকেশ হবে এবং দোজখ হবে ও বেহেশ্‌ত হবে। কখনো বলে, এসব দেব-দেবী, ঠাকুর-টাকুর এসব কিছুই নয়। একমাত্র এক ও একক আল্লাহই উপাস্য। কখনো বলে, আমি আল্লাহর রসূল। আকাশ থেকে আমার কাছে অহী আসে। যে বাণী আমি তোমাদের শুনাচ্ছি এসব আমার বাণী নয় বরং আল্লাহর বাণী। এ ব্যক্তি আমাদের এ অদ্ভুত কাহিনী শুনাচ্ছে। এসব কথার জবাব দেয়াই হচ্ছে এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়।

এর জবাবে কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, নিসন্দেহে এগুলো আল্লাহর কালাম ও বাণী। নবুওয়াতের কল্যাণ বঞ্চিত গাফলতির নিদ্রায় বিভোর একটি জাতিকে জাগিয়ে দেবার জন্য এ কালাম নাযিল করা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এর অবতীর্ণ হবার বিষয়টি যখনি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন তখন তোমরা একে মিথ্যা বলতে পারো কেমন করে?

তারপর তাদেরকে বলা হয়েছে, এ কুরআন তোমাদের সামনে যেসব সত্য পেশ করে, বুদ্ধি-বিবেক ব্যবহার করে নিজেরাই চিন্তা করে বলো এর মধ্যে কোন্‌টা তোমাদের মতে অদ্ভুত? আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা দেখো, নিজেদের জন্ম ও গঠনাকৃতি সম্পর্কে চিন্তা

করো—এ সবকিছু কি এ কুরআনে এ নবীর মাধ্যমে তোমাদের যেসব শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তার সত্যতার প্রমাণ নয়? বিশ্ব-জাহানের এ ব্যবস্থা তাওহীদের সত্যতা প্রমাণ করে, না শিরকের? এ সমগ্র ব্যবস্থা দেখে এবং তোমাদের নিজেদের জন্মের ব্যাপারটি দৃষ্টি সমক্ষে রেখে তোমাদের বুদ্ধি-বিবেক কি একথাই বলে যে, যিনি বর্তমানে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি পুনর্বার তোমাদের সৃষ্টি করতে পারবেন না?

এরপর পরলোকের একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ঈমানের পুরস্কার ও কুফরের পরিণাম বর্ণনা করে লোকদেরকে অশুভ পরিণামের মুখোমুখি হবার আগে ত্যাগ ও কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। তাদেরকে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, এভাবে তাদের নিজেদের পরিণাম শুভ ও সুন্দর হবে।

তারপর তাদেরকে বলা হয়েছে, আল্লাহ মানুষের ভুলের দরুন তাকে আকস্মিকভাবে চূড়ান্ত ও শেষ শাস্তি দেবার জন্য পাকড়াও করেন না, এটা তাঁর মহা অনুগ্রহ। বরং এর পূর্বে তাকে ছোটখাটো কষ্ট, বিপদ-আপদ ও ক্ষতির সম্মুখীন করেন। তাকে হাল্কা হাল্কা ও কম কষ্টকর আঘাত করতে থাকেন। এভাবে তাকে সতর্ক করতে থাকেন, যাতে তার চোখ খুলে যায়। মানুষ যদি এসব প্রাথমিক আঘাতে সতর্ক হয়ে যায় তাহলে তা হবে তার নিজের জন্য ভালো।

এরপর বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ব্যক্তির কাছে কিতাব এসেছে, দুনিয়ায় এটা কোন প্রথম ও নতুন ঘটনা নয়। এর আগে মূসার (আলাইহিস সালামের) কাছেও তো কিতাব এসেছিল। একথা তোমরা সবাই জানো। এটা এমন কী কথা যে, তা শুনেই তোমরা এভাবে কানখাড়া করছো। বিশ্বাস করো এ কিতাব আল্লাহরই পক্ষ থেকে এসেছে এবং মূসার (আ) যুগে যা কিছু হয়েছিল এখন আবার সেসব কিছুই হবে, একথা নিশ্চিত জেনো। আল্লাহর এ কিতাবকে যারা মেনে নেবে এখন নেতৃত্ব তারাই লাভ করবে। একে যারা প্রত্যাখ্যান করবে তাদের জন্য নিশ্চিত ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নেই।

তারপর মক্কার কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, নিজেদের বাণিজ্যিক সফরকালে তোমরা অতীতের যেসব জাতির ধ্বংস প্রাপ্ত জনপদ অতিক্রম করে থাকো তাদের পরিণাম দেখো। নিজেদের জন্য তোমরা কি এ পরিণাম পছন্দ করো? বাইরের অবস্থা দেখে প্রতারিত হয়ো না। আজ তোমরা দেখছো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা কতিপয় ছেলে-ছোকরা, গোলাম ও গরীব মানুষ ছাড়া আর কেউ শুনছে না এবং চারদিক তাঁর বিরুদ্ধে কেবল বিদ্রূপ, তিরস্কার ও নিন্দাবাদ ধ্বনিত হচ্ছে। এ থেকে তোমরা ধারণা করে নিয়েছো, এ বক্তব্য-বিষয় টেকসই হবে না, কিছু দিন চলবে তারপর খতম হয়ে যাবে। কিন্তু এটা কেবল তোমাদের দৃষ্টিভ্রম। তোমরা দিনরাত দেখছো আজ একটি জমি নিষ্ফল পড়ে আছে, সেখানে পানি ও লতাপাতার চিহ্নমাত্রও নেই। জমিটি দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে, এর গর্ভে সবুজ ও শ্যামলিমার বিশাল ভাণ্ডার লুকিয়ে আছে। হঠাৎ পরদিন বৃষ্টিপাত হতেই ঐ মরা মাটির বুকে দেখা দেয় অভাবিত পূর্ব জীবন প্রবাহ এবং সর্বত্র সবুজের বিচিত্র সমারোহ।

উপসংহারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, এরা তোমার কথা শুনে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে এবং জিজ্ঞেস করছে, জনাব! আপনার সেই চূড়ান্ত

বিজয় কবে অর্জিত হবে? তার সন-তারিখটা একটু বলেন না। ওদেরকে বলো, যখন আমাদের ও তোমাদের ফায়সালার সময় আসবে তখন তা মেনে নেয়ায় তোমাদের কোন উপকার হবে না। মানতে হয় এখন মানো। আর যদি শেষ ফায়সালার অপেক্ষা করতে চাও তাহলে বসে বসে তা করতে থাকো।

আয়াত ৩০ **সূরা আস্ সাজদাহ–মক্কী** রুকূ' ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

الٓمّٓ ۝١ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٢ اَمْ يَقُوْلُوْنَ
افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ
قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝٣

আলিফ লাম মীম। এ কিতাবটি রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই।[১]

এরা[২] কি বলে, এ ব্যক্তি নিজেই এটি তৈরি করে নিয়েছেন?[৩] না, বরং এটি সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে,[৪] যাতে তুমি সতর্ক করতে পারো এমন একটি জাতিকে যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি, হয়তো তারা সৎপথে চলবে।[৫]

১. কুরআন মজীদের অনেকগুলো সূরা এ ধরনের কোন না কোন পরিচিতিমূলক বক্তব্য দিয়ে শুরু হয়েছে। এ বাণী কোথায় থেকে আসছে সূরার শুরুতেই তা জানিয়ে দেয়াই হয় এর উদ্দেশ্য। রেডিও ঘোষক প্রোগ্রাম শুরু করার সূচনাতেই যেমন ঘোষণা করে দেন, আমি অমুক স্টেশন থেকে বলছি, এটা বাহ্যত তেমনি ধরনের একটা ভূমিকাসূচক বক্তব্য। কিন্তু রেডিওর এমনি ধরনের একটা মামুলি ঘোষণার বিপরীতে কুরআন মজীদের কোন সূরার সূচনা যখন এ ধরনের একটা অসাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হয়, যাতে বলা হয়, এ বাণী আসছে বিশ্ব–জাহানের শাসনকর্তার পক্ষ থেকে তখন এটা শুধুমাত্র বাণীর উৎস বর্ণনা করাই হয় না বরং এই সংগে এর মধ্যে শামিল হয়ে যায় একটা বিরাট বড় দাবী, একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ এবং একটা কঠোর ভীতি প্রদর্শনও। কারণ কথা শুরু করেই সে ঝট্ করে এত বড় একটা খবর দিয়ে দিচ্ছে যে, এটা মানুষের কথা নয় বরং বিশ্ব–জাহানের মালিক ও প্রভুর কথা। সংগে সংগেই এ ঘোষণা মানুষের সামনে এ দাবী স্বীকার করা না করার প্রশ্ন উত্থাপন করে। স্বীকার করলে চিরকালের জন্য তার সামনে আনুগত্যের শির নত করে দিতে হবে, তারপর তার মোকাবিলায় মানুষের আর কোন স্বাধীনতা থাকতে পারে না। আর স্বীকার না করলে নিশ্চিতভাবেই তাকে একটা ভয়াবহ আশংকার মুখোমুখি হতে হবে। অর্থাৎ যদি সত্যিই

এটা বিশ্ব-জাহানের প্রভুর বাণী হয়ে থাকে তাহলে একে প্রত্যাখ্যান করার ফল স্বরূপ তাকে চিরন্তন দুর্ভাগ্যের শিকার হতে হবে। এ জন্য এ ভূমিকাসূচক বাক্যটির শুধুমাত্র নিজের এই প্রকৃতিগত অসাধারণত্বেরই কারণে মানুষকে কান লাগিয়ে চূড়ান্ত মনোনিবেশ সহকারে এ বাণী শোনার এবং একে আল্লাহর বাণী হিসেবে স্বীকার করার বা না করার ফায়সালা করতে বাধ্য করে।

এ কিতাব রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে, শুধুমাত্র এতটুকু কথা বলেই এখানে শেষ করা হয়নি। বরং এর পরেও পূর্ণ জোরেশোরে বলা হয়েছে لَا رَيْبَ فِيهِ অর্থাৎ এটা আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর কাছ থেকে এর অবতীর্ণ হবার ব্যাপারে আদৌ কোন সন্দেহের অবকাশই নেই। এ তাকিদসূচক বাক্যাংশটিকে যদি কুরআন নাযিলের ঘটনামূলক পটভূমি এবং খোদ কুরআনের নিজের পূর্বাপর বক্তব্যের আলোকে দেখা হয় তাহলে পরিষ্কার অনুভব করা যাবে যে, তার মধ্যে দাবীর সাথে যুক্তি-প্রমাণও নিহিত রয়েছে এবং এ যুক্তি-প্রমাণ মক্কা মু'আয্যমার যেসব অধিবাসীর সামনে এ দাবী পেশ করা হচ্ছিল তাদের কাছে গোপন ছিল না। এ কিতাব উপস্থাপন কারীর সমগ্র জীবন তাদের সামনে ছিল। কিতাব উপস্থাপন করার আগেরও এবং পরেরও। তারা জানতো, যিনি এ দাবী সহকারে এ কিতাব পেশ করছেন তিনি আমাদের জাতির সবচেয়ে সত্যবাদী, দায়িত্বশীল ও সৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। তারা এও জানতো যে, নবুওয়াত দাবী করার একদিন আগে পর্যন্তও কেউ তাঁর মুখ থেকে কখনো সেসব কথা শোনেনি যেগুলো নবুওয়াত দাবী করার পরপরই তিনি সহসাই বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তারা এ কিতাবের ভাষা ও বর্ণনাভংগী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষা ও বর্ণনাভংগীর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখতে পেতো। তারা পরিষ্কারভাবে একথাও জানতো যে, একই ব্যক্তি কখনো এত বেশী সুস্পষ্ট পার্থক্য সহকারে দু'টি ভিন্ন স্টাইলের অধিকারী হতে পারে না। তারা এ কিতাবের একান্ত অসাধারণ সাহিত্য অলংকারও দেখছিল এবং আরবী ভাষাভাষী হিসেবে তারা নিজেরাই জানতো যে, তাদের সকল কবি ও সাহিত্যিক এর নজির পেশ করতে অক্ষম হয়েছে। তাদের জাতির কবি, গণক ও বাগ্মীদের বাণী এবং এ বাণীর মধ্যে কত বড় ফারাক রয়েছে এবং এ বাণীর মধ্যে যে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে তা কত উন্নতমানের তাও তাদের অজানা ছিল না। তারা এ কিতাব এবং এর উপস্থাপকের দাওয়াতের মধ্যে কোথাও দূরবর্তী এমন কোন স্বার্থপরতার সামান্যতম চিহ্নও দেখতে পেতো না যা থেকে কোন মিথ্যা দাবীদারের কথা ও কাজ কখনো মুক্ত হতে পারে না। নবুওয়াতের দাবী করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের, নিজের পরিবার অথবা নিজের গোত্র ও জাতির জন্য কি অর্জন করতে চাচ্ছিলেন এবং এ কাজের মধ্যে তাঁর নিজের কোন্ স্বার্থটি নিহিত রয়েছে তা তারা অণুবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়েও চিহ্নিত করতে পারতো না। তারপর এ দাওয়াতের দিকে তাঁর জাতির কেমন ধরনের লোকেরা আকৃষ্ট হয়ে চলছে এবং তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তাদের জীবনে কতবড় বিপ্লব সাধিত হচ্ছে তাও তারা দেখছিল। এ সমস্ত বিষয় মিলে মিশে দাবীর স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাই এ পটভূমিতে একথা বলা একদম যথেষ্ট ছিল যে, এ কিতাবের রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত হওয়াটা সকল প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধে। এর পাশে আরো কোন যুক্তি বসিয়ে যুক্তির বহর বৃদ্ধি করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

২. ওপরের ভূমিকামূলক বাক্যের পর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত সম্পর্কে মক্কার মুশরিকরা যে প্রথম আপত্তিটি করতো সেটির পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

৩. এটি নিছক প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা নয়। বরং এখানে মহাবিস্ময় প্রকাশের ভংগী অবলম্বন করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, যে সমস্ত বিষয়ের কারণে এ কিতাবের আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারটি যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়মুক্ত হয় সেসব সত্ত্বেও কি এরা প্রকাশ্যে এমন হঠকারিতার কথা বলে যাচ্ছে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই এটি রচনা করে মিথ্যামিথ্যি একে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের রচনা বলে চালিয়ে দিয়েছেন? এমন একটি বাজে ও ভিত্তিহীন দোষারোপ করতে তারা একটুও লজ্জিত হচ্ছে না? যারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর কথা ও কাজ সম্পর্কে জানে আর এ কিতাবটিও অনুধাবন করে তারা এ বাজে ও ভিত্তিহীন দোষারোপের কথা শুনে কি অভিমত পোষণ করবে সে সম্পর্কে কোন অনুভূতি কি তাদের নেই?

৪. যেভাবে প্রথম আয়াতে لَا رَيْبَ فِيْهِ বলা যথেষ্ট মনে করা হয়েছিল এবং কুরআনুল করীমের আল্লাহর কালাম হবার স্বপক্ষে এর চেয়ে বড় কোন যুক্তি পেশ করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। অনুরূপভাবে মক্কার কাফেরদের মিথ্যা অপবাদের জবাবে কেবলমাত্র এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করা হচ্ছে যে, "এটি সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে।" ওপরে এক নম্বর টীকায় আমরা যে কারণ বর্ণনা করেছি এর কারণও তাই। কে, কোন্ ধরনের পরিবেশে, কিভাবে এ কিতাব পেশ করছিলেন সেসব বিষয় শ্রোতাদের সামনে ছিল এবং এ কিতাবও তার নিজস্ব ভাষাশৈলী, সাহিত্য সম্পদ ও বিষয়বস্তু সহকারে সবার সামনে ছিল। এই সংগে এর প্রভাব ও ফলাফলও মক্কার সমকালীন সমাজে সবাই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছিল। এ অবস্থায় এ কিতাবের রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে আগত সত্য হওয়াটা এমন সুস্পষ্ট বাস্তব ঘটনা ছিল যাকে শুধুমাত্র চূড়ান্তভাবে বর্ণনা করে দেয়াই কাফেরদের দোষারোপ খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট ছিল। এ জন্য কোন যুক্তি প্রদান করার প্রচেষ্টা চালানো প্রতিপাদ্য বিষয়কে মজবুত করার পরিবর্তে তাকে আরো দুর্বল করে দেবার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্যাপারটি ঠিক যেমন নাকি দিনের বেলা সূর্য কিরণ দিতে থাকে এবং কোন বেহায়া বেলাজ ব্যক্তি নির্দ্বিধায় বলে দেয় এখন তো অন্ধকার রাত। এর জবাবে কেবলমাত্র এতটুকু বলাই যথেষ্ট হয় যে, তুমি একে রাত বলছো? এখন তো সামনে রয়েছে আলো ঝলমল দিন। এরপর দিনের উপস্থিতির স্বপক্ষে যদি যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয়, তাহলে এর ফলে নিজের জবাবের শক্তিবৃদ্ধি করা হবে না বরং তার শক্তি কিছুটা কমই করে দেয়া হবে।

৫. অর্থাৎ যেমন এর সত্য হওয়া ও আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়াটা নিশ্চিত ও সন্দেহাতীত বিষয় ঠিক তেমনি এর পেছনে সদুদ্দেশ্য থাকা এবং তোমাদের জন্য এর আল্লাহর রহমত হওয়াটাও সুস্পষ্ট। তোমরা নিজেরাই জানো শত শত বছর থেকে তোমাদের মধ্যে কোন নবী আসেনি। তোমরা নিজেরাই জানো তোমাদের সমগ্র জাতিটাই মূর্খতা, অজ্ঞতা, নৈতিক অধপতন ও মারাত্মক ধরনের পশ্চাদপদতায় ভুগছে। এ মূর্খতার মধ্যে যদি তোমাদেরকে জাগ্রত করার ও সঠিক পথ দেখাবার জন্য তোমাদের মধ্যে একজন নবী পাঠানো হয়ে থাকে, তাহলে এতে তোমরা অবাক হচ্ছো কেন? এটা তো

একটি মস্ত বড় প্রয়োজন এবং তোমাদের কল্যাণার্থে আল্লাহ এ প্রয়োজন পূর্ণ করে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, আরবে সত্য দীনের আলো সর্বপ্রথম পৌঁছেছিল হযরত হূদ ও হযরত সালেহ আলাইহিমাস সালামের মাধ্যমে। এটা ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঘটনা। তারপর আসেন হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের যুগের আড়াই হাজার বছর আগে অতিক্রান্ত হয়েছিল তাঁদের যুগ। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে আরবের যমীনে যে সর্বশেষ নবী পাঠানো হয় তিনি ছিলেন হযরত শো'আইব আলাইহিস সালাম। তার আগমনের পরও প্রায় দু'হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল। এ সময়টা এত দীর্ঘ ছিল যে, এ প্রেক্ষিতে এ জাতির মধ্যে কোন সতর্ককারী আসেনি একথা বলা একেবারেই যথার্থ ছিল। এ উক্তির অর্থ এ নয় যে, এ জাতির মধ্যে কখনো কোন সতর্ককারী আসেনি। বরং এর অর্থ হচ্ছে, সুদীর্ঘকাল থেকে এ জাতি একজন সতর্ককারীর প্রত্যাশী ছিল।

এখানে আর একটা প্রশ্ন সামনে এসে যায়। সেটাও পরিষ্কার করে দেয়া দরকার। এ আয়াতটি পড়তে গিয়ে মানুষের মনে সংশয় জাগে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে শত শত বছর পর্যন্ত আরবে যখন কোন নবী আসেননি তখন সে জাহেলী যুগে যেসব লোক অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে কিসের ভিত্তিতে? সৎপথ কোন্‌টা এবং অসৎপথ তথা পথভ্রষ্টতা কোন্‌টা তা কি তারা জানতো? তারপর যদি তারা পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে তাহলে তাদের এ পথভ্রষ্টতার জন্য তাদেরকে দায়ী করা যেতে পারে কেমন করে? এর জবাব হচ্ছে, সেকালের লোকদের দীনের বিস্তারিত জ্ঞান না থাকলেও আসল দীন যে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ এবং নবীগণ কখনো মূর্তিপূজা শিখাননি, একথা সেকালেও লোকদের অজানা ছিল না। আরবের লোকেরা তাদের দেশে আবির্ভূত নবীদের যেসব বাণী ও ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েছিল তার মধ্যেও এ সত্য সংরক্ষিত ছিল। নিকটতম দেশগুলোয় আগত নবীগণ যথা হযরত মূসা, হযরত দাউদ, হযরত সুলাইমান ও হযরত ঈসা আলাইহিমুস সালামের শিক্ষার মাধ্যমেও তারা এ সত্যের সন্ধান পেয়েছিল। আরবী প্রবাদসমূহের মাধ্যমে একথা ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও সর্বজন পরিচিত ছিল যে, প্রাচীন যুগে আরববাসীদের আসল ধর্ম ছিল ইবরাহীমের ধর্ম এবং মূর্তিপূজা সে দেশে শুরু করেছিল আমর ইবনে লুহাই নামক এক ব্যক্তি! শিরক ও মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন সত্ত্বেও আরবের বিভিন্ন অংশে স্থানে স্থানে এমন সব লোক ছিল যারা শিরক অস্বীকার করতো, তাওহীদের ঘোষণা দিতো এবং মূর্তির বেদীমূলে বলিদান করার প্রকাশ্যে নিন্দা করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলের একেবারেই কাছাকাছি সময়ে কুস্‌সা ইবনে সায়েদাতিল ইয়াদী, উমাইয়াহ ইবনে আবিস সাল্‌ত, সুওয়াইদ ইবনে আমরিল মুস্‌তালেকী, ওকী ইবনে সালামাহ ইবনে যুহাইরিল ইয়াদী, আমর ইবনে জুন্‌দুবিল জুহানী, আবু কায়েস সারমাহ ইবনে আবী আনাস, যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল, ওয়ারাকাহ ইবনে নওফাল, উসমান ইবনুল হুওয়াইরিস, উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশ, আমের ইবনুয্ যরবিল আদওয়ানী, আল্লাফ ইবনে শিহাবিত তামিমী, আলমুতালামমিস ইবনে উমাইয়াহ আলকিনানী, যুহাইর ইবনে আবী সুলমা, খালেদ ইবনে সিনান ইবনে গাইসিল আবসী, আবদুল্লাহ আলকুদাঈ এবং এ ধরনের আরো বহু লোকের

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا شَفِیْعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝

আল্লাহই[৬] আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের মাঝখানে যা কিছু আছে সব সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে এবং এরপর আরশে সমাসীন হয়েছেন।[৭] তিনি ছাড়া তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই এবং নেই তাঁর সামনে সুপারিশকারী, তারপরও কি তোমরা সচেতন হবে না?[৮]

অবস্থা আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি। ইতিহাসে এঁদেরকে 'হুনাফা' তথা সঠিক সত্যপন্থী নামে স্মরণ করা হয়। এঁরা সবাই প্রকাশ্যে তাওহীদকে আসল দীন বলে ঘোষণা করতেন এবং মুশরিকদের ধর্মের সাথে নিজেদের সম্পর্কহীনতার কথা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করতেন। একথা সুস্পষ্ট, পূর্ববর্তী নবীগণের যেসব শিক্ষা সমাজে তখনো প্রচলিত ছিল তার প্রভাব থেকেই তাদের মনে এ চিন্তার জন্ম হয়েছিল। তাছাড়া ইয়ামনে খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের যে শিলালিপি আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে জানা যায়, সেকালে সেখানে একটি তাওহীদী ধর্মের অস্তিত্ব ছিল। তার অনুসারীদের আকাশ ও পৃথিবীর করুণাময় রবকেই একক ইলাহ ও উপাস্য স্বীকার করতো। ৩৭৮ খৃষ্টাব্দের একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে একটি প্রাচীন উপাসনালয়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে। তাতে লিখিত আছে, এ উপাসনালয়টি "যূ-সামাওয়া"র "ইলাহ" অর্থাৎ আকাশের ইলাহি অথবা আকাশের রবের ইবাদাত করার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। ৪৬৫ খৃষ্টাব্দের একটি শিলালিপিতে লিখিত হয়েছে ঃ

بنصر وردا الهن بعل سمين وارضين (بنصرو بعون الا له رب السماء ولارض)

এ কথাগুলো সুস্পষ্টভাবে তাওহীদ বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করছে। একটি কবরগাত্রে সে যুগের আর একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। তাতে লেখা আছে ঃ

بخيل رحمنن (يعنى استعين بحول الرحمن)

অনুরূপভাবে দক্ষিণ আরবে ফোরাত নদী ও কিন্নাসিরীনের মাঝখানে যাবাদ নামক স্থানে ৫১২ খৃষ্টাব্দের একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। তাতে লিখিত আছে ঃ

بسم الا له ، لا عز الا له ، لا شكر الا له

এ সমস্ত কথাই প্রকাশ করছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতলাভের পূর্বে পূর্ববর্তী নবীগণের শিক্ষার প্রভাব আরব ভূখণ্ড থেকে একেবারে

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ۝٥ ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ ۝٦

তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করেন এবং এ পরিচালনার বৃত্তান্ত ওপরে তাঁর কাছে যায় এমন একদিনে যার পরিমাপ তোমাদের গণনায় এক হাজার বছর।[৯] তিনিই প্রত্যেকটি অদৃশ্য ও দৃশ্যমানকে জানেন,[১০] মহাপরাক্রমশালী[১১] ও করুণাময়[১২] তিনি।

নির্মূল হয়ে যায়নি। কমপক্ষে "তোমাদের আল্লাহ এক ও একক" একথাটুকু স্মরণ করিয়ে দেবার মতো বহু উপায় ও উপকরণ বিদ্যমান ছিল। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল ফুরকান, ৮৪ টীকা)

৬. এবার মুশরিকদের দ্বিতীয় আপত্তির জবাব দেয়া হচ্ছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদের দাওয়াতের ব্যাপারে তারা এ আপত্তিটি করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দেবতা ও মনীষীদের উপাস্য হওয়ার কথা অস্বীকার করেন এবং জোরেশোরে এ দাওয়াত দেন যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ, কর্ম সম্পাদনকারী, প্রয়োজন পূর্ণকারী, প্রার্থনা শ্রবণকারী, দুর্দশা নিরসনকারী ও স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন শাসক নেই, এ ব্যাপারে তারা কঠোর আপত্তি জানাতো।

৭. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আ'রাফ, ৫৪ আয়াত; ইউনুস, ৩ আয়াত এবং আর রা'য়াদ ২ আয়াত।

৮. অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টাইতো আসল খোদা। তোমাদের চিন্তা-ভাবনা কতই উদ্ভট, বিশ্ব-জাহানের এ বিশাল সাম্রাজ্যে তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে কর্ম-সম্পাদনকারী মনে করে বসেছো। এ সমগ্র বিশ্ব-জাহান এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে মহান আল্লাহই এসবের স্রষ্টা। তাঁর সত্তা ছাড়া বাকি এখানে যা কিছু আছে সবই সৃষ্টি। মহান আল্লাহ এ দুনিয়া সৃষ্টি করার পর কোথাও গিয়ে ঘুমিয়েও পড়েননি। বরং তিনিই নিজের এ রাজ্যের সিংহাসনে আসীন এবং শাসনকর্তা হয়েছেন। অথচ তোমাদের বুদ্ধি এতই ভ্রষ্ট হয়ে গেছে যে, তোমরা সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে কয়েকটি সত্তাকে নিজেদের ভাগ্যের মালিক গণ্য করে বসেছো। যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করতে না পারেন তাহলে তাদের মধ্য থেকে কার তোমাদের সাহায্য করার ক্ষমতা আছে? যদি আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন, তাহলে তাদের মধ্য থেকে কে তোমাদেরকে তাঁর হাত থেকে ছাড়িয়ে নেবার শক্তি রাখে? যদি আল্লাহ সুপারিশ না শোনেন, তাহলে তাদের মধ্য থেকে কে তাঁর কাছ থেকে এ সুপারিশ গ্রহণ করিয়ে নেবার ক্ষমতা রাখে?

৯. অর্থাৎ তোমাদের কাছে যেটা এক হাজার বছরের ইতিহাস আল্লাহর কাছে যেন সেটা মাত্র একদিনের কাজ। আল্লাহর ইচ্ছা পূরণকারীদের হাতে আজ এর পরিকল্পনা পেশ করা হয় এবং কালই তারা এ বিবরণ তাঁর কাছে পেশ করে যাতে তাদেরকে আবার পরদিনের (অর্থাৎ তোমাদের হিসেবে এক হাজার বছর) কাজ দেয়া হয় এ প্রসংগটি কুরআনের আরো দু' জায়গায় এসেছে। সেগুলোও সামনে রাখলে এর অর্থ ভালোভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে। আরবের কাফেররা বলতো ঃ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুওয়াতের দাবী নিয়ে সামনে এসেছেন আজ কয়েক বছর হয়ে গেলো। তিনি বারবার আমাদের বলছেন, যদি আমার এ দাওয়াত তোমরা গ্রহণ না করো এবং আমাকে প্রত্যাখ্যান করো তাহলে তোমাদের ওপর আল্লাহর আযাব নেমে আসবে। কয়েক বছর থেকে তিনি নিজের এ দাবীর পুনরাবৃত্তি করে চলছেন কিন্তু আজো আযাব আসেনি। অথচ আমরা একবার নয় হাজার বার তাঁকে পরিষ্কারভাবে প্রত্যাখ্যান করেছি। তাঁর এ হুমকি যদি যথার্থই সত্য হতো তাহলে এতদিন কবে না জানি আমাদের ওপর আযাব এসে যেতো। এর জবাবে আল্লাহ সূরা হাজ্জে বলেন ঃ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ؕ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ

"এরা শীঘ্রই আযাব চাচ্ছে। আল্লাহ কখনো ওয়াদার বরখেলাফ করবেন না। কিন্তু তোমার রবের কাছে এক দিন তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান হয়ে থাকে।" (৪৭ আয়াত)

অন্য এক জায়গায় একথার জবাব এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ

سَاَلَ سَآئِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۙ لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ۙ مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ؕ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ۝ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ۙ وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًا ۙ

"প্রশ্নকারী প্রশ্ন করছে সেই আযাব সম্পর্কে, যা কাফেরদের ওপর আপতিত হবে, যার প্রতিরোধকারী কেউ নেই, সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি সমুচ্চ স্তরসম্পন্ন (অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে কাজ করেন)। ফেরেশ্‌তা ও রূহ তাঁর দিকে উঠতে থাকে এমন একদিনে যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। কাজেই হে নবী! সুন্দর সবর অবলম্বন করুন। এরা তাকে দূরবর্তী মনে করে এবং আমি তাকে দেখছি নিকটে।

(আল মা'আরিজ, ১–৭ আয়াত)

এসব উক্তি থেকে যে কথা বুঝানো হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, মানুষের ইতিহাসে আল্লাহর ফায়সালা দুনিয়ার সময় ও পঞ্জিকা অনুসারে হয় না কোন জাতিকে যদি বলা হয়, অমুক নীতি অবলম্বন করলে তোমাদের এ ধরনের পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে,

الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۝٧ ثُمَّ
جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝٨ ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ
رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝٩

যে জিনিসই তিনি সৃষ্টি করেছেন উত্তমরূপেই সৃষ্টি করেছেন।[১৩] তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি থেকে, তারপর তার বংশ উৎপাদন করেছেন এমন সূত্র থেকে যা তুচ্ছ পানির মতো।[১৪] তারপর তাকে সর্বাংগ সুন্দর করেছেন[১৫] এবং তার মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দিয়েছেন,[১৬] আর তোমাদের কান, চোখ ও হৃদয় দিয়েছেন,[১৭] তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।[১৮]

তাহলে যে জাতি একথার এ অর্থ গ্রহণ করবে যে, আজই সে নীতি অবলম্বন করলে কালই তার অশুভ পরিণাম সামনে এসে যাবে, সে হবে বড়ই নির্বোধ। পরিণামফল প্রকাশের জন্য দিন, মাস, বছর তো কোন্ ছার শতাব্দীও তেমন কোন দীর্ঘ কাল নয়।

১০. অন্য যেই হোক না কেন তার কাছে একটি জিনিস প্রকাশিত থাকলে অন্য অসংখ্য জিনিস রয়েছে অপ্রকাশিত। ফেরেশতা, জিন, নবী, ওলী অথবা আল্লাহর নির্বাচিত পছন্দনীয় বান্দাগণ যেই হোন না কেন তাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যিনি সবকিছু জানেন। একমাত্র আল্লাহ এ গুণের অধিকারী, তাঁর কাছে সবকিছুই দিনের আলোকের মতই উজ্জ্বল। যা কিছু হয়ে গেছে, যা কিছু বর্তমান, যা কিছু হবে সবই তার কাছে সমান আলোকোজ্জ্বল।

১১. অর্থাৎ প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর প্রাধান্যের অধিকারী। বিশ্ব-জাহানে এমন কোন শক্তি নেই যা তাঁর ইচ্ছার পথে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে এবং তাঁর আদেশ বাস্তবায়নে বাধা দিতে পারে। প্রত্যেকটি জিনিস তাঁর অধীন এবং তাঁর মোকাবিলা করার ক্ষমতা কারো নেই।

১২. অর্থাৎ এ প্রাধান্য, পরাক্রম ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি সত্ত্বেও তিনি জালেম নন। বরং নিজের সৃষ্টির প্রতি দয়ার্দ্র ও করুণাময়।

১৩. এ মহাবিশ্বে তিনি অসংখ্য ও অগণিত জিনিস সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এর মধ্যে কোন একটি জিনিসও অসুন্দর, সৌষ্ঠবহীন ও বেখাপ্পা নয়। প্রত্যেকটি জিনিসের নিজস্ব একটি আলাদা সৌন্দর্য আছে। প্রত্যেকটি জিনিস তার নিজের জায়গায় সুসামঞ্জস্য ও উপযোগী। যে কাজের জন্য যে জিনিসই তিনি তৈরি করেছেন সবচেয়ে উপযোগী আকৃতিতে সর্বাধিক কার্যকর গুণাবলী সহকারে তৈরি করেছেন। দেখার জন্য চোখ ও শোনার জন্য কানের যে আকৃতি তিনি দিয়েছেন এর চেয়ে ভালো ও উপযোগী কোন আকৃতির কল্পনাও এ জন্য করা যেতে পারে না। হাওয়া ও পানি যেসব উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছে তাদের জন্য হাওয়া ঠিক তেমনি যেমন হওয়া উচিত এবং পানি ঠিক তেমনি

গুণাবলী সম্পন্ন যেমন তার হওয়া উচিত। আল্লাহর তৈরি করা কোন জিনিসের নক্‌শার মধ্যে কোন রকমের খুঁত বা ত্রুটি চিহ্নিত করা সম্ভবই নয় এবং তার মধ্যে কোন প্রকার সংস্কার সাধনের প্রস্তাব দেয়াও অসম্ভব।

১৪. অর্থাৎ প্রথমে তিনি নিজের প্রত্যক্ষ সৃষ্টিকর্মের (Direct Creation) মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টি করেন এবং তারপর সেই মানুষের মধ্যেই বংশ বিস্তারের এমন শক্তি সৃষ্টি করে দেন যার ফলে তার শুক্র থেকে তারই মতো মানুষের জন্ম হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে ভূমির সারবস্তু একত্র করে একটি সৃষ্টি-নির্দেশের মাধ্যমে তার মধ্যে এমন জীবন, চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তি সৃষ্টি করে দেন যার সাহায্যে মানুষের মতো একটি আশ্চর্য সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করে, এটি ছিল একটি কর্মকুশলতা। আবার দ্বিতীয় কর্মকুশলতা হচ্ছে, আগামীতে আরো মানুষ তৈরি করার জন্য এমন একটি অদ্ভুত যন্ত্র মানুষের নিজের কাঠামোতেই রেখে দেন যার গঠন প্রকৃতি ও কার্যধারা দেখে মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায়।

কুরআন মজীদের যেসব আয়াত থেকে প্রথম মানুষের প্রত্যক্ষ সৃষ্টির কথা সুস্পষ্ট হয় এটি তার অন্যতম। ডারউইনের যুগ থেকে বিজ্ঞানীগণ এ চিন্তাধারার ব্যাপারে নাসিকা কুঞ্চন করে আসছেন এবং একটি অবৈজ্ঞানিক মতবাদ গণ্য করে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে একে প্রায় ঠেলে ফেলে দিয়ে থাকেন। কিন্তু মানুষের ও জীবের সমস্ত প্রজাতির না হোক অন্ততপক্ষে সর্বপ্রথম জীবন কোষের সরাসরি সৃষ্টি থেকে তো তাঁরা নিজেদের চিন্তাকে কোনক্রমেই মুক্ত করতে পারবেন না। এ সৃষ্টিকে মেনে না নেয়া হলে এ ধরনের একদম বাজে কথা মেনে নিতে হবে যে, জীবনের সূচনা হয় নিছক একটি দুর্ঘটনাক্রমে। অথচ শুধুমাত্র এক কোষসম্পন্ন (Cell) জীবের মধ্যে জীবনের সবচেয়ে সহজ অবস্থাও এতটা জটিল ও সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক কারুকাজে পরিপূর্ণ, যাকে একটি দুর্ঘটনার ফল গণ্য করা একেবারেই অযৌক্তিক। এটা ক্রমবিবর্তন মতবাদের প্রবক্তারা সৃষ্টি মতবাদকে যতটা অবৈজ্ঞানিক গণ্য করেন তার চেয়ে লাখো গুণ বেশী অবৈজ্ঞানিক। আর মানুষ যদি একবার একথা মেনে নেয় যে, জীবনের প্রথম কোষটি সরাসরি সৃষ্টির মাধ্যমে অস্তিত্বলাভ করেছিল, তাহলে এরপর আর একথা মেনে নিতে দোষ কি যে, জীবের প্রত্যেক প্রজাতির প্রথমজন স্রষ্টার সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে অস্তিত্বলাভ করে এবং তারপর তার বংশধারা প্রজনন প্রক্রিয়ার (Procreation) বিভিন্ন ধারার মাধ্যমে চলে আসছে। একথা মেনে নেবার ফলে এমন অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে যায় ডারউইনবাদের পতাকাবাহীদের সকল বৈজ্ঞানিক কাব্য চর্চা সত্ত্বেও তাদের ক্রমবিবর্তন মতবাদে যেগুলোর কোন সমাধান হয়নি। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩৫; আন নিসা, ১; আল আন'আম, ৬৩; আল আ'রাফ, ১০ ও ১৪৫; আল হিজ্‌র, ১৭; আল হাজ্জ, ৫; এবং আল মু'মিনূন, ১২-১৩ টীকা)

১৫. অর্থাৎ একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অস্তিত্ব থেকে বাড়িয়ে তাকে পূর্ণ মানবিক আকৃতিতে পৌছান এবং সমস্ত অংগ-প্রত্যংগ ও পঞ্চেন্দ্রিয় সহকারে তাকে পুরোপুরি শারীরিক আকৃতি দান করেন।

১৬. রূহ বলতে নিছক যে জীবন প্রবাহের বদৌলতে একটি জীবের দেহ যন্ত্র সচল ও সক্রিয় হয় তাকে বুঝানো হয়নি। বরং এমন বিশেষ সার সত্তা ও সার উপাদান বুঝানো হয়েছে যা চিন্তা, চেতনা, বুদ্ধি, বিবেক, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী হয়

এবং যার বদৌলতে মানুষ পৃথিবীর অন্য সমস্ত সৃষ্টি থেকে পৃথক একটি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, অহংবোধের অধিকারী এবং প্রতিনিধিত্ব ক্ষমতা সম্পন্ন সত্তায় পরিণত হয়। এ রূহকে মহান আল্লাহ নিজের রূহ্ এ অর্থে বলেছেন যে, তা তাঁরই মালিকানাধীন এবং তাঁর পবিত্র সত্তার সাথে তাকে সম্পর্কিত করণ ঠিক তেমনি ধরনের যেমন একটি জিনিস তার মালিকের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তার জিনিস হিসেবে আখ্যায়িত হয়। অথবা এর অর্থ হচ্ছে, মানুষের মধ্যে জ্ঞান, চিন্তা, চেতনা, ইচ্ছা, সংকল্প, সিদ্ধান্ত, ইখতিয়ার এবং এ ধরনের আরো যেসব গুণাবলীর উদ্ভব হয়েছে এসবই মহান আল্লাহর গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়া। বস্তুর কোন যৌগিক উপাদান এদের উৎস নয় বরং এদের উৎস হচ্ছে আল্লাহর সত্তা। আল্লাহর তত্ত্বজ্ঞান থেকে সে জ্ঞান লাভ করেছে। আল্লাহর প্রজ্ঞা থেকে সে লাভ করেছে জ্ঞানবত্তা ও বিচক্ষণতা। আল্লাহর ক্ষমতা থেকে সে লাভ করেছে স্বাধীন ক্ষমতা। এসব গুণাবলী মানুষের মধ্যে কোন অজ্ঞান, নির্বোধ ও অক্ষম উৎস থেকে আসেনি। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হিজর, ১৭ ও ১৯ টীকা)

১৭. এটি একটি সূক্ষ্ম বর্ণনাভংগী। রূহ সঞ্চার করার আগে মানুষের সমস্ত আলোচনা প্রথম পুরুষে করা হয় : "তাকে সৃষ্টি করেছেন," "তার বংশ উৎপাদন করেছেন," "তাকে সর্বাংগ সুন্দর করেছেন", "তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছেন" এর কারণ হচ্ছে তখন পর্যন্ত সে সম্বোধন লাভের যোগ্যতা অর্জন করেনি। তারপর প্রাণ সঞ্চার করার পর এখন তাকে বলা হচ্ছে, "তোমাকে কান দিয়েছেন", "চোখ দিয়েছেন," "হৃদয় দিয়েছেন" কারণ প্রাণের অধিকারী হয়ে যাবার পরই সে এখন এমন যোগ্যতা অর্জন করেছে যার ফলে তাকে সম্বোধন করা যেতে পারে।

কান ও চোখ অর্থ হচ্ছে এমন সব মাধ্যম যার সাহায্যে মানুষ জ্ঞান আহরণ করে। যদিও জ্ঞান আহরণের মাধ্যমের মধ্যে জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বকও অন্তরভুক্ত তবুও যেহেতু শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলোর তুলনায় অনেক বেশী বড় ও বেশী গুরুত্বপূর্ণ তাই কুরআন বিভিন্ন স্থানে এ দু'টিকেই আল্লাহর উল্লেখযোগ্য দান আকারে পেশ করছে। এরপর "হৃদয়" মানে হচ্ছে এমন একটি "মন" (Mind) যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সংগৃহীত ও তথ্যাদি বিন্যস্ত করে তা থেকে ফলাফল বের করে আনে এবং কর্মের বিভিন্ন সম্ভাব্য পথগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি পথ নির্বাচন করে এবং সে পথে চলার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৮. অর্থাৎ এ মহান মর্যাদাসম্পন্ন মানবিক রূহ এত উন্নত পর্যায়ের গুণাবলী সহকারে তোমাকে তো এ জন্য দেয়া হয়নি যে, তুমি দুনিয়ায় পশুদের মতো অবস্থান করবে এবং পশুরা নিজেদের জীবনের যে চিত্র তৈরি করতে পারে তুমি তোমার জীবনের জন্য তেমনি ধরনের একটি চিত্র তৈরি করে নেবে। এ চোখ দু'টি তোমাকে দেয়া হয়েছিল অন্তরদৃষ্টি দিয়ে দেখার জন্য, অন্ধ হয়ে থাকার জন্য দেয়া হয়নি। এ কান দু'টি তোমাকে দেয়া হয়েছিল পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য, বধির হয়ে বসে থাকার জন্য নয়। এ হৃদয় তোমাকে দেয়া হয়েছিল সত্যকে বুঝার এবং সঠিক চিন্তা ও কাজ করার জন্য। এ জন্য দেয়া হয়নি যে, তোমার সমস্ত যোগ্যতা কেবলমাত্র নিজের পাশবিক প্রবৃত্তি লালনের উপকরণ সংগ্রহে ব্যয় করবে এবং এর চাইতে যদি কিছুটা ওপরে ওঠো তাহলে নিজের স্রষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দর্শন ও কর্মসূচী তৈরি করতে লেগে যাবে। আল্লাহর কাছ থেকে এ মহামূল্যবান নিয়ামত লাভ করার পর যখন তুমি নাস্তিক্যবাদ বা শিরকের পথ অবলম্বন

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۢ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ۝١٠ قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ۝١١

আর[১৯] এরা বলে, "যখন আমরা মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যাবো তখন কি আমাদের আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে?" আসল কথা হচ্ছে, এরা নিজেদের রবের সাথে সাক্ষাৎকার অস্বীকার করে।[২০] এদেরকে বলে দাও, "মৃত্যুর যে ফেরেশ্‌তাকে তোমাদের ওপর নিযুক্ত করা হয়েছে সে তোমাদেরকে পুরোপুরি তার কব্‌জায় নিয়ে নেবে এবং তারপর তোমাদেরকে তোমাদের রবের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে।[২১]

করো, যখন তুমি নিজেই খোদা বা অন্য খোদাদের বান্দা হয়ে বসো, যখন তুমি প্রবৃত্তির দাস হয়ে দেহ ও কামনার ভোগ-লালসায় ডুবে যেতে থাকো তখন যেন নিজের খোদাকে একথা বলো যে, আমি এসব নিয়ামতের যোগ্য ছিলাম না, আমাকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি না করে একটি বানর, নেকড়ে, কুমীর বা কাক হিসেবে সৃষ্টি করা উচিত ছিল।

১৯. রিসালাত ও তাওহীদ সম্পর্কে কাফেরদের আপত্তির জবাব দেবার পর এবার ইসলামের তৃতীয় মৌলিক আকীদা অর্থাৎ আখেরাত সম্পর্কে তাদের আপত্তি উল্লেখ করে তার জবাব দেয়া হচ্ছে। আয়াতে وَقَالُوْا শব্দের প্রথমে যে "ওয়াও" হরফটি বসানো হয়েছে সেটি আসলে পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে এ প্যারাগ্রাফটির সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ শব্দ বিন্যাস যেন এভাবে করা হয়েছে ঃ "তারা বলে মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল নয়", "তারা বলে আল্লাহ একক উপাস্য নয়" এবং "তারা বলে আমরা মারা যাবার পর আবার আমাদের উত্থান হবে না।"

২০. ওপরের বাক্য এবং এ বাক্যের মধ্যে পুরোপুরি একটি কাহিনী অব্যক্ত রয়ে গেছে। শ্রোতার চিন্তার ওপর এটা ছেড়ে দেয়া হয়েছে। প্রথম বাক্যে কাফেরদের যে আপত্তির কথা বলা হয়েছে তা এতই বাজে ও উদ্ভট যে, তার প্রতিবাদ করার প্রয়োজন অনুভব করা হয়নি। শুধুমাত্র তার উল্লেখ করাই তার উদ্ভট হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কারণ তাদের আপত্তি যে দু'টি অংশ নিয়ে সে দু'টিই আদতে অযৌক্তিক। তাদের একথা বলা, "আমরা মাটিতে মিশে যাবো" এর কি অর্থ হতে পারে? "আমরা" যে জিনিসটির নাম সেটি আবার কবে মাটিতে মিশে যায়? মাটিতে তো কেবল সেই দেহ মিশে যায় যার ভেতর থেকে "আমরা" বের হয়ে গেছে। দেহের নাম "আমরা" নয়। জীবন্ত অবস্থায় যখন সেই দেহের অংশগুলো কেটে ফেলা হয় তখন অংগের পর অংগ কেটে ফেলা হয় কিন্তু "আমরা" পুরোপুরি নিজের জায়গায় থেকে যায়। তার কোন একটি অংশও কর্তিত কোন অংগের সাথে চলে যায় না। আর যখন "আমরা" দেহ থেকে বের

হয়ে যায় তখন সম্পূর্ণ দেহটি বর্তমান থাকলেও তার ওপর এই "আমরা" এর কোন সামান্যতম অংশও প্রযোজ্য হয় না। তাইতো একজন প্রাণ উৎসর্গকারী প্রেমিক নিজের প্রেমাস্পদের মৃতদেহটি নিয়ে কবরস্থ করে। কারণ প্রেমাস্পদ সে দেহ থেকে বের হয়ে গেছে। এখন আর সে প্রেমাস্পদ নয়। বরং যে দেহের মধ্যে এক সময় প্রেমাস্পদ থাকতো সেই শূন্য দেহ পিঞ্জরটিকে সে দাফন করে। কাজেই আপত্তি উত্থাপনকারীদের আপত্তির প্রথম কথাই ভিত্তিহীন। এখন থাকে এর দ্বিতীয় অংশ। অর্থাৎ "আমাদের কি আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে?" এ ধরনের অস্বীকার ও বিস্ময়সূচক প্রশ্ন আদতে সৃষ্টিই হতো না যদি আপত্তিকারীরা কথা বলার আগে এই "আমরা" এবং এ প্রশ্নের উদ্ভব ঘটার তাৎপর্য নিয়ে একটু খানি চিন্তা-ভাবনা করতো। এই "আমরা" এর বর্তমান জন্মের উৎস এ ছাড়া আর কি যে, কোথাও থেকে কয়লা, কোথাও থেকে লোহা, কোথাও থেকে চুন এবং এ ধরনের অন্যান্য উপকরণ একত্র হয়ে গেছে আর এরপর তাদের মৃত্তিকার দেহ পিঞ্জরে এ "আমরা" বিরাজিত হয়েছে। তারপর তাদের মৃত্যুর পর কি ঘটে? তাদের মৃত্তিকার দেহপিঞ্জর থেকে যখন "আমরা" বের হয়ে যায় তখন তাদের আবাস নির্মাণ করার জন্য মাটির বিভিন্ন অংশ থেকে তাদের শরীরের যেসব অংশ সংগ্রহ করা হয়েছিল তা সবই সেই মাটিতে ফিরে যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, প্রথমে যে এই "আমরা"কে এ আবাস তৈরি করে দিয়েছিলেন, তিনি কি পুনরবার সেই একই উপকরণের সাহায্যে সেই একই আবাস তৈরি করে নতুন করে তাদেরকে তার মধ্যে রাখতে পারেন না? এ জিনিস যখন প্রথমে সম্ভব ছিল এবং ঘটনার আকারে সংঘটিত হয়েও গেছে তখন দ্বিতীয়বার এর সম্ভব হবার এবং ঘটনার রূপ পরিগ্রহ করার পথে বাধা কোথায়? সামান্য বুদ্ধি ব্যবহার করলে মানুষ নিজেই এগুলো বুঝতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে সে নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করে না কেন? কি কারণে সে জেনে বুঝে মৃত্যু পরের জীবন ও পরকাল সম্পর্কে এ ধরনের অযথা আপত্তি তুলছেন? মাঝখানের সমস্ত আলোচনা বাদ দিয়ে মহান আল্লাহ দ্বিতীয় বাক্যে এ প্রশ্নেরই জবাব দিচ্ছেন এভাবে ঃ "আসলে এরা এদের রবের সাথে সাক্ষাতকার অস্বীকার করে।" অর্থাৎ আসল কথা এ নয় যে, পুনরবার সৃষ্টি কোন অভিন্ন ও অসম্ভব কথা, ফলে একথা তারা বুঝতে পারছে না। বরং তাদের একথা বুঝার পথে যে জিনিসটি বাধা দিচ্ছে তা হচ্ছে তাদের এ ইচ্ছা যে, তারা পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবে, ইচ্ছা মতো পাপকাজ করবে এবং তারপর কোন প্রকার দণ্ড লাভ না করেই(Set-Free) এখান থেকে বের হয়ে যাবে, তারপর তাদেরকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য কোন জবাবদিহি তাদের করতে হবে না।

২১. অর্থাৎ তোমাদের সেই "আমরা" মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যাবে না বরং তার কর্মসময় শেষ হতেই আল্লাহর মউতের ফেরেশ্‌তা আসবে এবং তাকে দেহ থেকে বের করে পুরোপুরি নিজের কব্‌জায় নিয়ে নেবে। তার কোন সামান্যতম অংশও দেহের সাথে থেকে গিয়ে মাটিতে মিশে যাবে না। তাকে সম্পূর্ণত এবং একেবারে অবিকৃত ও অটুট অবস্থায় তত্ত্বাবধানে (Custody) নিয়ে নেয়া হবে এবং তার রবের সামনে পেশ করা হবে।

এ সংক্ষিপ্ত আয়াতে অনেকগুলো সত্যের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এগুলোকে হালকা দৃষ্টিতে দেখে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া ঠিক নয়।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا
وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ﴿١٢﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ
نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ
وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٣﴾ فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاۗءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا
نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾

২ রুকূ'

হায়,[২২] যদি তুমি দেখতে সে সময় যখন এ অপরাধীরা মাথা নিচু করে তাদের রবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। (তখন তারা বলতে থাকবে) "হে আমাদের রব। আমরা ভালোভাবেই দেখে নিয়েছি ও শুনেছি, এখন আমাদের ফেরত পাঠিয়ে দাও, আমরা সৎকাজ করবো, এবার আমাদের বিশ্বাস হয়ে গেছে।" (জবাবে বলা হবে) "যদি আমি চাইতাম তাহলে পূর্বাহ্নেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার হিদায়াত দিয়ে দিতাম।[২৩] কিন্তু আমার সে কথা পূর্ণ হয়ে গেছে, যা আমি বলেছিলাম যে, আমি জাহান্নাম জিন ও মানুষ দিয়ে ভরে দেবো।[২৪] কাজেই আজকের দিনের এ সাক্ষাতকারের কথা ভুলে গিয়ে তোমরা যে কাজ করেছো এখন তার মজা ভোগ কর।[২৫] আমিও এখন তোমাদের ভুলে গিয়েছি, নিজেদের কর্মফল হিসেবে চিরন্তন আযাবের স্বাদ আস্বাদন করতে থাকো।"

এক ঃ এখানে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, মৃত্যু এমনভাবে আসে না যেমন নাকি একটি ঘড়ি চলতে চলতে হঠাৎ দম শেষ হয়ে যাবার কারণে বন্ধ হয়ে যায়। বরং এ কাজের জন্য আসলে আল্লাহ একজন বিশিষ্ট ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত করে রেখেছেন। তিনি এসে যথারীতি রূহকে ঠিক তেমনিভাবে গ্রহণ করেন যেমন একজন সরকারী আমীন (Official Receiver) কোন জিনিস নিজের কব্‌জায় নিয়ে নেয়। কুরআনের অন্যান্য স্থানে এর আরো যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে তা থেকে জানা যায়, মৃত্যু বিভাগীয় এ অফিসারের অধীনে পুরোপুরি একটি আমলা বাহিনী রয়েছে। তারা মৃত্যু দান করা, রূহকে দেহ থেকে বের করে আনা এবং তাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেবার বহুতর দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া এ আমলারা অপরাধী রূহ ও সৎ মু'মিন রূহদের সাথে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করেন। (এসব বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য সূরা নিসা, ৯৭; আন'আম, ৯৩; আন নাহ্‌ল, ২৮; এবং ওয়াকি'আহ ৮৩ ও ৯৪ আয়াত দেখুন)

দুই ঃ এ থেকে একথাও জানা যায় যে, মৃত্যুর ফলে মানুষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায় না। বরং তার রূহ দেহ থেকে বের হয়ে সঞ্জীবিত থাকে। কুরআনের "মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা তোমাদেরকে পুরোপুরি তার কব্‌জায় নিয়ে নেবে" শব্দগুলো এ সত্যটির প্রকাশ করে। কারণ কোন বিলুপ্ত জিনিসকে কব্‌জায় নেয়া বা নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয় না। কব্‌জায় বা অধিকারে নিয়ে নেবার অর্থই হচ্ছে অধিকৃত জিনিস অধিকারকারীর কাছে রয়েছে।

তিন ঃ এ থেকে এও জানা যায় যে, মৃত্যুকালে যে জিনিসটি অধিকারে নিয়ে নেয়া হয় তা মানুষের জৈবিক জীবন (Biological life) নয় বরং তার সেই অহম (Ego) যাকে "আমরা" ও "তুমি" "তোমরা" শব্দাবলীর সাহায্যে চিত্রিত করা হয়। এ অহম দুনিয়ার কাজ করে যে ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয় তার সবটুকুই পুরোপুরি (Intact) বের করে নেয়া হয়। এমনভাবে বের করে নেয়া হয় যার ফলে তার গুণাবলীতে কোনপ্রকার কমবেশী দেখা দেয় না। মৃত্যুর পরে এ জিনিসই তার রবের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়। একেই পরকালে নবজন্ম ও নতুন দেহ দান করা হবে। এরি বিরুদ্ধে 'মোকদ্দমা' চালানো হবে। এর কাছ থেকেই হিসেব নেয়া হবে এবং একেই পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে।

২২. এবার মানুষের এ "অহম" যখন তার রবের কাছে ফিরে গিয়ে নিজের হিসেব দেবার জন্য তাঁর সামনে দাঁড়াবে তখনকার অবস্থার চিত্র অংকন করা হচ্ছে।

২৩. অর্থাৎ এভাবে সত্যের সাথে সাক্ষাত ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যদি লোকদেরকে পথ দেখানো আমার লক্ষ হতো তাহলে দুনিয়ার জীবনে এত বড় পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তোমাদের এখানে আনার কি দরকার ছিল? এ ধরনের পথের দিশা তো আমি তোমাদেরকে আগেও দিতে পারতাম। কিন্তু শুরু থেকেই তো তোমাদের জন্য আমার এ পরিকল্পনা ছিল না। আমি তো প্রকৃত সত্যকে দৃষ্টির অন্তরালে এবং ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ ও অনুভবের বাইরে রেখে তোমাদের পরীক্ষা নিতে চাচ্ছিলাম। আমি দেখতে চাচ্ছিলাম, তোমরা সরাসরি তাকে আবরণমুক্ত দেখার পরিবর্তে বিশ্ব-জাহানে এবং স্বয়ং তোমাদের নিজেদের মধ্যে তার আলামতগুলো দেখে নিজের বুদ্ধির সাহায্যে তাকে চিনতে পারো কিনা, আমি নিজের নবীদের ও কিতাবসমূহের সাহায্যে এ সত্যকে চিনে নেবার ব্যাপারে তোমাদের যে সাহায্য করতে চাচ্ছি তা থেকে তোমরা ফায়দা হাসিল করছো কি না এবং সত্যকে জেনে নেবার পর নিজের প্রবৃত্তিকে এতটা নিয়ন্ত্রিত করতে পারো কিনা যার ফলে কামনা ও বাসনার দাসত্ব মুক্ত হয়ে তোমরা এ সত্যকে মেনে নেবে এবং এ অনুযায়ী নিজের জীবন ধারার সংস্কার সাধন করবে। এ পরীক্ষায় তোমরা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছো। এখন পুনর্বার এ পরীক্ষার সিলসিলা শুরু করায় লাভ কি? দ্বিতীয় পরীক্ষাটি যদি এমনভাবে নেয়া হয় যে, তোমরা এখানে যা কিছু শুনেছো ও দেখেছো তা যদি সব মনেই থেকে যায়, তাহলে আদতে সেটা কোন পরীক্ষাই হবে না। আর যদি আগের মতো সকল চিন্তা-ভাবনা মুক্ত করে এবং সত্যকে দৃষ্টির অগোচরে রেখে তোমাদের আবার দুনিয়ায় সৃষ্টি করা যায় এবং প্রথম বারে যেমন নেয়া হয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে একেবারে নতুন করে তোমাদের পরীক্ষা নেয়া হয়, তাহলে বিগত পরীক্ষার তুলনায় ফলাফল কিছুই ভিন্নতর হবে না। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, ২২৮; আল আন'আম, ৬ ও ১৪১; ইউনুস, ২৬ এবং আল মু'মিনূন, ৯১ টীকা)

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ
رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾

আমার আয়াতের প্রতি তো তারাই ঈমান আনে যাদেরকে এ আয়াত শুনিয়ে যখন উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং নিজেদের রবের প্রশংসা সহকারে তাঁর মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করে না।[২৬] তাদের পিঠ থাকে বিছানা থেকে আলাদা, নিজেদের রবকে ডাকে আশংকা ও আকাংখা সহকারে[২৭] এবং যা কিছু রিযিক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।[২৮]

২৪. মহান আল্লাহ আদম সৃষ্টির সময় ইবলিসকে সম্বোধন করে যে উক্তি করেছিলেন সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। সূরা সাদের শেষ রুকূ'তে সে সময়ের পুরো ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ইবলিস আদমকে সিজদাহ করতে অস্বীকার করে এবং আদমের বংশধরদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের অবকাশ চায়। জবাবে আল্লাহ বলেন,

فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ

"কাজেই এ হচ্ছে সত্য এবং আমি সত্যই বলি যে, আমি জাহান্নাম ভরে দেবো তোমার এবং মানুষদের মধ্য থেকে যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদের দ্বারা।"

أَجْمَعِينَ শব্দটি এখানে এ অর্থে ব্যবহার করা হয়নি যে, সকল জিন ও সমস্ত মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, শয়তানরা এবং শয়তানদের অনুসারী মানুষরা সবাই এক সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

২৫. অর্থাৎ একদিন যে নিজের রবের সামনে যেতে হবে একথা দুনিয়ায় আয়েশ-আরামে মত্ত হয়ে একদম ভুলে গেছো।

২৬. অন্য কথায় তারা নিজেদের বিভ্রান্ত চিন্তা পরিহার করে আল্লাহর কথা মেনে নেয়া এবং আল্লাহর বন্দেগী অবলম্বন করে তাঁর ইবাদাত করাকে নিজেদের জন্য সম্মানহানিকর মনে করে না। আত্মম্ভরিতা তাদেরকে সত্যগ্রহণ ও রবের আনুগত্য করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

২৭. অর্থাৎ আয়েশ-আরাম করে রাত কাটাবার পরিবর্তে তারা নিজেদের রবের ইবাদাত করে। তাদের অবস্থা এমনসব দুনিয়াপূজারীদের মতো নয় যাদের দিনের পরিশ্রমের কষ্ট দূর করার জন্য রাতে নাচ-গান, শরাব পান ও খেলা তামাশার মতো আমোদ প্রমোদের প্রয়োজন হয়। এর পরিবর্তে তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, সারা দিন নিজেদের

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾
أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

তারপর কেউ জানে না তাদের কাজের পুরস্কার হিসেবে তাদের চোখের শীতলতার কি সরঞ্জাম লুকিয়ে রাখা হয়েছে।[২৯] এটা কি কখনো হতে পারে, যে ব্যক্তি মু'মিন সে ফাসেকের মতো হয়ে যাবে?[৩০] এ দু'পক্ষ সমান হতে পারে না।[৩১] যারা ঈমান এনেছে এবং যারা সৎকাজ করেছে তাদের জন্য তো রয়েছে জান্নাতের বাসস্থান[৩২] আপ্যায়নের জন্য তাদের কাজের প্রতিদানস্বরূপ।

দায়িত্ব পালন করে কাজ শেষে এসে দাঁড়ায় তারা নিজেদের রবের সামনে। তাঁকে স্মরণ করে রাত কাটিয়ে দেয়। তাঁর ভয়ে কাঁপতে থাকে এবং তাঁর কাছেই নিজেদের সমস্ত আশা-আকাংখা সমর্পণ করে।

বিছানা থেকে পিঠ আলাদা রাখার মানে এ নয় যে, তারা রাতে শয়ন করে না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তারা রাতের একটি অংশ কাটায় আল্লাহর ইবাদাতের মধ্য দিয়ে।

২৮. রিযিক বলতে বুঝায় হালাল রিযিক। হারাম ধন-সম্পদকে আল্লাহ তাঁর প্রদত্ত সম্পদ হিসেবে বর্ণনা করেন না। কাজেই এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যা সামান্য কিছু পবিত্র রিযিক আমি দিয়েছি তা থেকেই খরচ করে। তার সীমা অতিক্রম করে নিজের খরচপাতি পুরা করার জন্য হারাম সম্পদে হাত দেয় না।

২৯. বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমাদে বিভিন্ন সূত্রে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত এই হাদীসে কুদসীটি উদ্ধৃত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

قال الله تعالى اعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولاخطر على قلب بشر

"আল্লাহ বলেন, আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য আমি এমনসব জিনিস সংগ্রহ করে রেখেছি যা কখনো কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কোন মানুষ কোনদিন তা কল্পনাও করতে পারে না।"

এ বিষয়বস্তুটিই সামান্য শাব্দিক হেরফের করে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা), হযরত মুগীরাহ ইবনে শু'বা (রা) এবং হযরত সাহ্‌ল ইবনে সা'আদ সায়েদী নবী করীম (সা)

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا
مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم
بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ
الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ
ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾

আর যারা ফাসেকীর পথ অবলম্বন করেছে তাদের আবাস হচ্ছে জাহান্নাম। যখনই তারা তা থেকে বের হতে চাইবে তার মধ্যেই ঠেলে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, আস্বাদন করো এখন সেই আগুনের শাস্তির স্বাদ যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।

সেই বড় শাস্তির পূর্বে আমি এ দুনিয়াতেই (কোন না কোন) ছোট শাস্তির স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করাতে থাকবো, হয়তো তারা (নিজেদের বিদ্রোহাত্মক নীতি থেকে) বিরত হবে।[৩৩] আর তার চেয়ে বড় জালেম কে হবে যাকে তার রবের আয়াতের সাহায্যে উপদেশ দেয়া হয় এবং সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়?[৩৪] এ ধরনের অপরাধীদের থেকে তো আমি প্রতিশোধ নেবোই।

থেকে রেওয়ায়াত করেছেন এবং মুসলিম, আহমাদ, ইবনে জারীর ও তিরমিযী সহীহ সনদ সহকারে তা উদ্ধৃত করেছেন।

৩০. এখানে মু'মিন ও ফাসেকের দু'টি বিপরীতমুখী পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। মু'মিন বলতে এমন লোক বুঝানো হয়েছে, যে আল্লাহকে নিজের রব ও একমাত্র উপাস্য মেনে নিয়ে আল্লাহ তাঁর পয়গম্বরদের মাধ্যমে যে আইন-কানুন পাঠিয়েছেন তার আনুগত্য করে। পক্ষান্তরে ফাসেক হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে ফাসেকী আনুগত্য থেকে বের হয়ে আসা বা অন্যকথায় বিদ্রোহ, বল্গাহীন স্বেচ্ছাচারী মনোবৃত্তি ও আল্লাহ ছাড়া অন্য সত্তার আনুগত্যের নীতি অবলম্বন করে।

৩১. অর্থাৎ দুনিয়ায় তাদের চিন্তাধারা ও জীবন যাপন পদ্ধতি এক হতে পারে না এবং আখেরাতেও তাদের সাথে আল্লাহর আচরণ এক হওয়া সম্ভব নয়।

৩২. অর্থাৎ সেই জান্নাতগুলো নিছক তাদের প্রমোদ উদ্যান হবে না বরং সেখানেই হবে তাদের আবাস। চিরকাল তারা সেখানে বসবাস করবে।

৩৩. "বড় শাস্তি" বলতে আখেরাতের শাস্তিকে বুঝানো হয়েছে। কুফরী ও ফাসেকীর অপরাধে এ শাস্তি দেয়া হবে। এর মোকাবিলায় "ছোট শাস্তি" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

এর অর্থ হচ্ছে এ দুনিয়ায় মানুষ যেসব কষ্ট পায় সেগুলো। যেমন ব্যক্তিগত জীবনে কঠিন রোগ, নিজের প্রিয়তম লোকদের মৃত্যু, ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মারাত্মক ক্ষতি, ব্যর্থতা ইত্যাদি। সামাজিক জীবনে ঝড়-তুফান, ভূমিকম্প, বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, দাংগা, যুদ্ধ এবং আরো বহু আপদ-বিপদ, যা লাখো লাখো কোটি কোটি মানুষকে প্রভাবিত করে। এসব বিপদ অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন ও কল্যাণকর দিক বর্ণনা করে বলা হয়েছে, এর ফলে বড় শাস্তি ভোগ করার আগেই যেন মানুষ সচেতন হয়ে যায় এবং এমন চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি ত্যাগ করে যার পরিণামে তাদেরকে এ বড় শাস্তি ভোগ করতে হবে। অন্যকথায় এর অর্থ হবে, দুনিয়ায় আল্লাহ মানুষকে একেবারেই পরমানন্দে রাখেননি। নিশ্চিন্তে ও আরামে জীবনের গাড়ি চলতে থাকলে মানুষ এ ভুল ধারণায় লিপ্ত হয়ে পড়বে যে, তার চেয়ে বড় আর কোন শক্তি নেই যে, তার কোন ক্ষতি করতে পারে। বরং আল্লাহ এমন ব্যবস্থা করে রেখেছেন যার ফলে মাঝে মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি, জাতি ও দেশের ওপর এমন সব বিপদ-আপদ পাঠাতে থাকেন, যা তাদেরকে একদিকে নিজেদের অসহায়তা এবং অন্যদিকে নিজেদের চেয়ে বড় ও উর্ধে একটি মহাপরাক্রমশালী সর্বব্যাপী শাসন ব্যবস্থার অনুভূতি দান করে। এ বিপদ প্রত্যেকটি ব্যক্তি, দল ও জাতিকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তোমাদের ভাগ্য ওপরে অন্য একজন নিয়ন্ত্রণ করছেন। সবকিছু তোমাদের হাতে দিয়ে দেয়া হয়নি। আসল ক্ষমতা রয়েছে তাঁর হাতে যিনি কর্তৃত্ব সহকারে এসব কিছু করে চলছেন। তাঁর পক্ষ থেকে যখনই কোন বিপদ তোমাদের ওপর আসে, তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ তোমরা গড়ে তুলতে পারো না এবং কোন জিন, রূহ, দেব-দেবী, নবী বা অলীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেও তার পথ রোধ করতে সক্ষম হও না।

এদিক দিয়ে বিচার করলে এ বিপদ নিছক বিপদ নয় বরং আল্লাহর সতর্ক সংকেত। মানুষকে সত্য জানাবার এবং তার বিভ্রান্তি দূর করার জন্য একে পাঠানো হয়। এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে যদি মানুষ দুনিয়াতেই নিজের বিশ্বাস ও কর্ম শুধরে নেয় তাহলে আখেরাতে আল্লাহর বড় শাস্তির মুখোমুখি হবার তার কোন প্রয়োজনই দেখা দেবে না।

৩৪. "রবের আয়াত" অর্থাৎ তাঁর নিদর্শনাবলী, এ শব্দগুলো বড়ই ব্যাপক অর্থবোধক। সব ধরনের নিদর্শন এর অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। কুরআন মজীদের সমস্ত বর্ণনা দৃষ্টি সমক্ষে রাখলে জানা যায়, এ নিদর্শনাবলী নিম্নোক্ত ছয় প্রকারের ঃ

এক ঃ যে নিদর্শনাবলী পৃথিবী থেকে নিয়ে আকাশ পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিসের এবং বিশ্ব-জাহানের সামগ্রিক ব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া যায়।

দুই ঃ যে নিদর্শনগুলো মানুষের নিজের জন্ম এবং তার গঠনাকৃতি ও অস্তিত্বের মধ্যে পাওয়া যায়।

তিন ঃ যে নিদর্শনাবলী মানুষের স্বতস্ফূর্ত অনুভূতিতে, তার অচেতন ও অবচেতন মনে এবং তার নৈতিক চিন্তাধারায় পাওয়া যায়।

চার ঃ যে নিদর্শনাবলী পাওয়া যায় মানুষের ইতিহাসের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতায়।

পাঁচ ঃ যে নিদর্শনাবলী মানুষের প্রতি অবতীর্ণ পার্থিব আপদ-বিপদ ও আসমানী বালা-মুসিবতের মধ্যে পাওয়া যায়।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ وَجَعَلْنٰهُ
هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا
لَمَّا صَبَرُوْا ۖ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٢٤﴾ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٢٥﴾

৩ রুকূ'

এর আগে আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি, কাজেই সেই জিনিসই পাওয়ার ব্যাপারে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়।[৩৫] এ কিতাবকে আমি বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশক করেছিলাম।[৩৬] আর যখন তারা সবর করে এবং আমার আয়াতের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করতে থাকে তখন তাদের মধ্যে এমন নেতা সৃষ্টি করে দেই যারা আমার হুকুম অনুসারে পথপ্রদর্শন করতো।[৩৭] নিশ্চিতই তোমার রবই কিয়ামতের দিন সেসব কথার ফায়সালা করে দেবেন যেগুলোর ব্যাপারে তারা (বনী ইসরাঈল) পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত থেকেছে।[৩৮]

ছয় ঃ আর এসবের পরে আল্লাহ তাঁর নবীগণের মাধ্যমে যেসব আয়াত পাঠান ওপরে বর্ণিত নিদর্শনগুলো যেসব সত্যের প্রতি ইংগিত করেছে এ আয়াতগুলোর সাহায্যে যুক্তি-সংগত পদ্ধতিতে মানুষকে সেসব সত্যের জ্ঞান দান করাই কাম্য।

এ সমস্ত নিদর্শন পূর্ণ একাত্মতা সহকারে সোচ্চার কণ্ঠে মানুষকে একথা বলে যাচ্ছে যে, তুমি আল্লাহ নও এবং বহু সংখ্যক আল্লাহর বান্দা নও বরং তোমার আল্লাহ মাত্র একজন। তাঁর ইবাদাত ও আনুগত্য ছাড়া তোমার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তোমাকে এ জগতে স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী ও দায়িত্বহীন করে পাঠানো হয়নি। বরং নিজের জীবনের সমস্ত কাজ শেষ করার পর তোমাকে তোমার আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে জবাবদিহি করতে এবং নিজের কাজের প্রেক্ষিতে পুরস্কার ও শাস্তি পেতে হবে। কাজেই তোমার আল্লাহ তোমাকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য নিজের নবী ও কিতাবসমূহের মাধ্যমে যে পথ-নির্দেশনা পাঠিয়েছেন তা মেনে চলো এবং স্বেচ্ছাচারী নীতি অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকো। এখন একথা সুস্পষ্ট, যে মানুষকে এত বিভিন্নভাবে বুঝানো হয়েছে, যাকে উপদেশ দেবার ও পরিচালনা করার জন্য এমন অগণিত নিদর্শনাবলীর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে এবং যাকে দেখার জন্য চোখ, শোনার জন্য কান এবং চিন্তা করার জন্য অন্তরের নিয়ামত দান করা হয়েছে, সে যদি সমস্ত নিদর্শনাবলীর দিক থেকে চোখ বন্ধ করে নেয়, যারা বুঝাচ্ছে তাদের কথা ও উপদেশের জন্যও নিজের কানের ছিদ্র বন্ধ করে নেয় এবং নিজের মন-মস্তিষ্ক দিয়েও উল্টা দর্শনই তৈরী করার কাজে আত্মনিয়োগ করে, তাহলে তার চেয়ে বড় জালেম আর কেউ হতে পারে না। এরপর সে দুনিয়ায় নিজের পরীক্ষার

মেয়াদ খতম করার পর যখন তার আল্লাহর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে তখন বিদ্রোহের পূর্ণ শাস্তি লাভ করার যোগ্যই হবে।

৩৫. আপাতত দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু আসলে বক্তব্যের লক্ষ হচ্ছে তারা, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত এবং তাঁর প্রতি আল্লাহর কিতাব নাযিল হবার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছিল। সূরার শুরুতে (২ ও ৩ আয়াতে) যে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে এখান থেকে সেদিকেই বক্তব্যের মোড় ফিরে যাচ্ছে। মক্কার কাফেররা বলছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন কিতাব আসেনি, তিনি নিজেই সেটি রচনা করেছেন এবং এখন দাবী করছেন এটি আল্লাহ নাযিল করেছেন। এর একটি জবাব প্রথম দিকের আয়াতে দেয়া হয়েছিল, এখন দ্বিতীয় জবাব দেয়া হচ্ছে। এ প্রসংগে যে প্রথম কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, হে নবী! এই মূর্খ লোকেরা তোমার প্রতি আল্লাহর কিতাব নাযিল হওয়া অসম্ভব মনে করছে এবং তারা চাচ্ছে প্রতি দু'জনে একজন এটি অস্বীকার না করলেও অন্তত যেন এ ব্যাপারে সন্দেহেই লিপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এক বান্দার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব নাযিল হওয়াতো মানুষের ইতিহাসে কোন নতুন ঘটনা নয়। এর আগে বহু নবীর প্রতি কিতাব নাযিল হয়েছিল, এগুলোর মধ্যে মূসা (আলাইহিস সালাম)–কে প্রদত্ত কিতাবটি ছিল সবচেয়ে খ্যাতিমান। কাজেই একই ধরনের আর একটি জিনিস আজ তোমাদের দেয়া হয়েছে। তাহলে অযথা এর মধ্যে সন্দেহ করার মতো এমন নতুন কি তোমরা দেখলে?

৩৬. অর্থাৎ সে কিতাবটিকে বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশ লাভের মাধ্যমে পরিণত করা হয়েছিল এবং এ কিতাবটিকে ঠিক তেমনি তোমাদের পথনির্দেশ লাভের জন্য পাঠানো হয়েছে। আগেই তিন আয়াতে একথা বর্ণনা করা হয়েছে। এ উক্তির পূর্ণ তাৎপর্য এর ঐতিহাসিক পটভূমি দৃষ্টিসমক্ষে রাখার পরই অনুধাবন করা যেতে পারে। একথা ইতিহাস থেকে প্রমাণিত এবং মক্কার কাফেরদের কাছেও একথা অজানা ছিল না যে, বনী ইসরাঈল কয়েকশো বছর থেকে মিসরে চরম লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত জীবন যাপন করে আসছিল। এ অবস্থায় আল্লাহ তাদের মধ্যে মূসার (আলাইহিস সালাম) জন্ম দেন। তাঁর মাধ্যমে এ জাতিকে দাসত্বমুক্ত করেন। তারপর তাদের প্রতি কিতাব নাযিল করেন এবং তার বদৌলতে সেই অনুন্নত ও নিষ্পেষিত জাতি পথের দিশা লাভ করে দুনিয়ার বুকে একটি খ্যাতিমান জাতিতে পরিণত হয়। এ ইতিহাসের দিকে ইংগিত করে আরববাসীদেরকে বলা হচ্ছে যেভাবে বনী ইসরাঈলকে পথের দিশা দান করার জন্য সেই কিতাব পাঠানো হয়েছিল ঠিক তোমাদেরকে পথের দিশা দান করার জন্য এ কিতাব পাঠানো হয়েছে।

৩৭. অর্থাৎ এ কিতাব বনী ইসরাঈলকে যে শ্রেষ্ঠ জাতিসত্তায় পরিণত করে এবং তাদেরকে উন্নতির যে উচ্চ শিখরে পৌছিয়ে দেয় তা নিছক তাদের মধ্যে কিতাব এসে যাওয়ার ফল ছিল না। এ কিতাব কোন তাবীজ বা মাদুলী ধরনের কিছু ছিল না যে, এ জাতির গলায় ঝুলিয়ে দেবার সাথে সাথেই তারা উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে থাকে। বরং আল্লাহর আয়াতের প্রতি তারা যে দৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন করে এবং আল্লাহর বিধান

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي
مَسَاكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا
نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ
وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ
يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿٣٠﴾

আর এরা কি (এসব ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে) কোন পথনির্দেশ পায়নি যে, এদের পূর্বে কত জাতিকে আমি ধ্বংস করেছি, যাদের আবাসভূমিতে আজ এরা চলাফেরা করছে?[৩৯] এর মধ্যে রয়েছে বিরাট নিদর্শনাবলী, এরা কি শুনবে না? আর এরা কি কখনো এ দৃশ্য দেখেনি যে, আমি উষর ভূমির ওপর পানির ধারা প্রবাহিত করি এবং তারপর এমন জমি থেকে ফসল উৎপন্ন করি যেখান থেকে তাদের পশুরাও খাদ্য লাভ করে এবং তারা নিজেরাও খায়? তবুও কি এরা কিছুই দেখে না?[৪০] এরা বলে, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে বলো এ ফায়সালা কবে হবে?"[৪১] এদেরকে বলে দাও, "যারা কুফরী করেছে ফায়সালার দিন ঈমান আনা তাদের জন্য মোটেই লাভজনক হবে না এবং এরপর এদের কোন অবকাশ দেয়া হবে না।"[৪২] বেশ, এদেরকে এদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও এবং অপেক্ষা করো, এরাও অপেক্ষায় আছে।

মেনে চলার ব্যাপারে যে সবর ও অবিচল নিষ্ঠা প্রদর্শন করে, এ সমস্ত অলৌকিকতা ছিল তারই ফল। স্বয়ং বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে তারাই নেতৃত্ব লাভ করে যারা তাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাবের প্রতি প্রকৃত বিশ্বস্ত ছিল এবং যারা বৈষয়িক স্বার্থোদ্ধার ও স্বাদ আস্বাদনে সীমা ছাড়িয়ে যেত না। সত্যপ্রিয়তার খাতিরে তারা যখন দৃঢ়ভাবে প্রত্যেকটি বিপদের মোকাবিলা করে, প্রত্যেকটি ক্ষতি ও কষ্ট বরদাশ্‌ত করে এবং নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা থেকে নিয়ে বহিরাগত দীনের শত্রুদের পর্যন্ত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হয় তখনই তারা দুনিয়ায় নেতৃত্বের আসনে বসে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আরবের কাফেরদেরকে এ মর্মে সতর্ক করা যে, আল্লাহর কিতাবের অবতরণ যেমন বনী ইসরাঈলের ভাগ্যের ফায়সালা করেছিল তেমনিভাবে এ কিতাবের অবতরণও আজ তোমাদের ভাগ্যের ফায়সালা করে দেবে। এখন তারাই নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করবে

যারা একে মেনে নিয়ে ধৈর্য ও অবিচলতার সাথে সত্যের অনুসরণ করে চলবে। যারা এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের ভাগ্যবিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

৩৮. এখানে ইংগিত করা হয়েছে বনী ইসরাঈলের সর্বব্যাপী কোন্দল ও দলাদলির প্রতি। এসব কোন্দলে তারা লিপ্ত হয়েছিল ঈমান ও প্রত্যয়ের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবার, নিজেদের সত্যপন্থী নেতাদের আনুগত্য পরিত্যাগ করার ও বৈষয়িক স্বার্থপূজারী হয়ে যাবার পর। এ অবস্থার একটি ফল তো সুস্পষ্ট। বনী ইসরাঈল কোন্ ধরনের লাঞ্ছনা ও অবমাননার শিকার হয়েছিল, তা সারা দুনিয়া দেখছে। দ্বিতীয় ফলটি এখন দুনিয়াবাসীরা জানে না এবং তা কিয়ামতের দিন প্রকাশিত হবে।

৩৯. যে জাতির মধ্যেই নবী এসেছে তার ভাগ্যের ফায়সালা সেই নবীর ব্যাপারে সে যে নীতি ও দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করেছে তার ভিত্তিতেই হয়ে গেছে। রসূলকে প্রত্যাখ্যান করার পর আর কোন জাতি ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে পারেনি। তাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে একমাত্র তারাই টিকে গেছে। প্রত্যাখ্যান কারীরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি লাভ করে চিরকালের জন্য শিক্ষণীয় বস্তুতে পরিণত হয়ে গেছে। ইতিহাসের এ ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা থেকে তারা কি কোন শিক্ষা লাভ করেনি?

৪০. পূর্বাপর আলোচনা সামনে রাখলে পরিষ্কার অনুভূত হয়, এখানে মৃত্যুপরের জীবনের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করার জন্য এ প্রসংগ উত্থাপন করা হয়নি যেমন কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় সাধারণভাবে করা হয়েছে বরং এ প্রসংগে অন্য একটি উদ্দেশ্যে একথা বলা হয়েছে। আসলে এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে এ বিষয়ের প্রতি যে, একটি অনুর্বর পতিত জমি দেখে যেমন কেউ ধারণা করতে পারে না যে, এটিও কোনদিন সবুজ–শ্যামল ক্ষেতে পরিণত হবে। কিন্তু আল্লাহর পাঠানো এক পশলা বৃষ্টিধারাই এর কায়া পাল্টে দেয়। ঠিক তেমনি ইসলামের দাওয়াতও তোমাদের চোখে বর্তমানে একটি অচল জিনিস বলে প্রতিভাত হচ্ছে কিন্তু আল্লাহর কুদরাতের একটি ঝলকানি তাকে এমন উন্নতি ও অগ্রগতি দান করবে যে, তোমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে।

৪১. অর্থাৎ তোমরা যে বলছো, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য এসে যাবে এবং আমাদেরকে যারা মিথ্যুক বলছে তাদের ওপর আল্লাহর গযব পড়বে, এ সময়টা কখন আসবে? কবে আমাদের ও তোমাদের ফায়সালা হয়ে যাবে?

৪২. অর্থাৎ এটা এমন কি জিনিস যে জন্য তোমরা অস্থির হয়ে পড়েছো? আল্লাহর আযাব একবার এসে গেলে তখন তো আর তোমরা সংযত হবার সুযোগ পাবে না। আযাব আসার আগে তোমরা যে অবকাশটা পাচ্ছো এটাকে দুর্লভ সুযোগ মনে করো। আযাবকে সরাসরি সামনে দেখার পর ঈমান আনলে কোন লাভ হবে না।

আল আহ্যাব

৩৩

নামকরণ

এ সূরাটির নাম ২০ আয়াতের يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا বাক্যটি থেকে গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। এক, আহযাব যুদ্ধ। এটি ৫ হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। দুই, বনী কুরাইযার যুদ্ধ। ৫ হিজরীর যিল্‌কাদ মাসে এটি সংঘটিত হয়। তিন, হযরত যয়নবের (রা) সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে। এটি অনুষ্ঠিত হয় একই বছরের যিল্‌কাদ মাসে। এ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল যথাযথভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত ওহোদ যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়োজিত তীরন্দাজদের ভুলে মুসলিম সেনাবাহিনী পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিলো। এ কারণে আরবের মুশরিক সম্প্রদায়, ইহুদী ও মুনাফিকদের স্পর্ধা ও দুঃসাহস বেড়ে গিয়েছিল। তাদের মনে আশা জেগেছিল, তারা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে নির্মূল করতে সক্ষম হবে। ওহোদের পরে প্রথম বছরে যেসব ঘটনা ঘটে তা থেকেই তাদের এ ক্রমবর্ধমান স্পর্ধা ও ঔদ্ধত্য আন্দাজ করা যেতে পারে। ওহোদ যুদ্ধের পরে দু'মাসও অতিক্রান্ত হয়নি এমন সময় দেখা গেলো যে, নজ্‌দের বনী আসাদ গোত্র মদীনা তাইয়েবার ওপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি চালাচ্ছে। তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবু সালামার সারীয়া* বাহিনী পাঠাতে হলো। তারপর ৪ হিজরীর সফর মাসে আদাল ও কারাহ গোত্রদ্বয় তাদের এলাকায় গিয়ে লোকদেরকে দীন ইসলামের শিক্ষা দেবার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কয়েকজন লোক চায়। নবী (সা) ছ'জন সাহাবীকে তাদের সংগে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু রাজী' (জেদ্দা ও

* সীরাতের পরিভাষায় "সারীয়া" বলা হয় এমন সামরিক অভিযানকে যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরীক ছিলেন না। আর "গাযওয়া" বলা হয় এমন যুদ্ধ বা সমর অভিযানকে যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সশরীরে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

রাবেগের মাঝখানে) নামক স্থানে পৌঁছে তারা হুযাইল গোত্রের কাফেরদেরকে এ নিরস্ত্র ইসলাম প্রচারকদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। তাঁদের মধ্য থেকে চারজনকে তারা হত্যা করে এবং দু'জনকে (হযরত খুবাইব ইবনে আদী ও হযরত যায়েদ ইবনে দাসিন্নাহ) নিয়ে মক্কায় শত্রুদের হাতে বিক্রি করে দেয়। তারপর সেই সফর মাসেই আমের গোত্রের এক সরদারের আবেদনক্রমে রসূলুল্লাহ (সা) আরো একটি প্রচারক দল পাঠান। এ দলে ছিলেন চল্লিশ জন (অথবা অন্য উক্তি মতে ৭০ জন) আনসারী যুবক। তাঁরা নজদের দিকে রওয়ানা হন। কিন্তু তাঁদের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। বনী সুলাইমের 'উসাইয়া, বি'ল ও যাক্ওয়ান গোত্রত্রয় বি'রে মা'উনাহ নামক স্থানে অকস্মাত তাঁদেরকে ঘেরাও করে সবাইকে হত্যা করে ফেলে। এ সময় মদীনার বনী নাযীর ইহুদী গোত্রটি সাহসী হয়ে ওঠে এবং একের পর এক প্রতিশ্রুতি ভংগ করতে থাকে। এমনকি চার হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তারা স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শহীদ করে দেবার ষড়যন্ত্র করে। তারপর ৪ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে বনী গাত্ফানের দু'টি গোত্র বনু সা'লাবাহ ও বনু মাহারিব মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি চালায়। তাদের গতিরোধ করার জন্য স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই তাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতে হয়। এভাবে ওহোদ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মুসলমানদের ভাবমূর্তি ও প্রতাপে যে ধস নামে, ক্রমাগত সাত আট মাস ধরে তার আত্মপ্রকাশ হতে থাকে।

কিন্তু শুধুমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিচক্ষণতা এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবন উৎসর্গের প্রেরণাই মাত্র কিছু দিনের মধ্যেই অবস্থার গতি পাল্টে দেয়। আরবদের অর্থনৈতিক বয়কট মদীনাবাসীদের জন্য জীবন ধারণ কঠিন করে দিয়েছিল। আশপাশের সকল মুশরিক গোত্র হিংস্র ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছিল। মদীনার মধ্যেই ইহুদী ও মুশরিকরা ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে উঠছিল। কিন্তু এ মুষ্টিমেয় সাচ্চা মু'মিনগোষ্ঠী আল্লাহর রসূলের নেতৃত্বে একের পর এক এমন সব পদক্ষেপ নেয় যার ফলে ইসলামের প্রভাব প্রতিপত্তি কেবল বহাল হয়ে যায়নি বরং আগের চেয়ে অনেক বেড়ে যায়।

আহ্যাব যুদ্ধের পূর্বের যুদ্ধগুলো

এর মধ্যে ওহোদ যুদ্ধের পরপরই যে পদক্ষেপগুলো নেয়া হয় সেগুলোই ছিল প্রাথমিক পদক্ষেপ। যুদ্ধের পরে ঠিক দ্বিতীয় দিনেই যখন বিপুল সংখ্যক মুসলমান ছিল আহত, বহু গৃহে নিকটতম আত্মীয়দের শাহাদাত বরণে হাহাকার চলছিল এবং স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আহত ছিলেন এবং তাঁর চাচা হাম্যার (রা) শাহাদাত বরণে ছিলেন শোক সন্তপ্ত, তখন তিনি ইসলামের উৎসর্গীত প্রাণ সেনানীদের ডেকে বলেন, আমাদের কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবন করা উচিত। কারণ মাঝ পথ থেকে ফিরে এসে তারা আমাদের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে। নবী করীমের (সা) এ অনুমান একদম সঠিক ছিল। কাফের কুরাইশরা তাদের হাতের মুঠোয় এসে যাওয়া বিজয় থেকে লাভবান না হয়ে খালি হাতে চলে গেছে ঠিকই কিন্তু পথের মধ্যে কোথাও যখন তারা থেমে যাবে তখন নিজেদের নির্বুদ্ধিতার জন্য লজ্জা অনুভব করবে এবং পুনর্বার মদীনা আক্রমণ করার জন্যে দৌড়ে আসবে। এ জন্য তিনি তাদের পশ্চাদ্ধাবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সংগে সংগেই ৬৩০ জন উৎসর্গীত প্রাণ সাথী তাঁর সংগে যেতে প্রস্তুত হয়ে যান। মক্কার পথে

হাম্‌রাউল আসাদ নামক স্থানে পৌছে তিনি তিন দিন অবস্থান করেন। সেখানে একজন অমুসলিম শুভানুধ্যায়ীর কাছ থেকে জানতে পারেন আবু সুফিয়ান তার ২৯৭৮ জন সহযোগীকে নিয়ে মদীনা থেকে ৩৬ মাইল দূরে দওরুর রওহা নামক স্থানে অবস্থান করছিল। তারা যথার্থই নিজেদের ভুল উপলব্ধি করে আবার ফিরে আসতে চাচ্ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স) একটি সেনাদল নিয়ে তাদের পেছনে ধাওয়া করে আসছেন একথা শুনে তাদের সব সাহস উবে যায়। এ কার্যক্রমের ফলে কুরাইশরা আগে বেড়ে যে হিম্মত দেখাতে চাচ্ছিল তা ভেঙে পড়ে, এর ফায়দা স্রেফ এতটুকুই হয়নি বরং আশপাশের দুশমন-নরাও জানতে পারে যে, মুসলমানদের নেতৃত্ব দান করছেন এক সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী অত্যন্ত সজাগ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং তাঁর ইংগিতে মুসলমানরা মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরানের ভূমিকা এবং ১২২ টীকা)।

তারপর যখনই বনী আসাদ মদীনার ওপর নৈশ আক্রমণ করার প্রস্তুতি চালাতে থাকে, নবী করীম (স)-এর গোয়েন্দারা যথাসময়েই তাদের সংকল্পের খবর তাঁর কানে পৌছিয়ে দেয়। তাদের আক্রমণ করার আগেই তিনি হযরত আবু সালামার (উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামার প্রথম স্বামী) নেতৃত্বে দেড়শো লোকের একটি বাহিনী তাদের মোকাবিলা করার জন্য পাঠান। এ সেনাদল হঠাৎ তাদের ওপর আক্রমণ চালায় । অসচেতন অবস্থায় তারা নিজেদের সবকিছু ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। ফলে তাদের সমস্ত সহায়-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়।

এরপর আসে বনী নযীরের পালা। যেদিন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শহীদ করার ষড়যন্ত্র করে এবং সে গোপন কথা প্রকাশ হয়ে যায় সেদিনই তিনি তাদেরকে নোটিশ দিয়ে দেন, দশ দিনের মধ্যে মদীনা ত্যাগ করো এবং এরপর তোমাদের যাকেই এখানে দেখা যাবে তাকেই হত্যা করা হবে। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদেরকে অভয় দিয়ে বলে যে, অবিচল থাকো এবং মদীনা ত্যাগ করতে অস্বীকার করো, আমি দু'হাজার লোক নিয়ে তোমাদের সাহায্য করবো। বনী কুরাইযা তোমাদের সাহায্য করবে। নজ্‌দ থেকে বনী গাত্‌ফানও তোমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। এসব কথায় সাহস পেয়ে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে পাঠায়, আমরা নিজেদের এলাকা ত্যাগ করবো না, আপনার যা করার করেন। নবী করীম (স) নোটিশের মেয়াদ শেষ হবার সাথে সাথেই তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলেন, তাদের সহযোগীদের একজনেরও সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসার সাহস হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারা এ শর্তে অস্ত্র সম্বরণ করে যে, তাদের প্রত্যেক তিন ব্যক্তি একটি উটের পিঠে যে পরিমাণ সম্ভব সহায়-সম্পদ বহন করে নিয়ে চলে যাবে এবং বাদবাকি সবকিছু মদীনায় রেখে যাবে। এভাবে মদীনার শহরতলীর সমস্ত মহল্লা যেখানে বনী নযীর থাকতো, তাদের সমস্ত বাগান, দুর্গ, পরিখা, সাজ-সরঞ্জাম সবকিছু মুসলমানদের হাতে চলে আসে। অন্যদিকে এ প্রতিশ্রুতি ভংগকারী গোত্রের লোকেরা খায়বার, আল কুরা উপত্যকা ও সিরিয়ায় বিক্ষিপ্তভাবে বসতি স্থাপন করে।

তারপর তিনি বনী গাত্‌ফানের দিকে নজর দেন। তারা আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত নিচ্ছিল । তিনি চারশো সেনার একটি বাহিনী নিয়ে বের হয়ে পড়েন এবং যাতুর

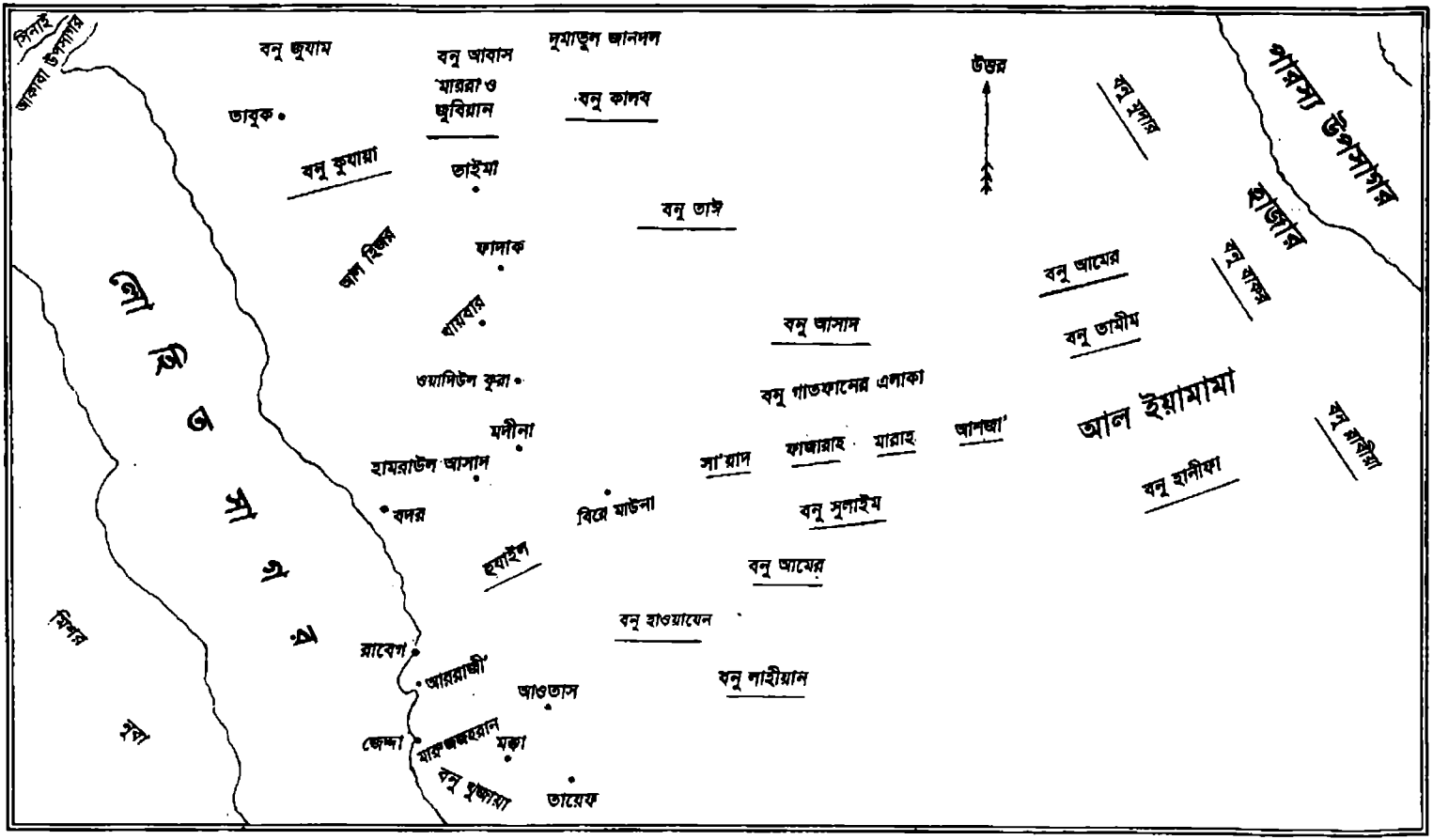

রসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে আরবের বিভিন্ন গোত্রের এলাকা

রিকা' নামক স্থানে গিয়ে তাদেরকে ধরে ফেলেন। এ অতর্কিত হামলায় তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং কোন যুদ্ধ ছাড়াই নিজেদের রাড়িঘর মাল–সামান সবকিছু ফেলে রেখে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

এরপর ৪ হিজরীর শাবান মাসে তিনি আবু সুফিয়ানের চ্যালেঞ্জের জবাব দেবার জন্য বের হয়ে পড়েন। ওহোদ থেকে ফেরার সময় আবু সুফিয়ান এ চ্যালেঞ্জ দেয়। যুদ্ধ শেষে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের দিকে ফিরে ঘোষণা দিয়েছিল ঃ ان موعدكم بدر للعام المقبل (আগামী বছর বদরের ময়দানে আবার আমাদের ও তোমাদের মোকাবিলা হবে।) নবী করীম (সা) জবাবে একজন সাহাবীর মাধ্যমে ঘোষণা করে দেন ঃ نعم ، هى بيننا وبينك موعد (ঠিক আছে, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একথা স্থিরীকৃত হলো।) এ সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্দিষ্ট দিনে তিনি দেড় হাজার সাহাবীদের নিয়ে বদরে উপস্থিত হন। ওদিকে আবু সুফিয়ান দু'হাজার সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হয়। কিন্তু মার্‌রায্‌ মাহ্‌রান (বর্তমান ফাতিমা উপত্যকা) থেকে সামনে অগ্রসর হবার হিম্মত হয়নি। নবী করীম (সা) আট দিন পর্যন্ত বদরে অপেক্ষা করেন। এ অন্তরবর্তীকালে ব্যবসায় করে মুসলমানরা বেশ দু'পয়সা কামাতে থাকে। এ ঘটনার ফলে ওহোদে মুসলমানদের যে প্রভাবহানি ঘটে তা আগের চাইতেও আরো কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এর ফলে সারা আরবদেশে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কুরাইশ গোত্র একা আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখে না। (এ সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ১২৪ টীকা)

আর একটি ঘটনা এ প্রভাব আরো বাড়িয়ে দেয়। আরব ও সিরিয়া সীমান্তে দূমাতুল জান্‌দাল (বর্তমান আল জওফ) ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সেখান থেকে ইরাক এবং মিসর ও সিরিয়ার মধ্যে আরবের বাণিজ্যিক কাফেলা যাওয়া আসা করতো। এ জায়গার লোকেরা কাফেলাগুলোকে বিপদগ্রস্ত এবং অধিকাংশ সময় লুণ্ঠন করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৫ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এক হাজার সৈন্য নিয়ে তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য নিজেই সেখানে যান। তারা তাঁর মোকাবিলা করার সাহস করেনি। লোকালয় ছেড়ে তারা পালিয়ে যায়। এর ফলে দক্ষিণ আরবের সমস্ত এলাকায় ইসলামের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং বিভিন্ন গোত্র ও উপজাতি মনে করতে থাকে মদীনায় যে প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির উন্মেষ ঘটেছে তার মোকাবিলা করা এখন আর একটি দু'টি গোত্রের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

আহ্‌যাবের যুদ্ধ

এ অবস্থায় আহ্‌যাব যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটি ছিল আসলে মদীনার এ শক্তিটিকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য আরবের বহুসংখ্যক গোত্রের একটি সম্মিলিত হামলা। এর উদ্যোগ গ্রহণ করে বনী নযীরের মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে খয়বরে বসতি স্থাপনকারী নেতারা। তারা বিভিন্ন এলাকা সফর করে কুরাইশ, গাত্‌ফান, হুযাইল ও অন্যান্য বহু গোত্রকে একত্র হয়ে সম্মিলিতভাবে বিরাট বাহিনী নিয়ে মদীনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে।

এভাবে তাদের প্রচেষ্টায় ৫ হিজরীর শাওয়াল মাসে আরবের বিভিন্ন গোত্রের এক বিরাট বিশাল সম্মিলিত বাহিনী এ ক্ষুদ্র জনপদ আক্রমণ করে। এতবড় বাহিনী আরবে ইতিপূর্বে আর কখনো একত্র হয়নি। এতে যোগ দেয় উত্তর থেকে বনী নযীর ও বনী কাইনুকার ইহুদিরা। এরা মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে খয়বর ও ওয়াদিউল কুরায় বসতি স্থাপন করেছিল। পূর্ব থেকে যোগ দেয় গাত্ফানের গোত্রগুলো (বনু সালীম, ফাযারাহ, মুর্রাহ, আশ্জা', সা'আদ ও আসাদ ইত্যাদি)। দক্ষিণ থেকে এগিয়ে আসে কুরাইশ তাদের বন্ধু গোত্রগুলোর সমন্বয়ে গঠিত বিশাল বাহিনী সহকারে। এদের সবার সম্মিলিত সংখ্যা দশ বারো হাজারের কম হবে না।

এটা যদি অতর্কিত আক্রমণ হতো তাহলে তা হতো ভয়াবহ ধ্বংসকর। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা তাইয়েবায় নির্লিপ্ত ও নিষ্ক্রিয় বসে ছিলেন না। বরং সংবাদদাতারা এবং সমস্ত গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা ইসলামী আন্দোলনের সহযোগী ও প্রভাবিত লোকেরা তাঁকে দুশমনদের চলাফেরা ও প্রত্যেকটি গতিবিধি সম্পর্কে সর্বক্ষণ খবরাখবর সরবরাহ করে আসছিলেন।* এ বিশাল বাহিনী তাঁর শহরে পৌঁছুবার আগেই ছ'দিনের মধ্যেই তিনি মদীনার উত্তর পশ্চিম দিকে পরিখা খনন করে ফেলেন এবং সাল্'আ পর্বতকে পেছনে রেখে তিন হাজার সৈন্য নিয়ে পরিখার আশ্রয়ে প্রতিরক্ষা যুদ্ধ পরিচালনা করতে প্রস্তুত হন। মদীনার দক্ষিণে বাগান ও গাছপালার পরিমাণ ছিল এত বেশী (এবং এখনো আছে) যে, সেদিক থেকে কোন আক্রমণ চালানো সম্ভব ছিল না। পূর্বদিকে ছিল লাভার পর্বতমালা। তার ওপর সম্মিলিত সৈন্য পরিচালনা করা কোন সহজ কাজ ছিল না। পশ্চিম দক্ষিণকোণের অবস্থাও এ একই ধরনের ছিল। তাই আক্রমণ হতে পারতো একমাত্র ওহোদের পূর্ব ও পশ্চিম কোণগুলো থেকে। নবী করীম (সা) এদিকেই পরিখা খনন করে নগরীকে সংরক্ষিত করে নেন। আসলে মদীনার বাইরে পরিখার মুখোমুখি হতে হবে, এটা কাফেররা ভাবতেই পারেনি। তাদের যুদ্ধের নীল নক্শায় আদতে এ জিনিসটি ছিলই না। কারণ আরববাসীরা এ ধরনের প্রতিরক্ষার সাথে পরিচিত ছিল না। ফলে বাধ্য হয়েই সেই শীতকালে তাদেরকে একটি দীর্ঘ স্থায়ী অবরোধের জন্য তৈরি হতে হয়। অথচ এ জন্য তারা গৃহ ত্যাগ করার সময় প্রস্তুতি নিয়ে আসেনি।

এরপর কাফেরদের জন্য শুধুমাত্র একটা পথই খোলা ছিল। তারা ইহুদি গোত্র বনী কুরাইযাকে বিশ্বাসঘাতকতায় উদ্বুদ্ধ করতে পারতো। এ গোত্রটির বসতি ছিল মদীনার দক্ষিণ পূর্ব কোণে। যেহেতু এ গোত্রটির সাথে মুসলমানদের যথারীতি মৈত্রী চুক্তি ছিল এবং এ চুক্তি অনুযায়ী মদীনা আক্রান্ত হলে তারা মুসলমানদের সাথে মিলে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হতে বাধ্য, তাই মুসলমানরা এদিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেদের পরিবার ও ছেলেমেয়েদেরকে বনী কুরাইযার সন্নিহিত এলাকায় পাঠিয়ে দেয় এবং সেদিকে প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা করেনি। কাফেররা মুসলমানদের প্রতিরক্ষার এ দুর্বল দিকটি আঁচ

* জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর মোকাবিলায় একটি আদর্শবাদী আন্দোলনের প্রাধান্যের এটি হয় একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। জাতীয়তাবাদীরা শুধুমাত্র নিজেদের জাতির সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমর্থন ও সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল হয়। কিন্তু একটি আদর্শবাদী ও নীতিবাদী অন্দোলন নিজের দাওয়াতের মাধ্যমে সবদিকে এগিয়ে চলে এবং স্বয়ং ঐ জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলোর মধ্য থেকেও তার সমর্থক বের করে আনে।

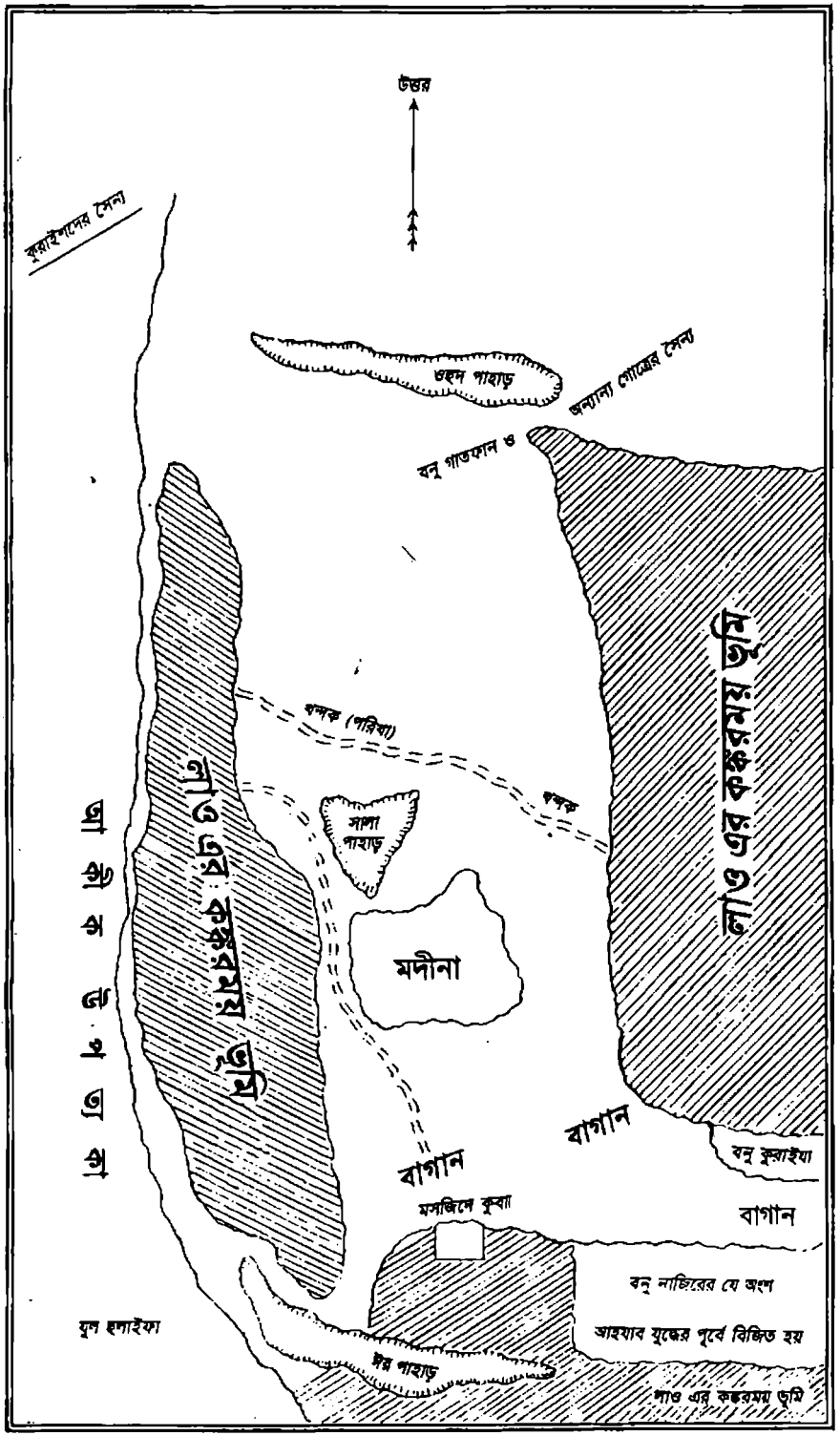

খন্দক যুদ্ধক্ষেত্রের নকশা

করতে পারে। তাদের পক্ষ থেকে বনী নযীরের ইহুদি সরদার হুয়াই ইবনে আখ্‌তাবকে বনী কুরাইযার কাছে পাঠানো হয়। বনী কুরাইযাকে চুক্তি ভংগ করে দ্রুত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করানোই ছিল তার কাজ। প্রথমদিকে তারা অস্বীকার করে এবং তাদেরকে পরিষ্কার বলে দেয়, মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে আমরা চুক্তিবদ্ধ এবং আজ পর্যন্ত তিনি আমাদের সাথে এমন কোন ব্যবহার করেননি যার ফলে আমরা তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনতে পারি। কিন্তু যখন ইবনে আখ্‌তাব তাদেরকে বললো, "দেখো, আমি এখন সারা আরবের সম্মিলিত শক্তিকে এ ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছি। একে খতম করে দেবার এটি একটি অপূর্ব সুযোগ। এ সুযোগ হাতছাড়া করলে এরপর আর কোন সুযোগ পাবে না" তখন ইহুদি জাতির চিরাচরিত ইসলাম বৈরী মানসিকতা নৈতিকতার মর্যাদা রক্ষার ওপর প্রাধান্য লাভ করে এবং বনী কুরাইযা চুক্তি ভংগ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারেও বেখবর ছিলেন না। তিনি যথা সময়ে এ খবর পেয়ে যান। সংগে সংগেই তিনি আনসার সরদারদেরকে (সা'দ ইবনে উবাদাহ, সা'দ ইবনে মু'আয, আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা ও খাওয়াত ইবনে জুবাইর) ঘটনা তদন্ত করার এবং এ সংগে তাদের বুঝাবার জন্য পাঠান। যাবার সময় তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন, যদি বনী কুরাইযা চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে ফিরে এসে সমগ্র সেনাদলকে সুস্পষ্ট ভাষায় এ খবর জানিয়ে দেবে। কিন্তু যদি তারা চুক্তি ভংগ করতে বদ্ধ-পরিকর হয় তাহলে শুধুমাত্র আমাকে ইংগিতে এ খবরটি দেবে, যাতে এ খবর শুনে সাধারণ মুসলমানরা হিম্মতহারা হয়ে না পড়ে। এ সরদারগণ সেখানে পৌঁছে দেখেন বনি কুরাইযা তাদের নোংরা চক্রান্ত বাস্তবায়নে পুরোপুরি প্রস্তুত। তারা প্রকাশ্যে তাঁদেরকে জানিয়ে দেয় لا عقد بيننا وبين محمد ولا عهد "আমাদের ও মুহাম্মাদের মধ্যে কোন অংগীকার ও প্রতিশ্রুতি নেই।" এ জবাব শুনে তারা মুসলিম সেনাদলের মধ্যে ফিরে আসেন এবং ইংগিতে রসূলে করীমকে (সা) জানান عضل وقاره অর্থাৎ 'আদল ও কারাহ ইসলাম প্রচারক দলের সাথে রাজী' নামক স্থানে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল বনী কুরাইযা এখন তাই করছে।

এ খবরটি অতি দ্রুত মদীনার মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মধ্য ব্যাপক অস্থিরতা দেখা দেয়। কারণ এখন তারা দু'দিক থেকেই ঘেরাও হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের শহরের যে অংশে তারা কোন প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়নি সে অংশটি বিপদের সম্মুখীন হয়ে গিয়েছিল। তাদের সন্তান ও পরিবারের লোকেরা সে অংশেই ছিল। এর ফলে মুনাফিকদের তৎপরতা অনেক বেশী বেড়ে যায়। মু'মিনদের উৎসাহ-উদ্যম নিস্তেজ করে দেবার জন্য তাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের মনস্তাত্ত্বিক হামলা শুরু করে দেয়। কেউ বলে, "আমাদের সাথে অংগীকার করা হয়েছিল পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য জয় করা হবে কিন্তু এখন অবস্থা এমন যে আমরা পেশাব পায়খানা করার জন্যও বের হতে পারছি না।" কেউ একথা বলে খন্দক যুদ্ধের ময়দান থেকে ছুটি চাইতে থাকে যে, এখন তো আমাদের গৃহও বিপদাপন্ন, সেখানে গিয়ে সেগুলো রক্ষা করতে হবে। কেউ এমন ধরনের গোপন প্রচারণাও শুরু করে দেয় যে, আক্রমণকারীদের সাথে আপোষ রফা করে নাও এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের হাতে তুলে দাও। এটা এমন একটা

কঠিন পরীক্ষার সময় ছিল যার মধ্যে পড়ে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির মুখোস উন্মোচিত হয়ে গেছে যার অন্তরে সামান্য পরিমাণও মুনাফিকী ছিল। একমাত্র সাচ্চা ও আন্তরিকতা সম্পন্ন ঈমানদাররাই এ কঠিন সময়েও আত্মোৎসর্গের সংকল্পের ওপর অটল থাকে।

এহেন নাজুক সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাত্ফানদের সাথে সন্ধির কথাবার্তা চালাতে থাকেন এবং তাদেরকে মদীনায় উৎপাদিত ফলের এক তৃতীয়াংশ নিয়ে ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। কিন্তু যখন আনসার সরদার বৃন্দের (সা'দ ইবনে উবাদাহ ও সা'দ ইবনে মু'আয) সাথে তিনি চুক্তির এ শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা করেন তখন তাঁরা বলেন, "হে আল্লাহর রসূল! আমরা এমনটি করবো এটা কি আপনার ইচ্ছা? অথবা এটা আল্লাহর হুকুম, যার ফলে আমাদের জন্য এটা করা ছাড়া আর কোন পথ নেই? না কি নিছক আমাদেরকে বাঁচাবার একটি ব্যবস্থা হিসেবে আপনি এ প্রস্তাব দিচ্ছেন?" জবাবে তিনি বলেন, "আমি কেবল তোমাদের বাঁচাবার জন্য এ ব্যবস্থা অবলম্বন করছি। কারণ আমি দেখছি সমগ্র আরব একজোট হয়ে তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমি তাদের এক দলকে অন্য দলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাই।" একথায় উভয় সরদার এক কণ্ঠে বলেন, "যদি আপনি আমাদের জন্য এ চুক্তি করতে এগিয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে তা খতম করে দিন। যখন আমরা মুশরিক ছিলাম তখনও এ গোত্রগুলো আমাদের কাছ থেকে একটি শস্যদানাও কর হিসেবে আদায় করতে পারেনি, আর আজ তো আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার গৌরবের অধিকারী। এ অবস্থায় তারা কি এখন আমাদের থেকে কর উসূল করবে? আমাদের ও তাদের মাঝখানে এখন আছে শুধুমাত্র তলোয়ার যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের ও তাদের মধ্যে ফায়সালা না করে দেন।" একথা বলে তাঁরা চুক্তিপত্রের খসড়াটি ছিঁড়ে ফেলে দেন, যার ওপর তখনো স্বাক্ষর করা হয়নি।

এ সময় গাত্ফান গোত্রের আশ্জা' শাখার না'ঈম ইবনে মাস'উদ নামক এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আসেন। তিনি বলেন, এখনো কেউ আমার ইসলাম গ্রহণের খবর জানে না। আপনি আমাকে দিয়ে যে কোন কাজ করাতে চান আমি তা করতে প্রস্তুত। নবী করীম (সা) বলেন, তুমি গিয়ে শত্রুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করো।* একথায় তিনি প্রথমে যান বনী কুরাইযার কাছে। তাদের সাথে তাঁর মেলামেশা ছিল খুব বেশী। তাদেরকে গিয়ে বলেন, কুরাইশ ও গাতফান তো অবরোধে বিরক্ত হয়ে এক সময় ফিরে যেতেও পারে। এতে তাদের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু তোমাদের তো মুসলমানদের সাথে এখানে বসবাস করতে হবে। তারা চলে গেলে তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে? আমার মতে তোমরা ততক্ষণ যুদ্ধে অংশ নিয়ো না যতক্ষণ বাইর থেকে আগত গোত্রগুলোর মধ্য থেকে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ লোককে তোমাদের কাছে যিম্মী হিসেবে না রাখে। একথা বনী কুরাইযার মনে ধরলো। তারা গোত্রসমূহের সংযুক্ত ফ্রন্টের কাছে যিম্মী চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। এরপর তিনি কুরাইশ ও গাত্ফানের সরদারদের কাছে যান। তাদেরকে বলেন, বনী কুরাইযা কিছুটা শিথিল হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তারা তোমাদের কাছে যদি যিম্মী হিসেবে কিছু লোক চায় তাহলে

* এ সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন الحرب خدعة অর্থাৎ যুদ্ধে প্রতারণা করা বৈধ।

আশ্চর্য হবার কিছু নেই এবং তাদেরকে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাতে সোপর্দ করে আপোষ রফা করে নিতে পারে। কাজেই তাদের সাথে সতকর্তার সাথে কাজ করা উচিত। এর ফলে সম্মিলিত জোটের নেতারা বনী কুরাইযার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে। তারা কুরাইযা নেতৃবৃন্দের কাছে বার্তা পাঠায় যে, দীর্ঘ অবরোধে আমাদের জন্য বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। এখন আমরা চাই একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ। আগামীকাল তোমরা ওদিক থেকে আক্রমণ করো, আমরা একই সংগে এদিক থেকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালাবো। বনী কুরাইযা জবাবে বলে পাঠায়, আপনারা যতক্ষণ যিম্মী স্বরূপ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে আমাদের হাওয়ালা করে না দেন ততক্ষণ আমরা যুদ্ধের বিপদের সম্মুখীন হতে পারি না। এ জবাব শুনে সম্মিলিত জোটের নেতারা না'ঈমের কথা সঠিক ছিল বলে বিশ্বাস করে। তারা যিম্মী দিতে অস্বীকার করে। ফলে বনী কুরাইযা বিশ্বাস করে না'ঈম আমাদের সঠিক পরামর্শ দিয়েছিল। এভাবে এ যুদ্ধ কৌশল বড়ই সফল প্রমাণিত হয়। এর ফলে শত্রুশিবিরে ফাটল সৃষ্টি হয়।

এখন অবরোধ কাল ২৫ দিন থেকেও দীর্ঘ হতে চলছিল। শীতের মওসুম চলছিল। এত বড় সেনাদলের জন্য পানি, আহার্যদ্রব্য ও পশুখাদ্য সংগ্রহ করা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে চলছিল, অন্যদিকে বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার কারণে অবরোধকারীদের উৎসাহেও ভাটা পড়েছিল। এ অবস্থায় এক রাতে হঠাৎ ভয়াবহ ধূলিঝড় শুরু হয়। এ ঝড়ের মধ্যে ছিল শৈত্য, বজ্রপাত ও বিজলী চমক এবং অন্ধকার ছিল এত গভীর যে নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। প্রবল ঝড়ে শত্রুদের তাঁবুগুলো তছনছ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে ভীষণ হৈ-হাংগামা সৃষ্টি হয়। আল্লাহর কুদরাতের এ জবরদস্ত আঘাত তারা সহ্য করতে পারেনি। রাতের অন্ধকারেই প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহের পথ ধরে। সকালে মুসলমানরা জেগে উঠে ময়দানে একজন শত্রুকেও দেখতে পায়নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ময়দান শত্রুশূন্য দেখে সংগে সংগেই বলেন ঃ

لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم

"এরপর কুরাইশরা আর কখনো তোমাদের ওপর আক্রমণ চালাবে না এখন তোমরা তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে।" এটি ছিল অবস্থার একেবারে সঠিক বিশ্লেষণ। কেবল কুরাইশ নয়, সমস্ত শত্রু গোত্রগুলো একত্র হয়ে সম্মিলিতভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে নিজেদের শেষ অস্ত্র হেনেছিল। এতে হেরে যাওয়ার পরে এখন আর তাদের মদীনার ওপর আক্রমণ করার সাধ্য ছিল না। এখন আক্রমণাত্মক শক্তি (Offensive) শত্রুদের হাত থেকে মুসলমানদের হাতে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

বনী কুরাইযার যুদ্ধ

খন্দক থেকে গৃহে ফিরে আসার পর যোহরের সময় জিব্রীল (আ) এসে হুকুম শুনালেন, এখনই অস্ত্র নামিয়ে ফেলবেন না। বনী কুরাইযার ব্যাপারটির এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। এ মুহূর্তেই তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেয়া দরকার। এ হুকুম পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি ঘোষণা করে দিলেন, "যে ব্যক্তিই শ্রবণ ও আনুগত্যের ওপর অবিচল আছো সে

আসরের নামায ততক্ষণ পর্যন্ত পড়ো না যতক্ষণ না বনী কুরাইযার আবাসস্থলে পৌঁছে যাও।" এ ঘোষণার সাথে সাথেই তিনি হযরত আলীকে (রা) একটি ক্ষুদ্র সেনাদলসহ অগ্রবর্তী সেনাদল হিসেবে বনী কুরাইযার দিকে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা যখন সেখানে পৌঁছলেন তখন ইহুদিরা নিজেদের গৃহের ছাদে উঠে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গালি বর্ষণ করলো। কিন্তু একেবারে ঠিক যুদ্ধের সময়েই তারা চুক্তি ভংগ করে এবং আক্রমণকারীদের সাথে মিলে মদীনার সমগ্র জনবসতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে যে মহাঅপরাধ করেছিল তার দণ্ড থেকে এ গালাগালি তাদেরকে কেমন করে বাঁচাতে পারতো? হযরত আলীর ক্ষুদ্র সেনাদল দেখে তারা মনে করেছিল এরা এসেছে নিছক ভয় দেখানোর জন্য। কিন্তু যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে পুরা মুসলিম সেনাদল সেখানে পৌঁছে গেলো এবং তাদের জনবসতি ঘেরাও করে নেয়া হলো তখন তাদের হুশ হলো। দু'তিন সপ্তাহের বেশী তারা অবরোধের কঠোরতা বরদাশ্‌ত করতে পারলো না। অবশেষে তারা এ শর্তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আত্মসমর্পণ করলো যে, আওস গোত্রের সরদার হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা) তাদের জন্য যা ফায়সালা করবেন উভয় পক্ষ তাই মেনে নেবে। তারা এ আশায় হযরত সা'দকে শালিস মেনেছিল যে, জাহেলিয়াতের যুগ থেকে আওস ও বনী কুরাইযার মধ্যে দীর্ঘকাল থেকে যে মিত্রতার সম্পর্ক চলে আসছিল তিনি সেদিকে নজর রাখবেন এবং তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে মদীনা থেকে বের হয়ে যাবার সুযোগ দেবেন যেমন ইতিপূর্বে বনী কাইনুকা' ও বনী নযিরকে দেয়া হয়েছিল। আওস গোত্রের লোকেরাও হযরত সা'দের কাছে নিজেদের মিত্রদের সাথে সদয় আচরণ করার দাবী করছিল। কিন্তু হযরত সা'দ মাত্র এই কিছুদিন আগেই দেখেছিলেন, দু'টি ইহুদি গোত্রকে মদীনা থেকে বের হয়ে যাবার সুযোগ দেয়া হয়েছিল এবং তারা কিভাবে আশপাশের সমস্ত গোত্রকে উত্তেজিত করে দশ বারো হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে এসেছিল। তারপর এ সর্বশেষ ইহুদি গোত্রটি একেবারে ঠিক বহিরাগত আক্রমণের সময়ই চুক্তিভংগ করে মদীনাবাসীদেরকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবার কি ষড়যন্ত্রটাই না করেছিল সে ঘটনা এখনো তাঁর সামনে তরতাজা ছিল। তাই তিনি ফায়সালা দিলেন ঃ বনী কুরাইযার সমস্ত পুরুষদেরকে হত্যা করা হোক, নারী ও শিশুদেরকে গোলামে পরিণত করা হোক এবং তাদের সমুদয় ধন-সম্পত্তি মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হোক। এ ফায়সালাটি বাস্তবায়িত করা হলো। এরপর মুসলমানরা প্রবেশ করলো বনী কুরাইযার পল্লীতে। সেখানে তারা দেখলো, আহযাব যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য এ বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠীটি ১৫ শত তলোয়ার, ৩ শত বর্ম, ২ হাজার বর্শা এবং ১৫ শত ঢাল গুদামজাত করে রেখেছে। মুসলমানরা যদি আল্লাহর সাহায্য লাভ না করতো তাহলে এ সমস্ত যুদ্ধাস্ত্র ঠিক এমন এক সময় পেছন থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা করার জন্য ব্যবহৃত হতো যখন সামনে থেকে মুশরিকরা একজোটে খন্দক পার হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ নিতো। এ বিষয়টি প্রকাশ হয়ে যাবার পর এখন আর এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশই থাকেনি যে, হযরত সা'দ ইহুদিদের ব্যাপারে যে ফায়সালা করেছিলেন তা সঠিক ছিল।

সামাজিক সংস্কার

ওহোদ যুদ্ধ ও আহযাব যুদ্ধের মাঝখানের এ দু'টি বছর যদিও এমন সংকট ও গোলযোগে পরিপূর্ণ ছিল যার ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ একদিনের জন্যও নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা লাভ করতে পারেননি, তারপরও এ সমগ্র সময়–কালে নতুন মুসলিম সমাজ গঠন এবং জীবনের প্রতিটি বিভাগে সংস্কার ও সংশোধনের কাজ অব্যাহতভাবে চলছিল। এ সময়েই মুসলমানদের বিয়ে ও তালাকের আইন প্রায় পূর্ণতা লাভ করেছিল। উত্তরাধিকার আইন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মদ ও জুয়াকে হারাম করা হয়েছিল। অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থার অন্যান্য বহু দিকে নতুন বিধি প্রয়োগ করা হয়েছিল।

এ প্রসংগে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনযোগ্য বিষয় ছিল দত্তক গ্রহণ। আরবের লোকেরা যে শিশুটিকে দত্তক বা পালিত পুত্র বা কন্যা হিসেবে গ্রহণ করতো তাকে একেবারে তাদের নিজেদের গর্ভজাত সন্তানের মতো মনে করতো। সে উত্তরাধিকার লাভ করতো। তার সাথে দত্তক মাতা ও বোনেরা ঠিক তেমনি খোলামেলা থাকতো যেমন আপন পুত্র ও ভাইয়ের সাথে থাকা হয়। তার সাথে দত্তক পিতার কন্যার এবং এ পিতার মৃত্যুর পর তার বিধিবা স্ত্রীর বিবাহ ঠিক তেমনি অবৈধ মনে করা হতো যেমন সহোদর বোন ও গর্ভধারিনী মায়ের সাথে কারো বিয়ে হারায় হয়ে থাকে। পালক পুত্র মরে যাবার বা নিজের স্ত্রীকে তালাক দেবার পরও এ একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। দত্তক পিতার জন্য সেই স্ত্রীলোককে তার আপন ঔরসজাত সন্তানের স্ত্রীর মতো মনে করা হতো। এ রীতিটি বিয়ে, তালাক ও উত্তরাধিকারের যেসব আইন সূরা বাকারাহ ও সূরা নিসায় আল্লাহ বর্ণনা করেছেন তার সাথে পদে পদে সংঘর্ষশীল ছিল। আল্লাহর আইনের দৃষ্টিতে যারা উত্তরাধিকারের প্রকৃত হকদার ছিল এ রীতি তাদের অধিকার গ্রাস করে এমন এক ব্যক্তিকে দিতো যার আদতে কোন অধিকারই ছিল না। এ আইনের দৃষ্টিতে যে সমস্ত পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিয়ে হালাল ছিল এ রীতি তা হারাম করে দিতো। আর সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে, ইসলামী আইন যেসব নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের পথরোধ করতে চায় এ রীতি সেগুলোর বিস্তারের পথ প্রশস্ত করতে সাহায্য করছিল। কারণ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দত্তক ভিত্তিক (মুখে ডাকা) আত্মীয়তার মধ্যে যতই পবিত্রতার ভাব সৃষ্টি করা হোক না কেন দত্তক মা, দত্তক বোন ও দত্তক কন্যা আসল মা, বোন ও কন্যার মতো হতে পারে না। এসব কৃত্রিম আত্মীয়তার লোকাচার ভিত্তিক পবিত্রতার ওপর নির্ভর করে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যখন প্রকৃত আত্মীয়দের মতো অবাধ মেলামেশা চলে তখন তা অনিষ্টকর ফলাফল সৃষ্টি না করে থাকতে পারে না। এসব কারণে ইসলামের বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকার আইন এবং যিনা হারাম হবার আইনের দাবী হচ্ছে এই যে, দত্তককে প্রকৃত সন্তানের মতো মনে করার ধারণাকে পুরোপুরি উচ্ছেদ করতে হবে।

কিন্তু এ ধারণাটি এমন পর্যায়ের নয় যে, শুধুমাত্র একটি আইনগত হুকুম হিসেবে এতটুকু কথা বলে দেয়া হলো যে, "দত্তক ভিত্তিক আত্মীয়তা প্রকৃত আত্মীয়তা নয়" এবং তারপর তা খতম হয়ে যাবে। শত শত বছরের অন্ধ কুসংস্কার নিছক মুখের কথায় বদলে যাবে না। আইনগতভাবে যদি লোকেরা একথা মেনেও নিতো যে, এ আত্মীয়তা প্রকৃত আত্মীয়তা নয়, তবুও পালক মা ও পালক পুত্রের মধ্যে, পালক ভাই ও পালক বোনের

মধ্যে, পালক বাপ ও পালক মেয়ের মধ্যে এবং পালক শ্বশুর ও পালক পুত্রবধুর মধ্যে বিয়েকে লোকেরা মাকরূহই মনে করতে থাকতো। তাছাড়া তাদের মধ্যে অবাধ মেলামেশাও কিছু না কিছু থেকে যেতো। তাই কার্যত এ রেওয়াজটি ভেঙে ফেলাই অপরিহার্য ছিল। আর ভেঙে ফেলার এ কাজটি স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতেই সম্পন্ন হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কারণ যে কাজটি রসূল নিজে করেছেন এবং আল্লাহর হুকুমে করেছেন তার ব্যাপারে কোন মুসলমানের মনে কোন প্রকার অপছন্দনীয় হবার ধারণা থাকতে পারতো না। তাই আহ্যাব যুদ্ধের কিছু পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইশারা করা হয় যে, তুমি নিজের পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসার তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে নিজেই বিয়ে করে নাও। বনী কুরাইযাকে অবরোধ করার সময় তিনি এ হুকুমটি তামিল করেন। (সম্ভবত ইদ্দত খতম হওয়ার জন্য অপেক্ষা করাই ছিল বিলম্বের কারণ। আবার এ সময় যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজের চাপও বেড়ে গিয়েছিল।)

যয়নবকে বিয়ে করার ফলে তুমুল অপপ্রচার

এ বিয়ে হওয়ার সাথে সাথেই নবী করীমের (সা) বিরুদ্ধে অকস্মাত ব্যাপক অপপ্রচার শুরু হয়ে যায়। মুশরিক, মুনাফিক ও ইহুদি সবাই তাঁর ক্রমাগত বিজয়ে জ্বলে পুড়ে মরছিল। ওহোদের পরে আহযাব ও বনী কুরাইযার যুদ্ধ পর্যন্ত দু'টি বছর ধরে যেভাবে তারা একের পর এক মার খেতে থেকেছে তার ফলে তাদের মনে আগুন জ্বলছিল দাউদাউ করে। এখন প্রকাশ্য ময়দানে যুদ্ধ করে আর কোন দিন তাঁকে হারাতে পারবে, এ ব্যাপারেও তারা নিরাশ হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা এ বিয়ের ব্যাপারটিকে নিজেদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটি সুযোগ মনে করে এবং ধারণা করে যে, এবার আমরা মুহাম্মাদের (সা) শক্তি ও তাঁর সাফল্যের মূলে রয়েছে যে চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব তাকে খতম করে দিতে পারবো। কাজেই গল্প ফাঁদা হয়, (নাউযুবিল্লাহ) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পুত্রবধূকে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। পুত্র এ প্রেমের কথা জানতে পেরে নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন। আর এরপর তিনি পুত্রবধূকে বিয়ে করে ফেলেন। অথচ এটা ছিল একদম বাজে কথা। কারণ হযরত যয়নব (রা) ছিলেন নবী করীমের (সা) ফুফাত বোন। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত তাঁর সমস্ত সময়টা অতিবাহিত হয় নবী করীমের (সা) সামনে। কোন এক সময় তাঁকে দেখে আসক্ত হবার প্রশ্ন কোথা থেকে আসে? তারপর রসূল (সা) নিজেই বিশেষ উদ্যোগী হয়ে হযরত যায়েদের (রা) সাথে তাঁর বিবাহ দেন। কুরাইশ বংশের মতো সম্ভ্রান্ত গোত্রের একটি মেয়েকে একজন আযাদকৃত গোলামের সাথে বিয়ে দেবার ব্যাপারে তাঁর পরিবারের কেউই রাজী ছিল না। হযরত যয়নব (রা) নিজেও এ বিয়েতে অখুশী ছিলেন। কিন্তু নবী করীমের (সা) হুকুমের সামনে সবাই হযরত যায়েদের (রা) সাথে তাঁকে বিয়ে দিতে বাধ্য হন। এভাবে তাঁরা সমগ্র আরবে এ মর্মে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যে, ইসলাম একজন আযাদকৃত গোলামকে, অভিজাত বংশীয় কুরাইশীদের সমপর্যায়ে নিয়ে এসেছে। সত্যিই যদি হযরত যয়নবের (রা) প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন আকর্ষণ থাকতো, তাহলে যায়েদ ইবনে হারেসার (রা) সাথে তাঁকে বিয়ে দেবার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি নিজেই তাঁকে বিয়ে

করতে পারতেন। কিন্তু নির্লজ্জ বিরোধীরা এসব নিরেট সত্যের উপস্থিতিতেও এ প্রেমের গল্প ফেঁদে বসে। খুব রঙ চড়িয়ে এগুলো ছড়াতে থাকে। অপপ্রচারের অভিযান ক্রমে এত প্রবল হয় যে, তার ফলে মুসলমানদের মধ্যেও তাদের তৈরি করা গল্প ছড়িয়ে পড়ে।

পর্দার প্রাথমিক বিধান

শত্রুদের এ মনগড়া কাহিনী যে মুসলমানদের মুখ দিয়েও রটিত হতে বাধেনি, এ দ্বারা স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, সমাজে যৌনতার উপাদান সীমাতিরিক্ত বেড়ে গিয়েছিল। সমাজ জীবনে এ নোংরামিটা যদি না থাকতো তাহলে এ ধরনের পাক-পবিত্র ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এমন ভিত্তিহীন, অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ মনগড়া কাহিনী মুখে উচ্চারিত হওয়া তো দূরের কথা সেদিকে কারো বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করাও সম্ভবপর হতো না। যে সংস্কারমূলক বিধানটিকে "হিজাব" (পর্দা) নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে এটি ছিল ইসলামী সমাজে তার প্রবর্তন শুরু করার সঠিক সময়। এ সূরা থেকেই এ সংস্কার কাজের সূচনা করা হয় এবং এক বছর পরে যখন হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অপবাদের কদর্য অভিযানটি চালানো হয় তখনই সূরা নূর নাযিল করে এ বিধানকে সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত করা হয়। (আরো বেশী বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূরের ভূমিকা।)

রসূলের পারিবারিক জীবনের বিষয়াবলী

এ সময়ে আরো দু'টি বিষয় ছিল দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। যদিও আপাতদৃষ্টিতে এর সম্পর্ক ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পারিবারিক জীবনের সাথে কিন্তু যে সত্তা আল্লাহর দীনকে সম্প্রসারিত ও বিকশিত করার জন্য প্রাণান্ত সংগ্রাম-সাধনা করে চলছিলেন এবং নিজের সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ এ মহত কাজে নিয়োজিত করে রেখেছিলেন তাঁর জন্য পারিবারিক জীবনে শান্তি লাভ, তাকে মানসিক অস্থিরতামুক্ত রাখা এবং মানুষের সন্দেহ-সংশয় থেকে রক্ষা করা ও স্বয়ং দীন তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যও জরুরী ছিল। তাই আল্লাহ নিজেই সরাসরি এ দু'টি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন।

প্রথম বিষয়টি ছিল, সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চরম আর্থিক সংকটে ভুগছিলেন। প্রথম চার বছর তো তাঁর অর্থোপার্জনের কোন উপায়-উপকরণ ছিল না। চতুর্থ হিজরীতে বনী নযিরকে দেশান্তর করার পর তাদের পরিত্যক্ত ভূমির একটি অংশকে আল্লাহর হুকুমের মাধ্যমে তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। কিন্তু তাঁর পরিবারের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। এদিকে রিসালাতের দায়িত্ব ছিল এত বিরাট যে, তাঁর দেহ, মন ও মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তি এবং সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত এ কাজে ব্যয়িত হবার দাবী জানাচ্ছিল। ফলে নিজের অর্থোপার্জনের জন্য সামান্যতম চিন্তা ও প্রচেষ্টাও তিনি চালাতে পারতেন না। এ অবস্থায় তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ আর্থিক অনটনের কারণে যখন তাঁর মানসিক শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাতেন তখন তাঁর মনের ওপর দ্বিগুণ বোঝা চেপে বসতো।

দ্বিতীয় সমস্যাটি ছিল, হযরত যয়নবকে (রা) বিয়ে করার আগে তাঁর চারজন স্ত্রী ছিল। তাঁরা ছিলেন ঃ হযরত সওদা (রা), হযরত আয়েশা (রা), হযরত হাফ্‌সা (রা) ও হযরত উম্মে সালামা (রা)। উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব (রা) ছিলেন তাঁর পঞ্চম স্ত্রী। এর ফলে বিরোধীরা এ আপত্তি উঠালো এবং মুসলমানদের মনেও এ সন্দেহ দানা বাঁধতে লাগলো যে, তাদের জন্য তো এক সংগে চারজনের বেশী স্ত্রী রাখা অবৈধ গণ্য করা হয়েছে কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এ পঞ্চম স্ত্রী রাখলেন কেমন করে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

সূরা আহ্‌যাব নাযিল হবার সময় এ সমস্যাগুলোর উদ্ভব ঘটে এবং এখানে এগুলোই আলোচিত হয়েছে।

এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে এবং এর পটভূমি সামনে রাখলে পরিষ্কার জানা যায়, এ সমগ্র সূরাটি একটি ভাষণ নয়। একই সময় একই সংগে এটি নাযিল হয়নি। বরং এটি বিভিন্ন বিধান ও ফরমান সম্বলিত। এগুলো সে সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী প্রসংগে একের পর এক নাযিল হয় তারপর সবগুলোকে একত্র করে একটি সূরার আকারে বিন্যস্ত করা হয়। এর নিম্নলিখিত অংশগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

এক ঃ প্রথম রুকূ'। আহ্‌যাব যুদ্ধের কিছু আগে নাযিল হয়েছে বলে মনে হয়। ঐতিহাসিক পটভূমি সামনে রেখে এ রুকূ'টি পড়লে পরিষ্কার অনুভূত হবে, এ অংশটি নাযিল হবার আগেই হযরত যায়েদ (রা) হযরত যয়নবকে (রা) তালাক দিয়ে ফেলেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দত্তক সম্পর্কিত জাহেলী যুগের ধারণা, কুসংস্কার ও রসম–রেওয়াজ খতম করে দেবার প্রয়োজন অনুভব করছিলেন। তিনি এও অনুভব করছিলেন যে, লোকেরা "পালক" সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্রেফ আবেগের ভিত্তিতে যে ধরনের স্পর্শকাতর ও কঠোর চিন্তাধারা পোষণ করে তা কোনক্রমেই খতম হয়ে যাবে না যতক্ষণ না তিনি নিজে (অর্থাৎ নবী) অগ্রবর্তী হয়ে এ রেওয়াজটি খতম করে দেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি এ ব্যাপারেই বড় সন্দিহান ছিলেন এবং সামনে অগ্রসর হতেও ইতস্তত করছিলেন। কারণ যদি তিনি এ সময় হযরত যায়েদের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করেন তাহলে ইসলামের বিরুদ্ধে হাংগামা সৃষ্টি করার জন্য পূর্বে যেসব মুনাফিক, ইহুদি ও মুশরিকরা তৈরি হয়ে বসেছিল তারা এবার একটা বিরাট সুযোগ পেয়ে যাবে। এ সময় প্রথম রুকূ'র আয়াতগুলো নাযিল হয়।

দুই ঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় রুকূ'তে আহ্‌যাব ও বনী কুরাইযার যুদ্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে। এ দু'টি রুকূ' যে সংশ্লিষ্ট যুদ্ধ দু'টি হয়ে যাবার পর নাযিল হয়েছে এটি তার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

তিন ঃ চতুর্থ রুকূ' থেকে শুরু করে ৩৫ আয়াত পর্যন্ত যে ভাষণ দেয়া হয়েছে তা দু'টি বিষয়বস্তু সম্বলিত। প্রথম অংশে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণকে নোটিশ দিয়েছেন। এ অভাব অনটনের যুগে তারা বেসবর হয়ে পড়ছিলেন। তাঁদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা একদিকে দুনিয়া ও দুনিয়ার শোভা সৌন্দর্য এবং অন্যদিকে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাত এ দু'টির মধ্য থেকে যে কোন একটিকে বেছে নাও। যদি প্রথমটি

তোমাদের কাংখিত হয় তাহলে পরিষ্কার বলে দাও। তোমাদেরকে একদিনের জন্যও এ অনটনের মধ্যে রাখা হবে না বরং সানন্দে বিদায় করে দেয়া হবে। আর যদি দ্বিতীয়টি তোমাদের পছন্দ হয়, তাহলে সবর সহকারে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে সহযোগিতা করো। পরবর্তী অংশগুলোতে এমন সামাজিক সংস্কারের দিকে অগ্রণী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে যার প্রয়োজনীয়তা ইসলামী ছাঁচে ঢালাই করা মন-মগজের অধিকারী ব্যক্তিগণ স্বতস্ফূর্তভাবেই অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। এ প্রসংগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহ থেকে সংস্কারের সূচনা করতে গিয়ে নবীর পবিত্র স্ত্রীগণকে হুকুম দেয়া হয়েছে, তোমরা জাহেলী যুগের সাজসজ্জা পরিহার করো। আত্মমর্যাদা নিয়ে গৃহে বসে থাকো। বেগানা পুরুষদের সাথে কথা বলার ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করো। এ ছিল পর্দার বিধানের সূচনা।

চার ঃ ৪৬ থেকে ৪৮ পর্যন্ত আয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে হযরত যয়নবের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে সম্পর্কিত। বিরোধীদের পক্ষ থেকে এ বিয়ের ব্যাপারে যেসব আপত্তি উঠানো হচ্ছিল এখানে সেসবের জবাব দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের মনে যেসব সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছিল সেগুলো সবই দূর করে দেয়া হয়েছে। মুসলমানদেরকে নবীর (সা) মর্যাদা কি তা জানানো হয়েছে এবং খোদ নবীকে (সা) কাফের ও মুনাফিকদের মিথ্যা প্রচারণার মুখে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দেয়া হয়েছে।

পাঁচ ঃ ৪৯ আয়াতে তালাকের আইনের একটি ধারা বর্ণনা করা হয়েছে। এটি একটি একক আয়াত। সম্ভবত এসব ঘটনাবলী প্রসংগে কোন সময় এটি নাযিল হয়ে থাকবে।

ছয় ঃ ৫০ থেকে ৫২ আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য বিয়ের বিশেষ বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে একথা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমানদের ওপর যেসব বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছে নবীর (সা) ব্যাপারে তা প্রযোজ্য হবে না।

সাত ঃ ৫৩—৫৫ আয়াতে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদক্ষেপ উঠানো হয়েছে। এগুলো নিম্নলিখিত বিধান সম্বলিত ঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহাভ্যন্তরে বেগানা পুরুষদের যাওয়া আসার ওপর বিধি-নিষেধ, সাক্ষাত করা ও দাওয়াত দেবার নিয়ম-কানুন, নবীর পবিত্র স্ত্রীগণ সম্পর্কিত এ আইন যে, গৃহাভ্যন্তরে কেবলমাত্র তাঁদের নিকটতম আত্মীয়রাই আসতে পারেন, বেগানা পুরুষদের যদি কিছু বলতে হয় বা কোন জিনিস চাইতে হয় তাহলে পর্দার আড়াল থেকে বলতে ও চাইতে হবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের ব্যাপারে এ হুকুম যে, তাঁরা মুসলমানদের জন্যে নিজেদের মায়ের মতো হারাম এবং নবীর (সা) পরও তাঁদের কারো সাথে কোন মুসলমানদের বিয়ে হতে পারে না।

আট ঃ ৫৬ থেকে ৫৭ আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে ও তাঁর পারিবারিক জীবনের বিরুদ্ধে যেসব কথাবার্তা বলা হচ্ছিল সেগুলো সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এই সংগে মু'মিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন শত্রুদের পরনিন্দা ও অন্যের ছিদ্রান্বেষণ থেকে নিজেদের দূরে রাখে এবং নিজেদের নবীর ওপর দরূদ পাঠ করে। এ ছাড়া এ উপদেশও দেয়া হয় যে, নবী তো অনেক বড় কথা, ঈমানদারদের তো

সাধারণ মুসলমানদের বিরুদ্ধেও অপবাদ দেয়া ও দোষারোপ করা থেকে দূরে থাকা উচিত।

নয় ঃ ৫৯ আয়াতে সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে তৃতীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এতে সমগ্র মুসলিম নারী সমাজের যখনই বাইরে বের হবার প্রয়োজন হবে চাদর দিয়ে নিজেদেরকে ঢেকে এবং ঘোমটা টেনে বের হবার হুকুম দেয়া হয়েছে।

এরপর থেকে নিয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত গুজব ছড়ানোর অভিযানের (Whispering Campaign) বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দাবাদ ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। মুনাফিক, অকাটমূর্খ ও নিকৃষ্ট লোকেরা এ অভিযান চালাচ্ছিল।

আয়াত ৭৩ | সূরা আল আহযাব–মাদানী | রুকূ' ৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝ وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

হে নবী![১] আল্লাহকে ভয় করো এবং কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী।[২] তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যে বিষয়ের ইংগিত করা হচ্ছে তার অনুসরণ করো। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা সবই জানেন।[৩] আল্লাহর প্রতি নির্ভর করো। কর্ম সম্পাদনের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।[৪]

১. ওপরে ভূমিকায় বর্ণনা করে এসেছি, এ আয়াত এমন এক সময় নাযিল হয় যখন হযরত যায়েদ (রা) হযরত যয়নবকে (রা) তালাক দিয়েছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও অনুভব করেছিলেন এবং আল্লাহর ইশারাও এটিই ছিল যে, দত্তক সম্পর্কের ব্যাপারে জাহেলীয়াতের রসম–রেওয়াজ ও কুসংস্কারের ওপর আঘাত হানার এটিই মোক্ষম সময়। নবীর (সা) নিজেকে অগ্রসর হয়ে তাঁর দত্তক পুত্রের (যায়েদ) তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা উচিত। এভাবে এ রেওয়াজটি চূড়ান্তভাবে খতম হয়ে যাবে। কিন্তু যে কারণে নবী করীম (সা) এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে ইতস্তত করছিলেন তা ছিল এ আশংকা যে, এর ফলে তাঁর একের পর এক সাফল্যের কারণে যে কাফের ও মুশরিকরা পূর্বেই ক্ষিপ্ত হয়েই ছিল এখন তাঁর বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা করার জন্য তাঁরা একটি শক্তিশালী অস্ত্র পেয়ে যাবে। এটা তাঁর নিজের দুর্নামের আশংকা জনিত ভয় ছিল না। বরং এ কারণে ছিল যে, এর ফলে ইসলামের ওপর আঘাত আসবে, শত্রুদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়া বহু লোকের মনে ইসলাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা জন্মাবে, বহু নিরপেক্ষ লোক শত্রুপক্ষে যোগ দেবে এবং স্বয়ং মুসলমানদের মধ্যে যারা দুর্বল বুদ্ধি ও মননের অধিকারী তারা সন্দেহ–সংশয়ের শিকার হবে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে করতেন, জাহেলীয়াতের একটি রেওয়াজ পরিবর্তন করার জন্য এমন পদক্ষেপ উঠানো কল্যাণকর নয় যার ফলে ইসলামের বৃহত্তর উদ্দেশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ
الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ
قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ۝٤

আল্লাহ কোন ব্যক্তির দেহাভ্যন্তরে দু'টি হৃদয় রাখেননি।[৫] তোমাদের যেসব স্ত্রীকে তোমরা "যিহার" করো তাদেরকে আল্লাহ তোমাদের জননীও করেননি[৬] এবং তোমাদের পালক পুত্রদেরকেও তোমাদের প্রকৃত পুত্র করেননি।[৭] এসব তো হচ্ছে এমন ধরনের কথা যা তোমরা স্বমুখে উচ্চারণ করো, কিন্তু আল্লাহ এমন কথা বলেন যা প্রকৃত সত্য এবং তিনিই সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করেন।

২. ভাষণ শুরু করে প্রথম বাক্যেই আল্লাহ নবী করীমের (সা) এ আশংকার অবসান ঘটিয়েছেন। বক্তব্যের নিগূঢ় অর্থ হচ্ছে দীনের কল্যাণ কিসে এবং কিসে নয় এ বিষয়টি আমিই ভালো জানি। কোন্ সময় কোন্ কাজটি করতে হবে এবং কোন্ কাজটি অকল্যাণকর তা আমি জানি। কাজেই তুমি এমন কর্মনীতি অবলম্বন করো না যা কাফের ও মুনাফিকদের ইচ্ছার অনুসারী হয় বরং এমন কাজ করো যা হয় আমার ইচ্ছার অনুসারী। কাফের ও মুনাফিকদেরকে নয় বরং আমাকেই ভয় করা উচিত।

৩. এ বাক্যে সম্বোধন করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, মুসলমানদেরকেও ইসলাম বিরোধীদেরকেও। এর অর্থ হচ্ছে নবী যদি আল্লাহর হুকুম পালন করে দুর্নামের ঝুঁকি মাথা পেতে নেন এবং নিজের ইজ্জত আবরুর ওপর শত্রুর আক্রমণ ধৈর্যসহকারে বরদাশ্‌ত করেন তাহলে তাঁর বিশ্বস্ততামূলক কর্মকাণ্ড আল্লাহর দৃষ্টির আড়ালে থাকবে না। মুসলমানদের মধ্য থেকে যেসব লোক নবীর প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অবিচল থাকবে এবং যারা সন্দেহ-সংশয়ে ভুগবে তাদের উভয়ের অবস্থাই অগোচরে থাকবে না। কাফের ও মুনাফিকরা তাঁর দুর্নাম করার জন্য যে প্রচেষ্টা চালাবে সে সম্পর্কেও আল্লাহ বেখবর থাকবেন না। কাজেই ভয়ের কোন কারণ নেই। প্রত্যেকে যার যার কার্য অনুযায়ী যে পুরস্কার বা শাস্তি লাভের যোগ্য হবে তা সে অবশ্যই পাবে।

৪. এ বাক্যে আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁকে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তোমার ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে তা সম্পন্ন করো এবং সারা দুনিয়ার মানুষ যদি বিরোধিতায় এগিয়ে আসে তাহলেও তার পরোয়া করো না। মানুষ যখন নিশ্চিতভাবে জানবে উমুক হুকুমটি আল্লাহ দিয়েছেন তখন সেটি পালন করার মধ্যেই সমস্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে বলে তার পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া উচিত। এরপর তার মধ্যে কল্যাণ, সুবিধা ও প্রজ্ঞা খুঁজে বেড়ানো সেই ব্যক্তির নিজের কাজ নয় বরং তার কাজ হওয়া উচিত শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে তাঁর হুকুম পালন করা। বান্দা তার যাবতীয় বিষয় আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দেবে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি পথ দেখাবার জন্যও যথেষ্ট

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

পালক পুত্রদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পর্কিত করে ডাকো। এটি আল্লাহর কাছে বেশী ন্যায়সংগত কথা।[৮] আর যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জানো, তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই এবং বন্ধু।[৯] না জেনে যে কথা তোমরা বলো সেজন্য তোমাদের পাকড়াও করা হবে না, কিন্তু তোমরা অন্তরে যে সংকল্প করো সেজন্য অবশ্যই পাকড়াও হবে।[১০] আল্লাহ ক্ষমাকারী ও দয়াময়।[১১]

এবং সাহায্য করার জন্যও। আর তিনিই এ বিষয়ের নিশ্চয়তাও দেন যে, তাঁর পথনির্দেশের আলোকে কার্যসম্পাদনকারী ব্যক্তি কখনো অশুভ ফলাফলের সম্মুখীন হবে না।

৫. অর্থাৎ একজন লোক একই সংগে মু'মিন ও মুনাফিক, সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী এবং সৎ ও অসৎ হতে পারে না। তার বক্ষদেশে দু'টি হৃদয় নেই যে, একটি হৃদয়ে থাকবে আন্তরিকতা এবং অন্যটিতে থাকবে আল্লাহর প্রতি বেপরোয়া ভাব। কাজেই একজন লোক এক সময় একটি মর্যাদারই অধিকারী হতে পারে। সে মু'মিন হবে অথবা হবে মুনাফিক। সে কাফের হবে অথবা হবে মুসলিম। এখন যদি তোমরা কোন মু'মিনকে মুনাফিক বলো অথবা মুনাফিককে বলো মু'মিন, তাহলে তাতে প্রকৃত সত্যের কোন পরিবর্তন হবে না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আসল মর্যাদা অবশ্যই একটিই থাকবে।

৬. "যিহার" আরবের একটি বিশেষ পরিভাষা। প্রাচীনকালে আরবের লোকেরা স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করতে করতে কখনো একথা বলে বসতো, "তোমার পিঠ আমার কাছে আমার মায়ের পিঠের মতো।" একথা কারো মুখ থেকে একবার বের হয়ে গেলেই মনে করা হতো, এ মহিলা এখন তার জন্য হারাম হয়ে গেছে। কারণ সে তাকে তার মায়ের সাথে তুলনা করেছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন, স্ত্রীকে মা বললে বা মায়ের সাথে তুলনা করলে সে মা হয়ে যায় না। মা তো গর্ভধারিণী জন্মদাত্রী। নিছক মুখে মা বলে দিলে প্রকৃত সত্য বদলে যায় না। এর ফলে যে স্ত্রী ছিল সে তোমাদের মুখের কথায় মা হয়ে যাবে না। (এখানে যিহার সম্পর্কিত শরীয়াতের বিধান বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। যিহার সম্পর্কিত আইন বর্ণনা করা হয়েছে সূরা মুজাদিলার ২-৪ আয়াতে)

৭. এটি হচ্ছে বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্য। ওপরের দু'টি বাক্যাংশ এ তৃতীয় বক্তব্যটি বুঝাবার যুক্তি হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

৮. এ হুকুমটি পালন করার জন্য সর্বপ্রথম যে সংশোধনমূলক কাজটি করা হয় সেটি হচ্ছে এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পালক পুত্র হযরত যায়েদকে (রা) যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ বলার পরিবর্তে তাঁর প্রকৃত পিতার সাথে সম্পর্কিত করে যায়েদ

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّاۤ اَنْ تَفْعَلُوْۤا اِلٰۤى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝

নিসন্দেহে নবী ঈমানদারদের কাছে তাদের নিজেদের তুলনায় অগ্রাধিকারী,[১২] আর নবীদের স্ত্রীগণ তাদের মা।[১৩] কিন্তু আল্লাহর কিতাবের দৃষ্টিতে সাধারণ মু'মিন ও মুহাজিরদের তুলনায় আত্মীয়রা পরস্পরের বেশী হকদার। তবে নিজেদের বন্ধুবান্ধবদের সাথে কোন সদ্ব্যবহার (করতে চাইলে তা) তোমরা করতে পারো।[১৪] আল্লাহর কিতাবে এ বিধান লেখা আছে।

ইবনে হারেসাহ বলা শুরু করা হয়। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি ও নাসাঈ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, যায়েদ ইবনে হারেসাকে প্রথমে সবাই যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ বলতো। এ আয়াত নাযিল হবার পর তাঁকে যায়েদ ইবনে হারেসাহ বলা হতে থাকে। তাছাড়া এ আয়াতটি নাযিল হবার পর কোন ব্যক্তির নিজের আসল বাপ ছাড়া অন্য কারো সাথে পিতৃ সম্পর্ক স্থাপন করাকে হারাম গণ্য করা হয়। বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام

"যে ব্যক্তি নিজেকে আপন পিতা ছাড়া অন্য কারো পুত্র বলে দাবী করে, অথচ সে জানে ঐ ব্যক্তি তার পিতা নয়, তার জন্য জান্নাত হারাম।"

হাদীসে একই বিষয়বস্তু সম্বলিত অন্যান্য রেওয়াতও পাওয়া যায়। সেগুলোতে এ কাজটিকে মারাত্মক পর্যায়ের গুনাহ গণ্য করা হয়েছে।

৯. অর্থাৎ এ অবস্থাতেও খামাখা কোন ব্যক্তির সাথে তার পিতৃ-সম্পর্ক জুড়ে দেয়া ঠিক হবে না।

১০. এর অর্থ হচ্ছে, কাউকে সস্নেহে পুত্র বলে ফেললে এতে কোন গুনাহ হবে না। অনুরূপভাবে মা, মেয়ে, বোন, ভাই ইত্যাদি শব্দাবলীও যদি কারো জন্য নিছক ভদ্রতার খাতিরে ব্যবহার করা হয় তাহলে তাতে কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু যদি এরূপ নিয়ত সহকারে একথা বলা হয় যে, যাকে পুত্র ইত্যাদি বলা হবে তাকে যথার্থই এ সম্পর্কগুলোর যে প্রকৃত মর্যাদা সেই মর্যাদার অভিসিক্ত করতে হবে, এ ধরনের আত্মীয়দের যে অধিকার স্বীকৃত তা দান করতে হবে এবং তার সাথে ঠিক তেমনি সম্পর্ক

স্থাপন করতে হবে যেমন সেই পর্যায়ের আত্মীয়দের সাথে করা হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবেই এটি হবে আপত্তিকর এবং এ জন্য পাকড়াও করা হবে।

১১. এর একটি অর্থ হচ্ছে, ইতিপূর্বে এ ব্যাপারে যেসব ভুল করা হয়েছে আল্লাহ সেগুলো মাফ করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাদেরকে আর কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, না জেনে কোন কাজ করার জন্য আল্লাহ পাকড়াও করবেন না। যদি বিনা ইচ্ছায় এমন কোন কাজ করা হয় যার বাইরের চেহারা কোন নিষিদ্ধ কাজের মতো কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে সেই নিষিদ্ধ কাজটি করার ইচ্ছা ছিল না। তাহলে নিছক কাজটির বাইরের কাঠামোর ভিত্তিতে আল্লাহ শাস্তি দেবেন না।

১২. অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মুসলমানদের এবং মুসলমানদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে সম্পর্ক তা অন্যান্য সমস্ত মানবিক সম্পর্কের উর্ধ্বের এক বিশেষ ধরনের সম্পর্ক। নবী ও মু'মিনদের মধ্যে যে সম্পর্ক বিরাজিত, অন্য কোন আত্মীয়তা ও সম্পর্ক তার সাথে কোন দিক দিয়ে সামান্যতমও তুলনীয় নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের জন্য তাদের বাপ-মায়ের চাইতেও বেশী স্নেহশীল ও দয়াদ্র হৃদয় এবং তাদের নিজেদের চাইতেও কল্যাণকামী। তাদের বাপ-মা, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা তাদের ক্ষতি করতে পারে, তাদের সাথে স্বার্থপরের মতো ব্যবহার করতে পারে, তাদেরকে বিপথে পরিচালিত করতে পারে, তাদেরকে দিয়ে অন্যায় কাজ করাতে পারে, তাদেরকে জাহান্নামে ঠেলে দিতে পারে, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পক্ষে কেবলমাত্র এমন কাজই করতে পারেন যাতে তাদের সত্যিকার সাফল্য অর্জিত হয়। তারা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে পারে, বোকামি করে নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করতে পারে কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য তাই করবেন যা তাদের জন্য লাভজনক হয়। আসল ব্যাপার যখন এই তখন মুসলমানদের ওপরও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ অধিকার আছে যে, তারা তাঁকে নিজেদের বাপ-মা ও সন্তানদের এবং নিজেদের প্রাণের চেয়েও বেশী প্রিয় মনে করবে। দুনিয়ার সকল জিনিসের চেয়ে তাঁকে বেশী ভালোবাসবে। নিজেদের মতামতের ওপর তাঁর মতামতকে এবং নিজেদের ফায়সালার ওপর তাঁর ফায়সালাকে প্রাধান্য দেবে। তাঁর প্রত্যেকটি হুকুমের সামনে মাথা নত করে দেবে। বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তাদের হাদীসগ্রন্থে সামান্য শাব্দিক পরিবর্তন সহকারে এ বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَ وَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ-

"তোমাদের কোন ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত মানুষের চাইতে বেশী প্রিয় হই।"

১৩. ওপরে বর্ণিত এ একই বৈশিষ্টের ভিত্তিতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এও একটি বৈশিষ্ট ছিল যে, মুসলমানদের নিজেদের পালক মাতা কখনো কোন অর্থেই তাদের মা নয় কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ ঠিক তেমনিভাবে

তাদের জন্য হারাম যেমন তাদের আসল মা তাদের জন্য হারাম। এ বিশেষ বিধানটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া দুনিয়ার আর কোন মানুষের জন্য প্রযোজ্য নয়।

এ প্রসংগে একথাও জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ শুধুমাত্র এ অর্থে মু'মিনদের মাতা যে, তাঁদেরকে সম্মান করা মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব এবং তাঁদের সাথে কোন মুসলমানের বিয়ে হতে পারে না। বাদবাকি অন্যান্য বিষয়ে তাঁরা মায়ের মতো নন। যেমন তাদের প্রকৃত আত্মীয়গণ ছাড়া বাকি সমস্ত মুসলমান তাদের জন্য গায়ের মাহরাম ছিল এবং তাদের থেকে পর্দা করা ছিল ওয়াজিব। তাঁদের মেয়েরা মুসলমানদের জন্য বৈপিত্রেয় বোন ছিলেন না, যার ফলে তাদের সাথে মুসলমানদের বিয়ে নিষিদ্ধ হতে পারে। তাঁদের ভাই ও বোনেরা মুসলমানদের জন্য মামা ও খালার পর্যায়ভুক্ত ছিলেন না। কোন ব্যক্তি নিজের মায়ের তরফ থেকে যে মীরাস লাভ করে তাঁদের তরফ থেকে কোন অনাত্মীয় মুসলমান সে ধরনের কোন মীরাস লাভ করে না।

এখানে আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল স্ত্রীই এ মর্যাদার অধিকারী। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাও এর অন্তরভুক্ত। কিন্তু একটি দল যখন হযরত আলী ও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং তাঁর সন্তানদেরকে দীনের কেন্দ্রে পরিণত করে সমগ্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে তাঁদের চারপাশে ঘোরাতে থাকে এবং এরি ভিত্তিতে অন্যান্য বহু সাহাবার সাথে হযরত আয়েশাকেও নিন্দাবাদ ও গালাগালির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে তখন কুরআন মজীদের এ আয়াত তাদের পথে প্রতিরোধ দাঁড় করায়। কারণ এ আয়াতের প্রেক্ষিতে যে ব্যক্তিই ঈমানের দাবীদার হবে সে–ই তাঁকে মা বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য। শেষমেষ এ সংকট থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে এ অদ্ভুত দাবী করা হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলীকে এ ইখতিয়ার দিয়েছিলেন যে, তাঁর ইন্তিকালের পর তিনি তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের মধ্য থেকে যাঁকে চান তাঁর স্ত্রীর মর্যাদায় টিকিয়ে রাখতে পারেন এবং যাঁকে চান তাঁর পক্ষ থেকে তালাক দিতে পারেন। আবু মনসুর আহমাদ ইবনে আবু তালেব তাবরাসী কিতাবুল ইহ্তিজাজে যে কথা লিখেছেন এবং সুলাইমান ইবনে আবদুল্লাহ আলজিরানী যা উদ্ধৃত করেছেন তা হচ্ছে এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলীকে বলেন ঃ

يا ابا الحسن ان هذا الشرف باق مادمنا على طاعة اللّه تعالى فايتهن عصت اللّه تعالى بعدى بالخروج عليك فطلقها من الازواج واسقطها من شرف امهات المؤمنين -

"হে আবুল হাসান! এ মর্যাদা ততক্ষণ অক্ষুণ্ন থাকবে যতক্ষণ আমরা আল্লাহর আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবো। কাজেই আমার স্ত্রীদের মধ্য থেকে যে কেউ আমার পরে তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আল্লাহর নাফরমানি করবে তাকে তুমি তালাক দিয়ে দেবে এবং তাদেরকে মু'মিনদের মায়ের মর্যাদা থেকে বহিষ্কার করবে।"

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۝٧
لِّيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝٨

আর হে নবী! স্মরণ করো সেই অংগীকারের কথা যা আমি নিয়েছি সকল নবীর কাছ থেকে, তোমার কাছ থেকে এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মারয়াম পুত্র ঈসার কাছ থেকেও। সবার কাছ থেকে আমি নিয়েছি পাকাপোক্ত অলংঘনীয় অঙ্গীকার[১৫] যাতে সত্যবাদীদেরকে (তাদের রব) তাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন[১৬] এবং কাফেরদের জন্য তো তিনি যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করেই রেখেছেন।[১৭]

হাদীস বর্ণনার রীতি ও মূলনীতির দিক দিয়ে তো এ রেওয়ায়াতটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি এ সূরার ২৮–২৯ এবং ৫১ ও ৫২ আয়াত ৪টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে তিনি জানতে পারবেন যে, এ রেওয়ায়াতটি কুরআনেরও বিরোধী। কারণ ইখ্‌তিয়ার সম্পর্কিত আয়াতের পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যেসকল স্ত্রী সর্বাবস্থায় তাঁর সাথে থাকা পছন্দ করেছিলেন তাঁদেরকে তালাক দেবার ইখ্‌তিয়ার আর রসূলের (সা) হাতে ছিল না। সামনের দিকে ৪২ ও ৯৩ টীকায় এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

এ ছাড়াও একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি যদি শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিই ব্যবহার করে এ রেওয়ায়াতটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করেন তাহলেও তিনি পরিষ্কার দেখতে পাবেন এটি একটি চরম ভিত্তিহীন এবং রসূলে পাকের বিরুদ্ধে অত্যন্ত অবমাননাকর মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। রসূল তো অতি উন্নত ও শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার অধিকারী, তাঁর কথাই আলাদা, এমন কি একজন সাধারণ ভদ্রলোকের কাছেও এ আশা করা যেতে পারে না যে, তিনি মারা যাবার পর তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেবার কথা চিন্তা করবেন এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার সময় নিজের জামাতাকে এই ইখতিয়ার দিয়ে যাবেন যে, যদি কখনো তার সাথে তোমার ঝগড়া হয় তাহলে তুমি আমার পক্ষ থেকে তাকে তালাক দিয়ে দেবে। এ থেকে জানা যায়, যারা আহ্‌লে বায়তের প্রেমের দাবীদার তারা গৃহস্বামীর (সাহেবে বায়েত) ইজ্জত ও আবরুর কতোটা পরোয়া করেন। আর এরপর তারা মহান আল্লাহর বাণীর প্রতিও কতটুকু মর্যাদা প্রদর্শন করেন সেটিও দেখার বিষয়।

১৪. এ আয়াতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তো মুসলমানদের সম্পর্কের ধরন ছিল সবকিছু থেকে আলাদা। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এমন নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে যার ফলে আত্মীয়দের অধিকার পরস্পরের ওপর সাধারণ লোকদের তুলনায় অগ্রগণ্য হয়। নিজের মা–বাপ, সন্তান–সন্ততি ও ভাইবোনদের প্রয়োজন পূর্ণ না করে বাইরে দান–খয়রাত করে বেড়ালে

তা সঠিক গণ্য হবে না। যাকাতের মাধ্যমে প্রথমে নিজের গরীব আত্মীয় স্বজনদেরকে সাহায্য করতে হবে এবং তারপর অন্যান্য হকদারকে দিতে হবে। মীরাস অপরিহার্যভাবে তারাই লাভ করবে যারা হবে মৃত ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়। অন্যদেরকে সে চাইলে (জীবিতাবস্থায়) হেবা, ওয়াকফ বা অসিয়াতের মাধ্যমে নিজের সম্পদ দান করতে পারে। কিন্তু এও ওয়ারিসদেরকে বঞ্চিত করে সে সবকিছু অন্যদেরকে দিয়ে যেতে পারে না। হিজরাতের পর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছিল, যার প্রেক্ষিতে নিছক দীনী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের ভিত্তিতে মুহাজির ও আনসারগণ পরস্পরের ওয়ারিস হতেন, এ হুকুমের মাধ্যমে তাও রহিত হয়ে যায়। আল্লাহ পরিষ্কার বলে দেন, মীরাস বন্টন হবে আত্মীয়তার ভিত্তিতে। তবে হাঁ কোন ব্যক্তি চাইলে হাদীয়া, তোহ্ফা, উপঢৌকন বা অসিয়াতের মাধ্যমে নিজের কোন দীনী ভাইকে সাহায্য করতে পারেন।

১৫. এ আয়াতে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, সকল নবীদের ন্যায় আপনার থেকেও আল্লাহ পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছেন সে অংগীকার আপনার কঠোরভাবে পালন করা উচিত। এ অংগীকার বলতে কোন্ অংগীকার বুঝানো হয়েছে? ওপর থেকে যে আলোচনা চলে আসছে সে সম্পর্কে চিন্তা করলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এখানে যে অংগীকারের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ নবী নিজে আল্লাহর প্রত্যেকটি হুকুম মেনে চলবেন এবং অন্যদের তা মেনে চলার ব্যবস্থা করবেন। আল্লাহর প্রত্যেকটি কথা হুবহু অন্যদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবেন এবং তাকে কার্যত প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে কোন প্রকার গাফলতি করবেন না। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ অংগীকারের কথা বলা হয়েছে। যেমন ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ –

"আল্লাহ তোমাদের জন্য এমন দীন নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে এবং যা অহির মাধ্যমে দান করা হয়েছে (হে মুহাম্মাদ) তোমাকে। আর নির্দেশ দেয়া হয়েছে ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এ তাকীদ সহকারে যে, তোমরা প্রতিষ্ঠিত করবে এ দীনকে এবং এর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে না।" (আশ্ শূরা, ১৩)

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ –

"আর স্মরণ করো, আল্লাহ অংগীকার নিয়েছিলেন তাদের থেকে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল এ জন্য যে, তোমরা তার শিক্ষা বর্ণনা করবে এবং তা লুকাবে না।" (আলে ইমরান, ১৮৭)

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ص

"আর স্মরণ করো, আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অংগীকার নিয়েছিলাম এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করবে না।"

(আল বাকারাহ, ৮৩)

اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ ..... خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

"তাদের থেকে কি কিতাবের অংগীকার নেয়া হয়নি?.....সেটিকে মজবুতভাবে ধরো যা আমি তোমাদের দিয়েছি এবং সেই নির্দেশ মনে রাখো যা তার মধ্যে রয়েছে। আশা করা যায়, তোমরা আল্লাহর নাফরমানি থেকে দূরে থাকবে।"

(আল আরাফ, ১৬৯—১৭১)

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِىْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا -

"আর হে মুসলমানরা! মনে রেখো আল্লাহর অনুগ্রহকে, যা তিনি তোমাদের প্রতি করেছেন এবং সেই অংগীকারকে যা তিনি তোমাদের থেকে নিয়েছেন যখন তোমরা বলেছিলে, আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম।" (আল মা-য়েদাহ, ৭)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শত্রুদের সমালোচনার আশংকায় পালক সন্তানের আত্মীয়তা সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের নিয়ম ভাংতে ইতস্তত করছিলেন বলেই মহান আল্লাহ এ অংগীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। যেহেতু ব্যাপারটা একটি মহিলাকে বিয়ে করার, তাই তিনি বারবার লজ্জা অনুভব করছিলেন। তিনি মনে করছিলেন, আমি যতই সৎ সংকল্প নিয়ে নিছক সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যেই কাজ করি না কেন শত্রু একথাই বলবে, প্রবৃত্তির তাড়নায় এ কাজ করা হয়েছে এবং এ ব্যক্তি নিছক ধোঁকা দেবার জন্য সংস্কারকের খোলস নিয়ে আছে। এ কারণেই আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, তুমি আমার নিযুক্ত পয়গম্বর, সকল পয়গম্বরদের মতো তোমার সাথেও আমার এ মর্মে অলংঘনীয় চুক্তি রয়েছে যে, আমি যা কিছু হুকুম করবো তাই তুমি পালন করবে এবং অন্যদেরকেও তা পালন করার হুকুম দেবে। কাজেই কারো তিরস্কার সমালোচনার পরোয়া করো না, কাউকে লজ্জা ও ভয় করো না এবং তোমাকে দিয়ে আমি যে কাজ করাতে চাই নির্দিধায় তা সম্পাদন করো।

একটি দল এ অংগীকারকে একটি বিশেষ অংগীকার অর্থে গ্রহণ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বের সকল নবীর কাজ থেকে এ অংগীকারটি নেয়া হয়। সেটি ছিল এই যে, তাঁরা পরবর্তীকালে আগমনকারী নবীর প্রতি ঈমান আনবেন এবং তাঁর সাথে সহযোগিতা করবেন। এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এ দলের দাবী হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরেও নবুওয়াতের দরজা খোলা আছে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকেও এ অংগীকার নেয়া হয়েছে যে, তাঁর পরেও যে নবী আসবে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرًا ۝٩ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ
الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ۝١٠
هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ۝١١

২ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ!১৮ স্মরণ করো আল্লাহর অনুগ্রহ, যা (এইমাত্র) তিনি করলেন তোমাদের প্রতি, যখন সেনাদল তোমাদের ওপর চড়াও হলো আমি পাঠালাম তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ধূলিঝড় এবং এমন সেনাবাহিনী রওয়ানা করলাম যা তোমরা দেখোনি।১৯ তোমরা তখন যা কিছু করছিলে আল্লাহ তা সব দেখছিলেন। যখন তারা ওপর ও নিচে থেকে তোমাদের ওপর চড়াও হলো,২০ যখন ভয়ে চোখ বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছিল, প্রাণ হয়ে পড়েছিল ওষ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা প্রকার ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলে তখন মু'মিনদেরকে নিদারুণ পরীক্ষা করা হলো এবং ভীষণভাবে নাড়িয়ে দেয়া হলো।২১

তাঁর উম্মাত তার প্রতি ঈমান আনবে। কিন্তু আয়াতের পূর্বাপর বক্তব্য পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভুল। যে বক্তব্য পরম্পরায় এ আয়াতটি এসেছে সেখানে তাঁর পরও নবী আসবে এবং তাঁর উম্মাতের তার প্রতি ঈমান আনা উচিত, একথা বলার কোন অবকাশই নেই। এর এ অর্থ গ্রহণ করলে এ আয়াতটি এখানে একেবারেই সম্পর্কহীন ও খাপছাড়া হয়ে যায়। তাছাড়া এ আয়াতের শব্দগুলোয় এমন কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই যা থেকে এখানে অংগীকার শব্দটির সাহায্যে কোন্ ধরনের অংগীকারের কথা বলা হয়েছে তা বুঝা যেতে পারে। অবশ্যই এর ধরন জানার জন্য আমাদের কুরআন মজীদের যেসব জায়গায় নবীদের থেকে গৃহীত অংগীকারসমূহের কথা বলা হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি ফিরাতে হবে। এখন যদি সমগ্র কুরআন মজীদে শুধুমাত্র একটি অংগীকারের কথা বলা হতো এবং তা হতো পরবর্তীকালে আগমনকারী নবীদের প্রতি ঈমান আনার সাথে সম্পর্কিত তাহলে এখানেও ঐ একই অংগীকারের কথা বলা হয়েছে একথা দাবী করা যথার্থ হতো। কিন্তু যে ব্যক্তিই সচেতনভাবে কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করে সে জানে এ কিতাবে নবীগণ এবং তাঁদের উম্মাতদের থেকে গৃহীত বহু অংগীকারের কথা বলা হয়েছে। কাজেই এসব বিভিন্ন ধরনের অংগীকারের মধ্য থেকে যে অংগীকারটি এখানকার পূর্বাপর বক্তব্যের সাথে

সামঞ্জস্য রাখে একমাত্র সেটির কথা এখানে বলা হয়েছে বলে মনে করা সঠিক হবে। এখানে যে অংগীকারের উল্লেখের কোন সুযোগই নেই তার কথা এখানে বলা হয়েছে বলে মনে করা কখনই সঠিক নয়। এ ধরনের ভুল ব্যাখ্যা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কিছু লোক কুরআন থেকে হিদায়াত গ্রহণ করার নয় বরং কুরআনকে হিদায়াত করার কাজে ব্যাপৃত হয়।

১৬. অর্থাৎ আল্লাহ কেবলমাত্র অংগীকার নিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং এ অংগীকার কতটুকু পালন করা হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন করবেন। তারপর যারা নিষ্ঠা সহকারে আল্লাহর সাথে করা অংগীকার পালন করে থাকবে তারাই অংগীকার পালনকারী গণ্য হবে।

১৭. এ রুকূ'র বিষয়বস্তু পুরোপুরি অনুধাবন করার জন্য একে এ সূরার ৩৬ ও ৪১ আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়া দরকার।

১৮. এখান থেকে ৩ রুকূ'র শেষ পর্যন্তকার আয়াতগুলো নাযিল হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী কুরাইযার যুদ্ধ শেষ করার পর। এ দু'টি রুকূ'তে আহযাব ও বনী কুরাইযার ঘটনাবলী সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে। এগুলো পড়ার সময় আমি ভূমিকায় এ দু'টি যুদ্ধের যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি তা যেন দৃষ্টি সমক্ষে থাকে।

১৯. শত্রুসেনারা যখন মদীনার ওপর চড়াও হয়েছিল ঠিক তখনই এ ধূলিঝড় আসেনি। বরং অবরোধের এক মাস হয়ে যাওয়ার পর এ ধূলি ঝড় আসে। অদৃশ্য "সেনাবাহিনী" বলতে এমন সব গোপন শক্তিকে বুঝানো হয়েছে যা মানুষের বিভিন্ন বিষয়াবলীতে আল্লাহর ইশারায় কাজ করতে থাকে এবং মানুষ তার খবরই রাখে না। ঘটনাবলী ও কার্যকলাপকে মানুয শুধুমাত্র তাদের বাহ্যিক কার্যকারণের দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে অননুভূত পদ্ধতিতে যেসব শক্তি কাজ করে যায় সেগুলো থাকে তার হিসেবের বাইরে। অথচ অধিকাংশ সময় এসব গোপন শক্তির কার্যকারিতা চূড়ান্ত প্রমাণিত হয়। এসব শক্তি যেহেতু আল্লাহর ফেরেশতাদের অধীনে কাজ করে তাই "সেনাবাহিনী" অর্থে ফেরেশ্তাও ধরা যেতে পারে, যদিও এখানে ফেরেশ্তাদের সৈন্য পাঠাবার কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি।

২০. এর একটি অর্থ হতে পারে, সবদিক থেকে চড়াও হয়ে এলো। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, নজ্দ ও খয়বরের দিক থেকে আক্রমণকারীরা ওপরের দিক থেকে এবং মক্কা মো'আয্যমার দিক থেকে আক্রমণকারীরা নিচের দিক থেকে আক্রমণ করলো।

২১. এখানে মু'মিন তাদেরকে বলা হয়েছে যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রসূল বলে মেনে নিয়ে নিজেকে তাঁর অনুসারীদের অন্তরভুক্ত করেছিলেন এদের মধ্যে সাচ্চা ঈমানদার ও মুনাফিক উভয়ই ছিল। এ প্যারাগ্রাফে মুসলমানদের দলের উল্লেখ করেছেন সামগ্রিকভাবে, এরপরের তিনটি প্যারাগ্রাফে মুনাফিকদের নীতির ওপর মন্তব্য করা হয়েছে। তারপর শেষ দু'টি প্যারাগ্রাফে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাচ্চা মু'মিনদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ
وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ
لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا
عَوْرَةٌ ۖ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ
أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ كَانُوا
عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾

স্মরণ করো যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা পরিষ্কার বলছিল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন[২২] তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যখন তাদের মধ্য থেকে একটি দল বললো, "হে ইয়াস্‌রিববাসীরা! তোমাদের জন্য এখন অবস্থান করার কোন সুযোগ নেই, ফিরে চলো।"[২৩] যখন তাদের একপক্ষ নবীর কাছে এই বলে ছুটি চাচ্ছিল যে, "আমাদের গৃহ বিপদাপন্ন,"[২৪] অথচ তা বিপদাপন্ন ছিল না[২৫] আসলে তারা (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) পালাতে চাচ্ছিল। যদি শহরের বিভিন্ন দিক থেকে শত্রুরা ঢুকে পড়তো এবং সেসময় তাদেরকে ফিত্‌না সৃষ্টি করার জন্য আহবান জানানো হতো,[২৬] তাহলে তারা তাতেই লিপ্ত হয়ে যেতো এবং ফিত্‌নায় শরীক হবার ব্যাপারে তারা খুব কমই ইতস্তত করতো। তারা ইতিপূর্বে আল্লাহর সাথে অংগীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না এবং আল্লাহর সাথে করা অংগীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা তো হবেই।[২৭]

২২. অর্থাৎ এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি যে, ঈমানদাররা আল্লাহর সাহায্য-সমর্থন লাভ করবে এবং তাদেরকে চূড়ান্ত বিজয় দান করা হবে।

২৩. এ বাক্যটি দুই অর্থে বলা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে, খন্দকের সামনে কাফেরদের মোকাবিলায় অবস্থান করার কোন অবকাশ নেই। শহরের দিকে চলো। আর এর গূঢ় অর্থ হচ্ছে, ইসলামের ওপর অবস্থান করার কোন অবকাশ নেই। এখন নিজেদের পৈতৃক ধর্মে ফিরে যাওয়া উচিত। এর ফলে সমগ্র আরব জাতির শত্রুতার মুখে আমরা যেভাবে নিজেদেরকে সঁপে দিয়েছি তা থেকে রক্ষা পেয়ে যাবো। মুনাফিকরা নিজ মুখে এসব কথা এ জন্য বলতো যে, তাদের ফাঁদে যে পা দেবে তাকে নিজেদের গূঢ় উদ্দেশ্য

قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا
لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٦﴾ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ
بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۭ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ
وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٧﴾ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَاۗىِٕلِيْنَ
لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٨﴾

হে নবী! তাদেরকে বলো, যদি তোমরা মৃত্যু বা হত্যা থেকে পলায়ন করো, তাহলে এ পলায়নে তোমাদের কোন লাভ হবে না। এরপর জীবন উপভোগ করার সামান্য সুযোগই তোমরা পাবে।[২৮] তাদেরকে বলো, কে তোমাদের রক্ষা করতে পারে আল্লাহর হাত থেকে যদি তিনি তোমাদের ক্ষতি করতে চান? আর কে তাঁর রহমতকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে যদি তিনি চান তোমাদের প্রতি মেহেরবানী করতে? আল্লাহর মোকাবিলায় তো তারা কোন পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী লাভ করতে পারে না।

আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে তাদেরকে খুব ভালো করেই জানেন যারা (যুদ্ধের কাজে) বাধা দেয়, যারা নিজেদের ভাইদেরকে বলে, "এসো আমাদের দিকে,"[২৯] যারা যুদ্ধে অংশ নিলেও নিয়ে থাকে শুধুমাত্র নামকাওয়াস্তে।

বুঝিয়ে দেবে এবং যে তাদের কথা শুনে সতর্ক হয়ে যাবে এবং তাদেরকে পাকড়াও করবে নিজেদের শব্দের বাহ্যিক আবরণের আড়ালে গিয়ে তাদের পাকড়াও থেকে বেঁচে যাবে।

২৪. অর্থাৎ যখন বনূ কুরাইযাও হানাদারদের সাথে হাত মিলালো তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেনাদল থেকে কেটে পড়ার জন্য মুনাফিকরা একটি চমৎকার বাহানা পেয়ে গেলো এবং তারা এই বলে ছুটি চাইতে লাগলো যে, এখন তো আমাদের ঘরই বিপদের মুখে পড়ে গিয়েছে, কাজেই ঘরে ফিরে গিয়ে আমাদের নিজেদের পরিবার ও সন্তানদের হেফাজত করার সুযোগ দেয়া উচিত। অথচ সেসময় সমগ্র মদীনাবাসীদের হেফাজতের দায়িত্ব ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর। বনী কুরাইযার চুক্তিভংগের ফলে যে বিপদ দেখা দিয়েছিল তার হাত থেকে শহর ও শহরবাসীদেরকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা ছিল রসূলের (সা) কাজ, পৃথক পৃথকভাবে একেকজন সৈনিকের কাজ ছিল না।

২৫. অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই তো এ বিপদ থেকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করেছিলেন। এ ব্যবস্থাপনাও তাঁর প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার একটি অংশ ছিল এবং

أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ
أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ
سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۚ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ
أَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۖ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ
يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾

যারা তোমাদের সাথে সহযোগিতা করার ব্যাপারে বড়ই কৃপণ।[৩০] বিপদের সময় এমনভাবে চোখ উলটিয়ে তোমাদের দিকে তাকাতে থাকে যেন কোন মৃত্যুপথযাত্রী মূর্ছিত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বিপদ চলে গেলে এই লোকেরাই আবার স্বার্থলোভী হয়ে তীক্ষ্ণ ভাষায় তোমাদেরকে বিদ্ধ করতে থাকে।[৩১] তারা কখনো ঈমান আনেনি, তাই আল্লাহ তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড ধ্বংস করে দিয়েছেন[৩২] এবং এমনটি করা আল্লাহর জন্য অত্যন্ত সহজ।[৩৩] তারা মনে করছে আক্রমণকারী দল এখনো চলে যায়নি। আর যদি আক্রমণকারীরা আবার এসে যায়, তাহলে তাদের মন চায় এ সময় তারা কোথাও মরুভূমিতে বেদুইনদের মধ্যে গিয়ে বসতো এবং সেখান থেকে তোমাদের খবরাখবর নিতো। তবুও যদি তারা তোমাদের মধ্যে থাকেও তাহলে যুদ্ধে খুব কমই অংশ নেবে।

সেনাপতি হিসেবে তিনি এ ব্যবস্থা কার্যকর করার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। কাজেই সে সময় কোন তাৎক্ষণিক বিপদ দেখা দেয়নি। এ কারণে তাদের এ ধরনের ওজর পেশ করা কোন পর্যায়েও যুক্তিসংগত ছিল না।

২৬. অর্থাৎ যদি নগরে প্রবেশ করে কাফেররা বিজয়ীর বেশে এ মুনাফিকদেরকে এই বলে আহবান জানাতো, এসো আমাদের সাথে মিলে মুসলমানদেরকে খতম করো।

২৭. অর্থাৎ ওহোদ যুদ্ধের সময় তারা যে দুর্বলতা দেখিয়েছিল তারপর লজ্জা ও অনুতাপ প্রকাশ করে তারা আল্লাহর কাছে অংগীকার করেছিল যে, এবার যদি পরীক্ষার কোন সুযোগ আসে তাহলে তারা নিজেদের এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবে। কিন্তু আল্লাহকে নিছক কথা দিয়ে প্রতারণা করা যেতে পারে না। যে ব্যক্তিই তাঁর সাথে কোন অংগীকার করে তাঁর সামনে তিনি পরীক্ষার কোন না কোন সুযোগ এনে দেন। এর মাধ্যমে তার সত্য ও মিথ্যা যাচাই হয়ে যায়। তাই ওহোদ যুদ্ধের মাত্র দু'বছর পরেই তিনি তার চাইতেও বেশী

বড় বিপদ সামনে নিয়ে এলেন এবং এভাবে তারা তাঁর সাথে কেমন ও কতটুকু সাচ্চা অংগীকার করেছিল তা যাচাই করে নিলেন।

২৮. অর্থাৎ এভাবে পলায়ন করার ফলে তোমাদের আয়ু বেড়ে যাবে না। এর ফলে কখনোই তোমরা কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকতে এবং সারা দুনিয়া জাহানের ধন-দৌলত হস্তগত করতে পারবে না। পালিয়ে বাঁচলে বড় জোর কয়েক বছরই বাঁচবে এবং তোমাদের জন্য যতটুকু নির্ধারিত হয়ে আছে ততটুকুই জীবনের আয়েশ-আরাম ভোগ করতে পারবে।

২৯. অর্থাৎ এ নবীর দল ত্যাগ করো। কেন তোমরা দীন, ঈমান, সত্য ও সততার চক্করে পড়ে আছো? নিজেদেরকে বিপদ-আপদ, ভীতি ও আশংকার মধ্যে নিক্ষেপ করার পরিবর্তে আমাদের মতো নিরাপদে অবস্থান করার নীতি অবলম্বন করো।

৩০. অর্থাৎ সাচ্চা মু'মিনরা যে পথে তাদের সবকিছু উৎসর্গ করে দিচ্ছে সেপথে তারা নিজেদের শ্রম, সময়, চিন্তা ও সহায়-সম্পদ স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ব্যয় করতে প্রস্তুত নয়। প্রাণপাত করা ও বিপদ মাথা পেতে নেয়া তো দূরের কথা কোন কাজেও তারা নির্দ্বিধায় মু'মিনদের সাথে সহযোগিতা করতে চায় না।

৩১. আভিধানিক দিক দিয়ে আয়াতটির দু'টি অর্থ হয়। এক, যুদ্ধের ময়দান থেকে সাফল্য লাভ করে যখন তোমরা ফিরে আসো তখন তারা বড়ই হৃদ্যতা সহকারে ও সাড়ম্বরে তোমাদেরকে স্বাগত জানায় এবং বড় বড় বুলি আউড়িয়ে এই বলে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে যে, আমরাও পাক্কা মু'মিন এবং এ কাজ সম্প্রসারণে আমরাও অংশ নিয়েছি কাজেই আমরাও গনীমাতের মালের হকদার। দুই, বিজয় অর্জিত হলে গনীমাতের মাল ভাগ করার সময় তাদের কণ্ঠ বড়ই তীক্ষ্ণ ও ধারাল হয়ে যায় এবং তারা অগ্রবর্তী হয়ে দাবী করতে থাকে, আমাদের ভাগ দাও, আমরাও কাজ করেছি, সবকিছু তোমরাই লুটে নিয়ে যেয়ো না।

৩২. অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করার পর তারা যেসব নামায পড়েছে, রোযা রেখেছে, যাকাত দিয়েছে এবং বাহ্যত যেসব সৎকাজ করেছে সবকিছুকে মহান আল্লাহ নাকচ করে দেবেন এবং সেগুলোর কোন প্রতিদান তাদেরকে দেবেন না। কারণ আল্লাহর দরবারে কাজের বাহ্যিক চেহারার ভিত্তিতে ফায়সালা করা হয় না বরং এ বাহ্য চেহারার গভীরতম প্রদেশে বিশ্বাস ও আন্তরিকতা আছে কিনা তার ভিত্তিতে ফায়সালা করা হয়। যখন এ জিনিস আদতে তাদের মধ্যে নেই তখন এ লোক দেখানো কাজ একেবারেই অর্থহীন। এখানে এ বিষয়টি গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, যেসব লোক আল্লাহ ও রসূলকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, নামায পড়ছিল, রোযা রাখছিল, যাকাতও দিচ্ছিল এবং মুসলমানদের সাথে তাদের অন্যান্য সৎকাজে শামিলও হচ্ছিল, তাদের সম্পর্কে পরিষ্কার ফায়সালা শুনিয়ে দেয়া হলো যে তারা আদতে ঈমানই আনেনি। আর এ ফায়সালা কেবলমাত্র এরি ভিত্তিতে করা হলো যে, কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্বে যখন কঠিন পরীক্ষার সময় এলো তখন তারা দোমনা হবার প্রমাণ দিল, দীনের স্বার্থের ওপর নিজের স্বার্থের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করলো এবং ইসলামের হেফাজতের জন্য নিজের প্রাণ, ধন-সম্পদ ও শ্রম নিয়োজিত করতে অস্বীকৃতি জানালো। এ থেকে জানা গেলো, ফায়সালার আসল ভিত্তি এসব বাহ্যিক কাজ-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ
وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ﴿٢١﴾ وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا
هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۫ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا
اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ﴿٢٢﴾ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ
فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾

৩ রুকূ'

আসলে তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে ছিল একটি উত্তম আদর্শ[৩৪] এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও শেষদিনের আকাংখী এবং বেশী করে আল্লাহকে স্মরণ করে।[৩৫] আর সাচ্চা মু'মিনদের (অবস্থা সে সময় এমন ছিল,[৩৬]) যখন আক্রমণকারী সেনাদলকে দেখলো তারা চিৎকার করে উঠলো, "এতো সেই জিনিসই যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদের দিয়েছিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা পুরোপুরি সত্য ছিল।"[৩৭] এ ঘটনা তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণ আরো বেশী বাড়িয়ে দিল।[৩৮] ঈমানদারদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকার পূর্ণ করে দেখালো। তাদের কেউ নিজের নজরানা পূর্ণ করেছে এবং কেউ সময় আসার প্রতীক্ষায় আছে।[৩৯] তারা তাদের নীতি পরিবর্তন করেনি।

কর্ম নয়। বরং মানুষের বিশ্বস্ততা কার সাথে সম্পর্কিত তারি ভিত্তিতে এর ফায়সালা সূচিত হয়। যেখানে আল্লাহ ও তাঁর দীনের প্রতি বিশ্বস্ততা নেই সেখানে ঈমানের স্বীকৃতি এবং ইবাদাত ও অন্যান্য সৎকাজের কোন মূল্য নেই।

৩৩. অর্থাৎ তাদের কার্যাবলীর কোন গুরুত্ব ও মূল্য নেই। ফলে সেগুলো নষ্ট করে দেয়া আল্লাহর কাছে মোটেই কষ্টকর হবে না। তাছাড়া তারা এমন কোন শক্তিই রাখে না যার ফলে তাদের কার্যাবলী ধ্বংস করে দেয়া তাঁর জন্য কঠিন হতে পারে।

৩৪. যে প্রেক্ষাপটে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে সে দৃষ্টিতে বিচার করলে বলা যায়, যারা আহ্যাব যুদ্ধে সুবিধাবাদী ও পিঠ বাঁচানের নীতি অবলম্বন করেছিল তাদেরকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই নবী করীমের (সা) কর্মধারাকে এখানে আদর্শ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, তোমরা ছিলে ঈমান, ইসলাম ও রসূলের আনুগত্যের দাবীদার। তোমাদের দেখা উচিত ছিল, তোমরা যে রসূলের অনুসারীদের অন্তরভুক্ত হয়েছো তিনি এ অবস্থায় কোন্ ধরনের নীতি অবলম্বন করেছিলেন। যদি কোন দলের নেতা নিজেই নিরাপদ থাকার নীতি অবলম্বন করেন, নিজেই আরামপ্রিয় হন, নিজেই ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণকে

অগ্রাধিকার দেন, বিপদের সময় নিজেই পালিয়ে যাবার প্রস্তুতি করতে থাকেন, তাহলে তার অনুসারীদের পক্ষ থেকে এ দুর্বলতাগুলোর প্রকাশ যুক্তিসংগত হতে পারে। কিন্তু এখানে তো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা এই ছিল যে, অন্যদের কাছে তিনি যে কষ্ট স্বীকার করার জন্য দাবী জানান তার প্রত্যেকটি কষ্ট স্বীকার করার ব্যাপারে তিনি সবার সাথে শরীক ছিলেন, সবার চেয়ে বেশী করে তিনি তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমন কোন কষ্ট ছিল না যা আন্যেরা বরদাশ্‌ত করেছিল কিন্তু তিনি করেননি। খন্দক খননকারীদের দলে তিনি নিজে শামিল ছিলেন। ক্ষুধা ও অন্যান্য কষ্ট সহ্য করার ক্ষেত্রে একজন সাধারণ মুসলমানের সাথে তিনি সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অবরোধকালে তিনি সর্বক্ষণ যুদ্ধের ময়দানে হাজির ছিলেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও শত্রুদের সামনে থেকে সরে যাননি। বনী কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতার পরে সমস্ত মুসলমানদের সন্তান ও পরিবারবর্গ যে বিপদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তাঁর সন্তান ও পরিবারবর্গও সেই একই বিপদের মুখে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। তিনি নিজের সন্তান ও পরিবারবর্গের হেফাজতের জন্য এমন কোন বিশেষ ব্যবস্থা করেননি যা অন্য মুসলমানদের জন্য করেননি। যে মহান উদ্দেশ্যে তিনি মুসলমানদের কাছ থেকে ত্যাগ ও কুরবানীর দাবী করছিলেন সে উদ্দেশ্যে সবার আগে এবং সবার চেয়ে বেশী করে তিনি নিজে নিজের সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। তাই যে কেউ তাঁর অনুসরণের দাবীদার ছিল তাকে এ আদর্শ দেখে তারই অনুসরণ করা উচিত ছিল।

পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী এ ছিল এ আয়াতের নির্গলিতার্থ। কিন্তু এর শব্দগুলো ব্যাপক অর্থবোধক এবং এর উদ্দেশ্যকে কেবলমাত্র এ অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখার কোন কারণ নেই। আল্লাহ একথা বলেননি যে, কেবলমাত্র এ দৃষ্টিতেই তাঁর রসূলের জীবন মুসলমানদের জন্য আদর্শ বরং শর্তহীন ও অবিমিশ্রভাবে তাকে আদর্শ গণ্য করেছেন। কাজেই এ আয়াতের দাবী হচ্ছে, মুসলমানরা সকল বিষয়েই তাঁর জীবনকে নিজেদের জন্য আদর্শ জীবন মনে করবে এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের চরিত্র ও জীবন গড়ে তুলবে।

৩৫. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ থেকে গাফিল তার জন্য এ জীবন আদর্শ নয়। কিন্তু তার জন্য অবশ্যই আদর্শ যে কখনো কখনো ঘটনাক্রমে আল্লাহর নাম নেয় না বরং বেশী করে তাঁকে স্মরণ করে ও স্মরণ রাখে। অনুরূপভাবে এ জীবন এমন ব্যক্তির জন্যও কোন আদর্শ নয় যে আল্লাহর কাছ থেকেও কিছু আশা করে না এবং আখেরাতের আগমনেরও প্রত্যাশা করে না। কিন্তু এমন ব্যক্তির জন্য তা অবশ্যই আদর্শ যে আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দান আশা করে এবং যে একথা চিন্তা করে যে, একদিন আখেরাতের জীবন শুরু হবে যেখানে দুনিয়ার জীবনে তার মনোভাব ও নীতি আল্লাহর রসূলের (সা) মনোভাব ও নীতির কতটুকু নিকটতর আছে তার ওপরই তার সমস্ত কল্যাণ নির্ভর করবে।

৩৬. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর এবার আল্লাহ সাহাবায়ে কেরামের কর্মধারাকে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরছেন, যাতে ঈমানের মিথ্যা দাবীদার এবং আন্তরিকতা সহকারে রসূলের আনুগত্যকারীদের কার্যাবলীকে পরস্পরের মোকাবেলায় পুরোপুরিভাবে সুস্পষ্ট করে দেয়া যায়। যদিও বাহ্যিক ঈমানের স্বীকারোক্তির ব্যাপারে তারা এবং এরা একই পর্যায়ভুক্ত ছিল, উভয়কেই মুসলমানদের দলভুক্ত গণ্য করা হতো এবং নামাযে উভয়ই শরীক হতো

কিন্তু পরীক্ষার মুহূর্ত আসার পর উভয়ই পরস্পর থেকে ছাঁটাই হয়ে আলাদা হয়ে যায় এবং পরিষ্কার জানা যায় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বস্ত কে এবং কে কেবল নিছক নামের মুসলমান?

৩৭. এ প্রসংগে ১২ আয়াতটি দৃষ্টিসমক্ষে রাখা উচিত। সেখানে বলা হয়েছিল, যারা ছিল মুনাফিক ও হৃদয়ের রোগে আক্রান্ত, তারা দশ বারো হাজার সৈন্যকে সামনে থেকে এবং বনী কুরাইযাকে পিছন থেকে আক্রমণ করতে দেখে চিৎকার করে বলতে থাকে, "আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা) আমাদের সাথে যেসব অংগীকার করেছিলেন সেগুলো ডাহা মিথ্যা ও প্রতারণা প্রমাণিত হলো। আমাদের বলা তো হয়েছিল, আল্লাহর দীনের প্রতি ঈমান আনলে আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন তোমাদের পেছনে থাকবে, আরবে ও আজমে তোমাদের ডংকা বাজবে এবং রোম ও ইরানের সম্পদ তোমাদের করায়ত্ত হবে কিন্তু এখন দেখছি সমগ্র আরব আমাদের খতম করে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে এবং আমাদেরকে এ বিপদ সাগর থেকে উদ্ধার করার জন্য কোথাও ফেরেশতাদের সৈন্যদলের টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না।" এখন বলা হচ্ছে, ঐ সব মিথ্যা ঈমানের দাবীদার আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অংগীকারের যে অর্থ বুঝেছিল এর একটি তাই ছিল। সাচ্চা ঈমানদাররা এর যে অর্থ বুঝেছে সেটি এর দ্বিতীয় অর্থ। বিপদের ঘনঘটা দেখে আল্লাহর অংগীকারের কথা তাদেরও মনে পড়েছে কিন্তু এ অংগীকার নয় যে, ঈমান আনার সাথে সাথেই কুটোটিও নাড়ার দরকার হবে না সোজা তোমরা দুনিয়ার শাসন কর্তৃত্ব লাভ করে যাবে এবং ফেরেশতারা এসে তোমাদের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেবে। বরং এ অংগীকার যে, কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তোমাদের এগিয়ে যেতে হবে, বিপদের পাহাড় তোমাদের মাথায় ভেঙে পড়বে, তোমাদের চরম ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, তবেই কোন পর্যায়ে আল্লাহর অনুগ্রহ তোমাদের প্রতি বর্ষিত হবে এবং তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের এমনসব সাফল্য দান করা হবে যেগুলো দেবার অংগীকার আল্লাহ মু'মিন বান্দাদের সাথে করেছিলেন ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۝

"তোমরা কি একথা মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা জান্নাতে এমনিই প্রবেশ করে যাবে? অথচ তোমাদের পূর্বে যারা ঈমান এনেছিল তারা যে অবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল এখনো তোমরা সে অবস্থার সম্মুখীন হওনি। তারা কাঠিন্য ও বিপদের মুখোমুখি হয়েছিল এবং তাদেরকে নাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, এমনকি রসূল ও তার সংগীসাথীরা চিৎকার করে উঠেছিল আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে।—শোনো, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই আছে।" (আল বাকারাহ, ২১৪)

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ۝

"লোকেরা কি একথা মনে করে নিয়েছে, 'আমরা ঈমান এনেছি' একথা বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে আর পরীক্ষা করা হবে না? অথচ এদের আগে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের সবাইকে আমি পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে অবশ্যই দেখতে হবে কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী।" (আল আনকাবূত, ২–৩)

৩৮. অর্থাৎ বিপদ আপদের এ পাহাড় দেখে তাদের ঈমান নড়ে যাবার পরিবর্তে আরো বেশী বেড়ে গেলো এবং আল্লাহর হুকুম পালন করা থেকে দূরে পালিয়ে যাবার পরিবর্তে তারা আরো বেশী প্রত্যয় ও নিশ্চিন্ততা সহকারে নিজেদের সবকিছু তাঁর হাতে সোপর্দ করতে উদ্যোগী হয়ে উঠলো।

এ প্রসংগে একথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, ঈমান ও আত্মসমর্পণ আসলে মনের এমন একটি অবস্থা যা দীনের প্রত্যেকটি হুকুম ও দাবীর মুখে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। দুনিয়ার জীবনে প্রতি পদে পদে মানুষ এমন অবস্থার মুখোমুখি হয় যখন দীন কোন কাজের আদেশ দেয় অথবা তা করতে নিষেধ করে অথবা প্রাণ, ধন–সম্পদ, সময়, শ্রম ও প্রবৃত্তির কামনা–বাসনা ত্যাগ করার দাবী করে। এ ধরনের প্রত্যেক সময়ে যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে সরে আসবে তার ঈমান ও আত্মসমর্পণে কমতি দেখা দেবে এবং যে ব্যক্তিই আদেশের সামনে মাথা নত করে দেবে তার ঈমান ও আত্মসমর্পণ বেড়ে যাবে যদিও শুরুতে মানুষ কেবলমাত্র ইসলাম গ্রহণ করতেই মু'মিন ও মুসলিম রূপে গণ্য হয়ে যায় কিন্তু এটা কোন স্থির ও স্থবির অবস্থা নয়। এ অবস্থা কেবল এক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে না। বরং এর মধ্যে উন্নতি ও অবনতি উভয়েরই সম্ভাবনা থাকে। আনুগত্য ও আন্তরিকতার অভাব ও স্বল্পতা এর অবনতির কারণ হয়। এমনকি এক ব্যক্তি পেছনে হটতে হটতে ঈমানের শেষ সীমানায় পৌঁছে যায়, যেখান থেকে চুল পরিমাণ পেছনে হটলেই সে মু'মিনের পরিবর্তে মুনাফিক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আন্তরিকতা যত বেশী হতে থাকে, আনুগত্য যত পূর্ণতা লাভ করে এবং আল্লাহর সত্য দীনের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার ফিকির, আকাংখা ও আত্মনিমগ্নতা যত বেড়ে যেতে থাকে সেই অনুপাতে ঈমানও বেড়ে যেতে থাকে। এভাবে এক সময় মানুষ "সিদ্দীক" তথা পূর্ণ সত্যবাদীর মর্যাদায় উন্নীত হয়। কিন্তু এই তারতম্য ও হ্রাসবৃদ্ধি কেবল নৈতিক মর্যাদার মধ্যেই সীমিত থাকে। আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে এর হিসেব করা সম্ভব নয়। বান্দাদের জন্য একটি স্বীকারোক্তি ও সত্যতার ঘোষণাই ঈমান। এর মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলমান ইসলামে প্রবেশ করে এবং যতদিন সে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে ততদিন তাকে মুসলমান বলে মেনে নেয়া হয়। তার সম্পর্কে আমরা একথা বলতে পারি না যে, সে আধা মুসলমান অথবা সিকি মুসলমান কিংবা দ্বিগুণ মুসলমান বা ত্রিগুণ মুসলমান। এ ধরনের আইনগত অধিকারের ক্ষেত্রে সকল মুসলমান সমান। কাউকে আমরা বেশী মু'মিন বলতে পারি না এবং তার অধিকারও বেশী হতে পারে না। আবার কাউকে কম মু'মিন গণ্য করে তার অধিকার কম করতে পারি না। এসব দিক দিয়ে ঈমান কমবেশী হবার কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। আসলে এ অর্থেই ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন ঃ

الايمان لا يزيد ولا ينقص

অর্থাৎ "ঈমান কমবেশী হয় না।" (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আনফাল ২ এবং আল ফাত্হ ৭ টীকা)

لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ
اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٤﴾ وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ۗ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ
قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴿٢٥﴾ وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ
صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ
فَرِيْقًا ﴿٢٦﴾ وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَئُوْهَا ۗ
وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢٧﴾

(এসব কিছু হলো এ জন্য) যাতে আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যতার পুরস্কার দেন এবং মুনাফিকদেরকে চাইলে শাস্তি দেন এবং চাইলে তাদের তাওবা কবুল করে নেন। অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

আল্লাহ কাফেরদের মুখ ফিরিয়ে দিয়েছেন, তারা বিফল হয়ে নিজেদের অন্তরজ্বালা সহকারে এমনিই ফিরে গেছে এবং মু'মিনদের পক্ষ থেকে লড়াই করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে গেছেন। আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত। তারপর আহ্‌যাব কিতাবদের মধ্য থেকে যারাই এর আক্রমণকারীদের সাথে সহযোগিতা করেছিল[৪০] তাদের দুর্গ থেকে আল্লাহ তাদেরকে নামিয়ে এনেছেন এবং তাদের অন্তরে তিনি এমন ভীতি সঞ্চার করেছেন যার ফলে আজ তাদের একটি দলকে তোমরা হত্যা করছো এবং অন্য একটি দলকে করছো বন্দী। তিনি তোমাদেরকে তাদের জায়গা-জমি, ঘরবাড়ি ও ধন-সম্পদের ওয়ারিস করে দিয়েছেন এবং এমন এলাকা তোমাদের দিয়েছেন যাকে তোমরা কখনো পদানত করোনি। আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতা সম্পন্ন।

৩৯. অর্থাৎ কেউ আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছে এবং কেউ তাঁর দীনের খাতিরে নিজের খুনের নজরানা পেশ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

৪০. অর্থাৎ ইহুদি বনী কুরাইযা।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا
فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٢٨﴾ وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا
عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾ يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ
لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

৪ রুকূ'

হে নবী![৪১] তোমার স্ত্রীদেরকে বলো, যদি তোমরা দুনিয়া এবং তার ভূষণ চাও, তাহলে এসো আমি তোমাদের কিছু দিয়ে ভালোভাবে বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতের প্রত্যাশী হও, তাহলে জেনে রাখো তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্য আল্লাহ মহা প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।[৪২]

হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ কোন সুস্পষ্ট অশ্লীল কাজ করবে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে।[৪৩] আল্লাহর জন্য এটা খুবই সহজ কাজ।[৪৪]

৪১. এখান থেকে ৩৫ আয়াত পর্যন্ত আহ্‌যাব ও বনী কুরাইযার যুদ্ধের সন্নিহিত সময়ে নাযিল হয়েছিল। ভূমিকায় আমি এগুলোর পটভূমি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। সহীহ মুসলিমে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) সেযুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদিন হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) নবী করীমের (সা) খেদমতে হাজির হয়ে দেখেন তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর চারদিকে বসে আছেন এবং তিনি কোন কথা বলছেন না। নবী করীম (সা) হযরত উমরকে সম্বোধন করে বললেন, هُنَّ كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِى النَّفَقَةَ "তুমি দেখতে পাচ্ছো, এরা আমার চারদিকে বসে আছে এবং আমার কাছে খরচপত্রের জন্য টাকা চাচ্ছে।" একথা শুনে তাঁরা উভয়ে নিজ নিজ মেয়েকে ধমক দিলেন এবং তাদেরকে বললেন, তোমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিচ্ছো এবং এমন জিনিস চাচ্ছো যা তাঁর কাছে নেই। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আর্থিক সংকট সে সময় কেমন ঘনীভূত ছিল এবং কুফর ও ইসলামের চরম দ্বন্দ্বের দিনগুলোতে খরচপাতির জন্য পবিত্র স্ত্রীগণের তাগাদা তাঁর পবিত্র ব্যক্তিত্বকে কিভাবে বিচলিত করে তুলছিল।

৪২. এ আয়াতটি নাযিল হবার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী ছিল চারজন। তাঁরা ছিলেন হযরত সওদা (রা), হযরত আয়েশা (রা), হযরত হাফসা (রা) এবং

হযরত উম্মে সালামাহ (রা)। তখনো হযরত যয়নবের (রা) সাথে নবী করীমের (সা) বিয়ে হয়নি। (আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী, ১৯৫৮ সালে মিসর থেকে মুদ্রিত, ৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১২—৫১৩) এ আয়াত নাযিল হবার পর নবী করীম (সা) সর্বপ্রথম হযরত আয়েশার সাথে আলোচনা করেন এবং বলেন, "আমি তোমাকে একটি কথা বলছি, জবাব দেবার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। তোমার বাপ–মায়ের মতামত নাও এবং তারপর ফায়সালা করো।" তারপর তিনি তাঁকে বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে এ হুকুম এসেছে এবং তাঁকে এ আয়াত শুনিয়ে দেন। হযরত আয়েশা বলেন, "এ ব্যাপারটি কি আমি আমার বাপ–মাকে জিজ্ঞেস করবো? আমি তো আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতকে চাই।" এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক এক করে তাঁর অন্যান্য পবিত্র স্ত্রীদের প্রত্যেকের কাছে যান এবং তাঁদেরকে একই কথা বলেন। তাঁরা প্রত্যেকে হযরত আয়েশার (রা) মতো একই জবাব দেন। (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম ও নাসাঈ)

ইসলামী পরিভাষায় একে বলা হয় "তাখ্ঈর"। অর্থাৎ স্ত্রীকে তার স্বামীর সাথে থাকার বা আলাদা হয়ে যাবার মধ্য থেকে যে কোন একটিকে বাছাই করে নেবার ফায়সালা করার ইখতিয়ার দান করা। এই তাখ্ঈর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ওয়াজিব ছিল। কারণ আল্লাহ তাঁকে এর হুকুম দিয়েছিলেন। যদি তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের কেউ আলাদা হয়ে যাবার পথ অবলম্বন করতেন তাহলে তিনি আপনা আপনিই আলাদা হয়ে যেতেন না বরং নবী করীমের (সা) আলাদা করে দেবার কারণে আলাদা হয়ে যেতেন যেমন আয়াতের শব্দাবলী থেকে সুস্পষ্ট হচ্ছে ঃ "এসো আমি কিছু দিয়ে তোমাদের ভালোভাবে বিদায় করে দেই।" কিন্তু এ অবস্থায় তাঁকে আলাদা করে দেয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ওয়াজিব ছিল। কারণ নিজের প্রতিশ্রুতি পালন না করা নবী হিসেবে তাঁর জন্য সমীচীন ছিল না। আলাদা হয়ে যাবার পর বাহ্যত এটাই মনে হয়, মু'মিনের মাতার তালিকা থেকে তাঁর নাম কাটা যেতো এবং অন্য মুসলমানের সাথে তাঁর বিবাহ আর হারাম থাকতো না। কারণ তিনি দুনিয়া এবং তার সাজসজ্জার জন্যই তো রসূলে করীমের (সা) থেকে আলাদা হতেন এবং এর অধিকার তাঁকে দেয়া হয়েছিল। আর একথা সুস্পষ্ট যে, অন্য কারো সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ থাকলে তাঁর এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হতো না। অন্যদিকে আয়াতের এটিও একটি উদ্দেশ্য মনে হয়, নবী করীমের (সা) যে সকল স্ত্রী আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতকে পছন্দ করে নিয়েছেন তাঁদেরকে তালাক দেবার, ইখতিয়ার নবীর আর থাকেনি। কারণ তাখ্ঈরের দু'টি দিক ছিল। এক, দুনিয়াকে গ্রহণ করলে তোমাদেরকে আলাদা করে দেয়া হবে। দুই, আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতকে গ্রহণ করলে তোমাদের আলাদা করে দেয়া হবে না। এখন একথা সুস্পষ্ট, এ দু'টি দিকের মধ্য থেকে যে কোন একটি দিকই কোন মহিমান্বিতা মহিলা গ্রহণ করলে দ্বিতীয় দিকটি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যেতো।

ইসলামী ফিক্হে "তাখ্ঈর" আসলে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করার পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ স্বামী এর মাধ্যমে স্ত্রীকে এ ক্ষমতা দেয় যে, সে চাইলে তার স্ত্রী হিসেবে থাকতে পারে এবং চাইলে আলাদা হয়ে যেতে পারে। এ বিষয়টির ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে ফকীহগণ যে বিধান বর্ণনা করেছেন তার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ এ ক্ষমতা একবার স্ত্রীকে দিয়ে দেবার পর স্বামী আর তা ফেরত নিতে পারে না এবং স্ত্রীকে তা ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখতেও পারে না। তবে স্ত্রীর জন্য তা ব্যবহার করা অপরিহার্য হয়ে যায় না। সে চাইলে স্বামীর সাথে থাকতে সম্মত হতে পারে, চাইলে আলাদা হয়ে যাবার কথা ঘোষণা করতে পারে এবং চাইলে কোন কিছুর ঘোষণা না দিয়ে এ ক্ষমতাকে এমনিই নষ্ট হয়ে যাবার সুযোগ দিতে পারে।

দুই ঃ এ ক্ষমতাটি স্ত্রীর দিকে স্থানান্তরিত হবার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। প্রথমত স্বামী কর্তৃক তাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তালাকের ইখতিয়ার দান করা চাই, অথবা তালাকের কথা সুস্পষ্ট ভাষায় না বললেও এই ইখতিয়ার দেবার নিয়ত তার থাকা চাই। যেমন, সে যদি বলে, "তোমার ইখতিয়ার আছে" বা "তোমার ব্যাপার তোমার হাতে আছে," তাহলে এ ধরনের ইংগিতধর্মী কথার ক্ষেত্রে স্বামীর নিয়ত ছাড়া তালাকের ইখতিয়ার স্ত্রীর কাছে স্থানান্তরিত হবে না। যদি স্ত্রী এর দাবী করে এবং স্বামী হলফ সহকারে বিবৃতি দেয় যে, এর মাধ্যমে তালাকের ইখতিয়ার সোপর্দ করার উদ্দেশ্য তার ছিল না, তাহলে স্বামীর কথা গ্রহণ করা হবে। তবে স্ত্রী যদি এ মর্মে সাক্ষ্য হাজির করে যে, অবনিবনা ঝগড়া বিবাদের পরিবেশে বা তালাকের কথাবার্তা চলার সময় একথা বলা হয়েছিল, তাহলে তখন তার দাবী বিবেচিত হবে। কারণ এ প্রেক্ষাপটে ইখতিয়ার দেবার অর্থ এটাই বুঝা যাবে যে, স্বামীর তালাকের ইখতিয়ার দেবার নিয়ত ছিল। দ্বিতীয়ত স্ত্রীর জানতে হবে যে, তাকে এ ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। যদি সে অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তার কাছে এ খবর পৌছুতে হবে এবং যদি সে উপস্থিত থাকে, তাহলে এ শব্দগুলো তার শুনতে হবে। যতক্ষণ সে নিজ কানে শুনবে না অথবা তার কাছে খবর পৌছুবে না ততক্ষণ ইখতিয়ার তার কাছে স্থানান্তরিত হবে না।

তিন ঃ যদি স্বামী কোন সময় নির্ধারণ করা ছাড়াই শর্তহীনভাবে স্ত্রীকে ইখতিয়ার দান করে, তাহলে স্ত্রী কতক্ষণ পর্যন্ত এ ইখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে? এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ পাওয়া যায়। একটি দল বলেন, যে বৈঠকে স্বামী একথা বলে সেই বৈঠকেই স্ত্রী তার ইখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে। যদি সে কোন জবাব না দিয়ে সেখান থেকে উঠে যায় অথবা এমন কাজে লিপ্ত হয় যা একথাই প্রমাণ করে যে, সে জবাব দিতে চায় না, তাহলে তার ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। এ মত পোষণ করেন হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা), হযরত জাবের ইবনে যায়েদ, আতা (র), মুজাহিদ (র), শা'বী (র), ইবরাহীম নাখঈ (র), ইমাম মালেক (র), ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম শাফেঈ (র), ইমাম আওযায়ী (র), সুফিয়ান সওরী (র) ও আবু সওর (র)। দ্বিতীয় দলের মতে, তার ইখতিয়ার ঐ বৈঠক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং তারপরও সে এ ইখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারবে। এ মত পোষণ করেন হযরত হাসান বসরী (র), কাতাদাহ ও যুহরী।

চার ঃ স্বামী যদি সময় নির্ধারণ করে দেয়। যেমন, সে যদি বলে, এক মাস বা এক বছর পর্যন্ত তোমাকে ইখতিয়ার দিলাম অথবা এ সময় পর্যন্ত তোমার বিষয় তোমার হাতে রইলো, তাহলে ঐ সময় পর্যন্ত সে এ ইখতিয়ার ভোগ করবে। তবে যদি সে বলে, তুমি যখন চাও এ ইখতিয়ার ব্যবহার করতে পারো, তাহলে এ অবস্থায় তার ইখতিয়ার হবে সীমাহীন।

পাঁচ ঃ স্ত্রী যদি আলাদা হতে চায়, তাহলে তাকে সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত অর্থবোধক শব্দাবলীর মাধ্যমে তা প্রয়োগ করতে হবে। অস্পষ্ট শব্দাবলী, যার মাধ্যমে বক্তব্য সুস্পষ্ট হয় না, তা দ্বারা ইখতিয়ার প্রয়োগ কার্যকর হতে পারে না।

ছয় ঃ আইনত স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে ইখতিয়ার দেবার জন্য তিনটি বাক্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এক, সে বলবে, "তোমার ব্যাপারটি তোমার হাতে রয়েছে।" দুই, সে বলবে, "তোমাকে ইখতিয়ার দেয়া হচ্ছে।" তিন, সে বলবে, "যদি তুমি চাও তাহলে তোমাকে তালাক দিলাম।" এর মধ্যে প্রত্যেকটির আইনগত ফলাফল হবে ভিন্ন রকমের ঃ

(ক) "তোমার বিষয়টি তোমার হাতে রয়েছে"—এ শব্দগুলো যদি স্বামী বলে থাকে এবং স্ত্রী এর জবাবে এমন কোন স্পষ্ট কথা বলে যা থেকে বুঝা যায় যে, সে আলাদা হয়ে গেছে, তাহলে হানাফী মতে এক তালাক বায়েন হয়ে যাবে। অর্থাৎ এরপর স্বামী আর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। কিন্তু ইদ্দত অতিবাহিত হবার পর উভয়ে আবার চাইলে পরস্পরকে বিয়ে করতে পারে। আর যদি স্বামী বলে থাকে, "এক তালাক পর্যন্ত তোমার বিষয়টি তোমার হাতে রয়েছে," তাহলে এ অবস্থায় একটি 'রজঈ' তালাক অনুষ্ঠিত হবে। (অর্থাৎ ইদ্দতের মধ্যে স্বামী চাইলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে।) কিন্তু স্বামী যদি বিষয়টি স্ত্রীর হাতে সোপর্দ করতে গিয়ে তিন তালাকের নিয়ত করে থাকে অথবা একথা সুস্পষ্ট করে বলে থাকে, তাহলে সে সুস্পষ্ট ভাষায় নিজের ওপর তিন তালাক আরোপ করুক অথবা কেবলমাত্র একবার বলুক আমি আলাদা হয়ে গেলাম বা নিজেকে তালাক দিলাম, এ অবস্থায় স্ত্রীর ইখতিয়ার তালাকের সমার্থক হবে।

(খ) "তোমাকে ইখতিয়ার দিলাম" শব্দগুলোর সাথে যদি স্বামী স্ত্রীকে আলাদা হয়ে যাওয়ার ইখতিয়ার দিয়ে থাকে এবং স্ত্রী আলাদা হয়ে যাওয়ার কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে থাকে, তাহলে হানাফীর মতে স্বামীর তিন তালাকের ইখতিয়ার দেবার নিয়ত থাকলেও একটি বায়েন তালাকই অনুষ্ঠিত হবে। তবে যদি স্বামীর পক্ষ থেকে তিন তালাকের ইখতিয়ার দেবার কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়ে থাকে, তাহলে স্ত্রীর তালাকের ইখতিয়ারের মাধ্যমে তিন তালাক অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। ইমাম শাফেঈর (র) মতে, যদি স্বামী ইখতিয়ার দেবার সময় তালাকের নিয়ত করে থাকে এবং স্ত্রী আলাদা হয়ে যায়, তাহলে একটি রজঈ তালাক অনুষ্ঠিত হবে। ইমাম মালেকের (র) মতে, স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকে তাহলে তিন তালাক অনুষ্ঠিত হবে আর যদি সহবাস না করে থাকে, তাহলে এ অবস্থায় স্বামী এক তালাকের নিয়তের দাবী করলে তা মেনে নেয়া হবে।

(গ) "যদি তুমি চাও, তাহলে তোমাকে তালাক দিলাম"—একথা বলার পর যদি স্ত্রী তালাকের ইখতিয়ার ব্যবহার করে, তাহলে বায়েন নয় বরং একটি রজঈ তালাক অনুষ্ঠিত হবে।

সাত ঃ যদি স্বামীর পক্ষ থেকে আলাদা হবার ইখ্তিয়ার দেবার পর স্ত্রী তার স্ত্রী হয়ে থাকার জন্য নিজের সম্মতি প্রকাশ করে, তাহলে কোন তালাক সংঘটিত হবে না। এ মত পোষণ করেন হযরত উমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আয়েশা (রা), হযরত আবুদ্ দারদা (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত ইবনে উমর (রা)।

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ
أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾ يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ
كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ
فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٢﴾

আর তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে এবং সৎকাজ করবে তাকে আমি দু'বার প্রতিদান দেবো[৪৫] এবং আমি তার জন্য সম্মানজনক রিযিকের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও।[৪৬] যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে থাকো, তাহলে মিহি স্বরে কথা বলো না, যাতে মনের গলদে আক্রান্ত কোন ব্যক্তি প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে, বরং পরিষ্কার সোজা ও স্বাভাবিকভাবে কথা বলো।[৪৭]

সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণ এ মতই অবলম্বন করেছেন। মাসরূক হযরত আয়েশাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি জবাব দেন ঃ

خَيَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نِسَائَهُ فَاخْتَرْنَهُ أَكَانَ ذٰلِكَ طَلَاقًا ؟

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদেরকে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন এবং তাঁরা রসূলুল্লাহরই সাথে থাকা পছন্দ করেছিলেন। একে কি তালাক বলে গণ্য করা হয়?"

এ ব্যাপারে একমাত্র হযরত আলীর (রা) ও হযরত যায়েদ ইবনে সাবেতের (রা) এ অভিমত উদ্ধৃত হয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে একটি রজঈ তালাক অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু এ উভয় মনীষীর অন্য একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তাঁরাও এ ক্ষেত্রে কোন তালাক সংঘটিত হবে না বলে মত প্রকাশ করেছেন।

৪৩. এর অর্থ এ নয় যে, নাউযুবিল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের থেকে কোন অশ্লীল কাজের আশংকা ছিল। বরং এর মাধ্যমে নবীর স্ত্রীগণকে এ অনুভূতি দান করাই উদ্দেশ্য ছিল যে, ইসলামী সমাজে তাঁরা যেমন উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত আছেন সেই অনুযায়ী তাঁদের দায়িত্বও অনেক কঠিন। তাই তাঁদের নৈতিক চালচলন হতে হবে অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। এটা ঠিক তেমনি যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ "যদি তুমি শিরক করো তাহলে তোমার সমস্ত কৃতকর্ম বরবাদ হয়ে যাবে।" (আয্ যুমার ঃ ৬৫) এর অর্থ এ নয় যে, নাউযুবিল্লাহ নবী করীম (সা) থেকে কোন শিরকের আশংকা ছিল বরং নবী করীমকে এবং তাঁর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে শিরক কত ভয়াবহ অপরাধ এবং তাকে কঠোরভাবে এড়িয়ে চলা অপরিহার্য, সে কথা বুঝানোই ছিল উদ্দেশ্য।

৪৪. অর্থাৎ তোমরা এ ভুলের মধ্যে অবস্থান করো না যে, নবীর স্ত্রী হওয়ার কারণে তোমরা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বেঁচে যাবে অথবা তোমাদের মর্যাদা এত বেশী উন্নত যে, সে কারণে তোমাদেরকে পাকড়াও করা আল্লাহর জন্য কঠিন হয়ে যেতে পারে।

৪৫. গোনাহর জন্য দু'বার শাস্তি ও নেকীর জন্য দু'বার পুরস্কার দেবার কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ যাদেরকে মানুষের সমাজে কোন উন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন তারা সাধারণত জনগণের নেতা হয়ে যায় এবং জনগণের বিরাট অংশ ভালো ও মন্দ কাজে তাঁদেরকেই অনুসরণ করে চলে। তাঁদের খারাপ কাজ শুধুমাত্র তাঁদের একার খারাপ কাজ হয় না বরং একটি জাতির চরিত্র বিকৃতির কারণও হয় এবং তাঁদের ভালো কাজ শুধুমাত্র তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত ভালো কাজ হয় না বরং বহু লোকের কল্যাণ সাধনেরও কারণ হয়। তাই তারা যখন খারাপ কাজ করে তখন নিজেদের খারাপের সাথে সাথে অন্যদের খারাপেরও শাস্তি পায় এবং যখনি তারা সৎকাজ করে তখন নিজেদের সৎকাজের সাথে সাথে অন্যদেরকে তারা যে সৎপথ দেখিয়েছে তারও প্রতিদান লাভ করে।

আলোচ্য আয়াত থেকে এ মূলনীতিও স্থিরীকৃত হয় যে, যেখানে মর্যাদা যত বেশী হবে এবং যত বেশী বিশ্বস্ততার আশা করা হবে সেখানে মর্যাদাহানি ও অবিশ্বস্ততার অপরাধ ততবেশী কঠোর হবে এবং এ সংগে তার শাস্তিও হবে তত বেশী কঠিন। যেমন মসজিদে শরাব পান করা নিজ গৃহে শরাব পান করার চেয়ে বেশী ভয়াবহ অপরাধ এবং এর শাস্তিও বেশী কঠোর। মাহরাম নারীদের সাথে যিনা করা অন্য নারীদের সাথে যিনা করার তুলনায় বেশী গোনাহের কাজ এবং এ জন্য শাস্তিও হবে বেশী কঠিন।

৪৬. এখান থেকে শেষ প্যারা পর্যন্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে ইসলামে পরদা সংক্রান্ত বিধানের সূচনা করা হয়েছে। এ আয়াতগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত মুসলিম পরিবারে এ সংশোধনীগুলো প্রবর্তন করা। নবীর পবিত্র স্ত্রীগণকে সম্বোধন করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহ থেকে এ পবিত্র জীবন ধারার সূচনা হবে তখন অন্যান্য সকল মুসলিম গৃহের মহিলারা আপনা আপনিই এর অনুসরণ করতে থাকবে। কারণ এ গৃহটিই তাদের জন্য আদর্শ ছিল। এ আয়াতগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে কেবলমাত্র এরি ভিত্তিতে কেউ কেউ দাবী করে বসেছেন যে, এ বিধানগুলো কেবলমাত্র তাঁদের সাথেই সংশ্লিষ্ট। কিন্তু সামনের দিকে এ আয়াতগুলোতে যা কিছু বলা হয়েছে তা পাঠ করে দেখুন। এর মধ্যে কোন্‌টি এমন যা শুধুমাত্র নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং বাকি মুসলমান নারীদের জন্য কাংখিত নয়? কেবলমাত্র নবীর স্ত্রীগণই আবর্জনামুক্ত নিষ্কলুষ

জীবন যাপন করবেন, তাঁরাই আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবেন, নামায তাঁরাই পড়বেন এবং যাকাত তাঁরাই দেবেন, আল্লাহর উদ্দেশ্য কি এটাই হতে পারতো? যদি এ উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব না হতো, তাহলে গৃহকোণে নিশ্চিন্তে বসে থাকা, জাহেলী সাজসজ্জা থেকে দূরে থাকা এবং ভিন্ পুরুষদের সাথে মৃদুস্বরে কথা বলার হুকুম একমাত্র তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং অন্যান্য সমস্ত মুসলিম নারীরা তা থেকে আলাদা হতে পারে কেমন করে? একই কথার ধারাবাহিকতায় বিধৃত সামগ্রিক বিধানের মধ্য থেকে কিছু বিধিকে বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জন্য নির্দিষ্ট ও কিছু বিধিকে সর্বসাধারণের পালনীয় গণ্য করার পেছনে কোন ন্যায়সংগত যুক্তি আছে কি? আর "তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও"—এ বাক্যটি থেকেও এ অর্থ বুঝায় না যে, সাধারণ নারীদের সাজসজ্জা করে বাইরে বের হওয়া এবং ভিন্ পুরুষদের সাথে খুব ঢলাঢলি করে কথাবার্তা বলা উচিত। বরং এ কথাটা কিছুটা এমনি ধরনের যেমন এক ভদ্রলোক নিজের সন্তানদেরকে বলে, "তোমরা বাজারের ছেলেমেয়েদের মত নও। তোমাদের গালাগালি না করা উচিত।" এ থেকে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ও বক্তা এ উদ্দেশ্য আবিষ্কার করবে না যে, সে কেবলমাত্র নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য গালি দেয়াকে খারাপ মনে করে, অন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে এ দোষ থাকলে তাতে তার কোন আপত্তি নেই।

৪৭. অর্থাৎ প্রয়োজন হলে কোন পুরুষের সাথে কথা বলতে বাধা নেই কিন্তু এ সময় নারীর কথা বলার ভংগী ও ধরন এমন হতে হবে যাতে আলাপকারী পুরুষের মনে কখনো এ ধরনের কোন চিন্তার উদয় না হয় যে, এ নারীটির ব্যাপারে অন্য কিছু আশা করা যেতে পারে। তার বলার ভংগীতে কোন নমনীয়তা থাকবে না। তার কথায় কোন মনমাতানো ভাব থাকবে না। সে সজ্ঞানে তার স্বরে মাধুর্য সৃষ্টি করবে না, যা শ্রবণকারী পুরুষের আবেগকে উদ্বেলিত করে তাকে সামনে পা বাড়াবার প্ররোচনা দেবে ও সাহস যোগাবে। এ ধরনের কথাবার্তা সম্পর্কে আল্লাহ পরিষ্কার বলেন, এমন কোন নারীর পক্ষে এটা শোভনীয় নয়, যার মনে আল্লাহ ভীতি ও অসৎকাজ থেকে দূরে থাকার প্রবণতা রয়েছে। অন্যকথায় বলা যায়, এটা দুশ্চরিত্রা ও বেহায়া নারীদের কথা বলার ধরন মু'মিন ও মুত্তাকী নারীদের নয়। এই সাথে সূরা নূরের নিম্নোক্ত আয়াতটিও সামনে রাখা দরকার وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ (আর তারা যেন যমীনের ওপর এমনভাবে পদাঘাত করে না চলে যার ফলে যে সৌন্দর্য তারা লুকিয়ে রেখেছে তা লোকদের গোচরীভূত হয়।) এ থেকে মনে হয় বিশ্ব-জাহানের রবের পরিষ্কার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, নারীরা যেন অযথা নিজেদের স্বর ও অলংকারের ধ্বনি অন্য পুরুষদেরকে না শোনায় এবং যদি প্রয়োজনে অপরিচিতদের সাথে কথা বলতে হয়, তাহলে পূর্ণ সতর্কতা সহকারে বলতে হবে। এ জন্য নারীদের আযান দেয়া নিষেধ। তাছাড়া জামায়াতের নামাযে যদি কোন নারী হাজির থাকে এবং ইমাম কোন ভুল করেন তাহলে পুরুষের মতো তার সুবহানাল্লাহ বলার অনুমতি নেই, তার কেবলমাত্র হাতের ওপর হাত মেরে আওয়াজ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে ইমাম সতর্ক হয়ে যান।

এখন চিন্তার বিষয় হচ্ছে যে দীন নারীকে ভিন্ পুরুষের সাথে কোমল স্বরে কথা বলার অনুমতি দেয় না এবং পুরুষদের সাথে অপ্রয়োজনে কথা বলতেও তাদেরকে নিষেধ করে, সে কি কখনো নারীর মঞ্চে এসে নাচগান করা, বাজনা বাজানো ও রঙ্গরস করা পছন্দ

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى وَأَقِمْنَ
الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَأَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۝

নিজেদের গৃহমধ্যে অবস্থান করো।[৪৮] এবং পূর্বের জাহেলী যুগের মতো সাজসজ্জা দেখিয়ে বেড়িও না।[৪৯] নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো। আল্লাহ তো চান, তোমাদের নবী পরিবার থেকে ময়লা দূর করতে এবং তোমাদের পুরোপুরি পাক-পবিত্র করে দিতে।[৫০]

করতে পারে? সে কি রেডিও-টেলিভিশনে নারীদের প্রেমের গান গেয়ে এবং সুমিষ্ট স্বরে অশ্লীল রচনা শুনিয়ে লোকদের আবেগকে উত্তেজিত করার অনুমতি দিতে পারে? নারীরা নাটকে কখনো কারো স্ত্রীর এবং কখনো কারো প্রেমিকার অভিনয় করবে, এটাকে কি সে বৈধ করতে পারে? অথবা তাদেরকে বিমানবালা (Air-hostess) করা হবে এবং বিশেষভাবে যাত্রীদের মন ভোলাবার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, কিংবা ক্লাবে, সামাজিক উৎসবে ও নারী-পুরুষের মিশ্র অনুষ্ঠানে তারা চমকপ্রদ সাজ-সজ্জা করে আসবে এবং পুরুষদের সাথে অবাধে মিলেমিশে কথাবার্তা ও ঠাট্টা-তামাসা করবে, এসবকে কি সে বৈধ বলবে? এ সংস্কৃতি উদ্ভাবন করা হয়েছে কোন্ কুরআন থেকে? আল্লাহর নাযিল করা কুরআন তো সবার সামনে আছে। সেখানে কোথাও যদি এ সংস্কৃতির অবকাশ দেখা যায় তাহলে সেখানটা চিহ্নিত করা হোক।

৪৮. মূলে বলা হয়েছে قَرْنَ কোন কোন অভিধানবিদ একে "قرار" শব্দ থেকে গৃহীত বলে মত প্রকাশ করেন আবার কেউ কেউ বলেন "وقار" থেকে গৃহীত। যদি এটি قرار থেকে উদ্ভূত হয়, তাহলে এর অর্থ হবে "স্থিতিবান হও", "টিকে থাকো"। আর যদি وقار থেকে উদ্ভূত হয়, তাহলে অর্থ হবে "শান্তিতে থাকো।", "নিশ্চিন্তে ও স্থির হয়ে বসে উভয় অবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, নারীর আসল কর্মক্ষেত্র হচ্ছে তার গৃহ। এ বৃত্তের মধ্যে অবস্থান করে তাকে নিশ্চিন্তে নিজের দায়িত্ব সম্পাদন করে যেতে হবে। কেবলমাত্র প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সে গৃহের বাইরে বের হতে পারে। আয়াতের শব্দাবলী থেকেও এ অর্থ প্রকাশ হচ্ছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস একে আরো বেশী সুস্পষ্ট করে দেয়। হাফেয আবু বকর বায্‌যার হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ নারীরা নবী করীমের (সা) কাছে নিবেদন করলো যে, পুরুষরা তো সকল শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লুটে নিয়ে গেলো। তারা জিহাদ করে এবং আল্লাহর পথে বড় বড় কাজ করে। মুজাহিদদের সমান প্রতিদান পাবার জন্য আমরা কি কাজ করবো? জবাবে বললেন ঃ

مَنْ قَعَدَتْ مِنْكُنَّ فِيْ بَيْتِهَا فَإِنَّهَا تُدْرِكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِيْنَ

"তোমাদের মধ্য থেকে যে গৃহমধ্যে বসে যাবে সে মুজাহিদদের মর্যাদা লাভ করবে।" অর্থাৎ মুজাহিদ তো তখনই স্থিরচিত্তে আল্লাহর পথে লড়াই করতে পারবে যখন নিজের ঘরের দিক থেকে সে পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে, তার স্ত্রী তার গৃহস্থালী ও সন্তানদেরকে আগলে রাখবে এবং তার অবর্তমানে তার স্ত্রী কোন অঘটন ঘটাবে না, এ ব্যাপারে সে পুরোপুরি আশংকামুক্ত থাকবে। যে স্ত্রী তার স্বামীকে এ নিশ্চিন্ততা দান করবে সে ঘরে বসেও তার জিহাদে পুরোপুরি অংশীদার হবে। অন্য একটি হাদীস বায্যার ও তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি বর্ণনা করেছেন ঃ

اِنَّ الْمَرْاَةَ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَاَقْرَبُ مَا تَكُوْنُ بِرَوْحَةٍ رَبِّهَا وَهِىَ فِىْ قَعْرِ بَيْتِهَا -

"নারী পর্দাবৃত থাকার জিনিস। যখন সে বের হয় শয়তান তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এবং তখনই সে আল্লাহর রহমতের নিকটতর হয় যখন সে নিজের গৃহে অবস্থান করে।" (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফসীর সূরা নূর ৪৯ টীকা)

কুরআন মজীদের এ পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হুকুমের উপস্থিতিতে মুসলমান নারীদের জন্য অবকাশ কোথায় কাউন্সিল ও পার্লামেন্টে সদস্য হবার, ঘরের বাইরে সামাজিক কাজকর্মে দৌড়াদৌড়ি করার, সরকারী অফিসে পুরুষদের সাথে কাজ করা, কলেজে ছেলেদের সাথে শিক্ষালাভ করার, পুরুষদের হাসপাতালে নার্সিংয়ের দায়িত্ব সম্পাদন করার, বিমানে ও রেলগাড়িতে যাত্রীদের সেবা করার দায়িত্বে নিয়োজিত হবার এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের জন্য তাদেরকে আমেরিকায় ও ইংল্যাণ্ডে পাঠাবার? নারীদের ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করার বৈধতার সপক্ষে সবচেয়ে যে যুক্তি পেশ করা হয় সেটি হচ্ছে এই যে, হযরত আয়েশা (রা) উষ্ট্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এ যুক্তি যারা পেশ করেন তারা সম্ভবত এ ব্যাপারে স্বয়ং হযরত আয়েশার কি চিন্তা ছিল তা জানেন না। আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল যাওয়ায়েদুয যাহ্দ এবং ইবনুল মুন্যির, ইবনে আবী শাইবাহ ও ইবনে সা'দ তাঁদের কিতাবে মাসরূক থেকে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, হযরত আয়েশা (রা) যখন কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে এ আয়াতে পৌঁছতেন (وقرن فى بيوتكن) তখন স্বতস্ফূর্তভাবে কেঁদে ফেলতেন, এমনকি তাঁর উড়না ভিজে যেতো। কারণ এ প্রসংগে উষ্ট্র যুদ্ধে গিয়ে তিনি যে ভুল করেছিলেন সে কথা তাঁর মনে পড়ে যেতো।

৪৯. এ আয়াতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ অনুধাবন করার জন্য এ দু'টি বুঝে নেয়া জরুরী। এর একটি হচ্ছে "তাবাররুজ" এবং দ্বিতীয়টি "জাহেলিয়াত।"

আরবী ভাষায় 'তাবাররুজ' মানে হচ্ছে উন্মুক্ত হওয়া, প্রকাশ হওয়া এবং সুস্পষ্ট হয়ে সামনে এসে যাওয়া। দূর থেকে দেখা যায় এমন প্রত্যেক উঁচু ভবনকে আরবরা "বুরুজ" বলে থাকে। দুর্গ বা প্রাসাদের বাইরের অংশের উচ্চ কক্ষকে এ জন্যই বুরুজ বলা হয়ে থাকে। পালতোলা নৌকার পাল দূর থেকে দেখা যায় বলে তাকে "বারজা" বলা হয়,

নারীর জন্য তাবার্‌রুজ শব্দ ব্যবহার করা হলে তার তিনটি অর্থ হবে। এক, সে তার চেহারা ও দেহের সৌন্দর্য লোকদের দেখায়। দুই, সে তার পোশাক ও অলংকারের বহর লোকদের সামনে উন্মুক্ত করে। তিন, সে তার চাল–চলন ও চমক–ঠমকের মাধ্যমে নিজেকে অন্যদের সামনে তুলে ধরে। অভিধান ও তাফসীর বিশারদগণ এ শব্দটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন। মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইবনে আবি নুজাইহ বলেন, التبرج المشى بتبختر وتكسر وتغنج "তাবাররুজের অর্থ হচ্ছে, গর্ব ও মনোরম অংগভংগী সহকারে হেলেদুলে ও সাড়ম্বরে চলা।" মুকাতিল বলেন, ابداء قلائدها وقرطها وعنقها "নিজের হার, ঘাড় ও গলা সুস্পষ্ট করা।" আল মুবার্‌রাদের উক্তি হচ্ছে ঃ ان تبدى من محاسنها مايجب عليها ستره "নারীর এমন গুণাবলী প্রকাশ করা যেগুলো তার গোপন রাখা উচিত।" আবু উবাইদাহর ব্যাখ্যা হচ্ছে ঃ

ان تخرج من محاسنها ماتستدعى به شهوة الرجال

"নারীর শরীর ও পোশাকের সৌন্দর্য এমনভাবে উন্মুক্ত করা যার ফলে পুরুষেরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।"

জাহেলিয়াত শব্দটি কুরআন মজিদের এ জায়গা ছাড়াও আরো তিন জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। এক, আলে ইমরানের ১৫৪ আয়াত। সেখানে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে যারা গা বাঁচিয়ে চলে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা "আল্লাহ সম্পর্কে সত্যের বিরুদ্ধে জাহেলিয়াতের মতো ধারণা পোষণ করে।" দুই, সূরা মা–য়েদাহর ৫০ আয়াতে। সেখানে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে অন্য কারোর আইন অনুযায়ী ফায়সালাকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তারা কি জাহেলিয়াতের ফায়সালা চায়?" তিন, সূরা ফাত্‌হের ২৬ আয়াতে সেখানে মক্কার কাফেররা নিছক বিদ্বেষ বশত মুসলমানদের উমরাহ করতে দেয়নি বলে তাদের এ কাজকেও "জাহেলী স্বার্থান্ধতা ও জিদ" বলা হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে, একবার হযরত আবু দারদা কারো সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে তার মাকে গালি দেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা শুনে বলেন, "তোমার মধ্যে এখনো জাহেলিয়াত রয়ে গেছে।" অন্য একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "তিনটি কাজ জাহেলিয়াতের অন্তরভুক্ত। অন্যের বংশের খোটা দেয়া, নক্ষত্রের আবর্তন থেকে ভাগ্য নির্ণয় করা এবং মৃতদের জন্য সুর করে কান্নাকাটি করা।" শব্দটির এ সমস্ত প্রয়োগ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, জাহেলিয়াত বলতে ইসলামী পরিভাষায় এমন প্রত্যেকটি কার্যধারা বুঝায় যা ইসলামী কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, ইসলামী শিষ্টাচার ও নৈতিকতা এবং ইসলামী মানসিকতার বিরোধী। আর প্রথম যুগের জাহেলিয়াত বলতে এমন অসৎকর্ম বুঝায় যার মধ্যে প্রাগৈসলামিক আরবরা এবং দুনিয়ার অন্যান্য সমস্ত লোকেরা লিপ্ত ছিল।

এ ব্যাখ্যা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ নারীদেরকে যে কার্যধারা থেকে বিরত রাখতে চান তা হচ্ছে, তাদের নিজেদের সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করে গৃহ থেকে বের হওয়া। তিনি তাদের আদেশ দেন, নিজেদের গৃহে অবস্থান করো। কারণ, তোমাদের আসল

কাজ রয়েছে গৃহে, বাইরে নয়। কিন্তু যদি বাইরে বের হবার প্রয়োজন হয়, তাহলে এমনভাবে বের হয়ো না যেমন জাহেলী যুগে নারীরা বের হতো। প্রসাধন ও সাজ-সজ্জা করে, সুশোভন অলংকার ও আঁটসাঁট বা হাল্কা মিহিন পোশাকে সজ্জিত হয়ে চেহারা ও দেহের সৌন্দর্যকে উন্মুক্ত করে এবং গর্ব ও আড়ম্বরের সাথে চলা কোন মুসলিম সমাজের নারীদের কাজ নয়। এগুলো জাহেলিয়াতের রীতিনীতি। ইসলামে এসব চলতে পারে না। এখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই দেখতে পারেন আমাদের দেশে যে সংস্কৃতির প্রচলন করা হচ্ছে তা কুরআনের দৃষ্টিতে ইসলামের সংস্কৃতি না জাহেলিয়াতের সংস্কৃতি? তবে হাঁ, আমাদের কর্মকর্তাদের কাছে যদি অন্য কোন কুরআন এসে গিয়ে থাকে, যা থেকে ইসলামের এ নতুন তত্ত্ব ও ধ্যান-ধারণা বের করে তারা মুসলমানদের মধ্যে ছড়াচ্ছেন, তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা।

৫০. যে প্রেক্ষাপটে এ আয়াত নাযিল হয়েছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, এখানে আহলে বায়েত বা নবী পরিবার বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদেরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ সম্বোধনের সূচনা করা হয়েছে "হে নবীর স্ত্রীগণ!" বলে এবং সামনের ও পিছনের পুরো ভাষণ তাদেরকে সম্বোধন করেই ব্যক্ত হয়েছে। এ ছাড়াও যে অর্থে আমরা "পরিবারবর্গ" শব্দটি বলি এ অর্থে একজন লোকের স্ত্রী ও সন্তানরা সবাই এর অন্তরভুক্ত হয় ঠিক সেই একই অর্থে আরবী ভাষায় "আহলুল বায়েত" শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্ত্রীকে বাদ দিয়ে "পরিবারবর্গ" শব্দটি কেউ ব্যবহার করে না। খোদ কুরআন মজীদেও এ জায়গা ছাড়াও আরো দু'জায়গায় এ শব্দটি এসেছে এবং সে দু'জায়গায়ও তার অর্থের মধ্যে স্ত্রী অন্তরভুক্তই শুধু নয়, অগ্রবর্তীও রয়েছে। সূরা হূদে যখন ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীমকে (আ) পুত্র সন্তান লাভের সুসংবাদ দেন তখন তাঁর স্ত্রী তা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেন এই বলে যে, এ বুড়ো বয়সে আমাদের আবার ছেলে হবে কেমন করে! একথায় ফেরেশতারা বলেন ঃ

اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُه عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ

"তোমরা কি আল্লাহর কাজে অবাক হচ্ছো? হে এ পরিবারের লোকেরা! তোমাদের প্রতি তো আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত রয়েছে।"

সূরা কাসাসে যখন হযরত মূসা (আ) একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু হিসেবে ফেরাউনের গৃহে পৌঁছে যান এবং ফেরাউনের স্ত্রী এমন কোন ধাত্রীর সন্ধান করতে থাকেন যার দুধ এ শিশু পান করবে তখন হযরত মূসার বোন গিয়ে বলেন ঃ

هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ

"আমি কি তোমাদের এমন পরিবারের খবর দেবো যারা তোমাদের জন্য এ শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব নেবেন?"

কাজেই ভাষার প্রচলিত কথ্যরীতি, কুরআনের বর্ণনাভংগী এবং খোদ এ আয়াতটির পূর্বাপর আলোচ্য বিষয় সবকিছুই চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহলি বায়েতের মধ্যে তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণও আছেন এবং তাঁর সন্তানরাও

আছেন। বরং বেশী নির্ভুল কথা হচ্ছে এই যে, আয়াতে মূলত সম্বোধন করা হয়েছে তাঁর স্ত্রীগণকেই এবং সন্তানরা এর অন্তরভুক্ত গণ্য হয়েছেন শব্দের অর্থের প্রেক্ষিতে। এ কারণে ইবনে আব্বাস (রা), উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) এবং ইকরামাহ বলেন, এ আয়াতে আহ্লে বায়েত বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদেরকেই বুঝনো হয়েছে।

কিন্তু কেউ যদি বলেন, 'আহলুল বায়েত' শব্দ শুধুমাত্র স্ত্রীদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, অন্য কেউ এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না, তাহলে একথাও ভুল হবে। "পরিবারবর্গ" শব্দের মধ্যে মানুষের সকল সন্তান-সন্ততি কেবল শামিল হয় তাই নয় বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সুস্পষ্টভাবে তাদের শামিল হবার কথা বলেছেন। ইবনে আবি হাতেম বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়েশাকে (রা) একবার হযরত আলী (রা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। জবাবে তিনি বলেন ঃ

تَسْأَلُنِىْ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَتُهُ وَاَحَبُّ النَّاسِ اِلَيْهِ -

"তুমি আমাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো যিনি ছিলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়তম লোকদের অন্তরভুক্ত এবং যার স্ত্রী ছিলেন রসূলের এমন মেয়ে যাকে তিনি মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন।" তারপর হযরত আয়েশা (রা) এ ঘটনা শুনান ঃ নবী করীম (সা) হযরত আলী ও ফাতেমা এবং হাসান ও হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে ডাকলেন এবং তাঁদের উপর একটি কাপড় ছড়িয়ে দিলেন এবং দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِىْ فَاَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيْرًا ۝

"হে আল্লাহ এরা আমার আহলে বায়েত (পরিবারবর্গ), এদের থেকে নাপাকি দূর করে দাও এবং এদেরকে পাক-পবিত্র করে দাও।"

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি নিবেদন করলাম, আমিও তো আপনার আহ্লে বায়েতের অন্তরভুক্ত (অর্থাৎ আমাকেও এ কাপড়ের নীচে নিয়ে আমার জন্যও দোয়া করুন) নবী করীম (সা) বলেন, "তুমি আলাদা থাকো, তুমি তো অন্তরভুক্ত আছোই।" প্রায় একই ধরনের বক্তব্য সম্বলিত বহু সংখ্যক হাদীস মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ, ইবনে জারীর, হাকেম, বায়হাকি প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ আবু সাঈদ খুদরী (রা), হযরত আয়েশা (রা), হযরত আনাস (রা), হযরত উম্মে সালামাহ (রা), হযরত ওয়াসিলাহ ইবনে আসকা' এবং অন্যান্য কতিপয় সাহাবা থেকে বর্ণনা করেছেন। সেগুলো থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রা), ফাতেমা (রা) এবং তাদের দু'টি সন্তানকে নিজের আহলে বায়েত গণ্য করেন। কাজেই যাঁরা তাঁদেরকে আহলে বায়েতের বাইরে মনে করেন তাদের চিন্তা ভুল।

অনুরূপভাবে যারা উপরোক্ত হাদীসগুলোর ভিত্তিতে রসূলের পবিত্র স্ত্রীগণকে আহলে বায়েতের বাইরে গণ্য করেন তাদের মতও সঠিক নয়। প্রথমত যে বিষয়টি সরাসরি কুরআন থেকে প্রমাণিত, তাকে কোন হাদীসের ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে না।

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾

আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের যেসব কথা তোমাদের গৃহে শুনানো হয়।[৫১] তা মনে রেখো। অবশ্যই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী[৫২] ও সর্ব অবহিত।

দ্বিতীয়ত সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলোর অর্থও তা নয় যা সেগুলো থেকে গ্রহণ করা হচ্ছে। এগুলোর কোন কোনটিতে এই যে কথা এসেছে যে, হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত উম্মে সালামাকে (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই চাদরের নীচে নেননি যার মধ্যে হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইনকে নিয়েছিলেন, এর অর্থ এ নয় যে, তিনি তাঁদেরকে নিজের "পরিবারের" বাইরে গণ্য করেছিলেন। বরং এর অর্থ হচ্ছে, স্ত্রীগণ তো পরিবারের অন্তরগত ছিলেনই। কারণ কুরআন তাঁদেরকেই সম্বোধন করেছিল। কিন্তু নবী করীমের মনে আশংকা হলো, এ চারজন সম্পর্কে কুরআনের বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে কারো যেন ভুল ধারণা না হয়ে যায় যে, তাঁরা আহলে বায়েতের বাইরে আছেন, তাই তিনি পবিত্র স্ত্রীগণের পক্ষে নয়, তাঁদের পক্ষে ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার প্রয়োজন অনুভব করেন।

একটি দল এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শুধুমাত্র এতটুকু বাড়াবাড়ি করেই ক্ষান্ত থাকেননি যে, পবিত্র স্ত্রীগণকে আহলে বায়েত থেকে বের করে দিয়ে কেবলমাত্র হযরত আলী (রা), ফাতেমা (রা) ও তাঁদের দু'টি সন্তানকে এর মধ্যে শামিল করেছেন বরং এর ওপর এভাবে আরো বাড়াবাড়ি করেছেন যে, "আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে ময়লা দূর করে তোমাদেরকে পুরোপুরি পবিত্র করে দিতে" কুরআনের এ শব্দগুলো থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, হযরত আলী, ফাতেমা এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততি আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামগণের মতোই মাসূম তথা গোনাহমুক্ত নিষ্পাপ। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, "ময়লা" অর্থ ভ্রান্তি ও গোনাহ এবং আল্লাহর উক্তি অনুযায়ী আহলে বায়েতকে এগুলো থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। অথচ আয়াতে একথা বলা হয়নি যে, তোমাদের থেকে ময়লা দূর করে দেয়া হয়েছে এবং তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করা হয়েছে। বরং বলা হয়েছে, আল্লাহ তোমাদের থেকে ময়লা দূর করতে এবং তোমাদের পুরোপুরি পাক পবিত্র করতে চান। পূর্বাপর আলোচনাও এখানে আহলে বায়েতের মর্যাদা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য একথা বলে না। বরং এখানে তো আহলে বায়েতকে এ মর্মে নসিহত করা হয়েছে, তোমরা অমুক কাজ করো এবং অমুক কাজ করো না কারণ আল্লাহ তোমাদের পাক পবিত্র করতে চান। অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা অমুক নীতি অবলম্বন করলে পবিত্রতার নিয়ামতে সমৃদ্ধ হবে অন্যথায় তা লাভ করতে পারবে না। তবুও যদি..... يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا এর অর্থ এ নেয়া হয় যে, আল্লাহ তাঁদেরকে নিষ্পাপ করে দিয়েছেন, তাহলে অযু, গোসল ও তায়াম্মুমকারী প্রত্যেক মুসলমানকে নিষ্পাপ বলে মেনে না নেয়ার কোন কারণ নেই। কারণ তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ

"কিন্তু আল্লাহ চান তোমাদেরকে পাকপবিত্র করে দিতে এবং তাঁর নিয়ামত তোমাদের উপর পূর্ণ করে দিতে।" (আল মা-য়েদাহ, ৬)

৫১. মূলে وَاذْكُرْنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর দু'টি অর্থ ঃ "মনে রেখো" এবং "বর্ণনা করো।" প্রথম অর্থের দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য এই দাঁড়ায় ঃ হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা কখনো ভুলে যেয়ো না যে, যেখান থেকে সারা দুনিয়াকে আল্লাহর আয়াত, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার শিক্ষা দেয়া হয় সেটিই তোমাদের আসল গৃহ। তাই তোমাদের দায়িত্ব বড়ই কঠিন। লোকেরা এ গৃহে জাহেলিয়াতের আদর্শ দেখতে থাকে, এমন যেন না হয়। দ্বিতীয় অর্থটির দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য হয় ঃ হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা যা কিছু শোনো এবং দেখো তা লোকদের সামনে বর্ণনা করতে থাকো। কারণ রসূলের সাথে সার্বক্ষণিক অবস্থানের কারণে এমন অনেক বিধান তোমাদের গোচরীভূত হবে যা তোমাদের ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে লোকদের জানা সম্ভব হবে না।

এ আয়াতে দু'টি জিনিসের কথা বলা হয়েছে। এক, আল্লাহর আয়াত, দুই, হিকমাত বা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। আল্লাহর আয়াত অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর কিতাবের আয়াত। কিন্তু হিকমাত শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। সকল প্রকার জ্ঞানের কথা এর অন্তরভুক্ত, যেগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে শেখাতেন। আল্লাহর কিতাবের শিক্ষার ওপরও এ শব্দটি প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র তার মধ্যেই একে সীমিত করে দেবার সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। কুরআনের আয়াত শুনানো ছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পবিত্র জীবন ও নৈতিক চরিত্র এবং নিজের কথার মাধ্যমে যে হিকমাতের শিক্ষা দিতেন তাও অপরিহার্যভাবে এর অন্তরভুক্ত। কেউ কেউ কেবলমাত্র এরি ভিত্তিতে যে আয়াতে مَا يُتْلٰى (যা তেলাওয়াত করা হয়) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এ দাবী করেন যে আল্লাহর আয়াত ও হিকমাত মানে হচ্ছে কেবলমাত্র কুরআন। কারণ "তেলাওয়াত" শব্দটি একমাত্র কুরআন তেলাওয়াতের সাথেই সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এ যুক্তি একেবারেই ভ্রান্ত। তেলাওয়াত শব্দটি পারিভাষিকভাবে একমাত্র কুরআন বা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেয়া পরবর্তীকালের লোকদের কাজ। কুরআনে এ শব্দটিকে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। সূরা বাকারার ১০২ আয়াতে এ শব্দটিকেই যাদুমন্ত্রের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। শয়তানরা হযরত সুলাইমানের নামের সাথে জড়িত করে এ মন্ত্রগুলো লোকদেরকে তেলাওয়াত করে শুনাতো ঃ

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ

"তারা অনুসরণ করে এমন এক জিনিসের যা তেলাওয়াত করতো (অর্থাৎ যা শুনাতো) শয়তানরা সুলাইমানের বাদশাহীর সাথে জড়িত করে"—থেকে স্পষ্টত প্রমাণিত হয়, কুরআন এ শব্দটিকে এর শাব্দিক অর্থে ব্যবহার করে। আল্লাহর কিতাবের আয়াত শুনাবার জন্য পারিভাষিকভাবে একে নির্দিষ্ট করে না।

৫২. আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী। অর্থাৎ গোপনে এবং অতিসংগোপনে রাখা কথাও তিনি জানতে পারেন। কোন জিনিসই তাঁর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা যেতে পারে না।

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ
وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ
وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ
وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ
كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ۙ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

৫ রুকূ'

একথা সুনিশ্চিত যে,[৫৩] যে পুরুষ ও নারী মুসলিম,[৫৪] মু'মিন,[৫৫] হুকুমের অনুগত,[৫৬] সত্যবাদী,[৫৭] সবরকারী,[৫৮] আল্লাহর সামনে বিনত,[৫৯] সাদকাদানকারী,[৬০] রোযা পালনকারী,[৬১] নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী[৬২] এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণকারী[৬৩] আল্লাহ তাদের জন্য মাগফিরাত এবং প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।[৬৪]

৫৩. পিছনের প্যারাগ্রাফের পরপরই এ বিষয়বস্তু উপস্থাপন করে এই মর্মে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত করা হয়েছে যে, ওপরে রসূলের (সা) পবিত্র স্ত্রীগণকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা কেবলমাত্র তাঁদের জন্যই নির্দিষ্ট নয় বরং মুসলিম সমাজের সামগ্রিক সংশোধন কাজ সাধারণভাবে এসব নির্দেশ অনুযায়ীই করতে হবে।

৫৪. অর্থাৎ যারা নিজেদের জন্য ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং এখন জীবন যাপনের ক্ষেত্রে এ বিধানের অনুসারী হবার ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত করে নিয়েছে। অন্য কথায়, যাদের মধ্যে ইসলাম প্রদত্ত চিন্তাপদ্ধতি ও জীবনধারার বিরুদ্ধে কোন রকমের বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতার লেশমাত্র নেই। বরং তারা তার পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের পথ অবলম্বন করেছে।

৫৫. অর্থাৎ যাদের এ আনুগত্য নিছক বাহ্যিক নয়, গত্যন্তর নেই, মন চায় না তবুও করছি, এমন নয়। বরং মন থেকেই তারা ইসলামের নেতৃত্বকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে। চিন্তা ও কর্মের যে পথ কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখিয়েছেন সেটিই সোজা ও সঠিক পথ এবং তারই অনুসরণের মধ্যে আমাদের সাফল্য নিহিত, এটিই তাদের ঈমান। যে জিনিসকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভুল বলে দিয়েছেন তাদের নিজেদের মতেও সেটি নিশ্চিতই ভুল। আর থাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা) সত্য বলে দিয়েছেন তাদের নিজেদের মন-মস্তিষ্কও তাকেই সত্য বলে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে। তাদের চিন্তা ও মানসিক অবস্থা এমন নয়। কুরআন ও সুন্নাত থেকে যে হুকুম প্রমাণিত হয় তাকে

তারা অসংগত মনে করতে পারে এবং এ চিন্তার বেড়াজালে এমনভাবে আটকে যেতে পারে যে, কোন প্রকারে তাকে পরিবর্তিত করে নিজেদের মন মাফিক করে নেবে অথবা দুনিয়ার প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে তাকে ঢালাইও করে নেবে আবার এ অভিযোগও নিজেদের মাথায় নেবে না যে, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হুকুম কাটছাঁট করে নিয়েছি। হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমানের সঠিক অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِا اللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا ٥

"ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে তার রব, ইসলামকে তার দীন এবং মুহাম্মাদকে তার রসূল বলে মেনে নিতে রাজি হয়ে গেছে।" (মুসলিম)

অন্য একটি হাদীসে তিনি এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন ঃ

لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

"তোমাদের কোন ব্যক্তি মু'মিন হয় না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমি যা এনেছি তার অনুগত হয়ে যায়।" (শারহুস সুন্নাহ)

৫৬. অর্থাৎ তারা নিছক মেনে নিয়ে বসে থাকার লোক নয়। বরং কার্যত আনুগত্যকারী। তাদের অবস্থা এমন নয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যে কাজের হুকুম দিয়েছেন তাকে সত্য বলে মেনে নেবে ঠিকই কিন্তু কার্যত তার বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন নিজেরা আন্তরিকভাবে সেগুলোকে খারাপ মনে করবে কিন্তু নিজেদের বাস্তব জীবনে সেগুলোই করে যেতে থাকবে।

৫৭. অর্থাৎ নিজেদের কথায় যেমন সত্য তেমনি ব্যবহারিক কার্যকলাপেও সত্য। মিথ্যা, প্রতারণা, অসৎ উদ্দেশ্য, ঠগবৃত্তি ও ছলনা তাদের জীবনে পাওয়া যায় না। তাদের বিবেক যা সত্য বলে জানে মুখে তারা তাই উচ্চারণ করে। তাদের মতে যে কাজ ঈমানদারীর সাথে সত্য ও সততা অনুযায়ী হয় সেই কাজই তারা করে। যার সাথেই তারা কোন কাজ করে বিশ্বস্ততা ও ঈমানদারীর সাথেই করে।

৫৮. অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রসূল নির্দেশিত সোজা সত্য পথে চলার এবং আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার পথে যে বাধাই আসে, যে বিপদই দেখা দেয়, যে কষ্টই সহ্য করতে হয় এবং যে সমস্ত ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়, দৃঢ়ভাবে তারা তার মোকাবিলা করে। কোনপ্রকার ভীতি, লোক ও প্রবৃত্তির কামনার কোন দাবী তাদেরকে সোজা পথ থেকে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয় না।

৫৯. অর্থাৎ তারা দম্ভ, অহংকার ও আত্মম্ভরীতামুক্ত। তারা এ সত্যের পূর্ণ সচেতন অনুভূতি রাখে যে, তারা বান্দা এবং বন্দেগীর বাইরে তাদের কোন মর্যাদা নেই। তাই তাদের দেহ ও অন্তরাত্মা উভয়ই আল্লাহর সামনে নত থাকে। আল্লাহ ভীতি তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। আত্মঅহমিকায় মত্ত আল্লাহভীতি শূন্য লোকদের থেকে যে

ধরনের মনোভাব প্রকাশিত হয় এমন কোন মনোভাব কখনো তাদের থেকে প্রকাশিত হয় না। আয়াতের বিন্যাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে জানা যায়, এখানে এ সাধারণ আল্লাহভীতি মূলক মনোভাবের সাথে বিশেষভাবে "খুশু" বা বিনত হওয়া শব্দ ব্যবহার করায় এর অর্থ হয় নামায। কারণ এরপরই সাদকাহ ও রোযার কথা বলা হয়েছে।

৬০. এর অর্থ কেবল ফরয যাকাত আদায় করাই নয় বরং সাধারণ দান-খয়রাতও এর অন্তরভুক্ত। অর্থাৎ তারা আল্লাহর পথে উন্মুক্ত হৃদয়ে নিজেদের অর্থ ব্যয় করে। আল্লাহর বান্দাদের সাহায্য করার ব্যাপারে নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালাতে তারা কসুর করে না। কোন এতিম, রুগ্ন, বিপদাপন্ন, দুর্বল, অক্ষম, গরীব ও অভাবী ব্যক্তি তাদের লোকালয়ে তাদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকে না। আর আল্লাহর দীনকে সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন হলে তার জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে তারা কখনো কার্পণ্য করে না।

৬১. ফরয ও নফল উভয় ধরনের রোযা এর অন্তরভুক্ত হবে।

৬২. এর দু'টি অর্থ হয়। একটি হচ্ছে, তারা যিনা থেকে দূরে থাকে এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তারা উলংগতাকে এড়িয়ে চলে। এই সাথে এটাও বুঝে নিতে হবে যে, কেবলমাত্র মানুষের পোশাক না পরে উলংগ হয়ে থাকাকে উলংগতা বলে না বরং এমন ধরনের পোশাক পরাও উলংগতার অন্তরভুক্ত, যা এতটা সূক্ষ্ম হয় যে, তার মধ্য দিয়ে শরীর দেখা যায় অথবা এমন চোস্ত ও আঁটসাঁট হয় যার ফলে তার সাহায্যে দৈহিক কাঠামো ও দেহের উঁচু-নীচু অংগ সবই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৬৩. আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করার অর্থ হচ্ছে, জীবনের সকল কাজেকর্মে সমস্ত ব্যাপারেই সবসময় যেন মানুষের মুখে আল্লাহর নাম এসে যায়। মানুষের মনে আল্লাহর চিন্তা পুরোপুরি ও সর্বব্যাপী আসন গেঁড়ে না বসা পর্যন্ত এ ধরনের অবস্থা তার মধ্যে সৃষ্টি হয় না। মানুষের চেতনার জগত অতিক্রম করে যখন অচেতন মনের গভীরদেশেও এ চিন্তা বিস্তৃত হয়ে যায় তখনই তার অবস্থা এমন হয় যে, সে কোন কথা বললে বা কোন কাজ করলে তার মধ্যে আল্লাহর নাম অবশ্যই এসে যাবে। আহার করলে 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করবে। আহার শেষ করবে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে। আল্লাহকে স্মরণ করে ঘুমাবে এবং ঘুম ভাঙবে আল্লাহর নাম নিতে নিতে। কথাবার্তায় তার মুখে বারবার বিসমিল্লাহ, আল্হামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ এবং এ ধরনের অন্য শব্দ ও বাক্য বারবার উচ্চারিত হতে থাকবে। প্রত্যেক ব্যাপারে বারবার সে আল্লাহর সাহায্য চাইবে। প্রত্যেকটি নিয়ামত লাভ করার পর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। প্রত্যেকটি বিপদ আসার পর তাঁর রহমতের প্রত্যাশী হবে। প্রত্যেক সংকটে তাঁর দিকে মুখ ফিরাবে। কোন খারাপ কাজের সুযোগ এলে তাঁকে ভয় করবে। কোন ভুল বা অপরাধ করলে তাঁর কাছে মাফ চাইবে। প্রত্যেকটি প্রয়োজন ও অভাবের মুহূর্তে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে। মোটকথা উঠতে বসতে এবং দুনিয়ার সমস্ত কাজকর্মে আল্লাহর স্মরণ হয়ে থাকবে তার কণ্ঠলগ্ন। এ জিনিসটি আসলে ইসলামী জীবনের প্রাণ। অন্য যে কোন ইবাদাতের জন্য কোন না কোন সময় নির্ধারিত থাকে এবং তখনই তা পালন করা হয়ে থাকে এবং তা পালন করার পর মানুষ তা থেকে আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু এ ইবাদাতটি সর্বক্ষণ জারী থাকে এবং এটিই আল্লাহ ও তাঁর বন্দেগীর সাথে মানুষের জীবনের স্থায়ী সম্পর্ক জুড়ে রাখে। মানুষের মন

কেবলমাত্র এসব বিশেষ কাজের সময়েই নয় বরং সর্বক্ষণ আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট এবং তার কণ্ঠ সর্বক্ষণ তাঁর স্মরণে সিক্ত থাকলেই এরি মাধ্যমেই ইবাদাত ও অন্যান্য দীনী কাজে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। মানুষের মধ্যে যদি এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহলে তার জীবনে ইবাদাত ও দীনী কাজ ঠিক তেমনিভাবে বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করে যেমন একটি চারাগাছকে তার প্রকৃতির অনুকূল আবহাওয়ায় রোপণ করা হলে তা বেড়ে ওঠে। পক্ষান্তরে যে জীবন আল্লাহর এ সার্বক্ষণিক স্মরণ শূন্য থাকে সেখানে নিছক বিশেষ সময়ে অথবা বিশেষ সুযোগে অনুষ্ঠিত ইবাদাত ও দীনী কাজের দৃষ্টান্ত এমন একটি চারাগাছের মতো যাকে তার প্রকৃতির প্রতিকূল আবহাওয়ায় রোপণ করা হয় এবং নিছক বাগানের মালির বিশেষ তত্ত্বাবধানের কারণে বেঁচে থাকে। একথাটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

عن معاذبن انس الجهنى عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان رجلا سأله اى المجاهدين اعظم اجرا يا رسول اللّه ؟ قال اكثرهم لله تعالى ذكرا - قال اى الصائمين اكثر اجرا ؟ قال اكثرهم لله عز وجل ذكرا - ثم ذكر الصلوة والزكوة والحج والصدقه كل ذلك يقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم اكثرهم لله ذكرا -

"মু'আয ইবনে আনাস জুহানী বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রসূল! জিহাদকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রতিদান লাভ করবে কে? জবাব দিলেন, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে স্মরণ করবে। তিনি নিবেদন করেন, রোযা পালনকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রতিদান পাবে কে? জবাব দিলেন, যে তাদের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করবে? আবার তিনি একইভাবে নামায, যাকাত, হজ্জ ও সাদকা আদায়কারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। জবাবে নবী করীম (সা) বলেন, "যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করে।" (মুসনাদে আহমাদ)

৬৪. আল্লাহর দরবারে কোন্ গুণাবলীকে আসল মূল্য ও মর্যাদা দেয়া হয় এ আয়াতে তা বলে দেয়া হয়েছে। এগুলো ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধ (Bassic Valucs)। একটি বাক্যে এগুলোকে একত্র সংযোজিত করে দেয়া হয়েছে। এ মূল্যবোধগুলোর প্রেক্ষিতে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন ফারাক নেই। কাজের ভিত্তিতে নিসন্দেহে উভয় দলের কর্মক্ষেত্র আলাদা। পুরুষদের জীবনের কিছু বিভাগে কাজ করতে হয়। নারীদের কাজ করতে হয় ভিন্ন কিছু বিভাগে। কিন্তু এ গুণাবলী যদি উভয়ের মধ্যে সমান থাকে তাহলে আল্লাহর কাছে উভয়ের মর্যাদা সমান এবং উভয়ের প্রতিদানও সমান হবে। একজন রান্নাঘর ও গৃহস্থালী সামলালো এবং অন্যজন খেলাফতের মসনদে বসে শরীয়াতের বিধান জারী করলো আবার একজন গৃহে সন্তান লালন-পালন করলো এবং অন্যজন যুদ্ধের ময়দানে

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ের ফায়সালা দিয়ে দেন তখন কোন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীর[৬৫] সেই ব্যাপারে নিজে ফায়সালা করার কোন অধিকার নেই। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হয়।[৬৬]

গিয়ে আল্লাহ ও তাঁর দীনের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করলো—এ জন্যে উভয়ের মর্যাদা ও প্রতিদানে কোন পার্থক্য দেখা দেবে না।

৬৫. হযরত যয়নবের (রা) সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবাহ প্রসংগে যে আয়াত নাযিল হয়েছিল এখান থেকেই তা শুরু হচ্ছে।

৬৬. ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদাহ, ইকরামাহ ও মুকাতিল ইবনে হাইয়ান বলেন, এ আয়াত তখন নাযিল হয়েছিল যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যায়েদের (রা) জন্য হযরত যয়নবের (রা) সাথে বিয়ের পয়গাম দিয়েছিলেন এবং হযরত যয়নব ও তাঁর আত্মীয়রা তা নামঞ্জুর করেছিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ পয়গাম দেন তখন হযরত যয়নব (রা) বলেনঃ انا خير منه نسبا "আমি তার চেয়ে উচ্চ বংশীয়া" ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, তিনি জবাবে একথাও বলেছিলেন ঃ لا ارضاه لنفسي وانا ايم قريش "আমি অভিজাত কুরাইশ পরিবারের মেয়ে, তাই আমি তাকে নিজের জন্য পছন্দ করি না।" তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাহ্শও (রা) এ ধরনের অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন। এর কারণ ছিল এই যে, হযরত যায়েদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদ করা গোলাম ছিলেন এবং হযরত যয়নব ছিলেন তাঁর ফুফু (উমাইমাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব)–এর কন্যা। এত উঁচু ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে, তাও আবার যাতা পরিবার নয়, নবীর নিজের ফুফাত বোন এবং তার বিয়ের পয়গাম তিনি দিচ্ছিলেন নিজের আযাদ করা গোলামের সাথে একথা তাদের কাছে অত্যন্ত খারাপ লাগছিল। এ জন্য এ আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াত শুনতেই হযরত যয়নব ও তাঁর পরিবারের সবাই নির্দ্বিধায় আনুগত্যের শির নত করেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের বিয়ে পড়ান। তিনি নিজে হযরত যায়েদের (রা) পক্ষ থেকে ১০ দীনার ও ৬০ দিরহাম মোহরানা আদায় করেন, কনের কাপড় চোপড় দেন এবং কিছু খাবার দাবারের জিনিসপত্র পাঠান।

এ আয়াত যদিও একটি বিশেষ সময়ে নাযিল হয় কিন্তু এর মধ্যে যে হুকুম বর্ণনা করা হয় তা ইসলামী আইনের একটি বড় মূলনীতি এবং সমগ্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ওপর

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ
زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى
النَّاسَ ۖ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

হে নবী![৬৭] স্মরণ করো, যখন আল্লাহ এবং তুমি যার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলে[৬৮] তাকে তুমি বলছিলে, "তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না এবং আল্লাহকে ভয় করো।"[৬৯] সে সময় তুমি তোমার মনের মধ্যে যে কথা গোপন করছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন, তুমি লোকভয় করছিলে, অথচ আল্লাহ এর বেশী হকদার যে, তুমি তাকে ভয় করবে।[৭০] তারপর তখন তার ওপর থেকে যায়েদের সকল প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল[৭১] তখন আমি সেই(তালাকপ্রাপ্ত মহিলার) বিয়ে তোমার সাথে দিয়ে দিলাম,[৭২] যাতে মু'মিনদের জন্য তাদের পালকপুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে কোন প্রকার সংকীর্ণতা না থাকে যখন তাদের ওপর থেকে তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়।[৭৩] আর আল্লাহর হুকুম তো কার্যকর হয়েই থাকে।

এটি প্রযুক্ত হয়। এর দৃষ্টিতে যে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে কোন হুকুম প্রমাণিত হয় সে বিষয়ে কোন মুসলিম ব্যক্তি, জাতি, প্রতিষ্ঠান, আদালত, পার্লামেন্ট বা রাষ্ট্রের নিজের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ব্যবহার করার কোন অধিকার নেই। মুসলমান হবার অর্থই হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সামনে নিজের স্বাধীন ইখতিয়ার বিসর্জন দেয়া। কোন ব্যক্তি বা জাতি মুসলমানও হবে আবার নিজের জন্য এ ইখতিয়ারটিও সংরক্ষিত রাখবে। এ দু'টি বিষয় পরস্পর বিরোধী—এ দু'টো কাজ এক সাথে হতে পারে না। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ দু'টি দৃষ্টিভংগীকে একত্র করার ধারণা করতে পারে না। যে ব্যক্তি মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকতে চায় তাকে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সামনে আনুগত্যের শির নত করতে হবে। আর যে ব্যক্তি শির নত করতে চায় না তাকে সোজাভাবেই মেনে নিতে হবে যে, সে মুসলমান নয়। যদি সে না মানে তাহলে নিজেকে মুসলমান বলে যত জোরে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করুক না কেন আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের দৃষ্টিতে সে মুনাফিকই গণ্য হবে।

৬৭. এখান থেকে ৪৮ আয়াত পর্যন্তকার বিষয়বস্তু এমন সময় নাযিল হয় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যয়নবকে (রা) বিয়ে করে ফেলেছিলেন এবং একে

ভিত্তি করে মুনাফিক, ইহুদী ও মুশরিকরা রসূলের বিরুদ্ধে তুমুল অপপ্রচার শুরু করে দিয়েছিল। এ আয়াতগুলো অধ্যয়ন করার সময় একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। যে শত্রুরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে ইচ্ছা করেই দুর্নাম রটাবার এবং নিজেদের অন্তরজ্বালা মিটাবার জন্য মিথ্যা, অপবাদ, গালমন্দ ও নিন্দাবাদের অভিযান চালাচ্ছিল তাদেরকে বুঝাবার উদ্দেশ্যে এগুলো বলা হয়নি। বরং এর আসল উদ্দেশ্য ছিল তাদের এ অভিযানের প্রভাব থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করা এবং ছড়ানো সন্দেহ–সংশয় থেকে তাদেরকে সংরক্ষিত রাখা। একথা স্পষ্ট, আল্লাহর কালাম অস্বীকারকারীদেরকে নিশ্চিত করতে পারতো না। এ কালাম যদি কাউকে নিশ্চিন্ত করতে পারতো, তাহলে তারা হচ্ছে এমনসব লোক যারা একে আল্লাহর কালাম বলে জানতো এবং সে হিসেবে একে মেনে চলতো। শত্রুদের এসব আপত্তি কোনভাবে তাদের মনেও সন্দেহ–সংশয় এবং তাদের মস্তিষ্কেও জটিলতা ও সংকট সৃষ্টিতে সক্ষম না হয়ে পড়ে, আল্লাহর এ বান্দাদের সম্পর্কে তখন এ আশংকা দেখা দিয়েছিল। তাই আল্লাহ একদিকে সম্ভাব্য সকল সন্দেহ নিরসন করেছেন অন্যদিকে মুসলমানদেরকেও এবং স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও এ ধরনের অবস্থায় তাদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত তা জানিয়ে দিয়েছেন।

৬৮. এখানে যায়েদের (রা) কথা বলা হয়েছে। সামনের দিকে একথাটি সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ কি ছিল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগ্রহ কি ছিল? এ বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য এখানে সংক্ষেপে তাঁর কাহিনীটি বর্ণনা করে দেয়া জরুরী মনে করছি। তিনি ছিলেন আসলে কালব গোত্রের হারেসা ইবনে শারাহীল নামক এক ব্যক্তির পুত্র। তাঁর মাতা সু'দা বিন্‌তে সা'লাবা ছিলেন তাঈ গোত্রের বনী মা'ন শাখার মেয়ে। তাঁর বয়স যখন আট বছর তখন তাঁর মা তাঁকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যান। সেখানে বনী কাইন ইবনে জাস্‌রের লোকেরা তাদের লোকালয় আক্রমণ করে এবং লুটপাট করে যেসব লোককে নিজেদের সাথে পাকড়াও করে নিয়ে যায় তাদের মধ্যে হযরত যায়েদও ছিলেন। তারা তায়েফের নিকটবর্তী উকাযের মেলায় নিয়ে গিয়ে তাঁকে বিক্রি করে দেয়। হযরত খাদীজার (রা) ভাতিজা হাকিম ইবনে হিযাম তাঁকে কিনে নিয়ে যান। তিনি তাঁকে মক্কায় নিয়ে এসে নিজের ফুফুর খেদমতে উপঢৌকন হিসেবে পেশ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হযরত খাদীজার (রা) যখন বিয়ে হয় তখন নবী করীম (সা) তাঁর কাছে যায়েদকে দেখেন এবং তাঁর চালচলন ও আদব কায়দা তাঁর এত বেশী পছন্দ হয়ে যায় যে, তিনি হযরত খাদীজার (রা) কাছ থেকে তাঁকে চেয়ে নেন। এভাবে এই সৌভাগ্যবান ছেলেটি সৃষ্টির সেরা এমন এক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে যান যাঁকে কয়েক বছর পরেই মহান আল্লাহ নবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে যাচ্ছিলেন। তখন হযরত যায়েদের (রা) বয়স ছিল ১৫ বছর। কিছুকাল পরে তাঁর বাপ চাচা জানতে পারেন তাদের ছেলে মক্কায় আছে। তারা তাঁর খোঁজ করতে করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে যান। তারা বলেন, আপনি মুক্তিপণ হিসেবে যা নিতে চান বলুন আমরা তা আপনাকে দিতে প্রস্তুত আছি, আপনি আমাদের সন্তান আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিন। নবী করীম (সা) বলেন, আমি ছেলেকে ডেকে আনছি এবং তার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি, সে চাইলে আপনাদের সাথে চলে যেতে পারে এবং চাইলে আমার কাছে থাকতে পারে। যদি সে আপনাদের সাথে চলে যেতে চায়

তাহলে আমি এর বিনিময়ে মুক্তিপণ হিসেবে কোন অর্থ নেবো না এবং তাকে এমনিই ছেড়ে দেবো। আর যদি সে আমার কাছে থাকতে চায় তাহলে আমি এমন লোক নই যে, কেউ আমার কাছে থাকতে চাইলে আমি তাকে খামখা তাড়িয়ে দেবো। জবাবে তারা বলেন, আপনি যে কথা বলেছেন তাতো ইনসাফেরও অতিরিক্ত। আপনি ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করে নিন। নবী করীম (সা) যায়েদকে ডেকে আনেন এবং তাঁকে বলেন, এই দু'জন ভদ্রলোককে চেনো? যায়েদ জবাব দেন, জি হাঁ, ইনি আমার পিতা এবং ইনি আমার চাচা। তিনি বলেন, আচ্ছা, তুমি এদেরকেও জানো এবং আমাকেও জানো। এখন তোমার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, তুমি চাইলে এদের সাথে চলে যেতে পারো এবং চাইলে আমার সাথে থেকে যাও। তিনি জবাব দেন, আমি আপনাকে ছেড়ে কারো কাছে যেতে চাই না। তাঁর বাপ ও চাচা বলেন, যায়েদ, তুমি কি স্বাধীনতার ওপর দাসত্বকে প্রাধান্য দিচ্ছো এবং নিজের মা–বাপ ও পরিবার পরিজনকে ছেড়ে অন্যদের কাছে থাকতে চাও? তিনি জবাব দেন, আমি এ ব্যক্তির যে গুণাবলী দেখেছি তার অভিজ্ঞতা লাভ করার পর এখন আর দুনিয়ার কাউকেও তাঁর ওপর প্রাধান্য দিতে পারি না। যায়েদের এ জবাব শুনে তার বাপ ও চাচা সন্তুষ্টচিত্তে তাঁকে রেখে যেতে রাজি হয়ে যান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনই যায়েদকে আযাদ করে দেন এবং হারাম শরীফে গিয়ে কুরাইশদের সাধারণ সমাবেশে ঘোষণা করেন, আপনারা সবাই সাক্ষী থাকেন আজ থেকে যায়েদ আমার ছেলে, সে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং আমি তার উত্তরাধিকারী হবো। এ কারণে লোকেরা তাঁকে যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ বলতে থাকে। এসব নবুওয়াতের পূর্বের ঘটনা। তারপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন তখন চারজন এমন ছিলেন যারা এক মুহূর্তের জন্যও কোন প্রকার সন্দেহ ছাড়াই তাঁর মুখে নবুওয়াতের দাবী শুনতেই তাঁকে নবী বলে মেনে নেন। তাদের একজন হযরত খাদীজা (রা), দ্বিতীয়জন হযরত যায়েদ (রা), তৃতীয় জন হযরত আলী (রা) এবং চতুর্থজন হযরত আবু বকর (রা)। এ সময় হযরত যায়েদের (রা) বয়স ছিল ৩০ বছর এবং নবী করীমের (সা) সাথে তার ১৫ বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। হিজরাতের পরে ৪ হিজরীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ফুফাত বোনের সাথে তাঁর বিয়ে দিয়ে দেন। নিজের পক্ষ থেকে তার মোহরানা আদায় করেন এবং ঘর–সংসার গুছিয়ে নেবার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও দেন।

এ অবস্থার প্রতিই মহান আল্লাহ তাঁর "যার প্রতি আল্লাহ ও তুমি অনুগ্রহ করেছিলে" বাক্যাংশের মধ্যে ইশারা করেছেন।

৬৯. এটা সে সময়ের কথা যখন হযরত যায়েদ (রা) ও হযরত যয়নবের (রা) সম্পর্ক তিক্ততার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল এবং তিনি বারবার অভিযোগ করার পর শেষ পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিবেদন করেন, আমি তাকে তালাক দিতে চাই। হযরত যয়নব (রা) যদিও আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হুকুম মেনে নিয়ে তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যান কিন্তু নিজের মন থেকে এ অনুভূতিটি তিনি কখনো মুছে ফেলতে পারেননি যে, যায়েদ একজন মুক্তিপ্রাপ্ত দাস, তাদের নিজেদের পরিবারের অনুগ্রহে লালিত এবং তিনি নিজে আরবের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও এ ধরনের একজন নিম্নমানের লোকের সাথে তার বিয়ে দেয়া হয়েছে। এ অনুভূতির কারণে

দাম্পত্য জীবনে তিনি কখনো হযরত যায়েদকে নিজের সমকক্ষ ভাবেননি। এ কারণে উভয়ের মধ্যে তিক্ততা বেড়ে যেতে থাকে। এক বছরের কিছু বেশী দিন অতিবাহিত হতে না হতেই অবস্থা তালাক দেয়া পর্যন্ত পৌছে যায়।

৭০. কেউ কেউ এ বাক্যটির উল্টা অর্থ গ্রহণ করেছেন এভাবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই হযরত যয়নবকে (রা) বিয়ে করতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং তাঁর মন চাচ্ছিল হযরত যায়েদ তাকে তালাক দিয়ে দিক। কিন্তু যখন যায়েদ (রা) এসে বললেন, আমি স্ত্রীকে তালাক দিতে চাই তখন তিনি নাউযুবিল্লাহ আসল কথা মনের মধ্যে চেপে রেখে কেবলমাত্র মুখেই তাঁকে নিষেধ করলেন। একথায় আল্লাহ বলছেন, "তুমি মনের মধ্যে যে কথা লুকিয়ে রাখছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন।" অথচ আসল ব্যাপারটা এর সম্পূর্ণ উল্টো। যদি এ সূরার ১, ২, ৩ ও ৭ আয়াতের সাথে এ বাক্যটি মিলিয়ে পড়া হয়, তাহলে পরিষ্কার অনুভূত হবে যে, হযরত যায়েদ ও তার স্ত্রীর মধ্যে যে সময় তিক্ততা বেড়ে যাচ্ছিল সে সময়ই আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ মর্মে ইংগিত দিয়েছিলেন যে, যায়েদ যখন তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেবে তখন তোমাকে তার তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করতে হবে। কিন্তু যেহেতু আরবের সে সমাজে পালকপুত্রের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করার অর্থ কি তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন এবং তাও এমন এক অবস্থায় যখন মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক মুসলমান ছাড়া বাকি সমগ্র আরব দেশ তাঁর বিরুদ্ধে ধনুকভাঙাপণ করে বসেছিল—এ অবস্থায় তিনি এ কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে ইতস্তত করছিলেন। এ কারণে হযরত যায়েদ (রা) যখন স্ত্রীকে তালাক দেবার সংকল্প প্রকাশ করেন তখন নবী করীম (সা) তাঁকে বলেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ো না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যায়েদ যদি তালাক না দেন, তাহলে তিনি এ বিপদের মুখোমুখি হওয়া থেকে বেঁচে যাবেন। নয়তো যায়েদ তালাক দিলেই তাঁকে হুকুম পালন করতে হবে এবং তারপর তাঁর বিরুদ্ধে খিস্তি-খেউড় ও অপপ্রচারের ভয়াবহ তুফান সৃষ্টি করা হবে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে উচ্চ মনোবল, দৃঢ় সংকল্প ও আল্লাহর ফায়সালায় রাজি থাকার যে উচ্চ মর্যাদার আসনে দেখতে চাচ্ছিলেন সে দৃষ্টিতে নবী করীমের (সা) ইচ্ছা করে যায়েদকে তালাক থেকে বিরত রাখা নিম্নমানের কাজ বিবেচিত হয়। তিনি আসলে ভাবছিলেন যে, এর ফলে তিনি এমন কাজ করা থেকে বেঁচে যাবেন যাতে তাঁর দুর্নামের আশংকা ছিল। অথচ আল্লাহ একটি বড় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁকে দিয়ে সে কাজটি করাতে চাচ্ছিলেন। "তুমি লোকভয় করছো অথচ আল্লাহকে ভয় করাই অধিকতর সংগত"—এ কথাগুলো পরিষ্কারভাবে এ বিষয়বস্তুর দিকে ইংগিত করছে।

ইমাম যয়নুল আবেদীন হযরত আলী ইবনে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একথাই বলেছেন। তিনি বলেন, "আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই মর্মে খবর দিয়েছিলেন যে, যয়নব (রা) আপনার স্ত্রীদের মধ্যে শামিল হতে যাচ্ছেন। কিন্তু যায়েদ (রা) যখন এসে তাঁর কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন তখন তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করো না। একথায় আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলাম, আমি তোমাকে যয়নবের সাথে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি অথচ তুমি যায়েদের সাথে কথা বলার সময় আল্লাহ যেকথা প্রকাশ করতে

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللَّهِ فِي
الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿٣٨﴾ الَّذِينَ
يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ
وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

নবীর জন্য এমন কোন কাজে কোন বাধা নেই যা আল্লাহ তার জন্য নির্ধারণ করেছেন[৭৪] ইতিপূর্বে যেসব নবী অতীত হয়ে গেছেন তাদের ব্যাপারে এটিই ছিল আল্লাহর নিয়ম, আর আল্লাহর হুকুম হয় একটি চূড়ান্ত স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত।[৭৫] (এ হচ্ছে আল্লাহর নিয়ম তাদের জন্য) যারা আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে থাকে, তাঁকেই ভয় করে এবং এক আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না আর হিসেব গ্রহণের জন্য কেবলমাত্র আল্লাহই যথেষ্ট।[৭৬]

(হে লোকেরা!) মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারোর পিতা নয় কিন্তু সে আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী আর আল্লাহ সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন।[৭৭]

চান তা গোপন করছিলে। (ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে)

আল্লামা আলূসীও তাফসীর রূহুল মা'আনীতে এর একই অর্থ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "এটি হচ্ছে শ্রেয়তর কাজ পরিত্যাগ করার জন্য ক্রোধ প্রকাশ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চুপ থাকতেন অথবা যায়েদকে (রা) বলতেন, তুমি যা চাও করতে পারো, এ অবস্থায় এটিই ছিল শ্রেয়তর। অভিব্যক্ত ক্রোধের সারৎসার হচ্ছে ঃ তুমি কেন যায়েদকে বললে তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না।? অথচ আমি তোমাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছি যে, যয়নব তোমার স্ত্রীদের মধ্যে শামিল হবে।"

৭১. অর্থাৎ যায়েদ (রা) যখন নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং তাঁর ইদ্দত পুরা হয়ে গেলো। "প্রয়োজন পূর্ণ করলো" শব্দগুলো স্বতস্ফূর্তভাবে একথাই প্রকাশ করে যে, তাঁর কাছে যায়েদের আর কোন প্রয়োজন থাকলো না। কেবলমাত্র তালাক দিলেই এ অবস্থাটির সৃষ্টি হয় না। কারণ স্বামীর আর কোন আকর্ষণ থেকে গেলে ইদ্দতের মাঝখানে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে। আর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়া বা না হওয়ার কথা জানতে পারার মধ্যেও স্বামীর প্রয়োজন থেকে যায়। তাই যখন ইদ্দত খতম হয়ে যায় একমাত্র তখনই তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর মধ্যে স্বামীর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়।

৭২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই নিজের ইচ্ছায় এ বিয়ে করেননি বরং আল্লাহর হুকুমের ভিত্তিতে করেন, এ ব্যাপারে এ শব্দগুলো একেবারেই সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন।

৭৩. এ শব্দগুলো একথা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে যে, আল্লাহ এ কাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে এমন একটি প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য করিয়েছিলেন যা এ পদ্ধতিতে ছাড়া অন্য কোনভাবে সম্পাদিত হতে পারতো না। আরবে পালক পুত্রদের সম্পর্কিত আত্মীয়তার ব্যাপারে যে সমস্ত ভ্রান্ত রসম-রেওয়াজের প্রচলন হয়ে গিয়েছিল আল্লাহর রসূল নিজে অগ্রসর হয়ে না ভাঙলে সেগুলো ভেঙে ফেলার ও উচ্ছেদ করার আর কোন পথ ছিল না। কাজেই আল্লাহ নিছক নবীর গৃহে আর একজন স্ত্রী বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে নয় বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য এ বিয়ে করিয়েছিলেন।

৭৪. এ শব্দগুলো থেকে একথা পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত হয় যে, অন্য মুসলমানদের জন্য তো এ ধরনের বিয়ে নিছক মুবাহ তথা অনুমোদিত কাজ কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এটি ছিল একটি ফরয এবং এ ফরয আল্লাহ তাঁর প্রতি আরোপ করেছিলেন।

৭৫. অর্থাৎ নবীদের জন্য চিরকাল এ বিধান নির্ধারিত রয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হুকুমই আসে তা কার্যকর করা তাঁদের জন্য স্থিরীকৃত কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনে বিরত থাকার কোন অবকাশ তাদের জন্য নেই। যখন আল্লাহ নিজের নবীর ওপর কোন কাজ ফরয করে দেন তখন সারা দুনিয়া তাঁর বিরোধিতায় উঠে পড়ে লাগলেও তাঁকে সে কাজ করতেই হয়।

৭৬. মূল শব্দগুলো হচ্ছে, كفى بالله حسيبا এর দু'টি অর্থ। এক, প্রত্যেকটি ভয় ও বিপদের মোকাবিলায় আল্লাহই যথেষ্ট। দুই, হিসেব নেবার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। তাঁর ছাড়া আর কারো কাছে জবাবদিহির ভয় করার কোন প্রয়োজন নেই।

৭৭. বিরোধীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বিয়ের ব্যাপারে যেসব আপত্তি উঠাচ্ছিল এ একটি বাক্যের মাধ্যমে সেসবের মূলোচ্ছেদ করে দেয়া হয়েছে।

তাদের প্রথম অভিযোগ ছিল, তিনি নিজের পুত্রবধূকে বিয়ে করেন, অথচ তাঁর নিজের শরীয়াতেও পুত্রের স্ত্রী পিতার জন্য হারাম। এর জবাবে বলা হয়েছে, "মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের কারো পিতা নন।" অর্থাৎ যে ব্যক্তির তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা হয়েছে তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্রই ছিলেন না, কাজেই তার তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম হবে কেন? তোমরা নিজেরাই জানো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদতে কোন পুত্র সন্তানই নেই।

তাদের দ্বিতীয় আপত্তি ছিল, ঠিক আছে, পালক পুত্র যদি আসল পুত্র না হয়ে থাকে তাহলেও তার তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা বড় জোর বৈধই হতে পারতো কিন্তু তাকে বিয়ে করার এমন কি প্রয়োজন ছিল? এর জবাবে বলা হয়েছে, "কিন্তু তিনি আল্লাহর রসূল।" অর্থাৎ রসূল হবার কারণে তাঁর ওপর এ দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত হয়েছিল যে, তোমাদের রসম-রেওয়াজ যে হালাল জিনিসটিকে অযথা হারাম গণ্য করে রেখেছে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً
وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ
يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۚ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾

৬ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ করো এবং সকাল সাঁঝে তাঁর মহিমা ঘোষণা করতে থাকো।[৭৮] তিনিই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারা তোমাদের জন্য দোয়া করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোকের মধ্যে নিয়ে আসেন, তিনি মু'মিনদের প্রতি বড়ই মেহেরবান।[৭৯] যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে, তাদের অভ্যর্থনা হবে সালামের মাধ্যমে[৮০] এবং তাদের জন্য আল্লাহ বড়ই সম্মানজনক প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

সে ব্যাপারে সকল রকমের স্বার্থপ্রীতির তিনি অবসান ঘটিয়ে দেবেন এবং তার হালাল হবার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশই রাখবে না।

আবার অতিরিক্ত তাকিদ সহকারে বলা হয়েছে, "এবং তিনি শেষ নবী।" অর্থাৎ যদি কোন আইন ও সামাজিক সংস্কার তাঁর আমলে প্রবর্তিত না হয়ে থাকে তাহলে তাঁর পরে আগমনকারী নবী তার প্রবর্তন করতে পারতেন, কিন্তু তাঁর পরে আর কোন রসূল তো দূরের কথা কোন নবীই আসবেন না। কাজেই তিনি নিজেই জাহেলিয়াতের এ রসমটির মূলোচ্ছেদ করে যাবেন, এটা আরো অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

এরপর আরো বেশী জোর দিয়ে বলা হয়েছে, "আল্লাহ প্রত্যেকটি বিষয়ের জ্ঞান রাখেন।" অর্থাৎ আল্লাহ জানেন, এ সময় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে জাহেলিয়াতের এ রসমটির মূলোচ্ছেদ করা কেন জরুরী ছিল এবং এমনটি না করলে কি মহা অনর্থ হতো। তিনি জানেন, এখন আর তাঁর পক্ষ থেকে কোন নবী আসবেন না, কাজেই নিজের শেষ নবীর মাধ্যমে এখন যদি তিনি এ রসমটিকে উৎখাত না করেন তাহলে এমন দ্বিতীয় আর কোন সত্তাই নেই যিনি এটি ভঙ্গ করলে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্য থেকে চিরকালের জন্য এটি মূলোৎপাটিত হয়ে যাবে। পরবর্তী সংস্কারকগণ যদি এটি ভাঙেন, তাহলে তাদের মধ্য থেকে কারো কর্মও তাঁর ইন্তিকালের পরে এমন কোন বিশ্বজনীন ও চিরন্তন কর্তৃত্বের অধিকারী হবে না যার ফলে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক যুগের লোকেরা তার অনুসরণ করতে থাকবে এবং তাদের মধ্য থেকে কারো ব্যক্তিত্ব ও তাঁর নিজের মধ্যে এমন কোন পবিত্রতার বাহন হবে না যার ফলে তাঁর

কোন কাজ নিছক তাঁর সুন্নাত হবার কারণে মানুষের মন থেকে অপছন্দনীয়তার সকল প্রকার ধারণার মূলোচ্ছেদ করতে সক্ষম হবে।

দুঃখের বিষয়, বর্তমান যুগের একটি দল এ আয়াতটি ভুল ব্যাখ্যা করে একটি বড় ফিত্নার দরোজা খুলে দিয়েছে, তাই 'খতমে নবুওয়াত' বিষয়টির পূর্ণ ব্যাখ্যা এবং এ দলটির ছড়ানো বিভ্রান্তিগুলো নিরসনের জন্য আমি এ সূরার তাফসীরের শেষে একটি বিস্তারিত পরিশিষ্ট সংযোজন করে দিয়েছি।

৭৮. মুসলমানদেরকে এ উপদেশ দেয়াই এর উদ্দেশ্য যে, যখন শত্রুদের পক্ষ থেকে আল্লাহর রসূলের প্রতি ব্যাপকভাবে বিদ্রূপ ও নিন্দাবাদ করা হয় এবং আল্লাহর সত্য দীনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য রসূলের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের তুফান সৃষ্টি করা হয় তখন নিশ্চিন্তে এসব বাজে খিস্তি খেউড় শুনতে থাকা, নিজেই শত্রুদের ছড়ানো সন্দেহ সংশয়ে জড়িয়ে পড়া এবং জবাবে তাদেরকেও গালাগালি করতে থাকা মু'মিনদের কাজ নয়। বরং তাদের কাজ হচ্ছে, সাধারণ দিনগুলোর তুলনায় এসব দিনে বিশেষভাবে আল্লাহকে আরো বেশী করে স্মরণ করা। "আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করা"র অর্থ ৬৩ টীকায় বর্ণনা করা হয়েছে। সকাল সাঁঝে আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করার অর্থ হচ্ছে সর্বক্ষণ তাঁর তাসবীহ করা। আর তাসবীহ করা মানে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা, নিছক তাসবীহর দানা হাতে নিয়ে গুণতে থাকা নয়।

৭৯. মুসলমানদের মনে এ অনুভূতি সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য যে, কাফের ও মুনাফিকদের মনের সমস্ত জ্বালা ও আক্রোশের কারণ হচ্ছে আল্লাহর রহমত, যা তাঁর রসূলের বদৌলতে তোমাদের ওপর বর্ষিত হয়েছে। এরি মাধ্যমে তোমরা ঈমানী সম্পদ লাভ করেছো, কুফরী ও জাহেলিয়াতের অন্ধকার ভেদ করে ইসলামের আলোকে চলে এসেছো এবং তোমাদের মধ্যে এমন উন্নত নৈতিক বৃত্তি ও গুণাবলীর সৃষ্টি হয়েছে যেগুলোর কারণে অন্যদের থেকে তোমাদের সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিভাত হচ্ছে। হিংসুটেরা রসূলের ওপর এরি ঝাল ঝাড়ছে। এ অবস্থায় এমন কোন নীতি অবলম্বন করো না যার ফলে তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাও।

অনুগ্রহের ভাব প্রকাশ করার জন্য মূলে সালাত (يصلى-صلوة) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'সালাত' শব্দটি যখন আলা (على) অব্যয় (Preposition) সহকারে আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য ব্যবহার করা হয় তখন এর অর্থ হয় রহমত, অনুগ্রহ, করুণা ও স্নেহাশীষ। আর যখন এটি ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হয় রহমতের দোয়া করা। অর্থাৎ ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে মানুষের জন্য এই মর্মে দোয়া করে যে, হে আল্লাহ, তুমি এদের প্রতি অনুগ্রহ করো এবং তোমার দানে এদেরকে আপ্লুত করে দাও। এভাবে يُصَلِّى عَلَيكُم এর অর্থ এও হয় যে, يشيع عنكم الذكر الجميل فى عباد الله অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে তোমাদেরকে খ্যাতি দান করেন এবং এমন পর্যায়ে উন্নীত করেন যার ফলে আল্লাহর সমুদয় সৃষ্টি তোমাদের প্রশংসা করতে থাকে এবং ফেরেশতারা তোমাদের প্রশংসা ও সুনামের আলোচনা করতে থাকে।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٤٥﴾ وَّدَاعِيًا
اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿٤٦﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ
اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ﴿٤٧﴾ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٤٨﴾

হে নবী![৮১] আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী বানিয়ে,[৮২] সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী করে[৮৩] আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারীরূপে[৮৪] এবং উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে। সুসংবাদ দাও তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে (তোমার প্রতি) যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে বিরাট অনুগ্রহ। আর কখনো দমিত হয়ো না কাফের ও মুনাফিকদের কাছে, পরোয়া করো না তাদের পীড়নের এবং ভরসা করো আল্লাহর প্রতি। আল্লাহই যথেষ্ট এ জন্য যে, মানুষ তাঁর হাতে তার যাবতীয় বিষয় সোপর্দ করে দেবে।

৮০. মূলে বলা হয়েছে ঃ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ "তার সাথে মোলাকাতের সময় সেদিন তাদের অভ্যর্থনা হবে সালাম" এর তিনটি অর্থ হতে পারে। এক, আল্লাহ নিজেই "আস্সালামু আলাইকুম" বলে তাদেরকে অভ্যর্থনা করবেন। যেমন সূরা ইয়াসীন–এর ৫৮ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ

দুই, ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম করবে। যেমন সূরা নাহ্লে বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا
الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ –

"ফেরেশতারা যাদের রূহ কব্য করবে এমন অবস্থায় যখন তারা পবিত্র লোক ছিল, তাদেরকে তারা বলবে, শান্তি ও নিরাপত্তা হোক তোমাদের প্রতি, প্রবেশ করো জান্নাতে তোমাদের সৎকাজসমূহের বদৌলতে, যা তোমরা দুনিয়ায় করতে।"

(৩২ আয়াত)

তিন, তারা নিজেরাই পরস্পরকে সালাম করবে। সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে ঃ

دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ
اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ –

"সেখানে তাদের আওয়াজ হবে, হে আল্লাহ! পবিত্র তোমার সত্তা, তাদের অভ্যর্থনা হবে 'সালাম' এবং তাদের কথা শেষ হবে এ বাক্য দিয়ে যে,. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্যই।" (১০ আয়াত)

৮১. মুসলমানদেরকে উপদেশ দেবার পর এবার আল্লাহ তাঁর নবীকে সম্বোধন করে কয়েকটা সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করেছেন। বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ আপনাকে আমি এসব উন্নত মর্যাদা দান করেছি। এ বিরোধীরা অপবাদ ও মিথ্যাচারের তুফান সৃষ্টি করে আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ আপনার ব্যক্তিত্ব তার অনেক উর্ধে। কাজেই আপনি তাদের শয়তানির কারণে দুঃখ ভারাক্রান্ত হবেন না এবং তাদের প্রচারণাকে তিলার্ধও গুরুত্ব দেবেন না। নিজের আরোপিত দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকেন এবং তাদের মনে যা চায় তাই বকবক করতে বলুন। এ সংগে পরোক্ষভাবে মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে সকল মানুষকে বলা হয়েছে যে, কোন সাধারণ মানুষের সাথে তাদের মোকাবিলা হচ্ছে না বরং মহান আল্লাহ যাঁকে মর্যাদার উচ্চমার্গে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন তেমনি এক মহান ব্যক্তিত্বের সাথে হচ্ছে তাদের মোকাবিলা।

৮২. নবীকে সাক্ষী করার ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। তিন ধরনের সাক্ষ প্রদান এর অন্তরভুক্ত ঃ

এক ঃ মৌখিক সাক্ষদান। অর্থাৎ আল্লাহর দীন যেসব সত্য ও মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নবী তার সত্যতার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন এবং দুনিয়াবাসীকে পরিষ্কার বলে দেবেন, এটিই সত্য এবং এর বিরুদ্ধে যা কিছু আছে সবই মিথ্যা। আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ব, ফেরেশতাদের অস্তিত্ব, অহী নাযিল হওয়া, মৃত্যু পরবর্তী জীবনের অনিবার্যতা এবং জান্নাত ও জাহান্নামের প্রকাশ, দুনিয়াবাসীদের কাছে যতই অদ্ভুত মনে হোক না কেন এবং তারা একথাগুলোর বক্তাকে যতই বিদ্রূপ করুক বা তাকে পাগল বলুক না কেন, নবী কারো পরোয়া না করেই দাঁড়িয়ে যাবেন এবং সোচ্চার কণ্ঠে বলে দেবেন, এসব কিছুই সত্য এবং যারা এসব মানে না তারা পথভ্রষ্ট। এভাবে নৈতিকতা ও সভ্যতা–সংস্কৃতির যে ধারণা, মূল্যবোধ, মূলনীতি ও বিধান আল্লাহ তাঁর সামনে সুস্পষ্ট করেছেন সেগুলোকে সারা দুনিয়ার মানুষ মিথ্যা বললেও এবং তারা তার বিপরীত পথে চললেও নবীর কাজ হচ্ছে সেগুলোকেই প্রকাশ্য জনসমক্ষে পেশ করবেন এবং দুনিয়ায় প্রচলিত তার বিরোধী যাবতীয় পদ্ধতিকে ভ্রান্ত ঘোষণা করবেন। অনুরূপভাবে আল্লাহর শরীয়াতে যা কিছু হালাল সারা দুনিয়া তাকে হারাম মনে করলেও নবী তাকে হালালই বলবেন। আর আল্লাহর শরীয়াতে যা হারাম সারা দুনিয়া তাকে হালাল ও ভালো গণ্য করলেও নবী তাকে হারামই বলবেন।

দুই ঃ কর্মের সাক্ষ। অর্থাৎ দুনিয়ার সামনে যে মতবাদ পেশ করার জন্য নবীর আবির্ভাব হয়েছে তিনি নিজের জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তার প্রদর্শনী করবেন। যে জিনিসকে তিনি মন্দ বলেন তাঁর জীবন তার সকল প্রকার গন্ধমুক্ত হবে। যে জিনিসকে তিনি ভালো বলেন তাঁর চরিত্রে তা পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান হবে। যে জিনিসকে তিনি ফরয বলেন তা পালন করার ক্ষেত্রে তিনি সবচেয়ে অগ্রণী হবেন। যে জিনিসকে তিনি গোনাহ বলেন তা থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে কেউ তাঁর সমান হবে না। যে জীবন বিধানকে তিনি আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান বলেন তাকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তিনি কোন প্রচেষ্টার

ত্রুটি করবেন না। তিনি নিজের দাওয়াতের ব্যাপারে কতটা সত্যনিষ্ঠ ও আন্তরিকতা তাঁর নিজের চরিত্র ও কার্যধারাই সাক্ষ দেবে। তাঁর সত্তা তাঁর শিক্ষার এমন মূর্তিমান আদর্শ হবে, যা দেখে প্রত্যেক ব্যক্তি জানবে, যে দীনের দিকে তিনি দুনিয়াবাসীকে আহবান জানাচ্ছেন তা কোন্ মানের মানুষ তৈরি করতে চায়, কোন্ ধরনের চরিত্র সৃষ্টি তার লক্ষ্য এবং তার সাহায্যে সে কোন্ ধরনের জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করে।

তিন ঃ পরকালীন সাক্ষ। অর্থাৎ আখেরাতে যখন আল্লাহর আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে তখন নবী এ মর্মে সাক্ষ দেবেন, তাঁকে যে পয়গাম দেয়া হয়েছিল তা তিনি কোন প্রকার কাটছাঁট ও কমবেশী না করে হুবহু মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের সামনে নিজের কথা ও কর্মের মাধ্যমে সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার ব্যাপারে সামান্যতম ত্রুটি করেননি। এ সাক্ষের ভিত্তিতে তাঁর বাণী মান্যকারী কি পুরস্কার পাবে এবং অমান্যকারী কোন্ ধরনের শাস্তির অধিকারী হবে তার ফায়সালা করা হবে।

এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাক্ষদানের পর্যায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তাঁর প্রতি কত বড় দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন এবং এত উচ্চ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য কত মহান ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন। একথা স্পষ্ট, কথা ও কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর সত্য দীনের সাক্ষ প্রদান করার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিল পরিমাণও ত্রুটি হয়নি। তবেই তো তিনি আখেরাতে এই মর্মে সাক্ষ দিতে পারবেন, "আমি লোকদের সামনে সত্যকে পুরোপুরি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলাম।" আর তবেই তো আল্লাহর প্রমাণ (হুজ্জাত) লোকদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। অন্যথায় যদি সাক্ষ দেবার ব্যাপারে এখানে নাউযুবিল্লাহ তাঁর কোন ত্রুটি থেকে যায়, তাহলে না তিনি আখেরাতে তাদের জন্য সাক্ষী হতে পারবেন আর না সত্য অমান্যকারীদের অপরাধ সত্য প্রমাণিত হতে পারবে।

কেউ কেউ এ সাক্ষদানকে এ অর্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আখেরাতে লোকদের কাজের ওপর সাক্ষ দেবেন এবং এ থেকে তারা একথা প্রমাণ করেন যে, নবী করীম (সা) সকল মানুষের কার্যক্রম দেখছেন অন্যথায় না দেখে কেমন করে সাক্ষ দিতে পারবেন? কিন্তু কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে এ ব্যাখ্যা একেবারেই ভ্রান্ত। কুরআন আমাদের বলে, লোকদের কার্যক্রমের ওপর সাক্ষ কায়েম করার জন্য তো আল্লাহ অন্য একটি ব্যবস্থা করেছেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁর ফেরেশতারা প্রত্যেক ব্যক্তির আমলনামা তৈরি করছে। (দেখুন সূরা কাফ ১৭-১৮ আয়াত এবং আল কাহ্ফ ১৪৯ আয়াত) আর এ জন্য তিনি মানুষের নিজের অংগ-প্রত্যংগেরও সাক্ষ নেবেন। (সূরা ইয়াসীন, ৬৫; হা মীম আস্ সাজদাহ, ২০-২১) বাকী রইলো নবীগণের ব্যাপার। আসলে নবীগণের কাজ বান্দাদের কার্যক্রমের ওপর সাক্ষ দেয়া নয় বরং বান্দাদের কাছে যে সত্য পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছিল, সে বিষয়ে তাঁরা সাক্ষ দেবেন। কুরআন পরিষ্কার বলে ঃ

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا اُجِبْتُمْ ط قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ط اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ۝

"যেদিন আল্লাহ সমস্ত রসূলকে সমবেত করবেন তারপর জিজ্ঞেস করবেন; তোমাদের দাওয়াতের কি জবাব দেয়া হয়েছিল? তখন তারা বলবে, আমাদের কিছুই জানা নেই। সমস্ত অজ্ঞাত ও অজানা কথাতো একমাত্র তুমিই জানো।" (আল মা-য়েদাহ, ১০৯)

আর এ প্রসংগে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কুরআন বলে, যখন তাঁকে ঈসায়ীদের গোমরাহী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে তখন তিনি বলবেন ঃ

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّادُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ؕ

"আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন পর্যন্ত তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম। যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন তখন আপনিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।"
(আল মা-য়েদাহ, ১১৭)

নবীগণ যে মানুষের কাজের ব্যাপারে সাক্ষী হবেন না এ সম্পর্কে এ আয়াতটি একেবারেই সুস্পষ্ট। তাহলে তাঁরা সাক্ষী হবেন কোন্ জিনিসের? এর পরিষ্কার জবাব কুরআন এভাবে দিয়েছে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ

"আর হে মুসলমানগণ! এভাবে আমি তোমাদেরকে করেছি একটি মধ্যপন্থী উম্মাত, যাতে তোমরা লোকদের ওপর সাক্ষী হবে এবং রসূল তোমাদের ওপর সাক্ষী হন।"
(আল বাকারাহ, ১৪৩)

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ؕ

"আর যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন সাক্ষী উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবো, যে তাদের ওপর সাক্ষ দেবে এবং (হে মুহাম্মাদ) তোমাকে এদের ওপর সাক্ষী হিসেবে নিয়ে আসবো।" (আন নাহ্ল, ৮৯)

এ থেকে জানা যায় কিয়ামতের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতকে এবং প্রত্যেক উম্মাতের ওপর সাক্ষদানকারী সাক্ষীদেরকে যে ধরনের সাক্ষদান করার জন্য ডাকা হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষ তা থেকে ভিন্ন ধরনের হবে না। একথা সুস্পষ্ট যে, এটা যদি কার্যাবলীর সাক্ষদান হয়ে থাকে, তাহলে সে সবের উপস্থিত ও দৃশ্যমান হওয়াও অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। আর মানুষের কাছে তার স্রষ্টার পয়গাম পৌছে গিয়েছিল কিনা কেবল এ বিষয়ের সাক্ষ দেয়ার জন্য যদি এ সাক্ষীদেরকে ডাকা হয়, তাহলে অবশ্যই নবী করীমকে (সা)ও এ উদ্দেশ্যেই পেশ করা হবে।

বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও ইমাম আহমাদ প্রমুখগণ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবুদ দারদা, আনাস ইবনে মালেক ও অন্যান্য বহু সাহাবা থেকে যে হাদীসগুলো উদ্ধৃত করেছেন সেগুলোও এ বিষয়বস্তুর সমর্থক। সেগুলোর সম্মিলিত বিষয়বস্তু হচ্ছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের দিন দেখবেন তাঁর কিছু সাহাবীকে আনা হচ্ছে কিন্তু তারা তাঁর দিকে না এসে অন্যদিকে যাচ্ছে অথবা তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। নবী করীম (সা) তাদেরকে দেখে নিবেদন করবেন, হে আল্লাহ! এরা তো আমার সাহাবী। একথায় আল্লাহ বলবেন, তুমি জানো না তোমার পর এরা কি সব কাজ করেছে। এ বিষয়বস্তুটি এত বিপুল সংখ্যক সাহাবী থেকে এত বিপুল সংখ্যক সনদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে যে, এর নির্ভুলতায় সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশ নেই। আর এ থেকে একথাও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের উম্মাতের প্রত্যেক ব্যক্তির এবং তার প্রত্যেকটি কাজের দর্শক মোটেই নন। তবে যে হাদীসে বলা হয়েছে যে, নবী (সা)–এর সামনে তাঁর উম্মাতের কার্যাবলী পেশ করা হয়ে থাকে সেটি কোনক্রমেই এর সাথে সংঘর্ষশীল নয়। কারণ তার মূল বক্তব্য শুধুমাত্র এতটুকু যে, মহান আল্লাহ নবী করীমকে (সা) তাঁর উম্মাতের কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত রাখেন। তার এ অর্থ কোথা থেকে পাওয়া যায় যে, তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির কার্যকলাপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করছেন?

৮৩. এখানে এ পার্থক্যটা সামনে রাখতে হবে যে, কোন ব্যক্তিকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে ঈমান ও সৎকাজের জন্য শুভ পরিণামের সুসংবাদ দেয়া এবং কুফরী ও অসৎকাজের অশুভ পরিণামের ভয় দেখানো এক কথা এবং কারো আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হয়ে প্রেরিত হওয়া সম্পূর্ণ আলাদা কথা। যে ব্যক্তিই আল্লাহর পক্ষ থেকে এ পদে নিযুক্ত হবেন তাঁর নিজের সুসংবাদ ও ভীতি প্রদর্শনের পেছনে অবশ্যই কিছু ক্ষমতা থাকে, যার ভিত্তিতে তার সুসংবাদ ও সতর্কীকরণগুলো আইনের মর্যাদা লাভ করে। তার কোন কাজের সুসংবাদ দেয়ার অর্থ হয়, যে সর্বময় ক্ষমতা সম্পন্ন শাসকের পথ থেকে তিনি প্রেরিত হয়েছেন তিনি এ কাজটি পছন্দনীয় ও প্রতিদান লাভের যোগ্য বলে ঘোষণা দিচ্ছেন। কাজেই তা নিশ্চয়ই ফরয বা ওয়াজিব বা মুস্তাহাব এবং কাজটি যিনি করেছেন তিনি নিশ্চয়ই প্রতিদান লাভ করবেন। আর তার কোন কাজের অশুভ পরিণামের খবর দেয়ার অর্থ হয়, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সত্তা সে কাজ করতে নিষেধ করছেন, কাজেই তা অবশ্যই হারাম ও গোনাহের কাজ এবং নিশ্চিতভাবেই সে কার্য সম্পাদনকারী শাস্তি লাভ করবে। কোন অনিয়োগকৃত সতর্ককারী ও সুসংবাদ দানকারী কখনো এ মর্যাদা লাভ করবে না।

৮৪. এখানেও একজন সাধারণ প্রচারকের প্রচার ও নবীর প্রচারের মধ্যেও সেই একই পার্থক্য রয়েছে যেদিকে ওপরে ইংগিত করা হয়েছে। প্রত্যেক প্রচারকই আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন এবং দিতে পারেন কিন্তু তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত হন না। পক্ষান্তরে নবী আল্লাহর হুকুমে (Sanction) দাওয়াত দিতে এগিয়ে যান। তাঁর দাওয়াত নিছক প্রচার নয় বরং তার পেছনেও থাকে তাঁর প্রেরক রব্বুল আলামীনের শাসন কর্তৃত্বের ক্ষমতা। তাই আল্লাহ প্রেরিত আহবায়কের বিরোধিতা স্বয়ং আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসেবে গণ্য হয়। দুনিয়ার কোন রাষ্ট্রের সরকারী কার্যসম্পাদনকারী সরকারী কর্মচারীকে বাধা দেয়া যেমন সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মনে করা হয় এও ঠিক তেমনি।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মু'মিন নারীদেরকে বিয়ে করো এবং তারপর তাদেরকে স্পর্শ করার আগে তালাক দিয়ে দাও[৮৫] তখন তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের জন্য কোন ইদ্দত অপরিহার্য নয়, যা পুরা হবার দাবী তোমরা করতে পারো। কাজেই তাদেরকে কিছু অর্থ দাও এবং ভালোভাবে বিদায় করো।[৮৬]

৮৫. এ বাক্যটিতে একথা সুস্পষ্ট যে, এখানে 'নিকাহ' তথা বিবাহ শব্দটি থেকে শুধুমাত্র বিবাহ বন্ধনের কথাই প্রকাশ হয়েছে। আরবী ভাষায় 'নিকাহ' শব্দটির আসল অর্থ কি অভিধানবিদদের মধ্যে এ ব্যাপারে বহুতর মতবিরোধ দেখা গেছে। একটি দল বলে, এ শব্দটির মধ্যে শাব্দিকভাবে সংগম ও বিয়ে উভয় অর্থই রয়েছে। অন্য একটি দল বলে, এর মধ্যে সংগম ও বিয়ে উভয় অর্থ প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে। তৃতীয় একটি দল বলে, এর আসল অর্থ হচ্ছে এক জোড়া মানব মানবীর বিবাহ এবং সংগমের জন্য একে রূপকভাবে ব্যবহার করা হয়। চতুর্থ দলটি বলে, এর আসল অর্থ হচ্ছে সংগম এবং বিয়ের জন্য একে রূপকভাবে ব্যবহার করা হয়। এর প্রমাণ হিসেবে প্রত্যেক দল আরবীয় প্রবাদ ও বাগধারা থেকে দৃষ্টান্ত পেশ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু রাগেব ইস্‌ফাহানী অত্যন্ত জোরের সাথে দাবী করেছেন ঃ

اصل النكاح العقد ثم استعير للجماع ومحال ان يكون فى الاصل للجماع ثم استعير للعقد

"নিকাহ শব্দটির আসল অর্থ হচ্ছে বিয়ে, তারপর এ শব্দটিকে রূপক অর্থে সহবাসের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এটা একেবারেই অসম্ভব যে, এর আসল অর্থ হবে সহবাস এবং একে রূপক অর্থে বিয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।"

এর সপক্ষে যুক্তি হিসেবে তিনি বলেন, আরবী ভাষায় বা দুনিয়ার অন্যান্য ভাষায় সহবাস–এর জন্য প্রকৃতপক্ষে যতগুলো শব্দ তৈরি করা হয়েছে তা সবই অশ্লীল। কোন রুচিশীল ব্যক্তি কোন ভদ্র মজলিসে সেগুলো মুখে উচ্চারণ করাও পছন্দ করেন না। এখন যে শব্দটিকে প্রকৃতপক্ষে এ কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে মানুষের সমাজ তাকে বিয়ের জন্য রূপক হিসেবে ব্যবহার করবে, এটা কেমন করে সম্ভব? এ অর্থটি প্রকাশ করার জন্য তো প্রত্যেক ভাষায় রুচিশীল শব্দই ব্যবহার করা হয়, অশ্লীল শব্দ নয়।

কুরআন ও সুন্নাতের ব্যাপারে বলা যায়, সেখানে 'নিকাহ' একটি পারিভাষিক শব্দ। সেখানে এর অর্থ হচ্ছে নিছক বিবাহ অথবা বিবাহোত্তর সংগম। কিন্তু বিবাহ বিহীন সংগম

অর্থে একে কোথাও ব্যবহার করা হয়নি। এ ধরনের সংগমকে তো কুরআর ও সুন্নাত বিয়ে নয়, যিনা ও ব্যভিচার বলে।

৮৬. এটি একটি একক আয়াত। সম্ভবত সে সময় তালাকের কোন সমস্যা সৃষ্টি হবার কারণে এটি নাযিল হয়েছিল। তাই পূর্ববর্তী বর্ণনা ও পরবর্তী বর্ণনার ধারাবাহিকতার মধ্যে একে রেখে দেয়া হয়েছে। এ বিন্যাসের ফলে একথা স্বতস্ফূর্তভাবেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এটি পূর্ববর্তী ভাষণের পরে এবং পরবর্তী ভাষণের পূর্বে নাযিল হয়।

এ আয়াত থেকে যে আইনগত বিধান বের হয় তার সার সংক্ষেপ হচ্ছে ঃ

এক ঃ আয়াতে যদিও "মু'মিন নারীরা" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা থেকে বাহ্যত অনুমান করা যেতে পারে যে, এখানে যে আইনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে কিতাবী (ইহুদী ও খৃষ্টান) নারীদের ব্যাপারে সে আইন কার্যকর নয়। কিন্তু উম্মাতের সকল উলামা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, পরোক্ষভাবে কিতাবী নারীদের জন্যও এ একই হুকুম কার্যকর হবে। অর্থাৎ কোন আহ্লি কিতাব নারীকে যদি কোন মুসলমান বিয়ে করে, তাহলে তার তালাক, মহর, ইদ্দত এবং তাকে তালাকের পরে কাপড়-চোপড় দেবার যাবতীয় বিধান একজন মু'মিন নারীকে বিয়ে করার অবস্থায় যা হয়ে থাকে তাই হবে। উলামা এ ব্যাপারে একমত, আল্লাহ এখানে বিশেষভাবে যে কেবলমাত্র মু'মিন নারীদের কথা বলেছেন এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবলমাত্র এ বিষয়ের প্রতি ইংগিত করা যে, মুসলমানদের জন্য মু'মিন নারীরাই উপযোগী। ইহুদি ও খৃষ্টান নারীদেরকে বিয়ে করা অবশ্যই জায়েয কিন্তু তা সংগত ও পছন্দনীয় নয়। অন্যকথায় বলা যায়, কুরআনের এ বর্ণনারীতি থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মু'মিনগণ মু'মিন নারীদেরকে বিয়ে করবে আল্লাহ এটাই চান।

দুই ঃ "স্পর্শ করা বা হাত লাগানো" এর আভিধানিক অর্থ তো হয় নিছক ছুঁয়ে দেয়া। কিন্তু এখানে এ শব্দটি রূপক অর্থে সহবাসের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এ দিক দিয়ে আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দাবী হচ্ছে এই যে, যদি স্বামী সহবাস না করে থাকে, তাহলে সে স্ত্রীর সাথে একান্তে (খাল্ওয়াত) অবস্থান করলেও বরং তার গায়ে হাত লাগালেও এ অবস্থায় তালাক দিলে ইদ্দত অপরিহার্য হবে না। কিন্তু ফকীহগণ সতর্কতামূলকভাবে এ বিধান দিয়েছেন যে, যদি "খাল্ওয়াতে সহীহা" তথা সঠিক অর্থে একান্তে অবস্থান সম্পন্ন হয়ে গিয়ে থাকে (অর্থাৎ যে অবস্থায় স্ত্রী সংগম সম্ভব হয়ে থাকে) তাহলে এরপর তালাক দেয়া হলে ইদ্দত অপরিহার্য হবে এবং একমাত্র এমন অবস্থায় ইদ্দত পালন করতে হবে না যখন খাল্ওয়াতের (একান্তে অবস্থান) পূর্বে তালাক দিয়ে দেয়া হবে।

তিন ঃ খাল্ওয়াতের পূর্বে তালাক দিলে ইদ্দত নাকচ হয়ে যাবার অর্থ হচ্ছে, এ অবস্থায় পুরুষের রুজু' করার অর্থাৎ স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার খতম হয়ে যায় এবং তালাকের পরপরই যাকে ইচ্ছা বিয়ে করার অধিকার নারীর থাকে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এ বিধান শুধুমাত্র খাল্ওয়াতের পূর্বে তালাক দেবার সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি খাল্ওয়াতের পূর্বে স্বামী মারা যায় তাহলে এ অবস্থায় স্বামীর মৃত্যুর পর যে ইদ্দত পালন করতে হয় তা বাতিল হয়ে যাবে না বরং বিবাহিতা স্বামীর সাথে সহবাস করেছে এমন স্ত্রীর জন্য চারমাস দশ দিনের ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হয় তাই তার জন্যও ওয়াজিব হবে। (ইদ্দত

বলতে এমন সময়কাল বুঝায় যা অতিবাহিত হবার পূর্বে নারীর জন্য দ্বিতীয় বিবাহ জায়েয নয়)

চার ঃ مَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ (তোমাদের জন্য তাদের ওপর কোন ইদ্দত অপরিহার্য হবে না) এ শব্দগুলো একথা প্রকাশ করে যে, ইদ্দত হচ্ছে স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার। কিন্তু এর এ অর্থ নয় যে, এটা শুধুমাত্র পুরুষের অধিকার। আসলে এর মধ্যে রয়েছে আরো দু'টি অধিকার। একটি হচ্ছে সন্তানের অধিকার এবং অন্যটি আল্লাহর বা শরীয়াতের অধিকার। পুরুষের অধিকার হচ্ছে এ জন্য যে, এ অন্তরবর্তীকালে তার রুজু' করার অধিকার থাকে। তাছাড়া আরো এ জন্য যে, তার সন্তানের বংশ প্রমাণ ইদ্দত পালনকালে স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। সন্তানের অধিকার এর মধ্যে শামিল হবার কারণ হচ্ছে এই যে, পিতা থেকে পুত্রের বংশ-ধারা প্রমাণিত হওয়া তার আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য জরুরী এবং তার নৈতিক মর্যাদাও তার বংশধারা সংশয়িত না হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। তারপর এর মধ্যে আল্লাহর অধিকার (বা শরীয়াতের অধিকার) এ জন্য শামিল হয়ে যায় যে, যদি লোকদের নিজেদের ও নিজেদের সন্তানদের অধিকারের পরোয়া না-ই বা হয় তবুও আল্লাহর শরীয়াত এ অধিকারগুলোর সংরক্ষণ জরুরী গণ্য করে। এ কারণেই কোন স্বামী যদি স্ত্রীকে একথা লিখে দেয় যে, আমার মৃত্যুর পর অথবা আমার থেকে তালাক নেবার পর তোমার ওপর আমার পক্ষ থেকে কোন ইদ্দত ওয়াজিব হবে না তবুও শরীয়াত কোন অবস্থায়ই তা বাতিল করবে না।

পাঁচ ঃ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (এদেরকে কিছু সম্পদ দিয়ে ভালো মতো বিদায় করে দাও) এ হুকুমটির উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে হবে দু'টি পদ্ধতির মধ্য থেকে কোন একটি পদ্ধতিতে। যদি বিয়ের সময় মহর নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং তারপর খালওয়াতের (স্বামী স্ত্রীর একান্ত অবস্থান) পূর্বে তালাক দেয়া হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এ অবস্থায় অর্ধেক মহর দেয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে যেমন সূরা বাকারার ২৩৭ আয়াতে বলা হয়েছে এর বেশী আর কিছু দেয়া অপরিহার্য নয় কিন্তু মুস্তাহাব। যেমন এটা পছন্দনীয় যে, অর্ধেক মহর দেবার সাথে সাথে বিয়ের কনে সাজাবার জন্য স্বামী তাকে যে কাপড় চোপড় দিয়েছিল তা তার কাছে থাকতে দেবে অথবা যদি আরো কিছু জিনিস পত্র বিয়ের সময় তাকে দেয়া হয়ে থাকে তাহলে সেগুলো ফেরত নেয়া হবে না। কিন্তু যদি বিয়ের সময় মহর নির্ধারিত না করা হয়ে থাকে তাহলে এ অবস্থায় স্ত্রীকে কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় করে দেয়া ওয়াজিব। আর এ "কিছু না কিছু" হতে হবে মানুষের মর্যাদা ও সামর্থ অনুযায়ী। যেমন সূরা বাকারার ২৩৬ আয়াতে বলা হয়েছে। আলেমগণের একটি দল এ মতের প্রবক্তা যে, মহর নির্ধারিত থাকা বা না থাকা অবস্থায়ও অবশ্যই "মুতা-ই-তালাক" দেয়া ওয়াজিব। (ইসলামী ফিকাহর পরিভাষায় মুতা-ই-তালাক এমন সম্পদকে বলা হয় যা তালাক দিয়ে বিদায় করার সময় নারীকে দেয়া হয়)

ছয় ঃ ভালোভাবে বিদায় করার অর্থ কেবল "কিছু না কিছু" দিয়ে বিদায় করা নয় বরং একথাও এর অন্তরভুক্ত যে, কোনপ্রকার অপবাদ না দিয়ে এবং বেইজ্জত না করে ভদ্রভাবে আলাদা হয়ে যাওয়া। কোন ব্যক্তির যদি স্ত্রী পছন্দ না হয় অথবা অন্য কোন অভিযোগ দেখা দেয় যে কারণে সে স্ত্রীকে রাখতে চায় না, তাহলে ভালো লোকদের মতো

সে তাকে তালাক দিয়ে বিদায় করে দেবে। এমন যেন না হয় যে, সে তার দোষ লোকদের সামনে বলে বেড়াতে থাকবে এবং তার বিরুদ্ধে এমনভাবে অভিযোগের দপ্তর খুলে বসবে যে অন্য কেউ আর তাকে বিয়ে করতে চাইবে না। কুরআনের এ উক্তি থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়ে যায় যে, তালাকের প্রয়োগকে কোন পাঞ্চায়েত বা আদালতের অনুমতির সাথে সংশ্লিষ্ট করা আল্লাহর শরীয়াতের জ্ঞান ও কল্যাণনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কারণ এ অবস্থায় "ভালোভাবে বিদায় দেবার" কোন সম্ভাবনাই থাকে না। বরং স্বামী না চাইলেও অপমান, বেইজ্জতি ও দুর্নামের ঝক্কি পোহাতে হবেই। তাছাড়া পুরুষের তালাক দেবার ইখতিয়ার কোন পঞ্চায়েত বা আদালতের অনুমতি সাপেক্ষ হবার কোন অবকাশই আয়াতের শব্দাবলীতে নেই। আয়াত একদম স্পষ্টভাবে বিবাহকারী পুরুষকে তালাকের ইখতিয়ার দিচ্ছে এবং তার ওপরই দায়িত্ব আরোপ করছে, সে যদি হাত লাগাবার পূর্বে স্ত্রীকে ত্যাগ করতে চায় তাহলে অবশ্যই অর্ধেক মহর দিয়ে বা নিজের সামর্থ অনুযায়ী কিছু সম্পদ দিয়ে তাকে বিদায় করে দেবে। এ থেকে পরিষ্কারভাবে আয়াতের এ উদ্দেশ্য জানা যায় যে, তালাককে খেলায় পরিণত হওয়ার পথ রোধ করার জন্য পুরুষের ওপর আর্থিক দায়িত্বের একটি বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এর ফলে সে নিজের তালাকের ইখতিয়ারকে ভেবে চিন্তে ব্যবহার করবে এবং পরিবারের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বাইরের কোন হস্তক্ষেপও হতে পারবে না। বরং স্বামী কেন স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছে একথা কাউকে বলতে বাধ্য হবার কোন সুযোগই আসবে না।

সাত ঃ ইবনে আব্বাস (রা), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, হাসান বাসরী, আলী ইবনুল হোসাইন (যয়নুল আবেদীন), ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল আয়াতের "যখন তোমরা বিয়ে করো এবং তারপর তালাক দিয়ে দাও" শব্দাবলী থেকে এ বিধান নির্ণয় করেছেন যে, তালাক তখনই সংঘটিত হবে যখন তার পূর্বে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। বিয়ের পূর্বে তালাক কার্যকর হয় না। কাজেই যদি কোন ব্যক্তি বলে, "আমি অমুক মেয়েকে বা অমুক গোত্র বা জাতির মেয়েকে অথবা কোন মেয়েকে বিয়ে করলে তাকে তালাক" তাহলে তার এ উক্তি অর্থহীন ও অকার্যকর হবে। এতে কোন তালাক হতে পারে না। এ চিন্তার সমর্থনে এ হাদীস পেশ করা যায়, রসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ لا طلاق لابن ادم فى ما لا يملك "ইবনে আদম যে জিনিসের মালিক নয় তার ব্যাপারে তালাকের ইখ্তিয়ার ব্যবহার করার অধিকার তার নেই।" (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ) তিনি আরো বলেছেন ঃ لا طلاق قبل النكاح "বিয়ের পূর্বে কোন তালাক নেই" (ইবনে মাজাহ) কিন্তু ফকীহদের একটি বড় দল বলেন, এ আয়াত ও এ হাদীসগুলো কেবলমাত্র তখনই প্রযুক্ত হবে যখন কোন ব্যক্তি তার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়নি এমন কোন মেয়েকে এভাবে বলে, "তোমাকে তালাক" অথবা "আমি তোমাকে তালাক দিলাম।" এ উক্তি নিসন্দেহে অর্থহীন ও উদ্ভট। এর ওপর কোন আইনগত ফলাফল বলবৎ হবে না। কিন্তু যদি সে এভাবে বলে, "যদি আমি তোমাকে বিয়ে করি তাহলে তোমাকে তালাক", তাহলে এটা বিয়ে করার পূর্বে তালাক দেয়া নয় বরং আসলে সে এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং ঘোষণা করছে যে, যখন সেই মেয়েটির সাথে তার বিয়ে হবে তখন তার ওপর তালাক অনুষ্ঠিত হবে। এ উক্তি অর্থহীন, উদ্ভট ও প্রভাবহীন হতে পারে না। বরং যখনই মেয়েটিকে সে বিয়ে করবে তখনই তার ওপর

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ
وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ
عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ز
وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ
يَّسْتَنْكِحَهَا ق خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا
عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ
حَرَجٌ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٠﴾

হে নবী! আমি তোমার জন্য হালাল করে দিয়েছি তোমার স্ত্রীদেরকে যাদের মহর তুমি আদায় করে দিয়েছো,[৮৭] এবং এমন নারীদেরকে যারা আল্লাহ প্রদত্ত বাঁদীদের মধ্য থেকে তোমার মালিকানাধীন হয়েছে আর তোমার চাচাত, ফুফাত, মামাত, খালাত বোনদেরকে, যারা তোমার সাথে হিজরাত করেছে এবং এমন মু'মিন নারীকে যে নিজেকে নবীর কাছে নিবেদন করেছে যদি নবী তাকে বিয়ে করতে চায়,[৮৮] এ সুবিধাদান বিশেষ করে তোমার জন্য, অন্য মু'মিনদের জন্য নয়।[৮৯] সাধারণ মু'মিনদের ওপর তাদের স্ত্রী ও বাঁদীদের ব্যাপারে আমি যে সীমারেখা নির্ধারণ করেছি তা আমি জানি, (তোমাকে এ সীমারেখা থেকে এ জন্য আলাদা রেখেছি) যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়,[৯০] আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

তালাক সংঘটিত হয়ে যাবে। যেসব ফকীহ এ মত অবলম্বন করেছেন তাঁদের মধ্যে আবার এ বিষয়ে মতবিরোধ হয়েছে যে, এ ধরনের তালাকের প্রয়োগ সীমা কতখানি।

ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম যুফার বলেন, কোন ব্যক্তি যদি কোন মেয়ে, কোন জাতি বা কোন গোত্র নির্দেশ করে বলে অথবা উদাহরণ স্বরূপ সাধারণ কথায় এভাবে বলে, "যে মেয়েকেই আমি বিয়ে করবো তাকেই তালাক।" তাহলে উভয় অবস্থায়ই তালাক সংঘটিত হয়ে যাবে। আবু বকর জাস্‌সাস এ একই অভিমত হযরত ওমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), ইবরাহীম নাখাঈ, মুজাহিদ ও উমর ইবনে আবদুল আযীয রাহেমাহুমুল্লাহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

সুফিয়ান সওরী ও উসমানুল বাত্তী বলেন, তালাক কেবলমাত্র তখনি হবে যখন বক্তা এভাবে বলবে, "যদি আমি অমুক মেয়েকে বিয়ে করি তাহলে তার ওপর তালাক সংগঠিত হবে।"

হাসান ইবনে সালেহ, লাইস ইবনে সা'দ ও আমেরুশ শা'বী বলেন, এ ধরনের তালাক সাধারণভাবেও সংঘটিত হতে পারে, তবে শর্ত এই যে, এর প্রয়োগক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট হতে হবে। যেমন এক ব্যক্তি এভাবে বললো ঃ "যদি আমি অমুক পরিবার, অমুক গোত্র, অমুক শহর, অমুক দেশ বা অমুক জাতির মেয়ে বিয়ে করি, তাহলে তার ওপর তালাক কার্যকর হবে।"

ইবনে আবী লাইলা ও ইমাম মালেক ওপরে উদ্ধৃত মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করে অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করেন এবং বলেন, এর মধ্যে সময়-কালও নির্ধারিত হতে হবে। যেমন, যদি এক ব্যক্তি এভাবে বলে, "যদি আমি এ বছর বা আগামী দশ বছরের মধ্যে অমুক মেয়ে বা অমুক দলের মেয়েকে বিয়ে করি, তাহলে তার ওপর তালাক কার্যকর হবে অন্যথায় তালাক হবে না। বরং ইমাম মালেক এর ওপর আরো এতটুকু বৃদ্ধি করেন যে, যদি এ সময়-কাল এতটা দীর্ঘ হয় যার মধ্যে ঐ ব্যক্তির জীবিত থাকার আশা করা যায় না তাহলে তার উক্তি অকার্যকর হয়ে যাবে।

৮৭. যারা আপত্তি করে বলতো, "মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো অন্যদের জন্য একই সময় চারজনের বেশী স্ত্রী রাখতে নিষেধ করেন কিন্তু তিনি নিজে পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ করলেন কেমন করে," এখানে আসলে তাদের জবাব দেয়া হয়েছে। এ আপত্তির ভিত্তি ছিল এরি ওপর যে, হযরত যয়নবকে (রা) বিয়ে করার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী ছিলেন চারজন। এদের একজন ছিলেন হযরত সওদা (রা)। তাঁকে তিনি বিয়ে করেছিলেন হিজরাতের ৩ বছর আগে। দ্বিতীয় ছিলেন হযরত আয়েশা (রা)। তাঁকেও হিজরাতের ৩ বছর আগে বিয়ে করেছিলেন কিন্তু হিজরী প্রথম বছরের শওয়াল মাসে তিনি স্বামীগৃহে আসেন। তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন হযরত হাফসা (রা) ৩ হিজরীর শাবান মাসে তাঁকে বিয়ে করেন। চতুর্থ স্ত্রী ছিলেন হযরত উম্মে সালামাহ (রা)। ৪ হিজরীর শওয়াল মাসে নবী করীম (সা) তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। এভাবে হযরত যয়নব (রা) ছিলেন তাঁর পঞ্চম স্ত্রী। এর বিরুদ্ধে কাফের ও মুনাফিকরা যে আপত্তি জানাচ্ছিল তার জবাব আল্লাহ এভাবে দিচ্ছেন ঃ হে নবী! তোমার এ পাঁচজন স্ত্রী, যাদের মহর আদায় করে তুমি বিয়ে করেছো, তাদেরকে আমি তোমার জন্য হালাল করে দিয়েছি। অন্যকথায় এ জবাবের অর্থ হচ্ছে, সাধারণ মুসলমানদের জন্য চার-এর সীমানির্দেশও আমিই করেছি এবং নিজের নবীকে এ সীমার উর্ধেও রেখেছি আমিই। যদি তাদের জন্য সীমানির্দেশ করার ইখতিয়ার আমার থেকে থাকে, তাহলে নবীকে সীমার উর্ধে রাখার ইখতিয়ার আমার থাকবে না কেন?

এ জবাবের ব্যাপারে আবার একথা মনে রাখতে হবে যে, এর সাহায্যে কাফের ও মুনাফিকদেরকে নিশ্চিন্ত করা এর উদ্দেশ্য নয় বরং এমন মুসলমানদেরকে নিশ্চিন্ত করা এর উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম বিরোধীরা যাদের মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিল। তারা যেহেতু বিশ্বাস করতো, কুরআন আল্লাহর কালাম এবং আল্লাহর নিজের শব্দসহই এ কুরআন নাযিল হয়েছে, তাই কুরআনের একটি সুস্পষ্ট বক্তব্য সম্বলিত আয়াতের মাধ্যমে

আল্লাহ এ ঘোষণা দিয়েছেন ঃ নবী নিজেই নিজেকে চারজন স্ত্রী রাখার সাধারণ আইনের আওতার বাইরে রাখেননি বরং এ ব্যবস্থা আমিই করেছি।

৮৮.পঞ্চম স্ত্রীকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য হালাল করা ছাড়াও আল্লাহ এ আয়াতে তাঁর জন্য আরো কয়েক ধরনের মহিলাদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন ঃ

এক ঃ আল্লাহ প্রদত্ত বাঁদীদের মধ্য থেকে যারা তাঁর মালিকানাধীন হয়। এ অনুমতি অনুযায়ী তিনি বনী কুরাইযার যুদ্ধবন্দিনীদের মধ্য থেকে হযরত রাইহানাকে (রা), বনিল মুস্তালিকের যুদ্ধবন্দিনীদের মধ্য থেকে হযরত যুওয়াইরাকে (রা), খয়বরের যুদ্ধ-বন্দিনীদের মধ্য থেকে হযরত সফীয়াকে (রা) এবং মিসরের মুকাওকিস প্রেরিত হযরত মারিয়া কিবৃতিয়াকে (রা) নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেন। এঁদের মধ্য থেকে প্রথমোক্ত তিনজনকে তিনি মুক্তি দান করে তাদেরকে বিয়ে করেন। কিন্তু হযরত মারিয়া কিবৃতিয়ার (রা) সাথে মালিকানাধীন হবার ভিত্তিতে সহবাস করেন। তিনি তাঁকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করেন একথা তাঁর সম্পর্কে প্রমাণিত নয়।

দুই ঃ তাঁর চাচাত, মামাত, ফুফাত ও খালাত বোনদের মধ্য থেকে যাঁরা হিজরাতে তাঁর সহযোগী হন। আয়াতে তাঁর সাথে হিজরাত করার যে কথা এসেছে তার অর্থ এ নয় যে, হিজরাতের সফরে তাঁর সাথেই থাকতে হবে বরং এর অর্থ ছিল, ইসলামের জন্য তাঁরাও আল্লাহর পথে হিজরাত করেন। তাঁর ওপরে উল্লেখিত মুহাজির আত্মীয়দের মধ্য থেকেও যাকে ইচ্ছা তাকে বিয়ে করার ইখতিয়ারও তাঁকে দেয়া হয়। কাজেই এ অনুমতির ভিত্তিতে তিনি ৭ হিজরী সালে হযরত উম্মে হাবীবাকে (রা) বিয়ে করেন। (পরোক্ষভাবে এ আয়াতে একথা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, চাচা, মামা, ফুফী ও খালার মেয়েকে বিয়ে করা একজন মুসলমানের জন্য হালাল। এ ব্যাপারে ইসলামী শরীয়াত খৃষ্ট ও ইহুদী উভয় ধর্ম থেকে আলাদা। খৃষ্টীয় বিধানে এমন কোন মহিলাকে বিয়ে করা অবৈধ যার সাথে সাত পুরুষ পর্যন্ত পুরুষের বংশধারা মিলে যায়। আর ইহুদীদের সমাজে সহোদর ভাইঝি ও ভাগ্নীকেও বিয়ে করা বৈধ।)

তিন ঃ যে মু'মিন নারী নিজেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য 'হিবা', তথা দান করে অর্থাৎ মহর ছাড়াই নিজেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে তৈরি হয়ে যায় এবং নবী (সা) তা গ্রহণ করা পছন্দ করেন। এ অনুমতির ভিত্তিতে তিনি ৭ হিজরীর শওয়াল মাসে হযরত মায়মুনাকে (রা) নিজের সহধর্মিনী রূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু মহর ছাড়া তার হিবার সুযোগ নেয়া পছন্দ করেননি। তাই তার কোন আকাংখা ও দাবী ছাড়াই তাঁকে মহর দান করেন। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন হিবাকারিনী স্ত্রী ছিল না। কিন্তু এর অর্থ আসলে হচ্ছে এই যে, তিনি হিবাকারিনী কোন স্ত্রীকেও মহর থেকে বঞ্চিত করেননি।

৮৯. এ বাক্যটির সম্পর্ক যদি নিকটের বাক্যের সাথে মেনে নেয়া হয়, তাহলে এর অর্থ হবে, অন্য কোন মুসলমানের জন্য কোন মহিলা নিজেকে তার হাতে হিবা করবে এবং সে মহর ছাড়াই তাকে বিয়ে করবে, এটা জায়েয নয়। আর যদি ওপরের সমস্ত

ইবারতের সাথে এর সম্পর্ক মেনে নেয়া হয়, তাহলে এর অর্থ হবে, চারটির বেশী বিয়ে করার সুবিধাও একমাত্র নবী করীমের (সা) জন্যই নির্দিষ্ট, সাধারণ মুসলমানের জন্য নয়। এ আয়াত থেকে একথাও জানা যায় যে, কিছু বিধান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে, উম্মাতের অন্য লোকেরা এ ব্যাপারে তাঁর সাথে শরীক নেই। কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে তাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়ে এ ধরনের বহু বিধানের কথা জানা যায়। যেমন নবী করীমের (সা) জন্য তাহাজ্জুদের নামায ফরয ছিল এবং সমগ্র উম্মাতের জন্য তা নফল। তাঁর ও তাঁর পরিবারবর্গের জন্য সাদ্কা নেয়া হারাম এবং অন্য কারোর জন্য তা হারাম নয়। তাঁর মীরাস বন্টন হতে পারতো না কিন্তু অন্য সকলের মীরাস বন্টনের জন্য সূরা নিসায় বিধান দেয়া হয়েছে। তাঁর জন্য চারজনের অধিক স্ত্রী হালাল করা হয়েছে। স্ত্রীদের মধ্যে সমতাপূর্ণ ইনসাফ তাঁর জন্য ওয়াজিব করা হয়নি। নিজেকে হিবাকারী নারীকে মহর ছাড়াই বিয়ে করার অনুমতি তাঁকে দেয়া হয়েছে। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণকে সমগ্র উম্মাতের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে এমন একটি বিশেষত্বও নেই যা নবী করীম (সা) ছাড়া অন্য কোন মুসলমানও অর্জন করেছে। মুফাস্সিরগণ তাঁর আর একটি বৈশিষ্টও বর্ণনা করেছেন। তা হচ্ছে এই যে, আহ্লি কিতাবের কোন মহিলাকে বিয়ে করাও তাঁর জন্য নিষিদ্ধ ছিল। অথচ উম্মাতের সবার জন্য তারা হালাল।

৯০. সাধারণ নিয়ম থেকে মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে আলাদা রেখেছেন তার মধ্যে রয়েছে এ সুবিধা ও কল্যাণ। "যাতে সংকীর্ণতা ও অসুবিধা না থাকে"–এর অর্থ এ নয় যে, নাউযুবিল্লাহ তাঁর প্রবৃত্তির লালসা খুব বেশী বেড়ে গিয়েছিল বলে তাঁকে বহু স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়া হয়, যাতে শুধুমাত্র চারজন স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে তিনি সংকীর্ণতা ও অসুবিধা অনুভব না করেন। এ বাক্যাংশের এ অর্থ কেবলমাত্র এমন এক ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারে যে বিদ্বেষ ও সংকীর্ণ স্বার্থপ্রীতিতে অন্ধ হয়ে একথা ভুলে যায় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২৫ বছর বয়সে এমন এক মহিলাকে বিয়ে করেন যাঁর বয়স ছিল তখন ৪০ বছর এবং পুরো ২৫ বছর ধরে তিনি তাঁর সাথে অত্যন্ত সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করতে থাকেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তিনি অন্য একজন অধিক বয়সের বিগত যৌবনা মহিলা হযরত সওদাকে (রা) বিয়ে করেন। পুরো চার বছর পর্যন্ত তিনি একাই ছিলেন তাঁর স্ত্রী। এখন কোন্ বুদ্ধিমান বিবেকবান ব্যক্তি একথা কল্পনা করতে পারে যে, ৫৩ বছর পার হয়ে যাবার পর সহসা তাঁর যৌন কামনা বেড়ে যেতে থাকে এবং তাঁর অনেক বেশী সংখ্যক স্ত্রীর প্রয়োজন হয়ে পড়ে? আসলে "সংকীর্ণতা ও অসুবিধা না থাকে"–এর অর্থ অনুধাবন করতে হলে একদিকে নবী করীমের (সা) ওপর আল্লাহ যে মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তার প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং অন্যদিকে যে অবস্থার মধ্যে আল্লাহ তাঁকে এ মহান দায়িত্ব সম্পাদন করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন তা অনুধাবন করা জরুরী। সংকীর্ণ স্বার্থপ্রীতি থেকে মন–মানসিকতাকে মুক্ত করে যে ব্যক্তিই এ দু'টি সত্য অনুধাবন করবেন তিনিই স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে তাঁকে ব্যাপক অনুমতি দেয়া কেন জরুরী ছিল এবং চারের সীমারেখা নির্দেশের মধ্যে তাঁর জন্য কি "সংকীর্ণতা ও অসুবিধা" ছিল তা ভালোভাবেই জানতে পারবেন।

নবী করীমকে (সা) যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তা ছিল এই যে, তিনি একটি অসংগঠিত ও অপরিপক্ক জাতিকে, যারা কেবল ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেই নয় বরং সাধারণ সভ্যতা সংস্কৃতির দৃষ্টিতেও ছিল অগোছালো ও অগঠিত, তাদেরকে জীবনের প্রতিটি বিভাগে শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে একটি উন্নত পর্যায়ের সুসভ্য, সংস্কৃতিবান ও পরিচ্ছন্ন জাতিতে পরিণত করবেন। এ উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র পুরুষদেরকে অনুশীলন দেয়া যথেষ্ট ছিল না বরং মহিলাদের অনুশীলনও সমান জরুরী ছিল। কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে মূলনীতি শিখাবার জন্য তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন তার দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ ছিল এবং এ নিয়ম ভংগ করা ছাড়া তাঁর পক্ষে মহিলাদেরকে সরাসরি অনুশীলন দান করা সম্ভবপর ছিল না। তাই মহিলাদের মধ্যে কাজ করার কেবলমাত্র একটি পথই তাঁর জন্য খোলা ছিল এবং সেটি হচ্ছে, বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতাসম্পন্ন মহিলাদেরকে তিনি বিয়ে করতেন, নিজে সরাসরি তাদেরকে অনুশীলন দান করে তাঁর নিজের সাহায্য সহায়তার জন্য প্রস্তুত করতেন এবং তারপর তাদের সাহায্যে নগরবাসী ও মরুচারী এবং যুবতী, পৌঢ় ও বৃদ্ধা সব ধরনের নারীদেরকে দীন, নৈতিকতা ও কৃষ্টি সংস্কৃতির নতুন নীতিসমূহ শিখবার ব্যবস্থা করতেন।

এ ছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পুরাতন জাহেলী জীবন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে তার জায়গায় কার্যত ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্বও দেয়া হয়েছিল। এ দায়িত্ব সম্পাদন করার জন্য জাহেলী জীবন ব্যবস্থার প্রবক্তা ও পতাকাবাহীদের সাথে যুদ্ধ অপরিহার্য ছিল। এ সংঘাত এমন একটি দেশে শুরু হতে যাচ্ছিল যেখানে গোত্রীয় জীবনধারা নিজের বিশেষ বিশেষ সাংস্কৃতিক অবয়বে প্রচলিত ছিল। এ অবস্থায় অন্যান্য ব্যবস্থার সাথে বিভিন্ন পরিবারে বিয়ে করে বহুবিধ বন্ধুত্বকে পাকাপোক্ত এবং বহুতর শত্রুতাকে খতম করার ব্যবস্থা করা তাঁর জন্য জরুরী ছিল। তাই যেসব মহিলাকে তিনি বিয়ে করেন তাঁদের ব্যক্তিগত গুণাবলী ছাড়াও তাঁদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে এসব বিষয়ও কমবেশী জড়িত ছিল। হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত হাফসাকে (রা) বিয়ে করে তিনি হযরত আবুবকর (রা) ও হযরত উমরের (রা) সাথে নিজের সম্পর্ককে আরো বেশী গভীর ও মজবুত করে নেন। হযরত উম্মে সালামাহ (রা) ছিলেন এমন এক পরিবারের মেয়ে যার সাথে ছিল আবু জেহেল ও খালেদ ইবনে ওলিদের সম্পর্ক। হযরত উম্মে হাবীবা (রা) ছিলেন আবু সুফিয়ানের মেয়ে। এ বিয়েগুলো সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোর শত্রুতার জের অনেকাংশে কমিয়ে দেয়। বরং হযরত উম্মে হাবীবার সাথে নবী করীমের (সা) বিয়ে হবার পর আবু সুফিয়ান আর কখনো তাঁর মোকাবিলায় অস্ত্র ধরেননি। হযরত সফিয়া (রা), হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) ও হযরত রাইহানা (রা) ইহুদি পরিবারের মেয়ে ছিলেন। তাঁদেরকে মুক্ত করে দিয়ে যখন নবী করীম (সা) তাঁদেরকে বিয়ে করেন তখন তাঁর বিরুদ্ধে ইহুদিদের তৎপরতা স্তিমিত হয়ে পড়ে। কারণ সে যুগের আরবীয় রীতি অনুযায়ী যে ব্যক্তির সাথে কোন গোত্রের মেয়ের বিয়ে হতো তাঁকে কেবল মেয়েটির পরিবারেরই নয় বরং সমগ্র গোত্রের জামাতা মনে করা হতো এবং জামাতার সাথে যুদ্ধ করা ছিল বড়ই লজ্জাকর।

সমাজের কার্যকর সংশোধন এবং তার জাহেলী রসম রেওয়াজ নির্মূল করাও তাঁর নবুওয়াতের অন্যতম দায়িত্ব ছিল। কাজেই এ উদ্দেশ্যেও তাঁকে একটি বিয়ে করতে হয়। এ সূরা আহযাবে এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে।

تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِيْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ۭ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ
مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۭ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ
وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ
قُلُوْبِكُمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ۝٥١

তোমাকে ইখতিয়ার দেয়া হচ্ছে, তোমার স্ত্রীদের মধ্য থেকে যাকে চাও নিজের থেকে আলাদা করে রাখো, যাকে চাও নিজের সাথে রাখো এবং যাকে চাও আলাদা রাখার পরে নিজের কাছে ডেকে নাও। এতে তোমার কোন ক্ষতি নেই। এভাবে বেশী আশা করা যায় যে, তাদের চোখ শীতল থাকবে এবং তারা দুঃখিত হবে না আর যা কিছুই তুমি তাদেরকে দেবে তাতে তারা সবাই সন্তুষ্ট থাকবে।[৯১] আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমাদের অন্তরে আছে এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সহনশীল।[৯২]

এসব বিষয় বিয়ের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য কোন রকম সংকীর্ণতা ও অসুবিধা না রাখার তাগাদা করছিল। এর ফলে যে মহান দায়িত্ব তাঁর প্রতি অর্পিত হয়েছিল তার প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তিনি প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিয়ে করতে পারতেন।

যারা মনে করেন একাধিক বিয়ে কেবলমাত্র কয়েকটি বিশেষ ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই বৈধ এবং সেগুলো ছাড়া তা বৈধ হবার পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না, এ বর্ণনা থেকে তাদের চিন্তার বিভ্রান্তিও সুস্পষ্ট হয়ে যায়। একথা সুস্পষ্ট যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একাধিক বিয়ে করার পেছনে তাঁর স্ত্রীর রুগ্নতা, বন্ধ্যাত্ব বা সন্তানহীনতা অথবা এতিম প্রতিপালনের সমস্যা ছিল না। এসব সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়া তিনি সমস্ত বিয়ে করেন প্রচার ও শিক্ষামূলক প্রয়োজনে অথবা সমাজ সংস্কারার্থে কিংবা রাজনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যে। প্রশ্ন হচ্ছে, যখন আজ হাতেগোনা যে কয়টি বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা বলা হচ্ছে আল্লাহ নিজেই সেগুলোর জন্য একাধিক বিয়েকে সীমাবদ্ধ করে রাখেননি এবং আল্লাহর রসূল এগুলো ছাড়া আরো অন্যান্য বহু উদ্দেশ্যে একাধিক বিয়ে করেছেন তখন অন্য ব্যক্তি আইনের মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে কতিপয় শর্ত ও বিধি-নিষেধ আরোপ করার এবং সে শরীয়াত অনুযায়ী এ সীমা নির্ধারণ করছে বলে দাবী করার কী অধিকার রাখে? আসলে একাধিক বিয়ে মূলতই একটি অপকর্ম, এই পাশ্চাত্য ধারণাটি উক্ত সীমা নির্ধারণের মূলে কাজ করছে। উক্ত ধারণার ভিত্তিতে এ মতবাদেরও জন্ম হয়েছে যে, এ হারাম কাজটি যদি কখনো হালাল হয়েও যায় তাহলে তা কেবলমাত্র অপরিহার্য প্রয়োজনের জন্যই হতে পারে। এখন এ বাইর থেকে আমদানী করা চিন্তার ওপর ইসলামের জাল ছাপ লাগাবার যতই চেষ্টা করা হোক না কেন কুরআন ও সুন্নাহ এবং সমগ্র উম্মাতে মুসলিমার সাহিত্য এর সাথে মোটেই পরিচিত নয়।

৯১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সংসার জীবনের সংকটমুক্ত করাই ছিল এ আয়াতটির উদ্দেশ্য। এর ফলে তিনি পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ততার সাথে নিজের কাজ করতে পারবেন। যখন আল্লাহ পরিষ্কার ভাষায় তাঁকে পবিত্র স্ত্রীদের মধ্য থেকে যার সাথে তিনি যেমন ব্যবহার করতে চান তা করার ইখতিয়ার দিয়ে দেন তখন এ মু'মিন ভদ্রমহিলাদের তাঁকে কোনভাবে পেরেশান করার অথবা পরস্পর ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতার কলহ সৃষ্টি করে সমস্যার মুখোমুখি করার আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না। কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে এ ইখতিয়ার লাভ করার পরও নবী করীম (সা) সকল স্ত্রীদের মধ্যে পূর্ণ সমতা ও ইনসাফ কায়েম করেন, কাউকেও কারো ওপর প্রাধান্য দেননি এবং যথারীতি পালা নির্ধারণ করে তিনি সবার কাছে যেতে থাকেন। মুহাদ্দিসদের মধ্যে একমাত্র আবু রাযীন বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) কেবলমাত্র চারজন স্ত্রীর (হযরত আয়েশা, হযরত হাফসাহ, হযরত যয়নব ও হযরত উম্মে সালামাহ) জন্য পালা নির্ধারণ করেন, বাকি অন্য সকল স্ত্রীর জন্য কোন পালা নির্দিষ্ট করেননি। কিন্তু অন্য সকল মুহাদ্দিস ও মুফাস্সির এর প্রতিবাদ করেন। তাঁরা অত্যন্ত শক্তিশালী রেওয়ায়াতের মাধ্যমে এ প্রমাণ পেশ করেন যে, এ ইখতিয়ার লাভ করার পরও নবী করীম (সা) সকল স্ত্রীর কাছে পালাক্রমে যেতে থাকেন এবং সবার সাথে সমান ব্যবহার করতে থাকেন। বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ ও আবু দাউদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হযরত আয়েশার এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ "এ আয়াত নাযিলের পর নবী করীমের (সা) রীতি এটিই ছিল যে, তিনি আমাদের মধ্য থেকে কোন স্ত্রীর পালার দিন অন্য স্ত্রীর কাছে যেতে হলে তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তবে যেতেন।" আবু বকর জাস্সাস হযরত উরওয়াহ ইবনে যুবাইরের (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে বলেন ঃ "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালা বন্টনের ক্ষেত্রে আমাদের কাউকে কারো ওপর প্রাধান্য দিতেন না। যদিও এমন ঘটনা খুব কমই ঘটতো যে, তিনি একই দিন নিজের সকল স্ত্রীর কাছে যাননি তবুও যে স্ত্রীর পালার দিন হতো সেদিন তাকে ছাড়া আর কাউকে স্পর্শও করতেন না।" হযরত আয়েশা (রা) এ হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন ঃ যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর শেষ রোগে আক্রান্ত হন এবং চলাফেরা করা তাঁর জন্য কঠিন হয়ে পড়ে তখন তিনি সকল স্ত্রীদের থেকে অনুমতি চান এই মর্মে, আমাকে আয়েশার কাছে থাকতে দাও। তারপর যখন সবাই অনুমতি দেন তখন তিনি শেষ সময়ে হযরত আয়েশার (রা) কাছে থাকেন। ইবনে আবি হাতেম ইমাম যুহরীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন স্ত্রীকে পালা থেকে বঞ্চিত করার কথা প্রমাণিত নয়। একমাত্র হযরত সওদা (রা) এর ব্যতিক্রম। তিনি সানন্দে নিজের পালা হযরত আয়েশাকে (রা) দিয়ে দেন। কারণ তিনি অনেক বয়োবৃদ্ধা হয়ে পড়েছিলেন।

এখানে কারো মনে এ ধরনের কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, আল্লাহ এ আয়াতে তাঁর নবীর জন্য নাউযুবিল্লাহ কোন অন্যায় সুবিধা দান করেছিলেন এবং তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের অধিকার হরণ করেছিলেন। আসলে যেসব মহৎ কল্যাণ ও সুবিধার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সংখ্যার ব্যাপারটি সাধারণ নিয়মের বাইরে রাখা হয়েছিল নবীকে সাংসারিক জীবনে শান্তি দান করা এবং যেসব কারণে তাঁর মনে পেরেশানী সৃষ্টি হতে পারে সেগুলোর পথ বন্ধ করে দেয়া ছিল সেসব কল্যাণ ও সুবিধারই দাবী। নবীর পবিত্র স্ত্রীগণের জন্য এটা ছিল বিরাট মর্যাদার ব্যাপার। তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ
وَّلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴿٥٢﴾

এরপর তোমার জন্য অন্য নারীরা হালাল নয় এবং এদের জায়গায় অন্য স্ত্রীদের আনবে এ অনুমতিও নেই, তাদের সৌন্দর্য তোমাকে যতই মুগ্ধ করুক না কেন,[৯৩] তবে বাঁদীদের মধ্য থেকে তোমার অনুমতি আছে।[৯৪] আল্লাহ সবকিছু দেখাশুনা করছেন।

আলাইহি ওয়া সাল্লামের ন্যায় মহামহিম ব্যক্তিত্বের স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করেছিলেন। এরি বদৌলতে তাঁরা ইসলামী দাওয়াত ও সংস্কারের এ মহিমান্বিত কর্মে নবী করীমের (সা) সহযোগী হতে সক্ষম হয়েছিলেন, যিনি কিয়ামত পর্যন্ত মানবতার কল্যাণের মাধ্যমে পরিণত হতে যাচ্ছিলেন। এ উদ্দেশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন অসাধারণ ত্যাগ ও কুরবানীর পথ অবলম্বন করেছিলেন এবং সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের সামর্থের শেষ সীমা পর্যন্ত কুরবানী করে চলছিলেন ঠিক তেমনি ত্যাগ স্বীকার করা নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণেরও কর্তব্য ছিল। তাই নবী করীমের (সা) সকল স্ত্রী মহান আল্লাহর এ ফায়সালা সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন।

৯২. এটি নবী করীমের (সা) পবিত্র স্ত্রীগণের জন্যও সতর্কবাণী এবং অন্য সমস্ত লোকদের জন্যও। পবিত্র স্ত্রীগণের জন্য এ বিষয়ের সতর্কবাণী যে, আল্লাহর এ হুকুম এসে যাবার পর যদি তাদের হৃদয় দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে তাহলে তারা পাকড়াও থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারবে না। অন্য লোকদের জন্য এর মধ্যে এ সতর্কবাণী রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে যদি তারা কোন প্রকার ভুল ধারণাও নিজেদের মনে পোষণ করে অথবা চিন্তা-ভাবনার কোন পর্যায়েও কোন প্ররোচনা লালন করতে থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে তাদের এ প্রচ্ছন্ন দুষ্কৃতি গোপন থাকবে না। এই সাথে আল্লাহর সহিষ্ণুতা গুণের কথাও বলে দেয়া হয়েছে। এভাবে মানুষ জানবে, নবী সম্পর্কে গোস্তাখীমূলক চিন্তা যদিও কঠিন শাস্তিযোগ্য তবুও যার মনে কখনো এ ধরনের প্ররোচনা সৃষ্টি হয় সে যদি তা বের করে দেয়, তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা লাভের আশা আছে।

৯৩. এ উক্তির দু'টি অর্থ রয়েছে। এক, ওপরে ৫০ আয়াতে নবী করীমের (সা) জন্য যেসব নারীকে হালাল করে দেয়া হয়েছে তারা ছাড়া আর কোন নারী এখন আর তাঁর জন্য হালাল নয়। দুই, যখন তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ অভাবে অনটনে তাঁর সাথে থাকবেন বলে রাজী হয়ে গেছেন এবং আখেরাতের জন্য তাঁরা দুনিয়াকে বিসর্জন দিয়েছেন আর তিনি তাঁদের সাথে যে ধরনের আচরণ করবেন তাতেই তাঁরা খুশী তখন এ ক্ষেত্রে আর তাঁর জন্য তাঁদের মধ্য থেকে কাউকে তালাক দিয়ে তাঁর জায়গায় অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা হালাল নয়।

৯৪. এ আয়াতটি পরিষ্কার করে একথা বর্ণনা করছে যে, বিবাহিতা স্ত্রীগণ ছাড়া মালিকানাধীন নারীদের সাথেও মিলনের অনুমতি রয়েছে এবং তাদের ব্যাপারে কোন সংখ্যা-সীমা নেই। সূরা নিসার ৩ আয়াতে, সূরা মু'মিনূনের ৬ আয়াতে এবং সূরা মা'আরিজের ৩০ আয়াতে এ বিষয়বস্তুটি পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে। এ সমস্ত আয়াতে মালিকানাধীন মহিলাদেরকে বিবাহিতা নারীদের মোকাবিলায় একটি আলাদা গোষ্ঠী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তারপর তাদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনকে বৈধ গণ্য করা হয়েছে। এ ছাড়াও সূরা নিসার ৩ আয়াত বিবাহিতা স্ত্রীদের জন্য ৪ জনের সীমারেখা নির্ধারণ করে। কিন্তু সেখানে আল্লাহ মালিকানাধীন মহিলাদের কোন সংখ্যাসীমা বেঁধে দেননি এবং এতদসংক্রান্ত অন্য আয়াতগুলোতেও কোথাও এ ধরনের কোন সীমার প্রতি ইংগিতও করেননি। বরং এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, আপনার জন্য এরপর অন্য মহিলাদেরকে বিয়ে করা অথবা কাউকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী নিয়ে আসা হালাল নয়। তবে মালিকানাধীন মহিলারা হালাল। এ থেকে পরিষ্কার প্রকাশ হয় মালিকানাধীন মহিলাদের ব্যাপারে কোন সংখ্যা-সীমা নির্ধারিত নেই।

কিন্তু এর অর্থ এ নয়, ইসলামী শরীয়াত ধনীদের অসংখ্য বাঁদী কিনে আয়েশ করার জন্য এ সুযোগ দিয়েছে। বরং আসলে প্রবৃত্তি পূজারী লোকেরা এ আইনটি থেকে অযথা সুযোগ গ্রহণ করেছে। আইন তৈরি করা হয়েছিল মানুষের সুবিধার জন্য। আইন থেকে এ ধরনের সুযোগ গ্রহণের জন্যও তা তৈরি করা হয়নি। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঠিক তেমনি যেমন শরীয়াত একজন পুরুষকে চারজন পর্যন্ত মহিলাকে বিয়ে করার অনুমতি দেয় এবং তাকে নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করারও অনুমতি দেয়। মানুষের প্রয়োজন সামনে রেখে এ আইন তৈরি করা হয়েছিল। এখন যদি কোন ব্যক্তি নিছক আয়েশ করার জন্য চারটি মহিলাকে বিয়ে করে কিছুদিন তাদের সাথে থাকার পর তাদেরকে তালাক দিয়ে আবার নতুন করে চারটি বউ ঘরে আনার ধারা চালু করে, তাহলে এটা তো আইনের অবকাশের সুযোগ গ্রহণ করাই হয়। এর পুরো দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপরই বর্তাবে, আল্লাহর শরীয়াতের ওপর নয়। অনুরূপভাবে যুদ্ধে গ্রেফতারকৃত মহিলাদেরকে যখন তাদের জাতি মুসলিম বন্দীদের বিনিময়ে ফিরিয়ে নিতে অথবা মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে এগিয়ে আসে না তখন ইসলামী শরীয়াত তাদেরকে বাঁদী হিসেবে গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছে। তাদেরকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যেসব ব্যক্তির মালিকানায় দিয়ে দেয়া হয় তাদের ঐ সব মহিলার সাথে সংগম করার অধিকার দিয়েছে। এর ফলে তাদের অস্তিত্ব সমাজে নৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না। তারপর যেহেতু বিভিন্ন যুদ্ধে গ্রেফতার হয়ে আসা লোকদের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা থাকতে পারে না, তাই আইনগতভাবে এক ব্যক্তি একই সংগে ক'জন গোলাম বা বাঁদী রাখতে পারে, এরও কোন সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। গোলাম ও বাঁদীদের বেচাকেনাও এ জন্য বৈধ রাখা হয়েছে যে, যদি কোন গোলাম বা বাঁদীর তার মালিকের সাথে বনিবনা না হয় তাহলে সে অন্য মালিকের অধীনে চলে যেতে পারবে এবং এক ব্যক্তির চিরন্তন মালিকানা মালিক ও অধীনস্থ উভয়ের জন্য আযাবে পরিণত হবে না। শরীয়াত এ সমস্ত নিয়ম ও বিধান তৈরি করেছিল মানুষের অবস্থা ও প্রয়োজন সামনে রেখে তার সুবিধার জন্য। যদি ধনী লোকেরা একে বিলাসিতার মাধ্যমে পরিণত করে নিয়ে থাকে তাহলে এ জন্য শরীয়াত নয়, তারাই অভিযুক্ত হবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ
اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا
طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ
يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْىٖ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْىٖ مِنَ الْحَقِّ
وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ
لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَآ اَنْ
تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ﴿٥٣﴾
اِنْ تُبْدُوْا شَيْـًٔا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ﴿٥٤﴾

৭ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! নবী গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না,[৯৫] খাবার সময়ের অপেক্ষায়ও থেকো না। হাঁ যদি তোমাদের খাবার জন্য ডাকা হয়, তাহলে অবশ্যই এসো[৯৬] কিন্তু খাওয়া হয়ে গেলে চলে যাও, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না।[৯৭] তোমাদের এসব আচরণ নবীকে কষ্ট দেয় কিন্তু তিনি লজ্জায় কিছু বলেন না এবং আল্লাহ হককথা বলতে লজ্জা করেন না। নবীর স্ত্রীদের কাছে যদি তোমাদের কিছু চাইতে হয় তাহলে পর্দার পেছন থেকে চাও। এটা তোমাদের এবং তাদের মনের পবিত্রতার জন্য বেশী উপযোগী।[৯৮] তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়া মোটেই জায়েয নয়[৯৯] এবং তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীদেরকে বিয়ে করাও জায়েয নয়,[১০০] এটা আল্লাহর দৃষ্টিতে মস্তবড় গোনাহ। তোমরা কোন কথা প্রকাশ বা গোপন করো আল্লাহ সবকিছুই জানেন।[১০১]

৯৫. প্রায় এক বছর পরে সূরা নূরে যে সাধারণ হুকুম দেয়া হয় এটা তার ভূমিকা স্বরূপ। প্রাচীন যুগে আরবের লোকেরা নিসংকোচে একজন অন্যজনের ঘরে ঢুকে পড়তো। কেউ যদি কারো সাথে দেখা করতে চাইতো তাহলে দরোজায় দাঁড়িয়ে ডাকার বা অনুমতি নিয়ে ভেতরে যাবার নিয়ম ছিল না। বরং ভেতরে গিয়ে গৃহকর্তা গৃহে আছে কি নেই স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কাছে জিজ্ঞেস করে তা জানতে চাইতো। এ জাহেলী পদ্ধতি বহু ক্ষতির

কারণ হয়ে পড়েছিল। অনেক সময় বহু নৈতিক অপকর্মেরও সূচনা এখান থেকে হতো। তাই প্রথমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহে এ নিয়ম জারী করা হয় যে, কোন নিকটতম বন্ধু বা দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজন হলেও বিনা অনুমতিতে তাঁর গৃহে প্রবেশ করতে পারবে না। তারপর সূরা নূরে এ নিয়মটি সমস্ত মুসলমানের গৃহে জারী করার সাধারণ হুকুম দিয়ে দেয়া হয়।

৯৬. এ প্রসংগে এটা দ্বিতীয় হুকুম। আরববাসীদের মধ্যে যেসব সভ্যতা বিবর্জিত আচরণের প্রচলন ছিল তার মধ্যে একটি এও ছিল যে, কোন বন্ধু বা পরিচিত লোকের গৃহে তারা পৌঁছে যেতো ঠিক খাবার সময় তাক করে। অথবা তার গৃহে এসে বসে থাকতো এমনকি খাবার সময় এসে যেতো। এহেন আচরণে গৃহকর্তা অধিকাংশ সময় বেকায়দায় পড়ে যেতো। মুখ ফুটে যদি বলে এখন আমার খাবার সময়, মেহেরবানী করে চলে যান, তাহলে বড়ই অসভ্যতা ও রুঢ়তার প্রকাশ হয়। আর যদি খাওয়ায়, তাহলে হঠাৎ আগত কতজনকে খাওয়াবে। যখনই যতজন লোকই আসুক সবসময় সংগে সংগেই তাদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করার মতো সামর্থ সবাই রাখে না। আল্লাহ এ অভদ্র আচরণ করতে তাদেরকে নিষেধ করেন এবং হুকুম দেন, কোন ব্যক্তির গৃহে খাওয়ার জন্য তখনই যেতে হবে যখন গৃহকর্তা খাওয়ার দাওয়াত দেবে। এ হুকুম শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না বরং সেই আদর্শগৃহে এ নিয়ম এ জন্যই জারী করা হয়েছিল যেন তা মুসলমানদের সাধারণ সাংস্কৃতিক জীবনের নিয়মে ও বিধানে পরিণত হয়ে যায়।

৯৭. এটি আরো একটি অসভ্য আচরণ সংশোধনের ব্যবস্থা। কোন কোন লোক খাওয়ার দাওয়াতে এসে খাওয়া দাওয়া সেরে এমনভাবে ধরণা দিয়ে বসে চুটিয়ে আলাপ জুড়ে দেয় যে, আর উঠবার নামটি নেই, মনে হয় এ আলাপ আর শেষ হবে না। গৃহকর্তা ও গৃহবাসীদের এতে কি অসুবিধা হচ্ছে তার কোন পরোয়াই তারা করে না। ভদ্রতা জ্ঞান বিবর্জিত লোকেরা তাদের এ আচরণের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও কষ্ট দিতে থাকতো এবং তিনি নিজের ভদ্র ও উদার স্বভাবের কারণে এসব বরদাশ্‌ত করতেন। শেষে হযরত যয়নবের ওলিমার দিন এ কষ্টদায়ক আচরণ সীমা ছাড়িয়ে যায়। নবী করীমের (সা) বিশেষ খাদেম হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ রাতের বেলা ছিল ওলিমার দাওয়াত। সাধারণ লোকেরা খাওয়া শেষ করে বিদায় নিয়েছিল। কিন্তু দু' তিনজন লোক বসে কথাবার্তায় মশগুল হয়ে গিয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরক্ত হয়ে উঠলেন এবং পবিত্র স্ত্রীদের ওখান থেকে এক চক্কর দিয়ে এলেন। ফিরে এসে দেখলেন তাঁরা যথারীতি বসেই আছেন। তিনি আবার ফিরে গেলেন এবং হযরত আয়েশার কামরায় বসলেন। অনেকটা রাত অতিবাহিত হয়ে যাবার পর যখন তিনি জানলেন তাঁরা চলে গেছেন তখন তিনি হযরত যয়নবের (রা) কক্ষে গেলেন। এরপর এ বদ অভ্যাসগুলো সম্পর্কে লোকদেরকে সতর্ক করে দেয়া স্বয়ং আল্লাহর জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়লো। হযরত আনাসের (রা) রেওয়ায়াত অনুযায়ী এ আয়াত সে সময়ই নাযিল হয়। (মুসলিম, নাসাঈ ও ইবনে জারীর)

৯৮. এ আয়াতকেই হিজাব বা পর্দার আয়াত বলা হয়। বুখারীতে হযরত আনাস ইবনে মালেকের (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে, হযরত উমর (রা) এ আয়াতটি নাযিল হবার

পূর্বে কয়েকবার নবী করীমের (সা) কাছে নিবেদন করেছিলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনার এখানে ভালোমন্দ সবরকম লোক আসে। আহা, যদি আপনি আপনার পবিত্র স্ত্রীদেরকে পর্দা করার হুকুম দিতেন। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, একবার হযরত উমর (রা) নবী করীমের (সা) স্ত্রীদের বলেন ঃ "যদি আপনাদের ব্যাপারে আমার কথা মেনে নেয়া হয় তাহলে আমার চোখ কখনোই আপনাদের দেখবে না।" কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু আইন রচনার ক্ষেত্রে স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না, তাই তিনি আল্লাহর ইশারার অপেক্ষায় ছিলেন। শেষ পর্যন্ত এ হুকুম এসে গেলো যে, মাহরাম পুরুষরা ছাড়া (যেমন সামনের দিকে ৫৫ আয়াতে আসছে) অন্য কোন পুরুষ নবী করীমের (সা) গৃহে প্রবেশ করবে না। আর সেখানে মহিলাদের কাছে যারই কিছু কাজের প্রয়োজন হবে তাকে পর্দার পেছনে থেকেই কথা বলতে হবে। এ হুকুমের পরে পবিত্র স্ত্রীদের গৃহে দরোজার ওপর পর্দা লটকে দেয়া হয় এবং যেহেতু নবী করীমের (সা) গৃহ সকল মুসলমানের জন্য আদর্শগৃহ ছিল তাই সকল মুসলমানের গৃহের দরোজায়ও পর্দা ঝোলানো হয়। আয়াতের শেষ অংশ নিজেই এদিকে ইংগিত করছে যে, যারাই পুরুষ ও নারীদের মন পাক-পবিত্র রাখতে চায় তাদেরকে অবশ্যই এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

এখন যে ব্যক্তিকেই আল্লাহ দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন সে নিজেই দেখতে পারে, যে কিতাবটি নারী পুরুষকে সামনা সামনি কথা বলতে বাধা দেয় এবং পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলার কারণ স্বরূপ একথা বলে যে, "তোমাদের ও তাদের অন্তরের পবিত্রতার জন্য এ পদ্ধতিটি বেশী উপযোগী", তার মধ্যে কেমন করে এ অভিনব প্রাণপ্রবাহ সঞ্চার করা যেতে পারে, যার ফলে নারী-পুরুষের মিশ্র সভা-সমিতি ও সহশিক্ষা এবং গণপ্রতিষ্ঠান ও অফিসসমূহে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা একেবারেই বৈধ হয়ে যাবে এবং এর ফলে মনের পবিত্রতা মোটেই প্রভাবিত হবে না? কেউ যদি কুরআনের বিধান অনুসরণ করতে না চায়, তাহলে সে তার বিরুদ্ধাচরণ করুক এবং পরিষ্কার বলে দিক আমি এর অনুসরণ করতে চাই না, এটিই তার জন্য অধিক যুক্তিসংগত পদ্ধতি। কিন্তু কুরআনের সুস্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং তারপর আবার বেহায়ার মতো বুক ফুলিয়ে বলবে, এটি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা যা আমি উদ্ভাবন করে নিয়ে এসেছি—এটি বড়ই হীন আচরণ। কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে কোন্ জায়গা থেকে তারা ইসলামের এ তথাকথিত শিক্ষা খুঁজে পেলেন?

৯৯. সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যেসব অপবাদ ছড়ানো হচ্ছিল এবং কাফের ও মুনাফেকদের সাথে সাথে অনেক দুর্বল ঈমানদার মুসলমানও তাতে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন, এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে।

১০০. সূরার শুরুতে "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ হচ্ছেন মু'মিনগণের মা" বলে যে বক্তব্য উপস্থাপন হয়েছে এ হচ্ছে তার ব্যাখ্যা।

১০১. অর্থাৎ নবী করীমের (সা) বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি যদি অন্তরেও কোন খারাপ ধারণা পোষণ করে অথবা তাঁর স্ত্রীদের সম্পর্কে কারো নিয়তের মধ্যে কোন অসততা প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে তা গোপন থাকবে না এবং এ জন্যে সে শাস্তি পাবে।

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ
اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ۝۵۵
اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰۗىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَي النَّبِيِّ ۭ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝۵۶

নবীর স্ত্রীদের গৃহে তাদের বাপ, ছেলে, ভাই-ভাতিজা, ভাগ্না[১০২] সাধারণ মেলামেশার মহিলারা[১০৩] এবং তাদের মালিকানাধীন দাসদাসীরা[১০৪] এলে কোন ক্ষতি নেই। (হে নারীগণ!) তোমাদের আল্লাহর নাফরমানি থেকে দূরে থাকা উচিত। আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।[১০৫]

আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশ্‌তাগণ নবীর প্রতি দরূদ পাঠান।[১০৬] হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠাও।[১০৭]

১০২. ব্যাখ্যার জন্য সূরা নূরের তাফসীরের ৩৮ থেকে ৪২ পর্যন্ত টীকা দেখুন। এ প্রসংগে আল্লামা আলূসীর এ ব্যাখ্যাও উল্লেখযোগ্য যে, ভাই, ভাতিজা ও ভাগ্নাদের বিধানের মধ্যে এমন সব আত্মীয়রাও এসে যায় যারা একজন মহিলার জন্য হারাম—তারা রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয় বা দুধ সম্পর্কিত যাই হোক না কেন। এ তালিকায় চাচা ও মামার উল্লেখ করা হয়নি। কারণ তারা নারীর জন্য পিতার সমান। অথবা তাদের উল্লেখ না করার কারণ হচ্ছে এই যে, ভাতিজা ও ভাগ্নার কথা এসে যাবার পর তাদের কথা বলার প্রয়োজন নেই। কেননা ভাতিজা ও ভাগ্নাকে পর্দা না করার পেছনে যে কারণ রয়েছে চাচা ও মামাকে পর্দা না করার কারণও তাই। (রুহুল মা'আনী)

১০৩. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা নূরের তাফসীর ৪৩ টীকা।

১০৪. ব্যাখ্যার জন্য সূরা নূরের তাফসীরের ৪৪ টীকা দেখুন।

১০৫. একথার অর্থ হচ্ছে, এ চূড়ান্ত হুকুম এসে যাবার পর ভবিষ্যতে এমন কোন ব্যক্তিকে বেপর্দা অবস্থায় গৃহে প্রবেশের অনুমতি দেয়া যাবে না যে ঐ ব্যতিক্রমী আত্মীয়দের গণ্ডীর বাইরে অবস্থান করে। দ্বিতীয় অর্থ এও হয় যে, স্ত্রীদের কখনো এমন নীতি অবলম্বন করা উচিত নয় যার ফলে স্বামীর উপস্থিতিতে তারা পর্দার নিয়ন্ত্রণ মেনে চলবে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে গায়ের মাহরাম পুরুষদের সামনে পর্দা উঠিয়ে দেবে। তাদের এ কর্ম স্বামীর দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না।

১০৬. আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীর প্রতি দরূদের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ নবীর প্রতি সীমাহীন করুণার অধিকারী। তিনি তাঁর প্রশংসা করেন। তাঁর কাজে বরকত দেন। তাঁর নাম বুলন্দ করেন। তাঁর প্রতি নিজের রহমতের বারি বর্ষণ করেন। ফেরেশ্‌তাদের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি দরূদের অর্থ হচ্ছে, তাঁরা তাঁকে চরমভাবে ভালোবাসেন এবং তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, আল্লাহ যেন তাঁকে সর্বাধিক উচ্চ মর্যাদা দান করেন, তাঁর শরীয়াতকে প্রসার ও বিস্তৃতি দান করেন এবং তাঁকে মাকামে মাহমুদ তথা সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থানে পৌঁছিয়ে দেন। পূর্বাপর বিষয়বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দিলে এ বর্ণনা পরম্পরায় একথা কেন বলা হয়েছে তা পরিষ্কার অনুভব করা যায়। তখন এমন একটি সময় ছিল যখন ইসলামের দুশমনরা এ সুস্পষ্ট জীবন ব্যবস্থার বিস্তার ও সম্প্রসারণের ফলে নিজেদের মনের আক্রোশ প্রকাশের জন্য নবী করীমের (সা) বিরুদ্ধে একের পর এক অপবাদ দিয়ে চলছিল এবং তারা নিজেরা একথা মনে করছিল যে, এভাবে কাঁদা ছিটিয়ে তারা তাঁর নৈতিক প্রভাব নির্মূল করে দেবে। অথচ এ নৈতিক প্রভাবের ফলে ইসলাম ও মুসলমানরা দিনের পর দিন এগিয়ে চলছিল। এ অবস্থায় আলোচ্য আয়াত নাযিল করে আল্লাহ দুনিয়াকে একথা জানিয়ে দেন যে, কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকরা আমার নবীর দুর্নাম রটাবার এবং তাঁকে অপদস্ত করার যতই প্রচেষ্টা চালাক না কেন শেষ পর্যন্ত তারা ব্যর্থ হবে। কারণ আমি তাঁর প্রতি মেহেরবান এবং সমগ্র বিশ্ব-জাহানের আইন ও শৃংখলা ব্যবস্থা যেসব ফেরেশ্‌তার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে তারা সবাই তাঁর সহায়ক ও প্রশংসাকারী। আমি যেখানে তাঁর নাম বুলন্দ করছি। এবং আমার ফেরেশতারা তাঁর প্রশংসাবলীর আলোচনা করছে সেখানে তাঁর নিন্দাবাদ করে তারা কি লাভ করতে পারে? আমার রহমত ও বরকত তাঁর সহযোগী এবং আমার ফেরেশতারা দিনরাত দোয়া করছে, হে রব্বুল আলামীন! মুহাম্মাদের (সা) মর্যাদা আরো বেশী উঁচু করে দাও এবং তাঁর দীনকে আরো বেশী প্রসারিত ও বিকশিত করো। এ অবস্থায় তারা তাদের বাজে অস্ত্রের সাহায্যে তাঁর কি ক্ষতি করতে পারে?

১০৭. অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছে, হে লোকেরা! মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহর বদৌলতে তোমরা যারা সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছো তারা তাঁর মর্যাদা অনুধাবন করো এবং তাঁর মহা অনুগ্রহের হক আদায় করো। তোমরা মূর্খতার অন্ধকারে পথ ভুলে বিপথে চলছিলে, এ ব্যক্তি তোমাদের জ্ঞানের আলোক বর্তিকা দান করেছেন। তোমরা নৈতিক অধপতনের মধ্যে ডুবেছিলে, এ ব্যক্তি তোমাদের সেখান থেকে উঠিয়েছেন এবং তোমাদের মধ্যে এমন যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার ফলে আজ মানুষ তোমাদেরকে ঈর্ষা করে। তোমরা বর্বর ও পাশবিক জীবন যাপন করছিলে, এ ব্যক্তি তোমাদের সর্বোত্তম মানবিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাজে সুসজ্জিত করেছেন। তিনি তোমাদের ওপর এসব অনুগ্রহ করেছেন বলেই দুনিয়ার কাফের ও মুশরিকরা এ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আক্রোশে ফেটে পড়ছে। নয়তো দেখো, তিনি কারো সাথে ব্যক্তিগতভাবে কোন দুর্ব্যবহার করেননি। তাই এখনি তোমাদের কৃতজ্ঞতার অনিবার্য দাবী হচ্ছে এই যে, তারা এ আপাদমস্তক কল্যাণ ব্রতী ব্যক্তিত্বের প্রতি যে পরিমাণ হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করে ঠিক একই পরিমাণ বরং তার চেয়ে বেশী ভালোবাসা তোমরা তাঁর প্রতি পোষণ করো। তারা তাঁকে যে পরিমাণ ঘৃণা করে ঠিক ততটাই বরং তার চেয়ে বেশীই তোমরা তাঁর প্রতি অনুরক্ত হবে। তারা তাঁর যতটা নিন্দা করে ঠিক ততটাই বরং তার চেয়ে বেশী তোমরা তাঁর প্রশংসা করো। তারা তাঁর যতটা

অশুভাকাংখী হয় তোমরা তাঁর ঠিক ততটাই বরং তার চেয়ে বেশী শুভাকাংখী হয়ে যাও এবং তাঁর পক্ষে সেই একই দোয়া করো যা আল্লাহর ফেরেশতারা দিনরাত তাঁর জন্য করে যাচ্ছে, হে দোজাহানের রব! তোমার নবী যেমন আমাদের প্রতি বিপুল অনুগ্রহ করেছেন তেমনি তুমিও তাঁর প্রতি অসীম ও অগণিত রহমত বর্ষণ করো, তাঁর মর্যাদা দুনিয়াতেও সবচেয়ে বেশী উন্নত করো এবং আখেরাতেও তাঁকে সকল নৈকট্যলাভকারীদের চাইতেও বেশী নৈকট্য দান করো।

এ আয়াতে মুসলমানদেরকে দু'টো জিনিসের হুকুম দেয়া হয়েছে। একটি হচ্ছে, "সাল্লু আলাইহে" অর্থাৎ তাঁর প্রতি দরূদ পড়ো। অন্যটি হচ্ছে, "ওয়া সাল্লিমূ তাসলীমা" অর্থাৎ তাঁর প্রতি সালাম ও প্রশান্তি পাঠাও।

"সালাত" শব্দটি যখন "আলা" অব্যয় সহকারে বলা হয় তখন এর তিনটি অর্থ হয় ঃ এক, কারো অনুরক্ত হয়ে পড়া, ভালোবাসা সহকারে তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং তার প্রতি ঝুঁকে পড়া। দুই, কারো প্রশংসা করা। তিন, কারো পক্ষে দোয়া করা। এ শব্দটি যখন আল্লাহর জন্য বলা হবে তখন একথা সুস্পষ্ট যে, তৃতীয় অর্থটির জন্য এটি বলা হবে না। কারণ আল্লাহর অন্য কারো কাছে দোয়া করার ব্যাপারটি একেবারেই অকল্পনীয়। তাই সেখানে অবশ্যই তা হবে শুধুমাত্র প্রথম দু'টি অর্থের জন্য। কিন্তু যখন এ শব্দ বান্দাদের তথা মানুষ ও ফেরেশ্‌তাদের জন্য বলা হবে তখন তা তিনটি অর্থেই বলা হবে। তার মধ্যে ভালোবাসার অর্থও থাকবে, প্রশংসার অর্থও থাকবে এবং দোয়া ও রহমতের অর্থও থাকবে। কাজেই মু'মিনদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে "সাল্লু আলাইহে"–এর হুকুম দেয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে, তোমরা তাঁর ভক্ত–অনুরক্ত হয়ে যাও তাঁর প্রশংসা করো এবং তাঁর জন্য দোয়া করো।

"সালাম" শব্দেরও দু'টি অর্থ হয়। এক সবরকমের আপদ বিপদ ও অভাব অনটন মুক্ত থাকা। এর প্রতিশব্দ হিসেবে আমাদের এখানে সালামতি বা নিরাপত্তা শব্দের ব্যবহার আছে, দুই, শান্তি, সন্ধি ও অবিরোধিতা। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে "সাল্লিমূ তাসলিমা" বলার একটি অর্থ হচ্ছে, তোমরা তাঁর জন্য পূর্ণ নিরাপত্তার দোয়া করো। আর এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমরা পুরোপুরি মনে প্রাণে তাঁর সাথে সহযোগিতা করো, তাঁর বিরোধিতা করা থেকে দূরে থাকো এবং তাঁর যথার্থ আদেশ পালনকারীতে পরিণত হও।

এ হুকুমটি নাযিল হবার পর বহু সাহাবী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! সালামের পদ্ধতি তো আপনি আমাদের বলে দিয়েছেন। (অর্থাৎ নামাযে "আস্‌সালামু আলাইকা আইয়ুহান্ নাবীয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ" এবং দেখা সাক্ষাত হলে "আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রসূলুল্লাহ" বলা।) কিন্তু আপনার প্রতি সালাত পাঠাবার পদ্ধতিটা কি? এর জবাবে নবী করীম (সা) বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন সময় যেসব দরূদ শিখিয়েছেন তা আমি নীচে উদ্ধৃত করছি ঃ

কা'ব ইবনে 'উজ্‌রাহ (রা) থেকে ঃ

اللّٰهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال

ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد –

এ দরূদটি সামান্য শাব্দিক বিভিন্নতা সহকারে হযরত কা'ব ইবনে উজ্‌রাহ (রা) থেকে বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে ইমাম আহমাদ, ইবনে আবী শাইবাহ, আবদুর রাজ্জাক, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জারীরে উদ্ধৃত হয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে ঃ তাঁর থেকেও হালকা পার্থক্য সহকারে ওপরে বর্ণিত একই দরূদ উদ্ধৃত হয়েছে। (ইবনে জারীর)

আবু হুমাইদ সা'য়েদী (রা) থেকে ঃ

اللّهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد –

(মুআত্তা ইমাম মালেক, মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

আবু মাসউদ বদরী (রা) থেকে ঃ

اللّهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم فى العالمين انك حميد مجيد –

(মালেক, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আহমাদ, ইবনে জারীর, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে ঃ

اللّهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم –

(আহমাদ, বুখারী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

বুরাইদাতাল খুযাঈ থেকে ঃ

اللّهم اجعل صلوتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى ال محمد كما جعلتها على ابراهيم انك حميد مجيد –

(আহমাদ, আব্‌দ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে মারদুইয়া)

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে ঃ

اللّٰهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم ال ابراهيم فى العالمين انك حميد مجيد -

(নাসাঈ)

হযরত তাল্হা (রা) থেকে ঃ

اللّٰهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد -

(ইবনে জারীর)

এ দরূদগুলো শব্দের পার্থক্য সত্ত্বেও অর্থ সবগুলোর একই। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। এ বিষয়গুলো ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে।

প্রথমত এসবগুলোতে নবী করীম (সা) মুসলমানদেরকে বলেছেন, আমার ওপর দরূদ পাঠ করার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, তোমরা আল্লাহর কাছে এ মর্মে দোয়া করো। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের (সা) ওপর দরূদ পাঠাও। অজ্ঞ লোকেরা, যাদের অর্থজ্ঞান নেই, তারা সংগে সংগেই আপত্তি করে বসে যে, এতো বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার যে, আল্লাহ তো আমাদের বলছেন তোমরা আমার নবীর ওপর দরূদ পাঠ করো কিন্তু অপর দিকে আমরা আল্লাহকে বলছি তুমি দরূদ পাঠাও। অথচ এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে একথা বলেছেন যে, তোমরা আমার প্রতি "সালাতের" হক আদায় করতে চাইলেও করতে পারো না, তাই আল্লাহরই কাছে দোয়া চাও যেন তিনি আমার প্রতি দরূদ পাঠান। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন, আমরা নবী করীমের (সা) মর্যাদা বুলন্দ করতে পারি না। আল্লাহই বুলন্দ করতে পারেন। আমরা নবী করীমের (সা) অনুগ্রহের প্রতিদান দিতে পারি না। আল্লাহই তার প্রতিদান দিতে পারেন। আমরা নবী করীমের (সা) কথা আলোচনাকে উচ্চমাপে পৌঁছাবার এবং তাঁর দীনকে সম্প্রসারিত করার জন্য যতই প্রচেষ্টা চালাই না কেন আল্লাহর মেহেরবানী এবং তাঁর সুযোগ ও সহায়তা দান ছাড়া তাতে কোন প্রকার সাফল্য অর্জন করতে পারি না। এমন কি নবী করীমের (সা) প্রতি ভক্তি-ভালোবাসাও আমাদের অন্তরে আল্লাহরই সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অন্যথায় শয়তান নাজানি কতরকম প্ররোচনা দিয়ে আমাদের তাঁর প্রতি বিরূপ করে তুলতে পারে। اعاذنا الله من ذلك —আল্লাহ আমাদের তা থেকে বাঁচান। কাজেই নবী করীমের (সা) ওপর দরূদের হক আদায় করার জন্য আল্লাহর কাছে তাঁর প্রতি সালাত বা দরূদের দোয়া করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। যে ব্যক্তি "আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন" বলে সে যেন আল্লাহর সমীপে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করতে

গিয়ে বলে, হে আল্লাহ! তোমার নবীর ওপর সালাত বা দরূদ পাঠানোর যে কর্তব্য আমার ওপর চাপানো আছে তা যথাযথভাবে সম্পন্ন করার সামর্থ আমার নেই, আমার পক্ষ থেকে তুমিই তা সম্পন্ন করে দাও এবং তা করার জন্য আমাকে যেভাবে কাজে নিয়োগ করতে হয় তা তুমি নিয়োগ করো।

দ্বিতীয়ত নবী করীমের (সা) ভদ্রতা ও মহানুভবতার ফলে তিনি কেবল নিজেকেই এ দোয়ার জন্য নির্দিষ্ট করে নেননি। বরং নিজের সাথে তিনি নিজের পরিজন স্ত্রী ও পরিবারকেও শামিল করে নিয়েছেন। স্ত্রী ও পরিবার অর্থ সুস্পষ্ট আর পরিজন শব্দটি নিছক নবী করীমের (সা) পরিবারের লোকদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। বরং এর মধ্যে এমনসব লোকও এসে যায় যারা তাঁর অনুসারী এবং তাঁর পথে চলেন। পরিজন অর্থে মূলে "আল" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষার দৃষ্টিতে "আল" ও "আহল"–এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, কোন ব্যক্তির "আল" হচ্ছে এমন সব লোক যারা হয় তার সাথি, সাহায্যকারী ও অনুসারী, তারা তার আত্মীয় বা অনাত্মীয় হোক বা না হোক আর কোন ব্যক্তির "আহ্ল" হচ্ছে এমনসব লোক যারা তার সাথি ও অনুসারী হোক বা নাহোক অবশ্যই তার আত্মীয়। কুরআন মজীদের ১৪টি স্থানে "আলে ফেরাউন" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে কোন জায়গায়ও "আহল" মানে ফেরাউনের পরিবারের লোকেরা নয়। বরং এমন সমস্ত লোক যারা হযরত মূসার মোকাবিলায় ফেরাউনের সমর্থক ও সহযোগী ছিল। (দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন সূরা বাকারার ৪৯–৫০, আলে 'ইমরানের ১১, আল আ'রাফের ১৩০ ও আল মু'মিনূনের ৪৬ আয়াতসমূহ) কাজেই এমন সমস্ত লোকই "আলে" মুহাম্মাদ (সা)–এর বহির্ভূত হয়ে যায় যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের অনুসারী নয়। চাই, তারা নবীর পরিবারের লোকই হোক না কেন। পক্ষান্তরে এমন সমস্ত লোকও এর অন্তরভুক্ত হয়ে যায় যারা নবী করীমের (সা) পদাংক অনুসরণ করে চলে, চাই তারা নবী করীমের (সা) কোন দূরবর্তী রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয় নাই হোক। তবে নবী পরিবারের এমন প্রত্যেকটি লোক সর্বতোভাবেই 'আলে' মুহাম্মাদের (সা) অন্তরভুক্ত হবে যারা তাঁর সাথে রক্ত সম্পর্কও রাখে আবার তাঁর অনুসারীও।

তৃতীয় তিনি যেসব দরূদ শিখিয়েছেন তার প্রত্যেকটিতেই অবশ্যই একথা রয়েছে যে, তাঁর প্রতি এমন অনুগ্রহ করা হোক যা ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিজনদের ওপর করা হয়েছিল। এ বিষয়টি বুঝতে লোকদের বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আলেমগণ এর বিভিন্ন জটিল ব্যাখ্যা (তাবীল) করেছেন। কিন্তু কোন একটি ব্যাখ্যাও ঠিকমতো গ্রহণীয় নয়। আমার মতে এর সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, (অবশ্য আল্লাহই সঠিক জানেন) আল্লাহ হযরত ইবরাহীমের প্রতি একটি বিশেষ করুণা করেন। আজ পর্যন্ত কারো প্রতি এ ধরনের করুণা প্রদর্শন করেননি। আর তা হচ্ছে এই যে, যারা নবুওয়াত, অহী ও কিতাবকে হিদায়াতের উৎস বলে মেনে নেয় তারা সবাই হযরত ইবরাহীমের (আ) নেতৃত্বের প্রশ্নে একমত। এ ব্যাপারে মুসলমান, খৃষ্টান ও ইহুদির মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে এই যে, যেভাবে হযরত ইবরাহীমকে মহান আল্লাহ সমস্ত নবীর অনুসারীদের নেতায় পরিণত করেছেন। অনুরূপভাবে আমাকেও পরিণত করুন। এমন কোন ব্যক্তি যে নবুওয়াত মেনে নিয়েছে সে যেন আমার নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনা থেকে বঞ্চিত না হয়।

নবী করীমের (সা) প্রতি দরূদ পড়া ইসলামের সুন্নাত। তাঁর নাম উচ্চারিত হলে তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব। বিশেষ করে নামাযে দরূদ পড়া সুন্নাত। এ বিষয়ে সমগ্র আলেম সমাজ একমত। সমগ্র জীবনে নবী (সা)–এর প্রতি একবার দরূদ পড়া ফরয, এ ব্যাপারে 'ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে। কারণ আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এর হুকুম দিয়েছেন। কিন্তু এরপর দরূদের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে বিভিন্ন মত দেখা দিয়েছে।

ইমাম শায়েঈ (র) বলেন, নামাযে একজন মুসল্লী যখন শেষ বার তাশাহ্হুদ পড়ে তখন সেখানে সালাতুন আলান নবী (صلوةعلى النبى) পড়া ফরয। কোন ব্যক্তি এভাবে না পড়লে তার নামায হবে না। সাহাবীগণের মধ্য থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ও হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা), তাবেঈদের মধ্য থেকে শা'বী, ইমাম মুহাম্মাদ বাকের, মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরযী ও মুকাতিল ইবনে হাইয়ান এবং ফকীহগণের মধ্য থেকে ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াইহও এ মতের প্রবক্তা ছিলেন। শেষের দিকে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলও এ মত অবলম্বন করেন।

ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম মালেক (র) ও অধিকাংশ উলামা এ মত পোষণ করেন যে, দরূদ সারা জীবনে শুধুমাত্র একবার পড়া ফরয। এটি কালেমায়ে শাহাদাতের মতো। যে ব্যক্তি একবার আল্লাহকে ইলাহ বলে মেনে নিয়েছে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের স্বীকৃতি দিয়েছে সে ফরয আদায় করে দিয়েছে। অনুরূপভাবে যে একবার দরূদ পড়ে নিয়েছে সে নবীর ওপর সালাত পাঠ করার ফরয আদায়ের দায়িত্ব মুক্ত হয়ে গেছে। এরপর তার ওপর আর কালেমা পড়া ফরয নয় এবং দরূদ পড়াও ফরয নয়।

একটি দল নামাযে দরূদ পড়াকে সকল অবস্থায় ওয়াজিব গণ্য করেন। কিন্তু তাঁরা তাশাহ্হুদের সাথে তাকে শৃংখলিত করেন না।

অন্য একটি দলের মতে প্রত্যেক দোয়ায় দরূদ পড়া ওয়াজিব। আরো কিছু লোক নবী করীমের (সা) নাম এলে দরূদ পড়া ওয়াজিব বলে অভিমত পোষণ করেন। অন্য একটি দলের মতে এক মজলিসে নবী করীমের (সা) নাম যতবারই আসুক না কেন দরূদ পড়া কেবলমাত্র একবারই ওয়াজিব।

কেবলমাত্র ওয়াজিব হবার ব্যাপারে এ মতবিরোধ। তবে দরূদের ফযীলত, তা পাঠ করলে প্রতিদান ও সওয়াব পাওয়া এবং তার একটি অনেক বড় সৎকাজ হবার ব্যাপারে তো সমস্ত মুসলিম উম্মাত একমত। যে ব্যক্তি ঈমানের সামান্যতম স্পর্শও লাভ করেছে তার এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না। এমন প্রত্যেকটি মুসলমানের অন্তর থেকেই তো স্বাভাবিকভাবে দরূদ বের হবে যার মধ্যে এ অনুভূতি থাকবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পরে আমাদের প্রতি সবচেয়ে বড় অনুগ্রহকারী। মানুষের দিলে ঈমান ও ইসলামের মর্যাদা যত বেশী হবে তত বেশী মর্যাদা হবে তার দিলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগ্রহেরও। আর মানুষ যত বেশী এ অনুগ্রহের কদর করতে শিখবে তত বেশীই সে নবী করীমের (সা) ওপর দরূদ পাঠ করবে। কাজেই বেশী বেশী দরূদ পড়া হচ্ছে একটি মাপকাঠি। এটি পরিমাপ করে জানিয়ে দেয়

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীনের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কতটা গভীর এবং ঈমানের নিয়ামতের কতটা কদর তার অন্তরে আছে। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

من صلى على صلواة لم تزل الملائكة تصلى عليه ما صلى على

"যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে ফেরেশ্তারা তার প্রতি দরূদ পাঠ করে যতক্ষণ সে দরূদ পাঠ করতে থাকে।" (আহমাদ ও ইবনে মাজাহ)

من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرا

"যে আমার ওপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার ওপর দশবার দরূদ পড়েন।" (মুসলিম)

اولى الناس بى يوم القيامة اكثرهم على صلواة (ترمذى)

"কিয়ামতের দিন আমার সাথে থাকার সবচেয়ে বেশী হকদার হবে সেই ব্যক্তি যে আমার ওপর সবচেয়ে বেশী দরূদ পড়বে।" (তিরমিযী)

البخيل الذى ذكرت عنده فلم يصل على (ترمذى)

"আমার কথা যে ব্যক্তির সামনে আলোচনা করা হয় এবং সে আমার ওপর দরূদ পাঠ করে না সে কৃপণ।" (তিরমিযী)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্যের জন্য اللهم صل على فلان অথবা صلى الله عليه وسلم কিংবা এ ধরনের অন্য শব্দ সহকারে 'সালাত' পেশ করা জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। একটি দল, কাযী ইয়াযের নাম এ দলের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, একে সাধারণভাবে জায়েয মনে করে। এদের যুক্তি হচ্ছে, কুরআনে আল্লাহ নিজেই অ-নবীদের ওপর একাধিক জায়গায় সালাতের কথা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। যেমন,

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ (البقره : ١٥٧)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

(التوبه : ١٠٣)

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ (الاحزاب : ٤٣)

এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও একাধিকবার অ-নবীদের জন্য সালাত শব্দ সহকারে দোয়া করেন। যেমন একজন সাহাবীর জন্য তিনি দোয়া করেন اللهم صل على ال ابى اوفى (হে আল্লাহ! আবু আওফার পরিজনদের ওপর সালাত পাঠাও) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর (রা) স্ত্রীর আবেদনের জবাবে বলেন, صلى الله

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদেরকে আল্লাহ দুনিয়ায় ও আখেরাতে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক আযাবের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।[১০৮] আর যারা মু'মিন পুরুষ ও মহিলাদেরকে কোন অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দেয় তারা একটি বড় অপবাদ[১০৯] ও সুস্পষ্ট গোনাহর বোঝা নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েছে।

عليك وعلى زوجك (আল্লাহ তোমার ও তোমার স্বামীর ওপর সালাত পাঠান)। যারা যাকাত নিয়ে আসতেন তাদের পক্ষে তিনি বলতেন, اللهم صل عليهم (হে আল্লাহ ওদের ওপর সালাত পাঠাও)। হযরত সা'দ ইবনে উবাদার পক্ষে তিনি বলেন, اللهم اجعل صلوتك ورحمتك على ال سعد بن عباده (হে আল্লাহ! সা'দ ইবনে উবাদার (রা) পরিজনদের ওপর তোমার সালাত ও রহমত পাঠাও)। আবার মু'মিনের রূহ সম্পর্কে নবী করীম (সা) খবর দিয়েছেন যে, ফেরেশ্‌তারা তার জন্য দোয়া করে ঃ صلى الله عليك وعلى جسدك কিন্তু মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশের মতে এমনটি করা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য তো সঠিক ছিল কিন্তু আমাদের জন্য সঠিক নয়। তারা বলেন, সালাত ও সালামকে মুসলমানরা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। এটি বর্তমানে তাদের ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। তাই নবীদের ছাড়া অন্যদের জন্য এগুলো ব্যবহার না করা উচিত। এ জন্যই হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয একবার নিজের একজন শাসনকর্তাকে লিখেছিলেন, "আমি শুনেছি কিছু বক্তা এ নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করতে শুরু করেছেন যে, তাঁরা 'সালাতু আলান নাবী'–এর মতো নিজেদের পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারীদের জন্যও "সালাত" শব্দ ব্যবহার করছেন। আমার এ পত্র পৌঁছে যাবার পরপরই তাদেরকে এ কাজ থেকে নিরস্ত করো এবং সালাতকে একমাত্র নবীদের জন্য নির্দিষ্ট করে অন্য মুসলমানদের জন্য দোয়া করেই ক্ষান্ত হবার নির্দেশ দাও।" (রূহুল মা'আনী) অধিকাংশ আলেম এ মতও পোষণ করেন যে, নবী করীম (সা) ছাড়া অন্য কোন নবীর জন্যও "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম" ব্যবহার করা সঠিক নয়।

১০৮. আল্লাহকে কষ্ট দেবার অর্থ হয় দু'টি জিনিস। এক, তাঁর নাফরমানি করা। তাঁর মোকাবিলায় কুফরী, শিরক ও নাস্তিক্যবাদের পথ অবলম্বন করা। তিনি যা হারাম করেছেন তাকে হালাল করা। দুই, তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়া কারণ রসূলের আনুগত্য যেমন আল্লাহর আনুগত্য ঠিক তেমনি রসূলের নিন্দাবাদ আল্লাহর নিন্দাবাদের শামিল। রসূলের বিরোধিতা আল্লাহর বিরোধিতার সমার্থক। রসূলের নাফরমানি আল্লাহরই নাফরমানি।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ
وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

৮ রুকূ'

হে নবী! তোমার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মু'মিনদের নারীদেরকে বলে দাও তারা *যেন তাদের চাদরের প্রান্ত তাদের ওপর টেনে নেয়।[১১০] এটি অধিকতর উপযোগী পদ্ধতি, যাতে তাদেরকে চিনে নেয়া যায় এবং কষ্ট না দেয়া হয়।[১১১] আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[১১২]*

১০৯. এ আয়াতটি অপবাদের সংজ্ঞা নিরূপণ করে। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে দোষ নেই অথবা যে অপরাধ মানুষ করেনি তা তার ওপর আরোপ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এটি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়, গীবত কি? জবাবে বলেন ঃ ذكرك اخاك بما يكره "তোমার নিজের ভাইয়ের আলোচনা এমনভাবে করা যা সে অপছন্দ করে।" জিজ্ঞেস করা হয়, যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সেই দোষ সত্যিই থেকে থাকে? জবাব দেন ঃ

ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ماتقول فقد بهته

"তুমি যে দোষের কথা বলছো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলে তুমি তার গীবত করলে আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তাহলে তার ওপর অপবাদ দিলে।"

এ কাজটি কেবলমাত্র একটি নৈতিক গোনাহই নয়, আখেরাতে যার শাস্তি পাওয়া যাবে বরং এ আয়াতের দাবী হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের আইনেও মিথ্যা অপবাদ দান করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করতে হবে।

১১০. মূল শব্দগুলো হচ্ছে, يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ আরবী ভাষায় 'জিলবাব' বলা হয় বড় চাদরকে। আর ইদ্‌ন (ادناء) শব্দের আসল মানে হচ্ছে নিকটবর্তী করা ও ঢেকে নেয়া। কিন্তু যখন তার সাথে 'আলা' অব্যয় (Preposition) বসে তখন তার মধ্যে ইরখা (ارخاء) অর্থাৎ ওপর থেকে ঝুলিয়ে দেয়ার অর্থ সৃষ্টি হয়। বর্তমান যুগের কোন কোন অনুবাদক ও তাফসীরকার পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে এ শব্দের অনুবাদ করেন শুধুমাত্র "জড়িয়ে নেয়া" যাতে চেহারা কোনভাবে ঢেকে রাখার হুকুমের বাইরে থেকে যায়। কিন্তু যা বর্ণনা করছেন আল্লাহর উদ্দেশ্য যদি তাই হতো, তাহলে তিনি يُدْنِينَ اِلَيْهِنَّ বলতেন। যে ব্যক্তিই আরবী ভাষা জানেন তিনি কখনো একথা মেনে নিতে পারেন না যে, يدنين عليهن মানে কেবলমাত্র জড়িয়ে নেয়া হতে পারে।

তাছাড়া مِن جَلَابِيبِهِنَّ শব্দ দু'টি এ অর্থ গ্রহণ করার পথে আরো বেশী বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একথা সুস্পষ্ট যে, এখানে মিন (مِن) শব্দটি "কিছু" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ চাদরের এক অংশ। আর এটাও সুস্পষ্ট যে, জড়িয়ে নিতে হলে পুরো চাদর জড়াতে হবে, নিছক তার একটা অংশ নয়। তাই আয়াতের পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, নারীরা যেন নিজেদের চাদর ভালোভাবে জড়িয়ে ঢেকে নিয়ে তার একটি অংশ বা একটি পাল্লা নিজেদের ওপর লটকিয়ে দেয়, সাধারণভাবে যাকে বলা হয় ঘোমটা।

নবুওয়াত যুগের নিকটবর্তী কালের প্রধান মুফাস্সিরগণ এর এ অর্থই বর্ণনা করেন। ইবনে জারীর ও ইবনুল মুনযিরের বর্ণনা মতে মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন (র) হযরত উবাইদাতুস সালমানীর কাছে এ আয়াতটির অর্থ জিজ্ঞেস করেন। (এই হযরত উবাইদাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মুসলমান হন কিন্তু তাঁর খিদমতে হাযির হতে পারেননি। হযরত উমরের (রা) আমলে তিনি মদীনা আসেন এবং সেখানেই থেকে যান। তাঁকে ফিক্হ ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে কাযী শুরাইহ-এর সমকক্ষ মনে করা হতো।) তিনি জবাবে কিছু বলার পরিবর্তে নিজের চাদর তুলে নেন এবং তা দিয়ে এমনভাবে মাথা ও শরীর ঢেকে নেন যে তার ফলে পুরো মাথা ও কপাল এবং পুরো চেহারা ঢাকা পড়ে যায়, কেবলমাত্র একটি চোখ খোলা থাকে। ইবনে আব্বাসও প্রায় এই একই ব্যাখ্যা করেন। তাঁর যেসব উক্তি ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে তাঁর যে বক্তব্য পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে, "আল্লাহ মহিলাদেরকে হুকুম দিয়েছেন যে, যখন তারা কোন কাজে ঘরের বাইরে বের হবে তখন নিজেদের চাদরের পাল্লা ওপর দিয়ে লটকে দিয়ে যেন নিজেদের মুখ ঢেকে নেয় এবং শুধুমাত্র চোখ খোলা রাখে।" কাতাদাহ ও সুদ্দীও এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

সাহাবা ও তাবে'ঈদের যুগের পর ইসলামের ইতিহাসে যত বড় বড় মুফাস্সির অতিক্রান্ত হয়েছেন তাঁরা সবাই একযোগে এ আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে জারীর তাবারী বলেন ঃ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ অর্থাৎ ভদ্র ঘরের মেয়েরা যেন নিজেদের পোশাক আশাকে বাঁদীদের মতো সেজে ঘর থেকে বের না হয়। তাদের চেহারা ও কেশদাম যেন খোলা না থাকে। বরং তাদের নিজেদের ওপর চাদরের একটি অংশ লটকে দেয়া উচিত। ফলে কোন ফাসেক তাদেরকে উত্যক্ত করার দুঃসাহস করবে না। (জামে'উল বায়ান, ২২ খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা)

আল্লামা আবু বকর জাস্সাস বলেন, "এ আয়াতটি প্রমাণ করে, যুবতী মেয়েদের চেহারা অপরিচিত পুরুষদের থেকে লুকিয়ে রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে। এই সাথে ঘর থেকে বের হবার সময় তাদের 'সতর' ও পবিত্রতা সম্পন্না হবার কথা প্রকাশ করা উচিত। এর ফলে সন্দেহযুক্ত চরিত্র ও কর্মের অধিকারী লোকেরা তাদেরকে দেখে কোন প্রকার লোভ ও লালসার শিকার হবে না।" (আহকামুল কুরআন, ৩ খণ্ড, ৪৫৮ পৃষ্ঠা)

আল্লামা যামাখ্শারী বলেন, يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ অর্থাৎ তারা যেন নিজেদের ওপর নিজেদের চাদরের একটি অংশ লটকে নেয় এবং তার সাহায্যে নিজেদের চেহারা ও প্রান্তভাগগুলো ভালোভাবে ঢেকে নেয়।" (আল কাশ্শাফ, ২ খণ্ড, ২২১ পৃষ্ঠা)

আল্লামা নিযামুদ্দীন নিশাপুরী বলেন, يدنين عليهن من جلابيبهن অর্থাৎ নিজেদের ওপর চাদরের একটি অংশ লটকে দেয়। এভাবে মেয়েদেরকে মাথা ও চেহারা ঢাকার হুকুম দেয়া হয়েছে। (গারায়েবুল কুরআন, ২২ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা)

ইমাম রাযী বলেন ঃ "এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, লোকেরা যেন জানতে পারে এরা দুশ্চরিত্রা মেয়ে নয়। কারণ যে মেয়েটি নিজের চেহারা ঢাকবে, অথচ চেহারা সতরের অন্তরভুক্ত নয়, তার কাছে কেউ আশা করতে পারে না যে, সে নিজের 'সতর' অন্যের সামনে খুলতে রাজী হবে। এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি জানবে, এ মেয়েটি পর্দানশীন, একে যিনার কাজে লিপ্ত করার আশা করা যেতে পারে না।" (তাফসীরে কবীর, ২ খণ্ড, ৫৯১ পৃষ্ঠা)

এ আয়াত থেকে পরোক্ষভাবে আর একটি বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। অর্থাৎ এখান থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকটি কন্যা থাকার কথা প্রমাণিত হয়। কারণ, আল্লাহ বলছেন, "হে নবী! তোমার স্ত্রীদের ও কন্যাদেরকে বলো।" এ শব্দাবলী এমনসব লোকদের উক্তি চূড়ান্তভাবে খণ্ডন করে যারা আল্লাহর ভয়শূন্য হয়ে নিসংকোচে এ দাবী করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কেবলমাত্র একটি কন্যা ছিল এবং তিনি ছিলেন হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা। বাদ বাকি অন্য কন্যারা তাঁর ঔরসজাত ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন তাঁর স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত এবং তাঁর কাছে প্রতিপালিত। এ লোকেরা বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে একথাও চিন্তা করেন না যে, নবী সন্তানদেরকে তাঁর ঔরসজাত হবার ব্যাপারটি অস্বীকার করে তারা কতবড় অপরাধ করছেন এবং আখেরাতে এ জন্য তাদেরকে কেমন কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। সমস্ত নির্ভরযোগ্য হাদীস এ ব্যাপারে ঐকমত্য ব্যক্ত করেছে যে, হযরত খাদীজার (রা) গর্ভে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কেবলমাত্র একটি সন্তান হযরত ফাতেমা (রা) জন্মগ্রহণ করেননি বরং আরো তিন কন্যাও জন্মলাভ করে। নবী করীমের (সা) সবচেয়ে প্রাচীন সীরাত লেখক মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক হযরত খাদীজার সাথে নবী করীমের (সা) বিয়ের ঘটনা উল্লেখ করার পর বলেন ঃ "ইবরাহীম ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত ছেলে মেয়ে তাঁরই গর্ভে জন্ম নেয়। তাদের নাম হচ্ছে ঃ কাসেম, তাহের ও তাইয়েব এবং যয়নব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতেমা।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ খণ্ড, ২০২ পৃষ্ঠা) প্রখ্যাত বংশতালিকা বিশেষজ্ঞ হিশাম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুস সায়েব কাল্‌বির বর্ননা হচ্ছে ঃ "নবুওয়াত লাভের পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণকারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম সন্তান হলো কাসেম। তারপর জন্মলাভ করে যয়নব, তারপর রুকাইয়া, তারপর উম্মে কুলসুম।" (তাবকাতে ইবনে সা'দ, ১ খণ্ড, ১৩৩পৃষ্ঠা) ইবনে হাযম জাওয়ামেউস সিয়ারে লিখেছেন, হযরত খাদীজার (রা) গর্ভে নবী করীমের (সা) চারটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে সবার বড় ছিলেন হযরত যয়নব (রা), তাঁর ছোট ছিলেন হযরত রুকাইয়া (রা), তাঁর ছোট ছিলেন হযরত ফাতেমা (রা) এবং তাঁর ছোট ছিলেন হযরত উম্মে কুলসুম (রা)। (পৃষ্ঠা ৩৮—৩৯) তাবারী, ইবনে সা'দ আল মুহাব্বার গ্রন্থ প্রণেতা আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে হাবীব এবং আল ইস্‌তি'আব গ্রন্থ প্রণেতা ইবনে আবদুল বার নির্ভরযোগ্য বরাতের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে হযরত খাদীজার (রা) আরো দু'জন স্বামী অতিক্রান্ত হয়েছিল। একজন ছিলেন আবু হালাহ তামিমী, তাঁর ঔরসে জন্ম নেয় হিন্দ

ইবনে আবু হালাহ। দ্বিতীয় জন ছিলেন আতীক ইবনে আয়েদ মাখযূমী। তাঁর ঔরসে হিন্দ নামে এক মেয়ের জন্ম হয়। তারপর তাঁর বিয়ে হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে। সকল বংশ তালিকা বিশেষজ্ঞ এ ব্যাপারে একমত যে তাঁর ঔরসে হযরত খাদীজার (রা) গর্ভে ওপরে উল্লেখিত চার কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। (দেখুন তাবারী, ২ খণ্ড, ৪১১ পৃষ্ঠা; তাবকাত ইবনে সা'দ, ৮ খণ্ড, ১৪—১৬ পৃষ্ঠা, কিতাবুল মুহাব্বার, ৭৮,৭৯ ও ৪৫২ পৃষ্ঠা এবং আল ইসতি'আব, ২ খণ্ড, ৭১৮ পৃষ্ঠা) এ সমস্ত বর্ণনা নবী করীমের (সা) একটি নয় বরং কয়েকটি মেয়ে ছিল, কুরআন মজীদের এ বর্ণনাকে অকাট্য প্রমাণ করে।

১১১. "চিনে নেয়া যায়" এর অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে এ ধরনের অনারাড়ম্বর লজ্জা নিবারণকারী পোশাকে সজ্জিত দেখে প্রত্যেক প্রত্যক্ষকারী জানবে তারা অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পূত-পবিত্র মেয়ে, এমন ভবঘুরে অসতী ও পেশাদার মেয়ে নয়, কোন অসদাচারী মানুষ যার কাছে নিজের কামনা পূর্ণ করার আশা করতে পারে। "না কষ্ট দেয়া হয়" এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তাদেরকে যেন উত্যক্ত ও জ্বালাতন না করা হয়।

এখানে কিছুক্ষণ থেমে একবার একথাটি অনুধাবন করার চেষ্টা করুন যে, কুরআনের এ হুকুম এবং এ হুকুমের যে উদ্দেশ্য আল্লাহ নিজেই বর্ণনা করেছেন তা ইসলামী সমাজ বিধানের কোন ধরনের প্রাণ শক্তির প্রকাশ ঘটাচ্ছে। ইতিপূর্বে সূরা নূরের ৩১ আয়াতে এ নির্দেশ আলোচিত হয়েছে যে, মহিলারা তাদের সাজসজ্জা অমুক অমুক ধরনের পুরুষ ও নারীদের ছাড়া আর কারো সামনে প্রকাশ করবে না। "আর মাটির ওপর পা দাপিয়ে চলবে না, যাতে যে সৌন্দর্য তারা লুকিয়ে রেখেছে লোকেরা যেন তা জেনে না ফেলে।" এ হুকুমের সাথে যদি সূরা আহ্যাবের এ আয়াতটি মিলিয়ে পড়া হয় তাহলে পরিষ্কার জানা যায় যে, এখানে চাদর দিয়ে ঢাকার যে হুকুম এসেছে অপরিচিতদের থেকে সৌন্দর্য লুকানোই হচ্ছে তার উদ্দেশ্য। আর একথা সুস্পষ্ট যে, এ উদ্দেশ্য তখনই পূর্ণ হতে পারে যখন চাদরটি হবে সাদামাটা । নয়তো একটি উন্নত নকশাদার ও দৃষ্টিনন্দন কাপড় জড়িয়ে নিলে তো উল্টো এ উদ্দেশ্য আরো খতম হয়ে যাবে। তাছাড়া আল্লাহ কেবল চাদর জড়িয়ে সৌন্দর্য ঢেকে রাখার হুকুম দিচ্ছেন না বরং একথাও বলছেন যে, মহিলারা যেন চাদরের একটি অংশ নিজেদের ওপর লটকে দেয়। কোন বিচক্ষণ বিবেকবান ব্যক্তি এ উক্তিটির এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন অর্থ করতে পারেন না যে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঘোমটা দেয়া, যাতে শরীর ও পোশাকের সৌন্দর্য ঢাকার সাথে সাথে চেহারাও ঢাকা পড়বে। তারপর আল্লাহ নিজেই এ হুকুমটির 'ইল্লাত' (কার্যকারণ) এ বর্ণনা করেছেন যে, এটি এমন একটি সর্বাধিক উপযোগী পদ্ধতি যা থেকে মুসলমান মহিলাদেরকে চিনে নেয়া যাবে এবং তারা উত্যক্ত হবার হাত থেকেও বেঁচে যাবে। এ থেকে আপনা-আপনিই একথা প্রকাশ হয়ে যায় যে, এ নির্দেশ এমন সব মহিলাকে দেয়া হচ্ছে যারা পুরুষদের হাতে উত্যক্ত হবার এবং তাদের দৃষ্টিতে পড়ার ও তাদের কামনা-লালসার বস্তুতে পরিণত হবার ফলে আনন্দ অনুভব করার পরিবর্তে একে নিজেদের জন্য কষ্টদায়ক ও লাঞ্ছনাকর মনে করে, যারা সমাজে নিজেদেরকে বে-আব্রু মক্ষিরাণী ধরনের মহিলাদের মধ্যে গণ্য করাতে চায় না । বরং সতী-সাধ্বী গৃহ প্রদীপ হিসেবে পরিচিত হতে চায়। এ ধরনের শরীফ ও পূত চরিত্রের অধিকারিনী সৎকর্মশীলা মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, যদি সত্যিই তোমরা এভাবে নিজেদেরকে পরিচিত করাতে চাও এবং পুরুষদের যৌন লালসার দৃষ্টি সত্যিই

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ
وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ
اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦٠﴾ مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ﴿٦١﴾
سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ
تَبْدِيْلًا ﴿٦٢﴾

যদি মুনাফিকরা এবং যাদের মনে গলদ[১১৩] আছে তারা আর যারা মদীনায় উত্তেজনাকর গুজব ছড়ায়,[১১৪] তারা নিজেদের তৎপরতা থেকে বিরত না হয়, তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবার জন্য তোমাকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবো; তারপর খুব কমই তারা এ নগরীতে তোমার সাথে থাকতে পারবে। তাদের ওপর লানত বর্ষিত হবে চারদিক থেকে, যেখানেই পাওয়া যাবে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে। এটিই আল্লাহর সুন্নাত, এ ধরনের লোকদের ব্যাপারে পূর্ব থেকে এটিই চলে আসছে এবং তুমি আল্লাহর সুন্নাতে কোন পরিবর্তন পাবে না।[১১৫]

তোমাদের জন্য আনন্দদায়ক না হয়ে কষ্টকর হয়ে থাকে, তাহলে এ জন্য তোমরা খুব ভালোভাবে সাজসজ্জা করে বাসর রাতের কনে সেজে ঘর থেকে বের হয়ো না এবং দর্শকদের লালসার দৃষ্টির সামনে নিজেদের সৌন্দর্যকে উজ্জল করে তুলে ধরো না। কেননা এটা এর উপযোগী পদ্ধতি নয়। বরং এ জন্য সর্বাধিক উপযোগী পদ্ধতি এই হতে পারে যে, তোমরা একটি সাদামাটা চাদরে নিজেদের সমস্ত সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা ঢেকে বের হবে, চেহারা ঘোমটার আড়ালে রাখবে এবং এমনভাবে চলবে যাতে অলংকারের রিনিঝিনি আওয়াজ লোকদেরকে তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট করবে না। বাইরে বের হবার আগে যেসব মেয়ে সাজগোজ করে নিজেদেরকে তৈরী করে এবং ততক্ষণ ঘরের বাইরে পা রাখে না যতক্ষণ অপরূপ সাজে নিজেদেরকে সজ্জিতা না করে নেয়, তাদের এর উদ্দেশ্য এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, তারা সারা দুনিয়ার পুরুষদের জন্য নিজেদেরকে দৃষ্টিনন্দন করতে চায় এবং তাদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতে চায়। এরপর যদি তারা বলে, দর্শকদের ভ্রূভংগী তাদেরকে কষ্ট দেয়, এরপর যদি তাদের দাবী হয় তারা "সমাজের মক্ষিরাণী" এবং "সর্বজনপ্রিয় মহিলা" হিসেবে নিজেদেরকে চিত্রিত করতে চায় না বরং পূত–পবিত্রা গৃহিনী হয়েই থাকতে চায়, তাহলে এটা একটা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের কথা তার নিয়ত নির্ধারণ করে না বরং কাজই তার আসল নিয়ত প্রকাশ করে। কাজেই যে নারী আকর্ষণীয়া হয়ে পর পুরুষের সামনে যায়, তার এ কাজটির পেছনে কোন্

ধরনের উদ্দেশ্য কাজ করছে সেটা ঐ কাজ দ্বারাই প্রকাশ পায়। কাজেই এসব মহিলাদের থেকে যা আশা করা যেতে পারে ফিত্‌নাবাজ লোকেরা তাদের থেকে তাই আশা করে থাকে। কুরআন মহিলাদেরকে বলে, তোমরা একই সংগে "গৃহপ্রদীপ" ও "সমাজের মক্ষিরাণী" হতে পারো না। গৃহপ্রদীপ হতে চাইলে সমাজের মক্ষিরানী হবার জন্য যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় তা পরিহার করো এবং এমন জীবনধারা অবলম্বন করো যা গৃহপ্রদীপ হতে সাহায্য করতে পারে। কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত মত কুরআনের অনুকূল হোক বা তার প্রতিকূল এবং তিনি কুরআনের পথনির্দেশকে নিজের কর্মনীতি হিসেবে গ্রহণ করতে চান বা না চান, মোটকথা তিনি যদি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জাল-জুয়াচুরির পথ অবলম্বন করতে না চান, তাহলে কুরআনের অর্থ বুঝতে তিনি ভুল করতে পারেন না। তিনি যদি মুনাফিক না হয়ে থাকেন, তাহলে পরিষ্কারভাবে একথা মেনে নেবেন যে, ওপরে যা বর্ণনা করা হয়েছে তাই হচ্ছে কুরআনের উদ্দেশ্য। এরপর তিনি যে বিরুদ্ধাচরণই করবেন একথা মেনে নিয়েই করবেন যে, তিনি কুরআন বিরোধী কাজ করছেন অথবা কুরআনের নির্দেশনাকে ভুল মনে করছেন।

১১২. অর্থাৎ ইতিপূর্বে জাহেলী জীবন যাপন করার সময় যেসব ভুল করা হয় আল্লাহ নিজ মেহেরবানীতে তা ক্ষমা করে দেবেন তবে এ জন্য শর্ত হচ্ছে, এখন পরিষ্কার পথনির্দেশ লাভ করার পর তোমরা নিজেদের কর্মধারা সংশোধন করে নেবে এবং জেনে বুঝে তার বিরুদ্ধাচরণ করবে না।

১১৩. "মনের গলদ" বলতে এখানে দু'ধরনের গলদের কথা বলা হয়েছে। এক, মানুষ নিজেকে মুসলমানদের মধ্যে গণ্য করা সত্ত্বেও ইসলাম ও মুসলমানদের অশুভাকাংখী হয়। দুই, মানুষ অসৎ সংকল্প, লাম্পট্য ও অপরাধী মানসিকতার আশ্রয় নেয়। এবং তার পূতিগন্ধময় প্রবণতাগুলো তার উদ্যোগ, আচরণ ও কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছুরিত হতে থাকে।

১১৪. এখানে এমন সব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা মুসলমানদের মধ্যে ভীতি ও আতংক ছড়াবার এবং তাদের মনোবল ভেংগে দেবার জন্য সে সময় প্রতি দিন মদীনায় এ ধরনের গুজব ছড়িয়ে বেড়াতো যে, অমুক জায়গায় মুসলমানরা খুব বেশী মার খেয়ে গেছে, অমুক জায়গায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিপুল শক্তিশালী সমাবেশ ঘটছে এবং শিগ্‌গির মদীনার ওপর অতর্কিত হামলা হবে। এই সংগে তাদের আর একটি কাজ এও ছিল যে, তারা নবীর পরিবার ও শরীফ মুসলমানদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার অলীক গল্প তৈরি করে সেগুলো ছড়াতে থাকতো, যাতে এর ফলে জনগণের মধ্যে কুধারণা সৃষ্টি হয় এবং মুসলমানদের নৈতিক প্রভাব ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১১৫. অর্থাৎ আল্লাহর শরীয়াতের একটি স্বতন্ত্র বিধান আছে। সে বিধান হচ্ছে, একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে এ ধরনের ফাসাদীদেরকে কখনো সমৃদ্ধি ও বিকাশ লাভের সুযোগ দেয়া হয় না। যখনই কোন সমাজ ও রাষ্ট্রের ব্যবস্থা আল্লাহর শরীয়াতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে, সেখানে এ ধরনের লোকদেরকে পূর্বেই সতর্ক করে দেয়া হবে, যাতে তারা নিজেদের নীতি পরিবর্তন করে নেয় এবং তারপর তারা বিরত না হলে কঠোরভাবে তাদেরকে দমন করা হবে।

يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ
لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ
سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾
يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا
الرَّسُولَا ﴿٦٦﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا
السَّبِيلَا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾

লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিয়ামত কবে আসবে?[১১৬] বলো, একমাত্র আল্লাহই এর জ্ঞান রাখেন। তুমি কী জানো, হয়তো তা নিকটেই এসে গেছে। মোটকথা এ বিষয়টি নিশ্চিত যে, আল্লাহ কাফেরদেরকে অভিসপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য উৎক্ষিপ্ত আগুনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যার মধ্যে তারা থাকবে চিরকাল, কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। যেদিন তাদের চেহারা আগুনে ওলট পালট করা হবে তখন তারা বলবে "হায়! যদি আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতাম।" আরো বলবে, "হে আমাদের রব! আমরা আমাদের সরদারদের ও বড়দের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দাও এবং তাদের প্রতি কঠোর লানত বর্ষণ করো।[১১৭]

১১৬. সাধারণত কাফের ও মুনাফিকরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ধরনের প্রশ্ন করতো। এর মাধ্যমে জ্ঞানলাভ করা তাদের উদ্দেশ্য হতো না। বরং তারা ঠাট্টা-মস্করা ও তামাশা-বিদ্রূপ করার জন্য একথা জিজ্ঞেস করতো। আসলে তারা আখেরাতে বিশ্বাস করতো না। কিয়ামতের ধারণাকে তারা নিছক একটি অন্তসারশূন্য হুমকি মনে করতো। কিয়ামত আসার আগে তারা নিজেদের যাবতীয় বিষয় ঠিকঠাক করে নেবার ইচ্ছা রাখে বলেই যে তারা তার আসার তারিখ জিজ্ঞেস করতো তা নয়। বরং তাদের আসল উদ্দেশ্য এই হতো, "হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমরা তোমাকে ছোট করার জন্য এসব করেছি এবং আজ পর্যন্ত তুমি আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারোনি। এখন তাহলে তুমি আমাদের বলো, সেই কিয়ামত কবে হবে যখন আমাদের শাস্তি দেয়া হবে।"

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْا۟ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ
مِمَّا قَالُوا۟ ۚ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا ﴿٦٩﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟
ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

৯ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ!১১৮ তাদের মতো হয়ে যেয়ো না যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল, তারপর আল্লাহ তাদের তৈরি করা কথা থেকে তাকে দায়মুক্ত করেন এবং সে আল্লাহর কাছে ছিল সম্মানিত।১১৯ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ ঠিকঠাক করে দেবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ মাফ করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে সে বড় সাফল্য অর্জন করে।

১১৭. এ বিষয়বস্তুটি কুরআন মজীদের বহুস্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নলিখিত স্থানগুলো দেখুন ঃ আল আ'রাফ ১৮৭, আন নাযি'আত ৪২ ও ৪৬, সাবা ৩ ও ৫, আল মুল্‌ক ২৪ ও ২৭, আল মুতাফ্‌ফিফীন ১০ ও ১৭, আল হিজ্‌র ২ ও ৩, আল ফুরকান ২৭ ও ২৯ এবং হা–মীম আস সাজদাহ ২৬ ও ২৯ আয়াত।

১১৮. মনে রাখতে হবে, কুরআন মজীদে "হে ঈমানদারগণ!" শব্দাবলীর মাধ্যমে কোথাও তো সাচ্চা মু'মিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে আবার কোথাও মুসলমানদের দলকে সামগ্রিকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, যার মধ্যে মু'মিন, মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানদার সবাই শামিল আছে। আবার কোথাও মুনাফিকদের দিকে কথার মোড় ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানদারদেরকে যখনই الذين امنوا বলে সম্বোধন করা হয় তখন এর উদ্দেশ্য তাদেরকে লজ্জা দেয়া এই মর্ম যে, তোমরা তো ঈমান আনার দাবী করে থাকো আর এই হচ্ছে তোমাদের কাজ। আগের পিছের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে প্রত্যেক জায়গায় الذين امنوا বলে কোন্ জায়গায় কার কথা বলা হয়েছে তা সহজেই জানা যায়। এখানে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা পরিষ্কার জানাচ্ছে যে, এখানে সাধারণ মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

১১৯. অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছে, "হে মুসলমানরা! তোমরা ইহুদিদের মতো করো না। মূসা আলাইহিস সালামের সাথে বনী ইসরাঈল যে আরচণ করে তোমাদের নবীর সাথে তোমাদের তেমনি ধরনের আচরণ করা উচিত নয়।" বনী ইসরাঈল নিজেরাই একথা স্বীকার করে যে, হযরত মূসা ছিলেন তাদের সবচেয়ে বড় অনুগ্রাহক ও উপকারী। এ জাতির যা কিছু উন্নতি অগ্রগতি সব তাঁরই বদৌলতে। নয়তো মিসরে তাদের পরিণতি

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ لِيُعَذِّبَ
اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ
اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾

আমি এ আমানতকে অকাশসমূহ, পৃথিবী ও পর্বতরাজির ওপর পেশ করি, তারা একে বহন করতে রাজি হয়নি এবং তা থেকে ভীত হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষ একে বহন করেছে, নিসন্দেহে সে বড় জালেম ও অজ্ঞ।১২০ এ আমানতের বোঝা উঠাবার অনিবার্য ফল হচ্ছে এই যে, আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও নারীদেরকে সাজা দেবেন এবং মু'মিন পুরুষ ও নারীদের তাওবা কবুল করবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

ভারতের শূদ্রদের চাইতেও খারাপ হতো। কিন্তু নিজেদের এ মহান হিতকারীর সাথে এ জাতির যে আচরণ ছিল তা অনুমান করার জন্য বাইবেলের নিম্নোক্ত স্থানগুলোর ওপর একবার নজর বুলিয়ে নেয়া যথেষ্ট হবে ঃ

যাত্রাপুস্তক ৫ ঃ ২০—২১, ১৪ ঃ ১১—১২, ১৬ ঃ ২—৩, ১৭ ঃ ৩—৪; গণনা পুস্তক ১১ ঃ ১—১৫, ১৪ ঃ ১—১০, ১৬ ঃ সম্পূর্ণ, ২০ ঃ ১—৫।

এত বড় হিতকারী ব্যক্তিত্বের সাথে বনী ইসরাঈল যে বৈরী নীতি অবলম্বন করেছিল। তার প্রতি ইংগিত করে কুরআন মজিদ মুসলমানদেরকে এই বলে সতর্ক করে দিচ্ছে যে, তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এ ধরনের আচরণ করো না। অন্যথায় ইহুদিরা যে পরিণাম ভোগ করেছে ও করছে, তোমরা নিজেরাও সেই পরিণামের জন্য তৈরি হয়ে যাও।

একথাটিই বিভিন্ন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বলেছেন। একবারের ঘটনা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের মধ্যে কিছু সম্পদ বিতরণ করছিলেন। এ মজলিস থেকে লোকেরা বাইরে বের হলে এক ব্যক্তি বললো, "মুহাম্মাদ এই বিতরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি একটুও নজর রাখেননি।" একথা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) শুনতে পান। তিনি নবী করীমের কাছে গিয়ে বলেন, আজ আপনার সম্পর্কে এ ধরনের কথা তৈরি করা হয়। তিনি জবাবে বলেন ঃ

رحمة الله على موسى فانه اوذى باكثر من هذا فصبر

"মূসার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তাঁকে এর চেয়েও বেশী পীড়া ও যন্ত্রণা দেয়া হয় এবং তিনি সবর করেন।" (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

১২০. বক্তব্য শেষ করতে গিয়ে আল্লাহ মানুষকে এ চেতনা দান করতে চান যে, দুনিয়ায় সে কোন্ ধরনের মর্যাদার অধিকারী এবং এ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থেকে যদি সে দুনিয়ার জীবনকে নিছক একটি খেলা মনে করে নিশ্চিন্তে ভুল নীতি অবলম্বন করে, তাহলে কিভাবে স্বহস্তে নিজের ভবিষ্যত নষ্ট করে।

এ স্থানে "আমানত" অর্থ সেই "খিলাফতই", যা কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে মানুষকে দুনিয়ায় দান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ মানুষকে আনুগত্য ও অবাধ্যতার যে স্বাধীনতা দান করেছেন এবং এ স্বাধীনতা ব্যবহার করার জন্য তাকে অসংখ্য সৃষ্টির ওপর যে কর্তৃত্ব ক্ষমতা দিয়েছেন। তার অনিবার্য ফল স্বরূপ মানুষ নিজেই নিজের স্বেচ্ছাকৃত কাজের জন্য দায়ী গণ্য হবে এবং নিজের সঠিক কর্মধারার বিনিময়ে পুরস্কার এবং অন্যায় কাজের বিনিময়ে শাস্তির অধিকারী হবে। এসব ক্ষমতা যেহেতু মানুষ নিজেই অর্জন করেনি বরং আল্লাহ তাকে দিয়েছেন এবং এগুলোর সঠিক ও অন্যায় ব্যবহারের দরুন তাকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে, তাই কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এগুলোকে "খিলাফত" শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে এবং এখানে এগুলোর জন্যই "আমানত" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

এ আমানত কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্বহ সে ধারণা দেবার জন্য আল্লাহ বলেন, আকাশ ও পৃথিবী তাদের সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব এবং পাহাড় তার বিশাল ও বিপুলায়তন দেহাবয়ব ও গম্ভীরতা সত্ত্বেও তা বহন করার শক্তি ও হিম্মত রাখতো না কিন্তু দুর্বল দেহাবয়বের অধিকারী মানুষ নিজের ক্ষুদ্রতম প্রাণের ওপর এ ভারী বোঝা উঠিয়ে নিয়েছে।

পৃথিবী ও আকাশের সামনে আমানতের বোঝা পেশ করা এবং তাদের তা উঠাতে অস্বীকার করা এবং ভীত হওয়ার ব্যাপারটি হতে পারে শাব্দিক অর্থেই সংঘটিত হয়েছে। আবার এও হতে পারে যে, একথাটি রূপকের ভাষায় বলা হয়েছে। নিজের সৃষ্টির সাথে আল্লাহর যে সম্পর্ক রয়েছে তা আমরা জানতেও পারি না এবং বুঝতেও পারি না। পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য ও পাহাড় যেভাবে আমাদের কাছে বোবা, কালা ও প্রাণহীন, আল্লাহর কাছেও যে তারা ঠিক তেমনি হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আল্লাহ নিজের প্রত্যেক সৃষ্টির সাথে কথা বলতে পারেন এবং সে তার জবাব দিতে পারে। এর প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করার ক্ষমতা আমাদের বুদ্ধি ও বোধশক্তির নেই। তাই এটা পুরোপুরিই সম্ভব যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ নিজেই এ বিরাট বোঝা তাদের সামনে পেশ করে থাকবেন এবং তারা তা দেখে কেঁপে উঠে থাকবে আর তারা তাদের প্রভু ও স্রষ্টার কাছে এ নিবেদন পেশ করে থাকবে যে, আমরা তো আপনার ক্ষমতাহীন সেবক হয়ে থাকার মধ্যেই নিজেদের মংগল দেখতে পাই। নাফরমানী করার স্বাধীনতা নিয়ে তার হক আদায় করা এবং হক আদায় না করতে পারলে তার শাস্তি বরদাশত করার সাহস আমাদের নেই। অনুরূপভাবে এটাও সম্ভব, আমাদের বর্তমান জীবনের পূর্বে আল্লাহ সমগ্র মানব জাতিকে অন্য কোন ধরনের একটি অস্তিত্ব দান করে নিজের সামনে হাজির করে থাকবেন এবং তারা নিজেরাই এ দায়িত্ব বহন করার আগ্রহ প্রকাশ করে থাকবে। একথাকে অসম্ভব গণ্য করার জন্য কোন যুক্তি আমাদের কাছে নেই। একে সম্ভাবনার গণ্ডীর বাইরে রাখার ফায়সালা সেই ব্যক্তিই করতে পারে যে নিজের চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতার ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছে।

তবে এ বিষয়টাও সমান সম্ভবপর যে, নিছক রূপকের আকারে আল্লাহ এ বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন এবং অবস্থার অস্বাভাবিক গুরুত্বের ধারণা দেবার জন্য এমনভাবে তার নকশা পেশ করা হয়েছে যেন একদিকে পৃথিবী ও আকাশ এবং হিমালয়ের মতো গগণচুম্বী পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে আর অন্যদিকে দাঁড়িয়ে আছে ৫/৬ ফুট লম্বা একজন মানুষ। আল্লাহ জিজ্ঞেস করছেন ঃ

"আমি আমার সমগ্র সৃষ্টিকূলের মধ্যে কোন একজনকে এমন শক্তি দান করতে চাই যার ফলে আমার সার্বভৌম কর্তৃত্বের মধ্যে অবস্থান করে সে নিজেই স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে আমার প্রাধান্যের স্বীকৃতি এবং আমার হুকুমের আনুগত্য করতে চাইলে করবে অন্যথায় সে আমাকে অস্বীকার করতেও পারবে আর আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা নিয়েও উঠতে পারবে। এ স্বাধীনতা দিয়ে আমি তার কাছ থেকে এমনভাবে আত্মগোপন করে থাকবো যেন আমি কোথাও নেই। এ স্বাধীনতাকে কার্যকর করার জন্য আমি তাকে ব্যাপক ক্ষমতা দান করবো, বিপুল যোগ্যতার অধিকারী করবো এবং নিজের অসংখ্য সৃষ্টির ওপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করবো। এর ফলে বিশ্ব-জাহানে সে যা কিছু ভাঙা-গড়া করতে চায় করতে পারবে। এরপর একটি নির্দিষ্ট সময়ে আমি তার কাজের হিসেব নেবো। যে আমার প্রদত্ত স্বাধীনতাকে ভুলপথে ব্যবহার করবে তাকে এমন শাস্তি দেবো যা কখনো আমার কোন সৃষ্টিকে আমি দেইনি। আর যে নাফরমানীর সমস্ত সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও আমার আনুগত্যের পথই অবলম্বন করে থাকবে তাকে এমন উচ্চ মর্যাদা দান করবো যা আমার কোন সৃষ্টি লাভ করেনি। এখন বলো তোমাদের মধ্য থেকে কে এ পরীক্ষাগৃহে প্রবেশ করতে প্রস্তুত আছে?"

এ ভাষণ শুনে প্রথমে তো সমগ্র বিশ্ব-জগত নিরব নিথর দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর একের পর এক এগিয়ে আসে। সকল প্রকাণ্ড অবয়ব ও শক্তির অধিকারী সৃষ্টি এবং তারা হাঁটু গেড়ে বসে কান্নাজড়িত স্বরে সানুনয় নিবেদন করে যেতে থাকে তাদেরকে যেন এ কঠিন পরীক্ষা থেকে মুক্ত রাখা হয়। সবশেষে এ একমুঠো মাটির তৈরি মানুষ ওঠে। সে বলে, হে আমার পওয়ারদিগার! আমি এ পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত। এ পরীক্ষায় সফলকাম হয়ে তোমার সালতানাতের সবচেয়ে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হবার যে আশা আছে সে কারণে আমি এ স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারের মধ্যে যেসব আশংকা ও বিপদাপদ রয়েছে সেগুলো অতিক্রম করে যাবো।

নিজের কল্পনাদৃষ্টির সামনে এ চিত্র তুলে ধরেই মানুষ এই বিশ্ব-জাহানে কেমন নাজুক স্থানে অবস্থান করছে তা ভালোভাবেই আন্দাজ করতে পারে। এখন এ পরীক্ষাগৃহে যে ব্যক্তি নিশ্চিন্তে বসে থাকে এবং কতবড় দায়িত্বের বোঝা যে সে মাথায় তুলে নিয়েছে, আর দুনিয়ার জীবনে নিজের জন্য কোন নীতি নির্বাচন করার সময় যে ফায়সালা সে করে তার সঠিক বা ভুল হবার ফল কি দাঁড়ায় তার কোন অনুভূতিই যার থাকে না তাকেই আল্লাহ এ আয়াতে জালেম ও অজ্ঞ বলে অভিহিত করছেন। সে অজ্ঞ, কারণ সেই বোকা নিজেই নিজেকে অদায়িত্বশীল মনে করে নিয়েছে। আবার সে জালেম, কারণ সে নিজেই নিজের ধ্বংসের ব্যবস্থা করছে এবং নাজানি নিজের সাথে সে আরো কতজনকে নিয়ে ডুবতে চায়।

পরিশিষ্ট

[৭৭ টীকার সাথে সংশ্লিষ্ট]

বর্তমান যুগে একটি দল নতুন নবুওয়াতের ফিত্না সৃষ্টি করেছে। এরা "খাতামুন নাবিয়্যীন" শব্দের অর্থ করে "নবীদের মোহর।" এরা বুঝাতে চায় রসূলুল্লাহর (সা) পর তাঁর মোহরাংকিত হয়ে আরো অনেক নবী দুনিয়ায় আগমন করবেন। অথবা অন্য কথায় বলা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত কারো নবুওয়াত রসূলুল্লাহর মোহরাংকিত না হয়, ততক্ষণ তিনি নবী হতে পারবেন না।

কিন্তু "খাতামুন নাবিয়্যীন" শব্দ সম্বলিত আয়াতটি যে ঘটনা পরম্পরায় বিবৃত হয়েছে, তাকে সেই বিশেষ পরিবেশে রেখে বিচার করলে, তা থেকে এ অর্থ গ্রহণের কোন সুযোগই দেখা যায় না। অধিকন্তু এ অর্থ গ্রহণ করার পর এ পরিবেশে শব্দটির ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাই বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্যেরও পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।[১] এটা কি নিতান্ত অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক কথা নয় যে, যয়নবের নিকাহর বিরুদ্ধে উত্থিত প্রতিবাদ এবং তা থেকে সৃষ্ট নানাপ্রকার সংশয়-সন্দেহের জবাব দিতে দিতে হঠাৎ মাঝখানে বলে দেয়া হলো ঃ মুহাম্মাদ (সা) নবীদের মোহর। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যত নবী আসবেন তাঁরা সবাই তাঁরই মোহরাংকিত হবেন। আগে পিছের এ ঘটনার মাঝখানে একথাটির আকস্মিক আগমন শুধু অবান্তরই নয়, এ থেকে প্রতিবাদকারীদের জবাবে যে যুক্তি পেশ করা হচ্ছিল, তাও দুর্বল হয়ে পড়ে। এহেন পরিস্থিতিতে প্রতিবাদকারীদের হাতে একটা চমৎকার সুযোগ আসতো এবং তারা সহজেই বলতে পারতো যে, আপনার জীবনে যদি এ কাজটা সম্পন্ন না করতেন, তাহলে ভালই হতো, কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকতো না, এই বদ রসমটা বিলুপ্ত করার যদি এতোই প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে আপনার পরে আপনার মোহরাংকিত হয়ে যেসব নবী আসবেন, এ কাজটা তাঁদের হাতেই সম্পন্ন হবে।

উল্লেখিত দলটি শব্দটির আর একটি বিকৃত অর্থ নিয়েছে ঃ "খাতামুন নাবিয়্যীন" অর্থ হলো ঃ "আফজালুন নাবিয়্যীন।" অর্থাৎ নবুওয়াতের দরজা উন্মুক্তই রয়েছে, তবে কিনা নবুওয়াত পূর্ণতা লাভ করেছে রসূলুল্লাহর ওপর। কিন্তু এ অর্থ গ্রহণ করতে গিয়েও পূর্বোল্লিখিত বিভ্রান্তির পুনরাবির্ভাবের হাত থেকে নিস্তার নেই। অগ্রপশ্চাতের সাথে এরও কোন সম্পর্ক নেই। বরং এটি পূর্বাপরের ঘটনা পরম্পরার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থবহ। কাফের ও মুনাফিকরা বলতে পারতো ঃ "জনাব, আপনার চাইতে কম মর্যাদার হলেও আপনার পরে যখন আরো নবী আসছেন, তখন এ কাজটা না হয় তাদের ওপরই ছেড়ে দিতেন। এ বদ রসমটাও যে আপনাকেই মিটাতে হবে, এরই বা কি এমন আবশ্যকতা আছে!"

১. বর্ণনার ধারাবাহিকতা অনুধাবন করার জন্য এ সূরার ৬৭ থেকে ৭৯ টীকার আলোচনাও সামনে রাখা দরকার।

আভিধানিক অর্থ

তাহলে পূর্বাপর ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে একথা নিসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এখানে 'খাতামুন নাবিয়্যীন' শব্দের অর্থ নবুওয়াতের সিলসিলার পরিসমাপ্তি ঘোষণা অর্থাৎ রসূলুল্লাহর (সা) পর আর কোন নবী আসবেন না। কিন্তু শুধু পূর্বাপর সম্বন্ধের দিক দিয়েই নয়, আভিধানিক অর্থের দিক দিয়েও এটিই একমাত্র সত্য। আরবী অভিধান এবং প্রবাদ অনুযায়ী 'খতম'; শব্দের অর্থ হলো ঃ মোহর লাগানো, বন্ধ করা, শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া এবং কোন কাজ শেষ করে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করা।

খাতামাল আমাল (خَتَمَ الْعَمَلَ) অর্থ হলো ঃ ফারাগা মিনাল আমাল (فَرَغَ مِنَ الْعَمَلِ) অর্থাৎ কাজ শেষ করে ফেলেছে।

খাতামাল এনায়া (خَتَمَ الاِنَاءَ) অর্থ হলো ঃ পাত্রের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে এবং তার ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে, যাতে করে তার ভেতর থেকে কোন জিনিস বাইরে আসতে এবং বাইরে থেকে কিছু ভেতরে যেতে না পারে।

খাতামাল কিতাব (خَتَمَ الْكِتَابَ) অর্থ হলো ঃ পত্র বন্ধ করে তার ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে, ফলে পত্রটি সংরক্ষিত হবে।

খাতামা আলাল কাল্‌ব (خَتَمَ عَلَى الْقَلْبِ) অর্থ হলো ঃ দিলের ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে। এরপর কোন কথা আর সে বুঝতে পারবে না এবং তার ভেতরের জমে থাকা কোন কথা বাইরে বেরুতে পারবে না।

খিতামু কুল্লি মাশরুব (خِتَامُ كُلِّ مَشْرُوبٍ) অর্থ হলো ঃ কোন পানীয় পান করার পর শেষে যে স্বাদ অনুভূত হয়।

খাতিমাতু কুল্লি শাইয়িন আকিবাতুহু ওয়া আখিরাতুহু (خَاتِمَةُ كُلِّ شَيْءٍ عَاقِبَتُهُ وَاٰخِرَتُهُ) অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসের খাতিমা অর্থ হলো তার পরিণাম এবং শেষ।

খাতামাশ্ শাইয়্যি বালাগা আখিরাহ (خَتَمَ الشَّيْءَ ، بَلَغَ اٰخِرَهُ) অর্থাৎ কোন জিনিসকে খতম করার অর্থ হলো তার শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। খত্‌মে কুরআন বলতে এ অর্থ গ্রহণ করা হয় এবং এ অর্থের ভিত্তিতে প্রত্যেক সূরার শেষ আয়াতকে বলা হয় 'খাওয়াতিম'।

খাতামুল কওমে আখেরুহুম (خَاتَمُ الْقَوْمِ اٰخِرُهُمْ) অর্থাৎ খাতামুল কওম অর্থ জাতির শেষ ব্যক্তি (দ্রষ্টব্য ঃ লিসানুল আরব, কামুস এবং আকরাবুল মাওয়ারিদ।)[১]

এ জন্যই সমস্ত অভিধান বিশারদ এবং তাফসীরকারগণ একযোগে "খাতামুন নাবিয়্যীন" শব্দের অর্থ নিয়েছেন, আখেরুন নাবিয়্যীন অর্থাৎ নবীদের শেষ। আরবী অভিধান এবং প্রবাদ অনুযায়ী 'খাতাম'–এর অর্থ ডাকঘরের মোহর নয়, যা চিঠির ওপর লাগিয়ে চিঠি পোষ্ট করা হয়; বরং সেই মোহর যা খামের মুখে এ উদ্দেশ্যে লাগানো হয় যে, তার ভেতর থেকে কোন জিনিস বাইরে বেরুতে পারবে না এবং বাইরের কোন জিনিস ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না।

১. এখানে আমি মাত্র তিনটি অভিধানের উল্লেখ করলাম। কিন্তু শুধু এই তিনটি অভিধানই কেন, আরবী ভাষায় যে কোন নির্ভরযোগ্য অভিধান খুলে দেখুন, সেখানে 'খতম' শব্দের উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যাই

খতমে নবুওয়াত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি

পূর্বাপর সম্বন্ধ এবং আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে শব্দটির যে অর্থ হয়, রসূলুল্লাহর (সা) বিভিন্ন ব্যাখ্যাও তা সমর্থন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে কতিপয় অত্যন্ত নির্ভুল হাদীসের উল্লেখ করছি ঃ

(١) قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ - كُلَّمَا هَلَكَ نَبِى خَلَفَهُ نَبِىٌّ ، وَاِنَّهُ لَا نَبِىَّ بَعْدِى وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءَ - (بخارى ، كتاب المناقب ، باب ماذكر عن بنىٔ اسرائيل)

পাবেন। কিন্তু 'খত্মে নবুওয়াত' অস্বীকারকারীরা আল্লাহর দীনের সুরক্ষিত গৃহে সিঁদ কাটার জন্য এর আভিধানিক অর্থকে পূর্ণরূপে এড়িয়ে গেছেন। তারা বলতে চান, কোন ব্যক্তিকে 'খাতামুশ শো'য়ারা', 'খাতামুল ফোকাহা' অথবা 'খাতামুল মুফাস্সিরীন' বললে এ অর্থ গ্রহণ করা হয় না যে, যাকে ঐ পদবী দেয়া হয়, তার পরে আর কোন শায়ের তথা কবি, ফকিহ্ অথবা মুফাস্সির পয়দা হননি। বরং এর অর্থ এই হয় যে, ঐ ব্যক্তির ওপরে উল্লিখিত বিদ্যা অথবা শিল্পের পূর্ণতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অথবা কোন বস্তুকে অত্যধিক ফুটিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে এই ধরনের পদবী ব্যবহারের ফলে কখনো খতম-এর আভিধানিক অর্থ 'পূর্ণ' অথবা 'শ্রেষ্ঠ' হয় না এবং 'শেষ' অর্থে এর ব্যবহার ত্রুটিপূর্ণ বলেও গণ্য হয় না। একমাত্র ব্যাকরণ-রীতি সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিই এ ধরনের কথা বলতে পারেন। কোন ভাষারই নিয়ম এ নয় যে, কোন একটি শব্দ তার আসল অর্থের পরিবর্তে কখনো কখনো দূর সম্পর্কের অন্য কোন অর্থে ব্যবহৃত হলে সেটাই তার আসল অর্থে পরিণত হবে এবং আসল আভিধানিক অর্থে তার ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। আপনি যখন কোন আরবের সম্মুখে বলবেন ঃ جَاءَ خَاتَمُ الْقَوْمِ (জাআ খাতামুল কওম)—তখন কখনো সে মনে করবে না যে, গোত্রের শ্রেষ্ঠ অথবা কামেল ব্যক্তি এসেছে। বরং সে মনে করবে যে, গোত্রের সবাই এসে গেছে, এমনকি অবশিষ্ট শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্তও।

এই সংগে একথাটিও সামনে রাখতে হবে যে, কোন কোন লোককে যে "খাতামুশ শো'য়ারা" "খাতামুল ফুকাহা" ও "খাতামুল মুহাদ্দিসীন" উপাধিগুলো দেয়া হয়েছে সেগুলো মানুষরাই তাদেরকে দিয়েছে। আর মানুষ যে ব্যক্তিকে কোন গুণের ক্ষেত্রে "শেষ" বলে দিচ্ছে তার পরে ঐ গুণ সম্পন্ন আর কেউ জন্মাবে কিনা তা সে কখনোই জানতে পারে না। তাই মানুষের কথায় এ ধরনের উপাধির অর্থ নিছক বাড়িয়ে বলা এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতার স্বীকৃতি ছাড়া আর বেশী কিছু হতে পরে না। কিন্তু আল্লাহ যখন কারো ব্যাপারে বলে দেন যে, অমুক গুণটি অমুক ব্যক্তি পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে তখন তাকে মানুষের কথার মতো উপমা বা রূপক মনে করে নেবার কোন কারণ নেই। আল্লাহ যদি কাউকে শেষ কবি বলে দিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চিন্তভাবে তারপর আর কোন কবি হতে পারে না। আর তিনি যাকে শেষ নবী বলে দিয়েছেন তাঁর পরে আর কোন নবী হওয়াই অসম্ভব। কারণ, আল্লাহ হচ্ছেন 'আলিমুল গাইব' এবং মানুষ আলিমুল গাইব নয়। আল্লাহর কাউকে 'খাতামুন নাবিয়্যীন' বলে দেয়া এবং মানুষের কাউকে 'খাতামুশ শোয়ারা বা খাতামুল ফুকারা', বলে দেয়া কেমন করে একই পর্যায়ভুক্ত হতে পারে?

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ বনী ইস্রাঈলের নেতৃত্ব করতেন আল্লাহর রসূলগণ। যখন কোন নবী ইন্তেকাল করতেন, তখন অন্য কোন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে কোন নবী হবে না, শুধু খলীফা।

(٢) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مَثَلِى وَمَثَلُ الاَنْبِيَاءِ مِن قَبلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنى بَيتًا فَاَحْسَنَهُ وَاَجْمَلَهُ اِلاَّ مَوْضَعِ لِبْنَةٍ مِّنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهِ وَيُعْجِبُوْنَ لَهُ وَيَقُوْلُوْنَ هَلاَّ وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبْنَةُ فَانَا اللَّبْنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ - (بخارى كتاب المناقب - باب خاتم النبيين)

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত হলো এই যে, এক ব্যক্তি একটি দালান তৈরি করলো এবং খুব সুন্দর ও শোভনীয় করে সেটি সজ্জিত করলো। কিন্তু তার এক কোণে একটি ইটের স্থান শূন্য ছিল। দালানটির চতুর্দিকে মানুষ ঘুরে ঘুরে তার সৌন্দর্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করছিল এবং বলছিল, "এ স্থানে একটা ইট রাখা হয়নি কেন? বস্তুত আমি সেই ইট এবং আমিই শেষ নবী।" (অর্থাৎ আমার আসার পর নবুওয়াতের দালান পূর্ণতা লাভ করেছে, এখন এর মধ্যে এমন কোন শূন্যস্থান নেই যাকে পূর্ণ করার জন্য আবার কোন নবীর প্রয়োজন হবে।)

এই বক্তব্য সম্বলিত চারটি হাদীস মুসলিম শরীফে কিতাবুল ফাযায়েলের বাবু খাতামুন নাবিয়্যীনে উল্লেখিত হয়েছে। এবং শেষ হাদীসটিতে এতোটুকু অংশ বর্ধিত হয়েছে ঃ فَجِئْتُ فَخَتَمْتُ الاَنْبِيَاءَ "অতপর আমি এলাম এবং আমি নবীদের সিলসিলা খতম করে দিলাম।"

হাদীসটি তিরমিযী শরীফে একই শব্দ সম্বলিত হয়ে 'কিতাবুল মানাকিবের বাবু ফাদ্লিন নাবী' এবং কিতাবুল আদাবের 'বাবুল আমসালে' বর্ণিত হয়েছে।

মুসনাদে আবু দাউদ তিয়ালাসীতে হাদীসটি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত হাদীসের সিলসিলায় উল্লেখিত হয়েছে এবং এর শেষ অংশটুকু হলো خُتِمَ بِىَ الاَنْبِيَاءُ "আমার মাধ্যমে নবীদের সিলসিলা খতম করা হলো।"

মুসনাদে আহমাদে সামান্য শাব্দিক হেরফেরের সাথে এই বক্তব্য সম্বলিত হাদীস হযরত উবাই ইবনে কা'ব, হযরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে।

(٣) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُضِّلْتُ عَلَى الاَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ اُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ و اُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ ،

وَجُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُوْرًا ، وَاُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَّخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ - (مسلم - ترمذى - ابن ماجه)

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "ছ'টা ব্যাপারে অন্যান্য নবীদের ওপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে ঃ (১) আমাকে পূর্ণ অর্থব্যঞ্জক সংক্ষিপ্ত কথা বলার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে। (২) আমাকে শক্তিমত্তা ও প্রতিপত্তি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। (৩) যুদ্ধলব্ধ অর্থ-সম্পদ আমার জন্য হালাল করা হয়েছে। (৪) পৃথিবীর যমীনকে আমার জন্য মসজিদে (অর্থাৎ আমার শরীয়াতে নামায কেবল বিশেষ ইবাদাতগাহে নয়, দুনিয়ার প্রত্যেক স্থানে পড়া যেতে পারে) এবং মাটিকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে (শুধু পানিই নয়, মাটির সাহায্যে তায়াম্মুম করেও পবিত্রতা হাসিল অর্থাৎ অজু এবং গোসলের কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে) পরিণত করা হয়েছে। (৫) সমগ্র দুনিয়ার জন্য আমাকে রসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে এবং (৬) আমার ওপর নবীদের সিলসিলা খতম করে দেয়া হয়েছে।"

(٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الرِّسَالَةَ وَ النُّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُوْلَ بَعْدِيْ وَلَا نَبِيٌّ - (ترمذى - كتاب الرؤيا ، باب ذهاب النبوة - مسند احمد ، مرويات انس بن مالك رض)

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "রিসালাত এবং নবুওয়াতের সিলসিলা খতম করে দেয়া হয়েছে। আমার পর আর কোন রসূল এবং নবী আসবে না।"

(٥) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا مُحَمَّدٌ ، وَاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِي الَّذِيْ يُمْحٰى بِيَ الْكُفْرُ ، وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِيْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى عَقِبِيْ ، وَاَنَا الْعَاقِبُ الَّذِيْ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ - (بخارى و مسلم ، كتاب الفضائل - باب اسماء النبى- ترمذى ، كتاب الاداب ، باب اسماء النبى- مؤطاء - كتاب اسماء النبى - المستدرك للحاكم ، كتاب التاريخ ، باب اسماء النبى)

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "আমি মুহাম্মাদ। আমি আহমাদ। আমি বিলুপ্তকারী, আমার সাহায্যে কুফরকে বিলুপ্ত করা হবে। আমি সমবেতকারী, আমার পরে লোকদেরকে হাশরের ময়দানে সমবেত করা হবে (অর্থাৎ আমার পরে শুধু কিয়ামতই বাকি আছে) আমি সবার শেষে আগমনকারী (এবং সবার শেষে আগমনকারী হলো সেই) যার পরে আর নবী আসবে না।"

(٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا اِلَّا حَذَّرَ

أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ وَأَنَا اٰخِرُ الْاَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ اٰخِرُ الْاُمَمِ وَهُوَ خَارِجٌ فِيْكُمْ لَا مَحَالَةَ - (ابن ماجه - كتاب الفتن ، باب الدجال)

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "আল্লাহ নিশ্চয়ই এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি তাঁর উম্মাতকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। (কিন্তু তাদের যুগে সে বহির্গত হয়নি) এখন আমিই শেষ নবী এবং তোমরা শেষ উম্মাত। দাজ্জাল নিসন্দেহে এখন তোমাদের মধ্যে বহির্গত হবে।"

(٧) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وبْنِ العاصِ يَقُوْلُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا كَالْمُوَدِّعِ فَقَالَ اَنَا مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ الْاُمِّيُّ ثَلَاثًا وَلَا نَبِيَّ بَعْدِيْ - (مسند احمد- مرويات - عبد اللّٰه بن عمروبن العاص)

আবদুর রহমান ইবনে জোবায়ের বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে আ'সকে বলতে শুনেছি, একদিন রসূলুল্লাহ (সা) নিজের গৃহ থেকে বরে হয়ে আমাদের মধ্যে তাশরীফ আনলেন। তিনি এভাবে আসলেন যেন আমাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তিনবার বললেন, আমি উম্মী নবী মুহাম্মাদ। অতপর বললেন, আমার পর আর কোন নবী নেই।

(٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِيْ اِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ قِيْلَ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ - اَوْ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ - (مسند احمد ، مرويات ابو الطفيل - نسائى ابو داؤد)

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমার পরে আর কোন নবুওয়াত নেই। আছে সুসংবাদ দানকারী ঘটনাবলী। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল, সুসংবাদ দানকারী ঘটনাগুলো কি? জবাবে তিনি বললেন ঃ ভালো স্বপ্ন। অথবা বললেন, কল্যাণময় স্বপ্ন। (অর্থাৎ আল্লাহর অহী নাযিল হবার এখন আর সম্ভাবনা নেই। বড় জোর এতোটুকু বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যদি কাউকে কোন ইঙ্গিত দেয়া হয়, তাহলে শুধু ভালো স্বপ্নের মাধ্যমেই তা দেয়া হবে)।

(٩) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ بَعْدِيْ نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُبْنِ الْخَطَّابِ - (ترمذى - كتاب المناقب)

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমার পরে যদি কোন নবী হতো, তাহলে উমর ইবনে খাত্তাব সে সৌভাগ্য লাভ করতো।

(١٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ اَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى اِلاَّ اَنَّهُ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى - (بخارى ومسلم - كتاب فضائل الصحابه)

রসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলীকে (রা) বলেন ঃ আমার সাথে তোমার সম্পর্ক মূসার সাথে হারুনের সম্পর্কের মতো। কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী নেই।

বুখারী এবং মুসলিম তাবুক যুদ্ধের বর্ণনা প্রসংগেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমাদে এই বিষয়বস্তু সম্বলিত দু'টি হাদীস হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি বর্ণনার শেষাংশ হলো ঃ الا انه لانبوة بعدى "কিন্তু আমার পরে আর কোন নবুওয়াত নেই।" আবু দাউদ তিয়ালাসি, ইমাম আহমাদ এবং মুহাম্মাদ ইসহাক এ সম্পর্কে যে বিস্তারিত বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, তাবুক যুদ্ধে রওয়ানা হবার পূর্বে রসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলীকে (রা) মদীনা তাইয়্যেবার তত্ত্বাবধান এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেখে যাবার ফায়সালা করেন। এ ব্যাপারটি নিয়ে মুনাফিকরা বিভিন্ন ধরনের কথা বলতে থাকে। হযরত আলী (রা) রসূলুল্লাহকে (সা) বলেন, "হে আল্লাহর রসূল, আপনি কি আমাকে শিশু এবং নারীদের মধ্যে ছেড়ে যাচ্ছেন?" রসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন ঃ "আমার সাথে তোমার সম্পর্কতো মূসার সাথে হারুনের সম্পর্কের মতো। "অর্থাৎ তূর পর্বতে যাবার সময় হযরত মূসা (আ) যেমন বনী ইসরাঈলদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হযরত হারুনকে পেছনে রেখে গিয়েছিলেন অনুরূপভাবে মদীনার হেফাজতের জন্য আমি তোমাকে পেছনে রেখে যাচ্ছি। কিন্তু সংগে সংগে রসূলুল্লাহর মনে এই সন্দেহও জাগে যে, হযরত হারুনের সংগে এভাবে তুলনা করার ফলে হয়তো পরে এ থেকে কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই পরমুহূর্তেই তিনি কথাটা স্পষ্ট করে দেন এই বলে যে, "আমার পর আর কোন ব্যক্তি নবী হবে না।"

(١١) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ..... وَاَنَّهُ سَيَكُوْنَ فِى اُمَّتِى ثَلاَثُوْنَ كَذَّابُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهُ نَبِىٌّ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى (ابو داود - كتاب الفتن)

হযরত সাওবান বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আর কথা হচ্ছে এই যে, আমার উম্মাতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী হবে। তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবী করবে। অথচ আমার পর আর কোন নবী নেই।

এ বিষয়বস্তু সম্বলিত আর একটি হাদীস আবু দাউদ 'কিতাবুল মালাহেমে' হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযীও হযরত সাওবান এবং হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে এ হাদীস দু'টি বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় বর্ণনাটির শব্দ হলো এই ঃ

حَتّٰى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبٌ مِنْ ثَلاَثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰه -

অর্থাৎ এমন কি তিরিশ জনের মতো প্রতারক আসবে। তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই দাবী করবে যে, সে আল্লাহর রসূল।

(١٢) قال النبى صلى اللّٰه عليه وسلم لقد كان فيمن كان قبلكم من بنى اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكونوا انبياء فان يكن من امتى احد فعمر - (بخارى ، كتاب المناقب)

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তোমাদের পূর্বে অতিবাহিত বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে অনেক লোক এমন ছিলেন, যাঁদের সংগে কথা বলা হয়েছে, অথচ তাঁরা নবী ছিলেন না। আমার উম্মাতের মধ্যে যদি এমন কেউ হয়, তাহলে সে হবে উমর।

মুসলিমে এই বিষয়বস্তু সম্বলিত যে হাদীস উল্লেখিত হয়েছে, তাতে يكلمون -এর পরিবর্তে محدثون শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু মুকাল্লাম এবং মুহাদ্দাস শব্দ দু'টি সমার্থক। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যার সংগে আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন অথবা যার সাথে পর্দার পেছন থেকে কথা বলা হয়। এ থেকে জানা যায় যে, নবুওয়াত ছাড়াও যদি এই উম্মাতের মধ্যে কেউ আল্লাহর সাথে কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন করতো তাহলে তিনি একমাত্র হযরত উমরই হতেন।

(١٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى وَلاَ اُمَّةَ بَعْدَ اُمَّتِى (بيهقى ، كتاب الرؤيا - طبرانى)

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমার পরে আর কোন নবী নেই এবং আমার উম্মাতের পর আর কোন উম্মাত (অর্থাৎ কোন ভবিষ্যত নবীর উম্মাত) নেই।

(١٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِنِّى اٰخِرُ الاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ مَسْجِدِى اٰخِرُ الْمَسَاجِدِ - (مسلم ، كتاب الحج ، باب فضل الصلواة بـ مسجد مكة والمدينة)

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমি শেষ নবী এবং আমার মসজিদ (অর্থাৎ মসজিদে নববী) শেষ মসজিদ।[১]

রসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে বহু সাহাবী হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন এবং বহু মুহাদ্দিস অত্যন্ত শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য সনদসহ এগুলো উদ্ধৃত করেছেন। এগুলো অধ্যয়ন করার পর স্পষ্ট জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার করে একথা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, তিনি শেষ নবী। তাঁর পর কোন নবী আসবে না। নবুওয়াতের সিলসিলা তাঁর ওপর খতম হয়ে গেছে এবং তাঁর পরে যে ব্যক্তি রসূল অথবা নবী হবার দাবী করবে, সে হবে দাজ্জাল (প্রতারক) এবং কাজ্জাব ও মিথ্যুক।[২] কুরআনের "খাতামুন নাবিয়্যীন" শব্দের এর চাইতে বেশী শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণ্য ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে। রসূলুল্লাহর বাণীই এখানে চরম সনদ এবং প্রমাণ। উপরন্তু যখন তা কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা করে তখন আরো অধিক শক্তিশালী প্রমাণে পরিণত হয়। এখন প্রশ্ন হলো এই যে, মুহাম্মাদের (সা) চেয়ে বেশী কে কুরআনকে বুঝেছে এবং তাঁর চাইতে বেশী এর ব্যাখ্যার অধিকার কার আছে? এমন কে আছে যে, খতমে নবুওয়াতের অন্য কোন অর্থ বর্ণনা করবে এবং তা মেনে নেয়া তো দূরের কথা, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করতেও আমরা প্রস্তুত হবো?

১. খত্মে নবুওয়াত অস্বীকারীরা এ হাদীস থেকে প্রমাণ করে যে, রসূলুল্লাহ (সা) যেমন তাঁর মসজিদকে শেষ মসজিদ বলেছেন, অথচ এটি শেষ মসজিদ নয়; এরপরও দুনিয়ায় বেশুমার মসজিদ নির্মিত হয়েছে অনুরূপভাবে তিনি বলেছেন যে, তিনি শেষ নবী। এর অর্থ হলো এই যে, তাঁর পরেও নবী আসবেন। অবশ্য শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে তিনি হলেন শেষ নবী এবং তাঁর মসজিদ শেষ মসজিদ। কিন্তু আসলে এ ধরনের বিকৃত অর্থই একথা প্রমাণ করে যে, এ লোকগুলো আল্লাহ এবং রসূলের কালামের অর্থ অনুধাবন করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। মুসলিম শরীফের যে স্থানে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সেখানে এ বিষয়ের সমস্ত হাদীস সম্মুখে রাখলেই একথা পরিস্ফুট হবে যে, রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মসজিদকে শেষ মসজিদ কোন্ অর্থে বলেছেন। এখানে হযরত আবু হুরাইরা (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এবং হযরত মায়মুনার (রা) যে বর্ণনা ইমাম মুসলিম উদ্ধৃত করেছেন, তাতে বলা হয়েছে, দুনিয়ায় মাত্র তিনটি মসজিদ এমন রয়েছে যেগুলো সাধারণ মসজিদগুলোর ওপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। সেখানে নামায পড়লে অন্যান্য মসজিদের চেয়ে হাজার গুণ বেশী সওয়াব হাসিল হয় এবং এ জন্য একমাত্র এ তিনটি মসজিদে নামায পড়ার জন্য সফর করা জায়েয। দুনিয়ার অবশিষ্ট মসজিদগুলোর মধ্যে সমস্ত মসজিদকে বাদ দিয়ে বিশেষ করে একটি মসজিদে নামায পড়বার জন্য সেদিকে সফর করা জায়েয নয়। এর মধ্যে 'মসজিদুল হারাম' হলো প্রথম মসজিদ। হযরত ইবরাহীম (আ) এটি বানিয়েছিলেন। দ্বিতীয়টি হলো 'মসজিদে আক্সা' হযরত সুলাইমান (আ) এটি নির্মাণ করেছিলেন এবং তৃতীয়টি মদীনা তাইয়েবার 'মসজিদে নববী'। এটি নির্মাণ করেন রসূলুল্লাহ (সা)। রসূলুল্লাহর (সা) এরশাদের অর্থ হলো এই যে, এখন যেহেতু আমার পর আর কোন নবী আসবে না, সেহেতু আমার মসজিদের পর দুনিয়ায় আর চতুর্থ এমন কোন মসজিদ নির্মিত হবে না, যেখানে নামায পড়ার সওয়াব অন্যান্য মসজিদের তুলনায় বেশী হবে এবং সেখানে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে সেদিকে সফর করা জায়েয হবে।

২. শেষ নবুওয়াতে অবিশ্বাসীরা নবী করিমের (সা) হাদীসের বিপরীতে হযরত আয়েশার (রা) বলে কথিত নিম্নোক্ত বর্ণনার উদ্ধৃতি দেয় ঃ "বল নিশ্চয়ই তিনি খাতামুন নাবিয়্যীন, একথা বলো না যে তার পর নবী নেই।" প্রথমত নবী করিমের (সা) সুস্পষ্ট আদেশকে অস্বীকার করার জন্য হযরত আয়েশার (রা)

সাহাবীদের ইজমা

কুরআন এবং সুন্নাহর পর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা বা মতৈক্য হলো তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমস্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহর (সা) ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই যেসব লোক নবুওয়াতের দাবী করে এবং যারা তাদের নবুওয়াত স্বীকার করে নেয়, তাদের সবার বিরুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করেছিলেন। এ সম্পর্কে মুসাইলামা কাজ্জাবের ব্যাপারটি বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য। সে রসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত অস্বীকার করছিল না; বরং সে দাবী করেছিল যে, রসূলুল্লাহর নবুওয়াতে তাকেও অংশীদার করা হয়েছে। রসূলুল্লাহর ইন্তেকালের পূর্বে সে তাঁর নিকট যে চিঠি পাঠিয়েছিল তার আসল শব্দ হলো এই ঃ

مِنْ مُسَيْلَمَةَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلٰى مُحَمَّدٍ رَّسُوْلُ اللّٰهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ فَاِنِّى اُشْرِكْتُ فِى الْاَمْرِ مَعَكَ (طبرى ، جلد ٢ ، صفحه ٣٩٩ ، طبع مصر)

"আল্লাহ্‌র রসূল মুসাইলামার তরফ হতে আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মাদের নিকট। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আপনি জেনে রাখুন, আমাকে আপনার সাথে নবুওয়াতের কাজে শরীক করা হয়েছে।"

এ ছাড়াও ঐতিহাসিক তাবারী একথাও বর্ণনা করেছেন যে, মুসাইলামার ওখানে যে আযান দেয়া হতো তাতে اشهد ان محمدا رسول الله শব্দাবলীও বলা হতো। এভাবে স্পষ্ট করে রিসালাতে মুহাম্মাদীকে স্বীকার করে নেবার পরও তাকে কাফের ও ইসলামী মিল্লাত বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে। ইতিহাস থেকে একথাও প্রমাণ হয় যে, বনু হোনায়ফা সরল অন্তকরণে তার ওপর ঈমান এনেছিল। অবশ্য তারা এই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছিল যে, মুহাম্মাদ (সা) নিজেই তাকে তাঁর নবুওয়াতের কাজে শরীক করেছেন। এ ছাড়াও আর একটা কথা হলো এই যে, মদীনা তাইয়্যেবা থেকে এক ব্যক্তি কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করেছিল এবং বনু হোনায়ফার নিকটে গিয়ে সে কুরআনের আয়াতকে মুসাইলামার নিকট অবতীর্ণ আয়াতরূপে পেশ করেছিল। (البداية والنهاية لابن كثير - جلدة صفحه ٠١) কিন্তু এ সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম তাকে মুসলমান বলে স্বীকার করেননি এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। অতপর একথা বলার সুযোগ নেই যে, ইসলাম বহির্ভূত হবার কারণে সাহাবীগণ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেননি বরং বিদ্রোহ ঘোষণা করার কারণেই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা

উদ্ধৃতি দেয়া একটা ধৃষ্টতা। অধিকন্তু হযরত আয়েশার (রা) বলে কথিত উপরোক্ত উদ্ধৃতি মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। হাদীস শাস্ত্রের কোন প্রামাণিক গ্রন্থেই হযরত আয়েশার (রা) উপরোক্ত উক্তির উল্লেখ নেই। কোন বিখ্যাত হাদীস লিপিবদ্ধকারী এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ বা উল্লেখ করেননি। উপরোক্ত হাদীসটি 'দুররি মানসূর' নামক তাফসীর এবং 'তাকমিলাহ মাজমা-উল-বিহার' নামক অপরিচিত হাদীস সংকলন থেকে নেয়া হয়েছে; কিন্তু এর উৎপত্তি বা বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই। রসূল (সা)-এর সুস্পষ্ট হাদীস যা বিখ্যাত হাদীস বর্ণনাকারীরা খুবই নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে বর্ণনা করেছেন, তাকে অস্বীকার করার জন্য হযরত আয়েশার (রা) উক্তির, যা দুর্বলতম সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ চূড়ান্ত ধৃষ্টতা মাত্র।

হয়েছিল। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে বিদ্রোহী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হলেও তাদের যুদ্ধবন্দীদেরকে গোলামে পরিণত করা যেতে পারে না। বরং শুধু মুসলমানই নয় জিম্মীও (অমুসলিম) বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, গ্রেফতার করার পর তাকে গোলামে পরিণত করা জায়েয নয়। কিন্তু মুসাইলামা এবং তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ঘোষণা করেন যে, তাদের মেয়েদের এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদেরকে গোলাম বানানো হবে এবং গ্রেফতার করার পর দেখা গেলো, সত্যি সত্যিই তাদেরকে গোলাম বানানো হয়েছে। হযরত আলী (রা) তাদের মধ্য থেকেই জনৈক যুদ্ধ বন্দিনীর মালিক হন। এই যুদ্ধ বন্দিনীর গর্ভজাত পুত্র মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়াই[১] হলেন পরবর্তীকালে ইসলামের ইতিহাসে সর্বজন পরিচিত ব্যক্তি। (البداية والنهاية جلد ٢ - صفحه ٣١٦ - ٣٢٠) এ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম যে অপরাধের কারণে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তা কোন বিদ্রোহের অপরাধ ছিল না বরং সে অপরাধ ছিল এই যে, এক ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে নবুওয়াতের দাবী করে এবং অন্য লোকেরা তার নবুওয়াতের ওপর ঈমান আনে। রসূলুল্লাহ্‌র ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই এই পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এর নেতৃত্ব দেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক(রা) এবং সাহাবীদের সমগ্র দলটি একযোগে তাঁর নেতৃত্বাধীনে এ কাজে অগ্রসর হন। সাহাবীদের ইজমার এর চাইতে সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে।

উম্মাতের সমগ্র আলেম সমাজের ইজমা

শরীয়াতে সাহাবীদের ইজমার পর চতুর্থ পর্যায়ের সবচাইতে শক্তিশালী দলিল হলো সাহাবীগণের পরবর্তী কালের আলেম সমাজের ইজমা। এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, হিজরীর প্রথম শতাব্দী থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগের এবং সমগ্র মুসলিম জাহানের প্রত্যেক এলাকার আলেম সমাজ হামেশাই এ ব্যাপারে একমত রয়েছেন যে, "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে কোন ব্যক্তি নবী হতে পারে না। এবং তাঁর পর যে ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করবে এবং যে ব্যক্তি এই মিথ্যা দাবীকে মেনে নেবে, সে কাফের এবং মিল্লাতে ইসলামের মধ্যে তার স্থান নেই।"

এ ব্যাপারে আমি কতিপয় প্রমাণ পেশ করছি ঃ

(১) ইমাম আবু হানীফার যুগে (৮০—১৫০ হি) এক ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করে এবং বলে ঃ "আমাকে সুযোগ দাও, আমি নবুওয়াতের সংকেত চিহ্ন পেশ করব।"

একথা শুনে ইমাম সাহেব বলেন ঃ যে ব্যক্তি এর কাছ থেকে নবুওয়াতের কোন সংকেত চিহ্ন তলব করবে সেও কাফের হয়ে যাবে। কেননা রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ لَانَبِيَ بَعْدِيْ "আমার পর আর কোন নবী নেই।"

১. হানাফিয়া নামে বনু হানাফিয়্যা গোত্রের মহিলা।

(২) আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী (২২৪—৩১০ হিঃ) তাঁর বিখ্যাত কুরআনের তাফসীরে (ولكن رسول الله وخاتم النبيين) আয়াতটির বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

اَلَّذِىْ خَتَمَ النُّبُوَّةَ فَطُبِعَ عَلَيْهَا فَلاَ تُفْتَحُ لاَحَدٍ بَعْدَهُ اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ -

"যে নবুওয়াতকে খতম করে দিয়েছে এবং তার ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত এর দরজা আর কারো জন্য খুলবে না।" (তাফসীরে ইবনে জারীর, ২২ খণ্ড, ১২ পৃষ্ঠা)

(৩) ইমাম তাহাবী (হিঃ ২৩৯—৩২১) তাঁর 'আকীদাতুস সালাফীয়া' গ্রন্থে সালাফে সালেহীন (প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ সৎকর্মশীলগণ) এবং বিশেষ করে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহেমাহুমুল্লাহর আকিদা বিশ্বাস বর্ণনা প্রসংগে নবুওয়াত সম্পর্কিত এ বিশ্বাস লিপিবদ্ধ করেছেন যে, "আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা, নির্বাচিত নবী ও পছন্দনীয় রসূল এবং শেষ নবী, মুত্তাকীদের ইমাম, রসূলদের সরদার ও রব্বুল আলামীনের বন্ধু। আর তাঁর পর নবুওয়াতের প্রত্যেকটি দাবী পথভ্রষ্টতা এবং প্রবৃত্তির লালসার বন্দেগী ছাড়া আর কিছুই নয়।" (শারহুত তাহাবীয়া ফিল আকীদাতিস সালাফিয়া, দারুল মা'আরিফ মিসর, ১৫, ৮৭, ৯৬, ৯৭, ১০০ ও ১০২ পৃষ্ঠা)

(৪) আল্লামা ইবনে হাজাম আন্দালুস (৩৮৪—৪৫৬ হিঃ) লিখেছেন ঃ নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহর ইন্তেকালের পর অহীর সিলসিলা খতম হয়ে গেছে। এর সপক্ষে যুক্তি এই যে, অহী আসে একমাত্র নবীর কাছে এবং মহান আল্লাহ বলেছেন, "মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নয়। কিন্তু সে আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নবী" (আল মুহাল্লা, প্রথম খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা)

(৫) ইমাম গায্যালী বলেন ঃ (৪৫০—৫০৫ হিঃ)[১]

لو فتح هذا الباب (اى باب انكار كون الاجماع حجة) انجو الى امور شنيعة وهو ان قائلا لو قال يجوز ان يبعث رسول بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيبعد التوقف فى تكفيره ، ومستبعد استحالة ذالك عند البحث تستمد من الاجماع لا محالة ، فان العقل لا يحيله ، وما نقل فيه من قوله لا نبى بعدى ، ومن قوله تعالى خاتم النبيين ، فلا يعجز هذا القائل عن تاويله ، فيقول

১. ইমাম গাজ্জালীর এ অভিমতটি এর মূল ইবারত সহকারে এখানে উদ্ধৃত করছি এ জন্য যে, খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারীরা এ বরাতের নির্ভুলতাকে জোরে শোরে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

خاتم النبيين اراد به اولوا العزم من الرسل ، فان قالوا النبيين عام ، فلا يبعد تخصيص العام ، وقوله لا نبى بعدى لم يرد به الرسول وفرق بين النبى والرسول والنبى اعلى مرتبة من الرسول الى غير ذالك من انواع الهذيان ، فهذا وامثاله لا يمكن ان ندعى استحالته ، من حيث مجرد اللفظ ، فانا فى تاويل ظواهر التشبيه فضينا باحتمالات ابعد من هذه ، ولم يكن ذالك مبطلا للنصوص ، ولكن الرد على هذا القائل ان الامة فهمت بالاجماع من هذا اللفظ ومن قرائن احواله انه افهم عدم نبى بعده ، ابدا وعدم رسول اللّه ابدا وانه ليس فيه تاويل ولا تخصيص فمنكر هذا لايكون الا منكر الاجماع (الاقتصاد فى الاعتقاد المطبعة الادبيه ، مصر ، ص ١١٤)

"যদি এ দরোজাটি (অর্থাৎ ইজমাকে প্রমাণ হিসেবে মানতে অস্বীকার করার দরোজা) খুলে দেয়া হয় তাহলে বড়ই ন্যক্কারজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। যেমন যদি কেউ বলে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে অন্য কোন নবীর আগমন অসম্ভব নয়, তাহলে তাকে কাফের বলার ব্যাপারে ইতস্তত করা যেতে পারে না। কিন্তু বিতর্কের সময় যে ব্যক্তি তাকে কাফের আখ্যায়িত করতে ইতস্তত করাকে অবৈধ প্রমাণ করতে চাইবে তাকে অবশ্যই ইজমার সাহায্য নিতে হবে। কারণ নিরেট যুক্তি দ্বারা তার অবৈধ হবার ফায়সালা করা যায় না। আর কুরআন ও হাদীসের বাণীর ব্যাপারে বলা যায়, এ মতে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি "আমার পরে আর কোন নবী নেই" এবং "নবীদের মোহর" এ উক্তি দু'টির নানা রকম চুলচেরা ব্যাখ্যা করতে অক্ষম হবে না। সে বলবে, "খাতামুন নাবীয়্যীন" মানে হচ্ছে অতীব মর্যাদাবান নবীদের আগমন শেষ হয়ে যাওয়া। আর যদি বলা হয়, "নবীগণ" শব্দটি দ্বারা সাধারণভাবে সকল নবীকে বুঝানো হয়েছে, তাহলে এই 'সাধারণ' থেকে 'অসাধারণ ও ব্যতিক্রমী' বের করা তার জন্য মোটেই কঠিন হবে না। "আমার পর আর নবী নেই" এ ব্যাপারে সে বলে দেবে, "আমার পর আর রসূল নেই" একথা তো বলা হয়নি। রসূল ও নবীর মধ্যে পার্থক্য আছে। নবীর মর্যাদা রসূলের চেয়ে বেশী। মোটকথা এ ধরনের আজেবাজে উদ্ভট কথা অনেক বলা যেতে পারে। আর নিছক শাব্দিক দিক দিয়ে এ ধরনের চুলচেরা ব্যাখ্যাকে আমরা একেবারে অসম্ভবও বলি না। বরং বাহ্যিক উপমার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমরা এর চেয়েও দূরবর্তী সম্ভাবনার অবকাশ স্বীকার করি। আর এ ধরনের

ব্যাখ্যাকারীদের সম্পর্কে আমরা একথাও বলতে পারি না যে, কুরআন হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য সে অস্বীকার করছে। কিন্তু এ অভিমতের প্রবক্তার বক্তব্য খণ্ডন করে আমি বলবো, মুসলিম উম্মাহ ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ শব্দ(অর্থাৎ আমার পরে আর কোন নবী নেই) থেকে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘটনাবলীর প্রমাণাদি থেকে একথাই বুঝেছে যে, নবী করীমের (সা) উদ্দেশ্য ছিল একথা বুঝানো যে, তাঁর পরে আর কখনো কোন নবী আসবে না এবং রসূলও আসবে না। এ ছাড়া মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারেও একমত যে, এর মধ্যে কোন তাবীল, ব্যাখ্যা ও বিশেষিত করারও কোন অবকাশ নেই। কাজেই এহেন ব্যক্তিকে ইজমা অস্বীকারকারী ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না।

(৬) মুহিউস সুন্নাহ বাগাবী (মৃত্যু ঃ ৫১০ হিঃ) তাঁর তাফসীরে মা'আলিমুত তানজীল–এ লিখেছেন ঃ রসূলুল্লাহর (সা) মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নবুওয়াতের সিলসিলা খতম করেছেন। কাজেই তিনি সর্বশেষ নবী এবং ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, মুহাম্মাদের (সা) পর কোন নবী নেই। (তৃতীয় খণ্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা)

(৭) আল্লামা যামাখশারী (৪৬৭—৫৩৮ হিঃ) তাফসীরে কাশশাফে লিখেছেন ঃ যদি তোমরা বল, রসূলুল্লাহ (সা) শেষ নবী কেমন করে হলেন, কেননা হযরত ঈসা (আ) শেষ যুগে অবতীর্ণ হবেন, তাহলে আমি বলবো, রসূলুল্লাহর শেষ নবী হবার অর্থ হলো এই যে, তাঁর পরে আর কাউকে নবীর পদে প্রতিষ্ঠিত করা হবে না। হযরত ঈসাকে (আ) রসূলুল্লাহর (সা) পূর্বে নবী বানানো হয়েছে। অবতীর্ণ হবার পর তিনি রসূলুল্লাহর অনুসারী হবেন এবং তাঁর কেবলার দিকে মুখ করে নামায পড়বেন। অর্থাৎ তিনি হবেন রসূলুল্লাহ্র (সা) উম্মাতের মধ্যে শামিল। (দ্বিতীয় খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা)

(৮) কাজী ইয়ায (মৃত্যু ঃ ৫৪৪ হিঃ) লিখেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজে নবুওয়াতের দাবী করে অথবা একথাকে বৈধ মনে করে যে, যে কোন ব্যক্তি নিজের প্রচেষ্টায় নবুওয়াত হাসিল করতে পারে এবং অন্তত পরিশুদ্ধির মাধ্যমে নবীর পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে (যেমন কোন কোন দার্শনিক এবং বিকৃতমনা সূফী মনে করেন) এবং এভাবে যে ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করে না অথচ একথার দাবী জানায় যে, তার ওপর অহী নাযিল হয়,—এ ধরনের সমস্ত লোক কাফের এবং তারা রসূলুল্লাহর নবুওয়াতকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করছে। কেননা তিনি খবর দিয়েছেন যে, তিনি শেষ নবী এবং তাঁর পর কোন নবী আসবে না এবং তিনি আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে এ খবর পৌঁছিয়েছেন যে, তিনি নবুওয়াতকে খতম করে দিয়েছেন এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য তাঁকে পাঠানো হয়েছে। সমগ্র মুসলিম সমাজ এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে কথাটির বাহ্যিক অর্থটিই গ্রহণীয় এবং এর দ্বিতীয় কোন অর্থ গ্রহণ করার সুযোগই এখানে নেই। কাজেই উল্লেখিত দলগুলোর কাফের হওয়া সম্পর্কে কুরআন, হাদীস এবং ইজমার দৃষ্টিতে কোন সন্দেহ নেই। (শিফা দ্বিতীয় খণ্ড, ২৭০—২৭১ পৃষ্ঠা)

(৯) আল্লামা শাহারিস্তানী (মৃত্যু ঃ ৫৪৮ হিঃ) তাঁর মশহুর কিতাব আল মিলাল ওয়ান নিহালে লিখেছেন ঃ এবং যে এভাবেই বলে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরও কোন নবী আসবে [হযরত ঈসা (আ) ছাড়া] তার কাফের হওয়া সম্পর্কে যে কোন দু'জন ব্যক্তির মধ্যেই কোন মতবিরোধ থাকতে পারে না। (তৃতীয় খণ্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা)

(১০) ইমাম রাযী (৫৪৩—৬০৬ হিঃ) তাঁর তাফসীরে কবীরে 'খাতামুন নাবিয়্যীন' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ এ বর্ণনায় খাতামুন নাবিয়্যীন শব্দ এ জন্য বলা হয়েছে যে, যে নবীর পর অন্য কোন নবী আসবেন তিনি যদি উপদেশ এবং নির্দেশাবলীর ব্যাখ্যার ব্যাপারে কিছু অতৃপ্তি রেখে যান, তাহলে তাঁর পর আগমনকারী নবী তা পূর্ণ করতে পারেন। কিন্তু যার পর আর কোন নবী আসবে না, তিনি নিজের উম্মাতের ওপর খুব বেশী স্নেহশীল হন এবং তাদেরকে সুস্পষ্ট নেতৃত্ব দান করেন। কেননা তাঁর দৃষ্টান্ত এমন এক পিতার ন্যায় যিনি জানেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর পুত্রের দ্বিতীয় কোন অভিভাবক এবং পৃষ্ঠপোষক থাকবে না। (ষষ্ঠ খণ্ড, ৫৮১ পৃষ্ঠা)

(১১) আল্লামা বায়যাবী (মৃত্যু ঃ ৬৮৫ হিঃ) তাঁর তাফসীরে আনওয়ারুত্ তানজীল–এ লিখেছেন ঃ অর্থাৎ তিনিই শেষ নবী। তিনি নবীদের সিলসিলা খতম করে দিয়েছেন। অথবা তাঁর কারণেই নবীদের সিলসিলার ওপর মোহর লাগানো হয়েছে। এবং তাঁর পর হযরত ঈসার (আ) নাযিল হবার কারণে খতমে নবুওয়াতের ওপর কোন দোষ আসছে না। কেননা তিনি রসূলুল্লাহর (সা) দীনের মধ্যেই নাযিল হবেন। (চতুর্থ খণ্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা)

(১২) আল্লামা হাফেয উদ্দীন নাসাফী (মৃত্যু ঃ ৮১০ হিঃ) তাঁর তাফসীরে মাদারেকুত তানজীল–এ লিখেছেন ঃ এবং রসূলুল্লাহ (সা) খাতামুন নাবিয়্যীন। অর্থাৎ তিনিই সর্বশেষ নবী। তাঁর পর আর কোন ব্যক্তিকে নবী করা হবে না। হযরত ঈসার (আ) ব্যাপার হলো এই যে, তাঁকে রসূলুল্লাহ্র পূর্বে নবীর পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এবং পরে যখন তিনি নাযিল হবেন, তখন তিনি হবেন রসূলুল্লাহর শরীয়াতের অনুসারী। অর্থাৎ তিনি হবেন রসূলুল্লাহ্র উম্মাত। (৪৭১ পৃষ্ঠা)

(১৩) আল্লামা আলাউদ্দীন বাগদাদী (মৃত্যু ঃ ৭২৬ হিঃ) তাঁর তাফসীরে 'খাজিন'–এ লিখেছেন ঃ وخاتم النبين অর্থাৎ আল্লাহ রসূলুল্লাহ্র নবুওয়াত খতম করে দিয়েছেন। কাজেই তাঁর পরে আর কোন নবুওয়াত নেই এবং এ ব্যাপারে কেউ তাঁর অংশীদারও নয়। وكان الله بكل شيى عليما অর্থাৎ 'আল্লাহ একথা জানেন যে, তাঁর পর আর কোন নবী নেই' (৪৭১—৪৭২ পৃষ্ঠা)

(১৪) আল্লামা ইবনে কাসীর (মৃত্যু ঃ ৭৭৪ হিঃ) তাঁর মশহুর তাফসীরে লিখেছেন ঃ অতপর আলোচ্য আয়াত থেকে একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, যখন রসূলুল্লাহ্র পর কোন নবী নেই, তখন অপর কোন রসূলেরও প্রশ্ন উঠতে পারে না। কেননা রিসালাত একটা বিশেষ পদমর্যাদা এবং নবুয়াতের পদমর্যাদা এর চাইতে বেশী সাধারণধর্মী। প্রত্যেক রসূল নবী হন, কিন্তু প্রত্যক নবী রসূল হন না। রসূলুল্লাহর পর যে ব্যক্তিই এই পদমর্যাদার দাবী করবে, সেই হবে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, দাজ্জাল এবং গোমরাহ। যতোই সে আলৌকিক ক্ষমতা ও যাদুর ক্ষমতাসম্পন্ন হোক না কেন, তার দাবী মানবার নয়। কিয়ামত পর্যন্ত যেসব ব্যক্তি এই পদমর্যাদার দাবী করবে, তাদের প্রত্যেকেরই অবস্থা হবে এই ধরনের। (তৃতীয় খণ্ড, ৪৯৩—৪৯৪ পৃষ্ঠা)

(১৫) আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃত্যু ঃ ৯১১ হিঃ) তাঁর তাফসীরে জালালাইন–এ লিখেছেন ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জানেন, রসূলুল্লাহর (সা) পর আর কোন নবী নেই। এবং হযরত ঈসা (আ) নাযিল হবার পর রসূলুল্লাহর শরীয়াত মোতাবেকই আমল করবেন।' (৭৬৮ পৃষ্ঠা)

(১৬) আল্লামা ইবনে নুজাইম (মৃত্যু ঃ ৯৭০ হিঃ) উসুলে ফিকাহর বিখ্যাত গ্রন্থ আল ইশবাহ ওয়ান নাযায়েরে 'কিতাবুস সিয়ারের' 'বাবুর রুইয়ায়' লিখেছেন ঃ যদি কেউ একথা না মনে করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী, তাহলে সে মুসলমান নয়। কেননা কথাগুলো জানা এবং স্বীকার করে নেয়া দীনের অপরিহার্য আকীদা বিশ্বাসের শামিল। (১৭৯ পৃষ্ঠা)

(১৭) মুল্লা আলী কারী (মৃত্যু ঃ ১০১৬ হিঃ) 'শারহে ফিকহে আকবার'-এ লিখেছেন ঃ আমাদের রসূলের (সা) পর অন্য কোন ব্যক্তির নবুওয়াতের দাবী করা সর্ববাদীসম্মতভাবে কুফর। (২০২ পৃষ্ঠা)

(১৮) শায়খ ইসমাইল হাক্কী (মৃত্যু ঃ ১১৩৭ হিঃ) তাফসীরে রুহুল বয়ান-এ উল্লেখিত ব্যাখ্যা প্রসংগে লিখেছেন ঃ আলেম সমাজ 'খাতাম' শব্দটির (ـ) তা-এর ওপর জবর লাগিয়ে পড়েছেন,—এর অর্থ হয় খতম করবার যন্ত্র, যার সাহায্যে মোহর লাগানো হয়। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সা) সমস্ত নবীর শেষে এসেছেন এবং তাঁর সাহায্যে নবীদের সিলসিলার ওপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। ফারসীতে আমরা একে বলবো 'মোহরে পয়গম্বর' অর্থাৎ তাঁর সাহায্যে নবুওয়াতের দরজা মোহর লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং পয়গম্বরদের সিলসিলা খতম করে দেয়া হয়েছে। অন্য পাঠকরা 'তা'-এর নীচে জের লাগিয়ে পড়েছেন 'খাতিমুন নাবিয়্যীন'। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ ছিলেন মোহর দানকারী। অন্যকথায় বলা যাবে, পয়গম্বরদের ওপর মোহরকারী। এভাবে এ শব্দার্থ 'খাতাম'-এর সমার্থক হয়ে দাঁড়াবে। তাহলে রসূলুল্লাহর (সা) পর তাঁর উম্মাতের আলেম সমাজ তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাবেন একমাত্র তাঁর প্রতিনিধিত্ব। তাঁর ইন্তেকালের সাথে সাথেই নবুওয়াতের উত্তরাধিকারেরও পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং তাঁর পরে হযরত ঈসার (আ) নাযিল হবার ব্যাপারটি তাঁর নবুওয়াতকে ত্রুটিযুক্ত করবে না। কেননা খাতিমুন নাবিয়্যীন হবার অর্থ হলো এই যে, তাঁর পর আর কাউকে নবী বানানো হবে না এবং হযরত ঈসাকে (আ) তাঁদের পূর্বেই নবী বানানো হয়েছে। কাজেই তিনি রসূলুল্লাহ্র অনুসারীর মধ্যে শামিল হবেন, রসূলুল্লাহর কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়বেন এবং তাঁরই উম্মাতের অন্তরভুক্ত হবেন। তখন হযরত ঈসার (আ) নিকট অহী নাযিল হবে না এবং তিনি কোন নতুন আহকামও জারি করবেন না, বরং তিনি হবেন রসূলুল্লাহর প্রতিনিধি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এ ব্যাপারে একমত যে, আমাদের নবীর পর আর কোন নবী নেই। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী। এবং রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমার পরে কোন নবী নেই। কাজেই এখন যে বলবেন মুহাম্মাদ (সা)-এর পর নবী আছে, তাকে কাফের বলা হবে। কেননা সে কুরআনকে অস্বীকার করেছে এবং অনুরূপভাবে সে ব্যক্তিকেও কাফের বলা হবে যে এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে। কেননা সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণের পর হক বাতিল থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এবং যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুওয়াতের দাবী করবে, তার দাবী বাতিল হয়ে যাবে। (২২ খণ্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

(১৯) শাহানশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীরের নির্দেশে বার'শ হিজরীতে পাক-ভারতের বিশিষ্ট আলেমগণ সম্মিলিতভাবে 'ফতোয়ায়ে আলমগিরী' নামে যে কিতাবটি লিপিবদ্ধ করেন তাতে উল্লেখিত হয়েছে ঃ যদি কেউ মনে করে যে, মুহাম্মাদ (সা) শেষ নবী নয়,

তাহলে সে মুসলমান নয় এবং যদি সে বলে যে, আমি আল্লাহর রসূল অথবা পয়গম্বর, তাহলে তার ওপর কুফরীর ফতোয়া দেয়া হবে। (দ্বিতীয় খণ্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা)

(২০) আল্লামা শওকানী (মৃত্যু ঃ ১২৫৫ হিঃ) তাঁর তাফসীর ফাতহুল কাদীরে লিখেছেন ঃ সমগ্র মুসলিম সমাজ 'খাতিম' শব্দটির 'তা'-এর নীচে জের লাগিয়ে পড়েছেন এবং একমাত্র আসেম জবরের সাথে পড়েছেন। প্রথমটার অর্থ হলো এই যে, রসূলুল্লাহ সমস্ত পয়গম্বরকে খতম করেছেন অর্থাৎ তিনি সবার শেষে এসেছেন এবং দ্বিতীয়টির অর্থ হলো এই যে, তিনি সমস্ত পয়গম্বরদের জন্য মোহর স্বরূপ। এবং এর সাহায্যে নবীদের সিলসিলা মোহর এঁটে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে তাঁদের দলটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছে। (চতুর্থ খণ্ড, ২৭৫ পৃষ্ঠা)

(২১) আল্লামা আলুসি (মৃত্যু ঃ ১২৮০ হিঃ) তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে লিখেছেন ঃ নবী শব্দটি রসূলের চাইতে বেশী ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক। কাজেই রসূলুল্লাহর খাতিমুন নাবিয়্যীন হবার অর্থ হলো এই যে, তিনি খাতিমুল মুরসালীনও। তিনি শেষ নবী এবং শেষ রসূল—একথার অর্থ হলো এই যে, এ দুনিয়ায় তাঁর নবুওয়াতের গুণে গুণান্বিত হবার পরেই মানুষ এবং জিনের মধ্য থেকে এ গুণটি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। (২২ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা)

রসূলুল্লাহর পর যে ব্যক্তি নবুওয়াতের অহীর দাবী করবে, তাকে কাফের বলে গণ্য করা হবে। এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে দ্বিমতের অবকাশ নেই। (২২ খণ্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা)

"রসূলুল্লাহ শেষ নবী—একথাটি কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে, রসূলুল্লাহর সুন্নাত এটিকে সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেছে এবং সমগ্র মুসলিম সমাজ এর ওপর আমল করেছে। কাজেই যে ব্যক্তি এর বিরোধী কোন দাবী করবে, তাকে কাফের বলে গণ্য করা হবে" (২২ খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা)

বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশ থেকে মরক্কো ও স্পেন এবং তুর্কী থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠ আলেম, ফকীহ, মুহাদ্দিস এবং তাফসীরকারগণের ব্যাখ্যা এবং মতামত আমি এখানে উল্লেখ করলাম। তাঁদের নামের সাথে সাথে তাঁদের জন্ম এবং মৃত্যু তারিখও উল্লেখ করেছি। এ থেকেই ধারণা করা যাবে যে, হিজরীর প্রথম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ আলেমগণ এর মধ্যে শামিল আছেন। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর আলেম সমাজের মতামতও আমি এখানে উল্লেখ করতে পারতাম, কিন্তু ইচ্ছা করেই তাঁদেরকে বাদ দিয়েছি। কেননা তাঁরা মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর সমসাময়িক এবং হয়তো অনেকে বলতে পারেন যে, মীর্জা সাহেবের বিরোধিতার মনোভাব নিয়েই তাঁরা খতমে নবুওয়াতের এই অর্থ বিবৃত করেছেন। এ জন্য মীর্জা সাহেবের পূর্ববর্তী যুগের আলেম সমাজের মতামতের উদ্ধৃতিই এখানে পেশ করেছি—যেহেতু মীর্জা সাহেবের সাথে তাঁদের বিরোধের প্রশ্নই উঠতে পারে না। এসব মতামত থেকে একথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, হিজরী প্রথম শতাব্দী থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম জাহান একযোগে খাতামুন নাবিয়্যীন শব্দের অর্থ নিয়েছে শেষ নবী। প্রত্যেক যুগের মুসলমানই এ একই আকীদা পোষণ করেছেন যে, রসূলুল্লাহর পর নবুওয়াতের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। একথা তাঁরা একযোগে স্বীকার করে নিয়েছেন

যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর নবী অথবা রসূল হবার দাবী করে এবং যে তার দাবীকে মেনে নেয়, সে কাফের হয়ে যায়, এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোন যুগে সামান্যতম মতবিরোধও সৃষ্টি হয়নি। কাজেই এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই ফায়সালা করতে পারেন যে, 'খাতামুন নাবিয়্যীন' শব্দের যে অর্থ আরবী অভিধান থেকে প্রমাণিত হয়, কুরআনের আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে যে অর্থ প্রতীয়মান হয়, রসূলুল্লাহ (সা) নিজেই যা ব্যাখ্যা করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম যে সম্পর্কে মতৈক্য পোষণ করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম সমাজ একযোগে দ্ব্যর্থহীনভাবে যা স্বীকার করে আসছেন, তার বিপক্ষে দ্বিতীয় কোন অর্থ গ্রহণ অর্থাৎ কোন নতুন দাবীদারের জন্য নবুওয়াতের দরজা উন্মুক্ত করার অবকাশ ও সুযোগ থাকে কি? এবং এই ধরনের লোকদেরকে কেমন করে মুসলমান বলে স্বীকার করা যায়, যারা নবুওয়াতের দরজা উন্মুক্ত করার নিছক ধারণাই প্রকাশ করেনি বরং ঐ দরজা দিয়ে এক ব্যক্তি নবুওয়াতের দালানে প্রবেশ করেছে এবং তারা তার 'নবুওয়াতের' ওপর ঈমান পর্যন্ত এনেছে?

এ ব্যাপারে আরো তিনটি কথা বিবেচনা করতে হবে।

আমাদের ঈমানের সংগে আল্লাহর কি কোন শত্রুতা আছে?

প্রথম কথা হলো এই যে, নবুওয়াতের ব্যাপারটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনের দৃষ্টিতে এ বিষয়টি ইসলামের বুনিয়াদী আকিদার অন্তরভুক্ত, এটি স্বীকার করার বা না করার ওপর মানুষের ঈমান ও কুফরী নির্ভর করে। কোন ব্যক্তি যদি নবী হয় এবং লোকেরা তাঁকে না মানে, তাহলে তারা কাফের হয়ে যায়। আবার কোন ব্যক্তি নবী না হওয়া সত্ত্বেও যারা তাকে নবী বলে স্বীকার করে, তারাও কাফের হয়ে যায়। এ ধরনের জটিল পরিস্থিতিতে আল্লাহর নিকট থেকে কোন প্রকার অসতর্কতার আশা করা যায় না। যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর কোন নবী আসার কথা থাকতো তাহলে আল্লাহ নিজেই কুরআনে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা ব্যক্ত করতেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে প্রকাশ্যভাবে তা ঘোষণা করতেন। এবং রসূলুল্লাহ কখনো এ দুনিয়া থেকে তাশরীফ নিয়ে যেতেন না; যতক্ষণ না তিনি সমগ্র উম্মাতকে এ ব্যাপারে পুরোপুরি অবগত করতেন যে, তাঁর পর আরো নবী আসবেন এবং আমরা সবাই তাঁদেরকে মেনে নিতে বাধ্য থাকবো। এটা কিভাবে সম্ভব যে, রসূলুল্লাহর (সা) পর নবুওয়াতের দরজা উন্মুক্ত থাকবে এবং এই দরজা দিয়ে কোন নবী প্রবেশ করবে, যার ওপর ঈমান না আনলে আমরা মুসলমান থাকতে পারি না। অথচ আমাদের এ সম্পর্কে শুধু বেখবরই রাখা হয়নি বরং আল্লাহ এবং তাঁর রসূল একযোগে এমন সব কথা বলেছেন, যার ফলে তের'শ বছর পর্যন্ত সমস্ত উম্মাত একথা মনে করছিল এবং আজও মনে করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আর কোন নবী আসবেন না? আমাদের সাথে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের এ ধরনের ব্যবহার কেন হবে? আমাদের দীন এবং ঈমানের বিরুদ্ধে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের তো কোন শত্রুতা নেই।

তর্কের খাতিরে যদি একথা মেনেও নেয়া যায় যে, নবুওয়াতের দরজা উন্মুক্ত আছে এবং কোন নবী আসার পর আমরা যদি নির্ভয়ে এবং নিশ্চিন্তে তাঁকে অস্বীকার করে বসি, তাহলে ভয় থাকতে পারে একমাত্র আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসাবাদের। কিন্তু কিয়ামতের দিন তিনি আমাদের নিকট থেকে এ সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করলে, আমরা সোজাসুজি উল্লেখিত রেকর্ডগুলো তাঁর আদালতে পেশ করবো। এ থেকে অন্তত প্রমাণ হয়ে যাবে যে, (মা'আযাল্লাহ) আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের সুন্নাতই আমাদের এই কুফরীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি যে, এসব রেকর্ড দেখার পর কোন নতুন নবীর ওপর ঈমান না আনার জন্য আল্লাহ আমাদের শাস্তি দেবেন না। কিন্তু যদি সত্যি সত্যিই নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে এবং কোন নতুন নবী যদি না আসতে পারে এবং এসব সত্ত্বেও কেউ কোন নবুওয়াতের দাবীদারের ওপর যদি ঈমান আনে, তাহলে তার চিন্তা করা উচিত যে, এই কুফরীর অপরাধ থেকে বাঁচার জন্য সে আল্লাহর দরবারে এমন কি রেকর্ড পেশ করতে পারবে, যার ফলে সে মুক্তি লাভের আশা করতে পারে! আদালতে হাযির হবার পূর্বে তার নিজের জবাবদিহির জন্য সংগৃহীত দলিল প্রমাণগুলো এখানেই বিশ্লেষণ করে নেয়া উচিত। এবং আমরা যেসব দলিল–প্রমাণ পেশ করেছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে তার বিবেচনা করা উচিত যে, নিজের জন্য যে সাফাইয়ের ওপর নির্ভর করে সে এ কাজ করছে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি এর ওপর নির্ভর করে কুফরীর শাস্তি ভোগ করার বিপদকে স্বাগতম জানাতে পারে?

এখন নবীর প্রয়োজনটাই বা কেন?

দ্বিতীয় কথা হলো এই যে, ইবাদাত এবং নেক কাজে তরক্কী করে কোন ব্যক্তি নিজের মধ্যে নবুওয়াতের গুণ পয়দা করতে পারে না। নবুওয়াতের যোগ্যতা কোন অর্জন করার জিনিস নয়। কোন বিরাট খেদমতের পুরস্কার স্বরূপ মানুষকে নবুওয়াত দান করা হয় না। বরং বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আল্লাহ কোন বিশেষ ব্যক্তিকে এই মর্যাদা দান করে থাকেন। এ প্রয়োজনের সময় যখন উপস্থিত হয় তখনই আল্লাহ এক ব্যক্তিকে এ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং যখন প্রয়োজন পড়ে না অথবা থাকে না, তখন খামখা আল্লাহ নবীর পর নবী প্রেরণ করতে থাকেন না। কুরআন মজিদ থেকে যখন আমরা একথা জানবার চেষ্টা করি যে, কোন্ পরিস্থিতিতে নবী প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সেখানে এ ধরনের চারটি অবস্থার সন্ধান পাওয়া যায় ঃ

এক ঃ কোন বিশেষ জাতির মধ্যে নবী প্রেরণের প্রয়োজন এ জন্য দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে ইতিপূর্বে কোন নবী আসেনি এবং অন্য কোন জাতির মধ্যে প্রেরিত নবীর পয়গামও তাদের নিকট পৌঁছেনি।

দুই ঃ নবী পাঠাবার প্রয়োজন এ জন্য দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট জাতি ইতিপূর্বে প্রেরিত নবীদের শিক্ষা ভুলে যায় অথবা তা বিকৃত হয়ে যায় এবং তাঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

তিন ঃ ইতিপূর্বে প্রেরিত নবীদের মাধ্যমে জনগণের শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি এবং দীনের পূর্ণতার জন্য অতিরিক্ত নবীর প্রয়োজন হয়।

চার ঃ কোন নবীর সংগে তাঁর সাহায্য-সহযোগিতার জন্য আর একজন নবীর প্রয়োজন হয়।

এখন একথা সুস্পষ্ট যে, ওপরের এ বিষয়গুলোর মধ্য থেকে কোনটিও আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর বিদ্যমান নেই।

কুরআন নিজেই বলছে, রসূলুল্লাহকে সমগ্র দুনিয়ার জন্য হিদায়াতকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে। দুনিয়ার সাংস্কৃতিক ইতিহাস একথা বলে যে, তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে সমগ্র দুনিয়ায় এমন অবস্থা বিরাজ করছে, যাতে করে তাঁর দাওয়াত সবসময় দুনিয়ার সকল জাতির মধ্যে পৌছতে পারে। এর পরেও প্রত্যেক জাতির মধ্যে পৃথক পৃথক পয়গম্বর প্রেরণের কোন প্রয়োজন থাকে না।

কুরআন একথাও বলে এবং একই সংগে হাদীস এবং সীরাতের যাবতীয় বর্ণনাও একথার সাক্ষবহ যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা পুরোপুরি নির্ভুল এবং নির্ভেজাল আকারে সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে কোন প্রকার বিকৃতি বা রদবদল হয়নি। তিনি যে কুরআন এনেছিলেন, তার মধ্যে আজ পর্যন্ত একটি শব্দেরও কম-বেশী হয়নি। এবং কিয়ামত পর্যন্তও তা হতে পারে না। নিজের কথা ও কর্মের মাধ্যমে যে নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন, তাও আজ আমরা এমনভাবে পেয়ে যাচ্ছি, যেন আমরা তাঁরই যুগে বাস করছি। কাজেই দ্বিতীয় প্রয়োজনটাও খতম হয়ে গেছে।

আবার কুরআন মজীদ স্পষ্টভাষায় একথাও ব্যক্ত করে যে, রসূলুল্লাহর (সা) মাধ্যমে আল্লাহর দীনকে পূর্ণতা দান করা হয়েছে। কাজেই দীনের পূর্ণতার জন্যও এখন আর কোন নবীর প্রয়োজন নেই।

এখন বাকি থাকে চতুর্থ প্রয়োজনটি। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো এই যে, এ জন্য যদি কোন নবীর প্রয়োজন হতো তাহলে রসূলুল্লাহর (সা) যুগে তাঁর সংগেই তাকে প্রেরণ করা হতো। কিন্তু একথা সবাই জানেন যে, এমন কোন নবী রসূলুল্লাহর (সা) যুগে প্রেরণ করা হয়নি। কাজেই এ কারণটা বাতিল হয়ে গেছে।

এখন আমরা জানতে চাই, রসূলুল্লাহর (সা) পর আর একজন নতুন নবী আসার পঞ্চম কারণটা কি? যদি কেউ বলে, সমগ্র উম্মাত বিগড়ে গেছে, কাজেই তাদের সংস্কারের জন্য আর একজন নতুন নবীর প্রয়োজন, তাহলে তাকে আমরা জিজ্ঞেস করবো ঃ নিছক সংস্কারের জন্য দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত কি কোন নবী এসেছে যে শুধু এই উদ্দেশ্যেই আর একজন নতুন নবীর অবির্ভাব হলো? অহী নাযিল করার জন্যই তো নবী প্রেরণ করা হয়। কেননা নবীর নিকটেই অহী নাযিল করা হয়। আর অহীর প্রয়োজন পড়ে কোন নতুন পয়গাম দেবার অথবা পূর্ববর্তী পয়গামকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। আল্লাহর কুরআন এবং রসূলুল্লাহর সুন্নাত সংরক্ষিত হয়ে যাবার পর যখন আল্লাহর দীন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং অহীর সমস্ত সম্ভাব্য প্রয়োজন খতম হয়ে গেছে, তখন সংস্কারের জন্য একমাত্র সংস্কারের প্রয়োজনই বাকী রয়ে গেছে—নবীর প্রয়োজন নয়।

নতুন নবুওয়াত বর্তমানে মুসলমানদের জন্য রহমত নয়, লা'নতের শামিল

তৃতীয় কথা হলো এই যে, যখনই কোন জাতির মধ্যে নবীর আগমন হবে, তখনই সেখানে প্রশ্ন উঠবে কুফর ও ঈমানের। যারা ঐ নবীকে স্বীকার করে নেবে, তারা এক উম্মাতভুক্ত হবে এবং যারা তাকে অস্বীকার করবে তারা অবশ্যই একটি পৃথক উম্মাতে শামিল হবে। এই দুই উম্মাতের মতবিরোধ কোন আংশিক মতবিরোধ বলে গণ্য হবে না বরং এটি এমন একটি বুনিয়াদী মতবিরোধের পর্যায়ে নেমে আসবে, যার ফলে তাদের একটি দল যতদিন না নিজের আকিদা–বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে, ততদিন পর্যন্ত তারা দু'দল কখনো একত্র হতে পারবে না। এ ছাড়াও কার্যত তাদের প্রত্যেকের জন্য হিদায়াত এবং আইনের উৎস হবে বিভিন্ন। কেননা একটি দল তাদের নিজেদের নবীর অহী এবং সুন্নাত থেকে আইন প্রণয়ন করবে এবং দ্বিতীয় দলটি এ দু'টিকে তাদের আইনের উৎস হিসেবে মেনে নিতেই প্রথমত অস্বীকার করবে। কাজেই তাদের উভয়ের সম্মিলনে একটি সমাজ সৃষ্টি কখনো সম্ভব হবে না।

এই প্রোজ্জ্বল সত্যগুলো পর্যবেক্ষণ করার পর যে কোন ব্যক্তি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন, 'খত্‌মে নবুওয়াত' মুসলিম জাতির জন্য আল্লাহর একটি বিরাট রহমত স্বরূপ। এর বদৌলতেই সমগ্র মুসলিম জাতি একটি চিরন্তন বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্বে শামিল হতে পেরেছে। এ জিনিসটা মুসলমানদেরকে এখন সব মৌলিক মতবিরোধ থেকে রক্ষা করেছে, যা তাদের মধ্যে চিরন্তন বিচ্ছেদের বীজ বপন করতো। কাজেই যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিদায়াত দানকারী এবং নেতা বলে স্বীকার করে এবং তিনি যে শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া অন্য কোন হিদায়াতের উৎসের দিকে ঝুঁকে পড়তে চায় না, সে আজ এই ভ্রাতৃত্বের অন্তরভুক্ত হতে পারবে। নবুওয়াতের দরজা বন্ধ না হয়ে গেলে মুসলিম জাতি কখনো এই ঐক্যের সন্ধান পেতো না। কেননা প্রত্যেক নবীর আগমনের পর এ ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো।

ভাবনা–চিন্তা করলে মানুষের বিবেক–বুদ্ধিও একথাই সমর্থন করে যে, একটি বিশ্বজনীন এবং পরিপূর্ণ দীন দিয়ে দেবার এবং তাকে সকল প্রকার বিকৃতি ও রদবদল থেকে সংরক্ষিত করার পর নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়াই উচিত। এর ফলে সম্মিলিতভাবে এই শেষ নবীর অনুগমন করে সমগ্র দুনিয়ার মুসলমান চিরকালের জন্য একই উম্মাতের অন্তরভুক্ত থাকতে পারবে এবং বিনা প্রয়োজনে নতুন নতুন নবীদের আগমনে উম্মাতের মধ্যে বারবার বিভেদ সৃষ্টি হতে পারবে না। নবী 'যিল্লী' হোক অথবা 'বুরুজী,' 'উম্মাতওয়ালা,' 'শরীয়াতওয়ালা' এবং 'কিতাবওয়ালা'—যে কোন অবস্থায়ই যিনি নবী হবেন এবং আল্লাহর পক্ষ হতে যাকে প্রেরণ করা হবে, তাঁর আগমনের অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়াবে এই যে, তাঁকে যারা মেনে নেবে, তারা হবে একটি উম্মাত আর যারা মানবে না তারা কাফের বলে গণ্য হবে। যখন নবী প্রেরণের সত্যিকার প্রয়োজন দেখা যায়, তখন—শুধুমাত্র তখনই—এই বিভেদ অবশ্যম্ভাবী হয়। কিন্তু যখন তাঁর আগমনের কোন প্রয়োজন থাকে না, তখন আল্লাহর হিকমাত এবং তাঁর রহমতের নিকট কোনক্রমেই আশা করা যায় না যে, তিনি নিজের বান্দাদেরকে খামখা কুফর ও ঈমানের সংঘর্ষে লিপ্ত করবেন এবং তাদেরকে সম্মিলিতভাবে একটি উম্মাতভুক্ত হবার সুযোগ

দেবন না। কাজেই কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা থেকে যা কিছু প্রমাণিত হয়, মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও তাকে নির্ভুল বলে স্বীকার করে এবং তা থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বর্তমানে নবুওয়াতের দরজা বন্ধ থাকাই উচিত।

'প্রতিশ্রুত মসীহ'-এর তাৎপর্য

নতুন নবুওয়াতের দিকে আহবানকারীরা সাধারণত অজ্ঞ মুসলমানদেরকে বলে থাকে, হাদীসে 'প্রতিশ্রুত মসীহ' আসবেন বলে খবর দেয়া হয়েছে। আর মসীহ নবী ছিলেন। কাজেই তাঁর আগমনের ফলে খত্মে নবুওয়াত কোন দিক দিয়ে প্রভাবিত হচ্ছে না। বরং খত্মে নবুওয়াত এবং 'প্রতিশ্রুত মসীহ' এর আগমন দু'টোই সমপর্যায়ে সত্য।

এই প্রসংগে তারা আরো বলে যে, হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম 'প্রতিশ্রুত মসীহ' নন। তাঁর মৃত্যু হয়েছে। হাদীসে যাঁর আগমনের খবর দেয়া হয়েছে তিনি হলেন 'মাসীলে মসীহ'— অর্থাৎ হযরত ঈসার (আ) অনুরূপ একজন মসীহ। এবং তিনি 'অমুক' ব্যক্তি যিনি সম্প্রতি আগমন করেছেন। তাঁকে মেনে নিলে খত্মে নবুওয়াত বিশ্বাসের বিরোধিতা করা হয় না।

এই প্রতারণার পর্দা ভেদ করবার জন্য আমি এখানে হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলো থেকে এ ব্যাপারে উল্লেখিত প্রামাণ্য হাদীসসমূহ সূত্রসহ নকল করছি। এ হাদীসগুলো প্রত্যক্ষ করে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই বুঝতে পারবেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেছিলেন এবং আজ তাঁকে কিভাবে চিত্রিত করা হচ্ছে।

হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম আলাইহিস সালামের নুযুল সম্পর্কিত হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَيُوْشِكَنَّ اَنْ يَّنْزِلَ فِيْكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعَ الْحَرْبَ وَيُفِيْضُ الْمَالَ حَتّٰى لاَ يَقْبَلُهُ اَحَدٌ حَتّٰى تَكُوْنَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

(بخارى كتاب احاديث الانبياء ، باب نزول عيسى ابن مريم - مسلم ، باب بيان نزول عيسى - ترمذى ابواب الفتن ، باب فى نزول عيسى مسند احمد مرويات ابو هريرة رض)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ সেই মহান সত্তার কছম যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, নিশ্চয়ই তোমাদের

মধ্যে ইবনে মারয়াম ন্যায়বিচারক শাসকরূপে অবতীর্ণ হবেন। অতপর তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকর হত্যা করবেন।[১] এবং যুদ্ধ খতম করে দেবেন (বর্ণনান্তরে যুদ্ধের পরিবর্তে 'জিযিয়া' শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে অর্থাৎ জিযিয়া খতম করে দেবেন)।[২] তখন ধনের পরিমাণ এতো বৃদ্ধি পাবে যে, তা গ্রহণ করার লোক থাকবে না এবং (অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছবে যে, মানুষ আল্লাহর জন্য) একটি সিজদা করে নেয়াটাকেই দুনিয়া এবং দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুর চাইতে বেশী মূল্যবান মনে করবে।

(২) অন্য একটি হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে ঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ .....

"ঈসা ইবনে মার্য়াম অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না....." এবং এরপর উপরোল্লেখিত হাদীসের মতো একই বিষয়বস্তু বলা হয়েছে। (বুখারী, কিতাবুল মাজালিম, বাবু কাসরিস সালিব--ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, বাবু ফিতনাতিদ দাজ্জাল)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَاَمَامُكُمْ مِنْكُمْ (بخارى ، كتاب احاديث الانبياء - باب نزول عيسى - مسلم ، بيان نزول عيسى-مسند احمد - مرويات ابى هريرة)

১. ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলার এবং শুকর হত্যা করার অর্থ হলো এই যে, একটি পৃথক ধর্ম হিসেবে ঈসায়ী ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ঈসায়ী ধর্মের সমগ্র কাঠামোটা এই আকীদার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর একমাত্র পুত্রকে [অর্থাৎ হযরত ঈসাকে (আ)] ক্রুশে বিদ্ধ করে 'লানত' পূর্ণ মৃত্যু দান করেছেন। এবং এতেই সমস্ত মানুষের গোনাহর কাফ্ফারা হয়ে গেছে। অন্যান্য নবীদের উম্মাতের সংগে ঈসায়ীদের পার্থক্য হলো এই যে, এরা শুধু আকিদাটুকু গ্রহণ করেছে, অতপর আল্লাহর সমস্ত শরীয়াত নাকচ করে দিয়েছে। এমনকি শুকরকেও এরা হালাল করে নিয়েছে—যা সকল নবীর শরীয়াতে হারাম। কাজেই হযরত ঈসা (আ) নিজে এসে যখন বলবেন, আমি আল্লাহর পুত্র নই, আমাকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়নি এবং আমি কারো গোনাহর কাফ্ফারা হইনি, তখন ঈসায়ী ধর্মবিশ্বাসের বুনিয়াদই সমূলে উৎপাটিত হবে। অনুরূপভাবে যখন তিনি বলবেন, আমার অনুসারীদের জন্য আমি শুকর হালাল করিনি এবং তাদেরকে শরীয়াতের বিধিনিষেধ থেকে মুক্তিও দেইনি, তখন ঈসায়ী ধর্মের দ্বিতীয় বৈশিষ্টও নির্মূল হয়ে যাবে।

২. অন্য কথায় বলা যায়, তখন ধর্মের বৈষম্য ঘুচিয়ে মানুষ একমাত্র দীন ইসলামের অন্তরভুক্ত হবে। এর ফলে আর যুদ্ধের প্রয়োজন হবে না এবং কারো কাছ থেকে জিযিয়াও আদায় করা হবে না। পরবর্তী ৫ এবং ১৫ নং হাদীস একথাই প্রমাণ করেছে।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কেমন হবে তোমরা যখন তোমাদের মধ্যে ইবনে মারয়াম অবতীর্ণ হবেন এবং তোমাদের ইমাম নিজেদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত হবেন?[১]

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَمْحُوا الصَّلِيْبَ وَتُجْمَعُ لَهُ الصَّلٰوةَ وَيُعْطِى الْمَالَ حَتّٰى لَا يُقْبَلُ وَيُضَعِ الْخَرَاجَ وَيَنْزِلُ الرَّوْحَاءَ فَيَحُجُّ مِنْهَا ، اَوْ يَعْتَمِرَ ، اَوْ يُجْمِعُهَا (مسند احمد ، بسلسله مرويات ابى هريرة رض - مسلم ، كتاب الحج باب جواز التمتع فى الحج والقران)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ ঈসা ইবনে মারয়াম অবতীর্ণ হবেন। অতপর তিনি শুকর হত্যা করবেন। ক্রুশ ধ্বংস করবেন। তাঁর জন্য একাধিক নামায এক ওয়াক্তে পড়া হবে। তিনি এতো ধন বিতরণ করবেন যে, অবশেষে তার গ্রহীতা পাওয়া যাবে না। তিনি খিরাজ মওকূফ করে দেবেন। রওহা[২] নামক স্থানে অবস্থান করে তিনি সেখান থেকে হজ্ব অথবা ওমরাহ করবেন অথবা দু'টোই করবেন।[৩] (রসূলুল্লাহ এর মধ্যে কোন্‌টি বলেছিলেন—এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়ে গেছে।)

(٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (بعد ذكر خروج الدجال) فَبَيْنَمَا هُمْ يُعَدُّوْنَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّوْنَ الصُّفُوْفَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَيَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَاَمَّهُمْ فَاِذَا رَاٰهُ عَدُوُّ اللّٰهِ يَنْذُوْبُ كَمَا يَنْذُوْبُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتّٰى يُهْلَكَ وَلٰكِنْ يَقْتُلُهُ اللّٰهُ بِيَدِهِ فَيُرِيْهِمْ دَمَهُ فِىْ حَرْبَتِهِ (مشكوة - كتاب الفتن ، باب الملاحم ، بحواله ، مسلم)

১. অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) নামাযে ইমামতি করবেন না। মুসলমানদের পূর্ব নিযুক্ত ইমামের পেছনে তিনি এক্তেদা করবেন।

২. রওহা মদীনা থেকে ২৫ মাইল দূরে একটি স্থানের নাম।

৩. উল্লেখ্য এ যুগে যাকে "মাসীলে মাসীহ" গণ্য করা হয়েছে তিনি জীবনে কোনদিন হজ্ব বা উমরাহ কোনটাই করেননি।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, দাজ্জালের আবির্ভাব বর্ণনার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ইত্যবসরে যখন মুসলমানরা তার সংগে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে থাকবে, কাতারবদ্ধ হতে থাকবে এবং নামাযের জন্য 'একামাত' পাঠ করা শেষ হবে, তখন ঈসা ইবনে মারয়াম অবতীর্ণ হবেন এবং নামাযে মুসলমানদের ইমামতি করবেন। আল্লাহর দুশমন দাজ্জাল তাঁকে দেখতেই এমনভাবে গলিত হতে থাকবে যেমন পানিতে লবণ গলে যায়। যদি ঈসা (আ) তাকে এই অবস্থায় পরিত্যাগ করেন, তাহলেও সে বিগলিত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু আল্লাহ তাকে হযরত ঈসার (আ) হাতে কতল করবেন তিনি দাজ্জালের রক্তে রঞ্জিত নিজের বর্শাফলক মুসলমানদের দেখাবেন।

(٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ نَبِىٌّ (يعنى عيسى) وَاِنَّهُ نَازِلٌ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاعْرِفُوْهُ رَجُلٌ مَرْبُوْعٌ اِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ كَاَنَّ رَاْسَهُ يَقْطُرُ وَاِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْاِسْلَامِ فَيَدُقُّ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُهْلِكُ اللّٰهُ فِىْ زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا اِلَّا الْاِسْلَامَ وَيُهْلِكُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَتَوَفّٰى فَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ - (ابو داؤد ، كتاب الملاحم ، باب خروج الد جال ، مسند احمد ، مرويات ابو هريرة)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমার এবং তাঁর (অর্থাৎ হযরত ঈসার) মাঝখানে আর কোন নবী নেই। এবং তিনি অবতীর্ণ হবেন। তাঁকে দেখা মাত্রই তোমরা চিনে নিয়ো। তিনি মাঝারি ধরনের লম্বা হবেন। বর্ণ লাল সাদায় মেশানো। পরনে দু'টো হলুদ রঙের কাপড়। তাঁর মাথার চুল থেকে মনে হবে এই বুঝি পানি টপকে পড়লো। অথচ তা মোটেই সিক্ত হবে না। তিনি ইসলামের জন্য মানুষের সংগে যুদ্ধ করবেন। ক্রুশ ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো করবেন। শুকর হত্যা করবেন। জিযিয়া কর রহিত করবেন। তাঁর যামানায় আল্লাহ ইসলাম ছাড়া সমস্ত ধর্মকেই নির্মূল করবেন। তিনি মাসীহ দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং দুনিয়ায় চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। অতপর তাঁর ইন্তেকাল হবে এবং মুসলমানরা তাঁর জানাযার নামায পড়বে।

(٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..... فَيَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُوْلُ اَمِيْرُهُمْ

تَعَالَ فَصَلِّ فَيَقُوْلُ لاَ اِنَّ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ اُمَرَاء تَكْرِمَةَ اللّٰهِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ - (مسلم ، بيان نزول عيسى ابن مريم - مسند احمد بسلسلةُ مرويات جابر بن عبد اللّه)

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছিঃ.....অতপর ঈসা ইবনে মারয়াম অবতীর্ণ হবেন। মুসলমানদের আমীর তাঁকে বলবেন, আসুন, আপনি নামায পড়ান। কিন্তু তিনি বলবেন, না তোমরা নিজেরাই একে অপরের আমীর[১] আল্লাহ এই উম্মাতকে যে ইজ্জত দান করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি একথা বলবেন।

(٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (فى قصة ابن صياد) فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ائْذَنْ لِىْ فَاَقْتُلُهٗ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ يَّكُنْ هُوَ فَلَسْتَ صَاحِبُهٗ ، اِنَّمَا صَاحِبُهٗ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ، وَاِنْ لاَ يَكُنْ فَلَيْسَ لَكَ اَنْ تَقْتُلَ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْعَهْدِ (مشكواة ، كتاب الفتن ، باب قصه ابن صياد ، بحو له شرح السنه بغوى)

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (ইবনে সাইয়াদ প্রসংগে) বর্ণনা করেছেন, অতপর উমর ইবনে খাত্তাব আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসূল! অনুমতি দিন, আমি তাকে কতল করি। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যদি এ সেই ব্যক্তি (অর্থাৎ দাজ্জাল) হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা এর হত্যাকারী নও, বরং ঈসা ইবনে মারয়াম একে হত্যা করবেন এবং যদি এ সেই ব্যক্তি না হয়ে থাকে, তাহলে জিম্মীদের মধ্য থেকে কাউকে হত্যা করার তোমাদের কোন অধিকার নেই।

(٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (فى قصة الدجال) فَاِذَا هُمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَتُقَامُ الصَّلٰوةُ فَيُقَالُ لَهٗ تَقَدَّمْ يَارُوْحَ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ لِيَتَقَدَّمْ اِمَامُكُمْ فَلْيُصَلِّ بِكُمْ فَاِذَا صَلّٰى صَلٰوةَ الصُّبْحِ خَرَجُوْا اِلَيْهِ قَالَ فَحِيْنَ يَرَى الْكَذَّابَ يَنْمَاثُ كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ فَيَمْشِىْ اِلَيْهِ فَيَقْتُلُهٗ حَتّٰى اِنَّ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ يُنَادِىْ يَارُوْحَ

১. অর্থাৎ তোমাদের আমীর তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে হওয়া উচিত।

اللّٰهِ هٰذَا الْيَهُوْدِيُّ فَلاَ يَتْرُكُ مِمَّنْ كَانَ يَتْبَعُهُ اَحَدًا اِلاَّ قَتَلَهُ (مسند احمد ، بسلسله روايات جابر بن عبد الله)

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেছেন, (দাজ্জাল প্রসংগে রসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ) সেই সময় ঈসা ইবনে মারয়াম হঠাৎ মুসলমানদের মধ্যে এসে উপস্থিত হবেন। অতপর লোকেরা নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। তাঁকে বলা হবে, হে রূহুল্লাহ! অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি বলবেন, না, তোমাদের ইমামের অগ্রবর্তী হওয়া উচিত, তিনিই নামায পড়াবেন। অতপর ফজরের নামাযের পর মুসলমানরা দাজ্জালের মোকাবিলায় বের হবে।(রসূলুল্লাহ) বলেছেন ঃ যখন সেই কাজ্জাব (মিথ্যাবাদী) হযরত ঈসাকে দেখবে, তখন বিগলিত হতে থাকবে যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। অতপর তিনি দাজ্জালের দিকে অগ্রসর হবেন এবং তাকে কতল করবেন। তখন অবস্থা এমন হবে যে, গাছপালা এবং প্রস্তরখণ্ড চিৎকার করে বলবে, হে রূহুল্লাহ! ইহুদীটা এই আমার পিছনে লুকিয়ে রয়েছে। দাজ্জালের অনুগামীদের কেউ বাঁচবে না, সবাইকে কতল করা হবে।

(١٠) عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ (فى قصة الدجال) فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذْ بَعَثَ اللّٰهُ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِىَ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُوْذَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلٰى اَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ اِذَا طَاَ طَاَ رَاْسَهُ قَطَرَ وَاِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَّانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيْحَ نَفَسِهِ اِلاَّ مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِى اِلٰى حَيْثُ يَنْتَهِى طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتّٰى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ - (مسلم ، ذكر الدجال ، ابو داؤد ، كتاب الملاحم ، باب خروج الدجال - ترمذى - ابواب الفتن ، باب فى فتنة الدجال - ابن ماجه ، كتاب الفتن ، باب فتنة الدجال)

হযরত নওয়াস ইবনে সাম'আন কেলাবী (দাজ্জাল প্রসংগে) বর্ণনা করেছেন যে, (রসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ) দাজ্জাল যখন এসব করতে থাকবে, ইত্যবসরে আল্লাহ মাসীহ ইবনে মারয়ামকে প্রেরণ করবেন। তিনি দামেশকের পূর্ব অংশে সাদা মিনারের সন্নিকটে দু'টো হলুদ বর্ণের কাপড় পরিধান করে দু'জন ফেরেশতার কাঁধে হাত রেখে নামবেন। তিনি মাথা নীচু করলে পানি টপকাচ্ছে বলে মনে হবে। আবার মাথা উঁচু করলে মনে হবে যেন বিন্দু বিন্দু পানি মোতির মতো চমকাচ্ছে। তাঁর নিশ্বাসের হাওয়া যে

কাফেরের গায়ে লাগবে—এবং এর গতি হবে তাঁর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত—সে জীবিত থাকবে না। অতপর ইবনে মারয়াম দাজ্জালের পশ্চাদ্ধাবন করবেন এবং লূদের[১] দ্বারপ্রান্তে তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করবেন।

(١١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِىْ اُمَّتِىْ فَيَمْكُثُ اَرْبَعِيْنَ (لَا اَدْرِىْ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ شَهْرًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ عَامًا) فَيَبْعَثُ اللّٰهُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَاَنَّهُ عُرْوَةُ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسَ سَبْعَ سِنِيْنَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ - مسلم ، ذكر الدجال)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ দাজ্জাল আমার উম্মাতের মধ্যে বের হবে এবং চল্লিশ (আমি জানি না চল্লিশ দিন, চল্লিশ মাস অথবা চল্লিশ বছর)[২] অবস্থান করবে। অতপর আল্লাহ ঈসা ইবনে মারয়ামকে পাঠাবেন। তাঁর চেহারা উরওয়া ইবনে মাসউদের (জনৈক সাহাবী) মতো। তিনি দাজ্জালের পশ্চাদ্ধাবন করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। অতপর সাত বছর পর্যন্ত মানুষ এমন অবস্থায় থাকবে যে, দু'জন লোকের মধ্যে শত্রুতা থাকবে না।

(١٢) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اَسِيْدُ الْغِفَارِىْ قَالَ اَطَّلَعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ مَا تَذْكُرُوْنَ - قَالُوْا نَذْكُرُ السَّاعَةَ - قَالَ اِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتّٰى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ اٰيَات - فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَةَ وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُوْلَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ وَثَلٰثَةُ خُسُوْفٌ ، خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاٰخِرُ ذٰلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ اِلَى مَحْشَرِهِمْ (مسلم : كتاب الفتن واشراط الساعه ابو داؤد ، كتاب الملاحم ، باب امارات الساعه)

১. এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, লুদ (Lydda) ফিলিস্তিনের অন্তর্গত বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের রাজধানী তেলআবীব থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। ইহুদীরা এখানে একটি বিরাট বিমান বন্দর নির্মাণ করেছে।

২. এটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসের নিজের বক্তব্য।

হযরত হুযাইফা ইবনে আসীদ আল গিফারী (রা) বর্ণনা করেছেন, একবার রসূলুল্লাহ (সা) আমাদের মজলিসে তাশরীফ আনলেন। তখন আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় লিপ্ত ছিলাম। রসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি আলোচনা করছো? লোকেরা বললো, আমরা কিয়ামতের কথা আলোচনা করছি। তিনি বললেন ঃ দশটি নিশানা প্রকাশ না হবার পূর্বে তা কখনো কায়েম হবে না। অতপর তিনি দশটি নিশানা বলে গেলেন। এক ঃ ধোঁয়া, দুই ঃ দাজ্জাল, তিন ঃ দাব্বাতুল আরদ, চার ঃ পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়, পাঁচ ঃ ঈসা ইবনে মারয়ামের অবতরণ, ছয় ঃ ইয়াজুজ ও মাজুজ, সাত ঃ তিনটি প্রকাণ্ড ভূমি ধস (Landslide) একটি পূর্বে, আট ঃ একটি পশ্চিমে, নয়ঃ আর একটি আরব উপদ্বীপে, দশ ঃ সর্বশেষ একটি প্রকাণ্ড অগ্নি ইয়েমেন থেকে উঠবে এবং মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে হাশরের ময়দানের দিকে।

(١٣) عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِصَابَتَانِ مِنْ اُمَّتِيْ اَحْرَزَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَ النَّارِ عِصَابَةٌ تَغْزُوا الْهِنْدَ ، وَعِصَابَةٌ تَكُوْنُ مَعَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ ،(نسائى ، كتاب الجهاد – مسند احمد ، بسلسلة روايات ثوبان)

রসূলুল্লাহর (সা) আজাদকৃত গোলাম সাওবান (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমার উম্মাতের দু'টো সেনাদলকে আল্লাহ দোজখের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। তাদের মধ্যে একটি হলো—যারা হিন্দুস্তানের ওপর হামলা করবে আর দ্বিতীয়টি ঈসা ইবনে মারয়ামের সংগে অবস্থানকারী।

(١٤) عَنْ مَجْمَعِ بْنِ جَارِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَّالَ بِبَابِ لُدٍّ (مسند احمد – ترمذى ابواب الفتن)

মুজাম্মে' ইবনে জারিয়া আনসারী (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ ইবনে মারয়াম দাজ্জালকে লুদের দারপ্রান্তে কতল করবেন।

(١٥) عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ (فى حديث طويل فى ذكر الدجال) فَبَيْنَمَا اَمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّيْ بِهِمُ الصُّبْحَ اِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَرَجَعَ ذٰلِكَ الْاِمَامُ يَنْكُصُ يَمْشِيْ قَهْقَرٰى لِيَتَقَدَّمَ

عِيْسٰى فَيَضَعُ عِيْسٰى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ لَهُ تَقَدَّمْ فَصَلِّ فَاِنَّهَا لَكَ اُقِيْمَتْ فَيُصَلِّى بِهِمْ اِمَامُهُمْ فَاِذَا انْصَرَفَ قَالَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ اِفْتَحُوا الْبَابَ فَيُفْتَحُ وَ وَرَاءَهُ الدَّجَّالُ وَمَعَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ يَهُوْدِيٍّ كُلُّهُمْ ذُوْ سَيْفٍ مُحَلًّ وَسَاجٍ فَاِذَا نَظَرَ اِلَيْهِ الدَّجَّالُ ذَابَ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ وَيَنْطَلِقُ هَارِبًا وَيَقُوْلُ عِيْسٰى اِنَّ لِىْ فِيْكَ ضَرْبَةً لَنْ تَسْبِقَنِى بِهَا فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ اللُّدِّ الشَّرْقِى فَيَهْزِمُ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ..... وَتَمْلَاُ الْاَرْضُ مِنَ الْمُسْلِمِ كَمَا يَمْلَاُ الْاِنَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَتَكُوْنُ الْكَلِمَةُ وَاحِدَةً فَلَا يُعْبَدُ اِلَّا اللّٰهُ تَعَالٰى (ابن ماجه ، كتاب الفتن ، باب فتنة الدجال)

আবু উমামা বাহেলী (এক দীর্ঘ হাদীসে দাজ্জাল প্রসংগে) বর্ণনা করেছেন ঃ ফজরের নামায পড়বার জন্য মুসলমানদের ইমাম যখন অগ্রবর্তী হবেন, ঠিক সে সময় ঈসা ইবনে মারয়াম তাদের ওপর অবতীর্ণ হবেন। ইমামের পিছনে সরে আসবেন ঈসাকে (আ) অগ্রবর্তী করার জন্য কিন্তু ঈসা (আ) তাঁর কাঁধে হাত রেখে বলবেন ঃ না, তুমিই নামায পড়াও। কেননা এরা তোমার জন্যই দাঁড়িয়েছে। কাজেই তিনিই (ইমাম) নামায পড়াবেন। সালাম ফেরার পর ঈসা (আ) বলবেন ঃ দরজা খোলো। দরজা খোলা হবে। বাইরে দাজ্জাল ৭০ হাজার সশস্ত্র ইহুদী সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করবে। তার দৃষ্টি হযরত ঈসার (আ) ওপর পড়া মাত্রই সে এমনভাবে বিগলিত হতে থাকবে, যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। এবং সে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। ঈসা (আ) বলবেন ঃ আমার নিকট তোর জন্য এমন এক আঘাত আছে যার হাত থেকে তোর কোনক্রমেই নিষ্কৃতি নেই। অতপর তিনি তাকে লুদের পূর্ব দ্বারদেশে গিয়ে গ্রেফতার করবেন এবং আল্লাহ ইহুদীদেরকে পরাজয় দান করবেন.....এবং যমীন মুসলমানদের দ্বারা এমনভাবে ভরপুর হবে যেমন পাত্র পানিতে ভরে যায়। সবাই একই কালেমায় বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং দুনিয়ায় আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করা হবে না।

(١٦) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ..... وَيَنْزِلُ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ عِنْدَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَيَقُوْلُ لَهُ اَمِيْرُهُمْ يَارُوْحَ اللّٰهِ تَقَدَّمْ ، صَلِّ ، فَيَقُوْلُ هٰذِهِ الْاُمَّةُ بَعْضُهُمْ اُمَرَاءُ عَلٰى بَعْضٍ فَيَتَقَدَّمُ اَمِيْرُهُمْ

فَيُصَلِّى فَاِذَا قَضٰى صَلٰوتَهٗ اَخَذَ عِيْسٰى حَرْبَتَهٗ فيذهب نحوا لرجال فاذا يراه الرجال ذاب كما يذوب الرّصاص فيضع حربه بين شُنُوْبَتِهٖ فَيَقْتُلُهٗ وَيَنْهَزِمُ اَصْحَابُهٗ لَيْسَ يَوْمَئِذٍ شَىْءٌ يُوَارِى مِنْهُمْ اَحَدًا حَتّٰى انَّ الشَّجَرَ لِقُوْلُ يَا مُؤْمِنُ هٰذَا كَافِرٌ وَيَقُوْلُ الْحَجَرُ يَا مُؤْمِنُ هٰذَا كَافِرٌ (مسند احمد - طبرانى - حاكم)

উসমান ইবনে আবিল আস (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছিঃ.....এবং ঈসা ইবনে মারয়াম আলাইহিস সালাম ফজরের নামাযের সময় অবতরণ করবেন। মুসলমানদের আমীর তাঁকে বলবেন, হে রূহুল্লাহ! আপনি নামায পড়ান! তিনি জবাব দেবেন ঃ এই উম্মাতের লোকেরা নিজেরাই নিজেদের আমীর। তখন মুসলমানদের আমীর অগ্রবর্তী হয়ে নামায পড়াবেন। অতপর নামায শেষ করে ঈসা (আ) নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে দাজ্জালের দিকে অগ্রসর হবেন। সে যখন তাঁকে দেখবে তখন এমনভাবে বিগলিত হতে থাকবে যেমন সীসা গলে যায়। তিনি নিজের অস্ত্র দিয়ে দাজ্জালকে কতল করবেন এবং তার দলবল পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। কিন্তু কোথাও তারা আত্মগোপন করার জায়গা পাবে না। এমন কি বৃক্ষও চিৎকার করে বলবে ঃ হে মু'মিন, এখানে কাফের লুকিয়ে আছে। এবং প্রস্তর খণ্ডও চিৎকার করে বলবে ঃ হে মু'মিন, এখানে কাফের লুকিয়ে আছে।

(١٧) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فى حديث طويل) فيصبح فِيْهِمْ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَيَهْزِمُهُ اللّٰهُ وَجُنُوْدُهٗ حَتّٰى اَنْ اَجْذُمَ الْحَائِطِ وَاَصْلُ الشَّجَرِ لَيُنَادِى يَا مُؤْمِنُ هٰذَا كَافِر يَسْتَتِرُ بِىْ فَتَعَالَ اُقْتُلْهُ (مسند احمد - حاكم)

সামুরা ইবনে জুনদুব (এক দীর্ঘ হাদীসে) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অতপর সকাল বেলা ঈসা ইবনে মারয়াম মুসলমানদের মধ্যে আসবেন এবং আল্লাহ দাজ্জাল ও তার সেনাবাহিনীকে পরাজয় দান করবেন। এমন কি প্রাচীর এবং বৃক্ষের কাণ্ডও ফুকারে বলবে ঃ হে মু'মিন, এখানে কাফের আমার পেছনে লুকিয়ে রয়েছে। এসো একে কতল করো!

(١٨) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِىْ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ عَلٰى مَنْ نَاوَاهُمْ حَتّٰى يَاْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَيَنْزِلُ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ (مسند احمد)

ইমরান ইবনে হাসীন বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে হামেশা একটি দল হকের ওপর কায়েম থাকবে এবং তারা বিরোধী দলের ওপর প্রতিপত্তি বিস্তার করবে। অবশেষে আল্লাহর ফায়সালা এসে যাবে এবং ঈসা ইবনে মারয়াম আলাইহিস সাল্লাম অবতীর্ণ হবেন।

(١٩) عَنْ عَائِشَةَ (فى قصة الدجال) فَيَنْزِلُ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِى الْاَرْضِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً اِمَامًا عَادِلاً وَحَكَمًا مُقْسِطًا (مسند احمد)

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আন্হা (দাজ্জাল প্রসংগে) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অতপর ঈসা আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ হবেন। তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন। অতপর ঈসা (আ) চল্লিশ বছর আদেল ইমাম এবং ন্যায়নিষ্ঠ শাসক হিসেবে দুনিয়ায় অবস্থান করবেন।

(٢٠) عَنْ سَفِيْنَةَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فى قصة الدجال) فَيَنْزِلُ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقْتُلُهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عِنْدَ عَقَبَةِ اَفِيْقَ (مسند احمد)

রসূলুল্লাহর আযাদকৃত গোলাম সাফীনা (রা) (দাজ্জাল প্রসংগে) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অতপর ঈসা আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ হবেন এবং আল্লাহ আফিয়েকের পার্বত্য পথের[১] সন্নিকটে তাকে (দাজ্জালকে) মেরে ফেলবেন।

(٢١) عَنْ حُذَيْفَةَ (فى ذكر الدجال) فَلَمَّا قَامُوْا يُصَلُّوْنَ نَزَلَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اِمَامُهُمْ فَصَلّٰى بِهِمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ هٰكَذَا فَرَجُوْا بَيْنِى وَبَيْنَ عَدُوِّ اللّٰهِ ..... وَيُسَلِّطُ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَقْتُلُوْنَهُمْ حَتّٰى اَنَّ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ لَيُنَادِى يَا عَبْدَ اللّٰهِ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ يَا مُسْلِمُ هٰذَا الْيَهُوْدِىُّ فَا قْتُلْهُمْ فَيُفْنِيْهِمُ اللّٰهُ تَعَالٰى

১. আফিয়েককে বর্তমানে ফায়েক বলা হয়। সিরিয়া এবং ইসরাঈল সীমান্তে বর্তমান সিরিয়া রাষ্ট্রের সর্বশেষ শহর। এরপরে পশ্চিমের দিকে কয়েক মাইল দূরে তাবারিয়া নামক হ্রদ আছে। এখানেই জর্দান নদীর উৎপত্তিস্থল। এর দক্ষিণ–পশ্চিমে পাহাড়ের মধ্যভাগে নিম্ন ভূমিতে একটি রাস্তা রয়েছে। এই রাস্তাটি প্রায় দেড় হাজার ফুট গভীরে নেমে গিয়ে সেই স্থানে পৌঁছায় যেখান থেকে জর্দান নদী তাবারিয়ার মধ্য হতে নির্গত হচ্ছে। এ পার্বত্য পথকেই বলা হয় "আকাবায়ে আফিয়েক" (উফায়েকের নিম্ন পার্বত্য পথ)।

وَيَظْهَرُ الْمُسْلِمُوْنَ فَيُكْسِرُوْنَ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُوْنَ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُوْنَ الْجَزِيَةَ (مستدرك حاكم)

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (দাজ্জাল প্রসংগে) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অতপর যখন মুসলমানরা নামাযের জন্য তৈরি হবে, তখন তাদের চোখের সম্মুখে ঈসা ইবনে মারয়াম অবতীর্ণ হবেন। তিনি মুসলমানদের নামায পড়াবেন অতপর সালাম ফিরিয়ে লোকদের বলবেন, আমার এবং আল্লাহর এই দুশমনের মাঝখান থেকে সরে যাও.....এবং আল্লাহ দাজ্জালের দলবলের ওপর মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন।

মুসলমানরা তাদেরকে বেধড়ক হত্যা করতে থাকবে। অবশেষে বৃক্ষ এবং প্রস্তর খণ্ডও চিৎকার করে বলবে ঃ হে আল্লাহর বান্দা, হে রহমানের বান্দা, হে মুসলমান! দেখো, এখানে একজন ইহুদী, একে হত্যা করো। এভাবে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন এবং মুসলমানগণ বিজয় লাভ করবে। তারা ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবে, শূকর হত্যা করবে এবং জিযিয়া মওকুফ করে দেবে।[১]

এ ২১টি হাদীস ১৪ জন সহাবীর মারফত নির্ভুল সনদসহ হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলোতে উল্লিখিত হয়েছে। এ ছাড়াও এ ব্যাপারে আরো অসংখ্য হাদীস অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু আলোচনা দীর্ঘ হবার ভয়ে আমি সেগুলো এখানে উল্লেখ করলাম না। বর্ণনা এবং সনদের দিক থেকে অধিকতর শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলোই শুধু এখানে উদ্ধৃত করলাম।

এ হাদীসগুলো থেকে কি প্রমাণিত হয়?

যে কোন ব্যক্তি হাদীসগুলো পড়ে নিজেই বুঝতে পারবেন যে, এখানে কোন "প্রতিশ্রুত মসীহ" "মসীলে মসীহ" বা "বুরুজী মসীহ"র কোন উল্লেখই করা হয়নি। এমন কি বর্তমান কালে কোন পিতার ঔরসে মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে কোন ব্যক্তির একথা বলার অবকাশ নেই যে, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মসীহ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনিই সেই মসীহ। আজ থেকে দু'হাজার বছর আগে পিতা ছাড়াই হযরত মারয়ামের (আ) গর্ভে যে ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম হয়েছিল এ হাদীসগুলোর দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য থেকে তাঁরই অবতারণের সংবাদ শ্রুত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি ইন্তেকাল করেছেন, না জীবিত অবস্থায় কোথাও রয়েছেন—এ আলোচনা সম্পূর্ণ অবান্তর। তর্কের খাতিরে যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, তিনি ইন্তেকাল করেছেন তাহলেও বলা যায় যে, আল্লাহ তাঁকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন।[২] উপরন্তু আল্লাহ তাঁর

১. মুসলিমেও হাদীসটি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে এবং হাফেয ইবনে হাজার আস্কালানী ফাতহুল বারীর ষষ্ঠ খণ্ডে ৫৫০ পৃষ্ঠায় এটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

২. যারা আল্লাহর এই পুনরুজ্জীবনের ক্ষমতা অস্বীকার করেন তাদের সূরা বাকারার ২৫৯ নম্বর আয়াতটির অর্থ অনুধাবন করা উচিত। এ আয়াতে আল্লাহ বলেন যে, তিনি তাঁর এক বান্দাকে ১০০ বছর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় রাখার পর আবার তাকে জীবিত করেন।

এক বান্দাকে তাঁর এ বিশাল সৃষ্টি জগতের কোন এক স্থানে হাজার বছর জীবিত অবস্থায় রাখার পর নিজের ইচ্ছামতো যে কোন সময় তাঁকে এই দুনিয়ায় ফিরিয়ে আনতে পারেন। আল্লাহর অসীম ক্ষমতার প্রেক্ষিতে একথা মোটেই অস্বাভাবিক মনে হয় না। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি হাদীসকে সত্য বলে স্বীকার করে তাকে অবশ্যই ভবিষ্যতে আগমনকারী ব্যক্তিকে উল্লেখিত ঈসা ইবনে মারয়াম বলে স্বীকার করতেই হবে। তবে যে ব্যক্তি হাদীস অস্বীকার করে সে আদতে কোন আগমনকারীর অস্তিত্বই স্বীকার করতে পারে না। কারণ আগমনকারীর আগমন সম্পর্কে যে বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে হাদীস ছাড়া আর কোথাও তার ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এ অদ্ভুত ব্যাপারটি শুধু এখানেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আগমনকারীর আগমন সম্পর্কিত ধারণা বিশ্বাস গ্রহণ করা হচ্ছে হাদীস থেকে কিন্তু সেই হাদীসগুলোই আবার যখন সুস্পষ্ট করে এ বক্তব্য তুলে ধরছে যে, উক্ত আগমনকারী কোন 'মসীলে মসীহ' (মসীহ–সম ব্যক্তি) নন বরং তিনি হবেন স্বয়ং ঈসা ইবনে মারয়াম আলাইহিস সালাম তখন তা অস্বীকার করা হচ্ছে।

এ হাদীসগুলো থেকে দ্বিতীয় যে বক্তব্যটি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে ফুটে উঠেছে তা হচ্ছে এই যে, হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম (আ) দ্বিতীয়বার নবী হিসেবে অবতরণ করবেন না। তাঁর ওপর ওহী নাযিল হবে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি কোন নতুন বাণী বা বিধান আনবেন না। শরীয়াতে মুহাম্মাদীর মধ্যেও তিনি হ্রাস বৃদ্ধি করবেন না। দীন ইসলামের পুনরুজ্জীবনের জন্যও তাঁকে দুনিয়ায় পাঠানো হবে না। তিনি এসে লোকদেরকে নিজের ওপর ঈমান আনার আহবান জানাবেন না এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান আনবে তাদেরকে নিয়ে একটি পৃথক উম্মাতও গড়ে তুলবেন না।[১] তাঁকে কেবলমাত্র একটি পৃথক দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠানো হবে। অর্থাৎ তিনি দাজ্জালের ফিত্নাকে সমূলে বিনাশ করবেন। এ জন্য

১. পূর্ববর্তী আলেমগণ এ বিষয়টিকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। আল্লামা তাফ্তাযানী (হি ৭২২–৭৯২) শারহে আকায়েদে নাসাফী গ্রন্থে লিখছেন ঃ

ثبت انه اخر الانبياء .....فان قيل قد روى فى الحديث نزول عيسى عليه السلام بعده قلنا نعم لكنه يتابع محمدا عليه السلام لان شريعته قد نسخت فلا يكون اليه وحى ولا نصب احكام بل يكون خليفة رسول الله عليه السلام (طبع مصر – ص ١٣٥)

"মুহাম্মাদ (সা) সর্বশেষ নবী, একথা প্রমাণিত সত্য..... যদি বলা হয়, তাঁর পর হাদীসে হযরত ঈসার (আ) আগমনের কথা বর্ণিত হয়েছে, তাহলে আমি বলবো, হাঁ হযরত ঈসার (আ) আগমনের কথা বলা হয়েছে সত্য, তবে তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী হবেন। কারণ তাঁর শরীয়াত বাতিল হয়ে গেছে। কাজেই তাঁর ওপর অহী নাযিল হবে না এবং তিনি নতুন বিধানও নির্ধারণ করবেন না। বরং তিনি মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহর (সা) প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন।" [মিসরে মুদ্রিত, ১৩৫ পৃষ্ঠা]

আল্লামা আলূসী তাঁর 'রুহুল মা'আনী' নামক তাফসীর গ্রন্থেও প্রায় একই বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

ثم انه عليه السلام حين ينزل باق على نبوته السابقة لم يعزل عنها بحال لكنه لا يتعبد بها لنسخها فى حقه وحق غيره وتكليفه باحكام هذه الشريعة اصلا

তিনি এমনভাবে অবতরণ করবেন যার ফলে তাঁর অবতরণের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশই থাকবে না। যেসব মুসলমানের মধ্যে তিনি অবতরণ করবেন তারা নিসংশয়ে বুঝতে পারবে যে, রসূলুল্লাহ (সা) যে ঈসা ইবনে মারয়াম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনিই সেই ব্যক্তি এবং রসূলুল্লাহর কথা অনুযায়ী তিনি যথা সময়ে অবতরণ করেছেন, তিনি এসে মুসলমানদের দলে শামিল হয়ে যাবেন। মুসলমানদের তদানীন্তন ইমামের পিছনে তিনি নামায পড়বেন।[১] তৎকালে মুসলমানদের যিনি নেতৃত্ব দেবেন তিনি তাঁকেই অগ্রবর্তী করবেন যাতে এই ধরনের সন্দেহের কোন অবকাশই না থাকে যে, তিনি নিজের পয়গম্বরী পদমর্যাদা সহকারে পুনর্বার পয়গম্বরীর দায়িত্ব পালন করার জন্য ফিরে এসেছেন। নিসন্দেহে বলা যেতে পারে কোন দলে আল্লাহর পয়গম্বরের উপস্থিতিতে অন্য কোন ব্যক্তি ইমাম বা নেতা হতে পারেন না। কাজেই নিছক এক ব্যক্তি হিসেবে মুসলমানদের দলে তাঁর অন্তরভুক্ত স্বতস্ফূর্তভাবে একথাই ঘোষণা করবে যে, তিনি পয়গম্বর হিসেবে আগমন করেননি। এ জন্য তাঁর আগমনে নবুওয়াতের দুয়ার উন্মুক্ত হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

নিসন্দেহে তাঁর আগমন বর্তমান ক্ষমতাসীন রাষ্ট্র প্রধানের আমলে প্রাক্তন রাষ্ট্র প্রধানের আগমনের সাথে তুলনীয়। এ অবস্থায় প্রাক্তন রাষ্ট্র প্রধান বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে রাষ্ট্রীয়

وفرعا فلا يكون اليه عليه السلام وحى ولا نصب احكام بل يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحاكما من حكام ملته بين امته (جلد ٢٢ ص ٣٢)

"অতপর ঈসা আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ হবেন। তিনি অবশ্য তাঁর পূর্ব প্রদত্ত নবুওয়াতের পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। কারণ তিনি নিজের আগের পদমর্যাদা থেকেতো অপসারিত হবেন না। কিন্তু নিজের পূর্বের শরীয়াতের অনুসারী হবেন না। কারণ তা তাঁর নিজের ও অন্যসব লোকদের জন্য বাতিল হয়ে গেছে। কাজেই বর্তমানে তিনি মূলনীতি থেকে খুঁটিনাটি ব্যাপার পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াতের অনুসারী হবেন। কাজেই তাঁর নিকট অহী নাযিল হবে না বরং তিনি শরীয়াতের বিধানও নির্ধারণ করবেন না। "বরং তিনি মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহর (সা) প্রতিনিধি এবং তাঁর উম্মাতের মধ্যস্থিত মুহাম্মাদী মিল্লাতের শাসকদের মধ্য থেকে একজন শাসক হবেন।" [২২শ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা]

ইমাম রাযী একথাটিকে আরো সুস্পষ্ট করে নিম্নোক্ত ভাষায় পেশ করেছেন ঃ

انتهاء الانبياء الى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعند مبعثه انتهت تلك المدة فلا يبعد ان يصير (اى عيسى بن مريم) بعد نزوله تبعا لمحمد (تفسير كبير، ج ٢، ص ٣٤٣)

"মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত নবীদের যুগ শেষ হয়ে গেছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পর নবীদের আগমন শেষ হয়ে গেছে। কাজেই বর্তমানে হযরত ঈসার (আ) অবতরণের পর তিনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী হবেন একথা মোটেই অযৌক্তিক নয়।" [তাফসীরে কবীর, ৩য় খণ্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা]

১. যদিও দু'টি হাদীসে (৫ ও ২৮নং) বলা হয়েছে যে, ঈসা আলাইহিস্ সালাম অবতরণ করার পর প্রথম নামাযটি নিজে পড়াবেন। কিন্তু অধিকাংশ এবং বিশেষ করে শক্তিশালী কতিপয় হাদীস (৩, ৭, ৯, ১৫ ও ১৬নং) থেকে জানা যায় যে, তিনি নামাযে ইমামতি করতে অস্বীকার করবেন এবং মুসলমানদের তৎকালীন ইমাম ও নেতাকে অগ্রবর্তী করবেন। মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরগণ সর্বসম্মতভাবে এ মতটি গ্রহণ করেছেন।

দায়িত্বে অংশগ্রহণ করতে পারেন। সাধারণ বোধ সম্পন্ন কোন ব্যক্তি সহজেই একথা বুঝতে পারেন যে, এক রাষ্ট্রপ্রধানের আমলে অন্য একজন প্রাক্তন রাষ্ট্র প্রধানের নিছক আগমনেই আইন ভেঙ্গে যায় না। তবে দু'টি অবস্থায় আইনের বিরুদ্ধাচরণ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এক, প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান এসে যদি আবার নতুন করে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেন। দুই, কোন ব্যক্তি যদি তাঁর রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা ও দায়িত্ব অস্বীকার করে বসেন। কারণ এটা হবে তাঁর রাষ্ট্রপ্রধান থাকাকালে যেসব কাজ হয়েছিল সেগুলোর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার নামান্তর। এ দু'টি অবস্থার কোন একটি না হলে প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধানের নিছক আগমনই আইনগত অবস্থাকে কোন প্রকারে পরিবর্তিত করতে পারে না। হযরত ঈসার (আ) দ্বিতীয় আগমনের ব্যাপারটিও অনুরূপ। তাঁর নিছক আগমনেই খত্মে নবুওয়াতের দুয়ার ভেঙ্গে পড়ে না। তবে তিনি এসে যদি নবীর পদে অধিষ্ঠিত হন এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন অথবা কোন ব্যক্তি যদি তাঁর প্রাক্তন নবুওয়াতের মর্যাদাও অস্বীকার করে বসে, তাহলে এ ক্ষেত্রে আল্লাহর নবুওয়াত বিধি ভেঙ্গে পড়ে। হাদীসে এ দু'টি পথই পরিপূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। হাদীসে একদিকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহর (সা) পর আর কোন নবী নেই এবং অন্যদিকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, ঈসা আলাইহিস সালাম পুনর্বার অবতরণ করবেন। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, তাঁর এ দ্বিতীয় আগমন নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করার উদ্দেশ্যে হবে না।

অনুরূপভাবে তাঁর আগমনে মুসলমানদের মধ্যে কুফর ও ঈমানের কোন নতুন প্রশ্ন দেখা দেবে না। আজও কোন ব্যক্তি তাঁর পূর্বের নবুওয়াতের ওপর ঈমান না আনলে কাফের হয়ে যাবে। মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (সা) নিজেও তাঁর ঐ নবুওয়াতের প্রতি ঈমান রাখতেন। মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহর (সা) সমগ্র উম্মাতও শুরু থেকেই তাঁর ওপর ঈমান রাখে। হযরত ঈসার (আ) পুনর্বার আগমনের সময়ও এই একই অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে। মুসলমানরা কোন নতুন নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনবে না, বরং আজকের ন্যায় সেদিনও তারা ঈসা ইবনে মারয়ামের (আ) পূর্বের নবুওয়াতের ওপরই ঈমান রাখবে। এ অবস্থাটি বর্তমানে যেমন খত্মে নবুওয়াত বিরোধী নয়, তেমনি সেদিনও বিরোধী হবে না।

সর্বশেষ যে কথাটি এ হাদীসগুলো এবং অন্যান্য বহুবিধ হাদীস থেকে জানা যায় তা হচ্ছে এই যে, হযরত ঈসাকে (আ) যে দাজ্জালের বিশ্বব্যাপী ফিত্না নির্মূল করার জন্য পাঠানো হবে সে হবে ইহুদী বংশোদ্ভূত। সে নিজেকে "মসীহ" রূপে পেশ করবে। ইহুদীদের ইতিহাস ও তাদের ধর্মীয় চিন্তা–বিশ্বাস সম্পর্কে অনবহিত কোন ব্যক্তি এ বিষয়টির তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবে না। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর যখন বনী ইসরাঈল ক্রমাগত অবক্ষয় ও পতনের শিকার হতে থাকলো এমন কি অবশেষে ব্যাবিলন ও আসিরিয়া অধিপতিরা তাদেরকে পরাধীন করে দেশ থেকে বিতাড়িত করলো এবং দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত করে দিলো, তখন বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাদেরকে সুসংবাদ দিতে থাকলেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন "মসীহ" এসে তাদেরকে এ চরম লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দেবেন। এসব ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষিতে ইহুদীরা একজন মসীহের আগমনের প্রতীক্ষারত ছিল। তিনি হবেন বাদশাহ। তিনি যুদ্ধ করে দেশ জয় করবেন। বনী ইসরাঈলকে বিভিন্ন দেশ থেকে এনে ফিলিস্তিনে একত্রিত করবেন এবং

তাদের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র কায়েম করবেন। কিন্তু তাদের এসব আশা-আকাংখাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যখন ঈসা ইবনে মারয়াম (আ) আল্লাহর পক্ষ থেকে "মসীহ" হয়ে আসলেন এবং কোন সেনাবাহিনী ছাড়াই আসলেন, তখন ইহুদীরা তাঁকে 'মসীহ' বলে মেনে নিতে অস্বীকার করল। তারা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত ইহুদী দুনিয়া সেই প্রতিশ্রুত মসীহর প্রতিক্ষা (Promised Messiah) করছে, যার আগমনের সুসংবাদ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। তাদের সাহিত্য সেই কাঙ্খিত যুগের সুখ-স্বপ্ন-কল্পকাহিনীতে পরিপূর্ণ। তালমুদ ও রাববীর সাহিত্য গ্রন্থসমূহে এর যে নক্শা তৈরি করা হয়েছে তার কল্পিত স্বাদ আহরণ করে শত শত বছর থেকে ইহুদী জাতি জীবন ধারণ করছে। তারা বুক ভরা আশা নিয়ে বসে আছে যে, এ প্রতিশ্রুত মসীহ হবেন একজন শক্তিশালী সামরিক ও রাজনৈতিক নেতা। তিনি নীল নদ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত সমগ্র এলাকা, (যে এলাকাটিকে ইহুদীরা নিজেদের "উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এলাকা" মনে করে) আবার ইহুদীদের দখলে আনবেন এবং সারা দুনিয়া থেকে ইহুদীদেরকে এনে এখানে একত্রিত করবেন।

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মহানবীর (সা) কথামত ইহুদীদের "প্রতিশ্রুত মসীহর" ভূমিকা পালনকারী প্রধানতম দাজ্জালের আগমনের জন্য মঞ্চ সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে গেছে। ফিলিস্তিনের বৃহত্তর এলাকা থেকে মুসলমানদেরকে বেদখল করা হয়েছে। সেখানে ইসরাঈল নামে একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সারা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদীরা দলে দলে এসে এখানে বাসস্থান গড়ে তুলছে। আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্স তাকে একটি বিরাট সামরিক শক্তিতে পরিণত করেছে। ইহুদী পুঁজিপতিদের সহায়তায় ইহুদী বৈজ্ঞানিক ও শিল্পপতিগণ তাকে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। চারপাশের মুসলিম দেশগুলোর জন্য তাদের এ শক্তি এক মহাবিপদে পরিণত হয়েছে। এই রাষ্ট্রের শাসকবর্গ তাদের এই "উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দেশ" দখল করার আকাংখাটি মোটেই ঢেকে ছেপে রাখেনি। দীর্ঘকাল থেকে ভবিষ্যত ইহুদী রাষ্ট্রের যে নীল নক্শা তারা প্রকাশ করে আসছে পরের পাতায় তার একটি প্রতিকৃতি দেয়া হলো। এ নক্শায় দেখা যাবে, সিরিয়া, লেবানন ও জর্দানের সমগ্র এলাকা এবং প্রায় সমগ্র ইরাক ছাড়াও তুরস্কের ইস্কান্দারুন, মিসরের সিনাই ও ব-দ্বীপ এলাকা এবং মদীনা মুনাওয়ারাসহ আরবের অন্তরগত হিজায ও নজ্দের উচ্চভূমি পর্যন্ত তারা নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে চায়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, আগামীতে কোন একটি বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে তারা ঐসব এলাকা দখল করার চেষ্টা করবে এবং ঐ সময়ই কথিত প্রধানতম দাজ্জাল তাদের প্রতিশ্রুত মসীহরূপে আগমন করবে। রসূলুল্লাহ (সা) কেবল তার আগমন সংবাদ দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং এই সংগে একথাও বলেছেন যে, সে সময় মুসলমানদের ওপর বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে এবং এক একটি দিন তাদের নিকট এক একটি বছর মনে হবে। এ জন্য তিনি নিজে মসীহ দাজ্জালের ফিত্না থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন এবং মুসলমানদেরকেও আশ্রয় চাইতে বলেছেন।

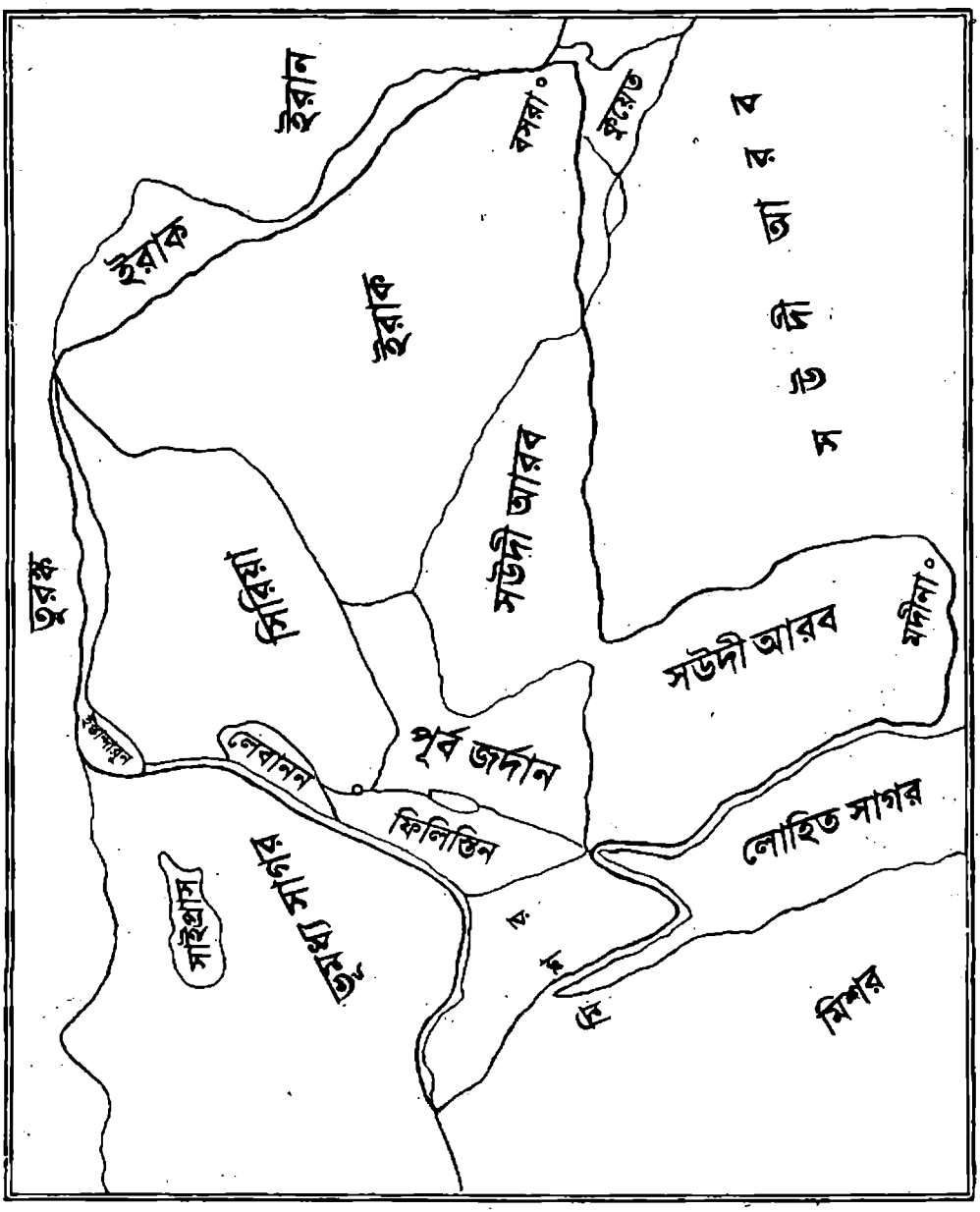

ইসরাঈলী নেতৃবৃন্দ যে ইয়াহুদী রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছে

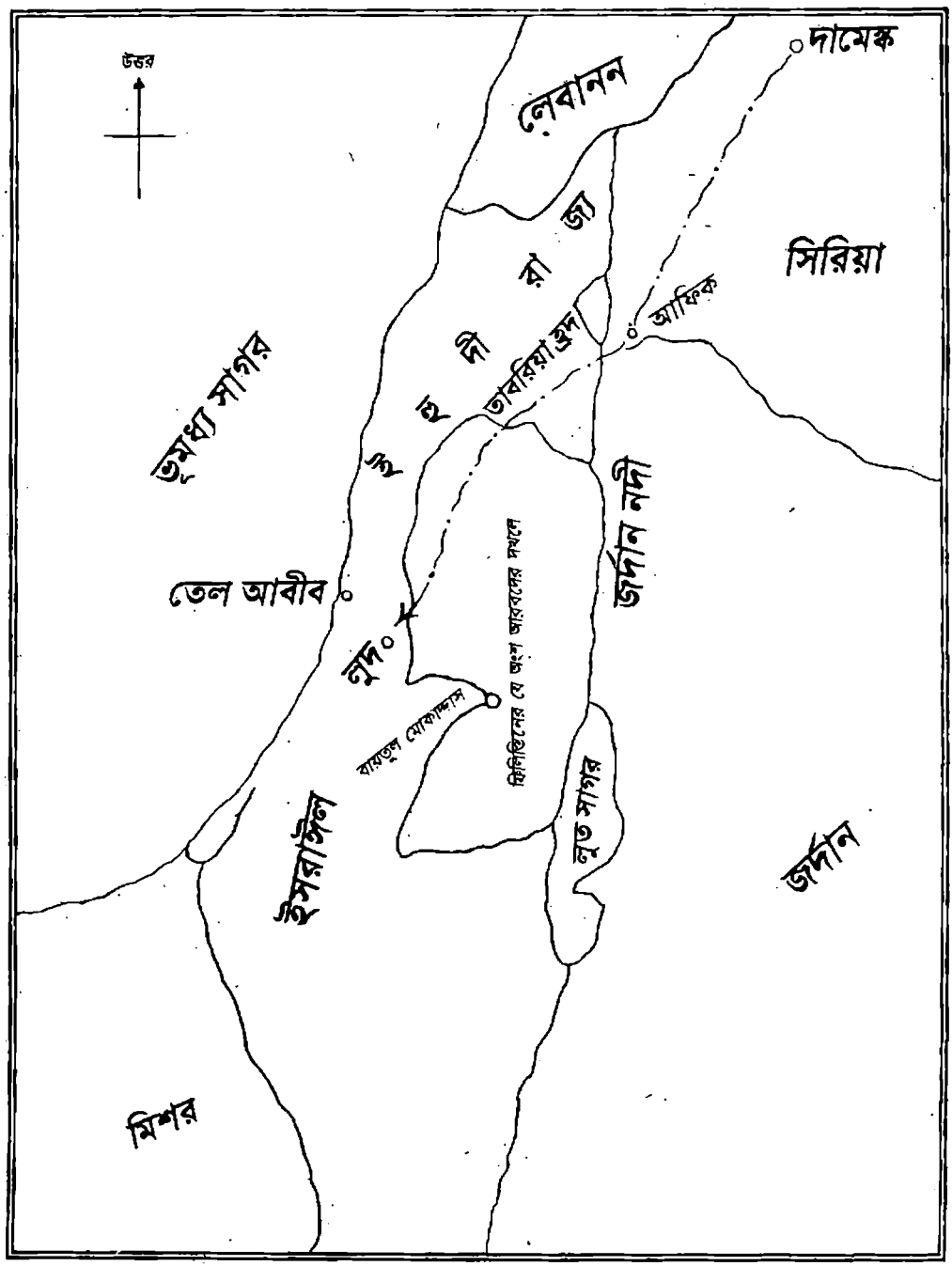

প্রকৃত মসীহ–এর অবতীর্ণ হওয়ার স্থান

এই মসীহ দাজ্জালের মোকাবিলা করার জন্য আল্লাহ কোন 'মসীলে মসীহ'কে পাঠাবেন না বরং আসল মসীহকে পাঠাবেন। দু'হাজার বছর আগে ইহুদীরা এই আসল মসীহকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল এবং নিজেদের জানা মতে তারা তাঁকে শূলবিদ্ধ করে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। এই আসল মসীহ ভারত, আফ্রিকা বা আমেরিকায় অবতরণ করবেন না বরং তিনি অবতরণ করবেন দামেশ্‌কে। কারণ তখন সেখানেই যুদ্ধ চলতে থাকবে। মেহেরবানী করে পরের পাতার নকশাটিও দেখুন। এতে দেখা যাচ্ছে, ইসরাঈলের সীমান্ত থেকে দামেশ্‌ক মাত্র ৫০ থেকে ৬০ মাইলের মধ্যে অবস্থিত। ইতিপূর্বে আমি যে হাদীস উল্লেখ করে এসেছি, তার বিষয়বস্তু মনে থাকলে সহজেই একথা বোধগম্য হবে যে, মসীহ দাজ্জাল ৭০ হাজার ইহুদী সেনাদল নিয়ে সিরিয়ায় প্রবেশ করবে এবং দামেশ্‌কের সামনে উপস্থিত হবে। ঠিক সেই মুহূর্তে দামেশ্‌কের পূর্ব অংশের একটি সাদা মিনারের নিকট সুবহে সাদেকের পর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন এবং ফজর নামায শেষে মুসলমানদেরকে নিয়ে দাজ্জালের মুকাবিলায় বের হবেন। তাঁর প্রচণ্ড আক্রমণে দাজ্জাল পশ্চাদপসরণ করে আফিয়েকের পার্বত্য পথ দিয়ে (২১ নম্বর হাদীসে দেখুন) ইসরাঈলের দিকে ফিরে যাবে। কিন্তু তিনি তার পশ্চাদ্ধাবন করতেই থাকবেন। অবশেষে লিড্ডা বিমান বন্দরে সে তাঁর হাতে মারা পড়বে (১০, ১৪ ও ১৫নং হাদীস)। এরপর ইহুদীদেরকে সব জায়গা থেকে ধরে ধরে হত্যা করা হবে এবং ইহুদী জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে (৯, ১৫ ও ৩১ নম্বর হাদীস)। হযরত ঈসার (আ) পক্ষ থেকে সত্য প্রকাশের পর ঈসায়ী ধর্মও বিলুপ্ত হয়ে যাবে (১, ২, ৪ ও ৬ নম্বর হাদীস) এবং মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে সমস্ত মিল্লাত একীভূত হয়ে যাবে (৬ ও ১৫ নম্বর হাদীস)।

কোন প্রকার জড়তা ও অস্পষ্টতা ছাড়াই এই দ্ব্যর্থহীন সত্যটিই হাদীস থেকে ফুটে উঠেছে। এই সুদীর্ঘ আলোচনার পর এ ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, "প্রতিশ্রুত মসীহ"র নামে আমাদের দেশে যে কারবার চালানো হচ্ছে তা একটি প্রকাণ্ড জালিয়াতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ জালিয়াতির সবচাইতে হাস্যকর দিকটি এবার আমি উপস্থাপিত করতে চাই। যে ব্যক্তি নিজেকে এই ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত মসীহ বলে ঘোষণা করেছেন, তিনি নিজে ঈসা ইবনে মারয়াম হবার জন্য নিম্নোক্ত রসালো বক্তব্যটি পেশ করেছেন ঃ

"তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ) বারাহীনে আহমদীয়ার তৃতীয় অংশে আমার নাম রেখেছেন মার্‌য়াম। অতপর যেমন বারাহীনে আহমদীয়ায় প্রকাশিত হয়েছে, দু'বছর পর্যন্ত আমি মার্‌য়ামের গুণাবলী সহকারে লালিত হই.....অতপর.....মারয়ামের ন্যায় ঈসার রুহ আমার মধ্যে ফুঁৎকারে প্রবেশ করানো এবং রূপকার্থে আমাকে গর্ভবতী করা হয়। অবশেষে কয়েকমাস পরে, যা দশ মাসের চাইতে বেশী হবে না, সেই এলহামের মাধ্যমে, যা বারাহীনে আহমদীয়ার চতুর্থ অংশে উল্লেখিত হয়েছে, আমাকে মার্‌য়াম থেকে ঈসায় পরিণত করা হয়েছে। কাজেই এভাবে আমি হলাম ঈসা ইবনে মারয়াম।" (কিশতীয়ে নূহ ৮৭, ৮৮, ৮৯ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ প্রথমে তিনি মার্‌য়াম হন অতপর নিজে নিজেই গর্ভবতী হন। তারপর নিজের পেট থেকে নিজেই ঈসা ইবনে মার্‌য়াম রূপে জন্ম নেন। এরপরও সমস্যা দেখা দিল যে,

হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী ঈসা ইবনে মারয়াম দামেশ্‌কে অবতরণ করবেন। দামেশ্‌ক কয়েক হাজার বছর থেকে সিরিয়ার একটি প্রসিদ্ধ ও সর্বজন পরিচিত শহর। পৃথিবীর মানচিত্রে আজও এই শহরটি এই নামেই চিহ্নিত। কাজেই অন্য একটি রসাত্মক বক্তব্যের মাধ্যমে এ সমস্যাটির সমাধান দেয়া হয়েছে ঃ

"উল্লেখ্য যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে দামেশ্‌ক শব্দের অর্থ আমার নিকট এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ স্থানে এমন একটি শহরের নাম দামেশ্‌ক রাখা হয়েছে যেখানে এজিদের সভাব সম্পন্ন ও অপবিত্র এজিদের অভ্যাস ও চিন্তার অনুসারী লোকদের বাস। .....এই কাদীয়ান শহরটি এখানকার অধিকাংশ এজিদী স্বভাব সম্পন্ন লোকের অধিবাসের কারণে দামেশকের সাথে সামঞ্জস্য ও সম্পর্ক রাখে।" (এযালায়ে আওহাম, ফুটনোট ঃ ৬৩ থেকে ৭৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত)।

আর একটি জটিলতা এখনো রয়ে গেছে। হাদীসের বক্তব্য অনুসারে ইবনে মার্‌য়াম একটি সাদা মিনারের নিকট অবতরণ করবেন। এ সমস্যার সমাধান সহজেই করে ফেলা হয়েছে অর্থাৎ মসীহ সাহেব নিজেই এসে নিজের মিনারটি তৈরি করে নিয়েছেন। এখন বলুন, কে তাঁকে বুঝাতে যাবে যে, হাদীসের বর্ণনা অনুসারে দেখা যায় ইবনে মার্‌য়ামের অবতরণের পূর্বে মিনারটি সেখানে মওজুদ থাকবে। অথচ এখানে দেখা যাচ্ছে প্রতিশ্রুত মসীহ সাহেবের আগমনের পর মিনারটি তৈরি হচ্ছে।

সর্বশেষ ও সবচাইতে জটিল সমস্যাটি এখনো রয়ে গেছে। অর্থাৎ হাদীসের বর্ণনা মতে ঈসা ইবনে মার্‌য়াম (আ) লিড্ডার প্রবেশ দ্বারে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এ সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে প্রথমে আবোলতাবোল অনেক কথাই বলা হয়েছে। কখনো স্বীকার করা হয়েছে যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি গ্রামের নাম লিড্ডা (এযালায়ে আওহাম, আঞ্জুমানে আহমদীয়া, লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত, ক্ষুদ্রাকার, ২২০ পৃষ্ঠা)। আবার কখনো বলা হয়েছে, "লিড্ডা এমন সব লোককে বলা হয় যারা অনর্থক ঝগড়া করে।.....যখন দাজ্জালের অনর্থক ঝগড়া চরমে পৌঁছে যাবে তখন প্রতিশ্রুত মসীহর আবির্ভাব হবে এবং তার সমস্ত ঝগড়া শেষ করে দেবে" (এযালায়ে আওহাম, ৭৩০ পৃষ্ঠা)। কিন্তু এত করেও যখন সমস্যার সমাধান হলো না তখন পরিষ্কার বলে দেয়া হলো যে, লিড্ডা (আরবীতে লুদ) অর্থ হচ্ছে পাঞ্জাবের লুদিয়ানা শহর। আর লুদিয়ানার প্রবেশ দ্বারে দাজ্জালকে হত্যা করার অর্থ হচ্ছে, দুষ্টদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মীর্জা গোলাম আহমদ সাহেবের হাতে এখানেই সর্বপ্রথম বাইয়াত হয়। (আলহুদা, ৯১ পৃষ্ঠা)।

যে কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি এসব বক্তব্য বর্ণনার নিরপেক্ষ পর্যালোচনা করলে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হবেন যে, এখানে প্রকাশ্য দিবালোকে মিথ্যুক ও বহুরূপীর অভিনয় করা হয়েছে।

সাবা

৩৪

নামকরণ

১৫ আয়াতের বাক্য لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِىْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ থেকে গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, এটি এমন একটি সূরা যেখানে 'সাবা'-এর কথা বলা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কোন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত থেকে এর নাযিলের সঠিক সময়-কাল জানা যায় না। তবে বর্ণনাধারা থেকে অনুভূত হয়, সেটি ছিল মক্কার মাঝামাঝি যুগ অথবা প্রাথমিক যুগ। যদি মাঝামাঝি যুগ হয়ে থাকে, তাহলে সম্ভবত সেটি ছিল তার একেবারে প্রথম দিককার সময়। তখনো পর্যন্ত জুলুম-নিপীড়নের তীব্রতা দেখা দেয়নি এবং তখনো কেবলমাত্র ঠাট্টা-তামাশা, বিদ্রূপ, গুজব ছড়ানো এবং মিথ্যা অপবাদ ও প্ররোচনা দেবার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনকে দমিত করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছিল।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য

এ সূরায় কাফেরদের এমন সব আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে যা তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদ ও আখেরাতের দাওয়াতের এবং তাঁর নবুওয়াতের বিরুদ্ধে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ব্যাংগ-বিদ্রূপ ও অর্থহীন অপবাদের আকারে পেশ করতো। কোথাও এ আপত্তিগুলো উদ্ধৃত করে তার জবাব দেয়া হয়েছে আবার কোথাও সেগুলো কোন্ আপত্তির জবাব তা স্বতস্ফূর্তভাবে প্রকাশ হয়ে গেছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জবাব গুলো দেয়া হয়েছে বুঝাবার পদ্ধতিতে এবং আলোচনার মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দেবার ও যুক্তিপ্রদর্শনের কায়দায়। কিন্তু কোথাও কোথাও কাফেরদেরকে তাদের হঠকারিতার খারাপ পরিণতির ভয় দেখানো হয়েছে। এ প্রসংগে হযরত দাউদ (আ), হযরত সুলাইমান (আ) ও সাবা জাতির কাহিনী এ উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমাদের সামনে ইতিহাসের এ দু'টি দৃষ্টান্তই রয়েছে ঃ একদিকে রয়েছে হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলাইমান (আ)। আল্লাহ তাঁদেরকে দান করেছিলেন বিপুল শক্তি এবং এমন গৌরব দীপ্ত শান-শওকত, যা ইতিপূর্বে খুব কম লোককে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এসব কিছু পাওয়ার পরও তাঁরা অহংকার ও আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত হননি। বরং নিজের রবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরিবর্তে তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হন। অন্যদিকে ছিল সাবা জাতি। যখন আল্লাহ তাদেরকে নিয়ামত দান করলেন, তারা অহমিকায় স্ফীত হয়ে উঠলো এবং শেষে

এমনভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো যে, এখন কেবল তাদের কাহিনীই দুনিয়ার বুকে রয়ে গেছে। এ দু'টি দৃষ্টান্ত সামনে রেখে স্বয়ং তোমাদেরকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে, তাওহীদ ও আখেরাতে বিশ্বাস এবং নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রবণতার ভিত্তিতে যে জীবন গড়ে ওঠে তা বেশী ভালো, না সেই জীবন বেশী ভালো যা গড়ে ওঠে কুফর ও শিরক এবং আখেরাত অস্বীকার ও বৈষয়িক স্বার্থ পূজার ভিত্তিতে।

আয়াত ৫৪ | সূরা সাবা-মক্কী | রুকূ' ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ
فِى الْاٰخِرَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝١ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ
وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ
وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ۝٢ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ؕ قُلْ
بَلٰى وَرَبِّىْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ۙ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ
فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَلَاۤ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْبَرُ اِلَّا فِىْ
كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝٣

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসের মালিক[১] এবং আখেরাতে প্রশংসা তাঁরি জন্য।[২] তিনি বিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ।[৩] যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে, যা কিছু তা থেকে বের হয়, যা কিছু আকাশ থেকে নামে এবং যা কিছু তাতে উত্থিত হয় প্রত্যেকটি জিনিস তিনি জানেন। তিনি দয়াবান ও ক্ষমাশীল।[৪]

অস্বীকারকারীরা বলে, কি ব্যাপার কিয়ামত আমাদের ওপর আসছে না কেন![৫] বলো, আমার অদৃশ্য জ্ঞানী পরওয়ারদিগারের কসম, তা তোমাদের ওপর অবশ্যই আসবে।[৬] তাঁর কাছ থেকে অণু পরিমাণ কোন জিনিস আকাশসমূহেও লুকিয়ে নেই এবং পৃথিবীতেও নেই। অণুর চেয়ে বড়ই হোক, কিংবা তার চেয়ে ছোটই হোক, — সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা আছে।[৭]

১. মূলে 'হাম্‌দ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটি প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এখানে এ দু'টি অর্থই প্রযুক্ত। আল্লাহ যখন

বিশ্ব-জাহান ও এর সমস্ত জিনিসের মালিক তখন অবশ্যই এ বিশ্ব-জাহানে সৌন্দর্য, পূর্ণতা, জ্ঞান, শক্তি, শিল্পকারিতা ও কারিগরির যে শোভা দৃষ্টিগোচর হয় এসবের জন্য একমাত্র তিনিই প্রশংসার অধিকারী। আর এ বিশ্ব-জাহানে বসবাসকারী যে কেউ যে কোন জিনিস থেকে লাভবান হচ্ছে বা আনন্দ ও স্বাদ উপভোগ করছে সে জন্য তার আল্লাহর প্রতিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। অন্য কেউ যখন এসব জিনিসের মালিকানায় শরীক নেই তখন প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতা লাভ করার অধিকারও অন্য কারো নেই।

২. অর্থাৎ যেভাবে এ দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামত তিনিই দান করেছেন, ঠিক তেমনি আখেরাতেও মানুষ যা কিছু পাবে তা তাঁরই ভাণ্ডার থেকে এবং তাঁরই দান হিসেবেই পাবে। তাই সেখানেও একমাত্র তিনিই হবেন প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা লাভের অধিকারী।

৩. অর্থাৎ তাঁর সমস্ত কাজই হয় পূর্ণজ্ঞান ও প্রজ্ঞা ভিত্তিক। তিনি যা করেন একদম ঠিকই করেন। নিজের প্রত্যেকটি সৃষ্টি কোথায় আছে, কি অবস্থায় আছে, তার প্রয়োজন কি, তার প্রয়োজনের জন্য কি উপযোগী, এ পর্যন্ত সে কি করেছে এবং সামনের দিকে আরো কি করবে—এসব সম্পর্কে তিনি পূর্ণজ্ঞান রাখেন। নিজের তৈরি দুনিয়া সম্পর্কে তিনি বেখর নন বরং প্রতিটি অণু-পরমাণুর অবস্থাও তিনি পুরোপুরি জানেন।

৪. অর্থাৎ তাঁর রাজ্যে কোন ব্যক্তি বা দল তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সত্ত্বেও যদি পাকড়াও না হয়ে থাকে তাহলে এর কারণ এ নয় যে, এ দুনিয়ায় নৈরাজ্য চলছে এবং আল্লাহ এখানকার ক্ষমতাহীন রাজা। বরং এর কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ করুণাশীল এবং ক্ষমা করাই তাঁর অভ্যাস। পাপী ও অপরাধীকে অপরাধ অনুষ্ঠিত হবার সাথে সাথেই পাকড়াও করা, তার রিযিক বন্ধ করে দেয়া, তার শরীর অবশ করে দেয়া, মুহূর্তের মধ্যে তাকে মেরে ফেলা, সবকিছুই তাঁর ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে কিন্তু তিনি এমনটি করেন না। তাঁর করুণাগুণের দাবী অনুযায়ী তিনি এটি করেন। সর্বময় ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তিনি নাফরমান বান্দাদেরকে ঢিল দিয়ে থাকেন। তাদেরকে আপন আচরণ শুধরে নেবার অবকাশ দেন এবং নাফরমানি থেকে বিরত হবার সাথেসাথেই মাফ করে দেন।

৫. ঠাট্টা-মস্করা করে চিবিয়ে চিবিয়ে তারা একথা বলে। তাদের একথা বলার অর্থ ছিল এই যে, বহুদিন থেকে এ পয়গম্বর সাহেব কিয়ামতের আগমনী সংবাদ দিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু জানি না আসতে আসতে তা আবার থেমে গেলো কোথায়। আমরা তার প্রতি এতই মিথ্যা আরোপ করলাম, এত গোস্তাখী করলাম, তা নিয়ে এত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলাম কিন্তু এরপরও সেই কিয়ামত কোনভাবেই আসছে না।

৬. পরওয়ারদিগারের কসম খেয়ে তাঁর জন্য "অদৃশ্য জ্ঞানী" বিশেষণ ব্যবহার করার দ্বারা স্বতস্ফূর্তভাবে এ দিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, কিয়ামতের আগমন তো অবধারিত কিন্তু তার আগমনের সময় অদৃশ্যজ্ঞানী আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। এ বিষয়টিই কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা আল আ'রাফ ১৮৭, তা-হা ১৫, লুকমান ৩৪, আল আহযাব ৬৩, আল মুলক ২৫—২৬ এবং আন নাযি'আত ৪২—৪৪ আয়াত।

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ﴿٥﴾ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي
أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٦﴾
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ
مُمَزَّقٍ ۙ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٧﴾ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ
جِنَّةٌ ۗ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٨﴾

আর এ কিয়ামত এ জন্য আসবে যে, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করতে থেকেছে তাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করবেন, তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও সম্মানজনক রিযক। আর যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[৮] হে নবী! জ্ঞানবানরা ভালো করেই জানে, যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা পুরোপুরি সত্য এবং তা পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর পথ দেখায়।[৯]

অস্বীকারকারীরা লোকদেরকে বললো, "আমরা বলবো তোমাদেরকে এমন লোকের কথা যে এই মর্মে খবর দেয় যে, যখন তোমাদের শরীরের প্রতিটি অণু ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে তখন তোমাদের নতুনভাবে সৃষ্টি করে দেয়া হবে, নাজানি এ ব্যক্তি আল্লাহর নামে মিথ্যা তৈরি করে, নাকি তাকে পাগলামিতে পেয়ে বসেছে।"[১০]

না, বরং যারা আখেরাত মানে না তারা শাস্তি লাভ করবে এবং তারাই রয়েছে ঘোরতর ভ্রষ্টতার মধ্যে।[১১]

৭. আখেরাতের সম্ভাবনার সপক্ষে যেসব যুক্তি পেশ করা হয় এটি তার অন্যতম। যেমন সামনের দিকে ৭ আয়াতে আসছে। আখেরাত অস্বীকারকারীরা যেসব কারণে মৃত্যুপরের জীবনকে যুক্তি বিরোধী মনে করতো তার মধ্যে একটি কথা ছিল এই যে, যখন সমস্ত মানুষ মরে মাটিতে মিশে যাবে এবং তাদের দেহের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশগুলোও চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে তখন এ অসংখ্য অংশের আবার কিভাবে একত্র হওয়া সম্ভব

হবে এবং এগুলোকে এক সাথে জুড়ে আবার কেমন করে তাদেরকে সেই একই দেহাবয়বে সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। একথা বলে এ সন্দেহ নিরসন করা হয়েছে যে, আল্লাহর দপ্তরে এসব লিখিত আছে এবং আল্লাহ জানেন কোন্ জিনিসটি কোথায় গেছে। যখন তিনি পুনর্বার সৃষ্টি করার সংকল্প করবেন তখন তাঁর পক্ষে প্রতিটি ব্যক্তির দেহের অংশগুলো একত্র করা মোটেই কষ্টকর হবে না।

৮. ওপরে আখেরাতের সম্ভাবনার যুক্তি পেশ করা হয়েছিল এবং এখানে তার অপরিহার্যতার যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, এমন একটি সময় অবশ্যই আসা উচিত যখন জালেমদেরকে তাদের জুলুমের এবং সৎকর্মশীলদেরকে তাদের সৎকাজের প্রতিদান দেয়া হবে। যে সৎকাজ করবে সে পুরস্কার পাবে এবং যে খারাপ কাজ করবে সে শাস্তি পাবে, সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি এটা চায় এবং এটা ইনসাফেরও দাবী। এখন যদি তোমরা দেখো, বর্তমান জীবনে প্রত্যেকটি অসৎলোক তার অসৎকাজের পুরোপুরি সাজা পাচ্ছে না এবং প্রত্যেকটি সৎলোক তার সৎকাজের যথার্থ পুরস্কার লাভ করছে না বরং অনেক সময় অসৎকাজ ও সৎকাজের উল্টো ফলাফল পাওয়া যায়, তাহলে তোমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে, যুক্তি, বিবেক-বুদ্ধি ও ইনসাফের এ অপরিহার্য দাবী একদিন অবশ্যই পূর্ণ হতে হবে। সেই দিনের নামই হচ্ছে কিয়ামত ও আখেরাত। তার আসা নয় বরং না আসাই বিবেক ও ইনসাফের বিরোধী।

এ প্রসংগে ওপরের আয়াত থেকে আর একটি বিষয়ও সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এখানে বলা হয়েছে, ঈমান ও সৎকাজের ফল হচ্ছে গোনাহের মার্জনা ও সম্মানজনক রিযিক লাভ এবং যারা আল্লাহর দীনকে হেয় করার জন্য বিদ্বিষ্ট ও শত্রুতামূলক প্রচেষ্টা চালাবে তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম শাস্তি। এ থেকে আপনা আপনিই একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সাচ্চা দিলে যে ব্যক্তি ঈমান আনবে তার কাজের মধ্যে যদি কিছু গলদও থাকে তাহলে সে সম্মানজনক রিযিক না পেয়ে থাকলেও মাগফিরাত থেকে অবশ্যই বঞ্চিত হবে না। আর যে ব্যক্তি কুফরী করবে কিন্তু আল্লাহর সত্য দীনের মোকাবিলায় বিদ্বেষমূলক ও বৈরী নীতি অবলম্বন করবে না সে শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না ঠিকই কিন্তু নিকৃষ্টতম শাস্তি তার জন্য নয়।

৯. অর্থাৎ এ বিরোধীরা তোমার উপস্থাপিত সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য যতই জোর দিক না কেন তাদের এসব প্রচেষ্টা ও কৌশল সফলকাম হতে পারবে না। কারণ এসব কথার মাধ্যমে তারা কেবলমাত্র মূর্খদেরকেই প্রতারিত করতে পারবে। জ্ঞানবানরা তাদের প্রতারণাজালে পা দেবে না।

১০. কুরাইশ সরদাররা একথা ভালোভাবে জানতো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যুক বলে মেনে নেয়া জনগণের জন্য ছিল বড়ই কঠিন। কারণ সমগ্র জাতি তাঁকে সত্যবাদী জানতো এবং সারা জীবনেও কখনো কেউ তাঁর মুখ থেকে একটি মিথ্যে কথা শোনেনি। তাই তারা লোকদের সামনে তাঁর প্রতি এভাবে দোষারোপ করতোঃ এ ব্যক্তি যখন মৃত্যু পরের জীবনের মতো অবাস্তব কথা মুখে উচ্চারণ করে চলেছে, তখন হয় সে (নাউযুবিল্লাহ) জেনে বুঝে একটি মিথ্যে কথা বলছে নয়তো সে পাগল। কিন্তু এ পাগল কথাটিও ছিল মিথ্যুক কথাটির মতই সমান ভিত্তিহীন ও উদ্ভট। কারণ একজন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে পাগল বলা কেবল একজন নিরেট মূর্খ ও নির্বোধ

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا
مِّنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝٩

তারা কি কখনো এ আকাশ ও পৃথিবী দেখেনি যা তাদেরকে সামনে ও পেছন থেকে ঘিরে রেখেছে? আমি চাইলে তাদেরকে যমীনে ধসিয়ে দিতে অথবা আকাশের কিছু অংশ তাদের ওপর নিক্ষেপ করতে পারি।[১২] আসলে তার মধ্যে রয়েছে একটি নির্দশন এমন প্রত্যেক বান্দার জন্য যে আল্লাহ অভিমুখী হয়।[১৩]

ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। নয়তো চোখে দেখেইবা এক ব্যক্তি একটি জ্যান্ত মাছি গিলে খেয়ে নিতো কেমন করে। এ কারণেই আল্লাহ এ ধরনের বাজে কথার জবাবে কোন প্রকার যুক্তি উপস্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করেননি এবং তারা মৃত্যুপরের জীবন সম্পর্কে যে বিস্ময় প্রকাশ করতো কেবলমাত্র তা নিয়েই কথা বলেছেন।

১১. এ হচ্ছে তাদের কথার প্রথম জবাব। এর অর্থ হচ্ছে, মূর্খের দল! তোমরা তো বিবেক বুদ্ধির মাথা খেয়ে বসেছ। যে ব্যক্তি তোমাদেরকে প্রকৃত অবস্থা জানাচ্ছে তার কথা মেনে নিচ্ছো না এবং সোজা যে পথটি জাহান্নামের দিকে চলে গেছে সেদিকেই চোখ বন্ধ করে দৌড়ে চলে যাচ্ছো কিন্তু তারপরও তোমাদের নির্বুদ্ধিতার চূড়ান্ত হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি তোমাদেরকে বাঁচাবার চিন্তা করছে উল্টা তাকেই তোমরা পাগল আখ্যায়িত করছো।

১২. এটা তাদের কথার দ্বিতীয় জবাব। এ জবাবটি অনুধাবন করতে হলে এ সত্যটি দৃষ্টি সমক্ষে রাখতে হবে যে, কুরাইশ কাফেররা যেসব কারণে মৃত্যুপরের জীবনকে অস্বীকার করতো তার মধ্যে তিনটি জিনিস ছিল সবচেয়ে বেশী সুস্পষ্ট। এক, তারা আল্লাহর হিসেব-নিকেশ এবং তাঁর কাছে জবাবদিহির ব্যাপারটি মেনে নিতে চাইতো না। কারণ এটা মেনে নিলে দুনিয়ায় তাদের ইচ্ছামতো কাজ করার স্বাধীনতা থাকতো না। দুই, তারা কিয়ামত হওয়া, বিশ্ব ব্যবস্থায় ওলট পালট হয়ে যাওয়া এবং পুনরায় একটি নবতর বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটাকে অকল্পনীয় মনে করতো। তিন, যারা শত শত হাজার হাজার বছর আগে মরে গেছে এবং যাদের হাড়গুলোও গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মাটিতে, বাতাসে ও পানিতে মিশে গেছে তাদের পুনর্বার প্রাণ নিয়ে সশরীরে বেঁচে ওঠা তাদের কাছে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার মনে হতো। ওপরের জবাবটি এ তিনটি দিককেই পরিবেষ্টন করেছে এবং এ ছাড়াও এর মধ্যে একটি কঠোর সতর্কবাণীও নিহিত রয়েছে। এ ছোট ছোট বাক্যগুলোর মধ্যে যে বিষয়বস্তু লুকিয়ে রয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ যদি তোমরা কখনো চোখ মেলে এ পৃথিবী ও আকাশের দিকে তাকাতে তাহলে দেখতে পেতে এসব খেলনা নয় এবং এ ব্যবস্থা ঘটনাক্রমে সৃষ্টি হয়ে যায়নি। এ

বিশ্ব-জাহানের প্রত্যেকটি জিনিস একথা প্রকাশ করছে যে, একটি সর্বময় ক্ষমতা সম্পন্ন সত্তা পূর্ণ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা সহকারে তাকে তৈরি করেছেন। এ ধরনের একটি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অধীনে এখানে কাউকে বুদ্ধি, বিবেক, বিচারশক্তি ও স্বাধীন ক্ষমতা দান করার পর তাকে অদায়িত্বশীল ও কারো কাছে কোনপ্রকার জবাবদিহি না করে এমনি ছেড়ে দেয়া যেতে পারে বলে ধারণা করা একেবারেই অযৌক্তিক ও অর্থহীন কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

দুই ঃ গভীর দৃষ্টিতে এ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে কিয়ামতের আগমন যে মোটেই কোন কঠিন ব্যাপার নয়, সে কথা যে কোন ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারবে। পৃথিবী ও আকাশ যেসব নিয়মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেগুলোর মধ্যে সামান্য একটু হেরফের হলে কিয়ামত ঘটে যেতে পারে। আর এ ব্যবস্থাই আবার একথারও সাক্ষ দেয় যে, যিনি আজ এ দুনিয়া-জাহান তৈরি করে রেখেছেন তিনি আবার অন্য একটি দুনিয়াও তৈরি করতে পারেন। এ কাজ যদি তাঁর জন্য কঠিন হতো তাহলে এ দুনিয়াটিই বা কেমন করে অস্তিত্ব লাভ করতো।

তিন ঃ তোমরা পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টাকে কী মনে করেছো? তাঁকে তোমরা মৃত মানব গোষ্ঠীকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে অক্ষম বলে মনে করছো? যারা মরে যায় তাদের দেহ পচে খসে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যতই দূরে ছড়িয়ে পড়ুক না কেন সেগুলো থাকে তো এ আকাশ ও পৃথিবীর সীমানার মধ্যেই। এর বাইরে তো চলে যায় না। তাহলে এ পৃথিবী ও আকাশ যে আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন রয়েছে তাঁর পক্ষে মাটি, পানি ও হাওয়ার মধ্যে সেখানে যে জিনিস প্রবেশ করে আছে সেখান থেকে তাকে টেনে বের করে আনা এমন আর কি কঠিন ব্যাপার। তোমাদের শরীরের মধ্যে এখন যা কিছু আছে, তাও তো তাঁরই একত্রিত করা এবং ঐ একই মাটি, পানি ও হাওয়া থেকে বের করে আনা হয়েছে। এ বিচ্ছিন্ন অংশগুলো সংগ্রহ করা যদি আজ সম্ভবপর হয়ে থাকে, তাহলে আগামীকাল কেন অসম্ভব হবে?

এ তিনটি যুক্তিসহ এ বক্তব্যের মধ্যে আরো যে সতর্কবাণী নিহিত রয়েছে, তা এই যে, তোমরা সব দিক থেকে আল্লাহর একচ্ছত্র কর্তৃত্বের আবেষ্টনীতে ঘেরাও হয়ে আছো। যেখানেই যাবে এ বিশ্ব-জাহান তোমাদের ঘিরে রাখবে। আল্লাহর মোকাবিলায় কোন আশ্রয়স্থল তোমরা পাবে না। অন্যদিকে আল্লাহর ক্ষমতা এতই অসীম যে, যখনই তিনি চান তোমাদের পায়ের তলদেশ বা মাথার ওপর থেকে যে কোন বিপদ আপদ তোমাদের প্রতি বর্ষণ করতে পারেন। যে ভূমিকে মায়ের কোলের মতো প্রশান্তির আধার হিসেবে পেয়ে তোমরা সেখানে গৃহ নির্মাণ করে থাকো, তার উপরিভাগের নীচে কেমন সব শক্তি কাজ করছে এবং কখন তিনি কোন্ ভূমিকম্পের মাধ্যমে এ ভূমিকে তোমাদের জন্য কবরে পরিণত করবেন তা তোমরা জানো না। যে আকাশের নিচে তোমরা এমন নিশ্চিন্তে চলাফেরা করছো যেন এটা তোমাদের নিজেদের ঘরের ছাদ, তোমরা জানো না এ আকাশ থেকে কখন কোন্ বিজলী নেমে আসবে অথবা কোন্ প্রলয়ংকর বর্ষার ঢল নামবে কিংবা কোন্ আকস্মিক বিপদ তোমাদের ওপর আপতিত হবে। এ অবস্থায় তোমাদের এ আল্লাহকে ভয় না করা, পরকালের ভাবনা থেকে এভাবে গাফেল হয়ে যাওয়া এবং একজন শুভাকাংখীর উপদেশের মোকাবিলায় এ মিথ্যাচারের আশ্রয় নেয়ার এ ছাড়া আর কি অর্থ হতে পারে যে, তোমরা নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই ডেকে আনছো।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ۚ يٰجِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ
وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ۝١٠ اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا
صَالِحًا ۚ اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝١١

২ রুকূ'

দাউদকে আমি নিজের কাছ থেকে বিরাট অনুগ্রহ দান করেছিলাম।[১৪] (আমি হুকুম দিলাম) হে পর্বতমালা! এর সাথে একাত্মতা করো (এবং এ হুকুমটি আমি) পাখিদেরকে দিয়েছি।[১৫] আমি তার জন্য লোহা নরম করে দিয়েছি এ নির্দেশ সহকারে যে, বর্ম নির্মাণ করো এবং তাদের পরিমাপ যথার্থ আন্দাজ অনুযায়ী রাখো।[১৬] (হে দাউদের পরিবার!) সৎকাজ করো, তোমরা যা কিছু করছো সবই আমি দেখছি।

১৩. অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন ধরনের বিদ্বেষ ও অন্ধ স্বার্থপ্রীতি দুষ্ট নয়, যার মধ্যে কোন জিদ ও হঠকারিতা নেই বরং যে আন্তরিকতা সহকারে তার মহান প্রতিপালকের কাছে পথনির্দেশনার প্রত্যাশী হয়, সে তো আকাশ ও পৃথিবীর এ ব্যবস্থা দেখে বড় রকমের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যার মন আল্লাহর প্রতি বিমুখ সে বিশ্ব-জাহানে সবকিছু দেখবে তবে প্রকৃত সত্যের প্রতি ইংগিতকারী কোন নিদর্শন সে অনুভব করবে না।

১৪. মহান আল্লাহ হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের প্রতি যে অসংখ্য অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলেন সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। তিনি ছিলেন বাইতুল লাহমের ইয়াহুদা গোত্রের একজন সাধারণ যুবক। ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে জালুতের মতো এক বিশাল দেহী ভয়ংকর শত্রুকে হত্যা করে তিনি রাতারাতি বনী ইসরাঈলের নয়নমণিতে পরিণত হন। এ ঘটনা থেকেই তাঁর উত্থান শুরু হয়। এমনকি তালুতের ইন্তিকালের পরে প্রথমে তাঁকে 'হাব্‌রূনে' (বর্তমান আল খালীল) ইয়াহুদিয়ার শাসনকর্তা করা হয়। এর কয়েক বছর পর সকল বনী ইসরাঈল গোত্র সর্বসম্মতভাবে তাঁকে নিজেদের বাদশাহ নির্বাচিত করে এবং তিনি জেরুসালেম জয় করে ইসরাঈলী রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত করেন। তাঁরই নেতৃত্বে ইতিহাসে প্রথমবার এমন একটি আল্লাহর অনুগত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় যার সীমানা আকাবা উপসাগর থেকে ফোরাত নদীর পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এসব অনুগ্রহের সাথে সাথে আল্লাহ তাঁকে আরো দান করেন জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, ইনসাফ, ন্যায়নিষ্ঠা, আল্লাহভীতি, আল্লাহর বন্দেগী ও তাঁর প্রতি আনুগত্যশীলতা। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন আল বাকারাহ, ২৭৩ টীকা এবং বনী ইসরাঈল, ৭ টীকা)

১৫. এর আগে এ বিষয়টি সূরা আম্বিয়ার ৭৯ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে আমি এর ব্যাখ্যা করেছি। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আম্বিয়া, ৭১ টীকা)

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ۭ
وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۭ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ
اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿١٢﴾ يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَاۗءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ
وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ۭ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ
دَاوٗدَ شُكْرًا ۭ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ﴿١٣﴾

আর সুলাইমানের জন্য আমি বাতাসকে বশীভূত করে দিয়েছি, সকালে তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত এবং সন্ধায় তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত।[১৭] আমি তার জন্য গলিত তামার প্রস্রবণ প্রবাহিত করি।[১৮] এবং এমন সব জিনকে তার অধীন করে দিয়েছে যারা তাদের রবের হুকুমে তার সামনে কাজ করতো।[১৯] তাদের মধ্য থেকে যে আমার হুকুম অমান্য করে তাকে আমি আস্বাদন করাই জলন্ত আগুনের স্বাদ। তারা তার জন্য তৈরি করতো যা কিছু সে চাইতো, উঁচু উঁচু ইমারত, ছবি,[২০] বড় বড় পুকুর সদৃশ থালা এবং অনড় বৃহদাকার ডেগসমূহ।[২১] —হে দাউদের পরিবার! কাজ করো কৃতজ্ঞতার পদ্ধতিতে।[২২] আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ।

১৬. এ বিষয়টিও সূরা আম্বিয়ার ৮০ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে এবং সেখানে এর ব্যাখ্যাও করেছি। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন আল আম্বিয়া, ৭২ টীকা)

১৭. এ বিষয়টিও সূরা আম্বিয়ার ৮১ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে এবং সেখানে তার ব্যাখ্যাও করেছি। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আম্বিয়া ৭৪–৭৫ টীকা)

১৮. কোন কোন প্রাচীন তাফসীরকার এর এ অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, ভূগর্ভ থেকে হযরত সুলাইমানের জন্য একটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়েছিল। তাতে পানির পরিবর্তে গলিত তামা প্রবাহিত হতো। কিন্তু আয়াতের অন্য ব্যাখ্যা এও হতে পারে যে, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের আমলে তামা গলাবার এবং তার সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার জিনিস তৈরি করার কাজ এত ব্যাপক আকারে চলতো যেন মনে হতো সেখানে তামার প্রস্রবণ প্রবাহিত রয়েছে। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আম্বিয়া, ৭৪–৭৫ টীকা)

১৯. যেসব জিনকে হযরত সুলাইমানের অধীন করে দেয়া হয়েছিল তারা গ্রামীণ ও পাহাড় পর্বতে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠী ছিল, না সত্যিকার জিন ছিল, যারা সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে একটি অদৃশ্য সৃষ্টি হিসেবে পরিচিত—সে ব্যাপারে সূরা আম্বিয়া ও সূরা

নামলের ব্যাখ্যায় আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আম্বিয়া, ৭৫ এবং আন নাম্‌ল, ২৩, ৪৫ ও ৫২ টীকা)

২০. মূলে تماثيل শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এটি تمثال শব্দের বহুবচন। আল্লাহর সৃষ্ট জিনিসের মতো করে তৈরি করা প্রত্যেকটি জিনিসকে আরবীতে বলে। এসব জিনিস মানুষ, পশু, গাছ, ফুল, নদী বা অন্য যে কোন নিষ্প্রাণ জিনিসও হতে পারে।

التمثال اسم للشى المصنوع مشبها بخلق من خلق الله

(لسان العرب)

"এমন প্রত্যেকটি কৃত্রিম জিনিসকে তিমসাল বলা হয় যা আল্লাহর তৈরি করা জিনিসের মতো করে তৈরি করা হয়েছে।"

التمثال كل ما صور على صورة غيره من حيوان وغير حيوان -

"এমন প্রত্যেকটি ছবিকে তিমসাল বলা হয়, যা অন্য কোন জিনিসের আকৃতি অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে, তা সপ্রাণ বা নিষ্প্রাণ যাই হোক না কেন।" (তাফসীরে কাশ্‌শাফ)

এ কারণে কুরআন মজীদের এ বর্ণনা থেকে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের জন্য যে ছবি তৈরি করা হতো তা মানুষের ও প্রাণীর ছবি অথবা তাদের ভাস্কর মূর্তি হওয়াটা অপরিহার্য ছিল না। হতে পারে হযরত সুলাইমান (আ) নিজের ইমারতগুলো যেসব ফুল, পাতা, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও কারুকাজে শোভিত করেছিলেন সেগুলোকেই তামাসীল বলা হয়েছে।

হযরত সুলাইমান (আ) ফেরেশতা ও নবীদের ছবি অংকন করিয়েছিলেন, কোন কোন মুফাস্‌সিরের এ ধরনের বক্তব্যই বিভ্রান্তির উদগাতা। বনী ইসরাঈলের পৌরাণিক বর্ণনাবলী থেকে তাঁরা একথা সংগ্রহ করেন এবং তারপর এর ব্যাখ্যা এভাবে করেন যে, পূর্ববর্তী শরীয়াতগুলোতে এ ধরনের ছবি আঁকা নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু কোন প্রকার অনুসন্ধান না করে এ বর্ণনাগুলো উদ্ধৃত করার সময় এ মনীষীবৃন্দ একথা চিন্তা করেননি যে, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম যে মূসার শরীয়াতের অনুসারী ছিলেন সেখানেও শরীয়াতে মুহাম্মাদীর (সা) মতো মানুষের ও প্রাণীর ছবি ও মূর্তি নির্মাণ একই পর্যায়ে হারাম ছিল। আর তাঁরা একথাও ভুলে যান যে, বনী ইসরাঈলের একটি দলের তাঁর সাথে শত্রুতা ছিল এবং এরি বশবর্তী হয়ে তারা শিরক, মূর্তি পূজা ও ব্যভিচারের নিকৃষ্টতম অপবাদ তাঁর প্রতি আরোপ করে। তাই তাদের বর্ণনার ওপর নির্ভর করে এ মহিমান্বিত পয়গম্বর সম্পর্কে এমন কোন কথা কোন ক্রমেই মেনে নেয়া উচিত নয় যা আল্লাহ প্রেরিত কোন শরীয়াতের বিরুদ্ধে চলে যায়। একথা সবাই জানেন, হযরত মূসা আলাইহিমুস সালামের পরে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত বনী ইসরাঈলে যত নবীই এসেছেন তাঁরা সবাই ছিলেন তাওরাতের অনুসারী। তাঁদের একজনও এমন কোন শরীয়াত আনেননি যা তাওরাতের আইন রদ করে দেয়। এখন তাওরাতের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে সেখানে মানুষ ও পশুর ছবি ও মূর্তি নির্মাণকে বারবার একেবারেই হারাম বলে ঘোষণা করা হচ্ছেঃ

"তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করিও না; উপরিস্থ স্বর্গে, নীচস্থ পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচস্থ জলমধ্যে যাহা যাহা আছে, তাহাদের কোন মূর্তি নির্মাণ করিও না।" (যাত্রা পুস্তক ২০ ঃ ৪)

"তোমরা আপনাদের জন্য অবস্তু প্রতিমা নির্মাণ করিও না, না ক্ষোদিত প্রতিমা কিম্বা স্তম্ভ স্থাপন করিও না, ও তাহার কাছে প্রণিপাত করিবার নিমিত্তে তোমাদের দেশে কোন ক্ষোদিত প্রস্তর রাখিও না।" (লেবীয় পুস্তক ২৬ ঃ ১)

"পাছে তোমরা ভ্রষ্ট হইয়া আপনাদের জন্য কোন আকারের মূর্তিতে ক্ষোদিত প্রতিমা নির্মাণ কর, পাছে পুরুষের বা স্ত্রীর প্রতিকৃতি, পৃথিবীস্থ কোন পশুর প্রতিকৃতি, আকাশে উড্ডীয়মান কোন পক্ষীর প্রতিকৃতি, ভূচর কোন সরীসৃপের প্রতিকৃতি, অথবা ভূমির নীচস্থ জলচর কোন জন্তুর প্রতিকৃতি নির্মাণ কর।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৪ ঃ ১৬—১৮)

"যে ব্যক্তি কোন ক্ষোদিত কিম্বা ছাচে ঢালা প্রতিমা, সদাপ্রভুর ঘৃণিত বস্তু, শিল্পকরের হস্তনির্মিত বস্তু নির্মাণ করিয়া গোপনে স্থাপন করে, সে শাপগ্রস্ত।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২৭ ঃ ১৫)

এ পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট বিধানের পর কেমন করে একথা মেনে নেয়া যেতে পারে যে, হযরত সুলাইমান (আ) জিনদের সাহায্যে নবী ও ফেরেশতাদের ছবি বা তাদের প্রতিমা তৈরি করার কাজ করে থাকবেন। আর যেসব ইহুদি হযরত সুলাইমানের বিরুদ্ধে অপবাদ দিতো যে, তিনি নিজের মুশরিকা স্ত্রীদের প্রেমে বিভোর হয়ে মূর্তি পূজা করতে শুরু করেছিলেন, তাদের বর্ণনার ওপর নির্ভর করে একথা কেমন করে মেনে নেয়া যায়। (দেখুন বাইবেলের রাজাবলী—১, ১১ অধ্যায়)

তবুও মুফাস্‌সিরগণ বনী ইসরাঈলের এ বর্ণনা উদ্ধৃত করার সাথে সাথে একথাও সুস্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়াতে এটি হারাম। তাই এখন হযরত সুলাইমানের (আ) অনুসরণ করে ছবি ও ভাস্কর মূর্তি নির্মাণ করা কারো জন্য বৈধ নয়। কিন্তু বর্তমান যুগের কিছু লোক পাশ্চাত্যবাসীদের অনুকরণে চিত্রাংকন ও মূর্তি নির্মাণকে হালাল করতে চান। তাঁরা কুরআন মজীদের এ আয়াতকে নিজেদের জন্য প্রমাণ হিসেবে গণ্য করেছেন। তারা বলেন, একজন নবী যখন এ কাজ করেছেন এবং আল্লাহ নিজেই যখন তাঁর কিতাবে একথা আলোচনা করেছেন এবং এর ওপর তাঁর কোন প্রকার অপছন্দনীয়তার কথা প্রকাশ করেননি তখন অবশ্যই তা হালাল হওয়া উচিত।

পাশ্চাত্য সভ্যতার এসব অন্ধ অনুসারীর এ যুক্তি দু'টি কারণে ভুল। প্রথমত কুরআনে এই যে, "তামাসীল" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এ থেকে সুস্পষ্টভাবে মানুষ ও পশুর ছবির অর্থ প্রকাশ হয় না। বরং এ থেকে নিষ্প্রাণ জিনিসের ছবিও বুঝা যায়। তাই নিছক এ শব্দটির ওপর ভিত্তি করে কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের ও পশুর ছবি হালাল এ বিধান দেয়া যেতে পারে না। দ্বিতীয়ত বিপুল সংখ্যক শক্তিশালী সনদযুক্ত মুতাওয়াতির হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাণী জাতীয় যে কোন জিনিসের ছবি নির্মাণ ও সংরক্ষণকে অকাট্যভাবে ও চূড়ান্তভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন। এ

প্রসংগে নবী করীম (সা) থেকে যেসব উক্তি প্রমাণিত হয়েছে এবং সাহাবীগণ থেকে যেসব বাণী ও কর্ম উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলো আমি এখানে উল্লেখ করছি ঃ

(١) عن عائشة ام المؤمنين ان ام حبيبة وام سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبى صلى اللّه عليه وسلم فقال ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فاؤلئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة (بخارى ، كتاب الصلوة - مسلم ، كتاب المساجد، ، نسائى ، كتاب المساجد)

"উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত উম্মে হাবীবা (রা) ও হযরত উম্মে সালামাহ (রা) আবিসিনিয়ায় একটি গীর্জা দেখেছিলেন, তাতে ছবি ছিল। তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলেন। নবী (সা) বলেন, তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, যখন তাদের মধ্যে কোন সৎলোকের জন্ম হতো, তার মৃত্যুর পর তার কবরের ওপর তারা একটি উপাসনালয় তৈরি করতো এবং তার মধ্যে এ ছবিগুলো তৈরি করতো। কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি হিসেবে গণ্য হবে।"

(٢) عن ابى حجيفة ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لعن المصور -

"আবু হুজাইফা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিত্রকর্মের প্রতি লা'নত বর্ষণ করেছেন।" (বুখারী ঃ ব্যবসা-বাণিজ্য অধ্যায়, তালাক অধ্যায়, পোশাক অধ্যায়)

(٣) عن ابى زرعة قال دخلت مع ابى هريرة دارا بالمدينة فراى اعلاها مصورا يصور ، قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا حبة وليخلقو ذرة -

"আবু যুর'আহ বলেন, একবার আমি হযরত আবু হুরাইরার (রা) সাথে মদীনার একটি গৃহে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, গৃহের ওপর দিকে একজন চিত্রকর চিত্র নির্মাণ করছে। এ দৃশ্য দেখে হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ বলেন, তার চেয়ে বড় জালেম তার কে হবে যে আমার সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে! তারা একটি শস্যদানা অথবা একটি পিঁপড়ে বানিয়ে দেখাক তো।" (বুখারী ঃ পোশাক অধ্যায়, মুসনাদে আহমাদ ও মুসলিমের বর্ণনায় পরিষ্কার উল্লেখিত হয়েছে, এটি . ছিল মারওয়ানের গৃহ)

(٤) عن ابى محمد الهذلى عن على قال كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فى جنازة فقال ايكم ينطلق الى المدينة فلا يدع بها وثنا الا كسره ولا قبرا الا سواه ولا صورة الا لطخها ، فقال رجل انا يا رسول الله فانطلق فهاب اهل المدينة - فرجع - فقال على انا انطلق يا رسول اللّه - قال فانطلق ، فانطلق ثم رجع - فقال يا رسول اللّه لم ادع بها وثنا الا كسرته ولا قبرا الا سويته ولا صورة الا لطختها - ثم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من عاد لصنعة شى من هذا فقد كفر بما انزل على محمد -

আবু মুহাম্মাদ হাযালী হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাস একটি জানাযায় শরীক হয়েছিলেন। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে মদীনায় গিয়ে সকল মূর্তি ভেঙ্গে ফেলবে। সকল কবর ভূমির সমান করে দেবে এবং সকল ছবি নিশ্চিহ্ন করে দেবে? এক ব্যক্তি বললো, আমি এ জন্য প্রস্তুত। কাজেই সে গেলো কিন্তু মদীনাবাসীদের ভয়ে এ কাজ না করেই ফিরে এলো। তখন হযরত আলী (রা) নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি যাই? নবী করীম (সা) বললেন, ঠিক আছে তুমি যাও। হযরত আলী (রা) গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন, আমি কোন মূর্তি না ভেঙ্গে কোন কবর ভূমির সমান না করে এবং কোন ছবি নিশ্চিহ্ন না করে ছাড়িনি। একথায় নবী করীম (সা) বললেন, এখন যদি কোন ব্যক্তি এ জাতীয় কোন জিনিস তৈরি করে তাহলে সে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওপর যে শিক্ষা অবতীর্ণ হয়েছে তার সাথে কুফরী করলো। (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম ঃ জানাযাহ অধ্যায় এবং নাসাঈ, জানাযাহ অধ্যায়েও এ বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে)

(٥) عن ابن عباس عن النبى صلى اللّه عليه وسلم ..... ومن صور صورة عذب وكلف ان ينفخ فيها وليس بنافخ -

"ইবনে আব্বাস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, ...আর যে ব্যক্তি ছবি অংকন করলো তাকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাকে বাধ্য

করা হবে তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করার জন্য। কিন্তু সে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। (বুখারী, তাফসীর অধ্যায়; তিরমিযী, পোশাক অধ্যায়; নাসাঈ সৌন্দর্য অধ্যায় এবং মুসনাদে আহমাদ)

(٦) عن سعيد ابن ابى الحسن قال كنت عند ابن عباس رضى الله عنهما اذ اتاه رجل فقال يا ابا عباس انى انسان انما معيشتى من صنعة يدى وانى اصنع هذه التصاوير - فقال ابن عباس لا احدثك الا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - سمعته يقول من صور صورة فان الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها ابدا - فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه - فقال ويحك ان ابيت الا ان تصنع فعليك بهذا الشجر كل شئ ليس فيه روح -

"সাঈদ ইবনে আবুল হাসান বলেন, আমি ইবনে আব্বাসের (রা) কাছে বসে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এলো এবং সে বললো, হে আবু আব্বাস! আমি এমন এক ব্যক্তি যে নিজের হাতে রোজগার করে এবং এ ছবি তৈরি করেই আমি রোজগার করি। ইবনে আব্বাস জবাব দিলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যা বলতে শুনেছি তোমাকেও তাই বলবো। আমি নবী করীম (সা) থেকে একথা শুনেছি যে, যে ব্যক্তি ছবি তৈরি করবে আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন এবং যতক্ষণ সে তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার না করবে ততক্ষণ তাকে রেহাই দেবেন না। আর সে কখনো তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। একথা শুনে সে ব্যক্তি বড়ই উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং তার চেহারা হলুদ হয়ে গেলো। এ অবস্থা দেখে ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! যদি তোমার ছবি আঁকতেই হয়, তাহলে এই গাছের ছবি আঁকো অথবা এমন কোন জিনিসের ছবি আঁকো যার মধ্যে প্রাণ নেই।" (বুখারী, ব্যবসায় অধ্যায়; মুসলিম, পোশাক অধ্যায়; নাসাঈ, সৌন্দর্য অধ্যায় এবং মুসনাদে আহমাদ)

(٧) عن عبد الله بن مسعود قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول ان اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে চিত্রকরেরা সবচেয়ে কঠিন শাস্তি পাবে।" (বুখারী, পোশাক অধ্যায়; মুসলিম, পোশাক অধ্যায়; নাসাঈ, সৌন্দর্য অধ্যায় এবং মুসনাদে আহমাদ)

(٨) عن عبد الله بن عمر ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم -

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যারা এ ছবি আঁকে তাদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, যা কিছু তোমরা তৈরি করেছো তাকে জীবিত করো।" (বুখারী, পোশাক অধ্যায়; মুসলিম, পোশাক অধ্যায়; নাসাঈ, সৌন্দর্য অধ্যায় এবং মুসনাদে আহমাদ)

(٩) عن عائشة رضى اللّه عنها انها اشترت نمرقة فيها تصاوير فقام النبى صلى اللّه عليه وسلم بالباب ولم يدخل فقلت اتوب الى الله مما اذ نبت قال ما هذه النمرقة قلت لتجلس عليها وتوسدها قال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم وان الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة -

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি বালিশ কেনেন। তার গায়ে ছবি আঁকা ছিল। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন। তিনি দরোজায়ই দাঁড়িয়ে রইলেন। ভিতরে প্রবেশ করলেন না। আমি বললাম, আমি এমন প্রত্যেকটি গোনাহ থেকে তাওবা করছি যা আমি করেছি। নবী করীম (সা) বললেন, এ বালিশটি কেন? বললাম, আপনি এখানে আসবেন এবং এর গায় হেলান দেবেন এ জন্য এটা এখানে রাখা হয়েছে। বললেন, এই ছবি অংকনকারীদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, যা কিছু তোমরা তৈরি করেছো তাকে জীবিত করো। আর ফেরেশ্‌তারা (রহমতের ফেরেশতারা) এমন কোন গৃহে প্রবেশ করে না যেখানে ছবি থাকে।" (বুখারী, পোশাক অধ্যায়; মুসলিম, পোশাক অধ্যায়; নাসাঈ, সৌন্দর্য অধ্যায়; ইবনে মাজাহ, ব্যবসায় অধ্যায়; মুআত্তা, অনুমতি চাওয়া অধ্যায়)

(١٠) عن عائشة قال دخلت على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وانا متستره بقرام فيه صورة فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه ثم قال ان من اشد الناس عذابا يوم القيمة الذين يشبهون بخلق الله -

"হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এলেন। তখন আমি একটি পর্দা টাঙিয়ে রেখেছিলাম। তার গায়ে ছবি

আঁকা ছিল। তাঁর চেহারার রং বদলে গেলো। তারপর তিনি পর্দাটা নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন, কিয়ামতের দিন যাদেরকে কঠিনতম শাস্তি দেয়া হবে তাদের মধ্যে আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি করার চেষ্টা যারা করে তারাও রয়েছে।" (মুসলিম, পোশাক অধ্যায়; বুখারী, পোশাক অধ্যায় এবং নাসাঈ, সৌন্দর্য অধ্যায়)

(١١) عن عائشة قالت قدم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابى درنوكا فيه الخيل ذوات الا جنحة فامرنى فنزعته –

"হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর থেকে ফিরে এলেন। তখন আমি আমার দরোজায় একটি পর্দা টাঙিয়ে রেখেছিলাম। তার গায়ে পক্ষ বিশিষ্ট ঘোড়ার ছবি আঁকা ছিল। নবী করীম (সা) হুকুম দিলেন, এটি নামিয়ে ফেলো। আমি তা নামিয়ে ফেললাম।" (মুসলিম, পোশাক অধ্যায় এবং নাসাঈ, সৌন্দর্য অধ্যায়)

(١٢) عن جابر قال نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الصورة فى البيت ونهى ان يصنع ذالك –

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরের মধ্যে ছবি রাখতে মানা করেছেন এবং ছবি আঁকতেও নিষেধ করেছেন।" (তিরমিযী, পোশাক অধ্যায়)

(١٣) عن ابن عباس عن ابى طلحة عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة –

"ইবনে আব্বাস (রা) আবু তালহা আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফেরেশতারা (অর্থাৎ রহমতের ফেরেশতারা) এমন কোন গৃহে প্রবেশ করে না যেখানে কুকুর পালিত থাকে এবং এমন কোন গৃহেও প্রবেশ করে না যেখানে ছবি থাকে।" (বুখারী, পোশাক অধ্যায়)

(١٤) عن عبد اللّه بن عمر قال وعد النبى صلى اللّه عليه وسلم جبريل فراث عليه حتى اشتد على النبى صلى اللّه عليه وسلم فخرج النبى صلى اللّه عليه وسلم فلقيه فشكا اليه ماوجد فقال له انا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب –

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, একবার জিব্রীল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসার ওয়াদা করেন কিন্তু অনেক দেরী হয়ে যায় এবং তিনি আসেন না। নবী করীম (সা) এতে পেরেশান হন। তিনি ঘর থেকে বের হয়ে পড়েন এবং তাঁকে পেয়ে যান। তিনি তাঁর কাছে অভিযোগ করেন। তাতে তিনি বলেন, আমরা এমন কোন গৃহে প্রবেশ করি না যেখানে কুকুর বা ছবি থাকে।" (বুখারী, পোশাক অধ্যায়, এ বিষয়বস্তু সম্বলিত বহু হাদীস বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইমাম মালেক ও ইমাম মুহাম্মাদ বিভিন্ন সাহাবী থেকে উদ্ধৃত করেছেন)

এসব হাদীসের মোকাবিলায় আরো কিছু হাদীস এমন পেশ করা হয় যেগুলোতে ছবির ব্যাপারে ছাড় পাওয়া যায়। যেমন আবু তাল্‌হা আনসারীর এ হাদীস ঃ যে কাপড়ে ছবি উৎকীর্ণ থাকে তা দিয়ে পর্দা তৈরি করে টানিয়ে দেবার অনুমতি আছে। (বুখারী, পোশাক অধ্যায়) হযরত আয়েশার (রা) এ বর্ণনা ঃ ছবিযুক্ত কাপড় ছিঁড়ে যখন তিনি তা দিয়ে তোষক বা গদি বানিয়ে নেন তখন নবী করীম (সা) তা বিছাতে নিষেধ করেননি। (মুসলিম, পোশাক অধ্যায়) সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমরের (রা) এ হাদীস ঃ প্রকাশ্য স্থানে যে ছবি টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে তা নিষিদ্ধ, ছবি সম্বলিত যে কাপড় বিছানায় বিছিয়ে দেয়া হয়েছে তা নিষিদ্ধ নয়। (মুসনাদে আহমাদ) কিন্তু এর মধ্য থেকে কোন একটি হাদীসও ওপরে উদ্ধৃত হাদীসগুলো খণ্ডন করে না। ছবি অংকন করার বৈধতা এর মধ্য থেকে কোন একটি হাদীস থেকেও পাওয়া যায় না। এ হাদীসগুলোতে যদি কোন কাপড়ের গায়ে ছবি অংকিত থাকে এবং তা কিনে নেয়া হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে কেবলমাত্র সে কথাই আলোচিত হয়েছে। এ বিষয়ে আবু তাল্‌হা আনসারীর বর্ণিত হাদীসটি কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এটি এমন বহু সহীহ হাদীসের পরিপন্থী যেগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছবি সম্বলিত কাপড় টানিয়ে দিতে কেবল নিষেধই করেননি বরং তা ছিঁড়ে ফেলেছেন। তাছাড়া তিরমিযী ও মুআত্তায় হযরত আবু তালহার নিজের যে কার্যক্রম উদ্ধৃত হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, তিনি ছবি সম্বলিত পর্দা ঝুলানো তো দূরের কথা এমন বিছানা বিছাতেও অপছন্দ করতেন যাতে ছবি আঁকা থাকতো। আর হযরত আয়েশা ও সালেম ইবনে আবদুল্লাহর রেওয়ায়াত সম্পর্কে বলা যায়, তা থেকে কেবলমাত্র এতটুকু বৈধতাই প্রকাশ পায় যে, ছবি যদি মর্যাদাপূর্ণ স্থানে না থাকে বরং হীনভাবে বিছানায় রাখা থাকে এবং তাকে পদদলিত করা হয়, তাহলে তা সহনীয়। যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি চিত্রাংকন ও মূর্তি নির্মাণ শিল্পকে মানব সভ্যতার সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল কৃতিত্ব গণ্য করে এবং তা মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত করতে চায় সার্বিকভাবে তার বৈধতা এ হাদীসগুলো থেকে কেমন করে প্রমাণ করা যেতে পারে?

ছবির ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চূড়ান্তভাবে উম্মাতের জন্য যে বিধান রেখে গেছেন তার সন্ধান বর্ষীয়ান ও শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণের অনুসৃত কর্মনীতি থেকেই পাওয়া যায়। ইসলামে এটি একটি স্বীকৃত মূলনীতি যে, সমস্ত পর্যায়ক্রমিক বিধান ও প্রাথমিক উদারনীতির পর সর্বশেষে নবী করীম (সা) যে বিধান নির্ধারণ করেন সেটাই নির্ভরযোগ্য ইসলামী বিধান। আর নবী করীমের (সা) পর শ্রেষ্ঠ ও বর্ষীয়ান সাহাবীগণ কর্তৃক কোন পদ্ধতিকে কার্যকর করা একথারই প্রমাণ পেশ করে যে, নবী করীম (সা)

উম্মাতকে ঐ পদ্ধতির ওপরই রেখে গিয়েছিলেন। এবার দেখুন ছবির ব্যাপারে এই পবিত্র দলটির আচরণ কিরূপ ছিল ঃ

قال عمر رضى الله عنه انا لا ندخل كنا ئسكم من اجل التماثيل التى فيها الصور (بخارى ، كتاب الصلوة)

"হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খৃষ্টানদের বলেন, আমরা তোমাদের গীর্জায় প্রবেশ করবো না, কারণ তার মধ্যে ছবি রয়েছে।" (বুখারী, সালাত অধ্যায়)

كان ابن عباس يصلى فى بيعة الابيعة فيها تماثيل –

"ইবনে আব্বাস (রা) গীর্জায় নামায পড়ে নিতেন কিন্তু এমন কোন গীর্জায় পড়তেন না যার মধ্যে ছবি থাকতো।" (বুখারী, সালাত অধ্যায়)

عن ابى الهياج الاسدى ، قال لى على الا ابعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته ولا صورة الا طمستها –

"আবুল হাইয়াজ আসাদী বলেন, হযরত আলী (রা) আমাকে বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে যে অভিযানে পাঠিয়েছিলেন আমি কি তোমাকে সেখানে পাঠাবো না? আর তা হচ্ছে এই যে, তুমি কোন মূর্তি না ভেঙে ছাড়বে না, কোন উঁচু কবর মাটির সমান না করে ছেড়ে দেবে না এবং কোন ছবি নিশ্চিহ্ন না করে ছাড়বে না।" (মুসলিম, জানাযাহ অধ্যায় এবং নাসাঈ, জানাযাহ অধ্যায়)

عن حنش الكنانى عن على انه بعث عامل شرطته فقال له اتدرى على ما ابعثك ؟ على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انحت كل صورة وان اسوى كل قبر–

"হানশুল কিনানী বলেন, হযরত আলী (রা) তাঁর পুলিশ বিভাগের কোতায়ালকে বলেন, তুমি জানো আমি তোমাকে কোন্ অভিযানে পাঠাচ্ছি? এমন অভিযানে যাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তা হচ্ছে এই যে, প্রত্যেকটি ছবি নিশ্চিহ্ন করে দাও এবং প্রত্যেকটি কবরকে জমির সাথে মিশিয়ে দাও।" (মুসনাদে আহমাদ)

এই প্রমাণিত ইসলামী বিধানকে ইসলামী ফকীহগণ মেনে নিয়েছেন এবং তাঁরা একে ইসলামী আইনের একটি ধারা গণ্য করেছেন। কাজেই আল্লামা বদরুদ্দীন 'আইনী 'তাওযীহ'–এর বরাত দিয়ে লিখছেন ঃ

"আমাদের সহযোগীগণ (অর্থাৎ হানাফী ফকীহগণ) এবং অন্যান্য ফকীহগণ বলেন, কোন জীবের ছবি আঁকা কেবল হারামই নয় বরং মারাত্মক পর্যায়ের হারাম এবং কবীরাহ গোনাহের অন্তরভুক্ত। অংকনকারী হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে তা তৈরি করলেও সর্বাবস্থায় তা হারাম। কারণ এতে আল্লাহর সৃষ্টিকর্মের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। অনুরূপভাবে ছবি কাপড়ে, বিছানায়, দীনারে বা দিরহামে অথবা পয়সায় কিংবা কোন পাত্রে বা দেয়ালে যেখানেই অংকন করা হোক না কেন তা হারাম। তবে জীব ছাড়া অন্য কোন জিনিস যেমন গাছপালা ইত্যাদির ছবি অংকন করা হারাম নয়। এ সমস্ত ব্যাপারে ছবির ছায়াধারী হবার বা না হবার মধ্যে কোন ফারাক নেই। এ অভিমতই প্রকাশ করেছেন ইমাম মালেক (র), ইমাম সুফিয়ান সওরী (র), ইমাম আবু হানীফা (র) এবং অন্যান্য উলামা। কাযী ঈয়ায বলেন, মেয়েদের খেলনা পুতুল এর আওতা বহির্ভূত। কিন্তু ইমাম মালেক (র) এগুলো কেনাও অপছন্দ করতেন।" (উমদাতুল কারী, ২২ খণ্ড, ৭০ পৃষ্ঠা, এ অভিমতকেই ইমাম নববী মুসলিমের ব্যাখায় আরো বেশী বিস্তারিত আকারে উদ্ধৃত করেছেন। দেখুন শারহে নববী, মিসরে মুদ্রিত, ১৪ খণ্ড, ৮১–৮২ পৃষ্ঠা)

এতো গেলো ছবি আঁকা সম্পর্কিত বিধান। এখন থাকে অন্যের আঁকা চবি ব্যবহার করার বিষয়। এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে হাজার অসকালানী মুসলিম ফকীহগণের অভিমত এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

"মালেকী ফকীহ ইবনে আরাবী বলেন, যে ছবির ছায়া পড়ে তার হারাম হওয়ার ব্যাপারে তো 'ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে—চাই তা অসম্মানজনকভাবে রাখা হোক বা না হোক। একমাত্র মেয়েদের খেলার পুতুল এ ইজমার বাইরে থাকে।.....ইবনে আরাবী একথাও বলেন, যে ছবির ছায়া হয় না তা যদি তার নিজের অবস্থায় অপরিবর্তিত থাকে (অর্থাৎ আয়নার প্রতিচ্ছায়ার মতো না হয় বরং ছাপানো ছবির মতো স্থায়ী ও অনড় হয়) তাহলে তাও হারাম—তাকে হীনতার সাথে রাখা হোক বা না হোক। তবে হাঁ, যদি তার মাথা কেটে দেয়া হয় অথবা তার অংশগুলো আলাদা করে দেয়া হয়, তাহলে তার ব্যবহার বৈধ। .....ইমামুল হারামাইন একটি অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। সেটি হচ্ছে এই যে, পর্দা বা বালিশের ওপর যদি কোন ছবি আঁকা থাকে, তাহলে তা ব্যবহারের অনুমতি আছে কিন্তু দেয়াল বা ছাদের গায়ে লাগানো ছবি অবৈধ। কারণ এ অবস্থায় ছবি মর্যাদা লাভ করে। পক্ষান্তরে পর্দা ও বালিশে ছবি অসম্মানজনক অবস্থায় থাকবে।.....ইবনে আবী শাইবা ইকরামা (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তাবে'ঈদের যুগের আলেমগণ এ অভিমত পোষণ করতেন যে, বিছানায় ও বালিশে ছবি থাকলে তা তাঁর জন্য লাঞ্ছনাকর হয়। তাছাড়া তাদের এ চিন্তাও ছিল যে, উঁচু জায়গায় যে ছবিই লাগানো হয় তা হারাম এবং পদতলে যাকে পিষ্ট করা হয় তা জায়েয। এ অভিমত ইবনে সীরীন, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ, ইকরামা ইবনে খালেদ এবং সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকেও উদ্ধৃত হয়েছে।" (ফাত্হুল বারী, ১০ খণ্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা)

এ বিস্তারিত আলোচনা থেকে একথা ভালোভাবেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইসলামে ছবি হারাম হওয়ার ব্যাপারটি কোন মতদ্বৈততামূলক বা সন্দেহযুক্ত বিষয় নয়। বরং নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুস্পষ্ট উক্তি, সাহাবায়ে কেরামের কর্মধারা এবং মুসলিম ফকীহগণের সর্বসম্মত ফতোয়ার ভিত্তিতে এটি একটি স্বীকৃত আইন। বিদেশী ও বিজাতীয় সভ্যতা–সংস্কৃতি প্রভাবিত কিছু লোকের চুলচেরা অপব্যাখ্যা তাতে কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না।

এ প্রসংগে আরো কয়েকটি কথাও অনুধাবন করতে হবে। এর ফলে আর কোন প্রকার বিভ্রান্তির অবকাশ থাকবে না।

কেউ কেউ ফটো ও হাতে আঁকা ছবির মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা করেন। অথচ শরীয়াত ছবিকেই হারাম করেছে, ছবির কোন বিশেষ পদ্ধতিকে হারাম করেনি। ফটো ও হাতে আঁকা ছবির মধ্যে ছবি হবার দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। তাদের মধ্যে যা কিছু পার্থক্য তা কেবলমাত্র ছবি নির্মাণ পদ্ধতির দিক দিয়েই আছে এবং এদিক দিয়ে শরীয়াত স্বীয় বিধানের মধ্যে কোন পার্থক্য করেনি।

কেউ কেউ যুক্তি দিয়ে থাকেন, ইসলামে ছবি হারাম করা হয়েছিল শুধুমাত্র শির্ক ও মূর্তিপূজা রোধ করার জন্য। আর এখন তার কোন ভয় নেই। কাজেই এখন এ নির্দেশ কার্যকর না থাকা উচিত। কিন্তু এ যুক্তি সঠিক নয়। প্রথমত হাদীসে কোথাও একথা বলা হয়নি যে, কেবলমাত্র শির্ক মূর্তিপূজার বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য ছবিকে হারাম করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত এ দাবীও একেবারেই ভিত্তিহীন যে, বর্তমানে দুনিয়ায় শির্ক ও মূর্তিপূজার অবসান ঘটেছে। আজ এই উপমহাদেশেই কোটি কোটি মুশরিক ও মূর্তিপূজারী রয়ে গেছে। দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্নভাবে শির্ক হচ্ছে। খৃষ্টানদের মতো কিতাবধারীগণও আজ হযরত ঈসা (আ), হযরত মারয়াম (আ) ও তাদের বহু মনীষীর মূর্তি ও ছবির পূজা করছে। এমনকি মুসলমানদের একটি বড় অংশও সৃষ্টিপূজার বিপদ থেকে রেহাই পেতে পারেনি।

কেউ কেউ বলেন, কেবলমাত্র মুশরিকী ধরনের ছবিগুলোই নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। অর্থাৎ এমনসব ব্যক্তির ছবি ও মূর্তি যাদেরকে উপাস্য বানিয়ে নেয়া হয়েছে। বাদবাকি অন্যান্য ছবি ও মূর্তি হারাম হবার কোন কারণ নেই। কিন্তু এ ধরনের কথা যারা বলেন তারা আসলে শরীয়াত প্রণেতার উক্তি ও বিধান থেকে আইন আহরণ করার পরিবর্তে নিজেরাই নিজেদের শরীয়াত প্রণেতা হয়ে বসেছেন। তারা জানেন না, ছবি কেবলমাত্র শির্ক ও মূর্তিপূজার কারণ হয় না বরং দুনিয়ায় আরো অনেক ফিত্‌নারও কারণ হয়েছে এবং হয়ে চলছে। যেসব বড় বড় উপকরণের মাধ্যম রাজা বাদশাহ, স্বৈরাচারী ও রাজনৈতিক নেতাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রভাব সাধারণ মানুষের মগজে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে ছবি তার অন্যতম। দুনিয়ায় অশ্লীলতা ও যৌনতার বিস্তারের জন্যেও ছবিকে ব্যাপক হারে ব্যবহার করা হয়েছে এবং আজকের যুগে এ ফিত্‌নাটি অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক বেশী অগ্রসরমান। বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঘৃণা ও শত্রুতার বীজ বপন, বিপর্যয় ও দাংগা–হাংহামা সৃষ্টি এবং সাধারণ মানুষকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করার জন্য ছবিকে ব্যাপক হারে ব্যবহার করা হয় এবং আজকের যুগে এর প্রচলন হয়েছে সবচেয়ে বেশী। তাই শরীয়াত প্রণেতা কেবলমাত্র মূর্তিপূজা প্রতিরোধের জন্য ছবি হারাম হবার হুকুম দিয়েছেন, একথা মনে করা আসলেই ভুল। শরীয়াত প্রণেতা শর্তহীনভাবে জীবের ছবি আঁকা নিষিদ্ধ করেছেন। আমরা নিজেরা যদি শরীয়াত প্রণেতা নই বরং শরীয়াত

প্রণেতার অনুসারী হয়ে থাকি, তাহলে আমাদের শর্তহীনভাবে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে হুকুমের কোন কার্যকারণ বের করে সে দৃষ্টিতে কিছু ছবি হারাম এবং কিছু ছবি হালাল গণ্য করতে থাকবো, এটা আমাদের জন্য কোনক্রমেই বৈধ নয়।

কিছু লোক আপাত দৃষ্টিতে একেবারেই 'অক্ষতিকর ধরনের কতিপয় ছবির দিকে ইংগিত করে বলেন, এগুলোতে ক্ষতি কি? এগুলোতো শিরক, অশ্লীলতা বিপর্যয় সৃষ্টি, রাজনৈতিক প্রচারণা এবং এমনি ধরনের অন্যান্য ক্ষতিকর বিষয় থেকে পুরোপুরি মুক্ত। এ ক্ষেত্রে এগুলোর নিষিদ্ধ হবার কারণ কি হতে পারে? এ ব্যাপারে লোকেরা আবার সেই একই ভুল করে অর্থাৎ প্রথমে হুকুমের কার্যকারণ নিজেরা বের করে এবং তারপর প্রশ্ন করতে থাকে, যখন অমুক জিনিসের মধ্যে এ কার্যকারণ পাওয়া যাচ্ছে না তখন তা নাজায়েয হবে কেন? এ ছাড়াও তারা ইসলামী শরীয়াতের এ নিয়মটিও বোঝে না যে, শরীয়াতে হালাল ও হারামের মধ্যে এমন কোন অস্পষ্ট সীমারেখা কায়েম করে না যা থেকে মানুষ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না যে সে বৈধতার সীমার মধ্যে কতদূরে অবস্থান করছে এবং কোথায় এ সীমা অতিক্রম করে গেছে। বরং শরীয়াত এমন পার্থক্য রেখা টেনে দেয় যাকে প্রত্যেক ব্যক্তি উন্মুক্ত দিবালোকের মতো প্রত্যক্ষ করতে পারে। জীবের ছবি হারাম এবং অজীবের ছবি হালাল— ছবির ব্যাপারে এ পার্থক্য রেখা পুরোপুরি সুস্পষ্ট। এ পার্থক্য রেখার মধ্যে কোন প্রকার সংশয়ের অবকাশ নেই। যে ব্যক্তি শরীয়াতের বিধান মেনে চলতে চায় তার জন্য কোন্ জিনিসটি হারাম এবং কোন্ জিনিসটি হালাল তা সে পরিষ্কারভাবে জানতে পারে। কিন্তু জীবের ছবির মধ্যে যদি কোনটিকে জায়েয ও কোনটিকে নাজায়েয গণ্য করা হয় তাহলে উভয় ধরনের ছবির বৃহত্তর তালিকা দিয়ে দেবার পরও বৈধতা ও অবৈধতার সীমারেখা কোনদিনও সুস্পষ্ট হতে পারে না এবং অসংখ্য ছবি এমন থেকে যাবে যেগুলোকে বৈধতার সীমারেখার মধ্যে না বাইরে মনে করা হবে সে ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যাবে। এ ব্যাপারটি ঠিক তেমনি যেমন মদের ব্যাপারে ইসলামের হুকুম হচ্ছে এ থেকে একেবারেই দূরে অবস্থান করতে হবে। এটি এ ব্যাপারে একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু যদি বলা হয়, এর এমন একটি পরিমাণ ব্যবহার করা থেকে দূরে থাকা উচিত যার ফলে নেশার সৃষ্টি হয়, তাহলে হালাল ও হারামের মধ্যে কোন জায়গায়ও পার্থক্য রেখা প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারবে না এবং কি পরিমাণ মদ পান করা যাবে এবং কোথায় গিয়ে থেমে যেতে হবে, এ ফায়সালা কোন ব্যক্তিই করতে পারবে না। (আরো বেশী বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, রাসায়েল ও মাসায়েল, ১ খণ্ড, ১৫২-১৫৫ পৃষ্ঠা।

২১. এ থেকে জানা যায়, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের রাজগৃহে বিরাট আকারে মেহমানদের আপ্যায়ন করা হতো। বড় বড় হাওযের সমান গামলা তৈরি করা হয়েছিল। তার মধ্যে লোকদের জন্য খাবার উঠিয়ে রাখা হতো। বৃহদাকার ডেগ বানিয়ে রাখা হয়েছিল। তার মধ্যে এক সংগে হাজার হাজার মানুষের খাদ্য পাকানো হতো।

২২. অর্থাৎ কৃতজ্ঞ বান্দাদের মতো কাজ করো। যে ব্যক্তি মুখেই কেবল অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ স্বীকার করে কিন্তু তার অনুগ্রহকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার করে, তার নিছক মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অর্থহীন। আসল কৃতজ্ঞ বান্দা হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে তার

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾

তারপর যখন সুলাইমানের ওপর আমি মৃত্যুর ফায়সালা প্রয়োগ করলাম তখন জিনদেরকে তার মৃত্যুর খবর দেবার মতো সেই ঘুণ ছাড়া আর কোন জিনিস ছিল না যা তার লাঠিকে খেয়ে চলছিল। এভাবে যখন সুলাইমান পড়ে গেলো, জিনদের কাছে একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো[২৩] যে, যদি তারা অদৃশ্যের কথা জানতো তাহলে এ লাঞ্ছনাকর শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না।[২৪]

মুখেও অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেয় এবং এ সংগে অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহকে তার ইচ্ছামতো কাজেও ব্যবহার করে।

২৩. মূল শব্দ হচ্ছে, تبينت الجن —এ বাক্যাংশের একটি অনুবাদ আমি ওপরে করেছি। এর আরেকটি অনুবাদ এও হতে পারে ঃ জিনদের অবস্থা পরিষ্কার হয়ে গেলো অথবা উন্মুক্ত হয়ে গেলো। প্রথম অবস্থায় এর অর্থ হবে, খোদ জিনেরাই জানতে পারবে যে, অদৃশ্য বিষয় জানার ব্যাপারে তাদের ধারণা ভুল। দ্বিতীয় অবস্থায় এর অর্থ হবে, সাধারণ মানুষেরা যারা জিনদেরকে অদৃশ্যজ্ঞানী মনে করতো তাদের কাছে একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, জিনেরা কোন অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।

২৪. বর্তমান যুগের কোন কোন মুফাস্‌সির এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন ঃ হযরত সুলাইমানের (আ) ছেলে রাহব্‌'আম যেহেতু ছিলেন অযোগ্য, বিলাশী ও তোষামোদকারী মোসাহেব পরিবৃত, তাই নিজের মহিমান্বিত পিতার ইন্তেকালের পর তার ওপর যে মহান দায়িত্ব এসে পড়েছিল তা পালন করতে তিনি সক্ষম হননি। তার ক্ষমতা গ্রহণের কিছুদিন পরেই রাষ্ট্রব্যবস্থা পতনমুখী হয় এবং আশপাশের সীমান্ত এলাকার যেসব উপজাতিকে (অর্থাৎ জিন) হযরত সুলাইমান (আ) তাঁর প্রবল পরাক্রমের মাধ্যমে নিজের দাসে পরিণত করে রেখেছিলেন তারা সবাই নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এ ব্যাখ্যা কোনক্রমেই কুরআনের শব্দাবলীর সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কুরআনের শব্দাবলী আমাদের সামনে যে নকশা পেশ করছে তা হচ্ছে এই যে, হযরত সুলাইমান এমন সময় মৃত্যুবরণ করেন যখন তিনি একটি লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বা বসে ছিলেন। এ লাঠির কারণে তাঁর নিষ্প্রাণ দেহ স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তিনি জীবিত আছেন মনে করেই জিনেরা তাঁর কাজ করে চলছিল। শেষে যখন লাঠিতে ঘুন ধরে গেলো এবং তা ভেতর থেকে অন্তসারশূন্য হয়ে গেলো তখন তাঁর মরদেহ মাটিতে গড়িয়ে পড়লো এবং জিনেরা জানতে পারলো তিনি মারা গেছেন। এই পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ঘটনা বর্ণনার গায়ে এ ধরনের অর্থের প্রলেপ লাগাবার কি যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে যে, ঘুন অর্থ হচ্ছে হযরত সুলাইমানের

ছেলের অযোগ্যতা, লাঠি অর্থ হচ্ছে তাঁর কর্তৃত্ব ক্ষমতা এবং তাঁর মৃতদেহ পড়ে যাবার মানে হচ্ছে তাঁর রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া? এ বিষয়টি বর্ণনা করাই যদি আল্লাহর উদ্দেশ্য হতো তাহলে কি এ জন্য সাবলীল আরবী ভাষায় শব্দের আকাল হয়ে গিয়েছিল? এভাবে হেরফের করে তা বর্ণনা করার কি কোন প্রয়োজন ছিল? এ ধরনের হেঁয়ালি ও ধাঁধার ভাষা কুরআনের কোথায় ব্যবহবার করা হয়েছে? আর এ বাণী প্রথমে সে যুগের সাধারণ আরবদের সামনে যখন নাযিল হয় তখন তারা কিভাবে এ ধাঁধার মর্মোদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন?

তারপর এ ব্যাখ্যার সবচেয়ে বেশী অদ্ভুত বিষয়টি হচ্ছে এই যে, এখানে জিন বলতে বুঝানো হয়েছে সীমান্ত উপজাতিগুলোকে, যাদেরকে হযরত সুলাইমান নিজের সেবাকর্মে নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এ উপজাতিগুলোর মধ্যে কে অদৃশ্যজ্ঞানের দাবীদার ছিল এবং মুশরিকরা কাকে অদৃশ্য জ্ঞানী মনে করতো? আয়াতের শেষের শব্দগুলো একটু মনোযোগ সহকারে পড়লে যে কোন ব্যক্তি নিজেই দেখতে পারে, জিন বলতে এখানে অবশ্যই এমন কোন দল বুঝানো হয়েছে যারা নিজেরাই অদৃশ্যজ্ঞানের দাবীদার ছিল অথবা লোকেরা তাদেরকে অদৃশ্যজ্ঞানী মনে করতো এবং তাদের অদৃশ্য বিষয়ক অজ্ঞতার রহস্য এ ঘটনাটিই উদঘাটন করে দিয়েছে যে, তারা হযরত সুলাইমানকে জীবিত মনে করেই তাঁর খেদমতে নিযুক্ত থাকে অথচ তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছিল। কুরআনের এই সুস্পষ্ট বর্ণনা দেখার পর জিন বলতে সীমান্ত উপজাতিদেরকে বুঝানো হয়েছে এই মতটি পুনরবিবেচনা করা একজন ঈমানদার ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বস্তুবাদী দুনিয়ার সামনে জিন নামের একটি অদৃশ্য সৃষ্টির অস্তিত্ব মেনে নিতে যারা লজ্জা অনুভব করছিলেন তারা কুরআনের এ সুস্পষ্ট বর্ণনার পর নিজেদের জটিল মনগড়া ব্যাখ্যার ওপরই জোর দিতে থাকেন।

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ বলেছেন, আরবের মুশকিরা জিনদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করতো, তাদেরকে আল্লাহর সন্তান মনে করতো এবং তাদের কাছে আশ্রয় চাইতো ঃ

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ

"আর তারা জিনদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করে নিয়েছে অথচ তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।" (আল আন'আম, ১০০)

وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا

"আর তারা আল্লাহ ও জিনদের মধ্যে বংশগত সম্পর্ক কল্পনা করে নিয়েছে"

(আস্ সাফ্ফাত, ১৫৮)

وَاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ

"আর ব্যাপার হচ্ছে, মানব জাতির মধ্য থেকে কিছু লোক জিনদের মধ্য থেকে কিছু লোকের কাছে আশ্রয় চাইতো।" (আল জিন, ৬)

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِىْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ۚ
كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ﴿١٥﴾
فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ
ذَوَاتَىْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَىْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ﴿١٦﴾ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ
بِمَا كَفَرُوْا ۚ وَهَلْ نُجٰزِىْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ ﴿١٧﴾

সাবার[২৫] জন্য তাদের নিজেদের আবাসেই ছিল একটি নিদর্শন।[২৬] দু'টি বাগান ডাইনে ও বামে।[২৭] খাও তোমাদের রবের দেয়া রিযিক থেকে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। উত্তম ও পরিচ্ছন্ন দেশ এবং ক্ষমাশীল রব। কিন্তু তারা মুখ ফিরালো।[২৮] শেষ পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে পাঠালাম বাঁধভাঙ্গা বন্যা[২৯] এবং তাদের আগের দু'টি বাগানের জায়গায় অন্য দু'টি বাগান তাদেরকে দিয়ে দিলাম যেখানে ছিল তিক্ত ও বিস্বাদ ফল এবং ঝাউগাছ ও সামান্য কিছু কুল।[৩০] এ ছিল তাদের কুফরীর প্রতিদান যা আমি তাদেরকে দিয়েছি এবং অকৃতজ্ঞ মানুষ ছাড়া অন্য কাউকে আমি এহেন প্রতিদান দেই না।

তাদের এসব বিশ্বাসের মধ্যে একটি বিশ্বাস এও ছিল যে, তারা জিনদেরকে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান সম্পন্ন মনে করতো এবং অদৃশ্য বিষয় জানার জন্য জিনদের শরণাপন্ন হতো। এ বিশ্বাসটির অসারতা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ এখানে এ ঘটনাটি শুনাচ্ছেন এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আরবের কাফেরদের মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি করা যে, তোমরা অনর্থক জাহেলিয়াতের মিথ্যা বিশ্বাসের ওপর জোর দিয়ে চলছো অথচ তোমাদের এ বিশ্বাসগুলো একেবারেই ভিত্তিহীন। (আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য সামনের দিকে ৬৩ টীকা দেখুন)

২৫. এ বর্ণনার ধারাবাহিকতা বুঝতে হলে প্রথম রুকূ'র বিষয়বস্তু সামনে রাখতে হবে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ আরবের কাফেররা আখেরাতের অগমনকে বুদ্ধি ও যুক্তি বিরোধী মনে করতো এবং যে রসূল এ আকীদা পেশ করতেন তাঁর ব্যাপারে প্রকাশ্যে বলতো যে এ ধরনের অদ্ভুত কথা যে ব্যক্তি বলে সে পাগল হতে পারে অথবা জেনে বুঝে মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়েছে। এর জবাবে আল্লাহ প্রথমে কয়েকটি বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি পেশ করেন। ৭, ৮ ও ১২ টীকায় আমি এগুলো পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছি। এরপর দ্বিতীয় রুকূ'তে হযরত দাউদ ও হযরত সুলাইমানের এবং তারপর সাবার কাহিনীকে একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ধরাপৃষ্ঠে মানব জাতির নিজের জীবন বৃত্তান্তই কর্মফল বিধানের সাক্ষ দিয়ে যাচ্ছে — একথাটি অনুধাবন করানোই ছিল এর উদ্দেশ্য। নিজের ইতিহাস মনোযোগ সহকারে পর্যালোচনা করলে মানুষ নিজেই একথা জানতে পারে যে, এ দুনিয়া এমন

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا
فِيهَا السَّيْرَ ۖ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴿١٨﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ
بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ
كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾

আর আমি তাদের ও তাদের যে জনবসতিগুলোতে সমৃদ্ধি দান করেছিলাম, সেগুলোর অন্তরবর্তী স্থানে দৃশ্যমান জনপদ গঠন করেছিলাম এবং একটি আন্দাজ অনুযায়ী তাদের মধ্যকার ভ্রমণের দূরত্ব নির্ধারণ করেছিলাম।[৩১] পরিভ্রমণ করো এসব পথে রাত্রিদিন পূর্ণ নিরাপত্তা সহকারে। কিন্তু তারা বললো, "হে আমাদের রব! আমাদের ভ্রমণের দূরত্ব দীর্ঘায়িত করো।"[৩২] তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছে। শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে কাহিনী বানিয়ে রেখে দিয়েছি এবং তাদেরকে একদম ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছি।[৩৩] নিশ্চিতভাবেই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে বেশী বেশী সবরকারী ও বেশী বেশী কৃতজ্ঞ প্রতিটি ব্যক্তির জন্য।[৩৪]

কোন নৈরাজ্যময় জগত নয় যার সমগ্র কারখানাটি নিজের ইচ্ছামতো খামখেয়ালীভাবে চলে। বরং এমন এক আল্লাহ এখানে শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনা করছেন যিনি সবকিছু শুনেন ও দেখেন। তিনি কৃতজ্ঞতার পথ অবলম্বনকারীদের সাথে এক ধরনের ব্যবহার করেন এবং অকৃতজ্ঞ ও নিয়ামত অস্বীকারকারীদের সাথে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবহার করেন। যে আল্লাহর রাষ্ট্র ব্যবস্থা এ ধরনের নিয়মের অধীন। তাঁর রাজ্যে পুণ্য ও পাপের পরিণাম কখনো এক হতে পারে না। যদি কেউ শিক্ষা নিতে চায় তাহলে এ ইতিহাস থেকেই এ শিক্ষা নিতে পারে। তাঁর ইনসাফ ও ন্যায় নীতির অনিবার্য দাবী হচ্ছে এই যে, এমন একটি সময় আসতেই হবে যখন সৎকাজের পূর্ণ প্রতিদান এবং অসৎকাজের পুরোপুরি বদলা দেয়া হবে।

২৬. অর্থাৎ এ বিষয়ের নিদর্শন যে, যা কিছু তারা লাভ করেছে তা কারো দান, তাদের নিজেদের উদ্ভাবন নয়। আর এ বিষয়েরও নিদর্শন যে, তাদের বন্দেগী ও ইবাদাত এবং কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার অধিকারী হচ্ছেন এমন এক আল্লাহ যিনি তাদেরকে নিয়ামত দান করেছেন। ঐ নিয়ামত দানের ব্যাপারে যাদের কোন অংশ নেই তারা ইবাদাত ও কৃতজ্ঞতা লাভের অধিকারী নয়। আবার এ বিষয়েরও নিদর্শন যে, তাদের সম্পদ অবিনশ্বর নয় বরং যেভাবে তা এসেছে ঠিক তেমনিভাবে চলে যেতেও পারে।

২৭. এর অর্থ এ নয় যে, সাবা দেশে মাত্র দু'টিই বাগান ছিল। বরং এর অর্থ হচ্ছে, সমগ্র সাবা রাজ্য শ্যামল সবুজ ক্ষেত ও বনানীতে পরিপূর্ণ ছিল। তার যে কোন জায়গায় দাঁড়ালে দেখা যেতো ডাইনেও বাগান এবং বাঁয়েও বাগান।

২৮. অর্থাৎ বন্দেগী ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে তারা নাফরমানি ও নিমকহারামির পথ অবলম্বন করে।

২৯. মূলে বলা হয়েছে سَيْلُ الْعَرِمْ দক্ষিণ আরবের ভাষায় 'আরিম' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'আরিমন' (عرمن) থেকে। এর অর্থ হচ্ছে "বাঁধ"। ইয়ামনের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সম্প্রতি যেসব প্রাচীন শিলালিপির সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলোতে এ শব্দটি এ অর্থে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ৫৪২ বা ৫৪৩ খৃষ্টাব্দের একটি শিলালিপি সম্পর্কে বলা যায়। ইয়ামনের হাবশী গভর্ণর আবরাহা "সাদ্দি মারিব" এর সংস্কার কাজ শেষ করার পর এটি স্থাপন করেন। এতে তিনি বারবার এ শব্দটি বাঁধ অর্থে ব্যবহার করেন। কাজেই "সাইলুল আরিম" মানে হচ্ছে বাঁধ ভেঙ্গে যে বন্যা আসে।

৩০. অর্থাৎ 'সাইলুল আরিম' আসার ফলে সাবা এলাকা ধ্বংস হয়ে যায়। সাবার অধিবাসীরা পাহাড়ের মধ্যে বাঁধ বেঁধে যেসব খাল ও পানি প্রবাহের সৃষ্টি করেছিল তা সব নষ্ট হয়ে যায় এবং পানি সেচের সমগ্র ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়। এরপর যে এলাকা এক সময় জান্নাত সদৃশ ছিল তা আগাছা ও জংগলে পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং সেখানে নিছক বন্য কুল ছাড়া আর আহারযোগ্য কিছু থাকেনি।

৩১. "সমৃদ্ধ জনপদ" বলতে সিরিয়া ও ফিলিস্তীন বুঝানো হয়েছে। কুরআন মজীদে সাধারণভাবে এ গুণবাচক শব্দ দিয়ে এর উল্লেখ করা হয়েছে। (দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন আল আ'রাফ, ১৩৭ আয়াত; বনী ইসরাঈল, ১ আয়াত এবং আল আম্বিয়া, ৭১ ও ৮১ আয়াত)

"দৃশ্যমান জনপদ" হচ্ছে এমন সব জনবসতি যেগুলো সাধারণ রাজপথের পাশে অবস্থিত। কোন এক কোণায় আড়ালে অবস্থিত নয়। আবার এর এ অর্থও হতে পারে যে, এ জনবসতিগুলো বেশী দূরে দূরে অবস্থিত ছিল না বরং লাগোয়া ছিল। একটি জনপদের চিহ্ন শেষ হবার পর দ্বিতীয় জনপদ শুরু হয়ে যেতো।

একটি আন্দাজ অনুযায়ী ভ্রমণের দূরত্ব নির্ধারণ করার মানে হচ্ছে, ইয়ামন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত পুরা সফর অবিচ্ছিন্ন জনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হতো, এর এক মঞ্জিল থেকে আর এক মঞ্জিলের দূরত্ব নির্ধারিত ও জানা ছিল। জনবসতিপূর্ণ এলাকা সফর ও অনাবাদ মরু এলাকা সফরের মধ্যে এ পার্থক্য থাকে। মরুভূমির মধ্যে মুসাফির যতক্ষণ চায় চলে এবং যতক্ষণ চলে কোথাও এক জায়গায় ডেরা বাঁধে। পক্ষান্তরে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় পথের এক জনপদ থেকে আর এক জনপদ পর্যন্ত এলাকার মধ্যকার দূরত্ব নির্ধারিত ও জানা থাকে। পথিক পথে কোন্ কোন্ জায়গায় থামবে, দুপুরে কোথায় বিশ্রাম নেবে এবং কোথায় রাত কাটাবে এর পূর্ণ কর্মসূচী পূর্বাহ্নেই তৈরি করে নিতে পারে।

৩২. তারা যে মুখে এ দোয়া উচ্চারণ করেছিল, এমনটি অপরিহার্য নয়। আসলে যে ব্যক্তিই আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয় সে যেন তার অবস্থা ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে একথা বলে, হে আল্লাহ! আমি এ নিয়ামতগুলোর যোগ্য নই। অনুরূপভাবে যে জাতি আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে অযথা সুবিধা লাভ করে সে যেন নিজের রবের কাছে দোয়া করে, হে আমাদের রব! এ অনুগ্রহগুলো আমাদের থেকে ছিনিয়ে নাও, কারণ আমরা এর যোগ্য নই।

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ
بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٢١﴾

তাদের ব্যাপারে ইবলিস তার ধারণা সঠিক পেয়েছে এবং একটি ক্ষুদ্র মু'মিন দল ছাড়া বাকি সবাই তারই অনুসরণ করেছে।[৩৫] তাদের ওপর ইবলিসের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু যা কিছু হয়েছে তা এ জন্য হয়েছে যে, আমি দেখতে চাচ্ছিলাম কে পরকাল মান্যকারী এবং কে সে ব্যাপারে সন্দিহান।[৩৬] তোমার রব সব জিনিসের তত্ত্বাবধায়ক।[৩৭]

এ ছাড়াও رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا (হে আল্লাহ! আমাদের সফর দীর্ঘায়িত করে দাও)—এ শব্দগুলো থেকে কিছুটা একথাও প্রতীয়মান হয় যে, সম্ভবত সাবা জাতির চোখে তাদের বিপুল জনসংখ্যা বিরক্তিকর মনে হয়েছিল এবং অন্যান্য জাতির মতো তারাও নিজেদের বর্ধিত জনসংখ্যাকে সংকট মনে করে জন্ম নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়েছিল।

৩৩. অর্থাৎ সাবা জাতি এমনভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় যে তাদের বিক্ষিপ্ততা ও বিশৃংখলা প্রবাদে পরিণত হয়। আজো যদি আরববাসী কোন জাতির মধ্যকার বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যের কথা আলোচনা করে তাহলে বলে تفرقوا ايدى سبا "তারা তো এমন নৈরাজ্যের শিকার হয়েছে যেমন সাবা জাতি নৈরাজ্যের শিকার হয়েছিল।" আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন অনুগ্রহের অবসান ও অবক্ষয়ের যুগ শুরু হয় তখন সাবার বিভিন্ন গোত্র নিজেদের স্বদেশ ত্যাগ করে আরবের বিভিন্ন এলাকায় চলে যায়। গাস্সানীরা জর্দান ও সিরিয়ার দিকে চলে যায়। আওস ও খাযরাজ গোত্র ইয়াস্রিবে বসতি স্থাপন করে। খুযা'আহ গোত্র জেদ্দার নিকটবর্তী তিহামা এলাকায় আবাস গড়ে তোলে। আয্দ গোত্র ওমানে গিয়ে ঠাঁই নেয়। লাখ্ম, জযাম এবং কিন্দাও বেরিয়ে পড়তে বাধ্য নয়। এমনকি শেষ পর্যন্ত সাবা নামে কোন জাতিই আর দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকেনি। কেবলমাত্র গল্প কাহিনীতেই তার আলোচনা থেকে গেছে।

৩৪. এ প্রেক্ষাপটে সবরকারী ও কৃতজ্ঞ বলতে এমন ব্যক্তি বা দল বুঝায় যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত লাভ করে অহংকারে মেতে ওঠে না, সমৃদ্ধিশালী হয়ে আত্মম্ভরী হয় না এবং যে আল্লাহ এসব কিছু দান করেছেন তাঁকে ভুলে যায় না। এ ধরনের লোকেরা যারা উন্নতি ও অগ্রগতির সুযোগ পেয়ে নাফরমানির পথ অবলম্বন করে এবং অশুভ পরিণামের সম্মুখীন হয় তাদের অবস্থা থেকে অনেক কিছু শিক্ষা নিতে পারে।

৩৫. ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্রাচীনকাল থেকে সাবা জাতির মধ্যে এমন একটি দল ছিল যারা অন্য উপাস্যদেরকে মেনে চলার পরিবর্তে এক আল্লাহকে মেনে চলতো।

বর্তমান যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে ইয়ামনের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ থেকে যেসব শিলালিপি উদ্ধার করা হয় তার মধ্য থেকে কোন কোনটি এই স্বল্প সংখ্যক দলের অস্তিত্ব চিহ্নিত করে। খৃঃ পূঃ ৬৫০ অব্দের কাছাকাছি সময়ের কোন কোন শিলালিপি একথা বলে যে, সাবা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এমন কিছু ইবাদাত গৃহ স্থাপিত ছিল যেগুলো আসমানি বা আসমান ওয়ালার (অর্থাৎ আসমানের রব) ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কোন কোন স্থানে এ উপাস্যের নাম ملكن نوسموى (আকাশসমূহের মালিক বাদশাহ) লেখা হয়েছে। এ দলের লোকেরা একনাগাড়ে শত শত বছর ইয়ামনে বাস করতে থাকে। কাজেই ৩৭৮ খৃষ্টাব্দে একটি শিলালিপিতে الـه نوسموى (আকাশসমূহের ইলাহ) নামে একটি ইবাদাত গৃহ নির্মাণের উল্লেখ দেখা যায়। তারপর ৪৬৫ খৃষ্টাব্দের একটি শিলালিপিতে এ শব্দগুলো পাওয়া যায় ঃ بنصر وردا الهن بعل سمعين وارضين (অর্থাৎ এমন খোদার মদদ ও সাহায্য সহকারে যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মালিক)। একই সময়ের ৪৫৮ খৃষ্টাব্দের আর একটি শিলালিপিতে একই খোদার জন্য "রহমান" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মূল শব্দ হচ্ছে بردا رحمنن (অর্থাৎ রহমানের সাহায্যে)।

৩৬. অর্থাৎ এ ক্ষমতা ইবলিসের ছিল না যে তারা আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে চাচ্ছিল কিন্তু ইবলিস জোর করে তাদেরকে নাফরমানির পথে টেনে নিয়ে গেছে। আল্লাহ তাকে যে শক্তি দিয়েছিলেন তা কেবল এতটুকুই ছিল যে, সে তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে এবং যারা তার পিছনে চলতে চায় তাদেরকে নিজের অনুসারী করতে পারে। যারা পরকাল মানে এবং যারা পরকালের অগমনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে তাদের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট করার জন্য ইবলিসকে এ বিপথগামী করার সুযোগ দেয়া হয়েছে।

অন্য কথায় আল্লাহর এ বাণী এ সত্যটিই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরে যে, আখেরাত বিশ্বাস ছাড়া অন্য কোন জিনিসই এমন নেই যা এ দুনিয়ায় মানুষকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত রাখার গ্যারান্টি দিতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি একথা না মানে যে, মৃত্যুর পর তাকে আবার জীবিত হতে হবে এবং আল্লাহর সামনে নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তাহলে সে অবশ্যই পথ ভ্রষ্ট ও কুপথগামী হবে। কারণ যে দায়িত্বানুভূতি মানুষকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত রাখে তা তার মধ্যে আদৌ সৃষ্টিই হতে পারবে না। তাই শয়তান মানুষকে আখেরাত থেকে গাফিল করে দেয়। এটিই তার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার এবং এর সাহায্যেই সে মানুষকে নিজের ফাঁদে আটকে ফেলে। যে ব্যক্তি তার এ প্রতারণা জাল ছিন্ন করে বের হয়ে আসে সে কখনো নিজের আসল চিরন্তন জীবনের স্বার্থকে দুনিয়ার এ সাময়িক জীবনের স্বার্থে কুরবানী করে দিতে রাজি হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শয়তানের প্রতারণায় বিভ্রান্ত হয়ে আখেরাতকে অস্বীকার করে বসে অথবা কমপক্ষে সে ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে সে কখনো এ দুনিয়ায় যে নগদ লাভ পেয়ে যাচ্ছে তা থেকে কেবলমাত্র এ জন্য হাত সংকুচিত করে নিতে রাজি হবে না যে এর ফলে পরবর্তী জীবনে ক্ষতি হবার আশংকা আছে। দুনিয়ায় যে ব্যক্তিই কখনো পথভ্রষ্ঠ হয়েছে তার পথভ্রষ্ঠতা এ আখেরাত অস্বীকার বা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করার কারণেই সংঘটিত হয়েছে এবং যে-ই সঠিক পথ অবলম্বন করেছে তার সঠিক কর্মের ভিত্তি আখেরাতের প্রতি ঈমানের ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩৭. কুরআন মজীদে সাবা জাতির ইতিহাসের প্রতি যে ইংগিত করা হয়েছে তা অনুধাবন করতে হলে এ জাতি সম্পর্কে ইতিহাসের অন্যান্য মাধ্যম থেকে যেসব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে সেগুলোও সামনে থাকা প্রয়োজন।

ইতিহাসের দৃষ্টিতে সাবা দক্ষিণ আরবের একটি বৃহৎ জাতির নাম। কতগুলো বড় বড় গোত্র সমন্বয়ে এ জাতিটি গড়ে উঠেছিল। ইমাম আহমাদ ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে আবদুল বার ও তিরমিযী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। সাবা ছিল আরবের এক ব্যক্তির নাম। আরবে তার বংশ থেকে নিম্নোক্ত গোত্রগুলোর উদ্ভব হয় ঃ কিন্দাহ, হিম্‌য়ার, আয্‌দ, আশ'আরীন, মায্‌হিজ, আন্‌মার (এর দু'টি শাখা ঃ খাস্‌'আম ও বাজীলাহ), আমেলাহ, জুযান, লাখ্‌ম ও গাস্‌সান।

অতি প্রাচীনকাল থেকে আরবে এ জাতির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে উর-এর শিলালিপিতে সাবোম নামের মধ্য দিয়ে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এরপর ব্যাবিলন ও আসিরিয়ার শিলালিপিতে এবং অনুরূপভাবে বাইবেলেও ব্যাপকহারে এর উল্লেখ দেখা যায়। (দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন যাবুর ৭২ ঃ ১৫, যিরমিয় ৬ ঃ ২০, যিহিস্কেল ২৭ ঃ ২২ ও ৩৮ ঃ ১৩ এবং ইয়োব ৬ ঃ ১৯) গ্রীক ও রোমীয় ঐতিহাসিকবৃন্দ এবং ভূগোলবিদগণ খ্রিয়োস্ট্রষ্টিসের (খৃঃ পূঃ ২৮৮) সময় থেকে খৃষ্ট পরবর্তী কয়েক শো বছর পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে এর আলোচনা করে এসেছেন।

এ জাতির আবাসভূমি ছিল আরবের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে বর্তমানে ইয়ামন নামে পরিচিত এলাকাটি। এর উত্থানকাল শুরু হয় খৃষ্টপূর্ব এগারো শো বছর থেকে। হযরত দাউদ ও হযরত সুলাইমান আলাইহিমাস সালামের যুগে একটি ধনাঢ্য ও সম্পদশালী জাতি হিসেবে সারা দুনিয়ায় এর নাম ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে এটি ছিল একটি সূর্যোপাসক জাতি। তারপর এর রাণী যখন হযরত সুলাইমানের (৯৬৫-৯২৬ খৃঃ পূঃ) হাতে ঈমান আনেন তখন জাতির বেশীর ভাগ লোক মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু পরে না জানি কোন্ সময় থেকে আবার তাদের মধ্যে শিরক ও মূর্তিপূজা প্রবল হয় এবং তারা আলমাকা (চন্দ্র দেবতা), 'আশতার (শুক্র) যাতে হামীম ও যাতে বা'দা (সূর্যদেবী), হোবস হারমতম বা হারীমত এবং এ ধরনের আরো বহু দেব-দেবীর পূজা করতে শুরু করে। আলমাকা ছিল এ জাতির সবচেয়ে বড় দেবতা। তাদের বাদশাহ নিজেকে এ দেবতার প্রতিনিধি হিসেবে আনুগত্য লাভের যোগ্য মনে করতো। ইয়ামনে এমন অসংখ্য শিলালিপি পাওয়া গেছে যা থেকে জানা যায়, সমগ্র দেশ উল্লেখিত দেবতাবৃন্দ বিশেষ করে আলমাকার মন্দিরে পরিপূর্ণ ছিল এবং প্রত্যকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হতো।

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ইয়ামন থেকে প্রায় ৩ হাজার শিলালিপি উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলো সাবা জাতির ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করে। এই সংগে আরবীয় ঐতিহ্য ও প্রবাদ এবং গ্রীক ও রোমীয় ইতিহাস থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলী একত্র করলে এ জাতির একটি বিস্তারিত ইতিহাস লেখা যেতে পারে। এসব তথ্যাবলীর দৃষ্টিতে তার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ যুগগুলো নিম্নভাবে বিবৃত করা যেতে পারে ঃ

এক ঃ খৃষ্টপূর্ব ৬৫০ অব্দের পূর্ববর্তী যুগ। এ সময় সাবার রাজার উপাধি ছিল "মুকার্‌রিবে সাবা" (مكرب سبا)। সম্ভবত এখানে مكرب শব্দটি مقرب এর

সমার্থক ছিল। এভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় ঃ এ বাদশাহ মানুষ ও খোদাদের মধ্যে নিজেকে সংযোগ মাধ্যম হিসেবে গণ্য করতেন। অথবা অন্যকথায় বলা যায়, তিনি ছিলেন পুরোহিত বাদশাহ (Priest Kings) এ সময় তাঁর রাজধানী ছিল সারওয়াহ নগরীতে। মারিবের পশ্চিম দিকে একদিনের দূরত্বে অবস্থিত খারীবাহ নামক স্থানে আজো এর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এ আমলে মারিবের বিখ্যাত বাঁধের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল এবং এরপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাদশাহ এর সীমানা আরো সম্প্রসারিত করেন।

দুই ঃ খৃষ্টপূর্ব ৬৫০ অব্দ থেকে খৃষ্টপূর্ব ১১৫ অব্দ পর্যন্ত সময়। এ সময় সাবার বাদশাহরা মুকাররিব উপাধি ত্যাগ করে মালিক (বাদশাহ) উপাধি গ্রহণ করেন। এর অর্থ হয়, রাজ্য পরিচালনায় ধর্মীয় ভাবধারার পরিবর্তে রাজনীতি ও সেকুলারিজমের রং প্রাধান্য লাভ করেছে। এ আমলে সাবার বাদশাহগণ সারওয়াহ ত্যাগ করে মারিবকে তাদের রাজধানী নগরীতে পরিণত করেন এবং এর অসাধারণ উন্নতি সাধন করেন। এ নগরটি সাগর থেকে ৩৯০০ ফুট উঁচুতে সানয়া থেকে ৬০ মাইল পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। আজ পর্যন্ত এর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলো সাক্ষ দিচ্ছে যে, এক সময় এটি ছিল দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুসভ্য জাতির কেন্দ্রভূমি।

তিন ঃ ১১৫ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়। এ সময় সাবার রাষ্ট্র ব্যবস্থায় হিম্‌য়ার গোত্র প্রাধান্য লাভ করে। এটি ছিল সাবা জাতিরই অন্তরভুক্ত একটি উপজাতি। অন্যান্য উপজাতিদের থেকে এদের লোকসংখ্যা ছিল অনেক বেশী। এ আমলে মারিবকে জনশূন্য করে যাইদানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এ শহরটি ছিল হিম্‌য়ার গোত্রের কেন্দ্র। পরবর্তীকালে এ শহরটি যাফার নামে আখ্যায়িত হয়। বর্তমানে ইয়েরেম শহরের কাছে একটি গোলাকার পর্বতের ওপর এর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় এবং এরই কাছাকাছি এলাকায় হিম্‌য়ার নামে একটি ক্ষুদ্রাকার উপজাতির বসতি রয়েছে। একে দেখে কোন ব্যক্তি ধারণাই করতে পারবে না যে, এটি এমন একটি জাতির স্মৃতিচিহ্ন একদিন যার ডংকা নিনাদ সমগ্র বিশ্বে গুঞ্জরিত হতো। এ সময়ই রাজ্যের একটি অংশ হিসেবে ইয়াম্‌নত ও ইয়াম্‌নিয়াত শব্দটির ব্যবহার শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে এটি আরবের দক্ষিণ পূর্ব কোণে অবস্থিত আসীর থেকে আদন (এডেন) এবং বাবুল মান্‌দাব থেকে হাদ্‌রামাউত পর্যন্ত সমগ্র এলাকার নামে পরিণত হয়। এ সময়ই সাবা জাতির পতন শুরু হয়।

চার ঃ ৩০০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে ইসলামের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত সময়। এটি ছিল সাবা জাতির ধ্বংসের সময়। এ সময় তাদের মধ্যে অনবরত গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে। বাইরের জাতিসমূহের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। কৃষি ব্যবস্থা বরবাদ হয়ে যায়। শেষে জাতীয় স্বাধীনতারও বিলোপ ঘটে। প্রথমে যাইদানী, হিম্‌য়ারী ও হামদানীদের পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘাতের সুযোগ গ্রহণ করে ৩৪০ থেকে ৩৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইয়ামনে হাব্‌শীদের রাজত্ব চলে। তারপর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার হয় ঠিকই কিন্তু মারিবের বিখ্যাত বাঁধে ফাটল দেখা দিতে থাকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত ৪৫০ বা ৪৫১ খৃষ্টাব্দে বাঁধ ভেঙ্গে পড়ে এবং এর ফলে যে মহাপ্লাবন হয় তার উল্লেখ কুরআন মজীদের ওপরের আয়াতে করা হয়েছে। যদিও এরপর থেকে আব্‌রাহার সময় পর্যন্ত অনবরত বাঁধের মেরামত কাজ চলতে থাকে তবুও যে জনবসতি একবার স্থানচ্যুত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল তা পুনরায় আর একত্র হতে পারেনি এবং পানিসেচ ও কৃষির যে ব্যবস্থা একবার

বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল তার আর পুনরগঠন সম্ভবপর হয়নি। ৫২৩ খৃষ্টাব্দে ইয়ামনের ইহুদি বাদশাহ যু-নওয়াস নাজ্‌রানের খৃষ্টানদের ওপর যে জুলুম-নিপীড়ন চালায় কুরআন মজীদে আসহাবুল উখদূদ নামে তার উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে হাবৃশার (আবিসিনিয়া এবং বর্তমানে ইথিওপিয়া) খৃষ্টান শাসক ইয়ামনের ওপর প্রতিশোধমূলক আক্রমণ চালান। তিনি সমগ্র দেশ জয় করে নেন। এরপর ইয়ামনের হাবৃশী গভর্ণর আবৃরাহা কা'বা শরীফের কেন্দ্রীয় গুরুত্ব খতম করার এবং আরবের সমগ্র পশ্চিম এলাকাকে রোমান-হাবশী প্রভাবাধীনে আনার জন্য ৫৭০ বা ৫৭১ খৃষ্টাব্দে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের মাত্র কিছুদিন পূর্বে মক্কা মুআয্যমা আক্রমণ করে। এ অভিযানে তার সমগ্র সেনাদল যে ধ্বংসের সম্মুখীন হয় কুরআন মজীদে আসহাবুল ফীল শিরোনামে তা উল্লেখিত হয়েছে। সবশেষে ৫৭৫ খৃষ্টাব্দে ইরানীরা ইয়ামন দখল করে ৬২৮ খৃষ্টাব্দে ইরানী গভর্ণর বাযান-এর ইসলাম গ্রহণের পর এ দখল দারিত্বের অবসান ঘটে।

সাবা জাতির উত্থান মূলত দুইটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক, কৃষি এবং দুই, ব্যবসায়। কৃষিকে তারা পানিসেচের একটি সর্বোত্তম ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নত করে। প্রাচীন যুগে ব্যবিলন ছাড়া আর কোথাও এর সমপর্যায়ের পানিসেচ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। সে দেশটি প্রাকৃতিক নদী সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল না। বর্ষাকালে পাহাড় থেকে পানির ঝরণা প্রবাহিত হতো। সারা দেশে এ ঝরণাগুলোতে বিভিন্ন স্থানে বাঁধ বেঁধে তারা কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করতো। তারপর এ হ্রদগুলো থেকে খাল কেটে সারা দেশে এমনভাবে পানি সেচের ব্যবস্থা গড়ে তুলে ছিল যাকে কুরআন মজীদের বর্ণনামতে, যেদিকে তাকাও সেদিকেই কেবল বাগ-বাগিচা ও সবুজ-শ্যামল গাছ-গাছালি দেখা যেতো। এ সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে সবচেয়ে বড় জলাধারটি মারিব নগরীর নিকটবর্তী বাল্‌ক পাহাড়ের মধ্যস্থলের উপত্যকায় বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে গড়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ দৃষ্টি যখন তাদের ওপর থেকে সরে গেলো তখন পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ বিশাল বাঁধটি ভেঙে গেলো। এ সময় এ থেকে যে বন্যা সৃষ্টি হলো তা পথের বাঁধগুলো একের পর এক ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চললো, এমনকি শেষ পর্যন্ত দেশের সমগ্র পানিসেচ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেলো এবং এরপর আর কোনভাবেই এ ব্যবস্থা পুনরবহাল করা গেলো না।

ব্যবসায়ের জন্য এ জাতিকে আল্লাহ সর্বোত্তম ভৌগলিক স্থান দান করেছিলেন। তারা এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। এক হাজার বছরের বেশী সময় পর্যন্ত এ জাতিটিই পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ব্যবসায়ের সংযোগ মাধ্যমের স্থান দখল করে থাকে। একদিকে তাদের বন্দরে চীনের রেশম, ইন্দোনেশিয়া ও মালাবারের গরম মশলা, হিন্দুস্তানের কাপড় ও তলোয়ার, পূর্ব আফ্রিকার যংগী দাস, বানর, উটপাখির পালক ও হাতির দাঁত পৌছে যেতো এবং অন্যদিকে তারা এ জিনিসগুলোকে মিসর ও সিরিয়ার বাজারে পৌছিয়ে দিতো। সেখান থেকে সেগুলো গ্রীস ও রোমে চলে যেতো। এ ছাড়াও তাদের নিজেদের এলাকায়ও উৎপন্ন হতো লোবান, চন্দন কাঠ, আম্বর, মিশ্‌ক, মুর, কারফা, কাস্‌বুখ, যারীরাহ, সালীখাহ ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যাদি বিপুল পরিমাণে। মিসর, সিরিয়া, গ্রীস ও রোমের লোকেরা এগুলো লুফে নিতো।

দু'টি বড় বড় পথে এ বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য চলতো। একটি ছিল সমুদ্রপথ এবং অন্যটি স্থলপথ। হাজার বছর পর্যন্ত সমুদ্রপথে ব্যবসায় ছিল সাবায়ীদের একচেটিয়া দখলে। কারণ

লোহিত সাগরের মৌসুমী বায়ু প্রবাহ, ভূগর্ভস্থ পাহাড় ও নোঙ্গর করার স্থানগুলোর গোপন তথ্য একমাত্র তারাই জানতো। অন্য কোন জাতির এ ভয়াল সাগরে জাহাজ চালাবার সাহসই ছিল না। এ সামদ্রিক পথে তারা জর্দান ও মিসরের বন্দরসমূহে নিজেদের পণ্যদ্রব্য পৌঁছিয়ে দিতো। অন্যদিকে স্থলপথ আদন (এডেন) ও হাদরামাউত থেকে মারিবে গিয়ে মিশতো এবং তারপর আবার সেখান থেকে একটি রাজপথ মক্কা, জেদ্দা, ইয়াসৃরিব, আল'উলা, তাবুক ও আইলা হয়ে পেট্রা পর্যন্ত পৌঁছে যেতো। এরপর একটি পথ মিসরের দিকে এবং অন্য পথটি সিরিয়ার দিকে যেতো। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, এ স্থলপথে ইয়ামন থেকে সিরিয়া সীমান্ত পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে সাবায়ীদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাদের বাণিজ্য কাফেলা দিনরাত এ পথে যাওয়া আসা করতো। এ উপনিবেশগুলোর মধ্যে অনেকগুলোর ধ্বংসাবশেষ এ এলাকায় আজো রয়ে গেছে এবং সেখানে সাবায়ী ও হিম্‌য়ারী ভাষায় লিখিত শিলালিপি পাওয়া যাচ্ছে।

খৃষ্টীয় প্রথম শতকের কাছাকাছি সময়ে এ ব্যবসায়ে অধোগতি শুরু হয়। মধ্যপ্রাচ্যে গ্রীক ও তারপর রোমানদের শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর তারা এ মর্মে শোরগোল শুরু করে দেয় যে, আরব ব্যবসায়ীরা নিজেদের ইজারাদারীর কারণে প্রাচ্যের ব্যবসায় পণ্যের ইচ্ছামতো মূল্য আদায় করে নিয়ে যাচ্ছে, এ ময়দানে অগ্রবর্তী হয়ে এ বাণিজ্য আমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে। এ উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম মিসরের গ্রীক বংশোদ্ভূত শাসক দ্বিতীয় বাতলিমূস (২৮৫–২৪৬ খৃঃ পূঃ) সেই প্রাচীন খালটি পুনরায় খুলে দেন, যা সতের শো বছর আগে ফেরাউন সিসুস্ত্রীস নীলনদকে লোহিত সাগরের সাথে সংযুক্ত করার জন্য এ খালটি খনন করেছিলেন। এ খালের মাধ্যমে মিসরের নৌবহর প্রথমবার লোহিত সাগরে প্রবেশ করে কিন্তু সাবায়ীদের মোকাবিলায় এ প্রচেষ্টা বেশী কার্যকর প্রমাণিত হতে পারেনি। তারপর রোমানরা যখন মিসর দখল করে তখন তারা লোহিত সাগরে অধিকতর শক্তিশালী বাণিজ্য বহর নিয়ে আসে এবং তার পশ্চাতভাগে একটি নৌবাহিনীও জুড়ে দেয়। এ শক্তির মোকাবিলা করার ক্ষমতা সাবায়ীদের ছিল না। রোমানরা বিভিন্ন বন্দরে নিজেদের ব্যবসায়িক উপনিবেশ গড়ে তোলে সেখানে জাহাজের প্রয়োজন পূর্ণ করার ব্যবস্থা করে। যেখানে সম্ভব হয় সেখানে নিজেদের সামরিক বাহিনীও রেখে দেয়। শেষ পর্যন্ত এমন এক সময় আসে যখন এডেনের ওপর রোমানদের সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সুযোগে রোমান ও হাবশী শাসকরা সাবায়ীদের মোকাবিলায় সম্মিলিতভাবে চক্রান্ত করে। এর ফলে শেষ পর্যন্ত এ জাতির স্বাধীনতা সূর্যও অস্তমিত হয়।

নৌবাণিজ্য বেদখল হয়ে যাবার পর সাবায়ীদের হাতে থেকে যায় শুধুমাত্র স্থলপথের বাণিজ্য। কিন্তু নানাবিধ কারণে ধীরে ধীরে তারও কোমর ভেঙে যায়। প্রথমে নাবতীরা পেট্রা থেকে নিয়ে আল'উলা পর্যন্ত হিজায ও জর্দানের উচ্চভূমির সমস্ত উপনিবেশ থেকে সাবায়ীদেরকে বের করে দেয়। তারপর ১০৬ খৃষ্টাব্দে রোমানরা নাবৃতী রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে হিজাযের সীমান্ত পর্যন্ত সিরিয়া ও জর্দানের সমস্ত এলাকা নিজেদের শক্ত হাতের মুঠোয় নিয়ে নেয়। এরপর হাবশা ও রোম সাবায়ীদের পারস্পরিক সংঘাতকে কাজে লাগিয়ে তাদের ব্যবসাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেবার জন্য সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এ কারণে হাবশীরা বারবার ইয়ামনের ব্যাপারে নাক গলাতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সারা দেশ অধিকার করে নেয়।

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ
مِنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا
فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا ۖ قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۖ وَهُوَ
الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾

৩ রুকূ'

(হে নবী![৩৮] এ মুশরিকদেরকে) বলো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব মাবূদকে তোমরা নিজেদের উপাস্য মনে করে নিয়েছো তাদেরকে ডেকে দেখো।[৩৯] তারা না আকাশে কোন অণু পরিমাণ জিনিসের মালিক, না পৃথিবীতে। আকাশ ও পৃথিবীর মালিকানায় তারা শরীকও নয়। তাদের কেউ আল্লাহর সাহায্যকারীও নয়। আর যে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ শাফায়াত করার অনুমতি দিয়েছেন আল্লাহর কাছে তার জন্য ছাড়া আর কারো জন্য কোন শাফায়াত উপকারী হতে পারে না।[৪০] এমনকি যখন মানুষের মন থেকে আশংকা দূর হয়ে যাবে তখন তারা (সুপারিশকারীদেরকে) জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের রব কি জবাব দিয়েছেন? তারা বলবে, ঠিক জবাব পাওয়া গেছে এবং তিনি উচ্চতম মর্যাদা সম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠতম।[৪১]

এভাবে আল্লাহর ক্রোধ এ জাতিকে উন্নতির উচ্চতম শিখর থেকে টেনে নামিয়ে এমন এক গর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করে যেখান থেকে কোন অভিশপ্ত জাতি আর কোনদিন বের হয়ে আসতে পারেনি। এক সময় ছিল যখন তার সম্পদশালিতার কথা শুনে গ্রীক ও রোমানরা ভীষণভাবে প্রলুব্ধ হতো। অষ্টাবু লিখছেন ঃ তারা সোনা ও রূপার পাত্র ব্যবহার করতো। তাদের গৃহের ছাদ, দেয়াল ও দরোজায়ও হাতির দাঁত, সোনা, রূপা ও হীরা জহরতের কারুকাজে পরিপূর্ণ থাকতো। প্লিনি লিখেছেনঃ রোম ও পারস্যের সম্পদ তাদের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তারা তৎকালীন দুনিয়ার সবচেয়ে ধনাঢ্য ও সম্পদশালী জাতি। তাদের সবুজ–শ্যামল দেশ বাগ–বাগিচা, ক্ষেত–খামার ও গবাদি পশুতে পরিপূর্ণ। আর্টি মেড্রোস বলেন ঃ তারা বিলাসীতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। জ্বালানী কাঠের পরিবর্তে তারা দারুচিনি, চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধি কাঠ ইন্ধন হিসেবে ব্যবহার করে। অনুরূপভাবে অন্যান্য গ্রীক ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন, তাদের এলাকার সমুদ্রোপকূল অতিক্রমকারী বিদেশী জাহাজগুলোতেও খোশ্‌বুর ছোঁয়াচ পৌছে যেতো। তারাই ইতিহাসে প্রথমবার সান'আর উচ্চ পার্বত্য স্থানসমূহে আকাশ ছোঁয়া (Skyscraper) ইমারত নির্মাণ করে। গুমদান প্রাসাদ নামে এগুলো দীর্ঘকাল ধরে প্রসিদ্ধ থাকে। আরব ঐতিহাসিকদের

বর্ণনা অনুযায়ী এগুলো ছিল ২০ তলা বিশিষ্ট ইমারত এবং প্রত্যেকটি তলার উচ্চতা ছিল ৩৬ ফুট। আল্লাহর অনুগ্রহ যতদিন তাদের সহযোগী ছিল ততদিন এসব কিছু ছিল। শেষে যখন তারা চরমভাবে অনুগ্রহ অস্বীকার করার এবং নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হবার পর্যায়ে পৌঁছে গেল তখন মহান সর্বশক্তিমান রবের অনুগ্রহ দৃষ্টি তাদের ওপর থেকে চিরকালের জন্য সরে যায় এবং তাদের নাম নিশানা পর্যন্তও মুছে যায়।

৩৮. আগের দুই রুকূ'তে আখেরাত সম্পর্কে মুশরিকদের ভুল ধারণার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছিল। এবার শিরক্ খণ্ডন করার দিকে আলোচনার মোড় ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে।

৩৯. অর্থাৎ এখনই তোমরা দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালাম এবং সাবা জাতির আলোচনায় যেমন শুনলে সেভাবেই আল্লাহ ব্যক্তি, জাতি ও রাজ্যের ভাগ্য ভাঙা-গড়া করেন। এখন তোমাদের বানোয়াট উপাস্যদেরকে ডেকে দেখে নাও। তারাও কি কারো দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে এবং সৌভাগ্যকে দুর্ভাগ্যে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা রাখে?

৪০. অর্থাৎ কারো নিজে মালিক হয়ে বসা, মালিকানায় শরীক হওয়া অথবা আল্লাহর সাহায্যকারী হওয়া তো দূরের কথা সমগ্র বিশ্ব-জাহানে এমন কোন সত্তা নেই যে আল্লাহর সামনে কারো পক্ষে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সুপারিশ পর্যন্ত করতে পারে। তোমরা এই ভুল ধারণা নিয়ে বসে রয়েছো যে, আল্লাহর এমন কিছু প্রিয়জন আছে অথবা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বাধীনে এমন কিছু শক্তিশালী বান্দা আছে যারা একবার বেঁকে বসলে আল্লাহকে তাদের সুপারিশ মানতেই হবে। অথচ সেখানে অবস্থা হচ্ছে এই যে, অনুমতি ছাড়া কেউ মুখ খোলার সাহসই করতে পারে না। যে অনুমতি লাভ করবে একমাত্র সে-ই কিছু নিবেদন করতে পারবে। আর যার পক্ষে সুপারিশ করার অনুমতি পাওয়া যাবে একমাত্র তার সপক্ষেই আবেদন নিবেদন করা যাবে। (সুপারিশের ইসলামী বিশ্বাস এবং সুপারিশের মুশরিকী বিশ্বাসের মধ্যকার পার্থক্য অনুধাবন করার জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা ইউনুস, ৫ ও ২৩; সূরা হূদ, ৮৪ ও ১০৬; আন নাহ্‌ল, ৬৪ ও ৭৯; সূরা তা-হা, ৮৬; আল আম্বিয়া, ২৭ এবং আল হাজ্জ ১২৫ টীকা দেখুন।

৪১. কিয়ামতের দিন কোন সুপারিশকারী যখন কারো পক্ষে সুপারিশ করার অনুমতি চাইবে তখনকার চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সে চিত্রে আমাদের সামনে যে অবস্থা ফুটে উঠছে তা হচ্ছে এই যে, অনুমতি চাওয়ার আবেদন পেশ করার পর সুপারিশকারী ও যার পক্ষে সুপারিশ করা হবে তারা দু'জনই অত্যন্ত অস্থিরভাবে ভীতি ও উদ্বেগের সাথে জবাবের জন্য প্রতীক্ষারত। শেষ পর্যন্ত যখন ওপর থেকে অনুমতি এসে যায় এবং সুপারিশকারীর চেহারা দেখে যার পক্ষে সুপারিশ করা হবে সে ব্যাপারটা আর উদ্বেগজনক নয় বলে অনুমান করতে থাকে তখন তার ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে আসে। সে এগিয়ে গিয়ে সুপারিশকারীকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, "কি জবাব এসেছে?" সুপারিশকারী বলে, "ঠিক আছে, জবাব পাওয়া গেছে।" একথার মাধ্যমে যে বিষয়টি বুঝাতে চাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, নির্বোধের দল! এ হচ্ছে যে দরবারের অবস্থা সে সম্পর্কে তোমরা কেমন করে এ ধারণা করতে পারলে যে সেখানে কেউ নিজের বল প্রয়োগ করে তোমাদেরকে ক্ষমা করিয়ে দেবে অথবা কারো সেখানে ধর্ণা দিয়ে বসে পড়ে আল্লাহকে একথা বলার সাহস হবে যে, এ ব্যক্তি আমার প্রিয়পাত্র এবং আমার লোক, একে মাফ করতেই হবে?

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّاۤ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾ قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّاۤ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٥﴾

(হে নবী!) তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, "কে তোমাদের আকাশসমূহ ও পৃথিবী থেকে জীবিকা দান করে?" বলো, "আল্লাহ,[৪২] এখন অবশ্যই আমরা অথবা তোমরা সঠিক পথে অথবা সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে নিপতিত।"[৪৩] তাদেরকে বলো, "আমরা যে অপরাধ করেছি সে জন্য তোমাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না এবং তোমরা যা কিছু করছো সে জন্য আমরা জিজ্ঞাসিত হবো না।"[৪৪]

৪২. প্রশ্ন ও জবাবের মাঝখানে একটি সূক্ষ্মতর শূন্যতা রয়েছে। সম্বোধন করা হয়েছিল মুশরিকদেরকে যারা আল্লাহর অস্তিত্ব তো স্বীকার করতোই অধিকন্তু তাঁর হাতেই যে রিযিকের চাবিকাঠি রয়েছে একথাও জানতো এবং মানতো। কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে অন্যদেরকেও শরীক করতো। এখন যখন তাদের সামনে প্রশ্ন রাখা হয়, বলো কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দিচ্ছেন তখন তারা সমস্যায় পড়ে যায়। জবাবে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো নাম নিলে তা নিজেদের ও নিজেদের জাতির আকিদা-বিশ্বাসের বিরোধী হয়ে যায় আবার হঠকারী হয়ে এমন কথা বলে দিলেও তাদের নিজেদের জাতির লোকেরাই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে বলে আশংকা করে। আর যদি আল্লাহকেই রিযিকদাতা বলে মেনেই নেয় তাহলে তো সংগে সংগেই দ্বিতীয় প্রশ্নটি সামনে এসে যায় যে, তাহলে অন্য সব উপাস্যরা কোন্ কাজের? এদেরকে তোমরা উপাস্য বানিয়ে রেখেছো কেন? রিযিক দেবেন আল্লাহ আর পূজা করা হবে এদেরকে, এটা কেমন কথা? তোমরা কি একেবারে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেছো, এতটুকু কথাও বুঝো না? এই দ্বিবিধ সংকটে পড়ে তারা হতবুদ্ধি হয়ে যায়। তারা 'আল্লাহ রিযিক দেন', একথাও বলে না, আবার একথাও বলে না যে, অন্য কোন মাবুদ রিযিক দেয়। প্রশ্নকারী যখন দেখছেন কোন জবাব আসছে না তখন তিনি নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাবে বলেন, "আল্লাহ।"

৪৩. এ বাক্যাংশে প্রচার কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ওপরের প্রশ্ন ও জবাবের অনিবার্য ফলশ্রুতি এই ছিল যে, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী ও উপাসনা করবে সে সঠিক পথে থাকবে এবং যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের বন্দেগী করবে সে ভ্রষ্টতায় লিপ্ত হবে। এ কারণে বাহ্যত এরপর একথাই বলা উচিত ছিল যে, আমরা সঠিক পথে আছি এবং তোমরা পথভ্রষ্ট। কিন্তু এ ধরনের স্পষ্টোক্তি সত্যকথনের দিক থেকে যতই সঠিক হোক না কেন প্রচার কৌশলের দিক থেকে মোটেই সঠিক হতো না। কারণ যখনই কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন করে আপনি সরাসরি তাকে পথভ্রষ্ট বলে দেবেন এবং নিজেকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করবেন তখনই সে জিদ ও

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۚ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾
قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا ۚ بَلْ هُوَ اللَّهُ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

বলো, "আমাদের রব আমাদের একত্র করবেন, তারপর আমাদের মধ্যে ঠিকমতো ফায়সালা করে দেবেন। তিনি এমন পরাক্রমশালী শাসক যিনি সবকিছু জানেন।"[৪৫] তাদেরকে বলো, "আমাকে একটু দেখাও তো, কারা তারা যাদেরকে তোমরা তাঁর সাথে শরীক করে রেখেছো।"[৪৬] কখ্খনো না, প্রবল পরাক্রান্ত ও জ্ঞানবান তো একমাত্র আল্লাহই।

হঠকারিতায় লিপ্ত হয়ে যাবে এবং সত্যের জন্য তার হৃদয় দুয়ার বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহর নবীকে যেহেতু শুধুমাত্র সত্য কথনের জন্য পাঠানো হয় না বরং তাঁর প্রতি এ দায়িত্বও আরোপিত থাকে যে, সর্বাধিক কৌশল অবলম্বন করে তিনি বিভ্রান্ত লোকদের সংশোধন করবেন, তাই আল্লাহ একথা বলেননি, হে নবী! এ প্রশ্ন ও জবাবের পরে এবার তুমি লোকদেরকে পরিষ্কার বলে দাও যে, তোমরা পথভ্রষ্ট এবং একমাত্র আমিই সঠিক পথে আছি। এর পরিবর্তে বরং এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদেরকে এখন এভাবে বুঝাও। তাদেরকে বলো, আমাদের ও তোমাদের মধ্যকার এ পার্থক্য তো সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আমরা এমন মাবুদকে মানি যিনি রিযিক দেন এবং তোমরা এমন সব সত্তাকে মাবুদে পরিণত করছো যারা রিযিক দেয় না। এখন আমাদের ও তোমাদের একই সাথে সঠিক পথাবলম্বী হওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। এ সুস্পষ্ট পার্থক্য সহকারে তো আমাদের মধ্য থেকে এক পক্ষই সঠিক পথাবলম্বী হতে পারে এবং অন্যপক্ষ অবশ্যই হবে পথভ্রষ্ট। এরপর তোমরা নিজেরাই চিন্তা করবে, যুক্তি ও প্রমাণ কার সঠিক পথাবলম্বী হবার পক্ষে রায় দিচ্ছে এবং সে দৃষ্টিতে কেইবা পথভ্রষ্ট।

৪৪. ওপরের বক্তব্য শ্রোতাদেরকে প্রথমেই চিন্তা করতে বাধ্য করেছিল। এরপর এই আরো একটি বাক্য বলা হলো। যাতে তারা আরো বেশী চিন্তা করার সুযোগ পায়। এর মাধ্যমে তাদেরকে এ অনুভূতি দেয়া হয়েছে যে, সঠিক পথ ও ভুল পথের এ বিষয়টির যথাযথ ফায়সালা করা আমাদের প্রত্যেকের নিজের স্বার্থের দাবী। ধরে নেয়া যাক আমরা পথভ্রষ্ট, তাহলে এ ভ্রষ্টতার খেশারত আমাদেরকেই ভোগ করতে হবে, তোমরা এ জন্য পাকড়াও হবে না। তাই কোন আকিদা গ্রহণ করার আগে আমরা কোন ভুল পথে যাচ্ছি কিনা একথা ভালোভাবে চিন্তা করে নিতে হবে, এটা আমাদের নিজেদের স্বার্থের দাবী। অনুরূপভাবে আমাদের কোন স্বার্থে নয় বরং তোমাদের নিজেদের কল্যাণার্থেই একটি আকিদায় স্থির বিশ্বাস স্থাপন করার আগে তোমাদের ভালোভাবে চিন্তা–ভাবনা করে নিতে হবে কোথাও কোন বাতিল মতবাদের পেছনে তোমরা নিজেদের জীবনের সমস্ত মূলধন

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٩﴾
قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾

আর (হে নবী!) আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী করে পাঠিয়েছি কিন্তু বেশীর ভাগ লোক জানে না।[৪৭]

তারা তোমাকে বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে সেই কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি কবে পূর্ণ হবে?[৪৮] বলো, তোমাদের জন্য এমন একটি দিনের মেয়াদ নির্ধারিত আছে যার আগমনের ব্যাপারে তোমরা এক মুহূর্ত বিলম্বও করতে পারো না আবার এক মুহূর্ত পূর্বেও তাকে আনতে পারো না।[৪৯]

নিয়োগ করছো কিনা। এ ব্যাপারে হোচট খেলে তাতে ক্ষতিটা তোমাদেরই হবে, আমাদের কোন ক্ষতি হবে না।

৪৫. এটি এ ব্যাপারে চিন্তা করার প্রেরণা দানকারী শেষ ও সবচেয়ে বলিষ্ঠ যুক্তি। শ্রোতাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, এ জীবনে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে হক ও বাতিলের বিরোধ রয়েছে এবং আমাদের দুই দলের মধ্য থেকে কোন একজনই হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে, এটাই শেষকথা নয় বরং এর পরে এটিও এক অকাট্য সত্য যে, আমাদের ও তোমাদের উভয় দলকেই নিজের রবের সামনে হাজির হতে হবে। আর রবও হচ্ছেন এমন যিনি প্রকৃত সত্য অবহিত আছেন এবং আমাদের উভয় দলের অবস্থাও ভালোভাবেই জানেন। সেখানে গিয়ে কেবলমাত্র আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কারা সত্য ও কারা মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এ বিষয়টিরই চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যাবে না বরং এ মামলারও নিষ্পত্তি হয়ে যাবে যে, তোমাদের কাছে সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য আমরা কি করেছি এবং তোমরা মিথ্যাপূজার জিদের বশবর্তী হয়ে কিভাবে আমাদের বিরোধিতা করেছো।

৪৬. অর্থাৎ এ উপাস্যদের ওপর ভরসা করে তোমরা এত বড় বিপদের ঝুঁকি মাথা পেতে নেবার আগে এখানেই আমাকে একটু জানিয়ে দাও, তাদের মধ্যে কে এমন শক্তিশালী আছে যে আল্লাহর আদালতে তোমাদের সাহায্যকারী হিসেবে দাঁড়িয়ে যেতে পারবে এবং তোমাদেরকে তাঁর পাকড়াও থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে?

৪৭. অর্থাৎ কেবল এ শহর, এ দেশ বা এ যুগের লোকদের জন্য নয় বরং সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জন্য তোমাকে চিরন্তন নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তোমার এ সমকালীন স্বদেশীয় লোকেরা তোমার মর্যাদা বুঝে না। কত বড় মহান সত্তাকে তাদের মধ্যে পাঠানো হয়েছে সে ব্যাপারে কোন অনুভূতিই তাদের নেই।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেবল তাঁর নিজের দেশ বা যুগের জন্য নয় বরং কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির জন্য পাঠানো হয়েছে, একথা কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে ঃ

وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ

"আর আমার প্রতি এ কুরআন অহীর সাহায্যে পাঠানো হয়েছে যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে এবং যার কাছে এ বাণী পৌঁছে যায় তাকেই সতর্ক করে দেই।"
(আল আন'আম, ১৯৭)

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

"হে নবী! বলে দাও, হে মানবজাতি, আমি হচ্ছি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রসূল।" (আল আ'রাফ, ১৫৮)

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

"আর হে নবী! আমি পাঠিয়েছি তোমাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যই রহমত হিসেবে।"
(আল আম্বিয়া, ১০৭)

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا

"বড়ই বরকত সম্পন্ন তিনি যিনি তাঁর বান্দার ওপর ফুরকান নাযিল করেছেন যাতে সে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারীতে পরিণত হয়।" (আল ফুরকান, ১)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এই একই বক্তব্য বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্নভাবে পেশ করেছেন। যেমন ঃ

بعثت الى الاحمر والاسود

"আমাকে সাদা কালো সবার কাছে পাঠানো হয়েছে।" (মুসনাদে আহমাদ ঃ আবু মূসা আশ'আরী বর্ণিত)

اما انا فارسلت الى الناس كلهم عامة وكان من قبلى انما يرسل الى قومه

"আমাকে ব্যাপকভাবে সমস্ত মানুষের কাছে পাঠানো হয়েছে। অথচ আমার আগে যে নবীই অতিক্রান্ত হয়েছেন তাঁকে তাঁর জাতির কাছে পাঠানো হতো।" (মুসনাদে আহমাদ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণিত)

وكان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة

"প্রথমে প্রত্যেক নবীকে বিশেষভাবে তাঁর জাতির কাছে পাঠানো হতো আর আমাকে সমগ্র মানব জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম ঃ জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ
يَدَيْهِ ؕ وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖۚ يَرْجِعُ
بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ ِۨالْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ
اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَآ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ
اسْتُضْعِفُوْٓا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ
مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٢﴾

৪ রুকূ'

এ কাফেররা বলে, "আমরা কখ্খনো এ কুরআন মানবো না এবং এর পূর্বে আগত কোন কিতাবকেও স্বীকার করবো না।"[৫০] হায়! যদি তোমরা দেখো এদের তখনকার অবস্থা যখন এ জালেমরা নিজেদের রবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। সে সময় এরা একে অন্যকে দোষারোপ করবে। যাদেরকে দুনিয়ায় দাবিয়ে রাখা হয়েছিল তারা ক্ষমতাগর্বীদেরকে বলবে, "যদি তোমরা না থাকতে তাহলে আমরা মু'মিন হতাম।"[৫১] ক্ষমতাগর্বীরা সেই দমিত লোকদেরকে জবাবে বলবে, "তোমাদের কাছে যে সৎপথের দিশা এসেছিল তা থেকে কি আমরা তোমাদেরকে রুখে দিয়েছিলাম? বরং তোমরা নিজেরাই তো অপরাধী ছিলে।"[৫২]

بعثت انا والساعة كهاتين يعنى اصبعين

"আমার আগমন ও কিয়ামতের অবস্থান এরূপ একথা বলতে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দু'টি আঙুল উঠান।" (বুখারী ও মুসলিম)

এর অর্থ এই ছিল যে, "এ দু'টি আঙুলের মাঝখানে যেমন তৃতীয় কোন আঙুলের অন্তরাল নেই ঠিক তেমনি আমার ও কিয়ামতের মাঝখানেও অন্য কোন নবুওয়াতের অন্তরাল নেই। আমার পরে এখন আর শুধু রয়েছে কিয়ামত এবং কিয়ামত পর্যন্ত আমিই নবী হিসেবে থাকবো।"

৪৮. অর্থাৎ যে সময় সম্পর্কে তুমি এইমাত্র বললে, "আমাদের রব আমাদের একত্র করবেন এবং আমাদের মধ্যে যথাযথ ফায়সালা করে দেবেন" সে সময়টি আসবে কবে? আমাদের ও তোমার মামলা চলছে দীর্ঘকাল থেকে। আমরা বারবার তোমার কথাকে

মিথ্যা বলেছি এবং প্রকাশ্যে তোমার বিরোধিতা করে আসছি। এখন এর ফায়সালা করা হচ্ছে না কেন?

৪৯. অন্যকথায় এ জবাবের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর ফায়সালা তোমাদের ইচ্ছার অধীন নয়। কোন কাজের জন্য তোমরা যে সময় বেঁধে দেবে সে সময়ই সে কাজটি করতে তিনি বাধ্য নন। নিজের কাজ নিজের ইচ্ছা ও সুবিধামতো তিনি করে থাকেন। তোমরা আল্লাহর পরিকল্পনা কি বুঝবে? তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী মানব জাতি কতদিন পর্যন্ত এ দুনিয়ায় কাজ করার সুযোগ পাবে, কত ব্যক্তির এবং কত জাতির কি কি ধরনের পরীক্ষা হবে এবং এ দপ্তরের সমস্ত কাজকর্ম গুটিয়ে নেবার এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদের সবাইকে হিসেব-নিকেশের উদ্দেশ্যে ডেকে নেবার জন্য কোন্ সময়টি উপযোগী হবে তোমরা তার কি বুঝবে! আল্লাহরই পরিকল্পনায় এর যে সময়টি নির্ধারিত রয়েছে ঠিক সে সময়ই এ কাজটি হবে। তোমাদের তাগাদার কারণে সেটি এক সেকেণ্ড আগেও আসবে না এবং তোমাদের আবেদন নিবেদনের ফলে তা এক সেকেণ্ড বিলম্বিতও হবে না।

৫০. এখানে আরবের কাফেরদের কথা বলা হয়েছে, যারা কোন আসমানী কিতাবের কথা স্বীকার করতো না।

৫১. অর্থাৎ সাধারণ মানুষ, যারা আজ দুনিয়ায় নিজেদের নেতা, সরদার, পীর ও শাসকদের অন্ধ অনুসারী এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন উপদেশদাতার কথায় কর্ণপাত করতে প্রস্তুত নয়, তারাই যখন প্রকৃত সত্য কি ছিল এবং তাদের নেতারা তাদেরকে কি বুঝাচ্ছিল তা স্বচক্ষে দেখবে এবং যখন তারা একথা জানতে পারবে যে, এ নেতাদের অনুসরণ তাদেরকে এ পরিণতির সম্মুখীন করে দিচ্ছে তখন তারা নিজেদের এসব মনীষীদের বিরুদ্ধে মারমুখো হবে এবং চিৎকার করে বলবে, হতভাগার দল! তোমরাই তো আমাদেরকে গোমরাহ করেছো। আমাদের সমস্ত বিপদের জন্য তোমরাই দায়ী। তোমরা আমাদের পথভ্রষ্ট না করলে আমরা আল্লাহ ও রসূলের কথা মেনে নিতাম।

৫২. অর্থাৎ তারা বলবে, আমাদের কাছে এমন কোন শক্তি ছিল না যার সাহায্যে আমরা মাত্র গুটিকয় মানুষ তোমাদের মতো কোটি কোটি মানুষকে জোরপূর্বক নিজেদের আনুগত্য করতে বাধ্য করতে পারতাম। যদি তোমরা ঈমান আনতে চাইতে তাহলে আমাদের সরদারি, নেতৃত্ব ও শাসন কর্তৃত্বের সিংহাসন উল্টে ফেলে দিতে পারতে। আমাদের সেনাদল তো তোমরাই ছিলে। আমাদের শক্তি ও সম্পদের উৎস্য তো ছিল তোমাদেরই হাতে। তোমরা নজরানা ও ট্যাক্স না দিলে তো আমরা বিত্তহীনই থাকতাম। তোমরা আমাদের হাতে বাইয়াত না করলে আমাদের পীরালী একদিনও চলতো না। তোমরা জিন্দাবাদের শ্লোগান না দিলে কেউ আমাদের কথা জিজ্ঞেসও করতো না। তোমরা আমাদের সৈন্য হয়ে সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত না হলে একজন মানুষের অপরও আমাদের প্রভাব বিস্তৃত হতে পারতো না। এখন একথা মেনে নিচ্ছো না কেন যে, আসলে রসূলগণ তোমাদের সামনে যে পথ পেশ করে ছিলেন তোমরা নিজেরাই তার ওপর চলতে চাচ্ছিলে না? তোমরা ছিলে নিজেদের স্বার্থ ও প্রবৃত্তির দাস। আর তোমাদের প্রবৃত্তির এ চাহিদা রসূলদের দেখানো তাকওয়ার পরিবর্তে আমাদের এখানেই পূর্ণ হতো। তোমরা হালাল ও হারামের পরোয়া না করে দুনিয়াবী আয়েশ ও আরামের প্রত্যাশী ছিলে এবং আমাদের কাছেই তোমরা তার সন্ধান পাচ্ছিলে। তোমরা এমন সব পীরের সন্ধানে

وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ
إِذْ تَأْمُرُوْنَنَآ أَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗٓ أَنْدَادًا ۭ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ
لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۭ وَجَعَلْنَا الْأَغْلٰلَ فِيْٓ أَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ
هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ
إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَقَالُوْا نَحْنُ
أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَّأَوْلَادًا ۙ وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٣٥﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّيْ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

সেই দমিত লোকেরা ক্ষমতাগর্বীদেরকে বলবে, "না, বরং দিবারাত্রের চক্রান্ত ছিল যখন তোমরা আমাদের বলতে আমরা যেন আল্লাহর কুফরী করি এবং অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ উপস্থাপন করি।[৫৩] শেষ পর্যন্ত যখন তারা আযাব দেখবে তখন মনে মনে পস্তাতে থাকবে এবং আমি এ অস্বীকারকারীদের গলায় বেড়ী পরিয়ে দেবো। লোকেরা যেমন কাজ করেছিল তেমনি প্রতিদান পাবে, এ ছাড়া আর কোন প্রতিদান কি তাদেরকে দেয়া যেতে পারে?

কখনো এমনটি ঘটেনি যে, আমি কোন জনপদে কোন সতর্ককারী পাঠিয়েছি এবং সেই জনপদের সমৃদ্ধিশালী লোকেরা একথা বলেনি যে, তোমরা যে বক্তব্য নিয়ে এসেছো আমরা তা মানি না।[৫৪] তারা সবসময় একথাই বলেছে, আমরা তোমাদের চাইতে বেশী সম্পদ ও সন্তানের অধিকারী এবং আমরা কখ্খনো শাস্তি পাবো না।[৫৫] হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, আমার রব যাকে চান প্রশস্ত রিযিক দান করেন এবং যাকে চান মাপাজোকা দান করেন কিন্তু বেশীর ভাগ লোক এর প্রকৃত তাৎপর্য জানে না।[৫৬]

ছিলে যারা তোমাদের সব রকমের পাপ কাজ করার ব্যাপক অনুমতি দিতো এবং সামান্য কিছু নজরানা নিয়ে তোমাদের পাপ মোচনের দায়িত্ব নিজেদের মাথায় তুলে নিতো। তোমরা এমনসব পণ্ডিত ও মৌলবীদের সন্ধানে ফিরছিলে যারা প্রত্যেকটি শিরক ও বিদ'আত এবং তোমাদের প্রত্যেকটি মনের মতো জিনিসকে প্রকৃত সত্য প্রমাণ করে তোমাদেরকে খুশী ও তোমাদের স্বার্থ উদ্ধার করে দিতো। তোমাদের এমনসব জালিয়াতের

প্রয়োজন ছিল যারা আল্লাহর দীনকে পরিবর্তিত করে তোমাদের প্রবৃত্তির কামনা অনুযায়ী একটি নতুন দীন তৈরি করে দিতে পারতো। তোমাদের এমন নেতার প্রয়োজন ছিল যারা পরকাল সমৃদ্ধ হোক বা উৎসন্নে যাক তার পরোয়া না করে যে কোনভাবেই হোক না কেন তোমাদের দুনিয়াবি স্বার্থ উদ্ধার করে দিতে পারলেই যথেষ্ট। তোমাদের এমন সব শাসকের প্রয়োজন ছিল যারা নিজেরাই হবে অসচ্চরিত্র ও অবিশ্বস্ত এবং তাদের পৃষ্ঠপোশকতায় তোমরা সব রকমের গোনাহ ও অসৎ কাজ করার অবাধ সুযোগ লাভ করবে। এভাবে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান সমান লেনদেনের কথা হয়েছিল। এখন তোমরা এ কেমন ভড়ং সৃষ্টি করে চলেছো, যেন তোমরা বড়ই নিরপরাধ এবং আমরা জোর করে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম।

৫৩. অন্যকথায় এ জনতার জবাব হবে, তোমরা এ দায়িত্বের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সমান অংশীদার করছো কেমন করে? তোমাদের কি মনে আছে, তোমরা চালবাজী, প্রতারণা ও মিথ্যা প্রচারণার কেমন মোহময় যাদু সৃষ্টি করে রেখেছিলে এবং রাতদিন আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজেদের ফাঁদে আটকাবার জন্য কেমন সব পদক্ষেপ নিয়েছিলে? তোমরা আমাদের সামনে দুনিয়া পেশ করেছিলে এবং আমরা তার জন্য জান দিয়ে দিলাম, ব্যাপারতো মাত্র এতটুকুই ছিল না বরং তোমরা রাতদিনের প্রতারণা ও চালাকির মাধ্যমে আমাদেরকে বেকুব বানাচ্ছিলে এবং তোমাদের প্রত্যেক শিকারী প্রতিদিন একটি নতুন জাল তৈরি করে নানা ছলচাতুরী ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাদেরকে তাতে ফাঁসিয়ে দিচ্ছিল, এটাও ছিল বাস্তব ঘটনা।

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে নেতা ও পীরদের এই বিবাদের উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নোক্ত স্থানগুলো দেখুন ঃ আ'রাফ, ৩৮-৩৯; ইবরাহীম, ২১; আল কাসাস, ৬৩; আল আহযাব, ৬৬-৬৮; আল মু'মিন, ৪৭-৪৮ এবং হা মীম আস্ সাজদাহ, ২৯ আয়াত।

৫৪. একথা কুরআন মজীদের বহুস্থানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের দাওয়াতকে সর্বপ্রথম ও সবার আগে রুখে দাঁড়াতো সমাজের সচ্ছল শ্রেণী, যারা অর্থ-বিত্ত, সহায়-সম্পদ ও কর্তৃত্ব-ক্ষমতার অধিকারী ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নোক্ত স্থানগুলো দেখুন ঃ আল আন'আম, ১২৩; আল আ'রাফ, ৬০, ৬৬, ৭৫, ৮৮, ৯০; হুদ, ২৭; বনী ইসরাঈল, ১৬; আল মু'মিনূন, ২৪, ৩৩ থেকে ৩৮, ৪৬, ৪৭ এবং আয্ যুখ্রুফ, ২৩ আয়াত।

৫৫. তাদের যুক্তি ছিল, আমরা তোমাদের চেয়ে আল্লাহর বেশী প্রিয় ও পছন্দনীয় লোক। তাইতো তিনি আমাদের এমন নিয়ামত দান করেছেন যা থেকে তোমরা বঞ্চিত অথবা কমপক্ষে আমাদের তুলনায় নিম্ন পর্যায়ের। আল্লাহ যদি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট না হয়ে থাকতেন, তাহলে আমাদের এ শানশওকত ও অর্থ-বিত্ত কেনই বা দিলেন ঃ এখন আল্লাহ এখানে তো আমাদের প্রতি অঢেল অনুগ্রহ বর্ষণ করছেন আর আখেরাতে আমাদেরকে শাস্তি দেবেন, একথা আমরা কেমন করে মেনে নিতে পারি। শাস্তি দিলে তাদেরকেই দেবেন যারা এখানে তাঁর অনুগ্রহ বঞ্চিত হয়েছে।

কুরআন মজীদের বিভিন্নস্থানে দুনিয়া পূজারীদের এ বিভ্রান্তির উল্লেখ করে তা খণ্ডন করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নোক্ত স্থানগুলো দেখুন ঃ আল বাকারাহ, ১২৬, ২১২; আত

وَمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُم بِٱلَّتِى تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰٓ إِلَّا مَنْ
ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا۟ وَهُمْ فِى
ٱلْغُرُفَٰتِ ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُو۟لَٰٓئِكَ
فِى ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ
عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥ ۚ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ
ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿٣٩﴾

৫ রুকূ'

তোমাদের এই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে; হাঁ, তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে।[৫৭] এরাই এমন লোক যাদের জন্য রয়েছে তাদের কর্মের দ্বিগুণ প্রতিদান এবং তারা সুউচ্চ ইমারতসমূহে নিশ্চিন্তে-নিরাপদে থাকবে।[৫৮] যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় তারা শাস্তি ভোগ করবে।

হে নবী! তাদেরকে বলো, "আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান মুক্ত হস্তে রিযিক দান করেন এবং যাকে চান মাপাজোপা দেন।[৫৯] যা কিছু তোমরা ব্যয় করে দাও তার জায়গায় তিনি তোমাদের আরো দেন, তিনি সব রিযিকদাতার চেয়ে ভালো রিযিকদাতা।[৬০]

তাওবা, ৫৫, ৬৯; হূদ, ৩, ২৭; আর রা'দ, ২৬; আল কাহ্‌ফ, ৩৪-৪৩; মার্‌য়াম, ৭৩-৭৭; তা-হা, ১৩১; আল মু'মিনূন, ৫৫-৬১; আশ্‌ শু'আরা, ১১১; আল কাসাস, ৭৬-৮৩; আর্‌ রূম, ৯; আল মুদ্দাস্‌সির, ১১-২৬ এবং আল ফাজর, ১৫-২০ আয়াত।

৫৬. অর্থাৎ দুনিয়ায় রিযিক বন্টনের ব্যবস্থা যে জ্ঞান, কৌশল ও কল্যাণ বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত তা তারা অনুধাবন করে না। ফলে তারা এ বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ যাকে প্রশস্ত রিযিক দান করেন সে তাঁর প্রিয়পাত্র এবং যার রিযিক তিনি সংকীর্ণ করে দেন সে তাঁর গযবের মুখোমুখি হয়েছে। অথচ কোন ব্যক্তি সামান্য চোখ মেলে তাকালে দেখতে পারে, অনেক সময় বড়ই নোংরা ও ভয়ংকর চরিত্রের লোকেরা বিত্ত ও সম্পদশালী হয়েছে এবং আয়েশী জীবন যাপন করছে, পক্ষান্তরে অনেক সৎকর্মশীল ও ভদ্রলোক, যাদের চরিত্র গুণ সবার স্বীকৃতি পেয়েছে, তারা আর্থিক অনটনে জীবন যাপন করছে। এখন কোন্‌ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলতে পারে, আল্লাহ এ পাক-পবিত্র চরিত্রের

অধিকারী লোকদেরকে অপছন্দ করেন এবং দুষ্ট প্রকৃতির শয়তান চরিত্রের লোকদেরকেই ভালোবাসেন?

৫৭. এর দু'টি অর্থ হতে পারে এবং দু'টিই সঠিক। এক, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নিকটবর্তী করার মতো জিনিস নয়। বরং ঈমান ও সৎকাজ মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে। দুই, সম্পদ ও সন্তান একমাত্র এমন সৎ মু'মিনের জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যমে পরিণত হতে পারে, যে নিজের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং নিজের সন্তানকে উত্তম শিক্ষা ও অনুশীলন দান করে তাকে আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী ও সৎকর্মশীল করে গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

৫৮. এর মধ্যে এ বিষয়ের প্রতি একটি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে যে, তাঁর এ নিয়ামত হবে অবিনশ্বর এবং এর প্রতিদানের ধারাবাহিকতা কোনদিনই ছিন্ন বা ক্ষুণ্ন হয়ে যাবে না। কারণ যে আয়েশ আরামের কখনো খতম হয়ে যাবার আশংকা থাকে, মানুষ পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে তা উপভোগ করতে পারে না। এ ব্যাপারে সবসময় ভয় থাকে কি জানি কখন এসব কিছু ছিনিয়ে নেয়া হবে।

৫৯. এ বিষয়টিকে পুনরুক্তি সহকারে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথার ওপর জোর দেয়া যে, রিযিক কম বেশী হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত, তাঁর সন্তুষ্টির সাথে নয়। আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে ভালো-মন্দ সব রকমের মানুষ রিযিক লাভ করছে। যারা আল্লাহকে মেনে নিয়েছে তারাও রিযিক পাচ্ছে এবং যারা অস্বীকার করেছে তারাও। প্রচুর রিযিক লাভ রিযিক লাভকারীর আল্লাহর প্রিয় বান্দা হবার কথা প্রমাণ করে না। আবার অন্যদিকে কম রিযিক লাভ বা রিযিকের অভাব অভাবগ্রস্তের প্রতি আল্লাহর ক্রোধান্বিত হবার আলামত পেশ করে না। আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী একজন জালেম এবং বেঈমান লোকও আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়। অথচ জুলুম ও বেঈমানী আল্লাহ পছন্দ করেন না। পক্ষান্তরে আল্লাহরই ইচ্ছার অধীনে একজন সত্যাশ্রয়ী ও ঈমানদার ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও কষ্ট সহ্য করতে থাকে অথচ আল্লাহ সত্যবাদিতা ও ঈমানদারী পছন্দ করেন। কাজেই বস্তুগত স্বার্থ ও মুনাফা অর্জনকে যে ব্যক্তি ভালো ও মন্দের মাপকাঠি গণ্য করে সে বিরাট ভুলের শিকার ও পথভ্রষ্ট। আসল জিনিস হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং এটি অর্জিত হয় এমন সব নৈতিক গুণাবলীর মাধ্যমে যা আল্লাহ পছন্দ করেন। এ গুণাবলীর সাথে কেউ যদি দুনিয়ার নিয়ামতগুলোও লাভ করে, তাহলে নিসন্দেহে তা হবে আল্লাহর দান এবং এ জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি নৈতিক গুণাবলীর দিক দিয়ে আল্লাহর বিদ্রোহী ও নাফরমান বান্দা হয়ে থাকে এবং এ সংগে তাকে দুনিয়ার নিয়ামতও দান করা হয়, তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সে কঠিন জবাবদিহি ও নিকৃষ্টতম শাস্তি ভোগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

৬০. রিযিকদাতা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, দাতা এবং এ ধরনের আরো বহু গুণ রয়েছে, যা আসলে আল্লাহরই গুণ কিন্তু রূপক অর্থে বান্দাদের সাথেও সংশ্লিষ্ট করা হয়। যেমন আমরা এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলি, সে অমুক ব্যক্তির রোজগারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অথবা সে এ উপহারটি দিয়েছে। কিংবা সে অমুক জিনিসটি তৈরি করেছে বা উদ্ভাবন করেছে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ নিজের জন্য 'উত্তম রিযিক দাতা' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا
يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ قَالُوا سُبْحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُوا
يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِى
كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾

আর যেদিন তিনি সমস্ত মানুষকে একত্র করবেন তারপর ফেরেশ্‌তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, "এরা কি তোমাদেরকেই পূজা করতো?"[৬১] তখন তারা জবাব দেবে, "পাক-পবিত্র আপনার সত্তা, আমাদের সম্পর্ক তো আপনার সাথে, এদের সাথে নয়।[৬২] আসলে এরা আমাদের নয় বরং জিনদের পূজা করতো, এদের অধিকাংশ তাদেরই প্রতি ঈমান এনেছিল।"[৬৩] (তখন আমি বলবো ঃ) আজ তোমাদের কেউ কারো উপকারও করতে পারবে না অপকারও করতে পারবে না এবং জালেমদেরকে আমি বলে দেবো, এখন আস্বাদন করো এ জাহান্নামের আযাবের স্বাদ, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।

অর্থাৎ যাদের সম্পর্কে তোমরা ধারণা করে থাকো যে, তারা রুজি দান করে থাকে তাদের সবার চেয়ে আল্লাহ উত্তম রিযিকদাতা।

৬১. প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে দেব-দেবী মনে করে তাদের মূর্তি বানিয়ে পূজা করে আসছে। বৃষ্টির দেবতা, বিজলীর দেবতা, বায়ুর দেবতা, ধন-সম্পদের দেবী, মৃত্যু ও ধ্বংসের দেবী ইত্যাদি প্রত্যেকটি জিনিসের পৃথক দেবতা বা দেবীর মূর্তি তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে। এরই সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন, কিয়ামতের দিন এই ফেরেশ্‌তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরাই কি এদের উপাস্য হয়েছিলে? নিছক অবস্থা অনুসন্ধান করা এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য নয় বরং এর মধ্যে এই অর্থও নিহিত রয়েছে যে, তোমরা কি তাদের পূজা-অর্চনায় রাজি ছিলে? কিয়ামতে এ প্রশ্ন কেবল ফেরেশ্‌তাদেরকেই করা হবে না বরং দুনিয়ায় যাদের ইবাদাত ও পূজা করা হয় তাদেরকেও করা হবে। তাই সূরা ফুরকানে বলা হয়েছে ঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ
عِبَادِى هٰٓؤُلَآءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ –

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ
يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ۚ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى ۚ
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۙ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٤٣﴾
وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ
نَذِيرٍ ﴿٤٤﴾ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ
فَكَذَّبُوا رُسُلِي ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾

এদেরকে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত শুনানো হয় তখন এরা বলে, "এ ব্যক্তি তো চায় তোমাদের বাপ–দাদারা যেসব উপাস্যের পূজা করে এসেছে তাদের থেকে তোমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিতে।" আর বলে, "এ (কুরআন) নিছক একটি মনগড়া মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।" এ কাফেরদের সামনে যখনই সত্য এসেছে তখনই এরা বলে দিয়েছে, "এ তো সুস্পষ্ট যাদু।" অথচ না আমি এদেরকে পূর্বে কোন কিতাব দিয়েছিলাম, যা এরা পড়তো, আর না তোমার পূর্বে এদের কাছে কোন সতর্ককারী পাঠিয়েছিলাম।৬৪ এদের পূর্বে অতিক্রান্ত লোকেরা মিথ্যা আরোপ করেছিল। যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম তার এক–দশমাংশেও এরা পৌঁছুতে পারেনি কিন্তু যখন তারা আমার রসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো তখন দেখে নাও আমার শাস্তি ছিল কেমন কঠোর।৬৫

"যেদিন আল্লাহ এদেরকে এবং যেসব সত্তার এরা ইবাদাত করতো তাদের সবাইকে একত্র করবেন তারপর জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি আমার এ বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলে, না এরা নিজেরাই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল?" (১৭ আয়াত)

৬২. অর্থাৎ তারা জবাব দেবে, অন্য কেউ খোদায়ী ও উপাস্য হবার ব্যাপারে আপনার সাথে শরীক হবে আপনার সত্তা এ থেকে পাক–পবিত্র এবং এর অনেক অনেক উর্ধে। এ লোকগুলোর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। এদের এবং এদের কাজ–কারবারের কোন দায়–দায়িত্ব আমাদের ওপর নেই। আমরা তো আপনার বান্দা।

৬৩. এ বাক্যাংশে জিন বলতে জিনদের মধ্যকার শয়তানদের কথা বুঝানো হয়েছে। ফেরেশ্‌তাদের এ জবাবের অর্থ হচ্ছে, বাহ্যত এরা আমাদের নাম নিয়ে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী আমাদের মূর্তি বানিয়ে যেন আমাদেরই ইবাদাত করতো কিন্তু আসলে আমাদের নয় বরং এরা ইবাদাত করতো শয়তানের। কারণ শয়তানরাই তাদেরকে এ পথ

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ
تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ
يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٧﴾

৬ রুকূ'

হে নবী! এদেরকে বলে দাও, "আমি তোমাদেরকে একটিই উপদেশ দিচ্ছি ঃ আল্লাহর জন্য তোমরা একা একা এবং দু'জন দু'জন মিলে নিজেদের মাথা ঘামাও এবং চিন্তা করো। তোমাদের সাথির মধ্যে এমন কি কথা আছে যাকে প্রলাপ বলা যায়?[৬৬] সেতো একটি কঠিন শাস্তি আসার আগে তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছে।"[৬৭] এদেরকে বলো, "যদি আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চেয়ে থাকি তাহলে তা তোমাদের জন্যই থাকুক।[৬৮] আমার প্রতিদান দেবার দায়িত্ব তো আল্লাহরই এবং তিনি সব জিনিসের ওপর সাক্ষী।"[৬৯]

দেখিয়েছিল। আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে প্রয়োজন পূর্ণকারী মনে করার এবং তাদের সামনে নজরানা পেশ করার জন্য শয়তানরাই তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

যারা জিনদেরকে পার্বত্য এলাকার অধিবাসী এবং গ্রামীণ ও মরু এলাকার মানুষ অর্থে গ্রহণ করেন এ আয়াতটি সুস্পষ্টভাবে তাদের সে চিন্তা ভুল বলে প্রমাণিত করে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি এ আয়াতটি পড়ে এরূপ ভাবতে পারে যে, লোকেরা পাহাড়ী, মরুচারী ও গ্রামীণ লোকদের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং তাদের ইবাদাত করতো?

এ আয়াত থেকে ইবাদাতের অন্য একটি অর্থের ওপরও আলোকপাত করা হয়। এ থেকে জানা যায় যে, ইবাদাত কেবল উপাসনা, আরাধনা ও পূজা–অর্চনারই নাম নয়। বরং কারো নির্দেশে চলা এবং চোখ–কান বন্ধ করে তার আনুগত্য করাও ইবাদাত। এমনকি মানুষ যদি কাউকে অভিশাপ দেয় (যেমন শয়তানদেরকে অভিশাপ দেয়) এবং তারপরও তারই পথ অনুসরণ করে চলে তাহলেও সে তারই ইবাদাত করছে। এর অন্য দৃষ্টান্তগুলোর জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নিসা, ১৪৫; আল মা–য়েদাহ, ৯১; আত্ তাওবা, ৩১; মারয়াম, ২৭ এবং আল কাসাস, ৮৬ টীকা।

৬৪. অর্থাৎ এর পূর্বে না এমন কোন কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে আর না এমন কোন রসূল আসেন, যিনি এসে তাদেরকে এমন শিক্ষা দেন, যার ফলে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের বন্দেগী ও পূজা করতো। তাই তারা কোন জ্ঞানের ভিত্তিতে নয় পুরোপুরি মূর্খতা ও অজ্ঞতার ভিত্তিতে কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের তাওহীদের দাওয়াত অস্বীকার করছে। এর সপক্ষে তাদের কাছে কোন যুক্তি ও প্রমাণ নেই।

৬৫. অর্থাৎ এ জাতিগুলো যে পরিমাণ শক্তি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল মক্কার লোকেরা তার দশ ভাগের একভাগও অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু নবীগণ তাদের সামনে যে সত্য পেশ করেছিলেন তা মেনে নিতে তারা অস্বীকার করেছিল এবং মিথ্যার ওপর নিজেদের জীবন ব্যবস্থার ভিত্ রচনা করেছিল। এর ফলে শেষ পর্যন্ত তারা কিভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের শক্তি ও ধন-সম্পদ তাদের কোন কাজে লাগেনি তা তোমরা নিজেরাই দেখে নাও।

৬৬. অর্থাৎ স্বার্থ কামনা ও বিদ্বেষ মুক্ত হয়ে একান্ত আল্লাহর ওয়াস্তে চিন্তা করে দেখো। প্রত্যেক সদুদ্দেশ্যে আলাদা আলাদাভাবেও চিন্তা করো আবার দু'জন চারজন মিলে মিশে একসাথে বসেও নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে পরস্পর বিতর্ক আলোচনার মাধ্যমে এ মর্মে অনুসন্ধান চালাও যে, গতকাল পর্যন্তও যে ব্যক্তিকে তোমরা নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত জ্ঞানী মনে করছিলে তাকে আজ কিসের ভিত্তিতে পাগল গণ্য করছো? নবুওয়াত লাভের মাত্র কিছুকাল আগেই তো একটি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। কা'বাঘর পুনরনির্মাণের পর হাজ্‌রে আসওয়াদ সংস্থাপনের প্রশ্নে কুরাইশের গোত্রগুলো যখন পরস্পর লড়াই করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল তখন তোমরাই তো একযোগে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিরোধ মীমাংসাকারী বলে স্বীকার করে নিয়েছিলে এবং তিনি এমনভাবে তোমাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিয়েছিলেন যার ফলে তোমরা সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলে। তোমাদের সমগ্র জাতি যে ব্যক্তির বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পর্কে এ অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল এখন এরপর এমন কি ঘটনা ঘটে গেলো যার ফলে তোমরা তাকে পাগল বলতে শুরু করেছো? হঠকারিতা ও গোয়ার্তুমির কথা তো আলাদা কিন্তু সত্যই কি তোমরা মুখে যা বলছো নিজেদের মনেও সেটাকেই সত্য বলে মনে করে থাকো?

৬৭. অর্থাৎ এ অপরাধের ভিত্তিতেই কি তোমরা তাকে মানসিক রোগী বলে গণ্য করছো? তোমাদের মতে বুদ্ধিমান কি এমন ব্যক্তিকেই বলা হবে যে তোমাদের ধ্বংসের পথে যেতে দেখে বলবে, শাবাশ, বড়ই চমৎকার পথে যাচ্ছো এবং পাগল বলা হবে তাকে যে তোমাদেরকে দুঃসময় আসার আগে সতর্ক করে দেবে এবং বিপর্যয়ের পরিবর্তে সংশোধনের পথ বাতলাবে?

৬৮. মূলে বলা হয়েছে ঃ مَا سَاَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ এর একটি অর্থ আমি ওপরে অনুবাদে বলেছি। এর দ্বিতীয় একটি অর্থ এও হতে পারে, তোমাদের কল্যাণ ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না এবং তোমরা ঠিক হয়ে যাও, এটিই আমার পুরস্কার। এ বিষয়বস্তুটি কুরআন মজীদের অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلاَّ مَنْ شَاءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلاً

"হে নবী! তাদেরকে বলো, তোমাদের কাছ থেকে এ কাজের জন্য এ ছাড়া আর কোন প্রতিদান আমি চাই না যে, যে চায় সে তার রবের পথ অবলম্বন করুক।"

(আল ফুরকান, ৫৭)

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٤٨﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا
يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ
نَفْسِي ۖ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾

এদেরকে বলো, "আমার রব (আমার প্রতি) সত্যের প্রেরণা দান করেন[৭০] এবং তিনি সমস্ত গোপন সত্য জানেন।" বলো, "সত্য এসে গেছে এবং এখন মিথ্যা যত চেষ্টাই করুক তাতে কিছু হতে পারে না।" বলো, "যদি আমি পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে থাকি, তাহলে আমার পথভ্রষ্টতার শাস্তি আমারই প্রাপ্য আর যদি আমি সঠিক পথে থেকে থাকি, তাহলে তা হবে আমার রব আমার প্রতি যে অহী নাযিল করেন তারই ভিত্তিতে। তিনি সবকিছু শোনেন এবং নিকটেই আছেন।[৭১]

৬৯. অর্থাৎ অপবাদদাতারা যা ইচ্ছা অপবাদ দিক কিন্তু আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি সাক্ষী আছেন, আমি নিস্বার্থ এবং নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থে আমি এ কাজ করছি না।

৭০. মূল শব্দ হচ্ছে, يَقْذِفُ بِالْحَقِّ এর একটি অর্থ হচ্ছে, অহীর মাধ্যমে তিনি সত্য জ্ঞান আমাকে দান করেন। অন্য অর্থটি হচ্ছে, তিনি সত্যকে বিজয়ী করেন এবং মিথ্যার মাথায় সত্যের আঘাত হানেন।

৭১. এ যুগের কোন কোন লোক এ আয়াত থেকে একথা প্রমাণ করেন যে, এর দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পথভ্রষ্ট হতে পারতেন বরং হয়ে যেতেন। তাইতো মহান আল্লাহ নিজেই নবী করীমের (সা) মুখে একথা বলে দিয়েছেন যে, যদি আমি পথভ্রষ্ট হই, তাহলে আমার পথভ্রষ্টতার জন্য দায়ী হবো আমি নিজেই এবং আমি তখনই সঠিক পথে থাকি যখন আমার রব আমার প্রতি অহী (অর্থাৎ কুরআনের আয়াত) নাযিল করেন। এ ভুল ব্যাখ্যার সাহায্যে এ জালেমরা যেন একথা প্রমাণ করতে চায় যে, নবী করীমের (সা) জীবন ছিল নাউযুবিল্লাহ সঠিক পথে চলা ও ভুল পথে চলার সমাহার এবং মহান আল্লাহ কাফেরদের সামনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ স্বীকারোক্তি এ জন্য করিয়েছিলেন যে, কোন ব্যক্তি যেন তাঁকে পুরোপুরি সঠিক পথে রয়েছেন মনে করে তাঁর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য না করে বসে। অথচ যে ব্যক্তিই বক্তব্যের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে চিন্তা করবে সেই বুঝতে পারবে যে, এখানে "যদি আমি পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে থাকি" কথাটার অর্থ এ নয় যে, নাউযুবিল্লাহ নবী করীম (সা) সত্যিসত্যি বিভ্রান্ত হয়ে যেতেন, বরং পুরো কথাটাই এ অর্থে বলা হয়েছে যে, "যদি আমি বিভ্রান্ত হয়ে গিয়ে থাকি, যেমন তোমরা আমার প্রতি অপবাদ দিচ্ছো এবং আমার এ নবুওয়াতের দাবী এবং আমার এ তাওহীদের দাওয়াত এই বিভ্রান্তিরই ফল, যেমন তোমরা ধারণা করছো, তাহলে আমার বিভ্রান্তির দায় আমার ওপরই পড়বে, এর দায়ে তোমরা পাকড়াও হবে না। কিন্তু যদি আমি সঠিক পথে থাকি, যেমন যথার্থই আমি আছি, তাহলে তার কারণ হচ্ছে

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ فَزِعُوْا فَلَا فَوْتَ وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿٥١﴾ وَّقَالُوْٓا
اٰمَنَّا بِهٖ ۚ وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٥٢﴾ وَقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ
مِنْ قَبْلُ ۚ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٥٣﴾ وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ
وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ
شَكٍّ مُّرِيْبٍ ﴿٥٤﴾

আহা, যদি তুমি দেখতে তাদেরকে সে সময় যখন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে এবং কোথাও নিরাপদে বের হয়ে যেতে পারবে না বরং নিকট থেকেই পাকড়াও হয়ে যাবে।[৭২] সে সময় তারা বলবে, আমরা তার প্রতি ঈমান আনলাম,[৭৩] অথচ এখন দূরে চলে যাওয়া জিনিস নাগালের মধ্যে আসতে পারে কেমন করে?[৭৪] ইতিপূর্বে তারা কুফরী করেছিল এবং আন্দাজে বহুদূর থেকে কথা নিয়ে আসতো।[৭৫] সে সময় তারা যে জিনিসের আকাংখা করতে থাকবে তা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে দেয়া হবে যেমনটি তাদের পূর্বসূরী সমপন্থীরা বঞ্চিত হয়েছিল। তারা বড়ই বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে পতিত ছিল।[৭৬]

এই যে, আমার কাছে আমার রবের পক্ষ থেকে অহী আসে, যার মাধ্যমে আমি সঠিক পথের জ্ঞান লাভ করেছি। আমার রব কাছেই আছেন। তিনি সবকিছু শুনছেন। আমি পথহারা অথবা তাঁর দিকে যাবার পথের সন্ধান পেয়েছি, তা তিনি জানেন।

৭২. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন অপরাধী এমনভাবে পাকড়াও হবে যেন মনে হবে পাকড়াওকারী কাছেই কোথাও লুকিয়ে ছিল। অপরাধী সামান্য একটু পালাবার চেষ্টা করার সাথে সাথেই যেন তাকে ধরে ফেলেছে।

৭৩. অর্থ হচ্ছে, এমন শিক্ষার প্রতি ঈমান আনলাম যা রসূল দুনিয়ায় পেশ করেছিলেন।

৭৪. অর্থাৎ ঈমান আনার জায়গা ছিল দুনিয়া। সেখান থেকে এখন তারা বহুদূরে চলে এসেছে। আখেরাতের জগতে পৌঁছে যাবার পর এখন আর তাওবা করা ও ঈমান আনার সুযোগ কোথায় পাওয়া যেতে পারে।

৭৫. অর্থাৎ রসূল, রসূলের শিক্ষা এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপবাদ দিতো, বিদ্রূপাত্মক শব্দ উচ্চারণ করতো ও ধ্বনি দিতো। কখনো বলতো, এ ব্যক্তি যাদুকর; কখনো বলতো পাগল। কখনো তাওহীদ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো আবার কখনো আখেরাতের ধারণাকে উপহাস করতো। কখনো এই মর্মে গল্প তৈরি করতো যে,

রসূলকে অন্য কেউ পড়িয়ে ও শিখিয়ে দেয় আবার কখনো মু'মিনদের ব্যাপারে বলতো, এরা শুধুমাত্র নিজেদের অজ্ঞতার কারণে রসূলের অনুসারী হয়েছে।

৭৬. আসলে শির্ক, নাস্তিক্যবাদ ও আখেরাত অস্বীকার করার বিশ্বাস কোন ব্যক্তি নিশ্চয়তার ভিত্তিতে গ্রহণ করে না এবং করতে পারে না। কারণ নিশ্চয়তা একমাত্র সঠিক জ্ঞান ও জানার ভিত্তিতেই অর্জিত হতে পারে। আর আল্লাহ নেই অথবা বহু আল্লাহ আছে কিংবা বহু সত্তা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী অথবা পরকাল হওয়া উচিত নয় ইত্যাকার বিষয়গুলো সম্পর্কে কোন ব্যক্তিরই সঠিক জ্ঞান নেই। কাজেই যে ব্যক্তিই দুনিয়ায় এ আকীদা–বিশ্বাস অবলম্বন করেছে সে নিছক আন্দাজ–অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে একটি ইমারত নির্মাণ করেছে। এ ইমারতের মূল ভিত্তি সন্দেহ–সংশয় ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এ সন্দেহ তাকে নিয়ে গেছে ঘোরতর বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার দিকে। আল্লাহর অস্তিত্বে সে সন্দিহান হয়েছে। তাওহীদের অস্তিত্বে সন্দিহান হয়েছে। আখেরাতের আগমনে সন্দেহ পোষণ করেছে। এমনকি এ সন্দেহকে সে নিশ্চিত বিশ্বাসের মতো মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে নবীদের কোন কথা মানেনি এবং নিজের জীবনের সমগ্র কর্মকালকে একটি ভুল পথে ব্যয় করে দিয়েছে।

ফাতের

৩৫

নামকরণ

প্রথম আয়াতের فاطر শব্দটিকে এ সূরার শিরোনাম করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, এটি সেই সূরা যার মধ্যে 'ফাতের' শব্দটি এসেছে। এর অন্য নাম الملائكه এবং এ শব্দটিও প্রথম আয়াতেই ব্যবহৃত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বক্তব্য প্রকাশের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সম্ভবত মক্কা মু'আয্যমার মধ্য যুগে সূরাটি নাযিল হয়। এ যুগেরও এমন সময় সূরাটি নাযিল হয় যখন ঘোরতর বিরোধিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য সব রকমের অপকৌশল অবলম্বন করা হচ্ছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদের দাওয়াতের মোকাবিলায় সে সময় মক্কাবাসীরা ও তাদের সরদার বৃন্দ যে নীতি অবলম্বন করেছিল, উপদেশের ভংগীতে সে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক ও তিরস্কার করা এবং শিক্ষকের ভংগীতে উপদেশ দেয়াও। বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে, হে মূর্খেরা। এ নবী যে পথের দিকে তোমাদেরকে আহবান করছেন তার মধ্যে রয়েছে তোমাদের নিজেদের কল্যাণ। তার বিরুদ্ধে তোমাদের আক্রোশ, প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র এবং তাঁকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য তোমাদের সমস্ত ফন্দি-ফিকির আসলে তাঁর বিরুদ্ধে নয় বরং তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই চলে যাচ্ছে। তাঁর কথা না মানলে তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করবে, তাঁর কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি তোমাদের যা কিছু বলছেন সে সম্পর্কে একটু চিন্তা করে দেখো তো, তার মধ্যে ভুল কোন্‌টা? তিনি শিরকের প্রতিবাদ করছেন। তোমরা নিজেরাই একবার ভালো করে চোখ মেলে তাকাও। দেখো, দুনিয়ায় শিরকের কি কোন যুক্তিসংগত কারণ আছে? তিনি তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছেন। তোমরা নিজেরাই বুদ্ধি খাটিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখো, সত্যিই কি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর স্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া আর এমন কোন সত্তার অস্তিত্ব আছে যে আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতার অধিকারী? তিনি তোমাদেরকে বলছেন, এ দুনিয়ায় তোমরা দায়িত্বহীন নও বরং তোমাদের নিজেদের আল্লাহর সামনে নিজেদের কাজের হিসেব দিতে হবে এবং এ দুনিয়ার জীবনের পরে আর

একটি জীবন আছে যেখানে প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে। তোমরা নিজেরাই চিন্তা করো, এ সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ ও বিস্ময় কতটা ভিত্তিহীন। তোমাদের চোখ কি প্রতিদিন সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি প্রত্যেক্ষ করছে না? তাহলে যে আল্লাহ্ এক বিন্দু শুক্র থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর জন্য তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা আবার অসম্ভব হবে কেন? ভালো ও মন্দের ফল সমান হওয়া উচিত নয়, তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি কি একথার সাক্ষ দেয় না? তাহলে তোমরাই বলো যুক্তিসংগত কথা কোন্‌টি— ভালো ও মন্দের পরিণাম সমান হোক? অর্থাৎ সবাই মাটিতে মিশে শেষ হয়ে যাক? অথবা ভালো লোক ভালো পরিণাম লাভ করুক এবং মন্দ লোক লাভ করুক তার মন্দ প্রতিফল? এখন তোমরা যদি এ পুরোপুরি যুক্তিসংগত ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত কথাগুলো না মানো এবং মিথ্যা খোদাদের বন্দেগী পরিহার না করো উপরন্তু নিজেদেরকে অদায়িত্বশীল মনে করে লাগাম ছাড়া উটের মতো দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকতে চাও, তাহলে এতে নবীর ক্ষতি কি? সর্বনাশ তো তোমাদেরই হবে। নবীর দায়িত্ব ছিল কেবলমাত্র বুঝানো এবং তিনি সে দায়িত্ব পালন করেছেন।

বক্তব্যের ধারাবাহিক বর্ণনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বারবার এ মর্মে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, আপনি যখন উপদেশ দেবার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করছেন তখন গোমরাহির ওপর অবিচল থাকতে যারা চাচ্ছে তাদের সঠিক পথে চলার আহবানে সাড়া না দেবার দায় আপনার ওপর বর্তাবে না। এই সাথে তাঁকে একথাও বুঝানো হয়েছে যে, যারা মানতে চায় না তাদের মনোভাব দেখে আপনি দুঃখ করবেন না এবং তাদের সঠিক পথে আনার চিন্তায় নিজেকে ধ্বংস করেও দেবেন না। এর পরিবর্তে যেসব লোক আপনার কথা শোনার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে তাদের প্রতি আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন।

ঈমান আনয়নকারীদেরকেও এ প্রসংগে বিরাট সুসংবাদ দান করা হয়েছে। এভাবে তাদের মনোবল বাড়বে এবং তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থা স্থাপন করে সত্যের পথে অবিচল থাকবে।

আয়াত ৪৫ | সূরা ফাতের-মক্কী | রুকূ' ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ؕ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝١ مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٢

প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নির্মাতা এবং ফেরেশ্‌তাদেরকে বাণীবাহক নিয়োগকারী[১] (এমন সব ফেরেশ্‌তা) যাদের দুই দুই তিন তিন ও চার চারটি ডানা আছে।[২] নিজের সৃষ্টির কাঠামোয় তিনি যেমনটি চান বৃদ্ধি করেন।[৩] নিশ্চয়ই আল্লাহ সব জিনিসের ওপর শক্তিমান। আল্লাহ যে রহমতের দরোজা মানুষের জন্য খুলে দেন তা রুদ্ধ করার কেউ নেই এবং যা তিনি রুদ্ধ করে দেন তা আল্লাহর পরে আর কেউ খোলার নেই।[৪] তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।[৫]

১. এর অর্থ এও হতে পারে যে, ফেরেশ্‌তারা মহান আল্লাহ ও আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মধ্যে বার্তা পৌছাবার কাজ করেন আবার এ অর্থও হতে পারে যে, সমগ্র বিশ্ব-জাহানে মহাশক্তির অধিকারী আল্লাহর বিধান নিয়ে যাওয়া এবং সেগুলো প্রবর্তন করা এ ফেরেশ্‌তাদেরই কাজ। একথা উল্লেখ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এ ফেরেশ্‌তাদেরকে মুশরিকরা দেব-দেবীতে পরিণত করেছিল অথচ এদের মর্যাদা এক ও লা-শরীক আল্লাহর একান্ত অনুগত খাদেমের চেয়ে মোটেই বেশী কিছু নয়। একজন বাদশাহর খাদেমরা যেমন তাঁর হুকুম তামিল করার জন্য দৌড়াদৌড়ি করে থাকে ঠিক তেমনি এ ফেরেশ্‌তারাও বিশ্ব-জাহানের প্রকৃত শাসনকর্তার হুকুম পালন করার জন্যও উড়ে চলতে থাকেন। এ খাদেমদের কোন ক্ষমতা নেই। সমস্ত ক্ষমতা রয়েছে আসল শাসনকর্তার হাতে।

২. এ ফেরেশ্‌তাদের হাত ও ডানার অবস্থা ও ধরন জানার কোন মাধ্যম আমাদের কাছে নেই। কিন্তু এ অবস্থা ও ধরন বর্ণনা করার জন্য আল্লাহ যখন এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন যা মানুষের ভাষায় পাখিদের হাত ও ডানার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে তখন

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَٰلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ
يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ۝٣ وَإِن
يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۝٤

হে লোকেরা! তোমাদের প্রতি আল্লাহর যেসব অনুগ্রহ রয়েছে সেগুলো স্মরণ করো।[৬] আল্লাহ ছাড়া কি আর কোন স্রষ্টা আছে, যে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দেয়?—তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তোমরা কোথা থেকে প্রতারিত হচ্ছো?[৭] এখন যদি (হে নবী!) এরা তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে থাকে[৮] (তাহলে এটা কোন নতুন কথা নয়) তোমার পূর্বেও বহু রসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপিত হয়েছে এবং সমস্ত বিষয় শেষ পর্যন্ত আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।[৯]

অবশ্যই আমাদের ভাষার এ শব্দকেই আসল অবস্থা ও ধরন বর্ণনার নিকটতর বলে ধারণা করা যেতে পারে। দুই দুই, তিন তিন ও চার চার ডানার কথা বলা থেকে বুঝা যায় যে, বিভিন্ন ফেরেশ্‌তাকে আল্লাহ বিভিন্ন পর্যায়ের শক্তি দান করেছেন এবং যাকে দিয়ে যেমন কাজ করতে চান তাকে ঠিক তেমনই দ্রুতগতি ও কর্মশক্তি দান করেছেন।

৩. এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ফেরেশতাদের ডানার সংখ্যা চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বরং কোন কোন ফেরেশতাকে আল্লাহ এর চেয়েও বেশী ডানা দিয়েছেন। হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) বর্ণনায় বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার জিব্রীল আলাইহিস সালামকে এমন অবস্থায় দেখেন যখন তাঁর ডানার সংখ্যা ছিল ছ'শো। (বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী) হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) দু'বার জিব্রীলকে তাঁর আসল চেহারায় দেখেন। তখন তাঁর ছ'শো ডানা ছিল এবং তিনি সারা আকাশে ছেয়ে ছিলেন। (তিরমিযী)

৪. মুশরিকরা যে মনে করে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেউ তাদের রিযিকদাতা, কেউ সন্তানদাতা এবং কেউ রোগ নিরাময়কারী, তাদের এ ভুল ধারণা দূর করাও এর উদ্দেশ্য। শিরকের এ সমস্ত ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন এবং নির্ভেজাল সত্য শুধুমাত্র এতটুকু যে, বান্দাদের কাছে যে ধরনের রহমতই আসে নিছক মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহর অনুগ্রহেই আসে। অন্য কারো এ রহমত দান করার ক্ষমতাও নেই এবং একে রোধ করার শক্তিও কারো নেই। এ বিষয়টি কুরআন মজীদ ও হাদীসের বহু স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে মানুষ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াবার এবং সবার কাছে হাত পাতার গ্লানি থেকে রেহাই পাবে। এই সংগে সে এ বিষয়টিও ভালোভাবে বুঝে নেবে যে, তার ভাগ্য ভাঙা গড়া এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইখতিয়ারে নেই।

৫. পরাক্রমশালী অর্থাৎ সবার ওপর প্রাধান্য বিস্তারকারী ও পূর্ণ সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী। তাঁর সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করার পথে কেউ বাধা দিতে পারে না। আবার এই সংগে

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا
يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۝٥ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ
إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ۝٦ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ
وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝٧

হে লোকেরা! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি নিশ্চিতভাবেই সত্য,[১০] কাজেই দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদের প্রতারিত না করে[১১] এবং সেই বড় প্রতারক যেন তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকা দিতে না পারে।[১২] আসলে শয়তান তোমাদের শত্রু, তাই তোমরাও তাকে নিজেদের শত্রুই মনে করো। সে তো নিজের অনুসারীদেরকে নিজের পথে এ জন্য ডাকছে যাতে তারা দোজখীদের অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। যারা কুফরী করবে[১৩] তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি আর যারা ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও বড় পুরস্কার।[১৪]

তিনি জ্ঞানীও। যে ফায়সালাই তিনি করেন পুরোপুরি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই করেন। কাউকে দিলে সেটিই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দাবী বলেই দেন এবং কাউকে না দিলে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দাবী বলেই দেন না।

৬. অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ ও নিমকহারাম হয়ো না। তোমরা যা কিছু লাভ করেছো তা আল্লাহরই দেয়া, এ সত্যটি ভুলে যেয়ো না। অন্য কথায় এ বাক্যটি এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছে যে, যে ব্যক্তিই আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী ও পূজা-উপাসনা করে অথবা কোন নিয়ামতকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তার দান মনে করে কিংবা কোন নিয়ামত লাভ করার জন্য আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অথবা কোন নিয়ামত চাওয়ার জন্য আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে দোয়া করে সে বড়ই অকৃতজ্ঞ।

৭. প্রথম বাক্যাংশ ও দ্বিতীয় বাক্যাংশের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ফাঁক রয়েছে। কথার স্থান ও কাল নিজেই এ ফাঁক ভরে দিচ্ছে। একথা অনুধাবন করার জন্য কল্পনার চোখের সামনে একটি চিত্র মেলে ধরুন। অর্থাৎ মুশরিকদের সামনে বক্তৃতা চলছে। বক্তা শ্রোতাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ ছাড়া কি আর কোন স্রষ্টা আছে, যে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছে এবং পৃথিবী ও আকাশ থেকে তোমাদের জীবিকা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে?

এ প্রশ্ন করে বক্তা কয়েক মুহূর্ত জবাবের অপেক্ষা করেন। কিন্তু দেখেন সমাবেশের সমগ্র জনতা নিরব। কেউ বলে না, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জীবিকাদানকারী ও স্রষ্টাও আছে। এ থেকে আপনা আপনিই এ ফল প্রকাশিত হয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন স্রষ্টা ও রিযিকদাতা নেই, শ্রোতাগণও একথা পুরোপুরি স্বীকার করে। এরপরই বক্তা বলেন, তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ মাবুদও হতে পারে না। তোমরা কেমন করে এ প্রতারণার শিকার হলে যে, স্রষ্টা ও রিযিকদাতা হবেন তো একমাত্র আল্লাহ কিন্তু মাবুদ হবেন তিনি ছাড়া অন্য কেউ?

৮. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদাত লাভের অধিকারী নেই, তোমার একথা মানে না এবং তুমি নবুওয়াতের মিথ্যা দাবী করছো, এ অভিযোগ তোমার বিরুদ্ধে আনে।

৯. অর্থাৎ ফায়সালা লোকদের হাতে নেই। তারা যাকে মিথ্যুক বলবে সে যথার্থই মিথ্যাবাদী হয়ে যাবে না। ফায়সালা তো রয়েছে আল্লাহরই হাতে। মিথ্যুক কে ছিল তা তিনি শেষ পর্যন্ত জানিয়ে দেবেন এবং প্রকৃতই যে মিথ্যুক তার পরিণতিও দেখিয়ে দেবেন।

১০. প্রতিশ্রুতি বলতে আখেরাতের প্রতিশ্রুতি বুঝানো হয়েছে যেদিকে ওপরের এ বাক্যে ইংগিত করে বলা হয়েছিল যে, সমস্ত বিষয় শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সামনে উপস্থাপিত হবে।

১১. অর্থাৎ এ দুনিয়াই সবকিছু এবং এরপর আর কোন আখেরাত নেই যেখানে কৃতকর্মের হিসেব নেয়া হবে, এ প্রতারণা জালে আবদ্ধ না করে। অথবা এভাবে প্রতারিত না করে যে, যদি কোন আখেরাত থেকেও থাকে, তাহলে যে ব্যক্তি এ দুনিয়ায় আরাম আয়েশে জীবন যাপন করছে সে সেখানেও আরাম আয়েশ করবে।

১২. "বড় প্রতারক" এখানে হচ্ছে শয়তান যেমন সামনের বাক্য বলছে। আর "আল্লাহর ব্যাপারে" ধোঁকা দেয়ার মানে হচ্ছে, শয়তান লোকদেরকে একথা বুঝায় যে, আসলে আল্লাহ বলে কিছুই নেই এবং কিছু লোককে এ বিভ্রান্তির শিকার করে যে, আল্লাহ একবার দুনিয়াটা চালিয়ে দিয়ে তারপর বসে আরাম করছেন, এখন তাঁর সৃষ্ট এ বিশ্ব-জাহানের সাথে কার্যত তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। আবার কিছু লোককে সে এভাবে ধোঁকা দেয় যে, আল্লাহ অবশ্যই এ বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা করে যাচ্ছেন কিন্তু তিনি মানুষকে পথ দেখাবার কোন দায়িত্ব নেননি। কাজেই এ অহী ও রিসালাত নিছক একটি ধোঁকাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়। সে কিছু লোককে এ মিথ্যা আশ্বাসও দিয়ে চলছে যে, আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান, তোমরা যতই গোনাহ কর না কেন তিনি সব মাফ করে দেবেন এবং তাঁর এমন কিছু পিয়ারা বান্দা আছে যাদেরকে আঁকড়ে ধরলেই তোমরা কামিয়াব হয়ে যাবে।

১৩. অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের এ দাওয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করবে।

১৪. অর্থাৎ তাদের ভুল-ভ্রান্তি ও অপরাধ মাফ করে দেবেন এবং তারা যেসব সৎকাজ করবে সেগুলোর কেবল সমান সমান প্রতিদান দেবেন না বরং বড় ও বিপুল প্রতিদান দেবেন।

أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي
مَن يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا
يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ
مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ النُّشُورُ ﴿٩﴾

২ রুকূ'

(এমন[১৫] ব্যক্তির বিভ্রান্তির কোন শেষ আছে কি) যার জন্য তার খারাপ কাজকে শোভন করে দেয়া হয়েছে এবং সে তাকে ভালো মনে করছে?[১৬] আসলে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্তিতে লিপ্ত করেন এবং যাকে চান সঠিক পথ দেখিয়ে দেন। কাজেই (হে নবী!) অযথা ওদের জন্য দুঃখে ও শোকে তুমি প্রাণপাত করো না।[১৭] ওরা যা কিছু করছে আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন।[১৮] আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন তারপর তা মেঘমালা উঠায় এরপর আমি তাকে নিয়ে যাই একটি জনমানবহীন এলাকার দিকে এবং মৃত পতিত যমীনকে সঞ্জীবিত করে তুলি। মৃত মানুষদের বেঁচে ওঠাও তেমনি ধরনের হবে।[১৯]

১৫. ওপরের দু'টি প্যারাগ্রাফ সাধারণ জনগণকে সম্বোধন করে বলা হয়েছিল। এখন এ প্যারাগ্রাফ যেসব বিভ্রান্তির নায়করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে ব্যর্থ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল তাদের কথা বলা হচ্ছে।

১৬. অর্থাৎ এমন এক ধরনের বিভ্রান্ত ও দুষ্কৃতকারী লোক আছে যে খারাপ কাজ করে ঠিকই কিন্তু সে জানে এবং স্বীকার করে যে সে যা কিছু করছে খারাপই করছে। এ ধরনের লোককে বুঝালেও ঠিক হয়ে যেতে পারে এবং কখনো নিজের বিবেকের তাড়নায়ও সে সঠিক পথে চলে আসতে পারে। কারণ তার শুধুমাত্র অভ্যাসই বিগড়েছে, মন-মানসিকতা বিগড়ে যায়নি। কিন্তু আর এক ধরনের দুষ্কৃতকারী আছে, যার মন-মানসিকতাই বিগড়ে গেছে। তার ভালো-মন্দের পার্থক্যবোধই খতম হয়ে গেছে। গোনাহের জীবন তার কাছে প্রিয় ও গৌরবময়। সৎকাজকে সে ঘৃণা করে এবং অসৎকাজকে যথার্থ সভ্যতা ও সংস্কৃতি মনে করে। সৎবৃত্তি ও তাকওয়াকে সে প্রাচীনত্ব এবং আল্লাহর হুকুম অমান্য করা ও অশ্লীল কাজ করাকে প্রগতিশীলতা মনে করে। তার দৃষ্টিতে হিদায়াত গোমরাহীতে এবং গোমরাহী হিদায়াতে পরিণত হয়। এ ধরনের লোকের ওপর কোন উপদেশ কার্যকর হয় না। সে নিজের নির্বুদ্ধিতার ওপর নিজেই সতর্ক হয় না এবং কেউ তাকে বোঝালেও বোঝে না। এ ধরনের লোকের পেছনে লেগে থাকা অর্থহীন। তাকে সৎপথে আনার চিন্তায় প্রাণপাত না করে সত্যের আহবায়ককে এমনসব লোকের প্রতি দৃষ্টি দেয়া

প্রয়োজন যাদের বিবেক এখনো বেঁচে আছে এবং যারা সত্যের আহবানের জন্য নিজেদের মনের দুয়ার বন্ধ করে দেয়নি।

১৭. আগের বাক্য এবং এ বাক্যের মাঝখানে "আল্লাহ যাকে চান গোমরাহীতে লিপ্ত করেন এবং যাকে চান সঠিক পথ দেখান"— একথা বলা পরিষ্কারভাবে এ অর্থই প্রকাশ করছে যে, যারা এতদূর মানবিক বিকৃতির শিকার হয় আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াতের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেন এবং পথহারা হয়ে এমন সব পথে ঘুরে বেড়াবার জন্য তাদেরকে ছেড়ে দেন যেসব ভুল পথে ঘুরে বেড়ানোর জন্য তারা নিজেরাই জিদ ধরে। এ সত্যটি বুঝিয়ে দেবার পর মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, এ ধরনের লোকদেরকে সঠিক পথে আনার সামর্থ তোমার নেই কাজেই তাদের ব্যাপারে সবর করো এবং আল্লাহ যেমন তাদের পরোয়া করছেন না তেমনি তোমরাও তাদের অবস্থা দেখে দুঃখিত ও শোকাভিভূত হয়ো না।

এ ক্ষেত্রে দু'টি কথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। এক, এখানে যাদের কথা বলা হচ্ছে তারা সাধারণ লোক ছিল না। তারা ছিল মক্কা মু'আয্যমার সরদার। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য সব রকমের মিথ্যা প্রতারণা ও ফন্দি-ফিকিরের আশ্রয় নিয়ে চলছিল। তারা আসলে নবী করীম (সা) সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা রাখতো না। তিনি কিসের দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন এবং তাঁর মোকাবিলায় তারা নিজেরা কোন্ ধরনের মূর্খতা ও নৈতিক দুষ্কৃতির প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট রয়েছে তা তারা ভালোভাবে জানতো। এসব কিছু জানার ও বুঝার পর ঠাণ্ডা মাথায় তাদের সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা চলতে দেয়া যাবে না। এ উদ্দেশ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট অস্ত্র এবং সবচেয়ে হীন হাতিয়ার ব্যবহার করতে তারা একটুও কুণ্ঠিত ছিল না। এখন একথা সুস্পষ্ট, যারা জেনে বুঝে এবং নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে প্রতিদিন একটি নতুন মিথ্যা রচনা করে এবং কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তা ছড়িয়ে বেড়ায় তারা সারা দুনিয়ার মানুষকে ধোঁকা দিতে পারে কিন্তু নিজেকে তো তারা মিথ্যুক বলে জানে এবং তাদের নিজেদের কাছে একথা গোপন থাকে না যে, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে তারা একটি অপবাদ দিয়েছে সে তা থেকে মুক্ত। তারপর যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ মিথ্যা হাতিয়ার ব্যবহার করা হচ্ছে সে যদি এর জবাবে কখনো সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে সরে গিয়ে কোন কথা না বলে তাহলে এ জালেমদের কাছেও একথা কখনো গোপন থাকতে পারে না যে, তাদের মোকাবিলায় যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি একজন সত্যবাদী ও নিখাদ পুরুষ। এরপরও নিজেদের কৃতকর্মের জন্য যারা এতটুকু লজ্জিত হয় না এবং অনবরত মিথ্যার মাধ্যমে সত্যের মোকাবিলা করে যেতে থাকে, তাদের এ নীতি নিজেই একথার সাক্ষ বহন করে যে, আল্লাহর লানত তাদের ওপর পড়েছে এবং ভালোমন্দের কোন পার্থক্যবোধ তাদের মধ্যে নেই।

দ্বিতীয় যে কথাটি এ প্রসংগে বুঝে নিতে হবে সেটি হচ্ছে এই যে, নিছক স্বীয় রসূল পাককে কাফেরদের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করানোই যদি আল্লাহর লক্ষ্য হতো, তাহলে তিনি গোপনে কেবলমাত্র তাঁকেই একথা বুঝাতে পারতেন। এ উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে সুস্পষ্ট অহীর মাধ্যমে তার উল্লেখের প্রয়োজন ছিল না। কুরআন মজীদে একথা বর্ণনা করবার এবং সারা দুনিয়ার মানুষকে তা শুনিয়ে দেবার উদ্দেশ্যই ছিল আসলে সাধারণ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ؕ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ
وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ؕ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيْدٌ ؕ وَمَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ ﴿١٠﴾

যে সম্মান চায় তার জানা উচিত সমস্ত সম্মান একমাত্র আল্লাহরই।[২০] তাঁর কাছে শুধুমাত্র পবিত্র কথাই ওপরের দিকে আরোহণ করে এবং সৎকাজ তাকে ওপরে ওঠায়।[২১] আর যারা অনর্থক চালবাজী করে[২২] তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি এবং তাদের চালবাজী নিজেই ধ্বংস হবে।

মানুষকে এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া যে, যেসব নেতার পেছনে তোমরা চোখ বন্ধ করে ছুটে চলছো তারা কতখানি বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন লোক এবং তাদের বেহুদা কাজকর্ম কেমন চিৎকার করে করে বলছে যে, তাদের ওপর আল্লাহর লানত পড়েছে।

১৮. আলোচ্য বাক্যটির মধ্যে এ স্বতস্ফূর্ত হুমকি প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, এমন একটি সময় আসবে যখন আল্লাহ তাদেরকে এসব কৃতকর্মের শাস্তি দেবেন। কোন শাসক যখন কোন অপরাধী সম্পর্কে বলেন, তার কাজকর্মের আমি সব খবর রাখি তখন তার অর্থ কেবল এতটুকুই হয় না যে, শাসক তার কাজকর্ম সব জানেন বরং তার মধ্যে এ সতর্কবাণীও নিহিত থাকে যে, আমি তাকে শাস্তি দেবোই।

১৯. অর্থাৎ এ মূর্খের দল আখেরাতকে অসম্ভব মনে করছে। তাই তারা নিজস্বভাবে এ চিন্তায় নিমগ্ন হয়েছে যে, দুনিয়ায় তারা যাই কিছু করতে থাকুক না কেন, তাদের জবাবদিহি করার জন্য আল্লাহর সামনে হাজির হবার সময়টি কখনো আসবে না। কিন্তু তারা যার মধ্যে নিমগ্ন আছে সেটি নিছক একটি খামখেয়ালি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিয়ামতের দিন সামনের পেছনের সমস্ত মরা মানুষ মহান আল্লাহর একটিমাত্র ইশারায় সহসা ঠিক তেমনিভাবে জীবিত হয়ে উঠবে যেমন একবার বৃষ্টি হবার পর শুকনো জমি অকস্মাত সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে এবং দীর্ঘকালের মৃত শিকড়গুলো সবুজ চারাগাছে রূপান্তরিত হয়ে মাটির বুক থেকে মাথা উঁচু করতে থাকে।

২০. মনে রাখতে হবে, কুরাইশ সরদাররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোকাবিলায় যা কিছু করছিল সবই ছিল তাদের নিজেদের ইজ্জত ও মর্যাদার খাতিরে। তাদের ধারণা ছিল, যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা গৃহীত হয়ে যায় তাহলে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব খতম হয়ে যাবে। আমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হবে এবং তামাম আরব মুল্লুকে আমাদের যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত আছে তা মাটিতে মিশে যাবে। এরি প্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে, আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও কুফরী করে তোমরা নিজেদের যে মর্যাদা তৈরি করে রেখেছো এ তো একটি মিথ্যা ও ঠুনকো মর্যাদা। মাটিতে মিশে যাওয়াই এর ভাগ্যের লিখন। আসল ও চিরস্থায়ী মর্যাদা, দুনিয়া থেকে নিয়ে আখেরাত পর্যন্ত যা

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ
مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ
عُمُرِهٖۤ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ ۚ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿١١﴾

আল্লাহ[২৩] তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে তারপর শুক্র থেকে[২৪] এরপর তোমাদের জুটি বানিয়ে দিয়েছেন (অর্থাৎ পুরুষ ও নারী)। কোন নারী গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব করলে কেবলমাত্র আল্লাহর জানা মতেই তা করে থাকে। কোন আয়ু লাভকারী আয়ু লাভ করলে এবং কারো আয়ু কিছু কম করা হলে তা অবশ্যই একটি কিতাবে লেখা থাকে।[২৫] আল্লাহর জন্য এসব একদম সহজ।[২৬]

কখনো হীনতা ও লাঞ্ছনার শিকার হতে পারে না, তা কেবলমাত্র আল্লাহর বন্দেগীর মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। তুমি যদি তাঁর হয়ে যাও, তাহলে তাঁকে পেয়ে যাবে এবং যদি তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে।

২১. এ হচ্ছে মর্যাদা লাভ করার আসল উপায়। আল্লাহর কাছে মিথ্যা, কলুষিত ও ক্ষতিকারক কথা কখনো উচ্চ মর্যাদা লাভ করে না। তাঁর কাছে একমাত্র এমন কথা উচ্চ মর্যাদা লাভ করে যা হয় সত্য, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন, বাস্তব ভিত্তিক, যার মধ্যে সদিচ্ছা সহকারে একটি ন্যায়নিষ্ঠ আকীদা-বিশ্বাস ও একটি সঠিক চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। তারপর একটি পবিত্র কথাকে যে জিনিসটি উচ্চ মর্যাদার দিকে নিয়ে যায় সেটি হচ্ছে কথা অনুযায়ী কাজ। যেখানে কথা খুবই পবিত্র কিন্তু কাজ তার বিপরীত সেখানে কথার পবিত্রতা নিস্তেজ ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। কেবলমাত্র মুখে কথার খই ফুটালে কোন কথা উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হয় না বরং এ জন্য সৎকাজের শক্তিমত্তার প্রয়োজন হয়।

এখানে একথাও অনুধাবন করতে হবে যে, কুরআন মজীদ ভালো কথা ও ভালো কাজকে পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য বিষয় হিসেবে পেশ করে। কোন কাজ নিছক তার বাহ্যিক আকৃতির দিক দিয়ে ভালো হতে পারে না যতক্ষণ না তার পেছনে থাকে ভালো আকীদা-বিশ্বাস। আর কোন ভালো আকীদা-বিশ্বাস এমন অবস্থায় মোটেই নির্ভরযোগ্য হতে পারে না যতক্ষণ না মানুষের কাজ তার প্রতি সমর্থন যোগায় এবং তার সত্যতা প্রমাণ করে। কোন ব্যক্তি যদি মুখে বলতে থাকে, আমি এক ও লা-শরীক আল্লাহকে মাবুদ বলে মানি কিন্তু কার্যত সে গাইরুল্লাহর ইবাদাত করে, তাহলে এ কাজ তার কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করে। কোন ব্যক্তি যদি মুখে মদ হারাম বলতে থাকে এবং কার্যত মদ পান করে চলে, তাহলে শুধুমাত্র তার কথা মানুষের দৃষ্টিতেও গৃহীত হতে পারে না, আর আল্লাহর কাছেও তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

২২. অর্থাৎ বাতিল ও ক্ষতিকর কথা নিয়ে এগিয়ে আসে তারপর শঠতা, প্রতারণা ও মনোমুগ্ধকর যুক্তির মাধ্যমে তাকে সামনের দিকে এগিয়ে দেবার চেষ্টা করে এবং তার

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ
اُجَاجٌ ۭ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ
وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ⑫

পানির দু'টি উৎস সমান নয়।[২৭] একটি সুমিষ্ট ও পিপাসা নিবারণকারী সুস্বাদু পানীয় এবং অন্যটি ভীষণ লবণাক্ত যা গলা ছিলে দেয়, কিন্তু উভয়টি থেকে তোমরা তরতাজা গোশ্‌ত লাভ করে থাকো,[২৮] পরিধান করার জন্য সৌন্দর্যের সরঞ্জাম বের করো[২৯] এবং এ পানির মধ্যে তোমরা দেখতে থাকো নৌযান তার বুক চিরে ভেসে চলছে, যাতে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

মোকাবিলায় সত্য ও হক কথাকে ব্যর্থ করার জন্য সবচেয়ে খারাপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতেও পিছপা হয় না।

২৩. এখান থেকে আবার কথার মোড় সাধারণ মানুষের দিকে ঘুরে যাচ্ছে।

২৪. অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টি প্রথমে সরাসরি মাটি থেকে করা হয় তারপর তার বংশধারা চালানো হয় তার বীর্য থেকে।

২৫. অর্থাৎ যে ব্যক্তিই দুনিয়ায় জন্মলাভ করে তার সম্পর্কে প্রথমেই লিখে দেয়া হয় সে দুনিয়ায় কত বছর বাঁচবে। কেউ দীর্ঘায়ু হলে তা হয় আল্লাহর হুকুমে এবং স্বল্পায়ু হলেও হয় আল্লাহর ফায়সালা অনুযায়ী। কতিপয় অজ্ঞ ও মূর্খ লোক এর জবাবে এ যুক্তি পেশ করে থাকে যে, পূর্বে নবজাত শিশুদের মৃত্যুহার ছিল বেশী এবং বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি এ মৃত্যুহার কমিয়ে দিয়েছে। পূর্বে লোকদের গড় আয়ু ছিল কম, বর্তমানে চিকিৎসা উপকরণ বৃদ্ধির ফলে আয়ু দীর্ঘায়িত হতে শুরু হয়েছে। কিন্তু এ যুক্তি কুরআন মজীদের এ বর্ণনার প্রতিবাদে কেবলমাত্র তখনই পেশ করা যেতে পারতো যখন কোন উপায়ে আমরা জানতে পারতাম, যেমন উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ অমুক ব্যক্তির আয়ু লিখেছিলেন দু'বছর এবং আমাদের চিকিৎসা উপকরণ তার মধ্যে একদিনের সময় বৃদ্ধি করে দিয়েছে। এ ধরনের কোন জ্ঞান যদি কারো কাছে না থেকে থাকে, তাহলে সে কোন সংগত ভিত্তিতে কুরআনের এ উক্তির প্রতিবাদ করতে পারে না। সংখ্যাতত্ব ও গণনার দিক দিয়ে শিশু মৃত্যুর হার এখন কমে গেছে অথবা আগের তুলনায় লোকেরা বেশী আয়ুর অধিকারী হচ্ছে, নিছক এই তথ্যের ভিত্তিতে একথা বলা যায় না যে, মানুষ এবার আল্লাহর ফায়সালা বদলে দেবার শক্তি অর্জন করেছে। আল্লাহ বিভিন্ন যুগে জন্মলাভকারী মানুষের আয়ু বিভিন্নভাবে নির্ধারণ করেছেন এতে অযৌক্তিক কি আছে? এবং এটিও মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর ফায়সালা যে, অমুক যুগে মানুষকে অমুক রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা দান করা হবে এবং অমুক যুগে মানুষকে জীবনী শক্তি বৃদ্ধির অমুক উপায় দান করা হবে।

يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِن تَدْعُوهُمْ
لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ۖ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾

তিনি দিনের মধ্যে রাতকে এবং রাতের মধ্যে দিনকে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আসেন।[৩০] চন্দ্র ও সূর্যকে তিনি অনুগত করে রেখেছেন।[৩১] এসব কিছু একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। এ আল্লাহই (এ সমস্তই যাঁর কাজ) তোমাদের রব, রাজত্ব তাঁরই। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য যাদেরকে তোমরা ডাকছো তারা তো একটি শুকনো ভূমির[৩২] অধিকারীও নয়। তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনতে পারে না এবং শুনে নিলেও তোমাদের কোন জবাব দিতে পারে না।[৩৩] এবং কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে।[৩৪] প্রকৃত অবস্থার এমন সঠিক খবর একজন সর্বজ্ঞ ছাড়া কেউ তোমাদের দিতে পারে না।[৩৫]

২৬. অর্থাৎ এত অসংখ্য সৃষ্টির ব্যাপারে এত বিস্তারিত জ্ঞান থাকা এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এত বিস্তারিত বিধান দেয়া ও ফায়সালা করা আল্লাহর জন্য মোটেই কোন কঠিন কাজ নয়।

২৭. অর্থাৎ পানির একটি উৎস যা সমুদ্রগুলোর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এবং পানির দ্বিতীয় উৎসটি গড়ে উঠেছে নদী, ঝরণা, হ্রদ ইত্যাদির সমন্বয়ে।

২৮. অর্থাৎ জলজ প্রাণীর গোশ্‌ত।

২৯. অর্থাৎ মুক্তা, প্রবাল এবং কোন কোন নদী–সাগর থেকে হীরা ও সোনা।

৩০. অর্থাৎ দিনের আলো ধীরে ধীরে নিভে যেতে থাকে এবং রাতের আঁধার বেড়ে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি তাকে ঢেকে ফেলে। এভাবে রাতের শেষ দিকে দিগন্তে হাল্‌কা আলোর রেখা জেগে ওঠে। তারপর আস্তে আস্তে তা অগ্রসর হতে হতে আলোকোজ্জ্বল দিনে পরিণত হয়।

৩১. অর্থাৎ একটি নিয়ম ও বিধানের অধীন করে রেখেছেন।

৩২. মূলে "কিত্‌মীর" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিত্‌মীর বলা হয় খেজুরের আঁটির গায়ে জড়ানো পাতলা ঝিল্লি বা আবরণকে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বলা যে,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿١٥﴾
إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ
مِنْهُ شَىْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم
بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِۦ ۚ وَإِلَى
ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

৩ রুকূ'

হে লোকেরা! তোমরাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী[৩৬] এবং আল্লাহ তো অভাবমুক্ত ও প্রশংসার্হ।[৩৭] তিনি চাইলে তোমাদের সরিয়ে কোন নতুন সৃষ্টি তোমাদের জায়গায় আনবেন। এমনটি করা আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়।[৩৮] কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা উঠাবে না।[৩৯] আর যদি কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি নিজের বোঝা উঠাবার জন্য ডাকে, তাহলে তার বোঝার সামান্য একটি অংশ উঠাবার জন্যও কেউ আসবে না, সে তার নিকটতম আত্মীয় স্বজন হলেও।[৪০] (হে নবী ঃ) তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পারো যারা না দেখে তাদের রবকে ভয় করে এবং নামায কায়েম করে।[৪১] আর যে ব্যক্তিই পবিত্রতা অবলম্বন করে সে নিজেরই ভালোর জন্য করে এবং ফিরে আসতে হবে সবাইকে আল্লাহরই দিকে।

মুশরিকদের মাবুদ ও উপাস্যরা কোন তুচ্ছ ও নগণ্য জিনিসেরও মালিক নয়। তাই শাব্দিক তরজমা বাদ দিয়ে আমি এখানে ভাব–তরজমা করেছি।

৩৩. এর অর্থ এ নয় যে, তারা তোমাদের দোয়ার জবাবে তোমাদের দোয়া কবুল করা হয়েছে বা হয়নি একথা চিৎকার করে বলতে পারে না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তারা তোমাদের আবেদনের ভিত্তিতে কোন পদক্ষেপ নিতে পারে না। কোন ব্যক্তি নিজের আবেদন যদি এমন কোন ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দেয় যে শাসনকর্তা নয়, তাহলে তার আবেদন ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ তা যার কাছে পাঠানো হয়েছে তার হাতে আদতে কোন ক্ষমতাই নেই। প্রত্যাখ্যান বা গ্রহণ করার কোন ইখতিয়ার তার নেই তবে এই একই আবেদন আবার যদি যথার্থ শাসনকর্তার কাছে পাঠানো হয়, তাহলে এর ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে কোন না কোন পদক্ষেপ গৃহীত হবেই। তা গৃহীতও হতে পারে আবার প্রত্যাখ্যাতও।

৩৪. অর্থাৎ তারা পরিষ্কার বলে দেবে, আমরা কখনো এদেরকে বলিনি, আমরা আল্লাহর শরীক এবং তোমরা আমাদের ইবাদাত করো। বরং আমরা এও জানতাম না যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাথে শরীক করছে এবং আমাদের কাছে প্রার্থনা করছে। এদের কোন প্রার্থনা আমাদের কাছে আসেনি এবং এদের কোন নজরানা ও উৎসর্গ আমাদের হস্তগত হয়নি।

৩৫. সর্বজ্ঞ বলে আল্লাহকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ অন্য কোন ব্যক্তিতো বড় জোর বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে শিরক খণ্ডন ও মুশরিকদের মাবুদদের শক্তিহীনতা বর্ণনা করবে। কিন্তু আমি সরাসরি প্রকৃত অবস্থা জানি। আমি নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে তোমাদের জানাচ্ছি, লোকেরা যাদেরকেই আমার সার্বভৌম কর্তৃত্বের মধ্যে স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন করে রেখেছে তারা সবাই ক্ষমতাহীন। তাদের কাছে এমন কোন শক্তি নেই যার মাধ্যমে তারা কারো কোন কাজ সফল বা ব্যর্থ করে দিতে পারে। আমি সরাসরি জানি, কিয়ামতের দিন মুশরিকদের এসব মাবুদরা নিজেরাই তাদের শিরকের প্রতিবাদ করবে।

৩৬. অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী, তোমরা তাঁকে আল্লাহ বলে মেনে না নিলে তাঁর সার্বভৌম ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব চলবে না এবং তোমরা তাঁর ইবাদাত ও বন্দেগী না করলে তাঁর কোন ক্ষতি হয়ে যাবে, এ ভুল ধারণা পোষণ করো না। আসল ব্যাপার হচ্ছে, তোমরা তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি যদি তোমাদের জীবিত না রাখেন এবং যেসব উপকরণের সহায়তায় তোমরা দুনিয়ায় বেঁচে থাকো এবং কাজ করতে পারো সেগুলো তোমাদের জন্য সরবরাহ না করেন, তাহলে তোমাদের জীবন এক মুহূর্তের জন্যও টিকে থাকতে পারে না। কাজেই তাঁর আনুগত্য ও ইবাদাতের পথ অবলম্বন করার জন্য তোমাদেরকে যে তাকীদ দেয়া হয় তা এ জন্য নয় যে, আল্লাহর এর প্রয়োজন আছে বরং এ জন্য যে, এরি ওপর নির্ভর করে তোমাদের দুনিয়ার ও আখেরাতের সাফল্য। এমনটি না করলে তোমরা নিজেদেরই সবকিছুর সর্বনাশ করে ফেলবে, আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

৩৭. মূলে বলা হয়েছে "গনী" ও হামীদ" "গনী" মানে হচ্ছে, তিনি সবকিছুর মালিক, প্রত্যেকটি জিনিসের অভাবমুক্ত ও অমুখাপেক্ষী। তিনি কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন। আর "হামীদ" মানে হচ্ছে, তিনি নিজে নিজেই প্রশংসিত, কেউ তাঁর প্রশংসা (শোকর ও প্রশংসা) করুক বা না করুক প্রশংসা লাভ করার অধিকার একমাত্র তাঁরই আছে। এ দু'টি গুণকে একসাথে বর্ণনা করার কারণ হচ্ছে এই যে, নিছক 'গনী' তো এমন ব্যক্তিও হতে পারে যে নিজের ধনাঢ্যতা দ্বারা কারো সাহায্য বা উপকার করে না। এ অবস্থায় সে গনী অবশ্যই হবে কিন্তু হামীদ বা প্রশংসিত হবে না। 'হামীদ' সে হতে পারে এমন অবস্থায় যখন সে কারো সাহায্যে নিজে লাভবান হবে না কিন্তু নিজের ধন-সম্পদ থেকে অন্যদেরকে সব ধরনের সহায়তা দান করবে। আল্লাহ যেহেতু এ দু'টি গুনের পূর্ণ আধার তাই বলা হয়েছে, তিনি নিছক 'গনী' নন বরং এমন 'গনী' যিনি সব রকমের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা লাভের অধিকারী। কারণ তিনি তোমাদের এবং বিশ্ব-জাহানের যাবতীয় জড় ও জীবের প্রয়োজন পূর্ণ করেন।

৩৮. অর্থাৎ তোমরা নিজেদের শক্তিতে এ পৃথিবীর বুকে বিচরণ করছো না। তোমাদেরকে এখান থেকে বিদায় দেবার এবং তার জায়গায় অন্য কোন জাতিকে এনে

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾
وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿٢١﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ
إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۖ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾

অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়, না অন্ধকার ও আলো সমান পর্যায়ভুক্ত, না শীতল ছায়া ও রোদের তাপ একই পর্যায়ের এবং না জীবিত ও মৃতরা সমান।[৪২] আল্লাহ যাকে চান শুনান কিন্তু (হে নবী!) তুমি তাদেরকে শুনাতে পারো না যারা কবরে শায়িত রয়েছে।[৪৩]

বসাবার জন্য তাঁর একটি ইশারাই যথেষ্ট। কাজেই নিজের মর্যাদা অনুধাবন করো এবং এমন নীতি অবলম্বন করো না যার ফলে শেষ পর্যন্ত জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন কারো ধ্বংসের ফায়সালা এসে যায় তখন সমগ্র বিশ্ব-জাহানে এমন কোন শক্তি নেই যে তাঁর হাত টেনে ধরতে পারে এবং এ ফায়সালা কার্যকর হবার পথ রোধ করতে সক্ষম হয়।

৩৯. "বোঝা" মানে কৃতকর্মের দায়-দায়িত্বের বোঝা। এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর কাছে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই তার কাজের জন্য দায়ী এবং প্রত্যেকের ওপর কেবলমাত্র তার নিজের কাজের দায়-দায়িত্ব আরোপিত হয়। এক ব্যক্তির কাজের দায়-দায়িত্বের বোঝা আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্য ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার কোন সম্ভাবনা নেই। কোন ব্যক্তি অন্যের দায়—দায়িত্বের বোঝা নিজের ওপর চাপিয়ে নেবে এবং তাকে বাঁচাবার জন্য তার অপরাধে নিজেকে পাকড়াও করাবে—এরও কোন সম্ভাবনা নেই। একথা এখানে বলার কারণ হচ্ছে এই যে, মক্কা মু'আযযমায় যারা ইসলাম গ্রহণ করছিল তাদেরকে তাদের মুশরিক আত্মীয় স্বজন ও গোত্রের লোকেরা বলছিল, আমাদের কথায় তোমরা এই নতুন ধর্ম ত্যাগ করো এবং নিজেদের বাপ-দাদার ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যাও, এ জন্য পাপপুণ্যের বোঝা আমরা বহন করবো।

৪০. ওপরের বাক্যে আল্লাহর ন্যায়নীতির বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি একজনের পাপে অন্যকে পাকড়াও করবেন না। বরং প্রত্যেককে তার নিজের পাপের জন্য দায়ী করবেন। আর এখানে এ বাক্যে বলা হয়েছে, আজ যারা বলছে, তোমরা আমাদের দায়িত্বে কুফরী ও গোনাহের কাজ করে যাও কিয়ামতের দিন তোমাদের গোনাহর বোঝা আমরা নিজেদের ঘাড়ে নিয়ে নেবো তারা আসলে নিছক একটি মিথ্যা ভরসা দিচ্ছে। যখন কিয়ামত আসবে এবং লোকেরা দেখে নেবে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য তারা কোন্ ধরনের পরিণামের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে তখন প্রত্যেকে নিজেকে বাঁচাবার ফিকিরে লেগে যাবে। ভাই ভাইয়ের থেকে এবং পিতা পুত্রের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। কেউ কারো সামান্যতম বোঝা নিজের ওপর চাপিয়ে নিতে প্রস্তুত হবে না।

إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِنْ
مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾
ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾

তুমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র।[৪৪] আমি তোমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী বানিয়ে। আর এমন কোন সম্প্রদায় অতিক্রান্ত হয়নি যার মধ্যে কোন সতর্ককারী আসেনি।[৪৫] এখন এরা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে থাকে তাহলে এদের পূর্বে অতিক্রান্ত লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল। তাদের কাছে এসেছিল তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি[৪৬] সহীফা ও দীপ্তোজ্জ্বল হিদায়াত দানকারী কিতাব[৪৭] নিয়ে। তারপর যারা মানেনি তাদেরকে আমি পাকড়াও করেছি এবং দেখে নাও আমার শাস্তি ছিল কেমন কঠোর।

৪১. অন্য কথায় হঠকারী ও গোঁয়ারদের ওপর তোমার সতর্কবাণী কার্যকর হতে পারে না। তুমি বুঝালে এমন সব লোক সত্য–সঠিক পথে আসতে পারে যাদের দিলে আল্লাহর ভয় আছে এবং যারা নিজের প্রকৃত মালিকের সামনে মাথা নোয়াতে প্রস্তুত।

৪২. এ উপমাগুলোতে মু'মিন ও কাফেরের বর্তমান ও ভবিষ্যতের পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। এক ব্যক্তি প্রকৃত সত্য থেকে চোখ বন্ধ করে আছে। সে একবারও দেখছে না বিশ্ব–জাহানের সমগ্র ব্যবস্থা এবং এমনকি তার নিজের অস্তিত্ব কোন্ সত্যের প্রতি ইংগিত করছে। অন্যদিকে আর এক ব্যক্তির চোখ খোলা আছে। সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, তার ভেতরের ও বাইরের প্রত্যেকটি জিনিস আল্লাহর একত্ব এবং তাঁর সামনে মানুষের জবাবদিহির ওপর সাক্ষ দিচ্ছে। একদিকে এক ব্যক্তি জাহেলী কল্পনা ও ভাববাদ এবং ধারণা, আন্দাজ–অনুমানের অন্ধকারে হাতড়ে মরছে এবং নবীর জ্বালানো প্রদীপের কাছাকাছি ঘেঁসতেও রাজি নয়। অন্যদিকে অপর ব্যক্তির চোখ একদম খোলা। নবীর জ্বালানো আলোর সামনে আসতেই তার কাছে একথা একেবারেই পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মুশরিক, কাফের ও নাস্তিক্যবাদীরা যেসব পথে চলছে সেগুলো ধ্বংসের দিকে চলে গেছে এবং সাফল্য ও মুক্তির পথ একমাত্র সেটিই যেটি আল্লাহ ও তাঁর রসূল দেখিয়েছেন। এখন দুনিয়ায় এদের দু'জনের নীতি এক হবে এবং দু'জনে এক সাথে একই পথে চলতে পারবে, এটা কেমন করে সম্ভব? দু'জনের পরিণতি এক হবে, দু'জনই মরে খতম হয়ে যাবে, একজন তার কুপথগামিতার শাস্তি পাবে না এবং অন্যজন সৎপথে চলার জন্য কোন পুরস্কার পাবে না, এটাই বা কেমন করে সম্ভব? "শীতল ছায়া ও রোদের তাপ সমান নয়"—এর মধ্যে এ পরিণতির দিকেই ইংগিত করা হয়েছে যে, একজন আল্লাহর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় লাভকারী এবং অন্যজন জাহান্নামের উত্তাপে ঝলসানো ব্যক্তি। তোমরা কোন্

উদ্ভট চিন্তায় মেতে আছো, এরা দু'জনা কি একই পরিণাম ভোগ করবে? শেষে মু'মিনকে জীবিতের সাথে এবং হঠকারী কাফেরদেরকে মৃতদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মু'মিন হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার মধ্যে অনুভূতি, উপলব্ধি, বিবেচনা, জ্ঞান, বুঝ ও চেতনা আছে এবং তার বিবেক তাকে ভালো ও মন্দের মধ্যকার পার্থক্য থেকে সবসময় সজাগ করছে। এর বিপরীত যে ব্যক্তি কুফরীর অন্ধতায় পুরোপুরি ডুবে গেছে তার অবস্থা এমন অন্ধের চেয়েও খারাপ যে অন্ধকারে পথ হারিয়েছে। তার অবস্থা এমন মৃতের মতো যার মধ্যে কোন অনুভূতিই নেই।

৪৩. অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছার ব্যাপার তো ভিন্ন। তিনি চাইলে পাথরকেও শ্রবণশক্তি দান করেন। কিন্তু যাদের বক্ষদেশে বিবেকের কবর রচিত হয়েছে তাদের হৃদয়ে নিজের কথা বদ্ধমূল করে দিতে পারা এবং যারা কথা শুনতেই চায় না তাদের বধির কর্ণকূহরে সত্যের ধ্বনি পৌঁছিয়ে দেয়ার সাধ্য রসূলের নেই। তিনি তো কেবলমাত্র তাদেরকেই শুনাতে পারেন যারা যুক্তিসংগত কথা শুনতে চায়।

৪৪. অর্থাৎ লোকদেরকে সতর্ক করে দেবার চেয়ে বেশী আর কোন দায়িত্ব তোমার নেই। এরপর যদি কেউ সচেতন না হয় এবং নিজের গোমরাহীর মধ্যে ছুটে চলতে থাকে তাহলে এর কোন দায়-দায়িত্ব তোমার ওপর নেই। অন্ধদের দেখাবার এবং বধিরদের শুনাবার দায়িত্ব তোমার ওপর সোপর্দ করা হয়নি।

৪৫. একথাটি কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, দুনিয়ায় এমন কোন জাতি ও সম্প্রদায় অতিক্রান্ত হয়নি যাকে সত্য-সঠিক পথের সন্ধান দেবার জন্য আল্লাহ কোন নবী পাঠাননি। সূরা রা'আদে বলা হয়েছে ঃ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (ايت : ٧)

সূরা হিজ্‌রে বলা হয়েছে ঃ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ (ايت : ١٠)

সূরা নাহ্‌লে বলা হয়েছে ঃ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً (ايت : ٣٦)

সূরা শূ'আরায় বলা হয়েছে ঃ وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلاَّ لَهَا مُنْذِرُوْنَ (ايت : ٢٠٨)

কিন্তু এ প্রসংগে দু'টি কথা অনুধাবন করতে হবে। তাহলে আর ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ থাকবে না। প্রথমত হচ্ছে, একজন নবীর প্রচারণা যতদূর পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে ততদূর পর্যন্ত তিনিই যথেষ্ট। প্রত্যেকটি জনপদে ও প্রত্যেকটি জাতির মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে নবী পাঠানো মোটেই জরুরী নয়। দ্বিতীয়ত, একজন নবীর দাওয়াত ও হিদায়াতের প্রভাব এবং তাঁর নেতৃত্বের পদাংক যতদিন পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত অন্য কোন নতুন নবীর প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক বংশ ও প্রত্যেক প্রজন্মের (Generation) জন্য আলাদা নবী পাঠানো অপরিহার্য নয়।

৪৬. অর্থাৎ এমন প্রমাণপত্র যা পরিষ্কারভাবে একথার সাক্ষ দিচ্ছিল যে, তাঁরা আল্লাহর রসূল।

৪৭. সহীফা ও কিতাবের মধ্যে সম্ভবত একটি বড় পার্থক্য থেকে থাকবে। সেটি হচ্ছে এই যে, সহীফা প্রধানত ছিল উপদেশাবলী ও নৈতিক পথ নির্দেশনার সমষ্টি। অন্যদিকে কিতাবে বিধৃত থাকতো একটি পূর্ণাঙ্গ শরীয়াত ব্যবস্থা।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا
أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَ
غَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ
كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

৪ রুকূ'

তুমি কি দেখো না আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তারপর তার মাধ্যমে আমি নানা ধরনের বিচিত্র বর্ণের ফল বের করে আনি? পাহাড়ের মধ্যেও রয়েছে বিচিত্র বর্ণের—সাদা, লাল ও নিকষকালো রেখা। আর এভাবে মানুষ, জীব-জানোয়ার ও গৃহপালিত জন্তুও বিভিন্ন বর্ণের রয়েছে।[৪৮] আসল ব্যাপার হচ্ছে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একমাত্র জ্ঞান সম্পন্নরাই তাঁকে ভয় করে।[৪৯] নিসন্দেহে আল্লাহ পরাক্রমশালী এবং ক্ষমাশীল।[৫০]

৪৮. এ দ্বারা যে কথা বুঝাতে চাওয়া হয়েছে তা এই আল্লাহর সৃষ্ট এ বিশ্ব-জাহানে কোথাও একঘেয়েমি ও বৈচিত্রহীনতা নেই। সর্বত্রই বৈচিত্র বৈচিত্র। একই মাটি ও একই পানি থেকে বিভিন্ন প্রকার গাছ উৎপন্ন হচ্ছে। একই গাছের দু'টি ফলেরও বর্ণ, দৈহিক কাঠামো ও স্বাদ এক নয়। একই পাহাড়ের দিকে তাকালে তার মধ্যে দেখা যাবে নানা রঙের বাহার। তার বিভিন্ন অংশের বস্তুগত গঠনপ্রণালীতে বিরাট পার্থক্য পাওয়া যাবে। মানুষ ও পশুদের মধ্যে একই মা-বাপের দু'টি সন্তানও একই রকম পাওয়া যাবে না। এ বিশ্ব-জাহানে যদি কেউ মেজাজ, প্রকৃতি ও মানসিকতার একাত্মতা সন্ধান করে এবং বিভিন্নতা, বিচিত্রতা ও বৈষম্য দেখে আতংকিত হয়ে পড়ে, যেদিকে ওপরের ১৯ থেকে ২২ আয়াতে ইশারা করা হয়েছে, তাহলে এটা হবে তার নিজের বোধশক্তি ও উপলব্ধির ত্রুটি। এই বৈচিত্র ও বিরোধই জানিয়ে দিচ্ছে, এ বিশ্ব-জাহানকে কোন মহাপরাক্রমশালী জ্ঞানী সত্তা বহুবিধ জ্ঞান ও বিজ্ঞতা সহকারে সৃষ্টি করেছেন এবং এর নির্মাতা একজন নজীরবিহীন স্রষ্টা ও তুলনাবিহীন নির্মাণ কৌশলী। তিনি একই জিনিসের কেবল একটিমাত্র নমুনা নিয়ে বসে পড়েননি। বরং তাঁর কাছে প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য একের পর এক এবং অসংখ্য ও সীমাহীন ডিজাইন রয়েছে। তারপর বিশেষ করে মানবিক প্রকৃতি ও বুদ্ধি বৈচিত্র সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে যে কোন ব্যক্তি একথা বুঝতে পারে যে, এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয় বরং প্রকৃতপক্ষে অতুলনীয় সৃষ্টি জ্ঞানের নিদর্শন। যদি জন্মগতভাবে সমস্ত মানুষকে তাদের নিজেদের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট, প্রবৃত্তি, কামনা, আবেগ-অনুভূতি, ঝোঁকপ্রবণতা ও চিন্তাধারার দিক দিয়ে এক করে দেয়া হতো এবং কোনপ্রকার বৈষম্য-বিভিন্নতার কোন অবকাশই না রাখা হতো, তাহলে দুনিয়ায় মানুষের

মতো একটি নতুন ধরনের সৃষ্টি তৈরি করাই হতো পুরোপুরি অর্থহীন। স্রষ্টা যখন এ পৃথিবীতে একটি দায়িত্বশীল ও স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করার ফায়সালা করেছেন তখন তার কাঠামোর মধ্যে সব রকমের বিচিত্রতা ও বিভিন্নতার অবকাশ রাখা ছিল সে ফায়সালার ধরনের অনিবার্য দাবী। মানুষ যে কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার ফল নয় বরং একটা মহান বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার ফলশ্রুতি, এ জিনিসটি এর সবচেয়ে বড় সাক্ষ প্রদান করে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই অনিবার্যভাবে তার পেছনে পাওয়া যাবে এক বিজ্ঞানময় সত্তার সক্রিয় সংযোগ। বিজ্ঞানী ছাড়া বিজ্ঞানের অস্তিত্ব কেবলমাত্র একজন নির্বোধই কল্পনা করতে পারে।

৪৯. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর গুণাবলীর ব্যাপারে যতবেশী অজ্ঞ হবে সে তাঁর ব্যাপারে তত বেশী নির্ভীক হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর শক্তিমত্তা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞানময়তা, ক্রোধ, পরাক্রম, সার্বভৌম কর্তৃত্ব–ক্ষমতা ও অন্যান্য গুণাবলী সম্পর্কে যে ব্যক্তি যতবেশী জানবে সে ততবেশী তাঁর নাফরমানী করতে ভয় পাবে। কাজেই আসলে এ আয়াতে জ্ঞান অর্থ দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অংক ইত্যাদি স্কুল–কলেজে পঠিত বিষয়ের জ্ঞান নয়। বরং এখানে জ্ঞান বলতে আল্লাহর গুণাবলীর জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। এ জন্য শিক্ষিত ও অশিক্ষিত হবার প্রশ্ন নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না সে যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হলেও এ জ্ঞানের দৃষ্টিতে সে নিছক একজন মূর্খ ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর গুণাবলী জানে এবং নিজের অন্তরে তাঁর ভীতি পোষণ করে সে অশিক্ষিত হলেও জ্ঞানী। এ প্রসংগে একথাও জেনে রাখা উচিত যে, এ আয়াতে উল্লেখিত "উলামা" শব্দটির অর্থ এমন পারিভাষিক উলামাও নয় যারা কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ ও ইল্‌মে কালামে জ্ঞান রাখার কারণে দীনী আলেম বলে পরিচিত। তারা ঠিক তখনই এ আয়াতটির প্রয়োগ ক্ষেত্রে পরিণত হবে যখন তাদের মধ্যে আল্লাহভীতি থাকবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) একথাই বলেছেন ঃ

ليس العلم عن كثرة الحديث ولكن العلم عن كثرة الخشية

"বিপুল সংখ্যক হাদীস জানা জ্ঞানের পরিচায়ক নয় বরং বেশী পরিমাণ আল্লাহভীতিই জ্ঞানের পরিচয় বহন করে।"

হযরত হাসান বাসরীও একথাই বলেছেন ঃ

العالم من خشى الرحمن بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه وزهد فيما سخط الله فيه –

"আল্লাহকে না দেখে যে ভয় করে সেই হচ্ছে আলেম। আল্লাহ যা কিছু পছন্দ করেন সেদিকেই আকৃষ্ট হয় এবং যে বিষয়ে আল্লাহ নারাজ সে ব্যাপারে সে কোন আগ্রহ পোষণ করে না।"

৫০. অর্থাৎ তিনি এমন পরাক্রমশালী যে, নাফরমানদের যখনই চান পাকড়াও করতে পারেন। তাঁর পাকড়াও মুক্ত হবার ক্ষমতা কারো নেই। কিন্তু তাঁর ক্ষমাগুণের ফলেই জালেমরা অবকাশ পেয়ে চলছে।

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ
وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ
لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾

যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, নিসন্দেহে তারা এমন একটি ব্যবসায়ের প্রত্যাশী যাতে কোনক্রমেই ক্ষতি হবে না। (এ ব্যবসায়ে তাদের নিজেদের সবকিছু নিয়োগ করার কারণ হচ্ছে এই যে) যাতে তাদের প্রতিদান পুরোপুরি আল্লাহ তাদেরকে দিয়ে দেন এবং নিজের অনুগ্রহ থেকে আরো বেশী করে তাদেরকে দান করবেন।[৫১] নিসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও গুণগ্রাহী।[৫২] (হে নবী!) আমি তোমার কাছে অহীর মাধ্যমে যে কিতাব পাঠিয়েছি সেটিই সত্য, সত্যায়িত করে এসেছে তার পূর্বে আগত কিতাবগুলোকে।[৫৩] অবশ্যই আল্লাহ নিজের বান্দাদের অবস্থা অবগত আছেন এবং সব জিনিসের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।[৫৪]

৫১. ঈমানদারদের এ কাজকে ব্যবসায়ের সাথে তুলনা করা হচ্ছে। কারণ মানুষ ব্যবসায়ে নিজের অর্থ, শ্রম ও মেধা নিয়োগ করে কেবলমাত্র আসল ফেরত পাবার এবং শ্রমের পারিশ্রমিক লাভ করার জন্য নয় বরং বাড়তি কিছু মুনাফা অর্জন করার জন্য। অনুরূপভাবে একজন মু'মিনও আল্লাহর হুকুম পালন, তাঁর ইবাদাত-বন্দেগী এবং তাঁর দীনের জন্য সংগ্রাম-সাধনায় নিজের ধন, সময়, শ্রম ও যোগ্যতা নিয়োগ করে শুধুমাত্র এসবের পুরোপুরি প্রতিদান লাভ করার জন্য নয় বরং এই সংগে আল্লাহ তাঁর নিজ অনুগ্রহে বাড়তি অনেক কিছু দান করবেন এই আশায়। কিন্তু উভয় ব্যবসায়ের মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ পার্থিব ব্যবসায়ে নিছক মুনাফালাভেরই আশা থাকে না, লোকসান এবং দেউলিয়া হয়ে যাবার আশংকাও থাকে। কিন্তু একজন আন্তরিকতা সম্পন্ন বান্দা আল্লাহর সাথে যে ব্যবসায় করে তাতে লোকসান ও ক্ষতির কোন আশংকাই নেই।

৫২. অর্থাৎ নিজের আন্তরিকতা সম্পন্ন মু'মিনদের সাথে আল্লাহ এমন সংকীর্ণমনা প্রভুর মতো ব্যবহার করেন না, যে কথায় কথায় পাকড়াও করে এবং সামান্য একটি ভুলের দরুন নিজের কর্মচারীর সমস্ত সেবা ও বিশ্বস্ততা অস্বীকার করে। তিনি মহানুভব দানশীল প্রভু। তাঁর বিশ্বস্ত বান্দার ভুল-ভ্রান্তি তিনি উপেক্ষা করে যান এবং তার পক্ষে যা কিছু সেবা করা সম্ভব হয়েছে তাকে যথার্থ মূল্য দান করেন।

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرٰتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٣٢﴾

তারপর আমি এমন লোকদেরকে এ কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি যাদেরকে আমি (এ উত্তরাধিকারের জন্য) নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়েছি।[৫৫] এখন তাদের মধ্য থেকে কেউ নিজের প্রতি জুলুমকারী, কেউ মধ্যপন্থী এবং কেউ আল্লাহর হুকুমে সৎকাজে অগ্রবর্তী, এটিই অনেক বড় অনুগ্রহ।[৫৬]

৫৩. এর অর্থ হচ্ছে, পূর্বে আগত নবীগণ যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তিনি তার বিরোধী কোন নতুন কথা বলছেন না। বরং সকল নবী চিরকাল যে আদি ও চিরন্তন সত্য পেশ করে গেছেন তিনি তারই পুনরাবৃত্তি করছেন।

৫৪. বান্দার কল্যাণ কোন্ জিনিসের মধ্যে রয়েছে, তার নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শনের উপযোগী নীতি কি এবং তার প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ নীতি–নিয়ম কি কি—এ সত্যগুলো সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়াই হচ্ছে এখানে আল্লাহর এ গুণাবলী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য। এ বিষয়গুলো আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না। কারণ বান্দার প্রকৃতি ও চাহিদা একমাত্র তিনিই জানেন এবং তার প্রকৃত প্রয়োজন ও কল্যাণের প্রতি একমাত্র তিনিই দৃষ্টি রাখেন। বান্দা নিজেকে তত বেশী জানে না যত বেশী তার স্রষ্টা তাকে জানেন। তাই সত্য সেটিই এবং একমাত্র সেটিই হতে পারে যা তিনি অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন।

৫৫. অর্থাৎ মুসলমানদেরকে। সমগ্র মানবজাতি থেকে ছাঁটাই বাছাই করে তাদেরকে বের করা হয়েছে। এভাবে তারা হবে আল্লাহর কিতাবের উত্তরাধিকারী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে এ কিতাব নিয়ে তারা অগ্রসর হবে। যদিও কিতাব পেশ করা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির সামনে কিন্তু যারা এগিয়ে এসে তা গ্রহণ করে নিয়েছে তাদেরকে এ মর্যাদা ও গৌরবের জন্য নির্বাচিত করে নেয়া হয়েছে যে, তারাই হবে কুরআনের ন্যায় মহিমান্বিত কিতাবের ওয়ারিস এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ন্যায় মহান রসূলের শিক্ষা ও হিদায়াতের বিশ্বস্ত সংরক্ষক।

৫৬. অর্থাৎ এ মুসলমানরা সবাই একরকম নয়। বরং এরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেছে ঃ

এক ঃ নিজেদের প্রতি জুলুমকারী। এরা হচ্ছে এমনসব লোক যারা আন্তরিকতা সহকারে কুরআনকে আল্লাহর কিতাব এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর রসূল বলে মানে কিন্তু কার্যত আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের অনুসরণের হক আদায় করে না। এরা মু'মিন কিন্তু গোনাহগার। অপরাধী কিন্তু বিদ্রোহী নয়। দুর্বল

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۚ
وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا
الْحَزَنَ ۭ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُ ۙ ﴿٣٤﴾ الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ
مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ﴿٣٥﴾

চিরস্থায়ী জান্নাতে তারা প্রবেশ করবে।[৫৭] সেখানে তাদেরকে সোনার কংকন ও মুক্তা দিয়ে সাজানো হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের এবং তারা বলবে ঃ আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদের দুঃখ মোচন করেছেন।[৫৮] অবশ্যই আমাদের রব ক্ষমাশীল ও গুণের সমাদরকারী,[৫৯] যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাসস্থল দিয়েছেন।[৬০] এখন এখানে আমাদের না কোন কষ্ট হয় এবং না আসে কোন ক্লান্তি।[৬১]

ঈমানদার, তবে মুনাফিক এবং চিন্তা ও মননের দিক দিয়ে কাফের নয়। তাই এদেরকে আত্মনিপীড়ক হওয়া সত্ত্বেও কিতাবের ওয়ারিসদের অন্তরভুক্ত এবং আল্লাহর নির্বাচিত বান্দাদের মধ্যে শামিল করা হয়েছে। নয়তো একথা সুস্পষ্ট, বিদ্রোহী, মুনাফিক এবং চিন্তা ও মননের দিক দিয়ে কাফেরদের প্রতি এ গুণাবলী আরোপিত হতে পারে না। তিন শ্রেণীর মধ্য থেকে এ শ্রেণীর ঈমানদারদের কথা সবার আগে বলার কারণ হচ্ছে এই যে, উম্মাতের মধ্যে এদের সংখ্যাই বেশী।

দুই ঃ মাঝামাঝি অবস্থানকারী। এরা হচ্ছে এমন লোক যারা এ উত্তরাধিকারের হক কমবেশী আদায় করে কিন্তু পুরোপুরি করে না। হুকুম পালন করে এবং অমান্যও করে। নিজেদের প্রবৃত্তিকে পুরোপুরি লাগামহীন করে ছেড়ে দেয়নি বরং তাকে আল্লাহর অনুগত করার জন্য নিজেদের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু কখনো তার বাগডোর ঢিলে করে দেয় এবং গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এভাবে এদের জীবনে ভালো ও মন্দ উভয় ধরনের কাজের সমাবেশ ঘটে। এরা সংখ্যায় প্রথম দলের চেয়ে কম এবং তৃতীয় দলের চেয়ে বেশী হয়। তাই এদেরকে দু' নম্বরে রাখা হয়েছে।

তিন ঃ ভালো কাজে যারা অগ্রবর্তী। এরা হয় কিতাবের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রথম সারির লোক। এরাই আসলে এ উত্তরাধিকারের হক আদায়কারী। কুরআন ও সুন্নাতের অনুসরণের ক্ষেত্রেও এরা অগ্রগামী। আল্লাহর পয়গাম তাঁর বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার ক্ষেত্রেও এরাই এগিয়ে থাকে। সত্যদীনের জন্য ত্যাগ স্বীকারেও এরাই এগিয়ে যায়। তাছাড়া সত্য, ন্যায়, সুকৃতি ও কল্যাণের যে কোন কাজেও এরাই হয় অগ্রবর্তী। এরা জেনে বুঝে গোনাহ করে না। আর অজান্তে কোন গোনাহর কাজ অনুষ্ঠিত হলেও সে সম্পর্কে জানার সাথে সাথেই এদের মাথা লজ্জায় নত হয়ে যায়। প্রথম দু'টি দলের তুলনায়

উম্মাতের মধ্যে এদের সংখ্যা কম। তাই এদের কথা সবার শেষে বলা হয়েছে, যদিও উত্তরাধিকারের হক আদায় করার ক্ষেত্রে এরাই অগ্রগামী।

"এটিই অনেক বড় অনুগ্রহ" বাক্যটির সম্পর্ক যদি নিকটতম বাক্যের সাথে ধরে নেয়া হয় তাহলে এর অর্থ হবে, ভালো কাজে অগ্রগামী হওয়াই হচ্ছে বড় অনুগ্রহ এবং যারা এমনটি করে মুসলিম উম্মাতের মধ্যে তারাই সবার সেরা। আর এ বাক্যটির সম্পর্ক পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে করা হলে এর অর্থ হবে, আল্লাহর কিতাবের উত্তরাধিকারী হওয়া এবং এ উত্তরাধিকারের জন্য নির্বাচিত হওয়াই বড় অনুগ্রহ এবং আল্লাহর সকল বান্দাদের মধ্যে সেই বান্দাই সর্বশ্রেষ্ঠ যে কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনে এ নির্বাচনে সফলকাম হয়েছে।

৫৭. মুফাস্‌সিরগণের একটি দলের মতে এ বাক্যের সম্পর্ক নিকটবর্তী দু'টি বাক্যের সাথেই রয়েছে। অর্থাৎ সৎকাজে অগ্রগামীরাই বড় অনুগ্রহের অধিকারী এবং তারাই এ জান্নাতগুলোতে প্রবেশ করবে। অন্যদিকে প্রথম দু'টি দলের ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করা হয়েছে, যাতে তারা নিজেদের পরিণামের কথা চিন্তা করে এবং নিজেদের বর্তমান অবস্থা থেকে বের হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে। আল্লামা যামাখ্‌শারী এ অভিমতটি বলিষ্ঠভাবে বিবৃত করেছেন এবং ইমাম রাযী একে সমর্থন দিয়েছেন।

কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্‌সির বলেন, ওপরের সমগ্র আলোচনার সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। আর এর অর্থ হচ্ছে, এ তিনটি দলই শেষ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে, কোনপ্রকার হিসেব-নিকেশ ছাড়াই বা হিসেব নিকেশের পর এবং সব রকমের জবাবদিহি থেকে সংরক্ষিত থেকে অথবা কোন শাস্তি পাওয়ার পর যে কোন অবস্থাতেই হোক না কেন। কুরআনের পূর্বাপর আলোচনা এ ব্যাখ্যার প্রতি সমর্থন দিচ্ছে। কারণ সামনের দিকে কিতাবের উত্তরাধিকারীদের মোকাবিলায় অন্যান্য দল সম্পর্কে বলা হচ্ছে, "আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন।" এ থেকে জানা যায়, যারা এ কিতাবকে মেনে নিয়েছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত এবং যারা এর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসও এর প্রতি সমর্থন জানায়। হযরত আবুদ দারদা এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং একে উদ্ধৃত করেছেন ইমাম আহমাদ, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, তাবারানী, বায়হাকী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ। হাদীসে নবী করীম (সা) বলছেন ঃ

فاما الذين سبقوا فاولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ، واما الذين اقتصدوا فاولئك الذين يحاسبون حسابا يسيرا ، واما الذين ظلموا انفسهم فاولئك يحبسون طول المحشر ثم هم الذين تتلقاهم اللّه برحمته فهم الذين يقولون الحمد لله الذى اذهب عنا الحزن -

"যারা সৎকাজে এগিয়ে গেছে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে কোনরকম হিসেব-নিকেশ ছাড়াই। আর যারা মাঝপথে থাকবে তাদের হিসেব-নিকেশ হবে, তবে তা হবে হালকা। অন্যদিকে যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে তাদেরকে হাশরের দীর্ঘকালীন সময়ে আটকে রাখা হবে, তারপর তাদেরকে আল্লাহর রহমতের মধ্যে নিয়ে নেয়া হবে এবং এরাই হবে এমনসব লোক যারা বলবে, সেই আল্লাহর শোকর যিনি আমাদের থেকে দুঃখ দূর করে দিয়েছেন।"

এ হাদীসে নবী করীম (সা) নিজেই এ আয়াতটির পুরোপুরি ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। এখানে ঈমানদারদের তিনটি শ্রেণীর পরিণাম আলাদা আলাদাভাবে তুলে ধরেছেন। মাঝখানে অবস্থানকারীদের "হাল্কা জবাবদিহির" সম্মুখীন হবার অর্থ হচ্ছে, কাফেরদেরকে তো তাদের কুফরীর শাস্তি ছাড়াও তাদের প্রত্যেকটি অপরাধ ও গোনাহের পৃথক শাস্তিও দেয়া হবে। কিন্তু এর বিপরীতে ঈমানদারদের মধ্যে যারা ভালো ও মন্দ উভয় ধরনের কাজ নিয়ে হাজির হবে তাদের সৎ ও অসৎ কাজগুলোর সম্মিলিত হিসেব-নিকেশ হবে। প্রত্যেক সৎকাজের জন্য আলাদা পুরস্কার ও প্রত্যেক অসৎ কাজের জন্য আলাদা শাস্তি দেয়া হবে না। আর ঈমানদারদের মধ্য থেকে যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করবে তাদেরকে হাশরের সমগ্র সময়-কালে আটকে রাখা হবে—একথার অর্থ হচ্ছে এই যে, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে না বরং তাদেরকে আদালতের কার্যকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখার শাস্তি দেয়া হবে। অর্থাৎ হাশরের সমগ্র সময়-কাল (না জানি তা কত শত বছরের সমান দীর্ঘ হবে) তার পূর্ণ কঠোরতা সহকারে তাদের ওপর দিয়ে অতিক্রান্ত হবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করবেন এবং আদালতের কাজ শেষ হবার সময় হুকুম দেবেন, ঠিক আছে, এদেরকেও জান্নাতে দিয়ে দাও। এ বিষয়বস্তু সম্বলিত বিভিন্ন উক্তি মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সাহাবী যেমন, হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আয়েশা (রা), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) এবং হযরত বারা'আ ইবনে আজেব (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আর একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সাহাবীগণ এহেন ব্যাপারে কোন কথা ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে পারেন না। যতক্ষণ না তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামের মুখে তা শুনে থাকবেন।

কিন্তু এ থেকে একথা মনে করা উচিত নয় যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে "যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে" তাদেরকে কেবলমাত্র "আদালত সমাপ্তিকালীন" সময় পর্যন্ত আটকে রাখারই শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ জাহান্নামে যাবেই না। কুরআন ও হাদীসে বহুবিধ অপরাধের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এসব অপরাধকারীদের ঈমানও তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারবে না। যেমন যে মু'মিন কোন মু'মিনকে জেনে বুঝে হত্যা করে আল্লাহ নিজেই তার জন্য জাহান্নামের শাস্তি ঘোষণা করেছেন। অনুরূপভাবে উত্তরাধিকার আইনের আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা ভংগকারীদের জন্যও কুরআন মজীদে জাহান্নামের শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। সূদ হারাম হবার হুকুম জারী হবার পর যারা সূদ খাবে তাদের জন্য পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে, তারা আগুনের সাথি। এ ছাড়াও আরো কোন কোন কবীরাহ গোনাহকারীদের জন্যও হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, তারা জাহান্নামে যাবে।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۖ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ
عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ
يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ۚ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ
أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا
لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٣٧﴾

আর যারা কুফরী করেছে[৬২] তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। না তাদের অস্তিত্ব খতম করে দেয়া হবে যাতে তারা মরে যাবে এবং না তাদের জন্য জাহান্নামের আযাব কিছু কমানো হবে। এভাবে আমি প্রত্যেক কুফরীকারীকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। তারা সেখানে চিৎকার করে করে বলবে, "হে আমাদের রব! আমাদের এখান থেকে বের করে নাও, আমরা সৎকাজ করবো, আগে যে কাজ করতাম তা থেকে আলাদা।" (তাদেরকে জবাব দেয়া হবে এই বলে,) "আমি কি তোমাদের এতটুকু আয়ুষ্কাল দান করিনি যে সময়ে কেউ শিক্ষাগ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারতো?[৬৩] আর তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসে গিয়েছিল। এখন স্বাদ আস্বাদন করো, জালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।"

৫৮. সব ধরনের দুঃখ। দুনিয়ায় যেসব চিন্তা ও পেরেশানীতে আমরা লিপ্ত ছিলাম তার হাত থেকেও মুক্তি পাওয়া গেছে। কিয়ামতে নিজের পরিণাম সম্পর্কে যে দুশ্চিন্তা ছিল তাও খতম হয়ে যাবে এবং এখন সামনের দিকে অখণ্ড নিশ্চিন্ততা, সেখানে কোন প্রকার দুঃখ কষ্টের প্রশ্নই থাকে না।

৫৯. অর্থাৎ আমাদের অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং কর্মের যে সামান্যতম পুঁজি আমরা সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম তাকে বিপুল মর্যাদা ও মূল্যদান করে তার বিনিময়ে তাঁর জান্নাত আমাদের দান করেছেন।

৬০. অর্থাৎ দুনিয়া আমাদের আখেরাতের সফরের একটি মনযিল ছিল। এ মনযিলটি আমরা অতিক্রম করে চলে এসেছি। হাশরের ময়দানও এ সফরের একটি পর্যায় ছিল। এ পর্যায়ও আমরা পার হয়েছি। এখন আমরা এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছি যেখান থেকে বের হয়ে আর কোথাও যেতে হবে না।

৬১. অন্যকথায় আমাদের সমস্ত পরিশ্রম ও কষ্টের অবসান ঘটেছে। এখন এখানে আমাদের এমন কোন কাজ করতে হবে না যা করতে আমাদের পরিশ্রম করতে হবে এবং যা শেষ করে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়বো।

إِنَّ اللَّهَ عَٰلِمُ غَيْبِ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ﴿٣٨﴾ هُوَ الَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ فِى الْأَرْضِ ۚ فَمَن كَفَرَ
فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ
وَلَا يَزِيدُ الْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

৫ রুকূ'

নিসন্দেহে আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত গোপন বিষয় অবগত, তিনি তো অন্তরের গোপন রহস্যও জানেন। তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন।[৬৪] এখন যে কেউ কুফরী করবে তার কুফরীর দায়ভার তার ওপরই পড়বে[৬৫] এবং কাফেরদের কুফরী তাদেরকে এ ছাড়া আর কোন উন্নতি দান করে না যে, তাদের রবের ক্রোধ তাদের ওপর বেশী বেশী করে উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে এবং কাফেরদের জন্য ক্ষতিবৃদ্ধি ছাড়া আর কোন উন্নতি নেই।

৬২. অর্থাৎ আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যে কিতাব নাযিল করেছেন তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে।

৬৩. এখানে এমন প্রত্যেকটি আয়ুষ্কালের কথা বলা হয়েছে, যার মধ্যে মানুষ সত্য ও মিথ্যা এবং ভালো ও মন্দের মধ্যে ফারাক করতে চাইলে করতে পারে এবং গোমরাহী ত্যাগ করে হিদায়াতের পথে পাড়ি দিতে চাইলেও দিতে পারে। এ বয়সে পৌঁছে যাবার আগে যদি কোন ব্যক্তি মরে গিয়ে থাকে তাহলে এ আয়াতের দৃষ্টিতে তাকে কোনপ্রকার জবাবদিহি করতে হবে না। তবে যে ব্যক্তি এ বয়সে পৌঁছে গেছে তাকে অবশ্যই তার কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। আর তারপর এ বয়স শুরু হয়ে যাবার পর যতদিন সে বেঁচে থাকবে এবং সতর্কতার সাথে সহজ সরল পথে চলার জন্য যতই সুযোগ সে পেয়ে যেতে থাকবে ততই তার দায়িত্ব কঠিন হয়ে যেতে থাকবে। এমনকি যে ব্যক্তি বার্ধক্যে পৌঁছেও সোজা হবে না তার জন্য কোন ওজরই থাকবে না। একথাটিই একটি হাদীসে হযরত সাহ্‌ল ইবনে সা'দ সায়েদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ যে ব্যক্তি কম বয়স পাবে তার জন্য তো ওজরের সুযোগ থাকে কিন্তু ৬০ বছর এবং এর বেশী বয়সের অধিকারীদের জন্য কোন ওজর নেই। (বুখারী, আহমাদ, নাসায়ী, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম ইত্যাদি)

৬৪. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, পূর্ববর্তী প্রজন্ম ও জাতিদের অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁরপর এই পৃথিবীর বুকে তিনি তোমাদেরকে তাদের জায়গায় স্থাপন করেছেন। দুই, তিনি পৃথিবীতে তোমাদেরকে বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করার যে ক্ষমতা দিয়েছেন তা

قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ أَرُونِى
مَاذَا خَلَقُوا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ ۚ أَمْ ءَاتَيْنَٰهُمْ
كِتَٰبًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّٰلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا
إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ
وَلَئِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾

(হে নবী!) তাদেরকে বলো, "তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমাদের যেসব শরীককে ডাকো কখনো কি তোমরা তাদেরকে দেখেছো?[৬৬] আমাকে বলো, তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে? অথবা আকাশসমূহে তাদের কি শরীকানা আছে?" (যদি একথা বলতে না পারো তাহলে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো) তাদেরকে কি আমি কোন কিতাব লিখে দিয়েছি যার ভিত্তিতে তারা (নিজেদের এ শিরকের জন্য) কোন সুস্পষ্ট প্রমাণপত্র লাভ করেছে?[৬৭] না, বরং এ জালেমরা পরস্পরকে নিছক ধাপ্পা দিয়েই চলছে।[৬৮] আসলে আল্লাহই আকাশ ও পৃথিবীকে অটল ও অনড় রেখেছেন এবং যদি তারা টলটলায়মান হয় তাহলে আল্লাহর পরে দ্বিতীয় আর কেউ তাদেরকে স্থির রাখার ক্ষমতা রাখে না।[৬৯] নিসন্দেহে আল্লাহ বড়ই সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল।[৭০]

তোমাদের এ জিনিসগুলোর মালিক হবার কারণে নয় বরং মূল মালিকের প্রতিনিধি হিসেবে তোমাদের এগুলো ব্যবহার করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

৬৫. যদি পূর্বের বাক্যের এ অর্থ গ্রহণ করা হয় যে, তোমাদেরকে তিনি পূর্ববর্তী জাতিদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন তাহলে এ বাক্যটির অর্থ হবে, যারা অতীতের জাতি সমূহের পরিণাম থেকে কোন শিক্ষাগ্রহণ করেনি এবং যে কুফরীর বদৌলতে জাতিসমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে সেই একই কুফরী নীতি অবলম্বন করেছে তারা নিজেদের এ নির্বুদ্ধিতার ফল ভোগ করবেই। আর যদি এ বাক্যটির এ অর্থ গ্রহণ করা হয় যে, আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করেছেন তাহলে এ বাক্যের অর্থ হবে, যারা নিজেদের প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা ভুলে গিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে বসেছে অথবা যারা আসল মালিককে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী করেছে তারা নিজেদের এ বিদ্রোহাত্মক কর্মনীতির অশুভ পরিণাম ভোগ করবে।

৬৬. "তোমাদের শরীক" শব্দ ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা তো আসলে আল্লাহর শরীক নয়, মুশরিকরা নিজেরাই তাদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে রেখেছে।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى
مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ﴿٤٢﴾
اسْتِكْبَارًا فِى الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۭ وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ
اِلَّا بِاَهْلِهٖ ۭ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ
اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا ﴿٤٣﴾

তারা শক্ত কসম খেয়ে বলতো, যদি কোন সতর্ককারী তাদের কাছে আসতো তাহলে তারা দুনিয়ার প্রত্যেক জাতির তুলনায় বেশী সৎপথের অনুগামী হতো।[৭১] কিন্তু যখন সতর্ককারী তাদের কাছে এলো তখন তার আগমন তাদের মধ্যে সত্য থেকে পলায়ন ছাড়া আর কোন জিনিসের বৃদ্ধি ঘটায়নি। তারা পৃথিবীতে আরো বেশী অহংকার করতে থাকে এবং দুষ্ট চাল চালতে থাকে, অথচ দুষ্ট চাল তার উদ্যোক্তাদেরকেই ঘিরে ফেলে। এখন তারা কি পূর্বের জাতিদের সাথে আল্লাহ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তাদের সাথে অনুরূপ পদ্ধতিরই অপেক্ষা করছে?[৭২] যদি একথাই হয়ে থাকে তাহলে তুমি আল্লাহর পদ্ধতিতে কখ্খনো কোন পরিবর্তন পাবে না এবং কখ্খনো আল্লাহর বিধানকে তার নির্ধারিত পথ থেকে হটে যেতেও তুমি দেখবে না।

৬৭. অর্থাৎ আমার লেখা এমন কোন পরোয়ানা কি তাদের কাছে আছে যাতে আমি একথা লিখে দিয়েছি যে, অমুক অমুক ব্যক্তিকে আমি রোগ নিরাময় বা কর্মহীনদের কর্মসংস্থান অথবা অভাবীদের অভাব পূরণ করার ক্ষমতা দিয়েছি কিংবা অমুক অমুক ব্যক্তিকে আমি আমার ভূপৃষ্ঠের অমুক অংশের কর্তৃত্ব দান করেছি এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদের ভাগ্য ভাঙাগড়ার দায়িত্ব এখন তাদের হাতে কাজেই আমার বান্দাদের এখন তাদের কাছেই প্রার্থনা করা উচিত, তাদের কাছেই নজরানা ও মানত করা উচিত এবং যেসব নিয়ামতই তারা লাভ করে সে জন্য ঐ সব ছোট খোদাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। এ ধরনের কোন প্রমাণপত্র যদি তোমাদের কাছে থাকে তাহলে তা সামনে হাজির করো। আর যদি তা না থাকে তাহলে তোমরা নিজেরাই চিন্তা করো, এসব মুশরিকী আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মধারা তোমরা কিসের ভিত্তিতে উদ্ভাবন করেছো? তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, পৃথিবী ও আকাশে কোথাও তোমাদের এসব বানোয়াট উপাস্যদের আল্লাহর সাথে শরীক হবার কোন আলামত পাওয়া যায়? এর জবাবে তোমরা কোন আলামত চিহ্নিত করতে পারো না। তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, আল্লাহ কি

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ
فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾ وَلَوْ يُؤَاخِذُ
اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن
يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ
بَصِيرًا ﴿٤٥﴾

তারা কি পৃথিবীতে কখনো চলাফেরা করেনি, যার ফলে তারা তাদের পূর্বে যারা চলে গেছে এবং যারা তাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল তাদের পরিণাম দেখতে পেতো? আকাশ মণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করে দেবার মতো কোন জিনিস নেই। তিনি সবকিছু জানেন এবং সব জিনিসের ওপর ক্ষমতাশালী। যদি কখনো তিনি লোকদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন তাহলে পৃথিবীতে কোন প্রাণসত্তাকে জীবিত ছাড়তেন না কিন্তু একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তিনি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন। তারপর যখন তাদের সময় পূরা হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে দেখে নেবেন।

তাঁর কোন কিতাবে একথা বলেছেন অথবা তোমাদের কাছে বা ঐসব বানোয়াট উপাস্যদের কাছে আল্লাহর দেয়া এমন কোন পরোয়ানা আছে যা এ মর্মে সাক্ষ দেয় যে, তোমরা যেসব ক্ষমতা-ইখতিয়ার তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট করছো আল্লাহ নিজেই তাদেরকে সেগুলো দান করেছেন? তোমরা এটাও পেশ করতে পারো না। এখন যার ভিত্তিতে তোমরা এ আকিদা তৈরি করে নিয়েছো সেটি কি? তোমরা কি আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের মালিক, যার ফলে আল্লাহর ক্ষমতা ইখতিয়ার যাকে ইচ্ছা ভাগ বাটোয়ারা করে দিচ্ছো?

৬৮. অর্থাৎ এসব ধর্মীয় নেতা, পীর, পুরোহিত, গুরু, পণ্ডিত, মাশায়েখ ও দরগাহের খাদেম এবং এদের এজেন্টরা নিছক নিজেদের দোকানদারীর পসরা সাজিয়ে বসার জন্য জনসাধারণকে বোকা বানাচ্ছে এবং নানা গাল গল্প তৈরি করে লোকদেরকে মিথ্যা ভরসা দিয়ে চলছে যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে অমুক অমুক সত্তার শরণাপন্ন হলে তোমাদের দুনিয়ার সমস্ত কাজের সমাধা হয়ে যাবে এবং আখেরাতে তোমরা যতই গোনাহ নিয়ে হাজির হও না কেন তারা তা ক্ষমা করিয়ে নেবে।

৬৯. অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত রাখার কারণেই এ সীমাহীন বিশ্ব-জাহান প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কোন ফেরেশ্‌তা, জিন, নবী বা অলী একে ধরে রাখছে না। বিশ্ব-জাহানকে ধরে রাখা তো দূরের কথা এ অসহায় বান্দারা তো নিজেদেরকেই ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে না। প্রত্যেকেই নিজের জন্ম ও স্থায়িত্বের জন্য মহান সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন আল্লাহর মুখাপেক্ষী। তাদের মধ্য থেকে কারো সম্পর্কে একথা মনে করা যে, আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের গুণাবলী ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারে তার কিছুটা অংশ আছে, নিছক বোকামী ও প্রতারণার শিকার হওয়া ছাড়া আর কি হতে পারে?

৭০. অর্থাৎ আল্লাহর সমীপে এত বড় গোস্তাখী করা হচ্ছে এবং এরপরও তিনি শাস্তি দেবার ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ নিচ্ছেন না, এটা তাঁর নিছক সহনশীলতা ও ক্ষমাগুণের পরিচায়ক।

৭১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবের লোকেরা সাধারণভাবে এবং কুরাইশরা বিশেষভাবে ইহুদি ও খৃষ্টানদের বিকৃত নৈতিক অবস্থা দেখে একথা বলতো। তাদের এ উক্তি ইতিপূর্বে সূরা আল আন'আমেও (১৫৬-১৫৭ আয়াত) উল্লেখিত হয়েছে এবং সামনে সূরা সাফ্‌ফাতেও (১৬৭-১৬৯ আয়াত) আসছে।

৭২. অর্থাৎ আল্লাহর এ আইন এদের ওপরও জারি হয়ে যাবে। যে জাতি নিজের নবীর প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে তাকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেয়া হবে।

ইয়া-সীন

৩৬

নামকরণ

যে দু'টি হরফ দিয়ে সূরার সূচনা করা হয়েছে তাকেই এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বর্ণনাভংগী দেখে অনুভব করা যায়, এ সূরার নাযিল হবার সময়টি হবে নবী করীমের (সা) নবুওয়াত লাভ করার পর মক্কায় অবস্থানের মধ্যবর্তী যুগের শেষের দিনগুলো। অথবা এটি হবে তাঁর মক্কায় অবস্থানের একেবারে শেষ দিনগুলোর একটি সূরা।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের ওপর ঈমান না আনা এবং জুলুম ও বিদ্রূপের মাধ্যমে তার মোকাবিলা করার পরিণামের ভয় দেখানোই এ আলোচনার লক্ষ। এর মধ্যে ভয় দেখানোর দিকটি প্রবল ও সুস্পষ্ট। কিন্তু বার বার ভয় দেখানোর সাথে যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে বিষয়বস্তু বুঝাবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

তিনটি বিষয়ের ওপর যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে ঃ

o তাওহীদের ওপর বিশ্ব-জাহানের নিদর্শনাবলী ও সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে।

o আখেরাতের ওপর বিশ্ব-জাহানের নিদর্শনাবলী, সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি ও মানুষের নিজের অস্তিত্বের সাহায্যে।

o মুহাম্মাদী নবুওয়াতের সত্যতার ওপর একথার ভিত্তিতে যে, তিনি নিজের রিসালাতের ক্ষেত্রে এ সমস্ত কষ্ট সহ্য করছিলেন নিস্বার্থভাবে এবং এ বিষয়ের ভিত্তিতে যে, তিনি লোকদেরকে যেসব কথার প্রতি আহবান জানাচ্ছিলেন সেগুলো পুরোপুরি যুক্তিসংগত ছিল এবং সেগুলো গ্রহণ করার মধ্যেই ছিল লোকদের নিজেদের কল্যাণ।

এ যুক্তি প্রদর্শনের শক্তির ওপর ভীতি প্রদর্শন এবং তিরস্কার ও সতর্ক করার বিষয়বস্তু অত্যন্ত জোরে শোরে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে হৃদয়ের তালা খুলে যায় এবং যাদের মধ্যে সত্যকে গ্রহণ করার সামান্যতম যোগ্যতাও আছে তারা যেন কুফরীর ওপর বহাল থাকতে না পারে।

ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও তাবারানী প্রমুখগণ মা'কাল ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, يس قلب القران অর্থাৎ এ ইয়া-সীন সূরাটি কুরআনের হৃদয়। এটি ঠিক তেমনই একটি উপমা যেমন সূরা ফাতিহাকে উম্মুল কুরআন বলা হয়েছে। ফাতিহাকে উম্মুল কুরআন গণ্য করার কারণ হচ্ছে এই যে, তার মধ্যে কুরআন মজীদের সমস্ত শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার এসে গেছে। অন্যদিকে ইয়াসীনকে কুরআনের স্পন্দিত হৃদয় বলা হয়েছে এ জন্য যে, কুরআনের দাওয়াতকে সে অত্যন্ত জোরেশোরে পেশ করে, যার ফলে জড়তা কেটে যায় এবং প্রাণপ্রবাহ গতিশীল হয়।

এই হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার থেকেই হযরত ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, اقرءوا سورة يس على موتاكم "তোমাদের মৃতদের ওপর সূরা ইয়া-সীন পাঠ করো।" এর পেছনে যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা হচ্ছে এই যে, এর মাধ্যমে মরার সময় মুসলমানের অন্তরে কেবলমাত্র ইসলামী আকীদা বিশ্বাসই তাজা হয়ে যায় না বরং বিশেষভাবে তার সামনে আখেরাতের পূর্ণ চিত্রও এসে যায় এবং সে জানতে পারে দুনিয়ার জীবনের মনযিল অতিক্রম করে এখন সামনের দিকে কোন্ সব মনযিল পার হয়ে তাকে যেতে হবে। এ কল্যাণকারিতাকে পূর্ণতা দান করার জন্য আরবী জানে না এমন ব্যক্তিকে সূরা ইয়াসীন শুনাবার সাথে সাথে তার অনুবাদও শুনিয়ে দেয়া উচিত। এভাবে উপদেশ দান ও স্মরণ করিয়ে দেবার হক পুরোপুরি আদায় হয়ে যায়।

আয়াত ৮৩ **সূরা ইয়া-সীন-মক্কী** রুকূ' ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

يٰسٓ ۝١ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۝٢ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٣ عَلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ ۝٤ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۝٥ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ
فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۝٦

ইয়া-সীন।[১] বিজ্ঞানময় কুরআনের কসম, তুমি নিসন্দেহে রসূলদের অন্তরভুক্ত,[২] সরল-সোজা পথ অবলম্বনকারী (এবং এ কুরআন) প্রবল পরাক্রমশালী ও করুণাময় সত্তার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত,[৩] যাতে তুমি সতর্ক করে দাও এমন এক জাতিকে যার বাপ-দাদাকে সতর্ক করা হয়নি এবং এ কারণে তারা গাফলতিতে ডুবে আছে।[৪]

১. ইবনে আব্বাস, ইকরামা, দ্বাহ্হাক, হাসান বসরী ও সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার বক্তব্য মতে এর অর্থ হচ্ছে, "হে মানুষ" অথবা "ওহে লোক" এবং কোন কোন মুফাস্‌সির একে "ইয়া সাইয়েদ" এর সংক্ষিপ্ত উচ্চারণও গণ্য করেন। এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে ধরা যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ করে এ শব্দগুলো বলা হয়েছে।

২. এভাবে বক্তব্য শুরু করার কারণ নাউযুবিল্লাহ এ নয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দিহান ছিলেন এবং তাঁকে নিশ্চয়তা দান করার জন্য আল্লাহর একথা বলার প্রয়োজন হয়েছিল। বরং এর কারণ হচ্ছে এই যে, সে সময় কুরাইশ বংশীয় কাফেররা অত্যন্ত জোরেশোরে নবী করীমের (সা) নবুওয়াত অস্বীকার করছিল। তাই আল্লাহ কোন প্রকার ভূমিকা ছাড়াই তাঁর ভাষণ শুরুই করেছেন এ বাক্য দিয়ে যে, "তুমি নিশ্চয়ই রসূলদের অন্তরভুক্ত।" অর্থাৎ যারা তোমার নবুওয়াত অস্বীকার করছে তারা বিরাট ভুল করছে। তারপর একথার ওপর কুরআনের কসম খাওয়া হয়েছে এবং কুরআনের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে "বিজ্ঞানময়" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তোমার নবী হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে এ কুরআন যা পুরোপুরি জ্ঞানে পরিপূর্ণ। এ জিনিসটি নিজেই সাক্ষ দিচ্ছে যে, যে ব্যক্তি এমন জ্ঞানপূর্ণ বাণী উপস্থাপন করছেন তিনি নিসন্দেহে আল্লাহর রসূল। কোন মানুষ এমন ধরনের বাণী রচনা করার ক্ষমতা রাখে না। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যারা

জানতো তাদের পক্ষে কোনক্রমেই এ বিভ্রান্তির শিকার হওয়া সম্ভব ছিল না যে, এ বাণী তিনি নিজে রচনা করে আনছেন অথবা অন্য কোন মানুষের কাছ থেকে শিখে এসে শুনাচ্ছেন। (এ বিষয়বস্তুর বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস, ২০, ২১, ২২, ৪৪, ৪৫; বনী ইসরাঈল, ১০৪, ১০৫ টীকা; সূরা নূরের ভূমিকা; সূরা আশ্ শূআরা, ১; আন্ নাম্‌ল, ৯২; আল কাসাস, ৬২, ৬৩, ৬৪, ১০২-১০৯; আল আনকাবুত, ৮৮-৯১ টীকা এবং আর রুমের ঐতিহাসিক পটভূমি ও ১, ২, ৩ টীকা।)

৩. এখানে কুরআন নাযিলকারীর দু'টি গুণের কথা বলা হয়েছে। এক, তিনি প্রবল ও পরাক্রান্ত। দুই, তিনি করুণাময়। প্রথম গুণটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ সত্যটি সম্পর্কে সতর্ক করা যে, এ কুরআন কোন অক্ষম উপদেষ্টার উপদেশ নয় যে, একে উপেক্ষা করলে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। বরং এটি এমন বিশ্ব-জাহানের মালিকের ফরমান যিনি সবার ওপর প্রবল পরাক্রান্ত, যাঁর ফায়সালাসমূহ প্রয়োগ করার পথে কোন শক্তি বাধা সৃষ্টি করতে পারে না এবং যার পাকড়াও থেকে রেহাই পাবার ক্ষমতা কারো নেই। আর দ্বিতীয় গুণটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ অনুভূতি সৃষ্টি করা যে, তিনি নিছক দয়াপরবশ হয়ে তোমাদের হিদায়াত ও পথ দেখাবার জন্য নিজের রসূল পাঠিয়েছেন এবং এ মহান কিতাবটি নাযিল করেছেন, যাতে তোমরা গোমরাহী মুক্ত হয়ে এমন সরল সঠিক পথে চলতে পারো যে পথে চলে তোমরা দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য লাভ করতে পারবে।

৪. এ আয়াতের দু'টি অনুবাদ হতে পারে। এর একটি অনুবাদ ওপরে করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি এও হতে পারে যে, "একটি জাতির লোকদেরকে তুমি সে জিনিসের ভয় দেখাও যার ভয় তাদের বাপ-দাদাদেরকেও দেখানো হয়েছিল, কারণ তারা গাফলতিতে ডুবে আছে।" প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে বাপ-দাদা বলতে নিকট অতীতে অতিক্রান্ত বাপ-দাদাদের কথা বুঝানো হবে। কারণ দূর অতীতে আরব ভূখন্ডে বহু নবী-রসূল এসেছিলেন। আর দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করলে এর অর্থ দাঁড়াবে প্রাচীনকালে এ জাতির পূর্বপুরুষদের কাছে নবীদের মাধ্যমে যে পয়গাম এসেছিল এখন তাকে পুনরুজ্জীবিত করো। কারণ এরা তা ভুলে গেছে। এদিক দিয়ে দু'টি অনুবাদের মধ্যে আসলে কোন বৈপরীত্য নেই এবং অর্থের দিক দিয়ে উভয় অনুবাদ সঠিক ও অর্থবহ।

এ জায়গায় সন্দেহ জাগে যে, এ জাতির পূর্ববর্তী লোকেরা এমন একটি যুগ অতিক্রম করেছিল যখন তাদের কাছে কোন নবী আসেনি, এ সময়ে নিজেদের গোমরাহীর জন্য তারা নিজেরা কেমন করে দায়ী হতে পারে? এর জবাব হচ্ছে, আল্লাহ যখনই দুনিয়ায় কোন নবী পাঠান তখনই তাঁর শিক্ষা ও হিদায়াতের প্রভাব দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং বংশ পরম্পরায় এ প্রভাব বিস্তার লাভ করতে থাকে। এ প্রভাব যতদিন টিকে থাকে এবং নবীর অনুসারীদের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত এমনসব লোকের আবির্ভাব ঘটতে থাকে যারা হিদায়াতের প্রদীপ উজ্জ্বল করে যেতে থাকেন ততদিন পর্যন্তকার সময়কে হিদায়াতবিহীন গণ্য করা যেতে পারে না। আর যখন এ নবীর শিক্ষার প্রভাব একদম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় অথবা তা পুরোপুরি বিকৃত হয়ে যায় তখন সেখানে নতুন নবীর আবির্ভাব অপরিহার্য হয়ে ওঠে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে আরবে হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, শোআইব, মূসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালামের শিক্ষার প্রভাব চতুরদিক ছড়িয়েছিল। আর মাঝে মাঝে এ জাতির মধ্যে এমনসব লোকের আবির্ভাব ঘটতো অথবা

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٧ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ
اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۝٨ وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ
سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۝٩ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ
ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝١٠ اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ
الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ۝١١
اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۗ
وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ۝١٢

তাদের অধিকাংশই শাস্তি লাভের ফায়সালার হকদার হয়ে গেছে, এ জন্যই তারা ঈমান আনে না।[৫] আমি তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি, যাতে তাদের চিবুক পর্যন্ত জড়িয়ে গেছে, তাই তারা মাথা উঠিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।[৬] আমি তাদের সামনে একটি দেয়াল এবং পেছনে একটি দেয়াল দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। আমি তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি, এখন তারা কিছুই দেখতে পায় না।[৭] তুমি তাদেরকে সতর্ক করো বা না করো তা তাদের জন্য সমান, তারা মানবে না।[৮] তুমি তো তাকেই সতর্ক করতে পারো যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে, তাকে মাগফেরাত ও মর্যাদাপূর্ণ প্রতিদানের সুসংবাদ দাও।

আমি অবশ্যই একদিন মৃতদেরকে জীবিত করবো, যা কিছু কাজ তারা করেছে তা সবই আমি লিখে চলছি এবং যা কিছু চিহ্ন তারা পেছনে রেখে যাচ্ছে তাও আমি স্থায়ী করে রাখছি।[৯] প্রত্যেকটি জিনিস আমি একটি খোলা কিতাবে লিখে রাখছি।

বাইর থেকে আগমন হতে থাকতো যারা এ প্রভাবগুলোকে তরতাজা করে তুলতেন। যখন এ প্রভাবগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার কাছাকাছি পৌঁছে যায় এবং আসল শিক্ষাও বিকৃত হয়ে যায় তখন মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠান এবং এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন যার ফলে তাঁর হিদায়াতের প্রভাব নিশ্চিহ্ন হতে পারবে না। এবং তা বিকৃত হতেও পারবে না। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা সাবা, ৫ টীকা)

৫. যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের মোকাবিলায় জিদ ও গোয়ার্তুমির পথ অবলম্বন করেছিল এবং তাঁর কথা কোনভাবেই মানবে না বলে সিদ্ধান্ত

নিয়েছিল এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তারা শাস্তিলাভের ফায়সালার হকদার হয়ে গেছে, তাই তারা ঈমান আনছে না।" এর অর্থ হচ্ছে, যারা উপদেশে কান দেয় না এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীদের মাধ্যমে প্রমাণ পুরোপুরি উপস্থাপিত হবার পরও সত্য অস্বীকার ও সত্যের সাথে শত্রুতার নীতি অবলম্বন করে চলতেই থাকে তাদের ওপর তাদের নিজেদেরই কৃতকর্মের দুর্ভোগ চাপিয়ে দেয়া হয় এবং তারপর তাদের ঈমানলাভের সৌভাগ্য হয় না। এ বিষয়বস্তুকে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে এ বাক্যের মধ্যে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে যে, "তুমি তো এমন ব্যক্তিকেই সতর্ক করতে পারো যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে।"

৬. এ আয়াতে বেড়ি মানে হচ্ছে তাদের নিজেদের হঠকারিতা। তাদের জন্য সত্য গ্রহণ করার পথে এটি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। "চিবুক পর্যন্ত জড়িয়ে গেছে" এবং "মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে"-এর অর্থ হচ্ছে, অহংকার বশত ঘাড় তেড়া করে দাঁড়িয়ে থাকা। আল্লাহ বলছেন, তাদের জিদ ও হঠকারিতাকে আমি তাদের ঘাড়ের বেড়িতে পরিণত করে দিয়েছি এবং যে অহংকার ও আত্মম্ভরিতায় তারা লিপ্ত রয়েছে তার ফলে তাদের ঘাড় এমনভাবে বাঁকা হয়ে গেছে যে, কোন উজ্জ্বলতর সত্য তাদের সামনে এসে গেলেও তারা সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করবে না।

৭. সামনে একটি দেয়াল ও পেছনে একটি দেয়াল দাঁড় করিয়ে দেবার অর্থ হচ্ছে এই যে, এ হঠকারিতা ও অহংকারের স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে তারা পূর্বের ইতিহাস থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না এবং ভবিষ্যত পরিণামের কথাও চিন্তা করে না। তাদের অন্ধ স্বার্থপ্রীতি তাদেরকে এমনভাবে চারদিক থেকে ঢেকে নিয়েছে এবং তাদের বিভ্রান্তি এমনভাবে তাদের চোখের ওপর আচ্ছাদন টেনে দিয়েছে যার ফলে প্রত্যেক সুস্থবোধ সম্পন্ন ও অন্ধ স্বার্থপ্রীতিহীন মানুষ যে উন্মুক্ত সত্য দেখতে পায় তা তারা দেখতে পায় না।

৮. এর অর্থ এ নয় যে, এ অবস্থায় সত্যদীনের কথা প্রচার করা অর্থহীন। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তোমার সাধারণ প্রচার সব ধরনের মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। তাদের মধ্য থেকে কিছু লোকের কথা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে এবং কিছু লোকের কথা সামনের দিকের আয়াতে আসছে। প্রথম ধরনের লোকদের মুখোমুখি হয়ে যখন দেখবে তারা অস্বীকার, অহংকার, বিদ্বেষ ও বিরোধিতার ওপর স্থির হয়ে আছে তখন তাদের পেছনে লেগে থাকার দরকার নেই। কিন্তু তাদের এ আচরণে হতাশ হয়েও মনোবল হারিয়ে নিজের কাজ ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ো না। কারণ, তুমি জানো না, মানুষের এ ভীড়ের মধ্যে আল্লাহর এমন বান্দা কোথায় আছে যে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং আল্লাহকে ভয় করে সরল-সঠিক পথে চলে আসবে। তোমার সত্য প্রচারের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এ দ্বিতীয় ধরনের লোকদের সন্ধান করা এবং তাদেরকে ছাঁটাই বাছাই করে বের করে আনা। একদিকে হঠকারীদেরকে ত্যাগ করে যেতে হবে এবং অন্যদিকে এ মূল্যবান সম্পদ হস্তগত করতে হবে।

৯. এ থেকে জানা যায়, মানুষের আমলনামা তিন ধরনের বিষয় সম্বলিত হবে। এক, প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু ভালো-মন্দ কাজ করে তা আল্লাহর দফতরে লিখে নেয়া হয়। দুই, নিজের চারপাশের বস্তুসমূহের এবং নিজের শরীরের অংগ-প্রত্যংগের ওপর মানুষ যে

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿١٣﴾
إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا
إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ﴿١٤﴾ قَالُوْا مَآ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ أَنْزَلَ
الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُوْنَ ﴿١٥﴾ قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ
إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٧﴾

২ রুকূ'

তাদেরকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেই জনপদের লোকদের কাহিনী শোনাও যখন সেখানে রসূলগণ এসেছিল।[১০] আমি তাদের কাছে দু'জন রসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তারা দু'জনকেই প্রত্যাখ্যান করেছিল; তখন আমি তৃতীয়জনকে সাহায্যার্থে পাঠিয়েছিলাম এবং তারা সবাই বলেছিল, "তোমাদের কাছে রসূল হিসেবে আমাদের পাঠানো হয়েছে।"

জনপদবাসীরা বললো, "তোমরা আমাদের মতো কয়েকজন মানুষ ছাড়া আর কেউ নও[১১] এবং দয়াময় আল্লাহ মোটেই কোন জিনিস নাযিল করেননি,[১২] তোমরা স্রেফ মিথ্যা বলছো।"

রসূলরা বললো, আমাদের রব জানেন আমাদের অবশ্যই তোমাদের কাছে রসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে এবং সুস্পষ্টভাবে পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া আমাদের ওপর আর কোন দায়িত্ব নেই।[১৩]

প্রভাব (Impressions) রাখে তা সবও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং এ সমস্ত চিহ্ন এক সময় এমনভাবে সামনে ভেসে উঠবে যে, তার নিজের আওয়াজ শোনা যাবে, তার নিজের চিন্তা, নিয়ত ও ইচ্ছা-সংকল্পসমূহের সমস্ত কথা তার মানসপটে লিখিত আকারে দৃষ্টিগোচর হবে এবং এক একটি ভাল ও মন্দ কাজ এবং তার সমস্ত নড়াচড়া ও আচরণের ছবি সামনে এসে যাবে। তিন, মৃত্যুর পর নিজের ভবিষ্যত প্রজন্মের ওপর এবং নিজের সমাজ ও সমগ্র মানব জাতির ওপর নিজের ভালো ও মন্দ যেসব প্রভাব সে রেখে গেছে তা যতক্ষণ পর্যন্ত এবং যেখানে যেখানে সক্রিয় থাকবে তা সবই তার হিসেবে লেখা হতে থাকবে। নিজের সন্তানদেরকে সে ভালো মন্দ যা কিছু শিক্ষা দিয়েছে, নিজের সমাজ ক্ষেত্রে যা কিছু সুকৃতি বা দুষ্কৃতি ছাড়িয়েছে এবং মানবতার পক্ষে যে ফুল বা কাঁটা গাছ বপন করে গেছে এসবের পূর্ণ রেকর্ড ততক্ষণ পর্যন্ত তৈরি করা হতে থাকবে যতক্ষণ তার বপন করা এসব চারা দুনিয়ায় ভালো-মন্দ ফল উৎপাদন করে যেতে থাকবে।

১০. প্রাচীন কুরআন ব্যাখ্যাতাগণ সাধারণভাবে এ মত পোষণ করেছেন যে, এ জনপদটি হচ্ছে সিরিয়ার ইন্তাকিয়া শহর। আর এখানে যে রসূলদের কথা বলা হয়েছে তাঁদেরকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ইসলাম প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। এ প্রসংগে যে বিস্তারিত কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তাতে একথাও বলা হয়েছে যে, সে সময় ইন্তাখিশ ছিল এ এলাকার বাদশাহ। কিন্তু এ পুরো কাহিনীটিই ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ, ইকরামাহ, কাবুল আহবার, ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ প্রমুখ মনীষীগণ খৃষ্টানদের অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে গ্রহণ করেছেন এবং ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ইন্তাকিয়ায় সালুতী পরিবারের (Seleucid dynasty) ১৩ জন বাদশাহ এনটিউকাস (Antiochus) নামে রাজ্য শাসন করেছিল। এ নামের শেষ শাসকের শাসন এবং সে সাথে গোটা পরিবারের শাসনকালও খৃষ্টপূর্ব ৬৫ সালে শেষ হয়ে গিয়েছিল। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের যুগে ইন্তাকিয়াসহ সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের সমগ্র এলাকা রোমানদের শাসনাধীনে ছিল। তাছাড়া হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নিজেই তাঁর সহচরদেরকে ইসলাম প্রচারের জন্য ইন্তাকিয়ায় পাঠিয়েছিলেন, খৃষ্টানদের কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে এ মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে বাইবেলের 'প্রেরিতদের কার্য' অধ্যায় থেকে জানা যায়, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার কয়েক বছর পর খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ প্রথমবার সেখানে পৌঁছেছিলেন। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, যাদেরকে আল্লাহ রসূল বানিয়ে পাঠাননি এবং আল্লাহর রসূল যাদেরকে নিযুক্ত করেননি তারা যদি নিজস্ব উদ্যোগে ধর্মপ্রচারে বের হন, তাহলে কোন ধরনের ব্যাখ্যার সাধ্যমে তাদেরকে আল্লাহর রসূল গণ্য করা যেতে পারে না। তাছাড়া বাইবেলের বর্ণনা মতে ইন্তাকিয়া হচ্ছে প্রথম শহর যেখানকার অইসরাঈলিরা বিপুল সংখ্যায় ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং ঈসায়ী গীর্জা অসাধারণ সাফল্যের অধিকারী হয়েছিল। অথচ কুরআন এখানে যে জনপদটির কথা বলছে সেটি এমন একটি জনপদ ছিল যার অধিবাসীরা রসূলদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আযাবের শিকার হয়েছিল। ইন্তাকিয়া যে এমন ধরনের ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছিল যাকে রিসালাত অস্বীকার করার কারণে আগত আযাব গণ্য করা যেতে পারে, তার কোন প্রমাণ ইতিহাসে নেই।

এসব কারণে জনবসতি বলে এখানে ইন্তাকিয়া বুঝানো হয়েছে একথা গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআন বা হাদীসে এ জনবসতিটিকে চিহ্নিত করা হয়নি। এমনকি এ রসূলগণ কারা ছিলেন এবং কোন্ যুগে এদেরকে পাঠানো হয়েছিল, কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রে একথাও জানা যায়নি। কুরআন মজীদ যে উদ্দেশ্যে এ কাহিনী এখানে বর্ণনা করছে তা বুঝার জন্য জনপদের ও রসূলগণের নাম জানার কোন প্রয়োজন নেই। কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরাইশদেরকে একথা জানানো যে, তোমরা হঠকারিতা ও সত্য অস্বীকার করার সে একই নীতির ওপর চলছো যার ওপর চলেছিল এ জনপদের লোকেরা এবং তারা যে পরিণাম ভোগ করেছিল সে একই পরিণামের সম্মুখীন হবার জন্য তোমরা প্রস্তুতি নিচ্ছো।

১১. অন্য কথায় তাদের বক্তব্য ছিল, তোমরা যেহেতু মানুষ, কাজেই তোমরা আল্লাহ প্রেরিত রসূল হতে পারো না। মক্কার কাফেররাও এ একই ধারণা করতো। তারা বলতো, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রসূল নন, কারণ তিনি মানুষ ঃ

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ

"তারা বলে, এ কেমন রসূল, যে খাবার খায় এবং বাজারে চলাফেরা করে!"

(আল ফুরকান, ৭)

وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ۖ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ -

"আর জালেমরা পরস্পর কানাঘুষা করে যে, এ ব্যক্তি (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কি। তারপর কি তোমরা চোখে দেখা এ যাদুর শিকার হয়ে যাবে?" (আল আম্বিয়া, ৩)

কুরআন মজীদ মক্কার কাফেরদের এ জাহেলী চিন্তার প্রতিবাদ করে বলে, এটা কোন নতুন জাহেলীয়াত নয়। আজ প্রথমবার এ লোকদের থেকে এর প্রকাশ হচ্ছে না। বরং অতি প্রাচীনকাল থেকে সকল মূর্খ ও অজ্ঞের দল এ বিভ্রান্তির শিকার ছিল যে, মানুষ রসূল হতে পারে না এবং রসূল মানুষ হতে পারে না। নূহের জাতির সরদাররা যখন হযরত নূহের রিসালাত অস্বীকার করেছিল তখন তারাও একথাই বলেছিল ঃ

مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ۭ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۚ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۝

"এ ব্যক্তি তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। সে চায় তোমাদের ওপর তার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে। অথচ আল্লাহ চাইলে ফেরেশতা নাযিল করতেন। আমরা কখনো নিজেদের বাপ-দাদাদের মুখে একথা শুনিনি।"

(আল মু'মিনূন, ২৪)

আদ জাতি একথাই হযরত হুদ (আ) সম্পর্কে বলেছিল ঃ

مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ۝ وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۝

"এ ব্যক্তি তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। সে তাই খায় যা তোমরা খাও এবং পান করে তাই যা তোমরা পান করো। এখন যদি তোমরা নিজেদেরই মতো একজন মানুষের আনুগত্য করো তাহলে তোমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (আল মু'মিনূন, ৩৩-৩৪)

সামূদ জাতি হযরত সালেহ (আ) সম্পর্কেও এ একই কথা বলেছিল ঃ

اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ ۙ

"আমরা কি আমাদের মধ্য থেকে একজন মানুষের আনুগত্য করবো?" (ক্বামার, ২৪)

আর প্রায় সকল নবীর সাথেই এরূপ ব্যবহার করা হয়। কাফেররা বলে ঃ اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا "তোমরা আমাদেরই মতো মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও।" নবীগণ তাদের জবাবে বলেন ঃ

اِنْ نَّحْنُ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط

"অবশ্যই আমরা তোমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কিছুই নই। কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার প্রতি চান অনুগ্রহ বর্ষণ করেন।" (ইবরাহীম, ১১)

এরপর কুরআন মজীদ বলছে, এ জাহেলী চিন্তাধারা প্রতি যুগে লোকদের হিদায়াত গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে এবং এরই কারণে বিভিন্ন জাতির জীবনে ধ্বংস নেমে এসেছে ঃ

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا –

"তোমাদের কাছে কি এমন লোকদের খবর পৌঁছেনি? যারা ইতিপূর্বে কুফরী করেছিল তারপর নিজেদের কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করে নিয়েছে এবং সামনে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এসব কিছু হয়েছে এজন্য যে, তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসতে থেকেছে কিন্তু তারা বলেছে, "এখন কি মানুষ আমাদের পথ দেখাবে?" এ কারণে তারা কুফরী করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।"

(আত্ তাগাবুন, ৫–৬)

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى اِلآَّ اَنْ قَالُوْٓا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلاً –

"লোকদের কাছে যখন হিদায়াত এলো তখন এ অজুহাত ছাড়া আর কোন জিনিস তাদের ঈমান আনা থেকে বিরত রাখেনি যে, তারা বললো, "আল্লাহ মানুষকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন?" (বনী ইসরাঈল, ৯৪)

তারপর কুরআন মজীদ সুস্পষ্টভাবে বলছে, আল্লাহ চিরকাল মানুষদেরকেই রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন এবং মানুষের হিদায়াতের জন্য মানুষই রসূল হতে পারে কোন ফেরেশতা বা মানুষের চেয়ে উচ্চতর কোন সত্তা এ দায়িত্ব পালন করতে পারে না ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ ○ وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لاَّ يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ○

قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ
مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوْا طَاۤئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ۭ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ۭ
بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَجَاۗءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى
قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ
اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢١﴾

জনপদবাসীরা বলতে লাগলো, "আমরা তো তোমাদেরকে নিজেদের জন্য অমঙ্গলজনক মনে করি।[১৪] যদি তোমরা বিরত না হও তাহলে আমরা তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করবো এবং আমাদের হাতে তোমরা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।"

রসূলরা জবাব দিল, তোমাদের অমংগল তোমাদের নিজেদের সাথেই লেগে আছে।[১৫] তোমাদের উপদেশ দেয়া হয়েছে বলেই কি তোমরা একথা বলছো? আসল কথা হচ্ছে, তোমরা সীমালংঘনকারী লোক।"[১৬]

ইতিমধ্যে নগরীর দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে বললো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! রসূলদের কথা মেনে নাও। যারা তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চায় না এবং সঠিক পথের অনুসারী, তাদের কথা মেনে নাও।[১৭]

"তোমার পূর্বে আমি মানুষদেরকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি, যাদের কাছে আমি অহি পাঠাতাম। যদি তোমরা না জানো তাহলে জ্ঞানবানদেরকে জিজ্ঞেস করো। আর তারা আহার করবে না এবং চিরকাল জীবিত থাকবে, এমন শরীর দিয়ে তাদেরকে আমি সৃষ্টি করিনি।" (আল আম্বিয়া, ৭-৮)

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اَنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ –

"আমি তোমার পূর্বে যে রসূলই পাঠিয়েছিলাম তারা সবাই আহার করতো এবং বাজারে চলাফেরা করতো।" (আল ফুরকান, ২০)

قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ○

"হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, যদি পৃথিবীতে ফেরেশাতারা নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে থাকতো, তাহলে আমি তাদের প্রতি ফেশেতাদেরকেই রসূল বানিয়ে নাযিল করতাম।" (বনী ইসরাঈল, ৯৫)

১২. এটি আরো একটি মূর্খতা ও অজ্ঞতা। মক্কার কাফেররা এ মূর্খতা ও অজ্ঞতায় লিপ্ত ছিল। বর্তমানকালের তথাকথিত মুক্ত বুদ্ধির প্রবক্তারাও এতে লিপ্ত রয়েছে এবং প্রাচীনতম কাল থেকে প্রত্যেক যুগের অহী ও রিসালাত অস্বীকারকারীরা এতে লিপ্ত থেকেছে। চিরকাল এদের সবার চিন্তা ছিল, মানুষের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ আদতে কোন অহী নাযিল করেন না। তিনি কেবলমাত্র উর্ধজগতের ব্যাপারে আগ্রহান্বিত। মানুষদের ব্যাপার মানুষদের নিজেদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন।

১৩. অর্থাৎ রব্বুল আলামীন্ তোমাদের কাছে যে পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবার জন্য আমাদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোন কাজ আমাদের নেই। এরপর তা মেনে নেয়া বা না মেনে নেয়া তোমাদের ইচ্ছাধীন। তোমাদের ওপর বল প্রয়োগ করে মেনে নিতে বাধ্য করার দায়িত্ব আমাদের ওপর সোপর্দ করা হয়নি। আর তোমরা না মেনে নিলে তোমাদের কুফরীর কারণে আমরা পাকড়াও হবো না। বরং তোমাদের এ অপরাধের জন্য তোমাদের নিজেদেরকেই জবাবদিহি করতে হবে।

১৪. তাদের এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল একথা বুঝানো যে, তোমরা আমাদের জন্য কুলক্ষুণে ও অশুভ। তোমরা এসে আমাদের উপাস্য দেবতাদের বিরুদ্ধে যেসব কথাবার্তা বলতে শুরু করেছো তার ফলে দেবতারা আমাদের প্রতি রুষ্ট হয়ে উঠেছে এবং এখন আমাদের ওপর যেসব বিপদ আসছে তা আসছে তোমাদেরই বদৌলতে। ঠিক এ একই কথাই আরবের কাফের ও মোনাফিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে বলতো ঃ

وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ؕ

"যদি তারা কোন কষ্টের সম্মুখীন হতো, তাহলে বলতো, এটা হয়েছে তোমার কারণে।" (আন্ নিসা, ৭৮)

তাই কুরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ ধরনের জাহেলী কথাবার্তাই প্রাচীন যুগের লোকেরাও তাদের নবীদের সম্পর্কে বলতো। সামূদ জাতি তাদের নবীকে বলতো, اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ "আমরা তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে অমংগল জনক পেয়েছি।" (আন্ নমলঃ ৪৭)

আর ফেরাউনের জাতিও এ একই মনোভাবের অধিকারী ছিল ঃ

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ –

وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ ءَأَتَّخِذُ
مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا
وَلَا يُنقِذُونِ ﴿٢٣﴾ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ
فَاسْمَعُونِ ﴿٢٥﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾
بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾

কেন আমি এমন সত্তার বন্দেগী করবো না যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে?[১৮] তাঁকে বাদ দিয়ে কি আমি অন্য উপাস্য বানিয়ে নেবো? অথচ যদি দয়াময় আল্লাহ আমার কোন ক্ষতি করতে চান তাহলে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে লাগবে না এবং তারা আমাকে ছাড়িয়ে নিতেও পারবে না।[১৯] যদি এমনটি করি[২০] তাহলে আমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হয়ে পড়বো। আমি তো তোমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি,[২১] তোমরাও আমার কথা মেনে নাও।

(শেষ পর্যন্ত তারা তাকে হত্যা করে ফেললো এবং) সে ব্যক্তিকে বলে দেয়া হলো, "প্রবেশ করো জান্নাতে।"[২২] সে বললো, "হায়, যদি আমার সম্প্রদায় জানতো আমার রব কোন্ জিনিসের বদৌলতে আমার মাগফিরাত করেছেন এবং আমাকে মর্যাদাশালী লোকদের অন্তরভুক্ত করেছেন!"[২৩]

"যখন তারা ভালো অবস্থায় থাকে তখন বলে, এটা আমাদের সৌভাগ্যের ফল এবং তাদের ওপর কোন বিপদ এলে তাকে মূসা ও তার সাথীদের অলক্ষুণের ফল গণ্য করতো। (আল আরাফ, ১৩১)

১৫. অর্থাৎ কেউ কারোর জন্য অপয়া ও অলক্ষণ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির তাকদীরের লিখন তার নিজেরই গলায় ঝুলছে। কোন অকল্যাণ ও অঘটন ঘটলে তা হয় তার নিজের তাকদীরেরই ফল এবং শুভ ও কল্যাণকর কিছু ঘটলে তাও হয় তার তাকদীরের ফল।

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ – بنى اسراءيل – ١٣

"প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণ ও অকল্যাণের পরোয়ানা আমি তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছি।"

১৬. আসলে তোমরা কল্যাণ থেকে পালাতে চাও এবং হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী পছন্দ করো। তাই তোমরা যুক্তির মাধ্যমে হক ও বাতিলের ফায়সালা করার পরিবর্তে কুসংস্কার ও পৌরানিক ভাব কল্পনার মাধ্যমে বাহানাবাজি করছো।

১৭. এ একটি বাক্যের মাধ্যমেই সেই ব্যক্তি নবুওয়াতের সত্যতার সপক্ষে সমস্ত যুক্তি বর্ণনা করে দিয়েছেন। দু'টি কথার মাধ্যমেই একজন নবীর সত্যতা যাচাই করা যেতে পারে। এক, তাঁর কথা ও কাজ। দুই, তাঁর নিস্বার্থপর হওয়া। সে ব্যক্তির যুক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, প্রথমত তাঁরা একটি ন্যায়সংগত কথা বলছেন এবং তাঁদের নিজেদের চরিত্র একেবারে নিষ্কলুষ। দ্বিতীয়ত তাঁরা নিজেদের কোন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এ দীনের দাওয়াত দিচ্ছেন একথা কেউ চিহ্নিত করতে পারবে না। এরপর তাঁদের কথা কেন মেনে নেয়া হবে না তার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। সে ব্যক্তির এ যুক্তি উদ্ধৃত করে কুরআন মজীদ লোকদের সামনে একটি মানদন্ড তুলে ধরেছে যে, নবীর নবুওয়াত যাচাই করতে হলে এরি নিরিখে যাচাই করো। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজ একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, তিনি সঠিক পথে রয়েছেন এবং তাছাড়া তাঁর প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের পেছনে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের লেশ মাত্রও নেই। এরপর কোন বিবেকবান ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তাঁদের কথা প্রত্যাখ্যান করবে কিসের ভিত্তিতে?

১৮. এ বাক্যটি দু'টি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটিতে রয়েছে উন্নত যুক্তিবাদিতা এবং দ্বিতীয় অংশে সত্য প্রচারের সর্বোত্তম কৌশলের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। প্রথম অংশে তিনি বলছেন, স্রষ্টার বন্দেগী করা বুদ্ধি ও প্রকৃতির দাবীর নামান্তর মাত্র। অযৌক্তিক কথা যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে যারা মানুষ সৃষ্টি করেনি মানুষ তাদের বন্দেগী করবে এটাই অযৌক্তিক। যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন মানুষ তাঁর বন্দেগী করবে, এটা অযৌক্তিক নয়। দ্বিতীয় অংশে তিনি নিজের জাতির লোকদের মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি করছেন যে, তোমাদের একদিন মরতে তো হবেই এবং যে আল্লাহর বন্দেগী করতে আজ তোমাদের আপত্তি তখন তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। এখন তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তোমরা কোন্ কল্যাণের আশা পোষণ করতে পারো।

১৯. অর্থাৎ তারা আল্লাহর এত প্রিয়ও নয় যে, আমি সুস্পষ্ট অপরাধ করবো এবং তিনি নিছক তাদের সুপারিশে আমাকে মাফ করে দেবেন। আবার তাদের এত শক্তিও নেই যে, আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিতে চান এবং তারা নিছক নিজেদের শক্তির জোরে আমাকে তাঁর কবল থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারেন।

২০. অর্থাৎ এসব জেনে বুঝে যদি আমি তাদেরকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করি।

২১. এ বাক্যের মধ্যে আবার সত্য প্রচারের একটি সূক্ষ্ম কৌশলের অবতারণা করা হয়েছে। একথা বলে সে ব্যক্তি তাদের অনুভূতিকে এভাবে সজাগ করেন যে, আমি যে রবের প্রতি ঈমান এনেছি তিনি কেবল আমারই রব নন বরং তোমাদেরও রব। তাঁর প্রতি ঈমান এনে আমি ভুল করিনি বরং তাঁর প্রতি ঈমান না এনে তোমরাই ভুল করছো।

২২. অর্থাৎ শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করার সাথে সাথেই তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হলো। যখনই মৃত্যুর দরোজা পার হয়ে তিনি অন্য জগতে পৌঁছে গেলেন, ফেরেশতারা সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন এবং তারা তখনই তাঁকে এ মর্মে সুসংবাদ দিয়ে দিলেন যে, সুসজ্জিত বেহেশ্‌ত তাঁর অপেক্ষায় রয়েছে। এ বাক্যটির ব্যাখ্যার ব্যাপারে মুফাস্‌সিরদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। কাতাদাহ বলেন, "আল্লাহ তখনই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন, তিনি সেখানে জীবিত রয়েছেন

وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا
مُنزِلِينَ ﴿٢٨﴾ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَٰمِدُونَ ﴿٢٩﴾ يَٰحَسْرَةً
عَلَى ٱلْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠﴾
أَلَمْ يَرَوْا۟ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾
وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾

এরপর তার সম্প্রদায়ের ওপর আমি আকাশ থেকে কোন সেনাদল পাঠাইনি, সেনাদল পাঠাবার কোন দরকারও আমার ছিল না। ব্যস, একটি বিস্ফোরণের শব্দ হলো এবং সহসা তারা সব নিস্তব্ধ হয়ে গেলো।[২৪] বান্দাদের অবস্থার প্রতি আফসোস, যে রসূলই তাদের কাছে এসেছে তাকেই তারা বিদ্রূপ করতে থেকেছে। তারা কি দেখেনি তাদের পূর্বে কত মানব সম্প্রদায়কে আমি ধ্বংস করেছি এবং তারপর তারা আর কখনো তাদের কাছে ফিরে আসবে না?[২৫] তাদের সবাইকে একদিন আমার সামনে হাজির করা হবে।

এবং আহারলাভ করছেন। অন্যদিকে মুজাহিদ বলেন, "ফেরেশ্‌তারা একথা সুসংবাদ হিসেবে তাঁকে জানিয়ে দেন এবং এর অর্থ হচ্ছে, কিয়ামতের পরে যখন সকল মু'মিন জান্নাতে প্রবেশ করবেন তখন তিনিও তাদের সাথে প্রবেশ করবেন।"

২৩. এটি সেই মু'মিন ব্যক্তির উন্নত নৈতিক মানসিকতার একটি শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। যারা এ মাত্র হত্যা কর্ম সংঘটিত করেছিল তাদের বিরুদ্ধে তাঁর মনে কোন ক্রোধ ও প্রতিশোধ স্পৃহা ছিল না। তিনি আল্লাহর কাছে তাদের জন্য কোন বদদোয়া করছেন না। এর পরিবর্তে তিনি এখনো তাদের কল্যাণ কামনা করে চলছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর মনে যদি কোন আকাংখা জন্ম নিয়ে থাকে তাহলে তা ছিল কেবলমাত্র এতটুকু যে, হায়, আমার জাতি যদি আমার এ শুভ পরিণাম জানতে পারতো এবং আমার জীবন থেকে না হলেও আমার মৃত্যু থেকেও যদি শিক্ষা নিয়ে সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন করতো। এ ভদ্র-বিবেকবান মানুষটি নিজের হত্যাকারীদের জন্যও জাহান্নামের প্রত্যাশা করতেন না। বরং তিনি চাইতেন তারা ঈমান এনে জান্নাতের অধিকারী হোক। এরি প্রশংসা করে হাদীসে বলা হয়েছে نصح قومه حيا وميتا "এ ব্যক্তি জীবিত অবস্থায়ও নিজের জাতির কল্যাণকামী থেকেছে এবং মৃত্যুর পরও।"

এ ঘটনাটি বর্ণনা করে মহান আল্লাহ মক্কার কাফেরদেরকে পরোক্ষভাবে এ সত্যটির ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ
يَاْكُلُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا
مِنَ الْعُيُوْنِ ﴿٣٤﴾ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ۭ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٥﴾
سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩ রুকূ'

এদের[২৬] জন্য নিষ্প্রাণ ভূমি একটি নিদর্শন।[২৭] আমি তাকে জীবন দান করেছি এবং তা থেকে শস্য উৎপন্ন করেছি, যা এরা খায়। আমি তার মধ্যে খেজুর ও আংগুরের বাগান সৃষ্টি করেছি এবং তার মধ্য থেকে ঝরণাধারা উৎসারিত করেছি, যাতে এরা তার ফল ভক্ষণ করে। এসব কিছু এদের নিজেদের হাতের সৃষ্ট নয়।[২৮] তারপরও কি এরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না?[২৯] পাক-পবিত্র সে সত্তা[৩০] যিনি সব রকমের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, তা ভূমিজাত উদ্ভিদের মধ্য থেকে হোক অথবা স্বয়ং এদের নিজেদের প্রজাতির (অর্থাৎ মানব জাতি) মধ্য থেকে হোক কিংবা এমন জিনিসের মধ্য থেকে হোক যাদেরকে এরা জানেও না।[৩১]

সাথী মু'মিনরাও তোমাদের ঠিক তেমনি যথার্থ কল্যাণকামী যেমন এ মর্দে মু'মিন তাঁর জাতির কল্যাণকামী ছিল। তোমাদের সকল প্রকার উৎপীড়ন-নিপীড়ন সত্ত্বেও এরা তোমাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও প্রতিশোধ স্পৃহা পোষণ করে না। তোমাদের সাথে এদের শত্রুতা নেই। বরং এদের শত্রুতা তোমাদের গোমরাহীর সাথে। তোমরা সত্যসঠিক পথে ফিরে আসবে, কেবল এ জন্যই এরা লড়াই করছে। এ ছাড়া এদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

যেসব আয়াত থেকে বরযখের (মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত) জীবনের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় এ আয়াতটি তার অন্যতম। এ থেকে জানা যায় মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়-কাল চূড়ান্ত অস্তিত্ব বিলুপ্তির যুগ নয়। কোন কোন স্বল্পজ্ঞান-সম্পন্ন লোক এ রকম ধারণা পোষণ করে থাকে। বরং এ সময় দেহ ছাড়াই প্রাণ জীবিত থাকে, কথা বলে ও কথা শোনে, আবেগ-অনুভূতি পোষণ করে, আনন্দ ও দুঃখ অনুভব করে এবং দুনিয়াবাসীদের ব্যাপারেও তার আগ্রহ অব্যাহত থাকে। যদি এমনটি না হতো, তাহলে মৃত্যুর পর এ মর্দে মু'মিনকে কেমন করে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয় এবং তিনিই বা কেমন করে তার জাতির জন্য এ আকাংখা করেন যে, হায়, যদি তারা তাঁর এ শুভ পরিণাম সম্পর্কে জানতে পারতো।

২৪. মূল শব্দটি হচ্ছে "নিভে গেল।" এ শব্দের মধ্যে রয়েছে একটি সূক্ষ্ম ব্যাংগ। নিজেদের শক্তির জন্য তাদের অহংকার এবং সত্যদীনের বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত ক্ষোভ ও আক্রোশ ছিল যেন একটি জলন্ত অগ্নিশিখা। তারা মনে করছিল, এটি ঐ তিনজন নবী ও তাঁদের অনুসারীদেরকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে। কিন্তু আল্লাহর আযাবের একটি আঘাতেই এ অগ্নিশিখা ঠান্ডা হয়ে গেলো।

২৫. অর্থাৎ এমনভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে যে, কোথাও তাদের সামান্যতম চিহ্নও নেই। যে একবার পড়ে গেছে সে আর ওঠেনি। দুনিয়ায় আজ তাদের নাম নেবার মতো একজন লোকও বেঁচে নেই। তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিই নয়, তাদের বংশধারাও বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

২৬. মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোকাবিলায় অস্বীকার, মিথ্যা আরোপ ও সত্য বিরোধিতার যে কর্মনীতি অবলম্বন করে, পিছনের দু'রুকূ'তে তার নিন্দা করা হয়েছে। আর এখন ভাষণের মোড় ফিরে যাচ্ছে মূল বিবাদের দিকে, যা তাদের ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আসল কারণ ছিল। অর্থাৎ তাওহীদ ও আখেরাতের বিশ্বাস, যা নবী করীম (সা) পেশ করছিলেন এবং কাফেররা মেনে নিতে অস্বীকার করছিল। এ প্রসঙ্গে একের পর এক কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন করে লোকদেরকে এ মর্মে চিন্তা-ভাবনা করার দাওয়াত দেয়া হচ্ছে যে, তোমাদের চোখের সামনে বিশ্ব-জাহানের এই যে, নিদর্শনাবলী প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে, এগুলো কি এ সত্যটির প্রতি পরিষ্কার অংগুলি নির্দেশ করছে না, যা এ নবী তোমাদের সামনে পেশ করছেন?

২৭. অর্থাৎ তাওহীদই সত্য এবং শিরক পুরোপুরি ভিত্তিহীন।

২৮. এ বাক্যটির দ্বিতীয় অনুবাদ এও হতে পারে, "যাতে এরা খেতে পারে তার ফল এবং সে জিনিসগুলো, যা এদের নিজেদের হাত তৈরি করে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে এরা নিজেরা যেসব কৃত্রিম খাদ্য তৈরি করে যেমন রুটি, তরকারী, মুরব্বা, আচার, চাটনি এবং অন্যান্য অসংখ্য জিনিস।

২৯. এ সংক্ষিপ্ত বাক্যগুলোতে ভূমির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতাকে যুক্তি হিসেবে পেশ করা হয়েছে। মানুষ দিনরাত ভূমি থেকে উৎপাদিত শস্য-ফলমূল খাচ্ছে। তারা নিজেরা একে একটি মামুলি ব্যাপার মনে করে থাকে। কিন্তু গাফলতির পর্দা ছিন্ন করে গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলে তারা জানতে পারবে, এ ভূমির আস্তরণ ভেদ করে সবুজ শ্যামল ফসল ও বন-বনানীর সৃষ্টি এবং তার মধ্যে নদ-নদী ও স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হওয়া এমন কোন খেলা নয় যা নিজে নিজেই চলছে। বরং এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে একটি বিরাট জ্ঞান, শক্তি এবং প্রতিপালন ও পরিচালন ব্যবস্থা। পৃথিবীর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে দেখা যাবে যেসব উপাদানের সাহায্যে এটি গঠিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে আপনা-আপনি বিকাশ, বৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধি লাভ করার কোন ক্ষমতা নেই। এসব উপাদান এককভাবেও এবং সব রকমের মিশ্রণ ও সংগঠনের পরও থাকে একেবারেই অকেজো ও অনুপযোগী। এ কারণে এদের মধ্যে জীবনের নামমাত্রও নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ নিষ্প্রাণ যমীনের বুক চিরে উদ্ভিদ জীবনের উন্মেষ সম্ভব হলো কেমন করে? এ

সম্পর্কে অনুসন্ধান চালালে জানা যাবে, পূর্বাহ্নেই কয়েকটি বড় বড় কার্যকারণ সংগৃহীত না হলে এ জীবনধারা আদৌ অস্তিত্বলাভই করতে পারতো না।

প্রথমত, পৃথিবীর বিশেষ অংশসমূহে তার উপরিভাগের ভূপৃষ্ঠে এমন অনেক জৈবিক উপাদানের আস্তরণ বিছানো হয়েছে যা উদ্ভিদের খাদ্যে পরিণত হবার উপযোগী হতে পারতো। এ আস্তরণকে নরম রাখা হয়েছে, যাতে উদ্ভিদের শিকড় তার মধ্যে বিস্তার লাভ করে নিজের খাদ্য আহরণ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যমীনের ওপর বিভিন্ন পদ্ধতিতে পানি সিঞ্চনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে খাদ্য উপাদানসমূহ তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এমন পর্যায়ে উপনীত হতে পারে যার ফলে উদ্ভিদের শিকড়সমূহ তা চূষে নিতে সক্ষম হয়।

তৃতীয়ত, ওপরের শূন্যলোকে বায়ু সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বায়ু উর্ধলোকের বিপদ-আপদ থেকে যমীনের হেফাজত করে এবং বৃষ্টি পরিবহনের কাজ সম্পাদন করে। এ সংগে এর মধ্যে এমন সব গ্যাসের সমাবেশ ঘটে যা উদ্ভিদের জীবন এবং তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশলাভের জন্য প্রয়োজন।

চতুর্থত, সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে এমনভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে যার ফলে উদ্ভিদ তাদের জীবন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় হারে উষ্ণতা এবং অনুকূল পরিবেশ ও মওসূম লাভ করতে পারে।

এ চারটি বড় বড় কার্যকারণ (যেগুলো মূলগতভাবে অসংখ্য আনুষংগিক কার্যকারণের সমষ্টি) সৃষ্টি করে দেয়ার পর উদ্ভিদের অস্তিত্ব লাভ করা সম্ভবপর হয়। তারপর এ উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবার পর উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের বীজ এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যার ফলে যখনই তা উপযোগী জমি, পানি, বাতাস ও মওসূমের সংস্পর্শে আসে তখনই তার মধ্যে উদ্ভিদ সুলভ জীবনের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। এছাড়াও এ বীজের মধ্যে এমন ব্যবস্থাও করে দেয়া হয়েছে যার ফলে প্রত্যেক উদ্ভিদ প্রজাতির বীজ থেকে অনিবার্যভাবে একই প্রজাতির চারা তার যাবতীয় শ্রেণী স্বাতন্ত্র ও উত্তরাধিকার বৈশিষ্ট সহকারে জন্ম নেয়। এর ওপর বাড়তি যে সৃজন কুশলতার অবতারণা করা হয় তা হচ্ছে এই যে, দশ-বিশ বা পঞ্চাশ শ্রেণীর নয় বরং অসংখ্য শ্রেণীর উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয় এবং সেগুলোকে এমনভাবে তৈরি করা হয় যার ফলে তারা অসংখ্য শ্রেণীর পশু ও মানবকূলের খাদ্য, ঔষুধ, পোশাক ও অন্যান্য অগণিত প্রয়োজন পূর্ণ করতে সক্ষম হয়, উদ্ভিদের পরে পৃথিবীর বুকে এ প্রয়োজনগুলো অস্তিত্বলাভের অপেক্ষায় ছিল।

এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা সম্পর্কে যে ব্যক্তিই চিন্তা করবে সে যদি হঠকারিতা ও সংকীর্ণ স্বার্থপ্রীতির শিকার না হয় তাহলে তার অন্তর সাক্ষ দেবে, এসব কিছু আপনা-আপনি হতে পারে না। এর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে একটি জ্ঞানদীপ্ত পরিকল্পনা কাজ করছে। এ ক্ষেত্রে মওসুমের সম্পর্ক উদ্ভিদের সাথে এবং উদ্ভিদের সম্পর্ক জীব জন্তু ও মানুষের প্রয়োজনের সাথে চরম স্পর্শকাতরতা ও সূক্ষতা বজায় রেখে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কোন বুদ্ধি-বিবেকবান মানুষ ধারণা করতে পারে না এ ধরনের সর্বব্যাপী সম্পর্ক নিছক ঘটনাক্রমে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তারপর এ ব্যবস্থাপনা আবার একথাও প্রমাণ করে যে,

এটি বহু প্রভুর কৃতিত্ব হতে পারে না। এটি এমন একজন মাত্র ইলাহর ব্যবস্থাধীনে সম্পাদিত হচ্ছে এবং হতে পারে যিনি মাটি, বাতাস, পানি, সূর্য, উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মানব জাতি সবার স্রষ্টা ও রব। এদের প্রত্যেকের প্রভু যদি আলাদা আলাদা হতো তাহলে কেমন করে এমনি ধরনের একটি সর্বব্যাপী ও গভীর জ্ঞানময় সম্পর্ক রক্ষাকারী পরিকল্পনা তৈরি হয়ে যাওয়ার এবং লাখো-লাখো কোটি-কোটি বছর পর্যন্ত এমন সুশৃংখলভাবে যথানিয়মে পরিচালিত হবার কথা কল্পনা করা যেতে পারে।

তাওহীদের সপক্ষে এ যুক্তি পেশ করার পর মহান আল্লাহ বলেন ঃ أَفَلَا يَشْكُرُونَ অর্থাৎ এরা কি এমনই অকৃতজ্ঞ ও নিমকহারাম হয়ে গেছে যে, যে আল্লাহ এদের জীবনের জন্য এ সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করে দিয়েছেন এরা তাঁর শোকরগুজারী করে না এবং তাঁর নিয়ামতগুলো উদরস্থ করে অন্যের শোকরগুজারী করে? তাঁর সামনে মাথা নত করে না এবং তাদের জন্য যে মিথ্যা উপাস্যরা একটি ঘাসও সৃষ্টি করেনি তাদের সামনে মাথা নত করে ষষ্ঠাংগ প্রণিপাত করে?

৩০. অর্থাৎ সব রকমের দোষ-ত্রুটির আবিলতামুক্ত, সব রকমের দুর্বলতা ও ভ্রান্তির উর্ধে তাঁর কোন শরীক ও ভাগীদার আছে এ ধরনের চিন্তা-ভাবনার কোন অবকাশই নেই। মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাস খণ্ডন করে সাধারণভাবে কুরআন মজীদে এ শব্দগুলো এ জন্য ব্যবহার করা হয় যে, শিরকের প্রতিটি আকীদা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর প্রতি কোন না কোন দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতা ও ভ্রান্তির অপবাদ। আল্লাহর জন্য শরীক নির্ধারণ করার অর্থই হচ্ছে এই যে, এ ধরনের কথা যে বলে সে আসলে মনে করে, আল্লাহ একা তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্ব পরিচালনার যোগ্যতা রাখেন না অথবা তিনি নিজে তাঁর প্রভুত্বের কর্তৃত্ব পরিচালনায় কাউকে শরীক করতে বাধ্য কিংবা অন্য কতিপয় সত্তা আপনা আপনিই এত বেশী শক্তির অধিকারী হয়ে গেছে যে, তারা প্রভুত্বের ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করছে এবং আল্লাহ তাদের হস্তক্ষেপ বরদাশ্‌ত করছেন অথবা নাউযুবিল্লাহ তিনি মানব বংশজাত রাজা-বাদশাহদের মতো দুর্বলতার অধিকারী, যে কারণে মন্ত্রী, পারিষদবর্গ, মোসাহেব ও প্রিয় শাহজাদা ও শাহজাদীদের একটি বিরাট দলের দ্বারা তিনি ঘেরাও হয়ে আছেন এবং আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের বহু ক্ষমতা তাদের মধ্যে বন্টিত হয়ে গেছে। আল্লাহ সম্পর্কে এ জাহেলী ধ্যান-ধারণা যদি চিন্তা-চেতনার সাথে সম্পৃক্ত না থাকতো, তাহলে আদতে শিরকের চিন্তার জন্মই হতে পারতো না। তাই কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে, মুশরিকরা আল্লাহর সাথে যেসব দোষ, অভাব ও দুর্বলতা সম্পৃক্ত করে, আল্লাহ তা থেকে মুক্ত, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র।

৩১. এটি তাওহীদের সপক্ষে আরো একটি যুক্তি। এখানে আবার পূর্ব থেকে উপস্থিত সত্যগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটিকে নিয়ে একথা বলা হচ্ছে যে, দিনরাত তোমরা যেসব জিনিস স্বচক্ষে দেখে চলছো এবং কোনপ্রকার ভাবনা-চিন্তা না করেই এমনিই সামনের দিকে এগিয়ে চলে যেতে থাকো সেগুলোর মধ্যেই সত্যের সন্ধান দেবার মতো নিদর্শনাবলী রয়ে গেছে। নারী ও পুরুষের জুটি তো মানুষের নিজের জন্মের উৎস। জীব-জন্তুর বংশধারাও পুরুষ ও স্ত্রী জাতীয় পশুর মিলনের সাহায্যেই এগিয়ে চলছে। উদ্ভিদ সম্পর্কেও মানুষ জানে, তাদের মধ্যে বিপরীত লিংগের জুড়ি বাঁধার নীতি কার্যকর রয়েছে। এমনকি নিষ্প্রাণ জড় বস্তুর মধ্যেও দেখা যায় বিভিন্ন বস্তু যখন একটা অন্যটার সাথে যুথবদ্ধ হয় তখনই

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَالشَّمْسُ
تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ
حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِىْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ
الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٤٠﴾

এদের জন্য রাত হচ্ছে আর একটি নিদর্শন। আমি তার উপর থেকে দিনকে সরিয়ে দেই তখন এদের ওপর অন্ধকার ছেয়ে যায়।[৩২] আর সূর্য, সে তার নির্ধারিত গন্তব্যের দিকে ধেয়ে চলছে।[৩৩] এটি প্রবল পরাক্রমশালী জ্ঞানী সত্তার নিয়ন্ত্রিত হিসেব। আর চাঁদ, তার জন্য আমি মনযিল নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, সেগুলো অতিক্রম করে সে শেষ পর্যন্ত আবার খেজুরের শুকনো ডালের মতো হয়ে যায়।[৩৪] না সূর্যের ক্ষমতা আছে চাঁদকে ধরে ফেলে[৩৫] এবং না রাত দিনের ওপর অগ্রবর্তী হতে পারে,[৩৬] সবাই এক একটি কক্ষপথে সন্তরণ করছে।[৩৭]

তাদের থেকে নানা প্রকার যৌগিক পদার্থ অস্তিত্ব লাভ করে। স্বয়ং পদার্থের মৌলিক গঠন ঋণাত্মক ও ধনাত্মক বৈদ্যুতিক শক্তির সংযোগেই সম্পন্ন হয়েছে। এ যুথিবদ্ধতা, যার মাধ্যমে এ সমগ্র বিশ্ব-জাহান অস্তিত্ব লাভ করেছে, প্রজ্ঞা ও সৃষ্টি কুশলতার এমন সব সূক্ষ্মতা ও জটিলতার অধিকারী এবং তার মধ্যে প্রতিটি জোড়ায় সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষের মধ্যে এমনসব সম্পর্ক পাওয়া যায়, যার ফলে স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী কোন ব্যক্তি এ জিনিসটিকে একটি আকস্মিক ঘটনাচক্র বলতে পারেন না। আবার একথা মেনেও নিতে পারেন না যে, বিভিন্ন ইলাহ এসব অসংখ্য জোট সৃষ্টি করে এদের মধ্যে এ ধরনের বুদ্ধিমত্তা সহকারে জুড়ি বেঁধে দিয়ে থাকবেন। পুরুষ ও স্ত্রীর পরস্পরের জুড়ি হওয়া এবং তাদের জুড়ি হবার ফলে নতুন জিনিসের সৃষ্টি হওয়া স্বয়ং স্রষ্টার একত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

৩২. দিন-রাত্রির আসা-যাওয়াও পূর্ব থেকে উপস্থিত সত্যগুলোর অন্যতম। স্বাভাবিকভাবে দুনিয়ায় এগুলো নিয়মিত ঘটে চলছে বলে নিছক এ জন্য মানুষ এগুলোর প্রতি মনোযোগ দেবার প্রয়োজন বোধ করে না। অথচ যদি দিন কেমন করে আসে, রাত কেমন করে অতিবাহিত হয় এবং দিনের চলে যাওয়ার ও রাতের ফিরে আসার মধ্যে কি কি বিজ্ঞতা ও কৌশল সক্রিয় রয়েছে সে সম্পর্কে সে চিন্তা-ভাবনা করতো তাহলে নিজেই অনুভব করতো যে, এটি একজন শক্তিশালী ও জ্ঞানবান রবের অস্তিত্ব এবং তাঁর একত্বের উজ্জ্বল প্রমাণ। পৃথিবীর সামনে থেকে সূর্যের সরে না যাওয়া পর্যন্ত কখনো দিনের বিদায় ও রাতের আগমন হতে পারে না। দিনের সরে যাওয়া এবং রাতের আগমনের মধ্যে যে চরম নিয়মানুবর্তিতা পাওয়া যায় তা সূর্য ও পৃথিবীকে একই অপরিবর্তনশীল বিধানের আওতায় আবদ্ধ না রেখে সম্ভবপর ছিল না। তারপর এ রাত ও দিনের আসা-যাওয়ার যে

গভীর সম্পর্ক পৃথিবীর সৃষ্ট জীবকুলের সাথে পাওয়া যায় তা পরিষ্কারভাবে একথাই প্রমাণ করে যে, চরম বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা সহকারে কোন সত্তা ইচ্ছাকৃতভাবেই এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পৃথিবীর বুকে মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব, বরং এখানে পানি, হাওয়া ও বিভিন্ন খনিজ দ্রব্যের অস্তিত্বও আসলে পৃথিবীকে সূর্য থেকে একটি বিশেষ দূরত্বে অবস্থান করাবার এবং তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের একটি ধারাবাহিকতা সহকারে নির্ধারিত বিরতির পর সূর্যের সামনে আসার এবং তার সামনে থেকে সরে যেতে থাকার ফল। যদি পৃথিবীর দূরত্ব সূর্য থেকে খুব কম বা বেশী হতো অথবা তার এক অংশে সবসময় রাত ও অন্য অংশে সব সময় দিন থাকতো কিংবা দিন-রাত্রির পরিবর্তন অতি দ্রুত বা অতি শ্লথ গতিতে হতো অথবা নিয়ম বহির্ভূতভাবে হঠাৎ কখনো দিনের উদয় হতো আবার কখনো রাত ঢেকে ফেলতো, তাহলে এ পৃথিবীতে কোন জীবনের অস্তিত্ব লাভ সম্ভবপর হতো না। শুধু তাই নয় বরং এ অবস্থায় নিষ্প্রাণ পদার্থসমূহের আকার-আকৃতিও তাদের বর্তমান আকৃতি থেকে ভিন্নতর হতো। অন্তরের চোখ যদি বন্ধ করে না রাখা হয়, তাহলে মানুষ এ ব্যবস্থার মধ্যে এমন এক আল্লাহর কর্মতৎপরতা প্রত্যক্ষ করতে পারে যিনি এ পৃথিবীর বুকে এ বিশেষ ধরনের সৃষ্ট জীবকুলকে অস্তিত্ব দান করার সংকল্প করেন এবং তাদের যথাযথ প্রয়োজন অনুসারে পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেন। আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ব যদি কোন ব্যক্তির দৃষ্টিতে বুদ্ধি বিরোধী হয়ে থাকে তাহলে সে নিজেই চিন্তা করে বলুক, এ কলাকৌশলকে বহু ইলাহর সাথে সংশ্লিষ্ট করা অথবা কোন অন্ধ ও বধির প্রাকৃতিক আইনের আওতায় আপনা-আপনিই এসব কিছু হয়ে গেছে বলে মনে করা কতদূর বুদ্ধি বিরোধী হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি কোন প্রকার প্রমাণ ছাড়াই শুধুমাত্র আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে একেবারেই অযৌক্তিক এ শেষোক্ত ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারে, সে যখন বলে, বিশ্ব-জাহানে আইন-শৃংখলা, জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও উদ্দেশ্যমুখিনতার সন্ধান পাওয়া আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়, তখন আমাদের জন্য একথা মেনে নেয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় যে, যথার্থই এ ব্যক্তি কোন মতবাদ বা বিশ্বাসকে স্বীকার করে নেবার জন্য কোন পর্যায়েরও যথেষ্ট বা অযথেষ্ট যৌক্তিক সাক্ষ-প্রমাণের প্রয়োজন অনুভব করে।

৩৩. অবস্থান বলতে এমন জায়গাও বুঝানো যেতে পারে যেখানে গিয়ে সূর্যকে সবশেষে থেমে যেতে ও অবস্থান গ্রহণ করতে হবে আবার এমন সময়ও হতে পারে যখন সে থেমে যাবে। এ আয়াতের সঠিক অর্থ মানুষ তখনই নির্ধারণ করতে পারে যখন বিশ্ব-জাহানের নিগুঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে সে সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু মানুষের জ্ঞানের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তা প্রত্যেক যুগে পরিবর্তনশীল ছিল এবং বর্তমানে বাহ্যত সে যা কিছু জানে যে কোন সময় তা পরিবর্তিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাচীন যুগের লোকেরা তাদের চাক্ষুষ দর্শনের ভিত্তিতে সূর্য সম্পর্কে এ নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করতো যে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। তারপর আরো গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের পরে এ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, সে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এবং সৌর জগতের গ্রহসমূহ তার চারদিকে ঘুরছে। কিন্তু এ মতবাদও স্থায়ী প্রমাণিত হয়নি। পরবর্তীকালের পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, কেবলমাত্র সূর্যই নয় বরং সমস্ত তারকারাজি, যাদেরকে অনড় (Fixed Stars) মনে করা হতো, একদিকে ছুটে চলছে। তাদের চলার গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১০ থেকে ১০০ মাইল বলে অনুমান করা হয়েছে। আর

আধুনিক আকাশ বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞগণ সূর্য সম্পর্কে বলেন যে, সে তার সমগ্র সৌরজগত নিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে ২০ কিলোমিটার (অর্থাৎ প্রায় ১২ মাইল) গতিতে এগিয়ে চলছে। (দেখুন ইন্‌সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, 'স্টার' ও 'সান' শব্দ)

৩৪. অর্থাৎ মাসের মধ্যে চাঁদের আবর্তন প্রতিদিন পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রথম দিন সে 'হেলাল' আকারে উদিত হয়। তারপর প্রতিদিন তার দেহ বড় হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত চতুর্দশীর রাতে সে পূর্ণ চন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। তারপর প্রতিদিন তার দেহ হ্রাস পেতে থাকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত আবার হেলালের আকারে ফিরে আসে। লাখো-লাখো বছর থেকে এ প্রক্রিয়া চলছে। এবং চাঁদের এ নির্ধারিত মন্‌যিলগুলো পরিভ্রমণের মধ্যে কখনো কোন ব্যতিক্রম দেখা দেয়নি। এ কারণে মানুষ হিসেব করে সবসময় বলতে পারে চাঁদ কোন্ দিন কোন্ মন্‌যিলে থাকবে। চাঁদের আবর্তন যদি কোন নিয়মের অধীন না হতো, তাহলে এ ধরনের হিসেব করা সম্ভব হতো না।

৩৫. এ বাক্যের দু'টি অর্থ হতে পারে এবং দু'টি অর্থই সঠিক। একটি হচ্ছে, চাঁদকে ধরে নিজের দিকে টেনে নেবার অথবা তার গতিপথে প্রবেশ করে তার সাথে সংঘাত বাধাবার ক্ষমতা সূর্যের নেই। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, চাঁদের উদয়ের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে সূর্য কখনো তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। রাতে চাঁদ আকাশে আলো ছড়াচ্ছে এ সময় হঠাৎ দিগন্তে সূর্যের উদয় সম্ভব নয়।

৩৬. অর্থাৎ দিনের নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাবার আগে কখনো রাত এসে যাওয়া এবং দিনের আলোর জন্য যে সময় নির্ধারিত রয়েছে তার মধ্যে অকস্মাত নিজের অন্ধকার নিয়ে তার উপস্থিত হওয়া কখনো সম্ভব নয়।

৩৭. মূলে "ফালাক" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় "ফালাক" মানে গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ (Orbit) এবং এর অর্থ আকাশের অর্থ থেকে ভিন্ন। "সবাই একটি কক্ষপথে সাঁতরাচ্ছে" এ উক্তি চারিটি সত্যের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করছে। এক, কেবলমাত্র সূর্য ও চন্দ্র নয় বরং সমস্ত তারকা ও গ্রহ এবং সমগ্র আকাশ জগত আবর্তন করছে। দুই, এদের প্রত্যেকের আকাশ অর্থাৎ প্রত্যেকের আবর্তন পথ বা কক্ষপথ আলাদা। তিন, আকাশসমূহ তারকারাজিকে নিয়ে আবর্তন করছে না বরং তারকারাজি আকাশসমূহে আবর্তন করছে। চার, আকাশসমূহে তারকাদের আবর্তন এমনভাবে হচ্ছে যেমন কোন তরল পদার্থে কোন জিনিস ভেসে চলে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনা এ আয়াতগুলোর মূল উদ্দেশ্য নয় বরং মানুষকে একথা বুঝানোই এর উদ্দেশ্য যে, যদি সে চোখ মেলে তাকায় এবং নিজের বুদ্ধি ব্যবহার করে তাহলে পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত যেদিকেই তাকাবে সেদিকেই তার সামনে আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর একত্বের অসংখ্য ও অগণিত যুক্তি-প্রমাণের সমাবেশ দেখতে পাবে। এ অবস্থায় সে কোথাও নাস্তিক্যবাদ ও শিরকের সপক্ষে একটি যুক্তি-প্রমাণও পাবে না। আমাদের এ পৃথিবী যে সৌরজগতের (Solar System) অন্তরভুক্ত তার বিশালত্বের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তার কেন্দ্রীয় সূর্যটি পৃথিবীর তিন লক্ষ গুণ বড় এবং তার সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রহ নেপচুনের দূরত্ব সূর্য থেকে কমপক্ষে ২শ' ৭৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। বরং যদি প্লুটোকে দূরবর্তী গ্রহ ধরা হয় তাহলে সূর্য থেকে তার দূরত্ব ৪শ' ৬০ কোটি মাইলে গিয়ে

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ
مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ
يُنْقَذُوْنَ ﴿٤٣﴾ اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٤٤﴾

এদের জন্য এটিও একটি নিদর্শন যে, আমি এদের বংশধরদেরকে ভরা নৌকায় চড়িয়ে দিয়েছি[৩৮] এবং তারপর এদের জন্য ঠিক তেমনি আরো নৌযান সৃষ্টি করেছি যেগুলোতে এরা আরোহণ করে।[৩৯] আমি চাইলে এদেরকে ডুবিয়ে দেই, এদের কোন ফরিয়াদ শ্রবণকারী থাকবে না এবং কোনভাবেই এদেরকে বাঁচানো যেতে পারে না। ব্যস, আমার রহমতই এদেরকে কূলে ভিড়িয়ে দেয় এবং একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত জীবনের দ্বারা লাভবান হবার সুযোগ দিয়ে থাকে।[৪০]

পৌঁছে। এ বিশালত্ব সত্ত্বেও এ সৌরজগত একটি বিরাট বিশাল ছায়াপথের নিছক একটি ছোট অংশ মাত্র। আমাদের এ সৌরজগত যে ছায়াপথটির (Galaxy) অন্তরভুক্ত তার মধ্যে প্রায় ৩ হাজার মিলিয়ন (৩শ' কোটি) সূর্য রয়েছে এবং তার নিকটবর্তী সূর্যটি আমাদের পৃথিবী থেকে এত দূরে অবস্থান করছে যে, তার আলো এখানে পৌঁছুতে ৪ বছর সময় লাগে। তারপর এ ছায়াপথই সমগ্র বিশ্ব-জাহান নয়। বরং এতদিনকার পর্যবেক্ষণ থেকে অনুমান করা হয়েছে যে, প্রায় ২০ লক্ষ নীহারিকাপুঞ্জের মধ্যে এটিও একটি এবং এদের নিকটতম নীহারিকা আমাদের থেকে এত বেশী দূরত্বে অবস্থিত যে, তার আলো আমাদের পৃথিবীতে পৌঁছুতে ১০ লক্ষ বছর লাগে। আর আমাদের অত্যাধুনিক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সবচেয়ে দূরের যে নীহারিকা দৃষ্টিগোচর হয় তার আলো দুনিয়ায় পৌঁছতে ১০ কোটি বছর লাগে। এরপরও মানুষ সমগ্র বিশ্ব-জাহান দেখে নিয়েছে, একথা বলা যায় না। আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের সামান্যতম অংশমাত্র এতদিন পর্যন্ত মানুষ পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছে। সামনের দিকে আরো অত্যাধুনিক পর্যবেক্ষণ উপকরণ উদ্ভাবিত ও সংগৃহিত হলে আরো কতো ব্যাপকতা মানুষের সামনে উন্মুক্ত হবে তা বলা সম্ভব নয়।

বিশ্ব-জাহান সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে পরিমাণ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয়, আমাদের এ ক্ষুদ্র পৃথিবীটি যেসব উপাদানে গঠিত এ সমগ্র বিশ্ব-জাহান সে একই উপাদানে গঠিত হয়েছে এবং এর মধ্যে আমাদের পৃথিবীর মতো একই নিয়ম সক্রিয় রয়েছে। নয়তো এ পৃথিবীতে বসে আমরা যে অতি দূরবর্তী বিশ্বগুলো পর্যবেক্ষণ করছি, তাদের দূরত্ব পরিমাপ করছি এবং তাদের গতির হিসেব কষছি এসব কোনক্রমেই সম্ভবপর হতো না। এসব কি একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ নয় যে, এ সমস্ত বিশ্ব-জাহান একই আল্লাহর সৃষ্টি এবং একই শাসকের রাজ্য? তারপর যে নিয়ম-শৃংখলা, প্রজ্ঞা-কলাকৌশল, দক্ষতা-শিল্পকারিতা ও সম্পর্ক-সম্বন্ধ এসব লাখো লাখো ছায়াপথ ও তাদের মধ্যে সঞ্চরণশীল শত শত কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে পাওয়া যায় তা দেখে কি

কোন বুদ্ধিমান মানুষ একথা কল্পনা করতে পারে যে, এসব কিছু আপনা-আপনিই হয়ে গেছে? এ নিয়ম-শৃংখলার পেছনে কি কোন ব্যবস্থাপক, এ কলা-কৌশলের পেছনে কোন জ্ঞানী কৌশলী, এ শিল্পকর্মের পেছনে কোন শিল্পী এবং এ সমন্বয় ও সম্পর্কের পেছনে কোন পরিকল্পনাকারী নেই?

৩৮. ভরা নৌযান মানে নূহ আলাইহিস সালামের নৌযান। আর মানব বংশধরদেরকে তাতে আরোহণ করিয়ে দেবার অর্থ হচ্ছে এই যে, এ নৌযানে বাহ্যত হযরত নূহের কয়েকজন সাথীই বসেছিলেন ঠিকই কিন্তু আসলে তাতে আরোহণ করেছিল কিয়ামত পর্যন্ত জন্মলাভকারী সমস্ত মানুষ। কারণ নূহের তূফানে তাদেরকে ছাড়া বাকি সমস্ত মানুষকে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল এবং পরবর্তী মানব বংশধারা এ নৌযান আরোহীদের থেকে শুরু হয়েছিল।

৩৯. এ থেকে এ ইংগিত পাওয়া যায় যে, ইতিহাসে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের নৌকাটিই ছিল প্রথম নৌকা। এর পূর্বে নদী ও সাগর পার হবার কোন উপায় মানুষ জানতো না। মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম হযরত নূহকে (আ) এ উপায়টি শেখান। তাঁর তৈরি করা নৌকায় চড়ে যখন আল্লাহর কিছু বান্দা প্লাবন ও জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে রক্ষা পায় তখন পরবর্তীকালে তাদের বংশধররা সামুদ্রিক সফরের জন্য নৌযান তৈরি করতে থাকে।

৪০. আগের নিদর্শনগুলো উল্লেখ করা হয়েছিল তাওহীদের সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ হিসেবে, আর এখানে এ নিদর্শনটির উল্লেখ করা হয়েছে এ ধারণা দান করার জন্য যে, প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহার করার যে ক্ষমতাও মানুষকে দেয়া হয়েছে তা সবই আল্লাহ প্রদত্ত, মানুষ নিজেই সেগুলো অর্জন করেনি। আর এ শক্তিগুলো ব্যবহার করার যে পদ্ধতি সে উদ্ভাবন করেছে তাও আল্লাহর পথনির্দেশনার মাধ্যমেই তার জ্ঞানের আওতাধীন হয়েছে, এগুলো তার নিজের উদ্ভাবন নয়। নিজ শক্তিতে এ বিশাল শক্তিগুলোকে বিজিত করার ক্ষমতা মানুষের ছিল না। প্রকৃতির রহস্য সন্ধান করা এবং তার শক্তিগুলোকে কাজে লাগাবার যোগ্যতাও তার ছিল না, তারপর যে শক্তিগুলোর ওপর আল্লাহ তাকে কর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে যতক্ষণ আল্লাহ তাদেরকে তার নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান। অন্যথায় আল্লাহর ইচ্ছা যখন ভিন্নতর হয় তখন যেসব শক্তি মানুষের সেবা করে চলছিল সেগুলো অকস্মাত তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মানুষ নিজেকে তাদের সামনে সম্পূর্ণ অসহায় দেখতে পায়। এ সত্যটি সম্পর্কে সজাগ করার জন্য আল্লাহ সামুদ্রিক সফরের ব্যাপারটিকে নিছক নমুনা হিসেবে পেশ করেছেন। আল্লাহ হযরত নূহকে যদি নৌকা তৈরি করার পদ্ধতি না শিখিয়ে দিতেন এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তারা তাতে আরোহণ না করতো তাহলে প্লাবনে সমগ্র মানব জাতি ধ্বংস হয়ে যেতো। তারপর আল্লাহর কাছ থেকে নৌকা নির্মাণের কায়দা-কানুন শিখে নিয়ে লোকেরা নদী ও সাগর অতিক্রম করার যোগ্যতা অর্জন করে। এর ফলে মানব জাতি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম হয়। কিন্তু এ প্রথম পর্ব থেকে আজকের বিশাল আকার জাহাজ নির্মাণ পর্যন্ত মানুষ যতদূর উন্নতি সাধন করেছে এবং নৌযান পরিচালনার ক্ষেত্রে

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾ وَمَا
تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا قِيلَ
لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ
مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾

এদেরকে যখন বলা হয়, তোমাদের সামনে যে পরিণাম আসছে এবং যা তোমাদের পেছনে অতিক্রান্ত হয়েছে তার হাত থেকে বাঁচো,[৪১] হয়তো তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে (তখন এরা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়)। এদের সামনে এদের রবের আয়াতসমূহের মধ্য থেকে যে আয়াতই আসে এরা সেদিকে দৃষ্টি দেয় না।[৪২] এবং যখন এদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তোমাদের যে রিযিক দান করেছেন তার মধ্য থেকে কিছু আল্লাহর পথে খরচ করো তখন এসব কুফরীতে লিপ্ত লোক মু'মিনদেরকে জবাব দেয়, "আমরা কি তাদেরকে খাওয়াবো, যাদেরকে আল্লাহ চাইলে নিজেই খাওয়াতেন? তোমরা তো পরিষ্কার বিভ্রান্তির শিকার হয়েছো।"[৪৩]

যতটুকুই নিপুণতা ও দক্ষতা অর্জন করেছে তা সত্ত্বেও সে এ দাবী করতে পারে না যে, নদী ও সাগর সবই তার নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে এবং তাদের ওপর সে পুরোপুরি বিজয় লাভ করেছে। আজো আল্লাহর পানি আল্লাহরই কুদরতের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং যখনই তিনি চান মানুষকে তার জাহাজসহ তার বুকে ডুবিয়ে দেন।

৪১. অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিরা যা দেখেছে।

৪২. আয়াত বলতে আল্লাহর কিতাবের আয়াতই বুঝানো হয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে মানুষকে উপদেশ দেয়া হয় আবার এমন নিদর্শনাবলীও বুঝানো হয়েছে যেগুলো প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ ও মানুষের নিজের অস্তিত্ব ও তার ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যায়। এসব মানুষকে শিক্ষা দান করে। তবে এ জন্য অবশ্যই মানুষের শিক্ষা গ্রহণ করার মানসিকতা থাকা জরুরী।

৪৩. এর মাধ্যমে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, কুফরী কেবল তাদের দৃষ্টিশক্তিকেই অন্ধ করে দেয়নি বরং তাদের নৈতিক অনুভূতিকেও নির্জীব করে দিয়েছে। তারা আল্লাহর ব্যাপারেও সঠিক চিন্তা-ভাবনা করে না এবং আল্লাহর সৃষ্টির সাথেও যথার্থ ব্যবহার করে না। তাদের কাছে রয়েছে প্রত্যেক উপদেশের উল্টা জবাব। প্রত্যেক পথভ্রষ্টতা ও অসদাচরণের জন্য একটি বিপরীত দর্শন। প্রত্যেক সৎকাজ থেকে দূরে থাকার জন্য একটি মনগড়া বাহানা তাদের কাছে তো রয়েছেই।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا
صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾

এরা[৪৪] বলে, "এ কিয়ামতের হুমকি কবে পুরা হবে? বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?"[৪৫] আসলে এরা যে জিনিসের দিকে তাকিয়ে আছে তা তো একটি বিস্ফোরণের শব্দ, য সহসা এদেরকে ঠিক এমন অবস্থায় ধরে ফেলবে যখন এরা (নিজেদের পার্থিব ব্যাপারে) বিবাদ করতে থাকবে এবং সে সময় এরা কোন অসিয়াতও করতে পারবে না এবং নিজেদের গৃহেও ফিরতে পারবে না।[৪৬]

৪৪. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কাফেরদের মধ্যে তাওহীদের পরে আর যে বিষয়টি নিয়ে বিরোধ চলছিল সেটি ছিল আখেরাত। এ সম্পর্কিত বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি অবশ্যই সামনের দিকে আলোচনার শেষ পর্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু যুক্তি উপস্থাপনের পূর্বে এখানে এ বিষয়টির ভিত্তিতে তাদের সামনে আখেরাতের একটি শিক্ষণীয় চিত্র অংকন করা হয়েছে। এর ফলে তারা জানতে পারবে, যে বিষয়টি তারা অস্বীকার করছে তা তাদের অস্বীকার করার ফলে মূলতবী হয়ে যাবে না বরং অনিবার্যভাবে একদিন তাদের এসব অবস্থার সম্মুখীন হতে হবেই।

৪৫. এ প্রশ্নের অর্থ এ ছিল না যে, যথার্থই তারা কিয়ামতের আসার তারিখ জানতে চায় এবং যদি তাদেরকে জানানো হতো, অমুক বছরের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিয়ামত হবে তাহলে তাদের সন্দেহ দূর হয়ে যেতো এবং তারা তা মেনে নিতো। আসলে এ ধরনের প্রশ্ন তারা করতো নিছক চ্যালেঞ্জের ঢংয়ে কূটতর্ক করার জন্য। এ ব্যাপারে তারা একথা বলতে চাচ্ছিল যে, কোন কিয়ামত টিয়ামত হবে না, তোমরা খামখা আমাদের ভয় দেখাচ্ছো। এ কারণে তাদের জবাবে বলা হয়নি, কিয়ামত অমুক দিন আসবে বরং তাদেরকে বলা হয়েছে, তা আসবে এবং প্রচণ্ড শক্তিতে আসবে।

৪৬. অর্থাৎ কিয়ামত আস্তে আস্তে ধীরে-সুস্থে আসবে এবং লোকেরা তাকে আসতে দেখবে, এমনটি হবে না। বরং তা এমনভাবে আসবে যখন লোকেরা পূর্ণ নিশ্চিন্ততা সহকারে নিজেদের কাজ কারবারে মশগুল থাকবে এবং তাদের মনের ক্ষুদ্রতম কোণেও এ চিন্তা জাগবে না যে, দুনিয়ার শেষ সময় এসে গেছে। এ অবস্থায় অকস্মাত একটি বিরাট বিস্ফোরণ ঘটবে এবং যে যেখানে থাকবে সেখানেই খতম হয়ে যাবে।

হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) ও হযরত আবু হুরাইরার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ লোকেরা পথে চলাফেরা করবে, বাজারে কেনাবেচা করতে থাকবে, নিজেদের মজলিসে বসে আলাপ আলোচনা করতে থাকবে, এমন সময় হঠাৎ শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। কেউ কাপড়

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا
يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ
الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا
مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ﴿٥٥﴾

৪ রুকূ'

—তারপর একটি শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং সহসা তারা নিজেদের রবের সামনে হাজির হবার জন্য নিজেদের কবর থেকে বের হয়ে পড়বে।[৪৭] ভীত হয়ে বলবে, "আরে, কে আমাদেরকে আমাদের নিদমহল থেকে উঠিয়ে দাঁড় করালো?"[৪৮]

—"এটা সে জিনিস যার প্রতিশ্রুতি দয়াময় আল্লাহ দিয়েছিলেন এবং রসূলদের কথা সত্য ছিল।"[৪৯] একটিমাত্র প্রচণ্ড আওয়াজ হবে এবং সবকিছু আমার সামনে হাজির করে দেয়া হবে।

আজ কারো[৫০] প্রতি তিলমাত্র জুলুম করা হবে না এবং যেমন কাজ তোমরা করে এসেছ ঠিক তারই প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে—জান্নাতীরা আজ আনন্দে মশগুল রয়েছে।[৫১]

কিনছিল। হাত থেকে রেখে দেবার সময়টুকু পাবে না, সে শেষ হয়ে যাবে। কেউ নিজের পশুগুলোকে পানি পান করাবার জন্য জলাধার ভর্তি করবে এবং তখনো পানি পান করানো শুরু করবে না তার আগেই কিয়ামত হয়ে যাবে। কেউ খাবার খেতে বসবে এবং এক গ্রাস খাবার মুখ পর্যন্ত নিয়ে যাবার সুযোগও পাবে না।

৪৭. শিংগা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা-হা, ৭৮ টীকা। শিংগার প্রথম ফুঁৎকার ও দ্বিতীয় ফুঁৎকারের মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান হবে, এ ব্যাপারে আমাদের কাছে কোন তথ্য নেই। এ সময়টা শত শত ও হাজার হাজার বছর দীর্ঘ হতে পারে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ইসরাফীল শিংগায় মুখ লাগিয়ে আরশের দিকে তাকিয়ে আছেন এবং কখন ফুঁৎকার দেবার হুকুম হয় তার অপেক্ষা করছেন। শিংগায় তিনবার ফুঁক দেয়া হবে। প্রথমটি হবে نفخة الفزع এটি পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত

সৃষ্টিকে হতবিহ্বল করে দেবে। দ্বিতীয়টি হবে نفخة الصعق এটি শোনার সাথে সাথেই সবাই মরে পড়ে যাবে। তারপর যখন একমাত্র ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী আল্লাহ ছাড়া আর কেউ থাকবে না তখন পৃথিবীকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে দেয়া হবে। উক্কাযের বাজারের সমতল ভূমির মতো তাকে এমনভাবে সমতল করা হবে যে, তার মধ্যে সামান্য একটু ভাঁজও কোথাও পড়ে থাকবে না। তারপর আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে একটি বিকট ধমক দেবেন আর তা শুনতেই প্রত্যেক ব্যক্তিই যেখানে সে মরে পড়ে গিয়েছিল সেখানকার পরিবর্তিত জমি থেকেই উঠে দাঁড়াবে। এটিই শেষ ফুঁক বলে পরিচিত। এর নাম হবে نفخة القيام لرب العالمين কুরআন মজীদের বিভিন্ন ইশারা-ইংগিত থেকে এ বিষয়বস্তুটিরই প্রতি সমর্থন পাওয়া গেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইবরাহীম, ৫৬-৫৭ ও সূরা ত্বা-হা, ৮২-৮৩ টীকা।

৪৮. অর্থাৎ তখন তাদের এ অনুভূতিই থাকবে না যে, তারা মরে গিয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে এখন আবার তাদেরকে জীবিত করে উঠানো হয়েছে। বরং তারা এ চিন্তায় মগ্ন থাকবে যে, তারা ঘুমিয়েছিল, এখন হঠাৎ কোন ভয়াবহ দুর্ঘটনার কারণে জেগে উঠেছে এবং ছুটে চলছে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা-হা ৭৮ এবং ইবরাহীম, ১৮ টীকা)

৪৯. কে এ জবাব দেবে, তা এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়নি। হতে পারে কিছুক্ষণ পরে তারা নিজেরাই বিষয়টির প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে এবং মনে মনে বলবে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, এ তো সে জিনিসই যার খবর আল্লাহর রসূল আমাদের দিতেন এবং আমরা তাঁকে মিথ্যুক বলতাম। আবার এও হতে পারে, মু'মিনরা তাদের বিভ্রান্তি দূর করে দেবে এবং তাদেরকে জানাবে, এটা ঘুম থেকে জেগে ওঠা নয় বরং মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জীবন। তাছাড়া এও হতে পারে যে, কিয়ামতের সমগ্র পরিবেশ তাদেরকে এ জবাব দেবে অথবা ফেরেশতারা তাদেরকে প্রকৃত অবস্থা জানাবে।

৫০. কাফের, মুশরিক, ফাসেক ও অপরাধীদেরকে যখন আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে তখন আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যে এ ভাষণ দেবেন।

৫১. এ বক্তব্য অনুধাবন করার জন্য প্রথমে মনে রাখতে হবে যে, সৎকর্মশীল মু'মিনদেরকে হাশরের ময়দানে আটকে রাখা হবে না বরং শুরুতেই তাদেরকে কোন প্রকার হিসেব-নিকেশ ছাড়াই অথবা সামান্য হাল্কা হিসেব গ্রহণ করার পর জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। কারণ তাদের রেকর্ড হবে পরিষ্কার। আদালত চলাকালীন সময়ে তাদেরকে অপেক্ষা করার কষ্ট বরদাশ্‌ত করার কোন প্রয়োজন হবে না। তাই মহান আল্লাহ হাশরের ময়দানে জবাবদিহিকারী অপরাধীদেরকে বলবেন, দেখো, যেসব সৎলোককে তোমরা দুনিয়ায় বোকা মনে করে বিদ্রূপ করতে তারা নিজেদের বুদ্ধিমত্তার কারণে আজ জান্নাতে বসে আরাম করছে এবং তোমরা যারা নিজেদেরকে অতি বুদ্ধিমান ও চালাক-চতুর মনে করতে তারা আজ দেখো কেমন এখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের অপরাধের জন্য জবাবদিহি করছো।

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ
وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ
أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ
أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي
كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾

তারা ও তাদের স্ত্রীরা ঘন ছায়ায় রাজকীয় আসনে হেলান দিয়ে বসে আছে। সবরকমের সুস্বাদু পানাহারের জিনিস তাদের জন্য সেখানে রয়েছে, যা কিছু তারা চাইবে তা তাদের জন্য হাজির রয়েছে। দয়াময় রবের পক্ষ থেকে তাদেরকে "সালাম" বলা হয়েছে —এবং হে অপরাধীরা! আজ তোমরা ছাঁটাই হয়ে আলাদা হয়ে যাও।[৫২] হে আদম সন্তানেরা! আমি কি তোমাদের এ মর্মে হিদায়াত করিনি যে, শয়তানের বন্দেগী করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু এবং আমারই বন্দেগী করো, এটিই সরল-সঠিক পথ?[৫৩] কিন্তু এ সত্ত্বেও সে তোমাদের মধ্য থেকে বিপুল সংখ্যককে গোমরাহ করে দিয়েছে, তোমাদের কি বুদ্ধি-জ্ঞান নেই?[৫৪] এটা সে জাহান্নাম, যার ভয় তোমাদের দেখানো হতো। দুনিয়ায় যে কুফরী তোমরা করতে থেকেছো তার ফলস্বরূপ আজ এর ইন্ধন হও।

৫২. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, সৎকর্মশীল মু'মিনদের থেকে ছাঁটাই হয়ে আলাদা হয়ে যাও। কারণ দুনিয়ায় তোমরা তাদের সম্প্রদায়, পরিবার ও গোষ্ঠীর অন্তরভুক্ত থাকলে থাকতে পারো, কিন্তু এখানে এখন তোমাদের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমরা নিজেদের মধ্যে আলাদা হয়ে যাও। এখন তোমাদের কোন দল ও জোট থাকতে পারে না। তোমাদের সমস্ত দল ভেঙে দেয়া হয়েছে। তোমাদের সকল প্রকার সম্পর্ক ও আত্মীয়তা খতম করে দেয়া হয়েছে। তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এখন একাকী ব্যক্তিগতভাবে নিজের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

৫৩. এখানে আবার আল্লাহ "ইবাদাত"কে আনুগত্য অর্থে ব্যবহার করেছেন। ইতিপূর্বে তাফহীমুল কুরআনে আমি বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছি। (দেখুন আল বাকারাহ, ১৭০; আন নিসা, ১৪৫; আল আনআম, ৮৭ ও ১০৭; আত্ তাওবা, ৩১; ইবরাহীম, ৩২;

আল কাহ্‌ফ, ৫০; মারয়াম, ২৭; আল কাসাস, ৮৬ এবং সাবা, ৬৩ টীকা) এ প্রসংগে এ আয়াতটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম রাযী তাঁর তাফসীরে কবীরে যে চমৎকার আলোচনা করেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ মানে হচ্ছে لَا تطيعوه (তার আনুগত্য করো না)। এর সপক্ষে যুক্তি হচ্ছে, তাকে নিছক সিজদা করাই নিষিদ্ধ নয় বরং তার আনুগত্য করা এবং তার হুকুম মেনে চলাও নিষিদ্ধ। কাজেই আনুগত্য হচ্ছে ইবাদাত। এরপর ইমাম সাহেব এ প্রশ্ন করেছেন, যদি ইবাদাতের অর্থ হয় আনুগত্য তাহলে, اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ আয়াতে আমাদের কি রসূল ও কর্তৃত্বশীলদের ইবাদাত করার হুকুম দেয়া হয়েছে? তারপর এ প্রশ্নের জবাব তিনি এভাবে দিয়েছেন ঃ "তাঁদের আনুগত্য যখন আল্লাহর হুকুমে করা হয় তখন তা আল্লাহরই ইবাদাত এবং তাঁরই আনুগত্য হবে। দেখছেন না, ফেরেশ্‌তারা আল্লাহর হুকুমে আদমকে সিজদা করলো এবং এটি আল্লাহর ছাড়া আর কারো ইবাদাত ছিল না। কর্তৃত্বশীলদের আনুগত্য একমাত্র তখনই তাদের ইবাদাত হতে পারে যখন এমন ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করা হবে যে ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করার হুকুম আল্লাহ দেননি।" তারপর বলেন, "তোমার সামনে যদি কোন লোক আসে এবং তোমাকে কোন জিনিসের হুকুম দেয় তাহলে দেখো তার এ হুকুম আল্লাহর হুকুমের অনুসারী কিনা। অনুসারী না হলে শয়তান সে লোকদের সহযোগী হয়েছে। যদি এ অবস্থায় তুমি তার আনুগত্য করো তাহলে তুমি তার ও তার শয়তানের ইবাদাত করলে। অনুরূপভাবে তোমার নিজের প্রবৃত্তি যদি তোমাকে কোন কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে তাহলে এ ক্ষেত্রে শরীয়াতের দৃষ্টিতে সে কাজটি করার অনুমতি আছে কিনা দেখো। অনুমতি না থাকলে তোমার প্রবৃত্তি নিজেই শয়তান হয়ে গেছে অথবা শয়তান তার সহযোগী হয়েছে এ অবস্থায় যদি তুমি তার আনুগত্য করো তাহলে তুমি তার ইবাদাত করলে।" সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে তিনি আবার বলেছেন, "কিন্তু শয়তানের ইবাদাত করার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। কখনো এমন হয়, মানুষ একটি কাজ করে এবং তার অংগ-প্রত্যংগের সাথে সাথে তার কণ্ঠও তার সহযোগী হয় এবং মনও তার সাথে অংশ গ্রহণ করে। আবার কখনো এমনও হয়, অংগ-প্রত্যংগের সাহায্যে মানুষ একটি কাজ করে কিন্তু অন্তর ও কণ্ঠ সে কাজে তার সহযোগী হয় না। কেউ কেউ এমন অবস্থায় একটি গোনাহ করে, যখন তার অন্তর তাতে সায় দেয় না এবং তার কণ্ঠ সে জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, এ অবস্থায় সে স্বীকার করে আমি এ খারাপ কাজ করছি। এ হচ্ছে নিছক বাইরের অংগ-প্রত্যংগের সাহায্যে শয়তানের ইবাদাত। আবার এমন কিছু লোকও আছে যারা ঠাণ্ডা মাথায় অপরাধ করে এবং মুখেও নিজেদের এ কাজে আনন্দ ও সন্তোষ প্রকাশ করে। ....এরা ভিতরে বাইরে উভয় পর্যায়ে শয়তানের ইবাদাতকারী।" (তাফসীরে কবীর, ৭ খণ্ড, ১০৩-১০৪ পৃষ্ঠা)

৫৪. অর্থাৎ যদি তোমরা বুদ্ধি-জ্ঞান বঞ্চিত হতে এবং তারপর নিজেদের রবকে ত্যাগ করে তোমাদের শত্রুদের ইবাদাত করতে তাহলে তোমাদের জন্য কোন ওজরের অবকাশ ছিল না। কিন্তু তোমাদের কাছে তো আল্লাহ প্রদত্ত বুদ্ধি-জ্ঞান ছিল! তার মাধ্যমে তোমরা দুনিয়ার সমস্ত কাজ-কারবার করে চলছিলে এবং আল্লাহ তোমাদের পয়গম্বরদের মাধ্যমে সতর্কও করে দিয়েছিলেন। এরপরও যখন তোমরা তোমাদের শত্রুদের প্রতারণা জালে আবদ্ধ হয়েছো এবং তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে তখন নিজেদের বোকামির দায়-দায়িত্ব থেকে তোমরা কোনক্রমেই মুক্ত হতে পারো না।

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا
كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ
فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا
مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾

আজ আমি এদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি, এদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং এদের পা সাক্ষ দেবে এরা দুনিয়ায় কি উপার্জন করে এসেছে।[৫৫]

আমি চাইলে এদের চোখ বন্ধ করে দিতাম, তখন এরা পথের দিকে চেয়ে দেখতো, কোথা থেকে এরা পথের দেখা পাবে? আমি চাইলে এদের নিজেদের জায়গায়ই এদেরকে এমনভাবে বিকৃত করে রেখে দিতাম যার ফলে এরা না সামনে এগিয়ে যেতে পারতো, না পেছনে ফিরে আসতে পারতো।[৫৬]

৫৫. যে উদ্ধত অপরাধীরা তাদের অপরাধ মেনে নিতে অস্বীকার করবে, সাক্ষীদেরকে মিথ্যা বলবে এবং আমলনামার নির্ভুলতাও মেনে নেবে না, তাদের ব্যাপারে এ ফায়সালা দেয়া হবে। তখন আল্লাহ হুকুম দেবেন, ঠিক আছে, তোমাদের বাজে কথা বন্ধ করো এবং এখন দেখো তোমাদের নিজেদের শরীরের অংগ-প্রত্যংগ তোমাদের কৃতকর্মের কি বর্ণনা দেয়। এ প্রসংগে এখানে কেবলমাত্র হাত ও পায়ের সাক্ষদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে, তাদের চোখ, কান, জিহ্বা এবং শরীরের চর্মও তাদেরকে দিয়ে যেসব কাজ করানো হয়েছে সেগুলোর পূর্ণ বিবরণ শুনিয়ে দেবে ঃ

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ (النور : ٢٤)

حَتّٰٓى اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ
بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (حم السجده : ٢٠)

এখানে এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, একদিকে আল্লাহ বলেন, আমি এদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেবো এবং অন্যদিকে সূরা নূরের আয়াতে বলেন, এদের কণ্ঠ সাক্ষ দেবে— এ দু'টি বক্তব্যের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যাবে? এর জবাব হচ্ছে, কণ্ঠ রুদ্ধ করার অর্থ হলো, তাদের কথা বলার ক্ষমতা কেড়ে নেয়া। অর্থাৎ এরপর তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের মর্জি মাফিক কথা বলতে পারবে না। আর কণ্ঠের সাক্ষদানের অর্থ হচ্ছে, পাপিষ্ঠ লোকেরা

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ
وَمَا يَنبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿٦٩﴾ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا
وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾

৫ রুকূ'

যে ব্যক্তিকে আমি দীর্ঘ আয়ু দান করি তার আকৃতিকে আমি একেবারেই বদলে দেই[৫৭] (এ অবস্থা দেখে কি) তাদের বোধোদয় হয় না?

আমি এ (নবী)-কে কবিতা শিখাইনি এবং কাব্য চর্চা তার জন্য শোভনীয়ও নয়।[৫৮] এ তো একটি উপদেশ এবং পরিষ্কার পঠনযোগ্য কিতাব, যাতে সে প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিকে সতর্ক করে দিতে পারে[৫৯] এবং অস্বীকারকারীদের ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

তাদেরকে কোন্ কোন্ কাজে লাগিয়েছিল, তাদের মাধ্যমে কেমন সব কুফরী কথা বলেছিল, কোন্ ধরনের মিথ্যা উচ্চারণ করেছিল, কতপ্রকার ফিত্না সৃষ্টি করেছিল এবং কোন্ কোন্ সময় তাদের মাধ্যমে কোন্ কোন্ কথা বলেছিল সেসব বিবরণ তাদের কণ্ঠ স্বতস্ফূর্তভাবে দিয়ে যেতে থাকবে।

৫৬. কিয়ামতের চিত্র অংকন করার পর এখন এদেরকে জানানো হচ্ছে, এ কিয়ামত তো তোমাদের কাছে দূরের জিনিস বলে মনে হচ্ছে কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো, এ দুনিয়ায় যে জীবনের জন্য তোমরা অহংকারে স্ফীত হচ্ছো, তোমরা কিভাবে আল্লাহর বিপুল শক্তির হাতে অসহায় হয়ে আছো। যে চোখের দৃষ্টিশক্তির কারণে তোমরা দুনিয়ার সমস্ত কাজ করে যাচ্ছো আল্লাহর একটিমাত্র ইশারায় তা অন্ধ হয়ে যেতে পারে। যে পায়ের ওপর ভর করে তোমরা এসব দৌড়াদৌড়ি ও চেষ্টা-তদবীর চালাচ্ছো, আল্লাহর একটিমাত্র হুকুমে অকস্মাত তা অবশ হয়ে যেতে পারে। আল্লাহর দেয়া এ শক্তিগুলো যতক্ষণ কাজ করতে থাকে ততক্ষণ তোমরা আত্মশক্তির বিভ্রমে মশগুল হয়ে থাকো। কিন্তু যখন এদের মধ্য থেকে কোন একটি শক্তিও বিকল হয়ে পড়ে, তখন তোমাদের শক্তির বহর বুঝতে আর তোমাদের মোটেই বেগ পেতে হয় না।

৫৭. আকৃতি বদলে দেয়ার মানে হচ্ছে, বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ মানুষের অবস্থা শিশুদের মতো করে দেন। ঠিক শিশুদের মতোই তারা চলতে ফিরতে অক্ষম হয়ে পড়ে। অন্যেরা তাদেরকে উঠাতে বসাতে ও সহায়তা দিয়ে চলাফেরা করাতে থাকে। অন্যেরা তাদেরকে পানাহার করায়। তারা নিজেদের কাপড়ে ও বিছানায় পেশাব পায়খানা করে দেয়। বালসুলভ কথা বলতে থাকে, যা শুনে লোকেরা হেসে ওঠে। মোট কথা যে ধরনের দুর্বলতার মধ্য দিয়ে তারা দুনিয়ার জীবন শুরু করেছিল, জীবন সায়াহ্নে প্রায় সেই একই অবস্থায় পৌঁছে যায়।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا
مَالِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ
فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ
آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ
مُّحْضَرُونَ ﴿٧٥﴾ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا
يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾

এরা কি দেখে না, আমি নিজের হাতে তৈরি জিনিসের[৬০] মধ্য থেকে এদের জন্য সৃষ্টি করেছি গবাদি পশু এবং এখন এরা তার মালিক। আমি এভাবে তাদেরকে এদের নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দিয়েছি যে, তাদের মধ্য থেকে কারো ওপর এরা সওয়ার হয়, কারো গোশত খায় এবং তাদের মধ্যে এদের জন্য রয়েছে নানা ধরনের উপকারিতা ও পানীয়। এরপর কি এরা কৃতজ্ঞ হয় না?[৬১] এ সবকিছু সত্ত্বেও এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে এবং এদেরকে সাহায্য করা হবে এ আশা করছে। তারা এদের কোন সাহায্য করতে পারে না বরং উল্টো এরা তাদের জন্য সদা প্রস্তুত সৈন্য হয়ে বিরাজ করছে।[৬২] হাঁ, এদের তৈরি কথা যেন তোমাকে মর্মাহত না করে এদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কথাই আমি জানি।[৬৩]

৫৮. কাফেররা তাওহীদ, আখেরাত, মৃত্যুপরের জীবন ও জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাকে নিছক কাব্য কথা গণ্য করে নিজেরা তাকে গুরুত্বহীন করে দেবার যে প্রচেষ্টা চালাতো এখানে তারই জবাব দেয়া হয়েছে।

৫৯. জীবন বলতে চিন্তাশীল ও বিবেকবান মানুষ বুঝানো হয়েছে। যার অবস্থা পাথরের মতো নির্জীব ও নিষ্ক্রিয় নয়। আপনি তার সামনে যতই যুক্তি সহকারে হক ও বাতিলের পার্থক্য বর্ণনা করেন না কেন এবং যতই সহানুভূতি সহকারে তাকে উপদেশ দেন না কেন সে কিছুই শোনে না, বোঝে না এবং নিজের জায়গা থেকে একটুও নড়ে না।

৬০. হাত শব্দটি আল্লাহর জন্যে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এর অর্থ এ নয় যে, নাউযুবিল্লাহ পবিত্র ও মহান আল্লাহ শরীর ও দেহাবয়বের অধিকারী এবং মানুষের মতো হাত দিয়ে কাজ করেন। বরং এর মাধ্যমে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, এ জিনিসগুলো আল্লাহ নিজেই তৈরি করেছেন এবং এগুলোর সৃষ্টিকর্মে অন্য কারো সামান্যতমও অংশ নেই।

৬১. নিয়ামতকে নিয়ামতদাতা ছাড়া অন্য কারো দান মনে করা, এ জন্য অন্য কারো অনুগ্রহভাজন হওয়া এবং নিয়ামতদাতা ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে নিয়ামতলাভের আশা করা অথবা নিয়ামত চাওয়া, এ সবকিছুই নিয়ামত অস্বীকারেরই নামান্তর। অনুরূপভাবে নিয়ামতদাতার প্রদত্ত নিয়ামতকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার করলেও নিয়ামত অস্বীকার করাই হয়। কাজেই একজন মুশরিক ও কাফের এবং মুনাফিক ও ফাসেক নিছক মুখে ধন্যবাদ শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহর শোকরগুজার বান্দা গণ্য হতে পারে না। এ জন্তু-জানোয়ারগুলোকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, একথা মেনে নিতে মক্কার কাফেররা অস্বীকার করতো না। তাদের একজনও এগুলোর সৃষ্টির ব্যাপারে অন্য উপাস্যদের হাত আছে বলে দাবী করতো না। কিন্তু এ সবকিছু মেনে নেবার পরও যখন তারা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের জন্য নিজেদের উপাস্য দেবতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো, তাদের সামনে নজরানা পেশ করতো এবং আরো নিয়ামত দান করার জন্য তাদের কাছে প্রার্থনা করতো, এ সংগে তাদের জন্য বলিদান করতে থাকতো, তখন আল্লাহর কাছে তাদের মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়তো। এ জন্যই আল্লাহ তাদেরকে নিয়ামত অস্বীকারকারী ও অকৃতজ্ঞ বলে অভিহিত করছেন।

৬২. অর্থাৎ ঐ মিথ্যা উপাস্য দেবতারা নিজেরাই তাদের অস্তিত্ব, টিকে থাকা, সংরক্ষণ ও প্রয়োজন পূরণের জন্য এসব পূজা উপাসনাকারীর মুখাপেক্ষী। এ সেনাবাহিনী ছাড়া তাদের খোদায়ী এক দিনও চলে না। এরা তাদের সার্বক্ষণিক উপস্থিত দাস। এরা তাদের দরবার বানিয়ে ও সাজিয়ে রাখছে। এরা তাদের পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে বেড়াচ্ছে। এরা আল্লাহর বান্দাদেরকে তাদের ভক্তে-অনুরক্তে পরিণত করছে। তাদের সমর্থনে এরা ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ করছে। তারপরই তাদের খোদায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়। নয়তো কেউ তাদের কথা জিজ্ঞেসও করতো না। তারা আসল খোদা নয়। কেউ তাদেরকে মেনে নিক বা না মেনে নিক তারা নিজ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সমগ্র বিশ্ব-জাহানে কর্তৃত্ব চালিয়ে যাবে, এমন ক্ষমতা তাদের নেই।

৬৩. সম্বোধন করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। গোপন ও প্রকাশ্য কথা বলে এদিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, মক্কার কাফেরদের বড় বড় সরদাররা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যার ঝড় সৃষ্টি করছিল। তারা ভালোভাবেই জানতো এবং নিজেদের ব্যক্তিগত মজলিসে একথা স্বীকার করতো যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে তারা যেসব অপবাদ দিচ্ছে সেগুলো একেবারেই ভিত্তিহীন। তারা লোকদের মনে তাঁর বিরুদ্ধে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করার জন্য তাঁকে কবি, গণক, যাদুকর, পাগল এবং আরো নাজানি কত কি বলতো। কিন্তু তাদের নিজেদের বিবেক একথা মানতো এবং তারা পরস্পরের সামনে স্বীকারও করতো যে, এসব ডাহা মিথ্যা কথা এবং নিছক তাঁর দাওয়াতকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তারা এগুলো তৈরি করছে। তাই আল্লাহ তাঁর নবীকে বলছেন, এদের বাজে কথায় মন খারাপ করো না। যারা মিথ্যা দিয়ে সত্যের মোকাবিলা করে তারা শেষ পর্যন্ত এ দুনিয়ায়ও ব্যর্থ হবে এবং আখেরাতেও নিজেদের অশুভ পরিণতি দেখে নেবে।

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾
وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ
رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ
عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ
تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ
أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ
إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِي
بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

মানুষ[৬৪] কি দেখে না, তাকে আমি সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে এবং তারপর সে দাঁড়িয়ে গেছে স্পষ্ট ঝগড়াটে হয়ে?[৬৫] এখন সে আমার ওপর উপমা প্রয়োগ করে[৬৬] এবং নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়[৬৭] বলে, "এ হাড়গুলো যখন পচে গলে গেছে এতে আবার প্রাণ সঞ্চার করবে কে?" তাকে বলো, এদেরকে তিনি জীবিত করবেন যিনি প্রথমে এদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনি সৃষ্টির প্রত্যেকটি কাজ জানেন। তিনিই তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তা থেকে নিজেদের চুলা জ্বালিয়ে থাকো।[৬৮] যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন না? কেন নয়, যখন তিনি পারদর্শী স্রষ্টা। তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তাঁর কাজ হয় কেবল এতটুকু যে, তিনি তাকে হুকুম দেন, হয়ে যাও এবং তা হয়ে যায়। পবিত্র তিনি যার হাতে রয়েছে প্রত্যেকটি জিনিসের পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

৬৪. এবার কাফেরদের প্রশ্নের যুক্তিভিত্তিক জবাব দেয়া হচ্ছে। ৪৮ আয়াতে এ প্রশ্নটি উদ্ধৃত হয়েছে। "কিয়ামতের হুমকি কবে পূর্ণ হবে" তাদের এ প্রশ্ন এ জন্য ছিল না যে, তারা কিয়ামত আসার তারিখ জানতে চাচ্ছিল বরং এ জন্য ছিল যে, মৃত্যুর পর তারা মানুষদের পুনরবার উঠানোকে অসম্ভব বরং বুদ্ধি বিরোধী মনে করতো। তাই তাদের প্রশ্নের জবাবে আখেরাতের সম্ভাবনার পক্ষে যুক্তি পেশ করা হচ্ছে।

ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদাহ ও সাঈদ ইবনে জুবাইর বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, এ সময় মক্কার কাফের সরদারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি কবরস্তান থেকে কোন লাশের একটি গলিত হাড় নিয়ে আসে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে সেটি ভেঙে ফেলে এবং তার বিচূর্ণিত অংশগুলো বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে বলে, "হে মুহাম্মাদ, তুমি বলছো মৃতদেরকে আবার জীবিত করে উঠানো হবে। বলো, এ পচা-গলা হাড়গুলোকে আবার কে জীবিত করবে?" সংগে-সংগেই এ আয়াতগুলোতে এর জবাব দেয়া হয়।

৬৫. অর্থাৎ এমন শুক্রবিন্দু যার মধ্যে নিছক একটি প্রাথমিক জীবন-কীট ছাড়া আর কিছুই ছিল না, তাকে উন্নতি দান করে আমি এমন পর্যায়ে পৌছিয়ে দিয়েছি যার ফলে সে কেবল প্রাণীদের মতো চলাফেরা ও পানাহার করতে থাকেনি বরং এর থেকে অগ্রসর হয়ে তার মধ্যে চেতনা, বুদ্ধি-জ্ঞান এবং তর্ক-বিতর্ক, আলাপ-আলোচনা, যুক্তি প্রদর্শন করা ও বাগ্মীতার এমন সব যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে গেছে যা অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে নেই। এমন কি এখন সে নিজের স্রষ্টাকেও বিদ্রূপ করতে এগিয়ে আসছে।

৬৬. অর্থাৎ আমাকে সৃষ্টিকুলের মতো অক্ষম মনে করে এবং এ ধারণা পোষণ করে যে, মানুষ যেমন কোন মৃতকে জীবিত করতে পারে না ঠিক তেমনি আমিও পারি না।

৬৭. অর্থাৎ একথা ভুলে যায় যে, আমি নিষ্প্রাণ বস্তু থেকে এমন প্রাথমিক জীবন-কীট সৃষ্টি করেছি, যা তার সৃষ্টির উৎসে পরিণত হয়েছে এবং তারপর এ কীটকে লালন করে তাকে এত বড় করে দিয়েছি, যার ফলে সে আজ আমার সামনে কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

৬৮. এর অর্থ হচ্ছে, তিনি সবুজ বৃক্ষসমূহে এমন দাহ্যবস্তু রেখে দিয়েছেন যা ব্যবহার করে তোমরা কাঠের সাহায্যে আগুন জ্বালিয়ে থাকো। অথবা এর মাধ্যমে 'মারখ' ও 'আফার' নামক দু'টি গাছের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ গাছ দু'টির কাঁচা ডাল নিয়ে আরবের লোকেরা একটার ওপর আর একটাকে মারতো, ফলে তা থেকে আগুন ঝরে পড়তো। প্রাচীন যুগে গ্রামীণ আরবরা আগুন জ্বালাবার জন্য চকমকি হিসেবে এ ডাল ব্যবহার করতো এবং সম্ভবত আজো করে থাকে।

আস্ সা-ফ্ফা-ত

৩৭

নামকরণ

প্রথম আয়াতের والصافات শব্দ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বক্তব্য উপস্থাপনা পদ্ধতি থেকে মনে হয়, এ সূরাটি সম্ভবত মক্কী যুগের মাঝামাঝি সময়ে বরং সম্ভবত ঐ মধ্য যুগেরও শেষের দিকে নাযিল হয়। বর্ণনাভংগী থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, পশ্চাতভূমিতে বিরোধিতা চলছে প্রচণ্ড ধারায় এবং নবী ও তাঁর সাহাবীগণ অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছেন।

বিষয়বস্তু ও বক্তব্য বিষয়

সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদ ও আখেরাতের দাওয়াতের জবাব দেয়া হচ্ছিল নিকৃষ্ট ধরনের রঙ-তামাসা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের মাধ্যমে। তাঁর রিসালাতের দাবী জোরে-শোরে অস্বীকার করা হচ্ছিল। এ জন্য মক্কার কাফেরদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এবং শেষে তাদেরকে এ মর্মে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যে পয়গম্বরকে আজ তোমরা বিদ্রূপ করছো খুব শিগ্‌গির তোমাদের চোখের সামনেই তিনি তোমাদের ওপর বিজয় লাভ করবেন এবং তোমরা নিজেরাই আল্লাহর সেনাদলকে তোমাদের গৃহের আঙিনায় প্রবেশ করতে দেখবে। (১৭১-১৭৯ আয়াত) এমন এক সময় এ ঘোষণা দেয়া হয় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাফল্যের লক্ষণ বহু দূরেও কোথাও দৃষ্টিগোচর হয়নি। মুসলমানরা (যাদেরকে এ আয়াতে আল্লাহর সেনাদল বলা হয়েছে) ভয়াবহ জুলুম-নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। তাদের তিন-চতুর্থাংশ দেশ ত্যাগ করেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বড় জোর ৪০-৫০ জন সাহাবী মক্কায় থেকে গিয়েছিলেন এবং চরম অসহায় অবস্থার মধ্যে সবরকমের উৎপীড়ন-নিপীড়ন বরদাশত করে যাচ্ছিলেন। এহেন অবস্থায় বাহ্যিক কার্যকারণগুলো প্রত্যক্ষ করে কোন ব্যক্তি ধারণা করতে পারতো না যে, শেষ পর্যন্ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সহায় সম্বলহীন ক্ষুদ্র দলটি বিজয় লাভ করবে। বরং প্রত্যক্ষকারীরা মনে করছিল, এ আন্দোলনের সমাধি মক্কার পার্বত্য উপত্যকার মধ্যেই রচিত হয়ে যাবে। কিন্তু ১৫-১৬ বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হয়নি, মক্কা বিজয়ের সময় ঠিক সে একই ঘটনা ঘটে গেলো যে ব্যাপারে কাফেরদেরকে আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল।

সতর্কবাণী উচ্চারণ করার সাথে সাথে আল্লাহ এ সূরায় পুরোপুরি ভারসাম্য রক্ষা করে বুঝাবার ও উৎসাহিত-উদ্দীপিত করার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসের নির্ভুলতার সপক্ষে সংক্ষিপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী যুক্তি পেশ করেছেন। মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাসের সমালোচনা করে তারা কেমন বাজে অর্থহীন বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে সে সম্পর্কে তাদেরকে সজাগ করেছেন। তাদের এসব বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার ফল তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। এ সংগে ঈমান ও সৎকাজের ফল কত মহান ও গৌরবময় তা শুনিয়ে দিয়েছেন। তারপর এ প্রসংগে ইতিহাস থেকে এমন সব উদাহরণ তুলে ধরেছেন যা থেকে জানা যায় আল্লাহ তাঁর নবীদের এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের সাথে কি ব্যবহার করেছেন, নিজের বিশ্বস্ত বান্দাদেরকে তিনি কিভাবে পুরস্কৃত করেছেন এবং কিভাবে তাদের প্রতি মিথ্যা আরোপকারীদেরকে শাস্তি দিয়েছেন।

যে ঐতিহাসিক ঘটনাটি এ সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী শিক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পবিত্র জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি যে, আল্লাহর একটি ইশারাতেই তিনি নিজের একমাত্র পুত্রকে কুরবানী দিতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। এর মধ্যে কেবলমাত্র কুরাইশদের যেসব কাফেররা হযরত ইবরাহীমের (আ) সাথে নিজেদের বংশগত সম্পর্কের জন্য অহংকার করতো তাদের জন্যই শিক্ষা ছিল তা নয় বরং এমন মুসলমানদের জন্যও শিক্ষা ছিল যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছিলেন। এ ঘটনা শুনিয়ে তাদেরকে বলা হয়েছে, ইসলামের তাৎপর্য ও তার মূল প্রাণশক্তি কি এবং তাকে নিজেদের দীন তথা জীবন ব্যবস্থায় পরিণত করার পর একজন সত্যিকার মু'মিনকে কিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে নিজের সবকিছু কুরবানী করে দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।

সূরার শেষ আয়াতগুলো কাফেরদের জন্য নিছক সতর্কবাণীই ছিল না বরং যেসব মু'মিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমর্থন ও তাঁর সাথে সহযোগিতা করে চরম নৈরাশ্যজনক অবস্থার মোকাবিলা করছিলেন তাঁদের জন্যও ছিল সুসংবাদ। তাঁদেরকে এসব আয়াত শুনিয়ে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, কাজের সূচনা করতে গিয়ে তাঁদেরকে যেসব বিপদ আপদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাতে যেন তাঁরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে না পড়েন, শেষ পর্যন্ত বিজয় তাঁদেরই পদচুম্বন করবে এবং বাতিলের যে পতাকাবাহীদেরকে বর্তমানে বিজয়ীর আসনে দেখা যাচ্ছে, তারা তাঁদেরই হাতে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হবে। মাত্র কয়েক বছর পরেই ঘটনাবলী জানিয়ে দিল, এটি নিছক আল্লাহর সান্ত্বনাবাণীই ছিল না বরং ছিল একটি বাস্তব ঘটনা এবং পূর্বাহ্নেই এর খবর দিয়ে তাদের মনোবল শক্তিশালী ও জোরদার করা হয়েছিল।

আয়াত ১৮২ | সূরা আস্-সা-ফফা-ত-মক্কী | রুকূ' ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۝١ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۝٢ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۝٣ اِنَّ اِلٰهَكُمْ
لَوَاحِدٌ ۝٤ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۝٥

সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মানদের কসম, তারপর যারা ধমক ও অভিশাপ দেয় তাদের কসম, তারপর তাদের কসম যারা উপদেশবাণী শুনায়,[১] তোমাদের প্রকৃত মাবুদ মাত্র একজনই[২]—যিনি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর এবং পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে যা কিছু আছে তাদের সবার মালিক এবং সমস্ত উদয়স্থলের[৩] মালিক।[৪]

১. মুফাস্সিরদের অধিকাংশ এ ব্যাপারে একমত যে, এ তিনটি দলই হচ্ছে ফেরেশ্‌তাদের দল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত কাতাদাহ (রা), মাসরূক, সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইকরামা, মুজাহিদ, সুদ্দী, ইবনে যায়েদ ও রাবী' ইবনে আনাস থেকেও এ একই তাফসীর উদ্ধৃত হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকার এর অন্য ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে এ ব্যাখ্যাটিই বেশী সামঞ্জস্যশীল বলে মনে হয়।

এখানে "সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো"—এর মাধ্যমে এদিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনায় যেসব ফেরেশ্‌তা নিয়োজিত রয়েছে তারা আল্লাহর বান্দা ও গোলাম। তারা সারিবদ্ধভাবে তাঁর বন্দেগী ও আনুগত্য করছে এবং তাঁর হুকুম তামিল করার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত রয়েছে। সামনের দিকে গিয়ে ১৬৫ আয়াতে এ বিষয়বস্তুটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। সেখানে ফেরেশ্‌তারা নিজেদের সম্পর্কে বলছে ঃ

وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ

কোন কোন মুফাস্সিরের মতে "ধমক ও অভিশাপ দেবার" অর্থ হচ্ছে, কিছু ফেরেশ্‌তা আছে তারা মেঘমালাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় এবং বৃষ্টির ব্যবস্থা করে। যদিও এ অর্থও ভুল নয়, কিন্তু সামনের দিকের বিষয়বস্তুর সাথে যে অর্থ বেশী মানানসই তা হচ্ছে এই যে, ঐ ফেরেশ্‌তাদের মধ্যে একটি দল নাফরমানদেরকে ও অপরাধীদেরকে অভিশাপ দিয়ে থাকে এবং তাদের এ অভিশাপ কেবল শাব্দিক হয় না বরং তা মানুষের ওপর বড় বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ঐতিহাসিক বিপদ মুসিবতের আকারে বর্ষিত হয়।

"উপদেশবাণী শুনাবার" অর্থ হচ্ছে ঐ ফেরেশ্‌তাদের মধ্যে এমন ধরনের ফেরেশ্‌তাও আছে যারা মানুষকে সত্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য উপদেশ দেবার দায়িত্ব পালন করে। সে উপদেশ দুর্যোগ দুর্ঘটনাদির আকারেও হয়, যা থেকে শিক্ষা গ্রহণকারীরা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। আবার তা এমন শিক্ষার আকারেও হয়, যা ঐ ফেরেশ্‌তাদের মাধ্যমে নবীদের ওপর নাযিল হয়। আবার কখনো তা হয় তাদের মাধ্যমে সৎকর্মশীল লোকদের ওপর নাযিলকৃত ইলহাম অর্থাৎ অভাবনীয় পন্থায় মানুষের মনে আল্লাহ যে প্রেরণার (Inspiration) সঞ্চার করেন তার আকারেও।

২. এ সত্যটির ভিত্তিতেই উল্লেখিত গুণাবলী সমৃদ্ধ ফেরেশ্‌তাদের কসম খাওয়া হয়েছে। অন্য কথায় যেন বলা হয়েছে, এ সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থা যা আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে সক্রিয় রয়েছে, এ বিশ্ব-জাহানের এমন সমস্ত নিদর্শন যেগুলো আল্লাহর বন্দেগী বিমুখতার অশুভ ফল মানুষের সামনে তুলে ধরছে এবং বিশ্ব-জাহানের এ আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা যার ফলে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত অবিরাম একই সত্যের কথা বিভিন্নভাবে স্মরণ করানো হচ্ছে—এ সবকিছুই মানুষের "ইলাহ" যে একজন, তারই সাক্ষ পেশ করছে।

"ইলাহ" শব্দটির ব্যবহার হয় দু'টি অর্থে। এক, এমন মাবুদ ও উপাস্য অর্থে, বাস্তবে ও সক্রিয়ভাবে যার বন্দেগী করা হচ্ছে। দুই, সে মাবুদ অর্থে, যিনি এমন মর্যাদার অধিকারী, যার ফলে প্রকৃতপক্ষে তাঁরই ইবাদাত ও বন্দেগী করা উচিত। এখানে ইলাহ শব্দটি দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ প্রথম অর্থে মানুষ তো বহু ইলাহ তৈরি করে রেখেছে। এ জন্য আমি ইলাহ শব্দটির অনুবাদ করেছি "প্রকৃত মাবুদ"।

৩. সূর্য সবসময় একই উদয়স্থল থেকে উদিত হয় না। বরং প্রতিদিন একটি নতুন স্থান থেকে উদিত হয়। তাছাড়া সারা দুনিয়ায় সে একই সময় উদিত হয় না বরং দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময় উদিত হয়। এসব কারণে উদয়স্থলের পরিবর্তে "সমস্ত উদয়স্থল" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং এ সংগে "সমস্ত অস্তস্থল"-এর কথা না বলার কারণ হচ্ছে এই যে, সমস্ত উদয়স্থল শব্দেই সমস্ত অস্তস্থল প্রমাণ করে। তবুও এক জায়গায় رب المشارق والمغارب (উদয়স্থলগুলো ও অস্তস্থলগুলোর রব) শব্দগুলোও এসেছে। (আল মা'আরিজ, ৪০)

৪. এ আয়াতগুলোতে যে সত্যটি বুঝানো হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, বিশ্ব-জাহানের আসল মালিক ও শাসনকর্তাই মানুষের আসল মা'বুদ। তিনিই প্রকৃতপক্ষে মা'বুদ হতে পারেন এবং তাঁরই মাবুদ হওয়া উচিত। রব (মালিক, শাসনকর্তা ও প্রতিপালক) হবে একজন এবং ইলাহ (ইবাদাত লাভের অধিকারী) হবে অন্যজন, এটা একেবারেই বুদ্ধি বিরোধী কথা। মানুষের লাভ ও ক্ষতি, তার অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণ হওয়া, তার ভাগ্য ভাঙা-গড়া বরং তার নিজের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বই যার ক্ষমতার অধীন তার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য স্বীকার করা এবং তার সামনে নত হওয়া মানুষের প্রকৃতিরই দাবী। এটিই তার ইবাদাতের মৌল কারণ। মানুষ যখন একথাটি বুঝতে পারে তখন আপনা আপনি সে একথাটিও বুঝতে পারে যে, ক্ষমতার অধিকারীর ইবাদাত না করা এবং ক্ষমতাহীনের ইবাদাত করা দু'টোই বুদ্ধি ও প্রকৃতির সুস্পষ্ট বিরোধী। কর্তৃত্বশালী ইবাদাত লাভের হকদার হন। কর্তৃত্বহীন সত্তারা এর হকদারও হয় না। তাদের ইবাদাত করে এবং তাদের

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ۝٦ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ
شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۝٧ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ
جَانِبٍ ۝٨ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۝٩ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ
فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝١٠ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا ۚ
إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ۝١١ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۝١٢ وَإِذَا ذُكِّرُوا
لَا يَذْكُرُونَ ۝١٣

আমি দুনিয়ার আকাশকে[৫] তারকারাজির সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত করেছি এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে তাকে সুরক্ষিত রেখেছি।[৬] এ শয়তানরা উর্ধ জগতের কথা শুনতে পারে না, সবদিক থেকে আঘাতপ্রাপ্ত ও তাড়িত হয় এবং তাদের জন্য রয়েছে অবিরাম শাস্তি। তবুও যদি তাদের কেউ তার মধ্য থেকে কিছু হাতিয়ে নিতে সক্ষম হয় তাহলে একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা তার পেছনে ধাওয়া করে।[৭]

এখন এদেরকে জিজ্ঞেস করো, এদের সৃষ্টি বেশী কঠিন, না আমি যে জিনিসগুলো সৃষ্টি করে রেখেছি সেগুলোর?[৮] এদেরকে তো আমি সৃষ্টি করেছি আঠাল কাদামাটি দিয়ে।[৯] তুমি তো (আল্লাহর কুদরাতের মহিমা দেখে) অবাক হচ্ছো এবং এরা তার প্রতি করছে বিদ্রূপ। তাদেরকে বুঝালেও তারা বোঝে না।

কাছে কিছু চেয়ে কোন লাভও হয় না। কারণ আমাদের কোন আবেদনের ভিত্তিতে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার কোন ক্ষমতাই তাদের নেই। তাদের সামনে বিনয়, দীনতা ও কৃতজ্ঞতা সহকারে মাথা নত করা এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করা ঠিক তেমনিই নির্বুদ্ধিতার কাজ যেমন কোন ব্যক্তি কোন শাসনকর্তার সামনে হাজির হয়ে তার কাছে আর্জি পেশ করার পরিবর্তে অন্য প্রার্থীরা যারা সেখানে আবেদনপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মধ্য থেকে কারো সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে।

৫. দুনিয়ার আকাশ বলতে বুঝানো হয়েছে নিকটবর্তী আকাশকে, কোন দূরবীনের সাহায্য ছাড়াই খালি চোখে যে আকাশকে আমরা দেখতে পাই। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রকার শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যে বিশ্বকে আমরা দেখি এবং আমাদের পর্যবেক্ষণ যন্ত্রপাতির মাধ্যমে যেসব বিশ্ব এখনো আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি সেগুলো সবই দূরবর্তী

আকাশ। এ প্রসংগে মনে রাখতে হবে "সামা" বা আকাশ কোন নির্দিষ্ট জিনিসের নাম নয়। বরং প্রাচীনতমকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মানুষ এ শব্দটি এবং এর সমার্থক শব্দাবলীকে উর্ধ জগতের জন্য ব্যবহার করে আসছে।

৬. অর্থাৎ উর্ধজগত নিছক মহাশূন্য নয়। যে কেউ চাইলেই তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। বরং এর বাঁধন অত্যন্ত মজবুত। এর বিভিন্ন অংশকে এমন সুদৃঢ় সীমান্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত করা হয়েছে যার ফলে কোন বিদ্রোহী শয়তানের পক্ষে সে সীমানাগুলো অতিক্রম করা সম্ভব নয়। বিশ্ব-জাহানের প্রত্যেকটি গ্রহ নক্ষত্রের নিজস্ব একটি কক্ষপথ ও আকাশ (Sphere) আছে। তার মধ্য থেকে কারো বের হয়ে আসা যেমন অত্যন্ত কঠিন তেমনি বাইর থেকে কারো তার মধ্যে প্রবেশ করাও সহজ নয়। বাইরের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে নিছক মহাশূন্য ছাড়া সেখানে আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু আসলে সে মহাশূন্যের মধ্যে অসংখ্য ও অগণিত অংশকে এমন শক্তিশালী ও সুদৃঢ় সীমানা দিয়ে সংরক্ষিত করা হয়েছে যার মোকাবিলায় লৌহ প্রাচীর কিছুই নয়। মানুষের কাছের প্রতিবেশী চাঁদে পৌছুতে মানুষকে যেসব বিচিত্র সমস্যা ও বহুমুখী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তা থেকে এ ব্যাপারে কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য জীব অর্থাৎ জিনদের উর্ধজগতে প্রবেশ করার পথেও এমনি ধরনের বাধা-প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

৭. এ বিষয়টি বুঝতে হলে একটি কথা অবশ্যই দৃষ্টি সমক্ষে থাকতে হবে। সে সময় আরবে জ্যোতিষশাস্ত্রের ব্যাপক চর্চা ছিল। বিভিন্ন স্থানে গণক ও জ্যোতিষীরা বসে ভবিষ্যদ্বাণী করতো। অদৃশ্যের সংবাদ দিত। হারিয়ে যাওয়া জিনিসের সন্ধান দিত। লোকেরা নিজেদের অতীত ও ভবিষ্যতের অবস্থা জানার জন্য তাদের দ্বারস্থ হতো। এ গণকদের দাবী ছিল, জিন ও শয়তানরা তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং তারা তাদেরকে সব ধরনের খবর এনে দেয়। এ পরিবেশে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন এবং তিনি কুরআন মজীদের আয়াত শুনাতে শুরু করেন। তাতে অতীতের ইতিহাস এবং ভবিষ্যতে যেসব অবস্থার সৃষ্টি হবে তার খবর দেয়া হয়েছিল। এ সংগে তিনি জানিয়ে দেন, একজন ফেরেশ্‌তা আমার কাছে এসব আয়াত নিয়ে আসেন এতে তাঁর বিরোধীরা সংগে সংগেই তাঁকে গণক বলে পরিহাস করতে থাকে। তারা লোকদেরকে বলতে থাকে, অন্যান্য গণকদের মতো তাঁর সম্পর্কও এমন কোন শয়তানের সাথে রয়েছে যে উর্ধজগত থেকে আড়ি পেতে কিছু শুনে তাঁর কাছে নিয়ে আসে এবং তিনি তাকে আল্লাহর অহী বানিয়ে পেশ করে দেন। এ অপবাদের জবাবে আল্লাহ যে সত্য বিবৃত করছেন তা এই যে, শয়তানরা তো উর্ধজগতে পৌছতেই পারে না। ফেরেশ্‌তাদের কথা শোনা এবং তা নিয়ে এসে কাউকে বলার ক্ষমতা তাদের নেই। আর যদি ঘটনাক্রমে সামান্য একটু ছিটে ফোঁটা তথ্য কোন শয়তানের কানে পড়ে যায় তাহলে সে তা নিয়ে নিচে নেমে আসার আগেই একটি দ্রুতগামী অগ্নিশিখা তার পিছু নেয়। অন্যকথায় এর অর্থ হচ্ছে ফেরেশ্‌তাদের মাধ্যমে বিশ্ব-জাহানের যে বিশাল ব্যবস্থা চলছে তা পুরোপুরি শয়তানদের হস্তক্ষেপ মুক্ত। তাতে হস্তক্ষেপ করাতো দূরের কথা সে সম্পর্কে কিছু জানার ক্ষমতাও তাদের নেই। (আরো বেশী জানতে হলে তাফহীমুল কুরআন সূরা আল হাজ্‌র, ৮ থেকে ১২ টীকা দেখুন।)

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾
قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ
يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿٢٠﴾ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي
كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾

কোনো নিদর্শন দেখলে উপহাস করে উড়িয়ে দেয় এবং বলে, "এ তো স্পষ্ট যাদু।[১০] আমরা যখন মরে একেবারে মাটি হয়ে যাবো এবং থেকে যাবে শুধুমাত্র হাড়ের পিঞ্জর তখন আমাদের আবার জীবিত করে উঠানো হবে, এমনও কি কখনো হতে পারে? আর আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকেও কি উঠানো হবে?" এদেরকে বলো, হাঁ, এবং তোমরা (আল্লাহর মোকাবিলায়) অসহায়।[১১]

ব্যস, একটিমাত্র বিকট ধমক হবে এবং সহসাই এরা স্বচক্ষে (সেই সবকিছু যার খবর দেয়া হচ্ছে) দেখতে থাকবে।[১২] সে সময় এরা বলবে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, এতো প্রতিফল দিবস—"এটা সে ফায়সালার দিন যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।"[১৩]

৮. আখেরাত সম্পর্কে মক্কার কাফেররা যে সন্দেহ পেশ করতো এটি তার জওয়াব। তাদের মতে আখেরাত সম্ভব নয়। কারণ যেসব মানুষ মরে গেছে তাদের আবার দ্বিতীয়বার জন্মলাভ করা অসম্ভব। এর জবাবে আখেরাতের সম্ভাবনার যুক্তি পেশ করতে গিয়ে আল্লাহ সর্বপ্রথম তাদের সামনে এ প্রশ্ন রাখেন, তোমাদের মতে যদি মৃত মানুষদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা অনেক কঠিন কাজ হয়ে থাকে এবং এ সৃষ্টি করার ক্ষমতা আমার না থেকে থাকে তাহলে বলো, এ পৃথিবী ও আকাশ এবং এদের মধ্যে যে অসংখ্য জিনিস রয়েছে এগুলো সৃষ্টি করা কি সহজ কাজ? তোমাদের বুদ্ধি কোথায় হারিয়ে গেছে? যে আল্লাহর জন্য এ বিশাল বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করা কঠিন কাজ ছিল না এবং যিনি তোমাদের নিজেদেরকে একবার সৃষ্টিও করেছেন তাঁর ব্যাপারে তোমরা কেমন করে ভাবতে পারলে যে, তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে তিনি অক্ষম?

৯. অর্থাৎ এ মানুষ তো কোন বিরাট জিনিস নয়। মাটি দিয়ে একে তৈরি করা হয়েছে এবং এ মাটি দিয়ে আবার তৈরি করা যেতে পারে। আঠাল কাদামাটি দিয়ে মানুষ তৈরি করার অর্থ এও হতে পারে যে, প্রথম মানুষটিকে সৃষ্টি করা হয়েছিল মাটি দিয়ে এবং তারপর মানুষের বংশধারা ঐ প্রথম মানুষটির শুক্রবীজ থেকে অস্তিত্বলাভ করেছে। এর

অর্থ এও হতে পারে যে, প্রত্যেকটি মানুষ আঠাল কাদামাটির তৈরি। কারণ মানুষের অস্তিত্বের সমস্ত উপাদান মাটি থেকেই লাভ করা হয়। যে বীর্যে তার জন্ম তা খাদ্য থেকে তৈরি এবং গর্ভসঞ্চার থেকে শুরু করে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তার সমগ্র অস্তিত্ব যেসব উপাদানে তৈরি হয় তার খাদ্যই তার সবটুকু সরবরাহ করে। এ খাদ্য পশু ও জীবজন্তু থেকে সরবরাহকৃত হোক বা উদ্ভিদ থেকে মূলত এর উৎস হচ্ছে মাটি, যা পানির সাথে মিশে মানুষের খাদ্য হওয়ার এবং তরকারী ও ফল উৎপন্ন করার যোগ্যতা অর্জন করে এবং জীবজন্তু লালন করারও যোগ্যতা অর্জন করে, যাদের দুধ ও গোশ্ত মানুষ আহার করে।

কাজেই যুক্তির বুনিয়াদ এরি ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, এ মাটি যদি জীবন গ্রহণ করার যোগ্যতা না রাখতো তাহলে তোমরা কেমন করে জীবিত আকারে দুনিয়ার বুকে বিরাজ করছো? আর যদি তার মধ্যে জীবন সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে থাকে, যেমন তোমাদের অস্তিত্বই এ সম্ভাবনার দ্ব্যর্থহীন প্রমাণ পেশ করছে, তাহলে আগামীকাল এ একই মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি অসম্ভব হবে কেন?

১০. অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক জগতের কথা। এ ব্যক্তি বলছে কোন ঐন্দ্রজালিক জগতের কথা। সেখানে মৃতরা পুনরুজ্জীবিত হবে। আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে। জান্নাত আবাদ করা হবে। জাহান্নামীদের শাস্তি বিধান করা হবে। অথবা এর এ অর্থও হতে পারে যে, এ ব্যক্তি মন ভুলানো কথা বলছে। এর এ কথাগুলোই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, কেউ এর ওপর যাদু করে দিয়েছে, যার ফলে এ সুস্থ-সচেতন ব্যক্তিটি এখন এ ধরনের আবোল-তাবোল কথা বলছে।

১১. অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে যা ইচ্ছা তাই বানাতে পারে। যখন তিনি চাইলেন তখনই তাঁর একটি ইশারাতেই তোমরা অস্তিত্ব লাভ করলে। যখন তিনি চাইবেন তখনই তাঁর একটি ইংগিতেই তোমরা মৃত্যু বরণ করবে। আবার যখন তিনি চাইবেন সাথে সাথেই তাঁর একটি ইংগিতই তোমাদেরকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবে।

১২. অর্থাৎ এ ঘটনা সংঘটিত হবার সময় যখন এসে যাবে তখন দুনিয়াকে পুনরায় উত্থিত করা কোন কঠিন কাজ হবে না। একটিমাত্র বিকট ধমক ঘুমন্তদেরকে জাগিয়ে উঠিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট হবে। "বিকট ধমক" শব্দটি এখানে বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। এর মাধ্যমে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের এমন কিছু ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে যা থেকে বুঝা যায়, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ মরে গিয়েছিল সবাই যেন শুয়ে ঘুমোচ্ছে এবং হঠাৎ কেউ ধমক দিয়ে বললো, "উঠে পড়ো" আর সংগে সংগেই মুহূর্তের মধ্যে তারা সবাই দাঁড়িয়ে গেলো।

১৩. হতে পারে মু'মিনরা তাদেরকে একথা বলে। এও হতে পারে, এটি ফেরেশ্তাদের উক্তি। এও হতে পারে, হাশরের ময়দানের সমগ্র পরিবেশ সে সময় সমকালীন পরিস্থিতির মাধ্যমে একথা বলছিল। আবার এও হতে পারে, এটা তাদের নিজেদেরই দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া। অর্থাৎ নিজেদের মনে মনে তারা নিজেদেরকেই সম্বোধন করে বলছিল, এ দুনিয়ায় সারা জীবন তোমরা একথা মনে করতে থেকেছো যে, ফায়সালা করার দিন কখনো আসবে না, কিন্তু এখন তোমাদের সর্বনাশের সময় এসে গেছে, যেদিনকে মিথ্যা বলতে সেদিনটি আজ তোমাদের সামনে উপস্থিত।

أُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِن دُونِ
اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ
لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾

২ রুকূ'

(হুকুম দেয়া হবে) ঘেরাও করে নিয়ে এসো সব জালেমকে,[১৪] তাদের সাথিদেরকে[১৫] এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব মাবুদদের তারা বন্দেগী করতো তাদেরকে[১৬] তারপর তাদের সবাইকে জাহান্নামের পথ দেখিয়ে দাও। আর এদেরকে একটু থামাও, এদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে। "তোমাদের কি হয়েছে, এখন কেন পরস্পরকে সাহায্য করো না? আরে, আজ তো এরা নিজেরাই নিজেদেরকে (এবং একজন অন্যজনকে) সমর্পণ করে দিয়ে যাচ্ছে।"[১৭] এরপর এরা একে অন্যের দিকে ফিরবে এবং পরস্পর বিতর্ক শুরু করে দেবে। (আনুগত্যকারীরা তাদের নেতাদেরকে) বলবে, "তোমরা তো আমাদের কাছে আসতে সোজা দিক দিয়ে।"[১৮]

১৪. জালেম বলতে কেবল তাদেরকে বুঝানো হয়নি যারা অন্যের প্রতি জুলুম করেছে। বরং কুরআনের পরিভাষায় এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই জালেম যে আল্লাহর মোকাবিলায় বিদ্রোহ, সীমালংঘন ও নাফরমানির পথ অবলম্বন করেছে।

১৫. মূলে ازواج (আযওয়াজ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ তাদের এমন সব স্ত্রীও হতে পারে যারা এ বিদ্রোহে তাদের সহযোগী ছিল। আবার এমনসব লোকও হতে পারে যারা তাদেরই মতো বিদ্রোহী সীমালংঘনকারী ও নাফরমান ছিল। এ ছাড়া এর অর্থ এও হতে পারে যে, এক এক ধরনের অপরাধীকে আলাদা আলাদা জোটের আকারে একত্র করা হবে।

১৬. এখানে মাবুদদের অর্থ দু' ধরনের মাবুদ। এক, এমনসব মানুষ ও শয়তান যাদের নিজেদের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা এ ছিল যে, লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের বন্দেগী করুক। দুই, এমনসব মূর্তি, গাছ, পাথর ইত্যাদি যাদের পূজায় দুনিয়াবাসীরা লিপ্ত ছিল। এর মধ্যে প্রথম ধরনের মাবুদরা নিজেরাই অপরাধীদের অন্তরভুক্ত হবে এবং শাস্তির জন্য তাদেরকে জাহান্নামের পথ দেখানো হবে। আর দ্বিতীয় ধরনের মাবুদদেরকে তাদের ইবাদাতকারীদের সাথে এ জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে যে, তারা এদেরকে দেখে সবসময় লজ্জা অনুভব করবে এবং নিজেদের নির্বুদ্ধিতার অনুশোচনা করতে থাকবে। এরা ছাড়া তৃতীয় আর এক ধরনের মাবুদ হচ্ছে, দুনিয়ায় যাদেরকে পূজা করা হয়েছে কিন্তু

قَالُوا بَلْ لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ ۚ
بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ﴿٣٠﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۖ إِنَّا لَذَائِقُونَ ﴿٣١﴾
فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴿٣٢﴾ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ
إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿٣٦﴾

তারা জবাব দেবে, "না, তোমরা নিজেরাই মু'মিন ছিলে না। তোমাদের ওপর আমাদের কোন জোর ছিল না। বরং তোমরা নিজেরাই ছিলে বিদ্রোহী। শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের রবের এ ফরমানের হকদার হয়ে গেছি যে, আমরা আযাবের স্বাদ গ্রহণ করবো। কাজেই আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম কারণ আমরা নিজেরাই বিভ্রান্ত ছিলাম।"[১৯]

এভাবে তারা সবাই সেদিন শাস্তিতে শরীক হবে।[২০] আমি অপরাধীদের সাথে এমনটিই করে থাকি। এরা ছিল এমন সব লোক যখন এদেরকে বলা হতো, "আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই" তখন এরা অহংকার করতো এবং বলতো, "আমরা কি একজন উন্মাদ কবির জন্য আমাদের মাবুদদেরকে ত্যাগ করবো?"

তারা কখনো তাদের পূজা–উপাসনা করার প্রতি ইংগিত করেনি। বরং তারা সবসময় মানুষকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পূজা করতে নিষেধ করেছেন। যেমন ফেরেশ্‌তা, আম্বিয়া ও আউলিয়া। এ ধরনের মাবুদদেরকে মোটেই অন্যান্য মাবুদদের মতো তাদের উপাসনাকারীদের সাথে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে না।

১৭. প্রথম বাক্যটি বলা হবে অপরাধীদেরকে সম্বোধন করে। দ্বিতীয় বাক্যটি উপস্থিত এমনসব সাধারণ ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে বলা হবে যারা সে সময় জাহান্নামের পথে অপরাধীদের রওয়ানা হবার দৃশ্য দেখতে থাকবে। এ বাক্যটি নিজেই জানিয়ে দিচ্ছে সে সময় অবস্থাটা কেমন হবে। বড় বড় তাগড়া অপরাধীদের কোমরের বল শেষ হয়ে যাবে। কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে তারা কান ধরে জাহান্নামের দিকে চলে যেতে থাকবে। কোথাও কোন 'জাহাঁপনা' ধাক্কা খেতে থাকবে এবং দরবারীদের মধ্য থেকে কেউ সেই "মহামতি মহামহিমকে" উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবে না। কোথাও কোন বিশ্ব বিজয়ী ও কোন ডিরেক্টর চরম লাঞ্ছনা সহকারে চলে যেতে থাকবে এবং তার পরাক্রমশালী সেনাদল নিজেরাই তাকে দণ্ড দেবার জন্য এগিয়ে দেবে। কোথাও কোন পীর সাহেব বা গুরুজী অথবা হোলি ফাদার জাহান্নামের শাস্তি লাভ করবে এবং মুরীদদের

بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٧﴾ اِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ ﴿٣٨﴾
وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٩﴾

অথচ সে সত্য নিয়ে এসেছিল এবং রসূলদেরকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিল[২১] (এখন তাদেরকে বলা হবে) তোমরা নিশ্চিতভাবেই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবে এবং পৃথিবীতে তোমরা যে সমস্ত কাজ করতে তারই প্রতিদান তোমাদের দেয়া হচ্ছে।

একজনও "হুজুরে আলা'র মর্যাদাহানির কথা ভাববে না। কোথাও কোন জাতীয় নেতা বড়ই হীনতার মধ্যে জাহান্নামের পথে যাত্রা করবে এবং দুনিয়ায় যেসব লোক তার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের ঝাণ্ডা বুলন্দ করে বেড়াতো তারা সবাই তার দিক থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নেবে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যে প্রেমিক দুনিয়ায় তার প্রেমাস্পদের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল সেও তার প্রেমাস্পদের দুরবস্থার দিকে ভ্রুক্ষেপই করবে না। এ অবস্থার চিত্র এঁকে মহান আল্লাহ আসলে একথা বুঝাতে চান যে, দুনিয়ায় মানুষের সাথে মানুষের যে সম্পর্ক খোদাদ্রোহিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে তা কিভাবে আখেরাতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে এবং এখানে যারা নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মত্ত হয়ে আছে সেখানে তাদের অহংকারের দেয়াল কিভাবে মিসমার হয়ে যাবে।

১৮. মূলে বলা হয়েছে ঃ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ "তোমরা আমাদের কাছে আসতে ইয়ামীনের পথে।" ইয়ামীন শব্দটি আরবী ভাষায় বিভিন্ন অর্থে বলা হয়। যদি একে শক্তি অর্থে বলা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে আমরা দুর্বল ছিলাম, তোমরা আমাদের ওপর প্রাধান্য লাভ করেছিলে তাই তোমরা নিজেদের শক্তি ব্যবহার করে আমাদের গোমরাহীর দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলে। যদি একে কল্যাণ অর্থে নেয়া হয়, তাহলে এর অর্থ হবে, তোমরা কল্যাণকামী সেজে আমাদের ধোঁকা দিয়েছো। তোমরা আমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছিলে, যে পথে তোমরা আমাদের চালাচ্ছো এটিই সত্য ও কল্যাণের পথ। তাই আমরা ধোঁকায় পড়ে গিয়েছিলাম। আর যদি একে কসম অর্থে গ্রহণ করা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে তোমরা কসম খেয়ে খেয়ে আমাদের নিশ্চিন্ত করতে যে, তোমরা যা পেশ করছো তা-ই সত্য।

১৯. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাবা, ৫১, ৫২, ৫৩ টীকা।

২০. অর্থাৎ নেতা ও অনুসারী এবং গোমরাহ ও গোমরাহকারী উভয়ই একই শাস্তি লাভ করবে। অনুসারীদের এ ওযর মেনে নেয়া হবে না যে, তারা নিজেরা গোমরাহ হয়নি বরং তাদেরকে গোমরাহ করা হয়েছিল। অন্যদিকে নেতাদের এ ওযরও গ্রহণ করা হবে না যে, গোমরাহ লোকেরা নিজেরাই সরল-সত্য পথের প্রত্যাশী ছিল না।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤١﴾ فَوَاكِهُ ۖ وَهُم
مُّكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِم
بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿٤٥﴾ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا
يُنزَفُونَ ﴿٤٧﴾ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٤٩﴾

কিন্তু আল্লাহর নির্বাচিত বান্দারা (এ অশুভ পরিণাম) মুক্ত হবে। তাদের জন্য রয়েছে জ্ঞাত রিযিক,[২২] সব রকমের সুস্বাদু জিনিস[২৩] এবং নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত, যেখানে তাদেরকে মর্যাদা সহকারে রাখা হবে। বসবে তারা আসনে মুখোমুখি। শরাবের[২৪] ঝরণা[২৫] থেকে পানপাত্র ভরে ভরে তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে।[২৬] উজ্জ্বল শরাব, পানকারীদের জন্য হবে সুস্বাদু। তা তাদের কোন শারীরিক ক্ষতি করবে না এবং তাতে তাদের বুদ্ধিও ভ্রষ্ট হবে না।[২৭] আর তাদের কাছে থাকবে আনত নয়না[২৮] সুলোচনা নারীগণ,[২৯] এমন নাজুক যেমন হয় ডিমের খোসার নিচে লুকানো ঝিল্লি।[৩০]

২১ রসূলদেরকে সত্য বলে মেনে নেয়ার তিনটি অর্থ রয়েছে এবং এ তিনটি অর্থই এখানে প্রযুক্ত। এক, তিনি পূর্ববর্তী এমন কোন রসূলের বিরোধিতা করেননি যার অনুসারীদের তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করার কোন যুক্তিসংগত কারণ থাকতো। বরং তিনি আল্লাহর সমস্ত পূর্ববর্তী রসূলকে সত্য বলতেন। দুই, তিনি কোন নতুন ও অভিনব কথা আনেননি। বরং শুরু থেকে আল্লাহর সব রসূল যে কথা বলে আসছিলেন তিনিও সে একই কথা পেশ করতেন। তিন, পূর্ববর্তী রসূলগণ তাঁর সম্পর্কে যেসব খবর দিয়েছিলেন তিনি সেগুলোর সঠিক প্রয়োগক্ষেত্র ছিলেন।

২২. অর্থাৎ এমন রিযিক যার সমস্ত গুণাবলী বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। যা পাওয়ার ব্যাপারে তারা নিশ্চিত। যে ব্যাপারে তারা একেবারে নিশ্চিন্ত যে, তা তারা চিরকাল পেতে থাকবে। যে ব্যাপারে কি পাওয়া যাবে কি না পাওয়া যাবে, এ ধরনের কোন অনিশ্চয়তা নেই।

২৩. এর মধ্যে এদিকেও একটি সূক্ষ্ম ইশারা রয়েছে যে, জান্নাতে আহার্য দ্রব্যাদি খাদ্য হিসেবে নয় বরং স্বাদ উপভোগের জন্য ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ সেখানে খাবার এ উদ্দেশ্যে খাওয়া হবে না যে, শরীরের ক্ষয় হয়ে যাওয়া অংশগুলোর শূন্যতা পূরণ করা হবে। কারণ সে চিরন্তন জীবনে শরীরের অংশগুলোর কোন ক্ষয়ই হবে না। মানুষের সেখানে ক্ষুধাও লাগবে না। এ দুনিয়ায় শরীরের অংশের ক্ষয়ের কারণে মানুষের ক্ষুধা পায়। আর শরীর নিজেকে জীবিত রাখার জন্য সেখানে খাদ্যও চাইবে না। এ কারণে জান্নাতের খাদ্যের জন্য فواكه (ফাওয়াকেহ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থের মধ্যে "খাদ্যে পরিণত হওয়া" এর পরিবর্তে "স্বাদ উপভোগ করা" এর অর্থ অধিকতর লক্ষণীয়।

২৪. আসলে এখানে শরাব শব্দটি সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি। বরং শুধুমাত্র كأس (পানপাত্র) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু আরবী ভাষায় كأس শব্দটি ব্যবহার করে সবসময় শরাব অর্থই গ্রহণ করা হয়। যে পেয়ালায় শরাবের পরিবর্তে দুধ বা পানি থাকে অথবা যে পেয়ালায় কিছুই থাকে না তাকে كأس (কাস) বলা হয় না। "কাস" শব্দটি একমাত্র তখনই বলা হয় যখন তার মধ্যে মদ থাকে।

২৫. অর্থাৎ দুনিয়ায় ফল ও খাদ্য বস্তু পচিয়ে যে শরাব তৈরি করা হয় এ শরাব তেমন ধরনের হবে না। বরং তা প্রাকৃতিকভাবে ঝরণা থেকে উৎসারিত হবে এবং নদীর আকারে প্রবাহিত হবে। সূরা মুহাম্মাদে এ বিষয়বস্তুটি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَأَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ

"আর শরাবের নদী, যা পানকারীদের জন্য হবে সুস্বাদু।"

২৬. শরাবের পানপাত্র নিয়ে ঘুরে ঘুরে জান্নাতীদের মধ্যে কারা পরিবেশন করবে সেকথা এখানে বলা হয়নি। এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে অন্যান্য স্থানে ঃ

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ

"আর তাদের খিদমত করার জন্য ঘুরবে তাদের খাদেম ছেলেরা যারা এমন সুন্দর যেমন ঝিনুকে লুকানো মোতি।" (আত্ তূর, ২৪)

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا

"আর তাদের খিদমত করার জন্য ঘুরে ফিরবে এমন সব বালক যারা হামেশা বালকই থাকবে। তোমরা তাদেরকে দেখলে মনে করবে মোতি ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।"

(আদ দাহ্‌র, ১৯)

তারপর এর বিস্তারিত বর্ণনা হযরত আনাস (রা) ও হযরত সামুরাহ ইবনে জুন্দুবের (রা) বর্ণিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসগুলো থেকে পাওয়া যায়। সেগুলোতে বলা হয়েছে "মুশরিকদের সন্তানরা জান্নাতবাসীদের সেবক হবে।" (আবু দাউদ তায়ালিসী, তাবারানী ও বায্‌যার) এ হাদীসগুলো সনদের দিক দিয়ে দুর্বল হলেও অন্যান্য বহু হাদীস থেকেও জানা যায়, যে শিশুরা বয়প্রাপ্ত না হয়ে মারা যায় তারা জান্নাতে যাবে। তাছাড়া একথাও হাদীস থেকে জানা যায় যে, যেসব শিশুর পিতামাতা জান্নাতবাসী হবে তারা নিজেদের বাপ-মায়ের সাথে থাকবে, যাতে তাদের চোখ শীতল হয়। এরপর অবশ্যই এমন সব শিশু থেকে যায় যাদের বাপ-মা জান্নাতী হবে না। কাজেই তাদের ব্যাপারে একথা যুক্তিসংগত মনে হয় যে, তাদেরকে জান্নাতবাসীদের খাদেম বানিয়ে দেয়া হবে। (এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনার জন্য "ফাত্‌হুল বারী" ও "উমদাতুল কারী"র জানায়েয অধ্যায়ের 'মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে' অনুচ্ছেদে, "রাসায়েল ও মাসায়েল" ৩ খন্ড ১৭৭-১৮৭ পৃষ্ঠা দেখুন।)

২৭. অর্থাৎ দুনিয়ার শরাবে যে দু'ধরনের দোষ থাকে তা হবে তার স্পর্শ মুক্ত। দুনিয়ার শরাবের এক ধরনের দোষ হচ্ছে, মানুষ তার কাছে আসতেই প্রথমে তার পচা দুর্গন্ধ নাকে

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ
لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾ يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا
وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿٥٤﴾ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي
سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾

তারপর তারা একজন অন্যজনের দিকে ফিরে অবস্থা জিজ্ঞেস করবে। তাদের একজন বলবে, "দুনিয়ায় আমার ছিল এক সংগী, সে আমাকে বলতো, তুমিও কি সত্য বলে মেনে নেবার দলে?[৩১] যখন আমরা মরে যাবো, মাটির সাথে মিশে যাবো এবং অস্থি পিঞ্জরই থেকে যাবে তখন সত্যিই কি আমাদের শাস্তি ও পুরস্কার দেয়া হবে? তোমরা কি দেখতে চাও সে এখন কোথায় আছে?" এ বলে যেমনি সে নিচের দিকে ঝুঁকবে তখনই দেখবে তাকে জাহান্নামের অতল গভীরে।

পৌঁছে যায়। তারপর তার স্বাদ মানুষের জিহ্বাকে তিক্ত ও বিস্বাদ করে দেয়। এরপর গলার নিচে নামার সাথে সাথেই তা পেট চেপে ধরে। তারপর তা মাথায় চড়তে থাকে এবং মাথায় চক্কর দিতে থাকে। এরপর তা যকৃত বা কলিজাকে প্রভাবিত করে এবং মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর তার খারাপ প্রভাব পড়তে থাকে। তারপর যখন নেশা খতম হয়ে যেতে থাকে তখন মানুষ নিদ্রালুতা ও অবসাদে আক্রান্ত হয়। এসব হচ্ছে শারীরিক ক্ষতি। দ্বিতীয় ধরনের দোষ হচ্ছে, শরাব পান করে মানুষ বকবক করতে থাকে, উল্টা পাল্টা আজে-বাজে অর্থহীন কথা বলতে থাকে, এগুলো শরাবের মানসিক ক্ষতি। দুনিয়ায় মানুষ কেবলমাত্র আনন্দ লাভের জন্য এ সমস্ত ক্ষতি বরদাশ্‌ত করে। আল্লাহ বলেন, জান্নাতের শরাবে আনন্দলাভ করা যাবে পূর্ণভাবে (لذة للشاربين) কিন্তু উপরোক্ত দু'ধরনের ক্ষতির কোনটারই সম্ভাবনা সেখানে থাকবে না।

২৮. অর্থাৎ নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না।

২৯. সম্ভবত এরা সেসব মেয়ে হবে যারা প্রাপ্ত বয়স্কা হবার আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে এবং যাদের পিতামাতা জান্নাতলাভের অধিকারী হয়নি। অনুমানের ভিত্তিতে একথা বলা যেতে পারে যে, এ ধরনের ছেলেদেরকে যেমন জান্নাতবাসীদের সেবায় নিযুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা হামেশা বালকই থাকবে ঠিক তেমনি এ ধরনের মেয়েদেরকে জান্নাতবাসীদের জন্য হূরে পরিণত করা হবে এবং তারা চিরকাল উঠতি বালিকাই থাকবে। অবশ্য এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন।

৩০. মূলে বলা হয়েছে كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ "যেন তারা গোপন বা সংরক্ষিত ডিম" তাফসীর বিশারদগণ এ শব্দগুলোর বিভিন্ন ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। কিন্তু সঠিক ব্যাখ্যা সেটিই যেটি হযরত উম্মে সালামাহ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

قَالَ تَاللّٰهِ إِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِينِ ﴿٥٦﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ
الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ
بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾ لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾
أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿٦٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾
إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ
الشَّيَاطِينِ ﴿٦٥﴾ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٦﴾

এবং তাকে সম্বোধন করে বলতে থাকবে, "আল্লাহর কসম, তুই তো আমাকে ধ্বংসই করে দিতে চাচ্ছিলি। আমার রবের মেহেরবাণী না হলে আজ আমিও যারা পাকড়াও হয়ে এসেছে তাদের অন্তরভুক্ত হতাম।[৩২] আচ্ছা, তাহলে কি এখন আমরা আর মরবো না? আমাদের যে মৃত্যু হবার ছিল তা প্রথমেই হয়ে গেছে? এখন আমাদের কোন শাস্তি হবে না?"[৩৩]

নিশ্চিতভাবেই এটিই মহান সাফল্য। এ ধরনের সাফল্যের জন্যই কাজ করতে হবে তাদের যারা কাজ করে। বলো, এ ভোজ ভালো, না যাক্কুম গাছ?[৩৪] আমি এ গাছটিকে জালেমদের জন্য ফিতনায় পরিণত করে দিয়েছি।[৩৫] সেটি একটি গাছ, যা বের হয় জাহান্নামের তলদেশ থেকে। তার ফুলের কলিগুলো যেন শয়তানদের মুণ্ড।[৩৬] জাহান্নামের অধিবাসীরা তা খাবে এবং তা দিয়ে পেট ভরবে।

থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, আমি নবী করীমকে (সা) এ আয়াতটির অর্থ জিজ্ঞেস করি। জবাবে তিনি বলেন, তাদের কোমলতা ও নাজুকতা এমন ঝিল্লির মত হবে যা ডিমের খোসা ও তার সাদা অংশের মাঝখানে থাকে। (ইবনে জারীর)

৩১. অর্থাৎ তোমরাও কি এমন দুর্বল বিশ্বাসীদের দলে ভিড়লে যারা মৃত্যু পরবর্তী জীবনের মতো অযৌক্তিক কথা মেনে নিয়েছে?

৩২. এ থেকে অনুমান করা যায়, আখেরাতে মানুষের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বাকশক্তি কোন্ ধরনের হবে। জান্নাতে বসে এক ব্যক্তি যখন চাইবে কোন টেলিভিশন যন্ত্রের সহায়তা ছাড়াই সামান্য একটু ঝুঁকে পড়ে এমন এক ব্যক্তিকে দেখে নেবে যে তার থেকে নাজানি কত হাজার মাইল ব্যবধানে জাহান্নামের আযাবের মধ্যে আছে। তারপর এখানেই শেষ নয়, তারা দু'জনই কেবল দু'জনকে দেখতে পাচ্ছে না বরং তাদের মধ্যে

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾
إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٩﴾ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ
قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿٧٢﴾ فَانظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾

তারপর পান করার জন্য তারা পাবে ফুটন্ত পানি। আর এরপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে। এ অগ্নিময় দোজখের দিকে।[৩৭] এরা এমনসব লোক যারা নিজেদের বাপ-দাদাদেরকে পথভ্রষ্ট পেয়েছে এবং তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে ছুটে চলেছে।[৩৮] অথচ তাদের পূর্বে বহু লোক পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে আমি সতর্ককারী রসূল পাঠিয়েছিলাম। এখন দেখো সে সতর্ককৃত লোকদের কি পরিণাম হয়েছিল। এ অশুভ পরিণতির হাত থেকে কেবলমাত্র আল্লাহর সে বান্দারাই রেহাই পেয়েছে যাদেরকে তিনি নিজের জন্য স্বতন্ত্র করে নিয়েছেন।

কোন টেলিফোন বা রেডিও যোগাযোগ ছাড়াই তারা সরাসরি কথার আদান প্রদানও করছে। এত দূরের ব্যবধান থেকে তারা কথা বলবে এবং পরস্পরের কথা শুনবে।

৩৩. বর্ণনাভংগী পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, নিজের জাহান্নামী বন্ধুর সাথে কথা বলতে বলতে হঠাৎ এ জান্নাতী লোকটি তার নিজের সাথে কথা বলতে থাকবে এবং এ তিনটি বাক্য তার মুখ থেকে এমনভাবে বের হবে যেন কোন ব্যক্তি নিজেকে সব ধরনের প্রত্যাশা ও অনুমানের উর্ধের অবস্থায় পেয়ে চরম বিস্ময় ও আনন্দ বিহ্বলতার মধ্যে স্বতস্ফূর্তভাবে বলে যাচ্ছে। এ ধরনের কথায় কোন বিশেষ ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয় না এবং এখানে মানুষ যে প্রশ্ন করে তার উদ্দেশ্য আসলে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করা হয় না। বরং সেখানে মানুষের নিজের মনের অনুভূতি প্রকাশ ঘটে তার নিজের ভাষায়। এ জান্নাতী লোকটি জাহান্নামী লোকটির সাথে কথা বলতে বলতে সহসা অনুভব করতে থাকবে যে, তার সৌভাগ্য তাকে কোথায় নিয়ে এসেছে। এখন মৃত্যুও নেই, শাস্তিও নেই। সমস্ত কষ্টের অবসান ঘটেছে এবং সে এখন চিরন্তন জীবনের অধিকারী হয়েছে। এ অনুভূতির ভিত্তিতে সে স্বতস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে, আমি এখন এ মর্যাদায় উপনীত হয়েছি?

৩৪. যাক্কুম এক ধরনের গাছ। তিহামা এলাকায় এ গাছ দেখা যায়। এর স্বাদ হয় তিতা, গন্ধ বিরক্তিকর এবং ভাঙলে এর মধ্য থেকে এক ধরনের দুধের মতো পদার্থ বের হয় যা গায়ে লাগলে গা ফুলে ওঠে ও ফোস্কা পড়ে।

وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ
الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿٧٨﴾
سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٩﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِنَّهٗ
مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿٨٢﴾

৩ রুকূ'

(ইতিপূর্বে)[৩৯] নূহ আমাকে ডেকেছিল,[৪০] তাহলে দেখো, আমি ছিলাম কত ভালো জওয়াবদাতা। আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করি ভয়াবহ যন্ত্রণা থেকে,[৪১] শুধু তার বংশধরদেরকেই টিকিয়ে রাখি[৪২] এবং পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে তারই প্রশংসা ছেড়ে দেই। সমগ্র বিশ্ববাসীর মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।[৪৩] সৎকর্মশীলদেরকে আমি এমনই প্রতিদান দিয়ে থাকি। আসলে সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তরভুক্ত। তারপর অন্যদলকে আমি ডুবিয়ে দেই।

৩৫. অর্থাৎ অস্বীকারকারীরা একথা শুনে কুরআনের নিন্দা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিদ্রূপ করার একটি নতুন সুযোগ পেয়ে যায়। এর ফলে তারা ঠাট্টা করে বলতে থাকে, নাও এখন নতুন কথা শোনো, জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে নাকি আবার গাছ জন্মাবে।

৩৬. এখানে এরূপ ভুল বুঝাবুঝি হওয়া চাই না যে, শয়তানের মাথা কে দেখেছে যে যাক্কুম গাছের ফুলকে তার সাথে তুলনা করা হয়েছে? আসলে এটি একটি কাল্পনিক উপমা। সাধারণভাবে প্রত্যেক ভাষার সাহিত্যে এর সাহায্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেমন আমরা একটি মেয়ের পরমা সুন্দরী হবার ধারণা প্রকাশ করার জন্য বলি, বাহ্ মেয়েটি পরীর মতো সুন্দরী। অন্যদিকে কোন মেয়ের চরম কদাকার রূপ বর্ণনা করার জন্য বলি, মেয়েটি যেন একটি পেত্নী। কোন ব্যক্তির নূরানী চেহারার বর্ণনা দেবার জন্য বলে থাকি, ঠিক ফেরেশ্‌তার মতো চেহারা। আর কেউ যদি অত্যন্ত ভয়াল ভীষণ আকৃতি নিয়ে সামনে আসে তাহলে আমরা বলি, তাকে ঠিক শয়তানের মতো দেখাচ্ছে।

৩৭. এ থেকে বুঝা যায় যে, জাহান্নামবাসীরা যখন ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে যেতে থাকবে তখন তাদেরকে হাঁকিয়ে এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে রয়েছে যাক্কুম গাছ ও টগবগে ফুটন্ত পানির ঝরণা। তারপর সেখান থেকে খানাপিনা শেষ করার পর তাদেরকে আবার তাদের জাহান্নামে ফিরিয়ে আনা হবে।

৩৮. অর্থাৎ তারা নিজেদের বুদ্ধি ব্যবহার করে তাদের বাপ-দাদাদের থেকে যে রীতি-রেওয়াজ চলে আসছে তা সঠিক কিনা সেকথা কোনদিন চিন্তা করেনি। ব্যাস, যে পথে অন্যদেরকে চলতে দেখেছে চোখ বন্ধ করে তারা সে পথেই চলতে থেকেছে।

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ
وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ
بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾

আর নূহের পথের অনুসারী ছিল ইবরাহীম। যখন সে তার রবের সামনে হাজির হয় "বিশুদ্ধ চিত্ত" নিয়ে।[৪৪] যখন বলে সে তার পিতা ও তার জাতিকে[৪৫] "এগুলো কি জিনিস যার ইবাদাত তোমরা করছো? আল্লাহকে বাদ দিয়ে কি তোমরা মিথ্যা বানোয়াট মাবুদ চাও? সমস্ত বিশ্ব-জগতের রব আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি?"[৪৬]

৩৯. এ বিষয়বস্তুটির সম্পর্ক রয়েছে পেছনের রুকূ'র শেষ বাক্যগুলোর সাথে। সেগুলোর ওপর চিন্তা-ভাবনা করলে এ কাহিনীটি এখানে কেন শুনানো হচ্ছে তা বুঝা যায়।

৪০. এখানে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের ফরিয়াদের কথা বলা হয়েছে। দীর্ঘকাল নিজের কওমকে সত্য দীনের দাওয়াত দেবার পর শেষে হতাশ হয়ে তিনি মহান আল্লাহর কাছে এ ফরিয়াদ করেছিলেন। সূরা কামারে এ ফরিয়াদের শব্দগুলো নিম্নোক্তভাবে এসেছে فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ "সে তার রবকে ডেকে বললো, আমি পরাজিত হয়ে গেছি, তুমি আমাকে সাহায্য করো।" (আল কামার, ১০ আয়াত)

৪১. অর্থাৎ একটি চরিত্রহীন ও জালেম জাতির ক্রমাগত বিরোধিতার কারণে তিনিই যে ভয়াবহ যন্ত্রণা, ক্লেশ ও কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছিলেন। এর মধ্যে এ বিষয়টির প্রতিও একটি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে যে, নূহ আলাইহিস সালাম ও তাঁর সাথিদেরকে যেভাবে সেই মহাক্লেশ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, ঠিক তেমনি শেষ পর্যন্ত আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সংগী-সাথিদেরকেও মক্কাবাসীরা যে মহাক্লেশের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে তা থেকে উদ্ধার করবো।

৪২. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, যারা হযরত নূহের বিরোধিতা করছিল তাদের বংশধারা দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে এবং হযরত নূহেরই বংশধারাকে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। দুই, সমস্ত মানব বংশধারাকে খতম করে দেয়া হয়েছে এবং সামনের দিকে কেবলমাত্র নূহ আলাইহিস সালামের সন্তানদের মাধ্যমে এ দুনিয়ার জনবসতিকে বিস্তৃতি দান করা হয়েছে। সাধারণভাবে মুফাস্সিরগণ এ দ্বিতীয় অর্থটিই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কুরআন মজীদের শব্দাবলী এ অর্থটির ব্যাপারে সুস্পষ্ট নয়। আসল ব্যাপারটা কি তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

৪৩. অর্থাৎ আজ সারা দুনিয়ায় হযরত নূহের দুর্নাম করার কেউ নেই। নূহের প্লাবনের পর থেকে আজ পর্যন্ত হাজার হাজার বছর ধরে দনিয়াবাসীরা তাঁর সুনামই করে চলছে।

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾
فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾
فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾

তারপর[৪৭] সে তারকাদের দিকে একবার তাকালো[৪৮] এবং বললো, আমি অসুস্থ।[৪৯] কাজেই তারা তাকে ত্যাগ করে চলে গেলো।[৫০] তাদের পেছনে সে চুপিচুপি তাদের দেবতাদের মন্দিরে ঢুকে পড়লো এবং বললো, "আপনারা খাচ্ছেন না কেন?"[৫১] কি হলো আপনাদের, কথা বলছেন না কেন?" এরপর সে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং ডান হাত দিয়ে খুব আঘাত করলো।

৪৪. রবের সামনে হাজির হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তাঁর দিকে রুজু হওয়া এবং সবার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একমাত্র তাঁর দিকে মুখ করা। আর বিশুদ্ধ চিত্ত (قلب سليم) মানে হচ্ছে "সঠিক ও নিষ্কলুষ অন্তকরণ"। অর্থাৎ সব রকমের বিশ্বাসগত ও নৈতিক ত্রুটিমুক্ত অন্তর। যেখানে কুফরী ও শিরক এবং সন্দেহ-সংশয়ের লেশ মাত্রও নেই। যার মধ্যে নাফরমানী ও বিদ্রোহের কোন সামান্যতম অনুভূতিও পাওয়া যায় না। যার মধ্যে কোন প্রকার প্যাঁচ ও জটিলতা নেই। যা সব ধরনের অসৎ প্রবণতা ও অপবিত্র কামনা-বাসনার সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত। যার মধ্যে কারো বিরুদ্ধে হিংসা, বিদ্বেষ ও অকল্যাণ কামনা পাওয়া যায় না এবং যার নিয়তে কোনপ্রকার ত্রুটি ও কৃত্রিমতা নেই।

৪৫. হযরত ইবরাহীমের (আ) এ ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আন'আম, ৫০-৫৫; মারয়াম, ২৬-২৭; আল আম্বিয়া, ৫১-৬৬ ; আশ্ শূ'আরা, ৫০-৬৪ এবং আল 'আনকাবূত, ২৫-৪৮ টীকা।

৪৬. অর্থাৎ আল্লাহকে তোমরা কী মনে করেছো? তোমরা কি মনে করো, এসব কাঠ-পাথরের তৈরি দেবতারা তাঁর সমজাতীয় হতে পারে? অথবা এরা তাঁর গুণাবলী ও ক্ষমতায় শরীক হতে পারে? আর তোমরা কি এ বিভ্রান্ত চিন্তারও শিকার হয়েছো যে, তাঁর সাথে এত বড় গোস্তাখী করার পর তোমরা তাঁর পাকড়াও থেকে রেহাই পেয়ে যাবে?

৪৭. এখন একটি বিশেষ ঘটনার কথা বলা হচ্ছে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা এসেছে সূরা আল আম্বিয়া, ৫১-৭৩ এবং আল 'আনকাবূতে, ১৬-২৭ আয়াতে।

৪৮. ইবনে আবি হাতেম প্রসিদ্ধ তাবে'ঈ মুফাস্সির কাতাদাহর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, আরবরা نَظَرَ فِي النُّجُوم (সে তারকাদের দিকে তাকালো) শব্দাবলী প্রবাদ বাক্য হিসেবে ব্যবহার করে তার যে অর্থ গ্রহণ করে তা হচ্ছে এই যে, সে ভাবনা-চিন্তা করলো অথবা সে চিন্তা করতে লাগলো। আল্লামা ইবনে কাসীর এ উক্তিটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এমনিতেও প্রায়ই দেখা যায়, যখন কোন ব্যক্তির সামনে চিন্তার কোন বিষয় আসে তখন সে আকাশের দিকে অথবা ওপরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তারপর ভেবে-চিন্তে জবাব দেয়।

فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴿٩٤﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ
وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾ فَأَرَادُوا بِهِ
كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٩٩﴾
رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾

(ফিরে এসে) তারা দৌড়ে তার কাছে এলো।[৫২] সে বললো, "তোমরা কি নিজেদেরই খোদাই করা জিনিসের পূজা করো? অথচ আল্লাহই তোমাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যে জিনিসগুলো তৈরি করো তাদেরকেও।" তারা পরস্পর বললো, "এর জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি করো এবং একে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দাও।" তারা তার বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপ নিতে চেয়েছিল কিন্তু আমি তাদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করেছি।[৫৩]

ইবরাহীম বললো,[৫৪] "আমি আমার রবের দিকে যাচ্ছি,[৫৫] তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন। হে পরওয়ারদিগার! আমাকে একটি সৎকর্মশীল পুত্র সন্তান দাও।"[৫৬]

৪৯. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর জীবনে তিনটে মিথ্যা বলেছিলেন বলে যে কথা বলা হয়ে থাকে এটি তার একটি। অথচ একথাটিকে মিথ্যা বা বাস্তব বিরোধী বলার জন্য প্রথমে কোন উপায়ে একথা জানা উচিত যে, সে সময় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কোন প্রকারের কোন কষ্ট ও অসুস্থতা ছিল না এবং তিনি নিছক বাহানা করে একথা বলেছিলেন। যদি এর কোন প্রমাণ না থেকে থাকে, তাহলে অযথা কিসের ভিত্তিতে একে মিথ্যা গণ্য করা হবে? এ বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমি তাফহীমুল কুরআন সূরা আল আম্বিয়া, ৬০ টীকায় করেছি এবং আরো কিছু আলোচনা রাসায়েল ও মাসায়েল ২ খণ্ডের ২০-২৪ পৃষ্ঠায় এসে গেছে।

৫০. আসল ব্যাপার কি ছিল তা এ বাক্য নিজেই প্রকাশ করছে। মনে হচ্ছে সম্প্রদায়ের লোকেরা কোন জাতীয় মেলায় যাচ্ছিল। হযরত ইবরাহীমের পরিবারের লোকেরা তাঁকেও সংগে যেতে অনুরোধ করে থাকবে। তিনি আমার শরীর খারাপ, আমি যেতে পারবো না, বলে ওযর পেশ করে দিয়ে থাকবেন। এখন যদি একথাটা একেবারে অসত্য বা বাস্তব বিরোধী হতো, তাহলে ঘরের লোকেরা তাঁকে বলতো, শরীর-স্বাস্থ্য তো ভালোই আছে দেখতে পাচ্ছি, তাহলে আবার খামখা বাহানা করছো কেন? কিন্তু যখন তারা এ ওজর গ্রহণ করে তাঁকে পেছনে রেখে চলে গেলো তখন এ থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে একথা প্রকাশ পায় যে, নিশ্চয়ই হযরত ইবরাহীম সে সময় সর্দি, কাশি অথবা এ ধরনের কোন সাধারণ রোগে ভুগছিলেন, যার ফলে পরিবারের লোকেরা তাঁকে রেখে চলে যেতে রাজি হয়ে যায়।

৫১. এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, মন্দিরে মূর্তিদের সামনে বিভিন্ন প্রকার খাবার জিনিস রাখা হয়েছিল।

৫২. এখানে ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। সূরা আল আম্বিয়ায় এর যে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে তাতে বলা হয়েছে, যখন তারা ফিরে এসে তাদের মন্দিরে সমস্ত মূর্তি ভেঙে পড়ে আছে দেখলো তখন চারদিকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলো। কিছু লোক বললো, ইবরাহীম নামের এক যুবক মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে নানান কথা বলে বেড়ায়। একথায় জমায়েতের লোকেরা বললো তাকে ধরে আনো। সে অনুসারে একটি দল দৌড়ে তাঁর কাছে এলো এবং তাঁকে সমবেত জনতার সামনে হাজির করলো।

৫৩. সূরা আল আম্বিয়ার ৬৯ আয়াতের শব্দাবলী হচ্ছে ঃ

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ

"আমি বললাম, হে আগুন! শীতল হয়ে যাও এবং নিরাপদ হয়ে যাও ইবরাহীমের জন্য।"

সূরা আল আনকাবূতের ২৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَاَنْجٰهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ (তারপর আল্লাহ থাকে আগুন থেকে উদ্ধার করলেন) এ থেকে প্রমাণ হয়, তারা হযরত ইবরাহীমকে (আ) আগুনে নিক্ষেপ করেছিল এবং তারপর আল্লাহ তাঁকে তা থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেন। "তারা তাঁর বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপ নিতে চাচ্ছিল কিন্তু আমি তাদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করেছি" আয়াতের এ শব্দগুলোকে এ অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে না যে, তারা হযরত ইবরাহীমকে আগুনে নিক্ষেপ করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। বরং ওপরে উল্লেখিত আয়াতের সাথে মিলিয়ে দেখলে তার এ অর্থটিই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, তারা তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতে চাচ্ছিল কিন্তু তা করতে পারেনি। অলৌকিকভাবে বেঁচে যাবার ফলে হযরত ইবরাহীমের (আ) শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয়ে গেলো এবং মুশরিকদেরকে আল্লাহ হেয়প্রতিপন্ন করলেন। এ ঘটনাটি বর্ণনা করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরাইশদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া যে, তোমরা যে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সন্তান হবার গর্ব করে থাকো তাঁর নীতি তা ছিল না যা তোমরা অবলম্বন করেছো বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নীতি অবলম্বন করেছেন সেটিই ছিল তাঁর নীতি। এখন যদি তোমরা তাঁকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য এমন ধরনের চক্রান্ত করো যা হযরত ইবরাহীমের জাতি তাঁর বিরুদ্ধে করেছিল, তাহলে শেষ পর্যন্ত তোমরাই হেয়প্রতিপন্ন হবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেয়-প্রতিপন্ন করার ক্ষমতা তোমাদের নেই।

৫৪. আগুন থেকে সুস্থ শরীরে স্বাচ্ছন্দে বেরিয়ে আসার পর যখন হযরত ইবরাহীম (আ) দেশ থেকে বের হয়ে যাবার ফায়সালা করলেন তখন চলার সময় একথাগুলো বলেন।

৫৫. এর অর্থ হচ্ছে, আমি আল্লাহর জন্য বের হয়ে পড়ছি। কারণ আমি আল্লাহর হয়ে গেছি, তাই আমার জাতি আমার শত্রু হয়ে গেছে। নয়তো আমার ও তার মধ্যে কোন দুনিয়াবী ঝগড়া ছিল না এবং এর ভিত্তিতে আমাকে স্বদেশ ত্যাগ করতে হচ্ছে না। তাছাড়া

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي
الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ۭ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۡ
سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَاۗءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ﴿١٠٣﴾
وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٠٥﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰۗؤُا الْمُبِيْنُ ﴿١٠٦﴾

(এ দোয়ার জবাবে) আমি তাকে একটি ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।[৫৭] সে পুত্র যখন তার সাথে কাজকর্ম করার বয়সে পৌঁছুলো তখন (একদিন) ইবরাহীম তাকে বললো, "হে পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখি তোমাকে আমি যবেহ করছি,[৫৮] এখন তুমি বল তুমি কি মনে কর?"[৫৯] সে বললো, "হে আব্বাজান! আপনাকে যা হুকুম দেয়া হচ্ছে[৬০] তা করে ফেলুন, আপনি আমাকে ইনশাআল্লাহ সবরকারীই পাবেন।" শেষ পর্যন্ত যখন এরা দু'জন আনুগত্যের শির নত করে দিল এবং ইবরাহীম পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে দিল[৬১] এবং আমি আওয়াজ দিলাম,[৬২] "হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়ে দিয়েছো।[৬৩] আমি সৎকর্মকারীদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি[৬৪] নিশ্চিতভাবেই এটি ছিল একটি প্রকাশ্য পরীক্ষা।"[৬৫]

দুনিয়ায় আমার যাবার মতো কোন ঠিকানা নেই। সমগ্র দেহ-প্রাণকে তাকদীরের হাতে ছেড়ে দিয়ে একমাত্র আল্লাহর ভরসায় বের হয়ে পড়ছি। যেদিকে তিনি নিয়ে যাবেন সেদিকেই চলে যাবো।

৫৬. এ দোয়া থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে একথা জানা যায় যে, হযরত ইবরাহীম সে সময় সন্তানহীন ছিলেন। কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে জানা যায়, তিনি কেবলমাত্র নিজের এক স্ত্রী ও এক ভাতিজাকে (হযরত লূত) সাথে নিয়ে দেশ থেকে বের হয়ে পড়েছিলেন। সে সময় স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনে এ কামনার উদ্ভব হয়ে থাকবে যে, আল্লাহ যেন তাঁকে একটি সৎকর্মশীল সন্তান দান করেন, যে এ প্রবাস জীবনে তাঁর দুঃখ লাঘব করতে সাহায্য করবে।

৫৭. দোয়া করতে করতেই সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, এ থেকে একথা মনে করার কোন কারণ নেই। কুরআন মজীদেরই অন্য স্থানে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ

"আল্লাহর শোকর, তিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাক দান করেছেন।"
(ইবরাহীম, ৩৯)

এ থেকে প্রমাণ হয়, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দোয়া এবং এ সুসংবাদের মধ্যে বহু বছরের ব্যবধান ছিল। বাইবেল বর্ণনা করছে, হযরত ইসমাঈলের (আ) জন্মের সময় হযরত ইবরাহীমের (আ) বয়স ছিল ৮৬ বছর। (আদি পুস্তক ১৬ ঃ ১৬) অন্যদিকে হযরত ইসহাকের জন্মের সময় তাঁর বয়স ছিল একশত বছর (৫ ঃ ২১)

৫৮. একথা মনে রাখতে হবে, হযরত ইবরাহীম (আ) স্বপ্নে দেখেননি যে, তিনি পুত্রকে যবেহ করে ফেলেছেন। বরং তিনি দেখেছিলেন, তিনি তাকে যবেহ করছেন। যদিও তিনি তখন স্বপ্নের এ অর্থই নিয়েছিলেন যে, তিনি পুত্রকে যবেহ করবেন। এ কারণে তিনি ঠাণ্ডা মাথায় পুত্রকে কুরবানী করে দেবার জন্য একেবারেই তৈরি হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু স্বপ্ন দেখাবার মধ্যে মহান আল্লাহ যে সূক্ষ্ম বিষয় সামনে রেখেছিলেন তা সামনের ১০৫ আয়াতে তিনি নিজেই সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন।

৫৯. পুত্রকে একথা জিজ্ঞেস করার এ অর্থ ছিল না যে, তুমি রাজি হয়ে গেলে আল্লাহর হুকুম তামিল করবো অন্যথায় করবো না। বরং হযরত ইবরাহীম আসলে দেখতে চাচ্ছিলেন, তিনি যে সৎসন্তানের জন্য দোয়া করেছিলেন সে যথার্থই কতটুকু সৎ। যদি সে নিজে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষে প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে, তাহলে এর অর্থ হয়, দোয়া পুরোপুরি কবুল হয়েছে এবং পুত্র নিছক শারীরিক দিক দিয়েই তাঁর সন্তান নয় বরং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও তাঁর সুসন্তান।

৬০. এ শব্দগুলো পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে, নবী-পিতার স্বপ্নকে পুত্র নিছক স্বপ্ন নয় বরং আল্লাহর হুকুম মনে করেছিলেন। এখন যদি যথার্থই এটি আল্লাহর হুকুম না হতো তাহলে অবশ্যই আল্লাহ পরিষ্কারভাবে বা ইংগিতের মাধ্যমে বলে দিতেন যে, ইবরাহীম-পুত্র ভুলে একে হুকুম মনে করে নিয়েছে। কিন্তু পূর্বাপর আলোচনায় এর কোন ইংগিত নেই। এ কারণে নবীদের স্বপ্ন নিছক স্বপ্ন নয় বরং তাও হয় এক ধরনের অহী, মুসলমানরা এ বিশ্বাস পোষণ করে। একথা সুস্পষ্ট, যে কথার মাধ্যমে এতবড় একটি নিয়ম আল্লাহর শরীয়াতের অন্তরভুক্ত হতে পারে তা যদি সত্য ভিত্তিক না হতো বরং নিছক একটি বিভ্রান্তি হতো তাহলে আল্লাহ তার প্রতিবাদ করতেন না, এটা হতো একটি অসম্ভব ব্যাপার। কুরআনকে যারা আল্লাহর কালাম বলে মানে তাদের পক্ষে আল্লাহর এ ধরনের ভুল হয়ে যেতে পারে একথা মেনে নেয়া একেবারেই অসম্ভব।

৬১. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ) যবেহ করার জন্য পুত্রকে চিৎ করে শোয়াননি বরং উপুড় করে শুইয়ে দিয়েছেন, যাতে যবেহ করার সময় পুত্রের মুখ দেখে কোন প্রকার স্নেহ-মমতার বসে তাঁর হাত কেঁপে না যায়। তাই তিনি নিচের দিক থেকে হাত রেখে ছুরি চালাতে চাচ্ছিলেন।

৬২. ব্যাকরণবিদদের একটি দল বলেন, এখানে "এবং" শব্দটি "তখন" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ বাক্যটি হবে—"যখন এরা দু'জন আনুগত্যের শির নত করে দিল এবং ইবরাহীম পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে দিল তখন আমি আওয়াজ দিলাম।" কিন্তু অন্য একটি দল বলেন, এখানে "যখন" শব্দটির জওয়াব উহ্য রয়ে গেছে এবং তাকে শ্রোতার মনের

وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٠٨﴾ سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿١٠٩﴾
كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١١٠﴾ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١١﴾ وَبَشَّرْنٰهُ
بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٢﴾ وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اِسْحٰقَ ۭ وَمِنْ
ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ ﴿١١٣﴾

একটি বড় কুরবানীর বিনিময়ে আমি এ শিশুটিকে ছাড়িয়ে নিলাম[৬৬] এবং পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে চিরকালের জন্য তার প্রশংসা রেখে দিলাম। শান্তি বর্ষিত হোক ইবরাহীমের প্রতি। আমি সৎকর্মকারীদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চিতভাবেই সে ছিল আমার মুসলিম বান্দাদের অন্তরভুক্ত। আর আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম, সে ছিল সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে একজন নবী। আর বরকত দিলাম তাকে ও ইসহাককে,[৬৭] এখন এ দু'জনের বংশধরদের মধ্য থেকে কতক সৎকর্মকারী আবার কতক নিজেদের প্রতি সুস্পষ্ট জুলুমকারী।[৬৮]

কল্পনার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কারণ কথা এত বড় ছিল যে, তাকে শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করার পরিবর্তে কল্পনারই জন্য ছেড়ে দেয়া বেশী সংগত ছিল। আল্লাহ যখন দেখে থাকবেন বুড়ো বাপ তার বুড়ো বয়সের আকাংখায় চেয়ে পাওয়া পুত্রকে নিছক তাঁর সন্তুষ্টিলাভের জন্য কুরবানী করে দিতে প্রস্তুত হয়ে গেছেন এবং পুত্রও নিজের গলায় ছুরি চালিয়ে দিতে রাজি হয়ে গেছে, তখন এ দৃশ্য দেখে রহমতের দরিয়া কেমন নাজানি উথলে উঠে থাকবে এবং দুই পিতা-পুত্রের প্রতি মালিকের প্রেম কেমন নাজানি বাঁধনহারা হয়ে গিয়ে থাকবে, তা কেবল কল্পনাই করা যেতে পারে। কথায় তার অবস্থা যতই বর্ণনা করা হোক না কেন তা ব্যক্ত করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। বরং বর্ণনায় তার আসল দৃশ্যের অতি অল্পই ফুটে উঠবে।

৬৩. অর্থাৎ তুমি পুত্রকে যবেহ করে দিয়েছো এবং তার প্রাণবায়ু বের হয়ে গেছে, এটা তো আমি তোমাকে দেখাইনি। বরং আমি দেখিয়েছিলাম, তুমি যবেহ করছো। তুমি সে স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়ে দিলে। কাজেই এখন তোমার সন্তানের প্রাণবায়ু বের করে নেয়া আমার লক্ষ নয়। আসল উদ্দেশ্য যা কিছু ছিল তা তোমার সংকল্প, উদ্যোগ ও প্রস্তুতিতেই সফল হয়ে গেছে।

৬৪. অর্থাৎ যারা সৎকর্মের পথ অবলম্বন করে তাদেরকে আমি খামখা কষ্টের মধ্যে ফেলে দেবার এবং দুঃখ ও ক্লেশের মুখোমুখি করার জন্য পরীক্ষার সম্মুখীন করি না। বরং তাদের উন্নত গুণাবলী বিকশিত করার এবং তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করার জন্যই তাদেরকে পরীক্ষার মুখোমুখি করি। তারপর পরীক্ষার খাতিরে তাদেরকে যে সংকট

সাগরে নিক্ষেপ করি তা থেকে নিরাপদে উদ্ধারও করি। তাই দেখো, পুত্রের কুরবানীর জন্য তোমার উদ্যোগ প্রবণতা ও প্রস্তুতিই তোমাকে এমন মর্যাদা দানের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে, যা আমার সন্তুষ্টিলাভের জন্য যথার্থই পুত্র উৎসর্গকারী লাভ করতে পারতো। এভাবে আমি তোমার পুত্রের প্রাণও রক্ষা করলাম এবং তোমাকে এ উচ্চ মর্যাদাও দান করলাম।

৬৫. অর্থাৎ তোমার হাতে তোমার পুত্রকে যবেহ করা উদ্দেশ্য ছিল না। বরং দুনিয়ার কোন জিনিসকে তুমি আমার মোকাবিলায় বেশী প্রিয় মনে করো কিনা, সে পরীক্ষা নেয়াই ছিল আসল উদ্দেশ্য।

৬৬. "বড় কুরবানী" বলতে বাইবেল ও ইসলামী বর্ণনা অনুসারে একটি ভেড়া। সে সময় আল্লাহর ফেরেশ্‌তা হযরত ইবরাহীমের সামনে এটি পেশ করেন পুত্রের পরিবর্তে একে যবেহ করার জন্য। একে "বড় কুরবানী" বলার কারণ হচ্ছে এই যে, এটি ইবরাহীমের ন্যায় আল্লাহর বিশ্বস্ত বান্দার জন্য ইবরাহীম পুত্রের ন্যায় ধৈর্যশীল ও প্রাণ উৎসর্গকারী পুত্রের প্রাণের বিনিময়ে ছিল এবং আল্লাহ একে একটি নজীর বিহীন কুরবানীর নিয়ত পুরা করার অসিলায় পরিণত করেছিলেন। এ ছাড়াও একে "বড় কুরবানী" গণ্য করার আর একটি বড় কারণ দিয়েছেন যে, এ তারিখে সারা দুনিয়ার সমস্ত মু'মিন পশু কুরবানী করবে এবং বিশ্বস্ততা ও প্রাণ উৎসর্গীতার এ মহান ঘটনার স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করতে থাকবে।

৬৭. এখানে এসে আমাদের সামনে এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর যে পুত্রকে কুরবানী করতে উদ্যত হয়েছিলেন এবং যিনি স্বতস্ফূর্তভাবে নিজেকে এ কুরবানীর জন্য পেশ করে দিয়েছিলেন তিনি কে ছিলেন? সর্বপ্রথম এ প্রশ্নের জবাব আমাদের সামনে আসছে বাইবেল থেকে ঃ

"ঈশ্বর আব্রাহামের পরীক্ষা করিলেন। তিনি তাঁহাকে কহিলেন, হে আব্রাহাম .....তুমি আপন পুত্রকে, তোমার অদ্বিতীয় পুত্রকে, যাহাকে তুমি ভালবাস, সেই ইসহাককে লইয়া মোরিয়া দেশে যাও এবং তথাকার যে এক পর্বতের কথা আমি তোমাকে বলিব, তাহার উপরে তাহাকে হোমার্থে বলিদান কর।"

(আদিপুস্তক ২২ ঃ ১-২)

এ বর্ণনায় একদিকে বলা হচ্ছে, আল্লাহ হযরত ইসহাকের কুরবানী চেয়েছিলেন আবার অন্যদিকে একথাও বলা হচ্ছে, তিনি একমাত্র পুত্র ছিলেন। অথচ বাইবেলের নিজেরই অন্যান্য বর্ণনা থেকে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ হয় যে, হযরত ইসহাক একমাত্র পুত্র ছিলেন না। তাই বাইবেলের নিম্নোক্ত বিস্তারিত বক্তব্যটি একবার দেখুন ঃ

"আব্রামের স্ত্রী সারী নিঃসন্তানা ছিলেন, এবং হাগার নামে তার এক মিস্রীয় দাসী ছিল। তাহাতে সারী আব্রামকে কহিলেন, দেখ সদাপ্রভূ আমাকে বন্ধ্যা করিয়াছেন; বিনয় করি, তুমি আমার দাসীর কাছে গমন কর, কি জানি ইহা দ্বারা আমি পুত্রবতী হইতে পারিব। তখন আব্রাম সারীর বাক্যে সম্মত হইলেন। এইরূপে কানান দেশে আব্রাম দশ বৎসর বাস করিলে পর আব্রামের স্ত্রী সারী আপন দাসী মিস্রীয়া হাগারকে লইয়া আপন স্বামী আব্রামের সহিত বিবাহ দিলেন। পরে আব্রাম হাগারের কাছে গমন করিলে সে গর্ভবতী হইল।" (আদি পুস্তক ১৬ ঃ ১-৪)

"সদাপ্রভূর দূত তাহাকে আরও কহিলেন, দেখ, তোমার গর্ভ হইয়াছে, তুমি পুত্র প্রসব করিবে, ও তাহার নাম ইশ্মায়েল [ঈশ্বর শুনেন] রাখিবে।" (আদিপুস্তক ১৬ ঃ ১১)

"আব্রামের ছেয়াশী বৎসর বয়সে হাগার আব্রামের নিমিত্তে ইশ্মায়েলকে প্রসব করিল।" (১৬ ঃ ১৬)

"আর ঈশ্বর আব্রাহামকে কহিলেন, তুমি তোমার স্ত্রী সারীকে আর সারী বলিয়া ডাকিওনা, তাহার নাম সারা [রানী] হইল.....তাহা হইতে এক পুত্রও তোমাকে দিব;.....তুমি তাহার নাম ইস্হাক [হাস্য] রাখিবে,.....আগামী বৎসরের এই ঋতুতে সারা তোমার নিমিত্তে যাহাকে প্রসব করিবে, ...পরে আব্রাহাম আপনপুত্র ইশ্মায়েলকে ও .....গৃহে যত পুরুষ ছিল, সেই সকলকে লইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সেই দিনে তাহাদের লিঙ্গাগ্রচর্ম ছেদন করিলেন। আব্রাহামের লিঙ্গাগ্রের ত্বক ছেদন কালে তাঁহার বয়স নিরানব্বই বৎসর। আর তাঁহার পুত্র ইশ্মায়েলের লিঙ্গাগ্রের ত্বক ছেদন কালে তাহার বয়স তের বৎসর।" (আদি পুস্তক ১৭ঃ ১৫-২৫)

"আব্রাহামের একশত বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র ইসহাকের জন্ম হয়।"

(আদিপুস্তক ২১ ঃ ৫)

এ থেকে বাইবেলের বর্ণনার বৈপরীত্য পরিষ্কার সামনে এসে যায়। একথা সুস্পষ্ট, ১৪ বছর পর্যন্ত হযরত ইসমাঈল (আ) হযরত ইবরাহীমের (আ) একমাত্র সন্তান ছিলেন। এখন যদি একমাত্র পুত্রের কুরবানী চাওয়া হয়ে থাকে তাহলে তা হযরত ইসহাকের নয় বরং ইসমাঈলের কুরবানী ছিল। কারণ তিনিই ছিলেন একমাত্র সন্তান। আর যদি হযরত ইসহাকের কুরবানী চাওয়া হয়ে থাকে তাহলে আবার একথা বলা ঠিক নয় যে, একমাত্র সন্তানের কুরবানী চাওয়া হয়েছিল।

এরপর আমরা ইসলামী বর্ণনাগুলোর প্রসংগে আসতে পারি। সেখানে দেখি ভীষণ মতবিরোধ। মুফাস্সিরগণ সাহাবা ও তাবেঈগণের যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন তাতে একটি দলের উক্তি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীমের পুত্র হযরত ইসহাক। এ দলে রয়েছেন নিম্নোক্ত মনীষীগণ ঃ

হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আবু হুরাইরাহ (রা), কাতাদাহ, ইকরামাহ, হাসান বাসরী, সাঈদ ইবনে জুবাইর, মুজাহিদ, শা'বী, মাসরূক, মাকহূল, যুহরী, আতা, মুকাতিল, সুদ্দী, কা'ব আহবার, যায়েদ ইবনে আসলাম এবং আরো অনেকে।

দ্বিতীয় দলটি বলেন, তিনি ছিলেন হযরত ইসমাঈল। এ দলে রয়েছেন নিম্নোক্ত মনীষীগণ ঃ

হযরত আবুবকর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আবু হুরাইরাহ (রা), হযরত মু'আবীয়াহ (রা), ইকরামাহ, মুজাহিদ, ইউসুফ ইবনে মেহরান, হাসান বাসরী, মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল কুরযী, শা'বী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, দাহ্হাক, মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন

(মুহাম্মাদ আল বাকের), রাবী' ইবনে আনাস, আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং আরো অনেকে।

এ দু'টি তালিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এর মধ্যে অনেকগুলো নাম উভয় তালিকায় পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ একজন মনীষী বিভিন্ন সময় দু'টি ভিন্ন উক্তি করেছেন। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে ইকরামাহ এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীমের পুত্র হযরত ইসহাক। কিন্তু তাঁরই থেকে আতা ইবনে আবী রাবাহ একথা উদ্ধৃত করেছেন ঃ زعمت اليهود انه اسحق وكذبت اليهود (ইহুদীদের দাবী হচ্ছে, তিনি ছিলেন হযরত ইসহাক কিন্তু ইহুদীরা মিথ্যা বলেছে) অনুরূপভাবে হযরত হাসান বাসরী থেকে একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি হযরত ইসহাকের কুরবানীর প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু আমর ইবনে উবাইদ বলেন, হাসান বাসরীর এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না যে, হযরত ইবরাহীমের (আ) যে পুত্রকে যবেহ করার হুকুম হয়েছিল তিনি ছিলেন হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম।

এ বর্ণনার বিভিন্নতার ফলে মুসলিম আলেমগণের একটি দল পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে হযরত ইসহাকের পক্ষে রায় দিয়েছেন। যেমন ইবনে জারীর ও কাযী ঈয়ায। অনেকে চূড়ান্তভাবে এ মত প্রকাশ করেছেন যে, হযরত ইসমাঈলকেই যবেহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেমন ইবনে কাসীর। আবার কেউ কেউ সংশয়াপন্ন। যেমন জালালুদ্দীন সুয়ূতী। কিন্তু গবেষণা ও অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে বিচার করলে একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইসমাঈলকেই যবেহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর সপক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তি রয়েছে ঃ

এক ঃ ওপরে কুরআন মজীদের এ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, স্বদেশ থেকে হিজরাত করার সময় হযরত ইবরাহীম (আ) একটি সৎকর্মশীল পুত্রের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন। এর জবাবে আল্লাহ তাঁকে একটি ধৈর্যশীল সন্তানের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। বক্তব্যের অন্তরনিহিত অর্থ পরিষ্কার একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, এ দোয়া ঠিক তখন করা হয়েছিল যখন তিনি ছিলেন সন্তানহীন। আর যে সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল সেটি ছিল তাঁর প্রথম সন্তান। তারপর কুরআনের বক্তব্যের ধারাবাহিক বর্ণনা থেকে একথাও প্রকাশ হয় যে, সে শিশুটিই যখন পিতার সাথে দৌড় ঝাঁপ করার যোগ্য হয়ে গেলো তখন তাকে যবেহ করার ইশারা করা হলো। এখন একথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত যে, হযরত ইবরাহীমের (আ) প্রথম সন্তান ছিলেন হযরত ইসমাঈল। হযরত ইসহাক প্রথম সন্তান ছিলেন না, কুরআনে হযরত ইবরাহীমের সন্তানদের ধারাবাহিকতার বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ (ابراهيم : ٣٩)

দুই ঃ কুরআন মজীদে যেখানে হযরত ইসহাকের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে সেখানে তাঁর জন্য "গোলামুন আলীমুন" (জ্ঞানবান বালক) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ঃ فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ (الحجر : ٥٣) এবং عَلِيْمٍ (الزاريات : ٢٨) কিন্তু এখানে যে সন্তানটির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তার জন্য "গোলামুন হালীমুন" (ধৈর্যশীল বালক) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, দুই পুত্রের দু'টি পৃথক বৈশিষ্ট

ছিল এবং যবেহ করার হুকুমটি জ্ঞানবান সন্তানের জন্য ছিল না, ছিল ধৈর্যশীল সন্তানের জন্য।

তিন ঃ কুরআন মজীদে হযরত ইসহাকের সুসংবাদ দেবার সাথে সাথেই এ সুসংবাদও দেয়া হয়েছিল যে, তাঁর গৃহে ইয়াকূবের মতো পুত্র সন্তান জন্ম নেবে ঃ

فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَاءِ إِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ (هود : ٧١)

এখন একথা পরিষ্কার যে, সন্তান জন্মের খবর দেবার সাথে সাথেই তার ওখানে একটি সুযোগ্য পুত্রসন্তানের জন্মেরও খবর দেয়া হয়ে গিয়ে থাকে, তার ব্যাপারে যদি হযরত ইবরাহীমকে এ স্বপ্ন দেখানো হয় যে, তিনি তাকে যবেহ করছেন, তাহলে হযরত ইবরাহীম কখনো একথা বুঝতে পারতেন না যে, তাঁর এ পুত্রকে কুরবানী করে দেবার ইংগিত করা হচ্ছে। আল্লামা ইবনে জারীর এ যুক্তিটির জবাবে বলেন, সম্ভবত এ স্বপ্নটি হযরত ইবরাহীমকে এমন এক সময় দেখানো হয় যখন হযরত ইসহাকের গৃহে হযরত ইয়াকুবের জন্ম হয়ে গেছে। কিন্তু আসলে এটি ঐ যুক্তির একটি অত্যন্ত দুর্বল জবাব। কুরআন মজীদের শব্দ হচ্ছে ঃ "যখন ছেলেটি বাপের সাথে দৌড় ঝাঁপ করার যোগ্য হয়ে গেলো" ঠিক এ সময়ই এ স্বপ্নটি দেখানো হয়েছিল। যে ব্যক্তি মুক্ত মনে এ শব্দগুলো পড়বে তার সামনে ভেসে উঠবে আট দশ বছরের একটি ছেলের ছবি। কোন জোয়ান ব্যক্তি যিনি সন্তানের পিতা তাঁর সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে বলে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।

চার ঃ কুরআনে আল্লাহ সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করার পর শেষে বলছেন, "আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিয়েছি, সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে একজন নবী।" এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, যে পুত্রকে যবেহ করার ইংগিত দেয়া হয়েছিল, এটি সে পুত্র নয়। বরং পূর্বে অন্য কোন পুত্রের সুসংবাদ দেয়া হয়। তারপর যখন সে পিতার সাথে দৌড়াদৌড়ি ও চলাফেরা করার যোগ্যতা অর্জন করে তখনই তাকে যবেহ করার হুকুম হয়। তারপর যখন হযরত ইবরাহীম এ পরীক্ষায় সফলকাম হয়ে যান তখন তাঁকে আর এক সন্তান অর্থাৎ ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের সুসংবাদ দেয়া হয়। ঘটনার এ বিন্যাস চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দান করে যে, যে পুত্রটিকে যবেহ করার হুকুম হয়েছিল তিনি হযরত ইসহাক ছিলেন না। বরং তাঁর কয়েক বছর আগে সে পুত্রের জন্ম হয়েছিল। আল্লামা ইবনে জারীর এ সুস্পষ্ট যুক্তিটি এ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, প্রথমে কেবলমাত্র হযরত ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল, তারপর যখন তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন তখন তাঁর নবী হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হলো। কিন্তু এটি তাঁর প্রথম জবাবটি থেকেও দুর্বলতর। সত্যই যদি ব্যাপার এটাই হতো, তাহলে আল্লাহ এভাবে বলতেন না ঃ "আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দেই, সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে একজন নবী।" বরং তিনি বলতেন, আমি তাকে এ সুসংবাদ দেই যে, তোমার এ পুত্র একজন নবী হবেন সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে।

পাঁচ ঃ নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে প্রমাণিত যে, হযরত ইসমাঈলের বিনিময়ে যে ভেড়াটি যবেহ করা হয়েছিল তার শিং কা'বাঘরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের (রা) যামানা পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিল। পরবর্তীতে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ যখন হরম শরীফে ইবনে যুবাইরকে (রা) অবরোধ করে এবং কা'বাঘর ভেঙে ফেলে তখন এ শিংও নষ্ট হয়ে যায়।

ইবনে আব্বাস ও আমের শা'বী উভয়ই এ মর্মে সাক্ষ দেন যে, তারা নিজেরা কা'বাঘরে এ শিং দেখেছিলেন (ইবনে কাসীর) এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরবানীর এ ঘটনা সিরিয়ায় নয়, মক্কা মু'আয্যমায় সংঘটিত হয়েছিল এবং হযরত ইসমাঈলের সাথেই ঘটেছিল। তাইতো হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈলের নির্মিত কা'বাঘরে তার স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল।

ছয় ঃ শত শত বছর থেকে আরবীয় বর্ণনাসমূহে ও কিংবদন্তীতে একথা সংরক্ষিত ছিল যে, কুরবানীর এ ঘটনা ঘটেছিল মিনায়। আর এটা শুধুমাত্র কিংবদন্তীই ছিল না বরং সে সময় থেকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানা পর্যন্ত হজ্জের কর্মকাণ্ডের মধ্যে এ কাজটিও নিয়মিতভাবে শামিল হয়ে আসছিল যে, এ মিনা নামক স্থানে যেখানে হযরত ইবরাহীম কুরবানী করেছিলেন প্রত্যেক ব্যক্তি সেখানে গিয়ে পশু কুরবানী করতো। তারপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন হলো তখন তিনিও এ পদ্ধতি অব্যাহত রাখেন। এমন কি আজো হজ্জের সময় যিলহজ্জের দশ তারিখে মিনায় কুরবানী করা হয়। সাড়ে চার হাজার বছরের এ অবিচ্ছিন্ন কার্যক্রম একথার অনস্বীকার্য প্রমাণ পেশ করে যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এ কুরবানীর উত্তরাধিকারী ছিল বনী ইসমাঈল, বনী ইসহাক নয়। হযরত ইসহাকের বংশে এ ধরনের কোন রেওয়াজ কোন দিন জারি থাকেনি, যাতে সমস্ত জাতি একসাথে কুরবানী করতো এবং তাকে হযরত ইবরাহীমের কুরবানীর স্মৃতি বলা হতো।

এগুলো এমন ধরনের যুক্তি যেগুলো সামনে রাখার পর একথা বিস্ময়কর মনে হচ্ছে যে, স্বয়ং উম্মতে মুসলিমার মধ্যে হযরত ইসহাকের আল্লাহর জন্য কুরবানী হবার ধারণা কেমন করে বিস্তার লাভ করলো। ইহুদীরা যদি হযরত ইসমাঈলকে এ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে তাদের দাদা হযরত ইসহাকের সাথে একে সংশ্লিষ্ট করার চেষ্টা করে, তাহলে এটি একটি বোধগম্য বিষয় হয় কিন্তু মুসলমানদের একটি বিরাট দল তাদের এ প্রতারণা গ্রহণ করলো কেমন করে? এ প্রশ্নের অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী জবাব দিয়েছেন আল্লামা ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে। তিনি বলেন ঃ

"প্রকৃত ব্যাপার তো আল্লাহই জানেন। তবে বাহ্যত মনে হয়, এ সমস্ত উক্তি (হযরত ইসহাকের আল্লাহর জন্য কুরবানী হবার পক্ষে যেগুলো বলা হয়েছে) কা'ব আহবার থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি যখন হযরত উমরের (রা) আমলে মুসলমান হন তখন মাঝে মধ্যে ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রাচীন কিতাবসমূহের বাণী তাঁদেরকে পড়ে শুনাতেন এবং হযরত উমর (রা) সেসব শুনতেন। এ কারণে অন্য লোকেরাও তাঁর কথা শুনতে শুরু করে এবং তিনি যেসব ভালো-মন্দ বর্ণনা করতেন সেগুলো তারা বর্ণনা করতে শুরু করে। অথচ এ উম্মতের জন্য তাঁর এ তথ্য সম্ভারের মধ্য থেকে কোন জিনিসেরই প্রয়োজন ছিল না।"

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরাযীর একটি রেওয়ায়াত এ প্রশ্নটির ওপর আরো কিছুটা আলোকপাত করে। তিনি বর্ণনা করেন, একবার আমার উপস্থিতিতে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের (র) সামনে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, আল্লাহর জন্যে যবেহ করা হয়েছিল কাকে, হযরত ইসহাককে না হযরত ইসমাঈলকে? সে সময় এমন এক ব্যক্তিও মজলিসে হাজির ছিলেন যিনি পূর্বে ইহুদী আলেমদের অন্তরভুক্ত ছিলেন এবং পরে সাচ্চা দিলে মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি বলেন, "হে আমীরুল মু'মেনীন! আল্লাহর কসম, তিনি

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١١٤﴾ وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ
الْعَظِيْمِ ﴿١١٥﴾ وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿١١٦﴾ وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ﴿١١٧﴾
وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿١١٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿١١٩﴾
سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٠﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢١﴾ اِنَّهُمَا
مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٢﴾

৪ রুকূ'

আমি অনুগ্রহ করেছি মূসা ও হারূনের প্রতি। তাদের উভয়কে ও তাদের জাতিকে উদ্ধার করেছি মহাক্লেশ থেকে।[৬৯] তাদেরকে সাহায্য করেছি, যার ফলে তারাই বিজয়ী হয়েছে। তাদের উভয়কে অত্যন্ত সুস্পষ্ট কিতাব দান করেছি। উভয়কে সঠিক পথ দেখিয়েছি এবং পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে তাদের উভয়ের সম্পর্কে সুখ্যাতি অক্ষুণ্ন রেখেছি। মূসা ও হারূনের প্রতি সালাম। সৎকর্মশীলদের আমি অনুরূপ প্রতিদানই দিয়ে থাকি। আসলে তারা আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তরভুক্ত ছিল।

ইসমাঈল ছিলেন। ইহুদীরা একথা জানে কিন্তু আরবদের প্রতি হিংসাবশত তারা দাবী করে যে, হযরত ইসহাককে আল্লাহর জন্য যবেহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। (ইবনে জারীর) এ দু'টি কথাকে মিলিয়ে দেখলে জানা যায়, আসলে এটা ছিল ইহুদী প্রচারণার প্রভাব এবং মুসলমানদের মধ্যে এ প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। আর মুসলমানরা যেহেতু তাত্ত্বিক বিষয়ে সবসময় বিদ্বেষ ও স্বার্থপ্রীতি মুক্ত থেকেছে তাই তাদের অনেকেই প্রাচীন সহীফাগুলোর বরাত দিয়ে ঐতিহাসিক বর্ণনার ছদ্মাবরণে ইহুদীরা যেসব বর্ণনা পেশ করতো সেগুলোকে নিছক একটি তাত্ত্বিক সত্য মনে করে গ্রহণ করে নেয় এবং একথা চিন্তা করেনি যে, এর মধ্যে তত্ত্বের পরিবর্তে বিদ্বেষ ও স্বার্থপ্রীতি সক্রিয় রয়েছে।

৬৮. যে উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীমের কুরবানীর কাহিনী এখানে বর্ণনা করা হয়েছে এ বাক্যটি তার সমগ্র অবয়বের ওপর আলোকপাত করে। হযরত ইবরাহীমের দুই পুত্রের বংশ থেকে দু'টি সুবিশাল জাতির সৃষ্টি হয়। একটি বনী ইসরাঈল জাতি। তাদের মধ্যে জন্ম হয় দুনিয়ার দু'টি বড় ধর্মমত (ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ)। তারা পৃথিবীর অনেক বড় ও বিস্তৃত অংশকে নিজেদের অনুসারী করে। দ্বিতীয়টি বনী ইসমাঈল জাতি। কুরআন নাযিলের সময় তারা ছিল সমগ্র আরববাসীর নেতা ও অনুসরণযোগ্য। সে সময় মক্কা মু'আয্যমার কুরাইশ গোত্র তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী ছিল। ইবরাহীমী বংশধারার এ দু'টি শাখা যে উন্নতি, বিস্তৃতি ও খ্যাতি অর্জন করে তা সম্ভব হয় হযরত

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ أَتَدْعُونَ
بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٥﴾ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ
الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ
الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٩﴾

আর ইলিয়াসও অবশ্যই রসূলদের একজন ছিল।[৭০] স্মরণ করো যখন সে তার জাতিকে বলেছিল, "তোমরা ভয় করো না? তোমরা কি বা'আলকে[৭১] ডাকো এবং পরিত্যাগ করো শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহকে, যিনি তোমাদের ও তোমাদের আগের পেছনের বাপ-দাদাদের রব?" কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো কাজেই এখন নিশ্চিতভাবেই তাদেরকে শাস্তির জন্য পেশ করা হবে, তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দারা ছাড়া।[৭২] আর ইলিয়াসের সম্পর্কে সুখ্যাতি আমি পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে অব্যাহত রেখেছি।[৭৩]

ইবরাহীম ও তাঁর দুই মহান মর্যাদা সম্পন্ন পুত্রের সাথে তাদের রক্ত সম্পর্কের কারণে। নয়তো দেখা যায়, দুনিয়ায় এমন কত শত পরিবারের উদ্ভব হয়েছে এবং কালক্রমে অপরিচিতির গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এখন মহান আল্লাহ এ পরিবারের ইতিহাসের সবচেয়ে স্বর্ণোজ্জ্বল কর্মকাণ্ড বর্ণনা করার পর এ উভয় দলকে এ অনুভূতি দান করছেন যে, তোমরা দুনিয়ায় যা কিছু মর্যাদা লাভ করেছো, এসবের মূলে রয়েছে তোমাদের বাপ-দাদা ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক আলাইহিমুস সালাম প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর আনুগত্য, নিঃস্বার্থ আন্তরিকতা ও আল্লাহর হুকুমের জন্য উৎসর্গিত প্রাণের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য। তিনি তাদেরকে বলেন, আমি তাদেরকে যে বরকত ও সমৃদ্ধি দান করেছিলাম এবং নিজের দয়া ও অনুগ্রহের যে বারিধারা তাদের প্রতি বর্ষণ করেছিলাম তা চোখ বন্ধ করে বর্ষণ করিনি। আমি এমনি সহসাই কোন কারণ ছাড়াই এক ব্যক্তি ও তাঁর দুই পুত্রকে বাছাই করে তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও দাক্ষিণ্যের ঝরণাধারা প্রবাহিত করিনি। বরং তাঁরা নিজেদের প্রকৃত মালিক ও প্রভুর প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার কিছু প্রমাণ পেশ করেছিলেন এবং তারই ভিত্তিতে এসব অনুগ্রহের হকদার হয়েছিলেন। এখন তোমরা নিছক তাদের আওলাদ এ অহংকারের ভিত্তিতে সেসব অনুগ্রহ ও নিয়ামতের হকদার হতে পারো না। আমি তো অবশ্যই দেখবো, তোমাদের মধ্যে কে সৎকর্মশীল এবং কে জালেম ও পাপাচারী। তারপর যে যেমনটি হবে তার সাথে ঠিক তেমনি ধরনেরই ব্যবহার করা হবে।

৬৯. অর্থাৎ ফেরাউন ও তার জাতি তাদেরকে যে ভয়াবহ বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল তা থেকে।

৭০. হযরত ইলিয়াস আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈলের নবীদের অন্তরভুক্ত ছিলেন। কুরআন মজীদে মাত্র দু'জায়গায় তাঁর আলোচনা এসেছে। এ জায়গায় এবং সূরা আল আন'আমের ৮৫ আয়াতে। আধুনিক গবেষকগণ খৃষ্টপূর্ব ৮৭৫ থেকে ৮৫০ এর মধ্যবর্তী সময়টাকে তাঁর সময় হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি ছিলেন জিল'আদ-এর অধিবাসী (প্রাচীন যুগে জিল'আদ বলা হতো বর্তমান জর্দান রাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলীয় জিলাগুলোর সমন্বয়ে গঠিত ইয়ারমুক নদীর দক্ষিণে অবস্থিত এলাকাকে)। বাইবেলে তাঁকে এলিয় তিশ্‌বী (Elijah the Tishbite) নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী নিচে দেয়া হলো :

হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালামের ইন্তেকালের পরে তাঁর পুত্র রহব'আম (Rehoboam)-এর অযোগ্যতার ফলে বনী ইসরাঈল রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একভাগে ছিল বাইতুল মাকদিস ও দক্ষিণ ফিলিস্তীন। এটি ছিল দাউদের পরিবারের অধিকারভুক্ত। আর উত্তর ফিলিস্তীন সমন্বয়ে গঠিত দ্বিতীয় ভাগটিতে ইসরাঈল নামে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। পরে সামেরীয়া তার কেন্দ্রীয় স্থান হিসেবে গণ্য হয়। যদিও উভয় রাষ্ট্রের অবস্থাই ছিল দোদুল্যমান কিন্তু ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রথম থেকেই এমন মারাত্মক বিকৃতির পথে এগিয়ে চলছিল যার ফলে তার মধ্যে শির্ক, মূর্তিপূজা, জুলুম, নিপীড়ন, ফাসেকী ও চরিত্রহীনতা বেড়ে চলছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন ইসরাঈলের বাদশাহ আখিয়াব (Ahab) সাইদা (বর্তমান লেবানন)-এর রাজকন্যা ইজবেলকে বিয়ে করে তখন এ বিকৃতি ও বিপর্যয় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে যায়। এ মুশরিক রাজকন্যার সংস্পর্শে এসে আখিয়াব নিজেও মুশরিক হয়ে যায়। সে সামেরীয়ায় বা'আল-এর মন্দির ও যজ্ঞবেদী নির্মাণ করে। এক আল্লাহর ইবাদাতের পরিবর্তে বা'আলের পূজার প্রচলন করার পূর্ণ প্রচেষ্টা চালায় এবং ইসরাঈলের শহরগুলোতে প্রকাশ্যে বা'আলের নামে বলিদানের প্রচলন করে।

এহেন সময় হযরত ইলিয়াস আলাইহিস সালাম অকস্মাত জনসমক্ষে হাজির হন। তিনি জালআদ থেকে এসে আখিয়াবকে এ মর্মে নোটিস দেন যে, তোমার পাপের কারণে এখন ইসরাঈল রাজ্যে এক বিন্দুও বৃষ্টি হবে না, এমনকি কুয়াসা ও শিশিরও পড়বে না। আল্লাহর নবীর এ উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হলো এবং সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত বৃষ্টি একদম বন্ধ থাকলো। শেষ পর্যন্ত আখিয়াবের হুঁশ হলো। সে হযরত ইলিয়াসের সন্ধান করে তাঁকে ডেকে পাঠালো। তিনি বৃষ্টির জন্য দোয়া করার আগে ইসরাঈলের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ও বা'আলের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে ভালোভাবে জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন মনে করলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি হুকুম দিলেন, একটি সাধারণ সমাবেশে বা'আলের পূজারীও এসে তার উপাস্য দেবতার নামে বলিদান করবে এবং আমিও আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নামে কুরবানী করবো। দু'টি কুরবানীর মধ্য থেকে মানুষের হাতে লাগানো আগুন ছাড়াই অদৃশ্য আগুন দ্বারা যেটিই ভস্মীভূত হবে তার উপাস্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যাবে। আখিয়াব একথা মেনে নিল। ফলে কারমাল (Carmel) পর্বতে বা'আলের সাড়ে আটশো পূজারী একত্র হলো। ইসরাঈলীদের সাধারণ সমাবেশে তাদের সাথে হযরত ইলিয়াস আলাইহিস সালামের মোকাবিলা হলো। এ মোকাবিলায় বা'আল পূজকরা পরাজিত হলো। হযরত ইলিয়াস সবার সামনে একথা প্রমাণ

করে দিলেন যে, বা'আল একটি মিথ্যা খোদা এবং আসল খোদা হচ্ছেন সেই এক ও একক খোদা যাঁর পক্ষ থেকে তিনি নবী নিযুক্ত হয়ে এসেছেন। এরপর হযরত ইলিয়াস সেই জনসমাবেশে বা'আলের পূজারীদের হত্যা করান এবং তারপর বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন। তাঁর দোয়া সংগে সংগেই কবুল হয়ে যায় এবং সমগ্র ইসরাঈল রাজ্যে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়।

কিন্তু এসব মু'জিযা দেখেও স্ত্রৈণ আখিয়াব তার মূর্তিপূজক স্ত্রীর গোলামী থেকে বের হয়ে আসেনি। তার স্ত্রী ইজবেল হযরত ইলিয়াসের দুশমন হয়ে গেলো এবং সে কসম খেয়ে বসলো, যেভাবে বা'আলের পূজারীদের হত্যা করা হয়েছে ঠিক অনুরূপভাবেই হযরত ইলিয়াস আলাইহিস সালামকেও হত্যা করা হবে। এ অবস্থায় হযরত ইলিয়াসকে দেশত্যাগ করতে হলো। কয়েক বছর তিনি সিনাই পাহাড়ের পাদদেশে আশ্রয় নিলেন। এ সময় তিনি আল্লাহর কাছে যে ফরিয়াদ করেছিলেন বাইবেল তাকে এভাবে উদ্ধৃত করছে ঃ

"আমি বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভূর পক্ষে অতিশয় উদ্যোগী হইয়াছি ; কেননা ইস্রায়েল সন্তানগণ তোমার নিয়ম ত্যাগ করিয়াছে, তোমার যজ্ঞবেদি সকল উৎপাটন করিয়াছে ও তোমার ভাববাদিগণকে খড়্গ দ্বারা বধ করিয়াছে ; আর আমি, কেবল একা আমিই অবশিষ্ট রহিলাম, আর তাহারা আমার প্রাণ লইতে চেষ্টা করিতেছে।"

[১—রাজাবলি ১৯ ঃ ১০]

এ সময়ই বায়তুল মাকদিসের ইহুদী শাসক ইয়াহরাম (Jehoram) ইসরাঈলের বাদশাহ্ আখিয়াবের মেয়েকে বিয়ে করলো এবং ইতিপূর্বে ইসরাঈলে যেসব বিকৃতি বিস্তার লাভ করেছিল এ মুশরিক শাহজাদীর প্রভাবে ইয়াহুদিয়া রাষ্ট্রেও তা ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। হযরত ইলিয়াস এখানেও নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করলেন এবং ইয়াহরামকে একটি পত্র লিখলেন। বাইবেলে এ পত্র এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

"তোমার পিতা দায়ূদের ঈশ্বর সদাপ্রভূ এইভাবে এই কথা কহেন, তুমি আপন পিতা যিহোশাফটের পথে ও যিহূদা-রাজ আসার পথে গমন কর নাই; কিন্তু ইস্রায়েলের রাজাদের পথে গমন করিয়াছ এবং আহাব-কুলের ক্রিয়ানুসারে যিহূদাকে ও যিরূশালেম নিবাসীদিগকে ব্যভিচার করাইয়াছ; আরও তোমা হইতে উত্তম যে তোমার পিতৃকুলজাত ভ্রাতৃগণ, তাহাদিগকে বধ করিয়াছ ; এই কারণ দেখ, সদাপ্রভূ তোমার প্রজাদিগকে, তোমার সন্তানদিগকে, তোমার ভার্য্যাদিগকে ও তোমার সমস্ত সম্পত্তি মহা আঘাতে আহত করিবেন। আর তুমি অন্ত্রের পীড়ায় অতিশয় পীড়িত হইবে, শেষে সেই পীড়ায় তোমার অন্ত্র দিন দিন বাহির হইয়া পড়িবে।" [২—রাজাবলি ২১ ঃ ১২—১৫]

এ পত্রে হযরত ইলিয়াস যা কিছু বলেছিলেন তা পূর্ণ হলো। প্রথমে ইয়াহরামের রাজ্য বহিরাগত আক্রমণকারীদের দ্বারা বিধ্বস্ত হলো এবং তার স্ত্রীদেরকে পর্যন্ত শত্রুরা পাকড়াও করে নিয়ে গেলো। তারপর সে নিজে অন্ত্ররোগে মারা গেলো। কয়েক বছর পর হযরত ইলিয়াস আবার ইসরাঈলে পৌঁছে গেলেন। তিনি আখিয়াব ও তার পুত্র আখ্যিয়াহকে সত্য সঠিক পথে আনার জন্য লাগাতার প্রচেষ্টা চালালেন। কিন্তু সামেরীয়ার রাজ পরিবারে যে পাপ একবার জেঁকে বসেছিল তা আর কোনভাবেই বের হলো না। শেষে

হযরত ইলিয়াসের বদ্‌দোয়ায় আখিয়াবের পরিবার ধ্বংস হয়ে গেলো এবং তারপর আল্লাহ তাঁর নবীকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিলেন। এ ঘটনাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য বাইবেলের নিম্নোক্ত অধ্যায়গুলো দেখুন ঃ [১—রাজাবলি, অধ্যায় ১৭, ১৮, ১৯, ২১; ২—রাজাবলি অধ্যায় ১ ও ২ এবং ২—বংশাবলি, অধ্যায় ২১]

৭১. বা'আল-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে প্রভু, সরদার ও মালিক। স্বামীর প্রতিশব্দ হিসেবেও এ শব্দটি বলা হতো এবং কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সূরা বাকারার ২২৮, সূরা নিসার ১২৭, সূরা হূদের ৭২ এবং সূরা নূরের ৩১ আয়াতসমূহ। কিন্তু প্রাচীন যুগে সিরিয়ার বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী এ শব্দটিকে উপাস্য ও প্রভু অর্থে ব্যবহার করতো এবং তারা একটি বিশেষ দেবতাকে বা'আল নামে চিহ্নিত করে রেখেছিল। বিশেষ করে লেবাননের ফনিকি সম্প্রদায়ের (Phoenicians) সবচেয়ে বড় পুরুষ দেবতা ছিল বা'আল এবং তার স্ত্রী আশারাত (Ashtoreth) ছিল তাদের সবচেয়ে বড় দেবী। বা'আল বলতে সূর্য বা বৃহস্পতি গ্রহ বুঝায় এবং আশারাত বলতে চাঁদ বা শুক্রগ্রহ বুঝায় এ ব্যাপারে গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যাই হোক না কেন একথা ঐতিহাসিক দিক দিয়ে প্রমাণিত যে, ব্যবিলন থেকে নিয়ে মিসর পর্যন্ত সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য এলাকায় বা'আল পূজা বিস্তার লাভ করেছিল। বিশেষ করে লেবানন, সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের মুশরিক জাতিগুলো আপাদমস্তক এর মধ্যে ডুবে ছিল। বনী ইসরাঈল যখন মিসর থেকে বের হবার পর ফিলিস্তীন ও পূর্ব জর্দানে এসে বসবাস শুরু করলো এবং তাওরাতের কঠোর নিষেধাজ্ঞাগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করে তারা ঐ মুশরিক জাতিগুলোর সাথে বিয়ে-শাদী ও সামাজিক সম্পর্ক কায়েম করতে শুরু করলো তখন তাদের মধ্যেও এ রোগ বিস্তার লাভ করতে লাগলো। বাইবেলের বর্ণনা মতে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রথম খলিফা হযরত ইউশা' বিন নূনের ইন্তেকালের পরপরই বনী ইসরাঈলের মধ্যে এ নৈতিক ও ধর্মীয় অবক্ষয়ের সূচনা হয়ে গিয়েছিল ঃ

"ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিতে লাগিল; এবং বাল দেবগণের সেবা করিতে লাগিল।.....তাহারা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া বাল দেবের ও অষ্টারেৎ দেবীদের সেবা করিত।" [বিচারকর্তৃগণ ২ ঃ ১১—১৩]

"ফলে ইস্রায়েল-সন্তানগণ কনানীয়, হিত্তীয়, ইমোরীয়, পরিযীয়, হিব্বীয় ও যিবূযীয়গণের মধ্যে বসতি করিল ; আর তাহারা তাহাদের কন্যাগণকে বিবাহ করিত, তাহাদের পুত্রগণের সহিত আপন আপন কন্যাদের বিবাহ দিত ও তাহাদের দেবগণের সেবা করিত।" [বিচারকর্তৃগণ ৩ ঃ ৫—৬]

সে সময় ইসরাঈলীদের মধ্যে বা'আল পূজার এত বেশী প্রচলন হয়ে পড়েছিল যে, বাইবেলের বর্ণনা মতে তাদের একটি জনপদে প্রকাশ্যে বা'আলের যজ্ঞবেদী নির্মিত হয়েছিল এবং সেখানে বলিদান করা হতো। আল্লাহর অনুগত জনৈক ইসরাঈলী এটা বরদাশ্‌ত করতে পারলো না। সে রাতের বেলা চুপিচুপি যজ্ঞবেদীটি ভেঙে ফেললো। পরদিন জনতার একটি বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো। তারা শিরকের এ আড্ডাখানা উচ্ছেদকারী ব্যক্তির হত্যার দাবী করতে লাগলো। (বিচারকর্তৃগণ ৬ ঃ ২৫—৩২) শেষ পর্যন্ত এ অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটালেন হযরত সামুয়েল, তালূত এবং হযরত দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমুস সালাম। তাঁরা কেবল বনী ইসরাঈলেরই সংস্কার করলেন না, নিজেদের রাজ্যেও

سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ ﴿١٣٠﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣١﴾ اِنَّهٗ مِنْ
عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾ وَاِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٣﴾ اِذْ نَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ
اَجْمَعِيْنَ ﴿١٣٤﴾ اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٣٦﴾ وَاِنَّكُمْ
لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ﴿١٣٧﴾ وَبِالَّيْلِ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٣٨﴾

ইলিয়াসের প্রতি সালাম।[৭৪] সৎকর্মশীলদের আমি অনুরূপ প্রতিদানই দিয়ে থাকি। যথার্থই সে আমার মু'মিন বান্দাদের একজন ছিল।

আর লূতও তাদের একজন ছিল যাদেরকে রসূল বানিয়ে পাঠানো হয়। স্মরণ করো যখন আমি তাকে এবং তার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করি, এক বুড়ি ছাড়া যে পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তরভুক্ত ছিল।[৭৫] তারপর বাকি সবাইকে ধ্বংস করে দেই। এখন তোমরা দিনরাত তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকা অতিক্রম করে যাও।[৭৬] তোমরা কি বোঝ না?

শির্ক ও মূর্তিপূজা নির্মূল করলেন। কিন্তু হযরত সুলাইমানের মৃত্যুর পর এ ফিত্নাটি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো এবং বিশেষ করে উত্তর ফিলিস্তীনের ইসরাঈল রাষ্ট্রটি বা'আল পূজার বন্যার বিপুল স্রোতে ভেসে গেলো।

৭২. অর্থাৎ এ শাস্তির বাইরে একমাত্র তারাই থাকবে যারা হযরত ইলিয়াসের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেনি এবং যাদেরকে আল্লাহ এ জাতির মধ্য থেকে তাঁর বন্দেগীর জন্য বাছাই করে নিয়েছিলেন।

৭৩. বনী ইসরাঈল হযরত ইলিয়াসকে তাঁর জীবদ্দশায় যেভাবে নির্যাতিত করেছিল তার কাহিনী ওপরে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু পরে তারা তাঁর এমনই ভক্তে–অনুরক্তে পরিণত হয় যে, হযরত মূসার (আ) পরে অতি অল্প লোককেই তারা তাঁর চেয়ে মহিমান্বিত বলে মেনে নিয়ে থাকবে। তাদের সেখানে একথা ছড়িয়ে পড়ে যে, হযরত ইলিয়াস আলাইহিস সালামকে একটি ঘূর্ণিঝড়ের মাধ্যমে জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয় (২—রাজাবলি, ২ অধ্যায়) এবং তিনি আবার দুনিয়ায় আসবেন। বাইবেলের মালাখি পুস্তকে বলা হয়েছে ঃ

"দেখ, সদাপ্রভূর সেই মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিন আসিবার পূর্বে আমি তোমাদের নিকট এলিয় ভাববাদীকে প্রেরণ করিব।" (৪ ঃ ৫)

হযরত ইয়াহইয়া ও ঈসা আলাইহিমাস সালামের আগমনকালে ইহুদিরা সাধারণত তিনজন আগমনকারীর প্রতীক্ষারত ছিল। তাদের একজন হচ্ছেন হযরত ইলিয়াস (আ) ও দ্বিতীয়জন হযরত ঈসা মসীহ (আ) এবং তৃতীয়জন হচ্ছেন "এ নবী" (অর্থাৎ মুহাম্মাদ

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾
فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَا
أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾

৫ রুকূ'

আর অবশ্যই ইউনুস রসূলদের একজন ছিল।[৭৭] স্মরণ করো যখন সে একটি বোঝাই নৌকার দিকে পালিয়ে গেলো,[৭৮] তারপর লটারীতে অংশগ্রহণ করলো এবং তাতে হেরে গেলো। শেষ পর্যন্ত মাছ তাকে গিলে ফেললো এবং সে ছিল ধিকৃত।[৭৯] এখন যদি সে তাস্‌বীহকারীদের অন্তরভুক্ত না হতো,[৮০] তাহলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত এ মাছের পেটে থাকতো।[৮১]

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। যখন হযরত ইয়াহইয়ার (আ) নবুওয়াত শুরু হয় এবং তিনি লোকদেরকে সত্যধর্মে দীক্ষিত করতে থাকেন তখন ইহুদীদের ধর্মীয় নেতারা তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি মসীহ? তিনি জবাব দেন, না। আবার জিজ্ঞেস করে, আপনি কি ইলিয়াহ? তিনি জবাব দেন, না। তারপর জিজ্ঞেস করে, আপনি কি "সেই নবী"? তিনি জবাব দেন, আমি সেই নবীও নই। তখন তারা বলে, আপনি যদি মসীহ না হন; ইলিয়াহ না হন এবং সেই নবী না হন, তাহলে আপনি সত্যধর্মে দীক্ষা দিচ্ছেন কেন? (যোহন ১ ঃ ১৯—২৬) তারপর কিছুকাল পরে যখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের তৎপরতা ব্যাপকতা লাভ করলো তখন ইহুদীরা মনে করলো, সম্ভবত ইলিয়াহ নবী এসে গেছেন। (মার্ক ৬ ঃ ১৪—১৫) হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাহাবীদের মধ্যে এ ধারণা বিস্তার লাভ করেছিল যে, ইলিয়াহ নবীর আগমন ঘটবে। কিন্তু হযরত ঈসা (আ) একথা বলে তাদের ভুল ধারণা দূর করে দেন যে, "ইলিয়াহ তো এসে গেছেন, লোকেরা তাঁকে চিনেনি এবং তাঁর সাথে যা ইচ্ছা ব্যবহার করেছে।" এর ফলে হযরত ঈসার (আ) সাহাবীগণ জানতে পারেন, আগমনকারী ছিলেন হযরত ইয়াহইয়া, আটশো বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হযরত ইলিয়াস নন।" (মথি ১১ ঃ ১৪ এবং ১৭ ঃ ১০—১৩)

৭৪. মূল শব্দগুলো হচ্ছে سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ এ সম্পর্কে কোন কোন মুফাস্‌সির বলেন, এটি হযরত ইলিয়াসের দ্বিতীয় নাম। যেমন হযরত ইব্‌রাহীমের দ্বিতীয় নাম ছিল আব্রাহাম। আর অন্য কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে আরববাসীদের মধ্যে ইব্‌রানী (হিব্রু) ভাষার শব্দাবলীর বিভিন্ন উচ্চারণের প্রচলন ছিল। যেমন মীকাল ও মীকাইল এবং মীকাইন একই ফেরেশতাকে বলা হতো। একই ঘটনা ঘটেছে হযরত ইলিয়াসের নামের ব্যাপারেও। স্বয়ং কুরআন মজীদে একই পাহাড়কে একবার "তূরে সাইনা" বলা হচ্ছে এবং অন্যত্র বলা হচ্ছে, "তূরে সীনীন।"

৭৫. এখানে হযরত লূতের (আ) স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে, যে হিজরাতের হুকুম আসার পর তার মহান স্বামীর সাথে যায়নি বরং নিজের সম্প্রদায়ের সাথে থাকে এবং আযাবে নিক্ষিপ্ত হয়।

৭৬. এ বিষয়ের দিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, কুরাইশ ব্যবসায়ীরা সিরিয়া ও ফিলিস্তীন যাবার পথে লূতের সম্প্রদায়ের বিধ্বস্ত জনপদ যেখানে অবস্থিত ছিল দিনরাত সে এলাকা অতিক্রম করতো।

৭৭. কুরআন মজীদে এ তৃতীয়বার হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের বিষয় আলোচিত হয়েছে। এর আগে সূরা ইউনুস ও সূরা আম্বিয়ায় তাঁর আলোচনা এসেছে এবং আমি তার ব্যাখ্যা করেছি। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা ইউনুস, ৯৮—১০০ টীকা এবং সূরা আল আম্বিয়া, ৮২—৮৫ টীকা)

৭৮. মূলে ابق শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটি কেবলমাত্র তখনই ব্যবহার করা হয় যখন গোলাম তার প্রভুর কাছ থেকে পালিয়ে যায়। الاباق هرب العبد من سيده অর্থাৎ "ইবাক অর্থ হচ্ছে প্রভুর কাছ থেকে গোলামের পালিয়ে যাওয়া।" (লিসানুল আরব)

৭৯. এ বাক্যগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে ঘটনার যে চিত্রটি সামনে ভেসে ওঠে তা হচ্ছে ঃ

এক ঃ হযরত ইউনুস যে নৌকায় আরোহণ করেছিলেন তা তার ধারণ ক্ষমতার চাইতে বেশী বোঝাই (Overloaded) ছিল।

দুই ঃ নৌকায় লটারী অনুষ্ঠিত হয় এবং সম্ভবত এমন সময় হয় যখন সামুদ্রিক সফরের মাঝখানে মনে করা হয় যে, নৌকা তার ধারণ ক্ষমতার বেশী বোঝা বহন করার কারণে সকল যাত্রীর জীবন বিপদের মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। কাজেই লটারীতে যার নাম উঠবে তাকেই পানিতে নিক্ষেপ করা হবে, এ উদ্দেশ্যে লটারী করা হয়।

তিন ঃ লটারীতে হযরত ইউনুসের নামই ওঠে। তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয় এবং একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলে।

চার ঃ হযরত ইউনুসের এ পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তিনি নিজে প্রভুর (অর্থাৎ মহান আল্লাহ) অনুমতি ছাড়াই তাঁর কর্মস্থল থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। "আবাকা" শব্দটি এ অর্থই প্রকাশ করছে, ওপরের ৭৮ টীকায় এ ব্যাখ্যাই করা হয়েছে। "মুলীম" শব্দটিও একথাই বলছে। মুলীম এমন অপরাধীকে বলা হয় যে নিজের অপরাধের কারণে নিজেই নিন্দিত হবার হকদার হয়ে গেছে, তাকে নিন্দা করা হোক বা না হোক।

(يقال قد الام الرجل اذا اتى مايلام عليه من الامر وان لم يلم - ابن جرير)

৮০. এর দু'টি অর্থ হয় এবং দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। একটি অর্থ হচ্ছে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম পূর্বেই আল্লাহ থেকে গাফিল লোকদের অন্তরভুক্ত ছিলেন না বরং তিনি তাদের অন্তরভুক্ত ছিলেন যারা ছিলেন আল্লাহর চিরন্তন প্রশংসা, মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণাকারী। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যখন তিনি মাছের পেটে পৌছুলেন তখন আল্লাহরই

فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ﴿١٤٥﴾ وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ﴿١٤٦﴾
وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ﴿١٤٧﴾ فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١٤٨﴾

শেষ পর্যন্ত আমি তাকে বড়ই রুগ্ন অবস্থায় একটি তৃণলতাহীণ বিরান প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম[৮২] এবং তার ওপর একটি লতানো গাছ উৎপন্ন করলাম।[৮৩] এরপর আমি তাকে এক লাখ বা এরচেয়ে বেশী লোকদের কাছে পাঠালাম।[৮৪] তারা ঈমান আনলো এবং আমি একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত তাদেরকে টিকিয়ে রাখলাম।[৮৫]

দিকে রুজূ' করলেন এবং তারই প্রশংসা, মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকলেন। সূরা আল আম্বিয়ায় বলা হয়েছে ঃ

فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

"তাই সে অন্ধকারের মধ্যে তিনি ডেকে উঠলেন, তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, পাক–পবিত্র তোমার সত্তা, অবশ্যই আমি অপরাধী।"

৮১. এর অর্থ এ নয় যে, এ মাছটি কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকতো এবং হযরত ইউনুস (আ) কিয়ামত পর্যন্ত তার পেটে বেঁচে থাকতেন। বরং এর অর্থ হচ্ছে, কিয়ামত পর্যন্ত এ মাছের পেটই তাঁর কবরে পরিণত হতো। প্রখ্যাত মুফাস্‌সিরগণ এ আয়াতটির এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

৮২. অর্থাৎ হযরত ইউনুস (আ) যখন তাঁর অপরাধ স্বীকার করে নিলেন এবং একজন মু'মিন ও ধৈর্যশীল বান্দার ন্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা গাইতে লাগলেন তখন আল্লাহর হুকুমে মাছ তাঁকে উপকূলে উদ্‌গীরণ করলো। উপকূল ছিল একটি বিরাণ প্রান্তর। সেখানে সবুজের কোন চিহ্ন ছিল না এবং এমন কোন জিনিসও ছিল না যা হযরত ইউনুসকে ছায়াদান করতে পারে। সেখানে খাদ্যেরও কোন সংস্থান ছিল না।

এখানে এসে অনেক বুদ্ধি ও যুক্তিবাদের দাবীদারকে একথা বলতে শুনা গেছে যে, মাছের পেটে ঢুকে যাবার পর কোন মানুষের জীবিত বের হয়ে আসা অসম্ভব। কিন্তু বিগত শতকের শেষের দিকে এ তথাকথিত বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিবাদীতার কেন্দ্র ভূমির (ইংল্যাণ্ড) উপকূলের সন্নিকটে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। এ ঘটনাটি তাদের দাবী খণ্ডন করে। "১৮৯১ সালের আগষ্ট মাসে Star of the East নামক জাহাজে চড়ে কয়েকজন মৎস্য শিকারী তিমি শিকারের উদ্দেশ্যে গভীর সমুদ্রে যায়। সেখানে তারা ২০ ফুট লম্বা, ৫ ফুট চওড়া ও ১০০ টন ওজনের একটি বিশাল মাছকে আহত করে। কিন্তু তার সাথে লড়াই করার সময় জেম্‌স বার্ডলে নামক একজন মৎস শিকারীকে তার সাথীদের চোখের সামনেই মাছটি গিলে ফেলে। একদিন পরে জাহাজের লোকেরা মাছটিকে মৃত অবস্থায় পায়। বহুকষ্টে সেটিকে তারা জাহাজে ওঠায় এবং তারপর দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর তার পেট কাটলে জেম্‌স তার মধ্য থেকে জীবিত বের হয়ে আসে। এ ব্যক্তি মাছের পেটে পুরা ৬০ ঘন্টা থাকে।" (উর্দূ ডাইজেষ্ট, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪) চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে, সাধারণ অবস্থায়

প্রাকৃতিকভাবে যদি এমনটি হওয়া সম্ভবপর হয়ে থাকে, তাহলে অস্বাভাবিক অবস্থায় আল্লাহর মু'জিযা হিসেবে এমনটি হওয়া কেমন করে অসম্ভব হতে পারে?

৮৩. মূলে বলা হয়েছে شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِيْنٍ ইয়াকতীন আরবী ভাষায় এমন ধরনের গাছকে বলা হয় যা কোন গুঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে না বরং লতার মতো ছড়িয়ে যেতে থাকে। যেমন লাউ, তরমুজ, শশা ইত্যাদি। মোটকথা সেখানে অলৌকিকভাবে এমন একটি লতানো গাছ উৎপন্ন করা হয়েছিল যার পাতাগুলো হযরত ইউনুসকে ছায়া দিচ্ছিল এবং ফলগুলো একই সংগে তাঁর জন্য খাদ্য সরবরাহ করছিল এবং পানিরও যোগান দিচ্ছিল।

৮৪. "এক লাখ বা এর বেশী" বলার মানে এ নয় যে, এর সঠিক সংখ্যার ব্যাপারে আল্লাহর সন্দেহ ছিল। বরং এর অর্থ হচ্ছে, যদি কেউ তাদের জনবসতি দেখতো তাহলে সে এ ধারণাই করতো যে, এ শহরের জনসংখ্যা এক লাখের বেশীই হবে, কম হবে না। সম্ভবত হযরত ইউনুস যে শহরটি ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছিলেন এটি সেই শহরই হবে। তাঁর চলে যাবার পর সে শহরের লোকেরা আযাব আসতে দেখে যে ঈমান এনেছিল তার অবস্থা ছিল এমন তাওবার মতো যা কবুল করে নিয়ে তাদের ওপর থেকে আযাব হটিয়ে দেয়া হয়েছিল। এখন হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে পুনরবার তাদের কাছে পাঠানো হলো, যাতে তারা নবীর প্রতি ঈমান এনে যথারীতি মুসলমান হয়ে যায়। এ বিষয়টি বুঝার জন্য সূরা ইউনুসের ৯৮ আয়াতটি সামনে থাকা দরকার।

৮৫. হযরত ইউনুসের (আ) এ ঘটনা সম্পর্কে আমি সূরা ইউনুস ও সূরা আম্বিয়ার ব্যাখ্যায় যা কিছু লিখেছি সে সম্পর্কে কেউ কেউ আপত্তি উঠিয়েছেন। তাই সংগতভাবেই এখানে অন্যান্য মুফাস্সিরগণের উক্তিও উদ্ধৃত করছি ঃ

বিখ্যাত মুফাস্সির কাতাদা সূরা ইউনুসের ৯৮ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ "এমন কোন জনপদ দেখা যায়নি যার অধিবাসীরা কুফরী করেছে এবং আযাব এসে যাবার পরে ঈমান এনেছে আর তারপর তাদেরকে রেহাই দেয়া হয়েছে। একমাত্র ইউনুসের সম্প্রদায় এর ব্যতিক্রম। তারা যখন তাদের নবীর সন্ধান করে তাঁকে না পেয়ে অনুভব করলো আযাব নিকটে এসে গেছে তখন আল্লাহ তাদের মনে তাওবার প্রেরণা সৃষ্টি করলেন।" (ইবনে কাসীর, ২ খণ্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা)

একই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলূসী লিখছেন, এ জাতির কাহিনী হচ্ছে ঃ "হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম মসুল এলাকায় নিনেভাবাসীদের কাছে আগমন করেছিলেন। তারা ছিল কাফের ও মুশরিক। হযরত ইউনুস তাদেরকে এক ও লা-শরীক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার ও মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করার আহবান জানান। তারা তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। হযরত ইউনুস তাদেরকে জানিয়ে দেন, তৃতীয় দিন আযাব আসবে এবং তৃতীয় দিন আসার আগেই অর্ধ রাতে তিনি জনপদ থেকে বের হয়ে পড়েন। তারপর দিনের বেলা যখন এ জাতির মাথার ওপর আযাব পৌঁছে যায়.....এবং তাদের বিশ্বাস জন্মে যে, তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে তখন তারা নিজেদের নবীকে খুঁজতে থাকে কিন্তু তাঁকে খুঁজে পায় না। শেষ পর্যন্ত তারা সবাই নিজেদের ছেলেমেয়ে, পরিবার-পরিজন ও গবাদি পশু নিয়ে খোলা প্রান্তরে বের হয়ে আসে

এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও তাওবা করে। .....আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা করেন এবং তাদের দোয়া কবুল করেন।" (রূহুল মা'আনী, ১১ খণ্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা)

সূরা আম্বিয়ার ৮৭ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলূসী লিখেছেন ঃ "হযরত ইউনুসের নিজের জাতির প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বের হয়ে যাওয়া ছিল হিজরাতের কাজ। কিন্তু তাঁকে এর হুকুম দেয়া হয়নি।" (রূহুল মা'আনী, ১৭ খণ্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা) তারপর তিনি হযরত ইউনুসের দোয়ার বাক্যাংশ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ এর অর্থ বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ "অর্থাৎ আমি অপরাধী ছিলাম। নবীদের নিয়মের বাইরে গিয়ে হুকুম আসার আগেই হিজরাত করার ব্যাপারে আমি তাড়াহুড়া করেছিলাম। হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে এটি ছিল তাঁর নিজের গোনাহের স্বীকৃতি এবং তাওবার প্রকাশ, যাতে আল্লাহ তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।" (রূহুল মা'আনী, ১৭ খণ্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা)

এ আয়াতটির টীকায় মওলানা আশরাফ আলী থানবী লিখেছেন ঃ "তাঁর নিজের জাতি তাঁর প্রতি ঈমান না আনায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে যান এবং জাতির ওপর থেকে আযাব হটে যাবার পরও নিজে তাদের কাছে ফিরে আসেননি। আর এ সফরের জন্য আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষাও করেননি।" (বায়ানুল কুরআন)

এ আয়াতের টীকায় মওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী লিখেছেন ঃ "জাতির কার্যকলাপে ক্ষিপ্ত হয়ে ক্রুদ্ধচিত্তে শহর থেকে বের হয়ে যান। আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা করেননি এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান যে, তিন দিনের মধ্যে তোমাদের ওপর আযাব নেমে আসবে।..... اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ বলে নিজের অপরাধ স্বীকার করেন এ মর্মে যে, অবশ্যই আমি তাড়াহুড়া করেছি, তোমার হুকুমের অপেক্ষা না করেই জনপদের অধিবাসীদের ত্যাগ করে বের হয়ে পড়ি।"

সূরা সা-ফ্ফা-তের ওপরে উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী লিখেছেন ঃ হযরত ইউনুসের অপরাধ ছিল, তাঁর যে জাতি তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল আল্লাহ তাকে ধ্বংস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, এ আযাব নির্ঘাত এসে যাবে। তাই তিনি সবর করেননি। জাতিকে দাওয়াত দেবার কাজ বাদ দিয়ে বাইরে বের হয়ে গিয়েছিলেন। অথচ দাওয়াতের কাজ সবসময় জারী রাখাই ছিল তাঁর দায়িত্ব। কারণ আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস না করার সম্ভাবনা তখনো ছিল।" (তাফসীরে কবীর, ৭ খণ্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা)

আল্লামা আলূসী اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ সম্পর্কে লিখেছেনঃ "আবাকা-এর আসল মানে হচ্ছে, প্রভুর কাছ থেকে দাসের পালিয়ে যাওয়া। যেহেতু হযরত ইউনুস তাঁর রবের অনুমতি ছাড়াই নিজের জাতির কাছ থেকে পলায়ন করেছিলেন তাই তাঁর জন্য এ শব্দটির ব্যবহার সঠিক হয়েছে। "তারপর সামনের দিকে তিনি আরো লিখেছেন ঃ "তৃতীয় দিনে হযরত ইউনুস আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই বের হয়ে গেলেন। এখন তাঁর জাতি তাঁকে না পেয়ে তাদের বড়দের, ছোটদের ও গবাদি পশুগুলো নিয়ে বের হয়ে পড়লো। আযাব অবতীর্ণ হবার বিষয়টি তাদের কাছে এসে পৌঁছেছিল। তারা আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করলো এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলো। আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিলেন।" (রূহুল মা'আনী, ২৩ খণ্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা)

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿١٤٩﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا
وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿١٥٠﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ
لَكَاذِبُونَ ﴿١٥٢﴾ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ﴿١٥٦﴾ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿١٥٧﴾

তারপর তাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করো,[৮৬] (তাদের মন কি একথায় সায় দেয় যে,) তোমাদের রবের জন্য তো হচ্ছে কন্যারা এবং তাদের জন্য পুত্ররা?[৮৭] সত্যই কি আমি ফেরেশ্‌তাদেরকে মেয়ে হিসেবে সৃষ্টি করেছি এবং তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে একথা বলছে? ভালো করেই শুনে রাখো, আসলে তারা তো মনগড়া কথা বলে যে, আল্লাহর সন্তান আছে এবং যথার্থই তারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ কি নিজের জন্য পুত্রের পরিবর্তে কন্যা পছন্দ করেছেন? তোমাদের কি হয়ে গেছে, কিভাবে ফায়সালা করছো? তোমরা কি সচেতন হবে না? অথবা তোমাদের কাছে তোমাদের এসব কথার সপক্ষে কোন পরিষ্কার প্রমাণপত্র আছে? তাহলে আনো তোমাদের সে কিতাব, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।[৮৮]

মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী وَهُوَ مُلِيمٌ -এর ব্যাখ্যা প্রসংগে লিখেছেন : "অভিযোগ এটিই ছিল যে, ইজতিহাদী ভুলের দরুন আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা না করে জনপদ থেকে বের হয়ে পড়েন এবং আযাবের দিন নির্ধারণ করে দেন।"

আবার সূরা আল কলম-এর

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ

আয়াতের টীকায় মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী লিখেছেন : "অর্থাৎ মাছের পেটে প্রবেশকারী পয়গম্বরের (হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম) মতো মিথ্যা আরোপকারীদের ব্যাপারে সংকীর্ণমনতা ও ভীতি-আশংকার প্রকাশ ঘটাবে না।" তারপর একই আয়াতের وَهُوَ مَكْظُومٌ বাক্যাংশের টীকায় তিনি লিখেছেন : "অর্থাৎ জাতির বিরুদ্ধে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। বিরক্ত হয়ে দ্রুত আযাবের জন্য দোয়া এবং ভবিষ্যদ্বাণী করে বসলেন।"

মুফাস্‌সিরগণের এসব বর্ণনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনটি ভুলের কারণে হযরত ইউনুসের (আ) ওপর অসন্তোষ ও ক্রোধ নেমে আসে। এক, তিনি নিজেই আযাবের

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾ فَإِنَّكُمْ وَمَا
تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿١٦٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا
مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ
الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ
الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٩﴾

তারা আল্লাহ ও ফেরেশ্‌তাদের[৮৯] মধ্যে আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপন করে রেখেছে। অথচ ফেরেশ্‌তারা ভালো করেই জানে তাদেরকে অপরাধী হিসেবে উপস্থিত করা হবে (এবং তারা বলে,) "আল্লাহ সেসব দোষ থেকে মুক্ত যেগুলো তাঁর একনিষ্ঠ বান্দারা ছাড়া অন্যেরা তাঁর ওপর আরোপ করে। কাজেই তোমরা ও তোমাদের এ উপাস্যরা কাউকে আল্লাহ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে না, সে ব্যক্তিকে ছাড়া যে জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশকারী হবে।[৯০] আর আমাদের অবস্থা তো হচ্ছে এই যে, আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের একটি স্থান নির্ধারিত রয়েছে[৯১] এবং আমরা সারিবদ্ধ খাদেম ও তাসবীহ পাঠকারী।"

তারা তো আগে বলে বেড়াতো, হায়! পূর্ববর্তী জাতিরা যে "যিকির" লাভ করেছিল তা যদি আমাদের কাছে থাকতো তাহলে আমরা হতাম আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা।[৯২]

দিন নির্দিষ্ট করে দেন। অথচ আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ধরনের কোন ঘোষণা হয়নি। দুই, সেদিন আসার আগেই হিজরাত করে দেশ থেকে বের হয়ে যান। অথচ আল্লাহর হুকুম না আসা পর্যন্ত নবীর নিজ স্থান ত্যাগ করা উচিত নয়। তিন, সে জাতির ওপর থেকে আযাব হটে যাওয়ার পর তিনি নিজে তাদের মধ্যে ফিরে যাননি।

৮৬. এখান থেকে আর একটি বিষয় শুরু হচ্ছে। প্রথম বিষয়টি ১১ আয়াত থেকে শুরু হয়েছিল। অর্থাৎ মক্কার কাফেরদের সামনে এ প্রশ্ন রাখা হয়েছিল : "তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তাদেরকে সৃষ্টি করা বেশী কঠিন কাজ, না আমি যেগুলো সৃষ্টি করে রেখেছি সেগুলো?" এখন তাদেরই সামনে এ দ্বিতীয় প্রশ্ন আনা হচ্ছে। প্রথম প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল কাফেরদেরকে তাদের এ ভ্রষ্টতা সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া যে, তারা মৃত্যু পরের জীবন ও শাস্তি–পুরস্কারকে অসম্ভব মনে করতো এবং এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে বিদ্রূপ করতো। এখন এ দ্বিতীয় প্রশ্নটি তাদের এ মূর্খতা সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার জন্য পেশ করা হচ্ছে যে, তারা বলতো আল্লাহর সন্তান আছে এবং অনুমানের ঘোড়া দাবড়িয়ে যাকে ইচ্ছা তাকেই আল্লাহর সন্তান বলে আখ্যায়িত করতো।

৮৭. হাদীস থেকে জানা যায়, আরবের কুরাইশ, জুহাইনিয়া, বনী সালেমাহ, খুযা'আহ, বনী মুলাহ এবং অন্যান্য গোত্র বিশ্বাস করতো, ফেরেশ্‌তারা আল্লাহর কন্যা। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে তাদের এ জাহেলী আকীদার কথা বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন সূরা আন নিসা, ১১৭; আন নাহ্‌ল, ৫৭—৫৮; বনী ইসরাঈল, ৪০; আয্ যুখ্‌রুফ, ১৬—১৯ এবং আন নাজ্‌ম, ২১—২৭ আয়াতসমূহ।

৮৮. অর্থাৎ ফেরেশ্‌তাদেরকে আল্লাহর কন্যা মনে করার জন্য দু'টি বুনিয়াদই হতে পারে। এ ধরনের কথা তারা বলতে পারে প্রত্যক্ষ দর্শনের ভিত্তিতে অথবা এ ধরনের দাবী যারা করে তাদের কাছে আল্লাহর এমন কোন কিতাব থাকতে হবে যাতে আল্লাহ নিজেই ফেরেশ্‌তাদেরকে নিজের কন্যা বলে উল্লেখ করে থাকবেন। এখন এ বিশ্বাসের প্রবক্তারা যদি কোন প্রত্যক্ষ দর্শনের দাবী করতে না পারে এবং এমন কোন কিতাবও তাদের কাছে না থাকে, যাতে একথা বলা হয়েছে, তাহলে নিছক উড়ো কথার ভিত্তিতে একটি দীনী বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করে নেয়া এবং বিশ্ব-জাহানের মালিকের সাথে সুস্পষ্ট হাস্যকর কথা সম্পৃক্ত করে দেয়ার চাইতে বড় মূর্খতা ও বোকামি আর কী হতে পারে।

৮৯. মূলে 'মালাইকা'র (ফেরেশ্‌তাবৃন্দ) পরিবর্তে 'আল জিন্নাহ' (الْجِنَّة) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু কোন কোন শ্রেষ্ঠ তাফসীরকারের মতে এখানে 'জিন' শব্দটি তার আভিধানিক অর্থের (অর্থাৎ গুপ্ত সৃষ্টি) প্রেক্ষিতে 'মালাইকা' তথা ফেরেশ্‌তা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ ফেরেশ্‌তাও আসলে একটি গোপন জীবই। পরবর্তী বিষয়বস্তু এখানে জিন শব্দটি ফেরেশ্‌তা অর্থে ব্যবহার করারই দাবী জানায়।

৯০. এ আয়াতের দ্বিতীয় অনুবাদ এও হতে পারে : "কাজেই তোমরা ও তোমাদের এ ইবাদাত, এর ভিত্তিতে তোমরা কাউকে ফিত্‌নার মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারো না কিন্তু একমাত্র তাকে যে.....।" এ দ্বিতীয় অনুবাদের প্রেক্ষিতে এর অর্থ হবে, হে পথভ্রষ্টের দল! এই যে, তোমরা আমাদের পূজা করছো এবং আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সন্তান গণ্য করছো, এর মাধ্যমে তোমরা আমাদেরকে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারো না। এর মাধ্যমে তো কেবলমাত্র এমন নির্বোধই ফিত্‌নার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে পারে, যে সর্বনাশের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। অন্য কথায় বলা যায়, ফেরেশ্‌তারা তাদেরকে বলছে : "পাতো এ ফাঁদ অন্য পাখির জন্য।"

৯১. অর্থাৎ আল্লাহর সন্তান হওয়া তো দূরের কথা, আমাদের অবস্থা তো হচ্ছে এই যে, আমাদের মধ্যে যার জন্য যে মর্যাদা ও স্থান নির্ধারিত হয়েছে তা থেকে সামান্যতমও এদিক ওদিক করার ক্ষমতা কারো নেই।

৯২. একই বিষয়বস্তু সূরা ফাতিরের ৪২ আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

فَكَفَرُوا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٧٥﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧١﴾
اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ ﴿١٧٢﴾ وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿١٧٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ
حَتّٰى حِيْنٍ ﴿١٧٤﴾ وَّاَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧٥﴾ اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٧٦﴾
فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٧﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى
حِيْنٍ ﴿١٧٨﴾ وَّاَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧٩﴾ سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا
يَصِفُوْنَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٢﴾

কিন্তু (যখন সে এসে গেছে) তখন তারা তাকে অস্বীকার করেছে। এখন শিগ্‌গির তারা (তাদের এ নীতির ফল) জানতে পারবে। আমার প্রেরিত বান্দাদেরকে আমি আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করা হবে এবং আমার সেনাদলই বিজয়ী হবে।[৯৩] কাজেই হে নবী! কিছু সময় পর্যন্ত তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও এবং দেখতে থাকো, শীঘ্রই তারা নিজেরাও দেখে নেবে।[৯৪] তারা কি আমার আযাবের জন্য তাড়াহুড়া করছে? যখন তা নেমে আসবে তাদের আঙিনায়, সেদিনটি হবে যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের জন্য বড়ই অশুভ। ব্যস, তাদেরকে কিছুকালের জন্য ছেড়ে দাও এবং দেখতে থাকো, শিগ্‌গির তারা নিজেরাও দেখে নেবে।

তারা যেসব কথা তৈরি করছে তা থেকে পাক-পবিত্র তোমার রব, তিনি মর্যাদার অধিকারী। আর সালাম প্রেরিতদের প্রতি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামীনেরই জন্য।

৯৩. আল্লাহর সেনাদল বলতে এমন ঈমানদারদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা আল্লাহর রসূলের আনুগত্য করে এবং তাঁর সহযোগী হয়। তাছাড়া এমন অদৃশ্য শক্তিও এর অন্তরভুক্ত হয় যাদের সাহায্যে মহান আল্লাহ সত্যপন্থীদেরকে সাহায্য-সহায়তা দান করে থাকেন।

এ সাহায্য ও বিজয়ের অর্থ অবশ্যই এ নয় যে, প্রত্যেক যুগে আল্লাহর প্রত্যেক নবী এবং তাঁর প্রত্যেক অনুসারী দল রাজনৈতিক বিজয়ই লাভ করবেন। বরং এ বিজয় বহু ধরনের হবে। রাজনৈতিক বিজয়ও এর মধ্যে একটি। যেখানে আল্লাহর নবীগণ এ ধরনের প্রাধান্য লাভ করেননি সেখানেও তাঁদের নৈতিক প্রাধান্য প্রমাণিত হয়েই থাকবে। যেসব

জাতি তাদের কথা মানেনি এবং তাদের দেয়া হিদায়াতের বিরোধী পথ অবলম্বন করেছে তারা শেষ পর্যন্ত বরবাদই হয়ে গেছে। মূর্খতা ও ভ্রষ্টতার যে দর্শনই মানুষ তৈরি করেছে এবং যে বিকৃত জীবনাচরণই জোরপূর্বক প্রচলন করা হয়েছে তা সবই কিছুদিন পর্যন্ত টিকে থাকার পর শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু হাজার হাজার বছর থেকে আল্লাহর নবীগণ যে সত্যগুলোকে প্রকৃত সত্য হিসেবে পেশ করে এসেছেন তা আগেও ছিল অপরিবর্তনীয় এবং আজো অপরিবর্তিত রয়েছে। কেউ তাকে স্বস্থান থেকে নড়াতে পারেনি।

৯৪. অর্থাৎ বেশীদিন যেতে না যেতেই তারা নিজেদের পরাজয় ও তোমার বিজয় স্বচক্ষে দেখে নেবে। একথা যেভাবে বলা হয়েছিল ঠিক সেভাবেই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এ আয়াতগুলো নাযিল হবার পর বড়জোড় ১৪/১৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে থাকবে মক্কার কাফেররা নিজেদের চোখেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর নিজের শহরে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ দেখে নিয়েছে এবং তারপর এর কিছুকাল পরেই তারা দেখে নিয়েছে, ইসলাম কেবলমাত্র আরবের ওপরেই নয় বরং বিশাল পারশ্য ও রোমান সাম্রাজ্যের ওপরও বিজয়ী হয়েছে।

সা-দ

৩৮

নামকরণ

সূরা শুরুর হরফ 'সা-দ'কে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হবার সময়-কাল

যেমন সামনের দিকে বলা হবে, কোন কোন হাদীস অনুযায়ী দেখা যায়, এ সূরাটি এমন এক সময় নাযিল হয়েছিল যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা মুআয্যমায় প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়া শুরু করেছিলেন এবং এ কারণে কুরাইশ সরদারদের মধ্যে হৈ চৈ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ হিসেবে প্রায় নবুওয়াতের চতুর্থ বছরটি এর নাযিল হবার সময় হিসেবে গণ্য হয়। অন্যান্য হাদীসে একে হযরত উমরের (রা) ঈমান আনার পরের ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা হয়। আর হযরত উমর হাবশায় হিজরাত অনুষ্ঠিত হবার পর ঈমান আনেন, একথা সবার জানা। আর এক ধরনের হাদীস থেকে জানা যায়, আবু তালেবের শেষ রোগগ্রস্ততার সময় যে ঘটনা ঘটে তারই ভিত্তিতে এ সূরা নাযিল হয়। একে যদি সঠিক বলে মেনে নেয়া হয়, তাহলে এর নাযিলের সময় হিসেবে ধরতে হয় নবুওয়াতের দশম বা দ্বাদশ বছরকে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

ইমাম আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে জারীর, ইবনে আবী শাইবাহ, ইবনে আবী হাতেম ও মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ যেসব হাদীস উদ্ধৃত করেছেন সেগুলোর সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে ঃ যখন আবু তালেব রোগাক্রান্ত হলেন এবং কুরাইশ সরদাররা অনুভব করলো, এবার তাঁর শেষ সময় এসে গেছে, তখন তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলো, বৃদ্ধের কাছে গিয়ে তাঁর সাথে কথা বলা উচিত। তিনি আমাদের ও তাঁর ভাতিজার ঝগড়া মিটিয়ে দিয়ে গেলে ভালো। নয়তো এমনও হতে পারে, তাঁর ইন্তিকাল হয়ে যাবে এবং আমরা তাঁর পরে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে কোন কঠোর ব্যবহার করবো আর আরবের লোকেরা এ বলে আমাদের খোঁটা দেবে যে, যতদিন বৃদ্ধ লোকটি জীবিত ছিলেন ততদিন এরা তাঁর মর্যাদা রক্ষা করে চলেছে, এখন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাতিজার গায়ে হাত দিয়েছে। একথায় সবাই একমত হয়। ফলে প্রায় ২৫ জন কুরাইশ সরদার আবু তালেবের কাছে হাজির হয়। এদের অন্যতম ছিল আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান, উমাইয়াহ ইবনে খালফ, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনুল

মুত্তালিব, উকবাহ ইবনে আবী মু'আইত, উতবাহ ও শাইবাহ। তারা যথারীতি প্রথমে আবু তালেবের কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে নিজেদের অভিযোগ পেশ করে তারপর বলে, আমরা আপনার কাছে একটি ইনসাফপূর্ণ আপোষের কথা পেশ করতে এসেছি। আপনার ভাতিজা আমাদেরকে আমাদের ধর্মের ওপর ছেড়ে দিক আমরাও তাকে তার ধর্মের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। সে যে মাবুদের ইবাদাত করতে চায় করুক, তার বিরুদ্ধে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সে আমাদের মাবুদদের নিন্দা করবে না এবং আমরা যাতে আমাদের মাবুদদেরকে ত্যাগ করি সে প্রচেষ্টা চালাবে না। এ শর্তের ভিত্তিতে আপনি তার সাথে আমাদের সন্ধি করিয়ে দিন। আবু তালেব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকলেন। তাঁকে বললেন, ভাতিজা! এই যে তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার কাছে এসেছে। তাদের আকাংখা, তুমি একটি ইনসাফপূর্ণ আপোষের ভিত্তিতে তাদের সাথে একমত হয়ে যাবে। এভাবে তোমার সাথে তাদের বিবাদ খতম হয়ে যাবে। তারপর কুরাইশ সরদাররা তাঁকে যে কথাগুলো বলেছিল সেগুলো তিনি তাঁকে শুনিয়ে দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন ঃ "চাচাজান! আমি তো তাদের সামনে এমন একটি কালেমা পেশ করছি তাকে যদি তারা মেনে নেয় তাহলে সমগ্র আরব জাতি তাদের হুকুমের অনুগত হয়ে যাবে এবং অনারবরা তাদেরকে কর দিতে থাকবে।"[১] একথা শুনে প্রথমে তো তারা হতভম্ব হয়ে গেল। তারা বুঝতে পারছিল না এমন লাভজনক কথার প্রতিবাদ করবে কি বলে। কাজেই নিজেদের বক্তব্য কিছুটা গুছিয়ে

১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তিটি বিভিন্ন বর্ণনাকারী বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। একটি হাদীসে বলা হয়েছে তিনি বলেছেন ঃ

اريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدى اليهم بها العجم الجزية

(অর্থাৎ আমি তাদের সামনে এমন একটি কালেমা পেশ করছি তা পাঠ করলে তারা সমগ্র আরব জয় করে ফেলবে এবং অনারবরা তাদেরকে জিযিয়া দেবে।) অন্য একটি হাদীসের শব্দাবলী হচ্ছে ঃ

ادعوهم الى ان يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها ارعجم

(অর্থাৎ আমি তাদেরকে এমন একটি কালেমা পড়ার ডাক দিচ্ছি যা পাঠ করলে তারা সমগ্র আরব জয় করবে এবং অনারবরা তাদের শাসনাধীন হবে।) অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি আবু তালেবের পরিবর্তে কুরাইশ সরদারদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم

অন্য একটি হাদীসের শব্দাবলী হচ্ছে ঃ

ارأيتم ان اعطيتكم كلمة تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم

বর্ণনাগুলোর এ শাব্দিক পার্থক্য সত্ত্বেও বক্তব্য সবগুলোর একই। অর্থাৎ নবী করীম (সা) তাদেরকে বলেন, যদি আমি এমন একটি কালেমা তোমাদের সামনে পেশ করি যা গ্রহণ করে তোমরা আরব ও আজমের মালিক হয়ে যাবে তাহলে বলো, এটি বেশী ভালো, না তোমরা ইনসাফের নামে যে কথাটি আমার সামনে পেশ করছো সেটি বেশী ভালো? তোমরা এ কালেমাটি মেনে নেবে অথবা যে অবস্থার মধ্যে তোমরা এখন পড়ে রয়েছো তার মধ্যেই তোমাদের পড়ে থাকতে দেবো এবং নিজের জায়গায় বসে আমি নিজের আল্লাহর ইবাদাত করতে থাকবো—কোন্‌টির মধ্যে তোমাদের কল্যাণ রয়েছে?

নিয়ে তারা বলতে শুরু করলো, তুমি একটি কালেমা বলছো কেন আমরা তো এমন দশটি কালেমা বলতে রাজি কিন্তু সেই কালেমাটি কি তাতো একবার বলো। তিনি বললেন ঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ। একথা শুনেই তারা সবাই একসাথে উঠে দাঁড়ালো এবং সে কথাগুলো বলতে বলতে চলে গেলো যা আল্লাহ এ সূরার শুরুতে উদ্ধৃত করেছেন।

ওপরে যেভাবে উল্লিখিত হয়েছে ইবনে সা'দ তাবকাতে ঠিক তেমনিভাবেই সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী এটা আবু তালেবের মৃত্যুকালীন রোগগ্রস্ততার সময়কার ঘটনা নয় বরং এটা এমন এক সময়ের ঘটনা যখন নবী করীম (সা) তাঁর সাধারণ দাওয়াতের কাজ শুরু করেছিলেন এবং মক্কায় অনবরত খবর ছড়িয়ে পড়ছিল যে, আজ অমুক ব্যক্তি মুসলমান হয়ে গেছে এবং কাল অমুক ব্যক্তি। সে সময় কুরাইশ সরদাররা একের পর এক কয়েকটি প্রতিনিধি দল নিয়ে আবু তালেবের কাছে পৌঁছেছিল। তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ প্রচার কাজ থেকে বিরত রাখতে চাচ্ছিল। এ প্রতিনিধি দলগুলোরই একটির সাথে উল্লিখিত আলাপ আলোচনা হয়।

যামাখ্‌শারী, রাযী, নিশাপুরী ও অন্যান্য কতিপয় মুফাস্‌সির বলেন, এ প্রতিনিধি দল আবু তালেবের কাছে গিয়েছিল এমন এক সময় যখন হযরত উমরের (রা) ঈমান আনার ফলে কুরাইশ সরদাররা হকচকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হাদীসের কোন কিতাবে এর সমর্থন পাওয়া যায়নি এবং মুফাস্‌সিরগণও তাঁদের উৎসসমূহের বরাত দেননি। তবুও যদি এটা সঠিক হয়ে থাকে তাহলে একথা বোধগম্য। কারণ কাফের কুরাইশরা প্রথমেই এ দৃশ্য দেখে ভীত হয়ে পড়েছিল যে, ইসলামের দাওয়াত নিয়ে তাদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তি উঠেছেন যিনি নিজের পারিবারিক আভিজাত্য, নিষ্কলংক চরিত্র, বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও বিচার-বিবেচনার দিক দিয়ে সমস্ত জাতির মধ্যে অদ্বিতীয়। তারপর আবু বকরের মতো লোক তাঁর ডানহাত, যাকে মক্কা ও তার আশপাশের এলাকার প্রত্যেকটি শিশুও একজন অত্যন্ত ভদ্র, বিবেচক, সত্যবাদী ও পবিত্র-পরিচ্ছন্ন মানুষ হিসেবে জানে। এখন যখন তারা দেখলো, উমর ইবনে খাত্তাবের মতো অসম সাহসী ও দৃঢ় সংকল্প ব্যক্তিও এ দু'জনের সাথে মিলিত হয়েছেন তখন নিশ্চিতভাবেই তারা অনুভব করে থাকবে যে, বিপদ সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

ওপরে যে মজলিসের উল্লেখ করা হয়েছে তার ওপর মন্তব্য দিয়েই সূরার সূচনা করা হয়েছে। কাফের ও নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যকার আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে আল্লাহ বলেছেন, তাদের অস্বীকারের আসল কারণ ইসলামী দাওয়াতের কোন ত্রুটি নয় বরং এর আসল কারণ হচ্ছে, তাদের আত্মম্ভরিতা, হিংসা ও একগুঁয়েমীর ওপর অবিচল থাকা। নিজেদের জ্ঞাতি-বেরাদরির এক ব্যক্তিকে আল্লাহর নবী বলে মেনে নিয়ে তাঁর আনুগত্য করতে তারা প্রস্তুত নয়। তাদের পূর্বপুরুষদেরকে তারা যেমন জাহেলী ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী পেয়েছে ঠিক তেমনি ধারণা-কল্পনার ওপর তারা নিজেরাও অবিচল থাকতে চায় আর যখন এ জাহেলিয়াতের আবরণ ছিন্ন করে এক ব্যক্তি তাদের সামনে আসল সত্য উপস্থাপন করেন তখন তারা উৎকর্ণ হয় এবং তাঁর কথাকে অদ্ভুত,

অভিনব ও অসম্ভব গণ্য করে। তাদের মতে, তাওহীদ ও আখেরাতের ধারণা কেবল যে, অগ্রহণযোগ্য তাই নয় বরং এটা এমন একটা ধারণা যা নিয়ে কেবল ঠাট্টা তামাশাই করা যেতে পারে।

এরপর আল্লাহ সূরার শুরুর দিকে এবং শেষ বাক্যগুলোতেও কাফেরদেরকে সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, আজ তোমরা যে ব্যক্তিকে বিদ্রূপ করছো এবং যার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে জোরালো অস্বীকৃতি জানাচ্ছো, খুব শিগগির সে-ই বিজয়ী হবে এবং সে সময়ও দূরে নয় যখন যে মক্কা শহরে তোমরা তাঁকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছো, এ শহরেই তোমরা তাঁর সামনে অবনত মস্তক হবে।

এরপর একের পর এক ৯ জন পয়গম্বরের কথা বলা হয়েছে। এঁদের মধ্যে হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলাইমানের (আ) কাহিনী বেশী বিস্তারিত। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ শ্রোতাদেরকে একথা হৃদয়ংগম করিয়েছেন যে, ইনসাফের আইন পুরোপুরি ব্যক্তি নিরপেক্ষ। মানুষের সঠিক মনোভাব ও কর্মনীতিই তার কাছে গ্রহণীয়। অন্যায় কথা, যে-ই বলুক না কেন, তিনি তাকে পাকড়াও করেন। ভুলের ওপর যারা অবিচল থাকার চেষ্টা করে না বরং জানার সাথে সাথেই তাওবা করে এবং দুনিয়ায় আখেরাতের জবাবদিহির কথা মনে রেখে জীবন যাপন করে তারাই তার কাছে পছন্দনীয়।

এরপর অনুগত ও বিদ্রোহী বান্দারা আখেরাতের জীবনে যে পরিণামের সম্মুখীন হবে তার চিত্র অংকন করা হয়েছে এবং এ প্রসংগে কাফেরদেরকে বিশেষ করে দু'টি কথা বলা হয়েছে। এক, আজ যেসব সরদার ও ধর্মীয় নেতাদের পেছনে মূর্খ লোকেরা অন্ধের মতো ভ্রষ্টতার দিকে ছুটে চলছে আগামীতে তারাই জাহান্নামে পৌঁছে যাবে তাদের অনুসারীদের আগে এবং তারা উভয়দল পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকবে। দুই, আজ যেসব মু'মিনকে এরা লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত মনে করছে আগামীতে এরা অবাক চোখে তাকিয়ে দেখবে জাহান্নামে কোথাও তাদের নাম নিশানাও নেই এবং এরা নিজেরাই তার আযাবে পাকড়াও হয়েছে।

সবশেষে আদম (আ) ও ইবলিসের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কাফের কুরাইশদেরকে একথা বলা যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে নত হবার পথে যে অহংকার তোমাদের বাধা দিচ্ছে সে একই অহংকার আদমের সামনে নত হতে ইবলিসকে বাধা দিয়েছিল। আল্লাহ আদমকে যে মর্যাদা দিয়েছিলেন ইবলিস তাতে ঈর্ষান্বিত হয়েছিল এবং আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে লানতের ভাগী হয়েছিল। অনুরূপভাবে আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তাতে তোমাদের হিংসা হচ্ছে এবং আল্লাহ যাঁকে রসূল নিযুক্ত করেছেন তাঁর আনুগত্য করতে প্রস্তুত হচ্ছো না। তাই ইবলিসের যে পরিণতি হবে সে একই পরিণতি হবে তোমাদেরও।

আয়াত ৮৮ | সূরা সা-দ-মক্কী | রুকূ' ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ ۝١ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ۝٢
كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ۝٣

সা-দ।[১] উপদেশপূর্ণ[২] কুরআনের শপথ। বরং এরাই, যারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, প্রচণ্ড অহংকার ও জিদে লিপ্ত হয়েছে।[৩] এদের পূর্বে আমি এমনি আরো কত জাতিকে ধ্বংস করেছি (এবং যখন তাদের সর্বনাশ এসে গেছে) তারা চিৎকার করে উঠেছে, কিন্তু সেটি রক্ষা পাওয়ার সময় নয়।

১. সমস্ত "মুকাত্তা'আত" হরফের মতো 'সা-দ'-এর অর্থ চিহ্নিত করা যদিও কঠিন তবুও ইবনে আব্বাস (রা) ও যাহ্হাকের এ উক্তিও কিছুটা মনে দাগ কাটে যে, এর অর্থ হচ্ছে, صادق فى قوله অথবা صدق محمد অর্থাৎ "মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যবাদী। তিনি যা বলছেন সবই সত্য।"

২. মূল শব্দ হচ্ছে ذى الذكر এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, ذى شرف অর্থাৎ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মহাপাণ্ডিত্যপূর্ণ। দুই, ذى التذكير অর্থাৎ উপদেশে পরিপূর্ণ। অর্থাৎ ভুলে যাওয়া শিক্ষা আবার স্মরণ করিয়ে দেয় এবং গাফলতি থেকে সজাগ করে দেয়।

৩. যদি ইবনে আব্বাস ও দ্বাহ্হাক বর্ণিত সা-দ-এর ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়, তাহলে এ বাক্যের অর্থ হবে, "জ্ঞানপূর্ণ বা উপদেশমালায় পরিপূর্ণ কুরআনের কসম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য কথা উপস্থাপন করছেন। কিন্তু যারা অস্বীকার করার ওপর অবিচল রয়েছে তারা আসলে জিদ ও অহংকারে লিপ্ত হয়েছে।" আর যদি সা-দকে এমন সব হরফে মুকাত্তা'আতের অন্তরভুক্ত করা হয় যাদের অর্থ নির্ধারণ করা যেতে পারে না তাহলে এখানে বলতে হবে কসমের জবাব উহ্য রয়েছে যা "বরং" তার পরবর্তী বাক্যাংশ নিজেই একথা প্রকাশ করছে। অর্থাৎ এ অবস্থায় সম্পূর্ণ বাক্যটি এভাবে হবে, "এ অস্বীকারকারীদের অস্বীকার করার কারণ এ নয় যে, তাদের সামনে যে দীন পেশ করা হচ্ছে তার মধ্যে কোন ত্রুটি আছে অথবা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সামনে সত্য প্রকাশে কোন ত্রুটি করেছেন, বরং এর কারণ হচ্ছে কেবলমাত্র তাদের মিথ্যা অহংকার, তাদের জাহেলী আত্মম্ভরিতা এবং তাদের হঠকারিতা, আর উপদেশে পরিপূর্ণ এ কুরআন এ ব্যাপারে সাক্ষী, যা দেখে প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তি স্বীকার করবে যে, এর মধ্যে উপদেশ দেবার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করা হয়েছে।"

وَعَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ۫ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۝٤
اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۝٥ وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ
مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُّرَادُ ۝٦
مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۚ اِنْ هٰذَآ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ۝٧ ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ
الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۭ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِيْ ۚ بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ ۝٨

এরা একথা শুনে বড়ই অবাক হয়েছে যে, এদের নিজেদের মধ্য থেকেই একজন ভীতি প্রদর্শনকারী এসে গেছে।[৪] অস্বীকারকারীরা বলতে থাকে, "এ হচ্ছে যাদুকর,[৫] বড়ই মিথ্যুক, সকল খোদার বদলে সেকি মাত্র একজনকেই খোদা বানিয়ে নিয়েছে? এতো বড় বিস্ময়কর কথা।" আর জাতির সরদাররা একথা বলতে বলতে বের হয়ে গেলো,[৬] "চলো, অবিচল থাকো নিজেদের উপাস্যদের উপাসনায়। একথা তো[৭] ভিন্নতর উদ্দেশ্যেই বলা হচ্ছে[৮] নিকট অতীতের মিল্লাতগুলোর মধ্য থেকে কারো কাছ থেকে তো আমরা একথা শুনিনি।[৯] এটি একটি মনগড়া কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের মধ্যে কি মাত্র এ এক ব্যক্তিই থেকে গিয়েছিল যার কাছে আল্লাহর যিক্‌র নাযিল করা হয়েছে?"

আসল কথা হচ্ছে, এরা আমার যিক্‌র-এর ব্যাপারে সন্দেহ করছে[১০] আমার আযাবের স্বাদ পায়নি বলেই এরা এসব করছে।

৪. অর্থাৎ এরা এমনই নির্বোধ যে, যখন এদের নিজেদেরই জাতি, সম্প্রদায় ও গোত্র থেকে একজন জানা-শোনা ভালো লোককে এদেরকে সতর্ক করার জন্য নিযুক্ত করা হয় তখন এ ব্যাপারটি এদের কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছে। অথচ মানুষকে সতর্ক করার জন্য যদি আকাশ থেকে কোন ভিন্ন ধরনের প্রাণী পাঠিয়ে দেয়া হতো অথবা তাদের মাঝখানে হঠাৎ যদি বাইর থেকে কোন একজন অপরিচিত ব্যক্তি এসে দাঁড়াতো এবং নিজের নবুওয়াতি চালিয়ে যেতো, তাহলে সেটাই তো অদ্ভুত মনে হবার কথা। সে অবস্থায় তারা নিসন্দেহে বলতে পারতো, আমাদের সাথে অদ্ভুত আচরণ করা হয়েছে। যে মানুষই নয়, সে আমাদের অবস্থা, আবেগ-অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা জানবে কেমন করে? কাজেই সে আমাদের পথের দিশা কেমন করে দেবে? অথবা যে অপরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ আমাদের মধ্যে এসে গেছে আমরা কেমন করে তার সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা যাচাই করবো এবং কেমন করে জানবো সে নির্ভরযোগ্য কিনা? তার চরিত্র ও কার্যকলাপই বা আমরা দেখলাম কোথায়? কাজেই তাকে নির্ভরযোগ্য বা অনির্ভরযোগ্য মনে করার ফায়সালা করবো কেমন করে?

৫. নবী করীমের (সা) জন্য যাদুকর শব্দটি তারা যে অর্থে ব্যবহার করতো তা হচ্ছে এই যে, তিনি মানুষকে এমন কিছু যাদু করতেন যার ফলে তারা পাগলের মতো তাঁর পেছনে লেগে থাকতো। কোন সম্পর্কচ্ছেদ করার বা কোন প্রকার ক্ষতির মুখোমুখি হবার কোন পরোয়াই তারা করতো না। পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে ত্যাগ করতো। স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করতো এবং স্বামী স্ত্রী থেকে আলাদা হয়ে যেতো। হিজরাত করার প্রয়োজন দেখা দিলে একেবারে সবকিছু সম্পর্ক ত্যাগ করে স্বদেশভূমি থেকে বের হয়ে পড়তো। কারবার শিকেয় উঠুক এবং সমস্ত জ্ঞাতি-ভাইরা বয়কট করুক—কোনদিকেই দৃকপাত করতো না। কঠিন থেকে কঠিনতর শারীরিক কষ্টও বরদাশত করে নিতো কিন্তু ঐ ব্যক্তির পেছনে চলা থেকে বিরত হতো না। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আম্বিয়া, ৫ টীকা)

৬. যে সরদাররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনে আবু তালেবের মজলিস থেকে উঠে গিয়েছিল তাদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

৭. অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একথা যে, কালেমা লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু কে মেনে নাও, তাহলে সমস্ত আরব ও আজম তোমাদের হুকুমের তাবেদার হয়ে যাবে।

৮. তাদের বক্তব্য ছিল, এটা একটা মতলবী কথা বলে মনে হচ্ছে। অর্থাৎ এ উদ্দেশ্যে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে যে, আমরা মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুকুমের তাবেদারী করবো এবং তিনি আমাদের মাথার ওপর নিজে ছড়ি ঘোরাবেন।

৯. অর্থাৎ নিকট অতীতে আমাদের নিজেদের মুরব্বি ও মনীষীরাও অতিক্রান্ত হয়েছেন। ইহুদী ও খৃষ্টানরাও আমাদের দেশে এবং আশপাশের দেশে রয়েছে এবং অগ্নি উপাসকরা তো ইরান-ইরাক ও সমগ্র পূর্ব আরব ভরে আছে। তাদের কেউও আমাদের একথা বলেনি যে, মানুষ একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে মেনে নেবে এবং আর কাউকেও মানবে না। একজন এবং মাত্র একক খোদাকে কেউ যথেষ্ট মনে করতে পারে না। আল্লাহর প্রিয়পাত্রদেরকে তো সবাই মেনে চলছে। তাদের আস্তানায় গিয়ে মাথা ঠেকাচ্ছে। নজরানা ও সিন্নি দিচ্ছে। প্রার্থনা করছে। কোথাও থেকে সন্তান পাওয়া যায়। কোথাও রিযিক পাওয়া যায়। কোন আস্তানায় গিয়ে যা চাইবে তাই পাবে। দুনিয়ার বিরাট অংশ তাদের ক্ষমতা মেনে নিয়েছে। তাদের দরবারসমূহ থেকে প্রার্থীদের প্রার্থনা পূর্ণ ও সংকট নিরসন কিভাবে হয়ে থাকে, তাদের অনুগ্রহ লাভকারীরা তা জানিয়ে দিচ্ছে। এখন এ ব্যক্তির কাছ থেকে আমরা এমন অভিনব কথা শুনছি যা ইতিপূর্বে কোথাও শুনিনি। এ ব্যক্তি বলছে, এদের কারো প্রভুত্বে কোন অংশ নেই এবং সমস্ত প্রভুত্ব একমাত্র এবং একচ্ছত্রভাবে আল্লাহরই জন্য নির্ধারিত।

১০. অন্যকথায় বলা যায়, আল্লাহ বলেন, হে মুহাম্মাদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরা মূলত তোমাকে অস্বীকার করছে না বরং অস্বীকার করছে আমাকে তারাতো পূর্বেও তোমার সত্যবাদিতায় সন্দেহ করেনি। আজ তারা যে এ সন্দেহ করছে এটা আসলে যিক্‌রের কারণে। তাদেরকে উপদেশ দেবার দায়িত্ব যখন আমি তোমার ওপর সোপর্দ করেছি তখন তারা এমন এক ব্যক্তির সত্যবাদিতায় সন্দেহ করতে শুরু করেছে যার

أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴿٩﴾ أَمْ لَهُم مُّلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴿١٠﴾ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ
مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ﴿١١﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ
ذُو الْأَوْتَادِ ﴿١٢﴾ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لْئَيْكَةِ ۖ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿١٣﴾
إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٤﴾

তোমার মহানদাতা ও পরাক্রমশালী পরওয়ারদিগারের রহমতের ভাণ্ডার কি এদের আয়ত্বাধীনে আছে? এরা কি আসমান-যমীন এবং তাদের মাঝখানের সবকিছুর মালিক? বেশ, তাহলে এরা কার্যকারণ জগতের উচ্চতম শিখরসমূহে আরোহণ করে দেখুক।[১১]

বহুদলের মধ্য থেকে এতো ছোট্ট একটি দল, এখানেই এটি পরাজিত হবে।[১২] এরপূর্বে নূহের সম্প্রদায়, আদ, কীলকধারী ফেরাউন,[১৩] সামূদ, লূতের সম্প্রদায় ও আইকাবাসীরা মিথ্যা আরোপ করেছিল। তারা ছিল বিরাট দল। তাদের প্রত্যেকেই রসূলগণকে অস্বীকার করেছে। ফলে তাদের প্রত্যেকের ওপর আমার শাস্তির ফায়সালা কার্যকর হয়েই গেছে।

সত্যবাদিতার তারা ইতিপূর্বে কসম খেতো। একই বিষয়বস্তু সূরা আল আন'আমের ৩৩ আয়াতেও ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন আল আন'আম, ২১ টীকা)

১১. "এটি হচ্ছে আমাদের মধ্যে কি মাত্র এ এক ব্যক্তিই থেকে গিয়েছিল যার কাছে আল্লাহর যিক্‌র নাযিল করা হয়েছে।" কাফেরদের এ উক্তির জবাব। এর জবাবে আল্লাহ বলছেন ঃ আমি কাকে নবী করবো এবং কাকে করবো না এর ফায়সালা করার দায়িত্ব আমার নিজের। এরা কবে থেকে এ ফায়সালা করার ইখতিয়ার লাভ করলো? যদি এরা এর ইখতিয়ার লাভ করতে চায়, তাহলে বিশ্ব-জাহানের শাসন কর্তৃত্বের আসন লাভ করার জন্য এরা আরশের ওপর পৌঁছে যাবার চেষ্টা করুক। এর ফলে এরা যাকে নিজেদের অনুগ্রহের হকদার মনে করবে তার ওপর অহী নাযিল করবে এবং যাকে আমি হকদার মনে করি তার ওপর অহী নাযিল করবে না। এ বিষয়বস্তু কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে আলোচিত হয়েছে। কারণ কুরাইশ বংশীয় কাফেররা বারবার বলছিল, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেমন করে নবী হয়ে গেলেন? আল্লাহ কি এ কাজের জন্য কুরাইশদের বড় বড় সরদারদের মধ্য থেকে কাউকে পেলেন না? (দেখুন বনী ইসরাঈল, ১০০ আয়াত এবং আয যুখরুফ ৩১-৩২ আয়াত)

وَمَا يَنظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ﴿١٥﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا
عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا
دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٧﴾ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ
وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾

২ রুকূ'

এরাও শুধু একটি বিস্ফোরণের অপেক্ষায় আছে, যার পর আর দ্বিতীয় কোন বিস্ফোরণ হবে না।[১৪] আর এরা বলে, হে আমাদের রব! হিসেবের দিনের আগেই আমাদের অংশ দ্রুত আমাদের দিয়ে দাও।[১৫]

হে নবী! এরা যে কথা বলে তার ওপর সবর করো[১৬] এবং এদের সামনে আমার বান্দা দাউদের কাহিনী বর্ণনা করো,[১৭] যে ছিল বিরাট শক্তিধর,[১৮] প্রত্যেকটি ব্যাপারে ছিল আল্লাহ অভিমুখী। পর্বতমালাকে আমি বিজিত করে রেখেছিলাম তার সাথে, ফলে সকাল সাঁঝে তারা তার সাথে আমার গুণগান, পবিত্রতা ও মহিমা প্রচার করতো। পাখপাখালী সমবেত হতো এবং সবাই তার তাসবীহ অভিমুখী হয়ে যেতো।[১৯]

১২. এখানে বলতে মক্কা মু'আয্যমাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে এরা এসব কথা রচনা করছে সেখানেই একদিন এরা পরাজিত হবে। আর এখানেই একদিন এমন সময় আসবে যখন এরা নতমুখে এমন এক ব্যক্তির সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে যাকে আজ এরা তুচ্ছ মনে করে নবী বলে মেনে নিতে অস্বীকার করছে।

১৩. ফেরাউনের জন্য ذى الاوتاد (কীলকধারী) এ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে যে, তার সালতানাত এমনই মজবুত ছিল যেন যমীনে কীলক পোঁতা রয়েছে। অথবা এই অর্থে যে, তার বিপুল সংখ্যক সৈন্য-সামন্ত যেখানেই অবস্থান করতো সেখানের চারদিকে কেবল তাঁবুর খুঁটিই পোঁতা দেখা যেতো। কিংবা এ অর্থে যে, সে যার প্রতি অসন্তুষ্ট হতো তার দেহে কীলক মেরে মেরে শাস্তি দিতো। আবার সম্ভবত কীলক বলতে মিসরের পিরামিডও বুঝানো যেতে পারে, কেননা এগুলো যমীনের মধ্যে কীলকের মতো গাঁথা রয়েছে!

১৪. অর্থাৎ আযাবের একটিমাত্র ধাক্কা তাদেরকে খতম করে দেবার জন্য যথেষ্ট হবে, দ্বিতীয় কোন ধাক্কার প্রয়োজন হবে না। এ বাক্যের দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, এরপর তারা আর কোন অবকাশ পাবে না। গরুর দুধ দোহন করার সময় এক বাঁট থেকে দুধ টেনে অন্য

এক বাঁটে হাত দেবার মাঝখানে প্রথম বাঁটটিতে দুধ নামতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু অবকাশও তারা পাবে না।

১৫. অর্থাৎ আল্লাহর আযাবের অবস্থা এইমাত্র বর্ণনা করা হয়েছে এবং অন্যদিকে এ নাদানদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, এরা ঠাট্টা করে বলে, তুমি আমাদের যে বিচারদিনের ভয় দেখাচ্ছো তার আসা পর্যন্ত আমাদের ব্যাপারটি মুলতবী করে রেখো না বরং আমাদের হিসেব এখনই চুকিয়ে দাও। আমাদের অংশে যা কিছু সর্বনাশ লেখা আছে তা এখনই নিয়ে এসো।

১৬. ওপরে মক্কার কাফেরদের যেসব কথা বিবৃত হয়েছে এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তাদের এ প্রলাপোক্তি যে, এ ব্যক্তি যাদুকর ও মিথ্যুক, তাদের এ আপত্তি যে, রসূল নিযুক্ত করার জন্য আল্লাহর কাছে কি কেবলমাত্র এ ব্যক্তিটিই থেকে গিয়েছিল এবং এ দোষারোপ যে, এ তাওহীদের দাওয়াত থেকে এ ব্যক্তির উদ্দেশ্য ধর্মীয় প্রচারণা নয় বরং অন্য কোন দুরভিসন্ধি রয়েছে।

১৭. এ বাক্যের আর একটি অনুবাদ এও হতে পারে যে, "আমার বান্দা দাউদের কথা স্মরণ করো।" প্রথম অনুবাদের দিক দিয়ে অর্থ হচ্ছে এই যে, এ কাহিনীতে এদের জন্য একটি শিক্ষা রয়েছে। আর দ্বিতীয় অনুবাদের দৃষ্টিতে এর অর্থ হচ্ছে, এ কাহিনীর স্মৃতি তোমাদের ধৈর্য ধারণ করতে সাহায্য করবে। যেহেতু এ কাহিনী বর্ণনা করার পেছনে উভয় উদ্দেশ্যই রয়েছে তাই এতে এমনসব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলো থেকে উভয়বিধ অর্থ প্রকাশ পায়। (হযরত দাউদের ঘটনার ওপর বিস্তারিত আলোচনা এর আগে নিম্নোক্ত স্থানগুলোতে এসে গেছে ঃ তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, ২৭৩; বনী ইসরাঈল, ৭, ৬৩; আল আম্বিয়া ৭০-৭৩' আন্ নাম্‌ল, ১৮-২০ এবং সাবা, ১৪-১৬ টীকাসমূহ)

১৮. মূল শব্দাবলী হচ্ছে ঃ ذَا الْاَيْدِ "হাতওয়ালা" হাত শব্দটি কেবল আরবী ভাষাতেই নয় অন্যান্য ভাষাতেও শক্তি ও ক্ষমতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। হযরত দাউদের জন্য যখন তাঁর গুণ হিসেবে বলা হয় তিনি "হাতওয়ালা" ছিলেন তখন অবশ্যই এর অর্থ হবে, তিনি বিপুল শক্তির অধিকারী ছিলেন। এসব শক্তি বলতে নানা ধরনের শক্তি বুঝানো যেতে পারে। যেমন দৈহিক শক্তি। জালূতের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে তিনি এর প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি। এর মাধ্যমে তিনি আশপাশের মুশরিক জাতিসমূহকে পরাজিত করে একটি শক্তিশালী ইসলামী সালতানাত কায়েম করেছিলেন। নৈতিকশক্তি এর বদৌলতে তিনি শাহী মসনদে বসেও ফকিরি করে গেছেন সবসময়। আল্লাহকে ভয় করেছেন এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা মেনে চলেছেন। ইবাদাতের শক্তি। এর অবস্থা এই ছিল যে, রাষ্ট্র পরিচালনা, শাসন কর্তৃত্ব ও আল্লাহর পথে জিহাদের ব্যস্ততার মধ্যেও বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি হামেশা একদিন পরপর রোজা রেখেছেন এবং প্রতিদিন রাতের এক-তৃতীয়াংশ নামাযে অতিবাহিত করতেন। ইমাম বুখারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে হযরত আবুদ দারদার (রা) বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন, যখন হযরত দাউদের (আ) কথা আলোচিত হতো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন كَانَ اَعْبَدَ الْبَشَرِ "তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশী ইবাদাতগুযার ব্যক্তি।"

১৯. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আম্বিয়া, ৭১ টীকা।

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴿٢٠﴾ وَهَلْ اَتٰىكَ نَبَؤُا
الْخَصْمِ ۘ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾ اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۭ
قَالُوْا لَا تَخَفْ ۚ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ
وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَآ اِلٰى سَوَاۗءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾ اِنَّ هٰذَآ اَخِيْ لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ
نَعْجَةً وَّلِيَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾

আমি মজবুত করে দিয়েছিলাম তার সালতানাত, তাকে দান করেছিলাম হিকমত এবং যোগ্যতা দিয়েছিলাম ফায়সালাকারী কথা বলার।[২০] তারপর তোমার কাছে কি পৌঁছেছে মামলাকারীদের খবর, যারা দেওয়াল টপকে তার মহলে পৌঁছে গিয়েছিল?[২১] যখন তারা দাউদের কাছে পৌঁছুলো, তাদেরকে দেখে সে ঘাবড়ে গেলো[২২] তারা বললো, "ভয় পাবেন না, আমরা মামলার দুইপক্ষ। আমাদের একপক্ষ অন্য পক্ষের ওপর বাড়াবাড়ি করেছে। আপনি আমাদের মধ্যে যথাযথ সত্য সহকারে ফায়সালা করে দিন, বেইনসাফী করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিন। এ হচ্ছে আমার ভাই,[২৩] এর আছে নিরানব্বইটি দুম্বী এবং আমার মাত্র একটি। সে আমাকে বললো, এ একটি দুম্বীও আমাকে দিয়ে দাও এবং কথাবার্তায় সে আমাকে দাবিয়ে নিল।[২৪]

২০. অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য জটিল ও অস্পষ্ট হতো না। সমগ্র ভাষণ শোনার পর শ্রোতা একথা বলতে পারতো না যে তিনি কি বলতে চান তা বোধগম্য নয়। বরং তিনি যে বিষয়ে কথা বলতেন তার সমস্ত মূল কথাগুলো পরিষ্কার করে তুলে ধরতেন এবং আসল সিদ্ধান্ত প্রত্যাশী বিষয়টি যথাযথভাবে নির্ধারণ করে দিয়ে তার দ্ব্যর্থহীন জবাব দিয়ে দিতেন। কোন ব্যক্তি জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, বিচার-বিবেচনা ও বাকচাতুর্যের উচ্চতম পর্যায়ে অবস্থান না করলে এ যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না।

২১. এখানে হযরত দাউদের কথা যে উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে তা আসলে এ কাহিনী শুনানো থেকে শুরু হয়েছে। এর আগে তাঁর যে উন্নত গুণাবলীর কথা ভূমিকাস্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র একথা বলা যে, যাঁর সাথে এ ব্যাপারটি ঘটে গেছে সে দাউদ আলাইহিস সালাম কত বড় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

২২. সোজা পথ ব্যবহার না করে হঠাৎ দেয়াল টপকে দেশের শাসনকর্তার মহলের নির্জনকক্ষে দু'জন লোক পৌঁছে গেছে, এটাই ছিল ঘাবড়ে যাওয়ার বা ভয় পাওয়ার কারণ।

২৩. ভাই মানে মায়ের পেটের ভাই নয় বরং দীনী এবং জাতীয় ভাই।

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾ فَغَفَرْنَا
لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٢٥﴾

দাউদ জবাব দিল, "এ ব্যক্তি নিজের দুম্বীর সাথে তোমার দুম্বী যুক্ত করার দাবী করে অবশ্যই তোমার প্রতি জুলুম করেছে।[২৫] আর আসল ব্যাপার হচ্ছে, মিলেমিশে একসাথে বসবাসকারীরা অনেক সময় একে অন্যের প্রতি বাড়াবাড়ি করে থাকে, তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে একমাত্র তারাই এতে লিপ্ত হয় না এবং এ ধরনের লোক অতি অল্প।" (একথা বলতে বলতেই) দাউদ বুঝতে পারলো, এ তো আমি আসলে তাকে পরীক্ষা করেছি, কাজেই সে নিজের রবের কাছে ক্ষমা চাইলো, সিজদানত হলো এবং তার দিকে রুজু করলো।[২৬] তখন আমি তার ত্রুটি ক্ষমা করে দিলাম এবং নিশ্চয়ই আমার কাছে তার জন্য রয়েছে নৈকট্যের মর্যাদা ও উত্তম প্রতিদান।[২৭]

২৪. সামনের আলোচনা ভালোভাবে অনুধাবন করার জন্য একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ ফরিয়াদী পক্ষ একথা বলছে না যে, এ ব্যক্তি আমার সে একটি দুম্বীও ছিনিয়ে নিয়েছে এবং নিজের দুম্বীগুলোর মধ্যে তাকে মিশিয়ে দিয়েছে। বরং সে বলছে, এ ব্যক্তি আমার কাছে আমার দুম্বী চাইছে এবং কথাবার্তায় আমাকে দাবিয়ে নিয়েছে। কারণ সে প্রতাপশালী বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং আমি একজন গরীব লোক। এর দাবী রদ করার ক্ষমতা আমার নেই।

২৫. এখানে কারো সন্দেহ করার প্রয়োজন নেই যে, হযরত দাউদ (আ) এক পক্ষের কথা শুনে নিজের সিদ্ধান্ত কেমন করে শুনিয়ে দিলেন। আসল কথা হচ্ছে, বাদীর অভিযোগ শুনে বিবাদী যখন খামুশ হয়ে থাকলো এবং প্রতিবাদে কিছুই বললো না তখন এটি স্বতস্ফূর্তভাবে তার স্বীকৃতিদানের সমর্থক হয়ে গেলো। এ কারণে হযরত দাউদ (আ) স্থির নিশ্চিত হলেন যে, ফরিয়াদী যা বলছে আসল ঘটনাই তাই।

২৬. এ জায়গায় তেলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব কিনা, এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফে'ঈ বলেন, এখানে সিজদা ওয়াজিব নয় বরং এ তো একজন নবীর তাওবা। অন্যদিকে ইমাম আবু হানীফা বলেন, ওয়াজিব। এ প্রসংগে মুহাদ্দিসগণ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে তিনটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। ইকরামার বর্ণনা মতে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "যেসব আয়াত পাঠ করলে সিজদা ওয়াজিব হয় এটি তার অন্তরভুক্ত নয়। কিন্তু আমি এ

স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সিজদা করতে দেখেছি।" (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ) সা'দ ইবনে জুবাইর তাঁর কাছ থেকে অন্য যে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন তার শব্দাবলী হচ্ছে ঃ "সূরা 'সা-দ'-এ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদা করেছেন এবং বলেছেন ঃ দাউদ আলাইহিস সালাম তাওবা হিসেবে সিজদা করেছিলেন এবং আমরা শোকরানার সিজদা করি।" অর্থাৎ তাঁর তাওবা কবুল হয়েছে এ জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। (নাসাঈ) তৃতীয় যে হাদীসটি মুজাহিদ তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি বলেন, কুরআন মজীদে মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুকুম দিয়েছেন,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ

"এরা ছিলেন এমনসব লোক যাদেরকে আল্লাহ সঠিক পথ দেখিয়েছিলেন। কাজেই তুমি এদের পথ অনুসরণ করো।"

এখন যেহেতু হযরত দাউদও একজন নবী ছিলেন এবং তিনি এ স্থানে সিজদা করেছিলেন, তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁকে অনুসরণ করে এ স্থানে সিজদা করেছেন। (বুখারী) এ তিনটি বর্ণনা হচ্ছে হযরত ইবনে আব্বাসের। আর হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার খুতবার মধ্যে সূরা সা-দ পড়েন এবং এ আয়াতে এসে পৌঁছলে মিম্বার থেকে নিচে নেমে এসে সিজদা করেন এবং তাঁর সাথে সাথে সমবেত সবাইও সিজদা করে। তারপর দ্বিতীয় আর একবার অনুরূপভাবে তিনি এ সূরাটি পড়েন এবং এ আয়াতটি শুনার সাথে সাথে লোকেরা সিজদা করতে উদ্যত হয়। তখন নবী করীম (সা) বলেন, "এটি একজন নবীর তাওবা কিন্তু আমি দেখছি তোমরা সিজদা করতে প্রস্তুত হয়ে গেছো"—একথা বলে তিনি মিম্বার থেকে নেমে আসেন এবং সিজদা করেন। সমবেত সবাইও সিজদা করে। (আবু দাউদ) এসব হাদীস থেকে যদিও সিজদা ওয়াজিব হবার চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না তবুও এতটুকু কথা অবশ্যই প্রমাণিত হয় যে, এ স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় সিজদা করেছেন এবং সিজদা না করার তুলনায় এখানে সিজদা করাটা অবশ্যই উত্তম। বরং ইবনে আব্বাসের (রা) তৃতীয় যে বর্ণনাটি আমরা ইমাম বুখারীর বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেছি সেটি ওয়াজিব না হওয়ার তুলনায় ওয়াজিব হওয়ার পাল্লার দিকটি ঝুঁকিয়ে দেয়।

এ আয়াতটি থেকে যে আর একটি বিষয়বস্তু বের হয়ে আসে সেটি হচ্ছে ঃ আল্লাহ এখানে خَرَّ رَاكِعًا (রুকূ'তে অবনত হয়) শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সকল মুফাস্‌সির এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, এর অর্থ خَرَّ سَاجِدًا (সিজদায় অবনত হয়)। এ কারণে ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর সহযোগীগণ এমত পোষণ করেছেন যে, নামাযে বা নামায ছাড়া অন্য অবস্থায় সিজদার আয়াত শুনে বা পড়ে সিজদা না করে কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র রুকূ'ও করতে পারে। কারণ আল্লাহ নিজেই যখন রুকূ' শব্দ বলে সিজদা অর্থ নিয়েছেন তখন জানা গেলো রুকূ' সিজদার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। শাফেঈ ফকীহগণের মধ্যে ইমাম খাত্তাবীও এ মত পোষণ করেন। এ অভিমতটি একটি অভিমত হিসেবে

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝

(আমি তাকে বললাম) "হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, কাজেই তুমি জনগণের মধ্যে সত্য সহকারে শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনা করো এবং প্রবৃত্তির কামনার অনুসরণ করো না, কারণ তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করবে। যারা আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী হয় অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, যেহেতু তারা বিচার দিবসকে ভুলে গেছে।"[২৮]

নির্ভুল ও যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নেই কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের কার্যক্রমের মধ্যে আমরা এর কোন নজির দেখি না যে, সিজদার আয়াত শুনে বা পড়ে সিজদা করার পরিবর্তে তাঁরা রুকূ' করাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। কাজেই এ অভিমত কার্যত বাস্তবায়িত একমাত্র তখনই করা উচিত যখন সিজদা করার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে। নিয়মিতভাবে এ রকম করা সঠিক হবে না। নিয়মিত এ রকম করা ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সহযোগীদের উদ্দেশ্যও নয়। বরং তাঁরা কেবলমাত্র এর বৈধতার প্রবক্তা।

২৭. এ থেকে জানা যায়, হযরত দাউদের (আ) ত্রুটি তো অবশ্যই হয়েছিল এবং সেটি এমন ধরনের ত্রুটি ছিল যার সাথে দুষীর মামলার এক ধরনের সামঞ্জস্য ছিল। তাই তার ফায়সালা শুনাতে গিয়ে সংগে সংগেই তাঁর মনে চিন্তা জাগে, এর মাধ্যমে আমার পরীক্ষা হচ্ছে। কিন্তু এ ত্রুটি এমন মারাত্মক ধরনের ছিল না যা ক্ষমা করা যেতো না অথবা ক্ষমা করা হলেও তাঁকে উন্নত মর্যাদা থেকে নামিয়ে দেয়া হতো। আল্লাহ নিজেই এখানে সুস্পষ্টভাষায় বলছেন, যখন তিনি সিজদায় পড়ে তাওবা করেন তখন তাঁকে কেবল ক্ষমাই করে দেয়া হয়নি বরং দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি যে উন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন তাতেও ফারাক দেখা দেয়নি।

২৮. তাওবা কবুল করার ও মর্যাদা বৃদ্ধির সুসংবাদ দেবার সাথে সাথে মহান আল্লাহ সে সময় হযরত দাউদকে (আ) এ সতর্কবাণী শুনিয়ে দেন। এ থেকে একথা আপনা আপনি প্রকাশ হয়ে যায় যে, তিনি যে কাজটি করেছিলেন তাতে প্রবৃত্তির কামনার কিছু দখল ছিল, শাসন ক্ষমতার অসংগত ব্যবহারের সাথেও তার কিছু সম্পর্ক ছিল এবং তা এমন কোন কাজ ছিল যা কোন ন্যায়নিষ্ঠ শাসকের জন্য শোভনীয় ছিল না।

এখানে এসে আমাদের সামনে তিনটি প্রশ্ন দেখা দেয়। এক, সেটি কি কাজ ছিল? দুই, আল্লাহ পরিষ্কারভাবে সেটি না বলে এভাবে অন্তরালে রেখে সেদিকে ইংগিত করছেন কেন? তিন, এ প্রেক্ষাপটে তার উল্লেখ করা হয়েছে কোন্ সম্পর্কের ভিত্তিতে?

যারা বাইবেল (খৃষ্টান ও ইহুদীদের পবিত্র গ্রন্থ) অধ্যয়ন করেছেন তাঁদের কাছে একথা গোপন নেই যে, এ গ্রন্থে হযরত দাউদের বিরুদ্ধে হিত্তীয় উরিয়ার (Uriah the Hittite) স্ত্রীর সাথে যিনা করার এবং তারপর উরিয়াকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে তার স্ত্রীকে বিয়ে করার পরিষ্কার অভিযোগ আনা হয়েছে। আবার এই সংগে একথাও বলা হয়েছে যে, এ মেয়েটি যে এক ব্যক্তির স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে হযরত দাউদের হাওয়ালা করে দিয়েছিল সে-ই ছিল হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের মা। এ সম্পর্কিত পুরো কাহিনীটি বাইবেলের শামুয়েল-২ পুস্তকের ১১-১২ অধ্যায়ে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। কুরআন নাযিল হবার শত শত বছর পূর্বে এগুলো বাইবেলে সন্নিবেশিত হয়েছিল। সারা দুনিয়ার ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই তাদের এ পবিত্র কিতাব পাঠ করতো অথবা এর পাঠ শুনতো সে-ই এ কাহিনীটি কেবল জানতোই না বরং এটি বিশ্বাসও করতো। তাদেরই মাধ্যমে দুনিয়ায় এ কাহিনীটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আজ অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, পাশ্চাত্য দেশগুলোতে বনী ইসরাঈল ও ইহুদী ধর্মের ইতিহাস সম্পর্কিত এমন কোন একটি বইও লিখিত হয় না যেখানে হযরত দাউদের বিরুদ্ধে এই দোষারোপের পুনরাবৃত্তি করা হয় না। এ বহুল প্রচলিত কাহিনীতে একথাও লিখিত হয়েছে ঃ

"পরে সদাপ্রভূ দাউদের নিকটে নাথনকে প্রেরণ করিলেন। আর তিনি তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—এক নগরে দুইটি লোক ছিল; তাহাদের মধ্যে একজন ধনবান, আর একজন দরিদ্র। ধনবানের অতি বিস্তর মেষাদি পাল ও গোপাল ছিল। কিন্তু সেই দরিদ্রের আর কিছুই ছিল না, কেবল একটি ক্ষুদ্র মেষবৎসা ছিল, সে তাহাকে কিনিয়া পুষিতে ছিল; আর সেটি তাহার সংগে ও তাহার সন্তানদের সংগে থাকিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল; সে তাহারই খাদ্য খাইত ও তাহারই পাত্রে পান করিত, আর তাহার বক্ষস্থলে শয়ন করিত ও তাহার কন্যার মত ছিল। পরে ঐ ধনবানের গৃহে একজন পথিক আসিল, তাহাতে বাটিতে আগত অতিথির জন্য পান করণার্থে সে আপন মেষাদি পাল ও গোপাল হইতে কিছু লইতে কাতর হইল, কিন্তু সেই দরিদ্রের মেষবৎসাটি লইয়া, যে অতিথি আসিয়াছিল, তাহার জন্য তাহাই পাক করিল। তাহাতে দাউদ সেই ধনবানের প্রতি অতিশয় ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন তিনি নাথনকে কহিলেন, জীবন্ত সদাপ্রভূর দিব্য, যে ব্যক্তি সেই কর্ম করিয়াছে, সে মৃত্যুর সন্তান; সে কিছু দয়া না করিয়া এ কর্ম করিয়াছে, এই জন্য সেই মেষ বৎসার চর্তুগুণ ফিরাইয়া দিবে।

তখন নাথন দাউদকে কহিলেন, আপনিই সেই ব্যক্তি। ইস্রায়েলের ঈশ্বর, সদাপ্রভূ এই কথা কহেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে অভিষেক করিয়াছি এবং শৌলের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছি, আর তোমার প্রভূর বাটী তোমাকে দিয়াছি ও তোমার প্রভূর স্ত্রীগণকে তোমার বক্ষস্থলে দিয়াছি এবং ইস্রায়েলের ও জিহূদার কুল তোমাকে দিয়াছি; আর তাহা যদি অল্প হইত, তবে তোমাকে আরও অমুক অমুক বস্তু দিতাম। তুমি কেন সদাপ্রভূর বাক্য তুচ্ছ করিয়া, তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিয়াছ? তুমি হিত্তীয় উরিয়কে খড়্গ দ্বারা আঘাত করাইয়াছ ও তাহার স্ত্রীকে লইয়া আপনার স্ত্রী করিয়াছ, আম্মোন-সন্তানদের খড়্গ দ্বারা উরিয়াকে মারিয়া ফেলিয়াছ।"

(২-শমুয়েল ১২ ঃ ১-৯)

এই কাহিনী এবং এর বহুলপ্রচারের উপস্থিতিতে কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে কোন বিস্তারিত বর্ণনা দেবার প্রয়োজন ছিল না। এ ধরনের বিষয়গুলোকে আল্লাহর কিতাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করাও আল্লাহর রীতি নয়। তাই এখানে পরদার অন্তরালে রেখে এদিকে ইংগিতও করা হয়েছে এবং এ সংগে একথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আসল ঘটনা কি ছিল এবং কিতাবধারীরা তাকে কিভাবে ভিন্নরূপ দিয়েছে। কুরআন মজীদের উপরোল্লিখিত বর্ণনা থেকে যে আসল ঘটনা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় তা হচ্ছে এই ঃ হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম উরিয়ার (অথবা এ ব্যক্তির যে নাম থেকে থাকুক) কাছে নিছক নিজের মনের এ আকাংখা পেশ করেছিলেন যে, সে যেন নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়। আর যেহেতু এ আকাংখা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে পেশ করা হয়নি বরং একজন মহাপরাক্রমশালী শাসক এবং জবরদস্ত দীনী গৌরব ও মাহাত্মের অধিকারী ব্যক্তিত্বের পক্ষ থেকে প্রজামন্ডলীর একজন সদস্যের সামনে প্রকাশ করা হচ্ছিল, তাই এ ব্যক্তি কোন প্রকার বাহ্যিক বল প্রয়োগ ছাড়াই তা গ্রহণ করে নেবার ব্যাপারে নিজেকে বাধ্য অনুভব করছিল। এ অবস্থায় হযরত দাউদের (আ) আহবানে সাড়া দেবার জন্য তার উদ্যোগ নেবার পূর্বেই জাতির দু'জন সৎলোক অকস্মাৎ হযরত দাউদের কাছে পৌছে গেলেন এবং একটি কাল্পনিক মামলার আকারে এ বিষয়টি তাঁর সামনে পেশ করলেন। প্রথমে হযরত দাউদ (আ) মনে করেছিলেন এটি যথার্থই তাঁর সামনে পেশকৃত একটি মামলা। কাজেই মামলাটির বিবরণ শুনে তিনি নিজের ফায়সালা শুনিয়ে দিলেন। কিন্তু মুখ থেকে ফায়সালার শব্দগুলো বের হবার সাথে সাথেই তাঁর বিবেক তাঁকে সতর্ক করে দিল যে, এটি একটি রূপক আকারে তাঁর ও ঐ ব্যক্তির বিষয়ের সাথে মিলে যায় এবং যে কাজটিকে তিনি জুলুম গণ্য করছেন তাঁর ও ঐ ব্যক্তির বিষয়ে তার প্রকাশ ঘটছে। এ অনুভূতি মনের মধ্যে সৃষ্টি হবার সাথে সাথেই তিনি আল্লাহর দরবারে সিজদা ও তাওবা করলেন এবং নিজের ঐ কাজটি থেকেও বিরত হলেন।

বাইবেলে এ ঘটনাটি এহেন কলংকিতরূপে চিত্রিত হলো কেমন করে? সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে একথাটিও বুঝতে পারা যায়। মনে হয়, কোন উপায়ে হযরত দাউদ (আ) ঐ ভদ্রমহিলার গুণাবলী জানতে পেরেছিলেন। তাঁর মনে আকাংখা জেগেছিল, এ ধরনের যোগ্যতাসম্পন্না মহিলার পক্ষে একজন সাধারণ অফিসারের স্ত্রী হয়ে থাকার পরিবর্তে রাজরানী হওয়া উচিত। এ চিন্তার বশবর্তী হয়ে তিনি তার স্বামীর কাছে এ ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, সে যেন তাকে তালাক দিয়ে দেয়। বনী ইসরাঈলী সমাজে এটা কোন নিন্দনীয় বিষয় ছিল না বলেই তিনি এতে কোন প্রকার অনিষ্টকারিতা অনুভব করেননি। তাদের সমাজে এটা অত্যন্ত মামুলি ব্যাপার ছিল যে, একজন অন্য একজনের স্ত্রীকে পছন্দ করলে নিসংকোচে তার কাছে আবেদন করতো তোমার স্ত্রীকে আমার জন্য ছেড়ে দাও। এ ধরনের আবেদনে কারো মনে খারাপ প্রতিক্রিয়া হতো না। বরং অনেক সময় এক বন্ধু অন্য বন্ধুকে খুশী করার জন্য নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিতো। যাতে সে তাকে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু একথা বলতে গিয়ে হযরত দাউদের মনে এ অনুভূতি জাগেনি যে, একজন সাধারণ লোকের পক্ষ থেকে এ ধরনের ইচ্ছা প্রকাশ করা জুলুম ও বলপ্রয়োগের রূপধারণ না করতে পারে তবে একজন শাসকের পক্ষ থেকে যখন এ ধরনের ইচ্ছা প্রকাশ করা হয় তখন তা বলপ্রয়োগমুক্ত হতে পারে না। উল্লেখিত রূপক মোকদ্দমার মাধ্যমে যখন এ দিকে

তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হলো তখন নির্দ্বিধায় তিনি নিজের ইচ্ছা ত্যাগ করলেন। এভাবে একটি কথার উদ্ভব হয়েছিল এবং তা খতমও হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু পরে কোন এক সময় যখন তাঁর কোন ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা ছাড়াই ঐ ভদ্রমহিলার স্বামী এক যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেলো এবং হযরত দাউদ (আ) তাকে বিয়ে করে নিলেন তখন ইহুদীদের দুষ্ট মানসিকতা কল্পকাহিনী রচনায় প্রবৃত্ত হলো। আর বনী ইসরাঈলীদের একটি দল যখন হযরত সুলাইমানের শত্রু হয়ে গেলো তখন তাদের এ দুষ্ট মানসিকতা দ্রুত কাজ শুরু করে দিল। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন্ নামূল, ৫৬ টীকা) এসব উদ্যোগ ও ঘটনাবলীর প্রভাবাধীনে এ কাহিনী রচনা করা হলো যে, হযরত দাউদ (আ) নাউযুবিল্লাহ তাঁর প্রাসাদের ছাদের ওপর উরিয়ার স্ত্রীকে এমন অবস্থায় দেখে নিয়েছিলেন যখন তিনি উলংগ হয়ে গোসল করছিলেন। তিনি তাকে নিজের মহলে ডেকে এনে তার সাথে যিনা করলেন। এতে তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি বনী আম্মোন এর মোকাবিলায় উরিয়াকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিলেন এবং সেনাপতি যোয়াবকে হুকুম দিলেন তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে এমন এক জায়গায় নিযুক্ত করতে যেখানে সে নিশ্চিতভাবে নিহত হবে। তারপর যখন সে মারা গেলো, তিনি তার স্ত্রীকে বিয়ে করে নিলেন। এ মহিলার গর্ভে সুলাইমানের (আলাইহিস সালাম) জন্ম হলো। এসব মিথ্যা অপবাদ জালেমরা তাদের পবিত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছে। এভাবে বংশ পরম্পরায় এর পাঠের ব্যবস্থা করেছে। তারা এসব পড়তে থাকবে এবং নিজেদের দু'জন শ্রেষ্ঠতম ও মহত্তম ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করতে থাকবে। হযরত মূসার (আ) পরে এঁরা দু'জনই ছিলেন তাদের সবচেয়ে বড় পথপ্রদর্শক।

কুরআন ব্যাখ্যাতাগণের একটি দল তো বনী ইসরাঈলের পক্ষ থেকে তাঁদের কাছে এ সম্পর্কিত যেসব কিস্সা কাহিনী এসে পৌছেছে সেগুলো হুবহু গ্রহণ করে নিয়েছেন। ইসরাঈলী বর্ণনার মধ্য থেকে কেবলমাত্র যে অংশটুকুতে হযরত দাউদের বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ দেয়া হয়েছিল এবং যেখানে ভদ্রমহিলার গর্ভবতী হয়ে যাবার উল্লেখ ছিল সে অংশটুকু তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁদের উদ্ধৃত বাদবাকি সমস্ত কাহিনী বনী ইসরাঈলের সমাজে যেভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল ঠিক সেভাবেই তাঁদের রচনায় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় দলটি দুম্বীর মোকদ্দমার সাথে সামঞ্জস্য রাখে হযরত দাউদের এমন কোন কর্মতৎপরতার কথা সরাসরি অস্বীকার করেছেন। এর পরিবর্তে তাঁরা নিজেদের পক্ষ থেকে এ কাহিনীর এমন সব ব্যাখ্যা দেন যা একেবারেই ভিত্তিহীন, যেগুলোর কোন উৎস নেই এবং কুরআনের পূর্বাপর আলোচ্য বিষয়ের সাথেও যার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু মুফাস্সিরদের মধ্যে আবার এমন একটি দলও আছে যারা সঠিক তত্ত্ব পেয়ে গেছেন এবং কুরআনের সুস্পষ্ট ইংগিতগুলো থেকে আসল সত্যটির সন্ধান লাভ করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কতিপয় উক্তি অনুধাবন করুন ঃ

মাসরূক ও সাঈদ ইবনে জুবাইর উভয়েই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, "হযরত দাউদ (আ) সে ভদ্র মহিলার স্বামীর কাছে এ ইচ্ছা প্রকাশ করার চাইতে বেশী কিছু করেননি যে, তোমার স্ত্রীকে আমার জন্য ছেড়ে দাও।" (ইবনে জারীর)

আল্লামা যামাখশারী তাঁর কাশ্শাফ তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "আল্লাহ হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের কাহিনীটি যে আকারে বর্ণনা করেছেন তা থেকে তো একথাই

প্রকাশিত হয় যে, তিনি ঐ ব্যক্তির কাছে কেবলমাত্র এ ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন যে, সে তাঁর জন্য যেন তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে।"

আল্লামা আবু বকর জাসসাস এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ঐ ভদ্র মহিলা ঐ ব্যক্তির বিবাহিত স্ত্রী ছিল না বরং ছিল কেবলমাত্র তার বাগদত্তা বা তার সাথে তার বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। হযরত দাউদ সে ভদ্র মহিলাকে বিয়ের পয়গাম দিলেন। এর ফলে আল্লাহর ক্রোধ বর্ষিত হলো। কারণ, তিনি তাঁর মু'মিন ভাইয়ের পয়গামের ওপর পয়গাম দিয়েছিলেন। অথচ তাঁর গৃহে পূর্ব থেকেই কয়েকজন স্ত্রী ছিল। (আহকামুল কুরআন) অন্য কয়েকজন মুফাস্‌সিরও এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু একথাটি কুরআনের বর্ণনার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য রাখে না। কুরআন মজীদে মোকদ্দমা পেশকারীর মুখ নিসৃত শব্দাবলী হচ্ছে ঃ

لِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا

"আমার কাছে একটিমাত্র দুম্বী আছে এবং এ ব্যক্তি বলছে, ওটি আমাকে দিয়ে দাও।" একথাই হযরত দাউদ (আ) তাঁর ফায়সালায়ও বলেছেন ঃ

قَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ

"তোমার দুম্বী চেয়ে সে তোমার প্রতি জুলুম করেছে।" এ রূপকটি হযরত দাউদ ও উরিয়ার কাহিনীর সাথে তখনই খাপ খেতে পারে যখন ঐ ভদ্র মহিলা হবে তার স্ত্রী। একজনের বিয়ের পয়গামের ওপর যদি অন্যজনের পয়গাম দেবার ব্যাপার হতো তাহলে রূপকটি এভাবে বলা হতো ঃ "আমি একটি দুম্বী নিতে চাইছিলাম কিন্তু সে বললো, ওটিও আমার জন্য ছেড়ে দাও।"

কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী এ বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রসংগে লিখেছেন ঃ "আসল ঘটনা মাত্র এতটুকুই যে, হযরত দাউদ (আ) তাঁর নিজের লোকদের মধ্য থেকে একজনকে বলেন, তোমার স্ত্রীকে আমার জন্য ছেড়ে দাও এবং গুরুত্ব সহকারে এ দাবী করেন।..... কুরআন মজীদে একথা বলা হয়নি যে, তাঁর দাবীর কারণে সে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে, হযরত দাউদ তারপর সে মহিলাকে বিয়ে করেন এবং তারই গর্ভে হযরত সুলাইমানের জন্ম হয়।..... যে কথার জন্য ক্রোধ নাযিল হয় সেটি এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তিনি এক মহিলার স্বামীর কাছে এ অভিলাস ব্যক্ত করেন যে, সে যেন তার স্ত্রীকে তাঁর জন্য ছেড়ে দেয়।..... এ কাজটি সামগ্রিকভাবে কোন বৈধ কাজ হলেও নবুওয়াতের মর্যাদা থেকে এটি ছিল অনেক নিম্নতর ব্যাপার। এ জন্যই তাঁর ওপর আল্লাহর ক্রোধ নাযিল হয় এবং তাঁকে উপদেশও দেয়া হয়।"

এখানে যে প্রেক্ষাপটে এ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তার সাথে এ তাফসীরটিই খাপ খেয়ে যায়। বক্তব্য পরম্পরা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে একথা পরিকার জানা যায় যে, কুরআন মজীদের এ স্থানে এ ঘটনাটি দু'টি উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবর করার উপদেশ দেয়া এবং এ উদ্দেশ্যে

তাঁকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ "এরা তোমার বিরুদ্ধে যা কিছু বলে সে ব্যাপারে সবর করো এবং আমার বান্দা দাউদের কথা স্মরণ করো।" অর্থাৎ তোমাকে শুধুমাত্র যাদুকর ও মিথ্যুক বলা হচ্ছে কিন্তু আমার বান্দা দাউদকে তো জালেমরা ব্যভিচার ও হত্যার ষড়যন্ত্র করার অপবাদ পর্যন্ত দিয়েছিল। কাজেই এদের কাছ থেকে তোমার যাকিছু শুনতে হয় তা বরদাশ্‌ত করতে থাকো। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি হচ্ছে কাফেরদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, তোমরা সব রকমের হিসেব-নিকেশের শংকামুক্ত হয়ে দুনিয়ায় নানা ধরনের বাড়াবাড়ি করে যেতে থাকো কিন্তু যে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীনে তোমরা এসব কাজ করছো তিনি কাউকেও হিসেব-নিকেশ না নিয়ে ছাড়েন না। এমনকি যেসব বান্দা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ও নৈকট্যলাভকারী হয় তাঁরাও যদি কখনো সামান্যতম ভুল-ভ্রান্তি করে বসেন তাহলে বিশ্ব-জাহানের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহ তাঁদেরকেও কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন করেন। এ উদ্দেশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে, তাদের সামনে আমার বান্দা দাউদের কাহিনী বর্ণনা করো, যিনি ছিলেন বিচিত্র গুণধর ব্যক্তিত্বের অধিকারী কিন্তু যখন তাঁর দ্বারা একটি অসংগত কাজ সংঘটিত হলো তখন দেখো কিভাবে আমি তাকে তিরস্কার করেছি।

এ সম্পর্কে আর একটি ভুল ধারণাও থেকে যায়। এটি দূর করাও জরুরী। রূপকের মাধ্যমে মোকদ্দমা পেশকারী বলছে, এ ব্যক্তির ৯৯টি দুম্বী আছে এবং আমার আছে মাত্র একটি দুম্বী আর সেটিই এ ব্যক্তি চাচ্ছে। এ থেকে বাহ্যত এ ধারণা হতে পারে যে, সম্ভবত হযরত দাউদের ৯৯ জন স্ত্রী ছিলেন এবং তিনি আর একজন মহিলাকে বিয়ে করে স্ত্রীদের সংখ্যা একশত পূর্ণ করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আসলে রূপকের প্রত্যেকটি অংশের সাথে হযরত দাউদ ও হিত্তীয় উরিয়ার ঘটনার প্রত্যেকটি অংশের ওপর অক্ষরে অক্ষরে প্রযুক্ত হওয়া জরুরী নয়। প্রচলিত প্রবাদে দশ, বিশ, পঞ্চাশ ইত্যাদি সংখ্যাগুলোর উল্লেখ কেবলমাত্র আধিক্য প্রকাশ করার জন্যই করা হয়ে থাকে সঠিক সংখ্যা উল্লেখ করার জন্য এগুলো বলা হয় না। আমরা যখন কাউকে বলি, দশবার তোমাকে বলেছি তবু তুমি আমার কথায় কান দাওনি তখন এর মানে এ হয় না যে, গুণে গুণে দশবার বলা হয়েছে বরং এর অর্থ হয়, বারবার বলা হয়েছে। এমনি ধরনের ব্যাপার এখানে ঘটেছে। রূপকের আকারে পেশকৃত মোকদ্দমার মাধ্যমে সে ব্যক্তি হযরত দাউদের মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলেন যে, আপনার তো কয়েকজন স্ত্রী আছেন এবং তারপরও আপনি অন্য ব্যক্তির স্ত্রীকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন। একথাটিই মুফাস্‌সির নিশাপুরী হযরত হাসান বসরী (র) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

لم يكن لداؤد تسع وتسعون امرأة وانما هذا مثل

"হযরত দাউদের ৯৯টি স্ত্রী ছিল না বরং এটি নিছক একটি রূপক।"

(একাহিনী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমার তাফহীমাত গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে। আমি এখানে যে ব্যাখ্যার প্রাধান্য দিয়েছি তার সপক্ষে বিস্তারিত দলিল প্রমাণ যারা জানতে চান তারা উক্ত গ্রন্থের ২৯ থেকে ৪৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়ুন।)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ
فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾
كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

৩ রুকূ'

আমি তো আকাশ ও পৃথিবীকে এবং তাদের মাঝখানে যে জগত রয়েছে তাকে অনর্থক সৃষ্টি করিনি।[২৯] এতো যারা কুফরী করেছে তাদের ধারণা আর এ ধরনের কাফেরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুনে ধ্বংস হওয়া। যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আর যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তাদেরকে আমি কি সমান করে দেবো? মুত্তাকীদেরকে কি আমি দুষ্কৃতকারীদের মতো করে দেবো?[৩০]—এটি একটি অত্যন্ত বরকতপূর্ণ কিতাব,[৩১] যা (হে মুহাম্মাদ!) আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে এরা তার আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং জ্ঞানী ও চিন্তাশীলরা তা থেকে শিক্ষা নেয়।

২৯. অর্থাৎ নিছক খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি এর পেছনে কোন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা নেই, কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ নেই, এর মধ্যে কোন ন্যায় ও ইনসাফ নেই এবং কোন ভালো ও মন্দ কাজের কোন ফল দেখা যায় না এমন নয়। এ উক্তি পেছনের ভাষণের সারনির্যাস এবং সামনের বিষয়বস্তুর মুখবন্ধও। পেছনের ভাষণের পর এ বাক্য বলার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এ সত্যটি শ্রোতাদের মনে বসিয়ে দেয়া যে, মানুষকে এখানে লাগাম ছাড়া উটের মতো ছেড়ে দেয়া হয়নি এবং দুনিয়াতে যার যা মন চাইবে তাই করে যেতে থাকবে এ জন্য কারো কাছে কোন জবাবদিহি করতে হবে না এমন কোন শাসকবিহীন অবস্থাও এখানে চলছে না। সামনের দিকের বিষয়বস্তুর মুখবন্ধ হিসেবে এ বাক্য থেকে বক্তব্য শুরু করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, যে ব্যক্তি শাস্তি ও পুরস্কারে বিশ্বাস করে না এবং নিজে একথা মনে করে বসেছে যে, সৎকর্মকারী ও দুষ্কৃতকারী উভয়ই শেষ পর্যন্ত মরে মাটি হয়ে যাবে, কাউকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না, ভালো বা মন্দ কাজের কেউ কোন প্রতিদান পাবে না, সে আসলে দুনিয়াকে একটি খেল্‌না এবং এর সৃষ্টিকর্তাকে একজন খেলোয়াড় মনে করে। সে আরো মনে করে, বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা দুনিয়া সৃষ্টি করে এবং তার মধ্যে মানুষ সৃষ্টি করে একটি অর্থহীন কাজ করেছেন। একথাটিই কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে। যেমন,

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ۝٣٠ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ
الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ۝٣١ فَقَالَ اِنِّيْۤ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ۚ حَتّٰى
تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۝٣٢ رُدُّوْهَا عَلَيَّ ؕ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ۝٣٣

আর দাউদকে আমি সুলাইমান (রূপ) সন্তান দিয়েছি,[৩২] সর্বোত্তম বান্দা, বিপুলভাবে নিজের রবের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সে সময় যখন অপরাহ্নে তার সামনে খুব পরিপাটি করে সাজানো দ্রুতগতি সম্পন্ন ঘোড়া পেশ করা হলো।[৩৩] তখন সে বললো, "আমি এ সম্পদ-প্রীতি[৩৪] অবলম্বন করেছি আমার রবের স্মরণের কারণে," এমনকি যখন সে ঘোড়াগুলো দৃষ্টির অগোচরে চলে গেলো তখন (সে হুকুম দিল) তাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো তারপর তাদের পায়ের গোছায় ও ঘাড়ে হাত বুলাতে লাগলো।[৩৫]

"তোমরা কি মনে করেছো আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের আমার দিকে ফিরে আসতে হবে না।" (আল মু'মিনূন, ১১৫)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ۝ مَا خَلَقْنٰهُمَاۤ
اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ
اَجْمَعِيْنَ ۝

"আমি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে এবং তাদের মাঝখানে যে বিশ্ব-জাহান রয়েছে তাদেরকে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি তাদেরকে সত্য সহকারে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। আসলে চূড়ান্ত বিচারের দিনে তাদের সবার জন্য উপস্থিতির সময় নির্ধারিত রয়েছে।" (আদ দুখান, ৩৮-৪০)

৩০. অর্থাৎ সৎ ও অসৎ উভয় শেষ পর্যন্ত সমান হয়ে যাবে একথা কি তোমাদের মতে যুক্তিসংগত? কোন সৎলোক তার সততার কোন পুরস্কার পাবে না এবং কোন অসৎলোক তার অসৎকাজের শাস্তি ভোগ করবে না, এ ধারণায় কি তোমরা নিশ্চিন্ত হতে পারো? একথা সুস্পষ্ট, যদি আখেরাত না থাকে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন প্রকার জবাবদিহি না হয় এবং মানুষের কাজের কোন পুরস্কার ও শাস্তি না দেয়া হয় তাহলে এর মাধ্যমে আল্লাহ প্রজ্ঞা ও ইনসাফ অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে এবং বিশ্ব-জাহানের সমগ্র ব্যবস্থা একটি অরাজক ব্যবস্থায় পরিণত হয়। এ ধারণার ভিত্তিতে বিচার করলে দুনিয়ায় আদৌ সৎকাজের কোন উদ্যোক্তা এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার জন্য কোন প্রতিবন্ধকতাই থাকে না। আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব নাউযুবিল্লাহ যদি এমনি অরাজক ব্যাপার হয় তাহলে এ পৃথিবীতে যে ব্যক্তি কষ্টভোগ করে নিজে সৎ জীবন যাপন করে এবং মানুষের সংস্কার

সাধনের কাজে আত্মনিয়োগ করে সে বড়ই নির্বোধ। আর যে ব্যক্তি অনুকূল সুযোগ-সুবিধা পেয়ে সব রকমের বাড়াবাড়ি করে লাভের ফল কুড়াতে থাকে এবং সব ধরনের ফাসেকী ও অশালীন কার্যকলাপের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করতে থাকে সে বুদ্ধিমান।

৩১. বরকতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, "কল্যাণ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি।" কুরআন মজীদকে বরকত সম্পন্ন কিতাব বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, এটি মানুষের জন্য একটি অত্যন্ত উপকারী কিতাব। এ কিতাবটি তার জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য সর্বোত্তম বিধান দান করে। এর বিধান মেনে চলায় মানুষের লাভই হয় কেবল, কোন প্রকার ক্ষতির আশংকা নেই।

৩২. হযরত সুলাইমান সম্পর্কিত আলোচনা ইতিপূর্বে নিম্নোক্ত স্থানগুলোতে এসেছে ঃ তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, ১০৪; বনী ইসরাঈল, ৭; আল আম্বিয়া, ৭০-৭৫; আন নামূল, ১৮-৫৬ টীকাসমূহে এবং সাবা, ১২-১৪ আয়াতসমূহে।

৩৩. মূলে বলা হয়েছে اَلصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ এর অর্থ হচ্ছে এমনসব ঘোড়া, যেগুলো দাঁড়িয়ে থাকার সময় অত্যন্ত শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, লাফালাফি দাপাদাপি করে না এবং যখন দৌড়ায় অত্যন্ত দ্রুতবেগে দৌড়ায়।

৩৪. মূলে خَيْر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবীতে এ শব্দটির ব্যবহার হয় বিপুল সম্পদ অর্থে এবং ঘোড়ার জন্য পরোক্ষ অর্থেও এর ব্যবহার হয়। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম যেহেতু ঐ ঘোড়াগুলোকে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য রেখেছিলেন তাই তিনি "খাইর" শব্দের মাধ্যমে তাদেরকে চিহ্নিত করেছেন।

৩৫. এ আয়াতগুলোর অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণের মধ্যে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে।

একটি দল এগুলোর অর্থ বর্ণনা করে বলেন ঃ হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম ঘোড়া দেখাশুনা ও তাদের দৌড় প্রতিযোগিতায় এতবেশী মশগুল হয়ে পড়েছিলেন যার ফলে আসরের নামাযের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। অথবা কারো কারো কথা মতে নিজের কোন বিশেষ ওযীফা পড়তে ভুলে গিয়েছিলেন। এ ওযীফাটি তিনি পাঠ করতেন আসর ও মাগরিবের নামাযের মাঝামাঝি সময়। কিন্তু সেদিন সূর্য ডুবে গিয়েছিল অথচ তিনি নামায পড়তে বা ওযীফা পাঠ করতে পারেননি। ফলে তিনি হুকুম দিলেন ঃ ঘোড়াগুলো ফিরিয়ে আনো। আর সেগুলো ফিরে আসার পর হযরত সুলাইমান (আ) তরবারির আঘাতে সেগুলোকে হত্যা করতে বা অন্য কথায় আল্লাহর জন্য কুরবানী করতে লাগলেন। কারণ, সেগুলো তাঁকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছিল। এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে এ আয়াতগুলোর অনুবাদ এভাবে করা হয়েছে ঃ "তখন সে বললো, আমি এ সম্পদের প্রতি আসক্তি এত বেশী পছন্দ করেছি যার ফলে আমার রবের স্মরণ (আসরের নামায বা বিশেষ ওযীফা) থেকে গাফেল হয়ে গেছি, এমনকি (সূর্য পশ্চিমাকাশের অন্তরালে) লুকিয়ে পড়েছে। (তখন সে হুকুম দিল) ফিরিয়ে আনো ঐ (ঘোড়া) গুলোকে। (আর যখন সেগুলো ফিরে এলো) তখন তাদের পায়ের গোছায় ও ঘাড়ে (তরবারির) হাত চালিয়ে দিল।" এ ব্যাখ্যাটি কোন কোন খ্যাতিমান তাফসীরকারের দেয়া হলেও এটি অগ্রাধিকার

পাওয়ার যোগ্য নয়। কারণ, এখানে তাফসীরকারকে নিজের পক্ষ থেকে তিনটি কথা বাড়াতে হয়, যেগুলোর কোন উৎস ও ভিত্তি নেই। প্রথমত তিনি ধরে নেন, হযরত সুলাইমানের আসরের নামায বা এ সময় তিনি যে একটি বিশেষ ওযীফা পড়তেন তেমন কোন ওযীফা এ কাজে মশগুল থাকার কারণে ছুটে গিয়েছিল। অথচ কুরআনের শব্দাবলী হচ্ছে কেবলমাত্র ঃ

اِنِّیْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِکْرِ رَبِّیْ

এ শব্দগুলোর অনুবাদ তো এভাবেও করা যেতে পারে যে, "আমি এ সম্পদ এতবেশী পছন্দ করে ফেলেছি, যার ফলে আমার রবের স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে পড়েছি।" কিন্তু এর মধ্যে আসরের নামায বা কোন বিশেষ ওযীফার অর্থ গ্রহণ করার কোন প্রসংগ বা পূর্বসূত্র নেই। দ্বিতীয়ত তারা এটাও ধরে নেন যে, সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। অথচ সেখানে সূর্যের কোন কথা বলা হয়নি। বরং حَتّٰی تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ শব্দাবলী পড়ার পর মানুষের চিন্তা স্বাভাবিকভাবে ফিরে আসে পেছনের আয়াতে উল্লেখিত اَلصَّافِنَاتُ الْجِیَادُ এর দিকে। তৃতীয়ত এটাও ধরে নেন যে, হযরত সুলাইমান ঘোড়াগুলোর পায়ের গোছায় ও ঘাড়ে খালি হাত বুলাননি বরং তলোয়ারসহ হাত বুলান। অথচ কুরআনে مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ শব্দ বলা হয়নি এবং এখানে এমন কোন প্রসংগ বা পূর্বসূত্রও নেই যার ভিত্তিতে হাত বুলানোকে তরবারিসহ হাত বুলানো অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে। কুরআনের ব্যাখ্যা করার এ পদ্ধতির সাথে আমি নীতিগতভাবে ভিন্নমত পোষণ করি। আমার মতে কুরআনের শব্দাবলীর বাইরে অন্য অর্থ গ্রহণ করা কেবলমাত্র চারটি অবস্থায়ই সঠিক হতে পারে। এক, কুরআনের বাক্যের মধ্যেই তার জন্য কোন পূর্বসূত্র বা প্রসংগ থাকবে। দুই, কুরআনের অন্য কোন জায়গায় তার প্রতি কোন ইংগিত থাকবে। তিন, কোন সহীহ হাদীসে এ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। অথবা চার, তার অন্য কোন নির্ভরযোগ্য উৎস থাকবে। যেমন ইতিহাসের বিষয় হলে ইতিহাসে এ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যেতে হবে। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের বিষয় হলে নির্ভরযোগ্য তাত্ত্বিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে হবে। আর শরীয়াতের বিধানের বিষয় হলো ইসলামী ফিক্‌হের উৎস এর ব্যাখ্যা পেশ করবে। যেখানে এর মধ্য থেকে কোন একটি বিষয়ও থাকবে না সেখানে নিছক নিজস্বভাবে একটি কিস্‌সা রচনা করে কুরআনের ইবারতের অন্তরভুক্ত করে দেয়া আমার মতে সঠিক নয়।

একটি দল উপরোক্ত অনুবাদ ও ব্যাখ্যার সামান্য বিরোধিতা করেছেন। তারা বলেন, رُدُّوْهَا عَلَیَّ এবং حَتّٰی تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ উভয়ের মধ্যে যে সর্বনাম রয়েছে সেটি হচ্ছে সূর্য। অর্থাৎ যখন আসরের নামায ছুটে গেলো এবং সূর্য অস্তমিত হলো তখন হযরত সুলাইমান (আ) বিশ্ব-জাহান পরিচালনায় নিযুক্ত কর্মকর্তাগণকে অর্থাৎ ফেরেশতাগণকে বললেন, সূর্যকে ফিরিয়ে আনো, যাতে আসরের সময় ফিরে আসে এবং আমি নামায পড়তে পারি। এর ফলে সূর্য ফিরে এলো এবং তিনি নামায পড়ে নিলেন। কিন্তু এ ব্যাখ্যাটি ওপরের ব্যাখ্যাটির চাইতেও আরো বেশী অগ্রহণযোগ্য। এ জন্য নয় যে, আল্লাহ সূর্যকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম নন বরং এ জন্য যে, আল্লাহ আদৌ এর কোন উল্লেখই করেননি। বরং হযরত সুলাইমানের জন্য যদি এত বড় মু'জিযার প্রকাশ ঘটতো তাহলে অবশ্যই তা উল্লেখযোগ্য হওয়া উচিত ছিল। এর আরো একটি কারণ এই যে, সূর্যের অস্তমিত হয়ে

তারপর আবার ফিরে আসা এমন একটি অসাধারণ ঘটনা যে, যদি সত্যিই তা ঘটে থাকতো তাহলে দুনিয়ার ইতিহাসে তা কখনো অনুল্লেখিত থাকতো না। এ ব্যাখ্যার সপক্ষে তাঁরা কতিপয় হাদীস পেশ করেও একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, সূর্যের অস্তমিত হয়ে পুনর্বার ফিরে আসার ঘটনা মাত্র একবার ঘটেনি বরং কয়েকবার এ ঘটনা ঘটেছে। মি'রাজের ঘটনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য সূর্যকে ফিরিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। খন্দকের যুদ্ধের সময়ও নবী করীমের (সা) জন্য তাকে ফিরিয়ে আনা হয়। আর হযরত আলীর (রা) জন্যও ফিরিয়ে আনা হয় যখন নবী করীম (সা) তাঁর কোলে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছিলেন এবং তাঁর আসরের নামায কাযা হয়ে গিয়েছিল। নবী করীম (সা) সূর্যকে ফিরিয়ে আনার দোয়া করেন এবং তা ফিরে আসে। কিন্তু যে ব্যাখ্যার সমর্থনে এ হাদীসগুলো বর্ণনা করা হয়েছে এগুলো থেকে তার সপক্ষে প্রমাণ পেশ করা তার চাইতেও দুর্বল। হযরত আলী সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণনা করা হয়ে থাকে তার সকল বর্ণনা পরম্পরা ও বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে ইবনে তাইমিয়া একে বনোয়াট ও জাল হাদীস প্রমাণ করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন, এর কোন ভিত্তি নেই। ইবনে জওযী বলেন, নিসন্দেহে এটি জাল হাদীস। খন্দকের যুদ্ধের সময় সূর্যকে ফিরিয়ে আনার হাদীসটিও অনেক মুহাদ্দিসের মতে যঈফ এবং অনেকের মতে বানোয়াট। অন্যদিকে মি'রাজের হাদীসের আসল ব্যাপারটি হচ্ছে, যখন নবী করীম (সা) মক্কার কাফেরদের কাছে মি'রাজের রাতের অবস্থা বর্ণনা করছিলেন তখন কাফেররা তাঁর কাছে প্রমাণ চাইলো। তিনি বললেন, বাইতুল মাকদিসের পথে অমুক জায়গায় একটি কাফেলার দেখা পেয়েছিলাম এবং তাদের সাথে অমুক ঘটনা ঘটেছিল। কাফেররা জিজ্ঞেস করলো, সে কাফেলাটি কবে মক্কায় পৌছুবে? তিনি জবাব দিলেন, অমুক দিন। যখন সেদিনটি এলো কুরাইশরা সারাদিন কাফেলার অপেক্ষা করতে লাগলো, এমনকি সন্ধ্যা হয়ে গেলো। তখন নবী (সা) দোয়া করলেন যেন সূর্য ততক্ষণ পর্যন্ত অস্তমিত না হয় যতক্ষণ কাফেলা না এসে যায়। কাজেই দেখা গেলো সূর্য ডুবার আগে তারা পৌছে গেছে। এ ঘটনাটিকে কোন কোন বর্ণনাকারী এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, সেদিন দিনের সময় এক ঘন্টা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল এবং এই বাড়তি সময় পর্যন্ত সূর্য দাঁড়িয়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের হাদীস এত বড় অস্বাভাবিক ঘটনার প্রমাণের ক্ষেত্রে সাক্ষ হিসেবে যথেষ্ট হতে পারে কি? যেমন আমি আগেই বলে এসেছি, সূর্যের ফিরে আসা বা ঘন্টা খানিক আটকে থাকা কোন সাধারণ ঘটনা নয়। এ ধরনের ঘটনা যদি সত্যিই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকতো তাহলে সারা দুনিয়ায় হৈ চৈ পড়ে যেতো। দু-চারটে খবরে ওয়াহিদের (যে হাদীসের বর্ণনাকারী কোন স্তরে মাত্র একজন) মধ্যে তার আলোচনা কেমন করে সীমাবদ্ধ থাকতো?

মুফাস্সিরগণের তৃতীয় দলটি এ আয়াতগুলোর এমন অর্থ গ্রহণ করেন যা একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি এর শব্দগুলো পড়ে এ থেকে গ্রহণ করতে পারে। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী ঘটনা কেবলমাত্র এতটুকু ঃ হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের সামনে যখন উন্নত ধরনের ভাল জাতের ঘোড়ার একটি পাল পেশ করা হলো তখন তিনি বললেন, অহংকার বা আত্মম্ভরিতা করার জন্য অথবা শুধুমাত্র আত্মস্বার্থের খাতিরে এ সম্পদ আমার কাছে প্রিয় নয়। বরং এসব জিনিসের প্রতি আমার আকর্ষণকে আমি আমার রবের কালেমা বুলন্দ করার জন্য পছন্দ করে থাকি। তারপর তিনি সে ঘোড়াগুলোর দৌড় করালেন এমনকি

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ﴿٣٤﴾
قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ
اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ﴿٣٦﴾
وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾ وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هٰذَا
عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى
وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٠﴾

আর (দেখো) সুলাইমানকেও আমি পরীক্ষায় ফেলেছি এবং তার আসনে নিক্ষেপ করেছি একটি শরীর। তারপর সে রুজু করলো এবং বললো, হে আমার রব! আমাকে মাফ করে দাও এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান করো যা আমার পরে আর কারো জন্য শোভন হবে না; নিসন্দেহে তুমিই আসল দাতা।[৩৬] তখন আমি বাতাসকে তার জন্য অনুগত করে দিলাম, যা তার হুকুমে যেদিকে সে চাইতো মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হতো।[৩৭] আর শয়তানদেরকে বিজিত করে দিয়েছি, সব ধরনের গৃহনির্মাণ কারিগর ও ডুবুরী এবং অন্য যারা ছিল শৃংখলিত।[৩৮] (আমি তাকে বললাম) "এ আমার দান, তোমাকে ইখতিয়ার দেয়া হচ্ছে, যাকে চাও তাকে দাও এবং যাকে চাও তাকে দেয়া থেকে বিরত থাকো, কোন হিসেব নেই।[৩৯] অবশ্যই তার জন্য আমার কাছে রয়েছে নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।[৪০]

সেগুলো দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো। এরপর তিনি সেগুলো ফেরত আনালেন। সেগুলো ফেরত আসার পর ইবনে আব্বাসের বক্তব্য অনুযায়ী ঃ

جعل يمسح اعراف الخيل وعرا قيبها حُبًّا لها

"তিনি তাদের পায়ের গোছায় ও ঘাড়ে আদর করে হাত বুলাতে লাগলেন।" আমাদের মতে এ ব্যাখ্যাটিই সঠিক। কারণ কুরআন মজীদের শব্দাবলীর সাথে এটি পূর্ণ সামঞ্জস্য রাখে এবং অর্থকে পূর্ণতা দান করার জন্য এর মধ্যে এমন কোন কথা বাড়িয়ে বলতে হয় না যা কুরআনে নেই, কোন সহীহ হাদীসে নেই এবং বনী ইসরাঈলের ইতিহাসেও নেই।

এ প্রসংগে একথাটাও সামনে থাকা উচিত যে, আল্লাহ হযরত সুলাইমানের পক্ষে এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন ঃ نعم العبد انه اواب (নিজের রবের দিকে বেশী বেশী ফিরে আসা ব্যক্তিই হচ্ছে সর্বোত্তম বান্দা) এর প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করার অব্যবহিত

পরেই করেছেন। এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, আসলে একথা বলাই এখানে উদ্দেশ্য ছিল যে, দেখো, সে আমার কত ভাল বান্দা ছিল, বাদশাহীর সাজ সরঞ্জাম তার কাছে পছন্দনীয় ছিল দুনিয়ার খাতিরে নয় বরং আমার জন্য, নিজের পরাক্রান্ত অশ্ববাহিনী দেখে দুনিয়াদার ও বৈষয়িক ভোগ লালসায় মত্ত শাসনকর্তাদের মতো সে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেনি বরং সে সময়ও তার মনোজগতে ভেসে উঠেছে আমারই স্মৃতি।

৩৬. বক্তব্যের ধারাবাহিকতা অনুসারে এখানে একথা বলাই মূল উদ্দেশ্য এবং পেছনের আয়াতগুলো এরই জন্য মুখবন্ধ হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন প্রথমে হযরত দাউদের প্রশংসা করা হয়েছে, তারপর যে ঘটনার ফলে তিনি ফিত্‌নার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন সেটি উল্লেখ করা হয়েছে, একথা বলা হয়েছে যে, মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ নিজের এত প্রিয় বান্দাকেও জবাবদিহি না করে ছাড়েননি, তারপর তাঁর এ কার্যক্রম দেখান যে, ফিত্‌না সম্পর্কে সজাগ করে দেবার সাথে সাথেই তিনি তাওবা করেন এবং আল্লাহর সামনে মাথা নত করে নিজের ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে ফিরে আসেন, অনুরূপভাবে এখানেও বক্তব্য বিন্যাস এভাবে করা হয়েছে ঃ প্রথমে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের উচ্চ মর্যাদা ও মহিমান্বিত বন্দেগীর কথা বলা হয়েছে, তারপর বলা হয়েছে, তাঁকেও পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়েছিল, তারপর তাঁর বন্দেগীর এ কৃতিত্ব দেখান যে, যখন তাঁর সিংহাসনে একটি দেহাবয়ব এনে ফেলে দেয়া হয় তখন সংগে সংগেই তিনি নিজের পদস্খলন সম্পর্কে সজাগ হন, নিজের রবের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং যে কথার জন্য তিনি ফিত্‌নার সম্মুখীন হয়েছিলেন নিজের সে কথা ও কার্যক্রম থেকে ফিরে আসেন। অন্যকথায় বলা যায়, এ দু'টি কাহিনী থেকে আল্লাহ একই সংগে দু'টি কথা বুঝাতে চান। এক, তাঁর নিরপেক্ষ সমালোচনা, পর্যালোচনা ও জবাবদিহি থেকে সাধারণ তো দূরের কথা নবীরাও বাঁচতে পারেননি। দুই, অপরাধ করে ঘাড় বেঁকা করে থাকা বান্দার জন্য সঠিক কর্মনীতি নয়। বরং তার কাজ হচ্ছে যখনই সে নিজের ভুল অনুভব করতে পারবে তখনই বিনীতভাবে নিজে রবের সামনে ঝুঁকে পড়বে। এ কর্মনীতিরই ফল স্বরূপ মহান আল্লাহ এ মনীষীদের পদস্খলনগুলো কেবল ক্ষমাই করে দেননি বরং তাঁদের প্রতি আরো বেশী দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেছেন।

এখানে আবার এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম যে ফিত্‌নার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেটি কেমন ফিত্‌না ছিল? তাঁর আসনের ওপর একটি দেহাবয়ব এনে ফেলে দেয়ার অর্থ কি? এ দেহাবয়ব এনে তাঁর আসনে ফেলে দেয়া তাঁর জন্য কোন্ ধরনের সতর্কীকরণ ছিল যার ফলে তিনি তাওবা করেন? এর জবাবে মুফাস্‌সিরগণ চারটি ভিন্ন ভিন্ন মত অবলম্বন করেছেন।

একটি দল একটি বিরাট কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এর বিস্তারিত বিবরণের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে আবার বহু ধরনের মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কিন্তু তাদের সবার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে ঃ হযরত সুলাইমানের থেকে এই ত্রুটি সংঘটিত হয়েছিল যে, তাঁর মহলে এক বেগম সাহেবা চল্লিশ দিন পর্যন্ত মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিলেন এবং তিনি ছিলেন এ ব্যাপারে বেখবর। অথবা তিনি কয়েকদিন পর্যন্ত গৃহমধ্যে বসেছিলেন এবং কোন মজলুমের ফরিয়াদ শুনেননি। এর ফলে তিনি যে শাস্তি পেয়েছিলেন তা ছিল এই যে, এক শয়তান যে কোনভাবেই তাঁর এমন একটি আংটি চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল যার বদৌলতে তিনি জিন

ও মানুষ জাতি এবং বাতাসের ওপর রাজত্ব করতেন। আংটি হাতছাড়া হয়ে যেতেই হযরত সুলাইমানের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব খতম হয়ে গিয়েছিল এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত তিনি দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে থাকলেন। এই অন্তরবর্তীকালে সেই শয়তান সুলাইমানের রূপ ধারণ করে রাজত্ব করতে থাকলো। সুলাইমানের সিংহাসনে একটি দেহাবয়ব এনে ফেলে দেয়ার অর্থ হচ্ছে তাঁর সিংহাসনে উপবেশনকারী এই শয়তান। কেউ কেউ একথাও বলে ফেলেছেন যে, সে সময় এই শয়তানের হাত থেকে সুলাইমানের হারেমের মহিলাদের সতীত্বও সংরক্ষিত থাকেনি। শেষ পর্যন্ত দরবারের আমাত্যবর্গ, পারিষদ ও উলামায়ে কেরামের মনে তার কার্যকলাপ দেখে সন্দেহের সৃষ্টি হলো এবং তারা মনে করতে থাকলেন, এ ব্যক্তি সুলাইমান নয়। কাজেই তারা তার সামনে তাওরাত খুলে মেলে ধরলেন এবং সে ভয়ে পালিয়ে গেলো। পথে তার হাত থেকে আংটি খুলে গিয়ে সমুদ্রে পড়ে গেলো অথবা সে নিজেই তা সমুদ্রে নিক্ষেপ করলো। একটি মাছ তা গিলে ফেললো। ঘটনাক্রমে সে মাছটি হযরত সুলাইমানের হস্তগত হলো। মাছটি রান্না করার জন্য তিনি তার পেট কেটে ফেললেন। সেখান থেকে আংটি বের হয়ে পড়লো। আংটি হাতে আসার সাথে সাথেই জিন, মানুষ ইত্যাদি সবাই সালাম করতে করতে তাঁর সামনে হাজির হয়ে গেলো।—এ পুরো কাহিনীটিই ছিল একটি পৌরানিক গালগল্প। নওমুসলিম আহ্‌লি কিতাবগণ তালমুদ ও অন্যান্য ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে সংগ্রহ করে এটি মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর আশ্চর্যের ব্যাপার, আমাদের বড় বড় পণ্ডিতগণ একে কুরআনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা মনে করে নিজেদের ভাষায় এগুলো বর্ণনা করেছেন। অথচ সুলাইমানের আংটির কোন সত্যতা নেই। হযরত সুলাইমানের কৃতিত্ব কোন আংটির ভেল্কিবাজি ছিল না। শয়তানদেরকেও আল্লাহ নবীদের আকৃতি ধরে আসার ও মানুষকে গোমরাহ করার ক্ষমতা দেননি। তাছাড়া আল্লাহ সম্পর্কে এমন কোন ধারণাও করা যেতে পারে না যে, তিনি কোন নবীর কোন ভুলের শাস্তি এমন ফিত্‌নার আকৃতিতে দান করবেন যার ফলে শয়তান নবী হয়ে একটি উম্মাতের সমগ্র জনগোষ্ঠীর সর্বনাশ করে দেবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, কুরআন নিজেই এ তাফসীরের প্রতিবাদ করছে। সামনের আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, হযরত সুলাইমান যখন এ পরীক্ষার সম্মুখীন হন এবং তিনি আমার কাছে ক্ষমা চান তখন আমি বায়ু ও শয়তানদের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করেদিলাম। কিন্তু এ তাফসীর এর বিপরীতে একথা বলছে যে, আংটির কারণে শয়তানরা পূর্বেই হযরত সুলাইমানের হুকুমের অনুগত হয়ে গিয়েছিল। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, যেসব মনীষী এ তাফসীর বর্ণনা করেছেন তাঁরা পরবর্তী আয়াত কি বলছে তা আর দেখেননি।

দ্বিতীয় দলটি বলেন, ২০ বছর পর হযরত সুলাইমানের একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। শয়তানরা বিপদ গণে। তারা মনে করে যদি হযরত সুলাইমানের পর তাঁর এ পুত্র বাদশাহ হয়ে যায় তাহলে তাদেরকে আবার একই গোলামীর জিঞ্জির বহন করে চলতে হবে। তাই তারা তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। হযরত সুলাইমান একথা জানতে পারেন। তিনি পুত্রকে মেঘের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। সেখানেই তার লালন-পালনের ব্যবস্থা করেন। এটিই ছিল সেই ফিত্‌না যার সম্মুখীন তিনি হয়েছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহর ওপর ভরসা করার পরিবর্তে তিনি মেঘের হেফাজতের ওপর ভরসা করেছিলেন। এর শাস্তি

তাঁকে এভাবে দেয়া হয় যে, সে শিশুটি মরে গিয়ে তাঁর সিংহাসনের ওপর এসে পড়ে।— এ কাহিনীটিও আগাগোড়া ভিত্তিহীন ও উদ্ভট এবং স্পষ্ট কুরআন বিরোধী। কারণ এখানেও ধারণা করে নেয়া হয়েছে যে, বায়ু ও শয়তানরা পূর্ব থেকেই হযরত সুলাইমানের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। অথচ কুরআন পরিষ্কার ভাষায় তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন হবার ব্যাপারটিকে এ ফিত্‌নার পরবর্তীকালের ঘটনা বলে উল্লেখ করছে।

তৃতীয় দলটি বলেন, একদিন হযরত সুলাইমান কসম খান, আজ রাতে আমি সত্তরজন স্ত্রীর কাছে যাবো এবং প্রত্যেকের গর্ভে একজন করে আল্লাহর পথের মুজাহিদ জন্ম দেব। কিন্তু একথা বলতে গিয়ে তিনি ইন্‌শাআল্লাহ বলেননি। এর ফলে মাত্র একজন স্ত্রী গর্ভবতী হয় এবং তাঁর গর্ভেও একটি অসমাপ্ত ও অপরিপক্ক শিশুর জন্ম হয়। দাই শিশুটিকে এনে হযরত সুলাইমানের আসনের ওপর ফেলে দেয়। এ হাদীসটি হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন রাবীর মাধ্যমে এটি উদ্ধৃত করেছেন। বুখারী শরীফেই এ হাদীসটি যেসব রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে তার কোনটিতে স্ত্রীদের সংখ্যা বলা হয়েছে ৬০, কোনটিতে ৭০, কোনটিতে ৯০, কোনটিতে ৯৯ আবার কোনটিতে ১০০ও বলা হয়েছে। সনদের দিক দিয়ে এর মধ্য থেকে অধিকাংশই শক্তিশালী এবং রেওয়ায়াত হিসেবে এগুলোর নির্ভুলতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা যেতে পারে না। কিন্তু এ হাদীসের বিষয়বস্তু সুস্পষ্টভাবে সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির বিরোধী। এর ভাষা বলছে, একথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো এভাবে বলেননি যেভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। বরং তিনি সম্ভবত ইহুদীদের মিথ্যা ও অপবাদমূলক কিচ্ছা-কাহিনীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে কোন পর্যায়ে একে এভাবে উদাহরণস্বরূপ বর্ণনা করে থাকবেন এবং শ্রোতার মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়ে থাকবে যে, নবী করীম (সা) নিজেই এ ঘটনা বর্ণনা করছেন। এ ধরনের রেওয়ায়াতকে নিছক জোরে লোকদের হজম করাবার চেষ্টা করানো দীনকে হাস্যাস্পদ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই হিসেব কষে দেখতে পারেন, শীতের দীর্ঘতম রাত ও এশা থেকে নিয়ে ফজর পর্যন্ত দশ এগারো ঘন্টার বেশী সময় হয় না। যদি স্ত্রীদের সংখ্যা কমপক্ষে ৬০ জন বলে মেনে নেয়া যায়, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায়, সেই রাতে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম কোন প্রকার বিশ্রাম না নিয়েই অবিরাম ১০ বা ১১ ঘন্টা ধরে প্রতি ঘন্টায় ৬ জন স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে থেকেছেন। কার্যত এটা কি সম্ভব? আর একথাও কি আশা করা যেতে পারে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাস্তব ঘটনা হিসেবে একথাটি বর্ণনা করে থাকবেন? তারপর হাদীসে কোথাও একথা বলা হয়নি যে, কুরআন মজীদে হযরত সুলাইমানের আসনের ওপর যে দেহাবয়বটি ফেলে রাখার কথা বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে এ অপরিণত শিশু। তাই নবী করীম (সা) এ ঘটনাটি এ আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন তা বলা যায় না। তাছাড়া এ সন্তানের জন্মের পর হযরত সুলাইমানের ইস্‌তিগ্‌ফার করার কথা তো বোধগম্য হতে পারে কিন্তু তিনি ইস্‌তিগ্‌ফারের সাথে সাথে "আমাকে এমন রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করো যা আমার পরে আর কারো জন্য শোভনীয় নয়"—এ দোয়াটি কেন করেছিলেন তা বোধগম্য নয়।

এর আর একটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং ইমাম রাযী এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে, হযরত সুলাইমান কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন অথবা কোন

বিপদের কারণে এত বেশী চিন্তান্বিত ছিলেন যার ফলে তিনি শুকাতে শুকাতে হাড্ডিচর্মসার হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এ ব্যাখ্যাটি কুরআনের শব্দের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কুরআনের শব্দাবলী হচ্ছে : "আমি সুলাইমানকে পরীক্ষায় ফেলে দিলাম এবং তার আসনের ওপর একটি দেহাবয়ব নিক্ষেপ করলাম তারপর সে ফিরে এলো।" এ শব্দগুলো পড়ে কোন ব্যক্তিও একথা বুঝতে পারে না যে, এ দেহাবয়ব বলতে হযরত সুলাইমানকেই বুঝানো হয়েছে। এ থেকে তো পরিষ্কার জানা যায়, এ পরীক্ষার সম্মুখীন করার মূলে হযরত সুলাইমানের কোন ভুলচুক বা পদস্খলন ছিল। এ ভুলচুকের কারণে তাঁকে সতর্ক করে জানিয়ে দেয়া হয় যে, আপনার আসনের ওপর একটি দেহ এনে ফেলে দেয়া হয়েছে। এর ফলে নিজের ভুলচুক বুঝতে পেরে তিনি ফিরে আসেন।

আসলে এটি কুরআন মজীদের জটিলতম স্থানগুলোর মধ্যে একটি। চূড়ান্তভাবে এর ব্যাখ্যা করার মতো কোন নিশ্চিত বুনিয়াদ আমাদের কাছে নেই। কিন্তু হযরত সুলাইমানের দোয়ার এ শব্দাবলী : "হে আমার রব! আমাকে মাফ করে দিন এবং আমাকে এমন রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করুন যা আমার পরে আর কারোর জন্য শোভনীয় নয়" যদি বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের আলোকে পড়া যায় তাহলে আপাতদৃষ্টে অনুভূত হবে, তাঁর মনে সম্ভবত এ আকাংখা ছিল যে, তাঁর পরে তাঁর ছেলে হবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত এবং শাসন ও রাষ্ট্র কর্তৃত্ব আগামীতে তাঁর পরিবারের মধ্যে অব্যাহত থাকবে। এ জিনিসটিকেই আল্লাহ তাঁর জন্য ফিত্না গণ্য করেছেন এবং এ ব্যাপারে তিনি এমন সময় সজাগ হয়েছেন যখন তাঁর পুত্র যুবরাজ রাজুবয়াম এমন এক অযোগ্য তরুণ হিসেবে সামনে এসে গিয়েছিল যার আচরণ পরিষ্কার বলে দিচ্ছিল যে, সে দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালামের সালতানাত চারদিনও টিকিয়ে রাখতে পারবে না। তাঁর আসনে একটি দেহ নিক্ষেপ করার তাৎপর্য সম্ভবত এই হবে যে, যে পুত্রকে তিনি সিংহাসনে বসাতে চাচ্ছিলেন সে ছিল একটি অযোগ্য পুত্র। এ সময় তিনি নিজের আকাংখা পরিহার করেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে এ মর্মে আবেদন জানান যে, এ বাদশাহী যেন আমার পর শেষ হয়ে যায় এবং আমার পরে আমার বংশের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা অব্যাহত রাখার আকাংখা আমি প্রত্যাহার করলাম। বনী ইসরাঈলের ইতিহাস থেকেও একথাই জানা যায় যে, হযরত সুলাইমান নিজের পরে আর কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করার জন্য অসিয়াত করে যাননি এবং কারো আনুগত্য করার জন্য লোকদেরকে বাধ্যও করেননি। পরবর্তীকালে তাঁর রাষ্ট্রীয় পারিষদবর্গ রাজুবয়ামকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু সামান্য কিছুদিন যেতে না যেতেই বনী ইসরাঈলের দশটি গোত্র উত্তর ফিলিস্তিনের এলাকাটি নিয়ে আলাদা হয়ে যায় এবং একমাত্র ইয়াহুদা গোত্র বাইতুল মাকদিসের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সাথে সংযুক্ত থাকে।

৩৭. সূরা আল আম্বিয়ার ব্যাখ্যায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আম্বিয়া, ৭৪ টীকা) তবে এখানে একটি কথা সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে, সূরা আল আম্বিয়ায় যেখানে বাতাসকে নিয়ন্ত্রিত করার কথা বলা হয়েছে সেখানে الريح عاصفة (প্রবল বায়ু) শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে। আর এখানে সে একই বাতাস সম্পর্কে বলা হচ্ছে, تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ رُخَاءً (তার হুকুমে সে মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হতো)। এর অর্থ হচ্ছে, সে বাতাস মূলত প্রবল ছিল যেমন বাতাস চালিত জাহাজ চালাবার জন্য প্রবল বায়ুর প্রয়োজন হয়। কিন্তু হযরত সুলাইমানের জন্য

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ
وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ
أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٤٣﴾

৪ রুকূ'

আর স্মরণ করো আমার বান্দা আইয়ূবের কথা[৪১] যখন সে তার রবকে ডাকলো এই বলে যে, শয়তান আমাকে কঠিন যন্ত্রণা ও কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।[৪২] (আমি তাকে হুকুম দিলাম) তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করো, এ হচ্ছে ঠাণ্ডা পানি গোসল করার জন্য এবং পান করার জন্য।[৪৩] আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার পরিবার পরিজন এবং সেই সাথে তাদের মতো আরো,[৪৪] নিজের পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ এবং বুদ্ধি ও চিন্তাশীলদের জন্য শিক্ষণীয় হিসেবে।[৪৫]

তাকে এ অর্থে মৃদুমন্দ করে দেয়া হয়েছিল যে, তাঁর বাণিজ্য বহর যেদিকে সফর করতে চাইতো সেদিকেই তা প্রবাহিত হতো।

৩৮. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আম্বিয়া, ৭৫ টীকা, আন নাম্‌ল ২৩, ২৮, ৪৫, ৪৬ ও ৪৭ টীকা।—শয়তান বলতে জিন বুঝানো হয়েছে। আর শৃংখলিত জিন বলতে এমনসব সেবক জিন বুঝানো হয়েছে যাদেরকে বিভিন্ন দুষ্কর্মের কারণে বন্দী করা হতো। যেসব বেড়ী ও জিঞ্জির দিয়ে এ জিনগুলোকে বাঁধা হতো সেগুলো লোহা নির্মিত হওয়া এবং বন্দীদেরকেও মানুষদের মতো প্রকাশ্যে শৃংখলিত দেখতে পাওয়াও অপরিহার্য ছিল না। মোটকথা তাদেরকে এমন পদ্ধতিতে বন্দী করা হতো যার ফলে তারা পালাবার ও কুকর্ম করার সুযোগ পেতো না।

৩৯. এ আয়াতের তিনটি অর্থ হতে পারে। এক, এটি আমার বেহিসেব দান। তুমি যাকে ইচ্ছা দিতে পারো, যাকে ইচ্ছা নাও দিতে পারে। দুই, এটি আমার দান। যাকে ইচ্ছা দাও এবং যাকে ইচ্ছা না দাও, দেয়া বা না দেয়ার জন্য তোমাকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না। কোন কোন মুফাস্‌সির এর আরো একটি অর্থ করেছেন। সেটি হচ্ছে, এ শয়তানদেরকে পুরোপুরি তোমার অধীনে দিয়ে দেয়া হয়েছে। এদের মধ্য থেকে যাকে চাও মুক্তি দিয়ে দাও এবং যাকে চাও আটকে রাখো, এ জন্য তোমাকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না।

৪০. এখানে একথা উল্লেখ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা জানিয়ে দেয়া যে, বান্দার অহংকার আল্লাহর কাছে যত বেশী অপ্রিয় ও অপছন্দনীয় তার দীনতা ও বিনয়ের প্রকাশ তাঁর কাছে তত বেশী প্রিয়। বান্দা যদি অপরাধ করে এবং সতর্ক করার কারণে উল্‌টো আরো বেশী বাড়াবাড়ি করে, তাহলে এর পরিণাম তাই হয় যা সামনের দিকে আদম ও ইবলিসের কাহিনীতে বর্ণনা করা হচ্ছে। পক্ষান্তরে বান্দার যদি সামান্য পদস্খলন হয়ে যায়

এবং সে তাওবা করে দীনতা সহকারে তার রবের সা'নে মাথা নত করে, তাহলে তার প্রতি এমন সব দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করা হয়, যা ইতিপূর্বে দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালামের ওপর প্রদর্শিত হয়। হযরত সুলাইমান ইস্‌তিগ্‌ফারের পরে যে দোয়া করেছিলেন আল্লাহ তাকে অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করেন এবং বাস্তবে তাঁকে এমন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দান করেন যা তাঁর পূর্বে কেউ লাভ করেনি এবং তাঁর পরে আজো পর্যন্ত কাউকে দেয়া হয়নি। বায়ু নিয়ন্ত্রণ ও জিনদের ওপর কর্তৃত্ব এ দু'টি এমন ধরনের অসাধারণ শক্তি যা মানুষের ইতিহাসে একমাত্র হযরত সুলাইমানকেই দান করা হয়েছে। অন্য কাউকে এর কোন অংশ দেয়া হয়নি।

৪১. এ নিয়ে চতুর্থবার হযরত আইয়ূবের কথা কুরআন মজীদে আলোচিত হয়েছে। এর আগে সূরা নিসার ১৬৩, সূরা আন'আমের ৮৪ ও সূরা আম্বিয়ার ৮৩-৮৪ আয়াতে এ সম্পর্কিত আলোচনা এসেছে। ইতিপূর্বে সূরা আম্বিয়ার ব্যাখ্যায় আমি তাঁর অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। (তাফহীমুল কুরআন, আল আম্বিয়া, ৭৬-৭৯ টীকা)

৪২. এর অর্থ এ নয় যে, শয়তান আমাকে রোগগ্রস্ত করে দিয়েছে এবং আমাকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, রোগের প্রচণ্ডতা, ধন-সম্পদের বিনাশ এবং আত্মীয়-স্বজনদের মুখ ফিরিয়ে নেবার কারণে আমি যে কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছি তার চেয়ে বড় কষ্ট ও যন্ত্রণা আমার জন্য হচ্ছে এই যে, শয়তান তার প্ররোচনার মাধ্যমে আমাকে বিপদগ্রস্ত করছে। এ অবস্থায় সে আমাকে আমার রব থেকে হতাশ করার চেষ্টা করে, আমাকে আমার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ করতে চায় এবং আমি যাতে অধৈর্য হয়ে উঠি সে প্রচেষ্টায় রত থাকে। হযরত আইয়ূবের ফরিয়াদের এ অর্থটি দু'টি কারণে আমাদের কাছে প্রাধান্য লাভের যোগ্য। এক, কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে আল্লাহ শয়তানকে কেবলমাত্র প্ররোচণা দেবার ক্ষমতাই দিয়েছেন। আল্লাহর বন্দেগীকারীদেরকে রোগগ্রস্ত করে এবং তাদেরকে শারীরিক যন্ত্রণা দিয়ে বন্দেগীর পথ থেকে সরে যেতে বাধ্য করার ক্ষমতা তাদেরকে দেননি। দুই, সূরা আম্বিয়ায় যেখানে হযরত আইয়ূব আল্লাহর কাছে তাঁর রোগের ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করছেন সেখানে তিনি শয়তানের কোন কথা বলেন না। বরং তিনি কেবল বলেন,

اِنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ

"আমি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছি এবং তুমি পরম করুণাময়।"

৪৩. অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমে মাটিতে পায়ের আঘাত করতেই একটি পানির ঝরণা প্রবাহিত হলো। এর পানি পান করা এবং এ পানিতে গোসল করা ছিল হযরত আইয়ূবের জন্য তাঁর রোগের চিকিৎসা। সম্ভবত হযরত আইয়ূব কোন কঠিন চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বাইবেলও একথাই বলে যে, তাঁর সারা শরীর ফোড়ায় ভরে গিয়েছিল।

৪৪. হাদীস থেকে জানা যায়, এ রোগে আক্রান্ত হবার পর হযরত আইয়ূবের স্ত্রী ছাড়া আর সবাই তাঁর সংগ ত্যাগ করেছিল এমন কি সন্তানরাও তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এ দিকে ইংগিত করেই আল্লাহ বলছেন, যখন আমি তার রোগ নিরাময় করলাম, সমস্ত পরিবারবর্গ তাঁর কাছে ফিরে এলো এবং তারপর আমি তাঁকে আরো সন্তান দান করলাম।

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ۗ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ۗ
نِعْمَ الْعَبْدُ ۗ اِنَّهٗ اَوَّابٌ ﴿٤٤﴾ وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ
اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ ﴿٤٥﴾ اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾
وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٧﴾ وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ
وَذَا الْكِفْلِ ۗ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٨﴾

(আর আমি তাকে বললাম) এক আটি ঝাড়ু নাও এবং তা দিয়ে আঘাত করো এবং নিজের কসম ভংগ করো না।[৪৬] আমি তাকে সবরকারী পেয়েছি, উত্তম বান্দা ছিল সে, নিজের রবের অভিমুখী।[৪৭]

আর আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের কথা স্মরণ করো। তারা ছিল বড়ই কর্মশক্তির অধিকারী ও বিচক্ষণ[৪৮] আমি একটি নির্ভেজাল গুণের ভিত্তিতে তাদেরকে নির্বাচিত করেছিলাম এবং তা ছিল পরলোকের স্মরণ।[৪৯] নিশ্চিতভাবে আমার কাছে তারা বিশিষ্ট সৎলোক হিসেবে গণ্য। আর ইসমাঈল, আল ইয়াসা'[৫০] ও যুল কিফ্‌ল-এর[৫১] কথা স্মরণ করো। এরা সবাই সৎলোকদের অন্তরভুক্ত ছিল।

৪৫. অর্থাৎ একজন বুদ্ধিমানের জন্য এর মধ্যে এ শিক্ষা রয়েছে যে, ভালো অবস্থায় আল্লাহকে ভুলে গিয়ে তার বিদ্রোহী হওয়া উচিত নয় এবং খারাপ অবস্থায় তার আল্লাহ থেকে নিরাশ হওয়াও উচিত নয়। তাকদীরের ভালমন্দ সরাসরি এক ও লাশরীক আল্লাহর ক্ষমতার আওতাধীন। তিনি চাইলে মানুষের সবচেয়ে ভাল অবস্থাকে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় পরিবর্তিত করে দিতে পারেন আবার চাইলে সবচেয়ে খারাপ অবস্থার মধ্য দিয়ে তাকে সবচেয়ে ভাল অবস্থায় পৌঁছিয়ে দিতে পারেন। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির সকল অবস্থায় তাঁর ওপর ভরসা এবং তাঁর প্রতি পুরোপুরি নির্ভর করা উচিত।

৪৬. এ শব্দগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হযরত আইয়ূব (আ) রুগ্ন অবস্থায় নারাজ হয়ে কাউকে মারার কসম খেয়েছিলেন। (কথিত আছে, স্ত্রীকে মারার কসম খেয়েছিলেন।) আর এ কসম খাওয়ার সময় তিনি একথাও বলেছিলেন যে, তোমাকে এতো ঘা দোর্‌রা মারবো। আল্লাহ যখন তাঁকে সুস্থতা দান করলেন এবং যে রোগগ্রস্ত অবস্থায় ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি এ কসম খেয়েছিলেন সে ক্রোধ স্তিমিত হয়ে গেলো তখন তিনি একথা মনে করে অস্থির হয়ে পড়লেন যে, কসম পুরা করতে গেলে অযথা একজন নিরপরাধকে মারতে হয় এবং কসম ভেঙে ফেললেও গোনাহগার হতে হয়। এ

উভয় সংকট থেকে আল্লাহ তাঁকে উদ্ধার করলেন। আল্লাহ তাঁকে হুকুম দিলেন, একটি ঝাড়ু নাও, তাতে তুমি যে পরিমাণ কোড়া মারার কসম খেয়েছিলে সে পরিমাণ কাঠি থাকবে এবং সে ঝাড়ু দিয়ে কথিত অপরাধীকে একবার আঘাত করো এর ফলে তোমার কসমও পুরা হয়ে যাবে এবং সেও অযথা কষ্টভোগ করবে না।

কোন কোন ফকীহ এ রেওয়ায়াতটিকে একমাত্র হযরত আইয়ূবের জন্য নির্ধারিত মনে করেন। আবার কতিপয় ফকীহের মতে অন্য লোকেরাও এ সুবিধাদান থেকে লাভবান হতে পারে। প্রথম অভিমতটি উদ্ধৃত করেছেন ইবনে আসাকির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এবং আবু বকর জাস্‌সাস মুজাহিদ থেকে। ইমাম মালেকেরও অভিমত এটিই। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেঈ দ্বিতীয় অভিমতটি অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেন, কোন ব্যক্তি যদি তার খাদেমকে দশ ঘা কোড়া মারার কসম খেয়ে বসে এবং পরে দশটি কোড়া মিলিয়ে তাকে এমনভাবে কেবলমাত্র একটি আঘাত করে যার ফলে কোড়াগুলোর প্রত্যেকটির কিছু অংশ তার গায়ে ছুঁয়ে যায় তাহলে তার কসম পুরো হয়ে যাবে।

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশী রোগগ্রস্ত বা দুর্বল হবার কারণে যে যিনাকারী একশো দোররার আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা রাখতো না তার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি প্রয়োগ করার ব্যাপারে এ আয়াতে বিবৃত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। আল্লামা আবু বকর জাস্‌সাস হযরত সাঈদ ইবনে সা'দ ইবনে উবাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বনী সা'য়েদে এক ব্যক্তি যিনা করে। সে এমন রুগ্ন ছিল যে, তাকে অস্থি-চর্মসার বলা যেতো। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুম দিলেন :

خذوا عثقالا فيه مأة شمراخ فاضربوه بها ضربة واحدة

"খেজুরের একটি ডাল নাও, যার একশোটি শাখা রয়েছে এবং তা দিয়ে একবার এ ব্যক্তিকে আঘাত করো।" (আহকামুল কুরআন)

মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, তাবারানী, আবদুর রাজ্জাক ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থসমূহেও এর সমর্থক কতিপয় হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। সেগুলোর মাধ্যমে একথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগী ও দুর্বলের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিলেন। তবে ফকীহগণ এ ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করেছেন যে, প্রত্যেকটি শাখা বা পাতার কিছু না কিছু অংশ অপরাধীর গায়ে অবশ্যই লাগা উচিত এবং একটি আঘাতই যথেষ্ট হলেও অপরাধীকে তা যেন কোন না কোন পর্যায়ে আহত করে। অর্থাৎ কেবল স্পর্শ করা যথেষ্ট নয় বরং আঘাত অবশ্যই করতে হবে।

এখানে এ প্রশ্নও দেখা দেয় যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম খেয়ে বসে এবং পরে জানা যায় যে, সে বিষয়টি অসংগত, তাহলে তার কি করা উচিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, এ অবস্থায় মানুষের পক্ষে যা ভালো, তাই করা উচিত এবং এটিই তার কাফ্‌ফারা। অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, এ অসংগত কাজের পরিবর্তে মানুষের ভাল কাজ করা এবং নিজের

কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দেয়া উচিত। এ আয়াতটি এ দ্বিতীয় হাদীসটিকে সমর্থন করে। কারণ একটি অসংগত কাজ না করাই যদি কসমের কাফ্ফারা হতো তাহলে আল্লাহ হযরত আইয়ূবকে একথা বলতেন না যে, তুমি একটি ঝাড়ু দিয়ে আঘাত করে নিজের কসম পুরা করে নাও। বরং বলতেন, তুমি এমন অসংগত কাজ করো না এবং এটা না করাই তোমার কসমের কাফ্ফারা। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নূর, ২০ টীকা)

এ আয়াত থেকে একথাও জানা যায় যে, কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম খেলে সংগে সংগেই তা পুরা করা অপরিহার্য হয় না। হযরত আইয়ূব রোগগ্রস্ত অবস্থায় কসম খেয়েছিলেন এবং তা পূর্ণ করেন পুরোপুরি সুস্থ হবার পর এবং সুস্থ হবার পরও তাও সংগে সংগেই পুরা করেননি।

কেউ কেউ এ আয়াতকে শরয়ী বাহানাবাজীর সপক্ষে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। সন্দেহ নেই, হযরত আইয়ূবকে যা করতে বলা হয়েছিল তা একটি বাহানা ও ফন্দিই ছিল। কিন্তু তা কোন ফরয থেকে বাঁচার জন্য করতে বলা হয়নি বরং বলা হয়েছিল একটি খারাপ কাজ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। কাজেই শরীয়াতে একমাত্র এমন বাহানা ও ফন্দি জায়েয যা মানুষের নিজের সত্তা থেকে অথবা অন্য কোন ব্যক্তি থেকে জুলুম, গোনাহ ও অসৎ প্রবণতা দূর করার জন্য করা হয়ে থাকে। নয়তো হারামকে হালাল বা ফরয বাতিল অথবা সৎকাজ থেকে রেহাই পাবার জন্য বাহানাবাজি করা বা ফন্দি আঁটা গোনাহর উপরি গোনাহ। বরং এর সূত্র গিয়ে কুফরীর সাথে মেলে। কারণ এসব অপবিত্র উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি বাহানা করে সে যেন অন্য কথায় আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চায়। যেমন যে ব্যক্তি যাকাত দেয়া থেকে রেহাই পাবার জন্য বছর শেষ হবার আগে নিজের সম্পদ অন্য কারো কাছে স্থানান্তর করে সে নিছক একটি ফরয থেকেই পলায়ন করে না বরং সে একথাও মনে করে যে, আল্লাহ তার এ প্রকাশ্য কাজ দেখে প্রতারিত হবে এবং তাকে ফরযের আওতাভুক্ত মনে করবে না। এ ধরনের 'হীলা' বা বাহানার বিষয়সমূহ যেসব ফকীহ তাদের কিতাবের অন্তরভুক্ত করেছেন, শরীয়াতের বিধান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করার জন্য এসব বাহানাবাজীর আশ্রয় নিতে উদ্বুদ্ধ করা তাঁদের উদ্দেশ্য নয় বরং তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদি কোন ব্যক্তি গোনাহকে আইনের রূপ দান করে গা বাঁচিয়ে বের হয়ে আসে, তাহলে কাযী বা শাসক তাকে পাকড়াও করতে পারেন না। তার শাস্তির ভার আল্লাহর হাতে সোপর্দ হয়ে যায়।

৪৭. এ প্রেক্ষাপটে একথা বলার জন্য হযরত আইয়ূবের কথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নেক বান্দারা যখন বিপদের ও কঠিন সংকটের মুখোমুখি হন তখন তাঁরা তাঁদের রবের কাছে অভিযোগ করেন না বরং ধৈর্য সহকারে তাঁর চাপিয়ে দেয়া পরীক্ষাকে মেনে নেন এবং তাতে উত্তীর্ণ হবার জন্য তাঁর কাছেই সাহায্য চান। কিছুকাল আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার পর যদি বিপদ অপসারিত না হয় তাহলে তাঁর থেকে নিরাশ হয়ে অন্যদের দরবারে হাত পাতবেন, এমন পদ্ধতি তাঁরা অবলম্বন করেন না। বরং তারা ভাল করেই জানেন, যা কিছু পাওয়ার আল্লাহর কাছ থেকেই পাওয়া যাবে। তাই বিপদের ধারা যতই দীর্ঘ হোক না কেন তারা তাঁরই করুণাপ্রার্থী হন। এ জন্য তারা এমন দান ও করুণা লাভে ধন্য হন যার দৃষ্টান্ত হযরত আইয়ূবের জীবনে পাওয়া যায়। এমনকি যদি তারা কখনো

অস্থির হয়ে কোন প্রকার নৈতিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে পড়েন তাহলেও আল্লাহ তাদেরকে দুষ্কৃতিমুক্ত করার জন্য একটি পথ বের করে দেন যেমন হযরত আইয়ূবের জন্য বের করে দিয়েছিলেন।

৪৮. মূলে বলা হয়েছে ঃ أُولِى الْأَيْدِىْ وَالْأَبْصَارِ (হস্তধারী ও দৃষ্টিধারীগণ) ইতিপূর্বে যেমন আমরা বলেছি, হাত মানে শক্তি ও সামর্থ। আর এ নবীগণকে শক্তি ও সামর্থের অধিকারী বলার অর্থ হচ্ছে, তাঁরা অত্যন্ত সক্রিয় ও কর্মশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁরা আল্লাহর আনুগত্যকারী ও গোনাহ থেকে সংরক্ষিত থাকার প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী ছিলেন। দুনিয়ায় আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য তাঁরা বিরাট প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। দৃষ্টি অর্থ চোখের দৃষ্টি নয় বরং অন্তরদৃষ্টি। তাঁরা সত্যদর্শী ও সূক্ষ্ম সত্যদ্রষ্টা ছিলেন। দুনিয়ায় তাঁরা চোখ বন্ধ করে চলতেন না। বরং চোখ খুলে জ্ঞান ও তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের পূর্ণ আলোকে সঠিক সোজা পথ দেখে চলতেন। এ শব্দগুলোর মধ্যে এ দিকে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত করা হয়েছে যে, দুষ্কৃতিকারী ও পথভ্রষ্টরা আসলে হাত ও চোখ উভয়টি থেকে বঞ্চিত। আসলে যারা আল্লাহর পথে কাজ করে তারাই হস্তধারী এবং যারা সত্যের আলো ও মিথ্যার অন্ধকারের মধ্যে পার্থক্য করে তারাই দৃষ্টির অধিকারী।

৪৯. অর্থাৎ তাঁদের যাবতীয় সাফল্যের মূল কারণ ছিল এই যে, তাঁদের মধ্যে বৈষয়িক স্বার্থলাভের আকাংখা ও বৈষয়িক স্বার্থপূজার সামান্যতম গন্ধও ছিল না। তাঁদের সমস্ত চিন্তা ও প্রচেষ্টা ছিল আখেরাতের জন্য। তাঁরা নিজেরাও আখেরাতের কথা স্মরণ করতেন এবং অন্যদেরকেও স্মরণ করিয়ে দিতেন। তাই আল্লাহ তাঁদেরকে দু'টি মর্যাদা দান করেছেন। বৈষয়িক স্বার্থ চিন্তায় ব্যাপৃত লোকদের ভাগ্যে কখনো এটা ঘটেনি। এ প্রসংগে এ সূক্ষ্ম বিষয়টিও দৃষ্টি সমক্ষে থাকা উচিত যে, এখানে আল্লাহ আখেরাতের জন্য কেবলমাত্র "আদ্‌দার" (সেই ঘর বা আসল ঘর) শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর মাধ্যমে এখানে এ সত্যটি বুঝানোই উদ্দেশ্য যে, এ দুনিয়া আদতে মানুষের ঘর নয় বরং এটি নিছক একটি অতিক্রম করার জায়গা এবং একটি মুসাফিরখানা মাত্র। এখান থেকে মানুষকে অবশ্যই বিদায় নিতে হবে। আসল ঘর হচ্ছে সেই আখেরাতের ঘর। যে ব্যক্তি তাকে সুসজ্জিত করার চিন্তা করে সে-ই দূরদৃষ্টির অধিকারী এবং আল্লাহর কাছে তাকে অবশ্যই পছন্দনীয় মানুষ হওয়া উচিত। অন্যদিকে যে ব্যক্তি এ মুসাফিরখানায় নিজের সামান্য কয়েক দিনের অবস্থানস্থলকে সুসজ্জিত করার জন্য এমনসব কাজ করে যার ফলে আখেরাতের আসল ঘর তার জন্য বিরাণ হয়ে যায়, তার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং স্বাভাবিকভাবেই এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ পছন্দ করতে পারেন না।

৫০. কুরআন মজীদে মাত্র দু' জায়গায় তাঁর কথা বলা হয়েছে। সূরা আল আন'আমের ৮৬ আয়াতে এবং এ জায়গায়। উভয় জায়গায় কোন বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। বরং কেবলমাত্র নবীদের কথা বর্ণনা প্রসংগে তাঁর নাম নেয়া হয়েছে। তিনি ছিলেন বনী ইসরাঈলের নেতৃস্থানীয় নবীদের একজন। জর্দান নদীর উপকূলে আবেল মেহুলা (Abel Meholah) এর অধিবাসী ছিলেন। ইহুদী ও খৃষ্টানরা তাঁকে ইলীশার (Elisha) নামে স্মরণ করে। হযরত ইলিয়াস আলাইহিস সালাম যে সময় সিনাই উপদ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন কয়েকটি বিশেষ কাজে তাঁকে সিরিয়ায় ও ফিলিস্তিনে ফিরে যাওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছিল। এর মধ্যে একটি কাজ ছিল হযরত আল ইয়াসা'কে তার স্থলাভিষিক্ত

هٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٩﴾ جَنَّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ
الْأَبْوَٰبُ ﴿٥٠﴾ مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَٰكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾
وَعِندَهُمْ قَٰصِرَٰتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾ هٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾
إِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ ﴿٥٤﴾

এছিল একটি স্মরণ। (এখন শোনো) মুত্তাকীদের জন্য নিশ্চিতভাবেই রয়েছে উত্তম আবাস—চিরন্তন জান্নাত, যার দরোজাগুলো খোলা থাকবে তাদের জন্য।[৫২] সেখানে তারা বসে থাকবে হেলান দিয়ে, বহুবিধ ফলমূল ও পানীয়ের ফরমাশ করতে থাকবে এবং তাদের কাছে থাকবে লজ্জাবতী কম বয়সী স্ত্রীরা।[৫৩] এসব এমন জিনিস যেগুলো হিসেবের দিন দেবার জন্য তোমাদের কাছে অংগীকার করা হচ্ছে। এ হচ্ছে আমার রিযিক, যা কখনো শেষ হবে না।

করার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। এ হুকুম অনুযায়ী হযরত ইলিয়াস তাঁর জনবসতিতে গিয়ে পৌঁছুলেন। তিনি দেখলেন, বারো জোড়া গরু সামনে নিয়ে হযরত আল ইয়াসা' জমিতে চাষ দিচ্ছেন এবং তিনি নিজে বারোতম জোড়ার সাথে আছেন। হযরত ইলিয়াস তাঁর পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁর ওপর নিজের চাদর নিক্ষেপ করলেন এবং তিনি তৎক্ষণাত ক্ষেতখামার ছেড়ে দিয়ে তাঁর সাথে চলে এলেন। (রাজাবলি ১৯ ঃ ১৫-২১) প্রায় দশ বারো বছর তিনি তাঁর প্রশিক্ষণের অধীনে থাকলেন। তারপর আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নেবার পর তিনি হযরত ইলিয়াসের স্থলে নিযুক্তি লাভ করলেন। (২-রাজাবলি ঃ ২) বাইবেলের ২-রাজাবলি পুস্তকের ২ থেকে ১৩ অধ্যায় পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তা থেকে জানা যায়, উত্তর ফিলিস্তিনের ইসরাঈলী সালতানাত যখন শিরক ও মূর্তি পূজা এবং নৈতিক অপবিত্রতায় ডুবে যেতে থাকলো তখন শেষ পর্যন্ত তিনি নিমশির পৌত্র যিহোশাফটের পুত্র যেহুকে রাজ পরিবারের বিরুদ্ধে দাঁড় করালেন। এ রাজ পরিবারের মাধ্যমেই ইসরাঈলে এসব দুষ্কৃতি বিস্তার লাভ করেছিল। যেহু কেবল বা'আলপূজাই বন্ধ করলো না বরং এ দুষ্কৃতকারী পরিবারের প্রত্যেককে হত্যা করলো, একটি শিশুকেও জীবিত ছাড়লো না। কিন্তু ইসরাঈলের শিরায় উপশিরায় যে দুষ্কৃতি অনুপ্রবেশ করেছিল এ সংস্কার বিপ্লব তাকে পুরোপুরি নির্মূল করতে পারলো না। হযরত আল ইয়াসা'আর মৃত্যুর পর তা ঝড়ের বেগে অগ্রসর হলো। এমনকি এরপর সামোরিয়দের ওপর আসিরীয়রা একের পর এক হামলা শুরু করে দিল। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, বনী ইসরাঈল, ৭ এবং সাফ্‌ফাত, ৭০-৭১ টীকা)

৫১. হযরত যুল কিফ্‌ল-এর উল্লেখও কুরআনে দু' জায়গায়ই এসেছে। সূরা আল আম্বিয়ায় এবং এখানে। এ সম্পর্কে আমার অনুসন্ধানলব্ধ আলোচনা আমি সূরা আল আম্বিয়াতেই করে এসেছি। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আম্বিয়া, ৮১ টীকা)

هٰذَا ؕ وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ
الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾ هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾ وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖۤ اَزْوَاجٌ ﴿٥٨﴾
هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ؕ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿٥٩﴾ قَالُوْا
بَلْ اَنْتُمْ ۖ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ؕ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾ قَالُوْا
رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِى النَّارِ ﴿٦١﴾ وَقَالُوْا مَا لَنَا
لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ﴿٦٢﴾ اَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا اَمْ
زَاغَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ ﴿٦٣﴾ اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾

এতো হচ্ছে মুত্তাকীদের পরিণাম আর বিদ্রোহীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম আবাস জাহান্নাম, যেখানে তারা দগ্ধীভূত হবে, সেটি বড়ই খারাপ আবাস। এ হচ্ছে তাদের জন্য, কাজেই তারা স্বাদ আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানির, পুঁজের[৫৪] ও এ ধরনের অন্যান্য তিক্ততার। (নিজেদের অনুসারীদের জাহান্নামের দিকে আসতে দেখে তারা পরস্পর বলাবলি করবে ঃ) "এ একটি বাহিনী তোমাদের কাছে ঢুকে চলে আসছে, এদের জন্য কোন স্বাগত সম্ভাষণ নেই, এরা আগুনে ঝলসিত হবে।" তারা তাদেরকে জবাব দেবে, "না, বরং তোমরাই ঝলসিত হচ্ছো, কোন অভিনন্দন নেই তোমাদের জন্য, তোমরাই তো আমাদের পূর্বে এ পরিণাম এনেছো, কেমন নিকৃষ্ট এ আবাস।" তারপর তারা বলবে, "হে আমাদের রব! যে ব্যক্তি আমাদের এ পরিণতিতে পৌঁছুবার ব্যবস্থা করেছে তাকে দোজখে দ্বিগুণ শাস্তি দাও।" আর তারা পরস্পর বলাবলি করবে, কি ব্যাপার, আমরা তাদেরকে কোথাও দেখছি না, যাদেরকে আমরা দুনিয়ায় খারাপ মনে করতাম?[৫৫] আমরা কি অযথা তাদেরকে বিদ্রূপের পাত্র বানিয়ে নিয়েছিলাম অথবা তারা কোথাও দৃষ্টি অগোচরে আছে?" অবশ্যই একথা সত্য, দোজখবাসীদের মধ্যে এসব বিবাদ হবে।

৫২. মূলে বলা হয়েছে : مُفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, এসব জান্নাতে তারা দ্বিধাহীনভাবে ও নিশ্চিন্তে ঘোরাফেরা করবে এবং কোথাও তাদের কোনপ্রকার বাধার সম্মুখীন হতে হবে না। দুই, জান্নাতের দরোজা খোলার জন্য তাদের কোন প্রচেষ্টা চালাবার দরকার হবে না বরং শুধুমাত্র তাদের মনে ইচ্ছা জাগার সাথে

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ رَبُّ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾ أَنتُمْ عَنْهُ
مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾ إِن
يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾

৫ রুকূ'

হে নবী![৫৬] এদেরকে বলো, "আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র।[৫৭] আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত মাবুদ নেই। তিনি একক, সবার ওপর আধিপত্যশীল, আকাশ ও পৃথিবীর মালিক এবং এ দু'য়ের মধ্যে অবস্থানকারী সমস্ত জিনিসের মালিক, পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।" এদেরকে বলো, "এটি একটি মহাসংবাদ, যা শুনে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও।"[৫৮]

(এদেরকে বলো,) "উর্ধলোকে যখন বিতর্ক হচ্ছিল সে সময়ের কোন জ্ঞান আমার ছিল না। আমাকে তো অহীর মাধ্যমে একথাগুলো এ জন্য জানিয়ে দেয়া হয় যে আমি সুস্পষ্ট সতর্ককারী।"

সাথে সাথেই তা খুলে যাবে। তিন, জান্নাতের ব্যবস্থাপনায় যেসব ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত থাকবে তারা জান্নাতের অধিবাসীদেরকে দেখতেই তাদের জন্য দরোজা খুলে দেবে। এ তৃতীয় বিষয়বস্তুটি কুরআনের এক জায়গায় বেশী স্পষ্টভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

"এমনকি যখন তারা সেখানে পৌঁছুবে এবং তার দরোজা আগে থেকেই খোলা থাকবে তখন জান্নাতের ব্যবস্থাপকরা তাদেরকে বলবে, 'সালামুন আলাইকুম, শুভ আগমন', চিরকালের জন্য এর মধ্যে প্রবেশ করুন।" (আয্ যুমার, ৭৩)

৫৩. সমবয়সী স্ত্রী অর্থ এও হতে পারে যে, তারা পরস্পর সমান বয়সের হবে আবার এও হতে পারে যে, তারা নিজেদের স্বামীদের সমান বয়সের হবে।

৫৪. মূলে غَسَّاق শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আভিধানিকরা এর কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। এর একটি অর্থ হচ্ছে, শরীর থেকে বের হয়ে আসা রক্ত, পূঁজ ইত্যাদি জাতীয় নোংরা তরল পদার্থ এবং চোখের পানিও এর অন্তরভুক্ত। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, অত্যন্ত ও চরম

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ
أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّآ إِبْلِيسَ ۖ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٧٤﴾

যখন তোমার রব ফেরেশ্‌তাদেরকে বললো,[৫৯] "আমি মাটি দিয়ে একটি মানুষ তৈরি করবো।[৬০] তারপর যখন আমি তাকে পুরোপুরি তৈরি করে ফেলবো এবং তার মধ্যে নিজের প্রাণ ফুঁকে দেবো[৬১] তখন তোমরা তার সামনে সিজদানত হয়ে যেয়ো।"[৬২] এ হুকুম অনুযায়ী ফেরেশ্‌তারা সবাই সিজদানত হয়ে গেলো, কিন্তু ইবলিস নিজে শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করলো এবং সে কাফেরদের অন্তরভুক্ত হয়ে গেলো।[৬৩]

ঠাণ্ডা জিনিস। তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, চরম দুর্গন্ধযুক্ত পচা জিনিস। কিন্তু প্রথম অর্থেই এ শব্দটির সাধারণ ব্যবহার হয়, যদিও বাকি দু'টি অর্থও আভিধানিক দিক দিয়ে নির্ভুল।

৫৫. এখানে এমন মু'মিনদের কথা বলা হয়েছে, যাদেরকে এ কাফেররা দুনিয়ায় খারাপ ভাবতো। এর অর্থ হচ্ছে, তারা অবাক হয়ে চারদিকে দেখতে থাকবে। ভাবতে থাকবে, এ জাহান্নামে তো আমরা ও আমাদের নেতারা সবাই আছি কিন্তু দুনিয়ায় আমরা যাদের দুর্নাম গাইতাম এবং আল্লাহ, রসূল ও আখেরাতের কথা বলার কারণে আমাদের মজলিসে যাদেরকে বিদ্রূপ করা হতো তাদের নাম নিশানাও তো এখানে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

৫৬. শুরুতে যে বিষয়বস্তুর ওপর ভাষণ শুরু হয়েছিল এখন বক্তব্য আবার সেদিকে মোড় নিচ্ছে। এ অংশটি পড়ার সময় প্রথম রুকূ'র সাথে তুলনামূলক অধ্যয়নও করতে থাকুন। এভাবে বক্তব্য পুরোপুরি অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

৫৭. ৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছিল, এদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারীর উত্থান ঘটায় এরা বড়ই বিস্ময় প্রকাশ করছে। এখানে বলা হচ্ছে, এদেরকে বলো, আমার কাজ হচ্ছে কেবলমাত্র তোমাদেরকে সতর্ক করে দেয়া। অর্থাৎ আমি কোন ফৌজদার বা সেনাধ্যক্ষ নই যে, জবরদস্তি তোমাদেরকে ভুল পথ থেকে সরিয়ে সঠিক পথে টেনে আনবো। আমি বুঝাবার ফলে যদি তোমরা না বুঝো তাহলে নিজেদেরই ক্ষতি করবে। বেখবর থাকাটাই যদি তোমাদের কাছে পছন্দনীয় হয়ে থাকে তাহলে নিজেদের গাফিলতির মধ্যে ডুবে থাকো। এভাবে নিজেদের পরিণাম তোমরা নিজেরাই ভোগ করবে।

৫৮. ৫ নম্বর আয়াতে কাফেরদের যে কথা বলা হয়েছে এটি তার জবাব। সেখানে বলা হয়েছে : "এ ব্যক্তি কি সমস্ত খোদার পরিবর্তে একজন খোদা বানিয়েছে? এ তো বড়ই

অদ্ভুত কথা।" এর জবাবে বলা হচ্ছে, তোমরা যতই নাক সিটকাওনা কেন, অবশ্যই এটি একটি সত্য, এর সংবাদ আমি তোমাদের দিচ্ছি এবং তোমাদের নাক সিটকাবার ফলে এ সত্য বদলে যেতে পারে না।

এ জবাবে কেবলমাত্র সত্যের বর্ণনাই নেই বরং তার সত্য হবার প্রমাণও এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। মুশরিকরা বলতো, অনেক উপাস্যের মধ্যে আল্লাহও একজন। তোমরা সমস্ত উপাস্যদেরকে খতম করে দিয়ে একজনকে মাত্র উপাস্য করে নিলে কেমন করে? এর জবাবে বলা হয়েছে, একমাত্র আল্লাহই প্রকৃত উপাস্য ও মাবুদ। কারণ তিনি সবার ওপর আধিপত্য বিস্তারকারী, আকাশ ও পৃথিবীর মালিক এবং বিশ্ব-জাহানের সমস্ত জিনিস তাঁর মালিকানাধীন। তাঁকে বাদ দিয়ে এ বিশ্ব-জাহানে যেসব সত্তাকে তোমরা মাবুদ বানিয়ে রেখেছো তাদের মধ্যে কোন একটি সত্তাও এমন নেই, যে তাঁর অধীন ও গোলাম নয়। এসব কর্তৃত্বাধীন ও গোলাম সত্তা সেই সর্বময় কর্তৃত্বকারী ও প্রাধান্যবিস্তারকারী সত্তার কর্তৃত্বে শরীক হতে পারে কেমন করে? কোন্ অধিকারে এদেরকে মাবুদ ও উপাস্য গণ্য করা যেতে পারে?

৫৯. ওপরের আয়াতে যে বিরোধের দিকে ইংগিত করা হয়েছে এ হচ্ছে তার বিস্তারিত বিবরণ। এ বিরোধ বলতে আল্লাহর সাথে শয়তানের বিরোধ বুঝানো হয়েছে যেমন সামনের আলোচনা থেকে প্রকাশ হচ্ছে। এ প্রসংগে একথা মনে রাখতে হবে যে, "উর্ধজগত" বলতে ফেরেশ্‌তাদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং আল্লাহর সাথে শয়তানের কথাবার্তা সামনাসামনি হয়নি বরং কোন মধ্যবর্তী ফেরেশ্‌তার মাধ্যমেই হয়েছে। কাজেই কারো এ ভুল ধারণা হওয়া উচিত নয় যে, আল্লাহও উর্ধজগতের অন্তরভুক্ত ছিলেন। এখানে যে কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে, তা ইতিপূর্বে নিম্নোক্ত স্থানসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, ৩৫-৫৩; আল আ'রাফ, ১০-১৫; আল হিজর, ১৭-১৯; বনী ইসরাঈল, ৭১-৮২; আল কাহ্‌ফ, ৪৬-৪৮ এবং ত্বা-হা, ৯২-১০৬ টীকাসমূহ।

৬০. মূল শব্দ হচ্ছে بشر (বাশারা)। এর আভিধানিক অর্থ "স্থূলদেহ", যার বাইরের অংশ কোন জিনিসে আবৃত নয়। মানুষ সৃষ্টির পর এ শব্দটি বরাবর মানুষের জন্যই ব্যবহৃত হতে থেকেছে। কিন্তু মানুষ সৃষ্টির আগে তার জন্যে 'বাশার' শব্দ ব্যবহার করা এবং তাকে মাটি দিয়ে তৈরি করার পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে এই যে, "আমি মাটির একটি পুতুল বানাতে চাই। তার ডানা ও পালক থাকবে না। অর্থাৎ তার ত্বক অন্যান্য প্রাণীর মতো উল, পশম, লোম ও পালকে ঢাকা থাকবে না।"

৬১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল হিজর, ১৭-১৯ এবং আস সিজদাহ, ১৬ টীকা।

৬২. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, ৪৫ এবং আল আ'রাফ, ১০ টীকা।

৬৩. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, ৪৭ এবং আল কাহ্‌ফ, ৪৮ টীকা।

قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ ؕ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ
كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ﴿٧٥﴾ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ؕ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ
طِيْنٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿٧٧﴾ وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىْٓ اِلٰى يَوْمِ
الدِّيْنِ ﴿٧٨﴾ قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِىْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿٧٩﴾ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ
الْمُنْظَرِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ﴿٨١﴾

রব বললেন, "হে ইবলিস! আমি আমার দু'হাত দিয়ে যাকে তৈরি করেছি তাকে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছে?[৬৪] তুমি কি বড়াই করছো, না তুমি কিছু উচ্চ মর্যাদার অধিকারী?" সে জবাব দিল, "আমি তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো আগুন থেকে এবং তাকে মাটি থেকে।" বললেন, "ঠিক আছে, তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও,[৬৫] তুমি বিতাড়িত[৬৬] এবং প্রতিদান দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি আমার লানত।"[৬৭] সে বললো, "হে আমার রব! একথাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে এদেরকে যখন পুনরায় উঠানো হবে সে সময় পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।" বললেন, ঠিক আছে, তোমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হলো যার সময় আমি জানি।"

৬৪. মানুষ সৃষ্টির মর্যাদা প্রমাণ করার জন্য এ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। বাদশাহ তাঁর চাকর বাকরদের দিয়ে কোন কাজ করালে তাতে সেটি যে একটি মামুলি ও সাধারণ পর্যায়ের কাজ ছিল তা প্রমাণ হয়ে যায়। অন্যদিকে বাদশাহ যদি নিজেই এবং নিজ হাতে কোন কাজ করেন তাহলে তা প্রমাণ করে যে, সেটি একটি অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠ কাজ ছিল। কাজেই আল্লাহর উক্তির অর্থ হচ্ছে এই যে, যাকে আমি নিজে কোন প্রকার মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি তৈরি করেছি তার সামনে নত হতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছে?

"দু'হাত" শব্দের মাধ্যমে সম্ভবত এ দিকে ইংগিত করাই উদ্দেশ্য যে, এ নতুন সৃষ্টিটির মধ্যে আল্লাহর সৃষ্টি কুশলতার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক পাওয়া যায়। এক, তাকে প্রাণীর দেহাবয়ব দান করা হয়েছে। এর ফলে সে প্রাণীকূলের একটি জাতিতে পরিণত হয়েছে। দুই, তার মধ্যে এমন প্রাণ সঞ্চার করে দেয়া হয়েছে যার ফলে সে তার নিজের যাবতীয় গুণাবলীর ক্ষেত্রে পৃথিবীর সৃষ্টজীবের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করেছে।

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾ قَالَ
فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾

সে বললো, "তোমার ইজ্জতের কসম, আমি এদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করবোই, তবে একমাত্র যাদেরকে তুমি একনিষ্ঠ করে নিয়েছো তাদেরকে ছাড়া।"[৬৮] বললেন, "তাহলে এটিই সত্য এবং আমি সত্যই বলে থাকি যে, আমি তোমাকে[৬৯] এবং এসব লোকদের মধ্য থেকে যারা তোমার আনুগত্য করবে তাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম ভরে দেবো।"[৭০]

(হে নবী!) এদেরকে বলো, আমি এ প্রচার কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইছি না[৭১] এবং আমি বানোয়াট লোকদের একজনও নই।[৭২] এ তো একটি উপদেশ সমস্ত পৃথিবীবাসীর জন্য এবং সামান্য সময় অতিবাহিত হবার পরই এ সম্পর্কে তোমরা নিজেরাই জানতে পারবে।[৭৩]

৬৫. অর্থাৎ সেখান থেকে যেখানে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, যেখানে আদমের সামনে ফেরেশ্‌তাদের সিজদা করার হুকুম দেয়া হয়েছিল এবং যেখানে ইবলিস মহান আল্লাহর নাফরমানি করেছিল।

৬৬. মূলে "রাজীম" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে "নিক্ষিপ্ত" বা "যাকে মারা হয়েছে।" অন্যদিকে প্রচলিত বাগধারা অনুযায়ী এ শব্দটি এমন ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে যাকে মর্যাদার আসন থেকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে এবং লাঞ্ছিত ও হেয় করে রাখা হয়েছে। সূরা আ'রাফে এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে বলা হয়েছে ঃ

فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ

"কাজেই তুই বের হয়ে যা, তুই লাঞ্ছিত সত্তাদের একজন।"

৬৭. এর অর্থ এ নয় যে, শেষ বিচারের দিনের পরে তার ওপর আর লানত পড়বে না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তো সে এ নাফরমানির কারণে অভিসম্পাত পেতে থাকবে এবং শেষ বিচারের পরে সে আদমের সৃষ্টি থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যত অপকর্ম করেছে তার শাস্তি ভোগ করবে।

৬৮. এর অর্থ এ নয় যে, "আমি তোমার নির্বাচিত বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো না।" বরং এর অর্থ হচ্ছে, "তোমার নির্বাচিত বান্দাদের ওপর আমার জারিজুরি খাটবে না।"

৬৯. "তোমাকে দিয়ে" শব্দের মাধ্যমে কেবলমাত্র ব্যক্তি ইবলিসকেই সম্বোধন করা হয়নি বরং সমগ্র জিন জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ ইবলিস ও তার সমগ্র শয়তান দল যারা তার সাথে মিলে মানুষ জাতিকে গোমরাহ করার কাজে লিপ্ত থাকবে।

৭০. এ পুরো কাহিনীটি শুনানো হয় কুরাইশ সরদারদের একটি কথার জবাবে। তারা বলে ঃ

أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا

"আমাদের মধ্যে কি এ একজনই লোক রয়ে গিয়েছিল যার ওপর যিক্‌র নাযিল করা হয়েছে?"

৯ ও ১০ নম্বর আয়াতে যা বলা হয়েছে তাই ছিল এর জবাব। সেখানে বলা হয়েছে, "তোমরা কি আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডারের মালিক, তোমরা কি আকাশ ও পৃথিবীর বাদশাহ এবং কাকে আল্লাহর নবী করা হবে ও কাকে করা হবে না এ ফায়সালা করা কি তোমাদের কাজ?" দ্বিতীয় জবাব এবং এর মধ্যে কুরাইশ সরদারদেরকে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোকাবিলায় তোমাদের হিংসা ও শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার, আদম আলাইহিস সালামের মোকাবিলায় ইবলিসের হিংসা ও অহংকারের সাথে মিলে যায়। ইবলিসও আল্লাহ যাকে চান তাকে খলিফা বা প্রতিনিধি করবেন তাঁর এ অধিকার মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। সে আদমের সামনে মাথা নত করার হুকুম মানেনি এবং তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করার হুকুম মানছো না। তার সাথে তোমাদের এ সামঞ্জস্য কেবলমাত্র এখানেই শেষ হয়ে যাবে না বরং তোমাদের পরিণামও আবার তাই হবে যা তার জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে অর্থাৎ দুনিয়ায় আল্লাহর লানত এবং আখেরাতে জাহান্নামের আগুন।

এ সংগে এ কাহিনীর আওতায় আরো দু'টি কথাও বুঝানো হয়েছে। এক, এ দুনিয়ায় যে মানুষই আল্লাহর নাফরমানি করছে সে আসলে তার সে চিরন্তন শত্রুর ফাঁদে আটকে যাচ্ছে, যে সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই মানব জাতিকে ফুসলিয়ে কুপথে পরিচালনা করার স্থির সিদ্ধান্ত করে রেখেছে। দুই, যে ব্যক্তি অহংকারের কারণে আল্লাহর নাফরমানি করে এবং তারপর নিজের এ নাফরমানি করার নীতির ওপর জিদ ধরে থাকে, আল্লাহর দৃষ্টিতে সে চরম ঘৃণিত। আল্লাহর কাছে এ ধরনের মানুষের কোন ক্ষমা নেই।

৭১. অর্থাৎ আমি একজন নিস্বার্থ ব্যক্তি। নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থে আমি এসব কথা প্রচার করছি না।

৭২. অর্থাৎ আমি তাদের অন্তরভুক্ত নই যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মিথ্যা দাবী নিয়ে ওঠে এবং তারপর প্রকৃতপক্ষে তারা যা নয় তাই হয়ে বসে। একথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ দিয়ে শুধুমাত্র মক্কার কাফেরদেরকে জানিয়ে দেবার জন্য বলা হয়নি বরং কাফেরদের মাঝে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের যে চল্লিশটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল এর পেছনে তার সবটাই সাক্ষী হিসেবে বিদ্যমান

রয়েছে। মক্কার আবালবৃদ্ধবনিতা একথা জানতো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন বানোয়াট নবী নন। সমগ্র জাতির মধ্যে কোন এক ব্যক্তিও কখনো তাঁর মুখ থেকে এমন কোন কথা শোনেনি যা থেকে এ সন্দেহ করার অবকাশ হয় যে, তিনি কিছু একটা হতে চান এবং তিনি নিজেকে গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা করছেন।

৭৩. অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা কয়েক বছরের মধ্যে স্বচক্ষে দেখে নেবে আমি যা বলছি তা সঠিক প্রমাণিত হবেই। আর যারা মরে যাবে তারা মৃত্যুর দুয়ার অতিক্রম করার পরপরই জানতে পারবে, আমি যাকিছু বলছি তা-ই প্রকৃত সত্য।

আয যুমার

৩৯

নামকরণ

আয়াত নম্বর ৭১ ও ৭৩ (وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا) এবং وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا (الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا) থেকে সূরাটির নাম গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ এটি সে সূরা যার মধ্যে 'যুমার' শব্দের উল্লেখ আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরা যে হাবশায় হিজরত করার পূর্বে নাযিল হয়েছিল, সে ব্যাপারে ১০ নম্বর আয়াত وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ থেকে স্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায়। কোন কোন রেওয়ায়াতে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত জাফর ইবনে আবী তালেব ও তার সংগী সাথীগণ হাবশায় হিজরতের সংকল্প করলে তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল (রূহুল মায়ানী, ২৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২২৬)।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

হাবশায় হিজরতের কিছু পূর্বে মক্কার পরিবেশ ছিল জুলুম-নির্যাতন এবং শত্রুতা ও বিরোধিতায় ভরা। ঠিক এ পরিবেশে এ গোটা সূরাটিকে একটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও মর্মস্পর্শী বক্তৃতারূপে পেশ করা হয়েছে। এটা একটা নসীহত। এতে মাঝে মধ্যে ঈমানদারদের সম্বোধন করা হলেও বেশীরভাগ কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের সম্বোধন করা হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। আর সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, মানুষ যেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করে এবং তার আল্লাহপ্রীতিকে অন্য কারো দাসত্ব ও আনুগত্য দ্বারা কলুষিত না করে। এ মৌলিক নীতিকে বারবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে উপস্থাপন করে অত্যন্ত জোরালো পন্থায় তাওহীদের সত্যতা এবং তা মেনে চলার উত্তম ফলাফল আর শিরকের ভ্রান্তি ও তা আঁকড়ে ধরে থাকার মন্দ ফলাফল অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া মানুষকে ভ্রান্ত আচরণ পরিত্যাগ করে আল্লাহর রহমতের দিকে ফিরে আসার জন্য আহবান জানানো হয়েছে। এ প্রসংগে ঈমানদারদেরকে পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, যদি আল্লাহর দাসত্বের জন্য একটি জায়গা সংকীর্ণ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তাঁর এ পৃথিবী অনেক প্রশস্ত। নিজের দীনকে রক্ষা করার জন্য অন্য কোথাও চলে যাও। আল্লাহ তোমাদের ধৈর্যের পুরস্কার দান করবেন। অন্যদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন একদিন না একদিন তোমাদেরকে এ পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে, এমন দুরাশা কাফেরদের মন থেকে দূর করে দাও এবং পরিষ্কারভাবে বলে দাও যে, আমার পথ রোধ করার জন্য তোমরা যা কিছু করতে চাও করো, আমি আমার কাজ চালিয়েই যেতে থাকবো।

আয়াত ৭৫ | সূরা আয-যুমার–মক্কী | রুকূ' ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝١ اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۝٢

এ কিতাব মহা পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।[১]

[হে মুহাম্মাদ (সা)] আমি তোমার কাছে হকসহ এ কিতাব নাযিল করেছি।[২] তাই তুমি একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহর ইবাদাত করো।[৩]

১. এটা এ সূরার সংক্ষিপ্ত ভূমিকা। এতে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের কথা নয় যা অস্বীকারকারীরা বলছে। বরং এটা আল্লাহ তা'আলার বাণী। তিনি নিজে এ বাণী নাযিল করেছেন। এর সাথে আল্লাহর দু'টি গুণ উল্লেখ করে শ্রোতাদেরকে দু'টি মহাসত্য সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে যাতে তারা এ বাণীকে মামুলি জিনিস মনে না করে, বরং এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে। বর্ণিত গুণের একটি হচ্ছে, যে আল্লাহ এ বাণী নাযিল করেছেন তিনি "আযীয" অর্থাৎ এমন মহা পরাক্রমশালী যে কোন শক্তিই তাঁর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তাবলী কার্যকরী হওয়া ঠেকাতে পারে না এবং তাঁর বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে এমন কোন শক্তিও নেই। আরেকটি গুণ হচ্ছে, তিনি 'হাকীম' অর্থাৎ এ কিতাবে তিনি যে হিদায়াত দিচ্ছেন তা আগাগোড়া বিজ্ঞোচিত। কেবল কোন অজ্ঞ ও মূর্খই তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আস সাজদা, টীকা, ১)

২. অর্থাৎ তার মধ্যে যা আছে তা ন্যায় ও সত্য, বাতিলের কোন সংমিশ্রণ তার মধ্যে নেই।

৩. এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত। এর মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এ আয়াতটি পড়ার সময় অমনোযোগী হওয়া উচিত নয়। বরং এর অর্থ ও প্রতিপাদ্য বিষয়টি ভালভাবে বুঝার চেষ্টা করা উচিত। এর মৌলিক বিষয় দু'টি। এ দু'টি বিষয় বুঝে নেয়া ছাড়া আয়াতটির অর্থ অনুধাবন সম্ভব নয়। একটি বিষয় হচ্ছে, এখানে আল্লাহর ইবাদাত করতে বলা হচ্ছে। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, সে ইবাদাত হবে এমন যা আনুগত্যকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে করা হয়।

ইবাদাত শব্দের শব্দমূল বা ধাতু হচ্ছে عبد । এ শব্দটি আরবী ভাষায় 'স্বাধীন' শব্দের বিপরীত শব্দ হিসেবে 'দাস' বা 'ক্রীতদাস' বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে 'ইবাদাত' শব্দের মধ্যে দু'টি অর্থ সৃষ্টি হয়েছে। একটি অর্থ হচ্ছে পূজা-অর্চনা। আরবী ভাষার বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য অভিধান 'লিসানুল আরবে' আছে عبد الله অর্থাৎ التنسك ، والتعبد ، تاله له । আরেকটি অর্থ হচ্ছে সবিনয় আনুগত্য এবং সন্তুষ্টি ও সাগ্রহ আদেশ পালন। যেমন "লিসানুল আরবে" বলা হয়েছে : العبادة-الطاعة ।

ومعنى العبادة فى اللغة الطاعة مع الخضوع - وكل من دان لملك فهو عابد له (وقومهما لنا عابدون) والعابد ، الخاضع لربه المستسلم المنقاد لامره - عبد الطاغوت ، اطاعه يعنى الشيطان فيما سول له واغواه - اياك نعبد ، اى نطيع الطاعة التى يخضع معها - اعبدوا ربكم ، اطيعوا ربكم -

সুতরাং অভিধানের এসব নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা অনুসারে আল্লাহর ইবাদাত করা অর্থ শুধু তাঁর পূজা-অর্চনার দাবী করাই নয়, বরং বিনা বাক্যে তাঁর আদেশ নিষেধ পালন, তাঁর শরয়ী আইন-কানুন সন্তুষ্ট চিত্তে সাগ্রহে মেনে চলা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মনেপ্রাণে অনুসরণ করার দাবীও বুঝায়।

আরবী ভাষায় دين (দীন) শব্দ কতিপয় অর্থ ধারণ করে :

একটি অর্থ হচ্ছে, আধিপত্য ও ক্ষমতা, মালিকানা ও প্রভুত্বমূলক মালিকানা, ব্যবস্থাপনা ও সার্বভৌম ক্ষমতা এবং অন্যদের ওপর সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা। তাই "লিসানুল আরবে" আছে :

دان الناس ، اى قهرهم على الطاعة - دنتهم ، اى قهرتهم - دنته ، سسته وملكته - وفى الحديث الكيس من دان نفسه ، اى اذلها واستعبدها - الديان ، القاضى ، الحكم ، القهار ، ولا انت ديانى ، اى لست بقاهرلى فتسوس امرى - ما كان ليأخذ اخاه فى دين الملك ، اى فى تضاء الملك -

দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আনুগত্য, আদেশ পালন ও দাসত্ব। লিসানুল আরব অভিধানে আছে :

الدين ، الطاعة - دنته ودنت له ، اى اطعته - والدين لله ، انما هو طاعته والتعبد له - فى الحديث اريد من قريش كلمة تدين لهم

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي
مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ۝

সাবধান! একনিষ্ঠ ইবাদাত কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য।[৪] যারা তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক বানিয়ে রেখেছে (আর নিজেদের এ কাজের কারণ হিসেবে বলে যে,) আমরা তো তাদের ইবাদাত করি শুধু এই কারণে যে, সে আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে।[৫] আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই তাদের মধ্যকার সেসব বিষয়ের ফায়সালা করে দেবেন যা নিয়ে তারা মতভেদ করছিলো।[৬] আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে হিদায়াত দান করেন না, যে মিথ্যাবাদী ও হক অস্বীকারকারী।[৭]

بها العرب ، اى تطيعهم وتخضع لهم - ثم دانت بعد الرباب ، اى ذلت له و اطاعته - يمرقون من الدين ، اى انهم يخرجون من طاعة الامام المفترض الطاعة ، المدين ، العبد - فلولا ان كنتم غير مدينين ، اى غير مملوكين -

তৃতীয় অর্থ হচ্ছে অভ্যাস ও পন্থা-পদ্ধতি—মানুষ যা অনুসরণ করে। লিসানুল আরবে আছে,

الدين ، العادة والشأن - يقال ما زال ذلك دينى وديدنى ، اى عادتى

এ তিনটি অর্থের প্রতি খেয়াল রাখলে এ আয়াতে 'দীন' শব্দটি এমন কর্মপদ্ধতি ও আচরণকে বুঝায় যা মানুষ কারো শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার এবং কারো আনুগত্য গ্রহণ করার মাধ্যমে অবলম্বন করে। আর "দীন"কে শুধু আল্লাহর জন্য নিবেদিত করে তাঁর দাসত্ব করার অর্থ হলো "আল্লাহর দাসত্বের সাথে মানুষ আর কাউকে শামিল করবে না বরং শুধু তাঁরই পূজা করবে, তাঁরই অনুসরণ এবং তারই হুকুম আহকাম ও আদেশ পালন করবে।"

৪. এটা একটা বাস্তবসম্মত ও সত্য ব্যাপার। ওপরে বর্ণিত দাবীর সপক্ষে প্রমাণস্বরূপ এটা পেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমার উচিত দীনকে কেবল আল্লাহর জন্য নিবেদিত করে তাঁর বন্দেগী ও দাসত্ব করা। কারণ নির্ভেজাল ও অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহর অধিকার। অন্য কথায় বন্দেগী ও দাসত্ব পাওয়ার মত অন্য কেউ আদতেই নেই। সুতরাং আল্লাহর সাথে তার পূজা-অর্চনা করা এবং তার হুকুম-আহকাম ও আইন-কানুনের আনুগত্য করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো একনিষ্ঠ ও অবিমিশ্র

দাসত্ব করে তাহলে সে ভ্রান্ত কাজ করে। অনুরূপভাবে সে যদি আল্লাহর দাসত্বের সাথে সাথে অন্য কারো দাসত্বের সংমিশ্রণ ঘটায় তাহলে সেটাও সরাসরি ন্যায় ও সত্যের পরিপন্থী। ইবনে মারদুইয়া কর্তৃক ইয়াযীদ আর রাকাশী থেকে উদ্ধৃত হাদীসটিই এ আয়াতের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, আমরা নাম ডাক সৃষ্টি করার জন্য আমাদের অর্থ-সম্পদ দেই। এতে কি আমরা কোন পুরস্কার পাব? নবী (সা) বললেন ঃ না। সে জিজ্ঞেস করলো ঃ আমাদের নিয়ত যদি আল্লাহর পুরস্কার এবং দুনিয়ার সুনাম অর্জন দু'টিই থাকে? তিনি বললেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ تعالى لاَ يَقبَلُ اِلاَّ مَن اَخلَصَ لَهٗ

"কোন আমল যতক্ষণ না আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠভাবে হবে ততক্ষণ তিনি তা গ্রহণ করেন না।" এরপর নবী (সা) এ আয়াত পাঠ করলেন।

৫. মক্কার কাফেররা বলতো, আর সাধারণত দুনিয়ার সব মুশরিকও একথাই বলে থাকে যে, আমরা স্রষ্টা মনে করে অন্যসব সত্তার ইবাদাত করি না। আমরা তো আল্লাহকেই প্রকৃত স্রষ্টা বলে মানি এবং সত্যিকার উপাস্য তাকেই মনে করি। যেহেতু তাঁর দরবার অনেক উঁচু। আমরা সেখানে কি করে পৌঁছতে পারি? তাই এসব বোযর্গ সত্তাদেরকে আমরা মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করি যাতে তারা আমাদের প্রার্থনা ও আবেদন-নিবেদন আল্লাহর কাছে পৌঁছিয়ে দেন।

৬. একথা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, কেবল তাওহীদের ব্যাপারেই ঐকমত্য হওয়া সম্ভব। শিরকের ব্যাপারে কোন প্রকার ঐকমত্য হতে পারে না। কোন্ কোন্ সত্তা আল্লাহর কাছে পৌঁছার মাধ্যম সে ব্যাপারে দুনিয়ার মুশরিকরা কখনো একমত হতে পারেনি। কারো কাছে কোন দেবতা বা দেবীরা এর মাধ্যম। কিন্তু তাদের মধ্যেও সব দেবতা ও দেবী সম্পর্কে ঐকমত্য নেই। কারো কাছে চাঁদ, সূর্য, মঙ্গল ও বৃহস্পতি এর মাধ্যম। কিন্তু তাদের মধ্যে কার কি মর্যাদা এবং কে আল্লাহর কাছে পৌঁছার মাধ্যম সে ব্যাপারে তারাও পরস্পর একমত নয়। কারো মতে মৃত মহাপুরুষগণ এর মাধ্যম। কিন্তু এদের মধ্যেও অসংখ্য ভিন্নমত বিদ্যমান। কেউ একজন মহাপুরুষকে মানলে আরেকজন অপর একজনকে মানছে। এর কারণ হচ্ছে, ভিন্ন ভিন্ন এসব মহাপুরুষ সম্পর্কে তাদের এই ধারণা কোন জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেনি কিংবা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে এমন কোন তালিকাও আসেনি যাতে বলা হয়েছে, অমুক ও অমুক ব্যক্তি আমার বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত। সুতরাং আমাকে পেতে হলে তাদেরকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করো। এটা বরং এমন এক আকীদা—যা কেবল কুসংস্কার ও অন্ধভক্তি এবং পুরনো দিনের লোকদেরকে অযৌক্তিক এবং অন্ধ অনুসরণের কারণে মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে। তাই ক্ষেত্রে মতের বিভিন্নতা অবশ্যম্ভাবী।

৭. আল্লাহ এখানে সেসব লোকের জন্য দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছেন। একটি كاذب (মিথ্যাবাদী) এবং অপরটি كفار (অস্বীকারকারী)। তাদেরকে كاذب বলা হয়েছে এ জন্য যে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে মিথ্যা এ আকীদা বানিয়ে নিয়েছে এবং অন্যদের মধ্যে এ মিথ্যাই প্রচার করছে। আর 'কাফ্ফার' শব্দের দু'টি অর্থ। একটি, ন্যায় ও সত্যের চরম

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٤﴾

আল্লাহ যদি কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করতে চাইতেন তাহলে তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নিতেন।[৮] তিনি এ থেকে পবিত্র (যে, কেউ তাঁর পুত্র হবে)। তিনি আল্লাহ। তিনি একক ও সবার ওপর বিজয়ী।[৯]

অস্বীকারকারী। অর্থাৎ তাওহীদের শিক্ষা সামনে আসার পর এরা এ ভ্রান্ত আকীদা আঁকড়ে ধরে আছে। আরেকটি, নিয়ামতের অস্বীকারকারী। অর্থাৎ এরা নিয়ামত লাভ করছে আল্লাহর কাছ থেকে আর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে সেসব সত্তার যাদের সম্পর্কে তারা নিজের থেকেই ধরে নিয়েছে যে, তাদের হস্তক্ষেপের কারণেই তারা এসব নিয়ামত লাভ করছে।

৮. অর্থাৎ আল্লাহর ছেলে হওয়া একেবারেই অসম্ভব। যা সম্ভব তা হচ্ছে, আল্লাহ কাউকে বাছাই করে নিতে পারেন। আর যাকে তিনি বাছাই করবেন সে অবশ্যই সৃষ্টির মধ্যেকার কেউ হবে। কারণ পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া আর যা কিছু আছে সবই সৃষ্টি। এ কথাও সবার জানা যে, সৃষ্টি যত সম্মানিতই হোক সে কখনো সন্তানের মর্যাদা পেতে পারে না। কারণ স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে বিরাট মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু সন্তান হওয়াটা পিতা ও সন্তানের মধ্যে মৌলিক ঐক্যের দাবী করে।

সাথে সাথে এ বিষয়টির প্রতিও লক্ষ রাখতে হবে যে, "আল্লাহ যদি কাউকে ছেলে বানাতে চাইতেন তাহলে এ রকম করতেন" কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। একথা থেকে স্বতই এ অর্থ প্রকাশ পায় যে, আল্লাহ কখনো এরূপ করতে চাননি। এ বর্ণনা ভঙ্গি দ্বারা একথা বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, কাউকে বেটা হিসেবে গ্রহণ করা তো দূরের কথা এরূপ করার ইচ্ছাও আল্লাহ কখনো পোষণ করেননি।

৯. এসব যুক্তি প্রমাণ দিয়েই সন্তান হওয়ার আকীদা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

প্রথম প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা সব রকমের ত্রুটি, দোষ এবং দুর্বলতা থেকে পবিত্র। একথা সুস্পষ্ট যে, সন্তানের প্রয়োজন হয় অকর্মন্য ও দুর্বলের। যে ব্যক্তি নশ্বর ও ধ্বংসশীল সে-ই সন্তান লাভের মুখাপেক্ষী হয় যাতে তার বংশ ও প্রজন্ম টিকে থাকে। আর কাউকে পালক পুত্রও কেবল সে ব্যক্তিই গ্রহণ করে, যে হয়তো উত্তরাধিকারীহীন হওয়ার কারণে কাউকে উত্তরাধিকারী বানানোর প্রয়োজন অনুভব করে। নয়তো ভালবাসার আবেগে তাড়িত হয়ে কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে। এসব মানবিক দুর্বলতাকে আল্লাহর ওপর আরোপ করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস রচনা করে নেয়া মূর্খতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টি ছাড়া আর কি?

দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে, তিনি এক-অদ্বিতীয় এবং একক সত্তার অধিকারী, কোন বস্তু বা দ্রব্যের কিংবা কোন পুরুষের অংশ নন। আর এ বিষয় সুস্পষ্ট যে, সন্তান সমগোত্রীয় হয়ে থাকে। আর দাম্পত্য জীবন ছাড়া সন্তানের কল্পনাই করা যায় না। আর দাম্পত্য সম্পর্কও

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ
النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۭ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ
مُّسَمًّى ۭ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ۝ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۭ يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ
اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ۭ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۭ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ۝

তিনি আসমান ও যমীনকে যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞোচিতভাবে সৃষ্টি করেছেন।[১০] তিনিই দিনের প্রান্তসীমায় রাতকে এবং রাতের প্রান্তসীমায় দিনকে জড়িয়ে দেন। তিনি সূর্য ও চাঁদকে এমনভাবে অনুগত করেছেন যে, প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গতিশীল আছে। জেনে রাখো, তিনি মহা পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।[১১] তিনি তোমাদের একটি প্রাণী থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জোড়াও সৃষ্টি করেছেন।[১২] আর তিনিই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর আটজোড়া নর ও মাদি সৃষ্টি করেছেন।[১৩] তিনি তোমাদেরকে মায়ের গর্ভে তিন তিনটে অন্ধকার পর্দার অভ্যন্তরে একের পর এক আকৃতি দান করে থাকেন।[১৪] এ আল্লাহই (যার এ কাজ) তোমাদের 'রব'[১৫] তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী,[১৬] তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই,[১৭] তা সত্ত্বেও তোমাদেরকে কোন্‌দিকে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে।[১৮]

কেবল সমগোত্রীয়ের সাথেই হতে পারে। সুতরাং একক ও অদ্বিতীয় সত্তা আল্লাহর সন্তান থাকার কথা যে ব্যক্তি বলে সে চরম মূর্খ ও নির্বোধ।

তৃতীয় প্রমাণ হচ্ছে, তিনি قهار বা অপরাজেয় এক মহাশক্তি। অর্থাৎ পৃথিবীতে সব জিনিসই তাঁর অজেয় আধিপত্যের অধীন। এ বিশ্ব-জাহানের কোন কিছুই কোন পর্যায়েই তাঁর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। তাই কোন জিনিস সম্পর্কেই এ ধারণা করা যেতে পারে না যে, আল্লাহর সাথে তার কোন আত্মীয়তার বন্ধন আছে।

১০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইবরাহীম, টীকা ২৬; আন নাহল, টীকা ৬ ; আল আনকাবূত, টীকা ৭৫।

১১. অর্থাৎ এমন মহাপরাক্রমশালী যে, তিনি যদি তোমাদের আযাব দিতে চান তাহলে কোন শক্তিই তা রোধ করতে সক্ষম নয়। কিন্তু এটা তাঁর মেহেরবানী যে তোমরা এসব

অপরাধ ও অবমাননা করা সত্ত্বেও তখনই তোমাদের পাকড়াও করছেন না, বরং একের পর এক অবকাশ দিয়ে যাচ্ছেন। এখানে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করা এবং অবকাশ দেয়াকে ক্ষমা (দেখেও না দেখা) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১২. একথার অর্থ এ নয় যে, প্রথমে হযরত আদম থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং পরে তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন। এখানে বক্তব্যের মধ্যে সময়ের পরম্পরার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে বর্ণনার পরম্পরার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাষায়ই এ ধরনের দৃষ্টান্ত বর্তমান। যেমন ঃ আমরা বলি তুমি আজ যা করেছো তা জানি এবং গতকাল যা করেছো তাও আমার জানা আছে। এ ধরনের বর্ণনার অর্থ এ নয় যে, গতকালের ঘটনা আজকের পরে সংঘটিত হয়েছে।

১৩. গবাদি পশু অর্থ উট, গরু, ভেড়া, বকরী। এ চারটি নর ও চারটি মাদি মিলে মোট আটটি নর ও মাদি হয়।

১৪. তিনটি পর্দা অর্থ পেট, গর্ভথলি এবং ঝিল্লি (সে ঝিল্লি যার মধ্যে বাচ্চা জড়িয়ে থাকে)।

১৫. অর্থাৎ মালিক, শাসক ও পালনকর্তা।

১৬. অর্থাৎ সমস্ত ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক তিনিই। গোটা বিশ্ব-জাহান তার হুকুমেই চলছে।

১৭. অন্যকথায় এখানে যুক্তি পেশ করা হচ্ছে যে, তিনিই যখন তোমাদের প্রভু এবং সমস্ত রাজত্ব তাঁরই তখন নিশ্চিতভাবে তোমাদের ইলাহও (উপাস্য) তিনিই। অন্য কেউ কি করে ইলাহ হতে পারে যখন প্রতিপালনের ক্ষেত্রে তার কোন অংশ নেই এবং রাজত্বের ক্ষেত্রেও তার কোন দখল নেই। তোমাদের বিবেক-বুদ্ধির কাছে একথা কি করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে যে, যমীন-আসমানের সৃষ্টিকর্তা হবেন আল্লাহ এবং সূর্য ও চন্দ্রকে আনুগত্য গ্রহণকারী আর রাতের পর দিন ও দিনের পর রাত আনয়নকারীও হবেন আল্লাহ। তাছাড়া তোমাদের নিজেদের এবং সমস্ত জীব-জন্তুর স্রষ্টা ও পালনকর্তাও হবেন আল্লাহ অথচ তোমাদের উপাস্য হবে তিনি ছাড়া অন্যরা?

১৮. একথাটি চিন্তা করে দেখার মত। এখানে একথা বলা হয়নি যে, তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছো? বরং বলা হয়েছে এই যে, তোমাদের কোথায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? অর্থাৎ অন্য কেউ তোমাদের বিপথগামী করছে এবং তোমরা তার প্রতারণার ফাঁদে পড়ে সাদামাটা যুক্তিসংগত কথাও বুঝতে পারছো না। এ বর্ণনাভঙ্গি থেকে দ্বিতীয় যে কথাটি প্রতীয়মান হয় তা হচ্ছে 'তোমরা' বলে সম্বোধন করে যারা ফিরিয়ে নিচ্ছে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়নি, বরং যারা তাদের প্রভাবে পড়ে ফিরে যাচ্ছিলো তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে, কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করলে যা সহজেই বোঝা যায়। যারা ফিরিয়ে নিচ্ছিলো তারা সে সমাজে সবার চোখের সামনেই ছিলো এবং সবখানে প্রকাশ্যেই কাজ করছিলো। তাই তাদের নাম নিয়ে বলার প্রয়োজন ছিলো না। তাদের সরাসরি সম্বোধন করাও ছিলো নিরর্থক। কারণ, তারা নিজেদের স্বার্থের জন্যই মানুষকে এক আল্লাহর দাসত্ব থেকে ফিরতে এবং অন্যদের দাসত্বে শৃঙ্খলিত করতে এবং করিয়ে রাখতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো। এটা জানা কথা যে, এ ধরনের লোকদের বুঝালেও

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۖ وَإِن
تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم
مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾

যদি তোমরা কুফরী করো তাহলে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন।[১৯] কিন্তু তিনি তাঁর বান্দার জন্য কুফরী আচরণ পছন্দ করেন না।[২০] আর যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন।[২১] আর কেউ–ই অপর কারো গোনাহর বোঝা বহন করবে না।[২২] অবশেষে তোমাদের সবাইকে তোমাদের রবের কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি জানাবেন তোমরা কি করছিলে। তিনি মনের খবর পর্যন্ত জানেন।

তারা তা বুঝতে রাজি ছিল না। কারণ, না বুঝার মধ্যেই তাদের স্বার্থ নিহিত ছিল এবং বুঝার পরও তারা তাদের স্বার্থ ত্যাগ করতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তবে জনসাধারণ যারা তাদের প্রতারণা ও চতুরতার ফাঁদে পতিত হচ্ছিলো তারা ছিল করুণার পাত্র। এ কারবারে তাদের কোন স্বার্থ ছিল না। তাই তাদেরকে বুঝালে বুঝতে পারতো এবং চোখ কিছুটা খুলে যাওয়ার পরে তারা এও দেখতে পারতো যে, যারা তাদেরকে আল্লাহর নিকট থেকে সরিয়ে অন্যদের আস্তানার পথ দেখাচ্ছে তারা তাদের এ কারবার থেকে কি স্বার্থ হাসিল করছে। এ কারণেই গোমরাহীতে নিক্ষেপকারী মুষ্টিমেয় লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে গোমরাহীর দিকে অগ্রসরমান জনসাধারণকে সম্বোধন করা হচ্ছে।

১৯. অর্থাৎ তোমাদের কুফরীর কারণে তাঁর প্রভুত্বের সামান্যতম ক্ষতিও হতে পারে না। তোমরা মানলেও তিনি আল্লাহ, না মানলেও তিনি আল্লাহ আছেন এবং থাকবেন। তাঁর নিজের ক্ষমতায়ই তাঁর কর্তৃত্ব চলছে। তোমাদের মানা বা না মানাতে কিছু এসে যায় না। হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ বলেন ঃ

يا عبادى لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر
قلب رجل منكم ما نقص من ملكى شيئا –

"হে আমার বান্দারা, যদি তোমরা আগের ও পরের সমস্ত মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যকার কোন সর্বাধিক পাপিষ্ঠ ব্যক্তির মত হয়ে যাও তাতেও আমার বাদশাহীর কোন ক্ষতি হবে না।" (মুসলিম)।

২০. অর্থাৎ নিজের কোন স্বার্থের জন্য নয়, বরং বান্দার স্বার্থের জন্য তার কুফরী করা পছন্দ করেন না। কেননা, কুফরী তাদের নিজেদের জন্যই ক্ষতিকর। এখানে একথা মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এক জিনিস এবং তাঁর সন্তুষ্টি সম্পূর্ণ ভিন্ন

وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ
مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ
تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾

মানুষের ওপর যখন কোন বিপদ আসে[২৩] তখন সে তার রবের দিকে ফিরে যায় এবং তাঁকে ডাকে।[২৪] কিন্তু যখন তার রব তাকে নিয়ামত দান করেন তখন সে ইতিপূর্বে যে বিপদে পড়ে তাঁকে ডাকছিলো[২৫] তা ভুলে যায় এবং অন্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করতে থাকে[২৬] যাতে তারা আল্লাহর পথ থেকে তাকে গোমরাহ করে।[২৭] (হে নবী,) তাকে বলো, তোমার কুফরী দ্বারা অল্প কিছুদিন মজা করে নাও। নিশ্চিতভাবেই তুমি দোযখে যাবে।

আরেকটি জিনিস। পৃথিবীতে আল্লাহর ইচ্ছার পরিপন্থী কোন কাজ হতে পারে না। কিন্তু তাঁর সন্তুষ্টির পরিপন্থী কাজ হতে পারে এবং রাত দিন হয়ে আসছে। উদাহরণ স্বরূপ ঃ পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী ও জালেমদের শাসনকর্তা হওয়া, চোর ও ডাকাতদের অস্তিত্ব থাকা এবং হত্যাকারী ও ব্যভিচারীদের বর্তমান থাকা এ কারণেই সম্ভব যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রচিত প্রাকৃতিক বিধানে এসব অকল্যাণ ও অপকর্মের অস্তিত্ব লাভের অবকাশ রেখেছেন। তাছাড়া তাদেরকে মন্দ কাজে লিপ্ত হওয়ার সুযোগও তিনিই দেন এবং ঠিক তেমনিভাবে দেন যেমনভাবে সৎকর্মশীলদের সৎকাজ করার সুযোগ দেন। তিনি যদি এসব কাজ করার আদৌ কোন সুযোগ না রাখতেন এবং যারা এসব কাজ করে তাদের আদৌ কোন সুযোগই না দিতেন তাহলে পৃথিবীতে কখনো কোন অকল্যাণ আত্মপ্রকাশ করতো না। এসব কিছুই তাঁর ইচ্ছার ভিত্তিতে হচ্ছে। কিন্তু ইলাহী ইচ্ছার অধীনে কোন কাজ সংঘটিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তার পেছনে আল্লাহর সন্তুষ্টিও রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ একথাটিকে এভাবে বুঝতে চেষ্টা করুন যে, কেউ যদি হারাম পন্থার মাধ্যমে তার রিযিক লাভের চেষ্টা করে তাহলে আল্লাহ তাকে ঐ পন্থায়ই রিযিক দান করেন। এটা তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু তাঁর ইচ্ছার অধীনে চোর, ডাকাত বা ঘুষখোরকে রিযিক দেয়ার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ চুরি, ডাকাতি এবং ঘুষও পছন্দ করেন। এখানে আল্লাহ তা'আলা একথাটিই বলছেন যে, তোমরা কুফরি করতে চাইলে করো। আমি জোর করে তাতে বাধা দিয়ে তোমাদেরকে মুমিন বানাবো না। তবে তোমরা বান্দা হয়ে স্রষ্টা ও পালনকর্তার সাথে কুফরি করবে তাও আমার পছন্দ নয়। কারণ, তা তোমাদের জন্যই ক্ষতিকর। এতে আমার প্রভুত্বে আদৌ কোন আঁচড় লাগে না।

২১. এখানে 'কুফর' এর বিপরীতে 'ঈমান' শব্দ ব্যবহার না করে 'শোকর' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে আপনা থেকেই এ বিষয়ের ইংগিত পাওয়া যায় যে, কুফরী প্রকৃতপক্ষে অকৃতজ্ঞতা ও নেমক হারামির নাম আর ঈমান প্রকৃতপক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনিবার্য

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو
رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝٩

(এ ব্যক্তির আচরণই সুন্দর না সে ব্যক্তির আচরণ সুন্দর) যে অনুগত, রাতের বেলা দাঁড়ায় ও সিজদা করে, আখেরাতকে ভয় করে এবং নিজের রবের রহমতের আশা করে? এদের জিজ্ঞেস করো যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি পরস্পর সমান হতে পারে?[২৮] কেবল বিবেক-বুদ্ধির অধিকারীরাই উপদেশ গ্রহণ করে।

দাবী। যে ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানীর সামান্য অনুভূতিও আছে সে ঈমান ছাড়া অন্য কোন পথ গ্রহণ করতে পারে না। এ কারণে 'শোকর' ও 'ঈমান' এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, যেখানে শোকর থাকবে সেখানে ঈমানও অবশ্যই থাকবে। অপর দিকে যেখানে কুফরী থাকবে সেখানে শোকর বা কৃতজ্ঞতা থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ কুফরীর সাথে "শোকরের" কোন অর্থ হয় না।

২২. অর্থাৎ তোমাদের মধ্যকার প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে তার কাজ-কর্মের জন্য দায়ী। কেউ যদি অন্যদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিংবা তার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার জন্য কুফরী করে তাহলে সে লোকেরা তার কুফরীর বোঝা নিজেদের মাথায় উঠিয়ে নেবে না। বরং তাকেই তার কাজের পরিণাম ভোগ করার জন্য রেখে দেবে। সুতরাং কুফরীর ভ্রান্তি এবং ঈমানের সত্যতা যার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে তার উচিত ভুল আচরণ পরিত্যাগ করে সঠিক আচরণ গ্রহণ করা এবং নিজের বংশ, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সাথে থেকে নিজেকে আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত না বানানো।

২৩. মানুষ বলতে এখানে সেসব কাফেরদের বুঝানো হয়েছে যারা অকৃতজ্ঞতার আচরণ করে যাচ্ছে।

২৪. অর্থাৎ সুদিনে সে যেসব উপাস্যকে ডাকতো সেই সময় তাদের কথা মনে হয় না। সে তখন তাদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহর দিকে ফিরে যায়। সে যে তার মনের গভীরে অন্য উপাস্যদের ক্ষমতা ও ইখতিয়ারহীন হওয়ার অনুভূতি রাখে এবং আল্লাহই যে প্রকৃত ক্ষমতা-ইখতিয়ারের মালিক এ বাস্তবতাবোধও তার মন-মস্তিষ্কের কোথাও না কোথাও অবদমিত হয়ে পড়ে আছে এটা যেন তারই প্রমাণ।

২৫. অর্থাৎ যে সময় সে অন্যসব উপাস্যদের পরিত্যাগ করে কেবল একক ও লা-শরীক আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করছিলো সে দুঃসময়ের কথা তার মনে থাকে না।

২৬. অর্থাৎ অন্যদের দাসত্ব করতে শুরু করে। তাদেরই আনুগত্য করে। তাদের কাছেই প্রার্থনা করে এবং তাদের সামনেই নযর-নিয়াজ পেশ করতে শুরু করে।

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۭ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۭ وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ۭ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

২ রুকূ'

[হে নবী, (সা)] বলো, হে আমার সেসব বান্দা যারা ঈমান গ্রহণ করেছো, তোমাদের রবকে ভয় করো।[২৯] যারা এ পৃথিবীতে সদাচরণ গ্রহণ করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ।[৩০] আর আল্লাহর পৃথিবী তো অনেক বড়।[৩১] ধৈর্যশীলদেরকে তো অঢেল পুরস্কার দেয়া হবে।[৩২]

২৭. অর্থাৎ নিজে পথভ্রষ্ট হয়েই ক্ষান্ত হয় না। অন্যদেরকেও একথা বলে পথভ্রষ্ট করে যে, আমার ওপর যে বিপদ এসেছিলো তা অমুক হযরতের কিংবা অমুক বুযর্গের বা অমুক দেবী ও দেবতাকে নযরানা পেশ করে দূর হয়েছে। এতে আরো অনেক মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যের ভক্ত ও অনুসারী হয়ে যায় আর প্রত্যেক জাহেল এ ধরনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে জনসাধারণের গোমরাহী বাড়িয়ে তুলতে থাকে।

২৮. প্রকাশ থাকে যে, এখানে দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে তুলনা করা হচ্ছে। এক শ্রেণীর মানুষ দুঃসময় আসলে আল্লাহর দিকে ফিরে যায়। কিন্তু স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে গায়রুল্লাহর বন্দেগী করে। আরেক শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর দাসত্বকে তাদের স্থায়ী নীতি বানিয়ে নিয়েছে। রাতের অন্ধকারে আল্লাহর ইবাদাত করা তাদের একনিষ্ঠ হওয়ার প্রমাণ। এর মধ্যে প্রথম দলের অন্তরভুক্ত লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানহীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ক্ষেত্রে তারা বড় বড় গ্রন্থাগার চষে থাকলেও কিছু এসে যায় না। আর দ্বিতীয় দলের অন্তরভুক্ত লোকদেরকে জ্ঞানী বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ক্ষেত্রে একেবারে নিরক্ষর হলেও কিছু এসে যায় না। কারণ, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে সত্য সম্পর্কে জ্ঞান ও তদানুযায়ী কাজ। এর ওপরেই মানুষের সাফল্য নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ এই দুই শ্রেণীর মানুষ কি করে সমান হতে পারে। কি করে সম্ভব যে, তারা দুনিয়ায় মিলে মিশে একই নিয়ম-পন্থায় চলবে এবং আখেরাতেও একই পরিণামের সম্মুখীন হবে।

২৯. অর্থাৎ শুধু মেনে নেবে তাই নয়, বরং তার সাথে সাথে তাকওয়াও অবলম্বন করো, আল্লাহ যেসব কাজ করতে আদেশ দিয়েছেন তার ওপর আমল করো, যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকো এবং আল্লাহর কাছে জবাবদিহির কথা মনে রেখে দুনিয়াতে কাজ করো।

৩০. দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টির কল্যাণ। তাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেরই কল্যাণ সাধিত হবে।

৩১. অর্থাৎ যদি একটি শহর, অঞ্চল বা দেশ আল্লাহর বান্দাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে যেখানে বিপদাপদ নেই সেখানে চলে যাও।

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ
أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي ﴿١٤﴾ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم
مِّن دُونِهِ ۗ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾

(হে নবী,) এদের বলো, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন আমি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহরই দাসত্ব করি। আমাকে এ আদেশও দেয়া হয়েছে যেন আমি সবার আগে মুসলমান হই।[৩৩] বলো, আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই তাহলে আমার একটি ভয়ানক দিনের ভয় আছে। বলে দাও, আমি আনুগত্যসহ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহরই দাসত্ব করবো। তোমরা তাঁর ছাড়া আর যাদের ইচ্ছা দাসত্ব করতে থাকো। বলো, প্রকৃত দেউলিয়া তারাই যারা কিয়ামতের দিন নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে ক্ষতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ভাল করে শুনে নাও, এটিই হচ্ছে স্পষ্ট দেউলিয়াপনা।[৩৪]

৩২. যারা আল্লাহভীরুতা ও নেকীর পথে চলার ক্ষেত্রে সব রকমের দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছে কিন্তু ন্যায়ের পথ থেকে সরেনি তার মধ্যে সেসব লোক অন্তরভুক্ত যারা দীন ও ঈমানের কারণে হিজরত করে দেশান্তরিত হওয়ার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করবে এবং সেসব লোকও অন্তরভুক্ত যারা জুলুম-নির্যাতনে ভরা দেশে থেকে সাহসিকতার সাথে সব বিপদের মোকাবিলা করতে থাকবে।

৩৩. অর্থাৎ আমার কাজ শুধু অন্যদের বলা নয়, নিজে করে দেখানোও। আমি যে পথের দিকে মানুষকে আহবান জানাই সর্বপ্রথম আমিই সে পথে চলি।

৩৪. কোন ব্যক্তির কারবারে খাটানো সমস্ত পুঁজি যদি নষ্ট হয়ে যায় এবং বাজারে তার পাওনাদারের সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, নিজের সবকিছু দিয়েও সে দায়মুক্ত হতে পারে না তাহলে এরূপ অবস্থাকেই সাধারণভাবে দেউলিয়াত্ব বলে। এখানে আল্লাহ তা'আলা কাফের ও মুশরিকদের জন্য এ রূপক ভাষাটিই ব্যবহার করেছেন। মানুষ এ পৃথিবীতে জীবন, আয়ু, জ্ঞান-বুদ্ধি, শরীর, শক্তি, যোগ্যতা, উপায়-উপকরণ এবং সুযোগ-সুবিধা যত জিনিস লাভ করেছে তার সমষ্টি এমন একটি পুঁজি যা সে পার্থিব জীবনের কারবারে খাটায়। কেউ যদি এ পুঁজির সবটাই এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে খাটায় যে, কোন ইলাহ নেই কিংবা অনেক ইলাহ আছে আর সে তাদের বান্দা। তাকে কারো কাছে হিসেব দিতে হবে না, কিংবা হিসেব-নিকেশের সময় অন্য কেউ এসে তাকে রক্ষা করবে, তাহলে

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ
عِبَادَهٗ ۚ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ﴿١٦﴾ وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا
وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ
فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ۚ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا
الْاَلْبَابِ ﴿١٨﴾

তাদেরকে মাথার ওপর থেকে এবং নীচে থেকে আগুনের স্তর আচ্ছাদিত করে রাখবে। এ পরিণাম সম্পর্কেই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ভীতি প্রদর্শন করেন, হে আমার বান্দারা, আমার গযব থেকে নিজেদের রক্ষা করো। কিন্তু যেসব লোক তাগুতের[৩৫] দাসত্ব বর্জন করেছে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে তাদের জন্য সু-সংবাদ। [হে নবী (সা)] আমার সেসব বান্দাদের সুসংবাদ দিয়ে দাও যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে এবং তার ভাল দিকটি অনুসরণ করে।[৩৬] এরাই সেসব মানুষ যাদের আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন এবং এরাই বুদ্ধিমান।

তার অর্থ হচ্ছে সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো এবং নিজের সবকিছু খুইয়ে বসলো। এটা হচ্ছে প্রথম ক্ষতি। দ্বিতীয় ক্ষতি হচ্ছে, এ ভ্রান্ত অনুমানের ভিত্তিতে সে যত কাজই করলো সেসব কাজের ক্ষেত্রে সে নিজেকে সহ দুনিয়ার বহু মানুষ, ভবিষ্যৎ বংশধর এবং আল্লাহর আরো বহু সৃষ্টির ওপর জীবনভর জুলুম করলো। তাই তার বিরুদ্ধে অসংখ্য দাবী আসলো। কিন্তু তার কাছে এমন কিছুই নেই যে, সে এসব দাবী পূরণ করতে পারে। তাছাড়া আরো একটি ক্ষতি হচ্ছে, সে নিজেই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হলো না, বরং নিজের সন্তান-সন্ততি, প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব ও স্বজাতিকেও তার ভ্রান্ত শিক্ষা-দীক্ষা এবং ভ্রান্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করলো। এ তিনটি ক্ষতির সমষ্টিকে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ক্ষতি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৩৫. طاغوت শব্দটি طغيان শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বিদ্রোহ। কাউকে طاغى বিদ্রোহী না বলে যদি 'তাগুত' (বিদ্রোহ) বলা হয় তাহলে তার অর্থ হয় চরম মাত্রার বিদ্রোহী। উদাহরণ স্বরূপ কাউকে সুন্দর বলার পরিবর্তে যদি সৌন্দর্য বলা হয় তাহলে তার অর্থ হয় সে যারপর নাই সুন্দর। আল্লাহ ছাড়া অন্য সব উপাস্যদের তাগুত বলার কারণ হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্যদের দাসত্ব করা তো নিছক বিদ্রোহ। কিন্তু যে অন্যদের দিয়ে নিজের দাসত্ব করায় সে চরম পর্যায়ের বিদ্রোহী। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল-বাকারাহ, টীকা, ২৮৬; আন নাহ্‌ল, টীকা, ৩২)। এখানে طاغوت শব্দটি طواغيت অর্থাৎ বহু সংখ্যক বিদ্রোহী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ۚ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٩﴾ لَٰكِنِ الَّذِينَ
اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ۖ وَعْدَ اللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿٢٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ
ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي
الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾

(হে নবী,) যে ব্যক্তিকে আযাব দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে তাকে কে রক্ষা করতে পারে?[৩৭] যে আগুনের মধ্যে পড়ে আছে তাকে কি তুমি রক্ষা করতে পার? তবে যারা তাদের রবকে ভয় করে চলছে তাদের জন্য রয়েছে বহুতল সু উচ্চ বৃহৎ প্রাসাদ যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। এটা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ কখনো তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

তোমরা কি দেখো না, আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। তারপর তাকে পৃথিবীর ওপর স্রোত, ঝর্ণাধারা এবং নদীর আকারে[৩৮] প্রবাহিত করেছেন। অতপর সেই পানি দ্বারা তিনি নানা রংএর শস্য উৎপাদন করেন। পরে সে শস্য পেকে শুকিয়ে যায়। তারপর তোমরা দেখতে পাও যে, তা হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে। অবশেষে আল্লাহ তা ভূষিতে পরিণত করেন। নিশ্চয়ই জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্নদের জন্য এর মধ্যে শিক্ষা রয়েছে।[৩৯]

তাই أَنْ يَعْبُدُوهَا বলা হয়েছে। যদি একবচন হতো তাহলে ব্যবহৃত শব্দ হতো يعبدوه ।

৩৬. এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে, তারা যে কোন কথা শুনলেই তা অনুসরণ করে না। তারা প্রত্যেকের কথা শুনে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং যেটি ন্যায় ও সত্য কথা তা গ্রহণ করে। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, তারা কোন কথা শুনে তার ভুল অর্থ করার চেষ্টা করে না বরং তার ভাল অর্থ গ্রহণ করে।

৩৭. অর্থাৎ যে নিজেই নিজেকে আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত বানিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহও তাকে শাস্তি দানের ফায়সালা করেছেন।

أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾

৩ রুকূ'

আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তির বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন[৪০] এবং যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত আলোতে চলছে[৪১] সেকি (সে ব্যক্তির মত হতে পারে যে এসব কথা থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেনি?) ধ্বংস সে লোকদের জন্য যাদের অন্তর আল্লাহর উপদেশ বাণীতে আরো বেশী কঠোর হয়ে গিয়েছে।[৪২] সে সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে ডুবে আছে।

৩৮. মূল আয়াতে ينابيع শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা এ তিনটি জিনিস বুঝাতেই ব্যবহার করা হয়।

৩৯. অর্থাৎ এ থেকে একজন বুদ্ধিমান মানুষ এ শিক্ষা গ্রহণ করে যে, দুনিয়ার এ জীবন ও এর সব সৌন্দর্য ও চাকচিক্য অস্থায়ী। প্রতিটি বসন্তের পরিণামই শরতের মলিনতা এবং যৌবনের পরিণাম বার্ধক্য ও মৃত্যু। প্রতিটি উত্থানই অবশেষে পতনে পরিণতি লাভ করে। সুতরাং এ পৃথিবী এমন জিনিস নয় যার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মানুষ আল্লাহ ও আখেরাতকে ভুলে যেতে পারে এবং এখানকার ক্ষণস্থায়ী বসন্তের মজা উপভোগ করার জন্য এমন আচরণ করবে যা তার পরিণামকে ধ্বংস করবে। তাছাড়া একজন বুদ্ধিমান লোক এসব দৃশ্য দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে যে, এ দুনিয়ার বসন্ত ও শরত আল্লাহর ইখতিয়ারে। তিনি যাকে ইচ্ছা উত্থান ঘটান এবং যাকে ইচ্ছা দুর্দশাগ্রস্ত করেন। আল্লাহ যাকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করছেন তার বেড়ে ওঠা যেমন কেউ রোধ করতে পারে না। তেমনি আল্লাহ যাকে ধ্বংস করতে চান তাকে মাটিতে মিশে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে এমন শক্তিও কারো নেই।

৪০. অর্থাৎ এ সমস্ত বাস্তব ব্যাপার দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ এবং ইসলামকে অকাট্য ও নির্ভুল সত্য বলে মেনে নেয়ার যোগ্যতা ও সুযোগ আল্লাহ যাকে দিয়েছেন। কোন ব্যাপারে মানুষের বক্ষ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া মূলত এমন একটি মানসিক অবস্থার নাম, যখন তার মনে উক্ত বিষয় সম্পর্কে কোন দুশ্চিন্তা বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কিংবা সন্দেহ-সংশয় থাকে না এবং কোন বিপদের আভাস বা কোন ক্ষতির আশংকাও তাকে ঐ বিষয় গ্রহণ করতে বাধা দিতে পারে না। বরং সে পূর্ণ মানসিক তৃপ্তির সাথে এ সিদ্ধান্ত করে যে, এ জিনিসটি ন্যায় ও সত্য। তাই যাই ঘটুক না কেন আমাকে এর ওপরই চলতে হবে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন ব্যক্তি যখন ইসলামের পথ অবলম্বন করে তখন আল্লাহ ও রসূলের পক্ষ থেকে যে নির্দেশই আসে তা সে অনিচ্ছায় নয় খুশী ও আগ্রহের সাথে মেনে নেয়। কিতাব ও সুন্নাহ থেকে যে অকাইদ ও ধ্যান-ধারণা এবং যে নীতিমালা ও নিয়ম-কানুন তার সামনে আসে তা সে এমনভাবে গ্রহণ করে যেন সেটাই হৃদয়ের প্রতিধ্বনি। কোন অবৈধ সুবিধা পরিত্যাগ করতে তার কোন অনুশোচনা হয় না। সে মনে করে ঐগুলো তার

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ هُدَى
اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ۝٢٣

আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী নাযিল করেছেন, এমন একটি গ্রন্থ যার সমস্ত অংশ সামঞ্জস্যপূর্ণ[৪৩] যার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এসব শুনে সে লোকদের লোম শিউরে ওঠে যারা তাদের রবকে ভয় করে। তারপর তাদের দেহমন বিগলিত হয়ে আল্লাহর স্মরণের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এটা হচ্ছে আল্লাহর হিদায়াত। এর দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে নিয়ে আসেন। আর যাকে আল্লাহ নিজেই হিদায়াত দান করেন না তার জন্য কোন হিদায়াতকারী নেই।

জন্য কল্যাণকর কিছু ছিল না। বরং তা ছিল একটি ক্ষতি যা থেকে সে আল্লাহর অনুগ্রহে রক্ষা পেয়েছে। অনুরূপ ন্যায় ও সত্যের ওপর কায়েম থাকার কারণে তার যদি কোন ক্ষতি হয় তাহলে সে সেই জন্য আফসোস করে না, ঠাণ্ডা মাথায় তা বরদাশত করে এবং আল্লাহর পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরিবর্তে তার কাছে ঐ ক্ষতি হালকা মনে হয়। বিপদাপদ আসলে তার এ একই অবস্থা হয়। সে মনে করে, আমার দ্বিতীয় কোন পথই নেই— এ বিপদ থেকে বাঁচার জন্য, যে পথ দিয়ে আমি বের হয়ে যেতে পারি। আল্লাহর সরল সোজা পথ একটিই। আমাকে সর্বাবস্থায় ঐ পথেই চলতে হবে। বিপদ আসলে আসুক।

৪১. অর্থাৎ জ্ঞানের আলো হিসেবে সে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত লাভ করেছে যার উজ্জ্বল আলোতে সে জীবনে চলার অসংখ্য ছোট ছোট পথের মধ্যে কোন্‌টি ন্যায় ও সত্যের সোজা রাস্তা তা প্রতি পদক্ষেপে স্পষ্ট দেখতে পায়।

৪২. "শরহে সদর" (উন্মুক্ত বক্ষ বা খোলা মন) এর বিপরীতে মানুষের মনের দু'টি অবস্থা হতে পারে। একটি হচ্ছে 'দীকে সদর' (বক্ষ সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া, মন সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া) এর অবস্থা। এ অবস্থায় মনের মধ্যে ন্যায় ও সত্য প্রবেশের কিছু না কিছু অবকাশ থাকে। দ্বিতীয়টি 'কাসাওয়াতে ক্বাল্‌ব' (মন কঠিন হয়ে যাওয়া) এর অবস্থা। এ অবস্থায় মনের মধ্যে ন্যায় ও সত্য প্রবেশের কোন সুযোগই থাকে না। দ্বিতীয় অবস্থাটি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ যে ব্যক্তি এ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে তার জন্য সর্বাত্মক ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নেই। এর অর্থ হচ্ছে, মনের সংকীর্ণতার সাথে হলেও কেউ যদি একবার ন্যায় ও সত্যকে কোনভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে যায় তাহলেও তার জন্য রক্ষা পাওয়ার কিছু না কিছু সম্ভাবনা থাকে। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি হতে এ দ্বিতীয় বিষয়টি আপনা থেকেই প্রকাশ পায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা সুস্পষ্ট করে বলেননি। কারণ, যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতায় জেদ ও হঠকারিতা করতে একপায়ে দাঁড়িয়ে ছিল এবং এ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছিলো যে, কোনমতেই তাঁর কোন কথা মানবে না, আয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে সাবধান করা। তাদেরকে এ মর্মে

أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا
مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ
الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

তুমি সে ব্যক্তির দুর্দশা কি করে উপলব্ধি করবে যে কিয়ামতের দিন আল্লাহর আযাবের কঠোর আঘাত তার মুখমণ্ডলের ওপর নেবে?[৪৪] এসব জালেমদের বলে দেয়া হবে ঃ এখন সেসব উপার্জনের ফল ভোগ করো যা তোমরা উপার্জন করেছিলে।[৪৫] এদের পূর্বেও বহু লোক এভাবেই অস্বীকার করেছে। শেষ পর্যন্ত এমন এক দিক থেকে তাদের ওপর আযাব আপতিত হয়েছে যা তারা কল্পনাও করতে পারতো না। আল্লাহ দুনিয়ার জীবনেই তাদেরকে লাঞ্ছনার শিকার করেছেন। আখেরাতের আযাব তো তার চেয়েও অধিক কঠোর। হায়! তারা যদি তা জানতো।

সাবধান করা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের এ জিদ ও হঠকারিতাকে অত্যন্ত গর্বের বিষয় বলে মনে করে থাকো। কিন্তু আল্লাহর যিকর এবং তাঁর পক্ষ থেকে আসা উপদেশ বাণী শুনে বিনম্র হওয়ার পরিবর্তে কেউ যদি আরো বেশী কঠোর হয়ে যায় তাহলে একজন মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় অযোগ্যতা ও দুর্ভাগ্য আর কিছুই নেই।

৪৩. ঐ সব বাণীর মধ্যে কোন বৈপরীত্য ও বিরোধ নেই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা কিতাব একই দাবী, একই আকীদা-বিশ্বাস এবং চিন্তা ও কর্মের একই আদর্শ পেশ করে। এর প্রতিটি অংশ অন্য সব অংশের এবং প্রতিটি বিষয় অন্য সব বিষয়ের সত্যায়ন, সমর্থন এবং ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে। অর্থ ও বর্ণনা উভয় দিক দিয়েই এ গ্রন্থের পূর্ণ মিল ও সামঞ্জস্য (Consistency) বিদ্যমান।

৪৪. মানুষ মুখমণ্ডলের ওপর কোন আঘাত তখনই গ্রহণ করে যখন সে পুরোপুরি অক্ষম ও নিরুপায় হয়ে পড়ে। অন্যথায় যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে প্রতিরোধের সামান্যতম শক্তিও থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে শরীরের প্রত্যেকটি অংশে আঘাত সহ্য করতে থাকে কিন্তু মুখের ওপর আঘাত লাগতে দেয় না। তাই এখানে ঐ ব্যক্তির চরম অসহায়ত্বের চিত্র অংকন করা হয়েছে এই বলে যে, সে নিজের মুখের ওপর চরম আঘাত সহ্য করবে।

৪৫. মূল আয়াতে كسب শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন মজীদের পরিভাষায় كسب শব্দের অর্থ হচ্ছে ব্যক্তি তার কর্মের ফলশ্রুতি হিসেবে শাস্তি ও পুরস্কারলাভের যে উপযুক্ততা অর্জন করে তাই। সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের আসল উপার্জন হচ্ছে এই যে, সে তার কাজের ফলশ্রুতিতে আল্লাহর কাছে পুরস্কারের যোগ্য হয়ে যায়। আর গোমরাহী ও

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾
قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٢٨﴾ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ
شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ﴿٣١﴾

এ কুরআনের মধ্যে আমি মানুষের জন্য নানা রকমের উপমা পেশ করেছি যাতে তারা সাবধান হয়ে যায়, আরবী ভাষার কুরআন[৪৬]— যাতে কোন বক্রতা নেই।[৪৭] যাতে তারা মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা পায়। আল্লাহ একটি উপমা পেশ করছেন। একজন ক্রীতদাসের—যে কতিপয় রূঢ় চরিত্র প্রভুর মালিকানাভুক্ত, যারা সবাই তাকে নিজের দিকে টানে এবং আরেক ব্যক্তির যে পুরোপুরি একই প্রভুর ক্রীতদাস। এদের দু'জনের অবস্থা কি সমান হতে পারে?[৪৮] সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।[৪৯] কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞতার মধ্যে ডুবে আছে।[৫০] [হে নবী (সা)] তোমাকেও মরতে হবে এবং এসব লোককেও মরতে হবে।[৫১] অবশেষে তোমরা সবাই কিয়ামতের দিন তোমাদের রবের সামনে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করবে।

বিপথগামিতা অবলম্বনকারী ব্যক্তিদের প্রকৃত উপার্জন হচ্ছে, সে শাস্তি যা সে আখেরাতে লাভ করবে।

৪৬. অর্থাৎ এ কিতাব অন্য কোন ভাষায় নাযিল হয়নি যে, তা বুঝার জন্য মক্কা ও আরবের লোকদের কোন অনুবাদক বা ব্যাখ্যাকারের দরকার হয়। এ কিতাব তাদের নিজের ভাষায় নাযিল হয়েছে। যা তারা নিজেরাই সরাসরি বুঝতে সক্ষম।

৪৭. অর্থাৎ তার মধ্যে কোন বক্রতা বা জটিলতাপূর্ণ কোন কথা নেই যে, তা বুঝা সাধারণ মানুষের জন্য কঠিন হবে। বরং এর মধ্যে পরিষ্কারভাবে সহজ-সরল কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি এখান থেকে জেনে নিতে পারে এ গ্রন্থ কোন্ জিনিসকে ভ্রান্ত বলে এবং কেন বলে? কোন্ জিনিসকে সঠিক বলে এবং কিসের ভিত্তিতে? কি স্বীকার করাতে চায় এবং কোন্ জিনিস অস্বীকার করাতে চায়। কোন্ কোন্ কাজের নির্দেশ দেয় এবং কোন্ কোন্ কাজে বাধা দেয়।

৪৮. এ উপমাতে আল্লাহ তা'আলা শিরক ও তাওহীদের পার্থক্য এবং মানব জীবনের ওপর এ দু'টির প্রভাব এমন পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এতো বড় বিষয়কে এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত কথায় এবং এতটা কার্যকর পন্থায় বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। একথা সবাই

স্বীকার করবে যে, যে ব্যক্তি অনেক মালিক বা মনিবের অধীন এবং তারা প্রত্যেকেই তাকে নিজের দিকে টানে। তারা এমন বদমেজাজী যে, প্রত্যেকে তার সেবা গ্রহণ করতে চায় কিন্তু অন্য মালিকের নির্দেশ পালনের সুযোগ তাকে দেয় না, তাছাড়া তাদের পরস্পর বিরোধী নির্দেশ শুনতে গিয়ে যার নির্দেশই সে পালন করতে অপারগ হয় সে তাকে শুধু ধমক ও বকাঝকা দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, বরং শাস্তি দিতেও বদ্ধপরিকর হয়, এমন ব্যক্তির জীবন অনিবার্যরূপেই অত্যন্ত সংকীর্ণতার মধ্যে পতিত হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একই মনিবের চাকর সে ব্যক্তি অতীব আরাম ও শান্তিতে জীবন যাপন করবে। তাকে অন্য কারো খেদমত এবং সন্তোষ বিধান করতে হয় না। এটা এমন সহজ সরল কথা যা বুঝার জন্য বড় বেশী চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন হয় না। এ উপমা পেশ করার পর কারো জন্য একথা বুঝাও কঠিন নয় যে এক আল্লাহর দাসত্বে মানুষের জন্য যে শান্তি ও নিরাপত্তা আছে বহু সংখ্যক ইলাহর দাসত্ব করে কখনো তা লাভ করা যেতে পারে না।

এখানে একথাও ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার যে, পাথরের মূর্তির সাথে বহু সংখ্যক বক্র স্বভাবের এবং পরস্পর কলহপ্রিয় মনিবদের উপমা খাটে না। এ উপমা সেসব জীবন্ত মনিবদের ক্ষেত্রেই খাটে যারা কার্যতই পরস্পর বিরোধী নির্দেশ দান করে এবং বাস্তবেও তাকে নিজের দিকে টানতে থাকে। পাথরের মূর্তি কাকে কবে আদেশ দেয় এবং কাকে কখন নিজের খেদমতের জন্য ডাকে? এ তো জীবন্ত মনিবদের কাজ। মানুষের নিজের প্রবৃত্তির মধ্যে এক মনিব বসে আছে। সে নানা রকমের ইচ্ছা-আকাংখা তার সামনে পেশ করে এবং তা পূরণ করতে বাধ্য করে। আরো অসংখ্য মনিব ও প্রভু আছে। তারা ঘরের মধ্যে, বংশের মধ্যে, জ্ঞাতি-গোষ্ঠির মধ্যে, জাতি ও দেশের সমাজের মধ্যে, ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে, শাসক ও আইন প্রণেতাদের মধ্যে, কায়কারবার ও জীবিকার গণ্ডির মধ্যে এবং পৃথিবীর সভ্যতার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিসমূহের মধ্যে সর্বত্র বিদ্যমান। তাদের পরস্পর বিরোধী আকাংখা ও বিভিন্ন দাবী মানুষকে সবসময় নিজের দিকে টানতে থাকে। সে তাদের যার আকাংখা ও দাবী পূরণ করতে ব্যর্থ হয় সে তাকে নিজের কর্মের গণ্ডির মধ্যে শাস্তি না দিয়ে ছাড়ে না। তবে প্রত্যেকের শাস্তির উপকরণ ভিন্ন ভিন্ন। কেউ মনে আঘাত দেয়, কেউ অসন্তুষ্ট হয়, কেউ উপহাস করে, কেউ সম্পর্ক ছিন্ন করে। কেউ নির্বোধ বলে আখ্যায়িত করে, কেউ ধর্মের ওপর আক্রমণ করে এবং কেউ আইনের আশ্রয় নিয়ে শাস্তি দেয়। মানুষের জন্য এ সংকীর্ণতা থেকে বাঁচার একটিই মাত্র উপায় আছে। আর তা হচ্ছে তাওহীদের পথ গ্রহণ করে শুধু এক আল্লাহর বান্দা হয়ে যাওয়া এবং গলদেশ থেকে অন্যদের দাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়ে দূরে নিক্ষেপ করা।

তাওহীদের পথ অবলম্বন করারও দু'টি পন্থা আছে এবং এর ফলাফলও ভিন্ন ভিন্ন।

একটি পন্থা এই যে, কেউ ব্যক্তিগত পর্যায়ে এক আল্লাহর বান্দা হয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেবে কিন্তু আশে-পাশের পরিবেশ তার সহযোগী হবে না। এ ক্ষেত্রে তার জন্য বাইরের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংকীর্ণতা আগের চেয়েও বেড়ে যেতে পারে। তবে সে যদি সরল মনে এ পথ অবলম্বন করে থাকে তাহলে মনের দিক দিয়ে শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করবে। সে প্রবৃত্তির এমন প্রতিটি আকাংখা প্রত্যাখ্যান করবে যা আল্লাহর নির্দেশের পরিপন্থী বা যা পূরণ করার পাশাপাশি আল্লাহভীরুতার দাবী পূরণ করা যেতে পারে না। সে পরিবার, গোত্র, গোষ্ঠী, জাতি, সরকার, ধর্মীয় নেতৃত্ব এবং আর্থিক কর্তৃত্বেরও এমন কোন দাবী গ্রহণ করবে না

যা আল্লাহর আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। এর ফলে সে সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হতে পারে তথা অনিবার্যরূপেই হবে কিন্তু তার মন এ ব্যাপারে পুরোপুরি পরিতৃপ্ত থাকবে যে, আমি যে আল্লাহর বান্দা তার দাসত্বের দাবী আমি সম্পূর্ণরূপে পূরণ করছি। আর আমি যাদের বান্দা নই আমার কাছে তাদের এমন কোন অধিকার নেই, যে কারণে আমি আমার রবের নির্দেশের বিরুদ্ধে তাদের দাসত্ব করবো। দুনিয়ার কোন শক্তিই তার থেকে মনের এ প্রশান্তি এবং আত্মার এ শান্তি ও তৃপ্তি ছিনিয়ে নিতে পারে না। এমনকি তাকে যদি ফাঁসি কাষ্ঠেও চড়তে হয় তাহলে সে প্রশান্ত মনে ফাঁসি কাষ্ঠেও ঝুলে যাবে। সে একথা ভেবে সামান্য অনুশোচনাও করবে না যে, আমি কেন মিথ্যা প্রভুদের সামনে মাথা নত করে আমার জীবন রক্ষা করলাম না।

আরেকটি পন্থা এই যে, গোটা সমাজ তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাক এবং সেখানে নৈতিক চরিত্র, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ধর্ম, আইন-কানুন, রীতিনীতি ও দেশাচার, রাজনীতি, অর্থনীতি মোট কথা জীবনের প্রতিটি বিভাগের জন্য আকীদা-বিশ্বাস হিসেবে সেসব মূলনীতি মেনে নেয়া হোক এবং কার্যত চালু করা হোক যা মহান আল্লাহ তাঁর কিতাব ও রসূলের মাধ্যমে দিয়েছেন। আল্লাহর দীন যেটিকে গোনাহ বলবে আইন সেটিকেই অপরাধ হিসেবে গণ্য করবে, সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সেগুলোকে উৎখাত করার চেষ্টা করবে, শিক্ষা-দীক্ষা সেটি থেকে বাঁচার জন্য মন-মানসিকতা তৈরী করবে। মিম্বার ও মিহরাব থেকে এর বিরুদ্ধেই আওয়াজ উঠবে, সমাজ এটিকে দোষণীয় মনে করবে এবং জীবিকা অর্জনের প্রতিটি কায়-কারবারে তা নিষিদ্ধ হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহর দীন যে জিনিসকে কল্যাণ ও সুকৃতি হিসেবে আখ্যায়িত করবে আইন তাকেই সমর্থন করবে। ব্যবস্থাপনার শক্তি তার লালন-পালন করবে। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা মন-মগজে সেটিকে বদ্ধমূল করতে এবং চরিত্র ও কর্মে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করবে। মিম্বর ও মিহরাব তারই শিক্ষা দেবে, সমাজও তারই প্রশংসা করবে। তার ওপরেই প্রচলিত রীতিনীতি কার্যত প্রতিষ্ঠিত করবে এবং কায়-কারবার ও জীবন জীবিকার প্রক্রিয়াও সে অনুসারেই চলবে। এভাবেই মানুষ পূর্ণ আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শান্তি লাভ করে এবং বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সমস্ত দরজা তার জন্য খুলে যায়। কারণ, আল্লাহ ও গায়রুল্লাহর দাসত্বের দাবীর যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত তা তখন প্রায় শেষ হয়ে যায়।

ইসলাম যদিও প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই বলে আহবান জানায় যে, দ্বিতীয় অবস্থাটা সৃষ্টি হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় সে তাওহীদকেই তার আদর্শ হিসেবে মেনে চলবে এবং সব রকম বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টের মোকাবিলা করে আল্লাহর দাসত্ব করবে। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ এ দ্বিতীয় অবস্থা সৃষ্টি করা। সমস্ত নবী ও রসূল আলাইহিমুস সালামের প্রচেষ্টা ও দাবীও এই যে, একটি মুসলিম উম্মাহর উত্থান ঘটুক যারা কুফর ও কাফেরদের আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে জামায়াত বদ্ধভাবে আল্লাহর দীন অনুসরণ করবে। কুরআন ও সুন্নাত সম্পর্কে অজ্ঞ এবং বিবেক-বুদ্ধিহীন না হয়ে কেউই একথা বলতে পারে না যে, নবী রসূল আলাইহিমুস সালামের চেষ্টা-সাধনার লক্ষ ছিল শুধু ব্যক্তিগত ঈমান ও আনুগত্য। সামাজিক জীবনে 'দীনে হক' বা ন্যায় ও সত্যের আদর্শ কায়েম করার উদ্দেশ্য আদৌ তাঁদের ছিল না।

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ
أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ
بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾

৪ রুকূ'

সে ব্যক্তির চাইতে বড় জালেম আর কে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে এবং তার সামনে যখন সত্য এসেছে তখন তা অস্বীকার করেছে? এসব কাফেরের জন্য কি জাহান্নামে কোন জায়গা নেই? আর যে ব্যক্তি সত্য নিয়ে এসেছে এবং যারা তাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে তারাই আযাব থেকে রক্ষা পাবে।[৫২]

৪৯. এখানে "আলহামদুলিল্লাহ" এর অর্থ বুঝার জন্য মনের মধ্যে এ চিত্রটি অংকন করুন যে, শ্রোতাদের সামনে উপরোক্ত প্রশ্ন পেশ করার পর বক্তা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন যাতে তাওহীদের বিরোধিতাকারীদের কাছে তার কোন জবাব থাকলে যেন দিতে পারে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে যখন কোন জবাব আসলো না এবং কোন দিক থেকে এ জবাবও আসলো না যে, দু'টি সমান, তখন বক্তা বললেন 'আলহামদুলিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর শুকরিয়া যে তোমরা নিজেরাও মনে মনে এ দু'টি অবস্থার পার্থক্য অনুভব করে থাকো। একজন মনিবের দাসত্বের চেয়ে অনেক মনিবের দাসত্ব উত্তম বা দু'টি সমান পর্যায়ের একথা বলার ধৃষ্টতা তোমাদের কারোই নেই।

৫০. অর্থাৎ একজন মনিবের দাসত্ব ও বহু সংখ্যক মনিবের দাসত্বের মধ্যকার পার্থক্য তো বেশ বুঝতে পার কিন্তু এক প্রভুর দাসত্ব ও বহু সংখ্যক প্রভুর দাসত্বের মধ্যকার পার্থক্য যখন বুঝানোর চেষ্টা করা হয় তখন অজ্ঞ সেজে বসো।

৫১. এ বাক্যাংশ ও পূর্ববর্তী বাক্যাংশের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম শূন্যতা আছে যা স্থান কাল ও পূর্বাপর বিষয়ে চিন্তা করে যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজেই পূর্ণ করতে পারেন। এখানে এ বিষয়টি প্রচ্ছন্ন আছে যে, তোমরা এভাবে একটি পরিষ্কার সহজ-সরল কথা সহজ-সরল উপায়ে এসব লোককে বুঝাচ্ছো আর এরা হঠকারিতা করে তোমাদের কথা শুধু প্রত্যাখ্যানই করছে না বরং এ সুস্পষ্ট সত্যকে পরাভূত করার জন্য তোমাদের চরম শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিক আছে! চিরদিন তোমরাও থাকবে না, এরাও থাকবে না। একদিন উভয়কেই মরতে হবে। তখন সবাই যার যার পরিণাম জানতে পারবে।

৫২. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার আদালতে যে মোকদ্দমা দায়ের হবে তাতে কোন্ লোকেরা শাস্তি লাভ করবে তা তোমরা আজই শুনে নাও। তাতে নিশ্চিতভাবে সে লোকেরাই শাস্তি পাবে যারা এ মিথ্যা আকীদা গড়ে নিয়েছিলো যে, আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, ইখতিয়ার এবং অধিকারে অন্য কিছু সত্তাও শরীক আছে। তাদের আরো বড় অপরাধ ছিল এই যে, তাদের সামনে সত্য পেশ করা হয়েছে কিন্তু তারা তা মানেনি। বরং যিনি সত্য পেশ করেছেন উল্টো তাকেই মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছে।

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٤﴾ لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ
عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِيْ كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٥﴾ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ۭ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ
دُوْنِهٖ ۭ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾ وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ
مُّضِلٍّ ۭ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾

তারা তাদের রবের কাছে যা চাইবে তা-ই পাবে।[৫৩] এটা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান। যাতে সর্বাপেক্ষা খারাপ যেসব কাজ তারা করেছে আল্লাহ তাদের হিসেব থেকে সেগুলো বাদ দেন এবং যেসব ভাল কাজ তারা করেছে তার বিনিময়ে তাদেরকে পুরস্কার দান করেন।[৫৪]

[হে নবী, (সা)] আল্লাহ নিজে কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? এসব লোক তাঁকে বাদ দিয়ে তোমাদেরকে অন্যদের ভয় দেখায়।[৫৫] অথচ আল্লাহ যাকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেন তাকে কেউ পথপ্রদর্শন করতে পারে না, আর যাকে তিনি পথপ্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ কি মহা পরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন?[৫৬]

পক্ষান্তরে যিনি সত্য এনেছেন আর যারা তা সত্য বলে মেনে নিয়েছে আল্লাহর আদালতে তাদের শাস্তি পাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

৫৩. একথা লক্ষ রাখতে হবে যে, এখানে فِى الْجَنَّة (জান্নাতে) না বলে عِنْدَ رَبِّهِمْ (তাদের রবের কাছে) কথাটি বলা হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট যে মৃত্যুর পরেই কেবল বান্দা তার রবের কাছে পৌছে। তাই জান্নাতে পৌছার পর এ আচরণ করা হবে না। বরং মৃত্যুর পর থেকে জান্নাতে প্রবেশ পর্যন্ত সময়েও মু'মিন নেক্কার বান্দার সাথে আল্লাহ তা'আলা এ আচরণ করবেন। এটাই আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় বলে মনে হয়। ঈমানদার সৎকর্মশীল বান্দা বরযখের আযাব থেকে, কিয়ামতের দিনের কষ্ট থেকে, হিসেবের কঠোরতা থেকে, হাশরের ময়দানের অপমান থেকে এবং নিজের দুর্বলতা ও অপরাধের কারণে পাকড়াও থেকে অবশ্যই রক্ষা পেতে চাইবে, আর মহিমান্বিত আল্লাহ তার এসব আকাংখা পূরণ করবেন।

৫৪. যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান এনেছিলো তাদের দ্বারা জাহেলী যুগে আকীদাগত ও চরিত্রগত উভয় ধরনের জঘন্যতম গোনাহর কাজও সংঘটিত হয়েছিল। ঈমান গ্রহণের পর তারা যে শুধু পূর্ব অনুসৃত মিথ্যা পরিত্যাগ করে

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلْ
أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ
كٰشِفٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهِۦ ۚ قُلْ
حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوا عَلٰى
مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ
وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ
بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهِۦ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ
وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾

তোমরা যদি এদের জিজ্ঞেস করো যমীন ও আসমান কে সৃষ্টি করেছে? তাহলে এরা নিজেরাই বলবে, আল্লাহ। এদের বলে দাও, বাস্তব ও সত্য যখন এই তখন আল্লাহ যদি আমার ক্ষতি করতে চান তাহলে আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব দেবীদের তোমরা পূজা করো তারা কি তাঁর ক্ষতির হাত থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারবে? কিংবা আল্লাহ যদি আমাকে রহমত দান করতে চান তাহলে এরা কি তাঁর রহমত ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? তাদের বলে দাও, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসাকারীরা তারই ওপর ভরসা করে।[৫৭] তাদেরকে পরিষ্কার করে বলে দাও হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা তোমাদের কাজ করতে থাকো।[৫৮] আমি আমার কাজ করে যাবো। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কার ওপর লাঞ্ছনাকর আযাব আসে এবং কে চিরস্থায়ী আযাবে নিক্ষিপ্ত হয়। [হে নবী (সা)] আমি সব মানুষের জন্য এ সত্য (বিধান সহ) কিতাব নাযিল করেছি। সুতরাং যে সোজা পথ অনুসরণ করবে সে নিজের জন্যই করবে। আর যে পথভ্রষ্ট হবে তার পথভ্রষ্টতার প্রতিফলও তাকেই ভোগ করতে হবে। তার জন্য তুমি দায়ী হবে না।[৫৯]

নবীর (সা) পেশকৃত সত্যকে গ্রহণ করেছিলো এবং এটিই তাদের একমাত্র নেকীর কাজছিল তাই নয়, বরং তারা নৈতিক চরিত্র, ইবাদাত এবং পারস্পরিক লেনদেন ও আচার আচরণের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম নেক আমল করেছিলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ জাহেলী যুগে তাদের দ্বারা যেসব জঘন্যতম কাজকর্ম সংঘটিত হয়েছিলো তাদের হিসেব থেকে তা

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ
فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ
مُّسَمًّى ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٢﴾

৫ রুকূ'

মৃত্যুর সময় আল্লাহই রূহসমূহ কবজ করেন আর যে এখনো মরেনি নিদ্রাবস্থায় তার রূহ কবজ করেন।[৬০] অতপর যার মৃত্যুর ফায়সালা কার্যকরী হয় তাকে রেখে দেন এবং অন্যদের রূহ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফেরত পাঠান। যারা চিন্তা-ভাবনা করে তাদের জন্য এর মধ্যে বড় নিদর্শন রয়েছে।[৬১]

মুছে দেয়া হবে এবং তাদের আমলনামায় সর্বোত্তম যেসব নেক আমল থাকবে তার হিসেবে তাদেরকে পুরস্কার দেয়া হবে।

৫৫. মক্কার কাফেররা নবীকে (সা) বলতো, তুমি আমাদের উপাস্যদের সাথে বেআদবী করে থাকো এবং তাদের বিরুদ্ধে কথা বলে থাকো। তারা কত বড় সম্মানিত সত্তা তা তুমি জানো না। যে-ই তাদের অবমাননা ও অপমান করেছে সে-ই ধ্বংস হয়েছে। তুমি যদি তোমার কথাবার্তা থেকে বিরত না হও তাহলে এরা তোমাকে ধ্বংস করে ছাড়বে।

৫৬. অর্থাৎ এটাও তাদের হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলশ্রুতি। কারণ এসব উপাস্যদের শক্তি ও মর্যাদার প্রতি এসব নির্বোধদের ভাল খেয়াল আছে। কিন্তু এ খেয়াল তাদের কখনো আসে না যে, আল্লাহ এক মহা পরাক্রমশালী সত্তা, শিরক করে এরা তাঁর যে অপমান ও অবমাননা করছে সে জন্যও শাস্তি হতে পারে।

৫৭. ইবনে আবী হাতেম ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাদীস উদ্বৃত করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

من احب ان يكون اقوى الناس فليتوكل على اللّه ، ومن احب ان يكون اغنى الناس فليكن بما فى يد اللّه عز وجل اوثق منه بما فى يديه ، ومن احب ان يكون اكرم الناس فليتق اللّه عز وجل –

"যে ব্যক্তি সব মানুষের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হতে চায় সে যেন আল্লাহর ওপর 'তাওয়াক্কুল' করে, যে ব্যক্তি সবার চেয়ে অধিক ধনবান হতে চায় সে যেন তার নিজের কাছে যা আছে তার চেয়ে আল্লাহর কাছে যা আছে তার ওপর বেশী আস্থা ও নির্ভরতা রাখে, আর যে ব্যক্তি সবার চেয়ে বেশী মর্যাদার অধিকারী হতে চায় সে যেন মহান আল্লাহকে ভয় করে।"

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾ قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾

এসব লোক কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে সুপারিশকারী বানিয়ে রেখেছে?[৬২] তাদেরকে বলো, তাদের ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে যদি কিছু না থাকে এবং তারা কিছু না বুঝে এমতাবস্থায়ও কি সুপারিশ করবে? বলো, সুপারিশ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইখতিয়ারাধীন।[৬৩] আসমান ও যমীনের বাদশাহীর মালিক তিনিই। তোমাদেরকে তারই দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

৫৮. অর্থাৎ আমাকে পরাভূত করার জন্য তোমরা যা কিছু করছো এবং যা কিছু করতে সক্ষম তা করে যাও, এ ব্যাপারে কোন কসুর করো না।

৫৯. অর্থাৎ তাদের সঠিক পথে নিয়ে আসা তোমার দায়িত্ব নয়। তোমার কাজ শুধু এই যে, তাদের সামনে সত্য পথটি পেশ করো। এরপর যদি তারা পথভ্রষ্ট থেকে যায় তাতে তোমার কোন দায়িত্ব নেই।

৬০. ঘুমন্ত অবস্থায় রূহ কবজ করার অর্থ অনুভূতি ও বোধ, উপলব্ধি ও অনুধাবন এবং ক্ষমতা ও ইচ্ছা নিষ্ক্রিয় করে দেয়া। এটা এমন এক অবস্থা যে "ঘুমন্ত মানুষ ও মৃত মানুষ সমান" এ প্রবাদ বাক্যটি এ ক্ষেত্রে হুবহু খাটে।

৬১. একথা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে এ অনুভূতি দিতে চাচ্ছেন যে, জীবন ও মৃত্যু কিভাবে তাঁর অসীম ক্ষমতার করায়ত্ব। রাতে ঘুমালে সকালে অবশ্যই জীবিত উঠবে এ নিশ্চয়তা কোন মানুষের জন্যই নেই। কেউ–ই জানে না এক মুহূর্তের মধ্যে তার ওপর কি বিপদ আসতে পারে। আবার পরবর্তী মুহূর্তটি তার জন্য জীবনের মুহূর্ত না মৃত্যুর মুহূর্ত তাও কেউ জানে না। শয়নে, জাগরনে, ঘরে অবস্থানের সময় কিংবা কোথাও চলাফেরা করার সময় মানব দেহের আভ্যন্তরীণ কোন ত্রুটি অথবা বাইরের অজানা কোন বিপদ অকস্মাত এমন মোড় নিতে পারে যা তার মৃত্যু ঘটাতে পারে। যে মানুষ আল্লাহর হাতে এতটা অসহায় সে যদি সেই আল্লাহ সম্পর্কে এতটা অমনোযোগী ও বিদ্রোহী হয় তাহলে সে কত অজ্ঞ।

৬২. অর্থাৎ এসব লোক নিজের পক্ষ থেকেই ধরে নিয়েছে যে, কিছু সত্তা এমন আছে যারা আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত ক্ষমতাধর। তাদের সুপারিশ কখনো বিফলে যায় না। অথচ তারা যে সুপারিশকারী এ ব্যাপারে না আছে কোন প্রমাণ, না আল্লাহ তা'আলা কখনো বলেছেন যে, আমার দরবারে তাদের এ ধরনের মর্যাদা রয়েছে, না ঐ সব সত্তা ও ব্যক্তিবর্গ দাবী করেছেন যে আমরা নিজেদের ক্ষমতায় তোমাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করে দেবো। তাদের আরো নির্বুদ্ধিতা এই যে, তারা প্রকৃত মালিককে বাদ দিয়ে সব অনুমানকৃত

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ
وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾ قُلِ اللَّهُمَّ
فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ
بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾

যখন শুধু আল্লাহর কথা বলা হয়, তখন যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না! তাদের মন কষ্ট অনুভব করে। আর যখন তাকে বাদ দিয়ে অন্যদের কথা বলা হয় তখন তারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।[৬৬] বলো, হে আল্লাহ, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী, তোমার বান্দারা যেসব বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করে আসছে তুমিই সে বিষয়ে ফায়সালা করবে।

সুপারিশকারীদেরই সবকিছু মনে করে নিয়েছে এবং এদের সকল সবিনয় প্রার্থনা ও আকুতি তাদের জন্যই নিবেদিত।

৬৩. অর্থাৎ সুপারিশ গ্রহণ করানোর ক্ষমতা তো দূরের কথা নিজে নিজেই আল্লাহর দরবারে সুপারিশকারী হিসেবে যাবে সে শক্তিও কারো নেই। যাকে ইচ্ছা সুপারিশের অনুমতি দেয়া ও যাকে ইচ্ছা না দেয়া এবং যার জন্য ইচ্ছা সুপারিশ করতে দেয়া আর যার জন্য ইচ্ছা করতে না দেয়া সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইখতিয়ারে। (শাফা'আত সম্পর্কে ইসলামী আকীদা ও শিরকমূলক আকীদার পার্থক্য বুঝার জন্য নিম্নোদ্ধৃত স্থানসমূহে দেখুন। তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, টীকা ২৮১; আল আন'আম, টীকা ৩৩; ইউনুস, টীকা ৫ ও ২৪; হূদ, টীকা ৮৪ ও ১০৬; আর রা'দ, টীকা ১৯; আন নাহল, টীকা ৬৪, ৬৫,৭৯; ত্বা-হা, টীকা ৮৫ ও ৮৬; আল আম্বিয়া, টীকা ২৭; আল হাজ্জ, টীকা ১২৫; আস সাবা, টীকা ৪০)

৬৪. গোটা পৃথিবীর মুশরেকী রুচি ও ধ্যান-ধারণার অধিকারী প্রায় সব মানুষের মধ্যেই এটি বিদ্যমান। এমনকি মুসলমানদের মধ্যেও যে দুর্ভাগাদের এ রোগ পেয়ে বসেছে তারাও এ দোষ থেকে মুক্ত নয়। মুখে বলে আমরা আল্লাহকে মানি। কিন্তু অবস্থা এই যে, শুধু আল্লাহর কথা বলুন, দেখবেন তাদের চেহারা বিকৃত হতে শুরু হয়েছে। এরা বলে বসবে। এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই বুযুর্গ ও আওলিয়াদের মানে না। সে জন্য শুধু আল্লাহর কথাই আওড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যদের কথাও বলা হয় তাহলে আনন্দে ও প্রফুল্লতায় তাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে তাদের আগ্রহ ও ভালবাসা কার প্রতি তা এ কর্মপন্থার মাধ্যমেই পরিষ্কার প্রকাশ পায়। আল্লামা আলূসী তাফসীরে রূহল মা'আনীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাঁর নিজের একটি অভিজ্ঞতার বিষয় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ একদিন আমি দেখলাম, কোন বিপদে পড়ে এক ব্যক্তি সাহায্যের জন্য এক মৃত বুযুর্গকে ডাকছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর বান্দা, আল্লাহকে ডাকো। আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ
مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا
يَحْتَسِبُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ
يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤٨﴾ فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ
نِعْمَةً مِّنَّا ۙ قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ؕ بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٩﴾

এসব জালেমদের কাছে যদি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদরাজি এবং তাছাড়া আরো অতটা সম্পদও থাকে তাহলে কিয়ামতের ভীষণ আযাব থেকে বাঁচার জন্য তারা মুক্তিপণ হিসেবে সমস্ত সম্পদ দিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। সেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু তাদের সামনে আসবে যা তারা কোন দিন অনুমানও করেনি। সেখানে তাদের সামনে নিজেদের কৃতকর্মের সমস্ত মন্দ ফলাফল প্রকাশ হয়ে পড়বে। আর যে জিনিস সম্পর্কে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো তা-ই তাদের ওপর চেপে বসবে।

এ মানুষকেই[৬৫] যখন সামান্য মসিবতে পেয়ে বসে তখন সে আমাকে ডাকে। কিন্তু আমি যখন নিজের পক্ষ থেকে নিয়ামত দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করি তখন সে বলে ওঠে ঃ এসব তো আমি আমার জ্ঞান-বুদ্ধির জোরে লাভ করেছি।[৬৬] না, এটা বরং পরীক্ষা। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।[৬৭]

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ

—আমার একথা শুনে সে ভীষণ চটে গেল। পরে লোকজন আমাকে বলেছে, সে বলছিলো ঃ এ ব্যক্তি আওলিয়াদের মানে না। তাছাড়া কিছু সংখ্যক লোক তাকে একথাও বলতে শুনেছে যে, অলীরা আল্লাহর চাইতে দ্রুত শুনে থাকেন।

৬৫. অর্থাৎ যার আল্লাহর নাম অপছন্দনীয় এবং একমাত্র আল্লাহর নামে যার চেহারা বিকৃত হতে শুরু করে।

৬৬. এ আয়াতাংশটির দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে, আমি যে, এ নিয়ামতের উপযুক্ত তা আল্লাহ জানেন। তাই তিনি আমাকে এসব দিয়েছেন। আমি যদি তার কাছে একজন দুষ্ট ভ্রষ্ট আকীদা এবং দুষ্কর্মশীল মানুষ হতাম তাহলে আমাকে তিনি এসব

قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٥٠﴾
فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۚ وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰٓؤُلَآءِ
سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۙ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٥١﴾ اَوَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ
اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾

তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও একথাই বলেছিলো। কিন্তু তারা নিজেদের কর্ম দ্বারা যা অর্জন করেছিল তা তাদের কোন কাজে আসেনি।[৬৮] অতপর নিজেদের উপার্জনের মন্দ ফলাফল তারা ভোগ করেছে। এদের মধ্যেও যারা জালেম তারা অচিরেই তাদের উপার্জনের মন্দ ফলাফল ভোগ করবে। এরা আমাকে অক্ষম করে দিতে পারবে না। তারা কি জানে না, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা তার রিযিক সংকীর্ণ করে দেন?[৬৯] এর মধ্যে সেসব লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা ঈমান পোষণ করে।

নিয়ামত কেন দিতেন? এর আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, এসব তো আমি আমার যোগ্যতার ভিত্তিতে লাভ করেছি।

৬৭. কেউ যদি নিয়ামত লাভ করতে থাকে তখন মানুষ তার মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে মনে করে, সে অনিবার্যরূপে তার যোগ্যতার ভিত্তিতেই তা লাভ করছে আর তা লাভ করাটা আল্লাহর দরবারে তার প্রিয়পাত্র হওয়ার লক্ষণ বা প্রমাণ। অথচ এখানে যাকেই যা কিছু দেয়া হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা হিসেবেই দেয়া হচ্ছে। এটা পরীক্ষার উপকরণ, যোগ্যতার পুরস্কার নয়। অন্যথায় কি কারণে বহু যোগ্য লোক দুর্দশাগ্রস্ত এবং বহু অযোগ্য লোক নিয়ামতের প্রাচুর্যে ডুবে আছে? অনুরূপভাবে এসব পার্থিব নিয়ামত আল্লাহর দরবারে প্রিয়পাত্র হওয়ারও লক্ষণ নয়। যে কোন ব্যক্তি দেখবেন, পৃথিবীতে বহু সৎকর্মশীল ব্যক্তি বিপদাপদে ডুবে আছে, অথচ তাদের সৎকর্মশীল হওয়া অস্বীকার করা যায় না। আবার বহু দুশ্চরিত্র লোক আরাম আয়েশে জীবন কাটাচ্ছে যাদের কুৎসিত আচরণ ও তৎপরতা সম্পর্কে সবাই অবহিত। এখন কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি কি একজনের বিপদাপদ এবং আরেকজনের আরাম-আয়েশকে একথার প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে যে, আল্লাহ সৎকর্মশীল মানুষদের পছন্দ করেন না, দুশ্চরিত্র ও দুষ্কর্মশীল মানুষদের পছন্দ করেন?

৬৮. অর্থাৎ যখন দুর্ভাগ্যের দিন আসলো তখন তাদের যোগ্যতার দাবী কোন কাজে লাগলো না। তাছাড়া একথাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা ছিলো

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٣﴾ وَاَنِيْبُوْٓا
اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا
تُنْصَرُوْنَ ﴿٥٤﴾ وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ
اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿٥٥﴾ اَنْ تَقُوْلَ
نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ
السّٰخِرِيْنَ ﴿٥٦﴾ اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٥٧﴾

৬ রুকূ'

(হে নবী,) বলে দাও, হে আমার বান্দারা[৭০] যারা নিজের আত্মার ওপর জুলুম করেছো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[৭১] ফিরে এসো তোমাদের রবের দিকে এবং তাঁর অনুগত হয়ে যাও তোমাদের ওপর আযাব আসার পূর্বেই। তখন কোন দিক থেকেই আর সাহায্য পাওয়া যাবে না। আর অনুসরণ করো তোমাদের রবের প্রেরিত কিতাবের সর্বোত্তম দিকগুলোর[৭২]—তোমাদের ওপর আকস্মিকভাবে আযাব আসার পূর্বেই—যে আযাব সম্পর্কে তোমরা অনবহিত থাকবে। এমন যেন না হয় যে, পরে কেউ বলবে ঃ "আমি আল্লাহর ব্যাপারে যে অপরাধ করেছি সে জন্য আফসোস। বরং আমি তো বিদ্রূপকারীদের মধ্যে শামিল ছিলাম।" অথবা বলবে ঃ "কতই না ভাল হতো যদি আল্লাহ আমাকে হিদায়াত দান করতেন। তাহলে আমিও মুত্তাকীদের অন্তরভুক্ত থাকতাম।"

না। একথা স্পষ্ট যে তাদের এসব উপার্জন যদি যোগ্যতা ও প্রিয়পাত্র হওয়ার কারণে হতো তাহলে দুর্দিন কি করে আসলো?

৬৯. অর্থাৎ রিযিকের স্বল্পতা ও প্রাচুর্য আল্লাহর আরেকটি বিধানের ওপর নির্ভরশীল। সেই বিধানের উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ ভিন্ন। রিযিকের বন্টন ব্যক্তির যোগ্যতা কিংবা তার প্রিয়পাত্র বা বিরাগভাজন হওয়ার ওপর আদৌ নির্ভর করে না। (এ বিষয়টি বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আত-তাওবা, টীকা ৫৪, ৭৫, ৮৯; ইউনুস,

টীকা ২৩; হূদ, টীকা ৩ ও ৩৩; আর রা'দ, টীকা ৪২; আল কাহাফ, টীকা ৩৭; মারয়াম, টীকা ৪৫; ত্বা-হা, টীকা ১১৩ ও ১১৪; আল আম্বিয়া, টীকা ৯৯; আল মু'মিনূন, ভূমিকা এবং টীকা ১, ৪৯ ও ৫০; আশ্ শু'য়ারা, টীকা ৮১ ও ৮৪; আল কাসাস, টীকা ৯৭, ৯৮ ও ১০১; সাবা টীকা ৫৪ থেকে ৬০)।

৭০. কেউ কেউ একথাটির অদ্ভুত এক ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে "হে আমার বান্দারা", বলে মানুষকে সম্বোধন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই সব মানুষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বান্দা। প্রকৃতপক্ষে এটা এমন এক ব্যাখ্যা যাকে ব্যাখ্যা নয় বরং কুরআন মজীদের জঘন্যতম অর্থ বিকৃতি এবং আল্লাহর বাণীর সাথে তামাসা বলতে হবে। মূর্খ ভক্তদের কোন গোষ্ঠি এ বিষয়টি শুনে তো সমর্থনে মাথা নাড়তে থাকবে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা সঠিক হলে গোটা কুরআনই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। কেননা, কুরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষকে একমাত্র আল্লাহর বান্দা হিসেবে আখ্যায়িত করে। তাছাড়া কুরআনের দাওয়াতই হচ্ছে, তোমরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ছিলেন আল্লাহর বান্দা। আল্লাহ তাকে প্রভু নয় রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তিনি নিজেও আল্লাহর দাসত্ব করবেন এবং মানুষকেও তাঁরই দাসত্বের শিক্ষা দেবেন। কোন বুদ্ধিমান মানুষের মগজে একথা কি করে আসতে পারে যে, মক্কায় কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের মাঝে দাঁড়িয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন হয়তো হঠাৎ একথা ঘোষণা করে দিয়ে থাকবেন যে, তোমরা উয্যা বা সূর্যের দাস নও, প্রকৃতপক্ষে তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাস। اعاذنا الله من ذلك

৭১. এখানে সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। শুধু ঈমানদারদের সম্বোধন করা হয়েছে একথা বলার কোন উপযুক্ত প্রমাণ নেই। তাছাড়া আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন, গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করে একথা বলার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাওবা ও অনুশোচনা ছাড়াই সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন। পরবর্তী আয়াতটিতে আল্লাহ নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, গোনাহ মাফের উপায় হচ্ছে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের দিকে ফিরে আসা এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বাণীর অনুসরণ করা। এ আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে সেসব লোকের জন্য আশার বাণী বয়ে এনেছিলো যারা জাহেলী যুগে হত্যা, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি এবং এ ধরনের বড় বড় গোনাহর কাজে লিপ্ত ছিল আর এসব অপরাধ যে কখনো মাফ হতে পারে সে ব্যাপারে নিরাশ ছিল। তাদের বলা হয়েছে, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। তোমরা যা কিছুই করেছো এখনো যদি তোমাদের রবের আনুগত্যের দিকে ফিরে আস তাহলে সবকিছু মাফ হয়ে যাবে। ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদা (রা), মুজাহিদ (র) ও ইবনে যায়েদ (র) এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। (ইবনে জারীর, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী) আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, সূরা আল ফুরকান, টীকা ৮৪।

৭২. আল্লাহর কিতাবের সর্বোত্তম দিকসমূহ অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যেসব কাজের নির্দেশ দিয়েছেন মানুষ তা পালন করবে। তিনি যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকবে। এবং উপমা ও কিসসা-কাহিনীতে যা বলেছেন

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾
بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ
مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ
وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾
وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ لَهُ
مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٣﴾

কিংবা আযাব দেখতে পেয়ে বলবে ঃ "কতই না ভাল হতো যদি আরো একবার সুযোগ পেতাম তাহলে নেক আমলকারীদের অন্তরভুক্ত হয়ে যেতাম।" (আর সে সময় যদি এ জওয়াব দেয়া হয়) কেন নয়, আমার আয়াতসমূহ তোমার কাছে এসেছিলো। কিন্তু তুমি তা অস্বীকার করেছিলে এবং গর্ব করেছিলে। আর তুমি তো কাফেরদের অন্তরভুক্ত ছিলে। আজ যেসব লোক আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে কিয়ামতের দিন তুমি দেখবে তাদের মুখমণ্ডল হবে কাল। অহংকারীদের জন্য কি জাহান্নামে যথেষ্ট জায়গা নেই? অন্যদিকে যেসব লোক এখানে তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদেরকে আল্লাহ তাদের সাফল্যের পন্থা অবলম্বনের জন্যই নাজাত দেবেন। কোন অকল্যাণ তাদেরকে স্পর্শ করবে না এবং তারা দুঃখ ভারাক্রান্তও হবে না।

আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর রক্ষক।[৭৩] যমীন ও আসমানের ভাণ্ডারের চাবিসমূহ তাঁরই কাছে। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করে তারাই ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

তা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করবে। অপরদিকে যে ব্যক্তি তাঁর নির্দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, নিষিদ্ধ কাজসমূহ করে এবং আল্লাহর উপদেশ বাণীর কানা কড়িও মূল্য দেয় না, সে আল্লাহর কিতাবের নিকৃষ্টতম দিক গ্রহণ করে। অর্থাৎ সে এমন দিক গ্রহণ করে যাকে আল্লাহর কিতাব নিকৃষ্টতম দিক বলে আখ্যায়িত করে।

قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ أُوحِيَ
إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾
وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۖ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾

৭ রুকূ'

(হে নবী,) এদের বলে দাও, "হে মূর্খেরা, তাহলে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো দাসত্ব করতে বলো আমাকে?" (তোমার উচিত তাদের একথা স্পষ্ট বলে দেয়া। কারণ) তোমার কাছে এবং ইতিপূর্বেকার সমস্ত নবীর কাছে এ অহী পাঠানো হয়েছে যে, যদি তুমি শিরকে লিপ্ত হও তাহলে তোমার আমল ব্যর্থ হয়ে যাবে[৭৪] এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। অতএব, [হে নবী, (সা)] তুমি শুধু আল্লাহরই বন্দেগী করো এবং তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাও।

আল্লাহকে যে মর্যাদা ও মূল্য দেয়া দরকার এসব লোক তা দেয়নি।[৭৫] (তাঁর অসীম ক্ষমতার অবস্থা এই যে,) কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী তাঁর মুঠির মধ্যে থাকবে আর আসমান তাঁর ডান হাতে পেঁচানো থাকবে।[৭৬] এসব লোক যে শিরক করছে তিনি তা থেকে পবিত্র ও অনেক উর্ধে।[৭৭]

৭৩. অর্থাৎ তিনি কেবল পৃথিবী সৃষ্টিই করেননি, বরং তিনিই এর সব জিনিসের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। পৃথিবীর সমস্ত বস্তু যেমন তাঁর সৃষ্টি করার কারণেই অস্তিত্ব লাভ করেছে তেমনি তাঁর টিকিয়ে রাখার কারণেই টিকে আছে, তাঁর প্রতিপালনের কারণেই বিকশিত হচ্ছে এবং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের কল্যাণেই তা কাজ করছে।

৭৪. অর্থাৎ শিরকের সাথে কৃত কোন কাজকে আমলে সালেহ বা ভাল কাজ বলে আখ্যায়িত করা যায় না। আর মুশরিক থেকে যে ব্যক্তি নিজের ধারণা অনুসারে অনেক কাজকে সৎকাজ মনে করে করবে তার জন্য সে কোন পুরস্কার লাভের যোগ্য হবে না। তার গোটা জীবন পুরোপুরি লোকসানজনক কারবার হয়ে দাঁড়াবে।

৭৫. অর্থাৎ আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ব সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই। তারা কখনো একথা বুঝার চেষ্টাই করেনি যে, বিশ্ব-জাহানের প্রভুকে কত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ
شَاءَ اللّٰهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٨﴾ وَأَشْرَقَتِ
الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ
مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٧٠﴾

সেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া[৭৮] হবে। আর তৎক্ষণাত আসমান ও যমীনে যারা আছে তারা সব মরে পড়ে যাবে। তবে আল্লাহ যাদের জীবিত রাখতে চান তারা ছাড়া। অতপর আরেকবার শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন হঠাৎ সবাই জীবিত হয়ে দেখতে থাকবে[৭৯]—পৃথিবী তার রবের নূরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, আমলনামা এনে হাজির করা হবে, নবী-রসূল ও সমস্ত সাক্ষীদের[৮০] হাজির করা হবে। মানুষের মধ্যে সঠিকভাবে ইনসাফ মত ফায়সালা করে দেয়া হবে, তাদের ওপর কোন জুলুম হবে না এবং প্রত্যেক প্রাণীকে তার কৃতকর্ম অনুসারে পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে। মানুষ যা করে আল্লাহ তা খুব ভাল করে জানেন।

আর এসব অজ্ঞ লোকেরা যাদেরকে খোদায়ীর আসনের অংশীদার ও উপাস্য হওয়ার অধিকারী বানিয়ে বসে আছে তারা কত নিকৃষ্ট ও নগণ্য।

৭৬. যমীন ও আসমানে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের চিত্র অংকনের জন্য যমীন হাতের মুঠিতে থাকা এবং আসমান ডান হাতে পেঁচানো থাকা রূপকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। একজন মানুষ ছোট একটি বলকে যেমন মুঠির মধ্যে পুরে নেয় এবং তার জন্য তা একটা মামুলি ব্যাপার ঠিক তেমনি কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ (যারা আজ আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্বের অনুমান করতেও অক্ষম) নিজ চোখে দেখতে পাবে যমীন ও আসমান আল্লাহর কুদরতের হাতে একটা নগণ্যতম বল ও ছোট একটি রুমালের মত। মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে জারীর প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ (রা) ইবনে উমর এবং হযরত আবু হুরাইরার বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে উঠে খুতবা দিচ্ছিলেন। খুতবা দানের সময় তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীনকে (অর্থাৎ গ্রহসমূহকে) তাঁর মুষ্ঠির মধ্যে নিয়ে এমনভাবে ঘুরাবেন—যেমন শিশুরা বল ঘুরিয়ে থাকে—এবং বলবেন ঃ আমি একমাত্র আল্লাহ। আমি বাদশাহ। আমি সর্বশক্তিমান। আমি বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের মালিক। কোথায় পৃথিবীর বাদশাহ? কোথায় শক্তিমানরা? কোথায় অহংকারীরা? এভাবে বলতে বলতে নবী (সা)

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَاۗءُوْهَا فُتِحَتْ
اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ
عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاۗءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۭ قَالُوْا بَلٰى
وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝ قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ
جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝

৮ রুকূ'

(এ ফায়সালার পরে) যারা কুফরী করেছিলো সেসব লোককে দলে দলে জাহান্নাম অভিমুখে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছবে তখন দোযখের দরজাসমূহ খোলা হবে[৮১] এবং তার ব্যবস্থাপক তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের কাছে কি তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে রসূলগণ আসেননি যারা তোমাদেরকে তোমাদের রবের আয়াতসমূহ শুনিয়েছেন এবং এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছেন যে, একদিন তোমাদেরকে এ দিনটির সম্মুখীন হতে হবে? তারা বলবে ঃ "হাঁ, এসেছিলো। কিন্তু আযাবের সিদ্ধান্ত কাফেরদের জন্য অবধারিত হয়ে গিয়েছে।" বলা হবে, জাহান্নামের দরজার মধ্যে প্রবেশ করো, তোমাদেরকে চিরকাল এখানেই থাকতে হবে। অহংকারীদের জন্য এটা অত্যন্ত জঘন্য ঠিকানা।

এমনভাবে কাঁপতে থাকলেন যে, তিনি মিম্বারসহ পড়ে না যান আমাদের সে ভয় হতে লাগলো।

৭৭. অর্থাৎ কোথায় তাঁর এই বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আর কোথায় তাঁর খোদায়ীতে কারো শরীক হওয়া।

৭৮. শিংগার ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আন'আম, টীকা ৪৭; ইবরাহীম, টীকা ৫৭; আল কাহ্‌ফ, টীকা ৭৩; ত্বা-হা, টীকা ৭৮; আল হাজ্জ, টীকা ১; আল মু'মিনূন, টীকা ৯৪; আন নাম্‌ল, টীকা ১০৬।

৭৯. এখানে শুধু দুইবার শিংগায় ফুৎকারের উল্লেখ আছে। এ ছাড়া সূরা আন নাম্‌লে এ দু'টি ফুৎকারের অতিরিক্ত আরো একবার শিংগায় ফুৎকারের উল্লেখও আছে যা শুনে আসমান ও যমীনের সমস্ত সৃষ্টি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে (আয়াত ৮৭)। এ কারণে হাদীসসমূহে তিনবার শিংগায় ফুৎকারের ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। এক, "নাফখাতুল ফাযা" অর্থাৎ ভীত সন্ত্রস্তকারী শিংগা। দুই, "নাফখাতুস সা'ক অর্থাৎ মৃত্যু ঘটানোর শিংগা।

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتّٰى إِذَا جَاءُوْهَا
وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا
خٰلِدِيْنَ ﴿٧٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ
نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۚ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٧٤﴾ وَتَرَى الْمَلٰئِكَةَ
حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ
بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٥﴾

আর যারা তাদের রবের অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকতো তাদেরকে দলে দলে জান্নাত অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন সেখানে পৌঁছবে তখন দেখবে জান্নাতের দরজাসমূহ পূর্বেই খুলে দেয়া হয়েছে। ব্যবস্থাপকরা তাদের বলবেঃ তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা অত্যন্ত ভাল ছিলে, চিরকালের জন্য এখানে প্রবেশ করো। আর তারা বলবে ঃ সেই মহান আল্লাহ শুকরিয়া যিনি আমাদের সাথে কৃত তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্যে পরিণত করলেন এবং আমাদেরকে যমীনের উত্তরাধিকারী করে দিয়েছেন।[৮২] এখন জান্নাতের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা আমরা স্থান গ্রহণ করতে পারি।[৮৩] সৎকর্মশীলদের জন্য এটা সর্বোত্তম প্রতিদান।[৮৪]

তুমি আরো দেখতে পাবে যে, ফেরেশতারা আরশের চারদিক বৃত্ত বানিয়ে তাদের রবের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছে। মানুষের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফায়সালা করে দেয়া হবে এবং ঘোষণা দেয়া হবে, সারা বিশ্ব-জাহানের রবের জন্যই সমস্ত প্রশংসা।[৮৫]

তিন, "নাফখাতুল কিয়াম লি রাব্বিল আলামীন" অর্থাৎ যে শিংগায় ফুৎকার দেয়ার সাথে সমস্ত মানুষ জীবিত হয়ে উঠবে এবং নিজের রবের সামনে হাজির হওয়ার জন্য নিজ নিজ কবর থেকে বেরিয়ে আসবে।

৮০. সাক্ষীসমূহ অর্থ সেসব সাক্ষীও যারা সাক্ষ দেবে যে, মানুষের কাছে আল্লাহ তা'আলার বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তাছাড়া এর অর্থ সেসব সাক্ষীও যারা মানুষের কাজ-কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ দেবে। এসব সাক্ষী কেবল মানুষই হবে তা জরুরী নয়। ফেরশতা, জিন, জীব-জন্তু, মানুষের অংগ-প্রত্যংগসমূহ, ঘরবাড়ী-দরজা, প্রাচীর, গাছপালা, পাথর সবকিছুই এসব সাক্ষীর অন্তরভুক্ত হবে।

৮১. অর্থাৎ জাহান্নামের দরজাসমূহ পূর্বে থেকে খোলা থাকবে না। বরং তারা সেখানে পৌছার পরে খোলা হবে, যেমন অপরাধীদের পৌছার পরে জেলখানার দরজা খোলা হয় এবং তাদের প্রবেশের পরই বন্ধ করে দেয়া হয়।

৮২. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা-হা, টীকা ৮৩; আল আম্বিয়া, টীকা ৯৯।

৮৩. অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেককে জান্নাত দান করা হয়েছে। এখন তা আমাদের মালিকানা এবং এখানে আমরা পুরা ক্ষমতা ও ইখতিয়ার লাভ করেছি।

৮৪. হতে পারে, এটা জান্নাতবাসীদের উক্তি। আবার এও হতে পারে যে, জান্নাতবাসীদের উক্তির সাথে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একথাটা জুড়ে দেয়া হয়েছে।

৮৫. অর্থাৎ গোটা বিশ্ব-জাহান আল্লাহর প্রশংসা গেয়ে উঠবে।

আল মু'মিন

৪০

নামকরণ

সূরার ২৮ আয়াতের وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ অংশ থেকে নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটা সে সূরা যার মধ্যে সেই বিশেষ মু'মিন ব্যক্তির উল্লেখ আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

ইবনে আব্বাস ও জাবের ইবনে যায়েদ বর্ণনা করেছেন যে, এ সূরা সূরা যুমার নাযিল হওয়ার পর পরই নাযিল হয়েছে। কুরআন মজীদের বর্তমান ক্রমবিন্যাসে এর যে স্থান, নাযিল হওয়ার ধারাক্রম অনুসারেও সূরাটির সে একই স্থান।

নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট

যে পটভূমিতে এ সূরা নাযিল হয়েছিলো এর বিষয়বস্তুর মধ্যে সেদিকে সুস্পষ্ট ইংগিত বিদ্যমান। সে সময় মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে দুই ধরনের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলো। এক, বাক-বিতণ্ডা ও তর্ক-বিতর্ক সৃষ্টি করে নানা রকমের উল্টা-পাল্টা প্রশ্ন উত্থাপন করে, এবং নিত্য নতুন অপবাদ আরোপ করে কুরআনের শিক্ষা, ইসলামী আন্দোলন এবং খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে মানুষের মনে এমন সন্দেহ সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দেয়া যে, তা খণ্ডন করতেই যেন নবী (সা) ও ঈমানদারগণ বিরক্ত হয়ে ওঠেন। দুই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ উদ্দেশ্যে তারা একের পর এক ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিলো। একবার তারা কার্যত এ পদক্ষেপ নিয়েও ফেলেছিলো। বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে আস (রা) বর্ণিত হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন হারাম শরীফের মধ্যে নামায পড়ছিলেন। হঠাৎ 'উকবা ইবনে আবু মু'আইত অগ্রসর হয়ে তাঁর গলায় কাপড় পেঁচিয়ে দিল। অতপর তাঁকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করার জন্য কাপড়ে মোচড় দিতে লাগলো। ঠিক সে মুহূর্তে হযরত আবু বকর (রা) সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং ধাক্কা মেরে 'উকবা ইবনে আবু মু'আইতকে হটিয়ে দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু বকর যে সময় ধাক্কা দিয়ে ঐ জালেমকে সরিয়ে দিচ্ছিলেন তখন তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিলো, اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ (তোমরা কি শুধু এতটুকুন অপরাধে একজন মানুষকে হত্যা করছো যে, তিনি বলছেন, আমার রব আল্লাহ?) এ ঘটনাটি

সীরাতে ইবনে হিশাম গ্রন্থেও কিছুটা ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া নাসায়ী ও ইবনে আবী হাতেমও ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য

বক্তব্যের শুরুতেই পরিস্থিতির এ দু'টি দিক পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অবশিষ্ট গোটা বক্তব্যই এ দু'টি দিকের অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষাপ্রদ পর্যালোচনা মাত্র।

হত্যার ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে ফেরাউনের সভাসদদের মধ্যকার ঈমানদার ব্যক্তির কাহিনী শুনানো হয়েছে (আয়াত ৩৩ থেকে ৫৫) এবং এ কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে তিনটি গোষ্ঠীকে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি শিক্ষা দেয়া হয়েছে ঃ

এক ঃ কাফেরদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যা কিছু করতে চাচ্ছো ফেরাউন নিজের শক্তির ওপর ভরসা করে হযরত মূসার (আ) সাথে এমন একটা কিছুই করতে চেয়েছিলো। একই আচরণ করে তোমরাও কি সে পরিণাম ভোগ করতে চাও যা তারা ভোগ করেছিলো?

দুই ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, এসব জালেম দৃশ্যত যত শক্তিশালী ও অত্যাচারীই হোক না কেন এবং তাদের মোকাবিলায় তোমরা যতই দুর্বল ও অসহায় হওনা কেন, তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত, যে আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করার জন্য তোমরা কাজ করে যাচ্ছো তাঁর শক্তি যে কোন শক্তির তুলনায় প্রচণ্ডতম। সুতরাং তারা তোমাদের যত বড় ভীতিকর হুমকিই দিক না কেন তার জবাবে তোমরা কেবল আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে নাও এবং তারপর একেবারে নির্ভয় হয়ে নিজেদের কাজে লেগে যাও। আল্লাহর পথের পথিকদের কাছে যে কোন জালেমের হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের একটিই জবাব, আর তা হচ্ছে ঃ

إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ

এভাবে আল্লাহর ওপর ভরসা করে বিপদ সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে যদি কাজ করো তাহলে শেষ পর্যন্ত তাঁর সাহায্য অবশ্যই লাভ করবে এবং অতীতের ফেরাউন যে পরিণামের সম্মুখীন হয়েছে বর্তমানের ফেরাউনও সে একই পরিণামের সম্মুখীন হবে। সে সময়টি আসার পূর্বে জুলুম-নির্যাতনের তুফান একের পর এক যতই আসুক না কেন তোমাদেরকে তা ধৈর্যের সাথে বরদাশত করতে হবে।

তিন ঃ এ দু'টি গোষ্ঠী ছাড়াও সমাজে তৃতীয় আরেকটি গোষ্ঠী ছিল। সেটি ছিল এমন লোকদের গোষ্ঠী যারা মনে প্রাণে বুঝতে পেরেছিলো যে, ন্যায় ও সত্য আছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে আর কুরাইশ গোত্রের কাফেররা নিছক বাড়াবাড়ি করছে। কিন্তু একথা জানা সত্ত্বেও তারা হক ও বাতিলের এ সংঘাতে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছিলো। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বিবেককে নাড়া দিয়েছেন। তিনি তাদের বলছেন, ন্যায় ও সত্যের দুশমনরা যখন তোমাদের চোখের সামনে এত বড় নির্যাতনমূলক পদক্ষেপ নেয়ার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে তখনও যদি তোমরা বসে

বসে তামাসা দেখতে থাকো তাহলে আফসোস। যে ব্যক্তির বিবেক একেবারে মরে যায়নি তাদের কর্তব্য ফেরাউন যখন মূসাকে (আ) হত্যা করতে চেয়েছিলো তখন তার ভরা দরবারে সভাসদদের মধ্য থেকে একজন ন্যায়পন্থী ব্যক্তি যে ভূমিকা পালন করেছিলো সে ভূমিকা পালন করা। যে যুক্তি ও উদ্দেশ্য তোমাদেরকে মুখ খোলা থেকে বিরত রাখছে সে একই যুক্তি ও উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তির সামনে পথের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু সে أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ (আমার সব বিষয় আল্লাহর ওপর সোপর্দ করলাম) বলে সমস্ত যুক্তি ও উদ্দেশ্যকে পদাঘাত করেছিলেন। কিন্তু দেখো, ফেরাউন তার কিছুই করতে পারেনি।

ন্যায় ও সত্যকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য পবিত্র মক্কায় রাতদিন কাফেরদের যে তর্ক-বিতর্ক ও বাক-বিতণ্ডা চলছিলো তার জবাবে একদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কাফেরদের মধ্যকার মূল বিবাদের বিষয় তাওহীদ ও আখিরাতের আকীদা বিশ্বাসের যথার্থতা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে এবং এ সত্য স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এসব লোক কোন যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই খামখা সত্যের বিরোধিতা করছে। অপর দিকে কুরাইশ নেতারা এতটা তৎপরতার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলো কেন সে কারণগুলোকে উন্মোচিত করা হয়েছে। বাহ্যত তারা দেখাচ্ছিলো যে, নবীর (সা) শিক্ষা এবং তাঁর নবুওয়াত দাবী সম্পর্কে তাদের বাস্তব আপত্তি আছে যার কারণে তারা এসব কথা মেনে নিতে পারছে না। তবে মূলত তাদের জন্য এটা ছিলো ক্ষমতার লড়াই। কোন রাখঢাক না করে ৫৬ আয়াতে তাদেরকে পরিষ্কার একথা বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের অস্বীকৃতির আসল কারণ তোমাদের গর্ব ও অহংকার যা দিয়ে তোমাদের মন ভরা। তোমরা মনে করো মানুষ যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত মেনে নেয় তাহলে তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকবে না। এ কারণে তাঁকে পরাস্ত করার জন্য তোমরা সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছো।

এ প্রসংগে কাফেরদেরকে একের পর এক সাবধান করা হয়েছে যে, যদি তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহের বিরুদ্ধে বিতর্ক সৃষ্টি করা থেকে বিরত না হও তাহলে অতীতের জাতিসমূহ যে পরিণাম ভোগ করেছে তোমরাও সে একই পরিণামের সম্মুখীন হবে এবং আখিরাতে তোমাদের জন্যে তার চেয়েও নিকৃষ্ট পরিণাম ভাগ্যের লিখন হয়ে আছে। সে সময় তোমরা অনুশোচনা করবে, কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না।

আয়াত ৮৫ | সূরা আল মু'মিন–মক্কী | রুকূ' ৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

حٰمٓ ۝١ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝٢ غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ
التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ۙ ذِى الطَّوْلِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ اِلَيْهِ
الْمَصِيْرُ ۝٣ مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ
تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۝٤

হা–মীম। এ কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত যিনি মহাপরাক্রমশালী, সবকিছু সম্পর্কে অতিশয় জ্ঞাত, গোনাহ মাফকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা এবং অত্যন্ত দয়ালু। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। সবাইকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।[১]

আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে কেবল সে সবলোকই বিতর্ক[২] সৃষ্টি করে যারা কুফরী করেছে[৩] এরপরও দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে তাদের চলাফেরা যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে।[৪]

১. এটা বক্তব্যের ভূমিকা। এর মাধ্যমে পূর্বাহ্নেই শ্রোতাদেরকে এ মর্মে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, তাদের সামনে যে বাণী পেশ করা হচ্ছে তা কোন সাধারণ সত্তার বাণী নয়, বরং তা নাযিল হয়েছে এমন আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি এসব গুণাবলীর অধিকারী। এরপর একের পর এক আল্লাহ তা'আলার কতিপয় গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। যা পরবর্তী বিষয়বস্তুর সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত ঃ

প্রথম গুণটি হচ্ছে তিনি পরাক্রমশালী বা সর্বশক্তিমান অর্থাৎ সবার ওপরে বিজয়ী। কারো ব্যাপারে তিনি যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন তা নিশ্চিতভাবেই কার্যকরী হয়। তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করে কেউ বিজয়ী হতে পারে না। কিংবা কেউ তাঁর পাকড়াও থেকেও বাঁচতে পারে না। তাই তাঁর নির্দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কেউ যদি সফলতার আশা করে এবং তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে তাঁকে পরাভূত ও অবদমিত দেখানোর আশা

করে, তাহলে তা তার নিজের বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ধরনের আশা কখনো পূরণ হতে পারে না।

দ্বিতীয় গুণটি হচ্ছে, তিনি সবকিছু জানেন। অর্থাৎ তিনি অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে কোন কথা বলেন না, বরং তিনি প্রতিটি বস্তু সম্পর্কেই সরাসরি জ্ঞানের অধিকারী। এ জন্য অনুভূতি ও ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয়ে তিনি যেসব তথ্য দিচ্ছেন কেবল সেগুলোই সঠিক হতে পারে এবং তা না মানার অর্থ হচ্ছে অযথা অজ্ঞতার অনুসরণ করা। একইভাবে তিনি জানেন কোন্ জিনিসে মানুষের উন্নতি এবং তার কল্যাণের জন্য কোন্ নীতিমালা, আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধ আবশ্যক। তাঁর প্রতিটি শিক্ষা সঠিক কৌশল ও জ্ঞান-ভিত্তিক যার মধ্যে ভুল-ভ্রান্তির কোন সম্ভাবনা নেই। অতএব, তাঁর পথনির্দেশনা গ্রহণ না করার অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তি নিজেই তার ধ্বংসের পথে চলতে চায়। তাছাড়া মানুষের কোন গতিবিধি তাঁর নিকট গোপন থাকতে পারে না। এমনকি মনের যে নিয়ত ও ইচ্ছা মানুষের সমস্ত কাজ-কর্মের মূল চালিকাশক্তি তাও তিনি জানেন। তাই কোন অজুহাত বা বাহানা দেখিয়ে মানুষ তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারে না।

তৃতীয় গুণ হচ্ছে, "গোনাহ মাফকারী ও তাওবা কবুলকারী" এটা তাঁর আশা ও উৎসাহ দানকারী গুণ। এ গুণটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা এখনো পর্যন্ত বিদ্রোহ করে চলেছে তারা যেন নিরাশ না হয় বরং একথা ভেবে নিজেদের আচরণ পুনর্বিবেচনা করে যে, এখনো যদি তারা এ আচরণ থেকে বিরত হয় তাহলে আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারে। এখানে একথা বুঝে নিতে হবে যে, গোনাহ মাফ করা আর তাওবা কবুল করা একই বিষয়ের দু'টি শিরোনাম মোটেই নয়। অনেক সময় তাওবা ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা গোনাহ মাফ করতে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ এক ব্যক্তি ভুল-ত্রুটিও করে আবার নেকীর কাজও করে এবং তার নেকীর কাজ গোনাহ মাফ হওয়ার কারণ হয়ে যায়, চাই ঐ সব ভুল-ত্রুটির জন্য তার তাওবা করার ও ক্ষমা প্রার্থনা করার সুযোগ হোক বা না হোক। এমনকি সে যদি তা ভুলে গিয়ে থাকে তাও। অনুরূপভাবে পৃথিবীতে কোন ব্যক্তির ওপর যত দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি এবং নানা রকম দুশ্চিন্তা ও মর্মপীড়াদায়ক বিপদাপদই আসে তা সবই তার গোনাহ ও ভুল-ত্রুটির কাফ্ফারা হয়ে যায়। এ কারণে গোনাহ মাফ করার কথা তাওবা কবুল করার কথা থেকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তাওবা ছাড়াই গোনাহ মাফলাভের এ সুযোগ কেবল ঈমানদারদের জন্যই আছে। আর ঈমানদারদের মধ্যেও কেবল তারাই এ সুযোগ লাভ করবে যারা বিদ্রোহ করার মানসিকতা থেকে মুক্ত এবং যাদের দ্বারা মানবিক দুর্বলতার কারণে গোনাহর কাজ সংঘটিত হয়েছে, অহংকার ও বার বার গোনাহ করার কারণে নয়।

চতুর্থ গুণ হচ্ছে, তিনি কঠিন শাস্তিদাতা। এ গুণটি উল্লেখ করে মানুষকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, বন্দেগী ও দাসত্বের পথ অনুসরণকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা যতটা দয়াবান, বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার আচরণকারীদের জন্য তিনি ঠিক ততটাই কঠোর। যেসব সীমা পর্যন্ত তিনি ভুল-ত্রুটি ক্ষমা ও উপক্ষো করেন, যখন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি সে সীমাসমূহ লংঘন করে তখন তারা তাঁর শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। আর তাঁর শাস্তি এমন ভয়াবহ যে, কোন নির্বোধ মানুষই কেবল তা সহ্য করার মত বলে মনে করতে পারে।

পঞ্চম গুণ হচ্ছে, তিনি অত্যন্ত দয়ালু অর্থাৎ দানশীল, অভাবশূন্য এবং উদার ও অকৃপণ। সমস্ত সৃষ্টিকূলের ওপর প্রতিমুহূর্তে তাঁর নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজি ব্যাপকভাবে বর্ষিত হচ্ছে। বান্দা যা কিছু লাভ করছে তা তাঁর দয়া ও অনুগ্রহেই লাভ করছে।

এ পাঁচটি গুণ বর্ণনা করার পর অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে দু'টি সত্য বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হচ্ছে, মানুষ আর যত মিথ্যা উপাস্যই বানিয়ে রাখুক না কেন প্রকৃত উপাস্য একমাত্র তিনি। অপরটি হচ্ছে, অবশেষে সবাইকে আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। মানুষের কৃতকর্মসমূহের হিসেব গ্রহণকারী এবং সে অনুসারে পুরস্কার বা শাস্তি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী আর কোন উপাস্য নেই। অতএব, কেউ যদি তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের উপাস্য বানিয়ে নেয় তাহলে তার এ নির্বুদ্ধিতার ফল সে নিজেই ভোগ করবে।

২. বিতর্ক সৃষ্টি করার অর্থ বাক চাতুরী করা, ত্রুটি বের করা, আবোল-তাবোল আপত্তি উত্থাপন করা, পূর্বাপর প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোন একটা শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে তা থেকে নানা রকম বিষয় বের করে তার ওপর সন্দেহ-সংশয় ও অপবাদের ইমারত নির্মাণ করা। বাক্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপেক্ষা করে তার বিভ্রান্তিকর অর্থ করা যাতে ব্যক্তি নিজেও কথা বুঝতে না পারে এবং অন্যদেরকেও বুঝতে না দেয়। মতানৈক্য ও বিরোধ করার এ পন্থা কেবল তারাই গ্রহণ করে, যাদের মতানৈক্য ও মতবিরোধ অসদোদ্দেশ্য প্রণোদিত। সৎ নিয়তে বিরোধকারী বিতর্কে লিপ্ত হলেও বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যেই এবং প্রকৃত আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে বিষয়টি সম্পর্কে তার নিজের দৃষ্টিকোণ সঠিক না বিপক্ষের দৃষ্টিকোণ সঠিক তা নিশ্চিত করতে চায়। এ ধরনের বিতর্ক হয় সত্যকে জানার জন্য, কাউকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য নয়। পক্ষান্তরে অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিপক্ষের লক্ষ তা বুঝা বা বুঝানো নয় বরং সে বিপক্ষকে পরাস্ত ও উত্যক্ত করতে চায়। অপরের কথা কোনভাবেই চলতে দেয়া যাবে না সে এ উদ্দেশ্যেই বিতর্কে লিপ্ত হয়। এ কারণে সে কখনো মূল প্রশ্নের মুখোমুখি হয় না, বরং সবসময় একথা সে কথা বলে পাশ কাটিয়ে যেতে চায়।

৩. এখানে "কুফর" শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এক, নিয়ামতের অস্বীকৃতি অর্থে, দুই, ন্যায় ও সত্যের অস্বীকৃতি অর্থে। প্রথম অর্থ অনুসারে এ বাক্যাংশের মানে হচ্ছে, আল্লাহর আয়াতসমূহ অর্থাৎ বাণী বা আদেশ-নিষেধসমূহের বিরুদ্ধে এ কর্মপন্থা কেবল সেসব লোকেরাই গ্রহণ করে যারা তাঁর অনুগ্রহরাজি ভুলে গিয়েছে এবং এ অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে যে, তাঁরই নিয়ামতের সাহায্যে তারা পালিত হচ্ছে। দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে এ বাক্যাংশের মানে হচ্ছে, যারা ন্যায় ও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং না মানার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কেবল তারাই এ কর্মপন্থা গ্রহণ করে থাকে। পূর্বাপর বিষয় বিবেচনা করলে এ বিষয়টি পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ ক্ষেত্রে কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তি বলতে যারা মুসলমান নয় এমন সব ব্যক্তি মাত্রকেই বুঝানো হয়নি। কেননা, যেসব অমুসলিম ইসলামকে বুঝার উদ্দেশ্যে সৎ নিয়তে বিতর্ক করে এবং যে কথা বুঝতে তার কষ্ট হচ্ছে তা বুঝার জন্য ব্যাখ্যা পাওয়ার চেষ্টা করে, ইসলাম গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত পারিভাষিক অর্থে তারা কাফের বটে, কিন্তু সাথে সাথে একথাও সত্য যে, এ আয়াতে যে জিনিসটির নিন্দা করা হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ وَهَمَّتْ
كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ
الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝ وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ
كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۝

এর পূর্বে নূহের (আ) কওম অস্বীকার করেছে এবং তাদের পরে আরো বহু দল ও গোষ্ঠী এ কাজ করেছে। প্রত্যেক উম্মত তার রসূলকে পাকড়াও করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা সবাই বাতিলের হাতিয়ারের সাহায্যে হককে অবদমিত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি। দেখে নাও, কত কঠিন ছিল আমার শাস্তি। অনুরূপ যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য তোমার রবের এ সিদ্ধান্তও অবধারিত হয়ে গিয়েছে যে, তারা জাহান্নামের বাসিন্দা হবে।[৫]

৪. আয়াতের প্রথমাংশ ও দ্বিতীয়াংশের মধ্যে একটা শূন্যতা আছে যা বুঝে নেয়ার দায়িত্ব শ্রোতাদের মন-মগজ ও চিন্তা-ভাবনার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কথার ধরন থেকে আপনা আপনি এ ইংগিত পাওয়া যায় যে, যারা আল্লাহর আয়াত বা আদেশ-নিষেধের বিরুদ্ধে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার কর্মপন্থা গ্রহণ করে, তারা শাস্তি থেকে কখনো রক্ষা পেতে পারে না। তাদের দুর্ভাগ্যের পালা একদিন না একদিন অবশ্যই আসবে। এ মুহূর্তে যদিও তোমরা দেখছো যে, তারা এসব কিছু করেও আল্লাহর দুনিয়ায় নিশ্চিন্তে বুকটান করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের জম-জমাট কারবার চলছে, জাঁক-জমকের সাথে তাদের কর্তৃত্ব ও শাসন চলছে এবং খুব ভোগ ও আরাম আয়েশের মধ্যে ডুবে আছে, তবুও এ ধোঁকায় পড়ো না যে, তারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বেঁচে গিয়েছে। কিংবা আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিরুদ্ধে লড়াই কোন খেল-তামাশার বিষয় যা তামাশা হিসেবে খেলা যেতে পারে এবং এ খেলার খেলোয়াড়দেরকে এর মন্দ ফলাফল কখনো ভোগ করতে হবে না। প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে দেয়া অবকাশ। এ অবকাশকে অন্যায়ভাবে কাজে লাগিয়ে যারা যতটা অপকর্ম করে তাদের জাহাজ ততটা পূর্ণ হয়ে নিমজ্জিত হয়।

৫. অর্থাৎ দুনিয়াতে তাদের ওপর যে আযাব এসেছে তা তাদের জন্য নির্ধারিত চূড়ান্ত আযাব ছিল না। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য এ ফায়সালাও করে দিয়েছেন যে, তাদেরকে জাহান্নামে যেতে হবে। এ আয়াতের আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, যেভাবে অতীত জাতিসমূহের দুর্ভাগ্য এসেছে, এখন যারা কুফরী করছে অনুরূপভাবে তাদের জন্যও আল্লাহর স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, তাদেরকেও জাহান্নামে যেতে হবে।

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ
بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً
وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝٧

আল্লাহর আরশের ধারক ফেরেশতাগণ এবং যারা আরশের চার পাশে হাজির থাকে তারা সবাই প্রশংসাসহ তাদের রবের পবিত্রতা বর্ণনা করে। তাঁর প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং ঈমানদারদের জন্য দোয়া করে।[৬] তারা বলে ঃ হে আমাদের রব, তুমি তোমার রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছো।[৭] তাই মাফ করে দাও এবং দোযখের আগুন থেকে রক্ষা কারো[৮] যারা তাওবা করেছে এবং তোমার পথ অনুসরণ করেছে[৯] তাদেরকে।

৬. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংগীদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য একথা বলা হয়েছে। তারা সে সময় মক্কার কাফেরদের বিদ্রূপ, কটূভাষণ ও অত্যাচার এবং তাদের সামনে নিজেদের অসহায়ত্ব দেখে দেখে ভগ্ন হৃদয় হয়ে পড়ছিলো। তাই বলা হয়েছে, এসব নীচু ও হীন লোকদের কথায় তোমরা মন খারাপ করছো কেন? তোমরা এমন মর্যাদার অধিকারী যে, আল্লাহর আরশের ধারক ফেরেশতারা এবং আরশের চারপাশে অবস্থানরত ফেরেশতারা পর্যন্ত তোমাদের সহযোগী। তারা তোমাদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে সুপারিশ করছে। সাধারণ ফেরেশতাদের কথা না বলে আল্লাহর আরশের ধারক ও তার চারপাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ ধারণা দেয়ার জন্য যে, মহান আল্লাহর বিশাল সাম্রাজ্যের কর্মচারীরা তো বটেই, তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অবস্থানরত যেসব ফেরেশতা ঐ সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ এবং বিশ্ব-জাহানের শাসন কর্তার কাছে যারা নৈকট্য লাভ করেছে তারা পর্যন্ত তোমাদের প্রতি গভীর আগ্রহ ও সমবেদনা পোষণ করে। আরো বলা হয়েছে যে, এসব ফেরেশতা আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ এবং ঈমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। একথা দ্বারা প্রকাশ পায় যে, ঈমানের বন্ধনই প্রকৃত বন্ধন যা আসমান ও যমীনবাসীদেরকে পরস্পর একই সূত্রে গেঁথে দিয়েছে। এ সম্পর্কের কারণেই আরশের পাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের তাদের মতই আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান পোষণকারী মাটির মানুষদের সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহর প্রতি ফেরেশতাদের ঈমান পোষণ করার অর্থ এই নয় যে, তারা কুফরী করতে পারতো। কিন্তু তা না করে তারা ঈমান গ্রহণ করেছে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তারা এক ও লা-শরীক আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকেই স্বীকার করে নিয়েছে। এমন আর কোন সত্তা নেই যে তাদের আদেশ দান করে আর তারাও তার আনুগত্য করে চলে। ঈমান গ্রহণকারী মানুষ যখন এ পথই গ্রহণ করলো তখন এত বড় জাতিগত পার্থক্য ও স্থানগত দূরত্ব সত্ত্বেও তাদের এবং ফেরেশতাদের মধ্যে একই দৃষ্টিভঙ্গিগত দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ
وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٨ وَقِهِمُ
السَّيِّئَاتِ ۚ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۚ وَذَٰلِكَ
هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝٩

হে আমাদের রব উপরন্তু তাদেরকে তোমার প্রতিশ্রুত[১০] চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তাদের বাপ মা, স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল (তাদেরকেও সেখানে তাদের সাথে পৌঁছিয়ে দাও)।[১১] তুমি নিসন্দেহে সর্বশক্তিমান ও মহাকৌশলী। আর তাদেরকে মন্দ কাজসমূহ থেকে রক্ষা করো।[১২] কিয়ামতের দিন তুমি যাকে মন্দ ও অকল্যাণসমূহ[১৩] থেকে রক্ষা করেছো তার প্রতি তুমি বড় করুণা করেছো। এটাই বড় সফলতা।

৭. অর্থাৎ তোমার বান্দার দুর্বলতা, বিচ্যুতি ও ভুল-ত্রুটি তোমার অজানা নয়। নিসন্দেহে তুমি সবকিছু জানো। কিন্তু তোমার জ্ঞানের মত তোমার রহমতও ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাই তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি জানা সত্ত্বেও এই অসহায়দের ক্ষমা করে দাও। আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, তোমার জ্ঞানানুসারে যাদের সম্পর্কে তুমি জান যে, তারা সরল মনে 'তাওবা' করেছে এবং প্রকৃতপক্ষে তোমার পথ অবলম্বন করেছে, দয়া ও রহমত দিয়ে তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দাও।

৮. ক্ষমা করা ও দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করা যদিও পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এর একটি কথা বলার পর বাহ্যত অপর কথাটি বলার কোন প্রয়োজন থাকে না। তবে এ বাচনভঙ্গি দ্বারা মূলত ঈমানদারদের প্রতি ফেরেশতাদের গভীর আগ্রহ প্রকাশ পায়। প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে, কোন ব্যাপারে কারো মন যদি আকৃষ্ট হয় সে যখন শাসকের কাছে আবেদন জানানোর সুযোগ লাভ করে তখন একই আবেদনকে সে বার বার নানাভাবে মিনতি করে পেশ করতে থাকে। এ ক্ষেত্রে একটি কথা একবার মাত্র পেশ করে সে তৃপ্তি ও সান্ত্বনা পায় না।

৯. অর্থাৎ অবাধ্যতা পরিত্যাগ করেছে, বিদ্রোহ থেকে বিরত হয়েছে এবং আনুগত্য গ্রহণ করে তোমার নিজের নির্দেশিত জীবন পথে চলতে শুরু করেছে।

১০. একথাটির মধ্যেও সেই মিনতি ভরা আবেদনের সুস্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান যার প্রতি আমরা ওপরে ৮নং টীকায় ইংগিত দিয়েছি। একথা সুস্পষ্ট যে, ক্ষমা করা এবং দোযখ থেকে রক্ষা করা দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করার অর্থও আপনা আপনিই এবং অনিবার্যভাবেই প্রকাশ পায়। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা নিজে ঈমানদারদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ
إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا
اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ
خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴿١١﴾ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ۖ
وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا ۚ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٢﴾

২ রুকূ'

যারা কুফরী করেছে কিয়ামতের দিন তাদের ডেকে বলা হবে, "আজ তোমরা নিজেদের ওপর যতটা ক্রোধান্বিত হচ্ছো, আল্লাহ তোমাদের ওপর তার চেয়েও অধিক ক্রোধান্বিত হতেন তখন যখন তোমাদেরকে ঈমানের দিকে আহবান জানানো হতো আর তোমরা উল্টা কুফরী করতে।"[১৪] তারা বলবে ঃ হে আমাদের রব, প্রকৃতই তুমি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছো এবং দু'বার জীবন দান করেছো।[১৫] এখন আমরা অপরাধ স্বীকার করছি।[১৬] এখন এখান থেকে বের হওয়ার কোন উপায় কি আছে?[১৭] (জবাব দেয়া হবে) এ অবস্থা যার মধ্যে তোমরা আছ, তা এ কারণে যে, যখন একমাত্র আল্লাহর দিকে ডাকা হতো তখন তোমরা তা মানতে অস্বীকার করতে। কিন্তু যখন তাঁর সাথে অন্যদেরকেও শামিল করা হতো তখন মেনে নিতে। এখন তো ফায়সালা মহান ও মর্যাদাবান আল্লাহর হাতে।[১৮]

দিয়েছেন মুমিনদেরকে সেটি দেয়ার জন্য দোয়া করা বাহ্যত অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। কিন্তু ফেরেশতাদের মনে ঈমানদারদের জন্য কল্যাণকামিতার এতটা আবেগ বিদ্যমান যে, তারা নিজেদের পক্ষ থেকে তাদের জন্য একাধারে কল্যাণ কামনা করে দোয়া করে যাচ্ছে। অথচ তারা জানে, আল্লাহ তাদের প্রতি এসব অনুগ্রহ অবশ্যই করবেন।

১১. অর্থাৎ তাদের চক্ষু শীতল করার জন্য তাদের মা-বাবা, স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিদেরও তাদের সাথে একত্রিত করে দেবেন। জান্নাতে ঈমানদারদেরকে যেসব নিয়ামত দান করা হবে তার বর্ণনা প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা নিজেও একথা বলেছেন। দেখুন, সূরা রা'দ, আয়াত ২৩ এবং সূরা তূর, আয়াত ২১। সূরা তূরের আয়াতে এ কথাও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি জান্নাতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয় এবং তার মা, বাবা ও সন্তান-সন্ততি অনুরূপ মর্যাদা লাভ না করে তাহলে তাকে উচ্চ মর্যাদা থেকে নামিয়ে তাদের সাথে মিলিত করার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা তার বাবা-মা ও সন্তান-সন্ততিকেই উচ্চ মর্যাদা দিয়ে তার পর্যায়ে উন্নীত করবেন।

১২. سيئات (মন্দ কাজসমূহ) তিনটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে তিনটি অর্থই প্রযোজ্য। এক, ভুল আকীদা-বিশ্বাস, বিকৃত নৈতিক চরিত্র এবং মন্দ কাজ-কর্ম। দুই, গোমরাহী ও মন্দ কাজের পরিণাম। তিন, বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্ট—তা এ পৃথিবীর হোক, আলমে বারযাখ বা মৃত্যুর পরের জীবনের হোক কিংবা কিয়ামতের দিনের হোক। ফেরেশতাদের দোয়ার লক্ষ হলো, যেসব জিনিস তাদের জন্য অকল্যাণকর সেরূপ প্রতিটি জিনিস থেকে তাদের রক্ষা করো।

১৩. কিয়ামতের দিনের অকল্যাণ অর্থ হাশরের ময়দানের ভয়াবহতা, ছায়া ও অন্যান্য আরাম-আয়েশ ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া, হিসেব-নিকেশের কঠোরতা, সমস্ত সৃষ্টির সামনে জীবনের গোপন বিষয়সমূহ প্রকাশ হয়ে যাওয়ার লাঞ্ছনা ও অপমান এবং সেখানে অপরাধীরা আর যেসব লাঞ্ছনা ও কষ্টের সম্মুখীন হবে তাও।

১৪. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কাফেররা যখন দেখবে যে, তারা পৃথিবীতে শিরক, নাস্তিকতা, আখেরাত অস্বীকৃতি এবং নবী-রসূলদের বিরোধিতার ওপর নিজেদের গোটা জীবনের তৎপরতার ভিত্তি স্থাপন করে যারপর নাই নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছে এবং সে নির্বুদ্ধিতার কারণে এখন চরম অকল্যাণকর ও অশুভ পরিণামের সম্মুখীন হয়েছে তখন তারা নিজেদের আঙ্গুল কামড়াতে থাকবে এবং বিরক্ত হয়ে নিজেরাই নিজেদেরই অভিশাপ দিতে থাকবে। তখন ফেরেশতারা তাদের ডেকে বলবে, আজ তোমরা নিজেরাই নিজেদের ওপর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হচ্ছো। কিন্তু ইতিপূর্বে পৃথিবীতে তোমাদেরকে এ পরিণাম থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এবং সৎকর্মশীল লোকেরা সঠিক পথের দিকে আহবান জানাতেন আর তোমরা সে আহবান প্রত্যাখ্যান করতে তখন আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ এর চেয়েও বেশী করে প্রজ্জ্বলিত হতো।

১৫. দু'বার মৃত্যু এবং দু'বার জীবন বলতে সূরা বাকারার ২৮ আয়াতে যা বলা হয়েছে তাই বুঝানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, তোমরা আল্লাহর সাথে কি করে কুফরী করো, অথচ তোমরা প্রাণহীন ছিলে, তিনি তোমাদের প্রাণ দান করেছেন। এরপর তিনি পুনরায় তোমাদের মৃত্যু দিবেন এবং পরে আবার জীবন দান করবেন। কাফেররা এসব ঘটনার প্রথম তিনটি অস্বীকার করে না। কারণ, ঐগুলো বাস্তবে প্রত্যক্ষ করা যায় এবং সে জন্য অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তারা শেষোক্ত ঘটনাটির সংঘটন অস্বীকার করে। কারণ, এখনো পর্যন্ত তারা তা প্রত্যক্ষ করেনি এবং শুধু নবী-রসূলগণই এটির খবর দিয়েছেন। কিয়ামতের দিন এ চতুর্থ অবস্থাটিও তারা কার্যত দেখতে পাবে এবং তখন স্বীকার করবে যে, আমাদেরকে যে বিষয়ের খবর দেয়া হয়েছিলো তা প্রকৃতই সত্যে পরিণত হলো।

১৬. অর্থাৎ এ দ্বিতীয় জীবনটির কথা অস্বীকার করে আমরা যে ভুল করেছি এবং এ ভ্রান্ত মতবাদ অনুসারে কাজ করে আমাদের জীবন যে পাপে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে তা আমরা স্বীকার করি।

১৭. অর্থাৎ এখন আমরা আযাবের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মত যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি আমাদের পক্ষ থেকে অপরাধের স্বীকৃতিকে গ্রহণ করে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা কি আছে?

هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ۭ وَمَا يَتَذَكَّرُ
اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ﴿١٣﴾ فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ
الْكٰفِرُوْنَ ﴿١٤﴾ رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ
اَمْرِهٖ عَلٰي مَنْ يَّشَاۗءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾ يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ
لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۭ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۭ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ
الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾

তিনিই তো তোমাদের নিদর্শনসমূহ দেখান[১৯] এবং তোমাদের জন্য আসমান থেকে রিযিক নাযিল করেন[২০] (কিন্তু এসব নিদর্শন দেখে) কেবল তারাই শিক্ষা গ্রহণ করে যারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী[২১] (সুতরাং হে প্রত্যাবর্তনকারীরা,) দীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে[২২] তাঁকেই ডাকো, তোমাদের এ কাজ কাফেরদের কাছে যতই অসহনীয় হোক না কেন।

তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী,[২৩], আরশের অধিপতি।[২৪] তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার কাছে ইচ্ছা নিজের হুকুমে 'রূহ' নাযিল করেন[২৫] যাতে সে সাক্ষাতের দিন[২৬] সম্পর্কে সাবধান করে দেয়। সেটি এমন দিন যখন সব মানুষের সবকিছু প্রকাশ হয়ে পড়বে। আল্লাহর কাছে তাদের কোন কথাই গোপন থাকবে না। (সেদিন ঘোষণা দিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে) আজ রাজত্ব কার?[২৭] (সমস্ত সৃষ্টি বলে উঠবে) একমাত্র আল্লাহর যিনি কাহ্হার।

১৮. অর্থাৎ যে আল্লাহর প্রভুত্ব মেনে নিতে তোমরা রাজি ছিলে না সেই একমাত্র আল্লাহর হাতেই এখন ফায়সালা। আর ইলাহী ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে যাদেরকে অংশীদার বানাতে তোমরা জিদ ধরেছিলে, ফায়সালার ক্ষেত্রে এখন তাদের কোন হাত নেই। (একথাটা বুঝার জন্য সূরা যুমারের ৪৫ আয়াত এবং তার ৬৪নং টীকার প্রতিও লক্ষ রাখতে হবে) এ আয়াতাংশের মধ্যে আপনা থেকে এ অর্থও অন্তরভুক্ত হয়ে আছে যে, এখন আযাবের এ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন পথও নেই। কারণ, তোমরা শুধু আখেরাত অস্বীকার করেছিলে তাই নয়, বরং তোমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহর প্রতিও ছিল তোমাদের চরম বিদ্রূপভাব। তাছাড়া তাঁর সাথে অন্যদের শরীক করা ছাড়া তোমরা আদৌ কোন মানসিক তৃপ্তি লাভ করতে পারতে না।

১৯. নিদর্শনসমূহ বলতে সেসব নিদর্শনকে বুঝানো হয়েছে যা থেকে এ বিশ্ব-জাহানের নির্মাতা, কারিগর, প্রশাসক ও ব্যবস্থাপক যে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা তা জানা যায়।

২০. এখানে রিযিক অর্থ বৃষ্টিপাত। কেননা, মানুষ এ পৃথিবীতে যত প্রকার রিযিক লাভ করে থাকে তা সবই বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসংখ্য নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে এ একটি মাত্র নিদর্শনের কথা তুলে ধরে এ মর্মে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, তোমরা যদি কেবল এ একটি জিনিসের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করো তাহলে বুঝতে পারবে, কুরআনে তোমাদেরকে বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা বিধানের যে ধারণা দেয়া হচ্ছে সেটিই বাস্তব ও সত্য। পৃথিবী ও তার সমস্ত সৃষ্টিকুল এবং পানি, বাতাস, সূর্য, উষ্ণতা ও শীতলতা সবকিছুর স্রষ্টা যদি একমাত্র আল্লাহ হন কেবল সে ক্ষেত্রেই এ ধরনের ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা বিধান সম্ভব। আর সে অনাদি অনন্ত আল্লাহই যদি চালু রাখেন কেবল তখনই এ ব্যবস্থা লক্ষ কোটি বছর পর্যন্ত একাধারে নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলতে পারে। এ ধরনের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠাকারী কেবল একমাত্র আল্লাহই হতে পারেন যিনি মহাজ্ঞানী, অতি দয়াবান ও পালনকর্তা। যিনি পৃথিবীতে মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদরাজি সৃষ্টি করার সাথে সাথে তাদের প্রয়োজন অনুসারে পানিও সৃষ্টি করেছেন এবং তা নিয়মিতভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌঁছিয়ে দেয়া ও ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বিস্ময়কর এ ব্যবস্থাপনাও দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এসব দেখে শুনেও আল্লাহকে অস্বীকার করে কিংবা আরো কিছু সত্তাকে তাঁর প্রভুত্বে অংশীদার বানায় তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে?

২১. অর্থাৎ আল্লাহ বিমুখ ব্যক্তি যার জ্ঞান বুদ্ধির ওপর গাফলতি এবং গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার পর্দা পড়ে আছে সে কোন জিনিস দেখেও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। তার পশু-চক্ষু এ দৃশ্য অবশ্যই দেখবে যে, বাতাস বয়ে গেল, মেঘরাশি উড়ে আসলো, বিদ্যুৎ চমকালো ও বজ্র ধ্বনি হলো এবং বৃষ্টিপাত হলো কিন্তু তার মানবিক মন-মগজ ভেবে দেখবে না, এসব কেন হচ্ছে, কে করছে এবং আমার কাছে তার কি কি অধিকার ও প্রাপ্য রয়েছে।

২২. দীনকে আল্লাহর জন্য নিবেদিত করার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা যুমারের ৩নং টীকায় করা হয়েছে।

২৩. অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি থেকে তার মর্যাদা অনেক উচ্চে। এ বিশ্ব-জাহানে বিদ্যমান কোন সত্তাই সে ফেরেশতা, নবী, অলী বা অন্য কোন সৃষ্টি যাই হোক না কেন আর তার মর্যাদা অন্য সব সৃষ্টিকুলের তুলনায় যত উচ্চ ও উন্নতই হোক না কেন, আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে তাঁর শরীক হওয়ার ধারণা করা তো দূরের কথা তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার ধারে কাছে পৌঁছার কথাও কল্পনা করা যায় না।

২৪. অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব-জাহানের বাদশাহ ও শাসক এবং এ সাম্রাজ্যের সিংহাসনের অধিপতি। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৪১; ইউনুস, টীকা ৪; আর রা'দ, টীকা ৩; ত্বা-হা, টীকা ২)।

২৫. রূহ অর্থ অহী ও নবুওয়াত। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, আন-নাহল, টীকা ২; বনী ইসরাঈল, টীকা ১০৩।) আর "আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার ওপর ইচ্ছা এ রূহ নাযিল

الْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ ۗ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى
الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ۗ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ﴿١٨﴾ يَعْلَمُ
خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ﴿١٩﴾ وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ۗ
وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَىْءٍ ۗ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ
الْبَصِيْرُ ﴿٢٠﴾

(বলা হবে,) আজ প্রত্যেক প্রাণীকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হবে। আজ কারো প্রতি কোন জুলুম হবে না।[২৮] আল্লাহ অতি দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী।[২৯] হে নবী, এসব লোকদের সেদিন সম্পর্কে সাবধান করে দাও যা সন্নিকটবর্তী হয়েছে।[৩০] যেদিন কলিজা মুখের মধ্যে এসে যাবে আর সব মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে। জালেমদের জন্য না থাকবে কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু,[৩১] না থাকবে কোন গ্রহণযোগ্য শাফায়াতকারী।[৩২] আল্লাহ চোখের চুরি ও মনের গোপন কথা পর্যন্ত জানেন। আল্লাহ সঠিক ও ন্যায় ভিত্তিক ফায়সালা করবেন। আর (এ মুশরিকরা) আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকে। তারা কোন কিছুরই ফায়সালাকারী নয়। নিসন্দেহে আল্লাহই সবকিছু শোনেন ও দেখেন।[৩৩]

করেন।" এ বাণীর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর মেহেরবানী ও অনুগ্রহের ওপর কারো কোন ইজারাদারী নেই। অমুক ব্যক্তিকে সৌন্দর্য দান করা হয়েছে কেন এবং অমুক ব্যক্তিকে স্মরণ শক্তি বা অসাধারণ মেধা শক্তি দান করা হয়েছে কেন, একথা বলার অধিকার যেমন কেউ রাখে না, তেমনি কেউ একথা বলারও অধিকার রাখে না যে, অমুক ব্যক্তিকে নবুওয়াতের পদমর্যাদার জন্য বাছাই করা হয়েছে কেন এবং আমরা যাকে চাই তাকে নবী বানানো হয়নি কেন?

২৬. অর্থাৎ যেদিন সমস্ত মানুষ, জিন ও শয়তান একই সময়ে তাদের রবের সামনে উপস্থিত হবে এবং তাদের কাজ-কর্মের সমস্ত সাক্ষীও উপস্থিত হবে।

২৭. অর্থাৎ পৃথিবীতে তো বহু অহংকারী ভ্রান্ত লোক নিজেদের বাদশাহী ও শক্তিমত্তার ডঙ্কা বাজাতো আর বহু সংখ্যক নির্বোধ তাদের বাদশাহী ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতো। এখন বলো প্রকৃতপক্ষে বাদশাহী কার? ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রকৃত মালিক কে? আর হুকুমই বা চলে কার? এটা এমন একটা বিষয় যে কোন ব্যক্তি যদি তা বুঝার চেষ্টা করে তাহলে সে

যত বড় বাদশাহ কিংবা একনায়ক হয়ে থাকুক না কেন, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং তার মন-মগজ থেকে শক্তিমত্তার সমস্ত অহংকার উবে যাবে। এখানে ঐতিহাসিক এ ঘটনাটা উল্লেখ্য যে, সামানী খান্দানের শাসক নাসর ইবনে আহমাদ (৩০১-৩৩১ হিঃ) নিশাপুরে প্রবেশ করলে একটি দরবার ডাকেন এবং সিংহাসনে বসার পর কুরআন মজীদ তিলাওয়াতের মাধ্যমে কাজকর্ম শুরু হবে বলে আদেশ দেন। একথা শুনে একজন সম্মানিত জ্ঞানী ব্যক্তি অগ্রসর হন এবং এ রুকূ'টি তিলাওয়াত করেন। যখন তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করছিলেন তখন নাসর ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি কাঁপতে কাঁপতে সিংহাসন থেকে নামলেন এবং মাথার মুকুট খুলে সিজদায় পড়ে বললেন ঃ হে আমার প্রভু, বাদশাহী তোমারই, আমার নয়।

২৮. অর্থাৎ কোন ধরনের জুলুমই হবে না। প্রকাশ থাকে যে, প্রতিদানের ক্ষেত্রে জুলুমের কয়েকটি রূপ হতে পারে। এক, প্রতিদানের অধিকারী ব্যক্তিকে প্রতিদান না দেয়া। দুই, সে যতটা প্রতিদান লাভের উপযুক্ত তার চেয়ে কম দেয়া। তিন, শাস্তি যোগ্য না হলেও শাস্তি দেয়া। চার, যে শাস্তির উপযুক্ত তাকে শাস্তি না দেয়া। পাঁচ, যে কম শাস্তির উপযুক্ত তাকে বেশী শাস্তি দেয়া। ছয়, জালেমের নির্দোষ মুক্তি পাওয়া এবং মজলুমের তা চেয়ে দেখতে থাকা। সাত, একজনের অপরাধে অন্যকে শাস্তি দেয়া। আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাঁর আদালতে এ ধরনের কোন জুলুমই হতে পারবে না।

২৯. এর অর্থ হিসেব নিতে আল্লাহর কোন বিলম্ব হবে না। যেভাবে তিনি গোটা বিশ্ব-জাহানের সমস্ত সৃষ্টিকে যুগপৎ রিযিক দান করছেন এবং কাউকে রিযিক পৌঁছানোর ব্যবস্থাপনায় এমন ব্যস্ত নন যে, অন্যদের রিযিক দেয়ার অবকাশই তিনি পান না। যেভাবে তিনি গোটা বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিসকে যুগপৎ দেখছেন, সমস্ত শব্দ যুগপৎ শুনছেন, প্রতিটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর এবং বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ব্যাপারের ব্যবস্থাপনাও তিনি যুগপৎ করছেন এবং কোন জিনিস এমনভাবে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না যে, ঠিক সে মুহূর্তে তিনি আর সব বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন না, তেমনি তিনি যুগপৎ প্রত্যেক ব্যক্তির হিসেবেও গ্রহণ করবেন এবং একটি বিচার্য বিষয়ের শুনানিতে তিনি কখনো এতটা ব্যস্ত হয়ে পড়বেন না যে, সে সময়ে অন্য অসংখ্য মোকদ্দমার শুনানি করতে পারবেন না। তাছাড়া তাঁর আদালতে এ কারণেও কোন বিলম্ব হবে না যে, মোকদ্দমার পটভূমি ও ঘটনাবলীর বিচার-বিশ্লেষণ এবং তার সাক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ কঠিন হবে। আদালতের বিচারক নিজে সরাসরি বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকবেন। মোকদ্দমার বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের সবকিছুই তাঁর জানা থাকবে। সমস্ত ঘটনার খুটি-নাটি সব দিক পর্যন্ত অনস্বীকার্য সাক্ষ প্রমাণসহ অনতিবিলম্বে সবিস্তার পেশ করা হবে। তাই সমস্ত মোকদ্দমার ফায়সালা ঝটপট হয়ে যাবে।

৩০. কুরআন মজীদে মানুষকে বার বার এ উপলব্ধি দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যে, কিয়ামত তাদের থেকে বেশী দূরে নয়, বরং তা অতি সন্নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে এবং যে কোন মুহূর্তে সংঘটিত হতে পারে। কোথাও বলা হয়েছে ঃ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ (আল নাহল ১)।কোথাও বলা হয়েছে اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ (আল আম্বিয়া ১) কোথাও সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (আল ক্বামার ১)। কোথাও বলা হয়েছেঃ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ مُعْرِضُونَ

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا
مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ
فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۖ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٢١﴾ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ۖ
إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا
وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ
كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾

৩ রুকূ'

এসব লোক কি কখনো পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করেনি তাহলে ইতিপূর্বে যারা অতীত হয়েছে তাদের পরিণাম দেখতে পেতো? তারা এদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী ছিল এবং এদের চেয়েও বেশী শক্তিশালী স্মৃতিচিহ্ন পৃথিবীর বুকে রেখে গিয়েছে। কিন্তু গোনাহর কারণে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন। আল্লাহর হাত থেকে তাদের রক্ষাকারী কাউকে পাওয়া যায়নি। তাদের এহেন পরিণতির কারণ হলো তাদের কাছে তাদের রসূল স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ[৩৪] নিয়ে এসেছিলো আর তারা তা মানতে অস্বীকার করেছিলো। অবশেষে আল্লাহ তাদের পাকড়াও করলেন। নিসন্দেহে তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং কঠোর শাস্তিদাতা।

আমি মূসাকে[৩৫] ফেরাউন, হামান[৩৬] ও কারূণের কাছে আমার নিদর্শনসমূহ এবং আমার পক্ষ থেকে আদিষ্ট হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ[৩৭] সহ পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা বললো ঃ জাদুকর, মিথ্যাবাদী।

لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (আন নাজ্‌ম ৫৭)। এসব কথার উদ্দেশ্য মানুষকে এ মর্মে সাবধান করে দেয়া যে, তারা যেন কিয়ামতকে দূরের কোন জিনিস মনে করে শঙ্কাহীন না থাকে। সতর্ক ও সামলিয়ে চলার প্রয়োজন মনে করলে এক মুহূর্তও নষ্ট না করে যেন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৩১. মূল আয়াতে حَمِيمٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এমন বন্ধু যাকে প্রহৃত হতে দেখে নিজেও উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং তাঁকে রক্ষার জন্য দ্রুত অগ্রসর হয়।

৩২. কাফেরদের শাফায়াত সম্পর্কিত আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিবাদ করে অবরোহমূলক-ভাবে একথাটি বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জালেমদের জন্য সেখানে আদৌ কোন শাফায়াতকারী থাকবে না। কারণ, শাফায়াতের অনুমতি লাভ করলে কেবল আল্লাহর নেক বান্দারাই করবে। আর আল্লাহর নেক বান্দারা কখনো কাফের, মুশরিক এবং ফাসেক ও পাপাচারীদের বন্ধু হতে পারে না যে, তারা তাদের বাঁচানোর জন্য শাফায়াত করার চিন্তা করবে। তবে যেহেতু কাফের, মুশরিক ও পথভ্রষ্ট লোকদের সাধারণ আকীদা-বিশ্বাস অতীতেও এই ছিল এবং বর্তমানেও আছে যে, আমরা যে বুযর্গদের অনুসরণ করে চলেছি তারা কখনো আমাদেরকে দোযখে যেতে দেবেন না। তারা বরং বাধা হয়ে সামনে দাঁড়াবেন এবং ক্ষমা করিয়েই ছাড়বেন। তাই বলা হয়েছে সেখানে এ রকম শাফায়াতকারী কেউ থাকবে না, যার কথা মেনে নেয়া হবে এবং আল্লাহকে যার সুপারিশ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

৩৩. অর্থাৎ তিনি তোমাদের উপাস্যদের মত কোন অন্ধ ও বধির আল্লাহ নন যে, যে ব্যক্তির ব্যাপারে তিনি সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন তার কৃতকর্ম সম্পর্কে কিছু জানেন না।

৩৪. স্পষ্ট নিদর্শন বলতে তিনটি জিনিস বুঝানো হয়েছে। এক, এমন সুস্পষ্ট চিহ্ন ও নিদর্শন যা তাঁদের আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আদিষ্ট হওয়ার প্রমাণ। দুই, এমন সব উজ্জ্বল প্রমাণ যা তাঁদের আনীত শিক্ষার সত্যতা প্রমাণ করছিলো। তিন, জীবনের বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে এমন সব সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা যা দেখে যে কোন যুক্তিবাদী মানুষ বুঝতে পারতো যে, কোন স্বার্থপর মানুষ এরূপ পবিত্র শিক্ষা দিতে পারে না।

৩৫. হযরত মূসার (আ) কাহিনীর আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, টীকা ৬৪ থেকে ৭৬; আন নিসা, টীকা ২০৬; আল মা-য়েদা, টীকা ৪২; আল আ'রাফ, টীকা ৯৩ থেকে ১১৯; ইউনুস, টীকা ৭২ থেকে ৯৪; হূদ, টীকা ১৯, ১০৪, ১১১; ইউসুফ, ভূমিকা; ইবরাহীম, টীকা ৮ থেকে ১৩; বনী ইসরাঈল, টীকা ১১৩ থেকে ১১৭; আল কাহাফ, টীকা ৫৭ থেকে ৫৯; মারয়াম, টীকা ২৯ থেকে ৩১, ত্বাহা, ভূমিকা, টীকা ৫ থেকে ৭৫; আল মু'মিনূন, টীকা ৩৯-৪২; আশ শু'আরা, টীকা ৭ থেকে ৪৯; আন নামল, টীকা ৮ থেকে ১৭১; আল কাসাস, ভূমিকা, টীকা ১ থেকে ৫৭; আল আহযাব আয়াত ৬৯; আস সাফ্‌ফাত, আয়াত ১১৪ থেকে ১২২।

৩৬. হামান সম্পর্কে ভিন্ন মতাবলম্বীদের আপত্তির জবাব ইতিপূর্বে সূরা কাসাসের টীকাসমূহে দেয়া হয়েছে।

৩৭. অর্থাৎ এমন স্পষ্ট নিদর্শনসহ যা দেখে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকতো না যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত আর তাঁর পক্ষে আছে বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা মহান আল্লাহর শক্তি। যে নিদর্শনগুলোকে এখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত মূসার (আ) আদিষ্ট হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে সেগুলো কি কুরআন মজীদে হযরত মূসার (আ) কাহিনীর যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে সে দিকে গভীরভাবে লক্ষ করলে তা বুঝা যায়। প্রথমত এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে কয়েক বছর আগে যে ব্যক্তি ফেরাউনের কওমের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো এবং যার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা ছিল, সে একখানা লাঠি হাতে হঠাৎ

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْٓا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ۭ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّىْٓ اَخَافُ
اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ ۝ وَقَالَ
مُوْسٰٓى اِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ
بِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝

অতপর যখন সে আমার পক্ষ থেকে সত্য এনে হাজির করলো[৩৮] তখন তারা বললো, যারা ঈমান এনে তার সাথে সামিল হয়েছে তাদের ছেলেদের হত্যা করো এবং মেয়েদের জীবিত রাখো।[৩৯] কিন্তু কাফেরদের চক্রান্ত ব্যর্থই হয়ে গেল।[৪০]

একদিন[৪১] ফেরাউন তার সভাসদদের বললো : আমাকে ছাড়ো, আমি এ মূসাকে হত্যা করবো।[৪২] সে তার রবকে ডেকে দেখুক। আমার আশংকা হয়, সে তোমাদের দীনকে পাল্টে দেবে কিংবা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।[৪৩]

মূসা বললো, যেসব অহংকারী হিসেবের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে না, তাদের প্রত্যেকের মোকাবিলায় আমি আমার ও তোমাদের রবের আশ্রয় গ্রহণ করেছি।[৪৪]

সোজা ফেরাউনের ভরা দরবারে নির্ভীক ও নিশঙ্কচিত্তে হাজির হচ্ছে এবং সাহসিকতার সাথে বাদশাহ ও তার সভাসদদের সম্বোধন করে আহবান জানাচ্ছেন যে, তারা যেন তাঁকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি হিসেবে মেনে নেয় এবং তার নির্দেশনা অনুসারে কাজ করে। কিন্তু তার গায়ে হাত তোলার সাহস কারো হচ্ছে না। অথচ মূসা (আ) যে কওমের লোক তারা এমন নিদারুনভাবে গোলামীর যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিলো যে, হত্যার অভিযোগে যদি তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রেফতার করা হতো তাহলে তার কওমের বিদ্রোহ করা তো দূরের কথা প্রতিবাদের জন্য মুখ খোলারও কোন আশংকা ছিল না। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, লাঠি ও "ইয়াদে বায়দা"র (শ্বেত-শুভ্র হাত) মু'জিযা দেখারও পূর্বে ফেরাউন এবং তার সভাসদরা হযরত মূসার (আ) আগমনেই ভীত হয়ে পড়েছিলো। প্রথম দর্শনেই তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলো যে, এ ব্যক্তি অন্য কোন শক্তির ভরসায় এখানে এসেছে। অতপর তার হাতে একের পর এক বিস্ময়কর যেসব মু'জিযা সংঘটিত হলো তার প্রত্যেকটি এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল করার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, এটা জাদুশক্তি নয়, বরং খোদায়ী

শক্তির বিস্ময়কর প্রকাশ। এমন কোন জাদু আছে যার জোরে লাঠি সত্যিকার আজদাহায় রূপান্তরিত হতে পারে? কিংবা গোটা একটা দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হতে পারে? কিংবা একটি নোটিশ দেয়ার সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ বর্গ মাইল বিস্তৃত একটি এলাকায় নানা ধরনের ঝড় তুফান আসতে পারে এবং আরেকটি নোটিশে তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে? কুরআন মজীদের বর্ণনা অনুসারে এ কারণে ফেরাউন ও তার দায়িত্বশীল লোকজন মুখে যত অস্বীকার করুক না কেন, মন তাদের পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছিলো যে, হযরত মূসা (আ) সত্যিই আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৮৬ থেকে ৮৯; ত্বা-হা, টীকা ২৯ থেকে ৫৩; আশ শু'আরা, টীকা ২২ থেকে ৪১; আন নামল, টীকা ১৬)।

৩৮. অর্থাৎ যখন হযরত মূসা (আ) একের পর এক মু'জিযা ও নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে পুরোপুরি প্রমাণ করলেন যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত রসূল এবং মজবুত প্রমাণাদি দ্বারা তাঁর সত্য হওয়া সুস্পষ্ট করে দিলেন।

৩৯. পূর্বেই সূরা আ'রাফের ১২৭ আয়াতে একথা উল্লেখিত হয়েছে যে, ফেরাউনের দরবারের লোকজন তাকে বলেছিলো, মূসাকে এভাবে অবাধে তৎপরতা চালানোর অধিকার আর কতদিন দেয়া যাবে এবং তার জবাবে ফেরাউন বলেছিলো অচিরেই আমি বনী ইসরাঈলদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করার এবং কন্যা সন্তানদের জীবিত রাখার নির্দেশ দিতে যাচ্ছি। (তাফহীমুল কুরআন , আল আ'রাফ, টীকা ৯৩)। এ আয়াতটি থেকে জানা যাচ্ছে যে, ফেরাউনের পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত যে নির্দেশ জারী করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য ছিল হযরত মূসা (আ) এবং তাঁর সহযোগী ও অনুসারীদের এতটা ভীত সন্ত্রস্ত করে দেয়া যে, তারা যেন ভয়ের চোটে তার পক্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

৪০. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِيْنَ اِلاَّ فِىْ ضَلاَلٍ । এ আয়াতাংশের আরেকটি অর্থ হতে পারে এই যে, ঐ কাফেরদের চক্রান্ত ছিল গোমরাহী, জুলুম-নির্যাতন এবং ন্যায় ও সত্যের বিরোধিতার খাতিরে। অর্থাৎ ন্যায় ও সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়া এবং মনে মনে তার সমর্থক হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও নিজেদের জিদ ও হঠকারিতা বৃদ্ধিই পেয়েছে এবং সত্যকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য তারা জঘন্য থেকে জঘন্যতম পন্থা অবলম্বন করতেও দ্বিধান্বিত হয়নি।

৪১. এখান থেকে যে ঘটনার বর্ণনা শুরু হচ্ছে তা বনী ইসরাঈল জাতির ইতিহাসের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অথচ বনী ইসরাঈল নিজেরাই তা বিস্মৃত হয়ে বসেছে। বাইবেল এবং তালমুদে এর কোন উল্লেখ নেই এবং অন্যান্য ইসরাঈলী বর্ণনায়ও তার কোন নাম গন্ধ পর্যন্ত দেখা যায় না। ফেরাউন এবং হযরত মূসার (আ) মধ্যকার সংঘাতের যুগে এক সময় এ ঘটনাটিও যে সংঘটিত হয়েছিলো বিশ্ববাসী কেবল কুরআন মজীদের মাধ্যমেই তা জানতে পেরেছে। ইসলাম ও কুরআনের বিরুদ্ধে শত্রুতায় অন্ধ হয়ে না থাকলে যে ব্যক্তিই এ কাহিনী পাঠ করবে সে একথা উপলব্ধি না করে পারবে না যে, ন্যায় ও সত্যের দিকে আহবানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ কাহিনী অত্যন্ত মূল্যবান ও বিশেষ মর্যাদার দাবীদার। তাছাড়া হযরত মূসার (আ) ব্যক্তিত্ব, তাঁর তাবলীগ ও প্রচার এবং তাঁর মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া বিস্ময়কর মু'জিযাসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ফেরাউনের নিজের সভাসদদের মধ্য থেকে কারো সংগোপনে ঈমান গ্রহণ করা এবং মূসাকে (আ) হত্যার

ব্যাপারে ফেরাউনকে উদ্যোগী হতে দেখে আত্মসংবরণ করতে না পারা বুদ্ধি-বিবেক ও যুক্তি বিরোধীও নয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদরা জ্ঞান চর্চা ও গবেষণার লম্বা চওড়া দাবি সত্ত্বেও গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতায় অন্ধ হয়ে কুরআনের সুস্পষ্ট সত্যসমূহের ধামাচাপা দেয়ার প্রচেষ্টা চালায়। ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামের "মূসা" নামক প্রবন্ধের লেখক এ শিরোনামের প্রবন্ধে যা লিখেছেন তা থেকেই একথা বুঝা যায়। তিনি লিখছেন ঃ

"ফেরাউনের দরবারে একজন বিশ্বাসী মূসাকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন, কুরআনের বর্ণিত এ কাহিনী সুস্পষ্ট নয় (সূরা ৪০, আয়াত ২৮)। আমরা কি তাহলে হাগ্‌গাদায় বর্ণিত কাহিনীর বিষয়বস্তুর সাথে এ কাহিনীর তুলনা করবো যাতে ক্ষমা সুলভ দৃষ্টিতে কাজ করার জন্য ইয়েথরো ফেরাউনের দরবারে পরামর্শ দিয়েছিলো?"

জ্ঞান গবেষণার এসব দাবিদারদের কাছে এটা যেন স্বতঃসিদ্ধ যে, কুরআনের প্রতিটি বিষয়ে অবশ্যই খুঁত বের করতে হবে। কুরআনের কোন বক্তব্যের মধ্যে যদি কোন খুঁত বের করার সুযোগ না-ই পাওয়া যায় তাহলেও অন্তত এতটুকু যেন বলা যায় যে, এ কাহিনী পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। এভাবে ধীরে ধীরে পাঠকদের মনে এ সন্দেহও সৃষ্টি করে দেয়ার চেষ্টা করা যে, ইয়েথরো কর্তৃক মূসার (আ) জন্ম পূর্ব যে কাহিনী হাগ্‌গাদায় বর্ণিত হয়েছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়তো কোথাও থেকে তা শুনে থাকবেন এবং সেটাই এখানে এভাবে বর্ণনা করে থাকবেন। এটা হচ্ছে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার একটা বিশেষ স্টাইল যা এসব লোকেরা ইসলাম, কুরআন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে অবলম্বন করে চলেছে।

৪২. একথার দ্বারা ফেরাউন এ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করছে যেন কিছু লোক তাকে বিরত রেখেছে আর সেই কারণে সে মূসাকে (আ) হত্যা করছে না। তারা যদি বাধা না দিতো তাহলে বহু পূর্বেই সে তাঁকে হত্যা করে ফেলতো। অথচ প্রকৃতপক্ষে বাইরের কোন শক্তিই তাকে বাধা দিচ্ছিলো না। তার মনের ভীতিই তাকে আল্লাহর রসূলের গায়ে হাত তোলা থেকে বিরত রেখেছিলো।

৪৩. অর্থাৎ আমি তার পক্ষ থেকে বিপ্লবের আশংকা করছি। আর সে যদি বিপ্লব করতে নাও পারে তাহলে এতটুকু বিপদাশঙ্কা অন্তত অবশ্যই আছে যে, তার কর্ম-তৎপরতার ফলে দেশে অবশ্যই বিপর্যয় দেখা দেবে। তাই সে মৃত্যুদণ্ড লাভের মত কোন অপরাধ না করলেও শুধু দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার (Maintenance of public order) খাতিরে তাকে হত্যা করা প্রয়োজন। সে ব্যক্তির ব্যক্তি সত্তা আইন শৃঙ্খলার জন্য সত্যিই বিপজ্জনক কিনা তা দেখার দরকার নেই। সে জন্য শুধু "হিজ ম্যাজেষ্টি"র সন্তুষ্টিই যথেষ্ট। মহামান্য সরকার যদি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন যে, এ লোকটি বিপজ্জনক তাহলে মেনে নিতে হবে, সে সত্যিই বিপজ্জনক এবং সে জন্য শিরোচ্ছেদের উপযুক্ত।

এ স্থানে "দীন পাল্টে দেয়া"র অর্থও ভালভাবে বুঝে নিন, যার আশঙ্কায় ফেরাউন হযরত মূসাকে (আ) হত্যা করতে চাচ্ছিলো। এখানে দীন অর্থ শাসন ব্যবস্থা। তাই ফেরাউনের কথার অর্থ হলো انى اخاف ان يغير سلطانكم (روح المعانى ج ٢٤ ص ٥٦)। অন্য কথায়, ফেরাউন ও তার খান্দানের চূড়ান্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ভিত্তিতে ধর্ম, রাজনীতি, সভ্যতা ও অর্থনীতির যে ব্যবস্থা মিসরে চলছিলো তা ছিল তৎকালে ঐ

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا
أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ
وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ
الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾

৪ রুকূ'

এ সময় ফেরাউনের দরবারের এক ব্যক্তি যে তার ঈমান গোপন রেখেছিলো— বললো ঃ তোমরা কি এক ব্যক্তিকে শুধু এ কারণে হত্যা করবে যে, সে বলে, আল্লাহ আমার রব? অথচ সে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছে।[৪৫] সে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকলে তার মিথ্যার দায়-দায়িত্ব তারই[৪৬]। কিন্তু সে যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে যেসব ভয়ানক পরিণামের কথা সে বলছে তার কিছুটা তো অবশ্যই তোমাদের ওপর আসবে। আল্লাহ কোন সীমালংঘনকারী মিথ্যাবাদী লোককে হিদায়াত দান করেন না।[৪৭]

দেশের 'দীন'। আর ফেরাউন হযরত মূসার আন্দোলনের কারণে এ দীন পাল্টে যাওয়ার আশঙ্কা করছিলো। কিন্তু প্রত্যেক যুগের কূচক্রী ও ধূরন্ধর শাসকদের মত সেও একথা বলছে না যে, আমার হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাওয়ার আশঙ্কা করছি। তাই আমি মূসাকে হত্যা করতে চাই। বরং পরিস্থিতিকে সে এভাবে পেশ করছে যে, হে জনগণ, বিপদ আমার নয়, তোমাদের। কারণ মূসার আন্দোলন যদি সফল হয়, তাহলে তোমাদের দীন বদলে যাবে। নিজের জন্য আমার চিন্তা নেই। আমি তোমাদের চিন্তায় নিশেষ হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে যে, আমার ক্ষমতার ছত্রছায়া থেকে বঞ্চিত হলে তোমাদের কি হবে। তাই যে জালেমের দ্বারা তোমাদের ওপর থেকে এ ছত্রছায়া উঠে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তাকে হত্যা করা প্রয়োজন। কারণ সে দেশ ও জাতি উভয়ের শত্রু।

৪৪. এখানে দু'টি সমান সম্ভাবনা বিদ্যমান। এ দু'টি সম্ভাবনার কোনটিকেই অগ্রাধিকার দেয়ার কোন ইংগিত এখানে নেই। একটি সম্ভাবনা হচ্ছে, হযরত মূসা নিজেই সে সময় দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতেই ফেরাউন তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং হযরত মূসা (আ) তাকে ও তার সভাসদদের উদ্দেশ করে তখনই সবার সামনে প্রকাশ্যে এ জবাব দেন। অপর সম্ভাবনাটি হচ্ছে, ফেরাউন হযরত মূসার (আ) অনুপস্থিতিতে তার সরকারের দায়িত্বশীল লোকদের কোন মজলিসে একথা প্রকাশ করে এবং হযরত মূসাকে (আ) তার এ আলোচনার খবর কিছু সংখ্যক ঈমানদার লোক পৌছিয়ে দেয়, আর তা শুনে তিনি তাঁর অনুসারীদের একথা বলেন। এ দু'টি অবস্থার যেটিই বাস্তবে ঘটে থাকুক না কেন হযরত মূসার (আ) কথায় স্পষ্টত প্রকাশ পাচ্ছে যে,

ফেরাউনের হুমকি তাঁর মনে সামান্যতম ভীতিভাবও সৃষ্টি করতে পারেনি। তিনি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে তার হুমকির জবাব তার মুখের ওপরেই দিয়ে দিয়েছেন। যে পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কুরআন মজীদে এ ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে আপনা আপনি একথা প্রকাশ পায় যে, "হিসেবের দিন" সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে যেসব জালেমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছিলো তাদের জন্যও সে একই জবাব।

৪৫. অর্থাৎ সে তোমাদেরকে এমন সব সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখিয়েছে যে, সে যে তোমাদের রবের রসূল তা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ফেরাউনের সভাসদদের মধ্যকার ঈমানদার ব্যক্তির ইংগিত ছিল সে নিদর্শনসমূহের প্রতি যার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। (তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৮৭, ৮৯, ৯০, ৯১, এবং ৯৪ থেকে ৯৬; বনী ইসরাঈল, টীকা ১১৩ থেকে ১১৬; ত্বা-হা, টীকা ২৯ থেকে ৫০; আশ শু'আরা, টীকা ২৬ থেকে ৩৯; আন নামল, টীকা ১৬)।

৪৬. অর্থাৎ এরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শন সত্ত্বেও তোমরা যদি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করো, সে ক্ষেত্রেও তোমাদের জন্য উচিত তাকে তার মত চলতে দেয়া। কারণ, অপর সম্ভাবনা এবং অত্যন্ত জোরদার সম্ভাবনা হচ্ছে, সে সত্যবাদী। আর সে ক্ষেত্রে তাকে হত্যা করে আল্লাহর আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে। তাই তোমরা যদি তাকে মিথ্যাবাদীও মনে করো তবুও তাকে বাধা দিও না। সে যদি আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা বলে থাকে তাহলে আল্লাহ নিজেই তার সাথে বুঝা পড়া করবেন। এর আগে হযরত মূসা আলাইহিস সালামও প্রায় অনুরূপ কথাই ফেরাউনকে বলেছিলেন ঃ

وَإِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِيْ فَاعْتَزِلُوْنِ (الدخان : ٢١)

"তোমরা যদি কথা না মানো তাহলে আমাকে আমার মত চলতে দাও।"

এখানে এ বিষয় লক্ষ রাখতে হবে যে, ফেরাউনের সভাসদদের মধ্যকার মু'মিন ব্যক্তি তার বক্তব্যের শুরুতে স্পষ্ট করে একথা বলেনি যে, সে হযরত মূসার (আ) প্রতি ঈমান এনেছে। প্রথম দিকে সে এমনভাবে তার বক্তব্য পেশ করেছে যাতে মনে হয় সে ফেরাউনের গোষ্ঠীরই একজন লোক এবং তার জাতির কল্যাণের জন্যই সে এ কথা বলছে। কিন্তু যখন সে দেখছে ফেরাউন ও সভাসদরা কোনক্রমেই সঠিক পথ অনুসরণ করতে চাচ্ছে না তখন শেষ মুহূর্তে সে তার ঈমানের গোপনীয়তা প্রকাশ করছে। পঞ্চম রুকূ'তে তার বক্তব্য থেকে তা প্রকাশ পাচ্ছে।

৪৭. এ আয়াতাংশের দু'টি অর্থ সম্ভব। ফেরাউনের সভাসদদের মধ্যকার ঈমান গ্রহণকারী ব্যক্তি হয়তো ইচ্ছা করেই এ দ্ব্যর্থবোধক শব্দটি এ জন্য বলেছিলো যে, তখনো সে তার ধ্যান-ধারণা খোলাখুলি প্রকাশ করতে চাচ্ছিলো না। এর একটি তাৎপর্য হচ্ছে, একই ব্যক্তির মধ্যে সত্যবাদিতার মত গুণ এবং মিথ্যা ও অপবাদের মত দোষের সমাবেশ ঘটতে পারে না। তোমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছো, মূসা (আ) একজন অতীব পবিত্র চরিত্র এবং অত্যন্ত উন্নত স্বভাবের মানুষ। তোমাদের মন-মগজে একথা কি করে স্থান পায়

يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ
بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ؕ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَمَآ
اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۝ وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ
اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ۝ مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ
وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ۝

হে আমার কওমের লোকেরা, আজ তোমরা বাদশাহীর অধিকারী এবং এ ভূ-ভাগের বিজয়ী শক্তি। কিন্তু আল্লাহর আযাব যদি আমাদের ওপর এসে পড়ে তাহলে আমাদেরকে সাহায্য করার মত কে আছে?[৪৮]

ফেরাউন বললো, আমি যা ভাল মনে করছি সে মতামতই তোমাদের সামনে পেশ করছি। আর আমি তোমাদেরকে সঠিক পথের নির্দেশনাই দিচ্ছি।[৪৯]

যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিলো, বললো ঃ হে আমার কওমের লোকেরা, আমার আশংকা হচ্ছে, তোমাদের ওপরও সেদিনের মত দিন এসে না যায়, যা এর আগে বহু দলের ওপর এসেছিলো। যেমন দিন এসেছিলো নূহ (আ), আদ, সামূদ এবং তাদের পরবর্তী কওমসমূহের ওপর। আর এটা সত্য যে, আল্লাহ তার বান্দাদের ওপর জুলুম করার কোন ইচ্ছা রাখেন না।[৫০]

যে, এক দিকে সে এত বড় মিথ্যাবাদী যে আল্লাহর নাম নিয়ে নবুওয়াতের ভিত্তিহীন দাবী করছে, অন্যদিকে তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে এরূপ উন্নত স্বভাব চরিত্র দান করেছেন। এর আরেকটি তাৎপর্য হচ্ছে, তোমরা যদি সীমালংঘনের মাধ্যমে মূসার (আ) প্রাণ নাশের জন্য উঠে পড়ে লাগো এবং তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে তোমাদের দূরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে তৎপর হও তাহলে মনে রেখো, আল্লাহ কখনো তোমাদেরকে সফল হতে দেবেন না।

৪৮. অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া এ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিরূপ নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে নিজেদের জন্য তাঁর গযব ডেকে আনছো কেন?

৪৯. ফেরাউনের এ জবাব থেকে বুঝা যায় তার দরবারের এ সভাসদ যে মনে মনে ঈমান এনেছে, তা সে তখনো পর্যন্ত জানতে পারেনি। এ কারণে সে তার কথায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেনি বটে তবে একথা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, তার মতামত ও চিন্তা ভাবনা শোনার পরও সে নিজের মত পাল্টাতে প্রস্তুত নয়।

وَيٰقَوْمِ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ۚ
مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾
وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا
جَآءَكُمْ بِهِۦ ۖ حَتّٰىٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِۦ رَسُولًا ۗ
كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ﴿٣٤﴾

হে কওম, আমার ভয় হয়, তোমাদের ওপর ফরিয়াদ ও অনুশোচনা করার দিন না এসে পড়ে, যখন তোমরা একে অপরকে ডাকতে থাকবে এবং দৌড়িয়ে পালাতে থাকবে। কিন্তু সেখানে আল্লাহর হাত থেকে বাঁচানোর কেউ থাকবে না। সত্য কথা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করে দেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। এর আগে ইউসুফ তোমাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু তোমরা তার আনীত শিক্ষার ব্যাপারে সন্দেহই পোষণ করেছো। পরে তার ইন্তিকাল হলে তোমরা বললে ঃ এখন আর আল্লাহ কোন রাসূল পাঠাবেন না।[৫১] এভাবে[৫২] আল্লাহ তা'আলা সেসব লোকদের গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেন যারা সীমালংঘনকারী ও সন্দেহ প্রবণ হয়।

৫০. অর্থাৎ বান্দার সাথে আল্লাহর কোন শত্রুতা নেই যে, তিনি অযথা তাদের ধ্বংস করবেন। তিনি তাদের ওপর আযাব কেবল তখনই পাঠান যখন তারা সীমালংঘন করে। আর সে সময় তাদের ওপর আযাব তাঁর ন্যায় ও ইনসাফের দাবী হয়ে দাঁড়ায়।

৫১. অর্থাৎ তোমাদের গোমরাহী এবং সে গোমরাহীর ব্যাপারে তোমাদের হঠকারিতার অবস্থা এই যে, মূসা আলাইহিস সালামের পূর্বে তোমাদের দেশে ইউসুফ আলাইহিস সালাম নবী হয়ে এসেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে তোমরা নিজেরাও স্বীকার করো যে, তিনি অত্যন্ত উন্নত স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, একথাও তোমরা স্বীকার করো যে, সে সময়ে তোমাদের ওপর যে দুর্ভিক্ষ এসেছিলো তৎকালীন বাদশাহর স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা বলে দিয়ে সাত বছর ব্যাপী সে ভয়ানক দুর্ভিক্ষের ধ্বংসকারিতা থেকে তিনি তোমাদের রক্ষা করেছিলেন। তোমাদের গোটা জাতি একথাও স্বীকার করে যে, তাঁর শাসনামলের চেয়ে অধিক ন্যায় ও ইনসাফ এবং কল্যাণ ও বরকতের যুগ মিসরে আর কখনো আসেনি। কিন্তু তাঁর এসব গুণাবলী জানা ও মানা সত্ত্বেও তোমরা তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর ওপর কখনো ঈমান আনো নাই। তাঁর মৃত্যু হলে তোমরা বলতে শুরু করলে, তাঁর মত লোক কি আর কখনো জন্ম নিতে পারে? তোমরা তাঁর গুণাবলী স্বীকার করলেও পরবর্তী কালেও সেটিকেই যেন তোমরা পরবর্তী সমস্ত নবীকে অস্বীকার করার একটা

الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۭ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ
اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۭ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰي كُلِّ قَلْبِ
مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۝ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ
الْاَسْبَابَ ۝ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ
لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ۭ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْۗءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ۭ
وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ۝

এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের ব্যাপারে ঝগড়া করে। অথচ এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোন সনদ বা প্রমাণ আসেনি।[৫৩] আল্লাহ ও ঈমানদারদের কাছে এ আচরণ অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী। এভাবে আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারীর মনে মোহর লাগিয়ে দেন।[৫৪]

ফেরাউন বললো ঃ "হে হামান, আমার জন্য একটি সুউচ্চ ইমারত নির্মাণ করো যাতে আমি রাস্তাসমূহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি অর্থাৎ আসমানের রাস্তা এবং মূসার ইলাহকে উঁকি দিয়ে দেখতে পারি। মূসাকে মিথ্যাবাদী বলেই আমার মনে হয়।"[৫৫] এভাবে ফেরাউনের জন্য তার কুকর্মসমূহ সুদৃশ্য বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তার সোজা পথে চলা থামিয়ে দেয়া হয়েছে। ফেরাউনের সমস্ত চক্রান্ত (তার নিজের) ধ্বংসের পথেই ব্যয়িত হয়েছে।

স্থায়ী বাহানা বানিয়ে নিয়েছো। এর অর্থ, কোন অবস্থায়ই তোমরা হিদায়াত গ্রহণ করবে না।

৫২. বাহ্যত মনে হয়, ফেরাউনের সভাসদদের মধ্যকার ঈমান গ্রহণকারী ব্যক্তির বক্তব্যের ব্যাখ্যা ও সংযোজনা হিসেবে আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী বাক্যগুলো বলেছেন।

৫৩. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে সেসব লোককেই গোমরাহীতে নিক্ষেপ করা হয় যাদের মধ্যে এ তিনটি বৈশিষ্ট রয়েছে। এক, তারা কুকর্মে সীমা লংঘন করে এবং গোনাহ ও পাপাচারে এমনভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে যে, নৈতিক চরিত্র সংশোধনের কোন আহবানই গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না। দুই, নবী-রসূলদের (আলাইহিমুস সালাম) ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয়ে লিপ্ত থাকা হয় তাদের স্থায়ী আচরণ। আল্লাহর নবী তাদের সামনে যত সুস্পষ্ট নিদর্শনই পেশ করুন না কেন, তারা তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারেও সন্দেহ পোষণ

وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۝ يٰقَوْمِ
اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۫ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۝
مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ
اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا
بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

৫ রুকূ'

যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিলো, বললো ঃ হে আমার কওমের লোকেরা, আমার কথা মেনে নাও। আমি তোমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিচ্ছি। হে কওম, দুনিয়ার এ জীবন তো কয়েক দিনের জন্য।[৫৬] একমাত্র আখেরাতই চিরদিনের অবস্থানস্থল। যে মন্দ কাজ করবে সে যতটুকু মন্দ করবে ততটুকুরই প্রতিফল লাভ করবে। আর নারী হোক বা পুরুষ যে নেক কাজ করবে সে যদি ঈমানদার হয় তাহলে তারা সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে বে হিসেব রিযিক দেয়া হবে।

করে। তাছাড়া তাওহীদ ও আখেরাত সম্পর্কে তারা যেসব সত্য ও বাস্তবতা পেশ করেছেন তারা সেগুলোকেও সবসময় সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে থাকে। তিন, তারা আল্লাহর কিতাবের বাণীসমূহ সম্পর্কে যুক্তি গ্রাহ্য পন্থায় চিন্তা-ভাবনা করার পরিবর্তে কূট তর্কের দ্বারা তার মোকাবিলার চেষ্টা করে। তাদের এ কূট তর্কের ভিত্তি কোন জ্ঞানগত যুক্তি বা আসমানী কিতাবের সনদ নয় বরং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের জিদ ও হঠকারিতাই তার একমাত্র ভিত্তি। যখন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে এ তিনটি দোষ দেখা দেয় আল্লাহ তখন তাদেরকে গোমরাহীর গহবরে নিক্ষেপ করেন। দুনিয়ার কোন শক্তিই তাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করতে পারে না।

৫৪. অর্থাৎ বিনা কারণে কারো মনে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয় না। যার মধ্যে অহংকার ও স্বেচ্ছাচারিতা সৃষ্টি হয় লা'নতের এ মোহর কেবল তার মনের ওপরেই লাগানো হয়। 'তাকাববুর' অর্থ ব্যক্তির মিথ্যা অহংকার যার কারণে ন্যায় ও সত্যের সামনে মাথা নত করাকে সে তার মর্যাদার চেয়ে নীচু কাজ বলে মনে করে। স্বেচ্ছাচারিতা অর্থ আল্লাহর সৃষ্টির ওপর জুলুম করা। এ জুলুমের অবাধ লাইসেন্স লাভের জন্য ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়াতের বাধ্য-বাধকতা মেনে নেয়া থেকে দূরে থাকে।

৫৫. ফেরাউনের সভাসদদের মধ্যকার মু'মিন ব্যক্তির বক্তব্য পেশের সময় ফেরাউন হামানকে সম্বোধন করে একথা কিছুটা এমন ভঙ্গিতে বলছে যেন সে ঐ মু'মিনের কথাকে

وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ﴿٤١﴾ تَدْعُوْنَنِيْ
لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۡ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى
الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾ لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي
الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ
اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿٤٣﴾ فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ۭ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ
اِلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾

হে কওম, কি ব্যাপার যে, আমি তোমাদেরকে মুক্তির দিকে আহবান জানাচ্ছি আর তোমরা আমাকে আগুনের দিকে আহবান জানাচ্ছো। তোমরা আমাকে আহবান জানাচ্ছো যেন আমি আল্লাহর সাথে কুফরী করি এবং সেসব সত্তাকে তাঁর সাথে শরীক করি যাদের আমি জানি না।[৫৭] অথচ আমি তোমাদের সে মহাপরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে আহবান জানাচ্ছি। না, সত্য হচ্ছে এই যে, তোমরা যেসব জিনিসের দিকে আমাকে ডাকছো, তাতে না আছে দুনিয়াতে কোন আবেদন না আছে আখেরাতে কোন আহবান।[৫৮] আমাদেরকে আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। আর সীমালংঘনকারী[৫৯] আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। আজ তোমাদেরকে আমি যা বলছি অচিরেই এমন সময় আসবে যখন তোমরা তা স্মরণ করবে। আমি আমার ব্যাপারটা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। তিনি তাঁর বান্দাদের রক্ষক।[৬০]

আদৌ বিবেচনার যোগ্য বলে মনে করে না। তাই অহংকারী ভঙ্গিতে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হামানকে বলছে? আমার জন্য একটা উঁচু ইমারত নির্মাণ করো। আমি দেখতে চাই, মূসা যে আল্লাহর কথা বলে সে আল্লাহ কোথায় থাকে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল কাসাস, টীকা ৫২ থেকে ৫৪)।

৫৬. অর্থাৎ তোমরা যে এ পৃথিবীর অস্থায়ী ধন-সম্পদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে গর্বিত হয়ে আল্লাহকে ভুলে যাচ্ছো তা তোমাদের অজ্ঞতা।

৫৭. অর্থাৎ তারা আল্লাহর শরীক এ ব্যাপারে আমার কাছে কোন জ্ঞানগত প্রমাণ নেই। তাই আমি চোখ বন্ধ করে এত বড় কথা কি করে মেনে নিতে পারি যে, প্রভুত্বে তাদেরও অংশীদারিত্ব আছে এবং আল্লাহর বন্দেগী করার সাথে সাথে আমাকে তাদের বন্দেগীও করতে হবে।

فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾
اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۫ اَدْخِلُوْٓا
اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾ وَاِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ
الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ
عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾

শেষ পর্যন্ত তারা ঐ ঈমানদারের বিরুদ্ধে যেসব জঘন্য চক্রান্ত করেছে আল্লাহ তা'আলা তাকে তা থেকে রক্ষা করেছেন।[৬১] আর ফেরাউনের সাংগপাংগরাই জঘন্য আযাবের চক্রে পড়ে গিয়েছে।[৬২] দোযখের আগুন, যে আগুনের সামনে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। কিয়ামত সংঘটিত হলে নির্দেশ দেয়া হবে, ফেরাউনের অনুসারীদের কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো।[৬৩] তারপর একটু চিন্তা করে দেখো সে সময়ের কথা যখন এসব লোক দোযখের মধ্যে পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হবে। যারা দুনিয়ায় দুর্বল ছিল তারা সেসব লোকদের বলবে যারা নিজেদের বড় মনে করতো, "আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম। এখন এখানে কি তোমরা আমাদেরকে জাহান্নামের কষ্টের কিছু অংশ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবে?"[৬৪]

৫৮. এ আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে, তাদের প্রভুত্ব মেনে নেয়ার জন্য আল্লাহর সৃষ্টিকে দাওয়াত দেয়ার অধিকার তাদের দুনিয়াতেও নেই আখেরাতেও নেই। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, মানুষ জোর করে তাদেরকে ইলাহ বানিয়েছে। অন্যথায় তারা নিজেরা না দুনিয়াতে প্রভুত্বের দাবী করে, না আখিরাতে এ দাবী করবে যে, আমরাও ইলাহ ছিলাম। তোমরা আমাদেরকে কেন মেনে নাওনি? তৃতীয় অর্থ তাদেরকে ডাকার কোন উপকার না এই দুনিয়ায় আছে, না আখেরাতে আছে। কেননা, তারা একেবারেই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বহীন এবং তাদেরকে ডাকা একেবারেই অর্থহীন।

৫৯. 'সীমালংঘন করা' অর্থ ন্যায় ও সত্যকে লংঘন করা। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রভুত্ব মেনে নেয় অথবা নিজেই প্রভু হয়ে বসে কিংবা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে পৃথিবীতে নিজে স্বাধীন হওয়ার নীতি ও আচরণ করে এবং নিজের ওপর, আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির ওপর এবং পৃথিবীর যে জিনিসের সাথেই তারা সংশ্লিষ্ট হয় তার ওপরই অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করে, এসব ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান-বুদ্ধি ও ইনসাফের সকল সীমালংঘনকারী মানুষ।

৬০. এ আয়াতাংশ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, একথা বলার সময় উক্ত মু'মিন ব্যক্তির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এ সত্য বলার অপরাধে সে ফেরাউনের গোটা রাজ শক্তির রোষানলে

পড়বে এবং তাকে শুধু তার সম্মান, মর্যাদা ও স্বার্থ হারাতে হবে তাই নয়, জীবনের আশাও ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু এত কিছু বুঝতে পারা সত্ত্বেও তিনি শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা করে এ নাজুক সময়ে তার বিবেক যেটিকে তার কর্তব্য বলে মনে করেছে সে দায়িত্ব পালন করেছেন।

৬১. এ থেকে জানা যায়, ফেরাউনের সাম্রাজ্যে সে ব্যক্তি এতটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিল যে, ভরা দরবারে ফেরাউনের মুখের ওপরে এ ধরনের সত্য কথন সত্ত্বেও তাকে প্রকাশ্যে শাস্তি দেয়ার সাহস হয়নি। এ কারণে তাকে হত্যা করার জন্য ফেরাউন ও তার সহযোগীদের গোপনে ষড়যন্ত্র করতে হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ সে ষড়যন্ত্রও বাস্তবায়িত হতে দেননি।

৬২. এ বর্ণনাভঙ্গি থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, ফেরাউনের সভাসদদের মধ্যকার ঈমানদার ব্যক্তির সত্য কথনের এ ঘটনা হযরত মূসা (আ) ও ফেরাউনের মধ্যকার দ্বন্দ্বের একেবারে শেষ যুগে সংঘটিত হয়েছিল। সম্ভবত এ দীর্ঘ দ্বন্দ্ব-সংঘাতে বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ফেরাউন হযরত মূসাকে হত্যা করার সংকল্প করে থাকবে। কিন্তু তার সাম্রাজ্যের প্রভাবশালী এ ব্যক্তির সত্য কথনের কারণে সে হয়তো আশঙ্কা করেছিলো যে, মূসা আলাইহিস সালামের প্রভাব সরকারের উচ্চ পর্যায়ের লোকদের ওপরেও পড়েছে। হয়তো এ কারণেই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যে, মূসার (আ) বিরুদ্ধে এ পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বেই সাম্রাজ্যের আমীর, উমরা ও উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী লোকদের মধ্যে যারা এ আন্দোলনে প্রভাবিত হয়েছে সেসব লোকদের খুঁজে বের করা হোক যাতে তাদের মূলোৎপাটনের পর মূসাকে হত্যা করা যায়। কিন্তু সে এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকাকালেই আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ) ও তাঁর অনুসারীদের হিজরতের আদেশ দিলেন। আর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে ফেরাউন তার সৈন্য-সামন্তসহ ডুবে মারা যায়।

৬৩. বহু সংখ্যক হাদীসে কবরের আযাব নামক বরযখের আযাবের যে উল্লেখ আছে এ আয়াত তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় আযাবের দু'টি পর্যায়ের উল্লেখ করছেন। একটি হচ্ছে কম মাত্রার আযাব যা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে ফেরাউনের অনুসারীদের দেয়া হচ্ছে অর্থাৎ তাদেরকে সকাল ও সন্ধ্যায় দোযখের আগুনের সামনে পেশ করা হয় আর ঐ আগুন দেখে তারা সর্বক্ষণ আতংকিত হয়ে কাটায় এই ভেবে যে, এ দোযখেই তাদেরকে শেষ পর্যন্ত যেতে হবে। এরপর কিয়ামত আসলে তাদেরকে তাদের জন্য নির্ধারিত বড় এবং সত্যিকার আযাব দেয়া হবে। ডুবে মরার সময় থেকে আজ পর্যন্ত তাদেরকে যে আযাবের দৃশ্য দেখানো হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত দেখানো হবে। এ ব্যাপারটি শুধু ফেরাউন ও ফেরাউনের অনুসারীদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। অপরাধীদের জন্য যে জঘন্য পরিণাম অপেক্ষা করছে, মৃত্যুর মুহূর্ত থেকে কিয়ামত পর্যন্ত তারা সবাই সে দৃশ্য দেখতে পায় আর সমস্ত সৎকর্মশীল লোকের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে শুভ পরিণাম প্রস্তুত করে রেখেছেন তার সুন্দর দৃশ্যও তাদেরকে দেখানো হয়। বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ ۙ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ
الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ
يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾ قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ
رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۭ قَالُوْا بَلٰى ۭ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ
اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿٥٠﴾

বড়ত্বের দাবীদাররা বলবেঃ আমরা সবাই এখানে একই অবস্থায় আছি। আর আল্লাহ তার বান্দাদের ব্যাপারে ফায়সালা করে দিয়েছেন।[৬৫] দোযখে নিক্ষিপ্ত এসব লোক জাহান্নামের কর্মকর্তাদের বলবে ঃ "তোমাদের রবের কাছে দোয়া করো তিনি যেন একদিনের জন্য আমাদের আযাব হ্রাস করেন।" তারা বলবে, "তোমাদের রসূলগণ কি তোমাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আসেননি?" "তারা বলবে হ্যাঁ।" জাহান্নামের কর্মকর্তারা বলবে ঃ "তাহলে তোমরাই দোয়া করো। তবে কাফেরদের দোয়া ব্যর্থই হয়ে থাকে।"[৬৬]

ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى ، ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة ، وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل اليه يوم القيامة –

"তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই মারা যায় তাকেই সকাল ও সন্ধায় তার শেষ বাসস্থান দেখানো হতে থাকে। জান্নাতী ও দোযখী উভয়ের ক্ষেত্রেই এটি হতে থাকে। তাকে বলা হয় কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তোমাকে পুনরায় জীবিত করে তাঁর সান্নিধ্যে ডেকে নেবেন, তখন তোমাকে আল্লাহ যে জায়গা দান করবেন, এটা সেই জায়গা।"

(অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নিসা, আয়াত ৯৭; আল আন'আম, ৯৩, ৯৪; আল আনফাল ৫০; আন নাহল ২৮, ৩২; আল মু'মিনূন, ৯৯, ১০০; ইয়াসীন ২৬, ২৭; টীকা ২২ ও ২৩; মুহাম্মাদ ২৭, টীকা ৩৭)।

৬৪. তারা এমন কোন আশা নিয়ে একথা বলবে না যে, তাদের ঐ সব পূর্বতন নেতা কিংবা শাসক বা পথপ্রদর্শক প্রকৃতই তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে বা তা

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ
الْأَشْهَادُ ﴿٥١﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ
سُوءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
الْكِتَابَ ﴿٥٣﴾ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٥٤﴾

৬ রুকূ'

নিশ্চিত জানো, আমি এ পার্থিব জীবনে আমার রসূল ও ঈমানদারদের অবশ্যই সাহায্য করি[৬৭] এবং যেদিন সাক্ষীদের পেশ করা হবে[৬৮] সেদিনও করবো। যেদিন ওজর ও যুক্তি পেশ জালেমদের কোন উপকারে আসবে না, তাদের ওপর লা'নত পড়বে এবং তাদের জন্য হবে জঘন্যতম ঠিকানা। অবশেষে দেখো, আমি মূসাকে পথনির্দেশনা দিয়েছিলাম[৬৯] এবং বনী ইসরাঈলদের এমন এক কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছি যা ছিল বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীদের জন্য হিদায়াত ও নসিহত।[৭০]

কিছুটা লাঘব করিয়ে দেবে। তখন তাদের কাছে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এখানে এসব লোক আমাদের কোন কাজে আসার মত নয়। তারা তাদেরকে হেয় ও লাঞ্ছিত করার জন্য তাদেরকে বলবে ঃ দুনিয়ায় তো জনাব অত্যন্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ফলিয়ে আমাদের ওপর আপনার নেতৃত্ব চালাতেন। আপনাদের কল্যাণে এখন এখানে যে বিপদ আমাদের ওপর আপতিত তা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন তো দেখি।

৬৫. অর্থাৎ আমরা ও তোমরা সবাই সাজাপ্রাপ্ত এবং আল্লাহর আদালত থেকে যার যে সাজা প্রাপ্য তা পেয়ে গেছি। তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা কিংবা তাঁর দেয়া শাস্তি হ্রাস বৃদ্ধি করার সাধ্য কারো নেই।

৬৬. অর্থাৎ ঘটনা যখন এই যে, রসূল তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিলেন। আর তোমরা তাঁর কথা মানতে অস্বীকার (কুফরী) করেছিলে সে কারণে সাজা প্রাপ্ত হয়ে এখানে এসেছো তখন আমাদের পক্ষে তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। কারণ, এ ধরনের দোয়ার জন্য কোন না কোন ওজর বা যুক্তি থাকা চাই। কিন্তু তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে কোন ওজর বা যুক্তি পেশের সুযোগ আগেই নষ্ট করে ফেলেছো। এ অবস্থায় তোমরা নিজেরা দোয়া করতে চাইলে করে দেখো। তবে আমরা তোমাদেরকে প্রথমেই একথা বলে দিতে চাই যে, তোমাদের মত কুফরী করে যারা এখানে এসেছে তাদের দোয়া করা একেবারেই নিরর্থক।

৬৭. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আস সাফ্‌ফাত, টীকা ৯৩।

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٥٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ
اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم
بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾

অতএব, হে নবী, ধৈর্যধারণ করো।[৭১] আল্লাহর ওয়াদা সত্য,[৭২] নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য মাফ চাও[৭৩] এবং সকাল সন্ধ্যা নিজের রবের প্রশংসার সাথে সাথে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকো।[৭৪] প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, যারা তাদের কাছে আসা যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে ঝগড়া করছে তাদের মন অহংকারে ভরা[৭৫] কিন্তু তারা যে বড়ত্বের অহংকার করে তারা তার ধারেও ঘেঁষতে পারবে না।[৭৬] তাই আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো[৭৭] তিনি সবকিছু দেখেন এবং শোনেন।

৬৮. অর্থাৎ যখন আল্লাহর আদালত কায়েম হবে এবং তাঁর সামনে সাক্ষী পেশ করা হবে।

৬৯. অর্থাৎ আমি মূসাকে (আ) ফেরাউনের মোকাবিলায় পাঠিয়ে তাকে অসহায়ভাবে ছেড়ে দিয়েছিলাম না। বরং প্রতি পদে আমি তাকে পথনির্দেশনা দিচ্ছিলাম এবং এভাবে তাকে সাফল্যের দ্বার প্রান্তে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম। একথাটির মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত আছে। ইংগিতটি হচ্ছে, হে মুহাম্মাদ, (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি তোমার সাথেও একই আচরণ করবো। তোমাকেও মক্কা নগরীতে কুরাইশ গোত্রের মধ্যে নবুয়াত দিয়ে পাঠানোর পর তোমাকে অসহায়ভাবে ছেড়ে দেইনি যে, এ জালেমরা তোমার সাথে যেমন ইচ্ছা আচরণ করবে। বরং আমি নিজে তোমার পৃষ্ঠপোষক আছি এবং তোমাকে পথনির্দেশনা দান করছি।

৭০. অর্থাৎ যেভাবে মূসার (আ) দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীরা এ নিয়ামত ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলো এবং তাঁর প্রতি ঈমান পোষণকারী বনী ইসরাঈলকেই কিতাবের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে তেমনিভাবে এখন যারা তোমাকে অস্বীকার করবে তারা বঞ্চিত হবে এবং তোমার প্রতি ঈমান পোষণকারীরাই কুরআনের উত্তরাধীকারী এবং পৃথিবীতে হিদায়াতের পতাকাবাহী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে।

৭১. অর্থাৎ তুমি যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছো তা অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে প্রশান্ত মনে বরদাশত করতে থাকো।

৭২. "আমি এ পার্থিব জীবনেও আমার রসূল ও ঈমানদারদের অবশ্যই সাহায্য করি।" একটু আগেই ওপরে বর্ণিত এ বাক্যাংশের প্রতিশ্রুতির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

৭৩. যে প্রসংগে একথা বলা হয়েছে তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে স্পষ্ট বুঝা যায়, এ ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে ধৈর্যহীনতার সে পরিস্থিতিকে যখন চরম বিরোধিতার সে পরিবেশে বিশেষ করে তাঁর সংগী সাথীদেরকে ক্রমাগত নির্যাতিত হতে দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছিলো। তিনি চাচ্ছিলেন শীঘ্রই এমন মু'জিযা দেখিয়ে দিতে যা দেখে কাফেররা স্বীকার করে নেবে কিংবা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অনতিবিলম্বে এমন কিছু প্রকাশ পাক যা দেখে বিরোধিতার এ আগুন নিভে যায়। এ ধরনের আকাংখা পোষণ কোন গোনাহ ছিল না যে, সে জন্য তাওবা ও ইসতিগফারের প্রয়োজন পড়তো। তবে আল্লাহ তা'আলা নবীকে (সা) যে উচ্চ আসনে সমাসীন করেছিলেন এবং সে পদমর্যাদা যে উচ্চ ও মহত সংকল্পের দাবি করে সে দিকের বিচারে এ যৎসামান্য ধৈর্যচ্যুতিও আল্লাহর কাছে তাঁর মর্যাদার চেয়ে অনেক নীচু মনে হয়েছে। তাই বলা হয়েছে, এ দুর্বলতার জন্য তোমার রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং পাথরের মত অটল হয়ে স্বীয় ভূমিকায় এমন অবিচল থাকো যেমনটি তোমার মত মহত মর্যাদার লোকদের হওয়া প্রয়োজন।

৭৪. অর্থাৎ এ প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করাই সে উপায় যার মাধ্যমে আল্লাহর পথের কর্মীরা আল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো দুঃখ-কষ্টের মোকাবিলা করার শক্তি অর্জন করে। সকাল ও সন্ধ্যায় 'হামদ' ও 'তাসবীহ' বা প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করার দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, সদা সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো। দুই, এ নির্দিষ্ট সময় দু'টিতে নামায আদায় করো। দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করা হলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যা এ সূরা নাযিল হওয়ার কিছুদিন পর সমস্ত ঈমানদারদের জন্য ফরয করে দেয়া হয়েছিল। কারণ, আরবী ভাষায় عشى শব্দটি সূর্য মাথার ওপর থেকে হেলে পড়ার সময় থেকে রাতের প্রথম অংশ পর্যন্ত সময় বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এ সময়ের মধ্যে যোহর থেকে শুরু করে এশা পর্যন্ত চার ওয়াক্ত নামায অন্তরভুক্ত। আর ابكار শব্দটি ভোর বেলায় উষার আলো প্রকাশ পাওয়ার সময় থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়কে অর্থাৎ ফজরের নামাযের ওয়াক্তকে বলা হয়। (অধিক বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ৫, ৫৯, ৬০, ২৬৩; হূদ, টীকা ১১৩; আল হিজ্‌র, টীকা ৫৩; বনী ইসরাঈল, ভূমিকা এবং টীকা ১, ৯১ থেকে ৯৮; ত্বা-হা, টীকা ১১১; আন নূর, টীকা ৮৪ থেকে ৮৯; আল আনকাবূত, টীকা ৭৬ থেকে ৭৯; আর রূম, টীকা ২৪, ৫০)।

৭৫. অর্থাৎ এসব লোকের যুক্তি-প্রমাণহীন বিরোধিতা এবং যুক্তিহীন কূট তর্কের মূল কারণ এ নয় যে, আল্লাহর আয়াতসমূহে যেসব সত্য এবং কল্যাণের কথা তাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে তা তাদের বোধগম্য হয় না। সুতরাং তারা তা বুঝার জন্য সৎ নিয়তে তর্কে লিপ্ত হয়। বরং তাদের এহেন আচরণের মূল কারণ হচ্ছে, তাদের মনের গর্ব ও অহংকার একথা মেনে নিতে প্রস্তুত নয় যে, তারা থাকতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনা মেনে নেয়া হবে এবং একদিন তাদের নিজেদেরকেও এ ব্যক্তির নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে, যার তুলনায় নিজেদেরকেই তারা নেতৃত্বের অধিক উপযুক্ত মনে করে। তাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্ব যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে সে জন্য তারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জঘন্য থেকে জঘন্যতর কোন কৌশল কাজে লাগাতেও তারা দ্বিধান্বিত নয়।

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْٓءُ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾ اِنَّ
السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٩﴾
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ
عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ﴿٦٠﴾

মানুষ[৭৮] সৃষ্টি করার চেয়ে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা নিসন্দেহে অনেক বড় কাজ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না।[৭৯] অন্ধ ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী এক রকম হতে পারে না এবং ঈমানদার ও সৎকর্মশীল সমান হতে পারে না। কিন্তু তোমরা কমই বুঝতে পারো।[৮০] কিয়ামত নিশ্চয়ই আসবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা বিশ্বাস করে না।[৮১]

তোমাদের[৮২] রব বলেন : আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো।[৮৩] যেসব মানুষ গর্বের কারণে আমার দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা অচিরেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[৮৪]

৭৬. অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ যাকে বড় বানিয়েছেন সে–ই বড় হয়ে থাকবে এবং এসব ছোট লোক নিজেদের বড়ত্ব কায়েম রাখার জন্য যে চেষ্টা–সাধনা করছে তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

৭৭. অর্থাৎ ফেরাউনের হুমকির মুখে মহাপরাক্রমশালী একমাত্র আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে মূসা (আ) যেমন চিন্তা মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন তেমনি কুরাইশ নেতাদের হুমকি ও ষড়যন্ত্রের মুখে তুমিও তাঁর আশ্রয় নাও এবং চিন্তামুক্ত হয়ে তাঁর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য তৎপরতা চালিয়ে যাও।

৭৮. ওপরে সাড়ে তিনটি রুকূ'তে কুরাইশ নেতাদের ষড়যন্ত্রসমূহ পর্যালোচনা করার পর এখান থেকে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করা হচ্ছে। তাদের বুঝানো হচ্ছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে যেসব সত্য মেনে নেয়ার আহবান জানাচ্ছেন তা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসংগত। তা মেনে নেয়ার মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ এবং না মানা তোমাদের জন্য ধ্বংসাত্মক। এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের

কথা বলে তার সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। কারণ, কাফেরদের কাছে এ বিশ্বাস ছিল অদ্ভুত। একে তারা দুর্বোধ্য ও জ্ঞান-বুদ্ধির পরিপন্থী বলে মনে করতো।

৭৯. এটি আখেরাত সম্ভব হওয়ার প্রমাণ। কাফেরদের ধারণা ছিল যে, মৃত্যুর পর মানুষের পুনরায় জীবিত হওয়া অসম্ভব। এর জবাবে বলা হচ্ছে, যারা এ ধরনের কথা বলে তারা প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞ। যদি জ্ঞান-বুদ্ধি কাজে লাগানো হয় তাহলে একথা বুঝা তাদের জন্য মোটেই কঠিন নয় যে, যে আল্লাহ এ বিশ্ব-জাহান বানিয়েছেন মানুষকে পুনরায় জীবিত করা তাঁর জন্য কোন কঠিন কাজ হতে পারে না।

৮০. এটি আখেরাতের অনিবার্যতার প্রমাণ। ওপরের আয়াতাংশে বলা হয়েছিলো যে, আখেরাত হতে পারে তা হওয়া অসম্ভব নয়। আর এ আয়াতাংশে বলা হচ্ছে যে, আখেরাত হওয়া অনিবার্য, অবধারিত। জ্ঞান-বুদ্ধি ও ইনসাফের দাবী হলো তা হতেই হবে। তা হওয়া নয়, না হওয়াই জ্ঞান-বুদ্ধি ও ইনসাফের পরিপন্থী। কোন যুক্তিবাদী মানুষ কি কখনো একথা সঠিক বলে মেনে নিতে পারে যে, যারা পৃথিবীতে অন্ধদের মত জীবন যাপন করে এবং নিজেদের দুশ্চরিত্র ও দুষ্কর্ম দ্বারা আল্লাহর পৃথিবীকে বিপর্যস্ত করে তোলে তারা তাদের ভুল আচার আচরণ ও কর্মকাণ্ডের কোন খারাপ পরিণাম আদৌ দেখবে না এবং অনুরূপ যারা দুনিয়াতে ভালমন্দ বিচার করে চলে এবং ঈমান গ্রহণ করে নেক কাজ করে, তারা নিজেদের এ উত্তম কর্মকাণ্ডের কোন ভাল ফলাফল থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে? এ বিষয়টি যদি জ্ঞান-বুদ্ধি ও ইনসাফের পরিপন্থী হয় তাহলে আখেরাত অস্বীকৃতির আকীদাও অবশ্যই জ্ঞান-বুদ্ধি ও ইনসাফের পরিপন্থী হতে হবে। কারণ, আখেরাত না হওয়ার অর্থ হচ্ছে ভাল ও মন্দ উভয় শ্রেণীর মানুষ মরে মাটিতে মিশে যাওয়া এবং উভয়ের একই পরিণতি লাভ করা। এরূপ হলে শুধু জ্ঞান-বুদ্ধি ও ইনসাফকেই হত্যা করা হয় না, বরং নৈতিকতাও মূলোৎপাটিত হয়। কারণ, ভাল ও মন্দ উভয় শ্রেণীর মানুষের যদি একই পরিণাম হয় তাহলে মন্দ লোকেরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান এ কারণে যে, তারা মৃত্যুর পূর্বে হৃদয়-মনের সমস্ত কামনা বাসনা পূরণ করেছে। আর সৎলোকেরা অত্যন্ত নির্বোধ এ কারণে যে, তারা অযথা নিজেদের ওপরে নানা রকমের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে রেখেছিলো।

৮১. এটা হচ্ছে আখেরাত সংঘটিত হওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা। এ ধরনের ঘোষণা যুক্তি-তর্কের ভিত্তিতে দেয়া যায় না শুধু জ্ঞানের ভিত্তিতেই দেয়া যায়। আর আল্লাহর বাণী ছাড়া অন্য কোন বাণীতে এ বিষয়টি এমন অকাট্যভাবে বর্ণিত হতে পারে না। অহী বাদ দিয়ে শুধু জ্ঞান-বুদ্ধির উদ্ভাবনী ক্ষমতা, যা বলা যেতে পারে, তা শুধু এতটুকু যে, আখেরাত সংঘটিত হতে পারে এবং হওয়া উচিত। এর চেয়ে অগ্রসর হয়ে আখেরাত অবশ্যই সংঘটিত হবে একথা কেবল সে মহান সত্তাই বলতে পারেন যার জানা আছে যে, আখেরাত হবে। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া এমন সত্তা আর কেউ নেই। এখানে এসেই একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, অনুমান ও যুক্তি-তর্কের পরিবর্তে নির্ভুল জ্ঞানের ওপর যদি দীনের ভিত্তি স্থাপিত হয় তবে তা হতে পারে শুধু আল্লাহর অহীর মাধ্যমে।

৮২. আখেরাতের আলোচনার পর এখন তাওহীদ সম্পর্কে বক্তব্য শুরু হচ্ছে। আর এটি ছিলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কাফেরদের মাঝে বিরোধের দ্বিতীয় বিষয়।

৮৩. অর্থাৎ দোয়া কবুল করা না করার সমস্ত ক্ষমতা ও ইখতিয়ার আমার কাছে। অথবা তোমরা অন্যদের কাছে দোয়া করো না, আমার কাছে দোয়া করো। এ আয়াতটির মূল ভাবধারা সঠিকভাবে বুঝতে হলে তিনটি বিষয় ভালভাবে বুঝে নিতে হবে।

প্রথমত, মানুষ দোয়া করে কেবল সে সত্তার কাছে যাকে সে سميع (সর্বশ্রোতা), بصير (সর্বদ্রষ্টা) এবং অতি প্রাকৃতিক ক্ষমতার (Super natural powers) অধিকারী মনে করে। মূলত মানুষের আভ্যন্তরীণ অনুভূতি তাকে দোয়া করতে উদ্বুদ্ধ করে। বস্তুজগতের প্রাকৃতিক উপায়-উপকরণ যখন তার কোন কষ্ট নিবারণ কিংবা কোন প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যথেষ্ট নয় বা যথেষ্ট বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না তখন কোন অতি প্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী সত্তার কাছে ধর্ণা দেয়া অপরিহার্য। তখনই মানুষ দোয়া করে এবং না দেখেই সে সত্তাকে ডাকে; প্রতি মুহূর্তে, প্রতিটি জায়গায় এবং সর্বাবস্থায় ডাকে। একাকী নির্জনে ডাকে, উচ্চস্বরেই শুধু নয়, চুপে চুপেও ডাকে এবং মনে মনেও তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। একটি বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তা হয়। বিশ্বাসটি হচ্ছে, সেই সত্তা তাকে সর্বত্র সর্বাবস্থায় দেখছেন। তাঁর মনের কথাও শুনছেন। তিনি এমন অসীম ক্ষমতার অধিকারী যে, তাঁর কাছে প্রার্থনাকারী যেখানেই অবস্থান করুক না কেন তিনি তাকে সাহায্য করতে পারেন, তার বিপর্যস্ত ভাগ্যকে পুনরায় তৈরী করতে পারেন। দোয়ার এ তাৎপর্য অনুধাবন করার পর মানুষের জন্য একথা বুঝা আর কঠিন থাকে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তাকে সাহায্যের জন্য ডাকে সে প্রকৃতই নিরেট নির্ভেজাল এবং স্পষ্ট শিরকে লিপ্ত হয়। কারণ, যেসব গুণাবলী কেবল আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট তা সেসব সত্তার মধ্যেও আছে বলে সে বিশ্বাস করে। সে যদি তাদেরকে ঐ সব খোদায়ী গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক না করতো তাহলে তার কাছে দোয়া করার কল্পনা পর্যন্ত তার মনে কখনো আসতো না।

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় যে কথাটি ভালভাবে বুঝে নিতে হবে তা হচ্ছে, কোন ব্যক্তি যদি কারো সম্পর্কে নিজের থেকেই একথা মনে করে বসে যে, সে অনেক ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক তাহলে অনিবার্য রূপেই সে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক হয়ে যায় না। ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক হওয়া একটি বাস্তব ব্যাপার যা কারো মনে করা বা না করার ওপর নির্ভর করে না। আপনি মালিক মনে করেন আর না করেন প্রকৃতই যে ক্ষমতা ইখতিয়ারের মালিক সে সর্বাবস্থায়েই মালিক থাকবে। আর যে প্রকৃত মালিক নয় আপনি তাকে মালিক মনে করে বসলেও এ মনে করাটা তাকে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের অতি সামান্য অংশও দিতে পারবে না। এটা বাস্তব ও সত্য যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সত্তাই সর্বশক্তিমান, বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপক ও শাসক এবং সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। তিনিই সামগ্রিকভাবে সমস্ত ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক। সমগ্র বিশ্ব-জাহানে দ্বিতীয় এমন কোন সত্তাই নেই, যে দোয়া শোনার কোন যোগ্যতা ও ইখতিয়ার রাখে বা তা কবুল করা বা না করার ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে। মানুষ যদি এ বাস্তবতার পরিপন্থী কাজ করে নিজের পক্ষ থেকে নবী-রসূল, আওলিয়া, ফেরেশতা, জিন, গ্রহ-উপগ্রহ ও মনগড়া দেবতাদেরকে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে অংশীদার মনে করে বসে তাতে বাস্তব অবস্থার সামান্যতম পরিবর্তনও হবে না। মালিক মালিকই থাকবেন এবং ক্ষমতা ও ইখতিয়ারহীন দাস দাসই থেকে যাবে।

তৃতীয় কথাটি হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যদের কাছে প্রার্থনা করা হবহু এমন যেন কোন ব্যক্তি দরখাস্ত লিখে নিয়ে রাজ প্রাসাদে গেল কিন্তু ক্ষমতার প্রকৃত মালিককে বাদ দিয়ে সেখানে অন্য যেসব প্রার্থী নিজেদের অভাব পূরণের আশায় বসে আছে তাদের কারো সামনে দরখাস্ত পেশ করে করজোড়ে কাকুতি-মিনতি করে বলতে থাকলো। হুজুরই সবকিছু, এখানে তো আপনার হুকুমই চলে, আমার প্রয়োজন যদি আপনি পূরণ করেন তবেই পূরণ হতে পারে। প্রথমত এ আচরণ নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার পরিচায়ক কিন্তু তৎন যদি প্রকৃত ক্ষমতার ও ইখতিয়ারের মালিক শাসক সামনে বিদ্যমান থাকেন আর তার উপস্থিতিতে তাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো সামনে দরখাস্ত পেশ করে কাকুতি-মিনতি করে প্রার্থনা করা হয় তাহলে এমন অবস্থায় তা চরম অশোভন ও ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজ বলে পরিগণিত হয়। তাছাড়া এ অজ্ঞতা চরমে পৌঁছে তখন, যখন যে ব্যক্তির সামনে দরখাস্ত পেশ করা হচ্ছে সে নিজে তাকে বারবার একথা বুঝায় যে, আমিও তোমার মত একজন প্রার্থী। আমার কাছে কিছুই নেই। আসল শাসক তো সামনেই আছেন। তুমি তার কাছে দরখাস্ত পেশ কর। কিন্তু তার বুঝানো ও নিষেধ সত্ত্বেও এ নির্বোধ যদি বলতেই থাকে যে, আমার মালিক মনিব আপনি। আপনি যদি করে দেন তবেই আমার কাজ হবে। বস্তুত এরূপ অবস্থায়ই এ অজ্ঞতার চরম বহির্প্রকাশ ঘটে।

এ তিনটি বিষয় মনে রেখে আল্লাহ তা'আলার বাণী "আমাকে ডাকো। তোমাদের ডাকে সাড়া দানকারী আমি। তা গ্রহণ করা আমার কাজ।" আল্লাহ তা'আলার এ বাণীটি বুঝার চেষ্টা করুন।

৮৪. এ আয়াতের দু'টি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একটি হচ্ছে, এখানে "দোয়া" ও "ইবাদাত" শব্দ দু'টিকে সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, প্রথম বাক্যাংশে যে জিনিসকে দোয়া শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে দ্বিতীয় বাক্যাংশে সে জিনিসকেই ইবাদাত শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এ দ্বারা একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, দোয়াও ঠিক ইবাদাত তথা ইবাদাতের প্রাণ। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না এমন লোকদের জন্য "অহংকার ও গর্বভরে আমার ইবাদাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়" কথাটি প্রয়োগ করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর কাছে দোয়া করা বন্দেগী বা দাসত্বের দাবী। এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অর্থ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গর্ব ও অহংকারে ডুবে আছে। এ কারণে নিজের স্রষ্টা ও মনিবের কাছে দাসত্বের স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বাণীতে আয়াতের এ দু'টি বিষয় পরিষ্কার বর্ণনা করেছেন। হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন : ..... اِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ অর্থাৎ দোয়াই 'ইবাদাত'। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন। (তোমরা আমাকে ডাকো আমি সাড়া দেবো। আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর)। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন : الدعاء مخ العبادة "দোয়া হচ্ছে ইবাদাতের সারবস্তু" (তিরমিযী)। হযরত আবু হুরাইরা বলেন, নবী (সা) বলেছেন : من لم يسأل الله يغضب عليه "যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চায় না আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন" (তিরমিযী)।

এ পর্যায়ে একটি সমস্যারও সমাধান হয়ে যায় যা বহু সংখ্যক মানুষের মনে বেশীর ভাগ সময় দ্বিধা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে থাকে। দোয়া করার ক্ষেত্রে মানুষের চিন্তাধারা হলো, তাকদীরের ভাল-মন্দ যখন আল্লাহর ইখতিয়ারে তখন তিনি তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে যে ফায়সালা করেছেন সেটাই অনিবার্যরূপে ঘটবে। সুতরাং আমার দোয়া করার স্বার্থকতা কি? এটা একটা বড় রকমের ভ্রান্তি। এ ভ্রান্তি মানুষের মন থেকে দোয়ার সমস্ত গুরুত্ব মুছে ফেলে। এ ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে পড়ে থেকে মানুষ যদি দোয়া করেও সেসব দোয়ায় কোন প্রাণ থাকে না। কুরআন মজীদের এ আয়াতটি দুটি পন্থায় এ ভ্রান্ত ধারণা দূর করে। প্রথমত, আল্লাহ তা'আলা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলছেন, "আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো।" এ থেকে জানা যায়, তাকদীর এমন কোন জিনিস নয়। আমাদের মত (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলার হাত পাও বেঁধে দিয়েছে এবং তিনি দোয়া কবুল করার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার হারিয়ে ফেলেছেন। নিসন্দেহে বান্দা আল্লাহর সিদ্ধান্তসমূহ এড়ানো বা পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু কোন বান্দার দোয়া ও আবেদন নিবেদন শুনে আল্লাহ নিজে তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা অবশ্যই রাখেন। এ আয়াতে দ্বিতীয় যে কথাটি বলা হয়েছে তা হলো, দোয়া কবুল হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় তার একটি ছোট বা বড় ফায়দা থাকে কোন অবস্থায়ই তা ফায়দাহীন নয়। সে ফায়দা হলো, বান্দা তার প্রভুর সামনে নিজের অভাব ও প্রয়োজন পেশ এবং দোয়া করে তাঁর প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয় এবং নিজের দাসত্ব ও অক্ষমতা স্বীকার করে। নিজের দাসত্বের এ স্বীকৃতিই যথাস্থানে একটি ইবাদাত তথা ইবাদাতের প্রাণসত্তা। বান্দা যে উদ্দেশ্যে দোয়া করলো সেই বিশেষ জিনিসটি তাকে দেয়া হোক বা না হোক কোন অবস্থায়ই সে তার এ দোয়ার প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হবে না।

আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস থেকে এ দু'টি বিষয়ের ব্যাখ্যা পেয়ে যাই। নিম্ন বর্ণিত হাদীসগুলো প্রথমোক্ত বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে।

হযরত সালমান ফারসী থেকে বর্ণিত নবী (সা) বলেছেন ঃ لا يرد القضاء الا الدعاء (ترمذى) "দোয়া ছাড়া আর কোন কিছুই তাকদীরকে পরিবর্তন করতে পারে না" অর্থাৎ কোন কিছুর মধ্যেই আল্লাহর ফায়সালা পরিবর্তনের ক্ষমতা নেই। কিন্তু আল্লাহ নিজে তাঁর ফায়সালা পরিবর্তন করতে পারেন। আর এটা হয় কেবল তখনি যখন বান্দা তাঁর কাছে দোয়া করে।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

ما من احد يدعو بدعاء الا اتاه الله ما سأل او كف عنه من السوء مثله ما لم يدع باثم او قطيعة رحم (ترمذى)

"বান্দা যখনই আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ তখন হয় তার প্রার্থিত জিনিস তাকে দান করেন কিংবা তার ওপরে সে পর্যায়ের বিপদ আসা বন্ধ করে দেন—যদি সে গোনাহর কাজে বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না করে।"

আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) কর্তৃক রসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত আরেকটি প্রায় অনুরূপ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ

ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه اللّه احدى ثلث ، اما ان يعجل له دعوته ، واما ان يدخرها له فى الا خرة واما ان يصرف عنه من السوء مثلها (مسند احمد)

"একজন মুসলমান যখনই কোন দোয়া করে তা যদি কোন গোনাহ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তা তিনটি অবস্থার যে কোন এক অবস্থায় কবুল করে থাকেন। হয় তার দোয়া এ দুনিয়াতেই কবুল করা হয়, নয়তো আখেরাতে প্রতিদান দেয়ার জন্য সংরক্ষিত রাখা হয় অথবা তার ওপরে ঐ পর্যায়ের কোন বিপদ আসা বন্ধ করা হয়।"

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ

اذا دعا احدكم فلا يقل اللهم اغفرلى ان شيئت ، ارحمنى ان شئت ، ارزقنى ان شئت ، وليغزم مسئلته (بخارى)

"তোমাদের কোন ব্যক্তি দোয়া করলে সে যেন এভাবে না বলে, হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে মাফ করে দাও, তুমি চাইলে আমার প্রতি রহম করো এবং তুমি চাইলে আমাকে রিযিক দাও। বরং তাকে নির্দিষ্ট করে দৃঢ়তার সাথে বলতে হবে; "হে আল্লাহ, আমার অমুক প্রয়োজন পূরণ করো।"

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকেই আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটির ভাষা হচ্ছে, নবী (সা) বলেছেন ঃ

ادعوا اللّه وانتم موقنون بالاجابة (ترمذى)

"আল্লাহ দোয়া কবুল করবেন এ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দোয়া করো।"

আরেকটি হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণী উদ্ধৃত করেছেন যে,

يستجاب للعبد ما لم يدع باثم او قطيعة رحم مالم يستعجل ، قيل يا رسول اللّه ما الاستعجال ؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم اريستجاب لى فيستحسر عند ذلك و يدع الدعاء (مسلم)

"যদি গোনাহ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না হয় এবং তাড়াহুড়া না করা হয় তাহলে বান্দার দোয়া কবুল করা হয়।" জিজ্ঞেস করা হলো ঃ হে আল্লাহর রসূল,

তাড়াহুড়ো কি? তিনি বললেন ঃ তাড়াহুড়ো হচ্ছে ব্যক্তির একথা বলা যে, "আমি অনেক দোয়া করেছি। কিন্তু দেখছি আমার কোন দোয়াই কবুল হচ্ছেনা। এভাবে সে অবসন্ন গ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং দোয়া করা ছেড়ে দেয়।"

দ্বিতীয় বিষয়টিও নিম্নবর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ

ليس شيئ اكرم على اللّه من الدعاء (ترمذى ، ابن ماجة)

"আল্লাহর কাছে দোয়ার চাইতে অধিক সম্মানার্হ জিনিস আর কিছুই নেই।"

হযরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

سلوا اللّه من فضله فان اللّه يحب ان يسأل (ترمذى).

"আল্লাহর কাছে তার করুণা ও রহমত প্রার্থনা করো। কারণ, আল্লাহ তাঁর কাছে প্রার্থনা করা পছন্দ করেন।"

হযরত ইবনে উমর (রা) ও মু'আয ইবনে জাবাল বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ

ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللّه بالدعاء

(ترمذى ، مسند احمد)

"যে বিপদ আপতিত হয়েছে তার ব্যাপারেও দোয়া উপকারী এবং যে বিপদ এখনো আপতিত হয়নি তার ব্যাপারেও দোয়া উপকারী। অতএব হে আল্লাহর বান্দারা, তোমাদের দোয়া করা কর্তব্য।" (তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)।

হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ

يسأل احدكم ربه حاجته كله حتى يسأل شسع نعله اذا انقطع

(ترمذى)

"তোমাদের প্রত্যেকের উচিত তার রবের কাছে নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করা। এমনকি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে তাও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে।"

অর্থাৎ মানুষ যে ব্যাপারগুলো বাহ্যত নিজের ইখতিয়ারভুক্ত বলে মনে করে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের আগে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করবে। কারণ, কোন ব্যাপারে আমাদের কোন চেষ্টা–তদবীরই আল্লাহর তাওফিক ও সাহায্য ছাড়া সাফল্য লাভ করতে পারে না। চেষ্টা–তদবীর শুরু করার আগে দোয়া করার অর্থ হচ্ছে , বান্দা সর্বাবস্থায় তার নিজের অক্ষমতা ও আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করছে।

اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الَّیْلَ لِتَسْكُنُوْا فِیْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ
لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْكُرُوْنَ ﴿٦١﴾ ذٰلِكُمُ
اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ ۫ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٦٢﴾
كَذٰلِكَ یُؤْفَكُ الَّذِیْنَ كَانُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ یَجْحَدُوْنَ ﴿٦٣﴾ اَللّٰهُ
الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ
صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ
رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿٦٤﴾

৭ রুকূ'

আল্লাহই তো সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা রাতের বেলা আরাম করতে পারো। আর দিনকে আলোকিত করেছেন। সত্য এই যে, আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুকম্পাশীল। তবে অধিকাংশ লোক শুকরিয়া আদায় করে না।[৮৫] সে আল্লাহই (যিনি তোমাদের জন্য এসব করেছেন) তোমাদের রব, সবকিছুর স্রষ্টা, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই।[৮৬] তোমাদেরকে কোন্ দিকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে?[৮৭] এভাবেই সেসব লোককে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো।[৮৮]

আল্লাহই তো সেই সত্তা যিনি পৃথিবীকে অবস্থানস্থল বানিয়েছেন[৮৯] এবং ওপরে আসমানকে গম্বুজ বানিয়ে দিয়েছেন।[৯০] যিনি তোমাদের আকৃতি নির্মাণ করেছেন এবং অতি উত্তম আকৃতি নির্মাণ করেছেন। যিনি তোমাদেরকে পবিত্র জিনিসের রিযিক দিয়েছেন।[৯১] সে আল্লাহই (এগুলো যার কাজ) তোমাদের রব। অপরিসীম কল্যাণের অধিকারী তিনি। বিশ্ব-জাহানের রব তিনি।

৮৫. এ আয়াতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তরভুক্ত হয়েছে। প্রথমত এতে রাত ও দিনকে তাওহীদের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। কারণ, রাত ও দিনের নিয়মতান্ত্রিকভাবে আগমনের অর্থ পৃথিবী ও সূর্যের ওপর একই আল্লাহর শাসন চলছে। আর তার ঘুরে ফিরে আসা এবং পৃথিবীর আর সব সৃষ্টির জন্য উপকারী হওয়া এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, এক মাত্র আল্লাহই এসব জিনিসের স্রষ্টাও। তিনি তাঁর চূড়ান্ত পর্যায়ের

জ্ঞান ও কৌশল দ্বারা এমনভাবে এ ব্যবস্থা চালু করেছেন যাতে তাঁর সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর হয়। দ্বিতীয়ত, এতে আল্লাহকে অস্বীকারকারী এবং আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারী মানুষদেরকেও এ অনুভূতি দেয়া হয়েছে যে, রাত ও দিনের আকারে আল্লাহ তাদেরকে কত বড় নিয়ামত দান করেছেন। কিন্তু তারা কত বড় অকৃতজ্ঞ যে, তাঁর এ নিয়ামত নিজেদের কল্যাণে কাজে লাগিয়েও তারা দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও বিশ্বাসহীনতার কাজ করে যাচ্ছে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, সূরা ইউনুস, টীকা ৬৫; আল ফুরকান, টীকা ৭৭; আন নামল, টীকা ১০৪; আল কাসাস, টীকা ৯১; আর রূম, টীকা ৩৬; লোকমান, আয়াত ২৯, টীকা ৫০; ইয়াসীন, আয়াত ৩৭, টীকা ৩২)।

৮৬. অর্থাৎ রাত ও দিনের ঘুরে ফিরে আসা প্রমাণ করে যে, তিনিই তোমাদের ওসব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। তাছাড়া এ আবর্তনের মধ্যে তোমাদের জীবনের জন্য যে বিরাট কল্যাণ নিহিত আছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি তোমাদের অত্যন্ত দয়াবান পালনকর্তা। সুতরাং একথা আপনা থেকেই নিসন্দেহে প্রমাণ হয় যে, তোমাদের প্রকৃত উপাস্যও তিনিই। তোমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা হবেন আল্লাহ আর উপাস্য হবে অন্য কেউ এটা জ্ঞান-বুদ্ধি ও ইনসাফের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

৮৭. অর্থাৎ যে তোমাদের স্রষ্টাও নয় পালনকর্তাও নয় সে তোমাদের ইবাদাত তথা দাসত্ব পাওয়ার অধিকারী হবে একথা বলে তোমাদেরকে কে বিভ্রান্ত করছে?

৮৮. অর্থাৎ প্রত্যেক যুগেই সাধারণ মানুষ শুধু এ কারণে এসব বিভ্রান্তকারীদের ধোঁকাবাজির শিকার হয়েছে যে, সত্য বুঝানোর জন্য আল্লাহ তাঁর রসূলের মাধ্যমে যে আয়াত নাযিল করেছেন মানুষ তা মানেনি। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, তারা সেসব স্বার্থপর ধোঁকাবাজদের জালে আটকে পড়েছে যারা নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের জন্য নকল খোদার আস্তানা বানিয়ে বসেছিল।

৮৯. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নামল, টীকা ৭৪, ৭৫।

৯০. অর্থাৎ তোমাদেরকে খোলা আকাশের নিচে এমনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়নি যে, মহাশূন্যের বিপদাপদ বৃষ্টির মত বর্ষিত হয়ে তোমাদেরকে তছনছ করে দেবে। বরং পৃথিবীর ওপরে একটি সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা কায়েম করে দিয়েছেন (যা দেখতে গম্বুজের মত মনে হয়)। এ ব্যবস্থাপনা অতিক্রম করে কোন ধ্বংসাত্মক বস্তুই তোমাদের কাছে পৌছতে পারে না। এমনকি মহাশূণ্যের প্রাণ সংহারী রশ্মিসমূহও পৌছতে পারে না। এ কারণেই তোমরা নিরাপদে আরামে এ পৃথিবীতে বেঁচে আছ।

৯১. অর্থাৎ তোমাদেরকে সৃষ্টি করার পূর্বেই এমন সুরক্ষিত ও নিরাপদ অবস্থানস্থল প্রস্তুত করেছেন। তারপর তোমাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, একটি সর্বোত্তম দেহ-কাঠামো, উপযুক্ত অংগ-প্রত্যংগ এবং উন্নত দৈহিক ও চিন্তা শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এ সরল সোজা দেহ কাঠামো, হাত পা, চোখ নাক, এবং কান, বাকশক্তি সম্পন্ন এ জিহবা এবং সর্বোত্তম যোগ্যতার ভাণ্ডার এ মস্তিষ্ক তোমরা নিজে তৈরী করে আননি, তোমাদের বাবা-মাও তৈরী করেনি, কোন নবী, অলী কিংবা দেবতার মধ্যেও তা তৈরী করার ক্ষমতা ছিল না। এসব যোগ্যতা ও ক্ষমতার সৃষ্টিকারী ছিলেন সে মহাজ্ঞানী,

هُوَ الْحَيُّ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَٰلَمِينَ ﴿٦٥﴾ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ
مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنَٰتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ
أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَٰلَمِينَ ﴿٦٦﴾

তিনি চিরঞ্জীব।[৯২] তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তোমাদের দীন তাঁর জন্য নিবেদিত করে তাঁকেই ডাকো।[৯৩] গোটা সৃষ্টি জগতের রব আল্লাহর জন্যই সব প্রশংসা।[৯৪]

হে নবী, এসব লোককে বলে দাও, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ডাকো আমাকে সেসব সত্তার দাসত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে।[৯৫] (আমি কি করে এ কাজ করতে পারি) আমার কাছে আমার রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী এসেছে। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন গোটা বিশ্ব-জাহানের রবের সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করি।

দয়ালু ও সর্বশক্তিমান সত্তা যিনি মানুষকে সৃষ্টি করার সময় পৃথিবীতে কাজ করার জন্য তাকে এ নজীরবিহীন দেহ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। অতপর জন্মলাভ করার সাথে সাথে তাঁর দয়ায় তোমরা প্রচুর পবিত্র খাদ্য পেয়েছো, পানাহারের এমন সব পবিত্র উপকরণ লাভ করেছো যা বিষাক্ত নয়, সুস্বাস্থ্য দায়ক, তিক্ত, নোংরা ও বিস্বাদ নয় বরং সুস্বাদু, পচা গলা ও দুর্গন্ধ নয় বরং সুবাসিত খাদ্য প্রাণহীন নয়, বরং তোমাদের দেহের লালন ও প্রবৃদ্ধির জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী খাদ্য প্রাণ ও প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানে সমৃদ্ধ। পানি, খাদ্য, শস্য, তরকারী, ফলমূল, দুধ, মধু, গোশত, লবণ, মরিচ ও মসলা তোমাদের পুষ্টি সাধনের জন্য এসব অত্যন্ত উপযোগী এবং জীবনদায়িনী শক্তিই শুধু নয়, বরং জীবনের পরিপূর্ণ আস্বাদলাভের জন্যও অত্যন্ত উপযোগী। এ পৃথিবীতে এসব জিনিস কে এত প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করেছে, ভূমি থেকে খাদ্যের এ অগণিত ভাণ্ডার উৎপাদনের এ ব্যবস্থা কে করেছে যে, তার যোগান কখনো বন্ধ হয় না? চিন্তা করে দেখো, রিযিকের এ ব্যবস্থা না করেই যদি তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হতো তাহলে তোমাদের জীবনের পরিস্থিতি কি দাঁড়াতো? সুতরাং এটা কি এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ নয় যে, তোমাদের স্রষ্টা শুধু স্রষ্টাই নন, বরং মহাজ্ঞানী স্রষ্টা এবং অত্যন্ত দয়ালু প্রভু? (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, সূরা হূদ, টীকা ৬ ও ৭, আন নামল, টীকা ৭৩ থেকে ৮৩)।

৯২. অর্থাৎ তাঁর জীবনই বাস্তব ও প্রকৃত জীবন। একমাত্র তিনিই আপন ক্ষমতায় জীবিত। তাঁর জীবন ছাড়া আর কারো জীবনই অনাদি ও চিরস্থায়ী নয়। আর সবার জীবনই আল্লাহ প্রদত্ত, মরণশীল ও ধ্বংসশীল।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ
يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ وَمِنْكُمْ
مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝
هُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ
كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

তিনিই তো সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর শুক্র থেকে। তারপর রক্তের পিণ্ড থেকে। অতপর তিনি তোমাদেরকে শিশুর আকৃতিতে বের করে আনেন। এরপর তিনি তোমাদেরকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করেন যাতে তোমরা নিজেদের পূর্ণ শক্তিতে উপনীত হতে পারো। তারপর আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করেন যাতে তোমরা বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হও। তোমাদের কাউকে আগেই ফিরিয়ে নেয়া হয়।[৯৬] এসব কাজ করা হয় এ জন্য যাতে তোমরা তোমাদের নির্ধারিত সময়ের সীমায় পৌঁছতে পারো[৯৭] এবং যাতে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে পারো।[৯৮] তিনিই প্রাণ সঞ্চারকারী এবং তিনিই মৃত্যুদানকারী। তিনি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে শুধু একটি নির্দেশ দেন যে, তা হয়ে যাক, আর তখনি তা হয়ে যায়।

৯৩. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আয যুমার, টীকা ৩ ও ৪।

৯৪. অর্থাৎ দ্বিতীয় আর কেউ নেই যার প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করা যেতে পারে এবং যার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যেতে পারে।

৯৫. এখানে পুনরায় 'ইবাদাত' ও দোয়াকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

৯৬. অর্থাৎ কেউ জন্মলাভের পূর্বে, কেউ যৌবন প্রাপ্তির পূর্বে এবং কেউ বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁছার পূর্বে মৃত্যু বরণ করে থাকে।

৯৭. নির্ধারিত সময়ের অর্থ মৃত্যুর সময় অথবা সে সময় যখন পুনরায় জীবিত হওয়ার পর সমস্ত মানুষকে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে। প্রথম অর্থ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে জীবনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করিয়ে সে বিশেষ সময় পর্যন্ত নিয়ে যান যা তিনি প্রত্যেক মানুষের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। বিশেষ সে মুহূর্তটি আসার পূর্বে যদি গোটা দুনিয়ার মানুষ মিলিত হয়েও তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করে তবুও হত্যা করতে পারবে না। আবার সে মুহূর্তটি এসে যাওয়ার পর দুনিয়ার সমস্ত শক্তি মিলিত হয়েও যদি কাউকে জীবিত রাখার জন্য চেষ্টা করে তবুও সফল হতে পারবে না। দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হবে এ পৃথিবীতে

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ ۖ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾
إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ
فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾

৮ রুকূ'

তুমি কি সেসব লোকদের দেখনি যারা আল্লাহর বিধানাবলী নিয়ে ঝগড়া করে, তাদেরকে কোথা থেকে ফিরানো হচ্ছে?[৯৯] যারা এ কিতাবকে অস্বীকার করে এবং আমি আমার রসূলদের যা দিয়ে পাঠিয়েছিলাম[১০০] তাও অস্বীকার করে? এসব লোক অচিরেই জানতে পারবে যখন তাদের গলায় থাকবে গ্রীবা বন্ধনী ও শৃঙ্খল, এসব ধরে টানতে টানতে তাদেরকে ফুটন্ত পানির দিকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।[১০১]

তোমাদেরকে এ জন্য সৃষ্টি করা হয়নি যে, তোমরা মরে মাটিতে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বরং তিনি তোমাদেরকে জীবনের এসব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এ জন্য অতিক্রম করান যাতে তাঁর নির্ধারিত সময়ে তোমরা তার সামনে হাজির হও।

৯৮. অর্থাৎ জীবনের এসব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে তোমাদেরকে অতিক্রম করানোর কারণ এ নয় যে, তোমরা পশুর মত জীবন যাপন করবে এবং পশুর মত মরবে। বরং এসব পর্যায় অতিক্রম করানো হয় এ জন্য যে, আল্লাহ তোমাদেরকে যে জ্ঞান–বুদ্ধি দিয়েছেন তা কাজে লাগাবে এবং সে নিয়ম–নীতি ও ব্যবস্থাপনা উপলব্ধি করবে যার অধীনে তোমাদের আপন সত্তার ওপর দিয়ে এসব আবার আবর্তন চলে। মাটির প্রাণহীন উপাদানসমূহের মধ্যে জীবনের মত বিস্ময়কর ও অদ্ভুত জিনিসের উৎপত্তি হওয়া, কেবল অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্টি–গোচর হয় এমন অতি ক্ষুদ্র শুক্রকীট থেকে মানুষের মত বিস্ময়কর সৃষ্টির অস্তিত্ব লাভ করা তারপর মাতৃগর্ভে স্থিতিকাল থেকে প্রসবকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই এমনভাবে বেড়ে ওঠা যে, তার লিংগ, তার আকার–আকৃতি, তার দৈহিক কাঠামো, তার মানসিক বৈশিষ্টাবলী এবং তার ক্ষমতা ও যোগ্যতা সবকিছুই সেখানে নির্ধারিত হয়ে যায় এবং তার সৃষ্টির ব্যাপারে দুনিয়ার কোন শক্তিরই প্রভাব খাটাতে না পারা। তাছাড়া যার গর্ভপাত হয় তার গর্ভপাতের শিকার হওয়া, যে শিশুকালে মরে যায় তার শিশুকালেই মরে যাওয়া, যে যৌবনকালে বা বৃদ্ধাবস্থায় কোন নির্দিষ্ট বয়স সীমায় পৌঁছে তার এমন সব ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেও সে বয়সে উপনীত হওয়া যেসব পরিস্থিতিতে নিশ্চিত মৃত্যু হওয়া উচিত এবং যাকে বয়সের কোন এক পর্যায়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে তার পৃথিবীর সর্বোত্তম কোন হাসপাতালে সুদক্ষ ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন থেকেও

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا
عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ
الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ
فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾

অতপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে; এখন তোমাদের সেসব ইলাহ কোথায় যাদেরকে তোমরা শরীক করতে।[১০২] তারা জবাব দেবে, তারা আমাদের থেকে হারিয়ে গেছে। এর আগে আমরা যাদেরকে ডাকতাম তারা কিছুই না।[১০৩] আল্লাহ এভাবে কাফেরদের ভ্রষ্টতাকে কার্যকর করে দেবেন। তাদের বলা হবে, তোমাদের এ পরিণতির কারণ হচ্ছে, তোমরা পৃথিবীতে অসত্য নিয়ে মেতে ছিলে এবং সে জন্য গর্ব প্রকাশ করতে।[১০৪] এখন অগ্রসর হয়ে জাহান্নামের দরজায় প্রবেশ করো। তোমাদেরকে চিরদিন সেখানেই থাকতে হবে। অহংকারীদের জন্য তা অতীব জঘন্য জায়গা।

মৃত্যুবরণ করা। এসব বিষয় কি এ সত্যটিই তুলে ধরছে না যে, আমাদের জীবনও কোন এক সর্বশক্তিমান সত্তার হাতে? বাস্তব অবস্থা যখন এই যে, এক সর্বশক্তিমান সত্তা আমাদের জীবন ও মৃত্যুর ব্যাপারে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী তখন কোন নবী, অলী, ফেরেশতা কিংবা তারকা বা গ্রহ-উপগ্রহ আমাদের ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য হয় কিভাবে? তাছাড়া কোন মানব শক্তি এ পদমর্যাদা কিভাবে লাভ করলো যে, আমরা তার আইন-কানুন, তার আদেশ-নিষেধ এবং তার নিজের নির্ধারিত হালাল-হারাম বিনা বাক্যে মেনে নেব? (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, সূরা হজ্জ, টীকা ৯)।

৯৯. অর্থাৎ ওপরের বক্তব্য শোনার পরও কি তুমি একথা উপলব্ধি করতে পারনি যে, এসব লোকের ভ্রান্তি ও ভ্রান্ত আচরণের মূল উৎস কোথায় এবং তারা কোথায় ঠোকর খেয়ে গোমরাহীর এ গভীর গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে? (প্রকাশ থাকে যে, এখানে তুমি শব্দটি দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়নি, বরং এ আয়াত ক'টি পাঠকারী ও শ্রবণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে)।

১০০. এটা হচ্ছে তাদের হোঁচট খাওয়ার মূল কারণ। তাদের কুরআন এবং আল্লাহর রসূলদের আনীত শিক্ষা না মানা এবং আল্লাহর নিদর্শনসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার পরিবর্তে ঝগড়াটেপনা দিয়ে তার মোকাবেলা করা এসব মৌলিক

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ
أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ
مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ
بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾

হে নবী, ধৈর্য অবলম্বন করো।[১০৫] আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আমি তাদেরকে যে মন্দ পরিণতির ভয় দেখাচ্ছি এখন তোমার সামনেই এদেরকে তার কোন অংশ দেখিয়ে দেই কিংবা (তার আগেই) তোমাকে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেই, সর্বাবস্থায় এদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে।[১০৬]

হে নবী,[১০৭] তোমার আগে আমি বহু রসূল পাঠিয়েছিলাম। আমি তাদের অনেকের কাহিনী তোমাকে বলেছি আবার অনেকের কাহিনী তোমাকে বলিনি। আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন নিদর্শন দেখানোর ক্ষমতা কোন রসূলেরই ছিল না।[১০৮] অতপর যখন আল্লাহর হুকুম এসেছে তখন ন্যায়সংগতভাবে ফায়সালা করা হয়েছে এবং ভ্রান্ত কাজে লিপ্ত ব্যক্তিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[১০৯]

কারণই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে এবং তাদের সোজা পথে আসার সমস্ত সম্ভাবনা নিশেষ করে দিয়েছে।

১০১. অর্থাৎ তারা যখন তীব্র পিপাসায় বাধ্য হয়ে পানি চাইবে তখন দোযখের কর্মচারীরা তাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে টেনে হেঁচড়ে এমন ঝর্ণাধারার দিকে নিয়ে যাবে, যা থেকে টগবগে গরম পানি বেরিয়ে আসছে। অতপর তাদের সে পানি পান করা শেষ হলে আবার তারা তাদেরকে টেনে হেঁচড়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করবে।

১০২. অর্থাৎ তারা যদি সত্যিই রব হয়ে থাকে কিংবা প্রভুত্বে শরীক থেকে থাকে এবং বিপদের মুহূর্তে তারা তোমাদের কাজে আসবে এ আশায় তোমরা তাদের দাসত্ব করে থাকো তাহলে এখন তারা তোমাদেরকে উদ্ধার করছে না কেন?

১০৩. একথার অর্থ এই নয় যে, আমরা দুনিয়াতে শিরক করতাম না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, এখন আমাদের কাছে একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, দুনিয়ায় আমরা যাদের ডাকতাম তারা কিছুই ছিল না, নগণ্য ছিল, মূল্যহীন ছিল।

اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٧٩﴾ وَلَكُمْ
فِیْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَیْهَا حَاجَةً فِیْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَیْهَا وَعَلَى
الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَیُرِیْكُمْ اٰیٰتِهٖ ۗ فَاَیَّ اٰیٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ ﴿٨١﴾

৯ রুকূ'

আল্লাহই তোমাদের জন্য এসব গৃহপালিত পশু সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা এসব পশুর কোনটির পিঠে আরোহণ করতে পার এবং কোনটির গোশত খেতে পার। এসবের মধ্যে তোমাদের জন্য আরো অনেক কল্যাণ নিহিত আছে। তোমাদের মনে যেখানে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয় এসবের পিঠে আরোহণ করে তোমরা সেখানে পৌঁছতে পার। এসব পশু এবং নৌকাতেও তোমাদের আরোহণ করতে হয়। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর এসব নিদর্শন দেখাচ্ছেন। তোমরা তাঁর কোন্ কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে?১১০

১০৪. অর্থাৎ যা ন্যায় ও সত্য ছিল না তোমরা শুধু তার আনুগত্য ও অনুসরণ করেই ক্ষান্ত হওনি বরং সে অসত্য নিয়ে তোমরা এতটা মগ্ন ছিলে যে, তোমাদের সামনে ন্যায় ও সত্য পেশ করা হলে সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করনি এবং নিজেদের বাতিল পূজার জন্য উল্টো গর্ব করেছো।

১০৫. অর্থাৎ যারা ঝগড়া ও বিতর্ক দ্বারা তোমাদের মোকাবিলা করছে এবং হীন চক্রান্তের মাধ্যমে তোমাদেরকে হেয় করতে চাচ্ছে তাদের কথা ও আচরণের জন্য ধৈর্য অবলম্বন করো।

১০৬. অর্থাৎ যে ব্যক্তিই তোমাকে পরাভূত করার জন্য চেষ্টা করেছে তাকেই এ পৃথিবীতে এবং তোমার জীবদ্দশাতেই আমি শাস্তি দেবো তা জরুরী নয়। কেউ এখানে শাস্তি পাক বা না পাক সে আমার শাস্তি থেকে কোন অবস্থায়ই রক্ষা পেতে পারে না। মৃত্যুর পর তাকে আমার কাছেই আসতে হবে। তখন সে তার কৃতকর্মের পুরো শাস্তি ভোগ করবে।

১০৭. এখান থেকে ভিন্ন একটি বিষয় শুরু হচ্ছে। মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতো, আমাদের দাবিকৃত মু'জিযা না দেখানো পর্যন্ত আমরা আপনাকে আল্লাহর রসূল বলে মেনে নিতে পারি না। তাদের একথা উল্লেখ না করেই পরবর্তী আয়াতসমূহে তার জবাব দেয়া হচ্ছে। (তারা যে ধরনের মু'জিযা দেখানোর দাবি করতো তার কয়েকটি নমুনার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, হূদ, টীকা ১৩; আল হিজর, টীকা ৪ ও ৫; বনী ইসরাঈল, টীকা ১০৫ ও ১০৬ ও আল ফুরকান, টীকা ৩৩)

১০৮. অর্থাৎ কোন নবীই নিজের ইচ্ছা মত কখনো কোন মু'জিযা দেখাননি। তাছাড়া নিজের পক্ষ থেকে মু'জিযা দেখানোর ক্ষমতাও কোন নবীর নেই। কোন নবীর মাধ্যমে

মু'জিযা কেবল তখনই প্রকাশ পেয়েছে যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে কোন অবাধ্য কওমকে দেখাতে চেয়েছেন। এটা কাফেরদের দাবির প্রথম জবাব।

১০৯. অর্থাৎ খেল-তামাসা হিসেবে কখনো মু'জিযা দেখানো হয়নি! মু'জিযা তো একটি সিদ্ধান্ত সূচক জিনিস। তা প্রকাশ পাওয়ার পরও কোন কওম যখন মানে না তখন তাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। তোমরা শুধু তামাশা দেখার জন্য মু'জিযা দাবী করছো। কিন্তু তোমরা বুঝতে পারছো না যে, এভাবে দাবীর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তোমরা নিজেদের দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনছো। এটা কাফেরদের এ ধরনের দাবীর দ্বিতীয় জবাব। ইতিপূর্বে কুরআনের কয়েকটি স্থানে এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল হিজর, টীকা ৫ ও ৩০; বনী ইসরাঈল, টীকা ৬৮ ও ৬৯; আল আম্বিয়া, টীকা ৭ ও ৮; আল ফুরকান, টীকা ৩৩ ও আশ শু'আরা, টীকা ৪৯)।

১১০. অর্থাৎ তোমরা যদি শুধু তামাশা দেখা ও মনের আনন্দের জন্য মু'জিযার দাবী করে থাকো অর্থাৎ এতোটুকু নিশ্চিত হওয়া তোমাদের প্রয়োজন হয়ে থাকে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব কথা মানার জন্য তোমাদেরকে আহবান জানাচ্ছেন তা সত্য কিনা তাহলে আল্লাহর যেসব নিদর্শনাবলী তোমরা সর্বদা অবলোকন করছো এবং তোমাদের অভিজ্ঞতায় সঞ্চিত হচ্ছে সেগুলোই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। প্রকৃত সত্য বুঝার জন্য এসব নিদর্শনের বর্তমানে আর কোন নিদর্শনের কি প্রয়োজন থাকতে পারে। এটা মু'জিযা দাবী করার প্রেক্ষিতে তৃতীয় জবাব। কুরআন মজীদের কতিপয় স্থানে এ জবাবটিও ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে। সেখানে আমরা ভালভাবে এর ব্যাখ্যা করেছি। (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আন'আম, টীকা ২৬ ও ২৭; ইউনুস, টীকা ১০৫; আর রা'দ, টীকা ১৫ থেকে ২০; আশ শু'আরা, টীকা ৩, ৪ ও ৫)।

পৃথিবীতে যেসব জন্তু মানুষের সেবায় নিয়োজিত আছে তার মধ্যে বিশেষ করে আছে গরু, মোষ, ভেড়া, বকরী, উট ও ঘোড়া। এসব জন্তুর সৃষ্টিকর্তা এমন নকশা অনুসারে এদের সৃষ্টি করেছেন যে, এসব অতি সহজেই মানুষের পোষ মানা সেবকে পরিণত হয়ে যায় এবং তাদের সাহায্যে মানুষের অসংখ্য প্রয়োজন পূরণ হয়। মানুষ এসবের ওপর আরোহণ করে, এসবকে ভার বহন করার কাজে লাগায়, ক্ষেত, কৃষি ও ফসল উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করে, এর দুধ দোহন করে পান করে আবার তা দিয়ে লাচ্ছি, মাখন, ঘি, দধি, পনির এবং নানা রকমের মিষ্টি তৈরী করে। এর গোশত খায় এবং চর্বি ব্যবহার করে। এর পশম, লোম, চামড়া, নাড়িভুঁড়ি, হাড্ডি, রক্ত, গোবর তথা প্রতিটি জিনিস তার কাজে লাগে। এটা কি সুস্পষ্ট প্রমাণ নয় যে, মানুষের সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীতে তাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই তার এ অসংখ্য প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রেখে একটি বিশেষ পরিকল্পনাধীনে এ জন্তুটিকে সৃষ্টি করেছেন যাতে সে তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে?

তাছাড়া পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ পানি এবং এক চতুর্থাংশ স্থলভাগ। স্থলভাগেরও বহু সংখ্যক ছোট বড় অঞ্চলের মধ্যে জলভাগ অবস্থিত। পৃথিবী গ্রহের এসব স্থলভাগে মানব বসতির বিস্তার এবং তাদের মাঝে পর্যটন ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া আদৌ সম্ভব হতো না যদি পানি, সমুদ্র ও বাতাসকে এমন নিয়ম-বিধির অধীন না করা হতো যার কারণে নৌ-পরিবহন করা সম্ভব হয়েছে এবং এমন সব উপায় উপকরণ সৃষ্টি করা

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا
أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ
فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨٣﴾
فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾
فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي
قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

সুতরাং এরা কি[১১১] এ পৃথিবীতে বিচরণ করেনি, তাহলে এরা এদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণতি দেখতে পেত? তারা সংখ্যায় এদের চেয়ে বেশী ছিল, এদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল এবং পৃথিবীর বুকে এদের চেয়ে অধিক জাঁকালো নিদর্শন রেখে গেছে। তারা যা অর্জন করেছিল, তা শেষ পর্যন্ত তাদের কাজে লাগেনি। তাদের রসূল যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে তাদের কাছে এসেছিলেন তখন তারা নিজের কাছে বিদ্যমান জ্ঞান নিয়েই মগ্ন ছিল[১১২] এবং যে জিনিস নিয়ে তারা বিদ্রূপ করতো সে জিনিসের আবর্তেই তারা পড়ে গিয়েছিলো। তারা যখন আমার আযাব দেখতে পেল তখন চিৎকার করে বলে উঠলো, আমরা এক ও লা-শরীক আল্লাহকে মেনে নিলাম। আর যেসব উপাস্যদের আমরা শরীক করতাম তাদের অস্বীকার করলাম। কিন্তু আমার আযাব দেখার পর তাদের ঈমান গ্রহণ কোন উপকারে আসার নয়। কারণ, এটাই আল্লাহর সুনির্ধারিত বিধান যা সবসময় তাঁর বান্দাদের মধ্যে চালু ছিল।[১১৩] সে সময় কাফেররা ক্ষতির মধ্যে পড়ে গেল।

না হতো যা ব্যবহার করে মানুষ জাহাজ নির্মাণে সক্ষম হয়েছে। এটা কি এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ নয় যে, এক সর্বশক্তিমান, দয়ালু ও মহাজ্ঞানী প্রভু আছেন যিনি মানুষ, পৃথিবী, পানি, সমুদ্র, বাতাস এবং ভূপৃষ্ঠের সমস্ত জিনিসকে তাঁর নিজের বিশেষ পরিকল্পনা অনুসারে সৃষ্টি করেছেন? এমনকি মানুষ যদি শুধু নৌপরিবহনের দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করে তাহলে নক্ষত্রসমূহের অবস্থান এবং গ্রহসমূহের নিয়মিত আবর্তন থেকে এ ক্ষেত্রে যে সাহায্য পাওয়া যায় তা প্রমাণ করে যে, শুধু পৃথিবী নয়, মহানুভব সে প্রভু আসমানসমূহেরও স্রষ্টা।

তাছাড়া এ বিষয়টিও একটু ভেবে দেখুন, যে মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাঁর এ অসংখ্য জিনিস মানুষের কর্তৃত্বাধীনে দিয়ে রেখেছেন এবং তার কল্যাণের জন্য এসব সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করেছেন, জ্ঞান ও চেতনা সুস্থ থাকলে আপনি কি তাঁর সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করতে পারেন যে, সে আল্লাহ (নাউযুবিল্লাহ) এমন নির্বোধ যে, তিনি মানুষকে এসব দিয়েছেন কিন্তু কখনো তার হিসেব নেবেন না?

১১১. এটা সমাপ্তিসূচক বাক্য। এ অংশ পাঠ করার সময় ৪, ৫ ও ২১ আয়াত ক'টি আরেকবার দেখে নিন।

১১২. অর্থাৎ নিজেদের দর্শন ও বিজ্ঞান, নিজেদের পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান, নেতাদের মনগড়া ধর্মীয় কিসসা কাহিনী (Mythology) এবং ধর্মীয় বিধি-বিধানকেই (Theology) তারা প্রকৃত জ্ঞান মনে করেছে এবং আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের আনীত জ্ঞানকে হীন ও নগণ্য মনে করে সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপই করেনি।

১১৩. আল্লাহর আযাব কিংবা মৃত্যুর মুখোমুখি না হওয়া পর্যন্তই কেবল তাওবা ও ঈমান উপকারে আসে। আযাব এসে পড়া বা মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর ঈমান আনা কিংবা তাওবা করা আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

হা-মীম আস সাজদাহ

৪১

নামকরণ

দুটি শব্দের সমন্বয়ে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। একটি শব্দ حٰمٓ ও অপরটি السجدة । অর্থাৎ এটি সেই সূরা যা শুরু হয়েছে হা-মীম শব্দ দিয়ে এবং যার মধ্যে এক স্থানে সিজদার আয়াত আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত অনুসারে এর নাযিল হওয়ার সময়কাল হচ্ছে হযরত হামযার (রা) ঈমান আনার পর এবং হযরত উমরের (রা) ঈমান আনার পূর্বে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাচীনতম জীবনীকার মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বিখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল-কারযীর বরাত দিয়ে এই কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন যে, একদিন কিছু সংখ্যক কুরাইশ নেতা মসজিদে হারামের মধ্যে আসর জমিয়ে বসেছিল এবং মসজিদের অন্য এক কোণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাকী বসেছিলেন। এটা এমন এক সময়ের ঘটনা যখন হযরত হামযা ঈমান এনেছিলেন এবং কুরাইশরা প্রতিনিয়ত মুসলমানদের সাংগঠনিক উন্নতি দেখে অস্থির হয়ে উঠছিলো। এই সময় 'উতবা ইবনে রাবী'আ (আবু সুফিয়ানের শ্বশুর) কুরাইশ নেতাদের বললেন, ভাইসব, আপনারা যদি ভালো মনে করেন তাহলে আমি গিয়ে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে আলাপ করতে এবং তাঁর কাছে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করতে পারি। সে হয়তো তার কোনটি মেনে নিতে পারে এবং আমাদের কাছেও তা গ্রহণ যোগ্য হতে পারে। আর এভাবে সে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে। উপস্থিত সবাই তার সাথে একমত হলো এবং 'উতবা উঠে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বসলো। নবী (সা) তার দিকে ফিরে বসলে সে বললো ঃ ভাতিজা, বংশ ও গোত্রের বিচারে তোমার কওমের মধ্যে তোমার যে মর্যাদা তা তুমি অবগত আছো। কিন্তু তুমি তোমার কওমকে এক মুসিবতের মধ্যে নিক্ষেপ করেছো। তুমি কওমের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছো। গোটা কওমকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করেছো। কওমের ধর্ম ও তাদের উপাস্যদের সমালোচনা করেছো এবং এমন কথা বলতে শুরু করেছো যার সারবস্তু হলো, আমাদের সকলের বাপ দাদা কাফের ছিল। এখন আমার কথা একটু মনোযোগ দিয়ে শোন। আমি তোমার কাছে কিছু প্রস্তাব রাখছি প্রস্তাবগুলো গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো। "হয়তো তার কোনটি তুমি গ্রহণ করতে পার।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আবুল ওয়ালীদ, আপনি বলুন, আমি শুনবো। সে বললো ঃ ভাতিজা, তুমি যে কাজ শুরু করেছো তা দিয়ে সম্পদ অর্জন যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমরা সবাই মিলে তোমাকে এতো সম্পদ দেব যে, তুমি আমাদের মধ্যে সবার চেয়ে সম্পদশালী হয়ে

যাবে। এভাবে তুমি যদি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে থাকো তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে নিচ্ছি, তোমাকে ছাড়া কোন বিষয়ে ফায়সালা করবো না। যদি তুমি বাদশাহী চাও তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের বাদশাহ বানিয়ে নিচ্ছি। আর যদি তোমার ওপর কোন জিন প্রভাব বিস্তার করে থাকে যাকে তুমি নিজে তাড়াতে সক্ষম নও তাহলে আমরা ভালো ভালো চিকিৎসক ডেকে নিজের খরচে তোমার চিকিৎসা করিয়ে দেই। 'উতবা এসব কথা বলছিলো আর নবী (সা) চুপচাপ তার কথা শুনছিলেন। অতপর তিনি বললেন ঃ আবুল ওয়ালীদ, আপনি কি আপনার সব কথা বলেছেন? সে বললো ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ তাহলে এখন আমার কথা শুনুন। এরপর তিনি "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ে এই সূরা তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন। 'উতবা তার দুই হাত পেছনের দিকে মাটিতে হেলান দিয়ে গভীর মনোযোগের সাথে শুনতে থাকলো। সিজদার আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করে তিনি সিজদা করলেন এবং মাথা তুলে বললেন ঃ হে আবুল ওয়ালীদ, আমার জবাবও আপনি পেয়ে গেলেন। এখন যা ইচ্ছা করেন।" 'উতবা উঠে কুরাইশ নেতাদের আসরের দিকে অগ্রসর হলে লোকজন দূর থেকে তাকে দেখেই বললো ঃ আল্লাহর শপথ! 'উতবার চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। যে চেহারা নিয়ে সে গিয়েছিল এটা সেই চেহারা নয়। সে এসে বসলে লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করলো ঃ কি শুনে এলে? সে বললো ঃ "আল্লাহর কসম! আমি এমন কথা শুনেছি যা এর আগে কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম! এটা না কবিতা, না যাদু, না গণনা বিদ্যা। হে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ, আমার কথা শোন এবং তাকে তার কাজ করতে দাও। আমার বিশ্বাস, এ বাণী সফল হবেই। মনে করো আরবের লোকেরা যদি তার বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে তাহলে নিজের ভাইয়ের গায়ে হাত তোলা থেকে তোমরা রক্ষা পেয়ে যাবে এবং অন্যরাই তাকে পরাভূত করবে। পক্ষান্তরে সে যদি আরবদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয় তাহলে তার রাজত্ব তোমাদেরই রাজত্ব এবং তার সম্মান ও মর্যাদা তোমাদের সম্মান ও মর্যাদা হবে।" তার এই কথা শোনা মাত্র কুরাইশ নেতারা বলে উঠলো ঃ "ওয়ালীদের বাপ, শেষ পর্যন্ত তোমার ওপর তার যাদুর প্রভাব পড়লো" 'উতবা বললো ঃ "আমি আমার মতামত তোমাদের সামনে পেশ করলাম। এখন তোমাদের যা ইচ্ছা করতে থাকো।" (ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৩-৩১৪)

আরো কতিপয় মুহাদ্দিস বিভিন্ন সনদে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে শব্দগত কিছু মতপার্থক্য আছে। ঐ সব রেওয়ায়েতের কোন কোনটিতে এ কথাও আছে যে, নবী (সা) তিলাওয়াত করতে করতে যে সময়

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ –

(এখন যদি এসব লোক মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে এদেরকে বলে দাও আমি তোমাদেরকে আদ ও সামূদ জাতির আযাবের মত অকস্মাত আগমনকারী আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি।) আয়াতটি পড়লেন তখন 'উতবা আপনা থেকেই তাঁর মুখের ওপর হাত চেপে ধরে বললো ঃ "আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের কওমের প্রতি সদয় হও।" পরে সে কুরাইশ নেতাদের কাছে তার এ কাজের কারণ বর্ণনা করেছে, এই বলে যে, আপনারা জানেন, মুহাম্মাদের (সা) মুখ থেকে যে কথা বের হয় তা সত্যে পরিণত হয়। তাই আমি আমাদের ওপর আযাব নাযিল না হয় এই ভেবে আতংকিত হয়ে পড়েছিলাম। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন,

তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯০–৯১, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬২)।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

'উতবার এই কথার জবাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বক্তব্য নাযিল হয়েছে তাতে সে নবীকে (সা) যে অর্থহীন কথা বলেছে সেদিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করা হয়নি। কারণ, সে যা বলেছিলো তা ছিল প্রকৃতপক্ষে নবীর (সা) নিয়ত ও জ্ঞান–বুদ্ধির ওপর হামলা। তার গোটা বক্তব্যের পেছনে এই অনুমান কাজ করছিল যে, তাঁর নবী হওয়া এবং কুরআনের অহী হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। তাই অনিবার্যরূপে তাঁর এই আন্দোলনের চালিকা শক্তি হয় ধন–সম্পদ এবং শাসন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভের প্রেরণা, নয়তো তাঁর জ্ঞান–বুদ্ধিই লোপ পেয়ে বসেছে (নাউযুবিল্লাহ)। প্রথম ক্ষেত্রে সে নবীর (সা) সাথে বিকিকিনির কারবার করতে চাচ্ছিলো। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সে এ কথা বলে নবীকে (সা) হেয় করছিলো যে, আমরা নিজের খরচে আপনার উন্মাদ রোগের চিকিৎসা করে দিচ্ছি। এ কথা সুস্পষ্ট যে, বিরোধীরা যখন এ ধরনের মূর্খতার আচরণ করতে থাকে তখন তাদের এ কাজের জবাব দেয়া শরীফ সম্ভ্রান্ত মানুষের কাজ হয় না। তার কাজ হয় তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে নিজের বক্তব্য তুলে ধরা। কুরআনের দাওয়াতকে ব্যর্থ করার জন্য মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে সে সময় চরম হঠকারিতা ও অসচ্চরিত্রের মাধ্যমে যে বিরোধিতা করা হচ্ছিলো 'উতবার বক্তব্য উপেক্ষা করে এখানে সেই বিরোধিতাকে আলোচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতো, আপনি যাই করেন না কেন আমরা আপনার কোন কথাই শুনবো না। আমরা আমাদের মনের গায়ে চাদর ঢেকে দিয়েছি এবং কান বন্ধ করে দিয়েছি। আমাদের ও আপনার মাঝে একটি প্রাচীর আড়াল করে দাঁড়িয়েছে, যা আপনাকে ও আমাদের কখনো এক হতে দেবে না।

তারা তাঁকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলো, আপনি আপনার দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যান, আপনার বিরোধিতায় আমাদের পক্ষে সম্ভবপর সবই আমরা করবো।

তারা নবীকে (সা) পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে যে কর্মসূচী তৈরী করেছিলো তা হচ্ছে, যখনই তিনি কিংবা তাঁর অনুসারীদের কেউ সর্বসাধারণকে কুরআন শুনানোর চেষ্টা করবেন তখনই হৈ চৈ ও হট্টগোল সৃষ্টি করতে হবে এবং এতো শোরগোল করতে হবে যাতে কানে যেন কোন কথা প্রবেশ না করে।

কুরআন মজীদের আয়াত সমূহের উল্টা পাল্টা অর্থ করে জনসাধারণের মধ্যে নানা রকম বিভ্রান্তি ছড়ানোর কাজ তারা পূর্ণ তৎপরতার সাথে চালিয়ে যাচ্ছিলো। কোন কথা বলা হলে তারা তাকে ভিন্ন রূপ দিতো। সরল সোজা কথার বাঁকা অর্থ করতো। পূর্বাপর প্রসংগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক স্থানের একটি শব্দ এবং আরেক স্থানের একটি বাক্যাংশ নিয়ে তার সাথে নিজের পক্ষ থেকে আরো অধিক কথা যুক্ত করে নতুন নতুন বিষয়বস্তু তৈরী করতো যাতে কুরআন ও তার উপস্থাপনকারী রাসূল সম্পর্কে মানুষের মতামত খারাপ করা যায়।

অদ্ভুত ধরনের আপত্তিসমূহ উত্থাপন করতো যার একটি উদাহরণ এ সূরায় পেশ করা হয়েছে। তারা বলতো, আরবী ভাষাভাষী একজন মানুষ যদি আরবী ভাষায় কোন কথা

শোনায় তাতে মু'জিযার কি থাকতে পারে? আরবী তো তার মাতৃভাষা। যে কেউ ইচ্ছা করলে তার মাতৃভাষায় একটি বাণী রচনা করে ঘোষণা করতে পারে যে, সেই বাণী তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। মু'জিযা বলা যেতো কেবল তখনই যখন হঠাৎ কোন ব্যক্তি তার অজানা কোন ভাষায় একটি বিশুদ্ধ ও উন্নত সাহিত্য রস সমৃদ্ধ বক্তৃতা শুরু করে দিতো। তখনই বুঝা যেতো, এটা তার নিজের কথা নয়, বরং তা ওপরে কোথাও থেকে তার ওপর নাযিল হচ্ছে।

অযৌক্তিক ও অবিবেচনা প্রসূত এই বিরোধিতার জবাবে যা বলা হয়েছে তার সারকথা হলো ঃ

(১) এ বাণী আল্লাহরই পক্ষ থেকে এবং আরবী ভাষায় নাযিলকৃত। এর মধ্যে যেসব সত্য স্পষ্টভাবে খোলামেলা বর্ণনা করা হয়েছে মূর্খেরা তাঁর মধ্যে জ্ঞানের কোন আলো দেখতে পায় না। কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারীরা সে আলো দেখতে পাচ্ছে এবং তা দ্বারা উপকৃতও হচ্ছে। এটা আল্লাহর রহমত যে, মানুষের হিদায়াতের জন্য তিনি এ বাণী নাযিল করেছেন। কেউ তাকে অকল্যাণ ভাবলে সেটা তার নিজের দুর্ভাগ্য। যারা এ বাণী কাজে লাগিয়ে উপকৃত হচ্ছে তাদের জন্য সু-খবর। কিন্তু যারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে তাদের সাবধান হওয়া উচিত।

(২) তোমরা যদি নিজেদের মনের ওপর পর্দা টেনে এবং কান বধির করে দিয়ে থাকো, সে অবস্থায় নবীর কাজ এটা নয় যে, যে শুনতে আগ্রহী তাকে শুনাবেন আর যে শুনতে ও বুঝতে আগ্রহী নয় জোর করে তার মনে নিজের কথা প্রবেশ করাবেন। তিনি তোমাদের মতই একজন মানুষ। যারা শুনতে আগ্রহী তিনি কেবল তাদেরকেই শুনাতে পারেন এবং যারা বুঝতে আগ্রহী কেবল তাদেরকেই বুঝাতে পারেন।

(৩) তোমরা নিজেদের চোখ বন্ধ করে নাও আর মনের ওপর পর্দা টেনে দাও প্রকৃত সত্য এই যে, একজনই মাত্র তোমাদের আল্লাহ, তোমরা অন্য কোন আল্লাহর বান্দা নও। তোমাদের হঠকারিতার কারণে এ সত্য কখনো পরিবর্তিত হওয়ার নয়। তোমরা যদি এ কথা মেনে নাও এবং সে অনুসারে নিজেদের কাজকর্ম শুধরে নাও তাহলে নিজেদেরই কল্যাণ সাধন করবে। আর যদি না মানো তাহলে নিজেরাই ধ্বংসের মুখোমুখি হবে।

(৪) তোমরা কার সাথে শিরক ও কুফরী করছো সে বিষয়ে কি তোমাদের কোন অনুভূতি আছে? তোমরা কি সেই আল্লাহর সাথে শিরক ও কুফরী করছো যিনি বিশাল ও অসীম এই বিশ্বজাহান সৃষ্টি করেছেন, যিনি যমীন ও আসমানের স্রষ্টা, যার সৃষ্ট কল্যাণ সমূহ দ্বারা তোমরা এই পৃথিবীতে উপকৃত হচ্ছো এবং যার দেয়া রিযিকের দ্বারা প্রতিপালিত হচ্ছো? তাঁরই নগণ্য সৃষ্টি সমূহকে তোমরা তাঁর শরীক বানাচ্ছো আর এ বিষয়টি বুঝানোর চেষ্টা করলে জিদ ও হঠকারিতা করে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো?

(৫) ঠিক আছে, যদি মানতে প্রস্তুত না হও সে ক্ষেত্রে আদ ও সামূদ জাতির ওপর যে ধরনের আযাব এসেছিল অকস্মাত সে ধরনের আযাব আপতিত হওয়া সম্পর্কে সাবধান হয়ে যাও। এ আযাবও তোমাদের অপরাধের চূড়ান্ত শাস্তি নয়। বরং এর পরে আছে হাশরের জবাবদিহি ও জাহান্নামের আগুন।

(৬) সেই মানুষ বড়ই দুর্ভাগা যার পেছনে এমন সব জিন ও মানুষ শয়তান লেগেছে যারা তাকে তার চারদিকেই শ্যামল-সবুজ মনোহর দৃশ্য দেখায়, তার নির্বুদ্ধিতাকে তার সামনে সুদৃশ্য বানিয়ে পেশ করে এবং তাকে কখনো সঠিক চিন্তা করতে দেয় না। অন্যের কথা শুনতেও দেয় না। এই শ্রেণীর নির্বোধ লোকেরা আজ এই পৃথিবীতে পরস্পরকে উৎসাহ দিচ্ছে ও লোভ দেখাচ্ছে এবং প্রত্যেকেই পরস্পরের প্রশ্রয় পেয়ে দিনকাল ভালই কাটাচ্ছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন দুর্ভাগ্যের পালা আসবে তখন তাদের প্রত্যেকেই বলবে, যারা আমাকে বিভ্রান্ত করেছিলো তাদের হাতে পেলে পায়ের তলায় পিষে ফেলতাম।

(৭) এই কুরআন একটি অপরিবর্তনীয় গ্রন্থ। তোমরা নিজেদের হীন চক্রান্ত এবং মিথ্যার অস্ত্র দিয়ে তাকে পরাস্ত করতে পারবে না। বাতিল পেছন থেকে আসুক, মুখোশ পরে আসুক কিংবা পরোক্ষভাবে আক্রমণ করুক কখনো তাকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে না।

(৮) তোমরা যাতে বুঝতে পার সে জন্য কুরআনকে আজ তোমাদের নিজেদের ভাষায় পেশ করা হচ্ছে। অথচ তোমরা বলছো, কোন অনারব ভাষায় তা নাযিল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তোমাদের হিদায়াতের জন্য যদি আমি কুরআনকে আরবী ছাড়া ভিন্ন কোন ভাষায় নাযিল করতাম তাহলে তোমরাই বলতে, এ কোন ধরনের তামাশা, আরব জাতির হিদায়াতের জন্য অনারব ভাষায় বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে যা এখানকার কেউই বুঝে না। এর অর্থ, হিদায়াত লাভ আদৌ তোমাদের কাম্য নয়। কুরআনকে না মানার জন্য নিত্য নতুন বাহানা তৈরী করছো মাত্র।

(৯) তোমরা কি কখনো এ বিষয়টি ভেবে দেখেছো, যদি এটাই সত্য বলে প্রমাণিত হয় যে, এ কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, তাহলে তা অস্বীকার করে এবং তার বিরোধিতায় এতদূর অগ্রসর হয়ে তোমরা কোন পরিণতির মুখোমুখি হবে?

(১০) আজ তোমরা এ কুরআনকে মানছো না। কিন্তু অচিরেই নিজের চোখে দেখতে পাবে, এ কুরআনের দাওয়াত দশ দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তোমরা নিজেরা তার কাছে পরাজিত হয়ে গিয়েছো। তখন তোমরা বুঝতে পারবে, ইতিপূর্বে তোমাদের যা বলা হয়েছিল তা ছিল সত্য।

বিরোধীদেরকে এসব জবাব দেয়ার সাথে সাথে এই চরম প্রতিকূল পরিবেশে ঈমানদারগণ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে যে সমস্যাবলীর সম্মুখীন ছিলেন সেদিকেও দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। মুমিনদের পক্ষে সে সময় তাবলীগ ও প্রচার তো দূরের কথা ঈমানের পথে টিকে থাকাও অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ছিলো। যে ব্যক্তি সম্পর্কেই প্রকাশ হয়ে পড়তো যে, সে মুসলমান হয়ে গিয়েছে সে-ই শাস্তির যাঁতাকলে পিষ্ট হতো। শত্রুদের ভয়াবহ জোটবদ্ধতা এবং সর্বত্র বিস্তৃত শক্তির মোকাবিলায় তারা নিজেদেরকে একেবারেই অসহায় ও বন্ধুহীন মনে করছিলো। এই পরিস্থিতিতে প্রথমত এই বলে তাদেরকে সাহস যোগানো হয়েছে যে, তোমরা সত্যি সত্যিই বান্ধব ও সহায়হীন নও। বরং যে ব্যক্তিই একবার আল্লাহকে তার রব মেনে নিয়ে সেই আকীদা ও পথ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে তার কাছে আল্লাহর ফেরেশতা নাযিল হয় এবং দুনিয়া থেকে শুরু করে

আখেরাত পর্যন্ত তার সাথে থাকে। অতপর তাকে সাহস ও উৎসাহ যোগানো হয়েছে এ কথা বলে যে, সেই মানুষ সর্বোৎকৃষ্ট যে নিজে সৎ কাজ করে, অন্যদের আল্লাহর দিকে আহবান জানায় এবং সাহসিকতার সাথে বলে, আমি মুসলমান।

সেই সময় যে প্রশ্নটি নবীর (সা) সামনে অত্যন্ত বিব্রতকর ছিল তা হচ্ছে, এসব জগদ্দল পাথর যখন এ আন্দোলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন এসব পাথরের মধ্যে দিয়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের রাস্তা কিভাবে বের করা যাবে? এ প্রশ্নের সমাধানের জন্য নবীকে (সা) বলা হয়েছে, এসব প্রদর্শনীমূলক বাধার পাহাড় বাহ্যত অত্যন্ত কঠিন বলে মনে হয়। কিন্তু উত্তম নৈতিক চরিত্রের হাতিয়ার এমন হাতিয়ার যা ঐ সব বাধার পাহাড় চূর্ণবিচূর্ণ করে গলিয়ে দেবে। ধৈর্যের সাথে উত্তম নৈতিক চরিত্রকে কাজে লাগাও এবং যখনই শয়তান উত্তেজনা সৃষ্টি করে অন্য কোন হাতিয়ার ব্যবহার করতে উস্কানি দেবে তখনই আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো।

আয়াত ৫৪ **সূরা হা-মীম আস সাজদা–মক্কী** রুকূ' ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও মেহেরবান আল্লাহর নামে

حٰمٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا
عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣﴾ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ
لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٤﴾ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ
اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ﴿٥﴾

হা-মীম। এটা পরম দয়ালু ও মেহেরবান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত জিনিস। এটি এমন এক গ্রন্থ যার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আরবী ভাষার কুরআন। সেই সব লোকদের জন্য যারা জ্ঞানের অধিকারী, সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী।[১]

কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শুনতেই পায় না। তারা বলে ঃ তুমি আমাদের যে জিনিসের দিকে আহবান জানাচ্ছো সে জিনিসের ব্যাপারে আমাদের মনের ওপর পর্দা পড়ে আছে,[২] *আমাদের কান বধির হয়ে আছে এবং তোমার ও আমাদের মাঝে একটি পর্দা আড়াল করে আছে।*[৩] *তুমি তোমার কাজ করতে থাকো আমরাও আমাদের কাজ করে যাবো।*[৪]

১. এটা এই সূরার সংক্ষিপ্ত ভূমিকা। পরবর্তী বক্তব্য সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা–ভাবনা করলে এ ভূমিকায় আলোচিত বিষয়বস্তুর পরবর্তী বিষয়বস্তুর সাথে যে সাদৃশ্য আছে তা বুঝা যেতে পারে।

প্রথমে বলা হয়েছে, এ বাণী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ যতদিন ইচ্ছা তোমরা এ অপপ্রচার চালাতে থাকো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এ সব কথা রচনা করছেন। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, এ বাণী বিশ্ব জাহানের রবের পক্ষ থেকে এসেছে। তাছাড়া এ কথা বলে শ্রোতাদেরকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, এ বাণী শুনে যদি তোমরা অসন্তুষ্ট হও তাহলে তোমাদের সেই অসন্তুষ্টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে নয়, আল্লাহর বিরুদ্ধে। যদি তা প্রত্যাখ্যান করো তাহলে

কোন মানুষের কথা প্রত্যাখ্যান করছো না, আল্লাহর নিজের কথা প্রত্যাখ্যান করছো। আর যদি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকো তাহলে কোন মানুষ থেকে মুখ ফিরাচ্ছো না বরং, খোদ আল্লাহ তায়ালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো।

দ্বিতীয় যে কথাটি বলা হয়েছে তাহচ্ছে এই যে, এ বাণী নাযিলকারী মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান (রাহমান ও রাহীম)। এ বাণী নাযিলকারী আল্লাহর আর সব গুণাবলীর পরিবর্তে 'রহমত' গুণটি এ সত্যের প্রতি ইংগিত করে যে, তিনি তাঁর দয়ার দাবী অনুসারে এ বাণী নাযিল করেছেন। এর দ্বারা শ্রোতাদেরকে এ মর্মে সাবধান করা হয়েছে যে, কেউ যদি এ বাণীর প্রতি রুষ্ট হয় বা একে প্রত্যাখ্যান করে কিংবা ভ্রুকুঞ্চিত করে তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে নিজের সাথেই শত্রুতা করে। এটা বিরাট এক নিয়ামত যা আল্লাহ মানুষকে পথ প্রদর্শন এবং তার সাফল্য ও সৌভাগ্যের জন্য সরাসরি নাযিল করেছেন। আল্লাহ যদি মানুষের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন তাহলে তাদেরকে অন্ধকারে হাতড়িয়ে মরার জন্য পরিত্যাগ করতেন এবং তারা কোন গর্তে গিয়ে পতিত হবে তার কোন পরোয়াই করতেন না। কিন্তু সৃষ্টি করা ও খাদ্য সরবরাহ করার সাথে সাথে তার জীবনকে সুন্দর করে গোছানোর জন্য জ্ঞানের আলো দান করাও তিনি তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেন এবং সে কারণেই তাঁর এক বান্দার কাছে এ বাণী নাযিল করছেন, এটা তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ। সুতরাং যে ব্যক্তি এই রহমত দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অগ্রসর হয় তার চেয়ে বড় অকৃতজ্ঞ এবং নিজেই নিজের দুশমন আর কে হতে পারে?

তৃতীয় কথাটি বলা হয়েছে এই যে, এই কিতাবের আয়াত সমূহ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এর কোন কথাই অস্পষ্ট ও জটিল নয়, যার ফলে এ কিতাবের বিষয়বস্তু কারো বোধগম্য হয় না বলে সে তা গ্রহণ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করতে পারে না। হক ও বাতিল কি, সত্য সঠিক আকীদা-বিশ্বাস ও ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস কি, ভাল ও মন্দ নৈতিক চরিত্র কি, সৎ কাজ ও নেক কাজ কি, কোন পথের অনুসরণে মানুষের কল্যাণ এবং কোন পথ অবলম্বনে তার নিজের ক্ষতি এ গ্রন্থে তা পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে। কেউ যদি এরূপ সুস্পষ্ট ও খোলামেলা হিদায়াত প্রত্যাখ্যান করে কিংবা সেদিকে মনযোগ না দেয় তাহলে সে কোন ওজর ও অক্ষমতা পেশ করতে পারে না। তার এই আচরণের সুস্পষ্ট অর্থ হচ্ছে সে ভুলকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়।

চতুর্থ কথাটি বলা হয়েছে এই যে, এটা আরবী ভাষার কুরআন। অর্থাৎ এ কুরআন যদি অন্য কোন ভাষায় নাযিল হতো তাহলে আরবরা অন্তত এ ওজর পেশ করতে পারতো যে, আল্লাহ যে ভাষায় তাঁর কিতাব নাযিল করেছেন আমরা সে ভাষার সাথেই পরিচিত নই। কিন্তু এ গ্রন্থ তাদের নিজের ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং তা না বুঝার অজুহাত পেশ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। (এখানে সূরার ৪৪ আয়াতটিও সামনে থাকা দরকার। এ আয়াতে এই বিষয়টিই অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অনারবদের জন্য কুরআনের দাওয়াত গ্রহণ না করার যে যুক্তিসংগত ওজর বিদ্যমান আমরা ইতিপূর্বে তার জবাব দিয়েছি। দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউসুফ, টীকা ৫; রাসায়েল ও মাসায়েল, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯ থেকে ২৩)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ
فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۝٦ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝٧ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝٨

হে নবী, এদের বলে দাও, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ।[৫] আমাকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয় যে, একজনই মাত্র তোমাদের ইলাহ[৬] কাজেই সোজা তাঁর প্রতি নিবিষ্ট হও[৭] এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।[৮] মুশরিকদের জন্য ধ্বংস, যারা যাকাত দেয় না।[৯] এবং আখেরাত অস্বীকার করে। যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, নিশ্চিতভাবে তাদের জন্য এমন পুরস্কার রয়েছে যার ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হবে না।[১০]

পঞ্চম কথাটি বলা হয়েছে এই যে, এ কিতাব তাদের জন্য যারা জ্ঞানের অধিকারী। অর্থাৎ কেবল জ্ঞানী লোকেরাই এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। অজ্ঞ লোকদের কাছে তা ঠিক তেমনি মূল্যহীন যেমন একটি মূল্যবান হীরক খণ্ড এমন ব্যক্তির কাছে মূল্যহীন যে সাধারণ পাথর ও হীরক খণ্ডের পার্থক্য জানে না।

ষষ্ঠ কথাটি বলা হয়েছে এই যে, এ কিতাব সু-সংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী। অর্থাৎ এটা শুধু এমন নয় যে, এটা শুধু এক কল্পনাচারিতা, একটি দর্শন এবং একটি আদর্শ রচনা শৈলী পেশ করে, যা মানা না মানায় কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। এ গ্রন্থ বরং চিৎকার করে ডেকে ডেকে গোটা দুনিয়াকে সাবধান করে দিচ্ছে যে, একে মেনে চলার ফলাফল অত্যন্ত শুভ ও মহিমময় এবং না মানার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ ও ধ্বংসকর। এ ধরনের গ্রন্থকে কেবল কোন নির্বোধই অবলীলাক্রমে উপেক্ষা করতে পারে।

২. অর্থাৎ আমাদের মন পর্যন্ত তার পৌঁছার কোন পথই খোলা নেই।

৩. অর্থাৎ এই আন্দোলন আমাদের ও তোমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছে। তা আমাদের ও তোমাদেরকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এটা এমন এক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে যা আমাদের ও তোমাদেরকে এক হতে দেয় না।

৪. এর দুটি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে, তোমার সাথে আমাদের এবং আমাদের সাথে তোমার কোন সংঘাত নেই। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, তুমি যদি তোমার আন্দোলন থেকে বিরত না হও তাহলে নিজের কাজ করে যেতে থাকো। আমরাও তোমার বিরোধিতা পরিত্যাগ করবো না এবং তোমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আমরা সাধ্যমত সব কিছুই করবো।

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ
وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝٩ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ
مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ۖ سَوَاءً
لِّلسَّائِلِينَ ۝١٠ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا
وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ۚ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۝١١

২ রুকূ'

হে নবী, এদের বলো, তোমরা কি সেই আল্লাহর সাথে কুফরী করছো এবং অন্যদেরকে তাঁর সাথে শরীক করছো যিনি দুদিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? তিনিই বিশ্ব জাহানের সবার রব। তিনি (পৃথিবীকে অস্তিত্ব দানের পর) ওপর থেকে তার ওপর পাহাড় স্থাপন করেছেন এবং তাতে বরকত দান করেছেন।[১১] আর তার মধ্যে সব প্রার্থীর জন্য প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে সঠিক পরিমাপে খাদ্য সরবরাহ করেছেন।[১২] এসব কাজ চার দিনে হয়েছে।[১৩] তার পর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেছেন যা সেই সময় কেবল ধূয়া ছিল।[১৪] তিনি আসমান ও যমীনকে বললেন ঃ ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তোমরা অস্তিত্ব ধারণ করো। উভয়ে বললো ঃ আমরা অনুগতদের মতই অস্তিত্ব গ্রহণ করলাম।[১৫]

৫. অর্থাৎ তোমাদের মনের ওপরের পর্দা উন্মোচন করা, বধির কানকে শ্রবণ শক্তি দান করার এবং যে পর্দা দিয়ে তোমরা নিজেরা আমার ও তোমাদের মধ্যে আড়াল সৃষ্টি করেছো তা সরিয়ে দেয়ার সাধ্য আমার নেই। আমিতো মানুষ। যে বুঝার জন্য প্রস্তুত আমি কেবল তাকেই বুঝাতে পারি, যে শোনার জন্য প্রস্তুত কেবল তাকেই শোনাতে পারি এবং যে মিলিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত কেবল তার সাথেই মিলতে পারি।

৬. অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মনের দুয়ারে পর্দা টাঙ্গিয়ে দাও আর কান বধির করে নাও, প্রকৃত সত্য হলো তোমাদের আল্লাহ অনেক নয়, বরং শুধু মাত্র একজনই। আর তোমরা সেই আল্লাহরই বান্দা। এটা আমার চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণা প্রসূত কোন দর্শন নয় যে, তার সঠিক ও ভ্রান্ত হওয়ার সমান সম্ভাবনা রয়েছে। আমার কাছে অহী পাঠিয়ে এ সত্য তুলে ধরা হয়েছে, যার ভুল-ত্রুটির লেশমাত্র থাকার সম্ভাবনা নেই।

৭. অর্থাৎ অন্য কাউকে আল্লাহ হিসেবে গ্রহণ করবে না, অন্য কারো দাসত্ব ও পূজা-অর্চনা করবে না, অন্য কাউকে সাহায্যের জন্য ডাকবে না। আর কারো সামনে

আনুগত্যের মাথা নত করো না এবং অন্য কারো রীতি ও নিয়ম-কানুনকে অবশ্য অনুসরণীয় বিধান হিসেবে মেনে নিও না।

৮. আজ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের আল্লাহর সাথে যে বিশ্বাস হীনতার কাজ করে এসেছো এবং আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার কারণে শিরক, কুফরী, নাফরমানি ও গোনাহ করে এসেছো তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা।

৯. এখানে 'যাকাত' শব্দের অর্থ কি তা নিয়ে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইবনে আব্বাস ও তাঁর উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ছাত্র ইকরিমা ও মুজাহিদ বলেন ঃ এখানে 'যাকাত' অর্থ আত্মার সেই পবিত্রতা যা তাওহীদের আকীদা এবং আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা অর্জিত হয়। এই তাফসীর অনুসারে আয়াতের অনুবাদ হবে, 'যেসব মুশরিক পবিত্রতা অবলম্বন করে না তাদের জন্য ধ্বংস। তাফসীরকারদের আরেকটি গোষ্ঠী যার মধ্যে কাতাদা, সুদ্দী, হাসান বাসারী, দাহহাক, মুকাতিল ও ইবনুস সাইয়েবের মত তাফসীরকারও আছেন তাঁরা এখানে 'যাকাত' শব্দটিকে অর্থ-সম্পদের যাকাত অর্থ গ্রহণ করেন। এ ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতের অর্থ হবে, 'যারা শিরক করে আল্লাহর হক এবং যাকাত না দিয়ে বান্দার হক মারে তাদের জন্য ধ্বংস।'

১০. মূল আয়াতে اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। এ কথাটির আরো দুটি অর্থ আছে। একটি অর্থ হচ্ছে, তা হবে এমন পুরস্কার যা কখনো হ্রাস পাবে না। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, তা হবে এমন পুরস্কার যা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে না বা সে জন্য খোঁটা দেয়া হবে না, যেমন কোন কৃপণ হিম্মত করে কোন কিছু দিলেও সে দানের কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়।

১১. পৃথিবীর বরকতসমূহ অর্থ অঢেল ও সীমা সংখ্যাহীন উপকরণ যা কোটি কোটি বছর ধরে ক্রমাগত পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে আসছে এবং শুধু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই দেখা যায় এমন ক্ষুদ্র কীট থেকে শুরু করে মানুষের উন্নত সভ্যতার দৈনন্দিন চাহিদা সমূহ পূরণ করছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় বরকত হচ্ছে বাতাস ও পানি। কারণ, পানির বদৌলতেই ভূ-পৃষ্ঠে উদ্ভিদ, জীবকূল ও মানুষের জীবন সম্ভব হয়েছে।

১২. মূল আয়াতের বাক্য হচ্ছে قَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِيْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ - سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ কতিপয় স্বতন্ত্র মতামত পেশ করেছেন।

কিছুসংখ্যক মুফাসসির এর অর্থ বর্ণনা করেছেন ঃ "পৃথিবীতে প্রার্থীদের সঠিক হিসাব অনুসারে তাদের সমুদয় রিযিক পুরা চার দিনে রাখা হয়েছে।" অর্থাৎ পুরো চার দিনে রাখা হয়েছে এর কম বা বেশী নয়।

ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদা ও সুদ্দী এর অর্থ করেন ঃ "পৃথিবীতে তার রিযিকসমূহ চার দিনে রাখা হয়েছে। জিজ্ঞেসকারীদের জবাব সম্পূর্ণ হয়েছে।" অর্থাৎ কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, এ কাজ কতদিনে সম্পন্ন হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ জবাব হচ্ছে চার দিনে সম্পন্ন হয়েছে। ইবনে যায়েদ এর অর্থ বর্ণনা করেন ঃ "প্রার্থীদের জন্য পৃথিবীতে চার দিনের মধ্যে তাদের রিযিকসমূহ সঠিক পরিমাণে প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে রেখেছেন।"

ভাষার ব্যাকরণগত নিয়ম অনুসারে আয়াতের বাক্যাংশে এ তিনটি অর্থই গ্রহণ করার অবকাশ আছে। তবে আমাদের মতে প্রথমোক্ত অর্থ দুটিতে গুণগত কোন বিষয় নেই। স্থানকাল অনুসারে বিচার করলে এ কথা এমনকি গুরুত্ব বহন করে যে, কাজটি চার দিনের এক ঘন্টা কমে বা বেশীতে নয় বরং পূর্ণ চার দিনে সম্পন্ন হয়েছে। আল্লাহর কুদরত, রবুবিয়াত ও হিকমতে কি অপূর্ণতা ছিল যা পূরণ করার জন্য এ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে? আয়াতের পূর্বের ও পরের বিষয়ের মধ্যে কোথাও এমন কোন ইংগিত নেই যা দ্বারা বুঝা যায় তখন কোন জিজ্ঞেসকারী এ প্রশ্ন করেছিলো যে এসব কাজ কতদিনে সম্পন্ন হয়েছিলো যার জবাব দিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছিলো। এসব কারণে আমরা অনুবাদের মধ্যে তৃতীয় অর্থটি গ্রহণ করেছি। আমাদের মতে আয়াতের সঠিক অর্থ হচ্ছে, সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত প্রকারের যত মাখলুক আল্লাহ সৃষ্টি করবেন তাদের প্রত্যেকের সঠিক চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে খাদ্যের সব সরঞ্জাম হিসাব করে তিনি পৃথিবীর বুকে রেখে দিয়েছেন। স্থল ভাগে ও পানিতে অসংখ্য প্রকারের উদ্ভিদ রয়েছে। এদের প্রতিটি শ্রেণীর খাদ্য সংক্রান্ত প্রয়োজন অন্য সব শ্রেণী থেকে ভিন্ন। আল্লাহ বায়ুমণ্ডল, স্থল ও পানিতে অসংখ্য প্রজাতির জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিটি প্রজাতিরই স্বতন্ত্র ধরনের খাদ্য প্রয়োজন। তাছাড়া এসব প্রজাতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সৃষ্টি মানুষ। মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন শুধু দেহের লালন ও পরিপুষ্টি সাধনের জন্যই নয়, তার রুচির পরিতৃপ্তির জন্যও নানা রকম খাদ্যের প্রয়োজন। আল্লাহ ছাড়া আর কার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল মাটির তৈরী এই গ্রহটির ওপরে জীবনের উৎপত্তি থেকে শুরু করে তার পরিসমাপ্তি পর্যন্ত কোন্ কোন্ শ্রেণীর সৃষ্টিকুল কত সংখ্যায় কোথায় কোথায় এবং কোন্ কোন্ সময় অস্তিত্ব লাভ করবে এবং তাদের প্রতিপালনের জন্য কোন প্রকারের খাদ্য কত পরিমাণে দরকার হবে। নিজের সৃষ্টি পরিকল্পনা অনুসারে যেভাবে তিনি খাদ্যের মুখাপেক্ষী এসব মাখলুককে সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করেছিলেন অনুরূপভাবে তাদের চাহিদা পূরণের জন্য খাদ্য সরবরাহেরও পূর্ণ ব্যবস্থা করেছেন।

বর্তমান যুগে যেসব লোক মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ইসলামী সংস্করণ কুরআনী নেজামে রবুবিয়াতের নামে বের করেছেন তারা سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ এর অনুবাদ করেন "সমস্ত প্রার্থীর জন্য সমান" আর এর ওপর যুক্তি প্রমাণের প্রাসাদ নির্মাণ করেন এই বলে যে, আল্লাহ পৃথিবীতে সব মানুষের জন্য সমপরিমাণে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য পূরণার্থে এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজন যা সবাইকে খাদ্যের সমান রেশন সরবরাহ করবে। কারণ, এই কুরআন যে সাম্য দাবী করে ব্যক্তি মালিকানা ব্যবস্থায় তা কায়েম হতে পারে না। কিন্তু কুরআনের দ্বারা নিজেদের মতবাদসমূহের খেদমত করানোর অতি আগ্রহে তারা এ কথা ভুলে যান যে سَائِلِيْنَ বা প্রার্থী বলে এ আয়াতে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে শুধু মানুষ নয় বিভিন্ন শ্রেণীর অন্যান্য সৃষ্টিও রয়েছে, জীবন ধারণের জন্য যাদের খাদ্যের প্রয়োজন। আল্লাহ কি প্রকৃতই এসব সৃষ্টির মধ্যে কিংবা তাদের এক একটি শ্রেণীর সবার মধ্যে জীবনোপকরণের ক্ষেত্রে সাম্যের ব্যবস্থা রেখেছেন। প্রকৃতির গোটা ব্যবস্থাপনায় কোথাও কি আপনি সমানভাবে খাদ্য বন্টনের ব্যবস্থা দেখতে পান? প্রকৃত ব্যাপার যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে তার অর্থ

হচ্ছে, উদ্ভিদ এবং জীবজগতের মধ্যে, যেখানে মানুষের পরিচালিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা নেই, বরং আল্লাহর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সরাসরি রিযিক বন্টনের ব্যবস্থা করছে সেখানে আল্লাহ নিজেই এই "কুরআনী বিধান" লংঘন করেছেন—এমনকি (নাউযুবিল্লাহ) বে-ইনসাফী করেছেন? তারা এ কথাও ভুলে যায়, মানুষ যেসব জীবজন্তু পালন করে এবং যাদের খাদ্য যোগানোর দায়িত্ব মানুষেরই তারাও سَائِلِيْنَ এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন ঃ ভেড়া, বকরী, গরু, মোষ, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর ও উট প্রভৃতি। সব প্রার্থীকে সমান খাদ্য দিতে হবে এটাই যদি কুরআনী বিধান হয় এবং এ বিধান চালু করার জন্য "নেজামে রবুবিয়াত" পরিচালনাকারী একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকে তাহলে সেই রাষ্ট্র কি মানুষ এবং এসব জীবজন্তুর মধ্যেও আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত করবে?

১৩. এ স্থানের ব্যাখ্যায় সাধারণভাবে মুফাসসিরদেরকে একটি জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। জটিলতাটি হচ্ছে, যদি পৃথিবী সৃষ্টির দুই দিন এবং সেখানে পাহাড় স্থাপন, বরকত দান এবং খাদ্যোপকরণ সৃষ্টির জন্য চার দিন ধরা হয় সে ক্ষেত্রে পরে আসমান সৃষ্টির জন্য যে দুই দিনের কথা বলা হয়েছে সেই দুই দিনসহ মোট আট দিন হয়। কিন্তু আল্লাহ কুরআন মজীদের বেশ কিছু জায়গায় সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, পৃথিবী ও আসমান সর্বমোট ছয় দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে (উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, তাফহীমুল কুরআন— সূরা আল আরাফ ৫৪, সূরা ইউনুস ৩, সূরা হুদ ৭ এবং সূরা আল ফুরকান ৫৯ আয়াত সমূহ।)

এ কারণে প্রায় সমস্ত মুফাসসিরই বলেন ঃ এই চার দিন পৃথিবী সৃষ্টির দু' দিন সহ। অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টির দু' দিন এবং উপরে যেসব জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে পৃথিবীতে সেসব জিনিস সৃষ্টির জন্য আরো দু' দিন। এভাবে মোট চার দিনে পৃথিবী তার সব রকম উপায় উপকরণসহ পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু একদিকে এটা কুরআন মজীদের বাহ্যিক বক্তব্যের পরিপন্থী আর মূলত যে জটিলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে তা একান্তই কাল্পনিক। যে দু দিনে সামগ্রিকভাবে গোটা বিশ্ব জাহান সৃষ্টি করা হয়েছে মূলত পৃথিবী সৃষ্টির দু দিন তা থেকে ভিন্ন নয়। পরবর্তী আয়াত সমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করুন দেখতে পাবেন সেখানে এক সাথে পৃথিবী ও আসমান সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, আল্লাহ দু' দিনে সাত আসমান নির্মাণ করেছেন। এই সাত আসমান বলে বুঝানো হয়েছে গোটা বিশ্ব জাহান, আমাদের এই পৃথিবীও যার একটা অংশ। তারপর যখন বিশ্ব জাহানের অন্যান্য অসংখ্য তারকা ও গ্রহের মত এই পৃথিবীও উক্ত দু দিনে একটি গ্রহের আকৃতি ধারণ করলো। তখন আল্লাহ সেটিকে জীবকুলের জন্য প্রস্তুত করতে শুরু করলেন এবং চার দিনের মধ্যে সেখানে সেই সব উপকরণ সৃষ্টি করলেন পূর্বোক্ত আয়াতে যার উল্লেখ করা হয়েছে। এ চার দিনে অন্যান্য তারকা ও গ্রহের কি উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে আল্লাহ এখানে তা উল্লেখ করেননি। কারণ যে যুগে কুরআন নাযিল হয়েছিলো সেই যুগের মানুষ তো দূরের কথা এ যুগের মানুষও সেসব তথ্য হজম করার সামর্থ রাখে না।

১৪. এখানে তিনটি বিষয় স্পষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন। এক, এখানে আসমান অর্থ সমগ্র বিশ্ব জাহান। পরবর্তী আয়াতাংশ থেকে তা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। অন্য কথায় আসমানের দিকে মনোনিবেশ করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ বিশ্ব জাহান সৃষ্টির দিকে মনোনিবেশ করলেন।

দুই, বিশ্ব জাহানকে আকৃতি দানের পূর্বে তা আকৃতিহীন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গো ধূলির মত মহাশূন্যে বস্তুর প্রাথমিক অবস্থায় ছড়ানো ছিল। ধোঁয়া বলতে বস্তুর এই প্রাথমিক অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণ এ জিনিসকেই নীহারিকা (Nebula) বলে ব্যাখ্যা করেন। বিশ্ব জাহান সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় সম্পর্কে তাদের ধ্যান-ধারণাও হচ্ছে, যে বস্তু থেকে বিশ্ব জাহান সৃষ্টি হয়েছে সৃষ্টির পূর্বে তা এই ধোঁয়া অথবা নীহারিকার আকারে ছড়ানো ছিল।

তিন, "তারপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন" বাক্য দ্বারা এ কথা বুঝা ঠিক নয় যে, প্রথমে তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তারপর তার ওপরে পাহাড় স্থাপন, বরকত দান এবং খাদ্য উপকরণ সরবরাহের কাজ সম্পন্ন করেছেন। এসব করার পর তিনি বিশ্ব জাহান সৃষ্টির প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। পরবর্তী বাক্যাংশ "তিনি আসমান ও যমীনকে বললেন ঃ তোমরা অস্তিত্ব ধারণ করো। উভয়ে বললো, আমরা অনুগতদের মতই অস্তিত্ব গ্রহণ করলাম" এই ভুল ধারণা নিরসন করে দেয়া এ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটি এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে সেই সময়ের কথা বলা হচ্ছে যখন আসমান ও যমীন কিছুই ছিল না, বরং বিশ্ব জাহান সৃষ্টির সূচনা করা হচ্ছিলো শুধু ثُمَّ (তারপর, অতপর বা পরে) শব্দটিকে এ বিষয়ের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায় না যে আসমান সৃষ্টির পূর্বেই পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছিলো। ثُمَّ শব্দটি যে অনিবার্যরূপে সময়-ক্রম বুঝাতে ব্যবহৃত হয় না বর্ণনা-ক্রম বুঝাতেও ব্যবহৃত হয় কুরআন মজীদে তার বেশ কিছু উদাহরণ বিদ্যমান। (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা যুমার, টীকা নম্বর ১২)

কুরআন মজীদের ভাষ্য অনুসারে প্রথমে যমীন না আসমান সৃষ্টি হয়েছে প্রাচীন যুগের মুফাসসিরদের মধ্যে এ নিয়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিতর্ক চলেছে। একদল এ আয়াত এবং সূরা বাকারার ২৯ আয়াতের মাধ্যমে যুক্তি পেশ করেন যে পৃথিবীই প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে। অপর দল সূরা নাযিয়াতের ২৭ থেকে ৩৩ পর্যন্ত আয়াত হতে দলীল পেশ করে বলেন, আসমান প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে। কেননা, সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে আসমানের পরে যমীন সৃষ্টি হয়েছে। তবে প্রকৃত ব্যাপার এই যে, পদার্থ বিজ্ঞান বা জ্যোতির্বিদ্যা শেখানোর জন্য কুরআন মজীদের কোথাও বিশ্ব জাহান সৃষ্টির বিষয় উল্লেখ করা হয়নি, বরং তাওহীদ ও আখেরাতের আকীদার প্রতি ঈমানের দাওয়াত দিতে গিয়ে আরো অসংখ্য নিদর্শনের মত যমীন ও আসমানের সৃষ্টির বিষয়টিও চিন্তা-ভাবনা করে দেখার জন্য পেশ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে আসমান ও যমীন সৃষ্টির সময়-ক্রম বর্ণনা করে যমীন আগে সৃষ্টি হয়েছে না আসমান আগে সৃষ্টি হয়েছে তার উল্লেখ একেবারেই অপ্রয়োজনীয় ছিল। দুটি বস্তুর মধ্যে এটি বা সেটি যেটিই প্রথমে সৃষ্টি হয়ে থাকুক সর্বাবস্থায় দুটিই আল্লাহর একমাত্র ইলাহ হওয়ার প্রমাণ। তা এ কথাও প্রমাণ করে যে, তাদের সৃষ্টিকর্তা এ সমগ্র কারখানা কোন খেলোয়াড়ের খেলনা হিসেবে সৃষ্টি করেননি। এ কারণেই কুরআন কোন জায়গায় পৃথিবী সৃষ্টির কথা প্রথমে উল্লেখ করে আবার কোন জায়গায় প্রথমে উল্লেখ করে আসমান সৃষ্টির কথা যে ক্ষেত্রে মানুষের মনে আল্লাহর নিয়ামত সমূহের অনুভূতি সৃষ্টি উদ্দেশ্য হয় সে ক্ষেত্রে সাধারণত যমীন সৃষ্টির উল্লেখ প্রথমে করেন। কারণ, তা মানুষের সবচেয়ে কাছে। আর যে ক্ষেত্রে আল্লাহর মহত্ব এবং তাঁর কুদরতের পূর্ণতার ধারণা দেয়া উদ্দেশ্য হয় সে ক্ষেত্রে সাধারণত আসমানের উল্লেখ প্রথমে করেন। কারণ, সুদূরবর্তী আসমান চিরদিনই মানুষের মনের ওপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে আছে।

فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ؕ
وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَحِفْظًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ
الْعَلِيْمِ ﴿١٢﴾ فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ
عَادٍ وَّثَمُوْدَ ﴿١٣﴾ اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ
اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ
اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿١٤﴾

তারপর তিনি দু'দিনের মধ্যে সাত আসমান বানালেন এবং প্রত্যেক আসমানে তিনি তাঁর বিধান অহী করলেন। আর পৃথিবীর আসমানকে আমি উজ্জ্বল প্রদীপ দিয়ে সজ্জিত করলাম এবং ভালভাবে সুরক্ষিত করে দিলাম।[১৬] এসবই এক মহা পরাক্রমশালী জ্ঞানী সত্তার পরিকল্পনা।

এখন যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়[১৭] তাহলে এদের বলে দাও আদ ও সামূদের ওপর যে ধরনের আযাব নাযিল হয়েছিলো আমি তোমাদেরকে অকস্মাত সেই রূপ আযাব আসার ব্যাপারে সাবধান করছি। সামনে ও পেছনে সব দিক থেকে যখন তাদের কাছে আল্লাহর রসূল এলো[১৮] এবং তাদেরকে বুঝালো আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না তখন তারা বললো ঃ আমাদের রব ইচ্ছা করলে ফেরেশতা পাঠাতে পারতেন। সুতরাং তোমাদেরকে যে জন্য পাঠানো হয়েছে আমরা তা মানি না।[১৯]

১৫. আল্লাহ এ আয়াতাংশে তাঁর সৃষ্টি পদ্ধতির অবস্থা এমন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন যার মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টি ও মানবীয় সৃষ্টি ক্ষমতার পার্থক্য পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যায়। মানুষ যখন কোন জিনিস বানাতে চায় তখন প্রথমেই নিজের মন-মগজে তার একটা নকশা ফুটিয়ে তোলে এবং সে জন্য পরে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে। তারপর ঐ সব উপকরণকে নিজের পরিকল্পিত নকশা ও কাঠামো অনুসারে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য পরিশ্রম করে ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালায়। যেসব উপকরণকে সে নিজের মগজে অংকিত নকশায় রূপদানের চেষ্টা করে চেষ্টার সময় তা একের পর এক বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকে। কখনো উপকরণের বাধা সফল হয় এবং কাংখিত বস্তু পরিকল্পিত নকশা অনুসারে ঠিকমত তৈরী হয় না। আবার কখনো ব্যক্তির প্রচেষ্টা প্রবল হয় এবং সে উপকরণ সমূহকে কাংখিত রূপদানে সফল হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ কোন দর্জি একটি জামা তৈরী করতে

চায়। এ জন্য সে প্রথমে তার মন-মগজে জামার নকশা ও আকৃতি কল্পনা করে। তারপর কাপড় সংগ্রহ করে নিজের পরিকল্পিত জামার নকশা অনুসারে কাপড় কাটতে ও সেলাই করতে চেষ্টা করে এবং এই চেষ্টার সময় তাকে উপর্যুপরি কাপড়ের প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করতে হয়। কারণ কাপড় তার পরিকল্পিত নকশা অনুসারে তৈরী হতে সহজে প্রস্তুত হয় না। এমনকি এ ক্ষেত্রে কখনো কাপড়ের প্রতিবন্ধকতা সফল হয় এবং জামা ঠিকমত তৈরী হয় না। আবার কখনো দর্জির প্রচেষ্টা সফল হয় এবং সে কাপড়কে তার পরিকল্পিত নকশায় রূপদান করে। এবার আল্লাহর সৃষ্টি পদ্ধতির দিকে লক্ষ্য করুন। বিশ্ব জাহান সৃষ্টির উপরকণ ধূঁয়ার আকারে ছড়িয়ে ছিলো। বিশ্ব জাহানের বর্তমান যে রূপ আল্লাহ তাকে সেই রূপ দিতে চাইলেন। এ উদ্দেশ্যে তাকে বসে বসে কোন মানুষ কারিগরের মত পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য এবং অন্যান্য তারকা ও গ্রহ-উপগ্রহ বানাতে হয়নি। বরং তাঁর পরিকল্পনায় বিশ্ব জাহানের যে নকশা ছিল সে অনুসারে তাকে অস্তিত্ব গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন। অর্থাৎ তিনি যে ছায়াপথ, তারকারাজি এবং গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলেন ঐ সব উপকরণ যেন সেই আকৃতি ধারণ করে সেই নির্দেশ দান করলেন। আল্লাহর আদেশের পথে প্রতিবন্ধক হওয়ার ক্ষমতা ঐ সব উপকরণের ছিল না। ঐ উপকরণ সমূহকে বিশ্ব জাহানের আকৃতি দান করতে আল্লাহকে কোন পরিশ্রম করতে ও প্রচেষ্টা চালাতে হয়নি। একদিকে আদেশ হয়েছে আরেকদিকে ঐ সব উপকরণ সংকুচিত ও একত্রিত হয়ে অনুগতদের মত প্রভুর পরিকল্পিত নকশা অনুযায়ী তৈরী হতে শুরু করেছে এবং ৪৮ ঘন্টায় পৃথিবীসহ সমস্ত বিশ্ব জাহান সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে।

আল্লাহর সৃষ্টি পদ্ধতির এই অবস্থাকে কুরআন মজীদের আরো কতিপয় স্থানে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ যখন কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন শুধু এই নির্দেশ দেন, 'হয়ে যাও' আর তখনি তা হয়ে যায়। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ১১৫; আল ইমরান, টীকা ৪৪ ও ৫৩; আন নাহল, টীকা ৩৫ ও ৩৬; মারয়াম, টীকা ২২; ইয়াসীন, আয়াত ৮২ এবং আল মু'মিন, আয়াত ৬৮)।

১৬. এসব আয়াত বুঝার জন্য তাফহীমুল কুরআনের নিম্ন বর্ণিত স্থান সমূহ অধ্যয়ন করা সহায়ক হবে ঃ আল বাকারা, টীকা ৩৪; আর রা'আদ, টীকা ২; আল-হিজর, টীকা ৮ থেকে ১২; আল আম্বিয়া, টীকা ৩৪ ও ৩৫; আল-মু'মিনুন, টীকা ১৫; ইয়াসীন, টীকা ৩৭ এবং আস সাফফাত, টীকা ৫ ও ৬।

১৭. অর্থাৎ যিনি এই পৃথিবী ও সারা বিশ্ব জাহান সৃষ্টি করেছেন তিনি একাই আল্লাহ ও উপাস্য এ কথা মানে না এবং বাস্তবে যারা তাঁর সৃষ্টি ও দাস তাদেরকে উপাস্য বানাবার এবং আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, অধিকার ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারে তাদেরকে শরীক করার জন্য জিদ করে যেতে থাকে।

১৮. এ আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, তাদের কাছে একের পর এক রসূল এসেছেন। দুই, রসূলগণ সব উপায়ে তাদের বুঝানোর চেষ্টা করেছেন এং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য কোন উপায় ও পন্থা গ্রহণ করতেই কসুর করেননি। তিন, তাদের নিজ দেশেও তাদের কাছে রসূল এসেছেন এবং তাদের আশেপাশের দেশসমূহেও রসূল এসেছেন।

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ
مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ
وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي
أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١٦﴾ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ
فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾

তাদের অবস্থা ছিল এই যে, পৃথিবীতে তারা অন্যায়ভাবে নিজেদেরকে বড় মনে করে বসেছিলো এবং বলতে শুরু করেছিল ঃ আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর কে আছে? তারা একথা বুঝলোনা যে, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকারই করে চললো। অবশেষে আমি কতিপয় অমঙ্গলকর দিনে তাদের ওপর প্রবল ঝড়ো বাতাশ পাঠালাম[২০] যেন পার্থিব জীবনেই তাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনাকর আযাবের মজা চাখাতে পারি।[২১] আখেরাতের আযাব তো এর চেয়েও অধিক অপমানকর। সেখানে কেউ তাদের সাহায্যকারী থাকবে না।

আর আমি সামূদের সামনে সত্য পথ পেশ করেছিলাম কিন্তু তারা পথ দেখার চেয়ে অন্ধ হয়ে থাকা পসন্দ করলো। অবশেষে তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের ওপর লাঞ্ছনাকর আযাব ঝাঁপিয়ে পড়লো। যারা ঈমান এনেছিলো এবং গোমরাহী ও দুষ্কৃতি থেকে দূরে অবস্থান করতো[২২] আমি তাদেরকে রক্ষা করলাম।

১৯. অর্থাৎ আল্লাহ যদি আমাদের এই ধর্ম পসন্দ না করতেন এবং এ ধর্ম থেকে বিরত রাখার জন্য আমাদের কাছে কোন রসূল পাঠাতে চাইতেন তাহলে ফেরেশতা পাঠাতেন। তোমরা যেহেতু ফেরেশতা নও, বরং আমাদের মত মানুষ। তাই তোমাদেরকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন। আমরা এ কথা মানতে প্রস্তুত নই আর তোমরা যে দীন পেশ করছো আমরা আমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে তা গ্রহণ করি এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তোমাদের পাঠিয়েছেন আমরা একথা মানতেও প্রস্তুত নই। "যে উদ্দেশ্যে তোমাদের পাঠানো হয়েছে" তা আমরা মানি না-কাফেরদের এ উক্তি ছিল তীব্র কটাক্ষ। এর অর্থ এ নয় যে,

তারা সেটাকে আল্লাহর প্রেরিত বলে জানতো কিন্তু তা সত্ত্বেও তা মানতে অস্বীকৃতি জানাতো। বরং ফেরাউন হযরত মূসা সম্পর্কে তার সভাসদদেরকে যে ধরনের বিদ্রুপাত্মক উক্তি করেছিলো এটাও সে ধরনের বিদ্রুপাত্মক বর্ণনাভঙ্গি। ফেরাউন তার সভাসদদের বলেছিলো ঃ

إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِيٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (الشعرا ايت – ٢٧)

"যে রসূল সাহেবকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে তাকে তো বদ্ধ পাগল বলে মনে হয়।" (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইয়াসীন, টীকা ১১)

২০. অমঙ্গলকর দিনের অর্থ এ নয় যে, দিনগুলোর মধ্যেই অমঙ্গল নিহিত ছিল। আর আদ জাতির ওপর এই অমঙ্গলকর দিন এসেছিলো বলেই যে আযাব এসেছিল তাও ঠিক নয়। এর অর্থ যদি তাই হতো এবং ঐ দিনগুলোই অমঙ্গলকর হতো তাহলে দূরের ও কাছের সব কওমের ওপরই আযাব আসতো। তাই এর সঠিক অর্থ হচ্ছে যেহেতু সেই দিনগুলোতে ঐ কওমের ওপর আল্লাহর আযাব নাযিল হয়েছিলো তাই আদ কওমের জন্য সেই দিনগুলো ছিল অমঙ্গলকর। এ আয়াতের সাহায্যে দিনসমূহের মঙ্গলজনক ও অমঙ্গলজনক হওয়ার প্রমাণ পেশ করা ঠিক নয়।

প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস বুঝাতে "رِيحٌ صَرْصَرٌ" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে ভাষাবিদদের মতানৈক্য আছে। কেউ কেউ বলেন ঃ এর অর্থ মারাত্মক 'লু' প্রবাহ; কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস এবং কারো কারো মতে এর অর্থ এমন বাতাস যা প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টি হয়। তবে এ অর্থে সবাই একমত যে, শব্দটি প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এ আযাব সম্পর্কে যেসব বিস্তারিত বর্ণনা আছে তা হচ্ছে, এ বাতাস উপর্যুপরি সাত দিন এবং আট রাত পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছিলো। এর প্রচণ্ডতায় মানুষ পড়ে গিয়ে এমনভাবে মৃত্যুবরণ করে এবং মরে মরে পড়ে থাকে যেমন খেজুরের ফাঁপা কাণ্ড পড়ে থাকে (আল হাক্কাহ, আয়াত ৭)। এ বাতাস যে জিনিসের ওপর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে তাকেই জরাজীর্ণ করে ফেলেছে (আয যারিয়াত, আয়াত ৪২)। যে সময় এ বাতাস এগিয়ে আসছিলো তখন আদ জাতির লোকেরা এই ভেবে আনন্দে মেতে উঠেছিলো যে, মেঘ চারদিক থেকে ঘিরে আসছে। এখন বৃষ্টি হবে এবং তাদের আশা পূর্ণ হবে। কিন্তু তা এমনভাবে আসলো যে গোটা এলাকাই ধ্বংস করে রেখে গেল (আল আহকাফ, আয়াত ২৪ ও ২৫)।

২১. যে অহংকার ও গর্বের কারণে তারা পৃথিবীতে বড় সেজে বসেছিলো এবং বুক ঠুকে বলতো ঃ আমাদের চাইতে অধিক শক্তিশালী আর কে আছে অপমান ও লাঞ্ছনাকর এ আযাব ছিল সেই অহংকার ও গর্বের জবাব। আল্লাহ এমনভাবে তাদেরকে লাঞ্ছিত করলেন যে, তাদের জনপদের একটি বড় অংশকে ধ্বংস করে দিলেন, তাদের সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেললেন এবং যে ক্ষুদ্র অংশটি অবশিষ্ট রইলো তারা পৃথিবীর সেই সব জাতির হাতেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হলো যাদের কাছে একদিন তারা শক্তির বড়াই করতো। (আদ জাতির বিস্তারিত কাহিনীর জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ,

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا
مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنْطَقَنَا
اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾

৩ রুকূ'

আর সেই সময়ের কথাও একটু চিন্তা করো যখন আল্লাহর এসব দুশমনকে দোযখের দিকে যাওয়ার জন্য পরিবেষ্টিত করা হবে।[২৩] তাদের অগ্রবর্তীদেরকে পশ্চাদবর্তীদের আগমন করা পর্যন্ত থামিয়ে রাখা হবে।[২৪] পরে যখন সবাই সেখানে পৌঁছে যাবে তখন তাদের কান, তাদের চোখ এবং তাদের দেহের চামড়া তারা পৃথিবীতে কি করতো সে সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।[২৫] তারা তাদের শরীরের চামড়াসমূহকে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা জবাব দেবে, সেই আল্লাহই আমাদের বাকশক্তি দান করেছেন যিনি প্রতিটি বস্তুকে বাকশক্তি দান করেছেন।[২৬] তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। আর এখন তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

টীকা ৫১ থেকে ৫৩; হুদ, টীকা ৫৪ থেকে ৬৬; আল মু'মিনূন, টীকা ৩৪ থেকে ৩৭; আশ-শু'আরা, টীকা ৮৮ থেকে ৯৪; আল আনকাবূত, টীকা ৬৫)।

২২. সামূদ জাতির বিস্তারিত কাহিনী জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৫৭ থেকে ৫৯; হূদ, টীকা ৬৯ থেকে ৭৪; আল হিজর, টীকা ৪২ থেকে ৪৬; বনী ইসরাইল, টীকা ৬৮; আশ শুআরা, টীকা ৯৫ থেকে ১০৬; আন নামল, টীকা ৫৮ থেকে ৬৬।

২৩. মূল উদ্দেশ্য একথা বলা যে আল্লাহর আদালতে হাজির হওয়ার জন্য তাদের পরিবেষ্টন করে আনা হবে। কিন্তু এ বিষয়টিকেই এ ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, দোযখের দিকে যাওয়ার জন্য পরিবেষ্টন করে আনা হবে। কেননা দোযখে যাওয়াই তাদের শেষ পরিণাম।

২৪. অর্থাৎ এক একটি বংশ ও প্রজন্মের হিসাব-নিকাশ করে একটার পর একটা সিদ্ধান্ত দেয়া হবে তা নয়। বরং আগের ও পরের সমস্ত বংশ ও প্রজন্মকে একই সময়ে একত্র করা হবে এবং এক সাথেই তাদের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে। কারণ, কোন

মানুষ তার জীবনে ভাল মন্দ যে কাজই করুক না কেন তার জীবন শেষ হওয়ার সাথে সাথে তার প্রভাব শেষ হয় না, বরং তার মৃত্যুর পরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলতে থাকে। এ ক্ষেত্রে সৃষ্ট প্রভাবের জন্য সে-ই দায়ী। অনুরূপ একটি প্রজন্ম তার সময়ে যা কিছুই করে পরবর্তী প্রজন্ম সমূহের মধ্যে তার প্রভাব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলতে থাকে। এই উত্তরাধিকারের জন্য মূলত সেঃই দায়ী হয়। ভুল-ত্রুটি নির্ণয় এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠার এই সমস্ত প্রভাব ও ফলাফল পর্যালোচনা করা এবং তার সাক্ষ্য প্রমাণ তুলে ধরা অপরিহার্য। এ কারণেই কিয়ামতের দিন প্রজন্মসমূহ একের পর এক আসতে থাকবে এবং তাদেরকে অবস্থান করানো হতে থাকবে। যখন আগের ও পরের সবাই এসে একত্রিত হবে তখনি কেবল আদালতের কার্যক্রম শুরু হবে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৩০)।

২৫. বিভিন্ন হাদীসে এর যে ব্যাখ্যা এসেছে তা হচ্ছে যখন কোন একগুঁয়ে অপরাধী তার অপরাধ সমূহ অস্বীকার করতে থাকবে এবং সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণকেও মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করতে তৎপর হবে তখন আল্লাহর আদেশে তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ এক এক করে সাক্ষ্য দিবে, সে ঐগুলোর সাহায্যে কি কি কাজ আঞ্জাম দিয়েছে। হযরত আনাস (রা), হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন এবং মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এসব হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইয়াসীন, টীকা ৫৫)।

যেসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আখিরাত শুধু একটি আত্মিক জগত হবে না, বরং মানুষকে সেখানে দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে পুনরায় ঠিক তেমনি জীবিত করা হবে যেমনটি বর্তমানে তারা এই পৃথিবীতে জীবিত আছে—এ আয়াতটি তারই একটি। শুধু তাই নয়, যে দেহ নিয়ে তারা এই পৃথিবীতে আছে ঠিক সেই দেহই তাদের দেয়া হবে। যেসব উপাদান, অঙ্গ-প্রতঙ্গ এবং অণু-পরমাণুর (Atoms) সমন্বয়ে এই পৃথিবীতে তাদের দেহ গঠিত কিয়ামতের দিন সেগুলোই একত্রিত করে দেয়া হবে এবং যে দেহে অবস্থান করে সে পৃথিবীতে কাজ করেছিলো পূর্বের সেই দেহ দিয়েই তাকে উঠানো হবে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত দেহ নিয়ে সে পূর্বের জীবনে কোন অপরাধ করেছিলো সেই সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেই যদি সে অবস্থান করে কেবল তখনি সে সেখানে সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হবে। কুরআন মজীদের নিম্ন বর্ণিত আয়াতগুলোও এ বিষয়ের অকাট্য প্রমাণ। বনী ইসরাঈল, আয়াত ৪৯ থেকে ৫১ ও ৯৮; আল মু'মিনূন, আয়াত ৩৫ থেকে ৩৮ এবং ৮২ ও ৮৩; আস সিজদা, আয়াত ১০; ইয়াসীন, আয়াত ৬৫, ৭৮ ও ৭৯; আস সাফফাত, আয়াত ১৬ থেকে ১৮; আল ওয়াকিয়া, ৪৭ থেকে ৫০ এবং আন নাযিআত, আয়াত ১০ থেকে ১৪।

২৬. এ থেকে জানা গেল কিয়ামতের দিন মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই শুধু সাক্ষ্য দেবে না, যেসব জিনিসের সামনে মানুষ কোন কাজ করেছিলো তার প্রতিটি জিনিসই কথা বলে উঠবে। সূরা যিলযালে এ কথাই বলা হয়েছে ঃ

وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ
وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾
وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ
الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۖ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم
مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٤﴾ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ
الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿٢٥﴾

পৃথিবীতে অপরাধ করার সময় যখন তোমরা গোপন করতে তখন তোমরা চিন্তাও করোনি যে, তোমাদের নিজেদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের দেহের চামড়া কোন সময় তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তোমরা তো বরং মনে করেছিলে, তোমাদের বহু সংখ্যক কাজকর্মের খবর আল্লাহও রাখেন না। তোমাদের এই ধারণা—যা তোমরা তোমাদের রব সম্পর্কে করেছিলে—তোমাদের সর্বনাশ করেছে এবং এর বদৌলতেই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছো।[২৭] এ অবস্থায় তারা ধৈর্য ধারণ করুক (বা না করুক) আগুনই হবে তাদের ঠিকানা। তারা যদি প্রত্যাবর্তনের সুযোগ চায় তাহলে কোন সুযোগ দেয়া হবে না।[২৮] আমি তাদের ওপর এমন সব সঙ্গী চাপিয়ে দিয়েছিলাম যারা তাদেরকে সামনের ও পেছনের প্রতিটি জিনিস সুদৃশ্য করে দেখাতো।[২৯] অবশেষে তাদের ওপরও আযাবের সেই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হলো যা তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানব দলসমূহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছিলো। নিশ্চিতভাবেই তারা ক্ষতিগ্রস্ত ছিলো।

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝

"মাটির গভীরে যেসব ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে আছে তা সে বের করে দেবে। মানুষ বলবে এ কি ব্যাপার। সে দিন যমীন তার সব কথা শুনাবে (অর্থাৎ মানুষ তার উপরি ভাগে যা যা করেছে তার সব কাহিনী বলে দেবে।)। কারণ, তোমার রব তাকে বর্ণনা করার আদেশ প্রদান করবেন।"

২৭. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত হাসান বাসারী (র) খুব সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যেকে তার রব সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে তার আচার-আচরণ সেই ধারণা অনুসারেই নির্ধারিত হয়। সৎ কর্মশীল ঈমানদারের আচরণ সঠিক হওয়ার কারণ সে তার রব সম্পর্কে সঠিক ধারণা পোষণ করে। আর কাফের, মুনাফিক ফাসেক ও জালেমের আচরণ ভ্রান্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, রব সম্পর্কে তার ধারণাই ভ্রান্ত হয়ে থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক হাদীসে এ বিষয়টিই তুলে ধরেছেন এভাবে ঃ তোমাদের রব বলেন, انا عند ظن عبدى بى 'আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে আমি তার জন্য সেই ধারণার অনুরূপ।'

২৮. এ কথার অর্থ হতে পারে, দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইলে আসতে পারবে না। এ অর্থও হতে পারে যে, দোযখ থেকে বের হতে চাইলে বের হতে পারবে না। আবার এও হতে পারে যে, তওবা করতে বা অক্ষমতা প্রকাশ করতে চাইলে তা গ্রহণ করা হবে না।

২৯. এটা আল্লাহর স্বতন্ত্র ও স্থায়ী বিধান। খারাপ নিয়ত ও খারাপ আকাংখা পোষণকারী মানুষকে তিনি কখনো ভাল সংগী যোগান না। তার ঝোঁক ও আগ্রহ অনুসারে তিনি তাকে খারাপ সঙ্গীই জুটিয়ে দেন। সে যতই দুষ্কর্মের নিকৃষ্টতার গহবরে নামতে থাকে ততই জঘন্য থেকে জঘন্যতর মানুষ ও শয়তান তার সহচর, পরামর্শদাতা ও কর্মসহযোগী হতে থাকে। কারো কারো উক্তি, অমুক ব্যক্তি নিজে খুব ভালো কিন্তু তার সহযোগী ও বন্ধু-বান্ধব জুটেছে খারাপ, এটা বাস্তবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। প্রকৃতির বিধান হলো, প্রতিটি ব্যক্তি নিজে যেমন তার বন্ধু জোটে ঠিক তেমনি। একজন সৎ ও নেক মানুষের সাহচর্যে খারাপ মানুষ আসলেও বেশী সময় সে তার সাথে থাকতে পারে না। অনুরূপ অসৎ উদ্দেশ্যে কর্মরত একজন দুষ্কর্মশীল মানুষের সাথে হঠাৎ সৎ ও সম্ভ্রান্ত মানুষের বন্ধুত্ব হলেও তা বেশী সময় টিকে থাকতে পারে না। অসৎ মানুষ প্রকৃতিগত-ভাবে অসৎ মানুষদেরই তার প্রতি আকৃষ্ট করে এবং তার প্রতি অসৎরাই আকৃষ্ট হয়। যেমন নোংরা ময়লা আবর্জনা মাছিকে আকৃষ্ট করে এবং মাছি নোংরা ময়লা আবর্জনার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

আর বলা হয়েছে, তারা সামনের ও পেছনের প্রতিটি জিনিস সুদৃশ্য করে দেখাতো। এর অর্থ তারা তাদের মধ্যে এ মর্মে দৃঢ় বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতো যে, আপনার অতীত মর্যাদা ও গৌরবে ভরা এবং ভবিষ্যতও অত্যন্ত উজ্জ্বল। তারা তাদের চোখে এমন চশমা পরিয়ে দিতো যে, তারা চারদিকে কেবল সবুজ শ্যামল সোভাই দেখতে পেতো। তারা তাদের বলতো, আপনার সমালোচকরা নির্বোধ। আপনি কি কোন ভিন্ন ও বিরল প্রকৃতির কাজ করছেন? আপনি যা করছেন পৃথিবীতে প্রগতিবাদীরা তো তাই করে থাকে আর ভবিষ্যতে প্রথমত আখেরাত বলে কিছুই নেই, যেখানে আপনাকে নিজের সব কাজকর্মের জবাবদিহি করতে হবে। তবে কতিপয় নির্বোধ আখেরাত সংঘটিত হওয়ার যে দাবী করে থাকে তা যদি সংঘটিত হয়ও তাহলে যে আল্লাহ এখানে আপনাকে নিয়ামত রাজি দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন সেখানেও তিনি আপনার ওপর পুরস্কার ও সম্মানের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। দোযখ আপনার জন্য তৈরী করা হয়নি, তাদের জন্য তৈরী করা হয়েছে যাদেরকে আল্লাহ এখানেও তাঁর নিয়ামতসমূহ থেকে বঞ্চিত রেখেছেন।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ
تَغْلِبُوْنَ ﴿٢٦﴾ فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ
اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾ ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ
فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ۭ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا
تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٢٩﴾

৪ রুকূ'

এসব কাফেররা বলে, এ কুরআন তোমরা কখনো শুনবে না। আর যখন তা শুনানো হবে তখন হট্টগোল বাধিয়ে দেবে। হয়তো এভাবে তোমরা বিজয়ী হবে।[৩০] আমি এসব কাফেরদের কঠিন শাস্তির মজা চাখাবো এবং যে জঘন্যতম তৎপরতা তারা চালিয়ে যাচ্ছে তার পুরো বদলা তাদের দেবো। প্রতিদানে আল্লাহর দুশমনরা যা লাভ করবে তা হচ্ছে দোযখ। সেখানেই হবে তাদের চির দিনের বাসস্থান। তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো। এটা তাদের সেই অপরাদের শাস্তি। সেখানে এসব কাফের বলবে, 'হে আমাদের রব, সেই সব জিন ও মানুষ আমাদের দেখিয়ে দাও যারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিলো। আমরা তাদের পদদলিত করবো, যাতে তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়।[৩১]

৩০. মক্কার কাফেররা যেসব পরিকল্পনার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আন্দোলন ও তার প্রচারকে ব্যর্থ করে দিতে চাচ্ছিলো এটি ছিল তারই একটি। কুরআন কি অসাধারণ প্রভাব ক্ষমতার অধিকারী, কুরআনের দাওয়াত পেশকারী ব্যক্তি কেমন অতুলনীয় মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ এবং তাঁর এহেন ব্যক্তিত্বের সাথে উপস্থাপনার ভঙ্গি কেমন বিস্ময়করভাবে কার্যকর তা তারা ভালো করেই জানতো। তারা মনে করতো, এ রকম উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির মুখ থেকে এমন হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে এই নজিরবিহীন বাণী যেই শুনবে সে শেষ পর্যন্ত ঘায়েল হবেই। অতএব তারা পরিকল্পনা করলো, এ বাণী না নিজে শুনবে, না কাউকে শুনতে দেবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই তা শুনাতে আরম্ভ করবেন তখনই হৈ চৈ করবে। তালি বাজাবে, বিদ্রূপ করবে, আপত্তি ও সমালোচনার ঝড় তুলবে এবং চিৎকার জুড়ে দেবে যেন তার মধ্যে তাঁর কথা হারিয়ে যায়। তারা আশা করতো, এই কৌশল অবলম্বন করে তারা আল্লাহর নবীকে ব্যর্থ করে দেবে।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ
أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ
تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ
فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ
رَّحِيمٍ ﴿٣٢﴾

যারা [৩২]ঘোষণা করেছে, আল্লাহ আমাদের রব, অতপর তার ওপরে দৃঢ় ও স্থির থেকেছে[৩৩] নিশ্চিত তাদের কাছে ফেরেশতারা আসে[৩৪] এবং তাদের বলে, ভীত হয়ো না, দুঃখ করো না[৩৫] এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনে খুশী হও তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। আমরা এই দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের বন্ধু এবং আখেরাতেও। সেখানে তোমরা যা চাবে তাই পাবে। আর যে জিনিসেরই আকাংখা করবে তাই লাভ করবে। এটা সেই মহান সত্তার পক্ষ থেকে মেহমানদারীর আয়োজন যিনি ক্ষমাশীল ও দায়াবান।

৩১. অর্থাৎ পৃথিবীতে তো এরা তাদের নেতৃবৃন্দ ও প্রতারক শয়তানদের ইংগিতে নাচছে, কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন বুঝতে পারবে এসব নেতা তাদের কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে তখন এরাই আবার তাদেরকে অভিশাপ দিতে থাকবে এবং চাইবে কোনভাবে তাদেরকে হাতের কাছে পেলে পায়ের নীচে ফেলে পিষ্ট করতে।

৩২. এ পর্যন্ত কাফেরদেরকে তাদের হঠকারিতা এবং ন্যায় ও সত্যের বিরোধিতার পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করার পর এখন ঈমানদারদের ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হচ্ছে।

৩৩. অর্থাৎ হঠাত কখনো আল্লাহকে রব বলে ঘোষণা করেই থেকে যায়নি এবং এ ভ্রান্তিতেও লিপ্ত হয়নি যে, আল্লাহকে রব বলে ঘোষণাও করেছে এবং তার সাথে অন্যদেরকেও রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। বরং একবার এ আকীদা পোষণ করার পর সারা জীবন তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছে, তার পরিপন্থী অন্য কোন আকীদা গ্রহণ করেনি কিংবা এর সাথে কোন বাতিল আকীদার সংমিশ্রণও ঘটায়নি এবং নিজের কর্মজীবনে তাওহীদের আকীদার দাবীসমূহও পূরণ করেছে।

তাওহীদের ওপর দৃঢ় থাকার অর্থ কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও বড় বড় সাহাবা তার ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে ঃ

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ

قد قالها الناس ثم كفر اكثرهم فمن مات عليها فهو ممن استقام

"বহু মানুষ আল্লাহকে তাদের রব বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই আবার কাফের হয়ে গিয়েছে। দৃঢ় পদ সেই ব্যক্তি যে মৃত্যু পর্যন্ত এই আকীদা আঁকড়ে ধরে রয়েছে।" (ইবনে জারির, নাসায়ী, ইবনে আবী হাতেম)

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে ঃ

لم يشركوا بالله شيئا لم يلتفتوا الى اله غيره

"এরপর আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করেনি, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্যের প্রতি আকৃষ্টও হয়নি।" (ইবনে জারির)

একবার হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মিম্বরে উঠে এ আয়াত পাঠ করে বললেন ঃ "আল্লাহর শপথ, নিজ আকীদায় দৃঢ় ও স্থির তারাই যারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শিয়ালের মত এদিক থেকে সেদিকে এবং সেদিক থেকে এদিকে ছুটে বেড়ায়নি।" (ইবনে জারির)।

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ"নিজের আমলকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে।" (কাশ্‌শাফ)

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ "আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধিবদ্ধ করা ফরয সমূহ আনুগত্যের সাথে আদায় করেছে।" (কাশশাফ)

৩৪. উপলব্ধি করা যায় এমন অবস্থায় ফেরেশতারা নাযিল হবে এবং ঈমানদারগণ চর্মচোখে তাদের দেখবে কিংবা তাদের আওয়াজ কানে শুনতে পাবে এটা জরুরী নয়। যদিও মহান আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা ফেরেশতাকে প্রকাশ্যে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সাধারণত ঈমানদারদের কাছে বিশেষত যখন তারা ন্যায় ও সত্যের দুশমনদের হাতে নাজেহাল হতে থাকে সেই সময় তাদের অবতরণ অমনুভূত পন্থায় হয় এবং তাদের কথা কানের পর্দায় প্রতিধ্বনিত হওয়ার পরিবর্তে হৃদয়ের গভীরে প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি হয়ে প্রবেশ করে। কোন কোন তাফসীরকার ফেরেশতাদের এই আগমনকে মৃত্যুর সময় কিংবা কবরে অথবা হাশরের ময়দানের জন্য নির্দিষ্ট বলে মনে করেছেন। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে সে সম্পর্কে যদি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা যায় তাহলে এই পার্থিব জীবনে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে সমুন্নত করার জন্য যারা জীবনপাত করছে তাদের কাছে ফেরেশতাদের অবতরণের কথা বর্ণনা করাই যে এখানে মূল উদ্দেশ্য সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে না। যাতে তারা প্রশান্তি লাভ করতে পারে, মনোবল ফিরে পায় এবং এই অনুভূতিতে তাদের হৃদয়-মন পরিতৃপ্ত হয় যে, তারা সহযোগী ও বন্ধুহীন নয়, বরং আল্লাহর ফেরেশতারা তাদের সাথে আছে। যদিও মৃত্যুর সময়ও ফেরেশতারা ঈমানদারদের স্বাগত জানাতে আসে, কবরে (আলমে বরযখ)ও তারা তাদের স্বাগত জানায় এবং যেদিন কিয়ামত হবে সেদিনও হাশরের শুরু থেকে জান্নাতে পৌঁছা পর্যন্ত সব সময় তারা তাদের সাথে থাকবে। তবে তাদের এই সাহচর্য সেই জগতের জন্য নির্দিষ্ট নয়, এ পৃথিবীতেও চলছে। কথার ধারাবাহিকতা বলছে হক ও বাতিলের সংঘাতে বাতিলের অনুসারীদের সাথে যেমন শয়তান ও অপরাধীরা থাকে তেমনি ঈমানদারদের সাথে ফেরেশতারাও

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِي
مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ
حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ
عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

৫ রুকূ'

সেই ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হবে যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, সৎ কাজ করলো এবং ঘোষণা করলো আমি মুসলমান।[৩৬]

হে নবী, সৎ কাজ ও অসৎ কাজ সমান নয়। তুমি অসৎ কাজকে সেই নেকী দ্বারা নিবৃত্ত করো যা সবচেয়ে ভাল। তাহলে দেখবে যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গিয়েছে।[৩৭] *ধৈর্যশীল ছাড়া এ গুণ আর কারো ভাগ্যে জোটে না।*[৩৮] *এবং অতি ভাগ্যবান ছাড়া এ মর্যাদা আর কেউ লাভ করতে পারে না।*[৩৯] *যদি তোমরা শয়তানের পক্ষ থেকে কোন প্ররোচনা আঁচ করতে পার তাহলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো*[৪০] *তিনি সব কিছু শোনেন এবং জানেন।*[৪১]

থাকে। এক দিকে বাতিলপন্থীদের কৃতকর্মসমূহকে তাদের সংগী সাথীরা সুদৃশ্য করে দেখায় এবং তাদেরকে এ মর্মে নিশ্চয়তা দেয় যে, হককে হেয় করার জন্য তোমরা যে জুলুম-অত্যাচার ও বে-ঈমানী করছো সেটিই তোমাদের সফলতার উপায় এবং এভাবে পৃথিবীতে তোমাদের নেতৃত্ব নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবে। অপরদিকে হকপন্থীদের কাছে আল্লাহর ফেরেশতারা এসে সেই সুখবরটি পেশ করে যা পরবর্তী আয়াতাংশে বলা হচ্ছে।

৩৫. এটা একটা ব্যাপক অর্থবোধক কথা যা দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত ঈমানদারদের জন্য প্রশান্তির একটি নতুন বিষয় বহন করে। পৃথিবীতে ফেরেশতাদের এই উপদেশের অর্থ হচ্ছে, বাতিল শক্তি যতই পরাক্রমশালী ও স্বৈরাচারী হোক না কেন তাদের দেখে কখনো ভীত হয়ো না এবং হকের অনুসারী হওয়ার কারণে যত দুঃখ-কষ্ট ও বঞ্চনাই সইতে হোক সে জন্য দুঃখ করবে না। কেননা, ভবিষ্যতে তোমাদের জন্য এমন কিছু আছে যার কাছে দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামত তুচ্ছ। মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা যখন এই কথাগুলো বলে তখন তার অর্থ দাঁড়ায়, তুমি সামনে যে গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর

হচ্ছো সেখানে তোমার জন্য ভয়ের কোন কারণ নেই। কারণ, সেখানে জান্নাত তোমার জন্য অপেক্ষমান। আর দুনিয়াতে তুমি যা কিছু ছেড়ে যাচ্ছো সে জন্য তোমার দুঃখ ভারাক্রান্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই কেননা, এখানে আমি তোমাদের অভিভাবক ও বন্ধু। আলমে বরযখ ও হাশরের ময়দানে যখন ফেরেশতারা এ কথাগুলো বলবে তখন তার অর্থ হবে, এখানে তোমাদের জন্য কেবল শান্তি আর শান্তি। পার্থিব জীবনে তোমরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছো। সে জন্য দুঃখ করো না এবং আখেরাতে যা কিছু সামনে আসবে সে জন্য ভয় করবে না। কারণ, আমরা তোমাদেরকে সেই জান্নাতের সুসংবাদ জানাচ্ছি যার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসা হচ্ছে।

৩৬. মু'মিনদের সান্ত্বনা দেয়া এবং মনোবল সৃষ্টির পর এখন তাদেরকে তাদের আসল কাজের প্রতি উৎসাহিত করা হচ্ছে। আগের আয়াতে তাদের বলা হয়েছিলো, আল্লাহর বন্দেগীর ওপর দৃঢ়পদ হওয়া এবং এই পথ গ্রহণ করার পর পুনরায় তা থেকে বিচ্যুত না হওয়াটাই এমন একটা মৌলিক নেকী যা মানুষকে ফেরেশতার বন্ধু এবং জান্নাতের উপযুক্ত বানায়। এখন তাদের বলা হচ্ছে, এর পরবর্তী স্তর হচ্ছে, তোমরা নিজে নেক কাজ করো, অন্যদেরকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে ডাকো এবং ইসলামের ঘোষণা দেয়াই যেখানে নিজের জন্য বিপদাপদ ও দুঃখ-মুসিবতকে আহবান জানানোর শামিল এমন কঠিন পরিবেশেও দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করো। আমি মুসলমান। মানুষের জন্য এর চেয়ে উচ্চস্তর আর নেই। এ কথার গুরুত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করার জন্য যে পরিস্থিতিতে তা বলা হয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সে সময় অবস্থা ছিল এই যে, যে ব্যক্তিই মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করতো সে হঠাৎ করেই অনুভব করতো যেন হিংস্র শ্বাপদ ভরা জংগলে পা দিয়েছে যেখানে সবাই তাকে ছিঁড়ে ফেড়ে খাওয়ার জন্য ছুটে আসছে। যে ব্যক্তি আরো একটু অগ্রসর হয়ে ইসলাম প্রচারের জন্য মুখ খুলেছে সে যেন তাকে ছিঁড়ে ফেড়ে খাওয়ার জন্য হিংস্র পশুকুলকে আহবান জানিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তির আল্লাহকে রব হিসেবে স্বীকার করে সোজা পথ গ্রহণ করা এবং তা থেকে বিচ্যুত না হওয়া নিসন্দেহে বড় ও মৌলিক কাজ।

কিন্তু আমি মুসলমান বলে কোন ব্যক্তির ঘোষণা করা, পরিণামের পরোয়া না করে সৃষ্টিকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে আহবান জানানো এবং কেউ যাতে ইসলাম ও তার ঝাণ্ডাবাহীদের দোষারোপ ও নিন্দাবাদ করার সুযোগ না পায় এ কাজ করতে গিয়ে নিজের তৎপরতাকে সেভাবে পবিত্র রাখা হচ্ছে পূর্ণ মাত্রার নেকী।

৩৭. এ কথার অর্থও পুরোপুরি বুঝার জন্য যে অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও তাঁর মাধ্যমে তাঁর অনুসারীদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তা বিবেচনা থাকা দরকার। তখন অবস্থা ছিল এই যে, চরম হঠকারিতার এবং আক্রমণাত্মক বিরোধিতার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের মোকাবিলা করা হচ্ছিলো যেখানে নৈতিকতা, মানবতা এবং ভদ্রতার সমস্ত সীমা লংঘন করা হয়েছিলো। নবী (সা) ও তাঁর সংগী সাথীদের বিরুদ্ধে সব রকমের মিথ্যা আরোপ করা হচ্ছিলো। তাঁকে বদনাম করা এবং তাঁর সম্পর্কে লোকের মনে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য সব রকমের দুষ্টবুদ্ধি ও কূটকৌশল কাজে লাগানো হচ্ছিলো। তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকমের অপবাদ আরোপ করা হচ্ছিলো এবং শত্রুতামূলক প্রচারনার জন্য পুরো একদল লোক তাঁর বিরুদ্ধে মানুষের মনে

সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে যাচ্ছিলো। তাঁকে তাঁর সংগীদেরকে সর্ব প্রকার কষ্ট দেয়া হচ্ছিলো। তাতে অতিষ্ঠ হয়ে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তাছাড়া তাঁর ইসলাম প্রচারের ধারাকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য পরিকল্পনা মাফিক হৈ চৈ ও হট্টগোলকারী একদল লোককে সব সময় ওঁত পেতে থাকার জন্য তৈরী করা হয়েছিলো। যখনই তিনি ন্যায় ও সত্যের দাওয়াত দেয়ার জন্য কথা বলতে শুরু করবেন তখনই তারা শোরগোল করবে এবং কেউ তাঁর কথা শুনতে পাবে না। এটা এমনই একটা নিরুৎসাহব্যঞ্জক পরিস্থিতি ছিল যে, বাহ্যিকভাবে আন্দোলনের সকল পথ রুদ্ধ বলে মনে হচ্ছিলো। বিরোধিতা নস্যাত করার জন্য সেই সময় নবীকে (সা) এসব পন্থা বলে দেয়া হয়েছিল।

প্রথম কথা বলা হয়েছে, সৎকর্ম ও দুষ্কর্ম সমান নয়। অর্থাৎ তোমাদের বিরোধীরা যত ভয়ানক তুফানই সৃষ্টি করুক না কেন এবং তার মোকাবিলায় নেকীকে যত অক্ষম ও অসহায়ই মনে হোক না কেন দুষ্কর্মের নিজের মধ্যেই এমন দুর্বলতা আছে যা শেষ পর্যন্ত তাকে ব্যর্থ করে দেয়। কারণ, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত তার স্বভাব প্রকৃতি দুষ্কর্মকে ঘৃণা না করে পারে না। দুষ্কর্মের সহযোগীই শুধু নয় তার ধ্বজাধারী পর্যন্ত মনে মনে জানে যে, সে মিথ্যাবাদী ও অত্যাচারী এবং সে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হঠকারিতা করছে। এ জিনিসটি অন্যদের মনে তার প্রতি সম্মানবোধ সৃষ্টি করা তো দূরের কথা নিজের কাছেই তাকে খাটো করে দেয়। এভাবে তার নিজের মনের মধ্যেই এক চোর জন্ম নেয়। শত্রুতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের সময় এই চোর ভেতর থেকেই তার সংকল্প ও মনোবলের ওপর সংগোপনে হানা দিতে থাকে। এই দুষ্কর্মের মোকাবিলায় যে সৎ কর্মকে সম্পূর্ণ অক্ষম ও অসহায় বলে মনে হয় তা যদি ক্রমাগত তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত সে-ই বিজয়ী হয়। কারণ, প্রথমত সৎ কর্ম নিজেই একটি শক্তি যা হৃদয়-মনকে জয় করে এবং ব্যক্তি যতই শত্রুতাভাবাপন্ন হোক না কেন সে নিজের মনে তার জন্য সম্মানবোধ না করে পারে না। তাছাড়া নেকী ও দুষ্কর্ম যখন সামনা সামনি সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং উভয়ের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট পুরোপুরি উন্মোচিত হয় এমন পরিস্থিতিতে কিছুকাল সংঘাতে লিপ্ত থাকার পর এমন খুব কম লোকই থাকতে পারে যারা দুষ্কর্মের প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে না এবং সৎ কর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবে না।

দ্বিতীয় কথাটি বলা হয়েছে এই যে, দুষ্কর্মের মোকাবিলা শুধুমাত্র সৎ কর্ম দিয়ে নয়, অনেক উচ্চমানের সৎকর্ম দিয়ে করো। অর্থাৎ কেউ যদি তোমাদের সাথে খারাপ আচরণ করে আর তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও তাহলে শুধু সৎকর্ম। উন্নত পর্যায়ের সৎকর্ম হচ্ছে, যে তোমার সাথে খারাপ আচরণ করবে সুযোগ পেলে তুমি তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করো।

এর সুফল বলা হয়েছে এই যে, জঘন্যতম শত্রুও এভাবে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে। কারণ, এটিই মানুষের প্রকৃতি। আপনি যদি গালির জবাব না দিয়ে চুপ থাকেন তাহলে নিসন্দেহে তা হবে একটি নেকী বা সৎকর্ম। অবশ্য তা গালিদাতার মুখ বন্ধ করতে পারবে না। কিন্তু গালির জবাবে আপনি যদি তার কল্যাণ কামনা করেন তাহলে চরম নির্লজ্জ শত্রুও লজ্জিত হবে এবং আর কখনো আপনার বিরুদ্ধে অশালীন কথা বলার জন্য মুখ খোলা তার জন্য কঠিন হবে। একজন লোক আপনার ক্ষতি করার কোন সুযোগই হাত ছাড়া হতে দেয় না। আপনি যদি তার অত্যাচার বরদাশত করে যেতে থাকেন তাহলে সে

হয়তো তার দুষ্কর্মের ব্যাপারে আরো সাহসী হয়ে উঠবে। কিন্তু কোন পরিস্থিতিতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তখন যদি আপনি তাকে রক্ষা করেন তাহলে আপনার একান্ত অনুগত হয়ে যাবে। কারণ, ঐ সুকৃতির মোকাবিলায় কোন দুষ্কৃতিই টিকে থাকতে পারে না। তা সত্ত্বেও এই সাধারণ নিয়মকে এ অর্থে গ্রহণ করা ঠিক নয় যে, উন্নত পর্যায়ের সৎকর্মের মাধ্যমে সব রকমের শত্রুর অনিবার্যরূপে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে। পৃথিবীতে এমন জঘন্য মনের মানুষও আছে যে, তার অত্যাচার ক্ষমা করা ও দুষ্কৃতির জবাব অনুকম্পা ও সুকৃতির মাধ্যমে দেয়ার ব্যাপারে আপনি যতই তৎপর হোন না কেন তার বিচ্ছুর ন্যায় বিষাক্ত হুলের দংশনে কখনো ভাটা পড়বে না। তবে এ ধরনের মূর্তিমান খারাপ মানুষ প্রায় ততটাই বিরল যতটা বিরল মূর্তিমান ভাল মানুষ।

৩৮. অর্থাৎ এটা অত্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থা হলেও তা কাজে লাগানো কোন ছেলেখেলা নয়। এ জন্য দরকার সাহসী লোকের। এ জন্য দরকার দৃঢ় সংকল্প, সাহস, অপরিসীম সহনশীলতা এবং চরম আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। সাময়িকভাবে কেউ কোন দুষ্কর্মের মোকাবিলায় সৎকর্ম করতে পারে। এটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে এমন সব বাতিলপন্থী দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ন্যায় ও সত্যের জন্য লড়াই করতে হয় যারা নৈতিকতার যে কোন সীমালংঘন করতে দ্বিধা করে না এবং শক্তি ও ক্ষমতার নেশায় চূর হয়ে আছে সেখানে দুষ্কর্মের মোকাবিলা সৎকর্ম দিয়ে করে যাওয়া তাও আবার উচ্চ মাত্রার সৎকর্ম দিয়ে এবং একবারও নিয়ন্ত্রণের বাগডোর হাত ছাড়া হতে না দেয়া কোন সাধারণ মানুষের কাজ নয়। কেবল সেই ব্যক্তিই এ কাজ করতে পারে যে বুঝে শুনে ন্যায় ও সত্যকে সমুন্নত করার জন্য কাজ করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছে, যে তার প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান–বুদ্ধি ও বিচার শক্তির অনুগত করে নিয়েছে এবং যার মধ্যে নেকী ও সততা এমন গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে যে, বিরোধীদের কোন অপকর্ম ও নোংরামি তাকে তার উচ্চাসন থেকে নীচে নামিয়ে আনতে সফল হতে পারেনা।

৩৯. এটা প্রকৃতির বিধান। অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার মানুষই কেবল এসব গুণাবলীর অধিকারী হয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি এসব গুণাবলীর অধিকারী হয় দুনিয়ার কোন শক্তিই তাকে সাফল্যের মনযিলে মকসুদে পৌঁছা থেকে বিরত রাখতে পারে না। নীচ প্রকৃতির মানুষ তাদের হীন চক্রান্ত, জঘন্য কৌশল এবং কুৎসিত আচরণ দ্বারা তাকে পরাস্ত করবে তা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

৪০. শয়তান যখন দেখে হক ও বাতিলের লড়াইয়ে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার দ্বারা হীনতার এবং সুকৃতি দ্বারা দুষ্কৃতির মোকাবিলা করা হচ্ছে তখন সে চরম অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যায়! সে চায় কোনভাবে একবারের জন্য হলেও হকের জন্য সংগ্রামকারী বিশেষ করে তাদের বিশিষ্ট লোকজন ও নেতৃবৃন্দের দ্বারা এমন কোন ত্রুটি সংঘটিত করিয়ে দেয়া যাতে সাধারণ মানুষকে বলা যায়, দেখুন খারাপ কাজ এক তরফা হচ্ছে না। এক পক্ষ থেকে নীচ ও জঘন্য কাজ করা হচ্ছে বটে, কিন্তু অপর পক্ষের লোকেরাও খুব একটা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ নয়, তারাও তো অমুক হীন আচরণ করেছে। এক পক্ষের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি এবং অপর পক্ষের জবাবী তৎপরতার মধ্যে ইনসাফের সাথে তুলনা মূলক বিচারের যোগ্যতা সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকে না। যতক্ষণ তারা দেখে বিরোধীরা সব

রকমের জঘন্য আচরণ করছে কিন্তু এই লোকগুলো ভদ্রতা ও শিষ্টাচার এবং মর্যাদা নেকী ও সত্যবাদিতার পথ থেকে বিন্দুমাত্রও দূরে সরে যাচ্ছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ওপর তার গভীর প্রভাব পড়তে থাকে। কিন্তু যদি কোথাও তাদের পক্ষ থেকে কোন অযৌক্তিক বা তাদের মর্যাদার পরিপন্থী আচরণ হয়ে যায়, তা কোন বড় জুলুমের প্রতিবাদে হলেও তাদের দৃষ্টিতে তারা উভয়েই সমান হয়ে যায় এবং বিরোধীরাও একটি শক্ত কথার জবাব হঠকারিতার সাহায্যে দেয়ার অজুহাত পেয়ে যায়। এ কারণে বলা হয়েছে, শয়তানের প্রতারণার ব্যাপারে সাবধান থাকো। সে অত্যন্ত দরদী ও মঙ্গলকামী সেজে এই বলে তোমাদেরকে উত্তেজিত করবে যে, অমুক অত্যাচার কখনো বরদাশত করা উচিত নয়, অমুক কথার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া উচিত এবং এই আক্রমণের জবাবে লড়াই করা উচিত। তা না হলে তোমাদেরকে কাপুরুষ মনে করা হবে এবং তোমাদের আদৌ কোন প্রভাব থাকবে না। এ ধরনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমরা যখন নিজেদের মধ্যে কোন অযথা উত্তেজনা অনুভব করবে তখন সাবধান হয়ে যাও। কারণ, তা শয়তানের প্ররোচনা। সে তোমাদের উত্তেজিত করে কোন ভুল সংঘটিত করাতে চায়। সাবধান হয়ে যাওয়ার পর মনে করো না, আমি আমার মেজাজকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখছি, শয়তান আমাকে দিয়ে কোন ত্রুটি করাতে পারবে না। নিজের এই ইচ্ছা শক্তির বিভ্রম হবে শয়তানের আরেকটি বেশী ভয়ংকর হাতিয়ার। এর চেয়ে বরং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। কারণ তিনি যদি তাওফীক দান করেন ও রক্ষা করেন তবেই মানুষ ভুল-ত্রুটি থেকে রক্ষা পেতে পারে।

ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে যে ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন সেটি এ বিষয়ের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে একবার এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অকথ্য গালিগালাজ করতে থাকলো। হযরত আবু বকর চুপচাপ তার গালি শুনতে থাকলেন আর তাঁর দিকে চেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসতে থাকলেন। অবশেষে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন এবং জবাবে তিনিও তাকে একটি কঠোর কথা বলে ফেললেন। তার মুখ থেকে সে কথাটি বের হওয়া মাত্র নবীর (সা) ওপর চরম বিরক্তি ভাব ছেয়ে গেল এবং ক্রমে তা তাঁর পবিত্র চেহারায় ফুটে উঠতে থাকলো। তিনি তখনই উঠে চলে গেলেন। হযরত আবু বকরও উঠে তাঁকে অনুসরণ করলেন এবং পথিমধ্যেই জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? সে যখন আমাকে গালি দিচ্ছিলো তখন আপনি চুপচাপ মুচকি হাসছিলেন। কিন্তু যখনই আমি তাকে জবাব দিলাম তখনই আপনি অসন্তুষ্ট হলেন? নবী (সা) বললেন ঃ তুমি যতক্ষণ চুপচাপ ছিলে ততক্ষণ একজন ফেরেশতা তোমার সাথে ছিল এবং তোমার পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছিলো। কিন্তু যখন তুমি নিজেই জবাব দিলে তখন ফেরেশতার স্থানটি শয়তান দখল করে নিল। আমি তো শয়তানের সাথে বসতে পারি না।

৪১. বিরোধিতার তুফানের মুখে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার পর যে জিনিসটি মু'মিনের হৃদয়ে ধৈর্য, প্রশান্তি ও তৃপ্তির গভীর শীতলতা সৃষ্টি করে তা এই বিশ্বাস যে আল্লাহ বিষয়টি সম্পর্কে অনবহিত নন। আমরা যা করছি তাও তিনি জানেন এবং আমাদের সাথে যা করা হচ্ছে তাও তিনি জানেন। আমাদের ও আমাদের বিরোধীদের সব কথাই তিনি শুনছেন এবং উভয়ের কর্মনীতি যা কিছুই হোক না কেন তা তিনি দেখছেন। এই

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ؕ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ
وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿٣٧﴾
فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَاۤ
اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ؕ اِنَّ الَّذِىْۤ اَحْيَاهَا لَمُحْىِ
الْمَوْتٰى ؕ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٩﴾

এই[৪২] রাত ও দিন এবং চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।[৪৩] সূর্য ও চাঁদকে সিজদা করো না, সেই আল্লাহকে সিজদা করো যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, যদি সত্যিই তোমরা তাঁর ইবাদতকারী হও।[৪৪] কিন্তু যদি অহংকার করে এসব লোকেরা নিজেদের কথায় গোঁ ধরে থাকে।[৪৫] তবে পরোয়া নেই। যেসব ফেরেশতা তোমার রবের সান্নিধ্য লাভ করেছে তারা রাত দিন তাঁর তাসবীহ বর্ণনা করছে এবং কখনো ক্লান্ত হয় না।[৪৬]

আর এটিও আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি যে তোমরা দেখতে পাও ভূমি শুষ্ক শস্যহীন পড়ে আছে। অতপর আমি যেই মাত্র সেখানে পানি বর্ষণ করি অকস্মাত তা অঙ্কুরোদগমে সুসজ্জিত হয়ে ওঠে। যে আল্লাহ এই মৃত ভূমিকে জীবন্ত করে তোলেন, নিশ্চিতভাবেই তিনি মৃতদেরকেও জীবন দান করবেন।[৪৭] নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু করতে সক্ষম।

আস্থার কারণেই মু'মিন বান্দা নিজের এবং ন্যায় ও সত্যের দুশমনের ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হয়ে যান।

কুরআন মজীদের এই পঞ্চম বার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও তাঁর মাধ্যমে ঈমানদারদেরকে দীনে ইসলামের দাওয়াত এবং সমাজ সংস্কারের এ কৌশল শেখানো হয়েছে। এর পূর্বে আরো চারবার চারটি স্থানে এ কৌশল শেখানো হয়েছে। সে সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আ'রাফ, ১১০ থেকে ১১৪ আয়াত, টীকাসহ; সূরা আন নাহল, আয়াত ১২৫ থেকে ১২৭ টীকাসহ; সূরা আল মু'মিনুন, আয়াত ৯৬ টীকাসহ; সূরা আন্‌কাবুত, আয়াত ৪৬ টীকাসহ।

৪২. এখানে জনসাধারণকে উদ্দেশ করে বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে এবং তাদেরকে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করানোর জন্য কয়েকটি কথা বলা হচ্ছে।

৪৩. অর্থাৎ এসব আল্লাহর প্রতিভূ নয় যে, এগুলোর আকৃতিতে আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করছেন বলে মনে করে তাদের ইবাদত করতে শুরু করবে। বরং এগুলো আল্লাহর নিদর্শন এসব নিদর্শন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে তোমরা বিশ্ব জাহান ও তার ব্যবস্থাপনার সত্যতা ও বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারবে এবং এ কথাও জানতে পারবে যে নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালাম আল্লাহ সম্পর্কে যে তাওহীদের শিক্ষা দিচ্ছেন তাই প্রকৃত সত্য। সূর্য ও চাঁদের উল্লেখের পূর্বে দিন ও রাতের উল্লেখ করা হয়েছে এ বিষয়ে সাবধান করে দেয়ার জন্য যে রাতের বেলা সূর্যের অদৃশ্য হওয়া ও চাঁদের আবির্ভূত হওয়া এবং দিনের বেলা চাঁদের অদৃশ্য হওয়া ও সূর্যের আবির্ভূত হওয়া সুস্পষ্ট ভাবে এ কথা প্রমাণ করে যে, এ দু'টির কোনটিই আল্লাহ বা আল্লাহ প্রতিভূ নয়। উভয়েই তাঁর একান্ত দাস। তারা আল্লাহর আইনের নিগড়ে বাঁধা পড়ে আবর্তন করছে।

৪৪. শিরককে যুক্তিসংগত প্রমাণ করার জন্য কিছুটা অধিক মেধাবী শ্রেণীর মুশরিকরা সাধারণত যে দর্শনের বুলি কপচিয়ে থাকে এটা তারই জবাব। তারা বলে, আমরা এসব জিনিসকে সিজদা করি না। বরং এদের মাধ্যমে আল্লাহকেই সিজদা করি। এর জবাব দেয়া হয়েছে, তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহর ইবাদতকারী হয়ে থাকো তাহলে এসব মাধ্যমের প্রয়োজন কি? সরাসরি তাঁকেই সিজদা করো না কেন?

৪৫. "অহংকার করে" অর্থ যে অজ্ঞতার মধ্যে এরা ডুবে আছে যদি তোমাদের কথা মেনে নেয়াকে নিজেদের অপমান মনে করে সেই অজ্ঞতাকেই আঁকড়ে ধরে থাকে।

৪৬. অর্থাৎ এসব ফেরেশতার মাধ্যমে গোটা বিশ্ব জাহানের যে ব্যবস্থাপনা চলছে তা আল্লাহর একত্ব ও দাসত্বের অধীনেই চলছে এবং এই ব্যবস্থার ব্যবস্থাপক ফেরেশতারা প্রতি মুহূর্তে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তাদের রবের সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও দাসত্বে অন্য কারো শরীক হওয়া থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র। তবে বুঝানো সত্ত্বেও যদি কতিপয় আহাম্মক না মানে এবং গোটা বিশ্ব জাহান যে পথে চলছে সে পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শিরকের পথে চলতেই গোঁ ধরে থাকে তাহলে তাদেরকে তাদের নির্বুদ্ধিতার পথেই হাবুডুবু খেতে দাও।

এ স্থানটিতে সিজদা করতে হবে এ বিষয়ে সবাই একমত। তবে উপরোক্ত দুটি আয়াতের কোনটিতে সিজদা করতে হবে সে বিষয়ে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে। হযরত আলী ও হযরত আবদুল্লাহ বিনে মাসউদ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ পর্যন্ত পাঠ করে সিজদা করতেন। ইমাম মালেক এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। এর সমর্থনে ইমাম শাফেয়ীর একটি মতও উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, মাসরূক, কাতাদা, হাসান বাসারী, আবু আবদুর রহমান আস-সুলামী, ইবনে সিরীন, ইবরাহীম নাখায়ী এবং আরো কতিপয় শিক্ষক وَهُمْ لَا يَسْئَمُونَ এর কাছে সিজদা করার পক্ষপাতী। এটি ইমাম আবু হানিফারও মত। তাছাড়া শাফেয়ীদের দৃষ্টিতেও এটিই অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত।

৪৭. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নাহল, আয়াত ৬৫ টীকাসহ; সূরা হজ্জ, আয়াত ৫ ও ৭ টীকাসহ; সূরা আর রূম, আয়াত ১৯ ও ২০ টীকাসহ; সূরা ফাতের, টীকা ১৯।

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ
فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۖ
إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۚ
وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ
خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ
لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾

যারা[৪৮] আমার আয়াতসমূহের উল্টা অর্থ করে[৪৯] তারা আমার অগোচরে নয়।[৫০] নিজেই চিন্তা করে দেখো যে ব্যক্তিকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে সেই ব্যক্তিই ভাল না যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন নিরাপদ অবস্থায় হাজির হবে সেই ভালো? তোমরা যা চাও করতে থাকো, আল্লাহ তোমাদের সব কাজ দেখছেন। এরা সেই সব লোক যাদের কাছে উপদেশ বাণী আসলে মানতে অস্বীকার করেছে। কিন্তু বাস্তব এই যে, এটি একটি মহা শক্তিশালী গ্রন্থ।[৫১] বাতিল না পারে সামনে থেকে এর ওপর চড়াও হতে না পারে পেছন থেকে।[৫২] এটা মহাজ্ঞানী ও পরম প্রশংসিত সত্তার নাযিলকৃত জিনিস।

হে নবী, তোমাকে যা বলা হচ্ছে তার মধ্যে কোন জিনিসই এমন নেই যা তোমার পূর্ববর্তী রসূলদের বলা হয়নি। নিসন্দেহে তোমার রব বড় ক্ষমাশীল[৫৩] এবং অতীব কষ্টদায়ক শাস্তিদাতাও বটে।

৪৮. যে তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসের দিকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম আহবান জানাচ্ছেন সেটি যুক্তিসংগত এবং বিশ্ব জাহানের নিদর্শনাবলী তারই সত্যতা প্রতিপাদন করছে, কয়েকটি বাক্যে জনসাধারণকে একথা বুঝানোর পর পুনরায় বক্তব্যের মোড় সেই সব বিরোধীদের দিকে ফিরছে যারা হঠকারিতার মাধ্যমে বিরোধিতা করার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়েছিলো।

৪৯. মূল আয়াতে ব্যবহৃত বাক্যাংশ হচ্ছে يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا (আমার আয়াতসমূহে ইলহাদ করে) 'ইলহাদ' অর্থ ফিরে যাওয়া, সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথের দিকে যাওয়া, বক্রতা অবলম্বন করা। আল্লাহর আয়াত সমূহে ইলহাদের অর্থ হচ্ছে কোন ব্যক্তি কর্তৃক সোজা কথার বাঁকা অর্থ করার চেষ্টা করা। আল্লাহর আয়াতসমূহের শুদ্ধ ও সঠিক অর্থ গ্রহণ না করে সব রকম মিথ্যা ও ভুল অর্থ করে নিজেও পথভ্রষ্ট হওয়া এবং অন্যদেরকেও

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ؕ ءَاَعْجَمِيٌّ
وَّعَرَبِيٌّ ؕ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ؕ وَالَّذِيْنَ
لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ؕ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ
مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٤٤﴾

আমি যদি একে আজমী কুরআন বানিয়ে পাঠাতাম তাহলে এসব লোক বলতো, এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়নি কেন? কি আশ্চর্য কথা, আজমী বাণীর শ্রোতা আরবী ভাষাভাষী[৫৪] এদের বলো, এ কুরআন মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রোগমুক্তি বটে। কিন্তু যারা ঈমান আনে না এটা তাদের জন্য পর্দা ও চোখের আবরণ। তাদের অবস্থা হচ্ছে এমন যেন দূর থেকে তাদেরকে ডাকা হচ্ছে।[৫৫]

পথভ্রষ্ট করতে থাকা। মক্কার কাফেররা কুরআন মজীদের দাওয়াত ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য যে চক্রান্ত করছিলো তার মধ্যে ছিল, তারা কুরআনের আয়াত শুনে তারপর কোন আয়াতকে পূর্বাপর প্রসংগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, কোন আয়াতের শাব্দিক বিকৃতি ঘটিয়ে কোন বাক্যাংশ বা শব্দের ভুল বা মিথ্যা অর্থ করে নানা রকমের প্রশ্ন উথাপন করতো এবং এই বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতো যে, আজ নবী সাহেব কি বলেছেন তা শোন।

৫০. এ কথাটির মধ্যে একটি হুমকি প্রচ্ছন্ন আছে। ক্ষমতাবান শাসক যদি বলেন, "অমুক ব্যক্তি যে আচরণ করছে তা আমার কাছে গোপন নয়" তাহলে আপনা থেকেই সে কথার অর্থ দাঁড়ায়, তার বাঁচার কোন উপায় নেই।

৫১. অর্থাৎ অনড় ও অবিচল। বাতিলের পূজারীরা এর বিরুদ্ধে যেসব চক্রান্ত করছে তার দ্বারা একে পরাভূত করা সম্ভব নয়। এর মধ্যে আছে সততার শক্তি, সত্য জ্ঞানের শক্তি, যুক্তি-প্রমাণের শক্তি, প্রেরণকারী আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের শক্তি এবং উপস্থাপনকারী রসূলের ব্যক্তিত্বের শক্তি। কেউ যদি মিথ্যা ও অন্তসারশূন্য প্রচারের হাতিয়ার দিয়ে একে ব্যর্থ করে দিতে চায় তাহলে কি তা সম্ভব?

৫২. সামনের দিক থেকে না আসতে পারার অর্থ হচ্ছে কেউ যদি কুরআনের ওপর সরাসরি আক্রমণ করে তার কোন কথা ভুল এবং কোন শিক্ষা বাতিল ও বিকৃত প্রমাণ করতে চায় তাহলে এ ক্ষেত্রে সে সফলকাম হতে পারে না। পেছন দিক থেকে না আসতে পারার অর্থ হচ্ছে কখনো এমন কোন বাস্তব ও সত্য দেখা দিতে পারে না যা কুরআনের পেশকৃত সত্যতা ও বাস্তবতার পরিপন্থী, এমন কোন জ্ঞান-বিজ্ঞান উদ্ভাবিত হতে পারে না যা প্রকৃতই জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং কুরআনের বর্ণিত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে।

এমন কোন অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ থাকতে পারে না যা আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা, আইন-কানুন, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, জীবন প্রণালী ও সামাজিকতা এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে কুরআন মানুষকে যে দিক নির্দেশনা দিয়েছে তা ভ্রান্ত প্রমাণ করবে। যে জিনিসকে এ গ্রন্থ ন্যায় ও সত্য বলে ঘোষণা করেছে তা কখনো বাতিল প্রামাণিত হতে পারে না। এর এ অর্থও হতে পারে যে বাতিল সম্মুখ দিক থেকে এসে হামলা করুক বা প্রতারণামূলক পথে এসে অকস্মাত হামলা করুক কুরআন যে দাওয়াত পেশ করছে তাকে সে কোন ভাবেই পরাজিত করতে পারবে না। সমস্ত বিরোধিতা এবং বিরোধীদের সব রকম গোপন ও প্রকাশ্য চক্রান্ত সত্ত্বেও এ আন্দোলন প্রসার লাভ করবে এবং কেউ একে ব্যর্থ করতে পারবে না।

৫৩. অর্থাৎ তাঁর রসূলদের প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, গালি দেয়া হয়েছে, কষ্ট দেয়া হয়েছে তা সত্ত্বেও তিনি বছরের পর বছর তাদেরকে অবকাশ দিয়েছেন। এটা তাঁর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা এবং ক্ষমা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৫৪. যেসব হঠকারিতার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোকাবিলা করা হচ্ছিলো এটা তার আরেকটি নমুনা। কাফেররা বলতো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব। আরবী তাঁর মাতৃভাষা। তিনি যখন আরবীতে কুরআন পেশ করছেন তখন কি করে বিশ্বাস করা যায়, একথা তিনি নিজে রচনা করেননি, বরং আল্লাহ তাঁর ওপর নাযিল করেছেন। তাঁর একথাকে আল্লাহর নাযিলকৃত বাণী হিসেবে কেবল তখনই মেনে নেয়া যেতো যদি তিনি এমন কোন ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে শুরু করতেন যা জানেন না। যেমন ফারসী, রোমান বা গ্রীক ভাষা। এর জবাবে আল্লাহ বলছেন ঃ এদের নিজের ভাষায় কুরআন পাঠানো হয়েছে যা এরা বুঝতে সক্ষম। কিন্তু এদের আপত্তি হচ্ছে, একজন আরবের মাধ্যমে আরবদের জন্য আরবী ভাষায় এ বাণী নাযিল করা হলো কেন? কিন্তু অন্য কোন ভাষায় যদি নাযিল করা হতো তাহলে তখনও এই সব লোকই আপত্তি তুলে বলতো— আজব ব্যাপার তো! আরব জাতির কাছে একজন আরবকে রসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর কাছে এমন এক ভাষায় বাণী নাযিল করা হয়েছে যা রসূল বা গোটা জাতি কেউই বুঝে না।

৫৫. দূর থেকে যখন কাউকে ডাকা হয় তখন তার কানে একটা আওয়াজ প্রবেশ করে ঠিকই তবে আওয়াজ দাতা কি বলছে তা সে বুঝতে পারে না। এটা এমন একটা নজির বিহীন উপমা যার মাধ্যমে হঠকারী বিরোধীদের পুরো মনস্তাত্ত্বিক চিত্র চোখের সামনে ফুটে ওঠে। বিদ্বেষ বা পক্ষপাত দোষ মুক্ত লোকের সামনে যদি আপনি কথা বলেন, তাহলে সে তা শোনে, বুঝার চেষ্টা করে এবং যুক্তিসংগত কথা হলে খোলা মনে তা গ্রহণ করে। এটাই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে শুধু বিদ্বেষই পোষণ করে না, বরং শত্রুতাও পোষণ করে তাকে আপনি আপনার কথা যতই বুঝাতে চেষ্টা করবেন সে আদৌ সে কথার প্রতি মনোযোগী হবে না। আপনার সব কথা শোনার পরও এত সময় ধরে আপনি তাকে কি বললেন তা সে বুঝবে না। আপনিও মনে করবেন যেন আপনার কথা তার কানের পর্দায় ধাক্কা খেয়ে বাইরে দিয়েই চলে গেছে, মন ও মগজে প্রবেশ করার মত কোন রাস্তাই খুঁজে পায়নি।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۭ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ
رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۭ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿٤٥﴾ مَنْ عَمِلَ
صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَاۗءَ فَعَلَيْهَا ۭ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٤٦﴾

৬ রুকূ'

এর আগে আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। সে কিতাব নিয়েও এই মতানৈক্য হয়েছিলো[৫৬] তোমার রব যদি পূর্বেই একটি বিষয় ফায়সালা না করে থাকতেন তাহলে এই মতানৈক্যকারীদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হতো।[৫৭] প্রকৃত ব্যাপার হলো, এসব লোক সে ব্যাপারে চরম অস্বস্তিকর সন্দেহে নিপতিত।[৫৮]

যে নেক কাজ করবে সে নিজের জন্যই কল্যাণ করবে। আর যে দুষ্কর্ম করবে তার মন্দ পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। তোমার রব বান্দাদের জন্য জালেম নন।[৫৯]

৫৬. অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোক তা মেনেছিলো আর কিছু সংখ্যক লোক তার বিরোধিতা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলো।

৫৭. একথার দুটি অর্থ একটি অর্থ হচ্ছে, চিন্তা–ভাবনা করা ও বুঝার জন্য মানুষকে যথেষ্ট সুযোগ দেয়া হবে আল্লাহ যদি পূর্বেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে থাকতেন তাহলে এ ধরনের বিরোধিতাকারীদের ধ্বংস করে দেয়া হতো। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, সব রকম মতানৈক্যের চূড়ান্ত ফায়সালা আখেরাতে করা হবে আল্লাহ যদি পূর্বেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করতেন তাহলে প্রকৃত সত্যকে এই পৃথিবীতেই উন্মুক্ত করে দেয়া হতো এবং কে ন্যায় ও সত্যের অনুসারী আর কে বাতিলের অনুসারী তাও পরিষ্কার করে দেয়া হতো।

৫৮. এই সংক্ষিপ্ত আয়াতাংশে মক্কার কাফেরদের রোগ পুরাপুরি চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, তারা কুরআন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে সন্দেহে নিপতিত আছে। এই সন্দেহ তাদেরকে চরম অস্থির ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে রেখেছে। অর্থাৎ বাহ্যত তারা অত্যন্ত তোড়জোড়ের সাথেই কুরআনের আল্লাহর বাণী হওয়া এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রসূল হওয়া অস্বীকার করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের এই অস্বীকৃতি কোন নিশ্চিত বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়, বরং এ ব্যাপারে তাদের মনে রয়েছে চরম দোদুল্যমানতা। এক দিকে তাদের ব্যক্তিস্বার্থ, প্রবৃত্তির কামনা–বাসনা এবং অজ্ঞতামূলক বিদ্বেষ কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার এবং পূর্ণ শক্তিতে বিরোধিতা করার দাবী করে। অপরদিকে ভেতর থেকে তাদের মন বলে, এ কুরআন সত্যি সত্যিই এক নজিরবিহীন বাণী। কোন সাহিত্যিক

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا
وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ
شُرَكَائِي ۖ قَالُوا آذَنَّاكَ ۖ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا
يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ﴿٤٨﴾ لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن
دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ﴿٤٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً
مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي ۖ

সেই সময়ের [৬০] জ্ঞান আল্লাহর কাছেই ফিরে যায়[৬১] এবং সেসব ফল সম্পর্কেও তিনিই অবহিত যা সবে মাত্র তার কুঁড়ি থেকে বের হয়। তিনিই জানেন কোন্ মাদি গর্ভধারণ করেছে এবং কে বাচ্চা প্রসব করেছে।[৬২] যে দিন তিনি এসব লোকদের ডেকে বলবেন, "আমার সেই সব শরীকরা কোথায়?" তারা বলবে ঃ আমরা তো বলেছি, আজ আমাদের কেউ-ই এ সাক্ষ্য দিবে না।[৬৩] তখন সেই সব উপাস্যের সবাই এদের সামনে থেকে উধাও হয়ে যাবে যাদের এরা ইতিপূর্বে ডাকতো।[৬৪] এসব লোক বুঝতে পারবে এখন তাদের জন্য কোন আশ্রয় স্থল নেই।

কল্যাণ চেয়ে দোয়া করতে মানুষ কখনো ক্লান্ত হয় না।[৬৫] আর যখন কোন অকল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হতাশ ও মনভাঙা হয়ে যায়। কিন্তু কঠিন সময় কেটে যাওয়ার পর যেই মাত্র আমি তাকে আমার রহমতের স্বাদ চাখাই সে বলতে থাকে, আমি তো এরই উপযুক্ত।[৬৬]

বা কবির নিকট থেকে এ ধরনের বাণী কখনো শোনা যায়নি। না কোন পাগল উম্মাদনার সময় এ ধরনের কথা বলতে পারে। না মানুষকে আল্লাহভীরুতা সৎ কর্ম ও পবিত্রতার শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে কখনো শয়তানদের আগমন ঘটতে পারে। একই ভাবে যখন তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যাবাদী বলে তখন ভেতর থেকে তাদের মন বলে, আল্লাহর বান্দারা, কিছু লজ্জাও তো তোমাদের থাকা উচিত এ ব্যক্তি কি মিথ্যাবাদী হতে পারে? যখন তারা তাঁকে পাগল বলে তখন তাদের বিবেক তাদেরকে ডেকে বলে ওঠে, 'জালেমের দল, তোমরা কি সত্যিই এ ব্যক্তিকে পাগল বলে মনে করো?' যখন তারা তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত সব কিছু ন্যায় ও সত্যের জন্য করছেন না বরং নিজের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব

প্রকাশ করার জন্য করছেন তখন তাদের বিবেক ভেতর থেকে তিরস্কার করে বলে, তোমাদের প্রতি লা'নত, যাঁকে তোমরা কখনো ধন-সম্পদ, ক্ষমতা ও খ্যাতির জন্য প্রচেষ্টা চালাতে দেখনি, যাঁর গোটা জীবন স্বার্থপরতার ক্ষুদ্রতম কালিমা থেকেও মুক্ত, যিনি সর্বদা নেকী ও কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন, কিন্তু কখনো নিজের প্রবৃত্তি ও ব্যক্তি স্বার্থের জন্য কোন অন্যায় কাজ করেননি এমন সৎ ও পবিত্র মানুষকে তোমরা স্বার্থপর বলছো?

৫৯. অর্থাৎ সৎ মানুষের সৎ কর্মকে ধ্বংস করে দিবেন এবং দুষ্কর্মকারীকে তার দুষ্কর্মের শাস্তি দিবেন না, তোমার রব এ ধরনের জুলুম কখনো করতে পারেন না।

৬০. সেই সময় অর্থ কিয়ামত। অর্থাৎ সেই বিশেষ সময় যখন দুষ্কর্মকারীদেরকে তাদের দুষ্কর্মের প্রতিফল দেয়া হবে এবং সৎ কর্মশীল সেই সব মানুষের প্রতি ন্যায় বিচার করা হবে, যাদের বিরুদ্ধে দুষ্কর্ম করা হয়েছিলো।

৬১. অর্থাৎ সে সময়টি কখন আসবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। কাফেররা বলতো, আমাদের ওপর দুষ্কর্মের যে প্রতিক্রিয়া হওয়ার হুমকি দেয়া হচ্ছে তা কখন পূরণ হবে? এখানে এ প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাদের প্রশ্নের উল্লেখ না করেই তার জবাব দিয়েছেন।

৬২. একথা বলে শ্রোতাদেরকে দুটি বিষয় বুঝানো হয়েছে। একটি হচ্ছে, শুধু কিয়ামত নয়, বরং সমস্ত গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। গায়েবী বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী আর কেউ নেই অপরটি হচ্ছে, যে আল্লাহ খুঁটিনাটি বিষয় সমূহের এত বিস্তারিত জ্ঞান রাখেন, কোন ব্যক্তির কাজ কর্ম তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অতএব তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার আওতায় নির্ভয়ে যা ইচ্ছা তাই করা ঠিক নয়। দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে এই বাক্যাংশের সম্পর্ক পরবর্তী বাক্যাংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একথাটির পরেই যা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে যদি চিন্তা করেন তাহলে বক্তব্যের ধারাক্রম থেকে আপনা আপনি একথার ইংগিত পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের তারিখ জানার ধান্ধায় কোথায় পড়ে আছ? বরং চিন্তা করো কিয়ামত যখন আসবে তখন নিজের এসব গোমরাহীর জন্য কি দুর্ভোগ পোহাতে হবে। কিয়ামতের তারিখ সম্পর্কে প্রশ্নকারী এক ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথার মাধ্যমেই জবাব দিয়েছিলেন। সহীহ, সুনান ও মুসনাদ গ্রন্থসমূহে মুতাওয়াতির পর্যায়ভুক্ত একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি দূর থেকে ডাকলো, হে মুহাম্মাদ! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ, কি বলতে চাও, বলো। সে বললো ঃ কিয়ামত কবে হবে? তিনি জবাবে বললেন ঃ ويحك انها كائنة لا محالة فما اعددت لها "হে আল্লাহর বান্দা, কিয়ামত তো আসবেই। তুমি সে জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো?"

৬৩. অর্থাৎ এখন আমাদের কাছে প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হয়েছে। আমরা যা বুঝেছিলাম তা যে একেবারেই ভ্রান্ত ছিল তা আমরা জানতে পেরেছি। এখন আমাদের মধ্যকার এক জনও একথা বিশ্বাস করে না যে, আপনার খোদায়ীতে আদৌ অন্য কোন অংশীদার আছে। "আমরা আগেই বলেছি" কথা থেকে বুঝা যায়, কিয়ামতের দিন প্রতিটি পর্যায়ে

وَمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّىْٓ اِنَّ لِىْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى ۚ
فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٥٠﴾ وَاِذَآ
اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَآءٍ
عَرِيْضٍ ﴿٥١﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَضَلُّ
مِمَّنْ هُوَ فِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿٥٢﴾ سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ
حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ۗ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ
شَىْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٥٣﴾ اَلَآ اِنَّهُمْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ۗ اَلَآ اِنَّهٗ بِكُلِّ
شَىْءٍ مُّحِيْطٌ ﴿٥٤﴾

আমি মনে করি না কিয়ামত কখনো আসবে। তবে সত্যিই যদি আমাকে আমার রবের কাছে নিয়ে হাজির করা হয় তাহলে সেখানেও আমার জন্য থাকবে মজা করার উপকরণসমূহ। অথচ আমি নিশ্চিতরূপেই কাফেরদের জানিয়ে দেব তারা কি কাজ করে এসেছে। আর তাদেরকে আমি অত্যন্ত জঘন্য শাস্তির মজা চাখাবো।

আমি যখন মানুষকে নিয়ামত দান করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং গর্বিত হয়ে ওঠে।[৬৭] কিন্তু যখনই কোন অকল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন লম্বা চওড়া দোয়া করতে শুরু করে।[৬৮]

হে নবী, এদের বলে দাও, তোমরা কি কখনো একথা ভেবে দেখেছো যে, সত্যিই এ কুরআন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থাকে আর তোমরা তা অস্বীকার করতে থাকো তাহলে সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হবে যে এর বিরোধিতায় বহুদূর অগ্রসর হয়েছে।[৬৯]

অচিরেই আমি এদেরকে সর্বত্র আমার নিদর্শনসমূহ দেখাবো এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও। যাতে এদের কাছে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ কুরআন যথার্থ সত্য[৭০] এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার রব প্রতিটি জিনিস দেখছেন?[৭১] জেনে রাখো, এসব লোক তাদের রবের সাথে সাক্ষাত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে।[৭২] শুনে রাখো, তিনি সব জিনিসকে পরিবেষ্টন করে আছেন।[৭৩]

কাফেরদের বার বার জিজ্ঞেস করা হবে, পৃথিবীতে তোমরা আল্লাহর রসূলদের কথা মানতে অস্বীকার করেছিলে। এখন বলো দেখি, তারাই সত্যের অনুসারী ছিলেন না তোমরা? প্রতিটি ক্ষেত্রেই কাফেররা স্বীকার করতে থাকবে যে রসূলগণ যা বলেছিলেন তাই ছিল সত্য। আর সেই জ্ঞানের বিষয় পরিত্যাগ করে অজ্ঞতাকে আঁকড়ে ধরে থেকে আমরা ভুল করেছিলাম।

৬৪. অর্থাৎ তারা নিরাশ হয়ে এই আশায় চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করতে থাকবে যে, সারা জীবন তারা যাদের সেবা করলো হয়তো তাদের মধ্য থেকে কেউ আসবে এবং আল্লাহর আযাব থেকে তাদের উদ্ধার করবে কিংবা অনন্ত শাস্তির মাত্রা কমিয়ে দেবে। কিন্তু কোথাও তারা কোন সাহায্যকারীকে দেখতে পাবে না।

৬৫. কল্যাণ অর্থ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, অঢেল রিযিক, সুস্থতা, সন্তান-সন্ততির কল্যাণ ইত্যাদি। এখানে মানুষ অর্থ প্রতিটি মানুষ নয়। কেননা নবী-রসূল ও নেককার মানুষেরাও মানুষের মধ্যে শামিল, কিন্তু তাঁরা এমনটা নন। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। এখানে মানুষ বলতে নীচমনা ও অদূরদর্শী মানুষকে বুঝানো হয়েছে, যারা কঠিন সময়ে কাকুতি-মিনতি করতে থাকে কিন্তু পার্থিব আরাম আয়েশ ও ভোগের উপকরণ লাভ করা মাত্র আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে। অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই যেহেতু এ দুর্বলতা আছে তাই একে মানব জাতির দুর্বলতা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৬৬. অর্থাৎ এসব কিছুই আমি আমার যোগ্যতা বলে লাভ করেছি এবং এসব পাওয়া আমার অধিকার।

৬৭. অর্থাৎ আমার আনুগত্য ও দাসত্ব পরিত্যাগ করে এবং আমার সামনে মাথা নত করাকে নিজের অপমান মনে করতে থাকে।

৬৮. কুরআন মজীদে এ বিষয় সম্পর্কিত আরো কতিপয় আয়াত আমরা পেয়েছি। বিষয়টি পুরোপুরি বুঝার জন্য নিচে বর্ণিত স্থানসমূহ দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত ১২; সূরা হুদ, আয়াত ৯ ও ১০ টীকাসহ; বানী ইসরাঈল, আয়াত ৮৩; সূরা-রূম, আয়াত ৩৩ থেকে ৩৬ টীকাসহ; আয যুমার, আয়াত ৮, ৯ ও ৪৯।

৬৯. এর অর্থ এ নয় যে, কুরআন সত্যিই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়ে থাকলে এর বিরোধিতার ফলে আমাদের ওপর দুর্ভাগ্য নেমে আসতে পারে শুধু এই ভয়ে এর ওপর ঈমান আনো। বরং এর অর্থ হলো, যেভাবে তোমরা না বুঝে শুনে কোন প্রকার ভাবনা চিন্তা না করে কুরআনকে অস্বীকার করছো, বুঝার চেষ্টা করার পরিবর্তে কানে আঙুল দিচ্ছো এবং অযথা জিদ করে বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর হয়েছো তা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। এ কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসেনি এবং আল্লাহ তা পাঠাননি বলে জানতে পেরেছো এ দাবীও তোমরা করতে পারো না। একথা সুস্পষ্ট যে, কুরআনকে আল্লাহর বাণী বলে মেনে নিতে তোমাদের অস্বীকৃতি নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে নয়, ধারণার ভিত্তিতে। বাহ্যত এ ধারণা যেমন অভ্রান্ত হওয়া সম্ভব তেমনি ভ্রান্ত হওয়াও সম্ভব। এই উভয় সম্ভাবনাকে একটু পর্যালোচনা করে দেখো। মনে করো তোমাদের ধারণাই সঠিক প্রমাণিত হলো। এ ক্ষেত্রে তোমাদের ধারণা অনুসারে বড় জোর এতটুকু হবে যে, মান্যকারী ও অমান্যকারী উভয়ের পরিণাম একই হবে। কারণ, মৃত্যুর পর উভয়েই

মাটিতে মিশে যাবে। এর পরে আর কোন জীবন থাকবে না। যেখানে কুফর ও ঈমানের কোন ভাল মন্দ ফলাফল দেখা দিতে পারে। কিন্তু সত্যি সত্যিই যদি এ কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে এবং কুরআন যা বলছে তা যদি বাস্তব রূপ নিয়ে সামনে আসে তাহলে বলো তা অস্বীকার করে ও বিরোধিতার ক্ষেত্রে এতদূর অগ্রসর হয়ে তোমরা কোন্ পরিণামের মুখোমুখি হবে? কাজেই তোমাদের আপন স্বার্থই দাবী করে, জিদ ও হঠকারিতা পরিত্যাগ করে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কুরআন সম্পর্কে ভেবে দেখো। চিন্তা ভাবনার পরও যদি তোমরা ঈমান না আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাও তবে তাই করো। কিন্তু বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর হয়ে এ আন্দোলনের পথ রুদ্ধ করার জন্য এতটা অগ্রসর হয়ো না যে মিথ্যা, চক্রান্ত, প্রতারণা এবং জুলুম-নির্যাতনের অস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করে দেবে এবং শুধু নিজেদের ঈমান আনা থেকে বিরত থাকা যথেষ্ট মনে না করে অন্যদেরকেও ঈমান আনা থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা চালাতে থাকবে।

৭০. এ আয়াতের দুটি অর্থ। আর দুটি অর্থই বর্ণনা করেছেন বড় বড় মুফাস্‌সিরগণ। একটি অর্থ হচ্ছে, অচিরেই এরা নিজ চোখে দেখতে পাবে এ কুরআনের আন্দোলন আশেপাশের সব দেশে বিস্তার লাভ করেছে এবং এরা নিজেরা তার সামনে নতশির। সে সময় তারা জানতে পারবে আজ তাদের যা বলা হচ্ছে তাই ছিল পুরোপুরি ন্যায় ও সত্য। অথচ এখন তারা তা মেনে নিচ্ছে না। কেউ কেউ এ অর্থ সম্পর্কে এই বলে আপত্তি উথাপন করেছেন যে, কোন আন্দোলনের শুধু বিজয়ী হওয়া এবং বিরাট বিরাট এলাকা জয় করা তার ন্যায় ও সত্য হওয়ার প্রমাণ নয়। বাতিল আন্দোলনসমূহও বিস্তার লাভ করে এবং তার অনুসারীরাও দেশের পর দেশ জয় করে থাকে। কিন্তু এটা একটা হাল্কা ও গুরুত্বহীন আপত্তি। গোটা বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করেই এ আপত্তি উথাপন করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ইসলাম যেসব বিস্ময়কর বিজয় লাভ করেছে তা কেবল এ অর্থে আল্লাহর নিদর্শন ছিল না যে, একদল ঈমানদার লোক দেশের পর দেশ জয় করেছে। বরং তা এ অর্থে আল্লাহর নিদর্শন যে তা পৃথিবীর আর দু'দশটি বিজয়ের মত ছিল না। কারণ, ঐ সব পার্থিব বিজয়ে এক ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতিকে অন্যদের প্রাণ ও সম্পদের মালিক মোখতার বানিয়ে দেয় এবং আল্লাহর পৃথিবী জুলুম নির্যাতনে ভরে ওঠে। অপরদিকে এই বিজয় তার সাথে এক বিরাট ধর্মীয়, নৈতিক, চিন্তাগত ও মানসিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং তামাদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব নিয়ে এসেছিলো। যেখানেই এর প্রভাব পড়েছে সেখানেই মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম যোগ্যতা ও গুণাবলী সৃষ্টি হয়েছে এবং কুপ্রবৃত্তি ও অসৎ স্বভাবসমূহ অবদমিত হয়েছে। পৃথিবীর মানুষ কেবল মাত্র দুনিয়া ত্যাগী দরবেশ এবং নিভৃত বসে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' জপকারীদের মধ্যে যেসব গুণাবলী দেখার আশা করতো এবং দুনিয়ার কায়কারবার পরিচালনাকারীদের মধ্যে যা পাওয়ার চিন্তাও কখনো করতে পারতো না এই বিপ্লব সেই সব গুণাবলী ও নৈতিকতা শাসকদের রাজনীতিতে, ন্যায় বিচারের আসনে সমাসীন বিচারকদের আদালতে, সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দানকারী সেনাধ্যক্ষদের পরিচালিত যুদ্ধে বিজয় অভিযানসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে, রাজস্ব আদায়কারীদের আচরণে এবং বড় বড় কারবার পরিচালনাকারীদের ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিফলন ঘটিয়ে দেখিয়েছে। এই বিপ্লব তার সৃষ্ট সমাজে সাধারণ মানুষকে নৈতিক চরিত্র ও আচরণ এবং পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে এত উর্ধে তুলে ধরেছে যে, অপরাপর সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও তার চেয়ে

অনেক নীচু পর্যায়ের বলে প্রতিভাত হয়েছে। এ বিপ্লব মানুষকে কুসংস্কার ও অমূলক ধ্যান-ধারণার আবর্ত থেকে বের করে জ্ঞান-গবেষণা এবং যুক্তিসঙ্গত চিন্তা ও কর্মনীতির সুস্পষ্ট রাজপথে এনে দাঁড় করিয়েছে। এ বিপ্লব সামাজিক জীবনের সেই সব রোগ ব্যাধির চিকিৎসা করেছে অপরাপর ব্যবস্থায় যার চিকিৎসার ধারণা পর্যন্ত ছিল না। কিংবা থাকলেও সেসব রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে সফলকাম হয়নি। যেমন ঃ বর্ণ, গোত্র এবং দেশ ও ভাষার ভিত্তিতে মানুষে মানুষে পার্থক্য, একই সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ এবং তাদের মধ্যে উচ্চ নীচের বৈষম্য, অস্পৃশ্যতা, আইনগত অধিকার ও বাস্তব আচরণে সাম্যের অভাব, নারীদের পশ্চাদপদতা ও মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চনা, অপরাধের আধিক্য, মদ ও মাদকদ্রব্যের ব্যাপক প্রচলন, জবাবদিহি ও সমালোচনার উর্ধে সরকারের অবস্থান, মৌলিক অধিকার থেকেও জনগণের বঞ্চনা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চুক্তিসমূহের অমর্যাদা, যুদ্ধের সময় বর্বর ও পশুসুলভ আচরণ এবং এরূপ আরো অনেক ব্যাধি। সবচেয়ে বড় কথা, এ বিপ্লব দেখতে দেখতে আরব ভূমিতে রাজনৈতিক অরাজকতার জায়গায় শৃংখলা, খুন-খারাবি ও নিরাপত্তাহীনতার জায়গায় নিরাপত্তা, পাপাচারের জায়গায় তাকওয়া ও পবিত্রতা, জুলুম ও বে-ইনসাফির জায়গায় ন্যায় বিচার, নোংরামি ও অশিষ্টতার জায়গায় পবিত্রতা ও রুচিশীলতা, অজ্ঞতার জায়গায় জ্ঞান এবং পুরুষাণুক্রমিক শত্রুতার জায়গায় ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি করে এবং যে জাতির লোকেরা নিজ গোত্রের সরদারী ছাড়া বড় আর কোন স্বপ্নও দেখতে পারতো না তাদেরকে সমগ্র পৃথিবীর নেতা বানিয়ে দিল। এগুলোই ছিল সেই নিদর্শনাবলী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম যাদেরকে উদ্দেশ্য করে এ আয়াত শুনিয়েছিলেন সেই প্রজন্মের লোকেরাই নিজেদের চোখে এসব নিদর্শন দেখেছিলো। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহ নিরবচ্ছিন্নভাবে এসব নিদর্শন দেখিয়ে যাচ্ছেন। মুসলমানরা নিজেদের পতন যুগেও নৈতিক চরিত্রের যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে যারা সভ্যতা ও শিষ্টাচারের ঝাণ্ডাবাহী সেজে আছে তারা কখনো তার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারেনি। ইউরোপের বিভিন্ন জাতি আফ্রিকা, আমেরিকা, এশিয়া এবং এমনকি ইউরোপেরও পরাজিত জাতিসমূহের সাথে যে নির্যাতন মূলক আচরণ করেছে মুসলমানদের ইতিহাসের কোন যুগেই তার কোন নজির পেশ করা সম্ভব নয়। কুরআনের কল্যাণকারিতাই মুসলমানদের মধ্যে এতটা মানবিক গুণাবলী সৃষ্টি করেছে যে, বিজয় লাভ করেও তারা কখনো ততটা অত্যাচারী হতে পারেনি ইতিহাসের প্রতিটি যুগে অমুসলিমরা যতটা অত্যাচারী হতে পেরেছে এবং আজও পারছে। চোখ থাকলে যে কেউ নিজেই দেখে নিতে পারে, মুসলমানরা যখন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে স্পেনের শাসক ছিল তখন তারা খৃষ্টানদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলো। কিন্তু খৃষ্টানরা সেখানে বিজয়ী হয়ে তাদের সাথে কি আচরণ করেছিলো? হিন্দুস্থানে দীর্ঘ আটশ' বছরের শাসনকালে মুসলমানরা হিন্দুদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলো। কিন্তু এখন হিন্দুরা বিজয়ী হয়ে তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করছে! বিগত তেরশ' বছর যাবত মুসলমানরা ইহুদীদের সাথে কি আচরণ করেছে আর বর্তমানে ফিলিস্তিনে মুসলমানদের সাথে তাদের আচরণ কেমন!

• এ আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ আসমান ও যমীনের সর্বত্র এবং মানুষের আপন সত্তার মধ্যেও মানুষকে এমন সব নিদর্শন দেখাবেন যা দ্বারা কুরআন যে শিক্ষা দান করছে তা যে সত্য সে কথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে। কেউ কেউ এ অর্থ গ্রহণ সম্পর্কে এই

বলে আপত্তি উত্থাপন করেছে যে, আসমান ও যমীনের দিগন্তরাজি এবং নিজের সত্তাকে মানুষ তখনো দেখছিলো। তাই ভবিষ্যতে এসব জিনিসের মধ্যে নিদর্শনাবলী দেখানোর অর্থ কি? কিন্তু ওপরে বর্ণিত অর্থ গ্রহণ সম্পর্কে আপত্তি যেমন হাল্কা ও গুরুত্বহীন এ আপত্তিও তেমনি হাল্কা ও গুরুত্বহীন। আসমান ও যমীনের দিগন্তরাজি নিসন্দেহে ছিল এবং মানুষ তা সব সময় দেখে এসেছে। তাছাড়া সব যুগে মানুষ তার আপন সত্তাকে যেমনটা দেখেছে এখনো ঠিক তেমনটাই দেখছে। কিন্তু এসব জিনিসের মধ্যে আল্লাহর এত অসংখ্য নিদর্শন আছে যে, মানুষ কখনো তা পূর্ণরূপে জ্ঞানের আওতায় আনতে সক্ষম হয়নি এবং হবেও না। প্রত্যেক যুগে মানুষের সামনে নতুন নতুন নিদর্শন এসেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবে।

৭১. অর্থাৎ মানুষকে মন্দ পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করার জন্য এতটুকু কথা কি যথেষ্ট নয় যে, ন্যায় ও সত্যের এই আন্দোলনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও ব্যর্থ করার জন্য তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তাদের প্রতিটি আচরণ ও তৎপরতা দেখছেন।

৭২. অর্থাৎ তাদের কখনো আপন রবের সামনে হাজির হতে হবে এবং নিজের কাজকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে তারা এ বিশ্বাস পোষণ করে না। তাদের এরূপ আচরণের এটাই মৌলিক কারণ।

৭৩. অর্থাৎ তাঁর পাকড়াও থেকে আত্মরক্ষা করে তারা কোথাও যেতে সক্ষম নয়। তাছাড়া তাঁর রেকর্ড থেকে তাদের কোন আচরণ বাদ পড়াও সম্ভব নয়।

আশ শূরা

৪২

নামকরণ

৩৮ আয়াতের وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ আয়াতাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। এ নামের তাৎপর্য হলো, এটি সেই সূরা যার মধ্যে শূরা শব্দটি আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনা থেকে এ সূরার নাযিল হওয়ার সময় কাল জানা যায়নি। তবে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে স্পষ্ট জানা যায়, সূরাটি حٰمٓ السجدة সূরা নাযিল হওয়ার পরপরই নাযিল হয়েছে। কারণ, এ সূরাটিকে সূরা হা-মীম আস সাজদার এক রকম সম্পূরক বলে মনে হয়। যে ব্যক্তিই মনযোগ সহকারে প্রথমে সূরা হা-মীম আস সাজদা পড়বে এবং তারপর এ সূরা পাঠ করবে সে-ই এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবে।

সে দেখবে এ সূরাটিতে কুরাইশ নেতাদের অন্ধ ও অযৌক্তিক বিরোধিতার ওপর বড় মোক্ষম আঘাত হানা হয়েছিল। এভাবে পবিত্র মক্কা ও তার আশেপাশের এলাকায় অবস্থানকারী যাদের মধ্যেই নৈতিকতা, শিষ্টাচার ও যুক্তিবাদিতার কোন অনুভূতি আছে তারা জানতে পরবে জাতির উচ্চস্তরের লোকেরা কেমন অন্যায়ভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করছে আর তাদের মোকাবিলায় তাঁর কথা কত ভারসাম্যপূর্ণ, ভূমিকা কত যুক্তিসঙ্গত এবং আচার-আচরণ কত ভদ্র। ঐ সতর্কীকরণের পরপরই এ সূরা নাযিল করা হয়েছে। ফলে এটি যথাযথভাবে দিক নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেছে এবং একান্ত হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের আন্দোলনের বাস্তবতা বুঝিয়ে দিয়েছে। কাজেই যার মধ্যেই সত্য প্রীতির কিছুমাত্র উপকরণ আছে এবং জাহেলিয়াতের গোমরাহীর প্রেমে যে ব্যক্তি একেবারে অন্ধ হয়ে যায়নি তার পক্ষে এর প্রভাবমুক্ত থাকা ছিল অসম্ভব ব্যাপার।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

কথা শুরু করা হয়েছে এভাবে ঃ তোমরা আমার নবীর পেশকৃত বক্তব্য শুনে এ কেমন আজেবাজে কথা বলে বেড়াচ্ছ? কোন ব্যক্তির কাছে অহী আসা এবং তাকে মানব জাতির পথপ্রদর্শনের হিদায়াত বা পথনির্দেশনা দেয়া কোন নতুন বা অদ্ভুত কথা নয় কিংবা কোন অগ্রহণযোগ্য ঘটনাও নয় যে, ইতিহাসে এই বারই সর্বপ্রথম এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এর আগে আল্লাহ নবী-রসূলদের কাছে এ রকম দিক নির্দেশনা দিয়ে একের পর এক অনুরূপ অহী পাঠিয়েছেন। আসমান ও যমীনের অধিকর্তাকে উপাস্য ও শাসক মেনে নেয়া অদ্ভুত ও অভিনব কথা নয়। তাঁর বান্দা হয়ে, তাঁর খোদায়ীর অধীনে বাস করে অন্য

কারো খোদায়ী মেনে নেয়াটাই বরং অদ্ভুত ও অভিনব ব্যাপার। তোমরা তাওহীদ পেশকারীর প্রতি ক্রোধান্বিত হচ্ছো। অথচ বিশ্ব জাহানের মালিকের সাথে তোমরা যে শিরক করছো তা এমন মহা অপরাধ যে আকাশ যদি তাতে ভেঙ্গে পড়ে তাও অসম্ভব নয়। তোমাদের এই ধৃষ্টতা দেখে ফেরেশতারাও অবাক। তারা এই ভেবে সর্বক্ষণ ভীত সন্ত্রস্ত যে কি জানি কখন তোমাদের ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসে।

এরপর মানুষকে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তিকে নবী হিসেবে নিয়োজিত করা এবং সেই ব্যক্তির নিজেকে নবী বলে পেশ করার অর্থ এ নয় যে, তাঁকে আল্লাহর সৃষ্টির ভাগ্য বিধাতা বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সেই দাবী নিয়েই সে মাঠে নেমেছে। সবার ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ নিজের হাতেই রেখেছেন। নবী এসেছেন শুধু গাফিলদের সাবধান এবং পথভ্রষ্টদের পথ দেখাতে। তাঁর কথা অমান্যকারীদের কাছে জবাবদিহি চাওয়া এবং তাদেরকে আযাব দেয়া বা না দেয়া আল্লাহর নিজের কাজ। নবীকে এ কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়নি। তাই তোমাদের সমাজের তথাকথিত ধর্মীয় নেতা ও পীর ফকীররা যে ধরনের দাবী করে অর্থাৎ যে তাদের কথা মানবে না, কিংবা তাদের সাথে বে-আদবী করে তারা তাকে জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, নবী এ ধরনের কোন দাবী নিয়ে এসেছেন বলে মনে করে থাকলে সে ভ্রান্ত ধারণা মন-মগজ থেকে ঝেড়ে ফেলো। এ প্রসঙ্গে মানুষকে একথাও বলা হয়েছে যে, নবী তোমাদের অমঙ্গল কামনার জন্য আসেননি। তিনি বরং তোমাদের কল্যাণকামী। তোমরা যে পথে চলছো সে পথে তোমাদের নিজেদের ধ্বংস রয়েছে, তিনি শুধু এ বিষয়ে তোমাদের সতর্ক করছেন।

অতপর আল্লাহ জন্মগতভাবে মানুষকে সুপথগামী করে কেন সৃষ্টি করেননি এবং মতানৈক্যের এই সুযোগ কেন রেখেছেন, যে কারণে মানুষ চিন্তা ও কর্মের যে কোন উল্টা বা সোজা পথে চলতে থাকে, এ বিষয়টির তাৎপর্য বুঝিয়েছেন। বলা হয়েছে, এ জিনিসের বদৌলতেই মানুষ যাতে আল্লাহর বিশেষ রহমত লাভ করতে পারে সে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। ইখতিয়ার বিহীন অন্যান্য সৃষ্টিকুলের জন্য এ সুযোগ নেই। এ সুযোগ আছে শুধু স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির অধিকারী সৃষ্টিকুলের জন্য যারা প্রকৃতিগতভাবে নয়, বরং জ্ঞানগত-ভাবে বুঝে শুনে নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহকে নিজেদের অভিভাবক (PATRON, GUARDIAN) বানিয়েছে। যে মানুষ এই নীতি ও আচরণ গ্রহণ করে আল্লাহ তাকে সাহায্য করার মাধ্যমে পথপ্রদর্শন করেন এবং সৎ কাজের তাওফীক দান করে তাঁর বিশেষ রহমতের মধ্যে শামিল করে নেন। কিন্তু যে ব্যক্তি তার স্বাধীন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার ভুল পন্থায় ব্যবহার করে যারা প্রকৃত অভিভাবক নয় এবং হতেও পারে না তাদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা এই রহমত হতে বঞ্চিত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে মানুষের ও গোটা সৃষ্টিকুলের অভিভাবক হচ্ছেন আল্লাহ। অন্যরা না প্রকৃত অভিভাবক, না আছে তাদের প্রকৃত অভিভাবকত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার ক্ষমতা। মানুষ তার স্বাধীন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার প্রয়োগ করে নিজের অভিভাবক নির্বাচনে ভুল করবে না এবং যে প্রকৃতই অবিভাবক তাকেই অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে। এর ওপরেই তার সফলতা নির্ভর করে।

তারপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীন পেশ করছেন তা প্রকৃতপক্ষে কি সে বিষয়ে বলা হয়েছে ঃ

সেই দীনের সর্বপ্রথম ভিত্তি হলো, আল্লাহ যেহেতু বিশ্ব জাহান ও মানুষের স্রষ্টা, মালিক এবং প্রকৃত অভিভাবক তাই মানুষের শাসনকর্তাও তিনি। মানুষকে দীন ও শরীয়ত (বিশ্বাস ও কর্মের আদর্শ) দান করা এবং মানুষের মধ্যেকার মতানৈক্য ও মতদ্বৈধতার ফায়সালা করে কোন্‌টি হক এবং কোন্‌টি নাহক তা বলে আল্লাহর অধিকারে অন্তর্ভুক্ত। অন্য কোন সত্তার মানুষের জন্য আইনদাতা ও রচয়িতা (Law giver) হওয়ার আদৌ কোন অধিকার নেই। অন্য কথায় প্রাকৃতিক সার্বভৌমত্বের মত আইন প্রণয়নের সার্বভৌমত্বও আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। মানুষ বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তা এই সার্বভৌমত্বের ধারক হতে পারে না। কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর এই সার্বভৌমত্ব না মানে তাহলে তার আল্লাহর প্রাকৃতিক সার্বভৌমত্ব মানা অর্থহীন। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য প্রথম থেকেই একটি দীন নির্ধারিত করেছেন।

সে দীন ছিল একটিই। প্রত্যেক যুগে সমস্ত নবী-রসূলকে ঐ দীনটিই দেয়া হতো। কোন নবীই স্বতন্ত্র কোন ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন না। আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য প্রথম দিন হতে ঐ দীনটিই নির্ধারিত হয়ে এসেছে এবং সমস্ত নবী-রসূল ছিলেন সেই দীনেরই অনুসারী ও আন্দোলনকারী।

শুধু মেনে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকার জন্য সে দীন পাঠানো হয়নি। বরং পৃথিবীতে সেই দীনই প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত থাকবে এবং যমীনে আল্লাহর দীন ছাড়া অন্যদের রচিত দীন যেন প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে সবসময় এ উদ্দেশ্যেই তা পাঠানো হয়েছে। শুধু এ দীনের তাবলীগের জন্য নবী-রসূলগণ আদিষ্ট ছিলেন না, বরং কায়েম করার জন্য আদিষ্ট ছিলেন।

এটিই ছিল মানব জাতির মূল দীন। কিন্তু নবী-রসূলদের পরবর্তী যুগে স্বার্থান্বেষী মানুষেরা আত্মপ্রীতি, স্বেচ্ছাচার এবং আত্মম্ভরিতার কারণে স্বার্থের বশবর্তী হয়ে এ দীনের মধ্যে বিভেদ ও বিরোধ সৃষ্টি করে নতুন নতুন ধর্ম সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীতে যত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম দেখা যায় তার সবই ঐ একমাত্র দীনকে বিকৃত করেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো তিনি যেন বহুবিধ পথ, কৃত্রিম ধর্মসমূহ এবং মানুষের রচিত দীনের পরিবর্তে সেই আসল দীন মানুষের সামনে পেশ করেন এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালান। এ জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার পরিবর্তে তোমরা যদি আরো বিগড়ে যাও এবং সংঘাতের জন্য তৎপর হয়ে ওঠো তাহলে সেটা তোমাদের অজ্ঞতা। তোমাদের এই নির্বুদ্ধিতার কারণে নবী তাঁর কর্মতৎপরতা বন্ধ করে দেবেন না। তাঁকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আপনার ভূমিকায় অটল থাকেন এবং যে কাজের জন্য তিনি আদিষ্ট হয়েছেন তা সম্পাদন করেন। যেসব কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস এবং জাহেলী রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা ইতিপূর্বে আল্লাহর দীনকে বিকৃত করা হয়েছে তিনি তোমাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য দীনের মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি করবেন তোমরা তাঁর কাছে এ প্রত্যাশা করো না।

আল্লাহর দীন পরিত্যাগ করে অন্যদের রচিত দীন ও আইন গ্রহণ করা আল্লাহর বিরুদ্ধে কত বড় ধৃষ্টতা সে অনুভূতি তোমাদের নেই। নিজেদের দৃষ্টিতে তোমরা একে দুনিয়ার সাধারণ ব্যাপার মনে করছো। তোমরা এতে কোন দোষ দেখতে পাও না। কিন্তু আল্লাহর

দৃষ্টিতে এটা জঘন্যতম শিরক এবং চরমতম অপরাধ। সেই সব লোককে এই শিরক ও অপরাধের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে যারা আল্লাহর যমীনে নিজেদের দীন চালু করেছে এবং যারা তাদের দীনের অনুসরণ ও আনুগত্য করেছে।

এভাবে দীনের একটি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করার পর বলা হয়েছে, তোমাদেরকে বুঝিয়ে সুজিয়ে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য যেসব উত্তম পন্থা সম্ভব ছিল তা কাজে লাগানো হয়েছে। একদিকে আল্লাহ তাঁর কিতাব নাযিল করেছেন। সে কিতাব অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক পন্থায় তোমাদের নিজের ভাষায় তোমাদের কাছে প্রকৃত সত্য পেশ করছে। অপর দিকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সংগী–সাথীদের জীবন তোমাদের সামনে বর্তমান, যা দেখে তোমরা জানতে পার এ কিতাবের দিক নির্দেশনায় কেমন মানুষ তৈরী হয়। এভাবেও যদি তোমরা হিদায়াত লাভ করতে না পার তাহলে দুনিয়ার আর কোন জিনিসই তোমাদেরকে সঠিক পথে আনতে সক্ষম নয়। কাজেই এখন এর ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে, তোমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী যে গোমরাহীতে ডুবে আছো তার মধ্যেই ডুবে থাকো এবং এ রকম পথভ্রষ্টদের জন্য আল্লাহর কাছে যে পরিণতি নির্ধারিত আছে সেই পরিণতির মুখোমুখি হও।

এসব সত্য বর্ণনা করতে গিয়ে মাঝে মাঝে সংক্ষেপে তাওহীদ ও আখেরাতের স্বপক্ষে যুক্তি–প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, দুনিয়া পূজার পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে, আখেরাতের শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে এবং কাফেরদের সেই সব নৈতিক দুর্বলতার সমালোচনা করা হয়েছে যা তাদের আখেরাত থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার মূল কারণ ছিল। তার পর বক্তব্যের সমাপ্তি পর্যায়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে ঃ

এক ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনের প্রথম চল্লিশ বছর কিতাব কি—এ ধারণার সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন এবং ঈমান ও ঈমান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে একেবারে অনবহিত ছিলেন। তারপর হঠাৎ এ দুটি জিনিস নিয়ে তিনি মানুষের সামনে এলেন। এটা তাঁর নবী হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

দুই ঃ তাঁর পেশকৃত শিক্ষাকে আল্লাহর শিক্ষা বলে আখ্যায়িত করার অর্থ এ নয় যে, তিনি আল্লাহর সাথে সামনা সামনি কথাবার্তা বলার দাবীদার। আল্লাহর এই শিক্ষা অন্য সব নবী–রসূলদের মত তাঁকেও তিনটি উপায়ে দেয়া হয়েছে। এক–অহী, দুই–পর্দার আড়াল থেকে আওয়াজ দেয়া এবং তিন—ফেরেশতার মাধ্যমে পয়গাম। এ বিষয়টি পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যাতে বিরোধীরা এ অপবাদ আরোপ করতে না পারে যে, নবী (সা) আল্লাহর সাথে সামনা সামনি কথা বলার দাবী করছেন। সাথে সাথে ন্যায়বাদী মানুষেরা যেন জানতে পারে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে মানুষটিকে নবুওয়াতের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে তাঁকে কোন্ কোন্ উপায় ও পন্থায় দিক নির্দেশনা দেয়া হয়।

আয়াত ৫৩ | সূরা আশ শূরা–মক্কী | রুকূ' ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও মেহেরবান আল্লাহর নামে

حٰمٓ ﴿١﴾ عٓسٓقٓ ﴿٢﴾ كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣﴾ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۭ وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْعَظِيْمُ ﴿٤﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰۗىِٕكَةُ
يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِى الْاَرْضِ ۭ اَلَآ اِنَّ
اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَاۗءَ اللّٰهُ
حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ڮ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٦﴾

হা মীম, আইন সীন ক্বাফ। মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানময় আল্লাহ তোমার কাছে ও তোমার পূর্ববর্তীদের (রসূল) কাছে এভাবেই অহী পাঠিয়ে আসছেন।[১] আসমান ও যমীনে যা আছে সবই তাঁর। তিনি সর্বোন্নত ও মহান।[২] আসমান ওপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়।[৩] ফেরেশতারা প্রশংসাসহ তাদের রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে যায়।[৪] জেনে রাখো, প্রকৃতই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।[৫] যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে নিজেদের অভিভাবক[৬] বানিয়ে নিয়েছে আল্লাহই তাদের তত্ত্বাবধায়ক। তুমি তাদের জিম্মাদার নও।[৭]

১. বক্তব্য শুরু করার এই ভঙ্গি থেকেই বুঝা যায়, সেই সময় পবিত্র মক্কার প্রতিটি মাহফিল ও গ্রাম্য বিপণী, প্রতিটি গলি ও বাজার এবং প্রতিটি বাড়ী ও বিপনীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আন্দোলন ও কুরআনের বিষয়বস্তু নিয়ে যে জোর গুজব, কানাঘুষা ও আলোচনা চলছিলো তা–ই ছিল এর পটভূমি। লোকেরা বলতো ঃ এ ব্যক্তি কোথা থেকে এসব অভিনব কথা নিয়ে আসছে তা কে জানে। এ রকম কথা আমরা

কখনো শুনিনি বা হতেও দেখিনি। তারা বলতো ঃ বাপ-দাদা থেকে যে দীন চলে আসছে, গোটা জাতি যে দীন অনুসরণ করছে, সমগ্র দেশে যে নিয়ম পদ্ধতি শত শত বছর ধরে প্রচলিত আছে এ লোকটি তার সব কিছুকেই ভুল বলে আখ্যায়িত করছে এবং বলছে, আমি যে দীন পেশ করছি সেটিই ঠিক। এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তারা বলতো ঃ এ লোকটি যদি এই বলে তার বক্তব্য পেশ করতো যে, বাপ-দাদার ধর্ম এবং প্রচলিত নিয়ম-পদ্ধতির মধ্যে তার দৃষ্টিতে কিছু দোষ-ত্রুটি আছে এবং সে চিন্তা-ভাবনা করে নিজে কিছু নতুন বিষয় বের করেছে তাহলে তা নিয়েও আলোচনা করা যেতো। কিন্তু সে বলে, আমি তোমাদের যা শুনাচ্ছি তা আল্লাহর বাণী। একথা কি করে মেনে নেয়া যায়। আল্লাহ কি তার কাছে আসেন? না কি সে নিজে আল্লাহর কাছে যায়। না তার ও আল্লাহর মধ্যে কথাবার্তা হয়? এসব আলোচনা ও কানাঘুষার জবাবে বাহ্যত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে কিন্তু মূলত কাফেরদের শুনিয়ে বলা হয়েছে ঃ হাঁ, মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানময় আল্লাহ অহীর মাধ্যমে এসব কথাই বলছেন এবং পূর্বের সমস্ত নবী-রসূলদের কাছে এসব বিষয় নিয়েই অহী নাযিল হতো।

অহীর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, দ্রুত ইংগিত এবং গোপন ইংগিত অর্থাৎ এমন ইংগিত যা অতি দ্রুত এমনভাবে করা হবে যে তা কেবল ইংগিতদাতা এবং যাকে ইংগিত করা হয়েছে সেই জানতে ও বুঝতে পারবে। তাছাড়া অন্য কেউ তা জানতে পারবে না। এ শব্দটিকে পারিভাষিক অর্থে এমন দিক নির্দেশনা বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কোন বান্দার মনে বিদ্যুৎ চমকের মত নিক্ষেপ করা হয়। আল্লাহর এ বাণীর উদ্দেশ্য হলো, কোন বান্দার কাছে আল্লাহর আসার কিংবা তাঁর কাছে কোন মানুষের যাওয়ার এবং সামনাসামনি কথা বলার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়। মানুষের হিদায়াত ও দিকনির্দেশনার জন্য যখনই তিনি কোন বান্দার সাথে যোগাযোগ করতে চান তখন কোন অসুবিধাই তাঁর ইচ্ছার পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে না। এ কাজের জন্য তিনি তাঁর জ্ঞান দ্বারা অহী পাঠানোর পথ অবলম্বন করেন। সূরার শেষ আয়াতগুলোতে এ বিষয়টিরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং সেখানে বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে বলা হয়েছে।

তাদের ধারণা ছিল এসব হচ্ছে অদ্ভুত ও অভিনব কথা। তার জবাবে বলা হয়েছে, এসব অদ্ভুত ও অভিনব কথা নয়। বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে যত নবী-রসূল এসেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের সকলকেই এসব হিদায়াতই দান করা হতো।

২. শুধু আল্লাহর প্রশংসার জন্য এই প্রারম্ভিক বাক্যটি বলা হচ্ছে না। যে পটভূমিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এর প্রতিটি শব্দ তার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনের বিরুদ্ধে শোরগোল ও কানাঘুষা করছিলো তাদের আপত্তির প্রথম ভিত্তি হলো, নবী (সা) তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন এতে তারা উৎকর্ণ হয়ে বলতো ঃ যদি শুধুমাত্র আল্লাহ একাই উপাস্য, প্রয়োজন পূরণকারী এবং আইনদাতা হন তাহলে আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীগণ কোন্ মর্যাদার অধিকারী? এর জবাবে বলা হয়েছে এই গোটা বিশ্ব জাহান আল্লাহর সাম্রাজ্য। মালিকের মালিকানায় অন্য কারো খোদায়ী কি করে চলতে পারে? বিশেষ করে যাদের খোদায়ী মানা হয় কিংবা যারা

নিজেদের খোদায়ী চালাতে চায়। তারা নিজেরাও তাঁর মালিকানাভুক্ত তারপর বলা হয়েছে তিনি সর্বোন্নত ও মহান। তাই কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না এবং তাঁর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা, ইখতিয়ার এবং অধিকারের মধ্যে কোনটিতেই অংশীদার হতে পারে না।

৩. অর্থাৎ কোন সৃষ্টির বংশধারা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করা এবং তাকে আল্লাহর পুত্র বা কন্যা আখ্যায়িত করা কোন সাধারণ ব্যাপার নয়। কাউকে অভাব পূরণকারী ও বিপদ ত্রাণকারী বানিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তার কাছে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করেছে। কাউকে সারা দুনিয়ার সাহায্যকারী মনে করে নেয়া হয়েছে এবং প্রকাশ্যে বলতে শুরু করা হয়েছে যে, আমাদের হযরত সব সময় সব স্থানে সবার কথা শোনেন। তিনিই প্রত্যেকের সাহায্যের জন্য হাজির হয়ে তার কাজ উদ্ধার করে দেন। কাউকে আদেশ নিষেধ এবং হালাল ও হারামের মালিক মোখতার মেনে নেয়া হয়েছে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষ এমনভাবে তার নির্দেশের আনুগত্য করতে শুরু করেছে যেন সে-ই তাদের আল্লাহ। এগুলো আল্লাহর বিরুদ্ধে এমন ধৃষ্টতা যে এতে আসমান ভেঙে পড়াও অসম্ভব নয়। (সূরা মারয়ামের ৮৮ থেকে ৯১ আয়াতে এই একই বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে)।

৪. অর্থাৎ মানুষের এসব কথা শুনে শুনে ফেরেশতারা এই বলে কানে হাত দেয় যে, আমাদের রব সম্পর্কে এসব কি বাজে বলা হচ্ছে এবং পৃথিবীর এই মাখলুক এ কি ধরনের বিদ্রোহ করেছে? তারা বলে ঃ সুবহানাল্লাহ! কে এমন মর্যাদার অধিকারী হতে পারে যে, বিশ্ব জাহানের রবের সাথে 'উলুহিয়াত' ও সার্বভৌম ক্ষমতায় শরীক হতে পারে। তিনি ছাড়া আমাদের ওসব বান্দার জন্য আর কে পৃষ্ঠপোষক আছে যে তার প্রশংসা গীতি গাইতে হবে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। তাছাড়া তারা উপলব্ধি করে যে, পৃথিবীতে এটা এমন এক মহা অপরাধ করা হচ্ছে যার কারণে যে কোন সময় আল্লাহর গযব নেমে আসতে পারে। তাই তারা পৃথিবীতে বসবাসকারী এই আত্মসংহারী বান্দাদের জন্য বার বার এই বলে দয়া ও করুণার আবেদন জানায় যে, তাদেরকে যেন এখনই শাস্তি দেয়া না হয় এবং সামলে নেয়ার জন্য তাদেরকে আরো কিছুটা সুযোগ দেয়া হয়।

৫. অর্থাৎ এটা তাঁর উদারতা, দয়া ও ক্ষমাশীলতা যার কল্যাণে কুফর, শিরক ও নাস্তিকতা এবং পাপাচার ও চরম জুলুম-নির্যাতনে লিপ্ত ব্যক্তিরাও বছরের পর বছর, এমনকি এ ধরনের পুরো এক একটা সমাজ শত শত বছর পর্যন্ত এক নাগাড়ে অবকাশ পেয়ে থাকে। তারা শুধু রিযিকই লাভ করে না, পৃথিবীতে তাদের খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়ে তাছাড়া পৃথিবীর এমন সব উপকরণ ও সাজসরঞ্জাম দ্বারা তারা অনুগৃহীত হয় যা দেখে নির্বোধ লোকেরা এই ভ্রান্ত ধারণায় পতিত হয় যে, হয়তো এ পৃথিবীর কোন খোদা-ই নেই।

৬. মূল আয়াতে اولياء শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে আরবী ভাষায় যার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। বাতিল উপাস্যদের সম্পর্কে পথভ্রষ্ট মানুষদের বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস এবং ভিন্ন ভিন্ন অনেক কর্মপদ্ধতি আছে। কুরআন মজীদে এগুলোকেই "আল্লাহ ছাড়া অন্যদের অভিভাবক বানানো" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কুরআন মজীদে অনুসন্ধান করলে ولى শব্দটির নিম্নবর্ণিত অর্থসমূহ জানা যায় ঃ

এক ঃ মানুষ যার কথামত কাজ করে, যার নির্দেশনা মেনে চলে এবং যার রচিত নিয়ম-পন্থা, রীতিনীতি এবং আইন-কানুন অনুসরণ করে (আন নিসা, আয়াত ১১৮ থেকে ১২০; আল-আ'রাফ, আয়াত ৩ ও ২৭ থেকে ৩০)।

দুই ঃ যার দিকনির্দেশনার (Guidance) ওপর মানুষ আস্থা স্থাপন করে এবং মনে করে সে তাকে সঠিক রাস্তা প্রদর্শনকারী এবং ভ্রান্তি থেকে রক্ষাকারী। (আল বাকারা-২৫৭; বানী ইসরাঈল-৯৭; আল কাহাফ-১৭ ও আল জাসিয়া-১৯ আয়াত)।

তিন ঃ যার সম্পর্কে মানুষ মনে করে, আমি পৃথিবীতে যাই করি না কেন সে আমাকে তার কুফল থেকে রক্ষা করবে। এমনকি যদি আল্লাহ থাকেন এবং আখেরাত সংঘটিত হয় তাহলে তার আযাব থেকেও রক্ষা করবেন (আন নিসা- ১২৩-১৭৩; আল আনআম-৫১; আর রা'দ ৩৭; আল আনকাবুত-২২; আল আহযাব-৬৫; আয-যুমার-৩ আয়াত)।

চার ঃ যার সম্পর্কে মানুষ মনে করে, পৃথিবীতে তিনি অতি প্রাকৃতিক উপায়ে তাকে সাহায্য করেন, বিপদাপদে তাকে রক্ষা করেন। রুজি-রোজগার দান করেন, সন্তান দান করেন, ইচ্ছা পূরণ করেন এবং অন্যান্য সব রকম প্রয়োজন পূরণ করেন (হুদ-২০, আর রা'দ-১৬ ও আল আনকাবুত-৪১ আয়াত)।

অলী (ولى) শব্দটি কুরআন মজীদের কোন কোন জায়গায় ওপরে বর্ণিত অর্থসমূহের কোন একটি বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে এবং কোথাও কোথাও সবগুলো অর্থ একত্রেও বুঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতটি তারই একটি। এখানে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অলী বা অভিভাবক বানানোর অর্থ ওপরে বর্ণিত চারটি অর্থেই তাদেরকে পৃষ্টপোষক, সহযোগী ও সাহায্যকারী মনে করা।

৭. আল্লাহই তাদের তত্বাবধায়ক অর্থাৎ তিনি তাদের সমস্ত কাজকর্ম দেখছেন এবং তাদের আমলনামা প্রস্তুত করছেন। তাদের কাছে জবাবদিহি চাওয়া ও তাদেরকে পাকড়াও করা তাঁরই কাজ। "তুমি তাদের জিম্মাদার নও"। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে একথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের ভাগ্য তোমার হাতে তুলে দেয়া হয়নি যে, যারা তোমার কথা মানবে না তাদেরকে তুমি জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে, কিংবা ক্ষমতাচ্যুত করবে অথবা তছনছ করে ফেলবে। একথার অর্থ আবার এও নয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে সে রকম মনে করতেন। তাই তাঁর ভুল ধারণা বা আত্মবিভ্রম দূর করার জন্য একথা বলা হয়েছে। বরং কাফেরদের শুনানোই এর মূল উদ্দেশ্য। যদিও বাহ্যিকভাবে নবীকেই (সা) সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাফেরদেরকে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, তোমাদের মধ্যে যারা খোদাপ্রাপ্তি এবং আধ্যাত্মিকতার প্রহসন করে সাধারণত যেভাবে ঘটা করে তা দাবী করে আল্লাহর নবী তেমন কোন দাবী করেন না। জাহেলী সমাজে সাধারণভাবে এ ধারণা প্রচলিত আছে যে, 'দরবেশ' শ্রেণীর লোকেরা এমন প্রতিটি মানুষের ভাগ্য নষ্ট করে দেয় যারা তাদের সাথে বে-আদবী করে। এমনকি তাদের মৃত্যুর পরেও কেউ যদি তাদের কবরেরও অবমাননা করে এবং অন্য কিছু না করলেও যদি তাদের মনের মধ্যে কোন খারাপ ধারণার উদয় হয় তাহলেই তাকে ধ্বংস করে দেয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ ধারণা ঐ সব "দরবেশ

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا
وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ ۝٧
وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ؕ
وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝٨ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ
اَوْلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِىُّ وَهُوَ يُحْىِ الْمَوْتٰى ۫ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ
قَدِيْرٌ ۝٩

হে নবী, এভাবেই আমি এই আরবী কুরআন অহী করে তোমার কাছে পাঠিয়েছি[৮] যাতে তুমি জনপদসমূহের কেন্দ্র (মক্কানগরী) ও তার আশেপাশের অধিবাসীদের সতর্ক করে দাও[৯] এবং একত্রিত হওয়ার দিন সম্পর্কে ভয় দেখাও[১০] যার আগমনে কোন সন্দেহ নেই। এক দলকে জান্নাতে যেতে হবে এবং অপর দলকে যেতে হবে দোযখে।

আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে এদের সবাইকে এক উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করে দিতেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমতের মধ্যে শামিল করেন। জালেমদের না আছে কোন অভিভাবক না আছে সাহায্যকারী।[১১] এরা কি (এমনই নির্বোধ যে) তাকে বাদ দিয়ে অন্য অভিভাবক বানিয়ে রেখেছে? অভিভাবক তো একমাত্র আল্লাহ। তিনিই মৃতদের জীবিত করেন এবং তিনি সব কিছুর ওপর শক্তিশালী।[১২]

মহামান্যরা" নিজেরাই প্রচার করেন এবং যেসব নেককার লোক নিজেরা এ কাজ করেন না কিছু ধূর্ত লোক তাদের হাড্ডিসমূহকে নিজেদের ব্যবসায়ের পুঁজি বানানোর জন্য তাদের সম্পর্কে এ ধারণা প্রচার করতে থাকে। যাই হোক মানুষের ভাগ্য গড়া ও ভাঙার ক্ষমতা–ইখতিয়ার থাকাকেই সাধারণ মানুষ রূহানিয়াত ও খোদাপ্রাপ্তির অতি আবশ্যকীয় দিক বলে মনে করেছে। প্রতারণার যাদুর এই মুখোশ খুলে দেয়ার জন্য আল্লাহ কাফেরদের শুনিয়ে তাঁর রসূলকে বলছেন, নিসন্দেহে তুমি আমার নবী এবং আমি তোমাকে আমার অহী দিয়ে সম্মানিত করেছি। শুধু মানুষকে সঠিক পথ দেখানোই তোমার কাজ। তাদের ভাগ্য তোমার হাতে তুলে দেয়া হয়নি। তা আমি নিজের হাতেই রেখেছি। বান্দার কাজকর্ম বিচার করা এবং তাদেরকে শাস্তি দেয়া বা না দেয়া আমার নিজের দায়িত্ব।

৮. বক্তব্যের প্রারম্ভে যা বলা হয়েছিলো সে কথার পুনরাবৃত্তি করে আরো জোর দিয়ে বলা হয়েছে। 'আরবী ভাষার কুরআন' বলে শ্রোতাদের বুঝানো হয়েছে, এটা অন্য কোন ভাষায় নয় তোমাদের নিজেদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। তোমরা নিজেরাই তা সরাসরি বুঝতে পারো। এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখো, আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড়া এই পাক-পবিত্র ও নিস্বার্থ দিক নির্দেশনা কি আর কারো পক্ষ থেকে হতে পারে?

৯. অর্থাৎ তাদেরকে গাফলতি থেকে জাগিয়ে দাও এবং এই মর্মে সতর্ক করে দাও যে, ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাসের যে গোমরাহী এবং নৈতিকতা ও চরিত্রের যে অকল্যাণ ও ধ্বংসকারিতার মধ্যে তোমরা ডুবে আছ এবং তোমাদের ব্যক্তি ও জাতীয় জীবন যে বিকৃত নীতিমালার ওপর চলছে তার পরিণাম ধ্বংস ছাড়া কিছু নয়।

১০. অর্থাৎ তাদেরকে এও বলে দাও যে, এই ধ্বংস শুধু দুনিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়, ভবিষ্যতে এমন দিনও আসবে যখন আল্লাহ সমস্ত মানুষকে একত্রিত করে তাদের হিসাব নিবেন। কোন ব্যক্তি যদি তার গোমরাহী ও দুষ্কর্মের পরিণাম ফল থেকে পৃথিবীতে বেঁচে গিয়েও থাকে তাহলে সেদিন তার বাঁচার কোন উপায় থাকবে না। আর সেই ব্যক্তি তো বড়ই দুর্ভাগা যে এখানেও অকল্যাণ লাভ করলো, সেখানেও দুর্ভাগ্যের শিকার হলো।

১১. এখানে এই বক্তব্যের মধ্যে একথাটি বলার তিনটি উদ্দেশ্য আছে ঃ

প্রথমত-এ কথা বলার উদ্দেশ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিক্ষা এবং সান্ত্বনা দান করা। এতে নবীকে (সা) বুঝানো হয়েছে, তিনি মক্কার কাফেরদের অজ্ঞতা, গোমরাহী ও বাহ্যিক ভাবে তাদের একগুঁয়েমী ও হঠকারিতা দেখে যেন বেশী মনোকষ্ট ও দুঃখ না পান। মানুষকে ক্ষমতা-ইখতিয়ার ও নির্বাচন করার স্বাধীনতা দেয়াই আল্লাহর ইচ্ছা। তারপর যে হিদায়াত চাইবে সে হিদায়াত লাভ করবে। আর যে পথভ্রষ্ট হতে চাইবে সে পথভ্রষ্ট হবে। সে যেদিকে যেতে চায় সেদিকেই যাবে। আল্লাহর অভিপ্রায় ও বিবেচ্য যদি এটা না হতো তাহলে নবী-রসূল ও কিতাব পাঠানোর প্রয়োজনই বা কি ছিল? সে জন্য মহান আল্লাহর একটি সৃষ্টিসূচক ইংগিতই যথেষ্ট ছিল। এভাবে সমস্ত মানুষ ঠিক তেমনি তাঁর আদেশ মেনে চলতো যেমন আদেশ মেনে চলে নদী, পাহাড়, গাছ, মাটি, পাথর ও সমস্ত জীবজন্তু। (এ উদ্দেশ্যে এ বিষয়টি কুরআন মজীদের অন্যান্য জায়গায়ও বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত ৩৫, ৩৬ ও ১০৭ টীকাসহ।

দ্বিতীয়ত-আল্লাহ যদি সত্যিই মানুষকে পথ দেখাতে চাইতেন আর মানুষের মধ্যে আকীদা ও কর্মের যে পার্থক্য বিস্তার লাভ করে আছে তা তাঁর পসন্দ না হতো এবং মানুষ ঈমান ও ইসলামের পথ অনুসরণ করুক তাই যদি তাঁর মনঃপুত, তাহলে এই কিতাব ও নবুওয়াতের কি প্রয়োজন ছিল? এ ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বে যেসব মানুষ হাবুডুবু খাচ্ছিলো এখানে তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তিনি সব মানুষকে মু'মিন ও মুসলিম হিসেবে সৃষ্টি করে এ কাজ সহজেই করতে পারতেন। এই বিভ্রান্তি ও দ্বিধা দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি হিসেবে যুক্তি দেখানো হয় যে, আল্লাহ যখন তা করেননি তখন নিশ্চয়ই তিনি ভিন্ন কোন পথ পসন্দ করেন। আমরা যে পথে চলছি সেটিই সেই পথ আর যা কিছু করছি তাঁরই ইচ্ছায় করছি। তাই এ ব্যাপারে আপত্তি করার অধিকার কারো নেই। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর

করার জন্যও এ বিষয়টি কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত ১১২, ১৩৮, ১৪৮, ১৪৯ টীকাসহ; সূরা নূর এর (তাফহীম) ভূমিকা; ইউনুস আয়াত ৯৯, টীকাসহ; হূদ আয়াত ১১৮ টীকাসহ; আন নাহল, আয়াত ৯ টীকাসহ, আয়াত ৩৬ ও ৩৭ টীকাসহ।

তৃতীয়ত–এর উদ্দেশ্য দীনের প্রচার ও আল্লাহর সৃষ্টির সংশোধন ও সংস্কারের পথে যেসব বিপদাপদ আসে ঈমানদারদেরকে তার বাস্তবতা ও তাৎপর্য উপলব্ধি করানো। যারা আল্লাহর দেয়া বাছাই ও ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং তার ভিত্তিতে স্বভাব–চরিত্র ও পন্থা–পদ্ধতির ভিন্ন হওয়ার বাস্তবতা উপলব্ধি করে না তারা কখনো সংস্কার কার্যের মন্থর গতি দেখে নিরাশ হতে থাকে। তারা চায় আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু 'কারামত' ও 'মু'জিযা' দেখানো যা দেখামাত্র মানুষের মন পরিবর্তিত হয়ে যাবে। আবার কখনো তারা প্রয়োজনের অধিক আবেগ–উত্তেজনার বশে সংস্কারের অবৈধ পন্থা–পদ্ধতি গ্রহণ করার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে (এ উদ্দেশ্যেও কুরআন মজীদের কয়েকটি জায়গায় এ বিষয়টি বলা হয়েছে। দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা রা'দ আয়াত ৩১ টীকাসহ; সূরা নাহল, আয়াত ৯০ থেকে ৯৩ টীকাসহ।)

এ উদ্দেশ্যে একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ কয়টি সংক্ষিপ্ত বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে। পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যিকার প্রতিনিধিত্ব এবং আখেরাতে তাঁর জান্নাত কোন সাধারণ রহমত নয় যা মাটি ও পাথর এবং গাধা ও ঘোড়ার মত মর্যাদার সৃষ্টিকুলকে সাধারণ ভাবে বন্টন করে দেয়া যায়। এটা তো একটা বিশেষ এবং অনেক উচ্চ পর্যায়ের রহমত যার জন্য ফেরেশতাদেরকেও উপযুক্ত মনে করা হয়নি। এ কারণেই মানুষকে একটি স্বাধীন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার সম্পন্ন সৃষ্টির মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করে আল্লাহ তাঁর পৃথিবীর এসব অঢেল উপায়–উপকরণ তার কর্তৃত্বাধীনে দিয়েছেন এবং এসব সাংঘাতিক শক্তিও তাকে দান করেছেন। যাতে সে সেই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে এবং এতে কামিয়াব হওয়ার পরই কেবল কোন বান্দা তাঁর এই বিশেষ রহমত লাভের উপযুক্ত হতে পারে। এ রহমত আল্লাহর নিজের জিনিস। এর ওপর আর কারো ইজারাদারী নেই। কেউ তার ব্যক্তিগত অধিকারের ভিত্তিতে তা দাবী করেও নিতে পারে না। এমন শক্তিও কারো নেই যে, জোর করেই তা লাভ করতে পারে। সে–ই কেবল তা নিতে পারে যে আল্লাহর কাছে তার দাসত্ব পেশ করবে, তাঁকেই নিজের অভিভাবক বানাবে এবং তাঁরই সাথে লেগে থাকবে। এ অবস্থায় আল্লাহ তাকে সাহায্য ও দিকনির্দেশনা দান করেন এবং তাকে নিরাপদে এ পরীক্ষা পাস করার তাওফীক দান করেন যাতে সে তাঁর রহমতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু যে জালেম আল্লাহর দিক থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাঁর পরিবর্তে অন্যদেরকে নিজের অভিভাবক বানিয়ে নেয়, অযথা জোর করে তাঁর অভিভাবক হওয়ার এমন কোন প্রয়োজন আল্লাহর পড়েনি। সে অন্য যাদেরকে অভিভাবক বানায় তাদের আদৌ এমন কোন জ্ঞান, শক্তি বা ক্ষমতা–ইখতিয়ার নেই যার ভিত্তিতে অভিভাবকত্বের হক আদায় করে তাকে সফল করিয়ে দিতে পারে।

১২. অর্থাৎ অভিভাবকত্ব কোন মনগড়া বস্তু নয় যে, আপনি যাকে ইচ্ছা আপনার অভিভাবক বানিয়ে নিবেন আর বাস্তবেও সে আপনার অভিভাবক হয়ে যাবে এবং

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿١٠﴾ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ
أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۖ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِ
شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾

২ রুকূ'

তোমাদের[১৩] মধ্যে যে ব্যাপারেই মতানৈক্য হোকনা কেন তার ফয়সালা করা আল্লাহর কাজ।[১৪] সেই আল্লাহই আমার[১৫] রব, আমি তাঁর ওপরেই ভরসা করেছি এবং তাঁর কাছেই আমি ফিরে যাই।[১৬] আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, যিনি তোমাদের আপন প্রজাতি থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, অনুরূপ অন্যান্য জীবজন্তুর ও (তাদের নিজ প্রজাতি থেকে) জোড়া বানিয়েছেন এবং এই নিয়মে তিনি তোমাদের প্রজন্মের বিস্তার ঘটান। বিশ্ব জাহানের কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।[১৭] তিনি সব কিছু শোনেন ও দেখেন।[১৮] আসমান ও যমীনের ভাণ্ডারসমূহের চাবি তাঁরই হাতে, যাকে ইচ্ছা অঢেল রিযিক দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা মেপে দেন। তিনি সব কিছু জানেন।[১৯]

অভিভাবকত্বের হক আদায় করবে। এটা এমন এক বাস্তব জিনিস যা মানুষের আশা আকাংখা অনুসারে হয় না বা পরিবর্তিতও হয় না। আপনি মানেন আর না মানেন বাস্তবে যিনি অভিভাবক তিনিই আপনার অভিভাবক। আর বাস্তবে যে অভিভাবক নয় আপনি মৃত্যু পর্যন্ত তাকে মানলেও এবং অভিভাবক মনে করলেও সে অভিভাবক নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শুধু আল্লাহই অভিভাবক আর কেউ অভিভাবক নয় তার প্রমাণ কি? এর জবাব হচ্ছে, মানুষের প্রকৃত অভিভাবক হতে পারেন তিনি যিনি মৃত্যুকে জীবনে রূপ দেন, যিনি প্রাণহীন বস্তুর মধ্যে জীবন দান করে জীবন্ত মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করার শক্তি ও ইখতিয়ারের অধিকারী। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ যদি তেমন থাকে তাহলে তাকে অভিভাবক বানাও। আর যদি শুধু আল্লাহই তেমন হয়ে থাকেন তাহলে তাঁকে ছাড়া আর কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা এবং আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৩. এই গোটা অনুচ্ছেদটি যদিও আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে বলা হয়েছে, কিন্তু বক্তা এখানে আল্লাহ নন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মহান আল্লাহ যেন তাঁর নবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তুমি একথা ঘোষণা করো। কুরান মজীদে এ ধরনের বিষয়বস্তুত কোথাও قُل (হে নবী, তুমি বলো) শব্দ দ্বারা শুরু হয় এবং কোথাও তা ছাড়াই শুরু হয়। সে ক্ষেত্রে কথার ভঙ্গিই বলে দেয়, এখানে বক্তা আল্লাহ নন, আল্লাহর রসূল। কোন কোন স্থানে তো আল্লাহর বাণীর বক্তা থাকেন ঈমানদারগণ। এর উদাহরণ সূরা ফাতেহা, কিংবা ফেরেশতাগণ। যেমন সূরা মারয়ামের ৬৪ থেকে ৬৫ আয়াত।

১৪. এটা আল্লাহর বিশ্ব জাহানের অধিপতি এবং সত্যিকার অভিভাবক হওয়ার স্বাভাবিক ও যৌক্তিক দাবী। রাজত্ব ও অভিভাবকত্ব যখন তাঁরই তখন শাসকও অনিবার্যরূপে তিনিই এবং মানুষের পারস্পরিক ঝগড়া–বিবাদ ও মতানৈক্যের ফায়সালা করাও তাঁরই কাজ। যারা এ বিষয়টিকে আখেরাতের জন্য নির্দিষ্ট বলে মনে করে তারা ভুল করে। আল্লাহর এই সার্বভৌম মর্যাদা যে এই দুনিয়ার জন্য নয়, শুধু মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য তার কোন প্রমাণ নেই। একইভাবে যারা তাঁকে শুধু এই দুনিয়ার আকীদা–বিশ্বাস এবং কতিপয় ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করে তারাও ভুল করে। কুরআন মজীদের ভাষা ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক। তাতে সব রকম বিবাদ ও মতানৈক্যের ক্ষেত্রে তা একমাত্র আল্লাহকেই ফায়সালা করার প্রকৃত অধিকারী বলে পরিষ্কার ও সুনিশ্চিতভাবে আখ্যায়িত করছে। সেই অনুসারে আল্লাহ যেমন আখেরাতের مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (প্রতিদান দিবসের মালিক) তেমনি এই পৃথিবীরও اَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ (সব শাসকের চাইতে বড় শাসক)। আকীদাগত মতানৈক্যের ক্ষেত্রে হক কোনটি আর বাতিল কোনটি সে বিষয়ের ফায়সালা যেমন তিনিই করবেন তেমনি আইনগত ক্ষেত্রেও তিনিই ফায়সালা করবেন মানুষের জন্য কোন্‌টি পবিত্র আর কোন্‌টি অপবিত্র, কোনটি বৈধ ও হালাল আর কোন্‌টি হারাম ও মাকরূহ? নৈতিকতার ক্ষেত্রে অন্যায় ও অশোভন কি আর ন্যায় ও শোভনীয় কি? পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন্‌টি কার প্রাপ্য আর কোনটি প্রাপ্য নয়? জীবনাচার, সভ্যতা, রাজনীতি এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে কোন্ পন্থা ও পদ্ধতি বৈধ আর কোনটি ভুল ও অবৈধ তাঁর সবই তিনি স্থির করবেন। এর ওপর ভিত্তি করেই তো আইনের মূলনীতি হিসেবে কুরআন মজীদে একথা বিধিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে যে,

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ – النساء : ٥٩

(যদি কোন ব্যাপারে তোমরা বিবাদে জড়িয়ে পড়ো তাহলে সেটিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে ফিরিয়ে দাও)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ – الاحزب : ٣٦

(আল্লাহ ও তাঁর রসূল যখন কোন ব্যাপারে ফায়সালা করে দেন তখন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীর জন্য সে ব্যাপারে কোন ইখতিয়ার থাকে না) এবং

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَآءَ – الاعراف : ٣

(তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরণ করো এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করো না।)

তাছাড়া যে প্রসঙ্গে এ আয়াত এসেছে তার মধ্যেও এটি আরো একটি অর্থ প্রকাশ করছে। সেটি হচ্ছে আল্লাহ শুধু মতবিরোধসমূহের মীমাংসা করার আইনগত অধিকারীই নন, যা মানা বা না মানার ওপর ব্যক্তির কাফের বা মু'মিন হওয়া নির্ভরশীল। বরং প্রকৃতপক্ষে কার্যত তিনিই হক ও বাতিলের ফায়সালা করছেন, যে কারণে বাতিল ও তার পূজারীরা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয় এবং হক ও তার অনুসারীরা সফলকাম হয়। পৃথিবীর মানুষ যে ফায়সালা কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব হচ্ছে বলে যতই মনে করুক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। পরবর্তী ২৪ আয়াতেও এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে এবং এর আগেও কুরআন মজীদের কতিপয় স্থানে আলোচিত হয়েছে। (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আর রা'দ, টীকা ৩৪-৬০; সূরা ইবরাহীম, টীকা ২৬-৩৪; সূরা বনী ইসরাঈল, টীকা ১০০; সূরা আম্বিয়া ১৫, ১৮-৪৪, ৪৬)

১৫. অর্থাৎ যিনি মতবিরোধসমূহের ফায়সালাকারী আসল শাসক।

১৬. এ দু'টি ক্রিয়াপদ। এর একটি অতীতকাল সূচক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে এবং অপরটি বর্তমান ও ভবিষ্যতকাল সূচক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে, যার মধ্যে চলমানতা বা নিরবচ্ছিন্নতার অর্থ বিদ্যমান। অতীতকাল সূচক শব্দে বলা হয়েছে ঃ আমি তাঁর ওপরেই ভরসা করেছি। "অর্থাৎ একবার আমি চিরদিনের জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, মৃত্যু পর্যন্ত আমাকে তাঁরই সাহায্য, তাঁরই দিক নির্দেশনা, তাঁরই আশ্রয় ও সংরক্ষণ এবং তাঁরই সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করতে হবে। অতপর বর্তমান ও ভবিষ্যত সূচক ক্রিয়াপদটিতে বলা হয়েছে ঃ আমি তাঁর কাছেই ফিরে যাই।" অর্থাৎ আমার জীবনে যা-ই ঘটে সে ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছেই ফিরে যাই। কোন বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্ট বা অসুবিধার সম্মুখীন হলে আর কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। কোন বিপদ আপতিত হলে তাঁর আশ্রয় তালাশ করি এবং তাঁর নিরাপত্তার ওপর নির্ভর করি। কোন সমস্যা দেখা দিলে তাঁর কাছে দিক নির্দেশনা চাই এবং তাঁরই শিক্ষা ও নির্দেশনামায় সে সমস্যার সমাধান ও সিদ্ধান্ত অনুসন্ধান করি। আর কোন বিবাদের মুখোমুখি হলে তাঁরই দিকে চেয়ে থাকি। কেননা, তিনিই তার চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এ বিষয়ে তিনি যে ফায়সালা করবেন সেটিই হবে সঠিক ও ন্যায়সংগত।

১৭. মূল আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ "কোন জিনিসই তাঁর মত জিনিসের অনুরূপও নয়।" তাফসীরকার ও ভাষাবিদদের কেউ কেউ বলেন ঃ এ বাক্যাংশে مثل শব্দটির কাফ বর্নটি (সামঞ্জস্যের অর্থ প্রকাশক হরফ) সংযোজন বাকধারা হিসেবে করা হয়েছে। বক্তব্যকে জোরালো করাই এর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং আরবে এ ধরনের বর্ণনাভঙ্গি প্রচলিত। যেমন ঃ কবি বলেন ঃ وقتلى كمثل جذوع النخل অন্য আরেকজন কবি বলেছেন ঃ ما ان كمثلهم فى الناس من احد অপর কিছু সংখ্যক লোকের মত হলো ঃ "তাঁর মত কেউ নেই" বলার চেয়ে তাঁর মত জিনিসের অনুরূপও কেউ নেই বলার মধ্যে অতিশয়তার অর্থ আছে। অর্থাৎ আল্লাহর মত তো দূরের কথা

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۭ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ۭ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاۗءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ۝١٣

তিনি তোমাদের জন্য দীনের সেই সব নিয়ম-কানুন নির্ধারিত করেছেন যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন এবং (হে মুহাম্মাদ) যা এখন আমি তোমার কাছে অহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি। আর যার আদেশ দিয়েছিলাম আমি ইবরাহীম (আ) মূসা (আ) ও ঈসাকে (আ)। তার সাথে তাগিদ করেছিলাম এই বলে যে, এ দীনকে কায়েম করো এবং এ ব্যাপারে পরস্পর ভিন্ন হয়ো না।[২০] (হে মুহাম্মাদ) এই কথাটিই এসব মুশরিকের কাছে অত্যন্ত অপসন্দনীয় যার দিকে তুমি তাদের আহবান জানাচ্ছো। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আপন করে নেন এবং তিনি তাদেরকেই নিজের কাছে আসার পথ দেখান যারা তাঁর প্রতি রুজু করে।[২১]

অসম্ভব হলেও যদি আল্লাহর সদৃশ কোন বস্তু আছে বলে ধরে নেয়া যায়, তাহলে সেই সদৃশের অনুরূপ কোন জিনিসও থাকতো না।

১৮. অর্থাৎ একই সাথে গোটা বিশ্ব জাহানের সবারই কথা শুনছেন এবং সব কিছুই দেখছেন।

১৯. শুধু একমাত্র আল্লাহই কেন প্রকৃত অভিভাবক, তাঁর ওপর নির্ভর করাই যুক্তিযুক্ত ও সঠিক কেন এবং কেন শুধু তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে, এগুলোই তার যুক্তি। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নামল, টীকা ৭৩-৮৩; সূরা আর রূম টীকা ২৫-৩১)

২০. প্রথম আয়াতে যে কথাটি বলা হয়েছিলো এখানে সেই কথাটিই আরো বেশী পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নন। নবী-রসূলদের মধ্যে কেউই কোন নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না। প্রথম থেকেই সমস্ত নবী-রসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে একই দীন পেশ করে আসছেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সেই একই দীন পেশ করছেন। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম হযরত নূহের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মহাপ্লাবনের পর তিনিই ছিলেন বর্তমান মানব গোষ্ঠীর সর্বপ্রথম পয়গম্বর। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি শেষ নবী। তারপর হযরত ইবরাহীমের (আ) নাম উল্লেখ করা হয়েছে, আরবের লোকেরা যাঁকে তাদের নেতা

বলে মানতো। সর্বশেষে হযরত মূসা এবং ঈসার কথা বলা হয়েছে যাঁদের সাথে ইহুদী ও খৃষ্টানরা তাদের ধর্মকে সম্পর্কিত করে থাকে। এর উদ্দেশ্য এ নয় যে, শুধু এই পাঁচজন নবীকেই উক্ত দীনের হিদায়াত দান করা হয়েছিলো। বরং একথা বলে দেয়াই এর উদ্দেশ্য যে, পৃথিবীতে যত নবী-রসূলই আগমন করেছেন তাঁরা সবাই একই দীন নিয়ে এসেছেন। নমুনা হিসেবে এমন পাঁচজন মহান নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে যাঁদের মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষ সুবিখ্যাত আসমানী শরীয়তসমূহ লাভ করেছে।

যেহেতু এ আয়াতটি দীন ও দীনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোকপাত করেছে। তাই সে বিষয়ে ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তাকে বুঝে নেয়া আবশ্যক ঃ

বলা হয়েছে شَرَعَ لَكُمْ "তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন।" شَرَعَ শব্দের আভিধানিক অর্থ রাস্তা তৈরী করা এবং এর পারিভাষিক অর্থ পদ্ধতি, বিধি ও নিয়ম-কানুন রচনা করা। এই পারিভাষিক অর্থ অনুসারে আরবী ভাষায় تشريع শব্দটি আইন প্রণয়ন(Legislation) شرع এবং شريعت শব্দটি আইন (Law) এবং شارع শব্দটি আইন প্রণেতার (Lawgiver) সমার্থক বলে মনে করা হয়। আল্লাহই বিশ্ব জাহানের সব কিছুর মালিক, তিনিই মানুষের প্রকৃত অভিভাবক এবং মানুষের মধ্যে যে বিষয়েই মতভেদ হোক না কেন তার ফায়সালা করা তাঁরই কাজ। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের যেসব মৌলিক সত্য বর্ণিত হয়েছে তারই স্বাভাবিক ও যৌক্তিক পরিণতি হচ্ছে আল্লাহর এই আইন রচনা। এখন মৌলিকভাবে যেহেতু আল্লাহই মালিক, অভিভাবক ও শাসক, তাই মানুষের জন্য আইন ও বিধি রচনার এবং মানুষকে এই আইন ও বিধি দেয়ার অনিবার্য অধিকার তাঁরই। আর এভাবে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন।

পরে বলা হয়েছে مِنَ الدِّيْنِ 'দীন' থেকে শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী এর অনুবাদ করেছেন আইন থেকে। অর্থাৎ আল্লাহ শরীয়ত নির্ধারণ করেছেন আইনের পর্যায়ভুক্ত। আমরা ইতিপূর্বে সূরা যুমারে ৩নং টীকায় دِيْنٌ শব্দের যে ব্যাখ্যা করেছি তা যদি সামনে থাকে তাহলে একথা বুঝতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, দীন অর্থই কারো নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে তার আদেশ-নিষেধের আনুগত্য করা। এ শব্দটি যখন পন্থা বা পদ্ধতি অর্থে ব্যবহার করা হয় তখন তার অর্থ হয় এমন পদ্ধতি যাকে ব্যক্তি অবশ্য অনুসরণীয় পদ্ধতি এবং তার যার নির্ধারণকারীকে অবশ্য অনুসরণযোগ্য বলে মেনে চলে। এ কারণে আল্লাহর নির্ধারিত এই পদ্ধতিকে দীনের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন আইন বলার পরিষ্কার অর্থ হলো এটা শুধু সুপারিশ (Rccomendation) ও ওয়াজ-নসীহতের মর্যাদা সম্পন্ন নয়। বরং তা বান্দার জন্য তার মালিকের অবশ্য অনুসরণীয় আইন, যার অনুসরণ না করার অর্থ বিদ্রোহ করা। যে ব্যক্তি তা অনুসরণ করে না সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আধিপত্য, সার্বভৌমত্ব এবং দাসত্ব অস্বীকার করে।

এর পরে বলা হয়েছে, দীনের বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত এ আইনই সেই আইন যার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো নূহ, ইবরাহীম ও মূসা আলাইহিমুস সালামকে এবং এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সে নির্দেশই দান করা হয়েছে। এ বাণী থেকে কয়েকটি বিষয় প্রতিভাত হয়। এক—আল্লাহ এ বিধানকে সরাসরি সব মানুষের কাছে পাঠাননি, বরং মাঝে মধ্যে যখনই তিনি প্রয়োজন মনে করেছেন এক ব্যক্তিকে তাঁর রসূল মনোনীত করে

এ বিধান তার কাছে সোপর্দ করেছেন। দুই—প্রথম থেকেই এ বিধান এক ও অভিন্ন। এমন নয় যে, কোন জাতির জন্য কোন একটি দীন নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং অন্য সময় অপর এক জাতির জন্য তা থেকে ভিন্ন ও বিপরীত কোন দীন পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে একাধিক দীন আসেনি। বরং যখনই এসেছে এই একটি মাত্র দীনই এসেছে। তিন—আল্লাহর আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব মানার সাথে সাথে যাদের মাধ্যমে এ বিধান পাঠানো হয়েছে তাদের রিসালাত মানা এবং যে অহীর দ্বারা এ বিধান বর্ণনা করা হয়েছে তা মেনে নেয়া এ দীনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তির দাবীও তাই। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত তা আল্লাহর তরফ থেকে বিশ্বাসযোগ্য (Authentic) হওয়া সম্পর্কে ব্যক্তি নিশ্চিত না হবে ততক্ষণ সে এই আনুগত্য করতেই পারে না।

অতপর বলা হয়েছে, এসব নবী-রসূলদেরকে দীনের বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত এই বিধান দেয়ার সাথে তাগিদসহ এ নির্দেশও দেয়া হয়েছিলো যে, أَقِيمُوا الدِّينَ শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী এ আয়াতাংশের অনুবাদ করেছেন "দীনকে কায়েম করো" আর শাহ রফিউদ্দিন ও শাহ আবদুল কাদের অনুবাদ করেছেন, "দীনকে কায়েম রাখো" এই দু'টি অনুবাদই সঠিক। اقامت শব্দের অর্থ কায়েম করা ও কায়েম রাখা উভয়ই। নবী-রসূলগণ আলাইহিমুস সালাম এ দু'টি কাজ করতেই আদিষ্ট ছিলেন। তাঁদের প্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল, যেখানে এই দীন কায়েম নেই সেখানে তা কায়েম করা। আর দ্বিতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল যেখানে তা কায়েম হবে কিংবা পূর্ব থেকেই কায়েম আছে সেখানে তা কায়েম রাখা। একথা সুস্পষ্ট যে কোন জিনিসকে কায়েম রাখার প্রশ্ন তখনই আসে যখন তা কায়েম থাকে। অন্যথায় প্রথমে তা কায়েম করতে হবে, তারপর তা যাতে কায়েম থাকে সে জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

এই পর্যায়ে আমাদের সামনে দু'টি প্রশ্ন দেখা দেয়। একটি হলো, দীন কায়েম করার অর্থ কি? দ্বিতীয়টি হলো, দীন অর্থই বা কি যা কায়েম করার এবং কায়েম রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে? এ দু'টি বিষয়ও ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার।

কায়েম করা কথাটি যখন কোন বস্তুগত বা দেহধারী জিনিসের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ হয় উপবিষ্টকে উঠানো। যেমন কোন মানুষ বা জন্তুকে উঠানো। কিংবা পড়ে থাকা জিনিসকে উঠিয়ে দাঁড় করানো। যেমন বাঁশ বা কোন থাম তুলে দাঁড় করানো অথবা কোন জিনিসের বিক্ষিপ্ত অংশগুলোকে একত্র করে সমুন্নত করা। যেমন ঃ কোন খালি জায়গায় বিল্ডিং নির্মাণ করা। কিন্তু যা বস্তুগত জিনিস নয়, অবস্তুগত জিনিস তার জন্য যখন কায়েম করা শব্দটা ব্যবহার করা হয় তখন তার অর্থ শুধু সেই জিনিসের প্রচার করাই নয়, বরং তা যথাযথভাবে কার্যে পরিণত করা, তার প্রচলন ঘটানো এবং কার্যত চালু করা। উদাহরণ স্বরূপ যখন আমরা বলি, অমুক ব্যক্তি তার রাজত্ব কায়েম করেছে তখন তার অর্থ এ হয় না যে, সে তার রাজত্বের দিকে আহবান জানিয়েছে। বরং তার অর্থ হয়, সে দেশের লোকদেরকে নিজের অনুগত করে নিয়েছে এবং সরকারের সকল বিভাগে এমন সংগঠন ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করেছে যে, দেশের সমস্ত ব্যবস্থাপনা তার নির্দেশ অনুসারে চলতে শুরু করেছে। অনুরূপ যখন আমরা বলি, দেশে আদালত কায়েম আছে তখন তার অর্থ হয় ইনসাফ করার জন্য বিচারক নিয়োজিত আছেন। তিনি মোকদ্দমা সমূহের শুনানি করছেন এবং ফায়সালা দিচ্ছেন। একথার এ অর্থ কখনো হয় না যে, ন্যায়

বিচার ও ইনসাফের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা খুব ভালভাবে করা হচ্ছে এবং মানুষ তা সমর্থন করছে। অনুরূপভাবে কুরআন মজীদে যখন নির্দেশ দেয়া হয়, নামায কায়েম করো তখন তার অর্থ কুরআন মজীদের দাওয়াত ও তাবলীগ নয়, বরং তার অর্থ হয় নামাযের সমস্ত শর্তাবলী পূরণ করে শুধু নিজে আদায় করা না বরং এমন ব্যবস্থা করা যেন ঈমানদারদের মধ্যে তা নিয়মিত প্রচলিত হয়। মসজিদের ব্যবস্থা থাকে, গুরুত্বের সাথে জুমআ ও জামা'য়াত ব্যবস্থা হয়, সময়মত আযান দেয়া হয়, ইমাম ও খতিব নির্দিষ্ট থাকে এবং মানুষের মধ্যে সময়মত মসজিদে আসা ও নামায আদায় করার অভ্যাস সৃষ্টি হয়। এই ব্যাখ্যার পরে একথা বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয় যে, নবী–রসূল আলাইহিমুস সালামদের যখন এই দীন কায়েম করার ও রাখার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, তার অর্থ শুধু এতটুকুই ছিল না যে, তাঁরা নিজেরাই কেবল এ দীনের বিধান মেনে চলবেন এবং অন্যদের কাছে তার তাবলীগ বা প্রচার করবেন, যাতে মানুষ তার সত্যতা মেনে নেয়। বরং তার অর্থ এটাও যে মানুষ যখন তা মেনে নেবে তখন আরো অগ্রসর হয়ে তাদের মাঝে পুরো দীনের প্রচলন ঘটাবেন, যাতে সে অনুসারে কাজ আরম্ভ হতে এবং চলতে থাকে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে দাওয়াত ও তাবলীগ এ কাজের অতি আবশ্যিক প্রাথমিক স্তর। এই স্তর ছাড়া দ্বিতীয় স্তর আসতেই পারে না। কিন্তু প্রত্যেক বিবেক–বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিই বুঝতে পারবেন এই নির্দেশের মধ্যে দীনের দাওয়াত ও তাবলীগকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানানো হয়নি, দীনকে কায়েম করা ও কায়েম রাখাকেই উদ্দেশ্য বানানো হয়েছে। দাওয়াত ও তাবলীগ অবশ্যই এ উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নয়। নবী–রসূলদের মিশনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দাওয়াত ও তাবলীগ করো একথা বলা একেবারেই অবান্তর।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্নটি দেখুন। কেউ কেউ দেখলেন, যে দীন কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা সমানভাবে সমস্ত নবী–রসূলের দীন। কিন্তু তাদের সবার শরীয়ত ছিল ভিন্ন ভিন্ন। যেমন আল্লাহ কুরআন মজীদে বলেছেন لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا "আমি তোমাদের প্রত্যেক উম্মতের জন্য স্বতন্ত্র শরীয়ত এবং একটি পদ্ধতি নির্ধারিত করে দিয়েছি।" তাই তারা ধরে নিয়েছে যে, এ দীন অর্থ নিশ্চয়ই শরীয়তের আদেশ–নিষেধ ও বিধি–বিধান নয়, এর অর্থ শুধু তাওহীদ, আখেরাত, কিতাব ও নবুওয়াতকে মানা এবং আল্লাহর ইবাদাত করা। কিংবা বড় জোর তার মধ্যে শরীয়তের সেই সব বড় বড় নৈতিক নীতিমালাও অন্তর্ভুক্ত যা সমস্ত দীনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

কিন্তু এটি একটি অপরিপক্ক মত। শুধু বাহ্যিকভাবে দীনের ঐক্য ও শরীয়তসমূহের বিভিন্নতা দেখে এ মত পোষণ করা হয়েছে। এটি এমন একটি বিপজ্জনক মত যে যদি তা সংশোধন করা না হয় তাহলে তা অগ্রসর হয়ে দীন ও শরীয়তের মধ্যে এমন একটি পার্থক্যের সূচনা করবে যার মধ্যে জড়িয়ে সেন্ট পল শরীয়ত বিহীন দীনের মতবাদ পেশ করেছিলেন এবং সাইয়েদেনা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উম্মতকে ধ্বংস ও বিপর্যস্ত করেছিলেন। কারণ, শরীয়ত যখন দীন থেকে স্বতন্ত্র একটি জিনিস আর নির্দেশ দেয়া হয়েছে শুধু দীন কায়েমের জন্য, শরীয়ত কায়েমের জন্য নয় তখন মুসলমানরাও খৃষ্টানদের মত অবশ্যই শরীয়তকে গুরুত্বহীন ও তার প্রতিষ্ঠাকে সরাসরি উদ্দেশ্য মনে না করে উপেক্ষা করবে এবং দীনের শুধু ঈমান সম্পর্কিত বিষয়গুলো ও বড় বড় নৈতিক

নীতিসমূহ নিয়েই বসে থাকবে। এভাবে অনুমানের ওপর নির্ভর করে دين এর অর্থ নিরূপণ করার পরিবর্তে কেনই বা আমরা আল্লাহর কিতাব থেকেই একথা জেনে নিচ্ছি না যে, যে দীন কায়েম করার নির্দেশ এখানে দান করা হয়েছে তার অর্থ কি শুধু ঈমান সম্পর্কিত বিষয়সমূহ এবং কতিপয় বড় বড় নৈতিক মূলনীতি না শরীয়তের অন্যান্য আদেশ নিষেধও? কুরআন মজীদ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি কুরআন মজীদে যেসব জিনিসকে দীনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে নিম্নোক্ত জিনিসগুলোও আছে ঃ

এক ঃ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ – البينة : ٥

"তাদেরকে এ ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা একনিষ্ঠ চিত্তে দীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে কেবল তাঁরই ইবাদাত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে এটাই সঠিক দীন।"

এ আয়াত থেকে জানা যায়, নামায এবং রোযা এই দীনের অন্তর্ভুক্ত। অথচ নামায ও রোযার আহকাম বিভিন্ন শরীয়তে বিভিন্ন রকম ছিল। পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে বর্তমানের মত নামাযের এই একই নিয়ম-কানুন, একই খুটি-নাটি বিষয়, একই সমান রাকআত, একই কিবলা, একই সময় এবং এই একই বিধি-বিধান ছিল একথা কেউ বলতে পারে না। অনুরূপ যাকাত সম্পর্কেও কেউ এ দাবী করতে পারে না যে, সমস্ত শরীয়তে বর্তমানের ন্যায় যাকাতের এই একই নিসাব, একই হার এবং আদায় ও বন্টনের এই একই বিধিনিষেধ ছিল। কিন্তু শরীয়তের ভিন্নতা সত্ত্বেও আল্লাহ এ দুটি জিনিসকে দীনের মধ্যে গণ্য করেছেন।

দুই ঃ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ....
اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ..... – المائده : ٣

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহকৃত জন্তু, দমবন্ধ হয়ে, আঘাত প্রাপ্ত হয়ে, ওপর থেকে পড়ে কিংবা ধাক্কা খেয়ে মরা জন্তু অথবা যে জন্তুকে কোন হিংস্র প্রাণী ক্ষতবিক্ষত করেছে কিন্তু তাকে তোমরা জীবিত পেয়ে যবেহ করেছো অথবা যে জন্তুকে কোন আস্তানায় যবেহ করা হয়েছে। তাছাড়া লটারীর মাধ্যমে নিজের ভাগ্য সম্পর্কে অবহিত হতে চাওয়াকেও তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। এসবই গুনাহর কাজ। আজ কাফেররা তোমাদের দীন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গিয়েছে। তাই তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণতা দান করলাম।"

এ থেকে জানা গেল যে, শরীয়তের এসব হুকুম আহকামও দীনের মধ্যে শামিল।

তিন ঃ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ – (التوبة : ٢٩)

"তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যারা আল্লাহ ও আখেরাত দিবসে বিশ্বাস করে না, আর আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা কিছু হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দীনকে নিজের দীন হিসেবে গ্রহণ করে না।"

এ থেকে জানা যায়, আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল যেসব আদেশ-নিষেধ দিয়েছেন তা মানা ও তার আনুগত্য করাও দীন।

চার ঃ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ – النور: ٢

"ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ উভয়কে একশটি করে বেত্রাঘাত করো। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করো তাহলে দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি মায়া-মমতা ও আবেগ যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে।"

مَاكَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ – يوسف : ٧٦

"বাদশার দীন অনুসারে ইউসুফ তার ভাইকে পাকড়াও করতে পারতো না।"

এ থেকে জানা গেলো, ফৌজদারী আইনসমূহও দীনের মধ্যে শামিল। ব্যক্তি যদি আল্লাহর দেয়া ফৌজদারী আইন অনুসারে চলে তাহলে সে আল্লাহর দীনের অনুসারী আর যদি বাদশার দীন অনুসারে চলে তাহলে বাদশাহর দীনের অনুসারী।

এ চারটি উদাহরণই এমন যেখানে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধানকে সুস্পষ্ট ভাষায় দীন বলা হয়েছে। কিন্তু গভীর মনোযোগ সহকারে দেখলে বুঝা যায়, আরো যেসব গোনাহর কারণে আল্লাহ জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন (যেমন ব্যভিচার, সুদখোরী, মু'মিন বান্দাকে হত্যা, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ, অন্যায়ভাবে মানুষের অর্থ নেয়া ইত্যাদি) যেসব অপরাধকে আল্লাহর শাস্তির কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে (যেমন ঃ লূতের কওমের মত পাপাচার এবং পারস্পরিক লেনদেনে শু'আইব আলাইহিস সালামের কওমের মত আচরণ) তার পথ রুদ্ধ করার কাজও অবশ্যই দীন হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। কারণ, দীন যদি জাহান্নাম ও আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করার জন্য না এসে থাকে তাহলে আর কিসের জন্য এসেছে। অনুরূপ শরীয়তের যেসব আদেশ-নিষেধ লংঘনকে চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসের কারণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে সেই সব আদেশ-নিষেধ ও দীনের আংশ হওয়া উচিত। যেমন উত্তরাধিকারের বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ – النساء : ١٤

"যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হবে এবং আল্লাহর সীমাসমূহ লংঘন করবে আল্লাহ তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব।"

অনুরূপ আল্লাহ যেসব জিনিসের হারাম হওয়ার কথা কঠোর ভাষায় অকাট্যভাবে বর্ণনা করেছেন, যেমন ঃ মা, বোন ও মেয়ের সাথে বিয়ে, মদ্যপান, চুরি, জুয়া এবং মিথ্যা

সাক্ষ্যদান। এসব জিনিসের হারাম হওয়ার নির্দেশকে যদি "ইকামাতে দীন" বা দীন প্রতিষ্ঠার মধ্যে গণ্য করা না হয় তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ কিছু অপ্রয়োজনীয় আদেশ-নিষেধও দিয়েছেন যার বাস্তবায়ন তাঁর উদ্দেশ্য নয়। অনুরূপ আল্লাহ যেসব কাজ ফরয করেছেন, যেমন ঃ রোযা ও হজ্জ—তাও দীন প্রতিষ্ঠার পর্যায় থেকে এই অজুহাতে বাদ দেয়া যায় না যে, রমযানের ৩০ রোযা পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে ছিল না এবং কা'বায় হজ্জ করা কেবল সেই শরীয়তেই ছিল যা ইবরাহীমের (আ) বংশধারার ইসমাঈলী শাখাকে দেয়া হয়েছিলো।

প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির কারণ হলো, ভিন্ন উদ্দেশ্যে لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا (আমি তোমাদের প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি শরীয়ত ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছি) আয়াতের এ অর্থ করা যে, যেহেতু প্রত্যেক উম্মতের জন্য শরীয়ত ছিল ভিন্ন কিন্তু কায়েম করতে বলা হয়েছে দীনকে যা সমানভাবে সব নবী-রসূলের দীন ছিল, তাই দীন কায়েমের নির্দেশের মধ্যে শরীয়ত অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ এ আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সূরা মায়েদার যে স্থানে এ আয়াতটি আছে তার পূর্বাপর অর্থাৎ ৪১ আয়াত থেকে ৫০ আয়াত পর্যন্ত যদি কেউ মনযোগ সহকারে পাঠ করে তাহলে সে জানতে পারবে আয়াতের সঠিক অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ যে নবীর উম্মতকে যে শরীয়ত দিয়েছিলেন সেটিই ছিল তাদের জন্য দীন এবং সেই নবীর নবুওয়াত কালে সেটিই কায়েম করা কাম্য ও উদ্দেশ্য ছিল। এখন যেহেতু হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের যুগ, তাই উম্মতে মুহাম্মাদীকে যে শরীয়ত দান করা হয়েছে এ যুগের জন্য সেটিই দীন এবং সেটিকে প্রতিষ্ঠিত করাই দীনকে প্রতিষ্ঠিত করা। এরপর থাকে ঐ সব শরীয়তের পরস্পর ভিন্নতা। এ ভিন্নতার তাৎপর্য এ নয় যে, আল্লাহর প্রেরিত শরীয়তসমূহ পরস্পর বিরোধী ছিল। বরং এর সঠিক তাৎপর্য হলো, অবস্থা ও পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ঐ সব শরীয়তের খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছু পার্থক্য ছিল। উদাহরণ স্বরূপ নামায ও রোযার কথাই ধরুন। সকল শরীয়তেই নামায কায়েম ফরয ছিল কিন্তু সব শরীয়তের কিবলা এক ছিল না। তাছাড়া নামাযের সময়, রাকআতের সংখ্যা এবং বিভিন্ন অংশে কিছুটা পার্থক্য ছিল। অনুরূপ রোযা সব শরীয়তেই ফরয ছিল। কিন্তু রমযানের ৩০ রোযা অন্যান্য শরীয়তে ছিল না। এ থেকে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঠিক নয় যে, নামায ও রোযা 'ইকামাতে দীন' বা দীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত ঠিকই, কিন্তু নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নামায পড়া এবং নির্দিষ্ট কোন সময়ে রোযা রাখা ইকামতে দীনের নির্দেশ বহির্ভূত। বরং এর সঠিক অর্থ হলো, প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্য তৎকালীন শরীয়তে নামায ও রোযা আদায়ের জন্য যে নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছিলো সেই সময়ে সেই পদ্ধতি অনুসারে নামায পড়া ও রোযা রাখাই ছিল দীন কায়েম করা। বর্তমানেও এসব ইবাদতের জন্য শরীয়তে মুহাম্মাদীতে যে নিয়ম-পদ্ধতি দেয়া হয়েছে সে মোতাবেক এসব ইবাদত বন্দেগী করা 'ইকামাতে দীন'। এ দু'টি দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে শরীয়তের অন্যসব আদেশ-নিষেধও বিচার করুন।

যে ব্যক্তি চোখ খুলে কুরআন মজীদ পড়বে সে স্পষ্ট দেখতে পাবে যে, এ গ্রন্থ তার অনুসারীদেরকে কুফরী ও কাফেরদের আজ্ঞাধীন ধরে নিয়ে বিজিতের অবস্থানে থেকে ধর্মীয় জীবন যাপন করার কর্মসূচী দিচ্ছে না, বরং প্রকাশ্যে নিজের শাসন ও কর্তৃত্ব

প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে, চিন্তাগত, নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আইনগত ও রাজনৈতিক ভাবে বিজয়ী করার লক্ষ্যে জীবনপাত করার জন্য অনুসারীদের কাছে দাবী করছে এবং তাদেরকে মানব জীবনের সংস্কার ও সংশোধনের এমন একটি কর্মসূচী দিচ্ছে যার একটা বৃহদাংশ কেবল তখনই বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে যদি সরকারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ঈমানদারদের হাতে থাকে। এ কিতাব তার নাযিল করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলে ঃ

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرٰكَ اللّٰهُ

-النساء : ١٠٥

"হে নবী, আমি ন্যায় ও সত্যসহ তোমার কাছে এই কিতাব নাযিল করেছি যাতে আল্লাহ তোমাকে যে আলো দেখিয়েছেন তার সাহায্যে তুমি মানুষের মধ্যে ফায়সালা করো।"

এই কিতাবে যাকাত আদায় ও বন্টনের যে নির্দেশাবলী দেয়া হয়েছে সে জন্য তা সুস্পষ্টভাবে এমন একটি সরকারের ধারণা পেশ করেছে যে, একটি নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে যাকাত আদায় করে হকদারদের কাছে পৌছানোর দায়িত্ব নেবে (আত তাওবা ৬০ ও ১০৩ আয়াত)। এই কিতাবে সুদ বন্ধ করার যে আদেশ দেয়া হয়েছে এবং সুদখোরী চালু রাখার কাজে তৎপর লোকদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। (আল বাকারা ২৭৫-২৭৯ আয়াত) তা কেবল তখনই বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে যখন দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে ঈমানদারদের হাতে থাকবে। এই কিতাবে হত্যাকারীর থেকে কিসাস গ্রহণের নির্দেশ (আল বাকারা ১৭৮ আয়াত), চুরির জন্য হাত কাটার নির্দেশ (আল মায়েদা ৩৮ আয়াত) এবং ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের জন্য হদ জারী করার নির্দেশ একথা ধরে নিয়ে দেয়া হয়নি যে, এসব আদেশ মান্যকারীদেরকে কাফেরদের পুলিশ ও বিচারালয়ের অধীন থাকতে হবে। এই কিতাবে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নির্দেশ (আল বাকারা-১৯০-২১৬ আয়াত) একথা মনে করে দেয়া হয়নি যে, এ দীনের অনুসারীরা কাফের সরকারের বাহিনীতে সৈন্য ভর্তি করে এ নির্দেশ পালন করবে। এ কিতাবে আহলে কিতাবদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায়ের নির্দেশ (আত তাওবা ২৯ আয়াত) একথা ধরে নিয়ে দেয়া হয়নি যে, মুসলমানরা কাফেরদের অধীন থেকে তাদের থেকে জিযিয়া আদায় করে এবং তাদের রক্ষার দায়িত্ব নেবে। এ ব্যাপারটি শুধু মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। দৃষ্টিশক্তির অধিকারীরা মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে স্পষ্টতই দেখতে পাবেন, প্রথম থেকেই যে পরিকল্পনা ছিল তা ছিলো দীনের বিজয় ও কর্তৃত্ব স্থাপন, কুফরী সরকারের অধীনে দীন ও দীনের অনুসারীদের জিম্মি হয়ে থাকা নয়। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা বানী-ইসরাঈল, আয়াত ৭৬ ও ৮০; সূরা কাসাস, আয়াত ৮৫-৮৬; সুরা রূম, আয়াত ১ থেকে ৬; সূরা আস সাফফাত, আয়াত ১৭১ থেকে ১৭৯, (টীকা ৯৩-৯৪) এবং সূরা সোয়াদ, ভূমিকা ও ১১ আয়াত ১২ টীকা সহ।

ব্যাখ্যার এই ভ্রান্তি যে জিনিসটির সাথে সবচেয়ে বেশী সাংঘর্ষিক তা হচ্ছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের বিরাট কাজ। যা তিনি ২৩ বছরের রিসালাত যুগে সমাধা করেছেন। তিনি তাবলীগ ও তলোয়ার উভয়টির সাহায্যেই যে গোটা আরবকে

বশীভূত করেছিলেন এবং বিস্তারিত শরীয়ত বা বিধি-বিধানসহ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় আদর্শ কায়েম করেছিলেন যা আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদাত থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড, সামাজিক চরিত্র, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি, রাজনীতি ও ন্যায় বিচার এবং যুদ্ধ ও সন্ধিসহ জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগে পরিব্যাপ্ত ছিল তা কেনা জানে? এ আয়াত অনুসারে নবী (সা)সহ সমস্ত নবী-রসূলকে ইকামাতে দীনের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো নবীর (সা) এসব কাজকে যদি তার ব্যাখ্যা বলে গ্রহণ করা না হয় তাহলে তার কেবল দু'টি অর্থই হতে পারে। হয় নবীর (সা) বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আরোপ করতে হবে (মা'আযাল্লাহ) যে, তিনি আদিষ্ট হয়েছিলেন শুধু ঈমান ও নৈতিক চরিত্র সম্পর্কিত বড় বড় মূলনীতিসমূহের তাবলীগ ও দাওয়াতের জন্য কিন্তু তা লংঘন করে তিনি নিজের পক্ষ থেকেই একটি সরকার কায়েম করেছিলেন, যা অন্যসব নবী-রসূলদের শরীয়ত-সমূহের সাধারণ নীতিমালা থেকে ভিন্নও ছিল অতিরিক্তও ছিল। নয়তো আল্লাহর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আরোপ করতে হবে যে, তিনি সূরা শূরায় উপরোক্ত ঘোষণা দেয়ার পর নিজেই তাঁর কথা থেকে সরে পড়েছেন এবং নিজের নবীর নিকট থেকে ঐ সূরায় ঘোষিত "ইকামাতে দীনের" চেয়ে কিছুটা বেশী এবং ভিন্ন ধরনের কাজই শুধু নেননি, বরং উক্ত কাজকে পূর্ণতা লাভের পর, নিজের প্রথম ঘোষণার পরিপন্থী দ্বিতীয় এই ঘোষণাটিও দিয়েছেন যে, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ (আজ আমি তোমাদের দীনকে পূর্ণতা দান করলাম) নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা। এ দুটি অবস্থা ছাড়া তৃতীয় এমন কোন অবস্থা যদি থাকে যে ক্ষেত্রে ইকামাতে দীনের এই ব্যাখ্যাও বহাল থাকে এবং আল্লাহ কিংবা তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও না আসে তাহলে আমরা অবশ্যই তা জানতে চাইবো।

দীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়ার পর আল্লাহ এ আয়াতে সর্বশেষ যে কথা বলেছেন তা হচ্ছে وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ "দীনে বিভেদ সৃষ্টি করো না" কিংবা "তাতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ো না।" দীনে বিভেদের অর্থ ব্যক্তির নিজের পক্ষ থেকে এমন কোন অভিনব বিষয় সৃষ্টি করা এবং তা মানা বা না মানার ওপর কুফর ও ঈমান নির্ভর করে বলে পীড়াপীড়ি করা এবং মান্যকারীদের নিয়ে অমান্যকারীদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া, অথচ দীনের মধ্যে তার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। এই অভিনব বিষয়টি কয়েক ধরনের হতে পারে। দীনের মধ্যে যে জিনিস নেই তা এনে শামিল করা হতে পারে। দীনের অকাট্য উক্তিসমূহের বিকৃত প্রায় ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে অদ্ভুত আকীদা-বিশ্বাস এবং অভিনব আচার-অনুষ্ঠান আবিষ্কার করা হতে পারে। আবার দীনের উক্তি ও বক্তব্যসমূহ রদবদল করে তা বিকৃত করা, যেমন যা গুরুত্বপূর্ণ তাকে গুরুত্বহীন বানিয়ে দেয়া এবং যা একেবারেই মোবাহ পর্যায়ভুক্ত তাকে ফরয ও ওয়াজিব এমনকি আরো অগ্রসর হয়ে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ বানিয়ে দেয়া। এ ধরনের আচরণের কারণেই নবী-রসূল আলাইহিমুস সালামদের উম্মতদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। অতপর এসব ছোট ছোট দলের অনুসৃত পথই ক্রমান্বয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করেছে যার অনুসারীদের মধ্যে বর্তমানে এই ধারণাটুকু পর্যন্তও বর্তমান নেই যে, এক সময় তাদের মূল ছিল একই। দীনের আদেশ-নিষেধ বুঝার এবং অকাট্য উক্তিসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে মাসয়ালা উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই যে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহর কিতাবের ভাষার মধ্যে আভিধানিক, বাগধারা ও ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে যার অবকাশ আছে সেই বৈধ ও যুক্তিসংগত মতভেদের সাথে এই বিবেদের কোন সম্পর্ক নেই

وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۭ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ
مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۭ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا
الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿١٤﴾ فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ
وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۗءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ
مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۭ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۭ لَنَآ اَعْمَالُنَا
وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۭ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۭ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ
وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٥﴾

মানুষের কাছে যখন জ্ঞান এসে গিয়েছিল তারপরই তাদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিয়েছে।[২২] আর তা হওয়ার কারণ তারা একে অপরের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করতে চাচ্ছিলো।[২৩] একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মূলতবী রাখা হবে একথা যদি তোমার রব পূর্বেই ঘোষণা না করতেন তাহলে তাদের বিবাদের চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়া হতো।[২৪] প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, পূর্ববর্তীদের পরে যাদের কিতাবের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তারা সে ব্যাপারে বড় অস্বস্তিকর সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে।[২৫]

যেহেতু এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তাই হে মুহাম্মাদ এখন তুমি সেই দীনের দিকেই আহবান জানাও এবং যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছো সেভাবে দৃঢ়তার সাথে তা আঁকড়ে ধরো এবং এসব লোকের ইচ্ছা আকাংখার অনুসরণ করো না।[২৬] এদের বলে দাও, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তার ওপর ঈমান এনেছি।[২৭] আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করি।[২৮] আল্লাহই আমাদেরও রব এবং তোমাদেরও রব তিনিই। আমাদের কাজকর্ম আমাদের জন্য আর তোমাদের কাজকর্ম তোমাদের জন্য।[২৯] আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোন বিবাদ নেই।[৩০] একদিন আল্লাহ আমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন। তাঁর কাছেই সবাইকে যেতে হবে।"

এই বিষয় সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ২১৩, টীকা ২৩০; সূরা আল ইমরান, আয়াত ১৯, টীকা ১৬ ও ১৭, আয়াত ৫১, টীকা ৪৮; সূরা আন নিসা, আয়াত ১৭১, টীকা ২১১ থেকে ২১৬; আল মায়েদা, আয়াত ৭৭, টীকা ১০১, আল আনআম, আয়াত ১৫৯, টীকা ১৪১; সূরা আন নাহল, আয়াত ১১৮ থেকে ১২৪, টীকা ১১৭ থেকে ১২১; সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ৯২-৯৩, টীকা ৯১, আল হাজ্জ, আয়াত ৬৭-৬৯, টীকা ১১৬, ১১৭; আল মু'মিনুন, আয়াত ৫১ থেকে ৫৬, টীকা ৪৫ থেকে ৪৯; সূরা আল কাসাস, আয়াত ৫৩ ও ৫৪, টীকা ৭৩; সূরা আর রুম, আয়াত ৩২ থেকে ৩৫, টীকা ৫১ থেকে ৫৪)।

২১. ইতিপূর্বে ৮ ও ৯ আয়াতে যা বলা হয়েছে এবং ১১ টীকায় আমরা তার যে ব্যাখ্যা করেছি এখানে আবার তার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এখানে একথাটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমরা এসব লোকদেরকে দীনের সুস্পষ্ট রাজপথ দেখিয়ে দিচ্ছো আর এ নির্বোধরা এই নিয়ামতকে মূল্য দেয়ার পরিবর্তে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছে। কিন্তু এদেরই মধ্যে এদেরই কওমের এমন সব লোক আছে যারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসছে এবং আল্লাহও বেছে বেছে তাদেরকে নিজের দিকে নিয়ে আসছেন। কারা এ নিয়ামত লাভ করে এবং কারা এর প্রতি খাপ্পা হয় তা নিজ নিজ ভাগ্যের ব্যাপার। তবে আল্লাহ অন্ধভাবে কোন কিছু বন্টন করেন না। যে তাঁর দিকে অগ্রসর হয় তিনি কেবল তাকেই নিজের দিকে টানেন। দূরে পলায়নপর লোকদের পেছনে দৌড়ানো আল্লাহর কাজ নয়।

২২. অর্থাৎ বিভেদের কারণ এ ছিল না যে, আল্লাহ নবী-রসূল পাঠাননি এবং কিতাবও নাযিল করেননি, তাই সঠিক পথ না জানার কারণে মানুষ নিজেদের জন্য আলাদা আলাদা ধর্ম, চিন্তা গোষ্ঠী ও জীবন আদর্শ আবিষ্কার করে নিয়েছে। বরং তাদের মধ্যে এই বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান আসার পর। তাই সে জন্য আল্লাহ দায়ী নন, বরং সেই সব লোক নিজেরাই দায়ী যারা দীনের সুস্পষ্ট নীতিমালা এবং শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধি-নিষেধ থেকে দূরে সরে গিয়ে নতুন নতুন ধর্ম ও পথ বানিয়ে নিয়েছে।

২৩. অর্থাৎ কোন প্রকার সদিচ্ছা এই মতভেদ সৃষ্টির চালিকা শক্তি ছিল না। এটা ছিল তোমাদের অভিনব ধারণা প্রকাশের আকাংখা। নিজের নাম ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চিন্তা, পারস্পরিক জিদ ও একগুঁয়েমি, একে অপরকে পরাস্ত করার প্রচেষ্টা এবং সম্পদ ও মর্যাদা অর্জন প্রচেষ্টার ফল। ধূর্ত ও উচ্চাভিলাসী লোকগুলো দেখলো, আল্লাহর বান্দারা যদি সোজাসুজি আল্লাহর দীন অনুসরণ করতে থাকে তাহলে একজনই মাত্র খোদা হবেন মানুষ যার সামনে মাথা নত করবে, একজন রসূল হবেন মানুষ নেতা ও পথপ্রদর্শক হিসেবে যাকে মেনে চলবে, একখানা কিতাব থাকবে যেখান থেকে মানুষ পথনির্দেশনা লাভ করবে এবং একটি পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট আকীদা-বিশ্বাস ও নির্ভেজাল বিধান থাকবে মানুষ যা অনুসরণ করতে থাকবে। এই ব্যবস্থায় তাদের নিজেদের জন্য কোন বিশেষ মর্যাদা থাকতে পারে না যে কারণে তাদের পৌরহিত্য চলবে, লোকজন তাদের পাশে ভিড় জমাবে তাদের সামনে মাথা নত করবে এবং পকেট ও শূন্য করবে। এটাই সেই মূল কারণ যা নতুন নতুন আকীদা ও দর্শন, নতুন নতুন ইবাদত-পদ্ধতি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং নতুন নতুন জীবনাদর্শ উদ্ভাবনের উৎসাহ যুগিয়েছে এবং আল্লাহর বান্দাদের একটি বড় অংশকে দীনের সুস্পষ্ট রাজপথ থেকে সরিয়ে বিভিন্ন পথে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে।

তারপর এ বিক্ষিপ্ততা এসব দল-উপদলের পারস্পরিক বিতর্ক ও বিবাদ এবং ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কলহের কারণে চরম তিক্ততায় পর্যবসিত হয়েছে। এমনকি এ থেকে এমন রক্তপাতও ঘটেছে যে জন্য মানবেতিহাস রক্ত রঞ্জিত হয়ে চলেছে।

২৪. অর্থাৎ যারা গোমরাহী উদ্ভাবন করার এবং জেনে বুঝে তা অনুসরণ করার অপরাধে অপরাধী ছিল তাদেরকে দুনিয়াতেই আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হতো এবং শুধু সঠিক পথ অনুসরণকারীদের বাঁচিয়ে রাখা হতো যার মাধ্যমে কে ন্যায় ও সত্যের অনুসারী আর কে বাতিলের অনুসারী তা সুস্পষ্ট হয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহ এই চূড়ান্ত ফায়সালা কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য মুলতবী করে রেখেছেন। কারণ, পৃথিবীতে এ ফায়সালা করে দেয়ার পর মানব জাতির পরীক্ষা অর্থহীন হয়ে যেতো।

২৫. অর্থাৎ প্রত্যেক নবী এবং তাঁর নিকট অনুসারীদের যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহর কিতাব পরবর্তী বংশধরদের কাছে পৌঁছলে তারা দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থার সাথে তা গ্রহণ করেনি, বরং তারা সে সম্পর্কে বড় সন্দেহ সংশয় এবং মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের শিকার হয়েছে। তাদের এ পরিস্থিতির শিকার হওয়ার অনেকগুলো কারণ ছিল। তাওরাত ও ইনজীলে ঐ সব পরিস্থিতি সম্পর্কে যেসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে তা অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা অতি সহজেই সেই সব কারণ অনুধাবন করতে পারি। পূর্ববর্তী প্রজন্মের লোকেরা এ দুটি গ্রন্থকে তার মূল অবস্থায় মূল রচনাশৈলী ও ভাষায় সংরক্ষিত করে পরবর্তী প্রজন্মের লোকদের কাছে পৌঁছায়নি। তার মধ্যে আল্লাহর বাণীর সাথে ব্যাখ্যা, ইতিহাস এবং জনশ্রুতিমূলক ঐতিহ্য ও ফিকাহবিদদের উদ্ভাবিত খুঁটিনাটি বিষয়সমূহের আকারে মানুষের কথাও মিশিয়ে একাকার করে দিয়েছে। এ দুটি গ্রন্থের অনুবাদের এত অধিক মাত্রায় প্রচলন করেছে যে, মূল গ্রন্থ হারিয়ে গিয়েছে এবং কেবল তার অনুবাদই টিকে আছে। এর ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহকেও এমনভাবে ধ্বংস করে ফেলেছে যে, এখন আর কেউই পুরো নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারে না তার কাছে যে কিতাব আছে পৃথিবীবাসী সেটিই হযরত মূসা বা হযরত ঈসার মাধ্যমে লাভ করেছিলো। তাছাড়া মাঝে মধ্যে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতরা ধর্ম, অধিবিদ্যা, দর্শন, আইন, পদার্থবিদ্যা, মনস্তত্ব এবং সমাজবিজ্ঞানের এমন সব আলোচনা করেছেন এবং চিন্তাদর্শ গড়ে তুলেছেন যার গোলকধাঁধায় পড়ে মানুষের জন্য এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কঠিন হয়ে পড়েছে যে, আঁকাবাঁকা এসব পথের মধ্যে ন্যায় ও সত্যের রাজপথ কোনটি। আল্লাহর কিতাব যেহেতু মূল ও নির্ভরযোগ্য অবস্থায় বর্তমান ছিল না তাই মানুষ নির্ভরযোগ্য এমন কোন প্রমাণের স্মরণাপন্ন হতেও পারতো না যা বাতিল থেকে হককে আলাদা করার ব্যাপারে তাদের সাহায্য করতে পারতো।

২৬. অর্থাৎ তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই দীনের মধ্যে কোন রদবদল ও হ্রাস-বৃদ্ধি করবে না। "কিছু নাও এবং কিছু দাও" এই নীতির ভিত্তিতে এই পথভ্রষ্ট লোকদের সাথে কোন আপোষ করো না। শুধু কোন না কোন ভাবে ইসলামের গণ্ডির মধ্যে এসে যাক, এ লোভের বশবর্তী হয়ে এদের কুসংস্কার ও গোঁড়ামি এবং জাহেলী আচার-আচরণের জন্য দীনের মধ্যে কোন অবকাশ সৃষ্টি করো না। আল্লাহ তাঁর দীনকে যেভাবে নাযিল করেছেন কেউ মানতে চাইলে সেই খাঁটি ও মূল দীনকে যেন সরাসরি মেনে নেয়। অন্যথায় যে জাহান্নামে হুমড়ি খেয়ে পড়তে চায় পড়ুক। মানুষের ইচ্ছানুসারে আল্লাহর দীনের

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٦﴾ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾
يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ۙ
وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۗ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ
بَعِيدٍ ﴿١٨﴾ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿١٩﴾

আল্লাহর আহবানে সাড়া দান করার পরে যারা (সাড়া দানকারীদের সাথে) আল্লাহর দীনের ব্যাপারে বিবাদ করে[৩১] আল্লাহর কাছে তাদের যুক্তি ও আপত্তি বাতিল। তাদের ওপর আল্লাহর গযব, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। এই কিতাব ও মিযান যথাযথভাবে আল্লাহই নাযিল করেছেন।[৩২] তুমি তো জান না, চূড়ান্ত ফায়সালার সময় হয়তো অতি নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে।[৩৩] যারা তা আসবে বলে বিশ্বাস করে না তারাই তার জন্য তাড়াহুড়া করে। কিন্তু যারা তা বিশ্বাস করে তারা তাকে ভয় করে। তারা জানে, অবশ্যই তা আসবে। ভাল করে শুনে নাও, যারা সেই সময়ের আগমনের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করার জন্য বিতর্ক করে তারা গোমরাহীর মধ্যে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে।

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান।[৩৪] যাকে যা ইচ্ছা তাই দান করেন।[৩৫] তিনি মহা শক্তিমান ও মহা পরাক্রমশালী।[৩৬]

পরিবর্তন সাধন করা যায় না। মানুষ যদি নিজের কল্যাণ চায় তাহলে যেন নিজেকেই পরিবর্তন করে দীন অনুসারে গড়ে নেয়।

২৭. অন্য কথায় আমি সেই বিভেদ সৃষ্টিকারী লোকদের মত নই যারা আল্লাহর প্রেরিত কোন কোন কিতাব মানে আবার কোন কোনটি মানে না। আমি আল্লাহর প্রেরিত প্রতিটি কিতাবই মানি।

২৮. এই ব্যাপকার্থক আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ হয় ঃ একটি অর্থ হচ্ছে, আমি এসব দলাদলি থেকে দূরে থেকে নিরপেক্ষ ন্যায় নিষ্ঠা অবলম্বনের জন্য আদিষ্ট। কোন দলের স্বার্থে এবং কোন দলের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করা আমার কাজ নয়। সব মানুষের সাথে আমার সমান সম্পর্ক। আর সে সম্পর্ক হচ্ছে ন্যায় বিচার ও ইনসাফের সম্পর্ক। যার যে

বিষয়টি ন্যায় ও সত্য সে যত দূরেরই হোক না কেন আমি তার সহযোগী। আর যার যে বিষয়টি ন্যায় ও সত্যের পরিপন্থী সে আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হলেও আমি তার বিরোধী।

দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আমি তোমাদের সামনে যে সত্য পেশ করার জন্য আদিষ্ট তাতে কারো জন্য কোন বৈষম্য নেই, বরং তা সবার জন্য সমান। তাতে নিজের ও পরের, বড়র ও ছোটর, গরীবের ও ধনীর, উচ্চের ও নীচের ভিন্ন ভিন্ন সত্য নেই। যা সত্য তা সবার জন্য সত্য। যা গোনাহ তা সবার জন্য গোনাহ। যা হারাম তা সবার জন্য হারাম এবং যা অপরাধ তা সবার জন্য অপরাধ। এই নির্ভেজাল বিধানে আমার নিজের জন্যও কোন ব্যতিক্রম নেই।

তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, আমি পৃথিবীতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আদিষ্ট। মানুষের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করা এবং তোমাদের জীবনে ও তোমাদের সমাজে যে ভারসাম্যহীনতা ও বে-ইনসাফী রয়েছে তার ধ্বংস সাধনের দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে।

এ তিনটি অর্থ ছাড়া এ বাক্যাংশের আরো একটি অর্থ আছে যা পবিত্র মক্কায় প্রকাশ পায়নি কিন্তু হিজরতের পরে তা প্রকাশ পায়। সেটি হচ্ছে, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োগ প্রাপ্ত বিচারক। তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করা আমার দায়িত্ব।

২৯. আমাদের প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ কাজের জন্য দায়ী এবং জবাবদিহিকারী। তোমরা নেক কাজ করলে তার সুফল আমি ভোগ করবো না, তোমরাই তা ভোগ করবে। অনুরূপ আমি খারাপ কাজ করলে সে জন্য তোমাদের পাকড়াও করা হবে না, আমাকেই তার পরিণাম ভোগ করতে হবে। একথাটিই ইতিপূর্বে সূরা বাকারার ১৩৯ আয়াত, সূরা ইউনুসের ৪১ আয়াত, সূরা হূদের ৩৫ আয়াত এবং সূরা কাসাসের ৫৫ আয়াতে বলা হয়েছে। দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা বাকারা, টীকা ১৩৯, সূরা ইউনুস টীকা ৪৯; সূরা হূদ, টীকা-৩৯; সূরা আল কাসাস, আয়াত ৫৫, টীকা ৭৯।

৩০. অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত দলীল-প্রমাণ দিয়ে কথা বুঝানোর যে দায়িত্ব আমার ছিল তা আমি পালন করেছি। এখন অযথা ঝগড়া-বিবাদ করে লাভ কি? তোমরা ঝগড়া-বিবাদ করলেও আমি তা করতে প্রস্তুত নই।

৩১. সেই সময় প্রতিদিনই মক্কায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছিলো এখানে সেই পরিস্থিতির দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। লোকেরা কারো সম্পর্কে যখনই জানতে পারতো যে সে মুসলমান হয়েছে তখনই মরিয়া হয়ে তার পেছনে লেগে যেতো। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাকে কোনঠাসা করে রাখতো। না বাড়ীতে তাকে আরামে থাকতে দেয়া হতো, না মহল্লায় না জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে। সে যেখানেই যেতো সেখানেই অশেষ ও বিরামহীন এক বিতর্ক শুরু হতো। এর উদ্দেশ্য হতো, জাহেলিয়াত বর্জন করে যে ব্যক্তি তার গণ্ডীর বাইরে বের হয়ে গেছে সে যে কোনভাবেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য ছেড়ে আবার সেদিকে ফিরে আসুক।

৩২. এখানে মীযান অর্থ আল্লাহর শরীয়ত, যা দাঁড়িপাল্লার মত ওজন করে ভুল ও শুদ্ধ, হক ও বাতিল, জুলুম ও ন্যায়বিচার এবং সত্য ও অসত্যের পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয়। ওপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে যে,

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ
حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ﴿٢٠﴾ اَمْ لَهُمْ
شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ ۭ وَلَوْلَا كَلِمَةُ
الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۭ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢١﴾ تَرَى الظّٰلِمِيْنَ
مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۭ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَاۗءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ
الْكَبِيْرُ ﴿٢٢﴾

৩ রুকূ'

যে আখেরাতের কৃষিক্ষেত্র চায় আমি তার কৃষিক্ষেত্র বাড়িয়ে দেই। আর যে দুনিয়ার কৃষিক্ষেত্র চায় তাকে দুনিয়ার অংশ থেকেই দিয়ে থাকি। কিন্তু আখেরাতে তার কোন অংশ নেই।[৩৭]

এসব লোক কি আল্লাহর এমন কোন শরীকে বিশ্বাস করে যে এদের জন্য দীনের মত এমন একটি পদ্ধতি নির্ধারিত করে দিয়েছে আল্লাহ যার অনুমোদন দেননি?[৩৮] *যদি ফায়সালার বিষয়টি পূর্বেই মীমাংসিত হয়ে না থাকতো তাহলে তাদের বিবাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয়া হতো।*[৩৯] *এ জালেমদের জন্য নিশ্চিত কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে। তোমরা দেখতে পাবে, সে সময় এসব জালেম তাদের কৃতকর্মের ভয়াবহ পরিণামের আশংকা করতে থাকবে। আর সে পরিণাম তাদের জন্য আসবেই। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে তারা জান্নাতের বাগ–বাগিচার মধ্যে অবস্থান করবে। তারা যা–ই চাইবে তা–ই তাদের রবের কাছে পাবে। এটাই বড় মেহেরবানী।*

أُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ (তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করার জন্য আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, এই পবিত্র কিতাব সহকারে সেই 'মিযান' এসে গেছে যার সাহায্যে এই ইনসাফ কায়েম করা যাবে।

৩৩. অর্থাৎ যার সংশোধন হওয়ার সে যেন অবিলম্বে সংশোধিত হয়ে যায়। চূড়ান্ত ফায়সালার সময় দূরে মনে করে পাশ কাটিয়ে যাওয়া উচিত নয়। একটি নিশ্বাস সম্পর্কেও

কেউ নিশ্চয়তার সাথে একথা বলতে পারে না যে, তার পরে শ্বাস গ্রহণের সুযোগ তার অবশ্যই হবে। প্রতিবার শ্বাস গ্রহণই শেষবারের মত শ্বাস গ্রহণ হতে পারে।

৩৪. মূল আয়াতে لَطِيْفٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার সঠিক ও পূরা অর্থ "দয়ালু" শব্দ দ্বারা প্রকাশ পায় না। এ শব্দটির মধ্যে দুটি অর্থ আছে। একটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ, মায়া ও বদান্যতা প্রবণ। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শিতার সাথে তার এমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রয়োজনের প্রতিও লক্ষ্য রাখেন যেখানে কারো দৃষ্টি যায় না। সে প্রয়োজনগুলো তিনি এমনভাবে পূরণ করেন যে বান্দা নিজেও উপলব্ধি করতে পারে না কে কখন তার কোন্ প্রয়োজন পূরণ করেছে। তাছাড়া এখানে বান্দা অর্থ শুধু ঈমানদারেরাই নয়, বরং সমস্ত বান্দা। আল্লাহর এই দয়া ও মেহেরবানী তাঁর সব বান্দার জন্য সমান।

৩৫. অর্থাৎ তাঁর এই নির্বিশেষ মেহেরবানীর দাবি এ নয় যে, সব বান্দাকেই সব কিছু সমানভাবে দেয়া হবে। যদিও সবাইকে তিনি তাঁর নিজের ভাণ্ডার থেকেই দিচ্ছেন। কিন্তু সেই দান একই প্রকৃতির নয়। একজনকে দিয়েছেন একটি জিনিস আরেকজনকে অন্য একটি জিনিস। একজনকে একটি জিনিস প্রচুর পরিমাণে দিয়ে থাকেন অপর একজনকে অন্য কোন জিনিস অঢেল দান করেছেন।

৩৬. অর্থাৎ তাঁর দান ও পুরস্কারের এই ব্যবস্থা নিজের শক্তিতেই চলছে। কারো ক্ষমতা নেই তা পরিবর্তন করতে পারে বা জোরপূর্বক তাঁর নিকট থেকে কিছু নিতে পারে কিংবা কাউকে দান করার ব্যাপারে তাকে বিরত রাখতে পারে।

৩৭. পূর্ববর্তী আয়াতে দু'টি সত্য তুলে ধরা হয়েছে, যা আমরা সবসময় সর্বত্র দেখতে পাই। একটি হচ্ছে, আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানী তাঁর সব বান্দার জন্য সমান। অপরটি হচ্ছে, তাঁর দান ও রিযিক পৌঁছানোর বন্দোবস্ত সবার জন্য সমান নয়, বরং তার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। এখানে এ আয়াতে বলা হচ্ছে, তাঁর দয়া ও মেহেরবানী এবং রিযিক পৌঁছানোর ব্যবস্থায় ছোটখাট পার্থক্য অসংখ্য। কিন্তু একটি অনেক বড় মৌলিক পার্থক্যও আছে। সেটি হচ্ছে, আখেরাতের আকাংখী ব্যক্তির জন্য এক ধরনের রিযিক এবং দুনিয়ার আকাংখী ব্যক্তির জন্য অন্য ধরনের রিযিক।

এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সত্য যা এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে বলা হয়েছে। এটিকে বিস্তারিতভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কারণ তা প্রত্যেক মানুষকে তার ভূমিকা নির্ধারণে সাহায্য করে। যারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের জন্য চেষ্টা-সাধনা ও কাজ করে এ আয়াতে তাদেরকে এমন কৃষকের সাথে তুলনা করা হয়েছে যারা ভূমি প্রস্তুত করা থেকে ফসল প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত উপর্যুপরি ঘাম ঝরায় এবং প্রাণান্তকর চেষ্টা চালায়। সে মাঠে যে বীজ বপন করছে তার ফসল আহরণ করে যেন উপকৃত হতে পারে সে জন্য সে এত সব পরিশ্রম করে কিন্তু নিয়ত ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য এবং বেশীর ভাগই কর্মপদ্ধতির পার্থক্য ও আখেরাতের ফসল বপনকারী কৃষক এবং পার্থিব ফসল বপনকারী কৃষকের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করে তাই আল্লাহ উভয় পরিশ্রমের ফলাফলও ভিন্ন রেখেছেন। অথচ এই পৃথিবীই উভয়ের কর্মক্ষেত্র।

আখেরাতের ফসল বপনকারী দুনিয়া লাভ করবে না আল্লাহ তা বলেননি। কম বা বেশী যাই হোক না কেন দুনিয়া তো সে পাবেই। কারণ এখানে আল্লাহর মেহেরবানী সবার জন্য সমান এবং তার মধ্যে তারও অংশ আছে। তাই ভালমন্দ সবাই এখানে রিযিক পাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ তাকে দুনিয়া লাভের সুসংবাদ দান করেননি, বরং তাকে সুসংবাদ দিয়েছেন এই বলে যে তার আখেরাতের কৃষিক্ষেত্র বৃদ্ধি করা হবে। কেননা সে সেটিই চায় এবং সেখানকার পরিণামের চিন্তায় সে বিভোর। এই কৃষিক্ষেত্র বর্ধিত করার অনেকগুলো উপায় ও পন্থা হতে পারে। যেমন ঃ সে যতটা সদুদ্দেশ্য নিয়ে আখেরাতের জন্য নেক আমল করতে থাকবে তাকে তত বেশী নেক আমল করার সুযোগ দেয়া হবে এবং তার হৃদয়–মন নেক কাজের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। যখন সে পবিত্র উদ্দেশ্যের জন্য পবিত্র উপায় অবলম্বন করার সংকল্প করবে তখন তার জন্য পবিত্র উপায়–উপকরণের মধ্যে বরকত দান করা হবে। তার জন্য কল্যাণের সব দরজা বন্ধ হয়ে কেবল অকল্যাণের দরজাসমূহই খোলা থাকবে, আল্লাহ এ অবস্থা কখনো আসতে দেবেন না। তাছাড়া সব চেয়ে বড় কথা হলো তার এই পৃথিবীর সামান্য নেকীও আখেরাতে কমপক্ষে দশগুণ বৃদ্ধি করা হবে। আর বেশীর তো কোন সীমাই থাকবে না। আল্লাহ যার জন্য চাইবেন হাজার বা লক্ষগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন।

এখন থাকে দুনিয়ার কৃষি বপনকারীর কথা। অর্থাৎ যে আখেরাত চায় না এবং দুনিয়ার জন্যই সব কিছু করে। আল্লাহ তাকে তার এই চেষ্টা–সাধনার দুটি ফলের কথা সুস্পষ্টভাবে শুনিয়ে দিয়েছেন। এক, সে যত চেষ্টাই করুক না কেন দুনিয়া যতটা অর্জন করতে চায় তা সে পুরাপুরি পাবে না, বরং তার একটা অংশ মাত্র অর্থাৎ আল্লাহ তার জন্য যতটা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন ততটাই পাবে। দুই, সে যা কিছু পাবে এই দুনিয়াতেই পাবে। আখেরাতের কল্যাণে তার কোন অংশ থাকবে না।

৩৮. একথা সুস্পষ্ট যে এ আয়াতে شُرَكَاء অর্থে সেই সব শরীক বুঝানো হয়নি মানুষ যাদের কাছে প্রার্থনা করে বা যাদেরকে নযর–নিয়াজ দেয় কিংবা যাদের সামনে পূজা অর্চনার অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করা হয়। বরং নিশ্চিতভাবে সেই সব মানুষকে বুঝানো হয়েছে মানুষ যাদেরকে আদেশ দানের ক্ষেত্রে অংশীদার বানিয়ে নিয়েছে, যাদের শেখানো ধ্যান–ধারণা, আকীদা–বিশ্বাস, মতবাদ এবং দর্শনের প্রতি মানুষ বিশ্বাস পোষণ করে, যাদের দেয়া মূল্যবোধ মেনে চলে, যাদের পেশকৃত নৈতিক নীতিমালা এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানদণ্ডসমূহ গ্রহণ করে, যাদের রচিত আইন–কানুন। পন্থা ও বিধি–বিধানকে নিজেদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ইবাদতসমূহে, ব্যক্তি জীবনে, সমাজে, সভ্যতায়, কায়কারবার ও লেনদেনে, বিচারালয়সমূহে এবং নিজেদের রাজনীতি ও সরকার ব্যবস্থায় এমনভাবে গ্রহণ করে যেন এটাই সেই শরীয়ত যার অনুসরণ তাদের করা উচিত। এটা যেন বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহর রচিত আইনের পরিপন্থী একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং তাঁর অনুমোদন (Sanction) ছাড়াই উদ্ভাবকরা উদ্ভাবন করেছে এবং মান্যকারীরা মেনে নিয়েছে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা এবং অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করা যেমন শিরক এটাও ঠিক তেমনি শিরক। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ১–৭২, টীকা ১৭০, আয়াত ২৫৬, টীকা ২৮৬; আল ইমরান, আয়াত ৬৪ ও ৬৫, টীকা ৫৭ ও ৫৮, আয়াত ৭৫ থেকে ৭৭, টীকা ৬৪, ৬৫;

ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۗ قُلْ
لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى ۗ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً
نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٢٣﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ
فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ
بِكَلِمٰتِهٖ ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٤﴾ وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ
وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٢٥﴾

এটাই সেই জিনিস যার সুসংবাদ আল্লাহ তাঁর সেই সব বান্দাদের দেন যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে। হে নবী, এসব লোককে বলে দাও, এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না।[৪০] তবে আত্মীয়তার ভালবাসা অবশ্যই চাই।[৪১] যে কল্যাণ উপার্জন করবে আমি তার জন্য তার সেই কল্যাণের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দেব। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল ও নেক কাজের মর্যাদাদাতা।[৪২]

এ লোকেরা কি বলে, এই ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে অপবাদ তৈরী করেছে?[৪৩] আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার দিলের ওপর মোহর মেরে দিতেন।[৪৪] তিনি বাতিলকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং নিজের আদেশে সত্যকে সত্য প্রমাণ করে দেখান।[৪৫] তিনি মনের গোপন বিষয়ও জানেন।[৪৬] তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং মন্দ কাজসমূহ ক্ষমা করেন। অথচ তোমাদের সব কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁর জানা আছে।[৪৭]

আন নিসা, আয়াত ৬০, টীকা ৯০; আল মায়েদা, আয়াত ১ ও ২ টীকাসহ, আয়াত ৮৭ ও ৮৮ টীকাসহ, আন'আম, আয়াত ১১৯ থেকে ১২১; টীকাসহ, আয়াত ১৩৬, ১৩৭ টীকাসহ; আত তাওবা, আয়াত ৩১ টীকাসহ; ইউনুস, আয়াত ৫৯, ৬০ টীকাসহ; ইবরাহীম, আয়াত ২২ টীকাসহ; সূরা আন নাহল, আয়াত ১১৩ থেকে ১১৫ টীকাসহ; আল কাহাফ, আয়াত ৫২ টীকাসহ; মারয়াম, আয়াত ৪২ টীকাসহ; আল-কাসাস, আয়াত ৬২, ৬৩ টীকাসহ; সাবা আয়াত ৪১ টীকা ৬৩, ইয়াসীন, আয়াত ৬০, টীকা ৫৩)।

৩৯. অর্থাৎ এটা আল্লাহর বিরুদ্ধে এমন এক ধৃষ্টতা যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারটি যদি কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য মুলতবী করা না হতো তাহলে আল্লাহর বান্দা হয়ে যারা আল্লাহর পৃথিবীতে নিজেদের রচিত 'দীন' চালু করেছে তাদের প্রত্যেকের ওপর আযাব

নাযিল করা হতো এবং তাদেরকেও ধ্বংস করে দেয়া হতো যারা আল্লাহর দীন পরিত্যাগ করে অন্যদের রচিত দীন গ্রহণ করেছে।

৪০. 'এ কাজ' অর্থ যে প্রচেষ্টার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচানো এবং জান্নাতের সুসংবাদের উপযুক্ত বানানোর জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

৪১. মূল আয়াতের বাক্যাংশ হলো اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। তবে قُرْبٰى র ভালবাসা অবশ্যই প্রত্যাশা করি। এই قُرْبٰى শব্দটির ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের মধ্যে বেশ মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে।

এক দল এ শব্দটিকে আত্মীয়তা (আত্মীয়তার বন্ধন) অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং আয়াতের অর্থ বর্ণনা করেছেন এই যে, "আমি এ কাজের জন্য তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক বা বিনিময় চাই না। তবে তোমাদের ও আমাদের মাঝে আত্মীয়তার যে বন্ধন আছে তোমরা (কুরাইশরা) অন্তত সেদিকে লক্ষ্য রাখবে এতটুকু আমি অবশ্যই চাই। তোমাদের উচিত ছিল আমার কথা মেনে নেয়া। কিন্তু যদি তোমরা তা না মানো তাহলে গোটা আরবের মধ্যে সবার আগে তোমরাই আমার সাথে দুশমনী করতে বদ্ধপরিকর হবে তা অন্তত করো না।" এটা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যা। ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে জারীর, তাবারানী, বায়হাকী, ইবনে সা'দ ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ বহু সংখ্যক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে এ ব্যাখ্যাটি উদ্ধৃত করেছেন এবং মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদা, সুদ্দী, আবু মালেক, আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম, দাহহাক, আতা ইবনে দীনার এবং আরো অনেক বড় বড় মুফাসসির এ ব্যাখ্যাটাই বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় দলটি قُرْبٰى শব্দটিকে নৈকট্য বা নৈকট্য অর্জন অর্থে গ্রহণ করেন এবং আয়াতটির অর্থ করেছেন, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নৈকট্যের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া ছাড়া আমি তোমাদের কাছে এ কাজের জন্য আর কোন বিনিময় চাই না। অর্থাৎ তোমরা সংশোধিত হয়ে যাও। শুধু এটাই আমার পুরস্কার। এ ব্যাখ্যা হাসান বাসারী থেকে উদ্ধৃত হয়েছে এবং কাতাদা থেকেও এর সমর্থনে একটি মত বর্ণিত হয়েছে। এমনকি তাবারানীর একটি বর্ণনায় ইবনে আব্বাসের সাথেও এ মতকে সম্পর্কিত করা হয়েছে। কুরআন মজীদেরও আরেক স্থানে বিষয়টি এ ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا

(الفرقان : ٥٨)-

"এদের বলে দাও, এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। যার ইচ্ছা সে তার রবের পথ অনুসরণ করুক, আমার পারিশ্রমিক শুধু এটাই।"

তৃতীয় দলটি قُرْبٰى শব্দটিকে নিকট আত্মীয় (আত্মীয় স্বজন) অর্থে গ্রহণ করেন। তারা আয়াতের অর্থ করেন ঃ "তোমরা আমার আত্মীয় ও আপনজনদের ভালবাসবে এছাড়া আমার এ কাজের আর কোন পারিশ্রমিক আমি চাই না।" এই দলের কেউ আত্মীয়দের মধ্যে গোটা বনী আবদুল মুত্তালিবকে অন্তর্ভুক্ত করেন আবার কেউ কেউ একে শুধু হযরত

আলী, ফাতেমা ও তাদের সন্তান-সন্ততি পর্যন্ত সীমিত রাখেন। এ ব্যাখ্যাটি সাঈদ ইবনে জুবায়ের এবং 'আমর ইবনে শু'আইব থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। আবার কোন কোন বর্ণনাতে একে ইবনে আব্বাস ও হযরত আলী ইবনে হুসাইনের (যয়নুল আবেদীন) সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। কিন্তু বেশ কিছু কারণে এ ব্যাখ্যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। প্রথমত সন্তানের প্রশ্ন তো দূরের কথা মক্কায় যে সময় এ সূরা শূরা নাযিল হয় সে সময় হযরত আলী ও ফাতিমার বিয়ে পর্যন্ত হয়নি। বনী আবদুল মুত্তালিব গোষ্ঠীরও সবাই আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সহযোগিতা করছিলো না। বরং তাদের কেউ কেউ তাঁর প্রকাশ্য দুশমনদের সহযোগী ছিল। এ ক্ষেত্রে আবু লাহাবের শত্রুতার বিষয় তো সর্বজনবিদিত। দ্বিতীয়ত, শুধু বনী আবদুল মুত্তালিব গোষ্ঠীই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয় ছিল না। নবীর (সা) মহিয়ষী মা, তাঁর মহান বাপ এবং হযরত খাদীজার (রা) মাধ্যমে কুরাইশদের সকল পরিবারের সাথেই তাঁর আত্মীয়তা ছিল। সেই সব পরিবারে নবীর (সা) গুণী সাহাবা যেমন ছিলেন তেমনি ঘোরতর শত্রুও ছিল। তাই ঐ সব আত্মীয়দের মধ্যে থেকে তিনি কেবল বনী আবদুল মুত্তালিব গোষ্ঠীকে নিজের ঘনিষ্ঠজন আখ্যায়িত করে এই ভালবাসার দাবীকে তাদের জন্য নির্দিষ্ট রাখবেন তা নবীর (সা) জন্য কি করে সম্ভব ছিল? তৃতীয়ত যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে, একজন নবী যে উচ্চাসনে দাঁড়িয়ে সুউচ্চ কণ্ঠে আল্লাহর দিকে আহবান জানান সেই উচ্চাসন থেকে এ মহান কাজের জন্য তিনি এত নীচ পর্যায়ের পুরস্কার চাইবেন যে, তোমরা আমার আত্মীয়-স্বজনকে ভালবাসো, তা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এটা এমনই নীচ পর্যায়ের ব্যাপার যে কোন সুস্থ-স্বাভাবিক রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি কল্পনাও করতে পারে না যে, আল্লাহ তাঁর নবীকে একথা শিখিয়ে থাকবেন আর নবী কুরাইশদের মধ্যে দাঁড়িয়ে একথা বলে থাকবেন। কুরআন মজীদে নবী-রসূলদের যেসব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তাতে আমরা দেখি একের পর এক নবী এসে তাঁদের কওমকে বলছেন ঃ আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় প্রত্যাশা করি না। আমার পারিশ্রমিক বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহর কাছে প্রাপ্য (ইউনুস ৭২, হূদ ২৯ ও ৫১, আশ-শুআরা ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪ ও ১৮০ আয়াত)। সূরা ইয়াসীনে নবীর সত্যতা যাচাইয়ের মানদণ্ড বলা হয়েছে এই যে, তিনি দাওয়াতের ব্যাপারে নিস্বার্থ হন (আয়াত ২১)। কুরআন মজীদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ দিয়ে বার বার একথা বলানো হয়েছে যে, আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না (আল আনয়াম ৯০, ইউসুফ ১০৪, আল মু মিনুন ৭২, আল ফুরকান ৫৭, সাবা ৪৭, সোয়াদ ৮৬, আত তূর ৪০, আল কলম ৪৬ আয়াত)। এর পরে একথা বলার কি কোন সুযোগ থাকে যে, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে আহবান জানানোর যে কাজ করছি তার বিনিময়ে তোমরা আত্মীয় স্বজনকে ভালভাসো। তাছাড়া যখন আমরা দেখি, এ ঈমানদারদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়নি বরং এখানে সম্বোধন করা হয়েছে কাফেরদেরকে তখন তা আরো খাপছাড়া বলে মনে হয়। আগে থেকেই কাফেরদেরকে লক্ষ্য করেই গোটা বক্তব্য চলে আসছে এবং পরবর্তী বক্তব্যও তাদের লক্ষ্য করেই পেশ করা হয়েছে। বক্তব্যের এই ধারাবাহিকতার মধ্যে বিরোধীদের কাছে কোন রকম বিনিময় চাওয়ার প্রশ্ন কি করে আসতে পারে? বিনিময় চাওয়া যায় তাদের কাছে যাদের কাছে কোন ব্যক্তির তাদের জন্য সম্পাদিত কাজের কোন মূল্য থাকে। কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কাজের কি মূল্য দিচ্ছিলো যে, তিনি তাদের কাছে বলতেন,

আমি তোমাদের জন্য যে কাজ করেছি তার বিনিময়ে তোমরা আমার আত্মীয়-স্বজনদের ভালবাসবে? তারা তো উল্টা সেটাকে অপরাধ মনে করছিলো এবং সে জন্য তাঁকে হত্যা করতে সংকল্পবদ্ধ ছিলো।

৪২. অর্থাৎ যারা জেনে বুঝে নাফরমানী করে সেই সব অপরাধীদের সাথে যে ধরনের আচরণ করা হয় নেক কাজে সচেষ্ট বান্দাদের সাথে আল্লাহর আচরণ তেমন নয়। তাদের সাথে আল্লাহর আচরণ হচ্ছে (১) তারা নিজের পক্ষ থেকে যতটা সৎ কর্মশীল হওয়ার চেষ্টা করে আল্লাহ তাদেরকে তার চেয়েও বেশী সৎ কর্মশীল বানিয়ে দেন (২) তাদের কাজকর্মে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যায় অথবা সৎকর্মশীল হওয়ার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যে গোনাহ সংঘটিত হয় আল্লাহ তা উপেক্ষা করেন এবং (৩) যে সামান্য পরিমাণ নেক কাজের পুঁজি তারা নিয়ে আসে সে জন্য আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদা দেন এবং অধিক পুরস্কার দান করেন।

৪৩. এই প্রশ্নবোধক বাক্যাংশে তীব্র তিরস্কার প্রচ্ছন্ন আছে, যার সারকথা হলো, হে নবী, এসব লোক কি এতই দুঃসাহসী ও নির্ভিক যে তোমার বিরুদ্ধে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলার মত ঘৃণিত অপবাদ আরোপ করতে আদৌ লজ্জা অনুভব করলো না? এরা তোমার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে যে তুমি নিজেই এ কুরআন রচনা করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করছো?

৪৪. অর্থাৎ এত বড় মিথ্যা কেবল তারাই বলে যাদের হৃদয়ে মোহর করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাকেও তাদের মধ্যে শামিল করে দেবেন। কিন্তু এটা তাঁর মেহেরবানী যে তিনি তোমাকে এই দল থেকে আলাদা করে রেখেছেন। এই জবাবের মাধ্যমে সেই সব লোকদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করা হয়েছে যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এ অপবাদ আরোপ করছিলো। এর তাৎপর্য হচ্ছে ঃ হে নবী, এরা তোমাকেও তাদের মত স্বভাবের মানুষ মনে করে নিয়েছে। এরা যেমন নিজ স্বার্থের জন্য বড় বড় মিথ্যা বলতে কুণ্ঠিত হয় না। তেমনি মনে করে নিয়েছে তুমিও অনুরূপ আপন স্বার্থ হাসিলের জন্য একটি মিথ্যা সাজিয়ে এনেছো। কিন্তু এটা আল্লাহরই মহেরবানী যে তিনি তাদের মত তোমার হৃদয়ে কোন মোহর লাগাননি।

৪৫. অর্থাৎ এটা আল্লাহর নিয়ম যে তিনি বাতিলকে কখনো স্থায়িত্ব দান করেন না এবং পরিশেষে ন্যায় ও সত্যকে ন্যায় ও সত্য হিসেবে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। অতএব, হে নবী (সা), তুমি এসব মিথ্যা অপবাদের আদৌ পরোয়া করো না এবং নিজের কাজ করতে থাকো। এমন এক সময় আসবে যখন এসব মিথ্যা ধূলিকণার মত উড়ে যাবে। কিন্তু তুমি যা পেশ করছো তার ন্যায় ও সত্য হওয়া স্পষ্ট হয়ে যাবে।

৪৬. অর্থাৎ তিনি জানেন, তোমার বিরুদ্ধে এসব অপবাদ কেন আরোপ করা হচ্ছে এবং তোমাকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য যে চেষ্টা-সাধনা করা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তার পেছনে কি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কাজ করছে।

৪৭. পূর্ববর্তী আয়াতের পর পরই তাওবার প্রতি উৎসাহ দান থেকে স্বতই এ বিষয়টি প্রতিভাত হয় যে, হে জালেমেরা সত্য নবীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে নিজেরাই নিজেদেরকে কেন আরো বেশী আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত বানিয়ে নিচ্ছো? এখনো যদি

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ
وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا
فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ
الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ
الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن
دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

তিনি ঈমানদার ও নেক আমলকারীদের দোয়া কবুল করেন এবং নিজের দয়ায় তাদের আরো অধিক দেন। কাফেরদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।

আল্লাহ যদি তাঁর সব বান্দাদেরকে অঢেল রিযিক দান করতেন তাহলে তারা পৃথিবীতে বিদ্রোহের তুফান সৃষ্টি করতো। কিন্তু তিনি একটি হিসাব অনুসারে যতটা ইচ্ছা নাযিল করেন। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবহিত এবং তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন।[৪৮] তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি মানুষদের নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং রহমত বিস্তার করে দেন। তিনি প্রশংসার যোগ্য অভিভাবক।[৪৯] এই আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং এ দু' জায়গায় তিনি যেসব প্রাণীকুল ছড়িয়ে রেখেছেন এসব তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।[৫০] যখন ইচ্ছা তিনি এদেরকে একত্র করতে পারেন।[৫১]

নিজেদের এই আচরণ থেকে বিরত থাকো এবং তাওবা করো তাহলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। তাওবার অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে, যে অপরাধ করেছে বা করে এসেছে তা থেকে বিরত হবে এবং ভবিষ্যতে আর তা করবে না। তাছাড়া সত্যিকার তাওবার অনিবার্য দাবী হচ্ছে কোন ব্যক্তি পূর্বে যে অন্যায় করেছে নিজের সাধ্যমত তার ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করবে। যে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের কোন উপায় বের করা সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং নিজের ওপর যে কলংক লেপন করেছে তা পরিষ্কার করতে থাকবে। তবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য না থাকলে কোন তাওবাই সত্যিকার তাওবা নয়। অন্য কোন কারণে বা উদ্দেশ্যে কোন খারাপ কাজ পরিত্যাগ করা আদৌ তাওবার সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না।

৪৮. যে প্রসংগে একথা বলা হয়েছে তা সামনে রাখলে স্পষ্ট বুঝা যায়, মক্কার কাফেরদের বিদ্রোহের পেছনে যে কার্যকারণ কাজ করছিলো আল্লাহ এখানে মূলত

وَمَآ أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾
وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ
وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣١﴾ وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلْجَوَارِ فِى ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَٰمِ ﴿٣٢﴾ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ
ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ
شَكُورٍ ﴿٣٣﴾ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا۟ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ﴿٣٤﴾ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ
يُجَٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا ۚ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ﴿٣٥﴾

৪ রুকূ'

তোমাদের ওপর যে মসিবতই এসেছে তা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে এসেছে। বহু সংখ্যক অপরাধকে তো আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন।[৫২] তোমরা তোমাদের আল্লাহকে পৃথিবীতে অচল ও অক্ষম করে দিতে সক্ষম নও এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন সহযোগী ও সাহায্যকারী নেই। সমুদ্রের বুকে পাহাড়ের মত দৃশ্যমান এসব জাহাজ তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ চাইলে বাতাসকে থামিয়ে দেবেন আর তখন সেগুলো সমুদ্রের বুকে নিশ্চল দাঁড়িয়ে যাবে।—এর মধ্যে সেই সব লোকদের প্রত্যেকের জন্য বড় বড় নিদর্শন রয়েছে যারা পূর্ণ মাত্রায় ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ।[৫৩] অথবা তার আরোহীদের বহু সংখ্যক গোনাহ ক্ষমা করেও তাদেরকে কতিপয় কৃতকর্মের অপরাধে ডুবিয়ে দেবেন। আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে যারা বিতর্ক করে সেই সময় তারা জানতে পারবে, তাদের আশ্রয় লাভের কোন জায়গানেই।[৫৪]

সেদিকেই ইংগিত করছেন। যদিও রোম ও ইরানের তুলনায় তাদের কোন মর্যাদাশীল অস্তিত্বই ছিল না এবং আশেপাশের জাতিসমূহের মধ্যে তারা একটি পশ্চাদপদ জাতির একটি ব্যবসায়জীবী গোষ্ঠী বা অন্য কথায় ফেরিওয়ালার চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী ছিল না। কিন্তু নিজেদের এই ক্ষুদ্র জগতের মধ্যে অন্য আরবদের তুলনায় তারা যে সচ্ছলতা ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলো তা তাদেরকে এতটাই অহংকারী করে তুলেছিলো যে, তারা আল্লাহর নবীর কথা শুনতেও কোনভাবে প্রস্তুত ছিল না এবং মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের নেতা হবে আর তারা তাঁকে অনুসরণ করবে তাদের গোত্রাধিপতিগণ একে তাদের মার্যাদার পরিপন্থী মনে করতো। এ কারণে বলা হচ্ছে, আমি যদি এসব সংকীর্ণমনা লোকদের জন্য সত্যিই রিযিকের দরজা খুলে দিতাম

তাহলে তারা পুরোপুরি গর্বে ফেটে পড়তো। কিন্তু আমি তাদেরকে আমার পর্যবেক্ষণে রেখেছি এবং বুঝে শুনে ঠিক ততটাই দিচ্ছি যতটা তাদেরকে গর্বে স্ফীত হতে দেবে না। এ অর্থ অনুসারে এ আয়াত ঠিক সেই অর্থ প্রকাশ করছে যা সূরা তাওবার ৬৮ ও ৭০ আয়াত, আল কাহাফের ৩২ ও ৪২ আয়াত, আল কাসাসের ৭৫ ও ৮২ আয়াত, আর রূম ৯ আয়াত, সাবা ৩৪ ও ৩৬ আয়াত এবং আল মু'মিনের ৮২ ও ৮৫ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

৪৯. এখানে অলী অর্থ এমন সত্তা যিনি তাঁর নিজের তৈরী সমস্ত সৃষ্টির সব ব্যাপারের তত্বাবধায়ক, যিনি বান্দাদের সমস্ত অভাব ও প্রয়োজন পূরণের সব দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

৫০. অর্থাৎ যমীন ও আসমান উভয় স্থানেই। জীবনের অস্তিত্ব যে শুধু পৃথিবীতেই নয়, অন্য সব গ্রহেও প্রাণী ও প্রাণধারী সত্তা আছে এটা তার সুস্পষ্ট ইংগিত।

৫১. অর্থাৎ তিনি যেমন তাদের ছড়িয়ে দিতে সক্ষম তেমনি একত্র করতেও সক্ষম। তাই কিয়ামত আসতে পারে না এবং আগের ও পরের সবাইকে একই সময়ে উঠিয়ে একত্রিত করা যেতে পারে না এ ধারণা মিথ্যা।

৫২. প্রকাশ থাকে যে, এখানে মানুষের সব রকম বিপদাপদের কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে না এখানে বক্তব্যের লক্ষ্য সেই সব লোক যারা সেই সময় পবিত্র মক্কায় কুফর ও নাফরমানিতে লিপ্ত হচ্ছিলো। তাদের বলা হচ্ছে, আল্লাহ যদি তোমাদের সমস্ত দোষ-ত্রুটির জন্য পাকড়াও করতেন তাহলে তোমাদেরকে জীবিতই রাখতেন না। তবে যে বিপদাপদ তোমাদের ওপর নাযিল হয়েছে (সম্ভবত মক্কার দুর্ভিক্ষের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে) তা কেবল সতর্কীকরণ হিসেবে দেয়া হয়েছে যাতে তোমাদের সম্বিত ফিরে আসে এবং নিজেদের কাজকর্মের পর্যালোচনা করে দেখো যে, তোমরা আপন রবের বিরুদ্ধে কি ধরনের আচরণ করেছো। একথাও বুঝার চেষ্টা করো, যে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমরা বিদ্রোহ করছো তাঁর কাছে তোমরা কত অসহায়। তাছাড়া জেনে রাখো, তোমরা যাদেরকে অভিভাবক ও সাহায্যকারী বানিয়ে বসে আছো কিংবা তোমরা যেসব শক্তির ওপর ভরসা করে আছো আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য তারা কোন কাজে আসবে না।

আরো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য এ বিষয়টিও বর্ণনা করা প্রয়োজন যে এ ব্যাপারে খাঁটি মু'মিনের জন্য আল্লাহর বিধান ভিন্ন। মু'মিনের ওপর যে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ আসে তার গোনাহ, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতার কাফফারা হতে থাকে। সহীহ হাদীসে আছে ঃ

مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَهَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ اَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا اِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ - (بخارى ، ومسلم)

"মুসলমান যে দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা ও দুর্ভাবনা এবং কষ্ট ও অশান্তির সম্মুখীনই হোক না কেন এমন কি একটি কাঁটা বিদ্ধ হলেও আল্লাহ তাকে তার কোন না কোন গোনাহর কাফফারা বানিয়ে দেন।"

فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ
لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ
وَٱلْفَوَٰحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا۟ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ
وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾
وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾

যা-ই তোমাদের দেয়া হয়েছে তা কেবল দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপকরণ মাত্র।[৫৫] আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা যেমন উত্তম তেমনি চিরস্থায়ী।[৫৬] তা সেই সব লোকের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের রবের ওপর নির্ভর করে,[৫৭] যারা বড় বড় গোনাহ এবং লজ্জাহীনতার কাজ থেকে বিরত থাকে[৫৮] এবং ক্রোধ উৎপত্তি হলে ক্ষমা করে,[৫৯] যারা তাদের রবের নির্দেশ মেনে চলে,[৬০] নামায কায়েম করে এবং নিজেদের সব কাজ পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে চালায়,[৬১] আমি তাদের যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে[৬২] এবং তাদের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করা হলে তার মোকাবিলা করে।[৬৩]

এরপর থাকে এমন সব বিপদাপদের প্রশ্ন যা আল্লাহর পথে তাঁর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য কোন ঈমানদারকে বরদাশত করতে হয়, তা কেবল ত্রুটি-বিচ্যুতির কাফফারাই হয় না, আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা বৃদ্ধিরও কারণ হয়। এসব বিপদাপদ গোনাহর শাস্তি হিসেবে নাযিল হয়ে থাকে এমন ধারণা পোষণ করার আদৌ কোন অবকাশ নেই।

৫৩. ধৈর্যশীল অর্থ এমন ব্যক্তি যে নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং ভাল মন্দ সব রকম পরিস্থিতিতে বন্দেগীর আচরণের ওপর দৃঢ়পদ থাকে। তাদের অবস্থা এমন নয় যে, সুদিন আসলে নিজের সত্তাকে ভুলে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এবং বান্দাদের জন্য অত্যাচারী হয়ে ওঠে এবং দুর্দিন আসলে মর্যাদাবোধ খুইয়ে বসে এবং যে কোন জঘন্য থেকে জঘন্যতর আচরণ করতে থাকে। কৃতজ্ঞ বলতে বুঝানো হয়েছে এমন ব্যক্তিকে যাকে তাকদীরে ইলাহী যত উচ্চাসনেই অধিষ্ঠিত করুক না কেন সে তাকে নিজের কৃতিত্ব নয়, বরং আল্লাহর ইহসান মনে করে এবং যত নিচেই তাকে নিক্ষেপ করা হোক না কেন তার দৃষ্টি নিজের বঞ্চনার পরিবর্তে সেই সব নিয়ামতের ওপর নিবদ্ধ থাকে যা অতি করুণ পরিস্থিতির মধ্যেও ব্যক্তি লাভ করে এবং সুখ ও দুঃখ উভয় পরিস্থিতিতে তার মুখ ও অন্তর থেকে তার রবের প্রতি কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পেতে থাকে।

৫৪. কুরাইশদেরকে তাদের বাণিজ্যিক কায়কারবারের উদ্দেশ্যে হাবশা এবং আফ্রিকার উপকূলীয় অঞ্চলের দিকে যেতে হতো। এসব সফরে তারা পালের জাহাজ ও নৌকায় লোহিত সাগর পাড়ি দিত যা একটি ভয়ানক সাগর। প্রায়ই তা ঝঞ্জা বিক্ষুব্ধ থাকে এবং তার পানির নীচে বিপুল সংখ্যক পাহাড় বিদ্যমান। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে এসব পাহাড়ের সাথে জাহাজের ধাক্কা খাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে আল্লাহ এখানে যে অবস্থা চিত্রিত করেছেন নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে কুরাইশরা তা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারতো।

৫৫. অর্থাৎ এটা এমন কোন জিনিস নয় যার জন্য মানুষ গর্বিত হতে পারে। কোন মানুষ পৃথিবীতে সর্বাধিক সম্পদ লাভ করলেও স্বল্পতম সময়ের জন্যই লাভ করেছে। সে কয়েক বছর মাত্র তা ভোগ করে তারপর সব কিছু ছেড়ে খালি হাতে পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে যায়। তাছাড়া সে সম্পদ যত অঢেলই হোক না কেন বাস্তবে তার একটা ক্ষুদ্রতম অংশই ব্যক্তির ব্যবহারে আসে। এ ধরনের সম্পদের কারণে গর্বিত হওয়া এমন কোন মানুষের কাজ নয় যে, নিজের এই অর্থ-সম্পদের এবং এই পৃথিবীর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করে।

৫৬. অর্থাৎ সেই সম্পদ গুণগত ও অবস্থাগত দিক দিয়েও উন্নতমানের। তাছাড়া তা সাময়িক বা অস্থায়ীও নয়, বরং চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর।

৫৭. এখানে আল্লাহর প্রতি ভরসাকে ঈমানের অনিবার্য দাবী এবং আখেরাতের সফলতার জন্য একটি জরুরী বৈশিষ্ট বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাওয়াক্কুল অর্থ হচ্ছে, প্রথমত, আল্লাহর পথনির্দেশনার ওপর ব্যক্তির পূর্ণ আস্থা থাকবে এবং সে মনে করবে, আল্লাহ প্রকৃত সত্য সম্পর্কে যে জ্ঞান, নৈতিক চরিত্রের যে নীতিমালা, হালাল ও হারামের যে সীমারেখা এবং পৃথিবীতে জীবন যাপনের জন্য যেসব নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান দিয়েছেন তাই সত্য ও সঠিক এবং সেসব মেনে চলার মধ্যেই মানুষের কল্যাণ নিহিত। দ্বিতীয়ত, মানুষের নির্ভরতা তার নিজের শক্তি, যোগ্যতা, মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ, ব্যবস্থাপনা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদের সাহায্য-সহযোগিতার ওপর হবে না। তাকে একথা পুরোপুরি মনে রাখতে হবে যে, দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতিটি ব্যাপারে তার সাফল্য প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্যের ওপর! আর সে আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্যের উপযুক্ত কেবল তখনই হতে পারে যখন সে তাঁর সন্তুষ্টিকে লক্ষ্য বানিয়ে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখাসমূহ মেনে কাজ করবে। তৃতীয়ত, ঈমান ও নেক কাজের পথ অবলম্বনকারী এবং বাতিলের পরিবর্তে ন্যায় ও সত্যের জন্য কর্মতৎপর বান্দাদেরকে আল্লাহ যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ব্যক্তিকে তার ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখতে হবে। ঐ সব প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থাশীল হয়ে সে সেই সব লাভ, উপকার ও আনন্দকে পদাঘাত করবে যা বাতিলের পথ অনুসরণ করার ক্ষেত্রে লাভ করা যাবে বলে মনে হয় এবং ন্যায় ও সত্যের ওপর দৃঢ়পদ থাকার কারণে যেসব ক্ষতি, দুঃখ কষ্ট এবং বঞ্চনা তার ভাগ্যে আসে তা সহ্য করবে। ঈমানের সাথে তাওয়াক্কুলের সম্পর্ক কত গভীর তা তাওয়াক্কুল শব্দের অর্থের এই বিশ্লেষণের পর সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং তাওয়াক্কুল ছাড়া যে ঈমান সাদামাটা স্বীকৃতি ও ঘোষণা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ তা থেকে সেই গৌরবময় ফলাফল কি করে অর্জিত হতে পারে ঈমান গ্রহণ করে তাওয়াক্কুলকারীদের যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে!

৫৮. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নিসা, টীকা ৫৩, ৫৪; আল আনয়াম, টীকা ১৩০-৩১; আন নাহল, টীকা ৮৯; তাছাড়া সূরা নাজমের ৩২ আয়াত।

৫৯. অর্থাৎ তারা রুক্ষ ও ক্রুদ্ধ স্বভাবের হয় না, বরং নম্র স্বভাব ও ধীর মেজাজের মানুষ হয়। তাদের স্বভাব প্রতিশোধ পরায়ণ হয় না। তারা আল্লাহর বান্দাদের সাথে ক্ষমার আচরণ করে এবং কোন কারণে ক্রোধান্বিত হলেও তা হজম করে। এটি মানুষের সর্বোত্তম গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মজীদ একে অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য বলে ঘোষণা করেছে (আল ইমরান, আয়াত ১৩৪) এবং একে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাফল্যের বড় বড় কারণসমূহের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে (আল ইমরান, ১৫৯ আয়াত)। হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ

ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فى شىء قط الا ان تنتهك حرمة الله - (بخارى ، مسلم)

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিগত কারণে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহর কোন হুরমত বা মর্যাদার অবমাননা করা হলে তিনি শাস্তি বিধান করতেন।"

৬০. শাব্দিক অনুবাদ হবে "রবের আহবানে সাড়া দেয়।" অর্থাৎ আল্লাহ যে কাজের জন্যই ডাকেন সে কাজের জন্যই ছুটে যায় এবং যে জিনিসের জন্যই আহবান জানান তা গ্রহণ করে।

৬১. এ বিষয়টিকে এখানে ঈমানদারদের সর্বোত্তম গুণাবলীর মধ্যে গণ্য করা হয়েছে এবং সূরা আল ইমরানে (আয়াত ১৫৯) এ জন্য আদেশ করা হয়েছে। এ কারণে পরামর্শ ইসলামী জীবন প্রণালীর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। পরামর্শ ছাড়া সামষ্টিক কাজ পরিচালনা করা শুধু জাহেলী পন্থাই নয়, আল্লাহর নির্ধারিত বিধানের সুস্পষ্ট লংঘন। ইসলামে পরামর্শকে এই গুরুত্ব কেন দেয়া হয়েছে? এর কারণসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে আমাদের সামনে তিনটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়।

এক ঃ যে বিষয়টি দুই বা আরো বেশী লোকের স্বার্থের সাথে জড়িত সে ক্ষেত্রে কোন এক ব্যক্তির নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং সংশ্লিষ্ট অন্য ব্যক্তিদের উপেক্ষা করা জুলুম। যৌথ ব্যাপারে কারো যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার নেই। ইনসাফের দাবী হচ্ছে, কোন বিষয়ে যত লোকের স্বার্থ জড়িত সে ব্যাপারে তাদের সবার মতামত গ্রহণ করতে হবে এবং তাতে যদি বিপুল সংখ্যক লোকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকে তাহলে তাদের আস্থাভাজন প্রতিনিধিদেরকে পরামর্শের মধ্যে শামিল করতে হবে।

দুই ঃ যৌথ ব্যাপারে মানুষ স্বেচ্ছাচারিতা করার চেষ্টা করে অন্যদের অধিকার নস্যাত করে নিজের ব্যক্তি স্বার্থ লাভ করার জন্য, অথবা এর কারণ হয় সে নিজেকে বড় একটা কিছু এবং অন্যদের নগণ্য মনে করে। নৈতিক বিচারে এই দুটি জিনিসই সমপর্যায়ের হীন। মু'মিনের মধ্যে এ দুটির কোনটিই পাওয়া যেতে পারে না। মু'মিন কখনো স্বার্থপর হয় না। তাই সে অন্যদের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করে নিজে অন্যায় ফায়দা চাইতে পারে না

এবং অহংকারী বা আত্মপ্রশংসিতও হতে পারে না যে নিজেকেই শুধু মহাজ্ঞানী ও সবজান্তা মনে করবে।

তিন ঃ যেসব বিষয় অন্যদের অধিকার ও স্বার্থের সাথে জড়িত সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটা বড় দায়িত্ব। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এবং একথা জানে যে এর জন্য তাকে তার রবের কাছে কত কঠিন জবাবদিহি করতে হবে সে কখনো একা এই গুরুভার নিজের কাঁধে উঠিয়ে নেয়ার দুঃসাহস করতে পারে না। এ ধরনের দুঃসাহস কেবল তারাই করে যারা আল্লাহর ব্যাপারে নির্ভিক এবং আখেরাত সম্পর্কে চিন্তাহীন। খোদাভীরু ও আখেরাতের জবাবদিহির অনুভূতি সম্পন্ন লোক কোন যৌথ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কিংবা তাদের নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধিদেরকে পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই শরীক করার চেষ্টা করবে যাতে সর্বাধিক মাত্রায় সঠিক, নিরপেক্ষ এবং ইনসাফ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এ ক্ষেত্রে যদি অজ্ঞাতসারে কোন ত্রুটি হয়েও যায় তাহলে কোন এক ব্যক্তির ঘাড়ে তার দায়দায়িত্ব এসে পড়বে না।

এ তিনটি কারণ এমন যদি তা নিয়ে মানুষ গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে অতি সহজেই সে একথা উপলব্ধি করতে পারবে যে, ইসলাম যে নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা দেয় পরামর্শ তার অনিবার্য দাবী এবং তা এড়িয়ে চলা একটি অতি বড় চরিত্রহীনতার কাজ। ইসলাম কখনো এ ধরনের কাজের অনুমতি দিতে পারে না। ইসলামী জীবন পদ্ধতি সমাজের ছোট বড় প্রতিটি ব্যাপারেই পরামর্শের নীতি কার্যকরী হোক তা চায়। পারিবারিক ব্যাপার হলে সে ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করে কাজ করবে এবং ছেলেমেয়ে বড় হলে তাদেরকেও পরামর্শে শরীক করতে হবে। খান্দান বা গোষ্ঠীর ব্যাপার হলে সে ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর সমস্ত বুদ্ধিমান ও বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ করতে হবে যদি একটি গোত্র বা জ্ঞাতিগোষ্ঠী কিংবা জনপদের বিষয়াদি হয় এবং তাতে সব মানুষের অংশগ্রহণ সম্ভব না হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব এমন পঞ্চায়েত বা সভা পালন করবে যেখানে কোন সর্বসম্মত পন্থা অনুসারে সংশ্লিষ্ট সবার আস্থাভাজন প্রতিনিধিরা শরীক হবে। গোটা জাতির ব্যাপার হলে তা পরিচালনার জন্য সবার ইচ্ছানুসারে তাদের নেতা নিযুক্ত হবে জাতীয় বিষয়গুলোকে সে এমন সব ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ অনুসারে পরিচালনা করবে জাতি যাদেরকে নির্ভরযোগ্য মনে করে এবং সে ততক্ষণ পর্যন্ত নেতা থাকবে যতক্ষণ জাতি তাকে নেতা বানিয়ে রাখতে চাইবে। কোন ঈমানদার ব্যক্তি জোরপূর্বক জাতির নেতা হওয়ার বা হয়ে থাকার আকাংখা কিংবা চেষ্টা করতে পারে না। প্রথমে জোরপূর্বক জাতির ঘাড়ে চেপে বসা এবং পরে জবরদস্তি করে মানুষের সম্মতি আদায় করা, এমন প্রতারণাও সে করতে পারে না। তাকে পরামর্শ দানের জন্য মানুষ স্বাধীন ইচ্ছানুসারে নিজেদের মনোনীত প্রতিনিধি নয়, বরং এমন প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করবে যে তার মর্জি মোতাবেক মতামত প্রকাশ করবে, এমন চক্রান্তও সে করতে পারে না এমন আকাংখা কেবল সেই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে যার মন অসৎ উদ্দেশ্য দ্বারা কলুষিত। এই আকাংখার সাথে أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ এর বাহ্যিক কাঠামো নির্মাণ এবং তার বাস্তব প্রাণসত্তাকে নিঃশেষ করে দেয়ার প্রচেষ্টা শুধু সেই ব্যক্তিই চালাতে পারে যে আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টিকে ধোঁকা দিতে ভয় করে না। অথচ না আল্লাহকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব না আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ এমন অন্ধ হতে পারে যে, প্রকাশ্য দিবালোকে কেউ ডাকাতি করছে আর মানুষ তা দেখে সরল মনে ভাবতে থাকবে যে, সে ডাকাত নয়, মানুষের সেবা করছে।

أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ এর নিয়মটি প্রকৃতি ও বৈশিষ্টের দিক দিয়ে পাঁচটি জিনিস দাবী করে ঃ

এক ঃ যৌথ বিষয়সমূহ যাদের অধিকার ও স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত তাদের মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকতে হবে এবং কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারগুলো কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে সে বিষয়ে তাদের অবহিত রাখতে হবে। তারা যদি তাদের ব্যাপারগুলোর নেতৃত্বে কোন ত্রুটি, অপরিপক্কতা বা দুর্বলতা দেখায় তাহলে তা তুলে ধরার ও তার প্রতিবাদ করার এবং সংশোধিত হতে না দেখলে পরিচালক ও ব্যবস্থাপকদের পরিবর্তন করার অধিকার থাকতে হবে। মানুষের মুখ বন্ধ করে, হাত পা বেঁধে এবং তাদেরকে অনবহিত রেখে তাদের সামুষ্টিক ব্যাপারসমূহ পরিচালনা করা সুস্পষ্ট প্রবঞ্চনা। কেউ-ই এ কাজকে أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ নীতির অনুসরণ বলে মানতে পারে না।

দুই ঃ যৌথ বিষয়সমূহ পরিচালনার দায়িত্ব যাকেই দেয়া হবে তাকে যেন এ দায়িত্ব সবার স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে দান করা হয়। জবরদস্তি ও ভয়ভীতি দ্বারা অর্জিত কিংবা লোভ-লালসা দিয়ে খরিদকৃত অথবা ধোঁকা-প্রতারণা ও চক্রান্তের মাধ্যমে লুণ্ঠিত সম্মতি প্রকৃতপক্ষে কোন সম্মতি নয়। যে সম্ভাব্য সব রকম পন্থা কাজে লাগিয়ে কোন জাতির নেতা হয় সে সত্যিকার নেতা নয়। সত্যিকার নেতা সেই যাকে মানুষ নিজের পসন্দানুসারে সানন্দ চিত্তে নেতা হিসেবে গ্রহণ করে।

তিন ঃ নেতাকে পরামর্শ দানের জন্যও এমন সব লোক নিয়োগ করতে হবে যাদের প্রতি জাতির আস্থা আছে। এটা সর্বজনবিদিত যে, যারা চাপ সৃষ্টি করে কিংবা অর্থ দ্বারা খরিদ করে অথবা মিথ্যা ও চক্রান্তের সাহায্যে বা মানুষকে বিভ্রান্ত করে প্রতিনিধিত্বের স্থানটি দখল করে তাদেরকে সঠিক অর্থে আস্থাভাজন বলা যায় না।

চার ঃ পরামর্শদাতাগণ নিজেদের জ্ঞান, ঈমান ও বিবেক অনুসারে পরামর্শ দান করবে এবং এভাবে মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকতে হবে। এ দিকগুলো যেখানে থাকবে না, যেখানে পরামর্শদাতা কোন প্রকার লোভ-লালসা বা ভীতির কারণে অথবা কোন দলাদলির মারপ্যাঁচের কারণে নিজের জ্ঞান ও বিবেকের বিরুদ্ধে মতামত পেশ করে সেখানে প্রকৃতপক্ষে হবে খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ এর অনুসরণ নয়।

পাঁচ ঃ পরামর্শদাতাদের 'ইজমা'র (সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত) ভিত্তিতে যে পরামর্শ দেয়া হবে, অথবা যে সিদ্ধান্ত তাদের অধিকাংশের সমর্থন লাভ করবে তা মেনে নিতে হবে। কেননা সবার মতামত জানার পরও যদি এক ব্যক্তি অথবা একটি ছোট্ট গ্রুপকে স্বেচ্ছাচার চালানোর সুযোগ দেয়া হয় তাহলে পরামর্শ অর্থহীন হয়ে যায়। আল্লাহ একথা বলছেন না যে, "তাদের ব্যাপারে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়" বরং বলছেন, 'তাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে চলে।" শুধু পরামর্শ করাতেই এ নির্দেশ পালন করা হয় না। তাই পরামর্শের ক্ষেত্রে সর্বসম্মত অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজকর্ম পরিচালনা প্রয়োজন।

ইসলামের পরামর্শ ভিত্তিক কাজ পরিচালনা নীতির এই ব্যাখ্যার সাথে এই মৌলিক কথাটার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মুসলমানদের পারস্পরিক বিষয়সমূহ পরিচালনায়

এই শূরা স্বেচ্ছাচারী এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নয়, বরং অবশ্যই সেই দীনের বিধি-বিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ আল্লাহ নিজেই যার জন্য বিধান রচনা করেছেন। সাথে সাথে তা সেই মূল নীতিরও আনুগত্য করতে বাধ্য যাতে বলা হয়েছে "যে ব্যাপারেই তোমাদের মধ্যে মতভেদ হবে তার ফায়সালা করবেন আল্লাহ।" এবং "তোমাদের মধ্যে যে বিরোধই বাধুক না কেন সে জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে ফিরে যাও।" এই সাধারণ সূত্র অনুসারে মুসলমানরা শারয়ী বিষয়ে মূল ধর্মগ্রন্থের কোন অংশের কি অর্থ এবং কিভাবে তা কার্যকর করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ করতে পারে যাতে তার মূল উদ্দেশ্য পূরণ হয়। কিন্তু যে ব্যাপারে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সে ব্যাপারে তারা নিজেরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এ উদ্দেশ্যে কোন পরামর্শ করতে পারে না।

৬২. এর তিনটি অর্থ ঃ

এক ঃ আমি তাদেরকে যে হালাল রিযিক দান করেছি তা থেকে খরচ করে, নিজের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য হারাম অর্থ-সম্পদের দিকে হাত বাড়ায় না।

দুই ঃ আমার দেয়া রিযিককে যক্ষের ধনের মত জমা করে রাখে না, বরং খরচ করে।

তিন ঃ তাদের যে রিযিক দেয়া হয়েছে তা থেকে আল্লাহর পথেও ব্যয় করে, সবটাই নিজের জন্য আঁকড়ে ধরে রাখে না।

প্রথম অর্থের ভিত্তি হলো, আল্লাহ শুধু হালাল ও পবিত্র রিযিককেই তাঁর দেয়া রিযিক বলে বর্ণনা করেন। অপবিত্র ও হারাম পন্থায় উপার্জিত রিযিককে তিনি তাঁর নিজের দেয়া রিযিক বলেন না। দ্বিতীয় অর্থের ভিত্তি হলো, আল্লাহ মানুষকে যে রিযিক দান করেন তা খরচ করার জন্য দান করেন, জমিয়ে জমিয়ে সাপের মত পাহারা দিয়ে রাখার জন্য দেন না। এবং তৃতীয় অর্থের ভিত্তি হলো, কুরআন মজীদে ব্যয় করা বলতে শুধু নিজের সত্তা ও প্রয়োজন পূরণের জন্য ব্যয় করা বুঝানো হয়নি। এ অর্থের মধ্যে আল্লাহর পথে ব্যয়ও অন্তর্ভুক্ত। এ তিনটি কারণে আল্লাহ এখানে খরচ করাকে ঈমানদারদের সর্বোত্তম গুণাবলীর মধ্যে গণ্য করছেন এবং এ জন্য আখেরাতের কল্যাণসমূহ তাদের জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

৬৩. এটাও ঈমানদারদের একটা সর্বোৎকৃষ্ট গুণ। তারা জালেম ও নিষ্ঠুরদের জন্য সহজ শিকার নয়। তাদের কোমল স্বভাব এবং ক্ষমাশীলতা দুর্বলতার কারণে নয়। তাদের ভিক্ষু ও পাদরীদের মত মিসকীন হয়ে থাকার শিক্ষা দেয়া হয়নি। তাদের ভদ্রতার দাবী হচ্ছে বিজয়ী হলে বিজিতের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়। সক্ষম হলে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে মাফ করে এবং অধীনস্ত ও দুর্বল ব্যক্তির দ্বারা কোন ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হলে তা উপেক্ষা করে যায়। কিন্তু কোন শক্তিশালী ব্যক্তি যদি তার শক্তির অহংকারে তার প্রতি বাড়াবাড়ি করে তাহলে বুক টান করে দাঁড়িয়ে যায় এবং তাকে উচিত শিক্ষা দান করে। মু'মিন কখনো জালেমের কাছে হার মানে না এবং অহংকারীর সামনে মাথা নত করে না। এ ধরনের লোকদের জন্য তারা বড় কঠিন খাদ্য যা চিবানোর প্রচেষ্টাকারীর মাড়িই ভেঙে দেয়।

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ
لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ
سَبِيْلٍ ﴿٤١﴾ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ
فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤٢﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ
وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿٤٣﴾

খারাপের[৬৪] প্রতিদান সমপর্যায়ের খারাপ।[৬৫] অতপর যে মাফ করে দেয় এবং সংশোধন করে তাকে পুরস্কৃত করা আল্লাহর দায়িত্ব।[৬৬] আল্লাহ জালেমদের পসন্দ করেন না।[৬৭] যারা জুলুম হওয়ার পরে প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের তিরস্কার করা যায় না। তিরস্কারের উপযুক্ত তো তারা যারা অন্যদের ওপর জুলুম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায় বাড়াবাড়ি করে। এসব লোকের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। তবে যে ধৈর্যের সাথে কাজ করে এবং ক্ষমা প্রদর্শন করে তার সে কাজ মহত্তর সংকল্পদীপ্ত কাজের অন্তর্ভুক্ত।[৬৮]

৬৪. এখান থেকে শেষ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত গোটা বক্তব্য পূর্ববর্তী আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ।

৬৫. এটা প্রথম নিয়মতান্ত্রিক বিধান, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে যা মনে রাখা দরকার। প্রতিশোধ গ্রহণের বৈধ সীমা হচ্ছে কারো প্রতি যতটুকুন অন্যায় করা হয়েছে সে তার প্রতি ঠিক ততটুকুন অন্যায় করবে। তার চেয়ে বেশী অন্যায় করার অধিকার তার নেই।

৬৬. এটা প্রতিশোধ গ্রহণের দ্বিতীয় বিধান। এর অর্থ অন্যায়কারী থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ যদিও বৈধ, তবে যেখানে ক্ষমা করে দিলে তা সংশোধনের কারণ হতে পারে সেখানে সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে মাফ করে দেয়া অধিক উত্তম। যেহেতু মানুষ নিজেকে কষ্ট দিয়ে এই ক্ষমা প্রদর্শন করে তাই আল্লাহ বলেন, এর প্রতিদান দেয়া আমার দায়িত্ব। কারণ, সত্য পথ থেকে বিচ্যুত মানুষকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে তুমি এই তিক্ততা হজম করেছো।

৬৭. এই সতর্ক বাণীর মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণ সম্পর্কে তৃতীয় আরেকটি বিধানের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে, অন্যের কৃত জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে করতে কোন ব্যক্তির নিজেরই জালেম না হয়ে যাওয়া উচিত। একটি অন্যায়ের পরিবর্তে তার চেয়ে বড় অন্যায় করে ফেলা বৈধ নয়। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কেউ অপর কাউকে একটি চপেটাঘাত করে তাহলে সে তাকে একটি চপেটাঘাতই করতে পারে, অসংখ্য লাথি ও ঘুঁষি মারতে পারে না। অনুরূপ গোনাহর, প্রতিশোধ গোনাহর কাজের মাধ্যমে নেয়া ঠিক

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا
الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٤﴾ وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ
عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْۤا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ
اَلَاۤ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ﴿٤٥﴾ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ
يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٦﴾

৫ রুকূ'

আল্লাহ নিজেই যাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেন আল্লাহ ছাড়া তাকে সামলানোর আর কেউ নেই।[৬৯] তোমরা দেখতে পাবে এসব জালেমরা যখন আযাব দেখবে তখন বলবে এখন কি ফিরে যাবারও কোন পথ আছে?[৭০] তুমি দেখতে পাবে এদের জাহান্নামের সামনে আনা হলে অপমানে আনত হতে থাকবে এবং দৃষ্টির আড়ালে বাঁকা চোখে তাকে দেখতে থাকবে।[৭১] যারা ঈমান এনেছিলো সেই সময় তারা বলবে ঃ প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা আজ কিয়ামতের দিন নিজেরাই নিজেদেরকে এবং নিজেদের সংশ্লিষ্টদেরকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। সাবধান! জালেমরা চিরস্থায়ী আযাব ভোগ করতে থাকবে এবং তাদের কোন সহযোগী ও অভিভাবক থাকবে না, যারা আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের সাহায্য করবে। আল্লাহ নিজেই যাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেন তার বাঁচার কোন পথ নেই।

নয়। যেমন কোন জালেম যদি কারোর পুত্রকে হত্যা করে তাহলে তার পুত্রকে হত্যা করা জায়েয নয়। কিংবা কোন দুরাচার যদি কারো বোন বা কন্যার সাথে ব্যভিচার করে তাহলে সেই ব্যক্তির তার বোন বা কন্যার সাথে ব্যভিচার করা হালাল হবে না।

৬৮. উল্লেখ্য, এ আয়াতগুলোতে ঈমানদারদের যেসব গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে তা সেই সময় বাস্তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদের জীবনে বিদ্যমান ছিল এবং মক্কার কাফেররা নিজ চোখে তা দেখছিলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ এভাবে কাফেরদের বুঝিয়েছেন যে, পৃথিবীর স্বল্প দিনের জীবন যাপনের যে উপায়-উপকরণ লাভ করে তোমরা আত্মহারা হয়ে পড়ছো প্রকৃত সম্পদ ঐ সব

اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ مَا لَكُمْ
مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ﴿٤٧﴾ فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ
عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاِنَّاۤ اِذَاۤ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا
رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ
الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ﴿٤٨﴾ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ
يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ﴿٤٩﴾ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ
ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٥٠﴾

তোমরা তোমাদের রবের কথায় সাড়া দাও—সেই দিনটি আসার আগেই আল্লাহর পক্ষ থেকে যাকে ফিরিয়ে দেয়ার কোন ব্যবস্থা নেই।[৭২] সেই দিন তোমাদের জন্য কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টাকারীও কেউ থাকবে না।[৭৩] এখন যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে হে নবী, আমি তো আপনাকে তাদের জন্য রক্ষক হিসেবে পাঠাইনি।[৭৪] কথা পৌঁছিয়ে দেয়াই কেবল তোমার দায়িত্ব। মানুষের অবস্থা এই যে, যখন আমি তাকে আমার রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই তখন সে তার জন্য গর্বিত হয়ে ওঠে। আর যখন তার নিজ হাতে কৃত কোন কিছু মুসিবত আকারে তার ওপর আপতিত হয় তখন সে চরম অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়।[৭৫]

যমীন ও আসমানের বাদশাহীর অধিকর্তা আল্লাহ[৭৬] তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র ও কন্যা উভয়টিই দেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। তিনি সব কিছু জানেন এবং সব কিছু করতে সক্ষম।[৭৭]

উপায়-উপকরণ নয়। বরং কুরআনের পথনির্দেশনা গ্রহণ করে তোমাদের সমাজের এসব ঈমানদার তাদের মধ্যে যে নৈতিক চরিত্র ও গুণাবলী সৃষ্টি করেছে। সেগুলোই প্রকৃত সম্পদ।

৬৯. অর্থাৎ আল্লাহ এসব লোকের হিদায়াতের জন্য কুরআনের মত সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব পাঠিয়েছেন, যা অত্যন্ত যুক্তিসংগত এবং অত্যন্ত কার্যকর ও চিত্তাকর্ষক উপায়ে প্রকৃত

সত্যের জ্ঞান দান করছে এবং জীবনের সঠিক পথ বলে দিচ্ছে। তাদের পথপ্রদর্শনের জন্য মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত নবী পাঠিয়েছেন যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ জীবন ও চরিত্রের অধিকারী মানুষ তাদের দৃষ্টি কখনো দেখেনি। আল্লাহ এই কিতাব ও এই রসূলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুফলসমূহও ঈমান গ্রহণকারীদেরকে তাদের নিজ চোখে দেখিয়ে দিয়েছেন। এসব দেখার পর যদি কোন ব্যক্তি হিদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ পুনরায় তাকে সেই গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করবেন যেখান থেকে সে বেরিয়ে আসতে আগ্রহী নয়। আর আল্লাহই যখন তাকে তাঁর দরজা থেকে ঠেলে সরিয়ে দেন তখন তাকে সঠিক পথে নিয়ে আসার দায়িত্ব কে নিতে পারে?

৭০. অর্থাৎ আজ যখন ফিরে আসার সুযোগ আছে তখন এরা ফিরে আসতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। কিন্তু কাল যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে এবং শাস্তির নির্দেশ কার্যকর হবে তখন নিজেদের দুর্ভাগ্য দেখে এরা ফিরে আসার সুযোগ পেতে চাইবে।

৭১. মানুষের স্বভাব হচ্ছে, কোন ভয়ানক দৃশ্য যখন তার সামনে থাকে এবং সে বুঝতে পারে, চোখের সামনে যা দেখা যাচ্ছে খুব শীঘ্রই সে তার কবলে পড়তে যাচ্ছে তখন প্রথমেই ভয়ের চোটে চোখ বন্ধ করে নেয়। এরপরও যদি তার হাত থেকে রেহাই না পায় তখন দেখার চেষ্টা করে বিপদটা কেমন এবং এখনো তার থেকে কত দূরে আছে। কিন্তু মাথা উঁচু করে ভালভাবে দেখার হিম্মত তার থাকে না। তাই সে বার বার একটু একটু করে চোখ খুলে বাঁকা দৃষ্টিতে দেখে এবং ভয়ের চোটে আবার চোখ বন্ধ করে নেয়। এ আয়াতে জাহান্নামের দিকে অগ্রসরমান লোকদের এই অবস্থাই এখানে চিত্রিত করা হয়েছে।

৭২. অর্থাৎ না আল্লাহ নিজে তা ফিরাবেন আর না অন্য কারো তা ফিরানোর ক্ষমতা আছে।

৭৩. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে مَا لَكُمْ مِّن نَّكِيرٍ এই আয়াতাংশের আরো কয়েকটি অর্থ আছে। এক—তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের কোনটিকেই অস্বীকার করতে পারবে না। দুই—তোমরা পোশাক বদল করে কোথাও লুকাতে পারবে না। তিন—তোমাদের সাথে যে আচরণই করা হোক না কেন তোমরা তার কোন প্রতিবাদ এবং তার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারবে না। চার—তোমাদেরকে যে পরিস্থিতির মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে তোমরা তা পাল্টিয়ে ফেলতে পারবে না।

৭৪. অর্থাৎ তোমাদের ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি যে, তোমরা অবশ্যই তাদেরকে সঠিক পথে আনবে অন্যথায় তারা সঠিক পথে আসেনি কেন সে জন্য তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

৭৫. মানুষ বলতে এখানে সেই নীচমনা ও অদূরদর্শী মানুষদের বুঝানো হয়েছে পূর্ব থেকেই যাদের আলোচনা চলে আসছে। পার্থিব কিছু সম্পদ লাভ করার কারণে যারা গর্বিত হয়ে উঠেছে এবং বুঝিয়ে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করা হলে সেদিকে কানই দেয় না কিন্তু নিজেদের কৃতকর্মের কারণেই যদি কোন সময় তাদের দুর্ভাগ্য এসে যায় তাহলে ভাগ্যকে দোষারোপ করতে থাকে। আল্লাহ তাদেরকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন তা সবই ভুলে যায় এবং যে অবস্থার মধ্যে সে পতিত হয়েছে তাতে তার নিজের দোষ-ত্রুটি কতটুকু তা

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾ وَكَذَٰلِكَ
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا
الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿٥٣﴾

কোন[৭৮] মানুষই এ মর্যাদার অধিকারী নয় যে, আল্লাহ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন। তিনি কথা বলেন হয় অহীর (ইংগিত) মাধ্যমে,[৭৯] অথবা পর্দার আড়াল থেকে,[৮০] কিংবা তিনি কোন বার্তাবাহক (ফেরেশতা) পাঠান এবং সে তাঁর হুকুমে তিনি যা চান অহী হিসেবে দেয়।[৮১] তিনি সুমহান ও সুবিজ্ঞ।[৮২] এভাবেই (হে মুহাম্মদ), আমি আমার নির্দেশে তোমার কাছে এক রূহকে অহী করেছি।[৮৩] তুমি আদৌ জানতে না কিতাব কি এবং ঈমানই বা কি।[৮৪] কিন্তু সেই রূহকে আমি একটি আলো বানিয়ে দিয়েছি যা দিয়ে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ দেখিয়ে থাকি। নিশ্চিতভাবেই আমি তোমাকে সোজা পথের দিক নির্দেশনা দান করছি। সেই আল্লাহর পথের দিকে যিনি যমীন ও আসমানের সব জিনিসের মালিক। সাবধান, সব কিছু আল্লাহর দিকেই ফিরে যায়।[৮৫]

বুঝার চেষ্টা করে না। এভাবে না স্বাচ্ছন্দ্য তাদের সংশোধনে কাজে আসে না দুরবস্থা তাদেরকে শিক্ষা দিয়ে সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারে। বক্তব্যের ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল পূর্বোক্ত বক্তব্যের শ্রোতাদের প্রতি একটি বিদ্রূপ। তবে তাদের সম্বোধন করে একথা বলা হয়নি যে, তোমাদের অবস্থা তো এই। বরং বলা হয়েছে, সাধারণত মানুষের মধ্যে এই দুর্বলতা দেখা যায় এবং এটাই তার নষ্টের মূল কারণ। এ থেকে ইসলামের প্রচার কৌশলের একটি দিক এই জানা যায় যে, শ্রোতার দুর্বলতার ওপর সরাসরি আঘাত না করা উচিত। সাধারণভাবে এসব দুর্বলতার উল্লেখ করা উচিত যাতে সে ক্ষিপ্ত না হয় এবং তার বিবেকবোধ যদি কিঞ্চিতও জীবিত থাকে তাহলে ঠাণ্ডা মাথায় নিজের ত্রুটি উপলব্ধি করার চেষ্টা করে।

৭৬. অর্থাৎ যারা কুফর ও শিরকের নির্বুদ্ধিতায় ডুবে আছে তারা যদি বুঝানোর পরও না মানতে চায় না মানুক, সত্য যথা স্থানে সত্যই। যমীন ও আসমানের বাদশাহী দুনিয়ার

তথাকথিত বাদশাহ, স্বৈরাচারী ও নেতাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়নি। কোন নবী, অলী, দেবী বা দেবতার তাতে কোন অংশ নেই, আল্লাহ একাই তার মালিক। তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী না নিজের শক্তিতে বিজয়ী হতে পারে, না সেই সব সত্তার কেউ এসে তাকে রক্ষা করতে পারে যাদেরকে মানুষ নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে খোদায়ী ক্ষমতা ও এখতিয়ারসমূহের মালিক মনে করে বসে আছে।

৭৭. এটা আল্লাহর বাদশাহীর নিরংকুশ (Absolute) হওয়ার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। কোন মানুষ, সে পার্থিব ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের যত বড় অধিকর্তাই সাজুক না কেন, কিংবা তাকে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের যত বড় মালিকই মনে করা হোক না কেন, অন্যদের সন্তান দেওয়ানো তো দূরের কথা নিজের জন্য নিজের ইচ্ছানুসারে সন্তান জন্ম দানেও সে কখনো সক্ষম হয়নি। আল্লাহ যাকে বন্ধ্যা করে দিয়েছেন সে কোন ওষুধ, কোন চিকিৎসা এবং কোন তাবীজ কবজ দ্বারা সন্তান ওয়ালা হতে পারেনি। আল্লাহ যাকে শুধু কন্যা সন্তান দান করেছেন সে কোনভাবেই একটি পুত্র সন্তান লাভ করতে পারেনি এবং আল্লাহ যাকে শুধু পুত্র সন্তানই দিয়েছেন সে কোনভাবেই একটি কন্যা সন্তান লাভ করতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে সবাই নিদারুণ অসহায় এমনকি সন্তান জন্মের পূর্বে কেউ এতটুকু পর্যন্ত জানতে পারেনি যে মায়ের গর্ভে পুত্র সন্তান বেড়ে উঠছে না কন্যা সন্তান। এসব দেখে শুনেও যদি কেউ খোদার খোদায়ীতে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী সেজে বসে, কিংবা অন্য কাউকে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে অংশীদার মনে করে তাহলে সেটা তার নিজের অদূরদর্শিতা যার পরিণাম সে নিজেই ভোগ করবে। কেউ নিজে নিজেই কোন কিছু বিশ্বাস করে বসলে তাতে প্রকৃত সত্যে সামান্য কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না।

৭৮. বক্তব্যের সূচনা পর্বে যা বলা হয়েছিলো সমাপ্তি পর্যায়েও সেই বিষয়টিই বলা হচ্ছে। কথাটা পুরোপুরি বুঝতে হলে এই সূরার প্রথম আয়াত এবং তার টীকা পুনরায় দেখে নিন।

৭৯. এখানে অহী অর্থ 'ইলকা', ইলহাম, মনের মধ্যে কোন কথা সৃষ্টি করে দেয়া কিংবা স্বপ্নে কিছু দেখিয়ে দেয়া, যেমন হযরত ইবরাহীম ও ইউসুফকে দেখানো হয়েছিলো (ইউসুফ, আয়াত ৪ ও ১০০ এবং আস সাফফাত, ১০২)।

৮০. এর সারমর্ম হচ্ছে, বান্দা শব্দ শুনতে পায় কিন্তু শব্দদাতাকে দেখতে পায় না, যেমন হযরত মূসার ক্ষেত্রে ঘটেছিলো। তূর পাহাড়ের পাদদেশে একটি বৃক্ষ থেকে হঠাৎ আওয়াজ আসতে শুরু হলো। কিন্তু যিনি কথা বললেন তিনি তার দৃষ্টির আড়ালেই থাকলেন (ত্বাহা, আয়াত ১১ থেকে ৪৮; আন নামল, আয়াত ৮ থেকে ১২; আল কাসাস, আয়াত ৩০ থেকে ৩৫)।

৮১. যে পদ্ধতিতে নবী-রসূলদের কাছে সমস্ত আসমানী কিতাব এসেছে এটা অহী আসার সেই পদ্ধতি। কেউ কেউ এ আয়াতাংশের ভুল ব্যাখ্যা করে এর অর্থ করেছেন ঃ আল্লাহ রসূল প্রেরণ করেন যিনি তাঁর নির্দেশে সাধারণ লোকদের কাছে তাঁর বাণী পৌঁছিয়ে দেন।" কিন্তু কুরআনের ভাষা فَيُوْحِيْ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ (তারপর সে তাঁর নির্দেশে তিনি যা চান তাই অহী হিসেবে দেয়) তাদের এই ব্যাখ্যার ভ্রান্তি সম্পূর্ণ স্পষ্ট করে দেয়। সাধারণ মানুষের সামনে নবীদের তাবলীগী কাজকর্মকে "অহী প্রদান" অর্থে না কুরআনের

কোথাও আখ্যায়িত করা হয়েছে, না আরবী ভাষায় মানুষের সাথে মানুষের কথাবার্তাকে 'অহী' শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করার কোন অবকাশ আছে। অহীর আভিধানিক অর্থই হচ্ছে গোপন এবং ত্বরিত ইংগিত। নবী-রসূলদের তাবলীগি কাজকর্ম বুঝাতে এই শব্দটির ব্যবহার শুধু এমন ব্যক্তিই করতে পারে যে আরবী ভাষায় একেবারেই অজ্ঞ।

৮২. অর্থাৎ তিনি কোন মানুষের সাথে সামনা-সামনি কথাবার্তা বলার বহু উর্ধে। নিজের কোন বান্দার কাছে নির্দেশনা পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য সামনা সামনি বাক্যালাপ করা ছাড়া আর কোন কৌশল উদ্ভাবন করতে তাঁর জ্ঞান অক্ষম নয়।

৮৩. "এভাবেই" অর্থ শুধু শেষ পদ্ধতি নয়, বরং ওপরের আয়াতে যে তিনটি পদ্ধতি উল্লেখিত হয়েছে তার সব কটি। আর 'রূহ' অর্থ অহী অথবা অহীর মাধ্যমে নবীকে (সা) যে শিক্ষা দান করা হয়েছে সেই শিক্ষা। কুরআন ও হাদীস থেকেই একথা প্রমাণিত যে, এই তিনটি পদ্ধতিতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিদায়াত দান করা হয়েছে ঃ

এক ঃ হাদীস শরীফে হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অহী আসার সূচনা হয়েছিলো সত্য স্বপ্নের আকারে (বুখারী ও মুসলিম)। এই ধারা পরবর্তী সময় পর্যন্ত জারি ছিল। তাই হাদীসে তাঁর বহু সংখ্যক স্বপ্নের উল্লেখ দেখা যায়। যার মাধ্যমে হয় তাঁকে কোন শিক্ষা দেয়া হয়েছে কিংবা কোন বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। তাছাড়া কুরআন মজীদে নবীর (সা) একটি স্বপ্নের সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে (আল ফাতহ, আয়াত ২৭)। তাছাড়া কতিপয় হাদীসে একথারও উল্লেখ আছে যে, নবী (সা) বলেছেন, আমার মনে অমুক বিষয়টি সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে, কিংবা আমাকে একথাটি বলা হয়েছে বা আমাকে এই নির্দেশ দান করা হয়েছে অথবা আমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ ধরনের সব কিছু অহীর প্রথমোক্ত শ্রেণীর সাথে সম্পর্কিত। বেশীর ভাগ হাদীসে কুদসী এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত।

দুই ঃ মে'রাজে নবীকে (সা) দ্বিতীয় প্রকার অহী দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে। কতিপয় হাদীসে নবীকে (সা) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ দেয়া এবং তা নিয়ে তাঁর বার বার দরখাস্ত পেশ করার কথা যেভাবে উল্লেখিত হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, সে সময় আল্লাহ এবং তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে ঠিক তেমনি কথাবার্তা হয়েছিলো যেমনটি তূর পাহাড়ের পাদদেশে মূসা (আ) ও আল্লাহর মধ্যে হয়েছিলো।

তিন ঃ এরপর থাকে অহীর তৃতীয় শ্রেণী। এ ব্যাপারে কুরআন নিজেই সাক্ষ্য দান করে যে, কুরআনকে জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছানো হয়েছে (আল বাকারা ৯৭, আশ শু'আরা ১৯২ থেকে ১৯৫ আয়াত)।

৮৪. অর্থাৎ নবুওয়াতের মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার আগে নবীর (সা) মগজে এ ধারণা পর্যন্তও কোন দিন আসেনি যে, তিনি কোন কিতাব লাভ করতে যাচ্ছেন বা তাঁর লাভ করা উচিত। বরং তিনি আসমানী কিতাব এবং তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আদৌ কিছু জানতেন না। অনুরূপ আল্লাহর প্রতি তাঁর ঈমান অবশ্যই ছিল। কিন্তু মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে কি কি বিষয় মানতে হবে সচেতনভাবে তিনি তার বিস্তারিত কিছুই জানতেন না। একথাও তাঁর

জানা ছিল না যে, এর সাথে ফেরেশতা, নবুওয়াত, আল্লাহর কিতাবসমূহ এবং আখেরাত সম্পর্কে অনেক কিছুই মানা আবশ্যক। এ দুটি ছিল এমনই বিষয় যা মক্কার কাফেরদের কাছেও গোপন ছিল না। মক্কার কোন মানুষই এ প্রমাণ দিতে সক্ষম ছিল না যে, হঠাৎ নবুওয়াত ঘোষণার পূর্বে সে কখনো নবীর (সা) মুখে আল্লাহর কিতাবের কথা শুনেছে কিংবা মানুষদের অমুক অমুক বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হবে এমন কোন কথা শুনেছে। একথা সুস্পষ্ট যদি কোন ব্যক্তি পূর্ব থেকেই নবী হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে তাহলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত রাত দিন তার সাথে উঠাবসা করেও কেউ তার মুখ থেকে কিতাব ও ঈমান শব্দ পর্যন্ত শুনবে না। অথচ চল্লিশ বছর পর সে ঐ সব বিষয়েই হঠাৎ জোরালো বক্তব্য পেশ করতে শুরু করবে তা কখনো হতে পারে না।

৮৫. এটা কাফেরদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত শেষ সতর্কবাণী। এর তাৎপর্য হলো, নবী (সা) বললেন আর তোমরা তা শুনে প্রত্যাখ্যান করলে কথা এখানেই শেষ হয়ে যাবে না। পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে তার সবই আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে এবং সবশেষে কার কি পরিণাম হবে সে চূড়ান্ত ফায়সালা তার দরবার থেকেই হবে।

আয্ যুখরুফ

৪৩

নামকরণ

সূরার ৮৫ আয়াতের وَزُخْرُفًا শব্দ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ যে সূরার মধ্যে زُخْرُف 'যুখরুফ' শব্দ আছে এটা সেই সূরা।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে নাযিল হওয়ার সময়-কাল সম্পর্কে জানা যায়নি। তবে সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়, যে যুগে সূরা আল-মু'মিন, হা-মীম আস সাজদা ও আশ্ শূরা নাযিল হয়েছিলো এ সূরাটিও সেই যুগেই নাযিল হয়। মক্কার কাফেররা যে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাণ সংহার করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলো সেই সময় যে সূরাগুলো নাযিল হয়েছিলো এ সূরাটিও তারই একটি বলে মনে হয়। সেই সময় মক্কার কাফেররা সভায় বসে বসে নবীকে (সা) কিভাবে হত্যা করা যায় তা নিয়ে পরামর্শ করতো। তাঁকে হত্যা করার জন্য একটি আক্রমণ সংঘটিতও হয়েছিলো। ৭৯ ও ৮০ আয়াতে এ পরিস্থিতির প্রতি ইংগিত রয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

কুরাইশ ও আরববাসীরা যেসব জাহেলী আকীদা-বিশ্বাস ও কুসংস্কার আঁকড়ে ধরে চলছিলো এ সূরায় প্রবলভাবে তার সমালোচনা করা হয়েছে এবং অত্যন্ত মজবুত ও হৃদয়গ্রাহী পন্থায় ঐগুলোর অযৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে যাতে সমাজের যেসব ব্যক্তির মধ্যে কিঞ্চিত যুক্তিবাদিতাও আছে তারা সবাই একথা চিন্তা করতে বাধ্য হয় যে, এসব কেমন ধরনের অজ্ঞতা যা আমাদের জাতি চরমভাবে আঁকড়ে ধরে বসে আছে আর যে ব্যক্তি এই আবর্ত থেকে আমাদের উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন আদাপানি খেয়ে তার বিরুদ্ধে লেগেছে।

বক্তব্যের সূচনা করা হয়েছে এভাবে যে, তোমরা চাচ্ছো তোমাদের দুষ্কর্মের ফলে এই কিতাব নাযিল হওয়া বন্ধ করে দেয়া হবে। কিন্তু আল্লাহ দুষ্কৃতিকারীদের কারণে কখনো নবী-রসূল প্রেরণ ও কিতাব নাযিল বন্ধ করেননি। বরং যে জালেমরা তাঁর হিদায়াতের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিলো তাদেরকেই ধ্বংস করে দিয়েছেন। এখনো তিনি তাই করবেন। পরে আরো একটু অগ্রসর হয়ে আয়াত ৪১, ৪৩ ও ৭৯, ৮০তে এ বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাণ সংহার করতে বদ্ধপরিকর ছিল তাদের শুনিয়ে নবীকে (সা) বলা হয়েছে, 'তুমি জীবিত থাক বা না

থাক এ জালেমদের আমি শাস্তি দেবই। তাছাড়া দুষ্কৃতিকারীদেরকেও পরিষ্কার ভাষায় সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি আমার নবীর বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাক তাহলে আমিও সে ক্ষেত্রে একটি চরম পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।

এরপর যে ধর্মকে তারা বুকে আঁকড়ে ধরে আছে তা-কি সে সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং যেসব যুক্তি-প্রমাণ দেখিয়ে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

এরা নিজেরাও স্বীকার করে যে, আল্লাহই যমীন, আসমান এবং এদের নিজেদের ও এদের উপাস্যদের সৃষ্টিকর্তা। এরা একথাও জানে এবং বিশ্বাস করে যে, যে নিয়ামত রাজি থেকে তারা উপকৃত হচ্ছে তা সবই আল্লাহর দেয়া। তারপরও আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অন্যদের শরীক করার ব্যাপারে গোঁ ধরে থাকে।

বান্দাদেরকে আল্লাহর সন্তান বলে ঘোষণা করে তাও আবার মেয়ে সন্তান হিসেবে। অথচ নিজেদের জন্য মেয়ে সন্তানকে লজ্জা ও অপমান বলে মনে করে।

তারা ফেরেশতাদেরকে দেবী মনে করে নিয়েছে। নারীর আকৃতি দিয়ে তাদের মূর্তি নির্মাণ করে রেখেছে। তাদেরকে মেয়েদের কাপড় ও অলংকার পরিধান করায় এবং বলে, এরা সব আল্লাহর কন্যা সন্তান। তাদের ইবাদত করা হয়, তাদের উদ্দেশ্যে মানত করা হয় এবং তাদের কাছেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দোয়া করা হয়। তারা একথা কি করে জানলো যে ফেরেশতারা নারী?

এসব অজ্ঞতার কারণে সমালোচনা করা হলে তাকদীরের বাহানা পেশ করে এবং বলে, আল্লাহ আমাদের এসব কাজ পসন্দ না করলে আমরা কি করে এসব মূর্তির পূজা করছি। অথচ আল্লাহর পসন্দ-অপসন্দ জানার মাধ্যম তাঁর কিতাব। পৃথিবীতে তাঁর ইচ্ছাধীনে যেসব কাজ হচ্ছে তা তাঁর পসন্দ অপসন্দ অবহিত হওয়ার মাধ্যম নয়। তাঁর ইচ্ছা বা অনুমোদনে শুধু এক মূর্তি পূজাই নয়, চুরি, ব্যভিচার, ডাকাতি, খুন সব কিছুই হচ্ছে। পৃথিবীতে যত অন্যায় সংঘটিত হচ্ছে তার সবগুলোকেই কি এই যুক্তিতে বৈধ ও ন্যায় বলে আখ্যায়িত করা হবে?

যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এই শিরকের সপক্ষে তোমাদের কাছে এই ভ্রান্ত যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া কি আর কোন প্রমাণ আছে তখন জবাব দেয়, বাপ-দাদার সময় থেকে তো এ কাজ এভাবেই হয়ে আসছে। এদের কাছে যেন কোন ধর্মের ন্যায় ও সত্য হওয়ার জন্য এই যুক্তি-প্রমাণই যথেষ্ট। অথচ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম—যার অধস্তন পুরুষ হওয়ার ওপরেই তাদের গর্ব ও মর্যাদার ভিত্তি—তাঁর বাপ-দাদার ধর্মকে পদাঘাত করে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং পূর্ব পুরুষদের এমন অন্ধ অনুসরণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যার সপক্ষে কোন যুক্তিসংগত দলিল-প্রমাণ ছিল না। এসব সত্ত্বেও যদি তাদেরকে পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুসরণই করতে হয় তাহলেও তো সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান পূর্ব পুরুষ ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমুস সালামকে ছেড়ে এরা নিজেদের চরম জাহেল পূর্ব পুরুষদের বাছাই করলো কেন?

এদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আল্লাহর সাথে অন্যরাও উপাসনা লাভের যোগ্য, কোন নবী বা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত কোন একটি কিতাবও কি কখনো এ শিক্ষা দিয়েছে? এর জবাবে তারা খৃষ্টানদের হযরত ঈসা ইবনে মারয়ামকে আল্লাহর বেটা হিসেবে মানার ও উপাসনা করাকে এ কাজের দলীল হিসেবে পেশ করে। অথচ কোন নবীর উম্মত শিরক করেছে বা করেনি প্রশ্ন সেটা ছিল না। প্রশ্ন ছিল কোন নবী শিরকের শিক্ষা দিয়েছেন কিনা? কবে ঈসা ইবনে মারয়াম বলেছিলেন, আমি আল্লাহর পুত্র, তোমরা আমার উপাসনা করো। দুনিয়ার প্রত্যেক নবী যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তাঁর শিক্ষাও তাই ছিল। প্রত্যেক নবীর শিক্ষা ছিল আমাদের ও তোমাদের প্রত্যেকের রব আল্লাহ। তোমরা তাঁরই ইবাদত করো।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালত মেনে নিতে তাদের মনে দ্বিধা শুধু এ কারণে যে, তাঁর কাছে ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতা ও জাঁকজমক তো মোটেই নেই। তারা বলে, আল্লাহ যদি আমাদের এখানে কাউকে নবী মনোনীত করতে চাইতেন তাহলে আমাদের দুটি বড় শহরের (মক্কা ও তায়েফ) গণ্য মান্য ব্যক্তিদের কাউকে মনোনীত করতেন। এই যুক্তিতে ফিরাউনও হযরত মূসাকে নগণ্য মনে করে বলেছিলো, আসমানের বাদশা যদি যমীনের বাদশার কাছে (আমার কাছে) কোন দূত পাঠাতেন তাহলে তাকে স্বর্ণের বালা পরিয়ে এবং তার আর্দালী হিসেবে একদল ফেরেশতাসহ পাঠাতেন। এ মিসকীন কোথেকে আমার সামনে এসে হাজির হয়েছে। আমিই মর্যাদার অধিকারী। কারণ, মিসরের বাদশাহী আমার এবং এই নীল নদ আমার আজ্ঞাধীনেই প্রবাহিত হচ্ছে। আমার তুলনায় এ ব্যক্তির এমন কি মর্যাদা আছে! এর না আছে ধন-সম্পদ না আছে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব।

এভাবে কাফেরদের এক একটি অজ্ঞতাপ্রসূত কথার সমালোচনা করা এবং অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ও সপ্রমাণ জবাব দেয়ার পর পরিষ্কার বলা হয়েছে, না আল্লাহর কোন সন্তানাদি আছে, না আসমান ও যমীনের আল্লাহ আলাদা, না এমন কোন সুপারিশকারী আছে যে জেনে বুঝে গোমরাহীর পথ অনুসরণকারীদের আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে। আল্লাহর সন্তানাদি থাকবে এমন অবস্থা থেকে তাঁর সত্তা পবিত্র। তিনি একাই গোটা বিশ্ব জাহানের খোদা। আর কেউ তাঁর খোদায়ীর গুণাবলী এবং ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে শরীক নয়, বরং সবাই তাঁর বান্দা। তাঁর দরবারে শাফায়াত কেবল সেই ব্যক্তিই করতে পারে যে নিজে ন্যায় ও সত্যপন্থী এবং তাদের জন্য করতে পারে যারা পৃথিবীতে ন্যায় ও সত্যের পথ অবলম্বন করেছিলো।

আয়াত ৮৯ **সূরা আয্ যুখরুফ-মক্কী** রুকূ' ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও মেহেরবান আল্লাহর নামে

حٰمٓ ﴿١﴾ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾ اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٣﴾
وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿٤﴾ اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ
صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ﴿٥﴾ وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِى الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦﴾
وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٧﴾ فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّ مِنْهُمْ
بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨﴾

হা-মীম। এই সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ। আমি একে আরবী ভাষার কুরআন বানিয়েছি যাতে তোমরা তা বুঝতে পারো।[১] প্রকৃতপক্ষে এটা মূল কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে[২] যা আমার কাছে অত্যন্ত উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন ও জ্ঞানে ভরা কিতাব।[৩]

তোমরা সীমালংঘনকারী, শুধু এ কারণে কি আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে উপদেশমূলক শিক্ষা পাঠানো পরিত্যাগ করবো?[৪] পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যেও আমি বার বার নবী পাঠিয়েছি। এমন কখনো ঘটেনি যে তাদের কাছে কোন নবী এসেছে। কিন্তু তাকে বিদ্রূপ করা হয়নি।[৫] যারা এদের চাইতে বহুগুণে শক্তিশালী ছিল তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উদাহরণ অতীত হয়ে গিয়েছে।[৬]

১. যে বিষয়টির জন্য কুরআন মজীদের শপথ করা হয়েছে তা হচ্ছে এ গ্রন্থের রচয়িতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নন, 'আমি'। আর শপথ করার জন্য কুরআনের যে বৈশিষ্টটি বেছে নেয়া হয়েছে তা হচ্ছে, 'কিতাবুম মুবীন'। কুরআন যে আল্লাহর বাণী এ বৈশিষ্টের জন্য কুরআনেরই শপথ করা স্বতই এ অর্থ প্রকাশ করে যে, হে লোকজন, এই সুস্পষ্ট কিতাব তোমাদের সামনে বিদ্যমান। চোখ মেলে তা দেখো; এর সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন

বিষয়বস্তু, এর ভাষা, এর সাহিত্য, এর সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য সূচনাকারী শিক্ষা, সব কিছুই এ সত্যের সাক্ষ্য পেশ করছে যে, আল্লাহ ছাড়া এর রচয়িতা আর কেউ হতে পারে না।

অতপর বলা হয়েছে, 'আমি একে আরবী ভাষার কুরআন বানিয়েছি যাতে তোমরা তা উপলব্ধি করো। এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক—এ কুরআন অন্য কোন ভাষায় নয়, বরং তোমাদের নিজেদের ভাষায় রচিত হয়েছে। তাই এর যাচাই বাছাই এবং মর্যাদা ও মূল্য নির্ণয় করতে তোমাদের কোন কষ্ট হওয়ার কথা নয়। এটা যদি আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় হতো তাহলে এই বলে তোমরা ওজর পেশ করতে পারতে যে, এটা আল্লাহর বাণী কিনা তা আমরা কিভাবে পরখ করবো। কারণ, এ বাণী বুঝতেই আমরা অক্ষম। কিন্তু আরবী ভাষার এই কুরআন সম্পর্কে তোমরা এ যুক্তি কি করে পেশ করবে? এর প্রতিটি শব্দ তোমাদের কাছে পরিষ্কার। ভাষা ও বিষয়বস্তু উভয়দিক থেকে এর প্রতিটি বাক্য তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট। এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা অন্য কোন আরবী ভাষাভাষীর বাণী হতে পারে কিনা তা নিজেরা বিচার করে দেখো। এই বাণীর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, আমি এই কিতাবের ভাষা আরবী রেখেছি এই জন্য যে, আমি আরব জাতিকে সম্বোধন করে কথা বলছি। আর তারা কেবল আরবী ভাষার কুরআনই বুঝতে সক্ষম। আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করার এই সুস্পষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ উপেক্ষা করে শুধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাতৃভাষা আরবী হওয়ার কারণে একে আল্লাহর বাণী না বলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী বলে যারা আখ্যায়িত করে তারা বড়ই জুলুম করে। (এই দ্বিতীয় অর্থটি বুঝার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা হা-মীম আস সাজদার ৪৪ আয়াত ৫৪ নং টীকাসহ)।

২. অর্থ اصل الكتاب অর্থাৎ সেই কিতাব যেখান থেকে সমস্ত নবী-রসূলদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবসমূহও গৃহীত হয়েছে। সূরা ওয়াকিয়ায় এ কিতাবকেই كِتَابٌ مَّكْنُونٌ (গোপন ও সুরক্ষিত কিতাব) বলা হয়েছে এবং সূরা বুরুজে এ জন্য 'লওহে মাহফুজ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এমন ফলক যার লেখা মুছে যেতে পারে না এবং যা সবরকম প্রক্ষেপণ ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত। কুরআন সম্পর্কে ام الكتاب এ লিপিবদ্ধ আছে একথা বলে একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশ ও জাতিকে হিদায়াতের জন্য নবী-রসূলদের কাছে বিভিন্ন ভাষায় কিতাব নাযিল করা হয়েছে। কিন্তু সব কিতাবে একই আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি দাওয়াত দেয়া হয়েছে, একই সত্যকে ন্যায় ও সত্য বলা হয়েছে, ভাল ও মন্দের একই মানদণ্ড পেশ করা হয়েছে, নৈতিকতা ও সভ্যতার একই নীতি বর্ণনা করা হয়েছে এবং এসব কিতাব যে দীন পেশ করেছে তা সবদিক দিয়ে একই দীন। কারণ, এ দীনের মূল ও উৎস এক, শুধু ভাষা ও বর্ণনা ভংগি ভিন্ন। একই অর্থ যা আল্লাহর কাছে একটি মূল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। যখনই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তিনি কোন নবী পাঠিয়েছেন এবং পরিবেশ ও অবস্থা অনুসারে সেই অর্থ একটি বিশেষ বাক্যে ও বিশেষ ভাষায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। ধরা যাক, আল্লাহ যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরব ছাড়া অন্য কোন জাতির মধ্যে পয়দা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন তাহলে তিনি এই কুরআনকে সেই জাতির ভাষায় মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল করতেন। সেই জাতি এবং দেশের পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারেই তাতে বক্তব্য পেশ করা হতো। বাক্যসমূহ ভিন্ন ধাঁচের হতো ভাষাও ভিন্ন হতো, কিন্তু শিক্ষা ও নির্দেশনা মৌলিকভাবে এটাই থাকতো। সেটাও এই কুরআনের মতই কুরআন হতো, যদিও আরবী কুরআন হতো না। সূরা শুআরাতে এই এ বিষয়টিই এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ الْعٰلَمِيْنَ ..... بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ وَاِنَّهٗ لَفِىْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ (١٩٢-١٩٦)

"এটা রব্বুল আলামীনের নাযিলকৃত কিতাব.....পরিষ্কার আরবী ভাষায়। আর এটি পূর্ববর্তী লোকদের কিতাবসমূহেও বিদ্যমান।" (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আশ শু'আরা, টীকা ১১৯-১২১)

৩. এ আয়াতাংশের সম্পর্ক ام الكتاب ও كتاب مبين উভয়ের সাথে। অর্থাৎ এটি এক দিকে কুরআনের পরিচয় এবং অন্যদিকে উম্মুল কিতাবেরও পরিচয় যেখান থেকে কুরআন গৃহীত বা উদ্ধৃত হয়েছে। কুরআনের এই পরিচিতি দানের মাধ্যমে মন-মগজে একথাই বদ্ধমূল করে দেয়া উদ্দেশ্য যে, কেউ যদি তার অজ্ঞতার কারণে এ কিতাবের মূল্য ও মর্যাদা উপলব্ধি না করে এবং এর জ্ঞানগর্ভ শিক্ষা দ্বারা উপকৃত না হয় তাহলে সেটা তার নিজের দুর্ভাগ্য। কেউ যদি এর মর্যাদা খাটো করার প্রয়াস পায় এবং এর বক্তব্যের মধ্যে ত্রুটি অন্বেষণ করে তাহলে সেটা তার নিজের হীনমন্যতা। কেউ একে মর্যাদা না দিলেই এটা মূল্যহীন হতে পারে না এবং কেউ গোপন করতে চাইলেই এর জ্ঞান ও যুক্তি গোপন হতে পারে না। এটা স্বস্থানে একটি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব যাকে এর অতুলনীয় শিক্ষা, মু'জিযাপূর্ণ বাগ্মিতা, নিষ্কলুষ জ্ঞান এবং এর রচয়িতার আকাশচুম্বী ব্যক্তিত্ব উচ্চে তুলে ধরেছে। তাই কেউ-এর অবমূল্যায়ণ করলে তা কি করে মূল্যহীন হতে পারে। পরে ৪৪ আয়াতে কুরাইশদের বিশেষভাবে এবং আরববাসীদের সাধারণভাবে বলা হয়েছে যে, এভাবে তোমরা যে কিতাবের বিরোধিতা করছো তার নাযিল হওয়াটা তোমাদের মর্যাদা লাভের একটি বড় সুযোগ এনে দিয়েছে। তোমরা যদি এই সুযোগ হাতছাড়া করো তাহলে তোমাদের আল্লাহর কাছে কঠোর জবাবদিহি করতে হবে। (দেখুন, টীকা ৩৯)

৪. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত ঘোষণার সময় থেকে এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়া পর্যন্ত বিগত কয়েক বছরে যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তার পুরো কাহিনী এই আয়াতাংশে একত্রে বিবৃত করা হয়েছে। আয়াতাংশটি আমাদের সামনে এই চিত্রই ফুটিয়ে তোলে যে, একটি জাতি শত শত বছর ধরে চরম অজ্ঞতা, অধপতন ও দুরবস্থার মধ্যে নিমজ্জিত। আল্লাহর পক্ষ থেকে হঠাৎ তার ওপর করুণার দৃষ্টি পড়ছে। তিনি তাদের মধ্যে একজন সর্বশ্রেষ্ট নেতার জন্ম দিচ্ছেন এবং তাদেরকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে উদ্ধার করার জন্য তাঁর নিজের বাণী পাঠাচ্ছেন। যাতে তারা অলসতা ঝেড়ে জেগে ওঠে, জাহেলী কুসংস্কারের আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসে এবং পরম সত্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে জীবনে চলার সঠিক পথ অবলম্বন করে। কিন্তু সেই জাতির নির্বোধ লোকেরা এবং

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ
الْعَلِيمُ ۝٩ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا
لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝١٠ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ ۚ فَأَنْشَرْنَا بِهِ
بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ ۝١١ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ
لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۝١٢ لِتَسْتَوُوا عَلٰى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا
نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحٰنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا
وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۝١٣ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۝١٤ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ
عِبَادِهِ جُزْءًا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ۝١٥

তোমরা যদি এসব লোকদের জিজ্ঞেস করো, যমীন ও আসমান কে সৃষ্টি করেছে, তাহলে এরা নিজেরাই বলবে, ঐগুলো সেই মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী সত্তা সৃষ্টি করেছেন।[৭] তিনিই তো সৃষ্টি করেছেন যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য দোলনা বানিয়েছেন এবং সেখানে তোমাদের জন্য রাস্তা তৈরী করে দিয়েছেন।[৮] যাতে তোমাদের গন্তব্যস্থলের পথ খুঁজে পাও।[৯] যিনি আসমান থেকে একটি বিশেষ পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছেন[১০] এবং তার সাহায্যে মৃত ভূমিকে জীবিত করে তুলেছেন। তোমাদের এভাবেই একদিন মাটির ভেতর থেকে বের করে আনা হবে।[১১] তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি সমস্ত জোড়া সৃষ্টি করেছেন।[১২] যিনি তোমাদের জন্য নৌকা-জাহাজ এবং জীব-জন্তুকে সওয়ারী বানিয়েছেন যাতে তোমরা তার পিঠে আরোহণ করো এবং পিঠের ওপর বসার সময় তোমাদের রবের ইহসান স্মরণ করে বলো ঃ পবিত্র সেই সত্তা যিনি আমাদের জন্য এসব জিনিসকে অনুগত করে দিয়েছেন। তা না হলে এদের আয়ত্বে আনার শক্তি আমাদের ছিল না।[১৩] এক দিন আমাদের রবের কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে।[১৪]

(এসব কিছু জানা এবং মানার পরেও) এসব লোক তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকেই কোন কোন বান্দাকে তাঁর অংশ বানিয়ে দিয়েছে।[১৫] প্রকৃত সত্য এই যে, মানুষ সুস্পষ্ট অকৃতজ্ঞ।

তার স্বার্থপর গোত্রপতিরা সেই নেতার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগছে এবং তাঁকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করছে। যতই বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে তাদের দুষ্কর্ম ততই বেড়ে যাচ্ছে। এমনকি তারা তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। ঠিক এই পরিস্থিতিতে বলা হচ্ছে, তোমাদের এই অযোগ্যতার কারণে কি আমি তোমাদের সংস্কার ও সংশোধনের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করবো? উপদেশ দানের এই ধারাবাহিকতা বন্ধ করবো? এবং শত শত বছর ধরে তোমরা যে অধপতনের মধ্যে পড়ে আছ সেই অধপতনের মধ্যেই পড়ে থাকতে দেব? তোমাদের কাছে আমার রহমতের দাবি কি এটাই হওয়া উচিত? তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করা এবং ন্যায় ও সত্য সামনে এসে যাওয়ার পর বাতিলকে আঁকড়ে থাকা তোমাদের কেমন পরিণতির সম্মুখীন করবে?

৫. অর্থাৎ এই নিরর্থক ও অযৌক্তিক কাজকর্ম যদি নবী এবং কিতাব প্রেরণের পথে প্রতিবন্ধক হতো তাহলে কোন জাতির কাছে কোন নবী আসতো না এবং কোন কিতাবও পাঠানো হতো না।

৬. অর্থাৎ বিশিষ্ট লোকদের অযৌক্তিক আচরণের ফলে গোটা মানব জাতিকে নবুওয়াত ও কিতাবের পথ নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত করা হবে এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি। বরং সর্বদাই এর ফলাফল দাঁড়িয়েছে এই যে, যারাই বাতিল পরস্তির নেশায় এবং নিজেদের শক্তির গর্বে উন্মত্ত হয়ে নবী–রসূলদের বিদ্রূপ ও হেয়প্রতিপন্ন করা থেকে বিরত হয়নি, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তখন যে শক্তির বলে এই কুরাইশদের ছোট ছোট এসব নেতা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছে। তাদের চেয়ে হাজার গুণ অধিক শক্তির অধিকারীদেরকে মশামাছির ন্যায় পিষে ফেলা হয়েছে।

৭. অন্যান্য স্থানে তো পৃথিবীকে বিছানা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিন্তু এখানে তার পরিবর্তে দোলনা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ একটি শিশু যেভাবে তার দোলনার মধ্যে আরামে শুয়ে থাকে মহাশূন্যে ভাসমান এই বিশাল গ্রহকে তোমাদের জন্য তেমনি আরামের জায়গা বানিয়ে দিয়েছেন। এটি তার অক্ষের ওপর প্রতি ঘন্টায় এক হাজার মাইল গতিতে ঘুরছে এবং প্রতি ঘন্টায় ৬৬,৬০০ মাইল গতিতে ছুটে চলছে। এর অভ্যন্তরে রয়েছে এমন আগুন যা পাথরকেও গলিয়ে দেয় এবং আগ্নেয় গিরির আকারে লাভা উদগীরণ করে কখনো কখনো তোমাদেরও তার ভয়াবহতা টের পাইয়ে দেয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তোমাদের স্রষ্টা তাকে এতটা সুশান্ত বানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা আরামে তার ওপর ঘুমাও অথচ ঝাঁকুনি পর্যন্ত অনুভব করো না। তোমরা তার ওপরে বসবাস করো কিন্তু অনুভব পর্যন্ত করতে পার না এটি মহাশূণ্যে ঝুলন্ত গ্রহ আর তোমরা তাতে পা ওপরে ও মাথা নীচের দিকে দিয়ে ঝুলছো। তোমরা এর পিঠের ওপরে আরামে ও নিরাপদে চলাফেরা করছো অথচ এ ধারণা পর্যন্ত তোমাদের নেই যে, তোমরা বন্দুকের গুলীর চেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন গাড়ীতে সওয়ার হয়ে আছো। বিনা দ্বিধায় তাকে খনন করছো, তার বুক চিরছো এবং নানাভাবে তার পেট থেকে রিযিক হাসিল করছো অথচ কখনো কখনো ভূমিকম্পের আকারে তার অতি সাধারণ কম্পনও তোমাদের জানিয়ে দেয় এটা কত ভয়ংকর দৈত্য যাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য অনুগত করে রেখেছেন (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নামল, টীকা ৭৪–৭৫)।

৮. ভূ-পৃষ্ঠে পাহাড়ের মাঝে গিরিপথ এবং পাহাড়ী ও সমতল ভূমি অঞ্চলে নদী হচ্ছে সেই সব প্রাকৃতিক পথ যা আল্লাহ তৈরী করেছেন। এসব পথ ধরেই মানুষ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। পর্বত শ্রেণীকে যদি কোন ফাঁক ছাড়া একেবারে নিশ্ছিদ্র প্রাচীরের মত করে দাঁড় করানো হতো এবং ভূ-পৃষ্ঠের কোথাও কোন সমুদ্র, নদী-নালা না থাকতো তাহলে মানুষ যেখানে জন্ম গ্রহণ করেছিলো সেখানেই আবদ্ধ হয়ে পড়তো। আল্লাহ আরো অনুগ্রহ করেছেন এই যে, তিনি গোটা ভূ-ভাগকে একই রকম করে সৃষ্টি করেননি, বরং তাতে নানা রকমের এমন সব পার্থক্য সূচক চিহ্ন (Land marks) রেখে দিয়েছেন যার সাহায্যে মানুষ বিভিন্ন এলাকা চিনতে পারে এবং এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে। এটা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় যার সাহায্যে পৃথিবীতে মানুষের চলাচল সহজ সাধ্য হয়েছে। মানুষের যখন বিশাল কোন মরুভূমিতে যাওয়ার সুযোগ হয়, যেখানে মাইলের পর মাইল এলাকায় কোন পার্থক্যসূচক চিহ্ন থাকে না। এবং মানুষ বুঝতে পারে না সে কোথা থেকে কোথায় এসে পৌছেছে এবং সামনে কোন দিকে যেতে হবে তখন সে এই নিয়ামতের মর্যাদা বুঝতে পারে।

৯. এ আয়াতাংশ একই সাথে দুটি অর্থ প্রকাশ করছে। একটি হচ্ছে, এসব প্রাকৃতিক রাস্তা ও রাস্তার চিহ্নসমূহের সাহায্যে তোমরা তোমাদের পথ চিনে নিতে পার এবং যেখানে যেতে চাও সেখানে পৌছতে পার। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, মহিমান্বিত আল্লাহর এসব কারিগরি দেখে হিদায়াত লাভ করতে পার। প্রকৃত সত্য লাভ করতে পার এবং বুঝতে পার যে, পৃথিবীতে আপনা থেকেই এ ব্যবস্থা হয়ে যায়নি, বহু সংখ্যক খোদা মিলেও এ ব্যবস্থা করেনি, বরং মহাজ্ঞানী এক পালনকর্তা আছেন যিনি তাঁর বান্দাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে পাহাড় ও সমতল ভূমিতে এসব রাস্তা বানিয়েছেন এবং পৃথিবীর একেকটি অঞ্চলকে অসংখ্য পন্থায় ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি দান করেছেন যার সাহায্যে মানুষ এক অঞ্চলকে আরেক অঞ্চল থেকে আলাদা করে চিনতে পারে।

১০. অর্থাৎ প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য বৃষ্টির একটা গড় পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন যা দীর্ঘকাল প্রতি বছর একইভাবে চলতে থাকে। এ ক্ষেত্রে এমন কোন অনিয়ম নেই যে কখনো বছরে দুই ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হবে আবার কখনো দুইশ' ইঞ্চি হবে। তাছাড়াও তিনি বিভিন্ন মওসুমের বিভিন্ন সময়ে বৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করে এমনভাবে বর্ষণ করেন সাধারণত তা ব্যাপক মাত্রায় ভূমির উৎপাদন ক্ষমতার জন্য উপকারী হয়। এটাও তাঁর জ্ঞান ও কৌশলেরই অংশ যে, তিনি ভূ-পৃষ্ঠের কিছু অংশকে প্রায় পুরোপুরিই বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করে পানি ও লতাগুল্ম শূন্য মরুভূমি বানিয়ে দিয়েছেন এবং অপর কিছু অঞ্চলে কখনো দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেন আবার কখনো ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি বর্ষণ করেন। যাতে ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন বসতি এলাকার জন্য বৃষ্টিপাত ও তা নিয়মিত হওয়া কত বড় নিয়ামত। তাছাড়া একথাও যেন তার স্মরণ থাকে যে, এই ব্যবস্থা অন্য কোন শক্তির নির্দেশনা মোতাবেক চলছে যার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন কিছুই কার্যকরী হয় না। একটি দেশে বৃষ্টিপাতের যে সাধারণ গড় তা পরিবর্তন কিংবা পৃথিবীর ব্যাপক এলাকায় তার বন্টন হারে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করা, অথবা কোন আগমনোদ্যত তুফানকে রোধ করতে পারা বা কোন বিমুখ বৃষ্টিকে খাতির তোয়াজ করে নিজ দেশের দিকে টেনে আনা এবং বর্ষণে বাধ্য করার সাধ্য কারোর নেই। আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হিজর, আয়াত ১৯ থেকে ২২ টীকাসহ, আল মু'মিনূন, টীকা ১৭, ১৮)।

১১. এখানে পানির সাহায্যে ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টিকে এক সাথে দুটি জিনিসের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। এক—এ কাজটি যিনি এক মাত্র আল্লাহ তাঁর জ্ঞান ও কুদরত দ্বারা হচ্ছে। আল্লাহর এই সার্বভৌম কর্তৃত্বে অন্য কেহ তাঁর শরীক নয়। দুই—মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবন হতে পারে এবং হবে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নাহল, টীকা ৫৩(ক); আল হাজ্জ, টীকা ৭৯; আন নামল টীকা ৭৩; আর রূম; টীকা ২৫, ৩৪ ও ৩৫; সূরা ফাতের, টীকা ১৯, সূরা ইয়াসীন, টীকা ২৯)।

১২. জোড়া অর্থ শুধু মানব জাতির নারী ও পুরুষ এবং জীব-জন্তু ও উদ্ভিদরাজীর নারী-পুরুষে জোড়াই বুঝানো হয়নি, বরং আল্লাহর সৃষ্ট আরো অসংখ্য জিনিসের জোড়া সৃষ্টির বিষয়ও বুঝানো হয়েছে যাদের পারস্পরিক সংমিশ্রণে পৃথিবীতে নতুন নতুন জিনিসের উৎপত্তি হয়। যেমন ঃ উপাদানসমূহের মধ্যে কোনটি কোনটির সাথে খাপ খায় এবং কোনটি কোনটির সাথে খাপ খায় না। যেগুলো পরস্পর সংযোজন ও সংমিশ্রণ ঘটে সেগুলোর মিশ্রণে নানা রকম বস্তুর উদ্ভব ঘটছে। যেমন বিদ্যুত শক্তির মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিদ্যুৎ একটি আরেকটির জোড়া। এ দুটির পারস্পরিক আকর্ষণ পৃথিবীতে বিস্ময়কর ও অদ্ভুত সব ক্রিয়াকাণ্ডের কারণ হচ্ছে। এটি এবং এ ধরনের আরো অগণিত জোড়া যা আল্লাহ নানা ধরনের সৃষ্টির মধ্যে পয়দা করেছেন, এদের আকৃতি কাঠামো, এদের পারস্পরিক যোগ্যতা, এদের পারস্পরিক আচরণের বিচিত্র রূপ এবং এদের পারস্পরিক সংযুক্তি থেকে সৃষ্ট ফলাফল নিয়ে যদি মানুষ চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে তার মন এ সাক্ষ্য না দিয়ে পারবে না যে, এই গোটা বিশ্ব কারখানা কোন একজন মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানবান কারিগরের তৈরী এবং তাঁরই ব্যবস্থাপনায় এটি চলছে। এর মধ্যে একাধিক খোদার অধিকার থাকার কোন সম্ভাবনাই নেই।

১৩. অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ শুধু মানুষকে নৌকা ও জাহাজ চালনা এবং সওয়ারীর জন্য সওয়ারী জন্তু ব্যবহার করার ক্ষমতা দিয়েছেন। কিন্তু সে ক্ষমতা তিনি এ জন্য দেননি যে, মানুষ খাদ্যের বস্তার মত এগুলোর পিঠে চেপে বসবে এবং যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন তিনি কে তা চিন্তা করবে না। অনুরূপ তিনি আমাদের জন্য বিশাল সমুদ্রে জাহাজ চালনা সম্ভব করেছেন এবং অসংখ্য রকমের জীব-জন্তুর মধ্যে এমন কিছু জীব-জন্তু সৃষ্টি করেছেন যেগুলো আমাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের অধীন হয়ে থাকে। আমরা তাদের পিঠে আরোহণ করে যে দিকে ইচ্ছা নিয়ে যাই। যিনি আমাদের এ ক্ষমতা দান করেছেন তিনি কে তা একবারও ভেবে দেখবো না সে জন্য তিনি এসব দেননি। এসব নিয়ামত থেকে উপকৃত হওয়া কিন্তু নিয়ামতদাতাকে ভুলে যাওয়া মৃত হৃদয়-মন ও অনুভূতিহীন বিবেক-বুদ্ধির আলামত। একটি জীবন্ত ও তীক্ষ্ণ অনুভূতি প্রবণ মন ও বিবেক সম্পন্ন মানুষ যখনই এসব সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করবে তখনই তার হৃদয়-মন নিয়ামতের উপলব্ধি ও কৃতজ্ঞতার আবেগে ভরে উঠবে। সে বলে উঠবে, পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি আমার জন্য এসব জিনিস অনুগত করে দিয়েছেন। পবিত্র এই অর্থে যে, তাঁর সত্তার গুণাবলী ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারে অন্য কেউ শরীক নয়। নিজের খোদায়ীর ক্রিয়াকাণ্ড চালাতে তিনি অক্ষম তাই অন্যান্য সাহায্যকারী খোদার প্রয়োজন পড়ে—এই দুর্বলতা থেকে তিনি মুক্ত। এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবো, এ অবস্থা থেকেও তিনি পবিত্র।

সওয়ারী পিঠে বসার সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে যেসব কথা উচ্চারিত হতো সেগুলোই এ আয়াতের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের সর্বোত্তম বাস্তব ব্যাখ্যা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, সফরে রওয়ানা হওয়ার সময় নবী (সা) যখন সওয়ারীতে বসতেন তখন তিনবার আল্লাহু আকবর বলতেন। তারপর এই আয়াতটি পড়ার পর এই বলে দোয়া করতেন ঃ

اللهم انى اسئالك فى سفرى هذا البر والتقوى ، ومن العمل ماترضى ، اللهم هون لنا السفر ، واطولنا البعيد ، اللهم انت الصاحب فى السفر ، والخليفة فى الاهل – اللهم اصحبنا فى سفرنا واخلفنا فى اهلنا (مسند احمد ، مسلم ، ابو داود ، نسائى ، دارمى ترمذى)

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, আমার এই সফরে আমাকে নেকী, তাকওয়া এবং এমন কাজ করার তাওফীক দান করো যা তোমার পসন্দ। হে আল্লাহ, আমার জন্য সফরকে সহজ এবং দীর্ঘ পথকে সংকুচিত করে দাও। হে আল্লাহ তুমিই আমার সফরের সাথী ও আমার অবর্তমানে আমার পরিবার পরিজনের রক্ষক। হে আল্লাহ, সফরে আমাদের সংগী হও এবং আমাদের অনুপস্থিতিতে পরিবার পরিজনের তত্ত্বাবধান করো।"

হযরত আলী বলেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিসমিল্লাহ বলে রিকাবে পা রাখলেন এবং সওয়ার হওয়ার পর বললেন ঃ الحمد لله ، ..... سبحان الذى سخرلنا هذا তারপর তিনবার الحمد لله ও তিনবার الله اكبر বললেন এবং তারপর বললেন ঃ

سبحانك ، لا اله الا انت ، قد ظلمت نفسى فاغفرلى

"তুমি অতি পবিত্র। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও।"

এরপর তিনি হেসে ফেললেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল, আপনি কি কারণে হাসলেন। তিনি বললেন, বান্দা رَبِّ اغْفِرْلِىْ (হে রব, আমাকে ক্ষমা করে দাও) বললে আল্লাহর কাছে তা বড়ই পসন্দনীয় হয়। তিনি বলেনঃ আমার এই বান্দা জানে যে, আমি ছাড়া রক্ষাকারী আর কেউ নেই। (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী প্রভৃতি।)

আবু মিজলায নামক এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, 'একবার আমি সওয়ারী জন্তুর পিঠে উঠে سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا আয়াতটি পড়লাম। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ তোমাদের কি এরূপ করতে বলা হয়েছে। আমি বললাম ঃ তা হলে আমরা কি বলবো? তিনি বললেন ঃ এভাবে বলো ঃ সেই আল্লাহর শোকর যিনি আমাদের ইসলামের হিদায়াত দান করেছেন। তার শোকর যে, তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়ে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তাঁর শোকর যে, তিনি তাঁর

أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ ﴿١٦﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم
بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾ أَوَمَن يُنَشَّأُ
فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ
عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا ۚ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿١٩﴾

২ রুকূ'

আল্লাহ কি তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে নিজের জন্য কন্যা বেছে নিয়েছেন এবং তোমাদের পুত্র সন্তান দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন। অথচ অবস্থা এই যে, এসব লোক সেই দয়াময় আল্লাহর সাথে যে ধরনের সন্তানকে সম্পর্কিত করে এদের নিজেদের কাউকে যদি সেই সন্তানের জন্মলাভের সুসংবাদ দেয়া হয় তাহলে তার মুখমণ্ডলে কালিমা ছেয়ে যায় এবং মন দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।[১৬] আল্লাহর ভাগে কি সেই সব সন্তান যারা অলঙ্কারাদির মধ্যে বেড়ে ওঠে এবং বিতর্ক ও যুক্তি পেশের ক্ষেত্রে নিজের লক্ষ্য পুরোপুরি সুস্পষ্ট করতেও পারে না?[১৭]

এরা ফেরেশতাদেরকে—যারা দয়াময় আল্লাহর খাস বান্দা[১৮] স্ত্রীলোক গণ্য করেছে। এরা কি তাদের দৈহিক গঠন দেখেছে?[১৯] এদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করে নেয়া হবে এবং সে জন্য এদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

মাখলুকের জন্য সৃষ্ট সর্বোত্তম উম্মতের মধ্যে শামিল করেছেন। তারপর এ আয়াত পাঠ করো (ইবনে জারীর, আহকামুল কুরআন–জাসসাস)।

১৪. অর্থাৎ প্রতিটি সফরে যাওয়ার সময় স্মরণ করো যে, সামনে আরো একটি বড় সফর আছে এবং সেটিই শেষ সফর। তাছাড়া প্রত্যেকটি সওয়ারী ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনাও যেহেতু থাকে যে, হয়তো বা কোন দুর্ঘটনা এ সফরকেই তার শেষ সফর বানিয়ে দেবে। তাই উত্তম হচ্ছে, প্রত্যেকবারই সে তার রবের কাছে ফিরে যাওয়ার বিষয়টিকে স্মরণ করে যাত্রা করবে। যাতে মরতে হলেও একেবারে অবচেতনার মৃত্যু যেন না হয়।

এখানে কিছুক্ষণ থেমে এই শিক্ষার নৈতিক ফলাফল ও কিছুটা অনুমান করুন। আপনি কি কল্পনা করতে পারেন যে, ব্যক্তি কোন সওয়ারীতে আরোহণের সময় জেনে বুঝে পূর্ণ অনুভূতির সাথে এভাবে আল্লাহকে এবং তাঁর কাছে নিজের ফিরে যাওয়া ও জবাবদিহি করার কথা স্মরণ করে যাত্রা করে সে কি অগ্রসর হয়ে কোন পাপাচার অথবা জুলুম নির্যাতনে জড়িত হবে? কোন চরিত্রহীনার সাথে সাক্ষাতের জন্য, কিংবা কোন ক্লাবে মদ্য পান বা জুয়াখেলার উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময়ও কি কোন মানুষের মুখ থেকে একথা

উচ্চারিত হতে পারে অথবা সে তা ভাবতে পারে? কোন শাসক কিংবা কোন সরকারী কর্মচারী অথবা ব্যবসায়ী যে মনে মনে এসব কথা ভেবে এবং মুখে উচ্চারণ করে বাড়ী থেকে বের হলো সেকি তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে মানুষের হক নষ্ট করতে পারে? কোন সৈনিক নিরপরাধ মানুষের রক্তপাত ঘটানো এবং দুর্বলদের স্বাধীনতা নস্যাত করার উদ্দেশ্যে যাত্রার সময়ও কি তার বিমানে আরোহণ কিংবা ট্যাংককে পা রাখতে গিয়ে মুখে একথা উচ্চারণ করতে পারে? যদি না পারে, তাহলে এই একটি মাত্র জিনিস গোনাহর কাজের প্রতিটি তৎপরতায় বাধা সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট।

১৫. অংশ বানিয়ে দেয়ার অর্থ আল্লাহর কোন বান্দাকে তাঁর সন্তান ঘোষণা করা। কেননা সন্তান অনিবার্যরূপেই পিতার স্বগোত্রীয় এবং তার অস্তিত্বের একটি অংশ। তাই কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর কন্যা বা পুত্র বলার অর্থ এই যে, তাকে আল্লাহর অস্তিত্ব ও সত্তায় শরীক করা হচ্ছে। এছাড়াও কোন সৃষ্টিকে আল্লাহর অংশ বানানোর আরেকটি রূপ হচ্ছে, যেসব গুণাবলী ও ক্ষমতা–ইখতিয়ার শুধু আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট সেই সব গুণাবলী ও ক্ষমতা–ইখতিয়ারে তাকেও শরীক করা এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তার কাছে প্রার্থনা করা, কিংবা তার সামনে ইবাদত–বন্দেগীর অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করা, অথবা তার ঘোষিত হালাল ও হারামকে অবশ্য পালনীয় শরীয়ত মনে করে নেয়া। কারণ, ব্যক্তি এ ক্ষেত্রে 'উলুহিয়াত' ও 'রবুবিয়াত'কে আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে ভাগ করে দেয় এবং তার একটা অংশ বান্দার হাতে তুলে দেয়।

১৬. এখানে আরবের মুশরিকদের বক্তব্যের অযৌক্তিকতাকে একেবারে উলংগ করে দেয়া হয়েছে। তারা বলতো ঃ ফেরেশতারা আল্লাহর মেয়ে। তারা মেয়েদের আকৃতি দিয়ে ফেরেশতাদের মূর্তি বানিয়ে রেখেছিলো। এগুলোই ছিলো তাদের দেবী। তাদের পূজা করা হতো। এ কারণে আল্লাহ বলছেন ঃ প্রথমত, যমীন ও আসমানের স্রষ্টা আল্লাহ। তিনিই তোমাদের জন্য এ যমীনকে দোলনা বানিয়েছেন। তিনিই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তোমাদের উপকারার্থে তিনিই এসব জীব–জন্তু সৃষ্টি করেছেন, একথা জানা এবং মানা সত্ত্বেও তোমরা তাঁর সাথে অন্যদের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছো। অথচ তোমরা যাদের উপাস্য বানাচ্ছো তারা আল্লাহ নয়, বান্দা। এ ছাড়াও আরো সর্বনাশ করেছে এভাবে যে, কোন কোন বান্দাকে শুধু গুণাবলীতে নয়, আল্লাহর আপন সত্তায়ও শরীক করে ফেলেছে এবং এই আকীদা তৈরী করে নিয়েছে যে, তারা আল্লাহর সন্তান। তোমরা এ পর্যন্ত এসেই থেমে থাকোনি, বরং আল্লাহর জন্য এমন সন্তান স্থির করেছো যাকে তোমরা নিজেদের জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা মনে করো। কন্যা সন্তান জন্মলাভ করলে তোমাদের মুখ কালো হয়ে যায়। বড় দুঃখভারাক্রান্ত মনে তা মেনে নাও। এমন কি কোন কোন সময় জীবিত কন্যা সন্তানকে মাটিতে পুঁতে ফেলো। এ ধরনের সন্তান রেখেছো আল্লাহর ভাগে। আর তোমাদের কাছে যে পুত্র সন্তান অহংকারের বস্তু তা তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে? এরপরও তোমরা দাবী করো, 'আমরা আল্লাহকে মেনে চলি।'

১৭. অন্য কথায় যারা কোমল, নাজুক ও দুর্বল সন্তান তাদের রেখেছো আল্লাহর অংশে। আর যারা বুক টান করে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত সন্তান তাদের রেখেছো নিজের অংশে।

এ আয়াত থেকে নারীদের গহনা ও অলংকারাদি ব্যবহারের বৈধতা প্রমাণিত হয়। কারণ আল্লাহ তাদের জন্য গহনা ও অলংকারকে একটি প্রকৃতিগত জিনিস বলে

আখ্যায়িত করেছেন। হাদীসসমূহ থেকেও একথাটিই প্রমাণিত হয়। ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও নাসায়ী হযরত আলী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাতে রেশম ও অপর হাতে স্বর্ণ নিয়ে বললেন ঃ এ দুটি জিনিসকে পোশাক হিসেবে ব্যবহার করা আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম। তিরমিযী ও নাসায়ী হযরত আবু মূসা আশআরীর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ রেশম ও স্বর্ণের ব্যবহার আমার উম্মতের নারীদের জন্য হালাল এবং পুরুষেদের জন্য হারাম করা হয়েছে। আল্লামা আবু বকর জাসসাস আহকামুল কুরআন গ্রন্থে এ মাসয়ালা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে নীচের বর্ণনাসমূহ উদ্ধৃত করেছেন।

হযরত আয়েশা বলেন, একবার যায়েদ ইবনে হারেসার ছেলে উসামা ইবনে যায়েদ আঘাত প্রাপ্ত হন এবং রক্ত ঝরতে থাকে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিজের সন্তানের মত ভালোবাসতেন। তিনি তার রক্ত চুষে থুথু করে ফেলছিলেন এবং তাকে এই বলে সোহাগ করছিলেন যে, উসামা যদি মেয়ে হতো আমি তাকে অলংকার পরাতাম। উসামা যদি মেয়ে হতো আমি তাকে ভালভাল কাপড় পরাতাম।

হযরত আবু মূসা আশআরী বর্ণনা করেছেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ

لبس الحرير والذهب حرام على ذكور امتى وحلال لاناثها

"রেশমী কাপড় এবং স্বর্ণের অলংকার পরিধান আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম এবং নারীদের জন্য হালাল।"

হযরত আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন, একবার দুজন মহিলা নবীর (সা) খেদমতে হাজির হলো। তারা স্বর্ণের গহনা পরিহিত ছিল। তিনি তাদের বললেন ঃ এর কারণে আল্লাহ তোমাদের আগুনের চুড়ি পরিধান করান তা কি তোমরা চাও? তারা বললো, না। নবী (সা) বললেন, তাহলে এগুলোর হক আদায় করো অর্থাৎ এর যাকাত দাও।

হযরত আয়েশার উক্তি হচ্ছে, যাকাত আদায় করা হলে অলংকার পরিধানে কোন দোষ নেই।

হযরত উমর (রা) হযরত আবু মূসা আশআরীকে লিখেছিলেন তোমার শাসন কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলে যেসব মুসলিম মহিলা আছে তাদেরকে তাদের অলংকারাদির যাকাত দেবার নির্দেশ দাও।

আমর ইবনে দীনারের বরাত দিয়ে ইমাম আবু হানিফা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা তাঁর বোনদের এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তাঁর মেয়েদেরকে স্বর্ণের অলংকার পরিয়েছিলেন।

এসব বর্ণনা উদ্ধৃত করার পর আল্লামা জাসসাস লিখছেন ঃ নারীদের জন্য স্বর্ণ ও রেশম হালাল হওয়ার সপক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যেসব হাদীস আছে সেগুলো নাজায়েয হওয়া সম্পর্কিত হাদীসসমূহ থেকে অধিক মশহুর ও সুস্পষ্ট। উপরোল্লেখিত আয়াতও জায়েয হওয়াই প্রমাণ করছে। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাদের যুগ থেকে আমাদের যুগ (অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ যুগ) পর্যন্ত গোটা উম্মতের কার্যধারাও তাই আছে। এ ব্যাপারে কেউ কোন আপত্তি উত্থাপন

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ۗ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنْ هُمْ
إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ آتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾
بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلٰى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلٰى آثٰرِهِمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾
وَكَذٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا ۙ
إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلٰى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلٰى آثٰرِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ قٰلَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ
بِأَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ۖ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُونَ ﴿٢٤﴾
فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾

এরা বলে ঃ "দয়াময় আল্লাহ যদি চাইতেন (যে আমরা তাদের ইবাদত না করি) তাহলে আমরা কখনো তাদের পূজা করতাম না।"[২০] এ বিষয়ে প্রকৃত সত্য এরা আদৌ জানে না, কেবলই অনুমানে কথা বলে। আমি কি এর আগে এদেরকে কোন কিতাব দিয়েছিলাম (নিজেদের এই ফেরেশতা পূজার সপক্ষে) এরা যার সনদ নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করছে?[২১] তা নয়, বরং এরা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে একটি পন্থার ওপর পেয়েছি, আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি।[২২] এভাবে তোমার পূর্বে আমি যে জনপদেই কোন সতর্ককারীকে পাঠিয়েছি, তাদের স্বচ্ছল লোকেরা একথাই বলেছে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে একটি পন্থার অনুসরণ করতে দেখেছি। আমরাও তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।[২৩] প্রত্যেক নবীই তাদের বলেছেন, তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের যে পথে চলতে দেখেছো আমি যদি তোমাদের তার চেয়ে অধিক সঠিক রাস্তা বলে দেই তাহলেও কি তোমরা সেই পথেই চলতে থাকবে? তারা সব রসূলকে এই জবাবই দিয়েছে, যে দীনের দিকে আহবান জানানোর জন্য তুমি প্রেরিত হয়েছো, আমরা তা অস্বীকার করি। শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে মার দিয়েছি এবং দেখে নাও, অস্বীকারকারীদের পরিণাম কি হয়েছে।

করেনি। এ ধরনের মাসয়ালা সম্পর্কে "আখবারে আহাদের" ভিত্তিতে কোন আপত্তি গ্রহণ করা যেতে পারে না।

১৮. অর্থাৎ পুরুষ বা নারী কোনটাই নয়। বক্তব্যের ধরন থেকে আপনা আপনি এ অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে।

১৯. আরেকটি অনুবাদ এও হতে পারে, "এরা কি তাদের সৃষ্টির সময় উপস্থিত ছিল?"

২০. নিজেদের গোমরাহীর ব্যাপারে এটা ছিল তাদের 'তাকদীর' থেকে প্রমাণ পেশ। এটা অন্যায়কারীদের চিরকালীন অভ্যাস। তাদের যুক্তি ছিল এই যে, আল্লাহ আমাদের করতে দিয়েছেন বলেই তো ফেরেশতাদের ইবাদত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তিনি যদি না চাইতেন তাহলে আমরা কি করে এ কাজ করতে পারতাম? তাছাড়া দীর্ঘদিন থেকে আমাদের এখানে এ কাজ হচ্ছে, কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে সে জন্য কোন আযাব নাযিল হয়নি। এর অর্থ, আমাদের এ কাজ আল্লাহর কাছে অপসন্দনীয় নয়।

২১. অর্থাৎ নিজেদের অজ্ঞতার কারণে এসব লোক মনে করে পৃথিবীতে যা হচ্ছে তা যেহেতু আল্লাহর অনুমোদনের অধীনে হচ্ছে, তাই এতে আল্লাহর সম্মতি বা স্বীকৃতি আছে। অথচ এ ধরনের যুক্তি যদি সঠিক হয় তাহলে পৃথিবীতে তো শুধু শিরকই হচ্ছে না, চুরি, ডাকাতি, খুন, ব্যভিচার, ঘুষ, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং এ ধরনের আরো অসংখ্য অপরাধও সংঘটিত হচ্ছে যেগুলোকে কোন ব্যক্তিই নেকী ও কল্যাণ মনে করে না। তাছাড়া এ ধরনের যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে কি একথাও বলা যাবে যে, এ কাজ সবই হালাল ও পবিত্র। কারণ, আল্লাহ তাঁর পৃথিবীতে এসব কাজ হতে দিচ্ছেন। আর তিনি যখন এসব হতে দিচ্ছেন তখন অবশ্যই তিনি এসব পসন্দ করেন? পৃথিবীতে যেসব ঘটনা ঘটছে সেগুলো আল্লাহর পসন্দ অপসন্দ জানার মাধ্যম নয়। বরং এ মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, যা তাঁর রসূলের মাধ্যমে আসে। আল্লাহ কোন্ ধরনের আকীদা-বিশ্বাস, কাজকর্ম ও চরিত্র পসন্দ করেন এবং কোন্ ধরনের পসন্দ করেন না তা এই কিতাবে তিনি নিজেই বলে দিয়েছেন। অতএব, এসব লোকের কাছে কুরআনের পূর্বে আগত এমন কোন কিতাব যদি বর্তমান থাকে যেখানে আল্লাহ বলেছেন, আমার সাথে ফেরেশতারাও তোমাদের উপাস্য, তাদের ইবাদত করাও তোমাদের উচিত, তাহলে এরা তার প্রমাণ দিক। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আন'আম, টীকা ৭১, ৭৯, ৮০, ১১০, ১২২, ১২৫; আল আ'রাফ, টীকা ১৬; ইউনুস টীকা ১০১; হূদ, টীকা ১১৬; আর রা'দ, টীকা ৪৫; আন নাহল, টীকা ১০, ৩১, ৯৪; আয যুমার, টীকা ২০; আশ শূরা, টীকা১১)।

২২. অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবের কোন সনদ তাদের কাছে নেই। শুধু এই সনদই আছে যে বাপ-দাদা থেকে এরূপই হয়ে আসছে। তাই তাদের অন্ধ অনুসরণ করতে গিয়ে আমরাও ফেরেশতাদের দেবী বানিয়ে নিয়েছি।

২৩. এটি অত্যন্ত গভীরভাবে ভেবে দেখার বিষয় যে, প্রত্যেক যুগে জাতির সচ্ছল শ্রেণীর লোকেরাই শুধু নবী-রসূলদের বিরুদ্ধে বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণের ঝাণ্ডাবাহী কেন হয়েছে? ন্যায় ও সত্যের বিরোধিতায় এরাই অগ্রগামী হয়েছে, এরাই প্রতিষ্ঠিত জাহেলিয়াতকে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় তৎপর থেকেছে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত ও

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا ٱلَّذِى
فَطَرَنِى فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ بَلْ مَتَّعْتُ هَٰٓؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ
مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِۦ كَٰفِرُونَ ﴿٣٠﴾

৩ রুকূ'

স্মরণ করো সেই সময়টি যখন ইবরাহীম তার বাপ এবং কওমকে বলেছিলো[২৪] "তোমরা যাদের দাসত্ব করো তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার সম্পর্ক শুধু তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করবেন।"[২৫] ইবরাহীম এ কথাটি[২৬] তার পেছনে তার সন্তানদের মধ্যেও রেখে গিয়েছিলো, যাতে তারা এ দিকে ফিরে আসে।[২৭] (এসব সত্ত্বেও যখন এরা অন্যদের দাসত্ব করতে শুরু করলো তখন আমি এদের ধ্বংস করে দিলাম আমি বরং এদের ও এদের বাপ-দাদাদেরকে জীবনোপকরণ দিতে থাকলাম এমনকি শেষ পর্যন্ত এদের কাছে ন্যায় ও সত্য এবং সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল এসে গেল।[২৮] কিন্তু ন্যায় ও সত্য যখন এদের কাছে আসলো তখন এরা বললো ঃ এতো যাদু।[২৯] আমরা তা মানতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছি।

উত্তেজিত করে নবী-রসূলদের বিরুদ্ধে ফিতনা সৃষ্টি এরাই করে এসেছে এর কারণ কি? এর মূল কারণ ছিল দুটি। একটি হচ্ছে, সুখী ও সচ্ছল শ্রেণী আপন স্বার্থ উদ্ধার ও তা ভোগ করার নেশায় এমনই ডুবে থাকে যে, তাদের মতে তারা হক ও বাতিলের এই অপ্রাসংগিক বিতর্কে মাথা ঘামানোর জন্য প্রস্তুত থাকে না। তাদের আরাম প্রিয়তা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতা দীনের ব্যাপারে তাদেরকে অত্যন্ত নির্লিপ্ত ও নিস্পৃহ এবং সাথে সাথে কার্যত রক্ষণশীল (Conservative) বানিয়ে দেয় যাতে প্রতিষ্ঠিত যে অবস্থা পূর্ব থেকেই চলে আসছে হক হোক বা বাতিল হোক—তাই যেন হুবহু প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং কোন নতুন আদর্শ সম্পর্কে চিন্তা করার কষ্ট না করতে হয়। অপরটি হচ্ছে, প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সাথে তাদের স্বার্থ ওতপ্রোতোভাবে জড়িত থাকে। নবী-রসূল আলাইহিমুস সালামদের পেশকৃত আদর্শ দেখে প্রথম দৃষ্টিতেই তারা বুঝে নেয় যে, এটা প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের মাতব্বরির পাটও চুকিয়ে দেবে এবং তাদের হারামখুরী ও হারাম কর্ম করার স্বাধীনতাও থাকবে না। (আরো ব্যখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আন'আম, টীকা ৯১; আল আ'রাফ, টীকা ৪৬, ৫৩, ৫৮, ৭৪, ৮৮, ৯২; হূদ টীকা ৩১, ৩২, ৪১; বানী ইসরাঈল, টীকা ৮১; আল মু'মিনূন, টীকা ২৬, ২৭, ৩৫, ৫৯; সূরা সাবা, আয়াত ৩৪, টীকা ৫৪)।

২৪. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ১২৪ থেকে ১৩৩; আল আন'আম, টীকা ৫০ থেকে ৫৫; ইবরাহীম, টীকা ৪৬ থেকে ৫২; মারয়াম, টীকা ২৬ ও ২৭; আল আম্বিয়া, টীকা ৫৪ থেকে ৬৬; আশ্-শুআরা, টীকা ৫০ থেকে ৬২; আল আনকাবূত, টীকা ২৬ ও ৪৬; আস সাফফাত, আয়াত ৮৩ থেকে ১০০, টীকা ৪৪ থেকে ৫৫।

২৫. একথা দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ) শুধু তাঁর আকীদা বিশ্বাসই বর্ণনা করেননি, তার সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণও পেশ করেছেন। অন্য সব উপাস্যদের সাথে সম্পর্ক না রাখার কারণ হচ্ছে, না তারা সৃষ্টি করেছে, না কোন ব্যাপারে সঠিক পথনির্দেশনা দেয় বা দিতে পারে। শুধু লা-শরীক আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার কারণ হচ্ছে, তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনিই মানুষকে সঠিক পথনির্দেশনা দেন এবং দিতে পারেন।

২৬. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কেউ উপাস্য হওয়ার অধিকারী নয়, একথাটা।

২৭. অর্থাৎ সঠিক পথ থেকে যখনই সামান্য একটু পদস্খলনও ঘটেছে এ বাণী তখনই তার পথনির্দেশনার জন্য সামনে রয়েছে। আর তারাও সেদিকেই ফিরে এসেছে। এখানে এ ঘটনাটি যে উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে, কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের অযৌক্তিকতাকে পুরোপুরি উলংগ করে দেয়া এবং একথা বলে তাদের লজ্জা দেয়া যে, তোমরা পূর্ব-পুরুষদের অন্ধ অনুকরণ করে থাকলেও এ উদ্দেশ্যে সর্বোত্তম পূর্ব-পুরুষদের বাদ দিয়ে নিজেদের জঘন্যতম পূর্ব-পুরুষদের বেছে নিয়েছো। আরবে যে কারণে কুরাইশদের পৌরোহিত্য চলছিলো তা হচ্ছে, তারা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈলের বংশধর এবং তাঁদের নির্মিত কা'বার তত্ত্বাবধায়ক। তাই কুরাইশদের উচিত ছিল তাঁদের অনুসরণ করা। যারা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈলের পথ ছেড়ে আশে পাশের মূর্তি পূজারী জাতিসমূহের নিকট থেকে শিরকের শিক্ষা লাভ করেছিলো তাদের অনুসরণ কুরাইশদের জন্য সঠিক ছিল না। এই ঘটনা বর্ণনা করে আরো একটি দিক থেকেও এসব পথভ্রষ্ট লোকদের ভ্রান্তি সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সেটি হচ্ছে, হক ও বাতিল যাচাই বাছাই না করেই যদি চোখ বন্ধ করে বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ ঠিক হতো তাহলে সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীমই এ কাজ করতেন। কিন্তু তিনি তাঁর বা-দাদা ও কওমকে পরিষ্কার ভাষায় একথা বলে দিয়েছিলেন, আমি তোমাদের অজ্ঞতা প্রসূত ধর্মের অনুসরণ করতে পারি না যার বিধান অনুসারে তোমরা স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে যারা স্রষ্টা নয় সেই সব সত্তাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছো। এ থেকে জানা যায়, হযরত ইবরাহীম বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণের সমর্থক নন। বরং তাঁর নীতি ছিল বাপ-দাদার অনুসরণের পূর্বে ব্যক্তিকে চোখ খুলে দেখতে হবে তারা সঠিক পথে আছে কিনা। যদি যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারা সঠিক পথে চলছে না তখন তাদের অনুসরণ বাদ দিয়ে যুক্তি অনুসারে যেটা ন্যায় ও সত্যের পথ সেটিই অনুসরণ করতে হবে।

২৮. মূল আয়াতে رسول مبين শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, এমন রসূল এসেছেন যার রসূল হওয়া সুস্পষ্ট ছিল, যার নবুওয়াত-পূর্ব জীবন ও নবুওয়াত পরবর্তী জীবন স্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছিলো যে, তিনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল।

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿٣١﴾ اَهُمْ
يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ؕ
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٣٢﴾ وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً
وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ
عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔوْنَ ﴿٣٤﴾
وَزُخْرُفًا ؕ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ
رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٥﴾

তারা বলে, দুটি শহরের বড় ব্যক্তিদের কারো ওপর এ কুরআন নাযিল করা হলো না কেন?[৩০] তোমার রবের রহমত কি এরা বন্টন করে? দুনিয়ার জীবনে এদের মধ্যে জীবন যাপনের উপায় উপকরণ আমি বন্টন করেছি এবং এদের মধ্য থেকে কিছু লোককে অপর কিছু সংখ্যক লোকের ওপর অনেক বেশী মর্যাদা দিয়েছি, যাতে এরা একে অপরের সেবা গ্রহণ করতে পারে।[৩১] (এদের নেতারা) যে সম্পদ অর্জন করছে তোমার রবের রহমত তার চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান।[৩২] সমস্ত মানুষ একই পথের অনুসারী হয়ে যাবে যদি এই আশংকা না থাকতো তাহলে যারা দয়াময় আল্লাহর সাথে কুফরী করে আমি তাদের ঘরের ছাদ, যে সিঁড়ি দিয়ে তারা তাদের বালাখানায় ওঠে সেই সিঁড়ি, দরজাসমূহ এবং যে সিংহাসনের ওপর তারা বালিশে হেলান দিয়ে বসে তা সবই রৌপ্য এবং স্বর্ণের বানিয়ে দিতাম।[৩৩] এগুলো তো শুধু পার্থিব জীবনের উপকরণ, তোমার রবের দরবারে আখেরাত শুধু মুত্তাকীদের জন্য নির্দিষ্ট।

২৯. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরাতুল আম্বিয়া, টীকা ৫ ও সূরা সোয়াদের ব্যাখ্যা, টীকা ৫।

৩০. দুটি শহর অর্থ মক্কা ও তায়েফ। কাফেররা বলতো সত্যিই যদি আল্লাহর কোন রসূল পাঠানোর প্রয়োজন হতো এবং তিনি সেই রসূলের কাছে তাঁর কিতাব নাযিল করতে

চাইতেন তাহলে আমাদের কেন্দ্রীয় মর্যাদার এই শহরগুলোর মধ্য থেকে কোন নামকরা লোককে বাছাই করতেন। আল্লাহ রসূল বানানোর জন্য পেলেন এমন ব্যক্তিকে যে ইয়াতীম হয়ে জন্মলাভ করেছে, যে কোন উত্তরাধিকার লাভ করেনি, যে বকরী চরিয়ে যৌবনকাল অতিবাহিত করেছে, যে এখন স্ত্রীর সম্পদ দিয়ে জীবন যাপনও করে, ব্যবসা–বাণিজ্য করে এবং যে কোন গোত্রের অধিপতি বা গোষ্ঠীর নেতা নয়। মক্কায় কি ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা ও 'উতবা ইবনে রাবীআর মত সম্মানিত ও নামযাদা লোক ছিল না? তায়েফে কি উরওয়া ইবনে মাসউদ, হাবীব ইবনে 'আমর, কিনানা ইবনে আবদে আমর এবং ইবনে আবদে ইয়ালীলের মত নেতারা ছিল না? এটা ছিল তাদের যুক্তি প্রমাণ। কোন মানুষ নবী হতে পারে প্রথমে তারা একথা মানতেই প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু কুরআন মজীদে যখন একের পর এক যুক্তি–প্রমাণ দিয়ে তাদের এ ধারণা পুরোপুরি বাতিল করে দেয়া হলো এবং বলা হলো, ইতিপূর্বেও মানুষই সবসময় নবী হয়ে এসেছেন এবং মানুষের হিদায়াতের জন্য মানুষই রসূল হতে পারেন অন্য কেউ নয়। দুনিয়াতে রসূল হিসেবে যিনিই এসেছেন তিনি হঠাত আসমান থেকে নেমে আসেননি। মানুষের এসব জনপদেই তিনি জন্মলাভ করেছিলেন, বাজারসমূহে চলাফেরা করতেন, সন্তানের পিতা ছিলেন এবং পানাহারের প্রয়োজন মুক্ত ছিলেন না। (দেখুন, আন–নাহল, আয়াত ৪৩, বানী ইসরাঈল ৯৪ ও ৯৫; ইউসুফ, ১০৯; আল ফুরকান, ৭ ও ২০; আল আম্বিয়া, ৭ ও ৮ এবং আর রা'দ ৩৮ আয়াত) তখন তারা কৌশল পরিবর্তন করে বললো, বেশতো, মানুষই রাসূল হয়েছেন তা ঠিক। কিন্তু তাকে তো কোন নামজাদা লোক হতে হবে। তিনি হবেন সম্পদশালী, প্রভাবশালী, বড় দলবলের অধিকারী এবং মানুষের মধ্যে তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব থাকবে। সে জন্য মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি করে উপযুক্ত হতে পারেন?

৩১. এটা তাদের আপত্তির জবাব। এ জবাবের মধ্যে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথায় অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা হয়েছে। প্রথম বিষয়টি হলো, তোমার রবের রহমত বন্টন করার দায়িত্ব তাদেরকে কবে দেয়া হলো? আল্লাহ তাঁর রহমত কাকে দান করবেন আর কাকে দান করবেন না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কি তাদের কাজ? (এখানে রবের রহমত অর্থ তাঁর ব্যাপক রহমত। যে রহমত থেকে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু লাভ করে থাকে)।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, নবুওয়াত তো অনেক বড় জিনিস। পৃথিবীতে জীবন যাপন করার যে সাধারণ উপায়–উপকরণ আছে তার বন্টন ব্যবস্থাও আমি নিজের হাতেই রেখেছি, অন্য কারো হাতে তুলে দেইনি। আমি কাউকে সুশ্রী এবং কাউকে কুশ্রী, কাউকে সুকণ্ঠের অধিকারী এবং কাউকে অপ্রিয় কণ্ঠের অধিকারী, কাউকে শক্তিশালী–সুঠামদেহী এবং কাউকে দুর্বল, কাউকে মেধাবী এবং কাউকে মেধাহীন, কাউকে মজবুত স্মৃতি শক্তির অধিকারী এবং কাউকে স্মৃতিশক্তিহীন, কাউকে সুস্থ অঙ্গ–প্রত্যাঙ্গের অধিকারী, কাউকে বিকলাঙ্গ, অন্ধ অথবা বোবা, কাউকে আমীর পুত্র এবং কাউকে গরীবের পুত্র, কাউকে উন্নত জাতির সদস্য এবং কাউকে পরাধীন অথবা পশ্চাদপদ জাতির সদস্য হিসেবে সৃষ্টি করে থাকি। জন্মগত এই ভাগ্যের ব্যাপারে কেউ সামান্যতম কর্তৃত্বও খাটাতে পারে না। আমি যাকে যা বানিয়েছি সে তাই হতে বাধ্য এবং কারো তাকদীরের ওপর এই ভিন্ন ভিন্ন

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّهُمْ
لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾ حَتَّىٰ
إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ
الْقَرِينُ ﴿٣٨﴾ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ
مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٩﴾

৪ রুকূ'

যে ব্যক্তি রহমানের স্মরণ[৩৪] থেকে গাফিল থাকে আমি তার ওপর এক শয়তান চাপিয়ে দেই, সে তার বন্ধু হয়ে যায়। এ শয়তানরা এসব লোকদেরকে সঠিক পথে আসতে বাধা দেয়, কিন্তু এরা মনে করে আমরা ঠিক পথেই চলছি। অবশেষে যখন এ ব্যক্তি আমার কাছে পৌছবে তখন তার শয়তানকে বলবে ঃ "আহা, যদি আমার ও তোমার মাঝে পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান হতো! তুমি তো জঘন্যতম সাথী প্রমাণিত হয়েছো।" সেই সময় এদের বলা হবে, তোমরা যখন জুলুম করেছো তখন আজ একথা তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। তোমরা ও তোমাদের শয়তানরা সমানভাবে আযাব ভোগ করবে।[৩৫]

জন্মগত অবস্থার যে প্রভাবই পড়ে তা পাল্টে দেয়ার সাধ্য কারো নেই। তাছাড়া আমিই মানুষের মধ্যে রিযিক, ক্ষমতা, মর্যাদা, খ্যাতি, সম্পদ ও শাসন কর্তৃত্ব ইত্যাদি বন্টন করছি। যে আমার পক্ষ থেকে সৌভাগ্য লাভ করে কেউ তার মর্যাদাহানি করতে পারে না। আর আমার পক্ষ থেকে যার জন্য দুর্ভাগ্য ও অধপতন এসে যায় কেউ তাকে পতন থেকে রক্ষা করতে পারে না। আমার সিদ্ধান্তের মোকাবিলায় মানুষের সমস্ত চেষ্টা ও কৌশল কোন কাজেই আসে না। এই বিশ্ব জনীন খোদায়ী ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব জাহানের অধিপতি কাকে তাঁর নবী বানাবেন আর কাকে বানাবেন না সে ব্যাপারে এসব লোক কি ফায়সালা করতে চায়?

তৃতীয় বিষয়টি হলো, এই খোদায়ী ব্যবস্থাপনায় একজনকেই সব কিছু অথবা সবাইকে সব কিছু না দেয়ার চিরস্থায়ী একটি নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। চোখ মেলে দেখো, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সর্বত্র সর্ব ক্ষেত্রে পার্থক্যই নজরে পড়বে। আমি কাউকে

أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٠﴾
فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ﴿٤١﴾ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ
فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ
عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٤﴾
وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ
آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾

হে নবী, তাহলে এখন কি তুমি বধিরদের শোনাবে? নাকি অন্ধ ও সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে পড়ে থাকা লোকদের পথ দেখাবে?[৩৬] আমি তোমাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেই কিংবা এদেরকে যে পরিণামের প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি তা তোমাকে চাক্ষুষ দেখিয়ে দেই এখন তো আমার এদেরকে শাস্তি দিতে হবে। এদের বিরুদ্ধে আমি পূর্ণ ক্ষমতা রাখি।[৩৭] অহীর মাধ্যমে তোমার কাছে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে সর্বাবস্থায় তুমি দৃঢ়ভাবে তা আঁকড়ে থাকো নিশ্চয়ই তুমি সোজা পথে আছো।[৩৮] প্রকৃত সত্য হলো, এ কিতাব তোমার ও তোমার কওমের জন্য অনেক বড় একটি মর্যাদা এবং এ জন্য অচিরেই তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।[৩৯] তোমার পূর্বে আমি যত রসূল পাঠিয়েছিলাম তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করে দেখো, আমি উপাসনার জন্য রহমান খোদা ছাড়া আর কোন উপাস্য নির্দিষ্ট করেছিলাম কিনা?[৪০]

কোন জিনিস দিয়ে থাকলে আরেকটি জিনিস থেকে তাকে বঞ্চিত করেছি। এবং সেটি অন্য কাউকে দিয়েছি। এমনটি করার ভিত্তি হলো কোন মানুষই যেন অন্য মানুষদের মুখাপেক্ষিতা মুক্ত না হয়। বরং কোন না কোন ব্যাপারে প্রত্যেকেই পরস্পরের মুখাপেক্ষী থাকে। যাকে আমি নেতৃত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করেছি নবুওয়াতও তাকেই দিতে হবে এরূপ নির্বুদ্ধিতামূলক ধ্যান-ধারণা তোমাদের মগজে ঢুকলো কি করে? অনুরূপ তোমরা কি একথাও বলবে যে, একজনের মধ্যেই বুদ্ধি, জ্ঞান, সম্পদ, সৌন্দর্য, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং অন্য সব পূর্ণতার সমাবেশ ঘটাতে হবে এবং যে একটি জিনিসও পায়নি তাকে অন্য কোন জিনিসই দিতে হবে না?

৩২. এখানে রবের রহমত অর্থ তাঁর বিশেষ রহমত, অর্থাৎ নবুওয়াত। এর সারমর্ম হলো, তোমরা নিজেদের যেসব নেতাকে তাদের সম্পদ, প্রভাব, প্রতিপত্তি ও মুরুব্বিয়ানার

কারণে বড় একটা কিছু মনে করছো তা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সম্পদ দেয়া হয়েছে তার সমপর্যায়ের নয়। এ সম্পদ ঐ সম্পদ থেকে অনেক গুণ বেশী উৎকৃষ্ট পর্যায়ের এবং তার উৎকৃষ্টতার মানদণ্ড অন্য কিছু। তোমরা যদি মনে করে থাকো, তোমাদের প্রত্যেক চৌধুরী আর শেঠই নবী হওয়ার উপযুক্ত তাহলে সেটা তোমাদের নিজেদের ধ্যান–ধারণার পশ্চাদপদতা। আল্লাহর কাছে এ ধরনের অজ্ঞতার আশা করো কেন?

৩৩. অর্থাৎ এই সোনা রূপা যা কারো লাভ করা তোমাদের দৃষ্টিতে চরম নিয়ামত প্রাপ্তি এবং সম্মান ও মর্যাদার চরম শিখরে আরোহণ, তা আল্লাহর দৃষ্টিতে এতই নগণ্য যে, যদি সমস্ত মানুষের কুফরীর প্রতি ঝুঁকে পড়ার আশংকা না থাকতো তাহলে তিনি প্রত্যেক কাফেরের বাড়ীঘর সোনা ও রূপা দিয়ে তৈরী করে দিতেন। এই নিকৃষ্ট বস্তুটি কখন থেকে মানুষের মর্যাদা ও আত্মার পবিত্রতার প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে? এই সম্পদ তো এমন সব মানুষের কাছেও আছে যাদের ঘৃণ্য কাজ–কর্মের পংকিলতায় গোটা সমাজ পূতিগন্ধময় হয়ে যায়। আর একেই তোমরা মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড বানিয়ে রেখেছো।

৩৪. ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। রহমানের 'যিকর' অর্থ তাঁর স্মরণ, তাঁর পক্ষ থেকে আসা উপদেশ বাণী এবং কুরআনও।

৩৫. অর্থাৎ তোমাদেরকে ভ্রান্ত পথে পরিচালনাকারীরা শাস্তি পাচ্ছে এতে তোমাদের সান্তনা লাভের কিছুই নেই। কারণ, গোমরাহীর পথে চলার অপরাধে তোমরাও একই শাস্তি লাভ করতে যাচ্ছো।

৩৬. অর্থাৎ যারা শোনার জন্য প্রস্তুত এবং যারা প্রকৃত সত্যের দিক থেকে চোখ বন্ধ করে নেয়নি তাদের প্রতি মনযোগ দাও এবং অন্ধদের দেখানো ও বধিরদের শুনানোর প্রয়াসে প্রাণপাত করো না। কিংবা তোমার এসব ভাই বেরাদর কেন সঠিক পথে আসে না এবং কেনই বা তারা নিজেদেরকে আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত বানাচ্ছে সেই দুঃখে নিজেই নিজেকে নিঃশেষ করো না।

৩৭. যে পরিস্থিতিতে একথা বলা হয়েছে তা সামনে রাখলেই এ কথার তাৎপর্য ভালভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে। মক্কার কাফেররা মনে করছিলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তি সত্তাই তাদের জন্য বিপদ হয়ে আছে। মাঝ পথ থেকে এই কাঁটা সরিয়ে দিতে পারলেই তাদের সব কিছু সুন্দর ও ঠিকঠাক হয়ে যাবে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে কোন না কোনভাবে তাঁকে হত্যা করার জন্য তারা রাত দিন বসে বসে পরামর্শ করতো। এতে আল্লাহ তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাঁর নবীকে উদ্দেশ করে বলছেন ঃ তোমার বর্তমান থাকা না থাকায় কিছুই আসে যায় না। তুমি বেঁচে থাকলে তোমার চোখের সামনেই তাদের দুর্ভাগ্য নেমে আসবে। আর যদি তোমাকে উঠিয়ে নেয়া হয় তাহলে তোমার বিদায়ের পরে তাদের দফারফা হবে। অশুভ কর্মফল এখন তাদের ভাগ্যের লিখন হয়ে গিয়েছে। এর হাত থেকে তাদের পক্ষে রক্ষা পাওয়া আর সম্ভব নয়।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرِيهِم
مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾

৫ রুকূ'

আমি[৪১] মূসাকে আমার নিদর্শনসমূহসহ[৪২] ফেরাউন ও তার সভাসদদের কাছে পঠিয়েছিলাম। সে গিয়ে তাদের বলেছিলো ঃ আমি বিশ্ব জাহানের রবের রসূল। অতপর সে যখন তাদের সামনে আমার নিদর্শনসমূহ পেশ করলো তখন তারা বিদ্রূপ করতে লাগলো। আমি তাদেরকে একের পর এক এমন সব নিদর্শন দেখাতে থাকলাম যা আগেরটার চেয়ে বড় হতো। আমি তাদেরকে আযাবের মধ্যে লিপ্ত করলাম যাতে তারা তাদের আচরণ থেকে বিরত থাকে।[৪৩]

৩৮. অর্থাৎ জুলুম ও বে-ঈমানীর সাহায্যে ন্যায় ও সত্যের বিরোধিতাকারীরা তাদের এই কৃতকর্মের শাস্তি কখন এবং কি পায় তুমি সে চিন্তা করবে না। অথবা তোমার জীবদ্দশায় ইসলাম প্রসার লাভ করে কিংবা করে না, সে চিন্তাও তুমি করবে না। তোমার জন্য সান্তনা হিসেবে এতটুকুই যথেষ্ট যে, তুমি ন্যায় ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছ। অতএব, ফলাফলের চিন্তা না করে নিজের দায়িত্ব পালন করতে থাকো। আর আল্লাহ তোমার সামনেই বাতিলে মাথা অবনত করান না তোমার বিদায়ের পরে করান সেটা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দাও।

৩৯. অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতির মধ্যে কোন ব্যক্তির জন্য এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কিছুই হতে পারে না যে, আল্লাহ তাকেই তাঁর কিতাব নাযিলের জন্য বাছাই করছেন এবং কোন জাতির জন্যও এর চেয়ে বড় কোন সৌভাগ্য কল্পনা করা যেতে পারে না যে, দুনিয়ার অন্য সব জাতিকে বাদ দিয়ে আল্লাহ তাদের মধ্যেই তাঁর নবীকে সৃষ্টি করছেন, তাদের ভাষায় তাঁর কিতাব নাযিল করছেন এবং তাদেরকেই গোটা বিশ্বব্যাপী আল্লাহর বানীবাহক হওয়ার মহা সুযোগ দান করছেন যদি কুরাইশ ও আরববাসীদের এই বিরাট মর্যাদার উপলব্ধি না থেকে থাকে এবং যদি তারা তার অমর্যাদা করতে চায় তাহলে এমন একটি সময় অবশ্যই আসবে যখন এ জন্য তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

৪০. রসূলদের জিজ্ঞেস করার অর্থ তাঁদের আনীত কিতাবসমূহ থেকে জেনে নেয়া। যেমন فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ আয়াতাংশের অর্থ "যদি কোন ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয় তাহলে তা আল্লাহ ও রসূলের কাছে নিয়ে যাও নয়, বরং তার অর্থ হচ্ছে, সে ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের স্মরণাপন্ন হও। অনুরূপ রসূলদেরকে জিজ্ঞেস করার অর্থ, যে রসূলগণ দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন তাদের সবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো নয়, বরং এর সঠিক তাৎপর্য হলো

আল্লাহর রসূলগণ পৃথিবীতে যেসব শিক্ষা রেখে গিয়েছেন তার মধ্যে অনুসন্ধান করে দেখো, মহান আল্লাহ ছাড়া আরো কেউ উপাসনা লাভের যোগ্য তা কেউ শিখিয়েছিলেন কি না।

৪১. এখানে এ ঘটনাটা তিনটি উদ্দেশ্যে বর্ণণা করা হয়েছে। এক—আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়ে আরববাসীদের বর্তমানে একটি সুযোগ দান করেছেন। যখনই আল্লাহ কোন দেশ ও জাতির কাছে তাঁর নবী পাঠিয়ে তাদের এ ধরনের সুযোগ দান করেন কিন্তু সে জাতি তার মর্যাদা ও মূল্য দেয়া এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে ফিরাউন ও তার কওম যেমন নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছিলো তেমন নির্বুদ্ধিতার কাজ করে বসে। তখন তারা এমন পরিণামের সম্মুখীন হয় যা ইতিহাসে শিক্ষণীয় উদাহরণ হয়ে আছে। দুই—যেভাবে বর্তমানে মক্কার কুরাইশ গোত্রের কাফেররা তাদের নেতাদের তুলনায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নগণ্য ও হেয় মনে করছে ফিরাউনও তার বাদশাহী, জাঁকজমক, প্রতিপত্তি এবং ধন-সম্পদের গর্বে গর্বিত হয়ে মূসা আলাইহিস সালামকে ঠিক তেমনি নগণ্য ও হেয় মনে করেছিলো। কিন্তু মহান আল্লাহর ফায়সালা ছিল ভিন্ন রকম। এবং বাস্তবে হেয় ও নগণ্য কে ছিলো সেই ফায়সালাই শেষ পর্যন্ত তা বুঝিয়ে দিয়েছে। তিন—আল্লাহর নিদর্শনসমূহের সাথে বিদ্রূপ করা এবং তাঁর সতর্ক বাণীসমূহের বিরুদ্ধে শক্তিমত্তা প্রদর্শন করা কোন ছোটখাট ব্যাপার নয়, বরং অত্যন্ত চড়া মূল্য দাবি করার মত ব্যাপার। যারা এর পরিণাম ভোগ করেছে তাদের উদাহরণ থেকে যদি শিক্ষা গ্রহণ না করো তাহলে নিজেও একদিন সেই পরিণাম ভোগ করবে।

৪২. এর অর্থ প্রাথমিক যেসব নিদর্শন নিয়ে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনের দরবারে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ লাঠি ও 'ইয়াদে বায়দা' বা আলোকোজ্জ্বল হাত(ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আ'রাফ, টীকা ৮৭ থেকে ৮৯; ত্বাহা, টীকা ১২, ১৩, ২৯, ৩০; আশ শুআরা, টীকা ২৬ থেকে ২৯; আন নামল, টীকা ১৬; আল কাসাস, টীকা ৪৪ ও ৪৫)।

৪৩. এসব নিদর্শন বলতে বুঝানো হয়েছে সেই নিদর্শনসমূহকে যা আল্লাহ পরবর্তীকালে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তাদের দেখিয়েছিলেন। নিদর্শনগুলো ছিল ঃ

এক ঃ জন সমক্ষে যাদুকরদের সাথে আল্লাহর নবীর মোকাবিলা হয় এবং তারা পরাজিত হয়ে ঈমান আনে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল 'আরাফ, টীকা ৮৮ থেকে ৯২; ত্বাহা, টীকা ৩০ থেকে ৫০ এবং আশ শুআরা, টীকা ২৯ থেকে ৪০।

দুই ঃ হযরত মূসার ভবিষ্যত বাণী অনুসারে মিসর দেশে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হয় এবং হযরত মূসার দোয়ার কারণেই তা দূরীভূত হয়

তিন ঃ তাঁর ভবিষ্যত বাণীর পর গোটা দেশে ভয়াবহ বৃষ্টি, শিলা বৃষ্টি, বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎ বর্ষণসহ প্রবল ঝড়, তুফান আসে, যা জনপদ ও কৃষি ক্ষেত্র ধ্বংস করে ফেলে। এ বিপদও তাঁর দোয়াতেই কেটে যায়।

চার ঃ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে গোটা দেশে পঙ্গপালের ভয়ানক আক্রমণ হয় এবং এ বিপদও ততক্ষণ পর্যন্ত দূরীভূত হয়নি যতক্ষণ না তিনি তা দূরীভূত হওয়ার জন্য দোয়া করেছেন।

পাঁচ ঃ তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী গোটা দেশে উকুন ও কীটাণু ছড়িয়ে পড়ে যার কারণে একদিকে মানুষ ও জীবজন্তু মারাত্মক কষ্টে পড়ে, অপর দিকে খাদ্য শস্যের গুদাম ধ্বংস হয়ে যায়। এ আযাব কেবল তখনই দূরীভূত হয় যখন কাকুতি-মিনতি করে হযরত মূসার দ্বারা দোয়া করানো হয়।

ছয় ঃ হযরত মূসা আলাইহিস সালামের পূর্ব-সতর্ক বাণী অনুসারে গোটা দেশের আনাচে কানাচে ব্যাঙের সয়লাব আসে যার ফলে গোটা জনপদের প্রায় দমবন্ধ হওয়ার মত অবস্থা হয়। আল্লাহর এই সৈনিকরাও হযরত মূসার দোয়া ছাড়া ফিরে যায়নি।

সাত ঃ ঠিক তাঁর ঘোষণা মোতাবেক রক্তের আযাব দেখা দেয়। যার ফলে সমস্ত নদীনালা, কূপ, ঝর্ণাসমূহ, দিঘী এবং হাউজের পানি রক্তে পরিণত হয়, মাছ মরে যায়, সর্বত্র পানির আধারে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় এবং পুরো এক সপ্তাহ পর্যন্ত মিসরের মানুষ পরিষ্কার পানির জন্য তড়পাতে থাকে। এ বিপদও কেবল তখনই কেটে যায় যখন তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য হযরত মূসাকে দিয়ে দোয়া করানো হয়। বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আ'রাফ, টীকা ৯৪ থেকে ৯৬; আন নামল, টীকা ১৬ ও ১৭; আল মু'মিন, টীকা ৩৭।

বাইবেলের যাত্রা পুস্তকের ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১২ অধ্যায়েও এ সব আযাবের বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। তবে তা কল্পকাহিনী ও সত্যের সংমিশ্রণ মাত্র। সেখানে বলা হয়েছে যখন রক্তের আযাব এলো তখন যাদুকররাও অনুরূপ রক্ত তৈরী করে দেখালো। কিন্তু উকুনের আযাব আসলে জবাবে যাদুকররা উকুন সৃষ্টি করতে পারলো না। তারা বললো, এটা আল্লাহর কাজ। এর চেয়েও অধিক মজার ব্যাপার হলো, অসংখ্য ব্যাঙের সয়লাব সৃষ্টি হলে জবাবে যাদুকররাও ব্যাঙের সয়লাব আনলো এবং এরপরও ফেরাউন মূসার কাছেই আবেদন জানালো যে, আল্লাহর কাছে দোয়া করে এ আযাব দূর করিয়ে দিন। প্রশ্ন হচ্ছে, যাদুকররাও যেখানে ব্যাঙের সয়লাব আনতে সমর্থ ছিল সেখানে ফেরাউন যাদুকরদের দিয়েই এই আযাব দূর করিয়ে নিলো না কেন? তাছাড়া কোনগুলো যাদুকরদের ব্যাঙ আর কোনগুলো আল্লাহর ব্যাঙ তাই বা কি করে বুঝা গেল? রক্ত সম্পর্কেও এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, হযরত মূসার সাবধান বাণী অনুসারে যখন সব জায়গার পানির ভাণ্ডার রক্তে পরিণত হয়েছিলো তখন যাদুকররা কোন পানিকে রক্ত বানিয়েছিলো এবং কিভাবে বুঝা গেল অমুক জায়গার পানি যাদুকরদের যাদু বিদ্যা দ্বারা রক্তে পারিণত হয়েছে? এ ধরনের বক্তব্যের কারণে স্পষ্ট বুঝা যায়, বাইবেল আল্লাহর নির্ভেজাল বাণী সমাহার নয়। বরং যারা তা রচনা করেছে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে তার মধ্যে অনেক কিছু সংযোজিত করেছে। তবে সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, ঐ সব রচয়িতারা ছিল নগণ্য জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোক। কোন কথা সুন্দর করে রচনা করার যোগ্যতা পর্যন্ত তাদের ছিল না।

وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٤٩﴾
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِيْ قَوْمِهٖ
قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ ۚ
اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٥١﴾ اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ مَهِيْنٌ ۙ وَّلَا
يَكَادُ يُبِيْنُ ﴿٥٢﴾ فَلَوْلَآ اُلْقِيَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ
الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ﴿٥٣﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا
فٰسِقِيْنَ ﴿٥٤﴾ فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥٥﴾ فَجَعَلْنٰهُمْ
سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ ﴿٥٦﴾

প্রত্যেক আযাবের সময় তারা বলতো, হে যাদুকর! তোমার রবের পক্ষ থেকে তুমি যে পদমর্যাদা লাভ করেছো তার ভিত্তিতে আমাদের জন্য তাঁর কাছে দোয়া করো। আমরা অবশ্যই সঠিক পথে এসে যাবো। কিন্তু আমি যেই মাত্র তাদের ওপর থেকে আযাব সরিয়ে দিতাম তারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতো।[৪৪] একদিন ফেরাউন তার কওমের মাঝে ঘোষণা করলো[৪৫] ঃ হে জনগণ, মিসরের বাদশাহী কি আমার নয় এবং এসব নদী কি আমার অধীনে প্রবাহিত হচ্ছে না? তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ না?[৪৬] আমিই উত্তম না এই ব্যক্তি যে হীন ও নগণ্য[৪৭] এবং নিজের বক্তব্যও স্পষ্ট করে বর্ণনা করতে পারে না।[৪৮] তার কাছে সোনার বালা কেন পাঠানো হলো না? অথবা তার আরদালী হিসেবে একদল ফেরেশতা কেন আসলো না?[৪৯]

সে তার জাতিকে হালকা ও গুরুত্বহীন মনে করেছে এবং তারাও তার আনুগত্য করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল ফাসেক।[৫০] অবশেষে তারা যখন আমাকে ক্রোধান্বিত করলো তখন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম, তাদের সবাইকে এক সাথে ডুবিয়ে মারলাম এবং পরবর্তীদের জন্য অগ্রবর্তী ও শিক্ষণীয় উদাহরণ বানিয়ে দিলাম।[৫১]

৪৪. ফেরাউন ও তার কওমের নেতাদের হঠকারিতার মাত্রা পরিমাপ করা যায় এভাবে যে, যখন তারা আল্লাহর আযাবে অতিষ্ঠ হয়ে তা থেকে মুক্তি লাভের জন্য মূসাকে দিয়ে দোয়া করাতে চাইতো তখনও তারা তাঁকে নবী বলে সম্বোধন না করে যাদুকর বলেই সম্বোধন করতো। অথচ যাদুর তাৎপর্য তারা জানতো না, তা নয়। তাছাড়া একথাও তাদের কাছে গোপন ছিল না যে, এসব অদ্ভুত কর্মকাণ্ড কোন প্রকার যাদুর সাহায্যে সংঘটিত হতে পারে না। একজন যাদুকর বড় জোর যা করতে পারে তা হচ্ছে, একটি সীমিত পরিসরে যেসব মানুষ তার সামনে বর্তমান থাকে সে তাদের মন-মস্তিষ্কের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যার ফলে তারা মনে করতে থাকে, পানি রক্তে পরিণত হয়েছে, অথবা ব্যাঙ উপছে পড়ছে কিংবা পঙ্গপালের ঝাঁক ক্রমে এগিয়ে আসছে। এই সীমিত পরিসরের মধ্যেও পানি বাস্তবিকই রক্তে পরিণত হবে না। বরং ঐ পরিসর থেকে মুক্ত হওয়া মাত্রই পানি পানিতে পরিণত হবে। বাস্তবে কোন ব্যাঙ সৃষ্টি হবে না। আপনি যদি সেটিকে ধরে ঐ গণ্ডির বাইরে নিয়ে যান তাহলে আপনার হাতে ব্যাঙের বদলে থাকবে শুধু বাতাস। পঙ্গপালের ঝাকও হবে শুধু মনের কল্পনা। তা কোন ক্ষেতের ফসল ধ্বংস করতে পারবে না। এখন কথা হলো, একটা গোটা দেশ দুর্ভিক্ষ কবলিত হওয়া, কিংবা সমগ্র দেশের নদী-নালা, ঝর্ণা এবং কূপসমূহ রক্তে পরিপূর্ণ হওয়া অথবা হাজার হাজার মাইল এলাকা জুড়ে পঙ্গপালের আক্রমণ হওয়া এবং লাখ লাখ একর জমির ফসল ধ্বংস করা। আজ পর্যন্ত কখনো কোন যাদুকর এ কাজ করতে সক্ষম হয়নি এবং যাদুর জোরে কখনো তা সম্ভবও নয়। কোন রাজা-বাদশাহর কাছে এমন কোন যাদুকর থাকলে তার সেনাবাহিনী রাখার এবং যুদ্ধের বিপদাপদ সহ্য করার প্রয়োজনই হতো না। যাদুর জোরেই সে গোটা দুনিয়াকে পদানত করতে পারতো। যাদুকরদের এমন শক্তি থাকলে তারা কি রাজা-বাদশাহদের অধীনে চাকরি করতো? তারা নিজেরাই কি বাদশাহ হয়ে বসতো না?

মুফাসসিরগণ এখানে সাধারণভাবে একটি জটিলতার সম্মুখীন হয়েছেন। অর্থাৎ আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ফেরাউন ও তার সভাসদরা হযরত মূসার কাছে যখন দোয়ার জন্য আবেদন করতো তখনো তারা তাঁকে 'হে যাদুকর' বলে সম্বোধন করতো কি করে? বিপদের সময় সাহায্য প্রার্থনাকারী তো তোষামোদ করে থাকে, নিন্দাবাদ নয়। এ কারণে তারা এই বলে ব্যাখ্যা করেছেন যে, সে যুগে মিসরবাসীদের দৃষ্টিতে যাদু অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ বিদ্যা ছিল। 'হে যাদুকর' বলে তারা প্রকৃতপক্ষে হযরত মূসার নিন্দাবাদ করতো না, বরং তাদের মতে যেন সম্মানের সাথে তাকে 'হে জ্ঞানী' বলে সম্বোধন করতো। কিন্তু এ ব্যাখ্যা পুরোপুরিই ভুল। কারণ কুরআনের অন্যান্য স্থানে যেখানেই ফেরাউন কর্তৃক মূসাকে যাদুকর এবং তাঁর পেশকৃত মু'জিযাসমূহকে যাদু বলে আখ্যায়িত করার কথা উদ্ধৃত হয়েছে সেখানেই নিন্দাবাদ ও হেয়ো প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়ই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং স্পষ্ট বুঝা গেছে, তাদের কাছে যাদু ছিল একটি মিথ্যা জিনিস। আর এ কারণেই তারা হযরত মূসার বিরুদ্ধে যাদুর অভিযোগ আরোপ করে তাঁকে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার বলে আখ্যায়িত করতো। তাই এ ক্ষেত্রে 'যাদুকর' কথাটি হঠাত করে তাদের দৃষ্টিতে সম্মানিত আলেম বা বিদ্বানের উপাধি হয়ে যাবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এখন প্রশ্ন হলো, দোয়ার জন্য আবেদন জানানোর সময়ও যখন তারা প্রকাশ্যে হযরত মূসার অমর্যাদা করতো তখন তিনি তাদের আবেদন গ্রহণই বা করতেন কেন? এর জবাব হচ্ছে,

হযরত মূসার লক্ষ্য ছিল আল্লাহর নির্দেশে ঐ সব লোকদের কাছে 'ইতমামে হুজ্জত' বা যুক্তি–প্রমাণের চূড়ান্ত করা। আযাব দূরীভূত করার জন্য তাঁর কাছে তাদের দোয়ার আবেদন করাই প্রমাণ করছিলো যে, আযাব কেন আসছে কোথা থেকে আসছে এবং কে তা দূর করতে পারে মনে মনে তারা তা উপলব্ধি করে ফেলেছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন তারা হঠকারিতা করে তাঁকে যাদুকর বলতো এবং আযাব কেটে যাওয়ার পর সঠিক পথ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতো তখন মূলত তারা আল্লাহর নবীর কোন ক্ষতি করতো না। বরং নিজেদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমাকে আরো বেশী জোরালো করে তুলতো। আর আল্লাহ তার ফায়সালা করে দিয়েছিলেন তাদের পুরোপুরি মূলোৎপাটন করার মাধ্যমে। তাঁকে তাদের যাদুকর বলার অর্থ এ নয় যে, তারা সত্যিই মন থেকেও বিশ্বাস করতো, তাদের ওপর যেসব আযাব আসছে তা যাদুর জোরেই আসছে। তারা মনে মনে ঠিকই উপলব্ধি করতো যে এগুলো সবই বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহর নিদর্শন। কিন্তু জেনে শুনেও তা অস্বীকার করতো। সূরা নামলে এ কথাটিই বলা হয়েছে ঃ

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا (ايت ١٤)

"তারা মনে মনে বিশ্বাস করে ফেলেছিলো। কিন্তু জুলুম ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে এসব নিদর্শন অস্বীকার করতো।"

৪৫. গোটা জাতির মধ্যে ঘোষণার বাস্তব রূপ সম্ভবত এই ছিল যে, ফেরাউন তার দরবারে সাম্রাজ্যের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ও জাতির বড় বড় নেতাদের উদ্দেশ করে যে কথা বলেছিলো ঘোষকদের মাধ্যমে তা গোটা দেশের সমস্ত শহর ও জনপদে প্রচার করা হয়েছিলো। সেই যুগে তার কাছে তো তোষামুদে প্রেস, নিজের পোষা সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী বেতার ছিল না যে তার মাধ্যমে ঘোষণা করতো।

৪৬. ঘোষণার এই বিষয়বস্তু থেকেই প্রকাশ পায় যে "হিজ ম্যাজেষ্টির" পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছিলো। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের একের পর এক মু'জিযা দেখানো দেবতাদের প্রতি জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস নড়বড়ে করে দিয়েছিলো এবং যে তেলেসমাতির মাধ্যমে ফেরাউনদের খান্দান আল্লাহর অবতার সেজে মিসরে তাদের খোদায়ী চালিয়ে যাচ্ছিলো তা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। এই পরিস্থিতি দেখে ফেরাউন বলে উঠেছিলো ঃ হতভাগারা, এ দেশে কার রাজত্ব চলছে এবং নীল নদ থেকে উৎপন্ন যে সব নদী নালার ওপর তোমাদের গোটা আর্থিক কায়–কারবার নির্ভরশীল তা কার নির্দেশে প্রবাহিত হচ্ছে তা তোমরা চোখে দেখতে পাও না? এসব উন্নয়ন মূলক কাজ তো করেছি আমি এবং আমার খান্দান আর তোমরা ভক্ত অনুরক্ত হচ্ছো এই ফকীরের।

৪৭. অর্থাৎ যার কাছে না আছে অর্থ–সম্পদ না আছে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব।

৪৮. কোন কোন মুফাসসিরের ধারণা, বাল্যকাল থেকেই হযরত মূসার (আ) কথায় যে তোতলামি ছিল সে বিষয়েই ফেরাউনের এই আপত্তি। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। সূরা তোয়াহাতে একথা বলা হয়েছে যে, হযরত মূসাকে (আ) যে সময় নবুওয়াতের পদ–মর্যাদায় ভূষিত করা হচ্ছিলো তখন তিনি আল্লাহর কাছে এই বলে প্রার্থনা করেছিলেন যে, আমার কথার জড়তা দূর করে দিন যাতে মানুষ ভালভাবে আমার কথা বুঝতে পারে। সেই সময়ই তাঁর অন্যান্য প্রার্থনার সাথে এই প্রার্থনাও মঞ্জুর করা হয়েছিলো (আয়াত ২৭

থেকে ৩৬)। তাছাড়া কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে হযরত মূসার (আ) যে সব বক্তৃতা উদ্ধৃত করা হয়েছে তা তাঁর পূর্ণ মাত্রার সাবলীল ভাষার প্রতি ইংগিত করে। অতএব, ফেরাউনের আপত্তির কারণ তাঁর কথার তোতলামি ছিল না। বরং তার আপত্তির বিষয় ছিল এই যে, এ ব্যক্তি অজানা কি সব এলোমেলো কথাবার্তা বলে যার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় কখনো আমাদের বোধগম্য হয়নি।

৪৯. প্রাচীনকালে কোন ব্যক্তিকে যখন কোন এলাকার শাসন কর্তৃত্ব অথবা অন্য দেশে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বে নিয়োগ করা হতো তখন বাদশাহর পক্ষ থেকে তাঁকে খেলাত দেয়া হতো যার মধ্যে স্বর্ণ-বলাকা অথবা চুড়িও থাকতো। তার সাথে সিপাই, দণ্ডধারী ও সেবকদের একটি দল থাকতো যাতে তার প্রভাব ও শান শওকত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যে বাদশাহর পক্ষ থেকে সে আদিষ্ট হয়ে আসছে তার জৌলুস ও জাঁকজমক প্রকাশ পায়। ফেরাউনের উদ্দেশ্য ছিল, সত্যিই যদি আসমানের বাদশাহ মূসাকে (আলাইহিস সালাম) আমার কাছে তাঁর দূত বানিয়ে পাঠাতেন তাহলে সে বাদশাহী খেলাত লাভ করতো এবং তাঁর সাথে ফেরেশতাদের অনেক দল আসতো। এ কেমন কথা যে, 'একজন নিস্ব ও সহায়-সম্বলহীন মানুষ হাতে একখানা লাঠি নিয়ে এসে বলছে, 'আমি বিশ্ব জাহানের রবের রসূল।'

৫০. এই ছোট্ট আয়াতটিতে একটি অনেক বড় সত্য বর্ণনা করা হয়েছে। যখন কোন ব্যক্তি কোন দেশে তার স্বেচ্ছাচারিতা চালানোর চেষ্টা করে এবং সে জন্য প্রকাশ্যে সব রকমের চক্রান্ত করে। সব রকমের প্রতারণা, শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নেয়। প্রকাশ্যে বিবেক বিক্রির কারবার চালায় এবং যারা বিক্রি হয় না তাদেরকে দ্বিধাহীন চিত্তে পদদলিত করে তখন সে মুখে না বললেও কার্যক্ষেত্রে একথা স্পষ্ট করে দেয় যে, প্রকৃত পক্ষে সে ঐ দেশের অধিবাসীদেরকে বুদ্ধি-বিবেক, নৈতিকতা ও সাহসিকতার দিক থেকে গুরুত্বহীন মনে করে এবং তাদের সম্পর্কে এই মত পোষণ করে যে, এসব নির্বোধ, বিবেক-বুদ্ধিহীন ও ভীরু লোকগুলোকে আমি যেদিকে ইচ্ছা তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি। তার এ প্রচেষ্টা যখন সফল হয় এবং দেশের অধিবাসীরা এর অনুগত দাসে পরিণত হয় তখন নিজেদের কাজ দ্বারাই তারা প্রমাণ করে দেয় যে, সেই ঘৃণ্য লোকটি তাদেরকে যা মনে করেছিলো তারা বাস্তবেও তাই। তাদের এই লাঞ্ছনাকর অবস্থায় পতিত হওয়ার আসল কারণ হচ্ছে, তারা মৌলিকভাবে 'ফাসেক'। হক ও বাতিল এবং ইনসাফ ও জুলুম কি তা নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা থাকে না। সততা, দীনদারী এবং মহত্ব মূল্য ও মর্যাদা লাভের উপযুক্ত না মিথ্যা, বে-ঈমানী এবং নীচতা মূল্য ও মর্যাদা লাভের উপযুক্ত তা নিয়েও তাদের কোন মাথা ব্যাথা থাকে না। এসব বিষয়ের পরিবর্তে ব্যক্তি স্বার্থই তাদের কাছে আসল গুরুত্বের বিষয়। সে জন্য তারা যে কোন জালেমকে সহযোগিতা করতে, যে কোন স্বৈরাচারের সামনে মাথা নত করতে, যে কোন বাতিলকে গ্রহণ করতে এবং সত্যের যে কোন আওয়াজকে দাবিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

৫১. অর্থাৎ যারা তাদের পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ না করবে এবং তাদের মতই আচরণ করবে তাদের জন্য তারা অগ্রবর্তী আর যারা শিক্ষা গ্রহণ করবে তাদের জন্য শিক্ষণীয় উদাহরণ।

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوا ءَأَلِهَتُنَا
خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾
إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾
وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنَّهُ
لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾
وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٢﴾

৬ রুকূ'

আর যেই মাত্র ইবনে মারয়ামের উদাহরণ দেয়া হলো তোমার কওম হৈ চৈ শুরু করে দিলো এবং বলতে শুরু করলো ঃ আমাদের উপাস্য উৎকৃষ্ট না সে?[৫২] তারা শুধু বিতর্ক সৃষ্টির জন্য তোমার সামনে এ উদাহরণ পেশ করেছে। সত্য কথা হলো, এরা মানুষই কলহ প্রিয়। ইবনে মারয়াম আমার বান্দা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি তাকে নিয়ামত দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলদের জন্য আমার অসীম ক্ষমতার একটি নমুনা বানিয়েছিলাম।[৫৩] আমি চাইলে তোমাদের পরিবর্তে ফেরেশতা সৃষ্টি করে দিতে পারি[৫৪] যারা পৃথিবীতে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। আর প্রকৃতপক্ষে সে তো কিয়ামতের একটি নিদর্শন।[৫৫] অতএব সে ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ করো না এবং আমার কথা মেনে নাও। এটাই সরল-সোজা পথ। শয়তান যেন তা থেকে তোমাদের বিরত না রাখে।[৫৬] সে তো তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

৫২. ইতিপূর্বে এ সূরার ৪৫ আয়াতে বলা হয়েছে "তোমাদের পূর্বে যে রসূলগণ অতিক্রান্ত হয়েছেন তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করে দেখো আমি বন্দেগী করার জন্য রহমান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য মনোনীত করেছি কিনা?" মক্কাবাসীদের সামনে যখন এ বক্তব্য পেশ করা হচ্ছিলো তখন এক ব্যক্তি হাদীসসমূহে যার নাম উল্লেখ করা হয়েছে আবদুল্লাহ ইবনুয যিবা'রা আপত্তি উথাপন করে বললো ঃ কেন খৃষ্টানরা মারয়ামের পুত্র ঈসাকে খোদার পুত্র মনে করে তার ইবাদত করে কিনা? তাহলে আমাদের উপাস্যের দোষ কি? এতে কাফেরদের সমাবেশে হাসির রোল পড়ে গেল এবং শ্লোগান শুরু হলো, এবার আচ্ছা মত জব্দ হয়েছে, ঠিকমত ধরা হয়েছে। এখন এর জবাব দাও। কিন্তু তাদের এই বাচালতার কারণে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন না করে প্রথমে তা পূর্ণ করা হয়েছে

এবং তারপর আপত্তিকারীর প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। (প্রকাশ থাকে যে, তাফসীর গ্রন্থসমূহে এ ঘটনা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ সব সূত্র সম্পর্কে অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু আয়াতটির পূর্বাপর প্রসঙ্গ এবং ঐসব বর্ণনা সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করার পর আমরা ওপরে যা বর্ণনা করেছি সেটিই আমাদের মতে ঘটনার সঠিক রূপ বলে প্রতিভাত হয়েছে)

৫৩. অসীম ক্ষমতার নমুনা বানানোর অর্থ হযরত ঈসাকে বিনা বাপে সৃষ্টি করা এবং তাঁকে এমন মু'জিযা দান করা যা না তাঁর পূর্বে কাউকে দেয়া হয়েছিলো না পরে। তিনি মাটি দিয়ে পাখি তৈরী করে তাতে ফুঁ দিতেন আর অমনি তা জীবন্ত পাখি হয়ে যেতো। তিনি জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করতেন এবং কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করতেন। এমনকি মৃত মানুষকে পর্যন্ত জীবিত করতেন। আল্লাহর বাণীর তাৎপর্য হচ্ছে, শুধু অসাধারণ জন্ম এবং এসব বড় বড় মু'জিযার কারণে তাঁকে আল্লাহর দাসত্বের উর্ধে মনে করা এবং আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যায়িত করে তাঁর উপাসনা করা নিতান্তই ভ্রান্তি। একজন বান্দা হওয়ার চেয়ে অধিক কোন মর্যাদা তাঁর ছিল না। আমি তাকে আমার নিয়ামতসমূহ দিয়ে অভিসিক্ত করে আমার অসীম ক্ষমতার নমুনা বানিয়ে দিয়েছিলাম। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল ইমরান, টীকা ৪২ থেকে ৪৪; আন নিসা, ১৯০; আল মায়েদা, টীকা ৪০, ৪৬ ও ১২৭; মারয়াম, টীকা ১৫ থেকে ২২; আল আম্বিয়া, টীকা ৮৮ থেকে ৯০; আল মু'মিনূন, টীকা ৪৩)।

৫৪. আরেকটি অনুবাদ হতে পারে তোমাদের কোন কোন লোককে ফেরেশতা বানিয়ে দেবো।

৫৫. এ আয়াতাংশের অনুবাদ এও হতে পারে যে তিনি কিয়ামত সম্পর্কে জ্ঞানের একটি মাধ্যম। এখানে এই মর্মে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, "সে" শব্দ দ্বারা কি জিনিস বুঝানো হয়েছে? হযরত হাসান বাসারী এবং সাঈদ ইবনে জুবায়েরের মতে এর অর্থ কুরআন মজীদ। অর্থাৎ কিয়ামত আসবে কুরআন মজীদ থেকে মানুষ তা জানতে পারে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা পূর্বাপর প্রসঙ্গের সাথে একেবারেই সম্পর্কহীন। কথার মধ্যে এমন কোন ইংগিত বর্তমান নেই যার ভিত্তিতে বলা যাবে যে এখানে কুরআনের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। অন্য সব তাফসীরকারগণ প্রায় সর্বসম্মতভাবে এ মত পোষণ করেন যে, এর অর্থ হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম এবং পূর্বাপর প্রসঙ্গের মধ্যে এটাই সঠিক। এরপর প্রশ্ন আসে, তাঁকে কোন্ অর্থে কিয়ামতের নিদর্শন অথবা কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞানের মাধ্যম বলা হয়েছে? ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদা, সুদ্দী, দাহ্হাক, আবুল আলিয়া ও আবু মালেক বলেন, এর অর্থ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় আগমন, যে সম্পর্কে বহু হাদীসে বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তিনি দ্বিতীয় বার যখন পৃথিবীতে আগমন করবেন তখন বুঝা যাবে কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে। কিন্তু এসব সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মহাসম্মান সত্ত্বেও একথা মেনে নেয়া কঠিন যে, এ আয়াতে হযরত ঈসার পুনরাগমনকে কিয়ামতের নিদর্শন অথবা সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভের মাধ্যম বলা হয়েছে। কেননা, পরের বাক্যই এ অর্থ গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক। তাঁর পুনরাগমন কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞানের মাধ্যমে শুধু তাদের জন্য হতে পারে যারা সেই যুগে বর্তমান থাকবে অথবা সেই যুগের পরে জন্ম লাভ করবে। মক্কার কাফেরদের জন্য তিনি কিভাবে

وَلَمَّا جَآءَ عِيسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ
لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿٦٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ
هُوَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۗ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦٤﴾ فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ
مِنْ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ﴿٦٥﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ
اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٦٦﴾ اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۢ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٧﴾

ঈসা যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলো, বলেছিলো ঃ আমি তোমাদের কাছে হিকমত নিয়ে এসেছি এবং এ জন্য এসেছি যে, তোমরা যেসব বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করছো তার কিছু বিষয়ের তাৎপর্য প্রকাশ করবো। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। প্রকৃত সত্য এই যে, আল্লাহই আমার ও তোমাদের রব। তাঁরই ইবাদত করো। এটাই সরল-সোজা পথ।[৫৭] কিন্তু (তাঁর এই সুস্পষ্ট শিক্ষা সত্ত্বেও) বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী পরস্পর মতপার্থক্য করলো।[৫৮] যারা জুলুম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক দিনের আযাব।

এখন এসব লোকেরা কি শুধু এ জন্যই অপেক্ষমান যে অকস্মাত এদের ওপর কিয়ামত এসে যাক এবং এরা আদৌ টের না পাক? যখন সে দিনটি আসবে তখন মুত্তাকীরা ছাড়া অবশিষ্ট সব বন্ধুই একে অপরের দুশমন হয়ে যাবে।[৫৯]

কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞানের মাধ্যম হতে পারেন যার কারণে তাদেরকে সম্বোধন করে একথা বলা সঠিক হবে যে, "অতএব তোমরা সে ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করো না।" অতএব, অন্য কয়েকজন মুফাসসির এ আয়াতের যে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন আমাদের মতে সেটিই সঠিক ব্যাখ্যা। তাঁদের মতে এখানে হযরত ঈসার বিনা বাপে জন্ম লাভ, মাটি দিয়ে জীবন্ত পাখি তৈরী করা এবং মৃতকে জীবিত করাকে কিয়ামতের সম্ভাবনার একটি প্রমাণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহর বাণীর তাৎপর্য এই যে, যে আল্লাহ বিনা বাপে সন্তান সৃষ্টি করতে পারেন এবং যে আল্লাহর এক বান্দা মাটির একটি কাঠামোর মধ্যে জীবন সঞ্চার করতে ও মৃতদের জীবিত করতে পারেন তিনি মৃত্যুর পর তোমাদের ও সমস্ত মানুষকে পুনরায় জীবিত করবেন তা তোমরা অসম্ভব মনে করো কেন?

৫৬. অর্থাৎ কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করা থেকে যেন বিরত না রাখে।

يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٦٨﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿٦٩﴾ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ
تُحْبَرُوْنَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ۚ وَفِيْهَا مَا
تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ
الَّتِيْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا
تَاْكُلُوْنَ ﴿٧٣﴾ اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ﴿٧٤﴾ لَا يُفَتَّرُ
عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٧٦﴾

৭ রুকূ'

যারা আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান এনেছিলো এবং আমার আদেশের অনুগত হয়েছিল সেই দিন তাদের বলা হবে, "হে আমার বান্দারা, আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং কোন দুঃখও আজ তোমাদের স্পর্শ করবে না। তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা[৬০] জান্নাতে প্রবেশ করো। তোমাদের খুশী করা হবে।" তাদের সামনে স্বর্ণের প্লেট ও পেয়ালাসমূহ আনা নেয়া করানো হবে এবং মনের মত ও দৃষ্টি পরিতৃপ্তকারী প্রতিটি জিনিস সেখানে থাকবে। তাদের বলা হবে, "এখন তোমরা এখানে চিরদিন থাকবে। পৃথিবীতে তোমরা যেসব কাজ করেছো তার বিনিময়ে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছো। তোমাদের জন্য এখানে প্রচুর ফল মজুদ আছে যা তোমরা খাবে।" আর অপরাধীরা তারা তো চিরদিন জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে। তাদের আযাব কখনো কম করা হবে না এবং তারা সেখানে নিরাশ অবস্থায় পড়ে থাকবে। আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে।

৫৭. অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাম একথা কখনো বলেননি যে, আমি আল্লাহ অথবা আল্লাহর পুত্র। তোমরা আমার উপাসনা করো। অন্য সব নবী-রসূল যে দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের যে দাওয়াত দিচ্ছেন তাঁর দাওয়াত তাই ছিল। ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল ইমরান, টীকা ৪৫ থেকে ৪৮; আন নিসা, টীকা ২১৩, ২১৭ ও ২১৮; আল মায়েদা, টীকা ১০০, ১৩০; মারয়াম, টীকা ২১ থেকে ২৩)।

وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۭ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ جِئْنٰكُمْ
بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٨﴾ اَمْ اَبْرَمُوْٓا اَمْرًا فَاِنَّا
مُبْرِمُوْنَ ﴿٧٩﴾ اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ ۭ بَلٰى وَرُسُلُنَا
لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٨٠﴾ قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ﴿٨١﴾
سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٨٢﴾
فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ
يُوْعَدُوْنَ ﴿٨٣﴾

তারা চিৎকার করে বলবে "হে মালেক।[৬১] তোমার রব আমাদেরকে একেবারে ধ্বংস করে দেন তাহলে সেটাই ভাল" সে জবাবে বলবে ঃ "তোমাদের এভাবেই থাকতে হবে। আমরা তোমাদের কাছে ন্যায় ও সত্য নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের অধিকাংশের কাছে ন্যায় ও সত্য ছিল অপসন্দনীয়।"[৬২]

এ লোকেরা কি কোন পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে?[৬৩] বেশ তো! তাহলে আমিও একটি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। এরা কি মনে করেছে, আমি এদের গোপন এবং এদের চুপিসারে বলা কথা শুনতে পাই না! আমি সব কিছু শুনছি এবং আমার ফেরেশতা তাদের কাছে থেকেই তা লিপিবদ্ধ করছে।

এদের বলো, "সত্যিই যদি রহমানের কোন সন্তান থাকতো তাহলে তার সর্বপ্রথম ইবাদতকারী হতাম আমি।[৬৪] আসমান ও যমীনের শাসনকর্তা আরশের অধিপতি এমন সমস্ত বিষয় থেকে পবিত্র যা এরা তার প্রতি আরোপ করে থাকে। ঠিক আছে, যে দিনের ভয় তাদের দেখানো হচ্ছে সেই দিন না দেখা পর্যন্ত তাদেরকে বাতিল ধ্যান-ধারণার মধ্যে ডুবে এবং নিজেদের খেলায় মেতে থাকতে দাও।"

৫৮. অর্থাৎ একটি গোষ্ঠী তাঁকে অস্বীকার করলে বিরোধিতায় এতদূর অগ্রসর হলো যে, তাঁর প্রতি অবৈধভাবে জন্মলাভ করার অপবাদ আরোপ করলো এবং নিজেদের ধারণায় তাঁকে শূলি বিদ্ধ করে তবেই ক্ষান্ত হলো। আরেকটি গোষ্ঠী তাঁকে মেনে নিয়ে ভক্তি শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে লাগামহীন বাড়াবাড়ি করে তাঁকে আল্লাহ বানিয়ে ছাড়লো এবং

একজন মানুষের আল্লাহ হওয়ার বিষয়টি তাদের জন্য এমন জটিলতা সৃষ্টি করলো যার সমাধান করতে করতে তাদের মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট দলের সৃষ্টি হলো। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নিসা, টীকা ২১১ থেকে ২১৬; আল মায়েদা, টীকা ৩৯, ৪০, ১০১ ও ১৩০)।

৫৯. অন্য কথায় কেবল সেই সব বন্ধুত্ব টিকে থাকবে যা পৃথিবীতে নেকী ও আল্লাভীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অন্য সব বন্ধুত্ব শত্রুতায় রূপান্তরিত হবে। আজ যারা গোমরাহী, জুলুম-অত্যাচার এবং গোনাহর কাজে একে অপরের বন্ধু ও সহযোগী কাল কিয়ামতের দিন তারাই একে অপরের প্রতি দোষারোপ করবে এবং নিজেকে রক্ষার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এ বিষয়টি কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় বারবার বলা হয়েছে। যাতে প্রত্যেকটি মানুষ এই পৃথিবীতেই ভালভাবে ভেবেচিন্তে দেখতে সক্ষম হয় যে, কোন্ প্রকৃতির লোকদের বন্ধু হওয়া তাদের জন্য কল্যাণকর এবং কোন্ প্রকৃতির লোকদের বন্ধু হওয়া ধ্বংসাত্মক।

৬০. মূল আয়াতে ازواج শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা স্ত্রীদের বুঝাতেও ব্যবহৃত হতে পারে আবার কোন ব্যক্তির একই পথের পথিক সমমনা ও সহপাঠী বন্ধুদের বুঝাতেও ব্যবহৃত হয়। এই ব্যাপক অর্থবোধক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এ জন্য যে, তার মধ্যে যেন এই উভয় অর্থই শামিল হয়। ঈমানদারদের ঈমানদার স্ত্রীরা এবং তাদের মু'মিন বন্ধুরাও জান্নাতে তাদের সাথে থাকবে।

৬১. মালেক অর্থ জাহান্নামের ব্যবস্থাপক। কথার ইংগিত থেকেই এটিই প্রকাশ পাচ্ছে।

৬২. অর্থাৎ আমি তোমাদের সামনে প্রকৃত সত্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা ছিলে সত্যের পরিবর্তে কেচ্ছা-কাহিনীর ভক্ত এবং সত্য ছিল তোমাদের কাছে অত্যন্ত অপসন্দনীয়। এখন নিজেদের এই নির্বুদ্ধিতা মূলক পসন্দের পরিণাম দেখে অস্থির হয়ে উঠছো কেন? হতে পারে এটা জাহান্নামের ব্যবস্থাপকের জবাবেরই একটা অংশ। আবার এও হতে পারে যে, "তোমরা এভাবেই এখানে পড়ে থাকবে" পর্যন্তই জাহান্নামের ব্যবস্থাপকের জবাব শেষ হয়ে গিয়েছে এবং এই দ্বিতীয় বাক্যাংশটা আল্লাহর নিজের কথা। প্রথম ক্ষেত্রে জাহান্নামের ব্যবস্থাপকের উক্তি "আমি তোমাদের কাছে ন্যায় ও সত্য নিয়ে গিয়েছিলাম" ঠিক তেমনি যেমন সরকারের কোন বড় কর্মকর্তা সরকারের পক্ষ থেকে বলতে গিয়ে "আমরা" শব্দ ব্যবহার করে এবং তার অর্থ হয় আমাদের সরকার এ কাজ করেছে বা এ নির্দেশ দিয়েছে।

৬৩. কুরাইশ নেতারা তাদের গোপন সভাসমূহে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পর্কে যেসব কথা আলোচনা করছিলো এখানে তার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

৬৪. অর্থাৎ কাউকে আল্লাহর সন্তান হিসেবে মানতে আমার অস্বীকৃতি এবং তোমরা যাদেরকে তাঁর সন্তান বলে আখ্যায়িত করছো তাদের ইবাদত করতে আমার অস্বীকৃতি কোন জিদ বা হঠকারিতার ভিত্তিতে নয়। আমি যে কারণে তা অস্বীকার করি তা শুধু এই যে, প্রকৃতপক্ষে কেউই আল্লাহর পুত্র বা কন্যা নয়। তোমাদের এই আকীদা-বিশ্বাস সত্য ও বাস্তবতার পরিপন্থী। আল্লাহর সন্তান আছে এটাই যদি বাস্তব হতো তাহলে আমি আল্লাহর এমন বিশ্বাসী বান্দা যে, তোমাদের সবার আগে আমি তাঁর বন্দেগী মেনে নিতাম।

وَهُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِي الْاَرْضِ اِلٰهٌ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ
الْعَلِيْمُ ﴿٨٤﴾ وَتَبٰرَكَ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ
وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٥﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾ وَلَئِنْ
سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٨٧﴾ وَقِيْلِهٖ
يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ؕ
فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾

সেই একজনই আসমানেও আল্লাহ এবং যমীনেও আল্লাহ। তিনি মহাকুশলী ও মহাজ্ঞানী।[৬৫] অনেক উচ্চ ও সম্মানিত সেই মহান সত্তা যার মুঠিতে যমীন ও আসমানসমূহ এবং যমীন ও আসমানে যা কিছু আছে তার প্রতিটি জিনিসের বাদশাহী।[৬৬] তিনিই কিয়ামতের সময়ের জ্ঞান রাখেন এবং তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।[৬৭]

এরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদের ডাকে তারা শাফায়াতের কোন ইখতিয়ার রাখে না। তবে যদি কেউ জ্ঞানের ভিত্তিতে ন্যায় ও সত্যের সাক্ষ্য দান করে।[৬৮]

যদি তোমরা এদের জিজ্ঞেস করো, কে এদের সৃষ্টি করেছে তাহলে এরা নিজেরাই বলবে, আল্লাহ।[৬৯] তাহলে কোথা থেকে এরা প্রতারিত হচ্ছে? রসূলের এই কথার শপথ, 'হে রব, এরাই সেই সব লোক যারা মানছে না।[৭০]

ঠিক আছে, হে নবী, এদের উপেক্ষা করো এবং বলে দাও, তোমাদের সালাম জানাই।[৭১] অচিরেই তারা জানতে পারবে।

৬৫. অর্থাৎ আসমান ও যমীনের আল্লাহ আলাদা আলাদা নয়, বরং গোটা বিশ্ব জাহানের আল্লাহ একজনই। গোটা বিশ্ব জাহানের ব্যবস্থাপনা তাঁরই জ্ঞান ও কৌশলে পরিচালিত হচ্ছে এবং সমস্ত সত্য তিনিই জানেন।

৬৬. অর্থাৎ খোদায়ীর ব্যাপারে কেউ তাঁর অংশীদার থাকবে এবং এই বিশাল বিশ্ব জাহানের শাসন কর্তৃত্বে কারো দখল থাকবে এমন অবস্থা থেকে তাঁর মহান সত্তা অনেক

উর্ধে। নবী হোক বা অলী, ফেরেশতা হোক বা জিন কিংবা রূহ, তারকা হোক বা গ্রহ আসমানে ও যমীনে যারাই আছে সবাই তাঁর বান্দা, দাস ও নির্দেশের অনুগত। খোদায়ীর কোন গুণে গুণান্বিত হওয়া কিংবা খোদায়ী ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়া তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

৬৭. অর্থাৎ পৃথিবীতে তোমরা যাকেই সহযোগী ও পৃষ্ঠপোষক বানাও না কেন মৃত্যুর পর সেই একমাত্র আল্লাহর সাথেই তোমাদের পাল্লা পড়বে। তাঁর আদালতেই তোমাদের সমস্ত কাজকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

৬৮. এ আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ ঃ

প্রথম অর্থ হচ্ছে, মানুষ পৃথিবীতে যাদেরকে উপাস্য বানিয়ে রেখেছে তারা কেউই আল্লাহর কাছে শাফায়াতকারী নয়। তাদের মধ্যে যারা পথভ্রষ্ট ও দুষ্কর্মশীল তারা নিজেরাই তো সেখানে অপরাধী হিসেবে উপস্থিত হবে। তবে যারা জ্ঞানের ভিত্তিতে (না জেনে শুনে নয়) ন্যায় ও সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছিলো তাদের কথা ভিন্ন।

দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, যারা শাফায়াত করার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার লাভ করবে তারাও কেবল সেই সব লোকের জন্যই শাফায়াত করতে পারবে যারা পৃথিবীতে জেনে শুনে (গাফলতিতে ও অজান্তে নয়) ন্যায় ও সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে ন্যায় ও সত্যের প্রতি রুষ্ঠ ছিল কিংবা না বুঝে শুনে اشهد ان لا اله الا الله -ও বলতো এবং অন্যান্য উপাস্যদের উপাসনাও করতো এমন কোন ব্যক্তির শাফায়াত না তারা নিজেরা করবে না তা করার অনুমতি পাবে।

তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, কেউ যদি বলে, সে যাদের উপাস্য বানিয়ে রেখেছে তারা অবশ্যই শাফায়াতের ক্ষমতা ও এখতিয়ার রাখে। এবং আল্লাহর কাছে তাদের এমন ক্ষমতা ও আধিপত্য আছে যে, আকীদা-বিশ্বাস যাই হোক না কেন তারা যাকে ইচ্ছা মাফ করিয়ে নিতে পারে, তাহলে সে মিথ্যা বলে। আল্লাহর কাছে কারোরই এই মর্যাদা নেই। যে ব্যক্তি কারো জন্য এমন শাফায়াতের দাবী করে সে যদি জ্ঞানের ভিত্তিতে একথা সত্য হওয়ার প্রমাণ পেশ করতে পারে তাহলে সাহস করে এগিয়ে আসুক। কিন্তু সে যদি এরূপ প্রমাণ পেশ করার মত পজিশনে না থাকে—এবং নিশ্চিতভাবেই নেই—তাহলে অযথা শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে কিংবা শুধু অনুমান, সংস্কার ও ধারণার বশবর্তী হয়ে এরূপ একটি আকীদা পোষণ করা একেবারেই অর্থহীন আর এই খেয়ালীপনার ওপর নির্ভর করে নিজেদের পরিণামকে বিপদগ্রস্ত করা চরম নির্বুদ্ধিতা।

এ আয়াত থেকে আনুসাঙ্গিকভাবে দুটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি পাওয়া যায়। এক, এ থেকে জানা যায়, ন্যায় ও সত্যের পক্ষে জ্ঞানবিহীন সাক্ষ্য দুনিয়াতে গ্রহণযোগ্য হলেও আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। দুনিয়াতে যে ব্যক্তিই মুখে কালেমা শাহাদাত উচ্চারণ করবে আমরা তাকে মুসলমান হিসেবে মেনে নেবো এবং যতক্ষণ না সে প্রকাশ্যে সুস্পষ্ট কুফরী করবে ততক্ষণ আমরা তার সাথে মুসলমানদের মতই আচরণ করতে থাকবো। কিন্তু আল্লাহর কাছে শুধু সেই ব্যক্তিই ঈমানদার হিসেবে গণ্য হবে যে তার জ্ঞান ও বুদ্ধির সীমা অনুসারে জেনে বুঝে لا اله الا الله বলেছে এবং সে একথা বুঝে যে এভাবে সে কি কি বিষয় অস্বীকার করছে এবং কি কি বিষয় স্বীকার করে নিচ্ছে।

দুই, এ থেকে সাক্ষ আইনের এই সূত্রটিও পাওয়া যায় যে, সাক্ষের জন্য জ্ঞান থাকা শর্ত। সাক্ষী যে ঘটনার সাক্ষ দান করছে তার যদি সে সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে তাহলে তার সাক্ষ অর্থহীন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি ফায়সালা থেকেও এ বিষয়টি জানা যায়। তিনি একজন সাক্ষীকে বলেছিলেন ঃ

اذا رايت مثل الشمس فاشهد والافدع (احكام القران للجصاص)

"যদি তুমি নিজ চোখে ঘটনা এমনভাবে দেখে থাকো যেমন সূর্যকে দেখছো তা হলে সাক্ষ দাও। তা না হলে দিও না।"

৬৯. এর দুটি অর্থ। একটি হচ্ছে, যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো, তাদের কে সৃষ্টি করেছেন তাহলে তারা বলবে, 'আল্লাহ'। অপরটি হচ্ছে, যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো, তাদের উপাস্যদের স্রষ্টা কে তাহলে তারা বলবে, 'আল্লাহ'।

৭০. কুরআন মজীদের যেসব আয়াতে আরবী ব্যাকরণের অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন দেখা দেয় এ আয়াতটি তার অন্যতম। এখানে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে যে, وقيله কথাটির মধ্যে واو কোন্ প্রকৃতির এবং ওপরের বক্তব্যের ধারাবাহিকতার মধ্যে কোন্ জিনিসটির সাথে এর সম্পর্ক? তাফসীরকারগণ এ সম্পর্কে বহু আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাদের সেই সব আলোচনার মধ্যে আমি কোন সন্তোষজনক বিষয় পাইনি। শাহ আবদুল কাদের (র) সাহেবের অনুবাদ থেকে যে ইংগিত পাওয়া যায় সেইটিই আমার কাছে সর্বাধিক বিশুদ্ধ বলে মনে হয় অর্থাৎ এখানে واو 'আতাফ'–এর (বাক্য সংযোজনের জন্য) জন্য ব্যবহৃত হয়নি, বরং শপথের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং তা فَانّٰى يُؤْفَكُوْنَ আয়াতাংশের সাথে সম্পর্কিত। আর قيله এর সর্বনাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ (হে রব, এরাই সেই সব লোক যারা মানছে না) আয়াতাংশ যার প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিত করছে। এ ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় ঃ

"রসূলের এই বাণীর শপথ যে, "হে রব! এরাই সেই সব লোক যারা মানছে না" কী বিস্ময়কর এদের প্রতারিত হওয়া। এরা নিজেরাই স্বীকার করছে যে, এদের ও এদের উপাস্যদের স্রষ্টাও আল্লাহ। তা সত্ত্বেও স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির উপাসনার জন্য গোঁ ধরে আছে।

রসূলের এই কথাটির শপথ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের এই আচরণ স্পষ্ট প্রমাণ করছিলো যে, তারা প্রকৃতই হঠকারী লোক। কারণ, তাদের নিজেদের স্বীকৃতি অনুসারে তাদের আচরণের অযৌক্তিকতা প্রকাশ পাচ্ছে। এ ধরনের অযৌক্তিক আচরণ শুধু সেই ব্যক্তিই করতে পারে যে না মানার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছে। অন্য কথায় এ শপথের অর্থ হচ্ছে, রসূল অতীব সত্য কথাই বলেছেন। প্রকৃতই এরা মেনে নেয়ার মত লোক নয়।

৭১. অর্থাৎ তাদের রূঢ় কথা এবং ঠাট্টা–বিদ্রূপের কারণে তাদের জন্য বদদোয়া করো না কিংবা তার জবাবে রূঢ় কথা বলো না। বরং সালাম দিয়ে তাদের কাছে থেকে সরে যাও।

আদ দুখান

৪৪

নামকরণ

সূরার ১০ নম্বর আয়াত يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ এর دُخَان শব্দকে এ সূরার শিরোনাম বানানো হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যার মধ্যে دخان শব্দটি আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল জানা যায় না। তবে বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীন সাক্ষ্য বলছে, যে সময় সূরা 'যুখরুফ' ও তার পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরা নাযিল হয়েছিলো। এ সূরাটিও সেই যুগেই নাযিল হয়। তবে এটি ঐগুলোর অল্প কিছুকাল পরে নাযিল হয়। এর ঐতিহাসিক পটভূমি হচ্ছে, মক্কার কাফেরদের বৈরী আচরণ যখন কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকে তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! ইউসুফের দুর্ভিক্ষের মত একটি দুর্ভিক্ষ দিয়ে আমাকে সাহায্য করো। নবী (সা) মনে করেছিলেন, এদের ওপর বিপদ আসলে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং ভাল কথা শোনার জন্য মন নরম হবে। আল্লাহ নবীর (সা) দোয়া কবুল করলেন। গোটা অঞ্চলে এমন দুর্ভিক্ষ নেমে এলো যে, সবাই অস্থির হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত কতিপয় কুরাইশ নেতা—হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ যাদের মধ্যে বিশেষভাবে আবু সুফিয়ানের নাম উল্লেখ করেছেন—নবীর (সা) কাছে এসে আবেদন জানালো যে, নিজের কওমকে এ বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। এ অবস্থায় আল্লাহ এই সূরাটি নাযিল করেন।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এই পরিস্থিতিতে মক্কার কাফেরদের উপদেশ দান ও সতর্ক করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যে বক্তব্য নাযিল করা হয় তার ভূমিকায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে ঃ

এক ঃ এই কুরআনকে তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের রচনা মনে করে ভুল করছো। এ গ্রন্থ তো তার আপন সত্তায় নিজেই এ বিষয়ের স্পষ্ট সাক্ষ যে তা কোন মানুষের নয়, বরং বিশ্ব জাহানের আল্লাহর রচিত কিতাব।

দুই ঃ তোমরা এই গ্রন্থের মর্যাদা ও মূল্য উপলব্ধি করতেও ভুল করছো। তোমাদের মতে এটা একটা মহাবিপদ। এ মহাবিপদই তোমাদের ওপর নাযিল হয়েছে। অথচ আল্লাহ তাঁর রহমতের ভিত্তিতে যে সময় সরাসরি তোমাদের কাছে তাঁর রাসূল প্রেরণ ও কিতাব নাযিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেই মুহূর্তটি ছিল অতীব কল্যাণময়।

তিন ঃ নিজেদের অজ্ঞতার কারণে তোমরা এই ভুল ধারণার মধ্যে ডুবে আছো যে, এই রসূল এবং এই কিতাবের বিরুদ্ধে লড়াই করে তোমরাই বিজয়ী হবে। অথচ এমন এক বিশেষ মুহূর্তে এই রসূলকে রিসালত দান ও এই কিতাব নাযিল করা হয়েছে যখন আল্লাহ সবার কিসমতের ফায়সালা করেন। আর আল্লাহর ফায়সালা এমন অথর্ব ও দুর্বল বস্তু নয় যে, ইচ্ছা করলে যে কেউ তা পরিবর্তিত করতে পারে। তাছাড়া তা কোন প্রকার মূর্খতা ও অজ্ঞতা প্রসূত হয় না যে, তাতে ভ্রান্তি ও অপূর্ণতার সম্ভাবনা থাকবে। তা তো বিশ্ব জাহানের শাসক ও অধিকর্তার অটল ফায়সালা যিনি সর্বশ্রোতা। সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী। তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করা কোন ছেলেখেলা নয়।

চার ঃ তোমরা নিজেরাও আল্লাহকে যমীন, আসমান এবং বিশ্ব জাহানের প্রতিটি জিনিসের মালিক ও পালনকর্তা বলে মানো এবং একথাও মানো যে, জীবন ও মৃত্যু তাঁরই এখতিয়ারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা অন্যদেরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণের জন্য গোঁ ধরে আছো। এর সপক্ষে এছাড়া তোমাদের আর কোন যুক্তি নেই যে, তোমার বাপ–দাদার সময় থেকেই এ কাজ চলে আসছে। অথচ কেউ যদি সচেতনভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, আল্লাহই মালিক ও পালনকর্তা এবং তিনিই জীবন ও মৃত্যুর মালিক মুখতার তাহলে কখনো তার মনে এ বিষয়ে সন্দেহ পর্যন্ত দানা বাঁধতে পারে না যে, তিনি ছাড়া আর কে–উপাস্য হওয়ার যোগ্য আছে। কিংবা উপাস্য হওয়ার ব্যাপারে তাঁর সাথে শরীক হতে পারে। তোমাদের বাপ–দাদা যদি এই বোকামি করে থাকে তাহলে চোখ বন্ধ করে তোমরাও তাই করতে থাকবে তার কোন যুক্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে সেই এক আল্লাহ তাদেরও রব ছিলেন যিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের যেমন সেই এক আল্লাহর দাসত্ব করা উচিত তাদেরও ঠিক তেমনি তাঁর দাসত্ব করা উচিত ছিল।

পাঁচ ঃ আল্লাহর রবুবিয়াত ও রহমতের দাবি এ নয় যে, তিনি শুধু তোমাদের পেট ভরাবেন। তিনি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন তাও এর অন্তর্ভুক্ত। সেই পথ প্রদর্শনের জন্যই তিনি রসূল পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন।

এই প্রারম্ভিক কথাগুলো বলার পর সেই সময় যে দুর্ভিক্ষ চলছিলো সে কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়টি আমরা ওপরে বর্ণনা করেছি। এ দুর্ভিক্ষ এসেছিলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়ার ফলে। তিনি দোয়া করেছিলেন এই ধারণা নিয়ে যে বিপদে পড়লে কুরাইশদের বাঁকা ঘাড় সোজা হবে এবং তখন হয়তো তাদের কাছে উপদেশ বাণী কার্যকর হবে। সেই সময় এই প্রত্যাশ্যা কিছুটা পূরণ হচ্ছে বলে মনে হচ্ছিলো। কেননা, ন্যায় ও সত্যের বড় বড় ঘাড় বাঁকা দুশমনও দুর্ভিক্ষের আঘাতে বলতে শুরু করেছিলো, হে প্রভু, আমাদের ওপর থেকে এ বিপদ দূর করে দিন, আমরা ঈমান আনবো। এ অবস্থায় একদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে, এ রকম বিপদে পড়ে এরা ঈমান আনার লোক নয়। যে রসূলের জীবন, চরিত্র, কাজকর্ম এবং কথাবার্তায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছিলো যে তিনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল সেই রসূল থেকেই যখন এরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তখন শুধু একটি দুর্ভিক্ষ এদের গাফলতি ও অচৈতন্য কি করে দূর করবে? অপরদিকে কাফেরদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তোমাদের ওপর থেকে এ আযাব সরিয়ে নিলেই তোমরা ঈমান আনবে, এটা তোমাদের চরম মিথ্যাচার। আমি এ আযাব সরিয়ে নিচ্ছি। এখনই বুঝা যাবে তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতিতে কতটা সত্যবাদী।

তোমাদের মাথার ওপরে দুর্ভাগ্য খেলা করছে। তোমরা একটি প্রচণ্ড আঘাত কামনা করছো। ছোট খাট আঘাতে তোমাদের বোধোদয় হবে না।

এ প্রসংগে পরে ফেরাউন ও তার কওমের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, বর্তমানে কুরাইশ নেতারা যে বিপদের সম্মুখীন তাদের ওপর ঠিক একই বিপদ এসেছিলো। তাদের কাছেও এ রকম একজন সম্মানিত রসূল এসিছিলেন। তারাও তাঁর কাছে থেকে এমন সব সুস্পষ্ট আলামত ও নিদর্শনাদি দেখেছিলো যা তাঁর আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হওয়া প্রমাণ করছিলো। তারাও একের পর এক নিদর্শন দেখেছে কিন্তু জিদ ও একগুঁয়েমি থেকে বিরত হয়নি। এমন কি শেষ পর্যন্ত রসূলকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। ফলে এমন পরিণাম ভোগ করেছে যা চিরদিনের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে আছে।

এরপর দ্বিতীয় যে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে সেটি হচ্ছে আখেরাত, যা মেনে নিতে মক্কার কাফেরদের চরম আপত্তি ছিল। তারা বলতো ঃ আমরা কাউকে মৃত্যুর পর জীবিত হয়ে ফিরে আসতে দেখিনি। আরেক জীবন আছে তোমাদের এ দাবি যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমাদের মৃত বাপ-দাদাকে জীবিত করে আনো। এর জবাবে আখেরাত বিশ্বাসের সপক্ষে সংক্ষিপ্তাকারে দুটি দলীল পেশ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে, আখেরাত বিশ্বাসের অস্বীকৃতি সবসময় নৈতিক চরিত্রের জন্য ধ্বংসাত্মক হয়েছে। আরেকটি হচ্ছে, বিশ্ব জাহান কোন খেলোয়াড়ের খেলার জিনিস নয়, বরং এটি একটি জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থাপনা। আর জ্ঞানীর কোন কাজ অর্থহীন হয় না। তাছাড়া "আমাদের বাপ-দাদাদের জীবিত করে আনো" কাফেরদের এই দাবির জবাব দেয়া হয়েছে এই বলে যে, এ কাজটি প্রতি দিনই একেকজনের দাবী অনুসারে হবে না। আল্লাহ এ জন্য একটি সময় নির্ধারিত করে রেখেছেন। সেই সময় তিনি সমস্ত মানব জাতিকে যুগপত একত্রিত করবেন এবং নিজের আদালতে তাদের জবাবদিহি করাবেন। কেউ যদি সেই সময়ের চিন্তা করতে চায় তাহলে এখনই করুক। কারণ, সেখানে কেউ যেমন নিজের শক্তির জোরে রক্ষা পাবে না তেমনি কারো বাঁচানোতে বাঁচতে পারবে না।

আল্লাহর সেই আদালতের উল্লেখ করতে গিয়ে যারা সেখানে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হবে তাদের কি হবে তা বলা হয়েছে এবং যারা সেখানে সফলকাম হবে তারা কি পুরস্কার লাভ করবে তাও বলা হয়েছে। সব শেষে কথার সমাপ্তি টানা হয়েছে এই বলে যে, তোমাদের বুঝানোর জন্য পরিষ্কার ও সহজ-সরল ভংগিতে তোমাদের নিজের ভাষায় এই কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এখন যদি বুঝানো সত্ত্বেও তোমরা না বুঝো এবং চরম পরিণতি দেখার জন্যই গোঁ ধরে থাকো তাহলে অপেক্ষা করো। আমার নবীও অপেক্ষা করছেন। যা হওয়ার তা যথা সময়ে দেখতে পাবে।

আয়াত ৫৯ **সূরা আদ দুখান–মক্কী** রুকূ' ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও মেহেরবান আল্লাহর নামে

حٰمٓ ۝١ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝٢ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا
مُنْذِرِيْنَ ۝٣ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ۝٤ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ۭ اِنَّا كُنَّا
مُرْسِلِيْنَ ۝٥ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٦ رَبِّ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۭ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ۝٧ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ
وَيُمِيْتُ ۭ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَاۗىِٕكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝٨ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ
يَّلْعَبُوْنَ ۝٩

হা–মীম। এই সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ, আমি এটি এক বরকত ও কল্যাণময় রাতে নাযিল করেছি। কারণ, আমি মানুষকে সতর্ক করতে চেয়েছিলাম।[১] এটা ছিল সেই রাত যে রাতে আমার নির্দেশে প্রতিটি বিষয়ের বিজ্ঞোচিত ফায়সালা[২] দেয়া হয়ে থাকে।[৩] আমি একজন রসূল পাঠাতে যাচ্ছিলাম, তোমার রবের রহমত স্বরূপ।[৪] নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।[৫] তিনি আসমান ও যমীনের রব এবং আসমান ও যমীনের মাঝখানের প্রতিটি জিনিসের রব, যদি তোমরা সত্যিই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণকারী হও।[৬] তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।[৭] তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান।[৮] তোমাদের রব ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের রব যারা অতীত হয়ে গিয়েছেন।[৯] (কিন্তু বাস্তবে এসব লোকের দৃঢ় বিশ্বাস নেই) বরং তারা নিজেদের সন্দেহের মধ্যে পড়ে খেলছে।[১০]

১. কিতাবুম মুবীন বা সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ করার উদ্দেশ্য সূরা যুখরুফের ১ নম্বর টীকায় বর্ণনা করা হয়েছে এখানেও যে বিষয়টির জন্য শপথ করা হয়েছে তা হলো এ কিতাবের রচিয়তা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নন, আমি নিজে। তার প্রমাণ

অন্য কোথাও অনুসন্ধান করার দরকার নেই, এ কিতাবই তার প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। এর পর আরো বলা হয়েছে, যে রাতে তা নাযিল করা হয়েছে সে রাত ছিল অত্যন্ত বরকত ও কল্যাণময়। অর্থাৎ যেসব নির্বোধ লোকদের নিজেদের ভালমন্দের বোধ পর্যন্ত নেই তারাই এ কিতাবের আগমনকে নিজেদের জন্য আকস্মিক বিপদ মনে করছে এবং এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বড়ই চিন্তিত। কিন্তু গাফলতির মধ্যে পড়ে থাকা লোকদের সতর্ক করার জন্য আমি যে মুহূর্তে এই কিতাব নাযিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তাদের ও গোটা মানব জাতির জন্য সেই মুহূর্তটি ছিল অত্যন্ত সৌভাগ্যময়।

কোন কোন মুফাসসির সেই রাতে কুরআন নাযিল করার অর্থ গ্রহণ করেছেন এই যে, ঐ রাতে কুরআন নাযিল শুরু হয় আবার কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ গ্রহণ করেন, ঐ রাতে সম্পূর্ণ কুরআন 'উম্মুল কিতাব' থেকে স্থানান্তরিত করে অহীর ধারক ফেরেশতাদের কাছে দেয়া হয় এবং পরে তা অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজন মত ২৩ বছর ধরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল করা হতে থাকে। প্রকৃত অবস্থা কি তা আল্লাহই ভাল জানেন।

ঐ রাত অর্থ সূরা কদরে যাকে 'লাইলাতুল কদর' বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ আর এখানে বলা হয়েছে اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ তাছাড়া কুরআন মজীদেই একথাও বলা হয়েছে যে, সেটি ছিল রমযান মাসের একটি রাত شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ (البقره : ١٨٥) ।

২. মূল আয়াতে اَمْرٍ حَكِيْمٍ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার দুটি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে, সেই নির্দেশটি সরাসরি জ্ঞানভিত্তিক হয়ে থাকে। তাতে কোন ত্রুটি বা অপূর্ণতার সম্ভাবনা নেই। অপর অর্থটি হচ্ছে, সেটি অত্যন্ত দৃঢ় ও পাকাপোক্ত সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে। তা পরিবর্তন করার সাধ্য কারো নেই।

৩. এ বিষয়টি সূরা কদরে বলা হয়েছে এভাবে ঃ

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ

সেই রাতে ফেরেশতারা ও জিবরাঈল তাদের রবের আদেশে সব রকম নির্দেশ নিয়ে অবতীর্ণ হয়।

এ থেকে জানা যায়, আল্লাহর রাজকীয় ব্যবস্থাপনায় এটা এমন এক রাত যে রাতে তিনি ব্যক্তি, জাতি এবং দেশসমূহের ভাগ্যের ফায়সালা করে তাঁর ফেরেশতাদের কাছে দিয়ে দেন। পরে তারা ঐ সব ফায়সালা অনুসারে কাজ করতে থাকে। কতিপয় মুফাসসিরের কাছে এ রাতটি শা'বানের পনের তারিখের রাত বলে সন্দেহ হয়েছে তাদের মধ্যে হযরত ইকরিমার নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। কারণ, কোন কোন হাদীসে এ রাত সম্পর্কে এ কথা উল্লেখ আছে যে, এ রাতেই ভাগ্যের ফায়সালা করা হয়। কিন্তু ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, মুজাহিদ, কাতাদা, হাসান বাসারী, সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইবনে যায়েদ, আবু মালেক, দাহ্হাক এবং আরো অনেক মুফাসসির এ ব্যাপারে একমত যে, এটা রমযানের সেই রাত যাকে "লাইলাতুল কদর" বলা হয়েছে। কারণ, কুরআন মজীদ

নিজেই সুস্পষ্ট করে তা বলছে। আর যে ক্ষেত্রে কুরআনের সুস্পষ্ট উক্তি বিদ্যমান সে ক্ষেত্রে 'আখবারে আহাদ'* ধরনের হাদীসের ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না। ইবনে কাসীর বলেন ঃ এক শা'বান থেকে আরেক শা'বান পর্যন্ত ভাগ্যের ফায়সালা হওয়া সম্পর্কে 'উসমান ইবনে মুহাম্মাদ বর্ণিত যে হাদীস ইমাম যুহরী উদ্ধৃত করেছেন তা একটি 'মুরসাল'** হাদীস। কুরআনের সুস্পষ্ট উক্তির (نص) বিরুদ্ধে এ ধরনের হাদীস পেশ করা যায় না। কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী বলেন ঃ শা'বানের পনের তারিখের রাত সম্পর্কে কোন হাদীসই নির্ভরযোগ্য নয়, না তার ফযীলত সম্পর্কে, না ঐ রাতে ভাগ্যের ফয়সালা হওয়া সম্পর্কে। তাই সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করা উচিত। (আহকামুল কুরআন)।

৪. অর্থাৎ এই কিতাবসহ একজন রসূল পাঠানো শুধু জ্ঞান ও যুক্তির দাবীই ছিল না, আল্লাহর রহমতের দাবীও তাই ছিল। কারণ, তিনি রব। আর রবুবিয়াত শুধু বান্দার দেহের প্রতিপালন ব্যবস্থা দাবীই করে না, বরং নির্ভুল জ্ঞানানুযায়ী তাদের পথপ্রদর্শন করা, হক ও বাতলির পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত করা এবং অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে না দেয়ার দাবীও করে।

৫. এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহর এ দু'টি গুণ বর্ণনা করার উদ্দেশ্য মানুষকে এ সত্য জানিয়ে দেয়া যে, কেবল তিনিই নির্ভুল জ্ঞান দিতে পারেন। কেননা, তিনিই সমস্ত সত্যকে জানেন। একজন মানুষ তো দূরের কথা সমস্ত মানুষ মিলেও যদি নিজেদের জন্য জীবন পদ্ধতি রচনা করে তবুও তার ন্যায়, সত্য ও বাস্তবানুগ হওয়ার কোন গ্যারান্টি নেই। কারণ, গোটা মানব জাতি এক সাথে মিলেও একজন سَمِيع ও عَلِيم (সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী) হয় না। একটি সঠিক ও নির্ভুল জীবন পদ্ধতি রচনার জন্য যেসব জ্ঞান ও সত্য জানা জরুরী তার সবগুলো আয়ত্ব করা তার সাধ্যাতীত। এরূপ পূর্ণ জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে। তিনিই সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী। তাই মানুষের জন্য কোন্‌টি হিদায়াত আর কোন্‌টি গোমরাহী, কোন্‌টি হক আর কোন্‌টি বাতিল এবং কোন্‌টি কল্যাণ আর কোন্‌টি অকল্যাণ তা তিনিই বলতে পারেন।

৬. আরবরা নিজেরাই স্বীকার করতো, আল্লাহই গোটা বিশ্ব জাহান ও তার প্রতিটি জিনিসের রব (মালিক ও পালনকর্তা)। তাই তাদের বলা হয়েছে, যদি তোমরা না বুঝে শুনে এবং শুধু মৌখিকভাবে একথা না বলে থাকো, বরং প্রকৃতই যদি তাঁর প্রভুত্বের উপলব্ধি ও মালিক হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস তোমাদের থাকে তাহলে তোমাদের মেনে নেয়া উচিত যে, (১) মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্য কিতাব ও রসূল প্রেরণ তাঁর রহমত ও প্রতিপালন গুণের অবিকল দাবী এবং (২) মালিক হওয়ার কারণে এটা তাঁর হক এবং তাঁর মালিকানাধীন হওয়ার কারণে তোমাদের কর্তব্য হলো, তাঁর পক্ষ থেকে যে হিদায়াত আসে তা মেনে চলো এবং যে নির্দেশ আসে তার আনুগত্য করে।

* আখবারে আহাদ বলতে এমন হাদীস বুঝায় যে হাদীসের বর্ণনা সূত্রের কোনো এক স্তরে বর্ণনাকারী মাত্র একজন থাকে। এ বিষয়টি হাদীসের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কিছুটা দুর্বলতা সঞ্চার করে।

** যে হাদীসে মূল রাবী সাহাবীর নাম উল্লেখিত থাকে না বরং তাবেঈ নিজেই রাসূলের (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তাকে মুরসাল হাদীস বলে। ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানীফা ছাড়া অন্য কোনো ইমামই এ ধরনের হাদীসকে নিসংকোচে গ্রহণ করেননি।

৭. উপাস্য অর্থ প্রকৃত উপাস্য। আর প্রকৃত উপাস্যের হক হচ্ছে তাঁর ইবাদত (দাসত্ব ও পূজা-অর্চনা) করতে হবে।

৮. এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং থাকতে পারে না। অতএব যিনি নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে তোমাদের জীবন্ত মানুষ বানিয়েছেন এবং যিনি এ ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক যে, যতক্ষণ ইচ্ছা তোমাদের এ জীবনকে টিকিয়ে রাখবেন এবং যখন ইচ্ছা এটা পরিসমাপ্তি ঘটাবেন। তোমরা তাঁর দাসত্ব করবে না, কিংবা তাঁর ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করবে অথবা তাঁর সাথে অন্যদেরও দাসত্ব করতে শুরু করবে তা সরাসরি বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থী।

৯. এখানে এ বিষয়ের প্রতি একটি সূক্ষ্ম ইংগিত আছে যে, তোমাদের যে পূর্বসূরীরা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের উপাস্য বানিয়েছিল প্রকৃতপক্ষে তাদের রবও তিনিই ছিলেন। তারা তাদের প্রকৃত রবকে বাদ দিয়ে অন্যদের দাসত্ব করে ঠিক কাজ করেনি। তাই তাদের অন্ধ অনুসরণ করে তোমরা ঠিকই করেছো এবং তাদের কর্মকাণ্ডকে নিজেদের ধর্মের সঠিক হওয়ার যুক্তি-প্রমাণ বলে ধরে নেবে তা ঠিক নয়। তাদের কর্তব্য ছিল একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করা। কারণ তিনিই ছিলেন তাদের রব। কিন্তু তারা যদি তা না করে থাকে তা হলে তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে, সবার দাসত্ব পরিত্যাগ করে কেবল সেই এক আল্লাহর দাসত্ব করা। কারণ, তিনিই তোমাদের রব।

১০. এই সংক্ষিপ্ত আয়াতাংশের মধ্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে। নাস্তিক হোক বা মুশরিক তাদের জীবনে মাঝে মধ্যে এমন কিছু মুহূর্ত আসে যখন ভেতর থেকে তাদের মন বলে ওঠে ঃ তুমি যা বুঝে বসে আছো তার মধ্যে কোথাও না কোথাও অসংগতি বিদ্যমান। নাস্তিক আল্লাহকে অস্বীকার করার ব্যাপারে বাহ্যত যতই কঠোর হোক না কেন, কোন না কোন সময় তার মন এ সাক্ষ্য অবশ্যই দেয় যে, মাটির একটি পরমাণু থেকে শুরু করে নীহারিকা পুঞ্জ পর্যন্ত এবং একটি তৃণপত্র থেকে শুরু করে মানুষের সৃষ্টি পর্যন্ত এই বিস্ময়কর জ্ঞানময় ব্যবস্থা কোন মহাজ্ঞানী স্রষ্টা ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। অনুরূপ একজন মুশরিক শিরকের যত গভীরেই ডুবে থাক না কেন তার মনও কোন না কোন সময় একথা বলে ওঠে, যাকে আমি উপাস্য বানিয়ে বসে আছি সে আল্লাহ হতে পারে না। মনের এই ভেতরের সাক্ষের ফলশ্রুতিতে না পারে তারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর তাওহীদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করতে না পারে নাস্তিকতার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস পোষণ ও তা থেকে মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে। ফলে বাহ্যিকভাবে তারা যত কঠোর ও দৃঢ় বিশ্বাসই প্রদর্শন করুক না কেন তাদের জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয় সন্দেহের ওপরে। এখন প্রশ্ন হলো, এই সন্দেহ তাদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করে না কেন এবং দৃঢ় বিশ্বাস ও সন্তোষজনক ভিত্তি খুঁজে পাওয়ার জন্য তারা ধীর ও ঠাণ্ডা মেজাজে প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান করে না কেন? এর জবাব হলো দীন বা জীবনাদর্শের ব্যাপারে তারা যে জিনিসটি থেকে বঞ্চিত হয় সেটি হচ্ছে ধীর ও ঠাণ্ডা মেজাজ। তাদের দৃষ্টিতে মূল গুরুত্ব লাভ করে শুধু পার্থিব স্বার্থ এবং তার ভোগের উপকরণ। এই বস্তুটি অর্জনের চিন্তা তারা তাদের মন-মগজ ও দেহের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে ফেলে। এরপর থাকে জীবনাদর্শের ব্যাপার। সেটা তাদের জন্য প্রকৃতপক্ষে একটা খেলা, একটা বিনোদন এবং একটা বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই তারা

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى النَّاسَ ۖ هَٰذَا
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ أَنَّىٰ لَهُمُ
الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ
مَّجْنُونٌ ﴿١٤﴾ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ
الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ ۚ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ
وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾

বেশ তো! সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করো, যে দিন আসমান পরিষ্কার ধোঁয়া নিয়ে আসবে এবং তা মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। এটা কষ্টদায়ক শাস্তি। (এখন এরা বলে) হে প্রভু, আমাদের ওপর থেকে আযাব সরিয়ে দাও। আমরা ঈমান আনবো। কোথায় এদের গাফলতি দূর হচ্ছে? এদের অবস্থা তো এই যে, এদের কাছে 'রসূলে মুবীন' এসেছেন।[১১] তা সত্ত্বেও এরা তাঁর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনি এবং বলেছে ঃ এতো শিখিয়ে নেয়া পাগল।[১২] আমি আযাব কিছুটা সরিয়ে নিচ্ছি। এরপরও তোমরা যা আগে করছিলে তাই করবে। যেদিন আমি বড় আঘাত করবো, সেদিন আমি তোমাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।[১৩]

আমি এর আগে ফেরাউনের কওমকেও এই পরীক্ষায় ফেলেছিলাম। তাদের কাছে একজন সম্ভ্রান্ত রসূল এসেছিলেন।[১৪]

এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে কয়েক মুহূর্তও ব্যয় করতে পারে না। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি হলে বিনোদন হিসেবে পালন করা হচ্ছে। নিরীশ্বরবাদ ও নাস্তিকতা বিষয়ক বিতর্ক বিনোদন মূলক ভাবে করা হচ্ছে। দুনিয়ার ব্যস্ততার মধ্যে কার এত অবসর আছে যে বসে একটু ভেবে দেখবে, আমরা ন্যায় ও সত্যের প্রতি বিমুখ নই তো? আর যদি তা হই তাহলে পরিণামই বা কি?

১১. رسول مبين এর দুটি অর্থ। এক, তাঁর জীবন, তাঁর নৈতিক চরিত্র এবং তাঁর কাজকর্ম থেকে তাঁর রসূল হওয়া পুরোপুরি স্পষ্ট। দুই, তিনি প্রকৃত সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতে কোন ত্রুটি করেননি।

১২. তাদের কথার উদ্দেশ্য হলো, এ বেচারা তো ছিল সাদামাটা মানুষ। অন্য কিছু লোক তাকে নেপথ্য থেকে উৎসাহ যোগাচ্ছে। তারা আড়ালে থেকে কুরআনের আয়াত

রচনা করে একে শিখিয়ে দেয়। আর এ সাধারণ মানুষের কাছে এসে তা বলে ফেলে। তারা মজা করে লোক চক্ষুর অন্তরালে বসে থাকে আর এ গালমন্দ শোনে এবং পাথর খায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বছরের পর বছর তাদের সামনে ক্রমাগত যেসব প্রমাণ, সদুপদেশ এবং যুক্তিপূর্ণ শিক্ষা পেশ করে ক্লান্ত প্রায় হয়ে পড়ছিলেন এভাবে একটি সস্তা কথা বলে তারা তা উড়িয়ে দিতো। কুরআন মজীদে যেসব যুক্তিপূর্ণ কথা বলা হচ্ছিলো তারা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করতো না, আবার যিনি এসব কথা পেশ করছিলেন তিনি কেমন মর্যাদার লোক তাও দেখতো না। তাছাড়া এসব অভিযোগ আরোপের সময়ও এ কথা ভেবে দেখার কষ্টটুকু পর্যন্ত স্বীকার করতো না যে, তারা যা বলছে তা অর্থহীন কথাবার্তা কিনা। এটা সর্বজন বিদিত যে নেপথ্যে বসে শেখানোর মত অন্য কোন ব্যক্তি যদি থাকতো তাহলে তা খাদীজা (রা), আবু বকর (রা), আলী (রা), যায়েদ ইবনে হারেসা এবং প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারী অন্যান্য মুসলমানদের কাছে কি করে গোপন থাকতো। কারণ তাদের চাইতে আর কেউ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ও সার্বক্ষণিক সাথী ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব লোকই নবীর (সা) সর্বাধিক ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন তারই বা কারণ কি? অথচ নেপথ্যে থেকে অন্য কারোর শেখানোর ওপর ভিত্তি করে নবুওয়াতের কাজ চালানো হয়ে থাকলে এসব লোকই সর্ব প্রথম তাঁর বিরোধিতা করতো। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নাহল, টীকা ১০৭; আল ফুরকান, টীকা ১২)।

১৩. এ আয়াত দুটির অর্থ বর্ণনায় মুফাসসিরদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে এবং এই মতভেদ সাহাবাদের যুগেও ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) বিখ্যাত শাগরেদ মাসরুক বলেন ঃ একদিন আমরা কুফার মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম এক বক্তা লোকদের সামনে বক্তৃতা করছে। সে يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ পাঠ করলো। তারপর বলতে লাগলো ঃ জানো, সে ধোঁয়া কেমন? এই ধোঁয়া কিয়ামতের দিন আসবে এবং কাফের ও মুনাফিকদের অন্ধ ও বধির করে দেবে। কিন্তু ঈমানদারদের ওপর তার প্রতিক্রিয়া হবে শুধু এতটুকু যেন সর্দিতে আক্রান্ত হয়েছে। তার এই বক্তব্য শুনে আমরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) কাছে গেলাম এবং তাকে বক্তার এই তাফসীর বর্ণনা করে শুনালাম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ শুয়ে ছিলেন। এ তাফসীর শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, কারো যদি জানা না থাকে তাহলে যারা জানে তাদের কাছে জেনে নেয়া উচিত। প্রকৃত ব্যাপার হলো, কুরাইশরা যখন ক্রমাগত ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতাই করে চলছিলো তখন তিনি এই বলে দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ, ইউসুফ আলাইহিস সালামের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ দিয়ে আমাকে সাহায্য করো। সুতরাং এমন কঠিন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল যে, মানুষ হাড়, চামড়া এবং মৃতজন্তু পর্যন্ত খেতে শুরু করলো। তখনকার অবস্থা ছিল, যে ব্যক্তিই আসমানের দিকে তাকাতো ক্ষুধার যন্ত্রণায় সে শুধু ধোঁয়াই দেখতে পেতো। অবশেষে আবু সুফিয়ান নবীর (সা) কাছে এসে বললো ঃ আপনি তো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার আহবান জানান আপনার কওম ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করছে। আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন এ বিপদ দূর করে দেন। এ যুগেই কুরাইশরা বলতে শুরু করেছিলো ঃ হে আল্লাহ! আমাদের ওপর থেকে আযাব দূর করে দাও, আমরা ঈমান আনবো। এ আয়াত দুটিতে এ ঘটনারই উল্লেখ করা হয়েছে। আর বড় আঘাত অর্থ

বদর যুদ্ধের দিন কুরাইশদের যে আঘাত দেয়া হয়েছিলো তাই। এ হাদীসটি ইমাম আহমদ, বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম কতিপয় সনদে মাসরূক থেকে উদ্ধৃত করেছেন। মাসরূক ছাড়া ইবরাহীম নাখায়ী, কাতাদা, আসেম এবং আমেরও বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এ আয়াতটির এ ব্যাখ্যাই বর্ণনা করেছিলেন। তাই এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাকে না যে, প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে এটিই ছিল তাঁর অভিমত। তাবেয়ীদের মধ্যে থেকে মুজাহিদ, কাতাদা, আবুল আলিয়া, মুকাতিল, ইবরাহীম নাখায়ী, দাহ্হাক, আতায়িতুল আওফী এবং অন্যরাও এ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

অপর দিকে হযরত আলী, ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ খুদরী, যায়েদ ইবনে আলী এবং হাসান বাসারীর মত পণ্ডিতবর্গ বলেন ঃ এ আয়াতগুলোতে যে আলোচনা করা হয়েছে তা সবই কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ের ঘটনা। আর এতে যে ধোঁয়ার কথা বলা হয়েছে তা সেই সময়েই পৃথিবীর ওপর ছেয়ে যাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের থেকে যেসব হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে সেই সব হাদীস থেকেও এ ব্যাখ্যা আরো দৃঢ়তা লাভ করে। হুযাইফা ইবনে আসীদ আল গিফারী বলেন ঃ একদিন আমরা পরস্পর কিয়ামত সম্পর্কে কথাবার্তা বলছিলাম। ইতিমধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে হাজির হলেন এবং বললেন ঃ যতদিন না একের পর এক দশটি আলামত প্রকাশ পাবে ততদিন কিয়ামত হবে না। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া, ধোঁয়া, দাব্বা বা জন্তু, ইয়াজুজ ও মাজুজের আবির্ভাব, ঈসা ইবনে মারয়ামের অবতীর্ণ হওয়া, ভূমি ধ্বস, পূর্বে, পশ্চিমে ও আরব উপদ্বীপে এবং আদন থেকে আগুনের উৎপত্তি হওয়া যা মানুষকে তাড়া করে নিয়ে যাবে (মুসলিম)। ইবনে জারীর ও তাবারানীর উদ্ধৃত আবু মালেক আশআরী বর্ণিত হাদীস এবং ইবনে আবী হাতেম উদ্ধৃত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত হাদীসও এ বর্ণনা সমর্থন করে। এ দুটি হাদীস থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধোঁয়াকে কিয়ামতের আলামতের মধ্যে গণ্য করেছেন। তাছাড়া নবী (সা) এও বলেছেন যে, যখন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে ফেলবে তখন মু'মিনের ওপর তার প্রতিক্রিয়া হবে সর্দির মত। কিন্তু তা কাফেরের প্রতিটি শিরা–উপশিরায় প্রবেশ করবে এবং তার শরীরের প্রতিটি ছিদ্র ও নির্গমন পথ দিয়ে বের হয়ে আসবে।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা–ভাবনা করলে এ দুটি ব্যাখ্যার গরমিল ও বৈপরিত্য সহজেই দূর হতে পারে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) ব্যাখ্যার ব্যাপারে বলা যায়, নবীর (সা) দোয়ার ফলে মক্কায় কঠিন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো যার ফলে কাফেরদের বিদ্রুপ ও উপহাসে কিছুটা ভাটা পড়েছিলো এবং দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্য তারা নবীর (সা) কাছে দোয়ার আবেদন জানিয়েছিলো। কুরআন মজীদের বেশ কিছু জায়গায় এ ঘটনার প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে। (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আন'আম ২৯, আল আরাফ ৭৭, ইউনুস ১৪, ১৫ ও ২৯ এবং আল মুমিনুন ৭২ টীকা)।

এই আয়াতগুলোর মাধ্যমেও যে ঐ পরিস্থিতি প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে তা স্পষ্ট বুঝা যায়। কাফেরদের উক্তি, "হে প্রভু, আমাদের ওপর থেকে এ আযাব সরিয়ে নিন, আমরা ঈমান আনবো।" আর আল্লাহর এ উক্তি, "কোথায় এদের গাফলতি দূর হচ্ছে? এদের

أَنْ أَدُّوٓا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾ وَأَنْ لَّا تَعْلُوا عَلَى
اللَّهِ ۚ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٩﴾ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ
أَن تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ﴿٢١﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ
هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴿٢٢﴾ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَاتْرُكِ
الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾
وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ﴿٢٧﴾ كَذَٰلِكَ
وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٨﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا
كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿٢٩﴾

তিনি বললেন[১৫] ঃ আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার কাছে সোপর্দ করো।[১৬] আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল।[১৭] আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো না। আমি তোমাদের কাছে (আমার নিযুক্তির) স্পষ্ট সনদ পেশ করছি।[১৮] তোমরা আমার ওপরে হামলা করে বসবে, এ ব্যাপারে আমি আমার ও তোমাদের রবের আশ্রয় নিয়েছি। তোমরা যদি আমার কথা না মানো, তাহলে আমাকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকো।[১৯] অবশেষে তিনি তাঁর রবকে ডেকে বললেন, এসব লোক অপরাধী।[২০] (জবাব দেয়া হলো) বেশ, তাহলে রাতের মধ্যেই আমার বান্দাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ো।[২১] তোমাদের পিছু ধাওয়া করা হবে।[২২] সমুদ্রকে আপন অবস্থায় উন্মুক্ত থাকতে দাও। এই পুরো সেনাবাহিনী নিমজ্জিত হবে।[২৩] কত বাগ-বাগিচা, ঝর্ণাধারা, ফসল ও জমকালো প্রাসাদ তারা ছেড়ে গিয়েছে। তাদের পিছনে কত ভোগের উপকরণ পড়ে রাইলো যা নিয়ে তারা ফূর্তিতে মেতে থাকতো। এই হয়েছে তাদের পরিণাম। আমি অন্যদেরকে এসব জিনিসের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছি।[২৪] অতপর না আসমান তাদের জন্য কেঁদেছে না যমীন[২৫] এবং সামান্যতম অবকাশও তাদের দেয়া হয়নি।

অবস্থা তো এই যে, এদের কাছে 'রসূলে মুবীন' এসেছেন। তা সত্ত্বেও এরা তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনি এবং বলেছে ঃ এতো শিখিয়ে নেয়া পাগল।" তাছাড়া এই উক্তিও যে,

"আমি আযাব কিছুটা সরিয়ে নিচ্ছি। এরপরও তোমরা আগে যা করছিলে তাই করবে।" এ ঘটনাগুলো নবীর (সা) যুগের হলে কেবল সেই পরিস্থিতিতেই এসব কথা খাপ খায়। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে এমন ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে এসব কথার প্রয়োগ বোধগম্য নয়। তাই ইবনে মাসউদের (রা) ব্যাখ্যার এতটুকু অংশ সঠিক বলে মনে হয়। কিন্তু ধোঁয়াও সেই যুগেই প্রকাশ পেয়েছিলো এবং প্রকাশ পেয়েছিলো এমনভাবে যে, ক্ষুধার যন্ত্রণা নিয়ে মানুষ যখন আসমানের দিকে তাকাতো তখন শুধু ধোঁয়াই দেখতে পেতো, তার ব্যাখ্যার এই অংশটুকু সঠিক বলে মনে হয় না। একথা কুরআন মজীদের বাক্যের সাথেও বাহ্যত খাপ খায় না এবং হাদীসসমূহেরও পরিপন্থী। কুরআনে একথা কোথায় বলা হয়েছে যে, আসমান ধোঁয়া নিয়ে এসেছে এবং মানুষের ওপর ছেয়ে গিয়েছে? সেখানে তো বলা হয়েছে, 'বেশ, তাহলে সেই দিনটির অপেক্ষা করো যেদিন আসমান সুস্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে এবং তা মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে।' পরবর্তী আয়াতের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিচার করলে এ বাণীর পরিষ্কার অর্থ যা বুঝা যায় তা হচ্ছে, তোমরা যখন উপদেশও মানছো না এবং দুর্ভিক্ষের আকারে যেভাবে তোমাদের সতর্ক করা হলো তাতেও সম্বিত ফিরে পাচ্ছো না, তাহলে কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা করো। সেই সময় যখন দুর্ভাগ্য ষোলকলায় পূর্ণ হবে তখন তোমরা ঠিকই বুঝতে পারবে হক কি আর বাতিল কি? সুতরাং ধোঁয়া সম্পর্কে সঠিক কথা হলো তা দুর্ভিক্ষকালীন সময়ের জিনিস নয়, বরং তা কিয়ামতের একটি আলামত। হাদীস থেকেও একথাই জানা যায়। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, বড় বড় মুফাসসিরদের মধ্যে যারা হযরত ইবনে মাসউদের মত সমর্থন করেছেন তারা তাঁর পুরো বক্তব্যই সমর্থন করেছেন। আবার যারা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন তারাও পুরোটাই প্রত্যাখ্যান করে বসেছেন। অথচ কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদীস সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে এর কোন্ অংশ ঠিক এবং কোন্ অংশ ভুল তা পরিষ্কার বুঝা যায়।

১৪. মূল আয়াতে رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। كريم শব্দটি যখন মানুষের জন্য ব্যবহার করা হয় তখন তার দ্বারা বুঝানো হয় এমন ব্যক্তিকে যে অত্যন্ত ভদ্র ও শিষ্ট আচার-আচরণ এবং অতীব প্রশংসনীয় গুণাবলীর অধিকারী। সাধারণ গুণাবলী বুঝাতে এ শব্দ ব্যবহৃত হয় না।

১৫. প্রথমেই একথা বুঝে নেয়া দরকার যে, এখানে হযরত মূসার যেসব উক্তি ও বক্তব্য উদ্ধৃত করা হচ্ছে, তা যুগপৎ একই ধারাবাহিক বক্তব্যের বিভিন্ন অংশ নয়, বরং বছরের পর বছর দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিতে যেসব কথা তিনি ফেরাউন ও তার সভাসদদের বলেছিলেন তার সারসংক্ষেপ কয়েকটি মাত্র বাক্যে বর্ণনা করা হচ্ছে। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আ'রাফ, টীকা ৮৩ থেকে ৯৭; ইউনুস, টীকা ৭২ থেকে ৯৩; ত্বাহা, টীকা ১৮ (ক) থেকে ৫২; আশ শুআরা, টীকা ৭ থেকে ৪৯; আন নামল, টীকা ৮ থেকে ১৭; আল কাসাস, টীকা ৪৬ থেকে ৫৬; আর মু'মিন, আয়াত ২৩ থেকে ৪৬; আয যুখরুফ, আয়াত ৪৬ থেকে ৫৬ টীকাসহ)।

১৬. মূল আয়াতে ادوا الى عباد الله বলা হয়েছে। এ আয়াতাংশের একটি অনুবাদ আমরা ওপরে বর্ণনা করেছি। এই অনুবাদ অনুসারে এটা ইতিপূর্বে সূরা আ'রাফ (আয়াত ১৫), সূরা ত্বাহা (৪৭) এবং আশ শুআরায় বনী ইসরাঈলদের আমার সাথে যেতে দাও বলে

যে দাবী করা হয়েছে সেই দাবীর সমার্থক। আরেকটি 'অনুবাদ' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে উদ্ধৃত। অনুবাদটি হলো, হে আল্লাহর বান্দারা, আমার হক আদায় করো অর্থাৎ আমার কথা মেনে নাও, আমার প্রতি ঈমান আনো এবং আমার হিদায়াত অনুসরণ করো। আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর এটা আমার হক। পরের বাক্যাংশ অর্থাৎ "আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল" এই দ্বিতীয় অর্থের সাথে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৭. অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য রসূল। নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা সংযোজন করে বলার মত ব্যক্তিও আমি নই কিংবা নিজের কোন ব্যক্তিগত আকাংখা বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিজেই একটি নির্দেশ বা আইন রচনা করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দেয়ারমত ব্যক্তিও নই। তোমরা আমার ওপর এতটা আস্থা রাখতে পার যে, আমার প্রেরণকারী যা বলেছেন কমবেশী না করে ঠিক ততটুকুই আমি তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেব। (প্রকাশ থাকে যে হযরত মূসা সর্বপ্রথম যখন তাঁর দাওয়াত পেশ করেছিলেন তখন এই দুটি কথা বলেছিলেন)।

১৮. অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা আমার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করছো প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কারণ, আমার যেসব কথা শুনে তোমরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছো তা আমার নয়, আল্লাহর কথা। আমি তাঁর রসূল হিসেবে এসব কথা বলছি। আমি আল্লাহর রসূল কিনা এ ব্যাপারে যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তাহলে আমি তোমাদের সামনে আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করছি। এই প্রমাণ বলতে কোন একটি মাত্র মু'জিযা বুঝানো হয়নি। বরং ফেরাউনের দরবারে প্রথমবার পৌঁছার পর থেকে মিসরে অবস্থানের সর্বশেষ সময় পর্যন্ত দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে যেসব মু'জিযা মূসা আলাইহিস সালাম ফেরাউন ও তার কওমকে দেখিয়েছেন তার সবগুলোকে বুঝানো হয়েছে। তারা যে প্রমাণটিই অস্বীকার করেছে তিনি পরে তার চেয়েও অধিক সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করেছেন। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আয যুখরুফ, টীকা নম্বর ৪২ ও ৪৩)।

১৯. এটা সেই সময়ের কথা যখন হযরত মূসার পেশকৃত সমস্ত নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও ফেরাউন তার জিদ ও হঠকারিতা বজায় রেখে চলছিলো। কিন্তু মিসরের সাধারণ ও অসাধারণ সব মানুষই প্রতিনিয়ত এসব নিদর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ছে দেখে সে অস্থির হয়ে উঠছিলো। সেই যুগেই প্রথমে সে ভরা দরবারে বক্তৃতা করে যা সূরা যুখরুফের ৫১ থেকে ৫৩ আয়াতে পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে (দেখুন, সূরা যুখরুফের ৪৫ থেকে ৪৯ টীকা)। তারপর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে দেখে শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর রসূলকে হত্যা করতে মনস্থ করে। ঐ সময় হযরত মূসা (আ) সেই কথাটি বলেছিলেন যা সূরা মু'মিনের ২৭ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ –

"যে অহংকারী জবাবদিহির দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে না আমি তার থেকে আশ্রয় গ্রহণ করেছি আমার ও তোমাদের যিনি রব, তার কাছে।"

এখানে হযরত মূসা (আ) তাঁর সেই কথা উল্লেখ করে ফেরাউন ও তার রাজকীয় সভাসদদের বলছেন, দেখো, আমি তোমাদের সমস্ত হামলার মোকাবিলার জন্য ইতিপূর্বেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আশ্রয় চেয়েছি। এখন তোমরা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবে যদি তোমরা নিজেদের কল্যাণ কামনা করো তাহলে আমার ওপর হামলা করা থেকে বিরত থাকো। আমার কথা মানতে না চাইলে না মানো। আমাকে কখনো আঘাত করবে না। অন্যথায়, ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হবে।

২০. এটা হযরত মূসা কর্তৃক তাঁর রবের কাছে পেশকৃত সর্বশেষ রিপোর্ট। 'এসব লোক অপরাধী' অর্থাৎ এদের অপরাধী হওয়াটা এখন অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। এদের প্রতি আনুকূল্য দেখানো এবং এদেরকে সংশোধনের সুযোগ দানের অবকাশ আর নেই। এখন জনাবের চূড়ান্ত ফায়সালা দেয়ার সময় এসে গিয়েছে।

২১. অর্থাৎ সেই সব লোককে যারা ঈমান এনেছে। তাদের মধ্যে বনী ইসরাঈলও ছিল এবং হযরত ইউসুফের যুগ থেকে হযরত মূসার যুগের আগমন পর্যন্ত মিসরের যেসব কিবতী মুসলমান হয়েছিলো তারাও। আবার সেই সব মিসরীয় লোকও যারা হযরত মূসার নিদর্শনসমূহ দেখে এবং তাঁর দাওয়াত ও তাবলীগে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউসুফ, টীকা ৫৮)

২২. এটা হযরত মূসাকে হিজরতের জন্য দেয়া প্রাথমিক নির্দেশ। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বাহা, টীকা ৫৩; আশ শুআরা টীকা ৩৯ থেকে ৪৭)।

২৩. এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো সেই সময় যখন হযরত মূসা তাঁর কাফেলাসহ সমুদ্র পার হয়ে গিয়েছেন এবং তিনি চাচ্ছিলেন সমুদ্রের মধ্য দিয়ে রাস্তা তৈরী হয়ে যাওয়ার আগে তা যেমন ছিল লাঠির আঘাতে পুনরায় তেমন করে দেবেন। যাতে মু'জিযার সাহায্যে যে রাস্তা তৈরী হয়েছে ফেরাউন ও তার সৈন্য-সামন্ত সেই রাস্তা ধরে এসে না পড়ে। সেই সময় বলা হয়েছিলো, তা যেন না করা হয়। সমুদ্রকে ঐভাবেই বিভক্ত থাকতে দাও, যাতে ফেরাউন তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এই রাস্তায় নেমে আসে। তারপর সমুদ্রের পানি ছেড়ে দিয়ে এই গোটা সেনাবাহিনীকে ডুবিয়ে মারা হবে।

২৪. হযরত হাসান বাসারী বলেন ঃ এর অর্থ বনী ইসরাঈল, যাদেরকে ফেরাউনের কওমের ধ্বংসের পর আল্লাহ মিসরের উত্তরাধিকারী করেছিলেন। কাতাদা বলেন ঃ এর অর্থ অন্য জাতির লোক, যারা ফেরাউনের অনুসারীদের ধ্বংস করার পরে মিসরের উত্তরাধিকারী হয়েছিলো। কারণ, ইতিহাসে কোথাও উল্লেখ নেই যে, মিসর থেকে বের হওয়ার পর বনী ইসরাঈলরা আর কখনো সেখানে ফিরে গিয়েছিলো এবং সে দেশের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছিলো। পরবর্তীকালের মুফাসসিরদের মধ্যেও এই মতভেদ দেখা যায়। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আশ শুআরা, টীকা ৪৫)।

২৫. অর্থাৎ তারা যখন শাসক ছিল তখন তাদের শ্রেষ্ঠত্বের ডঙ্কা বাজতো। পৃথিবীতে তাদের প্রশংসা গীত প্রতিধ্বনিত হতো। তাদের আগে ও পিছে চাটুকারদের ভিড় লেগে থাকতো। তাদের এমন ভাবমূর্তি সৃষ্টি করা হতো যেন গোটা জগতই তাদের গুণাবলীর ভক্ত-অনুরক্ত, তাদের দয়া ও করুণার দানে ঋণী এবং পৃথিবীতে তাদের চেয়ে জনপ্রিয় আর কেউ নেই। কিন্তু যখন তাদের পতন হলো একটি চোখ থেকেও তাদের জন্য

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿٣٠﴾ مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُۥ
كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَٰهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٣٢﴾
وَءَاتَيْنَٰهُم مِّنَ ٱلْءَايَٰتِ مَا فِيهِ بَلَٰٓؤٌا۟ مُّبِينٌ ﴿٣٣﴾ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَيَقُولُونَ ﴿٣٤﴾ إِنْ
هِىَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿٣٥﴾

২ রুকূ'

এভাবে আমি বনী ইসরাঈলদের কঠিন অপমানজনক আযাব, ফেরাউন[২৬] থেকে নাযাত দিয়েছিলাম। সীমালংঘনকারীদের মধ্যে সে ছিল প্রকৃতই উচ্চ পর্যায়ের লোক।[২৭] তাদের অবস্থা জেনে শুনেই আমি দুনিয়ার অন্য সব জাতির ওপর তাদের অগ্রাধিকার দিয়েছিলাম।[২৮] তাদেরকে এমন সব নিদর্শন দেখিয়েছিলাম যার মধ্যে সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল।[২৯]

এরা বলে ঃ আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নেই। এরপর আমাদের পুনরায় আর উঠানো হবে না।[৩০]

অশ্রুপাত হয়নি বরং সবাই প্রাণ ভরে এমন শ্বাস নিয়েছে যেন তার পাঁজরে বিদ্ধ কাঁটাটি বের হয়ে গিয়েছে। একথা সবারই জানা, তারা আল্লাহর বান্দাদের কোন কল্যাণ করেনি যে তারা তার জন্য কাঁদবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যও কোন কাজ করেনি যে, আসমান–বাসীরা তাদের ধ্বংসের কারণে আহাজারি করবে। আল্লাহর ইচ্ছানুসারে যতদিন তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে তারা পৃথিবীর বুকের ওপর দুর্বলদের অত্যাচার করেছে। কিন্তু তাদের অপরাধের মাত্রা সীমালংঘন করলে এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে যেমন ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়।

২৬. অর্থাৎ তাদের জন্য ফেরাউন নিজেই ছিল লাঞ্ছনাকর আযাব। অন্য সব আযাব ছিল এই মূর্তিমান আযাবের শাখা–প্রশাখা।

২৭. এর মধ্যে কুরাইশ গোত্রের কাফের নেতাদেরকে সূক্ষ্মভাবে বিদ্রূপ করা হয়েছে। অর্থাৎ দাসত্বের সীমালংঘনকারীদের মধ্যে তোমরা কি এমন মর্যাদার অধিকারী? অতি বড় বিদ্রোহী তো ছিল সেই যে তৎকালীন পৃথিবীর সবচাইতে বড় সাম্রাজ্যের সিংহাসনে খোদায়ীর দাবী নিয়ে বসেছিলো। তাকেই যখন খড়কুটোর মত ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে সেখানে তোমাদের এমন কি অস্তিত্ব আছে যে আল্লাহর আযাবের সামনে টিকে থাকবে?

২৮. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলদের গুণাবলী ও দুর্বলতা উভয় দিকই আল্লাহর জানা ছিল। তিনি না দেখে শুনে অন্ধভাবে তাদেরকে বাছাই করেননি। সেই সময় পৃথিবীতে যত জাতি ছিল তাদের মধ্য থেকে তিনি এই জাতিকে যখন তাঁর বার্তাবাহক এবং তাওহীদের

فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٦﴾ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ
لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ
اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٢﴾

"যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আমাদের বাপ-দাদাদের জীবিত করে আনো।"[৩১] 'এরাই উত্তম না তুব্বা' কওম[৩২] এবং তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা? আমি তাদের ধ্বংস করেছিলাম। কারণ তারা অপরাধী হয়ে গিয়েছিলো।[৩৩] আমি এই আসমান ও যমীন এবং এর মাঝের সমস্ত জিনিস খেলাচ্ছলে তৈরী করিনি। এসবই আমি যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না।[৩৪] এদের সবার পুনরুজ্জীবনের জন্য নির্ধারিত সময়টিই এদের ফায়সালার দিন।[৩৫] সেটি এমন দিন যেদিন কোন নিকটতম প্রিয়জনও[৩৬] কোন নিকটতম প্রিয়জনের কাজে আসবে না এবং আল্লাহ যাকে রহমত দান করবেন সে ছাড়া তারা কোথাও থেকে কোন সাহায্য লাভ করবে না। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও অত্যন্ত দয়াবান।[৩৭]

দাওয়াতের ঝাণ্ডাবাহী বানানোর জন্য মনোনীত করলেন তখন তা করেছিলেন এ জন্য যে, তাঁর জ্ঞানে তৎকালীন জাতিসমূহের মধ্যে এরাই তার উপযুক্ত ছিল।

২৯. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ৬৪ থেকে ৮৫; আন নিসা, টীকা ১৮২ থেকে ১৯৯; আল মায়েদা, টীকা ৪২ থেকে ৪৭; আল আ'রাফ, টীকা ৯৭ থেকে ১৩; ত্বাহা, টীকা ৫৬ থেকে ৭৪।

৩০. অর্থাৎ প্রথমবার মরার পরই আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো। তারপর আর কোন জীবন নেই। 'প্রথম মৃত্যু' কথা দ্বারা একথা বুঝায় না যে, এরপর আরো মৃত্যু আছে। আমরা যখন বলি, অমুক ব্যক্তির প্রথম সন্তান জন্ম নিয়েছে তখন একথা সত্য হওয়ার জন্য জরুরী নয় যে, এরপর অবশ্যই তার দ্বিতীয় সন্তান জন্ম নেবে। একথার অর্থ হচ্ছে, এর পূর্বে তার কোন সন্তান হয়নি।

৩১. তাদের যুক্তি ছিল এই যে, মৃত্যুর পর আমরা কখনো কাউকে পুনরায় জীবিত হতে দেখিনি। তাই আমরা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি মৃত্যুর পরে আর কোন জীবন হবে না। তোমরা যদি দাবী করো, মৃত্যুর পর আরেকটি জীবন হবে তাহলে আমাদের বাপদাদাদের কবর থেকে উঠিয়ে আনো যাতে মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। তোমরা যদি তা না করো তাহলে আমরা মনে করবো তোমাদের দাবী ভিত্তিহীন। তাদের মতে এটা যেন মৃত্যুর পরের জীবনকে অস্বীকার করার মজবুত প্রমাণ। অথচ এটি একেবারেই নিরর্থক কথা। কে তাদেরকে একথা বলেছে যে, মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে আবার এই দুনিয়াতেই ফিরে আসবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা অন্য কোন মুসলমান কবে এ দাবী করেছিলো যে, আমরা মৃতদের জীবিত করতে পারি?

৩২. হিময়ার গোত্রের বাদশাহদের উপাধি ছিল তুব্বা' যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাদশাহদের উপাধি ছিল কিসরা, কায়সার, ফেরাউন প্রভৃতি। তুব্বা' কওম সাবা কওমের একটি শাখার সাথে সম্পর্কিত ছিল। খৃষ্টপূর্ব ১১৫ সনে এরা সাবা দেশটি দখল করে এবং ৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তা শাসন করে। শত শত বছর ধরে আরবে এদের শ্রেষ্ঠত্বের কাহিনী সবার মুখে মুখে ছিল (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাবা, টীকা ৩৭)।

৩৩. এটা কাফেরদের আপত্তির প্রথম জবাব। এ জবাবের সারকথা হচ্ছে, আখেরাত অস্বীকৃতি এমনই জিনিস যা কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতিকে অপরাধী না বানিয়ে ছাড়ে না। নৈতিক চরিত্র ধ্বংস হয়ে যাওয়া এর অনিবার্য ফল। মানবেতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যে জাতিই জীবন সম্পর্কে এই মতবাদ গ্রহণ করেছে পরিণামে সে ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন বাকি থাকে এই প্রশ্নটির ব্যাখ্যা, যে, "এরাই উত্তম না তুব্বা' কওম এবং তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা?" এর অর্থ হচ্ছে, তুব্বা' কওম তার পূর্বের সাবা ও ফেরাউনের কওম এবং আরো অন্য কওম যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং গৌরব ও শান-শওকত অর্জন করেছিলো মক্কার এই কাফেররা তার ধারে কাছেও পৌছতে পারেনি। কিন্তু এই বস্তুগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং পার্থিব গৌরব ও জাঁকজমক নৈতিক অধপতনের ভয়াবহ পরিণাম থেকে কবে তাদের রক্ষা করতে পেরেছিলো যে, তারা নিজেদের সামান্য পুঁজি এবং উপায়-উপকরণের জোরে তা থেকে রক্ষা পাবে? (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাবা, টীকা ২৫ ও ৩৬)।

৩৪. এটা তাদের আপত্তির দ্বিতীয় জবাব। এর সারমর্ম হচ্ছে, যে ব্যক্তিই মৃত্যুর পরের জীবন এবং আখেরাতের প্রতিদান ও শাস্তিকে অস্বীকার করে প্রকৃতপক্ষে সে এই বিশ্ব সংসারকে খেলনা এবং তার স্রষ্টাকে নির্বোধ শিশু মনে করে। তাই সে এই সিদ্ধান্তে পৌছে যে, মানুষ এই পৃথিবীতে সব কিছু করে একদিন এমনি মাটিতে মিশে যাবে এবং তার ভাল বা মন্দ কাজের কোন ফলাফল দেখা দেবে না। অথচ এই বিশ্ব জাহান কোন খেলোয়াড়ের সৃষ্টি নয়, এক মহাজ্ঞানী স্রষ্টার সৃষ্টি। মহাজ্ঞানী সত্তা কোন অর্থহীন কাজ করবেন তা আশা করা যায় না। আখেরাত অস্বীকৃতির জবাবে কুরআনের বেশ কয়েকটি স্থানে এই যুক্তি পেশ করা হয়েছে এবং আমরা তার বিস্তারিত ব্যাখ্যাও পেশ করেছি (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আনয়াম, টীকা ৪৬; ইউনুস, টীকা ১০ ও ১১; আল আম্বিয়া, টীকা ১৬ ও ১৭; আল মু'মিনুন, টীকা ১০১ ও ১০২; আর রূম, টীকা ৪ থেকে ১০)।

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾
كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ
رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾
إِنَّ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾

৩ রুকূ'

'যাক্কূম[৩৮] গাছ হবে গোনাগারদের খাদ্য। তেলের তলানির মত।[৩৯] পেটের মধ্যে এমনভাবে উথলাতে থাকবে যেমন ফুটন্ত পানি উথলায়। পাকড়াও করো একে এবং টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যখানে। তারপর ঢেলে দাও তার মাতার ওপর ফুটন্ত পানির আযাব। এখন এর মজা চাখো। তুমি বড় সম্মানী ব্যক্তি কিনা, তাই। এটা সেই জিনিস যার আমার ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ করতে।

৩৫. এটা তাদের এই দাবীর জবাব যে, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আমাদের বাপ–দাদাদের জীবিত করে আনো। অর্থাৎ মৃত্যুর পরের জীবন কোন তামাশা নয় যে, যেখানেই কেউ তা অস্বীকার করবে তখনি কবরস্থান থেকে একজন মৃতকে জীবিত করে তাদের সামনে এনে হাজির করা হবে। বিশ্ব জাহানের রব এ জন্য একটি সময় বেঁধে দিয়েছেন। সেই সময় তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের সবাইকে পুনরায় জীবিত করে তাঁর আদালতে সমবেত করবেন এবং তাদের মোকদ্দমার রায় ঘোষণা করবেন। তোমরা বিশ্বাস করো কিংবা না–ই করো, এ কাজ নির্দিষ্ট সময়েই হবে। তোমরা বিশ্বাস করলে তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণ হবে। কারণ, এভাবে সময় থাকতেই সতর্ক হয়ে ঐ আদালতে সফলকাম হওয়ার প্রস্তুতি নিতে পারবে। বিশ্বাস না করলে নিজেদেরই ক্ষতি করবে। কারণ সে ক্ষেত্রে এই ভুলের মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করবে যে ভাল–মন্দ যাই আছে এই দুনিয়া পর্যন্তই তা সীমাবদ্ধ। মৃত্যুর পর কোন আদালত হবে না যেখানে আমাদের ভাল অথবা মন্দ কাজকর্মের স্থায়ী কোন ফল থাকতে পারে।

৩৬. মূল আয়াতে مولى শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা হয়, যে কোন সম্পর্কের কারণে অন্য কোন ব্যক্তিকে সহযোগিতা করে। সেই সম্পর্ক আত্মীয়তার সম্পর্ক হোক কিংবা বন্ধুত্বের সম্পর্ক হোক অথবা অন্য কোন প্রকারের সম্পর্ক হোক তা দেখার বিষয় নয়।

৩৭. ফায়সালার দিন যে আদালত কায়েম হবে তা কেমন প্রকৃতির হবে সে কথা এই আয়াতাংশগুলোতে বলা হয়েছে। সেদিন কারো সাহায্য–সহযোগিতা কোন অপরাধীকে রক্ষা করতে কিংবা তার শাস্তি হ্রাস করতে পারবে না। নিরংকুশ ক্ষমতা ও ইখতিয়ার

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِن
سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ
عِينٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا
الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ۖ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضْلًا مِّن
رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾

আল্লাহভীরু লোকেরা শান্তি ও নিরাপত্তার জায়গায় থাকবে[৪০] বাগান ও ঝর্ণা ঘেরা জায়গায়। তারা রেশম ও মখমলের[৪১] পোশাক পরে সামনাসামনি বসবে। এটা হবে তাদের অবস্থা। আমি সুন্দরী হরিণ নয়না[৪২] নারীদের সাথে তাদের বিয়ে দেবো। সেখানে তারা নিশ্চিন্তে মনের সুখে সবরকম সুস্বাদু জিনিস চেয়ে চেয়ে নেবে।[৪৩] সেখানে তারা কখনো মৃত্যুর স্বাদ চাখবে না। তবে দুনিয়াতে যে মৃত্যু এসেছিলো তা তো এসেই গেছে। আর আল্লাহ তাঁর করুণায় তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।[৪৪] এটাই বড় সফলতা।

হে নবী, আমি এই কিতাবকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি যাতে এই লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে। এখন তুমিও অপেক্ষা করো, এরাও অপেক্ষা করছে।[৪৫]

সত্যিকার সেই বিচারকের হাতে থাকবে যার সিদ্ধান্ত কার্যকরী হওয়া রোধ করার শক্তি কারো নেই এবং যার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাও কারো নেই। তিনি দয়াপরবশ হয়ে কাকে শাস্তি দিবেন না আর কাকে কম শাস্তি দিবেন এটা সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজের বিচার-বিবেচনার ওপর নির্ভর করবে। ইনসাফ করার ক্ষেত্রে তিনি দয়ামায়াহীনতা নয় বরং দয়া ও করুণা প্রদর্শন করেন এবং এটাই তাঁর নীতি। কিন্তু যার মোকদ্দমায় যে ফায়সালাই তিনি করবেন তা সর্বাবস্থায় অবিকল কার্যকর হবে। আল্লাহর আদালতের এই অবস্থা বর্ণনা করার পর যারা ঐ আদালতে অপরাধী প্রমাণিত হবে তাদের পরিণাম কি হবে এবং যাদের সম্পর্কে প্রমাণিত হবে, তারা পৃথিবীতে আল্লাহকে ভয় করে তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থেকেছে তাদেরকে কি কি পুরস্কারে ভূষিত করা হবে ছোট ছোট কয়েকটি বাক্যে তা বলা হয়েছে।

৩৮. 'যাক্কুম'—এর ব্যাখ্যা জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাফফাত, টীকা ৩৪।

৩৯. মূল আয়াতে المهل শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার কয়েকটি অর্থ আছে ঃ গলানো ধাতু, পুঁজ, রক্ত, গলানো আলকাতরা, লাভা এবং তেলের তলানি। আরবী ভাষাভাষী এবং মুফাসসিরগণ এই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। আমাদের দেশে যাকে ফনীমনসা বলা হয় 'যাক্কুম' বলতে যদি সেই জিনিসকেই বুঝানো হয়ে থাকে তাহলে তা চিবালে যে রস নির্গত হবে তা তেলের তলানির সাথে বেশী সাদৃশ্য পূর্ণ হবে।

৪০. শান্তি ও নিরাপত্তার জায়গা অর্থ এমন জায়গা যেখানে কোন প্রকার আশংকা থাকবে না। কোন দুঃখ, অস্থিরতা, বিপদ, আশংকা এবং পরিশ্রম ও কষ্ট থাকবে না। হাদীসে আছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীদের বলে দেয়া হবে, তোমরা এখানে চিরদিন সুস্থ থাকবে, কখনো রোগাক্রান্ত হবে না, চিরদিন জীবিত থাকবে, কখনো মরবে না, চিরদিন সুখী থাকবে, কখনো দুর্দশাগ্রস্ত হবে না এবং চিরদিন যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না।" (মুসলিম—আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত হাদীস)।

৪১. মূল আয়াতে سُنْدُس ও اِسْتَبْرَق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় সূক্ষ্ম রেশমী কাপড়কে سُنْدُس বলে। اِسْتَبْرَق ফারসী শব্দ এর আরবী রূপ। মোটা রেশমী কাপড় বুঝাতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

৪২. মূল শব্দ হচ্ছে حُوْرٌ عِيْن । حُوْر শব্দটি حَوْرَاء শব্দের বহুবচন। আরবী ভাষায় সুন্দরী নারীকে حَوْرَاء বলা হয়। عين শব্দটি عيناء শব্দের বহুবচন। এ শব্দটি বড় চোখ বিশিষ্ট নারীদের বুঝাতে ব্যবহার করা হয়। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেকুন, সূরা সাফ্ফাত, টীকা ২৬ ও ২৯)।

৪৩. 'নিশ্চিন্তে মনের সুখে' চাওয়ার অর্থ যে জিনিস যত পরিমাণে ইচ্ছা দ্বিধাহীনভাবে জান্নাতের খাদেমদেরকে তা আনার নির্দেশ দেবে এবং তা এনে হাজির করা হবে। দুনিয়াতে হোটেল তো দূরের কথা কোন ব্যক্তি নিজের বাড়ীতেও এরূপ নিশ্চিন্তে ও মনের সুখে কোন কিছু এমনভাবে চাইতে পারে না যেমন সে জান্নাতে চাইবে। কারণ, এখানে কারো কাছেই কোন জিনিসের অফুরন্ত ভাণ্ডার থাকে না। এবং ব্যক্তি যাই ব্যবহার করে তার মূল্য তাকে নিজের পকেট থেকে দিতে হয়। জান্নাতে সম্পদ হবে আল্লাহর এবং ব্যক্তিকে তা ব্যবহারের অবাধ অনুমতি দেয়া হবে। কোন জিনিসের ষ্টক শেষ হয়ে যাওয়ার বিপদ যেমন থাকবে না তেমনি পরে বিল আসারও কোন প্রশ্ন থাকবে না।

৪৪. এ আয়াতে দুটি বিষয় লক্ষণীয় ঃ

এক—জান্নাতের নিয়ামতসমূহের উল্লেখ করার পর জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার কথা আলাদা করে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। অথচ কোন ব্যক্তির জান্নাত লাভ করাই আপনা আপনিই তার জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়াকে অনিবার্য করে তোলে। এর কারণ, মানুষ আনুগত্যের পুরস্কারের মূল্য পুরোপুরি তখনই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যখন নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে সে কোথায় পৌঁছেছে এবং কোন ধরনের মন্দ পরিণতি থেকে রক্ষা পেয়েছে তা তার সামনে থাকে।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে, এ লোকদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া এবং জান্নাত লাভ করাকে আল্লাহ তাঁর দয়ার ফলশ্রুতি বলে আখ্যায়িত করছেন। এর দ্বারা মানুষকে এই সত্য সম্পর্কে অবহিত করা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর অনুগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তির ভাগ্যেই এই সফলতা আসতে পারে না। ব্যক্তি তার সৎকর্মের পুরস্কার লাভ করবে। কিন্তু প্রথমত আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া ব্যক্তি তার সৎকর্ম করার তাওফীক বা সামর্থ কিভাবে লাভ করবে। তাছাড়া ব্যক্তি দ্বারা যত উত্তম কাজই সম্পন্ন হোক না কেন তা পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণতর হতে পারে না। সুতরাং সে কাজ সম্পর্কে দাবী করে একথা বলা যাবে না যে, তাতে কোন ত্রুটি বা অপূর্ণতা নেই। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যে তিনি বান্দার দুর্বলতা এবং তার কাজকর্মের অপূর্ণতাসমূহ উপেক্ষা করে তার খেদমত কবুল করেন এবং তাকে পুরস্কৃত করে ধন্য করেন। অন্যথায়, তিনি যদি সূক্ষ্মভাবে হিসেব নিতে শুরু করেন তাহলে কার এমন দুঃসাহস আছে যে নিজের বাহুবলে জান্নাত লাভ করার দাবী করতে পারে? হাদীসে একথাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا ان احدا لن يدخله عمله الجنة

"আমল করো এবং নিজের সাধ্যমত সর্বাধিক সঠিক কাজ করার চেষ্টা করো। জেনে রাখো, কোন ব্যক্তিকে শুধু তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না।"

লোকেরা বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল, আপনার আমলওকি পারবে না? তিনি বললেন ঃ

ولا انا الا ان يتغمدنى الله برحمته

"হাঁ, আমিও শুধু আমার আমলের জোরে জান্নাতে যেতে পারবো না। তবে আমার রব যদি তাঁর রহমত দ্বারা আমাকে আচ্ছাদিত করেন।"

৪৫. অর্থাৎ এখন যদি এসব লোক উপদেশ গ্রহণ না করে তাহলে দেখো, কিভাবে তাদের দুর্ভাগ্য আসে। আর তোমার এই দাওয়াতের পরিণাম কি হয় তা দেখার জন্য এরাও অপেক্ষমান।

আল জাসিয়াহ

৪৫

নামকরণ

২৮ আয়াতের وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً বাক্যাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যার মধ্যে 'জাসিয়াহ' শব্দ আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটির নাযিল হওয়ার সময়-কাল কোন নির্ভরযোগ্য হাদীসে বর্ণিত হয়নি। তবে এর বিষয়বস্তু থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় এটি সূরা 'দুখান' নাযিল হওয়ার অল্প দিন পরই নাযিল হয়েছে। এ দুটি সূরার বিষয়বস্তুতে এতটা সাদৃশ্য বর্তমান যে সূরা দুটিকে যমজ বা যুগ্ম বলে মনে হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে তাওহীদ ও আখেরাত সম্পর্কে মক্কার কাফেরদের সন্দেহ, সংশয় ও আপাত্তির জবাব দেয়া এবং কুরআনের দাওয়াতের বিরুদ্ধে তারা যে নীতি ও আচরণ গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে সতর্ক করা।

তাওহীদের সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে বক্তব্য শুরু করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মানুষের নিজের অস্তিত্ব থেকে শুরু করে আসমান ও যমীনে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য নিদর্শনের প্রতি ইংগিত দিয়ে বলা হয়েছে, যেদিকেই চোখ মেলে তাকাও না কেন তোমরা যে তাওহীদ মানতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছো প্রতিটি বস্তু তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। নানা রকমের এসব জীব-জন্তু, এই রাতদিন, এই বৃষ্টিপাত এবং তার সাহায্যে উৎপন্ন উদ্ভিদ রাজি, এই বাতাস এবং মানুষের নিজের জন্ম এর সবগুলো জিনিসকে কোন ব্যক্তি যদি চোখ মেলে দেখে এবং কোন প্রকার গোঁড়ামি বা অন্ধ আবেগ ছাড়া নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে সরাসরি কাজে লাগিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে এসব নিদর্শন তার মধ্যে এই দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট যে এই বিশ্ব জাহান খোদাহীন নয় বা এখানে বহু খোদায়ী চলছে না, বরং এক আল্লাহ এটি সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি একাই এর ব্যবস্থাপক ও শাসক। তবে যে ব্যক্তি মানবে না বলে শপথ করেছে কিংবা সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে পড়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার কথা ভিন্ন। দুনিয়ার কোন জায়গা থেকেই সে ঈমান ও ইয়াকীনের সম্পদ লাভ করতে পারবে না।

দ্বিতীয় রুকূ'র শুরুতে বলা হয়েছে, এই পৃথিবীতে মানুষ যত জিনিসের সাহায্য গ্রহণ করছে এবং এই বিশ্ব জাহানে যে সীমাসংখ্যাহীন বস্তু ও শক্তি তার স্বার্থের সেবা করছে

তা আপনা আপনি কোথাও থেকে আসেনি বা দেব-দেবীরাও তা সরবরাহ করেনি, বরং এক আল্লাহই তাঁর নিজের পক্ষ থেকে তাকে এসব দান করেছেন এবং এসবকে তার অনুগত করে দিয়েছেন। কেউ যদি সঠিকভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে তার বিবেক-বুদ্ধিই বলে দেব, সেই আল্লাহই মানুষের প্রতি অনুগ্রহকারী মানুষ তাঁর শোকর গোজারী করবে এটা তাঁর প্রাপ্য।

এরপর মক্কার কাফেররা হঠকারিতা, অহংকার, ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং কুফরকে আঁকড়ে ধরে থেকে কুরআনের দাওয়াতের যে বিরোধিতা করছিলো। সে জন্য তাদেরকে কঠোরভাবে তিরস্কার করা হয়েছে এবং সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, এ কুরআন সেই নিয়ামত নিয়ে এসেছে যা ইতিপূর্বে বনী-ইসরাঈলদের দেয়া হয়েছিলো যার কল্যাণে বনী ইসরাঈলরা গোটা বিশ্বের সমস্ত জাতির ওপর মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলো। কিন্তু তারা এই নিয়ামতের অমর্যাদা করেছে এবং দীনের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি করে তা হারিয়ে ফেলেছে। তাই এখন তা তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। এটা এমন একটি হিদায়াতনামা যা মানুষকে দীনের পরিষ্কার রাজপথ দেখিয়ে দেয়। নিজেদের অজ্ঞতা ও বোকামির কারণে যারা তা প্রত্যাখ্যান করবে তারা নিজেদেরই ধ্বংসের আয়োজন করবে। আর আল্লাহর সাহায্য ও রহমতের উপযুক্ত বিবেচিত হবে কেবল তারাই যারা এর আনুগত্য করে তাকওয়ার নীতি ও আচরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

এ ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের বলা হয়েছে, এসব লোক আল্লাহকে ভয় করে না। এরা তোমাদের সাথে যে অশোভন আচরণ করছে তা উপেক্ষা করো এবং সহিষ্ণুতা অবলম্বন করো। তোমরা ধৈর্য অবলম্বন করলে আল্লাহ নিজেই এদের সাথে বুঝাপড়া করবেন এবং তোমাদের এই ধৈর্যের প্রতিদান দিবেন।

তারপর আখেরাত বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত কাফেরদের জাহেলী ধ্যান-ধারণা আলোচনা করা হয়েছে। কাফেররা বলতো ঃ এই দুনিয়ার জীবনই সব। এরপর আর কোন জীবন নেই। যুগের বিবর্তনে আমরা ঠিক তেমনি মরে যাব যেমন একটি ঘড়ি চলতে চলতে বন্ধ হয়ে যায়। মৃত্যুর পরে রূহের আর কোন অস্তিত্ব থাকে না যে, তা কব্জ করা হবে এবং পুনরায় কোন এক সময় এনে দেহে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে। তোমরা যদি এ ধরনের দাবী করো তাহলে আমাদের মৃত বাপ-দাদাদের জীবিত করে দেখাও। এর জবাবে আল্লাহ একের পর এক কয়েকটি যুক্তি পেশ করেছেন ঃ

এক ঃ কোন জ্ঞান ও যুক্তির ভিত্তিতে তোমরা একথা বলছো না, বরং শুধু ধারণার ভিত্তিতে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছ। সত্যিই কি তোমাদের জানা আছে যে, মৃত্যুর পরে আর কোন জীবন নেই এবং রূহ কব্জ করা হয় না, বরং ধ্বংস হয়ে যায়?

দুই ঃ তোমাদের এই দাবীর ভিত্তি বড় জোর এই যে, তোমরা কোন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসতে দেখোনি। এতটুকু বিষয়ই কি এতবড় দাবী করার জন্য যথেষ্ট যে মৃতরা আর কখনো জীবিত হবে না? তোমাদের অভিজ্ঞতায় ও পর্যবেক্ষণে কোন জিনিস ধরা না পাড়ার অর্থ কি এই যে, তোমরা তার অস্তিত্বহীন হওয়ার জ্ঞান লাভ করেছো?

তিন ঃ এ কথা সরাসরি বিবেক–বুদ্ধি ও ইনসাফের পরিপন্থী যে ভাল ও মন্দ, অনুগত ও অবাধ্য এবং জালেম ও মজলুম সবাইকে শেষ পর্যন্ত একই পর্যায়ভুক্ত করে দেয়া হবে। কোন ভাল কাজের ভাল ফল এবং মন্দ কাজের মন্দ ফল দেখা দেবে না। কোন মজলুমের আর্তনাদ শোনা হবে না কিংবা কোন জালেম তার কৃতকর্মের শাস্তি পাবে না। বরং সবাই একই পরিণাম ভোগ করবে। আল্লাহর সৃষ্ট এই বিশ্ব জাহান সম্পর্কে যে এই ধারণা পোষণ করে সে অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। জালেম ও দুষ্কর্মশীল লোকদের এ ধারণা পোষণ করার কারণ হলো এই যে, তারা তাদের কাজ–কর্মের মন্দ ফলাফল দেখতে চায় না। কিন্তু আল্লাহর এই সার্বভৌম কর্তৃত্ব কোন অনিয়মের রাজত্ব নয়। এটি একটি ন্যায় ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, যেখানে সৎ ও অসৎকে এক পর্যায়ভুক্ত করে দেয়ার মত জুলুম কখনো হবে না।

চার ঃ আখেরাত অস্বীকৃতির এই আকীদা নৈতিকতার জন্য অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক। এই আকীদা তারাই গ্রহণ করে যারা প্রবৃত্তির দাস হয়ে আছে। তারা এ আকীদা গ্রহণ করে এ জন্য, যাতে প্রবৃত্তির দাসত্ব করার অবাধ সুযোগ লাভ করতে পারে। কাজেই তারা যখন এ আকীদা গ্রহণ করে তখন তা তাদেরকে চরমতম গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করতে থাকে। এমনকি তাদের নৈতিক অনুভূতি একেবারেই মরে যায় এবং হিদায়াত লাভের সকল দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

এসব যুক্তি–প্রমাণ পেশ করার পর আল্লাহ অত্যন্ত জোর দিয়ে বলছেন, যেভাবে তোমরা নিজে নিজেই জীবন লাভ করোনি, আমি জীবন দিয়েছি বলে জীবন লাভ করেছো, তেমনি নিজে নিজেই মরে যাবে না, বরং আমি মৃত্যু দেই বলে মারা যাও এবং এমন একটি সময় অবশ্যই আসবে যখন তোমাদের সবাইকে যুগপৎ একত্র করা হবে। আজ যদি মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে তোমরা একথা না মানতে চাও তাহলে মেনো না। কিন্তু সে সময়টি যখন আসবে তখন নিজের চোখেই তোমরা দেখতে পাবে যে, তোমরা তোমাদের আল্লাহর সামনে হাজির আছো এবং কোন প্রকার কমবেশী ছাড়াই তোমাদের পুরো আমলনামা প্রস্তুত আছে, যা তোমাদের প্রতিটি কাজের সাক্ষ্য দিচ্ছে। সে সময় তোমরা জানতে পারবে আখেরাতের আকীদার এই অস্বীকৃতি এবং এ নিয়ে যে ঠাট্টা–বিদ্রূপ তোমরা করছো এর কত চড়া মূল্য তোমাদের দিতে হচ্ছে।

আয়াত ৩৭ **সূরা আল জাসিয়া-মক্কী** রুকূ' ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও মেহেরবান আল্লাহর নামে

حٰمٓ ۝١ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝٢ اِنَّ فِى
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٣ وَفِىْ خَلْقِكُمْ وَمَا
يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝٤ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ
اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝٥ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ
بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ۝٦

হা-মীম। এ কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।[১]

প্রকৃত সত্য হচ্ছে, মু'মিনদের জন্য আসমান ও যমীনে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে।[২] তোমাদের নিজেদের সৃষ্টির মধ্যে এবং যেসব জীব-জন্তুকে আল্লাহ পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিচ্ছেন তার মধ্যে বড় বড় নিদর্শন রয়েছে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণকারী লোকদের জন্য।[৩] তাছাড়া রাত ও দিনের পার্থক্য ও ভিন্নতার মধ্যে,[৪] আল্লাহ আসমান থেকে যে রিযিক[৫] নাযিল করেন এবং তার সাহায্যে মৃত যমীনকে যে জীবিত করে তোলেন তার মধ্যে[৬] এবং বায়ু প্রবাহের আবর্তনের মধ্যে[৭] অনেক নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাজে লাগায়। এগুলো আল্লাহর নিদর্শন, যা আমি তোমাদের সামনে যথাযথভাবে বর্ণনা করছি। আল্লাহ ও তাঁর নিদর্শনাদি ছাড়া এমন আর কি আছে যার প্রতি এরা ঈমান আনবে?[৮]

১. এটা এই সূরার সংক্ষিপ্ত ভূমিকা। এতে শ্রোতাদেরকে দুটি বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এর একটি বিষয় হচ্ছে, এ কিতাব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

নিজের রচনা নয়। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হচ্ছে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, এ কিতাব নাযিল করছেন আল্লাহ, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী। তাঁর মহাপরাক্রমশালী হওয়ার দাবী হলো, মানুষ যেন তাঁর আদেশের অবাধ্য হওয়ার দুঃসাহস না দেখায়। কারণ অবাধ্য হয়ে সে তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না। তাঁর মহাজ্ঞানী হওয়ার দাবী হলো মানুষ পূর্ণ মানসিক প্রশান্তিসহ স্বেচ্ছায় আগ্রহ নিয়ে তাঁর হিদায়াত ও আদেশ-নিষেধ পালন করবে। কারণ, তাঁর শিক্ষা ভ্রান্ত, অসংগত ও ক্ষতিকর হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

২. ভূমিকার পর মূল বক্তব্য এভাবে শুরু করায় স্পষ্ট বুঝা যায় এর পটভূমিতে রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার বিরুদ্ধে মক্কার লোকদের পেশকৃত আপত্তিসমূহ। তারা বলতো ঃ আজ পর্যন্ত যেসব সম্মানিত সত্তার আস্তানার সাথে আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা জড়িত তারা সবাই তুচ্ছ। নগণ্য আর সার্বভৌম কর্তৃত্ব শুধু এক মাত্র আল্লাহর, এক ব্যক্তির কথায় এত বড় একটা জিনিস আমরা কি করে মেনে নেই। এর জবাবে বলা হচ্ছে, যে সত্যটি মানার জন্য তোমাদের আহবান জানানো হচ্ছে সারা বিশ্ব জাহান তার সত্যতার নিদর্শনে ভরা। চোখ মেলে দেখো। তোমাদের ভেতরে ও বাইরে সর্বত্র শুধু নিদর্শনই ছড়িয়ে আছে। এসব নিদর্শন সাক্ষ্য দিচ্ছে, গোটা এই বিশ্ব জাহান একমাত্র আল্লাহর সৃষ্টি এবং তিনি একাই এর মালিক, শাসক ও ব্যবস্থাপক। আসমান ও যমীনে কোন জিনিসের নিদর্শন আছে তা বলার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, তখন বিবাদের মূল বিষয় ছিল এই যে, মুশরিকরা আল্লাহর সাথে অন্য সব খোদা এবং উপাস্যদের মানার জন্য জিদ ধরেছিলো। পক্ষান্তরে কুরআনের দাওয়াত ছিল এই যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই। তাই নিদর্শনসমূহ অর্থ যে তাওহীদের সত্যতা ও শিরক বাতিল হওয়ার নিদর্শন একথা বলা না হলেও পরিবেশ পরিস্থিতি থেকেই তা প্রকাশ পাচ্ছিলো।

তাছাড়া এই যে বলা হয়েছে, "এসব হচ্ছে মু'মিনদের জন্য নিদর্শন" এর অর্থ, যদিও এগুলো সমস্ত মানুষের জন্যই নিদর্শন, কিন্তু এসব দেখে সঠিক সিদ্ধান্ত কেবল তারাই নিতে পারে যারা ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত। গাফলতির মধ্যে পড়ে থাকা মানুষ, যারা পশুর ন্যায় বেঁচে থাকে এবং একগুঁয়ে ও জেদী লোক, যারা না মানার সংকল্প করে বসেছে তাদের জন্য এগুলো নিদর্শন হওয়া না হওয়া সমান কথা। বাগানের চাকচিক্য ও সৌন্দর্য তো চক্ষুষ্মানদের জন্য। অন্ধরা কোন চাকচিক্য ও সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে না। তাদের জন্য বাগানের অস্তিত্বই অর্থহীন।

৩. অর্থাৎ যারা না মানার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিংবা যারা নিজেদের জন্য সন্দেহের গোলক ধাঁধায় হাতড়িয়ে বেড়ানো পসন্দ করেছে তাদের ব্যাপার তো ভিন্ন। কিন্তু যাদের মনের দরজা বন্ধ হয়নি তারা যখন নিজের জন্মের প্রতি নিজের অস্তিত্বের গঠন আকৃতির প্রতি এবং পৃথিবীময় ছড়িয়ে থাকা নানা রকম জীব-জন্তুর প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকাবে তখন এমন অসংখ্য আলামত দেখতে পাবে যা দেখার পর এ সন্দেহ পোষণের সামান্যতম অবকাশও থাকবে না যে, এসব কিছু হয়তো কোন আল্লাহ ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে কিংবা তার

সৃষ্টির ক্ষেত্রে হয়তো একাধিক খোদার হাত আছে (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আন'আম, টীকা ২৫ থেকে ২৭; আন নাহল, টীকা ৭ থেকে ৯; আল হাজ্জ, টীকা ৫ থেকে ৯; আল মুমিনূন টীকা ১২ ও ১৩; আল ফুরকান টীকা ৬৯; আশ শুআরা, টীকা ৫৭ ও ৫৮; আন নামল, টীকা ৮০; আর রূম, টীকা ২৫ থেকে ৩২ ও ৭৯; আস সাজদা, টীকা ১৪ থেকে ১৮; ইয়াসীন, আয়াত ৭১ থেকে ৭৩; আয যুমার আয়াত ৬ এবং আল মু'মিন, টীকা ৯৭, ৯৮ ও ১১০)।

৪. রাত ও দিনের এই পার্থক্য ও ভিন্নতা এদিক দিয়েও নিদর্শন যে, দুটিই পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে একটার পর আরেকটা আসে। আবার এদিক দিয়েও নিদর্শন যে একটি আলো আরেকটি অন্ধকার। তাছাড়া তার নিদর্শন হওয়ার আরো একটি কারণ হচ্ছে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দিন ক্রমান্বয়ে ছোট এবং রাত বড় হতে থাকে এবং এক সময়ে দুটি এক সমান হয়ে যায়। তারপর আবার ক্রমান্বয়ে দিন বড় এবং রাত ছোট হতে থাকে। তারপর এক সময় দিন রাত আবার সমান হয়ে যায়। রাত ও দিনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের এই যে, পার্থক্য ও ভিন্নতা দেখা যায় তার সাথে বিরাট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জড়িত। এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্পষ্টরূপে একথাই প্রমাণ করে যে, সূর্য, পৃথিবী এবং পৃথিবীর সব বস্তুর স্রষ্টা মাত্র একজন এবং তিনি এক মহাশক্তির সত্তা। তিনিই এ দুটি গ্রহকে নিজ নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কোন অন্ধ, বধির ও অযৌক্তিক ক্ষমতা নয়, বরং এমন জ্ঞানগর্ভ ক্ষমতা যা এই অনড় হিসাব-নিকাশ প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীকে তার সৃষ্ট উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মানুষের মত অসংখ্য প্রজাতির জীবনসত্তার জীবন ধারণের উপযোগী করে দিয়েছেন। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস, টীকা ৬৫; আন নামল, টীকা-১০৪; আল কাসাস, টীকা ৯২; লোকমান, আয়াত ২৯; টীকা ৫০ ইয়াসীন, আয়াত ৩৭; টীকা ৩২)।

৫. এখানে রিযিক অর্থ যে বৃষ্টি তা পরবর্তী আয়াতাংশ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়।

৬. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল মু'মিনূন, টীকা ১৭; আল ফুরকান, টীকা ৬২ থেকে ৬৫; আশ শুআরা, টীকা ৫, আন নামল, টীকা ৭৩ ও ৭৪; আর রূম, টীকা ৩৫ ও ৭৩ এবং ইয়াসীন, টীকা ২৬ থেকে ৩১।

৭. বায়ু প্রবাহ অর্থ বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্নভাবে হাওয়া প্রবাহিত হওয়া, যার কারণে ঋতুর পরিবর্তন সংঘটিত হয়। দেখার বিষয় শুধু এটাই নয় যে, পৃথিবী পৃষ্ঠের উপরিভাগে একটি বিশাল বায়ু স্তর আছে যার মধ্যে এমন সব উপাদান বিদ্যমান যা প্রাণীকূলের শ্বাস গ্রহণের জন্য প্রয়োজন এবং বাতাসের এই আবরণ পৃথিবীবাসীদের বহু আসমানী বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বরং এর সাথে এটাও দেখার বিষয় যে, এ বাতাস উর্ধ বায়ুমণ্ডলে শুধু বিদ্যমান নয়, মাঝে মধ্যে তা বিভিন্নভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। কখনো মৃদুভাবে প্রবাহিত হয়, কখনো তীব্রভাবে প্রবাহিত হয় এবং কখনো আবার ঝড় তুফানের রূপ ধারণ করে। কখনো শুষ্ক হাওয়া প্রবাহিত হয়, কখনো আর্দ্র হাওয়া প্রবাহিত হয়। কখনো বৃষ্টিবাহী হাওয়া প্রবাহিত হয় এবং কখনো আবার তা উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার হাওয়া প্রবাহিত হয়। নানা ধরনের এসব বাতাস আপনা থেকেই এলোমেলোভাবে প্রবাহিত হয় না। এরও একটা নিয়ম-কানুন ও শৃংখলা আছে, যা সাক্ষ্য দেয়, এ ব্যবস্থা পূর্ণ মাত্রায় যুক্তিনির্ভর এবং এর দ্বারা অতীব গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যাবলী পূরণ

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۝٧ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا
كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٨ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا
اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝٩ مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ ۖ
وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ
أَوْلِيَاءَ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝١٠ هَٰذَا هُدًى ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ
رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ۝١١

ধ্বংস এমন প্রত্যেক মিথ্যাবাদী ও দুষ্কর্মশীল ব্যক্তির জন্য যার সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় এবং সে তা শোনে তারপর পুরো অহংকার নিয়ে কুফরীকে এমনভাবে আঁকড়ে থাকে যেন সে ঐগুলো শোনেইনি।[৯] এ রকম লোককে কষ্টদায়ক আযাবের সুখবর শুনিয়ে দাও। যখন সে আমার আয়াতসমূহের কোন কথা জানতে পারে তখন তা নিয়ে উপহাস ও বিদ্রূপ করে।[১০] এরূপ প্রতিটি ব্যক্তির জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম।[১১] তারা পৃথিবীতে যা কিছু অর্জন করেছে তার কোন জিনিসই তাদের কাজে আসবে না আবার আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তারা অভিভাবক বানিয়ে রেখেছে তারাও তাদের জন্য কিছু করতে পারবে না।[১২] তাদের জন্য রয়েছে বড় শাস্তি। এই কুরআন পুরাপুরি হেদায়াতের কিতাব। সেই লোকদের জন্য কঠিন জ্বালাদায়ক আযাব রয়েছে। যারা নিজেদের রব-এর আয়াতগুলোকে মেনে নিতে অস্বীকার করছে।

হচ্ছে। তাছাড়া পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল অবস্থা অনুসারে শীত ও গ্রীষ্মের যে হ্রাস বৃদ্ধি হয় তার সাথেও এর অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। তাছাড়াও ঋতু পরিবর্তন ও বৃষ্টি বন্টনের সাথেও এর অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এর সবগুলো জিনিসই ডেকে ডেকে বলছে, কোন অন্ধ প্রকৃতি আকস্মিকভাবে এর ব্যবস্থা করে দেয়নি। কিংবা সূর্য ও পৃথিবী হাওয়া ও পানি এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের জন্য আলাদা আলাদা কোন ব্যবস্থাপক নেই। বরং নিশ্চিতরূপে এক মাত্র আল্লাহই এসবের স্রষ্টা এবং এক বিরাট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁর জ্ঞান ও কৌশল এ ব্যবস্থা করেছে। তাঁর অসীম ক্ষমতাবলেই এ ব্যবস্থা পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে চলছে।

৮. অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা ও তাঁর "ওয়াহদানিয়াত" বা একত্বের স্বপক্ষে স্বয়ং আল্লাহর পেশকৃত এসব যুক্তি-প্রমাণ সামনে আসার পরও যখন এসব লোক ঈমান গ্রহণ করছে না

তখন এমন কি জিনিস আর আসতে পারে যার কারণে ঈমানের সম্পদ তাদের ভাগ্যে জুটবে? আল্লাহর কালামই তো সেই চূড়ান্ত বস্তু যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি এই নিয়ামত লাভ করতে পারে। আর একটি অদেখা সত্য সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য সর্বাধিক যুক্তি সঙ্গত যেসব দলীল-প্রমাণ পেশ করা সম্ভব তা এই পবিত্র কালামে পেশ করা হয়েছে। এরপরও যদি কেউ অস্বীকার করতেই বদ্ধপরিকর থাকে তাহলে করতে থাকুক। তার অস্বীকৃতির ফলে প্রকৃত সত্যের কোন পরিবর্তন হবে না।

৯. অন্য কথায় যে ব্যক্তি সদুদ্দেশ্যে খোলা মনে আল্লাহর আয়াতসমূহ শোনে এবং ঠাণ্ডা মাথায় তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তার এবং সেই ব্যক্তির মধ্যে অনেক পার্থক্য যে অস্বীকৃতির পূর্ব সিদ্ধান্ত নিয়ে তা শোনে এবং কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই এসব আয়াত শোনার পূর্বেই যে সিদ্ধান্ত সে গ্রহণ করেছিলো তার ওপর স্থির থাকে। প্রথম প্রকারের ব্যক্তি এই আয়াত শুনে যদিও আজ ঈমান আনছে না কিন্তু তার কারণ এ নয় যে, সে কাফের থাকতে চায়। এর কারণ বরং এই যে, সে আরো নিশ্চিত হতে চায়। এ কারণে যদিও তার ঈমান আনায় বিলম্ব হচ্ছে তবুও এটা অবশ্যই আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে অন্য কোন আয়াত হয়তো তার মনে ধরবে এবং সে নিশ্চিত ও পরিতৃপ্ত হয়ে ঈমান আনবে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ব্যক্তি কোন আয়াত শুনে কখনো ঈমান আনতে পারে না। কারণ, আল্লাহর আয়াতের জন্য সে আগে থেকেই তার মনের দরজা বন্ধ করে নিয়েছে। যেসব মানুষের মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট বিদ্যমান তারাই সাধাণত এই অবস্থার শিকার হয়। এক, তারা মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে। তাই সত্য ও সততা তাদের কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। দুই, তারা দুষ্কৃতকারী হয়ে থাকে। তাই তাদের পক্ষে এমন কোন শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা মেনে নেয়া অত্যন্ত কঠিন হয় যা তাদের ওপর নৈতিক বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। তিন, তারা এই অহংকারে আত্মমগ্ন থাকে যে, তারা সব কিছুই জানে কাজেই তাদেরকে আবার কে কি শিখাবে। এ কারণে তাদেরকে আল্লাহর যেসব আয়াত শুনানো হয় তারা তা আদৌ ভেবে চিন্তে দেখার মত কোন জিনিস বলে মনে করে না এবং তাদের শোনা ও না শোনার ফলাফল একই হয়ে থাকে।

১০. অর্থাৎ ঐ একটি আয়াত নিয়ে বিদ্রুপ করাই যথেষ্ট মনে করে না, সব আয়াত নিয়েই বিদ্রুপ করতে শুরু করে। উদাহরণ স্বরূপ, যখন সে শোনে যে কুরআনে অমুক কথা বলা হয়েছে তখন তার সোজা অর্থ গ্রহণ করার পরিবর্তে প্রথমে তার মধ্যেই কোন বাঁকা অর্থ অনুসন্ধান করে নেয়, যাতে তাকে বিদ্রুপের লক্ষ্যস্থল বানাতে পারে। অতপর তা নিয়ে বিদ্রূপ করার পরে বলে, জনাব, তার কথা কি বলেন, সে তো প্রতিদিন একেকটি অদ্ভুত কথা শুনাচ্ছে। দেখুন, অমুক আয়াতে সে এই মজার কথাটা বলেছে এবং অমুক আয়াতের মজার বিষয়ের তো কোন জুড়িই নেই।

১১. মূল আয়াতে আছে مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ । আরবী ভাষায় وَرَاء শব্দটি এমন প্রতিটি জিনিস বুঝাতে ব্যবহৃত হয় যা সামনে থাক বা পেছনে থাক মানুষের দৃষ্টির আড়ালে থাকে। সুতরাং এর আরেকটি অনুবাদ হতে পারে "তাদের পেছনে রয়েছে জাহান্নাম।" যদি প্রথম অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে আয়াতের অর্থ হবে, তারা নিশ্চিন্তে দ্বিধাহীন চিত্তে এ পথে ছুটে চলেছে, অথচ সামনেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে যাচ্ছে সে অনুভূতি তাদের নেই। দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হবে, তারা আখেরাত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে

اَللّٰهُ الَّذِیْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِیَ الْفُلْكُ فِیْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا
مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾
قُلْ لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یَغْفِرُوْا لِلَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ اَیَّامَ اللّٰهِ لِیَجْزِیَ
قَوْمًا بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ﴿١٤﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَیْهَا ۫
ثُمَّ اِلٰی رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٥﴾

২ রুকূ'

তিনিই তো আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে অনুগত করে দিয়েছেন যাতে তাঁর নির্দেশে জাহাজসমূহ সেখানে চলে[১৩] আর তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে[১৪] এবং কৃতজ্ঞ হতে পার। তিনি যমীন ও আসমানের সমস্ত জিনিসকেই তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন,[১৫] সবই নিজের পক্ষ থেকে।[১৬] এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বড় বড় নিদর্শন রয়েছে।[১৭]

হে নবী, যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলে দাও, যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন কঠিন দিন আসার আশংকা করে না[১৮] তাদের আচরণ সমূহ যেন ক্ষমা করে দেয় যাতে আল্লাহ নিজেই একটি গোষ্ঠীকে তাদের কৃতকর্মের বদলা দেন।[১৯] যে সৎকাজ করবে সে নিজের জন্যই করবে। আর যে অসৎ কাজ করবে তার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। সবাইকে তো তার রবের কাছেই ফিরে যেতে হবে।

নিজেদের এই দুষ্কর্মের মধ্যে ডুবে আছে। কিন্তু জাহান্নাম তাদের অনুসরণ করছে তা তারা জানে না।

১২. এখানে ولی শব্দ দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এক, সেই সব দেব-দেবী এবং জীবিত বা মৃত নেতাদের বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে যাদের সম্বন্ধে মুশরিকরা ধরে নিয়েছে, যে ব্যক্তিই তাদের নৈকট্য লাভ করেছে সে পৃথিবীতে যাই করুক না কেন আল্লাহর দরবারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে না। কেননা, তাদের হস্তক্ষেপ তাকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করবে। দুই, সেই সব নেতা, আমীর-উমরাহ ও শাসকদের বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষ যাদেরকে পথপ্রদর্শক ও অনুসরণীয় বানিয়ে থাকে, অন্ধভাবে তাদের আনুগত্য করে এবং তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহকে অসন্তুষ্ট

করতেও দ্বিধাবোধ করে না। এ আয়াত এসব লোককে এ মর্মে সাবধান করে যে, এই আচরণ ও ভূমিকার ফলে যখন তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে তখন এই দুই শ্রেণীর নেতাদের কেউই তাদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে না। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আশ শূরার ব্যাখ্যা, টীকা ৬)।

১৩. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, বনী ইসরাঈল, টীকা ৮৩, আর রূম; টীকা ৬৯; লোকমান, টীকা ৫৫, আল মু'মিন, টীকা ১১০, আশ শূরা, টীকা ৫৪।

১৪. অর্থাৎ সমুদ্র পথে বাণিজ্য, মৎস্য শিকার, ডুবুরীর কাজ, জাহাজ চালনা এবং অন্যান্য উপায়ে রিযিক অর্জনের চেষ্টা করো।

১৫. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইবরাহীম, টীকা-৪৪, লোকমান, টীকা ৩৫।

১৬. এ আয়াতাংশের দুটি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর এই দান দুনিয়ার বাদশাহদের দানের মত নয়। কেননা, তারা প্রজার নিকট থেকে নেয়া সম্পদ প্রজাদেরই কিছু লোককে দান করে থাকে। বিশ্ব জাহানের সমস্ত সম্পদ আল্লাহর নিজের সৃষ্টি। তিনি নিজের পক্ষ থেকে তা মানুষকে দান করেছেন। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, এসব নিয়ামত সৃষ্টি করার ব্যাপারে যেমন কেউ আল্লাহর শরীক নয়, তেমনি মানুষের জন্য এগুলোকে অনুগত করার ব্যাপারেও অন্য কোন সত্তার কোন প্রকার দখল বা কর্তৃত্ব নেই। আল্লাহ একাই এ সবের স্রষ্টা এবং তিনিই নিজের পক্ষ থেকে তা মানুষকে দান করেছেন।

১৭. অর্থাৎ অনুগতকরণে এবং এসব জিনিসকে মানুষের জন্য কল্যাণকর বানানোর মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বড় বড় নিদর্শন রয়েছে। এসব নিদর্শন পরিষ্কারভাবে এ সত্যের প্রতি ইংগিত দান করছে যে, পৃথিবী থেকে আসমান পর্যন্ত বিশ্ব জাহানের সমস্ত বস্তু এবং শক্তির স্রষ্টা, মালিক, প্রশাসক ও ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ, যিনি সব কিছুকেই একটি নিয়ম-বিধির অনুগত করে রেখেছেন এবং সেই আল্লাহই মানুষের রব-যিনি তাঁর অসীম ক্ষমতা, জ্ঞান ও কৌশল এবং রহমতে এসব বস্তু ও শক্তিসমূহকে মানুষের জীবন, জীবিকা, আয়েশ-আরাম, উন্নতি ও তাহযীব-তমদ্দুনের উপযোগী ও সহায়ক বানিয়েছেন এবং একা তিনিই মানুষের দাসত্ব, কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য লাভের অধিকারী। অন্য সত্তাসমূহ এসব বস্তু ও শক্তি সৃষ্টিতে যাদের কোন অংশ নেই কিংবা এসব বস্তু ও শক্তি মানুষের অনুগত করা ও কল্যাণকর বানানোর ক্ষেত্রে যাদের কোন কর্তৃত্ব নেই, মানুষের দাসত্ব, কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য লাভের অধিকারও তাদের নেই।

১৮. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে اَلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ । এর শাব্দিক অনুবাদ হবে, "যেসব মানুষ আল্লাহর দিনসমূহের আশা রাখে না।" কিন্তু আরবী বাক রীতিতে এ রকম ক্ষেত্রে اَيَّام অর্থ শুধু দিন নয়, বরং এমন সব স্মরণীয় দিন যখন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ সংঘটিত হয়েছে। যেমন اَيَّامُ الْعَرَب শব্দ আরব ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী এবং আরব গোত্রসমূহের এমন সব বড় বড় যুদ্ধ-বিগ্রহ বুঝানোর জন্য বলা হয় যা পরবর্তী বংশধররা শত শত বছর ধরে স্মরণ করে আসছে। এখানে اَيَّامُ اللّٰهِ অর্থ কোন জাতির জীবনের সর্বাধিক অকল্যাণকর দিন, যেদিন তাদের ওপর আল্লাহর গযব

নেমে আসে এবং নিজ কৃতকর্মের পরিণামে তাদের ধ্বংস করে দেয়া হয়। এই অর্থ অনুসারে আমরা এই আয়াতাংশের অনুবাদ করেছি, 'যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে ভয়াবহ দিন আসার আশংকা করে না।" অর্থাৎ যাদের এ চিন্তা নেই যে, কখনো এমন দিনও আসতে পারে যখন আমাদের এসব কাজ-কর্মের ফলশ্রুতিতে আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য নেমে আসবে। এই উদাসীনতাই তাদেরকে জুলুম-অত্যাচারের ব্যাপারে দুঃসাহস যুগিয়েছে।

১৯. মুফাসসিরগণ এ আয়াতের দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। আয়াতের শব্দাবলী থেকে এ দুটি অর্থ গ্রহণেরই অবকাশ আছে। একটি অর্থ হচ্ছে, মু'মিনদেরকে এ জালেম গোষ্ঠীর অত্যাচার উপেক্ষা করতে হবে যাতে আল্লাহ তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে তাদের ধৈর্য ও মহানুভবতা এবং শিষ্টাচারের প্রতিদান দেন এবং তারা আল্লাহর পথে যে দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছে তার পুরস্কার দান করেন।

আরেকটি অর্থ হচ্ছে, মু'মিনগণ যেন, এই গোষ্ঠীকে উপেক্ষা করে যাতে আল্লাহ নিজেই তাদের অত্যাচারের প্রতিফল দান করেন।

কতিপয় মুফাসসির এ আয়াতকে 'মনসূখ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা বলেন ঃ যতদিন মুসলমানদের যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়নি ততদিন এ আদেশ বহাল ছিল। কিন্তু যুদ্ধের অনুমতি দেয়ার পর এ হুকুম 'মনসূখ' হয়ে গিয়েছে। তবে আয়াতের শব্দসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মনসূখ হওয়ার এ দাবী ঠিক নয়। ব্যক্তি যখন কারো জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম নয় তখন তাকে ক্ষমা করে দেয়া অর্থে এই 'মাফ' শব্দটি কখনো ব্যবহৃত হয় না। বরং এ ক্ষেত্রে ধৈর্য, সহ্য ও বরদাশত শব্দগুলো প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এ শব্দগুলো বাদ দিয়ে এখানে যখন 'মাফ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তখন আপনা থেকেই তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ঈমানদারগণ সেই সব লোকের জুলুম ও বাড়াবাড়ির জবাব দেয়া থেকে বিরত থাকবে আল্লাহর ব্যাপারে নির্ভীক হওয়া যাদেরকে নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বের সীমালংঘনের দুঃসাহস যুগিয়েছে। যেসব আয়াতে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে তার সাথে এ নির্দেশের কোন অমিল বা বৈপরীত্য নেই। যুদ্ধের অনুমতি দানের প্রশ্নটি এমন অবস্থার সাথে সম্পর্কিত যখন কোন কাফের কওমের বিরুদ্ধে যথারীতি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মুসলিম সরকারের কাছে যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে। আর ক্ষমার নির্দেশ এমন সাধারণ পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত যখন কোন না কোনভাবে মু'মিনদের সম্মুখীন হতে হয় আল্লাহর ভয়ে ভীত নয় এমন সব লোকদের এবং তারা তাদের বক্তব্য, লেখনী ও আচার-আচরণ দ্বারা মু'মিনদেরকে নানাভাবে কষ্ট দেয়। এ নির্দেশের উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানরা যেন তাদের উচ্চতর আসন থেকে নেমে এসব হীন চরিত্র লোকদের সাথে ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়তে এবং তাদের প্রতিটি অর্থহীন কাজের জবাব দিতে শুরু না করে। যতক্ষণ পর্যন্ত শিষ্টতা ও যৌক্তিতার সাহায্যে কোন অভিযোগ ও আপত্তির জবাব দেয়া কিংবা কোন জুলুমের প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। কিন্তু যখনই এ সীমা লংঘিত হবে তখনই সেখানেই ক্ষান্তি দিয়ে ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করতে হবে। মুসলমানরা নিজেরাই যদি তাদের মোকাবিলায় ময়দানে নেমে পড়ে তাহলে আল্লাহ তাদের সাথে মোকাবিলার ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে তাদের আপন অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবেন। কিন্তু তারা যদি ক্ষমা ও

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾ وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا
اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۭ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰي
شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۗءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨﴾

ইতিপূর্বে আমি বনী ইসরাঈলদের কিতাব, হুকুম[২০] ও নবুওয়াত দান করেছিলাম। আমি তাদেরকে উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলাম, সারা দুনিয়ার মানুষের ওপর মর্যাদা দান করেছিলাম[২১] এবং দীনের ব্যাপারে স্পষ্ট হিদায়াত দান করেছিলাম। অতপর তাদের মধ্যে যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিলো তা (অজ্ঞতার কারণে নয়, বরং) জ্ঞান আসার পরে হয়েছিলো এবং এ কারণে হয়েছিলো যে, তারা একে অপরের ওপর জুলুম করতে চাচ্ছিলো।[২২] তারা যেসব ব্যাপারে মতভেদ করে আসছিলো আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেই সব ব্যাপারে ফায়সালা করবেন। অতপর হে নবী, আমি দীনের ব্যাপারে তোমাকে একটি সুস্পষ্ট রাজপথের (শরীয়ত) ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি।[২৩] সুতরাং তুমি তার ওপরেই চলো এবং যারা জানে না তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।

উপেক্ষার নীতি অনুসরণ করে তাহলে আল্লাহ নিজেই জালেমদের সাথে বুঝা পড়া করবেন এবং মজলুমদেরকে তাদের ধৈর্য ও মহানুভবতার পুরস্কার দান করবেন।

২০. হুকুম অর্থ তিনটি জিনিস। এক–কিতাবের জ্ঞান ও উপলব্ধি এবং দীনের অনুভূতি। দুই–কিতাবের অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করার কৌশল। তিন–বিভিন্ন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা।

২১. অর্থ এ নয় যে, চিরদিনের জন্য সারা দুনিয়ার মানুষের ওপর মর্যাদা দান করেছেন। বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, সেই যুগে দুনিয়ার সমস্ত জাতির মধ্য থেকে আল্লাহ বনী ইসরাইলকে এই খেদমতের জন্য বাছাই করে নিয়েছিলেন যে, তারা হবে আল্লাহর কিতাবের ধারক এবং আল্লাহর আনুগত্যের ঝাণ্ডাবাহী।

২২. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল বাকারা, টীকা ২৩০; আল ইমরান, টীকা ১৭ ও ১৮; আশ শূরা, টীকা ২২ ও ২৩।

إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ ۚ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾ هَٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ
كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ
سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾

আল্লাহর মোকাবিলায় তারা তোমার কোন কাজেই আসতে পারে না।[২৪] জালেমরা একে অপরের বন্ধু এবং মুত্তাকীদের বন্ধু আল্লাহ। এটা সব মানুষের জন্য দূরদৃষ্টির আলো এবং যারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে তাদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।[২৫]

যেসব[২৬] লোক অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, আমি তাদেরকে এবং মু'মিন ও সৎকর্মশীলদেরকে সমপর্যায়ভুক্ত করে দেবো যে তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান হয়ে যাবে? তারা যে ফায়সালা করে তা অত্যন্ত জঘণ্য।[২৭]

২৩. অর্থাৎ ইতিপূর্বে যে কাজের দায়িত্ব বনী ইসরাইলদের ওপর অর্পণ করা হয়েছিলো এখন তার দায়িত্ব তোমাদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। তারা জ্ঞান লাভ করা সত্ত্বেও আত্মস্বার্থের জন্য দীনের মধ্যে এমন মতভেদ সৃষ্টি করে এবং পরস্পর এমন দলাদলিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে যার ফলে দুনিয়ার মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান জানানোর যোগ্যতাই হারিয়ে বসে। বর্তমানে তোমাদের সেই দীনের সুস্পষ্ট রাজপথের ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে তোমরা সেই খেদমত আঞ্জাম দিতে পার যা বনী ইসরাঈলরা পরিত্যাগ করেছে এবং যার যোগ্যতাও তাদের ছিল না। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, সূরা আশ শূরা, আয়াত ১৩ থেকে ১৫ এবং টীকা ২০ থেকে ২৬)।

২৪. অর্থাৎ যদি তোমরা তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য দীনের মধ্যে কোন প্রকার রদবদল করো তাহলে তারা আল্লাহর সামনে জবাবদিহি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

২৫. অর্থাৎ এই কিতাব এবং এই শরীয়ত পৃথিবীর মানুষের জন্য এমন এক আলো যা হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়। কিন্তু তা থেকে হিদায়াত লাভ করে কেবল সেই সব লোক যারা তার সত্যতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। আর তা রহমত কেবল তাদের জন্যই।

২৬. তাওহীদের দিকে আহবান জানানোর পর এখান থেকে আখেরাত সম্পর্কে বক্তব্য শুরু হচ্ছে।

وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾ اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ
اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ
يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَقَالُوْا مَا هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا
الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ
عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٢٤﴾

৩ রুকূ'

আল্লাহ আসমান ও যমীনকে সত্যের ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন[২৮] এবং এ জন্য করেছেন যাতে প্রত্যেক প্রাণসত্তাকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া যায়। তাদের প্রতি কখনো জুলুম করা হবে না।[২৯]

তুমি কি কখনো সেই ব্যক্তির অবস্থা ভেবে দেখেছো যে তার প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে খোদা বানিয়ে নিয়েছে[৩০] আর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও[৩১] আল্লাহ তাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন, তার দিলে ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং চোখে আবরণ সৃষ্টি করেছেন।[৩২] আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে যে তাকে হিদায়াত দান করতে পারে? তোমরা কি কোন শিক্ষা গ্রহণ করো না?[৩৩]

এরা বলে ঃ জীবন বলতে তো শুধু আমাদের দুনিয়ার এই জীবনই। আমাদের জীবন ও মৃত্যু এখানেই এবং কালের বিবর্তন ছাড়া আর কিছুই আমাদের ধ্বংস করে না। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে এদের কোন জ্ঞান নেই। এরা শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে এসব কথা বলে।[৩৪]

২৭. আখেরাত সত্য হওয়ার সপক্ষে এটা নৈতিক যুক্তি-প্রমাণ। নৈতিক চরিত্রের ভাল-মন্দ এবং কর্মের মধ্যে সৎ ও অসতের পার্থক্যের অনিবার্য দাবী হলো ভাল এবং মন্দ লোকের পরিণাম এক হবে না বরং এ ক্ষেত্রে সৎ লোক তার সৎ কাজের ভাল প্রতিদান লাভ করবে এবং অসৎ লোক তার অসৎ কাজের মন্দ ফল লাভ করবে। তা যদি না হয় এবং ভাল ও মন্দের ফলাফল যদি একই রকম হয় সে ক্ষেত্রে নৈতিক চরিত্রের ভাল ও মন্দের পার্থক্যই অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে বে-ইনসাফীর অভিযোগ আরোপিত হয়। যারা পৃথিবীতে অন্যায়ের পথে চলে তারা তো অবশ্যই চাইবে যেন কোন

প্রকার প্রতিদান ও শাস্তির ব্যবস্থা না থাকে। কারণ, এই ধারণাই তাদের আরামকে হারাম করে দেয়। কিন্তু বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহর যুক্তিপূর্ণ বিধান ও ন্যায় বিচারের নীতির সাথে এটা আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যে, তিনি সৎ ও অসৎ উভয় শ্রেণীর মানুষের সাথে একই রকম আচরণ করবেন এবং সৎকর্মশীল ঈমানদার ব্যক্তিগণ পৃথিবীতে কিভাবে জীবন যাপন করেছে আর কাফের ও ফাসেক ব্যক্তিরা কি বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে তার কিছুই দেখবেন না। এক ব্যক্তি সারা জীবন নিজেকে নৈতিকতার বিধি-বন্ধনে আবদ্ধ রাখলো, প্রাপকদের প্রাপ্য অধিকার দিল, অবৈধ স্বার্থ ও ভোগের উপকরণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখলো এবং ন্যায় ও সত্যের জন্য নানা রকম ক্ষতি বরদাশত করলো। আরেক ব্যক্তি সম্ভাব্য সব উপায়ে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা পূরণ করলো। সে না আল্লাহর অধিকার চিনলো, না বান্দার অধিকারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত হলো এবং স্বার্থ ও ভোগের উপকরণ যেভাবে সম্ভব দুই হাতে আহরণ করলো। আল্লাহ এই দুই শ্রেণীর মানুষের জীবনের এই পার্থক্য উপেক্ষা করবেন তা কি আশা করা যায়? মৃত্যু পর্যন্ত যাদের জীবন এক রকম হলো না, মৃত্যুর পর তাদের পরিণাম যদি একই রকম হয় তাহলে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় বে-ইনসাফী আর কি হতে পারে? (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, ইউনুস, টীকা ৯ ও ১০; হূদ, টীকা ১০৬; আন নাহল, টীকা ৩৫; আল হাজ্ব, টীকা ৯; আন নামল, টীকা ৮৬; আর রূম, টীকা ৬ থেকে ৮; সূরা সোয়াদ, আয়াত ২৮, টীকা ৩০)

২৮. অর্থাৎ আল্লাহ খেল-তামাশা করার উদ্দেশ্যে পৃথিবী ও আসমান সৃষ্টি করেননি। বরং এটা একটা উদ্দেশ্যমুখী জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় একথা একেবারেই অকল্পনীয় যে, যারা আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা-ইখতিয়ার ও উপায়-উপকরণ সঠিক পন্থায় ব্যবহার করে ভাল কাজ করেছে এবং যারা ঐগুলোকে ভ্রান্ত পন্থায় ব্যবহার করে জুলুম ও বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে শেষ পর্যন্ত তারা সবাই মরে মাটিতে পরিণত হবে এবং এই মৃত্যুর পর আর কোন জীবন হবে না এবং সেখানে ইনসাফ মোতাবেক তাদের ভাল ও মন্দ কাজের কোন ভাল বা মন্দ ফলাফলও প্রকাশ পাবে না। যদি তাই হয় তাহলে এই বিশ্ব জাহান তো খেলোয়াড়ের খেলার বস্তু, কোন মহাজ্ঞানীর সৃষ্ট উদ্দেশ্যমুখী ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা নয়। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনয়াম, টীকা ৪৬; ইউনুস, টীকা ১১; ইবরাহীম টীকা ২৬; আন নাহল, টীকা ৬; আল আনকাবূত, টীকা ৭৫ এবং আর রূম, টীকা ৬)।

২৯. পূর্বাপর আলোচনার পেক্ষাপটে এ আয়াতের পরিষ্কার অর্থ হলো, সৎ মানুষেরা যদি তাদের সৎ কাজের পুরস্কার বা প্রতিদান না পায়, জালেমদেরকে তাদের শাস্তি না দেয়া হয় এবং মজলুমরা কখনো ন্যায় বিচার না পায় তাহলে তা হবে জুলুম। আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ব্যবস্থায় এ ধরনের জুলুম কখনো হতে পারে না। একইভাবে কোন সৎ মানুষকে তার প্রাপ্যের তুলনায় কম পুরস্কার দেয়া হবে কিংবা কোন অসৎ মানুষকে তার প্রাপ্যের তুলনায় অধিক শাস্তি দেয়া হবে আল্লাহর বিচারে এ ধরনের কোন জুলুমও হতে পারে না।

৩০. প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে খোদা বানিয়ে নেয়ার অর্থ ব্যক্তির নিজের ইচ্ছা আকাংখার দাস হয়ে যাওয়া। তার মন যা চায় তাই সে করে বসে যদিও আল্লাহ তা হারাম

করেছেন এবং তার মন যা চায় না তা সে করে না যদিও আল্লাহ তা ফরয করে দিয়েছেন। ব্যক্তি যখন এভাবে কারো আনুগত্য করতে থাকে তখন তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তার উপাস্য আল্লাহ নয়, বরং সে এভাবে যার আনুগত্য করছে সে-ই তার উপাস্য। সে মুখে তাকে 'ইলাহ' এবং উপাস্য বলুক বা না বলুক কিংবা মূর্তি তৈরী করে তার পূজা করুক বা না করুক তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ, দ্বিধাহীন আনুগত্যই তার উপাস্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এভাবে কার্যত শিরক করার পর কোন ব্যক্তি শুধু এই কারণে শিরকের অপরাধ থেকে মুক্ত হতে পারে না যে, সে যার আনুগত্য করছে মুখে তাকে উপাস্য বলেনি এবং সিজদাও করেনি। অন্যান্য বড় বড় মুফাসসিরও আয়াতটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন। ইবনে জারীর এর অর্থ বর্ণনা করেছেন এইভাবে যে, সে তার প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। প্রবৃত্তি যা কামনা করেছে সে তাই করে বসেছে। না সে আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হারাম বলে মনে করেছে, না তার হালালকৃত বস্তুকে হালাল বলে গণ্য করেছে।" আবু বকর জাসসাস এর অর্থ বর্ণনা করেছেন, কেউ যেমনভাবে আল্লাহর আনুগত্য করে সে ঠিক তেমনিভাবে প্রবৃত্তি আকাংখার আনুগত্য করে।" যামাখশারী এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, সে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার প্রতি অত্যন্ত অনুগত। তার প্রবৃত্তি তাকে যেদিকে আহবান জানায় সে সেদিকেই চলে যায়। সে এমনভাবে তার দাসত্ব করে যেমন কেউ আল্লাহর দাসত্ব করে" (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল ফুরকান, টীকা ৫৬; সূরা সাবার ব্যাখ্যা, টীকা ৬৩; ইয়াসীন, টীকা ৫৩; আশ শূরা, টীকা ৩৮)।

৩১. মূল বাক্যাংশ হচ্ছে اَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ । এই বাক্যাংশের একটি অর্থ হতে পারে এই যে, জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর পক্ষ থেকে সে ব্যক্তিকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কেননা সে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার দাস হয়ে গিয়েছিলো। আরেকটি অর্থ হতে পারে এই যে, সে তার প্রবৃত্তির ইচ্ছা ও কামনা-বাসনাকে খোদা বানিয়ে বসেছে এ বিষয়টি জেনে আল্লাহ তাকে গোমবাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন।

৩২. আল্লাহ কর্তৃক কাউকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করা, তার মন ও কানের ওপর মোহর লাগিয়ে দেয়া এবং চোখের ওপর আবরণ সৃষ্টি করে দেয়ার ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আমরা এ গ্রন্থের কয়েকটি স্থানে করেছি। দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ১০ ও ১৬; আল আনয়াম, টীকা ১৭ ও ২৭; আল আরাফ, টীকা ৮০; আত তাওবা, টীকা ৮৯ ও ৯৩; ইউনুস, টীকা ৭১; আর রা'দ, টীকা ৪৪; ইবরাহীম, টীকা ৬, ৭ ও ৪০; আন নাহল, টীকা ১১০; বনী ইসরাঈল, টীকা ৫১; আর রূম, টীকা ৮৪; ফাতের, আয়াত ৮, টীকা ১৬ ও ১৭ এবং আল মু'মিন, টীকা ৫৪।

৩৩. যে প্রসংগে এ আয়াতটি এসেছে তাতে আপনা থেকেই একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যারা প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার দাসত্ব করতে চায় প্রকৃতপক্ষে সেই সব লোকই আখেরাতকে অস্বীকার করে এবং আখেরাতে বিশ্বাসকে নিজের স্বাধীনতার পথের অন্তরায় মনে করে। তা সত্ত্বেও তারা যখন আখেরাতকে অস্বীকার করে বসে তখন তাদের প্রবৃত্তির দাসত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এবং প্রতিনিয়তই তারা আরো বেশী করে গোমরাহীর মধ্যে হারিয়ে যেতে থাকে। এমন কোন অপকর্ম থাকে না যাতে জড়িত হওয়া থেকে তারা বিরত থাকে। কারো হক মারতে তারা দ্বিধান্বিত হয় না। ন্যায় ও ইনসাফের প্রতি তাদের

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا
ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ
ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

যখন এদেরকে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ শুনানো হয়[৩৫] তখন এদের কাছে এ ছাড়া আর কোন যুক্তিই থাকে না যে, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের বাপদাদাদের জীবিত করে দেখাও।[৩৬] হে নবী, এদের বলো, আল্লাহই তোমাদের জীবন দান করেন এবং তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটান।[৩৭] তিনিই আবার সেই কিয়ামতের দিন তোমাদের একত্রিত করবেন যার আগমনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।[৩৮] কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না।[৩৯]

মনে কোন শ্রদ্ধাবোধ থাকে না। তাই কোন প্রকার জুলুম ও বাড়বাড়ির সুযোগ লাভের পর তা থেকে তারা বিরত থাকবে এ আশা করা যায় না। যেসব ঘটনা দেখে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সেই সব ঘটনা তাদের চোখের সামনে আসে কিন্তু তারা তা থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করে তা হচ্ছে, আমরা যা কিছু করছি ঠিকই করছি এবং এসবই আমাদের করা উচিত। কোন উপদেশ বাণীই তাদের প্রভাবিত করে না। কোন মানুষকে দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখার জন্য যে যুক্তি প্রমাণ ফলপ্রসূ হতে পারে তা তাদের আবেদন সৃষ্টি করে না। বরং তারা তাদের এই লাগামহীন স্বাধীনতার পক্ষে যুক্তি প্রমাণ খুঁজে খুঁজে বের করে। ভাল চিন্তার পরিবর্তে তাদের মন ও মস্তিষ্ক রাত-দিন সম্ভাব্য সফল পন্থায় তাদের নিজেদের স্বার্থ ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টায় লেগে থাকে। আখেরাত বিশ্বাসের অস্বীকৃতি যে মানুষের নৈতিক চরিত্রের জন্য ধ্বংসাত্মক এটা তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ। মানুষকে যদি মনুষ্যত্বের গণ্ডির মধ্যে কোন জিনিস ধরে রাখতে সক্ষম হয় তাহলে তা পারে কেবল এই অনুভূতি যে, আমরা দায়িত্ব মুক্ত নই, বরং আল্লাহর সামনে আমাদের সকল কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এই অনুভূতিহীন হওয়ার পর কেউ যদি অতি বড় জ্ঞানীও হয় তাহলেও সে পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট আচরণ না করে পারে না।

৩৪. অর্থাৎ জ্ঞানের এমন কোন মাধ্যমই নেই যার সাহায্যে তারা জেনে নিতে পারে, এই জীবনের পরে মানুষের আর কোন জীবন নেই। তাছাড়া একথা জানতেও কোন মাধ্যম নেই যে, কোন খোদার নির্দেশে মানুষের রূহ কবজ করা হয় না, বরং শুধু কালের প্রবাহ ও বিবর্তনে মানুষ মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আখেরাত অবিশ্বাসীরা জ্ঞানের ভিত্তিতে নয়, শুধু ধারণার ভিত্তিতে এসব কথা বলে থাকে। যদি তারা জ্ঞানের ভিত্তিতে কথা বলে তাহলে বড় জোর বলতে পারে যে, "মৃত্যুর পরে কোন জীবন আছে কিনা তা আমরা জানি না।" কিন্তু একথা কখনো বলতে পারে না যে, "আমরা জানি, এই জীবনের পরে আর

কোন জীবন নেই।" অনুরূপ জ্ঞান ও যুক্তির ভিত্তিতে তারা একথা জানার দাবি করতে পারে না যে, মানুষের রূহ আল্লাহর হুকুমে বের করে নেয়া হয় না, বরং একটি ঘড়ি যেমন চলতে চলতে বন্ধ হয়ে যায় তেমনি তা মরে নিঃশেষ হয়ে যায়। তারা বড় জোর যা কিছু বলতে পারে তা শুধু এই যে, এ দুটির মধ্যে কোনটি সম্পর্কেই আমরা জানি না, প্রকৃতই কি ঘটে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের জ্ঞানের সীমা পর্যন্ত মৃত্যুর পরের জীবন হওয়া না হওয়া এবং রূহ কবজ হওয়া অথবা কালের প্রবাহে আপনা থেকেই মরে যাওয়ার সমান সম্ভাবনা যখন বিদ্যমান তখন এসব লোক আখেরাতের সম্ভাবনার দিকটি বাদ দিয়ে আখেরাত অস্বীকৃতির পক্ষে যে চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত প্রদান করছে তার কারণ তাহলে কি? প্রকৃতপক্ষে তারা এই বিষয়টির চূড়ান্ত সমাধান যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে করে না বরং নিজেদের কামনা-বাসনার নিরিখে করে থাকে। এ ছাড়া কি এর আর কোন কারণ থাকতে পারে? যেহেতু তারা মৃত্যুর পরে আর কোন জীবন চায় না এবং মৃত্যু সত্যিকার অর্থে অস্তিত্বহীনতা বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া না হয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে রূহ কবজ করা হোক এটাও তারা চায় না, তাই নিজেদের মনের চাহিদা অনুসারে তারা আকীদা-বিশ্বাস গড়ে নেয় এবং এর বিপরীত জিনিসটি অস্বীকার করে বসে।

৩৫. অর্থাৎ যেসব আয়াতে আখেরাতের সম্ভাবনার মজবুত যুক্তিসংগত দলীল প্রমাণ পেশ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আখেরাত হওয়া সরাসরি যুক্তি ও ইনসাফের দাবি। আখেরাত সংঘটিত না হলে এই গোটা বিশ্ব ব্যবস্থা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

৩৬. অন্য কথায়, তাদের এই যুক্তির উদ্দেশ্য ছিল, যখনই কেউ তাদেরকে বলবে, মৃত্যুর পর আরো একটি জীবন হবে তখনই তাকে কবর থেকে একজন মৃতকে জীবিত করে উঠিয়ে সামনে আনতে হবে। যদি তা না করা হয় তাহলে তারা একথা মানতে প্রস্তুত নয় যে, মৃত মানুষকে আবার কোন সময় পুনায় জীবিত করে উঠানো হবে। অথচ কেউ কখনো তাদেরকে একথা বলেনি যে, মাঝে মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে এই পৃথিবীতে মৃতদের জীবিত করা হবে। যা কিছু বলা হয়েছে তা হচ্ছে, কিয়ামতের পরে আল্লাহ এক সময় যুগপৎ সমস্ত মানুষকে পুনরায় জীবিত করবেন এবং তাদের সবার কৃতকর্ম পর্যালোচনা করে পুরস্কার ও শাস্তি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

৩৭. তারা বলতো, কালের প্রবাহ ও সময়ের বিবর্তনের আপনা থেকেই মৃত্যু আসে। এটা তাদের সেই কথার জবাব। বলা হচ্ছে, না তোমরা আকস্মিকভাবে জীবন লাভ করে থাকো, না আপনা থেকেই তোমাদের মৃত্যু সংঘটিত হয়। একজন আল্লাহ আছেন, যিনি তোমাদের জীবন দান করেন এবং তিনিই তা কেড়ে নেন।

৩৮. তারা বলতো, আমাদের বাপ-দাদাদের জীবিত করে আনো, এটা তারই জবাব। এতে বলা হচ্ছে, তা এখন হবে না এবং বিচ্ছিন্নভাবেও হবে না। বরং সব মানুষকে একত্রিত করার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট আছে।

৩৯. অর্থাৎ অজ্ঞতা এবং চিন্তা ও দৃষ্টির সংকীর্ণতাই মানুষের আখেরাত অস্বীকৃতির মূল কারণ। তা না হলে প্রকৃতপক্ষে আখেরাত সংঘটিত হওয়া নয়, না হওয়াই বিবেক ও যুক্তি-বুদ্ধির পরিপন্থী। কোন ব্যক্তি যদি সঠিকভাবে বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা ও নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করে তাহলে সে আপনা থেকেই অনুভব করবে যে, আখেরাত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ
الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰۤى اِلٰى كِتٰبِهَا ؕ اَلْيَوْمَ
تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾ هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّا كُنَّا
نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾

৪ রুকূ'

যমীন এবং আসমানের বাদশাহী আল্লাহর।[৪০] আর যেদিন কিয়ামতের সময় এসে উপস্থিত হবে সেদিন বাতিলপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে সময় তোমরা প্রত্যেক গোষ্ঠীকে নতজানু দেখতে পাবে।[৪১] প্রত্যেক গোষ্ঠীকে এসে তার আমলনামা দেখার জন্য আহবান জানানো হবে। তাদের বলা হবে, তোমরা যেসব কাজ করে এসেছো তোমাদেরকে তার প্রতিদান দেয়া হবে। এটা আমাদের তৈরী করানো আমলনামা, যা তোমাদের বিরুদ্ধে ঠিক ঠিক সাক্ষ্য দিচ্ছে। তোমরা যাই করতে আমি তাই লিপিবদ্ধ করাতাম।[৪২]

৪০. পূর্বাপর প্রসঙ্গ সামনে রেখে বিচার করলে আপনা থেকেই এ আয়াতের যে অর্থ প্রকাশ পায় তা হচ্ছে, যে আল্লাহ এই বিশাল বিশ্ব জাহান শাসন করছেন তিনি যে মানুষদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন পুনরায় তাদেরকে সৃষ্টি করা তাঁর অসীম ক্ষমতার অসাধ্য মোটেই নয়।

৪১. অর্থাৎ সেখানে হাশরের ময়দানের এবং আল্লাহর আদালতের এমন ভীতি সৃষ্টি হবে যে, বড় বড় অহংকারীদের অহংকারও উবে যাবে। সেখানে সবাই অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নতজানু হবে।

৪২. কলমের সাহায্যে কাগজের ওপর লেখানোই লিখিয়ে রাখার একমাত্র সম্ভব পদ্ধতি নয়। মানুষের কথা ও কাজ লিপিবদ্ধ করা এবং পুনরায় তা হুবহু পূর্বের মত করে উপস্থাপনের আরো কতিপয় পদ্ধতি এই পৃথিবীতে মানুষ নিজেই উদ্ভাবন করেছে। ভবিষ্যতে মানুষের করায়ত্ব হবে এরূপ আরো কি কি সম্ভাবনা আছে তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কি কি পন্থায় আল্লাহ মানুষের এক একটি কথা, তার তৎপরতার প্রতিটি জিনিস এবং তার নিয়ত, ইচ্ছা, কামনা-বাসনা ও ধ্যান-ধারণার প্রতিটি গোপন থেকে গোপনতার বিষয় লিপিবদ্ধ করাচ্ছেন এবং কিভাবে তিনি প্রত্যেক ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং জাতির গোটা জীবনের সকল কর্মকাণ্ড অবিকল তার সামনে পেশ করবেন তা কার পক্ষে জানা সম্ভব?

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ
ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ۝ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۫ اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ
تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ۝ وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ
وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ ۙ اِنْ
نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ۝

যারা ঈমান এনেছিলো এবং সৎকাজ করেছিলো তাদের রব তাদেরকে তাঁর রহমতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। এটা সুস্পষ্ট সাফল্য। আর যারা কুফরী করেছিলো তাদের বলা হবে আমার আয়াতসমূহ কি তোমাদেরকে শুনানো হতো না? কিন্তু তোমরা অহংকার করেছিলে[৪৩] এবং অপরাধী হয়ে গিয়েছিলে। আর যখন বলা হতো, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত যে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তখন তোমরা বলতে, কিয়ামত কি জিনিস তা আমরা জানি না। আমরা কিছুটা ধারণা পোষণ করি মাত্র। দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের নেই।[৪৪]

৪৩. অর্থাৎ অহংকার বশতঃ তোমরা মনে করেছিলে আল্লাহর আয়াতসমূহ মেনে নিয়ে অনুগত হয়ে যাওয়া তোমাদের মর্যাদার পরিপন্থী এবং তোমাদের মর্যাদা দাসত্বের মর্যাদার অনেক ওপরে।

৪৪. ইতিপূর্বে ২৪ আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা ছিল খোলাখুলি ও অকাট্য রূপে আখেরাত অস্বীকারকারী। কিন্তু এখানে যাদের কথা বলা হচ্ছে, তারা আখেরাত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে না, শুধু একটা ধারণা পোষণ করে এবং এর সম্ভাব্যতা অস্বীকার করে না। বাহ্যত এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ, একটি গোষ্ঠী আখেরাতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে এবং অপরটি তা সম্ভব বলে ধারণা পোষণ করে। কিন্তু ফলাফল ও পরিণামের দিক দিয়ে এদের মধ্যে কান পার্থক্য নেই। কেননা, আখেরাত অস্বীকৃতি এবং তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকার নৈতিক ফলাফল প্রায় পুরোপুরি এক। কোন ব্যক্তি, যে আখেরাত মানে না বা বিশ্বাস করে না উভয় অবস্থায় অনিবার্যরূপে তার মধ্যে আল্লাহর সামনে জবাবদিহির অনুভূতি থাকবে না এবং এই অনুভূতিহীনতা অবশ্য তাকে চিন্তা ও কর্মের গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। কেবলমাত্র আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই পৃথিবীতে মানুষের ভূমিকা আচার-আচরণ ঠিক রাখতে পারে। এই বিশ্বাস না থাকলে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বীকৃতি এ দুটি জিনিস তাকে এক প্রকার দায়িত্বহীন আচরণ ও তৎপরতার দিকে ঠেলে দেয়। এই দায়িত্বহীন আচরণ ও

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٣﴾
وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ
وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٤﴾ ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا
وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ
يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٣٥﴾ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٦﴾ وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٧﴾

সেই সময় তাদের কাছে তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফলাফল প্রকাশ পাবে।[৪৫] তারা সেই জিনিসের পাল্লায় পড়ে যাবে যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করতো। তাদের বলে দেয়া হবে, আজ আমিও ঠিক তেমনি তোমাদের ভুলে যাচ্ছি যেমন তোমরা এই দিনের সাক্ষাৎ ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের ঠিকানা এখন দোযখ এবং তোমাদের সাহায্যকারী কেউ নেই। তোমাদের এই পরিণাম এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয়ে পরিণত করেছিলে এবং দুনিয়ার জীবন তোমাদের ধোকায় ফেলে দিয়েছিলো। তাই আজ এদেরকে দোযখ থেকেও বের করা হবে না কিংবা একথাও বলা হবে না যে, ক্ষমা চেয়ে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করো।[৪৬]

কাজেই সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি যমীন ও আসমানের মালিক এবং গোটা বিশ্ব জাহানের সবার পালনকর্তা। যমীন ও আসমানে তারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত এবং তিনিই মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।

তৎপরতাই যেহেতু আখেরাতে মন্দ পরিণামের মূল কারণ তাই না অস্বীকারকারী দোযখ থেকে রক্ষা পাবে, না সন্দেহ পোষণকারী।

৪৫. অর্থাৎ দুনিয়াতে যেসব নিয়ম-পদ্ধতি, আচার-আচরণ এবং কাজ-কর্ম ও তৎপরতাকে তারা খুব ভাল বলে মনে করতো তা যে ভাল ছিল না সেখানে তারা তা জানতে পারবে। নিজেদেরকে দায়িত্বহীন মনে করে যে মৌলিক ভুল তারা করেছে, যার

কারণে তাদের জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডই ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে তারা সেখানে তা উপলব্ধি করতে পারবে।

৪৬. এই শেষ বাক্যাংশের ধরন এরূপ যেন কোন মনিব তার কিছু সংখ্যক খাদেমকে তিরস্কার করার পর অন্যদের উদ্দেশ করে বলছেন, ঠিক আছে, এখন এই অপদার্থগুলোকে এই শাস্তি দাও।

আল আহক্বাফ

৪৬

নামকরণ

২১ নম্বর আয়াতের اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ বাক্যাংশ থেকে নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরা নাযিল হওয়ার সময়–কাল ২৯ থেকে ৩২ আয়াতে বর্ণিত একটি ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে নিরূপিত হয়ে যায়। ঐ আয়াতগুলোতে রসূলুল্লাহর (সা) কাছে এসে জিনদের ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে যাওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হাদীস ও সীরাত গ্রন্থসমূহের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ অনুসারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সময় তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরে আসার পথে নাখলা নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করেছিলেন সেই সময় ঘটনাটি ঘটেছিলো। সমস্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুসারে হিজরতের তিন বছর পূর্বে নবী (সা) তায়েফ গমন করেছিলেন। সুতরাং এ সূরা যে নবুওয়াতের ১০ম বছরের শেষ দিকে অথবা ১১শ বছরের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছিলো তা নিরূপিত হয়ে যায়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

নবীর (সা) পবিত্র জীবনে নবুওয়াতের ১০ম বছর ছিল অত্যন্ত কঠিন বছর। তিন বছর ধরে কুরাইশদের সবগুলো গোত্র মিলে বনী হাশেম এবং মুসলমানদের পুরোপুরি বয়কট করে রেখেছিলো। নবী (সা) তাঁর খান্দানের লোকজন ও মুসলমানদের সাথে শে'বে আবি তালিব* মহল্লায় অবরুদ্ধ হয়ে ছিলেন। কুরাইশদের লোকজন এই মহল্লাটিকে সব দিক থেকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলো। এ অবরোধ ডিঙিয়ে কোন প্রকার রসদ ভেতরে যেতে পারতো না। শুধু হজ্জের মওসুমে এই অবরুদ্ধ লোকগুলো বের হয়ে কিছু কেনাকাটা করতে পারতো। কিন্তু আবু লাহাব যখনই তাদের মধ্যে কাউকে বাজারের দিকে বা কোন বাণিজ্য কাফেলার দিকে যেতে দেখতো চিৎকার করে বণিকদের বলতো, 'এরা যে জিনিস

* শে'বে আবি তালিব মক্কার একটি মহল্লার নাম। এখানে বনী হাশেম গোত্রের লোকজন বাস করতেন। আরবী ভাষায় شعب শব্দের অর্থ উপত্যকা বা পাহাড়ের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র বাসযোগ্য ভূমি। মহল্লাটি যেহেতু 'আবু কুবাইস' পাহাড়ের একটি উপত্যকায় অবস্থিত ছিল এবং আবু তালিব ছিলেন বনী হাশেমদের নেতা। তাই এটিকে শে'বে আবি তালিব বলা হতো। পবিত্র মক্কার যে স্থানটি বর্তমানে স্থানীয় বর্ণনা অনুসারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম স্থান হিসেবে পরিচিত তার সন্নিকটেই এই উপত্যকা অবস্থিত ছিল। বর্তমানে একে শে'বে আলী বা শে'বে বনী হাশেম বলা হয়ে থাকে।

কিনতে চাইবে তার মূল্য এত অধিক চাইবে যেন এরা তা খরিদ করতে না পারে। আমি ঐ জিনিস তোমাদের নিকট থেকে কিনে নেব এবং তোমাদের লোকসান হতে দেব না। একাধারে তিন বছরের এই বয়কট মুসলমান ও বনী হাশেমদের কোমর ভেঙে দিয়েছিলো। তাদেরকে এমন সব কঠিন সময় পাড়ি দিতে হয়েছিলো যখন কোন কোন সময় ঘাস এবং গাছের পাতা খাওয়ার মত পরিস্থিতি এসে যেতো।

অনেক কষ্টের পর এ বছরই সবেমাত্র এই অবরোধ ভেঙ্গেছিলো। নবী (সা) চাচা আবু তালিব, যিনি দশ বছর ধরে তাঁর জন্য ঢাল স্বরূপ ছিলেন ঠিক এই সময় ইন্তেকাল করেন। এই দুর্ঘটনার পর এক মাস যেতে না যেতেই তাঁর জীবন সঙ্গিনী হযরত খাদীজাও ইন্তেকাল করেন যিনি নবুওয়াত জীবনের শুরু থেকে ঐ সময় পর্যন্ত নবীর (সা) জন্য প্রশান্তি ও সান্তনার কারণ হয়ে ছিলেন। একের পর এক এসব দুঃখ কষ্ট আসার কারণে নবী (সা) এ বছরটিকে (عام الحزن) "আমুল হুযন" বা দুঃখ বেদনার বছর বলে উলেখ করতেন।

হযরত খাদীজা ও আবু তালিবের মৃত্যুর পর মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে আরো অধিক সাহসী হয়ে উঠলো এবং তাঁকে আগের চেয়ে বেশী উত্যক্ত করতে শুরু করলো। এমন কি তাঁর জন্য বাড়ীর বাইরে বের হওয়াও কঠিন হয়ে উঠলো। ইবনে হিশাম সেই সময়ের একটি ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন কুরাইশদের এক বখাটে লোক জনসমক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথায় ধূলা নিক্ষেপ করে।

অবশেষে তিনি তায়েফে গমন করলেন। উদ্দেশ্য সেখানে বনী সাকীফ গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেবেন। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে অন্তত এ মর্মে তাদের সম্মত করাবেন যেন তাঁকে তাদের কাছে শান্তিতে থেকে তারা ইসলামের কাজ করার সুযোগ দেবে। সেই সময় তাঁর কাছে কোন সওয়ারীর জন্তু পর্যন্ত ছিল না। মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত গোটা পথ তিনি পায়ে হেঁটে অতিক্রম করলেন। কোন কোন বর্ণনা অনুসারে তিনি একাই তায়েফ গিয়েছিলেন এবং কোন কোন বর্ণনা অনুসারে শুধু যায়েদ ইবনে হারেসা তাঁর সাথে ছিলেন। সেখানে পৌছার পর তিনি কয়েক দিন সেখানে অবস্থান করলেন এবং সাকীফের নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে আলাপ করলেন। কিন্তু তারা তাঁর কোন কথা যে মানলো না শুধু তাই নয়, বরং স্পষ্ট ভাষায় তাদের শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার হুকুম শুনিয়ে দিল। কেননা তারা শংকিত হয়ে পড়েছিলো তাঁর প্রচার তাদের যুবক শ্রেণীকে বিগড়ে না দেয়। সুতরাং বাধ্য হয়েই তাঁকে তায়েফ ত্যাগ করতে হলো। তিনি তায়েফ ত্যাগ করার সময় সাকীফ গোত্রের নেতারা তাদের বখাটে ও পাণ্ডাদের তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল। তারা পথের দুই পাশ দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত তাঁর প্রতি বিদ্রুপবাণ নিক্ষেপ, গালিবর্ষণ এবং পাথর ছুঁড়ে মারতে মারতে অগ্রসর হতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত তিনি আহত হয়ে অবসন্ন হয়ে পড়লেন এবং তাঁর জুতা রক্তে ভরে গেলো। এ অবস্থায় তিনি তায়েফের বাইরে একটি বাগানের প্রাচীরের ছায়ায় বসে পড়লেন এবং আল্লাহর কাছে এই বলে ফরিয়াদ করলেন ঃ

হে আল্লাহ! আমি শুধু তোমার কাছে আমার অসহায়ত্ব ও অক্ষমতা এবং মানুষের দৃষ্টিতে নিজের অমর্যাদা ও মূল্যহীনতার অভিযোগ করছি। হে সর্বাধিক দয়ালু ও করুণাময়!

তুমি সকল দুর্বলদের রব। আমার রবও তুমিই। তুমি আমাকে কার হাতে ছেড়ে দিচ্ছ? এমন কোন অপরিচিতের হাতে কি যে আমার সাথে কঠোর আচরণ করবে? কিংবা এমন কোন দুশমনের হাতে কি যে আমার বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করবে? তুমি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হও তাহলে আমি কোন বিপদের পরোয়া করি না। তবে তোমার নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভ করলে সেটা হবে আমার জন্য অনেক বেশী প্রশস্ততা। আমি আশ্রয় চাই তোমার সত্তার সেই নূরের যা অন্ধকারকে আলোকিত এবং দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারসমূহকে পরিশুদ্ধ করে। তোমার গযব যেন আমার ওপর নাযিল না হয় তা থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করো এবং আমি যেন তোমার ক্রোধ ও তিরস্কারের যোগ্য না হই। তোমার মর্জিতেই আমি সন্তুষ্ট যেন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। তুমি ছাড়া আর কোন জোর বা শক্তি নেই।" (ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬২)

ভগ্ন হৃদয় ও দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে ফিরে যাওয়ার পথে যখন তিনি "কারনুল মানাযিল" নামক স্থানের নিকটবর্তী হলেন তখন মাথার ওপর মেঘের ছায়ার মত অনুভব করলেন। দৃষ্টি তুলে চেয়ে দেখলেন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম সামনেই হাজির। জিবরাঈল ডেকে বললেন ঃ "আপনার কওম আপনাকে যে জবাব দিয়েছে আল্লাহ তা শুনেছেন। এই তো আল্লাহ পাহাড়ের ব্যবস্থাপক ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন। আপনি যা ইচ্ছা তাকে নির্দেশ দিতে পারেন।" এরপর পাহাড়ের ব্যবস্থাপক ফেরেশতা তাঁকে সালাম দিয়ে আরজ করলেন ঃ আপনি যদি আদেশ দেন তাহলে দুই দিকের পাহাড় এই সব লোকদের ওপর চাপিয়ে দেই।" তিনি বললেন ঃ না, আমি আশা করি আল্লাহ তাদের বংশে এমন সব লোক সৃষ্টি করবেন যারা এক ও লা–শরীক আল্লাহর দাসত্ব করবে।" (বুখারী, বাদউল খালক, যিকরুল মালাইকা, মুসলিম, কিতাবুল মাগাযী, নাসায়ী, আলবু'য়স)।

এরপর তিনি নাখলা নামক স্থানে গিয়ে কয়েক দিনের জন্য অবস্থান করলেন। এখন কিভাবে মক্কায় ফিরে যাবেন সে কথা ভাবছিলেন।

তায়েফে যা কিছু ঘটেছে সে খবর হয়তো সেখানে ইতিমধ্যেই পৌছে গিয়েছে। এখন তো কাফেররা আগের চেয়েও দুঃসাহসী হয়ে উঠবে। এই সময়ে একদিন রাতের বেলা যখন তিনি নামাযে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করছিলেন সেই সময় জিনদের একটি দল সেখানে এসে হাজির হলো। তারা কুরআন শুনলো, তার প্রতি ঈমান আনলো এবং ফিরে গিয়ে নিজ জাতির মধ্যে ইসলামের প্রচার শুরু করলো। আল্লাহ তাঁর নবীকে এই সুসংবাদ দান করলেন যে, আপনার দাওয়াত শুনে মানুষ যদিও দূরে সরে যাচ্ছে, কিন্তু বহু জিন তার ভক্ত অনুরক্ত হয়ে পড়েছে এবং তারা একে স্বজাতির মধ্যে প্রচার করছে।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এই পরিস্থিতিতে সূরাটি নাযিল হয়। যে ব্যক্তি একদিকে নাযিল হওয়ার এই পরিস্থিতি সামনে রাখবে এবং অন্য দিকে গভীর মনোনিবেশ সহকারে সূরাটি পড়বে তার মনে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকবে না যে এটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী নয়। বরং "এটি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।" কেননা, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা সূরার মধ্যে কোথাও সেই ধরনের মানবিক আবেগ ও প্রতিক্রিয়ার সামান্য লেশ মাত্র নেই যা সাধারণত এরূপ পরিস্থিতির শিকার মানুষের

মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হয়। এটা যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী হতো যাকে একের পর এক বড় বড় দুঃখ-বেদনা ও মুসিবত এবং তায়েফের সাম্প্রতিক আঘাত দুর্দশার চরমে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলো—তাহলে এই পরিস্থিতির কারণে তাঁর মনের যে অবস্থা ছিল সূরার মধ্যে কোথাও না কোথাও তার চিত্র দৃষ্টিগোচর হতো। উপরে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে দোয়া উদ্ধৃত করেছি তার প্রতি একটু লক্ষ্য করুন। সেটা তাঁর নিজের বাণী। ঐ বাণীর প্রতিটি শব্দ সেই পরিস্থিতিরই চিত্রায়ন। কিন্তু এই সূরাটি সেই একই সময়ে একই পরিস্থিতিতে তাঁরই মুখ থেকে বেরিয়েছে, অথচ সেই পরিস্থিতি জনিত প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

কাফেররা বহুবিধ গোমরাহীর মধ্যে শুধু ডুবেই ছিল না বরং প্রচণ্ড জিদ, গর্ব ও অহংকারের সাথে তা আঁকড়ে ধরে ছিল। আর যে ব্যক্তি এসব গোমরাহী থেকে তাদেরকে উদ্ধার করতে সচেষ্ট ছিল তাকে তারা তিরস্কার ও সমালোচনার লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছিলো। এই সব গোমরাহীর ফলাফল সম্পর্কে কাফেরদের সাবধান করাই সূরার মূল আলোচ্য বিষয়। তাদের কাছে দুনিয়াটা ছিল একটা উদ্দেশ্যহীন খেলার বস্তু। তারা এখানে নিজেদেরকে দায়িত্বহীন সৃষ্টি মনে করতো। তাদের মতে তাওহীদের দাওয়াত ছিল মিথ্যা। তাদের উপাস্য আল্লাহর অংশীদার, তাদের এ দাবীর ব্যাপারে তারা ছিল একগুঁয়ে ও আপোষহীন। কুরআন আল্লাহর বাণী একথা মানতে তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। রিসালাত সম্পর্কে তাদের মন-মগজে ছিল একটি অদ্ভুত জাহেলী ধারণা এবং সেই ধারণার ভিত্তিতে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের দাবী পরখ করার জন্য নানা ধরনের অদ্ভুত মানদণ্ড পেশ করছিলো। তাদের মতে ইসলামের সত্য না হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ছিল এই যে, তাদের নেতৃবৃন্দ, বড় বড় গোত্রীয় সর্দার এবং তাদের কওমের গবুচন্দ্ররা তা মেনে নিচ্ছিলো না এবং শুধু কতিপয় যুবক, কিছু সংখ্যক দরিদ্র লোক এবং কতিপয় ক্রীতদাস তার ওপর ঈমান এনেছিলো। তারা কিয়ামত, মৃত্যুর পরের জীবন এবং শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয়কে মনগড়া কাহিনী বলে মনে করতো। তাদের ধারণা ছিল, বাস্তবে এসব ঘটা একেবারেই অসম্ভব।

এ সূরায় এসব গোমরাহীর প্রত্যেকটিকে সংক্ষেপে যুক্তি-প্রমাণসহ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং কাফেরদের এই বলে সাবধান করা হয়েছে যে, তোমরা বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে সত্য ও বাস্তবতা বুঝার চেষ্টা করার পরিবর্তে যদি গোড়ামি ও হঠকারিতার মাধ্যমে কুরআনের দাওয়াত ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতকে প্রত্যাখ্যান করো তাহলে নিজেদের ভবিষ্যত নিজেরাই ধ্বংস করবে।

আয়াত ৩৫ **সূরা আল আহক্বাফ–মক্কী** রুকূ' ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও মেহেরবান আল্লাহর নামে

حٰمٓ ۝١ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝٢ مَا خَلَقْنَا
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَالَّذِيْنَ
كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ۝٣ قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ؕ
اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ۝٤

হা–মী–ম। এই কিতাব মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।[১] আমি যমীন ও আসমান এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে যথার্থ সত্যের ভিত্তিতে বিশেষ সময় নির্ধারিত করে সৃষ্টি করেছি।[২] কিন্তু যে বিষয়ে এই কাফেরদের সাবধান করা হয়েছে তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে আছে।[৩]

হে নবী, এদের বলে দাও, "তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ডেকে থাকো কখনো কি তাদের ব্যাপারে ভেবে দেখেছো? আমাকে একটু দেখাও তো পৃথিবীতে তারা কি সৃষ্টি করেছে কিংবা আসমানসমূহের সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনায় তাদের কি অংশ আছে। যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে ইতিপূর্বে প্রেরিত কোন কিতাব কিংবা জ্ঞানের কোন অবশিষ্টাংশ (এসব আকীদা–বিশ্বাসের সমর্থনে) তোমাদের কাছে থাকলে নিয়ে এসো।"[৪]

১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরাতুয যুমার, টীকা ১ এবং সূরা আল জাসিয়া, টীকা ১, এর সাথে সূরা আস সিজদার এক নম্বর টীকাও যদি সামনে থাকে তাহলে এই ভূমিকার মূল ভাবধারা উপলব্ধি করা সহজ হবে।

২. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আন'আম, টীকা ৪৬; ইউনুস, টীকা ১১; ইবরাহীম, টীকা ৩৩; আল হিজর, টীকা ৪৭; আন নাহল, টীকা ৬; আল আম্বিয়া, টীকা ১৫ থেকে ১৭; আল মু'মিনুন, টীকা ১০২; আল আনকাবূত, টীকা ৭৫ ও ৭৬; লোকমান, টীকা ৫১; আদ দুখান, টীকা ৩৪ এবং আল জাসিয়া, টীকা ২৮।

৩. অর্থাৎ প্রকৃত সত্য হলো বিশ্ব জাহানের এই ব্যবস্থা উদ্দেশ্যহীন কোন খেলার বস্তু নয়, বরং একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থা যেখানে ভাল ও মন্দ এবং জালেম ও মজলুমের ফায়সালা অবশ্যই ইনসাফ মোতাবেক হতে হবে। আবার বিশ্ব জাহানের এই ব্যবস্থা স্থায়ীও নয়। এর জন্য একটা সময় নির্ধারিত আছে যা শেষ হওয়ার পর তাকে অবশ্যই ধ্বংস হতে হবে। তাছাড়া আল্লাহর আদালতের জন্যও একটা সময় নির্ধারিত আছে। সেই সময় আসলে তা অবশ্যই কায়েম হবে। কিন্তু যারা আল্লাহর রসূল ও তাঁর কিতাব মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তারা এসব সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে। তারা এ চিন্তা মোটেই করছে না যে, এমন এক সময় অবশ্যই আসবে যখন তাদেরকে নিজেদের কাজ-কর্মের জবাবদিহি করতে হবে। তারা মনে করে এসব পরম সত্য সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে আল্লাহর রসূল তাদের কোন ক্ষতি করেছেন। অথচ তিনি তাদের অনেক কল্যাণ করেছেন। কারণ, হিসাব, নিকাশ ও জবাবদিহির সময় আসার পূর্বেই তিনি তাদের শুধু বলেননি যে, সে সময় আসবে বরং যাতে তারা সে জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে সে জন্য কোন্ কোন্ বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে সাথে সাথে তাও বলে দিয়েছেন।

পরবর্তী বক্তব্য বুঝার জন্য এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ সম্পর্কে মানুষ তার আকীদা বা বিশ্বাস নির্ধারণে যে ভুল করে সেটিই তার সবচেয়ে বড় মৌলিক ভুল। এ ব্যাপারে ঢিলাঢালা ও উদাসীন ভাব দেখিয়ে কোন গভীর এবং গঠনমূলক চিন্তা ও বিশ্লেষণ ছাড়া ভাসা ভাসা, হালকা, অগভীর আকীদা গড়ে নেয়া এমন একটি বড় বোকামি যা পার্থিব জীবনে মানুষের চাল চলন ও আচার-আচরণকে এবং চিরদিনের জন্য তার পরিণামকে ধ্বংস করে ফেলে। কিন্তু যে কারণে মানুষ এই বিপজ্জনক গাছাড়া ভাব ও উদাসীনতার মধ্যে হারিয়ে যায় তা হলো, সে নিজেকে দায়িত্বহীন ও জবাবদিহি মুক্ত মনে করে এবং এই ভুল ধারণা পোষণ করে বসে যে, আমি আল্লাহ সম্পর্কে যে আকীদাই গ্রহণ করি না কেন তাতে কোন পার্থক্য সূচিত হয় না। কেননা, হয় মৃত্যুর পরে আদৌ কোন জীবন নেই যেখানে আমাকে কোন প্রকার জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে, কিংবা এমন কোন জীবন হবে যেখানে জবাবদিহি করতে হলেও আমি যেসব সত্তার আশ্রয় নিয়ে আছি তারা আমাকে খারাপ পরিণতি থেকে রক্ষা করবে। দায়িত্বানুভূতির এই অনুপস্থিতি ব্যক্তিকে ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুবিবেচনাহীন বানিয়ে দেয়। সে কারণে সে পরম নিশ্চিন্ততার সাথে নাস্তিকতা থেকে শুরু করে শিরকের চরম অযৌক্তিক পন্থা পর্যন্ত নানা ধরনের অর্থহীন আকীদা-বিশ্বাস নিজেই রচনা করে অথবা অন্যদের রচিত আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করে নেয়।

৪. যেহেতু শ্রোতারা একটি মুশরিক জাতির লোক তাই তাদের বলা হচ্ছে, দায়িত্বানুভূতির অনুপস্থিতির কারণে তারা না বুঝে শুনে কিভাবে এক চরম অযৌক্তিক আকীদা আঁকড়ে ধরে আছে। তারা আল্লাহকে বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা স্বীকার করার সাথে

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ۝٥ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا
لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ۝٦ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ
قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝٧ أَمْ يَقُولُونَ
افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۖ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ
وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝٨

সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশী পথভ্রষ্ট কে যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তাকে ডাকে যারা কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নয়।[৫] এমনকি আহবানকারী যে তাকে আহবান করছে সে বিষয়েও সে অজ্ঞ।[৬] যখন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে তখন তারা নিজেদের আহবানকারীর দুশমন হয়ে যাবে এবং ইবাদতকারীদের অস্বীকার করবে।[৭]

যখন এসব লোকদের আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ শুনানো হয় এবং সত্য তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করে তখন এই কাফেররা বলে এতো পরিষ্কার যাদু।[৮] তারা কি বলতে চায় যে, রসূল নিজেই এসব রচনা করেছেন?[৯] তাদের বলে দাও ঃ "আমি নিজেই যদি তা রচনা করে থাকি তাহলে কোন কিছু আমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারবে না। যেসব কথা তোমরা তৈরী করছো আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন। আমার ও তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য তিনিই যথেষ্ট।[১০] তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"[১১]

সাথে আরো বহু সত্তাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিলো। তাদের কাছে প্রার্থনা করতো, তাদেরকে নিজের প্রয়োজন পূরণকারী ও বিপদ ত্রাণকারী মনে করতো, তাদেরকে তোসামোদ করতো এবং নজর–নিয়াজ পেশ করতো এবং মনে করতো, আমাদের ভাগ্য গড়ার ও ভাঙার সমস্ত ক্ষমতা তাদেরই আছে। সেই সব ব্যক্তিদের সম্পর্কেই তাদের জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে, তোমরা কি কারণে তাদেরকে নিজেদের উপাস্যের মর্যাদা দান করেছো? একথা সবারই জানা যে, উপাস্য হওয়ার অধিকারে আল্লাহর সাথে কাউকে

অংশীদার করার দুটি ভিত্তি হতে পারে। সে ব্যক্তি নিজে কোন মাধ্যমের সাহায্যে জেনে নিয়েছে যে, যমীন ও আসমান সৃষ্টির ব্যাপারে সত্যিই তার কোন অংশ আছে, নয়তো আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন যে, খোদায়ীর কাজে অমুক ব্যক্তি আমার অংশীদার। এখন যদি কোন মুশরিক এ দাবী করতে না পারে যে তার উপাস্যদের আল্লাহর শরীক হওয়ার ব্যাপারে তার কাছে সরাসরি জ্ঞান আছে, অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত কোন কিতাবে দেখাতে না পারে যে আল্লাহ নিজেই কাউকে তাঁর শরীক ঘোষণা করেছেন, তাহলে তার এই আকীদা অবশ্যই চূড়ান্তরূপে ভিত্তিহীন।

এই আয়াতে "ইতিপূর্বে প্রেরিত কোন কিতাব" অর্থ এমন কোন কিতাব যা আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআন নাযিলের পূর্বে প্রেরিত হয়েছে। আর জ্ঞানের "অবশিষ্টাংশ" অর্থ প্রাচীনকালের নবী-রসূল ও নেক লোকদের শিক্ষার এমন কোন অংশ যা পরবর্তী বংশধরদের কাছে নির্ভরযোগ্য কোন সূত্রে পৌঁছেছে। এই দুটি সূত্রে মানুষ যা কিছুই লাভ করেছে তার মধ্যে শিরকের লেশমাত্র নেই। কুরআন যে তাওহীদের দিকে আহবান জানাচ্ছে সমস্ত আসমানী কিতাব সর্বসম্মতভাবে সেই তাওহীদই পেশ করছে। প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতটুকু স্মৃতিচিহ্ন অবশিষ্ট আছে তার মধ্যেও কোথাও এ প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, নবী, অলী বা নেক্কার ব্যক্তিগণ মানুষকে কখনো আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করার শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি কিতাব অর্থ যদি আল্লাহর কিতাব এবং জ্ঞানের অবশিষ্টাংশ অর্থ যদি নবী-রসূল ও নেক লোকদের রেখে যাওয়া জ্ঞান এই অর্থ গ্রহণ নাও করা হয় তাহলেও পৃথিবীর কোন জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ এবং দীনী বা দুনিয়াবী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন বিশেষজ্ঞের গবেষণা ও বিশ্লেষণেও আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন ইংগিত দেয়া হয়নি যে, পৃথিবী বা আসমানের অমুক বস্তু খোদা সৃষ্টি করেননি, বরং অমুক বুজর্গ অথবা অমুক দেবতা সৃষ্টি করেছে অথবা এই বিশ্ব জাহানে মানুষ যেসব নিয়ামত ভোগ করছে তার মধ্যে অমুক নিয়ামতটি আল্লাহর নয়, অমুক উপাস্যের সৃষ্টি।

৫. জবাব দেয়ার অর্থ কার্যত জবাবী, তৎপরতা দেখানো, শুধু মুখে উচ্চস্বরে জবাব দেয়া কিংবা লিখিতভাবে জবাব পাঠিয়ে দেয়া নয়। অর্থাৎ কেউ যদি সেই উপাস্যদের কাছে নালিশ বা সাহায্য প্রার্থনা করে, কিংবা তাদের কাছে দোয়া করে তাহলে যেহেতু তাদের আদৌ কোন শক্তি ও কর্তৃত্ব নেই তাই তার আবেদনে কোন প্রকার ইতিবাচক বা নেতিবাচক বাস্তব তৎপরতা চালাতে সক্ষম নয়। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আয যুমার, টীকা ৩৩)

কিয়ামত পর্যন্ত জবাব না দিতে পারার অর্থ হচ্ছে, যত দিন পর্যন্ত এই পৃথিবী আছে ততদিন পর্যন্ত ব্যাপারটা ওখানেই স্থির থাকবে। অর্থাৎ সেই সব উপাস্যদের পক্ষ থেকে তাদের আবেদনের কোন জবাব পাওয়া যাবে না। কিন্তু যখন কিয়ামত হবে তখন ব্যাপারটা আরো অগ্রসর হয়ে এই দাঁড়াবে যে, সেই সব উপাস্যরা উল্টা এসব উপাসনাকারীদের দুশমন হয়ে যাবে। পরের আয়াতে একথাই বলা হয়েছে।

৬. অর্থাৎ এসব আহবানকারীদের আহবান আদৌ তাদের কাছে পৌঁছে না। না তারা নিজের কানে তা শোনে, না অন্য কোন সূত্রে তাদের কাছে এ খবর পৌঁছে যে পৃথিবীতে কেউ তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে। আল্লাহর এ বাণীকে আরো পরিষ্কার করে এভাবে বুঝুন ঃ সারা পৃথিবীর মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া যেসব সত্তার কাছে প্রার্থনা করছে

তারা তিনভাগে বিভক্ত। এক, প্রাণহীন ও জ্ঞান-বুদ্ধিহীন সৃষ্টি। দুই, অতীতের বুযর্গ মানুষেরা। তিন, সেই সব পথভ্রষ্ট মানুষ যারা নিজেরাও নষ্ট ছিল এবং অন্যদেরও নষ্ট করে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছিলো। প্রথম প্রকারের উপাস্যদের তাদের উপাসনাকারীদের উপাসনা সম্পর্কে অনবহিত থাকা সুস্পষ্ট। এরপর থাকে দ্বিতীয় প্রকারের উপাস্য যারা ছিল আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী মানুষ। এদের অনবহিত থাকার কারণ দু'টি। একটি কারণ হচ্ছে, তারা আল্লাহর কাছে এমন একটি জগতে আছে যেখানে মানুষের আওয়াজ সরাসরি তাদের কাছে পৌছে না। আরেকটি কারণ হচ্ছে, যারা সারা জীবন যেসব মানুষকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা শিখিয়েছেন তারাই এখন উল্টা তাদের কাছে প্রার্থনা করছে আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতারা তাদের কাছে এ খবর পৌছিয়ে দেন না। কারণ, তাদের কাছে এই খবরের চেয়ে বেশী কষ্টদায়ক জিনিস আর কিছুই হতে পারে না। আল্লাহ তাঁর সেই নেক বান্দাদের কষ্ট দেয়া কখনো পসন্দ করেন না। এরপর তৃতীয় প্রকারের উপাস্যদের সম্পর্কে যদি চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন, তাদের অনবহিত থাকারও দুটি মাত্র কারণ। একটি কারণ হচ্ছে তারা আল্লাহর কাছে অপরাধী হিসেবে বিচারের অপেক্ষায় বন্দী। সেখানে দুনিয়ার কোন আবেদন-নিবেদন পৌছে না। আরেকটি কারণ হচ্ছে, আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতারাও তাদের এ খবর দেন না যে, পৃথিবীতে তোমাদের মিশন খুব সফলতা লাভ করেছে এবং তোমাদের মৃত্যুর পর মানুষ তোমাদেরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। কারণ এ খবর তাদের জন্য খুশীর কারণ হবে। অথচ আল্লাহ জালেমদের কখনো খুশী করতে চান না।

এ প্রসঙ্গে একথাও বুঝতে হবে যে, আল্লাহ তাঁর সৎ বান্দাদের কাছে দুনিয়ার মানুষের সালাম এবং তাদের রহমত কামনার দোয়া পৌছিয়ে দেন। কেননা এসব তাদের খুশীর কারণ হয়। একইভাবে তিনি অপরাধীদেরকে দুনিয়ার মানুষের অভিশাপ, ক্রোধ ও তিরস্কার সম্পর্কেও অবহিত করেন। যেমন একটি হাদীস অনুসারে বদর যুদ্ধে নিহত কাফেরদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরস্কার শুনানো হয়েছিলো। কারণ, তা ছিল তাদের জন্য কষ্টের ব্যাপার। কিন্তু যা নেককার বান্দাদের জন্য দুঃখ ও মনকষ্টের এবং অপরাধীদের জন্য আনন্দের কারণ হয় সে রকম বিষয় তাদের কাছে পৌছানো হয় না। এই ব্যাখ্যার সাহায্যে মৃতদের শুনতে পাওয়া সম্পর্কিত বিষয়টির তাৎপর্য অতি উত্তম রূপে সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

৭. অর্থাৎ তারা সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেবে, না আমরা কোন সময় তোমাদের একথা বলেছি যে, আমাদের ইবাদত করতে হবে, না আমাদের জানা আছে যে, এ লোকেরা আমাদের 'ইবাদত' করতো। এই গোমরাহীর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। তাই তার পরিণাম তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। এ গুনাহে আমাদের কোন অংশ নেই।

৮. এর অর্থ হচ্ছে, যখন কুরআনের আয়াতসমূহ মক্কার কাফেরদের শুনানো হতো তখন তারা পরিষ্কার উপলব্ধি করতো যে, এ বাণীর মর্যাদা মানুষের কথার চাইতে অনেক গুণ বেশী। কুরআনের অতুলনীয় অলংকার সমৃদ্ধ ভাষা হৃদয় বিমুগ্ধকারী ভাষণ, উন্নত বিষয় বস্তু এবং হৃদয় উত্তপ্তকারী বর্ণনাভংগির সাথে তাদের কোন কবি, বক্তা এবং শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিকের সাহিত্য কর্মেরও কোন তুলনাই ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বাণীর মধ্যে যে উৎকর্ষতা ছিল নবী সাল্লাল্লাহ

আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের বাণীর মধ্যেও তা ছিল না। যারা শৈশব থেকে তাঁকে দেখে আসছিলো তারা কুরআনের ভাষা এবং তাঁর ভাষার মধ্যে কত বড় পার্থক্য ছিল তা ভাল করেই জানতো। এক ব্যক্তি, যে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে রাত দিন তাদের মাঝেই অবস্থান করে আসছে সে হঠাৎ কোন সময় এমন এক বাণী রচনা করে ফেলছে যার ভাষার তাঁর নিজের জানা ভাষার সাথে আদৌ কোন মিল নেই, একথা বিশ্বাস করা তাদের জন্য মোটেই সম্ভব ছিল না। এই জিনিসটি তাদের সামনে সত্যকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে তুলে ধরছিলো। কিন্তু তারা যেহেতু কুফরীকে আঁকড়ে ধরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, তাই এই সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখেও এই বাণীকে অহীর বাণী হিসেবে মেনে নেয়ার পরিবর্তে বলতো যে, তা কোন যাদুর কারসাজি। (আরো যে দিকটি বিচার করে তারা কুরআনকে যাদু বলে আখ্যায়িত করতো তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমরা ইতিপূর্বেই করেছি। দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আম্বিয়া, টীকা ৫; সূরা সোয়াদের তাফসীর, টীকা ৫)।

৯. এই প্রশ্নমূলক বর্ণনাভংগির মধ্যে অতি বিস্ময় পরিলক্ষিত হয়। এর অর্থ হচ্ছে, এরা কি এতই নির্লজ্জ যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে কুরআন নিজে রচনা করার অপবাদ আরোপ করে। অথচ এরা ভাল করেই জানে যে, এটা তাঁর রচিত বাণী হতে পারে না। তাছাড়া এ বাণীকে তাদের যাদু বলা পরিষ্কারভাবে একথাই স্বীকার করে নেয়া যে, এটা একটা অসাধারণ বাণী যা তাদের নিজেদের মতেও কোন মানুষের রচনা হওয়া সম্ভব নয়।

১০. তাদের অপবাদ যে ভিত্তিহীন এবং সরাসরি হঠকারিতামূলক তা যেহেতু সম্পূর্ণ স্পষ্ট ছিল তাই তার প্রতিবাদে যুক্তি প্রমাণ পেশ করার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। অতএব, শুধু একথা বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে, যদি প্রকৃতই আমি নিজে একটি বাণী রচনা করে তা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করার মত মহা অপরাধ করে থাকি—যে অভিযোগে তোমরা আমাকে অভিযুক্ত করছো—তাহলে সে ক্ষেত্রে আমাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্য তোমরা আসবে না। কিন্তু এটা যদি আল্লাহরই বাণী হয়ে থাকে আর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তোমরা তা প্রতিরোধ করে থাকো তাহলে তোমাদের সাথে আল্লাহই বুঝাপড়া করবেন। প্রকৃত সত্য আল্লাহর অজানা নয়। সুতরাং মিথ্যা ও সত্যের ফায়সালার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। সারা পৃথিবী যদি কাউকে মিথ্যাবাদী বলে আর আল্লাহর কাছে সে সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যই তার পক্ষে হবে। আর গোটা পৃথিবী যদি কাউকে সত্যবাদী বলে কিন্তু আল্লাহর কাছে সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত সে মিথ্যাবাদীই সাব্যস্ত হবে। অতএব, আবোল তাবোল না বলে নিজের পরিণামের কথা চিন্তা করো।

১১. এখানে এ আয়াতাংশের দুটি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা। যারা আল্লাহর বাণীকে মিথ্যা বানোয়াট বলে আখ্যায়িত করতে কুণ্ঠিত নয়, এই দয়া ও ক্ষমার কারণেই তারা পৃথিবীর বুকে বেঁচে আছে। কোন নির্দয় ও কঠোর আল্লাহ যদি এই বিশ্ব জাহানের মালিক হতেন তাহলে এরূপ ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারীদের একটি শ্বাস গ্রহণের পর আরেকটি শ্বাস গ্রহণের ভাগ্য হতো না। এ আয়াতাংশের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে এই যে, হে জালেমরা এখনো যদি এই হঠকারিতা থেকে বিরত হও তাহলে আল্লাহর

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ ۖ
إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحٰى إِلَيَّ وَمَآ أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٩ قُلْ أَرَءَيْتُمْ
إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ
عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۖ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝١٠

এদের বলো, 'আমি কোন অভিনব রসূল নই। কাল তোমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে এবং আমার সাথেই বা কি আচরণ করা হবে তা আমি জানি না। আমি তো কেবল সেই অহীর অনুসরণ করি যা আমার কাছে পাঠানো হয় এবং আমি সুস্পষ্ট সাবধানকারী ছাড়া আর কিছুই নই।[১২] হে নবী (সা)! তাদের বলো, 'তোমরা কি কখনো একথা ভেবে দেখেছো, যদি এই বাণী আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসে থাকে আর তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করো (তাহলে তোমাদের পরিণাম কি হবে)?[১৩] এ রকম একটি বাণী সম্পর্কে তো বনী ইসরাঈলদের একজন সাক্ষী সাক্ষ্যও দিয়েছে। সে ঈমান এনেছে। কিন্তু তোমরা আত্মম্ভরিতায় ডুবে আছো।[১৪] এ রকম জালেমদের আল্লাহ হিদায়াত দান করেন না।"

রহমতের দরজা তোমাদের জন্য খোলা আছে এবং অদ্যাবধি তোমরা যা কিছু করেছো তা মাফ হতে পারে।

১২. এ বাণীর পটভূমি এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নিজেকে আল্লাহর রসূল হিসেবে পেশ করলেন তখন মক্কার লোকেরা একথা শুনে নানা রকম কথা বলতে শুরু করলো। তারা বলতো ঃ এ আবার কেমন রসূল যার সন্তানাদি আছে, যে বাজারে যায়, পানাহার করে এবং আমাদের মত মানুষের ন্যায় জীবন যাপন করে। তাহলে তার মধ্যে আলাদা কি বৈশিষ্ট আছে যে দিক দিয়ে সে সাধারণ মানুষের চেয়ে ভিন্ন এবং যার ফলে আমরাও বুঝতে পারবো যে, আল্লাহ বিশেষভাবে এই ব্যক্তিকেই তাঁর রাসূল বানিয়েছেন? তারা আরো বলতো, আল্লাহ যদি এই ব্যক্তিকেই তাঁর রসূল বানাতেন তাহলে তার আরদালী হিসেবে কোন ফেরেশতা পাঠাতেন। সেই ফেরেশতা ঘোষণা করতো, তিনি আল্লাহর রসূল। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে সামান্যতম বে-আদবীও করতো সে তাকেই শাস্তি স্বরূপ বেত্রাঘাত করতো। আল্লাহ যাকে তাঁর রাসূল হিসেবে নিয়োগ করবেন তাঁকে মক্কার অলিতে গলিতে এভাবে চলতে এবং সবরকম জুলুম-অত্যাচার বরদাশত করার জন্য অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবেন তা কি করে হতে পারে? আর কিছু না হলেও অন্তত এতটুকু হতো যে, আল্লাহ তাঁর রসূলের জন্য একটি জাঁকালো রাজ প্রাসাদ এবং একটি সবুজ-শ্যামল তরজাতা বাগান তৈরী করে দিতেন। তাহলে তাঁর রসূলের স্ত্রীর অর্থ-সম্পদ যখন নিঃশেষ হতো তখন তাঁর অভুক্ত থাকার মতো পরিস্থিতি আসতো না এবং তায়েফ

যাওয়ার জন্য সওয়ারী থাকতো না। এমন অবস্থাও দেখা দিতো না তাছাড়াও তারা তাঁর কাছে নানা ধরনের মু'জিযার দাবী করতো এবং গায়েবী বিষয়ে তাঁর কাছে জানতে চাইতো। তাদের ধারণায় কোন ব্যক্তির আল্লাহর রসূল হওয়ার অর্থ ছিল সে অতিমানবিক শক্তির মালিক হবে। তাঁর একটি ইংগিতে পাহাড় স্থানচ্যুত হবে, চোখের পলকে মরুভূমি শ্যামল শস্য ক্ষেতে পরিণত হবে, অতীত ও ভবিষ্যত সব কিছু তাঁর জানা থাকবে এবং অদৃশ্য সব কিছু তাঁর কাছে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হবে।

আয়াতটির বিভিন্ন ছোট ছোট অংশে একথাগুলোরই জবাব দেয়া হয়েছে। এর প্রতিটি অংশের মধ্যেই ব্যাপক অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে।

একটি অংশে বলা হয়েছে, এদের বলো, "আমি অন্য রসূলদের থেকে ভিন্ন কোন রসূল নই।" অর্থাৎ আমাকে রসূল বানানো দুনিয়ার ইতিহাসে রসূল বানানোর প্রথম ঘটনা নয় যে, রসূল কি এবং কি নন তা বুঝতে তোমাদের কষ্ট হবে। আমার পূর্বে বহু রসূল এসেছিলেন। আমি তাদের থেকে আলাদা কিছু নই। পৃথিবীতে এমন কোন রসূল কখন এসেছেন যার সন্তানাদি ছিল না, কিংবা যিনি পানাহার করতেন না অথবা সাধারণ মানুষদের মত জীবন যাপন করতেন না? কোন্ রসূলের সাথে ফেরেশতা এসে তাঁর রিসালাতের ঘোষণা দিতো এবং তাঁর আগে আগে চাবুক হাতে চলতো? কোন্ রসূলের জন্য বাগান ও রাজ প্রাসাদ তৈরী করে দেয়া হয়েছে এবং আমি যে দুঃখ–কষ্ট বরদাশত করছি আল্লাহর পথে ডাকতে গিয়ে কে তা করেনি? এমন রসূল কে এসিছিলেন যিনি তাঁর ইচ্ছামত মু'জিযা দেখাতে পারতেন কিংবা নিজের জ্ঞান দিয়েই সব কিছু জানতেন? তাহলে শুধু আমার রিসালাত পরখ করে দেখার জন্য এই অভিনব ও স্বতন্ত্র মানদণ্ড তোমরা কোথা থেকে নিয়ে আসছো?

এর পরে বলা হয়েছে, জবাবে তাদের একথাও বলো, "কাল তোমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে এবং আমার সাথেই বা কি আচরণ করা হবে তা আমি জানি না।" আমি তো কেবল আমার কাছে প্রেরিত অহী অনুসরণ করি। অর্থাৎ আমি আলেমুল গায়েব নই যে, আমার কাছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সব কিছু সুস্পষ্ট থাকবে এবং দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসই আমার জানা থাকবে। তোমাদের ভবিষ্যত তো দূরের কথা আমার নিজের ভবিষ্যতও আমার জানা নেই। আমাকে অহীর মাধ্যমে যে জিনিস সম্পর্কে জ্ঞান দেয়া হয় আমি শুধু সেটাই জানি। এর চেয়ে বেশী জানার দাবী আমি কবে করেছিলাম? এমন জ্ঞানের অধিকারী রসূলই বা পৃথিবীতে কবে এসেছিলেন যে তোমরা আমার রিসালাত পরখ করার জন্য আমার গায়েবী জ্ঞানের পরীক্ষা নিতে চাচ্ছো। হারানো বস্তুর সন্ধান বলা, গর্ভবতী নারী পুত্র সন্তান প্রসব করবে না কণ্যা সন্তান এবং রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে না মারা যাবে এসব বলা কবে থেকে রসূলের কাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সব শেষে বলা হয়েছে, তাদের বলে দাও, "আমি সুস্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নই।" অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী নই যে, তোমরা প্রতিনিয়ত আমার কাছে যে মু'জিযার দাবী করছো তা দেখিয়ে দেবো। আমাকে যে কাজের জন্য পাঠানো হয়েছে তা শুধু এই যে, আমি মানুষের সামনে সঠিক পথ পেশ করবো এবং যারা তা গ্রহণ করবে না তাদেরকে এর মন্দ পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করে দেবো।

১৩. এ বিষয়টি ইতিপূর্বে অন্যভাবে সূরা হা–মীম আস–সাজদার ৫২ আয়াতে বলা হয়েছে। ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, উল্লেখিত সূরার তাফসীর, টীকা ৬৯।

১৪. মুফাসসিরদের একটি বড় দল এই সাক্ষী বলতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালামকে বুঝিয়েছেন। তিনি মদীনার একজন বড় ইহুদী আলেম ছিলেন। তিনি হিজরতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনেন। এ ঘটনা যেহেতু মদীনাতে সংঘটিত হয়েছিলো তাই মুফাসসিরদের মত হলো, এটি মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত। আয়াতটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো, হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের এই বর্ণনাই এ ব্যাখ্যার ভিত্তি। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে জারীর)। এ কারণেই ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদা, দাহ্হাক, ইবনে সিরীন, হাসান বাসারী, ইবনে যায়েদ এবং 'আওফ ইবনে মালেক আল–আশজায়ীর মত কিছু সংখ্যক বড় বড় মুফাসসিরও এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অপর দিকে ইকরিমা, শাবী ও মাসরুক বলেন ঃ এ আয়াত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম সম্পর্কে হতে পারে না। কারণ, গোটা সূরাই মক্কায় অবতীর্ণ। ইবনে জারীর তাবারীও এ মতটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর যুক্তি হলো, প্রথম থেকেই মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশ করে ধারাবাহিকভাবে গোটা বক্তব্য চলে আসছে এবং পরের সবটুকু বক্তব্যও তাদের উদ্দেশেই পূর্বাপর এই প্রসংগের মধ্যে হঠাৎ মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত এসে যাওয়া কল্পনা করা যায় না। পরবর্তীকালের যেসব মুফাসসির এই দ্বিতীয় মতটি গ্রহণ করেছেন তারা হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের বর্ণনাটি প্রত্যাখ্যান করেন না। তারা মনে করেন, আয়াতটি যেহেতু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালামের ঈমান গ্রহণের ব্যাপারেও খাটে তাই হযরত সা'দ প্রাচীনদের অভ্যাস অনুসারে বলেছেন এটি আবদুল্লাহ ইবনে সালাম সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, তিনি যখন ঈমান এনেছেন তখন এটি তাঁর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। বরং এর অর্থ হলো, এ আয়াত তাঁর বেলায়ও হুবহু ঠিক। তাঁর ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে এ আয়াত পুরোপুরি প্রযোজ্য।

বাহ্যত এই দ্বিতীয় মতটিই অধিক বিশুদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। এরপর আরো একটি প্রশ্নের সমাধান দেয়া দরকার যে, সাক্ষী বলতে এখানে কাকে বুঝানো হয়েছে? যেসব মুফাসসির এই দ্বিতীয় মতটি গ্রহণ করেছেন তাদের কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা মূসা আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী বাক্যাংশ, "সে ঈমান এনেছে। কিন্তু তোমরা আত্মম্ভরিতায় ডুবে আছো।"–এর এই ব্যাখ্যার সাথে কোন মিল নেই। মুফাসসির নিশাপুরী ও ইবনে কাসীর যে মত ব্যক্ত করেছেন সেটিই অধিক বিশুদ্ধ বলে মনে হয়। অর্থাৎ এখানে সাক্ষী অর্থ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি নয়, বরং বনী ইসরাঈলদের যে কোন সাধারণ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর বাণীর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, কুরআন তোমাদের সামনে যে শিক্ষা পেশ করছে তা কোন অভিনব জিনিস নয়। পৃথিবীতে প্রথমবারের মত শুধুমাত্র তোমাদের সামনেই তা পেশ করা হয়নি যে, তোমরা ওজর পেশ করে বলবে ঃ এ ধরনের কথা তো ইতিপূর্বে মানব জাতির কাছে আর আসেনি। তাই আমরা কি করে তা মানতে পারি। ইতিপূর্বেও এসব শিক্ষা এভাবেই অহীর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলদের কাছে তাওরাত ও অন্যান্য আসমানী কিতাব রূপে এসেছিলো। বনী ইসরাঈলদের একজন সাধারণ মানুষও তা মেনে নিয়েছিলো এবং একথা স্বীকার করে নিয়েছিলো যে, অহীই হচ্ছে এসব শিক্ষা নাযিল হওয়ার মাধ্যম। তাই অহী এবং এই

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ ؕ
وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَآ اِفْكٌ قَدِيْمٌ ﴿١١﴾ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ
مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ؕ وَهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ
اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١٣﴾ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ
الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾

২ রুকূ'

যারা মানতে অস্বীকার করেছে তারা মু'মিনদের সম্পর্কে বলে, এই কিতাব মেনে নেয়া যদি কোন ভাল কাজ হতো তাহলে এ ব্যাপারে এসব লোক আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হতে পারতো না।[১৫] যেহেতু এরা তা থেকে হিদায়াত লাভ করেনি তাই তারা অবশ্যই বলবে, এটা পুরনো মিথ্যা।[১৬] অথচ এর পূর্বে মূসার কিতাব পথ-প্রদর্শক ও রহমত হয়ে এসেছিলো। আর এ কিতাব তার সত্যায়নকারী, আরবী ভাষায় এসেছে যাতে জালেমদের সাবধান করে দেয়[১৭] এবং সৎ আচরণ গ্রহণ-কারীদের সুসংবাদ দান করে। যারা ঘোষণা করেছে আল্লাহই আমাদের রব, অতপর তার ওপরে স্থির থেকেছে নিশ্চয়ই তাদের জন্য কোন ভয় নেই এবং তারা মন মরা ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হবে না।[১৮] এ ধরনের সব মানুষ জান্নাতে যাবে। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে, তাদের সেই কাজের বিনিময়ে যা তারা পৃথিবীতে করেছিলো।

শিক্ষা দুর্বোধ্য জিনিস তোমরা সে দাবী করতে পার না। আসল কথা হলো, তোমাদের গর্ব, অহংকার এবং ভিত্তিহীন আত্মম্ভরিতা ঈমানের পথে অন্তরায়।

১৫. কুরাইশ নেতারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করার জন্য যেসব যুক্তি কাজে লাগাতো এটা তার একটা। তারা বলতো, 'এ কুরআন যদি সত্য হতো এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি একটি সঠিক জিনিসের দাওয়াত দিতেন তাহলে কওমের নেতারা, গোত্রসমূহের অধিপতিরা এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অগ্রসর হয়ে তা গ্রহণ করতো। এটা কি করে হতে পারে যে, কতিপয় অনভিজ্ঞ বালক এবং কিছু সংখ্যক নীচু পর্যায়ের ক্রীতদাস একটি যুক্তিসঙ্গত কথা মেনে নেবে কিন্তু কওমের গণ্যমান্য ব্যক্তি যারা জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ এবং আজ পর্যন্ত কওম যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করে আসছে তারা তা

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ
وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۙ
قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ
وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي
تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ
أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ
الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۝١٦

আমি মানুষকে এই মর্মে নির্দেশনা দিয়েছি যে, তারা যেন পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে। তার মা কষ্ট করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছিলো এবং কষ্ট করেই তাকে প্রসব করেছিলো। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধপান করাতে ত্রিশ মাস লেগেছে।[১৯] এমন কি যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছেছে এবং তারপর চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়েছে তখন বলেছে ঃ "হে আমার রব, তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যেসব নিয়ামত দান করেছো আমাকে তার শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক দাও। আর এমন সৎ কাজ করার তাওফীক দাও যা তুমি পসন্দ করো।[২০] আমার সন্তানদেরকে সৎ বানিয়ে আমাকে সুখ দাও। আমি তোমার কাছে তাওবা করছি। আমি নির্দেশের অনুগত (মুসলিম) বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।" এ ধরনের মানুষের কাছে থেকে তাদের উত্তম আমলসমূহ আমি গ্রহণ করে থাকি, তাদের মন্দ কাজসমূহ ক্ষমা করে দেই।[২১] যে প্রতিশ্রুতি তাদের দিয়ে আসা হয়েছে তা ছিলো সত্য প্রতিশ্রুতি। সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে এরা জান্নাতী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রাত্যাখ্যান করবে? নতুন এই আন্দোলনে মন্দ কিছু অবশ্যই আছে। তাই কওমের গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তা মানছে না। অতএব, তোমরাও তা থেকে দূরে সরে যাও, এই প্রতারণা মূলক যুক্তি খাড়া করে তারা সাধারণ মানুষকে শান্ত করে রাখার চেষ্টা করতো।

১৬. অর্থাৎ এসব লোক নিজেরাই নিজেদেরকে হক ও বাতিলের মানদণ্ড গণ্য করে রেখেছে। এরা মনে করে, এরা যে হিদায়াতকে গ্রহণ করবে না তাকে অবশ্যই গোমরাহী

ও পথভ্রষ্টতা হতে হবে। কিন্তু এরা একে নতুন মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করার সাহস রাখে না। কারণ, এর আগের যুগের নবী-রসূলগণ এ শিক্ষাই পেশ করেছেন এবং আহলে কিতাবদের কাছে যেসব আসমানী কিতাব আছে তার সবই এ আকীদা-বিশ্বাস ও নির্দেশনায় ভরপুর। এ কারণে এরা একে পুরনো মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করে। যারা হাজার হাজার বছর ধরে এসব সত্য পেশ করে এসেছে এবং মেনেছে এদের মতে তারা সবাই জ্ঞান-বুদ্ধি থেকে বঞ্চিত। সমস্ত জ্ঞান শুধু এদের অংশেই পড়েছে।

১৭. অর্থাৎ সেই সব লোককে খারাপ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেবেন যারা আল্লাহর সাথে কুফরী এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদের দাসত্ব করে নিজের এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতি জুলুম করছে এবং নিজের এই গোমরাহীর কারণে নৈতিক চরিত্র ও কর্মের এমন সব ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্যে ডুবে আছে যার ফলে মানব সমাজ নানা প্রকার জুলুম-অত্যাচার ও বে-ইনসাফীতে ভরে উঠেছে।

১৮. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা হা-মীম আস-সাজদা, টীকা ৩৩ থেকে ৩৫।

১৯. সন্তানদের যদিও মা-বাপ উভয়েরই সেবা করতে হবে কিন্তু গুরুত্বের দিক দিয়া মায়ের অধিকার এ কারণে বেশী যে, সে সন্তানের জন্য বেশী কষ্ট স্বীকার করে। এ আয়াত এ দিকেই ইংগিত করে। একটি হাদীস থেকেও এ বিষয়টি জানা যায়। কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য সহ হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমদ এবং ইমাম বুখারীর আদাবুল মুফরাদে উল্লেখিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি নবীকে (সা) জিজ্ঞেস করলো, আমার ওপর কার খেদমতের হক সবচেয়ে বেশী? নবী (সা) বললেন ঃ তোমার মা'র; সে বললো ঃ তারপর কে? তিনি বললেন ঃ তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করলো ঃ তারপর কে? তিনি বললেন ঃ তোমার মা। সে আবারো জিজ্ঞেস করলো ঃ তারপর কে? তিনি বললেন ঃ তোমার বাপ। নবীর (সা) এই বাণী হুবহু এ আয়াতেরই ব্যাখ্যা। কারণ, এতেও মায়ের তিনগুণ বেশী অধিকারের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে ঃ (১) কষ্ট করে মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে। (২) কষ্ট করেই তাকে প্রসব করেছে এবং (৩) গর্ভধারণ ও দুধ পান করাতে ৩০ মাস লেগেছে।

এ আয়াত, সূরা লোকমানের ১৪ আয়াত এবং সূরা বাকারার ২৩৩ আয়াত থেকে আরো একটি আইনগত বিষয় পাওয়া যায়। একটি মামলায় হযরত আলী ও হযরত ইবনে আব্বাস সেই বিষয়টিই তুলে ধরেছিলেন এবং তার ওপর ভিত্তি করে হযরত উসমান (রা) তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছিলেন। ঘটনাটা হচ্ছে, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত যুগে এক ব্যক্তি জুহায়না গোত্রের একটি মেয়েকে বিয়ে করে এবং বিয়ের ছয় মাসের মধ্যেই তার গর্ভ থেকে একটি সুস্থ ও ত্রুটিহীন শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। লোকটি হযরত উসমানের কছে ঘটনাটা পেশ করে। তিনি উক্ত মহিলাকে ব্যভিচারিনী ঘোষণা করে তাকে রজম করার নির্দেশ দেন। হযরত আলী (রা) এই ঘটনা শোনা মাত্র হযরত উসমানের (রা) কাছে পৌঁছেন এবং বলেন ঃ আপনি এ কেমন ফায়সালা করলেন? জবাবে হযরত উসমান বললেন, বিয়ের ছয় মাস পরেই সে জীবিত ও সুস্থ সন্তান প্রসব করেছে। এটা কি তার ব্যভিচারিনী হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ নয়? হযরত আলী (রা) বললেন ঃ না এর পর তিনি কুরআন মজীদের উপরোক্ত আয়াত তিনটি ধারাবাহিকভাবে পাঠ করলেন। সূরা বাকরায়

আল্লাহ বলছেন ঃ "যে পিতা দুধ পানের পূর্ণ সময় পর্যন্ত দুধ পান করাতে চায় মায়েরা তার সন্তানকে পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে।" সূরা লোকমানে বলেছেন ঃ "তার দুধ ছাড়তে দুই বছর লেগেছে। সূরা আহক্বাফে বলেছেন ঃ "তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধ পান করাতে ত্রিশ মাস লেগেছে।" এখন ত্রিশ মাস থেকে যদি দুধ পানের দুই বছর বাদ দেয়া হয় তাহলে গর্ভ ধারণকাল ছয় মাস মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এ থেকে জানা যায়, গর্ভ ধারণের স্বল্পতম মেয়াদ ছয় মাস। এই সময়ের মধ্যে সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হতে পারে। অতএব, যে মহিলা বিয়ের ছয় মাস পরে সন্তান প্রসব করেছে তাকে ব্যভিচারিনী বলা যায় না। হযরত আলীর (রা) এই যুক্তি-প্রমাণ শুনে হযরত উসমান বললেন ঃ আমার মন-মস্তিষ্কে এ বিষয়টি আদৌ আসেনি। এরপর তিনি মহিলাটিকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। একটি বর্ণনাতে আছে, হযরত ইবনে আব্বাসও এ বিষয়ে হযরত আলীর মতকে সমর্থন করেছিলেন এবং তারপর হযরত উসমান তাঁর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছিলেন (ইবনে জারীর, আহকামুল কুরআন জাসসাস, ইবনে কাসীর)।

এ তিনটি আয়াত একত্রিত করে পাঠ করলে যেসব আইনগত বিধান পাওয়া যায় তা হচ্ছে ঃ

এক ঃ যে মহিলা বিয়ের পর ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করবে (অর্থাৎ তা যদি গর্ভপাত না হয়, বরং স্বাভাবিক প্রসব হয়) সে ব্যভিচারিনী সাব্যস্ত হবে এবং তার স্বামীর বংশ পরিচয়ে তার সন্তান পরিচিত হবে না।

দুই ঃ যে মহিলা বিয়ের ছয় মাস পর বা তার চেয়ে বেশী সময় পর জীবিত ও সুস্থ সন্তান প্রসব করবে শুধু এই সন্তান প্রসব করার কারণে তাকে ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করা যাবে না। তার স্বামীকে তার প্রতি অপবাদ আরোপের অধিকার দেয়া যেতে পারে না এবং তার স্বামী ঐ সন্তানের বংশ পরিচয় অস্বীকার করতে পারে না। সন্তান তারই বলে স্বীকার করা হবে এবং মহিলাকে শাস্তি দেয়া যাবে না।

তিন ঃ দুধপান করানোর সর্বাধিক মেয়াদ দুই বছর। এই বয়সের পর যদি কোন শিশু কোন মহিলার দুধ পান করে তাহলে সে তার দুধ মা হবে না এবং সূরা নিসার ২৩ আয়াতে দুধ পানের যে বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে তাও এই ধরনের দুধপানের বেলায় প্রযোজ্য হবে না। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা অধিক সতর্কতার জন্য দুই বছরের পরিবর্তে আড়াই বছরের মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন যাতে দুধপান করানোর কারণে যে সব বিষয় হারাম হয় সেই সব নাজুক বিষয়ে ভুল করার সম্ভাবনা না থাকে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা লোকমান, টীকা ২৩)

এখানে এ বিষয়টির অবগতি বে-ফায়েদা হবে না যে, সর্বাধুনিক মেডিকেল গবেষণা অনুসারে একটি শিশুকে পরিপুষ্টি ও পরিবৃদ্ধি লাভ করে জীবন্ত ভূমিষ্ঠ হওয়ার উপযোগী হতে হলে কমপক্ষে ২৮ সপ্তাহ মাতৃগর্ভে অবস্থান প্রয়োজন। এটা সাড়ে ছয় মাস সময়কালের সামান্য বেশী। ইসলামী আইনে আরো প্রায় অর্ধ মাস সুযোগ দেয়া হয়েছে। কারণ, একজন মহিলার ব্যভিচারিনী প্রমাণিত হওয়া এবং একটি শিশুর বংশ পরিচয় থেকে বঞ্চিত হওয়া বড় গুরুতর ব্যাপার। মা ও শিশুকে আইনগত এই কঠিন পরিণাম থেকে রক্ষা করার জন্য বিষয়টির নাজুকতা আরো বেশী সুযোগ পাওয়ার দাবী করে।

وَالَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِيْٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ
الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِيْ ۚ وَهُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ ۖ إِنَّ وَعْدَ
اللّٰهِ حَقٌّ ۖ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَآ إِلَّآ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿١٧﴾ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ
عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ
إِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٨﴾

আর যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বললো ঃ "আহ্! তোমরা বিরক্তির একশেষ করে দিলে। তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাচ্ছো যে, মৃত্যুর পর আমি আবার কবর থেকে উত্তোলিত হবো? আমার পূর্বে তো আরো বহু মানুষ চলে গেছে। (তাদের কেউ তো জীবিত হয়ে ফিরে আসেনি।)।" মা-বাপ আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলে ঃ "আরে হতভাগা, বিশ্বাস কর। আল্লাহর ওয়াদা সত্য।" কিন্তু সে বলে, "এসব তো প্রাচীনকালের বস্তাপচা কাহিনী" এরাই সেই সব লোক যাদের ব্যাপারে আযাবের সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। এদের পূর্বে জিন ও মানুষদের মধ্য থেকে (এই প্রকৃতির) যেসব ক্ষুদ্র দল অতীত হয়েছে এরাও গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হবে। নিশ্চয়ই এরা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার লোক।[২২]

তাছাড়া গর্ভ কোন্ সময় স্থিতি লাভ করেছে তা কোন ডাক্তার, কোন বিচারক এবং এমনকি মহিলা নিজে এবং তাকে গর্ভদানকারী পুরুষও সঠিকভাবে জানতে পারে না। এ বিষয়টিও গর্ভধারণের স্বল্পতম আইনগত মেয়াদ নির্ধারণে আরো কয়েক দিনের অবকাশ দাবী করে।

২০. অর্থাৎ আমাকে এমন সৎ কাজ করার তাওফীক দান করো যা বাহ্যিক দিক দিয়েও অবিকল তোমার বিধান মোতাবেক হবে এবং বাস্তবেও তোমার কাছে গৃহীত হওয়ার উপযুক্ত হবে। কোন কাজ যদি দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টিতে খুব ভালও হয়, কিন্তু তাতে যদি আল্লাহর আইনের আনুগত্য না করা হয়, তাহলে দুনিয়ার মানুষ তার যত প্রশংসাই করুক না কেন আল্লাহর কাছে তা আদৌ কোন প্রশংসার যোগ্য হতে পারে না। অপরদিকে একটা কাজ যদি অবিকল শরীয়ত মোতাবেক হয় এবং তার বাহ্যিক রূপ ও কাঠামোতে ত্রুটি নাও থাকে, কিন্তু অসৎ নিয়ত, প্রদর্শনীর মনোভাব, আত্মতুষ্টি, গর্ব ও অহংকার এবং স্বার্থ লোভ তাকে ভেতর থেকে অন্তসারশূন্য করে দেয়, এমন কাজও আল্লাহর কাছে গৃহীত হওয়ার যোগ্য থাকে না।

২১. অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে যত বেশী ভাল কাজ করেছে আখেরাতে সেই অনুপাতে তাদের মর্যাদা নিরূপণ করা হবে। তবে তাদেরকে পদস্খলন, দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ۭ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ
حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ
بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ﴿٢٠﴾

উভয় দলের প্রত্যেক মানুষের মর্যাদা হবে তাদের কর্ম অনুযায়ী। যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেন। তাদের প্রতি মোটেই জুলুম করা হবে না।[২৩] অতপর এসব কাফেরদের যখন আগুনের সামনে এনে দাঁড় করানো হবে তখন তাদের বলা হবে, 'তোমরা নিজের অংশের নিয়ামতসমূহ দুনিয়ার জীবনেই ভোগ করে নিঃশেষ করে ফেলোছো এবং তা ভোগ করেছো। কোন অধিকার ছাড়াই তোমরা পৃথিবীতে যে বড়াই করতে থেকেছো এবং যে নাফরমানি করেছো সে কারণে আজ তোমাদের লাঞ্ছনাকর আযাব দেয়া হবে।'[২৪]

জন্য পাকড়াও করা হবে না। এটা ঠিক তেমনি যেমন কোন মহত হৃদয়, উদার ও মর্যাদাবোধ সম্পন্ন মনিব তার অনুগত ও বিশ্বস্ত চাকরকে ছোট ছোট সেবা ও খেদমতের নিরিখে মূল্যায়ন করে না বরং তার এমন কোন কাজের বিচারে মূল্যায়ন করে যে ক্ষেত্রে সে বড় কোন কৃতিত্ব দেখিয়েছে কিংবা জীবনপাত ও বিশ্বস্ততার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে। এ রকম খাদেমের ছোট ছোট ত্রুটি–বিচ্যুতি তুলে ধরে সে তার সমস্ত সেবাকে খাটো করে দেখানোর মত আচরণ করে না।

২২. এখানে দুই রকম চরিত্র পাশাপাশি রেখে শ্রোতাদেরকে যেন নিঃশব্দ এই প্রশ্ন করা হয়েছে যে, বলো, এ দুটি চরিত্রের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম? সমাজে সেই সময় পাশাপাশি এই দুটি চরিত্রই বিদ্যমান ছিল। প্রথম প্রকার চরিত্রের অধিকারী কারা এবং দ্বিতীয় প্রকার চরিত্রের অধিকারী কারা তা জানা মানুষের জন্য আদৌ কঠিন ছিল না। এটা কুরাইশ নেতাদের এই উক্তির জবাব যে, এই কিতাব মেনে নেয়া যদি কোন ভাল কাজ হতো তাহলে এই কতিপয় যুবক ও ক্রীতদাস এ ব্যাপারে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হতে পারতো না। এই জবাবের আলোকে প্রতিটি মানুষ নিজেই বিচার করে দেখতে পারতো কিতাব মান্যকারীদের চরিত্র কি এবং অমান্যকারীদের চরিত্র কি?

২৩. অর্থাৎ না ভাল লোকদের ত্যাগ ও কুরবানী নষ্ট হবে না মন্দ লোকদেরকে তাদের প্রকৃত অপরাধের অধিক শাস্তি দেয়া হবে। সৎ ব্যক্তি যদি তার পুরস্কার থেকে বঞ্চিত থাকে কিংবা প্রকৃত প্রাপ্যের চেয়ে কম পুরস্কার পায় তাহলে তা জুলুম। আবার খারাপ লোক যদি তার কৃত অপরাধের শাস্তি না পায় কিংবা যতটা অপরাধ সে করেছে তার চেয়ে বেশী শাস্তি পায় তাহলে সেটাও জুলুম।

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ ۗ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن
بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا
تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٢﴾

৩ রুকূ'

এদেরকে 'আদের ভাই (হূদ)-এর কাহিনী কিছুটা শুনাও যখন সে আহক্বাফে তার কওমকে সতর্ক করেছিলো[২৫] -এ ধরনের সতর্ককারী পূর্বেও এসেছিলো এবং তার পরেও এসেছে—যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করো না। তোমাদের ব্যাপারে আমার এক বড় ভয়ংকর দিনের আযাবের আশংকা আছে। তারা বললো ঃ "তুমি কি এ জন্য এসেছো যে, আমাদের প্রতারিত করে আমাদের উপাস্যদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে দেবে? ঠিক আছে, তুমি যদি প্রকৃত সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আমাদের যে আযাবের ভীতি প্রদর্শন করে থাকো তা নিয়ে এসো।"

২৪. তারা যেমন বড়াই ও গর্ব করেছে লাঞ্ছনাকর আযাব হবে সেই অনুপাতে। তারা নিজেদের বড় একটা কিছু বলে মনে করতো। তাদের ধারণা ছিল রসূলের প্রতি ঈমান এনে গরীব ও অভাবী মু'মিনদের দলে শামিল হওয়া তাদের মর্যাদার চেয়ে নীচুমানের কাজ। তারা ভেবেছিলো, কতিপয় ক্রীতদাস ও সহায় সম্বলহীন মানুষ যে জিনিস বিশ্বাস করেছে আমাদের মত গণ্যমান্য লোকেরা যদি তা বিশ্বাস করে তাহলে তাতে আমাদের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হবে। এ কারণে আখেরাতে আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন এবং তাদের গর্ব ও অহংকার মাটিতে মিশিয়ে দেবেন।

২৫. যেহেতু কুরাইশ নেতারা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা পোষণ করতো এবং নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও মোড়লিপনার কারণে আনন্দে আত্মহারা ছিল তাই এখানে তাদেরকে আদ কওমের কাহিনী শুনানো হচ্ছে। আরবে আদ জাতি এভাবে পরিচিত ছিল যে, প্রাচীনকালে এই ভূখণ্ডে তারা ছিল সর্বাধিক শক্তিশালী কওম।

احقاف শব্দটি حقف শব্দের বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ বালুর এমন সব লম্বা লম্বা টিলা যা উচ্চতায় পাহাড়ের সমান নয়। পারিভাষিক অর্থে এটা আরব মরুভূমির (الربع الخالى) দক্ষিণ পশ্চিম অংশের নাম, বর্তমানে যেখানে কোন জনবসতি নেই। পরের পৃষ্ঠায় মানচিত্রে এর অবস্থান দেখুন ঃ

ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুসারে আদ কওমের আবাস ভূমি ওমান থেকে ইয়ামান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর কুরআন মজীদ আমাদের বলছে, তাদের আদি বাসস্থান ছিল আল-আহক্বাফ। এখান থেকে বেরিয়ে তারা আশেপাশের দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়েছিলো

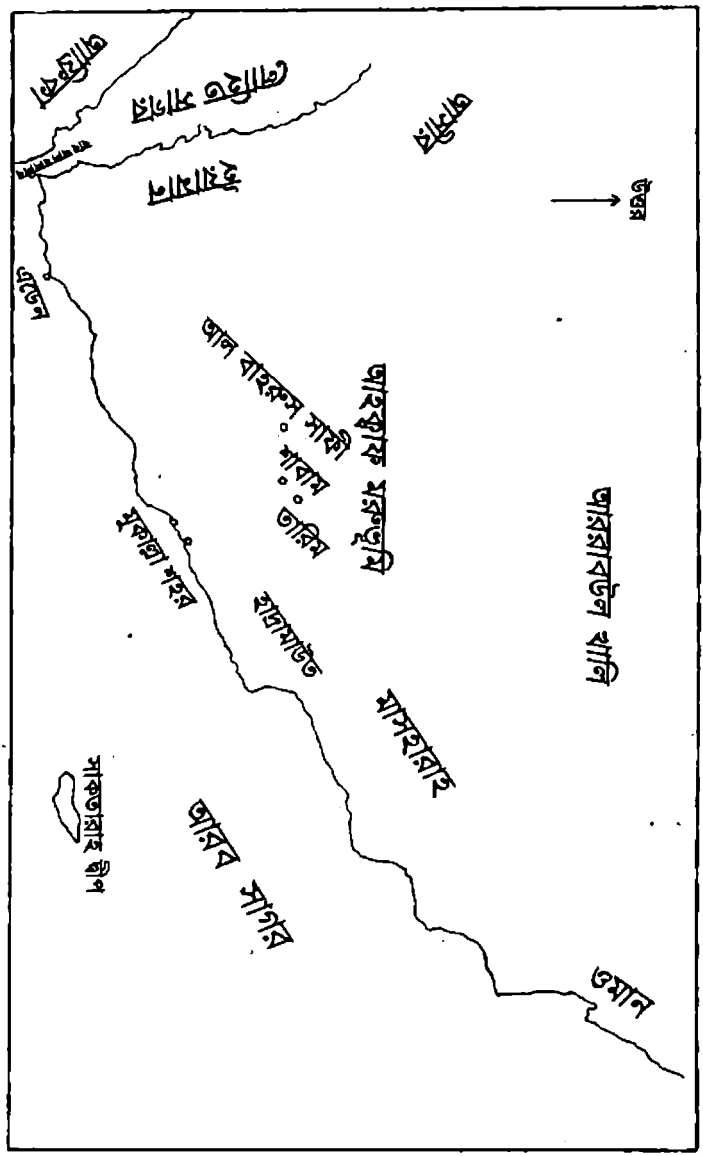

এবং দুর্বল জাতিসমূহকে গ্রাস করে ফেলেছিলো। বর্তমান কাল পর্যন্তও দক্ষিণ আরবের অধিবাসীদের মধ্যে একথা ছড়িয়ে আছে যে, এ এলাকাই ছিল আদ জাতির আবাস ভূমি। বর্তমানে "মুকাল্লা" শহর থেকে উত্তর দিকে ১২৫ মাইল দূরত্বে হাদ্রামাউতের একটি স্থানে লোকেরা হযরত হুদের (আ) মাযার তৈরী করে রেখেছে। সেটি হূদের কবর নামেই বিখ্যাত। প্রতি বছর ১৫ই শা'বান সেখানে 'উরস' হয়। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার লোক সেখানে সমবেত হয়। যদিও ঐতিহাসিকভাবে এ কবরটি হূদের কবর

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ ۖ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي
أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا
هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾

সে বললো ঃ এ ব্যাপারের জ্ঞান শুধু আল্লাহরই আছে।[২৬] যে পয়গাম দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে আমি শুধু সেই পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি। তবে আমি দেখছি, তোমরা অজ্ঞতা প্রদর্শন করছো।[২৭] পরে যখন তারা সেই আযাবকে তাদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখলো, বলতে শুরু করলো ঃ এই তো মেঘ, আমাদের 'ওপর প্রচুর বারিবর্ষণ করবে–না',[২৮] এটা বরং সেই জিনিস যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে। এটা প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস, যার মধ্যে কষ্টদায়ক আযাব এগিয়ে আসছে।

হিসেবে প্রমাণিত নয়। কিন্তু সেখানে তা নির্মাণ করা এবং দক্ষিণ আরবের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কম করে হলেও এতটুকু অবশ্যই প্রমাণ করে যে, আঞ্চলিক ঐতিহ্য এই এলাকাকেই আদ জাতির এলাকা বলে চিহ্নিত করে। এছাড়া হাদ্রামাউতে এমন কতিপয় ধ্বংসাবশেষ (Ruins) আছে যেগুলোকে আজ পর্যন্ত স্থানীয় অধিবাসীরা আদের আবাসভূমি বলে আখ্যায়িত করে থাকে।

আহক্বাফ অঞ্চলের বর্তমান অবস্থা দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে, এক সময় এখানে জাঁকালো সভ্যতার অধিকারী একটি শক্তিশালী জাতি বাস করতো। সম্ভবত হাজার হাজার বছর পূর্বে এটা এক উর্বর অঞ্চল ছিল। পরে আবহাওয়ার পরিবর্তন একে মরুভূমিতে পরিণত করেছে। বর্তমানে এই এলাকা একটি বিশাল মরুভূমি, যার আভ্যন্তরীণ এলাকায় যাওয়ার সাহসও কারো নেই। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ব্যাভেরিয়ার একজন সৈনিক এর দক্ষিণ প্রান্ত সীমায় পৌঁছেছিলো। তার বক্তব্য হলো ঃ যদি হাদ্রামাউতের উত্তরাঞ্চলের উচ্চ ভূমিতে দাঁড়িয়ে দেখা যায়, তাহলে বিশাল এই মরুপ্রান্তর এক হাজার ফুট নীচুতে দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে মাঝে মাঝে এমন সাদা ভূমিখণ্ড আছে যেখানে কোন বস্তু পতিত হলে তা বালুকা রাশির নীচে তলিয়ে যেতে থাকে এবং একেবারে পচে খসে যায়। আরব বেদুইনরা এ অঞ্চলকে ভীষণ ভয় করে এবং কোন কিছুর বিনিময়েই সেখানে যেতে রাজি হয় না। এক পর্যায়ে বেদুইনরা তাকে সেখানে নিয়ে যেতে রাজি না হলে সে একাই সেখানে চলে যায়। তার বর্ণনা অনুসারে এখানকার বালু একেবারে মিহিন পাউডারের মত। সে দূর থেকে তার মধ্যে একটি দোলক নিক্ষেপ করলে ৫ মিনিটের মধ্যেই তা তলিয়ে যায় এবং যে রশির সাথে তা বাঁধা ছিল তার প্রান্ত গলে যায়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন ঃ .

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ
نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ
سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ
وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ
بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٢٦﴾

তার রবের নির্দেশে প্রতিটি বস্তুকে ধ্বংস করে ফেলবে। অবশেষে তাদের অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, তাদের বসবাসের স্থান ছাড়া সেখানে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হতো না। এভাবেই আমি অপরাধীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।[২৯] আমি তাদেরকে এমন কিছু দিয়েছিলাম যা তোমাদের দেইনি।[৩০] আমি তাদেরকে কান, চোখ, হৃদয়-মন সব কিছু দিয়েছিলাম। কিন্তু না সে কান তাদের কোন কাজে লেগেছে, না চোখ, না হৃদয়-মন। কারণ, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো।[৩১] তারা সেই জিনিসের পাল্লায় পড়ে গেল যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।

- Arabia and the Isles, Harold Ingram, London, 1946.
The unveiling of Arabia. R. H. Kiman, London, 1937.
The Empty quarter, Phiby. London, 1933.

২৬. অর্থাৎ কবে তোমাদের ওপর আযাব আসবে তা শুধু আল্লাহই জানেন। তোমাদের ওপর কবে আযাব নাযিল করতে হবে এবং কতদিন পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেয়া হবে তার ফায়সালা করা আমার কাজ নয়।

২৭. অর্থাৎ নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে আমার এই সতর্কীকরণকে তোমরা তামাশার বস্তু বলে মনে করছো এবং খেলার সামগ্রীর মত আযাবের দাবী করে চলেছো। আল্লাহর আযাব যে কি ভয়াবহ জিনিস সে ধারণা তোমাদের নেই। তোমাদের আচরণের কারণে তা যে তোমাদের কাছে এসে গেছে সে বিষয়েও তোমরা অবগত নও।

২৮. এখানে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট নয় যে, কে তাদেরকে এই জবাব দিয়েছিলো। বক্তব্যের ধরন থেকে আপনাআপনি এ ইংগিত পাওয়া যায় যে, সেই সময় বাস্তব পরিস্থিতি তাদেরকে কার্যত যে জবাব দিয়েছিলো এটা ছিল সেই জবাব। তারা মনে করেছিলো এটা বৃষ্টির মেঘ, তাদের উপত্যকাসমূহ বর্ষণসিক্ত করার জন্য আসছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ছিল প্রচণ্ড ঝড়-তুফান, যা তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য এগিয়ে আসছিলো।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْأٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٧﴾ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا
اٰلِهَةً ۭ بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٨﴾
وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ
قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿٢٩﴾

৪ রুকূ'

আমি তোমাদের আশে পাশের এলাকায় বহু সংখ্যক জনপদ ধ্বংস করেছি। আমি আমার আয়াতসমূহ পাঠিয়ে বার বার নানাভাবে তাদের বুঝিয়েছি, হয়তো তারা বিরত হবে। কিন্তু আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব সত্তাকে তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিলো[৩২] তারা কেন তাদেরকে সাহায্য করলো না। বরং তারা তাদের থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিলো। এটা ছিল তাদের মিথ্যা এবং মনগড়া আকীদা-বিশ্বাসের পরিণাম, যা তারা গড়ে নিয়েছিলো।

(আর সেই ঘটনাও উল্লেখযোগ্য) যখন আমি জিনদের একটি দলকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছিলাম, যাতে তারা কুরআন শোনে।[৩৩] যখন তারা সেইখানে পৌঁছলো (যেখানে তুমি কুরআন পাঠ করছিলে) তখন পরস্পরকে বললো ঃ চুপ করো। যখন তা পাঠ করা শেষ হলো তখন তারা সতর্ককারী হয়ে নিজ কওমের কাছে ফিরে গেল।

২৯. আদ জাতির কাহিনী বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আ'রাফ, টীকা ৫১ থেকে ৫৬; হূদ, টীকা ৫৪ থেকে ৬৫; আল মু'মিনুন, টীকা ৩৪ থেকে ৩৭; আশ শূআরা, টীকা ৮৮ থেকে ৯৪; আল আনকাবূত, টীকা ৬৫; হা-মীম আস সাজদা, টীকা ২০ ও ২১।

৩০. অর্থাৎ অর্থ, সম্পদ, শক্তি, ক্ষমতা কোন বিষয়েই তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোন তুলনা হয় না। তোমাদের ক্ষমতার ব্যাপ্তি মক্কা শহরের বাইরে কোথাও নেই। কিন্তু তারা পৃথিবীর একটি বড় অংশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলো।

৩১. এই সংক্ষিপ্ত আয়াতাংশে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহর আয়াতসমূহই সেই জিনিস যা মানুষকে প্রকৃত সত্যের সঠিক উপলব্ধি ও জ্ঞান দান করে। মানুষের যদি এই জ্ঞান ও উপলব্ধি থাকে তাহলে সে চোখ দিয়ে টিকমত দেখতে পায়,

কান দিয়ে ঠিকমত শুনতে পায় এবং মন ও মস্তিষ্ক দিয়ে চিন্তা করতে ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু সে যখন আল্লাহর আয়াতসমূহ মানতে অস্বীকার করে তখন চোখ থাকা সত্ত্বেও ন্যায় ও সত্যকে চেনার মত দৃষ্টি লাভের সৌভাগ্য তার হয় না, কান থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি উপদেশ–বাণী শোনার বেলায় সে বধির হয় এবং মন ও মগজের যে নিয়ামত আল্লাহ তাকে দিয়েছেন তা দিয়ে সে উল্টা চিন্তা করে এবং একের পর এক ভ্রান্ত পরিণতির সম্মুখীন হতে থাকে। এমন কি তার সমস্ত শক্তি নিজের ধ্বংসসাধনেই ব্যয়িত হতে থাকে।

৩২. অর্থাৎ তারা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ঐ সব সত্তার সাথে ভক্তি শ্রদ্ধার সূচনা করেছিলো যে, এরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা। এদের অসীলায় আমরা আল্লাহর কাছে পৌঁছতে পারবো। কিন্তু এভাবে অগ্রসর হতে হতে তারা ঐ সব সত্তাকেই উপাস্য বানিয়ে নেয়। সাহায্যের জন্য তাদেরকেই ডাকতে থাকে, তাদের কাছেই প্রার্থনা করতে শুরু করে এবং তাদের সম্পর্কে এ বিশ্বাস পোষণ করতে থাকে যে, তারাই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মালিক, তাদের সাহায্যের আবেদনে তারাই সাড়া দেবে এবং বিপদ থেকে উদ্ধার তারাই করবে। তাদেরকে এই গোমরাহী থেকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ রসূলদের মাধ্যমে তাঁর আয়াত সমূহ পাঠিয়ে নানাভাবে তাদের বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তারা এই মিথ্যা খোদাদের দাসত্ব করতে বদ্ধপরিকর থাকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে এদেরকেই আঁকড়ে ধরে থাকার ব্যাপারে একগুঁয়েমি করতে থাকে। এখন বলো, যখন এই মুশরিক কওমের ওপর তাদের গোমরাহীর কারণে আল্লাহর আযাব আসলো তখন তাদের বিপদ ত্রাণকর্তা ও প্রার্থনা শ্রবণকারী উপাস্যরা কোথায় মরে পড়ে ছিলো? সেই দুর্দিনে তারা তাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসলো না কেন?

৩৩. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত যুবায়ের ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং হাসান বাসারী, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, যার ইবনু হুবায়েশ, মুজাহিদ, ইকরিমা ও অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিগণ থেকে যেসব বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে দেখা যায় তাঁরা সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, এ আয়াতে জিনদের প্রথম উপস্থিতির যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তা 'নাখলা' উপত্যকায় ঘটেছিলো। ইবনে ইসহাক, আবু নু'আইম ইসপাহানী এবং ওয়াকেদীর বর্ণনা অনুসারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তায়েফ থেকে নিরাশ হয়ে মক্কায় ফেরার পথে নাখলা প্রান্তরে অবস্থান করেছিলেন এটা তখনকার ঘটনা। সেখানে এশা, ফজর কিংবা তাহাজ্জুদের নামাযে তিনি কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। সেই সময় জিনদের একটি দল সে স্থান অতিক্রম করছিলো। তারা নবীর (সা). কিরায়াত শোনার জন্য থেমে পড়েছিলো। এর সাথে সাথে সমস্ত বর্ণনা এ ব্যাপারেও একমত যে, জিনেরা সেই সময় নবীর (সা) সামনে আসেনি, কিংবা তিনিও তাদের আগমন অনুভব করেননি। পরে আল্লাহ তাঁকে তাদের আগমনের এবং কুরআন তিলাওয়াত শোনার বিষয় অবহিত করেন।

যেখানে এ ঘটনা সংঘটিত হয়োছিলো সে স্থানটি ছিল اَلزَّيْمَه অথবা اَلسَّيْلُ الْكَبِيْر কারণ এ দুটি স্থানই নাখলা প্রান্তরে অবস্থিত। উভয় স্থানেই পানি ও উর্বরতা বিদ্যমান। তায়েফ থেকে আগমনকারীকে যদি তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করতে হয়

قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٠﴾ يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ
وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣١﴾

তারা গিয়ে বললো ঃ হে আমাদের কওমের লোকজন! আমরা এমন কিতাব শুনেছি যা মূসার পরে নাযিল করা হয়েছে। যা ইতিপূর্বেকার সমস্ত কিতাবকে সমর্থন করে, ন্যায় ও সঠিক পথপ্রদর্শন করে।[৩৪] হে আমাদের কওমের লোকেরা, আল্লাহর প্রতি আহবানকারীর আহবানে সাড়া দাও এবং তার প্রতি ঈমান আনো। আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মাফ করবেন এবং কষ্টদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবেন।[৩৫]

তাহলে এ দুটি স্থানের কোন একটিতে অবস্থান করতে পারে মানচিত্রে স্থান দুটির অবস্থান দেখুন ঃ

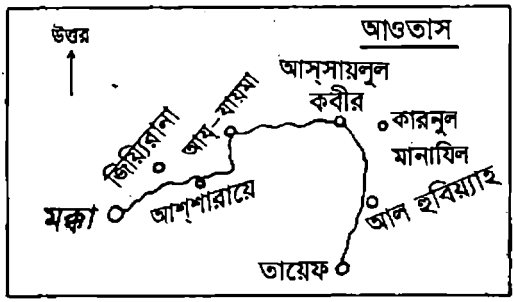

৩৪. এ থেকে জানা যায়, এসব জিন পূর্ব থেকে হযরত মূসা ও আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান রাখতো। কুরআন শোনার পর তারা বুঝতে পারলো পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণ যে শিক্ষা দিয়ে আসছেন এটাও সেই শিক্ষা। তাই তারা এই কিতাব এবং এর বাহক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনলো।

৩৫. নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহ থেকে জানা যায়, এরপর জিনদের প্রতিনিধি দল একের পর এক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসতে থাকে এবং তাঁর সাথে তাদের সামনা সামনি সাক্ষাত হতে থাকে। এ বিষয়ে হাদীস গ্রন্থসমূহে যেসব বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে তা একত্রিত করলে জানা যায়, হিজরতের পূর্বে মক্কায় এ রকম প্রায় ছয়টি প্রতিনিধি দল এসেছিলো।

وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ
دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ۭ اُولٰۗىِٕكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓي اَنْ يُّحْيِۦَ
الْمَوْتٰى ۭ بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى
النَّارِ ۭ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۭ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ۭ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝

আর যে[৩৫] আল্লাহর পক্ষ থেকে আহবানকারীর আহবানে সাড়া দেবে না সে না পৃথিবীতে এমন শক্তি রাখে যে আল্লাহকে নিরূপায় ও অক্ষম করে ফেলতে পারে, না তার এমন কোন সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক আছে যে আল্লাহর হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে। এসব লোক সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে ডুবে আছে।

যে আল্লাহ এই পৃথিবী ও আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলো সৃষ্টি করতে যিনি পরিশ্রান্ত হননি তিনি অবশ্যই মৃতদের জীবিত করে তুলতে সক্ষম, এসব লোক কি তা বুঝে না? কেন পারবেন না, অবশ্যই তিনি সব কিছু করতে সক্ষম। যে দিন এসব কাফেরকে আগুনের সামনে হাজির করা হবে সেদিন তাদের জিজ্ঞেস করা হবে, "এটা কি বাস্তব ও সত্য নয়?" এরা বলবে "হাঁ, আমাদের রবের শপথ, (এটা প্রকৃতই সত্য)।" আল্লাহ বলবেন ঃ "ঠিক আছে, তাহলে তোমরা যে অস্বীকার করতে তার পরিণতি হিসেবে এখন আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো।"

এসব প্রতিনিধি দলের একটি সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ একদিন রসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা রাত মক্কায় অনুপস্থিত ছিলেন। আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম এই ভেবে যে, তাঁর ওপর হয়তো আক্রমণ হয়ে থাকবে। প্রত্যুষে আমরা তাঁকে হেরা পর্বতের দিক থেকে আসতে দেখলাম। জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন ঃ এক জিন আমাকে সংগে করে নিতে এসেছিলো। আমি তার সাথে গিয়ে জিনদের একটি দলকে কুরআন শুনিয়েছি (মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদেরই আরো একটি বর্ণনা হচ্ছে, মক্কায়, একবার নবী (সা) সাহাবাদের (রা) বললেন ঃ আজ রাতে তোমাদের মধ্য থেকে কে আমার সাথে

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ
يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ۚ بَلَاغٌ ۚ
فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٥﴾

অতএব, হে নবী, দৃঢ়চেতা রসূলদের মত ধৈর্য ধারণ করো এবং তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না।[৩৭] এদেরকে এখন যে জিনিসের ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যেদিন এরা তা দেখবে সেদিন এদের মনে হবে যেন পৃথিবীতে অল্প কিছুক্ষণের বেশী অবস্থান করেনি। কথা পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছে। অবাধ্য লোকেরা ছাড়া কি আর কেউ ধ্বংস হবে?

জিনদের সাথে সাক্ষাতের জন্য যাবে। আমি তাঁর সাথে যেতে প্রস্তুত হলাম। মক্কার উচ্চভূমি এলাকায় এক স্থানে দাগ কেটে নবী (সা) আমাকে বললেন ঃ এটা অতিক্রম করবে না। অতপর তিনি এগিয়ে গেলেন এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলেন। আমি দেখলাম, বহু লোক তাঁকে ঘিরে আছে এবং তারা আমার ও নবীর (সা) মাঝে আড়াল করে আছে (ইবনে জারীর, বায়হাকী, দালায়েলুন নবুওয়াত, আবু নু'আইম ইসপাহানী)।

আরো একটি ক্ষেত্রেও রাতের বেলা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন এবং নবী (সা) মক্কার হাজুন নামক স্থানে জিনদের একটি মোকদ্দমার ফায়সালা করেছিলেন। এর বহু বছর পর ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফায় কৃষকদের একটি দলকে দেখে বলেছিলেন ঃ আমি হাজুনে জিনদের যে দলটিকে দেখেছিলাম তারা অনেকটা এই লোকগুলোর মত ছিল (ইবনে জারীর)।

৩৬. হতে পারে এই বাক্যাংশটি জিনদেরই উক্তির একটি অংশ। আবার এও হতে পারে যে, তাদের কথার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি যোগ করা হয়েছে। বক্তব্যের ধরন থেকে দ্বিতীয় মতটি অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

৩৭. অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তী নবী–রসূলগণ যেভাবে বছরের পর বছর ধরে ক্রমাগত ধৈর্য ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের জাতির অসন্তুষ্টি, বিরোধিতা, বাধা–বিপত্তি ও নানা রকম উৎপীড়নের মোকাবিলা করেছেন তুমিও সে রকম করো এবং কখনো মনে এরূপ ধারণাকে স্থান দিও না যে, হয় এসব লোক অনতিবিলম্বে ঈমান আনুক, নয়তো আল্লাহ তাদের ওপর আযাব নাযিল করুক।

মুহাম্মাদ

৪৭

নামকরণ

সূরার ২ নম্বর আয়াতের অংশ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যার মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান নামটি উল্লিখিত হয়েছে। এ ছাড়া এ সূরার আরো একটি বিখ্যাত নাম "কিতাল"। এ নামটি ২০নং আয়াতের وَذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ বাক্যটি থেকে গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

সূরার বিষয়বস্তু সাক্ষ দেয় যে, সূরাটি হিজরতের পরে এমন এক সময় মদীনায় নাযিল হয়েছিল যখন যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল বটে কিন্তু কার্যত যুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি। এ বিষয়ে বিস্তারিত দলীল–প্রমাণ পরে ৮নং টীকায় পাওয়া যাবে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

যে সময় এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল সে সময়ের পরিস্থিতি ছিল এই যে, বিশেষ করে পবিত্র মক্কা নগরীতে এবং সাধারণভাবে গোটা আরব ভূমির সর্বত্র মুসলমানদেরকে জুলুম নির্যাতনের লক্ষস্থল বানানো হচ্ছিলো এবং তাদের জীবন অত্যন্ত দুর্বিসহ করে দেয়া হয়েছিলো। মুসলমানগণ সমস্ত অঞ্চল থেকে এসে মদীনার নিরাপদ আশ্রয়ে জড়ো হয়েছিল। কিন্তু কুরাইশ গোত্রের কাফেররা এখানেও তাদেরকে শান্তিতে থাকতে দিতে প্রস্তুত ছিল না। মদীনার ক্ষুদ্র জনপদটি চারদিক থেকেই কাফেরদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েছিল। তারা এটিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। এ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের জন্য মাত্র দু'টি পথই খোলা ছিল। হয় তারা দীনে হকের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজই শুধু নয় বরং তার আনুগত্য ও অনুসরণও পরিত্যাগ করে জাহেলিয়াতের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। নয়তো জীবন বাজি রেখে প্রাণপণে লড়াই করবে এবং চিরদিনের জন্য এ বিষয়ের ফায়সালা করে দেবে যে, আরবের মাটিতে ইসলাম থাকবে না জাহেলিয়াত থাকবে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে দৃঢ় সংকল্পের পথ দেখিয়েছেন যেটি ঈমানদারদের একমাত্র পথ। তিনি সূরা হজ্জে (আয়াত ৩৯) প্রথমে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন এবং পরে সূরা বাকারায় (আয়াত ১৯০) যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু সে সময় সবাই জানতো যে, এ পরিস্থিতিতে যুদ্ধের অর্থ কি? মদীনায় ঈমানদারদের

একটা ক্ষুদ্র দল ছিল যার যুদ্ধ করার মত পুরা এক হাজার যোদ্ধা সংগ্রহ করার সামর্থও ছিল না। অথচ তাদেরকেই তরবারি নিয়ে সমগ্র আরবের জাহেলিয়াতের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। তাছাড়া যে জনপদে আশ্রয়হীন ও সহায় সম্বলহীন শত শত মুহাজির এখনো পুরোপুরি পুনর্বাসিত হতে পারেনি, আরবের অধিবাসীরা চারদিক থেকে আর্থিক বয়কটের মাধ্যমে যার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং অভুক্ত থেকে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করাও যার পক্ষে কঠিন ছিল এখন তাকেই লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এহেন পরিস্থিতিতে সূরাটি নাযিল করা হয়েছিল। ঈমানদারদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা। এবং এ বিষয়ে প্রাথমিক পথনির্দেশনা দেয়াই এর আলোচ্য ও বক্তব্য। এ দিকটি বিচার করে এর নাম "সূরা কিতাল"ও রাখা হয়েছে। এতে ধারাবাহিকভাবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরার প্রথমেই বলা হয়েছে যে, এখন দু'টি দলের মধ্যে মোকাবিলা হচ্ছে। এ দু'টি দলের মধ্যে একটি দলের অবস্থান এই যে, তারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু অপর দলটির অবস্থান হলো, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যে সত্য নাযিল হয়েছিল তা তারা মেনে নিয়েছে। এখন আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত হলো, প্রথমোক্ত দলটির সমস্ত চেষ্টা-সাধনা ও কাজ-কর্ম তিনি নিষ্ফল করে দিয়েছেন এবং শেষোক্ত দলটির অবস্থা সংশোধন করে দিয়েছেন।

এরপর মুসলমানদের সামরিক বিষয়ে প্রাথমিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তাদেরকে আল্লাহর সাহায্য ও দিকনির্দেশনার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। আল্লাহর পথে কুরবানী পেশ করার জন্য তাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদানের আশ্বাস দেয়া হয়েছে। তাদের এ বলে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, ন্যায় ও সত্যের পথে তাদের প্রচেষ্টা বৃথা যাবে না। বরং দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গাতেই তারা ক্রমান্বয়ে এর অধিক ভাল ফল লাভ করবে।

তারপর কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সাহায্য ও দিকনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত। ঈমানদারদের বিরুদ্ধে তাদের কোন প্রচেষ্টাই কার্যকর হবে না। তারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই অত্যন্ত খারাপ পরিণামের সম্মুখীন হবে। তারা আল্লাহর নবীকে মক্কা থেকে বের করে দিয়ে মনে করেছিলো যে, তারা বড় রকমের সফলতা লাভ করেছে। অথচ এ কাজ করে তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেরা নিজেদের জন্য বড় রকমের ধ্বংস ডেকে এনেছে।

এরপর মুনাফিকদের উদ্দেশ করে কথা বলা হয়েছে। যুদ্ধের নির্দেশ আসার পূর্বে এসব মুনাফিক নিজেদেরকে বড় মুসলমান বলে জাহির করতো। কিন্তু এ নির্দেশ আসার পরে তারা ঘাবড়ে গিয়ে নিজেদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ চিন্তায় কাফেরদের সাথে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করেছিল যাতে তারা নিজেদেরকে যুদ্ধের বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। তাদেরকে স্পষ্টভাবে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, যারা আল্লাহ এবং তাঁর দীনের সাথে মুনাফিকীর

আচরণ করে তাদের কোন আমলই আল্লাহর কাছে গৃহীত হয় না। এখানে যে মৌলিক প্রশ্নে ঈমানের দাবীদার প্রতিটি ব্যক্তির পরীক্ষা হচ্ছে তা হলো, সে ন্যায় ও সত্যের সাথে আছে না বাতিলের সাথে আছে? তার সমবেদনা ও সহানুভূতি মুসলমান ও ইসলামের প্রতি না কাফের ও কুফরীর প্রতি। সে নিজের ব্যক্তি সত্তা ও স্বার্থকেই বেশী ভালবাসে না কি যে ন্যায় ও সত্যের প্রতি ঈমান আনার দাবী সে করে তাকেই বেশী ভালবাসে? এ পরীক্ষায় যে ব্যক্তি মেকী প্রমাণিত হবে আল্লাহর কাছে তার নামায, রোযা এবং যাকাত কোন প্রতিদান লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হওয়া তো দূরের কথা সে আদৌ ঈমানদারই নয়।

অতপর মুসলমানদের উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের সংখ্যাল্পতা ও সহায় সম্বলহীনতা এবং কাফেরদের সংখ্যাধিক্য ও সহায় সম্বলের প্রাচুর্য দেখে সাহস না হারায় এবং তাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ না করে। এতে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের দুঃসাহস আরো বেড়ে যাবে। বরং তারা যেন আল্লাহর ওপর নির্ভর করে বাতিলকে রুখে দাঁড়ায় এবং কুফরের এ আগ্রাসী শক্তির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আল্লাহ মুসলমানদের সাথে আছেন। তারাই বিজয়ী হবে এবং তাদের সাথে সংঘাতে কুফরী শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

সর্বশেষে মুসলমানদেরকে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার আহবান জানানো হয়েছে। যদিও সে সময় মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক ছিল। কিন্তু সামনে প্রশ্ন ছিল এই যে, আরবে ইসলাম এবং মুসলমানরা টিকে থাকবে কি থাকবে না। এ প্রশ্নের গুরুত্ব ও নাজুকতার দাবী ছিল এই যে, মুসলমানরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের দীনকে কুফরের আধিপত্যের হাত থেকে রক্ষা করার এবং আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য তাদের জীবন কুরবানী করবে ও যুদ্ধ প্রস্তুতিতে নিজেদের সমস্ত সহায় সম্পদ যথা সম্ভব অকৃপণভাবে কাজে লাগাবে। সুতরাং মুসলমানদের উদ্দেশ করে বলা হয়েছে যে, এ মুহূর্তে যে ব্যক্তি কৃপণতা দেখাবে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না, বরং নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করবে। আল্লাহ মানুষের মুখাপেক্ষী নন। কোন একটি দল বা গোষ্ঠী যদি তার দীনের জন্য কুরবানী পেশ করতে টালবাহানা করে তাহলে আল্লাহ তাদের অপসারণ করে অপর কোন দল বা গোষ্ঠীকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন।

আয়াত ৩৮ | সূরা মুহাম্মাদ–মাদানী | রুকূ' ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝١ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ۝٢ ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۭ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ۝٣

যারা কুফরী করেছে[১] এবং আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিয়েছে[২] আল্লাহ তাদের সমস্ত কাজ–কর্ম ব্যর্থ করে দিয়েছেন[৩]। আর যারা ঈমান এনেছে নেক কাজ করেছে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে[৪] তা মেনে নিয়েছে—বস্তুত তা তো তাদের রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত অকাট্য সত্য কথা—আল্লাহ তাদের খারাপ কাজগুলো তাদের থেকে দূর করে দিয়েছেন[৫] এবং তাদের অবস্থা শুধরে দিয়েছেন।[৬] কারণ হলো, যারা কুফরী করেছে তারা বাতিলের আনুগত্য করেছে এবং ঈমান গ্রহণকারীগণ তাদের রবের পক্ষ থেকে আসা সত্যের অনুসরণ করেছে। আল্লাহ এভাবে মানুষের সঠিক মর্যাদা ও অবস্থান বলে দেন।[৭]

১. অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শিক্ষা ও পথনির্দেশনা পেশ করছেন তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে।

২. মূল আয়াতে صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ বলা হয়েছে। صَدَّ শব্দটি আরবী ভাষায় সকর্মক ও অকর্মক উভয় ক্রিয়াপদ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। তাই এ আয়াতাংশের একটি অর্থ হচ্ছে, তারা নিজেরা আল্লাহর পথে আসা থেকে বিরত থেকেছে এবং আরেকটি অর্থ হচ্ছে, তারা অন্যদের আল্লাহর পথে আসতে বাধা দিয়েছে।

অন্যদের আল্লাহর পথে আসতে বাধা দেয়ার বহু উপায় ও পন্থা আছে। এর একটি পন্থা হলো, জোরপূর্বক কাউকে ঈমান গ্রহণ থেকে বিরত রাখা। দ্বিতীয় পন্থা হলো ঈমান

গ্রহণকারী ব্যক্তির ওপর এমন জুলুম-নির্যাতন চালানো যে, তার পক্ষে ঈমানের ওপর টিকে থাকা এবং এরূপ ভয়ংকর পরিস্থিতিতে অন্যদের ঈমান গ্রহণ কঠিন হয়ে পড়ে। তৃতীয় পন্থা হলো, সে নানা উপায়ে দীন ও দীনের অনুসারীদের বিরুদ্ধে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে এবং হৃদয় মনে এমন সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করবে যার দ্বারা মানুষ এ দীন সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করবে। এ ছাড়াও প্রত্যেক কাফের ব্যক্তিই এ অর্থে আল্লাহর দীনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী যে, সে তার সন্তান-সন্ততিকে কুফরী রীতিনীতি অনুসারে লালন-পালন করে এবং এ কারণে তার ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করা কঠিন হয়ে যায়। একইভাবে প্রতিটি কুফরী সমাজ আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টিকারী একটি জগদ্দল পাথরের মত। কারণ, এ সমাজ তার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দ্বারা তার সমাজ ব্যবস্থা ও রীতিনীতি এবং সংকীর্ণতা দ্বারা ন্যায় ও সত্য দীনের প্রসারের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

৩. মূল আয়াতে أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের কাজ-কর্মকে বিপথগামী করে দিয়েছেন, পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন, ধ্বংস বা পণ্ড করে দিয়েছেন। একথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থ বহন করে। এর একটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে তাদের চেষ্টা ও শ্রম সঠিক পথে ব্যয়িত হওয়ার তাওফীক ছিনিয়ে নিয়েছেন। এখন থেকে যে কাজই তারা করবে তা ভ্রান্ত উদ্দেশ্যে ভ্রান্ত পন্থায়ই করবে। আর তাদের সকল চেষ্টা-সাধনা হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহীর পথেই ব্যয়িত হবে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তারা নিজেদের ধারণায় যে কাজ ভাল মনে করে আঞ্জাম দিয়ে আসছে, যেমন ঃ কা'বা ঘরের তত্তাবধান, হাজীদের খেদমত, মেহমানদের আপ্যায়ণ, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা এবং অনুরূপ আরো যেসব কাজকে আরবে ধর্মীয় সেবা এবং উন্নত নৈতিক কাজের মধ্যে গণ্য করা হতো, তা সব আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করে দিয়েছেন। তারা তার কোন প্রতিদান ও সওয়াব পাবে না। কারণ যখন তারা আল্লাহর তাওহীদ এবং শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদাতের পথ অবলম্বন করতে অস্বীকৃতি জানায় আর অন্যদেরকেও এ পথে আসতে বাধা দেয় তখন তাদের কোন কাজই আল্লাহর কাছে গৃহীত হতে পারে না। তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, ন্যায় ও সত্যের পথকে বন্ধ করতে এবং নিজেদের কুফর ভিত্তিক ধর্মকে আরবের বুকে জীবিত রাখার জন্য তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যে চেষ্টা-সাধনা চালাচ্ছে আল্লাহ তা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। এখন তাদের সমস্ত কৌশল একটি লক্ষহীন তীরের মত প্রমাণিত হয়েছে। এসব কৌশল দ্বারা তারা কখনো নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারবে না।

৪. الَّذِينَ آمَنُوا বলার পর آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ বলার প্রয়োজন আর থাকে না। কেননা, ঈমান আনয়ন করার মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিলকৃত শিক্ষাসমূহের প্রতি ঈমান পোষণ করা আপনা থেকেই অন্তরভুক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আলাদাভাবে বিশেষ করে এর উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য যে, নবী হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠানোর পর কোন ব্যক্তি যতক্ষণ না তাঁকে এবং তাঁর আনিত শিক্ষাসমূহকে মেনে না নেবে ততক্ষণ আল্লাহ, আখেরাত, পূর্ববর্তী নবী-রসূল ও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ সে যতই মেনে চলুক না কেন তা তার জন্য কল্যাণকর হবে না। একথাটা স্পষ্টভাবে বলা জরুরী ছিল। কারণ, হিজরতের পরে মদীনায়

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ
فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ
أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم
بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾ سَيَهْدِيهِمْ
وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿٥﴾ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾

অতএব এসব কাফেরের সাথে যখনই তোমাদের মোকাবিলা হবে তখন প্রথম কাজ হবে তাদেরকে হত্যা করা। এভাবে তোমরা যখন তাদেরকে আচ্ছামত পর্যুদস্ত করে ফেলবে তখন বেশ শক্ত করে বাঁধো। এরপর (তোমাদের ইখতিয়ার আছে) হয় অনুকম্পা দেখাও, নতুবা মুক্তিপণ গ্রহণ করো যতক্ষণ না যুদ্ধবাজরা অস্ত্র সংবরণ করে।[৮]

এটা হচ্ছে তোমাদের করণীয় কাজ। আল্লাহ চাইলে নিজেই তাদের সাথে বুঝাপড়া করতেন। কিন্তু (তিনি এ পন্থা গ্রহণ করেছেন এ জন্য) যাতে তোমাদেরকে পরস্পরের দ্বারা পরীক্ষা করেন।[৯] আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হবে আল্লাহ কখনো তাদের আমলসমূহ ধ্বংস করবেন না।[১০] তিনি তাদের পথপ্রদর্শন করবেন। তাদের অবস্থা শুধরে দিবেন এবং তাদেরকে সেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পরিচয় তিনি তাদেরকে আগেই অবহিত করেছেন।[১১]

এমন সব লোকের সাথে আদান-প্রদান ও উঠাবসা করতে হচ্ছিলো যারা ঈমানের আর সব আবশ্যকীয় বিষয় মানলেও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিলো।

৫. এর দু'টি অর্থ ঃ একটি হচ্ছে, তাদের দ্বারা জাহেলী যুগে যে গোনাহর কাজ সংঘটিত হয়েছিল আল্লাহ তার সবই তাদের হিসেব থেকে বাদ দিয়েছেন। ঐ সব গোনাহর কাজের জন্য এখন আর তাদের কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, আকীদা, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, নৈতিক চরিত্র এবং কাজ-কর্মের যে পঙ্কিলতার মধ্যে তারা ডুবে ছিল আল্লাহ তা'আলা তা থেকে তাদেরকে মুক্ত করেছেন। এখন তাদের মন-মস্তিষ্ক পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। তাদের অভ্যাস ও আচার-আচরণ পরিবর্তিত হয়েছে এবং তাদের জীবন, চরিত্র ও কর্মকাণ্ডও পরিবর্তিত হয়েছে। এখন তাদের মধ্যে জাহেলিয়াতের পরিবর্তে আছে ঈমান এবং দুষ্কৃতির পরিবর্তে আছে সুকৃতি।

৬. একথাটিরও দু'টি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে, অতীতের অবস্থা পরিবর্তিত করে আল্লাহ তাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য সঠিক পথে নিয়ে এসেছেন এবং তাদের জীবনকে সুবিন্যস্ত ও সুসজ্জিত করে দিয়েছেন। আরেকটি অর্থ হচ্ছে এখন পর্যন্ত তারা যে দুর্বল, অসহায় ও নির্যাতিত অবস্থার মধ্যে ছিল তা থেকে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বের করে এনেছেন। এখন তিনি তাদের জন্য এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, তারা জুলুমের শিকার হওয়ার পরিবর্তে জালেমের মোকাবিলা করবে, শাসিত হওয়ার পরিবর্তে নিজেরাই স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবন পরিচালনা করবে এবং বিজিত না হয়ে বিজয়ী হয়ে থাকবে।

৭. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ । অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা এভাবে মানুষের জন্য তাদের উদাহরণ পেশ করেন।" এটি এ আয়াতাংশের শাব্দিক অনুবাদ। কিন্তু শাব্দিক এ অনুবাদ দ্বারা এর প্রকৃত অর্থ স্পষ্ট হয় না। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, এভাবে আল্লাহ তা'আলা উভয় দলকে তাদের অবস্থান সঠিকভাবে বলে দেন। তাদের একদল বাতিলের অনুসরণ করতে বদ্ধপরিকর। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের সমস্ত চেষ্টা–সাধনাকে নিষ্ফল করে দিয়েছেন। কিন্তু অপর দল ন্যায় ও সত্যের আনুগত্য গ্রহণ করেছে। তাই আল্লাহ তাদেরকে সমস্ত অকল্যাণ থেকে মুক্ত করে তাদের অবস্থা সংশোধন করে দিয়েছেন।

৮. এ আয়াতের শব্দাবলী এবং যে পূর্বাপর প্রসংগে এ আয়াত নাযিল হয়েছে তা থেকেও একথা স্পষ্ট জানা যায় যে, আয়াতটি যুদ্ধের নির্দেশ আসার পর কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে নাযিল হয়েছিল। "যখন কাফেরদের সাথে তোমাদের মোকাবিলা হবে" কথাটিও ইংগিত দেয় যে, তখনও মোকাবিলা হয়নি বরং মোকাবিলা হলে কি করতে হবে সে সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই দিকনির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।

যে সময় সূরা হজ্জের ৩৯ আয়াতে এবং সূরা বাকারার ১৯০ আয়াতে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং যার কারণে ভয়ে ও আতংকে মদীনার মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের লোকদের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল এই যে, মৃত্যু যেন তাদের মাথার ওপর এসে হাজির হয়েছে, ঠিক সে সময়ই যে, এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল তা এর ২০ আয়াত থেকেই প্রমাণিত হয়।

তাছাড়া সূরা আনফালের ৬৭–৬৯ আয়াতগুলো থেকেও এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, এ আয়াতটি বদর যুদ্ধের আগেই নাযিল হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

"শত্রুকে যুদ্ধে উচিত মত শিক্ষা দেয়ার আগেই নবীর হাতে তারা বন্দী হবে এমন কাজ কোন নবীর জন্য শোভনীয় নয়। তোমরা পার্থিব স্বার্থ কামনা করো। কিন্তু আল্লাহর বিচার্য বিষয় হচ্ছে আখেরাত। আল্লাহ বিজয়ী ও জ্ঞানী। আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি আগেই লিপিবদ্ধ না থাকতো তাহলে তোমরা যা নিয়েছো সে জন্যে তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হতো। সুতরাং যে অর্থ তোমরা অর্জন করেছো তা খাও। কারণ, তা হালাল ও পবিত্র।"

এ বাক্যটি এবং বিশেষ করে এর নীচে দাগ টানা বাক্যাংশ সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এ ক্ষেত্রে যে কারণে তিরস্কার করা হয়েছে তা হচ্ছে বদর যুদ্ধে শত্রুদেরকে চরম শিক্ষা দেয়ার আগেই মুসলমানরা শত্রুদের লোকজনকে বন্দী করতে শুরু করেছিল। অথচ যুদ্ধের পূর্বে সূরা মুহাম্মাদে তাদেরকে যে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছিল তা হচ্ছে ঃ "তোমরা যখন তাদেরকে আচ্ছামত পদদলিত করে ফেলবে তখন

বন্দীদের শক্ত করে বাঁধবে।" তা সত্ত্বেও সূরা মুহাম্মাদে যেহেতু মুসলমানদেরকে বন্দীদের থেকে মুক্তিপণ নেয়ার অনুমতি মোটের ওপর দেয়া হয়েছিল তাই বদর যুদ্ধের বন্দীদের নিকট থেকে যে অর্থ নেয়া হয়েছিল আল্লাহ তা'আলা তা হালাল ঘোষণা করলেন এবং তা গ্রহণ করার জন্য মুসলমানদের শাস্তি দিলেন না। "যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আগেই লিপিবদ্ধ না থাকতো" কথাটি স্পষ্টত এ বিষয়ের প্রতিই ইংগিত দান করে যে, এ ঘটনার পূর্বেই কুরআন মজীদে মুক্তিপণ নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। একথাটিও স্পষ্ট যে, কুরআনের সূরা মুহাম্মাদ ছাড়া এমন আর কোন আয়াত নেই যেখানে এ নির্দেশ আছে। তাই একথা মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায়ান্তর নেই যে, এ আয়াতটি সূরা আনফালের পূর্বোল্লেখিত আয়াতের আগে নাযিল হয়েছিল। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন। সূরা আনফালের ব্যাখ্যা, টীকা ৪৯)

এটি কুরআন মজীদের সর্বপ্রথম আয়াত যাতে যুদ্ধের আইন-কানুন সম্পর্কে প্রাথমিক দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ থেকে যেসব বিধি-বিধান উৎসারিত হয় এবং সে বিধি-বিধান অনুসারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা কিরাম যেভাবে আমল করেছেন এবং ফিকাহবিদগণ এ আয়াত ও সুন্নাতের আলোকে গবেষণার ভিত্তিতে যেসব হুকুম-আহকাম রচনা করেছেন তার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর মূল লক্ষ থাকে শত্রুর সামরিক শক্তি ধ্বংস করা যাতে তার যুদ্ধ করার ক্ষমতা না থাকে এবং যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ লক্ষ থেকে বিচ্যুত হয়ে শত্রুর লোকজনকে বন্দী করতে লেগে যাওয়া অনুচিত। শত্রু সেনাদেরকে যুদ্ধবন্দী করার প্রতি মনোযোগ দেয়া কেবল তখনই উচিত যখন শত্রুর শক্তির আচ্ছামত মূলোৎপাটন হবে এবং যুদ্ধের ময়দানে তাদের কেবল মুষ্টিমেয় কিছু লোকই অবশিষ্ট থাকবে। প্রারম্ভেই মুসলমানদেরকে এ দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছিল যাতে তারা মুক্তিপণ লাভ অথবা ক্রীতদাস সংগ্রহের লোভে পড়ে যুদ্ধের মূল লক্ষ ও উদ্দেশ্য ভুলে না বসে।

দুই ঃ যুদ্ধে যারা গ্রেফতার হবে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের ইখতিয়ার আছে। তোমরা ইচ্ছা করলে, দয়াপরবশ হয়ে তাদের মুক্তি দাও অথবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও। এ থেকে এ সাধারণ বিধানের উৎপত্তি হয় যে, যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা যাবে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা), হাসান বাসরী, আতা এবং হাম্মাদ এ আইনাটিকে অবিকল এরূপ সর্বব্যাপী ও শর্তহীন আইন হিসেবেই গ্রহণ করেছেন এবং তা যথাস্থানে সঠিকও বটে। তারা বলেন ঃ যুদ্ধরত অবস্থায় মানুষকে হত্যা করা যেতে পারে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে এবং বন্দীরা আমাদের দখলে চলে আসলে তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। ইবনে জারীর এবং আবু বকর জাস্‌সাস বর্ণনা করেছেন যে, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ যুদ্ধ বন্দীদের একজনকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের (রা) হাতে দিয়ে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলে তিনি তা করতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং এ আয়াত পড়ে বললেন ঃ আমাদেরকে বন্দী অবস্থায় কাউকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। ইমাম মুহাম্মাদ আস সিয়ারুল কাবীর গ্রন্থেও এ বিষয়ে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আমের হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে (রা) একজন যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এ যুক্তির ভিত্তিতেই সে নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করেছিলেন।

তিন ঃ কিন্তু এ আয়াতে যেহেতু হত্যা করতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়নি তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর এ নির্দেশের অভিপ্রায় বুঝেছেন এই যে, যদি এমন কোন বিশেষ কারণ থাকে যার ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক কোন বন্দী অথবা কিছু সংখ্যক বন্দীকে হত্যা করা জরুরী মনে করেন তবে তিনি তা করতে পারেন। এটা কোন স্বাভাবিক ব্যাপকভিত্তিক নিয়ম-বিধি নয়, বরং একটি ব্যতিক্রমী নিয়ম-বিধি যা কেবল অনিবার্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই কাজে লাগানো হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, বদর যুদ্ধের বন্দীদের মধ্য থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু উকবা ইবনে আবী মু'আইত এবং নাদ্বর ইবনে হারেসকে হত্যা করেছিলেন। ওহুদ যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে শুধু কবি আবু আয্যাকে হত্যা করেছিলেন। বনী কুরাইযা গোত্র নিজেরাই নিজেদেরকে হযরত সা'দ ইবনে মু'আযের সিদ্ধান্তের ওপর সোপর্দ করেছিল এবং তাদের নিজেদের সমর্থিত বিচারকের রায় ছিল এই যে, তাদের পুরুষদের হত্যা করতে হবে, তাই তিনি তাদের হত্যা করিয়েছিলেন। খায়বার যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে শুধু কিনানা ইবনে আবীল হুকাইককে হত্যা করা হয়েছিল। কারণ, সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। মক্কা বিজয়ের পরে সমস্ত মক্কাবাসীর মধ্য থেকে শুধু কয়েকজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাদের মধ্যে যে-ই বন্দী হবে তাকেই হত্যা করতে হবে। এ কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া কোন যুদ্ধবন্দী হত্যা করা কখনো নবীর (সা) কর্মনীতি ছিল না। আর খোলাফায়ে রাশেদীনেরও কর্মধারা এরূপ ছিল। তাঁদের শাসন যুগেও যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করার দৃষ্টান্ত খুব কমই দেখা যায়। আর দু'একটি দৃষ্টান্ত থাকলেও নির্দিষ্ট কোন কারণে তাদের হত্যা করা হয়েছিল—কেবল যুদ্ধবন্দী হবার কারণে নয়। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযও তাঁর গোটা খিলাফত যুগে শুধু একজন যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করেছিলেন। এর কারণ ঐ ব্যক্তি মুসলমানদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছিল। এ কারণেই অধিকাংশ ফিকাহবিদ এ মত সমর্থন করেছেন যে, ইসলামী সরকার প্রয়োজন মনে করলে বন্দীদের হত্যা করতে পারেন। তবে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব সরকারের। যাকে ইচ্ছা হত্যা করার অধিকার কোন সৈনিকেরই নেই। তবে বন্দী যদি পালিয়ে যাওয়ার কিংবা তার কোন প্রকার কুমতলবের আশংকা সৃষ্টি হয় তাহলে যিনি এ পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন তিনি তাকে হত্যা করতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে ইসলামী ফিকাহবিদগণ আরো তিনটি বিষয় পরিষ্কার করে বর্ণনা করেছেন। এক, বন্দী যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে না। দুই, বন্দীকে ততক্ষণ পর্যন্ত হত্যা করা যাবে যতক্ষণ সে সরকারের হাতে থাকবে। বন্টন বা বিক্রির মাধ্যমে সে যদি অন্য কারো মালিকানাভুক্ত হয়ে যায় তাহলে আর তাকে হত্যা করা যাবে না। তিন, বন্দীকে হত্যা করতে হলে সোজাসুজি হত্যা করতে হবে। কষ্ট দিয়ে হত্যা করা যাবে না।

চার ঃ যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে সাধারণভাবে যে বিধান দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে, হয় তাদের প্রতি দয়া কর নয় তো মুক্তিপণের আদান প্রদান করো।

ইহসানের মধ্যে চারটি জিনিস অন্তরভুক্ত। এক, বন্দী থাকা অবস্থায় তার সাথে ভাল আচরণ করতে হবে। দুই, হত্যা বা স্থায়ীভাবে বন্দী করার পরিবর্তে তাকে দাস বানিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। তিন, জিযিয়া আরোপ করে তাকে জিম্মী অর্থাৎ নিরাপত্তা প্রাপ্ত বানিয়ে নিতে হবে। চার, কোন বিনিময় ছাড়াই তাকে মুক্ত করে দিতে হবে।

মুক্তিপণ গ্রহণের তিনটি পন্থা আছে। এক, অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দেয়া। দুই, মুক্তি দানের শর্ত হিসেবে বিশেষ কোন সেবা গ্রহণ করার পর মুক্তি দেয়া। তিন, শত্রুদের হাতে বন্দী নিজের লোকদের সাথে বিনিময় করা।

এসব বিবিধ পন্থা অনুসারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন সময়ে সুযোগ মত আমল করেছেন। আল্লাহর দেয়া শরীয়াতী বিধান ইসলামী সরকারকে কোন একটি মাত্র উপায় ও পন্থার অনুসরণ বাধ্যতামূলক করে দেয়নি। সরকার যখন যে উপায় ও পন্থাটিকে সর্বাধিক উপযুক্ত মনে করবে সে পন্থা অনুসারে কাজ করতে পারে।

পাঁচ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের (রা) আচরণ দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, একজন যুদ্ধবন্দী যতক্ষণ সরকারের হাতে বন্দী থাকবে ততক্ষণ তার খাদ্য, পোশাক এবং অসুস্থ বা আহত হলে চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারের। বন্দীদের ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন রাখা কিংবা তাদেরকে শাস্তি দেয়ার কোন বৈধতা ইসলামী শরীয়াতে নেই। বরং এর বিপরীত অর্থাৎ উত্তম আচরণ এবং বদান্যতামূলক ব্যবহার করার নির্দেশ যেমন দেয়া হয়েছে তেমনি নবীর বাস্তব কর্মকাণ্ডেও এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর যুদ্ধের বন্দীদেরকে বিভিন্ন সাহাবার পরিবারে বন্টন করে দিয়েছিলেন এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, استوصوا بالاسارٰی خیرًا "এসব বন্দীদের সাথে ভাল আচরণ করবে।" তাদের মধ্যে একজন বন্দী ছিলেন আবু আযীয। তিনি বর্ণনা করেন ঃ "আমাকে যে আনসারদের পরিবারে রাখা হয়েছিল তারা আমাকে সকাল সন্ধ্যায় রুটি খেতে দিত। কিন্তু নিজেরা শুধু খেজুর খেয়ে থাকতো।" অন্য একজন বন্দী সুহাইল ইবনে আমর সম্পর্কে নবীকে (সা) জানানো হলো যে, সে একজন অনলবর্ষী বক্তা। সে আপনার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করতো। তার দাঁত উপড়িয়ে দিন। জবাবে নবী (সা) বললেন ঃ "আমি যদি তার দাঁত উপড়িয়ে দেই তাহলে নবী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ আমার দাঁত উপড়িয়ে দেবেন।" (সীরাতে ইবনে হিশাম) ইয়ামামা অঞ্চলের নেতা সুমামা ইবনে উসাল বন্দী হয়ে আসলে সে বন্দী থাকা অবধি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে তার জন্য উত্তম খাদ্য ও দুধ সরবরাহ করা হতো। (ইবনে হিশাম) সাহাবায়ে কিরামের যুগেও এ কর্মপদ্ধতি চালু ছিল। তাঁদের যুগেও যুদ্ধবন্দীদের সাথে খারাপ আচরণের কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

ছয় ঃ বন্দীদের স্থায়ীভাবে বন্দী করে রাখতে হবে—এবং সরকার তাদের থেকে বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় করতে থাকবে ইসলাম এমন ব্যবস্থা আদৌ রাখেনি। যদি তাদের সাথে অথবা তাদের জাতির সাথে যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের অথবা মুক্তিপণ আদায়ের কোন ব্যবস্থা না হয় সে ক্ষেত্রে তাদের প্রতি ইহসান করার যে পন্থা রাখা হয়েছে তা হচ্ছে, তাদেরকে দাস বানিয়ে ব্যক্তির মালিকানায় দিয়ে দিতে হবে এবং তাদের মালিকদের নির্দেশ দিতে হবে যে, তারা যেন তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেও এ নীতি অনুযায়ী কাজ করা হয়েছে, সাহাবায়ে কিরামের যুগেও তা চালু ছিল এবং তা জায়েয হওয়া সম্পর্কে মুসলিম ফিকাহবিদগণ সর্বসম্মতিক্রমে মত প্রকাশ করেছেন। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি জানা থাকা দরকার তাহলো এই যে, বন্দী হওয়ার পূর্বেই যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং পরে কোনভাবে বন্দী

হয়েছে তাকে মুক্ত ও স্বাধীন করে দেয়া হবে। কিন্তু কেউ বন্দী হওয়ার পরে ইসলাম গ্রহণ করলে, অথবা কোন ব্যক্তির মালিকানাধীনে দিয়ে দেয়ার পরে মুসলমান হলে এভাবে ইসলাম গ্রহণ তার মুক্তির কারণ হতে পারে না। মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম এবং তিরমিযী হাদীস গ্রন্থে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত আছে যে, বনী উকাইল গোত্রের এক ব্যক্তি বন্দী হয়ে আসলো এবং বললো যে, সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

لَو قُلتَهَا وَاَنتَ تَملِكُ اَمرَكَ اَفلَحتَ كُلَّ الفَلَاحِ

"যখন তুমি স্বাধীন ছিলে তখন যদি একথাটি বলতে তাহলে তুমি নিসন্দেহে সফলকাম হতে।"

হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ

اذا اسلم الاسير فى ايدى المسلمين فقد امن من القتل وهو رقيق –

"বন্দী যদি মুসলমানদের হাতে পড়ার পরে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে, তবে দাস থেকে যাবে।"

এরই ওপরে ভিত্তি করে মুসলিম ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, বন্দী হওয়ার পরে ইসলাম গ্রহণকারী দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে না। (আস সিয়ারুল কাবীর, ইমাম মুহাম্মাদ) একথাটি অত্যন্ত যুক্তিসংগতও বটে। কারণ, আমাদের আইন যদি এমন হতো যে, বন্দী হওয়ার পর যে ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করবে তাকেই মুক্ত করে দেয়া হবে তাহলে কালেমা পড়ে মুক্তি লাভ করতো না এমন কোন নির্বোধ বন্দী কি পাওয়া যেতো?

সাত ঃ ইসলামে বন্দীদের প্রতি ইহসান করার তৃতীয় যে পন্থাটি আছে তা হচ্ছে, জিযিয়া আরোপ করে তাদেরকে দারুল ইসলামের যিম্মী (নিরাপত্তা প্রদত্ত) নাগরিক বানিয়ে নেয়া। এভাবে তারা ইসলামী রাষ্ট্রে ঠিক তেমনি স্বাধীনতা নিয়ে থাকবে যেমন মুসলমানরা থাকে। ইমাম মুহাম্মাদ তাঁর 'আস সিয়ারুল কাবীর' নামক গ্রন্থে লিখছেন ঃ "যেসব ব্যক্তিকে দাস বানানো বৈধ তাদের প্রত্যেকের ওপর জিযিয়া আরোপ করে যিম্মী নাগরিক বানানোও বৈধ।" অন্য এক স্থানে লিখছেন ঃ "তাদের ওপর জিযিয়া এবং তাদের ভূমির ওপর ভূমিকর আরোপ করে তাদেরকে প্রকৃতই স্বাধীন ও মুক্ত করে দেয়ার অধিকার মুসলমানদের শাসকের আছে।" বন্দী লোকেরা যে অঞ্চলের অধিবাসী সে অঞ্চল বিজিত হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তরভুক্ত হলে সে পরিস্থিতিতে সাধারণত এ নীতি–পদ্ধতি অনুসারে কাজ করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, খায়বারের অধিবাসীদের বেলায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নীতি অনুসরণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে শহর এলাকার বাইরে ইরাকের প্রত্যন্ত অঞ্চল বিজিত হওয়ার পর হযরত উমর (রা) ব্যাপকভাবে এ নীতি অনুসরণ করেছিলেন। আবু উবায়েদ কিতাবুল আমওয়াল গ্রন্থে লিখেছেন যে, ইরাক বিজিত হওয়ার পর সে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একটি প্রতিনিধি

দল হযরত উমরের (রা) দরবারে হাজির হয়ে আবেদন জানালো যে, আমীরুল মু'মিনীন। ইতিপূর্বে ইরানবাসীরা আমাদের ঘাড়ে চেপেছিল। তারা আমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছে, আমাদের সাথে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছে এবং আমাদের ওপর নানাভাবে বাড়াবাড়ি ও জুলুম করেছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা যখন আপনাদের পাঠালেন তখন আপনাদের আগমনে আমরা খুব খুশী হলাম এবং আপনাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলিনি কিংবা যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করিনি। এখন আমরা শুনছি যে, আপনি আমাদের দাস বানিয়ে নিতে চাচ্ছেন। হযরত উমর (রা) জবাব দিলেন ঃ তোমাদের স্বাধীনতা আছে, তোমরা মুসলমান হয়ে যাও, কিংবা জিযিয়া দিতে স্বীকৃত হয়ে স্বাধীন হয়ে যাও। ঐ সব লোক জিযিয়া প্রদান করতে স্বীকৃত হন এবং তাদেরকে স্বাধীন থাকতে দেয়া হয়। উক্ত গ্রন্থেরই আরো এক স্থানে আবু উবায়েদ বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা) হযরত আবু মূসা আশ'আরীকে লিখেন, যুদ্ধে যাদের বন্দী করা হয়েছে তাদের মধ্য থেকে কৃষকদের প্রত্যেককে ছেড়ে দাও।"

আট ঃ ইহসান করার চতুর্থ পন্থা হলো কোন প্রকার মুক্তিপণ বা বিনিময় না নিয়েই বন্দীকে ছেড়ে দেয়া। এটি একটি বিশেষ অনুকম্পা। বিশেষ কোন বন্দীর অবস্থা যখন এরূপ অনুকম্পা প্রদর্শনের দাবী করে কিংবা যদি আশা থাকে যে, এ অনুকম্পা সে বন্দীকে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করবে এবং সে শত্রু না থেকে বন্ধু এবং কাফের না থেকে মু'মিন হয়ে যাবে তাহলে কেবল সে অবস্থায়ই ইসলামী সরকার তা করতে পারে। অন্যথায় এ বিষয়টি সর্বজন বিদিত যে, মুক্তিলাভ করার পর সে পুনরায় আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসবে এ জন্য শত্রু কওমের কোন ব্যক্তিকে মুক্তি দেয়া কোনক্রমেই যুক্তির দাবী হতে পারে না। এ কারণেই মুসলিম ফিকাহবিদগণ ব্যাপকভাবে এর বিরোধিতা করেছেন এবং এর বৈধতার জন্য শর্ত আরোপ করেছেন যে, যদি মুসলমানদের ইমাম বন্দীদের সবাইকে কিংবা তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যককে ইহসান বা অনুকম্পার ভিত্তিতে ছেড়ে দেয়া যুক্তিসংগত মনে করেন তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই। (আস সিয়ারুল কাবীর) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এর বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এর প্রায় সব ক্ষেত্রেই যৌক্তিকতা ও উপকারিতার দিকটি সুস্পষ্ট।

বদর যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে নবী (সা) বলেছেন ঃ

لو كان المطعم بن عدى حيا ثم كلمنى فى هولاء النتنى لتركتهم له -

"মুতইম ইবনে আদ্দী যদি জীবিত থাকতো আর সে এসব জঘন্য লোকগুলো সম্পর্কে আমার সাথে আলোচনা করতো তাহলে আমি তার খাতিরে এদের ছেড়ে দিতাম।"
(বুখারী, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা এ জন্য বলেছিলেন যে, তিনি যে সময় তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরেছিলেন সে সময় মুতইমই তাঁকে নিজের আশ্রয়ে নিয়েছিলেন এবং তার ছেলে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে নিজের হিফাজতে তাঁকে হারাম শরীফে নিয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি এভাবে তার ইহসানের প্রতিদান দিতে চাচ্ছিলেন।

বুখারী, মুসলিম এবং মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়ামামার নেতা সুমামা ইবনে উসাল বন্দী হয়ে আসলে নবী (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ সুমামা, তোমার বক্তব্য কি? সে বললো ঃ "আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন তাহলে এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করবেন ঃ যার রক্তের কিছু মূল্য আছে, যদি আমার প্রতি ইহসান করেন তাহলে এমন এক ব্যক্তির প্রতি ইহসান করা হবে যে ইহসান স্বীকার করে। আর যদি আপনি অর্থ চান তাহলে তা আপনাকে প্রদান করা হবে।" তিনদিন পর্যন্ত তিনি তাকে একথাটিই জিজ্ঞেস করতে থাকলেন আর সে–ও একই জবাব দিতে থাকলো। অবশেষে তিনি সুমামাকে ছেড়ে দিতে আদেশ দিলেন। মুক্তি পাওয়া মাত্র সে নিকটবর্তী একটি খেজুরের বাগানে গিয়ে গোসল করে ফিরে আসলো এবং কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে বললো, আজকের দিনের আগে আমার কাছে আপনার চেয়ে কোন ব্যক্তি এবং আপনার দীনের চেয়ে কোন দীন অধিক ঘৃণিত ছিল না। কিন্তু এখন আমার কাছে আপনার চেয়ে কোন ব্যক্তি এবং আপনার দীনের চেয়ে কোন দীন অধিক প্রিয় নয়। এরপরে সে উমরা করার জন্য মক্কা গেল এবং সেখানে কুরাইশদের জানিয়ে দিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত আজকের দিনের পরে ইয়ামামা থেকে কোন শস্য তোমরা পাবে না। সে প্রকৃতপক্ষে তাই করলো। ফলে মক্কাবাসীদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আবেদন জানাতে হলো, তিনি যেন ইয়ামামা থেকে তাদের রসদ বন্ধ করিয়ে না দেন।

বনু কুরাইযার বন্দীদের মধ্য থেকে তিনি যাবীর ইবনে বাতা এবং আমর ইবনে সা'দ (অথবা ইবনে সু'দা) এর মৃত্যুদণ্ড রহিত করে দিলেন। তিনি যাবীরকে মুক্তি দিলেন এ কারণে যে, জাহেলী যুগে বুআস যুদ্ধের সময় সে হযরত সাবেত ইবনে কায়েসকে আশ্রয় দিয়েছিল। তাই তিনি তাকে সাবেতের হাতে তুলে দিলেন যাতে তিনি তাকে তাঁর প্রতি কৃত ইহসানের প্রতিদান দিতে পারেন। আর আমর ইবনে সা'দকে ছেড়েছিলেন এ জন্য যে, বনী কুরাইযা গোত্র যখন নবীর (সা) সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছিল সে সময় এ ব্যক্তিই তার গোত্রকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে নিষেধ করেছিলো। (কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবায়েদ)

বনী মুসতালিক যুদ্ধের পর যখন উক্ত গোত্রের বন্দীদের এনে সবার মধ্যে বন্টন করে দেয়া হলো তখন হযরত জুয়াইরিয়া যার অংশে পড়েছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার বিনিময় দিয়ে মুক্ত করলেন এবং এরপর নিজেই তাকে বিয়ে করলেন। এতে সমস্ত মুসলমান তাদের অংশের বন্দীদেরও মুক্ত করে দিলেন। কারণ, এখন তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়। এভাবে একশ'টি পরিবারের ব্যক্তিবর্গ মুক্তি লাভ করলো। (মুসনাদে আহমাদ, তাবকাতে ইবনে সা'দ, সীরাতে ইবনে হিশাম)

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মক্কার ৮০ ব্যক্তি তানয়ীমের দিকে এগিয়ে আসে এবং ফজরের নামাযের সময় তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্যাম্পে আকস্মিক আক্রমণ চালানোর সংকল্প করে। তাদের সবাইকে বন্দী করা হয়। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে ছেড়ে দেন যাতে এ নাজুক পরিস্থিতিতে এ বিষয়টি যুদ্ধের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)

মক্কা বিজয়ের সময় কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত সকলকে তিনি অনুগ্রহ করে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। যাদের বাদ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যেও তিন চারজন ছাড়া কাউকে হত্যা করা হয়নি। মক্কাবাসীরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানদের ওপর কিভাবে জুলুম করেছিল তা আরবরা সবাই জানতো। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে বিজয়লাভ করার পর যে মহত উদারতার সাথে নবী (সা) তাদের ক্ষমা করেছিলেন তা দেখে আরববাসীরা অন্তত এতটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলো যে, তাদের মোকাবিলা কোন নিষ্ঠুর ও কঠোর হৃদয় জালেমের সাথে নয়, বরং অত্যন্ত দয়াবান ও উদার নেতার সাথে। এ কারণেই মক্কা বিজয়ের পর গোটা আরব উপদ্বীপ অনুগত হতে দু'বছর সময়ও লাগেনি।

হুনায়েন যুদ্ধের পর হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল তাদের বন্দীদের মুক্ত করার জন্য যখন হাযির হলো তখন সমস্ত বন্দীদের বন্টন করা হয়ে গিয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত মুসলমানকে একত্রিত করে বললেন ঃ এরা সবাই তাওবা করে হাযির হয়েছে। আমার মত হলো তাদের বন্দীদের তাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হোক। তোমাদের মধ্যে যে তার অংশের বন্দীকে বিনিময় ছাড়াই সন্তুষ্ট চিত্তে ছেড়ে দিতে চায় সে যেন তাই করে। আর যে এর বিনিময় চায় তাকে আমি বায়তুলমালে সর্বপ্রথম যে অর্থ আমদানী হবে তা থেকে পরিশোধ করে দেব। এভাবে ছয় হাজার বন্দীকে মুক্ত করে দেয়া হলো যারা বিনিময় চেয়েছিলো সরকারের পক্ষ থেকে তাদের বিনিময় প্রদান করা হলো। (বুখারী, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ, তাবকাতে ইবনে সা'দ) এ থেকে এ বিষয়টিও জানা গেল যে, বন্টিত হওয়ার পর সরকার নিজে বন্দীদের মুক্ত করে দেয়ার অধিকার রাখে না বরং বন্দীদেরকে যেসব লোকের মালিকানায় দিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের সম্মতির ভিত্তিতে অথবা বিনিময় দিয়ে তা করা যেতে পারে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে সাহাবীদের যুগেও ইহসান করে বন্দীদের মুক্তি দান করার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হযরত আবু বকর (রা) আশয়াস ইবনে কায়েস কিন্দীকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং হযরত উমর (রা) হুরমুযানকে এবং মানাযির ও মায়সানের বন্দীদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। (কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবায়েদ)

নয় ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে অর্থের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্তি দেয়ার দৃষ্টান্ত কেবল বদর যুদ্ধের সময় দেখা যায়। সে সময় একেকজন বন্দীকে এক হাজার থেকে ৪ হাজার পর্যন্ত মুদ্রা নিয়ে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। (তাবকাতে ইবনে সা'দ, কিতাবুল আমওয়াল) সাহাবায়ে কিরামের যুগে এর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। মুসলিম ফিকাহবিদগণ ব্যাপকভাবে এরূপ করা অপছন্দ করেছেন। কারণ, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আমরা অর্থের বিনিময়ে শত্রুদের কাউকে ছেড়ে দেব আর সে পুনরায় আমাদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করবে। তবে কুরআন মজীদে যেহেতু মুক্তিপণ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার সে অনুযায়ী আমল করেছেন, তাই এ কাজ একেবারে নিষিদ্ধ নয়। ইমাম মুহাম্মাদ (র) আস সিয়ারুল কাবীর গ্রন্থে বলেন ঃ "প্রয়োজন দেখা দিলে মুসলমানরা অর্থের বিনিময়ে বন্দীদের ছেড়ে দিতে পারেন।"

দশ ঃ যুদ্ধবন্দীদেরকে কোন সেবা গ্রহণের বিনিময়ে মুক্তি দেয়ার দৃষ্টান্তও বদর যুদ্ধের সময় দেখা যায়। কুরাইশ বন্দীদের মধ্যে যাদের আর্থিক মুক্তিপণ দেয়ার ক্ষমতা ছিল না

তাদের মুক্তি দেয়ার জন্য নবী (সা) শর্ত আরোপ করেছিলেন যে, তারা আনসারদের দশজন করে শিশুকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেবে। (মুসনাদে আহমাদ, তাবকাতে ইবনে সা'দ, কিতাবুল আমওয়াল)

এগার ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমরা বন্দী বিনিময়ের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। একবার নবী (সা) হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একটি অভিযানে পাঠালেন। এতে কয়েকজন বন্দী হয়ে আসলো। তাদের মধ্যে জনৈকা পরমা সুন্দরী নারীও ছিল। সে সালামা ইবনুল আকওয়ার অংশে পড়ে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বার বার বলে মহিলাকে চেয়ে নিলেন এবং তাকে মক্কায় পাঠিয়ে তার বিনিময়ে বহু মুসলমান বন্দীকে মুক্ত করালেন। (মুসলিম, আবু দাউদ, তাহাবী, কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবায়েদ, তাবকাতে ইবনে সা'দ) হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন বর্ণনা করেন ঃ একবার সাকীফ গোত্র দু'জন মুসলমানকে বন্দী করে। এর কিছুদিন পর সাকীফের মিত্র বনী উকাইলের এক ব্যক্তি মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। নবী (সা) তাকে তায়েফে পাঠিয়ে তার বিনিময়ে ঐ দু'জন মুসলমানকে মুক্ত করে আনেন। (মুসলিম, তিরমিযি, মুসনাদে আহমাদ) ফিকাহবিদদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমাদের মতে বন্দী বিনিময় জায়েয। ইমাম আবু হানীফার একটি মত হচ্ছে, বিনিময় না করা উচিত। কিন্তু তাঁরও দ্বিতীয় মত হচ্ছে বিনিময় করা যেতে পারে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, বন্দীদের যে মুসলমান হয়ে যাবে বিনিময়ের মাধ্যমে তাকে কাফেরদের হাতে তুলে দেয়া যাবে না।

এ ব্যাখ্যার দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম যুদ্ধবন্দীদের জন্য এমন একটি ব্যাপক আইন রচনা করেছে যার মধ্যে প্রত্যেক যুগে এবং সব রকম পরিস্থিতিতে এ সমস্যার মোকাবিলা করার অবকাশ আছে। যারা কুরআন মজীদের এ আয়াতটির শুধু এ সংক্ষিপ্ত অর্থ গ্রহণ করে যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে ইহসান বা অনুকম্পা করে ছেড়ে দিতে হবে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে তারা জানে না যুদ্ধবন্দী সম্পর্কিত বিষয়টির কত ভিন্ন ভিন্ন দিক থাকতে পারে এবং বিভিন্ন যুগে তা কত সমস্যা সৃষ্টি করেছে এবং ভবিষ্যতেও করতে পারে।

৯. অর্থাৎ বাতিলের পূজারীদের মাথা চূর্ণ করাই যদি আল্লাহ তা'আলার একমাত্র কাজ হতো তাহলে তা করার জন্য তিনি তোমাদের মুখাপেক্ষী হতেন না। তাঁর সৃষ্ট ভূমিকম্প বা ঝড়-তুফান চোখের পলকেই এ কাজ করতে পারতো। কিন্তু তিনি চান মানুষের মধ্যে যারা ন্যায় ও সত্যের অনুসারী তারা বাতিলের অনুসারীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হোক এবং তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুক। যাতে যার মধ্যে যে গুণাবলী আছে তা এ পরীক্ষায় সুন্দর ও পরিমার্জিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং প্রত্যেকেই তার কর্মের বিচারে যে অবস্থান ও মর্যাদালাভের উপযুক্ত তাকে তা দেয়া যায়।

১০. অর্থাৎ আল্লাহর পথে কারো নিহত হওয়ার অর্থ এ নয় যে, কেউ নিহত হলেই তার ব্যক্তিগত সব কাজ-কর্মই ধ্বংস হয়ে গেল। কেউ যদি একথা মনে করে যে, শহীদদের ত্যাগ ও কুরবানী তাদের নিজেদের জন্য উপকারী নয় বরং তাদের পরে যারা এ পৃথিবীতে জীবিত থাকলো এবং তাদের ত্যাগ ও কুরবানী দ্বারা লাভবান হলো তারাই শুধু

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ⑦
وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ⑧ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا
مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ⑨ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ
أَمْثَالُهَا ⑩ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ
لَهُمْ ⑪

হে ঈমান গ্রহণকারীগণ, তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন[১২] এবং তোমাদের পা সুদৃঢ় করে দিবেন। যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে শুধু ধ্বংস।[১৩] আল্লাহ তাদের কাজ-কর্ম পণ্ড করে দিয়েছেন। কারণ আল্লাহ যে জিনিস নাযিল করেছেন তারা সে জিনিসকে অপছন্দ করেছে।[১৪] অতএব, আল্লাহ তাদের আমলসমূহ ধ্বংস করে দিয়েছেন। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে সেসব লোকের পরিণাম দেখে না, যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়েছে? আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। এসব কাফেরের জন্যও অনুরূপ পরিণাম নির্ধারিত হয়ে আছে।[১৫] এর কারণ, আল্লাহ নিজে ঈমান গ্রহণকারীদের সহযোগী ও সাহায্যকারী। কিন্তু কাফেরদের সহযোগী ও সাহায্যকারী কেউ নেই।[১৬]

কল্যাণ লাভ করলো তাহলে ভুল বুঝছে। প্রকৃত সত্য হলো যারা শাহাদাতলাভ করলো তাদের নিজেদের জন্যও এটি লোকসানের নয় লাভের বাণিজ্য।

১১. এটিই সেই মুনাফা যা আল্লাহর পথে জীবনদানকারীরা লাভ করবে তাদের তিনটি মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। এক, আল্লাহ তাদের পথপ্রদর্শন করবেন। দুই, তাদের অবস্থা সংশোধন করে দেবেন। তিন, তিনি তাদেরকে সেই বেহেশতে প্রবেশ করাবেন যার সম্পর্কে তিনি পূর্বেই তাদের অবহিত করেছেন। এখানে পথপ্রদর্শনের অর্থ স্পষ্টত জান্নাতের দিকে পথপ্রদর্শন করা। অবস্থা সংশোধন করার অর্থ জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উপহার হিসেবে প্রদত্ত পোশাকে সজ্জিত করে সেখানে নিয়ে যাবেন এবং পার্থিব জীবনে যেসব কলুষ কালিমা তাদের লেগেছিল তা বিদূরিত করবেন। আর তৃতীয় মর্যদাটির অর্থ হচ্ছে কুরআন ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবানীতে তাদেরকে ইতিপূর্বেই দুনিয়াতে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ
وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٢﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ
الَّتِي أَخْرَجَتْكَ ۚ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾

২ রুকূ'

আল্লাহ ঈমান গ্রহণকারী ও সৎকর্মশীলদের সে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা বয়ে যায়। আর কাফেররা দুনিয়ার ক'দিনের জীবনের মজা লুটছে, জন্তু-জানোয়ারের মত পানাহার করছে।[১৭] ওদের চূড়ান্ত ঠিকানা জাহান্নাম।

হে নবী, অতীতের কত জনপদ তো তোমার সে জনপদ থেকে অধিক শক্তিশালী ছিল, যারা তোমাকে বের করে দিয়েছিল। আমি তাদের এমনভাবে ধ্বংস করেছি যে, তাদের কোন রক্ষাকারী ছিল না।[১৮]

জন্য যে জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন তা কেমন। তারা যখন সে জান্নাতে গিয়ে পৌছবে তখন সম্পূর্ণরূপে নিজেদের পরিচিত জিনিসের মধ্যে প্রবেশ করবে। তারা তখন জানতে পারবে, তাদেরকে যে জিনিস দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল ঠিক তাই তাদের দেয়া হয়েছে। তাতে সামান্যতম পার্থক্যও নেই।

১২. আল্লাহকে সাহায্য করার একটা সাদামাঠা অর্থ হচ্ছে তার বাণী ও বিধানকে সমুন্নত করার জন্যে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করতে হবে। কিন্তু এর একটি গূঢ় দুর্বোধ্য অর্থও আছে। আমরা ইতিপূর্বে তার ব্যাখ্যা করেছি। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরানের ব্যাখ্যা, টীকা ৫০)

১৩. মূল কথাটি হলো فَتَعْسًا لَّهُمْ । تعس অর্থ হোঁচট লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়া।

১৪. অর্থাৎ তারা নিজেদের প্রাচীন জাহেলী ধ্যান-ধারণা, রীতিনীতি ও নৈতিক বিকৃতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং তাদেরকে সোজা পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ যে শিক্ষা নাযিল করেছেন তা অপছন্দ করেছে।

১৫. এ আয়াতাংশের দু'টি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে, এসব কাফেররা যে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছিল এখন যে কাফেররা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত মানছে না তাদের জন্যও ঠিক অনুরূপ শাস্তি নির্ধারিত হয়ে আছে। অন্য একটি অর্থ হচ্ছে, শুধু দুনিয়ার আযাব দ্বারাই তাদের ধ্বংসের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। আখেরাতেও তাদের জন্য এ ধ্বংস নির্ধারিত হয়ে আছে।

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا
أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٤﴾ مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ
غَيْرِ آسِنٍ ۖ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ۚ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ
لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ ۖ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ
وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا
فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾

এমনকি কখনো হয়, যে ব্যক্তি তার রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট হিদায়াতের ওপর আছে সে ঐ সব লোকের মত হবে যাদের মন্দ কাজকর্মকে সুদৃশ্য বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে গিয়েছে?[১৯] মুত্তাকীদের জন্য যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার অবস্থা এই যে, তার মধ্যে স্বচ্ছ ও নির্মল পানির নহর বইতে থাকবে।[২০] এমন সব দুধের নহর বইতে থাকবে যার স্বাদে সামান্য কোন পরিবর্তন বা বিকৃতিও আসবে না,[২১] শরাবের এমন নহর বইতে থাকবে পানকারীদের জন্য যা হবে অতীব সুস্বাদু[২২] এবং বইতে থাকবে স্বচ্ছ মধুর নহর।[২৩] এ ছাড়াও তাদের জন্য সেখানে থাকবে সব রকমের ফল এবং তাদের রবের পক্ষ থেকে থাকবে ক্ষমা।[২৪] (যে ব্যক্তি এ জান্নাত লাভ করবে সেকি) ঐ ব্যক্তির মত হতে পারে যে চিরদিন জাহান্নামে থাকবে, যাদের এমন গরম পানি পান করানো হবে যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে?

১৬. ওহুদ যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আহত হয়ে কয়েকজন সাহাবীর সাথে পাহাড়ের এক গুহায় অবস্থান করছিলেন তখন আবু সুফিয়ান চিৎকার করে বললো ঃ لَنَا عُزّٰى وَلَا عُزّٰى لَكُمْ "আমাদের আছে উয্যা দেবতা, তোমাদের তো উয্যা নেই।" তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের বললেন ঃ তাকে জবাব দাও اَللّٰهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلٰى لَكُمْ "আমাদের পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী আল্লাহ কিন্তু তোমাদের কোন পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী নেই।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ জবাবটি এ আয়াত থেকেই গৃহীত।

১৭. অর্থাৎ জীবজন্তু যেভাবে খায় অথচ আদৌ চিন্তা করে না যে, এ রিযিক কোথা থেকে এসেছে, কে তা তৈরী করেছে এবং এ রিযিকের সাথে সাথে তার ওপর

রিযিকদাতার কি কি অধিকার বর্তাচ্ছে? ঠিক তেমনি এসব লোকও শুধু খেয়ে চলেছে। চরে বেড়ানোর অধিক আর কোন জিনিসই তাদের চিন্তায় নেই।

১৮. মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে বড় দুঃখ ছিল। তিনি যখন হিজরত করতে বাধ্য হলেন তখন শহরের বাইরে গিয়ে তিনি শহরের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "হে মক্কা! আল্লাহর কাছে তুমি দুনিয়ার সব শহরের চেয়ে প্রিয়। আর আল্লাহর সমস্ত শহরের মধ্যে আমি তোমাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসি। যদি মুশরিকরা আমাকে বের করে না দিতো তাহলে আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।" এ কারণে বলা হয়েছে যে, তোমাকে বহিষ্কার করে মক্কাবাসীরা মনে করছে যে, তারা বড় রকমের সফলতা লাভ করেছে। অথচ এ আচরণের দ্বারা তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছে। আয়াতটির বাচনভঙ্গি স্পষ্ট বলে দিচ্ছে যে, তা অবশ্যম্ভাবী রূপে হিজরতের পরপরই নাযিল হয়ে থাকবে।

১৯. অর্থাৎ এটা কি কিরে সম্ভব যে, নবী এবং তাঁর অনুসারীগণ যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি স্পষ্ট ও সোজা পথ লাভ করেছেন এবং পূর্ণ দূরদৃষ্টির আলোকে তাঁরা তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তখন সেসব লোকদের সাথে চলবেন যারা পুরনো জাহেলিয়াতকে আঁকড়ে ধরে আছে, যারা নিজেদের গোমরাহীকে হিদায়াত এবং কুকর্মকে উত্তম মনে করছে এবং যারা কোন যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে নয়, বরং নিজেদের প্রবৃত্তির ইচ্ছানুসারে কোন্‌টি হক এবং কোন্‌টি বাতিল তার ফায়সালা করে থাকে। তাই এ দুই গোষ্ঠীর জীবন এখন দুনিয়াতে যেমন এক রকম হতে পারে না, তেমনি আখেরাতেও তাদের পরিণাম এক রকম হতে পারে না।

২০. মূল বাক্যাংশ হচ্ছে مَاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ । اسن বলা হয় এমন পানিকে যার স্বাদ ও বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে অথবা যার মধ্যে কোনভাবে গন্ধ সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণত পৃথিবীর সমুদ্র ও নদীর পানি ঘোলা হয়ে থাকে। তার সাথে বালু, মাটি এবং মাঝে মধ্যে নানা রকম উদ্ভিদরাজি মিশে যাওয়ার কারণে বর্ণ ও স্বাদ পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং তাতে কিছু না কিছু দুর্গন্ধও সৃষ্টি হয়। তাই জান্নাতের সমুদ্র ও নদীসমূহের পানির পরিচয় দেয়া হয়েছে এই যে, তা হবে غير اسن অর্থাৎ নির্ভেজাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পানি। তার মধ্যে কোন প্রকার সংমিশ্রণ থাকবে না।

২১. মারফূ' হাদীসে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এই যে, "তা পশুর বাঁট বা স্তন থেকে নির্গত দুধ হবে না।" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ দুধ ঝর্ণার আকারে মাটি থেকে বের করবেন এবং নদীর আকারে প্রবাহিত করবেন। পশুর পালান বা বাঁট থেকে দোহন করে তারপর জান্নাতের নদীসমূহে ঢেলে প্রবাহিত করা হবে এমন নয়। এ কুদরতী দুধের পরিচয়ে বলা হয়েছে, "তার স্বাদে কোন পরিবর্তন আসবে না" অর্থাৎ পশুর পালান থেকে নির্গত দুধে যে এক ধরনের গন্ধ থাকে, তার লেশমাত্রও এতে থাকবে না।

২২. মারফূ' হাদীসে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এই যে, "পদদলন বা মাড়ানো দ্বারা ঐ শরাব নির্গত হবে না" অর্থাৎ সে শরাব দুনিয়ার সাধারণ মদের মত ফল পঁচিয়ে পায়ে মাড়িয়ে নির্গত করা হবে না। বরং এটাও আল্লাহ তা'আলা ঝর্ণার আকারে সৃষ্টি করবেন এবং নদী-নালার আকারে প্রবাহিত করবেন। এর পরিচয় দিতে গিয়ে আরো বলা হয়েছে,

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا
لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ
قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٦﴾

তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা মনযোগ দিয়ে তোমার কথা শোনে এবং যখন তোমার কাছ থেকে চলে যায় তখন যাদেরকে জ্ঞানের নিয়ামত দান করা হয়েছে তাদের জিজ্ঞেস করে যে, এই মাত্র তিনি কি বললেন?[২৫] এরাই সেসব লোক যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে গিয়েছে।[২৬]

"তা হবে পানকারীদের জন্য অতীব সুস্বাদু।" অর্থাৎ তা দুনিয়ার মদের মত তীব্র এবং গন্ধযুক্ত হবে না। দুনিয়ার মদ তো এমন যে, যত বড় অভ্যস্ত মদখোরই তা পান করুক, মুখ বিকৃত না করে পান করতে পারে না।

সূরা সাফ্‌ফাতে এর আরো পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে যে, তা পান করায় শরীরের কোন ক্ষতিও হবে না এবং বুদ্ধি বিভ্রমও ঘটবে না। (আয়াত ৪৭) সূরা ওয়াকিআতে বলা হয়েছে যে, তার কারণে মাথাও ধরবে না কিংবা ব্যক্তির বিবেকও লুপ্ত হবে না। (আয়াত ১৯) এ থেকে জানা গেল যে, তা মাদকতাপূর্ণ হবে না, বরং শুধু স্বাদ ও আনন্দই দান করবে।

২৩. মারফূ' হাদীসে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এই যে, তা মৌমাছির পেট থেকে নির্গত মধু হবে না অর্থাৎ ঐ মধুও ঝর্ণা থেকে নির্গত হবে এবং নদী-নালায় প্রবাহিত হবে। সুতরাং তার মধ্যে মোম, মৌচাকের টুকরা এবং মৃত মৌমাছির পা মিশে থাকবে না। বরং তা হবে নির্যাদ ও নির্ভেজাল মধু।

২৪. জান্নাতের এসব নিয়ামতের উল্লেখের পর আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমার উল্লেখ করার দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, এসব নিয়ামতের চেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেবেন। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, পৃথিবীতে তাদের দ্বারা যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছিল জান্নাতে তাদের সামনে কখনো তার উল্লেখ পর্যন্ত করা হবে না। বরং যাতে তারা জান্নাতে লজ্জিত না হন সে জন্য আল্লাহ তাদের ঐ সব ত্রুটি-বিচ্যুতির ওপর চিরদিনের জন্য পর্দা টেনে দেবেন।

২৫. কাফের, মুনাফিক ও আহলে কিতাবদের মধ্যকার যেসব আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে এসে বসতো, তাঁর বাণী ও নির্দেশাবলী এবং কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ শুনতো তাদের সম্পর্কেই একথা বলা হয়েছে। নবীর (সা) পবিত্র মুখ থেকে যেসব বিষয়ে কথাবার্তা উচ্চারিত হতো তার সাথে তাদের যেহেতু

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰهُمْ تَقْوٰىهُمْ ﴿١٧﴾ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ
اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ فَاَنّٰى لَهُمْ
اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ﴿١٨﴾ فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ
وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ﴿١٩﴾

আর যারা হিদায়াত লাভ করেছে আল্লাহ তাদেরকে আরো অধিক হিদায়াত দান করেন।[২৭] এবং তাদেরকে তাদের অংশের তাকওয়া দান করেন।[২৮] এখন কি এসব লোক শুধু কিয়ামতের জন্যই অপেক্ষা করছে যে, তা তাদের ওপর অকস্মাৎ এসে পড়ুক।[২৯] তার আলামত তো এসে গিয়েছে।[৩০] যখন কিয়ামতই এসে যাবে তখন তাদের জন্য উপদেশ গ্রহণের আর কি অবকাশ থাকবে?

অতএব, হে নবী! ভাল করে জেনে নাও, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদাতের যোগ্য নয়। নিজের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। এবং মু'মিন নারী ও পুরুষদের জন্যও।[৩১] আল্লাহ তোমাদের তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত এবং তোমাদের ঠিকানা সম্পর্কেও অবহিত।

দূরতম সম্পর্কও ছিল না, তাই তারা সবকিছু শুনেও যেন শুনতো না। এ কারণে বাইরে এসেই মুসলমানদের জিজ্ঞেস করতো, এই মাত্র তিনি কি যেন বল্‌ছিলেন?

২৬. তাদের অন্তরের কান যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী শোনার ব্যাপারে বধির হয়ে গিয়েছিলো। এটিই ছিল তার প্রকৃত কারণ। তারা ছিল নিজেদের প্রবৃত্তির দাস। অথচ নবী (সা) যেসব শিক্ষা পেশ করছিলেন তা ছিল তাদের প্রবৃত্তির দাবীর পরিপন্থী। তাই যদিও কোন সময় তারা নবীর (সা) মজলিসে এসে তাঁর কথা শোনার ভান করলেও আসলে তাদের ঝুলিতে কিছুই পড়তো না।

২৭. অর্থাৎ সে একই কথা যা হিদায়াত প্রাপ্ত লোকদের জন্য আরো হিদায়াতের কারণ হতো। অথচ তা শুনে কাফের ও মুনাফিকরা জিজ্ঞেস করতো যে, একটু আগে তিনি কি বলেছেন? যে মজলিস থেকে এ দুর্ভাগারা অযথা সময় নষ্ট করে উঠে যেতো, এ সৌভাগ্যবানরা সে মজলিস থেকেই জ্ঞানের এক নতুন ভাণ্ডার ভরে নিয়ে যেতো।

২৮. অর্থাৎ তারা নিজেদের মধ্যে যে তাকওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সে তাওফীকই দান করেন।

২৯. অর্থাৎ ন্যায় ও সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার কাজটি তো যুক্তি–প্রমাণ, কুরআনের আলৌকিক বর্ণনা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবন এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন দ্বারা অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন পন্থায় করা

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۚ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ
وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ
إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٠﴾ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ
مَعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ ۚ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴿٢١﴾
فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾

৩ রুকূ'

যারা ঈমান আনয়ন করেছে তারা বলছিলো, এমন কোন সূরা কেন নাযিল করা হয় না (যাতে যুদ্ধের নির্দেশ থাকবে)? কিন্তু যখন সুস্পষ্ট নির্দেশ সম্বলিত সূরা নাযিল করা হলো এবং তার মধ্যে যুদ্ধের কথা বলা হলো তখন তোমরা দেখলে, যাদের মনে রোগ ছিল তারা তোমার প্রতি সে ব্যক্তির মত তাকাচ্ছে যার ওপর মৃত্যু চেপে বসেছে।[৩২] তাদের এ অবস্থার জন্য আফসোস (তাদের মুখে) আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি এবং ভাল ভাল কথা। কিন্তু যখন অলংঘনীয় নির্দেশ দেয়া হলো তখন যদি তারা আল্লাহর সাথে কৃত নিজেদের অঙ্গীকারের ব্যাপারে সত্যবাদী প্রমাণিত হতো তাহলে তা তাদের জন্যই কল্যাণকর হতো। এখন তোমাদের থেকে এ ছাড়া অন্য কিছুর কি আশা করা যায় যে, তোমরা যদি ইসলাম থেকে ফিরে যাও[৩৩] তাহলে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং একে অপরের গলা কাটবে?[৩৪]

হয়েছে। এখন ঈমান আনার জন্য এসব লোক কি কিয়ামতকে একেবারে প্রত্যক্ষভাবে দেখে নেয়ার অপেক্ষা করছে?

৩০. কিয়ামতের আলামত বলতে সেসব আলামতকে বুঝানো হয়েছে যা দ্বারা প্রকাশ পায় যে, এখন কিয়ামতের আগমনের সময় ঘনিয়ে এসছে। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলামত হচ্ছে আল্লাহর শেষ নবীর আগমন যার পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবে না। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আনাস, হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী এবং হযরত বুরাইদা বর্ণিত হাদীসসমূহে উদ্ধৃত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা অংগুলি উঠিয়ে বললেন ঃ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ "আমার আগমন ও কিয়ামত এ দু' অঙ্গুলির মত।" অর্থাৎ দু'টি আংগুলের মধ্যে যেমন আর কোন আংগুল নেই তেমনি আমার ও কিয়ামতের মাঝে আর কোন নবী পাঠানো হবে না। আমার পরে এখন শুধু কিয়ামতেরই আগমন ঘটবে।

৩১. ইসলাম মানুষকে যেসব নৈতিকতা শিক্ষা দিয়েছে তার একটি হচ্ছে বান্দা তার প্রভুর বন্দেগী ও ইবাদাত করতে এবং তাঁর দীনের জন্য জীবনপাত করতে নিজের পক্ষ থেকে যত চেষ্টা-সাধনাই করুক না কেন, তার মধ্যে এমন ধারণা কখনো আসা উচিত নয় যে, তার যা করা উচিত ছিল তা সে করেছে। তার বরং মনে করা উচিত যে, তার ওপর তার মালিকের যে দাবী ও অধিকার ছিল তা সে পালন করতে পারেনি। তার উচিত সবসময় দোষ-ত্রুটি স্বীকার করে আল্লাহর কাছে এ দোয়া করা যে, তোমার কাছে আমার যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপরাধ হয়েছে তা ক্ষমা করে দাও। "হে নবী, তোমার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো" আল্লাহর এ আদেশের অর্থ এ নয় যে, নবী (সা) জেনে বুঝে প্রকৃতই কোন অপরাধ করেছিলেন। নাউযুবিল্লাহ! বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর সমস্ত বান্দার মধ্যে যে বান্দা তার রবের বন্দেগী বেশী করে করতেন নিজের এ কাজের জন্য তাঁর অন্তরেও গর্ব ও অহংকারের লেশমাত্র প্রবেশ করতে পারেনি। তাঁর মর্যাদাও ছিল এই যে, নিজের এ মহামূল্যবান খেদমত সত্ত্বেও তাঁর প্রভুর সামনে নিজের অপরাধ স্বীকারই করেছেন। এ অবস্থা ও মানসিকতার কারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় বেশী বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। আবু দাউদ, নাসায়ী এবং মুসনাদে আহমাদের বর্ণিত হাদীসে নবীর (সা) এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে, "আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে একশ' বার ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকি।"

৩২. অর্থাৎ সে সময় মুসলমানরা যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলো এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে কাফেরদের যে আচরণ ছিল তার কারণে যুদ্ধের নির্দেশ আসার পূর্বেই মুসলমানদের সাধারণ মতামত ছিল এই যে, এখন আমাদের যুদ্ধের অনুমতি পাওয়া উচিত। তারা ব্যাকুল চিত্তে আল্লাহর নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিলো এবং বার বার জানতে চাচ্ছিলো যে, এ জালেমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে লড়াই করার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না কেন? কিন্তু যারা মুনাফিকীর আবরণে মুসলমানদের দলে শামিল হয়েছিল। তাদের অবস্থা ছিল মু'মিনদের অবস্থা থেকে ভিন্ন। তারা তাদের প্রাণ ও অর্থ-সম্পদকে আল্লাহ ও তাঁর দীনের চেয়ে অনেক বেশী প্রিয় মনে করতো এবং সে ক্ষেত্রে কোন রকম বিপদের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিল না। যুদ্ধের নির্দেশ আসা মাত্রই তাদেরকে এবং খাঁটি ঈমানদারদেরকে বাছাই করে পরস্পর থেকে আলাদা করে দিন। এ নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাদের ও ঈমানদারদের মধ্যে বাহ্যিক কোন পার্থক্য দেখা যেতো না। তারা এবং এরা উভয়েই নামায পড়তো। রোযা রাখতেও তাদের কোন দ্বিধা-সংকোচ ছিল না। ঠাণ্ডা প্রকৃতির ইসলাম তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। কিন্তু যখন ইসলামের জন্য জীবন বাজি রাখার সময় আসলো তখন তাদের মুনাফিকী প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং ঈমানের লোক দেখানো যে মুখোশ তারা পরেছিল তা খুলে পড়লো। তাদের এ অবস্থা সূরা নিসায় এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ "তোমরা কি সে লোকদের দেখেছো যাদের বলা হয়েছিলো, নিজের হাতকে সংযত রাখো, নামায কায়েম করো এবং যাকাত দাও। এখন তাদেরকে যখন যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তখন তাদের এক দলের অবস্থা এই যে, মানুষকে এমন ভয় পাচ্ছে যে ভয় আল্লাহকে করা উচিত। বরং তার চেয়েও বেশী ভয় পাচ্ছে। তারা বলছে ঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে যুদ্ধের এ নির্দেশ কেন দিলে? আমাদেরকে আরো কিছু অবকাশ দিলে না কেন?" (আয়াত ৭৭)

৩৩. মূল কথাটি হলো اِنْ تَوَلَّيْتُمْ । এ বাক্যাংশের একটি অনুবাদ আমরা ওপরে করেছি। এর দ্বিতীয় অনুবাদ হচ্ছে, "যদি তোমরা মানুষের শাসক হয়ে যাও।"

৩৪. একথাটির একটি অর্থ হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ঈমানদারগণ যে মহান সংস্কারমূলক বিপ্লবের জন্য চেষ্টা-সাধনা করছেন এ সময় তোমরা যদি ইসলামের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে টালবাহানা করো এবং সে মহান সংস্কারমূলক বিপ্লবের জন্য প্রাণ ও সম্পদের বাজি ধরা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে শেষ পর্যন্ত তার পরিণাম এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, তোমরা আবার সেই জাহেলী জীবন ব্যবস্থার দিকে ফিরে যাবে যার ব্যবস্থাধীনে তোমরা শত শত বছর ধরে একে অপরের গলা কেটেছো, নিজেদের সন্তানদের পর্যন্ত জীবন্ত দাফন করেছো এবং আল্লাহর দুনিয়াকে জুলুম ও ফাসাদে ভরে তুলেছো। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমাদের জীবনাচার ও কর্মকাণ্ডের অবস্থা যখন এই যে, যে দীনের প্রতি ঈমান পোষণের কথা তোমরা স্বীকার করেছিলে তার জন্য তোমাদের মধ্যে কোন আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা নেই এবং তার জন্য কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতেও তোমরা প্রস্তুত নও। তাহলে এ নৈতিক অবস্থার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাদেরকে ক্ষমতা দান করেন এবং পার্থিব সব কাজ-কর্মের দায়-দায়িত্ব তোমাদের ওপর অর্পিত হয় তাহলে জুলুম-ফাসাদ এবং ভ্রাতৃঘাতি কাজ ছাড়া তোমাদের থেকে আর কি আশা করা যেতে পারে?

এ আয়াতটি একথাও স্পষ্ট করে দেয় যে, আয়াত ইসলামে 'আত্মীয়তার বন্ধন' ছিন্ন করা হারাম। অপরদিকে ইতিবাচক পন্থায় কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহারকে বড় নেকীর কাজ বলে গণ্য করা হয়েছে এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, আল বাকারা, ৮৩; ১৭৭; আন নিসা, ৮-৩৬; আন নাহল, ৯০; বনী ইসরাইল, ২৬ এবং আন নূর, ২২ আয়াত। رحم শব্দটি আরবী ভাষায় রূপক অর্থে নৈকট্য ও আত্মীয়তা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। কোন ব্যক্তির দুর ও নিকট সম্পর্কীয় সব আত্মীয়ই তার ذوى الارحام । তাদের যার সাথে যত নিকট আত্মীয়তার সম্পর্ক তার অধিকার তত বেশী এবং তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা তত বড় গোনাহ। অত্মীয়তা রক্ষা করার অর্থ হলো, আত্মীয়ের উপকার করার যতটুকু সামর্থ ব্যক্তির আছে তা করতে দ্বিধা না করা। আর আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তির তার সাথে খারাপ ব্যবহার বা আচরণ করা, অথবা যে উপকার করা তার পক্ষে সম্ভব তা না করে পাশ কাটিয়ে চলা। হযরত উমর (রা) এ আয়াত থেকে প্রমাণ পেশ করে "উম্মে ওয়ালাদ" বা সন্তানের মা ক্রীতদাসীকে বিক্রি করা হারাম ঘোষণা করেছিলেন এবং সাহাবা কিরামের সবাই এতে ঐকমত্য প্রকাশ করেছিলেন। হাকেম মুসতাদরিক গ্রন্থে হযরত বুরাইদা থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, একদিন তিনি হযরত উমরের (রা) মজলিসে বসেছিলেন। হঠাৎ মহল্লার মধ্যে চেঁচামেচি শুরু হলো। জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে, এক ক্রীতদাসীকে বিক্রি করা হচ্ছে তাই তাঁর মেয়ে কাঁদছে। হযরত উমর (রা) সে মুহূর্তেই আনসার ও মুহাজিরদের একত্র করে তাদের জিজ্ঞেস করলেন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন তার মধ্যে আত্মীয়তা বা রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার কোন বৈধতা কি আপনারা পেয়েছেন? সবাই জবাব দিলেন, 'না।' হযরত উমর (রা) বললেন ঃ তাহলে এটা

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ
الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ
مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ
وَأَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ
فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾

আল্লাহ তা'আলা এসব লোকের ওপর লা'নত করেছেন এবং তাদেরকে অন্ধ ও বধির বানিয়ে দিয়েছেন। তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেনি, নাকি তাদের মনের ওপর তালা লাগানো আছে?[৩৫] প্রকৃত ব্যাপার হলো, হিদায়াত সুস্পষ্ট হওয়ার পরও যারা তা থেকে ফিরে গেল শয়তান তাদের জন্য এরূপ আচরণ সহজ বানিয়ে দিয়েছে এবং মিথ্যা আশাবাদকে দীর্ঘায়িত করে রেখেছে। এ কারণেই তারা আল্লাহর নাযিলকৃত দীনকে যারা পছন্দ করে না তাদের বলেছে, কিছু ব্যাপারে আমরা তোমাদের অনুসরণ করবো।[৩৬] আল্লাহ তাদের এ সলা-পরামর্শ ভাল করেই জানেন। সে সময় কি অবস্থা হবে যখন ফেরেশতারা তাদের রূহ কবজ করবে এবং তাদের মুখ ও পিঠের ওপর আঘাত করতে করতে নিয়ে যাবে।[৩৭] এসব হওয়ার কারণ হচ্ছে, তারা এমন পন্থার অনুসরণ করেছে যা আল্লাহর অসন্তুষ্টি উৎপাদন করে এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করা পছন্দ করেনি। এ কারণে তিনি তাদের সব কাজ-কর্ম নষ্ট করে দিয়েছেন।[৩৮]

কেমন কথা যে, আপনাদের এ সমাজেই মাকে তার মেয়ে থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে? এর চেয়ে বড় আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নের কাজ আর কি হতে পারে? তারপর তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন। সবাই বললো ত্রুটি রোধ করার জন্য আপনার মতে যে ব্যবস্থা উপযুক্ত মনে করেন তাই গ্রহণ করুন। সুতরাং হযরত উমর (রা) গোটা ইসলামী অঞ্চলে এই সাধারণ নির্দেশ জারী করে দিলেন, যে দাসীর গর্ভে তার মালিকের ঔরসজাত সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে তাকে বিক্রি করা যাবে না। কারণ, এটা আত্মীয়তা বা রক্তের বন্ধন ছিন্ন করা। সুতরাং এ কাজ হালাল নয়।

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾
وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ
وَالصَّابِرِينَ ۙ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا
عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۙ
لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴿٣٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾

৪ রুকূ'

যেসব লোকের মনে রোগ আছে তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, আল্লাহ তাদের মনের ঈর্ষা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করবেন না? আমি চাইলে তাদেরকে চাক্ষুষ দেখিয়ে দিতাম আর তুমি তাদের চেহারা দেখেই চিনতে পারতে। তবে তাদের বাচনভঙ্গি থেকে তুমি তাদেরকে অবশ্যই চিনে ফেলবে। আল্লাহ তোমাদের সব আমল ভাল করেই জানেন। আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করবো যাতে আমি তোমাদের অবস্থা যাঁচাই করে দেখে নিতে পারি তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী এবং কে ধৈর্যশীল।

যারা কুফরী করেছে, আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে এবং তাদের সামনে সঠিক পথ স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর রসূলের সাথে বিরোধ করেছে, প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বরং আল্লাহই তাদের সব কৃতকর্ম ধ্বংস করে দিবেন।[৩৯] হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের আমল ধ্বংস করো না।[৪০]

৩৫. অর্থাৎ হয় এসব লোক কুরআন মজীদ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে না। কিংবা চিন্তা-ভাবনা করার চেষ্টা করে কিন্তু তার শিক্ষা এবং অর্থ ও তাৎপর্য তাদের মনের গভীরে প্রবেশ করে না। কেননা, তাদের হৃদয়-মনে তালা লাগানো আছে। বলা হয়েছে, "মনের ওপরে তাদের তালা লাগানো আছে" একথার অর্থ হচ্ছে, তাদের মনে এমন তালা লাগানো আছে যা ন্যায় ও সত্যকে চিনে না এমন লোকদের জন্যই নির্দিষ্ট।

৩৬. অর্থাৎ ঈমান গ্রহণ করে মুসলমানদের দলে শামিল হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে তারা ইসলামের শত্রুদের সাথে ষড়যন্ত্র করে এসেছে এবং তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে যে, কিছু কিছু ব্যাপারে আমরা তোমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করবো।

৩৭. অর্থাৎ পৃথিবীতে তারা এ কর্মপন্থা অবলম্বন করেছে এ জন্য যাতে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারে এবং কুফর ও ইসলামের যুদ্ধের বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। কিন্তু মৃত্যুর পরে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কোথায় গিয়ে রক্ষা পাবে? সে সময় তাদের কোন কৌশলই তাদেরকে ফেরেশতাদের মারের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

যেসব আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে 'বরযখ' অর্থাৎ কবরের আযাব প্রমাণিত হয় এটি তার একটি। এ আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, মৃত্যুর সময় থেকেই কাফের ও মুনাফিকদের আযাব শুরু হয়ে যায়। কিয়ামতে তাদের মোকদ্দমার ফায়সালা হওয়ার পর যে শাস্তি দেয়া হবে এ আযাব তা থেকে ভিন্ন জিনিস। আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন আন নিসা, ৯৭ আয়াত; আল আনআম, ৯৩-৯৪; আল আনফাল, ৫০; আন্ নাহল, ২৮-৩২; আল মু'মিনূন। ৯৯-১০০; ইয়াসীন ২৬-২৭ এবং টীকা ২২-২৩ এবং আল মু'মিন ৪৬, টীকা ৬২ সহ।

৩৮. কাজ-কর্ম অর্থ সেসব কাজ যা তারা মুসলমান সেজে করেছে। তাদের নামায, রোযা, যাকাত মোটকথা সেসব ইবাদাত-বন্দেগী ও নেকীর কাজসমূহ যা বাহ্যিকভাবে নেকীর কাজ বলে গণ্য হতো। এসব নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে তারা মুসলমান হয়েও আল্লাহ, তার দীন এবং ইসলামী মিল্লাতের সাথে আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার আচরণ করেনি বরং শুধু নিজের পার্থিব স্বার্থের জন্য দীনের দুশমনদের সাথে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদের সুযোগ আসা মাত্রই নিজেকে বিপদ থেকে রক্ষা করার চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

কুফর ও ইসলামের যুদ্ধে যে ব্যক্তির সমবেদনা ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে নয়। কিংবা কুফরী ব্যবস্থা ও কাফেরদের পক্ষে আল্লাহর কাছে তার কোন আমল গ্রহণযোগ্য হওয়া তো দূরের কথা তার ঈমানই আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

৩৯. এ আয়াতাংশের দু'টি অর্থ। একটি অর্থ হলো, নিজেদের বিবেচনায় তারা যেসব কাজ-কর্মকে নেকীর কাজ মনে করে আঞ্জাম দিয়েছে আল্লাহ তা সবই ধ্বংস করে দিবেন এবং তার জন্য তারা আখেরাতেও কোন পারিশ্রমিক পাবে না। অন্য অর্থটি হচ্ছে তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দীনের পথে বাধা সৃষ্টি করার জন্য যেসব কৌশল অবলম্বন করছে তা সবই ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়ে যাবে।

৪০. অন্য কথায় আমলসমূহের কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ হওয়া সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্যের ওপর। আনুগত্য থেকে ফিরে যাওয়ার পর কোন আমলই আর নেক আমল থাকে না। তাই এ ধরনের ব্যক্তি সে আমলের জন্য প্রতিদানলাভের উপযুক্তও হতে পারে না।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ
يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ ۖ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ۚ
وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ
وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾
إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴿٣٧﴾ هَا أَنْتُمْ
هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ ۚ وَمَنْ
يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِنْ
تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴿٣٨﴾

কুফর অবলম্বনকারী, আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টিকারী এবং কুফরীসহ, মৃত্যুবরণকারীকে আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং সন্ধির জন্য আহবান করো না।[৪১] তোমরাই বিজয়ী থাকবে। আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। তিনি তোমাদের আমল কখনো নষ্ট করবেন না। দুনিয়ার এ জীবন তো খেল তামাশা মাত্র।[৪২] তোমরা যদি ঈমানদার হও এবং তাকওয়ার পথে চলতে থাক তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের ন্যায্য প্রতিদান অবশ্যই দিবেন। আর তিনি তোমাদের সম্পদ চাইবেন না।[৪৩] তিনি যদি কখনো তোমাদের সম্পদ চান এবং সবটাই চান তাহলে তোমরা কৃপণতা করবে এবং তিনি তোমাদের ঈর্ষা পরায়ণতা প্রকাশ করে দিবেন।[৪৪] দেখো, তোমাদেরকে আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে আহবান জানানো হচ্ছে অথচ তোমাদের মধ্যকার কিছু লোক কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করে তারা প্রকৃতপক্ষে নিজের সাথেই কৃপণতা করছে। আল্লাহ তো অভাব শূন্য। তোমরাই তার মুখাপেক্ষী। তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আল্লাহ তোমাদের স্থানে অন্য কোন জাতিকে নিয়ে আসবেন। তারা তোমাদের মত হবে না।

৪১. এখানে এ বিষয়টি মনে রাখা দরকার যে, এমন এক সময় একথাটি বলা হয়েছিল যখন মদীনার ক্ষুদ্র জনপদে মুহাজির ও আনসারদের একটি ক্ষুদ্র দল ইসলামের

পতাকা বহন করছিলো। তাদেরকে শুধু কুরাইশদের মত শক্তশালী গোত্রের মোকাবিলা করতে হচ্ছিলো না বরং গোটা আরবের কাফের ও মুশরিকদের মোকাবিলা করতে হচ্ছিলো। এমন এক পরিস্থিতিতে বলা হচ্ছে সাহস হারিয়ে এ দুশমনদের সন্ধির আহবান জানাবে না, বরং জীবন বাজি রাখার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। মুসলমানরা কোন সময়ই সন্ধির জন্য আলোচনা করবে না একথার অর্থ তা নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে এমন পরিস্থিতিতে সন্ধির আলোচনা করা ঠিক নয় যখন তার অর্থ দাঁড়াবে নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করা। এবং তাতে শত্রু আরো দুঃসাহসী হয়ে উঠবে। মুসলমানদের উচিত প্রথমে নিজেদের শক্তিমত্তা দেখিয়ে দেয়া। এরপর সন্ধির জন্য আলোচনা করলে কোন ক্ষতি নেই।

৪২. অর্থাৎ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার অবস্থা কয়েকদিনের মনভুলানোর চেয়ে অধিক কিছু নয়। এখানকার সফলতা ও বিফলতা সত্যিকার ও স্থায়ী কোন কিছু নয় যা গুরুত্বের দাবী রাখে। প্রকৃত জীবন হচ্ছে আখেরাতের জীবন। সে জীবনের সফলতার জন্য মানুষের চিন্তা–ভাবনা করা উচিত। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনকাবুত, টীকা ১০২)

৪৩. অর্থাৎ তিনি অভাব শূন্য। তাঁর নিজের জন্য তোমাদের থেকে নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি যদি তোমাদেরকে তার পথে কিছু ব্যয় করতে বলেন, তা নিজের জন্য বলেন না, বরং তোমাদেরই কল্যাণের জন্য বলেন।

৪৪. অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে এত বড় পরীক্ষায় ফেলেন না যা থেকে তোমাদের দুর্বলতাই শুধু প্রকাশ পেতো।

আল ফাতহ্

৪৮

নামকরণ

সূরার একেবারে প্রথম আয়াতের اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا বাক্যাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। এটি এ সূরার শুধু নামই নয় বরং বিষয়বস্তু অনুসারে এর শিরোনামও। কেননা, আল্লাহ তা'আলা হুদাইবিয়ার সন্ধির আকারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদেরকে যে মহান বিজয় দান করেছিলেন এতে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

৬ষ্ঠ হিজরীর যুল-কা'দা মাসে মক্কার কাফেরদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনার দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন সে সময় এ সূরাটি নাযিল হয়। এ ব্যাপারে সমস্ত রেওয়ায়াত একমত।

ঐতিহাসিক পটভূমি

যেসব ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরাটি নাযিল হয়েছিল তার সূচনা হয়েছিলো এভাবে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন স্বপ্নে দেখলেন, তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে পবিত্র মক্কা নগরীতে গিয়ে উমরা আদায় করেছেন। নবীর স্বপ্ন নিছক স্বপ্ন এবং কল্পনা হতে পারে না। বরং তা এক প্রকার অহী। পরবর্তী ২৭ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজেও একথা অনুমোদন করেছেন যে, তিনিই তাঁর রসূলকে এ স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। তাই প্রকৃতপক্ষে এটি নিছক স্বপ্ন ছিল না, বরং মহান আল্লাহর ইংগিত ছিল যার অনুসরণ নবীর (সা) জন্য জরুরী ছিল।

বাহ্যিক কার্যকারণ অনুসারে এ নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা কোনভাবেই সম্ভব বলে মনে হচ্ছিলো না। কাফের কুরাইশরা ৬ বছর যাবত মুসলমানদের জন্য বায়তুল্লাহর পথ বন্ধ করে রেখেছিল এবং এ পুরো সময়টাতে তারা হজ্জ ও উমরাহ আদায়ের জন্য পর্যন্ত কোন মুসলমানকে হারাম এলাকার ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। তাই এখন কি করে আশা করা যায় যে, তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহাবীদের একটি দলসহ মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে? উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম সাথে নিয়ে বের হওয়ার অর্থ যুদ্ধ ডেকে আনা এবং নিরস্ত্র হয়ে যাওয়ার অর্থ নিজের ও সংগীদের জীবনকে বিপন্ন করা। এ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলার ইংগিত অনুসারে কিভাবে কাজ করা যেতে পারে তা কেউই বুঝে উঠতে পারছিলো না।

কিন্তু নবীর পদমর্যাদাই এই যে, তাঁর রব তাঁকে যে নির্দেশই দান করেন তা তিনি বিনা দ্বিধায় বাস্তবায়িত করেন। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্বপ্নের কথা দ্বিধাহীন চিত্তে সাহাবীদের বললেন এবং সফরের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। আশপাশের গোত্রসমূহের মধ্যেও ব্যাপকভাবে ঘোষণা করলেন, আমরা উমরা আদায়ের জন্য যাচ্ছি। যারা আমাদের সাথে যেতে ইচ্ছুক তারা যেন এসে দলে যোগ দেয়। বাহ্যিক কার্যকারণসমূহের ওপর যাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তারা মনে করলো, এরা মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। তাদের কেউই তাঁর সাথে যেতে প্রস্তুত হলো না। কিন্তু যারা সত্যি সত্যিই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করতো পরিণাম সম্পর্কে তারা কোন পরোয়াই করছিলো না। তাদের জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, এটা আল্লাহ তা'আলার ইংগিত এবং তাঁর রসূল এ নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। সুতরাং এখন কোন জিনিসই আর তাদেরকে আল্লাহর রসূলকে সহযোগিতা করা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম ছিল না। নবীর (সা) সাথে এ বিপজ্জনক সফরে যেতে ১৪শ' সাহাবী প্রস্তুত হলেন।

৬ষ্ঠ হিজরীর যুল-কা'দা মাসের প্রারম্ভে এ পবিত্র কাফেলা মদীনা থেকে যাত্রা করলো। যুল-হুলাইফাতে[১] পৌঁছে সবাই উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধলেন। কুরবানীর জন্য ৭০টি উট সাথে নিলেন। এসব উটের গলায় কুরবানীর চিহ্ন স্বরূপ কিলাদা লটকানো ছিল।

আরবের সর্ব স্বীকৃত নিয়মানুসারে বায়তুল্লাহর যিয়ারতকারীদের জন্য মালপত্রের মধ্যে একখানা তরবারি নেয়ার অনুমতি ছিল। সুতরাং সবাই মালপত্রের মধ্যে একখানা করে তরবারি নিলেন। এ ছাড়া যুদ্ধের আর কোন উপকরণ সংগে নিলেন না। এভাবে তাঁদের এ কাফেলা লাব্বায়কা, লাব্বায়কা ধ্বনি তুলে বায়তুল্লাহ অভিমুখে যাত্রা করলো।

সে সময় মক্কা ও মদীনার মধ্যে যে ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল আরবের প্রতিটি শিশুও সে সম্পর্কে অবহিত ছিল। এই তো গত বছরই ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে কুরাইশরা বিভিন্ন আরব গোত্রের সম্মিলিত শক্তি নিয়ে মদীনার ওপর চড়াও হয়েছিল যার কারণে বিখ্যাত আহযাব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এত বড় একটা কাফেলা নিয়ে তাঁর রক্তের পিয়াসী শত্রুর নিজ এলাকার দিকে যাত্রা করলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই গোটা আরবের দৃষ্টি এ বিস্ময়কর সফরের প্রতি নিবদ্ধ হলো। সংগে সংগে তারা এও দেখলো যে, এ কাফেলা লড়াই করার জন্য যাত্রা করেনি। বরং পবিত্র মাসে ইহ্‌রাম বেঁধে কুরবানীর উট সাথে নিয়ে একেবারে নিরস্ত্র অবস্থায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফের জন্য যাচ্ছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ পদক্ষেপ কুরাইশদেরকে মারাত্মক অসুবিধায় ফেলে দিল। যে পবিত্র মাসগুলোকে শতশত বছর ধরে আরবে হজ্জ ও বায়তুল্লাহর যিয়ারতের জন্য পবিত্র মনে করা হতো যুল-কা'দা মাসটি ছিল তার অন্যতম। যে কাফেলা এ পবিত্র মাসে ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জ অথবা উমরার জন্য যাত্রা করছে তাকে বাধা দেয়ার অধিকার কারো ছিল না। এমনকি কোন গোত্রের সাথে যদি তার শত্রুতা থেকে থাকে তবুও আরবের সর্বজন স্বীকৃত আইন অনুসারে সে তাকে তার এলাকা দিয়ে অতিক্রম করতেও বাধা দিতে পারে না। কুরাইশরা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লো যে, যদি তারা

১। এ স্থানটি মদীনা থেকে মক্কার পথে ৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এর বর্তমান নাম বি'রে আলী। মদীনার হাজীগণ এখান থেকেই হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে থাকেন।

মদীনার এ কাফেলার ওপর হামলা করে মক্কা প্রবেশ করতে বাধা দেয় তাহলে গোটা দেশে হৈ চৈ শুরু হয়ে যাবে। আরবের প্রতিটি মানুষ বলতে শুরু করবে এটা বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। আরবের সমস্ত গোত্র মনে করবে, আমরা খানায়ে কা'বার মালিক মুখতার হয়ে বসেছি। প্রতিটি গোত্রই এ ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বে যে, ভবিষ্যতে কাউকে হজ্জ ও উমরা করতে দেয়া না দেয়া আমাদের মর্জির ওপর নির্ভরশীল। আজ যেমন মদীনার এ যিয়ারতকারীদের বাধা দিচ্ছি তেমনি যাদের প্রতিই আমরা অসন্তুষ্ট হবো ভবিষ্যতে তাদেরকেই বায়তুল্লাহর যিয়ারত করতে বাধা দেব। এটা হবে এমন একটা ভুল যার কারণে সমগ্র আরব আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। অপরদিকে আমরা যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এত বড় কাফেলা নিয়ে নির্বিঘ্নে আমাদের শহরে প্রবেশ করতে দেই তাহলে গোটা দেশের সামনেই আমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিনষ্ট হবে। লোকজন বলবে, আমরা মুহাম্মাদের (সা) ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি। শেষ পর্যন্ত অনেক চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনার পর তাদের জাহেলী আবেগ ও মানসিকতাই তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করলো এবং তারা নিজেদের মুখ রক্ষার জন্য যে কোন মূল্যে এ কাফেলাকে শহরে প্রবেশ করতে না দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগেভাগেই বনী কা'ব গোত্রের এক ব্যক্তিকে গুপ্তচর হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যাতে সে যথাসময়ে তাঁকে কুরাইশদের সংকল্প ও গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত করতে থাকে। তিনি উসফান[১] নামক স্থানে পৌঁছলে সে এসে জানালো যে, পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে কুরাইশরা যি-তুয়ায়[২] পৌঁছেছে এবং তাঁর পথরোধ করার জন্য তারা খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে দুই শত অশ্বারোহী সহ কুরাউল গামীম[৩] অভিমুখে অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছে। কুরাইশদের চক্রান্ত ছিল এই যে, কোন না কোন উপায়ে নবীর (সা) সংগী-সাথীদের উত্যক্ত করে উত্তেজিত করা এবং তার পরে যুদ্ধ সংঘটিত হলে গোটা দেশে একথা প্রচার করে দেয়া যে, উমরা আদায়ের বাহানা করে এরা প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ করার জন্যই এসেছিলো এবং শুধু ধোঁকা দেয়ার জন্যই ইহ্‌রাম বেঁধেছিলো।

এ খবর পাওয়া মাত্র রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাস্তা পরিবর্তন করলেন এবং ভীষণ কষ্ট স্বীকার করে অত্যন্ত দুর্গম একটি পথ ধরে হারাম শরীফের একেবারে প্রান্ত সীমায় অবস্থিত হুদাইবিয়ায়[৪] গিয়ে পৌঁছলেন। এখানে খুযা'আ গোত্রের নেতা বুদায়েল ইবনে ওয়ারকা তার গোত্রের কতিপয় লোককে সাথে নিয়ে নবীর (সা) কাছে আসলো এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলো। আপনি কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন? নবী (সা) বললেন ঃ "আমরা কারো বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসিনি। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু বায়তুল্লাহর যিয়ারত ও তাওয়াফ।" তারা গিয়ে কুরাইশ নেতাদের একথাটিই জানিয়ে দিল।

১। এ স্থানটি মদীনা থেকে মক্কাগামী পথে মক্কা থেকে প্রায় দু'দিনের দূরত্বে অবস্থিত। অর্থাৎ উটের পিঠে এখান থেকে মক্কা পৌঁছতে দু'দিন লেগে যায়।

২। মক্কার বাইরে উসফানগামী পথের ওপর অবস্থিত একটি স্থান।

৩। উসফান থেকে মক্কা অভিমুখে আট মাইল দূরে অবস্থিত।

৪। জেদ্দা থেকে মক্কাগামী সড়কের যে স্থানে হারাম শরীফের সীমা শুরু হয়েছে এ স্থানটি ঠিক সেখানে অবস্থিত। বর্তমানে এ স্থানটির নাম শুমাইসি। মক্কা থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১৩ মাইল।

তারা তাদেরকে এ পরামর্শও দিল যে, তারা যেন হারামের এসব যিয়ারতকারীদের পথরোধ না করে। কিন্তু তারা তাদের জিদ বজায় রাখলো এবং নবীকে (সা) ফিরে যেতে রাজি করানোর জন্য আহাবিশদের নেতা হুলাইস ইবনে আলকামাকে তাঁর কাছে পাঠালো। কুরাইশ নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা না মানলে সে অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে আসবে এবং এভাবে আহাবিশদের শক্তি তাদের পক্ষে থাকবে। কিন্তু সে এসে যখন স্বচক্ষে দেখলো, গোটা কাফেলা ইহ্‌রাম বেঁধে আছে, গলায় কিলাদা লটকানো কুরবানীর উটগুলো সামনেই দাঁড়িয়ে আছে এবং এ মানুষগুলো লড়াই করার জন্য নয়, বরং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করার জন্য এসেছে তখন সে নবীর (সা) সাথে কোন কথাবার্তা না বলেই মক্কায় ফিরে গিয়ে কুরাইশ নেতাদের স্পষ্ট বলে দিল যে, তারা বায়তুল্লাহর মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে তা যিয়ারত করতে এসেছে। তোমরা যদি তাদের বাধা দাও তাহলে আহাবিশরা কখনো তোমাদের সহযোগিতা করবে না। তোমরা নিষিদ্ধ বিষয়কে পদদলিত করবে আর আমরা সাহায্য-সহযোগিতা করবো এ জন্য আমরা তোমাদের সাথে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হইনি।

অতপর কুরাইশদের পক্ষ থেকে মাসউদ সাকাফী আসলো এবং সেও নিজের পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভাল-মন্দ সব দিক বুঝিয়ে তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করার সংকল্প থেকে বিরত রাখতে চাইলো। নবী (সা) বনী খুযাআ গোত্রের নেতাকে যে জওয়াব দিয়েছিলেন তাকেও সে একই জওয়াব দিলেন। অর্থাৎ আমরা লড়াই করার উদ্দেশ্যে আসিনি, বায়তুল্লাহর মর্যদা প্রদর্শনকারী হিসেবে একটি ধর্মীয় কর্তব্য পালন করার জন্য এসেছি। ফিরে গিয়ে উরওয়া কুরাইশদের বললো ঃ আমি কায়সার, কিসরা এবং নাজ্জাসীর দরবারে গিয়েছি। কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি মুহাম্মাদের (সা) সংগী-সাথীদেরকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যেমন নিবেদিত প্রাণ দেখেছি তেমন দৃশ্য বড় বড় বাদশাহর দরবারেও দেখিনি। এদের অবস্থা এই যে, মুহাম্মাদ (সা) অযু করলে তারা এক বিন্দু পানিও মাটিতে পড়তে দেয় না, সবাই তা নিজেদের শরীর ও কাপড়ে মেখে নেয়। এখন চিন্তা করে দেখ, তোমরা কার মোকাবিলা করতে যাচ্ছো?

দূতদের আসা যাওয়া ও আলাপ-আলোচনা চলাকালীন সময়ে গোপনে নবীর (সা) সেনা শিবিরে আকস্মিক হামলা চালিয়ে সাহাবীদের উত্তেজিত করা এবং যুদ্ধের অজুহাত হিসেবে কাজে লাগানো যায় তাদের দ্বারা এমন কোন কাজ করানোর জন্য কুরাইশরা বারবার চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের ধৈর্য ও সংযম এবং নবীর (সা) বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি তাদের সমস্ত অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। তাদের চল্লিশ পঞ্চাশজন লোকের একটি দল একদিন রাত্রিকালে এসে মুসলমানদের তাঁবুর ওপরে পাথর নিক্ষেপ ও তীর বর্ষণ করতে থাকে। সাহাবা কিরাম, তাদের সবাইকে বন্দী করে নবীর (সা) সামনে হাজির করেন। কিন্তু তিনি তাদের সবাইকে ছেড়ে দেন। অপর এক ঘটনায় ঠিক ফজর নামাযের সময় তানঈমের[১] দিক থেকে ৮০ ব্যক্তির একটি দল এসে অকস্মিকভাবে হামলা করে বসে। তাদেরকেও বন্দী করা হয়। নবী (সা) তাদেরকেও মুক্ত করে দেন। এভাবে কুরাইশরা তাদের প্রতিটি ধূর্তামি ও অপকৌশলে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে থাকে।

১। মক্কার হারাম সীমার বাইরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম, মক্কার লোকেরা সাধারনত এখানে এসে ওমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধে এবং ফিরে গিয়ে ওমরাহ আদায় করে।

অবশেষে নবী (সা) নিজের পক্ষ থেকে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দূত হিসেবে মক্কায় পাঠান এবং তাঁর মাধ্যমে কুরাইশ নেতাদের জানিয়ে দেন যে, আমরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নয়, বরং বায়তুল্লাহর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কুরবানীর পশু সংগে নিয়ে এসেছি। বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও কুরবানী করে ফিরে যাব। কিন্তু তারা এতে স্বীকৃত হলো না এবং হযরত উসমানকে মক্কাতে আটক করলো। এ সময় খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, হযরত উসমানকে (রা) হত্যা করা হয়েছে তাঁর ফিরে না আসায় মুসলমানরাও নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, খবরটা সত্য। এখন অধিক সংযম প্রদর্শনের আর কোন অবকাশ ছিল না। মক্কা প্রবেশের ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন জিনিস। সে জন্য শক্তি প্রয়োগের কোন চিন্তা আদৌ ছিল না। কিন্তু যখন দূতকে হত্যা করার ঘটনা পর্যন্ত ঘটলো তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া মুসলমানদের আর কোন উপায় থাকলো না। সুতরাং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সমস্ত সাহাবীকে একত্রিত করলেন এবং তাদের নিকট থেকে এ মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করলেন যে, আমরা এখন এখান থেকে আমৃত্যু পিছু হটবো না। অবস্থার নাজুকতা বিচার করলে যে কেউ উপলব্ধি করবেন যে, এটা কোন মামুলি বাইয়াত ছিল না। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪ শত। কোন যুদ্ধ সরঞ্জামও তাদের সাথে ছিল না। নিজেদের কেন্দ্র থেকে আড়াই শত মাইল দূরে একেবারে মক্কার সীমান্তে অবস্থান করছিলেন তারা, যেখানে শত্রু তার পুরো শক্তি নিয়ে আক্রমণ করতে পারতো এবং আশপাশের সহযোগী গোত্রগুলোকে ডেকে এনে তাদের ঘিরে ফেলতে পারতো। এসব সত্ত্বেও শুধু একজন ছাড়া গোটা কাফেলার সবাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে হাত রেখে জীবনের ঝুঁকি নিতে দ্বিধাহীন চিত্তে প্রস্তুত হয়ে গেল। তাদের নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমান এবং আল্লাহর পথে নিবেদিত প্রাণ হওয়ার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে? এটিই ইসলামের ইতিহাসে "বাইয়াতে রিদওয়ান" নামে খ্যাত।

পরে জানা গেল যে, হযরত উসমানকে হত্যা করার খবর মিথ্যা ছিল। হযরত উসমান নিজেও ফিরে আসলেন এবং কুরাইশদের পক্ষ থেকে সন্ধির আলোচনা করার জন্য সুহাইল ইবনে আমরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দলও নবীর (সা) শিবিরে এসে পৌঁছলো। নবী (সা) এবং তাঁর সংগী-সাথীদের আদৌ মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না—কুরাইশরা তাদের এ জিদ ও একগুঁয়েমী পরিত্যাগ করেছিলো। তবে নিজেদের মুখ রক্ষার জন্য তারা পীড়াপীড়ি করছিলো যে, নবী (সা) এ বছর ফিরে যাবেন এবং আগামী বছর আসতে পারবেন। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর যেসব শর্তের ভিত্তিতে সন্ধি পত্র লেখা হলো তা হচ্ছে ঃ

(১) উভয় পক্ষের মধ্যে দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ থাকবে এবং এক পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে গোপনে বা প্রকাশ্যে কোন প্রকার তৎপরতা চালাবে না।

(২) এ সময়ে কুরাইশদের কেউ তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া যদি পালিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চলে যায় তাহলে তিনি তাকে ফেরত দেবেন। কিন্তু তাঁর সংগী-সাথীদের কেউ কুরাইশদের কাছে চলে গেলে তারা তাকে ফেরত পাঠাবে না।

(৩) যে কোন আরব গোত্র যে কোন পক্ষের মিত্র হয়ে এই চুক্তির অন্তরভুক্ত হতে চাইলে তার সে অধিকার থাকবে।

(৪) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বছর ফিরে যাবেন এবং আগামী বছর উমরার জন্য এসে এ শর্তে তিনদিন মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন যে, সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে শুধু একখানা করে তরবারি ছাড়া আর কোন যুদ্ধ সরঞ্জাম সাথে আনতে পারবেন না। মক্কাবাসীরা উক্ত তিন দিন তাদের জন্য শহর খালি করে দেবে যাতে কোন প্রকার সংঘর্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়। কিন্তু ফিরে যাওয়ার সময় এখানকার কোন অধিবাসীকে সংগে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি তাঁর থাকবে না।

যে সময় এ সন্ধির শর্তসমূহ নির্ধারিত হচ্ছিলো তখন মুসলমানদের পুরা বাহিনী অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছিলেন। যে মহত উদ্দেশ্য সামনে রেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব শর্ত মেনে নিচ্ছিলেন তা কেউই বুঝে উঠতে পারছিলো না। এ সন্ধির ফলে যে বিরাট কল্যাণ অর্জিত হতে যাচ্ছিলো তা দেখতে পাওয়ার মত দূরদৃষ্টি কারোই ছিল না। কুরাইশদের কাফেররা একে তাদের সফলতা মনে করছিলো আর মুসলমানরা বিচলিত হচ্ছিল এই ভেবে যে, তারা নিচ হয়ে এ অবমাননাকর শর্তাবলী গ্রহণ করবে কেন? এমন কি হযরত উমরের (রা) মত গভীরদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানীজনের অবস্থা ছিল এই যে, তিনি বলেন ঃ ইসলাম গ্রহণের পরে কখনো আমার মনে কোন সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু এ যাত্রায় আমিও তা থেকে রক্ষা পাইনি। তিনি বিচলিত হয়ে হযরত আবু বকরের (রা) কাছে গিয়ে বললেন ঃ "তিনি কি আল্লাহর রসূল নন? আমরা কি মুসলমান নই? এসব লোক কি মুশরিক নয়? এসব সত্ত্বেও আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে এ অবমাননা মেনে নেব কেন?" তিনি জবাব দিলেন ঃ "হে উমর তিনি আল্লাহর রসূল আল্লাহ কখনো তাঁকে ধ্বংস করবেন না।" এরপরও তিনি ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকেও এ প্রশ্নগুলো করলেন। হযরত আবু বকর (রা) তাঁকে যে জবাব দিয়েছিলেন নবীও (সা) তাঁকে সেরূপ জবাব দিলেন। এ সময় হযরত উমর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যে কথাবার্তা বলেছিলেন তার জন্য তিনি পরবর্তী সময়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত ছিলেন। তাই তিনি অধিক পরিমাণে দান-খয়রাত এবং নফল নামায আদায় করতেন। যাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মাফ করে দেন।

এ চুক্তির দু'টি শর্ত লোকজনের কাছে সবচেয়ে বেশী অসহনীয় ও দুর্বিসহ মনে হচ্ছিলো। এক, ২ নম্বর শর্ত। এটি সম্পর্কে লোকজনের বক্তব্য হলো এটি অসম শর্ত। মক্কা থেকে পালিয়ে আসা লোকদের যদি আমরা ফিরিয়ে দেই তাহলে মদীনা থেকে পালিয়ে আসা লোকদের তারা ফিরিয়ে দেবে না কেন? এর জবাবে নবী (সা) বললেন ঃ যে আমাদের এখান থেকে পালিয়ে তাদের কাছে চলে যাবে সে আমাদের কোন্ কাজে লাগবে? আল্লাহ যেন তাকে আমাদের থেকে দূরেই রাখেন। তবে যে তাদের ওখান থেকে পালিয়ে আমাদের কাছে চলে আসবে তাকে যদি আমরা ফিরিয়েও দেই তাহলে তার মুক্তিলাভের অন্য কোন উপায় হয়তো আল্লাহ সৃষ্টি করে দেবেন। দ্বিতীয় যে জিনিসটি লোকজনের মনে দ্বিধা-সংশয় সৃষ্টি করছিলো সেটি ছিল সন্ধির চতুর্থ শর্ত। মুসলমানগণ মনে করছিলেন, এটি মেনে নেয়ার অর্থ হচ্ছে গোটা আরবের দৃষ্টিতে আমরা যেন ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছি। তাছাড়া এ প্রশ্নও মনে সন্দেহ সৃষ্টি করছিলো যে, নবী (সা) তো স্বপ্নে দেখেছিলেন, আমরা মক্কায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করছি। অথচ এখানে আমরা তাওয়াফ

না করেই ফিরে যাওয়ার শর্ত মেনে নিচ্ছি। নবী (সা) একথাটির ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন ঃ এ বছরই তাওয়াফ করা হবে স্বপ্নে একথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। চুক্তির শর্ত অনুসারে এ বছর যদি না-ও হয় তাহলে আগামী বছর ইনশায়াল্লাহ্ তাওয়াফ হবে।

যে ঘটনাটি জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢালার কাজ করলো তা হচ্ছে, যে সময় সন্ধি চুক্তিটি লিপিবদ্ধ করা হচ্ছিলো ঠিক তখন সুহাইল ইবনে আমরের পুত্র আবু জানদাল কোন প্রকারে পালিয়ে নবীর (সা) শিবিরে গিয়ে হাজির হলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মক্কার কাফেররা তাকে বন্দী করে রেখেছিলো। এ সময় তাঁর পায়ে শিকল পরানো ছিল এবং দেহে নির্যাতনের চিহ্ন ছিল। তিনি নবীর (সা) কাছে আবেদন জানালেন, আমাকে এ অন্যায় বন্দীদশা থেকে মুক্ত করুন। এ করুণ অবস্থা দেখে সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে ধৈর্যধারণ করা কঠিন হয়ে পড়লো। সুহাইল ইবনে আমর বললো ঃ চুক্তিপত্র লেখা শেষ না হলেও চুক্তির শর্তাবলী সম্পর্কে আপনার ও আমাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। অতএব এ ছেলেকে আমার হাতে অর্পণ করুন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার যুক্তি মেনে নিলেন এবং আবু জানদালকে জালেমদের হাতে তুলে দিলেন।

সন্ধি চুক্তি শেষ করে নবী (সা) সাহাবীদের বললেন ঃ এখানেই কুরবানী করে মাথা মুড়ে ফেলো এবং ইহ্‌রাম শেষ করো। কিন্তু কেউ-ই তাঁর জায়গা থেকে একটুও নড়লেন না। নবী (সা) তিনবার আদেশ দিলেন কিন্তু দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও মর্মবেদনা সাহাবীদের ওপর এমন প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিলো যে, তাঁরা যার যার জায়গা হতে একটু নড়াচড়া পর্যন্ত করলেন না। নবী (সা) সাহাবীদের আদেশ দিচ্ছেন কিন্তু তাঁরা তা পালনের জন্য তৎপর হচ্ছেন না এমন ঘটনা এ একটি ক্ষেত্র ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লামের গোটা নবুওয়াত জীবনে আর কখনো ঘটেনি। এতে নবী (সা) অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। তিনি তাঁর তাঁবুতে গিয়ে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামার কাছে নিজের মনোকষ্টের কথা প্রকাশ করলেন। হযরত উম্মে সালামা বললেন, আপনি চুপচাপ গিয়ে নিজের উট কুরবানী করুন এবং ক্ষৌরকার ডেকে মাথা মুড়ে ফেলুন। তাহলে সবাই স্বতস্ফূর্তভাবে আপনাকে অনুসরণ করবে এবং বুঝবে, যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তা পরিবর্তিত হওয়ার নয়। হলোও তাই। নবীকে (সা) এরূপ করতে দেখে সবাই কুরবানী করলো, মাথা মুড়ে কিংবা চুল ছেঁটে নিল এবং ইহ্‌রাম থেকে বেরিয়ে আসলো। কিন্তু দুঃখ ও মর্ম যাতনায় তাদের হৃদয় চৌচির হয়ে যাচ্ছিলো।

এরপর এ কাফেলা যখন হুদাইবিয়ার সন্ধিকে নিজেদের পরাজয় ও অপমান মনে করে মদীনার দিকে ফিরে যাচ্ছিলো তখন দাজনান[১] নামক স্থানে (অথবা কারো কারো মতে কুরাউল গামীম) এ সূরাটি নাযিল হয় যা মুসলমানদের জানিয়ে দেয় যে, এ সন্ধিচুক্তি যাকে তারা পরাজয় মনে করছে তা প্রকৃতপক্ষে বিরাট বিজয়। এ সূরা নাযিল হওয়ার পর নবী (সা) মুসলমানদের একত্রিত করে বললেন ঃ আজ আমার ওপর এমন জিনিস নাযিল হয়েছে যা আমার জন্য দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুর চেয়েও বেশী মূল্যবান। তারপর তিনি এ সূরা তেলাওয়াত করলেন এবং বিশেষভাবে হযরত উমরকে ডেকে তা শুনালেন। কেননা, তিনিই সবচেয়ে বেশী মনোকষ্ট পেয়েছিলেন।

১। মক্কা থেকে প্রায় ২৫ মাইল দূরবর্তী একটি স্থান।

ঈমানদারগণ যদিও আল্লাহ তা'আলার এ বাণী শুনেই সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। তবুও খুব বেশী সময় যেতে না যেতেই এ চুক্তির সুফলসমূহ এক এক করে প্রকাশ পেতে থাকলো এবং এ চুক্তি যে সত্যিই একটা বিরাট বিজয় সে ব্যাপারে আর কারো মনে কোন সন্দেহ থাকলো না।

এক ঃ এ চুক্তির মাধ্যমে আরবে প্রথমবারের মত ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নেয়া হলো। এর পূর্ব পর্যন্ত আরবদের দৃষ্টিতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সংগী-সাথীগণের মর্যাদা ছিল শুধু কুরাইশ ও আরব গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী একটি গোষ্ঠী হিসেবে তারা তাদের সমাজচ্যুত (Out law) বলেই মনে করতো। এখন তাঁর সাথে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে কুরাইশরা নিজেরাই ইসলামী রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত এলাকার ওপর তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব মেনে নিল এবং এ দু'টি রাজনৈতিক শক্তির যার সাথে ইচ্ছা মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার পথ খুলে দিল।

দুই ঃ কুরাইশরা এ যাবত ইসলামকে ধর্মহীনতা বলে আখ্যায়িত করে আসছিলো। কিন্তু মুসলমানদের জন্য বায়তুল্লাহর যিয়ারতের অধিকার মেনে নিয়ে তারা আপনা থেকেই যেন একথাও মেনে নিল যে, ইসলাম কোন ধর্মহীনতা নয়, বরং আরবে স্বীকৃত ধর্মসমূহের একটি এবং অন্যান্য আরবদের মত এ ধর্মের অনুসারীরাও হজ্জ ও উমরার অনুষ্ঠানসমূহ পালনের অধিকার রাখে। কুরাইশদের অপপ্রচারের ফলে আরবের মানুষের মনে ইসলামের বিরুদ্ধে যে ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিলো এতে সে ঘৃণাও অনেকটা হ্রাস পেল।

তিন ঃ দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হওয়ার ফলে মুসলমানগণ নিরাপত্তা ও শান্তিলাভ করলেন এবং গোটা আরবের আনাচে কানাচে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এত দ্রুত ইসলামের প্রচার চালালেন যে, হুদাইবিয়ার সন্ধি পরবর্তী দু' বছরে যত লোক মুসলমান হলো সন্ধি পূর্ববর্তী পুরো ১৯ বছরেও তা হয়নি। সন্ধির সময় যেখানে নবীর (সা) সাথে মাত্র ১৪ শত লোক ছিলেন। সেখানে মাত্র দুই বছর পরেই কুরাইশদের চুক্তিভঙ্গের ফলে নবী (সা) যখন মক্কায় অভিযান চালান তখন দশ হাজার সৈনিকের এক বিশাল বাহিনী তাঁর সাথে ছিল। এটা ছিল হুদাইবিয়ার সন্ধির সুফল।

চার ঃ কুরাইশদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অধিকারভুক্ত এলাকায় ইসলামী সরকারকে সুদৃঢ় করার এবং ইসলামী আইন-কানুন চালু করে মুসলিম সমাজকে একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা ও সংস্কৃতি হিসেবে দাঁড় করানোর সুযোগ লাভ করেন। এটিই সেই মহান নিয়ামত যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়েদার ৩ আয়াতে বলেছেন ঃ "আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের জন্য আমার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের দীন হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করলাম।" (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা মায়েদার ভূমিকা এবং টীকা ১৫)

পাঁচ ঃ কুরাইশদের সাথে সন্ধি হয়ে যাওয়ার পর দক্ষিণ দিক থেকে শান্তি লাভের এ সুফলও পাওয়া গেল যে, মুসলমানগণ উত্তর ও মধ্য আরবের সমস্ত বিরোধী শক্তিকে অতি সহজেই বশীভূত করে নেয়। হুদাইবিয়ার সন্ধির মাত্র তিন মাস পরেই ইহুদীদের সবচেয়ে বড় দুর্গ খায়বার বিজিত হয় এবং তারপর ফাদাক, ওয়াদিউল কুরা, তায়মা ও তাবুকের

মত ইহুদী জনপদও একের পর এক মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে। তারপর মধ্য আরবের যেসব গোত্র ইহুদী ও কুরাইশদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছিলো তার সবগুলোই এক এক করে মুসলমানদের শাসনাধীন হয়ে পড়ে। হুদাইবিয়ার সন্ধি এভাবে মাত্র দু' বছরের মধ্যে আরবে শক্তির ভারসাম্য এতটা পাল্টে দেয় যে, কুরাইশ এবং মুশরিকদের শক্তি অবদমিত হয়ে পড়ে এবং ইসলামের বিজয় নিশ্চিত হয়ে যায়।

যে সন্ধিচুক্তিকে মুসলমানগণ তাদের ব্যর্থতা আর কুরাইশরা তাদের সফলতা মনে করছিলো সে সন্ধিচুক্তি থেকেই তারা এসব সুফল ও কল্যাণ লাভ করে। এ সন্ধিচুক্তির যে বিষয়টি মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে বেশী অপছন্দনীয় ছিল এবং কুরাইশরা তাদের বড় বিজয় বলে মনে করেছিলো তা হচ্ছে, মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় আশ্রয় গ্রহণকারীদের ফিরিয়ে দেয়া হবে কিন্তু মদীনা থেকে পালিয়ে মক্কায় গমনকারীদের ফিরিয়ে দেয়া হবে না। কিন্তু অল্প কিছুদিন যেতে না যেতেই এ ব্যাপারটিও কুরাইশদের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ালো এবং অভিজ্ঞতার আলোকে জানা গেল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি কি কি সুফল দেখে এ শর্তটি মেনে নিয়েছিল। সন্ধির কিছুদিন পরেই মক্কার একজন মুসলমান আবু বাসীর কুরাইশদের বন্দীত্ব থেকে পালিয়ে মদীনায় চলে আসেন। কুরাইশরা তাকে ফেরত দেয়ার দাবী জানালো এবং নবীও (সা) চুক্তি অনুযায়ী মক্কা থেকে যারা তাকে বন্দী করে নিয়ে যেতে এসেছিলো তাদের কাছে হস্তান্তর করলেন। কিন্তু মক্কা যাওয়ার পথে সে আবার তাদের বন্দীত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে এবং লোহিত সাগরের যে পথ ধরে কুরাইশদের বাণিজ্য বহর যাতায়াত করতো সে পথের একটি স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এরপর থেকে যে মুসলমানই কুরাইশদের বন্দীত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করার সুযোগ করতে পারতো সে-ই মদীনায় যাওয়ার পরিবর্তে আবু বাসীরের আশ্রয়ে চলে যেতো। এভাবে সেখানে ৭০ জনের সমাবেশ ঘটে এবং তারা কুরাইশদের কাফেলার ওপর বারবার অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে তাদের অবস্থা শোচনীয় করে তোলে। অবশেষে তাদেরকে মদীনায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কুরাইশরা নিজেরাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আহবান জানায়। এভাবে হুদায়বিয়ার চুক্তির ঐ শর্তটি আপনা থেকেই রহিত হয়ে যায়।

এ ঐতিহাসিক পটভূমি সামনে রেখে সূরাটি অধ্যয়ন করলে তা ভালভাবে বোধগম্য হতে পারে।

আয়াত ২৯ | সূরা আল ফাতহ্–মাদানী | রুকূ' ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝١ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۝٢ وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۝٣

হে নবী, আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি[১] যাতে আল্লাহ তোমার আগের ও পরের সব ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করে দেন,[২] তোমার জন্য তাঁর নিয়ামতকে পূর্ণত্ব দান করেন,[৩] তোমাকে সরল সহজ পথ দেখিয়ে দেন[৪] এবং অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে সাহায্য করেন।[৫]

১. হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে বিজয়ের এ সুসংবাদ শুনানো হলে লোকজন বিস্মিত হলো এই ভেবে যে, এ সন্ধিকে বিজয় বলা যায় কি করে? ঈমানের ভিত্তিতে আল্লাহর নির্দেশ মেনে নেয়া ভিন্ন কথা। কিন্তু তাকে বিজয় বলাটা কারোরই বোধগম্য হচ্ছিলো না। এ আয়াতটি শুনে হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, এটা কি বিজয়? নবী (সা) বললেন ঃ হাঁ (ইবনে জারীর)। অন্য একজন সাহাবীও নবীর (সা) কাছে এসে একই প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ اى والذى نفس محمد بيده انه لفتح সেই মহান সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মাদের (সা) প্রাণ, এটা অবশ্যই বিজয়। (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ) মদীনায় ফেরার পর আরো এক ব্যক্তি তার সংগীকে বললো, "এটা কেমন বিজয়? বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে আমাদের বাধা দেয়া হয়েছে, আমাদের কুরবানীর উটগুলোও আর সামনে অগ্রসর হতে পারেনি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুদাইবিয়াতেই থামতে হয়েছে এবং এ সন্ধির ফলেই আমাদের দু' মজলুম ভাই আবু জানদাল ও আবু বাসীরকে জালেমদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।" একথাটি নবী (সা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ এটি অত্যন্ত ভুল কথা। প্রকৃতপক্ষে এটা বিরাট বিজয়। তোমরা একেবারে মুশরিকদের বাড়ীর দরজায় গিয়ে হাজির হয়েছিলে এবং তারা আগামী বছর উমরা করতে দেয়ার প্রস্তাব দিয়ে তোমাদের ফিরে যেতে সম্মত করেছিল। যুদ্ধ বন্ধ করা এবং সন্ধি করার জন্য তারা নিজেরাই ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। অথচ তাদের মনে তোমাদের প্রতি যে শত্রুতা রয়েছে তা অজানা নয়। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাদের ওপর বিজয় দান করেছেন। সেদিনের কথা কি ভুলে গেলে উহুদে যেদিন তোমরা

ছুটে পালাচ্ছিলে আর আমি পশ্চাত দিক থেকে চিৎকার করে তোমাদের ডাকছিলাম? সেদিনের কথা কি ভুলে গেলে যেদিন আহযাবের যুদ্ধে শত্রুরা সব দিক থেকে চড়াও হয়েছিল এবং তোমাদের শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল? (বায়হাকীতে উরওয়া ইবনে যুবায়েরের বর্ণনা) কিন্তু এ সন্ধি যে প্রকৃতই বিজয় তা কিছুদিন যেতে না যেতেই প্রকাশ পেতে থাকলো এবং সব শ্রেণীর মানুষের কাছে একথা পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, প্রকৃতপক্ষে হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকেই ইসলামের বিজয়ের সূচনা হয়েছিলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ এবং হযরত বারা ইবনে আযেব এ তিন সাহাবী থেকে প্রায় একই অর্থে একটি কথা বর্ণিত হয়েছে যে, লোকেরা মক্কা বিজয়কেই প্রকৃত বিজয় বলে থাকে। কিন্তু আমরা হুদাইবিয়ার সন্ধিকেই প্রকৃত বিজয় মনে করি। (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর)

২. যে পরিবেশ পরিস্থিতিতে একথাটি বলা হয়েছে তা মনে রাখলে স্পষ্ট বুঝা যায়, ইসলামের সাফল্য ও বিজয়ের জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে মুসলমানগণ বিগত ১৯ বছর ধরে যে চেষ্টা-সাধনা করে আসছিলেন তার মধ্যে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা রয়ে গিয়েছিলো এখানে সেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে। এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি কি তা কোন মানুষের জানা নেই। বরং মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি এ চেষ্টা-সাধনার মধ্যে কোন ত্রুটি ও অপক্কতা খুঁজে পেতে একেবারেই অক্ষম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে পূর্ণতার যে অতি উচ্চ মানদণ্ড রয়েছে তার বিচারে ঐ চেষ্টা-সাধনার মধ্যে এমন কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল যার কারণে মুসলমানগণ আরবের মুশরিকদের বিরুদ্ধে এত দ্রুত চূড়ান্ত বিজয় লাভ করতে পারতেন না। আল্লাহ তা'আলার বাণীর তাৎপর্য হচ্ছে, তোমরা যদি ঐ সব ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে চেষ্টা-সাধনা করতে তাহলে আরব বিজিত হতে আরো দীর্ঘ সময় দরকার হতো। কিন্তু এসব দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে কেবল নিজের মেহেরবানী দ্বারা আমি তোমাদের অপূর্ণতা দূর করেছি এবং হুদাইবিয়া নামক স্থানে তোমাদের জন্য সে বিজয় ও সফলতার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছি যা স্বাভাবিকভাবে তোমাদের প্রচেষ্টা দ্বারা অর্জিত হতো না।

এখানে একথাটিও ভালভাবে উপলব্ধি করা দরকার যে, কোন লক্ষ ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যে দল চেষ্টা-সাধনা চালাচ্ছে তার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য সে দলের নেতাকে সম্বোধন করা হয়। তার অর্থ এ নয় যে, ঐ সব ত্রুটি ও দুর্বলতা উক্ত নেতার ব্যক্তিগত ত্রুটি ও দুর্বলতা। গোটা দল সম্মিলিতভাবে যে চেষ্টা-সাধনা চালায় ঐ সব ত্রুটি ও দুর্বলতা সে দলের সম্মিলিত চেষ্টা-সাধনার। কিন্তু নেতাকে সম্বোধন করে বলা হয়, আপনার কাজে এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্তমান।

তা সত্ত্বেও যেহেতু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পূর্বাপর সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাই সাধারণভাবে এ শব্দগুলো থেকে এ বিষয়টিও বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর রসূলের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি (যা কেবল তাঁর উচ্চ মর্যাদার বিচারে ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল) ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল। এ কারণে সাহাবায়ে কিরাম যখন নবীকে (সা) ইবাদাতের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক রকমের কষ্ট করতে দেখতেন তখন বলতেন, আপনার পূর্বাপর সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতিই তো ক্ষমা করা হয়েছে। তারপরও আপনি এত কষ্ট

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ۗ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝۴

তিনিই তো সে সত্তা যিনি মু'মিনদের মনে প্রশান্তি নাযিল করেছেন[৬] যাতে তারা নিজেদের ঈমান আরো বাড়িয়ে নেয়।[৭] আসমান ও যমীনের সমস্ত বাহিনী আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন। তিনি মহাজ্ঞানী ও কৌশলী।[৮]

করেন কেন? জবাবে নবী (সা) বলতেন ঃ اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا "আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দাও হবো না?" (আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

৩. নিয়ামতকে পূর্ণতা দানের অর্থ হচ্ছে মুসলমানরা স্বস্থানে সব রকম ভয়-ভীতি, বাধা-বিপত্তি এবং বাইরের সব রকম হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থেকে পুরোপুরি ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ইসলামী আইন-কানুন অনুসারে জীবন যাপনের স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং পৃথিবীতে আল্লাহর বিধানকে উঁচু করে তুলে ধরার শক্তি লাভ করবে। কুফর ও পাপাচারের আধিপত্য যা আল্লাহর দাসত্বের পথে বাধা এবং আল্লাহর বিধানকে সমুন্নত করার প্রচেষ্টায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তা ঈমানদারদের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ। কুরআন এ বিপদকেই ফিতনা বলে আখ্যায়িত করে। এ ফিতনা থেকে মুক্তি পেয়ে যখন তারা এমন একটি শান্তির আবাস লাভ করে যেখানে আল্লাহর দীন পূর্ণরূপে হুবহু বাস্তবায়িত হতে পারে এবং সাথে সাথে এমন উপায়-উপকরণও লাভ করে যার দ্বারা আল্লাহর যমীনে কুফর ও পাপাচারের স্থানে ঈমান ও তাকওয়ার শাসন চালু করতে পারে তখন তা হয় তাদের জন্য আল্লাহর নিয়ামতের পরিপূর্ণতা দান। মুসলমানরা যেহেতু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমেই আল্লাহর এ নিয়ামত লাভ করেছিলো, তাই আল্লাহ তা'আলা নবীকে (সা) সম্বোধন করেই বলেছেন ঃ আমি তোমার জন্য আমার নিয়ামতকে পরিপূর্ণতা দান করতে চাচ্ছিলাম, আর সে জন্যই তোমাকে এ বিজয় দান করেছি।

৪. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সোজা পথ দেখানোর অর্থ এখানে তাঁকে বিজয় ও সাফল্যের পথ দেখনো। অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা হুদাইবিয়া নামক স্থানে সন্ধিচুক্তি করিয়ে নবীকে (সা) ইসলামের বিরুদ্ধে বাধাদানকারী শক্তিসমূহকে পরাভূত করার পথ সহজ করে দিয়েছেন এবং সে জন্য কৌশল শিখিয়ে দিয়েছেন।

৫. আরেকটি অনুবাদ এও হতে পারে যে, "তোমাকে অভূতপূর্ব বা বিরল সাহায্য দান করেছেন।" মূল আয়াতে نَصْرًا عَزِيْزًا ব্যবহৃত হয়েছে। عَزِيْز শব্দের অর্থ যেমন পরাক্রমশালী তেমনি নজীরবিহীন, অতুলনীয় এবং বিরলও। প্রথম অর্থের বিচারে এ আয়াতাংশের তাৎপর্য হচ্ছে, এ সন্ধির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নবীকে (সা) যে সাহায্য করেছেন তার কারণে তাঁর শত্রুরা অক্ষম হয়ে পড়বে। দ্বিতীয় অর্থটির বিচারে এর তাৎপর্য হচ্ছে, মানুষ বাহ্যত যে জিনিসটিকে শুধু একটি সন্ধিচুক্তি হিসেবে দেখছিলো—তাও

আবার অবদমিত হয়ে মেনে নেয়া সন্ধি—তা-ই একটি চূড়ান্ত বিজয়ে রূপান্তরিত হবে, কাউকে সাহায্য করার এমন অদ্ভুত পন্থা খুব কমই গ্রহণ করা হয়েছে।

৬. سكينة আরবী ভাষায় স্থিরতা, প্রশান্তি ও দৃঢ় চিত্ততাকে বুঝায়। এখানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের অন্তরে তা নাযিল করাকে হুদাইবিয়ায় ইসলাম ও মুসলমানগণ যে বিজয় লাভ করেছিলেন তার গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সে সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলেই বুঝা যায় তা কি ধরনের প্রশান্তি ছিল যা ঐ পুরো সময়টা ধরেই মুসলমানদের হৃদয় মনে অবতীর্ণ করা হয়েছিল আর কিভাবে তা এ বিজয়ের কারণ হয়েছিল। যে সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরা আদায়ের জন্য মক্কা শরীফ যাওয়ার সংকল্প প্রকাশ করেছিলেন মুসলমানগণ যদি সে সময় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তেন এবং মুনাফিকদের মত মনে করতেন যে, এতো স্পষ্টত মৃত্যুর মুখের মধ্যে চলে যাওয়া কিংবা পথে যখন খবর পাওয়া গেল কাফের কুরাইশরা যুদ্ধ করতে সংকল্প করেছে তখন যদি মুসলমানরা হতবুদ্ধি ও অস্থির হয়ে পড়তেন যে, যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম ছাড়াই কিভাবে আমরা শত্রুর মোকাবিলা করবো আর এ কারণে তাদের মধ্যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হতো তাহলে হুদাইবিয়াতে যে ফলাফল অর্জিত হয়েছিল তা কখনো অর্জিত হতো না। তাছাড়া কাফেররা হুদাইবিয়ায় যখন মুসলমানদের অগ্রসর হতে বাধা দিয়েছিল, যখন আকস্মিক হামলা চালিয়ে এবং রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করে করে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিল, যখন হযরত 'উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতলাভের খবর পাওয়া গিয়েছিল, যখন আবু জানদাল অত্যাচারিতের মূর্ত ছবি হয়ে মুসলমানদের জনসমাবেশের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তখন যদি মুসলমানগণ উত্তেজিত হয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শৃংখলা ও সংযম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা নষ্ট করতেন তাহলে সবকিছুই ভণ্ডুল হয়ে যেতো। সবচেয়ে বড় কথা হলো, মুসলমানদের গোটা সংগঠনের কাছে সন্ধিচুক্তির যেসব শর্ত অত্যন্ত অপছন্দনীয় ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তা মেনে নিয়েই চুক্তি সম্পাদন করতে যাচ্ছিলেন তখন যদি সাহাবীগণ নবীর (সা) নির্দেশ অমান্য করে বসতেন তাহলে হুদাইবিয়ার এ বিরাট বিজয় বিরাট পরাজয়ে রূপান্তরিত হতো। এসব নাজুক মুহূর্তে রসূলের নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শন সম্পর্কে, ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে এবং নিজেদের আদর্শিক কর্ম-তৎপরতার ন্যায় ও সত্য হওয়া সম্পর্কে মুসলমানদের মনে যে পূর্ণ আস্থা ও প্রশান্তি ছিল তা সরাসরি আল্লাহর মেহেরবানী। এ কারণে তারা ধীর স্থির মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে, আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে যাই ঘটুক না কেন তা সবই শিরধার্য। এ কারণে তারা ভয়-ভীতি, অস্থিরতা, উস্কানি এবং নৈরাশ্য সবকিছু থেকে মুক্ত ছিলেন। এর কল্যাণেই তাঁদের শিবিরে পূর্ণ শৃংখলা ও সংযম বজায় ছিল এবং সন্ধির শর্তসমূহ সম্পর্কে অত্যন্ত মনোক্ষুণ্ন হওয়া সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিদ্ধান্ত অবনত মস্তকে মেনে নিয়েছিলেন। এটাই সেই প্রশান্তি যা আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের মনে নাযিল করেছিলেন। এর কল্যাণেই উমরা আদায়ের সেই বিপদসংকুল উদ্যোগটি সর্বোত্তম সাফল্যের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

৭. অর্থাৎ তাদের যে ঈমান এ অভিযানের পূর্বে ছিল, তার সাথে আরো ঈমান তারা অর্জন করলো এ কারণে যে, এ অভিযান চলাকালে একের পর এক যত পরীক্ষা এসেছে তার প্রত্যেকটিতে তারা নিষ্ঠা, তাকওয়া ও আনুগত্যের নীতির ওপর দৃঢ়পদ থেকেছে।

لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا
عَظِيمًا ۝ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ
الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۖ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

(এ কাজ তিনি এ জন্য করেছেন) যাতে ঈমানদার নারী ও পুরুষদেরকে[৯] চিরদিন অবস্থানের জন্য এমন জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেন যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তাদের মন্দ কর্মসমূহ দূর করবেন।[১০] এটা আল্লাহর কাছে বড় সফলতা। আর যেসব মুনাফিক নারী ও পুরুষ এবং মুশরিক নারী ও পুরুষ আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে[১১] তাদের শাস্তি দেবেন। তারা নিজেরাই অকল্যাণের চক্রে পড়ে গিয়েছে।[১২] আল্লাহর গযব পড়েছে তাদের ওপর তিনি লা'নত করেছেন তাদেরকে এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন—যা অত্যন্ত জঘন্য জায়গা। আসমান ও যমীনের সকল বাহিনী আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন। তিনি মহাজ্ঞানী ও কৌশলী।[১৩]

যেসব আয়াত থেকে বুঝা যায় ঈমান কোন স্থির, জড় ও অপরিবর্তনীয় অবস্থার নাম নয়। বরং ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধি ও ওঠানামা আছে, এ আয়াতটি তার একটি। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে মু'মিনের জীবনের পদে পদে এমন সব পরীক্ষা আসে যখন তাকে এ সিদ্ধান্তকর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় যে, আল্লাহর দীনের জন্য সে তার জান–মাল, আবেগ-অনুভূতি, আশা–আকাংখা, সময়, আরাম–আয়েশ এবং স্বার্থ কুরবানী করতে প্রস্তুত আছে কিনা। এরূপ প্রতিটি পরীক্ষার সময় যদি সে কুরবানী ও ত্যাগের পথ অনুসরণ করে তাহলে তার ঈমান উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তার ঈমান থমকে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত এমন এক সময়ও আসে যখন তার ঈমানের প্রাথমিক পুঁজিও সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে যা নিয়ে সে ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করেছিল। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনফাল, টীকা ২; আল আহযাব, টীকা ৩৮)

৮. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে এমন বাহিনী আছে, যার সাহায্যে তিনি যখন ইচ্ছা কাফেরদের ধ্বংস করে দিতে পারেন। কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইচ্ছা করেই

তিনি ঈমানদারদের ওপরে এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যাতে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে চেষ্টা–সাধনা ও দ্বন্দ্ব–সংঘাতে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করেন। এ কাজের দ্বারাই তাদের মর্যাদা উন্নত এবং আখেরাতের সাফল্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়। পরের আয়াত এ কথারই প্রতিধ্বনি করছে।

৯. কুরআন মজীদে সাধারণত ঈমানদারদের পুরস্কারের উল্লেখ সামষ্টিকভাবে করা হয়ে থাকে। নারী ও পুরুষের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয় না। কিন্তু এখানে একত্রে উল্লেখ করলে যেহেতু এরূপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারতো যে, এ পুরস্কার হয়তো শুধু পুরুষদের জন্যই। তাই আল্লাহ তা'আলা মু'মিন নারীদের সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তারাও মু'মিন পুরুষদের সাথে এ পুরস্কারে সমভাবে অংশীদার। এর কারণ স্পষ্ট। যেসব দীনদার ও আল্লাহভীরু মহিলা তাদের স্বামী, পুত্র, ভাই ও পিতাকে এ বিপজ্জনক সফরে যেতে বাধা দেয়া এবং মাতম ও বিলাপ করে নিরুৎসাহিত করার পরিবর্তে সাহস যুগিয়েছেন, যারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের বাড়ীঘর ও সন্তান–সন্ততি, তাদের সহায়–সম্পদ, তাদের সম্ভ্রম এবং তাদের সন্তানদের সংরক্ষক হয়ে এ ব্যাপারে তাদেরকে দুশ্চিন্তা মুক্ত রেখেছেন। একযোগে চৌদ্দশ' সাহাবীর চলে যাওয়ার পর আশেপাশের কাফের ও মুনাফিকরা শহরের ওপর আক্রমণ করে না বসে এ আশংকায় যারা কান্নাকাটি ও চিৎকার শুরু করে দেয়নি তারা বাড়ীতে অবস্থান করা সত্ত্বেও সওয়াব ও পুরস্কারের ক্ষেত্রে তারা যে তাদের পুরুষদের সাথে সমান অংশীদার হবেন—এটাই স্বাভাবিক।

১০. অর্থাৎ মানবিক দুর্বলতার কারণে যে ত্রুটি–বিচ্যুতিই তাদের দ্বারা হয়েছে তা মাফ করে দেবেন, জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে ঐ সব ত্রুটি–বিচ্যুতির সব রকম প্রভাব থেকে তাদের পবিত্র করবেন এবং এমনভাবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে যে, তাদের দেহে কোন কালিমা থাকবে না যার কারণে সেখানে তাদেরকে লজ্জিত হতে হবে।

১১. এ যাত্রায় মদীনার আশেপাশের মুনাফিকদের ধারণা ছিল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাথীগণ এ সফর থেকে জীবিত ফিরে আসতে পারবেন না। পরবর্তী ১২ আয়াতে একথাটিই বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া মক্কার মুশরিক এবং তাদের সহযোগী কাফেররা মনে করেছিল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সংগীগণকে উমরা আদায় করা থেকে বিরত রেখে তারা তাঁকে পরাজিত ও অপমানিত করতে সক্ষম হয়েছে। ঐ দু'টি গোষ্ঠীর এসব চিন্তার মূলে প্রকৃতপক্ষে যে জিনিসটি কার্যকর ছিল তাহলো আল্লাহ সম্পর্কে তাদের এই কুধারণা যে, তিনি তাঁর নবীকে সাহায্য করবেন না এবং হক ও বাতিলের এ সংঘাতে হকের আওয়াজকে অবদমিত করার অবাধ সুযোগ দেবেন।

১২. অর্থাৎ যে মন্দ পরিণাম থেকে তারা রক্ষা পেতে চাচ্ছিল এবং যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা এসব কৌশল অবলম্বন করেছিল তারা নিজেরাই সে ফাঁদে আটকা পড়েছে। তাদের সেসব কৌশলই তাদের মন্দ পরিণাম ত্বরান্বিত করার কারণ হয়েছে।

১৩. এ কথাটিকে এখানে আরেকটি উদ্দেশ্যে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। ৪ নম্বর আয়াতে কথাটি যে উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল তা হচ্ছে, কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর অতি প্রাকৃতিক বাহনীকে কাজে লাগানোর পরিবর্তে মু'মিনদের

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۚ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ
إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۚ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ
نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

হে নবী, আমি তোমাকে সাক্ষ্যদানকারী,১৪ সুসংবাদদানকারী এবং সতর্ককারী১৫ হিসেবে পাঠিয়েছি— যাতে হে মানুষ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন, তাঁকে সাহায্য কর তাঁর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা দেখাও এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর।১৬

হে নবী যারা তোমার হাতে বাইয়াত করছিলো প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর কাছেই বাইয়াত করছিলো।১৭ তাদের হাতের ওপর ছিল আল্লাহর হাত।১৮ যে এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার অশুভ পরিণাম তার নিজের ওপরেই বর্তাবে। আর যে আল্লাহর সাথে কৃত এ প্রতিশ্রুতি পালন করবে,১৯ আল্লাহ অচিরেই তাকে বড় পুরস্কার দান করবেন।

দ্বারাই তা করিয়েছেন। কারণ, তিনি মু'মিনদের পুরস্কৃত করতে চাচ্ছিলেন। আর এখানে এ বিষয়টিকে পুনরায় বর্ণনা করেছেন এ জন্য যে, আল্লাহ যাকে শাস্তি দিতে চান তার মূলোৎপাটনের জন্য তিনি নিজের সৈন্যবাহিনীর মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন। কারো এ ক্ষমতা নেই যে, নিজের কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার জোরে তাঁর শাস্তি এড়িয়ে যেতে পারে।

১৪. শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (র) شاهد শব্দের অনুবাদ করেছেন اظهارحق كننده সত্য প্রকাশকারনী এবং অন্যান্য অনুবাদকগণ অনুবাদ করেছেন "সাক্ষ্যদানকারী"। শাহাদাত শব্দটি এ দু'টি অর্থই বহন করে। ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আহযাবের তাফসীর, টীকা ৮২।

১৫. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আহযাবের তাফসীর, টীকা ৮৩।

১৬. কোন কোন মুফাস্‌সির বলেছেন, تُعَزِّرُوهُ ও تُوَقِّرُوهُ শব্দ দু'টির هُ সর্বনাম দ্বারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং تُسَبِّحُوهُ শব্দের هُ সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের মতে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, "তোমরা রসূলকে সহযোগিতা দান করো এবং তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা দেখাও আর সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকো।" কিন্তু একই বাক্যের মধ্যে সর্বনামসমূহ দ্বারা কোন ইংগিত ছাড়াই দু'টি আলাদা সত্তাকে বুঝানো হবে তা সঠিক হতে পারে না।

এ কারণে আরেক দল মুফাস্‌সিরের মতে সবগুলো সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকেই বুঝানো হয়েছে। তাঁদের মতে বাক্যের অর্থ হচ্ছে, "তোমরা আল্লাহর সাথে থাকো, তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা দেখাও এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকো।"

সকাল ও সন্ধ্যায় পবিত্রতা বর্ণনা করার অর্থ শুধু সকাল ও সন্ধ্যাই নয়, বরং সর্বক্ষণ পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকা। এটা ঠিক তেমনি, যেমন আমরা বলে থাকি অমুক জিনিসটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জুড়ে প্রসিদ্ধ। এর অর্থ এ নয় যে, শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষই বিষয়টি জানে, বরং এর অর্থ হচ্ছে সারা পৃথিবীতেই তা পরিচিত ও আলোচিত।

১৭. পবিত্র মক্কা নগরীতে হযরত উসমানের (রা) শহীদ হয়ে যাওয়ার খবর শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম থেকে হুদাইবিয়া নামক স্থানে যে বাইয়াত নিয়েছিলেন সেই বাইয়াতের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক বর্ণনা অনুসারে এ মর্মে বাইয়াত নেয়া হয়েছিলো যে, আমরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবো না। প্রথম মতটি হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে আর দ্বিতীয়টি বর্ণিত হয়েছে হযরত ইবনে উমর, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ এবং মা'কাল ইবনে ইয়াসার থেকে। দু'টিরই প্রতিপাদ্য বিষয় এক। সাহাবীগণ এ সংকল্প নিয়ে রসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন যে, তারা সবাই এখানে এ মুহূর্তেই কুরাইশদের সাথে বুঝাপড়া করবেন, এমনকি পরিণামে সবাই নিহত হলেও। প্রকৃতই হযরত উসমান শহীদ হয়েছেন না জীবিত আছেন এ ক্ষেত্রে তা যেহেতু নিশ্চিত জানা ছিল না তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পক্ষ থেকে নিজের একহাত অন্য হাতের ওপর রেখে বাইয়াত করলেন। এভাবে হযরত উসমান (রা) এ অসাধারণ মর্যাদা লাভ করলেন যে, নবী (সা) নিজের পবিত্র হাতকে তাঁর হাতের স্থলাভিষিক্ত করে তাঁকে বাইয়াতে অংশীদার করলেন। হযরত উসমানের (রা) পক্ষ থেকে নবীর (সা) নিজের বাইয়াত করার অনিবার্য অর্থ হলো তাঁর প্রতি নবীর (সা) এ মর্মে পূর্ণ আস্থা ছিল যে, তিনি যদি উপস্থিত থাকতেন তাহলে অবশ্যই বাইয়াত করতেন।

১৮. অর্থাৎ সে সময় লোকেরা যে হাতে বাইয়াত করছিলো তা ব্যক্তি রসূলের হাত ছিল না, আল্লাহর প্রতিনিধির হাত ছিল এবং রসূলের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সাথে এ বাইয়াত অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো।

১৯. এখানে একটি অতি সূক্ষ্ম বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে। আরবী ভাষার সাধারণ নিয়ম অনুসারে এখানে عَاهَدَ عَلَيْهِ اللّٰهَ পড়া উচিত ছিল। কিন্তু এ সাধারণ নিয়ম পরিত্যাগ করে এখানে عَلَيْهُ اللّٰهَ পড়া হয়ে থাকে। আল্লামা আলূসী অস্বাভাবিকভাবে এ اعراب দেয়ার দু'টি কারণ বর্ণনা করেছেন। একটি হচ্ছে, এ বিশেষ ক্ষেত্রে যে মহান সত্তার সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হচ্ছিলো তাঁর মর্যাদা ও জাঁকজমক প্রকাশ উদ্দেশ্য। তাই এখানে عليه এর পরিবর্তে عليه -ই বেশী উপযুক্ত। অপরটি হচ্ছে عليه এর ه সর্বনাম প্রকৃতপক্ষে هو এর স্থলাভিষিক্ত। আর এর মূল اعراب পেশ; যের নয়। তাই এর মূল اعراب চুক্তি পূরণের বিষয়ের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا
فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۭ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ
لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـــًٔا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۭ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝ بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ
اِلٰٓى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّزُيِّنَ ذٰلِكَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ
وَكُنْتُمْ قَوْمًۢا بُوْرًا ۝

২ রুকূ'

হে নবী (সা)! বদ্দু আরবদের[২০] মধ্যে যাদেরকে পিছনে ছেড়ে যাওয়া হয়েছিল এখন তারা এসে অবশ্যই তোমাকে বলবে ঃ "আমাদেরকে আমাদের ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততিদের চিন্তা-ই ব্যস্ত রেখেছিল, আপনি আমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করুন।" এ লোকেরা নিজেদের মুখে সেসব কথা বলছে যা তাদের অন্তরে থাকে না।[২১] তাদেরকে বলো ঠিক আছে। ইহাই যদি সত্য হয়ে থাকে তা হলে তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালাকে কার্যকর হওয়া থেকে বাধাদানের সামান্য ক্ষমতা কি কারো আছে যদি তিনি তোমাদের কোন ক্ষতি করতে চান; অথবা চান কোন কল্যাণ দান করতে? তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে তো আল্লাহই ভালভাবে অবহিত[২২] (কিন্তু আসল কথা তো তা নয় যা তোমরা বলছো); বরং তোমরা মনে করে নিয়েছ যে, রসূল ও মু'মিনগণ নিজেদের ঘরে কখনই ফিরতে পারবে না। এ খেয়ালটা তোমাদের অন্তরে খুব ভাল লেগেছিল[২৩] এবং তোমরা খুবই খারাব ধারণা মনে স্থান দিয়েছো, আসলে তোমরা খুবই খারাপ মন-মানসিকতার লোক।[২৪]

২০. এটা মদীনার আশেপাশের সেসব লোকদের কথা যাদেরকে উমরা যাত্রার প্রস্তুতিকালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে রওনা হবার আহবান জানিয়েছিলেন। কিন্তু ঈমানের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও তারা বাড়ী ছেড়ে শুধু এ কারণে বের হয়নি যে, নিজেদের প্রাণ ছিল তাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, এরা ছিল আসলাম, মুযাইনা, জুহাইনা, গিফার, আশজা', দীল প্রভৃতি গোত্রের লোক।

২১. এর দু'টি অর্থ। একটি হচ্ছে তোমার মদীনায় পৌঁছার পর এসব লোক এখন তোমার উমরা যাত্রায় শরীক না হওয়ার যে অজুহাত পেশ করবে তা হবে একটি মিথ্যা

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ﴿١٣﴾ وَلِلّٰهِ
مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ
غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٤﴾ سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ
لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ۭ قُلْ
لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ۭ
بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٥﴾

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি যারা ঈমান আনেনি এমন কাফেরদের জন্য আমরা দাউ দাউ করে জ্বলা অগ্নি কুণ্ডলি তৈরী করে রেখেছি।[২৫] আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর বাদশাহীর (প্রভুত্ব ও প্রশাসন ক্ষমতা) একচ্ছত্র মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আল্লাহ–ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[২৬]

তোমরা যখন গনীমাতের মাল লাভ করার জন্য যেতে থাকবে তখন এ পিছনে রেখে যাওয়া লোকেরা তোমাকে অবশ্যই বলবে যে, আমাদেরকেও তোমাদের সাথে যেতে দাও।[২৭] এরা আল্লাহর ফরমান পরিবর্তন করে দিতে চায়।[২৮] এদের স্পষ্ট ভাষায় বলে দাও ঃ 'তোমরা কখনই আমাদের সাথে যেতে পারো না, আল্লাহ তো আগেই একথা বলে দিয়েছেন।"[২৯] এরা বলবেঃ "না, তোমরাই বরং আমাদের প্রতি হিংসা পোষণ কর।" (অথচ এটা কোন হিংসার কথা নয়) আসলে এরা সঠিক কথা খুব কমই বুঝে।

বাহানা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে কি কারণে তারা যায়নি তা তারা খুব ভাল করেই জানে। অপরটি হচ্ছে, আল্লাহর রসূলের কাছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করা মৌখিক জমা খরচ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে তারা যেমন নিজেদের এ আচরণের জন্য লজ্জিত নয়, তেমনি তাদের এ অনুভূতিও নেই যে, আল্লাহর রসূলকে সহযোগিতা না করে তারা কোন গোনাহর কাজ করেছে। এমনকি তাদের অন্তরে ক্ষমা লাভের কোন আকাংখাও নেই। নিজেরা কিন্তু মনে করে যে, এ বিপজ্জনক সফরে না গিয়ে তারা যারপর নেই বুদ্ধিমত্তার কাজ করেছে। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ক্ষমার পরোয়াই যদি তারা করতো তাহলে বাড়ীতে বসে থাকতে পারতো না।

২২. অর্থাৎ তোমাদের আমলের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহর যে জ্ঞান, সে জ্ঞানের ভিত্তিতেই তিনি ফায়সালা করবেন। তোমাদের আমল যদি শাস্তি পাওয়ার মত হয় আর আমি তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করি তাহলেও আমার এ দোয়া আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবে না। আর তোমাদের আমল যদি শাস্তি পাওয়ার মত না হয় আর আমি তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া না করি তাহলে আমার দোয়া না করায় তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আমার নয় আল্লাহর। কারো মুখের কথা তাকে প্রতারিত করতে পারে না। তাই আমি যদি তোমাদের বাহ্যিক কথাবার্তাকে সত্য বলে স্বীকার করেও নেই এবং তার ভিত্তিতে তোমাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়াও করি তাতেও কোন ফায়দা নেই।

২৩. অর্থাৎ তোমরা এই ভেবে খুশী হয়েছো যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহায্যকারী ঈমানদারগণ যে বিপদের মুখে এগিয়ে যাচ্ছেন তা থেকে তোমরা নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছো। তোমাদের মতে এটা ছিল খুবই বুদ্ধিমত্তার কাজ। তাছাড়া একথা ভেবে খুশী হতে তোমাদের একটুও লজ্জা বোধ হলো না যে, রসূল ও ঈমানদারগণ এমন এক অভিযানে যাচ্ছেন যা থেকে জীবিত আর ফিরে আসতে পারবেন না। ঈমানের দাবীদার হয়েও তোমরা এতে উদ্বিগ্ন হলে না। বরং নিজেদের এ আচরণ তোমাদের এতই ভাল মনে হলো যে, তোমরা অন্তত রসূলের সাথে এ বিপদের মধ্যে নিজেদেরকে নিক্ষেপ করোনি।

২৪. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে كُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا । بُور শব্দটি بائر শব্দের বহুবচন। بائر শব্দের দু'টি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে পাপী ও বিকৃত ব্যক্তি যে কোন ভাল কাজের যোগ্য নয়, যার উদ্দেশ্য অসৎ ও বিকৃত। অপরটি হচ্ছে, ধ্বংসকারী, মন্দ পরিণাম এবং ধ্বংসের পথগামী।

২৫. আল্লাহ এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় এমন সব মানুষকে কাফের ও ঈমানহীন বলে আখ্যায়িত করছেন যারা আল্লাহ ও তাঁর দীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠ নয় এবং পরীক্ষার সময় দীনের জন্য নিজের প্রাণ, সম্পদ ও স্বার্থের ঝুঁকি এড়িয়ে চলে। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, এটা এমন কুফরী নয় যার ভিত্তিতে এ পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে ইসলাম থেকে খারিজ বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এটা বরং এমন ধরনের কুফরী যার কারণে সে আখেরাতে বেঈমান বলে ঘোষিত হবে। এর প্রমাণ ঃ এ আয়াত নাযিলের পরেও যাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছিলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেসব লোককে ইসলাম থেকে খারিজ ঘোষণা করেননি কিংবা কাফেরদের সাথে যে ধরনের আচরণ করা যায় সে রকম আচরণও করেননি।

২৬. ওপরে উল্লেখিত চরম সাবধান বাণীর পর আল্লাহর 'গাফুর' (ক্ষমাশীল) ও 'রাহীম' (পরম দয়ালু) হওয়ার উল্লেখের মধ্যে উপদেশের একটি সূক্ষ্ম দিক বিদ্যমান। এর অর্থ হচ্ছে, এখনো যদি তোমরা নিজেদের অসৎ ও নিষ্ঠাহীন আচরণ পরিত্যাগ করে সৎ ও নিষ্ঠার পথে আস তাহলে দেখবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি তোমাদের অতীত ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন এবং নিজেদের নিষ্ঠার কারণে তোমরা যে আচরণ পাওয়ার যোগ্য হবে ভবিষ্যতে তিনি তোমাদের সাথে সে আচরণই করবেন।

২৭. অর্থাৎ অচিরেই এমন সময় আসছে যখন এসব লোক—যারা আজ তোমার সংগে এ বিপজ্জনক অভিযানে অংশ গ্রহণ এড়িয়ে গেল—তোমাকে এমন এক অভিযানে যেতে দেখবে যাতে তারা সহজ বিজয় এবং প্রচুর গনীমতের সম্পদ হস্তগত হচ্ছে বলে মনে করবে। তখন তারা নিজেরাই দৌড়ে এসে বলবে, আমাদেরকেও সাথে নিয়ে চলুন। বস্তুত হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তির তিন মাস পরই সে সুযোগ আসলো যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে অতি সহজেই তা দখল করে নিলেন। সে সময় প্রত্যেকেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো, কুরাইশদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পর এখন শুধু খায়বারই নয়, তায়মা, ফাদাক, ওয়াদীউল কুরা এবং উত্তর হিজাযের অন্য সব ইহুদীও মুসলমানদের শক্তির মোকাবিলা করতে পারবে না। এসব জনপদ এখন পাকা ফলের মত সহজেই মুসলমানদের দখলে চলে আসবে। তাই আল্লাহ তা'আলা এসব আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আগেই এ মর্মে সতর্ক করে দিলেন যে, মদীনার আশেপাশের সুযোগ সন্ধানী লোকেরা এসব সহজ বিজয় অর্জিত হতে দেখে তাতে ভাগ বসানোর জন্য এসে হাজির হবে। কিন্তু তুমি তাদেরকে পরিষ্কার বলে দেবে যে, তোমাদেরকে এতে ভাগ বসানোর সুযোগ কখনো দেয়া হবে না। এটা তাদের প্রাপ্য যারা বিপদ-মুসিবতের মোকাবিলায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে এসেছিলো।

২৮. আল্লাহর ফরমান অর্থ খায়বার অভিযানে নবীর (সা) সাথে কেবল তাদেরকেই যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে যারা হুদাইবিয়া অভিযানেও তাঁর সাথে গিয়েছিলেন এবং বাইয়াতে রিদওয়ানেও তাঁর সাথে শরীক হয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা খাইবারের গনীমতের সম্পদ তাদের জন্যই নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। পরবর্তী ১৮ আয়াতে এ বিষয়টিই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

২৯. "আল্লাহ পূর্বেই একথা বলেছেন," কথাটি দ্বারা লোকের মনে এ মর্মে একটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, এ আয়াতের আগে এ বিষয়বস্তু সম্বলিত আরো কোন নির্দেশ নাযিল হয়ে থাকবে। এখানে সে দিকেই ইংগিত দেয়া হয়েছে। আর যেহেতু এ সূরার মধ্যে এ বিষয় সম্বলিত কোন নির্দেশ এর আগে পাওয়া যায় না। তাই তারা কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে তা অনুসন্ধান করতে শুরু করে এবং সূরা তাওবার ৮৪ আয়াত তারা পেয়ে যায় যাতে আরেকটি প্রসংগে এ একই বিষয়ে কথা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ আয়াত এ ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। কারণ, ঐ আয়াত তাবুক যুদ্ধের প্রসংগে নাযিল হয়েছিলো। আর তা নাযিল হয়েছিলো সূরা ফাত্হ নাযিল হওয়ার তিন বছর পর। প্রকৃত ব্যাপার হলো, এ আয়াতটিতে এ সূরারই ১৮ ও ১৯ আয়াতের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে। আর "ইতিপূর্বেই আল্লাহ বলেছেন" কথাটির অর্থ এ আয়াতের পূর্বে বলা নয়, বরং পেছনে রেখে যাওয়া লোকদের সাথে এ কথাবার্তা হতে যাচ্ছিল—যে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আগেই দিকনির্দেশনা দেয়া হচ্ছে—খায়বার অভিযানে যাওয়ার সময়। অথচ সম্পূর্ণ সূরাটির—যার মধ্যে ১৮ ও ১৯ আয়াত আছে—তার তিন মাস পূর্বে হুদাইবিয়া থেকে ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে নাযিল হয়েছিলো। বক্তব্যের ধারা যদি পাঠক গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে বুঝতে পারবেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে তাঁর রসূলকে এই বলে নির্দেশনা দিচ্ছেন যে, তোমার মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর পিছনে থেকে

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ
تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ
تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦﴾ لَيْسَ عَلَى
الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ۗ وَمَنْ
يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ
يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٧﴾

এ পিছনে রেখে যাওয়া বদ্দু আরবদেরকে বলে দাও : "খুব শীঘ্রই তোমাদেরকে এমন সব লোকের সাথে লড়াই করার জন্য ডাকা হবে যারা বড়ই শক্তি সম্পন্ন।" তোমাদেরকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে, কিংবা তারা অনুগত হয়ে যাবে।[৩০] সে সময় তোমরা জিহাদের নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম সওয়াব দিবেন। আর যদি তোমরা পিছনে হটে যাও যেমন পূর্বে হটে গিয়েছিলে, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি দেবেন। যদি অন্ধ, পংগু ও রোগাক্রান্ত লোক জিহাদে না আসে তাহলে কোন দোষ নেই।[৩১] যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে সেসব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যেসবের নিম্নদেশে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবহমান থাকবে। আর যে মুখ ফিরিয়ে থাকবে আল্লাহ তাকে মর্মান্তিক আযাব দেবেন।

যাওয়া এসব লোক যখন তোমার কাছে এসে এসব ওজর পেশ করবে তখন তাদেরকে এ জবাব দিবে এবং খায়বার অভিযানে যাত্রাকালে যখন তারা তোমার সাথে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করবে তখন তাদের একথা বলবে।

৩০. মূল আয়াতে ব্যবহৃত বাক্যাংশ হচ্ছে اَوْ يُسْلِمُوْنَ । এর দু'টি অর্থ হতে পারে এবং এখানে দু'টি অর্থই উদ্দেশ্য। একটি অর্থ হচ্ছে, তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। অপর অর্থটি হচ্ছে, তারা ইসলামী সরকারের বশ্যতা স্বীকার করবে।

৩১. অর্থাৎ জিহাদে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তির সামনে প্রকৃতই কোন ওজর প্রতিবন্ধক হবে তার কোন দোষ নেই। কিন্তু সুঠাম ও সবলদেহী মানুষ যদি ছল-ছুতার ভিত্তিতে বিরত থাকে তাহলে তাকে আল্লাহ ও তাঁর দীনের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান বলে স্বীকার করা যায় না। তাকে এ সুযোগও দেয়া যায় না যে, সে মুসলিম সমাজের অন্তরভুক্ত

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ
مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿١٨﴾ وَّمَغَانِمَ
كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٩﴾ وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً
تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُوْنَ
اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٢٠﴾

৩ রুকূ'

আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের নিচে তোমার কাছে বাইয়াত করছিলো।[৩২] তিনি তাদের মনের অবস্থা জানতেন। তাই তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করেছেন,[৩৩] পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে আশু বিজয় দান করেছেন এবং প্রচুর গনীমতের সম্পদ দান করেছেন যা তারা অচিরেই লাভ করবে।[৩৪] আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী। আল্লাহ তোমাদেরকে অঢেল গনীমতের সম্পদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যা তোমরা লাভ করবে।[৩৫] তিনি তোমাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে এ বিজয় দিয়েছেন[৩৬] এবং তোমাদের বিরুদ্ধে মানুষের হাত উত্তোলনকে থামিয়ে দিয়েছেন[৩৭] যাতে মু'মিনদের জন্য তা একটি নিদর্শন হয়ে থাকে।[৩৮] আর আল্লাহ তোমাদেরকে সোজা পথের হিদায়াত দান করেন।[৩৯]

হওয়ার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে, কিন্তু যখন ইসলামের জন্য কুরবানী পেশ করার সময় আসবে তখন নিজের জান ও মালের নিরাপত্তার চিন্তায় বিভোর হবে।

এখানে জেনে নেয়া দরকার যে, শরীয়াতে যাদেরকে জিহাদে অংশ গ্রহণ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে তারা দু' ধরনের মানুষ। এক, যারা দৈহিকভাবে যুদ্ধের উপযুক্ত নয়। যেমন ঃ অপ্রাপ্ত বয়স্ক, বালক, নারী, পাগল, অন্ধ, সামরিক সেবা দিতে অক্ষম এমন রোগগ্রস্ত লোক এবং হাত পা অকেজো হওয়ার কারণে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে অক্ষম ব্যক্তিরা। দুই, অন্য কিছু যুক্তিসংগত কারণে যাদের পক্ষে জিহাদে অংশ গ্রহণ কঠিন। যেমন ঃ ক্রীতদাস, কিংবা এমন লোক যারা যুদ্ধে অংশ নিতে প্রস্তুত, কিন্তু যুদ্ধাস্ত্র এবং অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করতে অক্ষম। অথবা এমন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, অতি সত্বর যার ঋণ পরিশোধ করা দরকার এবং ঋণদাতা যাকে অবকাশ দিচ্ছে না। অথবা এমন ব্যক্তি যার পিতা-মাতা বা তাদের কোন একজন জীবিত আছে এবং তারা তার সেবা-যত্নের মুখাপেক্ষী। এ ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন যে,

পিতা–মাতা যদি মুসলমান হয় তাহলে তাদের অনুমতি ছাড়া সন্তানের জিহাদে যাওয়া উচিত নয়। তবে তারা যদি কাফের হয়, তাহলে তাদের বাধা দেয়ায় কারো জিহাদ থেকে বিরত থাকা জায়েয নয়।

৩২. হুদাইবিয়া নামক স্থানে সাহাবায়ে কিরামের কাছে যে বাইয়াত নেয়া হয়েছিল এখানে পুনরায় তার উল্লেখ করা হচ্ছে। এ বাইয়াতকে "বাইয়াতে রিদওয়ান" বলা হয়ে থাকে। কারণ, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদ দান করেছেন যে, যারা এ ভয়ংকর পরিস্থিতিতে জীবন বাজি রাখতে সামান্য দ্বিধাও করেনি এবং রসূলের হাতে হাত দিয়ে জীবনপাত করার বাইয়াত করে ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ পেশ করেছে তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। সময়টি ছিল এমন যে, মুসলমানগণ শুধুমাত্র একখানা করে তরবারি নিয়ে এসেছিলেন এবং সংখ্যায় ছিলেন মাত্র চৌদ্দ শ'। তাদের পরিধানেও সামরিক পোশাক ছিল না বরং ইহ্‌রামের চাদর বাঁধা ছিল। নিজেদের সামরিক কেন্দ্র (মদীনা) থেকে আড়াই শ' মাইল এবং শত্রুদের দূর্গ থেকে মাত্র ১৩ মাইল দূরে ছিল যেখান থেকে শত্রুরা সব রকমের সাহায্য লাভ করতে পারতো। আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর দীনের প্রতি এ মানুষগুলোর মনে যদি আন্তরিকতার সামান্য ঘাটতিও থাকতো তাহলে তারা এ চরম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরিত্যাগ করে চলে যেতো এবং ইসলাম বাতিলের সাথে লড়াইয়ে চিরদিনের জন্য হেরে যেতো। আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা ছাড়া বাইরের এমন কোন চাপ তাদের ওপর ছিল না যা তাদেরকে এ বাইয়াত গ্রহণে বাধ্য করতে পারতো। আল্লাহর দীনের জন্য সবকিছু করতে সে মুহূর্তেই তাদের প্রস্তুত হয়ে যাওয়া স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, তাঁরা তাঁদের ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী ও আন্তরিক এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ব্যাপারে বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে পূর্ণতার স্তরে উন্নীত। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে সন্তুষ্টির এ সনদ দান করেছেন। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার পর কেউ যদি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয় কিংবা তাদেরকে তিরস্কার করার সাহস করে তাহলে তাদের বুঝাপড়া তাদের সাথে নয়, আল্লাহর সাথে। এ ক্ষেত্রে যারা বলে, যে সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে সন্তুষ্টির এ সনদ দান করেছিলেন তখন তাঁরা আন্তরিক ছিলেন ঠিকই, কিন্তু পরে তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য হারিয়ে ফেলেছেন, তারা সম্ভবত আল্লাহ সম্পর্কে এ কুধারণা পোষণ করে যে, এ আয়াত নাযিল করার সময় তিনি তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে জানতেন না। তাই শুধু সে সময়কার অবস্থা দেখে তিনি তাদেরকে এ সনদপত্র দিয়ে ফেলেছেন। আর সম্ভবত এ নাজানার কারণেই তাঁর পবিত্র কিতাবেও তা অন্তরভুক্ত করেছেন যাতে পরে যখন এরা অবিশ্বাসী হয়ে যাবে তখনো দুনিয়ার মানুষ তাদের সম্পর্কে এ আয়াত পড়তে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার 'গায়েবী ইলম' সম্পর্কে বাহবা দিতে থাকে যিনি (নাউযুবিল্লাহ) ঐ অবিশ্বাসীদেরকে সন্তুষ্টির এ সনদপত্র দান করেছিলেন।

যে গাছের নিচে এ বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়েছিলো সেটি সম্পর্কে হযরত ইবনে উমরের আযাদকৃত ক্রীতদাস নাফে'র এ বর্ণনাটি সাধারণভাবে ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে যে, লোকজন সেখানে গিয়ে নামায পড়তে শুরু করেছিলো। বিষয়টি জানতে পেরে হযরত উমর (রা) লোকদের তিরস্কার করেন এবং গাছটি কাটিয়ে ফেলেন। (তবকাতে ইবনে সা'দ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০০) কিন্তু এর বিপরীতমুখী কয়েকটি বর্ণনাও রয়েছে। হযরত নাফে' থেকেই তবকাতে ইবনে সা'দে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, বাইয়াতে রিদওয়ানের

কয়েক বছর পর সাহাবায়ে কিরাম ঐ গাছটি তালাশ করেছিলেন কিন্তু চিনতে পারেননি এবং সে গাছটি কোনটি সে ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয়ে যায় (পৃঃ ১০৫) দ্বিতীয় বর্ণনাটি বুখারী, মুসলিম ও তবকাতে ইবনে সা'দে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের। তিনি বলেন ঃ আমার পিতা বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছেন, পরের বছর আমরা যখন উমরাতুল কাযার জন্য গিয়েছিলাম তখন গাছটি হারিয়ে ফেলেছিলাম। অনুসন্ধান করেও তার কোন হদিস করতে পারিনি। তৃতীয় বর্ণনাটি ইবনে জারীরের। তিনি বলেন, হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফত কালে যখন হুদাইবিয়া অতিক্রম করেন তখন জিজ্ঞেস করেন, যে গাছটির নিচে বাইয়াত হয়েছিলো তা কোথায়? কেউ বলে, অমুক গাছটি এবং কেউ বলেন অমুকটি। তখন হযরত উমর (র) বলেন, এ কষ্ট বাদ দাও, এর কোন প্রয়োজন নেই।

৩৩. এখানে سكينة অর্থ মনের সে বিশেষ অবস্থা যার ওপর নির্ভর করে কোন ব্যক্তি কোন মহত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঠাণ্ডা মনে পূর্ণ প্রশান্তি ও তৃপ্তি সহ নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয় এবং কোন ভয় বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ফলাফল যাই হোক না কেন এ কাজ করতেই হবে।

৩৪. এটা খায়বার বিজয় ও সেখানকার গনীমতের সম্পদের প্রতি ইংগিত। আর এ আয়াত এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরে যে, আল্লাহ তা'আলা এ পুরস্কারটি কেবল তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন যারা বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক ছিলেন। এ বিজয় ও গনীমতের সম্পদে তাদের ছাড়া আর কারো শরীক হওয়ার অধিকার ছিল না। এ কারণে ৭ম হিজরী সনের সফর মাসে যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার আক্রমণের জন্য যাত্রা করলেন তখন তিনি কেবল তাদেরকেই সংগে নিলেন। এতে সন্দেহ নেই যে, পরে নবী (সা) হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তনকারী মুহাজির এবং দাওস ও আশয়ারী গোত্রের কোন কোন সাহাবীকেও খায়বারের গনীমতের মাল থেকে কিছু অংশ দিয়েছিলেন। তবে তা হয় 'খুমুস' (এক-পঞ্চমাংশ) থেকে নয়তো বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারীদের সম্মতিক্রমে দিয়েছিলেন। কাউকে তিনি ঐ সম্পদের হকদার বানাননি।

৩৫. খায়বার বিজয়ের পর মুসলমানরা ক্রমাগত আর যেসব বিজয় লাভ করে এর দ্বারা সেসব বিজয়কে বুঝানো হয়েছে।

৩৬. এর অর্থ হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি। এ চুক্তিকেই সূরার প্রারম্ভে 'ফাত্হে মুবীন' (সুস্পষ্ট বিজয়) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৩৭. অর্থাৎ তিনি কাফের কুরাইশদের এতটা সাহস দেননি যে, হুদাইবিয়াতে তারা তোমাদের সাথে লড়াই বাধিয়ে বসতে পারতো। অথচ সমস্ত বাহ্যিক অবস্থার দিক থেকে তারা অনেক ভাল অবস্থানে ছিল এবং সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে তোমাদের পাল্লা তাদের চেয়ে অনেক বেশী দুর্বল বলে মনে হচ্ছিলো। এ ছাড়াও এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে, সে সময় কোন শত্রুশক্তি মদীনার ওপর আক্রমণ করতে সাহস পায়নি। অথচ যুদ্ধক্ষম চৌদ্দ শ' যোদ্ধা পুরুষ মদীনার বাইরে চলে যাওয়ার কারণে মদীনার যুদ্ধক্ষেত্র অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলো এবং ইহুদী, মুশরিক ও মুনাফিকরা এ পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে লাভবান হতে পারতো।

وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢١﴾
وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٢٢﴾
سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾
وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ
أَن أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾

এ ছাড়া তিনি তোমাদেরকে আরো গনীমতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যা তোমরা এখনো পর্যন্ত লাভ করতে পারনি। কিন্তু আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।৪০ আল্লাহ সবকিছুর ওপরে ক্ষমতাবান।

এ মুহূর্তেই এসব কাফের যদি তোমাদের সাথে লড়াই বাধিয়ে বসতো তাহলে অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতো এবং কোন সহযোগী ও সাহায্যকারী পেতো না।৪১ এটা আল্লাহর বিধান যা পূর্ব থেকেই চলে আসছে।৪২ তুমি আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না। তিনিই সেই সত্তা যিনি মক্কা ভূমিতে তাদের হাত তোমাদের থেকে আর তোমাদের হাত তাদের থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন তাদের ওপর তোমাদেরকে আধিপত্য দান করার পর। তোমরা যা কিছু করছিলে আল্লাহ তা দেখছিলেন।

৩৮. অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের নীতিতে স্থির সংকল্প থাকে এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা করে ন্যায় ও সত্যের পক্ষ অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় আল্লাহ তাদের কতভাবে সাহায্য-সহযোগিতা দান করে পুরস্কৃত করেন তার নিদর্শন।

৩৯. অর্থাৎ তোমরা আরো দূরদৃষ্টি ও দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করবে। ভবিষ্যতেও এভাবেই আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করে ন্যায় ও সত্যের পথে অগ্রসর হতে থাকবে। আর এসব অভিজ্ঞতা এ শিক্ষাদান করবে যে, আল্লাহর দীন যে পদক্ষেপের দাবী করছে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে সে পদক্ষেপ গ্রহণ করাই মু'মিনের কাজ। আমার শক্তি কতটা এবং বাতিলের শক্তি কত প্রবল এ বাছ বিচার ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে যেন সে পড়ে না থাকে।

৪০. খুব সম্ভবত এখানে মক্কা বিজয়ের প্রতি ইংগিত দান করা হয়েছে। কাতাদাও এ মত পোষণ করেছেন এবং ইবনে জারীরও এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লাহর একথাটার উদ্দেশ্য যা বুঝা যায় তা হচ্ছে, মক্কা এখনো তোমাদের করায়ত্ব হয়নি। তবে তাকে আল্লাহ পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন এবং হুদাইবিয়ার এ বিজয়ের ফলশ্রুতিতে তাও তোমাদের করায়ত্ব হবে।

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ
يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ۭ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاۗءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ
اَنْ تَطَــــُٔوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ
مَنْ يَّشَاۗءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝
اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ
سَكِيْنَتَهٗ عَلٰي رَسُوْلِهٖ وَعَلَي الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْٓا
اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝

এরাই তো সেসব লোক যারা কুফরী করেছে, তোমাদেরকে মসজিদে হারামে যেতে বাধা দিয়েছে এবং কুরবানীর উটসমূহকে কুরবানী গাহে পৌঁছতে দেয়নি।[৪৩] যদি (মক্কায়) এমন ঈমানদার নারী পুরুষ না থাকতো যাদেরকে তোমরা চিন না অজান্তে তাদেরকে পদদলিত করে ফেলবে এবং তাদের কারণে তোমরা বদনাম কুড়াবে এমন আশংকা না থাকতো (তাহলে যুদ্ধ থামানো হতো না। তা বন্ধ করা হয়েছে এ কারণে) যে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা যেন তাঁর রহমতের মধ্যে স্থান দেন। সেসব মু'মিন যদি আলাদা হয়ে যেতো তাহলে (মক্কাবাসীদের মধ্যে) যারা কাফের ছিল আমি অবশ্যই তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতাম।[৪৪] এ কারণেই যখন ঐসব কাফেররা তাদের মনে জাহেলী সংকীর্ণতার স্থান দিল[৪৫] তখন আল্লাহ তাঁর রসূল ও ঈমানদারদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন[৪৬] এবং তাদেরকে তাকওয়ার নীতির ওপর সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত রাখলেন। তারাই এ জন্য বেশী উপযুক্ত ও হকদার ছিল। আল্লাহ সব জিনিস সম্পর্কেই পরিজ্ঞাত।

৪১. অর্থাৎ হুদাইবিয়াতে যুদ্ধ হলে তোমাদের পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আল্লাহ এ জন্য সেখানে যুদ্ধ সংঘটিত হতে দেননি তা নয়, বরং এর উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন কিছু যা পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হচ্ছে। সে উদ্দেশ্য ও কৌশল যদি বাধা না হতো এবং আল্লাহ তা'আলা এখানে যুদ্ধ সংঘটিত হতে দিতেন তাহলে নিশ্চিতভাবে কাফেররাই পরাজয় বরণ করতো এবং পবিত্র মক্কা তখন বিজিত হতো।

৪২. এখানে আল্লাহর বিধান বলতে বুঝানো হয়েছে, যেসব কাফের আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন এবং তাঁর রসূলকে সাহায্য করেন।

৪৩. অর্থাৎ ইসলামের জন্য যে আন্তরিকতা নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে তোমরা জীবন বাজি রাখতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলে এবং বিনা বাক্যে যেভাবে রসূলের আনুগত্য করছিলে আল্লাহ তা দেখছিলেন। তিনি এও দেখছিলেন যে, কাফেররা সত্যিই বাড়াবাড়ি করছে। তোমাদের হাতে তৎক্ষণাৎ সেখানেই তাদেরকে শাস্তি দেয়া ছিল পরিস্থিতির দাবী। কিন্তু এসব সত্ত্বেও একটি বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তিনি তোমাদের হাত তাদের ওপর এবং তাদের হাত তোমাদের ওপর উত্তোলিত হওয়া থেকে বিরত রেখেছিলেন।

৪৪. আল্লাহ তা'আলা যে উদ্দেশ্য ও কৌশলের কারণে হুদাইবিয়াতে যুদ্ধ হতে দেননি এটাই সে উদ্দেশ্য ও কৌশল। এ উদ্দেশ্য ও কৌশলের দু'টি দিক আছে। একটি হচ্ছে সে সময় মক্কায় এমন অনেক নারী ও পুরুষ বর্তমান ছিলেন। যারা হয় তাদের ঈমান গোপন রেখেছিলেন নয়তো তাদের ঈমান গ্রহণ সম্পর্কে সবার জানা থাকলেও নিজেদের অসহায়ত্বের কারণে হিজরত করতে সক্ষম ছিলেন না এবং জুলুম-নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলো। যদি এ পরিস্থিতিতে যুদ্ধ সংঘটিত হতো এবং মুসলমানরা কাফেরদেরকে চরমভাবে পর্যুদস্ত করে পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করতো তাহলে অজানা ও অচেনা হওয়ার কারণে কাফেরদের সাথে এ মুসলমানরাও নিহত হতো। এর কারণে মুসলমানরা নিজেরাও দুঃখ ও পরিতাপে দগ্ধ হতো এবং আরবের মুশরিকরাও একথা বলার সুযোগ পেয়ে যেতো যে, যুদ্ধের ময়দানে নিজেদের দীনী ভাইয়ের হত্যা করতেও এসব লোক দ্বিধাবোধ করে না। তাই আল্লাহ তা'আলা অসহায় এ মুসলমানদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে এবং সাহাবীদেরকে মনোকষ্ট ও বদনাম থেকে রক্ষার জন্য এ ক্ষেত্রে যুদ্ধ সংঘটিত হতে দেননি। এ উদ্দেশ্য ও কৌশলের আরেকটি দিক এই যে, আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদেরকে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরাজিত করে মক্কা বিজিত করাতে চাচ্ছিলেন না। বরং তিনি চাচ্ছিলেন, দুই বছরের মধ্যে তাদেরকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে এমন অসহায় করে ফেলবেন যেন কোন প্রতিরোধ ছাড়াই তারা পরাজিত হয় এবং সমগ্র গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহর রহমতের মধ্যে প্রবেশ করে। মক্কা বিজয়ের সময় এ ঘটনাটিই ঘটেছিল।

এ ক্ষেত্রে একটি আইনগত বিতর্ক দেখা দেয়। যদি আমাদের ও কাফেরদের মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকে এবং কাফেরদের কব্জায় কিছু সংখ্যক মুসলিম নারী, পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধ থাকে আর তাদেরকে তারা মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে সামনে নিয়ে আসে কিংবা আমরা কাফেরদের যে শহরের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছি সেখানে কিছু মুসলিম বসতি থেকে থাকে, কিংবা কাফেরদের কোন যুদ্ধ জাহাজ আক্রমণের পাল্লায় এসে পড়ে এবং কাফেররা তার মধ্যে কিছু সংখ্যক মুসলমানকে রেখে দেয় তাহলে এরূপ পরিস্থিতিতে আমরা কি তাদের ওপর গোলাবর্ষণ করতে পারি? এ প্রশ্নের জবাবে ফকীহগণ যেসব সিদ্ধান্ত ও মতামত দিয়েছেন তা নিম্নরূপ ঃ

ইমাম মালেক (র) বলেন, এরূপ পরিস্থিতিতে গোলাবর্ষণ না করা উচিত। এ আয়াতটিকে তিনি এর দলীল হিসেবে পেশ করেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের রক্ষার জন্যই তো হুদাইবিয়াতে যুদ্ধ হতে দেননি। (আহকামুল কুরআন

—ইবনুল আরাবী) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা একটা দুর্বল দলীল। আয়াতের মধ্যে এমন কোন শব্দ নেই যা থেকে এ বিষয় প্রতীয়মান হয় যে, এরূপ পরিস্থিতিতে হামলা করা হারাম ও নাজায়েয। এর দ্বারা বড় জোর এতটুকু কথা প্রমাণিত হয় তাহচ্ছে এ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য হামলা করা থেকে বিরত থাকা যেতে পারে, যদি বিরত থাকার ক্ষেত্রে এ আশংকা সৃষ্টি না হয় যে, কাফেররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করবে, কিংবা তাদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় লাভ করার সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র), ইমাম যুফার (র) এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এ পরিস্থিতিতে গোলাবর্ষণ করা সম্পূর্ণরূপে জায়েয। এমনকি কাফেররা যদি মুসলমানদের শিশুদেরকেও ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে সামনে খাড়া করে তবুও তাদের ওপর গোলা বর্ষণ করায় কোন দোষ নেই। এ অবস্থায় যেসব মুসলমান মারা যাবে তাদের জন্য কোন কাফ্ফারা বা রক্তপণও মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব হবে না। (আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস, ইমাম মুহাম্মাদের কিতাবুস সিয়ার, অনুচ্ছেদ ঃ কাতউল মায়ে আন আহলিল হারব)

ইমাম সুফিয়ান সাওরীও এ পরিস্থিতিতে গোলাবর্ষণ জায়েয মনে করেন। কিন্তু তিনি বলেন, এ অবস্থায় যেসব মুসলমান মারা যাবে তাদের রক্তপণ দিতে হবে না। তবে সে জন্য কাফ্ফারা দেয়া মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব। (আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস)

ইমাম আওযায়ী এবং লাইস ইবনে সা'দ বলেন, কাফেররা যদি মুসলমানদেরকে ঢাল বানিয়ে সামনে ধরে তাহলে তাদের ওপর গুলি চালানো উচিত নয়। অনুরূপ আমরা যদি জানতে পারি যে, তাদের যুদ্ধ জাহাজে আমাদের বন্দীও আছে তাহলে সে অবস্থায় উক্ত যুদ্ধ জাহাজ না ডুবানো উচিত। কিন্তু আমরা যদি তাদের কোন শহরের ওপর আক্রমণ চালাই এবং জানতে পারি যে, ঐ শহরে মুসলমানও আছে তাহলেও তাদের ওপর গোলাবর্ষণ করা জায়েয। কারণ, আমাদের গোলা কেবল মুসলমানদের ওপরই পড়বে তা নিশ্চিত নয়। আর কোন মুসলমান যদি এ গোলাবর্ষণের শিকার হয়ও তাহলে তা আমাদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের উদ্দেশ্যমূলক হত্যা হবে না, বরং তা হবে আমাদের ইচ্ছার বাইরের একটি দুর্ঘটনা। (আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস)

এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ীর (র) মাযহাব হলো, এ অবস্থায় যদি গোলাবর্ষণ অনিবার্য না হয় তাহলে ধ্বংসের হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার চেষ্টা চালানো উত্তম যদিও এ ক্ষেত্রে গোলাবর্ষণ করা হারাম নয় তবে নিসন্দেহে মাকরূহ। তবে প্রকৃতই যদি গোলাবর্ষণের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং সন্দেহ থাকে যে, এরূপ না করা হলে যুদ্ধ পরিস্থিতি কাফেরদের জন্য লাভজনক এবং মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর হবে তাহলে সে ক্ষেত্রে গোলাবর্ষণ করা জায়েয। তবে এ পরিস্থিতিতেও মুসলমানদের রক্ষা করার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাছাড়া ইমাম শাফেয়ী এ মতও পোষণ করেন যে, যদি কাফেররা যুদ্ধের ময়দানে কোন মুসলমানকে ঢাল বানিয়ে সামনে ধরে এবং কোন মুসলমান তাকে হত্যা করে তাহলে তার দু'টি অবস্থা হতে পারে ঃ এক, হত্যাকারীর জানা ছিল যে, সে মুসলমান। দুই, সে জানতো না যে, সে মুসলমান। প্রথম অবস্থায় রক্তপণ ও কাফ্ফারা উভয়টিই তার ওপর ওয়াজিব এবং দ্বিতীয় অবস্থায় শুধু কাফ্ফারা ওয়াজিব। (মুগনিউল মুহতাজ)

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ
اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۙ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ۗ فَعَلِمَ مَا
لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ۞ هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ
بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۞

৪ রুকূ'

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন—যা ছিল সরাসরি হক।[৪৭] ইনশাআল্লাহ[৪৮] তোমরা পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে।[৪৯] নিজেদের মাথা মুণ্ডন করবে, চুল কাটাবে[৫০] এবং তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। তোমরা যা জানতে না তিনি তা জানতেন। তাই স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করার পূর্বে তিনি তোমাদেরকে এ আসন্ন বিজয় দান করেছেন।

আল্লাহই তো সে মহান সত্তা যিনি তাঁর রসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন যেন তাকে সমস্ত দীনের ওপর বিজয়ী করে দেন। আর এ বাস্তবতা সম্পর্কে আল্লাহর সাক্ষই যথেষ্ট।[৫১]

৪৫. জাহেলী সংকীর্ণতা অর্থ হলো, এক ব্যক্তির শুধু তার মর্যাদা রক্ষার জন্য কিংবা নিজের কথার মর্যাদা রক্ষার জন্য জেনে শুনে কোন অবৈধ কাজ করা। মক্কার কাফেররা জানতো এবং মানতো যে, হজ্জ ও উমরার জন্য বায়তুল্লাহর যিয়ারত করার অধিকার সবারই আছে। এ ধর্মীয় কর্তব্য পালনে বাধা দেয়ার অধিকার কারো নেই। এটা ছিল আরবের সুপ্রাচীন ও সর্বজন স্বীকৃত আইন। কিন্তু তারা নিজেরা নিজেদেরকে অন্যায় ও অসত্যের অনুসারী এবং মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণ ন্যায় ও সত্যের অনুসারী বলে জানা সত্ত্বেও শুধু নিজেদের মর্যাদা রক্ষার খাতিরে মুসলমানদের উমরা করতে বাধা দান করে। এমনকি মুশরিকদের মধ্যেও যারা সত্যানুসারী ছিল তারাও বলছিলো যে, যারা ইহ্‌রাম অবস্থায় কুরবানীর উট সাথে নিয়ে উমরা পালন করতে এসেছে তাদেরকে বাধা দেয়া একটি অন্যায় কাজ। কিন্তু কুরাইশ নেতারা শুধু একথা ভেবে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর ছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি এত বড় দলবল নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন তাহলে সমগ্র আরবে আমাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। এটাই ছিল তাদের জাহেলী সংকীর্ণতা।

৪৬. এখানে سكينة অর্থ ধৈর্য ও মর্যাদা যা দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানগণ কাফের কুরাইশদের এ জাহেলী সংকীর্ণতার মোকাবিলা করেছিলেন। তাঁরা তাদের এ হঠকারিতা ও বাড়াবাড়িতে উত্তেজিত হয়ে সংযম হারিয়ে

ফেলেছিলেন না এবং তাদের মোকাবিলায় এমন কোন কথাও তারা বলেননি যা ন্যায়ের সীমা ছাড়িয়ে যায় ও সত্যের পরিপন্থী হয় কিংবা যার কারণে কাজ সুন্দর ও সার্থকভাবে সম্পাদিত হওয়ার পরিবর্তে আরো বেশী এলোমেলো ও বিশৃংখল হয়ে যায়।

৪৭. যে প্রশ্নটি মুসলমানদের মনে বারবার খটকা সৃষ্টি করছিলো এটি তারই জবাব। তারা বলতো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি মসজিদে হারামে প্রবেশ করেছেন এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছেন। কিন্তু কি হলো যে, আমরা উমরা আদায় করা ছাড়াই ফিরে যাচ্ছি। এর জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদিও বলেছিলেন যে, স্বপ্নে তো এ বছরই উমরা আদায় করার কথা সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু না কিছু উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা মুসলমানদের মনের মধ্যে তখনো অবশিষ্ট ছিল। অতএব আল্লাহ তা'আলা নিজেই স্পষ্ট করে বললেন, স্বপ্ন আমি দেখিয়েছিলাম আর তা ছিল পুরোপুরি সত্য এবং নিশ্চিতভাবেই তা পূরণ হবে।

৪৮. এখানে আল্লাহ তা'আলা নিজে তাঁর প্রতিশ্রুতির সাথে ইনশাআল্লাহ কথাটি ব্যবহার করেছেন। এ ক্ষেত্রে কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে যে, আল্লাহ নিজেই যখন এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তখন তাকে আল্লাহর চাওয়ার সাথে শর্তযুক্ত করার অর্থ কি? এর জবাব হচ্ছে, এখানে যে কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ যদি না চান তাহলে তিনি এ প্রতিশ্রুতি পালন করবেন না। বরং যে প্রেক্ষিতে এ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এর সম্পর্ক তার সাথে। মক্কার কাফেররা যে ধারণার বশবর্তী হয়ে মুসলমানদেরকে উমরা থেকে বিরত রাখার জন্য এ খেলা খেলেছিলো তা হচ্ছে আমরা যাকে উমরা করতে দিতে চাইবো সে-ই কেবল উমরা করতে পারবে এবং যখন করতে দিব তখনই মাত্র করতে পারবে। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেছেন, এটা তাদের ইচ্ছার ওপর নয় বরং আমার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এ বছর উমরা হতে না পারার কারণ এটা নয় যে, মক্কার কাফেররা তাই চেয়েছিলো। বরং তা হয়েছে এ জন্য যে, আমি তা হতে দিতে চাইনি। আমি যদি চাই তাহলে ভবিষ্যতে এ উমরা হবে, কাফেররা তা হতে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করুক বা না করুক। সাথে সাথে একথার মধ্যে এ অর্থও প্রচ্ছন্ন আছে যে, মুসলমানরা যে উমরা করবে তাও নিজের ক্ষমতায় করবে না। আমি যেহেতু চাইবো যে তারা উমরা করুক তাই তারা উমরা করবে আমার ইচ্ছা যদি এর পরিপন্থী হয় তাহলে নিজেরাই উমরা আদায় করে ফেলবে এতটা শক্তি-সামর্থ তাদের মধ্যে নেই।

৪৯. পরের বছর ৭ম হিজরীর যুল-কা'দা মাসে এ প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়। ইতিহাসে এ উমরা উমরাতুল কাযা নামে খ্যাত।

৫০. একথা থেকে প্রমাণিত হয় উমরা ও হজ্জ আদায়ের সময় মাথা মুণ্ডন আবশ্যিক নয়, বরং চুল ছেঁটে নেয়াও জায়েয। তবে মাথা মুণ্ডন উত্তম। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তা প্রথমে বর্ণনা করেছেন এবং চুল ছাঁটার কথা পরে উল্লেখ করেছেন।

৫১. এখানে একথা বলার কারণ হলো যখন হুদাইবিয়াতে সন্ধিচুক্তি লিপিবদ্ধ করা হচ্ছিলো সে সময় মক্কার কাফেররা নবীর (সা) সম্মানিত নামের সাথে রসূলুল্লাহ কথাটি লিখতে আপত্তি জানিয়েছিলো, তাদের একগুঁয়েমির কারণে নবী (সা) নিজে চুক্তিপত্র থেকে একথাটি মুছে ফেলেছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলছেন, আমার রসূলের রসূল

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ
تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ
وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۚۖ
وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۚۛ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ
فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾

মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। আর যারা তাঁর সাথে আছে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে আপোষহীন[৫২] এবং নিজেরা পরস্পর দয়া পরবশ।[৫৩] তোমরা যখনই দেখবে তখন তাদেরকে রুকূ' ও সিজদা এবং আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি কামনায় তৎপর পাবে। তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন বর্তমান যা দিয়ে তাদেরকে আলাদা চিনে নেয়া যায়।[৫৪] তাদের এ পরিচয় তাওরাতে দেয়া হয়েছে।[৫৫] আর ইনযীলে তাদের উপমা পেশ করা হয়েছে এই বলে[৫৬] যে, একটি শস্যক্ষেত যা প্রথমে অঙ্কুরোদগম ঘটালো। পরে তাকে শক্তি যোগালো তারপর তা শক্ত ও মজবুত হয়ে স্বীয় কাণ্ডে ভর করে দাঁড়ালো। যা কৃষককে খুশী করে কিন্তু কাফের তার পরিপুষ্টিলাভ দেখে মনোকষ্ট পায়। এ শ্রেণীর লোক যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও বড় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[৫৭]

হওয়া একটি অনিবার্য সত্য, কারোর মানা বা না মানাতে তাতে কোন পার্থক্য সূচিত হয় না। কিছু লোক যদি তা না মানে না মানুক। তা সত্য হওয়ার জন্য আমার সাক্ষই যথেষ্ট। তাদের অস্বীকৃতির কারণে এ সত্য পরিবর্তিত হয়ে যাবে না। তাদের অস্বীকৃতি সত্ত্বেও এ রসূল আমার পক্ষ থেকে যে হিদায়াত ও দীন নিয়ে এসেছেন তা অন্য সব দীনের ওপর বিজয় লাভ করবে। তা ঠেকিয়ে রাখার জন্য এসব অস্বীকারকারীরা যত চেষ্টাই করুকনা কেন।

'সব দীন' বলতে বুঝানো হয়েছে সেসব ব্যবস্থাকে যা দীন হিসেবে গণ্য। আমরা পূর্বেই তাফহীমুল কুরআন সূরা যুমারের ব্যাখ্যায় ৩ টীকায় এবং সূরা শূরার ২০ টীকায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে আল্লাহ তা'আলা যে কথাটি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন তা হচ্ছে শুধু এ দীনের প্রচার করাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং উদ্দেশ্য ছিল একে দীন হিসেবে গণ্য সমস্ত

জীবনাদর্শের ওপর বিজয়ী করে দেয়া। অন্য কথায় জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগের ওপর কোন বাতিল জীবনাদর্শ বিজয়ী হয়ে থাকবে আর বিজয়ী সে জীবনাদর্শ তার আধিপত্যাধীনে এ দীনকে বেঁচে থাকার যতটুকু অধিকার দেবে এ দীন সে চৌহদ্দির মধ্যেই হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে এ উদ্দেশ্যে নবী (সা) এ দীন নিয়ে আসেননি। বরং তিনি এ জন্য তা এনেছেন যে, এটিই হবে বিজয়ী জীবনাদর্শ। অন্য কোন জীবনাদর্শ বেঁচে থাকলেও এ জীবনাদর্শ যে সীমার মধ্যে তাকে বেঁচে থাকার অনুমতি দেবে সে সীমার মধ্যেই তা বেঁচে থাকবে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা যুমারের তাফসীর, টীকা ৪৮)

৫২. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ । আরবী ভাষায় বলা হয় فُلَانٌ شَدِيْدٌ عَلَيْهِ অমুক ব্যক্তি তার প্রতি কঠোর। অর্থাৎ তাকে বশীভূত করা এবং নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা তার জন্য কঠিন। কাফেরদের প্রতি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের কঠোর হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তারা কাফেরদের সাথে রূঢ় এবং ক্রুদ্ধ আচরণ করেন, বরং এর অর্থ হচ্ছে, তারা তাদের ঈমানের পরিপক্কতা, নীতির দৃঢ়তা, চারিত্রিক শক্তি এবং ঈমানী দূরদর্শিতার কারণে কাফেরদের মোকাবিলায় মজবুত পাথরের মত অনমনীয় ও আপোষহীন। তারা চপল বা অস্থিরমনা নন যে, কাফেররা তাদেরকে যেদিকে ইচ্ছা ঘুরিয়ে দেবে। তারা নরম ঘাস নন যে, কাফেররা অতি সহজেই তাদেরকে চিবিয়ে পিষে ফেলবে। কোন প্রকার ভয় দেখিয়ে তাদেরকে স্তব্ধ করা যায় না। কোন লোভ দেখিয়ে তাদের কেনা যায় না। যে মহত উদ্দেশ্যে তারা জীবন বাজি রেখে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত হয়েছেন তা থেকে তাদের বিচ্যুত করার ক্ষমতা কাফেরদের নেই।

৫৩. অর্থাৎ তাদের মধ্যে যতটুকু কঠোরতা আছে তা কাফেরদের জন্য, ঈমানদারদের জন্য নয়। ঈমানদারদের কাছে তারা বিনম্র, দয়া পরবশ, স্নেহশীল, সমব্যাথী ও দুঃখের সাথী। নীতি ও উদ্দেশ্যের ঐক্য তাদের মধ্যে পরস্পরের জন্য ভালবাসা, সাযুজ্য ও গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছে।

৫৪. সিজদা করতে করতে কোন কোন নামাযীর কপালে যে দাগ পড়ে এখানে তা বুঝানো হয়নি। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে আল্লাহভীরুতা, হৃদয়ের বিশালতা, মর্যাদা এবং মহৎ নৈতিক চরিত্রের প্রভাব যা আল্লাহর সামনে মাথা নত করার কারণে স্বাভাবিকভাবেই কোন মানুষের চেহারায় ফুটে ওঠে। মানুষের চেহারা একখানা খোলা গ্রন্থের মত যার পাতায় পাতায় মানুষের মনোজগতের অবস্থা সহজেই অবলোকন করা যেতে পারে। একজন অহংকারী মানুষের চেহারা একজন বিনম্র ও কোমল স্বভাব মানুষের চেহারা থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। একজন দুশ্চরিত্র মানুষের চেহারা একজন সচ্চরিত্র ও সৎমনা মানুষের চেহারা থেকে আলাদা করে সহজে চেনা যায়। একজন গুণ্ডা ও দুশ্চরিত্রের চেহারা-আকৃতি এবং একজন সম্ভ্রান্ত ও পবিত্র ব্যক্তির চেহারা-আকৃতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকে। আল্লাহ তা'আলার এ উক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এসব সংগী-সাথী এমন যে, কেউ তাদের একবার দেখা মাত্রই অনুধাবন করতে পারবে তারা সৃষ্টির সেরা। কারণ তাদের চেহারায় আল্লাহভীরুতার দীপ্তি সমুজ্জল। এ বিষয়টি সম্পর্কে ইমাম মালেক (র) বলেন, সাহাবীদের

সেনাদল যে সময় সিরীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করে তখন সিরীয়ার খৃষ্টানরা বলছিলো ঃ ঈসার (আ) হাওয়ারীদের চালচলন সম্পর্কে আমরা যা যা শুনে আসছি এদের চালচলন দেখছি ঠিক তাই।

৫৫. সম্ভবত 'এখানে বাইবেলের' দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের ৩৩ অধ্যায়ের ২ ও ৩ শ্লোকের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে, যেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কল্যাণময় শুভ আগমনের কথা বলতে গিয়ে তাঁর সাহাবীদের জন্য "পবিত্রদের" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি ছাড়া সাহাবায়ে কিরামের আর কোন গুণ বা পরিচয় যদি তাওরাতে বর্ণিত হয়ে থাকে তাহলে তা এখন এ বিকৃত তাওরাতে নেই।

৫৬. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের একটি বক্তৃতায় এ উপমাটি বর্ণিত হয়েছে এবং বাইবেলের 'নতুন নিয়মে' তা উদ্ধৃত হয়েছে এভাবে ঃ "তিনি আরো কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য এইরূপ। কোন ব্যক্তি যেন ভূমিতে বীজ বুনে; পরে রাত দিন নিদ্রা যায় ও উঠে, ইতিমধ্যে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বাড়িয়া উঠে, কিরূপে তাহা সে জানে না। ভূমি আপনা আপনি ফল উৎপন্ন করে; প্রথমে অঙ্কুর পরে শীষ তাহার পর শীষের মধ্যে পূর্ণ শস্য। কিন্তু ফল পাকিলে সে তৎক্ষণাৎ কাস্তে লাগায়। কেননা শস্য কাটিবার সময় উপস্থিত। .....তাহা একটা সরিষা দানার তুল্য; সেই বীজ ভূমিতে বুনিবার সময় ভূমির সকল বীজের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু বুনা হইলে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া সকল শাক হইতে বড় হইয়া ওঠে, এবং বড় বড় ডাল ফেলে; তাহাতে আকাশের পক্ষিগণ তাহার ছায়ার নীচে বাস করিতে পারে।" (মার্ক, অধ্যায় ৪, শ্লোক ২৬ থেকে ৩২; এই বক্তৃতার শেষাংশ মথি লিখিত সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ের ৩১ ও ৩২ শ্লোকেও বর্ণিত হয়েছে)

৫৭. একদল এ আয়াতে ব্যবহৃত مِنْهُمْ এর من শব্দটিকে تبعيض অর্থে (অর্থাৎ তাদের কিছু সংখ্যক লোককে বুঝাতে) ব্যবহার করে আয়াতের অনুবাদ করেন "তাদের মধ্যে যারা ঈমান গ্রহণ এবং নেক কাজ করেছে তাদেরকে ক্ষমা ও বড় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।" এভাবে তারা সাহাবায়ে কিরামের (রা) প্রতি দোষারোপের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং দাবী করে যে, এ আয়াত অনুসারে সাহাবীদের (রা) মধ্যে অনেকেই মু'মিন ও নেক্কার ছিলেন না। কিন্তু এ ব্যাখ্যা এ সূরারই ৪, ৫, ১৮ এবং ২৬ আয়াতের পরিপন্থী এবং এ আয়াতের প্রথমাংশের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যারা হুদাইবিয়াতে নবীর (সা) সাথে ছিলেন ৪ ও ৫ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের মনে প্রশান্তি নাযিল করা ও তাদের ঈমান বৃদ্ধি করার কথা উল্লেখ করেছেন এবং কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই তাদের সবাইকে জান্নাতে প্রবেশ করার সুখবর দান করেছেন। আর যারা গাছের নিচে নবীর (সা) কাছে বাইয়াত হয়েছিলেন ১৮ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের সবার জন্য তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এ ক্ষেত্রেও কোন ব্যতিক্রমের উল্লেখ নেই। ২৬ আয়াতেও নবীর (সা) সমস্ত সংগী–সাথীর জন্য 'মু'মিনীন' শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাদের প্রতি তাঁর প্রশান্তি নাযিলের খবর দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এসব লোক তাকওয়ার নীতি অনুসরণের অধিক যোগ্য ও অধিকারী। এখানেও একথা বলা হয়নি যে, তাদের মধ্যে যারা মু'মিন কেবল তাদের জন্যই এ সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে। তাছাড়া এ আয়াতেও প্রথমাংশে যে প্রশংসা বাক্য বলা হয়েছে তা তাদের সবার জন্যে বলা হয়েছে যারা আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। কথাটা হচ্ছে যারাই আপনার সাথে আছে

তারাই এরূপ এবং এরূপ। এরপর আয়াতের শেষাংশে পৌঁছে একথা বলার এমন কি অবকাশ থাকতে পারে যে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক ঈমানদার ও নেক্‌কার ছিলেন এবং কিছু সংখ্যক লোক তা ছিলো না। তাই এখানে مِن শব্দটিকে تبعيض অর্থে গ্রহণ করা বাক্য বিন্যাসের পরিপন্থী। প্রকৃতপক্ষে এখানে مِن শব্দটি فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ স্পষ্ট করে বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন (মূর্তিসমূহের অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো) আয়াতে تبعيضٍ مِن অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তা না হলে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে মূর্তিসমূহের যেগুলো অপবিত্র সেগুলো থেকে দূরে থাকো। এর অর্থ হবে এই যে, কিছু মূর্তিকে পবিত্র বলেও ধরে নিতে হবে। আর সেগুলোর পূজা থেকে বিরত থাকা আবশ্যিক হবে না।

আল হুজুরাত

৪৯

নামকরণ

৪ আয়াতের اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ বাক্যাংশ থেকে এ সূরার নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ যে সূরার মধ্যে আল হুজুরাত শব্দ আছে এটি সেই সূরা।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় এবং সূরার বিষয়বস্তু থেকেও সমর্থন পাওয়া যায় যে, এ সূরা বিভিন্ন পরিবেশ ও ক্ষেত্রে নাযিল হওয়া হুকুম-আহকাম ও নির্দেশনাসমূহের সমষ্টি। বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যের কারণে এগুলোকে এখানে একত্রিত করা হয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন বর্ণনা থেকে একথাও জানা যায় যে, ঐ সব হুকুম-আহকামের বেশীর ভাগই মাদানী যুগের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। যেমন ঃ ৪ আয়াত সম্পর্কে তাফসীরকারদের বর্ণনা হচ্ছে আয়াতটি বনী তামীম গোত্র সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো যার প্রতিনিধি দল এসে নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণের হুজরা বা গৃহের বাইরে থেকে তাঁকে ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছিলো। সমস্ত সীরাত গ্রন্থে হিজরী ৯ম সনকে এ প্রতিনিধি দলের আগমনের সময় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপ ৬ আয়াত সম্পর্কে বহু সংখ্যক হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তা ওয়ালীদ ইবনে উকবা সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো—রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে বনী মুস্তালিক গোত্র থেকে যাকাত আদায় করে আনতে পাঠিয়েছিলেন। একথা সবারই জানা যে, ওয়ালীদ ইবনে উকবা মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হয়েছিলেন।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে মুসলমানদেরকে এমন আদব-কায়দা, শিষ্টাচার ও আচরণ শিক্ষা দেয়া, যা তাদের ঈমানদারসুলভ স্বভাব চরিত্র ও ভাবমূর্তির উপযুক্ত ও মানানসই।

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ব্যাপারে যেসব আদব-কায়দা ও শিষ্টাচারের দিকে লক্ষ রাখতে হবে প্রথম পাঁচ আয়াতে তাদেরকে তা শিখিয়ে দেয়া হয়েছে।

এরপর নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, প্রতিটি খবরই বিশ্বাস করা এবং সে অনুসারে কোন কর্মকাণ্ড করে বসা ঠিক নয়, যদি কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কওমের বিরুদ্ধে কোন খবর পাওয়া যায় তাহলে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে খবর পাওয়ার মাধ্যম নির্ভরযোগ্য কি

না। নির্ভরযোগ্য না হলে তার ভিত্তিতে কোন তৎপরতা চালানোর পূর্বে খবরটি সঠিক কি না তা যাঁচাই বাছাই করে নিতে হবে।

এরপর বলা হয়েছে মুসলমানদের দু'টি দল যদি কোন সময় পরস্পর সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তবে সে ক্ষেত্রে অন্য মুসলমানদের কর্মনীতি কি হওয়া উচিত।

তারপর মুসলমানদেরকে সেসব খারাপ জিনিস থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা সমাজ জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং যার কারণে পারস্পরিক সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। একে অপরকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা, বদনাম ও উপহাস করা, খারাপ নামে আখ্যায়িত করা, খারাপ ধারণা পোষণ করা, অন্যের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি ও অনুসন্ধান করা, অসাক্ষাতে মানুষের বদনাম করা এগুলো এমনিতেও গোনাহের কাজ এবং সমাজে বিপর্যয়ও সৃষ্টি করে। আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে নাম ধরে ধরে হারাম ঘোষণা করেছেন।

অতপর গোত্রীয় ও বংশগত বৈষম্যের ওপর আঘাত হানা হয়েছে যা সারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে। বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও বংশের নিজ নিজ মর্যাদা নিয়ে গর্ব ও অহংকার করা, অন্যদেরকে নিজেদের চেয়ে নিম্নস্তরের মনে করা এবং নিজেদের বড়ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যদের হেয় করা—এসব এমন জঘন্য খাসলত যার কারণে পৃথিবী জুলুমে ভরে উঠেছে। আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ছোট্ট একটি আয়াতে একথা বলে এসব অনাচারের মূলোৎপাটন করেছেন যে, "সমস্ত মানুষ একই মূল উৎস থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করা হয়েছে পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য, গর্ব ও অহংকার প্রকাশের জন্য নয় এবং একজন মানুষের ওপর আরেকজন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য আর কোন বৈধ ভিত্তি নেই।"

সব শেষে মানুষকে বলা হয়েছে যে, ঈমানের মৌখিক দাবী প্রকৃত জিনিস নয়. বরং সরল মনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মানা, কার্যত অনুগত হয়ে থাকা এবং আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর পথে জান ও মাল কুরবানী করা। সত্যিকার মু'মিন সে যে এ নীতি ও আচরণ গ্রহণ করে। কিন্তু যারা আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া ছাড়াই শুধু মৌখিকভাবে ইসলামকে স্বীকার করে এবং তারপর এমন নীতি ও আচরণ অবলম্বন করে যেন ইসলাম গ্রহণ করে তারা কোন মহা উপকার সাধন করেছে, পৃথিবীতে তারা মুসলমান হিসেবে গণ্য হতে পারে, সমাজে তাদের সাথে মুসলমানের মত আচরণও করা যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহর কাছে তারা মুসলমান হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

আয়াত ১৮ | সূরা আল হুজুরাত–মাদানী | রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ۭ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

হে মু'মিনগণ ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের চেয়ে অগ্রগামী হয়ো না।[১] আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।[২]

হে মু'মিনগণ ! নিজেদের আওয়ায রসূলের আওয়াযের চেয়ে উঁচু করো না এবং উচ্চস্বরে নবীর সাথে কথা বলো না, যেমন তোমরা নিজেরা পরস্পর বলে থাকো।[৩] এমন যেন না হয় যে, তোমাদের অজান্তেই তোমাদের সব কাজ–কর্ম ধ্বংস হয়ে যায়।[৪] যারা আল্লাহর রসূলের সামনে তাদের কণ্ঠ নিচু রাখে তারাই সেসব লোক, আল্লাহ যাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন।[৫] তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় পুরস্কার।

১. এটা ঈমানের প্রাথমিক ও মৌলিক দাবী। যে ব্যক্তি আল্লাহকে তার রব এবং আল্লাহর রসূলকে তার হিদায়াত ও পথপ্রদর্শনকারী মানে সে যদি তার এ বিশ্বাসে সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে সে নিজের মতামত ও ধ্যান–ধারণাকে কখনো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সিদ্ধান্তের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে পারে না, কিংবা বিভিন্ন ব্যাপারে স্বাধীন মতামত পোষণ করতে পারে না এবং ঐ সব ব্যাপারে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না বরং আল্লাহ ও তাঁর রসূল ঐ সব ব্যাপারে কোন হিদায়াত বা দিকনির্দেশনা দিয়েছেন

কিনা এবং দিয়ে থাকলে কি দিয়েছেন সে বিষয়ে আগে জানার চেষ্টা করবে। কোন মু'মিনের আচরণে এর ব্যতিক্রম কখনো হতে পারে না। এ জন্য আল্লাহ বলছেন, "হে ঈমানদাররা, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অগ্রগামী হয়ো না।" অর্থাৎ তাঁর আগে আগে চলবে না, পেছনে পেছনে চলো। তাঁর অনুগত হয়ে থাকো। এ বাণীতে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা সূরা আহযাবের ৩৬ আয়াতের নির্দেশ থেকে একটু কঠোর। সেখানে বলা হয়েছিলো, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যে বিষয়ে ফায়সালা করে দিয়েছেন সে বিষয়ে আলাদা কোন ফায়সালা করার ইখতিয়ার কোন ঈমানদারের জন্য আর অবশিষ্ট থাকে না। আর এখানে বলা হয়েছে ঈমানদারদের নিজেদের বিভিন্ন ব্যাপারে আপনা থেকেই অগ্রগামী হয়ে ফায়সালা না করা উচিত। বরং প্রথমে দেখা উচিত ঐ সব ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নাতে কি কি নির্দেশনা রয়েছে।

এ নির্দেশটি শুধু মুসলমানদের ব্যক্তিগত ব্যাপারসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাদের সমস্ত সামাজিক ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে এটি ইসলামী আইনের মৌলিক দফা। মুসলমানদের সরকার, বিচারালয় এবং পার্লামেন্ট কোন কিছুই এ আইন থেকে মুক্ত নয়। মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজায় সহীহ সনদে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যে, যে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মু'আয ইবনে জাবালকে ইয়ামানের বিচারক করে পাঠাচ্ছিলেন তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কিসের ভিত্তিতে ফায়সালা করবে? তিনি জবাব দিলেন ঃ "আল্লাহর কিতাব অনুসারে।" নবী (সা) বললেন ঃ যদি কোন বিষয়ে কিতাবুল্লাহর মধ্যে হুকুম না পাওয়া যায় তাহলে কোন্ জিনিসের সাহায্য নেবে ? তিনি বললেনঃ আল্লাহর রসূলের সুন্নাতের সাহায্য নেব। তিনি বললেন ঃ যদি সেখানেও কিছু না পাও? তিনি বললেন ঃ তাহলে আমি নিজে ইজতিহাদ করবো। একথা শুনে নবী (সা) তার বুকের ওপর হাত রেখে বললেন ঃ সে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করছি যিনি তাঁর রসূলের প্রতিনিধিকে এমন পন্থা অবলম্বন করার তাওফীক দান করেছেন যা তাঁর রসূলের কাছে পছন্দনীয়। নিজের ইজতিহাদের চেয়ে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং হিদায়াত লাভের জন্য সর্বপ্রথম এ দু'টি উৎসের দিকে ফিরে যাওয়াই এমন একটা জিনিস যা একজন মুসলিম বিচারক এবং একজন অমুসলিম বিচারকের মধ্যকার মূল পার্থক্য তুলে ধরে। অনুরূপ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাবই যে সর্বপ্রথম উৎস এবং তারপরই যে রসূলের সুন্নাত—এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তির কিয়াস ও ইজতিহাদ তো দূরের কথা গোটা উম্মতের ইজমাও এ দু'টি উৎসের পরিপন্থী কিংবা তা থেকে স্বাধীন হতে পারে না।

২. অর্থাৎ যদি তোমরা কখনো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে স্বেচ্ছাচারী হওয়ার নীতি গ্রহণ করো কিংবা নিজের মতামত ও ধ্যান-ধারণাকে তাঁদের নির্দেশের চেয়ে অগ্রাধিকার দান করো তাহলে জেনে রাখো তোমাদের বুঝাপড়া হবে সেই আল্লাহর সাথে যিনি তোমাদের সব কথা শুনছেন এবং মনের অভিপ্রায় পর্যন্ত অবগত আছেন।

৩. যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে ওঠাবসা ও যাতায়াত করতেন তাদেরকে এ আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো। এর উদ্দেশ্য ছিল

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾
وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

হে নবী ! যারা তোমাকে গৃহের বাইরে থেকে ডাকাডাকি করতে থাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। যদি তারা তোমার বেরিয়ে আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতো তাহলে তাদের জন্য ভাল হোত।[৬] আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[৭]

নবীর (সা) সাথে দেখা-সাক্ষাত ও কথাবার্তার সময় যেন ঈমানদাররা তাঁর সম্মান ও মর্যাদার প্রতি একান্তভাবে লক্ষ রাখেন। কারো কণ্ঠ যেন তাঁর কণ্ঠ থেকে উচ্চ না হয়। তাঁকে সম্বোধন করতে গিয়ে কেউ যেন একথা ভুলে না যায় যে, সে কোন সাধারণ মানুষ বা তার সমকক্ষ কাউকে নয় বরং আল্লাহর রসূলকে সম্বোধন করে কথা বলছে। তাই সাধারণ মানুষের সাথে কথাবার্তা এবং আল্লাহর রসূলের সাথে কথাবার্তার মধ্যে পার্থক্য থাকতে হবে এবং কেউ তাঁর সাথে উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলবে না।

যদিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসের জন্য এসব আদব-কায়দা শেখানো হয়েছিলো এবং নবীর (সা) যুগের লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিলো। কিন্তু যখনই নবীর (সা) আলোচনা হবে কিংবা তাঁর কোন নির্দেশ শুনানো হবে অথবা তাঁর হাদীসসমূহ বর্ণনা করা হবে এরূপ সকল ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ের লোকদেরও এ আদব-কায়দাই অনুসরণ করতে হবে। তাছাড়া নিজের চেয়ে উচ্চ মর্যাদার লোকদের সাথে কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনার সময় কি কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে এ আয়াত থেকে সে ইংগিতও পাওয়া যায়। কেউ তার বন্ধুদের সাথে কিংবা সাধারণ মানুষের সাথে যেভাবে কথাবার্তা বলে, তার কাছে সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের সাথেও যদি একইভাবে কথাবার্তা বলে তাহলে তা প্রমাণ করে যে, সে ব্যক্তির জন্য তাঁর মনে কোন সম্মানবোধ নেই এবং সে তার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না।

৪. ইসলামে রসূলের ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা ও স্থান কি এ বাণী থেকে তা জানা যায়। কোন ব্যক্তি সম্মানলাভের যতই উপযুক্ত হোক না কেন কোন অবস্থায়ই সে এমন মর্যাদার অধিকারী নয় যে, তার সাথে বেয়াদবী আল্লাহর কাছে এমন শাস্তিযোগ্য হবে যা মূলত কুফরীর শাস্তি। বড় জোর সেটা বেয়াদবী বা অশিষ্ট আচরণ। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সামান্য শিথিলতাও এত বড় গোনাহ যে, তাতে ব্যক্তির সারা জীবনের সঞ্চিত পুঁজি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই নবীর (সা) প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরই শামিল, যিনি তাঁকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে অবহেলার অর্থ স্বয়ং আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি বা অবহেলার পর্যায়ভুক্ত।

৫. অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং এসব পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছে যে, প্রকৃতই তাদের অন্তরে তাকওয়া বিদ্যমান তারাই আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সম্মানের প্রতি লক্ষ রাখে। এ আয়াতাংশ থেকে আপনা আপনি প্রমাণিত হয়

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟
قَوْمًۢا بِجَهَـٰلَةٍ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَـٰدِمِينَ ﴿٦﴾ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ فِيكُمْ
رَسُولَ ٱللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِى كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ
حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَـٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ
وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلرَّٰشِدُونَ ﴿٧﴾ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ
وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾

হে ঈমান গ্রহণকারীগণ, যদি কোন ফাসেক তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসে তাহলে তা অনুসন্ধান করে দেখ। এমন যেন না হয় যে, না জেনে শুনেই তোমরা কোন গোষ্ঠীর ক্ষতি করে বসবে এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।[৮]

ভাল করে জেনে নাও, আল্লাহর রসূল তোমাদের মাঝে বর্তমান। তিনি যদি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তোমাদের কথা মেনে নেন তাহলে তোমরা নিজেরাই অনেক সমস্যার মধ্যে পড়ে যাবে।[৯] *কিন্তু আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ঈমানের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা তোমাদের কাছে পছন্দনীয় করে দিয়েছেন। আর কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে তোমাদের কাছে ঘৃণিত করে দিয়েছেন। আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানীতে এসব লোকই সৎপথের অনুগামী।*[১০] *আল্লাহ জ্ঞানী ও কুশলী।*[১১]

যে, যে হৃদয়ে রসূলের মর্যাদাবোধ নেই সে হৃদয়ে প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া নেই। আর রসূলের সামনে কারো কণ্ঠস্বর উচ্চ হওয়া শুধু একটি বাহ্যিক অশিষ্টতাই নয় বরং অন্তরে তাকওয়া না থাকারই প্রমাণ।

৬. নবীর (সা) পবিত্র যুগে যারা তাঁর সাহচর্যে থেকে ইসলামী আদব-কায়দা, ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন তারা সবসময় নবীর (সা) সময়ের প্রতি লক্ষ রাখতেন। তিনি আল্লাহর কাজে কতটা ব্যস্ত জীবন যাপন করেন সে ব্যাপারে তাদের পূর্ণ উপলব্ধি ছিল। এসব ক্লান্তিকর ব্যস্ততার ভেতরে কিছু সময় তাঁর আরামের জন্য, কিছু সময় অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য এবং কিছু সময় পারিবারিক কাজকর্ম দেখা-শোনার জন্যও অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। এ জন্য তারা নবীর সাথে দেখা করার জন্য এমন সময় গিয়ে হাজির হতো যখন তিনি ঘরের বাইরেই অবস্থান করতেন এবং কখনো যদি তাঁকে

মজলিসে না-ও পেতো তাহলে তাঁর বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতো। অত্যধিক প্রয়োজন ছাড়া তাঁকে বাইরে আসার জন্য কষ্ট দিতো না। কিন্তু আরবের সে পরিবেশে যেখানে সাধারণভাবে মানুষ কোন প্রকার শিষ্টাচারের শিক্ষা পায়নি সেখানে বারবার এমন সব অশিক্ষিত লোকেরা নবীর (সা) সাথে সাক্ষাতের জন্য এসে হাজির হতো যাদের ধারণা ছিল ইসলামী আন্দোলন ও মানুষকে সংশোধনের কাজ যারা করেন তাদের কোন সময় বিশ্রাম গ্রহণের অধিকার নেই এবং রাতের বেলা বা দিনের বেলা যখনই ইচ্ছা তাঁর কাছে এসে হাজির হওয়ার অধিকার তাদের আছে। আর তাঁর কর্তব্য হচ্ছে, যখনই তারা আসবে তাদেরকে সাক্ষাত দানের জন্য তিনি প্রস্তুত থাকবেন। এ প্রকৃতির লোকদের মধ্যে সাধারণভাবে এবং আরবের বিভিন্ন অংশ থেকে আগত লোকদের মধ্যে বিশেষভাবে এমন কিছু অজ্ঞ অভদ্র লোকও থাকতো যারা নবীর (সা) সাথে সাক্ষাত করতে আসলে কোন খাদেমের মাধ্যমে ভিতরে খবর দেয়ার কষ্টটাও করতো না। নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের হুজরার চারদিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে বাইরে থেকেই তাঁকে ডাকতে থাকতো। সাহাবীগণ হাদীসে এ ধরনের বেশ কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছেন। লোকজনের এ আচরণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুব কষ্ট হতো। কিন্তু স্বভাবগত ধৈর্যের কারণে তিনি এসব সহ্য করে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন এবং এ অশিষ্ট কর্মনীতির জন্য তিরস্কার করে লোকজনকে এ নির্দেশনা দান করলেন যে, যখন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য এসে তাঁকে পাবে না, তখন চিৎকার করে তাঁকে ডাকার পরিবর্তে ধৈর্যের সাথে বসে সে সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে যখন তিনি নিজেই তাদেরকে সাক্ষাতদানের জন্য বেরিয়ে আসবেন।

৭. অর্থাৎ এ যাবত যা হওয়ার তা হয়েছে। যদি ভবিষ্যতে এ ভুলের পুনরাবৃত্তি না করা হয় তবে আল্লাহ অতীতের সব ভুল ক্ষমা করে দেবেন এবং যারা তাঁর রসূলকে এভাবে কষ্ট দিয়েছে দয়া ও করুণা পরবশ হয়ে তিনি তাদের পাকড়াও করবেন না।

৮. অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে এ আয়াতটি ওয়ালীদ ইবনে উকবা ইবনে আবী মু'আইত সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এর পটভূমি হচ্ছে, বনী মুসতালিক গোত্র মুসলমান হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের থেকে যাকাত আদায় করে আনার জন্য ওয়ালীদ ইবনে উকবাকে পাঠালেন। সে তাদের এলাকায় পৌঁছে কোন কারণে ভয় পেয়ে গেল এবং গোত্রের লোকদের কাছে না গিয়েই মদীনায় ফিরে গিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ বলে অভিযোগ করলো যে, তারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। এ খবর শুনে নবী (সা) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাদের শায়েস্তা করার জন্য একদল সেনা পাঠাতে মনস্থ করলেন। কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সেনাদল পাঠিয়েছিলেন এবং কোন কোনটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মোট কথা, এ বিষয়ে সবাই একমত যে, এ সময়ে বনী মুসতালিক গোত্রের নেতা হারেস ইবনে দ্বেরার (উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়াইরিয়ার পিতা) এক প্রতিনিধি দল নিয়ে নবীর (সা) খেদমতে হাজির হন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর কসম যাকাত দিতে অস্বীকৃতি এবং ওয়ালীদকে হত্যা করার চেষ্টা তো দূরের কথা তার সাথে আমাদের সাক্ষাত পর্যন্ত হয়নি। আমরা ঈমানের ওপরে অবিচল আছি এবং যাকাত প্রদানে আদৌ অনিচ্ছুক নই। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াত

নাযিল হয়। এ ঘটনাটি ইমাম আহমাদ, ইবনে আবী হাতেম, তাবারানী এবং ইবনে জারীর সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হারেস ইবনে যেরার, মুজাহিদ, কাতাদা, আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লা, ইয়াযীদ ইবনে রুমান, দ্বাহ্হাক এবং মুকাতিল ইবনে হাইয়ান থেকে উদ্ধৃত করেছেন। হযরত উম্মে সালামা বর্ণিত হাদীসে পুরো ঘটনাটি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে সুস্পষ্টভাবে ওয়ালীদের নামের উল্লেখ নেই।

এ নাজুক পরিস্থিতিতে যখন একটি ভিত্তিহীন খবরের ওপর নির্ভর করার কারণে একটি বড় ভুল সংঘটিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো সে মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে এ মৌলিক নির্দেশটি জানিয়ে দিলেন যে, যখন তোমরা এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর পাবে যার ভিত্তিতে বড় রকমের কোন ঘটনা সংঘটিত হতে পারে তখন তা বিশ্বাস করার পূর্বে খবরের বাহক কেমন ব্যক্তি তা যাঁচাই করে দেখো। সে যদি কোন ফাসেক লোক হয় অর্থাৎ যার বাহ্যিক অবস্থা দেখেই প্রতীয়মান হয় যে, তার কথা নির্ভরযোগ্য নয় তাহলে তার দেয়া খবর অনুসারে কাজ করার পূর্বে প্রকৃত ঘটনা কি তা অনুসন্ধান করে দেখো। আল্লাহর এ হুকুম থেকে শরীয়াতের একটি নীতি পাওয়া যায় যার প্রয়োগ ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। এ নীতি অনুসারে যার চরিত্র ও কাজ-কর্ম নির্ভরযোগ্য নয় এমন কোন সংবাদদাতার সংবাদের ওপর নির্ভর করে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা জাতির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামী সরকারের জন্য বৈধ নয়। এ নীতির ভিত্তিতে হাদীস বিশারদগণ হাদীস শাস্ত্রে "জারহ্ ও তা'দীল"-এর নীতি উদ্ভাবন করেছেন। যাতে যাদের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসমূহ পরবর্তী বংশধরদের কাছে পৌঁছেছিলো তাদের অবস্থা যাঁচাই বাছাই করতে পারেন। তাছাড়া সাক্ষ আইনের ক্ষেত্রে ফকীহগণ নীতি নির্ধারণ করেছন যে, এমন কোন ব্যাপারে ফাসেক ব্যক্তির সাক্ষ গ্রহণযোগ্য হবে না যার দ্বারা শরীয়াতের কোন নির্দেশ প্রমাণিত হয় কিংবা কোন মানুষের ওপর কোন অধিকার বর্তায়। তবে এ ব্যাপারে পণ্ডিতগণ একমত যে, সাধারণ পার্থিব ব্যাপারে প্রতিটি খবরই যাঁচাই ও অনুসন্ধান করা এবং খবরদাতার নির্ভরযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া জরুরী নয়। কারণ, আয়াতে نَبَأ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি সব রকম খবরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, শুধু গুরুত্বপূর্ণ খবরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ কারণে ফকীহগণ বলেন, সাধারণ ও খুঁটিনাটি ব্যাপারে এ নীতি খাটে না। উদাহরণ স্বরূপ আপনি কারো কাছে গেলেন এবং বাড়ীতে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। বাড়ীর ভেতর থেকে কেউ এসে বললো, আসুন। এ ক্ষেত্রে আপনি তার কথার ওপর নির্ভর করে প্রবেশ করতে পারেন। বাড়ীর মালিকের পক্ষ থেকে অনুমতির সংবাদদাতা সৎ না অসৎ এ ক্ষেত্রে তা দেখার প্রয়োজন নেই। অনুরূপ ফকীহগণ এ ব্যাপারেও একমত, যেসব লোকের ফাসেকী মিথ্যাচার ও চারিত্রিক অসততার পর্যায়ের নয়, বরং আকীদা-বিকৃতির কারণে ফাসেক বলে আখ্যায়িত তাদের সাক্ষ এবং বর্ণনাও গ্রহণ করা যেতে পারে। শুধু আকীদা খারাপ হওয়া তাদের সাক্ষ ও বর্ণনা গ্রহণ করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক নয়।

৯. বনী মুসতালিক গোত্র সম্পর্কে ওয়ালীদ ইবনে উকবার খবরের ভিত্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক যে তাদের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ পরিচালনার জন্য

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ
فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

ঈমানদারদের মধ্যকার দু'টি দল যদি পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়[১২] তাহলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।[১৩] তারপরও যদি দু'টি দলের কোন একটি অপরটির বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করে তবে যে দল বাড়াবাড়ি করে তার বিরুদ্ধে লড়াই করো।[১৪] যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।[১৫] এরপর যদি তারা ফিরে আসে তাহলে তাদের মাঝে ন্যায় বিচারের সাথে মীমাংসা করিয়ে দাও[১৬] এবং ইনসাফ করো। আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।[১৭] মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে দাও।[১৮] আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি মেহেরবানী করা হবে।

পীড়াপীড়ি করছিলো আয়াতের পূর্বাপর প্রসঙ্গ থেকেও এ বিষয়ে ইংগিত পাওয়া যায় এবং কিছু সংখ্যক মুফাস্‌সিরও আয়াতটি থেকে তাই বুঝেছেন। এ কারণে ঐ সব লোককে তিরস্কার করে বলা হয়েছে, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে তোমাদের মধ্যে বর্তমান, একথা ভুলে যেয়ো না। তিনি তোমাদের জন্য কল্যাণের বিষয়কে তোমাদের চেয়ে অধিক জানেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত তোমাদের কাছে যথোপযুক্ত মনে হয় তিনি যেন সে অনুসারেই কাজ করেন তোমাদের এরূপ আশা করাটা অত্যন্ত অন্যায় দুঃসাহস। যদি তোমাদের কথা অনুসারে সব কাজ করা হতে থাকে তাহলে বহু ক্ষেত্রে এমন সব ভুল-ত্রুটি হবে যার ভোগান্তি তোমাদেরকেই পোহাতে হবে।

১০. অর্থাৎ কতিপয় লোক তাদের অপরিপক্ক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরিচালনা করতে চাচ্ছিলো। তাদের এ চিন্তা ছিল ভুল। তবে মু'মিনদের গোটা জামায়াত এ ভুল করেনি। মু'মিনদের সঠিক পথের ওপর কায়েম থাকার কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তাঁর দয়া ও মেহেরবানীতে ঈমানী আচার-আচরণকে তাদের জন্য প্রিয় ও হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন এবং কুফরী, ফাসেকী ও নাফরমানীর আচরণকে তাদের কাছে ঘৃণিত করে দিয়েছেন। এ আয়াতের দু'টি অংশে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে কথা বলা হয়েছে। لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ আয়াতাংশে সব

সাহাবীকে উদ্দেশ করে কথা বলা হয়নি, বরং যারা বনী মুসতালিকের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য পীড়াপীড়ি করছিলো সে বিশেষ কিছু সাহাবীকে উদ্দেশ করে কথা বলা হয়েছে। আর وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ আয়াতাংশে সমস্ত সাহাবীদের সম্বোধন করা হয়েছে যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজেদের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করার দুঃসাহস কখনো দেখাতেন না। বরং ঈমানের দাবী অনুসারে তাঁর হিদায়াত ও দিকনির্দেশনার ওপর নির্ভর করে সবসময় আনুগত্যের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতেন। এর দ্বারা আবার একথা বুঝায় না যে, যারা নিজেদের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলো তাদের মধ্যে ঈমানের প্রতি কোন ভালবাসা ছিল না। একথা থেকে যে বিষয়ের ইংগিত পাওয়া যায় তা হচ্ছে ঈমানের এ দাবীর ব্যাপারে তাদের মধ্যে শিথিলতা এসে পড়েছিলো। এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতি সত্ত্বেও তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলো। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রথমে এ ভুল ও এর কুফল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং পরে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সাহাবীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে নীতির অনুসারী সেটিই সঠিক নীতি ও আচরণ।

১১. অর্থাৎ আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী কোন অযৌক্তিক ভাগ-বাঁটোয়ারা নয়। তিনি যাকেই এ বিরাট নিয়ামত দান করেন জ্ঞান ও যুক্তির ভিত্তিতে দান করেন এবং নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে যাকে এর উপযুক্ত বলে জানেন তাকেই দান করেন।

১২. আল্লাহ একথা বলেননি, যখন ঈমানদারদের মধ্যকার দু'টি গোষ্ঠী পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয় বরং বলেছেন, "যদি ঈমানদারদের দু'টি দল একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়।" একথা থেকে স্বতঃই বুঝা যায় যে, পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া মুসলমানদের নীতি ও স্বভাব নয় এবং হওয়া উচিতও নয়। মু'মিন হয়েও তারা পরস্পর লড়াই করবে এটা তাদের কাছ থেকে আশাও করা যায় না। তবে কখনো যদি এরূপ ঘটে তাহলে সে ক্ষেত্রে এমন কর্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত যা পরে বর্ণনা করা হচ্ছে। তাছাড়া দল বুঝাতেও فرقة শব্দ ব্যবহার না করে طائفة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় فرقة বড় দলকে এবং طائفة ছোট দলকে বুঝায়। এ থেকেও ইংগিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে এটি একটা চরম অপছন্দনীয় ব্যাপার। মুসলমানদের বড় বড় দলের এতে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকাও উচিত নয়।

১৩. এ নির্দেশ দ্বারা এমন সমস্ত মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা উক্ত বিবদমান দল দু'টিতে শামিল নয় এবং যাদের পক্ষে যুদ্ধমান দু'টি দলের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা করে দেয়া সম্ভব। অন্য কথায় আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে মুসলমানদের দু'টি দল পরস্পর লড়াই করতে থাকবে আর মুসলমান নিষ্ক্রিয় বসে তামাশা দেখবে আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে সেটা মুসলমানের কাজ নয়। বরং এ ধরনের দুঃখজনক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে তাতে সমস্ত ঈমানদার লোকদের অস্থির হয়ে পড়া উচিত এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণে যার পক্ষে যতটুকু চেষ্টা করা সম্ভব তাকে তা করতে হবে। উভয় পক্ষকে লড়াই থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতে হবে। তাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখাতে হবে। প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ উভয় পক্ষের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত

করবে। বিবাদের কারণসমূহ জানবে এবং নিজ নিজ সাধ্যমত তাদের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার সব রকম প্রচেষ্টা চালাবে।

১৪. অর্থাৎ এটাও মুসলমানের কাজ নয় যে, সে অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেবে এবং যার প্রতি অত্যাচার করা হচ্ছে তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে কিংবা অত্যাচারীকে সহযোগিতা করবে। তাদের কর্তব্য হচ্ছে, যুদ্ধরত দু' পক্ষের মধ্যে সন্ধি করানোর সমস্ত প্রচেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়ে যায় তাহলে দেখতে হবে সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী কে এবং অত্যাচারী কে? যে সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী তাকে সহযোগিতা করবে। আর যে অত্যাচারী তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে। যেহেতু এ লড়াই করতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন তাই তা ওয়াজিব এবং জিহাদ হিসেবে গণ্য। এটা সেই ফিতনার অন্তরভুক্ত নয় যার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ القائم فيها خير من الماشى والقاعد فيها خير من القائم (সে ফিতনার সময় দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি চলতে থাকা ব্যক্তির চেয়ে এবং বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির চেয়ে উত্তম।) কারণ, সে ফিতনার দ্বারা মুসলমানদের নিজেদের মধ্যকার সে লড়াইকে বুঝানো হয়েছে যা উভয় পক্ষের মাঝে গোত্র প্রীতি, জাহেলী সংকীর্ণতা এবং পার্থিব স্বার্থ অর্জনের প্রতিযোগিতা থেকে সংঘটিত হয় এবং দু' পক্ষের কেউই ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না। তবে অত্যাচারী দলের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত দলের সহযোগিতার জন্য যে যুদ্ধ করা হয় তা ফিতনায় অংশ গ্রহণ করা নয়। বরং আল্লাহর আদেশ মান্য করা। এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে সমস্ত ফিকাহবিদগণ একমত এবং ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে কোন মতানৈক্য ছিল না। (আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস) এমনকি কিছু সংখ্যক ফকীহ একে জিহাদের চাইতেও উত্তম বলে আখ্যায়িত করেন। তাদের যুক্তি হলো, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর গোটা খিলাফতকাল কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার পরিবর্তে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে কাটিয়ে দিয়েছেন। (রুহুল মাআনী)। এ ধরনের লড়াই ওয়াজিব নয় বলে কেউ যদি তার সপক্ষে এই বলে যুক্তি পেশ করে যে, হযরত আলীর (রা) এসব যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর এবং আরো কতিপয় সাহাবী অংশ গ্রহণ করেননি তাহলে সে ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত আছে। ইবনে উমর নিজেই বলেছেন ঃ

ما وجدت فى نفسى من شيئ ما وجدت من هذه الاية انى لم اقاتل هذه الفئة الباغية كما امرنى الله تعالى - (المستدرك للحاكم كتاب معرفة الصحابة ، باب الدفع عمن قعدوا عن بيعة على)

"কোন বিষয়ে আমার মনে এতটা খটকা লাগেনি যতটা এ আয়াতের কারণে লেগেছে। কেননা, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে আমি ঐ বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি।"

সীমালংঘনকারী দলের বিরুদ্ধে লড়াই করার অর্থ এটাই নয় যে, তার বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লড়াই করতেই হবে এবং তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে তার

বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা এবং এর মূল উদ্দেশ্য তার অত্যাচার নিরসন করা। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে ধরনের শক্তি প্রয়োগ অনিবার্য তা ব্যবহার করতে হবে এবং যতটা শক্তি প্রয়োগ উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে যথেষ্ট তার চেয়ে কম শক্তিও প্রয়োগ করবে না আবার বেশীও প্রয়োগ করবে না। এ নির্দেশে সেই লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে যারা শক্তি প্রয়োগ করে অত্যাচার ও সীমালংঘন নিরসন করতে সক্ষম।

১৫. এ থেকে বুঝা যায়, এ যুদ্ধ বিদ্রোহী (সীমালংঘনকারী দল)–কে বিদ্রোহের (সীমালংঘনের) শাস্তি দেয়ার জন্য নয়, বরং আল্লাহর নির্দেশ মেনে নিতে বাধ্য করার জন্য। আল্লাহর নির্দেশ অর্থ আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত অনুসারে যা ন্যায় বিদ্রোহী দল তা মেনে নিতে উদ্যোগী হবে এবং সত্যের এ মানদণ্ড অনুসারে যে কর্মপন্থাটি সীমালংঘন বলে সাব্যস্ত হবে তা পরিত্যাগ করবে। কোন বিদ্রোহী দল যখনই এ নির্দেশ অনুসরণ করতে সম্মত হবে তখন থেকেই তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। কারণ, এটিই এ যুদ্ধের চূড়ান্ত লক্ষ ও উদ্দেশ্য। এরপরও যদি কেউ বাড়াবাড়ি করে তাহলে সে–ই সীমালংঘনকারী। এখন কথা হলো, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাত অনুসারে কোন বিবাদে ন্যায় কি এবং অন্যায় কি তা নির্ধারণ করা নিসন্দেহে তাদেরই কাজ যারা এ উম্মতের মধ্যে জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির দিক দিয়ে বিষয়টি বিচার–বিশ্লেষণ করার যোগ্য।

১৬. শুধু সন্ধি করিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়নি, বরং নির্দেশ দেয়া হয়েছে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে সন্ধি করিয়ে দেয়ার। এ থেকে বুঝা যায় হক ও বাতিলের পার্থক্যকে উপেক্ষা করে শুধু যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য যে সন্ধি করানো হয় এবং যেখানে সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী দলকে অবদমিত করে সীমালংঘনকারী দলকে অন্যায়ভাবে সুবিধা প্রদান করানো হয় আল্লাহর দৃষ্টিতে তার কোন মূল্য নেই। সে সন্ধিই সঠিক যা ন্যায় বিচারের ওপর ভিত্তিশীল। এ ধরনের সন্ধি দ্বারা বিপর্যয় দূরীভূত হয়। তা না হলে ন্যায়ের অনুসারীদের অবদমিত করা এবং সীমালংঘনকারীদের সাহস ও উৎসাহ যোগানোর অনিবার্য পরিণাম দাঁড়ায় এই যে, অকল্যাণের মূল কারণসমূহ যেমন ছিল তেমনই থেকে যায়। এমনকি তা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তা থেকে বার বার বিপর্যয় সৃষ্টির ঘটনা ঘটতে থাকে।

১৭. এ আয়াতটি মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধ সম্পর্কে শরয়ী বিধানের মূল ভিত্তি। একটি মাত্র হাদীস (যা আমরা পরে বর্ণনা করব) ছাড়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতে এ বিধানের আর কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কারণ, নবীর (সা) যুগে মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের মত কোন ঘটনাই কখনো সংঘটিত হয়নি যে, তাঁর কাজ ও কথা থেকে এ বিধানের ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে। পরে হযরত আলীর (রা) খিলাফত যুগে যখন মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ হয় তখন এ বিধানের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ দেয়া হয়। তখন যেহেতু বহু সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম বর্তমান ছিলেন তাই তাদের কর্মকাণ্ড ও বর্ণিত আদেশ থেকে ইসলামী বিধানের এ শাখার বিস্তারিত নিয়ম–কানুন বিধিবদ্ধ করা হয়। বিশেষ করে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নীতি ও কর্মপন্থা এ ব্যাপারে সমস্ত ফিকাহবিদদের কাছে মূল উৎস হিসেবে গণ্য হয়। নিচে আমরা এ বিধানের একটি প্রয়োজনীয় সারসংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করছি ঃ

এক ঃ মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধের কয়েকটি ধরন হতে পারে এবং প্রতিটি ধরন সম্পর্কে শরীয়াতের বিধান বিভিন্ন ঃ

(ক) যুদ্ধরত দু'টি দল যখন কোন মুসলিম সরকারের প্রজা হবে তখন তাদের সন্ধি ও সমঝোতা করে দেয়া কিংবা তাদের মধ্যে কোন্ দলটি সীমালংঘনকারী তা নির্ণয় করা এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাকে ন্যায় ও সত্য গ্রহণ করতে বাধ্য করা সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(খ) যুদ্ধরত দু'পক্ষই যখন দু'টি বড় শক্তিশালী দল হবে কিংবা দু'টি মুসলিম সরকার হবে এবং উভয়ে পার্থিব স্বার্থের জন্য লড়াই চালাবে তখন মু'মিনদের কাজ হলো এ ফিতনায় অংশ গ্রহণ করা থেকে চূড়ান্তভাবে বিরত থাকা এবং উভয় পক্ষকেই আল্লাহর ভয় দেখিয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতে থাকা।

(গ) যুদ্ধরত যে দু'টি পক্ষের কথা ওপরে (খ) অংশে উল্লেখ করা হয়েছে তার একটি পক্ষ যদি ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় আর অপর পক্ষ যদি বাড়াবাড়ি করতে থাকে এবং আপোষ মীমাংসায় রাজী না হয় সে ক্ষেত্রে ঈমানদারদের কর্তব্য হচ্ছে সীমালংঘনকারী পক্ষের বিরুদ্ধে ন্যায়পন্থী দলের পক্ষ অবলম্বন করা।

(ঘ) উভয় পক্ষের একটি পক্ষ যদি প্রজা হয় আর তারা সরকার অর্থাৎ মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে থাকে তাহলে ফিকাহবিদগণ বিদ্রোহে অংশ গ্রহণকারী এ দলকেই তাদের পরিভাষায় বিদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।

দুই ঃ বিদ্রোহী অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণকারী গোষ্ঠীও নানা রকম হতে পারে ঃ

(ক) যারা শুধু হাংগামা সৃষ্টি করতে তৎপর হয়েছে। এ বিদ্রোহের স্বপক্ষে তাদের কাছে কোন শরীয়াতসম্মত কারণ নেই। এ ধরনের দল ও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সরকারের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সর্বসম্মত মতে বৈধ এবং এ ক্ষেত্রে সরকারকে সমর্থন করা ঈমানদারদের জন্য ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে সরকার ন্যায়বান হোক বা না হোক তাতে কিছু এসে যায় না।

(খ) যেসব বিদ্রোহী সরকারকে উৎখাতের জন্য বিদ্রোহ করে। কিন্তু এ জন্য তাদের কাছে শরীয়াত সম্মত কোন যুক্তি নেই। বরং তাদের বাহ্যিক অবস্থা থেকে প্রকাশ পাচ্ছে যে, তারা জালেম ও ফাসিক। এ ক্ষেত্রে সরকার যদি ন্যায়নিষ্ঠ হয় তাহলে তাকে সমর্থন করা বিনা বাক্য ব্যয়ে ওয়াজিব। কিন্তু সে সরকার যদি ন্যায়নিষ্ঠ নাও হয় তবুও তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য লড়াই করা ওয়াজিব। কারণ সেই সরকারের জন্যই রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা টিকে আছে।

(গ) যারা নতুন কোন শরয়ী ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, কিন্তু তাদের ব্যাখ্যা বাতিল এবং আকীদা ফাসেদ; যেমন, খারেজীদের আকীদা ও ব্যাখ্যা। এরূপ ক্ষেত্রে মুসলিম সরকারের তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার বৈধ অধিকার আছে। সে সরকার ন্যায়নিষ্ঠ হোক বা না হোক তাতে কিছু এসে যায় না। আর এ সরকারকে সমর্থন করাও ওয়াজিব।

(ঘ) যারা এমন কোন ন্যায়নিষ্ঠ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যার প্রধানের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব বৈধভাবে কায়েম হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের কাছে শরীয়াতসম্মত কোন

ব্যাখ্যা থাক বা না থাক সরকারের সর্বাবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা বৈধ এবং তাদের সমর্থন করা ওয়াজিব।

(৬) যারা এমন একটি জালেম সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে যার নেতৃত্ব জোর করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যার নেতৃবৃন্দ ফাসেক। কিন্তু বিদ্রোহকারীগণ ন্যায়নিষ্ঠ। তারা আল্লাহর বিধান কায়েম করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া তাদের বাহ্যিক অবস্থা থেকেও প্রতিভাত হচ্ছে যে, তারা সৎ ও নেক্‌কার। এরূপ ক্ষেত্রে তাদেরকে 'বিদ্রোহী' অর্থাৎ সীমালংঘনকারী বলে আখ্যায়িত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব বলে ঘোষণা করার ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে চরম মতবিরোধ হয়েছে। এ মতবিরোধের বিষয়টি আমরা এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

অধিকাংশ ফিকাহবিদ এবং আহলে হাদীসদের মত হচ্ছে, যে নেতার নেতৃত্ব একবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাঁর ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রে শান্তি, নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় আছে তিনি ন্যায়নিষ্ঠ ও অত্যাচারী যাই হয়ে থাকুন না কেন এবং তাঁর নেতৃত্ব যেভাবেই কায়েম হয়ে থাকুক না কেন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম। তবে তিনি সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হলে তা ভিন্ন কথা। ইমাম সারাখসী লিখছেন ঃ মুসলমানগণ যখন কোন শাসকের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে এবং তার কারণে শান্তি লাভ করে ও পথঘাট নিরাপদ হয় এরূপ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের কোন দল বা গোষ্ঠী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে যার যুদ্ধ করার ক্ষমতা আছে এমন লোকদের মুসলমানদের ঐ শাসকের সাথে মিলে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ওয়াজিব। (আল মাবসূত, খাওয়ারেজ অধ্যায়) ইমাম নববী শরহে মুসলিমে বলেন ঃ নেতা অর্থাৎ মুসলিম শাসকবৃন্দ জালেম এবং ফাসেক হলেও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও লড়াই করা হারাম। এ বিষয়ে ইজমা হয়েছে বলে ইমাম নববী দাবী করেছেন।

কিন্তু এ বিষয়ে ইজমা হয়েছে বলে দাবী করা ঠিক নয়। মুসলিম ফিকাহ্‌বিদদের একটি বড় দল যার মধ্যে বড় বড় জ্ঞানী ও পণ্ডিত অন্তরভুক্ত বিদ্রোহকারীদের কেবল তখনই বিদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করেন যখন তারা ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। জালেম ও ফাসেক নেতাদের বিরুদ্ধে সৎ ও নেক্‌কার লোকদের অবাধ্যতাকে তারা কুরআন মজীদের পরিভাষা অনুসারে বিদ্রোহের নামান্তর বলে আখ্যায়িত করেন না এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ওয়াজিব বলেও মনে করেন না। অত্যাচারী নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফার মতামত বিষয়ে জ্ঞানীগণ সম্যক অবহিত। আবু বকর জাস্‌সাস আহকামুল কুরআন গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে, ইমাম সাহেব এ যুদ্ধকে শুধু জায়েযই মনে করতেন না বরং অনুকূল পরিস্থিতিতে ওয়াজিব বলে মনে করতেন। (প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯) বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে যায়েদ ইবনে আলীর বিদ্রোহে তিনি যে শুধু অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন তাই নয়, বরং অন্যদেরকেও তা করতে উপদেশ দিয়েছেন। (আল জাস্‌সাস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১)। মনসূরের বিরুদ্ধে নাফসে যাকিয়ার বিদ্রোহে তিনি পুরাপুরি সক্রিয়ভাবে নাফসে যাকিয়াকে সাহায্য করেছেন। সেই যুদ্ধকে তিনি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চেয়েও উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন। (আল জাস্‌সাস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১; মানাকেবে আবী হানীফা, আল কারদারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা

৭১-৭২) তাছাড়াও ইমাম সারাখসী যে সিদ্ধান্ত বর্ণনা করেছেন তা হানাফী ফিকাহবিদদের সর্বসম্মত মত নয়। হিদায়ার শরাহ ফাতহুল কাদীরে ইবনে হুমাম লিখছেন ঃ

الباغى فى عرف الفقهاء الخارج عن طاعة امام الحق

"সাধারণভাবে ফিকাহবিদদের মতে বিদ্রোহী সে-ই যে ন্যায় পরায়ণ ইমামের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায়।"

হাম্বলীদের ইবনে আকীল ও ইবনুল জুযী ন্যায়নিষ্ট নয় এমন ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে জায়েয বলে মনে করেন। এ ব্যাপারে তারা হযরত হুসাইনের বিদ্রোহকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। (আল ইনসাফ, ১০ খণ্ড, বাবু কিতালি আহলিল বাগী) ইমাম শাফেয়ী তাঁর কিতাবুল উম্ম গ্রন্থে সে ব্যক্তিকে বিদ্রোহী বলে মত প্রকাশ করেছেন, যে ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। (৪ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৫) মুদাওয়ানা গ্রন্থে ইমাম মালেকের মত উদ্ধৃত হয়েছে যে, বিদ্রোহী যদি ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয় তবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে। (প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৭) কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী আহকামুল কুরআনে তাঁর এ উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন, যদি কেউ উমর ইবনে আবদুল আযীযের মত ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাহলে তাকে দমন করা ওয়াজিব। তাঁর চেয়ে ভিন্নতর কোন ইমাম সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় তাকে ঐ অবস্থাই ছেড়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা অপর কোন জালেম দ্বারা তাকে শাস্তি দেবেন এবং তৃতীয় কোন জালেম দ্বারা তাদের উভয়কে আবার শাস্তি দেবেন। তিনি ইমাম মালেকের আরো একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তা হচ্ছে এক শাসকের কাছে আনুগত্যের শপথ নিয়ে থাকলে তার ভাইও যদি তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তার বিরুদ্ধেও লড়াই করা হবে যদি সে ন্যায়নিষ্ঠ শাসক হয়। আমাদের সময়ের ইমাম বা নেতাদের সম্পর্কে বলা যায় যে, তাদের কোন বাইয়াত বা আনুগত্য শপথই নেই। কারণ জবরদস্তিমূলকভাবে তাদের পক্ষে শপথ নেয়া হয়েছে। তাছাড়া সাহনুনের বরাত দিয়ে কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী মালেকী উলামাদের যে রায় বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে, যুদ্ধ কেবল ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের সহযোগিতার জন্যই করা যাবে। এ ক্ষেত্রে প্রথম বাইয়াতকৃত ইমাম ন্যায়নিষ্ঠ হোক কিংবা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী ব্যক্তি ন্যায়নিষ্ঠ হোক তাতে কিছু এসে যায় না। দু' জনের কেউই যদি ন্যায়নিষ্ঠ না হয় তাহলে দু'জনের থেকেই দূরে থাকো। তবে যদি তোমার নিজের জীবনের ওপর হামলা হয় কিংবা মুসলমানগণ জুলুমের শিকার হয় তাহলে প্রতিরোধ করো। এ মত উদ্ধৃত করার পর কাজী আবু বকর বলেন ঃ

لانقاتل الامع امام عادل يقدمه اهل الحق لانفسهم

"সত্যের অনুসারীগণ যাকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাকে ছাড়া আর কারো জন্য আমরা যুদ্ধ করবো না।"

তিন ঃ বিদ্রোহীরা যদি স্বল্প সংখ্যক হয়, কোন বড় দল তাদের পৃষ্ঠপোষক না থাকে এবং তাদের কাছে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম বেশী না থাকে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে বিদ্রোহ সম্পর্কিত আইন প্রযোজ্য হবে না। তাদের ক্ষেত্রে সাধারণ আইন প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ

তারা যদি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে থাকে তাহলে কিসাস গহণ করা হবে এবং আর্থিক ক্ষতি সাধন করে থাকলে জরিমানা অদায় করা হবে। যেসব বিদ্রোহী কোন বড় রকমের শক্তির অধিকারী এবং অধিকতর সাংগঠনিক ক্ষমতা ও বিপুল যুদ্ধ সরঞ্জাম নিয়ে বিদ্রোহ করবে বিদ্রোহ বিষয়ক আইন কানুন কেবল তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

চার ঃ বিদ্রোহীরা যতক্ষণ শুধু তাদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস অথবা সরকার ও সরকার প্রধানের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহাত্মক ও শত্রুতামূলক ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করতে থাকবে ততক্ষণ তাদেরকে হত্যা বা বন্দী করা যাবে না। যখন তারা কার্যত সশস্ত্র বিদ্রোহ করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে কেবল তখনই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে। (আল মাবসূত—বাবুল খাওয়ারিজ, ফাতহুল কাদীর—বাবুল বুগাত, আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস)।

পাঁচ ঃ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে কুরআন মজীদের নির্দেশ অনুসারে তাদেরকে বিদ্রোহ পরিত্যাগ করে ইনসাফ ও ন্যায়ের পথ অনুসরণ করার আহবান জানানো হবে। তাদের যদি কোন সন্দেহ-সংশয় এবং প্রশ্ন থাকে তাহলে যুক্তি দ্বারা বুঝিয়ে দূর করার চেষ্টা করা হবে। তা সত্ত্বেও যদি তারা বিরত না হয় এবং তাদের পক্ষ থেকেই যুদ্ধ শুরু করা হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা হবে। (ফাতহুল কাদীর, আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস)।

ছয় ঃ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের বরাত দিয়ে হাকেম, বায্‌যার ও আল জাস্‌সাস বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা নীতিমালার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হে উম্মে আবদের পুত্র, এ উম্মতের বিদ্রোহীদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ কি তা কি জান?" তিনি বললেন ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন ঃ তাদের আহতদের ওপর আঘাত করা হবে না, বন্দীদের হত্যা করা হবে না, পলায়নরতদের পিছু ধাওয়া করা হবে না এবং তাদের সম্পদ গনীমতের সম্পদ হিসেবে বন্টন করা হবে না। এ নীতিমালার দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি ও কর্ম সমস্ত ফিকাহ্‌বিদ এ উক্তি ও আমলের ওপর নির্ভর করেছেন। উষ্ট্র যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর তিনি ঘোষণা করলেন ঃ পলায়নপরদের পিছু ধাওয়া করো না, আহতদের আক্রমণ করো না, বন্দীদের হত্যা করো না, যে অস্ত্র সমর্পণ করবে তাকে নিরাপত্তা দান করো, মানুষের বাড়ীঘরে প্রবেশ করো না এবং গালি দিতে থাকলেও কোন নারীর ওপর হাত তুলবে না। হযরত আলীর সেনাদলের কেউ কেউ দাবী করলো যে, বিরোধী ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের দাস বানিয়ে বন্টন করে দেয়া হোক। হযরত আলী (রা) একথা শুনে রাগান্বিত হয়ে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশাকে তার নিজের অংশে নিতে চাও?

সাত ঃ হযরত আলীর (রা) অনুসৃত নীতি ও আদর্শ থেকে বিদ্রোহীদের অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে যে বিধান গৃহীত হয়েছে তা হচ্ছে, তাদের সম্পদ সেনাবাহিনীর মধ্যে পাওয়া যাক কিংবা বাড়ীতে থাক এবং সম্পদের মালিক জীবিত হোক বা মৃত হোক কোন অবস্থায়ই তা গনীমতের মাল হিসেবে গণ্য করা যাবে না এবং সৈন্যদের মধ্যে বন্টনও করা যাবে না। তবে যে মাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া জরুরী নয়। যুদ্ধ

শেষ হলে এবং বিদ্রোহ স্তিমিত হওয়ার পর তাদের সম্পদ তাদেরকেই ফেরত দেয়া হবে। যুদ্ধ চলাকালে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও বাহন যদি হস্তগত হয় তা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু ওগুলোকে বিজয়ীদের মালিকানাভুক্ত করে গনীমতের সম্পদ হিসেবে বন্টন করা হবে না এবং পুনরায় তাদের বিদ্রোহ করার আশংকা না থাকলে ঐ সব জিনিসও তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। শুধু ইমাম আবু ইউসুফের মত হচ্ছে, সরকার ঐ সব সম্পদ গনীমত হিসেবে গণ্য করবেন। (আল মাবসূত, ফাতহুল কাদীর, আল জাস্‌সাস)।

আট ঃ পুনরায় বিদ্রোহ করবে না এ প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাদের বন্দীদের মুক্ত করে দেয়া হবে। (আল মাবসূত)

নয় ঃ নিহত বিদ্রোহীদের মাথা কেটে প্রদর্শন করা অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। কারণ তা মৃতদেহ বিকৃতকরণ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। এক রোমান বিশপের মাথা কেটে হযরত আবু বকরের (রা) কাছে আনা হলে তিনি তাতে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন ঃ রোমান ও ইরানীদের অন্ধ অনুসরণ আমাদের কাজ নয়। সুতরাং কাফেরদের সাথে যেখানে এরূপ আচরণ করা গ্রহণযোগ্য নয় সেখানে মুসলমানদের সাথে এরূপ আচরণ আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। (আল মাবসূত)

দশ ঃ যুদ্ধকালে বিদ্রোহীদের যেসব প্রাণ ও সম্পদের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে যুদ্ধ শেষ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তার কোন কিসাস বা ক্ষতিপূরণ তাদের ওপর বর্তাবে না। ফিতনা ও অশান্তি পুনরায় যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে জন্য কোন নিহতের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাবে না কিংবা কোন সম্পদের জন্য তাদের জরিমানাও করা যাবে না। সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক লড়াইয়ে এ নীতিমালাই অনুসরণ করা হয়েছিলো। (আল মাবসূত, আল জাস্‌সাস, আহকামুল কুরআন—ইবনুল আরাবী)

এগার ঃ যেসব অঞ্চল বিদ্রোহীদের করতলগত হয়েছে এবং সেখানে তারা নিজেদের প্রশাসন চালু করে যাকাত এবং সরকারী কর ইত্যাদি আদায় করে নিয়েছে, সরকার ঐ সব অঞ্চল পুনর্দখলের পর জনগণের কাছে পুনরায় উক্ত যাকাত ও কর দাবী করবে না। বিদ্রোহীরা যদি উক্ত অর্থ শরীয়াতসম্মত পন্থায় খরচ করে থাকে তাহলে আদায়কারীদের পক্ষ থেকে তা আল্লাহর কাছেও আদায়কৃত বলে গণ্য হবে। কিন্তু তারা যদি উক্ত সম্পদ শরীয়াতসম্মত নয় এমন পন্থায় খরচ করে থাকে তাহলে তা প্রদানকারী এবং আল্লাহর মধ্যকার ব্যাপার। তারা চাইলে পুনরায় যাকাত আদায় করতে পারে। (ফাতহুল কাদীর, আল জাস্‌সাস—ইবনুল আরাবী)।

বার ঃ বিদ্রোহীরা তাদের অধিকৃত অঞ্চলে যেসব বিচারালয় কায়েম করেছিল তার বিচারক যদি ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে থাকেন এবং শরীয়াত অনুসারে বিচারকার্য সমাধা করে থাকেন তাহলে তাদের নিয়োগকারীরা বিদ্রোহের অপরাধে অপরাধী হলেও তা বহাল রাখা হবে। কিন্তু তাদের ফায়সালা যদি শরীয়াতসম্মত না হয় এবং বিদ্রোহ দমনের পর তাদেরকে সরকারের বিচারালয়ে বিচারের জন্য হাজির করা হয় তাহলে তাদের ফায়সালাসমূহ বহাল রাখা হবে না। তাছাড়া বিদ্রোহীদের প্রতিষ্ঠিত বিচারালায়সমূহের পক্ষ থেকে জারী করা ওয়ারেন্ট বা হুকুমনামা সরকারের আদালতে গৃহীত হবে না। (আল মাবসূত, আল জাস্‌সাস)

তের ঃ ইসলামী আদালতসমূহে বিদ্রোহীদের সাক্ষ গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ ন্যায় ও ইনসাফের অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফাসেকীর অন্তরভুক্ত। ইমাম মুহাম্মাদ বলেন ঃ যতক্ষণ না তারা যুদ্ধ করবে এবং ন্যায়ের অনুসারীদের বিরুদ্ধে কার্যত বিদ্রোহে লিপ্ত হবে ততক্ষণ তাদের সাক্ষ গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু একবার তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লে আমি আর তাদের সাক্ষ গ্রহণ করবো না। (আল জাস্‌সাস)

এসব বিধান থেকে মুসলমান বিদ্রোহী এবং কাফের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আইনে পার্থক্য কি তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

১৮. এ আয়াতটি দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানকে এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। দুনিয়ার অন্য কোন আদর্শ বা মত ও পথের অনুসারীদের মধ্যে এমন কোন ভ্রাতৃত্ব বন্ধন পাওয়া যায় না যা মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া যায়। এটাও এ আয়াতের বরকতে সাধিত হয়েছে। এ নির্দেশের দাবী ও গুরুত্বসমূহ কি, বহুসংখ্যক হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বর্ণনা করেছেন। ঐ সব হাদীসের আলোকে এ আয়াতের আসল লক্ষ ও উদ্দেশ্য বোধগম্য হতে পারে।

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার থেকে তিনটি বিষয়ে "বাইয়াত" নিয়েছেন। এক, নামায কায়েম করবো। দুই, যাকাত আদায় করতে থাকবো। তিন, প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করবো। (বুখারী—কিতাবুল ঈমান)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী। (বুখারী—কিতাবুল ঈমান) মুসনাদে আহমাদে হযরত সাঈদ ইবনে মালেক ও তার পিতা থেকে অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জান, মাল ও ইজ্জত হারাম।" (মুসলিম—কিতাবুল বিরর ওয়াসসিলাহ, তিরমিযী—আবওয়াবুল বিরর ওয়াস্‌সিলাহ)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) ও হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার ওপরে জুলুম করে না, তাকে সহযোগিতা করা পরিত্যাগ করে না এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করে না। কোন ব্যক্তির জন্য তার কোন মুসলমান ভাইকে হেয় ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করার মত অপকর্ম আর নাই। (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী নবীর (সা) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, ঈমানদারদের সাথে একজন ইমানদারের সম্পর্ক ঠিক তেমন যেমন দেহের সাথে মাথার সম্পর্ক। সে ঈমানদারদের প্রতিটি দুঃখ-কষ্ট ঠিক অনুভব করে যেমন মাথা দেহের প্রতিটি অংশের ব্যথা অনুভব করে। (মুসনাদে আহমাদ) অপর একটি হাদীসে এ বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ পারস্পরিক ভালবাসা, সুসম্পর্ক এবং একে অপরের দয়ামায়া ও স্নেহের ব্যাপারে মু'মিনগণ একটি দেহের মত।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١١﴾

২ রুকূ'

হে[১৯] ঈমানদারগণ, পুরুষরা যেন অন্য পুরুষদের বিদ্রূপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। আর মহিলারাও যেন অন্য মহিলাদের বিদ্রূপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম।[২০] তোমরা একে অপরকে বিদ্রূপ করোনা[২১] এবং পরস্পরকে খারাপ নামে ডেকো না।[২২] ঈমান গ্রহণের পর গোনাহর কাজে প্রসিদ্ধি লাভ করা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার।[২৩] যারা এ আচরণ পরিত্যাগ করেনি তারাই জালেম।

দেহের যে অংগেই কষ্ট হোক না কেন তাতে গোটা দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় ভুগতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

আরো একটি হাদীসে নবীর (সা) এ বাণীটি উদ্ধৃত হয়েছে যে, মু'মিনগণ পরস্পরের জন্য একই প্রাচীরের ইঁটের মত একে অপরের থেকে শক্তিলাভ করে থাকে। (বুখারী—কিতাবুল আদাব, তিরমিযী—কিতাবুল বির্‌র-ওয়াস্ সিলাহ)

১৯. পূর্বের দু'টি আয়াতে মুসলমানদের পারস্পরিক লড়াই সম্পর্কে জরুরী নির্দেশনা দেয়ার পর ঈমানদারদেরকে এ অনুভূতি দেয়া হয়েছিল যে, ইসলামের পবিত্রতম সম্পর্কের ভিত্তিতে তারা একে অপরের ভাই এবং আল্লাহর ভয়েই তাদেরকে নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক রাখার চেষ্টা করা উচিত। এখন পরবর্তী দু'টি আয়াতে এমন সব বড় বড় অন্যায়ের পথ রুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যা সাধারণত লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। একে অপরের ইজ্জতের ওপর হামলা, একে অপরকে মনোকষ্ট দেয়া, একে অপরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা এবং একে অপরের দোষ-ত্রুটি তালাশ করা পারস্পরিক শত্রুতা সৃষ্টির এগুলোই মূল কারণ। এসব কারণ অন্যান্য কারণের সাথে মিশে বড় বড় ফিতনার সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে পরবর্তী আয়াতসমূহে যেসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তার যেসব ব্যাখ্যা হাদীসসমূহে পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে মানহানি (Law of Libel) সম্পর্কিত বিস্তারিত আইন-বিধান রচনা করা যেতে পারে। পাশ্চাত্যের মানহানি সম্পর্কিত আইন এ ক্ষেত্রে এতটাই অসম্পূর্ণ যে, এ আইনের অধীনে কেউ মানহানির অভিযোগ পেশ করে নিজের মর্যাদা আরো কিছু খুইয়ে আসে। পক্ষান্তরে ইসলামী আইন প্রত্যেক ব্যক্তির এমন একটি মৌলিক মর্যাদার স্বীকৃতি দেয় যার ওপর কোন আক্রমণ

চালানোর অধিকার কারো নেই। এ ক্ষেত্রে হামলা বাস্তবতা ভিত্তিক হোক বা না হোক এবং যার ওপর আক্রমণ করা হয়, জনসমক্ষে তার কোন সুপরিচিত মর্যাদা থাক বা না থাক তাতে কিছু যায় আসে না। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে অপমান করেছে শুধু এতটুকু বিষয়ই তাকে অপরাধী প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। তবে এ অপমান করার যদি কোন শরীয়াতসম্মত বৈধতা থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

২০. বিদ্রূপ করার অর্থ কেবল কথার দ্বারা হাসি-তামাসা করাই নয়। বরং কারো কোন কাজের অভিনয় করা, তার প্রতি ইংগিত করা, তার কথা, কাজ, চেহারা বা পোশাক নিয়ে হাসাহাসি করা অথবা তার কোন ত্রুটি বা দোষের দিকে এমনভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাতে অন্যদের হাসি পায়। এ সবই হাসি-তামাসার অন্তরভুক্ত। মূল নিষিদ্ধ বিষয় হলো কেউ যেন কোনভাবেই কাউকে উপহাস ও হাসি-তামাসার লক্ষ না বানায়। কারণ, এ ধরনের হাসি-তামাসা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের পেছনে নিশ্চিতভাবে নিজের বড়ত্ব প্রদর্শন এবং অপরকে অপমানিত করা ও হেয় করে দেখানোর মনোবৃত্তি কার্যকর। যা নৈতিকভাবে অত্যন্ত দোষণীয়। তাছাড়া এভাবে অন্যের মনোকষ্ট হয় যার কারণে সমাজে বিপর্যয় ও বিশৃংখলা দেখা দেয়। এ কারণেই এ কাজকে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

পুরুষ ও নারীদের কথা আলাদা করে উল্লেখ করার অর্থ এ নয় যে, পুরুষদের নারীদেরকে বিদ্রূপের লক্ষ বানানো এবং নারীদের পুরুষদেরকে হাসি-তামাসার লক্ষ বানানো জায়েয। মূলত যে কারণে নারী ও পুরুষদের বিষয় আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে, ইসলাম এমন সমাজ আদৌ সমর্থন করে না। যেখানে নারী পুরুষ অবাধে মেলামেশা করতে পারে। অবাধ খোলামেলা মজলিসেই সাধারণত একজন আরেকজনকে হাসি-তামাসার লক্ষ বানাতে পারে। মুহাররাম নয় এমন নারী পুরুষ কোন মজলিসে একত্র হয়ে পরস্পর হাসি-তামাসা করবে ইসলামে এমন অবকাশ আদৌ রাখা হয়নি। তাই একটি মুসলিম সমাজের একটি মজলিসে পুরুষ কোন নারীকে উপহাস ও বিদ্রূপ করবে কিংবা নারী কোন পুরুষকে বিদ্রূপ ও উপহাস করবে এমন বিষয় কল্পনার যোগ্যও মনে করা হয়নি।

২১. মূল আয়াতে لمز শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটির মধ্যে বিদ্রূপ ও কুৎসা ছাড়াও আরো কিছু সংখ্যক অর্থ এর মধ্যে শামিল। যেমন ঃ উপহাস করা, অপবাদ আরোপ করা, দোষ বের করা এবং খোলাখুলি বা গোপনে অথবা ইশারা-ইংগিত করে কাউকে তিরস্কারের লক্ষস্থল বানানো। এসব কাজও যেহেতু পারস্পরিক সুসম্পর্ক নষ্ট করে এবং সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তাই এসব কাজও হারাম করে দেয়া হয়েছে। এখানে আল্লাহর ভাষার চমৎকারিত্ব এই যে, لَا يَلْمِزْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (একে অপরকে বিদ্রূপ করো না) বলার পরিবর্তে لَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ (নিজেকে নিজে বিদ্রূপ করো না) কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা স্বতই একথার ইংগিত পাওয়া যায় যে, অন্যদের বিদ্রূপ ও উপহাসকারী প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই বিদ্রূপ ও উপহাস করে। এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, যতক্ষণ না কারো মনে কুপ্রেরণার লাভা জমে উপচে পড়ার জন্য প্রস্তুত না হবে ততক্ষণ তার মুখ অন্যদের কুৎসা রটনার জন্য খুলবে না। এভাবে এ মানসিকতার লালনকারী অন্যদের আগে নিজেকেই তো কুকর্মের আস্তানা বানিয়ে ফেলে। তারপর যখন সে অন্যদের ওপর আঘাত করে তখন তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সে তার নিজের ওপর আঘাত

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

হে ঈমানদারগণ, বেশী ধারণা ও অনুমান করা থেকে বিরত থাকো কারণ কোন কোন ধারণা ও অনুমান গোনাহ।[২৪] দোষ অন্বেষণ করো না।[২৫] আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে।[২৬] এমন কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছে, যে তার নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে?[২৭] দেখো, তা খেতে তোমাদের ঘৃণা হয়। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ অধিক পরিমাণে তাওবা কবুলকারী এবং দয়ালু।

করার জন্য অন্যদেরকে আহবান করছে। ভদ্রতার কারণে কেউ যদি তার আক্রমণ এড়িয়ে চলে তাহলে তা ভিন্ন কথা। কিন্তু যাকে সে তার বাক্যবাণের লক্ষস্থল বানিয়েছে সে-ও পাল্টা তার ওপর আক্রমণ করুক এ দরজা সে নিজেই খুলে দিয়েছে।

২২. এ নির্দেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোন ব্যক্তিকে এমন নামে যেন ডাকা না হয় অথবা এমন উপাধি না দেয়া হয় যা তার অপছন্দ এবং যা দ্বারা তার অবমাননা ও অমর্যাদা হয়। যেমন কাউকে ফাসেক বা মুনাফিক বলা। কাউকে খোঁড়া, অন্ধ অথবা কানা বলা। কাউকে তার নিজের কিংবা মা-বাপের অথবা বংশের কোন দোষ বা ত্রুটির সাথে সম্পর্কিত করে উপাধি দেয়া। মুসলমান হওয়ার পর তার পূর্ব অনুসৃত ধর্মের কারণে ইহুদী বা খৃষ্টান বলা। কোন ব্যক্তি, বংশ, আত্মীয়তা অথবা গোষ্ঠীর এমন নাম দেয়া যার মধ্যে তার নিন্দা ও অপমানের দিকটি বিদ্যমান। তবে যেসব উপাধি বাহ্যত খারাপ কিন্তু তা দ্বারা কারো নিন্দা করা উদ্দেশ্য নয়, বরং ঐ উপাধি দ্বারা যাদের সম্বোধন করা হয় তা তাদের পরিচয়ের সহায়ক এমন সব উপাধি এ নির্দেশের মধ্যে পড়ে না। এ কারণে মুহাদ্দিসগণ "আসমাউর রিজাল" (বা হাদীসের রাবীদের পরিচয় মূলক) শাস্ত্রে সুলায়মান আল আ'মাশ (ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন সুলায়মান) এবং ওয়াসেল আল আহদাব (কুঁজো ওয়াসেল) এর মত নামের উল্লেখ রেখেছেন। যদি একই নামের কয়েকজন লোক থাকে এবং তাদের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তার বিশেষ কোন উপাধি দ্বারাই কেবল চেনা যায় তাহলে ঐ উপাধি খারাপ হলেও তা বলা যেতে পারে। যেমন আবদুল্লাহ নামের যদি কয়েকজন লোক থাকে আর তাদের মধ্যে একজন অন্ধ হয় তাহলে তাকে চেনার সুবিধার জন্য আপনি 'অন্ধ আবদুল্লাহ' বলতে পারেন। অনুরূপ এমন সব উপাধি বা উপনাম এ নির্দেশের মধ্যে পড়বে না যা দ্বারা বাহ্যত অমর্যাদা বুঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ভালবাসা ও স্নেহবশতই রাখা হয় এবং যাদেরকে এ উপাধি বা উপনামে ডাকা হয় তারা নিজেরাও তা পছন্দ করে। যেমন ঃ আবু হুরাইরা এবং আবু তুরাব।

২৩. ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও সে কটুভাষী হবে এবং অসৎ ও অন্যায় কাজের জন্য বিখ্যাত হবে এটা একজন ঈমানদারের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার। কোন কাফের যদি মানুষকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করা কিংবা বেছে বেছে বিদ্রূপাত্মক নাম দেয়ার ব্যাপারে খুব খ্যাতি লাভ করে তাহলে তা মনুষ্যত্বের বিচারে যদিও সুখ্যাতি নয় তবুও অন্তত তার কুফরীর বিচারে তা মানায়। কিন্তু কেউ আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং আখেরাতে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও যদি এরূপ হীন বিশেষণে ভূষিত হয় তাহলে তার জন্য পানিতে ডুবে মরার শামিল।

২৪. একেবারেই ধারণা করতে নিষেধ করা হয়নি। বরং খুব বেশী ধারণার ভিত্তিতে কাজ করতে এবং সব রকম ধারণার অনুসরণ থেকে মানা করা হয়েছে। এর কারণ বলা হয়েছে এই যে, অনেক ধারণা গোনাহর পর্যায়ে পড়ে। এ নির্দেশটি বুঝার জন্য আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত ধারণা কত প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের নৈতিক অবস্থা কি?

এক প্রকারের ধারণা হচ্ছে, যা নৈতিকতার দৃষ্টিতে অত্যন্ত পছন্দনীয় এবং দীনের দৃষ্টিতেও কাম্য ও প্রশংসিত। যেমন ঃ আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং ঈমানদারদের ব্যাপারে ভাল ধারণা পোষণ করা। তাছাড়া যাদের সাথে ব্যক্তির মেলামেশা ও উঠাবসা আছে এবং যাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণের কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই।

আরেক প্রকার ধারণা আছে যা বাদ দিয়ে বাস্তব জীবনে চলার কোন উপায় নেই। যেমন, আদালতে বিচারকের সামনে যেসব সাক্ষ পেশ করা হয় তা যাঁচাই বাছাই করে নিশ্চিত প্রায় ধারণার ভিত্তিতে ফায়সালা করা ছাড়া আদালত চলতে পারে না। কারণ, বিচারকের পক্ষে ঘটনা সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। আর সাক্ষের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা নিশ্চিত সত্য হয় না, বরং প্রায় নিশ্চিত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। যে ক্ষেত্রে কোন না কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়ে, কিন্তু বাস্তব জ্ঞান লাভ সম্ভব হয় না সে ক্ষেত্রে ধারণার ওপর ভিত্তি করে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া মানুষের জন্য আর কোন উপায় থাকে না।

তৃতীয় এক প্রকারের ধারণা আছে যা মূলত খারাপ ধারণা হলেও বৈধ প্রকৃতির। এ প্রকারের ধারণা গোনাহের অন্তরভূক্ত হতে পারে না। যেমন ঃ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর চরিত্র ও কাজ-কর্মে কিংবা তার দৈনন্দিন আচার-আচরণ ও চালচলনে এমন সুস্পষ্ট লক্ষণ ফুটে ওঠে যার ভিত্তিতে সে আর ভাল ধারণার যোগ্য থাকে না। বরং তার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণের একাধিক যুক্তিসংগত কারণ বিদ্যমান। এরূপ পরিস্থিতিতে শরীয়াত কখনো এ দাবী করে না যে, সরলতা দেখিয়ে মানুষ তার প্রতি অবশ্যই ভাল ধারণা পোষণ করবে। তবে এ বৈধ খারাপ ধারণা পোষণের চূড়ান্ত সীমা হচ্ছে তার সম্ভাব্য দুষ্কৃতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নিছক ধারণার ভিত্তিতে আরো অগ্রসর হয়ে তার বিরুদ্ধে কোন তৎপরতা চালানো ঠিক নয়।

চতুর্থ আরেক প্রকারের ধারণা আছে যা মূলত গোনাহ, সেটি হচ্ছে, বিনা কারণে কারো অপরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা কিংবা অন্যদের ব্যাপারে মতস্থির করার বেলায় সবসময় খারাপ ধারণার ওপর ভিত্তি করেই শুরু করা কিংবা এমন লোকদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করা যাদের বাহ্যিক অবস্থা তাদের সৎ ও শিষ্ট হওয়ার প্রমাণ দেয়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি কোন কথা বা কাজে যদি ভাল ও মন্দের সমান

সম্ভাবনা থাকে কিন্তু খারাপ ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা যদি তা খারাপ হিসেবেই ধরে নেই তাহলে তা গোনাহের কাজ বলে গণ্য হবে। যেমন ঃ কোন সৎ ও ভদ্র লোক কোন মাহফিল থেকে উঠে যাওয়ার সময় নিজের জুতার পরিবর্তে অন্য কারো জুতা উঠিয়ে নেন আমরা যদি ধরে নেই যে, জুতা চুরি করার উদ্দেশ্যেই তিনি এ কাজ করেছেন। অথচ এ কাজটি ভুল করেও হতে পারে। কিন্তু ভাল সম্ভাবনার দিকটি বাদ দিয়ে খারাপ সম্ভাবনার দিকটি গ্রহণ করার কারণ খারাপ ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ বিশ্লেষণ থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ধারণা করা কোন নিষিদ্ধ বিষয় নয়। বরং কোন কোন পরিস্থিতিতে তা পছন্দনীয়, কোন কোন পরিস্থিতিতে অপরিহার্য, কোন কোন পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জায়েয কিন্তু ঐ সীমার বাইরে নাজায়েয এবং কোন কোন পরিস্থিতিতে একেবারেই নাজায়েয। তাই একথা বলা হয়নি যে, ধারণা বা খারাপ ধারণা করা থেকে একদম বিরত থাকো। বরং বলা হয়েছে, অধিকমাত্রায় ধারণা করা থেকে বিরত থাকো। তাছাড়া নির্দেশটির উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করার জন্য আরো বলা হয়েছে, কোন কোন ধারণা গোনাহ। এ সতর্কীকরণ দ্বারা আপনা থেকেই বুঝা যায় যে, যখনই কোন ব্যক্তি ধারণার ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে কিংবা কোন পদক্ষেপ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তখন তার ভালভাবে যাচাই বাছাই করে দেখা দরকার, যে ধারণা সে পোষণ করছে তা গোনাহর অন্তরভুক্ত নয় তো? আসলেই কি এরূপ ধারণা পোষণের দরকার আছে? এরূপ ধারণা পোষণের জন্য তার কাছে যুক্তিসংগত কারণ আছে কি? সে ধারণার ভিত্তিতে সে যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করছে তা কি বৈধ? যেসব ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এতটুকু সাবধানতা তারা অবশ্যই অবলম্বন করবে। লাগামহীন ধারণা পোষণ কেবল তাদেরই কাজ যারা আল্লাহর ভয় থেকে মুক্ত এবং আখেরাতের জবাবদিহি সম্পর্কে উদাসীন।

২৫. অর্থাৎ মানুষের গোপন বিষয় তালাশ করো না। একজন আরেকজনের দোষ খুঁজে বেড়িও না। অন্যদের অবস্থা ও ব্যাপার স্যাপার অনুসন্ধান করে বেড়াবে না। খারাপ ধারণার বশবর্তী হয়ে এ আচরণ করা হোক কিংবা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য করা হোক অথবা শুধু নিজের কৌতূহল ও ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য করা হোক শরীয়াতের দৃষ্টিতে সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। অন্যদের যেসব বিষয় লোকচক্ষুর অন্তরালে আছে তা খোঁজাখুজি করা এবং কার কি দোষ-ত্রুটি আছে ও কার কি কি দুর্বলতা গোপন আছে পর্দার অন্তরালে উঁকি দিয়ে তা জানার চেষ্টা করা কোন মু'মিনের কাজ নয়। মানুষের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পড়া, দু'জনের কথোপকথন কান পেতে শোনা, প্রতিবেশীর ঘরে উঁকি দেয়া এবং বিভিন্ন পন্থায় অন্যদের পারিবারিক জীবন কিংবা তাদের ব্যক্তিগত বিষয়াদি খোঁজ করে বেড়ানো একটা বড় অনৈতিক কাজ। এর দ্বারা নানা রকম ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এ কারণে একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খোতবায় দোষ অন্বেষণকারীদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين فانه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ، ومن يتبع الله عورته يفضحه فى بيته (ابو داؤد)

"হে সেই সব লোকজন, যারা মুখে ঈমান এনেছো কিন্তু এখনো ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলমানদের গোপনীয় বিষয় খুঁজে বেড়িও না। যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি তালাশ করে বেড়াবে আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটির অন্বেষণে লেগে যাবেন। আর আল্লাহ যার ত্রুটি তালাশ করেন তাকে তার ঘরের মধ্যে লাঞ্ছিত করে ছাড়েন।" (আবু দাউদ)

হযরত মুয়াবিয়া (রা) বলেন ঃ আমি নিজে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

انك ان اتبعت عورات الناس افسدتهم او كدت ان تفسد هم

"তুমি যদি মানুষের গোপনীয় বিষয় জানার জন্য পেছনে লাগো। তাদের জন্য বিপর্যয় সৃষ্টি করবে কিংবা অন্তত বিপর্যয়ের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেবে।" (আবু দাউদ)

অপর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اذا ظننتم فلا تحققوا (احكام القران - للجصاص)

"তোমাদের মনে কারো সম্পর্কে সন্দেহ হলে, অন্বেষণ করো না।"
(আহকামুল কুরআন -জাস্‌সাস)

অপর একটি হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ

من رأئى عورة فسترها كان كمن احيا موؤدة (الجصاص)

"কেউ যদি কারো গোপন দোষ-ত্রুটি দেখে ফেলে এবং তা গোপন রাখে তাহলে সে যেন একজন জীবন্ত পুঁতে ফেলা মেয়ে সন্তানকে জীবন দান করলো।" (আল জাস্‌সাস)

দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান না করার এ নির্দেশ শুধু ব্যক্তির জন্যই নয়, বরং ইসলামী সরকারের জন্যেও। ইসলামী শরীয়াত নাহী আনিল মুনকারের (মন্দ কাজের প্রতিরোধ) যে দায়িত্ব সরকারের ওপর ন্যস্ত করেছে তার দাবী এ নয় যে, সে একটি গোয়েন্দা চক্র কায়েম করে মানুষের গোপন দোষ-ত্রুটিসমূহ খুঁজে খুঁজে বের করবে এবং তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবে। বরং যেসব অসৎ প্রবণতা ও দোষ-ত্রুটি প্রকাশ হয়ে পড়বে কেবল তার বিরুদ্ধেই তার শক্তি প্রয়োগ করা উচিত। গোপনীয় দোষ-ত্রুটি ও খারাপ চালচলন সংশোধনের উপায় গোয়েন্দাগিরি নয়। বরং শিক্ষা, ওয়াজ-নসীহত, জনসাধারণের সামগ্রিক প্রশিক্ষণ এবং একটি পবিত্র সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করাই তার একমাত্র উপায়। এ ক্ষেত্রে হযরত উমরের (রা) এ ঘটনা অতীব শিক্ষাপ্রদ। একবার রাতের বেলা তিনি এক ব্যক্তির কণ্ঠ শুনতে পেলেন। সে গান গাইতেছিল। তাঁর সন্দেহ হলো। তিনি প্রাচীরে উঠে দেখলেন, সেখানে শরাব প্রস্তুত, তার সাথে এক নারীও। তিনি চিৎকার করে বললেন ঃ ওরে আল্লাহর দুশমন, তুই কি মনে করেছিস যে, তুই আল্লাহর নাফরমানী করবি আর তিনি তোর গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করবেন না? জবাবে সে বললো ঃ আমীরুল মু'মেনীন, তাড়াহুড়ো করবেন না। আমি যদি একটি গোনাহ করে থাকি তবে আপনি তিনটি গোনাহ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আপনি দোষ-ত্রুটি খুঁজেছেন। আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন, দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করো। কিন্তু আপনি প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছেন। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন,

নিজের ঘর ছাড়া অনুমতি না নিয়ে অন্যের ঘরে প্রবেশ করো না। কিন্তু আমার অনুমতি ছাড়াই আপনি আমার ঘরে পদার্পণ করেছেন।" এ জবাব শুনে হযরত উমর (রা) নিজের ভুল স্বীকার করলেন এবং তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করলেন না। তবে তিনি তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, সে কল্যাণ ও সুকৃতির পথ অনুসরণ করবে। (মাকারিমুল আখলাক—আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর আল খারায়েতী) এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, খুঁজে খুঁজে মানুষের গোপন দোষ-ত্রুটি বের করা এবং তারপর তাদেরকে পাকড়াও করা শুধু ব্যক্তির জন্যই নয়, ইসলামী সরকারের জন্যও জায়েয নয়। একটি হাদীসেও একথা উল্লেখিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ

ان الامير اذا بتغى الريبة فى الناس افسدهم (ابو داؤد)

"শাসকরা যখন সন্দেহের বশে মানুষের দোষ অনুসন্ধান করতে শুরু করে তখন তাদের চরিত্র নষ্ট করে দেয়।" (আবু দাউদ)

তবে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে যদি খোঁজ-খবর নেয়া ও অনুসন্ধান করা একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তবে সেটা এ নির্দেশের আওতাভুক্ত নয়। যেমন ঃ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচার-আচরণে বিদ্রোহের কিছুটা লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে তারা কোন অপরাধ সংঘটিত করতে যাচ্ছে বলে আশংকা সৃষ্টি হলে সরকার তাদের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে পারে। অথবা কোন ব্যক্তিকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয় বা তার সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন করতে চায় তাহলে তার ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্য সে তার সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে ও খোঁজ-খবর নিতে পারে।

২৬. গীবতের সংজ্ঞা হচ্ছে, "কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কারো এমন কথা বলা যা শুনলে সে অপছন্দ করবে।" খোদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে গীবতের এ সংজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী এবং আরো অনেক হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ঐ হাদীসে নবী (সা) গীবতের যে সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে ঃ

ذكرك اخاك بما يكره - قيل افرأيت ان كان فى اخى ما اقول ؟

قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد بهته -

"গীবত হচ্ছে, তুমি এমনভাবে তোমার ভাইয়ের কথা বললে যা তার কাছে অপছন্দনীয়। প্রশ্ন করা হলো, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সত্যিই থেকে থাকে তাহলে আপনার মত কি? তিনি বললেন ঃ তুমি যা বলছো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই তো তুমি তার গীবত করলে। আর তা যদি না থাকে তাহলে অপবাদ আরোপ করলে।"

ইমাম মালেক (র) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে হযরত মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ থেকে এ বিষয়ে আর একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যার ভাষা নিম্নরূপ ঃ

ان رجلا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة ؟ فقال

ان تذكر من المرء ما يكره ان يسمع - فقال يارسول الله وان كان حقا ؟ قال اذا قلت باطلا فذلك البهتان -

"এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, গীবত কাকে বলে ? তিনি বললেন ঃ কারো সম্পর্কে তোমার এমন কথা বলা যা তার পছন্দ নয়। সে বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল, যদি আমার কথা সত্য হয়? তিনি জবাব দিলেন ঃ তোমার কথা মিথ্যা হলে তো সেটা অপবাদ।"

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এসব বাণী থেকে প্রমাণিত হয় যে, কারো বিরুদ্ধে তার অনুপস্থিতিতে মিথ্যা অভিযোগ করাই অপবাদ। আর তার সত্যিকার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা গীবত। এ কাজ স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে করা হোক বা ইশারা ইংগিতের মাধ্যমে করা হোক সর্বাবস্থায় হারাম। অনুরূপভাবে এ কাজ ব্যক্তির জীবদ্দশায় করা হোক বা মৃত্যুর পরে করা হোক উভয় অবস্থায় তা সমানভাবে হারাম। আবু দাউদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মায়েয ইবনে মালেক আসলামীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপরাধে 'রজম' করার শাস্তি কার্যকর করার পর নবী (সা) পথে চলতে চলতে শুনলেন এক ব্যক্তি তার সংগীকে বলছে ঃ এ লোকটার ব্যাপারটাই দেখো, আল্লাহ তার অপরাধ আড়াল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যতক্ষণ না তাকে কুকুরের মত হত্যা করা হয়েছে ততক্ষণ তার প্রবৃত্তি তার পিছু ছাড়েনি। সামনে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একটি গাধার গলিত মৃতদেহ দৃষ্টিগোচর হলো। নবী (সা) সেখানে থেমে গেলেন এবং ঐ দু' ব্যক্তিকে ডেকে বললেন ঃ "তোমরা দু'জন ওখানে গিয়ে গাধার ঐ গলিত মৃত দেহটা আহার করো।" তারা দু'জনে বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল, কেউ কি তা খেতে পারে? নবী (সা) বললেন ঃ

فما قلتما من عرض اخيكما انفا اشد من اكل منه

"তোমরা এইমাত্র তোমাদের ভাইয়ের সম্মান ও মর্যাদার ওপর যেভাবে আক্রমণ চালাচ্ছিলে তা গাধার এ মৃতদেহ খাওয়ার চেয়ে অনেক বেশী নোংরা কাজ।"

যেসব ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে বা তার মৃত্যুর পর তার মন্দ দিকগুলো বর্ণনা করার এমন কোন প্রয়োজন দেখা দেয় যা শরীয়াতের দৃষ্টিতে সঠিক এবং গীবত ছাড়া ঐ প্রয়োজন পূরণ হতে পারে না, আর ঐ প্রয়োজন পূরণের জন্য গীবত না করা হলে তার চেয়েও অধিক মন্দ কাজ অপরিহার্য হয়ে পড়ে এমন ক্ষেত্রসমূহ গীবত হারাম হওয়া সম্পর্কিত নির্দেশের অন্তরভুক্ত নয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যতিক্রমকে মূলনীতি হিসেবে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

ان من اربى الربا الاستطالة فى عرض المسلم بغير حق

(ابو داؤد)

"কোন মুসলমানের মান-মর্যাদার ওপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করা জঘন্যতম জুলুম।"

এ বাণীতে "অন্যায়ভাবে" কথাটি বলে শর্তযুক্ত করাতে বুঝা যায় যে, ন্যায়ভাবে এরূপ করা জায়েয। নবীর (সা) নিজের কর্মপদ্ধতির মধ্যে এমন কয়েকটি নজীর দেখতে পাই যা

থেকে জানা যায় ন্যায়ভাবে বলতে কি বুঝানো হয়েছে এবং কি রকম পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে গীবত করা জায়েয হতে পারে।

একবার এক বেদুঈন এসে নবীর (সা) পিছনে নামাযে শামিল হলো এবং নামায শেষ হওয়া মাত্রই একথা বলে প্রস্থান করলো যে, হে আল্লাহ! আমার ওপর রহম করো এবং মুহাম্মাদের ওপর রহম করো। আমাদের দু'জন ছাড়া আর কাউকে এ রহমতের মধ্যে শরীক করো না। নবী (সা) সাহাবীদের বললেন ঃ

اتقولون هو اضل ام بعيره ؟ الم تسمعوا الى ما قال

"তোমরা কি বলো, এ লোকটাই বেশী বেকুফ, না তার উট? তোমরা কি শুননি সে কি বলছিলো?" (আবু দাউদ)

নবীকে (সা) তার অনুপস্থিতিতেই একথা বলতে হয়েছে। কারণ সালাম ফেরানো মাত্রই সে চলে গিয়েছিল। নবীর উপস্থিতিতেই সে একটি ভুল কথা বলে ফেলেছিল। তাই এ ব্যাপারে তাঁর নিশ্চুপ থাকা কাউকে এ ভ্রান্তিতে ফেলতে পারতো যে, সময় বিশেষে এরূপ কথা বলা হয় তো জায়েয। তাই নবী (সা) কর্তৃক একথার প্রতিবাদ করা জরুরী হয়ে পড়েছিলো।

ফাতেমা বিনতে কায়েস নামক এক মহিলাকে দু' ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব দেন। একজন হযরত মুয়াবিয়া (রা) অপরজন আবুল জাহম (রা)। ফাতেমা বিনতে কায়েস নবীর (সা) কাছে এসে পরামর্শ চাইলে তিনি বললেন ঃ মুয়াবিয়া গরীব আর আবুল জাহম স্ত্রীদের বেদম প্রহার করে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম) এখানে একজন নারীর ভবিষ্যত জীবনের প্রশ্ন জড়িত ছিল। সে নবীর (সা) কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চেয়েছিল। এমতাবস্থায় উভয় ব্যক্তির যে দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি তাঁর জানা ছিল তা তাকে জানিয়ে দেয়া তিনি জরুরী মনে করলেন।

একদিন নবী (সা) হযরত আয়েশার (রা) ঘরে ছিলেন। এক ব্যক্তি এসে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তি তার গোত্রের অত্যন্ত খারাপ লোক। এরপর তিনি বাইরে গেলেন এবং তার সাথে অত্যন্ত সৌজন্যের সাথে কথাবার্তা বললেন। নবী (সা) ঘরে ফিরে আসলে হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ আপনি তো তার সাথে ভালোভাবে কথাবার্তা বললেন। অথচ যাওয়ার সময় আপনি তার সম্পর্কে ঐ কথা বলেছিলেন। জবাবে নবী (সা) বললেন ঃ

ان شر الناس منزلة عِندَ اللّه يوم القيامة من ودعه (وتركه) النَّاسُ اتقاء فحشه -

"যে ব্যক্তির কটু বাক্যের ভয়ে লোকজন তার সাথে উঠাবসা পরিত্যাগ করে কিয়ামতের দিন সে হবে আল্লাহ তা'আলার কাছে জঘন্যতম ব্যক্তি।" (বুখারী ও মুসলিম)

এ ঘটনা সম্পর্কে যদি চিন্তা করেন তাহলে বুঝতে পারবেন ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করা সত্ত্বেও নবী (সা) তার সাথে সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলেছেন এ জন্য যে, নবীর (সা) উত্তম স্বভাব এটিই দাবী করে। কিন্তু সাথে সাথে তিনি আশংকা করলেন ঃ

লোকটির সাথে তাঁকে দয়া ও সৌজন্য প্রকাশ করতে দেখে তার পরিবারের লোকজন তাকে তাঁর বন্ধু বলে মনে করে বসতে পারে। তাহলে পরে কোন সময় সে এর সুযোগ নিয়ে কোন অবৈধ সুবিধা অর্জন করতে পারে। তাই তিনি হযরত আয়েশাকে সতর্ক করে দিলেন যে, সে তার গোত্রের জঘন্যতম মানুষ।

এক সময় হযরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা এসে নবীকে (সা) বললো, "আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমার ও আমার সন্তানের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হতে পারে এমন অর্থকড়ি সে দেয় না।" (বুখারী ও মুসলিম) স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর এ ধরনের অভিযোগ যদিও গীবতের পর্যায়ে পড়ে কিন্তু নবী (সা) তা বৈধ করে দিয়েছেন। কারণ জুলুমের প্রতিকার করতে পারে এমন ব্যক্তির কাছে জুলুমের অভিযোগ নিয়ে যাওয়ার অধিকার মজলুমের আছে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের এসব দৃষ্টান্তের আলোকে ফকীহ ও হাদীস বিশারদগণ এ বিধি প্রণয়ন করেছেন যে, গীবত কেবল তখনই বৈধ যখন একটি সংগত (অর্থাৎ শরীয়াতের দৃষ্টিতে সংগত) কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার প্রয়োজন পড়ে এবং ঐ প্রয়োজন গীবত ছাড়া পূরণ হতে পারে না। সুতরাং এ বিধির ওপর ভিত্তি করে আলেমগণ নিম্নরূপ গীবতকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন ঃ

এক ঃ যে ব্যক্তি জুলুমের প্রতিকারের জন্য কিছু করতে পারে বলে আশা করা যায় এমন ব্যক্তির কাছে জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের ফরিয়াদ।

দুই ঃ সংশোধনের উদ্দেশ্যে এমন ব্যক্তিদের কাছে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অপকর্মের কথা বলা যারা তার প্রতিকার করতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

তিন ঃ ফতোয়া চাওয়ার উদ্দেশ্যে কোন মুফতির কাছে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনার সময় যদি কোন ব্যক্তির ভ্রান্ত কাজ-কর্মের উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়।

চার ঃ মানুষকে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অপকর্মের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য সাবধান করে দেয়া। যেমন ঃ হাদীস বর্ণনাকারী, সাক্ষী এবং গ্রন্থ প্রণেতাদের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্ণনা করা সর্বসম্মত মতে শুধু জায়েযই নয়, বরং ওয়াজিব। কেননা, এ ছাড়া শরীয়াতকে ভুল রেওয়ায়াতের প্রচারণা ও বিস্তার থেকে, আদালতসমূহকে বেইনসাফী থেকে এবং জনসাধারণ ও শিক্ষার্থীদেরকে গোমরাহী থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। অথবা উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোন ব্যক্তি কারো সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী কিংবা কারো বাড়ীর পাশে বাড়ী খরিদ করতে চায় অথবা কারো সাথে অংশীদারী কারবার করতে চায় অথবা কারো কাছে আমানত রাখতে চায় সে আপনার কাছে পরামর্শ চাইলে তাকে সে ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি ও ভাল-মন্দ সম্পর্কে অবহিত করা আপনার জন্য ওয়াজিব যাতে না জানার কারণে সে প্রতারিত না হয়।

পাঁচ ঃ যেসব লোক গোনাহ ও পাপকার্যের বিস্তার ঘটাচ্ছে অথবা বিদআত ও গোমরাহীর প্রচার চালাচ্ছে অথবা আল্লাহর বান্দাদেরকে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড ও জুলুম- নির্যাতনের মধ্যে নিক্ষেপ করছে তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সোচ্চার হওয়া এবং তাদের দুষ্কর্ম ও অপকীর্তির সমালোচনা করা।

ছয় ঃ যেসব লোক কোন মন্দ নাম বা উপাধিতে এতই বিখ্যাত হয়েছে যে, ঐ নাম ও উপাধি ছাড়া অন্য কোন নাম বা উপাধি দ্বারা তাদেরকে আর চেনা যায় না, তাদের মর্যাদা হানির উদ্দেশ্যে নয়, বরং পরিচয়দানের জন্য ঐ নাম ও উপাধি ব্যবহার করা।

(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ফাতহুল বারী, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬২; শরহে মুসলিম—নববী, বাব ঃ তাহরীমুল গীবাত। রিয়াদুস সালেহীন, বাব ঃ মা ইউবাহ মিনাল গীবাত। আহ্কামুল কুরআন—জাস্সাস। রূহুল মা'আনী—লা ইয়াগতাব বাদুকুম বাদান-আয়াতের তাফসীর)।

এ ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রগুলো ছাড়া অসাক্ষাতে কারো নিন্দাবাদ একেবারেই হারাম। এ নিন্দাবাদ সত্য ও বাস্তব ভিত্তিক হলে তা গীবত, মিথ্যা হলে অপবাদ এবং দু'জনের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হলে চোখলখুরী। ইসলামী শরীয়াত এ তিনটি জিনিসকেই হারাম করে দিয়েছে। ইসলামী সমাজে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে যদি তার সামনে অন্য কোন ব্যক্তির ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হতে থাকে তাহলে সে যেন চুপ করে তা না শোনে বরং তার প্রতিবাদ করে। আর যদি কোন বৈধ শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া কারো সত্যিকার দোষ-ত্রুটিও বর্ণনা করা হতে থাকে তাহলে এ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে আল্লাহকে ভয় করতে এবং এ গোনাহ থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিতে হবে।

নবী (সা) বলেছেন ঃ

ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما فى موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه الاخذله اللّه تعالى فى مواطن يحب فيها نصرته - وما من امرئ ينصر امرأ مسلما فى موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا نصره اللّه عزوجل فى مواطن يحب فيها نصرته - (ابو داؤد)

"যদি কোন ব্যক্তি এমন পরিস্থিতিতে কোন মুসলমানকে সাহায্য না করে যেখানে তাকে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে এবং তার মান-ইজ্জতের ওপর হামলা করা হচ্ছে তাহলে আল্লাহ তা'আলাও তাকে সেসব ক্ষেত্রে সাহায্য করবেন না যেখানে সে তাঁর সাহায্যের প্রত্যাশা করে। আর যদি কোন ব্যক্তি এমন পরিস্থিতিতে কোন মুসলমানকে সাহায্য করে যখন তার মান-ইজ্জতের ওপর হামলা করা হচ্ছে এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করা হচ্ছে তাহলে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তাকে এমন পরিস্থিতিতে সাহায্য করবেন যখন সে আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশী হবে।" (আবু দাউদ)।

গীবতকারী ব্যক্তি যখনই উপলব্ধি করবে যে, সে এ গোনাহ করছে অথবা করে ফেলেছে তখন তার প্রথম কর্তব্য হলো আল্লাহর কাছে তাওবা করা এবং এ হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা। এরপর তার ওপর দ্বিতীয় যে কর্তব্য বর্তায় তা হচ্ছে, যতদূর সম্ভব এ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দিয়েছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে যে অধিক পরহেজগার সে-ই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদার অধিকারী।[২৮] নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।।[২৯]

গোনাহের ক্ষতিপূরণ করা। সে যদি কোন মৃত ব্যক্তির গীবত করে থাকে তাহলে সে ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য অধিক মাত্রায় দোয়া করবে। যদি কোন জীবিত ব্যক্তির গীবত করে থাকে এবং তা অসত্যও হয় তাহলে যাদের সাক্ষাতে সে এ অপবাদ আরোপ করেছিল তাদের সাক্ষাতেই তা প্রত্যাহার করবে। আর যদি সত্য ও বাস্তব বিষয়ে গীবত করে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে আর কখনো তার নিন্দাবাদ করবে না। তাছাড়া যার নিন্দাবাদ করেছিল তার কাছে মাফ চেয়ে নেবে। একদল আলেমের মতে, যার গীবত করা হয়েছে সে যদি এ বিষয়ে অবহিত হয়ে থাকে, কেবল তখনই ক্ষমা চাওয়া উচিত। অন্যথায় শুধু তাওবা করলেই চলবে। কারণ, যে ব্যক্তির গীবত করা হয়েছে সে যদি এ বিষয়ে অবহিত না থাকে এবং গীবতকারী তার কাছে গিয়ে বলে, আমি তোমার গীবত করেছিলাম তাহলে তা তার জন্য মনোকষ্টের কারণ হবে।

২৭. এ আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করে এ কাজের চরম ঘৃণিত হওয়ার ধারণা দিয়েছেন। মৃতের গোশত খাওয়া এমনিতেই ঘৃণ্য ব্যাপার। সে গোশতও যখন অন্য কোন জন্তুর না হয়ে মানুষের হয়, আর সে মানুষটিও নিজের আপন ভাই হয় তাহলে তো কোন কথাই নেই। তারপর এ উপমাকে প্রশ্নের আকারে পেশ করে আরো অধিক কার্যকর বানিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে নিজেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যে, সে কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে প্রস্তুত আছে? সে যদি তা খেতে রাজি না হয় এবং তার প্রবৃত্তি এতে ঘৃণাবোধ করে তাহলে সে কিভাবে এ কাজ পছন্দ করতে পারে যে, সে তার কোন মু'মিন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার মান মর্যাদার ওপর হামলা চালাবে যেখানে সে তা প্রতিরোধ করতে পারে না, এমনকি সে জানেও না যে, তাকে বেইজ্জতি করা হচ্ছে। এ আয়াতাংশ থেকে একথাও জানা গেল যে, গীবত হারাম হওয়ার মূল কারণ যার গীবত করা হয়েছে তার মনোকষ্ট নয়। বরং কোন ব্যক্তির অসাক্ষাতে তার নিন্দাবাদ করা আদতেই হারাম, চাই সে এ সম্পর্কে অবহিত হোক বা না হোক কিংবা এ কাজ দ্বারা সে কষ্ট পেয়ে থাক বা না থাক। সবারই জানা কথা, মৃত ব্যক্তির গোশত খাওয়া এ জন্য হারাম নয় যে, তাতে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়। মৃত্যুর পর কে তার লাশ ছিঁড়ে খাবলে খাচ্ছে তা মৃতের জানার কথা নয়। কিন্তু সেটা আদতেই অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। অনুরূপ, যার গীবত

করা হয়েছে, কোনভাবে যদি তার কাছে খবর না পৌঁছে তাহলে কোথায় কোন্ ব্যক্তি কখন কাদের সামনে তার মান-ইজ্জতের ওপর হামলা করেছিল এবং তার ফলস্বরূপ কার কার দৃষ্টিতে সে নীচ ও হীন সাব্যস্ত হয়েছিল, তা সে সারা জীবনেও জানতে পারবে না। না জানার কারণে এ গীবত দ্বারা সে আদৌ কোন কষ্ট পাবে না। কিন্তু এতে অবশ্যই তার মর্যাদাহানি হবে। তাই ধরন ও প্রকৃতির দিক থেকে কাজটি মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া থেকে ভিন্ন কিছু নয়।

২৮. মুসলিম সমাজকে বিভিন্ন অকল্যাণ ও অনাচার থেকে রক্ষা করার জন্য যেসব পথনির্দেশের প্রয়োজন ছিল পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে ঈমানদারদের উদ্দেশ করে সেসব পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছিলো। এখন এ আয়াতে গোটা মানব জাতিকে উদ্দেশ করে একটি বিরাট গোমরাহীর সংশোধন করা হচ্ছে যা আবহমান কাল ধরে বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে।

অর্থাৎ বংশ, বর্ণ, ভাষা, দেশ এবং জাতীয়তার গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা। প্রাচীনতম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে মানুষ সাধারণত মানবতাকে উপক্ষো করে তাদের চারপাশে কিছু ছোট ছোট বৃত্ত টেনেছে। এ বৃত্তের মধ্যে জন্মগ্রহণকারীদের সে তার আপন জন এবং বাইরে জন্মগ্রহণকারীদের পর বলে মনে করেছে। কোন যৌক্তিক বা নৈতিক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে এ বৃত্ত টানা হয়নি বরং টানা হয়েছে জন্মের ভিত্তিতে যা একটি অনিচ্ছাকৃত ব্যাপার মাত্র। কোথাও এর ভিত্তি একই খান্দান, গোত্র ও গোষ্ঠীতে জন্মগ্রহণ করা এবং কোথাও একই ভৌগলিক এলাকায় কিংবা এক বিশেষ বর্ণ অথবা একটি বিশেষ ভাষাভাষী জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করা। তাছাড়া এসব ভিত্তির ওপর নির্ভর করে আপন ও পরের বিভেদ রেখা টানা হয়েছে। এ মানদণ্ডে যাদেরকে আপন বলে মনে করা হয়েছে পরদের তুলনায় তাদের কেবল অধিক ভালবাসা বা সহযোগিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এ বিভেদনীতি ঘৃণা, শত্রুতা, তাচ্ছিল্য ও অবমাননা এবং জুলুম ও নির্যাতনের জঘন্যতম রূপ পরিগ্রহ করেছে। এর সমর্থনে দর্শন রচনা করা হয়েছে। মত ও বিশ্বাস আবিষ্কার করা হয়েছে। আইন তৈরী করা হয়েছে। নৈতিক নীতিমালা রচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্র এটিকে তাদের স্থায়ী ও স্বতন্ত্র বিধান হিসেবে গ্রহণ করে বাস্তবে অনুসরণ করেছে। এর ভিত্তিতেই ইহুদীরা নিজেদেরকে আল্লাহর মনোনীত সৃষ্টি বলে মনে করেছে এবং তাদের ধর্মীয় বিধি-বিধানে পর্যন্ত অইসরাঈলীদের অধিকার ও মর্যাদা ইসরাঈলীদের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ে রেখেছে। এ ভেদনীতিই হিন্দুদের মধ্যে বর্ণাশ্রমের জন্ম দিয়েছে যার ভিত্তিতে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। উচ্চ বর্ণের লোকদের তুলনায় সমস্ত মানুষকে নীচ ও অপবিত্র ঠাওরানো হয়েছে এবং শুদ্রদের চরম লাঞ্ছনার গভীর খাদে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কালো ও সাদার মধ্যে পার্থক্য টেনে আফ্রিকা ও আমেরিকায় কৃষ্ণাংগদের ওপর যে অত্যাচার চালানো হয়েছে তা ইতিহাসের পাতায় অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই বরং আজ এ শতাব্দীতেই প্রতিটি মানুষ তার নিজ চোখে দেখতে পারে। ইউরোপের মানুষ আমেরিকা মহাদেশে প্রবেশ করে রেড ইণ্ডিয়ান জাতি গোষ্ঠীর সাথে যে আচরণ করেছে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার দুর্বল জাতিসমূহের ওপর আধিপত্য কায়েম করে তাদের সাথে যে ব্যবহার করেছে তার গভীরেও এ ধ্যান-ধারণাই কার্যকর ছিল যে, নিজের দেশ ও জাতির গণ্ডির বাইরে জন্মগ্রহণকারীদের জান-মাল ও

সম্ভ্রম নষ্ট করা তাদের জন্য বৈধ। তাদেরকে লুট করা, ক্রীতদাস বানানো এবং প্রয়োজনে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার অধিকার তাদের আছে। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের জাতিপূজা এক জাতিকে অন্যান্য জাতিসমূহের জন্য যেভাবে পশুতে পরিণত করেছে তার জঘন্যতম দৃষ্টান্ত নিকট অতীতে সংঘটিত যুদ্ধসমূহেই দেখা গিয়েছে এবং আজও দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে নাৎসী জার্মানদের গোষ্ঠী দর্শন ও নরডিক প্রজাতির শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বিগত মহাযুদ্ধে যে ভয়াবহ ফল দেখিয়েছে তা স্মরণ রাখলে যে কোন ব্যক্তি অতি সহজেই অনুমান করতে পারবে যে, তা কত বড় এবং ধ্বংসাত্মক গোমরাহী। এ গোমরাহীর সংশোধনের জন্যই কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

এ ছোট্ট আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সত্য বর্ণনা করেছেন ঃ

এক ঃ তোমাদের সবার মূল উৎস এক। একমাত্র পুরুষ এবং একমাত্র নারী থেকে তোমাদের গোটা জাতি অস্তিত্ব লাভ করেছে। বর্তমানে পৃথিবীতে তোমাদের যত বংশধারা দেখা যায় প্রকৃতপক্ষে তা একটি মাত্র প্রাথমিক বংশধারার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা যা একজন মা ও একজন বাপ থেকে শুরু হয়েছিল। এ সৃষ্টি ধারার মধ্যে কোথাও এ বিভেদ এবং উচ্চ নীচের কোন ভিত্তি বর্তমান নেই। অথচ তোমরা এ ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত আছো। একই আল্লাহ তোমাদের স্রষ্টা। এমন নয় যে, বিভিন্ন মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন খোদা সৃষ্টি করেছেন। একই সৃষ্টি উপকরণ দ্বারা তোমরা সৃষ্টি হয়েছো। এমন নয় যে, কিছু সংখ্যক মানুষ কোন পবিত্র বা মূল্যবান উপাদানে সৃষ্টি হয়েছে এবং অপর কিছু সংখ্যক কোন অপবিত্র বা নিকৃষ্ট উপাদানে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। একই নিয়মে তোমরা জন্মলাভ করেছো। এমনও নয় যে, বিভিন্ন মানুষের জন্মলাভের নিয়ম-পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। তাছাড়া তোমরা একই পিতা-মাতার সন্তান। এমনটিও নয় যে, সৃষ্টির প্রথম দিককার মানব দম্পতির সংখ্যা ছিল অনেক এবং তাদের থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ আলাদা আলাদা জন্মলাভ করেছে।

দুই ঃ মূল উৎসের দিক দিয়ে এক হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত হওয়া ছিল একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। একথা স্পষ্ট যে, সমগ্র বিশ্বে গোটা মানব সমাজের একটি মাত্র বংশধারা আদৌ হতে পারতো না। বংশ বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন খান্দান ও বংশধারার সৃষ্টি হওয়া এবং তারপর খান্দানের সমন্বয়ে গোত্র ও জাতিসমূহের পত্তন হওয়া অপরিহার্য ছিল। অনুরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপনের পর বর্ণ, দেহাকৃতি, ভাষা এবং জীবন যাপন রীতিও অবশ্যম্ভাবীরূপে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা। একই ভূখণ্ডের বসবাসকারীরা পরস্পর ঘনিষ্ঠ এবং দূর-দূরান্তের ভূখণ্ডে বসবাসকারীদের মধ্যে পরস্পর ব্যবধান সৃষ্টি হওয়ার কথা। কিন্তু প্রকৃতিগত এ পার্থক্য ও ভিন্নতার দাবী এ নয় যে, এর ভিত্তিতে উচ্চ ও নীচ, ইতর ও ভদ্র এবং শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট হওয়ার ভেদাভেদ সৃষ্টি করা হবে, একটি বংশধারা আরেকটি বংশধারার ওপর কৌলিণ্যের দাবী করবে, এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণের লোকদের হেয় ও নীচ মনে করবে, এক জাতি অন্য জাতির ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য কায়েম করবে এবং মানবাধিকারের ক্ষেত্রে এক জাতি অন্য জাতির ওপর অগ্রাধিকার লাভ করবে। যে কারণে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ মানব গোষ্ঠীসমূহকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের আকারে বিন্যস্ত

করেছিলেন তা হচ্ছে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক জানা শোনা ও সহযোগিতার জন্য এটাই ছিল স্বাভাবিক উপায়। এ পদ্ধতিতে একটি পরিবার, একটি প্রজাতি, একটি গোত্র এবং একটি জাতির লোক মিলে একটি সম্মিলিত সমাজ গড়তে এবং জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে একে অপরের সাহায্যকারী হতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট প্রকৃতি যে জিনিসকে পারস্পরিক পরিচয়ের উপায় বানিয়েছিল শুধু শয়তানী মূঢ়তা ও মূর্খতা সে জিনিসকে গর্ব ও ঘৃণার উপকরণ বানিয়ে নিয়েছে এবং বিষয়টিকে অত্যাচার ও সীমালংঘনের পর্যায় পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছে।

তিন ঃ মানুষের মধ্যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বুনিয়াদ যদি কিছু থেকে থাকে এবং হতে পারে তাহলে তা হচ্ছে নৈতিক মর্যাদা। জন্মগতভাবে সমস্ত মানুষ সমান। কেননা, তাদের সৃষ্টিকর্তা এক, তাদের সৃষ্টির উপাদান ও সৃষ্টির নিয়ম-পদ্ধতিও এক এবং তাদের সবার বংশধারা একই পিতা-মাতা পর্যন্ত গিয়ে পৌছে। তাছাড়া কোন ব্যক্তির কোন বিশেষ দেশ, জাতি অথবা জাতি-গোষ্ঠীতে জন্মলাভ করা একটি কাকতালীয় ব্যাপার মাত্র। এতে তার ইচ্ছা, পছন্দ বা চেষ্টা-সাধনার কোন দখল নেই। এদিক দিয়ে কোন ব্যক্তির অন্য কোন ব্যক্তির ওপর মর্যাদালাভের কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। যে মূল জিনিসের ভিত্তিতে এক ব্যক্তি অপর সব ব্যক্তিদের ওপর মর্যাদা লাভ করতে পারে তা হচ্ছে, সে অন্য সবার তুলনায় অধিক আল্লাহ ভীরু মন্দ ও অকল্যাণ থেকে দূরে অবস্থানকারী এবং নেকী ও পবিত্রতার পথ অনুগমনকারী। এরূপ ব্যক্তি যে কোন বংশ, যে কোন জাতি এবং যে কোন দেশেরই হোক না কেন সে তার ব্যক্তিগত গুণাবলীর কারণে সম্মান ও মর্যাদার পাত্র। যার অবস্থা এর বিপরীত সর্বাবস্থাই সে একজন নিকৃষ্টতর মানুষ। সে কৃষ্ণাঙ্গ হোক বা শ্বেতাঙ্গ হোক এবং প্রাচ্যে জন্মলাভ করে থাকুক বা পাশ্চাত্যে তাতে কিছু এসে যায় না।

এ সত্য কথাগুলোই যা কুরআনের একটি ছোট্ট আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে— রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা ও উক্তিতে আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। মক্কা বিজয়ের সময় কা'বার তাওয়াফের পর তিনি যে বক্তৃতা করেছিলেন তাতে বলেছিলেন ঃ

الحمد لله الذى اذهب عنكم عيبة الجاهلية وتكبرها - يا ايها الناس ، الناس رجلان ، برتقى كريم على الله ، وفاجر شقى هين على الله - الناس كلهم بنو ادم وخَلَقَ اللّهُ ادم من تراب -

(بيهقى فى شعب الايمان - ترمذى)

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের দোষ-ত্রুটি ও অহংকার দূর করে দিয়েছেন। হে লোকেরা! সমস্ত মানুষ দু' ভাগে বিভক্ত। এক, নেক্কার ও পরহেজগার—যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মর্যাদার অধিকারী। দুই, পাপী ও দুরাচার যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট। অন্যথায় সমস্ত মানুষই আদমের সন্তান। আর আদম মাটির সৃষ্টি।" (বায়হাকী—ফী শুআবিল ঈমান, তিরমিযী)

বিদায় হজ্জের সময় আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে নবী (সা) বক্তৃতা করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন ঃ

يا ايها الناس ، الا ان ربكم واحد - لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لاسود على احمر ولا لاحمر على اسود الا بالتقوى ، ان اكرمكم عند اللّه اتقكم - الا هل بَلَّغتُ ؟ قالوا بلى يا رسول اللّه ، قال فليبلغ اشّاهد الغائب (بيهقى)

"হে লোকজন ! সাবধান ! তোমাদের আল্লাহ একজন। কোন অনারবের ওপর কোন আরবের ও কোন আরবের ওপর কোন অনারবের কোন কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের ও কোন শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই আল্লাহভীতি ছাড়া। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহভীরু সেই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাবান। বলো, আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌছিয়ে দিয়েছি? সবাই বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে যারা এখানে উপস্থিত আছে তারা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে এ বাণী পৌছিয়ে দেয়।" (বায়হাকী)

একটি হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ

كلكم بنو ادم وادم خلق من تراب ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم او ليكونن اهون على اللّه من الجعلان - (بزار)

"তোমরা সবাই আদমের সন্তান। আর আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল। লোকজন তাদের বাপদাদার নাম নিয়ে গর্ব করা থেকে বিরত হোক। তা না হলে আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা নগণ্য কীট থেকেও নীচ বলে গণ্য হবে।" (বায্যার)

আর একটি হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ

ان اللّه لا يسئلكم عن احسابكم ولا عن انسابكم يوم القيامة ان اكرمكم عند اللّه اتقكم - (ابن جرير)

"আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাদের বংশ ও আভিজাত্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না। তোমাদের মধ্যে যে বেশী আল্লাহভীরু সে-ই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী।" (ইবনে জারীর)

আরো একটি হাদীসের ভাষা হচ্ছে ঃ

ان اللّه لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم (مسلم ، ابن ماجه)

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চেহারা-আকৃতি ও সম্পদ দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজ-কর্ম দেখেন।" (মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

এসব শিক্ষা কেবল কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং সে শিক্ষা অনুসারে ইসলাম ঈমানদারদের একটি বিশ্বভ্রাতৃত্ব বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়ে দিয়েছে। যেখানে বর্ণ, বংশ, ভাষা, দেশ ও জাতীয়তার কোন ভেদাভেদ নেই, যেখানে উচ্চ নীচ, ছুত-ছাত এবং বিভেদ ও পক্ষপাতিত্বের কোন স্থান নেই, এবং যে কোন জাতি, গোষ্ঠী ও দেশেরই হোক না কেন সেখানে সমস্ত মানুষ সম্পূর্ণ সমান অধিকার নিয়ে শরীক হতে পারে এবং হয়েছে। ইসলামের বিরোধীদেরও একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, মানবিক সাম্য ও ঐক্যের নীতিমালাকে মুসলিম সমাজে যেভাবে সফলতার সাথে বাস্তব রূপদান করা হয়েছে বিশ্বের আর কোন ধর্ম ও আদর্শে কখনো তার কোন নজির পরিলক্ষিত হয়নি। একমাত্র ইসলাম সেই আদর্শ যা বিশ্বের সমগ্র অঞ্চলে ও আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য জাতিগোষ্ঠীকে মিলিয়ে একটি জাতি বানিয়ে দিয়েছে।

এ পর্যায়ে একটি ভ্রান্ত ধারণা দূর করাও অত্যন্ত জরুরী। বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে ইসলামী আইন 'কুফু' বা 'সমবংশ' হওয়ার প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করে, কিছু লোক তার অর্থ গ্রহণ করে এই যে, কিছুসংখ্যক জ্ঞাতি গোষ্ঠী আছে কুলীন ও অভিজাত এবং কিছু সংখ্যক ইতর ও নীচ। তাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক আপত্তিজনক। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। ইসলামী আইন অনুসারে প্রত্যেক মুসলমান পুরুষের প্রত্যেক মুসলমান নারীর সাথে বিয়ে হতে পারে। তবে দাম্পত্য জীবনের সফলতা স্বামী-স্ত্রীর অভ্যাস, আচার-আচরণ, জীবন যাপন পদ্ধতি, পারিবারিক ও বংশগত ঐতিহ্য এবং আর্থিক ও সামাজিক পরিবেশের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার ওপর নির্ভর করে যাতে তারা পরস্পরের সাথে ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। 'কুফু' বা সমবংশ হওয়ার মূল লক্ষ্য এটাই। যেখানে পুরুষ ও নারীর মধ্যে এদিক দিয়ে অনেক বেশী দূরত্ব হবে সেখানে জীবনব্যাপী বিস্তৃত বন্ধুত্বের সম্পর্ক বনিবনার আশা কমই করা যায়। তাই ইসলামী আইন এ রকম দাম্পত্য বন্ধনকে পছন্দ করে না। এখানে আশরাফ ও আতরাফের কোন প্রশ্ন নেই। বরং উভয়ের অবস্থার মধ্যে যদি স্পষ্ট পার্থক্য ও ভিন্নতা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলে দাম্পত্য জীবন ব্যর্থ হওয়ার অধিক সম্ভাবনা থাকে।

২৯. অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে কে গুণাবলীর দিক দিয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ আর কে নীচু মর্যাদার মানুষ তা আল্লাহই ভাল জানেন। মানুষ নিজেরা নিজেদের উচ্চ নীচের যে মানদণ্ড বানিয়ে রেখেছে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। হতে পারে দুনিয়াতে যাকে অনেক উচ্চ মর্যাদার মানুষ মনে করা হতো আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালায় সে অতি নীচুস্তরের মানুষ হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং যাকে এখানে অতি নগণ্য মনে করা হয়েছে সেখানে সে অনেক উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। আসল গুরুত্ব দুনিয়ার সম্মান ও লাঞ্ছনার নয়, বরং কেউ আল্লাহর কাছে যে সম্মান ও লাঞ্ছনা লাভ করবে তার। তাই যেসব গুণাবলী আল্লাহর কাছে মর্যাদা লাভের উপযুক্ত বানাতে পারে নিজের মধ্যে সেসব বাস্তব গুণাবলী সৃষ্টির জন্য মানুষের সমস্ত চিন্তা নিয়োজিত হওয়া উচিত।

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ
الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ
أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

এ বেদুইনরা বলে, "আমরা ঈমান এনেছি"[৩০] তাদের বলে দাও তোমরা ঈমান আন নাই। বরং বল, আমরা অনুগত হয়েছি।[৩১] ঈমান এখনো তোমাদের মনে প্রবেশ করেনি। তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের পথ অনুসরণ করো তাহলে তিনি তোমাদের কার্যাবলীর পুরস্কার দানে কোন কার্পণ্য করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। প্রকৃত ঈমানদার তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান এনেছে এবং এ ব্যাপারে পরে আর কোন সন্দেহ পোষণ করেনি। তারপর প্রাণ ও অর্থ-সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী।

৩০. এর অর্থ সমস্ত বেদুঈন নয়। বরং এখানে কতিপয় বিশেষ বেদুঈন গোষ্ঠীর উল্লেখ করা হচ্ছে যারা ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে এই ভেবে মুসলমান হয়ে যায় যে, মুসলমানদের আঘাত থেকেও নিরাপদ থাকবে এবং ইসলামী বিজয় থেকে সুবিধাও ভোগ করবে। এসব লোক প্রকৃতপক্ষে সরল মনে ঈমান গ্রহণ করেছিল না। শুধু ঈমানের মৌখিক অঙ্গীকার করে তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিজেদেরকে মুসলমানদের অন্তরভুক্ত করে নিয়েছিল। তাদের এ গোপন মানসিক অবস্থা তখনই ফাঁস হয়ে যেতো যখন তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে নানা রকমের দাবী-দাওয়া পেশ করতো এবং এমনভাবে নিজেদের অধিকার ফলাতো যে, ইসলাম গ্রহণ করে তারা যেন রসূলের (সা) মস্তবড় উপকার সাধন করেছে। বিভিন্ন রেওয়ায়াতে কয়েকটি গোষ্ঠীর এ আচরণের উল্লেখ আছে। যেমন ঃ মুযাইনা, জুহাইনা, আসলাম, আশজা', গিফার ইত্যাদি গোত্রসমূহ। বিশেষ করে বনী আসাদ ইবনে খুযায়মা গোত্র সম্পর্কে ইবনে আব্বাস এবং সাঈদ ইবনে জুবায়ের বর্ণনা করেছেন যে, একবার দুর্ভিক্ষের সময় তারা মদীনায় এসে আর্থিক সাহায্য দাবী করে বারবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে লাগলো ঃ আমরা যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই মুসলমান হয়েছি, অমুক ও অমুক গোত্র যেমন যুদ্ধ করেছে আমরা আপনার বিরুদ্ধে তেমন যুদ্ধ করিনি। একথা বলার পেছনে তাদের পরিষ্কার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা এবং ইসলাম গ্রহণ করা যেন তাদের একটি বড় দান। তাই রসূল ও ঈমানদারদের কাছে এর বিনিময় তাদের

পাওয়া উচিত। মদীনার আশেপাশের বেদুঈন গোষ্ঠীসমূহের এ আচরণ ও কর্মনীতি সম্পর্কে এ আয়াতগুলোতে সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ সমালোচনা ও পর্যালোচনার সাথে সূরা তাওবার ৯০ থেকে ১১০ আয়াত এবং সূরা ফাত্হের ১১ থেকে ১৭ আয়াত মিলিয়ে পড়লে এ বিষয়টি আরো ভালভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে।

৩১. মূল আয়াতে قُولُوا أَسْلَمْنَا কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর আরেকটি অনুবাদ হতে পারে, "বলো, আমরা মুসলমান হয়ে গিয়েছি" এ আয়াতাংশ থেকে কোন কোন লোক এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, কুরআন মজীদের ভাষায় 'মু'মিন' ও 'মুসলিম' দু'টি বিপরীত অর্থ জ্ঞাপক পরিভাষা। মু'মিন সে ব্যক্তি যে সরল মনে ঈমান আনয়ন করেছে এবং মুসলিম সে ব্যক্তি যে ঈমান ছাড়াই বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। এখানে অবশ্য ঈমান শব্দটি আন্তরিক বিশ্বাস এবং ইসলাম কেবল বাহ্যিক আনুগত্য বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এমনটি বুঝে নেয়া ঠিক নয় যে, এ দু'টি শব্দ কুরআন মজীদের দু'টি স্থায়ী ও বিপরীত অর্থজ্ঞাপক পরিভাষা। কুরআনের যেসব আয়াতে ইসলাম ও মুসলিম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তা বিশ্লেষণ করলে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির জন্য যে জীবন বিধান নাযিল করেছেন কুরআনের পরিভাষায় তার নাম ইসলাম। ঈমান ও আনুগত্য উভয়টি এর অন্তরভুক্ত। আর মুসলিম সে ব্যক্তি যে সরল মনে মেনে নেয় এবং কার্যত আনুগত্য করে। প্রমাণ স্বরূপ নিম্ন বর্ণিত আয়াতগুলো দেখুন ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ (ال عمران : ١٩)

"নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর মনোনীত দীন 'ইসলাম'।" (আলে ইমরান, ১৯)

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ (ال عمران : ٨٥)

"যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা চায় তার সেই জীবন ব্যবস্থা কখনো গ্রহণ করা হবে না।" (আলে ইমরান, ৮৫)

وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا (المائدة : ٣)

"আমি তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করেছি।"

(আল মায়েদা, ৩)

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ (الانعام : ١٢٥)

"আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করতে চান তার হৃদয় মনকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।" (আল আনআম, ১২৫)

قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ (الانعام : ١٤)

"হে নবী ! বলে দাও, আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে আমি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হই।" (আল আনআম, ১৪)

فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا (ال عمران : ٢٠)

"এরপর তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে হিদায়াত প্রাপ্ত হলো।"
(আলে ইমরান, ২০)

يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا (المائدة : ٤٤)

"সমস্ত নবী—যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাওরাত অনুসারে ফায়সালা করতেন।"
(আল মায়েদা, ৪৪)

এসব আয়াতে এবং এ ধরনের আরো বহু আয়াতে ইসলাম গ্রহণের অর্থ কি ঈমানবিহীন আনুগত্য করা? একইভাবে 'মুসলিম' শব্দটি যে অর্থে বারবার ব্যবহার করা হয়েছে তার জন্য নমুনা হিসেবে নিম্ন বর্ণিত আয়াতসমূহ দেখুন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (ال عمران : ١٠٢)

"হে ঈমান গ্রহণকারীগণ ! আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় করো। আর মুসলিম হওয়ার আগেই যেন তোমাদের মৃত্যু না আসে।" (আলে ইমরান, ১০২)

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا (الحج : ٧٨)

"তিনি এর পূর্বেও তোমাদের নামকরণ করেছিলেন মুসলিম তাছাড়া এ কিতাবেও।"
(আল হাজ্ব, ৭৮)

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا

(ال عمران : ٦٧)

"ইবরাহীম ইহুদী বা খৃষ্টান কোনটাই ছিলেন না। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম।"
(আলে ইমরান, ৬৭)

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ

(البقرة :١٢٨)

"(কা'বা ঘর নির্মাণের সময় হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈলের দোয়া) হে আমাদের রব, আমাদের দু'জনকেই তোমার অনুগত বানাও এবং আমাদের বংশ থেকে এমন একটি উম্মত সৃষ্টি করো যারা তোমার অনুগত হবে।" (আল বাকারা, ১২৮)।

يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

(البقرة : ١٣٢)

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ
إِسْلَامَكُمْ ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

হে নবী ! ঈমানের এ দাবীদারদের বলো, তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের দীনের কথা অবগত করাচ্ছো? আল্লাহ তো আসমান ও যমীনের প্রত্যেকটি জিনিস ভালভাবে অবহিত। এসব লোক তোমাকে বুঝাতে চায় যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে তোমার উপকার করেছে। তাদের বলো, ইসলাম গ্রহণ করে আমার উপকার করেছো একথা মনে করো না। বরং যদি তোমরা নিজেদের ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের উপকার করে চলেছেন। কারণ তিনি তোমাদেরকে ঈমানের পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ আসমান ও যমীনের প্রতিটি গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে জানেন। তোমরা যা কিছু করছো তা সবই তিনি দেখছেন।

[নিজের সন্তানদেরকে হযরত ইয়াকূবের (আ) অসীয়ত] হে আমার সন্তানেরা, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য এ জীবন বিধানকেই মনোনীত করেছেন। অতএব, মুসলিম হওয়ার আগে যেন তোমাদের মৃত্যু না আসে।" (আল বাকারা), ১৩২)।

এসব আয়াত পাঠ করে এমন ধারণা কে করতে পারে যে, এতে উল্লেখিত মুসলিম শব্দের দ্বারা এমন লোককে বুঝানো হয়েছে যে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করলেও আন্তরিকভাবে তা মানে না? সুতরাং কুরআনের পরিভাষা অনুসারে ইসলাম অর্থ ঈমানহীন আনুগত্য এবং কুরআনের ভাষায় কেবল বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণকারীকেই মুসলিম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এরূপ দাবী করাও চরম ভুল। অনুরূপ এ দাবী করাও ভুল যে, কুরআন মজীদে উল্লেখিত ঈমান ও মু'মিন শব্দ দু'টি অবশ্যই সরল মনে মেনে নেয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব শব্দ নিসন্দেহে এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এমন অনেক স্থানও আছে যেখানে এ শব্দ ঈমানের বাহ্যিক স্বীকৃতি বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। যারা মৌখিক স্বীকারোক্তির মাধ্যমে মুসলমানদের দলে শামিল হয়েছে। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا বলে তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তারা সত্যিকার মু'মিন, না দুর্বল ঈমানের অধিকারী না মুনাফিক তা বিচার করা হয়নি। এর বহুসংখ্যক

উদাহরণের মধ্য থেকে মাত্র কয়েকটির জন্য দেখুন, আলে ইমরান, আয়াত ১৫৬; আন নিসা, ১৩৬; আল মায়েদা, ৫৪; আল আনফাল, ২০ থেকে ২৭; আত তাওবা, ৩৮; আল হাদীদ, ২৮; আস্-সফ, ২০।

ক্বাফ

৫০

নামকরণ

সূরার প্রথম বর্ণটিই এর নাম হিসেবে গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যা ق (ক্বাফ) বর্ণ দিয়ে শুরু হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

ঠিক কোন্ সময় এ সূরা নাযিল হয়েছে তা কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় না। তবে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যায়, এটি মক্কী যুগের দ্বিতীয় পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। মক্কী যুগের দ্বিতীয় পর্যায় নবুওয়াতের তৃতীয় সন থেকে শুরু করে পঞ্চম সন পর্যন্ত বিস্তৃত। আমি সূরা আন'আমের ভূমিকায় এ যুগের বৈশিষ্টসমূহ বর্ণনা করেছি। ঐ সব বৈশিষ্টের প্রতি লক্ষ রেখে বিচার করলে মোটামুটি অনুমান করা যায় যে, সূরাটি নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে নাযিল হয়ে থাকবে। এ সময় কাফেরদের। বিরোধিতা বেশ কঠোরতা লাভ করেছিল। কিন্তু তখনো জুলুম-নির্যাতন শুরু হয়নি।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহ থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে দু' ঈদের নামাযে এ সূরা পড়তেন।

উম্মে হিশাম ইবনে হারেসা নাম্নী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিবেশিনী এক মহিলা বর্ণনা করেছেন যে, প্রায়ই আমি নবীর (সা) মুখ থেকে জুমআর খুতবায় এ সূরাটি শুনতাম এবং শুনতে শুনতেই তা আমার মুখস্ত হয়েছে। অপর কিছু রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি বেশীর ভাগ ফজরের নামাযেও এ সূরাটি পাঠ করতেন। এ থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, নবীর (সা) দৃষ্টিতে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা। সে জন্য এর বিষয়বস্তু অধিক সংখ্যক লোকের কাছে পৌছানোর জন্য বারবার চেষ্টা করতেন।

সূরাটি মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করলে এর গুরুত্বের কারণ সহজেই উপলব্ধি করা যায়। গোটা সূরার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আখেরাত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা মুয়াযযমায় দাওয়াতের কাজ শুরু করলে মানুষের কাছে তাঁর যে কথাটি সবচেয়ে বেশী অদ্ভুত মনে হয়েছিল তা হচ্ছে, মৃত্যুর পর পুনরায় মানুষকে জীবিত করে উঠানো হবে এবং তাদেরকে নিজের কৃতকর্মের হিসেব দিতে হবে। লোকজন বলতো,

এটা তো একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। এরূপ হতে পারে বলে বিবেক-বুদ্ধি বিশ্বাস করে না। আমাদের দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু যখন মাটিতে মিশে বিলীন হয়ে যাবে তখন হাজার হাজার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে ঐসব বিক্ষিপ্ত অংশকে পুনরায় একত্রিত করে আমাদের এ দেহকে পুনরায় তৈরী করা হবে এবং আমরা জীবিত হয়ে যাব তা কি করে সম্ভব? এর জবাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ ভাষণটি নাযিল হয়। এতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে ছোট ছোট বাক্যে একদিকে আখেরাতের সম্ভাব্যতা ও তা সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে। অন্যদিকে মানুষকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা বিস্মিত হও, বিবেক-বুদ্ধি বিরোধী মনে করো কিংবা মিথ্যা বলে মনে করো তাতে কোন অবস্থায়ই সত্য পরিবর্তিত হতে পারে না। সত্য তথা অকাট্য ও অটল সত্য হচ্ছে এই যে, তোমাদের দেহের এক একটি অণু-পরমাণু যা মাটিতে বিলীন হয়ে যায় তা কোথায় গিয়েছে এবং কি অবস্থায় কোথায় আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত আছেন। বিক্ষিপ্ত এসব অণু-পরমাণু পুনরায় একত্রিত হয়ে যাওয়া এবং তোমাদেরকে ইতিপূর্বে যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল ঠিক সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ তা'আলার একটি ইংগিতই যথেষ্ট। অনুরূপভাবে তোমাদের এ ধারণাও একটি ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয় যে, এখানে তোমাদেরকে লাগামহীন উটের মত ছেড়ে দেয়া হয়েছে, কারো কাছে তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তা'আলা নিজেও সরাসরি তোমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ সম্পর্কে এমনকি তোমাদের মনের মধ্যে জেগে ওঠা সমস্ত ধারণা ও কল্পনা পর্যন্ত অবহিত আছেন। তাছাড়া তাঁর ফেরেশতারাও তোমাদের প্রত্যেকের সাথে থেকে তোমাদের সমস্ত গতিবিধি রেকর্ড করে সংরক্ষিত করে যাচ্ছে। যেভাবে বৃষ্টির একটি বিন্দু পতিত হওয়ার পর মাটি ফুঁড়ে উদ্ভিদরাজির অঙ্কুর বেরিয়ে আসে ঠিক তেমনি নির্দিষ্ট সময় আসা মাত্র তাঁর একটি মাত্র আহবানে তোমরাও ঠিক তেমনি বেরিয়ে আসবে। আজ তোমাদের বিবেক-বুদ্ধির ওপর গাফলতের যে পর্দা পড়ে আছে তোমাদের সামনে থেকে সেদিন তা অপসারিত হবে এবং আজ যা অস্বীকার করছো সেদিন তা নিজের চোখে দেখতে পাবে। তখন তোমরা জানতে পারবে, পৃথিবীতে তোমরা দায়িত্বহীন ছিলে না, বরং নিজ কাজ-কর্মের জন্য দায়ী ছিলে। পুরস্কার ও শাস্তি, আযাব ও সওয়াব এবং জান্নাত ও দোযখ যেসব জিনিসকে আজ তোমরা আজব কল্প কাহিনী বলে মনে করছো সেদিন তা সবই তোমাদের সামনে বাস্তব সত্য হয়ে দেখা দেবে। যে জাহান্নামকে আজ বিবেক-বুদ্ধির বিরোধী বলে মনে করো সত্যের সাথে শত্রুতার অপরাধে সেদিন তোমাদেরকে সেই জাহান্নামেই নিক্ষেপ করা হবে। আর যে জান্নাতের কথা শুনে আজ তোমরা বিস্মিত হচ্ছো মহা দয়ালু আল্লাহকে ভয় করে সঠিক পথে ফিরে আসা লোকেরা সেদিন তোমাদের চোখের সামনে সেই জান্নাতে চলে যাবে।

আয়াত ৪৫ | সূরা ক্বাফ-মাদানী | রুকূ' ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۝١ بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ
فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ۝٢ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ
رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ۝٣ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ
حَفِيْظٌ ۝٤

ক্বাফ, মহিমান্বিত কল্যাণময় কুরআনের[১] শপথ। তারা বরং বিস্মিত হয়েছে এ জন্য যে, তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী এসেছে।[২] এরপর অস্বীকারকারীরা বলতে শুরু করলো এটা তো বড় আশ্চর্যজনক কথা, আমরা যখন মরে যাব এবং মাটিতে মিশে যাব (তখন কি আমাদের উঠানো হবে)? এ প্রত্যাবর্তন তো যুক্তি-বুদ্ধি বিরোধী।[৩] অথচ মাটি তার দেহের যা কিছু খেয়ে ফেলে তা সবই আমার জানা। আমার কাছে একখানা কিতাব আছে। তাতে সবকিছু সংরক্ষিত আছে।[৪]

১. مجيد শব্দ আরবী ভাষায় দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক, উচ্চ পদের অধিকারী, শ্রেষ্ঠ, মহান এবং সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। দুই, দয়ালু, অধিক দানশীল এবং অতি মাত্রায় উপকারকারী। কুরআনের জন্য এ শব্দটি দু'টি অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআন মহান এ দিক দিয়ে যে, তার মোকাবিলায় দুনিয়ার আর কোন গ্রন্থই পেশ করা যেতে পারে না। ভাষা ও সাহিত্যিক মূল্যবোধের বিচারেও তা মু'জিযা আবার শিক্ষা ও জ্ঞানের বিচারেও তা মু'জিযা। কুরআন যে সময় নাযিল হয়েছিল সে সময়েও মানুষ কুরআনের বাণীর মত বাণী বানিয়ে পেশ করতে অক্ষম ছিল এবং আজও অক্ষম। তার কোন কথা কখনো কোন যুগে ভুল প্রমাণ করা যায়নি এবং যাবেও না। বাতিল না পারে সামনে থেকে এর মোকাবিলা করতে না পারে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে পরাজিত করতে। কুরআন অধিক দাতা এ দিক দিয়ে যে, মানুষ তার থেকে যত বেশী পথ-নির্দেশনা পাওয়ার চেষ্টা করে সে তাকে ততটাই পথনির্দেশনা দান করে এবং যত বেশী তা অনুসরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সে ততই বেশী লাভ করতে থাকে। এর উপকার ও

কল্যাণের এমন কোন সীমা নেই যেখানে পৌছে মানুষ এর মুখাপেক্ষী না হয়েও পারে কিংবা যেখানে পৌছার পর এর উপকারিতা শেষ হয়ে যায়।

২. এ আয়াতাংশটি অলংকারময় ভাষার একটি অতি উত্তম নমুনা। অনেক বড় একটি বিষয়কে এতে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়েছে। যে ব্যাপারে কুরআনের শপথ করা হয়েছে তা বর্ণনা করা হয়নি। এ বিষয়টি উল্লেখ করার পরিবর্তে মাঝে একটি সূক্ষ্ম শূন্যতা রেখে পরবর্তী কথা 'আসলে' বা 'বরং' শব্দ দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে। কেউ যদি একটু চিন্তা-ভাবনা করে এবং যে পটভূমিতে একথা বলা হয়েছে সেদিকেও খেয়াল রাখে তাহলে শপথ ও 'বরং' শব্দের মাঝে যে শূন্যতা রেখে দেয়া হয়েছে তার বিষয়বস্তু কি তা সে জানতে পারবে। এখানে মূলত যে ব্যাপারে শপথ করা হয়েছে তাহচ্ছে, মক্কাবাসীরা কোন যুক্তিসংগত কারণে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত মানতে অস্বীকার করেনি বরং একেবারেই একটি অযৌক্তিক কারণে অস্বীকার করেছে। অর্থাৎ তাদের স্বজাতির একজন মানুষ এবং তাদের নিজেদের কওমের এক ব্যক্তির আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ককারী হয়ে আসা তাদের কাছে অতি আশ্চর্যজনক ব্যাপার। অথচ, বিস্ময়ের ব্যাপার হতে পারতো যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কল্যাণ অকল্যাণ সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে তাদের সাবধান করার কোন ব্যবস্থা না করতেন, কিংবা মানুষকে সাবধান করার জন্য মানুষ ছাড়া অন্য কিছুকে পাঠাতেন অথবা আরবদের সাবধান করার জন্য কোন চীনাকে পাঠিয়ে দিতেন। তাই অস্বীকৃতির এ কারণ একেবারেই অযৌক্তিক। সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন একজন মানুষ নিশ্চিতভাবেই একথা মানতে বাধ্য যে, বান্দাদেরকে হিদায়াতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অবশ্যই ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং সেটা হবে এভাবে যে, যাদের মধ্যে সাবধানকারীকে পাঠানো হয়েছে সে তাদেরই একজন হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই কি সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা এ কাজের জন্য পাঠিয়েছেন ? এ বিষয়টির মীমাংসার জন্য আর কোন সাক্ষের প্রয়োজন নেই, যে মহান ও শ্রেষ্ঠ কল্যাণময় কুরআন তিনি পেশ করছেন সেটিই তার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।

এ ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে, এ আয়াতে কুরআনের শপথ করা হয়েছে একথা বুঝানোর জন্য যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যিই আল্লাহর রসূল এবং তাঁর রিসালাত সম্পর্কে কাফেরদের বিস্ময় অহেতুক। কুরআনের "মজীদ" হওয়াকে এ দাবীর প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

৩. এটা ছিল তাঁদের দ্বিতীয় বিস্ময়। তাদের প্রথম ও প্রকৃত বিস্ময় মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে ছিল না, বরং তা ছিল এ বিষয়ে যে, তাদের নিজেদের কওমের এক ব্যক্তি দাবী করে বসেছে যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে সাবধান করার জন্য এসেছেন। তাছাড়া তারা আরো বিস্মিত হয়েছে এ কারণে যে, তিনি যে বিষয়ে তাদেরকে সাবধান করছিলেন তা হচ্ছে, সমস্ত মানুষকে মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবিত করা হবে, তাদেরকে একত্রিত করে আল্লাহর আদালতে হাজির করা হবে এবং সেখানে তাদের সমস্ত কাজ-কর্মের হিসেব নিকেশের পর পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে।

৪. অর্থাৎ একথা যদি তাদের বিবেক-বুদ্ধিতে না ধরে তাহলে তা তাদের বিবেক-বুদ্ধির সংকীর্ণতা। তাদের বিবেক-বুদ্ধির সংকীর্ণতার কারণে আল্লাহর জ্ঞান ও

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ ۝٥ أَفَلَمْ يَنظُرُوا
إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ۝٦
وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ
زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝٧ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝٨ وَنَزَّلْنَا مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۝٩ وَالنَّخْلَ
بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ۝١٠

এসব লোকেরা তো এমন যে, যখনই তাদের কাছে সত্য এসেছে, তখনই তারা তাকে মিথ্যা মনে করেছে। এ কারণেই তারা এখন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে আছে।[৫]

আচ্ছা,[৬] এরা কি কখনো এদের মাথার ওপরের আসমানের দিকে তাকায়নি? আমি কিভাবে তা তৈরী করেছি এবং সজ্জিত করেছি।[৭] তাতে কোথাও কোন ফাটল নেই।[৮] ভূপৃষ্ঠকে আমি বিছিয়ে দিয়েছি, তাতে পাহাড় স্থাপন করেছি এবং তার মধ্যে সব রকম সুদৃশ্য উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন করেছি।[৯] এসব জিনিসের সবগুলোই দৃষ্টি উন্মুক্তকারী এবং শিক্ষাদানকারী ঐ সব বান্দার জন্য যারা সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আমি আসমান থেকে বরকতপূর্ণ পানি নাযিল করেছি। অতপর তা দ্বারা বাগান ও খাদ্য শস্য উৎপন্ন করেছি। তাছাড়া থরে থরে সজ্জিত ফলভর্তি কাঁদি বিশিষ্ট দীর্ঘ সুউচ্চ খেজুর গাছ।

কুদরতও সংকীর্ণ হতে হবে তা নয়। এরা মনে করে, সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারী অসংখ্য মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশ যা মাটিতে মিশে গিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও বিক্ষিপ্ত হয়ে মিশে যাবে তা একত্রিত করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, ঐ সব দেহাংশের একেকটি যেখানে যে অবস্থায় আছে আল্লাহ তা'আলা তা সরাসরি জানেন, তাছাড়া আল্লাহর দফতরে তার পূর্ণাংগ রেকর্ডও সংরক্ষণ করা হচ্ছে। একটি ক্ষুদ্র অণুও তা থেকে বাদ পড়ছে না। যখন আল্লাহর নির্দেশ হবে সেই মুহূর্তেই তাঁর ফেরেশতারা উক্ত রেকর্ড দেখে একেকটি অণুকে খুঁজে বের করবে এবং সমস্ত মানুষ যে দেহ নিয়ে দুনিয়াতে কাজ করেছিল সেই দেহ তারা পুনরায় বানিয়ে দেবে।

আখেরাতের জীবন যে কেবল দুনিয়ার জীবনের মত দৈহিক জীবন হবে তাই নয় বরং দুনিয়াতে মানুষের যে দেহ ছিল আখেরাতেও প্রত্যেক মানুষের হুবহু সে একই দেহ হবে।

কুরআন মজীদের যেসব আয়াতে একথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এ আয়াতটিও তার একটি। যদি ব্যাপারটি তা না হতো তাহলে কাফেরদের কথার জবাবে একথা বলা একেবারেই অর্থহীন হতো যে, মাটি তোমাদের দেহের যা কিছু খেয়ে ফেলে তা সবই আমার জানা আছে এবং তার প্রতিটি অণু-পরমাণুর রেকর্ড আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা হা-মীম আস্ সাজদা, টীকা ২৫)

৫. এ সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশটিতে একটি অতি বড় বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ তারা শুধু বিস্ময় প্রকাশ করা এবং বিবেক-বুদ্ধি বিরোধী ঠাওরানোকেই যথেষ্ট মনে করেনি। বরং যে সময় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সত্যের দাওয়াত পেশ করেছেন সে সময় তারা কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তাকে নির্জলা মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেছে। অবশ্যম্ভাবীরূপে তার যে ফল হওয়ার ছিল এবং হয়েছে তা হচ্ছে, এ দাওয়াত এবং এ দাওয়াত পেশকারী রসূলের ব্যাপারে এরা কখনো স্থির ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। কখনো তাঁকে কবি বলে, কখনো বলে গণক কিংবা পাগল। কখনো বলে সে যাদুকর আবার কখনো বলে কেউ তাঁর ওপর যাদু করেছে। কখনো বলে নিজের বড়ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সে এ বাণী নিজে বানিয়ে এনেছে আবার কখনো অপবাদ আরোপ করে যে, অন্যকিছু লোক তার পৃষ্ঠপোষকতা করছে। তারাই তাকে এসব কথা বানিয়ে দেয়। এসব পরস্পর বিরোধী কথাই প্রকাশ করে যে, তারা নিজেদের দৃষ্টিভংগী সম্পর্কেই পুরোপুরি দ্বিধান্বিত। যদি তারা তাড়াহুড়া করে একেবারে প্রথমেই নবীকে অস্বীকার না করতো এবং কোন রকম চিন্তা-ভাবনা না করে আগেভাগেই একটি সিদ্ধান্ত দেয়ার পূর্বে ধীরস্থিরভাবে একথা ভেবে দেখতো যে, কে এ দাওয়াত পেশ করছে, কি কথা সে বলছে এবং তার দাওয়াতের স্বপক্ষে কি দলীল-প্রমাণ পেশ করছে তাহলে তারা কখনো এ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়তো না। এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, তাদের কাছে ঐ ব্যক্তি অপরিচিত কেউ ছিল না। সে অন্য কোনখান থেকে আকস্মিকভাবে উড়ে এসে জুড়ে বসেনি। সে তাদের স্বজাতিরই একজন সদস্য ছিল। তাদের জানা শোনা লোক ছিল। তারা তাঁর চরিত্র ও কর্ম যোগ্যতা সম্পর্কে অনবহিত ছিল না। এমন একজন মানুষের পক্ষ থেকে যখন একটি কথা পেশ করা হয়েছিল তখন সাথে সাথে তা গ্রহণ না করলেও শোনামাত্রই তা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মতও ছিল না। তাছাড়া সেটি যুক্তি-প্রমাণহীন কথাও ছিল না। সে তার পক্ষে দলীল-প্রমাণ পেশ করছিলো। তার প্রমাণাদি কতখানি যুক্তিসংগত তা খোলা কান দিয়ে শোনা এবং পক্ষপাতহীনভাবে যাঁচাই বাছাই করে দেখা উচিত ছিল। কিন্তু এ নীতি গ্রহণ করার পরিবর্তে যখন তারা জিদের বশবর্তী হয়ে প্রথম পর্যায়েই তাকে অস্বীকার করে বসলো তখন তার ফল হলো এই যে, সত্য পর্যন্ত পৌঁছার একটি দরজা তারা নিজেরাই বন্ধ করে দিল এবং চারদিকে উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ানোর অনেক দরজা খুলে নিল। এখন তারা নিজেদের প্রাথমিক ভুলকে যুক্তিসিদ্ধ করার পর পরস্পর বিরোধী আরো অনেক কথা গড়তে পারে। কিন্তু তিনি সত্য নবীও হতে পারেন এবং তার পেশকৃত কথা সত্যও হতে পারে এ একটি কথা চিন্তা করে দেখার জন্যও তারা প্রস্তুত নয়।

৬. উপরোল্লেখিত পাঁচটি আয়াতে মক্কার কাফেরদের ভূমিকার অযৌক্তিকতা স্পষ্ট করে দেয়ার পর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আখেরাতের যে খবর দিয়েছেন

তার সত্যতার প্রমাণাদি কি তা বলা হচ্ছে। এখানে একথাটি ভালভাবে বুঝে নেয়া প্রয়োজন যে, কাফেররা যে দু'টি বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করছিলো তার মধ্যে একটি অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের সত্যতা সম্পর্কে প্রারম্ভেই দু'টি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। প্রথম প্রমাণটি হলো, তিনি তোমাদের সামনে কুরআন মজীদ পেশ করছেন যা তাঁর নবী হওয়ার খোলাখুলি প্রমাণ। দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে তিনি তোমাদের নিজেদের স্বজাতি ও জ্ঞাতি গোষ্ঠীর লোক। তিনি হঠাৎ আসমান থেকে কিংবা অন্য কোন অঞ্চল থেকে এসে হাজির হননি যে, তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কিনা আর এ কুরআন তাঁর নিজের রচিত কথা হতে পারে কিনা তা তাঁর জীবন, চরিত্র ও কর্ম যাঁচাই-বাছাই করে বিশ্লেষণ করা কঠিন। অতএব তাঁর নবুওয়াত দাবী সম্পর্কে তোমাদের বিস্ময় অনর্থক। এ যুক্তি-প্রমাণ সবিস্তারে পেশ করার পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত দু'টি ইংগিত আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, মুহাম্মাদ (সা) যে সময় মক্কায় দাঁড়িয়ে নিজে সেসব লোকদের কুরআন শুনাচ্ছিলেন যারা তাঁর শৈশব থেকে শুরু করে যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত তাঁর গোটা জীবন দেখেছিল, সে সময়ের প্রতিটি ব্যক্তির কাছে এসব ইংগিতের বিস্তারিত পরিবেশ ও পটভূমি আপনা থেকেই সুস্পষ্ট ছিল। তাই তাঁর বর্ণনা বাদ দিয়ে দ্বিতীয় যে জিনিসটিকে ঐ সব লোক অদ্ভুত ও বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থী বলছে তার সত্যতার বিস্তারিত যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে।

৭. এখানে আসমান বলতে পুরো উর্ধজগতকে বুঝানো হয়েছে। যা মানুষ রাত-দিন তার মাথার ওপর ছেয়ে থাকতে দেখে। যেখানে দিনের বেলা সূর্য দীপ্তি ছড়ায়, রাতের বেলা চাঁদ এবং অসংখ্য তারকারাজি উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। মানুষ যদি এগুলোকে খালি চোখেই দেখে তাহলেও সে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়ে। আর দূরবীন লাগিয়ে দেখলে এমন একটি বিশাল সুবিস্তৃত সৃষ্টিজগত তার সামনে ভেসে ওঠে যার কোন সীমা পরিসীমা নেই। কোথায় শুরু এবং কোথায় শেষ হয়েছে বুঝা যাবে না। আমাদের পৃথিবীর চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় বিশালকায় গ্রহসমূহ এর মধ্যে বলের মত ঘুরপাক খাচ্ছে। আমাদের সূর্যের চেয়ে হাজার হাজার গুণ অধিক উজ্জ্বল তারকা তার মধ্যে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। আমাদের এ সৌরজগত তার একটি মাত্র ছায়াপথের এক কোণে পড়ে আছে। এ একটি মাত্র ছায়াপথে আমাদের সূর্যের মত কমপক্ষে আরো ৩ শত কোটি তারকা (স্থির বস্তু) বিদ্যমান এবং মানুষের পর্যবেক্ষণ এ পর্যন্ত এরূপ দশ লাখ ছায়াপথের সন্ধান দিচ্ছে। এ লক্ষ লক্ষ ছায়াপথের আমাদের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী প্রতিবেশী ছায়াপথটি এত দূরে অবস্থিত যে, তার আলো সেকেণ্ডে এক লাখ ছিয়াশি হাজার মাইল গতিতে অগ্রসর হয়ে দশ লাখ বছরে আমাদের পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছে। এটা হচ্ছে সৃষ্টিজগতের সেই অংশের বিস্তৃতির অবস্থা যা এ পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে। আল্লাহর কর্তৃত্ব কত ব্যাপক ও বিস্তৃত তার কোন অনুমান আমরা করতে পারি না। হতে পারে, সমুদ্রের তুলনায় এক বিন্দু পানি যতটুকু মানুষের জানা সৃষ্টিজগত গোটা সৃষ্টিজগতের অনুপাতের ততটুকুও নয়। যে আল্লাহ এ বিশাল সৃষ্টিজগতকে অস্তিত্ব দান করেছেন, ভূপৃষ্ঠের ধীরগতি ও বাকশক্তি সম্পন্ন মানুষ নামে অভিহিত অতি ক্ষুদ্র জীব যদি সেই আল্লাহ সম্পর্কে মত প্রকাশ করে যে, মৃত্যুর পর তিনি তাকে পুনরায় জীবিত করতে পারবেন না তাহলে সেটা তার নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির সংকীর্ণতা মাত্র। তাতে বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতা কি করে সীমিত হতে পারে।

رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ ﴿١١﴾ كَذَّبَتْ
قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ﴿١٢﴾ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ
لُوطٍ ﴿١٣﴾ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۚ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ
وَعِيدِ ﴿١٤﴾ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾

এটা হচ্ছে বান্দাহদেরকে রিযিক দেয়ার ব্যবস্থা। এ পানি দ্বারা আমি মৃত ভূমিকে জীবন দান করি।[১০] (মৃত মানুষের মাটি থেকে) বেরিয়ে আসাও এভাবেই হবে।[১১]

এদের আগে নূহের কওম, আসহাবুর রাস,[১২] সামূদ, আদ, ফেরাউন,[১৩] লূতের ভাই, আইকাবাসী এবং তুব্বা কওমের[১৪] লোকেরাও অস্বীকার করেছিল।[১৫] প্রত্যেকেই রসূলদের অস্বীকার করেছিল[১৬] এবং পরিণামে আমার শাস্তির প্রতিশ্রুতি তাদের জন্য কার্যকর হয়েছে।[১৭]

আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করতে অক্ষম ছিলাম? আসলে নতুন করে সৃষ্টির ব্যাপারে এসব লোক সন্দেহে নিপতিত হয়ে আছে।[১৮]

৮. অর্থাৎ এ বিস্ময়কর বিস্তৃতি সত্ত্বেও এ বিশাল ও জাঁকজমকপূর্ণ বিশ্ব ব্যবস্থা এমন সুশৃংখল ও মজবুত এবং তার বন্ধন এমন অটুট যে, তাতে কোথাও কোন চিড় বা ফাটল এবং কোথাও গিয়ে এর ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয় না। একটি উদাহরণের সাহায্যে এ বিষয়টি ভালভাবে বুঝা যেতে পারে, আধুনিক যুগের বেতার সংকেত ভিত্তিক জ্যোতির্বিজ্ঞান–গবেষকগণ একটি ছায়াপথ পর্যবেক্ষণ করেছেন যাকে তারা উৎস ৩গ ২৯৫ (Source 3c 295) নামে আখ্যায়িত করে থাকেন। উক্ত ছায়াপথ সম্পর্কে তাদের ধারণা হচ্ছে, বর্তমানে আমাদের কাছে তার যে আলো এসে পৌছেছে তা চারশ' কোটি বছরেরও বেশী সময় পূর্বে সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে থাকবে। এত দূর থেকে এসব আলোক রশ্মির পৃথিবী পর্যন্ত পৌছা কি করে সম্ভব হতো যদি পৃথিবী এবং উক্ত ছায়াপথের মাঝে বিশ্ব ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা কোথাও ছিন্ন থাকতো এবং বন্ধনে ফাটল থাকতো। আল্লাহ তা'আলা এ সত্যের দিকে ইংগিত করে প্রকৃতপক্ষে মানুষের সামনে এ প্রশ্নই রেখেছেন যে, আমার সৃষ্ট বিশ্ব–জাহানের এ ব্যবস্থাপনায় যখন তোমরা একটি সামান্য ছিদ্রও দেখিয়ে দিতে পারো না তখন তোমাদের মগজে আমার দুর্বলতার এ ধারণা কোথা থেকে আসে যে, তোমাদের পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ শেষ হয়ে যাওয়ার পর হিসেব–নিকেশ নেয়ার জন্য আমি তোমাদের জীবিত করে আমার সামনে হাজির করতে চাইলে তা করতে পারবো না।

এটা শুধু আখেরাতের সম্ভাবনার প্রমাণই নয় বরং তাওহীদেরও প্রমাণ। চারশত কোটি আলোক বর্ষের (Light Year) দূরত্ব থেকে এসব আলোক রশ্মির পৃথিবী পর্যন্ত পৌছা

এবং এখানে মানুষের তৈরী যন্ত্রপাতিতে ধরা পড়া খোলাখুলি একথা প্রমাণ করে যে, ঐ ছায়াপথ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত গোটা সৃষ্টিজগত একই বস্তুর তৈরী, তার মধ্যে একই রকম শক্তিসমূহ কর্মতৎপর রয়েছে এবং কোন প্রকার পার্থক্য ও ভিন্নতা ছাড়া তা একই রকম নিয়ম-কানুন অনুসারে কাজ করছে। তা না হলে এসব আলোক রশ্মি এ পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হতো না এবং পৃথিবী ও তার পরিবেশে ক্রিয়াশীল নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষ যেসব যন্ত্রপাতি তৈরী করেছে তাতেও ধরা পড়তো না। এতে প্রমাণিত হয়, একই আল্লাহ গোটা এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা, মালিক, শাসক ও ব্যবস্থাপক।

৯. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নাহ্‌ল, টীকা ১২, ১৩ ও ১৪; আন নাম্‌ল, টীকা ৭৩ ৭৪; আয্ যুখরুফ, টীকা ৭।

১০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নাম্‌ল, টীকা ৭৩, ৭৪, ৮১; আর রূম, টীকা ২৫, ৩৩, ৩৫; ইয়াসীন, টীকা ২৯।

১১. যুক্তি হচ্ছে, যে আল্লাহ এ পৃথিবী-গ্রহটিকে জীবন্ত সৃষ্টির বসবাসের জন্য উপযুক্ত স্থান বানিয়েছেন, যিনি পৃথিবীর প্রাণহীন মাটিকে আসমানের প্রাণহীণ পানির সাথে মিশিয়ে এত উচ্চ পর্যায়ের উদ্ভিদ জীবন সৃষ্টি করেছেন যা তোমরা তোমাদের বাগান ও শস্যক্ষেত রূপে শ্যামলিমায় ভরে উঠতে দেখছো এবং যিনি এ উদ্ভিদরাজিকে মানুষ ও জীব-জন্তু সবার জন্য রিযিকের মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর সম্পর্কে তোমাদের এ ধারণা যে, মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন। এটা নিরেট নির্বুদ্ধিতামূলক ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা নিজের চোখে অহরহ দেখছো, একটি এলাকা একেবারে শুষ্ক ও প্রাণহীণ পড়ে আছে, বৃষ্টির একটি বিন্দু পড়া মাত্রই তার ভেতর থেকে অকস্মাত জীবনের ঝর্ণাধারা ফুটে বের হয়, যুগ যুগ ধরে মৃত শিকড়সমূহ হঠাৎ জীবন ফিরে পায় এবং মাটির গভীর অভ্যন্তর ভাগ থেকে নানা রকম কীট ও পোকামাকড় বেরিয়ে এসে নর্তন কুর্দন শুরু করে দেয়। মৃত্যুর পরে জীবন যে আবার অসম্ভব নয় এটা তারই স্পষ্ট প্রমাণ। তোমাদের এ স্পষ্ট পর্যবেক্ষণকে যখন তোমরা মিথ্যা বলতে পার না তখন একথা কি করে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে চাও যে, আল্লাহ তা'আলা যখন চাইবেন তখন তোমরা নিজেরাও ঠিক তেমনি মাটির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে যেমনভাবে উদ্ভিদরাজির অঙ্কুর বেরিয়ে আসে। এ প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আরব ভূখণ্ডের বহু অঞ্চল এমন যেখানে কোন কোন সময় পাঁচ বছর পর্যন্ত বৃষ্টি হয় না। এমনকি কখনো কখনো তার চেয়েও বেশী সময় চলে যায় কিন্তু আসমান থেকে একবিন্দু বৃষ্টিও ঝরে না। উত্তপ্ত মরুভূমিতে এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঘাসের মূল এবং কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড়ের জীবিত থাকা কল্পনাতীত। তা সত্ত্বেও কোন সময় যখন সেখানে সামান্য বৃষ্টিও হয় তখন ঘাস ফুটে বের হয় এবং কীট-পতঙ্গ ও পোকা-মাকড় জীবনলাভ করে। সুতরাং এত দীর্ঘস্থায়ী অনাবৃষ্টির অভিজ্ঞতা যাদের নেই তাদের তুলনায় আরবের লোকেরা আরো ভালভাবে এ যুক্তি উপলব্ধি করতে সক্ষম।

১২. এর আগে সূরা ফুরকানের ৩৮ আয়াতে 'আসহাবুর রাস্‌সের' আলোচনা করা হয়েছে। এখানে দ্বিতীয় বারের মত তাদের উল্লেখ করা হচ্ছে। তবে উভয় স্থানেই নবীদের

অস্বীকারকারী জাতিসমূহের সাথে কেবল মাত্র তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের কোন বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করা হয়নি। আরবের কিংবদন্তীতে আর রাস্ নামে দু'টি স্থান সুপরিচিত। একটি নাজদে এবং দ্বিতীয়টি উত্তর হিজাযে। এর মধ্যে নাজদের আর রাস অধিক পরিচিত এবং জাহেলী যুগের কাব্য গাঁথায় এর উল্লেখই বেশী পাওয়া যায়। আসহাবুর রাস্ এ দু'টি স্থানের কোন্‌টির অধিবাসী ছিল তা এখন নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। কোন বর্ণনাতেই তাদের কাহিনীর নির্ভরযোগ্য বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। বড় জোর এতটুকু সঠিকভাবে বলা যেতে পারে যে, তারা ছিল এমন এক জাতি যারা তাদের নবীকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। তবে তাদের বিষয়ে কুরআন মজীদে শুধু ইংগিত দিয়েই ক্ষান্ত থাকা হয়েছে। এতে বুঝা যায়, কুরআন নাযিলের সময় আরবরা ব্যাপকভাবে তাদের কাহিনী সম্পর্কে অবহিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে এসব বর্ণনা ও কাহিনী ইতিহাসে সংরক্ষিত হতে পারেনি।

১৩. "ফেরাউনের কওম" বলার পরিবর্তে শুধু ফেরাউনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ সে তার জাতির ঘাড়ে এমনভাবে চেপে বসেছিল যে, তার সামনে তার জাতির কোন স্বাধীন বক্তব্য ও দৃঢ়তা অবশিষ্ট ছিল না। সে যে গোমরাহীর দিকেই অগ্রসর হতো তার জাতিও তার পেছনে পেছনে ছুটে চলতো। তাই একা ঐ ব্যক্তিকে গোটা জাতির গোমরাহীর জন্য দায়ী করা হয়েছে। যেখানে জাতির মতামত ও কর্মের স্বাধীনতা আছে সেখানে তার কাজ-কর্মের দায়-দায়িত্ব সে জাতি নিজেই বহন করে। আর যেখানে এক ব্যক্তির একনায়কত্ব জাতিকে অসহায় করে রাখে সেখানে সেই এক ব্যক্তিই গোটা জাতির অপরাধের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নেয়। এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে, এ বোঝা এক ব্যক্তির ঘাড়ে উত্তোলিত হওয়ার পর জাতি তার দায়-দায়িত্ব থেকে পুরোপুরি অব্যাহতি পেয়ে যায়। না, সে ক্ষেত্রে নিজের ঘাড়ে এক ব্যক্তিকে এভাবে চেপে বসতে দিয়েছে কেন, সেই নৈতিক দুর্বলতার দায়িত্ব জাতির ওপর অবশ্যই বর্তায়। সূরা যুখরুফের ৫৪ আয়াতে এ বিষয়টির প্রতিই ইংগিত দেয়া হয়েছে।

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوْهُ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَاسِقِيْنَ

"ফেরাউন তার জাতিকে গুরুত্বহীন মনে করে নিয়েছে এবং তারাও তার আনুগত্য করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল ফাসেক।"

(ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা যুখরুফের ব্যাখ্যা, টীকা ৫)

১৪. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাবার ব্যাখ্যা, টীকা ৩৭; সূরা দুখান, টীকা ৩২।

১৫. অর্থাৎ তারা সবাই তাদের রসূলের রিসালাতকে অস্বীকার করেছে এবং মৃত্যুর পরে তাদেরকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে তাঁদের দেয়া এ খবরও অস্বীকার করেছে।

১৬. যদিও প্রত্যেক জাতি কেবল তাদের কাছে প্রেরিত রসূলকেই অস্বীকার করেছিল। কিন্তু তারা যেহেতু এমন একটি খবরকে অস্বীকার করছিল যা সমস্ত রসূল সর্বসম্মতভাবে

পেশ করছিলেন। তাই একজন রসূলকে অস্বীকার করা প্রকৃতপক্ষে সমস্ত রসূলকেই অস্বীকার করার নামান্তর। তাছাড়া এসব জাতির প্রত্যেকে কেবল তাদের কাছে আগমনকারী রসূলের রিসালাত অস্বীকার করেনি, বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের হিদায়াতের জন্য কোন মানুষ যে আদিষ্ট হয়ে আসতে পারে একথা মানতে তারা আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং তারা ছিল মূলত রিসালাতেরই অস্বীকারকারী এবং তাদের কারো অপরাধই শুধুমাত্র একজন রসূলের অস্বীকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না।

১৭. এটা আখেরাতের সপক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থাপন। এর পূর্বের ৬টি আয়াতে আখেরাতের সম্ভাবনার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে পেশ করা হয়েছে আখেরাতের বাস্তবতার প্রমাণ। সমস্ত নবী-রসূল আলাইহিমুস সালাম আখেরাত সম্পর্কিত যে আকীদা পেশ করেছেন তা যে সম্পূর্ণ সত্য ও বাস্তব তার প্রমাণ হিসেবে এ আয়াতে আরব ও তার আশেপাশের জাতিসমূহের ঐতিহাসিক পরিণতিকে পেশ করা হয়েছে। কারণ যে জাতিই তা অস্বীকার করেছে সে জাতিই চরম নৈতিক বিকৃতির শিকার হয়েছে। এমনকি পরিশেষে আল্লাহর আযাব এসে তাদেরকে পৃথিবী থেকে একেবারেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। অখেরাতের অস্বীকৃতির সাথে নৈতিক বিকৃতির এ অনিবার্যতা যা ইতিহাসের আবর্তনের সাথে সাথে একের পর এক পরিলক্ষিত হয়—একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এ দুনিয়ায় মানুষকে প্রকৃতপক্ষে দায়িত্বহীন ও কৃতকর্মের জবাবদিহি মুক্ত করে ছেড়ে দেয়া হয়নি, বরং কার্যকাল শেষ হওয়ার পর তাকে তার সমস্ত কাজ-কর্মের জবাব দিতে হবে। এ কারণে যখনই সে নিজেকে দায়িত্বমুক্ত মনে করে দুনিয়ায় কাজ করে তখনই তার গোটা জীবন ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। যখন কোন কাজের ক্রমাগতভাবে খারাপ ফলাফল দেখা দিতে থাকে তখন তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, কাজটি বাস্তবতার পরিপন্থী।

১৮. এটা আখেরাতের সপক্ষে যৌক্তিক প্রমাণ। যে ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করে না এবং সুশৃংখল ও সুবিন্যস্ত এ বিশ্ব-জাহানে মানুষের সৃষ্টিকে নিছক একটি আকস্মিক ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করার মত নির্বুদ্ধিতা যাকে পেয়ে বসেনি তার পক্ষে একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, আল্লাহ তা'আলাই আমাদেরকে এবং পুরো এ বিশ্ব-জাহানকে সৃষ্টি করেছেন। আমরা যে এ দুনিয়ায় জীবিতাবস্থায় বর্তমান এবং দুনিয়া ও আসমানের এসব কাজ-কারবার যে আমাদের চোখের সামনেই চলছে, এটা স্বতই প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ আমাদেরকে এবং এ বিশ্ব-জাহানকে সৃষ্টি করতে অক্ষম ছিলেন না। তা সত্ত্বেও কেউ যদি বলে যে, কিয়ামত সংঘটিত করার পর সেই আল্লাহই আরেকটি জগত সৃষ্টি করতে পারবেন না এবং মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় আমাদের সৃষ্টি করতে পারবেন না তাহলে সে একটি যুক্তি বিরোধী কথাই বলে। আল্লাহ অক্ষম হলে প্রথমবারই তিনি সৃষ্টি করতে অক্ষম থাকতেন। তিনি যখন প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন এবং সেই সৃষ্টিকর্মের বদৌলতেই আমরা অস্তিত্ব লাভ করেছি তখন নিজের সৃষ্ট বস্তুকে ধ্বংস করে তা পুনরায় সৃষ্টি করতে তিনি অপারগ হবেন কেন? এর কি যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে?

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ
إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ
قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ
الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۖ
ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾

২ রুকূ'

আমি[১৯] মানুষকে সৃষ্টি করেছি আর তাদের মনে যেসব কুমন্ত্রণা উদিত হয় তা আমি জানি। আমি তার ঘাড়ের রগের চেয়েও তার বেশী কাছে আছি।[২০] (আমার এ সরাসরি জ্ঞান ছাড়াও) দু'জন লেখক তার ডান ও বাঁ দিকে বসে সবকিছু লিপিবদ্ধ করছে। এমন কোন শব্দ তার মুখ থেকে বের হয় না যা সংরক্ষিত করার জন্য একজন সদা প্রস্তুত রক্ষক উপস্থিত থাকে না।[২১] তারপর দেখো, মৃত্যুর যন্ত্রণা পরম সত্য নিয়ে হাজির হয়েছে।[২২] এটা সে জিনিস যা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলে।[২৩] এরপর শিংগায় ফুৎকার দেয়া হলো।[২৪] এটা সেদিন যার ভয় তোমাদের দেখানো হতো।

১৯. আখেরাতের সপক্ষে যুক্তি–প্রমাণ পেশ করার পর বলা হচ্ছে, তোমরা আখেরাতকে মেনে নাও বা অস্বীকার করো সর্বাবস্থায় তা অবধারিত এবং তা এমন একটি বাস্তব ঘটনা যা তোমাদের অস্বীকার করা সত্ত্বেও সংঘটিত হবে। নবী–রসূলদের অগ্রিম সতর্ক বাণী বিশ্বাস করে সেই সময়ের জন্য পূর্বাহ্নেই প্রস্তুতি গ্রহণ করলে তোমরা নিজেদেরই কল্যাণ করবে এবং বিশ্বাস না করলে নিজেরাই নিজেদের দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে। না মানলে আখেরাতের আগমন থেমে থাকবে না এবং আল্লাহর ন্যায়ের বিধান অচল হয়ে যাবে না।

২০. অর্থাৎ আমার ক্ষমতা ও জ্ঞান ভিতর ও বাহির থেকে এমনভাবে মানুষকে পরিবেষ্টিত করে আছে যে, আমার ক্ষমতা ও জ্ঞান তার যতটা নিকটে ততটা নিকটে তার ঘাড়ের শিরাও নয়। তার কথা শোনার জন্য আমাকে কোথাও থেকে আসতে হয় না। তার মনের মধ্যে উদিত কল্পনাসমূহ পর্যন্ত আমি সরাসরি জানি। অনুরূপভাবে তাকে যদি কোন সময় পাকড়াও করতে হয় তখনও আমাকে কোথাও থেকে এসে তাকে পাকড়াও করতে হয় না। সে যেখানেই থাকুক, সর্বদা আমার আয়ত্বাধীনেই আছে যখন ইচ্ছা আমি তাকে বন্দী করবো।

২১. অর্থাৎ এক দিকে আমি নিজে সরাসরি মানুষের প্রতিটি গতিবিধি এবং চিন্তা ও কল্পনা সম্পর্কে অবহিত। অপর দিকে প্রত্যেক মানুষের জন্য দু'জন করে ফেরেশতা নিয়োজিত আছে যারা তার প্রত্যেকটি তৎপরতা লিপিবদ্ধ করছে। তার কোন কাজ ও কথাই তাদের রেকর্ড থেকে বাদ পড়ে না। অর্থাৎ আল্লাহর আদালতে যে সময় মানুষকে পেশ করা হবে তখন কে কি করে এসেছে সে বিষয়ে আল্লাহ নিজ থেকেই অবহিত থাকবেন। তাছাড়া সে বিষয়ে সাক্ষ দেয়ার জন্য এমন দু'জন সাক্ষীও উপস্থিত থাকবেন যারা তার কাজ-কর্মের লিখিত নথিভুক্ত প্রমাণাদি এনে সামনে পেশ করবেন। লিখিত এ প্রমাণাদি কেমন ধরনের হবে তার সঠিক ধারণা করা আমাদের জন্য কঠিন। তবে আজ আমাদের সামনে যেসব সত্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে তা দেখে এ বিষয়টি একেবারে নিশ্চিত মনে হয় যে, যে পরিবেশে মানুষ অবস্থান ও কাজ-কর্ম করে তাতে চতুর্দিকের প্রতিটি অণু-পরমাণুর ওপর তার কণ্ঠস্বর, ছবি ও গতিবিধির ছাপ পড়ে যাচ্ছে। এসব জিনিসের প্রত্যেকটিকে পুনরায় হুবহু সেই আকার-আকৃতি ও স্বরে এমনভাবে পেশ করা যেতে পারে যে, আসল ও নকলের মধ্যে সামান্যতম পার্থক্যও থাকবে না। মানুষ যন্ত্রপাতির সাহায্যে এ কাজটি অত্যন্ত সীমিত মাত্রায় করছে। কিন্তু আল্লাহর ফেরেশতারা এসব যন্ত্রপাতিরও মুখাপেক্ষী নয়, এসব প্রতিবন্ধকতায়ও আবদ্ধ নয়। মানুষের নিজ দেহ এবং তার চারপাশের প্রতিটি জিনিস তাদের জন্য টেপ ও ফিল্ম স্বরূপ। তারা এসব টেপ ও ফিল্মের ওপর প্রতিটি শব্দ এবং প্রতিটি ছবি অতি সূক্ষ্ম ও খুঁটিনাটি বিষয়সহ অবিকল ধারণ করতে পারে এবং পৃথিবীতে ব্যক্তি যেসব কাজ করতো কিয়ামতের দিন তাকে তার নিজ কানে নিজ কণ্ঠস্বরে সেসব কথা শুনিয়ে দিতে পারে, নিজ চোখে তার সকল কর্মকাণ্ডের এমন জ্বলজ্যান্ত ছবি তাকে দেখিয়ে দিতে পারে যা অস্বীকার করা তার জন্য সম্ভব হবে না।

এখানে একথাটিও ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার যে, আল্লাহ তা'আলা আখেরাতের আদালতে কোন ব্যক্তিকে কেবল নিজের ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভিত্তিতে শাস্তি প্রদান করবেন না, বরং ন্যায় বিচারের সমস্ত পূর্বশর্ত পূরণ করে তাকে শাস্তি প্রদান করবেন। এ কারণে দুনিয়াতেই প্রত্যেক ব্যক্তির সমস্ত কথা ও কাজের পূর্ণাংগ রেকর্ড তৈরী করা হচ্ছে যাতে অনস্বীকার্য সাক্ষের ভিত্তিতে তার সমস্ত কর্মকাণ্ডের প্রমাণাদি পেশ করা যায়।

২২. পরম সত্য নিয়ে হাজির হওয়ার অর্থ হচ্ছে মৃত্যুর যন্ত্রণা সেই পরম সূচনা বিন্দু যেখান থেকে দুনিয়ার জীবনে পর্দার আড়ালে লুকানো মহাসত্য উন্মুক্ত হতে আরম্ভ করে। এ সময় মানুষ সেই জগতটিকে স্পষ্ট দেখতে পায় যার খবর নবী-রসূলগণ দিয়েছিলেন। তখন সে একথাও জানতে পারে যে, আখেরাত পুরোপুরি সত্য। জীবনের এ দ্বিতীয় পর্যায়ে সে সৌভাগ্যবান হিসেবে প্রবেশ করছে, না হতভাগ্য হিসেবে, সে সত্যও সে জানতে পারে।

২৩. অর্থাৎ এটা সেই চরম সত্য যা মানতে তুমি টালবাহানা করছিলে। তুমি পৃথিবীতে বন্ধনমুক্ত বলদের মত অবাধে বিচরণ করতে চাচ্ছিলে, আরো চাচ্ছিলে মৃত্যুর পরে যেন আর কোন জীবন না থাকে যেখানে তোমাকে নিজের সমস্ত কাজ-কর্মের পরিণতি ভোগ করতে হবে। এ কারণে তুমি আখেরাতের ধ্যান-ধারণা থেকে দূরে অবস্থান করতে এবং কোন সময় এ জগত বাস্তব রূপ লাভ করবে তা কোনক্রমেই মানতে প্রস্তুত ছিলে না। এখন দেখো, সেই আরেকটি জগতই তোমার সামনে বাস্তব হয়ে দেখা দিচ্ছে।

وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ
مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴿٢٢﴾ وَقَالَ
قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ﴿٢٣﴾ اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٢٤﴾
مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبِ ﴿٢٥﴾ الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ
فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ﴿٢٦﴾ قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ
فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ
بِالْوَعِيْدِ ﴿٢٨﴾ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٢٩﴾

প্রত্যেক ব্যক্তি এমন অবস্থায় এসে হাজির হলো যে, তাদের সাথে হাঁকিয়ে নিয়ে আসার মত একজন এবং সাক্ষ দেয়ার মত একজন ছিল।[২৫] এ ব্যাপারে তুমি অজ্ঞ ছিলে। তাই তোমার সামনে যে আবরণ ছিল তা আমি সরিয়ে দিয়েছি। তাই আজ তোমার দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর।[২৬] তার সাথী বললো ঃ এতো সে হাজির আমার ওপরে যার তদারকীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।[২৭] নির্দেশ দেয়া হলো ঃ "জাহান্নামে নিক্ষেপ করো,[২৮] প্রত্যেক কট্টর কাফেরকে[২৯]—যে সত্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো, কল্যাণের প্রতিবন্ধক[৩০] ও সীমালংঘনকারী ছিল,[৩১] সন্দেহ সংশয়ে নিপতিত ছিল[৩২] এবং আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ইলাহ বানিয়ে বসেছিল। নিক্ষেপ কর তাকে কঠিন আযাবে।[৩৩] তার সহগামী আরয করলো ঃ হে প্রভু, আমি তাকে বিদ্রোহী করিনি বরং সে নিজেই চরম গোমরাহীতে ডুবে ছিল।[৩৪] জবাবে বলা হলো ঃ আমার সামনে ঝগড়া করো না। আমি আগেই তোমাদেরকে মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিলাম।[৩৫] আমার কথার কোন রদবদল হয় না।[৩৬] আর আমি আমার বান্দাদের জন্য অত্যাচারী নই।[৩৭]

২৪. এর অর্থ শিংগার ফুৎকার। এ ফুৎকারের সাথে সাথে সমস্ত মৃত লোক দৈহিক জীবন পেয়ে পুনরায় উঠে দাঁড়াবে। ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আন'আম, টীকা ৪৭; ইবরাহীম, টীকা ৫৭; ত্বাহা, টীকা ৭৮; আল হাজ্জ, টীকা ১; ইয়াসীন, টীকা ৪৬ ও ৪৭; আয্ যুমার, টীকা ৭৯।

২৫. সম্ভবত এর দ্বারা সেই দু'জন ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে যারা পৃথিবীতে ঐ ব্যক্তির সমস্ত কথা ও কাজের রেকর্ড প্রস্তুত করতে নিযুক্ত ছিল। কিয়ামতের দিন সিংগায়

ফুৎকারের আওয়াজ উত্থিত হওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেক মানুষ যখন তার কবর থেকে উঠবে তৎক্ষণাৎ উক্ত দু' ফেরেশতা এসে তাকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে নিয়ে নেবে। একজন তাকে আল্লাহ তায়ালার আদালতের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে এবং অন্যজন তার 'আমলনামা' সাথে নিয়ে যাবে।

২৬. অর্থাৎ এখন তুমি খুব ভাল করেই দেখতে পাচ্ছ যে, আল্লাহর নবী তোমাকে যে খবর দিতেন তার সব কিছুই আজকে এখানে বিদ্যমান।

২৭. মুফাস্‌সিরদের কেউ কেউ এর অর্থ বর্ণনা করেছেন এই যে, সাথী অর্থ ২১ আয়াতে বর্ণিত সাক্ষদাতা ফেরেশতা। সে বলবে ঃ এইতো এ ব্যক্তির 'আমলনামা' আমার কাছে প্রস্তুত আছে। অপর কিছু সংখ্যক মুফাস্‌সির বলেন ঃ যে শয়তান পৃথিবীতে তার সাথে অণুক্ষণ লেগেছিল সাথী অর্থ সেই শয়তান। সে বলবে, এ ব্যক্তি সে-ই যাকে আমি আমার কব্জায় রেখে জাহান্নামের জন্য প্রস্তুত করেছি এখন সে আপনার সামনে হাজির। তবে কাতাদা ও ইবনে যায়েদ থেকে উদ্ধৃত ব্যাখ্যাই এর পূর্বাপর প্রসংগের সাথে সংগতিপূর্ণ। তারা বলেন, সাথী বলতে বুঝানো হয়েছে সে ফেরেশতাকে যে তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসবে এবং সে নিজেই আল্লাহর আদালতে হাজির হয়ে আরয করবে, এ ব্যক্তি আমার তত্ত্বাবধানে ছিল। এখন সে মহান প্রভুর দরবারে হাজির।

২৮. মূল আয়াতের বাক্যাংশ হচ্ছে اَلْقِيَا فِىْ جَهَنَّمَ "তোমরা দু'জন তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো।" বক্তব্যের ধারাবাহিকতাই বলে দিচ্ছে যে, কবর থেকে উঠতেই অপরাধীকে যে দু'জন ফেরেশতা গ্রেফতার করেছিলো এবং আদালতে হাজির করেছিলো তাদের লক্ষ করে এ নির্দেশ দেয়া হবে।

২৯. মূল আয়াতে كَفَّار শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটির দু'টি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে চরম অকৃতজ্ঞ। অপরটি হচ্ছে চরম সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

৩০.আরবী ভাষায়خَيْر শব্দটি সম্পদ অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং কল্যাণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে আয়াতের অর্থ হবে, তারা নিজেদের অর্থ-সম্পদ থেকে বান্দা ও আল্লাহ কারো হকই আদায় করতো না। দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতের অর্থ হবে, তারা কল্যাণের পথ থেকে নিজেরাই যে কেবল বিরত থাকতো তাই নয়, বরং অন্যদেরকেও তা থেকে বিরত রাখতো। তারা পৃথিবীর কল্যাণের পথে বাধা হয়েছিলো। কোনভাবেই যেন কল্যাণ ও সুকৃতি বিস্তার লাভ করতে না পারে এ উদ্দেশ্যেই তারা তাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করছিলো।

৩১. অর্থাৎ নিজের প্রতিটি কাজে নৈতিকতার সীমালংঘনকারী। নিজের স্বার্থ, উদ্দেশ্যাবলী ও আশা-আকাংখ্যার জন্য যে কোন কাজ করতে সে প্রস্তুত থাকতো। হারাম পন্থায় অর্থ-সম্পদ উপার্জন করতো এবং হারাম পথেই তা ব্যয় করতো। মানুষের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতো। না তার মুখ কোন বাধ্য-বাধকতায় সীমাবদ্ধ ছিল, না তার হাত কোন প্রকার জুলুম ও বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকতো। কল্যাণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাকেই সে যথেষ্ট মনে করতো না, বরং আরো অগ্রসর হয়ে সততা ও কল্যাণের পথের অনুসারীদেরকে সে উত্যক্ত করতো এবং কল্যাণের জন্য যারা কাজ করতো তাদের ওপর নির্যাতন চালাতো।

৩২. মূল আয়াতে مريب শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটির দু'টি অর্থ। এক, সন্দেহপোষণকারী। দুই, সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপকারী। এখানে দু'টি অর্থই গ্রহণীয়। অর্থাৎ নিজেও সন্দেহের মধ্যে পতিত ছিলো এবং অন্যদের মনেও সন্দেহ সৃষ্টি করতো। তার কাছে আল্লাহ, আখেরাত, ফেরেশতা, অহী এক কথায় ইসলামের সব সত্যই ছিল সন্দেহজনক। নবী-রসূলদের পক্ষ থেকে ন্যায় ও সত্যের যে কথাই পেশ করা হতো তার ধারণায় তা বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। তাই সে আল্লাহর অন্য বান্দাদের মধ্যেও এ রোগ ছড়িয়ে বেড়াতো। সে যার সাথেই মেলামেশার সুযোগ পেতো তার অন্তরেই কোন না কোন সন্দেহ এবং কোন না কোন দ্বিধা-সংশয় সৃষ্টি করে দিতো।

৩৩. যেসব বিষয় মানুষকে জাহান্নামের উপযুক্ত বানায় এ আয়াত ক'টিতে আল্লাহ তা'আলা সেগুলো নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছেন ঃ (১) সত্যকে অস্বীকার, (২) আল্লাহর প্রতি অকৃজ্ঞতা, (৩) সত্য ও সত্যপন্থীদের সাথে শত্রুতা, (৪) কল্যাণের পথের বাধা হয়ে দাঁড়ানো, (৫) নিজের অর্থ-সম্পদ দ্বারা আল্লাহ ও বান্দার হকসমূহ আদায় না করা, (৬) নিজের আচার আচরণে সীমালংঘন করা, (৭) মানুষের ওপর জুলুম ও বাড়াবাড়ি করা, (৮) ইসলামের বিধানসমূহের সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা, (৯) অন্যদের মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা এবং (১০) প্রভুত্বে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা।

৩৪. এখানে বক্তব্যের ধরন থেকে স্বতঃই প্রকাশ পাচ্ছে যে, 'সাথী' অর্থ শয়তান—যে পৃথিবীতে তার পেছনে লেগেছিলো। বক্তব্যের ধরন থেকে একথারও ইংগিত পাওয়া যায় যে, ঐ ব্যক্তি ও তার শয়তান উভয়ে আল্লাহর আদালতে পরস্পর ঝগড়া করছে। সে বলছে, জনাব, এ জালেম আমার পেছনে লেগেছিলো এবং শেষপর্যন্ত সে-ই আমাকে পথভ্রষ্ট করে ক্ষান্ত হয়েছে। সুতরাং শাস্তি পাওয়া উচিত তার। শয়তান তার জবাবে বলছে ঃ জনাব, আমার তো তার ওপরে কোন হাত ছিল না যে, সে বিদ্রাহী হতে না চাইলেও আমি জোর করে তাকে বিদ্রাহী বানিয়ে দিয়েছি। এ দুর্ভাগার তো নিজেরই সৎকাজের প্রতি ঘৃণা এবং মন্দকাজের প্রতি আসক্তি ছিলো। তাই নবী-রসূলদের কোন কথাই তার মনোপুত হয়নি এবং আমার প্ররোচনায় সে ক্রমাগত বিপথগামী হয়েছে।

৩৫. অর্থাৎ তোমাদের দু'জনকেই আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম যে, তোমাদের মধ্যে যে অন্যকে বিভ্রান্ত করবে সে কি শাস্তি পাবে এবং যে বিভ্রান্ত হবে তাকে কি পরিণাম ভোগ করতে হবে। আমার এ সতর্কবাণী সত্ত্বেও তোমরা উভয়েই যখন অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত হওনি তখন এ মুহূর্তে ঝগড়া করে কি লাভ। এখন বিভ্রান্ত ও বিভ্রান্তকারী উভয়কে বিভ্রান্ত হওয়া ও বিভ্রান্ত করার শাস্তি অবশ্যই পেতে হবে।

৩৬. অর্থাৎ আমার কাছে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোন নিয়ম নেই। তোমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপের যে নির্দেশ আমি দিয়েছি তা এখন প্রত্যাহার করা যেতে পারে না। তা ছাড়া বিপথগামী করার ও বিপথগামী হওয়ার শাস্তি আখেরাতে কি হবে সে বিষয়ে আমি পৃথিবীতে যে নিয়মের ঘোষণা দিয়েছিলাম তাও আর এখন পরিবর্তন করা যেতে পারে না।

৩৭. মূল আয়াতে ظلام শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ চরম অত্যাচারী। একথার অর্থ এ নয় যে, আমি আমার বান্দার ব্যাপারে চরম অত্যাচারী নই বরং অত্যাচারী। এর অর্থ বরং এই যে, সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হয়ে যদি আমি আমার প্রতিপালিত সৃষ্টির ওপরে

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿٣٠﴾ وَأُزْلِفَتِ
الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٣٢﴾
مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿٣٣﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ
ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٤﴾ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾

৩ রুকূ'

সেদিনের কথা স্মরণ করো, যখন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবো যে, তোমার পেট কি ভরেছে? সে বলবে, "আরো কিছু আছে না কি?"[৩৮] আর বেহেশতকে আল্লাহভীরুদের নিকটতর করা হবে—তা মোটেই দূরে থাকবে না।[৩৯] তখন বলা হবে ঃ এ হচ্ছে সেই জিনিস, যার কথা তোমাদেরকে আগাম জানানো হতো। এটা প্রত্যেক প্রত্যাবর্তনকারী[৪০] ও সংরক্ষণকারীর[৪১] জন্য, যে অদেখা দয়াময়কে ভয় করতো,[৪২] যে অনুরক্ত হৃদয় নিয়ে এসেছে।[৪৩] বেহেশতে ঢুকে পড় শান্তির সাথে।[৪৪] সেদিন অনন্ত জীবনের দিন হবে। সেখানে তাদের জন্য যা চাইবে তাই থাকবে। আর আমার কাছে আরো কিছু অতিরিক্ত জিনিসও থাকবে।[৪৫]

জুলুম করি সে ক্ষেত্রে আমি হবো চরম জালেম। তাই আমি আমার বান্দার ওপরে আদৌ কোন জুলুম করি না। যে শাস্তি তোমাকে আমি দিচ্ছি তা ঠিক ততখানি যার উপযুক্ত তুমি নিজেই নিজেকে বানিয়েছো। তোমার প্রাপ্য শাস্তির চাইতে সামান্য অধিক শাস্তিও তোমাকে দেয়া হচ্ছে না। আমার আদালত নির্ভেজাল ও পক্ষপাতহীন ইনসাফের আদালত। কোন ব্যক্তি এখানে এমন কোন শাস্তি পেতে পারে না আসলেই সে যার উপযুক্ত নয় এবং নিশ্চিত সাক্ষ দ্বারা যা প্রমাণ করা হয়নি।

৩৮. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, এখন আমার মধ্যে আর অধিক মানুষের স্থান সংকুলানের অবকাশ নেই। অপরটি হচ্ছে আরো যত অপরাধী আছে তাদের নিয়ে আসুন। প্রথম অর্থ গ্রহণ করলে একথা থেকে যে ধারণা পাওয়া যায় তাহলো অপরাধীদেরকে এমন গাদাগাদি করে জাহান্নামে ভরা হয়েছে যে, সেখানে একটি সুঁচ পরিমাণ স্থানও আর অবশিষ্ট নেই। তাই জাহান্নামকে যখন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তোমার উদর কি পূর্ণ হয়েছে? তখন সে বিব্রত হয়ে জবাব দিচ্ছে এখনো কি আরো মানুষ আছে? দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করলে মনে এরূপ একটি ধারণা সৃষ্টি হয় যে, সে সময় জাহান্নাম অপরাধীদের প্রতি এমন ভীষণভাবে রুষ্ট থাকবে যে, সে 'আরো কেউ আছে কি' বলে চাইতে থাকবে এবং সেদিন যেন কোন অপরাধী রেহাই না পায় তাই কামনা করবে।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহ তা'আলার এ প্রশ্ন এবং জাহান্নামের এ জবাবের ধরন কি হবে? এটা কি শুধু রূপক বর্ণনা? না কি বাস্তবে জাহান্নাম প্রাণ সত্তাধারী বাকশক্তিসম্পন্ন কোন বস্তু যাকে সম্বোধন করা যেতে পারে এবং সে-ও কথার জবাব দিতে পারে? প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে অকাট্যভাবে কোন কিছু বলা যেতে পারে না। হতে পারে এটা একটা রূপক কথা। পরিস্থিতির সঠিক চিত্র তুলে ধরার জন্য প্রশ্নোত্তর আকারে জাহান্নামের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন কোন লোক যদি বলে, আমি গাড়ীকে বললাম তুমি চলছো না কেন? সে জবাব দিল; আমার মধ্যে পেট্রোল নেই। তবে এটাও পুরোপুরি সম্ভব যে, কথাটি বাস্তব ভিত্তিকই হবে। কারণ, পৃথিবীর যেসব জিনিস আমাদের কাছে অচেতন জড় পদার্থ এবং বাকশক্তিহীন সেসব জিনিস সম্পর্কে আমাদের এ ধারণা পোষণ করা ঠিক নয় যে, তা আল্লাহর কাছেও অবশ্যই তদ্রূপ অচেতন জড় ও বাকশক্তিহীন পদার্থ হবে। স্রষ্টা তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির সাথে কথা বলতে পারেন এবং তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি তাঁর কথার জবাবও দিতে পারে। তার ভাষা আমাদের কাছে যতই দুর্বোধ্য হোক না কেন?

৩৯. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আদালতে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে যেই মাত্র ফায়সালা হবে যে, সে মুত্তাকী এবং জান্নাতলাভের উপযুক্ত, তৎক্ষণাত সে তার সামনে জান্নাতকে বিদ্যমান পাবে। জান্নাত পর্যন্ত পৌছার জন্য তাকে কোন দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে না যে, তাকে পায়ে হেঁটে কিংবা কোন বাহনে বসে ভ্রমণ করে সেখানে পৌছতে হবে তাই ফায়সালার সময় ও জান্নাতে প্রবেশের সময়ের মধ্যে কিছু সময়ের ব্যবধান থাকবে। বরং একদিকে ফায়সালা হবে অন্যদিকে সে তখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেন তাকে জান্নাতে পৌছানো হয়নি, জান্নাতকেই উঠিয়ে তার কাছে নিয়ে আসা হয়েছে। এ থেকেই অনুমান করা যায় যে, আখেরাতের স্থান ও কালের ধারণা আমাদের এ পৃথিবীর স্থান ও কালের ধারণা থেকে কতটা ভিন্ন হবে। দ্রুততা ও বিলম্ব এবং দূর ও নিকট সম্পর্কে এ পৃথিবীতে আমাদের যে জ্ঞান আছে সেখানে তা সবই অর্থহীন হবে।

৪০. মূল আয়াতে أَوَّاب শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা অনেক ব্যাপক অর্থবহ। এর অর্থ এমন ব্যক্তি যে নাফরমানী এবং প্রবৃত্তির আকাংখা চরিতার্থ করার পথ পরিহার করে আনুগত্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ অবলম্বন করেছে, যে আল্লাহর পছন্দ নয় এমন প্রতিটি জিনিস পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহ যা পছন্দ করে তা গ্রহণ করে, বন্দেগীর পথ থেকে পা সামান্য বিচ্যুত হলেই যে বিচলিত বোধ করে এবং তাওবা করে বন্দেগীর পথে ফিরে আসে, যে অধিক মাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের সমস্ত ব্যাপারে তাঁর স্মরণাপন্ন হয়।

৪১. মূল আয়াতে حفيظ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ "রক্ষাকারী"। এর দ্বারা এমন লোককে বুঝানো হয়েছে যে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, তাঁর ফরযসমূহ, হারামসমূহ এবং তার দায়িত্বে ন্যস্ত আমানতসমূহ রক্ষা করে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপর আরোপিত অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করে, যে ঈমান এনে তার রবের সাথে যে চুক্তি ও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে তা রক্ষা করে, যে তার শক্তি, শ্রম ও চেষ্টা-সাধনার পাহারাদারি করে যাতে এসবের কোনটি ভ্রান্ত কাজে নষ্ট না হয়, যে তাওবা করে তা রক্ষা

করে এবং তা ভঙ্গ হতে দেয় না, যে সর্বাবস্থায় আত্মসমালোচনা করে দেখতে থাকে যে, সে তার কথায় ও কাজে কোথাও তার রবের নাফরমানী তো করছে না?

৪২. অর্থাৎ সে কোথাও রহমান বা পরম দয়ালু আল্লাহর দেখা পেতো না এবং নিজের ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারাও কোনভাবেই তাঁকে অনুভব করতে পারতো না। তা সত্ত্বেও তাঁর নাফরমানী করতে সে ভয় পেতো। অন্যান্য অনুভূত শক্তি এবং প্রকাশ্যে দৃষ্টিগোচর হয় এমন সব শক্তি ও সত্তার তুলনায় তার মনে অদেখা রহমানের ভয় অধিক প্রবল ছিল। তিনি 'রহমান' বা দয়ালু একথা জানা সত্ত্বেও তাঁর রহমতের ভরসায় সে গোনাহর কাজে লিপ্ত হয়নি, বরং সবসময়ই তাঁর অসন্তুষ্টিকে ভয় পেয়েছে। এভাবে আয়াতটি ঈমানদার ব্যক্তির দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গুণের প্রতি ইংগিত করে। একটি হচ্ছে, অনুভূত ও দৃষ্টিগোচর না হওয়া সত্ত্বেও সে আল্লাহকে ভয় করে। অপরটি হচ্ছে, সে আল্লাহর রহমত গুণটি সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও গোনাহ করার দুঃসাহস করে না। এ দু'টি গুণই তাকে আল্লাহর কাছে মর্যাদার অধিকারী করে তোলে। তাছাড়াও এ আয়াতের মধ্যে আরো একটি সূক্ষ্ম বিষয়ও আছে যা ইমাম রাযী বর্ণনা করেছেন। বিষয়টি হচ্ছে, আরবী ভাষায় ভয় বুঝাতে خوف ও خشيت এ দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়। এ দু'টি শব্দের অর্থে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। خوف শব্দটি সাধারণত এমন ভয় বুঝাতে ব্যবহৃত হয় যা কারো শক্তির সামনে নিজের দুর্বলতার অনুভূতির কারণে নিজের মধ্যে সৃষ্টি হয়। আর خشيت বলা হয় এমন ভীষণ ভয়কে যা কারো বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা থেকে মানুষের মনে সৃষ্টি হয়। এখানে خوف এর পরিবর্তে خشيت শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবে বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, শুধু শাস্তির আশংকায়ই মু'মিন বান্দার অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয় না। তার চেয়েও বড় জিনিস অর্থাৎ আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব ও মর্যাদার অনুভূতি সবসময় তার মনে এক ভয়ানক ভীতিভাব জাগিয়ে রাখে।

৪৩. মূল কথাটি হচ্ছে قلب منيب নিয়ে এসেছে। منيب শব্দটির উৎপত্তি انابت থেকে যার অর্থ একদিকে মুখ করা এবং বারবার সেদিকেই ফিরে যাওয়া। যেমন কম্পাসের কাঁটা সবসময় মেরুর দিকেই মুখ করে থাকে। আপনি তাকে যতই নাড়া চাড়া বা ঝাঁকুনি দেন না কেন তা ঘুরে ফিরে মেরুর দিকে চলে আসে। অতএব قلب منيب অর্থ এমন হৃদয়-মন যা সব দিক থেকে এক আল্লাহর দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। অতপর সারা জীবন তার ওপর যে পরিস্থিতিই আসুক না কেন তাতে সে বার বার তাঁর দিকেই ফিরে এসেছে। এ বিষয়টাকেই আমরা "অনুরক্ত মন" কথাটি দিয়ে ব্যক্ত করেছি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর কাছে প্রকৃত সম্মানের অধিকারী সে ব্যক্তি যে শুধু মুখে নয় বরং পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে সরল মনে তাঁর একান্ত আপনজন হয়ে যায়।

৪৪. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ । سَلَامٌ শব্দটিকে যদি নিরাপত্তা অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে তার অর্থ হবে, সব রকম দুঃখ, দুশ্চিন্তা, চিন্তা ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ হয়ে এ জান্নাতে প্রবেশ করো। তবে যদি শান্তি অর্থেই গ্রহণ করা হয় তাহলে অর্থ হবে, এ জান্নাতে এসো, আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে তোমাকে সালাম।

যে গুণাবলী থাকলে কোন ব্যক্তি জান্নাতলাভের উপযুক্ত হয় এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সে গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। ঐগুলো হচ্ছে ঃ (১) তাকওয়া, (২) আল্লাহর

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ ۖ
هَلْ مِن مَّحِيصٍ ﴿٣٦﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى
السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴿٣٨﴾ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ
فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴿٤٠﴾

আমি তাদের আগে আরো বহু জাতিকে ধ্বংস করেছি। তারা ওদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিধর ছিল এবং তারা সারা দুনিয়ার দেশগুলো তন্ন তন্ন করে ঘুরেছে।[৪৬] অথচ তারা কি কোন আশ্রয়স্থল পেলো?[৪৭] যাদের হৃদয় আছে কিংবা যারা একাগ্র চিত্তে কথা শোনে[৪৮] তাদের জন্য এ ইতিহাসে অনেক শিক্ষা রয়েছে।

আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যকার সকল জিনিসকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি।[৪৯] অথচ তাতে আমি ক্লান্ত হইনি। কাজেই তারা যেসব কথা তৈরী করছে তার ওপর ধৈর্যধারণ করো।[৫০] আর স্বীয় প্রভুর প্রশংসা সহকারে গুণগান করতে থাকো সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগে, আবার রাতে পুনরায় তার গুণগান করো এবং সিজদা দেয়ার পরেও করো।[৫১]

দিকে প্রত্যাবর্তন, (৩) আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্কের সযত্ন পাহারাদারী, (৪) আল্লাহকে না দেখে এবং তাঁর ক্ষমা পরায়ণতায় বিশ্বাসী হয়েও তাঁকে ভয় করা এবং (৫) অনুরক্ত হৃদয়-মন নিয়ে আল্লাহর কাছে পৌছা অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত অনুরক্ত থাকার আচরণ করে যাওয়া।

৪৫. অর্থাৎ তারা যা চাইবে তাতো পাবেই। কিন্তু আমি তাদেরকে আরো এমন কিছু দেব যা পাওয়ার আকাংখা পোষণ করা তো দূরের কথা তাদের মন-মগজে তার কল্পনা পর্যন্ত উদিত হয়নি।

৪৬. অর্থাৎ তারা শুধু নিজেদের দেশেই শক্তিমান ছিল না পৃথিবীর অন্য অনেক দেশেও প্রবেশ করে দখল জমিয়েছিলো এবং ভূপৃষ্ঠের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তাদের লুট-তরাজের অপকর্ম বিস্তার লাভ করেছিলো।

৪৭. অর্থাৎ যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে পাকড়াও করার সময় সমুপস্থিত হলো তখন কি তাদের শক্তি তাদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলো? পৃথিবীতে কোথাও

কি তারা আশ্রয় লাভ করেছিলো? তাহলে কোন্ ভরসায় তোমরা এ আশা পোষণ করো যে, আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তোমরা কোথাও আশ্রয় পেয়ে যাবে?

৪৮. অন্য কথায় যাদের নিজেদের অন্তত এতটুকু বিবেক-বুদ্ধি আছে যে সঠিক চিন্তা করতে পারে কিংবা উদাসীনতা ও পক্ষপাত থেকে এতটা পবিত্র ও মুক্ত যে, যখন অন্য কেউ তাকে প্রকৃত সত্য বুঝায় তখন একাগ্রভাবে তার কথা শোনো। এমনভাবে নয় যে, শ্রোতার মন-মগজ অন্য দিকে ব্যস্ত থাকায় উপদেশদাতার কথা কানের পর্দার ওপর দিয়েই চলে যায়।

৪৯. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা হা-মীম আস সাজদার তাফসীর, টীকা ১১ থেকে ১৫ পর্যন্ত।

৫০. অর্থাৎ প্রকৃত ব্যাপার হলো, আমি গোটা এ বিশ্ব-জাহান মাত্র ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং তা সৃষ্টি করে আমি ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়িনি যে, পুনরায় তা সৃষ্টি করার সাধ্য আর আমার নেই। এখন এসব নির্বোধরা যদি তোমার কাছে মৃত্যুর পরের জীবনের খবর শুনে তোমাকে বিদ্রূপ করে এবং পাগল বলে আখ্যায়িত করে তাহলে ধৈর্য অবলম্বন করো। ঠাণ্ডা মাথায় এদের প্রতিটি অর্থহীন কথা শোন এবং তোমাকে যে সত্যটি পেশ করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে তা পেশ করতে থাকো।

এ আয়াতে আনুষঙ্গিকভাবে ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি একটি সূক্ষ্ম বিদ্রূপও প্রচ্ছন্ন আছে। কারণ, ইহুদী ও খৃষ্টানদের বাইবেলে এ কল্পকাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ছয় দিনে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছেন (আদিপুস্তক, ২ঃ২)। বর্তমানে যদিও খৃষ্টান পাদরীরা এতে লজ্জাবোধ করতে শুরু করেছে এবং তারা পবিত্র বাইবেলের উর্দূ অনুবাদে 'বিশ্রাম নিয়েছেন'কে 'বিরত হয়েছেন' কথায় পরিবর্তন করেছে। তা সত্ত্বেও কিং জেমসের নির্ভরযোগ্য ইংরেজী বাইবেলে (And he rested on seventh day) কথাটি স্পষ্ট বর্তমান আছে। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ইহুদীরা ফিলাডেলফিয়া থেকে যে অনুবাদ প্রকাশ করেছে তাতেও একথাটি আছে। আরবী অনুবাদেও فاستراح فى اليوم السابع কথাটি আছে।

৫১. এটাই সেই পন্থা যার মাধ্যমে মানুষ ন্যায় ও সত্যের জন্য আন্দোলনে মর্মান্তিক ও নিদারুণ পরিস্থিতির মোকাবিলা করার এবং নিজের চেষ্টা-সাধনার সুফল অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সারা জীবন ন্যায় ও সত্যের বাণী সমুন্নত করার এবং পৃথিবীকে কল্যাণের পথে আহবান জানানোর ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার শক্তি অর্জন করতে পারে। এখানে রবের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করা অর্থ নামায। কুরআন মজীদের যেখানেই প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করাকে নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পর্কিত করে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেই এর অর্থ হয়ে থাকে নামায। "সূর্যোদয়ের পূর্বে" ফজরের নামায। "সূর্যাস্তের পূর্বে দু'টি নামায আছে। একটি যোহরের নামায এবং অপরটি আসরের নামায" রাতে আছে মাগরিব ও এশার। তাছাড়া তৃতীয় আরেকটি নামায হিসেবে তাহাজ্জুদের নামাযও রাতের তাসবীহর অন্তরভুক্ত। ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, সূরা বানী ইসরাঈল, টীকা ৯১ থেকে ৯৭ পর্যন্ত। ত্বাহা, টীকা ১১১; আর রূম, টীকা ২৩ ও ২৪। তাছাড়া সিজদা শেষ করার পরে যে তাসবীহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার অর্থ

নামাযের পরের যিকরও হতে পারে এবং ফরযের পরে নফল নামায আদায় করাও হতে পারে। হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত হাসান ইবনে আলী, হযরত আবু হুরাইরা, ইবনে আব্বাস, শা'বী, মুজাহিদ, ইকরিমা, হাসান বাসরী, কাতাদা, ইবরাহীম নাখয়ী' ও আওযায়ী এর অর্থ বলেছেন মাগরিবের পরের দু' রাকআত নামায। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস এবং অপর একটি রেওয়ায়াত অনুসারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ধারণাও এই যে, এর অর্থ নামাযের পরের যিকর। ইবনে যায়েদ বলেন, একথার উদ্দেশ্য হচ্ছে ফরযের পরেও নফল আদায় করা হোক।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার গরীব মুহাজিররা এসে বললো হে আল্লাহর রাসূল, বড় বড় মর্যাদা তো বিত্তবান লোকেরাই লুফে নিল। নবী (সা) বললেন ঃ কি হয়েছে? তারা বললো ঃ আমরা যেমন নামায পড়ি বিত্তবান লোকেরাও তেমনি নামায পড়ে। আমরা যেমন রোযা রাখি তারাও তেমনি রোযা রাখে। কিন্তু তারা দান করে আমরা দান করতে পারি না এবং তারা ক্রীতদাস মুক্ত করে আমরা করতে পারি না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমি কি তোমাদের এমন কাজ বলে দেব, যা করলে তোমরা অন্য লোকদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যাবে? তবে যারা সে কাজটিও করবে তাদেরকে বাদ দিয়ে। সে কাজটি হচ্ছে তোমরা প্রত্যেক নামাযের পরে ৩৩ বার করে 'সুবহানাল্লাহ' 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার' বলো। কিছুদিন পরে তারা এসে বললো, এ আমলের কথা আমাদের বিত্তবান ভাইয়েরাও শুনেছে এবং তারাও এ আমল করতে শুরু করেছে। একথা শুনে তিনি বললেন ঃ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء । একটি রেওয়ায়াতে এ তাসবীহর সংখ্যা ৩৩ বারের পরিবর্তে দশবার করে পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে প্রত্যেক নামাযের পরে ৩৩ বার করে সুবহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়তে বলেছিলেন। পরে এক আনসারী বলেছিলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি কেউ যেন আমাকে বলছে যদি তুমি এ তিনটি তাসবীহ ২৫ বার করে পড় এবং তারপর ২৫ বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড় তাহলে অধিক উত্তম হবে। নবী (সা) বললেন ঃ ঠিক আছে, সেভাবেই করতে থাকো। (আহমাদ, নাসায়ী, দারেমী)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শেষ করে বসতেন তখন আমি তাঁকে এ দোয়া পড়তে শুনতাম ঃ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (احكام القران للجصاص)

এ ছাড়াও নামাযের পরবর্তী যিকরের আরো কতিপয় পন্থা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। যারা কুরআন মজীদের এ নির্দেশনা অনুসারে আমল করতে ইচ্ছুক তারা যেন হাদীসগ্রন্থ মিশকাতের আয যিকর বা'দাস সালাত অনুচ্ছেদ থেকে নিজের সবচেয়ে মনমত একটি দোয়া বেছে নেয় এবং সেটি আমল করে।

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ
بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿٤٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا
الْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٤﴾
نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ۖ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ
مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٤٥﴾

আর শোনো যেদিন আহবানকারী (প্রত্যেক মানুষের) নিকট স্থান থেকে আহবান করবে,[৫২] যেদিন সকলে হাশরের কোলাহল ঠিকমত শুনতে পাবে,[৫৩] সেদিনটি হবে কবর থেকে মৃতদের বেরুবার দিন। আমিই জীবন দান করি, আমিই মৃত্যু ঘটাই। এবং আমার কাছেই সবাইকে ফিরে আসতে হবে সেদিন—যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হবে, এবং লোকেরা তার ভেতর থেকে বেরিয়ে জোর কদমে ছুটতে থাকবে, এরূপ হাশর সংঘটিত করা আমার নিকট খুবই সহজ।[৫৪] হে নবী ! ওরা যেসব কথা বলে, তা আমি ভালো করেই জানি,[৫৫] বস্তুত তাদের কাছ থেকে বলপ্রয়োগে আনুগত্য আদায় করা তোমার কাজ নয়। কাজেই তুমি এ কুরআন দ্বারা আমার হুশিয়ারীকে যারা ডরায়, তাদেরকে তুমি উপদেশ দাও।[৫৬]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের বর্ণিত দোয়ার চাইতে ভাল দোয়া আর কি হতে পারে? তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, দোয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট কিছু শব্দ মুখে উচ্চারণ করাই নয়। বরং ঐ সব শব্দে যে অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে মন-মগজে তা দৃঢ় ও বদ্ধমূল করা। তাই যে দোয়াই করা হোক না কেন ভাল করে তার অর্থ বুঝে নিতে হবে এবং তা মনে রেখেই দোয়া পড়তে হবে।

৫২. অর্থাৎ যেখানেই যে ব্যক্তি মরে পড়ে থাকবে কিংবা পৃথিবীতে যেখানেই তার মৃত্যু সংঘটিত হয়েছিল সেখানেই তার কাছে আল্লাহর ঘোষকের এ আওয়াজ পৌছবে যে, উঠ এবং তোমার রবের কাছে হিসেব দেয়ার জন্য চলো। এ আওয়াজ হবে এমন যে, ভূপৃষ্ঠের আনাচে-কানাচে যেখানেই যে ব্যক্তি জীবিত হয়ে উঠবে সেখানেই সে মনে করবে যে, আহবানকারী নিকটেই কোথাও থেকে তাকে আহবান করেছে। একই সময়ে গোটা পৃথিবীর সব জায়গায় সমানভাবে এ আওয়াজ শোনা যাবে। এ থেকেও কিছুটা অনুমান করা যায় যে, আখিরাতের স্থান ও কাল বর্তমানে আমাদের এ পৃথিবীর স্থান ও কালের তুলনায় কতটা পরিবর্তিত হবে এবং সেখানে কেমন সব শক্তি কি ধরনের আইনানুসারে তৎপর ও সক্রিয় থাকবে।

৫৩. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ । এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, সমস্ত মানুষই মহাসত্য সম্পর্কিত আহবান শুনতে পাবে। অপর অর্থটি হচ্ছে হাশরের কলরব ঠিকমতই শুনতে পাবে। প্রথম অর্থ অনুসারে বক্তব্যের সারমর্ম দাঁড়ায়, মানুষ নিজ কানে সেই মহাসত্যের আহবান শুনতে পাবে যা তারা পৃথিবীতে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না, যা অস্বীকার করতে তাদের ছিল চরম একগুঁয়েমী এবং যার সংবাদদাতা নবী–রসূলদের তারা বিদ্রূপ করতো। দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে এর প্রতিপাদ্য বিষয় দাঁড়ায় এই যে, নিশ্চিতভাবেই তারা হাশরের কলরব–কোলাহল শুনবে, তারা নিজেরাই জানতে পারবে, এটা কোন কাল্পনিক বিষয় নয়, বরং প্রকৃতই হাশরের কলরব–কোলাহল। ইতিপূর্বে তদেরকে যে হাশরের খবর দেয়া হয়েছিলো তা যে সত্যিই এসে হাজির হয়েছে এবং এই যে তারই শোরগোল উত্থিত হচ্ছে সে ব্যাপারে তাদের কোন সন্দেহই থাকবে না।

৫৪. তিন নম্বর আয়াতে কাফেরদের যে কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে এটা তারই জবাব। তারা বলতো, আমরা যখন মরে মাটিতে মিশে যাবো তখন আমাদেরকে আবার জীবিত করে উঠানো হবে তা কি করে হতে পারে! এভাবে পুনরুত্থান তো অসম্ভব ও অযৌক্তিক। তাদের এ বক্তব্যের জবাবে বলা হয়েছে, এ হাশর অর্থাৎ একই সময়ে আগের ও পরের সমস্ত মানুষকে জীবিত করে একত্রিত করা আমার জন্য একেবারেই সহজ। কোন ব্যক্তির মাটি কোথায় পড়ে আছে তা জানা আমার জন্য আদৌ কোন কঠিন ব্যাপার নয়। এসব বিক্ষিপ্ত অণু–পরমাণুর মধ্যে কোন্‌গুলো যায়েদের আর কোন্‌গুলো বকরের তা জানতেও আমার কোন কষ্ট হবে না। এসব অণু–পরমাণুকে আলাদাভাবে একত্রিত করে একেকজন মানুষের দেহ পুনরায় তৈরী করা এবং ঐ দেহে হুবহু আগের ব্যক্তিত্ব নতুনভাবে সৃষ্টি করে দেয়া আমার জন্য কোন শ্রমসাধ্য ব্যাপার নয়, বরং আমার একটি মাত্র ইংগিতেই তৎক্ষণাৎ তা হতে পারে। আদমের সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষ সৃষ্টি হয়েছে আমার একটি মাত্র আদেশে তারা সবাই অতি সহজে সমবেত হতে পারে। তোমাদের অতি ক্ষুদ্র বুদ্ধি–বিবেক একে অসম্ভব মনে করলে মনে করুক। বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টার ক্ষমতার কাছে তা অসম্ভব নয়।

৫৫. এ আয়াতাংশে যুগপৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য সান্ত্বনা এবং কাফেরদের জন্য হুমকি বিদ্যমান। নবীকে (সা) উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে যে, এসব লোক তোমার বিরুদ্ধে যেসব মিথ্যা রটনা করছে মোটেই তার পরোয়া করো না। আমি সবকিছু শুনছি। তাদের সাথে বুঝা পড়া করা আমার কাজ। কাফেরদের হুঁশিয়ার করে দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা আমার নবীর বিরুদ্ধে যেসব বিদ্রূপাত্মক উক্তি করছো সে জন্য তোমাদেরকে অনেক মূল্য দিতে হবে। আমি নিজে প্রতিটি কথা শুনছি। তোমাদেরকে তার মাশুল দিতে হবে।

৫৬. এর অর্থ এ নয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জোর করে নিজের কথা মানুষকে মানাতে চাইতেন কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা থেকে তাঁকে বিরত রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে নবীকে (সা) সম্বোধন করে কাফেরদের একথা শুনানো হচ্ছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, তোমাদের কাছে আমার নবীকে শক্তি প্রয়োগকারী করে পাঠানো হয়নি। তোমাদেরকে জোর করে মু'মিন বানানো তার কাজ নয় যে, তোমরা মানতে না চাইলেও

তিনি তোমাদেরকে তা মানতে বাধ্য করবেন। তাঁর দায়িত্ব কেবল এতটুকু যে, সাবধান করে দিলে যারা সতর্ক হয়ে যাবে তিনি তাদেরকে কুরআন শুনিয়ে প্রকৃত সত্য বুঝিয়ে দেবেন। এরপরও যদি তোমরা না মানো তাহলে নবী তোমাদের সাথে বুঝাপড়া করবেন না, বরং আমি নিজে তোমাদের সাথে বুঝাপড়া করবো।

আয যারিয়াত

৫১

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ والذاريات থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যা الذاريات শব্দ দ্বারা শুরু হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গী থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসলামী আন্দোলনের মোকাবিলা অস্বীকৃতি, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও মিথ্যা অভিযোগ আরোপের মাধ্যমে অত্যন্ত জোরে শোরেই করা হচ্ছিলো ঠিকই কিন্তু তখনো জুলুম ও নিষ্ঠুরতার যাঁতাকলে নিষ্পেষণ শুরু হয়নি, ঠিক সেই যুগে এ সূরাটি নাযিল হয়েছিলো। এ কারণে যে যুগে সূরা ক্বাফ নাযিল হয়েছিলো এটিও সে যুগের নাযিল হওয়া সূরা বলে প্রতীয়মান হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর অধিকাংশটাই জুড়ে আছে আখেরাত সম্পর্কিত আলোচনা এবং শেষভাগে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করা হয়েছে। সাথে সাথে মানুষকে এ বিষয়েও হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে যে, নবী-রসূলদের (আ) কথা না মানা এবং নিজেদের জাহেলী ধ্যান-ধারণা আকড়ে ধরে একগুঁয়েমি করা সেসব জাতির নিজেদের জন্যই ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়েছে যারা এ নীতি অবলম্বন করেছিলো।

এ সূরার ছোট ছোট কিন্তু অত্যন্ত অর্থপূর্ণ আয়াতসমূহে আখেরাত সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, মানব জীবনের পরিণাম ও পরিণতি সম্পর্কে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করে। এটাই প্রমাণ করে যে, এসব আকীদা-বিশ্বাসের কোনটিই জ্ঞানগত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রত্যেকেই নিজের অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে নিজনিজ অবস্থানে যে মতবাদ গড়ে নিয়েছে সেটাকেই সে তার আকীদা-বিশ্বাস বানিয়ে আঁকড়ে ধরেছে। কেউ মনে করে নিয়েছে, মৃত্যুর পরে কোন জীবন হবে না। কেউ আখেরাত মানলেও জন্মান্তর বাদের ধারণা সহ মেনেছে। কেউ আখেরাতের জীবন এবং পুরস্কার ও শাস্তির কথা বিশ্বাস করলেও কর্মের প্রতিফল থেকে বাঁচার জন্য নানা রকমের সহায় ও অবলম্বন কল্পনা করে নিয়েছে। যে বিষয়ে ব্যক্তির সিদ্ধান্ত ভুল হলে তার গোটা জীবনকেই ব্যর্থ এবং চিরদিনের জন্য তার ভবিষ্যতকে ধ্বংস

করে দেয় এমন একটি বড় ও সর্বাধিক গুরুত্ববহ মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান ছাড়া শুধু অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে কোন আকীদা-বিশ্বাস গড়ে নেয়া একটি সর্বনাশা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। এর অর্থ হলো, মানুষ একটি বড় ভ্রান্তিতে ডুবে থেকে গোটা জীবন জাহেলী ঔদাসীন্যে কাটিয়ে দেবে এবং মৃত্যুর পর হঠাৎ এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে যার জন্য সে আদৌ প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি। এরূপ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটিই মাত্র পথ আছে, তা হচ্ছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবী আখেরাত সম্পর্কে যে জ্ঞান দান করছেন সে বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ধীর মস্তিষ্কে গভীরভাবে ভেবে দেখবে এবং আসমান ও যমীনের ব্যবস্থাপনা এবং নিজের সত্তা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে উন্মুক্ত চোখে দেখবে যে, চার পাশে সেই জ্ঞানটির যথার্থতার স্বপক্ষে প্রমাণ বিদ্যমান আছে কিনা? এ ক্ষেত্রে বাতাস ও বৃষ্টির ব্যবস্থাপনা, পৃথিবীর গঠনাকৃতি এবং তার সৃষ্টিকূল, মানুষ নিজে, আসমানের সৃষ্টি এবং পৃথিবীর সকল বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করাকে আখেরাতের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে এবং মানবেতিহাস থেকে উদাহরণ পেশ করে বলা হয়েছে যে, একটা কর্মফল ব্যবস্থা থাকা যে অত্যাবশ্যক এটা এ বিশ্ব-সাম্রাজ্যের স্বভাব-প্রকৃতির স্বতস্ফূর্ত দাবী বলেই প্রতীয়মান হয়।

এরপর অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করে বলা হয়েছে তোমাদের স্রষ্টা তোমাদেরকে অন্যদের বন্দেগী ও দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেননি, বরং নিজের বন্দেগী ও দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের মিথ্যা উপাস্যদের মত নন। তোমাদের মিথ্যা উপাস্যরা তোমাদের থেকে রিযিক গ্রহণ করে এবং তোমাদের সাহায্য ছাড়া তাদের প্রভুত্ব অচল। তিনি এমন উপাস্য যিনি সবার রিযিকদাতা। তিনি কারো নিকট থেকে রিযিক গ্রহণের মুখাপেক্ষী নন এবং নিজ ক্ষমতাবলেই তার প্রভুত্ব চলছে।

এ প্রসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, যখনই নবী-রসূলদের বিরোধিতা করা হয়েছে, তা যুক্তির ভিত্তিতে না করে একগুঁয়েমি, হঠকারিতা এবং জাহেলী অহংকারের ভিত্তিতে করা হয়েছে। ঠিক যেমনটি আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে করা হচ্ছে। অথচ এর উৎস ও চালিকা শক্তি বিদ্রোহাত্মক মনোভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। অতপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন তিনি এসব বিদ্রোহীদের আদৌ ভ্রূক্ষেপ না করেন এবং নিজের দাওয়াত ও নসীহতের কাজ চালিয়ে যান। কারণ, তা এ লোকদের কোন উপকারে না আসলেও ঈমানদারদের জন্য অবশ্যই উপকারে আসবে। কিন্তু যেসব জালেম তাদের বিদ্রোহের ওপর অটল তাদের প্রাপ্য শাস্তি প্রস্তুত হয়ে আছে। কারণ, তাদের পূর্বে এ নীতি ও আচরণ অবলম্বনকারী জালেমরাও তাদের প্রাপ্য আযাব পুরোপুরি লাভ করেছে।

আয়াত ৬০ **সূরা আয যারিয়াত–মক্কী** রুকূ' ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ۝١ فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ۝٢ فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ۝٣ فَالْمُقَسِّمٰتِ
أَمْرًا ۝٤ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۝٥ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ۝٦ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ
الْحُبُكِ ۝٧ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ۝٨ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ۝٩

শপথ সে বাতাসের যা ধূলাবালি উড়ায়। আবার পানি ভরা মেঘরাশি বয়ে নিয়ে যায়[১] তারপর ধীর মৃদুমন্দ গতিতে বয়ে যায়। অতপর একটি বড় জিনিস (বৃষ্টি) বন্টন করে।[২] প্রকৃত ব্যাপার হলো, তোমাদেরকে যে জিনিসের ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে[৩] তা সত্য। কর্মফল প্রদানের সময় অবশ্যই আসবে।[৪]

শপথ বিবিধ আকৃতি ধারণকারী আসমানের।[৫] (আখেরাত সম্পর্কে) তোমাদের কথা পরস্পর ভিন্ন।[৬] তার ব্যাপারে সে–ই বিরক্ত যে হকের প্রতি বিমুখ।[৭]

১. এ ব্যাপারে সমস্ত তাফসীরকার একমত যে, الذاريات অর্থ বিক্ষিপ্তকারী ও ধূলাবালি ছড়ানো বাতাস এবং الحملت وقرا (ভারী বোঝা বহনকারী) অর্থ সেই বাতাস যা সমুদ্র থেকে লক্ষ কোটি গ্যালন বাষ্প মেঘের আকারে বহন করে আনে। হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, হাসান বাসরী, কাতাদা ও সুদ্দী প্রমুখ মুফাস্‌সিরগণের থেকে বর্ণিত হয়েছে।

২. اَلْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ও اَلْجَارِيَاتِ يُسْرًا এর ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ এ কথাটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন বা এ অর্থ গ্রহণ করা জায়েয মনে করেছেন যে, এ দু'টি বাক্যাংশের অর্থও বাতাস। অর্থাৎ এ বাতাসই আবার মেঘমালা বহন করে নিয়ে যায় এবং ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহর নির্দেশানুসারে যেখানে যতটুকু বর্ষণের নির্দেশ দেয়া হয় ততটুকু পানি বন্টন করে। আরেক দল اَلْجَارِيَاتِ يُسْرًا আয়াতাংশের অর্থ করেছেন দ্রুতগতিশীল নৌকাসমূহ এবং اَلْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا অর্থ করেছেন সেসব ফেরেশতা যারা আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাঁর সমস্ত সৃষ্টির জন্য বরাদ্দকৃত জিনিস তাদের মধ্যে বন্টন করে। একটি রেওয়ায়াত অনুসারে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ দু'টি আয়াতাংশের এ অর্থ বর্ণনা করে বলেছেন, আমি এ

অর্থ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে না শুনে থাকলে বর্ণনা করতাম না। এর ওপর ভিত্তি করে আল্লামা আলুসী এ ধারণা প্রকাশ করেন যে, এটি ছাড়া এ আয়াতাংশ দু'টির আর কোন অর্থ গ্রহণ করা জায়েয নয়। যারা অন্য কোন অর্থ গ্রহণ করেছেন তারা অনর্থক দুঃসাহস দেখিয়েছেন। কিন্তু হাফেয ইবনে কাসীর বলেন, এ রেওয়ায়াতের সনদ দুর্বল এবং এর ওপর ভিত্তি করে অকাট্যভাবে বলা যায় না যে, নবী (সা) সত্যিই এসব আয়াতাংশের এ ব্যাখ্যাই বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, সাহাবা ও তাবেয়ীদের একটি উল্লেখযোগ্য দল কর্তৃক এ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাফসীরকারদের বড় দল প্রথম তাফসীরটিও বর্ণনা করেছেন। আর কথার ধারাবাহিকতার সাথে এ অর্থটিই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। শাহ রাফীউদ্দিন সাহেব, শাহ আবদুল কাদের সাহেব এবং মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেবও তাঁদের অনুবাদে প্রথম অর্থটিই গ্রহণ করেছেন।

৩. মূল আয়াতে تُوْعَدُوْنَ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি যদি মূল ধাতু وَعد থেকে গঠিত হয়ে থাকে তাহলে তার অর্থ হবে তোমাদেরকে যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে, আর যদি وَعِيْد থেকে গঠিত হয়ে থাকে তাহলে অর্থ হবে, "তোমাদেরকে যে জিনিসের ভয় দেখানো হচ্ছে।" ভাষাগতভাবে দু'টি অর্থই যথাযথ ও নির্ভুল। কিন্তু প্রয়োগ ক্ষেত্রের সাথে দ্বিতীয় অর্থটিই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, যারা কুফর, শিরক ও পাপাচারে ডুবে ছিল এবং কখনো নিজ কৃতকর্মের প্রতিফল পেতে হবে এবং সে জন্য জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে একথা মানতে প্রস্তুত ছিল না এখানে তাদেরকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। এ কারণে আমরা تُوْعَدُوْنَ শব্দটিকে প্রতিশ্রুতি অর্থে গ্রহণ না করে ভীতি অর্থে গ্রহণ করেছি।

৪. এটাই সেই মূল কথা যে জন্য শপথ করা হয়েছে। এ শপথের অর্থ হচ্ছে, যে নজিরবিহীন শৃঙ্খলা ও নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে বৃষ্টিপাতের এ মহা ব্যবস্থাপনা তোমাদের চোখের সামনে চলছে এবং তার মধ্যে যে যুক্তি, কৌশল ও উদ্দেশ্য সক্রিয় দেখা যাচ্ছে তা প্রমাণ করছে যে, এ পৃথিবী কোন উদ্দেশ্যহীন ও অনর্থক বালু মাটির খেলাঘর নয় যেখানে লক্ষ কোটি বছর থেকে উদ্দেশ্যহীনভাবে অতি বড় একটা খেলা চলছে, বরং প্রকৃতপক্ষে এটা একটা পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা যেখানে প্রতিটি কাজ কোন না কোন উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা সামনে রেখে হচ্ছে। এ ব্যবস্থাপনায় কোনক্রমেই এটা সম্ভব নয় যে, এখানে মানুষের মত একটা সৃষ্টিকে বিবেক বুদ্ধি, চেতনা-বিবেচনা, বাছ-বিচার কর্মের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব খাটানোর অধিকার দিয়ে তার মধ্যে ভাল ও মন্দের নৈতিক অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং তাকে সব রকম ন্যায় ও অন্যায় এবং ভুল ও নির্ভুল কাজ করার সুযোগ দিয়ে পৃথিবীতে যথেচ্ছা আচরণ করার জন্য একেবারে উদ্দেশ্যহীনভাবে ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাকে কখনো একথা জিজ্ঞেস করা হবে না যে, তাকে যে মন-মগজ ও দৈহিক শক্তি দেয়া হয়েছিল, পৃথিবীতে কাজ করার জন্য যে ব্যাপক উপায়-উপকরণ তার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল এবং আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টির ওপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব খাটানোর যেসব ইখতিয়ার তাকে দেয়া হয়েছিল তা সে কিভাবে ব্যবহার করেছে। যে বিশ্ব-ব্যবস্থায় সবকিছুর পেছনেই একটা উদ্দেশ্য কার্যকর সেখানে শুধু মানুষের মত একটি মহাসৃষ্টির আবির্ভাব কিভাবে উদ্দেশ্যহীন হতে পারে? যে ব্যবস্থায় প্রতিটি জিনিস জ্ঞান ও যুক্তি নির্ভর

সেখানে শুধুমাত্র মানুষের সৃষ্টি অর্থহীন হতে পারে কি করে? যেসব সৃষ্টির জ্ঞান-বুদ্ধি ও বোধশক্তি নেই এ বস্তুজগতেই তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যায়। এ কারণে তাদের আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পর যদি তাদের ধ্বংস করে দেয়া হয় তাহলে তা যথাযথ ও যুক্তিসংগত। কারণ তাদেরকে কোন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দেয়া হয়নি। তাই তাদের জবাবদিহিরও কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি, চেতনা ও বিবেক এবং ক্ষমতা-ইখতিয়ারের অধিকারী সৃষ্টি—যার কাজ-কর্ম শুধু বস্তুজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং যার নৈতিক প্রভাবও আছে এবং যার নৈতিক ফলাফল সৃষ্টিকারী কাজ-কর্মের ধারাবাহিকতা শুধু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চলে না, মৃত্যুর পরও তার নৈতিক ফলাফল উদ্ভব হতে থাকে এমন সৃষ্টিকে শুধু তার বস্তুগত তৎপরতা শেষ হয়ে যাওয়ার পর উদ্ভিদ ও জীব-জন্তুর মত কি করে ধ্বংস করা যেতে পারে? সে তার নিজের ক্ষমতা ও ইচ্ছায় যে নেক কাজ বা বদ কাজই করে থাকুক না কেন তার সঠিক ও ন্যায়সংগত প্রতিদান তার অবশ্যই পাওয়া উচিত। কারণ যে উদ্দেশ্যে তাকে অন্যসব সৃষ্টির মত না করে ক্ষমতা ও ইখতিয়ার সম্পন্ন সৃষ্টি হিসেবে বানানো হয়েছে এটা তার মৌলিক দাবী। তাকে যদি জবাবদিহি করতে না হয়, তার নৈতিক কাজ-কর্মের জন্য যদি পুরস্কার ও শাস্তি না হয় এবং ক্ষমতা ও ইখতিয়ারবিহীন সৃষ্টিকূলের মত স্বাভাবিক জীবন শেষ হওয়ার পর তাকে ধ্বংস করে দেয়া হয় তাহলে তাকে সৃষ্টি করা অবশ্যই অর্থহীন হবে। কিন্তু একজন মহাজ্ঞানী ও বিচক্ষণ স্রষ্টার কাছে এরূপ নিরর্থক কাজের আশা করা যায় না।

এ ছাড়াও আখেরাত এবং পুরস্কার ও শাস্তি সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সৃষ্টির এ চারটি নিদর্শনের নামে শপথ করার আরো একটি কারণ আছে। আখেরাত অস্বীকারকারীরা যে কারণে মৃত্যুর পরের জীবনকে অসম্ভব মনে করে তা এই যে, মৃত্যুর পর আমরা যখন মাটিতে বিলীন হয়ে যাবো এবং আমাদের অণু-পরমাণু যখন মাটিতে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে তখন কি করে সম্ভব যে, দেহের এসব বিক্ষিপ্ত অংশ পুনরায় একত্রিত হবে এবং পুনরায় আমাদেরকে সৃষ্টি করা হবে। আখেরাতের প্রমাণ হিসেবে সৃষ্টির যে চারটি নিদর্শনকে পেশ করা হয়েছে সেগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে আপনা থেকেই এ সন্দেহ ও ভ্রান্তি দূর হয়ে যায়। ভূপৃষ্ঠের যতগুলো পানির ভাণ্ডারে সূর্যের কিরণ পৌঁছে ততগুলো পানির ভাণ্ডারে সূর্যের তাপ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় পানির অগণিত বিন্দু তার ভাণ্ডারে পড়ে না থেকে শূন্যে উড়ে যায়। কিন্তু তা নিঃশেষ হয়ে যায় না, বরং বাষ্পে রূপান্তরিত হয়ে প্রতিটি বিন্দু বাতাসের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে। অতপর আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে এ বাতাসই বাষ্পে রূপান্তরিত ঐ সব বারিবিন্দুকে একত্রিত করে গাঢ় মেঘের সৃষ্টি করে, ঐ মেঘরাশিকে নিয়ে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সময় নির্ধারিত আছে ঠিক সেই সময় প্রতিটি বিন্দুকে ঠিক সেই আকৃতিতে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয় যে আকৃতিতে তা পূর্বে ছিল। প্রতিনিয়ত এই যে দৃশ্য মানুষের চোখের সামনে অতিক্রান্ত হচ্ছে তা সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত মানুষদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও আল্লাহর একটি মাত্র ইংগিতে একত্রিত হতে পারে এবং ঐ সব মানুষ আগে যেমন ছিল ঠিক সেই আকৃতিতেই তাদেরকে পুনরায় জীবিত করা যেতে পারে। এসব অংগ-প্রত্যংগ মাটি, বাতাস বা পানি যার মধ্যেই মিশে যেয়ে থাক না কেন সর্বাবস্থায়ই তা এ পৃথিবী এবং এর পরিমণ্ডলেই আছে। যে আল্লাহ পানি থেকে বাষ্পরাশি তৈরী করে তা বাতাসের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার পর পুনরায় সেই বাতাসের সাহায্যেই তা

একত্রিত করেন, এবং পরে পানির আকারে তা বর্ষণ করেন, তাঁর জন্য মানব-দেহের অংগ-প্রত্যংগকে বাতাস, পানি ও মাটির মধ্য থেকে বেছে একত্রিত এবং পূর্বের মত সংযোজিত করে দেয়া কঠিন হবে কেন?

৫. মূল আয়াতে ذَاتِ الْحُبُكِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। حبك রাস্তাসমূহ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বায়ু প্রবাহের কারণে মরুভূমির বালুকারাশি এবং বদ্ধ পানিতে যে ঢেউ সৃষ্টি হয় তাকেও বলে। আবার কোঁকড়া চুলে যে গুচ্ছ ও ভাঁজের সৃষ্টি হয় তা বুঝানোর জন্যও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখানে আসমানকে حبك এর অধিকারী বলার কারণ হচ্ছে যে, অধিকাংশ সময় আসমানে নানা আকৃতির মেঘরাশি ছেয়ে থাকে এবং বাতাসের প্রভাবে বারবার তার আকৃতি পরিবর্তিত হতে থাকে এবং কখনো কোন আকৃতি না স্থায়িত্ব লাভ করে না অন্য আকৃতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। অথবা এ কারণে বলা হয়েছে যে, রাতের বেলা যখন আকাশে তারকাসমূহ চড়িয়ে থাকে তখন মানুষ তার নানা রকম আকৃতি দেখতে পায় যাঁর কোনটি অন্যগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয় না।

৬. এ ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্যের ব্যাপারে বিভিন্ন আকৃতির আসমানের শপথ করা হয়েছে উপমা হিসেবে। অর্থাৎ আসমানের মেঘমালা ও তারকাপুঞ্জের আকৃতি যেমন ভিন্ন এবং তাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য ও মিল দেখা যায় না, তোমরাও আখেরাত সম্পর্কে অনুরূপ রকমারি মতামত ও বক্তব্য পেশ করছো এবং তোমাদের একজনের কথা আরেকজনের থেকে ভিন্ন। তোমাদের কেউ বলে এ পৃথিবী অনাদি ও চিরস্থায়ী। তাই কোন রকম কিয়ামত সংঘটিত হতে পারে না। কেউ বলে, এ ব্যবস্থা ধ্বংসশীল এবং এক সময় এটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তবে মানুষসহ যেসব জিনিস ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তার পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়। কেউ পুনরুজ্জীবনকে সম্ভব বলে মনে করে কিন্তু তার আকীদা-বিশ্বাস এই যে, মানুষ তার ভাল কাজের ফলাফল ভোগের জন্য এ পৃথিবীতে বারবার জন্ম নেয়। কেউ জান্নাত এবং জাহান্নামও বিশ্বাস করে, কিন্তু তার সাথে আবার জন্মান্তরবাদেরও সমন্বয় সাধন করে অর্থাৎ তার ধারণা হচ্ছে গোনাহগার ব্যক্তি জাহান্নামেও শাস্তি ভোগ করে এবং এ পৃথিবীতেও শাস্তি পাওয়ার জন্য বারবার জন্ম লাভ করতে থাকে। কেউ বলে, দুনিয়ার এ জীবনটাই তো একটা শাস্তি। মানবাত্মার যতদিন পর্যন্ত বস্তু জীবনের সাথে সম্পর্ক থাকে ততদিন পর্যন্ত মরে মরে পুনরায় এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে থাকে। তার প্রকৃত মুক্তি (নির্বান লাভ) হচ্ছে অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়া। কেউ আখেরাত এবং জান্নাত ও জাহান্নাম বিশ্বাস করে ঠিকই, কিন্তু বলে, আল্লাহ তাঁর একমাত্র পুত্রকে ক্রুশে মৃত্যু দান করে মানুষের সর্বকালের গোনাহর কাফ্ফারা আদায় করে দিয়েছেন। মানুষ আল্লাহর সেই পুত্রের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নিজের কুকর্মের মন্দ পরিণতি থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। কিছু লোক আছে যারা আখেরাত এবং শাস্তি ও পুরস্কারে বিশ্বাস করেও এমন কিছু বুযর্গ ব্যক্তিকে সুপারিশকারী মনে করে নেয়—তাদের ধারণায় তারা আল্লাহর এতই প্রিয় বা আল্লাহর কাছে এমন ক্ষমতার অধিকারী যে, যারাই তাদের ভক্ত হয়ে যাবে তারা পৃথিবীতে সবকিছু করেও শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। এসব সম্মানিত সত্তা সম্পর্কে এ আকীদা পোষণকারীদের মধ্যে মতের মিল নেই। প্রত্যেক গোষ্ঠীই তাদের নিজেদের আলাদা আলাদা সুপারিশকারী বানিয়ে রেখেছে। মতের এ ভিন্নতাই প্রমাণ করে যে, অহী ও রিসালাতের তোয়াক্কা না করে মানুষ তার নিজের এবং এ পৃথিবীর পরিণতি সম্পর্কে

قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ﴿١٠﴾ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ﴿١١﴾ يَسْئَلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ
الدِّيْنِ ﴿١٢﴾ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ﴿١٣﴾ ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ۗ هٰذَا الَّذِيْ
كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٤﴾ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٥﴾ اٰخِذِيْنَ
مَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۗ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ﴿١٦﴾

ধ্বংস হয়েছে অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা,[৮] যারা অজ্ঞতায় নিমজ্জিত এবং গাফলতিতে বিভোর।[৯] তারা জিজ্ঞেস করে, তবে সেই কর্মফল দিবস কবে আসবে? তা সেদিন আসবে যেদিন তাদের আগুনে ভাজা হবে।[১০] (এদের বলা হবে) এখন তোমাদের ফিতনার[১১] স্বাদ গ্রহণ করো। এটা সেই বস্তু যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে।[১২] তবে মুত্তাকীরা[১৩] সেদিন বাগান ও ঝর্ণাধারার মধ্যে অবস্থান করবে। তাদের রব যা কিছু তাদের দান করবেন তা সানন্দে গ্রহণ করতে থাকবে।[১৪] সেদিনটি আসার পূর্বে তারা ছিল সৎকর্মশীল।

যখনই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তা অজ্ঞতা প্রসূত হয়েছে। অন্যথায়, মানুষের কাছে সত্যিই যদি এ ব্যাপারে সরাসরি জ্ঞানলাভের কোন মাধ্যম থাকতো তাহলে এত ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী আকীদা-বিশ্বাস সৃষ্টি হতো না।

৭. মূল আয়াতের বাক্য হলো يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ । এ আয়াতাংশে ব্যবহৃত عنه সর্বনাম দ্বারা দু'টি জিনিস বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। এক, কৃতকর্মের প্রতিদান। দুই, ভিন্ন ভিন্ন কথা ও বক্তব্য। প্রথম ক্ষেত্রে এ বাণীর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, কৃতকর্মের প্রতিদান অবশ্যই সামনে আসবে, যদিও তোমরা সে প্রতিদান প্রাপ্তি সম্পর্কে নানা রকমের ভিন্ন ভিন্ন আকীদা পোষণ করে থাকো। তবে তা মেনে নিতে কেবল সেই ব্যক্তিই বিদ্রোহ করে যে ন্যায় ও সত্য বিমুখ। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এ বাণীর অর্থ দাঁড়ায় এই নানা রকমের বক্তব্য ও মতামত দেখে কেবল সেই ব্যক্তিই বিভ্রান্ত হয় যে ন্যায় ও সত্যের প্রতি বিমুখ।

৮. এ বাক্যটি দ্বারা কুরআন মজীদ মানুষকে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে সাবধান করছে। পার্থিব জীবনের ছোট ছোট ক্ষেত্রে অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে কোন পরিমাপ ও মূল্যায়ণ করা কিছুটা চলতে পারে যদিও তা জ্ঞানের বিকল্প হতে পারে না। কিন্তু গোটা জীবনের কৃতকর্মের জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে কিনা এবং যদি করতে হয় তাহলে কার কাছে কখন জবাবদিহি আমাদেরকে করতে হবে? সেই জবাবদিহিতে আমাদের সফলতা ও ব্যর্থতার ফলাফল কি হবে? এটা এমন কোন প্রশ্ন নয় যে, এ সম্পর্কে মানুষ শুধু অনুমান ও ধারণা অনুসারে একটা কিছু ঠিক করে নেবে এবং জুয়ার বাজি ধরার মত নিজের জীবনরূপ পুঁজির সবটাই বাজি ধরে বসবে। কারণ, এ

অনুমান যদি ভ্রান্ত হয় তাহলে তার অর্থ হবে, ব্যক্তি নিজেকেই নিজে ধ্বংস করে ফেললো। তাছাড়া মানুষ যেসব বিষয়ে শুধু অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে এটি আদৌ সে ধরনের নয়। কারণ, যা মানুষের ধরা-ছোঁয়ার গণ্ডির মধ্যে কেবল সেসব ক্ষেত্রেই অনুমান চলতে পারে। কিন্তু এটি এমন একটি বিষয় যার কোনকিছুই ধরা-ছোঁয়ার গণ্ডিভুক্ত নয়। তাই এর কোন অনুমান ভিত্তিক মূল্যায়ণ সঠিক হতে পারে না। এখন প্রশ্ন থাকে তাহলে অনুভূতি ও উপলব্ধির বাইরের এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঠিক উপায় কি? কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় এ প্রশ্নের যে জবাব দেয়া হয়েছে এবং এ সূরা থেকেও এ জওয়াবেরই ইংগিত পাওয়া যায় যে, মানুষ নিজে সরাসরি ন্যায় ও সত্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। আল্লাহ তাঁর নবীর মাধ্যমে ন্যায় ও সত্যের জ্ঞান দান করে থাকেন। এ জ্ঞানের সত্যতা সম্পর্কে মানুষ তার নিজের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে এভাবে যে, যমীন, আসমান ও তার নিজের মধ্যে যে অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান তা গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে নিরপেক্ষভাবে ভেবে দেখবে যে, নবী যা বলছেন এসব নিদর্শন কি সেই সত্যই প্রমাণ করছে, না এ বিষয়ে অন্যেরা যেসব ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ পেশ করেছে সেগুলোকেই সমর্থন করছে? আল্লাহ ও আখেরাত সম্পর্কে জ্ঞানগত বিশ্লেষণের এটিই একমাত্র পন্থা যা কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। এ পন্থা বাদ দিয়ে যে ব্যক্তিই নিজের আন্দাজ-অনুমান অনুসারে চলেছে সে-ই ধ্বংস হয়েছে।

৯. অর্থাৎ তারা জানে না যে, নিজেদের এ ভুল মূল্যায়ণের কারণে তারা কোন্ পরিণামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কেউ এভাবে মূল্যায়ণ করে যে পথই অবলম্বন করেছে তা তাকে সোজা ধ্বংসের গহবরে নিয়ে গেছে। যে ব্যক্তি আখেরাত অস্বীকার করে সে কোন প্রকার জবাবদিহির জন্য আদৌ প্রস্তুতি গ্রহণ করছে না, এবং এ চিন্তায় মগ্ন আছে যে, মৃত্যুর পরে আর কোন জীবন হবে না। কিন্তু সেই সময়টি আকস্মিকভাবে এসে হাজির হবে যখন তার আশা-আকাংখা ও চিন্তা-ভাবনার সম্পূর্ণ বিপরীত আরেকটি জীবনে তার চোখ খুলবে এবং সে জানতে পারবে যে, এখানে তাকে এক এক করে প্রতিটি কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। যে ব্যক্তি এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে গোটা জীবন অতিবাহিত করছে যে, মৃত্যুর পর পুনরায় এ দুনিয়ায় ফিরে আসবো, সে মৃত্যুর সাথে সাথে জানতে পারবে যে, এখন ফিরে যাওয়ার সব দরজা বন্ধ। নতুন কোন কাজের দ্বারা অতীত জীবনের কাজের ক্ষতিপূরণের কোন সুযোগই আর এখন নেই এবং সামনে আরো একটি জীবন আছে যেখানে চিরদিনের জন্য তাকে নিজের পার্থিব জীবনের কর্মফল দেখতে ও ভোগ করতে হবে। যে ব্যক্তি এ আশায় নিজের জীবনকে ধ্বংস করে ফেলে যে, যদি নফস এবং তার প্রবৃত্তিসমূহকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলি তাহলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আমি দৈহিক আযাব থেকে রক্ষা পেয়ে যাবো। কিন্তু মৃত্যুর দরজা পার হওয়া মাত্রই সে দেখতে পাবে সামনে ধ্বংস নেই আছে শুধু চিরস্থায়ী জীবন ও অস্তিত্ব। আর তাকে এখন এ বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে যে, তোমাকে জীবন ও অস্তিত্বের নিয়ামত কি এ জন্যই দেয়া হয়েছিলো যে, তুমি তাকে গড়ার ও সুসজ্জিত করার পরিবর্তে ধ্বংস করার জন্য নিজের সমস্ত শ্রম ব্যয় করবে? অনুরূপ যে ব্যক্তি তথাকথিত কোন ঈশ্বর পুত্রের কাফ্ফারা হওয়ার কিংবা কোন বুযর্গ ব্যক্তির শাফায়াতকারী হওয়ার ভরসায় সারা জীবন আল্লাহর নাফরমানী করতে থাকলো আল্লাহর সামনে হাজির হওয়া মাত্র সে জানতে পারবে যে, এখানে না কেউ কারো কাফ্ফারা আদায়কারী আছে, না কারো এমন শক্তি আছে যে

নিজের শক্তিতে অথবা নিজে কারো ভালবাসায় ধন্য হওয়ার কারণে কাউকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে। অতএব, অনুমান ভিত্তিক এসব আকীদা-বিশ্বাস প্রকৃতপক্ষে এক আফিম, যার নেশায় এসব লোক বুঁদ হয়ে আছে। তারা জানে না আল্লাহ ও নবী-রসূল প্রদত্ত সঠিক জ্ঞানকে উপেক্ষা করে এরা যে মূর্খতার মধ্যে নিমগ্ন আছে তা তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

১০. প্রতিদান দিবস কবে আসবে কাফেরদের এ প্রশ্ন আসলে প্রকৃত তথ্য জানার জন্য ছিল না, বরং তা ছিল-বিদ্রূপ ও হাসি ঠাট্টার উদ্দেশ্যে। তাই তাদেরকে এ ভঙ্গিতে জবাব দেয়া হয়েছে। এটা ঠিক সেরূপ যখন আপনি কোন ব্যক্তিকে দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন, একদিন এ আচরণের খারাপ পরিণতি দেখতে পাবে। কিন্তু সে বিদ্রূপ করে আপনাকে জিজ্ঞেস করছে ঃ জনাব, কবে আসবে সেদিন? সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, "খারাপ পরিণতি কবে আসবে" তার এ প্রশ্ন সেই খারাপ পরিণতি আসার তারিখ জানার জন্য নয়। বরং আপনার উপদেশকে বিদ্রূপ করার জন্য। সুতরাং এর সঠিক জবাব হবে এই যে, তা সেদিন আসবে যেদিন তোমার দুর্ভাগ্য আসবে। এখানে একথাটিও ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার যে, অখেরাত অস্বীকারকারী কোন ব্যক্তি যদি ভদ্রতা ও যুক্তি সহকারে বিতর্ক করে তাহলে সে এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দিয়ে কথা বলতে পারে। কিন্তু তার মস্তিষ্ক খারাপ না হলে সে এ প্রশ্ন কখনো করতে পারে না যে, আখেরাত কোন্ তারিখে সংঘটিত হবে তা বলো। তার পক্ষ থেকে যখনই এ ধরনের প্রশ্ন আসবে, বিদ্রূপ ও হাসি-তামাশা হিসেবেই আসবে। তাই আখেরাত সংঘটিত হওয়া না হওয়ার তারিখ বলে দেয়াতে মূল বিষয়ের ওপর কোন প্রভাবই পড়ে না। কেউ এ কারণে আখেরাত অস্বীকার করে না যে, তা সংঘটিত হওয়ার সন, মাস এবং দিন বলে দেয়া হয়নি। আবার তা অমুক সন, অমুক মাস ও অমুক তারিখে সংঘটিত হবে তা শুনে কেউ তা মেনে নিতে পারে না। তারিখ নির্দিষ্ট করে বলে দেয়া আদৌ কোন প্রমাণ নয় যে, তা কোন অস্বীকারকারীকে স্বীকার করে নিতে আগ্রহী করে তুলবে। কারণ, এরপরে এ প্রশ্নও দেখা দেয় যে, ঐ দিনটি আসার আগে কিভাবে বিশ্বাস করা যায় যে, সেদিন সত্যি সত্যিই তা সংঘটিত হবে।

১১. এখানে 'ফিত্না' শব্দটি দু'টি অর্থ প্রকাশ করছে। একটি অর্থ হচ্ছে, নিজের এ আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো। অপর অর্থটি হচ্ছে, তোমরা পৃথিবীতে যে বিভ্রান্তির ধুম্রজাল সৃষ্টি করে রেখেছিলে তার স্বাদ গ্রহণ করো। আরবী ভাষায় এ শব্দটির এ দু'টি অর্থ গ্রহণের সমান অবকাশ আছে।

১২. "তাহলে প্রতিদানের সেদিনটি কবে আসবে" কাফেরদের এ প্রশ্নে এ অর্থও বহন করছিলো যে, তা আসতে বিলম্ব হচ্ছে কেন? আমরা যখন তা অস্বীকার করছি এবং তার অস্বীকৃতির শাস্তি আমাদের জন্য অনিবার্য হয়ে পড়েছে তখন তা আসছে না কেন? এ কারণে তারা যখন জাহান্নামের আগুনে দগ্ধিভূত হতে থাকবে তখন বলা হবে, এটি সেই জিনিস যা তোমরা দ্রুত কামনা করছিলে। এ আয়াতাংশ থেকে স্বতই এ অর্থ প্রকাশ পায় যে, এটা নিছক আল্লাহর করুণা ছিল যে, তোমাদের অবাধ্যতা প্রকাশের সাথে সাথে তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করেননি। বরং তোমাদেরকে ভেবে-চিন্তে দেখার, বুঝার এবং নিজেকে সামলে নেয়ার জন্য তিনি দীর্ঘ অবকাশ দিয়ে এসেছেন। কিন্তু তোমরা এমন নির্বোধ

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ
لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا
تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿٢٣﴾

রাতের বেলা তারা কমই ঘুমাতো।[১৫] তারপর তারাই আবার রাতের শেষ প্রহরগুলোতে ক্ষমা প্রার্থনা করতো।[১৬] তাদের সম্পদে অধিকার ছিল প্রার্থী ও বঞ্চিতদের।[১৭] দৃঢ় প্রত্যয় পোষণকারীদের জন্য পৃথিবীতে বহু নিদর্শন রয়েছে।[১৮] এবং তোমাদের সত্তার মধ্যেও।[১৯] তোমরা কি দেখ না? আসমানেই রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং সে জিনিসও যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে।[২০] তাই আসমান ও যমীনের মালিকের শপথ, একথা সত্য এবং তেমনই নিশ্চিত যেমন তোমরা কথা বলছো।

যে, সে অবকাশ থেকে উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে সে সময়টি যেন দ্রুত নিয়ে আসা হয় সেই দাবী করে এসেছো। এখন দেখে নাও, যে জিনিসের দ্রুত আগমন কামনা করছিলে তা কেমন জিনিস।

১৩. এখানে 'মুত্তাকী' শব্দটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে যে, এর অর্থ সেসব লোক যারা আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের দেয়া খবরের প্রতি বিশ্বাস করে অথেরাতকে মেনে নিয়েছে এবং আখেরাতের জীবনের সফলতার জন্য তাদেরকে যে আচরণ করতে বলা হয়েছিলো তারা তাই করেছিলো এবং যে আচরণ ও নীতি সম্পর্কে বলে দেয়া হয়েছিলো যে, তা আল্লাহর আযাবের মধ্যে নিমজ্জিত করে তা বর্জন করেছিলো।

১৪. যদিও আয়াতের মূল বাক্যাংশ হচ্ছে اٰخِذِيْنَ مَا اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ এবং যার শাব্দিক অনুবাদ শুধু এই যে, "তাদের রব যা দিবেন তা তারা নিতে থাকবে।" কিন্তু এ ক্ষেত্রে নেয়ার অর্থ শুধু নেয়া নয়, বরং সানন্দচিত্তে নেয়া। যেন কোন দানশীল ব্যক্তি কিছু লোককে হাতে তুলে পুরস্কার দিচ্ছেন আর তারা লাফালাফি করে তা নিচ্ছে। কোন ব্যক্তিকে যখন তার পছন্দের জিনিস দেয়া যায় সে মুহূর্তে নেয়ার মধ্যে আপনা থেকেই সানন্দে নেয়ার অর্থ সৃষ্টি হয়ে যায়। কুরআন মজীদে একস্থানে বলা হয়েছে ঃ

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ

"মানুষ কি জানে না, আল্লাহই তো বান্দার তাওবা কবুল করেন এবং তাদের সাদকা গ্রহণ করেন। (তাওবা ঃ ১০৪)

এখানে সাদকা গ্রহণ করার অর্থ তা শুধু নেয়া নয়, বরং সন্তুষ্ট হয়ে তা গ্রহণ করা।

১৫. মুফাস্‌সিরদের এক দল এ আয়াতের যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তা হচ্ছে তারা শুধু শুয়ে শুয়ে সারারাত কাটিয়ে দিত এবং রাতের প্রারম্ভে, মধ্যভাগে বা শেষভাগে কম হোক বা বেশী হোক কিছু সময় জেগে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করে কাটাতো না, এমন খুব কমই ঘটতো। হযরত ইবনে আব্বাস, আনাস ইবনে মালেক, মুহাম্মাদ আল বাকের, মাতরাফ ইবনে আবদুল্লাহ, আবুল আলিয়া, মুজাহিদ, কাতাদা, রাবী' ইবনে আনাস প্রমুখ থেকে সামান্য শাব্দিক তারতম্য সহ এ তাফসীরই বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় দল এর অর্থ বর্ণনা করেছেন এই যে, তারা রাতের বেশীর ভাগ সময়ই মহান আল্লাহর ইবাদাতে কাটাতেন এবং অল্প সময় ঘুমাতেন। এটা হযরত হাসান বাসরী, আহনাফ ইবনে কায়েস এবং ইবনে শিহাব যুহরীর বক্তব্য। পরবর্তীকালের মুফাস্‌সির ও অনুবাদকগণ এ ব্যাখ্যাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ, আয়াতের শব্দসমূহ এবং তার প্রয়োগের ক্ষেত্র বিবেচনায় এ ব্যাখ্যাই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। সুতরাং অনুবাদেও আমরা এই অর্থ গ্রহণ করেছি।

১৬. অর্থাৎ যারা তাদের রাতসমূহ পাপ-পঙ্কিলতা ও অশ্লীল কাজ-কর্মে ডুবে থেকে কাটায় এবং তারপরও মাগফিরাত প্রার্থনা করার চিন্তাটুকু পর্যন্ত তাদের মনে জাগে না এরা তাদের শ্রেণীভুক্ত ছিল না। পক্ষান্তরে এদের অবস্থা ছিল এই যে, তারা রাতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আল্লাহর ইবাদাতে ব্যয় করতো এবং এরপরও রাতের শেষাংশে আপন প্রভুর কাছে এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করতো যে, তোমার যতটুকু ইবাদাত বন্দেগী করা আমাদের কর্তব্য ছিল তা করতে আমাদের ত্রুটি হয়েছে। هم يستغفرون কথাটির মধ্যে এ বিষয়েও একটি ইংগিত আছে যে, তাদের জন্য এ আচরণই শোভনীয় ছিল। তারাই ছিল আল্লাহর দাসত্বের এরূপ পরাকাষ্ঠা দেখাবার যোগ্য যে আল্লাহর বন্দেগীতে জীবনপাতও করবে এবং তা সত্ত্বেও এ জন্য কোন রকম গর্বিত হওয়া এবং নিজের নেক কাজের জন্য অহংকার করার পরিবর্তে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমার জন্য বিনীতভাবে প্রার্থনা করবে। যারা গোনাহ করার পরও বুকটান করে চলে সে নির্লজ্জ পাপীদের আচরণ এরূপ হতে পারতো না।

১৭. অন্য কথায় একদিকে তারা এভাবে তাদের প্রভুর অধিকার স্বীকার ও আদায় করতো, অন্যদিকে আল্লাহর বান্দাদের সাথে তাদের আচরণ ছিল এই। কম হোক বা বেশী হোক আল্লাহ তাদের যা কিছুই দান করেছিলেন তাতে তারা কেবল নিজেদের এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততির অধিকার আছে বলে মনে করতো না বরং তাদের মধ্যে এ অনুভূতিও ছিল যে, যারা তাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী এমন প্রত্যেক আল্লাহর বান্দার তাদের সম্পদে অধিকার আছে। আল্লাহর বান্দাদের সাহায্য তারা দান-খয়রাত হিসেবে করতো না। তাই তারা তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রত্যাশী ছিল না কিংবা তাদেরকে নিজেদের অনুগ্রহের পাত্র মনে করতো না। একে তারা তাদের অধিকার মনে করতো এবং নিজেদের কর্তব্য মনে করে পালন করতো। তাছাড়া যারা প্রার্থী হয়ে তাদের কাছে এসে সাহায্যের জন্য হাত পাততো শুধু এসব লোকের মধ্যেই তাদের সমাজ সেবা সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং যার সম্পর্কেই তারা জানতে পারতো যে, সে তার রুটি রুজি অর্জন করা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে তাকেই সাহায্য করার জন্য তারা অস্থির হয়ে পড়তো। যে ইয়াতীম শিশু অসহায় হয়ে পড়েছে, যে বিধবার কোন আশ্রয় নেই, যে অক্ষম ব্যক্তি নিজের

রুজি-রোজগারের জন্য চেষ্টা-সাধনা করতে পারে না, যে ব্যক্তি বেকার ও কর্মহীন হয়ে পড়েছে কিংবা যার উপার্জন প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হচ্ছে না, যে ব্যক্তি কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে এবং নিজে নিজের ক্ষতিপূরণে সক্ষম নয়, মোট কথা এমন অভাবী যে কোন ব্যক্তির অবস্থা তার গোচরীভূত হয়েছে সে তার সাহায্য লাভের অধিকার স্বীকার করেছে। সে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেছে।

এ তিনটি বিশেষ গুণের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে 'মুত্তাকী ও মুহসিন' বলে আখ্যায়িত করে বলছেন, এ গুণাবলীই তাদেরকে জান্নাতলাভের অধিকারী বানিয়েছে।

প্রথম গুণটি হচ্ছে, তারা আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করেছেন এবং এমন প্রতিটি আচরণ বর্জন করেছেন আল্লাহ ও তাঁর রসূল যাকে আখেরাতের জীবনের জন্য ধ্বংসাত্মক বলে বর্ণনা করেছিলেন। দ্বিতীয় গুণটি হচ্ছে, তারা নিজেদের জীবনপাত করে আল্লাহর বন্দেগীর হক আদায় করেছেন এবং সে জন্য অহংকার প্রকাশ করার পরিবর্তে ক্ষমা প্রার্থনাই করেছেন। তৃতীয় গুণটি হলো, তারা আল্লাহর বান্দাদের সেবা ইহসান মনে করে করেননি, বরং তাদের অধিকার ও নিজেদের কর্তব্য মনে করে করেছেন।

এখানে একথাটিও জেনে নেয়া দরকার যে, ঈমানদারদের অর্থ-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের যে অধিকারের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তার অর্থ যাকাত নয় যা শরীয়াতের নির্দেশ অনুসারে তাদের ওপর ফরয করে দেয়া হয়েছে। যাকাত আদায় করার পরও আর্থিক সংগতি সম্পন্ন একজন ঈমানদার তার অর্থ-সম্পদে অন্যদের যে অধিকার আছে বলে উপলব্ধি করে এবং শরীয়াত বাধ্যতামূলক না করে থাকলেও সে মনের একান্ত আগ্রহ সহকারে তা আদায় করে; এখানে সে অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ইবনে আব্বাস মুজাহিদ এবং যায়েদ ইবনে আসলাম প্রমুখ মনীষীগণ এ আয়াতটির এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর এ বাণীটির সারকথা হলো, একজন মুত্তাকী ও পরোপকারী মানুষ কখনো এরূপ ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত হয় না যে, তার সম্পদে আল্লাহ ও তাঁর বান্দার যে অধিকার ছিল যাকাত আদায় করে সে তা থেকে পুরোপুরি অব্যাহতি লাভ করেছে। ভুখা, নাংগা ও বিপদগ্রস্ত প্রতিটি মানুষকেই সাধ্যমত সাহায্য করে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সে স্বীকার করে। আল্লাহর মুত্তাকী ও মুহসিন বান্দা তার সাধ্যমত পরোপকারমূলক কাজ করতে সর্বদা মনে প্রাণে প্রস্তুত থাকে এবং পৃথিবীতে নেক কাজ করার যে সুযোগই সে লাভ করে তা হাতছাড়া হতে দেয় না। সে কখনো এরূপ চিন্তা-ভাবনা করে না যে, যে নেক কাজ করা তার জন্য ফরয করে দেয়া হয়েছিলো তা সে সম্পাদন করেছে, এখন আর কোন নেক কাজ সে কেন করবে?

যে ব্যক্তি নেক কাজের মূল্য বুঝতে পেরেছে সে তা বোঝা মনে করে বরদাশত করেনা, বরং নিজের লাভজনক ব্যবসায় মনে করে আরো অধিক উপার্জনের জন্য লালায়িত হয়ে পড়ে।

১৮. নিদর্শন অর্থ সেসব নিদর্শন যা আখেরাতের সম্ভাবনা এবং তার অবশ্যম্ভাবিতা ও অনিবার্যতার সাক্ষ দিচ্ছে। পৃথিবীর অস্তিত্ব এবং তার গঠন ও আকার-আকৃতি সূর্য থেকে তাকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে এবং বিশেষ কোণে স্থাপন, তার ওপর উষ্ণতা ও আলোর ব্যবস্থা করা, সেখানে বিভিন্ন মওসূম, ঋতুর আগমন ও প্রস্থান, তার ওপর বাতাস

ও পানি সরবরাহ করা, তার অভ্যন্তর ভাগে নানা রকমের অগণিত সম্পদের ভাণ্ডার সরবরাহ করা, তার উপরিভাগ একটি উর্বর আবরণ দিয়ে মুড়ে দেয়া এবং তার পৃষ্ঠদেশে ভিন্ন ভিন্ন রকমের অসংখ্য ও অগণিত উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন করে দেয়া, তাতে স্থল, জল ও বায়ুতে বিচরণকারী জীবজন্তু ও কীট-পতঙ্গের অসংখ্য প্রজাতির বংশধারা চালু করা, প্রত্যেক প্রজাতির জীবন ধারণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করা, সেখানে মানুষকে অস্তিত্ব দানের পূর্বে এমন সব উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করা যা ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে কেবল তার দৈনন্দিন প্রয়োজনই পূরণ নয় বরং তার তাহযীব তামাদ্দুনের ক্রমবিবর্তনের ক্ষেত্রে সহযোগিতাও করতে থাকবে, এসব এবং এ ধরনের এত অগণিত নির্দশনাদি আছে যে, চক্ষুষ্মান ব্যক্তি পৃথিবী ও এর পরিমণ্ডলে যে দিকেই দৃষ্টিপাত করে তা তার মনকে আকৃষ্ট করতে থাকে। যে ব্যক্তি তার বিবেক-বুদ্ধির দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, কোনক্রমেই বিশ্বাস করতে চায় না, তার কথা ভিন্ন। সে এর মধ্যে আর সবকিছুই দেখতে পাবে। কিন্তু দেখবে না শুধু সত্যের প্রতি ইংগিত প্রদানকারী কোন নিদর্শন। তবে যার হৃদয়-মন সংকীর্ণতা ও পক্ষপাত মুক্ত এবং সত্যের জন্য অবারিত ও উন্মুক্ত সে এসব জিনিস দেখে কখনো এ ধারণা পোষণ করবে না যে, এসবই কয়েকশ' কোটি বছর পূর্বে বিশ্ব-জাহানে সংঘটিত একটি আকস্মিক মহা বিস্ফোরণের ফল। বরং এসব দেখে তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে যে, এ চরম উন্নত মানের এ বৈজ্ঞানিক কীর্তি মহা শক্তিমান ও মহাজ্ঞানী এক আল্লাহরই সৃষ্টি। যে আল্লাহ এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি যেমন মৃত্যুর পরে পুনরায় মানুষকে সৃষ্টি করতে অক্ষম হতে পারেন না, তেমনি এমন নির্বোধ হতে পারেন না যে, তাঁর পৃথিবীতে বুদ্ধি-বিবেক ও উপলব্ধির অধিকারী একটি সৃষ্টিকে স্বাধীনতা ও এখতিয়ার দিয়ে লাগামহীন বলদের মত ছেড়ে দিবেন। স্বাধীনতা ও ইখতিয়ারের অধিকারী হওয়ার স্বতস্ফূর্ত ও অনিবার্য দাবী হলো জবাবদিহি। জবাবদিহির ব্যবস্থা না থাকলে স্বাধীনতা ও এখতিয়ার যুক্তি ও ইনসাফের পরিপন্থী হবে। আর অসীম শক্তির বিদ্যমানতা স্বভাবতই একথা প্রমাণ করে যে, পৃথিবীতে মানবজাতির কাজ শেষ হওয়ার পর সে যেখানেই মরে পড়ে থাকুক না কেন যখন ইচ্ছা তার মহাশক্তিধর স্রষ্টা জবাবদিহির জন্য সমস্ত মানুষকে পৃথিবীর প্রতিটি কোণ থেকে পুনরুজ্জীবিত করে আনতে সক্ষম।

১৯. অর্থাৎ বাইরে দেখারও প্রয়োজন নেই। শুধু নিজের মধ্যে দেখলেই তুমি এ সত্য প্রমাণকারী অসংখ্য নিদর্শন দেখতে পাবে। কিভাবে একটি অণুবীক্ষণিক কীট এবং অনুরূপ একটি অণুবীক্ষণিক ডিম্বকে মিলিয়ে একত্রিত করে মাতৃদেহের একটি নিভৃত কোণে তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করা হয়েছিল। অন্ধকার সেই নিভৃত কোণে কিভাবে লালন পালন করে তোমাদেরকে ক্রমান্বয়ে বড় করা হয়েছে। কিভাবে তোমাদেরকে অনুপম আকৃতি ও কাঠামোর দেহ এবং বিস্ময়কর কর্মশক্তি সম্পন্ন প্রাণ শক্তি দেয়া হয়েছে। কিভাবে তোমাদের দেহাবয়বের পূর্ণতা প্রাপ্তি মাত্রই তাকে মাতৃগর্ভের সংকীর্ণ ও অন্ধকার জগত থেকে বের করে এ বিশাল ও বিস্তৃত জগতে এমন সময় আনা হয়েছে যখন তোমাদের মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। এ যন্ত্র তোমাদের জন্ম থেকে যৌবন ও বার্ধক্য পর্যন্ত শ্বাস গ্রহণ করা, খাদ্য পরিপাক করা, রক্ত তৈরী করে শিরা উপশিরায় প্রবাহিত করা, মল নির্গমন করা, দেহের ক্ষয়িত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত অংশসমূহ আবার নির্মাণ করা ভিতর থেকে উদ্ভূত কিংবা বাইরে থেকে আগমনকারী বিপদাপদ-

সমূহের প্রতিরোধ করা, ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করা এমনকি পরিশ্রান্ত হওয়ার পর আরামের জন্য শুইয়ে দেয়ার কাজ পর্যন্ত আপনা থেকেই সম্পন্ন করে যাচ্ছে। জীবনের এ মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণের জন্য তোমাদের মনোযোগ ও চেষ্টা–সাধনার সামান্যতম অংশও ব্যয়িত হয় না। তোমাদের মাথার খুলির মধ্যে একটি বিস্ময়কর মস্তিষ্ক বসিয়ে দেয়া হয়েছে যার জটিল ভাঁজে ভাঁজে জ্ঞান–বুদ্ধি, চিন্তা–ভাবনা, কল্পনা, উপলব্ধি, ন্যায়–অন্যায় বোধ, ইচ্ছা, স্মৃতিশক্তি, আকাংখা, অনুভূতি, আবেগ, ঝোঁক ও প্রবণতা এবং আরো অনেক শক্তির এক বিশাল ভাণ্ডার কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে আছে। তোমাদেরকে জ্ঞান অর্জন করার অনেক মাধ্যম দেয়া হয়েছে যা চোখ, নাক, কান এবং গোটা দেহের স্নায়ুতন্ত্রীর সাহায্যে তোমাদেরকে সব রকমের সংবাদ পৌছিয়ে থাকে। তোমাদেরকে ভাষা এবং বাকশক্তি দেয়া হয়েছে যার সাহায্যে তোমরা নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পার। সর্বোপরি তোমাদের সত্তার এ গোটা সাম্রাজ্যের ওপর তোমার আমিত্ব বা অহংকে নেতা বানিয়ে বসিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে সবগুলো শক্তি কাজে লাগিয়ে মতামত গঠন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পার যে, কোন্ পথে তোমাদের সময়, শ্রম ও চেষ্টা–সাধনা ব্যয় করতে হবে, কোন্‌টি বর্জন করতে হবে এবং কোন্‌টি গ্রহণ করতে হবে, কোন্ বস্তুকে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ বানাতে হবে এবং কোন্‌টিকে নয়।

একটু লক্ষ করো এরূপ একটি সত্তা বানিয়ে তোমাদেরকে যখন পৃথিবীতে আনা হলো তখনই তোমাদের সত্তার লালন–পালন, প্রবৃদ্ধি, উন্নতি ও পূর্ণতা সাধনের জন্য কত সাজ–সরঞ্জাম এখানে প্রস্তুত পেয়েছো। এসব সাজ–সরঞ্জামের বদৌলতে জীবনের একটি পর্যায়ে পৌছে তোমরা নিজেদের ক্ষমতা ইখতিয়ার কাজে লাগানোর উপযুক্ত হয়েছো।

এসব ক্ষমতা ইখতিয়ার কাজে লাগানোর জন্য পৃথিবীতে তোমাদেরকে নানা উপায়–উপকরণ দেয়া হয়েছে, সুযোগ দেয়া হয়েছে, বহু জিনিসের ওপর তোমাদের কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। বহু মানুষের সাথে তোমরা নানা ধরনের আচরণ করেছো। তোমাদের সামনে কুফরী ও ঈমান, পাপাচার ও আনুগত্য, জুলুম ও ইনসাফ, নেকী ও কুকর্ম এবং হক ও বাতিলের সমস্ত পথ খোলা ছিল। এসব পথের প্রত্যেকটির দিকে আহবানকারী এবং প্রত্যেকটির দিকে নিয়ে যাওয়ার মত কার্যকারণসমূহ বিদ্যমান ছিল। তোমাদের মধ্যে যে–ই যেপথ বেছে নিয়েছে নিজের দায়িত্বেই বেছে নিয়েছে। কারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাছাই করার ক্ষমতা তার মধ্যে পূর্ব থেকেই দেয়া ছিলো। প্রত্যেকের নিজের পছন্দ অনুসারে তার নিয়ত ও ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করার যে সুযোগ সে লাভ করেছে তা কাজে লাগিয়ে কেউ সৎকর্মশীল হয়েছে এবং কেউ দুষ্কর্মশীল হয়েছে। কেউ কুফরী, শিরক ও নাস্তিকতার পথ গ্রহণ করেছে। কেউ তার প্রবৃত্তিকে অবৈধ আকাংখা চরিতার্থ করা থেকে বিরত রেখেছে আর কেউ প্রবৃত্তির দাসত্ব করতে গিয়ে সবকিছু করে বসেছে। কেউ জুলুম করেছে আর কেউ জুলুম বরদাশত করেছে। কেউ অধিকার দিয়েছে আর কেউ অধিকার নস্যাত করেছে। কেউ মৃত্যু পর্যন্ত পৃথিবীতে কল্যাণের কাজ করেছে আবার কেউ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কুকর্ম করেছে। কেউ ন্যায়কে সমুন্নত করার জন্য জীবনপাত করেছে। আবার কেউ বাতিলকে সমুন্নত করার জন্য ন্যায়ের অনুসারীদের ওপর জুলুম চালিয়ে গেছে।

هَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرٰهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا
سَلٰمًا ۖ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلٰىٓ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ
سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ
قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلٰمٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ
فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾ قَالُوا كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ
إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾

২ রুকূ'

হে নবী,[২১] ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের কাহিনী কি তোমার কাছে পৌঁছেছে?[২২] তারা যখন তার কাছে আসলো, বললো ঃ আপনার প্রতি সালাম। সে বললো ঃ "আপনাদেরকেও সালাম—কিছু সংখ্যক অপরিচিত লোক।[২৩] পরে সে নীরবে তার পরিবারের লোকদের কাছে গেল[২৪] এবং একটা মোটা তাজা বাছুর[২৫] এনে মেহমানদের সামনে পেশ করলো। সে বললো ঃ আপনারা খান না কেন? তারপর সে মনে মনে তাদের ভয় পেয়ে গেল।[২৬] তারা বললো ঃ ভয় পাবেন না। তাছাড়া তারা তাকে এক জ্ঞানবান পুত্র সন্তান জন্মের সুসংবাদ দিল।[২৭] একথা শুনে তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে অগ্রসর হলো। সে আপন গালে চপেটাঘাত করে বললো ঃ বুড়ী বন্ধ্যা।[২৮] তারা বললো ঃ তোমার রব একথাই বলেছেন। তিনি মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।[২৯]

এমন কোন ব্যক্তি যার বিবেকের চোখ একেবারেই অন্ধ হয়ে যায়নি সে কি একথা বলতে পারে যে, এ ধরনের একটি সত্তা আকস্মিকভাবে পৃথিবীতে অস্তিত্ব লাভ করেছে? এর পেছনে কোন যুক্তি ও পরিকল্পনা কার্যকর নেই? তার হাতে পৃথিবীতে যেসব কর্মকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে তা সবই ফলাফল এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যহীনভাবে শেষ হয়ে যাবে? কোন ভাল কাজের ভাল ফল এবং কোন মন্দ কাজের মন্দ ফল নেই? কোন জুলুমের কোন প্রতিকার এবং কোন জালেমের কোন জবাবদিহি নেই? যুক্তিবুদ্ধির ধার ধারে না এমন লোকই কেবল এ ধরনের কথা বলতে পারে। কিংবা বলতে পারে এমন লোক যে আগে থেকেই শপথ করে বসে আছে যে, মানব সৃষ্টির পেছনে যত বড় বৈজ্ঞানিক লক্ষ থাকার কথা বলা হোক, তা অস্বীকার করতেই হবে। কিন্তু গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতামুক্ত একজন লোকের পক্ষে একথা না মেনে উপায় নেই যে, মানুষকে যেভাবে

যেসব ক্ষমতা ও যোগ্যতা দিয়ে পৃথিবীতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যে মর্যাদা তাকে এখানে দেয়া হয়েছে তা নিশ্চিতভাবেই একটি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা। যে আল্লাহ এমন পরিকল্পনা করতে পারেন, তাঁর বিচক্ষণতা অনিবার্যরূপে দাবী করে যে, মানুষকে তার কাজ-কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। আর সেই আল্লাহর শক্তি-সামর্থ সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করা মোটেই ঠিক নয় যে, তিনি যে মানুষকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখার মত একটি কোষ থেকে সৃষ্টি করে এ পর্যায়ে পৌঁছিয়েছেন তাকে তিনি পুনরায় অস্তিত্ব দান করতে পারবেন না।

২০. এখানে আসমান অর্থ উর্ধজগত। মানুষকে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার এবং কাজ করার জন্য যা কিছু দেয়া হয় রিযিক অর্থে তার সবকিছুই বুঝায়। আর সমস্ত আসমানী কিতাব ও এ কুরআনে কিয়ামত, হাশর ও পুনরুত্থান, হিসেব-নিকেশ ও জবাবদিহি, পুরস্কার ও শাস্তি এবং জান্নাত ও জাহান্নামের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে مَا تُوعَدُونَ বলে সেসবকেই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর এ বাণীর অর্থ হচ্ছে, দুনিয়ায় তোমাদের কাকে কি দিতে হবে তার ফায়সালা উর্ধজগত থেকেই হয়। তাছাড়া জবাবদিহি ও কর্মফল দেয়ার জন্য কখন তলব করা হবে সে ফায়সালাও সেখান থেকেই হবে।

২১. এখান থেকে দ্বিতীয় রুকূ'র শেষ পর্যন্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং কিছু সংখ্যক অতীত জাতির পরিণতির প্রতি একের পর এক সংক্ষিপ্তভাবে ইংগিত দেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য মানুষের মনে দু'টি জিনিস বদ্ধমূল করে দেয়া।

একটি হচ্ছে, মানব ইতিহাসে আল্লাহর প্রতিদানের বিধান সবসময় কার্যকর আছে। এ বিধানে নেককারদের জন্য পুরস্কার এবং জালেমদের জন্য শাস্তির দৃষ্টান্ত সবসময় কার্যকর দেখা যায়। এটি এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ যে, এ পার্থিব জীবনেও মানুষের সাথে তার স্রষ্টার আচরণ কেবল প্রাকৃতিক বিধান (Physical Law) অনুসারে হয় না, বরং তার সাথে নৈতিক বিধানও (Moral Law) সক্রিয়। তাছাড়া এ গোটা বিশ্ব-জাহান সাম্রাজ্যের স্বভাবই যখন এই যে, যে সৃষ্টিকে বস্তুগত দেহে অবস্থান করে নৈতিক কাজ-কর্মের সুযোগ দেয়া হয়েছে তার সাথে পশু ও উদ্ভিদরাজির মত কেবল প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে আচরণ করা হবে না, বরং তার নৈতিক কাজ-কর্মের ওপর নৈতিক প্রতিফলের বিধানও কার্যকর করা হবে তখন এ দ্বারা স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, এ সাম্রাজ্যে এমন একটা সময় অবশ্যই আসতে হবে যখন এ প্রাকৃতিক জগতে মানুষের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর নিরেট নৈতিক আইনানুসারে তার নৈতিক কাজ-কর্মের ফলাফল পূর্ণরূপে প্রকাশ পাবে। কারণ এ বস্তুজগতে তা পূর্ণরূপে প্রকাশ পেতে পারে না।

এ ঐতিহাসিক ইংগিতসমূহের মাধ্যমে দ্বিতীয় যে জিনিসটি মানুষের মনে বদ্ধমূল করানো হয়েছে তা হচ্ছে, যেসব জাতিই আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের কথা মানেনি এবং নিজেদের জীবনের গোটা আচরণ তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত অস্বীকৃতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছে শেষ পর্যন্ত তারা ধ্বংসের উপযুক্ত হয়ে গিয়েছে। নবী-রসূলদের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নৈতিক বিধান দেয়া হয়েছে এবং সে বিধানানুসারে আখেরাতে মানুষের কাজ-কর্মের যে জবাবদিহি করতে হবে তা যে বাস্তব ও সত্য ইতিহাসের এ নিরবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাই তার সাক্ষী। কারণ যে জাতিই এ বিধানের তোয়াক্কা না করে নিজেকে দায়িত্ব ও জবাবদিহি মুক্ত মনে করে এ পৃথিবীতে তার

করণীয় নির্ধারণ করেছে পরিণামে সে জাতি সরাসরি ধ্বংসের পথের দিকে অগ্রসর হয়েছে।

২২. ইতিপূর্বে কুরআন মজীদের তিনটি স্থানে এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা হূদ, ৬৯ থেকে ৭৬ আয়াত; সূরা আল হিজর, আয়াত ৫১ থেকে ৬০; সূরা আল আনকাবূত, আয়াত ৩১ ও ৩২ টীকাসহ।

২৩. পূর্বাপর প্রসংগ অনুসারে এ আয়াতাংশের দুটি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নিজেই সে মেহমানদের বলেছিলেন যে, পূর্বে কখনো আপনাদের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়নি। আপনারা হয়তো এ এলাকায় নতুন এসেছেন। অপরটি হচ্ছে, তাদের সালামের জবাব দেয়ার পর হযরত ইবরাহীম মনে মনে বললেন কিংবা বাড়ীতে মেহমানদারির ব্যবস্থা করার জন্য যাওয়ার সময় তাদের খাদেমদের বললেন, এরা অপরিচিত লোক। আগে কখনো এ এলাকায় এরূপ জাঁকজমক ও বেশভূষার লোক দেখা যায়নি।

২৪. অর্থাৎ নিজের মেহমানদের একথা বলেননি যে, আপনাদের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করছি। বরং তাদেরকে বসিয়ে রেখে নীরবে মেহমানদারির ব্যবস্থা করতে চলে গিয়েছেন যাতে মেহমান সৌজন্যের খাতিরে একথা না বলে যে, এ কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন কি?

২৫. সূরা হূদে عِجْلٍ حَنِيْذٍ (ভূনা বাছুর) কথাটি আছে। এখানে বলা হয়েছে যে, তিনি ভালভাবে বাছাই করে মোটা তাজা গো-বৎস ভূনা করিয়েছিলেন।

২৬. অর্থাৎ তাদের হাত যখন খাবারের দিকে এগুলো না, তখন হযরত ইবরাহীমের মনে ভয়ের সঞ্চার হলো। গোত্রীয় জীবনধারায় কারো বাড়ীতে অপরিচিত মুসাফিরের খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকা কোন অসদুদ্দেশ্যে আগমনের লক্ষণ বলে মনে করা হয়। এটাও তাঁর ভয়ের একটা কারণ হতে পারে। তবে খুব সম্ভব, খাবার গ্রহণ থেকে তাদের বিরত থাকাতেই হযরত ইবরাহীম বুঝে ফেলেছিলেন যে, তারা ফেরেশতা, মানুষের রূপ ধরে এখানে এসেছে। তাছাড়া মানুষের আকৃতিতে ফেরেশতাদের আগমন যেহেতু অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই হয়ে থাকে তাই তিনি আশংকা করেছিলেন, কোন ভয়ংকর পরিস্থিতি আসন্ন, যার কারণে এসব ফেরেশতা এভাবে আগমন করেছে।

২৭. সূরা হূদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এটা ছিল হযরত ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের সুসংবাদ। এর মধ্যে এ সুসংবাদও আছে যে, হযরত ইসহাকের ঔরসে তিনি হযরত ইয়া'কূব আলাইহিস সালামের মত নাতিও লাভ করবেন।

২৮. অর্থাৎ একদিকে আমি বুড়ী অপর দিকে বন্ধ্যা। এমন অবস্থায় আমার সন্তান হবে? বাইবেলে বলা হয়েছে, সে সময় হযরত ইবরাহীমের বয়স ছিল এক শ' বছর এবং হযরত সারার বয়স ছিল ৯০ বছর। (আদি পুস্তক, ১৮ ঃ ১৭)

২৯. এ কাহিনী বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর যে বান্দা দুনিয়ায় আল্লাহর বন্দেগীর হক যথাযথভাবে আদায় করেছিল আখেরাতে তার সাথে যে আচরণ হবার তাতো হবেই। এ দুনিয়াতেও তাকে এভাবে পুরস্কৃত করা হয়েছে যে, সাধারণ প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে যে বয়সে সন্তান হওয়ার কথা ছিল না এবং তার স্ত্রীও সারা জীবন নিঃসন্তান থেকে চূড়ান্তভাবে নিরাশ হয়ে পড়েছিলো, সেই বয়সে আল্লাহ তাকে সন্তান দান করেছেন শুধু

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ
قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴿٣٣﴾ مُسَوَّمَةً
عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾
فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً
لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾

ইবরাহীম বললো ঃ হে আল্লাহর প্রেরিত দূতগণ, আপনাদের অভিপ্রায় কি?[৩০] তারা বললো ঃ আমাদেরকে একটি পাপী জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে[৩১] যাতে আমরা তাদের ওপর পোড়ানো মাটির পাথর বর্ষণ করি—যা আপনার রবের কাছে সীমালংঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত আছে।[৩২] অতপর[৩৩] ঐ জনপদে যারা মু'মিন ছিলো তাদের সবাইকে বের করে নিলাম। আমি সেখানে একটি পরিবার ছাড়া আর কোন মুসলিম পরিবার পাইনি।[৩৪] অতপর যারা কঠোর আযাবকে ভয় করে তাদের জন্য সেখানে একটি নিদর্শন রেখে দিয়েছি।[৩৫]

তাই নয় এমন নজীরবিহীন সন্তান দান করেছেন যা আজ পর্যন্ত কারো ভাগ্যে জোটেনি। এ পৃথিবীতে দ্বিতীয় এমন কোন মানুষ নেই যার বংশে পর পর চারজন নবী জন্মলাভ করেছেন। হযরত ইবরাহীমই (আ) ছিলেন এমন ব্যক্তিত্ব যার বংশে অধস্তন তিন পুরুষ পর্যন্ত নবুওয়াতের ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছিলো এবং তার পরিবারেই হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়া'কুব এবং হযরত ইউসুফ আলাইহিমুস সালামের মত মহা সম্মানিত নবীদের জন্ম হয়েছিলো।

৩০. মানুষের আকৃতিতে ফেরেশতাদের আগমন যেহেতু কোন বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য হয়ে থাকে তাই তাদের আগমনের উদ্দেশ্য অবহিত হওয়ার জন্য হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম خطب শব্দ ব্যবহার করেছেন। আরবী ভাষায় خطب শব্দটি কোন মামুলি কাজের জন্য ব্যবহৃত হয় না, বরং কোন বড় গরুত্বপূর্ণ কাজ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

৩১. অর্থাৎ লূতের (আ) জাতি। তাদের অপরাধ এতটা বৃদ্ধি পেয়েছিলো যে, 'অপরাধী জাতি' শুধু এ শব্দটাই জাতি হিসেবে তাদের পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল। এর আগে কুরআন, মজীদের নিম্ন বর্ণিত স্থানসমূহে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তাফহীমুল কুরআন, সূরা সা'দ, আয়াত ৮০ থেকে ৮৪; হূদ, ৭৩ থেকে ৮৩; সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ৭৪, ৭৫; সূরা আশ শু'আরা, ১৬০ থেকে ১৭৫; আন নামূল, ৫৪ থেকে ৫৮ ও ৬৩ থেকে ৬৮; সূরা সাফ্ফাত, ১৩৩ থেকে ১৩৮ টীকাসহ।

৩২. অর্থাৎ কোন্ পাথরটি কোন্ অপরাধীর মস্তক চূর্ণ করবে আপনার রবের পক্ষ থেকে তা ঐ পাথরের গায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। সূরা হূদ ও আল হিজরে এ আযাবের যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে, তাদের জনপদসমূহ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে এবং ওপর থেকে পোড়ানো মাটির পাথর বর্ষণ করা হয়েছে। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, প্রচণ্ড ভূমিকম্পে গোটা অঞ্চল উলটপালট করে দেয়া হয়েছে এবং যারা ভূমিকম্প থেকে রক্ষা পেয়ে পালিয়েছিল আগ্নেয়গিরির লাভার সাথে নির্গত পাথর–বৃষ্টি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

৩৩. এ ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নিকট থেকে কিভাবে হযরত লূতের (আ) কাছে পৌছলো এবং সেখানে তাদের ও লূতের (আ) জাতির মাঝে কি ঘটলো সেসব কাহিনীর বর্ণনা এখানে বাদ দেয়া হয়েছে। সূরা হূদ, আল হিজ্‌র ও আল আনকাবূতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আগেই করা হয়েছে। যে সময় এ জাতির ওপর আযাব নাযিল হতে যাচ্ছে এখানে শুধু সেই চরম মুহূর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৪. অর্থাৎ গোটা জাতি ও এলাকায় একটি মাত্র পরিবার ছিল যেখানে ইসলামের আলো বিদ্যমান ছিল। আর সেটা ছিল হযরত লূত আলাইহিস সালামের পরিবার। এ ছাড়া গোটা জাতি অশ্লীলতা ও পাপাচারে ডুবে ছিল এবং তাদের গোটা দেশ পঙ্কিলতায় ভরে উঠেছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা সেই একটি পরিবারের লোকজনকে রক্ষা করে বের করে নিলেন এবং তারপর সেই দেশে এমন প্রলয়ঙ্করী আযাব নাযিল করলেন যে, এ দুশ্চরিত্র জাতির একটি লোকও রক্ষা পায়নি। এ আয়াতটিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত হয়েছে ঃ

এক ঃ আল্লাহর প্রতিফল বিধান কোন জাতিকে ততদিন পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস করার ফায়সালা করে না যতদিন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ভালো গুণ বিদ্যমান থাকে। খারাপ লোকদের সংখ্যাধিক্যের মধ্যে নগণ্য সংখ্যক কিছু লোকও যদি অকল্যাণকে প্রতিরোধ করার এবং কল্যাণের পথের দিকে ডাকার জন্য তৎপর থাকে এবং তাদের কল্যাণকারিতা এখনো নিঃশেষ হয়ে না থাকে তাহলে আল্লাহ তাদেরকে আরো কিছুকাল কাজ করার সুযোগ দেন এবং তাদের অবকাশকাল বাড়িয়ে দিতে থাকেন। কিন্তু অবস্থা যদি এই দাঁড়ায় যে, কোন জাতির মধ্যে যৎসামান্য সদগুণও অবশিষ্ট না থাকে সে ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান হচ্ছে, উক্ত জনপদে যে দু' চারজন লোক অকল্যাণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়েছে, তিনি তাঁর মহা ক্ষমতাধীনে কোন না কোনভাবে তাদেরকে রক্ষা করে নিরাপদে বের করেন এবং অবশিষ্ট লোকদের সাথে ঠিক তেমনি আচরণ করেন, যে আচরণ একজন সুস্থ বিবেক–বুদ্ধি সম্পন্ন লোক পঁচা ফলের সাথে করে থাকে।

দুই ঃ 'মুসলমান' কেবল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের নাম নয়। তাঁর পূর্বের সমস্ত নবী–রসূল ও তাঁদের উম্মতও মুসলমান ছিলেন। তাঁদের দীনও ভিন্ন ভিন্ন ছিল না যে, কোনটা ইবরাহীমের দীন, কোনটা মূসার দীন আবার কোনটা 'ঈসার দীন বলে আখ্যায়িত হতে পারে। তাঁরা সবাই ছিলেন মুসলমান এবং তাদের দীনও ছিল এ ইসলাম। কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় এ সত্যটি এমন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নবর্ণিত

وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ
وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ
وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾
مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾ وَفِي ثَمُودَ
إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ
الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿٤٤﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا
مُنتَصِرِينَ ﴿٤٥﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾

এ ছাড়া (তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে) মূসার কাহিনীতে। আমি যখন তাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের কাছে পাঠালাম[৩৬] তখন সে নিজের শক্তিমত্তার ওপর গর্ব প্রকাশ করলো এবং বললো ঃ এ তো যাদুকর কিংবা পাগল।[৩৭] অবশেষে আমি তাকে ও তার সৈন্যদেরকে পাকড়াও করলাম এবং সবাইকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। আর সে তিরস্কৃত ও নিন্দিত হলো।[৩৮]

তাছাড়া (তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে) আদ জাতির মধ্যে। যখন আমি তাদের ওপর এমন অশুভ বাতাস পাঠালাম যে, তা যে জিনিসের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলো তাকেই জরাজীর্ণ করে ফেললো।[৩৯]

তাছাড়া (তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে) সামূদ জাতির মধ্যে। যখন তাদের বলা হয়েছিলো যে, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মজা লুটে নাও।[৪০] কিন্তু এ সতর্কীকরণ সত্ত্বেও তারা তাদের রবের হুকুম অমান্য করলো। অবশেষে তারা দেখতে দেখতে অকস্মাত আগমনকারী আযাব[৪১] তাদের ওপর আপতিত হলো। এরপর উঠে দাঁড়ানোর শক্তিও তাদের থাকলো না এবং তারা নিজেদের রক্ষা করতেও সক্ষম ছিল না।[৪২]

আর এদের সবার পূর্বে আমি নূহের কওমকে ধ্বংস করেছিলাম। কারণ তারা ছিল ফাসেক।

আয়াতগুলো দেখুন ঃ আল বাকারা, ১২৮, ১৩১, ১৩২, ও ১৩৩; আলে ইমরান, ৬৭; আল মায়েদা, ৪৪ ও ১১১; ইউনুস, ৭২ ও ৮৪; ইউসুফ, ১০১; আল আ'রাফ, ১২৬ ও আন্ নাহ্‌ল, ৩১, ৪২ ও ৪৪।

তিন ঃ 'মু'মিন' ও 'মুসলিম' শব্দ দু'টি এ আয়াতে সম্পূর্ণ সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতটি যদি সূরা হুজুরাতের ১৪ আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়া যায় তাহলে সেসব লোকদের ধারণার ভ্রান্তি পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যারা 'মু'মিন' ও 'মুসলিম' শব্দকে কুরআন মজীদের এমন দু'টি স্বতন্ত্র পরিভাষা বলে মনে করে যা সবখানে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এও মনে করে যে, ঈমান ছাড়াই যে ব্যক্তি বাহ্যত ইসলামের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করেছে সে-ই নিশ্চিত মুসলিম। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা হুজুরাতের ব্যাখ্যা, টীকা ৩১)।

৩৫. এ নিদর্শন অর্থ মরু সাগর (Dead Sea) বর্তমানেও যার দক্ষিণাঞ্চল এক সাংঘাতিক ধ্বংসের নিদর্শন পেশ করছে। প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা এই যে, লূতের (আ) জাতির বৃহৎ শহর খুব সম্ভবত প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ধসে ভূগর্ভে তলিয়ে গিয়েছিলো এবং তার উপরিভাগে মরু সাগরের পানি ছেয়ে গিয়েছিলো। কারণ, এই সাগরের যে অংশ اللسان (আল লিসান) নামক ক্ষুদ্র উপদ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত তা পরবর্তী সময়ে সৃষ্ট বলে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় এবং এ উপদ্বীপের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত প্রাচীন মরু সাগরের যেসব নিদর্শন দেখা যায় তা দক্ষিণের নিদর্শন থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। এ থেকে অনুমান করা হয় যে, উপদ্বীপের দক্ষিণের অংশ আগে মরু সাগর পৃষ্ঠ থেকে উঁচু ছিল। পরবর্তীকালে কোন এক সময় ধসে নীচে দেবে গিয়েছে। এর ধসে যাওয়ার সময়টাও খৃষ্টপূর্ব দু' হাজার সনের সম-সাময়িক বলে মনে হয়। ঐতিহাসিকভাবে এটাই হযরত ইবরাহীম ও হযরত লূতের (আ) যুগ। ১৯৬৫ সালে একদল আমেরিকান প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানী আল লিসানে এক বিশাল কবরস্থান আবিষ্কার করেছে যেখানে ২০ হাজারের অধিক কবর আছে। এ থেকে অনুমিত হয় যে, নিকটেই কোন বড় শহর অবশ্যই থাকবে। কিন্তু আশেপাশে কোথাও এমন কোন শহরের নিদর্শন নেই যার পাশেই এত বড় কবরস্থান গড়ে উঠতে পারে। এ থেকেও এ সন্দেহ দৃঢ়মূল হয় যে, এটি যে শহরের কবরস্থান ছিল তা সাগরে নিমজ্জিত হয়েছে। সাগরের দক্ষিণে যে এলাকা অবস্থিত সেখানে এখনো যত্রতত্র ধ্বংসের নিদর্শন বিদ্যমান এবং ভূমিতে গন্ধক, আলকাতরা, কয়লাজাত পিচ ও প্রাকৃতিক গ্যাসের এমন বিপুল মজুদ বর্তমান যা দেখে ধারণা জন্মে যে, এখানে কোন এক সময় বজ্রপাত হওয়ায় কিংবা ভূমিকম্পের কারণে লাভা উদ্গীরণ হওয়ায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়ে থাকবে (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আশ্ শু'আরা, টীকা ১১৪)।

৩৬. অর্থাৎ এরূপ সুস্পষ্ট মু'জিযা এবং প্রকাশ্য নিদর্শনসহ পাঠিয়েছিলেন যে, তিনি যে আসমান ও যমীনের স্রষ্টার পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে এসেছিলেন সে বিষয়টি আর সন্দেহযুক্ত ছিল না।

৩৭. অর্থাৎ কোন সময় সে তাঁকে যাদুকর বলে আখ্যায়িত করেছিলো আবার কখনো বলেছিলো এ ব্যক্তি পাগল।

৩৮. এ ক্ষুদ্র বাক্যাংশটিতে ইতিহাসের একটি পূর্ণাংগ ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। ঘটনাটা বুঝার জন্য কল্পণার চোখের সামনে এ চিত্রটি একটু নিয়ে আসুন যে, ফেরাউন তৎকালীন পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় কেন্দ্রের শক্তিধর শাসক ছিল, যার জাঁকজমক ও প্রভাব প্রতিপত্তিতে আশেপাশের সমস্ত জাতি ভীত সন্ত্রস্ত ছিল। একথা সুবিদিত যে, হঠাৎ একদিন যখন সে তার সৈন্য সামন্তসহ পানিতে ডুবে মরলো, তখন শুধু

মিশরেই নয়, আশেপাশের সমস্ত জাতির মধ্যে এ ঘটনা ব্যাপক প্রচার লাভ করে থাকবে। কিন্তু এতে ডুবে মরা লোকদের নিকটাত্মীয় ছাড়া আর কেউই এমন ছিলো না যারা তাদের নিজের দেশে কিংবা পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মধ্যে তাদের জন্য শোক প্রকাশ করতো, কিংবা অন্তত এতোটুকুই বলতো যে, হায়! এ দুর্ঘটনার শিকার লোকেরা কত ভাল মানুষ ছিল। পক্ষান্তরে পৃথিবী যেহেতু তাদের জুলুম-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো তাই তাদের এ দৃষ্টান্তমূলক পরিণতিলাভের কারণে প্রতিটি মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলো। প্রতিটি মুখই তাদের ওপর তিরস্কার ও নিন্দাবাদ বর্ষণ করেছে এবং যে-ই খবরটি শুনেছে সে-ই বলে উঠেছে, এ দুরাচার তার উপযুক্ত পরিণতিই ভোগ করেছে। সূরা দুখানে এ অবস্থাটা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ "অতপর না আসমান তাদের জন্য কেঁদেছে না যমীন তাদের জন্য অশ্রু বর্ষণ করেছে।" (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা দুখান, টীকা ২৫)।

৩৯. এ বাতাসের জন্য عَقِيم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা বন্ধ্যা নারীদের বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অভিধানে এর প্রকৃত অর্থ يَابِس বা শুষ্ক। যদি শব্দটিকে আভিধানিক অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, তা ছিল এমন প্রচণ্ড গরম ও শুষ্ক বাতাস যে, তা যে জিনিসের ওপর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে তাকে শুষ্ক করে ফেলেছে। আর যদি শব্দটিকে পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে তার অর্থ হবে তা ছিল বন্ধ্যা নারীর মত এমন হাওয়া যার মধ্যে কোন কল্যাণ ছিল না। তা না ছিল আরামদায়ক, না ছিল বৃষ্টির বাহক। না ছিল বৃক্ষরাজিকে ফলবানকারী না এমন কোন কল্যাণ তার মধ্যে ছিল যে জন্য বাতাস প্রবাহিত হওয়া কামনা করা হয়। অন্য স্থানসমূহে বলা হয়েছে এ বাতাস শুধু কল্যাণহীন ও শুষ্কই ছিল না বরং তা প্রচণ্ড ঝড়ের আকারে এসেছিলো যা মানুষকে শূন্যে তুলে তুলে সজোরে আছড়িয়ে ফেলেছে এবং এ অবস্থা একাদিক্রমে আটদিন ও সাত রাত পর্যন্ত চলেছে। এভাবে আদ জাতির গোটা এলাকা তছনছ করে ফেলেছে (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা হা-মীম আস সাজদার তাফসীর, টীকা ২০-২১ ও আল আহক্বাফ, টীকা ২৫ থেকে ২৮)।

৪০. এখানে কোন্ অবকাশ বুঝানো হয়েছে সে ব্যাপারে মুফাস্সিরদের মধ্যে মতভেদ আছে। হযরত কাতাদা বলেন, এর দ্বারা সূরা হূদের সে আয়াতটির বিষয়বস্তুর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে সামূদ জাতির লোকেরা হযরত সালেহর (আ) উটনীকে হত্যা করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, তোমরা তিন দিন পর্যন্ত ফূর্তি করে নাও। এরপরই তোমাদের ওপর আযাব আসবে। অপর দিকে হযরত হাসান বাসরী মনে করেন, একথা হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম দাওয়াতের প্রথম দিকেই তাঁর কওমকে বলেছিলেন। এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যদি তোমরা তাওবা ও ঈমানের পথ অবলম্বন করো তাহলে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সুযোগ লাভ করবে এবং এরপরেই কেবল তোমাদের দুর্দিন আসবে। এ দু'টি ব্যাখ্যার মধ্যে দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই অধিক বিশুদ্ধ বলে মনে হয়। কারণ, পরবর্তী আয়াত فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ (এরপর তারা তাদের রবের নির্দেশ লংঘন করলো) থেকে বুঝা যায় যে, এখানে যে অবকাশের কথা বলা হচ্ছে তা সীমালংঘনের পূর্বে দেয়া হয়েছিলো। আর তারা সীমালংঘন করেছিল এ সতর্ক বাণীর পরে। অন্যদিকে সূরা হূদের আয়াতে তিনদিনের যে অবকাশের

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ
الْمٰهِدُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٩﴾
فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۭ اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ
اِلٰهًا اٰخَرَ ۭ اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥١﴾ كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٥٢﴾

৩ রুকূ'

আসমানকে[৪৩] আমি নিজের ক্ষমতায় বানিয়েছি এবং সে শক্তি আমার আছে।[৪৪] যমীনকে আমি বিছিয়ে দিয়েছি। আমি উত্তম সমতলকারী।[৪৫] আমি প্রত্যেক জিনিসের জোড়া বানিয়েছি।[৪৬] হয়তো তোমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।[৪৭] অতএব আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমার জন্য স্পষ্ট সাবধানকারী। আল্লাহর সাথে আর কাউকে উপাস্য বানাবে না। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য স্পষ্ট সাবধানকারী।[৪৮]

এভাবেই হয়ে এসেছে। এদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের কাছেও এমন কোন রসূল আসেনি যাকে তারা যাদুকর বা পাগল বলেনি।[৪৯]

উল্লেখ করা হয়েছে তা ঐ সব অপরাধীর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্তকর সীমালংঘন হয়ে যাওয়ার পরে দেয়া হয়েছিলো।

৪১. এ আযাবের কথা বুঝাতে কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও একে رجفة (ভীতি প্রদর্শনকারী ও প্রকম্পিতকারী বিপদ) বলা হয়েছে। কোথাও একে صيحة (বিস্ফোরণ ও বজ্রধ্বনি) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কোথাও একে বুঝাতে طاغية (কঠিনতম বিপদ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর এখানে একেই صاعقة বলা হয়েছে যার অর্থ বিদ্যুতের মত অকস্মাত আগমনকারী বিপদ এবং কঠোর বজ্রধ্বনি উভয়ই। সম্ভবত এ আযাব এমন এক ভূমিকম্পের আকারে এসেছিলো যার সাথে আতংক সৃষ্টিকারী শব্দও ছিল।

৪২. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে مَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ । আরবী ভাষায় انتصار শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর একটি অর্থ হচ্ছে নিজেকে কারো আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। অপর অর্থটি হচ্ছে হামলাকারী থেকে প্রতিশোধ নেয়া।

৪৩. আখেরাতের সপক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণাদি পেশ করার পর এখন তার সমর্থনে বাস্তব জগতের বিদ্যমান প্রমাণাদি পেশ করা হচ্ছে।

৪৪. মূল আয়াতাংশ وَاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ । مُوسِع অর্থ ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী এবং প্রশস্তকারী উভয়টিই হতে পারে। প্রথম অর্থ অনুসারে এ বাণীর অর্থ হয় আমি কারো সাহায্যে এ আসমান সৃষ্টি করিনি, বরং নিজের ক্ষমতায় সৃষ্টি করেছি আর তা করা আমার সাধ্যের বাইরে ছিল না। তা সত্ত্বেও তোমাদের মন-মগজে এ ধারণা কি করে আসলো যে, আমি পুনরায় তোমাদের সৃষ্টি করতে পারবো না? দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে একথার অর্থ দাঁড়ায় এ বিশাল বিশ্ব-জাহানকে একবার সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হইনি, বরং ক্রমাগত তার সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছি এবং তার মধ্যে প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টির নতুন নতুন বিস্ময়কর দিক প্রকাশ পাচ্ছে। এরূপ মহা পরাক্রমশালী সৃষ্টিকারী সত্তার পুনরায় সৃষ্টি করার ক্ষমতাকে তোমরা অসম্ভব মনে করে নিয়েছো কেন?

৪৫. ১৮নং টীকায় এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নামল, টীকা ৭৪; সূরা ইয়াসীনের ব্যাখ্যা, টীকা ২৯ এবং আয যুখরুফ, টীকা ৭ থেকে ১০।

৪৬. অর্থাৎ জোড়ায় জোড়ায় সৃজনের নীতির ভিত্তিতে পৃথিবীর সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে। একটি জিনিসের সাথে আরেকটি জিনিসের সম্মিলন বা সংযোগ ঘটে এবং তাদের সংযুক্ত হওয়ার সাথে সাথে নানা রকমের যৌগিক বস্তু অস্তিত্ব লাভ করে। এখানে কোন বস্তুই এমন স্বতন্ত্র ও একক নয় যে, অন্য কোন জিনিসের সাথে তার জোড়া হয় না। প্রতিটি বস্তুই তার জোড়ার সাথে মিলে ফলপ্রসূ হয়। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, ইয়াসীন, টীকা ৩১; আয যুখরুফ, টীকা ১২)

৪৭. অর্থাৎ গোটা বিশ্ব-জাহানকে জোড়া বেঁধে সৃষ্টি করার নীতির ভিত্তিতে সৃষ্টি করা এবং পৃথিবীর সব জিনিস জোড়ায় জোড়ায় হওয়া এমন একটি সত্য যা আখেরাতের অনিবার্যতার সুস্পষ্ট সাক্ষ দিচ্ছে। তোমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা করো তাহলে তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যে, দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসের যখন জোড়া আছে এবং কোন কিছু তার জোড়ার সাথে না মিশে ফলপ্রসূ হতে পারে না তখন দুনিয়ার এ জীবন জোড়াহীন কি করে হতে পারে? আর আখেরাতই এর অনিবার্য জোড়া। আখেরাত না থাকলে এ দুনিয়া একেবারেই নিষ্ফল হবে।

পরবর্তী বিষয় বুঝার জন্য এখানে একথাটিও ভাল করে বুঝে নিতে হবে যে, এ পর্যন্তকার গোটা আলোচনা যদিও আখেরাত সম্পর্কিত বিষয়েই হয়ে আসছে তা সত্ত্বেও এসব আলোচনা ও যুক্তিতর্ক থেকে তাওহীদের প্রমাণও পাওয়া যায়। বৃষ্টির ব্যবস্থাপনা, পৃথিবীর গঠনাকৃতি, আসমানের সৃষ্টি, মানুষের নিজের অস্তিত্ব, গোটা বিশ্ব-জাহানে জোড়া বেঁধে সৃষ্টি নীতির বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড ও ফলাফল, এসব জিনিস যেমন আখেরাতের সম্ভাব্যতা ও অনিবার্যতার সাক্ষী তেমনি তা এ সাক্ষও পেশ করছে যে, এ বিশ্ব-জাহান আল্লাহহীনও নয় কিংবা বহু খোদার রাজত্বও নয় বরং এক মহাজ্ঞানী ও মহাশক্তিমান আল্লাহই এর সৃষ্টিকর্তা, মালিক এবং ব্যবস্থাপক ও শাসক। তাই পরে এসব যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতেই তাওহীদের দাওয়াত পেশ করা হচ্ছে। তাছাড়া আখেরাত বিশ্বাস করার অনিবার্য ফল হচ্ছে মানুষ আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণ পরিত্যাগ করে আনুগত্য ও দাসত্বের পথ অবলম্বন করে। মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহবিমুখ থাকে যতক্ষণ সে মনে করে যে, তাকে কারো সামনে জবাবদিহি করতে হবে না। এবং তার পার্থিব

জীবনের কাজ–কর্মের হিসেবও কারো কাছে দিতে হবে না। যখনই এ ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হবে সে মুহূর্তেই ব্যক্তির বিবেকের মধ্যে এ অনুভূতি জাগ্রত হয় যে, সে নিজেকে দায়িত্বমুক্ত মনে করে বড় ভুল করছিলো। এ অনুভূতিই তাকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে বাধ্য করে। এ কারণেই আখেরাতের সপক্ষে যুক্তি প্রমাণ পেশ করার পর পরই বলা হয়েছে, "অতপর আল্লাহর দিকে দ্রুত অগ্রসর হও।"

৪৮. এ বাক্যাংশ যদিও আল্লাহ তা'আলারই বাণী, কিন্তু এর বক্তা আল্লাহ তা'আলা নন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ব্যাপারটা যেন এই যে, আল্লাহ তাঁর নবীর মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন যে, আল্লাহর দিকে দ্রুত অগ্রসর হও। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি। এ ধরনের কথার উদাহরণ কুরআন মজীদের সর্বপ্রথম সূরা অর্থাৎ সূরা ফাতিহায় বিদ্যমান যেখানে বক্তব্য আল্লাহর কিন্তু বক্তা হিসেবে বান্দা কথাগুলো পেশ করে। اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ – اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ সেখানে যেমন একথা বলা হয়নি যে, হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের রবের কাছে এভাবে দোয়া করো। কিন্তু কথার ধরন থেকে আপনা আপনি একথার ইংগিত পাওয়া যায় যে, এটা একটা দোয়া যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের শিখিয়ে দিচ্ছেন। ঠিক তেমনি এখানেও বলা হয়নি যে, "হে নবী, তুমি এসব লোককে বলো।" কিন্তু কথার ধরন থেকে ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে যে এতে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনা অনুসারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদ গ্রহণের জন্য একটা আহবান পেশ করছেন। সূরা ফাতিহা ছাড়াও কুরআন মজীদের আরো কতিপয় স্থানে এ ধরনের বাণী বিদ্যমান যেখানে বক্তব্য আল্লাহর কিন্তু বক্তা কোথাও ফেরেশতা এবং কোথাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ঐ সব ক্ষেত্রে বক্তা কে তা সুস্পষ্টভাবে পেশ করা না হলেও কথার ধরন থেকেই স্বতই প্রকাশ পায় যে, কার মুখ দিয়ে আল্লাহ তার বক্তব্য পেশ করছেন। উদাহরণ হিসেবে দেখুন, সূরা মারয়াম, ৬৪, ৬৫; আস সাফ্‌ফাত, ১৫৯ থেকে ১৬৭ ও সূরা আশ শূরা, ১০।

৪৯. অর্থাৎ এ ঘটনা এই প্রথম সংঘটিত হয়নি যে, আল্লাহর প্রেরিত রসূলের মুখে আখেরাতের খবর এবং তাওহীদের দাওয়াত শুনে মানুষ তাঁকে যাদুকর ও পাগল বলছে। রিসালাতের গোটা ইতিহাস সাক্ষী, মানব জাতির হিদায়াতের জন্য যখন থেকে রসূলের আগমন ধারা শুরু হয়েছে জাহেলরা তখন থেকে আজ পর্যন্ত একইভাবে এ নির্বুদ্ধিতার কাজটি বারবার করে যাচ্ছে। যে রসূলই এসে এ মর্মে সাবধান করেছেন যে, তোমরা বহু সংখ্যক খোদার বান্দা নও, বরং একমাত্র আল্লাহই তোমাদের স্রষ্টা, উপাস্য এবং তোমাদের ভাগ্যের মালিক ও নিয়ন্তা, জাহেলরা তখনই এ মর্মে হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছে যে, এ ব্যক্তি যাদুকর। সে তার যাদুর সাহায্যে আমাদের বিবেক–বুদ্ধি বিকৃত করতে চায়। যে রসূলই এসে সাবধান করেছেন যে, তোমাদেরকে পৃথিবীতে দায়িত্ব মুক্ত করে ছেড়ে দেয়া হয়নি বরং জীবনের কাজ–কর্ম শেষ করার পর তোমাদেরকে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের সামনে হাজির হয়ে হিসেব দিতে হবে এবং সে হিসেবের পরিণামে নিজের কাজ–কর্মের প্রতিদান বা শাস্তি পেতে হবে, তাতে নির্বোধ লোকেরা বলে উঠেছে—এ লোকটি পাগল, এর বিবেক বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। আরে মৃত্যুর পরে কি আমরা পুনরায় জীবিত হবো?

أَتَوَاصَوْا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾
وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

এরা কি এ ব্যাপারে পরস্পর কোন সমঝোতা করে নিয়েছে? না, এরা সবাই বরং বিদ্রোহী।[৫০] অতএব, হে নবী, তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। এ জন্য তোমার প্রতি কোন তিরস্কার বাণী নেই।[৫১] তবে উপদেশ দিতে থাকো। কেননা উপদেশ ঈমান গ্রহণকারীদের জন্য উপকারী।[৫২]

৫০. অর্থাৎ একথা সুস্পষ্ট যে, হাজার হাজার বছর ধরে প্রতিটি যুগে বিভিন্ন দেশ ও জাতির লোকদের নবী-রসূলদের দাওয়াতের মোকাবিলায় একই আচরণ করা এবং তাঁদের বিরুদ্ধে একই রকমের কথা বলার কারণ এ নয় যে, একটি সম্মেলন করে আগের ও পরের সমস্ত মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যখনই কোন নবী এসে এ দাওয়াত পেশ করবে তখনই তাঁকে এ জবাব দিতে হবে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে তাদের আচরণের এ সাদৃশ্য এবং একই প্রকৃতির জবাবের ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি কেন? এর একমাত্র জবাব এই যে, অবাধ্যতা ও সীমালংঘন এদের সবার সাধারণ বৈশিষ্ট। তাছাড়া এ আচরণের আর কোন কারণ নেই। প্রত্যেক যুগের অজ্ঞ লোকেরাই যেহেতু আল্লাহর দাসত্ব থেকে মুক্ত ও তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে পৃথিবীতে লাগামহীন পশুর মত জীবন যাপন করতে আগ্রহী, তাই শুধু এ কারণে যিনিই তাদেরকে আল্লাহর দাসত্ব ও আল্লাহভীতিমূলক জীবন যাপনের আহবান জানিয়েছেন তাঁকেই তারা একই ধরাবাঁধা জবাব দিয়ে এসেছে।

এ আয়াত থেকে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের ওপর আলোকপাত হয়। সেটি হচ্ছে, হিদায়াত ও গোমরাহী, নেক কাজ ও বদ কাজ, জুলুম ও ন্যায় বিচার এবং এ ধরনের আরো অনেক কাজ-কর্মের যেসব প্রবণতা ও উদ্দীপনা স্বভাবসুলভভাবেই মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, উপায়-উপকরণের উন্নতির কারণে বাহ্যত তার রূপ-প্রকৃতি যত ভিন্নই প্রতীয়মান হোক না কেন প্রত্যেক যুগে ও পৃথিবীর প্রতিটি কোণে একইভাবে তার বহির্প্রকাশ ঘটে। আজকের মানুষ ট্যাংক, বিমান ও হাইড্রোজেন বোমার সাহায্যে যুদ্ধ করলেও এবং প্রাচীন যুগের মানুষ লাঠি ও পাথরের সাহায্যে লড়াই করলেও যে মৌলিক কারণে মানুষে মানুষে লড়াই বাধে, তাতে চুল পরিমাণ পার্থক্যও আসেনি। আজ থেকে ৬ হাজার বছর পূর্বে কোন নাস্তিকের নাস্তিকতা গ্রহণের পেছনে যে চালিকা শক্তি কাজ করেছে বর্তমান যুগের কোন নাস্তিক তার নাস্তিকতার সপক্ষে যত যুক্তিই পেশ করুক না কেন, তাকে এ পথে পরিচালিত করার পেছনেও হুবহু সেসব চালিকা শক্তিই কাজ করে। যুক্তি-প্রমাণ পেশের ক্ষেত্রেও সে তার পূর্বসূরীদের চেয়ে মৌলিকভাবে ভিন্ন কিছু বলে না।

৫১. এ আয়াতে দীনের তাবলীগের একটি নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। বিষয়টি ভালভাবে বুঝে নিতে হবে। হকের দাওয়াত পেশকারী যখন যুক্তিসংগত প্রমাণাদিসহ কারো সামনে সুস্পষ্টভাবে দাওয়াত পেশ করে এবং তার সন্দেহ-সংশয়, আপত্তি ও যুক্তি-প্রমাণের

জবাবও পেশ করে তখন সত্য প্রকাশ করার যে দায়িত্ব ও কর্তব্য তার ওপরে থাকে তা থেকে সে অব্যাহতি লাভ করে। এরপরও যদি সেই ব্যক্তি তার আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার প্রতি অটল থাকে, তার দায়-দায়িত্ব হকের দাওয়াত পেশকারীর ওপর বর্তায় না। এরপরও ঐ ব্যক্তির পেছনে লেগে থাকা, তার সাথে আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করে নিজের সময় ব্যয় করা এবং কোন না কোনভাবে ঐ একজন মাত্র ব্যক্তিকে নিজের সমমনা বানানোকে নিজের একমাত্র কাজ মনে করা তার জন্য জরুরী নয়। এ ক্ষেত্রে দাওয়াত পেশকারী তার কর্তব্য পালন করেছে। সে মানতে না চাইলে না মানবে। তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করার কারণে দাওয়াত পেশকারীকে এ অপবাদ দেয়া যাবে না যে, সে একজন মানুষকে গোমরাহীর মধ্যে ডুবে থাকতে দিয়েছে। কেননা, এখন সে নিজেই তার গোমরাহীর জন্য দায়ী।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ করে এ নিয়মটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এ নয় যে, তিনি দীনের তাবলীগের জন্য অনর্থক মানুষের পেছনে লেগে যেতেন। তাই আল্লাহ তাঁকে এ থেকে বিরত রাখতে চাইতেন। প্রকৃতপক্ষে একথা বলার কারণ হচ্ছে, ন্যায় ও সত্যের দিকে আহবানকারী যখন যথাসাধ্য সর্বাধিক যুক্তিসংগত পন্থায় কিছু লোককে বুঝানোর দায়িত্ব পালন করেন এবং তাদের মধ্যে হঠকারিতা ও ঝগড়াটে মনোবৃত্তির লক্ষণ দেখে তাদেরকে এড়িয়ে যান তখন তারা তাঁর পেছনে লেগে যায় এবং তাঁর প্রতি এ বলে দোষারোপ করতে থাকে যে, আরে ভাই আপনি তো দেখছি ন্যায় ও সত্যের আচ্ছা ঝাণ্ডাবাহী। কথা বুঝার জন্য আমরা আপনার সাথে আলোচনা করতে চাই। কিন্তু আপনি আমাদের দিকে ফিরেও দেখেন না। অথচ তাদের উদ্দেশ্য কথা বুঝা নয়, বরং নিজেদের উদ্দেশ্যমূলক বিতর্কের মধ্যে ন্যায় ও সত্যের দাওয়াত পেশকারীকে জড়ানো এবং শুধু তার সময় নষ্ট করাই তাদের লক্ষ্য হয়ে থাকে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কালামের মধ্যে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, "এ ধরনের মানুষের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করো না, তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করায় তোমাকে তিরস্কার করা যেতে পারে না।" এরপর কোন ব্যক্তি একথা বলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দোষারোপ করতে পারতো না যে, আপনি তো আমাদেরকে আপনার দীন বুঝানোর জন্য আদিষ্ট। তা সত্ত্বেও আপনি আমাদের কথার জবাব দেন না কেন?

৫২. এ আয়াতে দীন প্রচারের আরেকটি নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। ন্যায় ও সত্যের দাওয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য সেসব পুণ্যাত্মাদের কাছে ঈমানের নিয়ামত পৌঁছিয়ে দেয়া, যারা এ নিয়ামতের মূল্য বুঝে এবং নিজেরা তা অর্জন করতে চায়। কিন্তু দাওয়াত পেশকারী জানে না মানব সমাজের লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে সেসব পুণ্যাত্মা কোথায় আছে। তাই তার কাজ হচ্ছে, ব্যাপকভাবে তার দাওয়াতের কাজ ক্রমাগত চালিয়ে যাওয়া। যাতে যেখানে যেখানে ঈমান গ্রহণ করার মত লোক আছে সেখানেই যেন তার কথা পৌঁছে যায়। এ লোকেরাই তার প্রকৃত সম্পদ। তাদের খুঁজে বের করাই তার মূল কাজ। এদের বাছাই করে এনে আল্লাহর রাস্তায় দাঁড় করানো তার লক্ষ হওয়া উচিত। মাঝ পথে আদম সন্তানদের যেসব বাজে উপাদানের সাথে তার সাক্ষাত হবে তাদের প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত তার মনোযোগ দেয়া উচিত যতক্ষণ সে অভিজ্ঞতা দ্বারা না জানবে যে, এগুলো বাজে জিনিস। তাদের বাজে ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী হওয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর এ প্রকৃতির

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ
وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴿٥٩﴾
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

জিন ও মানুষকে আমি শুধু এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার দাসত্ব[৫৩] করবে। আমি তাদের কাছে কোন রিযিক চাই না কিংবা তারা আমাকে খাওয়াবে[৫৪] তাও চাই না। আল্লাহ নিজেই রিযিকদাতা এবং অত্যন্ত শক্তিধর ও পরাক্রমশালী।[৫৫] তাই যারা জুলুম করেছে[৫৬] তাদের প্রাপ্য হিসেবে ঠিক তেমনি আযাব প্রস্তুত আছে যেমনটি এদের মত লোকেরা তাদের অংশ পুরো লাভ করেছে। সে জন্য এসব লোক যেন আমার কাছে তাড়াহুড়ো না করে।[৫৭] যেদিনের ভয় তাদের দেখানো হচ্ছে পরিণামে সেদিন তাদের জন্য ধ্বংস রয়েছে।

লোকদের পেছনে তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট না করা উচিত। কারণ, এরা তার উপদেশে উপকৃত হওয়ার মত মানুষ নয়। এদের পেছনে শক্তি ব্যয় করায় বরঞ্চ সেসব লোকের ক্ষতি হয় যারা এ উপদেশ দ্বারা উপকৃত হয়।

৫৩. অর্থাৎ আমি তাদেরকে অন্য কারো দাসত্বের জন্য নয় আমার নিজের দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেছি। তারা আমার দাসত্ব করবে এ জন্য যে, আমি তাদের স্রষ্টা। যখন অন্য কেউ এদের সৃষ্টি করেনি তখন তার দাসত্ব করার কি অধিকার এদের আছে? তাছাড়া তাদের জন্য এটা কি করে বৈধ হতে পারে যে, এদের স্রষ্টা আমি অথচ এরা দাসত্ব করবে অন্যদের!

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা শুধু জিন ও মানুষের স্রষ্টা নন। তিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহান ও তার প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা। কিন্তু এখানে কেবল জিন ও মানুষ সম্পর্কে কেন বলা হয়েছে যে, আমি তাদেরকে আমার ছাড়া আর কারো দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করিনি? অথচ গোটা সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণু শুধু আল্লাহর দাসত্বের জন্য। এর জবাব হচ্ছে পৃথিবীতে জিন ও মানুষই শুধু এমন সৃষ্টি যাদের স্বাধীনতা আছে। তারা তাদের ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের গণ্ডির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব করতে চাইলে কিংবা তাঁর দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চাইলে নেবে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদের দাসত্ব করতে চাইলেও করতে পারে। জিন ও মানুষ ছাড়া এ পৃথিবীতে আর যত সৃষ্টি আছে তাদের এ ধরনের কোন স্বাধীনতা নেই। তাদের আদৌ কোন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার নেই যে, তারা আল্লাহর দাসত্ব করবে না অন্য কারো দাসত্ব করতে পারবে। তাই এখানে শুধু জিন ও মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা তাদের ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের গণ্ডির মধ্যে তাদের

নিজ স্রষ্টার আনুগত্য ও দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে এবং স্রষ্টা ছাড়া অন্যদের দাসত্ব করে নিজেরা নিজেদের স্বভাব প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তাদের জানা উচিত যে, তাদেরকে একমাত্র স্রষ্টা ছাড়া আর কারো দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। তাদের জন্য সোজা পথ হচ্ছে যে স্বাধীনতা তাদেরকে দেয়া হয়েছে তার অন্যায় ব্যবহার যেন না করে। বরং স্বাধীনতার এ সীমার মধ্যে নিজ নিজ ইচ্ছা অনুসারে ঠিক তেমনিভাবে যেন আল্লাহর দাসত্ব করে যেভাবে তার দেহের প্রতিটি লোম তার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার বিহীন সীমার মধ্যে তাঁর দাসত্ব করছে।

এ আয়াতে 'ইবাদাত' শব্দটিকে শুধু নামায রোযা এবং এ ধরনের অন্যান্য ইবাদাত অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। তাই কেউ এর এ অর্থ গ্রহণ করতে পারে না যে জিন ও মানুষকে শুধু নামায পড়া, রোযা রাখা এবং তাসবীহ তাহলীল করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। এ অর্থটিও এর মধ্যে শামিল আছে বটে, তবে এটা তার পূর্ণাংগ অর্থ নয়। এর পূর্ণাংগ অর্থ হচ্ছে, জিন ও মানুষকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের পূজা আনুগত্য আদেশ পালন ও বিনীত প্রার্থনার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। অন্য কোরো সামনে নত হওয়া, অন্য কারো নির্দেশ পালন করা, অন্য কাউকে ভয় করা, অন্য কারো রচিত দীন বা আদর্শের অনুসরণ করা, অন্য কাউকে নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা মনে করা এবং অন্য কোন সত্তার কাছে প্রার্থনার জন্য হাত বাড়ানো তাদের কাজ নয়। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাবার ব্যাখ্যা, টীকা ৬৩; আয যুমার, টীকা ২; আল জাসিয়া, টীকা ৩০)।

এ আয়াত থেকে আরো একটি অনুষাঙ্গিক বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। তা হচ্ছে জিনেরা মানুষ থেকে স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টি। যারা দাবি করে মানব জাতিরই কিছু সংখ্যক লোককে কুরআনে জিন বলা হয়েছে, এর দ্বারা তাদের ধারণার ভ্রান্তি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায়। কুরআন মজীদের নিম্ন বর্ণিত আয়াতসমূহও এ সত্যেরই অনস্বীকার্য প্রমাণ পেশ করে। (আল আন'আম, ১০০, ১২৮; আল আ'রাফ, ৩৮, ১৭৯; হূদ, ১১৯; আল হিজ্‌র, ২৭ থেকে ৩৩; বনী ইসরাঈল, ৮৮; আল কাহ্‌ফ, ৫০; আস সিজদা, ১৩; সাবা, ৪১; সাদ, ৭৫ ও ৭৬; হা-মীম আস সাজদা, ২৫; আল আহক্বাফ ১৮; আর রহমান ১৫, ৩৯, ৫৬; (এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল্ আম্বিয়া, টীকা ২১; আন নামল, টীকা ২৩, ৪৫; সূরা সাবার ব্যাখ্যা, টীকা ২৪)

৫৪. অর্থাৎ জিন ও মানুষের কাছে আমার কোন উদ্দেশ্য বাঁধা পড়ে নেই যে, এরা আমার দাসত্ব করলে আমার প্রভুত্ব চলবে আর এরা আমার দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে আমি আর আল্লাহ থাকতে পারবো না। আমি তাদের বন্দেগী বা দাসত্বের মুখাপেক্ষী নই। বরং আমার বন্দেগী করা তাদের প্রকৃতির দাবি। এ উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। নিজ প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করা তাদের নিজেদেরই ক্ষতি।

"আমি তাদের কাছে রিযিক চাই না, কিংবা তারা আমাকে খাবার দান করুক তাও চাই না" একথাটির মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত আছে। আল্লাহবিমুখ লোকেরা পৃথিবীতে যাদের বন্দেগী করছে তারা সবাই প্রকৃতপক্ষে এসব বান্দার মুখাপেক্ষী। এরা যদি তার প্রভুত্ব না চালায় তাহলে তা একদিনও চলবে না। সে এদের রিযিক দাতা নয় এরাই বরং তাকে রিযিক পৌঁছিয়ে থাকে। সে এদের খাওয়ায় না, এরাই তাকে খাইয়ে থাকে। সে এদের প্রাণের রক্ষক নয়, বরং এরাই তাদের প্রাণ রক্ষা করে থাকে। এরাই তাদের সৈন্য

সামন্ত। এদের ওপর নির্ভর করেই তাদের প্রভুত্ব চলে। যেখানেই কেউ এ মিথ্যা প্রভুদের সহযোগী বান্দা হয়নি কিংবা বান্দারা তাদেরকে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থেকেছে সেখানেই তাদের সব জৌলুস হারিয়ে গিয়েছে এবং দুনিয়ার মানুষ তাদের পতন দেখতে পেয়েছে। সমস্ত উপাস্যের মধ্যে একমাত্র মহান ও মহা পরাক্রমশালী আল্লাহই এমন উপাস্য, নিজের ক্ষমতায়ই যাঁর প্রভুত্ব চলছে। যিনি তাঁর বান্দাদের নিকট থেকে কিছু নেন না, বরং তিনিই তাদের সবকিছু দেন।

৫৫. মূল আয়াতে مَتِين শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ দৃঢ় ও অটল যা কেউ নড়াতে পারে না।

৫৬. এখানে জুলুম অর্থ বাস্তব ও সত্যের প্রতি জুলুম করা এবং নিজে নিজের প্রকৃতির প্রতি জুলুম করা। পূর্বাপর প্রসংগ থেকে একথা প্রকাশ পাচ্ছে যে, এখানে জুলুম-নির্যাতনকারী বলতে সেসব মানুষকে বুঝানো হয়েছে যারা বিশ্ব-জাহানের রবকে বাদ দিয়ে অন্যদের দাসত্ব করছে, যারা আখেরাত অস্বীকার করছে, পৃথিবীতে নিজেদেরকে দায়িত্ব মুক্ত মনে করছে এবং সেসব নবী-রসূলদের অস্বীকার করছে যারা তাদেরকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে সতর্ক করার চেষ্টা করেছেন।

৫৭. কাফেররা দাবি করে বলতো যে, সে প্রতিফল দিবস আসার পথে কোথায় আটকে গেল, তা এসে পড়ছে না কেন? এটা কাফেরদের সে দাবিরই জবাব।

আত্ তূর

৫২

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ والطور থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ সাক্ষ-প্রমাণ থেকে বুঝা যায়, মক্কী জীবনের যে যুগে সূরা আয যারিয়াত নাযিল হয়েছিল এ সূরাটিও সে যুগে নাযিল হয়েছিল। সূরাটি পড়তে গিয়ে একথা অবশ্যই মনে হয় যে, এটি নাযিল হওয়ার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, তবে তখনও চরম জুলুম-অত্যাচার শুরু হয়েছিল বলে মনে হয় না।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার প্রথম রুকূ'র বিষয়বস্তু আখেরাত। সূরা যারিয়াতে এর সম্ভাবনা, অবশ্যম্ভাবিতা এবং সংঘটিত হওয়ার প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছিল। সে জন্য এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। তবে আখেরাত প্রমাণকারী কয়েকটি বাস্তব সত্য ও নিদর্শনের শপথ করে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, তা নিশ্চিতভাবেই সংঘটিত হবে এবং তার সংঘটন রোধ করতে পারে এ শক্তি কারো নেই। এরপর বলা হয়েছে তা সংঘটিত হলে তার অস্বীকারকারীদের পরিণাম কি হবে এবং তা বিশ্বাস করে তাকওয়ার নীতি অবলম্বনকারীগণ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত দ্বারা কিভাবে পুরস্কৃত হবেন।

এরপর কুরাইশ নেতারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত ও আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে নীতি অনুসরণ করে চলছিল দ্বিতীয় রুকূ'তে তার সমালোচনা করা হয়েছে। কখনো তারা নবীকে (সা) গণক, কখনো পাগল এবং কখনো কবি বলে আখ্যায়িত করে সাধারণ মানুষকে তাঁর বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত করতো যাতে মানুষ তাঁর আনীত বাণীর প্রতি ধীর ও সুস্থ মস্তিষ্কে মনোযোগ না দেয়। নবীকে (সা) তারা নিজেদের জন্য একটি মহা বিপদ বলে মনে করতো এবং প্রকাশ্যেই বলতো, তার ওপর কোন বিপদ আপতিত হলে আমরা তার হাত থেকে বেঁচে যেতাম। তারা তাঁর বিরুদ্ধে এ বলে অভিযোগ করতো যে, এ কুরআন তিনি নিজেই রচনা করছেন এবং আল্লাহর নামে পেশ করছেন। তাই তিনি যা করছেন তা ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা বার বার উপহাস করে বলতো নবুওয়াত দানের জন্য আল্লাহ তা'আলা এ ব্যক্তিকে ছাড়া আর মানুষ

খুঁজে পাননি। তারা তাঁর ইসলামী আন্দোলন ও তা প্রচারের বিরুদ্ধে এতই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতো যে, তিনি যেন কিছু চাওয়ার জন্য তাদের পিছু লেগে রয়েছেন আর তারা নিজেদের রক্ষা করার জন্য তাঁর থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা নিজেরা বসে বসে চিন্তা করতো, তাঁর বিরুদ্ধে কি চক্রান্ত করলে তাঁর এ আন্দোলন ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এসব করতে গিয়ে তারা কি ধরনের জাহেলী ও কুসংস্কারমূলক আকীদা-বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে আছে যার গভীর অন্ধকার থেকে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পূর্ণ নিস্বার্থভাবে নিজের জীবনপাত করছেন সে সম্পর্কে কোন অনুভূতিই তাদের ছিল না। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ আচরণের সমালোচনা করে পরপর কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন। এসব প্রশ্নের প্রতিটি হয় তাদের কোন অভিযোগের জবাব, নয়তো তাদের কোন মূর্খতা বা কুসংস্কারের সমালোচনা। এরপর বলা হয়েছে, ঐ লোকদেরকে আপনার নবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাসী বানানোর জন্য কোন মু'জিযা দেখানো একেবারেই অর্থহীন। কারণ, এরা এমন একগুঁয়ে যে, তাদেরকে যাই দেখানো হোক না কেন এরা তার অন্য কোন ব্যাখ্যা করে পাশ কাটিয়ে যাবে এবং ঈমান গ্রহণ করবে না।

এ রুকূ'র শুরুতেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এসব বিরোধী শক্তি ও শত্রুদের অভিযোগ ও সমালোচনার তোয়াক্কা না করে তিনি যেন নিজের আন্দোলন ও উপদেশ-নসীহতের কাজ ক্রমাগত চালিয়ে যেতে থাকেন। রুকূ'র শেষাংশে তাঁকে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, তিনি যেন অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে আল্লাহর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত এসব বিরোধিতার মোকাবিলা করতে থাকেন। এর সাথে সাথে তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, তাঁর প্রভু তাঁকে শত্রুদের মোকাবিলায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে অসহায় ছেড়ে দেননি। বরং সবসময় তিনি তাঁর তদারক ও তত্ত্বাবধান করছেন। তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সময় না আসা পর্যন্ত আপনি সবকিছু বরদাশত করতে থাকুন এবং নিজ প্রভুর 'হামদ ও তাসবীহ' অর্থাৎ প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে সেই শক্তি অর্জন করুন যা এরূপ পরিস্থিতিতে আল্লাহর কাজ করার জন্য দরকার হয়।

আয়াত ৪৯ **সূরা আত্ তূর–মক্কী** রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالطُّوْرِ ۝١ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۝٢ فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۝٣ وَّالْبَيْتِ
الْمَعْمُوْرِ ۝٤ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۝٥ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۝٦ اِنَّ عَذَابَ
رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝٧ مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۝٨ يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ۝٩ وَّتَسِيْرُ
الْجِبَالُ سَيْرًا ۝١٠

তূরের[১] শপথ এবং এমন একখানা খোলা গ্রন্থের শপথ যা সূক্ষ্ম চামড়ার ওপর লিখিত।[২] আর শপথ আবাদ ঘরের,[৩] সুউচ্চ ছাদের[৪] এবং তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের।[৫] তোমার রবের আযাব অবশ্যই আপতিত হবে যার রোধকারী কেউ নেই।[৬] তা ঘটবে সেদিন, যেদিন আসমান প্রচণ্ডভাবে দুলিত হবে[৭] এবং পাহাড় শূন্যে উড়তে থাকবে।[৮]

১. তূর শব্দের প্রকৃত অর্থ পাহাড়। আর الطور শব্দের অর্থ সেই বিশেষ পাহাড় যার ওপরে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসাকে নবুওয়াত দানে সম্মানিত করেছিলেন।

২. প্রাচীন কালে যেসব গ্রন্থ ও লিখিত বস্তুকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সংরক্ষিত রাখার প্রয়োজন হতো সেগুলোকে কাগজের পরিবর্তে হরিণের চামড়ায় লেখা হতো। বিশেষত এসব চামড়া লেখার জন্য পাতলা অথবা ঝিল্লির আকারে তৈরী করা হতো এবং পরিভাষায় একেই رق বলা হতো। আহলে কিতাবগণ সাধারণত এই رق এর ওপরেই তাওরাত, যাবুর, ইনযীল এবং নবীদের সহীফাসমূহ লিখে রাখতো যাতে তা দীর্ঘ দিনের জন্য সংরক্ষিত থাকতে পারে। এখানে খোলা গ্রন্থ অর্থ আহলে কিতাবের কাছে বর্তমান পবিত্র গ্রন্থসমূহের এ সমষ্টি। একে উন্মুক্ত কিতাব বলার কারণ হচ্ছে তা দুষ্প্রাপ্য ছিল না, বরং পাঠ করা হতো এবং তাতে কি লিপিবদ্ধ ছিল তা সহজেই অবহিত হওয়া যেতো।

৩. হযরত হাসান বাসরীর মতে 'আবাদ ঘর' অর্থ খানায়ে কা'বা যা কোন সময়ই হজ্জ, উমরা এবং তাওয়াফ ও যিয়ারতকারী থেকে শূন্য থাকে না। কিন্তু হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, ইকরিমা, মুজাহিদ, কাতাদা, দাহ্হাক, ইবনে যায়েদ ও অন্য সব মুফাস্সিরদের মতে এর অর্থ বায়তুল মা'মূর যার উল্লেখ মি'রাজের প্রসংগে নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছিলেন এবং যার দেয়াল গাত্রে তিনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লামকে হেলান দিয়ে থাকতে দেখেছিলেন। মুজাহিদ, কাতাদা ও ইবনে যায়েদ বলেন, পৃথিবীবাসীদের জন্য খানায়ে কা'বা যেমন আল্লাহ পরস্তদের কেন্দ্র তেমনি প্রত্যেক আসমানে তার বাসিন্দাদের জন্য একটি করে কা'বা আছে যা আল্লাহর ইবাদাতকারীদের জন্য অনুরূপ কেন্দ্রের মর্যাদা রাখে। মি'রাজের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সব কা'বার একটির দেয়ালে হযরত ইবরাহীমকে হেলান দিয়ে থাকতে দেখেছিলেন। এর সাথে হযরত ইবরহীমের সম্পর্ক থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। কারণ তিনিই ছিলেন পৃথিবীর কা'বার প্রতিষ্ঠাতা। এ ব্যাখ্যাটি সামনে রেখে বিবেচনা করলে তা হযরত হাসান বাসরীর ব্যাখ্যার পরিপন্থী হবে না। বরং দু'টি ব্যাখ্যা মিলিয়ে আমরা এভাবে বুঝতে পারি যে, এখানে কেবল পৃথিবীর কা'বার শপথ করা হয়নি বরং বিশ্ব-জাহানে বর্তমান সমস্ত কা'বার শপথ এর মধ্যে অন্তরভুক্ত আছে।

৪. উঁচু ছাদ অর্থ আসমান, যা পৃথিবীকে একটি গম্বুজের মত আচ্ছাদিত করে আছে বলে মনে হয়। এখানে এ শব্দটি গোটা উর্ধ জগতকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ক্বাফ, টীকা ৭)

৫. মূল আয়াতে اَلْبَحْرُالْمَسْجُور শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে কোন কোন মুফাস্সির একে 'আগুনে ভর্তি' অর্থে গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ একে শূন্য ও খালি অর্থে গ্রহণ করেন যার পানি মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ একে আবদ্ধ বা আটকিয়ে রাখা অর্থে গ্রহণ করেন। তাদের মতে এর অর্থ হচ্ছে, সমুদ্রকে আটকিয়ে বা থামিয়ে রাখা হয়েছে যাতে তার পানি মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে হারিয়ে না যায় এবং স্থলভাগকে প্লাবিত করে না ফেলে এবং পৃথিবীর সব অধিবাসী তাতে ডুবে না মরে। কেউ কেউ একে মিশ্রিত অর্থে গ্রহণ করে থাকেন। অর্থাৎ এর মধ্যে মিঠা ও লবণাক্ত পানি এবং গরম ও ঠাণ্ডা সব রকম পানি এসে মিশ্রিত হয়। আর কেউ কেউ একে কানায় কানায় ভরা ও তরংগ বিক্ষুব্ধ অর্থে গ্রহণ করেন। এসব অর্থের মধ্যে প্রথম দু'টি অর্থের পরিবেশ ও অবস্থার সাথে কোন মিল নেই। সমুদ্রের এ দু'টি অবস্থা, অর্থাৎ এর তলদেশ ফেটে সমস্ত পানি মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং তা আগুনে পূর্ণ হয়ে যাবে—কিয়ামতের সময় প্রকাশ পাবে। যা সূরা তাকভীরের ৬ আয়াত এবং সূরা ইনফিতারের ৩ আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে। এ অবস্থা এখন বর্তমান নেই, ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে। তাই এ ঘটনার শপথ করে বর্তমান কালের লোকজনকে আখেরাত সংঘটিত হওয়ার কথা কি করে বিশ্বাস করানো যেতে পারে? তাই এ দু'টি অর্থ বাতিল করে اَلْبَحْرِ الْمَسْجُورِ অর্থ আবদ্ধ, মিশ্রিত, পূর্ণ ও তরংগ বিক্ষুব্ধ অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬. এটি সেই মহাসত্য যার জন্য এ পাঁচটি জিনিসের শপথ করা হয়েছে। রবের শাস্তি অর্থ আখেরাত। যেহেতু এখানে আখেরাত বিশ্বাসকারীদের সম্বোধন না করে আখেরাত অবিশ্বাসকারীদের সম্বোধন করা হয়েছে আর তাদের জন্য আখেরাত আসার অর্থই হচ্ছে আযাব আসা তাই তাকে কিয়ামত, আখেরাত কিংবা প্রতিফল দিবস বলার পরিবর্তে "রবের আযাব" বলা হয়েছে। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা বলে যে পাঁচটি জিনিসের

শপথ করা হয়েছে তা কিভাবে কিয়ামতের সংঘটিত হওয়া প্রতিপাদন করে এখন একটু গভীরভাবে তা ভেবে দেখুন।

তূর এমন একটি জায়গা যেখানে একটি অবদমিত ও নিষ্পেষিত জাতির উত্থান ঘটানো এবং একটি বিজয়ী ও জালেম জাতির পতন ঘটানোর সিদ্ধান্ত হয়েছিল। আর এ সিদ্ধান্ত প্রাকৃতিক বিধানের (Physical law) ভিত্তিতে ছিল না বরং নৈতিক বিধান (Moral law) ও প্রতিফল বিধানের ভিত্তিতে ছিল। তাই আখেরাতের পক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসেবে তূরকে একটি উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের মত একটি অসহায় জাতির উত্থান ঘটানো এবং ফেরাউনের মত এক জবরদস্ত শাসককে সেনাবাহিনীসহ ডুবিয়ে দেয়া—যার ফায়সালা এক নিঝুম রাতে তূর পর্বতে গৃহীত হয়েছিল—এ ব্যাপারে মানবেতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত যে বিশ্ব-জাহানের বিশাল সাম্রাজ্যের স্বভাবসুলভ দাবী এই যে, মানুষের মত একটি বুদ্ধিমান ও স্বাধীন সৃষ্টির নৈতিক জবাবদিহি ও কর্মফল বিধানের আওতায় থাকা উচিত। আর এ দাবীর পূর্ণতা সাধনের জন্যই এমন একটি হিসেবের দিন আবশ্যক যেদিন গোটা মানব জাতিকে একত্রিত করে তার হিসেব নেয়া হবে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা যারিয়াত টীকা ২১)

পবিত্র আসমানী গ্রন্থসমূহের শপথ করার কারণ হচ্ছে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ায় যত নবী-রসূল এসেছেন এবং তাঁরা যেসব কিতাব এনেছেন, প্রতি যুগে তাঁরা সেই একটি মাত্র খবরই দিয়েছেন যা আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিচ্ছেন। অর্থাৎ পূর্বের ও পরের সমস্ত মানুষকে জীবিত হয়ে একদিন আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে এবং নিজের কৃতকর্ম অনুসারে পুরস্কার বা শাস্তি পেতে হবে। এমন কোন আসমানী কিতাব কখনো আসেনি যাতে এ খবর দেয়া হয়নি। কিংবা উল্টা মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ দুনিয়ার জীবনই জীবন। মৃত্যুর পরে তো মানুষ মাটিতে পরিণত হবে। সুতরাং এ জীবনের পরে কোন হিসেব-নিকেশের বালাই নেই।

বায়তুল মা'মূরের শপথ করার কারণ হলো, সে যুগে বিশেষভাবে আরবের লোকদের জন্য কা'বা ঘরের ইমারত এমন একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল যা আল্লাহর নবী-রসূলদের সত্যবাদিতার স্পষ্ট প্রমাণ পেশ করছিল এবং মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ হিকমত এবং চরম শক্তিমত্তা যে তাদের পৃষ্ঠপোষক সে সাক্ষও পেশ করছিল। এসব আয়াত নাযিলের আড়াই হাজার বছর পূর্বে উষর ও জনবসতিহীন পাহাড়সমূহের মধ্যে কোন লোক-লস্কর ও সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই এক ব্যক্তি আসেন এবং তাঁর স্ত্রী ও দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে সম্পূর্ণ অসহায়ভাবে রেখে চলে যান। কিছুদিন পর সে ব্যক্তি পুনরায় সেখানে আসেন। এই জনহীন স্থানটিতে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য একটি ঘর নির্মাণ করেন এবং লোকজনের প্রতি এ বলে আহবান জানান, হে লোকজন, এখানে আস এবং এ ঘরে হজ্জ আদায় করো। এ নির্মাণ কাজ ও আহবান এমন বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, ঐ ঘরটিই সমগ্র আরববাসীর কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ আহবানে সাড়া দিয়ে মানুষ আরবের প্রত্যেক প্রান্ত থেকে লাব্বায়কা লাব্বায়কা বলে ছুটে আসে। আড়াই হাজার বছর পর্যন্ত এ ঘর এমন শান্তির আস্তানা হয়ে থাকে যে, এর চারদিকে গোটা দেশময় খুনখারাবি চলতে থাকলেও এ ঘরের সীমানায় এসে কারো গায়ে হাত তোলার দুঃসাহস কারো হয় না। তাছাড়া এ ঘরের

কল্যাণেই আরব ভূমি প্রতি বছর চার মাসের জন্য এমন নিরাপত্তা লাভ করে যে, কাফেলাসমূহ তখন নিঃশঙ্কচিত্তে ভ্রমণ করে, ব্যবসা-বাণিজ্য জমে ওঠে এবং ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বাজার বসতে থাকে। তাছাড়া এ ঘরের এমন প্রভাব বজায় থাকে যে, পুরো এ সময়-কালে অতি বড় কোন জালেমও সেদিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেনি। আর যে এরূপ দুঃসাহস করেছে সে আল্লাহ তা'আলার এমন গযবের শিকার হয়েছে যে শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে। এসব আয়াত নাযিল হওয়ার মাত্র ৪৫ বছর পূর্বে লোকজন এ রকম একটি মজার ঘটনা নিজ চোখে দেখেছিল এবং তা দর্শনকারী বহু লোক সে সময় মক্কায় জীবিতও ছিল। এমন পরিস্থিতিতেই এ আয়াতগুলো তাদের শোনানো হচ্ছিলো। আল্লাহর নবী যে ফাঁকা বুলি আওড়ান না এর চেয়ে তার বড় প্রমাণ আর কি হতে পারতো? আল্লাহর নবীদের চোখ এমন কিছু দেখতে পান যা অন্যদের দৃষ্টিগোচর হয় না, তাদের মুখ থেকে এমন সব মহাসত্য বেরিয়ে আসে সাধারণ মানুষের বিবেক-বুদ্ধি যার ধারে কাছেও যেতে পারে না। তাঁরা বাহ্যত এমন অনেক কাজ করেন যা দেখে এক যুগের লোক পাগলামি মনে করে বসে। কিন্তু তা দেখেই শতশত বছরের পরের লোকজন তাদের দূর দৃষ্টিতে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে। এ ধরনের মহান ব্যক্তিগণ সর্বসম্মতভাবে প্রতি যুগেই যখন এ খবর দেন যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং 'হাশর নাশর' অনুষ্ঠিত হবে, তখন তাকে পাগলের প্রলাপ মনে করাটাই পাগলামি।

সুউচ্চ ছাদ (আসমান) এবং তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের শপথ করার কারণ হলো, এ দু'টি জিনিস আল্লাহর হিকমত এবং ক্ষমতার প্রতি ইংগিত করে। তাছাড়া এ হিকমত ও ক্ষমতা দ্বারাই আখেরাতের সম্ভাব্যতা, অনিবার্যতা ও সংঘটিত হওয়া প্রমাণিত হয়। আসমান কিভাবে এ বিষয়ে ইংগিত করে সে সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে সূরা ক্বাফের ব্যাখ্যায় ৭নং টীকায় আলোচনা করেছি। বাকী থাকে শুধু সমুদ্রের বিষয়টি। তবে যে ব্যক্তি মুক্ত মনে ও অস্বীকার করার আগাম হঠকারী সিদ্ধান্ত ছাড়া সমুদ্র সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করবে, তার মন সাক্ষ দিতে বাধ্য যে, পৃথিবীর বুকে পানির এত বড় ভাণ্ডারের ব্যবস্থা হয়ে যাওয়াটাই এমন এক কারিগরী যা কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার ফল হতে পারে না। তাছাড়া এর সাথে এত বেশী যৌক্তিক বিষয় তত্ত্ব সংশ্লিষ্ট আছে যে, আকস্মিকভাবে এরূপ জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিসংগত ব্যবস্থা চালু হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সমুদ্রে অসংখ্য জীবজন্তু সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এর প্রত্যেকটি প্রজাতিকে সমুদ্রের যে গভীরতায় বসবাসের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার দৈহিক ব্যবস্থাপনাও সেই গভীরতার উপযোগী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। সমুদ্রের মধ্যে প্রতিদিন কোটি কোটি জীবজন্তু মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। এসব জীবজন্তুর দেহ যাতে পচে গলে না যায় সে জন্য এর পানি লবণাক্ত বানানো হয়েছে। সমুদ্রের পানি একটি নির্দিষ্ট সীমায় থামিয়ে রাখা হয়েছে। পৃথিবীর ফাটলের মধ্যে প্রবেশ করে তা তার অভ্যন্তরে নেমে যায় না কিংবা স্থলভাগে উঠে তা প্লাবিত করে দেয় না। লাখ লাখ ও কোটি কোটি বছর ধরে তা এ সীমার মধ্যেই থেমে আছে। পানির এ বিশাল ভাণ্ডার বহাল থাকার কারণেই পৃথিবীর স্থলভাগে বৃষ্টির ব্যবস্থা হয়। সূর্যের তাপ এবং বায়ু প্রবাহ সম্পূর্ণ নিয়মিতভাবে এ ব্যবস্থাকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। প্রাণীশূন্য না হওয়ার এবং এর মধ্যে নানা রকমের জীবজন্তু সৃষ্টি হওয়ার সুফল হয়েছে এই যে, মানুষ সমুদ্র থেকে ব্যাপক পরিমাণে তার খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় বহু জিনিস লাভ করছে। একটি নির্দিষ্ট সীমায় থেমে থাকার কারণে মহাদেশ ও দ্বীপগুলো টিকে আছে, যেখানে মানুষ বাস করছে।

فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿١٢﴾
يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٣﴾ هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا
تُكَذِّبُونَ ﴿١٤﴾ أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٥﴾ اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا
أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

ধ্বংস রয়েছে সেদিন সেসব অস্বীকারকারীদের জন্য যারা আজ তামাসাচ্ছলে নিজেদের যুক্তি–প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যস্ত আছে।[৯] যেদিন তাদের ধাক্কা দিতে দিতে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে সেদিন তাদের বলা হবে এতো সেই আগুন যা তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে। এখন বলো, এটা কি যাদু না এখনো তোমরা উপলব্ধি করতে পারছো না?[১০] যাও, এখন এর মধ্যে ঢুকে দগ্ধ হতে থাকো। তোমরা ধৈর্য ধর আর না ধর, এখন উভয়টিই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যেমন কাজ করে এসেছো ঠিক তেমন প্রতিদানই তোমাদের দেয়া হচ্ছে।

তা কতকগুলো অলংঘনীয় নিয়ম মেনে চলার কারণে সেখানে মানুষের জাহাজ চালানো সম্ভব হয়েছে। একজন মহাজ্ঞানীর জ্ঞান ও মহাক্ষমতাধরের ক্ষমতা ছাড়া এ সুব্যবস্থাপনার কল্পনাও করা যেতে পারে না এবং এ ধারণাও পোষণ করা যায় না যে, মানুষ এবং পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টির কল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত সমুদ্রের এ সুশৃংখল ব্যবস্থাপনার যে সম্পর্ক তা আকস্মিক ও এলোপাতাড়িভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এটা যদি এ বিষয়ের অনস্বীকার্য প্রমাণ হয় যে, এক মহাজ্ঞানী ও মহাশক্তিধর আল্লাহ পৃথিবীর বুকে মানুষকে আবাদ করার জন্য আরো অসংখ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে বিশাল এ লবণাক্ত সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন তাহলে সে ব্যক্তি হবে চরম আহমক, যে মহাজ্ঞানী সেই আল্লাহ থেকে এমন মূর্খতা প্রত্যাশা করে যে, তিনি এ সমুদ্র থেকে মানুষের শস্য ক্ষেতসমূহ সিক্ত করে তার মাধ্যমে মানুষকে রিযিক দানের ব্যবস্থা করে দিবেন কিন্তু কখনো তাকে জিজ্ঞেস করবেন না যে, তুমি আমার রিযিক খেয়ে কিভাবে তার হক আদায় করেছো? তাছাড়া তিনি এ সমুদ্রের বুকে মানুষকে জাহাজ চালানোর ক্ষমতা দেবেন কিন্তু একথা কখনো জিজ্ঞেস করবেন না যে, তুমি ন্যায় ও সত্যের আনুগত্য করে জাহাজ চালিয়েছো না তার সাহায্যে সারা বিশ্বে ডাকাতি করে বেড়িয়েছো? অনুরূপভাবে যে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্ষমতার একটি নগণ্য বিস্ময়কর নমুনা এ বিশাল সমুদ্রের সৃষ্টি, যিনি মহাশূন্যে আবর্তনকারী ঝুলন্ত এ গ্রহ পৃষ্ঠে পানির এত বড় ভাণ্ডার ধরে রেখেছেন, যিনি তার মধ্যে এমন বিশাল পরিমাণ লবণ গুলিয়ে দিয়েছেন, যিনি এর মধ্যে নানা রকমের অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছেন এবং এর মধ্য থেকেই তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন, যিনি প্রতি বছর সেখান থেকে শত শত কোটি টন পানি উঠিয়ে বাতাসের কাঁধে তুলে নিয়ে যান এবং কোটি কোটি বর্গমাইল ব্যাপী শুষ্ক অঞ্চলে নিয়মিতভাবে বর্ষণ করে চলেছেন তাঁর

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ
رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

মুত্তাকীরা[১১] সেখানে বাগান ও নিয়ামতসমূহের মধ্যে অবস্থান করবে এবং তাদের রব তাদের যা কিছু দান করবেন তা মজা করে উপভোগ করতে থাকবে। আর তাদের রব তাদেরকে দোযখের আযাব থেকে বাঁচিয়ে নেবেন।[১২] (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা যেসব কাজ করে এসেছো তার বিনিময়ে মজা করে পানাহার করো।[১৩]

সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করাও চরম মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয় যে, তিনি মানুষকে একবার সৃষ্টি করার পর এমন অক্ষম হয়ে যান যে, পুনরায় তাকে সৃষ্টি করতে চাইলেও করতে পারেন না।

৭. মূল আয়াতাংশ হলো تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا । আরবী ভাষায় مور আবর্তিত হওয়া, কেঁপে কেঁপে ওঠা, ঘুরপাক খাওয়া এবং বারবার সামনে ও পেছনে চলা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিয়ামতের দিন আসমানের যে অবস্থা হবে একথাটির মাধ্যমে তা বর্ণনা করে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যে, সেদিন উর্ধজগতের সমস্ত ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কেউ যদি সেদিন আকাশের দিকে তাকায় তবে দেখবে যে, সেই সুশোভিত নকশা বিকৃত হয়ে গিয়েছে যা সবসময় একই রকম দেখা যেতো আর চারদিকে একটা অস্থিরতা বিরাজ করছে।

৮. অন্য কথায় ভূপৃষ্ঠের আকর্ষণ ও বন্ধন পাহাড়কে আটকে রেখেছিল তা শিথিল হয়ে যাবে এবং তা সমূলে উৎপাটিত হয়ে এমনভাবে শূন্যে উড়তে থাকবে যেন মেঘমালা ভেসে বেড়াচ্ছে।

৯. অর্থাৎ তারা নবীর কাছে কিয়ামত, আখেরাত, জান্নাত ও দোযখের কথা শুনে সেগুলোকে হাসির খোরাক বানাচ্ছে এবং এ বিষয়ে সুস্থ মস্তিষ্কে গভীরভাবে চিন্তা করার পরিবর্তে কেবল বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করছে। আখেরাত নিয়ে তাদের বিতর্কের উদ্দেশ্য এর তাৎপর্য বুঝার প্রচেষ্টা নয়, বরং তা একটি খেলা যা দিয়ে তারা মনোরঞ্জন করে থাকে। কিন্তু এটা তাদের কোন্ পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে সে ব্যাপারে আদৌ কোন উপলব্ধি নেই।

১০. অর্থাৎ দুনিয়াতে রসূল যখন তোমাদেরকে এ জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে সাবধান করতেন তখন তোমরা বলতে, এটা কেবল কথার যাদুগিরি। আমাদেরকে এভাবে বোকা বানানো হচ্ছে। এখন বলো তোমাদের সামনে বিদ্যমান এ জাহান্নাম কি সেই যাদুর খেলা, নাকি এখনো বুঝে উঠতে পারনি, যে জাহান্নামের খবর তোমাদের দেয়া হতো তোমরা সে জাহান্নামের মুখোমুখি হয়েছো?

مُتَّكِـِٔيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ
مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۭ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿٢١﴾ وَاَمْدَدْنٰهُمْ
بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢٢﴾

তারা সামনাসামনি রাখা সুসজ্জিত আসনসমূহে হেলান দিয়ে বসবে এবং আমি সুনয়না হুরদের তাদের সাথে বিয়ে দেব।[১৪] যারা ঈমান গ্রহণ করেছে এবং তাদের সন্তানরাও ঈমানসহ তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে আমি তাদের সেসব সন্তানকেও তাদের সাথে (জান্নাতে) একত্রিত করে দেব। আর তাদের আমলের কোন ঘাটতি আমি তাদেরকে দেব না।[১৫] প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জিত কর্মের হাতে জিম্মী রয়েছে।[১৬] আমি তাদেরকে সব রকমের ফল, গোশত[১৭] এবং তাদের মন যা চাইবে তাই প্রচুর পরিমাণে দিতে থাকবো।

১১. অর্থাৎ যারা নবী-রসূলদের দেয়া খবরের ওপর ঈমান এনে দুনিয়ায় থাকতেই নিজেদের বাঁচানোর ব্যবস্থা করেছে এবং যেসব ধ্যান-ধারণা ও কাজ-কর্মের কারণে মানুষ জাহান্নামের উপযুক্ত হয়। তা থেকে দূরে অবস্থান করেছে।

১২. কোন ব্যক্তির জান্নাতে প্রবেশের কথা বলার পর তাকে দোযখ থেকে বাঁচিয়ে নেয়ার কথা বলার বাহ্যত কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু কুরআন মজীদের কয়েকটি জায়গায় এ দু'টি কথা আলাদা করে বলার কারণ হলো. কোন ব্যক্তির দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে যাওয়াটাই একটা বিরাট নিয়ামত। "আল্লাহ তাকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করেছেন" এ বাণীটি মূলত একটি মহাসত্যের প্রতি ইংগিত। মহাসত্যটি হলো, কোন ব্যক্তির দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে যাওয়া কেবল আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানীতে সম্ভব। অন্যথায় মানবিক দুর্বলতা প্রত্যেক ব্যক্তির আমলে এমন সব অপূর্ণতার সৃষ্টি করে যে, আল্লাহ তা'আলা যদি তাঁর মহানুভবতা দিয়ে তা উপেক্ষা না করেন এবং মুহাসাবা বা হিসেব-নিকেশ নিতে শুরু করেন তাহলে কেউ-ই পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারে না। তাই জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া আল্লাহর যত বড় নিয়ামত, দোযখ থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করে নেয়া তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

১৩. এখানে "মজা করে" কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থ বহন করে। মানুষ জান্নাতে যা লাভ করবে কোন প্রকার কষ্ট বা পরিশ্রম ছাড়াই তা লাভ করবে। তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়া বা ঘাটতি পড়ার আদৌ কোন সম্ভাবনা সেখানে থাকবে না। সে জন্য মানুষকে কোন খরচও করতে হবে না। তা হুবহু তার আকাংখা ও মনের পছন্দ মত হবে। যত চাইবে এবং যখনই চাইবে সামনে এনে হাজির করা হবে। সেখানে সে মেহমান হিসেবে অবস্থান

করবেন না যে, কিছু চাইতে লজ্জাবোধ করবে। সে যা কিছু লাভ করবে তা তার অতীত কাজের প্রতিদান হিসেবে এবং নিজের বিগত দিনের উপার্জনের ফল হিসেবে লাভ করবে। ঐ সব বস্তু পানাহারের কারণে কোন রকম রোগের আশংকা থাকবে না। ক্ষুধা নিবারণ এবং জীবন ধারণের জন্য ঐ সব নিয়ামত হবে না, বরং শুধু স্বাদ ও আনন্দ লাভের জন্য হবে। ব্যক্তি তা থেকে যত মজা ও স্বাদ লাভ করতে চাইবে ততই করতে পারবে; তাতে কোন প্রকার বদহজম হবে না। তাছাড়া ঐ সব খাদ্য কোন প্রকার নোংরা বর্জ্য সৃষ্টি করবে না। সুতরাং পৃথিবীতে মজা করে পানাহার করা যে অর্থ বহন করে জান্নাতে মজা করে পানাহার করা তা থেকে অনেক বেশী ব্যাপক ও উন্নত অর্থ বহন করে।

১৪. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাফ্ফাত, টীকা ২৬–২৯; আদ্ দুখান, টীকা ৪২।

১৫. এ বিষয়টি ইতিপূর্বে সূরা রা'দের ২৩ আয়াত এবং সূরা মু'মিনের ৮ আয়াতেও উল্লেখিত হয়েছে। তবে এখানে পূর্বে দু'টি জায়গায় উল্লেখিত সুখবরের চেয়ে অতিরিক্ত একটি বড় সুখবর শোনানো হয়েছে। সূরা রা'দের আয়াতে শুধু এতটুকু বলা হয়েছিল যে, জান্নাতবাসীদের পিতা–মাতা–সন্তান–সন্ততি এবং স্ত্রীদের মধ্যে যেসব ব্যক্তি নেককার, তারা সবাই তার সাথে জান্নাতে যাবে। আর সূরা মু'মিনে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতারা ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে এ বলে দোয়া করে যে, তাদের সন্তান, স্ত্রী এবং বাপ–দাদার মধ্যে যারা নেক্কার তাদেরকেও জান্নাতে তাদের সাথে একত্রিত করে দাও। ঐ দু'টি আয়াতের বক্তব্যের চেয়ে অধিক যে কথাটি এখানে বলা হয়েছে, তা হচ্ছে, সন্তান যদি কোন না কোন পর্যায়ের ঈমানসহ তার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাহলে সে ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ঈমান ও আমলের কারণে তার পিতা যে মর্যাদা লাভ করেছে, আমলের দিক দিয়ে ঐ মর্যাদার উপযুক্ত না হলেও সন্তানদেরকে পিতার সাথে একত্রিত করা হবে। এই একত্র হওয়া মাঝে মাঝে গিয়ে সাক্ষাত করার মত হবে না। এ জন্য اَلْحَقْنَا بِهِمْ কথা ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ হলো জান্নাতে তাদেরকে পিতা–মাতার সাথেই রাখা হবে। এ ছাড়া আরো সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, সন্তানদের সাথে একত্রিত করার জন্য পিতা–মাতাদের মর্যাদা হ্রাস করে পদাবনতি করা হবে না। বরং পিতা–মাতাদের সাথে একত্রিত করার জন্য সন্তানদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে তাদের পদোন্নতি দিয়ে ওপরে উঠানো হবে।

এখানে একথাটিও বুঝে নিতে হবে যে, নিজ ইচ্ছায় ও সংকল্পে ঈমান গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং নেক্কার মুরুব্বীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে এ বাণী তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু কোন ঈমানদার ব্যক্তির সন্তান যদি ভাল মন্দ উপলব্ধি করার মত বয়সে উপনীত হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করে তবে তাদের ব্যাপারে কুফরী ও ঈমান এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাদের তো এমনিতেই জান্নাতে যাওয়ার কথা এবং তাদের পিতা–মাতার চোখ জুড়ানোর জন্য তাদের সাথে একত্রে রাখার কথা।

১৬. এখানে "জিম্মী বা বন্ধক" শব্দটির রূপক ব্যবহার অত্যন্ত অর্থবহ। কোন ব্যক্তি যদি কাউকে কিছু ঋণ দেয় এবং ঋণদাতা তার পাওনা আদায়ের নিশ্চয়তা হিসেবে ঋণ গ্রহীতার কোন জিনিস নিজের কাছে বন্ধক রাখে তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঋণ পরিশোধ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধকী বস্তু মুক্ত হবে না। তাছাড়া নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার

পরও যদি বন্ধকী বস্তু মুক্ত না করে তাহলে বন্ধকী বস্তুটি বাজেয়াপ্ত বা হাতছাড়া হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলাও মানুষের মধ্যকার লেনদেনের বিষয়টিকে এখানে বন্ধকী লেনদেনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষকে যে সাজ-সরঞ্জাম, যেসব শক্তি, যেসব যোগ্যতা এবং যেসব ইখতিয়ার দিয়েছেন তা যেন মালিক তার বান্দাকে ঋণ দিয়েছেন। এ ঋণের জামানত হিসেবে বান্দা নিজেই আল্লাহর কাছে বন্ধক বা জিম্মী হয়ে রয়েছে। বান্দা যদি এসব সাজ-সরঞ্জাম, শক্তি এবং ইখতিয়ার সঠিকভাবে ব্যবহার করে নেকী অর্জন করে—যে নেকী দ্বারা এসব ঋণ পরিশোধ হবে, তাহলে সে বন্ধকী মাল অর্থাৎ নিজেকে মুক্ত করে নেবে। অন্যথায় তা বাজেয়াপ্ত করে নেয়া হবে। পূর্ববর্তী আয়াতের পরপরই একথা বলার কারণ হচ্ছে, সৎকর্মশীল ঈমানদারগণ যত বড় মর্যাদা সম্পন্নই হোক না কেন তাদের সন্তানরা নিজেদের কর্ম দ্বারা নিজেদের সত্তাকে মুক্ত না করলে তাদের বন্ধক মুক্তি হতে পারে না। বাপ-দাদার কর্ম সন্তানদের মুক্ত করতে পারে না। তবে সন্তানরা যদি যে কোন মাত্রার ঈমান ও সৎকর্মশীলদের আনুগত্য দ্বারা নিজেরা নিজেদের মুক্ত করতে পারে তাহলে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাদেরকে নিম্ন মর্যাদা থেকে উচ্চ মর্যাদা দিয়ে বাপ-দাদার সাথে একত্রিত করে দেবেন। এটা নিছক আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী ও দয়া। সন্তানরা বাপ-দাদার সৎকাজের এ সুফলটুকু অন্তত লাভ করতে পারে। তবে তারা যদি নিজেদের কর্মদ্বারা নিজেরাই নিজেদেরকে দোযখের উপযোগী বানায় তাহলে এটা কোনক্রমেই সম্ভব নয় যে, বাপ-দাদার কারণে তাদেরকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। সাথে সাথে এ আয়াত থেকে একথাও বুঝা যায় যে, নিম্ন মর্যাদার নেক সন্তানদের নিয়ে উচ্চ মর্যাদার নেক পিতা-মাতার সাথে একত্রিত করে দেয়া প্রকৃতপক্ষে সেসব সন্তানের কর্মের ফল নয়, বরং তা ঐসব পিতা-মাতার কর্মের ফল। তারা নিজেদের আমল দ্বারা এ মর্যাদা লাভের উপযুক্ত হবে। তাই তাদের মন খুশী করার জন্য সন্তানদেরকেও তাদের সাথে একত্রিত করা হবে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা মর্যাদা হ্রাস করে তাদেরকে তাদের সন্তানদের কাছে নিয়ে যাবেন না। বরং সন্তানদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে তাদের কাছে নিয়ে যাবেন; যাতে নিজ সন্তানদের থেকে দূরে অবস্থানের কারণে মনকষ্ট না হয় এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিয়ামতসমূহ পূর্ণ করে দেয়ার ক্ষেত্রে এ কমতিটুকু না থেকে যায়।

১৭. এ আয়াতটিতে জান্নাতবাসীদেরকে সব রকমের গোশত সরবরাহ করার কথা উল্লেখ আছে। আর সূরা ওয়াকিয়ার ২১ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে পাখীর গোশত দিয়ে আপ্যায়ন করা হবে। এ গোশত কি প্রকৃতির হবে তা আমরা সঠিক জানি না। কিন্তু কুরআনের কোন কোন আয়াতে এবং কোন কোন হাদীসে জান্নাতের দুধ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তা জীব-জন্তুর পালান থেকে নির্গত হবে না। জান্নাতের মধু সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা মৌমাছির মধু হবে না। আর জান্নাতের শরাব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা ফল পচিয়ে তার নির্যাসে তৈরী হবে না। আল্লাহর কুদরতে এগুলো ঝর্ণাসমূহ থেকে নির্গত হবে এবং নদীতে প্রবাহিত হবে। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, জান্নাতের গোশতও জবাইকৃত জীব-জন্তুর গোশত হবে না, বরং কুদরতি পন্থায় তৈরী হবে। যে আল্লাহ মাটির উপাদানসমূহ থেকে সরাসরি দুধ, মধু ও শরাব তৈরী করতে সক্ষম, তিনি এসব উপাদান দিয়েই জীব-জন্তুর গোশতের চেয়েও অধিক সুস্বাদ গোশত তৈরী করে দিতে পারেন। এটা

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ
غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٥﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا
وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ
الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾

তারা সেখানে পরস্পরের নিকট থেকে ক্ষিপ্রতার সাথে শরাব পাত্র গ্রহণ করতে থাকবে। কিন্তু সেখানে কোন অপ্রয়োজনীয় কথা থাকবে না এবং থাকবে না কোন চরিত্রহীনতা।[১৮] তাদের সেবার জন্য সেসব বালকেরা ছুটাছুটি করতে থাকবে যারা কেবল তাদের জন্য নির্দিষ্ট হবে[১৯] তারা এমন সুদর্শন যেন সযত্নে লুকিয়ে রাখা মোতি। তারা একে অপরকে (পৃথিবীতে অতিবাহিত) অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। তারা বলবে আমরা প্রথমে নিজের পরিবারের লোকদের মধ্যে ভয়ে ভয়ে জীবন যাপন করতাম।[২০] পরিশেষে আল্লাহ আমাদের ওপর মেহেরবানী করেছেন এবং দগ্ধকারী[২১] আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন। অতীত জীবনে আমরা তাঁর কাছেই দোয়া করতাম সত্যিই তিনি অতি বড় উপকারী ও দয়াবান।

তাঁর ক্ষমতার অসাধ্য নয়। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাফ্‌ফাত টীকা ২৫; সূরা মুহাম্মাদ, টীকা ২১ থেকে ২৩)।

১৮. অর্থাৎ সেই শরাব নেশা সৃষ্টিকারী হবে না। তাই তা পান করে কেউ মাতাল হয়ে বেহুদা ও আবোলতাবোল বকবে না, গালি-গালাজ করবে না, চড় থাপ্পড় দেবে না কিংবা দুনিয়ার শরাব পানকারীদের মত অশ্লীল ও অশালীন আচরণ করবে না। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাফ্‌ফাত, টীকা ২৭)।

১৯. এ সূক্ষ্ম বিষয়টি বিশেষ লক্ষণীয় যে, غِلْمَانُهُمْ বলা হয়নি, বরং غِلْمَانٌ لَّهُمْ বলা হয়েছে। যদি غِلْمَانُهُمْ বলা হতো তাহলে তা থেকে এ ধারণা করা যেতে পারতো যে, দুনিয়ায় যারা তাদের খাদেম ছিল জান্নাতেও তাদেরকেই তাদের খাদেম বানিয়ে দেয়া হবে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে দুনিয়ার যে ব্যক্তিই জান্নাতে যাবে সে তার উপযুক্ত পাত্র হিসেবেই যাবে এবং দুনিয়ায় সে যে প্রভুর খেদমত করতো বেহেশতেও তাকে সেই প্রভুর খাদেম বানিয়ে দেয়া হবে তার কোন কারণ নেই। বরং এমনও হতে পারে যে, কোন খাদেম তার নেক আমলের কারণে জান্নাতে প্রভুর চেয়েও উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। সুতরাং غِلْمَانٌ لَّهُمْ বলে এ ধারণা পোষণের কোন অবকাশই রাখা হয়নি। এ শব্দটি

فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ
شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِۦ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ﴿٣٠﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا۟ فَإِنِّى مَعَكُم مِّنَ
ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٣١﴾ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَٰمُهُم بِهَٰذَآ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ
تَقَوَّلَهُۥ ۚ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوا۟ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِۦٓ إِن كَانُوا۟
صَٰدِقِينَ ﴿٣٤﴾

২ রুকূ'

তাই হে নবী (সা), তুমি উপদেশ দিতে থাক। আল্লাহর মেহেরবাণীতে তুমি গণকও নও, পাগলও নও।[২২]

এসব লোক কি বলে যে, এ ব্যক্তি কবি, যার ব্যাপারে আমরা কালের আবর্তনের অপেক্ষা করছি।[২৩] তাদেরকে বলো, ঠিক আছে অপেক্ষা করতে থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।[২৪] তাদের বিবেক-বুদ্ধি কি তাদেরকে এসব কথা বলতে প্ররোচিত করে, না কি প্রকৃতপক্ষে তারা শত্রুতায় সীমালংঘনকারী লোক?[২৫]

তারা কি বলে যে, এ ব্যক্তি নিজেই কুরআন রচনা করে নিয়েছে? প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে তারা ঈমান গ্রহণ করতে চায় না।[২৬] তাদের একথার ব্যাপারে তারা যদি সত্যবাদী হয় তাহলে এ বাণীর মত একটি বাণী তৈরী করে আনুক।[২৭]

এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয় যে, এরা হবে সেই সব বালক যাদেরকে জান্নাতে তাদের খেদমতের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাফ্ফাত, টীকা ২৬)।

২০. অর্থাৎ আমরা সেখানে বিলাসিতায় ডুবে এবং আপন ভুবনে মগ্ন থেকে গাফলতির জীবন যাপন করিনি। সেখানে সবসময়ই আমাদের আশংকা থাকতো যে, কখন যেন আমাদের দ্বারা এমন কোন কাজ হয়ে যায়, যে কারণে আল্লাহ আমাদের পাকড়াও করবেন। এখানে বিশেষ করে নিজের পরিবারের লোকদের মধ্যে ভয়ে ভয়ে জীবন যাপন করার উল্লেখ করার কারণ এই যে, মানুষ বেশীর ভাগ যে জন্য গোনাহে লিপ্ত হয় তা হচ্ছে তার সন্তান-সন্ততির আরাম-আয়েসের ব্যবস্থা করা এবং তাদের দুনিয়া নির্মাণের চিন্তা। এ জন্য সে হারাম উপার্জন করে, অন্যদের অধিকার লুণ্ঠন করে এবং নানা রকম অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে। এ কারণে জান্নাতের বাসিন্দারা পরস্পর বলবে বিশেষভাবে যে জিনিসটি

আমাদেরকে মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা করেছে তা হচ্ছে, নিজের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে জীবন যাপন করতে গিয়ে তাদের আরাম-আয়েশে রাখার এবং তাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করার ততটা চিন্তা ছিল না যতটা চিন্তা ছিল এ ব্যাপারে যে, তাদের জন্য আমরা যেন এমন পন্থা অবলম্বন করে না বসি, যার দ্বারা আমাদের আখেরাত বরবাদ হয়ে যাবে, আর নিজের সন্তানদেরকেও আমরা এমন পথে নিয়ে যাবো যা তাদেরকে আল্লাহর আযাবের উপযোগী বানিয়ে দেবে।

২১. মূল আয়াত سَمُوم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ চরম উষ্ণ হাওয়া। অর্থাৎ দোযখ থেকে উত্থিত উত্তপ্ত হাওয়ার ঝাপটা।

২২. মক্কার কাফেররা জুলুম ও হঠকারিতার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের মোকাবিলা করছিল। ওপরে আখেরাতের চিত্র পেশ করার পর এখন বক্তব্যের মোড় এখানে তাদের জুলুম ও হঠকারিতার দিকে ঘুরে যাচ্ছে। এখানে বাহ্যতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে তার মাধ্যমে মক্কার কাফেরদেরকেই এসব কথা শুনানো হচ্ছে। তিনি যখন তাদের সামনে কিয়ামত, হাশর-নাশর, হিসেব-নিকেশ, শাস্তি ও পুরস্কার এবং জান্নাত ও জাহান্নামের কথা বলতেন আর এসব বিষয় সম্বলিত কুরআন মজীদের আয়াত শুনিয়ে দাবী করতেন, এসব খবর আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার কাছে এসেছে, এ হচ্ছে আল্লাহর বাণী, আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে এ বাণী নাযিল করেছেন তখন তাদের নেতৃবৃন্দ, ধর্মীয় পুরোহিত গোষ্ঠী এবং তাদের বখাটে লোকেরা তাঁর এ বক্তব্য যেমন কখনো সুস্থ মস্তিষ্কে ভেবে-চিন্তে দেখতো না, তেমনি এও চাইতো না যে, জনসাধারণ তাঁর বক্তব্যের প্রতি মনোযোগ দিক। তাই তারা কখনো বলতো তিনি গণক, কখনো বলতো তিনি পাগল, কখনো বলতো তিনি কবি, আবার কখনো বলতো তিনি নিজেই এসব অদ্ভুত কথা রচনা করেন এবং নিজের প্রভাব বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর নাযিলকৃত অহী বলে পেশ করেন। তাদের ধারণা ছিল, এভাবে অপবাদ আরোপ করে মানুষের মনে তাঁর ব্যাপারে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে দিতে পারবে এবং তাঁর সব কথা ব্যর্থ হয়ে যাবে। সুতরাং এখানে বলা হচ্ছে, হে নবী, বাস্তব অবস্থা তো তাই যা সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এসব কারণে এসব লোক যদি তোমাকে গণক এবং পাগল বলে তাহলে তার পরোয়া করো না। আল্লাহর বান্দাদেরকে তাদের গাফলতি সম্পর্কে সতর্ক এবং প্রকৃত সত্য সম্পর্কে সাবধান করার কাজ করতে থাকো। কারণ, আল্লাহর মেহেরবানীতে তুমি গণকও নও, পাগলও নও।

আরবী ভাষায় كاهن শব্দটি জোতিষী, ভবিষ্যৎ বক্তা ও জ্ঞানবান অর্থে ব্যবহৃত হয়। জাহেলী যুগে এটি একটি স্বতন্ত্র পেশা ছিল। গণকরা দাবী করতো এবং দুর্বল আকীদার লোকেরা মনে করতো যে, তারা নক্ষত্র বিশারদ বা আত্মা, শয়তান ও জিনদের সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক আছে, যার মাধ্যমে তারা গায়েবী খবর জানতে পারে। কোন জিনিস হারিয়ে গেলে তা কোথায় পড়ে আছে তা তারা বলে দিতে পারে। কারো বাড়ীতে চুরি হলে কে চোর তা তারা বলে দিতে পারে। কেউ তার ভাগ্য সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা বলে দিতে পারে তার ভাগ্যে কি লেখা আছে। মানুষ এসব উদ্দেশ্য নিয়েই তাদের কাছে যেতো। তারা কিছু নযর-নিয়াজ নিয়ে তাদেরকে গায়েবী কথা বলে দিতো। মানুষ যাতে তাদের

কাছে আসে এ উদ্দেশ্যে তারা নিজেরাও অনেক সময় বস্তিতে গিয়ে হাঁক ছেড়ে বেড়াতো। তাদের একটা বিশেষ ঢং হতো, যা দিয়ে তাদের চেনা যেতো। তাদের কথাবার্তাও সাধারণ বোলচাল থেকে ভিন্ন হতো। তারা বিশেষ ভংগীতে কিছুটা গানের সুরে ছন্দবদ্ধ কথা বলতো এবং সাধারণত এমন হেঁয়ালিপূর্ণ কথা বলতো যা থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি তার মনের কথার সন্ধান করে নিতে পারে। জনসাধারণকে ধোঁকা দেয়ার জন্য কুরাইশ নেতারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তারা গণক হওয়ার অপবাদ আরোপ করেছিল। আর তা করেছিল শুধু এ কারণে যে, তিনি এমন সব বিষয়ে কথা বলতেন যা মানুষের দৃষ্টির আড়ালে ছিল, তাছাড়া তিনি দাবী করতেন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা এসে তাঁর কাছে অহী নাযিল করে এবং আল্লাহর যে বাণী তিনি পেশ করেন তাও ছিল ছন্দায়িত। কিন্তু তাদের এ অপবাদের কারণে আরবের কোন মানুষই প্রতারিত হয়নি। কারণ গণকদের পেশা, তাদের চালচলন, তাদের কথাবার্তা এবং তাদের কারবার কারোই অজানা ছিল না। সবাই জানতো, তারা কি কাজ করে, কি উদ্দেশ্যে লোকজন তাদের কাছে যায়, কি কি কথা তারা তাদেরকে বলে, তাদের ছন্দবদ্ধ কথাগুলো কেমন হয় এবং তার বিষয়বস্তু কি থাকে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এটা আদৌ কোন গণকের কাজ হতে পারে না যে, জাতির মধ্যে তৎকালে প্রচলিত আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী আকীদা-বিশ্বাস সে তুলে ধরবে, দিনরাত তার প্রচার প্রসারে জীবনপাত করবে এবং সে জন্য গোটা জাতির শত্রুতার ঝুঁকি নেবে। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গণক হওয়ার এ অপবাদের নাম মাত্র সামঞ্জস্যও ছিল না। তাই নবীর (সা) ওপর এ অপবাদ আরোপ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সুতরাং আরবের কোন নিরেট বোকা লোকও এতে প্রতারিত হয়নি।

অনুরূপভাবে মক্কার কাফেররা নিছক তাদের মনের সান্ত্বনার জন্য নবীকে (সা) পাগল হওয়ার অপবাদ দিতো। যেমন বর্তমান যুগের কোন কোন বেশরম পাশ্চাত্য লেখক ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের হিংসা চরিতার্থ করার জন্য দাবী করে যে, নবীর (সা) ওপর মৃগি রোগের (Epilepsy) আক্রমণ হতো এবং আক্রান্ত অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে যেসব কথা বের হতো লোকে তাকেই অহী মনে করতো। সে যুগের কোন জ্ঞানী লোকও এসব বেহুদা অপবাদকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেনি, এ যুগের কোন মানুষও কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে সাধিত বিস্ময়কর কীর্তিসমূহ দেখে একথা বিশ্বাস করতে পারে না যে, এসব কিছু মৃগী রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফল।

২৩. অর্থাৎ এ ব্যক্তির ওপর কোন আকস্মিক বিপদ আপতিত হোক এবং আমরা তার জ্বালাতন থেকে রক্ষা পাই, এ জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। সম্ভবত তাদের ধারণা ছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু আমাদের উপাস্যদের বিরোধিতা এবং তাদের অলৌকিক কর্মকাণ্ড অবিশ্বাস করেন, তাই হয় তাঁর ওপরে আমাদের কোন উপাস্য দেব-দেবীর কোপানল পড়বে অথবা কোন দুঃসাহসী বীর তার এসব কথা শুনে ধৈর্য হারিয়ে ফেলবে এবং তাকে হত্যা করবে।

২৪. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে, আমিও দেখছি তোমাদের এ আকাংখা পূরণ হয় কিনা। অপর অর্থটি হচ্ছে, দুর্ভাগ্য আমার আসে না তোমাদের আসে, তা দেখার জন্য আমিও অপেক্ষা করছি।

২৫. এ দু'টি বাক্যে বিরোধীদের সমস্ত অপপ্রচার খণ্ডন করে দিয়ে তাদের মুখোশ সম্পূর্ণরূপে খুলে দেয়া হয়েছে। যুক্তির সারকথা হলো, কুরাইশদের এসব নেতা ও প্রবীণ ব্যক্তি বড় বড় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান সেজে বসে আছে। কিন্তু তাদের জ্ঞানবুদ্ধি কি বলে, যে ব্যক্তি কবি নয় তাকে কবি বলো, গোটা জাতির লোক যাকে একজন জ্ঞানী বলে জানে তাকে পাগল বলো এবং গণনা বিদ্যার সাথে যার দূরতম সম্পর্কও নেই তাকে অযথা গণক বলে আখ্যায়িত করো। এরপরও যদি তারা জ্ঞান ও যুক্তির ভিত্তিতেই এ সিদ্ধান্ত নিতো তাহলে যে কোন একটি কথাই বলতো। অনেকগুলো পরস্পর বিরোধী উপাধি তো কাউকে একসাথে দেয়া যায় না। এক ব্যক্তি কবি, পাগল ও গণক একই সাথে কিভাবে হতে পারে? সে যদি পাগল হয়ে থাকে তাহলে গণক বা কবি হতে পারে না। গণক হলে কবি হতে পারে না এবং কবি হলে গণক হতে পারে না। কেননা, কবিতার ভাষা ও আলোচ্য বিষয় যা গণক বা জোতিষীদের ভাষা ও বিষয়বস্তু তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। একই কথাকে যুগপৎ কাব্য ও গণকদের গণনা বলে আখ্যায়িত করা এমন কোন ব্যক্তির কাজ হতে পারে না, যে কাব্য ও গণনা বিদ্যার পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত। অতএব, এটা অত্যন্ত পরিষ্কার কথা যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে পরস্পর বিরোধী কথা ও মন্তব্য জ্ঞান-বুদ্ধির ভিত্তিতে নয়, বরং সরাসরি জিদ ও হঠকারিতার ভিত্তিতে করা হচ্ছে। জাতির এসব বড় বড় নেতা শুধু শত্রুতার আতিশয্যে অন্ধ হয়ে এমন সব ভিত্তিহীন অপবাদ আরোপ করছে যা কোন সুস্থ ও স্থির মস্তিষ্কের মানুষ গ্রহণযোগ্য মনে করতে পারে না। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আ'রাফ, টীকা ১০৪; ইউনুস, টীকা ৩; বানী ইসরাঈল, টীকা ৫৩, ৫৪; আশ শু'আরা, টীকা ১৩০, ১৩১, ১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪)

২৬. অন্য কথায় এ উক্তির তাৎপর্য হচ্ছে, কুরাইশদের মধ্যে যেসব লোক বলতো, কুরআন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের রচিত বাণী তারাও জানতো যে, এটা তাঁর বাণী হতে পারে না। তাছাড়া অন্য যেসব লোকের ভাষা আরবী, তারা এ বাণী শোনা মাত্র পরিষ্কার বুঝে ফেলতো যে, এটা মানুষের কথার চেয়ে অনেক উর্ধের জিনিসই শুধু নয়, বরং তাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানতো সে কখনো ধারণাই করতে পারতো না যে, এটা সত্যিই তাঁর নিজের কথা। অতএব, পরিষ্কার ও সোজা কথা হলো, কুরআনকে তাঁর নিজের রচনা বলে আখ্যা দানকারীরা আসলে ঈমান আনতে চায় না। তাই তারা নানা রকমের মিথ্যা বাহানা খাড়া করছে। আর এটি সেসব বাহানারই একটি। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, ইউনুস, টীকা ২১; আল ফুরকান, টীকা ১২; আল কাসাস, টীকা ৬৪; আল আনকাবূত, টীকা ৮৮-৮৯; আস সাজদা, টীকা ১ থেকে ৪; হা-মীম আস সাজদা; টীকা ৫৪; আল আহকাফ, টীকা ৮ থেকে ১০)

২৭. অর্থাৎ কথা শুধু এ টুকু নয় যে, এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী নয়, বরং এটা আদৌ মানুষের কথা নয়। এ রকম বাণী রচনা করাও মানুষের সাধ্যাতীত। তোমরা যদি একে মানুষের কথা বলতে চাও তাহলে মানুষের রচিত এ মানের কোন কথা এনে প্রমাণ করো। শুধু কুরাইশদেরকে নয়, সারা দুনিয়ার মানুষকে এ আয়াতের মাধ্যমে সর্বপ্রথম এ চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল। এরপর পুনরায় মক্কায়

তিনবার এবং মদীনায় শেষ বারের মত এ চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। (দেখুন ইউনুস, আয়াত ৩৮; হূদ, ১৩; বনী ইসরাঈল, ৮৮; আল বাকারা, ২৩)। কিন্তু সে সময়ও কেউ এর জবাব দেয়ার সাহস দেখাতে পারেনি। তার পরেও আজ পর্যন্ত কেউ কুরআনের মোকাবিলায় মানুষের রচিত কোন কিছু পেশ করার দুঃসাহস দেখাতে পারেনি। কেউ কেউ এ চ্যালেঞ্জের প্রকৃত ধরন না বুঝার কারণে বলে থাকে, শুধু কুরআন কেন, কোন একক ব্যক্তির নিজস্ব রীতিতেও অন্য কেউ গদ্য বা কবিতা লিখতে সমর্থ হয় না। হোমার, রুমী, সেক্সপিয়ার, গেটে, গালিব, ঠাকুর, ইকবাল সবাই এদিক দিয়ে অনুপম যে তাদের অনুকরণ করে তাদের মত কথা রচনা করার সাধ্য কারোই নেই। কুরআনের চ্যালেঞ্জের এ জবাবদাতারা প্রকৃতপক্ষে এ বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত আছে যে, فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ আয়াতাংশের অর্থ হুবহু কুরআনের মতই কোন গ্রন্থ রচনা করে দেয়া। অথচ এর অর্থ বাকরীতির দিক দিয়ে সমমান নয়। এর অর্থ সামগ্রিকভাবে এর গুরুত্ব ও মর্যাদার সমপর্যায়ের কোন গ্রন্থ নিয়ে এসো। যেসব বৈশিষ্টের কারণে কুরআন একটি মু'জিযা ঐ গ্রন্থও সে একই রকম বৈশিষ্ট মণ্ডিত সমপর্যায়ের হতে হবে। যেসব বড় বড় বৈশিষ্টের কারণে কুরআন পূর্বেও মু'জিযা ছিল এবং এখনো মু'জিযা তার কয়েকটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ যে ভাষায় কুরআন মজীদ নাযিল হয়েছে তা সে ভাষার সাহিত্যের উচ্চতম ও পূর্ণাঙ্গ নমুনা। গোটা গ্রন্থের একটি শব্দ বা একটি বাক্যও মানের নিচে নয়। যে বিষয়টিই ব্যক্ত করা হয়েছে সেটিই উপযুক্ত শব্দ ও উপযুক্ত বাচনভংগীতে বর্ণনা করা হয়েছে। একই বিষয় বার বার বর্ণিত হয়েছে এবং প্রতিবারই বর্ণনার নতুন ভংগী গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু সেজন্য পৌনপুনিকতার দৃষ্টিকটূতা ও শ্রুতিকটূতা কোথাও সৃষ্টি হয়নি। গোটা গ্রন্থে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শব্দের গাঁথুনি এমন যেন আংটির মূল্যবান পাথরগুলো ছেঁটে ছেঁটে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। কথা এতটা মর্মস্পর্শী যে, তা শুনে ভাষাভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিই মাথা নিচু না করে থাকতে পারে না। এমন কি অমান্যকারী এবং বিরোধী ব্যক্তির মনপ্রাণ ও ভাবাবেগ পর্যন্ত উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। ১৪ শত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আজ অবধি এ গ্রন্থ তার ভাষায় সাহিত্যের সবচেয়ে উন্নত নমুনা। এর সমপর্যায়ের তো দূরের কথা সাহিত্যিক মর্যাদা ও মূল্যমানে আরবী ভাষার কোন গ্রন্থ আজ পর্যন্ত এর ধারে কাছেও পৌছেনি। শুধু তাই নয়, এ গ্রন্থ আরবী ভাষাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে বসেছে যে, ১৪ শত বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও এ ভাষার বিশুদ্ধতার মান তাই আছে যা এ গ্রন্থ প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল। অথচ এ সময়ের মধ্যে ভাষাসমূহ পরিবর্তিত হয়ে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। পৃথিবীতে আর কোন ভাষা এমন নেই যা এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত লিখন পদ্ধতি, রচনা রীতি, বাচনভংগী, ভাষার নিয়ম-কানুন এবং শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একই রূপ নিয়ে টিকে আছে। কিন্তু এটা শুধু কুরআনের শক্তি যা আরবী ভাষাকে স্থানচ্যুত হতে দেয়নি। আজ পর্যন্ত এর একটি শব্দও পরিত্যক্ত হয়নি। এর প্রতিটি বাকরীতি অদ্যাবধি আরবী ভাষায় প্রচলিত আছে। এর সাহিত্যমান আজ পর্যন্ত আরবী ভাষার উচ্চ মানের সাহিত্য। ১৪ শত বছর আগে কুরআনে যে বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছিল বক্তৃতা ও লেখায় আজও সেটাই বিশুদ্ধ ভাষা বলে মানা হচ্ছে। দুনিয়ার কোন ভাষায় মানুষের রচিত কোন গ্রন্থ কি এ মর্যাদা লাভ করেছে!

দুই ঃ এটা পৃথিবীর একমাত্র গ্রন্থ যা মানব জাতির ধ্যান-ধারণা, স্বভাব-চরিত্র, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং জীবন প্রণালীর ওপর এমন ব্যাপক, এমন গভীর এবং এমন সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করেছে যে, পৃথিবীতে তার কোন নজির পাওয়া যায় না। এর প্রভাব প্রথমে একটি জাতির মধ্যে পরিবর্তন আনলো। অতপর সেই জাতি তৎপর হয়ে পৃথিবীর একটি বিশাল অংশে পরিবর্তন আনলো। দ্বিতীয় আর কোন গ্রন্থ নেই যা এতটা বিপ্লবাত্মক প্রমাণিত হয়েছে। এ গ্রন্থ কেবলমাত্র কাগজের পৃষ্ঠাসমূহেই লিপিবদ্ধ থাকেনি বরং তার এক একটি শব্দ ধ্যান-ধারণাকে বাস্তবে রূপদান করেছে এবং একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা নির্মাণ করেছে। ১৪ শত বছর ধরে তার এ প্রভাব চলে আসছে এবং দিনে দিনে তা আরো বিস্তৃত হচ্ছে।

তিন ঃ এ গ্রন্থ যে বিষয়ে আলোচনা করে তা একটি ব্যাপকতর বিষয়। এর পরিধি আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত গোটা বিশ্ব-জাহানকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। এ গ্রন্থ বিশ্ব-জাহানের তাৎপর্য তার শুরু ও শেষ এবং তার নিয়ম-শৃংখলা সম্পর্কে বক্তব্য ও মত পেশ করে। এ গ্রন্থ বলে দেয় এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা, শৃংখলাবিধানকারী এবং পরিচালক কে? কি তাঁর গুণাবলী, কি তাঁর ইখতিয়ার ও ক্ষমতা এবং কি সেই মূল ও আসল বিষয় যার ভিত্তিতে তিনি এ গোটা বিশ্ব ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেছেন। সে এ পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত মর্যাদা ও অবস্থান সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করে বলে দেয় যে, এটা তার স্বাভাবিক অবস্থান এবং এটা তার জন্মগত মর্যাদা। সে এ অবস্থান ও মর্যাদা পাল্টে দিতে সক্ষম নয়। এ অবস্থান ও মর্যাদার দিক দিয়ে মানুষের জন্য সত্য ও বাস্তবতার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল সঠিক পথ কি এবং সত্য ও বাস্তবের সাথে সংঘাতপূর্ণ ভ্রান্ত পথ কি তা সে বলে দেয়। সঠিক পথের সঠিক হওয়া এবং ভ্রান্ত পথের ভ্রান্ত হওয়া প্রমাণের জন্য সে যমীন ও আসমানের এক একটি বস্তু থেকে, মহাবিশ্ব ব্যবস্থার এক একটি প্রান্ত থেকে মানুষের নিজের আত্মা ও সত্তা থেকে এবং মানুষেরই নিজের ইতিহাস থেকে অসংখ্য যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে। এর সাথে সে বলে দেয় মানুষ কিভাবে ও কি কি কারণে ভ্রান্ত পথে চলেছে এবং প্রতি যুগে তাকে কিভাবে সঠিক পথ বাতলে দেয়া হয়েছে যা সবসময় একই ছিল এবং একই থাকবে। সে কেবল সঠিক পথ দেখিয়েই ক্ষান্ত হয় না। বরং সে পথে চলার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার চিত্র পেশ করে যার মধ্যে আকায়েদ, আখলাক, আত্মার পরিশুদ্ধি, ইবাদাত-বন্দেগী, সামাজিকতা, তাহযীব, তামাদ্দুন, অর্থনীতি, রাজনীতি, ন্যায়বিচার, আইন-কানুন—এক কথায় মানব জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে অত্যন্ত সুসংবদ্ধ বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া এ সঠিক পথ অনুসরণ করার এবং ভ্রান্ত পথসমূহে চলার কি কি ফলাফল এ দুনিয়ায় দেখা দেবে এবং দুনিয়ার বর্তমান ব্যবস্থা ধ্বংস হওয়ার পর অন্য আরেকটি জগতে দেখা দেবে তাও সে বিস্তারিত বলে দেয়। সে এ দুনিয়ার পরিসমাপ্তি এবং আরেকটি দুনিয়া প্রতিষ্ঠার অবস্থা অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে; এ পরিবর্তনের সমস্ত স্তর এক এক করে বলে দেয়, দৃষ্টির সামনে পরজগতের পূর্ণ চিত্র অংকন করে এবং সেখানে মানুষ কিভাবে আরেকটি জীবন লাভ করবে তা স্পষ্ট করে বর্ণনা করে, কিভাবে তার পার্থিব জীবনের কার্যাবলীর হিসেব-নিকেশ হবে, কোন্ কোন্ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, কেন অনস্বীকার্য রূপে তার সামনে তার আমলনামা পেশ করা হবে। সেসব কাজের প্রমাণ স্বরূপ কি ধরনের অকাট্য সাক্ষসমূহ পেশ করা হবে, পুরস্কার ও শাস্তিলাভকারী কেন পুরস্কার ও শাস্তিলাভ

করবে। পুরস্কার লাভকারীরা কি ধরনের পুরস্কারলাভ করবে এবং শাস্তি প্রাপ্তরা কি কি ভাবে তাদের কার্যাবলীর মন্দফল ভোগ করবে, এ ব্যাপক বিষয়ে যে বক্তব্য এ গ্রন্থে পেশ করা হয়েছে তার মর্যাদা এমন নয় যে, তার রচয়িতা তর্ক শাস্ত্রের কিছু যুক্তিতর্ক একত্রিত করে কতকগুলো অনুমানের প্রাসাদ নির্মাণ করছেন, বরং এর রচয়িতা প্রকৃত সত্য সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান রাখেন, তাঁর দৃষ্টি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছু দেখছে। সমস্ত সত্য তাঁর কাছে উন্মুক্ত। মহাবিশ্বের গোটাটাই তাঁর কাছে একখানা উন্মুক্ত গ্রন্থের মত। মানব জাতির শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই শুধু নয়। লয় প্রাপ্তির পর তার অপর জীবনও তিনি যুগপৎ এক দৃষ্টিতে দেখছেন এবং শুধু অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে নয়, জ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষকে পথপ্রদর্শন করছেন। এ গ্রন্থ যেসব সত্যকে তাত্ত্বিকভাবে পেশ করে থাকে আজ পর্যন্ত তার কোন একটিকে ভুল বা মিথ্যা বলে প্রমাণ করা যায়নি। বিশ্ব-জাহান ও মানুষ সম্পর্কে সে যে ধারণা পেশ করে তা সমস্ত দৃশ্যমান বস্তু ও ঘটনাবলীর পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা পেশ করে এবং জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় গবেষণার ভিত্তি রচনা করে। দর্শন বিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞানের সমস্ত সাম্প্রতিকতম প্রশ্নের জবাব তার বাণীতে বর্তমান এবং এসবের মধ্যে এমন একটা যৌক্তিক সম্পর্ক বিদ্যমান যে, ঐগুলোকে ভিত্তি করে একটি পূর্ণাংগ সুসংবদ্ধ ও ব্যাপক চিন্তাপদ্ধতি গড়ে ওঠে। তাছাড়া জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে সে মানুষকে যে বাস্তব পথনির্দেশনা দিয়েছে তা শুধু যে, সর্বোচ্চ মানের যুক্তিগ্রাহ্য ও অত্যন্ত পবিত্র তাই নয়। বরং ১৪ শত বছর ধরে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন আনাচে কানাচে অসংখ্য মানুষ কার্যত তার অনুসরণ করছে। আর অভিজ্ঞতা তাকে সর্বোত্তম ব্যবস্থা বলে প্রমাণিত করেছে। এরূপ মর্যাদার মানব রচিত কোন গ্রন্থ কি দুনিয়ায় আছে কিংবা কোন সময় ছিল, যা এ গ্রন্থের মোকাবিলায় এনে দাঁড় করানো যেতে পারে?

চার ঃ এ গ্রন্থ পুরোটা একবারে লিখে দুনিয়ার সামনে পেশ করা হয়নি। বরং কতগুলো প্রাথমিক নির্দেশনা নিয়ে একটি সংস্কার আন্দোলন শুরু করা হয়েছিল। এরপর ২৩ বছর পর্যন্ত উক্ত আন্দোলন যেসব স্তর অতিক্রম করেছে তার অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে ঐ আন্দোলনের নেতার মুখ দিয়ে এর বিভিন্ন অংশ কখনো দীর্ঘ ভাষণ এবং কখনো সংক্ষিপ্ত বাক্যের আকারে উচ্চারিত হয়েছে। অতপর এ কার্যক্রম পূর্ণতালাভের পর বিভিন্ন সময়ে মুখ থেকে উচ্চারিত এসব অংশ পূর্ণাংগ গ্রন্থের আকারে সাজিয়ে দুনিয়ার সামনে পেশ করা হয়েছে যাকে 'কুরআন' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আন্দোলনের নেতার বক্তব্য হলো, এসব ভাষণ ও বাক্য তাঁর রচিত নয়, বরং তা বিশ্ব-জাহানের রবের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে নাযিল হয়েছে। কেউ যদি একে ঐ নেতার নিজের রচিত বলে অভিহিত করে, তাহলে সে দুনিয়ার গোটা ইতিহাস থেকে এমন একটি নজির পেশ করুক যে, কোন মানুষ বছরের পর বছর নিজে একাধারে একটি বড় সংঘবদ্ধ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে কখনো একজন বক্তা এবং কখনো একজন নৈতিক শিক্ষক হিসেবে, কখনো একটি মজলুম দলের নেতা হিসেবে, কখনো একটি রাষ্ট্রের শাসক হিসেবে, কখনো একটি যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে, কখনো একজন বিজয়ী হিসেবে, কখনো আইন ও বিধান দাতা হিসেবে মোটকথা অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থেকে ভিন্ন ভিন্ন যেসব বক্তব্য পেশ করেছেন, কিংবা কথা বলেছেন, তা একত্রিত হয়ে একটি পূর্ণাংগ, সুসংবদ্ধ ও সর্বাত্মক চিন্তা ও কর্মপ্রণালীতে পরিণত হয়েছে এবং তার মধ্যে কোথাও কোন বৈপরীত্য পাওয়া যায় না, তার মধ্যে প্রথম

থেকে শেষ পর্যন্ত একটিই মাত্র কেন্দ্রীয় ধারণা ও চিন্তার ধারাবাহিকতা সক্রিয় দেখা যায়। প্রথম দিন থেকে তিনি তাঁর আন্দোলনের যে ভিত্তি বর্ণনা করেছিলেন শেষ দিন পর্যন্ত সে ভিত্তি অনুসারে আকীদা–বিশ্বাস ও কার্যাবলীর এমন একটি ব্যাপক ও সার্বজনীন আদর্শ নির্মাণ করেছেন যার প্রতিটি অংশ অন্যান্য অংশের সাথে পূর্ণরূপে সামঞ্জস্য রাখে এবং এ সংকলন অধ্যয়নকারী কোন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিই একথা উপলব্ধি না করে পারবে না যে আন্দোলনের সূচনাকালে আন্দোলনকারীর সামনে আন্দোলনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত গোটা অন্দোলনের পূর্ণাংগ চিত্র বর্তমান ছিল। এমন কখনো হয়নি মধ্য পথে কোন স্থানে তাঁর মাথায় এমন কোন ধারণার উদ্ভব হয়েছে যা পূর্বে তাঁর কাছে পরিষ্কার ছিল না অথবা যা পরে পরিবর্তন করতে হয়েছে। মস্তিষ্কের সৃষ্টিশীলতার এমন চরম পরাকাষ্ঠা দেখাতে সক্ষম হয়েছে এমন কোন মানুষ যদি কোন সময় জন্মগ্রহণ করে থাকে তাহলে তা দেখিয়ে দেয়া হোক।

পাঁচ ঃ যে নেতার মুখ থেকে এসব ভাষণ ও বাণীসমূহ উচ্চারিত হয়েছে, তিনি হঠাৎ কোন গোপন আস্তানা থেকে শুধু এগুলো শোনানোর জন্য বেরিয়ে আসতেন না এবং শোনাবার পর আবার কোথাও চলে যেতেন না। এ আন্দোলন শুরু করার পূর্বেও তিনি মানব সমাজে জীবন যাপন করেছিলেন এবং পরেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সবসময় ঐ সমাজেই থাকতেন। মানুষ তার আলোচনা ও বক্তব্যের ভাষা এবং বাচনভংগীর সাথে ভালভাবে পরিচিত ছিল। হাদীসসমূহ তার একটি বড় অংশ এখনও সংরক্ষিত আছে। পরবর্তী সময়ের আরবী ভাষাভিজ্ঞ মানুষ যা পড়ে সহজেই দেখতে পারেন যে, সেই নেতার বাচনভংগী কেমন ছিল। তাঁর স্বভাষী মানুষ সে সময়ও পরিষ্কার উপলব্ধি করতো এবং আরবী ভাষা জানা মানুষ আজও উপলব্ধি করে যে, এ গ্রন্থের (কুরআন) ভাষা ও বাকরীতি সেই নেতার ভাষা ও বাকরীতি থেকে অনেক ভিন্ন। এমন কি তাঁর ভাষণের মধ্যে যেখানে এ গ্রন্থের কোন বাক্যের উদ্ধৃতি আসে তখন উভয়ের ভাষার পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পৃথিবীতে কোন মানুষ কি কখনো দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্টাইলে বছরের পর বছর কথা বলার ভান করতে সক্ষম হয়েছে বা হতে পারে অথচ দু'টিই যে, একই ব্যক্তির স্টাইল, সে রহস্য কখনো প্রকাশ পায় না? এ ধরনের ভান বা অভিনয় করে আকস্মিক বা সাময়িকভাবে সফল হওয়া সম্ভব। কিন্তু একাধারে ২৩ বছর পর্যন্ত এমনটি হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয় যে, এক ব্যক্তি যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা অহী হিসেবে কথা বলে তখন তার ভাষা ও স্টাইল এক রকম হবে আবার যখন নিজের পক্ষ থেকে কথা বলে বা বক্তৃতা করে তখন তার ভাষা ও স্টাইল সম্পূর্ণ আরেক রকম হবে।

ছয় ঃ এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দান কালে সেই নেতা বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। কখনো তিনি বছরের পর বছর স্বদেশবাসী ও স্বগোত্রীয় লোকদের উপহাস, অবজ্ঞা ও চরম জুলুম–নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, কখনো তাঁর সংগী–সাথীদের ওপর এমন জুলুম করা হয়েছে যে, তারা দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কখনো শত্রুরা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে, কখনো তাঁর নিজেকেই স্বদেশভূমি ছেড়ে হিজরত করতে হয়েছে। কখনো তাঁকে চরম দারিদ্রকষ্ট সইতে এবং ভুখা জীবন কাটাতে হয়েছে। কখনো তাঁকে একের পর এক লাড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং তাতে বিজয় ও পরাজয়

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ
بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾

কোন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া এরা কি নিজেরাই সৃষ্টি হয়েছে? না কি এরা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা? না কি পৃথিবী ও আসমানকে এরাই সৃষ্টি করেছে? প্রকৃত ব্যাপার হলো, তারা বিশ্বাস পোষণ করে না।[২৮]

তোমার রবের ভাণ্ডারসমূহ কি এদের অধিকারে? নাকি ঐ সবের ওপর তাদের কর্তৃত্ব চলে?[২৯]

উভয়টিই এসেছে। কখনো তিনি দুশমনদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেছেন এবং যেসব দুশমন তাঁর ওপর নির্যাতন চালিয়েছিল তাদেরকেই তাঁর সামনে অধোবদন হতে হয়েছে। কখনো তিনি এমন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করেছেন যা খুব কম লোকের ভাগ্যেই জুটে থাকে। একথা স্পষ্ট যে, এ ধরনের নানা পরিস্থিতিতে কোন মানুষের আবেগ অনুভূতি এক রকম থাকতে পারে না। এসব রকমারি ক্ষেত্র ও পরিস্থিতিতে সেই নেতা যখনই তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে কথা বলেছেন তখনই তাঁর মধ্যে স্বভাবসুলভ মানবোচিত আবেগ অনুভূতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে যা এরূপ ক্ষেত্র ও পরিস্থিতিতে একজন মানুষের মনে সচরাচর সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু এসব পরিস্থিতিতে তাঁর মুখ হতে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা অহী হিসেবে যেসব কথা শোনা গিয়েছে তা ছিল মানবিক আবেগ-অনুভূতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কোন একটি ক্ষেত্রেও কোন কট্টর সমালোচকও অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলতে পারবে না যে, এখানে মানবিক আবেগ-অনুভূতির প্রভাব পড়েছে বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সাত ঃ এ গ্রন্থে যে ব্যাপক ও পূর্ণাংগ জ্ঞান পাওয়া যায় তা সে যুগের আরববাসী, রোমান, গ্রীক ও ইরানবাসীদের কাছে তো দূরের কথা এ বিংশ শতাব্দীর বড় বড় পণ্ডিতদেরও কারো ঝুলিতে নেই। বর্তমানে অবস্থা এই যে, দর্শন, বিজ্ঞান এবং সমাজ বিদ্যার কোন একটি শাখার অধ্যয়নে গোটা জীবন কাটিয়ে দেয়ার পরই কেবল কোন ব্যক্তি জ্ঞানের সেই শাখার সর্বশেষ সমস্যাবলী জানতে পারে। তারপর যখন গভীর দৃষ্টি নিয়ে সে কুরআন অধ্যয়ন করে তখন জানতে পারে যে, এ গ্রন্থে সেসব সমস্যার একটি সুস্পষ্ট জবাব বিদ্যমান। এ অবস্থা জ্ঞানের কোন একটি শাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং যেসব জ্ঞান বিশ্ব-জাহান ও মানুষের সাথে কোনভাবে সম্পর্কিত তার সবগুলোর ক্ষেত্রেই সঠিক। কি করে বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, ১৪ শত বছর পূর্বে আরব-মরুর এক নিরক্ষর ব্যক্তি জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় এমন ব্যাপক দক্ষ ছিল এবং তিনি প্রতিটি মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে সেগুলোর একটি পরিষ্কার ও চূড়ান্ত জওয়াব খুঁজে পেয়েছিলেন?

কুরআনের মু'জিযা হওয়ার যদিও আরো অনেক কারণ আছে। তবে কেউ যদি শুধু এ কয়টি কারণ নিয়ে চিন্তা করে তাহলে সে জানতে পারবে কুরআন নাযিল হওয়ার যুগে

কুরআনের মু'জিয়া হওয়া যতটা স্পষ্ট ছিল আজ তার চেয়ে অনেক গুণে বেশী স্পষ্ট এবং ইনশায়াল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত স্পষ্টতর হতে থাকবে।

২৮. ইতিপূর্বে যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিলো তার উদ্দেশ্য ছিল মক্কার কাফেরদের বুঝানো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের দাবীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার জন্য তারা যেসব কথা বলছে তা কতটা অযৌক্তিক। এ আয়াতে তাদের সামনে প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দাওয়াত পেশ করছেন তার মধ্যে এমন কি আছে যে জন্য তোমরা ক্রোধান্বিত হচ্ছো? তিনি তো একথাই বলছেন যে, আল্লাহ তোমাদের স্রষ্টা এবং তোমাদের উচিত তাঁরই বন্দেগী করা। এতে তোমাদের ক্রোধান্বিত হওয়ার যুক্তিসংগত কি কারণ থাকতে পারে? তোমরা কি নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছো, কোন স্রষ্টা তোমাদের সৃষ্টি করেননি? নাকি তোমরা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা? কিংবা এ বিশাল মহাবিশ্ব তোমাদের তৈরী? এসব কথার কোনটিই যদি সত্য না হয়, আর তোমরা নিজেরাই স্বীকার করো যে তোমাদের স্রষ্টা আল্লাহ আর এই বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টাও তিনিই, তাহলে যে ব্যক্তি তোমাদের বলে, সেই আল্লাহই তোমাদের বন্দেগী ও উপাসনা পাওয়ার অধিকারী সেই ব্যক্তির প্রতি তোমরা এত ক্রোধান্বিত কেন? আসলে ক্রোধোদ্দীপক ব্যাপার তো যে স্রষ্টা নয় তার বন্দেগী করা এবং যিনি স্রষ্টা তার বন্দেগী না করা। তোমরা মুখে একথা অবশ্যই স্বীকার করো যে, বিশ্ব-জাহান ও তোমাদের স্রষ্টা আল্লাহ। কিন্তু সত্যিই যদি একথায় বিশ্বাস থাকতো তাহলে তাঁর বন্দেগীর প্রতি আহবানকারীর পেছনে এভাবে আদাপানি খেয়ে লাগতে না।

এটা ছিল এমন একটি তীক্ষ্ণ ছুঁচালো প্রশ্ন যা মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিমূলকেই কাঁপিয়ে দিয়েছে। বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদীসে আছে, বদর যুদ্ধের পর বন্দী কুরাইশদের মুক্ত করার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে জুবাইর ইবনে মুতয়িম মদীনায় আসে। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরিবের নামাযে ইমামতি করছিলেন। নামাযে তিনি সূরা তূর পড়ছিলেন। তার নিজের বর্ণনা হচ্ছে, নবী (সা) যখন সূরার এ আয়াত পড়ছিলেন তখন মনে হলো, আমার কলিজাটা বুঝি বক্ষ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। সেদিন এ আয়াত শুনে তার মনে ইসলাম বদ্ধমূল হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এটি তার ইসলাম গ্রহণ করার একটি বড় কারণ হয়েছিল।

২৯. মক্কার কাফেরদের প্রশ্ন ছিল, শেষ পর্যন্ত আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই কেন রসূল বানানো হলো? এটি তাদের সে প্রশ্নের জবাব। এ জবাবের তাৎপর্য হচ্ছে, এসব লোককে গায়রুল্লাহর ইবাদাতের গোমরাহী থেকে মুক্ত করার জন্য কাউকে না কাউকে তো রসূল বানিয়ে পাঠাতেই হতো। এখন প্রশ্ন হলো, সে সিদ্ধান্ত কে গ্রহণ করবেন? আল্লাহ কাকে তাঁর রসূল মনোনীত করবেন আর কাকে করবেন না সে সিদ্ধান্ত কে গ্রহণ করবে? এরা যদি আল্লাহর মনোনীত রসূলকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে থাকে তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, হয় তারা নিজেদেরকে আল্লাহর রাজ্যের মালিক মনে করে নিয়েছে। নয়তো তারা ধারণা করে বসে আছে যে, বিশ্ব জাহানের মালিক মনিব তো আল্লাহ তা'আলাই থাকবেন, তবে সেখানে বাস্তব কর্তৃত্ব চলবে তাদের।

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۚ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَهُ
الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٣٩﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٤٠﴾
أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ
كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾

তাদের কাছে কি কোন সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে তারা উর্ধজগতের কথা শুনে নেয়? এদের মধ্যে যে শুনেছে সে পেশ করুক কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ। আল্লাহর জন্য কি কেবল কন্যা সন্তান আর তোমাদের জন্য যত পুত্র সন্তান?৩০

তুমি কি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক দাবী করছো যে, তাদের ওপর জোরপূর্বক চাপানো জরিমানার বোঝার নীচে তারা নিষ্পেষিত হচ্ছে?৩১

তাদের কাছে কি অদৃশ্য সত্যসমূহের জ্ঞান আছে যার ভিত্তিতে তারা লিখছে?৩২

তারা কি কোন চক্রান্ত আঁটতে চাচ্ছে?৩৩ (যদি তাই হয়) তাহলে কাফেররাই উল্টো নিজেদের ষড়যন্ত্রের জালে আটকা পড়বে।৩৪

আল্লাহ ছাড়া কি তাদের আর কোন ইলাহ আছে? যে শিরক তারা করছে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।৩৫

৩০. এ সংক্ষিপ্ত বাক্যসমূহে একটা বিরাট যুক্তি-তর্ক তুলে ধরা হয়েছে। এর বিস্তারিত রূপ হলো, তোমরা যদি রসূলের কথা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাও তাহলে সত্যকে জানার জন্য তোমাদের কাছে কি উপায় ও মাধ্যম আছে? তোমাদের কেউ কি উর্ধজগতে আরোহণ করে আল্লাহ তা'আলা কিংবা তাঁর ফেরেশতাদের নিকট থেকে সরাসরি একথা জেনে নিয়েছে যে, যেসব আকীদা-বিশ্বাসের ওপর তোমাদের বাতিল ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত তা পুরোপুরি বাস্তব সম্মত ও সত্য? কেউ যদি এ দাবী করতে চায় তাহলে সে সামনে আসুক এবং বলুক, সে কবে কিভাবে উর্ধজগতে আরোহণের অধিকার লাভ করেছে এবং সেখান থেকে কি জ্ঞান সে নিয়ে এসেছে? কিন্তু এটা যদি তোমাদের দাবী না হয়, তাহলে নিজেরাই ভেবে দেখো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা আল্লাহর সন্তান আছে বলে তোমরা যে দাবী করছো তাও আবার কন্যা সন্তান—যাকে নিজের জন্য তোমরা লজ্জা ও অপমানের কারণ বলে মনে করো—এর চেয়ে অধিক হাস্যকর ধারণা আর কিছু হতে পারে কি? প্রকৃত জ্ঞান ছাড়াই তোমরা এ ধরনের স্পষ্ট মূর্খতার অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছো, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সামনে জ্ঞানের আলো পেশ করছে, তোমরা তার প্রাণের দুশমন হয়ে দাঁড়াচ্ছো।

৩১. প্রশ্নের মূল লক্ষ কাফেররা। অর্থাৎ তোমাদের কাছে রসূলের যদি কোন স্বার্থ থাকতো এবং নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তিনি এসব তৎপরতা দেখাতেন তাহলে তাঁর নিকট থেকে সরে যাওয়ার একটা যুক্তিসংগত কারণ অন্তত তোমাদের থাকতো। কিন্তু তোমরা জান এ আন্দোলনের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নিস্বার্থ, শুধু তোমাদের কল্যাণের জন্যই তিনি জীবনপাত করছেন। এরপরও ধির স্থির মন-মেজাজ নিয়ে তাঁর কথা শোনার মত উদারতা তোমাদের না থাকার কি কারণ থাকতে পারে? এ প্রশ্নের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম সমালোচনাও বিদ্যমান। সারা দুনিয়ার ভণ্ড ধর্মগুরুরা এবং ধর্মীয় আস্তানার সেবকদের মত আরবেও মুশরিকদের ধর্মীয় নেতা এবং পণ্ডিত পুরোহিতরা খোলাখুলি ধর্মীয় কারবার চালিয়ে যাচ্ছিল। তাই তাদের সামনে প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, একদিকে আছে এসব ধর্ম ব্যবসায়ীরা যারা তোমাদের নিকট থেকে প্রকাশ্যে নজর-নিয়াজ এবং প্রতিটি ধর্মীয় কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য পারিশ্রমিক আদায় করছে। অপরদিকে এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিস্বার্থভাবে, বরং নিজের ব্যবসায়-বাণিজ্য ধ্বংস করে অত্যন্ত যুক্তিসংগত প্রমাণ দিয়ে তোমাদেরকে দীনের সোজা পথ দেখানোর চেষ্টা করছে অথচ তোমরা তার নিকট থেকে সরে যাচ্ছো এবং তাদের দিকে দৌড়ে অগ্রসর হচ্ছো এটা চরম নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কি?

৩২. অর্থাৎ রসূল তোমাদের সামনে যেসব সত্য পেশ করছেন তা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য তোমাদের কাছে এমন কি প্রমাণ আছে যা পেশ করে দাবী করতে পারো দৃশ্যমান বস্তু ছাড়া চোখের আড়ালে যেসব সত্য লুকিয়ে আছে তোমরা সরাসরি তা জানো? তোমরা কি সত্যিই জানো যে, আল্লাহ এক নন এবং তোমরা যাদেরকে উপাস্য বানিয়ে রেখেছো তারাও আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারের অধিকারী? তোমরা কি সত্যিই ফেরেশতাদের দেখেছো; তারা যে মেয়ে তা জানতে পেরেছো এবং নাউযুবিল্লাহ আল্লাহর ঔরসেই তারা জন্ম নিয়েছে, তোমরা কি সত্যিই জানো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোন অহী আসেনি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বান্দার কাছে তা আসতেও পারে না? তোমরা কি সত্যিই একথা জানতে পেরেছো যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে না, মৃত্যুর পরে আর কোন জীবন হবে না, আখেরাত কায়েম হবে না যেখানে মানুষের হিসেব-নিকেশ করে তাকে শাস্তি ও পুরস্কার দেয়া হবে? তোমরা এ ধরনের কোন জ্ঞানের দাবী করলে একথা লিখে দিতে কি প্রস্তুত আছ যে, তোমরা এ সম্পর্কে রসূলের পেশকৃত বর্ণনা ও তথ্য যে অস্বীকার করছো তার কারণ হলো পরদার পেছনে উঁকি দিয়ে তোমরা দেখে নিয়েছো, রসূল যা বলছেন তা বাস্তব ও সত্য নয়। এখানে কেউ একথা বলে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন যে, এ জবাবে ঐ সব মানুষ যদি হঠকারিতার আশ্রয় নিয়ে তা লিখে দেয় তাহলে কি এসব যুক্তি অর্থহীন হয়ে পড়ে না? কিন্তু এরূপ সন্দেহ করা ভুল। কারণ, হঠকারিতা করে যদি তা লিখেও দেয় তাহলেও যে সমাজে জন সমক্ষে এ চ্যালেঞ্জ পেশ করা হয়েছিল সেখানে সাধারণ মানুষ অন্ধ ছিল না। প্রত্যেকেই জানতে পারতো, একথা নিছক হঠকারিতা করেই লিখে দেয়া হয়েছে এবং রসূলের বর্ণনাসমূহ এ জন্য অস্বীকার করা হচ্ছে না যে, তার অসত্য ও বাস্তবতা বিরোধী হওয়া সম্পর্কে কেউ প্রত্যক্ষ ও নির্ভুল জ্ঞান লাভ করেছে।

৩৩. মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়া ও তাঁকে হত্যা করার জন্য একত্রে বসে যে সলাপরামর্শ করতো ও ষড়যন্ত্র পাকাতো এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে।

وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾ فَذَرْهُمْ
حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ
كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿٤٩﴾

এরা যদি আসমানের একটি অংশ পতিত হতে দেখে তাহলেও বলবে, এ তো ধাবমান মেঘরাশি।[৩৬] অতএব, হে নবী, তাদেরকে আপন অবস্থায় থাকতে দাও। যাতে তারা সে দিনটির সাক্ষাত পায় যেদিন তাদেরকে মেরে ভূপাতিত করা হবে। সেদিন না তাদের কোন চালাকি কাজে আসবে, না কেউ তাদেরকে সাহায্য করতে এগুবে। আর সেদিনটি আসার আগেও জালেমদের জন্য একটা আযাব আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।[৩৭]

হে নবী ! তোমার রবের ফায়সালা আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করো।[৩৮] তুমি আমার চোখে চোখেই আছ।[৩৯] তুমি যখন উঠবে তখন তোমার রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করো[৪০] তাছাড়া রাত্রিকালেও তার তাসবীহ পাঠ করো।[৪১] আর তারকারাজি যখন অস্তমিত হয় সে সময়ও।[৪২]

৩৪. এটি কুরআনের সুস্পষ্ট ভবিষ্যতবাণীসমূহের একটি। মক্কী যুগের প্রথম দিকে যখন মুষ্টিমেয় সহায় সম্বলহীন মুসলমান ছাড়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাহ্যত আর কোন শক্তি ছিল না। গোটা জাতিই তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল এবং প্রত্যেকেই ইসলাম ও কুফরী শক্তির নিতান্তই অসম মোকাবিলা প্রত্যক্ষ করছিল। কেউ–ই সে সময় ভাবতে পারেনি যে, কয়েক বছর পরই এখানে কুফরী শক্তির মূলোৎপাটিত হতে যাচ্ছে। স্থূল দৃষ্টির অধিকারীরা দেখতে পাচ্ছিলো, কুরাইশ ও গোটা আরবের বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলনকে উৎখাত করে ছাড়বে। এ পরিস্থিতিতেও কাফেরদেরকে চূড়ান্ত ও পরিষ্কার ভাষায় চ্যালেঞ্জ করে বলে দেয়া হয়েছে যে, এ আন্দোলনকে হেয় করার জন্য যত অপকৌশল ও ষড়যন্ত্র তোমরা করতে চাও তা করে দেখো। ঐ ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল উল্টো তোমাদের বিরুদ্ধেই যাবে। তোমরা কখনো এ আন্দোলনকে পরাস্ত করতে সক্ষম হবে না।

৩৫. প্রকৃত ব্যাপার হলো, যাদেরকে তারা ইলাহ বানিয়ে রেখেছে প্রকৃতপক্ষে তারা ইলাহ নয় এবং শির্‌ক আগাগোড়া একটি ভিত্তিহীন জিনিস। তাই যে ব্যক্তি তাওহীদের

আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর সাথে আছে সত্যের শক্তি। আর যারা শির্কের সহযোগিতা করছে, তারা একটি অবাস্তব ও অসত্য জিনিসের জন্য লড়াই করছে। এ লড়াইয়ে শির্ক কি করে বিজয় লাভ করবে?

৩৬. একথার উদ্দেশ্য এক দিকে কুরাইশ নেতাদের হঠকারিতার মুখোস খুলে দেয়া, অন্যদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সংগী–সাথীদের সান্ত্বনা দেয়া। নবী (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের মনে বারবার এ আকাংখা জাগতো যে, এসব লোককে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কোন মু'জিযা দেখানো হোক যার দ্বারা মুহাম্মাদের (সা) নবুওয়াতের সত্য বুঝতে পারবে। তাই বলা হয়েছে, এরা যদি নিজ চোখে কোন মু'জিযাও দেখে তবুও তার কোন না কোন অপব্যাখ্যা করে কুফরীর ওপর অবিচল থাকার অজুহাত খুঁজে নেবে। কারণ, তাদের মন ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত নয়। কুরআন মজীদের আরো কয়েকটি স্থানেও তাদের এ হঠকারিতার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সূরা আনআমে বলা হয়েছে, আমি যদি তাদের কাছে ফেরেশতাও পাঠাতাম, মৃত ব্যক্তিরা এদের সাথে কথা বলতো এবং এদের চোখের সামনে সারা দুনিয়ার সবকিছু এনে জড়ো করে দিতাম তবুও এরা ঈমান আনতো না। (আয়াত ১১) সূরা হিজরে বলা হয়েছে, আমি যদি তাদের জন্য আসমানের কোন দরজা খুলেও দিতাম আর এরা প্রকাশ্য দিবালোকে সে দিকে উঠতে থাকতো তারপরও একথাই বলতো, আমাদের চোখ প্রতারিত হচ্ছে, আমাদেরকে যাদু করা হয়েছে। (আয়াত ১৫)

৩৭. এটি সূরা আস সাজ্‌দার ২১ আয়াতের বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি। সেখানে বলা হয়েছে "সেই বড় আযাবের পূর্বে আমি দুনিয়াতেই তাদেরকে কোন না কোন ছোট আযাবের স্বাদ ভোগ করাতে থাকবো। হয়তো এরা তাদের বিদ্রোহাত্মক আচরণ থেকে বিরত হবে।" অর্থাৎ দুনিয়াতে মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত ও জাতিগত পর্যায়ে আযাব নাযিল করে আমি তাদের একথা স্মরণ করিয়ে দিতে থাকবো যে, ওপরে কোন এক উচ্চতর শক্তি তাদের ভাগ্যের ফায়সালা করছে। তাঁর ফায়সালা পরিবর্তন করার শক্তি কেউ রাখে না। তবে যারা জাহেলিয়াতের মধ্যে ডুবে আছে তারা এ ঘটনাবলী থেকে পূর্বেও কোন শিক্ষা গ্রহণ করেনি এবং ভবিষ্যতেও কখনো করবে না। দুনিয়াতে যেসব বিপর্যয় আসে তারা তার অর্থ বুঝে না। তাই তারা এসব বিপর্যয়ের এমন এমন সব ব্যাখ্যা করে যা তাদেরকে সত্য উপলব্ধি করা থেকে আরো দূরে নিয়ে যায়। নিজেদের নাস্তিকতা বা শির্কের ত্রুটি ধরা পড়ে তাদের মেধা ও মস্তিষ্ক এমন ব্যাখ্যার দিকে কখনো আকৃষ্ট হয় না। একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এ বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

ان المنافق اذا مرض ثم اعفى كان كالبعير عقله اهله ثم ارسلوه فلم يدر لم عقلوه ولم يدر لم ارسلوه (ابو داؤد ، كتاب الجنائز)

"মুনাফিক যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং পরে যখন সুস্থ হয়ে যায় তখন তার অবস্থা হয় সেই উটের মত যাকে তার মালিক বেঁধে রাখলো কিন্তু সে বুঝলো না তাকে কেন বেঁধে রাখা হয়েছিল এবং তারপর আবার যখন খুলে দিল তখনও সে কিছু বুঝলো না তাকে কেন ছেড়ে দেয়া হলো।" (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আম্বিয়া, টীকা ৪৫; আন নামূল, টীকা ৬৬; আল আনকাবূত, টীকা ৭২ ও ৭৩)।

৩৮. আরেকটি অর্থ হতে পারে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে আপন প্রভুর নির্দেশ পালন করতে বদ্ধপরিকর থাকো।

৩৯. অর্থাৎ আমি তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করছি। তোমাদেরকে তোমাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেইনি।

৪০. একথাটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং এখানে সবগুলো অর্থ গ্রহণীয় হওয়া অসম্ভব নয়।

একটি অর্থ হচ্ছে, তুমি যখনই কোন মজলিস থেকে উঠবে আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ করে উঠবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এ নির্দেশ পালন করতেন এবং মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তারা যেন কোন মজলিস থেকে উঠার সময় আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ করে। এভাবে সেই মজলিসে যেসব কথাবার্তা হয়েছে তার কাফ্ফারা হয়ে যায়। আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী এবং হাকেম হযরত আবু হুরাইরার (রা) মাধ্যমে নবীর (সা) এ বাণী উদ্ধৃত করেছেন, যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসলো এবং সেখানে অনেক বাকবিতণ্ডা করলো সে যদি উঠে যাওয়ার সময় বলে ঃ

سبحانك اللهم وبحمدك ، اشهد ان لا اله الا انت ، استغفرك واتوب اليك –

"হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসাসহ তাসবীহ করছি। আমি সাক্ষ দিচ্ছি, তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তোমার কাছে তাওবা করছি।"

তাহলে সেখানে যেসব ভুল-ত্রুটি হবে আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন।

এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, যখন তোমরা ঘুম থেকে জেগে বিছানা ছাড়বে তখন তাসবীহসহ তোমার রবের প্রশংসা করো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিও নিজে আমল করতেন এবং ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর একথাগুলো বলার জন্য সাহাবীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন ঃ

لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله – (مسند احمد ، بخارى بروايت عبادہ بن الصامت)

এর তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমরা যখন নামাযের জন্য দাঁড়াবে তখন আল্লাহর হামদ ও তাসবীহ দ্বারা তার সূচনা করো। এ হুকুম পালনের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাকবীর তাহরীমার পর নামায শুরু করবে একথা বলে ঃ

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك

এর চতুর্থ অর্থ হচ্ছে, যখন তোমরা আল্লাহর পথে আহবান জানানোর জন্য প্রস্তুত হবে তখন আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ দ্বারা তার সূচনা করো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নির্দেশটিও স্থায়ীভাবে পালন করতেন। তিনি সবসময় আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা তার খুতবা শুরু করতেন।

তাফসীর বিশারদ ইবনে জারীর এর আরো একটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। সে অর্থটি হচ্ছে, তোমরা যখন দুপুরের আরামের পর উঠবে তখন নামায পড়বে। অর্থাৎ যোহরের নামায।

৪১. এর অর্থ মাগরিব, ইশা এবং তাহজ্জুদের নামায। সাথে সাথে এর দ্বারা কুরআন তিলাওয়াত এবং আল্লাহর যিকরও বুঝানো হয়েছে।

৪২. তারকারাজির অস্তমিত হওয়ার অর্থ রাতের শেষভাগে এগুলোর অস্তমিত হওয়া এবং ভোরের আলো দেখা দেয়ায় তার আলো নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়া। এটা ফজরের নামাযের সময়।

আন্ নাজ্‌ম

৫৩

নামকরণ

সূরার একেবারে প্রথম শব্দ والنجم থেকে গৃহীত। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটিও সূরার শিরোনাম নয়। শুধুমাত্র পরিচয় চিহ্ন স্বরূপ এ শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, أَوَّلُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ فِيهَا سَجْدَةُ النَّجْمِ (সর্ব প্রথম যে সূরাটিতে সিজদার আয়াত নাযিল হয়েছে, সেটি হচ্ছে আন-নাজ্‌ম)। এ হাদীসের যে অংশসমূহ আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ, আবু ইসহাক এবং যুহায়ের ইবনে মুয়াবিয়া কর্তৃক ইবনে মাসউদের রেওয়ায়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, এটি কুরআন মজীদের প্রথম সূরা যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের এক সমাবেশে (ইবনে মারদুইয়ার বর্ণনা অনুসারে হারাম শরীফের মধ্যে) শুনিয়েছিলেন। সমাবেশে কাফের ও ঈমানদার সব শ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিল। অবশেষে তিনি সিজদার আয়াত পড়ে সিজদা করলে উপস্থিত সবাই তাঁর সাথে সিজদা করে। এমনকি মুশরিকদের বড় বড় নেতা যারা তাঁর বিরোধিতার অগ্রভাগে ছিল তারাও সিজদা না করে থাকতে পারেনি! ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন; আমি কাফেরদের মধ্যে মাত্র এক ব্যক্তি অর্থাৎ উমাইয়া ইবনে খালফকে দেখলাম, সে সিজদা করার পরিবর্তে কিছু মাটি উঠিয়ে কপালে লাগিয়ে বললো ঃ আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। পরবর্তী সময়ে আমি নিজ চোখে তাকে কাফের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি।

এ ঘটনার অপর একজন চাক্ষুষদর্শী হলেন হযরত মুত্তালিব ইবনে আবী ওয়াদা'আ। তিনি তখনও মুসলমান হননি। নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদে তাঁর নিজের বক্তব্য এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে যে, নবী (সা) সূরা নাজ্‌ম পড়ে সিজদা করলেন এবং উপস্থিত সবাই তাঁর সাথে সিজদা করলো। কিন্তু আমি সিজদা করিনি। বর্তমানে আমি তার ক্ষতিপূরণ করি এভাবে যে, এ সূরা তিলাওয়াতকালে কখনো সিজদা না করে ছাড়ি না।

ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, ইতিপূর্বে নবুওয়াতের ৫ম বছরের রজব মাসে সাহাবা কিরামের একটি ছোট্ট দল হাবশায় হিজরত করেছিলেন। পরে ঐ বছর রমযান মাসেই এ ঘটনা ঘটে অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের জনসমাবেশে

সূরা নাজ্‌ম পাঠ করে শোনান এবং এতে কাফের ও ঈমানদার সবাই তাঁর সাথে সিজদায় পড়ে যায়। হাবশায় মুহাজিরদের কাছে এ কাহিনী এভাবে পৌঁছে যে, মক্কার কাফেররা মুসলমান হয়ে গিয়েছে। এ খবর শুনে তাদের মধ্যকার কিছু লোক নবুওয়াতের ৫ম বছরের শাওয়াল মাসে মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু এখানে আসার পর জানতে পারেন যে, জুলুম-নির্যাতন আগের মতই চলছে। অবশেষে হাবশায় দ্বিতীয়বার হিজরত করার ঘটনা সংঘটিত হয়। এতে প্রথমবারের হিজরতের তুলনায় অনেক বেশী লোক মক্কা ছেড়ে চলে যায়।

এভাবে প্রায় নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, সূরাটি নবুওয়াতের ৫ম বছরের রমযান মাসে নাযিল হয়েছিলো।

ঐতিহাসিক পটভূমি

নাযিল হওয়ার সময়-কাল সম্পর্কে এ বিস্তারিত আলোচনা থেকে কিরূপ পরিস্থিতিতে এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল তা জানা যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াতলাভের শুরু থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত শুধু ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং বিশেষ বিশেষ বৈঠকেই আল্লাহর বাণী শুনিয়ে মানুষকে আল্লাহর দীনের দিকে আহবান জানিয়ে আসছিলেন। এ সুদীর্ঘ সময়ে তিনি কখনো কোন জনসমাবেশে কুরআন শোনানোর সুযোগ পাননি। কাফেরদের চরম বিরোধীতাই ছিল এর প্রধান অন্তরায়। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রচারণামূলক তৎপরতায় কিরূপ প্রচণ্ড আকর্ষণ এবং কুরআন মজীদের আয়াতসমূহে কি সাংঘাতিক প্রভাব আছে তারা তা খুব ভাল করেই জানতো। তাই তাদের চেষ্টা ছিল তারা নিজেরাও এ বাণী শুনবে না অন্য কাউকেও শুনতে দিবে না এবং তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকমের ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করে শুধু নিজেদের মিথ্যা প্রচার প্রোপাগাণ্ডার জোরে তাঁর এ আন্দোলনকে দমিয়ে দেবে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একদিকে তারা বিভিন্ন স্থানে একথা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছিলো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়েছেন এবং লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। অপরদিকে তাদের স্থায়ী কর্মপন্থা ছিল এই যে, নবী (সা) যেখানেই কুরআন শোনানোর চেষ্টা করতেন সেখানেই হট্টগোল, চিৎকার হৈ হল্লা শুরু করিয়ে দিতে হবে যাতে যে কারণে তাঁকে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত লোক বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে জানতে তা যেন লোকে আদৌ জানতে না পারে। এ পরিস্থিতিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন পবিত্র হারাম শরীফের মধ্যে কুরাইশদের একটি বড় সমাবেশে হঠাৎ বক্তৃতা করতে দাঁড়ালেন। সূরা নাজম আকারে এখন যে সূরাটি আমাদের সামনে বর্তমান, আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূলের (সা) মুখে তা বক্তৃতা আকারে পরিবেশিত হলো। এ বাণীর প্রচণ্ড প্রভাবে অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, তিনি তা শুনাতে আরম্ভ করলে এর বিরুদ্ধে বিরোধীদের হট্টগোল ও হৈ-হল্লা করার খেয়ালই হলো না। আর শেষের দিকে তিনি যখন সিজদা করলেন তখন তারাও সিজদা করলো। পরে তারা এই ভেবে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করলো যে, আমরা একি দুর্বলতা দেখিয়ে ফেললাম। এজন্য লোকজনও তাদেরকে এ বলে তিরস্কার করলো যে, এরা অন্যদের এ বাণী শুনতে নিষেধ করে ঠিকই কিন্তু আজ তারা কান পেতে তা শুধু শুনলো না, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সিজদাও করে বসলো। অবশেষে

তারা এ মর্মে মিথ্যা অপবাদ রটায় যে, আরে মিয়া, আমরা তো أَفَرَءَيْتُمُ اللَّٰتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَوٰةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ কথাটির পর মুহাম্মাদের (সা) মুখ থেকে تلك الغرانقة العلى وان شفاعتهن لترجى (এরা সব উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন দেবী। তাদের শাফায়াতের আশা অবশ্যই করা যায়) কথাটি শুনেছিলাম। তাই আমরা মনে করেছিলাম যে, মুহাম্মাদ (সা) আমাদের পথে ফিরে এসেছে। অথচ তারা যে কথাটি শুনতে পেয়েছে বলে দাবী করেছিলো, এ সমগ্র সূরাটির পূর্বাপর প্রেক্ষিতের মধ্যে তা কোথাও খাটে না। এ ধরনের একটি উদ্ভট বাক্যের সাথে এ সূরার মিল খুঁজে পাওয়া একমাত্র কোন পাগলের পক্ষেই সম্ভব। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল-হাজ্জ, টীকা-৯৬ থেকে ১০১)

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

মক্কার কাফেররা কুরআন ও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যে আচরণ ও নীতি অবলম্বন করে চলছিলো তাদের ঐ নীতি ও আচরণের ভ্রান্তি সম্পর্কে সাবধান করে দেয়াই এ সূরার মূল বিষয়বস্তু।

বক্তব্য শুরু করা হয়েছে এভাবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভ্রান্ত বা পথভ্রষ্ট ব্যক্তি নন যেমনটি তোমরা রটনা করে বেড়াচ্ছো। আর ইসলামের এ শিক্ষা ও আন্দোলন তিনি নিজে মনগড়া ভাবে প্রচার করছেন না যেমনটা তোমরা মনে করে বসে আছ। বরং তিনি যা কিছু পেশ করছেন তা নির্ভেজাল অহী ছাড়া আর কিছুই নয়। এ অহী তাঁর ওপর নাযিল করা হয়। তিনি তোমাদের সামনে যে সব সত্য বর্ণনা করেন তা তাঁর অনুমান ও ধারণা নির্ভর নয়, বরং নিজ চোখে দেখা অকাট্য সত্য। যে ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁকে এ জ্ঞান দেয়া হয় তাকে তিনি নিজ চোখে দেখেছেন। তাঁকে সরাসরি তাঁর রবের বড় বড় নিদর্শনসমূহ পরিদর্শন করানো হয়েছে। তিনি যা কিছু বলছেন চিন্তা-ভাবনা করে বলছেন না, দেখে বলছেন। যে জিনিস একজন অন্ধ দেখতে পায় না অথচ একজন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি দেখতে পায়, সে জিনিস নিয়ে চক্ষুষ্মানের সাথে অন্ধের বিতর্কে লিপ্ত হওয়া যেমন, মুহাম্মাদ (সা) এর সাথে তাওহীদ আখেরাত প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তোমাদের তর্ক করা ঠিক তেমনি।

এরপর ক্রমান্বয়ে তিনটি বিষয়ে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে ঃ

প্রথমত শ্রোতাদের বুঝানো হয়েছে তোমরা যে ধর্মের অনুসরণ করছো তা কতকগুলো ধারণা ও মনগড়া জিনিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তোমরা লাত, মানাত ও উয্যার মত কয়েকটি দেব-দেবীকে উপাস্য বানিয়ে রেখেছো অথচ প্রকৃত খোদায়ীর ক্ষেত্রে তাদের নাম মাত্রও অংশ নেই। তোমরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা ধরে নিয়ে বসে আছ। কিন্তু নিজেদের কন্যা সন্তান থাকাকে তোমরা লজ্জা ও অপমানের বিষয় বলে মনে কর। তোমরা নিজের পক্ষ থেকে ধরে নিয়েছো যে, তোমাদের এ উপাস্যরা আল্লাহ তা'আলার কাছে তোমাদের কাজ আদায় করে দিতে পারে। অথচ আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী সমস্ত ফেরেশতা সম্মিলিতভাবেও আল্লাহকে তাদের কোন কথা মানতে বাধ্য বা উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। তোমাদের অনুসৃত এ ধরনের আকীদা-বিশ্বাসের কোনটিই কোন জ্ঞান বা দলীল

প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এগুলো নিছক তোমাদের প্রবৃত্তির কিছু কামনা-বাসনা যার কারণে তোমরা কিছু ভিত্তিহীন ধারণাকে বাস্তব ও সত্য মনে করে বসে আছ। এটা একটা মস্ত বড় ভুল। এ ভুলের মধ্যেই তোমরা নিমজ্জিত আছ। সত্যের সাথে যার পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে সেটিই প্রকৃত আদর্শ। সত্য মানুষের প্রবৃত্তি ও আকাংখার তাবেদার হয় না যে, সে যাকে সত্য মনে করে বসবে সেটিই সত্য হবে। প্রকৃত সত্যের সাথে সংগতির জন্য অনুমান ও ধারণা কোন কাজে আসে না। এজন্য দরকার জ্ঞানের। সে জ্ঞানই তোমাদের সামনে পেশ করা হলে তোমরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে এবং উল্টা সে ব্যক্তিকেই পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করো যে তোমাদের সত্য কথা বলছেন। তোমাদের এ ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হওয়ার মূল কারণ হলো, আখেরাতের কোন চিন্তাই তোমাদের নেই। কেবল দুনিয়াই তোমাদের উদ্দেশ্য হয়ে আছে। তাই সত্যের জ্ঞান অর্জনের আকাংখা যেমন তোমাদের নেই, তেমনি তোমরা যে আকীদা-বিশ্বাসের অনুসরণ করছো তা সত্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হোক বা না হোক তারও কোন পরোয়া তোমাদের নেই।

দ্বিতীয়ত, লোকদের বলা হয়েছে যে, আল্লাহই সমগ্র বিশ্ব-জাহানের একচ্ছত্র মালিক মোক্তার। যে তাঁর পথ অনুসরণ করছে সে সত্য পথ প্রাপ্ত আর যে তার পথ থেকে বিচ্যুত সে পথ ভ্রষ্ট। পথভ্রষ্ট ব্যক্তির পথভ্রষ্টতা এবং সত্য-পন্থীর সত্য পথ অনুসরণ তাঁর অজানা নয়। তিনি প্রত্যেকের কাজ কর্মকে জানেন। তাঁর কাছে অন্যায়ের প্রতিফলন অকল্যাণ এবং সুকৃতির প্রতিদান কল্যাণ লাভ অনিবার্য ।

তুমি নিজে নিজেকে যা-ই মনে করে থাকো এবং নিজের মুখে নিজের পবিত্রতার যত লম্বা চওড়া দাবিই করো না কেন তা দিয়ে তোমার বিচার করা হবে না। বরং আল্লাহর বিচারে তুমি মুত্তাকী কিনা তা দিয়ে তোমার বিচার করা হবে। তুমি যদি বড় বড় গোনাহ থেকে দূরে অবস্থান করো তাহলে তাঁর রহমত এত ব্যাপক যে, তিনি ছোট ছোট গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

তৃতীয়ত, কুরআন মজীদ নাযিল হওয়ার শত শত বছর পূর্বে দীনে হকের যে কয়টি মৌলিক বিষয় হযরত ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে বর্ণনা করা হয়েছিলো তা মানুষের সামনে এজন্য পেশ করা হয়েছে যে, মানুষ যেন এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সম্পূর্ণ নতুন দীন নিয়ে এসেছেন, বরং মানুষ যাতে জানতে পারে যে, এগুলো মৌলিক সত্য এবং আল্লাহর নবীগণ সব সময় এ সত্যই প্রচার করেছেন। সাথে সাথে ঐসব সহীফা থেকে একথাও উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, আদ, সামূদ, নূহ ও লূতের কওমের ধ্বংস হয়ে যাওয়া কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার ফল ছিল না। আজ মক্কার কাফেররা যে জুলুম ও সীমালংঘন থেকে বিরত থাকতে কোন অবস্থাতেই রাজি হচ্ছে না, সে একই জুলুম ও সীমালংঘনের অপরাধেই আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংস করেছিলেন।

এসব বিষয় তুলে ধরার পর বক্তৃতার সমাপ্তি টানা হয়েছে এ কথা বলে যে, চূড়ান্ত ফায়সালার সময় অতি নিকটবর্তী হয়েছে। তা প্রতিরোধ করার মত কেউ নেই। চূড়ান্ত সে মুহূর্তটি আসার পূর্বে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকেও ঠিক তেমনিভাবে সাবধান করে দেয়া হচ্ছে যেভাবে পূর্ববর্তী লোকদের সাবধান করা হয়েছিল। এখনি এ কথাগুলোই কি তোমাদের কাছে অভিনব মনে হয়?

এজন্যই কি তা নিয়ে তোমরা ঠাট্টা তামাসা করছো? একারণেই কি তোমরা তা শুনতে চাও না, শোরগোল ও হৈ চৈ করতে থাকো। যাতে অন্য কেউও তা শুনতে না পায়? নিজেদের এ নির্বুদ্ধিতার জন্য তোমাদের কান্না আসে না? নিজেদের এ আচরণ থেকে বিরত হও, আল্লাহর সামনে নত হও এবং তাঁরই বন্দেগী করো।

এটা ছিল বক্তব্যের অত্যন্ত মর্মস্পর্শী উপসংহার যা শুনে কট্টর বিরোধীরাও নিজেদের সংবরণ করতে পারেনি। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বাণীর এ অংশ পড়ে সিজদা করলে তারাও স্বতস্ফূর্তভাবে সিজদায় পড়ে যায়।

আয়াত ৬২ **সূরা আন নাজ্‌ম–মক্কী** রুকূ' ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۝١ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۝٢ وَمَا يَنْطِقُ
عَنِ الْهَوٰى ۝٣ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى ۝٤ عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۝٥
ذُوْ مِرَّةٍ ؕ فَاسْتَوٰى ۝٦ وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ۝٧ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۝٨
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۝٩ فَاَوْحٰٓى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى ۝١٠
مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ۝١١ اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ۝١٢ وَلَقَدْ رَاٰهُ
نَزْلَةً اُخْرٰى ۝١٣ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ۝١٤

তারকারাজির শপথ[১] যখন তা অস্তমিত হলো। তোমাদের বন্ধু[২] পথভ্রষ্ট হয়নি বা বিপথগামীও হয়নি।[৩] সে নিজের খেয়াল খুশীমত কথা বলে না। যা তার কাছে নাযিল করা হয় তা অহী ছাড়া আর কিছুই নয়।[৪] তাকে মহাশক্তির অধিকারী একজন শিক্ষা দিয়েছে[৫], যে অত্যন্ত জ্ঞানী।[৬] সে সামনে এসে দাঁড়ালো। তখন সে উঁচু দিগন্তে ছিল।[৭] তারপর কাছে এগিয়ে এলো এবং ওপরে শূন্যে ঝুলে রইলো। অতপর তাদের মাঝে মুখোমুখি দু'টি ধনুকের জ্যা–এর মত কিংবা তার চেয়ে কিছু কম ব্যবধান রইলো।[৮] তখন আল্লাহর বান্দাকে যে অহী পৌঁছানোর ছিল তা সে পৌঁছিয়ে দিল।[৯] দৃষ্টি যা দেখলো মন তার মধ্যে মিথ্যা সংমিশ্রিত করলো না।[১০] যা সে নিজের চোখে দেখেছে তা নিয়ে কি তোমরা তার সাথে ঝগড়া করো?

পুনরায় আর একবার সে তাকে সিদরাতুল মুনতাহার কাছে দেখেছে।

১. মূল আয়াতে النجم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ এবং সুফিয়ান সাওরী বলেন এর অর্থ সপ্তর্ষিমণ্ডল (Pleiades) । ইবনে জারীর ও যামাখশারী এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ, আরবী ভাষায় শুধু النجم শব্দ বলা হলে তা দ্বারা সাধারণত সপ্তর্ষিমণ্ডলকেই বুঝানো হয়ে থাকে। সুদ্দী বলেন, এর অর্থ শুক্রগ্রহ (Venus) ।

আবু উবায়দা নাহবীর বক্তব্য হলো, এখানে النجم বলে সমস্ত তারকাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বলতে চাওয়া হয়েছে যখন সকাল হলো এবং সমস্ত তারকা অস্তমিত হলো। পরিবেশ ও স্থান-কাল-পাত্রের বিচারে আমাদের কাছে এ শেষ মতটিই অধিক অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

২. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে এবং কুরাইশদের সম্বোধন করা হয়েছে। মূল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে صَاحِبُكُمْ (তোমাদের বন্ধু)। আরবী ভাষায় صاحب বলতে বন্ধু, সাথী, নিকটে অবস্থানকারী এবং সাথে উঠা-বসা করে এমন লোককে বুঝায়। এখানে নবীর (সা) নাম উল্লেখ করা বা "আমার রসূল" বলার পরিবর্তে "তোমাদের বন্ধু" বলে তাঁর কথা উল্লেখ করার মধ্যে অত্যন্ত গভীর তাৎপর্য আছে। এভাবে কুরাইশদের একথা বুঝানো হয়েছে যে, তোমাদের কাছে যে ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে তিনি তোমাদের এখানে বাইরে থেকে আসা কোন অপরিচিত ব্যক্তি নন যে, আগে থেকে তোমাদের সাথে তাঁর কোন জানা শোনাই নেই। তিনি তোমাদের নিজ কওমের লোক। তোমাদের মধ্যেই তিনি থাকেন ও বসবাস করেন। তিনি কে, কি তাঁর পরিচয়, তিনি কেমন চরিত্র ও কর্মের অধিকারী মানুষ, কেমন তাঁর আচার-আচরণ, কেমন তাঁর অভ্যাস ও স্বভাব চরিত্র এবং আজ পর্যন্ত তোমাদের মাঝে তাঁর জীবন কেমন কেটেছে তা তোমাদের প্রতিটি শিশু পর্যন্ত জানে। তাঁর সম্পর্কে কেউ যদি নির্লজ্জের মত কিছু বলে তাহলে তাঁকে জানে তোমাদের মধ্যে এমন বহু মানুষ বর্তমান যারা নিজেরাই বিচার করে দেখতে পারে, একথা তাঁর ব্যাপারে প্রযোজ্য হয় কিনা।

৩. এটিই মূল কথা যার জন্য অস্তমিত তারকা বা তারকারাজির শপথ করা হয়েছে। পথভ্রষ্ট হওয়ার অর্থ পথ না চেনার কারণে কারো ভুল পথে চলা এবং বিপথগামী হওয়ার অর্থ জেনে শুনে কারো ভুল পথ অবলম্বন করা। আল্লাহর এ বাণীর তাৎপর্য হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের একান্ত পরিচিত ব্যক্তি। তিনি পথভ্রষ্ট বা বিপথগামী হয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধে তোমাদের এ অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে ভুল। প্রকৃতপক্ষে তিনি পথভ্রষ্ট বা বিপথগামী কিছুই হননি। একথা বলতে যে কারণে তারকারাজির অস্তমিত হওয়ার শপথ করা হয়েছে তা হলো, রাতের অন্ধকারে যখন তারকা জ্বল জ্বল করে তখন কোন ব্যক্তি তার চারপাশের বস্তুকে স্পষ্ট দেখতে পায় না এবং বিভিন্ন বস্তুকে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেয়ে সেগুলো সম্পর্কে ভুল অনুমান করতে পারে। যেমন অন্ধকারে দূরে থেকে কোন গাছ দেখে তাকে ভূত মনে করতে পারে। রশি পড়ে থাকতে দেখে তাকে সাপ মনে করতে পারে। বালুকাস্তূপের কোন পাথর উঁচু হয়ে থাকতে দেখে কোন হিংস্র জন্তু বসে আছে বলে মনে করতে পারে। কিন্তু যে সময় তারকাসমূহ অদৃশ্য হয়ে যায় এবং সকালের আলো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তখন প্রতিটি বস্তু তার মূল আকার-আকৃতিতে মানুষের সামনে প্রকাশ পায়। সে সময় কোন বস্তুর মূল রূপ ও আকার আকৃতির ব্যাপারে কোন সন্দেহের সৃষ্টি হয় না। তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারটাও তাই। তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব অন্ধকারে ঢাকা নয়, বরং আলোক উদ্ভাসিত ভোরের মত স্পষ্ট। তোমরা জান, তোমাদের এ "বন্ধু" একজন অতি নম্র স্বভাব, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁর সম্পর্কে কুরাইশদের কোন ব্যক্তির এ ভুল ধারণা কি করে হতে পারে যে, তিনি পথভ্রষ্ট হয়েছেন। তোমরা এও জান যে, তিনি অত্যন্ত সদিচ্ছা পরায়ণ এবং

সত্যবাদী মানুষ। তোমাদের কেউ তাঁর সম্পর্কে কি করে এ মত পোষণ করতে পারে যে, তিনি জেনে শুনে শুধু যে নিজে বাঁকা পথ অবলম্বন করে বসে আছেন তাই নয়, অন্যদেরও সে বাঁকা পথের দিকে আহবান জানাতে উঠে পড়ে লেগেছেন।

৪. অর্থাৎ যেসব কথার কারণে তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছো যে, তিনি পথভ্রষ্ট বা বিপথগামী হয়েছেন সেসব কথা তাঁর মনগড়া নয় কিংবা তাঁর প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ঐ সবের উৎস নয়। তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে তাঁর ওপর নাযিল করা হয়েছে এবং হচ্ছে তিনি নিজে নবী হওয়ার আকাংখা করেননি। তাই নিজের আকাংখা পূরণের জন্য নবুওয়াতের দাবী করে বসেছেন এমন নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে যখন তাঁকে এ পদে অভিষিক্ত হতে আদেশ দিলেন তখনই তিনি তোমাদের মাঝে রিসালাতের তাবলীগ তথা প্রচারের জন্য তৎপরতা শুরু করলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নবী। একইভাবে ইসলামের এ আন্দোলন, তাওহীদের এ শিক্ষা, আখেরাত, হাশর-নাশর এবং কাজকর্মের প্রতিদানের এ খবর মহাবিশ্ব ও মানুষ সম্পর্কে এসব সত্য ও তথ্য এবং পবিত্র জীবন যাপন করার জন্য যেসব নীতিমালা তিনি পেশ করছেন এসবও তাঁর নিজের রচিত দর্শন নয়। আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে তাঁকে এসব বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি তোমাদেরকে যে কুরআন শুনিয়ে থাকেন তাও তাঁর নিজের রচিত নয়; এসব আল্লাহর বাণী। এসব বাণী অহীর মাধ্যমে তাঁর ওপর নাযিল হয়।

এখানে একটি প্রশ্ন আসে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার এ উক্তি যে, "তিনি নিজের খেয়াল খুশীমত কথা বলেন না, যা বলেন তা তাঁর কাছে নাযিলকৃত অহী ছাড়া আর কিছুই নয়।" তাঁর পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত কোন্ কোন্ কথার সাথে সম্পর্কিত? তিনি যত কথা বলতেন এ উক্তি কি তার সবটার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য? নাকি কিছু কিছু কথার ওপর প্রযোজ্য আর কিছু কথার জন্য প্রযোজ্য নয়? এর জবাব হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার এ উক্তি কুরআন মজীদের ক্ষেত্রে তো প্রযোজ্য হবেই। কুরআন মজীদ ছাড়া আরো যেসব কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত হতো তাও অনিবার্যরূপে তিন ভাগে বিভক্ত হতে পারে।

দীনের প্রচার ও আল্লাহর পথে মানুষকে আহবানের জন্য তিনি যেসব কথাবার্তা বলতেন অথবা কুরআন মজীদের বিষয়বস্তু, তার শিক্ষা এবং আদেশ-নিষেধ ও হিদায়াতসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হিসেবে যা কিছু বলতেন অথবা কুরআনেরই উদ্দেশ্য ও দাবী পূরণ করার জন্য যেসব বক্তৃতা করতেন বা লোকদের উপদেশ ও শিক্ষা দিতেন এগুলো এক শ্রেণীর কথা। এসব কথা সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ করার আদৌ কোন অবকাশ নেই যে, তা তিনি (নাউযুবিল্লাহ) মনগড়া ভাবে বলতেন। এ ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে তাঁর মর্যাদা ছিল কুরআনের সরকারী ভাষ্যকার বা মুখপাত্র এবং আল্লাহ তা'আলার মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে। কুরআনের প্রতিটি শব্দ যেমন নবীর (সা) ওপরে নাযিল করা হতো অনুরূপ এসব কথার প্রতিটি শব্দ যদিও তাঁর ওপর নাযিল করা হতো না কিন্তু তা অবশ্যই তাঁর ওপর নাযিলকৃত ওহীর জ্ঞান ভিত্তিক ছিল। এসব কথা ও কুরআনের মধ্যে শুধু এতটুকু পার্থক্য ছিল যে, কুরআনের ভাষা ও ভাব সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল। এসব কথার অর্থ ও ভাব আল্লাহ তাঁকে শিখিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের ভাষায় ও শব্দে

তা প্রকাশ করতেন। এ পার্থক্যের কারণে কুরআনকে "অহীয়ে জলী" (প্রকাশ্য অহী) এবং নবীর (সা) অবশিষ্ট এসব কথাবার্তাকে "অহীয়ে খফী" (অপ্রকাশ্য অহী) বলা হয়।

নবীর (সা) দ্বিতীয় আরেক প্রকারের কথাবার্তা ছিল যা তিনি আল্লাহর বিধানের তাবলীগ ও প্রচারণার চেষ্টা সাধনায় এবং দীন প্রতিষ্ঠার তৎপরতার ক্ষেত্রে বলতেন। এ কাজে তাঁকে মুসলমানদের জামায়াতের নেতা ও পথ প্রদর্শক হিসেবে বিভিন্ন রকমের অসংখ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হতো। এসব ব্যাপারে অনেক সময় তিনি তাঁর সংগী সাথীদের পরামর্শও গ্রহণ করেছেন, নিজের মত বাদ দিয়ে তাদের মতও গ্রহণ করেছেন। তাদের জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে কোন কোন সময় স্পষ্টভাবে বলেছেনও যে, একথা আমি আল্লাহর আদেশে নয়, নিজের মত হিসেবেই বলছি। তাছাড়া অনেকবার এ রকমও হয়েছে যে, তিনি নিজের ইজতিহাদের ভিত্তিতে কোন কথা বলেছেন কিন্তু পরে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার পরিপন্থী নির্দেশনা এসেছে। এ ধরনের যত কথা তিনি বলেছেন তার কোন কথাই আদৌ এমন ছিল না এবং থাকতে পারে না যা তাঁর প্রবৃত্তির খেয়ালখুশী ও কামনা-বাসনার ফল। এখন প্রশ্ন হলো, তাঁর এ ধরনের সব কথা কি অহী ভিত্তিক ছিল? এ প্রশ্নের জবাব হলো, যেসব কথা সম্পর্কে তিনি নিজে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, একথা আল্লাহর নির্দেশ ভিত্তিক নয়, কিংবা যে ক্ষেত্রে তিনি সাহাবীদের (রা) পরামর্শ চেয়েছেন এবং তাদের মতামত গ্রহণ করেছেন অথবা যেসব ক্ষেত্রে কোন কথা বা কাজ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তার পরিপন্থী হিদায়াত নাযিল করেছেন সে কথা ছাড়া তাঁর আর সব কথাই পূর্বোক্ত ধরনের কথাসমূহের মত 'অহীয়ে খফী'র অন্তরভুক্ত। তাই ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও পথ প্রদর্শক, মু'মিনদের দলের সরদার এবং ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকের যে পদ মর্যাদায় তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন তা তাঁর নিজের রচিত বা মানুষের প্রদত্ত ছিল না। তিনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ কাজ করার জন্য আদিষ্ট ও নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ পদমর্যাদার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে গিয়ে তিনি যা কিছু বলতেন এবং করতেন তা আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা নিয়ে করতেন। এ ক্ষেত্রে যেসব কথা তিনি তাঁর ইজতিহাদের ভিত্তিতে বলতেন, তাঁর ঐসব ইজতিহাদের অনেকগুলো আল্লাহর কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় ছিল। আল্লাহ তাঁকে জ্ঞানের যে আলো দিয়েছিলেন ওগুলো তা থেকে উৎসারিত ছিল। এ কারণে তাঁর ইজতিহাদ যেখানেই আল্লাহর পছন্দের বাইরে চলে গিয়েছে সেখানে তৎক্ষণাৎ "অহীয়ে জলী"র মাধ্যমে তা সংশোধন করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কোন কোন ইজতিহাদের এ সংশোধনই এ কথা প্রমাণ করে যে, তাঁর অবশিষ্ট সমস্ত ইজতিহাদ হুবহু আল্লাহর মর্জির সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল।

তৃতীয় আরেক রকমের কথা ছিল যা মানুষ হিসেবে নবী (সা) সাধারণ কাজকর্মে বলতেন। নবুওয়াতের দায়-দায়িত্ব পালনের সাথে এসব কথার কোন সম্পর্ক ছিল না। এ ধরনের কথা তিনি নবী হওয়ার পূর্বেও বলতেন এবং নবী হওয়ার পরেও বলতেন। এ ধরনের কথা সম্পর্কে সর্ব প্রথমে বুঝে নিতে হবে যে, ঐ গুলো নিয়ে কাফেরদের সাথে কোন ঝগড়া বিবাদ ছিল না। এসব কথার কারণে কাফেররা তাঁকে পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী বলেনি।

তারা এ অভিযোগ আরোপ করতো প্রথম দুই শ্রেণীর কথার ক্ষেত্রে। তাই এ তৃতীয় প্রকারের কথা আদৌ আলোচ্য বিষয় ছিল না। অতএব আল্লাহ তা'আলার এ বাণী এ

প্রকারের কথার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু ঐ প্রকারের কথা এখানে আলোচনা বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও এটা বাস্তব যে, জীবনের একান্ত ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে কখনো সত্যের পরিপন্থী কোন কথা বের হতো না। নবী ও মুত্তাকী সুলভ জীবন যাপনের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য কথা ও কাজের যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন তাঁর কথা ও কাজ সদা সর্বদা সে গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো। তাই প্রকৃত পক্ষে ঐ সব কথার মধ্যেও অহীর নূর প্রতিফলিত হতো। কোন কোন সহীহ হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একথাটিই বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমদে হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক সময় নবী (সা) বলেছিলেন, لَا اَقُوْلُ اِلَّا حَقًّا "আমি কখনো সত্য কথা ছাড়া বলি না।" এক সাহাবী বললেন ঃ فانك تداعبنا يا رسول الله "হে আল্লাহর রসূল, অনেক সময় তো আপনি আমাদের সাথে হাসি-ঠাট্টাও করেন।" জবাবে নবী (সা) বললেন ঃ انى لا اقول الا حقا "প্রকৃতপক্ষে তখনো আমি সত্য ছাড়া কিছু বলি না।" মুসনাদে আহমদ ও আবু দাউদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে যা-ই শুনতাম তা সংরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে লিখে রাখতাম। কুরাইশরা আমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করলো তারা বলতে শুরু করলো, তুমিতো সব কথাই লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছো। অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো মানুষ। অনেক সময় রাগান্বিত হয়েও কোন কথা বলেন। এতে আমি লেখা ছেড়ে দিলাম। পরবর্তী সময়ে আমি এ বিষয়টি নবীর (সা) কাছে বললে তিনি বললেন ঃ

اكتب فوالذى نفسى بيده ما خرج منى الا الحق .

"তুমি লিখতে থাকো, যাঁর মুঠিতে আমার প্রাণ সে মহান সত্তার শপথ, আমার মুখ থেকে সত্য ছাড়া কখনো কোন কথা উচ্চারিত হয়নি।"

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আমার গ্রন্থ তাফহীমাত, ১ম খণ্ড, শিরোনাম "রিসালাত আওর উসকে আহকাম"। (নির্বাচিত রচনাবলী, ১ম খণ্ড)

৫. অর্থাৎ তাঁকে শিক্ষাদানকারী কোন মানুষ নয়, যা তোমরা মনে করে থাকো। মানব সত্তার উর্ধের একটি মাধ্যম থেকে তিনি এ জ্ঞান লাভ করছেন। "মহাশক্তির অধিকারী" অর্থ কারো কারো মতে আল্লাহর পবিত্র সত্তা। কিন্তু তাফসীরকারদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এ ব্যাপারে একমত যে, এর অর্থ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আয়েশা (রা), হযরত আবু হুরায়রা (রা), কাতাদা, মুজাহিদ এবং রাবী' ইবনে আনাস থেকে এ মতটিই বর্ণিত হয়েছে। ইবনে জারীর, ইবনে কাসীর, রাযী, আলূসী প্রমুখ তাফসীরকারগণও এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব এবং মাওলানা আশরাফ আলী সাহেবও তাঁদের অনুবাদে এটিই অনুসরণ করেছেন। সত্য বলতে কি, কুরআন মজীদের অন্যান্য বর্ণনা থেকেও এটি প্রমাণিত হয়েছে। সূরা তাকভীরে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -

(ايات : ١٩-٢٣)

"প্রকৃতপক্ষে এ এক মহাশক্তিধর সম্মানিত ফেরেশতার বর্ণনা, আরশের অধিপতির কাছে অত্যন্ত মর্যাদাবান। তাঁর আদেশ পালিত হয় এবং সেখানে অত্যন্ত বিশ্বাসী। তোমাদের বন্ধু মোটেই পাগল নন। তিনি সে ফেরেশতাকে আসমানের পরিষ্কার দিগন্তে দেখেছেন।"

যে ফেরেশতার মাধ্যমে নবীর (সা) হৃদয়-মনে এ শিক্ষা নাযিল করা হয়েছিল সূরা বাকারার ৯৭ আয়াতে সে ফেরেশতার নামও বলে দেয়া হয়েছে ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ

যদি এসব আয়াত সূরা 'নাজ্‌মে'র এ আয়াতের সাথে মিলিয়ে পাঠ করা হয় তাহলে এ ব্যাপারে আদৌ সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, মহাশক্তিধর শিক্ষক বলতে যে, আল্লাহ তা'আলাকে নয়, বরং জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে সে ব্যাপারে আদৌ কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এ বিষয়ে পরে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, জিবরাঈলকে কি করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষক বলা যায়। তাহলে তো এর অর্থ দাঁড়াবে তিনি শিক্ষক আর নবী (সা) ছাত্র। এভাবে তো নবীর (সা) তুলনায় জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মর্যাদা অধিক বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। কিন্তু এরূপ সন্দেহ করা ভুল। কারণ, জিবরাঈল নবীকে (সা) তাঁর নিজের জ্ঞান শিক্ষা দিতেন না যে, তাঁর মর্যাদা অধিক হয়ে যাবে। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত জ্ঞান পৌঁছিয়ে দেয়ার মাধ্যম বানিয়েছিলেন। শিক্ষার মাধ্যম বা বাহক হওয়ার কারণে তিনি রূপক অর্থে নবীর (সা) শিক্ষক ছিলেন। এতে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কোন ব্যাপার নেই। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযের সঠিক সময় জানানোর জন্য তাঁকে দু'দিন পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, এবং মুয়াত্তা প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে সহীহ সনদে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এসব হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বলেছেন যে, তিনি মুক্তাদী হয়েছিলেন এবং জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ইমাম হয়ে নামায পড়িয়েছিলেন। এভাবে শুধু শিক্ষার জন্য তাঁকে ইমাম বানানোর অর্থ এ নয় যে, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবীর (সা) চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এটাও ঠিক অনুরূপ ব্যাপার।

৬. মূল আয়াতে ذُو مِرَّةٍ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইবনে আব্বাস ও কাতাদা একে সুন্দর ও জাঁকজমকপূর্ণ অর্থে গ্রহণ করেছেন। মুজাহিদ, হাসান বাসরী, ইবনে যায়েদ এবং সুফিয়ান সাওরী বলেন ঃ এর অর্থ শক্তিশালী। সাঈদ ইবনে মুসাইয়েবের মতে এর অর্থ

জ্ঞানের অধিকারী। হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى এ হাদীসে نومرة শব্দকে তিনি সুস্থ ও সবল অর্থে ব্যবহার করেছেন। আরবী বাক রীতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখানে জিবরাঈল আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক শব্দটি ব্যবহার করেছেন এই জন্য যে, তাঁর মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক উভয় প্রকার শক্তি পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। এর সবগুলো অর্থ এক সাথে বুঝানোর মত কোন শব্দ বাংলা ভাষায় নেই। তাই অনুবাদে আমরা এর মধ্য থেকে একটি অর্থকে গ্রহণ করেছি। কারণ, পূর্বের আয়াতাংশেই দৈহিক শক্তির পূর্ণতার উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. দিগন্ত অর্থ আসমানের পূর্ব প্রান্ত যেখানে সূর্য উদিত হয় এবং দিনের আলো ছড়িয়ে পড়ে। সূরা তাকভীরের ২৩ আয়াতে একেই পরিষ্কার দিগন্ত বলা হয়েছে। দু'টি আয়াত থেকেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমবার যখন জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে দেখেন তখন তিনি আসমানের পূর্ব প্রান্ত থেকে আত্ম প্রকাশ করেছিলেন। নির্ভরযোগ্য কিছুসংখ্যক রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মূল যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছিলেন সে সময় তিনি সে মূল আকৃতিতে ছিলেন। যে সব রেওয়ায়াতে এ বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে পরে আমরা তার সবগুলোই উদ্ধৃত করবো।

৮. অর্থাৎ আসমানের পূর্ব দিগন্তের উপরের দিকে আবির্ভূত হওয়ার পর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন এবং অগ্রসর হতে হতে তাঁর কাছে এসে উপর দিকে শূন্যে ঝুলে থাকলেন। এরপর তিনি তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং এতটা নিকটবর্তী হলেন যে, তাঁর এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে কেবল মুখোমুখি দু'টি ধনুকের জ্যা পরিমাণ কিংবা তার চেয়েও কিছু কম ব্যবধান রইলো। সাধারণভাবে মুফাসসিরগণ قاب قوسين অর্থ দুই ধনুক পরিমাণই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) قوس শব্দের অর্থ করেছেন হাত এবং كَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ অর্থ করেছেন এই যে, উভয়ের মাঝে তখন দুই হাত পরিমাণ ব্যবধাণ ছিল। মুখোমুখি লাগানো দু'টি ধনুকের মধ্যবর্তী ব্যবধানের সমান কিংবা তার চেয়ে কিছু কম ব্যবধান ছিল বলার অর্থ এ নয় যে, দূরত্বের পরিমাণ নির্ণয়ের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কোন সন্দেহ হয়েছে, (নাউযুবিল্লাহ)। এ ধরনের বাচনভঙ্গি গ্রহণের কারণ হলো সব ধনুক একই পরিমাপের হয় না। সুতরাং ঐ হিসেব অনুসারে যদি কোন দূরত্ব বর্ণনা করা হয় তাহলে দূরত্বের পরিমাণে অবশ্যই কম বেশী হবে।

৯. মূল আয়াত হচ্ছে, فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى । এ আয়াতাংশটির দু'টি অনুবাদ সম্ভব। একটি হচ্ছে, তিনি আল্লাহর বান্দার প্রতি যা কিছু অহী নাযিল করার ছিল, তা করলেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তিনি অহী করলেন নিজের বান্দার ওপর যা কিছু অহী করার ছিল। প্রথম অনুবাদ করা হলে তার অর্থ হবে জিবরাঈল আল্লাহর বান্দাকে অর্থাৎ রসূল (সা)-কে অহী দিলেন যা তাঁকে অহী দেয়ার ছিল। দ্বিতীয় অনুবাদটি করলে তার অর্থ হবে, আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলের মাধ্যমে তাঁর বান্দাহকে অহী দিলেন যা অহী দেয়ার ছিল। তাফসীরকারগণ এ দু'টি অর্থই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রথম অর্থটাই পূর্বাপর বিষয়ের

সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। হযরত হাসান বাসরী এবং ইবনে যায়েদ থেকে এ অর্থটাই বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, عَبْدِهٖ শব্দের ه সর্বনাম اَوْحٰى ক্রিয়ার কর্তার প্রতি ইংগিত করার পরিবর্তে আল্লাহর প্রতি কিভাবে ইংগিত করবে? কারণ সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত কোথাও আদৌ আল্লাহর নাম উল্লেখিত হয়নি। এর জবাব হলো, যেখানে বক্তব্যের পূর্ব প্রসংগ দ্বারা সর্বনামের উদ্দিষ্ট বিশেষ ব্যক্তির প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায় সেখানে পূর্বে উল্লেখ করা হোক বা না হোক সর্বনাম দ্বারা আপনা থেকেই সে ব্যক্তিকে বুঝাবে। কুরআন মজীদে এর অনেকগুলো দৃষ্টান্ত আছে। যেমন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ "আমি কদরের রাতে তা নাযিল করেছি।" এখানে কোথাও কুরআনের উল্লেখ মোটেই করা হয়নি। কিন্তু বক্তব্য থেকে ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে যে, ه সর্বনাম দ্বারা কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে। অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ

"আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতে শুরু করেন তাহলে তার পৃষ্ঠে জীবন্ত কিছুই রাখবেন না"

এখানে আগে বা পরে পৃথিবীর কোন উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু কথার ধরন থেকে আপনিই প্রকাশ পায় যে, তার পৃষ্ঠ অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ। সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِىْ لَهٗ "আমি তাঁকে কবিতা শিক্ষা দেইনি। আর কবিতা তার জন্য শোভাও পায় না। এখানে পূর্বে বা পরে কোথাও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু কথার ধরন থেকে প্রকাশ পায় যে, সর্বনামগুলো তাঁর প্রতি ইংগিত করেছে। সূরা আর-রাহমানে বলা হয়েছে ঃ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ "তার ওপরে যা আছে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।" এখানে আগে ও পরে পৃথিবী পৃষ্ঠের কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু বাচনভঙ্গি দ্বারা বুঝা যায় عَلَيْهَا এর সর্বনাম هَا দ্বারা সেদিনকেই ইংগিত করা হয়েছে।

সূরা ওয়াকিয়ায় বলা হয়েছে ঃ اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً "আমি তাদেরকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করবো। আশে পাশে এমন কোন বস্তু নেই যার প্রতি هُنَّ শব্দটি দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। কথার ভঙ্গি থেকে প্রকাশ পায় যে, এর দ্বারা জান্নাতের নারীদের বুঝানো হয়েছে। জিবরাঈল নিজের বান্দাকে অহী দিলেন اَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ আয়াতাংশের অর্থ যেহেতু এরকম হতে পারে না। তাই "জিবরাঈল (আ) আল্লাহর বান্দাকে অহী দিলেন কিংবা আল্লাহ জিবরাঈলের মাধ্যমে তাঁর বান্দাকে অহী দিলেন" অনিবার্যরূপে এ অর্থই গ্রহণ করতে হবে।

১০. অর্থাৎ দিনের আলোতে, পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় এবং খোলা চোখে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু দেখলেন সে সম্পর্কে তাঁর মন বলেনি যে, এসব দৃষ্টিভ্রম কিংবা আমি কোন জিন বা শয়তান দেখছি কিংবা আমার সামনে কোন কাল্পনিক ছবি ভেসে উঠেছে এবং জেগে জেগেই কোন স্বপ্ন দেখছি। বরং তাঁর চোখ যা দেখছিলো মন হুবহু তাই বিশ্বাস করেছে। তিনি যে সত্যিই সত্যিই জিবরাঈল এবং যে বাণী তিনি পৌঁছিয়ে দিচ্ছিলেন তাও বাস্তবে আল্লাহর অহী সে ব্যাপারে তার মনে কোন সন্দেহই জাগেনি।

এখানে প্রশ্ন জাগে যে, কি কারণে এ বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখা সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে আদৌ কোন সন্দেহ সৃষ্টি হলো না এবং তিনি পূর্ণ নিশ্চয়তা সহ জানতে পারলেন যে, তাঁর চোখ যা দেখছে তা প্রকৃতপক্ষেই সত্য ও বাস্তব, কোন কাল্পনিক বস্তু বা কোন জিন কিংবা শয়তান নয়? এ প্রশ্ন নিয়ে আমরা যখন গভীরভাবে চিন্তা করি তখন পাঁচটি কারণ আমাদের বোধগম্য হয়।

প্রথম কারণ, যে পারিপার্শিক অবস্থা ও পরিবেশে দেখার কাজটি সংঘটিত হয়েছিল সেটাই তার সত্যতা সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করে দেয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্ধকারে মুরাকাবারত অবস্থায় স্বপ্নে কিংবা অর্ধ জাগ্রত অবস্থায় এ দর্শন লাভ করেছিলেন না, বরং তখন সকালের পরিষ্কার আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত ছিল, তিনি পুরোপুরি জাগ্রত ছিলেন, খোলা আকাশে এবং দিনের পূর্ণ আলোতে তিনি নিজ চোখে ঠিক তেমনিভাবে এ দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিলেন যেমন কোন ব্যক্তি পৃথিবীর অন্যান্য জিনিস দেখে থাকে। এতে যদি সন্দেহের অবকাশ থাকে তাহলে আমরা দিনের বেলা নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, মানুষ, ঘরবাড়ী, মোট কথা যা কিছু দেখে থাকি তা সবই সন্দেহ যুক্ত এবং শুধু দৃষ্টিভ্রম ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

দ্বিতীয় কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মানসিক অবস্থাও এর সত্যতার স্বপক্ষে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করছিলো। তিনি পূর্ণরূপে স্বজ্ঞান ও সুস্থ ছিলেন। তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ সুস্থ ও সচল ছিল। তাঁর মন-মগজে পূর্ব থেকে এরূপ কোন খেয়াল চেপে ছিল না যে, এ ধরনের কোন দর্শন লাভ হওয়া উচিত বা হতে যাচ্ছে। এরূপ চিন্তা এবং তা অর্জন করার চেষ্টা থেকে মন-মগজ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিল। এ পরিস্থিতিতে তিনি আকস্মিকভাবে এ ঘটনার মুখোমুখি হলেন। তাই সন্দেহ করার আদৌ কোন অবকাশ ছিল না যে, চোখ কোন বাস্তব দৃশ্য দেখছে না, বরং সামনে এসে দাঁড়ানো একটি কাল্পনিক বস্তু দেখছে।

তৃতীয় কারণ, এ পরিস্থিতিতে তাঁর সামনে যে সত্তা আবির্ভূত হয়েছিল তা এত বিরাট, এত জাঁকালো, এত সুন্দর এবং এতই আলোকোদ্ভাসিত ছিল যে, ইতিপূর্বে নবীর (সা) চিন্তায় ও ধ্যান-ধারণায় এরূপ সত্তার কল্পিত রূপও আসেনি। সুতরাং তা তাঁর কল্পনা প্রসূতও ছিল না। কোন জিন বা শয়তান এমন জাঁকালো হতে পারে না। তাই তিনি তাকে ফেরেশতা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেননি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সে সময় আমি জিবরাঈলকে দেখেছি, তাঁর তখন ছয়শত ডানা ছিল (মুসনাদে আহমদ)। অপর একটি বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আরো ব্যাখ্যা করেছেন যে, জিবরাঈল আলাইহিস সালামের এক একটি ডানা এমন বিশাল ছিল যে, গোটা দিগন্ত জুড়ে আছে বলে মনে হচ্ছিল (মুসনাদে আহমদ)। আল্লাহ তা'আলা নিজে তাঁর অবস্থাকে شَدِيْدُ الْقُوٰى এবং ذُوْمِرَّةٍ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করছেন।

চতুর্থ কারণ, সে সত্তা যেসব শিক্ষা দান করছিলেন তাও এ সাক্ষাতের সত্যতা সম্পর্কে প্রশান্তিদায়ক ছিল। তাঁর মাধ্যমে তিনি হঠাৎ যেসব জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং গোটা মহাবিশ্বের প্রকৃত সত্য ও তাৎপর্যের ধারক যেসব জ্ঞান লাভ করলেন তাঁর মন-মগজে সে সম্পর্কে কোন ধারণাও ছিল না। তাই তিনি সন্দেহ করেননি যে, আমারই ধ্যান-ধারণা ও কল্পনা সুবিন্যস্ত হয়ে আমার সামনে এসে হাজির হয়েছে। অনুরূপভাবে ঐ জ্ঞান সম্পর্কে

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ﴿١٥﴾ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ﴿١٦﴾ مَا زَاغَ الْبَصَرُ
وَمَا طَغٰى ﴿١٧﴾ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ﴿١٨﴾ اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ
وَالْعُزّٰى ﴿١٩﴾ وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ﴿٢٠﴾ اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ﴿٢١﴾
تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ﴿٢٢﴾ اِنْ هِىَ اِلَّاۤ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ
وَاٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى
الْاَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ﴿٢٣﴾ اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ﴿٢٤﴾
فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾

যার সন্নিকটেই জান্নাতুল মা'ওয়া অবস্থিত।[১১] সে সময় সিদরাকে আচ্ছাদিত করছিলো এক আচ্ছাদনকারী জিনিস।[১২] দৃষ্টি ঝলসেও যায়নি কিংবা সীমা অতিক্রমও করেনি।[১৩] সে তার রবের বড় বড় নিদর্শনসমূহ দেখেছে।[১৪]

এখন একটু বলতো, তোমরা কি কখনো এ লাত, এ উয্‌যা এবং তৃতীয় আরো একজন দেবতা মানাতের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছো?[১৫] তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান আর কন্যা সন্তান কি আল্লাহর জন্য?[১৬] তাহলে এটা অত্যন্ত প্রতারণামূলক বন্টন। প্রকৃতপক্ষে এসব তোমাদের বাপ দাদাদের রাখা নাম ছাড়া আর কিছুই না। এজন্য আল্লাহ কোন সনদপত্র নাযিল করেন নি।[১৭] প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে মানুষ শুধু ধারণা ও প্রবৃত্তির বাসনার দাস হয়ে আছে।[১৮] অথচ তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের কাছে হিদায়াত এসেছে।[১৯] মানুষ যা চায় তাই কি তার জন্য ঠিক?[২০] দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক তো একমাত্র আল্লাহ।

এমন সন্দেহ পোষণেরও কোন অবকাশ ছিল না যে, শয়তান ঐ আকৃতিতে এসে তাঁকে ধোঁকা দিচ্ছে। কারণ, মানুষকে শিরক ও মূর্তিপূজার পরিবর্তে নির্ভেজাল তাওহীদের শিক্ষা দেয়া কি কখনো শয়তানের কাজ হতে পারে, না শয়তান কোনদিন এমন কাজ করেছে? আখেরাতের জবাবদিহি সম্পর্কে কি শয়তান কখনো মানুষকে সাবধান করেছে? জাহেলিয়াত ও তার রীতিনীতির বিরুদ্ধে কি মানুষকে কখনো ক্ষেপিয়ে তুলেছে? নৈতিক গুণাবলীর প্রতি কি আহবান জানিয়েছে? নাকি কোন ব্যক্তিকে বলেছে, তুমি নিজে শুধু এ

শিক্ষাকে গ্রহণ করা তাই নয়, বরং গোটা বিশ্বের বুক থেকে শিরক, জুলুম এবং পাপ পঙ্কিলতাকে উৎখাত এবং ঐসব দুষ্কৃতির জায়গায় তাওহীদ, ন্যায়বিচার এবং তাকওয়ার সুফলসমূহ প্রতিষ্ঠা করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যাও?

পঞ্চম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন ব্যক্তিকে নবুওয়াত দানের জন্য বাছাই করেন তখন তাঁর হৃদয়-মনকে সব রকম সন্দেহ সংশয় ও শয়তানী প্ররোচনা থেকে মুক্ত করে দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয় দ্বারা পূর্ণ করে দেন। এ অবস্থায় তাঁর চোখ যা দেখে এবং কান যা শোনে তার সত্যতা সম্পর্কে তাঁর মন-মগজে সামান্যতম দ্বিধা-দ্বন্দ্বও সৃষ্টি হয় না। তিনি সম্পূর্ণ উদার ও উন্মুক্ত মনে এমন প্রতিটি সত্যকে গ্রহণ করে নেন যা তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে প্রকাশ করা হয়। তা চোখে দেখার মত প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ হতে পারে, ইলহামী জ্ঞান হিসেবে তাঁর মনে সৃষ্টি করা হতে পারে কিংবা অহীর পয়গাম হিসেবে আসতে পারে একটি একটি করে যার প্রতিটি শব্দ শুনানো হয়ে থাকে। এর সবক'টি ক্ষেত্রেই নবীর এ উপলব্ধি পুরোপুরিই থাকে যে, তিনি সব রকম শয়তানী হস্তক্ষেপ থেকে চূড়ান্তভাবে সুরক্ষিত। যে আকারেই হোক না কেন যা কিছু তাঁর কাছে পৌঁছছে তা অবিকল তাঁর প্রভুর নিকট থেকে এসেছে। আল্লাহ প্রদত্ত সমস্ত অনুগ্রহ ও নিয়ামতের মত নবীর এ উপলব্ধি ও অনুভূতিও এমন একটি নিশ্চিত জিনিস যার মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি বা বিভ্রান্তির কোন সম্ভাবনা নেই। মাছের যেমন তার সাঁতারু হওয়া সম্পর্কে পাখির যেমন তার পাখি হওয়া সম্পর্কে এবং মানুষের যেমন তার মানুষ হওয়া সম্পর্কে অনুভূতি আছে এবং তা আল্লাহ প্রদত্ত। এতে যেমন বিভ্রান্তির লেশমাত্র থাকতে পারে না। অনুরূপ নবীর তাঁর নবী হওয়া সম্পর্কে যে অনুভূতি তাও আল্লাহ প্রদত্ত হয়ে থাকে। কখনো এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর মনে এ সন্দেহ জাগে না যে, নবী হওয়ার ব্যাপারে হয়তো সে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে।

১১. এটা জিবরাঈল আলাইহিস সালামের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বিতীয়বারের মত সাক্ষাত। এ সাক্ষাতকারের সময় জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবীর (সা) সামনে তাঁর আসল চেহারায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। এ সাক্ষাৎকারের স্থান বলা হয়েছে سدرة المنتهى । সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, তার নিকটেই "জান্নাতুল মা'ওয়া" অবস্থিত।

আরবীতে 'সিদরা' বলা হয় বরই গাছকে আর 'মুনতাহা' অর্থ শেষ প্রান্ত সুতরাং سدرةالمنتهى -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, শেষ প্রান্তে অবস্থিত বরই-গাছ। আল্লামা আলূসী "রুহুল মাআনী"তে এর ব্যাখ্যা করেছেন ঃ اليها ينتهى علم كل عالم وما وراء ها لا يعلمه الا الله "এ পর্যন্ত গিয়ে সব জ্ঞানীর জ্ঞান শেষ হয়ে যায়। এর পরে যা আছে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।" ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে এবং ইবনে আসীর" النهاية فى غريب الحديث والاثر এও প্রায় অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। বস্তু জগতের শেষ প্রান্তে অবস্থিত সে কুল বৃক্ষ কেমন এবং তার প্রকৃতি ও পরিচয় কি তা জানা আমাদের জন্য কঠিন। এটা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট মহাবিশ্বের এমন রহস্যাবৃত বিষয় যেখানে আমাদের বোধ ও উপলব্ধি পৌঁছতে অক্ষম। যাই হোক, সেটা হয়তো এমন কোন জিনিস যা বুঝানোর মানুষের ভাষায় سدرة শব্দের চেয়ে অধিক উপযুক্ত শব্দ আল্লাহ তা'আলা আর কোন কিছুকে মনে করেননি।

"জান্নাতুল মা'ওয়া"র আভিধানিক অর্থ এমন জান্নাত যা অবস্থান স্থল হতে পারে। হযরত হাসান বাসরী বলেন ঃ এটা সেই জান্নাত যা আখেরাতে ঈমানদার ও তাকওয়ার অধিকারী লোকেরা লাভ করবে। এ আয়াত দ্বারাই তিনি প্রমাণ করেছেন যে, এ জান্নাত আসমানে অবস্থিত। কাতাদা (রা) বলেন ঃ এটাই সে জান্নাত যেখানে শহীদদের রূহসমূহ রাখা হয়। আখেরাতে যে জান্নাত পাওয়া যাবে এটা সে জান্নাত নয়। ইবনে আব্বাসও (রা) একথাই বলেন। তিনি অধিক এতটুকু বলেছেন যে, আখেরাতে ঈমানদারগণ যে জান্নাত লাভ করবেন এটা সে জান্নাত নয়। সে জান্নাতের স্থান এ পৃথিবীতেই।

১২. অর্থাৎ তার অবস্থাও প্রকৃত বর্ণনার অতীত। সেটা ছিল এমন আলোকোচ্ছটা মানুষ যার কল্পনাও করতো না এবং মানুষের কোন ভাষা তার বর্ণনা দিতেও সক্ষম নয়।

১৩. অর্থাৎ একদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরম সহ্য ও গ্রহণ ক্ষমতার অবস্থা ছিল এই যে, এ ধরনের সাংঘাতিক আলোকোচ্ছটার সামনেও তাঁর দৃষ্টি কোন রকম ঝলসে যায়নি। তিনি পূর্ণ প্রশান্তিসহ ঐ সব দেখেছেন। অপরদিকে তাঁর সংযম ও একাগ্রতার পরাকাষ্ঠা ছিল এই যে, যে উদ্দেশ্যে তাঁকে ডেকে নেয়া হয়েছিল সেদিকেই তিনি তাঁর মন-মগজ ও দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। যেসব বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী সেখানে ছিল তা দেখার জন্য তিনি একজন কৌতূহলী ও বিমুগ্ধ দর্শকের মত এদিক সেদিক দৃষ্টি দেননি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কোন ব্যক্তি কোন পরাক্রমশালী বাদশাহর দরবারে যাওয়ার সুযোগ লাভ করলো এবং সেখানে সে এমন জাঁকজমকপূর্ণ কিছু জিনিস দেখতে পেল যা সে কোন দিন কল্পনার চোখ দিয়েও দেখেনি। লোকটি যদি নীচাশয় হয় তাহলে সেখানে গিয়ে সে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে পড়বে এবং দরবারের আদব কায়দা সম্পর্কে যদি অজ্ঞ হয় তাহলে শাহী মর্যাদা সম্পর্কে অমনযোগী হয়ে দরবারের সাজ সজ্জা দেখার জন্য সবদিকে ঘুরে ঘুরে তাকাতে থাকবে। কিন্তু একজন উঁচুমনা ও বুদ্ধিমান, রীতিনীতি ও নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সচেতন এবং কর্তব্য পরায়ণ কোন ব্যক্তি সেখানে গিয়ে হতভম্ব হবে না এবং দরবারের দৃশ্য দেখার জন্যও ব্যস্ত হয়ে পড়বে না। সে গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে সেখানে হাজির হবে। যে উদ্দেশ্যে তাকে দরবারে ডাকা হয়েছে সেদিকে মনোনিবেশ করবে। এ আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ গুণটির প্রশংসা করা হয়েছে।

১৪. এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলাকে দেখেননি কেবল তার বিশাল ও বিপুল নিদর্শনাদি দেখেছেন। যেহেতু পূর্বাপর প্রসংগের বিচারে দ্বিতীয় বারও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সে সত্তার সাথে সাক্ষাত হয়েছিল যার সাথে প্রথম বার সাক্ষাত ঘটেছিল। তাই অনিবার্যরূপে একথা মানতে হবে যে, প্রথমবার তিনি উঁচু দিগন্তে যাকে দেখেছিলেন তিনিও আল্লাহ ছিলেন না এবং দ্বিতীয়বার سدرة المنتهى 'র কাছে যাকে দেখেছিলেন তিনিও আল্লাহ ছিলেন না। এ দু'টি ক্ষেত্রের কোন একটিতেও যদি তিনি আল্লাহকে দেখতেন তাহলে তা হতো এমন একটি অতি গুরুত্ব পূর্ণ ব্যাপার যা অবশ্যই স্পষ্ট করে বলে দেয়া হতো। হযরত মূসা সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে তিনি আল্লাহ তা'আলাকে দেখার প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে জবাব দেয়া হয়েছিল

لن ترانى "তুমি আমাকে দেখতে পারবে না" (আল-আ'রাফ-১৪৩)। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, হযরত মূসাকে যে মর্যাদা দেয়া হয়নি তা যদি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেয়া হতো তাহলে তা এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, বিষয়টি স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হতো। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কুরআন মজীদে কোথাও বলা হয়নি, নবী (সা) তাঁর রবকে দেখেছিলেন। পক্ষান্তরে মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে সূরা বনী ইসরাঈলেও বলা হয়েছে, আমি আমার বান্দাকে নিয়ে গিয়েছিলাম এজন্য যে, তাকে আমার নিদর্শনাদী দেখাবো" (لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيَاتِنَا) আর 'সিদরাতুল মুনতাহায়' যাওয়া প্রসঙ্গে এখানে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর রবের বড় বড় নিদর্শন দেখেছেন,

(لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى)

এসব কারণে বাহ্যত এ বিতর্কের কোন প্রয়োজনই ছিল না যে, এ দু'টি ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছিলেন, না জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে দেখেছিলেন? কিন্তু যে কারণে এ বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তা হচ্ছে, এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহে মতানৈক্য দেখা যায়। এ বিষয়ে বিভিন্ন সাহাবা কিরাম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ আমরা নিচে এক এক করে বর্ণনা করলাম।

এক ঃ হযরত আয়েশার (রা) বর্ণিত হাদীসসমূহ ঃ

হাদীস গ্রন্থ বুখারীর কিতাবুত তাফসীরে হযরত মাসরূক থেকে বর্ণিত হয়েছে, আমি হযরত আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম; "আম্মাজান, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আল্লাহকে দেখেছিলেন?" তিনি জবাব দিলেন। "তোমার একথা শুনে আমার গায়ের পশম শিউরে উঠেছে। তুমি কি ক্বরে ভুলে গেলে যে, তিনটি বিষয় এমন যা কেউ দাবী করলে মিথ্যা দাবী করা হবে।" (তার মধ্যে প্রথম কথাটি হযরত আয়েশা (রা) যা বললেন, তা হচ্ছে) "কেউ যদি তোমাকে বলে যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে দেখেছিলেন, তাহলে সে মিথ্যা বলে।" তারপর হযরত আয়েশা (রা) এ আয়াতগুলো পাঠ করলেন। لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ (দৃষ্টিসমূহ তাঁকে দেখতে সক্ষম নয়)

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاۤئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاۤءُ -

"কোন মানুষেরই এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন। তবে হয় অহী হিসেবে বা পর্দার আড়াল থেকে কিংবা তিনি কোন ফেরেশতা পাঠাবেন এবং সে তাঁর ইচ্ছা মাফিক তার প্রতি অহী নাযিল করবে।" এরপর তিনি বললেনঃ "তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে দু'বার তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছেন।"

এ হাদীসের একটি অংশ বুখারীর কিতাবুত তাওহীদের ৪র্থ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া বাদ্‌উল খালক্ অধ্যায়ে ইমাম বুখারী মাসরূক বর্ণিত যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে মাসরূক (রা) বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশার একথা শুনে আমি বললাম তাহলে

আল্লাহ তা'আলার একথার কি অর্থ হবে? ثُمَّ دَنَىٰ فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ তিনি বললেন এর দ্বারা জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়েছে। তিনি সব সময় মানুষের রূপ ধরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসতেন। কিন্তু ঐ সময় তিনি তাঁর আসল আকৃতিতে তাঁর কাছে এসেছিলেন এবং তাঁর শরীরে গোটা দিগন্ত আড়াল হয়ে গিয়েছিল।

মুসলিম কিতাবুল ঈমানের باب فى ذكر سدرة المنتهى এ হযরত আয়েশার (রা) সাথে মাসরূকের এ কথোপকথন অধিক বিস্তারিত রূপে উদ্ধৃত হয়েছে। তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছেঃ হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি দাবী করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রবকে দেখেছেন সে আল্লাহ তা'আলার প্রতি অতি বড় অপবাদ আরোপ করে। "মাসরূক বলেন ঃ আমি হেলান দিয়ে বসেছিলাম। একথা শুনে আমি উঠে বসলাম এবং বললাম; উম্মুল মু'মিনীন তাড়াহুড়ো করবেন না। আল্লাহ তা'আলা কি বলেন নি وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ এবং ؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ জবাবে হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ এ উম্মতের মধ্যে আমিই সর্ব প্রথম এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন ঃ

انما هو جبريل عليه السلام ، لم اره على صورته التى خلق عليها غير هاتين المرتين - رايته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والارض -

তিনি তো ছিলেন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন সে আসল আকৃতিতে আমি তাঁকে এ দু'বার ছাড়া আর কখনো দেখিনি। দু'বারই আমি তাঁকে আসমান থেকে নেমে আসতে দেখেছি। সে সময় তাঁর বিশাল সত্তা পৃথিবী ও আসমানের মধ্যবর্তী সমগ্র শূন্যলোক ছেয়ে ফেলেছিলো।"

মাসরূক বর্ণিত এ হাদীস ইবনে মারদুইয়া যে ভাষায় বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ আমিই সর্ব প্রথম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঃ আপনি কি আপনার রবকে দেখেছিলেন? জবাবে নবী (সা) বললেন, না। "আমি তো জিবরাঈলকে আসমান থেকে নেমে আসতে দেখেছিলাম।"

দুই ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীসসমূহ ঃ বুখারী কিতাবুত তাফসীর, মুসলিম কিতাবুল ঈমান এবং তিরমিযী আবওয়াবুত তাফসীরে যির ইবনে হুবাইশ থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ আয়াতটির তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে এমন আকৃতিতে দেখেছেন যে, তাঁর ছয়শত ডানা ছিল।

মুসলিমের অন্যান্য রেওয়ায়াতে مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ এবং لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ আয়াতেরও এ একই তাফসীর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে যির ইবনে হুবাইশ বর্ণনা করেছেন ঃ

মুসনাদে আহমদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের এ তাফসীর যির ইবনে হুবাইশ ছাড়া আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ এবং আবু ওয়ায়েলের মাধ্যমেও বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়াও মুসনাদে আহমদে যির ইবনে হুবাইশের আরো দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ولقد راه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى আয়াতের তাফসীর বর্ণনা প্রসংগে বলেছেন ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت جبريل عند سدرة المنتهى عليه ستمائة جناح

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "আমি জিবরাঈলকে সিদরাতুল মুনতাহার কাছে দেখেছি। সে সময় তাঁর ছয়শত ডানা ছিল।"

এ একই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস শাকীক ইবনে সালামা থেকে ইমাম আহমদও বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসে তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) মুখ থেকে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বলেছিলেনঃ আমি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে এ আকৃতিতে "সিদরাতুল মুনতাহায়" দেখেছিলাম।

তিনঃ আতা ইবনে আবী রাবাহ হযরত আবু হুরাইরাকে (রা) لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন ঃ راى جبريل عليه السلام নবী (সা) জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে দেখেছিলেন (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)।

চার ঃ ইমাম মুসলিম কিতাবুল ঈমানে হযরত আবু যার গিফারীর মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক বর্ণিত দু'টি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। এক রেওয়ায়াতে তিনি বলেছেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার রবকে দেখেছিলেন? জবাবে নবী (সা) বললেন ঃ نُوْرٌ اَنّٰى اَرَاهُ । অপর রেওয়ায়াতে বলেছেন ঃ তিনি আমার এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন ঃ رَاَيْتُ نُوْرًا । ইবনুল কাইয়েম زاد المعاد গ্রন্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম উক্তির অর্থ বর্ণনা করে বলেছেন আমার ও আল্লাহকে দেখার মধ্যে প্রতিবন্ধক ছিল নূর। তিনি দ্বিতীয় উক্তির অর্থ বর্ণনা করেছেন এই যে, আমি আমার রবকে দেখিনি, বরং নূর দেখেছি।"

নাসায়ী ও ইবনে আবী হাতেম নিম্নোক্ত ভাষায় হযরত আবু যারের (রা) বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্তর দিয়ে তাঁর রবকে দেখেছেন, চোখ দিয়ে দেখেন নি।"

পাঁচ ঃ ইমাম মুসলিম কিতাবুল ঈমানে হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ما انتهى اليه بصر من خلقه "আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্য থেকে কারো চোখই আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌছেনি।"

ছয় ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসসমূহ ঃ

মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى - وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً أُخْرٰى আয়াত দু'টির অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রবকে দু'বার অন্তর দিয়ে দেখেছেন। মুসনাদে আহমদেও এ হাদীসটি আছে।

আতা ইবনে আবী রাবাহ্‌র বরাত দিয়ে ইবনে মারদুইয়াহ্‌ ইবনে আব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলাকে চোখ দিয়ে নয়, অন্তর দিয়ে দেখেছিলেন।

নাসায়ীতে ইকরিমা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ

اتعجبون ان تكون الخلة لابراهيم والكلام لموسى والروية لمحمد؟

"আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন, মূসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলে তাঁকে সম্মানিত করেছেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর দর্শনলাভের মর্যাদা দিয়েছেন" এতে কি তোমরা বিস্ময়বোধ করছো ? হাকেমও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

তিরমিযীতে শা'বী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে আব্বাস এক মজলিসে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাক্ষাতলাভ ও কথোপকথনকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মূসা আলাইহিস সালামের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। তিনি মূসা আলাইহিস সালামের সাথে দু'বার কথা বলেছেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দু'বার দেখেছেন।" ইবনে আব্বাসের এ কথা শুনে মাসরূক হযরত আয়েশার (রা) কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তাঁর রবকে দেখেছিলেন? "তিনি বললেন ঃ তুমি এমন কথা বলেছো যা শুনে আমার পশম শিউরে উঠেছে।" এর পর হযরত আয়েশা ও মাসরূকের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছে আমরা তা উপরে হযরত আয়েশার (রা) বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে উদ্ধৃত করেছি।

তিরমিযীতেই অন্য যেসব হাদীস ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে তার একটিতে তিনি বলেছেন, নবী (সা) আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছিলেন। দ্বিতীয় একটি হাদীসে বলেছেন; দু'বার দেখেছিলেন এবং তৃতীয় আরেকটি হাদীসে বলেছেন, তিনি অন্তর দিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছিলেন।"

মুসনাদে আহমাদে ইবনে আব্বাস বর্ণিত একটি হাদীসে আছে ঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ربى تبارك وتعالى "আমি আমার মহাকল্যাণময় ও মর্যাদাবান রবকে দেখেছি।" আরেকটি হাদীসে তিনি বলেন ঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتانى ربى الليلة فى احسن صورة ، احسبه يعنى فى النوم -

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আমার রব আজ রাতে অতীব সুন্দর আকৃতিতে আমার কাছে এসেছিলেন। আমার মনে হয় নবীর (সা) এ কথার অর্থ তিনি স্বপ্নে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছিলেন।"

তাবারানী ও ইবনে মারদুইয়াহ্ ইবনে আব্বাস বর্ণিত একটি হাদীসে এও উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'বার তাঁর রবকে দেখেছেন। একবার দেখেছেন চোখে আরেকবার দেখেছেন অন্তর দিয়ে।

সাত ঃ মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল-কুরাযী বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন? নবী (সা) জবাব দিলেন ঃ আমি তাঁকে দু'বার অন্তর দিয়ে দেখেছি (ইবনে আবী হাতেম)। এ বর্ণনাটিকে ইবনে জারীর যেরূপ ভাষায় উদ্ধৃত করেছেন তা হচ্ছে, নবী (সা) বললেন ঃ "আমি তাঁকে চোখ দিয়ে অন্তর দিয়ে দু'বার দেখেছি।"

আট ঃ মি'রাজের ঘটনা প্রসংগে শারীক ইবনে আবদুল্লাহর বরাত দিয়ে ইমাম বুখারী কিতাবুত তাওহীদে হযরত আনাস ইবনে মালেক বর্ণিত যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে এ কথাগুলো আছে ঃ

حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او ادنى فاوحى الله فيما اوحى اليه خمسين صلوة –

"তিনি যখন সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছলেন তখন মহাপরাক্রান্ত ও মহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী হলেন এবং তার উপর দিকে শূন্যে অবস্থান করলেন। এমন কি নবী (সা) ও তাঁর মধ্যে মুখোমুখি দু'টি ধনুকের মধ্যকার সমান বা তার চেয়েও কম ব্যবধান রইলো। অতপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে যেসব বিষয়ে অহী করলেন তার মধ্যে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশও ছিল।"

কিন্তু এ হাদীসের সনদ ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইমাম খাত্তাবী, হাফেজ ইবনে হাজার, ইবনে হাযম এবং الجمع بين الصحيحين প্রণেতা হাফেয আবদুল হক যেসব আপত্তি উত্থাপন করেছেন তা ছাড়াও সবচেয়ে বড় আপত্তি হচ্ছে এটি স্পষ্টরূপে কুরআনের পরিপন্থী। কারণ, কুরআন মজীদ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করে। তার মধ্যে প্রথমটি নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে একটি উঁচু দিগন্তে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেখানে دَنَا فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى বিষয়ক ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। আর দ্বিতীয়টি সিদরাতুল মুনতাহার সন্নিকটে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু ওপরে বর্ণিত এ রেওয়ায়াতটি দু'টি সাক্ষাতের ঘটনাকে একসাথে মিলিয়ে জগাখিচুড়ি করে একই সাক্ষাত বানিয়ে ফেলেছে। অতএব কুরআন মজীদের পরিপন্থী হওয়ার কারণে কোন ক্রমেই তা গ্রহণ করা যেতে পারে না।

এরপর ওপরে বর্ণিত হাদীসগুলোর প্রসংগে আসা যাক। ও গুলোর মধ্যে আবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসগুলোই

অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তাঁরা উভয়েই ঐকমত্য সহকারে খোদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একথা বর্ণনা করেছেন যে, উভয় ক্ষেত্রেই তিনি আল্লাহ তা'আলাকে নয়, জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে দেখেছিলেন। তাছাড়া এসব হাদীস কুরআন মজীদের বক্তব্য ও ইংগিতের সাথেও সম্পূর্ণরূপে সংগতিপূর্ণ। এছাড়া হযরত আবু যার (রা) এবং হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) নবীর (সা) যেসব উক্তি উদ্ধৃত করেছেন তা থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে হাদীস গ্রন্থসমূহে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাতে গুরুতর অনৈক্য পরিলক্ষিত হয়। কোন হাদীসে উভয় সাক্ষাতকেই চাক্ষুষ সাক্ষাত বলা হয়েছে, কোনটাতে উভয় সাক্ষাতকেই অন্তরের সাক্ষাত বলা হয়েছে, কোনটাতে একটি সাক্ষাতকে চাক্ষুষ অপরটাকে অন্তরের বলা হয়েছে, আবার কোনটাতে চাক্ষুষ দর্শনকে পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করা হয়েছে। এসব বর্ণনার একটিও এমন নয় যাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। আর যেখানে তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের কোন কথা বা উক্তি উদ্ধৃত করেছেন সেখানে প্রথমত কুরআন মজীদে বর্ণিত এ দু'টি সাক্ষাতলাভের কোনটিরও নামের উল্লেখ নেই। তাছাড়া তাদের একটি রেওয়ায়াতের ব্যাখ্যা অন্য রেওয়ায়াত থেকে যা জানা যায় তা হচ্ছে নবী (সা) কোন সময়ই জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলাকে দেখেননি, স্বপ্নে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছিলেন। তাই প্রকৃতপক্ষে এসব আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সাথে সম্পর্কিত রেওয়ায়াতসমূহের ওপর নির্ভর করা যেতে পারে না। অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল-কুরাযীর বর্ণনাসমূহে যদিও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে কিন্তু যেসব সাহাবায়ে কিরাম নবী (সা) থেকে একথা শুনেছেন তাতে তাদের নাম বলা হয়নি। তার একটিতে আবার বলা হয়েছে যে, নবী (সা) চাক্ষুষ দেখার বিষয় সরাসরি অস্বীকার করেছেন।

১৫. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের যে শিক্ষা দিচ্ছেন তোমরা তো তাকে গোমরাহী ও কুপথগামিতা বলে আখ্যায়িত করছো। অথচ এ জ্ঞান তাঁকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দেয়া হচ্ছে। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে চাক্ষুষভাবে এমন সব সত্য ও বাস্তবতা দেখিয়েছেন যার সাক্ষ তিনি তোমাদের সামনে পেশ করছেন। এখন তেমরা নিজেরাই একটু ভেবে দেখ, যে আকীদা-বিশ্বাস মেনে চলার জন্য তোমরা গোঁ ধরে আছো তা কত অযৌক্তিক। অন্য দিকে যে ব্যক্তি তোমাদের সোজা পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন তার বিরোধীতা করে তোমরা কার ক্ষতি করছো? এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে তিনজন দেবীর কথা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে যাদেরকে মক্কা, তায়েফ, মদীনা এবং হিজাজের আশে পাশের লোক জন বেশী বেশী পূজা করতো। তাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে, কখনো কি তোমরা বুদ্ধি বিবেক খাটিয়ে চিন্তা করে দেখেছো, যমীন ও আসমানের প্রভুত্বের ক্ষেত্রে এদের সামান্যতম দখল বা কর্তৃত্বও থাকতে পারে কি? না বিশ্ব-জাহানের প্রভুর সাথে সত্যিই তাদের কোন সম্পর্ক হতে পারে?

লাতের আস্তানা ছিল তায়েফে। বনী সাকীফ গোত্র তার এত ভক্ত ছিল যে, আবরাহা যে সময়, হস্তী বাহিনী নিয়ে কা'বা ঘর ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মক্কার ওপর আক্রমণ করতে

যাচ্ছিল তখন তারা শুধু তাদের এ উপাস্যের আস্তানা রক্ষা করার জন্য সে অত্যাচারীকে মক্কার রাস্তা দেখানোর জন্য পথ প্রদর্শক সরবরাহ করেছিল যাতে সে লাতের কোন ক্ষতি না করে। অথচ কা'বা যে আল্লাহর ঘর গোটা আরববাসীর মত সাকীফ গোত্রও একথা বিশ্বাস করতো। লাত শব্দের অর্থ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। ইবনে জারীর তাবারীর জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ হচ্ছে এ শব্দটি আল্লাহ শব্দের স্ত্রীলিংগ। মূল শব্দটি ছিল اللهة । এটিকেই পরিবর্তন করে اللات করা হয়েছে। যামাখশারীর মতে— لوى يلوى থেকে শব্দটির উৎপত্তি। এর অর্থ ঘুরা বা কারো প্রতি ঝুঁকে পড়া। মুশরিকরা যেহেতু ইবাদাতের জন্য তার প্রতি মনযোগী হতো, তার সামনে ঝুঁকতো এবং তার তাওয়াফ করতো তাই তাকে 'লাত' আখ্যা দেয়া শুরু হলো। ইবনে আব্বাস نا বর্ণটিতে "তাশদীদ" প্রয়োগ করে لات পড়তেন এবং لت يلت থেকে এর উৎপত্তি হয়েছে বলতেন। এর অর্থ মন্থন করা বা লেপন করা। ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বর্ণনা করেছেন যে, মূলত সে ছিল একজন মানুষ, যে তায়েফের সন্নিকটে এক কঙ্করময় ভূমিতে বাস করতো এবং হজ্জের উদ্দেশ্যে গমনকারীদের ছাতু ও অন্যান্য খাদ্য খাওয়াতো। সে মারা গেলে লোকেরা ঐ কঙ্করময় ভূমিতে তার নামে একটা আস্তানা গড়ে তোলে এবং তার উপাসনা করতে শুরু করে। কিন্তু লাতের এ ব্যাখ্যা ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদের মত সম্মানিত ব্যক্তিদের থেকে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও দু'টি কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। একটি কারণ হলো একে لات (লাত) বলা হয়েছে لاة ("লাত্তা") বলা হয়নি। অপর কারণটি হলো কুরআন মজীদ তিনজনকেই দেবী বলে উল্লেখ করেছে কিন্তু বর্ণিত হাদীস অনুসারে সে পুরুষ ছিল নারী নয়।

عزى (উয্‌যা) শব্দটির উৎপত্তি عزت শব্দ থেকে। এর অর্থ সম্মানিতা। এটা ছিল কুরাইশদের বিশেষ দেবী। এর আস্তানা ছিল মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী "নাখলা" উপত্যকার "হুরাদ" নামক স্থানে (নাখলার অবস্থান জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল-আহকাফ, টীকা-৩৩) বনী হাশেমের মিত্র বনী শায়বান গোত্রের লোক এর প্রতিবেশী ছিল। কুরাইশ এবং অন্যান্য গোত্রের লোকজন এর যিয়ারতের জন্য আসতো, এর উদ্দেশ্যে মানত করতো এবং বলি দান করতো। কা'বার মত এ স্থানটিতেও কুরবানী বা বলির জন্তু নিয়ে যাওয়া হতো এবং এটিকে সমস্ত মূর্তির চেয়ে অধিক সম্মান দেয়া হতো। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, আবু উহায়হার মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে আবু লাহাব তাকে রোগ শয্যায় দেখতে গিয়ে দেখলো সে কাঁদছে। আবু লাহাব জিজ্ঞেস করলো ঃ আবু উহায়হা, তুমি কাঁদছো কেন? তুমি কি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছো? মৃত্যু তো সবারই হবে। সে বললো ঃ আল্লাহর শপথ, আমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে কাঁদছি না। আমার মৃত্যুর পর উয্‌যার পূজার কি উপায় হবে সে দুশ্চিন্তা আমাকে নিশেষ করে দিচ্ছে। আবু লাহাব বললো ঃ তোমার জীবদ্দশায়ও তোমার কারণে উয্‌যার পূজা করা হতো না আর তোমার মৃত্যুর পরে তাকে পরিত্যাগ করাও হবে না। আবু উহায়হা বললো ঃ এখন আমি নিশ্চিন্ত হলাম যে, আমার মৃত্যুর পরে কেউ অবশ্যই আমার স্থান পূরণ করবে।

মানাতের আস্তানা ছিল মক্কা ও মদীনার মাঝে লোহিত সাগরের তীরবর্তী কুদাইদ নামক স্থানে। বিশেষ করে খুযা'আ, আওস এবং খাযরাজ গোত্রের লোকেরা এর খুব ভক্ত ছিল। তার হজ্জ ও তাওয়াফ করা হতো এবং তার উদ্দেশ্যে মানতের বলি দেয়া হতো। হজ্জের মওসুমে হাজীরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং আরাফাতে ও মিনায় অবস্থানের পর সেখান থেকে মানাতের যিয়ারত তথা দর্শনলাভের জন্য লাব্বায়কা লাব্বায়কা ধ্বনি দিতে শুরু করতো। যারা এ দ্বিতীয় হজ্জের নিয়ত করতো তারা সাফা এবং মারওয়ার মাঝে সাঈ করতো না।

১৬. অর্থাৎ এসব দেবীদেরকে তোমরা আল্লাহর কন্যা সন্তান বলে ধরে নিয়েছো। এ অর্থহীন আকীদা-বিশ্বাস গড়ে নেয়ার সময় তোমরা আদৌ এ চিন্তা করনি যে, মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণকে তোমরা নিজেদের জন্য অপমানকর ও লজ্জাকর মনে করে থাকো। তোমরা চাও যেন তোমরা পুত্র সন্তান লাভ করো। কিন্তু যখন আল্লাহর সন্তান আছে বলে ধরে নাও, তখন তাঁর জন্য কন্যা সন্তান বরাদ্দ করো।

১৭. অর্থাৎ তোমরা যাদের দেবী ও দেবতা বলে থাকো তারা দেবীও নয় দেবতাও নয়। তাদের মধ্যে খোদায়ীর কোন বৈশিষ্টও যেমন দেখা যায় না, তেমনি প্রভুত্বের ক্ষমতা ও এখতিয়ারের সামান্যতম অংশও তাদের মধ্যে নেই। তোমরা নিজেরাই তাদেরকে আল্লাহর সন্তান, উপাস্য এবং প্রভুত্বের অংশীদার বানিয়ে নিয়েছো। নিজেদের মনগড়া এসব বিষয়ের সমর্থনে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা কোন প্রমাণ তোমরা পেশ করতে সক্ষম নও।

১৮. অন্য কথায় তাদের গোমরাহীর মৌলিক কারণ দু'টি ঃ এক, তারা কোন জিনিসকে নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস ও দীন বানিয়ে নেয়ার জন্য প্রকৃত বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানের কোন প্রয়োজন অনুভব করে না, বরং অনুমান ও ধারণার ওপর ভিত্তি করে একটি জিনিস মেনে নেয় এবং পরে এমনভাবে তা বিশ্বাস করে নেয়, যেন সেটিই সত্য ও বাস্তব। দুই, প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের নফসের নানা রকম কামনা বাসনা পূরণ করার জন্যই এ নীতি ও আচরণ গ্রহণ করে থাকে। তাদের মন চায় তাদের এমন কোন উপাস্য থাকুক যে দুনিয়ায় তাদের আশা-আকাংখা পূরণ করবে এবং আখেরাত যদি সংঘটিত হয়-ই, তাহলে সেখানে তাদেরকে ক্ষমা করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। কিন্তু সে হালাল হারামের কোন বাধ্য বাধকতা আরোপ করবে না এবং কোন রূপ নৈতিক বিধি-বন্ধনেও আবদ্ধ করবে না। একারণেই তারা নবী-রসূলদের আনীত নিয়ম পদ্ধতি অনুসারে এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত হতো না। এবং নিজেদের গড়া এসব দেবদেবীর দাসত্ব করাই তাদের মনঃপুত ছিল।

১৯. অর্থাৎ প্রত্যেক যুগেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রসূলগণ এসব পথহারা মানুষকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তারপর এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে সত্যিকার অর্থে বিশ্ব-জাহানের প্রভুত্ব কার তা জানিয়ে দিয়েছেন।

২০. এ আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, যাকে ইচ্ছা তাকেই উপাস্য বানিয়ে নেয়ার অধিকার কি মানুষের আছে? এর তৃতীয় একটি অর্থ এও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, ঐসব উপাস্যের কাছে মানুষ তার কামনা-বাসনা ও আকাংখা পূরণের যে আশা করে তা কি কখনো পূরণ হওয়া সম্ভব?

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ
أَنْ يَّأْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ﴿٢٦﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ
لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثٰى ﴿٢٧﴾ وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ
إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾ فَأَعْرِضْ عَنْ
مَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾

২ রুকূ'

আসমানে তো কত ফেরেশতা আছে যাদের সুপারিশও কোন কাজে আসতে পারে না যতক্ষণ না আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় যাকে খুশী তার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দান করেন।[২১] কিন্তু যারা আখেরাত মানে না তারা ফেরেশতাদেরকে দেবীদের নামে নামকরণ করে।[২২] অথচ এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। তারা কেবলই বদ্ধমূল ধারণার অনুসরণ করছে।[২৩] আর ধারণা কখনো জ্ঞানের প্রয়োজন পূরণে কোন কাজে আসতে পারে না।

সুতরাং হে নবী, যে আমার উপদেশ বাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়[২৪] এবং দুনিয়ার জীবন ছাড়া যার আর কোন কাম্য নেই তাকে তার আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও।[২৫]

২১. অর্থাৎ তোমাদের এসব মনগড়া উপাস্যদের সুপারিশ উপকারে আসা তো দূরের কথা, সমস্ত ফেরেশতা মিলেও যদি কারো জন্য সুপারিশ করে তথাপিও তা তার কাজে আসবে না। প্রভুত্বের এখতিয়ারসমূহ সবই পুরোপুরি আল্লাহর হাতে। যদি আল্লাহ তা'আলা কারো পক্ষে সুপারিশ করতে কাউকে অনুমতি না দেন এবং কারো পক্ষে সুপারিশ শুনতে সম্মত না হন তাহলে ফেরেশতাও তাঁর কাছে কারো জন্য সুপারিশ করার সাহস দেখাতে পারে না।

২২. অর্থাৎ তাদের একটি নির্বুদ্ধিতা হচ্ছে, তারা এখতিয়ার ও ক্ষমতাহীন ফেরেশতাদের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশ পর্যন্ত করার সামর্থ ও সাহস রাখে না। তাছাড়া আরো নির্বুদ্ধিতা হচ্ছে এই যে, তারা তাদেরকে নারী বলে মনে করে এবং আল্লাহর কন্যা বলে আখ্যায়িত করে। এসব অজ্ঞতায় নিমজ্জিত হওয়ার মৌলিক কারণ হলো, তারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে না। তারা যদি আখেরাতে বিশ্বাস করতো তাহলে এ ধরনের দায়িত্বহীন কথাবার্তা বলতে পারতো না। আখেরাতের অস্বীকৃতি তাদেরকে পরিণাম সম্বন্ধে নিরুদ্বিগ্ন করে দিয়েছে। তারা মনে করে, আল্লাহকে

ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ﴿٣٠﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ لِيَجْزِيَ
الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٣١﴾ الَّذِينَ
يَجْتَنِبُونَ كَبٰٓئِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ
هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ
أُمَّهٰتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ﴿٣٢﴾

এদের[২৬] জ্ঞানের দৌড় এতটুকুই।[২৭] তোমার রবই অধিক জানেন—কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়েছে আর কে সঠিক পথে আছে। যমীন ও আসমানের প্রতিটি জিনিসের মালিক একমাত্র আল্লাহ[২৮]—যাতে[২৯] আল্লাহ অন্যায়কারীদেরকে তাদের কাজের প্রতিদান দেন এবং যারা ভাল নীতি ও আচরণ গ্রহণ করেছে তাদের উত্তম প্রতিদান দিয়ে পুরস্কৃত করেন। যারা বড় বড় গোনাহ[৩০] এবং প্রকাশ্য ও সর্বজনবিদিত অশ্লীল কাজ[৩১] থেকে বিরত থাকে—তবে ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া ভিন্ন কথা[৩২]—নিশ্চয়ই তোমার রবের ক্ষমাশীলতা অনেক ব্যাপক।[৩৩] যখন তিনি মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণ আকারে ছিলে তখন থেকে তিনি তোমাদের জানেন। অতএব তোমরা নিজেদের পবিত্রতার দাবী করো না। সত্যিকার মুত্তাকী কে তা তিনিই ভাল জানেন।

মানা বা না মানা কিংবা হাজার জন খোদাকে মানায় কোনই পার্থক্য নেই। কারণ তারা এসব আকীদা-বিশ্বাসের কোনটিরই কোন ভাল বা মন্দ পরিণাম দুনিয়ার বর্তমান জীবনে প্রতিফলিত হতে দেখে না। আল্লাহদ্রোহী মুশরিক কিংবা তাওহীদবাদী যাই হোক না কেন এখানে সবার ফসলই পাকতে এবং ধ্বংস হতে দেখা যায়। সবাই রোগাক্রান্ত হয় আবার সুস্থও হয়ে ওঠে। সব রকম ভাল ও মন্দ পরিস্থিতি সবার জন্যই আসে। তাই কোন ব্যক্তি কাউকে উপাস্য মানুক বা না মানুক কিংবা যত ও যেভাবে ইচ্ছা উপাস্য বানিয়ে নিক এটা তাদের কাছে কোন বড় গুরুত্বপূর্ণ বা সুবিবেচনা পাওয়ার মত বিষয় নয়। তাদের মতে হক এবং বাতিলের ফায়সালা যখন এ দুনিয়াতেই হতে হবে আর এ দুনিয়াতে প্রকাশিত ফলাফল দ্বারাই তা নিরূপিত হবে তখন একথা স্পষ্ট যে, এখানে প্রকাশিত ফলাফল কোন আকীদা-বিশ্বাসের ন্যায় ও সত্য হওয়ার চূড়ান্ত ফায়সালা যেমন করে না, তেমনি অন্যসব আকীদা-বিশ্বাসের বাতিল হওয়ার চূড়ান্ত ফায়সালাও দেয় না। কাজেই এরূপ

লোকদের পক্ষে একটি আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করা এবং আরেকটিকে প্রত্যাখ্যান করা মনের খেয়ালীপনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

২৩. অর্থাৎ ফেরেশতারা যে স্ত্রীলোক এবং আল্লাহর কন্যা এ বিশ্বাসটি তারা জ্ঞান অর্জনের কোন একটি মাধ্যম ছাড়া জানতে পেরেছে বলে অবলম্বন করেনি। বরং নিজেদের অনুমান ও ধারণার ওপর ভিত্তি করে এ বিষয়টা স্থির করে নিয়েছে এবং এর ওপর ভিত্তি করেই এসব আস্তানা গড়ে নিয়েছে। তাদের কাছেই মনের কামনা বাসনা পূর্ণ করার জন্য প্রার্থনা করছে এবং নযর-নেওয়াজ পেশ করা হচ্ছে।

২৪. এখানে 'যিকর' শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ কুরআন হতে পারে কিংবা শুধু উপদেশবাণী হতে পারে এবং আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে, আল্লাহর কথা শুনতে একদম পছন্দ করে না।

২৫. অর্থাৎ তার পিছে লেগে থেকো না এবং তাকে বুঝানোর জন্য নিজের সময় নষ্ট করো না। কেননা এ প্রকৃতির লোক এমন কোন দাওয়াত বা আন্দোলনকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হবে না যার ভিত্তি আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা দুনিয়ার বস্তুগত লাভের চেয়ে অনেক উচ্চতর উদ্দেশ্য ও মূল্যমানের দিকে আহবান জানায় এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী সাফল্য ও সৌভাগ্যই যার মূল লক্ষ। এ ধরনের বস্তুপূজারী এবং আল্লাহ বিমুখ মানুষের পেছনে নিজের শ্রম ব্যয় করার পরিবর্তে যারা আল্লাহর কথা শুনতে প্রস্তুত এবং দুনিয়া পূজার ব্যধিতে আক্রান্ত নয় তাদের দিকে মনযোগ দাও।

২৬. এটি পূর্বাপর প্রসংগহীন একটি বাক্য যা কথার ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে আগের কথার ব্যাখ্যা হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

২৭. অর্থাৎ এসব লোক দুনিয়া এবং দুনিয়াবী স্বার্থের উর্ধে আর কিছুই জানে না এবং কিছু চিন্তাও করতে পারে না। তাই তাদের পেছনে পরিশ্রম করা বৃথা।

২৮. অন্য কথায় কোন মানুষের পথভ্রষ্ট বা সুপথপ্রাপ্ত হওয়ার ফায়সালা যেমন এ পৃথিবীতে হবে না তেমনি এর ফায়সালা দুনিয়ার মানুষের মতামতের ওপর ছেড়ে দেযাও হয়নি। এর ফায়সালা একমাত্র আল্লাহর হাতে। তিনিই যমীন ও আসমানের মালিক এবং দুনিয়ার মানুষ ভিন্ন ভিন্ন যেসব পথে চলছে তার কোন্‌টি হিদায়াতের পথ এবং কোন্‌টি গোমরাহীর পথ তা কেবল তিনিই জানেন। অতএব আরবের এসব মুশরিক এবং মক্কার কাফেররা যে তোমাকে বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করছে আর নিজেদের জাহেলিয়াতকে হিদায়াত বলে মনে করছে সে জন্য তুমি মোটেই পরোয়া করবে না। এরা যদি নিজেদের এ ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে ডুবে থাকতে চায় তাহলে তাদের ডুবে থাকতে দাও। তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করে সময় নষ্ট করা এবং মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন নেই।

২৯. আগে থেকেই যে বক্তব্য চলছিলো এখান থেকে পুনরায় তার ধারাবাহিকতা শুরু হচ্ছে। সুতরাং মাঝখানের পূর্বাপর প্রসংগহীন কথাটা বাদ দিলে বাক্যের অর্থ দাঁড়ায় এরূপ ঃ "তাকে তার আপন অবস্থায় চলতে দাও। যাতে আল্লাহ অন্যায়কারীকে তার কাজের প্রতিফল দান করেন।"

৩০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নিসা, টীকা ৫৩।

৩১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আন'আম, টীকা ১৩০, আন নাহল, টীকা ৮৯ ।

৩২. মূল শব্দ হচ্ছে اللَّمَمَ । কোন জিনিসের অতি সামান্য পরিমাণ কিংবা নগণ্য প্রভাব অথবা শুধু নৈকট্য বা সামান্য দেরী থাকা বুঝাতে আরবী ভাষায় لَمَم শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় اَلَمَّ بِالْمَكَانِ সে অমুক স্থানে সামান্য কিছু সময় মাত্র অবস্থান করেছে কিংবা সামান্য সময়ের জন্য গিয়েছে اَلَمَّ بِالطَّعَامِ সে সামান্য খাবার খেয়েছে। بِهِ لَمَمٌ তার মস্তিষ্কে কিছুটা বিকৃতি আছে কিংবা তাতে কিছু উন্মাদনা ভাব আছে। কেউ যখন কোন কাজে লিপ্ত হওয়ার নিকটবর্তী হয় কিন্তু কাজটি তখনো করা হয়নি এমন অবস্থা বুঝাতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ফার্‌রা বলেন, আমি আরবদেরকে এভাবে বলতে শুনেছি ضَرَبَهُ مَالَمَ الْقَتْلَ অমুক ব্যক্তি তাকে এত মেরেছে যে, কেবল হত্যা করা বাকি আছে। এবং اَلَمَّ يَفْعَلُ অমুক ব্যক্তি এ কাজ প্রায় করেই ফেলেছিলো। কবি বলেছেন ঃ اَلَمَّتْ فَحَيَّتْ ثُمَّ قَامَتْ فَوَدَّعَتْ "সে মুহূর্তের জন্য আসলো, সালাম দিল, উঠলো এবং বিদায় হয়ে গেল"

এসব ব্যবহারের দিক লক্ষ করে তাফসীরকারদের মধ্যে কেউ কেউ এ আয়াতের لمم শব্দের অর্থ গ্রহণ করেছেন ছোট গোনাহ। কেউ কেউ এর অর্থ বলেছেন যে, ব্যক্তির কার্যত বড় গোনাহর নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও তাতে লিপ্ত না হওয়া। কেউ কেউ একে ক্ষণিকের জন্য গোনাহে লিপ্ত হয়ে পরে তা থেকে বিরত হওয়া অর্থে গ্রহণ করেছেন। কারো কারো মতে এর অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তি গোনাহর কল্পনা, ইচ্ছা কিংবা সংকল্প করবে ঠিকই কিন্তু কার্যত কোন পদক্ষেপ নেবে না। এ বিষয়ে সাহাবা ও তাবেয়ীদের মতামত নিম্নরূপ ঃ

যায়েদ ইবনে আসলাম ও ইবনে যায়েদ বলেন ঃ এর অর্থ মানুষ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে জাহেলী যুগে যেসব গোনাহ করেছে, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তা পরিত্যাগ করেছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) একটি মতও তাই।

ইবনে আব্বাসের (রা) দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে, ব্যক্তির কোন বড় গোনাহ বা অশ্লীল কাজে অল্প সময়ের জন্য কিংবা ভুলক্রমে কখনো লিপ্ত হয়ে পড়া এবং পরে তা পরিত্যাগ করা। হযরত আবু হুরাইরা (রা), হযরত আবদুল্লাহ (রা) ইবনে আমর ইবনে আস, মুজাহিদ (রা) হাসান বাসরী (র) এবং আবু সালেহর (র) মতও তাই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), মাসরূক এবং শা'বী বলেন ঃ এর অর্থ কোন ব্যক্তির কোন বড় গোনাহের নিকটবর্তী হওয়া এবং তার প্রাথমিক পর্যায়সমূহ অতিক্রম করা কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়ে বিরত থাকা। যেমন ঃ কেউ চুরি করার উদ্দেশ্যে বের হলো কিন্তু চুরি করা থেকে বিরত থাকলো। কিংবা পরনারীর সাথে মেলামেশা করলো কিন্তু ব্যভিচার করতে অগ্রসর হলো না। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা সূত্রে হযরত আবু হুরাইরা এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকেও এ মতটি উদ্ধৃত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, ইকরিমা, কাতাদা এবং দাহ্‌হাক বলেন ঃ এর অর্থ এমন ছোট ছোট গোনাহ যার জন্য দুনিয়াতে কোন শাস্তি নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং আখেরাতেও আযাব দেয়ার কোন ভয় দেখানো হয়নি।

أَفَرَءَيْتَ الَّذِى تَوَلَّىٰ ﴿٣٣﴾ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴿٣٤﴾ أَعِندَهُۥ عِلْمُ الْغَيْبِ
فَهُوَ يَرَىٰ ﴿٣٥﴾ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِى صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَإِبْرَٰهِيمَ الَّذِى وَفَّىٰٓ ﴿٣٧﴾
أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾
وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَىٰهُ الْجَزَآءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾

৩ রুকূ'

হে নবী, তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছো যে আল্লাহর পথ থেকে ফিরে গিয়েছে এবং সামান্য মাত্র দিয়ে ক্ষান্ত হয়েছে?[৩৪] তার কাছে কি গায়েবের জ্ঞান আছে যে সে প্রকৃত ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছে?[৩৫] তার কাছে কি মূসার সহীফাসমূহের কোন খবর পৌঁছেনি? আর আনুগত্যের পরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে[৩৬] যে ইবরাহীম তার সহীফাসমূহের কথাও কি পৌঁছেনি?

একথা যে, "কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।"[৩৭]

একথা যে, মানুষ যে চেষ্টা সাধনা করে তা ছাড়া তার আর কিছুই প্রাপ্য নেই।[৩৮]

একথা যে, "তার চেষ্টা-সাধনা অচিরেই মূল্যায়ণ করা হবে[৩৯] এবং তাকে তার পুরো প্রতিদান দেয়া হবে।"

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব বলেন ঃ এর অর্থ মনে গোনাহের চিন্তার উদ্রেক করা কিন্তু কার্যত তাতে লিপ্ত না হওয়া।

এগুলো হচ্ছে, সম্মানিত সাহাবা ও তাবেয়ীদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা যা বিভিন্ন রেওয়ায়াতে উদ্ধৃত হয়েছে। পরবর্তী কালের তাফসীরকার, ইমাম ও ফিকাহবিদদের অধিকাংশই এ মত পোষণ করেন যে, এ আয়াত এবং সূরা নিসার ৩১ আয়াত সুস্পষ্টরূপে গোনাহকে সগীরা ও কবীরা এই দু'টি বড় ভাগে বিভক্ত করেছে। এ দু'টি আয়াত মানুষকে আশান্বিত করে যে, তারা যদি বড় বড় গোনাহ ও অশ্লিল কাজ থেকে বিরত থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের ছোট ছোট গোনাহ মাফ করে দেবেন। যদিও দু'য়েকজন বড় আলেম মত প্রকাশ করেছেন যে, কোন গোনাহই ছোট নয়। আল্লাহর অবাধ্যতা মাত্রই বড় গোনাহ। কিন্তু ইমাম গায্‌যালী (র) বলেছেন ঃ কবীরা ও সগীরা গোনাহের পার্থক্য এমন একটি বিষয় যা অস্বীকার করা যায় না। কারণ, যেসব উৎস থেকে শরীয়াতের হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করা যায় তার সবগুলোতেই এর উল্লেখ আছে।

এখন প্রশ্ন হলো, সগীরা ও কবীরা গোনাহর মধ্যে পার্থক্য কি? এবং কি ধরনের গোনাহ সগীরা আর কি ধরনের গোনাহ কবীরা? এ ব্যাপারে কবীরা ও সগীরা গোনাহর যে সংজ্ঞায় আমরা পূর্ণরূপে নিশ্চিত ও পরিতৃপ্ত তা হচ্ছে, "যে গোনাহকে কিতাব ও

সুন্নাহর কোন সুস্পষ্ট উক্তিতে হারাম বলা হয়েছে অথবা যে গোনাহর জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূল দুনিয়াতে কোন শাস্তি নির্দিষ্ট করেছেন অথবা যে গোনাহের কারণে আখেরাতে আযাবের ভয় দেখিয়েছেন বা অভিশাপ দিয়েছেন অথবা তাতে লিপ্ত ব্যক্তির ওপর আযাব নাযিলের খবর দিয়েছেন" এ ধরনের সমস্ত গোনাহই কবীরা গোনাহ। এ প্রকৃতির গোনাহ ছাড়া শরীয়াতের দৃষ্টিতে আর যত রকমের অপছন্দনীয় কাজ আছে তার সবই সগীরা গোনাহর সংজ্ঞায় পড়ে। একইভাবে কেবলমাত্র গোনাহের আকাংখা পোষণ করা কিংবা ইচ্ছা করাও কবীরা গোনাহ নয়, সগীরা গোনাহ। এমন কি কোন বড় গোনাহর প্রাথমিক পর্যায়সমূহ অতিক্রম করাও ততক্ষণ পর্যন্ত কবীরা গোনাহ নয় যতক্ষণ না ব্যক্তি কার্যত তা করে বসবে। তবে সগীরা গোনাহও যখন ইসলামী বিধানকে হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে করা হয়, আল্লাহ তা'আলার মোকবিলায় অহংকারের মনোবৃত্তি নিয়ে করা হয় এবং যে শরীয়াত একে খারাপ কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে তাকে আদৌ গুরুত্ব দেয়ার উপযুক্ত মনে করা না হয় তখন তা কবীরা গোনাহে রূপান্তরিত হয়।

৩৩. অর্থাৎ সগীরা গোনাহকারী ব্যক্তিকে মাফ করে দেয়ার কারণ এ নয় যে, সগীরা গোনাহ কোন গোনাহই নয়। বরং এর কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহদের সাথে সংকীর্ণচেতার মত আচরণ এবং ছোট ছোট ব্যাপারে পাকড়াও করার নীতি গ্রহণ করেন না। বান্দা যদি নেকীর পথ অনুসরণ করে এবং বড় বড় গোনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে তাহলে ছোট ছোট ব্যাপারে তিনি তাকে পাকড়াও করবেন না। অশেষ রহমতের কারণে তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

৩৪. কুরাইশদের বড় নেতাদের অন্যতম ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। ইবনে জারীর তাবারী বর্ণনা করেছেন যে, এ ব্যক্তি প্রথমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত গ্রহণ করতে মনস্থির করে ফেলেছিল। কিন্তু তার এক মুশরিক বন্ধু জানতে পারলো যে, সে মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছে। সে তাকে বললো, তুমি পিতৃধর্ম ত্যাগ করো না। যদি তুমি আখেরাতের আযাবের ভয় পেয়ে থাকো তাহলে আমাকে এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে দাও, তোমার পরিবর্তে আমি সেখানকার আযাব ভোগ করার দায়িত্ব গ্রহণ করছি। ওয়ালীদ একথা মেনে নিল এবং আল্লাহর পথে প্রায় এসে আবার ফিরে গেল। কিন্তু সে তার মুশরিক বন্ধুকে যে পরিমাণ অর্থ দেবে বলে ওয়াদা করেছিল তার সামান্য মাত্র দিয়ে অবশিষ্ট অংশ বন্ধ করে দিল। এ ঘটনার প্রতি ইংগিত করার উদ্দেশ্য ছিল মক্কার কাফেরদের একথা জানিয়ে দেয়া যে, আখেরাত সম্পর্কে নিরুদ্বেগ এবং দীনের তাৎপর্য সম্পর্কে অজ্ঞতা তাদেরকে কি ধরনের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার মধ্যে নিমগ্ন করে রেখেছে।

৩৫. অর্থাৎ সে কি জানতে পেরেছে যে, এ আচরণ তার জন্য সত্যিই কল্যাণকর? সে কি জানতে পেরেছে যে, এভাবে কেউ আখেরাতের আযাব থেকে বাঁচতে পারে?

৩৬. হযরত মূসা ও হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সহীফাসমূহে যে শিক্ষা নাযিল করা হয়েছিল তার সংক্ষিপ্তসার এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। হযরত মূসার সহীফাসমূহ বলতে তো তাওরাতকে বুঝানো হয়েছে। আর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সহীফাসমূহ আজ পৃথিবীতে কোথাও বর্তমান নেই। তাছাড়া ইহুদী ও খৃষ্টানদের পবিত্র গ্রন্থসমূহেও তার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যার দু'টি

স্থানে ইবরাহীমের সহীফার শিক্ষাসমূহের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হয়েছে। তার একটি স্থান হলো এটি এবং অপর স্থানটি হলো সূরা আল আ'লার শেষ কয়েকটি আয়াত।

৩৭. এ আয়াত থেকে তিনটি বড় মূলনীতি পাওয়া যায়। এক, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে তার কাজের জন্য নিজেই দায়ী। দুই, একজনের কাজের দায়দায়িত্ব অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে না তবে সেই কাজ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে তার কোন ভূমিকা থাকলে ভিন্ন কথা। তিন, কেউ চাইলেও অন্য কারো কাজের দায়দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করতে পারে না। আর প্রকৃত অপরাধীকে এ কারণে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে না যে, তার শাস্তি ভোগ করার জন্য অন্য কেউ এগিয়ে আসছে।

৩৮. একথাটি থেকেও তিনটি মূলনীতি পাওয়া যায়। এক, প্রত্যেক ব্যক্তি যা পরিণতি ভোগ করবে তা তার কৃতকর্মেরই ফল। দুই, একজনের কর্মফল অন্যজন ভোগ করতে পারে না। তবে ঐ কাজের পেছনে তার কোন ভূমিকা থাকলে তা ভিন্ন কথা। তিন, চেষ্টা-সাধনা ছাড়া কেউ-ই কিছু লাভ করতে পারে না।

কোন কোন ব্যক্তি এ তিনটি মূলনীতিকে ভুল পন্থায় পৃথিবীর অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, কোন ব্যক্তি নিজের কষ্টার্জিত আয় (Earned Income) ছাড়া কোন কিছুর বৈধ মালিক হতে পারে না। কিন্তু একথা কুরআন মজীদেরই দেয়া কিছু সংখ্যক আইন ও নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক। উদাহরণ হিসেবে উত্তরাধিকার আইনের কথা বলা যেতে পারে। এ আইন অনুসারে কোন ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে বহু সংখ্যক লোক অংশ পায় এবং বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকৃত হয়। কিন্তু উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত এ সম্পদ তার শ্রম দ্বারা অর্জিত নয়। শত যুক্তি দেখিয়েও একজন দুগ্ধপোষ্য শিশু সম্পর্কে একথা প্রমাণ করা যাবে না যে, পিতার পরিত্যক্ত সম্পদে তার শ্রমের কোন ভূমিকা আছে। অনুরূপভাবে যাকাত ও সাদকার বিধান অনুসারে শুধুমাত্র শরয়ী ও নৈতিক অধিকারের ভিত্তিতে একজনের অর্থ-সম্পদ অন্যেরা লাভ করে থাকে। এভাবে তারা ঐ সম্পদের বৈধ মালিকানা লাভ করে। কিন্তু সেই সম্পদ সৃষ্টির ব্যাপারে তার শ্রমের কোন অংশ থাকে না। অতএব কুরআনের কোন একটি আয়াত নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে কুরআনের অন্যান্য শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কুরআনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

আবার কিছু সংখ্যক লোক এসব মূলনীতিকে আখেরাতের সাথে সম্পৃক্ত ধরে নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, এসব মূলনীতি অনুসারে এক ব্যক্তির কাজ কি কোন অবস্থায় অপর ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর হতে পারে? এক ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তির জন্য কিংবা তার পরিবর্তে কোন আমল করে তাহলে তার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করা যেতে পারে? এক ব্যক্তির আমল কি অন্য কোন ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া সম্ভব? এসব প্রশ্নের জবাব যদি নেতিবাচক হয় তাহলে "ইসালে সওয়াব" বদলি হজ্জ ইত্যাদি সবই না জায়েজ হয়ে যায়। এমন কি অন্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে দোয়া করাও অর্থহীন হয়ে পড়ে। কেননা যার জন্য দোয়া করা হবে সেই দোয়াও তার নিজের কাজ নয়। তবে শুধুমাত্র মু'তাযিলারা ছাড়া ইসলামের অনুসারীদের মধ্য থেকে আর কেউ-ই এ চরম দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেনি। শুধু তারাই এ আয়াতের এ অর্থ গ্রহণ করে থাকে যে, এক ব্যক্তির চেষ্টা-সাধনা কোন অবস্থায়ই অন্যের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। অপরদিকে আহলে সুন্নাত একজনের

দোয়া অন্যের জন্য কল্যাণকর হওয়ার বিষয়টা সর্বসম্মতভাবে স্বীকার করে। কেননা, কুরআন থেকেই তা প্রমাণিত। "ইসালে সওয়াব" এবং অন্য কারো পক্ষ থেকে কৃত কোন নেক কাজের কল্যাণকর হওয়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে মৌলিক দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই, বরং বিস্তারিত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মতানৈক্য বিদ্যমান।

(১) ইসালে সওয়াব হলো, এক ব্যক্তির কোন নেক কাজ করে তার সওয়াব ও প্রতিদান অপর কোন ব্যক্তিকে দেয়া হোক বলে আল্লাহর কাছে দোয়া করা। এ মাসয়ালা সম্পর্কে ইমাম মালেক (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ নিরেট শারীরিক ইবাদাত যেমন ঃ নামায, রোযা ও কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদির সওয়াব অন্যেরা পেতে পারে না। তবে আর্থিক ইবাদাত যেমন ঃ সাদকা কিংবা আর্থিক ও শারিরীক উভয়টির সংমিশ্রিত ইবাদাত যেমন ঃ হজ্জ—এ সবের সওয়াব অন্যে পেতে পারে। কারণ, মূলনীতি হিসেবে এটা অবিসম্পাদিত যে, এক ব্যক্তির আমল অন্যের কল্যাণে আসবে না। তবে, অনেক সহীহ হাদীসের ভাষ্য অনুসারে যেহেতু সাদকার সওয়াব পৌছানো যায় এবং বদলি হজ্জও করা যায়, তাই আমরা এ প্রকৃতির ইবাদাতের "ইসালে সওয়াব" বা সওয়াব পৌছানোর বৈধতা স্বীকাব করছি। পক্ষান্তরে হানাফী আলেমদের রায় হলো, মানুষ তাঁর সব রকম নেক আমলের সওয়াব অপরকে দান করতে পারে—তা নামায হোক বা রোযা, কুরআন তিলাওয়াত হোক বা যিকর কিংবা সাদকা হোক বা হজ্জ ও উমরা হোক। এর স্বপক্ষে যুক্তি হচ্ছে, শ্রমের কাজ করে মানুষ যেমন মালিককে বলতে পারে, এর পারিশ্রমিক আমার পরিবর্তে অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হোক। তেমনি কোন নেক কাজ করে সে আল্লাহ তা'আলার কাছে এ বলে দোয়া করতে পারে এ কাজের প্রতিদান আমার পক্ষ থেকে অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হোক। এ ক্ষেত্রে কতিপয় নেকীর কাজকে বাদ দিয়ে অন্য কতিপয় নেকীর কাজের মধ্যে একে সীমিত রাখার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। এ বিষয়টি বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ঃ

বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে মাজা, তাবারানী (ফিল-আওসাত) মুসতাদরিক এবং ইবনে আবী শায়বাতে হযরত আয়েশা, হযরত আবু হুরাইরা, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, হযরত আবু রাফে', হযরত আবু তালহা আনসারী এবং হুযাইফা ইবনে উসাইদুল গিফারী কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি ভেড়া নিয়ে তার একটি নিজের ও নিজের পরিবারের সবার পক্ষ থেকে এবং অপরটি তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে কুববানী করেছেন।

মুসলিম, বুখারী, মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ এবং নাসায়ীতে হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, আমার মা অকস্মাত মারা গিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, যদি তিনি কথা বলার সুযোগ পেতেন তাহলে অবশ্যই সাদকা করার জন্য বলতেন। এখন আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে সাদকা করি তাহলে তিনি কি তার প্রতিদান পাবেন? নবী (সা) বললেন, হ্যাঁ।

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তার দাদা আস ইবনে ওয়ায়েল জাহেলী যুগে একশত উট কুরবানী করার মানত করেছিলেন। তার চাচা হিশাম ইবনুল আস তার অংশের পঞ্চাশটি উট কুরবানী করে দিয়েছেন। হযরত আমর ইবনুল আস রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস

করলেন, তিনি কি করবেন। নবী (সা) বললেন ঃ তোমার পিতা যদি তাওহীদের অনুসারী হয়ে মারা গিয়ে থাকেন তাহলে তুমি তার পক্ষ থেকে রোযা রাখো অথবা সাদকা করো। এতে তার কল্যাণ হবে।

মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাতে হযরত হাসান বাসরীর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ আমার মা ইনতিকাল করেছেন? আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে সাদকা করবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা), হযরত আবু হুরাইরা (রা) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আরো কিছু সংখ্যক হাদীস আছে। ঐ সব হাদীসেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সাদকা করার অনুমতি দিয়েছেন এবং বলেছেন, তা মৃত ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর।

দারু কুতনীতে বর্ণিত হয়েছে ঃ এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, আমি আমার পিতা-মাতার সেবা তাঁদের জীবদ্দশায়ও করে যাচ্ছি। তাঁদের মৃত্যুর পর কিভাবে সেবা করবো? তিনি বললেন ঃ "তাদের মৃত্যুর পর তোমার নামাযের সাথে তাদের জন্যও নামায পড়বে, তোমার রোযার সাথে তাদের জন্য রোযা রাখবে, এটাও তাদের সেবার অন্তরভুক্ত।" দারু কুতনীতে হযরত আলী (রা) থেকে আরো একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে তিনি বলেন ঃ নবী (সা) বলেছেন কোন ব্যক্তি যদি কবরস্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে এবং এগার বার কুল হুয়াল্লাহু আহাদ পড়ে ঐ কবরস্থানের মৃতদের জন্য দোয়া করে তাহলে ওখানে যত মৃত আছে তাদের সকলকে সওয়াব দান করা হবে। একটি আরেকটির সমর্থক এ ধরনের বিপুল সংখ্যক হাদীস এ বিষয় স্পষ্ট করে দেয় যে, "ইসালে সওয়াব" বা সওয়াব পৌছানো শুধু সম্ভবই নয়, বরং সব রকম ইবাদাত এবং নেকীর কাজের সওয়াব পৌছানো যেতে পারে। এ জন্য বিশেষ ধরনের আমল বা ইবাদাত নির্দিষ্ট নেই। তবে এ প্রসংগে চারটি বিষয় খুব ভালভাবে বুঝে নিতে হবে ঃ

এক ঃ কেবল এমন আমলের সওয়াবই পৌছানো যেতে পারে যা নিছক আল্লাহর উদ্দেশ্যে শরীয়াতের নিয়ম-কানুন মাফিক করা হয়েছে। তা নাহলে একথা স্পষ্ট যে, গায়রুল্লাহর জন্য কিংবা শরীয়াতের বিধি-বিধানের পরিপন্থী কোন কাজ বা ইবাদাত করা হলে তা অন্য কারো জন্য দান করা তো দূরের কথা আমলকারী নিজেই তার কোন সওয়াব পেতে পারে না।

দুই ঃ যেসব ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার দরবারে সৎলোক হিসেবে মেহমান হয়ে আছে তারা তো নিশ্চিতভাবেই এ সওয়াবের উপহার লাভ করবেন। কিন্তু যারা সেখানে অপরাধী হিসেবে হাজতে বন্দী আছে তাদের কাছে কোন সওয়াব পৌছবে বলে আশা করা যায় না। আল্লাহর মেহমানদের কাছে তো উপহার পৌছতে পারে। কিন্তু আল্লাহর বন্দীদের কাছে উপহার পৌছার কোন আশা নেই। কোন ব্যক্তি যদি ভুল বুঝার কারণে তার জন্য ইসালে সওয়াব করে তাহলে তার সওয়াব নষ্ট হবে না, বরং অপরাধীর কাছে পৌছার বদলে মূল আমলকারীর কাছে ফিরে আসবে। ঠিক মানি অর্ডার যেমন প্রাপকের হাতে না পৌছলে প্রেরকের কাছে ফিরে আসে।

তিন ঃ সওয়াব পৌছানো সম্ভব কিন্তু আযাব পৌছানো সম্ভব নয়। অর্থাৎ কেউ নেককাজ করে অন্য কাউকে তার সওয়াব দান করবে এটা সম্ভব কিন্তু গোনাহর কাজ করে তার আযাব অন্য কাউকে দান করবে আর তা তার কাছে পৌছে যাবে, তা সম্ভব নয়।

চার ঃ নেক কাজের দু'টি কল্যাণকর দিক আছে। একটি হচ্ছে নেক কাজের সে শুভ ফলাফল যা আমলকারীর ব্যক্তিসত্তায় ও চরিত্রে প্রতিফলিত হয় এবং যার কারণে সে আল্লাহর পুরস্কার ও প্রতিদান লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। দ্বিতীয়ত তার সেই সব প্রতিদান যা তাকে আল্লাহ তা'আলা পুরস্কার হিসেবে দান করেন। এর প্রথমটির সাথে ইসালে সওয়াবের কোন সম্পর্ক নেই, শুধু দ্বিতীয়টির সাথে এর সম্পর্ক। এর উদাহরণ হলো ঃ কোন ব্যক্তি শরীর চর্চার মাধ্যমে কুস্তিতে দক্ষতা লাভের চেষ্টা করে। এভাবে তার মধ্যে যে শক্তি ও দক্ষতা সৃষ্টি হয় তা সর্বাবস্থায় তার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তা অন্য কাউকে দেয়া যায় না। অনুরূপভাবে সে যদি কোন রাজ দরবারের কর্মচারী হয় এবং কুস্তিগীর হিসেবে তার জন্য একটি বেতন নির্দিষ্ট থাকে তাহলে সে বেতনও শুধু সে-ই পাবে। অন্য কাউকে তা দেয়া হবে না। তবে তার কর্মতৎপরতায় খুশী হয়ে তার পৃষ্ঠপোষক তাকে যেসব পুরস্কার ও উপহার দেবে সেগুলো সম্পর্কে সে আবেদন করতে পারে যে তা তার শিক্ষক, মাতা-পিতা কিংবা অন্য কল্যাণকামী ও হিতাকাংখীদের দেয়া হোক। নেক কাজের ব্যাপারটাও তাই। এর আত্মিক কল্যাণসমূহ হস্তান্তর যোগ্য নয়। তার প্রতিদানও কাউকে হস্তান্তর করা যায় না। কিন্তু তার পুরস্কার ও সওয়াব সম্পর্কে সে আল্লাহ তা'আলার কাছে এ বলে দোয়া করতে পারে যে, তা তার কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিংবা কোন কল্যাণকামীকে দান করা হোক। এ কারণে একে 'ইসালে জাযা' প্রতিদান পৌছানো নয়, "ইসালে সওয়াব" সওয়াব পৌছানো বলা হয়ে থাকে।

(২) এক ব্যক্তির চেষ্টা ও তৎপরতা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য উপকারী হওয়ার আরেকটি রূপ হচ্ছে, ব্যক্তি হয় অন্য কারো ইচ্ছা বা ইংগিতে তার জন্য কোন নেক কাজ করবে। কিংবা তার ইচ্ছা বা ইংগিত ছাড়াই তার পক্ষ থেকে এমন কোন কাজ করবে যা মূলত ঐ ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব ছিল কিন্তু সে নিজে তা আদায় করতে পারেনি। এ ব্যাপারে হানাফী ফিকাহবিদদের মত হলো ঃ ইবাদাত তিন প্রকার ঃ এক, নিরেট দৈহিক ইবাদাত, যেমন ঃ নামায। দুই, নিরেট আর্থিক ইবাদাত, যেমন ঃ যাকাত এবং তিন, দেহ ও অর্থের সমন্বিত ইবাদাত, যেমন ঃ হজ্জ। এসব ইবাদাতের মধ্যে প্রথম প্রকারের ইবাদাতে কোন রকম প্রতিনিধিত্ব চলে না। যেমন এক ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসেবে আরেক ব্যক্তি নামায পড়তে পারে না। দ্বিতীয় প্রকারের ইবাদাতে প্রতিনিধিত্ব চলতে পারে। যেমন ঃ স্বামী স্ত্রীর অলঙ্কারাদির যাকাত আদায় করতে পারে। তৃতীয় প্রকারের ইবাদাতে প্রতিনিধিত্ব কেবল তখনি চলতে পারে যখন মূল ব্যক্তি, যার পক্ষ থেকে কোন কাজ করা হচ্ছে, নিজের দায়িত্ব নিজে পালনে সাময়িকভাবে নয়, বরং স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পড়ে। যেমন, বদলি হজ্জ শুধু এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে হতে পারে যে নিজে হজ্জ পালন করতে যেতে অক্ষম এবং কখনো হজ্জ পালনে যেতে সক্ষম হওয়ার আশাও করা যায় না। মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীগণও এ মতের সমর্থক। তবে বদলি হজ্জের জন্য ইমাম মালেক শর্ত আরোপ করেছেন যে, বাপ যদি ছেলেকে এ মর্মে অসীয়ত করে থাকে যে,

তার মৃত্যুর পর তার ছেলে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করবে তাহলে তা জায়েজ হবে অন্যথায় নয়। তবে এ ব্যাপারে হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে বাপের ইংগিত বা অসীয়ত থাক বা না থাক—ছেলে তার পক্ষ থেকে বদলি হজ্জ করতে পারে।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, খাস'আম গোত্রের এক মহিলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো ঃ আমার পিতার ওপর হজ্জের আদেশ এমন অবস্থায় প্রয়োজ্য হয়েছে যখন তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তিনি উটের পিঠে বসে থাকতে পারেন না। নবী (সা) বললেন ঃ فحجى عنه "তার পক্ষ থেকে তুমি হজ্জ আদায় করো (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী)। হযরত আলীও (রা) প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হদীস বর্ণনা করেছেন।" (আহমাদ, তিরমিযী)।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) যুবায়ের খাস'আম গোত্রেরই একজন পুরুষের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, সে ও তার বৃদ্ধ পিতা সম্পর্কে এ একই প্রশ্ন করেছিলো। নবী (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমিই কি তার বড় ছেলে? সে বললো হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ ارايت لو كان على ابيك دين فقضيته عنه كان يجزى ذلك عنه তুমি কি মনে করো, যদি তোমার পিতা ঋণী থাকে আর তুমি তা আদায় করে দাও তাহলে তার পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে? সে বললোঃ 'জি হাঁ'। তিনি বললেন, فاحجج عنه তাহলে অনুরূপভাবে তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জও আদায় করো। (আহমদ, নাসায়ী)

ইবনে আব্বাস বলেন ঃ জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা এসে বললো ঃ আমার মা হজ্জ করার মানত করেছিলেন। কিন্তু হজ্জ আদায় করার আগেই তিনি মারা গেছেন। এখন আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন ঃ তোমার মা যদি ঋণগ্রস্ত হতো তাহলে তুমি কি তা পরিশোধ করতে পারতে না? একইভাবে তোমরা আল্লাহর হকও আদায় করো। আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পালন করার মাধ্যমে আল্লাহর অধিকার প্রদান করা সবচেয়ে বেশী জরুরী কাজ। (বুখারী, নাসায়ী) বুখারী ও মুসলিমের আরো একটি রেওয়ায়াত হচ্ছে, এক ব্যক্তি এসে তার বোন সম্পর্কে প্রশ্ন করলো যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। নবী (সা) তাকেও এ একই জবাব দিলেন।

এসব বর্ণনা থেকে অর্থ ও দেহের সমন্বিত ইবাদাতসমূহে প্রতিনিধিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এরপর থাকে নিরেট দৈহিক ইবাদাতসমূহ। এ বিষয়ে এমন কিছু হাদীস আছে যা থেকে এ প্রকৃতির ইবাদাতসমূহের ক্ষেত্রেও প্রতিনিধিত্বের বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ইবনে আব্বাসের (রা) এই বর্ণনা যে, জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো ঃ আমার মা রোযা মানত করেছিলেন। কিন্তু তা পূরণ করার পূর্বেই তিনি মারা গিয়েছেন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে রোযা রাখতে পারি? নবী (সা) বললেন ঃ তার পক্ষ থেকে রোযা রাখো (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, নাসায়ী, আবু দাউদ)। হযরত বুরাইদা (রা) বর্ণিত এ হাদীস থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এক মহিলা তার মা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো যে, তার ওপর এক মাসের (অথবা আরেকটি বর্ণনা অনুসারে দু' মাসের) রোযা ওয়াজিব ছিল। আমি কি তার পক্ষ থেকে এ রোযা পালন করবো? নবী (সা) তাকেও অনুমতি দিলেন। (মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযি, আবু দাউদ)। তাছাড়া হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসেও নবী (সা) বলেছেন ঃ من مات وعليه صيام صام عنه وليه কেউ যদি মারা যায় আর তাঁর

ওপর কিছু রোযা থাকে তাহলে তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক সেই রোযা রাখবে (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ)। বায্‌যার বর্ণিত হাদীসে নবীর (সা) কথা উল্লেখিত হয়েছে এরূপ ঃ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ اِنْ شَاءَ অর্থাৎ তার অভিভাবক ইচ্ছা করলে তার পক্ষ থেকে রোযা রাখবে। এসব হাদীসের ভিত্তিতে আসহাবুল হাদীস, ইমাম আওযায়ী এবং জাহেরিয়াগণ দৈহিক ইবাদাতসমূহেও প্রতিনিধিত্ব জায়েয হওয়ার সমর্থক। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম যায়েদ ইবনে আলীর ফতোয়া হচ্ছে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা রাখা যেতে পারে না। ইমাম আহমাদ, ইমাম লাইস এবং ইসহাক ইবনে রাহাবিয়া বলেন ঃ এটা কেবল তখনই করা যেতে পারে যখন মৃত ব্যক্তি তা মানত করেছে কিন্তু পূরণ করতে পারেনি। বিরোধীদের যুক্তি হলো, যেসব হাদীস থেকে এর বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায় তার বর্ণনাকারীগণ নিজেরাই ঐ সব হাদীসের পরিপন্থী ফতোয়া দিয়েছেন। নাসায়ী ইবনে আব্বাসের ফতোয়া নিম্নোক্ত ভাষায় উদ্ধৃত করেছেন ঃ لا يصل احد عن احد ولا يصم احد عن احد কোন ব্যক্তি যেন কারো পক্ষ থেকে নামায না পড়ে এবং রোযাও না রাখে। আবদুর রায্‌যাকের বর্ণনা অনুসারে হযরত আয়েশার ফতোয়া হলো ঃ لا تصوموا عن موتكم واطعموا عنهم "তোমাদের মৃতদের পক্ষ থেকে রোযা রেখো না, খাবার খাইয়ে দাও।" আবদুর রায্‌যাক আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকেও একথাই উদ্ধৃত করেছেন, অর্থাৎ মৃতের পক্ষ থেকে যেন রোযা রাখা না হয়। এ থেকে জানা যায় যে, প্রথম প্রথম শারীরিক ইবাদাতসমূহেও প্রতিনিধিত্বের অনুমতি ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্থিরিকৃত হয় যে, এটা করা জায়েজ নয়। অন্যথায় কি করে সম্ভব যে যারা রসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা নিজেরাই আবার তার পরিপন্থী ফতোয়া প্রদান করবেন?

এ ক্ষেত্রে একথা ভালভাবে বুঝতে হবে যে, প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে কোন ফরয পালন কেবল তাদের জন্যই উপকারী হতে পারে যারা নিজে ফরয আদায় করতে আগ্রহী কিন্তু বাস্তব কোন অসুবিধার কারণে অপারগ হয়ে পড়েছেন। তবে সমর্থ ও সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে হজ্জ আদায় করা থেকে বিরত থাকে এবং এ ফরযটি আদায় করা সম্পর্কে তার মনে কোন অনুভূতি পর্যন্ত না থেকে থাকে তার জন্য বদলি হজ্জ যতই করা হোক না কেন তা তার জন্য কল্যাণকর হবে না। এটা ঠিক যেন কোন ব্যক্তি কর্তৃক অপর কোন ব্যক্তির ঋণের টাকা আত্মসাত করা এবং মৃত্যু পর্যন্ত পরিশোধ করার ইচ্ছা না থাকা। পরবর্তী সময়ে তার পক্ষ থেকে যদি প্রতিটি পাইও পরিশোধ করা হয় তবুও আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে সে ঋণ আত্মসাতকারী ব্যক্তি হিসেবেই গণ্য হবে। অপরের আদায় করে দেয়ায় কেবল সেই ব্যক্তিই নিষ্কৃতি পেতে পারে যে তার জীবদ্দশায় ঋণ আদায়ে আগ্রহী ছিল। কিন্তু কোন অসুবিধার কারণে আদায় করতে পারেনি।

৩৯. অর্থাৎ আখেরাতে মানুষের কাজ-কর্মের যাঁচাই বাছাই হবে এবং কে কি কাজ করে এসেছে তা দেখা হবে। আয়াতের এ অংশটি যেহেতু পূর্ববর্তী অংশের পরপরই বলা হয়েছে তাই এ থেকে স্বতই একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আখেরাতের প্রতিদান ও শাস্তির সাথেই প্রথম অংশের সম্পর্ক। এ অংশকে যারা এ পৃথিবীর জন্য একটি অর্থনৈতিক মূলনীতি হিসেবে পেশ করে থাকে তাদের কথা ঠিক নয়। কুরআন মজীদের কোন আয়াতের এমন কোন অর্থ গ্রহণ করা ঠিক নয় যা পূর্বাপর প্রসংগের পরিপন্থী এবং কুরআনের অন্যান্য বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক।

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ ﴿٤٢﴾ وَأَنَّهُۥ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿٤٣﴾ وَأَنَّهُۥ هُوَ أَمَاتَ
وَأَحْيَا ﴿٤٤﴾ وَأَنَّهُۥ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿٤٦﴾
وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٤٧﴾ وَأَنَّهُۥ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿٤٨﴾ وَأَنَّهُۥ
هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّهُۥ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ﴿٥٠﴾ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ ﴿٥١﴾

একথা যে, "শেষ পর্যন্ত তোমার রবের কাছেই পৌঁছতে হবে।"

একথা যে, "তিনিই হাসিয়েছেন এবং তিনিই কাঁদিয়েছেন।"[৪০]

একথা যে, "তিনিই মৃত্যু দিয়েছেন এবং তিনিই জীবন দান করেছেন।"

একথা যে, "তিনিই পুরুষ ও নারী রূপে জোড়া সৃষ্টি করেছেন।"—এক ফোটা শুক্রের সাহায্যে যখন তা নিক্ষেপ করা হয়।"[৪১]

একথা যে, "পুনরায় জীবন দান করাও তাঁরই কাজ।"[৪২]

একথা যে, "তিনিই সম্পদশালী করেছেন এবং স্থায়ী সম্পদ দান করেছেন।"[৪৩]

একথা যে, "তিনিই শে'রার রব।"[৪৪]

আর একথাও যে, তিনিই প্রথম আদকে[৪৫] ধ্বংস করেছেন এবং সামূদকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করেছেন যে, কাউকে অবশিষ্ট রাখেননি।

৪০. অর্থাৎ আনন্দ ও দুঃখের কার্যকারণ তার পক্ষ থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। ভাল ও মন্দ ভাগ্যের মূলসূত্র তাঁরই হাতে। কারো ভাগ্যে যদি আরাম ও আনন্দ জুটে থাকে তাহলে তা তাঁর দানেই হয়েছে। আবার কেউ যদি বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হয়ে থাকে তাও তাঁর ইচ্ছায়ই হয়েছে। এ বিশ্ব-জাহানে এমন আর কোন সত্তা নেই ভাগ্যের ভাঙা গড়ায় যার কোন হাত আছে।

৪১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আর রূম, টীকা ২৭ থেকে ৩০; আশ শূরা, টীকা ৭৭।

৪২. ওপরের দু'টি আয়াতের সাথে এ আয়াতটি মিলিয়ে পড়লে বুঝা যায়, বাক্যের বিন্যাস থেকে আপনা আপনি মৃত্যুর পরের জীবনের প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। যে আল্লাহ মৃত্যু এবং জীবন দান করার ক্ষমতা রাখেন, যিনি একফোটা নগণ্য শুক্র দিয়ে মানুষের মত একটি সৃষ্টিকে তৈরী করেন, বরং সৃষ্টির একই উপাদান ও একই সৃষ্টির পদ্ধতি থেকে নারী ও পুরুষের দু'টি স্বতন্ত্র শ্রেণী সৃষ্টি করে দেখান, তার জন্য মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা কোন কঠিন কাজ নয়।

৪৩. মূল আয়াতে اقنى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ভাষাবিদ ও মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। কাতাদা বলেন ঃ ইবনে আব্বাস এর অর্থ বলেছেন ارضى

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿٥٢﴾ وَالْمُؤْتَفِكَةَ
أَهْوَىٰ ﴿٥٣﴾ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ﴿٥٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿٥٥﴾

তাদের পূর্বে তিনি নূহের কওমকে ধ্বংস করেছেন। কারণ, তারা আসলেই বড় অত্যাচারী ও অবাধ্য লোক ছিল। তিনি উল্টে দেয়া জনপদকেও উঠিয়ে নিক্ষেপ করেছেন। তারপর ঐগুলোকে আচ্ছাদিত করে দিল তাই যা (তোমরা জানো যে কি) আচ্ছাদিত করেছিলো।[৪৬]

তাই[৪৭]*, হে শ্রোতা, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে?*[৪৮]

(সম্মত) করে দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস থেকে ইকরিমা এর অর্থ বর্ণনা করেছেন قنع (সন্তুষ্ট করে দিয়েছেন)। ইমাম রাযী বলেন ঃ মানুষকে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা-ই দেয়া হয়ে থাকে তাকেই اقناء বলে। আবু উবায়দা এবং আরো কিছু সংখ্যক ভাষাভিজ্ঞের মতে اقنى শব্দটির উদ্ভব قنية শব্দ থেকে। এর অর্থ অবশিষ্ট ও সংরক্ষিত থাকার মত সম্পদ। যেমন ঃ ঘর-বাড়ী, জমিজমা, বাগান, গবাদিপশু ইত্যাদি। ইবনে যায়েদ এসব অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন اقنى শব্দটি এখানে افقر (দরিদ্র করে দিয়েছে) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় তিনি যাকে ইচ্ছা সম্পদশালী করেছেন এবং যাকে ইচ্ছা দরিদ্র বানিয়েছেন।

৪৪. শে'রা আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। আরবীতে একে مرزم الجوزاء، الكلب الاكبر، الكلب الجبار، الشعرىٰ العبور প্রভৃতি নামে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। ইংরেজী ভাষায় একে Sirius, Dog star এবং Canis Majoris বলা হয়। এটি সূর্যের চেয়েও ২৩ গুণ বেশী উজ্জ্বল। কিন্তু পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব আট আলোকবর্ষেরও বেশী। তাই একে সূর্যের চেয়ে ছোট ও কম উজ্জ্বল দেখা যায়। মি রবাসীরা এর উপাসনা করতো। কারণ এর উদয়কালে নীল নদে জোয়ার ও প্লাবন হতো। সুতরাং তারা মনে করতো, এর উদয়ের প্রভাবেই এরূপ হয়েছে। জাহেলী যুগে আরবদেরও বিশ্বাস ছিল যে, এ নক্ষত্র মানুষের ভাগ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সেই কারণে এটি আরবদের উপাস্য দেবতাদের মধ্যে অন্তরভুক্ত ছিল এবং বিশেষ করে কুরাইশদের প্রতিবেশী খুজা'য়া গোত্র এর উপাসনার জন্য বিখ্যাত ছিল। আল্লাহ তা'আলার বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, শে'রা নক্ষত্র তোমাদের ভাগ্য গড়ে না বরং তার রব গড়ে থাকেন।

৪৫. প্রথম আদ অর্থ প্রাচীন আদ জাতি যাদের কাছে হযরত হূদ আলাইহিস সালামকে পাঠানো হয়েছিল। হযরত হূদকে (আ) অস্বীকার করার অপরাধে এ জাতি আল্লাহর আযাবের শিকার হলে যারা তার ওপর ঈমান এনেছিল কেবল তারাই রক্ষা পায়। এদের বংশধরদেরকে ইতিহাসে পরবর্তীকালের আদ বা দ্বিতীয় আদ বলা হয়ে থাকে।

هٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولٰى ﴿٥٦﴾ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ﴿٥٧﴾ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ
اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾ أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُونَ
وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ ﴿٦١﴾ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿٦٢﴾

এটি একটি সাবধান বাণী—ইতিপূর্বে আগত সাবধান বাণীসমূহের মধ্য থেকে।[৪৯] আগমনকারী মুহূর্ত অতি সন্নিকটবর্তী হয়েছে।[৫০] আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তার প্রতিরোধকারী নেই।[৫১] তাহলে কি এসব কথা শুনেই তোমরা বিস্ময় প্রকাশ করছো?[৫২] হাসছো কিন্তু কাঁদছো না?[৫৩] আর গান-বাদ্য করে তা এড়িয়ে যাচ্ছো?[৫৪] আল্লাহর সামনে মাথা নত কর এবং তাঁর ইবাদাত করতে থাকো।[৫৫]

৪৬. উল্টিয়ে দেয়া জনপদসমূহ অর্থ লূতের কওমের জনপদসমূহ। আর "আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল তাদের ওপর যা কিছু আচ্ছন্ন করে দিয়েছিলো" অর্থ সম্ভবত মরু সাগরের পানি। তাদের জনপদসমূহ মাটিতে দেবে যাওয়ার পর এ সমুদ্রের পানি তার ওপর ছড়িয়ে পড়েছিলো। আজ পর্যন্ত তা এ অঞ্চল প্লাবিত করে আছে।

৪৭. কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে একথাটিও ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহের একটি বাক্যাংশ। কিন্তু কোন কোন মুফাসসিরের মতে فغشاها ما غشى পর্যন্তই সহীফাসমূহের বাক্য শেষ হয়েছে এবং এখান থেকে অন্য বিষয় শুরু হচ্ছে। পরবর্তী কথার প্রতি লক্ষ করলে প্রথমোক্ত বক্তব্যই সঠিক বলে মনে হয়। কারণ পরবর্তী এই বাক্য ঃ "এটি একটি সাবধান বাণী—ইতিপূর্বে আগত সাবধানবাণীসমূহের মধ্য থেকে' এ বিষয়ের প্রতিই ইংগিত করে যে, পূর্ববর্তী সবগুলো বাক্যই হযরত ইবরাহীম (আ) ও মূসার (আ) সহীফাসমূহে উদ্ধৃত হয়েছে। আর এগুলো সবই পূর্বেকার সাবধান বাণীসমূহের অন্তরভুক্ত।

৪৮. মূল আয়াতে تتمارى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ সন্দেহ পোষণ এবং ঝগড়া করা উভয়টিই। এখানে প্রত্যেক শ্রোতাকে সম্বোধন করা হয়েছে। যে ব্যক্তিই এ বাণী শুনছে তাকেই সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহ অস্বীকার করা এবং তা নিয়ে নবী-রসূলদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়ার যে পরিণতি মানবেতিহাস দেখেছে তা সত্ত্বেও কি তুমি সেই নির্বুদ্ধিতার কাজ করবে? অতীত জাতিসমূহও তো এ একই সন্দেহ পোষণ করেছিলো যে, তারা এ পৃথিবীতে যেসব নিয়ামত ভোগ করছে তা একমাত্র আল্লাহর নিয়ামত না তা সরবরাহের কাজে অন্য কেউ শরীক আছে? অথবা এসব কারো সরবরাহকৃত নিয়ামত নয় বরং আপনা থেকেই পাওয়া গিয়েছে। এ সন্দেহের কারণেই তারা নবী-রসূলদের (আ) বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিল। নবী-রসূলগণ তাদের বলতেন, আল্লাহ এবং এক আল্লহই তোমাদেরকে এসব নিয়ামতের সবগুলো দান করেছেন। তাই তোমাদের উচিত তাঁরই প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং তাঁরই দাসত্ব করা। কিন্তু

তারা একথা মানতো না এবং এ বিষয়টি নিয়েই নবী–রসূলদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হতো। এখন কথা হলো, এসব জাতি তাদের এ সন্দেহ ও বিবাদের কি পরিণাম দেখেছে তাকি তুমি ইতিহাসে দেখতে পাও না? যে সন্দেহ–সংশয় ও বিবাদ অন্যদের জন্য ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়েছে তুমিও কি সেই সন্দেহ–সংশয় ও ঝগড়ায় লিপ্ত হবে?

এ ক্ষেত্রে আরো লক্ষ রাখতে হবে যে, আদ, সামূদ এবং নূহের কওমের লোকেরা হযরত ইবরাহীমের (আ) পূর্বে অতিবাহিত হয়েছিলো। এবং লূতের কওম হযরত ইবরাহীমের (আ) সময়েই আযাবে নিপতিত হয়েছিল। তাই এ বাক্যটি যে ইবরাহীমের সহীফার অংশ সে ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা বা জটিলতা নেই।

৪৯. মূল কথাটি হলো هٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُولٰى । এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণের তিনটি মত আছে। এক, نَذِير অর্থ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। দুই, এর অর্থ কুরআন। তিন, এর অর্থ অতীতের ধ্বংস প্রাপ্ত জাতিসমূহের পরিণতি যা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী বিষয়বস্তুর বিচারে আমাদের মতে এ তৃতীয় ব্যাখ্যাই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

৫০. অর্থাৎ একথা মনে করো না যে, চিন্তা–ভাবনা করার জন্য এখনো অনেক সময় আছে। তাই এসব কথা নিয়ে এখনই গুরুত্ব সহকারে চিন্তা–ভাবনা করার এবং অবিলম্বে এসব মেনে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য তাড়াহুড়ার প্রয়োজনটা কি? কিন্তু না; তোমাদের কেউ–ই জানে না তার জন্য জীবনের আর কতটা সময় এখনো আছে। যে কোন সময় তোমাদের যে কোন লোকের মৃত্যু এসে হাজির হতে পারে এবং অকস্মাত কিয়ামতও এসে পড়তে পারে। তাই চূড়ান্ত ফায়সালার মুহূর্তকে দূরে মনে করো না। যে ব্যক্তিই নিজের পরিণাম সম্পর্কে ভেবে দেখতে চায় সে যেন এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে নিজেকে সংযত করে। কারণ, প্রতিবার শ্বাস গ্রহণের সাথে সাথে এ সম্ভাবনাও বিদ্যমান যে, দ্বিতীয়বার শ্বাস গ্রহণের আর কোন সুযোগ হয়তো পাওয়া যাবে না।

৫১. অর্থাৎ ফায়সালার সময় যখন এসে পড়বে তখন তোমরা না পারবে তা প্রতিরোধ করতে আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের যেসব উপাস্য আছে তাদের কারো এমন ক্ষমতাও নেই যে তা ঠেকাতে পারে। তা ঠেকালে কেবল মাত্র আল্লাহ তা'আলাই ঠেকাতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা ঠেকাবেন না।

৫২. মূল আয়াতে هٰذَا الْحَدِيثِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে কুরআন মজীদের আকারে যেসব শিক্ষা পেশ করা হচ্ছিলো এর দ্বারা সেই সব শিক্ষাকে বুঝানো হয়েছে। আর বিস্ময় বলতে বুঝানো হয়েছে সেই বিস্ময়কে যা অভিনব ও অবিশ্বাস্য কথা শুনে মানুষ প্রকাশ করে থাকে। আয়াতটির প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিষয়ের প্রতি আহবান জানাচ্ছেন তা তো এসব কথাই যা তোমরা শুনেছো। তাহলে এগুলোই কি সেই সব কথা যা শুনে তোমরা কান খাড়া করে থাকো এবং বিস্ময়ের সাথে এমনভাবে মুখের দিকে তাকাতে থাকো যেন তোমাদেরকে কোন অদ্ভুত ও অভিনব কথা শুনানো হচ্ছে?

৫৩. অর্থাৎ নিজেদের মূর্খতা ও গোমরাহীর কারণে যেখানে তোমদের কান্না আসা দরকার সেখানে যে সত্য তোমাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে তা নিয়ে তোমরা ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করছো।

৫৪. মূল আয়াতে سامدون শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ভাষাবিদগণ এ শব্দটির দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস, ইকরিমা এবং আবু উবায়দা নাহবীর মতে سمود অর্থ গান বাদ্য করা। মক্কার কাফেররা কুরআনের আওয়াজকে স্তব্ধ করতে ও মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য জোরে জোরে গান বাদ্য শুরু করতো। এখানে সেদিকেই ইংগিত দেয়া হয়েছে। ইবনে আব্বাস ও ইকরিমা এর আরেকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। তা হচ্ছে ঃ

السمود البر طمة وهى رفع الراس تكبرا ، كانوا يمرون على النبى صلى الله عليه وسلم عضابا مبرطمين -

"অহংকার ভরে ঘাড় উঁচু বা বাঁকা করা। মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ক্রোধে ঘাড় উঁচু করে চলে যেতো।"

রাগেব ইস্পাহানী তার 'মুফরাদাত' গ্রন্থে এ অর্থটিই গ্রহণ করেছেন। এ অর্থ বিবেচনা করে কাতাদা سامدون শব্দের অর্থ করেছেন غافلون এবং সায়ীদ ইবনে জুবাইর অর্থ করেছেন معرضون ।

৫৫. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী ও অধিকাংশ আলেমের মতে এ আয়াত পাঠ করে সিজদা করা অবশ্য কর্তব্য। ইমাম মালেক এ আয়াত তিলাওয়াত করে যদিও সব-সময় সিজদা করতেন (যেমন কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী আহকামুল কুরআন গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন) কিন্তু এখানে সিজদা করা জরুরী নয় বলে তিনি মত পোষণ করতেন। তাঁর এ মতের ভিত্তি যায়েদ ইবনে সাবেতের এই বর্ণনা যে, "আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে সূরা নাজ্‌ম পাঠ করলে তিনি সিজদা করেননি।" (বুখারী, মুসলিম, আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী)। কিন্তু উক্ত হাদীসটি এ আয়াত পাঠ করে সিজদা করার বাধ্যবাধকতা রহিত করে না। কারণ এ ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভাবনা বিদ্যমান যে, কোন কারণে নবী (সা) সে সময় সিজদা করেননি কিন্তু পরে করেছেন। এ বিষয়ে অন্য সব রেওয়ায়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যে, এ আয়াত পাঠ করে সব সময় অবশ্যই সিজদা করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), ইবনে আব্বাস (রা) ও মুত্তালিব (রা) ইবনে আবী ওয়াদা'আর সর্বসম্মত বর্ণনাসমূহ হচ্ছে, নবী (সা) সর্বপ্রথম যখন হারাম শরীফে তিলাওয়াত করেন তখন তিনি সিজদা করেছিলেন। সে সময় মুসলমান ও কাফের সবাই তাঁর সাথে সিজদায় পড়ে গিয়েছিলো।" (বুখারী, আহমাদ, নাসায়ী)। ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, "নবী (সা) নামাযে সূরা নাজ্‌ম তিলাওয়াত করে সিজদা করেছেন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত সিজদায় থেকেছেন।" (বায়হাকী, ইবনে মারদুইয়া)। সাবুরাতুল জুহানী বলেন ঃ হযরত উমর (রা) ফজরের নামাযে সূরা নাজ্‌ম পড়ে সিজদা করেছেন এবং তারপর উঠে সূরা যিলযাল পড়ে রুকূ' করেছেন।" (সা'য়ীদ ইবনে মানসুর)। ইমাম মালেক নিজেও মুয়াত্তা গ্রন্থের ما جاء فى سجود القران অনুচ্ছেদে হযরত উমরের এ আমলের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

আল ক্বামার

৫৪

নামকরণ

সূরার সর্ব প্রথম আয়াতের وَانشَقَّ الْقَمَرُ বাক্যাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। এভাবে নামকরণের তাৎপর্য হচ্ছে এটি সেই সূরা যার মধ্যে القمر শব্দ আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার মধ্যে চন্দ্র খণ্ডিত হওয়ার উল্লেখ আছে। এ থেকেই এর নাযিলের সময়-কাল চিহ্নিত হয়ে যায়। মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ এ ব্যাপারে একমত যে, চন্দ্র খণ্ডিত হওয়ার এ ঘটনা হিজরতের প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে মক্কায় মিনা নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিলো।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের বিরুদ্ধে মক্কার কাফেররা যে হঠকারিতার পন্থা অবলম্বন করে আসছিলো এ সূরায় সে বিষয়ে তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার যে খবর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিচ্ছিলেন তা যে সত্যিই সংঘটিত হতে পারে এবং তার আগমনের সময় যে অত্যন্ত নিকটবর্তী-চন্দ্র খণ্ডিত হওয়ার বিস্ময়কর ঘটনা তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। চন্দ্রের মত একটি বিশাল উপগ্রহ তাদের চোখের সামনে বিদীর্ণ হয়েছিলো। তার দু'টি অংশ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি আরেকটি থেকে এত দূরে চলে গিয়েছিলো যে, প্রত্যক্ষদর্শীরা একটি খণ্ডকে পাহাড়ের এক পাশে এবং অপর খণ্ডটিকে অপর পাশে দেখতে পেয়েছিলো। তারপর দু'টি অংশ মুহূর্তের মধ্যে আবার পরস্পর সংযুক্ত হয়েছিলো। বিশ্ব ব্যবস্থা যে অনাদি, চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর নয়, বরং তা ধ্বংস ও ছিন্ন ভিন্ন হতে পারে এটা তার অকাট্য প্রমাণ। বড় বড় তারকা ও গ্রহরাজি ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে পারে, একটি আরেকটির ওপর আছড়ে পড়তে পারে এবং কিয়ামতের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে কুরআনে তার যে চিত্র অংকন করা হয়েছে তার সব কিছুই যে ঘটতে পারে, শুধু তাই নয় বরং এ ঘটনা এ ইংগিতও দিচ্ছিলো যে, বিশ্ব ব্যবস্থা ধ্বংস ও ছিন্নভিন্ন হওয়ার সূচনা হয়ে গিয়েছে এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় অতি নিকটে এসে পড়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দিকটির প্রতিই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন ঃ তোমরা দেখো এবং সাক্ষী থাকো। কিন্তু কাফেররা এ ঘটনাকে যাদুর বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড বলে আখ্যায়িত করলো এবং তা না মানতে বদ্ধপরিকর রইল। এ হঠকারিতার জন্য তাদেরকে এ সূরায় তিরস্কার করা হয়েছে।

বক্তব্য শুরু করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এসব লোক যুক্তি তর্কও মানে না, ইতিহাস থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করে না, স্পষ্ট নিদর্শনাদি চোখে দেখেও বিশ্বাস করে না। এরা কেবল তখনই মানবে যখন সত্যি সত্যিই কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং এরা কবর থেকে উঠে হাশরের দিনের একচ্ছত্র অধিপতির দিকে ছুটে যেতে থাকবে।

এরপর তাদের সামনে নূহের কওম, আদ, সামূদ, লূতের কওম এবং ফেরাউনের অনুসারীদের অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রেরিত রসূলদের সাবধান বাণীসমূহ অমান্য করে এসব জাতি কি ভয়াবহ আযাবে নিপতিত হয়েছিলো। এভাবে এক একটি জাতির কাহিনী বর্ণনা করার পর বারবার বলা হয়েছে যে, কুরআন উপদেশ গ্রহণের সহজ মাধ্যম। এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে কোন জাতি যদি সঠিক পথ অনুসরণ করে তাহলে এসব কওমের ওপর যে আযাব এসেছে তা তাদের ওপর কখনো আসতে পারে না।

কিন্তু এটা কোন্ ধরনের নির্বুদ্ধিতা যে, এই সহজলভ্য উৎস থেকে উপদেশ গ্রহণ করার পরিবর্তে কেউ গোঁ ধরে থাকবে যে, আযাবে নিপতিত না হওয়া পর্যন্ত মানবে না।

একইভাবে অতীত জাতিসমূহের ইতিহাস থেকে উদাহরণ পেশ করার পর মক্কার কাফেরদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, যে কর্মপন্থা গ্রহণের কারণে অপরাপর জাতিসমূহ সাজা প্রাপ্ত হয়েছে তোমরাও যদি সেই একই কর্মপন্থা গ্রহণ করো তাহলে তোমরাই বা শাস্তি পাবে না কেন? তোমাদের কি আলাদা কোন বৈশিষ্ট আছে যে, তোমাদের সাথে অন্যদের চেয়ে ভিন্ন আচরণ করা হবে? নাকি এই মর্মে ক্ষমার কোন বিশেষ সনদ লিখিতভাবে তোমাদের কাছে এসেছে যে, অন্যদেরকে যে অপরাধে পাকড়াও করা হয়েছে সেই একই অপরাধ করলেও তোমাদের পাকড়াও করা হবে না? আর তোমরা যদি নিজেদের দলীয় বা সংঘবদ্ধ শক্তির কারণে গর্বিত হয়ে থাকো তাহলে তোমাদের এ সংঘবদ্ধ শক্তিকে অচিরেই পরাজিত হয়ে পালাতে দেখা যাবে। সর্বোপরি কিয়ামতের দিন তোমাদের সাথে এর চেয়েও কঠোর আচরণ করা হবে।

সবশেষে কাফেরদের বলা হয়েছে, কিয়ামত সংঘটনের জন্য আল্লাহ তা'আলার বড় কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। তাঁর আদেশ হওয়া মাত্র চোখের পলকে তা সংঘটিত হবে। তবে সব কিছুর মতই বিশ্ব ব্যবস্থা ও মানব জাতির জন্যও একটা "তাকদীর" বা পরিকল্পিত সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ আছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে এ কাজের জন্য যে নির্দিষ্ট সময় আছে সে সময়েই তা হবে। এ ক্ষেত্রে কেউ চ্যালেঞ্জ করলো আর অমনি তাকে স্বমতে আনার জন্য কিয়ামত সংঘটিত করে দেয়া হলো এমনটা হতে পারে না। তা সংঘটিত হচ্ছে না দেখে তোমরা যদি বিদ্রোহ করে বসো তাহলে নিজেদের দুষ্কর্মের প্রতিফলই ভোগ করবে। আল্লাহর কাছে তোমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি প্রস্তুত হচ্ছে। তোমাদের ছোট বড় কোন তৎপরতাই তাতে লিপিবদ্ধ হওয়া থেকে বাদ পড়ছে না।

আয়াত ৫৫ **সূরা আল ক্বামার–মক্কী** রুকূ' ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ① وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ② وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ۭ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ③

কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হয়েছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে।[১] কিন্তু এসব লোকের অবস্থা হচ্ছে তারা যে নিদর্শনই দেখে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে এ তো গতানুগতিক যাদু।[২] এরা (একেও) অস্বীকার করলো এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করলো।[৩] প্রত্যেক বিষয়কে শেষ পর্যন্ত একটা পরিণতি লাভ করতে হয়।[৪]

১. অর্থাৎ যে কিয়ামতের সংঘটিত হওয়ার খবর তোমাদের দিয়ে আসা হচ্ছে তার সময় যে ঘনিয়ে এসেছে এবং বিশ্ব ব্যবস্থা ধ্বংস ও ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার সূচনা যে হয়ে গিয়েছে, চাঁদ বিদীর্ণ হওয়াই তার প্রমাণ। তাছাড়া চাঁদের মত একটি বিশাল জ্যোতিষ্কের বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার ঘটনা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, যে কিয়ামতের কথা তোমাদেরকে বলা হচ্ছে তা সংঘটিত হওয়া সম্ভব। এ কথা সুস্পষ্ট যে, চাঁদ যখন বিদীর্ণ হতে পারে তখন পৃথিবীও বিদীর্ণ হতে পারে, তারকা ও গ্রহরাজির কক্ষপথ ও পরিবর্তিত হতে পারে, উর্ধজগতের গোটা ব্যবস্থাই ধ্বংস ও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে পারে। এর মধ্যেকার কোনটিই অনাদি, চিরস্থায়ী এবং স্থির ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় যে, কিয়ামত সংঘটিত হতে পারে না।

কেউ কেউ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করেছেন, এভাবে যে, "চাঁদ বিদীর্ণ হবে" আরবী ভাষার বাকরীতি অনুসারে এ অর্থ গ্রহণ সম্ভব হলেও বাক্যের পূর্বাপর প্রসংগের সাথে এ অর্থ একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। প্রথমত এ অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতের প্রথম অংশ অর্থহীন হয়ে পড়ে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় চাঁদ যদি বিদীর্ণ না হয়ে থাকে বরং ভবিষ্যতে কোন এক সময় বিদীর্ণ হয় তাহলে তার ভিত্তিতে একথা বলা একেবারেই নিরর্থক যে, কিয়ামতের সময় সন্নিকটবর্তী হয়েছে। ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন ঘটনা কিয়ামত সন্নিকটবর্তী হওয়ার প্রমাণ হতে পারে কি করে যে তাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যুক্তিযুক্ত হবে? দ্বিতীয়ত এ অর্থ গ্রহণ করার পর যখন আমরা পরবর্তী বাক্য পাঠ করি তখন বুঝা যায় যে, এর সাথে তার কোন মিল নেই। পরবর্তী আয়াত সুস্পষ্টভাবে বলছে যে, লোকেরা সে সময় কোন নিদর্শন দেখেছিলো যা ছিল কিয়ামতের সম্ভাব্যতার স্পষ্ট

প্রমাণ। কিন্তু তারা তাকে যাদুর তেলেসমাতি আখ্যায়িত করে অস্বীকার করেছিলো এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয় বলে নিজেদের বদ্ধমূল ধারণা আঁকড়ে ধরে পড়েছিলো। যদি اِنْشَقَّ الْقَمَرُ কথাটির অর্থ "চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে" গ্রহণ করা হয় তাহলেই কেবল পূর্বাপর প্রসংগের মাঝে তা খাপ খায়। কিন্তু এর অর্থ যদি "বিদীর্ণ হবে" গ্রহণ করা হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে পরবর্তী সব কথাই সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে। বক্তব্যের ধারাবাহিকতার মাঝে এ অংশটি জুড়ে দিয়ে দেখুন, আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে, একথাটির কারণে গোটা বক্তব্যই অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

"কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হয়েছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হবে। কিন্তু এসব লোকের অবস্থা হচ্ছে, তারা যে নিদর্শনই দেখে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এতো গতানুগতিক যাদু। এরা অস্বীকার করলো এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করলো।"

সুতরাং প্রকৃত সত্য এই যে, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকেই প্রমাণিত তা কেবল হাদীসের বর্ণনা সমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তবে হাদীস সমূহের বর্ণনা থেকে এ বিষয়টি সবিস্তারে জানা যায় এবং তা কবে ও কোথায় সংঘটিত হয়েছিলো তাও অবহিত হওয়া যায়। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আহমদ, আবু 'উওয়ানা, আবু দাউদ তায়ালেসী, আবদুর রায্যাক, ইবনে জারীর, বায়হাকী, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া ও আবু নু'য়াইম ইস্পাহানী বিপুল সংখ্যক সনদের মাধ্যমে হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, হযরত হুযাইফা, হযরত আনাস ইবনে মালেক ও হযরত জুবাইর ইবনে মুত'এম থেকে এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এসব সম্মানিত সাহাবা কিরামের মধ্যে তিনজন অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত হুযাইফা ও হযরত জুবাইর ইবনে মুত'এম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, তাঁরা এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তাছাড়া তাঁদের মধ্যে দু'জন এমন ব্যক্তি আছেন যারা প্রত্যক্ষদর্শী নন। কারণ এটা তাদের মধ্যে একজনের (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস) জন্মের পূর্বের ঘটনা। আর অপরজন ঘটনার সময় শিশু ছিলেন। কিন্তু তারা উভয়েই যেহেতু সাহাবী। তাই যেসব বয়স্ক সাহাবা এ ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন তাঁদের নিকট থেকে শুনেই হয়তো তারা এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

সমস্ত রেওয়ায়াত একত্রিত করলে এ ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় তা হচ্ছে, এটি হিজরতের প্রায় পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা। সেদিন ছিল চান্দ্র মাসের চতুর্দশ রাত্রি। চাঁদ তখন সবে মাত্র উদিত হয়েছিলো। অকস্মাত তা দ্বিখণ্ডিত হলো এবং তার একটি অংশ সম্মুখের পাহাড়ের এক দিকে আর অপর অংশ অপরদিকে পরিদৃষ্ট হলো। এ অবস্থা অল্প কিছু সময় মাত্র স্থিতি পায়। এর পরক্ষণেই উভয় অংশ আবার পরস্পর সংযুক্ত হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় মিনাতে অবস্থান করছিলেন। তিনি লোকদের বললেন ঃ দেখো এবং সাক্ষী থাকো। কাফেররা বললো ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ওপর যাদু করেছিলো তাই আমাদের দৃষ্টি ভ্রম ঘটেছিল। অন্যেরা বললো ঃ মুহাম্মাদ আমাদের ওপর যাদু করতে পারে, তাই বলে সমস্ত মানুষকে তো যাদু করতে সক্ষম নয়। বাইরের লোকদের আসতে দাও। আমরা তাদেরকেও জিজ্ঞেস করবো,

তারাও এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে কি না। বাইরে থেকে কিছু লোক আসলে তারা বললো যে, তারাও এ দৃশ্য দেখেছে।

হযরত আনাস থেকে বর্ণিত কোন কোন রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে এরূপ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় যে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা একবার নয়, দুইবার সংঘটিত হয়েছিলো। কিন্তু প্রথমত সাহাবীদের মধ্যে আর কেউ এ কথা বর্ণনা করেননি। দ্বিতীয়ত হযরত আনাসের কোন কোন রেওয়ায়াতে (مرتين) দুইবার কথাটি উল্লেখিত হয়েছে এবং কোন কোনটিতে فرقتين বা شقتين (দুই খণ্ড) শব্দ উল্লেখিত হয়েছে। তৃতীয়ত, কুরআন মজীদে শুধু একবার খণ্ডিত হওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে। এ দিক দিয়ে সঠিক কথা এটিই যে এ ঘটনা শুধু একবারই সংঘটিত হয়েছিলো।

এ সম্পর্কে সমাজে কিছু কিচ্ছাকাহিনীও প্রচলিত আছে। ওগুলোতে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আঙুল দিয়ে চাঁদের দিকে ইশারা করলেন আর তা দ্বি-খণ্ডিত হয়ে গেল। তাছাড়া চাঁদের একটি অংশ নবীর (সা) জামার গলদেশ দিয়ে প্রবেশ করে হাতার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে গেল। এসব একেবারেই ভিত্তিহীন কল্পকাহিনী।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এ ঘটনার সত্যিকার ধরন ও প্রকৃতি কি ছিল? এটা কি কোন মু'জিযা ছিল যা মক্কার কাফেরদের দাবীর প্রেক্ষিতে রিসালাতের প্রমাণ হিসেবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখিয়েছিলেন ? নাকি এটা কোন দুর্ঘটনা ছিল যা আল্লাহর কুদরত বা অসীম ক্ষমতায় চাঁদের বুকে সংঘটিত হয়েছিল এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন শুধু এই জন্য যে, তা কিয়ামতের সম্ভাব্যতাও সন্নিকটবর্তী হওয়ার একটি নিদর্শন। মুসলিম মনীষীদের একটি বিরাট গোষ্ঠী এ ঘটনাকে নবীর (সা) মু'জিযা হিসেবে গণ্য করেন। তাঁদের ধারণা অনুসারে মক্কার কাফেরদের দাবীর কারণে এ মু'জিযা দেখানো হয়েছিলো। কিন্তু হযরত আনাস বর্ণিত হাদীসসমূহের দু'য়েকটির ওপর ভিত্তি করেই এ অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। তিনি ছাড়া অন্য আর কোন সাহাবীই এ কথা বর্ণনা করেননি। ইবনে হাজার তাঁর ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেছেন ঃ "যতগুলো সূত্রে এ ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার মধ্যে হযরত আনাস বর্ণিত হাদীস ছাড়া আর কোথাও এ কথা আমার চোখে পড়েনি যে, মুশরিকদের দাবীর কারণে চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল।" باب انشقاق القمر । আবু নুয়াইম ইস্পাহানী "দালায়েলুন নবুওয়াত" গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকেও একই বিষয়ে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তার সনদ দুর্বল। মজবুত সনদে হাদীস গ্রন্থসমূহে যতগুলো হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে তার কোনটিতেই একথার উল্লেখ নেই। তাছাড়া হযরত আনাস ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস উভয়ই এ ঘটনার সম সাময়িক ছিলেন না। অপর দিকে যেসব সাহাবাকিরাম সে সময় বর্তমান ছিলেন— যেমন ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত হুযাইফা (রা), হযরত জুবাইর (রা) ইবনে মুত'এম, হযরত আলী (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর–তাঁদের কেউ-ই এ কথা বলেননি যে, মক্কার মুশরিকরা নবীর (সা) নবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে কোন নির্দশনের দাবী করেছিলো এবং সে কারণেই তাদেরকে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার এ মু'জিযা দেখানো হয়েছিলো। সব চেয়ে বড় কথা, কুরআন মজীদ এ ঘটনাকে মুহাম্মাদের (সা) রিসালাতের নিদর্শন হিসেবে পেশ

করছে না, বরং কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার নিদর্শন হিসেবে পেশ করছে। তবে নবী (সা) লোকদেরকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার যে খবর দিয়েছিলেন এ ঘটনা তার সত্যতা প্রমাণ করছিলো। সুতরাং এদিক দিয়ে এ ঘটনা অবশ্যই তাঁর নবুওয়াতেরও সত্যতার স্পষ্ট প্রমাণ ছিল।

বিরুদ্ধবাদীরা এ ক্ষেত্রে দুই ধরনের আপত্তি উত্থাপন করে থাকে। প্রথমত, তাদের মতে এরূপ ঘটা আদৌ সম্ভব নয় যে, চাঁদের মত বিশালায়তন একটি উপগ্রহ বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে যাবে এবং খণ্ড দু'টি পরস্পর শত সহস্র মাইল দূরত্বে চলে যাওয়ার পর আবার পরস্পর সংযুক্ত হবে। দ্বিতীয়ত, তারা বলে, এ ঘটনা যদি ঘটেই থাকে তাহলে তা দুনিয়াময় প্রচার হয়ে যেতো, ইতিহাসে তার উল্লেখ দেখা যেতো এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে তার বর্ণনা থাকতো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ দু'টি আপত্তি গুরুত্বহীন। চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার সম্ভাব্যতার প্রশ্নে বলা যায়, তা সম্ভব নয় একথা প্রাচীন কালে হয়তো বা গ্রহণযোগ্য হতে পারতো। কিন্তু গ্রহ-উপগ্রহসমূহের গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে বর্তমানে মানুষ যে জ্ঞান ও তথ্য লাভ করেছে তার ভিত্তিতে একটি গ্রহ তার আভ্যন্তরীণ অগ্ন্যুৎপাতের কারণে বিদীর্ণ হতে পারে। এ ভয়ানক বিস্ফোরণের ফলে তা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পরস্পর বহুদূরে চলে যেতে পারে এবং তার কেন্দ্রের চৌম্বক শক্তির কারণে পুনরায় পরস্পর সংযুক্ত হতে পারে। এটা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। এরপর দ্বিতীয় আপত্তির গুরুত্বহীন হওয়া সম্পর্কে বলা যায়, এ ঘটনা অকস্মাৎ এক মুহূর্তের জন্য সংঘটিত হয়েছিল। সে বিশেষ মুহূর্তে সারা পৃথিবীর দৃষ্টি চাঁদের দিকে নিবদ্ধ থাকবে এটা জরুরী নয়। সে মুহূর্তে বিস্ফোরণের কোন শব্দ হয়নি যে, সেদিকে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। এ উদ্দেশ্যে পূর্বাহ্নেই কোন ঘোষণা দেয়া হয়নি যে লোকজন তার অপেক্ষায় আকাশের দিকে চেয়ে থাকবে। ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র তা দৃষ্টিগোচর হওয়াও সম্ভব ছিল না। সে সময় শুধু আরব ও তার পূর্বাঞ্চল সন্নিহিত দেশ সমূহেই চন্দ্র উদিত হয়েছিল। সে সময় ইতিহাস চর্চার রুচি ও প্রবণতা ছিল না এবং স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবেও সে সময় তা এতটা উন্নত ছিল না যে, পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহের যেসব লোক তা দেখেছিলো তারা তা লিপিবদ্ধ করে নিতো, কোন ঐতিহাসিকের কাছে এসব প্রমাণাদি সংগৃহীত থাকতো এবং কোন গ্রন্থে সে তা লিপিবদ্ধ করতো। তা সত্ত্বেও মালাবারের ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, সেরাতে সেখানকার একজন রাজা এ দৃশ্য দেখেছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি ও পঞ্জিকাসমূহে এ ঘটনার উল্লেখ কেবল তখনই থাকা জরুরী হতো যদি এর দ্বারা চন্দ্রের গতি, তার পরিক্রমণের পথ এবং উদয়াস্তের সময়ে কোন পরিবর্তন সূচিত হতো। কিন্তু তা যেহেতু হয়নি, তাই প্রাচীনকালের জ্যোতির্বিদদের দৃষ্টিও এদিকে আকৃষ্ট হয়নি। সে যুগের মানমন্দিরসমূহও এতটা উন্নত ছিল না যে, নভোমণ্ডলে সংঘটিত প্রতিটি ঘটনাই তারা পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ডভুক্ত করতে পারতেন।

২. মূল ইবারতে سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতদিন একের পর এক যে যাদু চালিয়ে যাচ্ছেন, নাউযুবিল্লাহ—এটিও তার একটি। দুই, এটা পাকা যাদু। অত্যন্ত নিপুণভাবে এটি দেখানো হয়েছে। তিন, অন্য সব যাদু যেভাবে অতীত হয়ে গিয়েছে এটিও সেভাবে অতীত হয়ে যাবে, এর দীর্ঘস্থায়ী কোন প্রভাব পড়বে না।

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ۙ﴿٤﴾ حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ۙ﴿٥﴾
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكُرٍ ۙ﴿٦﴾ خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ
يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ۙ﴿٧﴾ مُّهْطِعِيْنَ اِلَى
الدَّاعِ ۭ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾

এসব লোকদের কাছে (পূর্ববর্তী জাতি সমূহের) সেসব পরিণতির খবর অবশ্যই এসেছে যার মধ্যে অবাধ্যতা থেকে নিবৃত্ত রাখার মত যথেষ্ট শিক্ষনীয় বিষয় আছে। আরো আছে এমন যুক্তি যা নসীহতের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ মাত্রায় পূরণ করে। কিন্তু সাবধানবাণী তাদের জন্য ফলপ্রদ হয় না। অতএব হে নবী, এদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।[৫] যেদিন আহবানকারী একটি অত্যন্ত অপছন্দনীয়[৬] জিনিসের দিকে আহবান জানাবে, লোকেরা ভীত বিহবল দৃষ্টি নিয়ে[৭] নিজ নিজ কবর থেকে[৮] এমনভাবে উঠে আসবে যেন তারা বিক্ষিপ্ত পতঙ্গরাজি। তারা আহবানকারীর দিকে দৌড়িয়ে যেতে থাকবে। আর সেসব অস্বীকারকারী (যারা দুনিয়াতে তা অস্বীকার করতো) সে সময় বলবে, এ তো বড় কঠিন দিন।

৩. অর্থাৎ কিয়ামত বিশ্বাস না করার যে সিদ্ধান্ত তারা নিয়ে রেখেছে এ নিদর্শন দেখার পরও তারা সেটিকেই আঁকড়ে ধরে আছে। কিয়ামতকে বিশ্বাস করা যেহেতু তাদের প্রবৃত্তির আকাংখার পরিপন্থী ছিল, তাই সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরও এরা তা মেনে নিতে রাজী হয়নি।

৪. এর অর্থ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের ন্যায় ও সত্যের দিকে আহবান জানাতে থাকবেন আর তোমরা হঠকারিতা করে নিজেদের বাতিল মত ও পথের ওপর অবিচল থাকবে, এ অবস্থা অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত চলতে পারে না। তাঁর ন্যায় ও সত্যপন্থী হওয়া এবং তোমাদের বাতিল পন্থী হওয়া কখনো প্রমাণিত হবে না, তা হতে পারে না। সব কিছুই শেষ পর্যন্ত একটা পরিণতি লাভ করে। অনুরূপভাবে তোমাদের ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সংঘাত চলছে তারও একটি অনিবার্য পরিণাম আছে। তাকে অবশ্যই সে পরিণাম লাভ করতে হবে। এমন একটি সময় অবশ্যই আসতে হবে যখন প্রকাশ্যে প্রমাণিত হবে যে, তিনি ন্যায় ও সত্যের পথে ছিলেন আর তোমরা বাতিলের অনুসরণ করছিলে। অনুরূপভাবে যারা ন্যায় ও সত্যপন্থী, তারা ন্যায় ও সত্যপন্থা অনুসরণের এবং যারা বাতিল পন্থী, তারা বাতিল পন্থা অনুসরণের ফলও একদিন অবশ্যই লাভ করবে।

৫. অন্য কথায় এদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও। আখেরাত অস্বীকৃতির পরিণাম ও ফলাফল কি এবং অপরাপর জাতিসমূহ নবী-রসূলদের কথা না মানার যে দৃষ্টান্তমূলক

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴿٩﴾
فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ﴿١٠﴾ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ
مُنْهَمِرٍ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾

এদের পূর্বে নূহের (আ) জাতিও অস্বীকার করেছে।[৯] তারা আমার বান্দাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছে, এবং বলেছে, এ লোকটি পাগল। উপরন্তু তাকে তীব্রভাবে তিরস্কারও করা হয়েছে।[১০] অবশেষে সে তার রবকে উদ্দেশ্য করে বললো; আমি পরাভূত হয়েছি, এখন তুমি এদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো। তখন আমি আসমানের দরজাসমূহ খুলে দিয়ে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করলাম এবং যমীন বিদীর্ণ করে ঝর্ণাধারায় রূপান্তরিত করলাম।[১১] এ পানির সবটাই সেই কাজ পূর্ণ করার জন্য সংগৃহীত হলো যা আগে থেকেই সুনির্দিষ্ট ছিল।

শাস্তি ভোগ করেছে তা যখন এদেরকে অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য পন্থায় বুঝানো হয়েছে এবং মানবেতিহাস থেকে উদাহরণ পেশ করে বলে দেয়া হয়েছে, তারপরও এরা যদি হঠকারিতা পরিহার না করে তাহলে তাদেরকে এ বোকার স্বর্গেই বাস করতে দাও। এরপর এরা কেবল তখনই তোমার কথা মেনে নেবে যখন মৃত্যুর পর কবর থেকে উঠে নিজের চোখে দেখবে, কিয়ামত শুরু হয়ে গিয়েছে। তখন স্বচক্ষেই দেখতে পাবে যে, যে কিয়ামত সম্পর্কে তাদেরকে আগে ভাগেই সাবধান করে দিয়ে সঠিক পথ অনুসরণের পরামর্শ দেয়া হতো তা যথারীতি শুরু হয়ে গেছে।

৬. আরেকটি অর্থ অজানা-অচেনা জিনিসও হতে পারে। অর্থাৎ এমন জিনিস যা কখনো তাদের কল্পনায়ও স্থান পায়নি, যার কোন চিত্র বা ধারণা তাদের মগজে ছিল না, কোন সময় এ ধরনের কোন কিছুর মুখোমুখি হতে হবে সে অনুমানও তারা করতে পারেনি।

৭. মূল শব্দ হচ্ছে خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ অর্থাৎ তাদের দৃষ্টি আনত থাকবে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, ভীতি ও আতঙ্ক তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। দুই, তাদের মধ্যে লজ্জা ও অপমানবোধ জাগ্রত হবে এবং চেহারায় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। কারণ, কবর থেকে বেরিয়ে আসামাত্র তারা বুঝতে পারবে যে, এটিই সে পরকালীন জীবন যা আমরা অস্বীকার করতাম। যে জীবনের জন্য আমরা কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করে আসিনি এবং যে জীবনে এখন আমাদেরকে অপরাধী হিসেবে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। তিন, তারা হতবুদ্ধি হয়ে তাদের চোখের সামনে বিদ্যমান সে ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে থাকবে। তা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়ার হুঁশও তাদের থাকবে না।

৮. কবর বলতে শুধুমাত্র সেসব কবরই বুঝানো হয়নি মাটি খুঁড়ে যার মধ্যে কাউকে যথারীতি দাফন করা হয়েছে। বরং এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে, যেখানেই কোন ব্যক্তি মৃত্যু

وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ﴿١٣﴾ تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ
كُفِرَ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٥﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿١٦﴾
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾

আর নূহকে (আ) আমি কাষ্ঠফলক ও পেরেক সম্বলিত[১২] বাহনে আরোহন করিয়ে দিলাম যা আমার তত্ত্বাবধানে চলছিলো। এ ছিলো সে ব্যক্তির জন্য প্রতিশোধ যাকে অস্বীকার ও অবমাননা করা হয়েছিলো।[১৩] সে নৌকাকে আমি একটি নিদর্শন বানিয়ে দিয়েছি।[১৪] এমতাবস্থায় উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছ কি? দেখো, কেমন ছিল আমার আযাব আর কেমন ছিল আমার সাবধান বাণী। আমি এ কুরআনকে উপদেশ লাভের সহজ উৎস বানিয়ে দিয়েছি।[১৫] এমতাবস্থায় উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছ কি?

বরণ করেছে কিংবা যেখানেই তার দেহ পড়েছিল হাশরের ময়দানের দিকে আহবানকারীর একটি আওয়াজ শুনেই সে সেখান থেকে উঠে দাঁড়াবে।

৯. অর্থাৎ অখেরাত সংঘটিত হবে যেখানে মানুষকে তার কাজ কর্মের হিসেব দিতে হবে এ কথাটাই তারা অবিশ্বাস করেছে, যে নবী তাঁর জাতিকে এ সত্য সম্পর্কে অবহিত করে আসছিলো সে নবীকেও অস্বীকার করেছে, আখেরাতের জিজ্ঞাসাবাদে সফলকাম হওয়ার জন্য মানুষকে কিরূপ আকীদা বিশ্বাস পোষণ করতে হবে, কি ধরনের কাজ করতে হবে এবং কোন্ জিনিস পরিহার করে চলতে হবে এসব সম্পর্কে নবী যা শিক্ষা দিতেন তাও তারা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে।

১০ অর্থাৎ এ লোকেরা নবীকে অস্বীকার ও অমান্যই শুধু করেনি, তাঁকে পাগল বলে আখ্যায়িত করেছে, তাঁকে হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন করেছে, তাঁর প্রতি অভিশাপ ও তিরস্কার বর্ষণ করেছে, হুমকি-ধমকি ও ভয়ভীতি দেখিয়ে সত্য প্রচার থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছে এবং তাঁর জীবন ধারণ অসম্ভব করে তুলেছে।

১১. অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশে ভূ-পৃষ্ঠ ফেটে এমনভাবে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকলো, যেন তা ভূ-পৃষ্ঠ নয়, অসংখ্য ঝর্ণাধারা।

১২. অর্থাৎ প্লাবন আসার পূর্বেই আল্লাহর নির্দেশে হযরত নূহ (আ) যে জাহাজ নির্মাণ করেছিলেন।

১৩. মূল ইবারত হচ্ছে جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ অর্থাৎ এসব করা হয়েছে সে ব্যক্তির কারণে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে যাকে অবমাননা ও অসম্মান করা হয়েছিল। كفر শব্দটিকে যদি অস্বীকৃতি অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে অর্থ হবে "যার কথা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছিল। আর যদি নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা বা অস্বীকৃতি অর্থে গ্রহণ

করা হয় তাহলে তার অর্থ হয়" যার সত্তা ছিল একটি নিয়ামত স্বরূপ তার প্রতি অকৃজ্ঞতা ও অস্বীকৃতির আচরণ করা হয়েছিল।

১৪. এ অর্থও হতে পারে যে, আমরা এ আযাবকে শিক্ষণীয় নির্দশন বানিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমাদের মতে সর্বাধিক অগ্রাধিকার যোগ্য অর্থ হচ্ছে, সে জাহাজকে শিক্ষনীয় নিদর্শন বানিয়ে দেয়া হয়েছে। একটি সুউচ্চ পর্বতের ওপরে তার অস্তিত্ব টিকে থাকা হাজার হাজার বছর ধরে মানুষকে আল্লাহর গযব সম্পর্কে সাবধান করে আসছে। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, এ ভূ-খণ্ডে আল্লাহর নাফরমানদের জন্য কি দুর্ভাগ্য নেমে এসেছিল এবং ঈমান গ্রহণকারীদের কিভাবে রক্ষা করা হয়েছিল। ইমাম বুখারী, ইবনে আবী হাতেম, আবদুর রাযযাক ও ইবনে জারীর কাতাদা থেকে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, মুসলমানদের ইরাক ও আল-জাযিরা বিজয়ের যুগে এ জাহাজ জুদী পাহাড়ের ওপর (অন্য একটি রেওয়ায়াত অনুসারে "বা-কিরদা" নামক জনপদের সন্নিকটে) বর্তমান ছিল এবং প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ তা দেখেছিলেন। বর্তমান যুগেও বিমান ভ্রমণের সময় কেউ কেউ এ এলাকার একটি পর্বত শীর্ষে জাহাজের মত বস্তু পড়ে থাকতে দেখেছেন। সেটিকে নূহের জাহাজ বলে সন্দেহ করা হয়। আর এ কারণেই তা অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে মাঝে মধ্যে অভিযাত্রী দল অভিযান পরিচালনা করে আসছে। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা-৪৭, হূদ, টীকা-৪৬; আল আনকাবূত, টীকা-২৫)

১৫. কেউ কেউ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ কথাটির ভুল অর্থ গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ কুরআন একখানা সহজ গ্রন্থ। এ গ্রন্থ বুঝার জন্য কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। এমনকি আরবী ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ছাড়াই যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে এর তাফসীর করতে পারে এবং হাদীস ও ফিকাহর সাহায্য ছাড়াই কুরআনের আয়াত থেকে যে কোন আইন ও বিধান উদ্ভাবন করতে পারে। অথচ পূর্বাপর যে প্রসংগে একথাটি বলা হয়েছে সে দিকে লক্ষ রেখে বিবেচনা করলে বুঝা যায়, একথাটির উদ্দেশ্য মানুষকে এ বিষয়টি উপলব্ধি করানো যে, উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের একটি উৎস হচ্ছে বিদ্রোহী জাতিসমূহের ওপর নাযিল হওয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং আরেকটি উৎস হলো এ কুরআন যা যুক্তি প্রমাণ ও ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে তোমাদেরকে সরল সহজ পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। প্রথমোক্ত উৎসের তুলনায় নসীহতের এ উৎস অধিক সহজ। এতদত্ত্বেও কেন তোমরা এ থেকে কল্যাণ লাভ করছো না এবং আযাব দেখার জন্যই গোঁ ধরে আছ? এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর মেহেরবানী যে, তিনি তাঁর নবীর মাধ্যমে এ কিতাব পাঠিয়ে তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছেন যে তোমরা যে পথে চলছো তা চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। তাছাড়া তোমাদের কল্যাণ কোন্ পথে তাও বলে দেয়া হয়েছে। নসীহতের এ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে এজন্য যাতে ধ্বংসের গহবরে পতিত হওয়ার আগেই তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করা যায়। সহজভাবে বুঝানোর পরও যে ব্যক্তি মানে না এবং গর্তের মধ্যে পতিত হওয়ার পরই কেবল স্বীকার করে যে, এটি সত্যিই গর্ত তার চেয়ে নির্বোধ আর কে আছে?

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿١٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا
فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ ﴿٢٠﴾
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن
مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾

আদ জাতি অস্বীকার করেছিলো। দেখো, কেমন ছিল আমার আযাব এবং কেমন ছিল আমার সাবধানবাণী। আমি এক বিরামহীন অশুভ দিনে১৬ তাদের ওপর প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস পাঠালাম যা তাদেরকে উপরে উঠিয়ে এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলছিলো যেন তারা সমূলে উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড। দেখো, কেমন ছিল আমার আযাব এবং কেমন ছিল আমার সাবধানবাণী। আমরা এ কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের সহজ উৎস বানিয়ে দিয়েছি। অতপর উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছ কি?

১৬. অর্থাৎ এমন একটি দিন যার দুর্যোগ ও দুর্ভোগ একাধারে কয়েকদিন ধরে চলেছিল। সূরা حٰمٓ السجدہ এর ১৬ আয়াতে فِيْٓ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং সূরা الحاقة আল হাক্কার ৭ আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই ঝঞ্ঝা বাত্যা একাধারে সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত চলেছিল। সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ কথা হলো, এ আযাব যেদিন শুরু হয়েছিল সেদিন ছিল বুধবার। এ কারণে মানুষের মধ্যে এ ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে যে, বুধবার দিনটি হচ্ছে অশুভ। তাই এ দিনে কোন কাজ শুরু করা উচিত নয়। এ বিষয়ে কিছু যয়ীফ হাদীসও উদ্ধৃত করা হয়েছে যার কারণে এ দিনটির অশুভ হওয়ার বিশ্বাস সাধারণের মনমগজে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ইবনে মারদুইয়া ও খতীব বাগদাদীর বর্ণিত এ হাদীসটিও আছে যে, اخر اربعاء فى الشهر يوم نحس مستمر (মাসের শেষ বুধবার অশুভ, যার অশুভ প্রভাব একাধারে চলতে থাকে। ইবনে জাওযী একে 'মাওযূ' অর্থাৎ জাল ও মনগড়া হাদীস বলেছেন। ইবনে রজব বলেছেন, এ হাদীস সহীহ নয়। হাফেজ সাখাবী বলেন ঃ এ হাদীস যতগুলো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তা সবই একেবারে ভিত্তিহীন। অনুরূপভাবে তাবারানী বর্ণিত এই হাদীস يوم الاربعاء يوم نحس مستمر (বুধবার দিনটি অশুভ দিন যার অকল্যাণ ক্রমাগত চলতে থাকে)। আরো কিছু সংখ্যক হাদীসে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, বুধবার দিন যেন ভ্রমণ না করা হয়, লেনদেন না করা হয়। নখ না কাটানো হয় এবং রোগীর সেবা না করা হয়। কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগ এ দিনেই শুরু হয়। কিন্তু এসব হাদীসের সব কটিই যয়ীফ। এর ওপরে কোন আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করা যায় না। বিশেষজ্ঞ মুনাভী বলেন ঃ

توقى الاربعاء على جهة الطيرة وظن اعتقاد المنجمين حرام شديد التحريم ، اذ الايام كلها لله تعالى ، لا تنفع ولا تضر بذاتها -

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ ۙ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ
وَسُعُرٍ ﴿٢٤﴾ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ﴿٢٥﴾
سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ﴿٢٦﴾ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ
فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾

২য় রুকূ'

সামূদ সাবধান বাণীসমূহ অস্বীকার করলো এবং বলতে লাগলো "এখন কি আমরা আমাদেরই মধ্যকার এক ব্যক্তিকে এককভাবে মেনে চলবো?[১৭] আমরা যদি তার আনুগত্য গ্রহণ করি তাহলে তার অর্থ হবে আমরা বিপথগামী হয়েছি এবং আমাদের বিবেক-বুদ্ধির মাথা খেয়েছি। আমাদের মধ্যে কি একা এই ব্যক্তিই ছিল যার ওপর আল্লাহর যিকর নাযিল করা হয়েছে? না, বরং এ চরম মিথ্যাবাদী ও দাম্ভিক।[১৮] (আমি আমার নবীকে বললাম) কে চরম মিথ্যাবাদী ও দাম্ভিক তা এরা কালকেই জানতে পারবে। আমি উটনীকে তাদের জন্য ফিতনা বানিয়ে পাঠাচ্ছি। এখন একটু ধৈর্য ধরে দেখ, এদের পরিণতি কি হয়।

"অশুভ লক্ষণসূচক মনে করে বুধবারের দিনকে পরিত্যাগ করা এবং এ ক্ষেত্রে জ্যোতিষদের ন্যায় বিশ্বাস পোষণ করা কঠোরভাবে হারাম। কেননা, সব দিনই আল্লাহর। কোন দিনই দিন হিসেবে কল্যাণ বা অকল্যাণ কিছুই সাধন করতে পারে না।"

আল্লামা আলুসী বলেন ঃ "সবদিন সমান। বুধবারের বিশেষ কোন বৈশিষ্ট নেই। রাত ও দিনের মধ্যে এমন কোন মুহূর্ত নেই যা কারো জন্য কল্যাণকর এবং কারো জন্য অকল্যাণকর নয়। আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি মুহূর্তেই কারো জন্য অনুকূল এবং কারো জন্য প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করে থাকেন।"

১৭. অন্য কথায় তিনটি কারণে তারা হযরত সালেহ (আ) এর অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। প্রথম কারণ, তিনি মানুষ, মানব সত্তার উর্ধে নন যে, আমরা তার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেব। দ্বিতীয় কারণ, তিনি আমাদের কওমেরই একজন মানুষ। আমাদের ওপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কোন কারণ নেই, তৃতীয় কারণ, তিনি একা, এক ব্যক্তি। আমাদের সাধারণ মানুষদেরই একজন। তিনি কোন নেতা নন। তাঁর সাথে কোন বড় দল বা সৈন্য সামন্ত নেই, সেবক সেবিকাও নেই। তাই আমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে পারি না। তাদের মতে নবী হবে মানব সত্তার উর্ধে। আর তিনি যদি মানুষ হন তাহলে আমাদের নিজের দেশ ও জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করবেন না, উপর থেকে নেমে আসবেন অথবা বাইরে

وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ
فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً
وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ
مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾

তাদের জানিয়ে দাও, এখন তাদের ও উটনীর মধ্যে পানি ভাগ হবে এবং প্রত্যেকেই তার পালার দিনে পানির জন্য আসবে।"[১৯] শেষ পর্যন্ত তারা নিজেদের লোকটিকে ডাকলো, সে এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করলো এবং উটনীকে হত্যা করলো[২০] দেখ, কেমন ছিল আমার আযাব আর কেমন ছিল আমার সাবধান বাণীসমূহ। আমি তাদের ওপর একটি মাত্র বিকট শব্দ পাঠালাম এবং তারা খোঁয়াড়ের মালিকের শুষ্ক ও পদদলিত শস্যের মত হয়ে গেল।[২১] আমি এ কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের সহজ উৎস বানিয়ে দিয়েছি। এখন উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

থেকে পাঠানো হবে। তাও যদি না হয় তাহলে অন্তত তিনি হবেন নেতা। তাঁর অস্বাভাবিক শান শওকত ও জাঁকজমক থাকবে। এ কারণে মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মনোনীত করেছেন বলে মেনে নেয়া হবে। মক্কার কাফেররাও এই মূর্খতার মধ্যেই নিমজ্জিত ছিল। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষ। সাধারণ লোকদের মতই তিনি বাজারে চলাফেরা করেন। কাল আমাদের মাঝেই তিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং আজ দাবী করছেন যে, আল্লাহ আমাকে নবী বানিয়েছেন। মক্কার কাফেররা এ যুক্তির ভিত্তিতেই তাঁর রিসালাত মানতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছিলো।

১৮. মূল আয়াতে اشر শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ আত্মগর্বী ও দাম্ভিক ব্যক্তি যার মগজে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে এবং এ কারণে সে গর্ব প্রকাশ করে থাকে।

১৯. "আমি উটনীকে তাদের জন্য ফিতনা বানিয়ে পাঠাচ্ছি" এটা এ কথার ব্যাখ্যা। ফিতনাটা ছিল এই যে, হঠাৎ একটি উটনী এনে তাদের সামনে পেশ করে তাদেরকে বলে দেয়া হলো যে, একদিন এটি একা পানি পান করবে। অন্যদিন তোমরা সবাই নিজের ও তোমাদের জীব জন্তুর জন্য পানি নিতে পারবে। যেদিন উটনীর পানি পানের পালা সেদিন তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি নিজেও কোন ঝর্ণা বা কূপের ধারে পানি নিতে আসবে না এবং তাদের জীবজন্তুকেও পানি পান করানোর জন্য আনবে না। এ চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল সে ব্যক্তির পক্ষ থেকে যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেরাই বলতো যে, তার না আছে কোন সৈন্য সামন্ত, না আছে কোন বড় দল।

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ ۖ
نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿٣٥﴾
وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ
فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ
مُسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿٤٠﴾

লূতের কওম সাবধানবাণীসমূহ অস্বীকার করলো। আমি তাদের ওপর পাথর বর্ষণকারী বাতাস পাঠালাম। শুধু লূতের পরিবারের লোকেরা তা থেকে রক্ষা পেল। আমি নিজের অনুগ্রহে তাদেরকে রাতের শেষ প্রহরে বাঁচিয়ে বের করে দিলাম। যারা কৃতজ্ঞ আমি তাদের সবাইকে এভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি। লূত তার কওমের লোকদেরকে আমার শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করেছিল। কিন্তু তারা সবগুলো সাবধানবাণী সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করলো এবং কথাচ্ছলেই উড়িয়ে দিল। অতপর তারা তাকে তার মেহমানদের হিফাজত করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করলো। শেষ পর্যন্ত আমি তাদের চোখ অন্ধ করে দিলাম। এখন তোমরা আমার আযাব ও সাবধানবাণীর স্বাদ আস্বাদন করো।[২২] খুব ভোরেই একটি অপ্রতিরোধ্য আযাব তাদের ওপর আপতিত হলো। এখন আমার আযাব ও সাবধান বাণীসমূহের স্বাদ আস্বাদন করো। আমি এ কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের সহজ উৎস বানিয়ে দিয়েছি। উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

২০. এ শব্দগুলো থেকে আপনা আপনি একটি পরিস্থিতির আভাস পাওয়া যায়। তাহলো ঐ উটনীটা অনেক দিন পর্যন্ত তাদের জনপদে দৌরাত্ম্য চালিয়েছে। তার পানি পানের নির্দিষ্ট দিনে পানির ধারে কাছে যাওয়ার সাহস কারো হতো না। অবশেষে তারা তাদের কওমের একজন দুঃসাহসী নেতাকে ডেকে বললো ঃ তুমি তো অত্যন্ত সাহসী বীরপুরুষ। কথায় কথায় হাতা গুটিয়ে মারতে ও মরতে প্রস্তুত হয়ে যাও। একটু সাহস করে এ উটনীর ব্যাপারটা চুকিয়ে দাও তো। তাদের উৎসাহ দানের কারণে সে একাজ সমাধা করার দায়িত্ব গ্রহণ করলো এবং উটনীকে মেরে ফেললো। এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, উটনীর কারণে তারা অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত ছিল। তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, এর পেছনে অস্বাভাবিক কোন শক্তি কাজ করছে। তাই তাকে আঘাত করতে তার ভয়

وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ
مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾ اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾
اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ﴿٤٤﴾ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾

৩ রুকূ'

ফেরাউনের অনুসারীদের কাছেও সাবধান বাণীসমূহ এসেছিল। কিন্তু তারা আমার সবগুলো নিদর্শনকে অস্বীকার করলো। অবশেষে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। যেভাবে কোন মহা-পরাক্রমশালী পাকড়াও করে।

তোমাদের কাফেররা কি ঐসব লোকদের চেয়ে কোন অংশে ভাল ? নাকি আসমানী কিতাবসমূহে তোমাদের জন্য কোন ক্ষমা লিখিত আছে ? না কি এসব লোক বলে, আমরা একটা সংঘবদ্ধ শক্তি। নিজেরাই নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থা করবো। অচিরেই এ সংঘবদ্ধ শক্তি পরাজিত হবে। এবং এদের সবাইকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালাতে দেখা যাবে।২৪

পাচ্ছিল। এ কারণে একটি উটনীকে হত্যা করা, তাদের কাছে একটি অভিযান পরিচালনার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। অথচ উটনীটা পেশ করেছিলেন একজন নবী যার কোন সেনাবাহিনী ছিল না, যার ভয়ে তারা ভীত ছিল। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল-আ'রাফ, টীকা-৫৮, আশ্ শূ'আরা, টীকা-১০৪, ১০৫)।

২১. যারা গবাদি পশু পালে তারা পশুর খোঁয়াড়ের সংরক্ষণ ও হিফাজতের জন্য কাঠ ও গাছের ডালপালা দিয়ে বেড়া তৈরী করে দেয়। এ বেড়ার কাঠ ও গাছ-গাছালীর ডালপালা আস্তে আস্তে শুকিয়ে ঝরে পড়ে এবং পশুদের আসা যাওয়ায় পদদলিত হয়ে করাতের গুঁড়ার মত হয়ে যায়। সামূদ জাতির দলিত মথিত লাশসমূহকে করাতের ঐ গুঁড়োর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

২২. এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা হূদ (আয়াত ৭৭ থেকে ৮৩) ও সূরা হিজরে (আয়াত ৬১ থেকে ৭৪) পূর্বেই দেয়া হয়েছে। ঘটনার সারসংক্ষেপ হলো, আল্লাহ তা'আলা এ জাতির ওপর আযাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে কয়েকজন ফেরেশতাকে অত্যন্ত সুদর্শন বালকের আকৃতিতে হযরত লূতের বাড়ীতে মেহমান হিসেবে পাঠিয়ে দিলেন। কওমের লোকজন তাঁর কাছে এত সুশ্রী মেহমান আসতে দেখে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে চড়াও হলো এবং তাঁর কাছে দাবী করলো যে, তিনি যেন তাঁর মেহমানদের সাথে কুকর্ম করার জন্য তাদের হাতে তুলে দেন। হযরত লূত এ জঘন্য আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য তাদের কাছে অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি ও অনুরোধ-উপরোধ করলেন। কিন্তু তারা তা মানলো না এবং ঘরে প্রবেশ করে জোরপূর্বক মেহমানদের বের করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো। এ পর্যায়ে হঠাৎ তারা অন্ধ হয়ে গেল। এ

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴿٤٦﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي
ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ
سَقَرَ ﴿٤٨﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ
بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ
فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ
وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

এদের সাথে বুঝাপড়া করার জন্য প্রকৃত প্রতিশ্রুত সময় হচ্ছে কিয়ামত। কিয়ামত অত্যন্ত কঠিন ও অতীব তিক্ত সময়। প্রকৃতপক্ষে এ পাপীরা ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত আছে। এদের বিবেক বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। যেদিন এদেরকে উবুড় করে আগুনের মধ্যে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে, সেদিন এদের বলা হবে, এখন জাহান্নামের স্পর্শের স্বাদ আস্বাদন করো।

আমি প্রত্যেকটি জিনিসকে একটি পরিমাপ অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি।[২৫] আমার নির্দেশ একটি মাত্র নির্দেশ হয়ে থাকে এবং তা চোখের পলকে কার্যকর হয়।[২৬] তোমার মত অনেককেই আমি ধ্বংস করেছি[২৭] আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী ? তারা যা করেছে সবই রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ আছে এবং প্রতিটি ছোট ও বড় বিষয়ই লিখিতভাবে বিদ্যমান আছে।[২৮]

আল্লাহর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষাকারীরা নিশ্চিতরূপে বাগান ও ঝর্ণাসমূহের মধ্যে অবস্থান করবে, সত্যিকার মর্যাদার স্থানে মহা শক্তিধর সম্রাটের সান্নিধ্যে।

সময় ফেরেশতারা হযরত লূতকে বললেন, তিনি ও তাঁর পরিবারের লোকজন ভোর হওয়ার পূর্বেই যেন এ জনপদের বাইরে চলে যান। তারা জনপদের বাইরে চলে যাওয়া মাত্র ঐ জাতির ওপর এক ভয়ানক আযাব নেমে আসে। বাইবেলেও ঘটনাটি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। বাইবেলের ভাষা হচ্ছে ঃ তখন তাহারা লোটের উপরে ভারী চড়াও হইয়া কবাট ভাংগিতে গেল। তখন সেই দুই ব্যক্তি হস্ত বাড়াইয়া লোটকে গৃহের মধ্যে আপনাদের নিকটে টানিয়া লইয়া কবাট বন্ধ করিলেন ; এবং গৃহদ্বারের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র ও মহান সকল লোককে অন্ধতায় আহত করিলেন। তাহাতে তাহারা দ্বার খুঁজিতে খুঁজিতে পরিশ্রান্ত হইল।-(আদি পুস্তক, ১৯ ঃ ৯-১১)

২৩. কুরাইশদের সম্বোধন করা হয়েছে। এর অর্থ, তোমাদের মধ্যে এমন কি গুণ আছে এবং এমন কি মূল্যবান বৈশিষ্ট আছে যে, যে ধরনের কুফরী, সত্য প্রত্যাখ্যান ও হঠকারিতার আচরণের জন্য অন্যান্য জাতিসমূহকে শাস্তি দেয়া হয়েছে তোমরা সে একই নীতি ও আচরণ গ্রহণ করলেও তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না?

২৪. এটা একটা সুস্পষ্ট ভবিষ্যতবাণী। হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে এ ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল, কুরাইশদের সংঘবদ্ধ শক্তি যে শক্তি নিয়ে তাদের গর্ব ছিল অচিরেই মুসলমানদের কাছে পরাজিত হবে। সে সময় কেউ কল্পনাও করতে পারতো না যে, অদূর ভবিষ্যতে কিভাবে এ বিপ্লব সাধিত হবে। সে সময় মুসলমানরা এমন অসহায় অবস্থার মধ্যে নিপতিত ছিল যে, তাদের একটি দল দেশ ছেড়ে হাবশায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং অবশিষ্ট মুসলমানগণ আবু তালেব গিরি গুহায় অবরুদ্ধ ছিল। কুরাইশদের বয়কট ও অবরোধ ক্ষুধায় তাদেরকে মৃতপ্রায় করে দিয়েছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে কে কল্পনা করতে পারতো যে, মাত্র সাত বছরের মধ্যেই অবস্থা পাল্টে যাবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ছাত্র ইকরিমা বর্ণনা করেন যে, হযরত 'উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, যে সময় সূরা ক্বামারের এ আয়াত নাযিল হয় তখন আমি অস্থির হয়ে পড়েছিলাম যে, এটা কোন্ সংঘবদ্ধ শক্তি যা পরাজিত হবে? কিন্তু বদর যুদ্ধে যখন কাফেররা পরাজিত হয়ে পালাচ্ছিল সে সময় আমি দেখতে পেলাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ম পরিহিত অবস্থায় সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন এবং তাঁর পবিত্র জবান থেকে উচ্চারিত হচ্ছে سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ তখন আমি বুঝতে পারলাম এ পরাজয়ের খবরই দেয়া হয়েছিল (ইবনে জারীর ইবনে আবী হাতেম)।

২৫. অর্থাৎ দুনিয়ার কোন জিনিসই উদ্দেশ্য ও লক্ষহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমিতি ও অনুপাত আছে। সে অনুসারে প্রত্যেক বস্তু একটা নির্দিষ্ট সময় অস্তিত্ব লাভ করে, একটি বিশেষ রূপ ও আকৃতি গ্রহণ করে। একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশ লাভ করে, একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত টিকে থাকে এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। এ বিশ্বজনীন নিয়ম-নীতি অনুসারে এ দুনিয়াটারও একটা 'তাকদীর' বা পরিমিতি ও অনুপাত আছে। সে অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তা চলছে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়েই তার পরিসমাপ্তি ঘটতে হবে। এর পরিসমাপ্তির জন্য যে সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে তার এক মুহূর্ত পূর্বে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে না কিংবা এক মুহূর্ত পরে তা অবশিষ্টও থাকবে না। এ পৃথিবী অনাদি ও চিরস্থায়ী নয় যে, চিরদিনই তা আছে এবং চিরদিন থাকবে। কিংবা কোন শিশুর খেলনাও নয় যে, যখনই তোমরা চাইবে তখনই তিনি এটাকে ধ্বংস করে দেখিয়ে দেবেন।

২৬. অর্থাৎ কিয়ামত সংগঠনের জন্য আমাকে কোন বড় প্রস্তুতি নিতে হবে না কিংবা তা সংঘটিত করতে কোন দীর্ঘ সময়ও ব্যয়িত হবে না। আমার পক্ষ থেকে একটি নির্দেশ জারী হওয়ার সময়টুকু মাত্র লাগবে। নির্দেশ জারী হওয়া মাত্রই চোখের পলকে তা সংঘটিত হয়ে যাবে।

২৭. অর্থাৎ তোমরা যদি মনে করে থাক যে, এ বিশ্ব কোন মহাজ্ঞানী ও ন্যায়বান আল্লাহর কর্তৃত্বের অধীন নয়, বরং এটা মগের মুল্লুক যেখানে মানুষ যা ইচ্ছা তাই করতে পারে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার কেউ নেই—তাহলে তোমাদের চোখ খুলে দেয়ার জন্য

মানবেতিহাসেই বিদ্যমান। এখানে এ নীতি অনুসারী জাতিসমূহকে একের পর এক ধ্বংস করা হয়েছে।

২৮. অর্থাৎ এ লোকেরা যেন একথা ভেবে বিভ্রান্ত না হয় যে, তাদের সম্পাদিত কাজ-কর্ম বুঝি কোথাও উধাও হয়ে গিয়েছে। না, প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক গোষ্ঠী এবং প্রত্যেক জাতির গোটা রেকর্ডই সংরক্ষিত আছে। যথা সময়ে তা সামনে এসে হাজির হবে।

আর রাহমান

৫৫

নামকরণ

প্রথম শব্দটিকেই এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবে বুঝানো হয়েছে যে, এটি সেই সূরা যা "আর-রাহমান" শব্দ দিয়ে শুরু হয়েছে। তাছাড়া সূরার বিষয়বস্তুর সাথেও এ নামের গভীর মিল রয়েছে। কারণ এ সূরার মধ্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার রহমতের পরিচায়ক গুণাবলী ও তার বাস্তব ফলাফলের উল্লেখ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

তাফসীর বিশারদগণ সাধারণতঃ এ সূরাটিকে মক্কী সূরা বলে আখ্যায়িত করেন। যদিও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইকরিমা ও কাতাদা থেকে কোন কোন হাদীসে একথা উদ্ধৃত হয়েছে যে, এ সূরা মদীনায় অবতীর্ণ তা সত্ত্বেও প্রথমত ঐ সব সম্মানিত সাহাবা থেকে আরো কিছু সংখ্যক হাদীসে বিপরীত বক্তব্যও উদ্ধৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এ সূরার বিষয়বস্তু মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের তুলনায় মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের সাথে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ।এমন কি বিষয়বস্তুর বিচারে এটি মক্কী যুগেরও একেবারে প্রথম দিকের বলে মনে হয়। তাছাড়া বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, এটি হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে মক্কাতে নাযিল হয়েছিল। মুসনাদে আহমদে হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন ঃ কা'বা ঘরের যে কোণে হাজরে আসওয়াদ স্থাপিত আমি হারাম শরীফের মধ্যে সে কোণের দিকে মুখ করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামায পড়তে দেখেছি। তখনও পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ (তোমাকে যে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে প্রকাশ্যে তা বলে দাও) নাযিল হয়নি। সে নামাযে মুশরিকরা তাঁর মুখ থেকে فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ কথাটি শুনেছিল। এ থেকে জানা যায় যে, এ সূরাটি সূরা আল হিজ্‌রের পূর্বেই নাযিল হয়েছিল।

আল বাযযার, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, দারুকুতনী (ফিল আফরাদ), ইবনে মারদুইয়া এবং আল খাতীব (ফিত তারীখ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন যে, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সূরা আর রাহমান তিলাওয়াত করলেন অথবা এ সূরাটি তাঁর সামনে পাঠ করা হলো। পরে তিনি লোকদের বললেন ঃ জিনরা তাদের রবকে যে জওয়াব দিয়েছিল তোমাদের নিকট থেকে সে রকম সুন্দর জওয়াব শুনছি না কেন? লোকেরা বললো, সে জওয়াব কি

ছিল! নবী (সা) বললেন ঃ যখনই আমি আল্লাহর বাণী فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ পড়ছিলাম, জিনরা তার জবাবে বলছিল لَا بِشَيْءٍ مِّنْ نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ আমরা আমাদের রবের কোন নিয়ামতকেই অস্বীকার করি না।"

তিরমিযী, হাকেম ও হাফেজ আবু বকর বাযযার হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনার ভাষা হচ্ছে ঃ সূরা রাহমানের তিলাওয়াত শুনে লোকজন যখন চুপ করে থাকলো তখন নবী (সা) বললেন ঃ

لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا احسن مردودا منكم ، كنت كلما اتيت على قوله فباى الاء ربكما تكذبان قالوا لابشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد -

" যে রাতে কুরআন শোনার জন্য জিনরা একত্রিত হয়েছিল, সে রাতে আমি জিনদের এ সূরা শুনিয়েছিলাম। তারা তোমাদের চেয়ে এর উত্তম জওয়াব দিচ্ছিল। যখনই আমি আল্লাহ তা'আলার এ বাণী শুনাচ্ছিলাম হে জিন ও মানুষ তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে" তখনই তারা জওয়াবে বলছিল ঃ হে আমাদের রব, আমরা তোমার কোন নিয়ামতকেই অস্বীকার করি না। সব প্রশংসা কেবল তোমারই।"

এ হাদীস থেকে জানা যায়, সূরা আহকাফে (২৯ থেকে ৩২ আয়াত) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে জিনদের কুরআন শোনার যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে সেই সময় নবী (সা) নামাযে সূরা আর রাহমান পাঠ করছিলেন। এটা নবুওয়াতের ১০ম বছরের ঘটনা। সে সময় নবী (সা) তায়েফ সফর থেকে ফেরার পথে "নাখলা" নামক স্থানে কিছু সময় অবস্থান করেছিলেন। যদিও অপর কিছু সংখ্যক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানা ছিল না যে, জিনেরা তাঁর নিকট থেকে কুরআন শরীফ শুনছে। বরং পরে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ কথা অবহিত করেছিলেন যে, জিনেরা তাঁর কুরআন তিলাওয়াত শুনছিলো কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নবীকে (সা) যেভাবে জিনদের কুরআন তিলাওয়াত শোনা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন অনুরূপভাবে তাঁকে একথাও জানিয়েছিলেন যে, কুরআন তিলাওয়াত শোনার সময় তারা তার কি জওয়াব দিচ্ছিল। এরূপ হওয়াটা অযৌক্তিক ব্যাপার নয়।

এসব বর্ণনা থেকে শুধু এতটুকুই জানা যায় যে, সূরা আর রাহমান সূরা আল হিজ্‌র ও সূরা আহকাফের পূর্বে নাযিল হয়েছিল। এসব ছাড়া আমরা আরো একটি হাদীস দেখতে পাই যা থেকে জানা যায়, সূরা আর রাহমান মক্কী যুগের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরা সমূহের একটি। ইবনে ইসহাক হযরত 'উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে এই মর্মে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবা কিরাম একদিন পরস্পর আলোচনা করলেন কুরাইশরা তো প্রকাশ্যে কখনো কাউকে উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনেনি। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে একবার অন্তত তাদেরকে এ পবিত্র বাণী শোনাতে পারে? হযরত

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন ঃ আমি এ কাজ করবো। সাহাবা কিরাম বললেন ঃ তারা তোমার ওপর জুলুম করবে বলে আমাদের আশংকা হয়। আমাদের মতে, একাজ এমন কোন ব্যক্তির করা উচিত যার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী শক্তিশালী। কুরাইশরা যদি তার অনিষ্ট করার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ায় তাহলে তার গোষ্ঠীর লোকেরা যেন তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। হযরত আবদুল্লাহ বললেন, আমাকেই একাজ করতে দাও আল্লাহ আমার হিফাজতকারী পরে বেশ কিছু বেলা হলে তিনি হারাম শরীফে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কুরাইশ নেতারা সেই সময় নিজ নিজ মজলিসে বসেছিল। হযরত আবদুল্লাহ মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে উচ্চস্বরে সূরা আর রাহমান তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন। আবদুল্লাহ কি বলছে কুরাইশরা প্রথমে তা বুঝার চেষ্টা করলো। পরে যখন তারা বুঝতে পারলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বাণী হিসেবে যেসব কথা পেশ করেন এটা সে কথা তখন তারা তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তার মুখের ওপর চপেটাঘাত করতে লাগলো। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ কোন পরোয়াই করলেন না। যতক্ষণ তাঁর সাধ্যে কুলালো ততক্ষণ তিনি তাদের কুরআন শুনিয়ে যেতে থাকলেন। পরিশেষে তিনি তাঁর ফুলে উঠা মুখ নিয়ে ফিরে আসলে সংগী-সাথীরা বললো ঃ আমরা এ আশংকাই করেছিলাম। জবাবে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর এ দুশমনরা আমার কাছে আজকের চেয়ে অধিক গুরুত্বহীন আর কখনো ছিল না। তোমরা চাইলে আমি আগামীকাল আবার তাদেরকে কুরআন শোনাবো। সবাই বললো এ-ই যথেষ্ট হয়েছে। যা তারা আদৌ শুনতে চাইতো না তা তো তুমি শুনিয়ে দিয়েছো (সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৬)।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এটাই কুরআন মজীদের একমাত্র সূরা যার মধ্যে মানুষের সাথে পৃথিবীর অপর একটি স্বাধীন সৃষ্টি জিনদেরকেও সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে এবং উভয়কেই আল্লাহর কুদরতের পরিপূর্ণতা, তাঁর সীমা-সংখ্যাহীন দয়া ও অনুগ্রহ, তাঁর সামনে তাদের অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব এবং তাঁর কাছে তাদের জবাবদিহির উপলব্ধি জাগ্রত করে তাঁর অবাধ্যতার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে দেয়া হয়েছে আর আনুগত্যের উত্তম ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। যদিও পবিত্র কুরআনের কয়েকটি স্থানে এ বিষয়ে পরিষ্কার বক্তব্য রয়েছে যা থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, জিনরাও মানুষের মত স্বাধীন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পন্ন দায়িত্বশীল সৃষ্টি, যাদেরকে কুফরী ও ঈমান গ্রহণের এবং আনুগত্য করার ও অবাধ্য হওয়ার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যেও মানুষের মতই কাফের ও ঈমানদার এবং অনুগত ও অবাধ্য আছে। তাদের মধ্যেও এমন গোষ্ঠী আছে যারা নবী-রসূল আলাইহিমুস সালাম ও আসমানী কিতাবসমূহের ওপর ঈমান এনেছে। তবে এ সূরা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআন মজীদের দাওয়াত জিন ও মানুষ উভয়ের জন্য এবং নবীর (সা) রিসালাত শুধু মানবজাতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়।

সূরার শুরুতে মানুষকে লক্ষ করেই সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ তারাই পৃথিবীর খিলাফত লাভ করেছে, তাদের মধ্যেই আল্লাহর রসূল এসেছেন এবং তাদের ভাষাতেই

আল্লাহর কিতাব নাযিল করা হয়েছে। কিন্তু পরে ১৩ আয়াত থেকে মানুষ ও জিন উভয়কেই সমানভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং উভয়ের সামনে একই দাওয়াত পেশ করা হয়েছে।

সূরার বিষয়বস্তু ছোট ছোট বাক্যে একটি বিশেষ ক্রমানুসারে বর্ণিত হয়েছে ঃ

১ থেকে ৪ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে, এ কুরআনের শিক্ষা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে। এ শিক্ষার সাহায্যে তিনি মানব জাতির হিদায়াতের ব্যবস্থা করবেন এই তাঁর রহমতের স্বাভাবিক দাবী। কারণ বুদ্ধি বিবেচনা ও বোধশক্তি সম্পন্ন জীব হিসেবে তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

৫ ও ৬ আয়াতে বলা হয়েছে যে, গোটা বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তা'আলার একক নির্দেশ ও কর্তৃত্বাধীনে চলছে। আসমান ও যমীনের সব কিছুই তার কর্তৃত্বাধীন। এখানে দ্বিতীয় আর কারো কর্তৃত্ব চলছে না।

৭ থেকে ৯ আয়াতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব-জাহানের গোটা ব্যবস্থাকে পূর্ণ ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যসহ ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি দাবী করে যে, এখানে অবস্থানকারীরাও তাদের ক্ষমতা ও স্বাধীনতার সীমার মধ্যে সত্যিকার ভারসাম্য ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকুক এবং ভারসাম্য বিনষ্ট না করুক।

১০ থেকে ২৫ আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতার বিস্ময়কর দিক ও তার পূর্ণতা বর্ণনা করার সাথে সাথে জিন ও মানুষ তাঁর যেসব নিয়ামত ভোগ করছে সে দিকেও ইংগিত দেয়া হয়েছে।

২৬ থেকে ৩০ পর্যন্ত আয়াতে জিন ও মানব জাতিকে এ মহাসত্য স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এই বিশ্ব-জাহানে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী নয় এবং ছোট বড় কেউ-ই এমন নেই যে তার অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে আল্লাহর মুখাপেক্ষী নয়। যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত রাতদিন যা কিছু ঘটছে তা তাঁরই কর্তৃত্বে সংঘটিত হচ্ছে।

৩১ থেকে ৩৬ আয়াতে এ উভয় গোষ্ঠীকেই এই বলে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, সে সময় অচিরেই আসবে যখন তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এ জিজ্ঞাসাবাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে তোমরা কোথাও যেতে পারবে না। সবখানে আল্লাহর কর্তৃত্ব তোমাদের পরিবেষ্টন করে আছে। তার মধ্য থেকে বেরিয়ে সটকে পড়ার সাধ্য তোমাদের নেই। তাঁর কর্তৃত্বের গণ্ডি থেকে পালিয়ে যেতে পারবে বলে যদি তোমাদের মধ্যে অহমিকা সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে একবার পালিয়ে দেখ।

৩৭ ও ৩৮ আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ জিজ্ঞাসাবাদ হবে কিয়ামতের দিন।

যেসব মানুষ ও জিন দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করতো ৩৯ থেকে ৪৫ পর্যন্ত আয়াতে তাদের পরিণাম সম্পর্কে বলা হয়েছে।

যেসব সৎকর্মশীল মানুষ ও জিন পৃথিবীতে আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করেছে এবং একদিন আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে নিজের সব কাজের হিসেব দিতে হবে এ

উপলব্ধি নিয়ে কাজ করেছে আখেরাতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যেসব পুরস্কার দিবেন, ৪৬ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত সে সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

এ বক্তব্যের পুরোটাই বক্তৃতার ভাষায় পেশ করা হয়েছে। এটা একটা আবেগময় ও উচ্চমানের ভাষণ। এ ভাষণের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার অসীম শক্তির এক একটি বিস্ময়কর দিক, তাঁর দেয়া নিয়ামতসমূহের এক একটি নিয়ামত, তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা ও পরাক্রমের এক একটি দিক এবং তাঁর পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপক বিস্তৃত ক্ষেত্রসমূহের এক একটি জিনিস বর্ণনা করে জিন ও মানুষকে বার বার প্রশ্ন করা হয়েছে : فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ । ৭৭ যে একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ তা আমরা পরে আলোচনা করবো। এ ভাষণের মধ্যে এ শব্দটিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। জিন ও মানুষের উদ্দেশ্যে এ প্রশ্ন প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্থান কাল ও পাত্র ভেদে একটি বিশেষ অর্থ বহন করছে।

আয়াত ৭৮ **সূরা আর রাহমান–মাদানী** রুকূ' ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

اَلرَّحْمٰنُ ۝١ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝٢ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝٣ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝٤ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
بِحُسْبَانٍ ۝٥ وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ۝٦ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ
الْمِيْزَانَ ۝٧ اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ۝٨ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا
الْمِيْزَانَ ۝٩

পরম দয়ালু (আল্লাহ) এ কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন।[১] তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন[২] এবং তাকে কথা শিখিয়েছেন।[৩]

সূর্য ও চন্দ্র একটি হিসেবের অনুসরণ করছে[৪] এবং তারকারাজি[৫] ও গাছপালা সব সিজদাবনত।[৬] আসমানকে তিনিই সুউচ্চ করেছেন এবং দাড়িপাল্লা কায়েম করেছেন।[৭] এর দাবী হলো তোমরা দাড়িপাল্লায় বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না। ইনসাফের সাথে সঠিকভাবে ওজন করো এবং ওজনে কম দিও না।[৮]

১. অর্থাৎ এ কুরআনের শিক্ষা কোন মানুষের রচিত বা তৈরী নয়, বরং পরম দয়ালু আল্লাহ নিজে এর শিক্ষা দাতা। আল্লাহ তা'আলা কুরআনের এ শিক্ষা কাকে দিয়েছেন এখানে সে কথা বলার প্রয়োজন ছিল না। কেননা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকেই মানুষ তা শুনছিলো। তাই অবস্থার দাবী অনুসারে আপনা থেকেই একথার প্রতিপাদ্য এই প্রকাশ পাচ্ছিল যে, এ শিক্ষা দেয়া হয়েছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে।

এ বাক্য দিয়ে সূচনা করার প্রথম উদ্দেশ্যই হচ্ছে একথা বলে দেয়া যে, নবী (সা) নিজে এর রচয়িতা নন, এ শিক্ষা দানকারী স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। তাছাড়া আরো একটি উদ্দেশ্য আছে। 'রাহমান' শব্দটি সে দিকেই ইংগিত করছে। এটা নবীর (সা) রচিত কোন শিক্ষা নয়, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে শুধু এতটুকু কথা বলার প্রয়োজন হলে আল্লাহ তা'আলার 'যাত' বা মূল নাম ব্যবহার না করে গুণবাচক নাম ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিলনা। তাছাড়া একান্তই গুণবাচক নাম ব্যবহার করার প্রয়োজন হলে শুধু এ বিষয়টি প্রকাশের জন্য আল্লাহর পবিত্র নামসমূহের মধ্য থেকে যে কোন একটি নাম গ্রহণ করা

যেতে পারতো। কিন্তু যখন আল্লাহ, স্রষ্টা, বা রিযিকদাতা এ শিক্ষা দিয়েছেন বলার পরিবর্তে 'রাহমান' এ শিক্ষা দিয়েছেন বলা হয়েছে তখন আপনা থেকেই এ বিষয় প্রকাশ পায় যে, বান্দাদের হিদায়াতের জন্য কুরআন মজীদ নাযিল করা সরাসরি আল্লাহর রহমত। যেহেতু তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতি অতীব দয়াবান; তাই তিনি তোমাদেরকে অন্ধকারে হাতড়িয়ে মরার জন্য ছেড়ে দেয়া পছন্দ করেননি। তিনি তাঁর রহমতের দাবী অনুসারে এ কুরআন পাঠিয়ে তোমাদেরকে এমন জ্ঞান দান করেছেন যার ওপরে পার্থিব জীবনে তোমাদের সত্যানুসরণ এবং আখেরাতের জীবনের সফলতা নির্ভরশীল।

২. অন্য কথায় আল্লাহ তা'আলা যেহেতু মানুষের স্রষ্টা, তাই স্রষ্টার দায়িত্ব হচ্ছে নিজের সৃষ্টিকে পথ প্রদর্শন করা এবং যে পথের মাধ্যমে সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে সক্ষম হবে সে পথ দেখানো। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনের এ শিক্ষা নাযিল হওয়া শুধু তাঁর অনুগ্রহ পরায়ণতার দাবীই নয়, তাঁর স্রষ্টা হওয়ারও অনিবার্য এবং স্বাভাবিক দাবী। স্রষ্টা যদি সৃষ্টিকে পথ প্রদর্শন না করেন তাহলে আর কে তা করবে? তাছাড়া স্রষ্টা নিজেই যদি পথ প্রদর্শন না করেন তাহলে আর কে তা করতে পারে? স্রষ্টা যে বস্তু সৃষ্টি করলেন তিনি যদি তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করার পন্থা-পদ্ধতি না শেখান তাহলে তাঁর জন্য এর চেয়ে বড় ত্রুটি আর কি হতে পারে? সুতরাং প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়া কোন আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। বরং তাঁর পক্ষ থেকে যদি এ ব্যবস্থা না থাকতো তাহলে সেটাই হতো বিস্ময়কর ব্যাপার। গোটা সৃষ্টিলোকে যে জিনিসই তিনি সৃষ্টি করেছেন তা কেবল সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি। তাকে এমন উপযুক্ত আকার-আকৃতি দিয়েছেন যার সাহায্যে সে প্রাকৃতিক ব্যবস্থার অধীনে তার নিজের অংশের কাজ করার যোগ্য হতে পারে। সাথে সাথে সে কাজ সম্পাদন করার পন্থা পদ্ধতিও তাকে শিখিয়েছেন। মানুষের নিজের দেহের এক একটি লোম এবং এক একটি কোষকে (Cell) মানবদেহে যে কাজ আঞ্জাম দিতে হবে সে কাজ শিখেই তা জন্ম লাভ করেছে। তাই মানুষ নিজে কেমন করে তার স্রষ্টার শিক্ষা ও পথ নির্দেশ লাভ করা থেকে মুক্ত ও বঞ্চিত হতে পারে? এ বিষয়টি কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে বুঝানো হয়েছে। সূরা লায়লে (১২ আয়াত) বলা হয়েছে : اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى "পথ প্রদর্শন করা আমার দায়িত্ব।" সূরা নাহলে (৯ আয়াত) বলা হয়েছে : وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ সরল সোজা পথ দেখিয়ে দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব। বাঁকা পথের সংখ্যা তো অনেক। সূরা ত্বা-হায় (৪৭-৫০ আয়াত) উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফেরাউন মূসার মুখে রিসালাতের পয়গাম শুনে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো : তোমার সেই 'রব' কে যে আমার কাছে দূত পাঠায়? জবাবে হযরত মূসা বললেন :

رَبُّنَا الَّذِىْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى -

"তিনিই আমার রব যিনি প্রতিটি জিনিসকে একটি নির্দিষ্ট আকার-আকৃতি দান করে পথ প্রদর্শন করেছেন।"

অর্থাৎ তিনি তাকে সেই নিয়ম-পদ্ধতি শিখিয়েছেন যার সাহায্যে সে বস্তু জগতে তার করণীয় কাজ সম্পাদন করতে পারবে। মানুষকে শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ

থেকে নবী-রসূল ও আসমানী কিতাবসমূহ আসা যে সরাসরি প্রকৃতিরই দাবী, একজন নিরপেক্ষ মন-মগজের অধিকারী মানুষ এসব যুক্তি প্রমাণ দেখে সে বিষয়ে নিশ্চিত ও সন্তুষ্ট হতে পারে।

৩. মূল আয়াতে بيان শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর একটি অর্থ হচ্ছে মনের ভাব প্রকাশ করা। অর্থাৎ কোন কিছু বলা এবং নিজের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করা। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট স্পষ্ট করে তোলা। এখানে এর অর্থ হচ্ছে ভাল মন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণের মধ্যকার পার্থক্য। এ দু'টি অর্থ অনুসারে ক্ষুদ্র এ আয়াতাংশটি ওপরে বর্ণিত যুক্তি প্রমাণকে পূর্ণতা দান করে। বাকশক্তি এমন একটি বিশিষ্ট গুণ যা মানুষকে জীবজন্তু ও পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টিকূল থেকে পৃথক করে দেয়। এটা শুধু বাকশক্তিই নয়। এর পেছনে জ্ঞান ও বুদ্ধি, ধারণা ও অনুভূতি, বিবেক ও সংকল্প এবং অন্যান্য মানসিক শক্তি কার্যকর থাকে যেগুলো ছাড়া মানুষের বাকশক্তি কাজ করতে পারে না। এজন্য বাকশক্তি প্রকৃতপক্ষে মানুষের জ্ঞানী ও স্বাধীন সৃষ্টজীব হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ। আর আল্লাহ তা'আলা এ বিশেষ গুণটি যখন মানুষকে দান করেছেন তখন এটাও স্পষ্ট যে, জ্ঞান ও অনুভূতি এবং ইখতিয়ারবিহীন সৃষ্টিকূলের পথ প্রদর্শনের জন্য শিক্ষার যে প্রকৃতি ও পদ্ধতি উপযুক্ত হতে পারে মানুষের শিক্ষার প্রকৃতি ও পদ্ধতি তা হতে পারে না। একইভাবে মানুষের আরেকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ গুণ হলো আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে একটি নৈতিক অনুভূতি (Moral sense) সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার কারণে সে প্রকৃতিগতভাবেই ভাল ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়, জুলুম ও ইনসাফ এবং উচিত ও অনুচিতের মধ্যে পার্থক্য করে এবং চরম গোমরাহী ও অজ্ঞতার মধ্যেও তার ভিতরের এ আত্মজ্ঞান ও অনুভূতি লোপ পায় না। এ দু'টি বিশেষ বৈশিষ্টের অনিবার্য দাবী হচ্ছে মানুষের জ্ঞানালোক সমৃদ্ধ ও স্বাধীন জীবনের জন্য শিক্ষাদানের পন্থা ও পদ্ধতি জন্মগতভাবে লব্ধ শিক্ষা পদ্ধতি— যার সাহায্যে মাছকে সাঁতার কাটা, পাখীকে উড়ে বেড়ানো এবং মানুষের নিজ দেহের মধ্যে চোখের পাতাকে পলক ফেলা, চোখকে দেখা, কানকে শোনা এবং পাকস্থলীকে হজম করা শেখানো হয়েছে—থেকে ভিন্ন হতে হবে। জীবনের এ ক্ষেত্রে মানুষ নিজেও শিক্ষক, বই পুস্তক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা ও ধর্মীয় শিক্ষা, লেখা, বক্তৃতা, বিতর্ক ও যুক্তি প্রমাণের মত উপায় উপকরণকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকার করে এবং শুধু জন্মগতভাবে লব্ধ জ্ঞানকে যথেষ্ট মনে করে না। তাহলে মানুষের স্রষ্টার ওপরে তাদের পথ প্রদর্শনের যে দায়িত্ব বর্তায় তা সম্পাদন করার জন্য যখন তিনি রসূল ও কিতাবকে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন তখন তা বিস্ময়ের ব্যাপার হবে কেন? সৃষ্টি যেমন হবে তার শিক্ষাও তেমন হবে এটা একটা সহজ যুক্তিগ্রাহ্য কথা। بيان যে সৃষ্টিকে শেখানো হয়েছে তার জন্য 'কুরআন'ই হতে পারে শিক্ষার উপযুক্ত মাধ্যম। যেসব সৃষ্টিকে 'বায়ান' শেখানো হয়নি তাদের উপযোগী শিক্ষা মাধ্যম 'বায়ান' শেখানো হয়েছে এমন সৃষ্টির জন্য উপযোগী হতে পারে না।

৪. অর্থাৎ এসব বিরাট বিরাট গ্রহ উপগ্রহ একটা অত্যন্ত শক্তিশালী নিয়মবিধি ও অপরিবর্তনীয় শৃংখলার বাঁধনে আবদ্ধ। মানুষ সময়, দিন, তারিখ এবং ফসলাদি ও

মওসূমের হিসেব করতে সক্ষম হচ্ছে এ কারণে যে, সূর্যের উদয়াস্ত ও বিভিন্ন রাশি অতিক্রমের যে নিয়ম কানুন নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে তাতে কোন সময়ই কোন পরিবর্তন হয় না। পৃথিবীতে অসংখ্য জীব-জন্তু বেঁচেই আছে এ কারণে যে, চন্দ্র ও সূর্যকে ঠিকমত হিসেব করে পৃথিবী থেকে একটি বিশেষ দূরত্বে স্থাপন করা হয়েছে এবং একটি সঠিক মাপ জোকের মাধ্যমে বিশেষ শৃংখলার সাথে এ দূরত্বের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। কোন হিসেব নিকেশ ও মাপজোক ছাড়াই যদি পৃথিবী থেকে এদের দূরত্বের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটতো তাহলে কারো পক্ষেই এখানে বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। অনুরূপভাবে পৃথিবীর চারদিকে চন্দ্র ও সূর্যের গতি বিধিতে এমন পূর্ণ ভারসাম্য কায়েম করা হয়েছে যে, চন্দ্র একটি বিশ্বজনীন পঞ্জিকায় রূপান্তরিত হয়েছে যা অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিকতাবে প্রতিরাতে সমগ্র বিশ্বকে চান্দ্র মাসের তারিখ নির্দেশ করে দেয়।

৫. মূল আয়াতে النجم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর সর্বজন বিদিত ও সহজ বোধগম্য অর্থ তারকা। কিন্তু আরবী ভাষায় এ শব্দটি দ্বারা এমন সব লতাগুল্ম ও লতিয়ে উঠা গাছকে বুঝানো হয় যার কোন কাণ্ড হয় না। যেমন ঃ শাক-সবজি, খরমুজ, তরমুজ ইত্যাদি। এখানে এ শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে বিষয়ে মুফাসসিরদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, সুদ্দী ও সুফিয়ান সাওরীর মতে এর অর্থ কাণ্ডহীন উদ্ভিদরাজি। কেননা এর পরেই الشجر (বৃক্ষ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার সাথে এ অর্থ বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ। অপর দিকে মুজাহিদ, কাতাদা ও হাসান বাসরীর মতে এখানেও 'নাজ্‌ম' অর্থ পৃথিবীর লতাগুল্ম নয়, বরং আকাশের তারকা। কারণ এটাই এর সহজ বোধগম্য ও সর্বজন বিদিত অর্থ। এ শব্দটি শোনার সাথে সাথে মানুষের মন-মগজে এ অর্থটিই জেগে ওঠে এবং সূর্য ও চন্দ্রের উল্লেখের পর তারকাসমূহের উল্লেখ করাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। মুফাসসির ও অনুবাদকদের অধিকাংশই যদিও প্রথম অর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। একে ভ্রান্ত বলা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাফেজ ইবনে কাসীরের এ মতটি সঠিক যে, ভাষা ও বিষয়বস্তু উভয় বিচারেই দ্বিতীয় অর্থটিই অধিক অগ্রগণ্যতা পাওয়ার যোগ্য বলে মনে হয়। কুরআন মজিদের অন্য একটি স্থানেও তারকা ও বৃক্ষরাজির সিজদাবনত হওয়ার উল্লেখ আছে এবং সেখানে نجوم শব্দটি তারকা ছাড়া অন্য কোন অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে না। আয়াতটি হচ্ছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ .....

.....(الحج:١٨)

এখানে সূর্য ও চন্দ্রের সাথে نجوم শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে এবং شجر শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে পাহাড় ও জীবজন্তুর সাথে। আর বলা হয়েছে, এসব আল্লাহর সামনে সিজদাবনত।

৬. অর্থাৎ আকাশের তারকা ও পৃথিবীর বৃক্ষরাজি সবই আল্লাহর নির্দেশের অনুগত এবং তাঁর আইন-বিধানের অনুসারী। তাদের জন্য যে নিয়ম-বিধি তৈরী করে দেয়া হয়েছে তারা তা মোটেই লংঘন করে না।

এ দু'টি আয়াতে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য এ কথা বলা যে, সমগ্র বিশ্ব-জাহানের গোটা ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তা'আলার তৈরী এবং সব কিছু তাঁরই আনুগত্য করে চলেছে। পৃথিবী থেকে আসমান পর্যন্ত কোথাও কোন সার্বভৌম সত্তা নেই। অন্য কারো কর্তৃত্ব এ বিশ্বজাহানে চলছে না।, আল্লাহর কর্তৃত্বে কারো কোন রকম দখলও নেই, কারো এমন মর্যাদাও নেই যে, তাকে উপাস্য বানানো যায়। সবাই এক আল্লাহর বান্দা ও দাসানুদাস। একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহই সকলের মনিব। তাই তাওহীদই সত্য। আর কুরআনই তার শিক্ষা দিচ্ছে। এ শিক্ষা পরিত্যাগ করে যে ব্যক্তিই শিরক অথবা কুফরীতে লিপ্ত হচ্ছে সে প্রকৃতপক্ষে গোটা বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে লড়াইতে লিপ্ত আছে।

৭. প্রায় সব তাফসীরকারই এখানে "মীযান" (দাড়িপাল্লা) অর্থ করেছেন সুবিচার ও ইনসাফ এবং মীযান কায়েম করার অর্থ বর্ণনা করেছেন এই যে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব-জাহানের এই গোটা ব্যবস্থায় ইনসাফ ও সুবিচার কায়েম করেছেন। মহাকাশে আবর্তনরত এসব সীমা সংখ্যাহীন তারকা ও গ্রহ উপগ্রহ, বিশ্ব-জাহানে সক্রিয় এই বিশাল শক্তিসমূহ, এবং এ বিশ্বলোকে বিদ্যমান অসংখ্য সৃষ্টি ও বস্তুরাজির মধ্যে যদি পূর্ণমাত্রার সুবিচার ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা না হতো তাহলে এ জগত এক মুহূর্তের জন্যেও চলতে পারতো না। কোটি কোটি বছর ধরে এই পৃথিবীর বুকে বাতাস ও পানি এবং স্থলভাগে সৃষ্টিকুল আছে, তাদের প্রতি লক্ষ করুন। তাদের জীবন তো এ জন্যই টিকে আছে যে, তাদের জীবন ধারণের উপকরণের মধ্যে পুরোপুরি সুবিচার ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত আছে। এসব উপকরণের মধ্যে যদি সামান্য পরিমাণ ভারসাম্যহীনতাও সৃষ্টি হয় তাহলে এখানে জীবনের নাম গন্ধ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে না।

৮. অর্থাৎ তোমরা যেহেতু এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্বলোকে বাস করছো যার গোটা ব্যবস্থাপনাই সুবিচার ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তোমাদেরকেও সুবিচার ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যে গণ্ডীর মধ্যে তোমাদেরকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে সেখানে যদি তোমরা বে-ইনসাফী করো এবং যে হকদারদের হক তোমাদের হাতে দেয়া হয়েছে তাদের হক যদি তোমরা হরণ কর, তাহলে তা হবে বিশ্ব প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। এ মহা বিশ্বের প্রকৃতি জুলুম, বে-ইনসফী ও অধিকার হরণকে স্বীকার করে না। এখানে বড় রকমের কোন জুলুম তো দূরের কথা, দাঁড়ি পাল্লার ভারসাম্য বিঘ্নিত করে কেউ যদি খরিদ্দারকে এক তোলা পরিমাণ জিনিসও কম দেয় তাহলে সে বিশ্বলোকের ভারসাম্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। -এটা কুরআনের শিক্ষার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ তিনটি আয়াতে এ শিক্ষাটাই তুলে ধরা হয়েছে। কুরআনের প্রথম শিক্ষা হচ্ছে তাওহীদ এবং দ্বিতীয় শিক্ষা হচ্ছে সুবিচার ও ইনসাফ। এভাবে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বাক্যে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, 'রাহমান' বা পরম দয়াবান আল্লাহ পথ প্রদর্শনের জন্য যে কুরআন পাঠিয়েছেন তা কি ধরনের শিক্ষা নিয়ে এসেছে।

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴿١١﴾
وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾

পৃথিবীকে[৯] তিনি সমস্ত সৃষ্টির জন্য বানিয়েছেন।[১০] এখানে সব ধরনের সুস্বাদু ফল প্রচুর পরিমাণে আছে। খেজুর গাছ আছে যার ফল পাতলা আবরণে ঢাকা। নানা রকমের শস্য আছে যার মধ্যে আছে দানা ও ভূষি উভয়ই।[১১] অতএব, হে জিন ও মানব জাতি, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে[১২] অস্বীকার করবে[১৩]?

৯. এখান থেকে ২৫ আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার সেসব নিয়ামত, অনুগ্রহ এবং তার অসীম শক্তির সেসব বিস্ময়কর দিকের উল্লেখ করা হচ্ছে যা মানুষ ও জিন উভয়েই উপভোগ করছে এবং যার স্বাভাবিক ও নৈতিক দাবী হলো, কুফরী বা ঈমান গ্রহণের স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও তারা যেন নিজেদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও ইচ্ছায় তাদের রবের বন্দেগী ও আনুগত্যের পথ অনুসরণ করে।

১০. মূল কথাটি হলো পৃথিবীকে তিনি انام এর জন্য وضع (সংস্থাপিত) করেছেন। এখানে وضع বা সংস্থাপন করা বলতে বুঝানো হয়েছে সংযোজন করা, নির্মাণ করা, তৈরি করা, রাখা এবং স্থাপিত করা বা সেঁটে দেয়া। আর আরবী ভাষায় انام শব্দ দ্বারা সব সৃষ্টিকেই বুঝায়। এর মধ্যে মানুষ ও অন্যান্য সব প্রাণীকূল অন্তরভুক্ত। ইবনে আব্বাস বলেন ঃ كُلُّ شَيْءٍ مَا فِيهِ الرُّوحُ প্রাণধারি সব সত্তাই انام হিসেবে গণ্য। মুজাহিদের মতে এর অর্থ সমস্ত সৃষ্টিকূল। কাতাদা, ইবনে যায়েদ ও শা'বীর মতে সমস্ত প্রাণীই انام (আনাম)। হাসান বাসারী বলেন ঃ মানুষ ও জিন উভয়েই এর মধ্যে অন্তরভুক্ত। সমস্ত ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। এ থেকে জানা যায়, যারা এ আয়াতের সাহায্যে ভূমিকে রাষ্ট্রের মালিকানাধীন করার নির্দেশ দিতে চান তারা অর্থহীন কথা বলেন। এটা বাইরের মতবাদ এনে জোরপূর্বক কুরআনের ওপর চাপিয়ে দেয়ার একটি কদর্য্য প্রচেষ্টা। আয়াতে ব্যবহৃত শব্দাবলী থেকে যেমন তা প্রমাণিত হয় না, তেমনি পূর্বাপর প্রসংগ দ্বারাও তা সমর্থিত হয় না। শুধু মানব সমাজকেই আনাম বলা হয় না, বরং পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টিও এর মধ্যে শামিল। পৃথিবীকে আনামের জন্য সংস্থাপিত করার অর্থ এ নয় যে, তা সবার সাধারণ মালিকানা। বাক্যের ভাবধারা থেকেও প্রকাশ পায় না যে, এখানে কোন অর্থনৈতিক নিয়ম-বিধি বর্ণনা করা এর উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে এখানে এ কথা বলাই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীকে এমনভাবে সৃষ্টি ও প্রস্তুত করে দিয়েছেন যে, তা নানা প্রকারের প্রাণীকূলের বসবাস ও জীবন যাপনের উপযোগী হয়ে গিয়েছে। এ পৃথিবী আপনা থেকেই এরূপ হয়ে যায়নি, বরং স্রষ্টার বানানোর কারণেই এরূপ হয়েছে। তিনি নিজের জ্ঞান ও সৃষ্টি কৌশলের আলোকে এ পৃথিবীকে এ অবস্থানে সংস্থাপন করছেন এবং তার পৃষ্ঠদেশে এমন পরিবেশ ও অবস্থা সৃষ্টি করেছেন যার ফলশ্রুতিতে প্রাণধারী প্রজাতিসমূহের পক্ষে এখানে টিকে থাকা সম্ভব হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন,

তাফহীমুল কুরআন, আন নামল, টীকা ৭৩-৭৪; ইয়াসীন, টীকা ২৯-৩২; আল মু'মিন, টীকা ৯০-৯১; হা মীম আস সাজদা, টীকা ১১ থেকে ১৩ পর্যন্ত; আয যুখরুফ, টীকা ৭ থেকে ১০ পর্যন্ত; আল জাসিয়া, টীকা ৭)।

১১. অর্থাৎ মানুষের জন্য খাদ্য শস্য এবং পশুর ভূষিখাদ্য।

১২. মূল আয়াতে ءالاء শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে এ শব্দটি বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। আমরাও বিভিন্নস্থানে এর অর্থ বিভিন্ন শব্দে ব্যক্ত করেছি। তাই এ শব্দটি কতটা ব্যাপক অর্থবোধক এবং কত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ, তা শুরুতেই বুঝে নেয়া দরকার। ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত ও তাফসীর বিশারদগণ ءالاء শব্দের অর্থ করেছেন সাধারণত "নিয়ামতসমূহ"। সমস্ত অনুবাদক এ শব্দের অনুবাদও করেছেন তাই। ইবনে আব্বাস, কাতাদা, হাসান বাসরী থেকে এর এই অর্থই বর্ণিত হয়েছে। এটি যে এ শব্দের সঠিক অর্থ তার বড় প্রমাণ হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে জিনদের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, এ আয়াত শুনে তারা বারবার বলছিল ঃ لَا بِشَيْءٍ مِّنْ نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ বর্তমান যুগের কোন কোন গবেষকের এ সিদ্ধান্তের সাথে আমরা একমত নই যে, ءالاء শব্দটি নিয়ামত অর্থে আদৌ ব্যবহৃত হয় না।

এ শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে, অসীম ক্ষমতা, অসীম ক্ষমতার বিস্ময়কর দিকসমূহ অসীম ক্ষমতার পরিপূর্ণতাসমূহ। ইবনে জারীর তাবারী ইবনে যায়েদের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا অর্থ فَبِاَيِّ قُدْرَةِ اللّٰهِ ঃ ইবনে জারীর নিজেও ৩৭ ও ৩৮ আয়াতের ব্যাখ্যায় ءالاء শব্দটিকে অসীম ক্ষমতা অর্থে গ্রহণ করেছেন। ইমাম রাযীও ১৪, ১৫ ও ১৬ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন "এ আয়াতগুলোতে নিয়ামতের বর্ণনা করা হয়নি, বরং অসীম ক্ষমতার বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি ২২ ও ২৩ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ এ দু'টি আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের বর্ণনা করা হয়নি। বরং তার অসীম ক্ষমতার বিস্ময়কর দিকসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।"

এর তৃতীয় অর্থ হচ্ছে গুণাবলী, মহত গুণাবলী এবং পরিপূর্ণ ও মর্যাদা। ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত ও তাফসীরকারগণ এ অর্থ বর্ণনা করেননি। কিন্তু আরবদের কাব্যে এ শব্দটি এ অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কবি নাবেগাহ বলেছেন ঃ

هم الملوك وابناء الملوك لهم : فضل على الناس فى الالاء والنعم

"তারা বাদশাহ এবং বাদশাহজাদা। প্রশংসনীয় গুণাবলী ও নিয়ামতের দিক দিয়ে মানুষের কাছে তাদের মর্যাদা আছে।"

মুহালহিল তার ভাই কুলাইবের জন্য রচিত শোকগাথায় বলেছেন ঃ

الحزم والعزم كانا من طبائعه : ما كل الائه ياقوم احصيها

"পরিণাম দর্শিতা ও দৃঢ়সংকল্প ছিল তার মহত গুণাবলীর অন্তরভুক্ত। হে লোকেরা, আমি তার সব মহত গুণ এখানে তুলে ধরছি না।"

ফাদালা ইবনে যায়েদ আল-আদওয়ানী দারিদ্র্যের মন্দ দিকসমূহ বর্ণনা প্রসংগে বলছেন যে, দরিদ্র মানুষ ভাল কাজ করলেও মন্দ বিবেচিত হয়। কিন্তু

وتحمد الاء البخيل المدرهم

সম্পদশালী কৃপণের অনেক গুণ-বৈশিষ্ট ও পরিপূর্ণতার প্রশংসা করা হয়।

আজদা' হামদানী তার "কুমাইত" নামের ঘোড়ার প্রশংসা প্রসংগে বলেন ঃ

ورضيت الاء الكميت فمن يبع : فرسا فليس جوادنا بمباع

"আমি 'কুমাইতে'র উত্তম গুণাবলী পছন্দ করি। কেউ কোন ঘোড়া বিক্রি করতে চাইলে করুক। আমাদের ঘোড়া বিক্রি করা হবে না।"

হাম্মাসার এক কবি আবু তামাম যার নাম উল্লেখ করেনি তার শ্রদ্ধেয় ও প্রশংসনীয় ব্যক্তি ওয়ালীদ ইবনে আদহামের ক্ষমতা ও কতৃত্বের শোকগাথায় বলেছেন ঃ

اذا ما امرؤ اثنى بالاء ميت : فلا يبعد اللّه الوليدبن ادهما

"যখনই কেউ কোন মৃত ব্যক্তির গুণাবলীর প্রশংসা করবে আল্লাহ না করুন, সে যেন ওয়ালীদ ইবনে আদহামকে ভুলে না যায়।"

فما كان مفراحا اذا الخير مسه : ولا كان منانا اذا هو انعما

"সুদিন আসলে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ো না এবং কারো প্রতি অনুগ্রহ করে থাকলে কখনো খোঁটা দিয়ো না।"

কবি তারাফা এক ব্যক্তির প্রশংসা উপলক্ষে বলেন ঃ

كامل يجمع الاء الفتى : نبه سيد سادات خضم

"সে পূর্ণাঙ্গ ও নিষ্কলুষ, সাহসিকতার সমস্ত গুণাবলীর সমাহার, অভিজাত, নেতাদের নেতা এবং উদারমনা।"

এসব প্রমাণাদি ও দৃষ্টান্তাবলী সামনে রেখে ءالاء শব্দটিকে আমরা তার ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছি এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে যে অর্থটি যথোপযুক্ত মনে হয়েছে অনুবাদে সেটিই লিপিবদ্ধ করেছি। তা সত্ত্বেও কোন কোন জায়গায় একই স্থানে ءالاء শব্দটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে। অনুবাদের বাধ্যবাধকতার কারণে আমাকে তার একটি অর্থই গ্রহণ করতে হয়েছে। কেননা, যুগপত সবগুলো অর্থই ধারণ করতে পারে আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় এরূপ ব্যাপক অর্থবোধক কোন শব্দ নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আলোচ্য আয়াতটিতে পৃথিবী সৃষ্টি এবং সেখানকার সমস্ত সৃষ্টির রিযিক সরবরাহের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনার উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ ءالاء কে অস্বীকার করবে? এক্ষেত্রে ءالاء শব্দটি শুধুমাত্র নিয়ামত অর্থেই ব্যবহৃত হয়নি, বরং মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার পরিপূর্ণতা এবং তাঁর মহৎ গুণাবলীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। এটা তাঁর অসীম ক্ষমতার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ যে, তিনি এই মাটির পৃথিবীকে এমন বিস্ময়কর পন্থায় তৈরী করেছেন যেখানে অসংখ্য প্রজাতির প্রাণীকূল বাস করে এবং নানা রকমের ফল ও শস্য উৎপন্ন হয়। এটাও তাঁর প্রশংসনীয় গুণ যে, তিনি এসব প্রাণীকূলকে

সৃষ্টি করার সাথে সাথে এখানে তাদের লালন-পালন এবং রিযিক সরবরাহেরও ব্যবস্থা করেছেন। ব্যবস্থাপনাও এমন ব্যাপক ও নিখুঁত যে, তাদের খাদ্যে কেবল খাদ্য গুণ ও পুষ্টিই নয়, বরং তার মধ্যে প্রবৃত্তি ও রসনার তৃপ্তি আছে এবং আছে অগণিত দৃষ্টিলোভা দিক। এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার কারিগরী ও নৈপুন্যের চরম পূর্ণতার একটি মাত্র দিকের প্রতি নমুনা হিসেবে ইংগিত দিয়ে দেখানো হয়েছে কিভাবে খেজুর গাছে পাতলা আবরণে আচ্ছাদিত করে ফল সৃষ্টি করা হয়। এই একটি মাত্র উদাহরণকে সামনে রেখে একটু লক্ষ করুন, কলা, দাড়িম্ব, কমলালেবু, নারিকেল এবং অন্যান্য ফলের প্যাকিংয়ে কি রকম নৈপুন্য ও শৈল্পিক কারুকার্যের পরাকাষ্ঠা ও উৎকর্ষতা দেখানো হয়েছে। তাছাড়া নানা রকমের খাদ্য শস্য, ডাল এবং বীজ যা আমরা পরিতুষ্টির সাথে অবলীলাক্রমে রান্না করে খাই তার প্রত্যেকটিকে উৎকৃষ্ট ও পরিচ্ছন্ন আঁশ ও ছালের আকারে প্যাক করে এবং অতি সুক্ষ্ম আবরণে জড়িয়ে সৃষ্টি করা হয়।

১৩. অস্বীকার করার অর্থ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহ, তাঁর অসীম ক্ষমতার বিস্ময়কর কার্যাবলী এবং মহৎ গুণাবলীর ক্ষেত্রে মানুষের কতিপয় আচরণ। যেমন ঃ

এসব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা যে মহান আল্লাহ, অনেকে তা আদৌ স্বীকার করে না। তাদের ধারণা, এসবই বস্তুর আকস্মিক বিশৃংখলার কিংবা একটা দুর্ঘটনার ফল যার মধ্যে জ্ঞান ও সৃষ্টিশীলতার কোন হাত নেই। এ ধরনের উক্তি একেবারে খোলাখুলি অস্বীকৃতির নামান্তর।

কিছু সংখ্যক লোক এ কথা স্বীকার করে যে, এসব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তবে তারা এর সাথে সাথে অন্যদেরকেও খোদায়ীতে শরীক মনে করে, তাঁর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অন্যদের কাছে এবং তাঁর দেয়া রিযিক খেয়ে অন্যের গুণ গায়। এটা অস্বীকৃতির আরেকটি রূপ। কোন লোক যখন স্বীকার করে যে, আপনি তার প্রতি অমুক অনুগ্রহ করেছেন এবং তখনি আপনার সামনেই সেজন্য অন্য কোন লোকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে শুরু করে—অথচ প্রকৃত পক্ষে সে তার প্রতি আদৌ অনুগ্রহ করেনি—তাহলে আপনি নিজেই বলবেন যে, সে জঘন্য অকৃতজ্ঞতা দেখিয়েছে। কারণ তার এ আচরণ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সে আপনাকে নয় বরং সে ব্যক্তিকেই অনুগ্রহকারী স্বীকার করে যার প্রতি সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

আরো কিছু লোক আছে যারা আল্লাহকেই সমস্ত জিনিসের সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করে, কিন্তু তাদেরকে নিজেদের সৃষ্টি ও পালনকর্তার আদেশ নিষেধের আনুগত্য এবং তাঁর হিদায়াতসমূহের অনুসরণ করতে হবে তা মানে না। এটা অকৃতজ্ঞতা ও নিয়ামত অস্বীকার করার আরো একটি রূপ। কারণ, যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে সে নিয়ামতসমূহ স্বীকার করা সত্ত্বেও নিয়ামত দাতার অধিকারকে অস্বীকার করে।

আরো এক শ্রেণীর মানুষ মুখে নিয়ামতকে অস্বীকার করে না কিংবা নিয়ামত দানকারীর অধিকারকেও অস্বীকার করে না। কিন্তু কার্যত তাদের এবং একজন অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী ও মিথ্যানুসারীর জীবনে উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য থাকে না। এটা মৌখিক অস্বীকৃতি নয়, কার্যত অস্বীকৃতি।

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ
مِنْ نَارٍ ﴿١٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ
الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾

মাটির শুকনো ঢিলের মত পচা কাদা থেকে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।[১৪] আর জিনদের সৃষ্টি করেছেন আগুনের শিখা থেকে[১৫]। হে জিন ও মানব জাতি, তোমরা তোমাদের রবের অসীম ক্ষমতার কোন্ কোন্ বিস্ময়কর দিক অস্বীকার করবে?[১৬]

দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচল— সব কিছুর মালিক ও পালনকর্তা তিনিই।[১৭] হে জিন ও মানবজাতি, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ কুদরতকে[১৮] অস্বীকার করবে?

১৪. কুরআন মজীদে মানুষ সৃষ্টির যে প্রাথমিক পর্যায়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানের বক্তব্য একত্রিত করে তার নিম্নবর্ণিত ক্রমিক বিন্যাস অবগত হওয়া যায় (১) তুরাব অর্থাৎ মাটি। (২) ত্বীন অর্থাৎ পচা কর্দম যা মাটিতে পানি মিশিয়ে বানানো হয়। (৩) ত্বীন লাযেব-আঠালো কাদামাটি। অর্থাৎ এমন কাদা, দীর্ঘদিন পড়ে থাকার কারণে যার মধ্যে আঠা সৃষ্টি হয়ে যায় (৪) حمإٍ مسنون যে কাদার মধ্যে গন্ধ সৃষ্টি হয়ে যায় (৫) صلصال من حمإٍ مسنون كالفخار অর্থাৎ পচা কাদা যা শুকিয়ে যাওয়ার পরে মাটির শুকনো টিলার মত হয়ে যায়। (৬) بشر মাটির এ শেষ পর্যায় থেকে যাকে বানানো হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা যার মধ্যে তাঁর বিশেষ রূহ ফুৎকার করেছেন, ফেরেশতাদের দিয়ে যাকে সিজদা করানো হয়েছিল এবং তার সমজাতীয় থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করা হয়েছিল (৭) ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين তারপর পরবর্তী সময়ে নিকৃষ্ট পানির মত সংমিশ্রিত দেহ নির্যাস থেকে তার বংশ ধারা চালু করা হয়েছে। এ কথাটি বুঝাতে অন্য স্থানসমূহে نطفه (শুক্র) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

মানব সৃষ্টির এ পর্যায়সমূহ অবগত হওয়ার জন্য কুরআন মজীদের নিম্নবর্ণিত আয়াতসমূহ পর্যায়ক্রমে পাঠ করুন। كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ (ال عمران : ٥٩) بَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ (السجده : ٧) اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ (الصفات:١١) চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায় আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তার পরের পর্যায়গুলো নীচের আয়াত সমূহে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ
فَقَعُوْا لَهٗ سَاجِدِيْنَ (ص : ٧١-٧٢) خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ

مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَآءً (النساء : ١) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ (السجدة : ٨) فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ (الحج : ٥)

১৫. মূল আয়াতে مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। نار অর্থ এক বিশেষ ধরনের আগুন। কাঠ বা কয়লা জ্বালালো যে আগুন সৃষ্টি হয় এটা সে আগুন নয়। আর مارج অর্থ ধোঁয়াবিহীন শিখা। এ কথার অর্থ হচ্ছে প্রথম মানুষকে যেভাবে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তারপর সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার সময় তার মাটির সত্তা অস্থি-মাংসে তৈরী জীবন্ত মানুষের আকৃতি লাভ করেছে এবং পরবর্তী সময়ে শুক্রের সাহায্যে তার বংশধারা চালু আছে। অনুরূপ প্রথম জিনকে নিছক আগুনের শিখা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তার বংশধরদের থেকে পরবর্তী সময়ে জিনদের অধস্তন বংশধররা সৃষ্টি হয়ে চলেছে। মানব জাতির জন্য আদমের মর্যাদা যা, জিন জাতির জন্য সেই প্রথম জিনের মর্যাদাও তাই। জীবন্ত মানুষ হয়ে যাওয়ার পর হযরত আদম এবং তার বংশ থেকে জন্ম লাভকারী মানুষের দেহের সেই মাটির সাথে যেমন কোন মিল থাকলো না যে মাটি দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। যদিও এখনো আমাদের দেহ পুরোটাই মাটির অংশ দ্বারাই গঠিত। কিন্তু মাটির ঐ সব অংশ রক্ত-মাংসের দেহে রূপান্তরিত হয়েছে এবং প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার পর তা শুধু মাটির দেহ না থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিসে রূপান্তরিত হয়েছে। জিনদের ব্যাপারটাও তাই। তাদের সত্তাও মূলত আগুনের সত্তা। কিন্তু আমরা যেমন মাটির স্তূপ নই, অনুরূপ তারাও শুধু অগ্নি শিখা নয়।

এ আয়াত থেকে দু'টি বিষয় জানা যায় ঃ এক, জিনেরা নিছক আত্মিক সত্তা নয়, বরং তাদেরও এক ধরনের জড় দেহ আছে। তবে তা যেহেতু নিরেট আগুনের উপাদানে গঠিত, তাই তারা মাটির উপাদানে গঠিত মানুষের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। নীচে বর্ণিত এ আয়াতটি এ বিষয়ের প্রতিই ইংগিত করে ঃ

اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

"শয়তান ও তার দলবল এমন অবস্থান থেকে তোমাদের দেখছে যেখানে তোমরা তাদের দেখতে পাও না" (আল-আ'রাফ-২৭)।

অনুরূপভাবে জিনদের দ্রুত গতিসম্পন্ন হওয়া, অতি সহজেই বিভিন্ন আকার-আকৃতি গ্রহণ করা এবং যেখানে মাটির উপাদানে গঠিত বস্তুসমূহ প্রবেশ করতে পারে না, কিংবা প্রবেশ করলেও তা অনুভূত হয় বা দৃষ্টি গোচর হয়, সেখানে তাদের প্রবেশ অনুভূত বা দৃষ্টিগোচর না হওয়া—এসবই এ কারণে সম্ভব ও বোধগম্য যে, প্রকৃতই তারা আগুনের সৃষ্টি।

এ থেকে দ্বিতীয় যে বিষয়টি জানা যায় তা হচ্ছে, জিনরা মানুষ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সৃষ্টিই শুধু নয়, বরং তাদের সৃষ্টি উপাদানই মানুষ, জীবজন্তু, উদ্ভিদরাজি এবং চেতন পদার্থসমূহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যারা জিনদেরকে মানুষেরই একটি শ্রেণী বলে মনে করে এ

আয়াত স্পষ্ট ভাষায় তাদের ভ্রান্তি প্রমাণ করছে। তারা এর ব্যাখ্যা করে বলেন, মাটি থেকে মানুষকে এবং আগুন থেকে জিনকে সৃষ্টি করার অর্থ প্রকৃত পক্ষে দুই শ্রেণীর মানুষের মেজাজের পার্থক্য বর্ণনা করা। এক প্রকারের মানুষ নম্র মেজাজের হয়ে থাকেন। সত্যিকার অর্থে তারাই মানুষ। আরেক প্রকারের মানুষের মেজাজ হয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত গরম। তাদের মানুষ না বলে শয়তান বলাটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। তবে এ ধরনের ব্যাখ্যা প্রকৃতপক্ষে কুরআনের তাফসীর নয়, কুরআনের বিকৃতি সাধন করা। উপরে ১৪ নম্বর টীকায় আমরা দেখিয়েছি যে, কুরআন নিজেই মাটি দ্বারা মানুষের সৃষ্টির অর্থ কতটা স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে। বিস্তারিত এসব বিবরণ পড়ার পর কোন বিবেকবান ব্যক্তি কি এর এ অর্থ গ্রহণ করতে পারে যে, এসব কথার উদ্দেশ্য শুধু উত্তম মানুষদের নম্র মেজাজ হওয়ার প্রশংসা করা? তার পরেও সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষের মগজে একথা কি করে আসতে পারে যে, মানুষকে পঁচা আঠাল মাটির শুকনো ঢিলা থেকে সৃষ্টি করা এবং জিনদেরকে নিরেট অগ্নি শিখা থেকে সৃষ্টি করার অর্থ একই মানব জাতির দু'টি ভিন্ন ভিন্ন মেজাজের ব্যক্তিদের বা গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র নৈতিক গুণাবলীর পার্থক্য বর্ণনা করা? (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা যারিয়াতের তাফসীর, টীকা-৫৩)।

১৬. এখানে ক্ষেত্র অনুসারে ءلا শব্দের অর্থ "অসীম ক্ষমতার বিস্ময়কর দিক সমূহই অধিক উপযোগী। তবে এর মধ্যে নিয়ামতের বিষয়টিও অন্তরভুক্ত। মাটি থেকে মানুষ এবং আগুনের শিখা থেকে জিনের মত বিস্ময়কর জীবকে অস্তিত্ব দান করা যেমন আল্লাহর অসীম ক্ষমতার বিস্ময়কর ব্যাপার। তেমনি এ দু'টি সৃষ্টির জন্য এটাও এক বিরাট নিয়ামত যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শুধু সৃষ্টিই করেননি, বরং প্রত্যেককে এমন আকার আকৃতি দান করেছেন, প্রত্যেকের মধ্যে এমন সব শক্তি ও যোগ্যতা দিয়েছেন যার সাহায্যে তারা পৃথিবীতে বড় বড় কাজ সম্পন্ন করার যোগ্য হয়েছে। জিনদের সম্পর্কে আমাদের কাছে বেশী তথ্য না থাকলেও মানুষ তো আমাদের সামনে বিদ্যমান। মানুষকে মানুষের মস্তিষ্ক দেয়ার পরে যদি মাছ, পাখি অথবা বানরের দেহ দান করা হতো তাহলে সেই দেহ নিয়ে কি সে ঐ মস্তিষ্কের উপযোগী কাজ করতে পারতো? তাহলে এটা কি আল্লাহর বিরাট নিয়ামত নয় যে, মানুষের মস্তিষ্কে তিনি যে সব শক্তি দিয়েছেন তা কাজে লাগানোর জন্য সর্বাধিক উপযোগী দেহও তাকে দান করেছেন? এক দিকে এ হাত, পা, চোখ, কান, জিহ্বা ও দীর্ঘ দেহ এবং অপরদিকে এ জ্ঞান-বুদ্ধি, চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা, আবিষ্কার ও যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষমতা, শৈল্পিক নৈপুন্য এবং কারিগরী যোগ্যতা পাশাপাশি রেখে বিচার করলে বুঝতে পারবেন এ সবের স্রষ্টা এসবের মধ্যে পূর্ণ মাত্রার যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন তা যদি না থাকতো তাহলে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বই অর্থহীন হয়ে পড়তো। এসব জিনিসই আবার আল্লাহ তা'আলার মহত গুণাবলীর প্রতি ইংগিত করে। জ্ঞান-বুদ্ধি, সৃষ্টি নৈপুন্য, অপরিসীম দয়া এবং পূর্ণমাত্রার সৃষ্টিক্ষমতা ছাড়া মানুষ ও জিনের মত এমন জীব কি করে সৃষ্টি হতে পারতো? আকস্মিক দুর্ঘটনা এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্মতৎপর অন্ধ ও বধির প্রাকৃতিক নিয়ম এরূপ অনুপম ও বিস্ময়কর সৃষ্টিকর্ম কি করে সম্পন্ন করতে পারে?

১৭. দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের অর্থ শীত কালের সবচেয়ে ছোট দিন এবং গ্রীষ্মকালের সবচেয়ে বড় দিনের উদয়াচল ও আস্তাচলও হতে পারে। আবার পৃথিবীর দুই

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ﴿٢٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿٢١﴾ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٣﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَـَٔاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٢٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٥﴾

দু'টি সমুদ্রকে তিনি পরস্পর মিলিত হতে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে একটি পর্দা আড়াল হয়ে আছে যা তারা অতিক্রম করে না[১৯] হে জিন ও মানব জাতি, তোমরা তোমাদের রবের অসীম শক্তির কোন্ কোন্ বিস্ময়কর দিক অস্বীকার করবে?

এই উভয় সমুদ্র থেকেই মুক্তা ও প্রবাল[২০] পাওয়া যায়।[২১] হে জিন ও মানব জাতি, তোমরা তোমাদের রবের কুদরতের কোন্ কোন্ পরিপূর্ণতা অস্বীকার করবে?[২২]

সমুদ্রের বুকে পাহাড়ের মত উঁচু ভাসমান জাহাজসমূহ তাঁরই।[২৩] অতএব, হে জিন ও মানব জাতি, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?[২৪]

গোলার্ধের উদয়াচল ও অস্তাচলও হতে পারে। শীত মৌসুমের সর্বাপেক্ষা ছোট দিনে সূর্য অত্যন্ত সংকীর্ণ একটি কোণ সৃষ্টি করে উদয় হয় এবং অস্ত যায়। অপর দিকে গ্রীষ্মের সর্বাপেক্ষা বড় দিনে অতি বিস্তৃত কোণ সৃষ্টি করে উদয় হয় এবং অস্ত যায়। প্রতি দিন এ উভয় কোণের মাঝে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের স্থান পরিবর্তিত হতে থাকে। এ কারণে কুরআনের অন্য এক স্থানে (المعارج : ٤٠) رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ বলা হয়েছে। অনুরূপ পৃথিবীর এক গোলার্ধে যখন সূর্য উদয় হয় ঠিক সে সময় অন্য গোলার্ধে তা অস্ত যায়। এভাবেও পৃথিবীর দু'টি উদয়াচল ও অস্তাচল হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলাকে এ দু'টি উদয়াচল ও অস্তাচলের রব বলার কয়েকটি অর্থ আছে। এক, তাঁর হুকুমেই সূর্যের উদয় হওয়া ও অস্ত যাওয়া এবং সারা বছর ধরে তা ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে থাকার এই ব্যবস্থা চালু আছে। দুই, পৃথিবী ও সূর্যের মালিক ও শাসক তিনি। এ দু'টির রব যদি ভিন্ন ভিন্ন হতো তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সূর্যের এ উদয়াস্তের ব্যবস্থা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো এবং স্থায়ীভাবে কি করে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারতো। তিন, এ দুই উদয়াচল ও অস্তাচলের মালিক ও পালনকর্তাও তিনি। উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসকারী সমস্ত সৃষ্টি তাঁরই মালিকানাভুক্ত, তিনিই তাদেরকে প্রতিপালন করছেন এবং প্রতিপালনের জন্যই তিনি ভূ-পৃষ্ঠে সূর্য অস্ত যাওয়ার এবং উদয় হওয়ার এ জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থা চালু রেখেছেন।

১৮. এখানেও পরিবেশ ও ক্ষেত্র অনুসারে الاء শব্দের সর্বাধিক স্পষ্ট অর্থ বুঝা যায় "অসীম ক্ষমতা"। তবে তার সাথে এর অর্থ নিয়ামত ও মহৎ গুণাবলী হওয়ার দিকটাও বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা সূর্যের উদয়াস্তের এই নিয়ম নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এটা তাঁর একটা বড় নিয়ামত। কারণ, এর বদৌলতেই নিয়মিতভাবে মৌসূমের পরিবর্তন ঘটে থাকে। আর মৌসূমের পরিবর্তনের সাথে মানুষ, জীবজন্তু, ও উদ্ভিদরাজি সবকিছুর অসংখ্য স্বার্থ জড়িত। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে যেসব সৃষ্টিকুলকে সৃজন করেছেন, তাদের প্রয়োজনের বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে নিজের অসীম ক্ষমতায় এসব ব্যবস্থাপনা আঞ্জাম দিয়েছেন এটাও তাঁরই দয়া, রবুবিয়াত ও সৃষ্টি কুশলতা।

১৯. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ফুরকান, টীকা-৬৮।

২০. মূল আয়াতে مرجان শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইবনে আব্বাস, কাতাদা, ইবনে যায়েদ ও দাহ্হাক (রা)-এর মতে এর অর্থ মুক্তা। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ আরবীতে এ শব্দটি প্রবাল অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২১. মূল আয়াতের ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে يَخْرُجُ مِنْهُمَا "উভয় সমুদ্র থেকেই পাওয়া যায়"। কেউ কেউ এতে আপত্তি উত্থাপন করে বলেন, মুক্তা ও প্রবাল পাথর তো কেবল লবণাক্ত পানিতেই পাওয়া যায়। সুতরাং লবণাক্ত ও সুপেয় উভয় প্রকারের পানি থেকেই এ দু'টি পাওয়া যায় তা কি করে বলা হলো? এর জবাব হচ্ছে, মিঠা ও লবণাক্ত উভয় প্রকার পানিই সমুদ্রে জমা হয়। অতএব যদি বলা হয়, একত্রে সঞ্চিত এ পানি থেকে এ গুলো পাওয়া যায় কিংবা যদি বলা হয়, তা উভয় প্রকার পানি থেকেই পাওয়া যায় তাহলে কথা একই থেকে যায়। তাছাড়া আরো গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে যদি প্রমাণিত হয় যে, মুক্তা ও প্রবাল পাথর সমুদ্র গর্ভে এমন স্থানে উৎপন্ন হয় যেখানে তার গভীর তলদেশে মিঠা পানির ধারা প্রবাহিত হচ্ছে এবং তার সৃষ্টি ও পরিণতি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যুগপৎ উভয় প্রকার পানির ভূমিকা ও অবদান আছে তাহলে তাতেও বিস্ময়ের কিছু নেই। বাহরাইনে যেখানে সুপ্রাচীন কাল থেকে মুক্তা আহরণ করা হয় সেখানে উপসাগরের তলদেশে মিঠা পানির ঝর্ণা প্রবাহিত আছে বলে প্রমাণিত হয়েছে।

২২. এখানেও الاء শব্দের দ্বারা যদিও আল্লাহর অসীম ক্ষমতার' দিকটিই বেশী স্পষ্ট তা সত্ত্বেও নিয়ামত ও মহত গুণাবলী অর্থটাও অস্পষ্ট নয়।। এটা আল্লাহর নিয়ামত যে, এসব মূল্যবান বস্তু সমুদ্র থেকে পাওয়া যায়। তাছাড়া এটা তাঁর প্রতিপালক সুলভ মহত গুণ যে, তার যে সৃষ্টিকে তিনি রূপ ও সৌন্দর্যের পিপাসা দিয়েছেন সে পিপাসা নিবারণের জন্য তিনি তাঁর পৃথিবীতে নানা রকমের সুন্দর বস্তুও সৃষ্টি করেছেন।

২৩. অর্থাৎ এসব সমুদ্রগামী জাহাজ তাঁরই অসীম ক্ষমতায় সৃষ্টি হয়েছে। তিনিই মানুষকে সমুদ্র পাড়ি দেয়ার জন্য জাহাজ নির্মাণের যোগ্যতা দান করেছেন আর তিনিই পানিকে এমন নিয়ম-কানুনের অধীন করে দিয়েছেন যার কারণে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র বক্ষ চিরে পাহাড়ের ন্যায় বড় বড় জাহাজের চলাচল সম্ভব হয়েছে।

২৪. এখানে الاء শব্দের মধ্যে নিয়ামত ও অনুগ্রহ অর্থটি স্পষ্ট। তবে উপরের ব্যাখ্যা থেকে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এর অসীম ক্ষমতা ও উত্তম গুণাবলী প্রকাশের দিকটিও বর্তমান।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ فَبِأَيِّ
آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ
فِي شَأْنٍ ﴿٢٩﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٠﴾

২ রুকূ'

এ ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি জিনিসই[২৫] ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমার মহীয়ান ও দয়াবান রবের সত্তাই শুধু অবশিষ্ট থাকবে। অতএব, হে জিন ও মানুষ তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ পূর্ণতাকে অস্বীকার করবে?[২৬] পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলে যা-ই আছে সবাই তাঁর কাছে নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করছে। প্রতি মুহূর্তে তিনি নতুন নতুন কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত।[২৭] হে জিন ও মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ মহত গুণাবলী অস্বীকার করবে?[২৮]

২৫. এখান থেকে ৩০ আয়াত পর্যন্ত জিন ও মানুষকে দু'টি মহা সত্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

এক ঃ তোমরা নিজেরাও অবিনশ্বর নও, সেই সব সাজ-সরঞ্জামও চিরস্থায়ী নয়, যা তোমরা এ পৃথিবীতে ভোগ করছো। অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী শুধুমাত্র মহা সম্মানিত ও সুমহান আল্লাহর সত্তা, এ বিশাল বিশ্ব-জাহান যার সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং যাঁর বদান্যতায় তোমাদের ভাগ্যে এসব নিয়ামত জুটেছে। এখন যদি তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ "আমার চেয়ে কেউ বড় নেই" এই গর্বে গর্বিত হয় তাহলে এটা তার বুদ্ধির সংকীর্ণতা ছাড়া কিছুই নয়। কোন নির্বোধ যদি তার ক্ষমতার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ডঙ্কা বাজায়, কিংবা কতিপয় মানুষ তার কর্তৃত্ব স্বীকার করায় সে তাদের খোদা হয়ে বসে, তাহলে তার এ মিথ্যার বেসাতী কত দিন চলতে পারে? মহাবিশ্বের বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে পৃথিবীর অনুপাত যেখানে মটরশুটির দানার মতও নয় তার এক নিভৃত কোণে দশ বিশ কিংবা পঞ্চাশ ষাট বছর যে কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব চলে এবং তারপরই অতীত কাহিনীতে রূপান্তরিত হয় তা এমন কোন্ কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব যার জন্য কেউ গর্ব করতে পারে?

দুই ঃ যে গুরুত্বপূর্ণ মহাসত্য সম্পর্কে জিন ও মানুষ—এ দু'টি সৃষ্টিকে সাবধান করা হয়েছে তা হচ্ছে, মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহ ছাড়া তোমরা আর যেসব সত্তাকেই উপাস্য, বিপদে রক্ষাকারী ও অভাব মোচনকারী হিসেবে গ্রহণ করে থাক তারা ফেরেশতা, নবী-রসূল, অলী-দরবেশ কিংবা চন্দ্র-সূর্য বা অন্য কোন সৃষ্টি যাই হোক না কেন তাদের কেউই তোমাদের কোন প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম নয়। অভাব মোচন ও প্রয়োজন পূরণের জন্য ওরা নিজেরাই তো মহান আল্লাহর মুখাপেক্ষী। তাদের নিজেদের হাতই তার সামনে প্রসারিত। তারা নিজেদের ক্ষমতায় নিজেদের বিপদই যেখানে দূর করতে পারেন সেখানে সে তোমাদের বিপদ মোচন কি করে করবে? পৃথিবী থেকে আকাশ

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿٣١﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٢﴾ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ
وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٣٣﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٤﴾
يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ﴿٣٥﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٦﴾

ওহে পৃথিবীর দুই বোঝা[২৯] তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমি অতি শীঘ্রই তোমাদের প্রতি একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করবো।[৩০] (তারপরে দেখবো) তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করো?[৩১] হে জিন ও মানব গোষ্ঠী, তোমরা যদি পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলের সীমা পেরিয়ে কোথাও পালিয়ে যেতে পার তাহলে গিয়ে দেখ। পালাতে পারবে না, এ জন্য বড় শক্তি প্রয়োজন।[৩২] তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ অসীম ক্ষমতাকে অস্বীকার করবে? (যদি পালানোর চেষ্টা করো তাহলে) তোমাদের প্রতি আগুনের শিখা এবং ধোঁয়া[৩৩] ছেড়ে দেয়া হবে তোমরা যার মোকাবিলা করতে পারবে না। হে জিন ও মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ ক্ষমতাকে অস্বীকার করবে?

মণ্ডল পর্যন্ত বিশাল বিস্তৃত এই মহাবিশ্বে যা কিছু হচ্ছে, শুধু এক আল্লাহর নির্দেশেই হচ্ছে। মহান এ কর্মকাণ্ডে আর কারো কোন কর্তৃত্ব ও আধিপত্য নেই। তাই কোন ব্যাপারেই সে কোন বান্দার ভাগ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

২৬. পরিবেশ ও ক্ষেত্র থেকে স্পষ্ট যে, اَلثَّقَلٰن শব্দটি এখানে পরিপূর্ণতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নশ্বর সৃষ্টিকুলের মধ্যে যাকেই তার নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকায় পেয়ে বসে এবং নিজের ক্ষুদ্র ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে অবিনশ্বর মনে করে গর্বে স্ফীত হয়ে উঠে সে মুখে না বললেও নিজের কর্মকাণ্ড দ্বারা সে বিশ্বপালনকর্তা মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বকে অবশ্যই অস্বীকার করে। তার গর্ব আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের পরিপন্থী তথা অস্বীকৃতি। নিজের মুখে সে পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের যে দাবীই করে কিংবা মনের মধ্য যে দাবী সুপ্ত রাখে তা পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃত দাবীদারের পদমর্যাদা ও সম্মানকে অস্বীকার করার শামিল।

২৭. অর্থাৎ মহাবিশ্বের এ কর্মক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে তাঁরই কর্মতৎপরতার এক সীমাহীন ধারাবাহিকতা চলছে। কাউকে তিনি মারছেন আবার কাউকে জীবন দান করছেন। কারো উত্থান ঘটাচ্ছেন আবার কারো পতন ঘটাচ্ছেন, কাউকে আরোগ্য দান করছেন আবার কাউকে রোগাক্রান্ত করছেন, কাউকে ডুবন্ত অবস্থা থেকে রক্ষা করছেন আবার সাতার

কেটে চলা কাউকে নিমজ্জিত করছেন। সীমা সংখ্যাহীন সৃষ্টিকে নানাভাবে রিযিক দান করছেন। অসংখ্য বস্তুকে নতুন নতুন স্টাইল, আকার-আকৃতি ও গুণ-বৈশিষ্ট দিয়ে সৃষ্টি করছেন। তাঁর পৃথিবী কখনো এক অবস্থায় অপরিবর্তিত থাকে না। তাঁর পরিবেশ ও অবস্থা প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তার স্রষ্টা তাকে প্রতিবারই একটি নতুন রূপে সজ্জিত করেন যা পূর্বের সব আকার-আকৃতি থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে।

২৮. এখানে الاء শব্দের 'গুণাবলী' অর্থটিই অধিক উপযুক্ত বলে মনে হয়। কোন ব্যক্তি যখনই কোন প্রকার শিরকে লিপ্ত হয় তখন সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার কোন না কোন গুণকে অস্বীকার করে। কেউ যদি বলে অমুক ব্যক্তি আমাকে রোগমুক্ত করেছেন তাহলে প্রকৃতপক্ষে তার অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ রোগ আরোগ্যকারী নন, বরং সেই ব্যক্তিই রোগ আরোগ্যকারী। কেউ যদি বলে, অমুক বুযুর্গ ব্যক্তির অনুগ্রহে আমি রুজি লাভ করেছি। তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে যেন বললো, আল্লাহ তা'আলা রিযিকদাতা নন বরং সেই বুযুর্গ ব্যক্তি রিযিক দাতা। কেউ যদি বলে, অমুক আস্তানা থেকে আমার উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে, তাহলে সে যেন বললো, পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুম চলছে না, বরং ঐ আস্তানার হুকুম চলছে। মোটকথা প্রতিটি শিরকমূলক আকীদা ও শিরকমূলক কথাবার্তা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে আল্লাহর গুণাবলীর অস্বীকৃতির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। শিরকের অর্থই হচ্ছে ব্যক্তি অন্যদের সর্বশ্রোতা, সর্বদর্শী, অদৃশ্য জ্ঞাতা, স্বাধীনভাবে কর্মসম্পাদনকারী, সর্বশক্তিমান এবং খোদায়ীর অন্য সব গুণে গুণান্বিত বলে আখ্যায়িত করছে এবং এককভাবে আল্লাহই যে এসব গুণে গুণান্বিত তা অস্বীকার করছে।

২৯. মূল আয়াতে ثَقَلَانِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মূল ধাতু ثقل । ثقل অর্থ বোঝা। আর ثقل বলা হয় এমন বোঝাকে যা সওয়ারী বা বাহনের ওপর চাপানো হয়েছে। ثقلين শব্দের শাব্দিক অনুবাদ হবে "দুই বোঝা" এখানে এ শব্দটি জিন ও মানুষকে বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, এ দু'টি জাতিকেও পৃথিবী পৃষ্ঠে বোঝা হিসেবে চাপানো হয়েছে এবং পূর্ব থেকে সেই সব জিন ও মানুষকে উদ্দেশ করেই কথা বলা হচ্ছে যারা তাদের রবের আনুগত্য ও দাসত্ব থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তাছাড়া পরবর্তী ৪৫ আয়াতেও তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। সে জন্য তাদেরকে اَيُّهَا الثَّقَلَانِ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ স্রষ্টা যেন তাঁর এই দু'টি অযোগ্য সৃষ্টিকে বলছেন ঃ তোমরা যারা আমার পৃথিবীর ওপর বোঝা হয়ে আছ, তোমাদের সাথে বুঝাপড়ার জন্য অবসর গ্রহণ করবো।

৩০. এখন আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যস্ত যে এসব অবাধ্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করার অবকাশ তিনি পান না, একথার অর্থ তা নয়। প্রকৃতপক্ষে একথার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ একটি বিশেষ সময়সূচী নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সেই সময়সূচী অনুসারে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তিনি এ পৃথিবীতে মানুষ ও জিনদের বংশের পর বংশ সৃষ্টি করতে থাকবেন এবং তাদেরকে পৃথিবীর এ পরীক্ষাগারে এনে কাজ করার সুযোগ দেবেন। তারপর একটা নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষার এ ধারা হঠাৎ বন্ধ করে দেয়া হবে এবং সে সময়ে বিদ্যমান সমস্ত জিন ও মানুষকে একই সময়ে হঠাৎ ধ্বংস করে দেয়া হবে। তারপর মানব ও জিন উভয়

জাতির জবাবদিহির জন্য তার কাছে আরো একটি সময় নির্দিষ্ট করা আছে। সেই সময় জিন ও মানব জাতির সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ লোকদেরকে পুনরায় জীবিত করে একই সময় একত্রিত করা হবে। এ সময়সূচীর প্রতি লক্ষ রেখে বলা হয়েছে, এখনো আমি প্রথম পর্যায়ের কাজ করছি। দ্বিতীয় পর্যায়ের সময় এখনো আসেনি। তাই তৃতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করার কোন প্রশ্নই আসে না। তবে ঘাবড়াবে না। খুব শীঘ্রই সে সময়টি এসে যাচ্ছে যখন আমি তোমাদের খবর নেয়ার জন্য অবসর নেব। এখানে অবসরহীনতার অর্থ এই নয় যে, এখন কোন কাজ আল্লাহ তা'আলাকে এমনভাবে ব্যস্ত রেখেছে যে, অন্য কাজ করার অবকাশই তিনি পাচ্ছেন না। বরং এর ধরন ও প্রকৃতি হচ্ছে, যেন কেউ বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য একটি সময়সূচী প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং সেই অনুসারে যে কাজের সময় এখনো আসেনি সে কাজ সম্পর্কে বলছেন, আমি সে কাজের জন্য আদৌ প্রস্তুত নই।

৩১. এখানে ءال শব্দটিকে "অসীম ক্ষমতা" অর্থেও গ্রহণ করা যেতে পারে। বক্তব্যের ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ করলে আলাদা আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে এ দু'টি অর্থই সঠিক বলে মনে হয়। একটি অর্থ গ্রহণ করলে তার সারকথা দাঁড়ায় এই যে, আজ তোমরা আমার নিয়ামতের নাশোকরী করছো এবং কুফর, শির্ক, নাস্তিকতা, পাপাচার ও নাফরমানীর বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে নানা রকমের নেমকহারামী করে চলেছো। কিন্তু কাল যখন জবাবদিহির পালা আসবে তখন দেখবো আমার কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা আকস্মিক দুর্ঘটনা কিংবা নিজেদের যোগ্যতার ফল বা কোন দেব-দেবী অথবা বুযুর্গের অনুগ্রহের দান বলে প্রমাণ করো। অন্য অর্থটি গ্রহণ করলে তার সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, আজ তোমরা কিয়ামত, হাশর-নাশর, হিসেব-নিকেশ এবং জান্নাত ও জাহান্নাম নিয়ে হাসি-তামাসা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছো এবং নিজ থেকেই এ অমূলক ধারণা নিয়ে বসে আছ যে, এরূপ হওয়া সম্ভবই নয়। কিন্তু আমি যখন তোমাদেরকে পরিবেষ্ঠিত করে ধরে আনবো এবং আজ যা তোমরা অস্বীকার করছো তা সবই তোমাদের সামনে এসে হাজির হবে সে সময় আমি দেখে নেব তোমরা আমার কোন্ কোন্ অসীম ক্ষমতাকে অস্বীকার করে থাকো।

৩২. যমীন ও আসমান অর্থ গোটা সৃষ্টিজগত অথবা অন্য কথায় আল্লাহর প্রভুত্ব। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়ার সাধ্য তোমাদের নেই। যে জবাবদিহি সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করা হচ্ছে তার সময় যখন আসবে তখন তোমরা যেখানেই থাক না কেন পাকড়াও করে আনা হবে। এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোমাদেরকে আল্লাহর প্রভুত্বাধীন এলাকা থেকে চলে যেতে হবে। কিন্তু সে ক্ষমতা তোমাদের নেই। তোমরা যদি মনে এ ধরনের অহমিকা পোষণ করে থাক তাহলে সর্বশক্তি নিয়োগ করে দেখ।

৩৩. মূল আয়াতে شواظ ও نحاس শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়েছে। এমন নিরেট অগ্নি-শিখাকে شواظ বলা হয় যার মধ্যে ধোঁয়া থাকে না আর এমন নিরেট ধোঁয়াকে نحاس বলা হয় যার মধ্যে অগ্নিশিখা থাকে না। জিন ও মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার সামনে জবাবদিহি থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করবে তখন তাদের প্রতি একের পর এক এ দু'টি জিনিস নিক্ষেপ করা হবে।

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ ﴿٣٨﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿٣٩﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٠﴾ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي
وَالْأَقْدَامِ ﴿٤١﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٢﴾ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ
بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٤٣﴾ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ ﴿٤٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ ﴿٤٥﴾

অতপর (কি হবে সেই সময়) যখন আসমান ফেটে চৌচির হয়ে যাবে এবং লাল চামড়ার মত লোহিত বর্ণ ধারণ করবে?[৩৪] হে জিন ও মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ ক্ষমতা অস্বীকার করবে?[৩৫]

সে দিন কোন মানুষ ও কোন জিনকে তার গোনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবে না।[৩৬] তখন (দেখা যাবে) তোমরা দুই গোষ্ঠী তোমাদের রবের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করো।[৩৭] সেখানে চেহারা দেখেই অপরাধীকে চেনা যাবে এবং তাদেরকে মাথার সম্মুখভাগের চুল ও পা ধরে হিঁচড়ে টেনে নেয়া হবে। সেই সময় তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ ক্ষমতাকে অস্বীকার করবে? সেই (সময় বলা হবে) এতো সেই জাহান্নাম অপরাধীরা যা মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করতো। তারা ঐ জাহান্নাম ও ফুটন্ত টগবগে পানির উৎসের মধ্যে যাতায়াত করতে থাকবে।[৩৮] তারপরেও তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ ক্ষমতাকে অস্বীকার করবে?[৩৯]

৩৪. এখানে কিয়ামতের দিনের কথা বলা হয়েছে। আসমান বিদীর্ণ হওয়ার অর্থ মহাকাশ বা মহাবিশ্বের মধ্যকার পারস্পরিক আকর্ষণ না থাকা, মহাকাশের সমস্ত সৌরজগতের বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া, মহাজগতের সমস্ত নিয়ম-শৃংখলা ধ্বংস হয়ে যাওয়া। আরো বলা হয়েছে, সে সময় আসমান লাল চামড়ার মত বর্ণধারণ করবে। অর্থাৎ সেই মহাপ্রলয়ের সময় যে ব্যক্তি পৃথিবী থেকে আসমানের দিকে তাকাবে তার মনে হবে গোটা উর্ধজগতে যেন আগুন লেগে গিয়েছে।

৩৫. অর্থাৎ আজ তোমরা বলছো কিয়ামত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের মতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত সংঘটিত করতে সক্ষম নন। কিন্তু যখন তা

সংঘটিত হবে এবং আজ তোমাদেরকে যে খবর দেয়া হচ্ছে নিজের চোখে তা সংঘটিত হতে দেখবে তখন আল্লাহর কোন্ কোন্ ক্ষমতাকে অস্বীকার করবে?

৩৬. পরবর্তী আয়াতের অর্থাৎ "চেহারা দেখেই সেখানে অপরাধীদের চেনা যাবে" কথাটিই এর ব্যাখ্যা। অর্থাৎ সেই মহাসমাবেশে সমস্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষকে একত্রিত করা হবে। অপরাধীদের চেনার জন্য সেখানে জনে জনে একথা জিজ্ঞেস করার দরকার হবে না যে, তারা কে কে অপরাধী কিংবা কোন জিন ও মানুষকে, সে অপরাধী কিনা একথা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন পড়বে না। অপরাধীদের শুষ্ক ম্লান মুখ ভীতি ভরা দু'টি চোখ, অস্থির অপ্রস্তুত ভাবভঙ্গি এবং ঘর্মসিক্ত হওয়াই তাদের অপরাধী হওয়ার গোপন রহস্য উদঘাটিত করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। অপরাধী ও নিরপরাধ এ উভয় শ্রেণীর লোকের একটি দল যদি পুলিশের কবলে পড়ে তাহলে নিরপরাধ লোকদের চেহারার প্রশান্তি ও নিরুদ্বিগ্নতা এবং অপরাধীদের চেহারার অস্থিরতা ও উদ্বিগ্নতা প্রথম দর্শনেই বলে দেবে ঐ দলে কে অপরাধী আর কে নিরপরাধ। দুনিয়াতে এ নিয়ম কোন কোন সময় ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। কারণ দুনিয়ার পুলিশের ন্যায়নিষ্ঠতার ব্যাপারে মানুষ আস্থা রাখতে পারে না। তাদের হাতে বরং অপরাধীদের চেয়ে নিরপরাধরাই বারবার বেশী করে হয়রানির শিকার হয়। তাই পৃথিবীতে পুলিশের কবলে পড়ে ভদ্র ও নিরপরাধ লোকদের অধিক ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়া সম্ভব। কিন্তু আখেরাতে আল্লাহ তা'আলার ন্যায়বিচারের প্রতি প্রতিটি ভদ্র ও নিরপরাধ ব্যক্তিরই পূর্ণ আস্থা থাকবে। এ ধরনের অস্থিরতা ও উদ্বেগ থাকবে কেবল তাদেরই যাদের নিজের বিবেকই তাদের অপরাধী হওয়া সম্পর্কে অবহিত থাকবে। হাশরের ময়দানে উপস্থিত হওয়া মাত্র তারা এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, এখন তাদের সেই দুর্ভাগ্য এসে গিয়েছে যাকে তারা অসম্ভব ও সন্দেহজনক মনে করে দুনিয়াতে অপরাধ করে বেড়িয়েছে।

৩৭. কুরআনের দৃষ্টিতে অপরাধের প্রকৃত ভিত্তি হলো, বান্দা আল্লাহর দেয়া যেসব নিয়ামত ভোগ করছে সেসব নিয়ামত সম্পর্কে তার এ ধারণা পোষণ যে, তা কারো দেয়া নয়, বরং সে এমনিই তা লাভ করেছে। কিংবা এসব নিয়ামত আল্লাহর দান নয়, বরং নিজের যোগ্যতা ও সৌভাগ্যের ফল। অথবা একথা মনে করা যে, এসব নিয়ামত আল্লাহর দান বটে, কিন্তু সেই আল্লাহর তাঁর বান্দার ওপর কোন অধিকার নেই। অথবা আল্লাহ নিজে তার প্রতি এসব অনুগ্রহ দেখাননি। বরং অন্য কোন সত্তা তাকে দিয়ে তা করিয়েছেন। এসব ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে মানুষ আল্লাহ বিমুখ এবং তাঁর আনুগত্য ও দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে পৃথিবীতে এমন সব কাজ-কর্ম করে আল্লাহ যা করতে নিষেধ করেছেন এবং সেসব কাজ করে না আল্লাহ যা করতে আদেশ দিয়েছেন। এ বিচারের প্রতিটি অপরাধ ও প্রতিটি গোনাহর মূলগতভাবে আল্লাহ তা'আলার দান ও অনুগ্রহের অস্বীকৃতি ও অবমাননা। এ ক্ষেত্রে কেউ মুখে তা মানুক বা অস্বীকার করুক তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু প্রকৃতই যে ব্যক্তি অস্বীকৃতি ও অবমাননার ইচ্ছা ও মনোবৃত্তি পোষণ করে না, বরং তার মনের গভীরে তার সত্য হওয়ার বিশ্বাস সদা বর্তমান, মানবিক দুর্বলতার কারণে কোন সময় তার দ্বারা ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে সে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তা থেকে নিজেকে রক্ষা

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿٤٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٧﴾ ذَوَاتَآ
اَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٩﴾ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ﴿٥٠﴾ فَبِاَيِّ
اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥١﴾ فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ﴿٥٢﴾

৩ রুকূ'

আর যারা তাদের প্রভুর সামনে হাজির হওয়ার ব্যাপারে ভয় পায়[৪০] তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে দু'টি করে বাগান।[৪১] তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অস্বীকার করবে?[৪২] তরুতাজা লতাপাতা ও ডালপালায় ভরা। তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অস্বীকার করবে? উভয় বাগানে দু'টি ঝর্ণা প্রবাহিত থাকবে। তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অস্বীকার করবে? উভয় বাগানের প্রতিটি ফলই হবে দু' রকমের।[৪৩]

করার চেষ্টা করে। এ জিনিসটি তাকে অস্বীকারকারীদের অন্তরভুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। এ ছাড়া আর সব অপরাধীই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিয়ামতসমূহ অবিশ্বাসকারী এবং তাঁর দয়া ও অনুগ্রহসমূহ অস্বীকারকারী। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ যখন তোমরা অপরাধী হিসেবে ধরা পড়বে তখন আমি দেখবো তোমরা আমার কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করছো। একথাটিই সূরা "তাকাসূরে" এভাবে বলা হয়েছে ঃ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ তোমাদেরকে যেসব নিয়ামত দেয়া হয়েছিল সেদিন ঐ গুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অর্থাৎ জিজ্ঞেস করা হবে, আমিই তোমাদেরকে এসব নিয়ামত দিয়েছিলাম কিনা। ঐ সব নিয়ামত লাভ করার পর তোমরা তোমাদের অনুগ্রহকারীর প্রতি কি আচরণ করেছিলে, আর ঐ সব নিয়ামতকে কিভাবে কাজে লাগিয়েছিলে?

৩৮. অর্থাৎ জাহান্নামের মধ্যে বারবার পিপাসার্ত হওয়ার কারণে তাদের অবস্থা হবে অত্যন্ত করুণ। দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে পানির ঝর্ণার দিকে যাবে। কিন্তু সেখানে পাবে টগবগে গরম পানি যা পান করে পিপাসা মিটবে না। এভাবে জাহান্নাম ও পানির ঝর্ণাসমূহের মাঝে যাতায়াত করেই তাদের জীবন কাটতে থাকবে।

৩৯. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে কিয়ামত সংঘটিত করতে পারেন, মৃত্যুর পর তোমাদেরকে আরেকটি জীবন দিতে পারেন, তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারেন এবং যে জাহান্নামে আজ তোমরা শাস্তি ভোগ করছো তাও বানাতে পারেন, তখনও কি তোমরা একথা অস্বীকার করতে পারবে?

৪০. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে পৃথিবীতে জীবন যাপন করেছে, সবসময় যার এ উপলব্ধি ছিল যে, পৃথিবীতে আমাকে দায়িত্বহীন এবং লাগাম বিহীন উটের মত মুক্ত স্বাধীন করে ছেড়ে দেয়া হয়নি। আমাকে একদিন আমার রবের সামনে দাঁড়াতে হবে

এবং নিজের সব কাজ-কর্মের হিসেব দিতে হবে। এ আকীদা-বিশ্বাস যার মধ্যে থাকবে অনিবার্যভাবেই সে প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে রক্ষা পাবে, এলোপাথাড়ি যে কোন পথ ধরেই চলতে শুরু করবে না। ন্যায় ও অন্যায়, জুলুম ও ইনসাফ পাক ও না-পাক এবং হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য করবে। আর জেনে বুঝে আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না। পরে যে প্রতিদানের কথা বলা হচ্ছে এটাই তার প্রকৃত কারণ।

৪১. জান্নাত শব্দের শাব্দিক অর্থ বাগান। আখেরাতের জীবনে সৎমানুষদেরকে যেখানে রাখা হবে কুরআন মজীদের কোথাও সেই পুরো স্থানটাকে জান্নাত বলা হয়েছে। অর্থাৎ তা যেন সবটাই একটা বাগান। কোথাও বলা হয়েছে তাদের জন্য থাকবে বাগানসমূহ যার পাদদেশ দিয়ে নদী ও ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে। এর অর্থ সেই বিশাল বাগানের মধ্যে ছোট ছোট অনেক বাগান হবে। আর এখানে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, সেই বিশাল বাগানের মধ্যে প্রত্যেক নেক্কার ব্যক্তিকে দু'টি করে বাগান দেয়া হবে। ঐ দু'টি বাগান কেবল তার জন্যই নির্দিষ্ট হবে। তার মধ্যে থাকবে তার প্রাসাদ। সেখানে সে তার চাকর-বাকর ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে বাদশাহী ঠাটবাট ও জাঁকজমকের সাথে অবস্থান করবে। তাকে যেসব সাজ-সরঞ্জাম দেয়ার কথা পরে বলা হয়েছে সেখানেই তাকে তা সরবরাহ করা হবে।

৪২. এখান থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত ﴿آلاء﴾ শব্দটি নিয়ামতরাজি ও অসীম ক্ষমতা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া এর মধ্যে মহত গুণাবলীর দিকটিও প্রতিভাত হয়েছে। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করা হলে বর্ণনার এ ধারাবাহিকতার মধ্যে এ বাক্যাংশটি বারবার উল্লেখ করার অর্থ হবে তোমরা অস্বীকার করতে চাইলে করতে থাক। আল্লাহভীরু লোকেরা তাদের রবের পক্ষ থেকে এসব নিয়ামত অবশ্যই লাভ করবেন। দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা হলে তার সারকথা হবে, তোমাদের মতে আল্লাহ তা'আলার জান্নাত তৈরী করা এবং সেখানে তাঁর নেক বান্দাহদেরকে এসব নিয়ামত দান করা অসম্ভব হয়ে থাকলে হোক। কিন্তু আল্লাহ নিশ্চিতভাবে তা করতে সক্ষম এবং তিনি অবশ্যই তা করবেন। তৃতীয় অর্থ অনুসারে এর তাৎপর্য হচ্ছে, তোমরা মনে কর আল্লাহ তা'আলা ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করেন না। তোমাদের কথা অনুসারে এর অর্থ দাঁড়ায়, তিনি এ বিশাল পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ঠিকই। কিন্তু এখানে কেউ জুলুম করলো না ইনসাফ, ন্যায় ও সত্যের জন্য কাজ করলো না বাতিলের জন্য এবং অকল্যাণের প্রসার ঘটালো না কল্যাণের তার কোন পরোয়াই তিনি করেন না। তিনি জালেমকেও শাস্তি দেন না, মজলুমের ফরিয়াদও শোনেন না। ভালো কাজের মূল্যও বুঝেন না, মন্দ কাজকেও ঘৃণা করেন না। তোমাদের ধারণা অনুসারে তিনি অক্ষমও বটে। তিনি যমীন ও আসমান ঠিকই বানাতে পারেন, কিন্তু জালেমদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য দোজখ এবং ন্যায় ও সত্যের অনুসারীদের প্রতিদান দেয়ার জন্য জান্নাত নির্মাণ করতে সক্ষম নন। তাঁর এসব মহত গুণাবলীকে আজ যত ইচ্ছা তোমরা অস্বীকার করতে থাকো। কাল যখন তিনি সত্যি সত্যি জালেমদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন এবং ন্যায় ও সত্যের অনুসারীদেরকে জান্নাতে এসব নিয়ামত দান করবেন, সে সময়ও কি তোমরা তার এসব গুণাবলী অস্বীকার করতে পারবে?

৪৩. একথার একটা অর্থ হতে পারে এই যে, উভয় বাগানের ফলই হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্টপূর্ণ। এক বাগানে গেলে গাছের শাখা প্রশাখায় প্রচুর ফল দেখতে

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٥﴾ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۢ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ
وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٦٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٧﴾ فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ
الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٦٨﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٩﴾ كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٧٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿٧١﴾

তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অস্বীকার করবে? জান্নাতের বাসিন্দারা এমন সব ফরাশের ওপর হেলান দিয়ে বসবে যার আবরণ হবে পুরু রেশমের[৪৪] এবং বাগানের ছোট ছোট শাখা-প্রশাখা ফলভারে নুয়ে পড়তে থাকবে। তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? এসব নিয়ামতের মধ্যে থাকবে লজ্জাবনত চক্ষু বিশিষ্টা ললনারা[৪৫] যাদেরকে এসব জান্নাতবাসীদের আগে কোন মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি।[৪৬] তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অস্বীকার করবে? এমন সুদর্শনা, যেমন হীরা এবং মুক্তা। তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে?

পাবে। অপর বাগানে গেলে সেখানকার ফলের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন দেখতে পাবে। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে এর প্রতিটি বাগানের এক প্রকারের ফল হবে তার পরিচিত। তার সাথে সে দুনিয়াতেও পরিচিত ছিল—যদিও তা স্বাদে দুনিয়ার ফল থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ হবে। আর আরেক প্রকার ফল হবে বিরল ও অভিনব জাতের—দুনিয়ায় যা সে কোন সময় কল্পনাও করতে পারেনি।

৪৪. অর্থাৎ তার আবরণই যেখানে এরূপ সেখানে তার ওপরের আচ্ছাদনকারী চাদর কেমন হবে তা অনুমান করে দেখ।

৪৫. নারীর প্রকৃত সৌন্দর্য হচ্ছে লজ্জাহীনা ও বাচাল না হওয়া এবং সলজ্জ দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া। এ কারণে জান্নাতের নিয়ামতসমূহের অন্যতম নিয়ামত নারী সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম তার রূপ ও সৌন্দর্যের কথা না বলে তার লজ্জাশীলতা ও সতীত্বের প্রশংসা করেছেন। সুন্দরী মেয়েরা তো নারী ও পুরুষের যৌথ ক্লাব-সমূহে এবং চলচ্চিত্র নির্মাণ কেন্দ্র চিত্রপুরীতেও সমবেত হয়ে থাকে। আর সুন্দরী প্রতিযোগিতায় বেছে বেছে সুন্দরী নারীদের নিয়ে আসা হয়। কিন্তু শুধু বিকৃত রুচিবোধ সম্পন্ন ও দুশ্চরিত্র লোকেরাই এদের ব্যাপারে আগ্রহী হতে পারে। যে সুন্দরী নারী যে কোন কাম দৃষ্টিকে তার সৌন্দর্য ভোগের আহবান জানায় এবং যে কোন বাহু বন্ধনে আবদ্ধ হতে প্রস্তুত হয় তা কোন ভদ্র ও রুচিবান মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে না।

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ﴿٦٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦١﴾
وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ﴿٦٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٣﴾ مُدْهَامَّتٰنِ ﴿٦٤﴾
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٥﴾ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ﴿٦٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٧﴾ فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٩﴾
فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾

সদাচারের প্রতিদান সদাচার ছাড়া আর কি হতে পারে?[৪৭] হে জিন ও মানুষ, এরপরও তোমরা তোমাদের রবের মহত গুণাবলীর কোন্ কোন্‌টি অস্বীকার করবে?[৪৮]

ঐ দু'টি বাগান ছাড়া আরো দু'টি বাগান থাকবে।[৪৯] তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে? নিবিড়, শ্যামল-সবুজ ও তরুতাজা বাগান।[৫০] তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে। উভয় বাগানের মধ্যে দু'টি ঝর্ণাধারা ফোয়ারার মত উৎক্ষিপ্ত হতে থাকবে। তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে। সেখানে থাকবে প্রচুর পরিমাণে ফল, খেজুর ও আনার। তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে? এসব নিয়ামতের মধ্যে থাকবে সচ্চরিত্রের অধিকারীনী সুন্দরী স্ত্রীগণ।

৪৬. এর অর্থ, পার্থিব জীবনে কোন নারী কুমারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে থাকুক কিংবা কারো স্ত্রী থেকে থাকুক যৌবনে মৃত্যুবরণ করে থাকুক কিংবা বৃদ্ধাবস্থায় দুনিয়া ছেড়ে যেয়ে থাকুক, এসব নেক্‌কার নারীরা আখেরাতে যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তাদেরকে যুবতী ও কুমারী বানিয়ে দেয়া হবে। সেখানে তাদের মধ্য থেকে যাকেই কোন নেক্‌কার পুরুষের জীবন সঙ্গিনী বানানো হবে জান্নাতে সে তার জান্নাতী স্বামীর পূর্বে আর কারো সাহচর্য লাভ করবে না।

এ আয়াত থেকে একথাটিও জানা যায় যে, নেক্‌কার মানুষের মত নেক্‌কার জিনরাও জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সেখানে মানুষ পুরুষের জন্য যেমন মানুষ নারী থাকবে তেমনি জিন পুরুষদের জন্য জিন নারীও থাকবে। উভয়ের সাথে বন্ধনের জন্য উভয়ের নিজ প্রজাতির জোড়া বাঁধা হবে। কোন ভিন্ন প্রজাতির সৃষ্ট জীবের সাথে তাদের জোড়া বাঁধা হবে না। কারণ প্রকৃতিগতভাবেই তারা তাদের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে সক্ষম নয়। "তাদের পূর্বে কোন মানুষ বা জিন তাদের স্পর্শ করবে না" আয়াতে উল্লেখিত একথার অর্থ এ নয় যে, সেখানে নারীরা সবাই হবে মানুষ এবং তাদের জান্নাতী স্বামী স্পর্শ করার

পূর্বে তারা কোন মানুষ বা জিনের স্পর্শ লাভ করবে না। একথার প্রকৃত অর্থ হলো সেখানে জিন ও মানুষ উভয় প্রজাতির নারী থাকবে। তারা সবাই হবে লজ্জাশীলা ও অস্পর্শিতা। কোন জিন নারীও তার জান্নাতী স্বামীর পূর্বে অন্য কোন জিন পুরুষ কর্তৃক স্পর্শিতা হবে না, কোন মানুষ নারীও তার জান্নাতী স্বামীর পূর্বে অন্য কোন মানুষ পুরুষ কর্তৃক স্পর্শিতা ও অপবিত্রা হবে না।

৪৭. অর্থাৎ যেসব মানুষ আল্লাহ তা'আলার জন্য সারা জীবন পৃথিবীতে নিজেদের প্রবৃত্তির ওপর বিধি-নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে রেখেছিল, হারাম থেকে আত্মরক্ষা করে হালালের ওপর সন্তুষ্ট থেকেছে, ফরযকে ফরয মনে করে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করেছে, ন্যায় ও সত্যকে ন্যায় ও সত্য মনে করে হকদারদের হক-সমূহ আদায় করেছে এবং সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করে অন্যায় ও অকল্যাণের বিরুদ্ধে ন্যায় ও কল্যাণকে সমর্থন করেছে। আল্লাহ তাদের এসব ত্যাগ ও কুরবানীকে ধ্বংস ও ব্যর্থ করে দেবেন এবং কখনো এর কোন প্রতিদান তাদেব দেবেন না তা কি করে সম্ভব?

৪৮. একথা স্পষ্ট, যে ব্যক্তি জান্নাত ও সেখানকার প্রতিদান ও পুরস্কার অস্বীকার করে প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ তা'আলার বহুসংখ্যক উত্তম গুণাবলী অস্বীকার করে। সে আল্লাহকে মানলেও তাঁর সম্পর্কে অনেক খারাপ ধারণা পোষণ করে। তার মতে, আল্লাহ একজন অবিবেচক রাজা যার আইন-কানুন বিহীন রাজত্বে ভাল কাজ করা কোন কিছু পানিতে নিক্ষেপ করার শামিল। সে তাঁকে অন্ধ ও বধির বলে মনে করে। তাঁর বিশাল রাজ্যে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কে প্রাণ, সম্পদ, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা এবং শ্রমের কুরবানী পেশ করছে সে খবর তিনি আদৌ রাখেন না। কিংবা সে মনে করে, তিনি অনুভূতিহীন ও কোন কিছুর যথাযথ মূল্যায়ণে অক্ষম—যার কাছে ভাল-মন্দের কোন পার্থক্য নেই। অথবা তার মতে, তিনি অক্ষম ও অপদার্থ। তাঁর কাছে নেক কাজের যতই মূল্য থাক না কেন, তার প্রতিদান দেয়ার সাধ্য তাঁর নেই। এ কারণে বলা হয়েছে, আখেরাতে তোমাদের চোখের সামনে যখন নেক কাজের উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে, তখনও কি তোমরা তোমাদের রবের মহত গুণাবলী অস্বীকার করতে পারবে?

৪৯. মূল আয়াতে ব্যবহৃত বাক্যাংশ হলো ঃ من دونهما جنتن আরবী ভাষায় دون শব্দটি তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক, কোন উঁচু জিনিসের তুলনায় নীচু হওয়া অর্থে। দুই, কোন উত্তম ও উৎকৃষ্ট জিনিসের তুলনায় নিম্নমানের হওয়া অর্থে। তিন, কোন জিনিসের চেয়ে অতিরিক্ত হওয়া অর্থে। অর্থের এ ভিন্নতার কারণে বাক্যাংশের এ অর্থেরও সম্ভাবনা বিদ্যমান যে, এ দু'টি বাগান ছাড়াও প্রত্যেক জান্নাতীকে আরো দু'টি বাগান দেয়া হবে। দ্বিতীয় সম্ভাবনা হচ্ছে, এ দু'টি বাগান ওপরে উল্লেখিত বাগান দু'টির তুলনায় অবস্থান ও মর্যাদায় নীচু মানের হবে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত দু'টি বাগান হয়তো উচ্চস্থানে অবস্থিত হবে এবং এ দু'টি তার নীচে অবস্থিত হবে কিংবা প্রথমোক্ত বাগান দু'টি অতি উন্নতমানের হবে এবং তার তুলনায় এ দু'টি নিম্নমানের হবে। প্রথম সম্ভাবনা মেনে নিলে তার অর্থ হবে, ওপরে যেসব জান্নাতীদের কথা বলা হয়েছে অতিরিক্ত এ দু'টি বাগানও হবে তাদেরই। আর দ্বিতীয় অর্থের সম্ভাবনা মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে অর্থ হবে প্রথমোক্ত দু'টি বাগান হবে "মুকাররাবীন" বা আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٣﴾ حُورٌ مَّقْصُورٰتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿١٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٥﴾ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿١٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٧﴾ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿١٨﴾
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٩﴾ تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٢٠﴾

তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে? তাঁবুতে অবস্থানরত হুরগণ।[৫১] তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে? এসব জান্নাতবাসীদের পূর্বে কখনো কোন মানুষ বা জিন তাদের স্পর্শও করেনি। তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে। ঐ সব জান্নাতবাসী সবুজ গালিচা ও সূক্ষ্ম পরিমার্জিত অনুপম ফরাশের[৫২] ওপর হেলান দিয়ে বসবে। তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে? তোমার মহিমান্বিত ও দাতা রবের নাম অত্যন্ত কল্যাণময়।

বান্দাদের জন্য এবং এ দু'টি বাগান হবে "আসহাবুল ইয়ামীন"-দের জন্য। দ্বিতীয় অর্থের সম্ভাবনাটি যে কারণে দৃঢ় ভিত্তি লাভ করছে তা হলো, সূরা ওয়াকি'আয় সৎকর্মশীল মানুষদের দু'টি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটি "সাবেকীন" বা অগ্রবর্তীগণ। তাদেরকে "মুকাররাবীন" বা নৈকট্য লাভকারীও বলা হয়েছে। অপরটি "আসহাবুল ইয়ামীন"। তাদেরকে "আসহাবুল মায়মানা" নামেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং তাদের উভয় শ্রেণীর জন্য দু'টি আলাদা বৈশিষ্টের জান্নাতের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া আবু মূসা আশ'আরী থেকে তাঁর পুত্র আবু বকর যে হাদীস বর্ণনা করেছে সে হাদীসটিও এ সম্ভাবনাকে জোরদার করছে। আবু মূসা আশ'আরী বর্ণিত উক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সাবেকীন অগ্রগামী বা "মুকাররাবীন"—নৈকট্য লাভকারীদের জন্য যে দু'টি জান্নাত হবে তার পাত্র ও আসবাবপত্রসমূহের প্রতিটি জিনিস হবে স্বর্ণের। আর 'তাবেয়ীন' বা "আসহাবুল ইয়ামীন"দের জন্য যে দু'টি জান্নাত হবে তার পাত্র ও আসবাবপত্রসমূহ হবে রৌপ্যের (ফাতহুল বারী, কিতাবুত তাফসীর, তাফসীরে সূরা আর রাহমান)।

৫০. এসব বাগানের পরিচয় দানের জন্য مُدْهَامَّتَانِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। مُدْهَامَّة বলা হয় এমন ঘন নিবিড় শ্যামলতাকে যা মাত্রাতিরিক্ত হওয়ার কারণে অনেকটা কাল বর্ণ ধারণ করেছে।

৫১. 'হুর' শব্দের ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাফ্‌ফাতের তাফসীর, টীকা ২৮-২৯ এবং সূরা দুখানের তাফসীর টীকা ৪২। রাজা বাদশাহ ও আমীর উমরাদের

জন্য প্রমোদ কেন্দ্রসমূহে যে ধরনের তাঁবু খাটানো হয়ে থাকে এখানে তাঁবু বলতে সম্ভবত সেই ধরনের তাঁবু বুঝানো হয়েছে। জান্নাতবাসীদের স্ত্রীগণ সম্ভবত তাদের সাথে প্রাসাদে বাস করবে এবং তাদের জন্য বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত প্রমোদ কেন্দ্রসমূহের তাঁবুতে হুরগণ তাদের জন্য আনন্দ ফূর্তি ও আরাম-আয়েশের উপকরণ সরবরাহ করবে। আমাদের এ ধারণার ভিত্তি হচ্ছে, প্রথমে উত্তম চরিত্র ও সুদর্শনা স্ত্রীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর স্বতন্ত্রভাবে আবার হুরদের কথা উল্লেখ করার অর্থই হচ্ছে, এরা হবে স্ত্রীদের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির নারী। উম্মে সালামা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে এ ধারণা আরো দৃঢ় ভিত্তি লাভ করে। তিনি বলেছেন, "আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রসূল পৃথিবীর নারীরাই উত্তম না হুরেরা? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন ঃ হুরদের তুলনায় পৃথিবীর নারীদের মর্যাদা ঠিক ততটা বেশী যতটা বেশী মর্যাদা আবরণের চেয়ে তার ভিতরের বস্তুর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ কারণ, পৃথিবীর নারী নামায পড়েছে, রোযা রেখেছে এবং ইবাদাত-বন্দেগী করেছে।" (তাবারানী) এ থেকে জানা যায়, যেসব নারীরা দুনিয়াতে ঈমান এনেছিল এবং নেক কাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছিলো তারাই হবে জান্নাতবাসীদের স্ত্রী। তারা নিজেদের ঈমান ও নেক আমলের ফলশ্রুতিতে জান্নাতে যাবে এবং একান্ত নিজস্বভাবেই জান্নাতের নিয়ামত লাভের অধিকারিনী হবে। তারা নিজেদের ইচ্ছা ও পছন্দ অনুসারে হয় নিজেদের পূর্বতন স্বামীদের স্ত্রী হবে—যদি তারাও জান্নাতবাসী হয়। নয়তো আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অন্য কোন জান্নাতবাসী পুরুষের সাথে বিয়ে দিয়ে দেবেন যদি তারা উভয়েই পরস্পরে সাহচর্য ও বন্ধুত্ব পছন্দ করে। এরপর থাকে হুরদের বিষয়টি। তারা নিজেদের কোন নেক কাজের ফলশ্রুতিতে নিজ অধিকারের ভিত্তিতে জান্নাতবাসিনী হবে না। বরং জান্নাতের অন্যান্য নিয়ামতের মত একটি নিয়ামত হিসেবে আল্লাহ তাদেরকে যুবতী, সুন্দরী ও রূপবতী নারীর আকৃতি দিয়ে জান্নাতবাসীদেরকে নিয়ামত হিসেবে দান করবেন যাতে তারা তাদের সাহচর্য উপভোগ করতে পারে। তবে কোন অবস্থাতেই তারা জিন বা পরী শ্রেণীর কোন সৃষ্ট জীব হবে না। কারণ, মানুষ কখনো ভিন্ন প্রজাতির সান্নিধ্যে ও সাহচর্যে অভ্যস্ত ও তৃপ্ত হতে পারে না। এ কারণে খুব সম্ভব তারা হবে সেই সব নিষ্পাপ মেয়ে যারা প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেছিল। তাদের পিতা-মাতাও জান্নাত লাভ করেনি যে, সন্তান হিসেবে পিতা-মাতার সাথে জান্নাতে থাকার সুযোগ পাবে।

৫২. মূল আয়াতে عبقرى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। জাহেলী যুগের আরবীয় কিচ্ছা-কাহিনীতে জিনদের রাজধানীর নাম ছিল عبقر (আবকার)। বাংলা ভাষায় আমরা যাকে পরীস্থান বলে থাকি। এ কারণে আরবের লোকেরা প্রতিটি উৎকৃষ্ট ও দুষ্প্রাপ্য বস্তুকে عبقرى আবকারী বলতো। অর্থাৎ তা যেন পরীস্থানের বস্তু, দুনিয়ার সাধারণ কোন বস্তু তার সমকক্ষ নয়। এমনকি যে ব্যক্তি অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী, যার দ্বারা অদ্ভুত ও বিস্ময়কর কার্যাদি সম্পন্ন হয় তাদের পরিভাষায় তাকেও (عبقرى) আবকারী বলতো। ইংরেজী (Genius) শব্দটিও এ অর্থেই বলা হয়ে থাকে এ শব্দটিও আবার Geni শব্দ থেকে গৃহীত যা জিন শব্দের সমার্থক। এ কারণে আরববাসীদেরকে জান্নাতের সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্রের অস্বাভাবিক উৎকৃষ্ট ও সুন্দর হওয়ার ধারণা দেয়ার জন্য عبقرى আবকারী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

আল ওয়াকি'আ

৫৬

নামকরণ

সূরার সর্বপ্রথম আয়াতে اَلْوَاقِعَةُ শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস সূরাসমূহ নাযিলের যে পরম্পরা বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি বলেছেন ঃ প্রথমে সূরা ত্বাহা নাযিল হয়, তারপর আল ওয়াকি'আ এবং তারও পরে আশ শু'আরা (الاتقان للسيوطى) । ইকরিমাও এ পরম্পরা বর্ণনা করেছেন (بيهقى دلائل النبوة) ।

হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাক থেকে যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন তা থেকেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। কাহিনীতে বলা হয়েছে হযরত উমর (রা) যখন তাঁর বোনের ঘরে প্রবেশ করলেন তখন সূরা ত্বাহা তেলাওয়াত করা হচ্ছিলো। তাঁর উপস্থিতির আভাস পেয়ে সবাই কুরআনের আয়াত লিখিত পাতাসমূহ লুকিয়ে ফেললো। হযরত উমর (রা) প্রথমেই ভগ্নিপতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু তাকে রক্ষা করার জন্য বোন এগিয়ে আসলে তাকেও এমন প্রহার করলেন যে, তাঁর মাথা ফেটে গেল। বোনের শরীর থেকে রক্ত ঝরতে দেখে হযরত উমর (রা) অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। তিনি বললেন, তোমরা যে সহীফা লুকিয়েছো তা আমাকে দেখাও। তাতে কি লেখা আছে দেখতে চাই। তাঁর বোন বললেন, শিরকে লিপ্ত থাকার কারণে আপনি অপবিত্র وانه لايمسها الا الطاهر "কেবল পবিত্র লোকেরাই ঐ সহীফা হাতে নিতে পারে।" একথা শুনে হযরত উমর (রা) গিয়ে গোসল করলেন এবং তারপর সহীফা নিয়ে পাঠ করলেন। এ ঘটনা থেকে জানা যায় যে, তখন সূরা ওয়াকি'আ নাযিল হয়েছিল। কারণ ঐ সূরার মধ্যেই لَا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ আয়াতাংশ আছে। আর একথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, হযরত উমর (রা) হাবশায় হিজরতের পর নবুওয়াতের ৫ম বছরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে আখেরাত, তাওহীদ ও কুরআন সম্পর্কে মক্কার কাফেরদের সন্দেহ-সংশয়ের প্রতিবাদ। এক দিন যে কিয়ামত হবে, পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের সমস্ত ব্যবস্থা ধ্বংস ও লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। তারপর সমস্ত মৃত মানুষকে পুনরায় জীবিত করে

তাদের হিসেব-নিকেশ নেয়া হবে এবং সৎকর্মশীল মানুষদেরকে জান্নাতের বাগানসমূহে রাখা হবে আর গোনাহগারদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে—এসব কথাকে তারা সর্বাধিক অবিশ্বাস্য বলে মনে করতো। তারা বলতো ঃ এসব কল্পনা মাত্র। এসব বাস্তবে সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। এর জবাবে আল্লাহ বলছেন ঃ এ ঘটনা প্রকৃতই যখন সংঘটিত হবে তখন এসব মিথ্যা কথকদের কেউ-ই বলবে না যে, তা সংঘটিত হয়নি তার আগমন রুখে দেয়ার কিংবা তার বাস্তবতাকে অবাস্তব বানিয়ে দেয়ার সাধ্যও কারো হবে না। সে সময় সমস্ত মানুষ অনিবার্যরূপে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক, সাবেকীন বা অগ্রগামীদের শ্রেণী। দুই, সালেহীন বা সাধারণ নেক্কারদের শ্রেণী। এবং তিন, সেই সব মানুষ যারা আখেরাতকে অস্বীকার করতো এবং আমৃত্য কুফরী, শিরক ও কবীরা গোনাহর ওপর অবিচল ছিল। এ তিনটি শ্রেণীর সাথে যে আচরণ করা হবে ৭ থেকে ৫৬ আয়াত পর্যন্ত তা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

এরপর ৫৭ থেকে ৭৪ আয়াত পর্যন্ত তাওহীদ ও আখেরাত ইসলামের এ দু'টি মৌলিক আকীদার সত্যতা সম্পর্কে পর পর যুক্তি-প্রমান পেশ করা হয়েছে। এ দু'টি বিষয়কেই কাফেররা অস্বীকার করে আসছিলো। এ ক্ষেত্রে যুক্তি-প্রমাণ হিসেবে পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে মানুষকে তার নিজের সত্তার প্রতি যে খাবার সে খায় সে খাবারের প্রতি, যে পানি সে পান করে সে পানির প্রতি এবং যে আগুনের সাহায্যে সে নিজের খাবার তৈরী করে সে আগুনের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাকে এ প্রশ্নটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার আহবান জানানো হয়েছে যে, যে আল্লাহর সৃষ্টি করার কারণে তুমি সৃষ্টি হয়েছো যার দেয়া জীবন যাপনের সামগ্রীতে তুমি প্রতিপালিত হচ্ছো, তাঁর মোকাবিলায় তুমি স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী হওয়ার কিংবা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করার কি অধিকার তোমার আছে? তাঁর সম্পর্কে তুমি এ ধারণা করে বসলে কি করে যে, তিনি একবার তোমাকে অস্তিত্ব দান করার পর এমন অক্ষম ও অথর্ব হয়ে পড়েছেন যে, পুনরায় তোমাকে অস্তিত্ব দান করতে চাইলেও তা পারবেন না?

তারপর ৭৫ থেকে ৮২ আয়াত পর্যন্ত কুরআন সম্পর্কে তাদের নানা রকম সন্দেহ-সংশয় নিরসন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে এ উপলব্ধি সৃষ্টিরও চেষ্টা করা হয়েছে যে, হতভাগারা তোমাদের কাছে এ তো এক বিরাট নিয়ামত এসেছে। অথচ এ নিয়ামতের সাথে তোমাদের আচরণ হলো, তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করছো এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে তার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করছো না। কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে দু'টি সংক্ষিপ্ত বাক্যে অনুপম যুক্তি পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যদি কুরআন নিয়ে কেউ গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখে তাহলে তার মধ্যেও ঠিক তেমনি মজবুত ও সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা দেখতে পাবে যেমন মজবুত ও সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা আছে মহাবিশ্বের তারকা ও গ্রহরাজির মধ্যে। আর এসব একথাই প্রমাণ করে যে, যিনি এই মহাবিশ্বের নিয়ম-শৃংখলা ও বিধান সৃষ্টি করেছেন কুরআনের রচয়িতাও তিনিই। তারপর কাফেরদের বলা হয়েছে, এ গ্রন্থ সেই ভাগ্যলিপিতে উৎকীর্ণ আছে যা সমস্ত সৃষ্টির নাগালের বাইরে। তোমরা মনে করো শয়তান মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ গ্রন্থের কথাগুলো নিয়ে আসে। অথচ 'লাওহে মাহফুজ' থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যে মাধ্যমে এ কুরআন পৌঁছায় তাতে পবিত্র আত্মা ফেরেশতারা ছাড়া আর কারো সামান্যতম হাতও থাকে না।

সর্বশেষে মানুষকে বলা হয়েছে, তুমি যতই গর্ব ও অহংকার করো না কেন এবং নিজের স্বেচ্ছাচারিতার অহমিকায় বাস্তব সম্পর্কে যতই অন্ধ হয়ে থাক না কেন, মৃত্যুর মুহূর্তটি তোমার চোখ খুলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। সে সময় তুমি একান্তই অসহায় হয়ে পড়ো। নিজের পিতা-মাতাকে বাঁচাতে পার না। নিজের সন্তান-সন্ততিকে বাঁচাতে পার না। নিজের পীর ও মুর্শিদ এবং অতি প্রিয় নেতাদেরকে বাঁচাতে পার না। সবাই তোমার চোখের সামনে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে আর তুমি অসহায়ের মত দেখতে থাক। তোমার ওপরে যদি কোন উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী ও শাসক না-ই থেকে থাকে এবং পৃথিবীতে কেবল তুমিই থেকে থাক, কোন আল্লাহ না থেকে থাকে, তোমার এ ধারণা যদি ঠিক হয় তাহলে কোন মৃত্যুপথযাত্রীর বেরিয়ে যাওয়া প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পার না কেন? এ ব্যাপারে তুমি যেমন অসহায় ঠিক তেমনি আল্লাহর সামনে জবাবদিহি এবং তার প্রতিদান ও শাস্তি প্রতিহত করাও তোমার সাধ্যের বাইরে। তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর, মৃত্যুর পর প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিকে তার পরিণাম অবশ্যই ভোগ করতে জবে। "মুকাররাবীন" বা নৈকট্য লাভকারীদের অন্তরভুক্ত হলে 'মুকাররাবীনদের' পরিণাম ভোগ করবে। 'সালেহীন' বা সৎকর্মশীল হলে সালেহীনদের পরিণাম ভোগ করবে এবং অস্বীকারকারী পথভ্রষ্টদের অন্তরভুক্ত হলে সেই পরিণাম লাভ করবে যা এ ধরনের পাপীদের জন্য নির্ধারিত আছে।

আয়াত ৯৬ **সূরা আল ওয়াকি'আ–মক্কী** রুকূ' ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝١ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝٢ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝٣
إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ۝٤ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝٥ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ۝٦
وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۝٧ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝٨
وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝٩

যখন সেই মহা ঘটনা সংঘটিত হবে তখন তার সংঘটিত হওয়াকে কেউ-ই মিথ্যা বলতে পারবে না।[১] তা হবে উলট-পালটকারী মহা প্রলয়।[২] পৃথিবীকে সে সময় অকস্মাত ভীষণভাবে আলোড়িত করা হবে[৩] এবং পাহাড়কে এমন টুকরো টুকরো করে দেয়া হবে যে, তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে।

সে সময় তোমরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে।[৪]

ডান দিকের লোক।[৫] ডান দিকের লোকদের (সৌভাগ্যের) কথা আর কতটা বলা যাবে।

বাম দিকের লোক[৬] বাম দিকের লোকদের (দুর্ভাগ্যের) পরিণতি আর কি বলা যাবে।

১. এ আয়াতাংশ দ্বারা বক্তব্য শুরু করা স্বতসিদ্ধভাবেই প্রমাণ করে যে, সে সময় কাফেরদের মজলিস–সমূহে কিয়ামতের বিরুদ্ধে যেসব কাহিনী ফাঁদা হতো এবং গালগল্প করা হতো, এটা তার জবাব। যখন মক্কার লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে সবেমাত্র ইসলামের দাওয়াত শুনছে এটা ঠিক সে সময়ের কথা। এর মধ্যে তাদের কাছে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশী অদ্ভুত, অযৌক্তিক ও অসম্ভব বলে মনে হতো তা হচ্ছে, এক দিন আসমান যমীনের এ ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তারপর অন্য একটি জগত সৃষ্টি হবে যেখানে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের সমস্ত মৃত মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হবে। একথা শুনে তাদের চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে যেতো। তারা বলতো ঃ এটা হওয়া একেবারেই অসম্ভব। তাহলে এ পৃথিবী, পাহাড় পর্বত, সমুদ্র, চন্দ্র এবং সূর্য কোথায় যাবে। শত শত হাজার হাজার বছরের কবরস্থ মৃতরা কিভাবে জীবিত হয়ে উঠবে? মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবনলাভ, তারপর সেখানে থাকবে বেহেশতের বাগান ও

দোযখের আগুন এসব স্বপ্নচারিতা ও আকাশ কুসুম কল্পনা মাত্র। বুদ্ধিবিবেক ও সুস্থ মস্তিষ্কে আমরা এসব কি করে মেনে নিতে পারি? মক্কার সর্বত্র তখন এই গালগল্পকে কেন্দ্র করে আসর জমছিলো। এ পটভূমিতে বলা হয়েছে, যখন সে মহা ঘটনা সংঘটিত হবে তখন তা অস্বীকার করার মত কেউ থাকবে না।

এ বাণীর মধ্যে কিয়ামত বুঝাতে وَاقِعَة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এর অর্থ যা অনিবার্য ও অবধারিত। অর্থাৎ তা এমন জিনিস যা অনিবার্যরূপেই সংঘটিত হতে হবে। এর সংঘটিত হওয়াকে আবার وقعة শব্দ দিয়ে বুঝানো হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটি আকস্মিকভাবে কোন বড় দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়া বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ কথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, এর সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হওয়া, আগমন থেমে যাওয়া কিংবা এর আগমন ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব হবে না। অন্য কথায়, এ বাস্তব ঘটনাকে অবাস্তব ও অস্তিত্বহীন বানিয়ে দেয়ার মত কেউ থাকবে না। দুই, কোন জীবন্ত সত্তাই তখন এ মিথ্যা কথা বলবে না যে, এ ঘটনা আদৌ সংঘটিত হয়নি।

২. মূল আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ "নীচুকারী ও উঁচুকারী" এর একটি অর্থ হতে পারে সেই মহা ঘটনা সব কিছু উলট-পালট করে দেবে। নীচের জিনিস উপরে উঠে যাবে এবং উপরের জিনিস নীচে নেমে যাবে। আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, তা নীচে পতিত মানুষদেরকে উপরে উঠিয়ে দেবে এবং উপরের মানুষদেরকে নীচে নামিয়ে দেবে। অর্থাৎ তা আসার পর মানুষের মধ্যে মর্যাদা ও অমর্যাদার ফায়সালা হবে সম্পূর্ণ আলাদা ভিত্তি ও দৃষ্টিকোণ থেকে। যারা পৃথিবীতে নিজেদেরকে অতি সম্মানিত বলে দাবী করে বেড়াতো তারা লাঞ্ছিত হবে আর যাদের নীচ ও হীন মনে করা হতো তারা মর্যাদা লাভ করবে।

৩. অর্থাৎ তা কোন আঞ্চলিক সীমিত মাত্রার ভূমিকম্প হবে না। বরং যুগপৎ সমগ্র পৃথিবীকে গভীর আলোড়নে প্রকম্পিত করবে। পৃথিবী হঠাৎ করে এমন বিরাট ঝাঁকুনি খাবে যার ফলে তা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

৪. যাদেরকে এ বক্তব্য শুনানো হচ্ছিলো কিংবা এখন যারা তা পড়বে বা শুনবে, বাহ্যত কেবল তাদেরকে সম্বোধন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে গোটা মানব জাতিকেই সম্বোধন করা হয়েছে। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ সৃষ্টি হয়েছে তারা সবাই কিয়ামতের দিন তিন ভাগে বিভক্ত হবে।

৫. মূল আয়াতে أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ব্যাকরণ অনুসারে ميمنة শব্দটি يمين শব্দ থেকে গৃহিত হতে পারে—যার অর্থ ডান হাত। আবার يمن শব্দ থেকেও গৃহিত হতে পারে যার অর্থ শুভ লক্ষণ। যদি ধরে নেয়া যায় যে, এ শব্দটির উৎপত্তি يمين শব্দ থেকে হয়েছে তাহলে أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ এর অর্থ হবে "ডান হাতের অধিকারী।" কিন্তু এখানে এর আভিধানিক অর্থ অভিপ্রেত নয়। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোক ডান হাতকে আরবের লোকেরা শক্তি, মহত্ব ও মর্যাদার প্রতীক বলে মনে করতো। যাকে মর্যাদা প্রদর্শন উদ্দেশ্য হতো মজলিসের মধ্যে তাকে ডান হাতের দিকে বসাতো। আমার কাছে অমুক ব্যক্তির অনেক সম্মান ও মর্যাদা একথা বুঝানোর প্রয়োজন হলে বলতো ঃ فُلَانٌ مِنِّى بِالْيَمِيْنِ সে তো আমার

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ۝١٠ اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝١١ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝١٢ ثُلَّةٌ
مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٣ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ۝١٤ عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ۝١٥ مُّتَّكِـِٕيْنَ
عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ۝١٦ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۝١٧ بِاَكْوَابٍ
وَّاَبَارِيْقَ ۙ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۝١٨ لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ۝١٩
وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ۝٢٠ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ۝٢١

আর অগ্রগামীরা তো অগ্রগামীই।[৭] তারাই তো নৈকট্য লাভকারী। তারা নিয়ামতে ভরা জান্নাতে থাকবে। পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে বেশী এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকে হবে কম।[৮] তারা মণিমুক্তা খচিত আসনসমূহে হেলান দিয়ে সামনা সামনি বসবে। তাদের মজলিসে চির কিশোররা[৯] বহমান ঝর্ণার সুরায় ভরা পান পাত্র, হাতল বিশিষ্ট সুরা পাত্র এবং হাতলবিহীন বড় সুরা পাত্র নিয়ে সদা ব্যস্ত থাকবে—যা পান করে মাথা ঘুরবে না কিংবা বুদ্ধিবিবেক লোপ পাবে না।[১০] তারা তাদের সামনে নানা রকমের সুস্বাদু ফল পরিবেশন করবে যাতে পছন্দ মত বেছে নিতে পারে। পাখীর গোশত পরিবেশন করবে, যে পাখীর গোশত ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে।[১১]

ডান হাতের পাশে। আমাদের ভাষাতেও কাউকে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির 'দক্ষিণ হস্ত' বলার অর্থ সে তার ঘনিষ্ঠ জন। আর যদি ধরে নেয়া যায় যে, এর উৎপত্তি يمن শব্দ থেকে হয়েছে তাহলে اصحاب الميمنة এর অর্থ হবে 'খোশ নসীব' ও সৌভাগ্যবান।

৬. মূল ইবারতে " اَصْحَابُ الْمَشْئَمَة "শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। مشئمة শব্দের উৎপত্তি হয়েছে شئوم থেকে। এর অর্থ, দুর্ভাগ্য, কুলক্ষণ, অশুভ লক্ষণ। আরবী ভাষায় বাঁ হাতকেও شومى বলা হয়। আরবরা شمال (বাঁ হাত) এবং شوم অশুভ লক্ষণ, শব্দ দু'টিকে সমার্থক বলে মনে করতো। তাদের কাছে বাঁ হাত দুর্বলতা ও লাঞ্ছনার প্রতীক। সফরে রওয়ানা হওয়ার সময় যদি পাখী তাদের বাঁ হাতের দিক দিয়ে উড়ে যেতো তাহলে তারা একে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করতো। কাউকে বাঁ পাশে বসালে তার অর্থ হতো সে তাকে নীচু মর্যাদার লোক মনে করে। আমার কাছে তার কোন মর্যাদা নেই কারো সম্পর্কে যদি একথা বলতে হয় তাহলে বলা হয় فلان منى بالشمال সে আমার বাঁ পাশের লোক। বাংলা ভাষাতেও খুব হালকা ও সহজ কাজ বুঝাতে বলা হয়, এটা আমার বাঁ হাতের খেলা। অতএব اصحاب المشئمة অর্থ দুর্ভাগা লোক অথবা এমন লোক যারা আল্লাহর কাছে লাঞ্ছনার শিকার হবে এবং আল্লাহর দরবারে তাদেরকে বাঁ দিকে দাঁড় করানো।

৭. سابقين (অগ্রগামীগণ) অর্থ যারা সৎকাজ ও ন্যায়পরায়ণতায় সবাইকে অতিক্রম করেছে, প্রতিটি কল্যাণকর কাজে সবার আগে থেকেছে। আল্লাহ ও রসূলের আহবানে সবার আগে সাড়া দিয়েছে, জিহাদের ব্যাপারে হোক কিংবা আল্লাহর পথে খরচের ব্যাপারে হোক কিংবা জনসেবার কাজ হোক কিংবা কল্যাণের পথে দাওয়াত কিংবা সত্যের পথে দাওয়াতের কাজ হোক মোট কথা পৃথিবীতে কল্যাণের প্রসার এবং অকল্যাণের উচ্ছেদের জন্য ত্যাগ ও কুরবানী এবং শ্রমদান জীবনপনের যে সুযোগই এসেছে তাতে সে-ই অগ্রগামী হয়ে কাজ করেছে। এ কারণে আখেরাতেও তাদেরকেই সবার আগে রাখা হবে। অর্থাৎ আখেরাতে আল্লাহ তা'আলার দরবারের চিত্র হবে এই যে, ডানে থাকবে 'সালেহীন' বা (নেককারগণ, বাঁয়ে থাকবে ফাসেক বা পাপীরা এবং সবার আগে আল্লাহ তা'আলার দরবারের নিকটে থাকবেন 'সাবেকীন'গণ। হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের জিজ্ঞেস করলেন? তোমরা কি জান কিয়ামতের দিন কারা সর্বপ্রথম পৌঁছবে এবং আল্লাহর ছায়ায় স্থান লাভ করবে? সবাই বললেন। আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ

الذين اذا اعطو الحق قبلوه ، واذا سئلوه بذلوه ، وحكموا الناس كحكمهم لانفسهم -

"যাদের অবস্থা ছিল এই যে, তাদের সামনে যখনই সত্য পেশ করা হয়েছে, তা গ্রহণ করেছে। যখনই তাদের কাছে প্রাপ্য চাওয়া হয়েছে, তখনই তা দিয়ে দিয়েছে। আর তারা নিজেদের ব্যাপারে যে ফায়সালা করেছে অন্যদের ব্যাপারেও সেই ফায়সালা করেছে। "(মুসনাদে আহমদ)।"

৮. 'আওয়ালীন' ও আখেরীন' অর্থাৎ অগ্রবর্তী ও পরবর্তী বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে সে ব্যাপারে তাফসীরকারদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। এক দলের মতে আদম আলাইহিস সালাম থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তি পর্যন্ত যত উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে তারা 'আওয়ালীন' আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষের আগমন ঘটবে তারা সবাই আখেরীন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতের অর্থ হবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত পূর্ববর্তী হাজার হাজার বছরে যত মানুষ চলে গিয়েছে তাদের মধ্য থেকে 'সাবেকীন'দের সংখ্যা বেশী হবে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানুষদের মধ্যে যারা 'সাবেকীন'দের মর্যাদা লাভ করবে তাদের সংখ্যা হবে কম। দ্বিতীয় দল বলেন, এখানে 'আওয়ালীন' ও 'আখেরীন' অর্থ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের 'আওয়ালীন' ও 'আখেরীন'। অর্থাৎ তাঁর উম্মতের প্রাথমিক যুগের লোকেরা হচ্ছে 'আওয়ালীন'। তাদের মধ্যে 'সাবেকীনদের সংখ্যা হবে বেশী। পরবর্তী যুগের লোকেরা হচ্ছে 'আখেরীন'। তাদের মধ্যে সাবেকীনদের সংখ্যা হবে কম। তৃতীয় দল বলেন ঃ এর অর্থ প্রত্যেক নবীর উম্মতের 'আওয়ালীন' ও 'আখেরীন'। অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর প্রাথমিক যুগের অনুসারীদের মধ্যে আওয়ালীনদের সংখ্যা বেশী হবে এবং পরবর্তীকালের অনুসারীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা কম হবে। আয়াতের শব্দাবলী এ তিনটি অর্থই ধারণ করছে। এখানে

وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢﴾ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾
لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾ وَأَصْحَابُ
الْيَمِينِ ۙ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ﴿٢٩﴾
وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ﴿٣٠﴾ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ﴿٣١﴾ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَا مَقْطُوعَةٍ
وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنَاهُنَّ
أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٣٨﴾

তাদের জন্য থাকবে সুনয়না হুর এমন অনুপম সুন্দরী যেন লুকিয়ে রাখা মুক্তা।[১২] দুনিয়াতে তারা যেসব কাজ করেছে তার প্রতিদান হিসেবে এসব লাভ করবে। সেখানে তারা কোন অর্থহীন বা গোনাহর কথা শুনতে পাবে না।[১৩] বরং যে কথাই শুনবে তা হবে যথাযথ ও ঠিকঠাক।[১৪]

আর ডান দিকের লোকেরা। ডান দিকের লোকদের সৌভাগ্যের কথা আর কতটা বলা যাবে। তারা কাঁটাহীন কুল গাছের কুল,[১৫] থরে বিথরে সজ্জিত কলা, দীর্ঘ বিস্তৃত ছায়া, সদা বহমান পানি, অবাধ লভ্য অনিশেষ যোগ্য প্রচুর ফলমূল[১৬] এবং সুউচ্চ আসনসমূহে অবস্থান করবে। তাদের স্ত্রীদেরকে আমি বিশেষভাবে নতুন করে সৃষ্টি করবো এবং কুমারী বানিয়ে দেব।[১৭] তারা হবে নিজের স্বামীর প্রতি আসক্ত[১৮] ও তাদের সমবয়স্কা।[১৯] এসব হবে ডান দিকের লোকদের জন্য।

এ তিনটি অর্থই প্রযোজ্য হওয়াটা বিচিত্র নয়। কারণ, প্রকৃত পক্ষে এসব অর্থের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। এছাড়াও এসব শব্দ থেকে আরো একটি অর্থ পাওয়া যায়। সেটিও নির্ভুল অর্থ। অর্থাৎ প্রতিটি প্রাথমিক যুগে মানব গোষ্ঠীর মধ্যে 'সাবেকীন'দের অনুপাত থাকবে বেশী এবং পরবর্তী যুগে সে অনুপাত থাকবে কম। তাই মানুষের সংখ্যা যত দ্রুত বৃদ্ধি পায় নেক কাজে অগ্রগামী মানুষের সংখ্যা সে গতিতে বৃদ্ধি পায় না। গণনার দিক দিয়ে তাদের সংখ্যা প্রথম যুগের সাবেকীনদের চেয়ে অধিক হলেও পৃথিবীর সমস্ত জনবসতির বিচারে তাদের অনুপাত ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে।

৯. অর্থাৎ এমন সব বালক যারা চিরদিনই বালক থাকবে। তাদের বয়স সব সময় একই অবস্থায় থেমে থাকবে। হযরত আলী (রা) ও হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন ঃ এরা দুনিয়ার মানুষের সেসব শিশু সন্তান যারা বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ

করেছিলো। সুতরাং তাদের এমন কোন নেকী থাকবে না যার প্রতিদান দেয়া যেতে পারে এবং এমন কোন বদ কাজও থাকবে না যার শাস্তি দেয়া যেতে পারে। তবে একথা সুস্পষ্ট যে, তারা হবে পৃথিবীর এমন লোকদের সন্তান যাদের ভাগ্যে জান্নাত জোটেনি। অন্যথায় নেক্কার মু'মিনদের মৃত অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, তাদের সন্তানদেরকেও জান্নাতে তাদের সাথে একত্রিত করে দেয়া হবে। (আত্ তূর, আয়াত ২১) আবু দাউদ তায়ালেসী, তাবারানী ও বায্যার কর্তৃক হযরত আনাস (রা) ও হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব হতে বর্ণিত হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। উক্ত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, মুশরিকদের সন্তানরা জান্নাতবাসীদের খাদেম হবে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাফ্ফাতের তাফসীর, টীকা ২৬, আত তূর, টীকা ১৯)।

১০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাফ্ফাতের তাফসীর। টীকা ২৭; সূরা মুহাম্মাদ, টীকা ২২, আত তূর, টীকা ১৮।

১১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা তূর এর তাফসীর, টীকা ১৭।

১২. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাফফাতের তাফসীর, টীকা ২৮ ও ২৯ আদ দুখান, টীকা ৪২, আর রাহমান, টীকা ৫১।

১৩. এটি জান্নাতের বড় বড় নিয়ামতের একটি। এসব নিয়ামত সম্পর্কে কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানুষের কান সেখানে কোন অনর্থক ও বাজে কথা, মিথ্যা, গীবত, চোগলখুরী, অপবাদ, গালি, অহংকার ও বাজে গালগল্প বিদ্রূপ ও উপহাস, তিরস্কার ও বদনামমূলক কথাবার্তা শোনা থেকে রক্ষা পাবে। সেটা কটুভাষী ও অভদ্র লোকদের সমাজ হবে না যে, পরস্পরে কাদা ছুঁড়াছুঁড়ি করবে। সেটা হবে সভ্য ও ভদ্র লোকদের সমাজ যেখানে এসব অর্থহীন ও বেহুদা কথাবার্তার নামগন্ধ পর্যন্ত থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা কাউকে যদি সামান্য কিছু শিষ্টতা বোধ ও সুরুচির অধিকারী করে থাকেন তাহলে তিনি ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে পার্থিব জীবনে এটা কত বড় কষ্টদায়ক ব্যাপার। জান্নাতে মানুষকে এ থেকে মুক্তির আশ্বাস দেয়া হয়েছে।

১৪. মূল আয়াতটি হচ্ছে إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا কিছুসংখ্যক মুফাসসির ও অনুবাদক এর অর্থ করেছেন সেখানে সব দিক থেকেই কেবল 'সালাম' 'সালাম' শব্দ শুনা যাবে। কিন্তু এর সঠিক অর্থ হচ্ছে সঠিক, সুস্থ ও যথাযথ কথা। অর্থাৎ এমন কথাবার্তা যা দোষ-ত্রুটি মুক্ত, যার মধ্যে পূর্ববর্তী বাক্যে উল্লেখিত মন্দ দিকগুলো নেই। ইংরেজীতে Safe শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত এখানে সালাম শব্দটি প্রায় সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৫. অর্থাৎ কাঁটাবিহীন কুল বৃক্ষের কুল। কেউ এ কথা ভেবে বিস্ময় প্রকাশ করতে পারেন যে, কুল আবার এমন কি উৎকৃষ্ট ফল যা জান্নাতে থাকবে বলে সুখবর দেয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, জান্নাতের কুল নয়, এ পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে এ ফলটি এমন সুস্বাদু, খোশবুদার ও মিষ্টি হয় যে, একবার মুখে দিলে রেখে দেয়া কঠিন হয়ে যায়। তাছাড়া কুল যত উন্নতমানের হবে তার গাছ তত কম কাঁটাযুক্ত হবে। তাই

জান্নাতের কুল বৃক্ষের পরিচয় দেয়া হয়েছে এই বলে যে, তাতে মোটেই কাঁটা থাকবে না। অর্থাৎ তা হবে এমন উন্নত জাতের কুল যা এই পৃথিবীতে নেই।

১৬. মূল আয়াত হচ্ছে لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ । لَا مَقْطُوعَةٍ অর্থ তা কোন মওসূমী ফল হবে না যে, মওসুম শেষ হওয়ার পর আর পাওয়া যাবে না। তার উৎপাদন কোন সময় বন্ধ হবে না যে, কোন বাগানের সমস্ত ফল সংগ্রহ করে নেয়ার পর একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাগান ফলশূন্য থাকবে। বরং যতই খাওয়া হোক না কেন সেখানে প্রতিটি মওসুমে প্রতিটি ফল পাওয়া যাবে এবং লাগাতার উৎপন্ন হতে থাকবে। আর لَا مَمْنُوعَةٍ অর্থ দুনিয়ার ফল বাগানসমূহের মত সেখানে কোন বাধা বিঘ্ন থাকবে না। ফল আহরণ ও খাওয়ার ব্যাপারে যেমন কোন বাধা থাকবে না তেমনি গাছে কাঁটা না থাকা এবং ফল অধিক উচ্চতায় না থাকার কারণে আহরণ করতেও কোন কষ্ট হবে না।

১৭. অর্থাৎ দুনিয়ার সেসব সৎকর্মশীলা নারী যারা তাদের ঈমান ও নেক আমলের ভিত্তিতে জান্নাত লাভ করবে। পৃথিবীতে তারা যত বৃদ্ধাবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করুক না কেন সেখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে যুবতী বানিয়ে দেবেন। পৃথিবীতে তারা সুন্দরী থাক বা না থাক সেখানে আল্লাহ তাদের পরম সুন্দরী বানিয়ে দেবেন। পৃথিবীতে তারা কুমারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে বা সন্তানবতী হয়ে মৃত্যুবরণ করে থাকুক, আল্লাহ তাদের কুমারী বানিয়ে দেবেন। তাদের সাথে তাদের স্বামীরাও যদি জান্নাত লাভ করে থাকে তাহলে তাদেরকে একত্রিত করা হবে। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসী অন্য কারো সাথে তাদের বিয়ে দিয়ে দেবেন। এ আয়াতের এ ব্যাখ্যা কতিপয় হাদীসের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। 'শামায়েলে তিরমিযী' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, এক বৃদ্ধা নবীর (সা) কাছে এসে বললো ঃ আমি যেন জান্নাতে যেতে পারি সেজন্য দোয়া করুন। নবী (সা) বললেন ঃ কোন বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না। সে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যেতে থাকলে তিনি উপস্থিত সবাইকে বললেন ঃ তাকে বলে দাও, সে বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ "আমি তাদেরকে বিশেষভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো এবং কুমারী বানিয়ে দেবো।" ইবনে আবী হাতেম হযরত সালামা ইবনে ইয়াযীদ থেকে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এর দ্বারা পৃথিবীর মেয়েদের বুঝানো হয়েছে—তারা কুমারী বা বিবাহিতা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে থাকুক তাতে কিছু যায় আসে না। তাবারানীতে হযরত উম্মে সালামা থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে তিনি নবীর (সা) কাছে জান্নাতের মেয়েদের সম্পর্কে কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানের আয়াতসমূহের অর্থ জিজ্ঞেস করছেন। এক্ষেত্রে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে নবী (সা) বলেন ঃ

هن اللواتى قبضن فى دار الدنيا عجائز رمصا شمطا خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارى –

"এরা সেসব মেয়ে যারা দুনিয়ার জীবনে খুন খুনে বুড়ী, পিচুটি গলা চোখ ও পাকা সাদা চুল নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলো। এ বার্ধক্যের পরে আল্লাহ তা'আলা পুনরায় তাদেরকে কুমারী বানিয়ে সৃষ্টি করবেন।"

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ۙ
مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾
لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ
عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾

২ রুকূ'

তাদের সংখ্যা পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকেও হবে অনেক এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকেও হবে অনেক।

বাঁ দিকের লোক। বাঁ দিকের লোকদের দুর্ভাগ্যের কথা আর কি বলা যাবে। তারা লু হাওয়ার হলকা, ফুটন্ত পানি এবং কালো ধোঁয়ার ছায়ার নীচে থাকবে। তা না হবে ঠাণ্ডা, না হবে আরামদায়ক। এরা সেসব লোক যারা এ পরিণতিলাভের পূর্বে সুখী ছিল এবং বারবার বড় বড় গোনাহ করতো।[২০]

হযরত উম্মে সালামা জিজ্ঞেস করেন, পৃথিবীতে কোন মেয়ের যদি একাধিক স্বামী থেকে থাকে তাহলে কে তাকে লাভ করবে? নবী (সা) বলেন ঃ

انها تخير فتختارا حسنهم خلقا فتقول يارب ان هذا كان احسن خلقا معى فزوجنيها - يالم سلمة ، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والاخرة -

"তাকে যাকে ইচ্ছা বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া হবে। যার আখলাক ও আচরণ সবার চেয়ে ভাল ছিলো সে তাকেই বেছে নেবে। সে আল্লাহ তা'আলাকে বলবে ঃ "হে আমার রব, আমার সাথে তার আচরণ ছিলো সবচেয়ে ভাল। অতএব আমাকে তার স্ত্রী বানিয়ে দিন। হে উম্মে সালামা, উত্তম আচরণ দুনিয়ার সমস্ত কল্যাণ অর্জন করলো।" (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আর রাহমানের তাফসীর, টীকা ৫১)।

১৮. মূল আয়াতে عُرُبًا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটি মেয়েদের সর্বোত্তম মেয়েসুলভ গুণাবলী বুঝাতে বলা হয়। এ শব্দ দ্বারা এমন মেয়েদের বুঝানো হয় যারা কমনীয় স্বভাব ও বিনীত আচরণের অধিকারিনী, সদালাপী, নারীসুলভ আবেগ অনুভূতি সমৃদ্ধ, মনে প্রাণে স্বামীগত প্রাণ এবং স্বামীও যার প্রতি অনুরাগী।

১৯. এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে তারা তাদের স্বামীদের সমবয়সী হবে। অন্য অর্থটি হচ্ছে, তারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে। অর্থাৎ জান্নাতের সমস্ত মেয়েদের একই

وَكَانُوا يَقُولُونَ ۝ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۝
أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۝ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۝ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ
مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ۝ لَآكِلُونَ
مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ۝ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۝ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ
مِنَ الْحَمِيمِ ۝ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ۝ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ۝
نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ۝ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ۝ أَأَنتُمْ
تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ۝

বলতো ঃ আমরা যখন মরে মাটিতে মিশে যাবো এবং নিরেট হাড্ডি অবশিষ্ট থাকবো তখন কি আমাদেরকে জীবিত করে তোলা হবে? আমাদের বাপ দাদাদেরকেও কি উঠানো হবে যারা ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে? হে নবী, এদের বলে দাও, নিশ্চিতভাবেই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের সব মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করা হবে। সে জন্য সময় নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। তারপর হে পথভ্রষ্ট ও অস্বীকারকারীরা তোমাদেরকে 'যাক্কূম'[২১] বৃক্ষজাত খাদ্য খেতে হবে। তোমরা ঐ খাদ্য দিয়েই পেট পূর্ণ করবে এবং তার পরই পিপাসার্ত উটের মত ফুটন্ত পানি পান করবে। প্রতিদান দিবসে বাঁ দিকের লোকদের আপ্যায়নের উপকরণ।

আমি তোমাদের[২২] সৃষ্টি করেছি। এরপরও কেন তোমরা মানছো না?[২৩] তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, যে শুক্র তোমরা নিক্ষেপ করো তা দ্বারা সন্তান সৃষ্টি তোমরা করো, না তার স্রষ্টা আমি?[২৪]

বয়স হবে এবং চিরদিন সেই বয়সেরই থাকবে। যুগপৎ এ দু'টি অর্থই সঠিক হওয়া অসম্ভব নয়। অর্থাৎ এসব জান্নাতী নারী পরস্পরও সমবয়সী হবে এবং তাদের স্বামীদেরকেও তাদের সমবয়সী বানিয়ে দেয়া হবে। একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

يدخل اهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين ابناء ثلاث وثلاثين –

"জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করলে তাদের শরীরে কোন পশম থাকবে না। মোচ ভেজা ভেজা মনে হবে। কিন্তু দাড়ি থাকবে না। ফর্সা শ্বেত বর্ণ হবে। কুঞ্চিত কেশ হবে। কাজল কাল চোখ হবে এবং সবার বয়স ৩৩ বছর হবে" (মুসনাদে আহমদ, আবু হুরায়রার বর্ণিত হাদীস)।

২০. অর্থাৎ তাদের ওপর সুখ-স্বাচ্ছেন্দের উল্টা প্রভাব পড়েছিলো। আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে তারা তাঁর নিয়ামতের অস্বীকারকারী হয়ে গিয়েছিলো। নিজেদের প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধনে নিমগ্ন হয়ে তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলো এবং একের পর এক বড় বড় গোনাহর কাজে লিপ্ত হয়েছিলো। বড় গোনাহ শব্দটি ব্যাপক অর্থ ব্যঞ্জক। এর দ্বারা যেমন কুফর, শিরক ও নাস্তিকতা বড় গোনাহ বুঝানো হয়েছে তেমনি নৈতিকতা ও আমলের ক্ষেত্রে বড় গোনাহও বুঝানো হয়েছে।

২১. যাক্‌কূমের ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা সাফ্‌ফাতের তাফসীর, টীকা-৩৪।

২২. এখান থেকে ৭৪ আয়াতে যে যুক্তিপ্রমাণ পেশ করা হয়েছে তাতে একই সাথে আখেরাত ও তাওহীদ উভয় বিষয়েই যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। মক্কার মানুষেরা যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার এ দু'টি মৌলিক বিষয়ের প্রতিবাদ করছিলো তাই এখানে এমনভাবে যুক্তিপ্রমাণ পেশ করা হয়েছে যা দ্বারা আখেরাত প্রমাণিত হয় এবং তাওহীদের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৩. অর্থাৎ আমিই যে তোমাদের রব ও উপাস্য এবং আমি পুনরায় তোমাদের সৃষ্টি করতে পারি এ কথা মেনে নেয়া।

২৪. ছোট্ট এ বাক্যে মানুষের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন রাখা হয়েছে। পৃথিবীর অন্য সব জিনিস বাদ দিয়ে মানুষ যদি শুধু এই একটি বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করতো যে, সে নিজে কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে তাহলে কুরআনের একত্ববাদী শিক্ষায়ও তার কোন সন্দেহ-সংশয় থাকতো না, তার আখেরাত সম্পর্কিত শিক্ষায়ও কোন সন্দেহ-সংশয় থাকতো না। মানুষের জন্ম পদ্ধতি তো এছাড়া আর কিছুই নয় যে, পুরুষ তার শুক্র নারীর গর্ভাশয়ে পৌঁছে দেয় মাত্র। কিন্তু ঐ শুক্রের মধ্যে কি সন্তান সৃষ্টি করার এবং নিশ্চিত রূপে মানুষের সন্তান সৃষ্টি করার যোগ্যতা আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে? অথবা মানুষ নিজে সৃষ্টি করেছে? কিংবা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ সৃষ্টি করেছে? অথবা এই শুক্র দ্বারা গর্ভে মানুষ সৃষ্টি করে দেয়া কি কোন পুরুষ অথবা কোন নারী কিংবা দুনিয়ার কোন শক্তির ইখতিয়ারে? তারপর গর্ভের সূচনা থেকে সন্তান প্রসব পর্যন্ত মায়ের পেটে ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি ও লালন করা এবং প্রতিটি শিশুকে স্বতন্ত্র আকৃতি দান করা, প্রতিটি শিশুর মধ্যে একটি বিশেষ অনুপাতে মানসিক ও দৈহিক শক্তি দান করা যার সাহায্যে সে একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে—এটা কি এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাজ? এতে কি আর কারো সামান্যতম দখলও আছে? পিতা-মাতা নিজে কি একাজ করে থাকে? না কোন ডাক্তার এ কাজ করে? নাকি নবী-রসূল ও আওলিয়াগণ এ কাজ করে থাকেন—যারা এই একই পন্থায় জন্মলাভ করেছেন? না কি সূর্য, চাঁদ, তারকারাজি এ কাজ করে থাকে—যারা নিজেরাই একটি নিয়ম-নীতির নিগড়ে বাঁধা? নাকি সেই প্রকৃতি (Nature) একাজ করে যা নিজে কোন

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ
أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ
فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ
نَحْنُ الزَّٰرِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾
إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾

আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যুকে বন্টন করেছি।[২৫] তোমাদের আকার আকৃতি পাল্টে দিতে এবং তোমাদের অজানা কোন আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করতে আমি অক্ষম নই।[২৬] নিজেদের প্রথমবার সৃষ্টি সম্পর্কে তোমরা জান। তবুও কেন শিক্ষা গ্রহণ করোনা।[২৭]

তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, যে বীজ তোমরা বপন করে থাকো তা থেকে ফসল উৎপন্ন তোমরা করো, না আমি?[২৮] আমি চাইলে এসব ফসলকে দানাবিহীন ভূষি বানিয়ে দিতে পারি। তখন তোমরা নানা রকমের কথা বলতে থাকবে। বলবে আমাদেরকে তো উল্টা জরিমানা দিতে হলো। আমাদের ভাগ্যটাই মন্দ।

জ্ঞান কলাকৌশল, ইচ্ছা ও ইখতিয়ার রাখে না? তাছাড়া সন্তান ছেলে হবে, না মেয়ে, সুশ্রী হবে না কদাকার, শক্তিশালী হবে না দুর্বল, অন্ধ, কালা, খোঁড়া ও প্রতিবন্ধী হবে, না সুস্থ অংগ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট এবং মেধাবী হবে, না মেধাহীন—সে সিদ্ধান্ত কি আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইখতিয়ারে? তাছাড়া জাতিসমূহের ইতিহাসে কখন কোন জাতির মধ্যে কোন কোন ভাল বা মন্দ গুণের অধিকারী লোক সৃষ্টি করতে হবে যারা সে জাতিকে উন্নতির শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছিয়ে দেবে কিংবা অধপতনের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করবে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কি সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে? কেউ যদি এক গুঁয়েমি ও হঠকারিতায় লিপ্ত না হয় তাহলে সে উপলব্ধি করতে পারবে যে, শিরক ও নাস্তিকতার ভিত্তিতে এসব প্রশ্নের যুক্তি সংগত জওয়াব দেয়া সম্ভব নয়। এর যুক্তি সংগত জওয়াব একটিই। তা হচ্ছে, মানুষ পুরোপুরি আল্লাহর সৃষ্টি। আর প্রকৃত সত্য যখন এই তখন আল্লাহর সৃষ্টি এই মানুষের তার আল্লাহর মোকাবেলায় স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী হওয়ার দাবী করার কিংবা তাঁর ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করার কি অধিকার আছে?

তাওহীদের মত আখেরাতের ব্যাপারেও এ প্রশ্ন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানকারী। এমন একটি ক্ষুদ্র কীট থেকে মানুষের জন্মের সূচনা হয় যা শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখাই যায়

না। এক সময় এই কীট নারী দেহের গভীর অন্ধকারে নারীর ডিম্বানুর সাথে মিলিত হয় ঐ ডিম্বানুও আবার অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দৃষ্টিগোচর হওয়ার মত নয়। এ দু'য়ের সংযুক্তি দ্বারা একটি অতি ক্ষুদ্র জীবন্ত কোষ (cell) সৃষ্টি হয়। এটিই মানব জীবনের সূচনা বিন্দু। এ কোষটিও এত ক্ষুদ্র হয় যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া তা দেখা যায় না। মাতৃগর্ভে অতি ক্ষুদ্র এ কোষের প্রবৃদ্ধি ঘটিয়ে আল্লাহ তায়ালা ৯ মাসের কিছু বেশী সময়ের মধ্যে তাকে একটি পূর্ণ মানুষে রূপ দান করেন। তার গঠন ও নির্মাণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে হৈ চৈ করে দুনিয়া মাতিয়া তোলার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে মায়ের দেহই তাকে ঠেলে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়। সমস্ত মানুষ এভাবেই পৃথিবীতে এসেছে এবং তাদের মত মানুষের জন্ম গ্রহণের এ দৃশ্যই রাত দিন দেখছে। তা সত্ত্বেও কোন বিবেকহীন ব্যক্তিই শুধু বলতে পারে, যে আল্লাহ বর্তমানে এভাবে মানুষকে সৃষ্টি করছেন তিনি তাঁর সৃষ্ট এসব মানুষকে পুনরায় অন্য কোন পদ্ধতিতে সৃষ্টি করতে পারবেন না।

২৫. অর্থাৎ তোমাদেরকে সৃষ্টি করা যেমন আমার ইখতিয়ারে। তেমনি তোমাদের মৃত্যুও আমার ইখতিয়ারে। কে মাতৃগর্ভে মারা যাবে, কে ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মারা যাবে এবং কে কোন্ বয়সে উপনীত হয়ে মারা যাবে সে সিদ্ধান্ত আমিই নিয়ে থাকি। যার মৃত্যুর জন্য আমি যে সময় ঠিক করে দিয়েছি তার পূর্বে দুনিয়ার কোন শক্তিই তাকে মারতে পারে না এবং সে সময়ের পর কেউ তাকে এক মুহূর্ত জীবিত রাখতেও পারে না। যাদের মৃত্যুর সময় হাজির হয় তারা বড় বড় হাসপাতালে বড় বড় ডাক্তারের চোখের সামনে মৃত্যুবরণ করে। এমনকি ডাক্তার নিজেও তার মৃত্যুর সময় মরে যায়। কেউ কখনো মৃত্যুর সময় জানতে পারেনি, ঘনিয়ে আসা মৃত্যুকে প্রতিরোধ করতে পারেনি, কার মৃত্যু কিসের মাধ্যমে কখন কোথায় কিভাবে সংঘটিত হবে তাও কেউ জানে না।

২৬. অর্থাৎ বর্তমান আকার-আকৃতিতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করতে আমি যেমন অক্ষম হই নাই। তেমনি তোমাদের সৃষ্টি পদ্ধতি পরিবর্তন করে অন্য আকার-আকৃতিতে ভিন্ন প্রকৃতির গুণাবলী ও বৈশিষ্ট দিয়ে তোমাদের সৃষ্টি করতেও আমি অক্ষম নই। বর্তমানে আমি তোমাদের সৃষ্টি করি এভাবে যে, তোমাদের শুক্র নারীর গর্ভাশয়ে স্থিতি লাভ করে এবং সেখানে ক্রমান্বয়ে প্রবৃদ্ধি লাভ করে একটি শিশুর আকারে তা বেরিয়ে আসে। সৃষ্টির এই পদ্ধতিও আমার নির্ধারিত। সৃষ্টির ধরাবাঁধা এই একটা নিয়মই শুধু আমার কাছে নেই যে, এটি ছাড়া অন্য কোন নিয়ম-পদ্ধতি আমি জানি না বা কার্যকরী করতে পারি না। যে বয়সে তোমাদের মৃত্যু হয়েছিল কিয়ামতের দিন ঠিক সেই বয়সের মানুষের আকৃতি দিয়েই আমি তোমাদের সৃষ্টি করতে পারি। বর্তমানে আমি তোমাদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ শক্তি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের এক রকমের পরিমাপ রেখেছি। কিন্তু আমার কাছে মানুষের জন্য এই একটি মাত্র পরিমাপই নেই যে, আমি তা পরিবর্তন করতে পারি না। আমি কিয়ামতের দিন তা পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের কিছু করে দেব। ফলে তোমরা এখানে যা দেখতে ও শুনতে পাও না তা দেখতে ও শুনতে পাবে। এখন তোমাদের শরীরের চামড়া, তোমাদের হাত পা এবং তোমাদের চোখের কোন বাক শক্তি নেই। কিন্তু মুখকে বলার শক্তি তো আমিই দিয়েছি। কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং তোমাদের গাত্র চর্মের প্রতিটি অংশ আমার আদেশে কথা বলবে। এ ব্যবস্থা করতে আমি অক্ষম নই। বর্তমানে তোমরা একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাক এবং তারপর মৃত্যুবরণ কর।

তোমাদের এ জীবন মৃত্যুও আমার নির্ধারিত একটি বিধানের অধীনে হয়ে থাকে। তোমাদের জীবনের জন্য ভবিষ্যতে আমি অন্য আরেকটি বিধান বানাতে সক্ষম যার অধীনে তোমাদের কখনো মৃত্যু হবে না। বর্তমানে তোমরা একটা বিশেষ মাত্রা পর্যন্ত আযাব সহ্য করতে পার। তার চেয়ে অধিক আযাব দেয়া হলে তোমরা জীবিত থাকতে পার না। এ নিয়ম বিধানও আমারই তৈরী। ভবিষ্যতে আমি তোমাদের জন্য আর একটি আইন-বিধান তৈরী করতে পারি যার অধীনে তোমরা এত দীর্ঘকাল পর্যন্ত এরকম আযাব ভোগ করতে সক্ষম হবে যে, তার কল্পনাও তোমরা করতে পার না। কঠোর থেকে কঠোরতর আযাব ভোগ করেও তোমাদের মৃত্যু হবে না। আজ তোমরা ভাবতেও পার না যে, কোন বৃদ্ধ যুবক হয়ে যেতে পারে, কেউ রোগব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকতে পারে কিংবা কেউ মোটেই বার্ধক্যে উপনীত হবে না এবং চিরদিন একই বয়সের যুবক থাকবে। কিন্তু এখানে যৌবনের পরে বার্ধক্য আসে আমার দেয়া নিয়ম বিধান অনুসারেই। ভবিষ্যতে তোমাদের জীবনের জন্য আমি এমন ভিন্ন নিয়ম-বিধান বানাতে সক্ষম, যার আওতায় জান্নাতে প্রবেশ মাত্র প্রত্যেক বৃদ্ধ যুবকে পরিণত হবে এবং তার যৌবন ও সুস্থতা অটুট ও অবিনশ্বর হবে।

২৭. অর্থাৎ কিভাবে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল তা তোমরা অবশ্যই জান। যে শুক্র দ্বারা তোমাদের অস্তিত্বের সূচনা হয়েছে তা পিতার মেরুদণ্ড থেকে কিভাবে স্থানান্তরিত হয়েছিল, মায়ের গর্ভাশয় যা কবরের অন্ধকার থেকে কোন অংশে কম অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল না তার মধ্যে কিভাবে পর্যায়ক্রমে তোমাদের বিকাশ ঘটিয়ে জীবিত মানুষে রূপান্তরিত করা হয়েছে, কিভাবে একটি অতি ক্ষুদ্র পরমাণু সদৃশ কোষের প্রবৃদ্ধি ও বিকাশ সাধন করে এই মন-মগজ, এই চোখ কান ও এই হাত পা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বুদ্ধি ও অনুভূতি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, শিল্প জ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তি, ব্যবস্থাপনা ও অধীনস্ত করে নেয়ার মত বিস্ময়কর যোগ্যতাসমূহ দান করা হয়েছে। এটা কি মৃতদের জীবিত করে উঠানোর চেয়ে কম অলৌকিক ও কম বিস্ময়কর? এসব বিস্ময়কর ব্যাপার তোমরা যখন নিজের চোখেই দেখছো এবং নিজেরাই তার জ্বলন্ত সাক্ষী হিসেবে বর্তমান আছ, তখন তা থেকে এ শিক্ষা কেন গ্রহণ করছো না যে, আল্লাহর যে অসীম শক্তিতে দিন রাত এসব মু'জিযা সংঘটিত হচ্ছে তাঁর ক্ষমতায়ই মৃত্যুর পরের জীবন, হাশর নাশর এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মত মু'জিযাও সংঘটিত হতে পারে?

২৮. উপরে উল্লেখিত প্রশ্ন এ সত্যের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল যে, তোমরা তো আল্লাহ তা'আলার গড়া। তিনি সৃষ্টি করেছেন বলে তোমরা অস্তিত্ব লাভ করেছো। এখন এই দ্বিতীয় প্রশ্নটি দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ সত্যের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে তাহচ্ছে যে রিযিকে তোমরা প্রতিপালিত হচ্ছো তাও আল্লাহই সৃষ্টি করে থাকেন। তোমাদের সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষের কর্তৃত্ব ও প্রচেষ্টা এর অধিক আর কিছুই নয় যে, তোমাদের পিতা তোমাদের মায়ের দেহাভ্যন্তরে এক ফোঁটা শুক্র নিক্ষেপ করে। অনুরূপ তোমাদের রিযিক উৎপাদনের ক্ষেত্রেও মানুষের প্রচেষ্টা জমিতে বীজ বপনের বেশী আর কিছুই নয়। যে জমিতে এই চাষাবাদ করা হয় তাও তোমাদের তৈরী নয়। এই জমিতে উর্বরা শক্তি তোমরা দান কর নাই। ভূমির যে উপাদান দ্বারা তোমাদের খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা হয় তা তোমরা সরবরাহ কর নাই। তোমরা জমিতে যে বীজ বপন কর তাকে

أَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ
نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ
الَّتِى تُورُونَ ﴿٧١﴾ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ الْمُنشِـُٔونَ ﴿٧٢﴾
نَحْنُ جَعَلْنَٰهَا تَذْكِرَةً وَمَتَٰعًا لِّلْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ
الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

তোমরা কি চোখ মেলে কখনো দেখেছো, যে পানি তোমরা পান করো, মেঘ থেকে তা তোমরা বর্ষণ করো, না তার বর্ষণকারী আমি?[২৯] আমি চাইলে তা লবণাক্ত বানিয়ে দিতে পারি।[৩০] তা সত্ত্বেও তোমরা শোকরগোজার হও না কেন?[৩১]

তোমরা কি কখনো লক্ষ করেছো,—এই যে আগুন তোমরা জ্বালাও তার গাছ[৩২] তোমরা সৃষ্টি করো, না তার সৃষ্টিকর্তা আমি? আমি সেটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার উপকরণ[৩৩] এবং মুখাপেক্ষীদের[৩৪] জন্য জীবনোপকরণ বানিয়েছি।

অতএব হে নবী, তোমার মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করো।[৩৫]

প্রবৃদ্ধির উপযুক্ত তোমরা বানাও নাই। ঐ গুলো যে গাছের বীজ তার প্রতিটি থেকে ঐ একই প্রজাতির গাছ ফুটে বের হওয়ার যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট তোমরা সৃষ্টি কর নাই। সেই ভূমিকে বাতাসে ঢেউ খেলা শ্যামল শস্য ক্ষেত্রে পরিণত করার জন্য ভূমির অভ্যন্তরে যে ক্রিয়া প্রক্রিয়া এবং ভূমির উপরিভাগে যে বাতাস, পানি, উষ্ণতা, আর্দ্রতা ও মৌসূমী পরিবেশ প্রয়োজন তার কোনটিই তোমাদের কোন তদবীর বা ব্যবস্থাপনার ফল নয়। এর সব কিছুই আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও প্রতিপালক হওয়ার বিস্ময়কর কীর্তি। অতএব তোমরা যখন তার সৃষ্টি করার করণে অস্তিত্ব লাভ করেছো এবং তাঁরই দেয়া রিযিকে প্রতিপালিত হচ্ছো তখন তাঁর নির্দেশের বাইরে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার কিংবা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব ও আনুগত্য করার অধিকার তোমরা কি করে লাভ করো?

এ আয়াতের যুক্তি প্রমাণ বাহ্যিকভাবে তাওহীদের স্বপক্ষে। তবে এতে যে বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে সে বিষয়ে কেউ আরেকটু গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করলেই এর মধ্যে আখেরাতের প্রমাণও পেয়ে যাবে। জমিতে যে বীজ বপন করা হয় তা মৃত বস্তু ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু কৃষক তাকে মাটির কবরে দাফন করার পর আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে জীবন সৃষ্টি করেন। তা থেকে অঙ্কুরোদগম হয় এবং সবুজ-শ্যামল শষ্য ক্ষেত্রের

মনোমুগ্ধকর দৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের চোখের সামনে প্রতিদিন হাজার হাজার মৃত এভাবে কবর থেকে জীবিত হয়ে উঠছে। এটা কি কোন অংশে কম বিস্ময়কর মু'জিযা যে, মানুষের মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া সম্পর্কে কুরআন আমাদেরকে যে খবর দিচ্ছে সে মু'জিযাকে অসম্ভব মনে করবো?

২৯. অর্থাৎ শুধু তোমাদের ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থাই নয় তোমাদের পিপাসা মেটানোর ব্যবস্থাও আমিই করেছি। তোমাদের জীবন ধারণের জন্য যে পানি খাদ্যের চেয়েও অধিক প্রয়োজনীয় তার ব্যবস্থা তোমরা নিজেরা কর নাই। আমিই তা সরবরাহ করে থাকি। পৃথিবীর সমুদ্রসমূহ আমি সৃষ্টি করেছি। আমারই সৃষ্টি করা সূর্যের তাপে সমুদ্রের পানি বাষ্পে পরিণত হয়। আমি পানির মধ্যে এমন বৈশিষ্ট দিয়েছি যে, একটি বিশেষ মাত্রার তাপে তা বাষ্পে পরিণত হয়। আমার সৃষ্ট বাতাস তা বহন করে নিয়ে যায়। আমার অসীম ক্ষমতা ও কৌশলে বাষ্পরাশি একত্রিত হয়ে মেঘে পরিণত হয়। আমার নির্দেশে এই মেঘরাশি একটি বিশেষ অনুপাত অনুসারে বিভক্ত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে যাতে পৃথিবীর যে অঞ্চলের জন্য যে পরিমাণ পানি বরাদ্দ করা হয়েছে তা সেখানে পৌঁছে যায়। তারপর আমি উর্ধাকাশে এমন এক মাত্রার ঠাণ্ডা সৃষ্টি করে রেখেছি যার ফলে বাষ্প পুনরায় পানিতে পরিণত হয়। আমি তোমাদেরকে শুধু অস্তিত্ব দান করেই বসে নাই। তোমাদের প্রতিপালনের এত সব ব্যবস্থাও আমি করছি যা না থাকলে তোমরা বেঁচেই থাকতে পারতে না। আমি সৃষ্টি করার ফলে অস্তিত্বলাভ করে, আমার দেয়া রিযিক খেয়ে এবং আমার দেয়া পানি পান করে আমার মোকাবিলায় স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী হবে কিংবা আমার ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করবে এ অধিকার তোমরা কোথা থেকে লাভ করেছো?

৩০. এ আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতা ও কর্মকৌশলের এক অতি বিস্ময়কর দিকের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পানির মধ্যে যে সব অতি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট রেখেছেন তার একটি হচ্ছে, পানির মধ্যে যত বস্তুই মিশে থাকুক না কেন, তাপের প্রভাবে যখন তা বাষ্পে পরিণত তখন সমস্ত মিশে যাওয়া বস্তু নীচে পড়ে থাকে এবং শুধু জলীয় অংশই বাতাসে উড়ে যায়। পানির যদি এই বিশেষত্ব না থাকতো তাহলে পানি অবস্থায় তার মধ্যে মিশে থাকা বস্তুসমূহ বাষ্পে পরিণত হওয়ার সময়ও তার মধ্যে থেকে যেতো। সুতরাং এমতাবস্থায় সমুদ্র থেকে যে বাষ্প উত্থিত হতো তার মধ্যে সমুদ্রের লবণও মিশে থাকতো এবং ঐ পানি বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হয়ে গোটা ভূপৃষ্ঠকে লবণাক্ত ভূমিতে পরিণত করতো। সে পানি পান করে মানুষ যেমন বেঁচে থাকতে পারতো না, তেমনি তা দ্বারা কোন প্রকারের উদ্ভিদও উৎপন্ন হতে পারতো না। এখন যে ব্যক্তির মস্তিষ্কে কিছুমাত্র মগজ আছে সে কি এ দাবী করতে পারে যে, অন্ধ ও বধির প্রকৃতিতে আপনা থেকেই পানির মধ্যে এ জ্ঞানগর্ভ বৈশিষ্ট সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে? পানির যে বৈশিষ্টের কারণে লবণাক্ত সমুদ্র থেকে পরিষ্কার সুপেয় পানি উত্থিত হয়ে বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হয় এবং নদী, খাল, ঝর্ণা ও কূপের আকারে পানি সরবরাহ ও সেচের কাজ আঞ্জাম দেয় তা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, যিনি পানির মধ্যে এই বৈশিষ্ট সৃষ্টি করেছেন তিনি বুঝে শুনেই তা করেছেন যেন পানি তাঁর সৃষ্টিকূলের প্রতিপালনের সহায়ক হয়। যেসব জীবজন্তুর পক্ষে লবণাক্ত পানিতে বেঁচে থাকা ও জীবন যাপন করা সম্ভব তাদেরকে সমুদ্রে সৃষ্টি করেছেন। সেখানে তারা স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করছে। কিন্তু স্থলভাগ ও বায়ু মন্ডলের বসবাসের জন্য

যেসব জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন তাদের জীবন ধারণ ও জীবন যাপনের জন্য সুপেয় মিঠা পানির প্রয়োজন ছিল। সে উদ্দেশে বৃষ্টির ব্যবস্থা করার পূর্বে তিনি পানির মধ্যে এই বৈশিষ্ট দিলেন যে, তাপে বাষ্পে পরিণত হওয়ার সময় তা যেন পানিতে মিশ্রিত কোন জিনিস সাথে নিয়ে উত্থিত না হয়।

৩১. অন্য কথায় তোমাদের মধ্যে কেউ এ বৃষ্টিকে দেবতাদের কীর্তি বলে মনে করে। আবার কেউ মনে করে, সমুদ্রের পানি থেকে মেঘমালার সৃষ্টি এবং পুনরায় তা পানি হয়ে আসমান থেকে বর্ষিত হওয়াটা একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই চলছে। আবার কেউ এটাকে আল্লাহর রহমত মনে করলেও আল্লাহর সামনেই আনুগত্যের মাথা নোয়াতে হবে এতটা অধিকার আল্লাহর আছে বলে মনে করে না। তোমরা আল্লাহর নিয়ামতের এত বড় না-শুকরী কেন করছো? আল্লাহর এত বড় নিয়ামত কাজে লাগিয়ে উপকৃত হচ্ছো এবং তার বিনিময়ে কুফর, শিরক, পাপাচার ও অবাধ্যতায় লিপ্ত হচ্ছো।

৩২. গাছ বলতে যেসব গাছ থেকে জ্বালানী কাঠ সংগৃহীত হয় সে গাছের কথা বলা হয়েছে কিংবা মারখ ও আফার নামে পরিচিত গাছের কথা বলা হয়েছে যার তাজা কাঁচা ডাল পরস্পর রগড়িয়ে প্রাচীনকালে আরবের অধিবাসীরা আগুন জ্বালাতো।

৩৩. আগুনকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার উপকরণ বানানোর অর্থ হচ্ছে, আগুন এমন জিনিস যা প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রজ্বলিত হয়ে মানুষকে তার ভুলে যাওয়া শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দেয়। আগুন যদি না থাকতো তাহলে মানুষের জীবন পশুর জীবন থেকে ভিন্ন হতো না। মানুষ পশুর মতো কাঁচা খাদ্য খাওয়ার পরিবর্তে আগুনের সাহায্যে তা রান্না করে খাওয়া শুরু করেছে এবং আগুনের কারণেই মানুষের জন্য একের পর এক শিল্প ও আবিষ্কারের নতুন নতুন দরজা উদঘাটিত হয়েছে। এ কথা সুস্পষ্ট, যেসব উপকরণের সাহায্যে আগুন জ্বালানো যায় আল্লাহ যদি তা সৃষ্টি না করতেন এবং আগুনে যে সব বস্তু জ্বলে তাও যদি তিনি সৃষ্টি না করতেন তাহলে মানুষের উদ্ভাবনী যোগ্যতার তালা কোন দিনই খুলতো না। কিন্তু মানুষের স্রষ্টা যে একজন বিজ্ঞ পালনকর্তা যিনি একদিকে তাকে মানবিক যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং অন্যদিকে পৃথিবীতে সেসব উপকরণ ও সাজ-সরঞ্জামও সৃষ্টি করেছেন যার সাহায্যে তার এসব যোগ্যতা বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে সে কথা মানুষ একদম ভুলে বসে আছে। মানুষ যদি গাফিলতি ও অমনযোগিতায় নিমগ্ন না হয় তাহলে সে দুনিয়াতে যা যা ভোগ করছে তা কার অনুগ্রহ ও নিয়ামত সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য এক আগুনই যথেষ্ট।

৩৪. মূল আয়াতে مقوين শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন মরুভূমিতে উপনীত মুসাফির বা পথচারী। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন ক্ষুধার্ত মানুষ। কারো কারো মতে এর অর্থ হচ্ছে সেসব মানুষ যারা খাবার পাকানো, আলো পাওয়া কিংবা তাপ গ্রহণ করার কাজে আগুন ব্যবহার করে।

৩৫. অর্থাৎ সে পবিত্র নাম নিয়ে ঘোষণা করে দাও যে, কাফের ও মুশরিকরা যেসব দোষত্রুটি, অপূর্ণতা ও দুর্বলতা তাঁর ওপর আরোপ করে তা থেকে এবং কুফর ও শিরকমূলক সমস্ত আকীদা ও আখেরাত অস্বীকারকারীদের প্রতিটি যুক্তি তর্কে যা প্রচ্ছন্ন আছে তা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ
كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِى كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ تَنزِيلٌ
مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾ أَفَبِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُونَ
رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾

৩ রুকূ'

অতএব না,[৩৬] আমি শপথ করছি তারকাসমূহের ভ্রমণ পথের। এটা এক অতি বড় শপথ যদি তোমরা বুঝতে পার। এ তো মহা সম্মানিত কুরআন।[৩৭] একখানা সুরক্ষিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ।[৩৮] পবিত্র সত্তাগণ ছাড়া আর কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না।[৩৯] এটা বিশ্ব-জাহানের রবের নাযিলকৃত। এরপরও কি তোমরা এ বাণীর প্রতি উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করছো?[৪০] এ নিয়ামতে তোমরা নিজেদের অংশ রেখেছো এই যে, তোমরা তা অস্বীকার করছো?[৪১]

৩৬ . অর্থাৎ তোমরা যা মনে করে বসে আছো ব্যাপার তা নয়। কুরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সে বিষয়ে কসম খাওয়ার আগে এখানে لَا শব্দের ব্যবহার করায় আপনা থেকেই একথা প্রকাশ পায় যে, এই পবিত্র গ্রন্থ সম্পর্কে মানুষ মনগড়া কিছু কথাবার্তা বলছিলো। সেসব কথার প্রতিবাদ করার জন্যই এ কসম খাওয়া হচ্ছে।

৩৭. তারকারাজি ও গ্রহসমূহের 'অবস্থান স্থল' অর্থ তাদের স্থান, তাদের মনযিল ও তাদের কক্ষপথসমূহ। আর কুরআনের মহা সম্মানিত গ্রন্থ হওয়া সম্পর্কে ঐগুলোর শপথ করার অর্থ হচ্ছে উর্ধ জগতে সৌরজগতের ব্যবস্থাপনা যত সুসংবদ্ধ ও মজবুত এই বাণীও ততটাই সুসংবদ্ধ ও মজবুত। যে আল্লাহ ঐ ব্যবস্থা তৈরী করেছেন সে আল্লাহ এই বাণীও নাযিল করেছেন। মহাবিশ্বের অসংখ্য ছায়াপথ (Galaxies) ঐ সব ছায়াপথের মধ্যে সীমা সংখ্যাহীন নক্ষত্র (Stars) এবং গ্রহরাজি (Planets) বাহ্যত ছড়ানো ছিটানো দেখা গেলেও তাদের মধ্যে পূর্ণ মাত্রার যে সুসংবদ্ধতা বিরাজমান এ মহাগ্রন্থও ঠিক অনুরূপ পূর্ণ মাত্রার সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত জীবন বিধান পেশ করে। যার মধ্যে আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে নৈতিক চরিত্র, ইবাদাত, তাহযীব তামাদ্দুন, অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থা, আইন ও আদালত, যুদ্ধ ও সন্ধি মোট কথা মানব জীবনের সকল বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত পথ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং এর কোন একটি দিকই আরেকটি দিকের সাথে সামঞ্জস্যহীন ও বেখাপ্পা নয়। অথচ এই ব্যবস্থা বিভিন্ন আয়াত ও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রদত্ত ভাষণে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া উর্ধজগতের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম-শৃঙ্খলা যেমন অপরিবর্তনীয়, তাতে কোন সময় সামান্য পরিমাণ পার্থক্যও সূচিত হয় না, ঠিক তেমনি এই গ্রন্থে যেসব সত্য ও পথ নির্দেশনা পেশ করা হচ্ছে তাও অটল ও অপরিবর্তনীয় তার একটি বিন্দুকেও স্ব-স্থান থেকে বিচ্যুত করা যেতে পারে না।

৩৮. এর অর্থ 'লাওহে মাহফুজ'। এটি বুঝাতে كِتَابٍ مَّكْنُونٍ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এমন লিখিত বস্তু যা গোপন করে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যা কারো ধরা ছোঁয়ার বাইরে। সুরক্ষিত ঐ লিপিতে কুরআন মজীদ লিখিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপরে কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার কাছে তা সেই ভাগ্যলিপিতে লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছে যাতে কোন রকম পরিবর্তন পরিবর্ধন সম্ভব নয়। কারণ, তা যে কোন সৃষ্টির ধরা ছোঁয়ার উর্ধে।

৩৯. কাফেররা কুরআনের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আরোপ করতো এটা তার জবাব। তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামকে গণক আখ্যায়িত করে বলতো, জিন ও শয়তানরা তাঁকে এসব কথা শিখিয়ে দেয়। কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে এর জবাব দেয়া হয়েছে। যেমন ঃ সূরা শূ'আরাতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ
اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ -

"শয়তান এ বাণী নিয়ে আসেনি। এটা তার জন্য সাজেও না। আর সে এটা করতেও পারে না। এ বাণী শোনার সুযোগ থেকেও তাকে দূরে রাখা হয়েছে।"

(আয়াত ২১০ থেকে ২১২)

এ বিষয়টিই এখানে এ ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, "পবিত্র সত্তা ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না।" অর্থাৎ শয়তান কর্তৃক এ বাণী নিয়ে আসা কিংবা নাযিল হওয়ার সময় এতে কর্তৃত্ব খাটানো বা হস্তক্ষেপ করা তো দূরের কথা যে সময় 'লাওহে মাহফুজ' থেকে তা নবীর (সা) ওপর নাযিল করা হয় সে সময় পবিত্র সত্তাসমূহ অর্থাৎ পবিত্র ফেরেশতারা ছাড়া কেউ তার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না। ফেরেশতাদের জন্য পবিত্র কথাটি ব্যবহার করার তাৎপর্য হলো মহান আল্লাহ তাদেরকে সব রকমের অপবিত্র আবেগ অনুভূতি এবং ইচ্ছা আকাংখা থেকে পবিত্র রেখেছেন।

আনাস (রা) ইবনে মালেক, ইবনে আব্বাস (রা), সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইকরিমা, মুজাহিদ, কাতাদা, আবুল আলীয়া, সুদ্দী, দাহ্হাক এবং ইবনে যায়েদ এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই বর্ণনা করেছেন। বাক্য বিন্যাসের সাথেও এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, বাক্যের ধারাবাহিকতা থেকে এ কথাই বুঝা যায় যে, তাওহীদ ও আখেরাত সম্পর্কে মক্কার কাফেরদের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার প্রতিবাদ করার পর কুরআন মজীদ সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা প্রত্যাখ্যান করে তারকা ও গ্রহরাজির "অবস্থান ক্ষেত্র"সমূহের শপথ করে বলা হচ্ছে, এটি একটি অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন গ্রন্থ, আল্লাহর সুরক্ষিত লিপিতে তা লিপিবদ্ধ আছে কোন সৃষ্টির পক্ষে তাতে হস্তক্ষেপ করার কোন সম্ভাবনা নেই এবং তা এমন পদ্ধতিতে নবীর ওপর নাযিল হয় যে, পবিত্র ফেরেশতাগণ ছাড়া কেউ তা স্পর্শও করতে পারে না।

মুফাস্সিরদের মধ্যে কেউ কেউ এ আয়াতের لَا শব্দটিকে 'না' অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা আয়াতের অর্থ করেছেন "পাক পবিত্র নয় এমন কোন ব্যক্তি যেন তা স্পর্শ না করে।" "কিংবা এমন কোন ব্যক্তির তা স্পর্শ করা উচিত—নয়, যে না পাক।" আরো

কতিপয় মুফাসসির যদিও لَا শব্দটিকে 'না' অর্থেই গ্রহণ করেছেন এবং আয়াতের অর্থ করেছেন এই গ্রন্থ পবিত্র সত্তাগণ ছাড়া আর কেউ স্পর্শ করে না। কিন্তু তাদের বক্তব্য হচ্ছে, এখানে 'না' শব্দটি ঠিক তেমনি নির্দেশ সূচক যেমন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী اَلْمُسْلِمُ اَخُوا الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهُ (মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করে না) এর মধ্যে উল্লেখিত 'না' শব্দটি নির্দেশসূচক। এখানে যদিও বর্ণনামূলকভাবে বলা হয়েছে যে, মুসলমান মুসলমানের ওপর জুলুম করে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে মুসলমান যেন মুসলমানের ওপর জুলুম না করে। অনুরূপ এ আয়াতে যদিও বলা হয়েছে যে, পবিত্র লোক ছাড়া কুরআনকে কেউ স্পর্শ করে না। কিন্তু তা থেকে যে নির্দেশ পাওয়া যায় তা হচ্ছে, পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি যেন তা স্পর্শ না করে।

তবে প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাখা আয়াতের পূর্বাপর প্রসংগের সাথে খাপ খায় না। পূর্বাপর বিষয়বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে এ বাক্যের এরূপ অর্থ করা যেতে পারে। কিন্তু যে বর্ণনাধারার মধ্যে কথাটি বলা হয়েছে সে প্রেক্ষিতে রেখে একে বিচার করলে এ কথা বলার আর কোন সুযোগই থাকে না যে, "পবিত্র লোকেরা ছাড়া কেউ যেন এ গ্রন্থ স্পর্শ না করে।" কারণ, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে কাফেরদেরকে। তাদের বলা হচ্ছে, এটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাব। এ কিতাব সম্পর্কে তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে, শয়তানরা নবীকে তা শিখিয়ে দেয়। কোন ব্যক্তি পবিত্রতা ছাড়া এ গ্রন্থ স্পর্শ করতে পারবে না শরীয়াতের এই নির্দেশটি এখানে বর্ণনা করার কি যুক্তি ও অবকাশ থাকতে পারে? বড় জোর যা বলা যেতে পারে তা হচ্ছে, এ নির্দেশ দেয়ার জন্য যদিও আয়াতটি নাযিল হয়নি। কিন্তু বাক্যের ভঙ্গি থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহর দরবারে যেমন কেবল পবিত্র সত্তারাই এ গ্রন্থ স্পর্শ করতে পারে অনুরূপ দুনিয়াতেও অন্তত সেসব ব্যক্তি নাপাক অবস্থায় এ গ্রন্থ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুক। যারা এ গ্রন্থের আল্লাহর বাণী হওয়া সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করে।

এ মাসয়ালা সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ ইমাম মালেক (র) মুয়াত্তা গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে আবী বকর মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযম বর্ণিত এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামানের নেতৃবৃন্দের কাছে আমর ইবনে হাযমের মাধ্যমে যে লিখিত নির্দেশনামা পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে এ নির্দেশটিও ছিল যে, لَا يَمَسُّ الْقُرْاٰنَ الاطاهر (পাক-পবিত্র লোক ছাড়া কেউ যেন কুরআন স্পর্শ না করে)। আবু দাউদ তাঁর 'মারাসীল' গ্রন্থে ইমাম যুহরী থেকে একথাটি উদ্ধৃত করেছেন। অর্থাৎ তিনি আবু মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযমের কাছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লিখিত যে নির্দেশনামা দেখেছিলেন তার মধ্যে এ নির্দেশটিও ছিল।

দুই ঃ হযরত আলী থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন ঃ

ان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم لم يكن يحجزه عن القران شيئ ليس الجنابة -

"অপবিত্র অবস্থা ছাড়া অন্য কিছুই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত রাখতে পারতো না" (আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযি)।

তিন ঃ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القران

"ঋতুবতী নারী ও নাপাক কোন ব্যক্তি যেন কুরআনের কোন অংশ না পড়ে"।

(অবু দাউদ, তিরমিযী)

চার ঃ বুখারীর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে যে পত্র দিয়েছিলেন তাতে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটিও লিখিত ছিল ঃ

يَا أَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ .....

সাহাবা কিরাম (রা) ও তাবেয়ীনদের থেকে এ মাসয়ালাটি সম্পর্কে যেসব মতামত বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

হযরত সালমান ফারসী (রা) অযু ছাড়া কুরআন শরীফ পড়া দুষণীয় মনে করতেন না। তবে তাঁর মতে এরূপ ক্ষেত্রে হাত দিয়ে কুরআন স্পর্শ করা জায়েয নয়। হযরত সা'দ (রা) ইবনে আবী ওয়াক্কাস এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ও এমত অনুসরণ করতেন। হযরত হাসান বাসরী ও ইবরাহীম নাখয়ীও বিনা অযুতে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা মাকরূহ মনে করতেন। (আহকামুল কুরআন- জাস্সাস)। আতা, তাউস, শা'বী এবং কাসেম ইবনে মুহাম্মাদও এই মত পোষণ করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে (আল-মুগনী-ইবনে কুদামাহ)। তবে তাঁদের সবার মতে অযু ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ না করে পড়া কিংবা মুখস্ত পড়া জায়েয।

নাপাক, হায়েজ ও নিফাস অবস্থায় কুরআন শরীফ পড়া হযরত, 'উমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত হাসান বাসরী, হযরত ইবরাহীম নাখয়ী এবং ইমাম যুহরীর মতে মাকরূহ। তবে ইবনে আব্বাসের (রা) মত ছিল এই যে, কোন ব্যক্তি কুরআনের যে অংশ স্বভাবতই মুখে মুখে পড়তে অভ্যস্ত তা মুখস্ত পড়তে পারে। তিনি এ মতের ওপর আমলও করতেন। এ মাসয়ালা সম্পর্কে হযরত সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়েব এবং সা'ঈদ ইবনে জুবাইরকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ তার স্মৃতিতে কি কুরআন সংরক্ষিত নেই? সুতরাং পড়ায় কি দোষ হতে পারে? (আল-মুগনী ও আল-মুহাল্লা -ইবনে হাযম)।

এ মাসয়ালা সম্পর্কে ফকীহদের মতামত নিম্নরূপ ঃ

ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাশানী بدائع الصنائع গ্রন্থে এ বিষয়ে হানাফীদের মতের ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ বিনা অযুতে নামায পড়া যেমন জায়েয নয়, তেমনি কুরআন মজীদ স্পর্শ করাও জায়েয নয়। তবে কুরআন মজীদ যদি গেলাফের মধ্যে থাকে তাহলে স্পর্শ করা যেতে পারে। কোন কোন ফকীহর মতে চামড়ার আবরণ এবং কারো

কারো মতে যে কোষ, লেফাফা বা জুযদানের মধ্যে কুরআন শরীফ রাখা হয় এবং তা থেকে আবার বের করা যায় তা-ই গেলাফের পর্যায়ভুক্ত। অনুরূপ বিনা অযুতে তাফসীর গ্রন্থসমূহ এবং এমন কোন বস্তু স্পর্শ করা উচিত নয় যার ওপর কুরআনের কোন আয়াত লিখিত আছে। কিন্তু ফিকাহর গ্রন্থসমূহ স্পর্শ করা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রেও উত্তম হচ্ছে বিনা অযুতে স্পর্শ না করা। কারণ দলীল প্রমাণ হিসেবে তার মধ্যে কুরআনের আয়াত লিখিত থাকে। হানাফী ফকীহদের কারো কারো মত হচ্ছে কুরআন মজীদের যে অংশে আয়াত লিখিত আছে শুধু সেই অংশ বিনা অযুতে স্পর্শ করা ঠিক নয়। কিন্তু যে অংশে টীকা লেখা হয় তা ফাঁকা হোক কিংবা ব্যাখ্যা হিসেবে কিছু লেখা থাক, তা স্পর্শ করায় কোন দোষ নেই। তবে সঠিক কথা হলো, টীকা বা ব্যাখ্যাসমূহও কুরআনেরই একটা অংশ এবং তা স্পর্শ করা কুরআন মজীদ স্পর্শ করার শামিল। এরপর কুরআন শরীফ পড়া সম্পর্কে বলা যায় যে, "বিনা অযুতে কুরআন শরীফ পড়া জায়েয।" ফতোয়ায়ে আলমগিরী গ্রন্থে শিশুদেরকে এই নির্দেশের আওতা বহির্ভূত গণ্য করা হয়েছে। অযু থাক বা না থাক শিক্ষার জন্য শিশুদের হাতে কুরআন শরীফ দেয়া যেতে পারে।

ইমাম নববী (র) المنهاج গ্রন্থে শাফেয়ী মাযহাবের মতামত বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ নামায ও তাওয়াফের মত বিনা অযুতে কুরআন মজীদ স্পর্শ করা কিংবা তার কোন পাতা স্পর্শ করা হারাম। অনুরূপ কুরআনের জিলদ স্পর্শ করাও নিষেধ। তাছাড়া কুরআন যদি কোন থলি বা ব্যাগের মধ্যে রাখা থাকে কিংবা গেলাফ বা বাক্সের মধ্যে থাকে বা দরসে কুরআনের জন্য তার কোন অংশ কোন ফলকের ওপরে লিখিত থাকে তাও স্পর্শ করা জায়েয নয়। তবে যদি কারো মালপত্রের মধ্যে রাখা থাকে, কিংবা তাফসীর গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ থাকে অথবা কোন মুদ্রার গায়ে তা ক্ষোদিত হয় তাহলে তা স্পর্শ করা জায়েয। শিশুর অযু না থাকলেও সে কুরআন স্পর্শ করতে পারে। কেউ যদি অযু ছাড়া কুরআন পাঠ করে তাহলে কাঠ বা অন্য কোন জিনিসের সাহায্যে পাতা উল্টাতে পারে।

'আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ' গ্রন্থে মালেকী মাযহাবের যে মত উদ্ধৃত করা হয়েছে তা হচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহদের সাথে তারা এ ব্যাপারে একমত যে, হাত দিয়ে কুরআন মজীদ স্পর্শ করার জন্য অযু শর্ত কিন্তু কুরআন শিক্ষার প্রয়োজনে তারা শিক্ষক ও ছাত্র উভয়কে এ ব্যাপারে ছাড় দিয়েছেন। এমনকি তাদের মতে শিক্ষার জন্য ঋতুবতী নারীর জন্যেও কুরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয। ইবনে কুদামা আল-মুগনী গ্রন্থে ইমাম মালেকের (র) এ উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন যে, নাপাক অবস্থায় তো কুরআন শরীফ পড়া নিষেধ। কিন্তু ঋতু অবস্থায় নারীর জন্য কুরআন পড়ার অনুমতি আছে। কারণ, আমরা যদি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাকে কুরআন পড়া থেকে বিরত রাখি তাহলে সে তা ভুলে যাবে।

ইবনে কুদামা হাম্বলী মযহাবের যেসব বিধি-বিধান উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে, নাপাক এবং হায়েজ ও নিফাস অবস্থায় কুরআন কিংবা কুরআনের পূর্ণ কোন আয়াত পড়া জায়েয নয়। তবে বিসমিল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ ইত্যাদি পড়া জায়েয। কারণ এগুলো কুরআনের কোন না কোন আয়াতের অংশ হলেও সেগুলো পড়ার ক্ষেত্রে কুরআন তেলাওয়াতের উদ্দেশ্য থাকে না। তবে কোন অবস্থায়ই বিনা অযুতে হাত দিয়ে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা

فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ
إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾
تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾
فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنْ أَصْحَٰبِ
الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلَٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَٰبِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ
الْمُكَذِّبِينَ الضَّآلِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾
إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾

তোমরা যদি কারো অধীন না হয়ে থাকো এবং নিজেদের এ ধারণার ব্যাপারে যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে মৃত্যুপথযাত্রীর প্রাণ যখন কণ্ঠনালীতে উপনীত হয় এবং তোমরা নিজ চোখে দেখতে পাও যে, সে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে সে সময় তোমরা বিদায়ী প্রাণবায়ুকে ফিরিয়ে আন না কেন? সে সময় তোমাদের চেয়ে আমিই তার অধিকতর নিকটে থাকি। কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না। মৃত সেই ব্যক্তি যদি মুকাররাবীনদের কেউ হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য রয়েছে আরাম-আয়েশ, উত্তম রিযিক এবং নিয়ামতে ভরা জান্নাত। আর সে যদি ডান দিকের লোক হয়ে থাকে তাহলে তাকে সাদর অভিনন্দন জানানো হয় এভাবে যে, তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আর সে যদি অস্বীকারকারী পথভ্রষ্টদের কেউ হয়ে থাকে তাহলে তার সমাদরের জন্য রয়েছে ফুটন্ত গরম পানি এবং জাহান্নামে ঠেলে দেয়ার ব্যবস্থা।

এ সবকিছুই অকাট্য সত্য। অতএব, হে নবী, আপনার মহান রবের নামের তাসবীহ- তথা পবিত্রতা ঘোষণা করুন।[৪২]

জায়েয নয়। তবে চিঠিপত্রে কিংবা ফিকাহর কোন গ্রন্থ বা অন্য কিছু লিখিত বিষয়ের মধ্যে যদি কুরআনের কোন আয়াত লিপিবদ্ধ থাকে তাহলে তা হাত দিয়ে স্পর্শ করা নিষেধ নয়। অনুরূপভাবে কুরআন যদি কোন জিনিসের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে তাহলে অযু ছাড়াই তা হাত দিয়ে ধরে উঠানো যায়। তাফসীর গ্রন্থসমূহ হাত দিয়ে ধরার ক্ষেত্রে অযু শর্ত নয়। তাছাড়া তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে অযুহীন কোন লোককে যদি হাত দিয়ে কুরআন শরীফ

স্পর্শ করতে হয় তাহলে সে তায়াম্মুম করে নিতে পারে। 'আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ' গ্রন্থে হাম্বলী মাযহাবের এ মাসয়ালাটিও উল্লেখ আছে যে, শিক্ষার উদ্দেশ্যেও শিশুদের বিনা অযুতে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা ঠিক নয়। তাদের হাতে কুরআন শরীফ দেয়ার আগে তাদের অভিভাবকদের কর্তব্য তাদের অযু করানো।

এ মাসয়ালা সম্পর্কে জাহেরীদের মাতামত হচ্ছে, কেউ বিনা অযুতে থাক বা নাপাক অবস্থায় থাক কিংবা ঋতুবতী স্ত্রীলোক হোক সবার জন্য কুরআন পাঠ করা এবং হাত দিয়ে তা স্পর্শ করা সর্বাবস্থায় জায়েয। ইবনে হাযম তাঁর আল-মুহাল্লা গ্রন্থে (১ম খণ্ড, ৭৭ থেকে ৮৪ পৃষ্ঠা) এ মাসয়ালা সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। তাতে এ মতটি সঠিক ও বিশুদ্ধ হওয়া সম্পর্কে বহু দলীল প্রমাণ পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, কুরআন পাঠ করা এবং তা স্পর্শ করার ব্যাপারে ফকীহগণ যে শর্তাবলী আরোপ করেছেন তার কোনটিই কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত নয়।

৪০. মূল আয়াতের কথাটি হচ্ছে اَنتُم مُدهِنُونَ । ادهان অর্থ কোন ব্যাপারে খোশামোদ ও তোয়াজ করার নীতি গ্রহণ করা, গুরুত্ব না দেয়া এবং যথাযোগ্য মনোযোগের উপযুক্ত মনে না করা। ইংরেজীতে (to take lightly) কথাটি দ্বারা প্রায় একই অর্থ প্রকাশ পায়।

৪১. ইমাম রাযী تَجعَلُونَ رِزقَكُم কথাটির ব্যাখ্যায় এখানে রিযিক শব্দটির অর্থ আয় রোজগার ও উপার্জন হওয়ার সম্ভাবনার কথাও প্রকাশ করেছেন। কুরাইশ গোত্রের কাফেররা যেহেতু কুরআনের দাওয়াতকে তাদের উপার্জন ও আর্থিক স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করতো। তারা মনে করতো এ আন্দোলন যদি সাফল্য মণ্ডিত হয় তাহলে আমাদের আয় উপার্জনের পথ ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই আয়াতটির অর্থ এও হতে পারে যে, তোমরা পেটের ধান্ধার কারণেই কুরআনকে অস্বীকার করে যাচ্ছো। তোমাদের কাছে হক ও বাতিলের কোন গুরুত্বই নেই। তোমাদের দৃষ্টিতে সত্যিকার গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে রুটি। রুটির জন্য তোমরা হকের বিরোধীতা করতে এবং বাতিলের সহযোগিতা গ্রহণ করতে একটুও দ্বিধান্বিত নও।

৪২. হযরত উকবা ইবনে আমের জুহানী বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত নাযিল হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা এটিকে রুকূ'তে স্থান দাও। অর্থাৎ রুকূ'তে سبحانَ ربّىَ العظيم পড়। পরে سَبِّحِ اسمَ ربِّكَ الاعلى আয়াতটি নাযিল হলে তিনি বললেন, এটিকে তোমরা সিজদায় স্থান দাও। অর্থাৎ সিজদায় سبحانَ ربّىَ الاعلى পড় (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাববান, হাকেম)। এ থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের যে নিয়ম পদ্ধতি বেঁধে দিয়েছেন তার ছোট ছোট বিষয়গুলো পর্যন্ত কুরআনের ইংগিত ও নির্দেশনা থেকেই গৃহীত।

আল হাদীদ

৫৭

নামকরণ

সূরার ২৫ আয়াতের وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ বাক্যাংশ থেকে নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

সর্ব সম্মত মতে এটি মদীনায় অবতীর্ণ সূরা। এ সূরার বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে মনে হয় সম্ভবত উহুদ যুদ্ধ ও হুদায়বিয়ার সন্ধির মধ্যবর্তী কোন এক সময় এ সূরা নাযিল হয়েছে। এটা সে সময়ের কথা যখন কাফেররা চারদিক থেকে ক্ষুদ্র এ ইসলামী রাষ্ট্রটিকে তাদের আক্রমণের লক্ষস্থল বানিয়েছিল এবং ঈমানদারদের ক্ষুদ্র একটি দল অত্যন্ত সহায় সম্বলহীন অবস্থায় সমগ্র আরবের শক্তির মোকাবিলা করে যাচ্ছিলেন। এ পরিস্থিতিতে ইসলাম তার অনুসারীদের কাছে শুধু জীবনের কুরবানীই চাচ্ছিলো না বরং সম্পদের কুরবানীর প্রয়োজনীয়তাও একান্তভাবে উপলব্ধি করছিলো। এ ধরনের কুরবানী পেশ করার জন্য এ সূরায় অত্যন্ত জোরালো আবেদন জানানো হয়েছে। সূরার ১০ আয়াত এ অনুমানকে আরো জোরালো করছে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের দলকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, যারা বিজয়ের পরে নিজেদের অর্থ সম্পদ খরচ করবে এবং আল্লাহর পথে লড়াই করবে তারা কখনো ঐ সব লোকের সমমর্যাদা সম্পন্ন হতে পারবে না যারা বিজয় লাভের পূর্বে জান ও মালের কুরবানী পেশ করবে। ইবনে মারদুইয়া কর্তৃক উদ্ধৃত হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীস একথাই সমর্থন করে। তিনি اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ কুরআন নাযিলের শুরু থেকে ১৭ বছর পর ঈমানদারদের আলোড়নকারী এ আয়াতটি নাযিল হয়। এ হিসেব অনুসারে এর নাযিল হওয়ার সময় ৪র্থ ও পঞ্চম হিজরী সনের মধ্যবর্তী সময়ই এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল বলে নির্ধারিত হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার উপদেশ দান। যখন আরব জাহেলিয়াতের সাথে ইসলামের সিদ্ধান্তকর সংগ্রাম চলছিলো, ইসলামের ইতিহাসের সে সংকটকালে মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে আর্থিক কুরবানীর জন্য প্রস্তুত করা এবং ঈমান যে শুধু মৌখিক স্বীকৃতি ও বাহ্যিক কিছু কাজকর্মের নাম নয় বরং আল্লাহ ও তার রসূলের জন্য একনিষ্ঠ হওয়াই তার মূল চেতনা ও প্রেরণা, একথা তাদের

মনে বদ্ধমূল করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ সূরা নাযিল করা হয়েছিল। যে ব্যক্তির মধ্যে এ চেতনা ও প্রেরণা অনুপস্থিত এবং আল্লাহ ও তার দীনের মোবাবিলায় নিজের প্রাণ, সম্পদ ও স্বার্থকে অধিকতর ভালবাসে তার ঈমানের দাবী অন্তসার শূন্য। আল্লাহর কাছে এ ধরনের ঈমানের কোন মূল্য ও মর্যাদা নেই।

এ উদ্দেশ্যে সর্ব প্রথম আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে যাতে শ্রোতারা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে, কোন মহান সত্তার পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বোধন করা হচ্ছে। তারপর নিম্নের বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে পেশ করা হয়েছে।

ঈমানের অনিবার্য দাবী হচ্ছে, ব্যক্তি যেন আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে গড়িমসি ও টালবাহানা না করে। এ ধরনের কাজ শুধু ঈমানের পরিপন্থীই নয়, বাস্তবতার বিচারেও ভুল। কেননা, এসব অর্থ-সম্পদ মূলত আল্লাহ তা'আলারই অর্থ-সম্পদ। তোমাদেরকে খলিফা হিসেবে তা ব্যবহার করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। এ অর্থ-সম্পদই কাল অন্যদের হাতে ছিল, আজ তোমাদের হাতে আছে এবং ভবিষ্যতে অন্য কারো হাতে চলে যাবে। শেষ মেশ তা বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিসের মালিক আল্লাহর কাছেই থেকে যাবে। এ সম্পদের কোন অংশ তোমাদের কাজে লাগলে কেবল সেই অংশই লাগতে পারে যা তোমাদের অধিকারে থাকা কালে তোমরা আল্লাহর কাজে ব্যয় করবে।

আল্লাহর পথে জান ও মালের কুরবানী পেশ করা যদিও সর্বাবস্থায়ই সম্মানজনক কাজ। কিন্তু এসব ত্যাগ ও কুরবানীর মূল্য ও মর্যাদা অবস্থার নাজুকতা দিয়ে নিরূপিত হয়। এমন সময়ও আসে যখন কুফরী শক্তি অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে এবং সর্বক্ষণ এমন একটা আশংকা বিদ্যমান থাকে যে, কুফরীর সাথে সংঘাতে ইসলাম হয়তো পরাভূত হয়ে পড়বে। আবার এমন একটা সময়ও আসে যখন কুফর ও ইসলামের দ্বন্দে শক্তির ভারসাম্য ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং ন্যায় ও সত্যের দুশমনদের মোকাবেলায় ঈমানের অনুসারীরা বিজয়লাভ করতে থাকে। গুরুত্বের দিক দিয়ে এ দু'টি পরিস্থিতি সমান নয়। তাই এ ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে যে ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করা হয় মূল্যের দিক দিয়ে তাও সমান নয়। ইসলাম যখন দুর্বল তখন তাকে সমুন্নত ও বিজয়ী করার জন্য যারা প্রাণপণ চেষ্টা সাধনা ও অর্থ সম্পদ ব্যয় করবে ইসলামের বিজয় যুগে তার বিস্তার ও প্রসারের জন্য যারা প্রাণ ও সম্পদ অকাতরে ব্যয় করবে তারা তাদের সমমর্যাদা লাভ করতে পারবে না।

ন্যায় ও সত্যের পথে যতটা সম্পদ ব্যয় করা হবে আল্লাহর কাছে তা ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। আর আল্লাহ ঐ সম্পদকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেবেন শুধু তাই নয় নিজের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত পুরস্কারও দান করবেন।

আখেরাতে সেসব ঈমানদার কেবল নূর লাভ করবে যারা আল্লাহর পথে তাদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছে। মুনাফিকরা যারা দুনিয়াতে নিজেদের স্বার্থই কেবল রক্ষা করেছে। এবং ন্যায় ও সত্য বিজয়ী হচ্ছে, না বাতিল বিজয়ী হচ্ছে তার কোন পরোয়াই করেনি। দুনিয়ার এ জীবনে তারা ঈমানদারদের সাথেই মিলে মিশে থাকলেও আখেরাতে

তাদেরকে ঈমানদারদের থেকে আলাদা করে দেয়া হবে। তারা 'নূর' থেকে বঞ্চিত হবে এবং কাফেরদের সাথে তাদের হাশর হবে।

যেসব আহলে কিতাবের গোটা জীবন দুনিয়া পূজায় অতিবাহিত হয়েছে এবং যাদের মন দীর্ঘদিনের গাফলতি ও অমনোযোগিতার কারণে পাথরের ন্যায় কঠোর হয়ে গিয়েছে মুসলমানদের তাদের মত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়। সে কেমন ঈমানদার আল্লাহর কথা শুনে যার হৃদয়মন বিগলিত হয় না। এবং তাঁর নাযিলকৃত সত্য বিধানের সামনে মাথা নত করে না।

কেবল সেই সব ঈমানদারই আল্লাহর নিকট 'সিদ্দীক' ও শহীদ বলে গণ্য যারা কোন রকম প্রদর্শনীর মনোভাব ছাড়াই একান্ত আন্তরিকতা ও সততার সাথে নিজেদের অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে।

দুনিয়ার জীবন মাত্র কয়েক দিনের চাকচিক্য এবং ধোকার উপকরণ। এখানকার খেল তামাসা, এখানকার আনন্দ ও আকর্ষণ, এখানকার সৌন্দর্য ও সাজ সজ্জা, এখানকার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে গর্ব ও অহংকার এবং এখানকার ধন সম্পদ ও ঐশ্বর্যের ব্যাপারে একে অপরকে অতিক্রম করার চেষ্টা সাধনা সব কিছুই অস্থায়ী। এর উপমা দেয়া যায় সেই শস্য ক্ষেত্রের সাথে যা প্রথম পর্যায়ে সবুজ ও সতেজ হয়ে ওঠে। তারপর বিবর্ণ হয়ে তামাটে বর্ণ ধারণ করে এবং সর্বশেষে ভূষিতে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের জীবন হচ্ছে স্থায়ী জীবন যেখানে সব কাজের বড় বড় ফলাফল পাওয়া যাবে। তোমাদের যদি প্রতিযোগিতামূলকভাবে কিছু করতে হয় তাহলে জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জন্য চেষ্টা করো। পৃথিবীতে আরাম-আয়েশ ও বিপদ আপদ যাই আসে তা আল্লাহ তা'আলার পূর্ব লিখিত সিদ্ধান্ত অনুসারেই আসে। একজন ঈমানদারের ভূমিকা হওয়া উচিত বিপদ আপদ আসলে সাহস না হারানো এবং আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তি আসলে গর্ব প্রকাশ না করা। একজন মুনাফিক বা কাফেরের আচরণ হচ্ছে আল্লাহ যদি তাকে নিয়ামত দান করেন তাহলে সে গর্বে মেতে ওঠে, অহংকার প্রকাশ করতে থাকে এবং নিয়ামত দাতা আল্লাহর কাজে ব্যয় করতে নিজেও সংকীর্ণতার পরিচয় দেয় এবং অন্যদেরকেও কার্পণ্য করতে পরামর্শ দেয়।

আল্লাহ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, কিতাব এবং ন্যায় বিচারের ভারসাম্যপূর্ণ মানদণ্ড সহকারে তাঁর রসূল পাঠিয়েছেন, যাতে মানুষ ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে আর তার সাথে লোহাও নাযিল করেছেন যাতে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা এবং বাতিলের মাথা অবনত করার জন্য শক্তি ব্যবহার করা যায়। এভাবে আল্লাহ দেখতে চান মানুষের মধ্যে এমন লোক কারা যারা তাঁর দীনের সহায়তা ও সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয় এবং সেজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। তোমাদের নিজেদের উন্নতি ও মর্যাদার জন্য আল্লাহ এই সুযোগসমূহ সৃষ্টি করেছেন। অন্যথায় আল্লাহ তাঁর কাজের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে ইতিপূর্বেও একের পর এক নবী রসূলগণ এসেছেন। তাদের আহবানে কিছু লোক সঠিক পথে ফিরে এসেছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই পাপাচারী রয়ে গিয়েছে। তার পর ঈসা আলাইহিস সালাম এসেছেন। তাঁর শিক্ষায় মানুষের মধ্যে বহু নৈতিক গুণাবলী সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাঁর 'উম্মত' বৈরাগ্যবাদের বিদআত অবলম্বন করে।

এখন আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন। যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করবে আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমতের দ্বিগুণ অংশ দেবেন এবং তাদেরকে এমন 'নূর' দান করবেন যার সাহায্যে তারা দুনিয়ার জীবনে পদে পদে বাঁকা পথসমূহের মধ্যে সোজা পথটি স্পষ্ট দেখে চলতে পারবে। আহলে কিতাব নিজেদেরকে যদিও আল্লাহর রহমতের ঠিকাদার মনে করে থাকে। কিন্তু আল্লাহর রহমত তাঁর নিজেরই হাতে আছে। যাকে ইচ্ছা তাকে এই রহমত ও অনুগ্রহ দান করার ইখতিয়ার তাঁর আছে। এ হচ্ছে এই সূরায় সুবিন্যস্ত ও ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সার সংক্ষেপ।

আয়াত ২৯ **সূরা আল হাদীদ–মাদানী** রুকূ' ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝١ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٢ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝٣

যমীন ও আসমানসমূহের প্রতিটি জিনিসই আল্লাহর তাসবীহ করেছে।[১] তিনি মহা পরাক্রমশালী ও অতিশয় বিজ্ঞ।[২] পৃথিবী ও আকাশ সাম্রাজ্যের সার্বভৌম মালিক তিনিই। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তিনিই আদি তিনি অন্ত এবং তিনিই প্রকাশিত তিনিই গোপন।[৩] তিনি সব বিষয়ে অবহিত।

১. অর্থাৎ বিশ্ব–জাহানের প্রত্যেকটি বস্তু সদা সর্বদা এ সত্য প্রকাশ এবং ঘোষণা করে চলেছে যে, এ বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা ও পালনকর্তা সব রকম দোষ–ত্রুটি, অপূর্ণতা, দুর্বলতা, ভুল ভ্রান্তি ও অকল্যাণ থেকে পবিত্র। তার ব্যক্তি সত্তা পবিত্র, তাঁর গুণাবলী পবিত্র, তাঁর কাজকর্ম পবিত্র এবং তাঁর সমস্ত সৃষ্টিমূলক বা শরীয়াতের বিধান সম্পর্কিত নির্দেশাবলীও পবিত্র। এখানে অতীতকাল নির্দেশক শব্দরূপ سَبَّحَ ব্যবহার করা হয়েছে এবং অন্য কিছু ক্ষেত্রে বর্তমান ও ভবিষ্যত কাল নির্দেশক শব্দ يُسَبِّحُ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বিশ্ব–জাহানের প্রতিটি অণু পরমাণু চিরদিন তার স্রষ্টার পবিত্রতা বর্ণনা করেছে, আজও করছে এবং ভবিষ্যতেও চিরদিন করতে থাকবে।

২. মূল আয়াতে هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ বাক্যের শুরুতেই هُوَ শব্দ ব্যবহার করায় আপনা থেকেই এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, তিনি মহা পরাক্রমশালী ও অতিশয় বিজ্ঞ শুধু তাই নয়, বরং প্রকৃত পক্ষে কেবলমাত্র তিনিই এমন সত্তা যিনি মহা পরাক্রমশালী ও অতিশয় বিজ্ঞ। عَزِيْزٌ শব্দের অর্থ পরাক্রমশালী, শক্তিমান ও অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারী যার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন পৃথিবীর কোন শক্তিই রোধ করতে পারে না, যার সাথে টক্কর নেয়ার সাধ্য কারো নেই, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যার আনুগত্য সবাইকে করতে হয়, যার অমান্যকারী কোনভাবেই তার পাকড়াও থেকে রক্ষা পায় না। আর حَكِيْمٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে, তিনি যাই করেন, জ্ঞান ও যুক্তি বুদ্ধির সাহায্যে

করেন। তাঁর সৃষ্টি, তাঁর ব্যবস্থাপনা, তাঁর শাসন, তাঁর আদেশ নিষেধ, তাঁর নির্দেশনা সব কিছুই জ্ঞান ও যুক্তি নির্ভর। তাঁর কোন কাজেই অজ্ঞতা, বোকামি ও মূর্খতার লেশমাত্র নেই।

এখানে আরো একটি সূক্ষ্ম বিষয় আছে যা ভালভাবে বুঝতে হবে। কুরআন মজীদের অতি অল্প সংখ্যক স্থানে আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম عزيز (মহাপরাক্রমশালী) এর সাথে قوى (নিরংকুশ শক্তির অধিকারী), مقتدر (ক্ষমতাধর), جبار (আপন নির্দেশাবলী বাস্তবায়নকারী) এবং ذوانتقام (প্রতিশোধ গ্রহণকারী) শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে যার সাহায্যে তাঁর নিরংকুশ ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে। যেখানে বাক্যের ধারাবাহিকতা জালেম ও অবাধ্যদের জন্য আল্লাহর আযাবের ভীতি প্রদর্শন দাবী করে কেবল সেখানেই এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ ধরনের হাতে গোনা কতিপয় স্থান বাদ দিলে আর যেখানেই عزيز শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেই তার সাথে সাথে حكيم (অতিশয় বিজ্ঞ), عليم (সর্বজ্ঞাতা), رحيم (দয়াল, নিয়ামতদানকারী), غفور (ক্ষমাশীল) وهاب (সার্বক্ষণিক দানকারী) এবং حميد (প্রশংসিত) শব্দগুলোর মধ্য থেকে কোন শব্দ অবশ্যই ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, যে সত্তা অসীম ক্ষমতার অধিকারী, সে যদি নির্বোধ হয়, মূর্খ হয়, দয়া মায়াহীন হয়, ক্ষমা ও মার্জনা আদৌ না জানে, কৃপণ হয় এবং দুশ্চরিত্র হয় তাহলে তার ক্ষমতার পরিণাম জুলুম নির্যাতন ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। পৃথিবীতে যেখানেই জুলুম নির্যাতন হচ্ছে তার মূল কারণ এই যে, যে ব্যক্তি অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে সে তার শক্তি ও ক্ষমতাকে হয় মূর্খতার সাথে ব্যবহার করছে, নয়তো সে দয়ামায়াহীন, কঠোর হৃদয় অথবা কৃপণ ও সংকীর্ণমনা কিংবা দুশ্চরিত্র ও দুষ্কর্মশীল। যে ক্ষেত্রেই শক্তির সাথে এসব দোষ একত্রিত হবে সে ক্ষেত্রেই কোন কল্যাণের আশা করা যায় না। এ কারণে কুরআন মজীদে আল্লাহর গুনবাচক নাম عزيز এর সাথে তাঁর حكيم ، عليم ، رحيم ، غفور ، حميد ও وهاب হওয়ার কথাও অবশ্যই উল্লেখ করা হয়েছে যাতে মানুষ জানতে পারে, যে আল্লাহ এ বিশ্ব-জাহান শাসন ও পরিচালনা করছেন একদিকে তিনি এমন ক্ষমতার অধিকারী যে যমীন থেকে নিয়ে আসমান পর্যন্ত কেউ তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধা দিতে পারে না, অপর দিকে তিনি حكيم বা (মহাজ্ঞানী)ও বটে। তাঁর প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত সরাসরি জ্ঞান ও বিজ্ঞতার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। তিনি عليمও। যে ফায়সালাই তিনি করেন জ্ঞান অনুসারেই করেন। তিনি رحيمও। নিজের অসীম ক্ষমতা ও কতৃত্বকে নির্দয়ভাবে ব্যবহার করেন না। তিনি غفورও। অধীনস্তদের সাথে ছিদ্রান্বেষণ বা খুঁত ধরা মানসিকতার নয়, বরং ক্ষমাশীলতার আচরণ করে থাকেন। তিনি وهابও। নিজের অধীনস্তদের সাথে কৃপণতার আচরণ করেন না। বরং চরম দানশীলতা ও বদান্যতার আচরণ করছেন। এবং তিনি حميد ও। তাঁর সত্তায় প্রশংসার যোগ্য সমস্ত গুণাবলী ও পূর্ণতার সমাহার ঘটেছে।

যারা সার্বভৌমত্বের (Sovereignty) ওপর রাষ্ট্র দর্শন ও আইন দর্শনের আলোচনা সম্পর্কে অবহিত, তারা কুরআনের এ বক্তব্যের প্রকৃত গুরুত্বকে ভালভাবে বুঝতে পারবেন। সার্বভৌমত্ব বলতে বুঝায়, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি, অসীম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মালিক হবে। তার আদেশ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টিকারী, তা পরিবর্তনকারী বা পুনর্বিবেচনাকারী কোন আভ্যন্তরীণ বা বাইরের শক্তি থাকবে না এবং তার আনুগত্য করা ছাড়া কারো কোন উপায়ও থাকবে না। এ অসীম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের

ধারণার সাথে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি অনিবার্যরূপেই দাবী করে যে, যিনি এ ধরনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হবেন তাকে নিষ্কলুষ এবং জ্ঞান-বুদ্ধিতে পূর্ণাংগ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। কারণ, এরূপ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পন্ন লোক নির্বোধ, মুর্খ, দয়ামায়াহীন এবং দুশ্চরিত্র হলে তার সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সর্বাত্মক জুলুম ও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। এ কারণে যেসব দার্শনিক কোন মানুষ বা মানবীয় প্রতিষ্ঠান কিংবা কোন একদল মানুষকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করেছে তাদেরকে একথাও ধরে নিতে হয়েছে যে, তারা ভুল ত্রুটির উর্ধে হবে। কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, কোন মানবীয় কর্তৃত্ব বাস্তবে যেমন কখনো এরূপ নিরঙ্কুশ ও সীমাহীন সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করতে পারে না তেমনি কোন বাদশাহ বা পার্লামেন্ট, জাতি কিংবা পার্টি সীমিত পরিসরে যে সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করে থাকে তা নির্ভুল পন্থায় কাজে লাগানোও তার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এমন যুক্তিবুদ্ধি যার মধ্যে অজ্ঞতার লেশমাত্র নেই এবং এমন জ্ঞান যা সংশ্লিষ্ট সব সত্যকে পরিব্যাপ্ত করে—কোন একজন মানুষ, একক কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন জাতির ভাগ্যে জুটে যাওয়া তো দূরের কথা, সম্মিলিতভাবে গোটা মানব জাতিও লাভ করেনি। অনুরূপভাবে মানুষ যতক্ষণ মানুষ ততক্ষণ তার পক্ষে নিজের স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, ভয়ভীতি, লোভ লালসা, ইচ্ছা আকাংখা, পক্ষপাতিত্ব, আবেগ তাড়িত সন্তুষ্টি ও ক্রোধ এবং ভালবাসা ও ঘৃণা করা থেকে উর্ধে উঠাও সম্ভবপর নয়। এসব সত্যকে সামনে রেখে কেউ যদি গভীরভাবে চিন্তা করে তাহলে সে উপলব্ধি করবে যে, এ বক্তব্যের মধ্যে কুরআন প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমত্বের সঠিক ও পূর্ণাংগ ধারণা পেশ করছে। কুরআন বলছে ঃ عزيز এ বিশ্ব-জাহানে অর্থাৎ নিরংকুশ ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ নেই। আর কেবল তিনিই সমাহীন এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী একমাত্র সত্তা যিনি 'নিষ্কলুষ' 'হাকীম' ও 'আলীম' 'রাহীম' ও 'গাফুর' এবং 'হামীদ' ও 'ওয়াহহাব'।

৩. অর্থাৎ যখন কিছুই ছিল না তখন তিনি ছিলেন এবং যখন কিছুই থাকবে না তখন তিনি থাকবেন। তিনি সব প্রকাশ্যের চেয়ে অধিক প্রকাশ্য। কারণ পৃথিবীতে যে জিনিসের প্রকাশ দেখা যায় তা তাঁরই গুণাবলী, তাঁরই কার্যাবলী এবং তাঁরই নূরের প্রকাশ। আর তিনি সব গুপ্ত জিনিসের চেয়ে অধিক গুপ্ত। কারণ, ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা তাঁর সত্তাকে অনুভব ও উপলব্ধি করা তো দূরের কথা বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তাভাবনা ও কল্পনা পর্যন্ত তাঁর রহস্য ও বাস্তবতাকে স্পর্শ করতে পারে না। ইমাম আহমদ, মুসলিম, তিরমিযী ও বায়হাকী হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে এবং হাফেজ আবু ইয়া'লা মুসেলী তার মুসনাদ গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি দোয়া সম্বলিত যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার নিম্নোক্ত কথাগুলোই এ আয়াতের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা ঃ

انت الاول فليس قبلك شيئ وانت الاخر فليس بعدك شيئ وانت

ال ظاهر فليس فوقك شيئ وانت الباطن فليس دونك شيئ –

"তুমিই সর্ব প্রথম। তোমার পূর্বে আর কেউ নেই। তুমিই সর্বশেষ। তোমার পরে আর কেউ নেই। তুমিই প্রকাশ্য। তোমার চেয়ে প্রকাশ্য কেউ নেই। তুমি গুপ্ত। তোমার চেয়ে অধিক গুপ্ত আর কেউ নেই।"

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى
عَلَى الْعَرْشِ ؕ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ
مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
بَصِيْرٌ ۝٤ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝٥
يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ؕ وَهُوَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ
الصُّدُوْرِ ۝٦

তিনিই আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর আরশে সমাসীন হয়েছেন।[৪] যা কিছু মাটির মধ্যে প্রবেশ করে, যা কিছু তা থেকে বেরিয়ে আসে এবং যা কিছু আসমান থেকে অবতীর্ণ হয় আর যা কিছু আসমানে উঠে যায়[৫] তা তিনি জানেন। তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সাথে আছেন।[৬] তোমরা যা করছো আল্লাহ তা দেখছেন। আসমান ও যমীনের নিরংকুশ ও সার্বভৌম মালিকানা একমাত্র তাঁরই। সব ব্যাপারের ফায়সালার জন্য তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হয়। তিনিই রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন। তিনি অন্তরের গোপন কথা পর্যন্ত জানেন।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কুরআন মজীদে জান্নাত ও দোযখবাসীদের জন্য যে চিরস্থায়ী জীবনের কথা বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলাই সর্বশেষ অর্থাৎ যখন কিছুই থাকবে না তখন তিনি থাকবেন—তার সাথে এ কথা কি করে খাপ খায়? এর জবাব কুরআন মজীদের মধ্যেই বিদ্যমান। كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ (القصص : ٨٨) অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা ছাড়া আর সব জিনিসই নশ্বর ও ধ্বংসশীল।" অন্য কথায় কোন সৃষ্টিরই নিজস্ব স্থায়িত্ব নেই। যদি কোন জিনিস স্থায়ী হয় বা স্থায়ী থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা স্থায়ী রাখার কারণেই তা স্থায়ী হয়ে আছে এবং থাকতে পারে। অন্যথায় আল্লাহ ছাড়া স্ব স্ব ক্ষেত্রে আর সবাই নশ্বর ও ধ্বংসশীল। কেউ আপন ক্ষমতা ও বৈশিষ্টে অবিনশ্বর বিধায় জান্নাত বা দোযখে চিরস্থায়িত্ব লাভ করবে—এমনটা নয়। বরং সেখানে তার স্থায়িত্ব লাভ করার কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা তাকে চিরস্থায়ী জীবন দান করবেন। ফেরেশতাদের ব্যাপারটাও ঠিক তাই। তারা আপন ক্ষমতা ও বৈশিষ্টে অবিনশ্বর নয়। আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেছেন তখন তারা অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং যত সময় পর্যন্ত তিনি চাইবেন তত সময় পর্যন্তই তারা বেঁচে থাকতে পারে।

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝٧ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ
وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝٨

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের[৭] প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং ব্যয় কর[৮] সে জিনিস যার প্রতিনিধিত্বমূলক মালিকানা তিনি তোমাদের দিয়েছেন।[৯] তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে ও অর্থ-সম্পদ খরচ করবে[১০] তাদের জন্য বড় প্রতিদান রয়েছে। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনছো না। অথচ তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনার জন্য রসূল তোমাদের প্রতি আহবান জানাচ্ছেন[১১] অথচ তিনি তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন।[১২] যদি তোমরা সত্যিই স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত হও।

৪. অর্থাৎ বিশ্বজাহানের স্রষ্টাও তিনি শাসনকর্তাও তিনি। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৪১-৪২, ইউনুস, টীকা ৪, আর রা'দ, টীকা ২ থেকে ৫, হামীম আস সাজদা, টীকা ১১ থেকে ১৫)।

৫. অন্য কথায় তিনি শুধু সামগ্রিক জ্ঞানের অধিকারী নন, খুঁটি নাটি বিষয়েও জ্ঞানের অধিকারী। এক একটি শস্যদানা ও বীজ যা মাটির গভীরে প্রবিষ্ট হয়, এক একটি ছোট পাতা ও অঙ্কুর যা মাটি ফুঁড়ে বের হয়, বৃষ্টির এক একটি বিন্দু যা আসমান থেকে পতিত হয় এবং সমুদ্র ও খালবিল থেকে যে বাষ্পরাশি আকাশের দিকে উত্থিত হয়, তার প্রতিটি মাত্রা তাঁর জানা আছে। কোন্ দানাটি ও বীজটি পৃথিবীর কোন্খানে কিভাবে পড়ে আছে তা তিনি জানেন বলেই সেটিকে বিদীর্ণ করে অঙ্কুরোদগম করেন এবং তাকে লালন পালন করে বড় করেন। কি পরিমাণ বাষ্প কোন্ কোন্ স্থান থেকে উত্থিত হয়েছে এবং কোথায় কোথায় পৌঁছেছে তা তিনি জানেন বলেই সেগুলো একত্রিত করে মেঘমালা সৃষ্টি করেন এবং ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশের জন্য তা বন্টন করে দিয়ে একটি হিসেব অনুসারে বৃষ্টিপাত ঘটান। আর যেসব জিনিস মাটিতে প্রবেশ করে ও তা থেকে বেরিয়ে আসে এবং যেসব জিনিস আসমানের দিকে উঠে যায় ও তা থেকে নেমে আসে তার বিস্তারিত দিকও এর আলোকে অনুমান ও অনুধাবন করা যেতে পারে। আল্লাহর জ্ঞান যদি এসব বিষয়ে পরিব্যপ্ত না হতো, তাহলে প্রতিটি জিনিসই আলাদা আলাদা ব্যবস্থাপনা এবং প্রত্যেকটি জিনিসই এমন নিপুন, নিখুঁত ও বিজ্ঞোচিত পন্থায় ব্যবস্থাপনা করা কিভাবে সম্ভব হতো?

৬. অর্থাৎ তোমরা কোন জায়গায়ই তাঁর জ্ঞান, তাঁর অসীম ক্ষমতা, তাঁর শাসন কর্তৃত্ব এবং তাঁর ব্যবস্থাপনার আওতা বহির্ভূত নও। মাটিতে, বায়ুতে, পানিতে অথবা কোন

নিভৃত কোণে যেখানেই তোমরা থাক না কেন সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ জানেন তোমরা কোথায় আছো। সেখানে তোমাদের বেঁচে থাকাটাই একথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ ঐ স্থানেও তোমাদের জীবন ধারণের উপকরণ সরবরাহ করছেন। তোমাদের হৃদপিণ্ডে যে স্পন্দন উঠছে, তোমাদের ফুসফুস যে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করছে, তোমাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি যে কাজ করছে এসব কিছুরই কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায় তোমাদের দেহের সব যন্ত্রপাতি ঠিকমত কাজ করছে। কোন সময় যদি তোমাদের মৃত্যু আসে তাহলে এ কারণে আসে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের বেঁচে থাকার ব্যবস্থাপনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে তোমাদেরকে প্রত্যাহার করে নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

৭. অমুসলিমদের সম্বোধন করে একথা বলা হয়নি। বরং পরবর্তী গোটা বক্তব্য থেকে একথাই প্রকাশ পাচ্ছে যে, এখানে সেই সব মুসলমানদের সম্বোধন করা হয়েছে যারা ইসলামের বাণী স্বীকার করে ঈমান গ্রহণকারীদের সাথে শামিল হয়েছিলেন। কিন্তু ঈমানের দাবী পূরণ করা এবং মু'মিনের মত জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করা থেকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন। একথা সবারই জানা যে, অমুসলিমদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথেই একথা বলা যায় না যে, আল্লাহর পথে জিহাদের খাতে উদার মনে সাহায্য করো। কিংবা তাদেরকে একথাও বলা যায় না যে, তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়লাভের পূর্বে জিহাদ ও আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করবে তাদের মর্যাদা যারা বিজয়লাভের পরে এসব কাজ করবে তাদের চেয়ে অনেক বেশী হবে। অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে তাদের সামনে ইসলামের প্রাথমিক দাবী পেশ করা হয়ে থাকে, চূড়ান্ত দাবী নয়। এ কারণে বক্তব্যের ধারা অনুসারে এখানে اٰمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ বলার অর্থ হচ্ছে, হে সেই সব লোক, যারা ঈমানের দাবী করে মুসলমানদের দলে শামিল হয়েছো—আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সরল মনে সত্যিকার অর্থে মেনে নাও এবং এমন কর্মপন্থা গ্রহণ করো যা নিষ্ঠাবান মু'মিনদের করা উচিত।

৮. এখানে ব্যয় করার অর্থ সাধারণ কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা নয়। বরং ১০ নম্বর আয়াতের ভাষা স্পষ্টভাবে বলছে যে, এখানে এর অর্থ ঐ সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে ইসলামকে সমুন্নত করার যে সংগ্রাম চলছিলো সে উদ্দেশ্যে ব্যয় করা। বিশেষ করে সে সময় এমন দু'টি প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল যে জন্য ইসলামী সরকার চরমভাবে আর্থিক সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিল। এর একটি ছিল সামরিক প্রয়োজন। আর অপরটি ছিল সেসব নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্য সহযোগিতা করা যারা কাফেরদের জুলুম নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে আরবের প্রতিটি অংশ থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছিলো এবং আরো আসছিলো। এ ব্যয় মেটানোর জন্য সত্যিকার মু'মিনগণ তাঁদের শক্তি ও সামর্থের চেয়ে বেশী বোঝা নিজেরা বহন করছিলো। পরবর্তী ১০, ১২, ১৮ ও ১৯ আয়াতে এজন্য তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে বহুসংখ্যক এমন স্বচ্ছল লোকও ছিল যারা কুফর ও ইসলামের এ সংঘাতকে নিছক দর্শক হয়ে দেখছিলো। যে জিনিসের প্রতি ঈমান পোষণের দাবী তারা করছিলো তার কিছু কর্তব্য ও দায়-দায়িত্ব যে, তাদের প্রাণ ও সম্পদের ওপর বর্তায়, সে বিষয়ে কোন অনুভূতিই তাদের ছিল না। এ দ্বিতীয় প্রকারের লোকদেরকেই এ আয়াতে

সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের বলা হচ্ছে, খাঁটি মু'মিন হও এবং আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় কর।

৯. এর দু'টি অর্থ এবং দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। একটি অর্থ হচ্ছে, তোমাদের কাছে যে সম্পদ আছে তা মূলত তোমাদের নিজের সম্পদ নয়, তা আল্লাহর দেয়া সম্পদ। তোমরা নিজেরা এর মালিক নও। আল্লাহ তাঁর নিজের প্রতিনিধি হিসেবে এ সম্পদ তোমদের অধিকারে দিয়েছেন। অতএব, সম্পদের মূল মালিকের কাজে তা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত ও পিছপা হয়ো না। মালিকের সম্পদ মালিকের কাজে ব্যয় করতে টালবাহানা করা প্রতিনিধির কাজ নয়। দ্বিতীয় অর্থ হলো, এ অর্থ চিরদিন তোমাদের কাছে ছিল না এবং চিরদিন তোমাদের কাছে থাকবেও না। কাল তা অন্য কিছু লোকের কাছে ছিল, আজ আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করে তা তোমাদের হাতে সোপর্দ করেছেন। আবার এমন এক সময় আসবে যখন তা তোমাদের কাছে থাকবে না। অন্য লোকেরা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। সাময়িক কৃর্তত্বের এ সংক্ষিপ্ত সময়ে যখন এ সম্পদ তোমাদের অধিকার ও কর্তৃত্বে থাকে তখন আল্লাহর কাজে তা খরচ করো, যাতে আখেরাতে তোমরা তার স্থায়ী প্রতিদান লাভ করতে পার। একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাটিই বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বর্ণনা করেছেন ঃ একবার নবীর (সা) বাড়ীতে একটি বকরী জবাই করে তার গোশত বন্টন করা হলো। ঘরে গিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ বকরীর কি অবশিষ্ট আছে ? হযরত আয়েশা বললেন ঃ مَا بَقِىَ اِلاَّ كَتِفُهَا "একটি হাত ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।" নবী (সা) বললেন ঃ بقى كلها غير كتفها "একটি হাত ছাড়া গোটা বকরীই অবশিষ্ট আছে।" অর্থাৎ আল্লাহর পথে যা ব্যয়িত হলো প্রকৃতপক্ষে সেটাই অবশিষ্ট রইলো। আরো একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আল্লাহর রসূল কোন্ প্রকার দানের সওয়াব সবচেয়ে বেশী? তিনি বললেন ঃ

ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتامل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان –

"যদি তুমি এমন পরিস্থিতিতে দান করো যে, তুমি সুস্থ সবল সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে তা বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন অনুভব করছো এবং তা কোন কাজে খাটিয়ে অধিক উপার্জনের আশা করো। সে সময়ের অপেক্ষায় থেকো না যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে আর তুমি ওসিয়ত করবে যে, এটা অমুককে দিতে হবে এবং এটা অমুককে দিতে হবে। সে সময় তো এ সম্পদ অমুক অমুকের কাছেই চলে যাবে" (বুখারী ও মুসলিম)।

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। নবী (সা) বলেছেন ঃ

يقول ابن ادم مالى مالى ، وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت ، او تصدقت فامضيت ؟ وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس –

"মানুষ বলে, আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। অথচ তোমার সম্পদের যতটা তুমি খেয়ে নিঃশেষ করলে কিংবা পরিধান করে পুরনো করে ফেললে অথবা দান করে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করলে তা ছাড়া তোমার সম্পদে তোমার আর কোন অংশ নেই। এছাড়া আর যাই আছে একদিন তা তোমার হাত থেকে চলে যাবে আর তুমি অন্যদের জন্য তা রেখে যাবে"। –(মুসলিম)

১০. এখানে পুনরায় জিহাদে অর্থ সম্পদ ব্যয় করাকে ঈমানের অনিবার্য দাবী এবং আন্তরিকতাপূর্ণ ঈমানের আবশ্যিক প্রমাণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অন্য কথায় যেন বলা হয়েছে। প্রকৃত ও নিষ্ঠাবান মু'মিন সে–ই, যে এরূপ পরিস্থিতিতে অর্থ ব্যয় করতে টালবাহানা করে না।

১১. অর্থাৎ এমন এক পরিস্থিতিতে তোমরা ঈমানের পরিপন্থী এই কর্মপন্থা গ্রহণ করছো যখন আল্লাহর রসূল নিজে তোমাদের মাঝে আছেন এবং তোমাদেরকে কোন দূরবর্তী মাধ্যমের সাহায্যে ঈমানের দাওয়াত দেয়া হচ্ছে না, বরং তোমাদের কাছে সে দাওয়াত সরাসরি আল্লাহর রসূলের মুখ থেকে পৌঁছুচ্ছে।

১২. কিছু সংখ্যক মুফাসসির এ প্রতিশ্রুতি বলতে অর্থ করেছেন আল্লাহর দাসত্ব করার সে প্রতিশ্রুতি যা সৃষ্টির সূচনা পর্বে আদম আলাইহিস সালামের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সমস্ত সন্তানকে বের করে তাদের সবার নিকট থেকে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু অপর কিছু সংখ্যক তাফসীরকার এর অর্থ করেছেন সে প্রতিশ্রুতি যা প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি ও প্রকৃতিগত বিবেক–বুদ্ধিতে আল্লাহর দাসত্বের জন্য বর্তমান। কিন্তু সঠিক কথা হলো, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের সচেতন প্রতিশ্রুতি ঈমান গ্রহণ করার মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহর সাথে যে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়। কুরআন মজীদের অন্য এক স্থানে যে ভাষায় এ প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِىْ وَاثَقَكُمْ بِهٖ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (المائده :٧)

"আল্লাহ তোমাদের যেসব নিয়ামত দান করেছেন সেসব নিয়ামতের কথা মনে কর এবং তোমাদের কাছ থেকে যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন তার কথাও মনে কর। সে সময় তোমরা বলেছিলে ঃ আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম। আর আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ মনের কথাও জানেন।"

হযরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ

بايعنا رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم على السمع والطاعة فى النشاط والكسل وعلى النفقة فى العسر واليسر وعلى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وعلى ان نقول فى اللّٰه تعالى ولا نخاف لومة لائم – (مسند احمد)

هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖٓ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ
اِلَى النُّوْرِ ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ لَا يَسْتَوِيْ
مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ۭ اُولٰۗىِٕكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً
مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ۭ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۭ وَاللّٰهُ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

সেই মহান সত্তা তো তিনিই যিনি তাঁর বান্দার কাছে স্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করছেন যাতে তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতীব দয়ালু ও মেহেরবান। কি ব্যাপার যে, তোমরা আল্লাহর পথে খরচ করছো না, অথচ যমীন ও আসমানের উত্তরাধিকার তাঁরই।[১৩] তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পরে অর্থ ব্যয় করবে ও জিহাদ করবে তারা কখনো সেসব লোকের সমকক্ষ হতে পারে না যারা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। বিজয়ের পরে ব্যয়কারী ও জিহাদকারীদের তুলনায় তাদের মর্যাদা অনেক বেশী। যদিও আল্লাহ উভয়কে ভাল প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[১৪] তোমরা যা করছো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।[১৫]

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে এই মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন যে, আমরা যেন সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা উভয় অবস্থায় শুনি ও আনুগত্য করে যাই এবং স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতা উভয় অবস্থায় আল্লাহর পথে খরচ করি, ভাল কাজের আদেশ করি এবং মন্দ কাজে নিষেধ করি, আল্লাহ সম্পর্কে সত্য কথা বলি এবং সেজন্য কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় না করি।" (মুসনাদে আহমদ)।

১৩. এর দু'টি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে, এ অর্থ সম্পদ চিরদিন তোমাদের কাছে থাকবে না। একদিন তা ছেড়ে তোমাদেরকে অবশ্যই যেতে হবে এবং তখন আল্লাহই হবেন এর উত্তরাধিকারী। তাহলে নিজের জীবদ্দশায় নিজের হাতে কেন তা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে না? এভাবে ব্যয় করলে আল্লাহর কাছে তোমাদের পুরস্কার প্রাপ্য হবে। ব্যয় না করলেও তা আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবে। তবে পার্থক্য হবে এই যে, সে ক্ষেত্রে তোমরা কোন পুরস্কার লাভ করবে না। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর পথে অর্থ খরচ করতে গিয়ে তোমাদের কোন রকম দারিদ্র বা অস্বচ্ছলতার আশংকা করা উচিত নয়। কেননা, যে

আল্লাহর উদ্দেশ্যে তা খরচ করবে তিনি পৃথিবী ও উর্ধ জগতের সমস্ত ভাণ্ডারের মালিক। আজ তিনি তোমাদেরকে যা দান করে রেখেছেন তাঁর কাছে দেয়ার শুধু ঐ টুকুই ছিল না। কাল তিনি তোমাদেরকে তার চেয়েও অনেক বেশী দিতে পারেন। একথাটাই অন্য একটা স্থানে এভাবে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ - (السبا : ٣٩)

"হে নবী, তাদের বলো, আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা অঢেল রিযিক দান করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা সংকীর্ণ করে দেন। আর তোমরা যা খরচ করো তার পরিবর্তে তিনিই তোমাদেরকে আরো রিযিক দান করেন। তিনি সর্বোত্তম রিযিক দাতা।" (সাবা-৩৯)

১৪. অর্থাৎ উভয়েই পুরস্কার লাভের যোগ্য। কিন্তু এক গোষ্ঠীর মর্যাদা অপর গোষ্ঠীর চেয়ে নিশ্চিতভাবেই অনেক উচ্চতর। কারণ, অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে তারা আল্লাহ তা'আলার জন্য এমন সব বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছিলো যার সম্মুখীন অন্য গোষ্ঠীকে হতে হয়নি। তারা এমন পরিস্থিতিতে অর্থ খরচ করেছে যখন কোথাও এ সম্ভাবনা পরিদৃষ্ট হচ্ছিলো না যে, বিজয়ের মাধ্যমে এ ব্যায়ের ক্ষতিপূরণ হবে। তাছাড়া তারা এমন নাজুক সময়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে যখন প্রতি মুহূর্তে এ আশংকা ছিল যে, শত্রু বিজয় লাভ করে ইসলামের অনুসারীদের পিষে মারবে। মুফাসসিরদের মধ্যে মুজাহিদ, কাতাদা এবং যায়েদ ইবনে আসলাম বলেন ঃ এ আয়াতে বিজয় শব্দটি যে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে মক্কা বিজয়। আমের শা'বী বলেন ঃ এর দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বুঝানো হয়েছে। অধিকাংশ মুফাসসির প্রথম মতটি গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় মতটির সমর্থনে হযরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত এই হাদীসটি পেশ করা হয় যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বললেন ঃ অচিরেই এমন লোক জন আসবে যাদের আমল বা কাজকর্ম দেখে তোমরা নিজেদের কাজকর্মকে নগণ্য মনে করবে। কিন্তু

لو كان لاحدهم جبل من ذهب فانفقه ما ادرك مد احدكم ولا نصيفه -

"তাদের কারো কাছে যদি পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে আর সে তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে তবুও সে তোমাদের দুই রতল এমন কি এক রতল পরিমাণ ব্যয় করার সমকক্ষও হতে পারবে না" (ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুইয়া, আবু নুআইম ইসফাহানী)।

তাছাড়া ইমাম আহমদ কর্তৃক হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসেও এ মতের প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ একবার হযরত খালেদ (রা) ইবনে ওয়ালীদ এবং হযরত আবদুর রহমান (রা) ইবনে আওফের মধ্যে ঝগড়া হয়। ঝগড়ার মুহূর্তে হযরত

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗۤ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿١١﴾
يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ
وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ
وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا
وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ؕ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ
الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾

২ রুকূ'

এমন কেউ কি আছে যে আল্লাহকে ঋণ দিতে পারে? উত্তম ঋণ যাতে আল্লাহ তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেন। আর সেদিন তার জন্য রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান[১৬] যেদিন তোমরা ঈমানদার নারী ও পুরুষদের দেখবে, তাদের 'নূর' তাদের সামনে ও ডান দিকে দৌড়াচ্ছে।[১৭] (তাদেরকে বলা হবে) "আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ।" জান্নাতসমূহ থাকবে যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই বড় সফলতা। সেদিন মুনাফিক নারী পুরুষের অবস্থা হবে এই যে, তারা মু'মিনদের বলবে ঃ আমাদের প্রতি একটু লক্ষ কর যাতে তোমাদের 'নূর' থেকে আমরা কিছু উপকৃত হতে পারি।[১৮] কিন্তু তাদের বলা হবে ঃ পেছনে চলে যাও। অন্য কোথাও নিজেদের নূর তালাশ কর। অতপর একটি প্রাচীর দিয়ে তাদের মাঝে আড়াল করে দেয়া হবে। তাতে একটি দরজা থাকবে। সে দরজার ভেতর দিকে থাকবে রহমত আর বাইরে থাকবে আযাব।[১৯]

খালেদ (রা) হযরত আবদুর রহমান (রা) কে বলেন ঃ "তোমরা তোমাদের অতীত কাজ কর্মের কারণেই আমাদের কাছে গর্ব কর এবং বড় হতে চাও।" এ কথা নবীর (সা) কাছে পৌছলে তিনি বললেন ঃ "যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ ! যদি তোমরা উহুদের সমপরিমাণ বা পাহাড়গুলোর সমপরিমাণ স্বর্ণও খরচ করো তবুও এসব লোকের আমলের সমান হতে পারবে না।" এ থেকে প্রমাণ পেশ করা হয় যে, বিজয় অর্থ হুদাইবিয়ার

সন্ধি। কারণ, হযরত খালেদ হুদাইবিয়ার এ সন্ধির পরে ঈমান এনেছিলেন এবং মক্কা বিজয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এ বিশেষ ক্ষেত্রে বিজয় বলতে হুদাইবিয়ার সন্ধি কিংবা মক্কা বিজয় যা-ই বুঝানো হোক না কেন সর্বক্ষেত্রে এ আয়াতের অর্থ এ নয় যে, এ একটি মাত্র বিজয় মর্যাদার পার্থক্যের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। বরং এ থেকে নীতিগত যে কথাটি জানা যায় তা হচ্ছে, ইসলামের জন্য যখনই এমন কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যখন কুফর ও কাফেরদের পাল্লা অনেক ভারী হবে এবং বাহ্যত ইসলামের বিজয় লাভ করার কোন সুদূর সম্ভাবনা দৃষ্টি গোচর হবে না সে সময় যারা ইসলামের সহযোগিতায় জীবনপাত ও অর্থ-সম্পদ খরচ করবে তাদের সমমর্যদা সেসব লোক লাভ করবে না যারা কুফর ও ইসলামের মধ্যকার ফায়সালা ইসলামের অনুকূলে হয়ে যাওয়ার পর ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করবে।

১৫. অর্থাৎ আল্লাহ যাকে যে প্রতিদান দেন ও মর্যাদা দান করেন তা এই দেখে দান করেন যে, সে কোন্ পরিস্থিতিতে কোন্ ধরনের আবেগ অনুভূতি নিয়ে কাজ করেছে। তিনি অন্ধভাবে বন্টন করেন না। তিনি জেনে শুনেই প্রত্যেককে মর্যাদা ও তার কাজের প্রতিদান নির্ধারণ করে থাকেন।

১৬. এটা আল্লাহ তা'আলার চরম উদারতা ও দানশীলতা যে, মানুষ যদি তাঁরই দেয়া সম্পদ তাঁর পথে ব্যয় করে তাহলে তিনি তা নিজের জন্য ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন। অবশ্য শর্ত এই যে, তা "কর্জে হাসানা" (উত্তম ঋণ) হতে হবে। অর্থাৎ খাঁটি নিয়তে কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ছাড়াই তা দিতে হবে, তার মধ্যে কোন প্রকার প্রদর্শনীর মনোবৃত্তি, খ্যাতি ও নামধামের আকাংখা থাকবে না, তা দিয়ে কাউকে খোঁটা দেয়া যাবে না, দাতা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দেবে এবং এছাড়া অন্য কারো প্রতিদান বা সন্তুষ্টি লক্ষ হবে না। এ ধরনের ঋণের জন্য আল্লাহর দুইটি প্রতিশ্রুতি আছে। একটি হচ্ছে, তিনি তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেবেন। অপরটি হচ্ছে, এজন্য তিনি নিজের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কারও দান করবেন। হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াত যখন নাযিল হয় এবং নবীর (সা) পবিত্র মুখ থেকে লোকজন তা শুনতে পায় তখন হযরত আবুদ দাহ্দাহ আনসারী জিজেস করেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহ কি আমাদের কাছে ঋণ চান? জবাবে নবী (সা) বলেন ঃ হে আবুদ দাহ্দাহ, হাঁ।' তখন তিনি বললেন ঃ আপনার হাত আমাকে একটু দেখান। নবী (সা) তার দিকে নিজে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আবুদ দাহ্দাহ নবীর (সা) হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন ঃ "আমি আমার রবকে আমার বাগান ঋণ দিলাম" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ সেই বাগানে ৬ শত খেজুর গাছ ছিল। বাগানের মধ্যেই ছিল আবুদ দাহ্দাহের বাড়ী। তার ছেলে মেয়েরা সেখানেই থাকতো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এসব কথাবার্তা বলে তিনি সোজা বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলেন এবং স্ত্রীকে ডেকে বললেন ঃ "দাহ্দাহর মা, বেরিয়ে এসো। আমি এ বাগান আমার রবকে ঋণ হিসেবে দিয়ে দিয়েছি।" স্ত্রী বললো ঃ দাহ্দাহর বাপ, তুমি অতিশয় লাভজনক কারবার করেছো" এবং সেই মুহূর্তেই সব আসবাবপত্র ও ছেলেমেয়েকে সাথে নিয়ে বাগান ছেড়ে চলে গেলেন" (ইবনে আবী হাতেম)। এ ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় সে সময় প্রকৃত মু'মিনদের কর্ম পদ্ধতি কেমন ছিল। এ থেকে একথাও বুঝা যায়, যে কর্জে হাসানাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে

ফেরত দেয়ার এবং তাছাড়াও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সম্মানজনক পুরস্কার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা কেমন।

১৭. এ আয়াতটি এবং পরবর্তী আয়াতসমূহ থেকে জানা যায় হাশরের ময়দানে শুধুমাত্র নেককার ঈমানদারদেরই 'নূর' থাকবে। কাফের, মুনাফিক, ফাসেক ও ফাজেররা দুনিয়াতে যেমন অন্ধকারে পথ হারিয়ে হাতড়িয়ে মরেছে সেখানেও তেমনি অন্ধকারে হাতড়িয়ে মরতে থাকবে। যেখানে আলো যেটুকু হবে তা হবে সৎ আকীদা–বিশ্বাস ও সৎ আমলের। ঈমানের সততা এবং চরিত্র ও কর্মের পবিত্রতাই 'নূরে' রূপান্তরিত হবে যার কারণে সৎ লোকদের ব্যক্তিত্ব ঝলমলিয়ে উঠবে। যার কর্ম যতটা উজ্জল হবে তার ব্যক্তি–সত্তার আলোক রশ্মিও তত বেশী তীব্র হবে। সে যখন হাশরের ময়দান থেকে জান্নাতের দিকে যাত্রা করবে তখন তার 'নূর' বা আলো তার আগে আগে ছুটতে থাকবে। এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হচ্ছে কাতাদা বর্ণিত একটি 'মুরসাল' হাদীস। উক্ত হাদীসে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কারো কারো 'নূর' এত তীব্র হবে যে, মদীনা থেকে "আদন" এর সম পরিমাণ দূরত্ব পর্যন্ত পৌছতে থাকবে। তাছাড়া কারো 'নূর' পৌছবে মদীনা থেকে সান'আ পর্যন্ত, কারো তার চেয়েও কম এমনকি এমন মু'মিন থাকবে যার নূর তার পায়ের তলা থেকে সামনে যাবে না" (ইবনে জারীর)। অন্য কথায় যার মাধ্যমে পৃথিবীর যত বেশী কল্যাণ হবে তার 'নূর' তত বেশী উজ্জ্বল হবে এবং পৃথিবীর যেসব স্থানে তার কল্যাণ পৌছবে হাশরের ময়দানেও তার নূরের আলো ততটা দূরত্ব পর্যন্ত দৌড়াতে থাকবে।

এখানে একটি প্রশ্ন মানুষের মনে দ্বিধা–দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে। প্রশ্নটি হচ্ছে, নূর বা আলোক রশ্মির আগে আগে দৌড়ানোর ব্যাপারটি বোধগম্য হয়। কিন্তু শুধু ডান পাশে নূর দৌড়ানোর অর্থ কি? তবে কি তাদের বাঁ দিকে অন্ধকার থাকবে? এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, কেউ যদি তার ডান হাতে আলো নিয়ে পথ চলতে থাকে তাহলে তার বাঁ দিকটাও কিন্তু আলোকিত হবে। অথচ বাস্তব ঘটনা এই যে, আলো আছে তার ডান হাতে। হযরত আবু যার ও আবুদ দারদা কর্তৃক বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস থেকে এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্য পাওয়া যায়। নবী (সা) বলেছেন ঃ

اعرفهم بنورهم الذى يسعى بين ايديهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم-

"আমি সেখানে আমার উম্মতের নেক্কার লোকদের তাদের নূরের সাহায্যে চিনতে পারবো—যে নূর তাদের সামনে ডানে ও বাঁয়ে দৌড়াতে থাকবে" (হাকেম, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুইয়া)।

১৮. অর্থ হচ্ছে, মু'মিনগণ যখন জান্নাতের দিকে যেতে থাকবেন তখন আলো থাকবে তাদের সামনে আর মুনাফিকরা পেছনের অন্ধকারে ঠোকর খেতে থাকবে। সে সময় তারা ঈমানদারদেরকে ডেকে ডেকে বলতে থাকবে। আমাদের দিকে একটু ফিরে তাকাও যাতে আমরাও কিছু আলো পেতে পারি। কারণ এ মুনাফিকরা দুনিয়াতে ঈমানদারদের সাথে একই মুসলিম সমাজে বসবাস করতো।

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ
أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ
وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿١٤﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ
كَفَرُوا ۚ مَأْوَاكُمُ النَّارُ ۖ هِيَ مَوْلَاكُمْ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

তারা ঈমানদারদের ডেকে ডেকে বলবে আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?[২০] ঈমানদাররা জওয়াব দেবে হাঁ, তবে তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলে[২১], সুযোগের সন্ধানে ছিলে,[২২] সন্দেহে নিপতিত ছিলে[২৩] এবং মিথ্যা আশা-আকাংখা তোমাদেরকে প্রতারিত করছিলো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ফায়সালা এসে হাজির হলো[২৪] এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে বড় প্রতারক[২৫] আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারণা করে চললো। অতএব, তোমাদের নিকট থেকে আজ কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না। আর তাদের নিকট থেকেও গ্রহণ করা হবে না যারা সুস্পষ্টভাবে কুফরিতে লিপ্ত ছিল।[২৬] তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সে (জাহান্নাম) তোমাদের খোঁজ খবর নেবে।[২৭] এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট পরিণতি।

১৯. এর অর্থ হচ্ছে, জান্নাতবাসীগণ ঐ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারপর দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। দরজার এক দিকে থাকবে জান্নাতের নিয়ামতসমূহ আর অপরদিকে থাকবে দোযখের আযাব। যে সীমারেখা জান্নাত ও দোযখের মাঝে আড়াল হয়ে থাকবে মুনাফিকদের পক্ষে তা অতিক্রম করা সম্ভব হবে না।

২০. অর্থাৎ আমরা কি তোমাদের সাথে একই মুসলিম সমাজের অন্তরভুক্ত ছিলাম না? আমরা কি কালেমায় বিশ্বাসী ছিলাম না? তোমাদের মত আমরাও কি নামায পড়তাম না? রোযা রাখতাম না? হজ্জ ও যাকাত আদায় করতাম না? আমরা তোমাদের মজলিসে শরীক হতাম না? তোমাদের সাথে কি আমাদের বিয়ে শাদী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল না? তাহলে আমাদের ও তোমাদের মাঝে আজ এ বিচ্ছিন্নতা আসলো কিভাবে?

২১. অর্থাৎ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তোমরা খাঁটি মুসলমান হও নাই, বরং ঈমান ও কুফরের মাঝে দোদুল্যমান ছিলে, কুফরী ও কাফেরদের প্রতি তোমাদের আকর্ষণ কখনো ছিন্ন হয়নি এবং তোমরা নিজেদেরকে কখনো ইসলামের সাথে পূর্ণরূপে সম্পৃক্ত করনি।

২২. আয়াতে মূল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে تَرَبَّصْتُمْ । আরবী ভাষায় تَرَبُّص বলে অপেক্ষা করা ও সুযোগলাভের প্রতীক্ষায় থাকাকে। কেউ যখন দু'টি পথের কোন একটিতে চলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, বরং এই ভেবে অপেক্ষা করতে থাকে যে, যেদিকে যাওয়া লাভজনক বলে মনে হবে সেদিকেই যাবে তখন বলা হয় সে تَرَبُّص এ

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ
مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ
عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٦﴾ اعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

ঈমান গ্রহণকারীদের জন্য এখনো কি সে সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে তাদের মন বিগলিত হবে, তাঁর নাযিলকৃত মহা সত্যের সামনে অবনত হবে[২৮] এবং তারা সেসব লোকদের মত হবে না যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে তাদের মন কঠোর হয়ে গিয়েছে এবং আজ তাদের অধিকাংশই ফাসেক হয়ে আছে।[২৯] খুব ভাল করে জেনে নাও, আল্লাহ ভূ-পৃষ্ঠকে মৃত হয়ে যাওয়ার পর জীবন দান করেন। আমরা তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে নির্দশনসমূহ দেখিয়ে দিয়েছি যাতে তোমরা বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগাও।[৩০]

পড়ে আছে। কুফর ও ইসলামের মধ্যকার সে নাজুক যুগে মুনাফিকরা এ ভূমিকাই গ্রহণ করেছিল। তারা খোলাখুলি কুফরের পক্ষও অবলম্বন করছিল না। আবার পূর্ণ তৃপ্তি ও প্রশান্তির সাথে নিজের শক্তিকে ইসলামের সাহায্য সহযোগিতায় কাজে লাগাচ্ছিলো না। বরং যথারীতি বসে বসে দেখছিলো, এ শক্তি পরীক্ষায় কোন্ দিকের পাল্লা শেষ পর্যন্ত ভারী হয়। যাতে ইসলাম বিজয়ী হচ্ছে বলে মনে হলে সে ইসলামের দিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়তে পারে এবং মুসলমানদের সাথে কালেমায় বিশ্বাস করার যে সম্পর্ক আছে তা কাজে লাগে। আর যদি কুফরী শক্তি বিজয়ী হয় তাহলে তার সহযোগীদের সাথে যেয়ে শামিল হতে পারে এবং তখন ইসলামের পক্ষ থেকে যুদ্ধে কোন প্রকার অংশ গ্রহণ না করা তার জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হয়।

২৩. এর অর্থ বিভিন্ন রকম সংশয়--সন্দেহ। মুনাফিকরা এ ধরনের সংশয়-সন্দেহে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এগুলোই মুনাফিকীর মূল কারণ। সে আল্লাহর অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণ করে। রসূলের রিসালাতে সন্দেহ পোষণ করে, কুরআন যে আল্লাহর কিতাব তাতেও সন্দেহ পোষণ করে। আখেরাত, আখেরাতের জবাবদিহি এবং প্রতিদান ও শাস্তির ব্যাপারেও সন্দেহ পোষণ করে এবং তার মনে এরূপ সন্দেহও সৃষ্টি হয় যে, হক ও বাতিলের এ দ্বন্দ্বের সত্যিই কি কোন স্বার্থকতা আছে? না কি এসবই একটা ঢং। সত্য

শুধু এত টুকুই যে, সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকো। এটাই সত্যিকারের জীবন। যতক্ষণ না কেউ এ ধরনের সন্দেহ সংশয়ে নিমজ্জিত হবে ততক্ষণ সে মুনাফিক হতে পারে না।

২৪. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে, তোমাদের মৃত্যু এসে গেল এবং তোমরা মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত এ প্রতারণার ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারনি। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, ইসলাম বিজয় লাভ করলো আর তোমরা তামাশার মধ্যেই ডুবে রইলে।

২৫. অর্থাৎ শয়তান।

২৬. এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আখেরাতে কাফেরের পরিণতি যা হবে মুনাফিকের পরিণতিও ঠিক তাই হবে।

২৭. মূল আয়াতে ব্যবহৃত কথাটি হচ্ছে هِيَ مَوْلَاكُمْ "দোযখই তোমাদের مولى । এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, সেটিই তোমাদের জন্য উপযুক্ত জায়গা। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, তোমরা তো আল্লাহকে তোমাদের অভিভাবক বানাওনি যে, তিনি তোমাদের তত্ত্বাবধান করবেন। এখন দোযখই তোমাদের অভিভাবক। সে-ই তোমাদের যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধান করবে।

২৮. এখানেও "ঈমান গ্রহণকারী" কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক কিন্তু তা দ্বারা সব মুসলমানকে বুঝানো হয়নি, বরং মুসলমানদের সে বিশেষ গোষ্ঠীকে বুঝানো হয়েছে যারা ঈমান গ্রহণের অঙ্গীকার করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের মধ্যে শামিল হয়েছিলো এবং তা সত্ত্বেও ইসলামের জন্য তাদের মনে কোন দরদ ছিল না। তারা নিজ চোখে দেখছিলো সমস্ত কুফরী শক্তি ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়েছে, মু'মিনদের ক্ষুদ্র একটি দলকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। আরব ভূমির বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের জুলুম-নির্যাতনের শিকার বানানো হচ্ছে। দেশের নানা স্থান থেকে নির্যাতিত মুসলমানরা নিতান্ত সহায় সম্বলহীন অবস্থায় আশ্রয়লাভের জন্য মদীনার দিকে ছুটে আসছে। এসব মজলুমদের সহায়তা দিতে দিতে সত্যিকার মুসলমানদের কোমর ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এরাই আবার জীবন বাজি রেখে শত্রুর মোকাবিলা করছে। কিন্তু এসব দেখে ঈমানের দাবীদার এ লোকগুলোর মধ্যে কোন পরিবর্তনই অসছে না। এ জন্য তাদেরকে ধিক্কার দিয়ে বলা হচ্ছে, তোমরা কেমন ঈমানদার? ইসলামের জন্য পরিস্থিতি নাজুক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। আল্লাহর কথা শুনে তোমাদের অন্তর বিগলিত হবে, তাঁর দীনের জন্য তোমাদের অন্তরে ত্যাগ ও কুরবানীর মনোভাব প্রবল হবে এবং সে জন্য প্রাণপাত করতে আবেগ উদ্বেলিত হয়ে উঠবে, এখনো কি তোমাদের জন্য সে সময় আসেনি? ঈমান গ্রহণকারীরা কি এমনই হয়ে থাকে যে, আল্লাহর দীনের জন্য চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির দেখা দিলেও সেজন্য সামান্যতম দরদও অনুভব করবে না? আল্লাহর নাম নিয়ে তাদের আহবান জানানো হবে, কিন্তু তারা আপন স্থান থেকে একটুও নড়বে না? আল্লাহ তাঁর নাযিলকৃত কিতাবে নিজে দান করার জন্য আহবান জানিয়ে তাকে নিজের জন্য ঋণ হিসেবে ঘোষণা করবেন এবং স্পষ্টভাবে এও জানিয়ে দেবেন যে, এ পরিস্থিতিতে যারা তাদের অর্থ সম্পদকে আমার দীনের চেয়ে প্রিয় মনে করবে তারা মু'মিন নয়, মুনাফিক—এতেও তাদের অন্তর আল্লাহর ভয়ে কেঁপেও উঠবে না, তাঁর নির্দেশের আগে তাদের মাথাও নত হবে না?

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ
وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ
الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾

দান সাদকা প্রদানকারী নারী ও পুরুষ[৩১] এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে, নিশ্চয়ই কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে তাদেরকে ফেরত দেয়া হবে। তাছাড়াও তাদের জন্য আছে সর্বোত্তম প্রতিদান। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে[৩২] তারাই তাদের রবের কাছে 'সিদ্দীক'[৩৩] ও 'শহীদ'[৩৪] বলে গণ্য। তাদের জন্য তাদের পুরস্কার ও 'নূর' রয়েছে।[৩৫] আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে তারাই দোযখের বাসিন্দা।

২৯. অর্থাৎ নবীদের তিরোধানের শত শত বছর পর তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদের চেতনাহীন, মৃত আত্মা এবং নৈতিকভাবে মৃত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছ। অথচ তোমাদের রসূল তোমাদের মধ্যে বর্তমান, আল্লাহর কিতাব নাযিল হচ্ছে, তোমাদের ঈমান গ্রহণের পর দীর্ঘ দিনও অতিবাহিত হয়নি, অথচ তোমাদের অবস্থা ঠিক তেমনি হয়ে যাচ্ছে, শত শত বছর ধরে আল্লাহর দীন ও তাঁর আয়াত নিয়ে খেল তামাশা করতে থাকার পর ইহুদী ও খৃষ্টানদের অবস্থা যা হয়েছে।

৩০. এখানে যে প্রসংগে একথাটি বলা হয়েছে তা ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার। কুরআন মজীদে বেশ কিছু জায়গায় নবুওয়াত ও কিতাব নাযিলকে বৃষ্টির বরকতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেননা, ভূ-পৃষ্ঠের ওপর বৃষ্টিপাত যে কল্যাণ বয়ে আনে নবুওয়াত এবং কিতাবও মানবজাতির জন্য সে একই রকমের কল্যাণ বয়ে আনে। মৃত ভূ-পৃষ্ঠে যেমন রহমতের বৃষ্টির এক বিন্দু পড়তেই শস্য শ্যামল হয়ে ওঠে। ঠিক তেমনি আল্লাহর রহমতে যে দেশে নবী প্রেরিত হন এবং অহী ও কিতাব নাযিল হওয়া শুরু হয় সেখানে মৃত মানবতা অকস্মাত জীবন লাভ করে। তার এমন সব প্রতিভা ও গুণাবলীর বহিপ্রকাশ ঘটতে থাকে, যা জাহেলিয়াত দীর্ঘদিন থেকে মাটিতে মিশিয়ে রেখেছিলো। তার মধ্য থেকে মহত নৈতিক চরিত্রের ঝর্ণাধারা ফুটে বের হতে থাকে এবং কল্যাণ ও সৎকর্মের ফুলবাগিচা শ্যামলিমায় ভরে ওঠে। এখানে যে উদ্দেশ্যে এ সত্যটির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে তা হচ্ছে, দুর্বল ঈমান মুসলমানদের চোখ যেন খুলে যায় এবং তারা যেন নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে দেখে। নবুওয়াত ও অহীর কল্যাণময় বৃষ্টিধারা থেকে মানবতার মধ্যে যেভাবে নতুন প্রাণের সঞ্চার হচ্ছিলো এবং যেভাবে তার আঁচল কল্যাণে ভরে উঠছিলো তা তাদের জন্য সুদূর অতীতের কোন কাহিনী ছিল না। সাহাবা কিরামের (রা) পুত পবিত্র সমাজে তারা নিজ চোখে তা দেখছিলো। এ ব্যাপারে তারা দিনরাত সর্বক্ষণ

অভিজ্ঞতা লাভ করছিলো। জাহেলিয়াতও তার সমস্ত অকল্যাণসহ তাদের সামনে বর্তমান ছিল এবং জাহেলিয়াতের মোকাবিলায় ইসলাম থেকে যে গুণাবলী ও কল্যাণ উৎসারিত হয়ে পূর্ণরূপে বিকশিত হচ্ছিলো। তাই এসব বিষয় তাদেরকে বিস্তারিত বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। অতএব, মৃত ভূ-পৃষ্ঠকে আল্লাহ তা'আলা রহমতের বারিধারা দ্বারা কিভাবে জীবন দান করেন তোমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে তার নিদর্শন দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। এ কারণে সেদিকে শুধু ইংগিত করাই যথেষ্ট ছিল। এখন তোমরা বুদ্ধি বিবেক খাটিয়ে নিজেদের অবস্থা ভেবে দেখ যে, এ নিয়ামত দ্বারা তোমরা কতখানি উপকৃত হচ্ছো।

৩১. বাংলা ভাষায় صدقه (সাদকা) শব্দটি অত্যন্ত খারাপ অর্থে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলামের পরিভাষায় 'সাদকা' বলা হয় এমন দানকে যা সরল মনে খাঁটি নিয়তে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দেয়া হয়। যার মধ্যে কোন প্রদর্শনীর মনোভাব থাকে না, কাউকে উপকার করে খোঁটা দেয়া হয় না। দানকারী তার রবের দাসত্ব ও আনুগত্যের খাঁটি মনোবৃত্তি পোষণ করেন বলেই দেন। এ শব্দটি صدق শব্দটি থেকে গৃহীত। তাই এর পেছনে কাজ করে সততা। কোন দান বা কোন অর্থ ব্যয় ততক্ষণ 'সাদকা' বলে গণ্য হয় না যতক্ষণ তার মধ্যে "ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ" আল্লাহর পথে ব্যয় করার খাঁটি নিয়ত এবং নির্ভেজাল আবেগ ও ভাবধারা কার্যকর না থাকে।

৩২. এখানে ঈমান গ্রহণকারী অর্থ সেসব লোক যারা ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী এবং যাদের কর্মপদ্ধতি ঈমানের মিথ্যা দাবীদার ও দুর্বল ঈমানের লোকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। সে সময় যারা একে অন্যের তুলনায় অধিক আর্থিক কুরবানী পেশ করছিলো এবং আল্লাহর দীনের জন্য জীবনপণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল।

৩৩. এটি صدق শব্দের অর্থের আধিক্য প্রকাশক শব্দ। صادق অর্থ সত্যবাদী এবং صديق অর্থ অতিশয় সত্যবাদী। কিন্তু একথা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, صدق কেবল সত্য ও বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কথাকেই বলে না। যে কথা যথাস্থানে সত্য, যার বক্তা মুখে যা বলছে অন্তরেও সেটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে কেবল সে কথার ক্ষেত্রেই এ শব্দটি প্রযোজ্য। যেমন ঃ কেউ যদি বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল, তা হলে তা বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কথা। কারণ তিনি তো সত্যিকার অর্থেই আল্লাহর রসূল। কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে একথার ক্ষেত্রে কেবল তখনই সত্যবাদী বলা যাবে যখন সে বিশ্বাস করবে যে, সত্যই তিনি আল্লাহর রসূল। সুতরাং কোন কথা সত্য হতে হলে প্রয়োজন বাস্তবের সাথে এবং বক্তার মন ও বিবেকের সাথে তার মিল থাকা। অনুরূপভাবে صديق শব্দের অর্থের মধ্যে বিশ্বস্ততা, সরলতা এবং বাস্তব কাজ কর্মে সততাও অন্তরভুক্ত। صادق الوعد (প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যবাদী) সে ব্যক্তিকে বলা হবে যে কার্যত তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। صديق (সত্যিকার বন্ধু) তাকেই বলা হবে যে বিপদের সময় বন্ধুত্বের হক আদায় করেছে এবং কেউ কখনো তার থেকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিজ্ঞতা লাভ করেনি। যুদ্ধে صادق فى القتال (খাঁটি সৈনিক) কেবল সেই ব্যক্তিকেই বলা হবে যে তার কাজ দ্বারা নিজের বীরত্ব প্রমাণ করেছে। বক্তার কাজ তার কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াটাও صدق শব্দের অর্থ ও তাৎপর্যের অন্তরভুক্ত। যে ব্যক্তি তার কথার পরিপন্থী কাজ করে তাকে সত্যবাদী বলা

যেতে পারে না। এ কারণে যে ব্যক্তি বলে এককথা কিন্তু করে ভিন্ন কিছু, তাকে সবাই মিথ্যাবাদী বলে। এখন ভেবে দেখা দরকার যে, صدق ও صادق শব্দের অর্থ যেখানে এই সেখানে صديق (অতিশয় সত্যবাদী) এ আধিক্য প্রকাশক শব্দটি বলার অর্থ কি হবে। এর অনিবার্য অর্থ হবে এমন সত্যবাদী লোক যার মধ্যে কোন ভেজাল নেই, যে ন্যায় ও সত্যের পথ থেকে কখনো বিচ্যুত হয়নি। যার নিকট থেকে বিবেকের বিরুদ্ধে কোন কথা আশাই করা যায় না, যে কোন কথা মেনে নিয়ে থাকলে পূর্ণ সততার সাথেই মেনে নিয়েছে, যথাযথভাবে তা পালন করেছে এবং নিজের কাজ দ্বারা প্রমাণ করেছে যে, একজন মান্যকারীকে বাস্তবে যা হওয়া উচিত সে তেমনি একজন মান্যকারী (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নিসা, টীকা-৯৯)।

৩৪. এ আয়াতের তাফসীরে বড় বড় মুফাসসিরদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। ইবনে আব্বাস (রা), মাসরূক, দাহ্হাক, মুকাতিল ইবনে হাইয়ান প্রমুখ মুফাস্সিরদের মতে أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ পর্যন্ত একটি বাক্য শেষ হয়েছে। এরপর وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ পর্যন্ত কথাগুলো একটা স্বতন্ত্র বাক্য। এ ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতের অনুবাদ হবে "যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান এনেছে তারাই 'সিদ্দীক'। আর শহীদদের জন্য তাদের রবের কাছে তাদের পুরস্কার ও 'নূর' রয়েছে। পক্ষান্তরে মুজাহিদ এবং আরো কিছু সংখ্যক মুফাসসির এ পুরা বক্তব্যকে একটা বাক্য বলে মনে করেন। তাদের ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতের অনুবাদ হবে তাই যা আমি ওপরে আয়াতের অনুবাদে লিখেছি। উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে ভিন্নতার কারণ হচ্ছে, প্রথমোক্ত দল শহীদ বলতে আল্লাহর পথে নিহতদের বুঝেছেন। তারা এও দেখছেন যে, প্রত্যেক মু'মিন আল্লাহর পথে নিহত হয় না। তাই তারা وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ কথাটিকে একটি পূর্ণাংগ বাক্য ধরে নিয়েছেন। কিন্তু শেষোক্ত দলটি 'শহীদ'কে আল্লাহর পথে নিহত অর্থে গ্রহণ করেননি, বরং সত্যের সাক্ষদাতা অর্থে গ্রহণ করেছেন। এ বিচারে প্রত্যেক নিষ্ঠাবান মু'মিনই শহীদ হিসেবে গণ্য। আমাদের এ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য। কুরআন ও হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرة : ١٤٣)

"আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি যেন তোমরা লোকদের জন্য সাক্ষী হতে পার এবং রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন।"
(আল বাকারা ১৪৩)।

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (الحج : ٧٨)

"আল্লাহ পূর্বেও তোমাদের নাম রেখেছিলেন মুসলমান। এ কুরআনেও (তোমাদের এ নাম-ই রাখা হয়েছে।) যেন রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন আর তোমরাও মানুষের জন্য সাক্ষী হও।" (আল হজ্জ ৭৮)।

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ
وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ
نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ
شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ
الْغُرُوْرِ ﴿٢٠﴾ سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ
السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ
اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢١﴾

৩ রুকূ'

ভালভাবে জেনে রাখো দুনিয়ার এ জীবন, একটা খেলা, হাসি তামাসা, বাহ্যিক চাকচিক্য, তোমাদের পারস্পরিক গৌরব ও অহংকার এবং সন্তান সন্ততি ও অর্থ-সম্পদে পরস্পরকে অতিক্রম করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উপমা হচ্ছে, বৃষ্টি হয়ে গেল এবং তার ফলে উৎপন্ন উদ্ভিদরাজি দেখে কৃষক আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। তারপর সে ফসল পেকে যায় এবং তোমরা দেখতে পাও যে, তা হলদে বর্ণ ধারণ করে এবং পরে তা ভূষিতে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে আখেরাত এমন স্থান যেখানে রয়েছে কঠিন আযাব, আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।[৩৬] দৌড়াও এবং একে অপরের চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করো[৩৭] —তোমার রবের মাগফিরাতের দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের মত।[৩৮] তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে সে লোকদের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।

হাদীসে হযরত বারা ইবনে আযেব বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছেন যে, مُؤْمِنُوْا اُمَّتِىْ شُهَدَاءُ "আমার উম্মতের মু'মিনগণই শহীদ।" তারপর নবী (সা) সূরা হাদীদের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন (ইবনে জারীর)। ইবনে মারদুইয়া হযরত আবুদ দারদা থেকে এই একই অর্থের একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

من فريدينه من ارض مخافة الفتنة على نفسه ودينه كتب عند الله صديقا فاذا مات قبضه الله شهيدا ثم تلا هذه الاية –

"যে ব্যক্তি তার প্রাণ ও দীন বিপন্ন হবে ও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে এ আশংকায় কোন দেশ বা ভূ-খণ্ড ছেড়ে চলে যায় তাকে আল্লাহর কাছে 'সিদ্দীক' বলে লেখা হয়। আর সে যখন মারা যায় তখন আল্লাহ শহীদ হিসেবে তার রূহ কবজ করেন। একথা বলার পর নবী (সা) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন (শাহাদাতের এই অর্থ বিশদভাবে বুঝার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা বাকারা, টীকা ১৪৪, আন নিসা, টীকা ৯৯, আল আহযাব, টীকা ৮২)।

৩৫. অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে যে যে মর্যাদার পুরস্কার ও যে মর্যাদার 'নূরের' উপযুক্ত হবে সে তা পাবে। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পুরস্কার ও 'নূর' লাভ করবে। তাদের প্রাপ্য অংশ এখন থেকেই তাদের জন্য সংরক্ষিত আছে।

৩৬. এ বিষয়টি পুরোপুরি বুঝার জন্য কুরআন মজীদের নিম্নবর্ণিত স্থানগুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে ঃ সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪-১৫, ইউনুস, আয়াত ২৪, ২৫, ইবরাহীম ১৮, আল কাহাফ, ৪৫-৪৬, আন নূর ৩৯। এসব স্থানে মানুষের মনে যে বিষয়টি বদ্ধমূল করার চেষ্টা করা হয়েছে তা হচ্ছে, এ পৃথিবীর জীবন প্রকৃতপক্ষে একটি ক্ষণস্থায়ী জীবন। এখানকার বসন্তকাল যেমন অস্থায়ী তেমনি শরতকালও অস্থায়ী। এখানে চিত্তহরণের বহু উপকরণ আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা এত নিকৃষ্ট এবং এত নগণ্য যে, নিজেদের নির্বুদ্ধিতার কারণে মানুষ ঐগুলোকে বড় বড় জিনিস বলে মনে করে এবং প্রতারিত হয়ে মনে করে ঐগুলো লাভ করতে পারাই যেন চরম সফলতা অর্জন করা। অথচ যেসব বড় বড় স্বার্থ এবং আনন্দের উপকরণই এখানে লাভ করা সম্ভব তা নিতান্তই নগণ্য এবং কেবল কয়েক বছরের ধার করা জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। তার অবস্থাও আবার এমন যে, ভাগ্যের একটি বিপর্যয় ও বিড়ম্বনা এ পৃথিবীতেই ওগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। পক্ষান্তরে আখেরাতের জীবন এক বিশাল ও স্থায়ী জীবন। সেখানকার কল্যাণও বিশাল ও স্থায়ী এবং ক্ষতিও বিশাল এবং স্থায়ী। সেখানে কেউ যদি আল্লাহর মাগফিরাত ও সন্তুষ্টি পেয়ে যায় তাহলে সে চিরদিনের জন্য এমন নিয়ামত লাভ করলো যার সামনে গোটা পৃথিবীর ধন-সম্পদ এবং রাজত্বও অতিশয় নগণ্য ও হীন। আর সেখানে যে আল্লাহর আযাবে গ্রেফতার হলো, সে যদি দুনিয়াতে এমন কিছুও পেয়ে যায় যা সে নিজে বড় মনে করতো। তবুও সে বুঝতে পারবে যে, সে ভয়ানক ক্ষতিকর কারবার করেছে।

৩৭. মূল আয়াতে سابقوا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। শুধু দৌড়াও কথা দ্বারা এর সঠিক অর্থ প্রকাশ পায় না। مسابقت শব্দের অর্থ প্রতিযোগিতায় অন্যদের পেছনে ফেলে আগে চলে যাওয়ার চেষ্টা করা অর্থাৎ তোমরা পৃথিবীর ধন-সম্পদ, আনন্দ ও সুখ এবং কল্যাণসমূহ হস্তগত করার জন্য যে চেষ্টা করেছো তা পরিত্যাগ করে এ জিনিসকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নাও এবং এ দিকে দৌড়িয়ে সফলতা লাভের চেষ্টা করো।

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ
مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ
مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ
فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ
فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾

পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের ওপর যেসব মুসিবত আসে তার একটিও এমন নয় যে, তাকে আমি সৃষ্টি করার পূর্বে[৩৯] একটি গ্রন্থে লিখে রাখিনি।[৪০] এমনটি করা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ কাজ।[৪১] (এ সবই এজন্য) যাতে যে ক্ষতিই তোমাদের হয়ে থাকুক তাতে তোমরা মনক্ষুণ্ন না হও। আর আল্লাহ তোমাদের যা দান করেছেন। সেজন্য গর্বিত না হও।[৪২] যারা নিজেরা নিজেদের বড় মনে করে এবং অহংকার করে, নিজেরাও কৃপণতা করে এবং মানুষকেও কৃপণতা করতে উৎসাহ দেয়[৪৩] আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না। এর পরও যদি কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ অভাবশূন্য ও অতি প্রশংসিত।[৪৪]

৩৮. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ । কোন কোন মুফাসসির عرض শব্দটিকে প্রস্থ অর্থে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে এ শব্দটি বিস্তৃতি ও প্রশস্ততা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় عرض শব্দটি দৈর্ঘ্যের বিপরীত প্রস্থ বুঝাতেই শুধু ব্যবহৃত হয় না, বরং শুধুমাত্র বিস্তৃতি বুঝাতেও ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ কুরআন মজীদের অন্য একস্থানে বলা হয়েছে فَذُوْدُعَآءٍ عَرِيْضٍ "মানুষ তখন লম্বা চওড়া দোয়া করতে শুরু করে (হা মীম, আস সাজদা ৫১)। এক্ষেত্রে একথাও বুঝে নিতে হবে যে, একথা দ্বারা জান্নাতের আয়তন বুঝাতে চাওয়া হয়নি, বরং তার বিস্তৃতির ধারণা দিতে চাওয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, তার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের মত ব্যাপক। আর সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে ঃ

سَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ
اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ (اية ١٣٣)

"দৌড়াও তোমাদের রবের মাগফিরাত ও সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি গোটা বিশ্ব-জাহান জুড়ে, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।" (আয়াত ১৩৩)।

এ দু'টি আয়াত এক সাথে পড়লে মাথায় এমন একটা ধারণা জন্মে যে, একজন মানুষ জান্নাতে যে বাগান এবং প্রাসাদসমূহ লাভ করবে তার অবস্থান স্থল কেবল তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গোটা বিশ্ব-জাহান হবে তার বিচরণ ক্ষেত্র। সে কোথাও সীমাবদ্ধ থাকবে না। সেখানে তার অবস্থা এ পৃথিবীর মত হবে না যে, চাঁদের মত সর্বাধিক নিকটবর্তী উপগ্রহ পর্যন্ত পৌঁছতেও তাকে বছরের পর বছর ধরে একের পর এক বহু কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে এবং এ সামান্য পথ ভ্রমণের কষ্ট দূর করার জন্য অজস্র সম্পদ ব্যয় করতে হয়েছে। কিন্তু সেখানে গোটা বিশ্ব-জাহান তার জন্য উন্মুক্ত হবে, যা চাইবে নিজের জায়গায় বসে বসেই দেখতে পারবে এবং যেখানে ইচ্ছা বিনা বাধায় যেতে পারবে।

৩৯. 'তাকে' কথাটি দ্বারা মুসিবতের প্রতিও ইংগিত করা হতে পারে, পৃথিবীর প্রতিও ইংগিত করা হতে পারে, নিজেদের কথাটির প্রতিও ইংগিত করা হতে পারে এবং বাক্যের ধারা অনুসারে সৃষ্টিকূলের প্রতিও ইংগিত করা হতে পারে।

৪০. কিতাব অর্থ ভাগ্য লিপি।

৪১. অর্থাৎ নিজের সৃষ্টিকূলের মধ্যে প্রত্যেকের ভাগ্য আগেই লিখে দেয়া আল্লাহর জন্য কোন কঠিন কাজ নয়।

৪২. বর্ণনায় এই ধারাবাহিকতার মধ্যে যে উদ্দেশ্যে এ কথাটি বলা হয়েছে তা বুঝার জন্য এ সূরা নাযিল হওয়ার সময় ঈমানদারগণ যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছিলেন তা সামনে রাখা দরকার। প্রতি মুহূর্তে শত্রুদের হামলার আশংকা একের পর এক যুদ্ধ বিগ্রহ, সর্বদা অবরোধ পরিস্থিতি, কাফেরদের অর্থনৈতিক অবরোধের কারণে চরম দুরবস্থা, গোটা আরবের সর্বত্র ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর কাফেরদের জুলুম নির্যাতন এ পরিস্থিতির মধ্যে তখনকার মুসলমানদের সময় অতিবাহিত হচ্ছিলো। কাফেররা একে মুসলমানদের লাঞ্ছিত ও অভিশপ্ত হওয়ার প্রমাণ মনে করতো। এ পরিস্থিতিকে মুনাফিকরা তাদের সন্দেহের সমর্থনে ব্যবহার করতো। আর একনিষ্ঠ মু'মিনগণ যদিও অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ পরিস্থিতির মোকাবিলা করছিলেন। তবুও বিপদ মসিবতের আধিক্য কোন কোন সময় তাদের জন্যও চরম ধৈর্য পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়াতো। এ কারণে মুসলমানদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলা হচ্ছে, তোমাদের ওপর কোন বিপদই তোমাদের রবের অবগতির বাইরে নাযিল হয়নি। যা কিছু হচ্ছে তা সবই আল্লাহর পূর্ব পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক হচ্ছে- যা তাঁর দফতরে লিখিত আছে। তোমাদের প্রশিক্ষণের জন্যই এসব সঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তোমাদেরকে অগ্রসর করানো হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দিয়ে যে বিরাট কাজ আঞ্জাম দিতে চান তার জন্য এ প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরী। এসব পরীক্ষা ছাড়াই যদি তোমাদেরকে সফলতার স্বর্ণ দুয়ারে পৌঁছিয়ে দেয়া হয় তাহলে তোমাদের চরিত্রে এমন সব দুর্বলতা থেকে যাবে যার কারণে তোমরা না পারবে মর্যাদা ও ক্ষমতার গুরুপাক খাদ্য হজম করতে, না পারবে বাতিলের প্রলয়ংকরী তুফানের চরম আঘাত সহ্য করতে।

৪৩. সে সময় মুসলিম সমাজের মুনাফিকদের যে চরিত্র সবারই চোখে পড়ছিলো এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। ঈমানের বাহ্যিক স্বীকারোক্তি অনুসারে মুনাফিক ও খাঁটি মুসলমানদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা না থাকার

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

আমি আমার রসূলদের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং হিদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছি। তাদের সাথে কিতাব ও মিযান নাযিল করেছি যাতে মানুষ ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।[৪৫] আর লোহা নাযিল করেছি যার মধ্যে বিরাট শক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে।[৪৬] এটা করা হয়েছে এজন্য যে, আল্লাহ জেনে নিতে চান কে তাঁকে না দেখেই তাঁকে ও তাঁর রসূলদেরকে সাহায্য করে। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী।[৪৭]

কারণে খাঁটি ঈমানদারদের যে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিলো তারা তাতে শামিল হয়নি। তাই তাদের অবস্থা ছিল এই যে, আরবের অতি সাধারণ একটা শহরে যে নাম মাত্র স্বচ্ছলতা ও পৌরহিত্য তারা লাভ করেছিলো তাতেই তারা যেন গর্বে স্ফীত হয়ে উঠছিলো এবং ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছিলো। তাদের মনের সংকীর্ণতা এমন পর্যায়ের ছিল যে, তারা যে আল্লাহর ওপর ঈমান আনার, যে রসূলের অনুসারী হওয়ার এবং যে দীন মানার দাবী করতো, তার জন্য নিজেরা একটি পয়সাও ব্যয় করবে কি, অন্য দাতাদেরও একথা বলে ব্যয় করা থেকে বিরত রাখতো যে, তোমরা নিজের অর্থ এভাবে অপচয় করছো কেন? স্পষ্ট কথা, দুঃখ কষ্টের উত্তপ্ত অগ্নি কুণ্ডে যদি জ্বালানো না হতো, তাহলে এই কৃত্রিম পদার্থগুলো—যা আল্লাহর কোন কাজে লাগার মত ছিল না—খাঁটি সোনা থেকে পৃথক করা যেতো না। আর তাকে আলাদা করা ছাড়া দুর্বল ও খাঁটি মুসলমানদের এই সংমিশ্রিত সমাবেশকে দুনিয়ার নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ মহান পদটি অর্পণ করা যেতো না, যার বহুবিধ মহতী কল্যাণ খিলাফতে রাশেদার যুগে দুনিয়া অবলোকন করেছিলো।

৪৪. অর্থাৎ উপদেশবাণী শোনার পরও যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর দীনের জন্য আন্তরিকতা, আনুগত্য এবং ত্যাগ ও কুরবানীর পন্থা অবলম্বন না করে এবং নিজের বক্রতা আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় যা আল্লাহ অপছন্দ করেন—তাহলে আল্লাহর তাতে কোন পরোয়া নেই। তিনি অভাব শূন্য, এসব লোকের কাছে তাঁর কোন প্রয়োজন আটকে নেই, আর তিনি অতিশয় প্রশংসিত, তাঁর কাছে উত্তম গুণাবলীর অধিকারী লোকেরাই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। দুষ্কর্মশীল লোকেরা তাঁর কৃপা দৃষ্টিলাভের উপযুক্ত হতে পারে না।

৪৫. এ সংক্ষিপ্ত আয়াতাংশে নবী-রসূলদের মিশনের পুরা সার সংক্ষেপ বর্ণনা করা হয়েছে, যা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে। এতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পৃথিবীতে যত রসূল এসেছেন, তারা সবাই তিনটি বিষয় নিয়ে এসেছিলেন ঃ

এক ঃ بينات অর্থাৎ স্পষ্ট নিদর্শনাবলী যা থেকে স্পষ্টরূপ প্রতিভাত হচ্ছিলো যে, তাঁরা সত্যিই আল্লাহর রসূল। তাঁরা নিজেরা রসূল সেজে বসেননি। তাঁরা যা সত্য বলে পেশ করছেন তা সত্যিই সত্য আর যে জিনিসকে বাতিল বলে উল্লেখ করেন তা যে সত্যিই বাতিল তা প্রমাণ করার জন্য তাঁদের পেশকৃত উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহই যথেষ্ট। সুস্পষ্ট হিদায়াতসমূহ, যাতে কোন সন্দেহ-সংশয় ছাড়া বলে দেয়া হয়েছিল—আকায়েদ, আখলাক, ইবাদাত-বন্দেগী এবং আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে মানুষের জন্য সঠিক পথ কি-যা তারা অনুসরণ করবে এবং ভ্রান্ত পথসমূহ কি যা তারা বর্জন করবে।

দুই ঃ কিতাব, মানুষের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সব দিক নির্দেশনা এতে বর্তমান যাতে মানুষ পথ নির্দেশনার জন্য তার স্মরণাপন্ন হতে পারে।

তিন ঃ মিযান, অর্থাৎ হক ও বাতিলের মানদণ্ড যা দাঁড়ি পাল্লার মতই সঠিকভাবে ওজন করে বলে দিবে চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা, নৈতিকতা ও পারস্পরিক লেনদেনে প্রাচুর্য ও অপ্রতুলতার বিভিন্ন চরম পন্থার মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার কোন্‌টি।

নবী-রসূলদেরকে এ তিনটি জিনিস দিয়ে যে উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে তা হচ্ছে পৃথিবীতে মানুষের আচরণ এবং মানব জীবনের বিধি-বিধান ব্যক্তিগত ও সামগ্রিকভাবেও যেন ন্যায় বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। একদিকে প্রতিটি মানুষ তার আল্লাহর অধিকার, নিজের অধিকার এবং আল্লাহর সেসব বান্দাদের অধিকার সঠিকভাবে জানবে এবং ইনসাফের সাথে আদায় করবে যার সাথে কোন না কোনভাবে তাকে জড়িত হতে হয়। অপর দিকে সামাজিক জীবনের বিধি-বিধান এমন নীতিমালার ওপর নির্মাণ করতে হবে যাতে সমাজে কোন প্রকার জুলুম অবশিষ্ট না থাকে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিটি দিক ভারসাম্যহীনতা থেকে রক্ষা পায়, সমাজ জীবনের প্রতিটি বিভাগে সঠিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজের সবাই যেন ইনসাফ মত যার যার অধিকার লাভ করে এবং নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে। অন্য কথায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাই ছিল নবী-রসূলদের প্রেরণের উদ্দেশ্য। তারা প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে উদগ্রীব ছিলেন, যাতে তার মন-মগজ, তার চরিত্র ও কর্ম এবং তার ব্যবহারে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। তারা গোটা মানব সমাজেও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী ছিলেন যাতে ব্যক্তি এবং ব্যষ্টি উভয়েই পরস্পরের আত্মিক, নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক ও সাংঘর্ষিক হওয়ার পরিবর্তে সহযোগী ও সাহায্যকারী হয়।

৪৬. লোহা নাযিল করার অর্থ মাটির অভ্যন্তরে লোহা সৃষ্টি করা। যেমন কুরআন মজীদের অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে। وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ

তিনি তোমাদের জন্য গবাদী পশুর আটটি জোড়া নাযিল করেছেন (আয যুমার ৬)। পৃথিবীতে যা কিছু পাওয়া যায় তা যেহেতু আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়নি, আল্লাহর নির্দেশে এখানে এসেছে। সুতরাং কুরআন মজীদে তা সৃষ্টি করাকে নাযিল করা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

নবী-রসূলদের মিশন কি তা বর্ণনা করার পর পরই আমি লোহা নাযিল করেছি, তার মধ্যে বিপুল শক্তি ও মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে। বলায় আপনা থেকেই এ বিষয়ে ইংগিত পাওয়া যায় যে, এখানে লোহা অর্থে রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিকে বুঝানো হয়েছে। বাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য শুধু একটা পরিকল্পনা পেশ করার উদ্দেশ্যে রসূলদের পাঠান নাই। কার্যত তা প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালানো ও সে উদ্দেশ্যে শক্তি সঞ্চয় করাও তাদের মিশনের অন্তরভুক্ত ছিল। যাতে এ প্রচেষ্টার ধ্বংস সাধনকারীদের শাস্তি দেয়া যায় এবং এর বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টিকারীদের শক্তি নির্মূল করা যায়।

৪৭. অর্থাৎ আল্লাহ দুর্বল, তিনি আপন শক্তিতে এ কাজ করতে সক্ষম নন, তাই তার সাহায্য প্রয়োজন, ব্যাপারটা তা নয়। তিনি মানুষকে পরীক্ষার জন্য এ কর্ম পন্থা গ্রহণ করেছেন। এ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েই মানুষ তার উন্নতি ও সফলতার পথে এগিয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলার সব সময় এ ক্ষমতা আছে যে, যখন ইচ্ছা তিনি তাঁর একটি ইংগিতেই সমস্ত কাফেরকে পরাস্ত করে তাঁদের ওপর তাঁর রসূলদের আধিপত্য দান করতে পারেন। কিন্তু তাতে রসূলদের ওপর ঈমান আনয়নকারীদের কি কৃতিত্ব থাকবে যে, তারা পুরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে? তাই আল্লাহ তা'আলা এ কাজকে তাঁর বিজয়ী শক্তির সাহায্যে আঞ্জাম দেয়ার পরিবর্তে এ কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন যে, তাঁর রসূলদেরকে 'বাইয়েনাত' স্পষ্ট নিদর্শনাদী, কিতাব ও মিযান দিয়ে মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন। তাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন মানুষের সামনে ন্যায়নীতির বিধান পেশ করেন এবং জুলুম-নির্যাতন ও বে-ইনসাফী থেকে বিরত থাকার জন্য আহবান জানান। মানুষকে এ ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, যার ইচ্ছা রসূলদের দাওয়াত কবুল করবে এবং যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করবে। যারা কবুল করলো তাদের আহবান জানিয়েছেন; এসো, এই ন্যায়বিচারপূর্ণ জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করতে আমার ও আমার রসূলদের সহযোগী হও এবং যারা জুলুম ও নির্যাতনমূলক বিধান টিকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর, তাদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করো। আল্লাহ তা'আলা এভাবে দেখতে চান, মানুষের মধ্যে কারা ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের বাণী প্রত্যাখ্যান করে, আর কারা ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের মোকাবিলায় বে-ইনসাফী কায়েম রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ইনসাফের বাণী গ্রহণ করার পর তার সাহায্য-সহযোগিতা ও সে উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করা থেকে পালিয়ে বেড়ায়। আর কারা আল্লাহকে না দেখেও তাঁরই কারণে এই ন্যায় ও সত্যকে বিজয়ী করার জন্য প্রাণ-সম্পদও বাজি রাখছে। যারা এ পরীক্ষায় সফল হবে, ভবিষ্যতে তাদের জন্যই বহুবিধ উন্নতির পথ খুলে যাবে।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ
فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا
وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ ۖ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ
الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةً ۟ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا
عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ فَآتَيْنَا
الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾

৪ রুকূ'

আমি[৪৮] নূহকে ও ইবরাহীমকে পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের উভয়ের বংশধরের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাবের প্রচলন করেছিলাম[৪৯]। তারপর তাদের বংশধরদের কেউ কেউ হিদায়াত গ্রহণ করেছিল এবং অনেকেই ফাসেক হয়ে গিয়েছিল[৫০]। তাদের পর আমি একের পর এক আমার রসূলগণকে পাঠিয়েছি। তাদের সবার শেষে মারয়ামের পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি, তাকে ইনজীল দিয়েছি এবং তার অনুসারীদের মনে দয়া ও করুণার সৃষ্টি করেছি[৫১]। আর বৈরাগ্যবাদ তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করে নিয়েছে[৫২]। আমি ওটা তাদের ওপর চাপিয়ে দেইনি। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তারা নিজেরাই এ বিদয়াত বানিয়ে নিয়েছে[৫৩]। তারপর সেটি যেভাবে মেনে চলা দরকার, সেভাবে মেনেও চলেনি[৫৪]। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, তাদের প্রতিদান আমি দিয়েছি। তবে তাদের অধিকাংশই পাপী।

৪৮. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে যে রসূলগণ 'বাইয়েনাত' কিতাব ও মিযান নিয়ে এসেছিলেন তাদের অনুসারীদের মধ্যে কি বিকৃতি সৃষ্টি হয়েছিলো এখানে তাই বলা হচ্ছে।

৪৯. অর্থাৎ যে রসূলই কিতাব নিয়ে এসেছিলেন তারা হযরত নূহ (আ) ও তাঁর পরবর্তীগণ হযরত ইবরাহীমের বংশধর ছিলেন।

৫০. অর্থাৎ অবাধ্য হয়ে গিয়েছিলো এবং আল্লাহর আনুগত্যের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো।

৫১. মূল আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে رافت ও رحمت। এ দু'টি শব্দ প্রায় সমার্থক কিন্তু দু'টি শব্দই যখন একসাথে বলা হয় তখন رافت এর অর্থ হয় মনের নম্র ও সদয়

অনুভূতি যা কাউকে দুঃখ কষ্ট ও বিপদের মধ্যে দেখে কারো মনে সৃষ্টি হয়। আর رحمت অর্থ সেই আবেগ যার কারণে সে তাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যেহেতু অত্যন্ত দয়াদ্র হৃদয় এবং আল্লাহর সৃষ্টির জন্য অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহ প্রবন ছিলেন। তাই তাঁর অনুসারীদের মধ্যেও তাঁর চরিত্রের এ প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিলো। যার কারণে আল্লাহর বান্দাদের জন্য তাদের মনে দয়া সৃষ্টি হতো এবং সহানুভূতির সাথে তাদের সেবা করতো।

৫২. এ শব্দটির উচ্চারণ 'রাহবানিয়াত' ও 'রুহ্‌বানিয়াত' দুই রকমই করা হয়ে থাকে। এর শব্দমূল رهب যার অর্থ হচ্ছে ভয়। রাহবানিয়াত অর্থ ভীত হওয়ার পথ ও পন্থা এবং রুহ্‌বানিয়াত অর্থ ভীতদের পথ ও পন্থা। এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে ভয়ের কারণে কোন ব্যক্তির (কারো জুলুম নির্যাতনের ভয়ে হোক বা দুনিয়ার ফিতনার ভয়ে হোক কিংবা নিজের প্রবৃত্তির দুর্বলতার ভয়ে হোক) দুনিয়াত্যাগী হয়ে যাওয়া এবং দুনিয়ার জীবন থেকে পালিয়ে বন-জংগলে বা পাহাড়ে আশ্রয় নেয়া কিংবা নির্জন নিভৃতে যেয়ে বসা।

৫৩. মূল আয়াতে ব্যবহৃত বাক্যাংশ হচ্ছে اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ । এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে আমি তাদের জন্য রাহ্‌বানিয়াত বা বৈরাগ্যবাদ ফরয করেছিলাম না। বরং আমি তাদের ওপর যা ফরয করেছিলাম তা ছিলো এই যে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করবে। আর অপর অর্থটি হচ্ছে, এ বৈরাগ্যবাদ আমার ফরযকৃত ছিল না। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে তারা তা নিজেরাই নিজেদের ওপর ফরয করে নিয়েছিলো। দু'টি অবস্থাতেই এ আয়াতটি একথা স্পষ্ট করে তুলে ধরছে যে, বৈরাগ্যবাদ একটি অনৈসলামিক রীতি। এটি কখনো দীনে ইসলামের অংগীভূত ছিল না। এ প্রসংগেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, لَا رَهْبَانِيَّةَ فِى الْاِسْلَامِ "ইসলামে কোন বৈরাগ্যবাদ নেই" (মুসনাদে আহমদ)। অন্য একটি হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ رَهْبَانِيَّةُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ "আল্লাহর পথে জিহাদই হচ্ছে এ উম্মতের বৈরাগ্যবাদ।" (মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আবু ইয়া'লা) অর্থাৎ দুনিয়া বর্জন করা এ উম্মতের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ নয়, বরং এর আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ। আর এ উম্মত ফিতনার ভয়ে ভীত হয়ে বন-জংগল ও পাহাড়-পর্বতে পালিয়ে যায় না বরং আল্লাহর পথে জিহাদের মাধ্যমে তার মোকাবিলা করে। বুখারী ও মুসলিম উভয়ের বর্ণিত হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে যে, সাহাবীদের একজন বললেন ঃ আমি সব সময় সারা রাত নামায পড়বো। দ্বিতীয়জন বললো ঃ আমি সব সময় রোযা রাখবো, কখনো বিরতি দেব না। তৃতীয় জন বললো, আমি কখনো বিয়ে করবো না এবং নারীর সাথে কোন সম্পর্ক রাখবো না। তাদের এসব কথা শুনতে পেয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

اما والله انى لاخشاكم لله واتقاكم له لكنى اصوم وافطر واصلى

و ارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى -

"আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভয় করি এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলি। আমার নীতি হলো, আমি রোযা রাখি এবং রোযা না রেখেও

থাকি, রাতের বেলা নামাযও পড়ি আবার নিদ্রাও যাই এবং নারীদের বিয়েও করি। যে আমার নীতি পছন্দ করে না তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

হযরত আনাস বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ

لَا تُشَدِّدُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوْا فَشَدَّدَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَا هُمْ فِى الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ –

"নিজের প্রতি কঠোর হয়ো না তাহলে আল্লাহও তোমাদের প্রতি কঠোর হবেন। একটি কওম কঠোরতা অবলম্বন করলে আল্লাহও তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন। দেখে নাও, তারা এবং তাদের অবশিষ্টরা গীর্জা ও উপাসনালয়ে বর্তমান।"

(আবু দাউদ)।

৫৪. অর্থাৎ তারা দ্বিবিধ ভ্রান্তিতে ডুবে আছে। একটি ভ্রান্তি হচ্ছে তারা নিজেদের ওপর এমন সব বাধ্য বাধকতা আরোপ করে নিয়েছিল যা করতে আল্লাহ কোন নির্দেশ দেননি। দ্বিতীয় ভ্রান্তি হচ্ছে নিজেদের ধারণা মতে যেসব বাধ্য বাধকতাকে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায় বলে মনে করে নিজেদের ওপর আরোপ করে নিয়েছিলো তার হক আদায় করেনি এবং এমন সব আচরণ করেছে যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তার গযব খরিদ করে নিয়েছে।

এ বিষয়টিকে ভালভাবে বুঝতে হলে খৃষ্টীয় বৈরাগ্যবাদের ইতিহাসের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করে নেয়া দরকার।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পর খৃষ্টান গীর্জাসমূহ দুই'শ বছর পর্যন্ত বৈরাগ্যবাদের সাথে অপরিচিত ছিল। কিন্তু শুরু থেকেই খৃষ্টান ধর্মে এর বিষাক্ত জীবাণু বিদ্যমান ছিল এবং যেসব ধ্যান–ধারণা এর জন্ম দেয় তাও এর মধ্যে বর্তমান ছিল। সংসার বর্জন ও নিসঙ্গ জীবন যাপনকে নৈতিক আদর্শ মনে করা এবং বিয়ে শাদী ও পার্থিব কায় কারবারমূলক জীবনের তুলনায় দরবেশী জীবন ধারাকে অধিক উন্নত ও ভাল মনে করাই বৈরাগ্যবাদের ভিত্তি। খৃষ্টান ধর্মে এ দু'টি জিনিস শুরু থেকেই ছিল। বিশেষ করে কৌমার্য বা নিসঙ্গ জীবন যাপনকে পবিত্রতার সম পর্যায়ের মনে করার কারণে গীর্জায় ধর্মীয় কাজ কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তিদের জন্য বিয়ে করা, তাদের সন্তানাদি থাকা এবং সাংসারিক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়াকে অপছন্দনীয় মনে করা হতো। তৃতীয় শতাব্দীর আগমনের পূর্বেই এটি একটি ফিতনার রূপ ধারণ করে এবং বৈরাগ্যবাদ মহামারীর আকারে খৃষ্ট ধর্মের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ঐতিহাসিকভাবে এর তিনটি বড় কারণ ছিল।

একটি কারণ হচ্ছে, প্রাচীন মুশরিক সমাজে যৌনতা, চরিত্রহীনতা ও দুনিয়া পূজা যে চরম আকারে বিস্তার লাভ করেছিল তা উচ্ছেদ করার জন্য খৃষ্টান পাদ্রীরা মধ্যপন্থা অবলম্বনের পরিবর্তে চরম পন্থার নীতি গ্রহণ করে। তারা সতীত্ব ও পবিত্রতার ওপর এমন গুরুত্ব আরোপ করে যে, বিয়ের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক হলেও তা মূলত অপবিত্র বলে গণ্য হয়। তারা দুনিয়া পূজার বিরুদ্ধে এমন কঠোরতা অবলম্বন করে যে, একজন দীনদার ও ধর্মভীরু লোকের পক্ষে কোন প্রকার সম্পদের মালিক হওয়া গোনাহর

কাজ বলে গণ্য হয় এবং একেবারে নিসম্বল ও সব দিক দিয়ে দুনিয়াত্যাগী হওয়াটাই ব্যক্তির জন্য নৈতিক মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপ মুশরিক সমাজের ভোগবাদী নীতির প্রতিবাদে তারা এমন চরম পন্থার আশ্রয় নেয় যে, ভোগ সুখ বর্জন, যৌন বাসনাকে হত্যা করা এবং প্রবৃত্তির মূলোৎপাটন করাই নৈতিকতার উদ্দেশ্য হয়ে যায় এবং নানা রকম সাধনা দ্বারা শরীরকে কষ্ট দেয়াই ব্যক্তির আধ্যাত্মিক পূর্ণতা ও তার প্রমাণ হিসেবে মনে করা হতে থাকে।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, খৃষ্ট ধর্ম যখন সফলতার যুগে প্রবেশ করে এবং জনগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করতে থাকে, গীর্জা তখন তার ধর্মের প্রসার ও প্রচারের আকাংখায় জনপ্রিয় প্রতিটি খারাপ জিনিসকেও তার গণ্ডিভুক্ত করতে থাকে। ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের পূজা প্রাচীন উপাস্যদের স্থান দখল করে নেয়। হোরাস (HORUS) ও আইসিস (ISIS) এর মূর্তির বদলে যীশু ও মারয়ামের মূর্তির পূজা শুরু হয়। স্যাটারনেলিয়া (Saturnalia) এর পরিবর্তে বড় দিনের উৎসব পালন শুরু হয়। খৃষ্টান দরবেশগণ প্রাচীন যুগের তাবিজ ও বালা পরা, আমল-তদবীর করা, শুভ-অশুভ লক্ষণ নির্ণয় ও অদৃশ্য বলা, জিন ভূত তাড়ানোর আমল সব কিছুই করতে শুরু করে। অনুরূপ যে ব্যক্তি নোংরা, অপরিষ্কার ও উলঙ্গ থাকতো এবং কোন কুঠরি বা গুহায় বসবাস করতো জনগণ যেহেতু তাকে ধার্মিক মনে করতো তাই খৃষ্টান গীর্জাসমূহ এটাই আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বা ওলী হওয়ার একমাত্র পথ বলে ধরে নেয়া হয়। এ ধরনের লোকদের 'কারামত' বা অলৌকিক ক্রিয়া কাণ্ডের কাহিনী দ্বারা খৃষ্টানদের মধ্যে তাযকিরাতুল আওলিয়া ধরনের প্রচুর বই-পুস্তক বহুল প্রচারিত হয়।

তৃতীয় কারণ হচ্ছে ধর্মের সীমা নির্ণয়ের জন্য খৃষ্টানদের কাছে কোন বিস্তারিত শরীয়াত এবং কোন সুস্পষ্ট 'সুন্নাত' বর্তমান ছিল না। মূসার শরীয়াতকে তারা পরিত্যাগ করেছিল, কিন্তু এককভাবে শুধু ইনজীলের মধ্যে কোন পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনামা ছিল না। এ কারণে খৃষ্টান পণ্ডিতগণ কিছুটা বাইরের দর্শন ও রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এবং কিছুটা নিজেদের মানসিক প্রবণতার কারণে ধর্মের মধ্যে নানা ধরনের বিদআতকে অন্তরভুক্ত করতে থাকে। বৈরাগ্যবাদ ওই সব বিদআতেরই একটি। খৃষ্টান ধর্মের পণ্ডিত পুরোহিত ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এ ধর্মের দর্শন ও এর কর্মপদ্ধতি বৌদ্ধ ধর্মের ভিক্ষু, হিন্দু যোগী-সন্নাসী, প্রাচীন মিসরীয় সংসার ত্যাগী (Anchorits) সন্নাসী, পারস্যের মানেবীয়া এবং প্লেটো ও প্লেটোনিক দর্শনের অনুসারীদের থেকে গ্রহণ করেছে এবং একেই আত্মার পরিশুদ্ধির পন্থা, আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় ও আল্লাহর নৈকট্যলাভের অসীলা হিসেবে গণ্য করেছে। যারা এ ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়েছিল তারা কোন সাধারণ লোক ছিল না। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী (অর্থাৎ কুরআন নাযিল হওয়ার সময়) পর্যন্ত তারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে খৃষ্ট ধর্মের বড় বড় পণ্ডিত-পুরোহিত এবং ধর্মীয় নেতা ও পথ প্রদর্শক ছিল। অর্থাৎ সেন্ট আথানাসিউয়াস, সেন্ট বাসেল, সেন্ট গ্রেগরী নাযিয়ানযীন, সেন্ট কারাই সুষ্টাম, সেন্ট আয়ম ব্রোজ, সেন্ট জিরুম, সেন্ট অগাষ্টাইন, সেন্ট বেনডিক্ট, মহান গ্রেগরী। এঁরা সবাই ছিলেন সংসার বিরাগী দরবেশ এবং বৈরাগ্যবাদের বড় প্রবক্তা। এদের প্রচেষ্টায়ই গীর্জাসমূহে বৈরাগ্যবাদ চালু হয়।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, খৃষ্টানদের মধ্যে বৈরাগ্যবাদের সূচনা হয় মিসর থেকে। সেন্ট এন্থনী (St. Anthony) ছিলেন এর প্রবর্তক। তিনি ২৫০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৩৫০ খৃষ্টাব্দে মারা যান। তাঁকেই সর্ব প্রথম খৃষ্টান দরবেশ বলে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি 'কাইয়ুম' অঞ্চলে 'পাসপীর' নামক স্থানে (যা বর্তমানে দাইর আল-মাইমুন নামে পরিচিত) প্রথম খানকাহ প্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর তিনি লোহিত সাগরের তীরে দ্বিতীয় খানকাহ প্রতিষ্ঠিত করেন, যাকে বর্তমানে দাইর মার আনতিনিউস বলা হয়। খৃষ্টানদের মধ্যে বৈরাগ্যবাদের মৌলিক নিয়ম-কানুন তাঁর লেখা ও নির্দেশাবলী থেকেই গৃহীত হয়েছে। এভাবে সূচনা হওয়ার পর গোটা মিসরে তা প্লাবনের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানে স্থানে পুরুষ ও মহিলা দরবেশ ও সংসার বিরাগীদের জন্য স্বতন্ত্র খানকাহ গড়ে ওঠে যার কোন কোনটিতে তিন হাজার পর্যন্ত দরবেশ ও সন্ন্যাসী থাকতো। ৩২৫ খৃষ্টাব্দে মিসরেই পাখোমিউস নামের আরো একজন খৃষ্টান অলীর আবির্ভাব ঘটে, যিনি নারী ও পুরুষ সন্ন্যাসী-দরবেশদের জন্য দশটি বড় খানকাহ নির্মাণ করেন। এরপর এ ধারা সিরিয়া, ফিলিস্তিন এবং আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করতে থাকে। গীর্জা কর্তৃপক্ষ প্রথম প্রথম এ বৈরাগ্যবাদের ব্যাপারে কঠিন দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যায়। কারণ গীর্জাসমূহ দুনিয়া বর্জন, নিসঙ্গ ও কুমার জীবন যাপন এবং দারিদ্র ও অভাব অনটনকে আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শ মনে করতো ঠিকই কিন্তু সন্ন্যাসীদের বিয়ে শাদী করা, সন্তান উৎপাদন করা এবং সম্পদের মালিকানা লাভকে গোনাহর কাজ বলে আখ্যায়িত করতে পারতো না। অবশেষে সেন্ট আথানাসিউস (মৃত্যু ৩৭৩ খৃষ্টাব্দ), সেন্ট বাসেল (মৃত্যু ৩৭৯ খৃষ্টাব্দ), সেন্ট অগাষ্টাইন (মৃত্যু ৪৩০ খৃষ্টাব্দ) এবং মহান গ্রেগরী (মৃত্যু ৬০৯ খৃষ্টাব্দ) এর মত ব্যক্তিদের প্রভাবে বৈরাগ্যবাদের অনেক নিয়ম-কানুন চার্চ ব্যবস্থায় যথারীতি প্রবেশ লাভ করে।

এই বৈরাগ্যবাদী বিদআতের কতিপয় বৈশিষ্ট ছিল। আমরা সংক্ষেপে সেগুলো বর্ণনা করছি ঃ

এক ঃ কঠোর সাধনা ও নিত্য নতুন পন্থায় নিজের দেহকে নানা রকম কষ্ট দেয়া। এ ব্যাপারে প্রত্যেক দরবেশই অন্যদের পেছনে ফেলার চেষ্টা করতো। খৃষ্টান আওলিয়া দরবেশদের কিস্সা-কাহিনীতে তাদের কামালিয়াতের যেসব বর্ণনা আছে তা কতকটা এখানে বর্ণনা করা হলো ঃ

আলেকজান্দ্রিয়ার সেন্ট মাকারিউস তার দেহের ওপর সব সময় ৮০ পাউণ্ড ওজনের বোঝা বহন করতো। ৬ মাস পর্যন্ত সে কর্দমাক্ত মাটিতে শয়ন করতে থাকে এবং বিষাক্ত মক্ষিকাসমূহ তার উদোম শরীরে দংশন করতে থাকে। তার সাগরেদ সেন্ট ইউসিবিউস গুরুর চেয়েও অধিক সাধনায় মগ্ন হয়। সে সব সময় ১৫০ পাউণ্ড ওজনের বোঝা বহন করতো এবং তিনবছর পর্যন্ত একটি শুষ্ক কূপের মধ্যে অবস্থান করেছিলো। সেন্ট সাবিউস শুধু এমন জোয়ারের রুটি খেতেন যা গোটা মাস পানিতে ভিজে থাকার কারণে গন্ধযুক্ত হয়ে যেতো। সেন্ট বাইসারিউন ৪০ দিন পর্যন্ত কন্টকাকীর্ণ ঝোপের মধ্যে পড়েছিলো এবং ৪০ বছর পর্যন্ত সে মাটিতে পিঠ ঠেকায়নি। সেন্ট পাখোমিউস ১৫ বছর অপর একটি বর্ণনা অনুসারে পঞ্চাশ বছর মাটিতে পিঠ না ঠেকিয়ে অতিবাহিত করেছে। সেন্ট জন নামক একজন ওলী তিন বছর পর্যন্ত উপাসনারত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল। পুরো এই সময়টাতে সে

কখনো বসেও নাই কিংবা শয্যা গ্রহণও করে নাই। আরাম করার জন্য একটি বড় পাথরে হেলান দিত এবং প্রতি রবিবারে তার জন্য 'তাবাররুক' হিসেবে যে খাদ্য আনা হতো কেবল তাই ছিল তার খাদ্য। সেন্ট সিমিউন স্টায়লাইট (৩৯০–৪৪৯ খৃঃ) খৃষ্টানদের বড় বড় ওলী দরবেশদের অন্যতম। প্রত্যেক ইষ্টারের আগে সে পুরা চল্লিশ দিন না খেয়ে কাটিয়ে দিত। একবার সে পুরো এক বছর পর্যন্ত এক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। মাঝে মধ্যে সে তার খানকাহ থেকে বেরিয়ে একটি কূপের মধ্যে গিয়ে থাকতো। অবশেষে সে উত্তর সিরিয়ার সীমান দূর্গের সন্নিকটে ৬০ ফুট উঁচু একটি স্তম্ভ নির্মাণ করিয়ে নেয় যার ওপরের অংশের পরিধি ছিল মাত্র তিন ফুট। এরই উপরে তার জন্য একটি ঘেরা নির্মাণ করে দেয়া হয়েছিলো। এই স্তম্ভটির ওপরে সে পুরো তিনটি বছর কাটিয়ে দেয়। রোদ–বৃষ্টি ও শীত–গ্রীষ্ম সব কিছুই তার ওপর দিয়ে চলে যেতো কিন্তু স্তম্ভ থেকে সে কখনো নিচে নামতো না। তার শিষ্য সিড়ি লাগিয়ে তাকে খাবার পৌছাতো এবং তার ময়লা আবর্জনা সাফ করতো। তার পর সে একটি রশি দিয়ে নিজেকে স্তম্ভের সাথে বেঁধে নেয়। এমনকি রশি তার শরীরের মাংসের মধ্যে ঢুকে যায়। এতে মাংসে পচন ধরে এবং তাতে পোকা পড়ে। তার ফোঁড়া থেকে যখনই কোন পোকা নীচে পড়ে যেতো তখনই সে তা উঠিয়ে ফোঁড়ার মধ্যে রাখতো এবং বলতো ঃ "আল্লাহ তোকে যা খেতে দিয়েছেন, খা।" সাধারণ খৃষ্টানরা বহুদূর দূরান্ত থেকে তার সাক্ষাত লাভের জন্য আসতো। সে মারা গেলে খৃষ্টান জনতা তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেয় যে, সে খৃষ্টান অলী দরবেশদের মধ্যে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত।

এ যুগের খৃষ্টান আওলিয়াদের যেসব গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে তা এ ধরনের দৃষ্টান্তে ভরা। অলীদের মধ্যে কারো পরিচয় ছিল এই যে, সে ৩০ বছর পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিশ্চুপ ছিল, তাকে কখনো কথা বলতে দেখা যায়নি। কেউ নিজেকে একটি বড় পাথরের সাথে বেঁধে রেখেছিল। কেউ জংগলে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতো এবং ঘাস ও লতাপাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতো। কেউ সব সময় ভারী বোঝা বহন করে বেড়াতো। কেউ শৃঙ্খলে নিজের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ বেঁধে রাখতো। কিছু সংখ্যক অলী আবার জীব–জন্তুর গুহায়, শুষ্ক বিরান কূপে কিংবা পুরনো কবরে গিয়ে বাস করতো। আরো কিছু সংখ্যক বুযর্গ সব সময় উলঙ্গ থাকতো, লম্বা চুল দিয়ে নিজেদের লজ্জাস্থান ঢাকতো এবং বুকে হেঁটে চলতো। সবখানে এ ধরনের ওলী দরবেশদের কারামতের চর্চা হতো এবং মৃত্যুর পর তাদের হাড্ডিসমূহ খানকাহসমূহে সংরক্ষণ করা হতো। আমি নিজে সিনাই পর্বতের পাদদেশে সেন্ট ক্যাথারাইনের খানকায় এ ধরনের হাড় গোড়ে সজ্জিত গোটা একটা লাইব্রেরী দেখেছি যেখানে এক জায়গায় ওলীদের মাথার খুলি, এক জায়গায় পায়ের হাড় এবং এক জায়গায় হাতের হাড় সাজানো ছিল। একজন ওলীর গোটা কংকালই কাঁচের আলমারীতে রাখা ছিল।

দুই ঃ তাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট ছিল এই যে, তারা সব সময় নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন থাকতো এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে চরমভাবে বর্জন করে চলতো। তাদের দৃষ্টিতে গোসল করা বা শরীরে পানি লাগানো আল্লাহ ভীরুতার পরিপন্থী। দেহের পরিচ্ছন্নতাকে তারা আত্মার অপবিত্রতা বলে মনে করতো। সেন্ট আথানাসিউস অত্যন্ত ভক্তির সাথে সেন্ট এ্যানথোনীর এই বৈশিষ্টটি বর্ণনা করেছেন যে, মৃত্যু পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে তার নিজের পা

৫০ বছর পর্যন্ত সে মুখ বা পা কিছুই ধোয়নি। এক বিখ্যাত খৃষ্টান সন্ন্যাসীনী কুমারী সিলভিয়া আঙ্গুল ছাড়া জীবনভর দেহের অন্য কোন অংশে পানি লাগতে দেয়নি। একটি কনভেন্টের ১৩০ জন সন্ন্যাষিনীর প্রশংসায় লেখা হয়েছে যে, তারা কখনো নিজেদের পা ধোয়নি। আর গোসলের তো নাম শুনলেই তাদের দেহে কম্পন সৃষ্টি হতো।

তিন ঃ এ বৈরাগ্যবাদ দাম্পত্য জীবনকে কার্যত পুরোপুরি হারাম করে দেয় এবং বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলার ব্যাপারে অত্যন্ত নির্মমভাবে কাজ করে। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর সমস্ত ধর্মীয় রচনাবলী এ ধারণায় ভরা যে, নিসঙ্গ জীবন বা কৌমার্য সর্বাপেক্ষা বড় নৈতিক মূল্যবোধ। পবিত্রতার অর্থ হচ্ছে ব্যক্তি যৌন সম্পর্ককে একেবারেই বর্জন করবে। এমনকি তা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার যৌন সম্পর্ক হলেও। এমন একটি অবস্থাকে পুতঃ পবিত্র আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণতা মনে করা হতো, যে ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তিকে পুরোপুরি হত্যা করে এবং তার মধ্যে দৈহিক ভোগাকাংখার লেশ মাত্রও অবশিষ্ট না থাকে। প্রবৃত্তিকে হত্যা করা তাদের দৃষ্টিতে এজন্য জরুরী ছিল যে, তা দ্বারা পশুত্ব শক্তি লাভ করে। তাদের কাছে ভোগ এবং গোনাহ ছিল সমার্থক। এমনকি তাদের দৃষ্টিতে আনন্দ প্রকাশ করাও আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার নামান্তর ছিল। সেন্ট বাসেল শব্দ করে হাসা এমনকি মুচকি হাসা পর্যন্ত নিষেধ করেছেন। এসব ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে তাদের কাছে নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক একেবারেই অপবিত্র বলে গণ্য হয়েছিলো। বিয়ে তো দূরের কথা নারীর চেহারা না দেখা এবং বিবাহিত হলে স্ত্রীকে ফেলে চলে যাওয়া সন্ন্যাসীর জন্য অত্যন্ত জরুরী ছিল। পুরুষদের মত নারীদের মনেও একথা বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছিল যে, তারা যদি আসমানী বাদশাহীতে প্রবেশ করতে চায় তাহলে যেন চির কুমারী থাকে এবং বিবাহিতা হলে স্বামীদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। সেন্ট জিরুমের মত বিশিষ্ট খৃষ্টান পণ্ডিত বলেন, যে নারী যীশু খৃষ্টের কারণে সন্ন্যাসিনী হয়ে সারা জীবন কুমারী থাকবে সে খৃষ্টের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী আর সেই নারীর মা, খোদা অর্থাৎ খৃষ্টের শ্বাশুড়ী (Mother in law of god) হওয়ার মর্যাদা লাভ করবে। সেন্ট জিরুম অন্য একস্থানে বলেন ঃ "পবিত্রতার কুঠার দিয়ে দাম্পত্য বন্ধনের কাষ্ঠ খণ্ড কেটে ফেলাই আধ্যাত্মিক পথের অনুসারীর সর্ব প্রথম কাজ।" এসব শিক্ষার প্রভাবে ধর্মীয় আবেগ সৃষ্টি হওয়ার পর একজন খৃষ্টান পুরুষ বা খৃষ্টান নারীর মধ্যে এর সর্ব প্রথম যে প্রতিক্রিয়া হয় তা হচ্ছে, তার মধুর দাম্পত্য জীবন চিরদিনের জন্য ধ্বংস হয়ে যায়। আর খৃষ্টান ধর্মে যেহেতু তালাক ও বিচ্ছেদের কোন ব্যবস্থা ছিল না তাই বৈবাহিক বন্ধনের মধ্যে থেকেই স্বামী-স্ত্রী পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। সেন্ট নাইলাস (St. Nilus) ছিল দুই সন্তানের পিতা। সে বৈরাগ্যবাদের খপ্পরে পড়লে তার স্ত্রী কাঁদতে শুরু করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেন্ট আম্মুন (St. Ammon) বিয়ের রাতে বাসর শয্যায়ই তার নব বধুকে দাম্পত্য সম্পর্কের অপবিত্রতা সম্পর্কে উপদেশ দেয় এবং উভয়ে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা আজীবন পরস্পর আলাদা থাকবে। সেন্ট এ্যালেক্সিসও (St. Alexis) এই একই কাজ করেছিল। খৃষ্টান আওলিয়া-দরবেশদের জীবন-কথা এ ধরনের কাহিনীতে ভরপুর।

গীর্জা কর্তৃপক্ষ তার গণ্ডির মধ্যে তিনশত বছর পর্যন্ত কোন না কোনভাবে এ চরমপন্থী ধ্যান-ধারণা প্রতিরোধ করতে থাকে। সেই সময় একজন পাদ্রীর জন্য নিসঙ্গ বা অবিবাহিত

হওয়া জরুরী ছিল না। সে যদি পাদ্রীর পদ মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার আগেই বিবাহিত হয়ে থাকে তাহলে সে স্ত্রীর সাথেই থাকতে পারতো। তবে পাদ্রী হিসেবে নিয়োজিত হওয়ার পর তার বিয়ে করা নিষেধ ছিল। তাছাড়া এমন কোন ব্যক্তিকে পাদ্রী নিয়োগ করা যেতো না যে কোন বিধবা কিংবা তালাক প্রাপ্তাকে বিয়ে করেছে বা যার দুই স্ত্রী আছে কিংবা যার ঘরে দাসী আছে। ক্রমান্বয়ে চতুর্থ শতাব্দীতে এ ধারণা জোরদার হয়ে ওঠে যে, যে ব্যক্তি গীর্জায় ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করে তার বিবাহিত হওয়া অত্যন্ত ঘৃণার ব্যাপার। ৩৬২ খৃষ্টাব্দের গেংরা কাউন্সিল ছিল এ ব্যাপারে সর্বশেষ সম্মেলন যেখানে এ ধরনের ধ্যান-ধারণাকে ধর্মের পরিপন্থী বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু এর অল্প কিছুকাল পরেই ৩৮৬ খৃষ্টাব্দে রোমান সিনোড (Synod) সমস্ত পাদ্রীকে পরামর্শ দেয় যে, তারা যেন বৈবাহিক বন্ধন থেকে দূরে থাকে। পরের বছর পোপ সাইরিকিয়াস (Siricius) নির্দেশ জারি করে যে, যে পাদ্রী বিয়ে করবে কিংবা পূর্ব বিবাহিত হওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রাখবে, তাকে তার পদ থেকে অপসারিত করা হোক। সেন্ট জিরুম, সেন্ট এ্যাম্ব্রুজ ও সেন্ট অগাষ্টাইনের মত বড় বড় পণ্ডিত ও মনীষী অত্যন্ত জোরালোভাবে এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে এবং যৎ সামান্য প্রতিরোধের পর পাশ্চাত্য গীর্জাসমূহে অত্যন্ত কঠোরভাবে তা চালু হয়। পূর্ব বিবাহিত লোকেরা ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত হওয়ার পরও নিজেদের স্ত্রীর সাথে "অবৈধ" সম্পর্ক রক্ষা করে চলছে এ ধরনের অনেক অভিযোগ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য সে সময় অনেকগুলো কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। অবশেষে তাদের সংশোধনের জন্য নিয়ম করে দেয়া হয় যে, তারা উন্মুক্ত স্থানে ঘুমাবে, স্ত্রীদের সাথে কখনো একাকী সাক্ষাত করবে না এবং তাদের সাক্ষাতের সময় কমপক্ষে দুই জন লোক উপস্থিত থাকবে। সেন্ট গ্রেগরী একজন পাদ্রীর প্রশংসা করে লিখছেন যে, সে ৪০ বছর পর্যন্ত তার স্ত্রী থেকে দূরে ছিল এবং মৃত্যুর সময় তার স্ত্রী যখন তার কাছে যায় তখন সে বলে ঃ "নারী, তুই দূর হ।"

চার ঃ এ বৈরাগ্যবাদের সব চাইতে বেদনাদায়ক দিক ছিল এই যে, তা মা-বাপ, ভাইবোন ও সন্তানদের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিল। খৃষ্টান আওলিয়া দরবেশদের দৃষ্টিতে সন্তানের জন্য মা বাবার স্নেহ-ভালবাসা, ভাইয়ের জন্য ভাই-বোনের স্নেহ-ভালবাসা এবং বাপের জন্য ছেলেমেয়ের ভালবাসাও ছিল একটি পাপ। তাদের মতে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এসব সম্পর্ক ছিন্ন করা অপরিহার্য। খৃষ্টান আওলিয়া দরবেশদের জীবন কথায় এর এমন সব হৃদয় বিদারক কাহিনী দেখা যায় যা পাঠ করে কোন মানুষের পক্ষে ধৈর্যধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। একজন সন্ন্যাসী ইভাগ্রিয়াস (Evagrius) বছরের পর বছর মরুভূমিতে গিয়ে সাধনা করছিল। তার বাবা মা বহু বছর ধরে তার জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করছিল। একদিন হঠাৎ তার কাছে তার মা বাবার পত্র পৌছলো। এ পত্র পাঠ করে তার মনে মানবিক ভালবাসার আবেগ উদ্বেলিত হয়ে উঠতে পারে এ আশংকা দেখা দিল। তাই সে ঐ পত্রগুলো না খুলেই আগুনে নিক্ষেপ করলো। সেন্ট থিউডোরাসের মা ও বোন বহুসংখ্যক পাদ্রীর সুপারিশ পত্র নিয়ে যে খানকায় সে অবস্থান করতো সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো এবং পুত্র ও ভাইকে এক নজর দেখার আকাংখা প্রকাশ করলো। কিন্তু সে তাদের সম্মুখে আসতে পর্যন্ত অস্বীকার করলো। সেন্ট মার্কাসের (St. Marcus) মা তার সাথে সাক্ষাতের জন্য তার খানকায় যায় এবং খানকার প্রধানকে অনুনয়-বিনয় করে ছেলেকে মায়ের সামনে আসার নির্দেশ দিতে রাজি করায়। কিন্তু ছেলে কোনক্রমেই মায়ের

সাথে সাক্ষাত করতে চাচ্ছিলো না। শেষ পর্যন্ত সে খানকা প্রধানের নির্দেশ পালন করে এভাবে যে, বেশভূষা পরিবর্তন করে মায়ের সামনে যায় এবং চোখ বন্ধ করে থাকে। এভাবে মাও ছেলেকে চিনতে পারেনি, ছেলেও মায়ের চেহারা দেখতে পায়নি। আরো একজন অলী সেন্ট পোমেন (St. Poemen) ও তার ৬ ভাই মিসরের একটি মরু খানকায় থাকতো। বহু বছর পর তাদের বৃদ্ধা মা তা খোঁজ পায় এবং তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সেখানে গিয়ে হাজির হয়। ছেলে দূর থেকে মাকে দেখা মাত্রই দৌড়িয়ে গিয়ে তার হুজরায় প্রবেশ করে এবং দরজা বন্ধ করে দেয়। মা বাইরে বসে কাঁদতে থাকলো এবং চিৎকার করে বললো ঃ এই বৃদ্ধাবস্থায় এত দীর্ঘ পথ হেটে আমি কেবল তোমাকে দেখতে এসেছি। আমি যদি তোমার চেহারা দেখি তাহলে তোমার কি ক্ষতি হবে? আমি কি তোমার মা নই? কিন্তু সেসব অলী-দরবেশরা দরজা খুললো না। তারা মাকে বলে দিল যে, আমরা আল্লাহর কাছে তোমার সাথে সাক্ষাত করবো। সেন্ট সিমিউন স্টায়লাইটসের (St. Simeon Stylites) কাহিনী এর চেয়েও বেদনাদায়ক। সে তার মাকে ছেড়ে ২৭ বছর নিরুদ্দেশ থাকে। বাপ তার বিচ্ছেদে মারা যায়। মা জীবিত থাকে। ছেলের আল্লাহর অলী হওয়ার কথা যখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তখন মা ছেলের অবস্থান জানতে পারে। বেচারী মা তার সাথে সাক্ষাতের জন্য তার খানকায় গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু কোন নারীর জন্য সেখানে প্রবেশের অনুমতি ছিল না। ছেলে হয় তাকে ভেতরে ডেকে নিক কিংবা বাইরে এসে তাকে দর্শন দিক এ ব্যাপারে মা অশেষ কাকুতি-মিনতি জানায়। কিন্তু সেই অলী তা করতে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকৃতি জানায়। এ অবস্থায় হতভাগিনী মা তিনদিন তিন রাত খানকার দরজার সামনে পড়ে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সেখানেই শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তখন অলী সাহেব বেরিয়ে এসে মায়ের লাশের পাশে অশ্রুপাত এবং তার ক্ষমার জন্য দোয়া করে।

এসব অলীরা তাদের বোন ও সন্তানদের সাথেও এ ধরনের নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছে। এক ব্যক্তি মিউটিয়াসের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন যে, সে ছিল একজন সুখী-স্বচ্ছল মানুষ। হঠাৎ তাকে ধর্মীয় আবেগে পেয়ে বসে এবং সে তার ৮ বছর বয়সের একমাত্র পুত্রকে নিয়ে এক খানকায় গিয়ে হাজির হয়। সেখানে তার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য মন থেকে পুত্রের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা দূর করা একান্ত আবশ্যক ছিল। সেজন্য প্রথমে তাকে পুত্রের নিকট থেকে বিচ্ছন্ন করে দেয়া হয়। অতপর তার চোখের সামনে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার সে নিষ্পাপ শিশু সন্তানকে নানাভাবে নির্মম কষ্ট দেয়া হতে থাকে এবং সে তা দেখতে থাকে। এরপর খানকার পুরোহিত তাকে তার ঐ সন্তানকে নিজ হাতে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে নির্দেশ দেয়। সে যখন এ নির্দেশও পালন করতে প্রস্তুত হয় এবং শিশুটিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হয় ঠিক সে মুহূর্তে সন্ন্যাসীরা এসে তার জীবন রক্ষা করে। এরপরে স্বীকৃতি দেয়া হয় যে, সত্যিই সে অলী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে।

এসব ব্যাপারে খৃষ্টীয় বৈরাগ্যবাদের দৃষ্টিকোণ ছিল এই যে, আল্লাহর ভালবাসা যে ব্যক্তি চায় তাকে মানবীয় ভালবাসার সেসব শৃঙ্খল কেটে ফেলতে হবে যা পৃথিবীতে তাকে তার মা বাবা, ভাইবোন এবং সন্তান-সন্ততির সাথে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করে। সেন্ট জিরুম বলেন ঃ "তোমার ভাতিজা যদি তোমার গলায় বাহু জড়িয়েও থাকে, তোমার মা যদি তোমাকে দুধের দোহাই দিয়ে বিরত রাখতে চায়, তোমাকে বিরত রাখার জন্য

তোমার বাবা যদি তোমার সামনে লুটিয়ে পড়ে, তারপরও তুমি সবাইকে পরিত্যাগ করে এবং বাবার দেহকে পদদলিত করে এক ফোটাও অশ্রুপাত না করে ক্রুশের ঝাণ্ডার দিকে ছুটে যাও। এ ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতাই তাকওয়া।" সেন্ট গ্রেগরী লিখেছেন ঃ "এক যুবক সন্ন্যাসী মন থেকে মা বাবার প্রতি ভালবাসা দূর করতে পারেনি। সে এক রাতে চুপে চুপে তাদের সাথে সাক্ষাত করতে যায়। আল্লাহ তাকে এ অপরাধের সাজা দেন। সে খানকায় ফিরে আসা মাত্রই মারা যায়। তার লাশ দাফন করা হলে মাটি তা গ্রহণ করে না। কবরে বার বার তার লাশ রাখা হয় কিন্তু মাটি তা বাইরে নিক্ষেপ করে। অবশেষে সেন্ট বেনেডিক্ট তার বুকের ওপর তাবারুরুক রাখলে কবর তাকে গ্রহণ করে।" এক সন্ন্যাসিনী সম্পর্কে লিখেছেন যে, সে মারা যাওয়ার পর তিনদিন পর্যন্ত আযাব হতে থাকে। কারণ সে মন থেকে তাঁর মায়ের ভালবাসা দূর করতে পারেনি। একজন অলীর প্রশংসায় লিখেছেন যে, নিজের আত্মীয়-স্বজন ছাড়া সে কখনো অন্য কারো সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করেনি।

পাঁচ ঃ নিজের নিকটাত্মীয়দের সাথে নির্দয়তা, নিষ্ঠুরতা এবং কঠোরতা প্রদর্শনের যে অনুশীলন তারা করতো তাতে তাদের মানবিক আবেগ-অনুভূতি মরে যেতো। এর স্বাভাবিক ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, যাদের সাথে তাদের ধর্মীয় বিরোধ দেখা দিতো এরা তাদের ওপর জুলুম-অত্যাচারের চরম পন্থা গ্রহণ করতো। চতুর্থ শতাব্দীর আগমন পর্যন্ত খৃষ্টবাদের মধ্যে ৮০-৯০টি ফিরকা সৃষ্টি হয়েছিল। সেন্ট অগাষ্টাইন তার সময়ে ৮৮টি ফিরকা গণনা করেছেন। এসব ফিরকা পরস্পরের বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা ও হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করতো। হিংসা বিদ্বেষের এ আগুনের ইন্ধন যোগানদাতাও ছিল সন্ন্যাসীরা। এ আগুনে বিরোধী ফিরকাসমূহকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয়ার প্রচেষ্টায়ও এসব খানকাবাসী সন্ন্যাসীরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতো। এ সাম্প্রদায়িক সংঘাতের একটি বড় আখড়া ছিল আলেকজান্দ্রিয়া। সেখানে প্রথমে এরিয়ান ফিরকার বিশপ আথানাসিউসের দলের ওপর হামলা করে। তার খানকা থেকে কুমারী সন্ন্যাসীনীদের ধরে ধরে বের করে আনা হয়। তাদেরকে উলংগ করে কাঁটাযুক্ত ডাল পালা দিয়ে প্রহার করা হয় এবং শরীরে দাগ লাগানো হয় যাতে তারা নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস বর্জন করে তাওবা করে। এর পর মিসরে ক্যাথলিক গোষ্ঠী বিজয় লাভ করলে এরিয়ান ফিরকার সাথে একই আচরণ করে। এমনকি খুব সম্ভবত খোদ এরিয়াস (Arius)কেও বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। আলেকজান্দ্রিয়াতেই সেন্ট সাইরিল (Cyril) এর মুরীদ সন্ন্যাসীরা ব্যাপক হাংগামার সৃষ্টি করে। এমনকি তারা বিরোধী ফিরকার এক সন্ন্যাসিনীকে ধরে তাদের গীর্জায় নিয়ে হত্যা করে এবং লাশ টুকরো টুকরো করে কেটে আগুনে নিক্ষেপ করে। রোমের পরিস্থিতিও এর থেকে ভিন্ন কিছু ছিল না। ৩৬৬ খৃষ্টাব্দে পোপ লিবেরিয়াস (Liberius) এর মৃত্যু হলে দুই গোষ্ঠীই পোপের পদের জন্য নিজ নিজ প্রার্থী দাঁড় করায়। উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক খুনাখুনি ও রক্তপাত হয়। এমনকি একটি চার্চ থেকে একদিনে ১৩৭টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

ছয় ঃ দুনিয়া বর্জন ও নিসঙ্গ জীবন যাপন এবং কৃচ্ছতা ও দরবেশীর জীবন যাপনের পাশাপাশি পার্থিব ধন-সম্পদ উপার্জনও কম করা হয়নি। পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতেই পরিস্থিতি এ দাঁড়িয়েছিল যে, রোমের বিশপ তার মহলে রাজা-বাদশাহদের মত বসবাস করতো। আর সে যখন সওয়ারীতে আরোহণ করে শহরে বের হতো তখন তার জাঁকজমক

কাইজারের চাইতে কম হতো না। সেন্ট জিরুম তার সময়ে (চতুর্থ শতাব্দীর শেষযুগ) অভিযোগ করেছেন যে, বহু সংখ্যক বিশপের খাওয়ার অনুষ্ঠানসমূহ জাঁকজমকের দিক দিয়ে গভর্ণরদের খাওয়া অনুষ্ঠানসমূহকে লজ্জা দিত। খানকাহ ও গীর্জাসমূহের প্রতি সম্পদের এই প্রবাহ সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভকাল (কুরআন নাযিল হওয়ার যুগ) পর্যন্ত প্লাবনের আকার ধারণ করেছিলো। জনসাধারণের মনে একথা বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছিলো যে, কোন ব্যক্তির দ্বারা কোন বড় গোনাহর কাজ সংঘটিত হলে কোন না কোন অলীর দরগায় নজরানা পেশ করে কিংবা কোন খানকাহ বা চার্চকে ভেট ও উপঢৌকন দিয়েই কেবল ক্ষমা পাওয়া যেতে পারে। যে পার্থিব স্বার্থ ও ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করাই ছিল পাদ্রী–সন্ন্যাসীদের বিশেষ বৈশিষ্ট তা–ই এখন তাদের পদতলে লুটিয়ে পড়লো। যে জিনিস বিশেষ ভাবে এ অধপতনের কারণ হয় তা ছিল সন্ন্যাসীদের অস্বাভাবিক আধ্যাত্মিক সাধনা ও প্রবৃত্তি দমনের চরম প্রচেষ্টা দেখে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে চরম ভক্তি–শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়েছিলো তাতে বহু দুনিয়াদার লোক দরবেশের পোশাক পরে পাদ্রী–সন্ন্যাসীদের দলে অন্তরভুক্ত হয়েছিলো। তারা পার্থিব স্বার্থ বর্জনের মুখোশ পরে দুনিয়া অর্জনের কারবার এমনভাবে জাঁকিয়ে বসেছিল যে, বড় বড় দুনিয়াদারও তাদের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়।

সাত ঃ সতীত্বের ক্ষেত্রেও বৈরাগ্যবাদ প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে বারবার পরাজয় বরণ করেছে আর সে পরাজয়ও বরণ করতে হয়েছে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে। খানকাসমূহে প্রবৃত্তি দমনের এমন কিছু অনুশীলনও ছিল, যে ক্ষেত্রে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা মিলে একই জায়গায় থাকতো এবং কোন কোন সময় কিছুটা কঠিন অনুশীলনের জন্য একই বিছানায় রাত কাটাতো। বিখ্যাত দরবেশ সেন্ট ইভাগ্রিয়াস (Evagrius) অত্যন্ত প্রশংসামুখর হয়ে ফিলিস্তিনের কিছু সংখ্যক সন্ন্যাসী–দরবেশের আত্ম সংযমের উল্লেখ করে বলেছেনঃ "তারা তাদের আবেগ অনুভূতিকে এতটা কাবু করতে সক্ষম হয়েছিল যে, নারীদের সাথে এক জায়গায় গোসল করতো কিন্তু তাদেরকে দেখে, তাদের স্পর্শ পেয়ে এমনকি তাদের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েও তাদের প্রবৃত্তি সাড়া দিতো না।" বৈরাগ্যবাদের দৃষ্টিতে গোসল যদিও অত্যন্ত অপছন্দনীয় ব্যাপার ছিল। কিন্তু প্রবৃত্তি দমনের উদ্দেশ্যে এ ধরনের গোসলও করা হতো। শেষ পর্যন্ত এ ফিলিস্তিন সম্পর্কেই নাইসার (Nyssa) সেন্ট গ্রেগরী যিনি ৩৯৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন—লিখেছেন যে, ফিলিস্তিন অসৎ ও দুশ্চরিত্রের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। যারা মানব–প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে মানব–প্রকৃতি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ক্ষান্ত হয় না। বৈরাগ্যবাদ এর বিরুদ্ধে লড়াই করে অবশেষে লাম্পট্যের যে গহ্বরে পতিত হয়েছে তার কাহিনী খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের ধর্মীয় ইতিহাসের একটি কুৎসিত কলঙ্ক। দশম শতাব্দীর একজন ইতালীয় বিশপ লিখছেন ঃ চার্চে ধর্মীয় দায়িত্ব পালনকারীদের বিরুদ্ধে যদি লাম্পট্য ও চরিত্রহীনতার শাস্তিমূলক আইন কার্যকর করা হয় তাহলে চার্চের কাজে নিয়োজিত লোকদের মধ্যে কেবল বালকরা ছাড়া আর কেউ তা থেকে রক্ষা পাবে না। আর যদি অবৈধ সন্তানদেরকেও ধর্মীয় কাজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার নিয়ম চালু করা হয় তাহলে হয়তো চার্চের কাজে নিয়োজিত কোন বালকই সেখানে থাকতে পারবে না। মধ্য যুগের লেখকদের গ্রন্থসমূহ এ ধরনের অভিযোগ ও কাহিনীতে ভরা যে, সন্ন্যাসিনীদের খানকাসমূহ চরিত্রহীনতার আখড়া তথা বেশ্যালয়ে পরিণত হয়েছে, চতুর্দেয়ালের মধ্যে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ
رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٨﴾
لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ
الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রসূল (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর ঈমান আনো।[৫৫] তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে দ্বিগুণ রহমত দান করবেন, তোমাদেরকে সেই জ্যোতি দান করবেন যার সাহায্যে তোমরা পথ চলবে[৫৬] এবং তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করে দেবেন।[৫৭] আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (তোমাদের এ নীতি অবলম্বন করা উচিত) যাতে কিতাবধারীরা জানতে পারে যে, আল্লাহর অনুগ্রহের ওপর তাদের একচেটিয়া অধিকার নেই, বরং আল্লাহর অনুগ্রহ নিরংকুশভাবে আল্লাহরই হাতে নিবদ্ধ। তিনি যাকে চান তা দেন। তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল।

নবজাতক শিশুদের গণহত্যা চলছে, পাদ্রী এবং চার্চের ধর্মীয় কাজ সম্পাদনকারী কর্মীদের মধ্যে "মুহরেম" বা যেসব নারীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম তাদের সাথে পর্যন্ত অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন ও খানকাসমূহে সমকামিতার অপরাধ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে এবং গীর্জাসমূহে পাপ স্বীকারের (Confession) অনুষ্ঠান দুষ্কর্ম ও চরিত্রহীনতার সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কুরআন মজীদ এখানে বৈরাগ্যবাদরূপী বিদআত আবিষ্কার করা এবং পরে তা যথার্থভাবে মেনে চলতে না পারার কথা বলে খৃষ্টান ধর্মের কোন্ বিকৃতির প্রতি ইংগিত করছে বিস্তারিত এসব বর্ণনা থেকে তা সঠিকভাবে অনুমান করা যেতে পারে।

৫৫. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল মুফাসসির বলেনঃ এখানে يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا কথাটি দ্বারা যারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর ঈমান এনেছিলো তাদের সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের বলা হচ্ছে, এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনো। এজন্য তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেয়া হবে। একটি পুরস্কার দেয়া হবে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর ঈমান আনার জন্য এবং আরেকটি পুরস্কার দেয়া হবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনার জন্য। অপর দল বলেন, যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান এনেছে এখানে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের বলা হচ্ছে, তোমরা শুধু মৌখিকভাবে তার নবুওয়াতকে স্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়ো না, বরং সরল মনে নিষ্ঠার সাথে ঈমান গ্রহণ করো এবং ঈমান গ্রহণের হক

আদায় করো। এভাবে তোমরা দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে। একটি পুরস্কার কুফরী ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণের জন্য এবং আরেকটি পুরস্কার নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা সহ ইসলামের খেদমত করার ও তার ওপর দৃঢ়পদ থাকার জন্য। সূরা কাসাসের ৫২ থেকে ৫৪ পর্যন্ত আয়াত প্রথম তাফসীরের সমর্থন করে। তাছাড়া হযরত আবু মূসা আশআরী বর্ণিত হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীসটিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তিন ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। উক্ত তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন হচ্ছে

رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنَ بِنَبِيِّهٖ وَ اٰمَنَ بِمُحَمَّدٍ

"আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে সে ব্যক্তি যে পূর্ববর্তী নবীর প্রতি ঈমান পোষণ করতো এবং পরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর ওপর ঈমান এনেছে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

সূরা সাবার ৩৭ আয়াত দ্বিতীয় তাফসীরের সমর্থন করে যাতে বলা হয়েছে; সৎকর্মশীল ঈমানদারদের জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। দলীল–প্রমাণের দিক দিয়ে দু'টি তাফসীরই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পরবর্তী বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে বুঝা যায় যে, এখানে দ্বিতীয় তাফসীরটিই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এ সূরার বিষয়বস্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ তাফসীরকেই সমর্থন করে। যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতকে স্বীকার করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এ সূরার শুরু থেকে সেসব লোককেই সম্বোধন করা হয়েছে। গোটা সূরায় তাদেরকেই সম্বোধন করে এ আহবান জানানো হয়েছে যে, তারা যেন শুধু মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দান করে ঈমানদার না হয়, বরং নিষ্ঠার সাথে সরল মনে ঈমান গ্রহণ করে।

৫৬. অর্থাৎ পৃথিবীতে জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির এমন 'নূর' দান করবেন যার আলোতে তোমরা প্রতি পদক্ষেপে স্পষ্ট দেখতে পাবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের বাঁকা পথ–সমূহের মধ্যে ইসলামের সরল সোজা পথ কোন্‌টি। আর আখেরাতে এমন 'নূর' দান করবেন যার উল্লেখ ১২ আয়াতে পূর্বেই করা হয়েছে।

৫৭. অর্থাৎ ঈমানের দাবী পূরণের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মানবিক দূর্বলতার কারণে তোমাদের দ্বারা যে ভুল ত্রুটিই সংঘটিত হোক না কেন তিনি তা ক্ষমা করে দেবেন। আর ঈমান গ্রহণের পূর্বে জাহেলিয়াতের সময় তোমাদের দ্বারা যেসব ভুল–ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে তাও ক্ষমা করে দেবেন।

আল মুজাদালাহ

৫৮

নামকরণ

المجادلة এবং المجادلة উভয়টিই এ সূরার নাম। নামটি প্রথম আয়াতের تُجَادِلُكَ শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। সূরার প্রারম্ভেই যেহেতু সে মহিলার কথা উল্লেখ আছে, যে তার স্বামীর 'যিহারে'র ঘটনা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পেশ করে পীড়াপীড়ি করেছিল যে, তিনি যেন এমন কোন উপায় বলে দেন যাতে তার এবং তার সন্তানদের জীবন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। আল্লাহ তা'আলা তার এ পীড়াপীড়িকে مجادلة শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। তাই এ শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। শব্দটিকে যদি مجادلة পড়া হয় তাহলে তার অর্থ হবে "আলোচনা ও যুক্তি তর্ক" আর যদি مجادلة পড়া হয় তাহলে অর্থ হবে "আলোচনা ও যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকারিনী।"

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

মুজাদালার এ ঘটনাটি কখন সংঘটিত হয়েছিল তা কোন রেওয়ায়াতেই স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়নি। কিন্তু এ সূরার বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন একটি ইংগিত আছে যার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করে বলা যায় যে, এ সূরা আহযাব যুদ্ধের (৫ম হিজরীর শাওয়াল মাস) পরে নাযিল হয়েছে। পালিত পুত্র যে প্রকৃতই পুত্র হয় না সে বিষয়ে বলতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা সূরা আহযাবে যিহার সম্পর্কে শুধু এতটুকু বলেছিলেন ঃ

وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ

"তোমরা যেসব স্ত্রীর সাথে যিহার করো আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের মা বানিয়ে দেননি।" (আল আহযাব ঃ ৪)

কিন্তু যিহার করা যে, একটি গোনাহ বা অপরাধ সেখানে তা বলা হয়নি। এ কাজের শরয়ী বিধান কি সেখানে তাও বলা হয়নি। পক্ষান্তরে এ সূরায় যিহারের সমস্ত বিধি-বিধান বলে দেয়া হয়েছে। এতে বুঝা যায় বিস্তারিত এ হুকুম আহকাম ঐ সংক্ষিপ্ত হিদায়াতের পরেই নাযিল হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

সেসময় মুসলমানগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এ সূরায় সেসব সমস্যা সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সূরার শুরু থেকে ৬ নং আয়াত পর্যন্ত যিহারের শরয়ী

হুকুম আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। সে সাথে মুসলমানদের কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণ করার পরে জাহেলী রীতিনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ লংঘন করা অথবা তা মেনে চলতে অস্বীকার করা অথবা তার পরিবর্তে নিজের ইচ্ছা মাফিক অন্য নিয়ম নীতি ও আইন কানুন তৈরী করে নেয়া ঈমানের চরম পরিপন্থী কাজ ও আচরণ। এর শাস্তি হচ্ছে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা। এ ব্যাপারে আখেরাতেও কঠোর জবাবদিহি করতে হবে।

৭ থেকে ১০ আয়াতে মুনাফিকদের আচরণের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। তারা পরস্পর গোপন সলা পরামর্শ করে নানারূপ ক্ষতি সাধনের পরিকল্পনা করতো। তাদের মনে যে গোপন হিংসা বিদ্বেষ ছিল তার কারণে তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইহুদীদের মত এমন কায়দায় সালাম দিতো যা দ্বারা দোয়ার পরিবর্তে বদ দোয়া প্রকাশ পেতো। এ ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে এই বলে সান্তনা দেয়া হয়েছে যে, মুনাফিকদের ঐ সলা পরামর্শ তোমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করে নিজেদের কাজ করতে থাক। সাথে সাথে তাদেরকে এই নৈতিক শিক্ষাও দেয়া হয়েছে যে, গোনাহ জুলুম বাড়াবাড়ি এবং নাফরমানির কাজে সলা পরামর্শ করা ঈমানদারদের কাজ নয়। তারা গোপনে বসে কোন কিছু করলে তা নেকী ও পরহেজগারীর কাজ হওয়া উচিত।

১১ থেকে ১৩ আয়াতে মুসলমানদের কিছু মজলিসী সভ্যতা ও বৈঠকী আদব-কায়দা শেখানো হয়েছে। তাছাড়া এমন কিছু সামাজিক দোষ-ত্রুটি দূর করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যা মানুষের মধ্যে আগেও ছিল এবং এখনো আছে। কোন মজলিসে যদি বহু সংখ্যক লোক বসে থাকে এমতাবস্থায় যদি বাইরে থেকে কিছু লোক আসে তাহলে মজলিসে পূর্ব থেকে বসে থাকা ব্যক্তিগণ নিজেরা কিছুটা গুটিয়ে বসে তাদের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার কষ্টটুকু স্বীকার করতেও রাজি হয় না। ফলে পরে আগমনকারীগণ দাঁড়িয়ে থাকেন, অথবা দহলিজে বসতে বাধ্য হয় অথবা ফিরে চলে যায় অথবা মজলিসে এখনো যথেষ্ট স্থান আছে দেখে উপস্থিত লোকজনকে ডিঙ্গিয়ে ভিতরে চলে আসেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে প্রায়ই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো। তাই আল্লাহ তা'আলা সবাইকে হিদায়াত বা নির্দেশনা দিয়েছেন যে, মজলিসে আত্মস্বার্থ এবং সংকীর্ণ মনের পরিচয় দিও না। বরং খোলা মনে পরবর্তী আগমনকারীদের জন্য স্থান করে দাও।

অনুরূপ আরো একটি ত্রুটি মানুষের মধ্যে দেখা যায়। কেউ করো কাছে গেলে বিশেষ করে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কাছে গেলে জেঁকে বসে থাকে এবং এদিকে মোটেই লক্ষ করে না যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় নেয়া তার কষ্টের কারণ হবে। তিনি যদি বলেন, জনাব এখন যান তাহলে সে খারাপ মনে করবে। তাকে ছেড়ে উঠে গেলে অভদ্র আচরণের অভিযোগ করবে। ইশারা ইংগিতে যদি বুঝাতে চান যে, অন্য কিছু জরুরী কাজের জন্য তার এখন কিছু সময় পাওয়া দরকার তাহলে শুনেও শুনবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও মানুষের এ আচরণের সম্মুখীন হতেন আর তাঁর সাহচর্য থেকে উপকৃত হওয়ার আকাঙ্খায় আল্লাহর বান্দারা মোটেই খেয়াল করতেন না যে, তারা অতি মূল্যবান কাজের সময় নষ্ট করছেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ কষ্টদায়ক বদঅভ্যাস

পরিত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দিলেন যে, যখন বৈঠক শেষ করার জন্য উঠে যাওয়ার কথা বলা হবে তখন উঠে চলে যাবে।

মানুষের মধ্যে আরো একটি বদঅভ্যাস ছিল। তা হচ্ছে, কেউ হয়তো নবীর (সা) সাথে অযথা নির্জনে কথা বলতে চাইতো অথবা বড় মজলিসে তাঁর নিকটে গিয়ে গোপনীয় কথা বলার ঢংয়ে কথা বলতে চাইতো। এটি নবীর (সা) জন্য যেমন কষ্টদায়ক ছিল তেমনি মজলিসে উপস্থিত লোকজনের কাছে অপছন্দনীয় ছিল। তাই যে ব্যক্তিই নির্জনে একাকী তাঁর সাথে কথা বলতে চায় , আল্লাহ তা'আলা তার জন্য কথা বলার আগে সাদকা দেয়া বাধ্যতামূলক করে দিলেন। লোকজনকে তাদের এ বদঅভ্যাস সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। যাতে তারা এ বদঅভ্যাস পরিত্যাগ করে।

সুতরাং এ বাধ্যবাধকতা মাত্র অল্প কিছু দিন কার্যকর রাখা হয়েছিল। মানুষ তাদের কার্যধারা ও অভ্যাস সংশোধন করে নিলে এ নির্দেশ বাতিল করে দেয়া হলো।

মুসলিম সমাজের মানুষের মধ্যে নিস্বার্থ ঈমানদার, মুনাফিক এবং দোদুল্যমান তথা সিদ্ধান্তহীনতার রোগে আক্রান্ত মানুষ সবাই মিলে মিশে একাকার হয়েছিল। তাই কারো সত্যিকার ও নিস্বার্থ ঈমানদার হওয়ার মানদণ্ড কি তা ১৪ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত তা স্পষ্টভাষায় বলে দেয়া হয়েছে। এক শ্রেণীর মুসলমান ইসলামের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে, সে যে দীনের ওপর ঈমান আনার দাবী করে নিজের স্বার্থের খাতিরে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতেও দ্বিধাবোধ করে না এবং ইসলামের বিরুদ্ধে নানারকম সন্দেহ-সংশয় এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর পথে আসতে বাধা দেয়। তবে যেহেতু তারা মুসলমানদের দলে অন্তরভুক্ত তাই ঈমান গ্রহণের মিথ্যা স্বীকৃতি তাদের জন্য ঢালের কাজ করে। আরেক শ্রেণীর মুসলমান তাদের দীনের ব্যাপারে অন্য কারো পরোয়া করা তো দূরের কথা নিজের বাপ, ভাই, সন্তান-সন্ততি এবং গোষ্ঠীকে পর্যন্ত পরোয়া করে না। তাদের অবস্থা হলো, যে আল্লাহ, রসূল এবং তার দীনের শত্রু তার জন্য তার মনে কোন ভালবাসা নেই। এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, প্রথম শ্রেণীর এই মুসলমানরা যতই শপথ করে তাদের মুসলমান হওয়ার নিশ্চয়তা দিক না কেন প্রকৃতপক্ষে তারা শয়তানের দলের লোক। সুতরাং শুধু দ্বিতীয় প্রকার মুসলমানগণই আল্লাহর দলে অন্তরভুক্ত হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে। তারাই খাঁটি মুসলমান। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই লাভ করবে সফলতা।

আয়াত ২২ | সূরা আল মুজাদালাহ—মাদানী | রুকূ' ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ
اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ۝١ اَلَّذِيْنَ
يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ۭ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰۗئِيْ
وَلَدْنَهُمْ ۭ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ
لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝١

আল্লাহ অবশ্যই সে মহিলার কথা শুনেছেন[১] যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার কাছে কাকুতি মিনতি করেছে এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ করছে। আল্লাহ তোমাদের দু'জনের কথা শুনছেন[২] তিনি সবকিছু শুনে ও দেখে থাকেন।

তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে "যিহার" করে[৩] তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। তাদের মা কেবল তারাই যারা তাদেরকে প্রসব করেছে।[৪] এসব লোক একটা অতি অপছন্দনীয় ও মিথ্যা কথাই বলে থাকে।[৫] প্রকৃত ব্যাপার হলো, আল্লাহ মাফ করেন, তিনি অতীব ক্ষমাশীল।[৬]

১. এখানে শোনা অর্থ শুধুমাত্র শোনা নয়, বরং বিপদে সাহায্য করা। যেমন, আমরা সাধারণভাবে বলি, আল্লাহ দোয়া শুনেছেন। এর অর্থ আল্লাহ দোয়া কবুল করেছেন।

২. অনুবাদকগণ সাধারণভাবে এ স্থানে অনুবাদ করেছেন, মহিলা ঝগড়া করছিল, অভিযোগ করছিল। আর এ অনুবাদ পড়ে পাঠক এ অর্থ গ্রহণ করে যে, মহিলাটি তার অভিযোগ পেশ করে হয়তো চলে গিয়েছিল এবং পরে কোন এক সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল হয়েছিল। তাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি সে মহিলার কথা শুনেছি, যে তোমার কাছে অনুনয় বিনয় ও ফরিয়াদ করছিল। সে সময় আমি তোমাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনছিলাম। কিন্তু এ ঘটনা সম্পর্কে হাদীসসমূহে যেসব বর্ণনা আছে তার অধিকাংশ বর্ণনাতেই বলা হয়েছে, যে

সময় সেই মহিলা তার স্বামীর "যিহারের" ঘটনা শুনিয়ে নবীর (সা) কাছে বারবার এ বলে আবেদন করছিল যে, তাদের মধ্যে যদি বিচ্ছেদ হয়ে যায় তাহলে সে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে এবং তার সন্তান-সন্ততি ধ্বংস হয়ে যাবে। ঠিক এ সময়েই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল হওয়ার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠলো এবং এ আয়াতগুলো নাযিল হলো। এ কারণে আমরা বর্তমান কাল বোধক শব্দ দিয়ে এর অনুবাদ করেছি।

যে মহিলা সম্পর্কে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল তিনি ছিলেন খাযরাজ গোত্রের খাওলা বিনতে সা'লাবা। তাঁর স্বামী ছিলেন আওস গোত্রের নেতা আওস ইবনে সামেত আনসারীর ভাই। তাঁর যিহারের ঘটনা আমরা পরে সবিস্তারে বর্ণনা করবো। এখানে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, আল্লাহর দরবারে এ সাহাবিয়ার অভিযোগ গৃহীত হওয়া এবং আল্লাহর তরফ থেকে সংগে সংগে তাঁর অভিযোগের প্রতিকার করে নির্দেশ নাযিল হওয়া ছিল এমন একটি ঘটনা যার কারণে সাহাবা কিরামের মধ্যে তিনি বিশেষ একটি সম্মান ও মর্যাদার স্থান লাভ করেছিলেন। ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত 'উমর (রা) কিছুসংখ্যক সংগী-সাথীর সাথে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে এক মহিলার সাথে দেখা হলে সে তাঁকে থামতে বললে তিনি সংগে সংগে থেমে গেলেন। মাথা নিচু করে দীর্ঘ সময় তার কথা শুনলেন এবং সে নিজে কথা শেষ না করা পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন। সংগীদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন, এ বুড়ীর জন্য আপনি কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে এত সময় থামিয়ে রেখেছেন কেন? তিনি বললেন ঃ সে কে তা কি জান? এ যে, খাওলা বিনতে সা'লাবা। এ তো সে মহিলা, সাত আসমানের ওপরে যার অভিযোগ গৃহীত হয়েছে। আল্লাহর কসম, তিনি যদি আমাকে সারা রাত দাঁড় করিয়ে রাখতেন তাহলে আমি সারা রাতই দাঁড়িয়ে থাকতাম। শুধু নামাযের সময় ওজর পেশ করতাম। ইবনে আব্দুল বার তাঁর 'ইসতিয়াব' গ্রন্থে কাতাদার একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, রাস্তায় হযরত 'উমরের (রা) সাথে এ মহিলার সাক্ষাত হলে তিনি তাঁকে সালাম দিলেন। সালামের জবাব দেয়ার পর তিনি বলতে থাকলেন ঃ "ওহ্ উমর এমন এক সময় ছিল যখন আমি তোমাকে "উকাযের" বাজারে দেখেছিলাম। তখন তোমাকে উমায়ের বলে ডাকা হতো। তখন তুমি লাঠি হাতে নিয়ে বকরী চরিয়ে বেড়াতে। এর অল্প দিন পর তোমাকে 'উমর' নামে ডাকা হতে থাকলো। অতপর এমন এক সময় আসলো যখন তোমাকে 'আমীরুল মু'মিনীন' বলে সম্বোধন করা শুরু হলো। প্রজাদের ব্যাপারে অন্তত কিছুটা আল্লাহকে ভয় করো। মনে রেখো, যে আল্লাহর আযাব সম্পর্কিত সাবধানবাণীকে ভয় পায় দূরের মানুষও তাঁর নিকটাত্মীয়ের মত হয়ে যায়। আর যে মৃত্যুকে ভয় পায় তার ব্যাপারে আশংকা হয় যে, সে এমন জিনিসও হারিয়ে ফেলবে যা সে রক্ষা করতে চায়।" হযরত উমরের (রা) সাথে ছিলেন জারুদ আবদী। একথা শুনে তিনি বললেন ঃ হে নারী, তুমি আমীরুল মু'মিনের সাথে অনেক বে-আদবী করেছো। হযরত 'উমর বললেন ঃ তাকে বলতে দাও। তুমি কি জান সে কে? তাঁর কথা তো সাত আসমানের ওপরে গৃহীত হয়েছিল। 'উমরকে (রা) তো তাঁর কথা শুনতেই হবে।' ইমাম বুখারীও (র) তাঁর লিখিত ইতিহাস গ্রন্থে সংক্ষেপে এ ঘটনার প্রায় অনুরূপ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন।

৩. আরবে অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটতো যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হলে স্বামী ক্রোধান্বিত হয়ে বলতো أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي এর আভিধানিক অর্থ হলো, "তুমি আমার জন্য ঠিক আমার মায়ের পিঠের মত" কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, আমার তোমার সাথে সহবাস ঠিক আমার মায়ের সাথে সহবাস করার মত। এযুগেও বহু নির্বোধ মানুষ স্ত্রীর সাথে ঝগড়া বিবাদ করে তাদের মা, বোন ও মেয়ের মত বলে ফেলে। এর স্পষ্ট অর্থ দাঁড়ায় স্বামী এখন আর তাকে স্ত্রী মনে করে না, বরং যেসব স্ত্রীলোক তার জন্য হারাম তাদের মত মনে করে। এরূপ করাকেই "যিহার" বলা হয়। ظهر আরবী ভাষায় রূপক অর্থে বাহনকে বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ সওয়ারী জন্তুকে ظهر বলা হয়। কেননা, মানুষ তার পিঠে আরোহণ করে। মানুষ যেহেতু স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করে নেয়ার উদ্দেশ্যে বলতো যে, তোমাকে ظهر বানানো আমার জন্য আমার মাকে ظهر বানানোর মতই হারাম। সুতরাং তাদের মুখ থেকে এসব কথা উচ্চারণ করাকেই তাদের ভাষায় 'যিহার' বলা হতো। জাহেলী যুগে আরবদের কাছে এটা তালাক বা তার চেয়ে অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা বলে মনে করা হতো। কারণ, তাদের দৃষ্টিতে এর অর্থ ছিল এই যে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্কই ছিন্ন করছে না বরং তাকে নিজের মায়ের মত হারাম করে নিচ্ছে। এ কারণে আরবদের মতে তালাক দেয়ার পর তা প্রত্যাহার করা যেতো। কিন্তু "যিহার" প্রত্যাহার করার কোন সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকতো না।

৪. এটা যিহার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার প্রথম ফায়সালা। এর অর্থ হলো, কেউ যদি মুখ ফুটে স্ত্রীকে মায়ের মত বলে বসে তাহলে তার বলার কারণে স্ত্রী তার মা হতে পারে না। কোন মহিলার কারো মা হওয়া একটা সত্য ও বাস্তব ব্যাপার। কারণ, সে তাকে প্রসব করেছে। এ কারণে সে স্থায়ীভাবে হারাম হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু যে নারী তাকে প্রসব করেনি, শুধু মৌখিক কথাতেই সে কিভাবে তার মা হয়ে যাবে? বুদ্ধি-বিবেক, নৈতিকতা এবং আইন কানুন যে কোন বিচারেই হোক সে কিভাবে প্রকৃত প্রসবকারিনী মায়ের মত হারাম হবে? আল্লাহ তা'আলা এভাবে এ কথাটি ঘোষণা করে সেসব জাহেলী আইন-কানুনকে বাতিল করে দিয়েছেন যার ভিত্তিতে যিহারকারী স্বামীর সাথে তার স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেতো এবং স্ত্রীকে স্বামীর জন্য মায়ের মত অলংঘনীয় হারাম মনে করা হতো।

৫. অর্থাৎ স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করা প্রথমত এমন একটি অর্থহীন ও লজ্জাজনক কথা যা মুখে উচ্চারণ করা তো দূরের কথা কোন শরীফ মানুষের যার কল্পনাও করা উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, এটি একটি মিথ্যা কথাও বটে। কারণ, যে এরূপ কথা বলছে সে যদি এর দ্বারা বুঝিয়ে থাকে যে, তার স্ত্রী এখন তার মা হয়ে গিয়েছে তাহলে সে মিথ্যা বলছে। আর সে যদি এ একথাটি তার সিদ্ধান্ত হিসেবে শুনিয়ে থাকে যে, আজ থেকে সে তার স্ত্রীকে মায়ের মর্যাদা দান করেছে তাহলেও তার এ দাবী মিথ্যা। কারণ, আল্লাহ তাকে অধিকার দেননি যে, যতদিন ইচ্ছা সে একজন নারীকে স্ত্রী হিসেবে রাখবে এবং যখন ইচ্ছা তাকে মায়ের মর্যাদা দান করবে। সে নিজে আইন রচয়িতা নয় বরং আইন রচয়িতা হলেন আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা প্রসবকারিনী মায়ের সাথে দাদী, নানী, শাশুড়ী, দুধমা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণকেও মাতৃত্বের মর্যাদা দান করেছেন।

وَالَّذِينَ يُظٰهِرُونَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ۝

যারা[৭] নিজের স্ত্রীর সাথে "যিহার" করে বসে এবং তারপর নিজের বলা সে কথা প্রত্যাহার করে[৮] এমতাবস্থায় তারা পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি ক্রীতদাসকে মুক্ত করতে হবে। এর দ্বারা তোমাদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে।[৯] তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।[১০]

নিজের স্ত্রীকে তো দূরের কথা নিজের পক্ষ থেকে অন্য কোন নারীকেও এ মর্যাদার অন্তরভুক্ত করার অধিকার কারোই নেই। একথা থেকে আরো একটি আইনগত বিধান যা পাওয়া যায় তাহলো, 'যিহার' করা একটি গুরুতর গোনাহ এবং হারাম কাজ। যে এ কাজ করবে সে শাস্তির উপযুক্ত।

৬. অর্থাৎ এটি এমন একটি কাজ যে জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কঠিন শাস্তি পাওয়া উচিত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার মেহেরবাণী যে, তিনি প্রথমত যিহারের ব্যাপারে জাহেলী আইন-কানুন বাতিল করে তোমাদের পারিবারিক জীবনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। দ্বিতীয়ত এ অপরাধে অপরাধী ব্যক্তির জন্য সর্বাধিক লঘু শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। তার সবচেয়ে বড় মেহেরবানী এই যে, জেল খাটা বা মারপিট অকারে এ অপরাধের শাস্তি বিধান করেননি। বরং এমন কিছু ইবাদাত ও নেকীর কাজকে এ অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত করেছেন যা তোমাদের প্রবৃত্তির সংশোধন করে এবং সমাজে কল্যাণ ও সুকৃতির বিস্তার ঘটায়। এ ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও বুঝা উচিত যে, কোন কোন অপরাধ ও গোনাহর জন্য যেসব ইবাদাতকে কাফ্ফারা নির্ধারণ করা হয়েছে তা ইবাদাতের চেতনাবিহীন নিরেট শাস্তি নয়। আবার নিছক এমন ইবাদাতও নয় যে, তার মধ্যে শাস্তির কষ্টকর কোন দিক আদৌ নেই। এর মধ্যে ইবাদাত ও শাস্তি উভয়টিই একত্রিত করা হয়েছে, যাতে ব্যক্তি যুগপত কষ্টও ভোগ করে এবং সাথে সাথে একটি ইবাদাত ও নেকীর কাজ করে তার কৃত গোনাহরও প্রতিকার করে।

৭. এখান থেকে যিহারের আইনগত আদেশ নিষেধ শুরু হয়েছে। এসব বিধি-বিধান সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যুগে যিহারের যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তা সামনে থাকা জরুরী। কেননা, যিহারের বিধি-বিধান সম্পর্কিত এসব আয়াত নাযিল হওয়ার পর সংঘটিত ঘটনাসমূহের ক্ষেত্রে নবী (সা) যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তা থেকেই ইসলামে যিহার সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধি-বিধান গৃহীত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুসারে আওস ইবনে সামেত আনসারীর ঘটনাই ইসলামে যিহার সম্পর্কিত সর্ব প্রথম ঘটনা। তাঁর স্ত্রী খাওলার ফরিয়াদের জওয়াবে

আল্লাহ তা'আলা এসব আয়াত নাযিল করেছেন। বিভিন্ন বর্ণনাকারীর নিকট থেকে মুহাদ্দিসগণ এ ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন তাতে অনেক খুঁটি নাটি মতভেদ আছে। তবে আইনগত গুরুত্ব বহন করে এরূপ উপাদান সম্পর্কে সবাই প্রায় একমত। এসব বর্ণনার সার কথা হলো, বৃদ্ধাবস্থায় হযরত আওস ইবনে সামেত কিছুটা খিটমিটে মেজাজের হয়ে গিয়েছিলেন। কোন কোন বর্ণনা অনুসারে তার মধ্যে কতকটা পাগলামী ভাব সৃষ্টি হয়েছিল। এ বিষয়টা বুঝানোর জন্য বর্ণনাকারীগণ كان به لمم বাক্য ব্যবহার করেছেন। আরবী ভাষায় لمم শব্দ দ্বারা পাগলামী বুঝানো হয় না, বরং এমন একটি অবস্থাকে বুঝানো হয় যাকে আমরা বাংলায় "ক্রোধে পাগল হয়ে যাওয়া" কথাটি দ্বারা বুঝিয়ে থাকি। এ অবস্থায় তিনি পূর্বেও কয়েকবার স্ত্রীর সাথে যিহার করেছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর সাথে ঝগড়া বিবাদ করে তার দ্বারা পুনরায় এ ঘটনা সংঘটিত হওয়া ছিল ইসলামে সর্ব প্রথম ঘটনা। এ ঘটনার পর তাঁর স্ত্রী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির হয় এবং পূরা ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন, হে আল্লাহর রসূল, আমার এবং আমার সন্তানাদির জীবনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার কোন অবকাশ আছে কি? নবী (সা) এর যে জওয়াব দিয়েছিলেন বিভিন্ন বর্ণনাকারী তা বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে উদ্ধৃত করেছেন। কোন কোন বর্ণনার ভাষা হলো, "এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত আমাকে কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি।" কোন কোন বর্ণনার ভাষা হলো, "আমার ধারণা, তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছো।" আবার কোন কোন বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, "তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছো।" এ জবাব শুনে তিনি কাকুতি ও আহাজারি করতে শুরু করলেন। তিনি বারবার নবীকে (সা) বললেন ঃ সে তো তালাকের শব্দ বলেনি। আপনি এমন কোন পন্থা বলুন যার দ্বারা আমি আমার সন্তানাদি এবং বুড়ো স্বামীর জীবন ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু নবী (সা) প্রতিবার তাকে একই জবাব দিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে নবীর (সা) ওপর অহী নাযিল হওয়ার অবস্থা দেখা দিল এবং এ আয়াতগুলো নাযিল হলো। এরপর তিনি তাকে বললেন, কোন কোন বর্ণনা অনুসারে তার স্বামীকে ডেকে বললেন ঃ একটি ক্রীতদাসকে মুক্ত করতে হবে। সে এতে তার অক্ষমতা প্রকাশ করলে বললেন ঃ লাগাতার দুই মাস রোযা রাখতে হবে। সে বললো তার অবস্থা এমন যে, দিনে তিনবার পানাহার না করলে তার দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণতর হতে থাকে। তিনি বললেন ঃ তাহলে ৬০ জন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াতে হবে। সে বললো তার সে সামর্থ নেই। তবে আপনি যদি সাহায্য করেন তাহলে পারবো। তিনি তাকে ৬০ জন মিসকীনকে দু'বার খাওয়ানোর মত খাদ্য দিলেন। বিভিন্ন রেওয়ায়াতে প্রদত্ত এ খাদ্যের বিভিন্ন পরিমাণ বর্ণনা করা হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় আছে, নবী (সা) যে পরিমাণ খাদ্য দিয়েছিলেন হযরত খাওলা নিজেও তার স্বামীকে সে পরিমাণ খাদ্য দিয়েছিলেন যাতে তিনি কাফ্ফারা আদায় করতে পারেন (ইবনে জারীর, মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে আবী হাতেম)।

যিহারের দ্বিতীয় ঘটনা ছিল সালামা ইবনে সাখার বায়াদীর ঘটনা। তাঁর যৌন শক্তি ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে কিছু বেশী। রমযান মাস আসলে সে এই আশংকায় রমযানের শেষ অবধি সময়ের জন্য স্ত্রীর সাথে যিহার করলো যাতে রোযা অবস্থায় দিনের বেলায় অধৈর্যের কাজ করে না বসে। কিন্তু সে নিজের এ সংকল্প রক্ষা করতে পারেনি। এক রাতে সে স্ত্রীর কাছে চলে যায় এবং তারপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সব কিছু খুলে বলে। তিনি বললেন, একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করো। সে

বললো, আমার কাছে আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই যাকে আমি মুক্ত করতে পারি। তিনি বললেন, একাধারে দুই মাস রোযা রাখো। সে বললো, রোযা অবস্থায় অধৈর্য হয়েই তো আমি এ মসিবতে জড়িয়ে পড়েছি। নবী (সা) বললেন, তাহলে ৬০ জন মিসকীনকে খেতে দাও। সে বললো, আমি এত দরিদ্র যে, উপোস করে রাত কাটিয়েছি। তখন নবী (সা) বনী যুরাইকের যাকাত আদায়কারীর নিকট থেকে তাকে এতটা খাদ্য দিলেন যাতে সে তা ৬০ জন মিসকীনকে বন্টন করে দিতে পারে এবং নিজের সন্তানাদির প্রয়োজন পূরণ করার জন্যও কিছু রাখতে পারে। (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

নাম উল্লেখ না করে তৃতীয় ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করলো এবং কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বেই তার সাথে সহবাস করলো। পরে নবী (সা) এর কাছে এ বিষয়ের সমাধান জানতে চাইলে তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন কাফ্ফারা আদায় না করা পর্যন্ত স্ত্রীর নিকট থেকে দূরে থাকো। আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)।

চতুর্থ ঘটনাটি হলো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনলেন এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বোন সম্বোধন করে ডাকছে। এতে তিনি রাগান্বিতভাবে বললেন ঃ সে কি তোমার বোন? তবে এটিকে তিনি যিহার হিসেবে গণ্য করলেন না। (আবু দাউদ)

এ চারটি ঘটনার নির্ভরযোগ্য বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহে পাওয়া যায়। পরবর্তী আয়াতসমূহে কুরআন মজীদের 'যিহার' সম্পর্কিত যে নির্দেশ আছে এসব হাদীসের সাহায্যে তা ভালভাবে বুঝা যেতে পারে।

৮. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে, يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا । একথাটির শাব্দিক অনুবাদ হবে, "তারা যা বলেছে যদি সেদিকে ফিরে যায়" কিন্তু আরবী ভাষা ও বাকরীতি অনুসারে এর অর্থ নিরূপণে বড় রকমের মতভেদ হয়েছে।

এর একটি অর্থ হতে পারে, যিহারের শব্দাবলী একবার মুখ থেকে বের হওয়ার পর পুনরায় তা বলবে। জাহেরিয়া, বুকাইর ইবনুল আশাজ্জ এবং ইয়াহইয়া ইবনে যিহাদ আল ফার্‌রা এ অর্থের সমর্থক। আতা ইবনে আবী রাবাহর একটি মতও এর সমর্থন করে বলে বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের মতে একবার যিহার করলে তা ক্ষমার যোগ্য। তবে কেউ যদি বার বার তা করে তাহলে তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে। তবে দু'টি কারণে এ ব্যাখ্যা স্পষ্ট ভুল। একটি কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা যিহার অর্থহীন ও মিথ্যা কথা ঘোষণা করে তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। এখন একথা কি কল্পনা করা যায় যে, কেউ একবার মিথ্যা এবং অর্থহীন কথা বললে তা মাফ হবে কিন্তু দ্বিতীয়বার বললে শাস্তির উপযুক্ত হবে? এটি ভুল হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিহারকারী কোন লোককেই একথা জিজ্ঞেস করেননি যে, সে একবার যিহার করেছে না দুইবার।

এ আয়াতাংশের দ্বিতীয় অর্থ হলো, জাহেলী যুগে যেসব লোক এ কাজ করতে অভ্যস্ত ছিল তারা যদি ইসলামী যুগেও তা করে তাহলে এটা হবে তাদের শাস্তি। এক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, যিহার করা মূলত একটি শাস্তিযোগ্য কাজ। যে ব্যক্তিই তার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে মুখ থেকে যিহারের শব্দাবলী উচ্চারণ করবে সে পরে তার স্ত্রীকে তালাক দিক বা তার স্ত্রী মারা

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ
يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

যে মুক্ত করার জন্য কোন ক্রীতদাস পাবে না সে বিরতিহীনভাবে দুই মাস রোযা রাখবে—উভয়ে পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বেই। যে তাও পারবে না সে ষাট জন মিসকীনকে খাবার দেবে।[১১]

তোমাদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এ জন্য যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনো।[১২] এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত 'হদ'। কাফেরদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।[১৩]

যাক কিংবা সে তার স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক রক্ষা না করার সংকল্প করুক তাতে কিছু আসে যায় না। সর্বাবস্থায় তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে। ফকীহদের মধ্যে তাউস, মুজাহিদ, শা'বী, যুহরী, সুফিয়ান সাওরী এবং কাতাদা এমত পোষণ করেছেন। তাঁদের মতে, যিহার করার পর স্ত্রী যদি মারা যায় তাহলে কাফ্ফারা আদায় না করা পর্যন্ত স্বামী তার পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে না।

এ আয়াতাংশের তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, যিহারের শব্দাবলী মুখ থেকে উচ্চারণের পর ব্যক্তি যা বলেছে তা প্রত্যাহার করে এবং যদি তার প্রতিকার করতে চায়। অন্য কথায় عَادَ لِمَا قَالَ অর্থ সে যদি তার কথা থেকে ফিরে যায়।

এর চতুর্থ অর্থ হলো, যিহার করার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার জন্য যে জিনিস হারাম করে নিয়েছিল তা যদি আবার নিজের জন্য হালাল করে নিতে চায়। অন্য কথায় عَادَ لِمَا قَالَ এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি হারাম করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এখন সে পুনরায় তা হালাল করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অধিকাংশ ফিকাহবিদ শেষোক্ত দু'টি অর্থের মধ্যে যে কোন একটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

৯. অন্য কথায় তোমাদেরকে শিষ্ট ও ভদ্র আচরণ শিখানোর জন্য এ নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যাতে মুসলিম সমাজের মানুষ এ জাহেলী কু আচরণ পরিত্যাগ করে এবং তোমাদের মধ্য থেকে কেউই যেন এ অর্থহীন কাজ না করে। যদি স্ত্রীর সাথে বিবাদ না করে কোন উপায় না থাকে তাহলে সভ্য ও রুচিশীল মানুষের মত বিবাদ করো। যদি তালাকই দিতে হয় তাহলে সরাসরি তালাক দিয়ে দাও। স্ত্রীর সাথে বিবাদ হলে তাকে মা অথবা বোন বানিয়ে ছাড়তে হবে এটা কি ধরনের ভদ্রতা ?

১০. অর্থাৎ কেউ যদি বাড়িতে স্ত্রীর সাথে চুপে চুপে যিহার করে বসে এবং পরে কাফ্ফারা আদায় করা ছাড়াই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আগের মতই দাম্পত্য সম্পর্ক চলতে থাকে তাহলে সে সম্পর্কে দুনিয়াতে কেউ অবহিত থাক আর না থাক আল্লাহ সর্বাবস্থায়ই তা জানেন। তার জন্য আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়।

১১. এটি যিহার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ। মুসলিম ফিকাহবিদগণ এ আয়াতের শব্দাবলী, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিদ্ধান্তসমূহ এবং ইসলামের সাধারণ নীতিমালা থেকে এ বিষয়ে যেসব আইন-কানুন রচনা করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ আরব জাহেলিয়াতের যেসব রসম-রেওয়াজ অনুসারে যিহার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দিত এবং স্ত্রী স্বামীর জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যেতো যিহার সম্পর্কিত এসব ইসলামী আইন-কানুন তা বাতিল করে দেয়। অনুরূপভাবে যেসব আইনকানুন ও রসম-রেওয়াজ যিহারকে অর্থহীন ও প্রতিক্রিয়াহীন মনে করে এবং স্ত্রীকে মা কিংবা বিয়ে করা হারাম এমন মহিলাদের সাথে তুলনা করা সত্ত্বেও স্বামী তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখা বৈধ করে দেয় ইসলামী আইন-কানুন সে সবকেও বাতিল করে দেয়। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে মা এবং বিয়ে করা হারাম এমন অন্য সব মহিলার হারাম হওয়ার ব্যাপারটা মামুলি কোন বিষয় নয়। তাই স্ত্রী এবং তাদের মধ্যে তুলনা করার বিষয়টা মুখে উচ্চারণ করা তো দূরের কথা তা কল্পনাও করা যায় না। এ ব্যাপারে দু'টি চরম পন্থার মধ্যে ইসলামী আইন যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা তিনটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম ভিত্তি হলো, যিহার দ্বারা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয় না। বরং মহিলা যথারীতি স্বামীর স্ত্রীই থাকে। দ্বিতীয় ভিত্তি হলো, যিহার দ্বারা স্ত্রী সাময়িকভাবে স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায়। তৃতীয় ভিত্তি হলো, স্বামী কাফ্ফারা আদায় না করা পর্যন্ত এই 'হরমত' অবশিষ্ট থাকে এবং শুধু কাফ্ফারাই এই 'হরমত' রহিত করতে পারে।

দুই ঃ যিহারকারী স্বামী সম্পর্কে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, যে স্বামী সুস্থ বুদ্ধি ও প্রাপ্ত বয়স্ক এবং সুস্থ ও সজ্ঞানে যিহারের শব্দাবলী মুখ থেকে উচ্চারণ করবে কেবল তার যিহার গ্রহণযোগ্য হবে। শিশু ও বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির যিহার গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া যিহারের শব্দাবলী উচ্চারণের সময় যার বিবেক-বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক সুস্থ নাই তার যিহারও গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন, কেউ ঘুমন্ত অবস্থা অস্ফুট স্বরে কিছু বললো অথবা কোন প্রকার সংজ্ঞাহীনতায় আক্রান্ত হলো। এগুলো ছাড়া নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহে ফিকাহবিদদের মতভেদ আছে ঃ

(ক) নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যিহারকারী সম্পর্কে চার ইমামসহ ফিকাহবিদদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মত হচ্ছে, কেউ যদি জেনে শুনে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে তাহলে তালাকের মত তার যিহারও আইনত সঠিক বলে ধরে নেয়া হবে। কারণ সে নিজেই নিজের ওপর এ অবস্থা চাপিয়ে নিয়েছে। তবে কেউ যদি রোগের জন্য কোন ওষুধ ব্যবহার করে এবং তা দ্বারা নেশা ও মাদকতা সৃষ্টি হয়ে থাকে অথবা তীব্র পিপাসায় জীবন রক্ষার জন্য শরাব পান করতে বাধ্য হয়ে থাকে তবে এভাবে সৃষ্ট নেশায় তার যিহার ও তালাক কার্যকর করা হবে না। হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীগণ এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। সাধারণভাবে সাহাবা কিরামের মতও এটিই ছিল। পক্ষান্তরে হযরত

উসমানের (রা) মত হলো, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তালাক ও যিহার গ্রহণযোগ্য নয়। হানাফীদের মধ্য থেকে ইমাম তাহাবী (র) ও কারখী (র) এ মতটিকে অগ্রাধিকার দান করেন এবং ইমাম শাফেয়ীর (র) একটি মতও এর সমর্থন করে। মালেকীদের মতে ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণরূপে বিচার বুদ্ধি খুইয়ে না বসে বরং সংলগ্ন ও সাজানো গোছানো কথাবার্তা বলতে থাকে এবং কি বলছে সে উপলব্ধি থাকে তাহলে নেশাগ্রস্ত অবস্থার যিহারও গ্রহণযোগ্য হবে।

(খ) ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মালেকের (র) মতে কেবল মুসলমান স্বামীর যিহারই গ্রহণযোগ্য হবে। যিহার সম্পর্কিত এসব বিধি-নিষেধ যিম্মিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। কারণ কুরআন মজীদে الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم বলে মুসলমানদের সম্বোধন করা হয়েছে। তাছাড়া কুরআন মজীদে যিহারের যে তিন প্রকার কাফ্ফারার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে রোযাও অন্তরভুক্ত আছে। একথা স্পষ্ট যে, রোযা যিম্মীদের জন্য প্রয়োজ্য হতে পারে না। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে এসব আদেশ নিষেধ যিম্মী ও মুসলমান উভয়ের যিহারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। তবে যিম্মীদের রোযা রাখতে হবে না। তারা শুধু একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করবে অথবা ৬০ জন মিসকীনকে খেতে দেবে।

(গ) পুরুষের মত নারীও কি যিহার করতে পারে? যেমন ঃ সে যদি স্বামীকে বলে, তুমি আমার জন্য আমার বাপের মত অথবা আমি তোমার জন্য তোমার মায়ের মত তাহলে কি তা 'যিহার' বলে গণ্য হবে? চার ইমামের মতে এটা যিহার হবে না এবং এক্ষেত্রে যিহারের আইনগত বিধি বিধান আদৌ প্রযোজ্য হবে না। কেননা, স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে যিহার করে কেবল তখনই এই বিধি নিষেধ প্রযোজ্য হবে বলে কুরআন মজীদ স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছে (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِم) এবং যিহার করার ইখতিয়ার কেবল তারই থাকবে যার তালাক দেয়ার অধিকার আছে। ইসলামী শরীয়াত স্বামীকে তালাক দেয়ার ইখতিয়ার যেমন স্ত্রীকে দেয় নি ঠিক তেমনি নিজেকে স্বামীর জন্য হারাম করে নেয়ার ইখতিয়ারও দেয়নি। সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক ইবনে রাহাবিয়া, আবু সাওর এবং লাইস ইবনে সা'দ এমতটিই পোষণ করেছেন। তাদের মতে, স্ত্রীর এরূপ কথা অযথা ও অর্থহীন। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, এতে যিহার হবে না। তবে এর দ্বারা স্ত্রীর ওপর কসমের কাফ্ফারা দেয়া অত্যাবশ্যকীয় হবে। কারণ স্ত্রীর একথা বলার অর্থ হচ্ছে সে তার স্বামীর সাথে সম্পর্ক না রাখার শপথ করেছে। ইবনে কুদামাহ উদ্ধৃত করেছেন যে, এটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (র)ও মত। ইমাম আওযায়ী (র) বলেন, স্ত্রী যদি বিয়ে হওয়ার আগে একথা বলে থাকে যে, তার যদি অমুক ব্যক্তির সাথে বিয়ে হয় তাহলে সে তার জন্য তার বাপের মত তবে তা যিহার বলে গণ্য হবে। আর যদি বিয়ের পরে বলে থাকে তাহলে কসম বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে শুধু কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে। তবে কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে স্বামীকে কাছে আসতে বাধা দেয়ার কোন অধিকার নারীর থাকবে না। এর সমর্থনে ইবরাহীম নাখয়ী একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হলো, তালহার (রা) কন্যা আয়েশাকে বিয়ে করার জন্য হযরত যুবায়েরের পুত্র মুসআব প্রস্তাব দিলে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে; আমি যদি তাকে বিয়ে করি তাহলে هو على كظهر ابى সে আমার জন্য আমার পিতার পিঠের মত। এর কিছুকাল পর সে

তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে সম্মত হয়। এ ব্যাপারে মদীনার উলামাদের নিকট থেকে ফতোয়া চাওয়া হলে বহু সংখ্যক ফকীহ ফতোয়া দিলেন যে, আয়েশাকে যিহারের কাফ্ফারা দিতে হবে। এসব ফকীহদের মধ্যে কয়েকজন সাহাবীও অন্তরভুক্ত ছিলেন। এ ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত ইবরাহীম নাখয়ী মত প্রকাশ করেছেন যে, আয়েশা যদি বিয়ের পর একথা বলতেন তাহলে কাফ্ফারা দিতে হতো না। কিন্তু তিনি এ কথা বলেছিলেন বিয়ের পূর্বে, যখন তাঁর বিয়ে করা বা না করার অধিকার ছিল তাই তার ওপর কাফ্ফারা দেয়া ওয়াজিব।

তিন ঃ সুস্থ বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি যদি সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে যিহারের শব্দাবলী মুখ থেকে উচ্চারণ করে এবং পরে যুক্তি দেখিয়ে বলে যে, সে ক্রুদ্ধ হয়ে হাসি তামাসা করে অথবা আদর সোহাগ করে এরূপ বলেছে কিংবা তার যিহারের নিয়ত ছিল না তাহলে এ ওজর গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে যেসব শব্দ থেকে স্পষ্টভাবে যিহার বুঝায় না এবং যেসব শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থের অবকাশ আছে সেসব শব্দের ধরন ও প্রকৃতির ওপর তার সিদ্ধান্ত নির্ভর করে। যিহারের স্পষ্ট শব্দ কোন্‌গুলো এবং অস্পষ্ট শব্দ কোন্‌গুলো সে সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করবো।

চার ঃ এটা সর্বসম্মত ব্যাপার যে, বিবাহিত স্ত্রীর সাথেই কেবল যিহার করা যায়। অতএব স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন নারীর সাথে যিহার করা যায় কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন মত নিম্নরূপ ঃ

হানাফীদের মতে কেউ যদি অপর কোন নারীকে বলে, "আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি তাহলে তুমি আমার জন্য ঠিক আমার মায়ের পিঠের মত।" এক্ষেত্রে সে যখনই তাকে বিয়ে করুক না কেন কাফ্ফারা আদায় করা ছাড়া তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এটি হযরত 'উমরের (রা)ও ফতোয়া। তাঁর খিলাফত যুগে এক ব্যক্তি এক মহিলাকে একথা বলেছিল এবং পরে তাকে বিয়ে করেছিল। হযরত উমর (রা) বললেন, তাকে যিহারের কাফ্ফারা দিতে হবে।

মালেকী এবং হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীগণও এ কথাই বলেন। এর সাথে তারা অতিরিক্ত এতটুকু সংযোজিত করেন যে, যদি নির্দিষ্ট করে কোন মহিলার কথা না বলে এভাবে বলে যে, সমস্ত নারীই আমার জন্য এরূপ, এমতাবস্থায় সে যে নারীকেই বিয়ে করুক না কেন তাকে স্পর্শ করার আগেই কাফ্ফারা দিতে হবে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, উরওয়া ইবনে যুবায়ের, আতা ইবনে আবী রাবাহ, হাসান বাসরী এবং ইসহাক ইবনে রাহাবিয়া এমতটিই পোষণ করেছেন।

শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহদের মতে, বিয়ের পূর্বে যিহার অর্থহীন। ইবনে আব্বাস এবং কাতাদাও এ মতটিই পোষণ করেন।

পাঁচ ঃ যিহার কি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হতে পারে? হানাফী এবং শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহদের মতে, কেউ যদি নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করে যিহার করে তাহলে সেই সময়ের মধ্যে স্ত্রীকে স্পর্শ করলে কাফ্ফারা দিতে হবে। তবে সেই সময় অতিক্রান্ত হলে যিহার অকার্যকর হয়ে পড়বে। এর প্রমাণ সালামা ইবনে সাখার বায়াদীর ঘটনা। তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে রমযান মাসের জন্য যিহার করেছিলেন কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম তাকে বলেননি যে, সময় নির্দিষ্ট করা অর্থহীন। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক এবং ইবনে আবী লায়লা বলেন ঃ যিহার যখনই করা হোক না কেন তা সব সময়ের জন্য হবে। এক্ষেত্রে সময় নির্দিষ্ট করার কোন কার্যকারিতা থাকবে না। কারণ, যে 'হুরমত' কার্যকর হয়েছে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে তা আপনা থেকেই শেষ হয়ে গিয়েছে।

ছয় ঃ শর্তযুক্ত যিহার করা হয়ে থাকলে যখনই শর্ত ভঙ্গ হবে কাফ্ফারা দিতে হবে। যেমন ঃ কেউ যদি স্ত্রীকে বলে, "আমি যদি ঘরে প্রবেশ করি তাহলে তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত" এমতাবস্থায় সে যখনই ঘরে প্রবেশ করবে কাফ্ফারা আদায় করা ছাড়া সে স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পারবে না।

সাত ঃ একই স্ত্রীর উদ্দেশ্যে কয়েকবার যিহারের শব্দাবলী বলা হয়ে থাকলে তা একই বৈঠকে বলা হয়ে থাক বা ভিন্ন ভিন্ন বৈঠকে বলা হয়ে থাক, সর্বাবস্থায়ই তা যতবার বলা হয়েছে ততবার কাফ্ফারা দিতে হবে। তবে যিহারের শব্দাবলী ব্যবহারকারী যদি তা একবার ব্যবহার করার পর শুধু পূর্বের কথার ওপর জোর দেয়ার উদ্দেশ্যে তা বারবার বলে তাহলে ভিন্ন কথা। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন ঃ কথাটি বারবার বলার নিয়তে বলা হোক কিংবা জোর দেয়ার জন্য বলা হোক, যতবারই বলা হোক না কেন সেজন্য একবারই কাফ্ফারা দিতে হবে।। শা'বী, তাউস, আতা ইবনে আবী রাবাহ, হাসান বাসরী এবং আওযায়ী রাহিমাহুমুল্লাহ এ মতেরই অনুসারী। এ বিষয়ে হযরত আলীর ফতোয়া হলো, কথাটি যদি একই বৈঠকে বার বার বলা হয়ে থাকে তাহলে সেজন্য একবার মাত্র কাফ্ফারা দিতে হবে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বৈঠকে বলা হলে যত সংখ্যক বৈঠকে বলা হয়েছে ততবার কাফ্ফারা দিতে হবে। এটি কাতাদা এবং আ'মর ইবনে দীনারেরও মত।

আট ঃ দুই বা দু'য়ের অধিক সংখ্যক স্ত্রীর সাথে একসাথে যিহার করা হলে, যেমন ঃ স্বামী তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললো যে, তোমরা আমার জন্য ঠিক আমার মায়ের পিঠের মত, তাহলে হানাফী ও শাফেয়ীদের মতে, প্রত্যেককে হালাল করার জন্য আলাদা আলাদা কাফ্ফারা দিতে হবে। এটি হযরত 'উমর (রা), হযরত আলী (রা), উরওয়া ইবনে যুবায়ের, তাউস, আতা, হাসান বাসরী, ইবরাহীম নাখয়ী, সুফিয়ান সাওরী এবং ইবনে শিহাব যুহরীর মত। ইমাম মালেক (র) এবং ইমাম আহমদ (র) বলেন, এক্ষেত্রে সবার জন্য একবারই কাফ্ফারা দিতে হবে। রাবীয়া, আওযায়ী, ইসহাক ইবনে রাহাবিয়া এবং আবু সাওরও এমতের অনুসারী।

নয় ঃ কেউ যদি এক যিহারের কাফ্ফারা দেয়ার পর পুনরায় যিহার করে বসে তাহলে পুনরায় কাফ্ফারা দেয়া ছাড়া স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না।

দশ ঃ কেউ যদি কাফ্ফারা দেয়ার আগেই স্ত্রীকে স্পর্শ করে বসে তাহলে চার ইমামের মতে, যদিও একাজ গোনাহ কিন্তু তাকে একটি কাফ্ফারাই দিতে হবে। তবে তার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত এবং পুনরায় এ কাজ না করা উচিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যারা এরূপ করেছিল তিনি তাদের বলেছিলেন ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং যতক্ষণ কাফ্ফারা না দিবে ততক্ষণ স্ত্রী থেকে আলাদা থাকো। কিন্তু এজন্য তিনি যিহারের কাফ্ফারা ছাড়া আর কোন কাফ্ফারা দিতে হবে বলে নির্দেশ দেননি।

হযরত আমর ইবনুল আস, কাবিসা ইবনে যুয়াইব, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, যুহরী এবং কাতাদা বলেন, তাকে দুইটি কাফ্ফারা দিতে হবে। এবং হাসান বাসরী ও ইবরাহীম নাখয়ীর মতে তিনটি কাফ্ফারা দিতে হবে। এ বিষয়ে যেসব হাদীসে নবীর (সা) ফায়সালা বর্ণিত হয়েছে উক্ত মনিষীদের কাছে সম্ভবত সে সব হাদীস পৌঁছেনি।

এগার ঃ স্ত্রীকে কাদের সাথে তুলনা করলে যিহার হবে? এ বিষয়ে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে ঃ

আমের শা'বী বলেন, কেবলমাত্র মায়ের সাথে তুলনা করলেই যিহার হবে। জাহেরিয়াগণ বলেন ঃ মায়েরও শুধু পিঠের সাথে তুলনা করলে যিহার হবে। অন্য কোন কথার ওপর এ নির্দেশ প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু এ বিষয়ে ফিকাহবিদদের কোন গোষ্ঠীই তাঁর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেননি। কারণ, মায়ের সাথে স্ত্রীর তুলনা করাকে কুরআন কর্তৃক গোনাহর কাজ বলার কারণ হলো, এটা একটা চরম অর্থহীন ও মিথ্যা কথা। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, যেসব নারী মায়ের মতই হারাম, তাদের সাথে স্ত্রীকে তুলনা করা অর্থহীনতা ও মিথ্যাবাদিতার দিক থেকে এর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তাই মায়ের সাথে তুলনা করার ক্ষেত্রে যে বিধান প্রয়োজ্য এ ক্ষেত্রেও সেই একই বিধান প্রযোজ্য না হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না।

হানাফীদের মতে যেসব নারী বংশ, দুগ্ধদান অথবা দাম্পত্য সম্পর্কের কারণে কারো জন্য চিরস্থায়ী হারাম তারা সবাই এ বিধানের অন্তরভুক্ত। কিন্তু যেসব নারী অস্থায়ীভাবে হারাম এবং যে কোন সময় হালাল হতে পারে তারা এর অন্তরভুক্ত না। যেমন, স্ত্রীর বোন, খালা, ফুফু অন্যান্য নারী যারা তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নয়। চিরস্থায়ী হারাম মহিলাদের মধ্য থেকে কোন মহিলার যে অংগের প্রতি দৃষ্টিপাত করা কারো জন্য হালাল নয় তার সাথে তুলনা করাই যিহার বলে গণ্য হবে। তবে স্ত্রীর হাত, পা, মাথা, চুল, দাঁত ইত্যাদিকে চিরস্থায়ী হারাম নারীর পিঠের সাথে অথবা স্ত্রীকে তার মাথা, হাত ও পায়ের মত দৈহিক অংগ-প্রত্যাংগের সাথে তুলনা করা যিহার বলে গণ্য হবে না। কারণ, মা ও বোনের এসব অংগ প্রত্যাংগের প্রতি তাকানো হারাম নয়। অনুরূপভাবে তোমার হাত আমার মায়ের হাতের মত অথবা তোমার পা আমার মায়ের পায়ের মত বলায় যিহার হবে না।

শাফেয়ীদের মতে, কেবল সেসব নারীই এ নির্দেশের অন্তরভুক্ত হবে যারা চিরদিন হারাম ছিল এবং চিরদিন হারাম থাকবে। অর্থাৎ মা, বোন, মেয়ে ইত্যাদি। কিন্তু যেসব নারী কোন সময় হালাল ছিল যেমন, দুধ মা, দুধ বোন, শাশুড়ী এবং পুত্রবধু অথবা যে সব নারী কোন সময় হালাল হতে পারে যেমন শ্যালিকা। এসব বিশেষ কারণে হারাম বা সাময়িক ও অস্থায়ী হারাম নারী ছাড়া স্থায়ী হারাম নারীদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা দেখানোর জন্য সাধারণত যে সব অংগের কথা উল্লেখ করা হয় না স্ত্রীকে যদি সেসব অংগের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে তা যিহার বলে গণ্য হবে। তবে যেসব অংগ- প্রত্যাংগের উল্লেখ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য করা হয় তার সাথে তুলনা করা কেবল তখনই যিহার হবে যখন তা যিহারের নিয়তে বলা হবে। যেমন, স্ত্রীকে একথা বলা তুমি আমার মায়ের চোখ অথবা জানের মত অথবা মার হাত অথবা পা অথবা পেটের মত, অথবা মায়ের পেট অথবা বক্ষস্থলের সাথে স্ত্রীর পেট অথবা বক্ষস্থলের সাথে তুলনা

করা, অথবা স্ত্রীর মাথা, পিঠ অথবা হাতকে নিজের জন্য মায়ের হাতের মত মনে করা, অথবা স্ত্রীকে একথা বলা যে, তুমি আমার জন্য আমার মায়ের মত। এসব কথা যদি যিহারের নিয়তে বলা হয়ে থাকে তাহলে যিহার হবে, আর যদি সম্মান দেখানোর নিয়তে বলা হয়ে থাকে তাহলে সম্মান প্রদর্শনই হবে।

মালেকীগণ বলেন, যেসব নারী পুরুষের জন্য হারাম তাদের সাথে স্ত্রীকে তুলনা করাই যিহার। এমন কি তাদের মতে, স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার জন্য অমুক পরনারীর পিঠের মত তাহলে তাও যিহারের সংজ্ঞায় পড়ে। তারা আরো বলেন, মা এবং চিরস্থায়ী হারাম মহিলাদের কোন অংগের সাথে স্ত্রীকে কিংবা স্ত্রীর কোন অংগকে তুলনা করা যিহার। এক্ষেত্রে এমন কোন শর্ত নেই যে, সেসব অংগ এমন হতে হবে যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হালাল নয়। কারণ স্ত্রীর প্রতি যেভাবে দৃষ্টিপাত করা হয় সেভাবে মায়ের কোন অংগের প্রতিই দৃষ্টিপাত করা হালাল নয়।

হাম্বলী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ হারাম মহিলাদের সবাইকে এ নির্দেশের অন্তরভুক্ত বলে মনে করেন। তারা চাই স্থায়ী হারাম হোক অথবা ইতিপূর্বে কখনো হালাল ছিল এখন চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে গিয়েছে। যেমন ঃ শাশুড়ী ও দুধমা। তবে যেসব মহিলা পরবর্তী কোন সময় হালাল হতে পারে যেমন ঃ শ্যালিকা। তাদের ব্যাপারে ইমাম আহমদের একটি মত হলো, তাদের সাথে তুলনা করাও যিহার হবে। দ্বিতীয় মতটি হলো, তাদের সাথে তুলনা করলে যিহার হবে না। তাছাড়াও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীদের মতে স্ত্রীর কোন অংগকে হারাম মেয়েদের কোন অংগের সাথে তুলনা করা যিহারের সংজ্ঞায় পড়ে। তবে চুল, নখ ও দাঁতের মত শরীরের অস্থায়ী অংগসমূহ এ নির্দেশের বহির্ভূত।

বার ঃ এ ব্যাপারে সমস্ত ফিকাহবিদগণ একমত যে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত" তাহলে তা স্পষ্ট যিহার হবে। কারণ, আরবদের মধ্যে এটাই যিহারের নিয়ম হিসেবে প্রচলিত ছিল। আর এ বিষয়টি সম্পর্কেই কুরআনের নির্দেশ নাযিল হয়েছে। অন্য সব বাক্যের কোন্‌টি দ্বারা স্পষ্ট যিহার হবে আর কোন্‌টি দ্বারা যিহার হবে না, বরং সেক্ষেত্রে যিহার হওয়া না হওয়ার সিদ্ধান্ত বক্তার নিয়ত অনুসারে করা হবে। এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে।

হানাফীদের মতে, যেসব বাক্য দ্বারা হালাল নারীকে (স্ত্রী) স্পষ্টভাবে হারাম নারীর (স্থায়ী হারাম নারীদের কোন একজন) সাথে তুলনা করা হয়েছে, অথবা যে অংগের দিকে দৃষ্টিপাত করা হালাল নয় এমন অংগের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেমন, কেউ তার স্ত্রীকে বললো ঃ তুমি আমার জন্য মা অথবা অমুক হারাম নারীর পেট অথবা উরুর মত। এছাড়া অন্য সব বাক্য সম্পর্কে মতভেদ করার অবকাশ আছে। কেউ যদি বলে ঃ "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত হারাম। ইমাম আবু হানীফার মতে এটা স্পষ্ট যিহার। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে এক্ষেত্রে যিহারের নিয়ত থাকলে যিহার হবে এবং তালাকের নিয়ত থাকলে তালাক হবে। যদি বলে, তুমি যেন আমার মা অথবা আমার মায়ের মত তাহলে এক্ষেত্রে সাধারণভাবে হানাফীদের ফতোয়া হলো, যিহারের নিয়তে একথা বলা হয়ে থাকলে যিহার হবে, এবং তালাকের নিয়তে বলা হয়ে থাকলে বায়েন তালাক হবে এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে বলা হয়ে থাকলে অর্থহীন

বাক্য হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদের মতে এটা অকাট্যভাবে যিহার। কেউ যদি স্ত্রীকে মা অথবা বোন অথবা কন্যা বলে সম্বোধন করে তাহলে এটা চরম অর্থহীন ও বাজে কথা। এরূপ কথায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাকে যিহার বলে গণ্য করেন নি। কেউ যদি বলে "তুমি আমার জন্য মায়ের মতই হারাম" যদি যিহারের নিয়তে বলে তাহলে যিহার হবে, তালাকের নিয়তে বললে তালাক হবে। আর কোন নিয়ত না থাকলে যিহার হবে। যদি বলে "তুমি আমার জন্য মায়ের অনুরূপ অথবা মায়ের মত" তাহলে উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। যদি সম্মান ও মর্যাদা বুঝানোর জন্য বলে থাকে তাহলে সম্মান মর্যাদা দেখানো বলে গণ্য করা হবে। যিহারের নিয়তে বলা হয়ে থাকলে যিহার হবে। তালাকের নিয়তে বলে থাকলে তালাক হবে। কোন নিয়ত না থাকলে এবং এমনি বলে থাকলে ইমাম আবু হানীফার মতে অর্থহীন কথা হবে, ইমাম আবু ইউসুফের মতে তাকে যিহারের কাফ্ফারা দিতে হবে না তবে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে এবং ইমাম মুহাম্মাদের মতে যিহার হবে।

শাফেয়ী ফিকাহবিদদের মতে যিহারের স্পষ্ট বাক্য হলো 'তুমি আমার কাছে অথবা আমার সংগে অথবা আমার জন্যে আমার মায়ের পিঠের মত, অথবা তুমি আমার মায়ের পিঠের মত। অথবা তোমার দেহ বা শরীর অথবা তোমার সত্তা আমার জন্য আমার মায়ের দেহ বা শরীর অথবা সত্তার মত। এছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত বাক্যের ব্যাপারে বাক্য প্রয়োগকারীর নিয়ত অনুসারে সিদ্ধান্ত হবে।

হাম্বলী ফিকাহবিদদের মতে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে অথবা তার স্বতন্ত্র কোন অংগকে বিয়ে করা হারাম এমন কোন মহিলার সাথে অথবা তার দেহের স্বতন্ত্র কোন অংগের সাথে স্পষ্ট ভাষায় তুলনা করে তাহলে তা যিহারের স্পষ্ট বাক্য বলে গণ্য করা হবে। মালেকী মাযহাবের অনুসৃত মতও প্রায় অনুরূপ। তবে বিস্তারিত খুটিনাটিতে গিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। যেমন কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে। তুমি আমার জন্য আমার মায়ের তুল্য অথবা আমার মায়ের মত তাহলে মালেকীদের মতে যিহারের নিয়ত থাকলে যিহার হবে, তালাকের নিয়ত থাকলে তালাক হবে এবং কোন নিয়ত না থাকলে যিহার হবে। হাম্বলীদের মতে শুধু নিয়তের শর্তে যিহার বলে গণ্য করা যেতে পারে। কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বলে তুমি আমার মা। মালেকীদের মতে তা যিহার হবে। হাম্বলীদের মতে ঝগড়া বিবাদ বা ক্রুদ্ধাবস্থায় বলা হয়ে থাকলে যিহার হবে এবং আদর সোহাগপূর্ণ পরিবেশে বলা হয়ে থাকলে তা খুবই খারাপ কথা। কিন্তু তা যিহার হিসেবে গণ্য হবে না। কেউ যদি স্ত্রীকে বলে ঃ তোমাকে তালাক, তুমি আমার মায়ের মত তাহলে হাম্বলীদের মতে এতে তালাক হবে যিহার নয়। তবে যদি বলে ঃ তুমি আমার মায়ের মত, তোমাকে তালাক তাহলে যিহার ও তালাক উভয়টিই হয়ে যাবে। আর যদি বলে ঃ তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত হারাম তাহলে মালেকী ও হাম্বলী উভয় মাযহাবের ফিকাহবিদদের মতে এ বাক্য তালাকের নিয়তে বলা হোক বা আদৌ কোন নিয়ত না থাক এতে যিহার হবে।

যিহারের বাক্য সম্পর্কিত এ আলোচনায় এ বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে হবে যে, এ বিষয়ে ফিকাহবিদগণ যত আলোচনা করেছেন তা সবই আরবী ভাষার বাক্য ও বাকরীতি সম্পর্কে। একথা সবারই জানা যে, পৃথিবীর অন্য ভাষাভাষী লোকেরা যিহার করার সময়

আরবী ভাষা ব্যবহার করবে না কিংবা যিহার করার সময় আরবী বাক্য ও বাক্যাংশের হুবহু অনুবাদ উচ্চারণ করবে না। সুতরাং কোন শব্দ বা বাক্যাংশ যিহারের সংজ্ঞায় পড়ে কিনা সে বিষয়ে যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় তাহলে তা ফিকাহবিদদের বর্ণিত বাক্য-সমূহের কোন্‌টির সঠিক অনুবাদ শুধু সেটিই বিচার বিবেচনা করা ঠিক হবে না বরং শুধু এ বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে যে, বক্তা বা শব্দ ব্যবহারকারী ব্যক্তি স্ত্রীকে যৌন (Sexual) সম্পর্কের দিক দিয়ে হারাম নারীদের কারো সাথে সুস্পষ্টভাবে তুলনা করেছে নাকি ঐ সব বাক্যের অন্য কোন অর্থ হওয়ার অবকাশ আছে? আরবী ভাষার اَنتَ عَلَىَّ كَظَهرِ اُمِّى (তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত) বাক্যটি এর সুস্পষ্ট উদাহরণ। ফিকাহবিদ এবং মুফাসসিরগণ এ বিষয়ে একমত যে, আরবে যিহার করার জন্য এ বাক্যটিই ব্যবহার করা হতো এবং এ বাক্যটি সম্পর্কেই কুরআন মজীদের নির্দেশ নাযিল হয়েছে। সম্ভবত দুনিয়ার কোন ভাষাতেই— উর্দু ভাষা সম্পর্কে তো আমরা অন্তত নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি—যিহারকারী কোন ব্যক্তি এমন বাক্য ব্যবহার করতে পারে না যা এই আরবী বাক্যটির হুবহু শাব্দিক অনুবাদ হতে পারে। তবে তারা নিজের ভাষার এমন সব বাক্য অবশ্যই ব্যবহার করতে পারে যার অর্থ অবিকল তাই যা একজন আরব এইটি দ্বারা প্রকাশ করতো। একথাটি বলার অর্থ ছিল, তোমার সাথে সহবাস করা আমার জন্য আমার মায়ের সাথে সহবাস করার মত। অথবা কোন কোন মূর্খ ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে বসে যে, "আমি যদি তোমার কাছে যাই তাহলে যেন আমার মায়ের কাছেই গেলাম।"

তের ঃ কুরআন মজীদের যে জিনিসকে কাফ্‌ফারা আবশ্যিক হওয়ার কারণ বলা হয়েছে তা শুধু যিহার করা নয়, বরং যিহারের পরবর্তী عود । অর্থাৎ ব্যক্তি যদি শুধু যিহার করে এবং 'عود' না করে তাহলে তাকে কাফ্‌ফারা দিতে হবে না। এখন প্রশ্ন হলো عود কি যা কাফ্‌ফারা দেয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়? এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মতামত নিম্নরূপ ঃ হানাফীদের মতে عود অর্থ সহবাস করার ইচ্ছা। তবে তার অর্থ এই নয় যে, শুধু ইচ্ছা বা আকাংখা করলেই কাফ্‌ফারা দেয়া জরুরী হবে। এমন কি ব্যক্তি যদি শুধু ইচ্ছা করেই থেমে থাকে এবং কার্যত কোন পদক্ষেপ না নেয় তাহলেও তাকে কাফ্‌ফারা দিতে হবে, ব্যাপার এমন নয়। বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি যিহার করার দ্বারা স্ত্রীর সাথে একান্ত দাম্পত্য সম্পর্কের ব্যাপারে যে 'হুরমত' বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল প্রথমে কাফ্‌ফারা তা দূর করে। কারণ এই 'হুরমত' বা নিষেধাজ্ঞা কাফ্‌ফারা দেয়া ছাড়া দূরীভূত হতে পারে না।

এ বিষয়ে ইমাম মালেকের (র) তিনটি মত আছে। তবে এ ব্যাপারে ওপরে হানাফীদের যে মত বর্ণিত হয়েছে সেটিই মালেকীদের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধতম মত। তাঁদের মতে যিহার দ্বারা স্বামী নিজের জন্য যে জিনিসটি হারাম করে নিয়েছিল তা হচ্ছে স্ত্রীর সাথে সহবাসের সম্পর্ক। এরপর عود করা অর্থ পুনরায় তার সাথে সেই সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ফিরে যাওয়া।

এ বিষয়ে ওপরে দুই ইমামের যে মতামত বর্ণনা করা হয়েছে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (র) মতও প্রায় অনুরূপ বলে ইবনে কুদামা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেনঃ যিহার করার পর সহবাস হালাল হওয়ার জন্য কাফ্‌ফারা দেয়া শর্ত। যিহারকারী যে ব্যক্তিই তা হালাল করতে চায় সে যেন হারাম করে নেয়া থেকে ফিরতে চায়। তাই তাকে নির্দেশ

দেয়া হয়েছে যে, হালাল করে নেয়ার পূর্বে সে যেন কাফ্ফারা আদায় করে। কোন ব্যক্তি কোন নারীকে নিজের জন্য হালাল করে নিতে চাইলে তাকে হালাল করার পূর্বে যেমন বিয়ে করতে বলা হবে এটা যেন ঠিক তাই।

ইমাম শাফেয়ীর (র) মত এ তিনটি মতামত থেকে ভিন্ন। তিনি বলেন ঃ কারো নিজের স্ত্রীর সাথে যিহার করার পর তাকে পূর্বের মত স্ত্রী হিসেবে রাখা, কিংবা অন্য কথায় তাকে স্ত্রী হিসেবে কাছে রাখাটাই عود । কারণ, সে যে সময় যিহার করেছে সে সময় থেকেই যেন তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখা হারাম করে নিয়েছে। সুতরাং সে যদি যিহার করার সাথে সাথেই তালাক না দিয়ে থাকে এবং তালাকের শব্দগুলো উচ্চারণ করার মত সময়টুকু পর্যন্ত তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখে তাহলে সে عود করলো এবং তার ওপর কাফ্ফারা দেয়া ওয়াজিব হয়ে গেল। এর অর্থ হচ্ছে, কেউ এক নিশ্বাসে যিহার করার পর পরবর্তী নিশ্বাসেই যদি তালাক না দেয় তাহলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে পরে তাকে স্ত্রী হিসেবে না রাখার এবং দাম্পত্য সম্পর্ক রক্ষা না করার সিদ্ধান্ত না হলেও কিছু এসে যায় না। এমন কি এর পর সে কয়েক মিনিট চিন্তাভাবনা করে যদি সে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে ইমাম শাফেয়ীর (র) মতানুসারে তবুও তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে।

চৌদ্দ ঃ কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে, স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে "مس" করার পূর্বেই যিহারকারীকে কাফ্ফারা দিতে হবে। এ আয়াতে উল্লেখিত "مس" শব্দের অর্থ স্পর্শ করা এ বিষয়ে চার ইমামই একমত। সুতরাং কাফ্ফারা দেয়ার পূর্বে শুধু সহবাসই হারাম নয় বরং স্বামী কোনভাবেই স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পারবে না। শাফেয়ী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ বলেনঃ যৌন ইচ্ছা সহ স্পর্শ করা হারাম। হাম্বলী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ সব রকম উপভোগকেই হারাম বলেন। মালেকী ফিকাহবিদগণ স্ত্রীর দেহের প্রতি কামনার দৃষ্টিতে তাকানোও না জায়েজ বলেন। তাঁদের মতে এ অবস্থায় কেবল মুখমণ্ডল ও হাতের দিকে তাকানো যেতে পারে।

পনের ঃ যিহার করার পর স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে 'রিজয়ী' তালাকের ক্ষেত্রে 'রুজু' করার পরও কাফ্ফারা দেয়া ছাড়া স্বামী স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পারবে না। বায়েন তালাক হওয়ার ক্ষেত্রে সে যদি তাকে পুনরায় বিয়ে করে তখনও স্পর্শ করার পূর্বে কাফ্ফারা দিতে হবে। এমনকি যদি তিন তালাকও দিয়ে থাকে এবং স্ত্রী অন্য পুরুষের সাথে বিবাহিতা হওয়ার পর বিধবা অথবা তালাক প্রাপ্তা হয় এবং তারপর যিহারকারী স্বামী তাকে নতুন করে বিয়ে করে, তাহলেও কাফ্ফারা ছাড়া সে তার জন্য হালাল হবে না। কেননা, মা বা অন্যান্য চিরনিষিদ্ধ মহিলাদের সাথে স্ত্রীর সাদৃশ্য বর্ণনা করে সে ইতিপূর্বে একবার তাকে নিজের ওপর হারাম বা নিষিদ্ধ করে নিয়েছে। কাফ্ফারা ছাড়া সেই হারাম বা নিষিদ্ধাবস্থার অবসান ঘটা সম্ভব নয়। চার ইমামের সকলেই এ ব্যাপারে একমত।

ষোল ঃ যে স্বামী স্ত্রীর সাথে যিহার করেছে কাফ্ফারা না দেয়া পর্যন্ত তাকে তার শরীর স্পর্শ করতে না দেয়া স্ত্রীর কর্তব্য। যেহেতু দাম্পত্য সম্পর্ক চালু থাকা স্ত্রীর একটি অধিকার বিশেষ এবং তা থেকে স্বামী তাকে বঞ্চিত করেছে, তাই সে যদি কাফ্ফারা না দেয় তবে স্ত্রী আদালতের আশ্রয় নিতে পারে। আদালত তার স্বামীকে সে বাধা অপসারণে

বাধ্য করবে। যা সে নিজের ও তার স্ত্রীর মাঝখানে দাঁড় করিয়েছে। আর যদি সে তা না মানে, তবে আদালত তাকে প্রহার বা কারাদণ্ড বা উভয় প্রকারের দণ্ড দিতে পারে। চার মাযহাবেই এ ব্যাপারে পূর্ণ মতৈক্য রয়েছে। তবে পার্থক্য শুধু এই যে, হানাফী মাযহাবে স্ত্রীর জন্য আদালতের সরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। আদালত যদি স্ত্রীকে এ সংকট থেকে উদ্ধার না করে তবে সে আজীবন ঝুলন্ত অবস্থায়ই থেকে যাবে। কেননা, হানাফী মাযহাব অনুসারে যিহার দ্বারা বিয়ে বাতিল হয় না, কেবল স্বামীর সংগমের অধিকার রহিত হয়। মালেকী মাযহাবে স্বামী যদি স্ত্রীকে নির্যাতন করার জন্য যিহার করে ঝুলিয়ে রাখে। তাহলে সে ক্ষেত্রে "ইলার" বিধান বলবত হবে। অর্থাৎ সে চার মাসের বেশী স্ত্রীকে আটকে রাখতে পারে না। ("ইলা"র বিধান তাফহীমুল কুরআন, সূরা বাকারা ২৪৫ থেকে ২৪৭ টীকায় দ্রষ্টব্য।) আর শাফেয়ী মাযহাবে যদিও স্বামী কেবল নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য যিহার করলেই এবং সে মেয়াদ চার মাসের বেশী হলেই ইলার বিধান কার্যকর হবে। কিন্তু যেহেতু শাফেয়ী মাযহাবে স্বামী স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখলেই কাফ্ফারা দিতে হয়। তাই তার পক্ষে দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্ত্রীকে ঝুলন্ত রাখা সম্ভব হয় না।

সতের ঃ কুরআন ও হাদীসে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে, যিহারের প্রথম কাফ্ফারা হচ্ছে দাস মুক্ত করা। এটা করতে অসমর্থ হলেই দু'মাস ব্যাপী রোযা রাখা এবং তাতেও অসমর্থ হলে ৬০ জন দরিদ্র মানুষকে আহার করানো যেতে পারে। কিন্তু কেউ যদি এ তিন ধরনের কাফ্ফারার কোনটাই দিতে সমর্থ না হয় তাহলে শরীয়াতে কাফ্ফারার অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকা হেতু সে যতক্ষণ পর্যন্ত এ তিন ধরনের কাফ্ফারার কোন একটি দেয়ার সামর্থ লাভ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে। তবে হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, এ ধরনের ব্যক্তি যাতে তৃতীয় কাফফারাটি দিতে পারে সে জন্য তাকে সাহায্য করা উচিত। যারা নিজেদের ভুলের কারণে এরূপ সমস্যার জালে আটকা পড়েছিল, এবং এ তিন প্রকারের কাফ্ফারার কোনটাই দিতে সমর্থ ছিল না, তাদেরকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল মাল থেকে সাহায্য করেছিলেন।

আঠার ঃ পবিত্র কুরআনে কাফ্ফারা হিসেবে যে কোন পরাধীন মানুষকে মুক্ত করার আদেশ দেয়া হয়েছে চাই সে দাস হোক অথবা দাসী হোক। এ ক্ষেত্রে দাস-দাসীর বয়সেরও কোন কড়াকড়ি নেই। দুধ খাওয়া শিশুও যদি গোলামীতে আবদ্ধ হয়ে থাকে তবে তার মুক্তির ব্যবস্থা করাও কাফ্ফারার জন্য যথেষ্ট। তবে মুসলিম ও অমুসলিম উভয় ধরনের দাস-দাসী মুক্ত করা চলবে, না শুধু মুসলিম দাস-দাসী মুক্ত করতে হবে, সে ব্যাপারে মুসলিম ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফী ও যাহেরী মাযহাবের মতানুসারে দাস-দাসী মুসলিম কিংবা অমুসলিম যাই হোক না কেন, তাকে মুক্ত করা যিহারের কাফ্ফারার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা কুরআন শরীফে শর্তহীনভাবে কেবল পরাধীন মানুষকে মুক্ত করতে বলা হয়েছে। তাকে মুসলমানই হতে হবে, একথা বলা হয়নি। পক্ষান্তরে শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব এ দাস-দাসীর মুসলমান হওয়ার শর্ত আরোপ করে। অন্য যেসব কাফ্ফারায় কুরআন শরীফে শুধুমাত্র মুসলিম দাস-দাসীকে মুক্ত করতে বলা হয়েছে। আলোচ্য কাফ্ফারাকেও এ তিন মাযহাবে সেসব কাফ্ফারার সমপর্যায়ের বলে কিয়াস করা হয়েছে।

উনিশ ঃ দাস–দাসী মুক্ত করা সম্ভব না হলে কুরআনের বিধান হলো, স্বামী স্ত্রী কর্তৃক পরস্পরকে স্পর্শ করার আগেই যিহারকারীকে এক নাগাড়ে দু'মাস রোযা রাখতে হবে। আল্লাহর এ আদেশ বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিধিমালা বিভিন্ন মাযহাবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, মাস বলতে এখানে চন্দ্র মাস বুঝানো হয়েছে। চাঁদ ওঠা থেকে যদি রোযা রাখা শুরু করা হয়, তবে দু'টি চন্দ্র মাস পূর্ণ করতে হবে। আর যদি মাসের মধ্যবর্তী কোন তারিখ থেকে শুরু করা হয়, তাহলে হানাফী ও হাম্বলী মাযহাব অনুসারে ষাটদিন রোযা রাখতে হবে। শাফেয়ী মাযহাবের মত এই যে, প্রথম এবং তৃতীয় মাসে সর্বমোট ৩০ দিন রোযা রাখতে হবে। আর মাঝখানের চন্দ্রমাসটি ২৯ দিনের হোক বা ৩০ দিনের হোক—সে মাস রোযা রাখলেই চলবে।

(খ) হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাব অনুসারে রোযা এমন সময় শুরু করতে হবে, যাতে মাঝখানে রমযান, ঈদ কিংবা আইয়ামে তাশরীক না পড়ে। কেননা কাফ্ফারার রোযা চলাকালে রমযানের রোযা রাখায় এবং ঈদ ও আইয়ামে তাশরীকে রোযার বিরতি দেয়ায় দু'মাস রোযা রাখার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হবে এবং আবার নতুন করে রোযা রাখতে হবে। হাম্বলী মাযহাবের মত এই যে, রমযানের রোযা রাখা ও নিষিদ্ধ দিনের রোযায় বিরতি দেয়ায় ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয় না

(গ) দু'মাস রোযা রাখার মাঝে যে কোন ওজরের কারণে অথবা বিনা ওজরে রোযা ভাংলেই হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাব অনুসারে ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হবে এবং আবার গোড়া থেকে রোযা রাখা শুরু করতে হবে। ইমাম মুহাম্মাদ বাকের, ইবরাহীম নাখয়ী, সাঈদ বিন জুবায়ের এবং সুফিয়ান সাওরীর অভিমতও অনুরূপ। ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মতে রোগ বা সফরের কারণে মাঝখানে রোযায় বিরতি দেয়া চলে। এতে ধারাবাহিকতা নষ্ট হবে না। তবে বিনা ওজরে রোযায় বিরতি দিলে ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হয়। শেষোক্ত ইমাম দ্বয়ের যুক্তি এই যে, কাফ্ফারার রোযার গুরুত্ব রমযানের ফরয রোযার গুরুত্বের চেয়ে বেশী নয়। রমযানের রোযা যদি ওজর বশত ছাড়া যায়। তাহলে কাফ্ফারার রোযায় বিরতি দেয়া যাবে না এমন কোন কারণ নেই। অন্য যারা এ অভিমত পোষণ করেন তাঁরা হচ্ছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হাসান বাসরী, আতা বিন আবী রাবাহ, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, আমর বিন দীনার, শা'বী, তাউস, মুজাহিদ, ইসহাক বিন রাহওয়াই, আবু উবাইদ এবং আবু সাওর।

(ঘ) দু'মাস ব্যাপী রোযা চলতে থাকাকালে যিহারকারী যদি তার যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে সংগম করে বসে, তা সকল ইমামের সর্বসম্মত মত এই যে, এ দ্বারা ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যাবে এবং নতুন করে রোযা রাখতে হবে। কেননা স্পর্শ করার আগেই দু'মাস রোযা রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে।

বিশ ঃ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তৃতীয় কাফ্ফারাটি (৬০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে আহার করানো) শুধুমাত্র সে ব্যক্তিই দিতে পারে যার দ্বিতীয়টি দেয়ার সামর্থ নেই। (অর্থাৎ দু'মাস ব্যাপী রোযা রাখা) এ বিধিটি বাস্তবায়নের জন্য ফকীহগণ যে বিস্তারিত নিয়মপদ্ধতি রচনা করেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

(ক) চার ইমামের মতে রোযা রাখতে অসমর্থ হওয়ার অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হয় বার্ধক্যের কারণে, নচেত রোগব্যাধির কারণে অথবা এক নাগাড়ে দু'মাস যৌন সংগম থেকে সংযত থাকতে না পারা ও এ সময়ের মধ্যে ধৈর্য হারিয়ে বসার আশংকার কারণে অক্ষম হওয়া। এ তিনটি ওজরই যে সঠিক এবং শরীয়াতে গ্রহণযোগ্য, সে কথা হযরত আওস বিন সাবেত আনসারী এবং সালমা বিন সাখর বায়াজীর বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত। তবে রোগ সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে সামান্য কিছু মতভেদ রয়েছে। হানাফী ফকীহগণের মতে, যে রোগে আরোগ্যলাভের আশা নেই অথবা রোযার কারণে রোগ বেড়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে কেবল সে রোগ ওজর হিসেবে গ্রহণযোগ্য। শাফেয়ী ফকীহগণ বলেন, রোযার কারণে যদি এত কঠিন শারীরিক পরিশ্রম হয় যে, দু'মাসের মাঝখানেই রোযার ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হবার আশংকা থাকে, তাহলে সেটিও একটি সঠিক ওজর বলে বিবেচিত হতে পারে। মালেকী মাযহাবের ফকীহগণের মতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি নিজের সম্পর্কে প্রবলভাবে আস্থাশীল হয় যে, ভবিষ্যতে রোযা রাখতে সক্ষম হবে তাহলে তার অপেক্ষা করা উচিত। আর যদি প্রবলতর ধারণা এটাই হয় যে, আর কখনো রোযা রাখার সামর্থ ফিরে পাবে না, তাহলে দরিদ্র লোকদেরকে আহার করিয়ে দেয়া উচিত। হাম্বলী মাযহাবের মতে রোযার কারণে রোগ বৃদ্ধির আশংকা ওজর হিসেবে যথেষ্ট।

(খ) শুধুমাত্র সেসব দরিদ্র ব্যক্তিকে আহার করানো যাবে, যাদের ভরণ-পোষণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দায়ভুক্ত নয়।

(গ) হানাফী ফকীহগণের মত এই যে, মুসলিম ও অমুসলিম উভয় ধরনের নাগরিককেই আহার করানো চলবে। তবে যুদ্ধরত ও আশ্রয়প্রার্থী অমুসলিমদেরকে আহার করানো যাবে না। মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব অনুসারে শুধুমাত্র মুসলিম দরিদ্রদেরকেই আহার করানো যাবে।

(ঘ) আহার করানো দ্বারা যে দু'বার পেট ভরে খাওয়ানো বুঝায়, সে ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। তবে কিভাবে খাওয়াতে হবে তা নিয়ে মতভেদ আছে। হানাফী মতে দু'বার পেট পুরে খাওয়ার মত খাদ্য শস্য দিয়ে দেয়া অথবা রান্না বান্না করে দু'বেলা খাইয়ে দেয়া দু'টোই শুদ্ধ। কেননা কুরআন শরীফে "ইত্য়া'ম" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর অর্থ খাবার দেয়া এবং খাওয়ানো দু'টোই। তবে মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব রান্না করে খাওয়ানো শুদ্ধ মনে করে না বরং খাদ্য শস্য প্রদান করাই সঠিক মনে করে। খাদ্য শস্য দেয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি সর্বসম্মত যে, স্থানীয়ভাবে যেটি জনসাধারণের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত খাদ্য সেটিই দিতে হবে এবং সকল দরিদ্র ব্যক্তিকে সমপরিমাণ দিতে হবে।

(ঙ) হানাফী মতানুসারে একই দরিদ্র ব্যক্তিকে যদি ৬০ দিন ব্যাপী খাবার দেয়া হয় তবে তাও সঠিক হবে। তবে একই দিন তাকে ৬০ দিনের খোরাক দেয়া শুদ্ধ নয়। অন্য তিন মাযহাবে একই দরিদ্র ব্যক্তিকে খাবার দেয়া সঠিক মনে করা হয় না। তাদের মতে ৬০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকেই দিতে হবে। ৬০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে এক বেলার খাবার এবং অন্য ৬০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে আর এক বেলার খাবার দেয়া সকল মাযহাবেই অবৈধ।

(চ) এটাও সকল মাযহাবের মতে অশুদ্ধ যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ৩০ দিনের রোযা রাখবে আর ৩০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে আহার করাবে। দু'রকমের কাফ্ফারার সমাবেশ ঘটানো যাবে না। রোযা রাখতে হলে পুরো দু'মাস এক নাগাড়ে রাখা চাই। খাবার দিতে হলেও ৬০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে দিতে হবে।

(ছ) কাফ্ফারা হিসেবে খাওয়ানোর ক্ষেত্রে যদিও কুরআনে এরূপ শব্দ ব্যবহৃত হয়নি যে, এ কাফ্ফারাও স্বামী স্ত্রীর পরস্পরকে স্পর্শ করার আগেই সমাধা হওয়া চাই, তথাপি বাক্যের অবস্থান ও প্রেক্ষাপট থেকে বুঝা যায় যে, এ কাফ্ফারার ক্ষেত্রেও ঐ শর্তটি বলবত রয়েছে। তাই কাফ্ফারার ভোজনপর্ব চলাকালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যাওয়া চার ইমামের কেউই বৈধ মনে করেন না। তবে এমন কাণ্ড কেউ যদি ঘটিয়েই বসে, তবে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। হাম্বলী মাযহাব মতে আবার খাওয়াতে হবে। কিন্তু হানাফী মাযহাবে তার প্রয়োজন নেই। কেননা, তাদের মতে এই তৃতীয় কাফ্ফারায় সুস্পষ্টভাবে "পরস্পরকে স্পর্শ করার আগে" বলা হয়নি এবং এ কারণে এ ক্ষেত্রে কিছুটা উদারতার অবকাশ রয়েছে।

উল্লিখিত বিধিসমূহ নিম্নোক্ত ফিকাহ শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলী থেকে গৃহীত হয়েছে ঃ

হানাফী ফিকাহ ঃ হিদায়া, ফাতহুল কাদীর, বাদায়িউস-সানায়ে' এবং আহকামুল কুরআন (জাসসাস)

শাফেয়ী ফিকাহ ঃ আল মিনহাজ (নবাবী) তৎসহ মুগনীল মুহতাজ শীর্ষক টীকা। তাফসীরে কাবীর।

মালেকী ফিকাহ ঃ শারহুল কাবীরের ওপর দাসুকীর টীকা, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, আহকামুল কুরআন (ইবনুল আরাবী)

হাম্বলী ফিকাহ ঃ আল্ মুগ্নী (ইবনে কুদামা)।

জাহেরী ফিকাহ ঃ আল্ মুহাল্লা (ইবনে হাযম)।

১২. এখানে "ঈমান আনা" দ্বারা খাঁটি ও একনিষ্ঠ মু'মিন সুলভ আচরণকে বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতের সম্বোধন যে, কাফের ও মুশরিকদের প্রতি নয় বরং আগে থেকেই ঈমান আনা মুসলমানদের প্রতি করা হয়েছে, তা সুস্পষ্ট। তাদেরকে শরীয়াতের একটি নির্দেশ প্রদানের পর একথা বলা যে, "তোমরা যাতে আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান আনো, সে জন্য তোমাদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হচ্ছে" স্পষ্টতই এ তাৎপর্য বহন করে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর এ আদেশ শ্রবণের পরও প্রাচীন জাহেলী রসম রেওয়াজ মেনে চলতে থাকে, তার এ আচরণ ঈমানের পরিপন্থী। এটা কোন মু'মিনের কাজ নয় যে, আল্লাহ ও তার রসূল যখন তার জন্য জীবনের কোন ব্যপারে কোন আইন নির্ধারণ করে দেন, তখন সে তা বাদ দিয়ে দুনিয়ার অন্য কোন আইন মেনে চলবে কিংবা নিজের প্রবৃত্তির ইচ্ছা ও খায়েশ মোতাবেক কাজ করবে।

১৩. এখানে কাফের অর্থ আল্লাহ ও রসূলকে অস্বীকারকারী নয়। এখানে কাফের শব্দটি দ্বারা সেই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে আল্লাহ ও রসূলকে মান্য করার স্বীকৃতি ও ঘোষণা দেয়ার পরও একজন কাফেরের উপযোগী আচরণ করতে থাকে। অন্য কথায় এ

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝٥
يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۚ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ۚ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝٦

যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের বিরোধীতা করে[১৪] তাদেরকে ঠিক সেইভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হবে যেভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হয়েছে।[১৫] আমি পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে সব নির্দেশ নাযিল করেছি। কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।[১৬] (এই অপমানকর শাস্তি হবে) সেই দিন যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে জীবিত করে উঠাবেন এবং তারা কি কাজ করে এসেছে তা জানিয়ে দেবেন। তারা ভুলে গিয়েছে কিন্তু আল্লাহ তাদের সব কৃতকর্ম সযত্নে সংরক্ষণ করেছেন।[১৭] আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বাধিক অবহিত।

উক্তির মর্ম এই যে, আল্লাহ ও তার রসূলের আদেশ শোনার পরও নিজের খেয়াল খুশীমত চলা অথবা জাহেলী রীতি প্রথা ও রসম রেওয়াজের অনুসরণ করতে থাকা আসলে কাফেরদের কাজ। সাচ্চা দিলে ঈমান এনেছে এমন কোন ব্যক্তি এ ধরনের আচরণ করতে পারে না। সূরা আলে ইমরানে যেখানে হজ্জ ফরয করার বিধান ঘোষণা করা হয়েছে সেখানেও ঐ ঘোষণাটির অব্যবহিত পর বলা হয়েছে যে,

وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

"আর যে ব্যক্তি কুফরি করবে (অর্থাৎ এ আদেশে অমান্য করবে) তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ জগতবাসীর মোটেই মুখাপেক্ষী নন।"

এ উভয় জায়গায় "কুফর" শব্দটির অর্থ এটা নয় যে, যে ব্যক্তি যিহার করার পর কাফ্ফারা না দিয়ে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে, অথবা এরূপ মনে করে যে, যিহার দ্বারাই স্ত্রীর ওপর তালাক কার্যকর হয়ে গেছে অথবা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করে না, শরীয়াতের আদালত তাকে কাফের ও মুরতাদ ঘোষণা করবে এবং সকল মুসলমান তাকে ইসলাম বহির্ভূত মনে করবে। বরঞ্চ এর অর্থ এই যে, আল্লাহর নিকট এ ধরনের লোকেরা মু'মিন বলে গণ্য হয় না, যারা তার আদেশ নিষেধকে কথা বা কাজের মাধ্যমে প্রত্যাখান করে এবং আল্লাহ মানুষের জন্য কি কি সীমা নির্ধারণ করেছেন, কোন্ কোন্ কাজকে ফরয করেছেন, কোন্ কোন্ জিনিসকে হালাল এবং কোন্ কোন্ জিনিসকে হারাম করেছেন তার কোন ধার ধারে না।

১৪. বিরোধীতা করার অর্থ হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা বা বিধিনিষেধ না মেনে তার পরিবর্তে অন্য কতকগুলো মনগড়া সীমারেখা ও বিধিনিষেধ নির্ধারণ করা।

ইবনে জারীর তাবারী এ আয়াতের তাফসীর করেছেন এভাবে ঃ

اى يخالفون فى حدوده وفرائضه فيجعلون حدودا غير حدوده

"তারা আল্লাহর সীমানা ও তার বিধানসমূহের ব্যাপারে তার বিরোধীতা করে এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমার পরিবর্তে অন্যান্য সীমা নির্ধারণ করে।"

আল্লামা বায়যাবী এর তাফসীর প্রসংগে বলেন ঃ

اى يعادونهما و يشاقونهما او يضعون او يختارون حدودا غير حدودهما –

"আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে দুশমনী ও বিবাদে লিপ্ত হয়, অথবা আল্লাহ ও রসূলের নির্ধারিত সীমারেখার পরিবর্তে অন্যান্য সীমারেখা নির্ধারণ করে। অথবা অন্যদের নির্ধারিত সীমারেখাকে মেনে নেয়।"

আল্লামা আলূসী রুহুল মায়ানীতে বায়যাবীর উক্ত তাফসীরের সাথে মতৈক্য প্রকাশ করে শায়খুল ইসলাম সা'দুল্লা চালপীর এই বক্তব্য উদ্বৃত করেছেন যে, "এ আয়াতে সেসব রাজা বাদশাহ ও স্বেচ্চাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে, যারা শরীয়াতের নির্ধারিত আইনবিধির পরপন্থী বহু আইনবিধি প্রবর্তন করেছে এবং তাকে আইন নামে আখ্যায়িত করেছে।" এ প্রসংগে আল্লামা আলূসী শরীয়াতী আইনের মোকাবিলায় মানব রচিত আইনের সাংবিধানিক অসারতা (অর্থাৎ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সাংবিধানিক অসারতা) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"সে ব্যক্তিতো নিসন্দেহে কাফের, যে মানব রচিত আইনকে উত্তম ও শরীয়াতের চেয়ে ভালো বলে আখ্যায়িত করে এবং বলে যে, এ আইন অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞজনোচিত ও জাতির জন্য অধিকতর উপযোগী। অধিকন্তু তাকে যখন কোন ব্যাপারে বলা হয় যে, শরীয়াতের আদেশ এ ব্যাপারে এরূপ, তখন সে রাগে ফেটে পড়ে। এ ধরনের চরিত্র সম্পন্ন কিছু লোক আমরা দেখেছি, যাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ পড়েছে।"

১৫. মূল আয়াতে ব্যবহৃত শব্দটি হচ্ছে كبت এর অর্থ হচ্ছে লাঞ্ছিত করা, ধ্বংস করা। অভিসম্পাত দেয়া, দরবার থেকে বিতাড়িত করা, ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া, অপমানিত করা। আল্লাহর এ উক্তির মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ ও তার রসূলের বিরোধীতা এবং তার আইন লংঘনের যে পরিণতি পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতেরা ভোগ করেছে, আজকের মুসলমানদের মধ্য থেকে যারা সে আচরণ করবে তারা সে পরিণতি থেকে কোনমতেই রক্ষা পাবে না। তারাও যখন আল্লাহর শরীয়াতের বিরুদ্ধে নিজেদের মনগড়া আইন অনুসরণ করেছে অথবা অন্যদের কাছ থেকে মানব রচিত আইন গ্রহণ করেছে, তখন তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুকম্পা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অধিকন্তু এর ফলে তাদের জীবন এমন সব বিভ্রান্তি, অনাচার এবং নৈতিক ও সামাজিক–সাংস্কৃতিক অপকীর্তি ও

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ مَا يَكُوْنُ
مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ اَدْنٰى
مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهَوْا
عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهَوْا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ ۣ وَاِذَا جَاۗءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ
بِهِ اللّٰهُ ۙ وَيَقُوْلُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ ۭ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ
يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

২ রুকূ'

আল্লাহ যে আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে অবগত, সে ব্যাপারে তুমি কি সচেতন নও?[১৮] যখনই তিন ব্যক্তির মধ্যে কোন গোপন কানাঘুষা হয়, তখন সেখানে আল্লাহ অবশ্যই চতুর্থজন হিসেবে উপস্থিত থাকেন। যখনই পাঁচজনের মধ্যে গোপন সলাপরামর্শ হয় তখন সেখানে ষষ্ঠ জন হিসেবে আল্লাহ অবশ্যই বিদ্যমান থাকেন।[১৯] গোপন সলাপরামর্শকারীরা সংখ্যায় এর চেয়ে কম হোক বা বেশী হোক, এবং তারা যেখানেই থাকুক, আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন।[২০] তারপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন তারা কে কি করেছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তথাপি তারা সে নিষিদ্ধ কাজ করে চলেছে?[২১] তারা লুকিয়ে লুকিয়ে পরস্পরে গোনাহ, বাড়াবাড়ি এবং রসূলের অবাধ্যতার কথাবার্তা বলাবলি করে, আর যখন তোমার কাছে আসে, তখন তোমাকে এমনভাবে সালাম করে যেভাবে আল্লাহ তোমাকে ছালাম করে নি।[২২] আর মনে মনে বলে যে, আমাদের এসব কথাবার্তার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেয় না কেন?[২৩] তাদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। তারা তাতেই দগ্ধ হবে। তাদের পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয়।

পাপাচারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে যে, দুনিয়ার জীবনেই তারা চরম লাঞ্ছনা গঞ্জনার শিকার হয়েছে। উম্মাতে মুহাম্মাদী যদি আজ এই একই ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়, তাহলেও তারা আল্লাহর প্রিয়ই থাকবে এবং আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছনা গঞ্জনার গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতেই থাকবেন— এর কোনই কারণ নেই। পূর্তবর্তী রসূলগণের উম্মাতদের সাথেও আল্লাহর কোন শত্রুতা ছিল না, আর শেষ নবীর উম্মতের সাথেও আল্লাহর কোন বিশেষ আত্মীয়তা নেই।

১৬. বাক্যের প্রেক্ষিত নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে বুঝা যায় যে, এখানে এ আচরণের দু'টো শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে অবমাননা ও লাঞ্ছনা—যার শিকার এ দুনিয়াতেই হতে হয়েছে এবং হতে হবে। অপরটি হচ্ছে অপমানজনক আযাব-যা আখেরাতে ভোগ করতে হবে।

১৭. অর্থাৎ তারা ভুলে গেছে বলেই ব্যাপারটা মিটে যায়নি। আল্লাহর অবাধ্যতা ও তাঁর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ তাদের কাছে এমন মামুলী বিষয় বিবেচিত হতে পারে যা করে তারা মনেও রাখেনা, এমনকি তাকে আদৌ কোন আপত্তিকর জিনিসই মনে করে না যে, তারা তার কিছুমাত্র পরোয়া করবে। কিন্তু আল্লাহর কাছে তা মোটেই মামুলী জিনিস নয়। তার কাছে তাদের প্রতিটি তৎপরতা নিবন্ধিত হয়ে গেছে। কোন্ ব্যক্তি কখন, কোথায়, কি কাজ করেছে তা করার পর তার নিজের প্রতিক্রিয়া কি ছিল, আর অন্যত্র কোথায় কোথায় তার কি কি ফলাফল কি কি আকারে দেখা দিয়েছে, এ সবই সবিস্তারে তার রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

১৮. এখান থেকে ১০ নং আয়াত পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে মুসলিম সমাজে মুনাফিকরা যে কর্মধারা চালিয়ে যাচ্ছিল তার সমালোচনা করা হয়েছে। বাহ্যত তারা মুসলমানদের সমাজে বসবাস করলেও ভেতরে ভেতরে তারা মু'মিনদের থেকে স্বতন্ত্র নিজেদের একটা জোট বানিয়ে রেখেছিল। মুসলমানরা যখনই তাদেরকে দেখতো, এটাই দেখতো যে, তারা পরস্পরে কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে। এসব গোপন সলাপরামর্শের মধ্য দিয়ে তারা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি এবং রকমারি ফিতনা-বিভ্রান্তি ও ভয়ভীতি ছড়ানোর জন্য নানা ধরনের চক্রান্ত আঁটতো এবং গুজব রটাতো।

১৯. এখানে প্রশ্ন জাগে যে, এ আয়াতে দুই ও তিনের বদলে তিন ও পাঁচের উল্লেখের রহস্য কি? প্রথমে দুই এবং তার পরে চার বাদ দেয়া হলো কেন? তাফসীরকারগণ এর অনেকগুলো জবাব দিয়েছেন। তবে আমার মতে সঠিক জবাব এই যে, আসলে পবিত্র কুরআনের সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও ভাষাগত মাধুর্য বজায় রাখার জন্যই এই বর্ণনাভংগী অবলম্বন করা হয়েছে। এটা না করা হলে বর্ণনা ভংগীটা এ রকম দাঁড়াতো ঃ

مَا يَكُوْنُ مِنْ نَجْوٰى اثْنَيْنِ اِلَّا هُوَ ثَالِثُهُمْ وَلَا ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ

এতে نجوى اثنين কথাটার শব্দ বিন্যাস যেমন সুন্দর হতো না, তেমনি ثالث ও ثلثة শব্দ দু'টির পর পর আসাও শ্রুতিমধুর হতো না الا هو رابعهم এরপর ولا اربعة বলাটাও একই রকমের শ্রুতিকটু লাগতো। এজন্য প্রথমে তিন ও পাঁচজন ফিসফিসকারীর উল্লেখ করার পর পরবর্তী বাক্যে এই বলে শূন্যতা পূরণ করা হয়েছে যে,

وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যখন পরস্পরে গোপন অলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হও তখন পাপ, জুলুম ও রসূলের অবাধ্যতার কথা বলাবলি করো না, বরং সততা ও আল্লাহভীতির কথাবার্তা বল এবং যে আল্লাহর কাছে হাশরের দিন তোমাদের উপস্থিত হতে হবে, তাঁকে ভয় কর।[২৪] কানাঘুষা একটা শয়তানী কাজ এবং ঈমানদার লোকদের মনে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যেই তা করা হয়। অবশ্য আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। আর মু'মিনদের কর্তব্য হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করা।[২৫]

"ফিসফিসকারীরা চাই তিনের চেয়ে কম বা পাঁচের চেয়ে বেশী হোক, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাদের সংগে থাকেন।"

২০. বান্দার সংগে আল্লাহর এই অবস্থান বা সাহচর্য মূলত আল্লাহর সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়াকেই বুঝায়। এরূপ নয় যে, (নাউজুবিল্লাহ) তিনি কোন ভৌতিক বা জৈবিক ব্যক্তি এবং পাঁচ ব্যক্তির বৈঠকে ষষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে কোথাও আত্মগোপন করে অবস্থান করেন। আসলে একথা দ্বারা মানুষকে এ মর্মে সচেতন করাই আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য যে, সে যতই সুরক্ষিত স্থানে বসে গোপন সলাপরামর্শ করুক না কেন, তাদের কথাবার্তা দুনিয়ার আর কারো কর্ণগোচর না হোক আল্লাহর গোচরীভূত না হয়ে পারে না। পৃথিবীর আর কোন শক্তি তাদেরকে পাকড়াও করতে না পারুক আল্লাহর পাকড়াও থেকে তারা কিছুতেই বাঁচতে পারবে না।

২১. এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, এ আয়াত নাযিল হবার আগে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও যখন তারা এ থেকে নিবৃত্ত হয়নি, তখন সরাসরি আল্লাহর কাছথেকে এ ভর্ৎসনাপূর্ণ বাণী নাযিল হয়।

২২. ইহুদী ও মুনাফিক-উভয় গোষ্ঠী এ ধরনের আচরণে লিপ্ত ছিল। একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক ইহুদী রসূল (সা) এর দরবারে উপনীত হয়ে বললো ঃ السام عليك يا ابا القاسم অর্থাৎ "আসসামু আলাইকা ইয়া আবাল কাসেম" কথাটা এমনভাবে উচ্চারণ করলো যে, শ্রোতা মনে করতে পারে যে, তারা তাকে সালাম দিয়েছে। অথচ আসলে তারা বলেছে আস্‌সামু আলাইকা অর্থাৎ তোমার মৃত্যু হোক। রসূল (সা) জবাবে বললেন ঃ وعليكم অর্থাৎ "তোমাদের ওপরও"। হযরত আয়েশা (রা)

আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। তিনি বললেন, "তোমাদের মৃত্যু হোক এবং আল্লাহর গযব ও অভিশাপ পড়ুক।" রসূল (সা) বললেন ঃ হে আয়েশা, আল্লাহ তা'আলা কটু বাক্য পসন্দ করেন না। হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ হে রসূল, ওরা কি বলেছে তা কি আপনি শোনেননি? রসূল (সা) বললেন ঃ আর আমি কি জবাব দিয়েছি তা তুমি শোনোনি? আমি তাদেরকে বলে দিয়েছি "তোমাদের ওপরও।" (বুখারী, মুসলিম, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন যে, মুনাফিক ও ইহুদী উভয় গোষ্ঠী এভাবেই সালাম দিতো। (ইবনে জারীর)

২৩. অর্থাৎ তারা এ জিনিসটাকে রসূল (সা) এর রসূল হওয়ার প্রমাণ মনে করতো। তারা ভাবতো যে, তিনি যদি রসূল হতেন, তাহলে যে মুহূর্তে আমরা "আসসালামু আলাইকা"র পরিবর্তে "আস্‌সামু আলাইকা" বলেছি, সে মুহূর্তে আমাদের ওপর আযাব এসে যেতো, আমরা দিনরাত এরূপ আচরণ করা সত্ত্বেও যখন কোন আযাব আসেনি, তখন ইনি রসূল নন।

২৪. এ বক্তব্য থেকে বুঝা গেল যে, পরস্পরে গোপন আলাপ-আলোচনা করা মূলত কোন নিষিদ্ধ কাজ নয়। যারা এ ধরনের আলাপ আলোচনা করে তারা কেমন চরিত্রের লোক, যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এরূপ আলোচনা করা হয় তা কি ধরনের পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং যে কথাবার্তা এভাবে গোপনে অনুষ্ঠিত হয় তা কি ধরনের কথাবার্তা, তার ওপরই এর বৈধতা বা অবৈধতা নির্ভরশীল। সমাজে যাদের সততা, ন্যায়নিষ্ঠতা ও নির্মল চরিত্রের সর্বব্যাপী-খ্যাতি ও পরিচিতি বিরাজমান, তারা কোথাও গোপন পরামর্শে লিপ্ত দেখলে কারো মনে এরূপ সন্দেহ জন্মে না যে, তারা কোন দুরভিসন্ধিতে বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে সমাজে যারা অনাচার ও অপকর্মের হোতা এবং দুশ্চরিত্র রূপে খ্যাত, তাদের গোপন সলাপরামর্শ যে কোন মানুষের মনে এরূপ খট্‌কা ও শংকার জন্ম দেয় যে, একটা কিছু গোলযোগ পাকানোর প্রস্তুতি নিশ্চয়ই চলছে। ঘটনাচক্রে কখনো দু'চার ব্যক্তি কোন ব্যাপারে চুপিসারে কিছু আলোচনা সেরে নিলে সেটা কোন আপত্তিকর ব্যাপার হয় না। কিন্তু কিছু লোক যদি নিজেদের একটা আলাদা স্থায়ী দল বানিয়ে নেয় এবং সাধারণ মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হরহামেশা গোপন সলাপরামর্শ চালাতে থাকে, তাহলে সেটা অবশ্যই একটা দুর্যোগের পূর্বলক্ষণ। আর না হোক, এ দ্বারা অন্তত এতটুকু ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী যে, এতে মুসলমানদের মধ্যে দলাদলির ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে। সর্বোপরি, যে জিনিসের ওপর এসব গোপন সলাপরামর্শের বৈধ বা অবৈধ হওয়া নির্ভর করে। তা হচ্ছে এ গোপন সলাপরামর্শের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু। দুই ব্যক্তি যদি কোন ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে, কারো কোন ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করিয়ে দেয়ার মানসে, অথবা কোন ভালো কাজে অংশ গ্রহণের লক্ষে গোপন আলাপ আলোচনা করে, তবে তা কোন অন্যায় কাজ নয়, বরং তা সওয়াবের কাজ। পক্ষান্তরে একাধিক ব্যক্তির সলাপরামর্শের উদ্দেশ্য যদি হয় কোন গোলযোগ ও নাশকতা সংঘটিত করার চক্রান্ত করা, কারো অধিকার নষ্ট করা কিংবা কোন পাপকাজ সংঘটিত করার ফন্দি আঁটা—তাহলে এরূপ অসদুদ্দেশ্য পোষণ করাটাই যে এক দুষ্কৃতি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এই অসদুদ্দেশ্য নিয়ে গোপন সলাপরামর্শ করা দ্বিগুণ পাপ ও দুষ্কৃতি।

এ ব্যাপারে যে মজলিসী রীতিনীতি রসূল (সা) শিক্ষা দিয়েছেন তা এই যে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا
يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١﴾
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ
صَدَقَةً ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ۭ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

হে ঈমানদারগণ! মজলিসে জায়গা করে দিতে বলা হলে জায়গা করে দিও, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রশস্ততা দান করবেন।[২৬] আর যখন চলে যেতে বলা হবে, তখন চলে যেও।[২৭] তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদের মর্যাদা আল্লাহ উন্নীত করবেন।[২৮] বস্তুত আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত।

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন রসূলের সাথে গোপন আলাপ কর তখন আলাপ করার আগে কিছু সদকা দিয়ে নাও।[২৯] এটা তোমাদের জন্য অপেক্ষাকৃত ভালো ও পবিত্র। তবে যদি সদকা দিতে কিছু না পাও তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فان ذالك يحزنه

"যখন তিন ব্যক্তি এক জায়গায় বসা থাকবে, তখন তাদের মধ্য থেকে দু'জনের তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে গোপন সলাপরামর্শ করা উচিত নয়। কেননা, এটা তৃতীয় ব্যক্তির মনোকষ্টের কারণ হবে। "(বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

অপর হাদীসে রসূল (সা) বলেন ঃ

فلا يتناجى اثنان دون الثالث الا باذنه فان ذلك يحزنه

"তৃতীয় ব্যক্তির অনুমতি না নিয়ে তাকে বাদ দিয়ে দু'জনে গোপন আলোচনা করা চাই না। কারণ সেটা তার জন্য মনোপীড়াদায়ক হবে।" (মুসলিম)

দুই ব্যক্তি যদি তৃতীয় ব্যক্তির উপাস্থিতিতেই সে বুঝতে পারে না এমন ভাষায় কথা বলে, তবে সেটাও এ অবৈধ গোপন সংলাপের আওতায় আসে। এরচেয়েও জঘন্য অবৈধ কাজ–হলো গোপন সংলাপের সময় কারো দিকে এমনভাবে তাকানো বা ইশারা করা, যাতে বুঝা যায় যে, তাকে নিয়েই তাদের কথাবার্তা চলছে।

২৫. একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, কতিপয় ব্যক্তির গোপন সলাপরামর্শ দেখে কোন মুসলমানের মনে যদি এরূপ সন্দেহ জন্মেও যায় যে, এসব সলাপরামর্শ তার বিরুদ্ধেই

চলছে, তা হলেও তার এতটা দুঃখ পাওয়া ও ঘাবড়ে যাওয়া উচিত নয় যে, নিছক সন্দেহের বশেই কোন পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তা তাকে পেয়ে বসে, অথবা তার মনে কোন দুশ্চিন্তা, বিদ্বেষ অথবা অস্বাভাবিক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সঞ্চার হতে থাকে। তার বুঝা উচিত যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। এ আস্থা ও প্রত্যয় তার মনে এমন দুর্জয় শক্তির জন্ম দেবে যে, অনেক ভিত্তিহীন শংকা এবং কাল্পনিক ভয়ভীতি ও উৎকণ্ঠা থেকে সে মুক্তি পেয়ে যাবে। দুষ্কৃতিকারীদের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন ও নিশ্চিন্ত মনে আপন কাজে নিয়োজিত থাকবে। আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল মু'মিন ব্যক্তি এমন অস্থিরচিত্ত হয় না যে, যে কোন ভীতি ও আশংকা তার মনকে বিচলিত ও অশান্ত করে তুলবে। সে এতটা হীনমনাও হয় না যে, দুষ্কৃতিকারীদের উস্কানিতে উত্তেজিত ও ধৈর্যহারা হয়ে নিজেও ইনসাফ বিরোধী কার্যকলাপ করতে আরম্ভ করবে।

২৬. সূরার ভূমিকায় এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কতক মুফাস্‌সির এ আদেশকে শুধুমাত্র রসূল (সা) এর মজলিসের মধ্যে সীমিত মনে করেছেন। তবে ইমাম মালেক প্রমূখের এ মতটিই সঠিক যে, মুসলমানদের সকল বৈঠকাদির জন্য এটি একটি স্থায়ী বিধি। আল্লাহ ও তার রসূল মুসলিম জাতিকে যে সামাজিক রীতিনীতি, আদব আখলাক ও আচার ব্যবহার শিখিয়েছেন। এটি তার অন্যতম। আগে থেকে কিছু লোক বসে আছে এমন একটি মজলিসে যখন আরো কিছু লোক যোগ দেবে, তখন আগের সমবেত লোকদের মধ্যে এ সৌজন্য বোধ থাকা বাঞ্ছনীয় যে, স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে নবাগতদের জন্য জায়গা করে দেবে এবং নিজেরা যথাসম্ভব চেপে বসে তাদের বসার সুযোগ করে দেবে। আবার নবাগতদের মধ্যেও এতটা ভদ্রতা থাকা উচিত যে, তারা যেন জোর জবরদস্তির সাথে ভেতরে না ঢোকে এবং একজনকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসার চেষ্টা না করে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ও হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হাদীসে রসূল (সা) বলেছেন ঃ

لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا –

"কেউ যেন কাউকে উঠিয়ে তার জায়গায় না বসে। তোমরা বরং স্বেচ্ছায় অন্যদের জন্য জায়গা করে দাও।" (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ

لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما

"দু'জনের মাঝখানে তাদের অনুমতি ছাড়া জোর পূর্বক চেপে বসা বৈধ নয়।"
(মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

২৭. আবদুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম জানান যে, লোকেরা রসূল (সা) এর মজলিসে দীর্ঘ সময় বসে থাকতো এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বসে থাকার চেষ্টা করতো। এতে অনেক সময় রসূল (সা) এর কষ্ট হতো। তাঁর বিশ্রামের যেমন বিঘ্ন ঘটতো, তেমনি কাজকর্মেও অসুবিধার সৃষ্টি হতো। এজন্য এ আদেশ নাযিল হয় যে, যখন চলে যেতে বলা হয় তখন চলে যাও। (ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর)

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ؕ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا
وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

গোপন আলাপ-আলোচনা করার আগে সদকা দিতে হবে ভেবে তোমরা ঘাবড়ে গেলে না কি? ঠিক আছে, সেটা যদি না করতে চাও,—বস্তুত আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে অব্যাহতি দিয়ে দিয়েছেন।—তাহলে নামায কায়েম করতে ও যাকাত দিতে থাকো এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ নিষেধ মেনে চলতে থাকো। মনে রেখো তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ ওয়াকিফহাল।[৩০]

২৮. অর্থাৎ এরূপ ভেবো না যে, রসূল (সা) এর মজলিসে অন্যদেরকে জায়গা করে দিতে গিয়ে যদি তোমাদের তার কাছ থেকে একটু দূরে গিয়ে বসতে হয় তাহলে তোমাদের সম্মান হানি ঘটবে, কিংবা তোমাদেরকে চলে যেতে বলা হলে তোমাদের অবমাননা হবে। মর্যাদা বৃদ্ধির আসল উৎস হলো ঈমান ও ইসলামী জ্ঞান। রসূল (সা) এর মজলিসে কে তার কতটা নিকটে বসলো, এবং কে কত বেশী সময় বসে কাটালো, তা দ্বারা কারো সম্মান নিরূপিত হয় না। কেউ যদি রসূল (সা) এর খুব কাছাকাছি বসতে পারে। তাহলেই যে তার মর্যাদা বেড়ে যাবে তা নয়। মর্যাদা বাড়বে তারই যার ঈমান ও ইসলামী জ্ঞান বেশী হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি বেশী সময় বসে থেকে আল্লাহর রসূলকে বিব্রত করে তাহলে সে বরঞ্চ মূর্খতার কাজই করে। শুধুমাত্র রসূলের (সা) কাছে বেশী সময় বসে থাকার করণে কারো মর্যাদা বেশী হবে না। আল্লাহর কাছে অধিকতর মর্যাদা হবে সে ব্যক্তির যে রসূল (সা) এর সাহচর্য দ্বারা ঈমান ও ইসলামী জ্ঞানের মত অমূল্য সম্পদ আহরণ করেছে এবং মু'মিন সুলভ স্বভাব ও চরিত্র অর্জন করেছে।

২৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুসারে এ আদেশের কারণ এই যে, মুসলমানরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে (নিভৃতে কথা বলার আবেদন জানিয়ে) এত বেশী জিজ্ঞাসাবাদ করতো যে, তিনি বিরক্ত হয়ে ওঠেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁর ওপর থেকে এ বোঝা হালকা করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। (ইবনে জারীর) যায়েদ বিন আসলাম বলেন যে, যে কেউ রসূল (সা) এর সাথে নিভৃতে কথা বলতে চাইতো, তিনি তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করতেন না। যার ইচ্ছা হতো, এসে বলতো, আমি একটু নিভৃতে কথা বলতে চাই। আর রসূল (সা) তাতে সম্মতি দিতেন। এতে পরিস্থিতি এত দূর গড়ালো যে, নিভৃতে বলার আদৌ প্রয়োজন হয় না এমন ব্যাপারেও অনেকে রসূল (সা)-কে কষ্ট দিতে লাগলো। এ সময়টা ছিল এমন যে, সমগ্র আরব মদীনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। কখনো কখনো এমনও হতো যে, কোন ব্যক্তি এভাবে রসূল (সা)-এর সাথে গোপনে কথা বলার পর শয়তান মানুষের কানে কানে রটিয়ে দিত যে, এ লোকটি অমুক গোত্র কবে মদীনায় আক্রমণ চালাবে সে খবর দিয়ে গেল। এভাবে মদীনায় গুজবের

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ
وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا
شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً
فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٦﴾ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ
وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿١٧﴾

৩ রুকূ'

তুমি কি তাদের দেখনি যারা এমন এক গোষ্ঠীকে বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে যারা আল্লাহর গযবে নিপতিত।[৩১] তারা তোমাদেরও নয়, তাদেরও নয়।[৩২] তারা জেনে ও বুঝে মিথ্যা বিষয়ে কসম করে।[৩৩] আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। তারা যা করছে তা অত্যন্ত মন্দ কাজ। তারা নিজেদের কসমকে ঢাল বানিয়ে রেখেছে। এর আড়ালে থেকে তারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেয়।[৩৪] এ কারণে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব। আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের অর্থ-সম্পদ যেমন কাজে আসবে না, তেমনি সন্তান-সন্ততিও কোন কাজে আসবে না। তারা দোযখের উপযুক্ত, সেখানেই তারা চিরদিন থাকবে।

ছড়াছড়ি হতো। অপর দিকে মুসলমানদের এরূপ আচরণের দরুন মুনাফিকরা একথা বলার সুযোগ পেয়ে যেতো যে, মুহাম্মাদ (সা) যে যা বলে তাই শোনেন, সত্য মিথ্যার বাছবিচার করেন না। এসব কারণে আল্লাহ এ বিধিনিষেধ আরোপ করলেন যে, যে ব্যক্তি রসূল (সা) এর সাথে গোপনে কথা বলতে চাইবে, তার আগে সাদকা দিতে হবে। (আহকামুল কুরআন ইবনুল আরাবী) কাতাদাহ বলেন যে, অন্যদের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার উদ্দেশ্যে কেউ কেউ রসূল (সা) এর সাথে নিভৃতে কথা বলতো।

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ এ আদেশ নাযিল হবার পর রসূল (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, সাদকা কত ধার্য করা উচিত? এক দীনার? আমি বললাম, এটা মানুষের সাধ্যের বাইরে হবে। তিনি বললেন ঃ আধা দীনার? আমি বললাম, এটাও তাদের ক্ষমতার আওতাবহির্ভূত। তিনি বললেন, তাহলে কত? আমি বললাম, একটি জবের দানা পরিমাণ স্বর্ণ। তিনি বললেন, انك لزهيد অর্থাৎ তুমি খুবই কম পরিমাণের পরামর্শ দিলে। (ইবনে

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ
اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٨﴾ اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ
فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ
الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اُولٰٓئِكَ فِى الْاَذَلِّيْنَ ﴿٢٠﴾
كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢١﴾

যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে জীবিত করে উঠাবেন সেদিন তাঁর সামনেও তারা ঠিক সেভাবে কসম করবে যেমন তোমাদের সামনে কসম করে থাকে[৩৫] এবং মনে করবে এভাবে তাদের কিছু কাজ অন্তত হবে। ভাল করে জেনে রাখো, তারা যারপর নাই মিথ্যাবাদী। শয়তান তাদের ওপর চেপে বসেছে এবং তাদের অন্তর থেকে আল্লাহর স্মরণ মুছে দিয়েছে। তারা শয়তানের দলভুক্ত লোক। সাবধান! শয়তানের দলভুক্ত লোকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের মোকাবিলা করে নিসন্দেহে তারা নিকৃষ্টতর সৃষ্টি। আল্লাহ লিখে দিয়েছেন যে, তিনি এবং তাঁর রসূল অবশ্যই বিজয়ী হবেন।[৩৬] প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মহা শক্তিমান ও পরাক্রমশালী।

জারীর, তিরমিযী, মুসনাদে আবু ইয়া'লা) অপর এক বর্ণনা মতে হযরত আলী (রা) বলেন ঃ এটি কুরআনের এমন এক আয়াত যা আমি ছাড়া আর কেউ বাস্তবায়িত করেনি। এ আদেশ আশা মাত্রই আমি একটি সাদকা দিয়ে রসূল (সা) এর কাছ থেকে একটি মাসয়ালা গোপনে জেনে নেই। (ইবনে জারীর, হাকেম, ইবনুল মুনযির, আবদ বিন হুমাইদ)

৩০. উপরোক্ত নির্দেশের অল্প দিন পরে এ দ্বিতীয় নির্দেশটি নাযিল হয়। এর দ্বারা সাদকার বাধ্যবাধকতা রহিত হয়। সাদকার বাধ্যবাধকতা কতদিন ছিল, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কাতাদাহ বলেন, একদিনের চেয়েও কম সময় চালু ছিল, তারপর রহিত হয়ে যায়। মুকাতেল বিন হাইয়ান বলেন, দশদিন ছিল। এটাই এ আদেশ বহাল থাকার সর্বোচ্চ বর্ণিত মেয়াদ।

৩১. এখানে মদীনার ইহুদীদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, মুনাফিকরা এসব ইহুদীদেরকেই বন্ধু বানিয়ে রেখেছিল।

৩২. অর্থাৎ মুসলমান বা ইহুদী কারো সাথেই তাদের আন্তরিক সম্পর্ক ছিল না। নিজেদের স্বার্থের কারণেই তারা উভয়ের সাথে সম্পর্ক পাতিয়ে রেখেছিল।

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ
اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَيُدْخِلُهُمْ
جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ
رَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٢٢﴾

তোমরা কখনো এমন দেখতে পাবে না যে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে তারা এমন লোকদের ভাল বাসছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধীতা করেছে। তারা তাদের পিতা, অথবা পুত্র অথবা ভাই অথবা গোষ্ঠীভুক্ত[৩৭] হলেও তাতে কিছু এসে যায় না। আল্লাহ এসব লোকদের হৃদয়-মনে ঈমান বদ্ধমূল করে দিয়েছেন এবং নিজের পক্ষ থেকে একটি 'রূহ' দান করে তাদের শক্তি যুগিয়েছেন। তিনি তাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। তারা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। তারা আল্লাহর দলের লোক। জেনে রেখো আল্লাহর দলের লোকেরাই সফলকাম।

৩৩. অর্থাৎ তারা এই বলে মিথ্যামিথ্যি কসম খায় যে, তারা ঈমান এনেছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের নেতা ও পথ প্রদর্শনকারী হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের প্রতি বিশ্বস্ত আছে।

৩৪. এর অর্থ একদিকে তারা নিজেদের ঈমান ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কসম খেয়ে মুসলমানদের আক্রোশ থেকে নিজেদের রক্ষা করে, অপরদিকে মানুষের মধ্যে ইসলাম, ইসলামের অনুসারী এবং ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে নানা রকম সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে যাতে মানুষ এ কথা চিন্তা করে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত থাকে যে, ইসলামের ঘরের লোকেরাই যখন একথা বলছে তখন এর মধ্যে ব্যাপার কিছু একটা অবশ্যই আছে।

৩৫. অর্থাৎ তারা শুধু দুনিয়াতেই এবং শুধু মানুষের সামনেই মিথ্যা মিথ্যা শপথ করে না। আখরাতে আল্লাহ তা'আলার সামনেও তারা মিথ্যা শপথ করা থেকে বিরত হবে না। মিথ্যা এবং প্রতারণা তাদের মনের এত গভীরে স্থান করে নিয়েছে যে, মৃত্যুর পরও এরা তা থেকে মুক্ত হতে পারবে না।

৩৬. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আস্ সাফফাত, টীকা-৯৩।

৩৭. এ আয়াতে দুইটি কথা বলা হয়েছে। একটি নীতি কথা। অন্যটি প্রকৃত ঘটনার বর্ণনা। নীতি কথায় বলা হয়েছে যে, সত্য দীনের প্রতি ঈমান এবং দীনের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা দু'টি সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী জিনিস। এ দু'টি জিনিসের একত্র সমাবেশ বা অবস্থান কোনভাবে কল্পনাও করা যায় না। ঈমান এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শত্রুদের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব একই হৃদয়ে একত্রিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। কোন মানুষের হৃদয়ে যখন একই সাথে নিজের প্রতি ভালবাসা এবং শত্রুর প্রতি ভালবাসা একত্রিত হতে পারে না তখন এটাও ঠিক অনুরূপ ব্যাপার। অতএব তোমরা যদি কাউকে দেখো, সে ঈমানের দাবীও করে এবং সাথে সাথে ইসলাম বিরোধী লোকদের সাথে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্কও রাখে তাহলে তোমাদের মনে কখনো যেন এ ভুল ধারণা না জন্মে যে, এ আচরণ সত্ত্বেও সে তার ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী। অনুরূপ যেসব লোক একই সাথে ইসলাম ও ইসলাম বিরোধীদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলছে সে নিজেও যেন তার এ অবস্থান ভালভাবে চিন্তা ভাবনা করে দেখে যে, প্রকৃতপক্ষে সে কি, মু'মিন না মুনাফিক? সে প্রকৃতপক্ষে কি হতে চায়, মু'মিন হয়ে থাকতে চায়, না মুনাফিক হয়ে? তার মধ্যে যদি সততার লেশমাত্রও থেকে থাকে এবং মুনাফিকীর আচরণ যে নৈতিক দিক দিয়ে মানুষের জন্য নিকৃষ্টতম আচরণ এ বিষয়ে তার মধ্যে সামান্যতম অনুভূতিও থাকে তা হলে তার উচিত একই সাথে দুই নৌকায় আরোহণের চেষ্টা পরিত্যাগ করা। ঈমান এ ব্যাপারে তার কাছে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত দাবী করে। সে যদি মু'মিন থাকতে চায় তা হলে যেসব সম্পর্ক ও বন্ধন ইসলামের সংগে তার সম্পর্ক ও বন্ধনের সাথে সাংঘর্ষিক তার সবই তাকে বর্জন করতে হবে। ইসলামের সাথে সম্পর্কের চাইতে অন্য কোন সম্পর্ক প্রিয়তর হয়ে থাকলে ঈমানের মিথ্যা দাবী ছেড়ে দেয়াই উত্তম।

এটি ছিল নীতিগত কথা। কিন্তু এখানে আল্লাহ তা'আলা শুধু নীতি বর্ণনা করাই যথেষ্ট মনে করেননি। বরং ঈমানের দাবীদারদের সামনে নমুনা স্বরূপ এ বাস্তব ঘটনাও পেশ করেছেন যে, সত্যিকার ঈমানদারগণ বাস্তবে সবার চোখের সামনে সে সম্পর্ক ও বন্ধন ছিন্ন করেছিল যা আল্লাহর দীনের সাথে তাদের সম্পর্কের পথে প্রতিবন্ধক ছিল। এটা ছিল এমন একটা ঘটনা যা বদর ও উহুদ যুদ্ধের সময় সমগ্র আরব জাতি প্রত্যক্ষ করেছিল। যেসব সাহাবায়ে কিরাম মক্কা থেকে হিজরত করে এসেছিলেন তারা শুধু আল্লাহ এবং তাঁর দীনের খাতিরে নিজেদের গোত্র এবং ঘনিষ্টতর নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। হযরত আবু উবাইদাহ তাঁর নিজের পিতা আবদুল্লাহ ইবনে জাররাহকে হত্যা করেছিলেন। হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের আপন ভাই উবাইদ ইবনে উমায়েরকে হত্যা করেছিলেন। হযরত উমর (রা) তাঁর মামা আস ইবনে হিশাম ইবনে মুগীরাহকে হত্যা করেন। হযরত আবু বকর (রা) তাঁর পুত্র আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত হয়েছিলেন। হযরত আলী, হযরত হামযা এবং হযরত উবাইদা ইবনুল হারেস তাঁদের নিকটাত্মীয় উতবা, শায়বা এবং ওয়ালীদ ইবনে উতবাকে হত্যা করেছিলেন। বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে হযরত উমর (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাদের সবাইকে হত্যা করার আবেদন করে বলেছিলেন, আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিকটাত্মীয়কে হত্যা করবে। এ বদর যুদ্ধেই এক আনসারী হযরত মুসআব ইবনে উমায়েরের আপন ভাই আবু আযীয ইবনে উমায়েরকে পাকড়াও করে বাঁধছিলেন। তা

দেখে হযরত মুসআব চিৎকার করে বললেন ঃ বেশ শক্ত করে বাঁধো। এর মা অনেক সম্পদশালিনী। এর মুক্তির জন্য সে তোমাদেরকে অনেক মুক্তিপণ দিবে। একথা শুনে আবু আযীয বললোঃ তুমি ভাই হয়ে একথা বলছো? জবাবে হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের বললেন ঃ এ মুহূর্তে তুমি আমার ভাই নও, বরং যে আনসারী তোমাকে পাকড়াও করছে সে আমার ভাই। বদর যুদ্ধেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামাতা আবুল আস বন্দী হয়ে আসলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামাতা হওয়ার কারণে তার সাথে অন্য সব কয়েদী থেকে ভিন্ন বিশেষ কোন সৌজন্যমূলক আচরণ করা হয়নি। খাঁটি ও নিষ্ঠাবান মুসলমান কাকে বলে এবং আল্লাহ ও তাঁর দীনের সাথে তাদের সম্পর্ক কি এভাবে বাস্তবে তা দুনিয়াকে দেখানো হয়েছে।

দায়লামী হযরত মুয়ায থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ দোয়াটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

اللهم لا تجعل لفاجر (وفى رواية لفاسق) على يدا ولا نعمة فيوده قلبى فانى وجدت فيما اوحيت الى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله -

"হে আল্লাহ আমাকে কোন পাপী লোকের দ্বারা (অপর একটি বর্ণনায় আছে ফাসেক) উপকৃত হতে দিও না। তাহলে আমার মনে তার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হবে। কারণ, তোমার নাযিলকৃত অহীর মধ্যে আমি একথাও পেয়েছি যে, আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণকারী লোকদেরকে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে না।"

আল হাশর

৫৯

নামকরণ

সূরাটির দ্বিতীয় আয়াতের اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ অংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যার মধ্যে 'আল হাশর' শব্দের উল্লেখ আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে সা'ঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে সূরা হাশর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ সূরা আনফাল যেমন বদর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল তেমনি সূরা হাশর বনী নাযীর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। হযরত সা'ঈদ ইবনে যুবাইরের দ্বিতীয় বর্ণনায় ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য এরূপ قُلْ سُوْرَةُ النَّضِيْرِ অর্থাৎ এরূপ বলো যে, এটা সূরা নাযীর। মুজাহিদ, কাতাদা, যুহরী, ইবনে যায়েদ, ইয়াযীদ ইবনে রুমান, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক এবং অন্যদের থেকেও একথাটিই বর্ণিত হয়েছে। তাদের সবার ঐকমত্যভিত্তিক বর্ণনা হলো, এ সূরাতে যেসব আহলে কিতাবের বহিষ্কারের উল্লেখ আছে তারা বনী নাযীর গোত্রেরই লোক। ইয়াযীদ ইবনে রুমান, মুজাহিদ এবং মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বক্তব্য হলো, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা সূরাটিই বনী নাযীর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, এ যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়েছিল ? এ সম্পর্কে ইমাম যুহরী উরওয়া ইবনে যুবায়েরের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, এ যুদ্ধ বদর যুদ্ধের ছয় মাস পরে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু ইবনে সা'দ, ইবনে হিশাম এবং বালাযুরী একে হিজরী চতুর্থ সনের রবিউল আউয়াল মাসের ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন। আর এটিই সঠিক মত। কারণ সমস্ত বর্ণনা এ বিষয়ে একমত যে, এ যুদ্ধ 'বি'রে মা'উনা'র দুঃখজনক ঘটনার পরে সংঘটিত হয়েছিল। এ বিষয়টিও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, 'বি'রে মা'উনা'র মর্মান্তিক ঘটনা ওহুদ যুদ্ধের পরে ঘটেছিল—আগে নয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এ সূরার বিষয়বস্তু ভালভাবে বুঝতে হলে মদীনা ও হিজাযের ইহুদীদের ইতিহাসের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। তা নাহলে নবী (সা) তাদের বিভিন্ন গোত্রের সাথে যে আচরণ করেছিলেন তার প্রকৃত কারণসমূহ কি ছিল কেউ তা সঠিকভাবে জানতে পারবে না।

আরবের ইহুদীদের নির্ভরযোগ্য কোন ইতিহাস দুনিয়ায় নেই। তারা নিজেরাও পুস্তক বা শিলালিপি আকারে এমন কোন লিখিত বিষয় রেখে যায়নি যা তাদের অতীত ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করতে পারে। তাছাড়া আরবের বাইরের ইহুদী ঐতিহাসিক কিংবা লেখকগণও তাদের কোন উল্লেখ করেননি। এর কারণ হিসেবে বলা হয়, আরব উপদ্বীপে এসে তারা তাদের স্বজাতির অন্য সব জাতি–গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাই দুনিয়ার ইহুদীরা তাদেরকে স্বজাতীয় লোক বলে মনেই করতো না। কারণ তারা ইহুদী সভ্যতা–সংস্কৃতি, ভাষা এমনকি নাম পর্যন্ত পরিত্যাগ করে আরবী ভাবধারা গ্রহণ করেছিল। হিজাযের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদির মধ্যে যেসব শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে তাতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বে ইহুদীদের কোন নাম নিশানা বা উল্লেখ পাওয়া যায় না। এতে শুধুমাত্র কয়েকজন ইহুদীর নাম পাওয়া যায়। এ কারণে আরব ইহুদীদের ইতিহাসের বেশীর ভাগ আরবদের মধ্যে প্রচলিত মৌখিক বর্ণনার ওপরে নির্ভরশীল। এরও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ইহুদীদের নিজেদেরই প্রচারিত।

হিজাযের ইহুদীরা দাবী করতো যে, তারা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জীবনকালের শেষদিকে সর্বপ্রথম এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। এই কাহিনী বর্ণনা করে তারা বলতো, হযরত মূসা (আ) আমালেকাদের বহিষ্কারের উদ্দেশ্যে তাঁর একটি সেনাদলকে ইয়াসরিব অঞ্চল দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ঐ জাতির কোন ব্যক্তিকেই যেন জীবিত রাখা না হয়। বনী ইসরাঈলদের এই সেনাদল নবীর নির্দেশ মোতাবেক কাজ করল। তবে, আমালেকাদের বাদশার একটি সুদর্শন যুবক ছেলে ছিল। তারা তাকে হত্যা করল না। বরং সাথে নিয়ে ফিলিস্তিনে ফিরে গেল। এর পূর্বেই হযরত মূসা (আ) ইনতিকাল করেছিলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গ এতে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। তারা বললেন ঃ একজন আমালেকীকেও জীবিত রাখা নবীর নির্দেশ এবং মূসার শরীয়াতের বিধি–বিধানের স্পষ্ট লংঘন। তাই তারা উক্ত সেনাদলকে তাঁদের জামায়াত থেকে বহিষ্কার করে। বাধ্য হয়ে দলটিকে ইয়াসরিবে ফিরে এসে এখানেই বসবাস করতে হয়। (কিতাবুল আগানী, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা–৯৪) এভাবে ইহুদীরা যেন দাবী করছিল যে, খৃষ্টপূর্ব ১২শ' বছর পূর্বে থেকেই তারা এখানে বসবাস করে আসছে। কিন্তু বাস্তবে এর পেছনে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। সম্ভবত এ কাহিনী তারা এ জন্য গড়ে নিয়েছিল যাতে আরবের অধিবাসীদের কাছে তারা নিজেদের সুপ্রাচীন ও অভিজাত হওয়া প্রমাণ করতে পারে।

ইহুদীদের নিজেদের বর্ণনা অনুসারে খৃষ্টপূর্ব ৫৮৭ সনে বাস্তুভিটা ত্যাগ করে আরেকবার এদেশে তাদের আগমন ঘটেছিল। এই সময় বাবেলের বাদশাহ 'বখতে নাস্‌সার' বায়তুল মাকদাস ধ্বংস করে ইহুদীদেরকে সারা পৃথিবীতে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। আরবের ইহুদীরা বলতো, সেই সময় আমাদের কিছু সংখ্যক গোত্র এসে ওয়াদিউল কুরা, তায়মা এবং ইয়াস্‌রিবে বসতি স্থাপন করেছিল। (ফুতূহুল বুলদান, আল বালাযুরী) কিন্তু এর পেছনেও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। অসম্ভব নয় যে, এর মাধ্যমেও তারা তাদের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করতে চায়।

প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি প্রমাণিত তা হলো, ৭০ খৃষ্টাব্দে রোমানরা যখন ফিলিস্তিনে ইহুদীদের ওপর গণহত্যা চালায় এবং ১৩২ খৃষ্টাব্দে এই ভূখণ্ড থেকে তাদের

সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কার করে সেই সময় বহু সংখ্যক ইহুদী গোত্র পালিয়ে হিজাযে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো। কেননা, এই এলাকা ছিল ফিলিস্তিনের দক্ষিণাঞ্চল সংলগ্ন। এখানে এসে তারা যেখানেই ঝর্ণা ও শ্যামল উর্বর স্থান পেয়েছে সেখানেই বসতি গড়ে তুলেছে এবং পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে ষড়যন্ত্র ও সুদী কারবারের মাধ্যমে সেসব এলাকা কুক্ষিগত করে ফেলেছে। আয়লা, সাকনা, তাবুক, তায়মা, ওয়াদিউল কুরা, ফাদাক এবং খায়বরের ওপরে এই সময়েই তাদের আধিপত্য কায়েম হয়েছিলো। বনী কুরাইযা, বনী নাযীর, বনী বাহদাল এবং বনী কায়নুকাও এ সময়ই আসে এবং ইয়াসরিবের ওপর আধিপত্য কায়েম করে।

ইয়াসরিবে বসতি স্থাপনকারী ইহুদী গোত্রসমূহের মধ্যে বনী নাযীর ও বনী কুরায়যা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ তারা ইহুদী পুরোহিত (Cohens বা Priests) শ্রেণীর অন্তরভুক্ত ছিল। ইহুদীদের মধ্যে তাদের অভিজাত বলে মান্য করা হতো এবং স্বজাতির মধ্যে তারা ধর্মীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল। এরা যে সময় মদীনায় এসে বসতি স্থাপন করে তখন কিছু সংখ্যক আরব গোত্রও এখানে বসবাস করতো। ইহুদীরা তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং কার্যত শস্য–শ্যামল উর্বর এই ভূখণ্ডের মালিক মোখতার হয়ে বসে। এর প্রায় তিন শ' বছর পরে ৪৫০ অথবা ৪৫১ খৃষ্টাব্দে ইয়ামানে সেই মহাপ্লাবন আসে সূরা সাবার দ্বিতীয় রুকূ'তে যার আলোচনা করা হয়েছে। এই প্লাবনের কারণে সাবা কওমের বিভিন্ন গোত্র ইয়ামান ছেড়ে আরবের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। এদের মধ্য থেকে গাস্সানীরা সিরিয়ায়, লাখামীরা হীরায় (ইরাক), বনী খুযা'আ জিদ্দা ও মক্কার মধ্যবর্তী এলাকায় এবং আওস ও খাযরাজ ইয়াসরিবে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। ইহুদীরা যেহেতু আগে থেকেই ইয়াসরিবের ওপর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল। তাই প্রথম প্রথম তারা আওস ও খাযরাজ গোত্রকে কর্তৃত্ব চালানোর কোন সুযোগ দেয়নি। তাই এ দু'টি আরব গোত্র অনুর্বর এলাকায় বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হয় যেখানে জীবন ধারণের ন্যূনতম উপকরণও তারা খুব কষ্টে সংগ্রহ করতে পারতো। অবশেষে তাদের একজন নেতা তাদের স্বগোত্রীয় গাসসানী ভাইদের সাহায্য প্রার্থনা করতে সিরিয়া গমন করে এবং সেখান থেকে একটি সেনাদল এনে ইহুদীদের শক্তি চূর্ণ করে দেয়। এভাবে আওস ও খাযরাজ ইয়াসরিবের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও আধিপত্য লাভ করে এবং ইহুদীদের দু'টি বড় গোত্র বনী নাযীর ও বনী কুরায়যা শহরের বাইরে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হয়। তৃতীয় আরেকটি ইহুদী গোত্র বনী কায়নুকার যেহেতু বনু কুরাইযা ও বনু নাজীর গোত্রের সাথে তিক্ত সম্পর্ক ছিল তাই তারা শহরের ভেতরেই থেকে যায়। তবে এখানে থাকার জন্য তাদেরকে খাযরাজ গোত্রের নিরাপত্তামূলক ছত্রছায়া গ্রহণ করতে হয়। এর বিরুদ্ধে বনী নাযীর ও বনী কুরায়যা গোত্রকে আওস গোত্রের নিরাপত্তামূলক আশ্রয় নিতে হয় যাতে তারা নিরাপদে ইয়াসরিবের আশেপাশে বসবাস করতে পারে। নীচের মানচিত্র দেখলে স্পষ্ট বুঝা যাবে, এই নতুন ব্যবস্থা অনুসারে ইয়াসরিব এবং তার আশেপাশে কোথায় কোথায় ইহুদী বসতি ছিল।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় আগমনের পূর্বে হিজরাতের সূচনাকাল পর্যন্ত সাধারণভাবে গোটা হিজাযের এবং বিশেষভাবে ইয়াসরিবে ইহুদীদের অবস্থা ও পরিচয় মোটামুটি এরূপ ছিল ঃ

হিজরতের পর মদীনায় ইয়াহুদী অবস্থানসমূহ

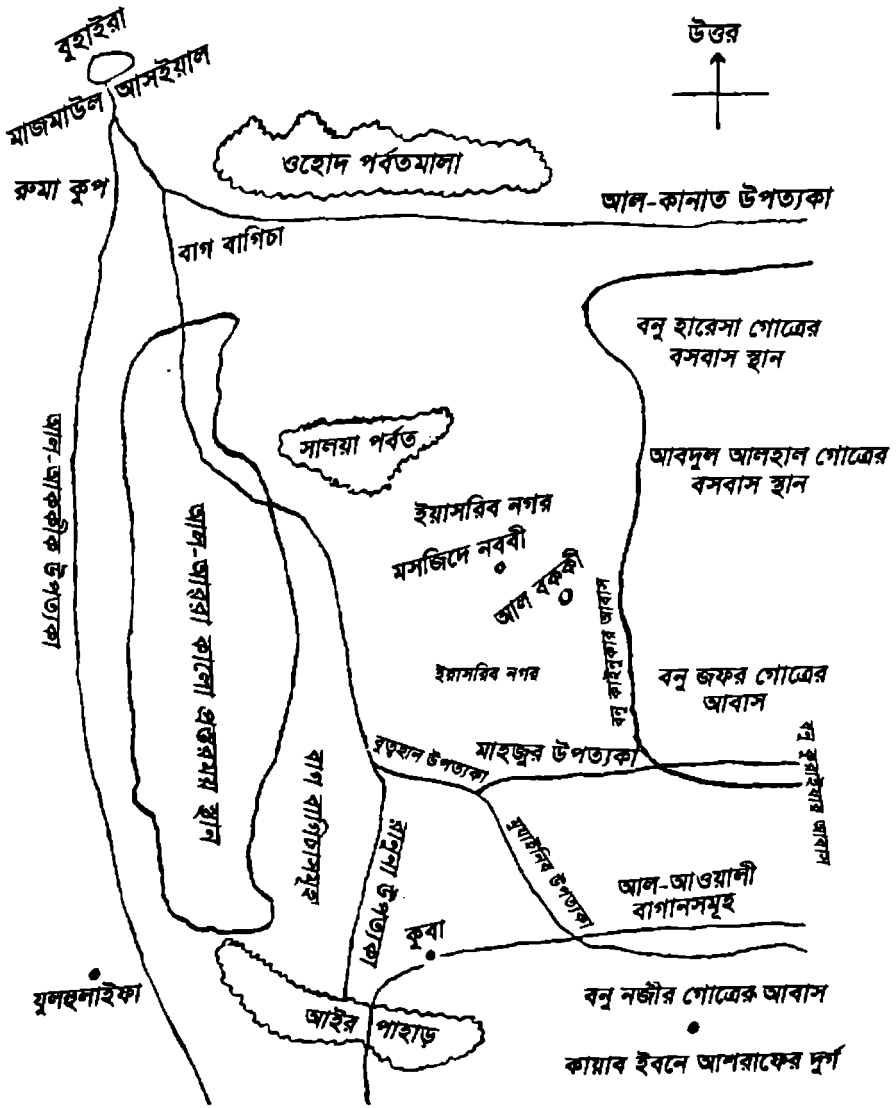

ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, তাহযীব, তামাদ্দুন সবদিক দিয়ে তারা আরবী ভাবধারা গ্রহণ করে নিয়েছিল। এমনকি তাদের অধিকাংশের নামও হয়ে গিয়েছিল আরবী। হিজাযে বসতি স্থাপনকারী ইহুদী গোত্র ছিল বারটি। তাদের মধ্যে একমাত্র বনী যা'য়ুরা ছাড়া আর কোন গোত্রেরই হিব্রু নাম ছিল না। হাতেগোণা কয়েকজন ধর্মীয় পণ্ডিত ছাড়া তাদের কেউ-ই হিব্রু ভাষা জানত না। জাহেলী যুগের ইহুদী কবিদের যে কাব্যগাঁথা আমরা দেখতে পাই তার ভাষা, ধ্যান-ধারণা ও বিষয়বস্তুতে আরব কবিদের থেকে স্বতন্ত্র এমন কিছুই পাওয়া যায় না যা তাদেরকে আলাদাভাবে বৈশিষ্টমণ্ডিত করে। তাদের ও আরবদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক পর্যন্ত স্থাপিত হয়েছিল। মোটকথা, তাদের ও সাধারণ আরবদের মধ্যে ধর্ম ছাড়া আর কোন পার্থক্যই অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তারা আরবদের মধ্যে একেবারে বিলীনও হয়ে যায়নি। তারা অত্যন্ত কঠোরভাবে নিজেদের ইহুদী জাত্যাভিমান ও পরিচয় টিকিয়ে রেখেছিল। তারা বাহ্যত আরবী ভাবধারা গ্রহণ করেছিল শুধু এ জন্য যে, তাছাড়া তাদের পক্ষে আরবে টিকে থাকা অসম্ভব ছিল। আরবী ভাবধারা গ্রহণ করার কারণে পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদরা তাদের ব্যাপারে বিভ্রান্ত হয়ে মনে করে নিয়েছে যে, তারা মূলত বনী ইসরাঈল নয়, বরং ইহুদী ধর্ম গ্রহণকারী আরব কিংবা তাদের অধিকাংশ অন্তত আরব ইহুদী। ইহুদীরা হিজাযে কখনো ধর্ম প্রচারের কাজ করেছিল অথবা তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতগণ খৃষ্টান পাদ্রী এবং মিশনারীদের মত আরববাসীদের ইহুদী ধর্মের প্রতি আহবান জানাতো এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে আমরা দেখতে পাই যে, তাদের মধ্যে ইসরাঈলিয়াত বা ইহুদীবাদের চরম গোঁড়ামি এবং বংশীয় আভিজাত্যের গর্ব ও অহংকার ছিল। আরবের অধিবাসীদের তারা 'উম্মী' (Gentiles) বলে আখ্যায়িত করত যার অর্থ শুধু নিরক্ষরই নয়, বরং অসভ্য এবং মূর্খও। তারা বিশ্বাস করত, ইসরাঈলীরা যে মানবাধিকার ভোগ করে এরা সে অধিকার লাভেরও উপযুক্ত নয়। বৈধ ও অবৈধ সব রকম পন্থায় তাদের অর্থ-সম্পদ মেরে খাওয়া ইসরাঈলীদের জন্য হালাল ও পবিত্র। নেতৃ পর্যায়ের লোক ছাড়া সাধারণ আরবদের তারা ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত করে সমান মর্যাদা দেয়ার উপযুক্তই মনে করত না। কোন আরব গোত্র বা বড় কোন আরব পরিবার ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। আরব লোকগাথায় তার কোন হদিসও মেলে না। এমনিতেও ইহুদীদের ধর্মপ্রচারের চেয়ে নিজেদের আর্থিক কায়-কারবারের প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগ ছিল অধিক। তাই একটি ধর্ম হিসেবে হিজাযে ইহুদীবাদের বিস্তার ঘটেনি। বরং তা হয়েছিল কয়েকটি ইহুদী গোত্রের গর্ব ও অহংকারের পুঁজি। তবে ইহুদী ধর্মীয় পণ্ডিতরা তাবীজ-কবচ, ভাল-মন্দ লক্ষণ নির্ণয় এবং যাদুবিদ্যার রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। আর এ কারণে আরব সমাজে তাদের 'ইলম' ও 'আমলে'র খ্যাতি ও প্রতাপ বিদ্যমান ছিল।

আরব গোত্রসমূহের তুলনায় তাদের আর্থিক অবস্থা ও অবস্থান ছিল অধিক মজবুত। তারা যেহেতু ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার অধিক সুসভ্য অঞ্চল থেকে এসেছিল তাই এমন অনেক শিল্প ও কারিগরী তারা জানতো যা আরবের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। তাছাড়া বাইরের জগতের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্কও ছিল। এসব কারণে ইয়াসরিব এবং হিজাযের উত্তরাঞ্চলে খাদ্যশস্যের আমদানী আর এখান থেকে খেজুর রপ্তানীর কারবার তাদের হাতে চলে এসেছিল। হাঁস-মুরগী পালন ও মৎস্য শিকারেরও বেশীর ভাগ তাদেরই করায়ত্ত ছিল। বস্ত্র উৎপাদনের কাজও তারাই করত। তারাই আবার জায়গায়

জায়গায় পানশালা নির্মাণ করে রেখেছিল। এসব জায়গা থেকে মদ এনে বিক্রি করা হতো। বনু কায়নুকা গোত্রের অধিকাংশ লোক স্বর্ণকার, কর্মকার ও তৈজসপত্র নির্মাণ পেশায় নিয়োজিত ছিল। এসব কায়কারবারে ইহুদীরা অস্বাভাবিক মুনাফা লুটতো। কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় কারবার ছিল সুদী কারবার। আশেপাশের সমস্ত আরবদের তারা এই সুদী কারবারের ফাঁদে আটকে ফেলেছিল। বিশেষ করে আরব গোত্রসমূহের নেতা ও সরদাররা বেশী করে এই জালে জড়িয়ে পড়েছিল। কারণ ঋণগ্রহণ করে জাঁকজমকে চলা এবং গর্বিত ভঙ্গিতে জীবনযাপন করার রোগ সবসময়ই তাদের ছিল। এরা অত্যন্ত চড়া হারের সুদের ভিত্তিতে ঋণ দিতো এবং তা চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়াতে থাকত। কেউ একবার এই জালে জড়িয়ে পড়লে তা থেকে মুক্তি পাওয়া তার জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়ত। এভাবে তারা আর্থিক দিক দিয়ে আরবদেরকে অন্তসারশূন্য করে ফেলেছিল। তবে তার স্বাভাবিক ফলাফলও দাঁড়িয়েছিল এই যে, তাদের বিরুদ্ধে আরবদের মধ্যে ব্যাপক ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছিল।

—আরবদের মধ্যে কারো বন্ধু হয়ে অন্য কারো সাথে শত্রুতা সৃষ্টি না করা এবং পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশগ্রহণ না করাই ছিল তাদের ব্যবসায়িক ও আর্থিক স্বার্থের অনুকূলে। কিন্তু অন্যদিকে আবার আরবদেরকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হতে না দেয়া এবং তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত রাখাই ছিল তাদের স্বার্থের অনুকূলে। কারণ, তারা জানতো, আরব গোত্রসমূহ যখনই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে তখন আর তারা সেই সব সহায়-সম্পত্তি, বাগান এবং শস্য-শ্যামল ফসলের মাঠ তাদের অধিকারে থাকতে দেবে না, যা তারা সুদী কারবার ও মুনাফাখোরীর মাধ্যমে লাভ করেছে। তাছাড়া নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তাদের প্রতিটি গোত্রকে কোন না কোন শক্তিশালী আরব গোত্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হতো যাতে অন্য কোন শক্তিশালী গোত্র তাদের গায়ে হাত তুলতে না পারে। এ কারণে আরব গোত্রসমূহের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদে তাদেরকে বারবার শুধু জড়িয়ে পড়তেই হতো না, বরং অনেক সময় একটি ইহুদী গোত্রকে তার মিত্র আরব গোত্রের সাথে মিলে অপর কোন ইহুদী গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হতো, বিরোধী আরব গোত্রের সাথে যাদের থাকতো মিত্রতার সম্পর্ক। ইয়াসরিবে বনী কুরায়যা ও বনী নাযীর ছিল আওস গোত্রের এবং বনী কায়নুকা ছিল খাযরাজ গোত্রের মিত্র। হিজরাতের কিছুকাল পূর্বে 'বু'আস' নামক স্থানে আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল তাতে এই ইহুদী গোত্রগুলোও নিজ নিজ বন্ধু গোত্রের পক্ষ নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে মদীনায় ইসলাম পৌঁছে এবং শেষ পর্যন্ত রসূলুল্লাহর (সা) আগমনের পর সেখানে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার সাথে সাথে তিনি প্রথম যে কাজগুলো করলেন তার মধ্যে একটি হলো আওস, খাযরাজ এবং মুহাজিরদের মধ্যে একটি ভ্রাতৃবন্ধন সৃষ্টি করা। দ্বিতীয় কাজটি হলো, এই মুসলিম সমাজ এবং ইহুদীদের মধ্যে স্পষ্ট শর্তাবলীর ভিত্তিতে একটি চুক্তি সম্পাদন করা। এ চুক্তিতে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল যে, একে অপরের অধিকারসমূহে হস্তক্ষেপ করবে না এবং বাইরের শত্রুর মোকাবিলায় সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করবে।

ইহুদী এবং মুসলমানরা পরস্পরের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় মেনে চলবে এই চুক্তি থেকে তা স্পষ্টভাবে জানা যায়। চুক্তির কতকগুলো বিষয় নিম্নরূপ ঃ

ان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم - وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة - وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الا ثم - وانه لم يثم امر ؤبحليفه ، وان النصر للمظلوم ، وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربيي ، وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة ..... وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث او اشتجار يخاف فساده فان مرده الى اللّه عزوجل والى محمد رسول اللّه ..... وانه لاتجار قريش ولا من نصرها ، وان بينهم والنصر على من دهم يثرب - على كل اناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم -

(ابن هشام - ج ٢ - ص ١٤٧ - ١٥٠)

ইয়াহুদীরা নিজেদের ব্যয় বহন করবে এবং মুসলমানরাও নিজেদের ব্যয় বহন করবে।

এই চুক্তির পক্ষসমূহের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ করলে তারা পরস্পরকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে। নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে তারা একে অপরের কল্যাণ কামনা করবে। তাদের পরস্পরের সম্পর্ক হবে কল্যাণ করা ও অধিকার পৌঁছিয়ে দেয়ার সম্পর্কে গোনাহ ও সীমালংঘনের সম্পর্ক নয়।

কেউ তার মিত্রশক্তির সাথে কোনপ্রকার খারাপ আচরণ করবে না।

মজলুম ও নির্যাতিতদের সাহায্য করা হবে।

যতদিন যুদ্ধ চলবে ইহুদীরা ততদিন পর্যন্ত মুসলমানদের সাথে মিলিতভাবে তার ব্যয় বহন করবে।

এই চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী পক্ষগুলোর জন্য ইয়াসরিবের অভ্যন্তরে কোনপ্রকার ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

এই চুক্তির শরীক পক্ষগুলোর মধ্যে যদি এমন কোন ঝগড়া-বিবাদ ও মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় যার কারণে বিপর্যয় সৃষ্টির আশংকা দেখা দিতে পারে তাহলে আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর বিধান অনুসারে তার মীমাংসা করবেন। .....

কুরাইশ এবং তাদের মিত্র ও সাহায্যকারীদের আশ্রয় দেয়া হবে না।

কেউ ইয়াসরিবের ওপর আক্রমণ করলে চুক্তির শরীকগণ তার বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য করবে। প্রত্যেকপক্ষ নিজ নিজ এলাকার প্রতিরক্ষার দায়-দায়িত্ব বহন করবে। (ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ১৪৭ থেকে ১৫০ পর্যন্ত)

এটা ছিল একটা সুস্পষ্ট ও অলংঘনীয় চূড়ান্ত চুক্তি। ইহুদীরা নিজেরাই এর শর্তাবলী গ্রহণ করেছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক আচরণ করতে শুরু করল। তাদের এই শত্রুতা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠতে লাগল। এর বড় বড় কারণ ছিল তিনটি ঃ

এক ঃ তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাতির একজন নেতা হিসেবে দেখতে আগ্রহী ছিল যিনি তাদের সাথে শুধু একটি রাজনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ থাকবেন এবং নিজের দলের পার্থিব স্বার্থের সাথে কেবল তার সম্পর্ক থাকবে। কিন্তু তারা দেখলো, তিনি আল্লাহ, আখেরাত, রিসালাত এবং কিতাবের প্রতিও ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছেন (যার মধ্যে তাদের নিজেদের রসূল ও কিতাবের প্রতি ঈমান আনাও অন্তরভুক্ত) এবং গোনাহর কাজ পরিত্যাগ করে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ এবং নৈতিক সীমা ও বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে আহবান জানাচ্ছেন, খোদ তাদের নবী-রসূলগণ দুনিয়ার মানুষকে যে আহবান জানাতেন। এসব ছিল তাদের কাছে অপছন্দনীয়। তারা আশংকাবোধ করলো, যদি এই বিশ্বজনীন আদর্শিক আন্দোলন চলতেই থাকে তাহলে তার সয়লাবের মুখে তাদের স্থূল ও অচল ধর্ম ও ধর্মীয় দর্শন এবং বংশ ও গোষ্ঠীগত জাতীয়তা খড়কুটোর মত ভেসে যাবে।

দুই ঃ আওস, খাযরাজ এবং মুহাজিরদেরকে পরস্পর ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হতে দেখে এবং আশেপাশের আরব গোত্রসমূহের যারাই ইসলামের এই আহবানে সাড়া দিচ্ছে তারাই মদীনার এই ইসলামী ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে যাচ্ছে দেখে তারা এই ভেবে শংকিত হয়ে উঠলো যে, নিজেদের নিরাপত্তা ও স্বার্থের খাতিরে আরব গোত্রসমূহের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে স্বার্থোদ্ধার করার যে নীতি তারা শত শত বছর ধরে অনুসরণ করে আসছে নতুন এই ব্যবস্থাধীনে তা আর চলবে না, বরং এখন তাদেরকে আরবের একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তির মোকাবিলা করতে হবে। যেখানে এই অপকৌশল আর সফল হবে না।

তিন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমাজ ও সভ্যতার যে সংস্কার করছিলেন তাতে ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে সব রকম অবৈধ পথ ও পন্থা নিষিদ্ধ ঘোষণা করাও অন্তরভুক্ত ছিল। সর্বাপেক্ষা বড় ব্যাপার হলো, সুদভিত্তিক কারবারকেও তিনি নাপাক উপার্জন এবং হারাম খাওয়া' বলে ঘোষণা করছিলেন। এ কারণে তারা আশংকা করছিল যে, আরব জনগণের ওপর যদি তাঁর শাসন কর্তৃত্ব কায়েম হয় তাহলে তিনি আইনগতভাবে সুদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেবেন। একে তারা নিজেদের মৃত্যুর শামিল বলে মনে করছিল।

এসব কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করা তারা নিজেদের জাতীয় লক্ষ হিসেবে স্থির করে নিয়েছিল। তাঁকে আঘাত দেয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত করার কোন অপকৌশল, ষড়যন্ত্র ও উপায় অবলম্বন করতে তারা মোটেই কুণ্ঠিত হতো না। সাধারণ

মানুষ যাতে তাঁর প্রতি সন্দিহান হয়ে ওঠে সে জন্য তারা তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকম মিথ্যা প্রচারণা চালাতো। ইসলাম গ্রহণকারীদের মনে সব রকমের সন্দেহ-সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতো। যাতে তারা এ দ্বীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলাম ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যত বেশী পারা যায় ভুল ধারণা সৃষ্টি করার জন্য নিজেরাও মিথ্যামিথ্যি ইসলাম গ্রহণ করতো এবং তারপর আবার মুরতাদ বা ইসলাম ত্যাগী হয়ে যতো। অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য মুনাফিকদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধতো। ইসলামের শত্রু প্রতিটি ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং গোত্রের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতো। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে এবং তাদেরকে পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত করানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতো। তাদের বিশেষ লক্ষ ছিল আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকজন। দীর্ঘদিন যাবত এ দু'টি গোত্রের সাথে তাদের সুসম্পর্ক ছিল। অপ্রাসঙ্গিকভাবে বারবার 'বু'আস' যুদ্ধের আলোচনা তুলে তাদেরকে পূর্ব শত্রুতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতো। যাতে আরেকবার তাদের মধ্যে তরবারির ঝনঝনানি শুরু হয়ে যায় এবং ইসলাম তাদেরকে যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিলো তা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। মুসলমানদের আর্থিক দিক থেকে বিব্রত ও বিপদগ্রস্ত করার জন্যও তারা নানারূপ জালিয়াতি করতো। যাদের সাথে আগে থেকেই তাদের লেনদেন ছিল তাদের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করতো তারা তার ক্ষতিসাধন করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যেতো। তার কাছে যদি কিছু পাওনা থাকতো তাহলে তাগাদার পর তাগাদা দিয়ে তাকে উত্যক্ত ও বিব্রত করে তুলতো। তবে তার যদি কিছু পাওনা থাকতো তাহলে তা আত্মসাৎ করতো। তারা প্রকাশ্যে বলতো ঃ আমরা তোমার সাথে যখন লেনদেন ও কারবার করেছিলাম তখন তোমার ধর্ম ছিল অন্যকিছু। এখন যেহেতু তুমি তোমার ধর্মই পরিবর্তন করে ফেলেছো তাই আমাদের কাছে তোমার কোন অধিকারই আর অবশিষ্ট নেই। তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে নায়শাবুরী. তাফসীরে তাবরাসী এবং তাফসীরে রূহুল মায়ানীতে সূরা আলে ইমরানের ৭৫নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এর বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে।

চুক্তির বিরুদ্ধে খোলাখুলি এই শত্রুতামূলক আচরণ তারা বদর যুদ্ধের আগে থেকেই করতে শুধু করেছিলো। কিন্তু বদর যুদ্ধে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানগণ কুরাইশদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করলে তারা অস্থির হয়ে ওঠে এবং তাদের হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন আরো অধিক প্রজ্জ্বলিত হয়। তারা আশা করেছিলো, এই যুদ্ধে কুরাইশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে মুসলমানরা ধ্বংস হয়ে যাবে। ইসলামের এই বিজয়ের খবর পৌছার পূর্বেই তারা মদীনায় গুজব ছড়াতে শুরু করেছিল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়ে গিয়েছেন, মুসলমানদের চরম পরাজয় ঘটেছে এবং আবু জেহেলের নেতৃত্বে কুরাইশ বাহিনী মদীনার দিকে ধেয়ে আসছে। কিন্তু ফলাফল তাদের আশা আকাংখার সম্পূর্ণ বিপরীত হলে তারা রাগে ও দুঃখে ফেটে পড়ার উপক্রম হলো। বনী নাযীর গোত্রের নেতা কা'ব ইবনে আশরাফ চিৎকার করে বলতে শুরু করলোঃ খোদার শপথ, মুহাম্মাদ যদি আরবের এসব সম্মানিত নেতাদের হত্যা করে থাকে তাহলে পৃথিবীর উপরিভাগের চেয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগই আমাদের জন্য অধিক উত্তম। এরপর সে মক্কায় গিয়ে হাজির হলো এবং বদর যুদ্ধে যেসব কুরাইশ নেতা নিহত হয়েছিলো তাদের নামে অত্যন্ত উত্তেজনাকর শোকগাঁথা শুনিয়ে শুনিয়ে মক্কাবাসীদের

প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উত্তেজিত করতে থাকলো। এরপর সে মদীনায় ফিরে আসলো এবং নিজের মনের ঝাল মিটানোর জন্য এমন সব কবিতা ও গান গেয়ে শুনাতে শুরু করলো যাতে সম্মানিত মুসলমানদের স্ত্রী–কন্যাদের সাথে প্রেম নিবেদন করা এবং প্রেম সম্পর্কের কথা উল্লেখ থাকতো। তার এই ঔদ্ধত্য ও বখাটেপনায় অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত নবী (সা) তৃতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা আনসারীকে পাঠিয়ে তাকে হত্যা করাতে বাধ্য হলেন। (ইবনে সা'দ, ইবনে হিশাম, তারীখে তাবারী)।

বদর যুদ্ধের পর ইহুদীদের যে গোত্রটি সমষ্টিগতভাবে সর্বপ্রথম খোলাখুলি চুক্তিভংগ করেছিল সেটি ছিল বনু কায়নুকা গোত্র। এরা মদীনার শহরাভ্যন্তরে একটি মহল্লায় বাস করতো। যেহেতু তারা স্বর্ণকার, কর্মকার ও তৈজসপত্র প্রস্তুতকারী ছিল, তাই মদীনাবাসীদের তাদের বাজারে বেশী বেশী যাতায়াত করতে হতো। নিজেদের বীরত্ব ও সাহসিকতা নিয়ে তারা গর্ববোধ করতো। কর্মকার হওয়ার কারণে তাদের প্রতিটি বাচ্চা পর্যন্ত অস্ত্র সজ্জিত ছিল। তাদের মধ্যে ছিল সাত শত যুদ্ধোপযোগী পুরুষ। খাযরাজ গোত্রের সাথে তাদের পুরনো মিত্রতা সম্পর্ক ছিল। আর খাযরাজ গোত্রের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে 'উবাই ছিল তাদের পৃষ্ঠপোষক। এ কারণেও তাদের অহমিকা ছিল। বদর যুদ্ধের ঘটনায় তারা এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে, তারা তাদের বাজারে যাতায়াতকারী মুসলমানদের বিব্রত করা ও কষ্ট দেয়া এবং বিশেষ করে মুসলিম মহিলাদের উত্যক্ত করতে শুরু করেছিলো। আস্তে আস্তে পরিস্থিতি এতদূর গড়ায় যে, তাদের বাজারে একদিন একজন মুসলমান মহিলাকে সবার সামনে উলঙ্গ করে ফেলা হলে তা নিয়ে মারাত্মক ঝগড়া–বিবাদের সৃষ্টি হয় এবং হাংগামায় একজন মুসলমান এবং একজন ইহুদী নিহত হয়। পরিস্থিতি এতদূর গড়ালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মহল্লায় গেলেন এবং তাদের সবাইকে ডেকে একত্রিত করে ন্যায় ও সততার পথ অনুসরণ করার উপদেশ দিলেন। কিন্তু প্রত্যুত্তরে তারা বললো ঃ "মুহাম্মাদ, সম্ভবত তুমি আমাদেরকেও কুরাইশ মনে করেছো? যুদ্ধবিদ্যায় তারা ছিল অনভিজ্ঞ। তাই তুমি তাদেরকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছো। কিন্তু আমাদের সাথে পালা পড়লে জানতে পারবে পুরুষলোক কাকে বলে।" এটা ছিল স্পষ্ট যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। অবশেষে নবী (সা) দুই হিজরীর শাওয়াল (অপর এক বর্ণনা অনুসারে যিলকা'দা) মাসের শেষ দিকে তাদের মহল্লা অবরোধ করলেন। মাত্র পনের দিন অবরোধ চলার পরই তারা আত্মসমর্পণ করলো এবং তাদের যুদ্ধক্ষম সমস্ত ব্যক্তিকে বন্দী করা হলো। এই সময় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদের সাহায্য সমর্থনে এগিয়ে আসলো। নবী (সা) যেন তাদের ক্ষমা করে দেন এ জন্য সে বারবার অনুরোধ উপরোধ করতে থাকলো। নবী (সা) তার আবেদনে সাড়া দিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন যে, বনু কায়নুকা তাদের অর্থ–সম্পদ, অস্ত্র–শস্ত্র এবং শিল্প–সরঞ্জাম রেখে মদীনা ছেড়ে চলে যাবে। (ইবনে সা'দ, ইবনে হিশাম, তারীখে তাবারী)।

এ দু'টি চরম পদক্ষেপ (অর্থাৎ বনী কায়নুকার বহিষ্কার এবং কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যা) গ্রহণ করার ফলে কিছুকাল পর্যন্ত ইহুদীরা এতটা ভীত সন্ত্রস্ত রইলো যে, আর কোন দুষ্কর্ম করার সাহস তাদের হলো না। কিন্তু হিজরী ৩য় সনের শাওয়াল মাসে কুরাইশরা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে আসলে ইহুদীরা দেখলো, কুরাইশদের তিন হাজার সৈন্যের মোকাবিলায় মাত্র এক হাজার

লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধাভিযানে বেরিয়েছে এবং তাদের মধ্যে থেকেও তিন শত মুনাফিক দলত্যাগ করে ফিরে এসেছে। তখন তারা প্রথমবারের মত স্পষ্টভাবে চুক্তিলংঘন করে বসলো। অর্থাৎ মদীনার প্রতিরক্ষায় তারা নবীর (সা) সাথে শরীক হলো না। অথচ চুক্তি অনুসারে তারা তা করতে বাধ্য ছিল। এরপর উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলে তাদের সাহস আরো বেড়ে গেল। এমন কি রসূলুল্লাহকে (সা) হত্যা করার জন্য বনী নাযীর গোত্র একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র করে বসলো। কিন্তু ঠিক বাস্তবায়নের মুখে তা বানচাল হয়ে গেল। ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ হলো, 'বিরে মা'য়ুনা'র মর্মান্তিক ঘটনার (৪র্থ হিজরীর সফর মাস) পর আমর ইবনে উমাইয়া দামরী প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ভুলক্রমে বনী আমের গোত্রের দু'জন লোককে হত্যা করে ফেলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ছিলো চুক্তিবদ্ধ গোত্রের লোক। 'আমর তাদেরকে শত্রু গোত্রের লোক মনে করেছিল। এ ভুলের কারণে মুসলমানদের জন্য তাদের রক্তপণ আদায় করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আর বনী আমের গোত্রের সাথে চুক্তিতে যেহেতু বনী নাযীর গোত্রও শরীক ছিল, তাই রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে তাদেরকে শরীক হওয়ার আহবান জানাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে নিজে তাদের এলাকায় গেলেন। সেখানে তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু খোশগল্পে ব্যস্ত রেখে ষড়যন্ত্র আঁটলো যে, তিনি যে ঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসেছিলেন এক ব্যক্তি তার ছাদ থেকে তাঁর ওপর একখানা ভারী পাথর গড়িয়ে দেবে। কিন্তু তারা এই ষড়যন্ত্র কার্যকরী করার আগেই আল্লাহ তা'আলা যথা সময়ে তাঁকে সাবধান করে দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে উঠে মদীনায় ফিরে গেলেন।

এরপর তাদের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ আচরণের কোন প্রশ্নই ওঠে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবিলম্বে তাদেরকে চরমপত্র দিলেন যে, তোমরা যে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চেয়েছিলে তা আমি জানতে পেরেছি। অতএব দশ দিনের মধ্যে মদীনা ছেড়ে চলে যাও। এ সময়ের পরেও যদি তোমরা এখানে অবস্থান করো তাহলে তোমাদের জনপদে যাকে পাওয়া যাবে তাকেই হত্যা করা হবে। অন্যদিকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদেরকে খবর পাঠালো যে, আমি দুই হাজার লোক দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবো। তাছাড়া বনী কুরায়যা এবং বনী গাতফানও তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। তাই তোমরা রুখে দাঁড়াও, নিজেদের জায়গা পরিত্যাগ করো না। এ মিথ্যা আশ্বাসের ওপর নির্ভর করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরমপত্রের জবাবে তারা জানিয়ে দিল যে, আমরা এখান থেকে চলে যাব না। আপনার কিছু করার থাকলে করে দেখতে পারেন। এতে ৪র্থ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অবরোধ করলেন। অবরোধের মাত্র ক'দিন পরই (কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী মাত্র ছয় দিন এবং কোন কোন বর্ণনা অনুসারে পনর দিন) তারা এই শর্তে মদীনা ছেড়ে চলে যেতে রাজি হলো যে, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া অন্য সব জিনিস নিজেদের উটের পিঠে চাপিয়ে যতটা সম্ভব নিয়ে যাবে। এভাবে ইহুদীদের দ্বিতীয় এই পাপী গোত্র থেকে মদীনাকে মুক্ত করা হলো। তাদের মধ্য থেকে মাত্র দু'জন লোক মুসলমান হয়ে মদীনায় থেকে গেল এবং অন্যরা সবাই সিরিয়া ও খায়বার এলাকার দিকে চলে গেল।

এ ঘটনা সম্পর্কেই এ সূরাটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বনী নাযীর যুদ্ধের পর্যালোচনাই এ সূরার বিষয়বস্তু। এতে মোটামুটি চারটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে।

(১) প্রথম চারটি আয়াতে গোটা দুনিয়াবাসীকে সেই পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে বনী নাযীর গোত্র সবেমাত্র যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। একটি বৃহত গোত্র যার জনসংখ্যা সে সময় মুসলমানদের জনসংখ্যার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। অর্থ–সম্পদে যারা মুসলমানদের চেয়ে অগ্রসর ছিল, যাদের কাছে যুদ্ধের সাজ–সরঞ্জামেরও অভাব ছিল না এবং যাদের দুর্গসমূহও ছিল অত্যন্ত মজবুত, মাত্র কয়েকদিনের অবরোধের মুখে তারা টিকে থাকতে পারলো না এবং কোন একজন মানুষ নিহত হওয়ার মত পরিস্থিতিরও উদ্ভব হলো না। তারা শত শত বছর ধরে গড়ে ওঠা তাদের আপন জনপদ ছেড়ে দেশান্তরিত হতে রাজি হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এটা মুসলমানদের শক্তির দাপটে হয়নি। বরং তারা যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলো। এটা ছিল তার প্রত্যক্ষ ফল। আর যারা আল্লাহর শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার দুঃসাহস দেখায় তারা এ ধরনের পরিণতির সম্মুখীন হয়।

(২) ৫নং আয়াতে যুদ্ধের একটি মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। নীতিটি হলো, শত্রুদের এলাকার অভ্যন্তরে সামরিক প্রয়োজনে যে ধংসাত্মক কাজকর্ম করতে হয় তা ফাসাদ ফিল আরদ অর্থাৎ পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির সমার্থক নয়।

(৩) যুদ্ধ বা সন্ধির ফলে যেসব ভূমি ও সম্পদ ইসলামী সরকারের হস্তগত হয় তার বন্দোবস্ত কিভাবে করতে হবে ৬ থেকে ১০নং আয়াতে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেহেতু এ সময়ই প্রথমবারের মত একটি বিজিত অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে এসেছিলো, সে জন্য এখানে তার আইন–বিধান বলে দেয়া হয়েছে।

(৪) বনী নাযীর যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা যে আচরণ ও নীতিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল ১১ থেকে ১৭ আয়াতে তার পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং তাদের এই আচরণ ও নীতিভঙ্গির মূলে যেসব কারণ কার্যকর ছিল তাও দেখিয়ে দেয়া হয়েছে।

(৫) শেষ রুকূ'র পুরোটাই উপদেশবাণী। ঈমানের দাবী করে মুসলমানদের দলে শামিল হলেও যাদের মধ্যে ঈমানের প্রাণসত্তা নেই তাদের লক্ষ করেই এই উপদেশবাণী। এতে তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে, ঈমানের মূল দাবী কি, তাকওয়া ও পাপাচারের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য কি, যে কুরআনকে মানার দাবী তারা করছে তার গুরুত্ব কতটুকু এবং যে আল্লাহর ওপর ঈমান আনার স্বীকৃতি তারা দিচ্ছে সেই আল্লাহ কি কি গুণাবলীর অধিকারী?

আয়াত ২৪ | সূরা আল হাশর-মাদানী | রুকূ' ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ①
هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ
لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ۭ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ
حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۤ وَقَذَفَ فِيْ
قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۤ
فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ ②

আল্লাহরই তাসবীহ করেছে আসমান ও যমীনের প্রতিটি জিনিস। তিনিই বিজয়ী এবং মহাজ্ঞানী।[১]

তিনিই আহলেকিতাব কাফেরদেরকে প্রথম আক্রমণেই[২] তাদের ঘরবাড়ী থেকে বের করে দিয়েছেন।[৩] তোমরা কখনো ধারণাও কর নাই যে, তারা বের হয়ে যাবে। তারাও মনে করে বসেছিলো যে, তাদের দুর্গসমূহ তাদেরকে আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে।[৪] কিন্তু আল্লাহ এমন এক দিক থেকে তাদের ওপর চড়াও হয়েছেন, যে দিকের ধারণাও তারা করতে পারেনি।[৫] তিনি তাদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দিয়েছেন। ফল হয়েছে এই যে, তারা নিজ হাতেও নিজেদের ঘর-বাড়ী ধ্বংস করছিলো এবং মু'মিনদের হাত দিয়েও ধ্বংস করছিলো।[৬] অতএব, হে দৃষ্টিশক্তির অধিকারীরা,[৭] শিক্ষাগ্রহণ করো।

১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন সূরা হাদীদের তাফসীরের ১ ও ২নং টীকা। বনী নাযীরের বহিষ্কার সম্পর্কে বিশ্লেষণ শুরু করার আগে এই প্রারম্ভিক কথাটি বলার উদ্দেশ্য হলো মন-মগজকে এ সত্য উপলব্ধি করতে প্রস্তুত করা যে, এই শক্তিশালী

ইহুদী গোত্রের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে তা মুসলমানদের শক্তির কারণে নয়, বরং আল্লাহর অসীম শক্তির বিস্ময়কর কীর্তি মাত্র।

২. মূল শব্দ হলো لاوّل الحشر । হাশর (حشر) শব্দের অর্থ বিক্ষিপ্ত জনতাকে একত্র করা অথবা ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ব্যক্তিদের একত্রিত করে বের হওয়া। আর لاوّل الحشر –এর অর্থ হলো, প্রথমবার একত্রিত হওয়ার সাথে অথবা প্রথমবার একত্রিত হওয়ার সময়ে। এখন প্রশ্ন হলো, এখানে প্রথম হাশর বলতে কি বুঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। একদলের মতে এর অর্থ মদীনা থেকে বনী নাযীরের বহিষ্কার। একে প্রথম হাশর এই অর্থে বলা হয়েছে যে, তাদের দ্বিতীয় হাশর হয়েছিলো হযরত 'উমরের (রা) সময়ে। এই সময় ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আর তাদের শেষ হাশর হবে কিয়ামতের দিন। দ্বিতীয় দলের মতে এর অর্থ হলো মুসলমানদের সৈন্য সমাবেশের ঘটনা যা বনী নাযীর গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য করা হয়েছিল সুতরাং لاوّل الحشر –এর অর্থ হলো, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মুসলমানরা সবেমাত্র একত্রিত হয়েছিলো। লড়াই ও রক্তপাতের কোন অবকাশই সৃষ্টি হয়নি। ইতিমধ্যেই আল্লাহ তা'আলার কুদরাতে তারা দেশান্তরিত হতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। অন্য কথায় এখানে এ বাক্যাংশটি আক্রমণের "প্রথম চোটে" বা "প্রথম আঘাতে" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী এর অনুবাদ করেছেন ঃ در اول جمع كردن لشكر । শাহ আবদুল কাদের সাহেবের অনুবাদ হলো ঃ پہلے ہی بھیر ہوتے আমাদের মতে এই দ্বিতীয় অর্থটিই এ আয়াতাংশের সঠিক ও বোধগম্য অর্থ।

৩. এখানে প্রথমেই একটি বিষয় বুঝে নেয়া উচিত, যাতে বনী নাযীরের বহিষ্কারের ব্যাপারে কোন মানসিক দ্বিধা–দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বনী নাযীর গোত্রের যথারীতি একটি লিখিত চুক্তি ছিল। এ চুক্তিকে তারা বাতিলও করেছিলো না যে, তার কোন অস্তিত্ব নেই মনে করা চলে। তবে যে কারণে তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছিল তা হলো, এই চুক্তি লংঘনের অনেকগুলো ছোট বড় কাজ করার পর তারা এমন একটি কাজ করে বসেছিল যা সুস্পষ্টভাবে চুক্তিভংগেরই নামান্তর। অর্থাৎ তারা চুক্তির অপর পক্ষ মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আর তাও এমনভাবে প্রকাশ হয়ে পড়লো যে, সে জন্য তাদেরকে চুক্তিভংগের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলে তারা তা অস্বীকার করতে পারেনি। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে দশদিন সময় দিয়ে এই মর্মে চরমপত্র দিলেন যে, এই সময়ের মধ্যেই তোমরা মদীনা ছেড়ে চলে যাও। অন্যথায় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। এই চরমপত্র ছিল সম্পূর্ণরূপে কুরআন মজীদের নির্দেশ অনুসারে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ "যদি তোমরা কোন কওমের পক্ষ থেকে বিশ্বাসভংগের (চুক্তিলংঘনের) আশংকা কর তাহলে সেই চুক্তি প্রকাশ্যে তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও।" (সূরা আল আনফাল—৫৮) এ কারণে তাদের বহিষ্কারকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের কাজ বলে ঘোষণা করছেন। কারণ, তা ছিল আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক। যেন তাদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানগণ বহিষ্কার করেননি, বরং আল্লাহ তা'আলা নিজে বহিষ্কার করেছেন। দ্বিতীয় যে কারণটির জন্য তাদের বহিষ্কারকে আল্লাহ তা'আলা নিজের কাজ বলে ঘোষণা করেছেন তা পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে।

৪. একথাটি বুঝার জন্য মনে রাখা দরকার যে, বনী নাযীর শত শত বছর ধরে এখানে প্রভাব প্রতিপত্তির সাথে বসবাস করে আসছিল। মদীনার বাইরে তাদের গোটা জনবসতি একই সাথে ছিল। নিজের গোত্রের লোকজন ছাড়া আর কোন গোত্রের লোকজন তাদের মধ্যে ছিল না। গোটা বসতি এলাকাকে তারা একটি দুর্গে রূপান্তরিত করেছিল। সাধারণত বিশৃংখলাপূর্ণ ও নিরাপত্তাহীন উপজাতীয় এ এলাকায় ঘর-বাড়ী যেভাবে নির্মাণ করা হয়ে থাকে তাদের ঘর-বাড়ীও ঠিক তেমনিভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল। এগুলো ছিল ছোট ছোট দুর্গের মত। তাছাড়া তাদের সংখ্যাও সেই সময়ের মুসলমানদের সংখ্যার চেয়ে কম ছিল না। এমনকি মদীনার অভ্যন্তরেও বহু সংখ্যক মুনাফিক তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতো। তাই মুসলমানরাও কখনো এ আশা করেনি যে, লড়াই ছাড়া শুধু অবরোধের কারণেই দিশেহারা হয়ে তারা নিজেদের বসতভিটা ছেড়ে চলে যাবে। বনু নাযীর গোত্রের লোকজন নিজেরাও একথা কল্পনা করেনি যে, কোন শক্তি মাত্র ছয় দিনের মধ্যেই তাদের হাত থেকে এ জায়গা ছিনিয়ে নেবে। তাদের পূর্বে যদিও বনী কায়নুকা গোত্রকে বহিষ্কার করা হয়েছিলো এবং নিজেদের বীরত্বের অহংকার তাদের কোন কাজেই আসেনি। কিন্তু তারা ছিল মদীনার অভ্যন্তরে এক মহল্লার অধিবাসী। তাদের নিজেদের স্বতন্ত্র কোন দুর্গ-প্রাকার বেষ্টিত জনপদ ছিল না। তাই বনী নাযীর গোত্র মনে করতো যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের টিকে থাকতে না পারা অযৌক্তিক বা অসম্ভব কিছু ছিল না। পক্ষান্তরে তারা নিজেদের সুরক্ষিত জনপদ এবং মজবুত দুর্গসমূহ দেখে ধারণাও করতে পারতো না যে, এখান থেকে কেউ তাদের বহিষ্কার করতে পারে। এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে দশ দিনের মধ্যে মদীনা ছেড়ে চলে যাওয়ার চরমপত্র দিলে তারা অত্যন্ত ধৃষ্টতার সাথে খোলাখুলি জবাব দিল, আমরা এখান থেকে চলে যাব না। আপনার কিছু করার থাকলে করে দেখতে পারেন।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রশ্নটি হলো, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে একথা বললেন যে, তারা মনে করে নিয়েছিলো তাদের ছোট ছোট দুর্গের মত বাড়ীঘর তাদেরকে আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করবে? বনী নাযীর কি সত্যি সত্যিই জানতো যে, তাদের মোকাবিলা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে নয়, বরং খোদ আল্লাহর সাথে? আর এটা জানার পরেও কি তারা একথা বিশ্বাস করেছিল যে, তাদের দুর্গসমূহ আল্লাহর হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে পারবে? যারা ইহুদী জাতির মানসিকতা এবং তাদের শত শত বছরের ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত নয় এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির মনে এ প্রশ্ন দ্বিধা ও সংশয়ের সৃষ্টি করবে। সাধারণ মানুষ সম্পর্কে কেউ ধারণাও করতে পারে না যে, আল্লাহর সাথে মোকাবিলা হচ্ছে সচেতনভাবে একথা জেনে শুনেও তারা এ ধরনের খোশ খেয়ালে মত্ত থাকবে এবং ভাববে যে, তাদের দুর্গ এবং অস্ত্রশস্ত্র তাদেরকে আল্লাহর থেকে রক্ষা করবে। এ কারণে একজন অনভিজ্ঞ লোক এখানে আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর অর্থ করবেন এই যে, বনী নাযীর বাহ্যত নিজেদের সুদৃঢ় দুর্গসমূহ দেখে ভুল ধারণা করে বসেছিল যে, তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে তাদের মোকাবিলা ছিল আল্লাহর সাথে। এ আক্রমণ থেকে তাদের দুর্গসমূহ তাদের রক্ষা করতে সক্ষম ছিল না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, এই পৃথিবীতে ইহুদীরা একটি অদ্ভুত জাতি যারা জেনে বুঝেও আল্লাহর মোকাবিলা করে আসছে। তারা আল্লাহর রসূলদেরকে আল্লাহর রসূল জেনেও হত্যা করেছে এবং

অহংকারে বুক ঠুকে বলেছে, আমরা আল্লাহর রসূলকে হত্যা করেছি। এ জাতির লোকগাথায় রয়েছে যে, "তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইয়া'কূবের (আ) সাথে আল্লাহ তা'আলার সারা রাত ধরে কুস্তি হয়েছে এবং ভোর পর্যন্ত লড়াই করেও আল্লাহ তা'আলা তাকে পরাস্ত করতে পারেননি। অতপর ভোর হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা তাকে বললেন ঃ এখন আমাকে যেতে দাও। এতে ইয়া'কূব (আ) বললেন ঃ যতক্ষণ না তুমি আমাকে বরকত দেবে ততক্ষণ আমি তোমাকে যেতে দেব না। আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার নাম কি? তিনি বললেন ঃ ইয়া'কূব। আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ ভবিষ্যতে তোমার নাম ইয়া'কূব হবে না, বরং 'ইসরাঈল' হবে। কেননা, তুমি খোদা ও মানুষের সাথে শক্তি পরীক্ষা করে বিজয়ী হয়েছো।" দেখুন ইহুদীদের পবিত্র গ্রন্থের (The Holy Scriptures) আধুনিকতম অনুবাদ, প্রকাশক, জুয়িশ পাবলিকেশন সোসাইটি অব আমেরিকা, ১৯৫৪, আদিপুস্তক, অধ্যায় ৩২, শ্লোক ২৫ থেকে ২৯। খৃষ্টানদের অনূদিত বাইবেলেও এ বিষয়টি একইভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইহুদীদের অনুবাদের ফুটনোটে 'ইসরাঈল' শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে ঃ He who Striveth with God অর্থাৎ যিনি খোদার সাথে শক্তি পরীক্ষা করেন। ইনসাইক্লোপেডিয়া অব বাইবেলিকাল লিটারেচারে খৃষ্টান পুরোহিতগণ ইসরাঈল শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ Wrestler with God "খোদার সাথে কুস্তি লড়নেওয়ানা।" হোশেয় পুস্তকে হযরত ইয়াকূবের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, "তিনি তাঁর যৌবনে খোদার সাথে কুস্তি লড়েছেন। তিনি ফেরেশতার সাথে কুস্তি করে বিজয়ী হয়েছেন।" (অধ্যায় ১২, শ্লোক ৪) অতএব একথা স্পষ্ট যে, বনী ইসরাঈলরা মহান সেই ইসরাঈলেরই বংশধর যার সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস হলো, তিনি খোদার সাথে শক্তি পরীক্ষা করেছিলেন এবং তাঁর সাথে কুস্তি লড়েছিলেন। তাই খোদার সাথে মোকাবিলা একথা জেনে বুঝেও খোদার বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত হওয়া তাদের জন্য এমন কি আর কঠিন কাজ? এ কারণে তাদের নিজেদের স্বীকারোক্তি অনুসারে তারা আল্লাহর নবীদের হত্যা করেছে এবং একই কারণে তাদের নিজেদের ধারণা অনুসারে তারা হযরত ঈসাকে শূলে চড়িয়েছে এবং বুক ঠুকে বলেছে: اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (আমরা আল্লাহর রসূল মাসীহ 'ঈসা ইবনে মারয়ামকে হত্যা করেছি)। তাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল একথা জেনে বুঝেও তারা যদি তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করে থাকে তাহলে তা তাদের ঐতিহ্য বিরোধী কোন কাজ নয়। তাদের জনসাধারণ না জানলেও পণ্ডিত-পুরোহিত ও আলেম সমাজ ভাল করেই জানতো যে, তিনি আল্লাহর রসূল। এ বিষয়ের কয়েকটি প্রমাণ কুরআন মজীদেই বর্তমান। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, টীকা ৭৯—৯৫ ; সাফ্‌ফাত, টীকা ৭০—৭৩।

৫. আল্লাহ তা'আলার তাদের ওপর চড়াও হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তিনি অন্য কোন স্থানে ছিলেন সেখান থেকে তাদের ওপর চড়াও হয়েছেন। বরং এটি একটি রূপক বাক্য। এরূপ ধারণা দেয়াই মূলত উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর বিরুদ্ধে মোকাবিলার সময় তাদের ধারণা ছিল, শুধু একটি পন্থায় আল্লাহ তাদের ওপর বিপদ আনতে পারেন। তাহলো সামনাসামনি কোন সেনাবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে নিয়ে আসা। আর তারা মনে করতো যে, দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় নিয়ে তারা সে বিপদ ঠেকাতে পারবে। কিন্তু এমন একটি পথে তিনি তাদের ওপর হামলা করেছেন, যে দিক থেকে কোন বিপদ আসার আদৌ কোন আশংকা তারা করতো

না। সে পথটি ছিল এই যে, ভিতর থেকেই তিনি তাদের মনোবল ও মোকাবিলার ক্ষমতা নিঃশেষ ও অন্তসারশূন্য করে দিলেন। এরপর তাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং দুর্গ কোন কাজেই আসেনি।

৬. অর্থাৎ ধ্বংসসাধিত হয়েছে দু'ভাবে। যে দুর্গের মধ্যে তারা আশ্রয় নিয়েছিল মুসলমানরা বাইরে থেকে অবরোধ করে তা ভেঙ্গে ফেলতে শুরু করলো। আর ভেতর থেকে তারা নিজেরা প্রথমত মুসলমানদের প্রতিহত করার জন্য স্থানে স্থানে কাঠ ও পাথরের প্রতিবন্ধক বসালো এবং সে জন্য নিজেদের ঘর দরজা ভেঙ্গে ভেঙ্গে আবর্জনা জমা করলো। এরপর যখন তারা নিশ্চিত বুঝতে পারলো যে, এ জায়গা ছেড়ে তাদেরকে চলে যেতেই হবে তখন তারা নিজেদের হাতে নিজেদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করতে শুরু করলো যাতে তা মুসলমানদের কোন কাজে না আসে। অথচ এক সময় বড় শখ করে তারা এসব বাড়ীঘর নির্মাণ করে সাজিয়ে গুছিয়েছিল। এরপর তারা যখন এই শর্তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সন্ধি করলো যে, তাদের প্রাণে বধ করা হবে না এবং অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া আর যাই তারা নিয়ে যেতে সক্ষম হবে নিয়ে যেতে পারবে তখন যাওয়ার বেলায় তারা ঘরের দরজা, জানালা এবং খুঁটি পর্যন্ত উপড়িয়ে নিয়ে গেল। এমনকি অনেকে ঘরের কড়িকাঠ এবং কাঠের চাল পর্যন্ত উটের পিঠে তুলে দিল।

৭. এই ঘটনার মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের কয়েকটি দিক আছে। সংক্ষিপ্ত ও জ্ঞানগর্ভ এই আয়াতাংশে সে দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। এই ইহুদীরা মূলত অতীত নবীদেরই উম্মাত ছিল। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করতো, কিতাব বিশ্বাস করতো, পূর্ববর্তী নবীদের বিশ্বাস করতো এবং আখেরাতেও বিশ্বাস করতো। এ সব বিচারে তারা ছিল মূলত সাবেক মুসলমান। কিন্তু তারা যখন দীন ও আখলাককে উপেক্ষা করে শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির লালসা এবং পার্থিব উদ্দেশ্য ও স্বার্থ উদ্ধারের জন্য স্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে ন্যায় ও সত্যের প্রতি শত্রুতা পোষণের নীতি অবলম্বন করলো এবং নিজেদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির কোন তোয়াক্কাই করলো না তখন আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ-দৃষ্টিও আর তাদের প্রতি রইলো না। তা না হলে একথা সবারই জানা যে, তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল না। তাই এই পরিণাম দেখিয়ে সর্বপ্রথম মুসলমানদের উপদেশ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে, যেন ইহুদীদের মত তারাও নিজেদেরকে খোদার প্রিয়পাত্র ও আদরের সন্তান মনে করে না বসে এবং এই খামখেয়ালীতে মগ্ন না হয় যে, আল্লাহর শেষ নবীর উম্মাত হওয়াটাই তাদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্য লাভের গ্যারান্টি। এর বাইরে দীন ও আখলাকের কোন দাবী পূরণ তাদের জন্য জরুরী নয়। সাথে সাথে গোটা দুনিয়ার সেই সব লোককেও এ ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে যারা জেনে বুঝে সত্যের বিরোধিতা করে এবং নিজেদের সম্পদ ও শক্তি এবং উপায়-উপকরণের ওপর এতটা নির্ভর করে যে, মনে করে তা তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। মদীনার ইহুদীদের একথা অজানা ছিল না যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কওম বা গোত্রের মান মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছেন না। বরং তিনি একটি আদর্শিক দাওয়াত পেশ করছেন। এ দাওয়াতের লক্ষ গোটা দুনিয়ার সব মানুষ। এ দাওয়াত গ্রহণ করে যে কোন জাতি, গোষ্ঠী ও দেশের মানুষ কোন প্রকার বৈষম্য ছাড়াই তাঁর উম্মাত হিসেবে গণ্য হতে পারে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى
الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَآقِّ
اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً
عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

আল্লাহ যদি তাদের জন্য দেশান্তর হওয়া নির্দিষ্ট না করতেন তাহলে তিনি দুনিয়াতেই তাদের শাস্তি দিতেন।[৮] আর আখেরাতে তো তাদের জন্য দোযখের শাস্তি রয়েছেই। এ হওয়ার কারণ হলো, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের চরম বিরোধিতা করেছে। যে ব্যক্তিই আল্লাহর বিরোধিতা করে, তাকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর।

খেজুরের যেসব গাছ তোমরা কেটেছো কিংবা যেসব গাছকে তার মূলের ওপর আগের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছো তা সবই ছিল আল্লাহর অনুমতিক্রমে।[৯] (আল্লাহ এ অনুমতি দিয়েছিলেন এ জন্য) যাতে তিনি ফাসেকদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন।[১০]

সাল্লামের নিজ খান্দানের লোকজনের মুসলিম সমাজে যে মর্যাদা ছিল হাবশার বেলাল (রা), রোমের সুহাইব (রা) এবং পারস্যের সালমানের (রা)ও সেই একই মর্যাদা ছিল, এটা তারা নিজ চোখে দেখছিল। তাই কুরাইশ, খাযরাজ ও আওস গোত্রের লোকেরা তাদের ওপর আধিপত্য কায়েম করবে এ আশংকা তাদের সামনে ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আদর্শিক দাওয়াত পেশ করছিলেন তা যে অবিকল সেই দাওয়াত যা তাদের নবী–রসূলগণ পেশ করে এসেছেন, এ বিষয়টিও তাদের অজানা ছিল না। এ দাবীও তো তিনি করেননি যে, তিনি নতুন একটি দীন নিয়ে এসেছেন যা ইতিপূর্বে আর কেউ আনেনি। এখন তোমরা নিজেদের দীন বা জীবন ব্যবস্থা ছেড়ে আমার এই দীন বা আদর্শ গ্রহণ করো। বরং তাঁর দাবী ছিল, এটা সেই একই দীন, সৃষ্টির শুরু থেকে আল্লাহর নবী–রসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন। প্রকৃতই এটা যে সেই দীন তার সত্যতা তারা তাওরাত থেকে প্রমাণ করতে পারতো। এর মৌল নীতিমালার সাথে নবী–রসূলদের দীনের মৌল নীতিমালার কোন পার্থক্য নেই। এ কারণেই কুরআন মজীদে তাদেরকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে ঃ وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ (তোমরা ঈমান আনো আমার নাযিলকৃত সেই শিক্ষার ওপরে যা তোমাদের কাছে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান শিক্ষার সত্যায়নকারী। সবার আগে তোমরাই তার অস্বীকারকারী হয়ো না) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন চরিত্র ও আখলাকের লোক। তাঁর দাওয়াত কবুল করে মানুষের জীবনে কেমন সর্বাত্মক বিপ্লব সাধিত হয়েছে। তা তারা

চাক্ষুষ দেখছিল। আনসারগণ দীর্ঘদিন থেকে তাদের নিকট প্রতিবেশী। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাদের অবস্থা যা ছিল তাও তারা দেখেছে। আর এখন ইসলাম গ্রহণের পর তাদের যে অবস্থা হয়েছে তাও তাদের সামনে বর্তমান। এভাবে দাওয়াত, দাওয়াতদাতা ও দাওয়াত গ্রহণকারীদের পরিণাম ও ফলাফল সবই তাদের কাছে স্পষ্ট ছিল। এসব দেখে এবং জেনে বুঝেও তারা শুধু নিজেদের বংশগত গোঁড়ামি এবং পার্থিব স্বার্থের খাতিরে এমন একটি জিনিসের বিরোধিতায় সমস্ত শক্তি নিয়ে উঠে পড়ে লাগলো যার ন্যায় ও সত্য হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ করার কোন অবকাশ অন্তত তাদের জন্য ছিল না। এই সজ্ঞান শত্রুতার পরেও তারা আশা করতো, তাদের দুর্গ তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। অথচ গোটা মানব ইতিহাস একথার সাক্ষী যে, আল্লাহর শক্তি যার বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয় কোন অস্ত্রই তাকে রক্ষা করতে পারে না।

৮. দুনিয়ার আযাবের অর্থ তাদের নামনিশানা মুছে দেয়া। সন্ধি করে নিজেদের জীবন রক্ষা না করে যদি তারা লড়াই করতো তাহলে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। তাদের পুরুষরা নিহত হতো এবং নারী ও শিশুদের দাস-দাসী বানানো হতো। মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের উদ্ধার করারও কেউ থাকতো না।

৯. এখানে একটি বিষয়ের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। মুসলমানরা অবরোধ শুরু করার পর তা সহজসাধ্য করার জন্য বনী নাযীরের বসতির চারদিকে যে খেজুর বাগান ছিল তার অনেক গাছ কেটে ফেলে কিংবা জ্বালিয়ে দেয়। আর যেসব গাছ সামরিক বাহিনীর চলাচলে প্রতিবন্ধক ছিল না সেগুলোকে যথাস্থানে অক্ষত রাখে। এতে মদীনার মুনাফিকরা ও বনী কুরায়যা এমনকি বনী নাযীর গোত্রের লোকও হৈ চৈ করতে শুরু করলো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "ফাসাদ ফিল আরদ" বা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করেন; কিন্তু দেখো, তরুতাজা শ্যামল ফলবান গাছ কাটা হচ্ছে। এটা কি "ফাসাদ ফিল আরদ" নয়? এই সময় আল্লাহ তা'আলা এই নির্দেশ নাযিল করলেন ঃ "তোমরা যেসব গাছ কেটেছো এবং যা না কেটে অক্ষত রেখেছো এর কোন একটি কাজও নাজায়েয নয়। বরং এ উভয় কাজেই আল্লাহর সম্মতি রয়েছে।" এ থেকে শরীয়াতের এ বিধানটি পাওয়া যায় যে, সামরিক প্রয়োজনে যেসব ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর তৎপরতা অপরিহার্য হয়ে পড়ে তা "ফাসাদ ফিল আরদ" বা পৃথিবীতে বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টির সংজ্ঞায় পড়ে না। "ফাসাদ ফিল আরদ" হলো কোন সেনাবাহিনীর মাথায় যদি যুদ্ধের ভূত চেপে বসে এবং তারা শত্রুর দেশে প্রবেশ করে শস্যক্ষেত, গবাদি পশু, বাগান, দালানকোঠা, প্রতিটি জিনিসই নির্বিচারে ধ্বংস ও বরবাদ করতে থাকে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক সিরিয়ায় সেনাবাহিনী পাঠানোর সময় যে নির্দেশ দিয়েছিলেন যুদ্ধের ব্যাপারে সেটিই সাধারণ বিধান। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ ফলবান বৃক্ষ কাটবে না, ফসল ধ্বংস করবে না এবং জনবসতি বিরাণ করবে না। কুরআন মজীদে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী মানুষদের নিন্দা ও সমালোচনা করতে গিয়ে এ কাজের জন্য তাদের তিরস্কার ও ভীতি প্রদর্শন করে বলা হয়েছে ঃ "যখন তারা ক্ষমতাসীন হয় তখন শস্যক্ষেত ও মানব বংশ ধ্বংস করে চলে।" (বাকারাহ, ২০৫) হযরত আবু বকরের (রা) এ নীতি ছিল কুরআনের এ শিক্ষারই হুবহু অনুসরণ। তবে সামরিক প্রয়োজন দেখা দিলে বিশেষ নির্দেশ হলো, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের জন্য কোন ধ্বংসাত্মক কাজ অপরিহার্য হয়ে পড়লে তা করা যেতে পারে। তাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে স্পষ্ট করে বলেছেন

যে, قطعو منها ما كان موضعًا للقتال "মুসলমানগণ বনী নাযীরের গাছপালার মধ্যে কেবল সেই সব গাছপালাই কেটেছিলেন যা যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থিত ছিল।" (তাফসীরে নায়শাপুরী) ফকীহদের কেউ কেউ ব্যাপারটির এ দিকটার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে মত পেশ করেছেন যে, বনী নাযীরের বৃক্ষ কাটার বৈধতা শুধু এ ঘটনার জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। এ থেকে এরূপ সাধারণ বৈধতা পাওয়া যায় না যে, সামরিক প্রয়োজন দেখা দিলেই শত্রুর গাছপালা কেটে ফেলা এবং জ্বালিয়ে দেয়া যাবে। ইমাম আওযায়ী, লাইস ও আবু সাওর এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। তবে অধিকাংশ ফকীহর মত হলো, গুরুত্বপূর্ণ সামরিক প্রয়োজন দেখা দিলে এরূপ করা জায়েয। তবে শুধু ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর জন্য এরূপ করা জায়েয নয়।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, কুরআন মজীদের এ আয়াত মুসলমানদের হয়তো সন্তুষ্ট করে থাকতে পারে কিন্তু যারা কুরআনকে আল্লাহর বাণী বলে স্বীকার করতো না নিজেদের প্রশ্নের এ জবাব শুনে তারা কি সান্ত্বনা লাভ করবে যে, এ দু'টি কাজই আল্লাহর অনুমতির ভিত্তিতে বৈধ? এর জবাব হলো শুধু মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্যই কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়েছে। কাফেরদের সন্তুষ্ট করা এর আদৌ কোন উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু ইহুদী ও মুনাফিকদের প্রশ্ন সৃষ্টির কারণে কিংবা মুসলমানদের মনে স্বতস্ফূর্তভাবে সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল, আমরা "ফাসাদ ফিল আরদে" লিপ্ত হয়ে পড়ি নাই তো? তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন যে, অবরোধের প্রয়োজনে কিছুসংখ্যক গাছপালা কেটে ফেলা এবং অবরোধের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না এমন সব গাছপালা না কাটা এ দু'টি কাজই আল্লাহর বিধান অনুসারে বৈধ ছিল।

এ সব গাছ কেটে ফেলা বা জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই দিয়েছিলেন না মুসলমানরা নিজেরাই এ কাজ করে পরে এর শরয়ী বিধান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন সে বিষয়ে মুহাদ্দিসদের বর্ণিত হাদীসসমূহে মতানৈক্য দেখা যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'উমরের বর্ণনা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এর নির্দেশ দিয়েছিলেন (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে জারীর)। ইয়াযীদ ইবনে রূমানের বর্ণনাও তাই। (ইবনে জারীর) অন্যদিকে মুজাহিদ ও কাতাদার বর্ণনা হলো, এসব গাছপালা মুসলমানরা নিজেদের সিদ্ধান্তেই কেটেছিলেন। তারপর এ বিষয়টি নিয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় যে, কাজটি করা তাদের উচিত হয়েছে কিনা? কেউ কেউ তা বৈধ বলে মত প্রকাশ করলেন। আবার কেউ কেউ এরূপ করতে নিষেধ করলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে উভয় দলের কাজই সঠিক বলে ঘোষণা করলেন। (ইবনে জারীর) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এ রেওয়ায়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ এ বিষয়ে মুসলমানদের মনে সংশয় সৃষ্টি হয় যে, আমাদের মধ্যে থেকে অনেকে গাছপালা কেটেছে আবার অনেকে কাটেনি। অতএব এখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা উচিত, আমাদের কার কাজ পুরস্কার লাভের যোগ্য আর কার কাজ পাকড়াও হওয়ার যোগ্য? (নাসায়ী) ফকীহদের মধ্যে যারা প্রথম রেওয়ায়াতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তারা এ রেওয়ায়াত থেকে প্রমাণ করেন যে, এটি ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইজতিহাদ। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট অহী দ্বারা তা সমর্থন ও সত্যায়ন করেছেন। এটা এ বিষয়ের একটা প্রমাণ যে, যেসব ব্যাপারে

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ
وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝
مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ
الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

আল্লাহ তা'আলা যেসব সম্পদ তাদের দখলমুক্ত করে তাঁর রসূলের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন[১১] তা এমন সম্পদ নয়, যার জন্য তোমাদের ঘোড়া বা উট পরিচালনা করতে হয়েছে। বরং আল্লাহ তা'আলা যার ওপরে চান তাঁর রসূলদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য দান করেন। আল্লাহ সবকিছুই করতে সক্ষম।[১২] এসব জনপদের দখলমুক্ত করে যে জিনিসই আল্লাহ তাঁর রসূলকে ফিরিয়ে দেন তা আল্লাহ, রসূল, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য।[১৩] যাতে তা তোমাদের সম্পদশালীদের মধ্যেই কেবল আবর্তিত হতে না থাকে।[১৪] রসূল যা কিছু তোমাদের দেন তা গ্রহণ করো এবং যে জিনিস থেকে তিনি তোমাদের বিরত রাখেন তা থেকে বিরত থাকো। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।[১৫]

আল্লাহর কোন নির্দেশ বর্তমান থাকতো না সে সব ব্যাপারে নবী (সা) ইজতিহাদ করে কাজ করতেন। অপরপক্ষে যেসব ফকীহ দ্বিতীয় রেওয়ায়াতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তারা এ থেকে প্রমাণ পেশ করেন যে, মুসলমানদের দু'টি দল ইজতিহাদের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন দু'টি মত গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা দু'টি মতই সমর্থন করেছেন। অতএব জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ যদি সৎনিয়তে ইজতিহাদ করে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন তবে তাদের মতসমূহ পরস্পর ভিন্ন হবে। কিন্তু আল্লাহর শরীয়াতে তারা সবাই হকের অনুসারী বলে গণ্য হবেন।

১০. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল এসব গাছ কাটার দ্বারাও তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হোক এবং না কাটা দ্বারাও অপমানিত ও লাঞ্ছিত হোক। কাটার মধ্যে তাদের অপমান ও লাঞ্ছনার দিকটি ছিল এই যে, যে বাগান তারা নিজ হাতে তৈরী করেছিল এবং দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তারা যে বাগানের মালিক ছিল সেই সব বাগানের গাছপালা তাদের চোখের

সামনেই কেটে ফেলা হচ্ছে। কিন্তু তারা কোনভাবে কর্তনকারীদের বাধা দিতে পারছে না। একজন সাধারণ কৃষক বা মালিও তার ফসল বা বাগানে অন্য কারো হস্তক্ষেপ বরদাশত করতে পারে না। কেউ যদি তার সামনে তার ফসল বা বাগান ধ্বংস করতে থাকে তাহলে সে তার বিরুদ্ধে প্রাণপাত করবে। সে যদি নিজের সম্পদে অন্য কারো হস্তেক্ষেপ বন্ধ করতে না পারে তবে তা হবে তার চরম অপমান ও দুর্বলতার প্রমাণ। কিন্তু এখানে পুরা একটি গোত্র যারা শত শত বছর ধরে এ স্থানে বসবাস করে আসছিলো অসহায় হয়ে দেখছিলো যে, তাদের প্রতিবেশী তাদের বাগানের ওপর চড়াও হয়ে এর গাছপালা ধ্বংস করছে। কিন্তু তারা তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারেনি। এ ঘটনার পর তারা মদীনায় থেকে গেলেও তাদের কোন মান-মর্যাদা অবশিষ্ট থাকতো না। এখন থাকলো গাছপালা না কাটার মধ্যে অপমান ও লাঞ্ছনার বিষয়টি। সেটি হলো, যখন তারা মদীনা ছেড়ে চলে চাচ্ছিলো তখন নিজ চোখে দেখছিল যে, শ্যামল-সবুজ যেসব বাগান কাল পর্যন্তও তাদের মালিকানায় ছিল আজ তা মুসলমানদের দখলে চলে যাচ্ছে। ক্ষমতায় কুলালে তারা ওগুলো পুরাপুরি ধ্বংস করে যেতো এবং অবিকৃত একটি গাছও মুসলমানদের দখলে যেতে দিতো না। কিন্তু তারা নিরূপায়ভাবে সবকিছু যেমন ছিল তেমন রেখে হতাশা ও দুঃখ ভরা মনে বেরিয়ে গেল।

১১. যেসব বিষয় সম্পত্তি বনী নাযীরের মালিকানায় ছিল এবং তাদের বহিষ্কারের পর তা ইসলামী সরকারের হস্তগত হয়েছিলো এখানে সেই সব বিষয় সম্পত্তির কথা বলা হচ্ছে। এসব সম্পদের ব্যবস্থাপনা কিভাবে করা যাবে এখান থেকে শুরু করে ১০নং আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা সেই সব কথাই বলেছেন। কোন এলাকা বিজিত হয়ে ইসলামী সরকারের দখলভুক্ত হওয়ার ঘটনা যেহেতু এটাই প্রথম এবং পরে আরো এলাকা বিজিত হতে যাচ্ছিলো তাই এ জন্য বিজয়ের শুরুতেই বিজিত ভূমি সম্পর্কে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ভেবে দেখার মত বিষয় হলো, আল্লাহ তা'আলা مَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ (যেসব সম্পদ তাদের দখলমুক্ত করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন) বাক্যটি ব্যবহার করেছেন। এ বাক্য থেকে স্বতঃই এ অর্থ প্রকাশ পায় যে, এই পৃথিবী এবং যেসব জিনিস এখানে পাওয়া যায় তাতে সেই সব লোকদের মূলত কোন অধিকার নেই যারা মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। তারা যদি এর ওপরে দখলকারী ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেও থাকে তাহলেও তার অবস্থা হলো বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য কর্তৃক মনিবের বিষয়-সম্পদ কুক্ষিগত করার মত। প্রকৃতপক্ষে এসব সম্পদের হক হলো তা তার আসল মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মর্জি অনুসারে তাঁর আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করা। আর এভাবে ব্যবহার কেবল নেককার ঈমানদার বান্দারাই করতে পারে। তাই বৈধ ও ন্যায়সংগত যুদ্ধের পরিণতিতে যেসব সম্পদ কাফেরদের দখলমুক্ত হয়ে ঈমানদারদের করায়ত্ত হবে তার মর্যাদা হলো তার মালিক এ সম্পদ নিজের বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যদের দখল থেকে উদ্ধার করে তাঁর অনুগত ভৃত্যদের দখলে দিয়েছেন। তাই ইসলামী আইনের পরিভাষায় এসব বিষয় সম্পদকে 'ফাই' (প্রত্যাবর্তিত বা ফিরিয়ে আনা সম্পদ) বলা হয়েছে।

১২. অর্থাৎ এসব সম্পদের অবস্থা ও প্রকৃতি এমন নয় যে, সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে লড়াই করে তা অর্জন করেছে। তাই এতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এ সম্পদ তাদের মধ্যেই বন্টন করে দিতে হবে। বরং তার প্রকৃত

অবস্থা হলো, আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে তাঁর রসূলদের এবং যে আদর্শের প্রতিনিধিত্ব এ রসূল করছেন সেই আদর্শকে তাদের ওপর বিজয় দান করেছেন। অন্য কথায়, এসব সম্পদ মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হওয়া সরাসরি সেনাবাঁহিনীর শক্তি প্রয়োগের ফল নয়। বরং এটা সেই সামগ্রিক শক্তির ফল যা আল্লাহ তাঁর রসূল, রসূলের উম্মাত এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আদর্শকে দান করেছেন। তাই এসব সম্পদ গনীমাতের সম্পদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মর্যাদা সম্পন্ন। এতে যুদ্ধরত সৈনিকদের এমন কোন অধিকার বর্তায় না যে, তা তাদের মধ্যে গনীমাতের মত বন্টন করে দিতে হবে।

এভাবে শরীয়াতে 'গনীমাত' ও 'ফাই'–এর আলাদা আলাদা বিধান দেয়া হয়েছে। সূরা আনফালের ৪১নং আয়াতে গনীমাতের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। বিধানটি হলো, গনীমাতের সম্পদ পাঁচটি অংশে ভাগ করা হবে। এর চারটি অংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে এবং একটি অংশ বায়তুলমালে জমা দিয়ে উক্ত আয়াতে বর্ণিত খাতসমূহে খরচ করতে হবে। ফাইয়ের বিধান হলো, তা সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা যাবে না। বরং এর সবটাই পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত খাতসমূহের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে। এই দুই ধরনের সম্পদের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ করা হয়েছেঃ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ (তোমরা তার বিরুদ্ধে নিজেদের ঘোড়া বা উট পরিচালনা কর নাই।) কথাটি দ্বারা ঘোড়া বা উট পরিচালনা করার অর্থ সামরিক তৎপরতা চালানো (Warlike Operations)। সুতরাং সরাসরি এ ধরনের তৎপরতার ফলে যেসব সম্পদ হস্তগত হয়ে থাকে তা গনীমাতের সম্পদ। আর যেসব সম্পদ লাভের পেছনে এ ধরনের তৎপরতা নেই তা সবই 'ফাই' হিসেবে গণ্য।

'গনীমাত' ও 'ফাই'–এর মোটামুটি যে অর্থ এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে ইসলামের ফকীহগণ তা আরো স্পষ্ট করে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ গনীমাত হলো সেই সব অস্থাবর সম্পদ যা সামরিক তৎপরতা চালানোর সময় শত্রু সেনাদের নিকট থেকে লাভ করা গিয়েছে। এসব ছাড়া শত্রু এলাকার ভূমি, ঘরবাড়ী এবং অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ গনীমাতের সংজ্ঞায় পড়ে না। এ ব্যাখ্যার উৎস হলো হযরত উমরের (রা) সেই পত্র যা তিনি ইরাক বিজয়ের পর হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে লিখেছিলেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ

فَانْظُرْ مَا اَجْلَبُوْا بِهٖ عَلَيْكَ فِى الْعَسْكَرِ مِنْ كُرَاعٍ اَوْمَالٍ فَاقْسِمْهُ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاتْرُكِ الْاَرْضِيْنَ وَالْاَنْهَارَ لِعُمَّالِهَا لِيَكُوْنَ ذٰلِكَ فِىْ اَعْطِيَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ –

"সেনাবাহিনীর লোকজন যেসব ধন–সম্পদ তোমাদের কাছে কুড়িয়ে আনবে তা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দাও। আর ভূমি ও সেচ খালে যেসব লোক কাজ করে ভূমি ও সেচ খাল তাদের জন্য রেখে দাও যাতে তার আয় মুসলমানদের বেতন ভাতা ও বৃত্তি দেয়ার কাজে লাগে।" (কিতাবুল খারাজ, আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা ২৪; কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবায়েদ, পৃষ্ঠা ৫৯; কিতাবুল খারাজ, ইয়াহইয়া ইবনে আদম, পৃষ্ঠা ২৭, ২৮, ৪৮)

এ কারণে হাসান বসরী বলেন ঃ শত্রুর শিবির থেকে যা হস্তগত হবে তা সেই সব সৈনিকদের হক যারা তা দখল করেছে। কিন্তু ভূমি সব মুসলমানের জন্য। (ইয়াহইয়া ইবনে আদম ২৭) ইমাম আবু ইউসুফ বলেন ঃ "শত্রুসেনাদের কাছ থেকে যেসব জিনিস মুসলমানদের হস্তগত হবে এবং যেসব দ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র ও জীবজন্তু তারা কুড়িয়ে ক্যাম্পে আনবে তাহলো গনীমাত। এর মধ্য থেকে এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করে রেখে অবশিষ্ট চার অংশ সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা হবে।" (কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ১৮) ইয়াহইয়া ইবনে আদমও এ মত পোষণ করেন এবং তা তিনি তাঁর গ্রন্থ কিতাবুল খারাজে বর্ণনা করেছেন। (পৃষ্ঠা ২৭) যে জিনিসটি 'গনীমাত ও ফাই'-এর পার্থক্য আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরে তা হলো, নাহাওয়ান্দের যুদ্ধ শেষে গনীমাতের সম্পদ বন্টন এবং বিজিত এলাকা যথারীতি ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তরভুক্ত হওয়ার পর সায়েব ইবনে আকরা' নামক এক ব্যক্তি দুর্গের অভ্যন্তরে দু'টি থলি ভর্তি মণি মুক্তা কুড়িয়ে পান। এতে তার মনে খটকা সৃষ্টি হয় যে, তা 'গনীমাত' না 'ফাই'? গনীমাত হলে তা সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা হবে। আর 'ফাই' হলে তা বায়তুলমালে জমা হওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত তিনি মদীনায় হাজির হলেন এবং বিষয়টি হযরত উমরের (রা) সামনে পেশ করলেন। হযরত উমর (রা) ফায়সালা করলেন যে, তা বিক্রি করে অর্থ বায়তুলমালে জমা দিতে হবে। এ থেকে জানা গেল যে, শুধু এমন সব অস্থাবর সম্পদ গনীমাত হিসেবে গণ্য হবে যা যুদ্ধের সময় সৈন্যদের হস্তগত হবে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রাপ্ত অস্থাবর সম্পদ স্থাবর সম্পদের মতই 'ফাই' হিসেবে গণ্য হয়। এ ঘটনাটি উল্লেখ করে ইমাম আবু উবায়েদ লিখছেন ঃ

مَا نِيْلَ مِنْ اَهْلِ الشِّرْكِ عُنْوَةً قَسْرًا وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ فَهُوَ الْغَنِيْمَةُ - وَمَانِيْلَ مِنْهُمْ بَعْدَ مَا تَضَعُ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا وَتَصِيْرُ الدَّارُ دَارَالْاِسْلَامِ- فَهُوَ فَيْءٌ يَكُوْنُ لِلنَّاسِ عَامًّا وَلَا خُمُسَ فِيْهِ -

"যুদ্ধ চলাকালে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যেসব সম্পদ শত্রুর কাছ থেকে হস্তগত হবে তা গনীমাত। আর যুদ্ধ শেষে দেশ দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হওয়ার পর যেসব সম্পদ হস্তগত হবে তা 'ফাই' হিসেবে পরিগণিত হবে। এ সম্পদ দারুল ইসলামের অধিবাসীদের কল্যাণে কাজে লাগা উচিত। তাতে এক-পঞ্চমাংশ নির্দিষ্ট হবে না।" (কিতাবুল আমওয়াল, পৃষ্ঠা ২৫৪)

গনীমাতকে এভাবে সংজ্ঞায়িত ও নির্দিষ্ট করার পর কাফেরদের কাছ থেকে মুসলমানদের হস্তগত হওয়া যেসব সম্পদ, বিষয়-সম্পত্তি ও জায়গা-জমি অবশিষ্ট থাকে তা প্রধান দু'টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক, লড়াই করে হস্তগত করা সম্পদ ইসলামী ফিকহের পরিভাষায় যাকে শক্তি বলে দখলকৃত দেশ বা অঞ্চল বলা হয়। দুই, সন্ধির ফলে যা মুসলমানদের হস্তগত হবে। এ সন্ধি মুসলমানদের সামরিক শক্তির প্রভাব, দাপট কিংবা ভীতির কারণে হলেও। বাহুবলে হস্তগত না হয়ে অন্য কোনভাবে হস্তগত হওয়া সম্পদও এরই মধ্যে অন্তরভুক্ত। মুসলিম ফকীহদের মধ্যে যা কিছু বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তা প্রথম প্রকারের সম্পদ সম্পর্কে হয়েছে। অর্থাৎ তার সঠিক শরয়ী মর্যাদা কি? কেননা, তা فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب -এর সংজ্ঞায় পড়ে না। এরপর

থাকে দ্বিতীয় প্রকার সম্পদ। এ প্রকারের সম্পদ সম্পর্কে সর্বসম্মত মত হলো, তা 'ফাই' হিসেবে গণ্য। কারণ এর বিধান কুরআন মজীদে স্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। পরে আমরা প্রথম প্রকারের সম্পদের শরয়ী মর্যাদা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

১৩. এসব সম্পদ আক্রমণকারী সেনাবাহিনীর মধ্যে গনীমাতের মত বন্টন না করার কারণ কি এবং তার শরয়ী বিধান গনীমাত সম্পর্কিত বিধান থেকে ভিন্ন কেন পূর্ববর্তী আয়াতে শুধু এতটুকু কথাই বলা হয়েছে। এখন এসব সম্পদের হকদার কারা এ আয়াতটিতে তা বলা হয়েছে।

এসব সম্পদের মধ্যে সর্বপ্রথম অংশ হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের। রসূলুল্লাহ (সা) এ নির্দেশ অনুসারে যেভাবে আমল করেছেন হযরত উমর (রা) থেকে মালেক ইবনে আওস ইবনুল হাদাসান তা উদ্ধৃত করেছেন। হযরত উমর (রা) বলেন ঃ এ অংশ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের ও পরিবার-পরিজনের খরচ নিয়ে নিতেন আর অবশিষ্ট অর্থ জিহাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং সওয়ারী জন্তু সংগ্রহ করতে ব্যয় করতেন। (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ইত্যাদি) নবীর (সা) ইন্তিকালের পর এ অংশটি মুসলমানদের বায়তুলমালে জমা দেয়া হতো যাতে আল্লাহ তাঁর রসূলকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেই কাজেই তা ব্যয়িত হয়। ইমাম শাফেয়ীর (র) মত হলো, যে অংশটি বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল তা তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর খলীফাদের জন্য নির্দিষ্ট হবে। কারণ ইমামত বা নেতৃত্বের পদমর্যাদার জন্য তিনি এর হকদার ছিলেন, রিসালাতের পদমর্যাদার জন্য নয়। তবে শাফেয়ী ফিকাহবিদগণের অধিকাংশ এ ব্যাপারে অন্যান্য অধিকাংশ ফিকাহবিদগণের অনুরূপ মতামত পোষণ করেন। অর্থাৎ এ অংশটি এখন আর কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং তা মুসলমানদের দীনি ও সামাজিক কল্যাণে ব্যয়িত হবে।

দ্বিতীয় অংশটি হলো আত্মীয়-স্বজনের জন্য। এর অর্থ রসূলের আত্মীয়-স্বজনের জন্য। অর্থাৎ বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব। এ অংশটি নির্ধারিত করা হয়েছিল এ জন্য যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন নিজের এবং নিজের পরিবার-পরিজনের হক আদায় করার সাথে সাথে নিজের সেই সব আত্মীয়-স্বজনের হকও আদায় করতে পারেন যারা তাঁর সাহায্যের মুখাপেক্ষী অথবা তিনি নিজে যাদের সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর এ অংশেরও ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র মর্যাদা অবশিষ্ট নেই। বরং মুসলমানদের অন্য সব মিসকীন, ইয়াতীম এবং মুসাফিরদের মত বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবের অভাবী লোকদের অধিকারসমূহ ও বায়তুলমালের জিম্মাদারীতে চলে গিয়েছে। তবে যাকাতে তাদের অংশ না থাকার কারণে অন্যদের তুলনায় তাদের অধিকার অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু বকর, উমর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমের যুগে প্রথম দু'টি অংশ বাতিল করে শুধু অবশিষ্ট তিনটি অংশের (ইয়াতীম, মিসকীন ও ইবনুস সাবীল) হকদারদের জন্য 'ফাই' নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু তাঁর যুগে এ নীতি অনুসারে আমল করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইমাম মুহাম্মাদ বাকেরের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, যদিও

হযরত আলীর (রা) আহলে বায়তের রায়ই [এ অংশ নবীর (সা) আত্মীয়-স্বজনের পাওয়া উচিত] তাঁর ব্যক্তিগত রায় ছিল। তথাপি তিনি হযরত আবু বকর ও উমরের (রা) সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাজ করা পছন্দ করেননি। হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া বলেন ঃ নবীর (সা) পরে ঐ দু'টি অংশ (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অংশ ও যাবিল কুরবার অংশ) সম্পর্কে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিল। কিছু সংখ্যক লোকের মত ছিল, প্রথম অংশটি হুজুরের (সা) খলীফার প্রাপ্য। কিছু সংখ্যক লোকের মত ছিল, দ্বিতীয় অংশটি হুজুরের (সা) আত্মীয়-স্বজনদের পাওয়া উচিত। অপর কিছু সংখ্যক লোকের ধারণা ছিল, দ্বিতীয় অংশটি খলীফার আত্মীয়-স্বজনদের দেয়া উচিত। অবশেষে এমতে 'ইজমা' বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো যে, এ দু'টি অংশই জিহাদের প্রয়োজনে খরচ করা হবে। আতা ইবনে সায়েব বলেন ঃ হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) তাঁর শাসনকালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অংশ এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের অংশ বনী হাশেমদের কাছে পাঠাতে শুরু করেছিলেন। ইমাম আবু হানীফা এবং অধিকাংশ হানাফী ফকীহদের সিদ্ধান্ত হলো, এ ক্ষেত্রে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে অনুসৃত কর্মনীতিই সঠিক ও নির্ভুল (কিতাবুল খারাজ, আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা ১৯ থেকে ২১)। ইমাম শাফেয়ীর (র) মত হলো, যারা হাশেম ও মুত্তালিব বংশের লোক বলে প্রমাণিত কিংবা সাধারণভাবে সবার কাছে পরিচিত তাদের সচ্ছল ও অভাবী উভয় শ্রেণীর লোককেই 'ফাই'-এর সম্পদ থেকে দেয়া যেতে পারে। (মুগনিউল মুহতাজ) হানাফীদের মতে, এ অর্থ থেকে কেবল তাদের অভাবীদের সাহায্য করা যেতে পারে। অবশ্য অন্যদের তুলনায় তাদের অধিকার অগ্রগণ্য। (রুহুল মায়ানী) ইমাম মালেকের মতে এ ব্যাপারে সরকারের ওপর কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা নেই। যে খাতে ইচ্ছা সরকার তা ব্যয় করতে পারেন। তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধরদের অগ্রাধিকার দেয়া উত্তম। (হাশিয়াতুদ দুসুকী আলাশ্‌শারহিল কাবীর)

অবশিষ্ট তিনটি অংশ সম্পর্কে ফকীহদের মধ্যে কোন বিতর্ক নেই। তবে ইমাম শাফেয়ী এবং অন্য তিনজন ইমামের মধ্যে মতানৈক্য আছে। ইমাম শাফেয়ীর (র) মতে 'ফাই'-এর সমস্ত অর্থ-সম্পদ সমান পাঁচ ভাগে ভাগ করে তার এক ভাগ উপরোক্ত খাতসমূহে এমনভাবে খরচ করা উচিত যেন তার $\frac{১}{৫}$ সাধারণভাবে মুসলমানদের কল্যাণে, $\frac{১}{৫}$ বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবের জন্য, $\frac{১}{৫}$ ইয়াতীমদের জন্য, $\frac{১}{৫}$ মিসকীনদের জন্য এবং $\frac{১}{৫}$ মুসাফিরদের জন্য ব্যয়িত হয়। অপরদিকে ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আহমাদ এভাবে বন্টনের পক্ষপাতী নন। তাঁদের মতে, 'ফাই'-এর সমস্ত অর্থ-সম্পদই সাধারণভাবে মুসলমানদের কল্যাণে ব্যয়িত হবে। (মুগনিউল মুহতাজ)

১৪. এটি কুরআন মজীদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারক আয়াতসমূহের একটি। এতে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পলিসির একটি মৌলিক নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, গোটা সমাজে ব্যাপকভাবে সম্পদ আবর্তিত হতে থাকা উচিত। এমন যেন না হয় অর্থ-সম্পদ কেবল ধনবান ও বিত্তশালীদের মধ্যেই আবর্তিত হতে থাকবে। কিংবা ধনী দিনে দিনে আরো ধনশালী হতে থাকবে আর গরীব দিনে দিনে আরো বেশী গরীব হতে থাকবে। কুরআন মজীদে এ নীতি শুধু বর্ণনা করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়নি। বরং এ উদ্দেশ্যে সুদ হারাম করা হয়েছে, যাকাত ফরয করা হয়েছে, গনীমাতের

সম্পদ থেকে এক-পঞ্চমাংশ বের করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, বিভিন্ন আয়াতে নফল সাদকা ও দান-খয়রাতের শিক্ষা দেয়া হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের কাফ্ফারা আদায়ের এমন সব পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে যার মাধ্যমে সম্পদের প্রবাহ সমাজের দরিদ্র মানুষদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া যেতে পারে। উত্তরাধিকারের জন্য এমন আইন রচনা করা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ যেন ব্যাপক পরিসরে ছড়িয়ে পড়ে, কার্পণ্য ও বখিলীকে নৈতিক বিচারে কঠোরভাবে নিন্দনীয় এবং দানশীলতাকে সর্বোত্তম গুণ বলে প্রশংসা করা হয়েছে আর সচ্ছল শ্রেণীকে বুঝানো হয়েছে যে, তাদের সম্পদে প্রার্থী এবং বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে যাকে খয়রাত মনে করে নয় বরং তাদের অধিকার মনে করে আদায় করা উচিত। তাছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের একটি বড় খাত অর্থাৎ 'ফাই' সম্পর্কে এমন একটি আইন রচনা করা হয়েছে যে, এর একটি অংশ যেন অনিবার্যরূপে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীকে সহায়তা দানের জন্য ব্যয়িত হয়। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত, ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাত দু'টি একটি যাকাত এবং অন্যটি 'ফাই'। মুসলমানদের নিসাবের অতিরিক্ত পুঁজি, গবাদি পশু, ব্যবসায় পণ্য এবং কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য থেকে আদায় করা হয়, আর এর বেশীর ভাগই গরীবদের জন্য নির্দিষ্ট। আর 'ফাই'-এর মধ্যে জিযিয়া ও ভূমি রাজস্ব সহ সেই সব আয়ও অন্তরভুক্ত যা অমুসলিমদের নিকট থেকে আসে। এরও বেশীর ভাগ গরীবদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এটা এ বিষয়েরই স্পষ্ট ইংগিত যে, একটি ইসলামী রাষ্টকে তার আয় ও ব্যয়ের ব্যবস্থা এবং সামগ্রিকভাবে দেশের গোটা আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা এমনভাবে পরিচালনা করা উচিত যেন ধন-সম্পদের উপায়-উপকরণের ওপর বিত্তবান এবং প্রভাবশালী লোকদের ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত না হয়ে সম্পদের প্রবাহ গরীবদের দিক থেকে ধনীদের দিকে ঘুরে না যায় আর বিত্তশালীদের মধ্যেই যেন আবর্তিত হতে না থাকে।

১৫. বর্ণনার ধারাবাহিকতার দিক থেকে এ আয়াতের অর্থ হলো, বনী নাযীর গোত্র থেকে লব্ধ সম্পদের ব্যবস্থাপনা এবং অনুরূপভাবে পরবর্তীকালে লব্ধ 'ফাই'-এর সম্পদের বিলি-বন্টনের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তা কোন প্রকার আপত্তি ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই মেনে নাও। তিনি যাকে যা দেবেন সে তা গ্রহণ করবে এবং যা কাউকে দেবেন না সে জন্য যেন সে আপত্তি বা দাবী উত্থাপন না করে। কিন্তু নির্দেশটির ভাষা যেহেতু ব্যাপকতাবোধক, তাই এ নির্দেশ শুধু 'ফাই' সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর অভিপ্রায় হলো, মুসলমান সব ব্যাপারেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করবে। এ অভিপ্রায়কে আরো স্পষ্ট করে দেয় এ বিষয়টি যে, "রসূল তোমাদের যা কিছু দেন" কথাটির বিপরীতে "যা কিছু না দেন" বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে যে, "যে জিনিস থেকে তিনি তোমাদের বিরত রাখেন (নিষেধ করেন) তা থেকে বিরত থাকো।" এ নির্দেশের লক্ষ যদি শুধু 'ফাই' -এর সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে আনুগত্য করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হতো তা হলে 'যা দেন' কথাটির বিপরীতে 'যা না দেন' বলা হতো। এ ক্ষেত্রে নিষেধ করা বা বিরত রাখা কথাটির ব্যবহার দ্বারা আপনা থেকেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ নির্দেশের লক্ষ ও উদ্দেশ্য নবীর (সা) আদেশ ও নিষেধের আনুগত্য করা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ
فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الصّٰدِقُوْنَ ۚ﴿۸﴾ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ
هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ
عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ ۚ﴿۹﴾

(তাছাড়াও এ সম্পদ) সেই সব গরীব মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘর-বাড়ী ও বিষয়-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে।[১৬] এসব লোক চায় আল্লাহর মেহেরবানী এবং সন্তুষ্টি। আর প্রস্তুত থাকে আল্লাহ ও তার রসূলকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য। এরাই হলো সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ লোক। (আবার তা সেই সব লোকের জন্যও) যারা এসব মুহাজিরদের আগমনের পূর্বেই ঈমান এনে দারুল হিজরাতে বসবাস করছিলো।[১৭] তারা ভালবাসে সেই সব লোকদের যারা হিজরাত করে তাদের কাছে এসেছে। যা কিছুই তাদের দেয়া হোক না কেন এরা নিজেদের মনে তার কোন প্রয়োজন পর্যন্ত অনুভব করে না এবং যত অভাবগ্রস্তই হোক না কেন নিজেদের চেয়ে অন্যদের অগ্রাধিকার দান করে।[১৮] মূলত যেসব লোককে তাদের মনের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে তারাই সফলকাম।[১৯]

নিজেও একথাটি বলেছেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ

اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِاَمْرٍ فَاْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ
فَاجْتَنِبُوْهُ - (بخارى - مسلم)

"আমি কোন বিষয়ে তোমাদের নির্দেশ দিলে তা যথাসাধ্য পালন করো। আর যে বিষয়ে বিরত থাকতে বলি তা থেকে দূরে থাকো।" (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার তিনি বক্তৃতাকালে বললেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা অমুক অমুক ফ্যাশনকারীনী মহিলাকে লা'নত করেছেন।" এই বক্তৃতা শুনে এক মহিলা তাঁর কাছে এসে বলল ঃ একথা আপনি কোথায়

পেয়েছেন? আল্লাহর কিতাবে তো এ বিষয়টি আমি কোথাও দেখি নাই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন ঃ তুমি আল্লাহর কিতাব পড়ে থাকলে একথা অবশ্যই পেতে। তুমি কি এ আয়াত مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا পড়েছো? সে বললো ঃ হাঁ, এ আয়াত তো আমি পড়েছি। হযরত আবদুল্লাহ বললেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে, এরূপ কাজে লিপ্ত নারীদের ওপর আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন। মহিলাটি বললোঃ এখন আমি বুঝতে পারলাম। (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে ইবনে আবী হাতেম।)

১৬. এ কথা দ্বারা সেই সব লোকদের বুঝানো হয়েছে যারা ঐ সময় মক্কা মুয়াযযামা ও আরবের অন্যান্য এলাকা থেকে ইসলাম গ্রহণের কারণে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। বনী নাযীর গোত্রের এলাকা বিজিত হওয়া পর্যন্ত এসব মুহাজিরের জীবন যাপনের কোন স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না। এখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেসব অর্থ-সম্পদ এখন হস্তগত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যেসব সম্পদ 'ফাই' হিসেবে হস্তগত হবে তাতে সাধারণ মিসকীন, ইয়াতীম এবং মুসাফিরদের সাথে সাথে এসব লোকেরও অধিকার আছে। উক্ত সম্পদ থেকে এমন সব লোকদের সহযোগিতা দেয়া উচিত যারা আল্লাহ, আল্লাহর রসূল এবং তাঁর দীনের জন্য হিজরাত করতে বাধ্য হয়েছে এবং দারুল ইসলামে চলে এসেছে। এই নির্দেশের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী নাযীরের সম্পদের একটি অংশ মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এবং আনসারগণ যেসব খেজুর বাগান তাদের মুহাজির ভাইদের সাহায্যের জন্য দিয়ে রেখেছিলেন তা তাদের ফিরিয়ে দেয়া হলো। কিন্তু এরূপ মনে করা ঠিক নয় যে, 'ফাই'-এর সম্পদে মুহাজিরদের এ অংশ কেবল সেই যুগের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, কিয়ামত পর্যন্ত যত লোকই মুসলমান হওয়ার কারণে নির্বাসিত হয়ে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে তাদের পুনর্বাসিত করা এবং নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করে দেয়া উক্ত রাষ্ট্রের ইসলামী সরকারের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তরভুক্ত। তাই তার উচিত যাকাত ছাড়া 'ফাই'-এর সম্পদও এ খাতে খরচ করা।

১৭. এখানে আনসারদের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ 'ফাই' অর্থ-সম্পদে শুধু মুহাজিরদের অধিকার নেই। বরং আগে থেকেই যেসব মুসলমান দারুল ইসলামে বসবাস করে আসছে তারাও এতে অংশ লাভের অধিকারী।

১৮. এটা মদীনা তাইয়্যেবার আনসারদের পরিচয় ও প্রশংসা। মুহাজিরগণ মক্কা ও অন্যান্য স্থান থেকে হিজরত করে তাঁদের শহরে আসলে তাঁরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রস্তাব দিলেন, আমাদের বাগ-বাগিচা ও খেজুর বাগান দিয়ে দিচ্ছি। আপনি ওগুলো আমাদের এবং এসব মুহাজির ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিন। নবী (সা) বললেন ঃ এসব লোক তো বাগানের কাজ জানে না। তারা এমন এলাকা থেকে এসেছে যেখানে বাগান নেই। এমন কি হতে পারে না, এসব বাগ-বাগিচা ও খেজুর বাগানে তোমরাই কাজ করো এবং উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ এদের দাও। তারা বললো ঃ سمعنا واطعنا আমরা মেনে নিলাম। (বুখারী, ইবনে জারীর) এতে মুহাজিরগণ বলে উঠলেন ঃ এ রকম আত্মত্যাগী মানুষ তারা আর কখনো দেখেনি। এরা নিজেরা কাজ

করবে অথচ আমাদেরকে অংশ দেবে। আমাদের তো মনে হচ্ছে, সমস্ত সওয়াব তারাই লুটে নিয়েছে। নবী (সা) বললেন ঃ তা নয়, যতক্ষণ তোমরা তাদের প্রশংসা করতে থাকবে এবং তাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করবে ততক্ষণ তোমরাও সওয়াব পেতে থাকবে। (মুসনাদে আহমাদ) অতপর বনী নাযীরের এলাকা বিজিত হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এখন একটা বন্দোবস্ত হতে পারে এভাবে যে, তোমাদের বিষয়-সম্পদ এবং ইহুদীদের পরিত্যক্ত ফল-ফলাদি ও খেজুর বাগান মিলিয়ে একত্রিত করে সবটা তোমাদের ও মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া যাক । আরেকটা বন্দোবস্ত হতে পারে এভাবে যে, তোমরা তোমাদের বিষয়-সম্পদ নিজেরাই ভোগ দখল করো আর পরিত্যক্ত এসব ভূমি মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া যাক। আনসারগণ বললেন ঃ এসব বিষয়-সম্পদ আপনি তাদের মধ্যে বিলি-বন্টন করে দিন। আর আপনি চাইলে আমাদের বিষয়-সম্পদেরও যতটা ইচ্ছা তাদের দিয়ে দিতে পারেন। এতে হযরত আবু বকর চিৎকার করে উঠলেন : جزاكم الله يامعشر الانصار خيرا "হে আনসারগণ, আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিন।" (ইয়াহইয়া ইবনে আদম, বালাযুরী) এভাবে আনসারদের সম্মতির ভিত্তিতেই ইহুদীদের পরিত্যক্ত অর্থ-সম্পদ মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হলো। আনসারদের মধ্যে থেকে শুধু হযরত আবু দুজানা, হযরত সাহল ইবনে সা'দ এবং কারো কারো বর্ণনা অনুসারে হযরত হারেস ইবনুস্ সিমাকে অংশ দেয়া হলো। কারণ, তাঁরা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। (বালাযুরী, ইবনে হিশাম, রূহুল মায়ানী) বাহরাইন এলাকা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তরভুক্ত হলে সে সময়ও আনসারগণ এই ত্যাগের প্রমাণ দেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ অঞ্চলের বিজিত ভূমি শুধু আনসারদের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করছিলেন। কিন্তু আনসারগণ বললেন ঃ যতক্ষণ আমাদের সমপরিমাণ অংশ আমাদের ভাই মুহাজিরদের দেয়া না হবে ততক্ষণ আমরা এ সম্পদের কোন অংশ গ্রহণ করবো না। (ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদম) আনসারদের এ সব ত্যাগের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসা করেছেন।

১৯. 'রক্ষা পেয়েছে' না বলে বলা হয়েছে 'রক্ষা করা হয়েছে'। কেননা আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ও সাহায্য ছাড়া কেউ নিজ বাহু বলে মনের ঔদার্য ও ঐশ্বর্য লাভ করতে পারে না। এটা আল্লাহর এমন এক নিয়ামত যা আল্লাহর দয়া ও করুণায়ই কেবল কারো ভাগ্যে জুটে থাকে। شح শব্দটি আরবী ভাষায় অতি কৃপণতা ও বখিলী বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শব্দটিকে যখন نفس শব্দের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে شح النفس বলা হয় তখন তা দৃষ্টি ও মনের সংকীর্ণতা, পরশ্রীকাতরতা এবং মনের নীচতার সমার্থক হয়ে যায় যা বখিলী বা কৃপণতার চেয়েও ব্যাপক অর্থ বহন করে। বরং কৃপণতার মূল উৎস এটিই। এই বৈশিষ্টের কারণে মানুষ অন্যের অধিকার স্বীকার করা এবং তা পূরণ করা তো দূরের কথা তার গুণাবলী স্বীকার করতে পর্যন্ত কুণ্ঠাবোধ করে। সে চায় দুনিয়ার সবকিছু সে-ই লাভ করুক। অন্য কেউ যেন কিছুই না পায়। নিজে অন্যদের কিছু দেয়া তো দূরের কথা, অপর কোন ব্যক্তি যদি কাউকে কিছু দেয় তাহলেও সে মনে কষ্ট পায়। তার লালসা শুধু নিজের অধিকার নিয়ে কখনো সন্তুষ্ট নয়, বরং অন্যদের অধিকারেও সে হস্তক্ষেপ করে, কিংবা অন্ততপক্ষে সে চায় তার চারদিকে ভাল বস্তু যা আছে তা সে নিজের জন্য দু'হাতে লুটে নেবে অন্য কারো জন্য কিছুই রাখবে না। এ কারণে এ জঘন্য স্বভাব থেকে রক্ষা পাওয়াকে কুরআন মজীদে সাফল্যের গ্যারান্টি বলে

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٠﴾

(তা সেই সব লোকের জন্যও) যারা এসব অগ্রবর্তী লোকদের পরে এসেছে।[২০] যারা বলে ঃ হে আমাদের রব, আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে মাফ করে দাও যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে। আর আমাদের মনে ঈমানদারদের জন্য কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব, তুমি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু।[২১]

আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাছাড়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এটিকে মানুষের নিকৃষ্টতম স্বভাব বলে গণ্য করেছেন যা বিপর্যয়ের উৎস। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ

اِتَّقُوْا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ (مسلم - مسند احمد - بيهقى - بخارى فى الادب)

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে আমরের বর্ণনার ভাষা হলো ঃ

اَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوْا وَاَمَرَهُمْ بِالْفُجُوْرِ فَفَجَرُوْا - وَاَمَرَهُمْ بِالْقَطِيْعَةِ فَقَطَعُوْا (مسند احمد - ابو داؤد - نسائى)

অর্থাৎ شح থেকে নিজেকে রক্ষা করো। কারণ এটিই তোমাদের পূর্বের লোকদের ধ্বংস করেছে। এটিই তাদেরকে পরস্পরের রক্তপাত ঘটাতে এবং অপরের মর্যাদাহানি নিজের জন্য বৈধ মনে করে নিতে মানুষকে প্ররোচিত করেছে। এটিই তাদের জুলুম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে তাই তারা জুলুম করেছে। পাপের নির্দেশ দিয়েছে তাই পাপ করেছে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে বলেছে তাই তারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ ঈমান ও মনের সংকীর্ণতা একই সাথে কারো মনে অবস্থান করতে পারে না। (ইবনে আবি শায়বা, নাসায়ী, বায়হাকী ফী শুআবিল ঈমান, হাকেম) হযরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ দুইটি স্বভাব এমন যা কোন মুসলমানের মধ্যে থাকতে পারে না। অর্থাৎ কৃপণতা ও দুশ্চরিত্রতা। (আবু দাউদ, তিরমিযী, বুখারী ফিল আদাব) কিছু সংখ্যক ব্যক্তির কথা বাদ

দিলে পৃথিবীতে জাতি হিসেবে মুসলমানরা আজও সবচেয়ে বেশী দানশীল ও উদারমনা। সংকীর্ণমন্যতা ও কৃপণতার দিক দিয়ে যেসব জাতি পৃথিবীতে নজিরবিহীন সেই সব জাতির কোটি কোটি মুসলমান তাদের স্বগোত্রীয় অমুসলিমদের পাশাপাশি বসবাস করছে। হৃদয়-মনের ঔদার্য ও সংকীর্ণতার দিক দিয়ে তাদের উভয়ের মধ্যে যে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায় তা ইসলামের নৈতিক শিক্ষার অবদান। এ ছাড়া তার অন্য কোন ব্যাখ্যা দেয়া যায় না। এ শিক্ষাই মুসলমানদের হৃদয়-মনকে বড় করে দিয়েছে।

২০. এ পর্যন্ত যেসব বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে তাতে চূড়ান্তভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, 'ফাই'-এর সম্পদে আল্লাহ, রসূল, রসূলের আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, মুহাজির, আনসার এবং কিয়ামত পর্যন্ত জন্মলাভকারী সমস্ত মুসলমানের অধিকার আছে। এটি কুরআন মজীদের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনগত সিদ্ধান্ত যার আলোকে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাক, শাম ও মিসরের বিজিত এলাকাসমূহের ভূমি ও অর্থ-সম্পদ এবং ঐ সব দেশের পূর্বতন সরকার ও তার শাসকদের বিষয়-সম্পদের নতুনভাবে বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করেছিলেন। এসব অঞ্চল বিজিত হলে হযরত যুবায়ের, হযরত বেলাল, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ এবং হযরত সালমান ফারসী সহ বিশিষ্ট কিছু সংখ্যক সাহাবী অত্যন্ত জোর দিয়ে বললেন যে, যেসব সৈন্য লড়াই করে এসব এলাকা জয় করেছে এসব তাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হোক। তাঁদের ধারণা ছিল এসব সম্পদ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ এর সংজ্ঞায় পড়ে না। বরং মুসলমানরা তাদের ঘোড়া এবং উট পরিচালনা করে এসব করায়ত্ত করেছে। তাই যেসব শহর ও অঞ্চল যুদ্ধ ছাড়াই বশ্যতা স্বীকার করেছে সেইগুলো ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত বিজিত অঞ্চল গনীমাতের সংজ্ঞায় পড়ে। আর তার শরয়ী বিধান হলো, ঐ সব অঞ্চলের ভূমি ও অধিবাসীদের এক-পঞ্চমাংশ বায়তুলমালের অধীনে ন্যস্ত করতে হবে এবং অবশিষ্ট চার অংশ সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। কিন্তু এই মতটি সঠিক ছিল না। কারণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যুগে যুদ্ধ করে যেসব এলাকা দখল করা হয়েছিলো তিনি তার কোনটিরই ভূমি ও বাসিন্দাদের থেকে গনীমাতের মত এক-পঞ্চমাংশ বের করে রেখে অবশিষ্টাংশ সেনাবাহিনীর মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন না। তাঁর যুগের দু'টি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো, মক্কা ও খায়বার বিজয়। এর মধ্যে পবিত্র মক্কাকে তিনি অবিকল তার বাসিন্দাদের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর থাকলো খায়বারের বিষয়টি। এ সম্পর্কে হযরত বুশাইর ইয়াসার বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) খায়বারকে ৩৬টি অংশে ভাগ করলেন। তার মধ্য থেকে ১৮ অংশ সামষ্টিক ও সামগ্রিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখে অবশিষ্ট ১৮ অংশ সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। (আবু দাউদ, বায়হাকী, কিতাবুল আমওয়াল-আবু উবায়েদ; কিতাবুল খারাজ—ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদম; ফুতূহুল বুলদান—বালাযুরী; ফাতহুল কাদীর—ইবনে হুমাম) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কাজ দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়েছিলো যে, যুদ্ধ করে জয় করা হলেও বিজিত ভূমির বিধান গনীমাতের বিধানের মত নয়। তা না হলে পবিত্র মক্কাকে পুরোপুরি তার অধিবাসীদের কাছে ফেরত দেয়া এবং খায়বারের এক-পঞ্চমাংশ বের করে নেয়ার পরিবর্তে তার পুরা অর্ধেকটা অংশ সামগ্রিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বায়তুলমালে নিয়ে নেয়া কি করে সম্ভব হলো? অতএব, সুন্নাত তথা রসূলের কাজকর্ম দ্বারা যা প্রমাণিত তাহলো, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিজিত অঞ্চলসমূহের

ব্যাপারে পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার ও এখতিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানের আছে। তিনি তা বন্টনও করতে পারেন, আর পবিত্র মক্কার মত কোন অস্বাভাবিক প্রকৃতির এলাকা যদি হয় তাহলে তিনি সেখানকার অধিবাসীদের প্রতি ইহসানও করতে পারেন, নবী (সা) যেমনটি মক্কাবাসীদের প্রতি করেছিলেন।

কিন্তু নবীর (সা) যুগে যেহেতু ব্যাপক এলাকা বিজিত হয়নি এবং বিভিন্ন প্রকারের বিজিত অঞ্চলের আলাদা আলাদা বিধান সুস্পষ্টভাবে লোকের সামনে আসেনি। তাই হযরত উমরের (রা) যুগে বড় বড় দেশ ও অঞ্চল বিজিত হলে সাহাবায়ে কিরামের সামনে এ সমস্যা দেখা দিলো যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিজিত এসব অঞ্চল গনীমাত হিসেবে গণ্য হবে না 'ফায়' হিসেবে গণ্য হবে? মিসর বিজয়ের পর হযরত যুবায়ের দাবী করলেন যে,

اَقْسِمْهَا كَمَا قَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ-

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে খায়বর এলাকা বন্টন করে দিয়েছিলেন অনুরূপ এই গোটা অঞ্চল ভাগ করে দিন।" (আবু উবায়েদ)

শাম ও ইরাকের বিজিত অঞ্চলসমূহ সম্পর্কে হযরত বেলাল (রা) জোর দিয়ে বললেন যে,

اَقْسِمِ الْاَرْضِيْنَ بَيْنَ الَّذِيْنَ افْتَتَحُوْهَا كَمَا تُقَسِّمُ غَنِيْمَةُ الْعَسْكَرِ

"যেভাবে গনীমাতের সম্পদ ভাগ করা হয় ঠিক সেভাবে সমস্ত বিজিত ভূমি বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে ভাগ করে দিন।" (কিতাবুল খারাজ—আবু ইউসুফ)

অপর দিকে হযরত আলীর (রা) মত ছিল এই যে,

دَعْهُمْ يَكُوْنُوْا مَادَّةً لِلْمُسْلِمِيْنَ

"এসব ভূমি এর চাষাবাদকারীদের কাছে থাকতে দিন যেন তা মুসলমানদের আয়ের একটা উৎস হয়ে থাকে"। (আবু ইউসুফ, আবু উবায়েদ)

অনুরূপ হযরত মু'য়ায ইবনে জাবালের মত ছিল এই যে, আপনি যদি এসব বন্টন করে দেন তাহলে তার পরিণাম খুবই খারাপ হবে। এ বন্টনের ফলে বড় বড় সম্পদ ও সম্পত্তি মুষ্টিমেয় কিছু লোকের করায়ত্ত হয়ে পড়বে যারা এসব অঞ্চল জয় করেছে। পরে এসব লোক দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবে আর তাদের বিষয়-সম্পদ তাদের উত্তরাধিকারীদের কাছেই থেকে যাবে। অনেক সময় হয়তো একজন মাত্র নারী বা পুরুষ হবে এই উত্তরাধিকারী। কিন্তু পরবর্তী বংশধরদের প্রয়োজন পূরণের জন্য এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যয়ের জন্য কিছুই থাকবে না। তাই আপনি এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন যার মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বার্থের সংরক্ষণ সমানভাবে হতে পারে (আবু উবায়েদ, পৃষ্ঠা—৫৯; ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা—১৩৮)। গোটা ইরাক বন্টন করে দিলে মাথাপিছু কি পরিমাণ অংশ হয় হযরত উমর (রা) তা হিসেব করে দেখলেন। তিনি জানতে পারলেন, গড়ে মাথাপিছু দুই তিন ফাল্লাহ করে পড়ে, (আবু

ইউসুফ, আবু উবায়েদ) অতপর তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, ঐ সব এলাকা বন্টিত না হওয়া উচিত। সুতরাং বন্টনের দাবীদার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে তিনি যেসব জওয়াব দিয়েছিলেন তাহলো ঃ

تُرِيْدُوْنَ اَنْ يَاْتِىَ اٰخِرُ النَّاسِ لَيْسَ لَهُمْ شَىْءٌ (ابو عبيد)

"আপনারা কি চান, পরবর্তী লোকদের জন্য কিছুই না থাক?"

فَكَيْفَ بِمَنْ يَاْتِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَجِدُوْنَ الْاَرْضَ بِعُلُمْ جِهَا قَدِ اقْتُسِمَتْ وَوُرِّثَتْ عَنِ الْاٰبَاءِ وَحِيْزَتْ ؟ مَاهٰذَا بِرَائِىْ (ابو يوسف)

"পরবর্তীকালের মুসলমানদের কি উপায় হবে? তারা এসে দেখবে ভূমি কৃষকসহ আগে থেকেই বন্টিত হয়ে আছে এবং মানুষ বাপ-দাদার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তা ভোগ দখল করছে? তা কখনো হতে পারে না।"

فَمَا لِمَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَخَافُ اِنْ قَسَّمْتُهُ اِنْ تَفَاسَدُوْا بَيْنَكُمْ فِى الْمِيَاهِ (ابو عبيد)

"তোমাদের পরে আগমনকারী মুসলমানদের জন্য কি থাকবে? তাছাড়া আমার আশংকা হয় যদি আমি এসব বন্টন করে দেই তাহলে পানি নিয়ে তোমরা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে।"

لَوْلَا اٰخِرُ النَّاسِ مَافَتَحْتُ قَرْيَةً اِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ (بخارى ، مؤطا ، ابو عبيد)

"পরবর্তী লোকদের চিন্তা যদি না হতো তাহলে যে জনপদই আমি জয় করতাম তা ঠিক সেভাবে বন্টন করতাম যেভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার বন্টন করেছিলেন।"

لَا هٰذَا عَيْنُ الْمَالِ وَلٰكِنِّىْ اَحْبِسُهُ فِيْمَا يَجْرِىْ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ (ابو عبيد)

"না, এটাই তো মূল সম্পদ (Real estate) আমি তা ধরে রাখবো যাতে তা দিয়ে বিজয়ী সৈনিক ও সাধারণভাবে মুসলমানদের সবার প্রয়োজন পূরণ হতে পারে।"

কিন্তু এসব জওয়াব শুনেও লোকজন সন্তুষ্ট হলো না। তারা বলতে শুরু করলো যে, আপনি জুলুম করছেন। অবশেষে হযরত উমর (রা) মজলিসে শুরার অধিবেশন ডাকলেন এবং তাদের সামনে এ বিষয়টি পেশ করলেন। এই সময় তিনি যে ভাষণ দান করেন তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

আমি আপনাদেরকে শুধু এ জন্য কষ্ট দিয়েছি যে, আপনাদের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনার যে দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে সেই আমানত রক্ষা করার ব্যবস্থাপনায় আমার সাথে আপনারাও শরীক হবেন। আমি আপনাদেরই একজন। আর আপনারা সেই সব ব্যক্তি যারা আজ সত্যকে মেনে চলছেন। আপনাদের মধ্য থেকে যার ইচ্ছা আমার সাথে ঐকমত্য পোষণ করবেন। আর যার ইচ্ছা আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করবেন। আমি চাই না, আপনারা আমার ইচ্ছার অনুসরণ করেন। আপনাদের কাছে ন্যায় ও সত্য বিধানদাতা আল্লাহর কিতাব রয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমি যদি কোন কিছু করার জন্য কোন কথা বলে থাকি তাহলে সে ক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য আমার নেই .....। আপনারা তাদের কথা শুনেছেন যাদের ধারণা হলো আমি তাদের প্রতি জুলুম করছি এবং তাদের হক নষ্ট করতে চাচ্ছি। অথচ কারো প্রতি জুলুম করা থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকি। যা তাদের জুলুম করে আমি যদি তা তাদের না দিয়ে অন্য কাউকে দেই তাহলে সত্যি সত্যিই আমি বড় হতভাগ্য। আমি দেখতে পাচ্ছি কিসরার দেশ ছাড়া বিজিত হওয়ার মত আর কোন অঞ্চল এখন নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরানীদের ধন-সম্পদ, তাদের ভূমি এবং কৃষক সবই আমাদের করায়ত্ত করে দিয়েছেন। আমাদের সৈনিকরা যেসব গনীমাত লাভ করেছিল তার এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করে আমি তাদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছি। আর গনীমাতের যেসব সম্পদ এখনো বন্টিত হয়নি আমি সেগুলোও বন্টন করার চিন্তা-ভাবনা করছি। তবে ভূমি সম্পর্কে আমার মত হলো, ভূমি ও এর চাষাবাদকারীদের বন্টন করবো না। বরং ভূমির ওপর খারাজ বা ভূমি-রাজস্ব এবং কৃষকদের ওপর জিযিয়া আরোপ করবো। তারা সবসময় এগুলো দিতে থাকবে। এই অর্থ বর্তমানকালের সব মুসলমান, যুদ্ধরত সৈনিক, মুসলমানদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্য 'ফাই' হিসেবে গণ্য হবে। আপনারা কি দেখছেন না আমাদের সীমান্তসমূহ রক্ষার জন্য লোকের অপরিহার্য প্রয়োজন? আপনারা কি দেখছেন না, এসব বড় বড় দেশ—সিরিয়া, আলজিরিয়া, কুফা, বসরা, মিসর এসব স্থানে সেনাবাহিনী মোতায়েন থাকা দরকার এবং নিয়মিতভাবে তাদের বেতনও দেয়া দরকার? চাষাবাদকারী সহ এসব ভূমি যদি আমি বন্টন করে দেই তাহলে এসব খাতে ব্যয়ের অর্থ কোথা থেকে আসবে?

দুই তিন দিন পর্যন্ত এ বিষয়ে আলোচনা ও যুক্তি-তর্ক চলতে থাকলো। হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর এবং আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হযরত উমরের (রা) মত সমর্থন করলেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা গেল না। অবশেষে হযরত উমর (রা) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ আমি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি দলীল পেয়ে গিয়েছি যা এ সমস্যার সমাধান দেবে। এরপর তিনি সূরা হাশরের এই আয়াত কয়টি অর্থাৎ مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ থেকে رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ পর্যন্ত পড়লেন এবং তা থেকে এ দলীল পেশ করলেন যে, আল্লাহর দেয়া এসব সম্পদে শুধু এ যুগের লোকদেরই অংশ ও অধিকার বর্তায় না। বরং তাদের সাথে আল্লাহ পরবর্তীকালের লোকদেরও শরীক করেছেন। তাই 'ফাই'য়ের যে সম্পদ সবার জন্য; পরবর্তীকালের লোকদের জন্য তার কিছুই না রেখে সবই কেবল এসব বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে আমি বন্টন করে দেব, তা কি করে সঠিক হতে পারে? তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ "যাতে এ সব

সম্পদ শুধু তোমাদের বিত্তবানদের মধ্যে আবর্তিত হতে না থাকে।" কিন্তু আমি যদি কেবল বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যেই তা বন্টন করে দেই তাহলে তা তোমাদের বিত্তবানদের মধ্যেই আবর্তিত হতে থাকবে, অন্যদের জন্য কিছুই থাকবে না। এই যুক্তি ও প্রমাণ সবাইকে সন্তুষ্ট করলো, আর এ বিষয়ে 'ইজমা' বা ঐকমত্য হয়ে গেল যে, বিজিত গোটা এলাকা সকল মুসলমানের স্বার্থে 'ফাই' হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। যেসব লোক এখানে কাজ করছে তাদের হাতেই এসব ভূমি থাকতে দেয়া হবে এবং তার ওপর ভূমি রাজস্ব ও জিযিয়া আরোপ করতে হবে। (কিতাবুল খারাজ—আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা ২৩ থেকে ২৭ ও ৩৫; আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস)

এ সিদ্ধান্ত অনুসারে বিজিত ভূমির প্রকৃত যে মর্যাদা স্থিরিকৃত হলো তাহচ্ছে, সমষ্টিগতভাবে গোটা মুসলিম মিল্লাত হবে এর মালিক, আগে থেকেই যারা এসব ভূমিতে কাজ করে আসছে মুসলিম মিল্লাত তার নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে চাষাবাদকারী হিসেবে বহাল রেখেছে, এসব ভূমি বাবদ তারা ইসলামী রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট একটা হারে খাজনা বা ভূমি রাজস্ব দিতে থাকবে, চাষাবাদের এই অধিকার বংশানুক্রমিকভাবে তাদের উত্তরাধিকারীদের কাছে হস্তান্তরিত হতে থাকবে এবং এ অধিকার তারা বিক্রি করতেও পারবে। কিন্তু তারা ভূমির প্রকৃত মালিক হবে না, এর প্রকৃত মালিক হবে মুসলিম মিল্লাত। ইমাম আবু উবায়েদ তাঁর আল আমওয়াল গ্রন্থে আইনগত এই মর্যাদা ও অবস্থানের কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

اَقَرَّ اَهْلَ السَّوَادِ فِىْ اَرْضِيْهِمْ وَضَرَبَ عَلَى رُؤُسِهِمُ الْجِزْيَةَ وَعَلَى اَرْضِيْهِمُ الطَّسَقَ (ص – ٥٧)

"হযরত উমর (রা) ইরাকবাসীদের তাদের কৃষি ভূমিতে বহাল রাখলেন, তাদের সবার ওপর মাথা পিছু জিযিয়া আরোপ করলেন এবং ভূমির ওপর ট্যাক্স ধার্য করলেন।"

وَاِذَا اَقَرَّ الْاِمَامُ اَهْلَ الْعَنْوَةِ فِىْ اَرْضِهِمْ تَوَارَثُوْهَا وَتَبَا يَعُوْهَا (ص– ٨٤)

"ইমাম (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান) বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীদের যদি তাদের কৃষি ভূমিতে বহাল রাখেন তাহলে তারা ঐ সব ভূমি উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তর করতে এবং বিক্রি করতে পারবে।"

উমর ইবনে আবদুল আযীযের আমলে শা'বীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, ইরাকের অধিবাসীদের সাথে কোন চুক্তি আছে কি? তিনি জবাব দিয়েছিলেন যে, চুক্তি নেই। তবে তাদের নিকট থেকে যখন ভূমি রাজস্ব গ্রহণ করা হয়েছে তখন তা চুক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে (আবু উবায়েদ, পৃষ্ঠা ৪৯; আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা ২৮)।

হযরত উমরের (রা) খিলাফতকালে উৎবা ইবনে ফারকাদ ফোরাত নদীর তীরে একখণ্ড জমি কিনলেন। হযরত উমর (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এ জমি কার নিকট থেকে কিনেছো? তিনি বললেন ঃ জমির মালিকের নিকট থেকে। হযরত উমর (রা) বললেন ঃ তার মালিক তো এসব লোক (অর্থাৎ মুহাজির ও আনসার)।

رَأَىٰ عُمَرَ أَنَّ أَصْلَ الْأَرْضِ لِلْمُسْلِمِينَ হযরত উমরের (রা) অভিমত ছিল এই যে, ঐ সব ভূমির প্রকৃত মালিক মুসলমানগণ— (আবু উবায়েদ, পৃষ্ঠা ৭৪)

এ সিদ্ধান্ত অনুসারে বিজিত দেশসমূহের যেসব সম্পদ মুসলমানদের সমষ্টিগত মালিকানা বলে ঘোষণা করা হয়েছিলো তা নীচে উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) কোন সন্ধিচুক্তির ফলে যেসব ভূমি ও অঞ্চল ইসলামী রাষ্ট্রের হস্তগত হবে।

(২) যুদ্ধ ছাড়াই কোন এলাকার লোক মুসলমানদের নিকট থেকে নিরাপত্তা লাভের উদ্দেশ্যে যে মুক্তিপণ (فديه), ভূমি রাজস্ব (خراج) এবং জিযিয়া প্রদান করতে সম্মত হবে।

(৩) যেসব জমি ও সম্পদের মালিক তা ফেলে পালিয়ে গিয়েছে।

(৪) যেসব সম্পদের মালিক মারা গেছে বা যেসব সম্পদের কোন মালিক নেই।

(৫) যেসব ভূমি পূর্বে কারো অধিকারে ছিল না।

(৬) যেসব ভূমি আগে থেকে মানুষের অধিকারে ছিল। কিন্তু তার সাবেক মালিকদেরকেই বহাল রেখে তাদের ওপর জিযিয়া ও ভূমির ওপর খারাজ বা ভূমিকর ধার্য করা হয়েছে।

(৭) পূর্ববর্তী শাসক পরিবারসমূহের জায়গীরসমূহ।

(৮) পূর্ববর্তী সরকারসমূহের মালিকানাভুক্ত বিষয়-সম্পত্তি। —বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বাদায়েউস সানায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৬-১১৮; কিতাবুল খারাজ-ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদম, পৃষ্ঠা ২২-৬৪, মুগনিউল মুহতাজ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৩; হাশিয়াতুদ দুসূকী আলাশ শারহিল কাবীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯০; গায়াতুল মুনতাহা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬৭-৪৭১)।

এসব জিনিস যেহেতু সাহাবায়ে কিরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে 'ফাই' বলে ঘোষিত হয়েছিলো, তাই একে 'ফাই' বলে সিদ্ধান্ত দেয়ার ব্যাপারে ও ইসলামের ফিকাহবিদদের মধ্যে নীতিগত ঐক্য বিদ্যমান। তবে কয়েকটি বিষয়ে মতানৈক্য আছে। আমরা ঐগুলো সংক্ষিপ্তাকারে নীচে বর্ণনা করলাম।

হানাফীগণ বলেন ঃ বিজিত দেশ ও অঞ্চলসমূহের ভূমির ব্যাপারে ইসলামী সরকারের (ফিকাহবিদদের পরিভাষায় ইমাম) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইখতিয়ার আছে। তিনি ইচ্ছা করলে এর মধ্য থেকে এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করে রেখে অবশিষ্ট সবটা বিজয়ী সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেবেন। কিংবা পূর্ববর্তী মালিকদের অধিকারে রেখে দেবেন, আর তার মালিকদের ওপরে জিযিয়া এবং ভূমির ওপরে খারাজ বা ভূমিকর ধার্য করবেন। এ অবস্থায় এসব সম্পদ মুসলমানদের জন্য স্থায়ী ওয়াক্ফ সম্পদ বলে গণ্য হবে। (বাদায়েউস সানায়ে, আহকামুল কুরআন জাস্সাস, শারহুল এনায়া আলাল হিদায়া, ফাতহুল কাদীর) ইমাম সুফিয়ান সাওরী থেকে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারাক এ মতটিই উদ্ধৃত করেছেন। (ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদম; কিতাবুল আমওয়াল—আবু উবায়েদ)

মালেকীগণ বলেন ঃ মুসলমানদের শুধু দখল করে নেয়ার কারণেই এসব ভূমি আপনা-আপনি মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ হয়ে যায়। তা ওয়াকফ করার জন্য ইমামের

সিদ্ধান্ত বা মুজাহিদদের রাজি করার প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া মালেকীগণের সর্বজন পরিজ্ঞাত মত হলো, বিজিত এলাকার শুধু ভূমিই নয়, বরং ঘরবাড়ী, দালানকোঠাও প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ। তবে ইসলামী রাষ্ট্র বা সরকার ঐগুলোর জন্য ভাড়া ধার্য করবে না । (হাশিয়াতুদ দুসূকী)

হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীগণ এতটুকু বিষয়ে হানাফীদের সাথে একমত যে, ভূমি বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করা কিংবা মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দেয়া ইমামের ইখতিয়ারাধীন। তারা মালেকীদের সংগে এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, বিজিত অঞ্চলসমূহের ঘরবাড়ী ওয়াকফ হিসেবে গণ্য হলেও তার ওপর ভাড়া ধার্য করা হবে না। (গায়াতুল মুনতাহা—হাম্বলী মযহাবের যেসব মত ও সিদ্ধান্তের সমর্থনে ফতোয়া দেয়া হয়েছে এ গ্রন্থখানি তারই সমষ্টি। দশম শতাব্দী থেকে এ মযহাবের সমস্ত ফতোয়া এ গ্রন্থ অনুসারেই দেয়া হয়ে থাকে।)।

শাফেয়ী মযহাবের মত হলো ঃ বিজিত অঞ্চলের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি গনীমাত এবং সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি (ভূমি ও ঘরবাড়ী) 'ফাই' হিসেবে গণ্য করা হবে। (মুগনিউল মুহ্‌তাজ)

কোন কোন ফিকাহবিদ বলেন ঃ ইমাম যদি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিজিত দেশের বা অঞ্চলের ভূমি মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করতে চান তাহলে তাঁকে অবশ্যই বিজয়ী সৈনিকদের সম্মতি নিতে হবে। এর সপক্ষে তারা এ দলীল পেশ করেন, ইরাক জয়ের পূর্বে হযরত উমর (রা) জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আলবাহালীকে এ মর্মে ওয়াদা করেছিলেন যে, বিজিত অঞ্চলের এক-চতুর্থাংশ তাঁকে দেয়া হবে। কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনাবাহিনীর এক-চতুর্থাংশ লোক ছিল জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আলবাহালীর গোত্রের লোক। সুতরাং ২-৩ বছর পর্যন্ত এ অংশ তাঁর কাছেই ছিল। পরে হযরত উমর (রা) তাঁকে বললেন ঃ

لَوْلَا اَنِّیْ قَاسِمٌ مَسْئُوْلٌ لَكُنْتُمْ عَلٰى مَا جُعِلَ لَكُمْ وَاَرَى النَّاسَ قَدْ كَثُرُوا فَاَرَىٰ اَنْ تَرُدَّهُ عَلَيْهِمْ -

"বন্টনের ব্যাপারে আমি যদি দায়িত্বশীল না হতাম এবং আমাকে জবাবদিহি করতে না হতো তাহলে তোমাদের যা কিছু দেয়া হয়েছে তা তোমাদের কাছেই থাকতে দেয়া হতো। কিন্তু এখন আমি দেখছি লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই আমার মত হলো তোমরা সাধারণ মানুষের স্বার্থে তা ফিরিয়ে দাও।"

হযরত জারীর (রা) তাঁর এ কথা মেনে নিলেন। এ কারণে হযরত উমর (রা) তাঁকে পুরস্কার হিসেবে ৮০ দিনার প্রদান করলেন। (কিতাবুল খারাজ—আবু ইউসুফ; কিতাবুল আমওয়াল—আবু উবায়েদ)। এ ঘটনা দ্বারা তারা প্রমাণ দেন যে, হযরত উমর বিজয়ী সৈন্যদের সম্মত করার পর বিজিত অঞ্চলসমূহ মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ফিকাহবিদদের অধিকাংশই এ যুক্তি মেনে নেননি। কারণ সকল বিজিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে সমস্ত বিজয়ী সৈনিকদের নিকট থেকে এ ধরনের কোন সম্মতি নেয়া হয়নি। আর কেবল হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহর সাথে এ আচরণ করা হয়েছিল

শুধু এ কারণে যে, বিজয়ের পূর্বে বিজিত ভূমি সম্পর্কে কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হওয়ার পূর্বে হযরত উমর (রা) তাঁর সাথে এ মর্মে একটি অঙ্গীকার করে ফেলেছিলেন। সেই অঙ্গীকার থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যই তাঁকে তাঁর সম্মতি নিতে হয়েছিল। তাই এটাকে কোন ব্যাপকভিত্তিক আইন হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

ফিকাহবিদদের আরেকটি গোষ্ঠী বলেন ঃ ওয়াকফ ঘোষণা করার পরও বিজিত এ সব ভূমি বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে যে কোন সময় বন্টন করে দেয়ার ইখতিয়ার সরকারের থেকে যায়। এর সপক্ষে তারা যে রেওয়ায়াত থেকে দলীল পেশ করেন তাহলো, একবার হযরত আলী (রা) লোকদের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন ঃ

لَوْلَا اَنْ يَّضْرِبَ بَعْضُكُمْ وُجُوْهَ بَعْضٍ لَقَسَّمْتُ السَّوَادَ بَيْنَكُمْ

"যদি আমি এ আশংকা না করতাম যে, তোমরা পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হবে তাহলে এসব প্রত্যন্ত অঞ্চল আমি তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম।" (কিতাবুল খারাজ—আবু ইউসুফ; কিতাবুল আমওয়াল— আবু উবায়েদ)।

কিন্তু অধিকাংশ ফিকাহবিদ এমতটিও গ্রহণ করেননি। বরং তাদের সর্বসম্মত মত হলো, জিযিয়া ও খারাজ ধার্য করে বিজিত এলাকার ভূমি একবার যদি উক্ত এলাকার অধিবাসীদের অধিকারেই রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহলে এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা যায় না। এরপর থাকে হযরত আলীর (রা) সাথে সম্পর্কিত কথাটি। এ সম্পর্কে আবু বকর জাস্‌সাস আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন যে, ঐ রেওয়ায়াত সঠিক নয়।

২১. 'ফাই'-এর সম্পদ উপস্থিত ও বর্তমান কালের বিদ্যমান মুসলমানদেরই কেবল নয়, বরং অনাগত কালের মুসলমান এবং তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরও অংশ আছে। এ আয়াতের মূল বক্তব্য ও প্রতিপাদ্য এ বিষয়টি তুলের ধরা হলেও একই সাথে এর মধ্যে মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক শিক্ষাও দেয়া হয়েছে। তাহলো, কোন মুসলমানের মনে অপর কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা না থাকা উচিত। আর মুসলমানদের জন্য সঠিক জীবনাচার হলো, তারা তাদের পূর্ববর্তী মুসলমান ভাইদের লা'নত বা অভিশাপ দেবে না কিংবা তাদের সাথে সম্পর্কহীনতার কথা বলবে না। বরং তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে থাকবে। যে বন্ধন মুসলমানদের পরস্পর সম্পর্কিত করেছে তাহলো ঈমানের বন্ধন। কোন ব্যক্তির অন্তরে অন্য সব জিনিসের চেয়ে ঈমানের গুরুত্ব যদি অধিক হয় তাহলে যারা ঈমানের বন্ধনের ভিত্তিতে তার ভাই, সে অনিবার্যভাবেই তাদের কল্যাণকামী হবে। তাদের জন্য অকল্যাণ, হিংসা-বিদ্বেষ এবং ঘৃণা কেবল তখনই তার অন্তরে স্থান পেতে পারে যখন ঈমানের মূল্য ও মর্যাদা তার দৃষ্টিতে কমে যাবে এবং অন্য কোন জিনিসকে তার চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে শুরু করবে। তাই ঈমানের সরাসরি দাবী, একজন মু'মিনের অন্তরে অন্য কোন মু'মিনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। নাসায়ী কর্তৃক হযরত আনাস (রা) বর্ণিত একটি হাদীস থেকে এ ক্ষেত্রে উত্তম শিক্ষা লাভ করা যায়। তিনি বর্ণনা করেছেন, এক সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে একাধারে তিন দিন একটি ঘটনা ঘটতে থাকলো। রসূলুল্লাহ (সা) বলতেন ঃ এখন তোমাদের সামনে এমন এক ব্যক্তির আগমন

হবে যে জান্নাতের অধিবাসী। আর প্রত্যেকবারই আনসারদের কোন একজন হতেন সেই আগন্তুক। এতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসের মধ্যে কৌতূহল দেখা দিল যে, তিনি এমন কি কাজ করেন যার ভিত্তিতে নবী (সা) তাঁর সম্পর্কে বারবার এই সুসংবাদ দান করলেন। সুতরাং তার ইবাদাতের অবস্থা দেখার জন্য একটা উপলক্ষ সৃষ্টি করে তিনি পরপর তিন দিন তাঁর বাড়ীতে গিয়ে রাত কাটাতে থাকলেন। কিন্তু রাতের বেলা তিনি কোন প্রকার অস্বাভাবিক কাজ-কর্ম দেখতে পেলেন না। বাধ্য হয়ে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ভাই, আপনি এমন কি কাজ করেন, যে কারণে আমরা নবীর (সা) মুখে আপনার সম্পর্কে এই বিরাট সুসংবাদ শুনেছি। তিনি বললেন ঃ আমার ইবাদাত-বন্দেগীর অবস্থা তো আপনি দেখেছেন। তবে একটি বিষয় হয়তো এর কারণ হতে পারে। আর তা হলো,

لَا اَجِدُ فِىْ نَفْسِىْ غِلًّا لِاَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا اَحْسُدُهُ عَلَى خَيْرٍ اَعْطَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِيَّاهُ -

"আমি আমার মনের মধ্যে কোন মুসলমানের জন্য বিদ্বেষ পোষণ করি না এবং মহান আল্লাহ তাকে যে কল্যাণ দান করেছেন সে জন্য তাকে হিংসাও করি না।"

তবে এর মানে এ নয় যে, কোন মুসলমান অন্য কোন মুসলমানের কথা ও কাজে যদি কোন ত্রুটি দেখতে পান তাহলে তাকে তিনি ত্রুটি বলবেন না। কোন ঈমানদার ভুল করলেও সেটাকে ভুল না বলে শুদ্ধ বলতে হবে কিংবা তার ভ্রান্ত কথাকে ভ্রান্ত বলা যাবে না, ঈমানের দাবী কখনো তা নয়। কিন্তু কোন জিনিসকে প্রমাণের ভিত্তিতে ভুল বলা এবং ভদ্রতা রক্ষা করে তা প্রকাশ করা এক কথা আর শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা, নিন্দাবাদ ও কুৎসা রটনা করা এবং গালমন্দ করা আরেক কথা। সমসাময়িক জীবিত লোকদের বেলায়ও এরূপ আচরণ করা হলে তা একটি বড় অন্যায়। কিন্তু পূর্বের মৃত লোকদের সাথে এরূপ আচরণ করলে তা আরো বড় অন্যায়। কারণ, এরূপ মন ও মানসিকতা এমনই নোংরা যে, তা মৃতদেরও ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয়। এর চেয়েও বড় অন্যায় হলো, সেই সব মহান ব্যক্তি সম্পর্কে কটূক্তি করা যারা অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার সময়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বন্ধুত্ব ও সাহচর্যের হক আদায় করেছিলেন এবং নিজেদের জীবন বিপন্ন করে পৃথিবীতে ইসলামের আলোর বিস্তার ঘটিয়েছিলেন যার বদৌলতে আজ আমরা ঈমানের নিয়ামত লাভ করেছি। তাদের মাঝে যেসব মতানৈক্য হয়েছে সে ক্ষেত্রে কেউ যদি এক পক্ষকে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করে এবং অপর পক্ষের ভূমিকা তার মতে সঠিক না হয় তাহলে সে এরূপ মত পোষণ করতে পারে এবং যুক্তির সীমার মধ্যে থেকে তা প্রকাশ করতে বা বলতেও পারে। কিন্তু এক পক্ষের সমর্থনে এতটা বাড়াবাড়ি করা যে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষে মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং কথা ও লেখনীর মাধ্যমে গালি দিতে ও নিন্দাবাদ ছড়াতে থাকার এটা এমন একটা আচরণ যা কোন আল্লাহভীরু মানুষের দ্বারা হতে পারে না। কুরআনের স্পষ্ট শিক্ষার পরিপন্থী এ আচরণ যারা করে তারা তাদের এ আচরণের সমর্থনে যুক্তি পেশ করে যে, কুরআন মু'মিনদের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করতে নিষেধ করে। কিন্তু আমরা যাদের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করি তারা মু'মিন

নয়, বরং মুনাফিক। কিন্তু যে গোনাহর সপক্ষে সাফাই ও ওযর হিসেবে এ অপবাদ পেশ করা হয়ে থাকে তা ঐ গোনাহর চেয়েও জঘন্য। কুরআন মজীদের এ আয়াতগুলোই তাদের এ অপবাদ খণ্ডন ও প্রত্যাখ্যানের জন্য যথেষ্ট। কারণ এ আয়াতগুলোর বর্ণনাধারার মধ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা পরবর্তীকালের মুসলমানদেরকে তাদের পূর্ববর্তী ঈমানদারদের সাথে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ না রাখতে এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে শিক্ষা দিয়েছেন। এসব আয়াতে পর পর তিন শ্রেণীর লোককে 'ফাই'-এর সম্পদ লাভের অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম মুহাজির, দ্বিতীয় আনসার এবং তৃতীয় তাদের পরবর্তীকালের মুসলমান। তাদের পরবর্তী কালের মুসলমানদের বলা হয়েছে, তোমাদের পূর্বে যেসব লোক ঈমান আনার ব্যাপারে অগ্রগামী তোমরা তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো। একথা সবারই জানা যে, অগ্র-পশ্চাত বিবেচনায় ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে অগ্রগামী বলতে এখানে মুহাজির ও আনসার ছাড়া আর কেউ-ই হতে পারে না। তাছাড়া মুনাফিক কারা সে সম্পর্কে এই সূরা হাশরেরই ১১ থেকে ১৭ আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে। এভাবে এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুনাফিক তারাই যারা বনী নাযীর যুদ্ধের সময় ইহুদীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে উৎসাহিত করেছিলো। আর মু'মিন তারা যারা এ যুদ্ধে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিল। যে মুসলমানের মনে এক বিন্দু আল্লাহভীতি আছে এরপরও কি সে ঐ সব ব্যক্তির ঈমানকে অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখাতে পারে, আল্লাহ নিজে যাদের ঈমানের সাক্ষ্য দিয়েছেন?

এ আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমাদ মত প্রকাশ করেছেন যে, যারা সম্মানিত সাহাবীদের গালমন্দ ও নিন্দাবাদ করে 'ফাই' সম্পদে তাদের কোন অংশ নেই। (আহকামুল কুরআন ইবনুল আরাবী, গায়াতুল মুনতাহা) কিন্তু হানাফী ও শাফেয়ীগণ এ সিদ্ধান্তের সাথে একমত নন। এর কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা তিন শ্রেণীর লোককে ফাই-এর সম্পদ লাভের অধিকারী ঘোষণা করেছেন এবং প্রত্যেক শ্রেণীর একটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এসব গুণের কোনটিকেই পূর্বশর্ত হিসেবে পেশ করেননি যে, সেই শ্রেণীর মধ্যে ঐ বিশেষ শর্তটি বর্তমান থাকলেই কেবল তাদেরকে অংশ দেয়া যাবে, অন্যথায় দেয়া যাবে না। মুহাজিরদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। তার অর্থ এ নয় যে, যে মুহাজিরের মধ্যে এই গুণটি নেই সে 'ফাই'-এর অংশ লাভের অধিকারী নয়। আনসারদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ "তারা মুহাজিরদের ভালবাসে। মুহাজিরদের যাই দেয়া হোক না কেন অভাবী হয়েও তারা সে জন্য মনের মধ্যে কোন চাহিদা অনুভব করে না।" এরও অর্থ এটা নয় যে, যেসব আনসার মুহাজিরদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে না এবং মুহাজিরদের যা কিছু দেয়া হয় তারা তা পেতে আগ্রহী 'ফাই'-এর সম্পদে এমন মুহাজিরদের কোন অংশ নেই। অতএব তৃতীয় শ্রেণীর এই গুণটি অর্থাৎ তাদের পূর্বে ঈমান গ্রহণকারীদের মাগফিরাতের জন্য তারা দোয়া করে, আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে যে, তাদের হৃদয়-মনে যেন কোন ঈমানদারদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ না থাকে এটাও 'ফাই'-এর হকদার হওয়ার কোন পূর্বশর্ত নয়। বরং এটা একটা ভাল গুণের বর্ণনা এবং অন্য সব ঈমানদার ও পূর্ববর্তী ঈমানদারদের সাথে তাদের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে একটি শিক্ষাদান।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ
الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ
وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١١﴾ لَئِنْ اُخْرِجُوْا
لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ
لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ۫ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١٢﴾

২ রুকূ'

তোমরা[২২] *কি সেই সব লোকদের দেখনি যারা মুনাফিকীর আচরণ গ্রহণ করেছে? তারা তাদের কাফের আহলে কিতাব ভাইদের বলে ঃ যদি তোমাদের বহিষ্কার করা হয় তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাবো। তোমাদের ব্যাপারে কারো কথাই আমরা শুনবো না। আর যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তাহলে আমরা তোমাদের সাহায্য করবো। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী, তারা পাকা মিথ্যাবাদী। যদি তাদেরকে বহিষ্কার করা হয় তাহলে এরা তাদের সাথে কখনো বেরিয়ে যাবে না। আর যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তাহলে তারা তাদেরকে সাহায্যও করবে না। আর যদি সাহায্য করেও তাহলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। অতপর কোনখান থেকে কোন সাহায্য তারা পাবে না।*

২২. পুরো এই রুকূ'র আয়াতসমূহের বাচনভঙ্গি থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সময় বনু নাযীরকে মদীনা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য দশদিন সময় দিয়ে নোটিশ দিয়েছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে অবরোধ শুরু হতে এখনো কয়েকদিন দেরী ছিল সেই সময় এ রুকূ'র আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিলো। আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু নাযীরকে এই নোটিশ দিলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং মদীনার অন্যান্য মুনাফিক নেতারা তাদের বলে পাঠালো যে, আমরা দুই হাজার লোক নিয়ে তোমাদের সাহায্য করার জন্য আসবো। আর বনী কুরায়যা এবং বনী গাতফানও তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। অতএব তোমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও এবং কোন অবস্থায় তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করো না। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করলে আমরাও তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো। আর তোমরা এখান থেকে বহিষ্কৃত হলে আমরাও চলে যাব। এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলো নাযিল করেছেন। তাই নাযিল হওয়ার পরম্পরার দিক দিয়ে এ রুকূ'টা প্রথমে নাযিল হয়েছে। আর বনী নাযীরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করার পর প্রথম রুকূ'র আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। তবে কুরআন মজীদে সন্নিবেশ করার ক্ষেত্রে প্রথম রুকূ'

لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا
يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ
جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا
ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾

তাদের মনে আল্লাহর চেয়ে তোমাদের ভয়ই বেশী।[২৩] কারণ, তারা এমন লোক যাদের কোন বিবেক-বুদ্ধি নেই।[২৪] এরা একত্রিত হয়ে (খোলা ময়দানে) কখনো তোমাদের মোকাবিলা করবে না। লড়াই করলেও দুর্গাভ্যন্তরে অবস্থিত জনপদে বা প্রাচীরের আড়ালে লুকিয়ে থেকে করবে। তাদের আভ্যন্তরীণ পারস্পরিক কোন্দল অত্যন্ত কঠিন। তুমি তাদের ঐক্যবদ্ধ মনে কর। কিন্তু তাদের মন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন।[২৫] তাদের এ অবস্থার কারণ হলো তারা জ্ঞান ও বুদ্ধিহীন। এরা তাদের কিছুকাল পূর্বের সেই সব লোকের মত যারা তাদের কৃতকর্মের পরিণাম ভোগ করেছে।[২৬] তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

আগে এবং দ্বিতীয় রুকূ' পরে রাখার কারণ হলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথম রুকূ'তে বর্ণিত হয়েছে।

২৩. অর্থাৎ তারা যে তোমাদের মোকাবেলায় প্রকাশ্যে ময়দানে নামছে না তার কারণ এ নয় যে, তারা মুসলমান, তাদের মনে আল্লাহর ভয় আছে এবং এরূপ কোন আশংকাও তাদের মনে আছে যে, ঈমানের দাবী করা সত্ত্বেও তারা যদি ঈমানদারদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য করে তাহলে আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। বরং তোমাদের প্রকাশ্য মোকাবেলা করা থেকে যে জিনিস তাদের বিরত রাখে তা হলো, ইসলাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য তোমাদের ভালবাসা, প্রাণপণ সংকল্প এবং আত্মত্যাগের স্পৃহা আর তোমাদের পারস্পরিক দৃঢ় ঐক্য দেখে তারা সাহস হারিয়ে ফেলে। তারা ভাল করেই জানে যে, তোমরা নগণ্য সংখ্যক হলেও শাহাদাতের যে অদম্য আকাংখা তোমাদের প্রতিটি ব্যক্তিকে জান কবুল মুজাহিদ বানিয়ে রেখেছে এবং যে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার কারণে তোমরা একটি ইস্পাত কঠিন দল ও সংগঠনে রূপান্তরিত হয়েছো তার সাথে সংঘর্ষ বাধলে ইহুদীদের সাথে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। এখানে এ বিষয়টি মনে রাখা দরকার যে, কারো অন্তরে আল্লাহর ভয়ের চেয়ে অন্য কারো ভয় অধিক থাকলে তা মূলত আল্লাহর ভয় না থাকারই নামান্তর। একথা সবারই জানা, যে ব্যক্তি দু'টি বিপদের একটিকে লঘু এবং অপরটিকে গুরুতর মনে করে সে

প্রথমোক্ত বিপদটির পরোয়াই করে না। দ্বিতীয় বিপদটি থেকে রক্ষা পাওয়াই তার সমস্ত চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়।

২৪. ছোট এই আয়াতাংশে একটি বড় সত্য তুলে ধরা হয়েছে। বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি জানে, মানুষের শক্তি নয়, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর শক্তিই ভয় করার মত। এ কারণে যেসব কাজে আল্লাহর সামনে তার জবাবদিহির ভয় থাকবে এ ধরনের সকল কাজ থেকে সে নিজেকে রক্ষা করবে। এ ক্ষেত্রে জবাব চাওয়ার মত কোন মানবীয় শক্তি থাক বা না থাক তা দেখার প্রয়োজন সে মনে করবে না। আর আল্লাহ তা'আলা যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য তার ওপর ন্যস্ত করেছেন তা সমাধা করার জন্য সে তৎপর হয়ে উঠবে। গোটা দুনিয়ার সমস্ত শক্তি এ পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালেও সে তার পরোয়া করবে না। কিন্তু একজন বুদ্ধি-বিবেকহীন মানুষের কাছে যেহেতু আল্লাহর শক্তি অনুভূত হয় না কিন্তু মানুষের শক্তিসমূহ অনুভূত হয় তাই সমস্ত ব্যাপারে সে তার কর্মনীতি নির্ধারণ করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষের শক্তির প্রতি লক্ষ রেখে। কোন কিছু থেকে দূরে থাকলে এ জন্য থাকে না যে, সে জন্য আল্লাহর কাছে পাকড়াও হতে হবে। বরং এ জন্য দূরে থাকে যে, সামনেই কোন মানবীয় শক্তি তার খবর নেয়ার জন্য প্রস্তুত আছে। আর কোন কাজ যদি সে করে তবে তাও এ জন্য করে না যে, আল্লাহ তা'আলা তা করতে নির্দেশ দিয়েছেন কিংবা সে জন্য সে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কারের প্রত্যাশী। বরং এ জন্য করে যে, কোন মানবীয় শক্তি তা করতে নির্দেশ দিচ্ছে কিংবা পছন্দ করছে এবং সে-ই এ জন্য পুরস্কৃত করবে। বুঝা ও না বুঝার এই পার্থক্যই প্রকৃতপক্ষে একজন ঈমানদার ও ঈমানদারের জীবন ও কর্মকে পরস্পর থেকে পৃথক করে দেয়।

২৫. এখানে মুনাফিকদের দ্বিতীয় দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে। তাদের প্রথম দুর্বলতা হলো, তারা ছিল ভীরু—আল্লাহকে ভয় করার পরিবর্তে মানুষকে ভয় করতো। ঈমানদারদের মত তাদের সামনে এমন কোন উন্নত লক্ষ ও আদর্শ ছিল না যা অর্জনের জন্য তাদের মধ্যে প্রাণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হতো। তাদের দ্বিতীয় দুর্বলতা হলো মুনাফিকীর আচরণ ছাড়া তাদের মধ্যে আর কোন বিষয়ে মিল ছিল না যা তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি মজবুত ও সুসংবদ্ধ দলে পরিণত করতে পারতো। যে বিষয়টি তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল তাহলো, নিজেদের শহরে বহিরাগত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্ব ও শাসন চলতে দেখে তাদের কলিজা দগ্ধ হচ্ছিলো আর স্বদেশবাসী আনসার কর্তৃক মুহাজিরদের সসম্মানে গ্রহণ করতে দেখে তাদের মন দুখ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিলো। এই হিংসার কারণে তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে এবং আশেপাশের ইসলাম বৈরীদের সাথে ষড়যন্ত্র ও যোগসাজশ করে এই বহিরাগত প্রভাব-প্রতিপত্তিকে খতম করে দিতে চাইতো। তাদেরকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এই নেতিবাচক উদ্দেশ্য ছাড়া কোন গঠনমূলক জিনিস ছিল না। তাদের প্রত্যেক নেতার আলাদা আলাদা দল ও উপদল ছিল। প্রত্যেকেই নিজের মাতবরী ফলাতে চাইতো। তারা কেউ কারো অকৃত্রিম বন্ধু ছিল না। প্রত্যেকের মনে অন্যদের জন্য এতটা হিংসা-বিদ্বেষ ছিল যে, নিজেদের সাধারণ শত্রুর মোকাবেলায়ও তারা নিজেদের পারস্পরিক শত্রুতা ভুলতে কিংবা একে অপরের মূলোৎপাটন থেকে বিরত থাকতে পারতো না।

আল্লাহ তা'আলা এভাবে বনী নাযীর যুদ্ধের পূর্বেই মুনাফিকদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যালোচনা করে মুসলমানদের জানিয়ে দিলেন যে, তাদের দিক থেকে বাস্তব কোন

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ
مِّنْكَ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا
فِى النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٧﴾

এদের উদাহরণ হলো শয়তান। সে প্রথমে মানুষকে বলে কুফরী কর। যখন মানুষ কুফরী করে বসে তখন সে বলে, আমি তোমার দায়িত্ব থেকে মুক্ত। আমি তো আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে ভয় পাই।[২৭] উভয়েরই পরিণাম হবে এই যে, তারা চিরদিনের জন্য জাহান্নামী হবে। জালেমদের প্রতিফল এটাই।

বিপদের আশংকা নেই। তাই বারবার এ খবর শুনে তোমাদের ঘাবড়ে যাওয়ার আদৌ কোন কারণ নেই যে, তোমরা বনী নাযীরকে অবরোধ করার জন্য যাত্রা করলেই এই মুনাফিক নেতা দুই হাজার লোকের একটি বাহিনী নিয়ে তোমাদের ওপর আক্রমণ করে বসবে এবং একই সংগে বনী কুরাইযা ও বনী গাতফান গোত্র দু'টিকেও তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণে উস্কে দেবে। এসবই লফঝম্ফ মাত্র। চরম পরীক্ষা শুরু হতেই এর অন্তসারশূন্যতা প্রমাণিত হয়ে যাবে।

২৬. এখানে কুরাইশ গোত্রের কাফের এবং বনী কায়নুকার ইহুদীদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যারা নিজেদের সংখ্যাধিক্য এবং সাজ-সরঞ্জামের প্রাচুর্য সত্ত্বেও এ সব দুর্বলতার কারণে মুসলমানদের সাজ-সরঞ্জামহীন মুষ্টিমেয় লোকের একটি দলের কাছে পরাজিত হয়েছিল।

২৭. অর্থাৎ এসব মুনাফিক বনী নাযীরের সাথে সেই একই আচরণ করছে, যে আচরণ শয়তান মানুষের সাথে করে থাকে। এখন এসব মুনাফিক তাদের বলছে, তোমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও প্রয়োজনে আমরাও তোমাদের সাথে থাকবো। কিন্তু তারা যখন সত্যি সত্যি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বে তখন এরা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেদের সমস্ত প্রতিশ্রুতি থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে এবং তাদের পরিণতি কি হলো তা দেখার জন্য ফিরেও তাকাবে না। শয়তান প্রত্যেক কাফেরের সাথে এ ধরনের আচরণই করে থাকে। বদর যুদ্ধে কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের সাথেও সে এরূপ আচরণ করেছিল। সূরা আনফালের ৪৮ আয়াতে এর উল্লেখ আছে। প্রথমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সে তাদেরকে হিম্মত ও সাহস যুগিয়ে বদর প্রান্তরে এনে হাজির করেছে এবং বলেছেঃ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّىْ جَارٌ لَّكُمْ (আজ কেউই তোমাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে পারবে না। আর আমি তো তোমাদের পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগী হিসেবে আছিই)। কিন্তু যখন দুটো সেনাবাহিনী মুখোমুখি হয়েছে তখন সে একথা বলতে বলতে পালিয়েছে ঃ

اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّىْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ ، اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ
فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ
النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

৩ রুকূ'

হে[২৮] ঈমানদাররা, আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রত্যেকেই যেন লক্ষ রাখে, সে আগামীকালের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে।[২৯] আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই তোমাদের সেই সব কাজ সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা করে থাক। তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের নিজেদেরকেই ভুলিয়ে দিয়েছেন।[৩০] তারাই ফাসেক। যারা দোযখে যাবে এবং যারা জান্নাতে যাবে তারা পরস্পর সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতে যাবে তারাই সফলকাম।

(আমি তোমাদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত। আমি যা দেখতে পাচ্ছি তোমরা তা দেখতে পাও না। আমি তো আল্লাহকে ভয় পাই।)

২৮. কুরআন মজীদের নিয়ম হলো, যখনই মুনাফিক মুসলমানদের মুনাফিকসুলভ আচরণের সমালোচনা করা হয় তখনই তাদেরকে নসীহতও করা হয়। যাতে তাদের যার যার মধ্যে এখনো কিছুটা বিবেক অবশিষ্ট আছে সে যেন তার এই আচরণে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহকে ভয় করে ধ্বংসের সেই গহবর থেকে উঠে আসার চিন্তা করে যার মধ্যে সে প্রকৃতির দাসত্বের কারণে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এ রুকূ' পুরোটাই এ ধরনের নসীহতে পরিপূর্ণ।

২৯. আগামীকাল অর্থ আখেরাত। দুনিয়ার এই গোটা জীবনকাল হলো 'আজ' এবং কিয়ামতের দিন হলো আগামীকাল যার আগমন ঘটবে আজকের এই দিনটির পরে। এ ধরনের বাচনভঙ্গির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত বিজ্ঞোচিতভাবে মানুষকে বুঝিয়েছেন যে, ক্ষণস্থায়ী আনন্দ উপভোগ করার জন্য যে ব্যক্তি তার সবকিছু ব্যয় করে ফেলে এবং কাল তার কাছে ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্য আর মাথা গুঁজবার ঠাঁই থাকবে কিনা সে কথা চিন্তা করে না সেই ব্যক্তি এ পৃথিবীতে বড় নির্বোধ। ঠিক তেমনি ঐ ব্যক্তিও নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করছে যে তার পার্থিব জীবন নির্মাণের চিন্তায় এতই বিভোর যে আখেরাত সম্পর্কে একেবারেই গাফেল হয়ে গিয়েছে। অথচ আজকের দিনটির পরে কালকের দিনটি যেমন অবশ্যই আসবে তেমনি আখেরাতও আসবে। আর দুনিয়ার বর্তমান জীবনে যদি সে সেখানকার জন্য অগ্রিম কোন ব্যবস্থা না করে তাহলে সেখানে কিছুই

لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ
اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ
لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٢﴾

আমি যদি এই কুরআনকে কোন পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম তাহলে তুমি দেখতে পেতে তা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ছে এবং ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে।[৩১] আমি মানুষের সামনে এসব উদাহরণ এ জন্য পেশ করি যাতে তারা (নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে) ভেবে দেখে।

আল্লাহই সেই[৩২] মহান সত্তা যিনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই।[৩৩] অদৃশ্য ও প্রকাশ্য সবকিছুই তিনি জানেন।[৩৪] তিনিই রহমান ও রহীম।[৩৫]

পাবে না। এর সাথে দ্বিতীয় জ্ঞানগর্ভ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, এ আয়াতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের হিসাব পরীক্ষক বানানো হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির মধ্যে ভাল এবং মন্দের পার্থক্যবোধ সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আদৌ সে অনুভব করতে পারে না যে, সে যা কিছু করছে তা তার আখেরাতের জীবনকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করছে, না ধ্বংস করছে। তার মধ্যে এই অনুভূতি যখন সজাগ ও সচেতন হয়ে ওঠে তখন তার নিজেকেই হিসেব-নিকেশ করে দেখতে হবে, সে তার সময়, সম্পদ, শ্রম, যোগ্যতা এবং প্রচেষ্টা যে পথে ব্যয় করছে তা তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে না জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়টি বিবেচনা করা তার নিজের স্বার্থেই প্রয়োজন। অন্যথায় সে নিজের ভবিষ্যত নিজেই ধ্বংস করবে।

৩০. অর্থাৎ আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার অনিবার্য ফল হলো নিজেকে ভুলে যাওয়া, সে কার বান্দা সে কথা যখন কেউ ভুলে যায়, তখন অনিবার্যরূপে সে দুনিয়ায় তার একটা ভুল অবস্থান ঠিক করে নেয়। এই মৌলিক ভ্রান্তির কারণে তার গোটা জীবনই ভ্রান্তিতে পর্যবসিত হয়। অনুরূপভাবে সে যখন একথা ভুলে যায় যে, সে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো বান্দা নয় তখন আর সে শুধু সেই এদের বন্দেগী করে না। এমতাবস্থায় সে প্রকৃতই যার বান্দা তাকে বাদ দিয়ে যাদের সে বান্দা নয় এমন অনেকের বন্দেগী করতে থাকে। এটা আর একটা মারাত্মক ও সর্বাত্মক ভুল যা তার গোটা জীবনকেই ভুলে পরিণত করে। পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত মর্যাদা ও অবস্থান হলো সে বান্দা বা দাস, স্বাধীন বা মুক্ত নয়। সে কেবল এক আল্লাহর বান্দা, তার ছাড়া আর কোরো বান্দা সে নয়। একথাটি যে ব্যক্তি জানে না প্রকৃতপক্ষে সে নিজেই নিজেকে জানে না। আর যে ব্যক্তি একথাটি জেনেও এক মুহূর্তের জন্যও তা ভুলে যায় সেই মুহূর্তে সে এমন কোন কাজ করে বসতে পারে যা কোন আল্লাহদ্রোহী বা মুশরিক অর্থাৎ আত্মবিস্মৃত মানুষই করতে পারে। সঠিক পথের ওপর মানুষের টিকে থাকা পুরোপুরি নির্ভর করে আল্লাহকে স্মরণ করার ওপর। আল্লাহ

তা'আলা সম্পর্কে গাফেল হওয়া মাত্রই সে নিজের সম্পর্কেও গাফেল হয়ে যায় আর এই গাফিলতিই তাকে ফাসেক বানিয়ে দেয়।

৩১. এই উপমার তাৎপর্য হলো, কুরআন যেভাবে আল্লাহর বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য এবং তাঁর কাছে বান্দার দায়িত্ব ও জবাবদিহির বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে পাহাড়ের মত বিশাল সৃষ্টিও যদি তার উপলব্ধি লাভ করতে পারতো এবং কেমন পরাক্রমশালী ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রভুর সামনে নিজের সব কাজকর্মের জবাবদিহি করতে হবে তা যদি জানতো তাহলে সেও ভয়ে কেঁপে উঠতো। কিন্তু যে মানুষ কুরআনকে বুঝতে পারে এবং কুরআনের সাহায্যে সবকিছুর তাৎপর্য ও বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে, কিন্তু এরপরও তার মনে কোন ভয়-ভীতি সৃষ্টি হয় না কিংবা যে কঠিন দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হয়েছে সে সম্পর্কে তার আল্লাহকে কি জবাব দেবে সে বিষয়ে আদৌ কোন চিন্তা তার মনে জাগে না। বরং কুরআন পড়ার বা শোনার পরও সে এমন নির্লিপ্ত ও নিষ্ক্রীয় থাকে যেন একটি নিষ্প্রাণ ও অনুভূতিহীন পাথর। শোনা, দেখা ও উপলব্ধি করা আদৌ তার কাজ নয়। মানুষের এই চেতনাহীনতা ও নিরুদ্বিগ্নতা বিস্ময়কর বৈকি। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আহযাব, টীকা ১২০)।

৩২. এ আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার কাছে এই কুরআন পাঠানো হয়েছে, যিনি তোমার ওপর এসব দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং যাঁর কাছে অবশেষে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে সেই আল্লাহ কেমন এবং তাঁর গুণাবলী কি? উপরোল্লেখিত বিষয়টি বর্ণনার পর পরই আল্লাহর গুণাবলীর বর্ণনা আপনা থেকেই মানুষের মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি করে যে, তার লেনদেন ও বুঝা পড়া কোন সাধারণ সত্তার সাথে নয়, বরং এমন এক জবরদস্ত সত্তার সাথে যিনি এসব গুণাবলীর অধিকারী। এখানে এ বিষয়টি জেনে নেয়া দরকার যে, যদিও কুরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর গুণাবলী এমন অনুপম ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে যা থেকে আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। কিন্তু দু'টি স্থান বিশেষভাবে এমন যেখানে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক বর্ণনা পাওয়া যায়। এর একটি হলো, সূরা বাকারার আয়াতুল কুরসী (২৫৫ আয়াত) অপরটি হলো সূরা হাশরের এই আয়াতগুলো।

৩৩. অর্থাৎ যিনি ছাড়া আর কারোই ক্ষমতা, পদমর্যাদা ও অবস্থান এমন নয় যে, তার বন্দেগী ও আরাধনা করা যেতে পারে। যিনি ছাড়া আর কেউ আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতার মালিকই নয় যে, সে উপাস্য হওয়ার অধিকার লাভ করতে পারে।

৩৪. অর্থাৎ সৃষ্টির কাছে যা গোপন ও অজানা তিনি তাও জানেন আর যা তাদের কাছে প্রকাশ্য ও জানা তাও তিনি জানেন। এই বিশ্ব-জাহানের কোন বস্তুই তার জ্ঞানের বাইরে নয়। যা অতীত হয়ে গিয়েছে, যা বর্তমানে আছে এবং যা ভবিষ্যতে হবে তার সবকিছুই তিনি সরাসরি জানেন। এসব জানার জন্য তিনি কোন মাধ্যমের মুখাপেক্ষী নন।

৩৫. অর্থাৎ একমাত্র তিনিই এমন এক সত্তা যার রহমত অসীম ও অফুরন্ত। সমগ্র বিশ্ব চরাচরব্যাপী পরিব্যপ্ত এবং বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিসই তাঁর বদান্যতা ও অনুগ্রহ লাভ করে থাকে। গোটা বিশ্ব-জাহানে আর একজনও এই সর্বাত্মক ও অফুরন্ত রহমতের অধিকারী নেই। আর যেসব সত্তার মধ্যে দয়ামায়ার এই গুণটি দেখা যায় তা আংশিক ও

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ
الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۭ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

আল্লাহ-ই সেই মহান সত্তা যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি বাদশাহ,[৩৬] অতীব পবিত্র,[৩৭] পূর্ণাঙ্গ শান্তি,[৩৮] নিরাপত্তাদানকারী,[৩৯] হিফাযতকারী,[৪০] সবার ওপর বিজয়ী,[৪১] শক্তি বলে নিজের নির্দেশ কার্যকরী করতে সক্ষম।[৪২] এবং সবার চেয়ে বড় হয়েই বিরাজমান থাকতে সক্ষম।[৪৩] আল্লাহ সেই সব শিরক থেকে পবিত্র যা লোকেরা করে থাকে।[৪৪] সেই পরম সত্তা তো আল্লাহ-ই যিনি সৃষ্টির পরিকল্পনাকারী, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশ দানকারী এবং সেই অনুপাতে রূপদানকারী।[৪৫] উত্তম নামসমূহ তাঁর-ই।[৪৬] আসমান ও যমীনের সবকিছু তাঁর তাসবীহ বা পবিত্রতা বর্ণনা করে চলেছে।[৪৭] তিনি পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।[৪৮]

সীমিত। তাও আবার তার নিজস্ব গুণ বা বৈশিষ্ট নয়। বরং স্রষ্টা কোন উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন সামনে রেখে তা তাকে দান করেছেন তিনি কোন সৃষ্টির মধ্যে দয়ামায়ার আবেগ অনুভূতি সৃষ্টি করে থাকলে তা এ জন্য করেছেন যে, তিনি একটি সৃষ্টিকে দিয়ে আরেকটি সৃষ্টির প্রতিপালন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করতে চান। এটাও তাঁরই রহমতের প্রমাণ।

৩৬. মূল আয়াতে الملك শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ প্রকৃত বাদশাহ তিনিই। তাছাড়া শুধু الملك শব্দ ব্যবহার করায় তার অর্থ দাঁড়ায় তিনি কোন বিশেষ এলাকা বা নির্দিষ্ট কোন রাজ্যের বাদশাহ নন, বরং সমগ্র বিশ্ব-জাহানের বাদশাহ। তাঁর ক্ষমতা ও শাসন কর্তৃত্ব সমস্ত সৃষ্টিজগত জুড়ে পরিব্যাপ্ত। প্রতিটি বস্তুর তিনিই মালিক। প্রতিটি বস্তু তার ইখতিয়ার, ক্ষমতা এবং হুকুমের অধীন। তার কর্তৃত্ব তথা সার্বভৌম ক্ষমতাকে (Soverignty) সীমিত করার মত কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলার বাদশাহীর এ দিকগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ - (الروم : ٢٦)

"আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা সব তাঁরই মালিকানাধীন। সবাই তাঁর নির্দেশের অনুগত।" (আর রাম-২৬)

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ - (السجده : ٥)

"আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সব কাজের ব্যবস্থাপনা তিনিই পরিচালনা করে থাকেন।"

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ – (الحديد : ٥)

"আসমান ও যমীনের বাদশাহী তাঁরই। সব বিষয় আল্লাহর দিকেই রুজু করা হবে।"

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ– (الفرقان : ٢)

"বাদশাহী ও সার্বভৌমত্বে কেউ তাঁর অংশীদার নয়।"

بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ– (يس : ٨٢)

"সবকিছুর কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা তাঁরই হাতে।" (ইয়াসীন-৮২)

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ – (البروج : ١٦)

"যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম" (আল বুরুজ-১৬)

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ – (الانبياء : ٢٣)

"তিনি যা করেন তার জন্য তাঁকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। তবে অন্য সবাইকে জবাবদিহি করতে হয়।"

وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ – (الرعد : ٤١)

"আল্লাহ ফায়সালা করেন। তাঁর ফায়সালা পুনর্বিবেচনাকারী কেউ নেই।"

وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ – (المؤمنون : ٨٨)

"তিনিই আশ্রয় দান করেন। তাঁর বিরুদ্ধে কেউ আশ্রয় দিতে পারে না।

(আল মু'মিনূন, ৮৮)

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ – (ال عمران : ٢٦)

"বলো, হে আল্লাহ, বিশ্ব-জাহানের মালিক! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও। তুমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদা দান করো আবার যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত কর। সমস্ত কল্যাণ তোমার আয়ত্বে। নিসন্দেহে তুমি সব বিষয়ে শক্তিমান।" (আলে ইমরান, ২৬)

এসব স্পষ্ট ঘোষণা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'আলার বাদশাহী সার্বভৌমত্ব কোন সীমিত বা রূপক অর্থের বাদশাহী নয়, বরং সত্যিকার বাদশাহী যা

সার্বভৌমত্বের পূর্ণাংগ অর্থ ও পূর্ণাংগ ধারণার মূর্তপ্রতীক। সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে প্রকৃতপক্ষে যা বুঝায় তার অস্তিত্ব বাস্তবে কোথাও থাকলে কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার বাদশাহীতেই আছে। তাঁকে ছাড়া আর যেখানেই সার্বভৌম ক্ষমতা থাকার দাবী করা হয় তা কোন বাদশাহ বা ডিক্টেটরের ব্যক্তি সত্তা, কিংবা কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠী অথবা কোন বংশ বা জাতি যাই হোক না কেন প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়। কেননা, যে ক্ষমতা অন্য কারো দান, যা এক সময় পাওয়া যায় এবং আবার এক সময় হাতছাড়া হয়ে যায়, অন্য কোন শক্তির পক্ষ থেকে যা বিপদের আশংকা করে, যার প্রতিষ্ঠা ও টিকে থাকা সাময়িক এবং অন্য বহু প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি যার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের গণ্ডি সীমিত করে দেয় এমন সরকার বা রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে আদৌ সার্বভৌম ক্ষমতা বলা হয় না।

কিন্তু কুরআন মজীদ শুধু একথা বলেই ক্ষান্ত হয় না যে, আল্লাহ তা'আলা গোটা বিশ্ব-জাহানের বাদশাহ। এর সাথে পরবর্তী আয়াতাংশগুলোতে স্পষ্ট করে বলছে, তিনি এমন বাদশাহ যিনি 'কুদ্দুস,' 'সালাম,' 'মু'মিন', 'মুহাইমিন', 'আযীয', 'জাব্বার', 'মুতাকাব্বির,' 'খালেক', 'বারী' এবং 'মুছাওবির'।

৩৭. মূল ইবারতে قدوس শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা আধিক্য বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। এর মূল ধাতু قدس । قدس অর্থ সবরকম মন্দ বৈশিষ্ট মুক্ত ও পবিত্র হওয়া। قدوس অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা কোন পকার দোষ-ত্রুটি অথবা অপূর্ণতা কিংবা কোন মন্দ বৈশিষ্টের অনেক উর্ধ্বে। বরং তা এক অতি পবিত্র সত্তা যার মন্দ হওয়ার ধারণাও করা যায় না। এখানে একথাটি ভালভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, চরম পবিত্রতা প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমত্বের প্রাথমিক অপরিহার্য বিষয়সমূহের অন্তরভুক্ত যে সত্তা দুষ্ট, দুশ্চরিত্র এবং বদনিয়াত পোষণকারী, যার মধ্যে মানব চরিত্রের মন্দ বৈশিষ্টসমূহ বিদ্যমান এবং যার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভে অধিনস্তরা কল্যাণ লাভের প্রত্যাশী হওয়ার পরিবর্তে অকল্যাণের ভয়ে ভীত হয়ে ওঠে এমন সত্তা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে এটা মানুষের স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধি ও স্বভাব-প্রকৃতি মেনে নিতে অস্বীকার করে। এ কারণে মানুষ যাকেই সার্বভৌম ক্ষমতার আধার বলে স্বীকৃতি দেয় তার মধ্যে পবিত্রতা না থাকলেও তা আছে বলে ধরে নেয়। কারণ পবিত্রতা ছাড়া নিরংকুশ ক্ষমতা অকল্পনীয়। কিন্তু এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, আল্লাহ ছাড়া কোন চূড়ান্ত ক্ষমতাধর ব্যক্তি পবিত্র নয় এবং তা হতেও পারে না। ব্যক্তিগত বাদশাহী, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি, অন্য কোন পদ্ধতির মানবীয় সরকার যাই হোক না কেন কোন অবস্থায়ই তার সম্পর্কে চরম পবিত্রতার ধারণা করা যেতে পারে না।

৩৮. মূল আয়াতে السلام শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ শান্তি। কাউকে 'সুস্থ' ও 'নিরাপদ' না বলে 'নিরাপত্তা' বললে আপনা থেকেই তার মধ্যে আধিক্য অর্থ সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন কাউকে সুন্দর না বলে যদি সৌন্দর্য বলা হয় তাহলে তার অর্থ হবে সে আপাদমস্তক সৌন্দর্যমণ্ডিত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলাকে السلام বলার অর্থ তার গোটা সত্তাই পুরাপুরি শান্তি । কোন বিপদ, কোন দুর্বলতা কিংবা অপূর্ণতা স্পর্শ করা অথবা তাঁর পূর্ণতায় কোন সময় ভাটা পড়া থেকে তিনি অনেক উর্ধে।

৩৯. মূল আয়াতে المؤمن শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটির মূল ধাতু হলো امن । امن অর্থ ভয়ভীতি থেকে নিরাপদ হওয়া। তিনিই মু'মিন যিনি অন্যকে নিরাপত্তা দান করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে নিরাপত্তা দান করেন তাই তাঁকে মু'মিন বলা হয়েছে। তিনি কোন সময় তাঁর সৃষ্টির ওপর জুলুম করবেন, কিংবা তার অধিকার নস্যাত করবেন কিংবা তার পুরস্কার নষ্ট করবেন অথবা তার কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবেন এ ভয় থেকে তার সৃষ্টি পুরোপুরি নিরাপদ। আর কর্তার কোন কর্ম অর্থাৎ তিনি কাকে নিরাপত্তা দেবেন তা যেহেতু উল্লেখিত হয়নি বরং শুধু المؤمن বা নিরাপত্তা দানকারী বলা হয়েছে তাই আপনা থেকে এর অর্থ দাঁড়ায় গোটা বিশ্ব-জাহান ও তার সমস্ত জিনিসের জন্য তাঁর নিরাপত্তা।

৪০. মূল আয়াতে اَلْمُهَيْمِنُ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটির তিনটি অর্থ হয়। এক, তত্ত্বাবধান ও হিফাজতকারী। দুই, পর্যবেক্ষণকারী, কে কি করছে তা যিনি দেখছেন। তিন, সৃষ্টির যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থাপক, যিনি মানুষের সমস্ত প্রয়োজন ও অভাব পূরণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এখানেও যেহেতু শুধু المهيمن শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই কর্তার কোন কর্ম নির্দেশ করা হয়নি। অর্থাৎ তিনি কার তত্ত্বাবধানকারী ও সংরক্ষক, কার পর্যবেক্ষক এবং কার দেখা শোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তা বলা হয়নি। তাই শব্দের এ ধরনের প্রয়োগ থেকে স্বতঃই যা অর্থ দাঁড়ায় তা হলো তিনি সমস্ত সৃষ্টির তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণ করছেন, সবার কাজকর্ম দেখছেন এবং বিশ্ব-জাহানের সমস্ত সৃষ্টির দেখাশোনা, লালন-পালন এবং অভাব ও প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

৪১. মূল ইবারতে العزيز শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এমন এক পরাক্রমশালী সত্তা যার মোকাবিলায় অন্য কেউ মাথা তুলতে পারে না, যার সিদ্ধান্তসমূহের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর সাধ্য কারো নেই এবং যার মোকাবিলায় সবাই অসহায় ও শক্তিহীন।

৪২. মূল আয়াতে الجبار শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর শব্দমূল বা ধাতু হলো جبر । جبر শব্দের অর্থ কোন বস্তুকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ঠিক করা, কোন জিনিসকে শক্তি দ্বারা সংশোধন করা। যদিও আরবী ভাষায় جبر শব্দটির কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু সংশোধন অর্থে এবং কোন কোন সময় শুধু জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হলো, সংস্কার ও সংশোধনের জন্য শক্তি প্রয়োগ করা। সুতরাং আল্লাহ তা'আলাকে جبار (জাব্বার) বলার অর্থ হলো বল প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি সৃষ্ট বিশ্ব-জাহানের শৃংখলা রক্ষাকারী এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নকারী, যদিও তাঁর ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান ও যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়াও جبار শব্দটির মধ্যে বড়ত্ব ও মহত্ববোধক অর্থও বিদ্যমান। খেজুরের যে গাছ অত্যন্ত উঁচু হওয়ার কারণে তার ফল সংগ্রহ করা কারো জন্য সহজসাধ্য নয় আরবী ভাষায় তাকে জাব্বার বলে। অনুরূপ যে কাজ অত্যন্ত গুরুত্ব ও জাকজমকপূর্ণ তাকে জাব্বার বা অতি বড় কাজ বলা হয়।

৪৩. মূল আয়াতে اَلْمُتَكَبِّرُ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটির দু'টি অর্থ। এক, যে প্রকৃতপক্ষে বড় নয়, কিন্তু খামাখা বড়ত্ব জাহির করে। দুই, যে প্রকৃতপক্ষেই বড় এবং বড় হয়েই থাকে। মানুষ হোক, শয়তান হোক বা অন্য কোন মাখলুক হোক, যেহেতু প্রকৃতপক্ষে তার কোন বড়ত্ব মহত্ব নেই, তাই নিজেকে নিজে বড় মনে করা এবং

অন্যদের কাছে নিজের বড়ত্ব ও মহত্ব জাহির করা একটা মিথ্যা দাবী ও জঘন্য দোষ। অপর দিকে আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতই বড়, বড়ত্ব বাস্তবে তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট এবং বিশ্ব–জাহানের সব বস্তু তাঁর সামনে ক্ষুদ্র ও নগণ্য। তাই তাঁর বড় হওয়া এবং বড় হয়ে থাকা নিছক কোন দাবী বা ভান নয়। বরং একটি বাস্তবতা। এটি কোন খারাপ বা মন্দ বৈশিষ্ট নয়, বরং একটি গুণ ও সৌন্দর্য যা তাঁর ছাড়া আর কারো মধ্যে নেই।

৪৪. অর্থাৎ যারাই তাঁর ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও গুণাবলীতে কিংবা তাঁর সত্তায় অন্য কোন সৃষ্টিকে অংশীদার বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তারা অতিবড় এক মিথ্যা বলছে। কোন অর্থেই কেউ আল্লাহ তা'আলার শরীক বা অংশীদার নয়। তিনি তা থেকে পবিত্র।

৪৫. অর্থাৎ সারা দুনিয়ার এবং দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু সৃষ্টির প্রাথমিক পরিকল্পনা থেকে শুরু করে তার নির্দিষ্ট আকার আকৃতিতে অস্তিত্ব লাভ করা পর্যন্ত পুরাপুরি তাঁরই তৈরী ও লালিতপালিত। কোন কিছুই আপনা থেকে অস্তিত্ব লাভ করেনি কিংবা আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হয়ে যায়নি অথবা তার নির্মাণ ও পরিপাটি করণে অন্য কারো সামান্যতম অবদানও নেই। এখানে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকর্মকে তিনটি স্বতন্ত্র পর্যায় বা স্তরে বর্ণনা করা হয়েছে যা ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। প্রথম পর্যায়টি হলো সৃষ্টি অর্থাৎ পরিকল্পনা করা। এর উদাহরণ হলো, কোন ইঞ্জিনিয়ার কোন ইমারত নির্মাণের পূর্বে যেমন মনে মনে স্থির করে যে, অমুক বিশেষ উদ্দেশ্যে তাকে এরূপ ও এরূপ একটি ইমারত নির্মাণ করতে হবে। সে তখন মনে মনে তার নমুনা বা ডিজাইন (Design) চিন্তা করতে থকে। এ উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত ইমারতের বিস্তারিত ও সামগ্রিক কাঠামো কি হবে এ পর্যায়ে সে তা ঠিক করে নেয়। দ্বিতীয় পর্যায় হলো برء । এ শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো পৃথক করা, চিরে ফেলা, ফেড়ে আলাদা করা। স্রষ্টার জন্য 'বারী' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে, তিনি তাঁর পরিকল্পিত কাঠামোকে বাস্তবে রূপ দেন। অর্থাৎ যে নকশা তিনি নিজে চিন্তা করে রেখেছেন তাকে কল্পনা বা অস্তিত্বহীনতার জগত থেকে এনে অস্তিত্ব দান করেন। এর উদাহরণ হলো, ইঞ্জিনিয়ার ইমারতের যে কাঠামো ও আকৃতি তাঁর চিন্তার জগতে অংকন করেছিলেন সে অনুযায়ী ঠিকমত মাপজোঁক করে মাটিতে দাগ টানেন, ভিত খনন করেন, প্রাচীর গেঁথে তোলেন এবং নির্মাণের সকল বাস্তব স্তর অতিক্রম করেন। তৃতীয় পর্যায় হলো, 'তাসবীর'–এর অর্থ রূপদান করা। এখানে এর অর্থ হলো, কোন বস্তুকে চূড়ান্ত, পূর্ণাঙ্গ আকৃতি ও রূপ দান করা। এই তিনটি পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলার কাজ ও মানুষের কাজের মধ্যে আদৌ কোন মিল বা তুলনা হয় না। মানুষের কোন পরিকল্পনাই এমন নয় যা পূর্বের কোন নমুনা থেকে গৃহীত নয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি পরিকল্পনা অনুপম এবং তাঁর নিজের আবিষ্কার। মানুষ যা তৈরী করে তা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট উপাদানসমূহের একটিকে আরেকটির সাথে জুড়ে করে। অস্তিত্ব নেই এমন কোন জিনিসকে সে অস্তিত্ব দান করে না, বরং যা আছে তাকেই বিভিন্ন পন্থায় জোড়া দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত বস্তুকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং যে উপাদান দিয়ে তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সে উপাদানও তাঁর নিজের সৃষ্টি। অনুরূপ আকার–আকৃতি দানের ব্যাপারেও মানুষ আবিষ্কর্তা নয়, বরং আল্লাহর তৈরী আকার–আকৃতি ও চিত্রসমূহের অনুকরণকারী ও অপরিপক্ক নকলকারী। প্রকৃত আকার–আকৃতি দানকারী ও চিত্র অংকনকারী মহান আল্লাহ। তিনি প্রতিটি জাতি,

প্রজাতি এবং প্রতিটি ব্যক্তির অনুপম ও নজীরহীন আকার-আকৃতি বানিয়েছেন এবং কোন সময় একই আকার-আকৃতির পুনরাবৃত্তি ঘটাননি।

৪৬. নামসমূহ অর্থ গুণবাচক নাম। তাঁর উত্তম নাম থাকার অর্থ হলো, যেমন গুণবাচক নাম দ্বারা তার কোন প্রকার অপূর্ণতা প্রকাশ পায় যেসব গুণবাচক নাম তাঁর জন্য উপযুক্ত নয়। যেসব নাম তাঁর পূর্ণাংগ গুণ ও বৈশিষ্ট প্রকাশ করে সেই সব নামে তাঁকে স্মরণ করা উচিত। কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ আ'আলার এসব উত্তম নামের উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে তাঁর পবিত্র সত্তার ৯৯টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে তিরমিযী ও ইবনে মাজা এসব নাম বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। কেউ যদি কুরআন ও হাদীস থেকে এসব নাম গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়ে তাহলে সে অতিসহজেই উপলব্ধি করতে পারবে যে, পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় যদি আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করতে হয় তাহলে সে জন্য কি ধরনের শব্দ উপযুক্ত হবে।

৪৭. অর্থাৎ মুখের ভাষায় ও অবস্থার ভাষায় বর্ণনা করছে যে, তার স্রষ্টা সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি, অপূর্ণতা, দুর্বলতা এবং ভুল-ভ্রান্তি থেকে পবিত্র।

৪৮. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআনের সূরা হাদীদের ২নং টীকা।

আল মুমতাহিনা

৬০

নামকরণ

যেসব স্ত্রীলোক হিজরত করে চলে আসবে এবং মুসলমান হওয়ার দাবী করবে এ সূরার ১০ আয়াতে তাদের পরীক্ষা করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। এ কারণে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে আল মুমতাহিনা। মুমতাহানা এবং মুমতাহিনা এই দু'ভাবেই শব্দটি উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। প্রথম প্রকার উচ্চারণের ক্ষেত্রে এর অর্থ হয়, যে স্ত্রীলোককে পরীক্ষা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় প্রকার উচ্চারণের ক্ষেত্রে এর অর্থ হয় পরীক্ষা গ্রহণকারী সূরা।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরায় এমন দু'টি বিষয়ে কথা বলা হয়েছে যার সময়-কাল ঐতিহাসিকভাবে জানা। প্রথমটি হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতা'আর (রা) ঘটনা। তিনি মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে একটি গোপন পত্রের মাধ্যমে কুরাইশ নেতাদের এ মর্মে অবগত করেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করতে যাচ্ছেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি মুসলমান মহিলাদের সম্পর্কে, যারা হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মক্কা থেকে হিজরাত করে মদীনায় আসতে শুরু করেছিল এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, সন্ধির শর্ত অনুসারে মুসলমান পুরুষদের মত তাদেরও কি কাফেরদের হাতে সোপর্দ করতে হবে? এ দু'টি ঘটনার উল্লেখ থেকে এ বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, সূরাটি হুদাইবিয়ার সন্ধি এবং মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে নাযিল হয়েছিল। এ দু'টি ঘটনা ছাড়াও সূরার শেষের দিকে তৃতীয় আরেকটি ঘটনার উল্লেখ আছে। তাহলো, ঈমান গ্রহণের পর বাই'য়াত গ্রহণের উদ্দেশ্যে মহিলারা যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হবে তখন তিনি তাদের কাছ থেকে কি কি বিষয়ের প্রতিশ্রুতি নেবেন? সূরার এ অংশ সম্পর্কেও অনুমান হলো, তা মক্কা বিজয়ের অল্প কিছুকাল পূর্বে নাযিল হয়েছিল। কারণ মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশদের পুরুষদের মত তাদের নারীরাও বিপুল সংখ্যায় একসাথে ইসলাম গ্রহণ করবে বলে মনে হচ্ছিলো। তাদের নিকট থেকে সামষ্টিকভাবে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের প্রয়োজন তখন অবশ্যম্ভাবী ছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটির তিনটি অংশ ঃ

প্রথম অংশ সূরার শুরু থেকে ৯ আয়াত পর্যন্ত। সূরার সমাপ্তি পর্বের ১৩নং আয়াতটিও এর সাথে সম্পর্কিত। হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতা'আ শুধু তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি

গোপন সামরিক তথ্য শত্রুদের জানিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এটি যথাসময়ে ব্যর্থ করে দেয়া না গেলে মক্কা বিজয়ের সময় ব্যাপক রক্তপাত হতো। মুসলমানদেরও বহু মূল্যবান প্রাণ নষ্ট হতো এবং কুরাইশদেরও এমন বহু লোক মারা যেতো, যাদের দ্বারা পরবর্তী সময়ে ইসলামের ব্যাপক খেদমত পাওয়ার ছিল। শান্তিপূর্ণ উপায়ে মক্কা বিজিত হলে যেসব সুফল অর্জিত হতে পারতো তা সবই পণ্ড হয়ে যেতো। এসব বিরাট ও ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হতো শুধু এ কারণে যে, মুসলমানদেরই এক ব্যক্তি যুদ্ধের বিপদ থেকে নিজের সন্তান-সন্ততিকে নিরাপদ রাখতে চেয়েছিল। এ আয়াতে হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতা'আর এ কাজের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। মারাত্মক এই ভুল সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত ঈমানদারদের এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোন ঈমানদারের কোন অবস্থায় কোন উদ্দেশ্যেই ইসলামের শত্রু কাফেরদের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক না রাখা উচিত এবং এমন কোন কাজও না করা উচিত যা কুফর ও ইসলামের সংঘাতে কাফেরদের জন্য সুফল বয়ে আনে। তবে যেসব কাফের কার্যত ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক ও নির্যাতনমূলক কোন আচরণ করছে না তাদের সাথে প্রীতিপূর্ণ ও অনুগ্রহের আচরণ করায় কোন দোষ নেই।

১০ ও ১১ আয়াত হলো, সূরাটির দ্বিতীয় অংশ। সেই সময় মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি করছিল এমন একটি সামাজিক সমস্যার সমাধান পেশ করা হয়েছে এ অংশে। মক্কায় বহু মুসলমান মহিলা ছিল যাদের স্বামীরা ছিল কাফের। এসব মহিলা কোন না কোনভাবে হিজরাত করে মদীনায় এসে হাজির হতো। অনুরূপ মদীনায় বহুসংখ্যক মুসলমান পুরুষ ছিল যাদের স্ত্রীরা ছিল কাফের এবং তারা মক্কাতেই রয়ে গিয়েছিল। এসব লোকের দাম্পত্য বন্ধন অক্ষুণ্ন আছে কিনা এ বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিতো। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে চিরদিনের জন্য ফায়সালা দিলেন যে, মুসলমান নারীর জন্য কাফের স্বামী হালাল নয় এবং মুসলমান পুরুষের জন্যও মুশরিক স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধনে ধরে রাখা জায়েয নয়। এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনগত ফলাফলের ধারক। পরে আমরা টীকাসমূহে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

১২নং আয়াত হলো সূরাটির তৃতীয় অংশ। এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, জাহেলী যুগের আরব সমাজে যেসব বড় বড় দোষ-ত্রুটি ও গোনাহর কাজ নারীসমাজের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিল যেসব নারী ইসলাম গ্রহণ করবে তা থেকে মুক্ত থাকার জন্য তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিতে হবে এবং এ বিষয়েও অঙ্গীকার নিতে হবে যে, আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে যেসব কল্যাণ ও সুকৃতির পথ, পন্থা ও নিয়ম-কানুন মেনে চলার আদেশ দেয়া হবে তা তারা মেনে চলবে।

আয়াত ১৩ **সূরা আল মুমতাহিনা-মাদানী** রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ
اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ
الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ۗ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا
فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ۚ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۚ وَاَنَا
اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ ۗ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ
السَّبِيْلِ ①

হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আমার পথে জিহাদ করার জন্য এবং আমার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে (জন্মভূমি ছেড়ে ঘর থেকে) বেরিয়ে থাক তাহলে আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না। তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা কর, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে তারা তা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তাদের আচরণ হলো, তারা রসূলকে এবং তোমাদেরকে শুধু এই অপরাধে জন্মভূমি থেকে বহিষ্কার করে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছো। তোমরা গোপনে তাদের কাছে বন্ধুত্বমূলক পত্র পাঠাও। অথচ তোমরা গোপনে যা কর এবং প্রকাশ্যে যা করো তা সবই আমি ভাল করে জানি। তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই এরূপ করে নিশ্চিন্তভাবেই সে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

১. যেসব ঘটনা প্রসংগে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে শুরুতেই তা বিস্তারিত বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। এতে পরবর্তী বিষয়বস্তু বুঝা সহজ হবে। মক্কার মুশরিকদের কাছে হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতা'আর (রা) লিখিত পত্র ধরা পড়ার পর এ

আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল। সমস্ত তাফসীরকার এ ব্যাপারে একমত। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদা, উরওয়া ইবনে যুবায়ের প্রমুখ বর্ণনাকারীর সর্বসম্মত বর্ণনাও তাই।

ঘটনা হলো, কুরাইশরা হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। কিন্তু কোথায় অভিযান পরিচালনা করতে চাচ্ছেন বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবা ছাড়া আর কাউকে তিনি তা বললেন না। ঘটনাক্রমে এই সময় মক্কা থেকে একজন মহিলা আসল। পূর্বে সে আবদুল মুত্তালিবের দাসী ছিল। কিন্তু পরে দাসত্ব শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে গানবাদ্য করে বেড়াত। নবীর(সা) কাছে এসে সে তার দারিদ্র্যের কথা বলল এবং কিছু অর্থ সাহায্য চাইল। তিনি বনী আবদুল মুত্তালিব এবং বনী মুত্তালিবের লোকদের কাছে থেকে কিছু অর্থ চেয়ে দিয়ে তার অভাব পূরণ করলেন। সে মক্কায় ফিরে যেতে উদ্যত হলে হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতা'আ তার সাথে দেখা করলেন এবং মক্কার কয়েকজন কাফের নেতার নামে লেখা একখানা পত্র গোপনে তাকে দিলেন। আর সে যাতে এই গোপনীয় বিষয়টি প্রকাশ না করে এবং গোপনে তাদের কাছে পৌঁছে দেয় সে জন্য তিনি তাকে দশটি দিনারও দিলেন। সে সবেমাত্র মদীনা থেকে রওয়ানা হয়েছিল। ইতিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত আলী, হযরত যুবায়ের এবং হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদকে তার সন্ধানে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন, তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও। রাওদায়ে খাখ নামক স্থানে (মদীনা থেকে মক্কার পথে ১২ মাইল দূরে) তোমরা এক মহিলার সাক্ষাত পাবে। তার কাছে মুশরিকদের নামে হাতেবের একটি পত্র আছে। যেভাবে হোক তার নিকট থেকে এ পত্রখানা নিয়ে এসো। সে যদি পত্রখানা দিয়ে দেয় তাহলে তাকে ছেড়ে দেবে। আর যদি না দেয় তাহলে তাকে হত্যা করবে। তাঁরা ঐ স্থানে পৌঁছে মহিলাকে দেখতে পেলেন। তাঁরা তার কাছে পত্রখানা চাইলেন। কিন্তু সে বললঃ আমার কাছে কোন পত্র নেই। তাঁরা তার দেহ তল্লাশী করলেন। কিন্তু কোন পত্র পাওয়া গেল না। অবশেষে তারা বললেন ঃ পত্রখানা আমাদের দিয়ে দাও তা না হলে আমরা তোমাকে উলঙ্গ করে তল্লাশী নেব। সে যখন বুঝতে পারলো রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই তখন সে তার চুলের খোপার ভেতর থেকে পত্রখানা বের করে তাদের দিল। আর তাঁরা তা নিয়ে নবীর (সা) দরবারে হাজির হলেন। পত্রখুলে পড়া হলো। দেখা গেল তাতে কুরাইশদের অবগত করানো হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। (বিভিন্ন বর্ণনায় পত্রের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণিত হয়েছে কিন্তু বিষয়বস্তু ছিল এটিই) নবী (সা) হযরত হাতেবকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি একি করেছো? তিনি বললেন ঃ আপনি আমার ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি যা করেছি তা এ জন্য করি নাই যে, আমি কাফের বা মুরতাদ হয়ে গিয়েছি এবং ইসলামকে পরিত্যাগ করে এখন কুফরকে ভালবাসতে শুরু করেছি। প্রকৃত ব্যাপার হলো, আমার আপনজনেরা সব মক্কায় অবস্থান করছে। আমি কুরাইশ গোত্রের লোক নই। বরং কুরাইশদের কারো কারো পৃষ্ঠপোষকতা ও ছত্রছায়ায় আমি সেখানে বসতিস্থাপন করেছিলাম। অন্য যেসব মুহাজিরের পরিবার-পরিজন মক্কায় অবস্থান করছে তাদের গোত্র তাদের রক্ষা করবে। কিন্তু আমার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার মত কেউই সেখানে নেই। তাই আমি এই পত্র লিখেছিলাম। আমি মনে করেছিলাম, এটা হবে কুরাইশদের প্রতি আমার একটা অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহের কথা মনে করে তারা আমার

إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ
وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿١﴾ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ
وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾

তাদের আচরণ হলো, তারা যদি তোমাদের কাবু করতে পারে তাহলে তোমাদের সাথে শত্রুতা করবে এবং হাত ও জিহবা দ্বারা তোমাদের কষ্ট দেবে। তারা চায় যে, কোনক্রমে তোমরা কাফের হয়ে যাও।[২] কিয়ামতের দিন না তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন কোন কাজে আসবে না সন্তান-সন্ততি[৩] কোন কাজে আসবে। সেদিন আল্লাহ তোমাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দেবেন।[৪] আর তিনিই তোমাদের আমল বা কর্মফল দেখবেন।[৫]

সন্তানদের ওপর নির্যাতন চালাবে না। (হযরত হাতেবের পুত্র আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন যে, ঐ সময় হযরত হাতেবের সন্তান-সন্ততি ও ভাই মক্কায় অবস্থান করছিল। তাছাড়া হযরত হাতেবের নিজের একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় সেসময় তাঁর মাও সেখানে ছিল।) হাতেবের এই বক্তব্য শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সবাইকে বললেন ঃ قد صدقكم হাতেব তোমাদের কাছে সত্য কথাই বলেছে। অর্থাৎ এটিই তার এ কাজের মূল কারণ। ইসলামকে পরিত্যাগ বা কুফরকে সহযোগিতা করার মানসিকতা এর চালিকাশক্তি নয়। হযরত উমর উঠে বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, আমাকে অনুমতি দিন এই মুনাফিকের শিরচ্ছেদ করি। সে আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। নবী (সা) বললেন, এ ব্যক্তি তো বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। তোমরা তো জানো না, হয়তো আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের বিষয় বিবেচনা করে বলে দিয়েছেন ঃ তোমরা যাই করো না কেন আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন। (শেষ বাক্যাংশটির ভাষা বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। কোনটাতে আছে قد غفرت لكم 'আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।' কোনটাতে আছে انى غافر لكم 'আমি তোমাদের মাফ করে দেব।' আবার কোনটাতে আছে ساغفر لكم 'আমি অচিরেই তোমাদের মাফ করে দেব') একথা শুনে হযরত 'উমর (রা) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই সর্বাধিক জানেন। এ হলো বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জারীর, তাবারী, ইবনে হিশাম, ইবনে হিব্বান এবং ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক সহীহ সনদে বর্ণিত বহু সংখ্যক হাদীসের সার সংক্ষেপ। এসব বর্ণনার মধ্যে যে বর্ণনাটি হযরত আলীর নিজের মুখ থেকে তাঁর সেক্রেটারী উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু রাফে শুনেছেন এবং তার নিকট থেকে হযরত আলীর (রা) পৌত্র হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হানফীয়া শুনে পরবর্তী রাবীদের কাছে পৌঁছিয়েছেন সেটিই সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। এসব বর্ণনার কোনটিতেই স্পষ্ট করে একথা বলা হয়নি যে, হযরত হাতেবের এই ওজর শোনার পর তাকে মাফ করে দেয়া

হয়েছিল। আবার কোন সূত্র থেকে একথাও জানা যায় না যে, তাঁকে কোন শাস্তি দেয়া হয়েছিল। তাই আলেমগণ ধরে নিয়েছেন হযরত হাতেবের ওজর গ্রহণ করে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।

২. এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে এবং পরে যা বলা হবে যদিও তা নাযিল হওয়ার উপলক্ষ ছিল হযরত হাতেবের ঘটনা, কিন্তু মহান আল্লাহ কেবল তার ব্যাপারে কথা বলার পরিবর্তে এর মাধ্যমে সমস্ত ঈমানদারদের চিরদিনের জন্য শিক্ষা দিয়েছেন যে, যেখানে কুফর ও ইসলামের মোকাবিলা এবং যেখানে কিছু লোক ঈমানদারদের বিরুদ্ধে তাদের মুসলমান হওয়ার কারণে শত্রুতা করছে সেখানে কোন ব্যক্তির কোন উদ্দেশ্য বা কোন যুক্তির খাতিরেও এমন কোন কাজ করা যা দ্বারা ইসলামের স্বার্থের ক্ষতি এবং কুফর ও কাফেরদের স্বার্থের আনুকূল্য হয়, ঈমানের পরিপন্থি আচরণ। কারো মধ্যে যদি ইসলামের প্রতি শত্রুতা ও ক্ষতি করার মানসিকতা একেবারেই না থাকে এবং সে খারাপ নিয়তে নয় বরং নিছক নিজের একান্ত কোন ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই এরূপ কাজ করে বসে তবুও তা কোন ঈমানদারের জন্য যোগ্য ও শোভনীয় কাজ নয়। এ ধরনের কাজ যেই করে থাকুক না কেন সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

৩. এখানে হযরত হাতেবের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। তিনি তাঁর মা, ভাই এবং সন্তান–সন্ততিকে যুদ্ধের সময় শত্রুর নির্যাতন থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এ কাজ করেছিলেন। তাই বলা হচ্ছে, যাদের জন্য তুমি এত বড় অপরাধ করে বসলে কিয়ামতের দিন তারা তোমাকে রক্ষা করতে আসবে না। আল্লাহর আদালতে এগিয়ে গিয়ে কারো একথা বলার সাহস হবে না যে, আমার বাপ, আমার মা অথবা আমার ভাই আমার জন্য এ গোনাহ করেছিল। তাই তার জন্য যে শাস্তি হওয়ার তা আমাকে দেয়া হোক। সেদিন প্রত্যেকে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। অন্য কারো পরিণাম বা কর্মফল ভোগ করতে প্রস্তুত হওয়া তো দূরের কথা নিজের কৃতকর্মের পরিণাম থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায়, সেই ভাবনাতেই সবাই থাকবে দিশেহারা। কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় একথাটিই অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে, "অপরাধী সেদিন কামনা করবে, যদি তার সন্তান–সন্ততি, স্ত্রী, ভাই এবং সাহায্যকারী নিজ বংশ এবং গোটা পৃথিবীর সমস্ত লোককে বিনিময়ে দিয়েও যদি সে এ আযাব থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে তাহলে তা সে দেবে এবং নিজে মুক্তি লাভ করবে।" (আল মা'আরিজ, আয়াত ১১—১৪) আরেক স্থানে বলা হয়েছে, "সেদিন মানুষ নিজের ভাই, নিজের মা, নিজের বাপ, নিজের স্ত্রী এবং নিজের ছেলেমেয়ের কাছ থেকে পালাবে। প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে যে, হুশই থাকবে না। (আবাসা, ৩৪—৩৭)।

৪. অর্থাৎ সেখানে দুনিয়ার সব রকম আত্মীয়তা, সম্পর্ক এবং বন্ধন ছিন্ন করে দেয়া হবে। দল, পার্টি এবং বংশ বা গোত্র হিসেবে মানুষের হিসেব–নিকেশ হবে না। বরং প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে পেশ করা হবে এবং তাকে কেবল তার নিজের হিসেবই দিতে হবে। তাই কোন আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব বা যুথবদ্ধতার খাতিরে কারো কোন নাজায়েয কাজ করা উচিত নয়। কারণ কৃতকর্মের শাস্তি তার নিজেকেই ভোগ করতে হবে অন্য কেউ তার ব্যক্তিগত দায়–দায়িত্বের অংশীদার হবে না।

৫. হযরত হাতেব সম্পর্কিত এই ঘটনাটির বিস্তারিত যে বিবরণ আমরা উপরে পেশ করেছি তা থেকে এবং ঐ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ এসব আয়াত থেকে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত ও ফলাফল পাওয়া যায় ঃ

এক ঃ কাজ যিনি করেছেন তিনি কি নিয়তে করেছেন সে বিষয়টি বাদ দিলেও এ কাজটি ছিল স্পষ্টত গুপ্তচরবৃত্তি তাও আবার অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতে চরম বিপজ্জনক প্রকৃতির গুপ্তচরবৃত্তি। অর্থাৎ আক্রমণের ঠিক পূর্বক্ষণে বে-খবর শত্রুকে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল। তাছাড়া ব্যাপারটা শুধু সন্দেহের পর্যায়ে ছিল না। অভিযুক্তের নিজ হাতে লেখা পত্রও ধরা পড়েছিল। তাই আর কোন প্রমাণেরও প্রয়োজন ছিল না তখন শান্তিকালীন অবস্থা ছিল না, যুদ্ধকালীন অবস্থা বিরাজ করছিল। তা সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম হাতেবকে সাফাই ও নির্দোষিতা প্রমাণ করার সুযোগ না দিয়ে গ্রেফতার করলেন না। আর কোন রুদ্ধদ্বার কক্ষে তাকে সাফাই পেশ করতে বলা হয়নি। বরং উন্মুক্ত আদালতে সবার সামনে সাফাই পেশ করতে দিয়েছেন। এ থেকে স্পষ্ট জানা যায়, ইসলামে এমন কোন আইন-কানুন ও নিয়ম-পদ্ধতির আদৌ কোন অবকাশ নেই যার ভিত্তিতে শাসক শুধু নিজের অবগতি ও সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে কোন অবস্থায় কাউকে গ্রেফতার করার অধিকার রাখে। তাছাড়া বদ্ধ কামরায় গোপনপন্থায় কারো বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানোর কোন বিধানও ইসলামে নেই।

দুই ঃ হযরত হাতেব শুধু মুহাজিরই ছিলেন না। তিনি বদর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। সাহাবীদের মধ্যেও তার একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এত বড় অপরাধ করে ফেলেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে অত্যন্ত কঠোরভাবে তার সমালোচনা করেছেন যা উপরোল্লেখিত আয়াত থেকে জানা যেতে পারে। বিভিন্ন হাদীসেও তার এ কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাফসীরকারদের মধ্যে এ ঘটনার উল্লেখ করেননি এমন তাফসীরকার নেই বললেই চলে। সাহাবায়ে কেরাম যে নির্ভুল ও নিষ্পাপ নন এটি তার বহু সংখ্যক প্রমাণের একটি। মানবীয় দুর্বলতার কারণে তাঁদের দ্বারাও ভুল-ত্রুটি হতে পারে এবং কার্যত হয়েছেও। আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সাহাবীদের প্রতি সম্মান দেখানোর যে শিক্ষা দিয়েছেন তার দাবী কখনো এ নয় যে, তাদের কারো দ্বারা কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকলে তার উল্লেখ করা যাবে না। তাই যদি হতো তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কিতাবে তার উল্লেখ করতেন না এবং সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, মুফাস্সির এবং মুহাদ্দিসগণও তাঁদের রেওয়ায়াতসমূহে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতেন না।

তিন ঃ হযরত হাতেবের ঘটনায় হযরত উমর (রা) যে অভিমত ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন তা ছিল হযরত হাতেবের কাজের বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে। হযরত উমরের যুক্তি ছিল, এটি এমন একটি কাজ যা সরাসরি আল্লাহ, আল্লাহর রসূল এবং মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। অতএব হাতেব মুনাফিক এবং হত্যার উপযুক্ত। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করলেন এবং ইসলামী শরীয়াতের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে বললেন ঃ কাজের বাহ্যিক অবস্থা বিচার করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত নয়। বরং এও দেখা উচিত যে, যে ব্যক্তির দ্বারা কাজটি সংঘটিত হয়েছে তার অতীত জীবন এবং সার্বিক স্বভাব-চরিত্র কেমন। তার চাল-চলন

কিসের ইংগিত দেয়। নিসন্দেহে কাজটির বাহ্যিক রূপ ছিল গুপ্তচরবৃত্তি। কিন্তু কাজটি যিনি করেছেন ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের সাথে তার আজ পর্যন্তকার আচরণ কি একথাই বলে যে, এ ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার নিয়তে এ কাজ করতে পারে? যাঁরা ঈমান রক্ষার কারণে হিজরাত করেছিলেন তিনি তাঁদের একজন। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ছাড়া কি তিনি এত বড় ত্যাগ স্বীকার করতে পারতেন? বদর যুদ্ধের মত নাজুক পরিস্থিতিতেও যখন শত্রুর তিনগুণ এবং অনেক বেশী ও ব্যাপকভাবে অস্ত্রসজ্জিত শক্তির সাথে মোকাবিলা হতে যাচ্ছিল—তখন ঈমানের খাতিরে তিনি জীবন বাজি রেখেছিলেন। এমন ব্যক্তির নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা কি সন্দেহযুক্ত হতে পারে? অথবা তাঁর সম্পর্কে কি একথা বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, তাঁর অন্তরে কুরাইশ কাফেরদের প্রতি সামান্যতম আকর্ষণ ও সহানুভূতি থাকতে পারে? তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় তাঁর কাজের কারণ তুলে ধরেছেন এই বলে যে, মক্কায় তাঁর ছেলেমেয়ের জন্য বংশ ও গোত্রের এমন কোন নিরাপত্তা ব্যূহ নেই যা অন্য মুহাজিরদের আছে। তাই যুদ্ধের সময় তাদেরকে শত্রুর নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি এ কাজ করেছেন। মক্কায় যে তাঁর কোন আপন গোত্র নেই, বাস্তব অবস্থাও তার প্রমাণ এবং একথাও সবার জানা যে, তাঁর সন্তান-সন্ততি সেখানেই অবস্থান করছে। তাই তাঁর এ বক্তব্য মিথ্যা মনে করার কোন কারণ নেই। তাছাড়া তাঁর সম্পর্কে এ অভিমত পোষণ করা এবং তাঁর এ বক্তব্য যে তাঁর কাজটির মূল কারণ নয়, বরং তাঁর মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার উদ্দেশ্য কাজ করছিল, সেরূপ মনে করার কোন সংগত যুক্তি নেই। তথাপি নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে শত্রুদেরকে মুসলমানদের সামরিক পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করা সদুদ্দেশ্যে হলেও একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানের জন্য এরূপ কাজ ও আচরণ জায়েয নয়। কিন্তু সৎ ও নিষ্ঠাবান লোকের ত্রুটি এবং মুনাফিকের বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। শুধু কাজের ধরন ও প্রকৃতি দেখে উভয়ের একই শাস্তি হতে পারে না। আলোচ্য মোকদ্দমায় এটি ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিদ্ধান্ত। সূরা মুমতাহিনার এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন। গভীর মনোনিবেশ সহকারে ওপরের তিনটি আয়াত পড়লে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এসব আয়াতে হযরত হাতেবকে তিরস্কার করা হয়েছে ঠিকই; তবে একজন মু'মিনকে তিরস্কারের ধরন যা হয়ে থাকে এটা ঠিক সেই ধরনের তিরস্কার। কোন মুনাফিকের জন্য যে ধরনের তিরস্কার হয়ে থাকে এটা ঠিক তা নয়। তাছাড়া তাঁকে কোন আর্থিক বা শারীরিক শাস্তি দেয়া হয়নি। বরং প্রকাশ্যে কঠোর তিরস্কার, সমালোচনা ও শাসনবাণী শুনিয়েই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তার অর্থ, মুসলিম সমাজে একজন অপরাধী ঈমানদারের মর্যাদাহানি হওয়া এবং তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়াও তার জন্য একটি বড় শাস্তি।

চার ঃ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের মর্যাদা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি ঃ তুমি তো জান না, আল্লাহ তা'আলা হয়তো বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের দেখে বলে দিয়েছেন ঃ তোমরা যাই কর না কেন, আমি তোমাদের মাফ করে দিয়েছি"— এর অর্থ এ নয় যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সাত খুন মাফ করে দেয়া হয়েছে এবং পৃথিবীতে যে গোনাহ ও অপরাধই তারা করতে চাইবে তা করার অবাধ স্বাধীনতা তাদের দেয়া হয়েছে। এসব অপরাধ ক্ষমা করার অগ্রিম নিশ্চয়তা

তারা লাভ করেছেন তা বুঝাতে নবী (সা) একথাটি বলেননি, কোন সাহাবীও কোন সময় একথার এ অর্থ গ্রহণ করেননি, এ সুসংবাদ শুনে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোন সাহাবীও যে কোন গোনাহর কাজ করার ব্যাপারে নিজেকে স্বাধীন মনে করেননি এবং ইসলামী শরীয়াতও এর ভিত্তিতে এমন কোন ফর্মুলা তৈরী করেনি যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোন সাহাবীর দ্বারা যদি কোন অপরাধ সংঘটিত হয় তাহলে তাকে কোন শাস্তি দেয়া যাবে না। প্রকৃতপক্ষে যে ক্ষেত্র ও পরিবেশে কথাটা বলা হয়েছিল সেই ক্ষেত্র ও পরিবেশ এবং নবী (সা) যে কথাটি বলেছিলেন সেই কথাটি সম্পর্কে যদি চিন্তা-ভাবনা ও পর্যালোচনা করা যায় তাহলে এর যে স্পষ্ট অর্থ বুঝা যায় তাহলো, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ আল্লাহ ও তাঁর দীনের জন্য নিষ্ঠা, কুরবানী এবং বীরত্ব ও সাহসিকতার এত বড় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন যার ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা যদি তাদের আগের ও পরের সব গোনাহ মাফ করে দিয়ে থাকেন তাহলে তাঁদের এই খেদমত এবং আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুকম্পার প্রতি লক্ষ করলে তা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। অতএব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এক সাহাবী সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতা ও মুনাফেকীর সন্দেহ করো না। অপরাধের যে কারণ সে নিজে বর্ণনা করছে তা গ্রহণ করো।

পাঁচ ঃ কুরআন মজীদ এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী থেকে একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কাফেরদের জন্য কোন মুসলমানের গোয়েন্দাগিরি করাটাই তার মুরতাদ, বেঈমান অথবা মুনাফিক হয়ে যাওয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যথেষ্ট নয়। এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যদি অন্য কোন সাক্ষ-প্রমাণ থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। তা নাহলে এটি নিছক একটি অপরাধমূলক কাজ, কুফরীমূলক কাজ নয়।

ছয় ঃ কুরআন মজীদের এই আয়াত থেকে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কাফেরদের পক্ষ হয়ে মুসলমানদের গোয়েন্দাগিরি করা কোন অবস্থায়ই জায়েয নয়। এতে কারো নিজের কিংবা তার অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের প্রাণ ও সম্পত্তি যত কঠিন বিপদের মুখোমুখিই হোক না কেন।

সাত ঃ হযরত উমর (রা) যখন হযরত হাতেবকে গোয়েন্দাগিরির অপরাধে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন তখন তার জবাবে নবী (সা) একথা বলেননি যে, এ ধরনের অপরাধ হত্যাযোগ্য অপরাধ নয়। বরং তিনি হত্যা করার অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালেন এ জন্য যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা হাতেবের নিষ্ঠা ও সংনিয়তের স্পষ্ট প্রমাণ। তার এ বক্তব্যও সত্য যে, তিনি শত্রুদের কল্যাণ কামনায় নয়, বরং নিজের সন্তান-সন্ততিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এ কাজ করেছিলেন। এ ঘটনা থেকে একদল ফকীহ প্রমাণ পেশ করেছেন যে, মুসলিম গুপ্তচরদের হত্যা করাই হলো সাধারণ আইন। তবে যদি অত্যন্ত যুক্তিসংগত কারণ বর্তমান থাকে তাহলে তাকে ন্যূনতম শাস্তি দিয়ে কিংবা শুধু তিরস্কার করে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। ইমাম শাফেয়ী (র) এবং অপর কিছুসংখক ফিকাহবিদদের মত হলো, মুসলিম গুপ্তচরদের তাযীর করতে হবে। কিন্তু তাকে হত্যা করা জায়েয নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আওযায়ী বলেন ঃ তাকে দৈহিক শাস্তি দিতে হবে এবং দীর্ঘদিন বন্দী করে রাখার শাস্তি দিতে হবে। ইমাম মালেক বলেনঃ তাকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মালেকী ফকীহদের বক্তব্য ভিন্নরূপ। আশহাব

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرٰهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُوا
لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ كَفَرْنَا بِكُمْ
وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
وَحْدَهُ ۚ إِلَّا قَوْلَ إِبْرٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ
مِن شَيْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٤﴾

তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সাথীদের মধ্যে একটি উত্তম আদর্শ বর্তমান। তিনি তাঁর কওমকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিলেন ঃ আমরা তোমাদের প্রতি এবং আল্লাহকে ছেড়ে যেসব উপাস্যের উপাসনা তোমরা করে থাক তাদের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অসন্তুষ্ট। আমরা তোমাদের অস্বীকার করেছি।[৬] আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরদিনের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে— যতদিন তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনবে। তবে ইবরাহীমের তার বাপকে একথা বলা (এর অন্তরভুক্ত নয়) "আমি আপনার জন্য অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করবো। তবে আল্লাহর নিকট থেকে আপনার জন্য নিশ্চিত কোন কিছু অর্জন করে নেয়া আমার আয়ত্বাধীন নয়।"[৭] (ইবরাহীম ও ইবরাহীমের দোয়া ছিল ঃ) হে আমাদের রব, তোমার ওপরেই আমরা ভরসা করেছি, তোমার প্রতিই আমরা রুজু করেছি আর তোমার কাছেই আমাদের ফিরে আসতে হবে।

বলেন ঃ এ ব্যাপারে ইমাম ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। অপরাধ এবং অপরাধীর অবস্থা বিবেচনা করে তিনি তাঁর ইজতিহাদের ভিত্তিতে কোন শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেন। ইমাম মালেক (র) এবং ইবনুল কাসেমের একটি মতও তাই। ইবনুল মাজেশুন এবং আবদুল মালেক ইবনে হাবীব বলেন, গুপ্তচরবৃত্তি যদি অপরাধীর স্বভাবে পরিণত হয়ে থাকে তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে। ইবনে ওয়াহাব বলেন ঃ গুপ্তচরবৃত্তির শাস্তি মূলত মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু সে যদি এ কাজ থেকে তাওবা করে তাহলে তাকে মাফ করা যেতে পারে। সাহনূন বলেন ঃ তাওবার ক্ষেত্রে তার তাওবা সত্যিকার তাওবা না ধোঁকাবাজি তা কিভাবে নিরূপণ করা যাবে? তাই তাকে হত্যা করাই উচিত। ইবনুল কাসেমের একটি মত এ বক্তব্যকে সমর্থন করে। আসবাগ বলেন ঃ হারবী বা যুদ্ধরত জাতির গুপ্তচরের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু মুসলিম ও যিম্মী গুপ্তচরকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে শাস্তি দিতে হবে। তবে সে যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুদের খোলাখুলি সাহায্য করে তাহলে ভিন্ন কথা। (আহকামুল কুরআন—ইবনুল আরাবী, উমদাতুল কারী, ফাতহুল বারী)।

আট ঃ উল্লেখিত হাদীস থেকে এ বিষয়ের বৈধতা লাভ করা যায় যে, অপরাধের তদন্ত বা অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজন হলে শুধু অভিযুক্ত পুরুষকেই নয়, স্ত্রীলোককেও উলঙ্গ করা যেতে পারে। হযরত আলী (রা), হযরত যুবায়ের (রা) এবং হযরত মিকদাদ (রা) যদিও মহিলাটিকে উলঙ্গ করেননি, কিন্তু পত্র না দিলে তাঁরা তাকে তার কাপড় খুলে তল্লাশী চালাবেন বলে ভয় দেখিয়েছিলেন। এ কাজটি যদি বৈধ না হতো তাহলে এ তিনজন সম্মানিত সাহাবী এ কাজ করার ভয় দেখাতে পারতেন না। এ ক্ষেত্রে যুক্তির দাবী হলো, তারা ফিরে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁদের অভিযানের কাহিনী অবশ্যই শুনিয়ে থাকবেন। নবী (সা) তাদের এ কাজ অপছন্দ করে থাকলে বা এ কাজের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকলে তা অবশ্যই বর্ণনা সূত্রে আমরা লাভ করতাম। এ কারণে ফকীহগণ এ ধরনের কাজ বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। (উমদাতুল কারী)

৬. অর্থাৎ আমরা তোমাদের অস্বীকারকারী। আমরা তোমাদেরকে সত্যপথের অনুসারী বলে মানি না এবং তোমাদের দীনকেও সত্য দীন বলে স্বীকার করি না। আল্লাহর প্রতি ঈমানের অপরিহার্য দাবী হলো তাগুতের সাথে কুফরী করা।

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا –

"যে ব্যক্তি তাগুতের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে সে এমন একটি মজবুত অবলম্বন আঁকড়ে ধরে যা ছিন্ন হবার নয়।" (আল বাকারাহ ২৫৬)

৭. অন্য কথায় এর অর্থ হলো, হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর কাফের ও মুশরিক কওমের প্রতি যে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন এবং পরিষ্কার ভাষায় তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার যে ঘোষণা করেছিলেন তা তোমাদের জন্য অনুসরণীয়। কিন্তু তিনি তাঁর মুশরিক পিতার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার যে ওয়াদা করেছিলেন এবং কার্যত তা করেছিলেন, তার মধ্যে তোমাদের জন্য অনুসরণীয় কিছু নেই। কারণ কাফেরদের সাথে ভালবাসা ও সহানুভূতির সামান্যতম সম্পর্ক রাখাও ঈমানদারদের জন্য ঠিক নয়। সূরা তাওবায় (১১৩ আয়াত) আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى –

"যত নিকট আত্মীয়ই হোক না কেন মুশরিকদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা কোন নবীর কাজ নয় এবং ঈমানদারদের জন্যও তা শোভনীয় নয়"।

তাই হযরত ইবরাহীম এ কাজ করেছিলেন এই যুক্তি দেখিয়ে কোন মুসলমানই তার কাফের নিকটাত্মীয়দের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারে না। এখন কথা হলো, হযরত ইবরাহীম (আ) নিজে কিভাবে এ কাজ করলেন? আর তিনি কি তাঁর এ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন? এ প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব আমরা কুরআন মজীদ থেকেই পেয়ে যাই। তাঁর বাপ যে সময় তাঁকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেন তখন বিদায় বেলায় তিনি বলেছিলেনঃ

سَلٰمٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ -

"আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আমার রবের কাছে আপনার ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করবো।" (মারয়াম, ৪৭)

এই প্রতিশ্রুতির কারণে তিনি দুইবার তাঁর পিতার জন্য দোয়া করেছেন। এর একটি দোয়ার উল্লেখ আছে সূরা ইবরাহীমে (আয়াত, ৪১) ঃ

رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ -

"হে আমাদের প্রতিপালক যেদিন হিসেব নেয়া হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা মাতাকে এবং সমস্ত ঈমানদারকে মাফ করে দিও।"

দ্বিতীয়বার দোয়ার উল্লেখ আছে সূরা শু'আরাতে (আয়াত, ৮৬-৮৭)ঃ

وَاغْفِرْ لِاَبِىْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ - وَلَا تُخْزِنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ -

"আমার পিতাকে ক্ষমা করে দিন। সে তো পথভ্রষ্টদের অন্তরভুক্ত। আর যেদিন মানুষকে জীবিত করে উঠানো হবে সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত করো না।"

কিন্তু পরে যখন তিনি বুঝতে পারলেন, যে পিতার ক্ষমা চেয়ে তিনি দোয়া করছেন সে আল্লাহর দুষমন তখন তিনি তার প্রতি বিমুখ হয়ে গেলেন এবং তার সাথে ভালবাসা ও সহানুভূতির সম্পর্কও ছিন্ন করলেন।

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ - (التوبه : ١١٤)

"আর ইবরাহীমের তার পিতার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করার কারণ তার পিতাকে দেয়া একটি প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অতপর তাঁর কাছে যখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম অত্যন্ত কোমল হৃদয় ও নম্র স্বভাবের ছিলেন।"

এসব আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে এ মৌলিক সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নবীদের সেসব কাজই কেবল অনুসরণযোগ্য যার ওপরে তাঁরা শেষ পর্যন্ত বহাল ছিলেন। এরপর থাকে তাদের সেসব আমল যা তাঁরা পরবর্তী সময়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন অথবা যেগুলোর ওপর আল্লাহ তা'আলা তাঁদের বহাল থাকতে দেননি অথবা আল্লাহর শরীয়াতে যেসব আমলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে, তা অনুসরণযোগ্য নয়। অমুক নবী এ কাজ করেছেন এ যুক্তি দেখিয়ে কেউ নবীদের এ ধরনের কাজকর্মের অনুসরণ করতে পারে না।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যা মানুষের মনে খটকা সৃষ্টি করতে পারে। আলোচ্য আয়াতে হযরত ইবরাহীমের (আ) যে কথাটিকে আল্লাহ তা'আলা অনুসরণযোগ্য হওয়া থেকে বাদ দিয়েছেন তার দু'টি অংশ আছে। একটি অংশ হলো, তিনি তাঁর বাপকে বলেছিলেন ঃ আমি আপনার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করবো। দ্বিতীয় অংশটি হলো,

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿٥﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦﴾

হে আমাদের রব, আমাদেরকে কাফেরদের জন্য ফিতনা বানিয়ে দিও না।[৮] হে আমাদের রব, আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও। নিসন্দেহে তুমিই পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানী।

এসব লোকের কর্মপদ্ধতিতে তোমাদের জন্য এবং আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রত্যাশী লোকদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।[৯] এ থেকে যদি কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও প্রশংসিত।[১০]

আল্লাহর নিকট থেকে আপনাকে ক্ষমা নিয়েই দেব এ সাধ্য আমার নেই। এ দু'টি কথার মধ্যে প্রথম কথাটি অনুসরণযোগ্য না হওয়া বোধগম্য। কিন্তু দ্বিতীয় কথাটির মধ্যে কি এমন মন্দ দিক আছে যে, সেটিকে অনুসরণযোগ্য হওয়া থেকে বাদ দেয়া হয়েছে? অথচ তা নিতান্তই একটি সত্য কথা। এর জবাব হলো, হযরত ইবরাহীমের (আ) একথাটি বাদ পড়েছে এ জন্য যে, কেউ যখন কোন কাজ করে দেয়ার জন্য কারো সাথে ওয়াদা করার পর বলে যে, তোমার জন্য এর অধিক আর কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই। তখন আপনা থেকেই তার অর্থ দাঁড়ায়, যদি এর চেয়েও বেশী কিছু করার সাধ্য তার থাকতো তাহলে সে তার জন্য তাও করতো। একথাটি ঐ ব্যক্তির সাথে তার আরো গভীর সহানুভূতিমূলক সম্পর্কই প্রকাশ করে। এ কারণে হযরত ইবরাহীমের কথার দ্বিতীয় অংশটিও বাদ যাওয়ার উপযুক্ত। যদিও তার এ বিষয়বস্তু অতিব সত্য ও বাস্তব যে, আল্লাহর নিকট থেকে ক্ষমা বা মাগফিরাত নিয়ে দেয়া কোন নবীর ইখতিয়ার বহির্ভূত ব্যাপার। আল্লামা আলূসীও তাঁর তাফসীর গ্রন্থ রুহুল মায়া'নীতে এ প্রশ্নের এ জবাব দিয়েছেন।

৮. কাফেরদের জন্য ঈমানদারদের ফিতনা হওয়ার কয়েকটি অবস্থা হতে পারে। ঈমানদার বান্দার উচিত এর সবগুলো থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। উদাহরণস্বরূপ, এর একটি অবস্থা হতে পারে কাফেররা মু'মিনদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়া। আর এই বিজয়কে তারা তাদের সত্যপন্থী হওয়ার এবং ঈমানদারদের বাতিলপন্থী হওয়ার প্রমাণ বলে ধরে নিতে পারে। তারা মনে করতে পারে, এ লোকগুলো যদি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভ করে থাকে তাহলে কিভাবে আমরা তাদের বিরুদ্ধে বিজয়লাভ করতে সক্ষম হলাম। দ্বিতীয় অবস্থা হতে পারে এই যে, ঈমানদারদের ওপর কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন সহ্যসীমা অতিক্রম করে যাওয়ার কারণে তারা পরিশেষে নতি স্বীকার করে বসবে এবং আদর্শ ও নৈতিকতার বিকিকিনি করে আপোষ করতে সম্মত হয়ে যাবে। এটা সারা দুনিয়ার সামনে ঈমানদারদের হাস্যাস্পদ হওয়ার কারণ হবে আর এভাবে কাফেররা দীন ও দীনের অনুসারীদের হেয় ও অপমানিত করার সুযোগ পেয়ে যাবে। তৃতীয় আরেকটি

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ؕ
وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٧ لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ
يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ
وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝٨

২ রুকূ'

অসম্ভব নয় যে, আজ তোমরা যাদের শত্রু বানিয়ে নিয়েছো আল্লাহ তা'আলা তাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন এক সময় বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন।[১১] *আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমতাবান। আর তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।*

যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং বাড়ীঘর থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দেয়নি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদের পছন্দ করেন।[১২]

অবস্থা হতে পারে, দীনে হকের প্রতিনিধিত্বের উচ্চাসনে সমাসীন হওয়া সত্ত্বেও ঈমানদারগণ এই পদমর্যাদার উপযুক্ত নৈতিক গুণাবলী থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে এবং তাদের জীবন, চরিত্র ও কর্মেও এমনসব দোষ-ত্রুটি থেকে যাবে যা জাহেলী সমাজে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান থাকে। এভাবে কাফেররা বলার সুযোগ পাবে যে, এ আদর্শের মধ্যে এমন কি সৌন্দর্যবৈশিষ্ট ও কল্যাণকর বিষয় আছে যা তাকে আমাদের কুফরী আদর্শের তুলনায় অধিক মর্যাদা দান করে? (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস, টীকা, ৮৩)।

৯. অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, একদিন তাকে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে এবং এ আশাও করে যে, আল্লাহ যেন তাকে তাঁর অনুগ্রহ ও নিয়ামত দানে ধন্য করেন আর আখেরাতের দিন সে সফলতা লাভ করতে সক্ষম হয়।

১০. অর্থাৎ এমন ঈমানদারদের দিয়ে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই যারা তাঁর দীনকে মানার দাবীও করবে আবার তাঁর দুশমনের সাথে বন্ধুত্বও করবে। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। এসব লোক তাঁকে আল্লাহ হিসেবে মানুক আল্লাহর উলুহিয়াত এর মুখাপেক্ষী নয়। তিনি তাঁর সত্তায় নিজেই প্রশংসিত। তাঁর প্রশংসিত হওয়া এদের প্রশংসা করার ওপর নির্ভর করে না। এরা যদি ঈমান গ্রহণ করে তাতে আল্লাহর কোন উপকার হবে না। বরং তাতে তাদের নিজেদেরই উপকার হবে। আর যে পর্যন্ত না তারা হযরত ইবরাহীম ও তাঁর সাথীদের মত আল্লাহর দুশমনদের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন না করবে সে পর্যন্ত তারা নিজেদের ঈমান দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না।

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝٩

আল্লাহ তোমাদেরকে শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করছেন যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেছে, বাড়ীঘর থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারাই জালেম।[১৩]

১১. পূর্বোল্লেখিত আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল প্রকৃত ঈমানদারগণ অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে যদিও তা মেনে চলছিলেন, কিন্তু নিজের মা, বাপ, ভাই, বোন এবং নিকটাত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা কত কঠিন কাজ এবং এ কাজ ঈমানদারদের মন মানসিকতার জন্য কতটা দুর্বিসহ তা আল্লাহ ভাল করেই জানতেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই বলে সান্তনা দিয়েছেন যে, সেই সময় বেশী দূরে নয়, যখন তোমাদের এসব আত্মীয়-স্বজন ইসলাম গ্রহণ করবে এবং বর্তমান সময়ের এই শত্রুতা ভবিষ্যতে আবার ভালবাসায় রূপান্তরিত হবে। যে সময় একথা বলা হয়েছিল সে সময় কারো পক্ষেই বুঝে ওঠা সম্ভব ছিল না তা কিভাবে হবে। কিন্তু এসব আয়াত নাযিলের মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই মক্কা বিজিত হলো, এ সময় কুরাইশরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকল এবং মুসলমানগণ দিব্যি দেখতে পেল, যে বিষয়ের আশাবাদ তাদের শুনান হয়েছিল তা কিভাবে বাস্তব রূপ লাভ করল।

১২. এখানে কারো মনে এরূপ সংশয় দেখা দিতে পারে যে, যেসব কাফের শত্রুতা করছে না তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার ব্যাপারটি তো যুক্তিসংগত। কিন্তু ইনসাফও কি শুধু তাদের জন্যই নির্দিষ্ট। কাফেরদের মধ্যে যারা শত্রু তাদের সাথে কি বেইনসাফী করতে হবে? এর জবাব হলো, পূর্বাপর এই প্রসংগের মধ্যে ইনসাফ কথাটি প্রকৃতপক্ষে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এখানে ইনসাফ কথাটির অর্থ হলো, যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে শত্রুতামূলক আচরণ করে না ইনসাফের দাবী হলো তোমরাও তার সাথে শত্রুতামূলক আচরণ করবে না। শত্রু এবং অশত্রুকে একই মর্যাদা দেয়া এবং উভয়ের সাথে একই আচরণ করা ইনসাফ নয়। ঈমান আনার কারণে যারা তোমাদের ওপরে জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে। স্বদেশ ও জন্মভূমি ছাড়তে বাধ্য করেছে এবং বের করে দেয়ার পরও তোমাদের পেছনে লেগে থাকতে ছাড়েনি তাদের সাথে কঠোর আচরণ করার অধিকার তোমাদের আছে। কিন্তু যারা এসব জুলুম-অত্যাচারে কোনভাবে শরীক হয়নি তোমরা তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে এবং আত্মীয়তা ও ভ্রাতৃ সম্পর্কের কারণে তোমাদের ওপরে তাদের যেসব অধিকার বর্তায় তা পূরণ করতে কার্পণ্য করবে না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ۭ اَللّٰهُ
اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ۭ
لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ۭ وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ۭ وَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۭ وَلَا
تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْـَٔـلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔـلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ۭ
ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ۭ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝١٠

হে ঈমানদাররা, ঈমানদার নারীরা যখন হিজরাত করে তোমাদের কাছে আসবে তখন (তাদের ঈমানদার হওয়ার বিষয়টি) পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নাও। তাদের ঈমানের প্রকৃত অবস্থা অবশ্য আল্লাহই ভাল জানেন। অতপর যদি তোমরা বুঝতে পার যে, তারা সত্যিই ঈমানদার তাহলে তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিও না।[১৪] না তারা কাফেরদের জন্য হালাল না কাফেররা তাদের জন্য হালাল। তাদের কাফের স্বামীরা তাদেরকে যে মোহরানা দিয়েছে তা তাদের ফিরিয়ে দাও। তাদেরকে মোহরানা দিয়ে বিয়ে করায় তোমাদের কোন গোনাহ হবে না।[১৫] আর তোমরা নিজেরাও কাফের নারীদেরকে নিজেদের বিয়ের বন্ধনে আটকে রেখো না। নিজেদের কাফের স্ত্রীদের তোমরা যে মোহরানা দিয়েছ তা ফেরত চেয়ে নাও। আর কাফেররা তাদের মুসলমান স্ত্রীদের যে মোহরানা দিয়েছে তাও যেন তারা ফেরত চেয়ে নেয়।[১৬] এটি আল্লাহর নির্দেশ। তিনি তোমাদের সবকিছুর ফায়সালা করেন। আল্লাহ জ্ঞানী ও বিজ্ঞ।

১৩. পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো সে বিষয়ে লোকের মধ্যে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারত যে, তাদের কাফের হওয়ার কারণেই বুঝি এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই এ আয়াতগুলোতে বুঝানো হয়েছে যে, তাদের কুফরী এর মূল কারণ নয়। বরং ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের সাথে তাদের শত্রুতা ও নির্যাতনমূলক আচরণই এর মূল কারণ। অতএব, মুসলমানদের উচিত শত্রু কাফের এবং অশত্রু কাফেরদের মধ্যে পার্থক্য করা, আর যেসব কাফের কখনো তাদের কোন ক্ষতি করেনি তাদের সাথে ইহসান ও অনুগ্রহের আচরণ করা উচিত। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর এবং তাঁর মায়ের ঘটনাটি এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। হযরত আবু বকরের (রা) এক স্ত্রী কুতাইলা বিনতে আবদুল উয্যা কাফের ছিলেন এবং হিজরাতের পর মক্কায়

থেকে গিয়েছিলেন। তাঁর গর্ভেই হযরত আসমা জন্ম লাভ করেছিলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মদীনা এবং মক্কার মধ্যে যাতায়াত শুরু হলে তিনি মেয়েকে দেখার জন্য কিছু উপহার সামগ্রী নিয়ে মদীনায় হাজির হলেন। হযরত আসমার (রা) নিজের বর্ণনা হলো ঃ আমি গিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমি কি আমার মায়ের সংগে দেখা করব? আর আমি কি তার সাথে আপনজনের মত সদাচরণও করব? জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি তার সাথে আপনজনদের মত সদাচরণ কর। (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম) হযরত আসমার ছেলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এ ঘটনাটি আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে বলছেন, প্রথমে হযরত আসমা মায়ের সাথে সাক্ষাত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। পরে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের (সা) অনুমতি পাওয়ার পর তিনি তার সাথে দেখা করেছিলেন। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম) এ থেকে স্বতঃই যে সিদ্ধান্তলাভ করা যায় তা হলো ইসলামের দুশমন না হলে কাফের পিতা মাতার খেদমত করা এবং কাফের ভাইবোন ও আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করা একজন মুসলমানের জন্য সম্পূর্ণরূপে জায়েয। একইভাবে গরীব ও অসহায় জিম্মিদের জন্য সাদকার অর্থও খরচ করা যেতে পারে। (আহকামুল কুরআন—জাসসাস, রূহুল মায়ানী)

১৪. এই নির্দেশের পটভূমি হলো, হুদাইবিয়ার সন্ধির পর প্রথম প্রথম মুসলমানরা মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় এসে হাজির হতে থাকল এবং সন্ধির শর্ত মোতাবেক তাদেরকে যথারীতি ফেরত পাঠান হতে থাকল। এরপর মুসলিম নারীদের আগমন শুরু হলো এবং সর্বপ্রথম উম্মে কুলসূম বিনতে উকবা ইবনে আবু মু'আইত হিজরত করে মদীনায় এসে পৌঁছলেন। কাফেররা চুক্তির কথা বলে তাকেও ফিরিয়ে দেয়ার দাবী জানাল। উম্মে কুলসূমের দুই ভাই ওয়ালীদ ইবনে উকবা এবং উমারা ইবনে উকবা তাকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য মদীনায় হাজির হলো। তখন এ মর্মে প্রশ্ন দেখা দিল যে, হুদাইবিয়ার সন্ধি নারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে কি না? এখানে আল্লাহ তা'আলা এ প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে বলেছেন ঃ যদি সে মুসলমান হয় এবং নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে সে ঈমানের জন্যই হিজরাত করে এখানে এসেছে অন্য কিছু তাকে এখানে আনেনি, তাহলে তাকে ফেরত পাঠান যাবে না।

এ ক্ষেত্রে হাদীসের শুধু ভাবার্থ বর্ণনা করার কারণে বড় রকমের একটা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে যার সমাধান হওয়া আবশ্যক। হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তাবলী সম্পর্কে হাদীসসমূহে আমরা যেসব বর্ণনা দেখতে পাই তার অধিকাংশই ভাবার্থের বর্ণনা। আলোচ্য শর্ত সম্পর্কিত কোন বর্ণনার ভাষা হলো ঃ

مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَ كُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا -

"তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যদি আমাদের কাছে চলে আসে তাকে আমরা ফেরত পাঠাব না। কিন্তু আমাদের মধ্য থেকে কেউ তোমাদের কাছে চলে গেলে তাকে তোমরা ফিরিয়ে দেবে।"

কোন বর্ণনার ভাষা হলো ঃ

مَنْ أَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ أَصْحَابِهِ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهِ رَدَّهُ عَلَيْهِ –

"রসূলুল্লাহর (সা) কাছে তাঁর সাহাবীদের কেউ যদি তার অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে আসে তাহলে তিনি তাকে ফেরত পাঠাবেন।"

আবার কোন বর্ণনাতে আছে ঃ

مَنْ أَتَى مُحَمَّدًا مِنْ قُرَيْشٍ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهِ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ –

"কুরাইশদের কোন ব্যক্তি যদি তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চলে যায় তাহলে তিনি তাকে কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠাবেন।"

এ সব রেওয়ায়াতের বর্ণনার ধরন থেকে আপনা আপনি এ কথা প্রকাশ পায় যে, মূলত চুক্তিতে সন্ধির শর্ত যে ভাষায় লেখা হয়েছিল এসব বর্ণনায় তা হুবহু উদ্ধৃত হয়নি। বরং বর্ণনাকারীগণ তার বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। আর বহু সংখ্যক রেওয়ায়াত যেহেতু এই প্রকৃতির তাই মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিসগণ বুঝে নিয়েছেন যে, চুক্তির মধ্যে সাধারণভাবে নারী ও পুরুষ উভয়ই অন্তরভুক্ত এবং চুক্তি অনুসারে নারীদের ফেরত পাঠানো কর্তব্য ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই যখন তারা আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশ দেখতে পেলেন যে, ঈমানদার নারীদের ফেরত পাঠান যেন না হয়, তখন তাঁরা এর ব্যাখ্যা করলেন যে, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার নারীদের ক্ষেত্রে অন্তত চুক্তি ভঙ্গের ফায়সালা ও নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এটা সহজভাবে গ্রহণ করার মত কোন মামুলী বক্তব্য নয়। সন্ধি যদি প্রকৃতপক্ষে পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে সবার জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য হয়ে থাকে তাহলে একপক্ষ এক তরফাভাবে তাতে সংশোধনী যোগ করবে কিংবা নিজেদের পক্ষ থেকে তার কোন অংশ পরিবর্তন করে ফেলবে তা কি করে বৈধ হতে পারে? আর এরূপ করা হয়েছিল বলে যদি ধরেও নেয়া হয় তাহলে বড় বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এই যে, কুরাইশরা এর কোন প্রতিবাদই করল না। কুরাইশরা তো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানদের প্রতিটি কথার সমালোচনা করার জন্য সর্বদা এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি সন্ধির শর্তাবলী স্পষ্ট লংঘন করেছেন এমন প্রমাণ পেশ করার সুযোগ পেলে তো তারা চিৎকার করে আসমান মাথায় তুলে নিত। কিন্তু কোন বর্ণনা থেকেই আমরা এ বিষয়ে আভাস পর্যন্ত পাই না যে, কুরআনের এই ফায়সালার বিরুদ্ধে তারা সামান্যতম আপত্তি বা প্রতিবাদ করেছে। এটি ছিল এমন একটি প্রশ্ন, যে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তা করা হলেও চুক্তির মূল ভাষা অনুসন্ধান করে এই জটিলতার সমাধান পেশ করার চেষ্টা করা হতো। কিন্তু অনেকে এদিকে লক্ষই করেননি। কেউ কেউ (যেমন কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী) লক্ষ করলেও তাঁরা কুরাইশদের আপত্তি ও প্রতিবাদ না করার কারণ হিসেবে এরূপ ব্যাখা পর্যন্ত করতে দ্বিধা করেননি যে, আল্লাহ তা'আলা মু'জিযার মাধ্যমে এ ব্যাপারে কুরাইশদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ ধরনের ব্যাখ্যা পেশ করে তাঁরা কিভাবে সন্তুষ্ট হতে পারলেন তা ভেবে বিস্মিত হতে হয়।

আসল কথা হলো, সন্ধি চুক্তির এই শর্তটি মুসলমানদের পক্ষ থেকে নয়, কুরাইশদের পক্ষ থেকে পেশ করা হয়েছিল। তাদের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিনিধি সুহাইল ইবনে আমর চুক্তিপত্রে যে ভাষা লিপিবদ্ধ করেছিল তা ছিল ঃ

عَلٰى اَنْ لَا يَاْتِيْكَ مِنَّا رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ عَلٰى دِيْنِكَ اِلَّا رَدَدْتَهٗ اِلَيْنَا -

"আমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে কোন পুরুষও যদি আসে আর সে যদি তোমাদের ধর্মের অনুসারীও হয় তাহলেও তোমরা তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবে।"

চুক্তির এই ভাষা বুখারী "কিতাবুশ্ শুরুতে বাবুশ শুরুত ফিল জিহাদ ওয়াল মুসালাহা" অনুচ্ছেদে মজবুত সনদে উদ্ধৃত হয়েছে। সুহাইল হয়তো 'রাজুল' (رجل) শব্দটি ব্যক্তি অর্থে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু এটি তার চিন্তা ও মন-মস্তিষ্ক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। চুক্তিপত্রে রাজুল শব্দটিই লেখা হয়েছিল আরবী ভাষায় যা পুরুষদের বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই উম্মে কুলসুম বিনতে উকবার প্রত্যর্পণের দাবী নিয়ে তার ভাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলে (ইমাম যুহরীর বর্ণনা অনুসারে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ফেরত পাঠাতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বললেন ঃ كان الشرط فى الرجال دون النساء এ শর্ত শুধু পুরুষদের ব্যাপারে ছিল, মেয়েদের ব্যাপারে ছিল না। (আহকামুল কুরআন—ইবনে আরাবী, তাফসীরে কাবীর—ইমাম রাযী)। তখন পর্যন্ত খোদ কুরাইশরাও এই ভুল ধারণার মধ্যে ছিল যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব ধরনের মুহাজিরদের বেলায় এ চুক্তি প্রযোজ্য। কিন্তু নবী (সা) যখন চুক্তির এই ভাষার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তখন তারা হতবাক ও লা-জওয়াব হয়ে গেল এবং বাধ্য হয়েই তাদেরকে এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হলো।

যে কোন স্ত্রীলোক মক্কা ছেড়ে মদীনায় আসুক না কেন এবং যে উদ্দেশ্যেই আসুক না কেন চুক্তির এই শর্ত অনুসারে তাকে প্রত্যর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানানোর অধিকার মুসলমানদের ছিল। কিন্তু ইসলাম আগ্রহী ছিল কেবলমাত্র ঈমানদার নারীদের নিরাপত্তা দান করতে। পালিয়ে আসা সব রকম স্ত্রীলোকের জন্য মদীনাকে আশ্রয় কেন্দ্র বানান ইসলামের উদ্দেশ্য ছিল না। তাই আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন, যেসব স্ত্রীলোক হিজরাত করে আসবে এবং তাদের ঈমানদার হওয়ার কথা প্রকাশ করবে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এ বিষয়ে নিশ্চিত হও যে, প্রকৃতই তারা ঈমান গ্রহণ করে এখানে চলে এসেছে। এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর আর তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দিও না। আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশ কার্যকরী করার জন্য যে নিয়ম পদ্ধতি রচনা করা হয়েছিল তা হলো, যেসব স্ত্রীলোক হিজরাত করে মদীনায় চলে আসত তাদেরকে এ মর্মে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো যে, তারা সত্যিই আল্লাহর একত্ব এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে কি না এবং কেবল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যই হিজরাত করেছে কি না? ব্যাপারটা এমন নয়তো যে, সে স্বামীর প্রতি বিরূপ ও বিরক্ত হয়ে রাগে বা অভিমানে ঘর ছেড়ে চলে এসেছে? কিংবা আমাদের এখানকার কোন পুরুষের প্রতি তার ভালবাসা ও অনুরাগ তাকে নিয়ে এসেছে? কিংবা অন্য কোন পার্থিব স্বার্থ তার এ কাজের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে? যেসব স্ত্রীলোকেরা এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারত শুধু তাদেরকেই থাকতে দেয়া হতো এবং অবশিষ্ট সবাইকে ফিরিয়ে দেয়া হতো। (ইবনে জারীর—ইবনে আব্বাসের বর্ণনার বরাত দিয়ে কাতাদা, মুজাহিদ, ইকরিমা, ইবনে যায়েদ)।

এ আয়াতে সাক্ষদান আইনেরও একটা মূলনীতি ও সূত্র বর্ণনা করা হয়েছে আর তা কার্যকরী করার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কর্মপদ্ধতি ঠিক করে দিয়েছিলেন তা থেকে এর আরো স্পষ্ট ব্যাখ্যা হয়ে গিয়েছে। আয়াতটিতে তিনটি কথা বলা হয়েছে। এক, হিজরাতকারিণী যেসব স্ত্রীলোক নিজেদেরকে ঈমানদার হিসেবে পেশ করবে তাদের ঈমানের বিষয়টি খোঁজ খবর নিয়ে দেখ। দুই, তাদের ঈমানের প্রকৃত অবস্থা কেবল আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তারা প্রকৃতই ঈমান গ্রহণ করেছে কি না তা জানার কোন উপায় বা মাধ্যম তোমাদের কাছে নেই। তিন, যাঁচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে যখন তোমরা জানতে পারবে যে তারা ঈমানদার, তাহলে তাদেরকে ফেরত পাঠাবে না। তাছাড়াও এই নির্দেশ অনুসারে ঐ সব স্ত্রীলোকদের ঈমান পরীক্ষা করার জন্য নবী (সা) যে পদ্ধতি ঠিক করেছিলেন তা ছিল এই যে, সেসব মহিলাদের শপথভিত্তিক বক্তব্য বিশ্বাস করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, তাদের হিজরাত করার পেছনে উদ্বুদ্ধকারী শক্তি ঈমান ছাড়া অন্য কিছুই না। এ থেকে প্রথমত যে নীতিটি জানা গেল তাহলো মামলাসমূহের ফায়সালা করার জন্য প্রকৃত ঘটনা কি তা জানা থাকা আদালতের জন্য জরুরী নয়। বরং সাক্ষের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানই এ জন্য যথেষ্ট। দ্বিতীয়ত, যে কথাটি জানা গেল তা হলো, কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা তার শপথ ভিত্তিক বক্তব্যের ওপর বিশ্বাসস্থাপন করব। তৃতীয়ত, যে কথাটি জানা গেল, কোন ব্যক্তি তার আকীদা–বিশ্বাস ও ঈমান সম্পর্কে নিজে যে কথা বলছে আমরা তা গ্রহণ করব এবং সে যা বলছে তার আকীদা–বিশ্বাস সত্যিই তাই কি না তা খুঁজে বেড়াতে শুরু করব না। তবে তার বক্তব্যের বিপরীত কোন স্পষ্ট প্রমাণ যদি আমাদের সামনে প্রকাশ পায় তাহলে ভিন্ন কথা। আর চতুর্থ আরেকটি কথা হলো, কোন ব্যক্তির যেসব একান্ত ব্যক্তিগত কথা অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয় সেসব ব্যাপারে তার নিজের বক্তব্যের ওপর নির্ভর করা হবে। যেমন ঃ তালাক ও ইদ্দতের ব্যাপারে এবং মেয়েদের মাসিক ও পবিত্রতার ব্যাপারে তার নিজের বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে। এ ক্ষেত্রে সে সত্য মিথ্যা যাই বলুক না কেন তাতে কিছু এসে যায় না। এ নীতি অনুসারে "ইলমে হাদীস" বা হাদীসশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও সেসব বর্ণনা গ্রহণ করা হবে যার বর্ণনাকারীগণের বাহ্যিক অবস্থা তাদের সত্যবাদী হওয়ার প্রমাণ দেয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কোন বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার পথে কোন প্রমাণ বা ইংগিত বাধা হয়ে না দাঁড়ায় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বর্ণনাসমূহ গ্রহণ করা হবে।

১৫. এর অর্থ হলো, তাদের কাফের স্বামীদেরকে তাদের যে মোহরানা ফেরত দেয়া হবে সেটিই ঐ সব মেয়েদের মোহরানা হিসেবে গণ্য হবে না। বরং এখন যে কোন মুসলমানই তাদের কাউকে বিয়ে করতে চাইবে সে তাকে মোহরানা দিয়ে বিয়ে করবে।

১৬. এসব আয়াতে চারটি বড় বড় নির্দেশের উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের পারিবারিক এবং আন্তর্জাতিক এই উভয় আইনের সাথেই এ চারটি নির্দেশ সম্পর্কিত।

প্রথম নির্দেশটি হলো, যে স্ত্রীলোক মুসলমান হয়ে যায় সে তার কাফের স্বামীর জন্য হালাল থাকে না আর তার কাফের স্বামীও তার জন্য হালাল থাকে না।

দ্বিতীয় নির্দেশটি হলো, যে বিবাহিতা নারী মুসলমান হয়ে দারুল কুফর থেকে হিজরাত করে দারুল ইসলামে আসে তার বিবাহ বন্ধন আপনা থেকেই ছিন্ন হয়ে যায় এবং ইচ্ছা করলে যে কোন মুসলমানই মোহরানা দিয়ে তাকে বিয়ে করতে পারে।

তৃতীয় নির্দেশটি হলো, কোন পুরুষ লোক মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর তার স্ত্রী যদি কাফেরই থেকে যায় তাহলে ঐ স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধনে আটকে রাখা তার জন্য জায়েয নয়।

চতুর্থ নির্দেশটি হলো, দারুল কুফর ও দারুল ইসলামের মধ্যে যদি সন্ধি চুক্তি বর্তমান থাকে তাহলে কাফেরদের যেসব বিবাহিত স্ত্রী হিজরাত করে দারুল ইসলামে চলে এসেছে মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের মোহরানা ফিরিয়ে দেয়া এবং মুসলমানদের সাথে বিবাহিত যেসব কাফের স্ত্রী দারুল কুফরে রয়ে গিয়েছে তাদেরকে প্রদত্ত মোহরানা কাফেরদের পক্ষ থেকে ফিরে পাওয়ার জন্য ইসলামী সরকারকে দারুল কুফরের সরকারের সাথে বিষয়টির ফায়সালা করার চেষ্টা করতে হবে।

এসব নির্দেশের ঐতিহাসিক পটভূমি হলো, ইসলামের প্রাথমিক যুগে এমন অনেক পুরুষ ছিল যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু তাদের স্ত্রীরা ইসলাম গ্রহণ করেনি। আবার এমন অনেক স্ত্রীলোকও ছিল যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু তাদের স্বামীরা ইসলাম গ্রহণ করেনি। খোদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক মেয়ে হযরত যয়নবের (রা) স্বামী আবুল আস ছিলেন অমুসলিম এবং কয়েক বছর পর্যন্ত অমুসলিমই রয়ে গিয়েছিলেন। মুসলমান নারীদের জন্য তাদের কাফের স্বামী এবং মুসলমান স্বামীদের জন্য তাদের মুশরিক স্ত্রী হালাল নয় এমন কোন নির্দেশও ইসলামের প্রাথমিক যুগে হয়নি। তাই তাদের মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। হিজরাতের পরেও কয়েক বছর পর্যন্ত এ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। এ সময় বহু সংখ্যক নারী মুসলমান হওয়ার পর হিজরাত করে চলে এসেছিল। কিন্তু তাদের কাফের স্বামীরা দারুল কুফরেই থেকে গিয়েছিল। আবার বহু সংখ্যক মুসলমান পুরুষ হিজরাত করে চলে এসেছিল। কিন্তু তাদের কাফের স্ত্রীরা দারুল কুফরেই রয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও তাদের বিবাহ বন্ধন অবশিষ্ট ছিল। এতে বিশেষভাবে মহিলাদের জন্য বড় ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছিল। কারণ, পুরুষরা তো দ্বিতীয় বিয়েও করতে পারে। কিন্তু মহিলাদের জন্য তা সম্ভব ছিল না। পূর্ব স্বামীর সাথে তার বিয়ে বাতিল না হওয়া পর্যন্ত সে অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারত না। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর এসব আয়াত নাযিল হলে মুসলমান এবং কাফের ও মুশরিকদের মধ্যকার পূর্বের দাম্পত্য সম্পর্ক বাতিল করে দেয়া হয় এবং তাদের ভবিষ্যতের জন্য একটা অকাট্য ও সুস্পষ্ট আইন তৈরী করে দেয়া হয়। ফিকাহবিদগণ এ আইনটিকে চারটি বড় বড় অনুচ্ছেদে সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করে দিয়েছেন।

একটি অবস্থা হলো, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি দারুল ইসলামে অবস্থানকারী হয় এবং তাদের মধ্যে একজন মুসলমান হয়ে যায় আর অপরজন কাফেরই থেকে যায়।

দ্বিতীয় অবস্থা হলো, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি দারুল কুফরে অবস্থানকারী হয় এবং তাদের একজন মুসলমান হয়ে যায় কিন্তু অপরজন কাফেরই থেকে যায়।

তৃতীয় অবস্থা হলো, স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন যদি মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে হিজরাত করে আসে এবং অপরজন দারুল কুফরে কাফের হিসেবেই থেকে যায়।

চতুর্থ অবস্থা হলো, মুসলমান স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন একজন যদি মুরতাদ হয়ে যায়।

এই চারটি অবস্থা সম্পর্কে ফিকাহবিদগণের কার কি মত আমরা তা আলাদা আলাদাভাবে নীচে বর্ণনা করছি।

এক ঃ প্রথম ক্ষেত্রে স্বামী যদি ইসলাম গ্রহণ করে আর স্ত্রী খৃষ্টান কিংবা ইহুদী হয় এবং সে তার ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে উভয়ের বিবাহ বন্ধন বহাল থাকবে। কারণ মুসলমান পুরুষের জন্য আহলে কিতাব স্ত্রী গ্রহণ করা বা থাকা জায়েয। এ বিষয়ে সমস্ত ফিকাহবিদ একমত।

আর ইসলাম গ্রহণকারী পুরুষের স্ত্রী যদি আহলে কিতাব না হয় এবং সে তার ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে সে সম্পর্কে হানাফীদের বক্তব্য হলো ঃ স্ত্রীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হবে। সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে বিয়ে বহাল থাকবে। আর যদি সে ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটান হবে। এ ক্ষেত্রে স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে নির্জনবাস হয়ে থাকলে স্ত্রী মোহরানা লাভের অধিকারীনী হবে এবং নির্জনবাস না হয়ে থাকলে মোহরানা লাভের কোন অধিকার তার থাকবে না। কারণ তার অস্বীকৃতির কারণেই বিচ্ছেদ ঘটেছে। (আল মাবসূত, হিদায়া, ফাতহুল কাদীর) ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ বলেন ঃ স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে যদি নির্জনবাস না হয়ে থাকে তাহলে পুরুষের ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে স্ত্রী তার বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি নির্জনবাস হয়ে থাকে তাহলে তিনবার মাসিক আসা পর্যন্ত স্ত্রী তার বিবাহ বন্ধনে থাকবে। এ সময়ের মধ্যে সে যদি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে বিয়ে বহাল থাকবে। অন্যথায়, তৃতীয় বার মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার সাথে সাথেই আপনা থেকেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র) একথাও বলেন যে, আমাদের পক্ষ থেকে যিম্মীদেরকে তাদের ধর্মীয় কাজে হস্তক্ষেপ না করার যে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে নারীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করাও ঠিক হবে না। কিন্তু বাস্তবে এটা একটা দুর্বল যুক্তি। কারণ একজন যিম্মী নারীকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হলে তখনই কেবল তা তার ধর্ম মতে বাধা সৃষ্টি করা বলে গণ্য হবে। তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর তাহলে তোমার স্বামীর সাথে থাকতে পারবে অন্যথায় তোমাকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে, শুধু এই কথাটি তাকে বলা তার ধর্মমতে কোন প্রকার অবৈধ হস্তক্ষেপ নয়। হযরত আলীর (রা) খিলাফত কালে এ ধরনের একটি ঘটনার নজীর পাওয়া যায়। তখন ইরাকের একজন অগ্নিপূজক জমিদার ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু তার স্ত্রী কাফেরই থেকে যায়। হযরত আলী (রা) তার সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে দিলেন। (আল মাবসূত) ইমাম মালেক (র) বলেন ঃ যদি নির্জনবাস না হয়ে থাকে তাহলে পুরুষের ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে তার কাফের স্ত্রী তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তবে যদি নির্জনবাস না হয়ে থাকে তাহলে নারীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হবে। সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। (আল মুগনী ইবনে কুদামা)।

পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং স্বামী কাফের থেকে যায় তাহলে সে আহলে কিতাব হোক বা না হোক এবং উভয়ের নির্জনবাস হয়ে থাক বা না থাক হানাফীদের মতে সর্বাবস্থায় স্বামীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হবে। সে ইসলাম গ্রহণ করলে নারী তার বিবাহ বন্ধনে বহাল থাকবে এবং অস্বীকৃতি জানালে কাজী তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন। ইসলামের দাওয়াত পেশ করার পর স্বামী যতক্ষণ পর্যন্ত

ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি না জানাবে ততক্ষণ পর্যন্ত নারী তার স্ত্রী থাকবে ঠিকই কিন্তু স্ত্রীর সান্নিধ্য লাভের অধিকার তার থাকবে না। স্বামীর অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটবে তা হবে বায়েন তালাক হিসেবে। এমতাবস্থায় নির্জনবাস না হয়ে থাকলে নারী নির্ধারিত মোহরানার অর্ধেক পাওয়ার অধিকারী হবে। আর নির্জনবাস হয়ে থাকলে সম্পূর্ণ মোহরানা লাভের অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে ইদ্দতকালীন খোরপোষ লাভেরও অধিকারী হবে। (আল মাবসূত, হিদায়া, ফাতহুল কাদীর) ইমাম শাফেয়ীর (র) মতে, নির্জনবাস না হওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে এবং নির্জনবাস হওয়ার ক্ষেত্রে ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর বিবাহ বন্ধনে বহাল থাকবে। এই সময়ের মধ্যে যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে বিবাহ বহাল থাকবে। অন্যথায় ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। কিন্তু নারীর বেলায় ইমাম শাফেয়ীর (র) যে মত ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে পুরুষের বেলায়ও তিনি সেই একই মত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ তার সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা জায়েয নয়। তবে এ মতটি অত্যন্ত দুর্বল। হযরত উমরের (রা) খিলাফতকালে এ ধরনের বেশ কিছু সংখক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ নারী ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং পুরুষকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হয়েছে আর যখন সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তখন দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া হলো। যেমন ঃ বনী তাগলেব গোত্রের জনৈকা খৃষ্টান স্ত্রীলোকের ব্যাপারটি তার সামনে পেশ করা হলে তিনি স্বামীকে বললেন ঃ তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। তা নাহলে আমি তোমাদের দু'জনকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দেব। সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তিনি তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি দিয়ে দিলেন। বাহযুল মালিকের এক নওমুসলিম জমিদারনীর মামলা তাঁর কাছে পাঠান হলে এ মামলাতেও তিনি নির্দেশ দিলেন যে, তার স্বামীর সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হোক। যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে ভাল কথা। অন্যথায় দু'জনের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটান হোক। সাহাবায়ে কিরামের সামনেই এসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু কেউ ভিন্নমত পোষণ করেছেন বলে উল্লেখ নেই। (আহকামুল কুরআন জাস্‌সাস, আল মাবসূত, ফাতহুল কাদীর) এ ব্যাপারে ইমাম মালেকের (র) রায় হলো, স্ত্রী যদি নির্জনবাসের পূর্বেই মুসলমান হয়ে যায় তাহলে স্বামীর সামনে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত পেশ করতে হবে। সে যদি দাওয়াত গ্রহণ করে তাহলে উত্তম। অন্যথায় অবিলম্বে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। কিন্তু যদি নির্জনবাস হওয়ার পরে স্ত্রীলোকটি ইসলাম গ্রহণ করে থাকে তাহলে ইদ্দতের সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে স্বামী ইসলাম গ্রহণ করলে বিবাহ বন্ধন ঠিক থাকবে। অন্যথায় ইদ্দতের সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। ইমাম আহমাদের (র) একটি মত ইমাম শাফেয়ীর (র) মতকে সমর্থন করে। তাঁর দ্বিতীয় মতটি হলো, নির্জনবাস হোক বা না হোক স্বামী এবং স্ত্রীর দীন বা ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া সর্বাবস্থায় তাৎক্ষণিক বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ বলে গণ্য হবে। (আল মুগনী)

দুই ঃ স্ত্রী যদি দারুল কুফরে ইসলাম গ্রহণ করে এবং স্বামী কাফের থেকে যায় অথবা স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে এবং স্ত্রী (যে খৃষ্টান বা ইহুদী বরং আহলে কিতাব নয় এমন ধর্মের অনুসারী হয়) তার ধর্ম আঁকড়ে ধরে থাকে এমতাবস্থায় হানাফীদের মতে তাদের নির্জনবাস হোক বা না হোক স্ত্রীর তিনবার মাসিক না হওয়া কিংবা মাসিক রহিতা হয়ে

থাকলে তিন মাস অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটবে না। এ সময়ের মধ্যে অপরজনও মুসলমান হয়ে গেলে বিবাহ বন্ধন ঠিক থাকবে। অন্যথায় এ সময় শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রেও ইমাম শাফেয়ী (র) নির্জনবাস হওয়া এবং না হওয়ার ক্ষেত্রে পার্থক্য করেন। তাঁর রায় হলো, নির্জনবাস যদি না হয়ে থাকে তাহলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ধর্মের ভিন্নতা সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে বিচ্ছেদ সংঘটিত হবে। আর যদি নির্জনবাস হওয়ার পরে ধর্মের ভিন্নতা দেখা দিয়ে থাকে তাহলে ইদ্দতের সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে বহাল থাকবে। এ সময়ের মধ্যে যদি অপরজন ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে ইদ্দত শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিয়েও বাতিল হয়ে যাবে। (আল মাবসূত, ফাতহুল কাদীর, আহকামুল কুরআন জাস্‌সাস)

তিন ঃ যে ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ধর্মের ভিন্নতা হওয়ার সাথে সাথে দেশও ভিন্ন হয়ে যায় অর্থাৎ তাদের কোন একজন কাফের অবস্থায় দারুল কুফরে থেকে যায় এবং অপরজন হিজরাত করে দারুল ইসলামে চলে আসে তাদের সম্পর্কে হানাফীদের বক্তব্য হলো তাদের বিবাহ বন্ধন আপনা থেকেই ছিন্ন হয়ে যাবে। হিজরাত করে অগমনকারী যদি নারী হয় তাহলে তার তখনই দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার থাকে। তাকে কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না। তবে স্ত্রীর সাহচর্য লাভ করতে হলে তার গর্ভে সন্তান আছে কিনা তা জানার জন্য একবার মাসিক আসা পর্যন্ত স্বামীকে অপেক্ষা করতে হবে। আর সে যদি গর্ভবতীও হয় তবুও বিয়ে হতে পারবে। তবে একান্ত নৈকট্য লাভের জন্য সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এ মাসয়ালায় ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ ইমাম আবু হানীফার সাথে শুধু এতটুকু ভিন্ন মত পোষণ করেছেন যে, নারীকে ইদ্দত পালন করতে হবে এবং গর্ভবতী হলে সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে হতে পারবে না। (আল মাবসূত, হিদায়া, আহকামুল কুরআন জাস্‌সাস) ইমাম শাফেয়ী (র), ইমাম আহমাদ (র) এবং ইমাম মালেক বলেন ঃ এ ক্ষেত্রে দেশ ভিন্ন ভিন্ন হওয়াতে কিছুই এসে যায় না। বরং এ ক্ষেত্রে মূল জিনিস হলো ধর্মের ভিন্নতা। যদি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ধর্মের এই ভিন্নতা সৃষ্টি হয় তাহলে দারুল ইসলামে ধর্মের ভিন্নতা সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে যে বিধান প্রযোজ্য এ ক্ষেত্রেও সেই একই বিধান প্রযোজ্য হবে। (আল মুগনী)।

হিজরাতকারিনী মুসলমান নারী সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র) তার পূর্বোল্লেখিত মতের সাথে সাথে এ মতও প্রকাশ করেন যে, সে যদি তার কাফের স্বামীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে তার স্বামীত্বের অধিকার রহিত করার উদ্দেশ্যে এসে থাকে তাহলে দেশ ভিন্ন হওয়ার কারণে নয় বরং তার এই সংকল্প ও ইচ্ছার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটবে । (আল মাবসূত, হিদায়া)।

কিন্তু কুরআন মজীদের আলোচ্য আয়াতটি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফার মতই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি হিজরাত করে আগমনকারী ঈমানদার নারীদের সম্পর্কে নাযিল করেছিলেন এবং তাদের ব্যাপারেই বলেছেন যে, তারা তাদের দারুল কুফরে ছেড়ে আসা কাফের স্বামীদের জন্য এখন আর হালাল নয়। আর মোহরানা দিয়ে তাদেরকে বিয়ে করার জন্য দারুল ইসলামের মুসলমানদের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অপর দিকে মুহাজির মুসলমানদের

সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের যেসব কাফের স্ত্রী দারুল কুফরে রয়ে গিয়েছে তাদেরকে তোমাদের বিবাহ বন্ধনে আটকে রেখ না। ঐ সব স্ত্রীদেরকে তোমরা যে মোহরানা দিয়েছ কাফেরদের থেকে তা চেয়ে নাও। এটা স্পষ্ট যে, শুধু দীন বা ধর্মের ভিন্নতার কারণে এ নির্দেশ দেয়া হয়নি। বরং যে অবস্থা ও পরিবেশ এসব হুকুমকে বিশেষ রূপ দান করেছে তাহলো দেশের ভিন্নতা। হিজরাতের কারণে কাফের স্বামীদের সাথে মুসলমান মেয়েদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন না হয়ে থাকলে তাদেরকে বিয়ে করার অনুমতি মুসলমানদের কি করে দেয়া যেতে পারে। তাও আবার এমনভাবে যে, এ অনুমতির ক্ষেত্রে ইদ্দত পালনের কোন ইংগিত পর্যন্ত নেই। অনুরূপ لا تمسكوا بعصم الكوافر এর নির্দেশ আসার পরও যদি মুসলমান মুহাজিরদের কাফের স্ত্রীরা তাদের বিবাহ বন্ধনের মধ্যেই থাকত তাহলে সংগে সংগে এ হুকুমও দেয়া হতো যে, তাদের তালাক দিয়ে দাও। কিন্তু এখানে সেদিকেও কোন ইংগিত দেয়া হয়নি। একথা নিঃসন্দেহে ঠিক যে, এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর হযরত উমর (রা), হযরত তালহা এবং আরো কিছু সংখ্যক মুহাজির তাঁদের স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, এরূপ করা তাদের জন্য জরুরী হয়ে পড়েছিল এবং তাদের স্ত্রীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া না হওয়া তালাক দেয়ার ওপরেই নির্ভর করছিল। আর তারা তালাক না দিলে ঐসব স্ত্রী তাদের স্ত্রীই থেকে যেত।

এর জবাবে নবীর (সা) যুগের তিনটি ঘটনাকে নজীর হিসেবে পেশ করা হয়। এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পরও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেশের ভিন্নতার কারণে মু'মিন ও কাফের স্বামী স্ত্রীর বিবাহ বন্ধন যে ঠিক রেখেছেন এসব ঘটনাকে তার প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়। প্রথম ঘটনাটি হলো, মক্কা বিজয়ের কিছু পূর্বে আবু সুফিয়ান মাররুয্ যাহরান (বর্তমান ওয়াদীয়ে ফাতেমা) নামক স্থানে মুসলিম সেনাদলের কাছে এসে সেখানে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর তাঁর স্ত্রী হিন্দ কাফের হিসেবে মক্কায়ই থেকে যায়। মক্কা বিজয়ের পর হিন্দ ইসলাম গ্রহণ করে। আর বিয়ে নবায়ন না করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পূর্বের বিয়ে বহাল রাখেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো, মক্কা বিজয়ের পর ইকরিমা ইবনে আবু জাহল এবং হাকীম ইবনে হিযাম মক্কা থেকে পালিয়ে যান। কিন্তু তাঁদের উভয়ের স্ত্রী তাঁদের চলে যাওয়ার পর মুসলমান হয়ে যান। এরপর তারা নবীর (সা) নিকট থেকে তাদের স্বামীর জন্য নিরাপত্তা নেন এবং গিয়ে তাদের নিয়ে আসেন। উভয়েই ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরও পূর্ব বিয়ে বহাল রাখলেন। তৃতীয় ঘটনাটি নবীর (সা) নিজের মেয়ে হযরত যয়নাবের (রা)। হযরত যয়নাব (রা) হিজরাত করে মদীনায় চলে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বামী আবুল আস কাফের হিসেবে মক্কায়ই থেকে গিয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাতে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াত হলো, তিনি ৮ম হিজরীতে মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী (সা) তাঁদের বিয়েও নবায়ন করেননি বরং পূর্বের বিয়ের ভিত্তিতে নিজের মেয়েকে আবুল আসের স্ত্রী হিসেবে থাকতে দিয়েছেন। এসব ঘটনার মধ্যে প্রথম দু'টি ঘটনা প্রকৃতপক্ষে দেশ ভিন্ন হওয়ার পর্যায়ভুক্ত নয়। কারণ সাময়িকভাবে এক ব্যক্তির একদেশ থেকে অন্য দেশে চলে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া দেশের ভিন্নতা নয়। কেবল সেই ক্ষেত্রেই দেশের ভিন্নতা হয় যখন কোন ব্যক্তি একদেশ ছেড়ে অন্য কোন দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করে এবং তার ও তার স্ত্রীর মধ্যে

বর্তমান কালের পরিভাষা অনুসারে জাতীয়তার (Nationality) পার্থক্য দেখা দেয়। এরপর থাকে কেবল সাইয়েদা যয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপারটি। এ ব্যাপারে দু'টি রেওয়ায়াত আছে। একটি হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াত। ওপরে যার বরাত দেয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসের রেওয়ায়াত। ইমাম আহমাদ, তিরমিযী এবং ইবনে মাজা এটি উদ্ধৃত করেছেন। দ্বিতীয় এই রেওয়ায়াতটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় মোহরানা নির্ধারণ করে নতুনভাবে মেয়েকে আবুল আসের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। যারা স্বামী ও স্ত্রীর দেশ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার আইনগত প্রভাব অস্বীকার করেন রেওয়ায়াতের এই পার্থক্যের ক্ষেত্রে এই নজীরটি তাদের জন্য প্রথমত অকাট্য দলীল হতে পারে না। দ্বিতীয়ত তারা যদি ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতকেই বিশুদ্ধ বলে গুরুত্ব দেন তাহলে তা তাদের নিজেদেরই মতের বিরুদ্ধে চলে যায়। কারণ তাদের মতানুসারে যেসব স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ধর্মের ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে যদি তাদের নির্জনবাস হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীর তিনবার মাসিক হওয়া পর্যন্ত তাদের বিয়ে অক্ষুণ্ণ থাকে। এই সময়ের মধ্যে অপরজনও ইসলাম গ্রহণ করলে বিবাহ বন্ধন ঠিক থাকে। অন্যথায় তৃতীয় মাসিক আসলে বিবাহ বন্ধন আপনা থেকেই ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু হযরত যয়নাবের যে ঘটনাকে তারা দলীল হিসেবে পেশ করেন তাতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ধর্মের ভিন্নতা সৃষ্টি হওয়ার পর কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল। হযরত যয়নাবের হিজরাতের ছয় বছর পর আবুল আস ঈমান গ্রহণ করেছিলেন এবং কুরআনের যে নির্দেশ অনুসারে মুসলমান নারীদেরকে মুশরিকদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছিল তা তাঁর ঈমান গ্রহণের অন্তত দুই বছর পূর্বে নাযিল হয়েছিল।

চার ঃ চতুর্থ বিষয়টি মুরতাদ হওয়া সম্পর্কিত। এর একটি অবস্থা হলো স্বামী–স্ত্রী উভয়েরই মুরতাদ হয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয় অবস্থা হলো তাদের কোন একজনের মুরতাদ হয়ে যাওয়া আর অপরজনের মুসলমান থাকা।

স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে যদি একই সাথে মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে শাফেয়ী এবং হাম্বলী উলামাদের মতে নির্জনবাসের পূর্বে এরূপ হলে তৎক্ষণাৎ আর নির্জনবাসের পরে হলে ইদ্দতের সময় শেষ হওয়া মাত্র মুসলিম থাকা অবস্থায় যে বিয়ে হয়েছিল তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে হানাফীদের মতে, যদিও তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাওয়াই সাধারণ বিবেক–বুদ্ধি ও যুক্তির দাবী কিন্তু হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে মুরতাদ হওয়ার যে ব্যাপক ফিতনা দেখা দিয়েছিল তাতে হাজার হাজার মানুষ মুরতাদ হওয়ার পর আবার মুসলমান হয়েছিল। সাহাবায়ে কিরাম তাদের কাউকেই বিয়ে নবায়নের জন্য নির্দেশ দেননি। তাই আমরা সাহাবীদের ঐকমত্য ভিত্তিক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সাধারণ যুক্তি ও বুদ্ধির বিপক্ষে একথা মেনে নিচ্ছি যে, স্বামী–স্ত্রীর এক সাথে মুরতাদ হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয় না। (আল মাবসূত, হিদায়া, ফাতহুল কাদীর, আল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবায়া)

স্বামী যদি মুরতাদ হয়ে যায় এবং স্ত্রী মুসলমান থাকে এমতাবস্থায় ইতিপূর্বে তাদের মধ্যে নির্জনবাস হয়ে থাক বা না থাক হানাফী ও মালেকীদের মতে তখনই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু শাফেয়ী এবং হাম্বলীগণ এ ক্ষেত্রে নির্জনবাসের পূর্বের ও পরের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন। তাদের মতে, নির্জনবাসের পূর্বে যদি এরূপ হয়ে

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

তোমাদের কাফের স্ত্রীদেরকে দেয়া মোহরানার কিছু অংশ যদি তোমরা ফেরত না পাও এবং পরে যদি তোমরা সুযোগ পেয়ে যাও তাহলে যাদের স্ত্রীরা ওদিকে রয়ে গিয়েছে তাদেরকে তাদের দেয়া মোহরানার সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে দাও।[১৭] যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছো তাকে ভয় করে চলো।

থাকে তাহলে বিবাহ বন্ধন তৎক্ষণাৎ ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যদি নির্জনবাসের পরে হয়ে থাকে তাহলে বিবাহ বন্ধন ইদ্দতের সময়–কাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকবে। সে যদি এ সময়ের মধ্যে মুসলমান হয়ে যায় তাহলে বিবাহ ঠিক থাকবে। অন্যথায় ইদ্দতের সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে তার মুরতাদ হওয়ার সময় থেকে বিয়ে বাতিল বলে ধরে নেয়া হবে। অর্থাৎ স্ত্রীকে নতুন করে আর কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না। চারটি মযহাবের ফকীহগণ এ বিষয়ে একমত যে, নির্জনবাসের পূর্বে এ ঘটনা ঘটে থাকলে স্ত্রী অর্ধেক মোহরানা এবং নির্জনবাসের পরে ঘটে থাকলে সম্পূর্ণ মোহরানা লাভের অধিকারী হবে।

আর স্ত্রী যদি মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে হানাফীদের পুরনো ফতোয়া হলো, বিয়ে তৎক্ষণাৎ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু পরবর্তীকালে বলখ ও সমরখন্দের আলেমগণ ফতোয়া দিয়েছেন যে, স্ত্রী মুরতাদ হওয়ার সংগে সংগেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না। স্বামীদের হাত থেকে বাঁচার জন্য বা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য স্ত্রীরা যাতে মুরতাদ হওয়ার পথ অনুসরণ না করে সেজন্যই তারা এ পন্থার সাহায্য নিয়েছেন। মালেকীদের ফতোয়াও অনেকটা এরূপ। তাঁরা বলেন ঃ যদি এমন ইংগিত পাওয়া যায় যে, স্ত্রী কেবলমাত্র স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পন্থা হিসেবে মুরতাদ হয়েছে তাহলে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হবে না। শাফেয়ী ও হাম্বলী মযহাবের মতে স্বামীর মুরতাদ হওয়ার ক্ষেত্রে যে আইন প্রযোজ্য স্ত্রীর মুরতাদ হওয়ার ক্ষেত্রেও সেই একই আইন প্রযোজ্য। অর্থাৎ নির্জনবাসের পূর্বে মুরতাদ হলে বিয়ে তৎক্ষণাৎ বাতিল হয়ে যাবে। আর নির্জনবাসের পরে মুরতাদ হলে ইদ্দতের সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে ঠিক থাকবে। এ সময়ের মধ্যে সে মুসলমান হয়ে গেলে দাম্পত্য বন্ধন অক্ষুণ্ন থাকবে। তা নাহলে ইদ্দতকাল শেষ হওয়ার সাথে সাথে মুরতাদ হওয়ার সময় থেকে বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে। মোহরানার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সবাই একমত যে, স্ত্রী যদি নির্জনবাসের পূর্বে মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে সে মোহরানা আদৌ পাবে না। তবে সে যদি নির্জনবাসের পরে মুরতাদ হয়ে থাকে তাহলে সম্পূর্ণ মোহরানা লাভ করবে। (আল মাবসূত, হিদায়া, ফাতহুল কাদীর, আল মুগনী, আল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবায়া)।

১৭. এ ব্যাপারে দু'টি অবস্থা বিদ্যমান ছিল। এ দু'টি ক্ষেত্রেই এ আয়াতটি প্রযোজ্য ঃ একটি অবস্থা ছিল এই যে, যেসব কাফেরের সাথে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি ছিল মুসলমানরা তাদের সাথে বিষয়টির ফায়সালা করতে চাচ্ছিল এভাবে যে, যেসব স্ত্রীলোক হিজরাত করে আমাদের কাছে চলে এসেছে আমরা তাদের মোহরানা ফিরিয়ে দেব। আর আমাদের লোকদের যেসব কাফের স্ত্রী ওদিকে রয়ে গিয়েছে তোমরা তাদের মোহরানা ফিরিয়ে দাও। কিন্তু তারা এ প্রস্তাব গ্রহণ করল না। ইমাম যুহরী বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশ অনুসারে আমল করার জন্য মুসলমানগণ সেই স্ত্রীদের মোহরানা ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে গেল যারা মক্কায় কাফেরদের কাছে থেকে গিয়েছিল। কিন্তু যেসব স্ত্রীলোক হিজরাত করে মুসলমানদের কাছে চলে এসেছিল মুশরিকরা তাদের মোহরানা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানাল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিলেন ঃ মুশরিকদেরকে মুহাজির মহিলাদের যে মোহরানা ফিরিয়ে দিতে হবে তা তাদের ফিরিয়ে দেয়ার পরিবর্তে মদীনাতেই জমা করা হোক এবং মুশরিকদের কাছে যেসব লোকের মোহরানা পাওনা আছে জমাকৃত এই অর্থ থেকে তাদের প্রত্যেককে কাফেরদের কাছে পাওনা অর্থের সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে দেয়া হোক।

দ্বিতীয় অবস্থাটি ছিল এই যে, যেসব কাফেরদের সাথে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি ছিল না তাদের এলাকা থেকেও বেশ কিছু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে দারুল ইসলামে এসেছিল এবং তাদের কাফের স্ত্রীরা সেখানেই রয়ে গিয়েছিল। একই ভাবে কিছু কিছু মহিলাও মুসলমান হয়ে হিজরাত করে চলে এসেছিল। কিন্তু তাদের কাফের স্বামীরা সেখানেই রয়ে গিয়েছিল। তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়া হলো যে, দারুল ইসলামেই অদল-বদল করে বিষয়টি চুকিয়ে দেয়া হোক। কাফেরদের নিকট থেকে যখন কোন মোহরানা ফেরত পাওয়া যাচ্ছে না তখন তাদেরকেও কোন মোহরানা ফিরিয়ে দেয়া যাবে না। তার পরিবর্তে যেসব স্ত্রীলোক দারুল ইসলামে চলে এসেছে তাদের ফেরতযোগ্য মোহরানা সেই স্বামীদের দেয়া হোক যাদের স্ত্রীরা কাফেরদের সাথে তাদের এলাকায় রয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এভাবে যদি হিসেব সমান সমান না হয় এবং যেসব মুসলমানের স্ত্রীরা কাফেরদের সাথে রয়ে গিয়েছে তাদের পাওনা মোহরানা হিজরাত করে আসা মুসলমান মহিলাদের মোহরানার পরিমাণ থেকে বেশী হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধের সময় যে গনীমাতের মাল মুসলমানদের হস্তগত হবে তা দ্বারা অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধ করতে হবে। ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তির অংশের মোহরানা পাওনা থেকে যেত নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম গনীমাতের মাল থেকে তার ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিতেন। (ইবনে জারীর) আতা, মুজাহিদ, যুহরী, মাস্‌রূক, ইবরাহীম নাখায়ী, কাতাদা, মুকাতিল এবং দাহ্‌হাক এ নীতি গ্রহণ করেছেন । তাঁরা বলেন, যে লোকদের প্রাপ্য মোহরানা কাফেরদের কাছে রয়ে গিয়েছে কাফেরদের নিকট থেকে হস্তগত হওয়া গনীমাতের মালের মোটের ওপর থেকে তার সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ গনীমাত বন্টনের পূর্বে তাদের হাতছাড়া হওয়া মোহরানা তাদের দিয়ে দিতে হবে এবং তারপর গনীমাত বন্টিত হবে। আর তখন এসব লোকও অন্য সব মুজাহিদদের মত সমান অংশ লাভ করবে। কোন কোন ফকীহ একথাও বলেন যে, শুধু

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ
شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ
بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى
مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

হে নবী, ঈমানদার নারীগণ যখন তোমার কাছে বাইয়াত গ্রহণের জন্য আসে[১৮] এবং এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না,[১৯] যিনা করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না[২০] সন্তান সম্পর্কে কোন অপবাদ তৈরী করে আনবে না[২১] এবং কোন ভাল কাজে তোমার অবাধ্য হবে না[২২] তাহলে তাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করো[২৩] এবং তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

গনীমাতের সম্পদ থেকেই নয়, বরং 'ফাই' এর অর্থ দ্বারাও এসব লোকের ক্ষতিপূরণ করা যেতে পারে। কিন্তু আলেমদের একটি বড় দল এই মতটি গ্রহণ করেননি।

১৮. আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আয়াতটি মক্কা বিজয়ের পূর্বে নাযিল হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে মক্কা বিজিত হলে কুরাইশরা বাইয়াতের জন্য দলে দলে রসূলুল্লাহর (সা) কাছে এসে হাজির হতে থাকল। তিনি নিজে সাফা পাহাড়ের ওপর পুরুষদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করলেন এবং তাঁর নিজের পক্ষ থেকে মহিলাদের 'বাইয়াত' গ্রহণ করতে এবং এ আয়াতে যে বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে সে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি নিতে হযরত উমরকে (রা) নির্দেশ দিলেন। (ইবনে আব্বাসের বর্ণনা সূত্রে ইবনে জারীর, কাতাদার বর্ণনা সূত্রে ইবনে আবী হাতেম) এরপর তিনি মদীনায় ফিরে গিয়ে আনসারী মহিলাদের এক জায়গায় জমায়েত করার নির্দেশ দিলেন এবং তাদের বাইয়াত গ্রহণের জন্য হযরত উমরকে (রা) পাঠালেন। (ইবনে জারীর, ইবনে মারদইয়া, বায্যার, ইবনে হিব্বান উম্মে আতিয়া আনসারিয়ার বর্ণনা সূত্রে) তিনি ঈদের দিনেও পুরুষদের সমাবেশে বক্তৃতা করার পর মহিলাদের সমাবেশে গিয়েছেন এবং সেখানেও বক্তৃতার মধ্যে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। এর মধ্যে যেসব বিষয়ের উল্লেখ আছে সেসব বিষয়ে তিনি মহিলাদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। (বুখারী ইবনে আব্বাসের বর্ণনা সূত্রে) এসব ক্ষেত্র ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে মহিলারা ব্যক্তিগতভাবেও এবং সমষ্টিগতভাবেও তাঁর কাছে হাজির হয়ে বাইয়াত গ্রহণ করত যা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

১৯. মক্কায় যে সময় মহিলাদের নিকট থেকে বাইয়াত নেয়া হচ্ছিল সেই সময় হযরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবা এই নির্দেশটির ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, আবু সুফিয়ান কিছুটা

কৃপণ প্রকৃতির লোক। আমি যদি তাকে না জানিয়ে আমার এবং আমার সন্তানদের প্রয়োজন পূরণের জন্য তার সম্পদ থেকে কিছু নেই তাতে কি আমার কোন গোনাহ হবে? তিনি বললেন ঃ না, তবে ন্যায়সংগত সীমার মধ্যে থেকে। অর্থাৎ ঠিক এতটা অর্থ নাও যা প্রকৃত অর্থে বৈধ প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট । (আহকামুল কুরআন, ইবনে আরাবী)।

২০. গর্ভপাত ঘটানোও এর অন্তরভুক্ত তা বৈধ গর্ভ বা অবৈধ গর্ভ যাই হোক না কেন।

২১. এর দ্বারা দুই প্রকারের অপবাদ বুঝানো হয়েছে। এক, কোন নারীর অন্য কোন নারীর প্রতি পরপুরুষের সাথে প্রেম-প্রণয় করার অপবাদ আরোপ করা এবং এ ধরনের কল্পকাহিনী মানুষের মধ্যে ছড়ান। কারণ এসব কথা বলে বেড়ানোর একটা রোগ মহিলাদের মধ্যে দেখা যায়। দুই, কোন নারীর অন্য পুরুষের ঔরসজাত সন্তান প্রসব করে স্বামীকে বিশ্বাস করানো যে, সেটা তারই সন্তান—এটাও অপবাদের অন্তরভুক্ত। আবু দাউদে হযরত আবু হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি নবীকে (সা) বলতে শুনেছেন যে, যে নারী কোন পরিবারে এমন কোন সন্তান প্রবেশ করায় যে সেই বংশের সন্তান নয়, সেই নারীর আল্লাহর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তাকে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।

২২. সংক্ষিপ্ত এই আয়াতাংশে আইনের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম বিষয় বর্ণনা করা হয়েছেঃ

প্রথম বিষয়টি হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের ব্যাপারেও "ভাল কাজে আনুগত্য করা" কথাটি যোগ করা হয়েছে। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এ বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ ছিল না যে, তিনি কখনো মুনকার বা মন্দ কাজের নির্দেশও দিতে পারেন। এভাবে আপনা থেকেই একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহর আইন ও নির্দেশের বাইরে গিয়ে পৃথিবীতে কোন মানুষের আনুগত্য করা যেতে পারে না। কারণ আল্লাহর রসূলের আনুগত্যের ব্যাপারেও যখন মারূফ বা ভাল কাজ হওয়ার শর্তযুক্ত করা হয়েছে তখন শর্তহীন আনুগত্য লাভের মর্যাদা অন্য কারো কিভাবে থাকতে পারে। কিংবা তার এমন কোন নির্দেশ অথবা আইন অথবা নিয়ম-কানুন এবং আচার অনুষ্ঠানের আনুগত্য কিভাবে করা হবে যা আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী? এই মৌলিক নীতিটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

لَا طَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ ، اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ

"আল্লাহর নাফরমানী করে কারো আনুগত্য করা যেতে পারে না। মারূফ বা সুকৃতির কাজেই কেবল আনুগত্য করা যেতে পারে। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী)

বড় বড় জ্ঞানী-গুণী ও মনীষীগণ এ আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে এই বিষয়টিকেই গ্রহণ করেছেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম বলেনঃ

"আল্লাহ তা'আলা একথা বলেননি যে, তারা যেন আদৌ তোমার নাফরমানী না করে, বরং বলেছেন যে, মারূফ বা ভাল কাজে তারা যেন তোমার নাফরমানী না করে। আল্লাহ তা'আলা যখন নবীর আনুগত্যের ক্ষেত্রে পর্যন্ত এ শর্ত যুক্ত করেছেন তখন মারূফ ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে অন্যদের আনুগত্য করা যাবে তা কি করে হতে পারে।" (ইবনে জারীর)

ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস লিখছেন ঃ

আল্লাহ জানতেন, তাঁর নবী মারূফ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে নির্দেশ দেন না। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর নবীর নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে গিয়ে মারূফ বা ভাল কাজের শর্ত আরোপ করেছেন। যাতে আল্লাহর আনুগত্যমূলক নির্দেশ না হওয়া সত্ত্বেও কেউ কখনো কোন রাজশক্তির আনুগত্যের অবকাশ খুঁজে বের করতে না পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ اَطَاعَ مَخْلُوْقًا فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ذٰلِكَ الْمَخْلُوْقَ-

"যে ব্যক্তি স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করে আল্লাহ তা'আলা তার ওপর উক্ত সৃষ্টিকে কর্তৃত্ব দান করেন।" (আহকামুল কুরআন)

আল্লামা আলুসী বলেন ঃ

"যেসব মূর্খ মনে করে 'উলুল আমর' বা শাসন কর্তৃত্বের আনুগত্য শর্তহীন, এ নির্দেশ তাদের ধারণা প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহ তা'আলা তো রসূলের নির্দেশের আনুগত্য করার জন্যও ভাল কাজের নির্দেশ হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। অথচ রসূল কখনো 'মারূফ' বা ভাল কাজের জন্য ছাড়া নির্দেশ দেন না। এর উদ্দেশ্য মানুষকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দেয়া যে, স্রষ্টার নাফরমানী করে কারো আনুগত্য করা জায়েয নয়।" (রূহুল মা'য়ানী)

এই নির্দেশটি প্রকৃতপক্ষে ইসলামে আইনের শাসনের (Rull of law) ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ। মৌলিক কথা হলো, ইসলামের পরিপন্থী প্রত্যেকটি কাজই অপরাধ এবং কাউকে এ ধরনের কাজ করতে নির্দেশ দেয়ার আইনগত অধিকার কারো নেই। যে ব্যক্তিই আইনের পরিপন্থী কোন কাজের নির্দেশ দেয় সে নিজেই একজন অপরাধী। আর যে ব্যক্তি সে নির্দেশ পালন করে সে–ও অপরাধী। অধীনস্ত কোন ব্যক্তিই এ যুক্তি দেখিয়ে শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারে না যে, তার উর্ধতন কর্মকর্তা তাকে এমন একটি কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিল যা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি আইনগত দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহলো এ আয়াতটিতে পাঁচটি নেতিবাচক নির্দেশ দেয়ার পর একটি মাত্র ইতিবাচক নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নির্দেশটি হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাল কাজের জন্য যেসব নির্দেশ দেবেন তার সবগুলোর আনুগত্য করা হবে। অন্যায় ও পাপ কাজ সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় জাহেলী যুগের মহিলারা বড় বড় যেসব অন্যায় ও গোনাহর কাজে জড়িত ছিল তার উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা থেকে বিরত থাকার জন্য তাদের কাছে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে। কিন্তু ভাল কাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তার কোন ফিরিস্তি দিয়ে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়নি যে, তোমরা অমুক অমুক কাজ করবে বরং শুধু এই মর্মে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে যে, নবী (সা) ভাল কাজ করার জন্য যে নির্দেশই দিবেন তোমাদেরকে তার আনুগত্য করতে হবে। এখন এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে যেসব নির্দেশ দিয়েছেন কেবল তাই যদি ভাল কাজ, হতো তাহলে প্রতিশ্রুতি নেয়া উচিত ছিল এই ভাষায় যে, তোমরা আল্লাহর নাফরমানী করবে না অথবা তোমরা কুরআনের নির্দেশসমূহ অমান্য করবে না। কিন্তু প্রতিশ্রুতি যখন এই ভাষায় নেয়া হয়েছে যে, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেক কাজের জন্য যে, নির্দেশই দেবেন তোমরা তা লংঘন করবে না"। সুতরাং আপনা থেকেই এর অর্থ দাঁড়ায় সমাজ সংস্কারের জন্য নবীকে (সা) ব্যাপক ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে এবং তাঁর সব নির্দেশই অবশ্য পালনীয়—কুরআন মজীদে তার উল্লেখ থাক বা না থাক।

আইনগত এই ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের ওপর ভিত্তি করেই বাইয়াত গ্রহণের সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎকালীন আরব সমাজের মহিলাদের মধ্যে প্রসার লাভ করা বহুসংখ্যক অন্যায় ও পাপকাজ পরিত্যাগ করার জন্য প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন এবং এমন কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন যার উল্লেখ কুরআন মজীদে নেই। এ বিষয়ে জানার জন্য নিম্ন বর্ণিত হাদীসগুলো দেখুন ঃ

ইবনে আব্বাস (রা), উম্মে সালামা (রা) এবং উম্মে আতিয়া আনসারিয়া প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহিলাদের বাইয়াত গ্রহণের সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মর্মে প্রতিশ্রুতি নিতেন যে, তারা মৃতদের জন্য বিলাপ করে কাঁদবে না। বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী এবং ইবনে জারীর এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে বিস্তারিত উল্লেখ আছে যে, নবী (সা) হযরত উমরকে (রা) মহিলাদের বাইয়াত গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়ে বললেন ঃ তাদের বিলাপ করে কাঁদতে নিষেধ করবে। কারণ জাহেলী যুগে মহিলারা মৃতদের জন্য বিলাপ করে কাঁদত এবং পরিধেয় পোশাক ছিঁড়ে ফেলত, মুখমন্ডল খামচাত, চুল কেটে ফেলত এবং খুব বেশী চিৎকার ও হা-হুতাশ করত। (ইবনে জারীর)

যায়েদ ইবনে আসলাম বর্ণনা করেন ঃ নবী (সা) বাইয়াত গ্রহণের সময় মহিলাদেরকে নিষেধ করেছেন, তারা যেন বিলাপ করে না কাঁদে, মুখমন্ডল না খামচায়, কাপড় না ছিঁড়ে, হা-হুতাশ ও আহাজারী না করে এবং কবিতা আবৃত্তি করে ইনিয়েবিনিয়ে না কাঁদে। (ইবনে জারীর) প্রায় অনুরূপ অর্থের একটি হাদীস ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে জারীর এমন একজন মহিলার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে নিজে বাইয়াত গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্তরভুক্ত ছিল।

কাতাদা এবং হাসান বসরী বলেন ঃ নবী (সা) মহিলাদের বাইয়াত নেয়ার সময় যেসব প্রতিশ্রুতি নিতেন তার মধ্যে একটি ছিল তারা বেগানা পুরুষের সাথে কথা বলবে না। ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, বেগানা পুরুষদের সাথে নির্জনে, একা একা কথা বলবে না। কাতাদা আরো স্পষ্ট করে বলেছেন যে, নবীর (সা) একথা শুনে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! অনেক সময় এ রকম অবস্থা দেখা দেয় যে, আমরা বাড়ীতে থাকি না। কেউ হয়তো তখন সাক্ষাতের জন্য আমাদের কাছে আসে। তিনি বললেন ঃ আমি এ অবস্থা বুঝাতে চাইনি। অর্থাৎ "বাড়ীতে কেউ নেই", কোন আগন্তুককে এতটুকু কথা বলা মহিলাদের জন্য নিষিদ্ধ নয়। (ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন)

হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার খালা উমাইমা (রা) বিনতে রুকাইকা থেকে হযরত আমর ইবনুল আস বর্ণনা করেছেন, নবী (সা) মহিলাদের থেকে এই মর্মে

প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, বিলাপ করে কাঁদবে না এবং জাহেলী যুগের মত সাজগোজ করে নিজেদের প্রদর্শন করবে না। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক খালা সালমা বিনতে কায়েস বলেন ঃ আমি বাইয়াতের জন্যে কয়েকজন আনসারী মহিলার সাথে তাঁর কাছে হাজির হলে তিনি কুরআনের এই আয়াত অনুসারে আমাদের থেকে বাইয়াত নিয়ে বললেন ঃ ولاتغششن ازواجكن "তোমাদের স্বামীর সাথে প্রতারণা করবে না।" ফিরে আসার মুহূর্তে এক মহিলা আমাকে বলল ঃ গিয়ে নবীকে (সা) জিজ্ঞেস করো স্বামীর সাথে প্রতারণা করা বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন? আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ

تَاْخُذُ مَالَهُ فَتَحَابَّى بِهِ غَيْرَهُ

"স্বামীর টাকা পয়সা নিয়ে অন্যের জন্য ব্যয় করা।" (মুসনাদে আহমাদ)

উম্মে আতিয়া (রা) বলেন ঃ বাইয়াত গ্রহণের পর নবী (সা) আমাদের নির্দেশ দিলেন যে, আমরা দুই ঈদের জামায়াতে হাজির হব। তবে জুময়ার নামায আমাদের জন্য ফরয নয়। আর তিনি আমাদেরকে জানাযার সাথে যেতেও নিষেধ করলেন ।(ইবনে জারীর)

কিছু সংখ্যক লোক নবীর (সা) এই আইনগত ক্ষমতা ও ইখতিয়ারকে তাঁর রিসালাতের পদবী বা মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত করার পরিবর্তে তাঁর ইমারতের পদবী ও মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত করেন। তারা বলেন, তিনি যেহেতু তাঁর সময়ের শাসকও ছিলেন, তাই এই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থেকে যেসব নির্দেশ তিনি দিয়েছেন তা শুধু তাঁর যুগ পর্যন্তই অবশ্য পালনীয় ছিল। যারা একথা বলেন, তারা অত্যন্ত মূর্খতাপূর্ণ কথা বলেন। নবীর (সা) যেসব নির্দেশ আমরা ওপরে উদ্ধৃত করেছি সেদিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন। এর মধ্যে নারী সমাজের সংস্কার ও সংশোধনের জন্য যেসব নির্দেশ তিনি দিয়েছেন তা যদি কেবল তদানীন্তন শাসক হিসেবেই তিনি দিতেন তাহলে চিরদিনের জন্য সারা দুনিয়ার মুসলিম সমাজের নারীদের মধ্যে এসব সংস্কার ও সংশোধন কি করে কার্যকর হতে পারতো? এ পৃথিবীতে এমন মর্যাদাবান কোন শাসক আছেন কি যে, একবার মাত্র তাঁর মুখ থেকে একটি নির্দেশ জারী হয়েছে আর সংগে সংগে গোটা দুনিয়ার যেখানে যেখানে মুসলিম জনবসতি আছে সেখানকার মুসলমান সমাজে চিরদিনের জন্য সেই সংস্কার ও সংশোধন জারী হয়ে গিয়েছে যা জারী করার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন? (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা হাশর, টীকা ১৫)

২৩. কিছু সংখ্যক নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মহিলাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণের পদ্ধতি পুরুষদের থেকে বাইয়াত গ্রহণের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন ছিল। পুরুষদের থেকে বাইয়াত গ্রহণের পদ্ধতি ছিল এই যে, বাইয়াত গ্রহণকারী নবীর (সা) হাতে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করত। কিন্তু মহিলাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণের সময় তিনি কখনো তাঁর হাত দিয়ে কোন মহিলার হাত ধরেননি বরং ভিন্ন পদ্ধতিতে গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে যেসব হাদীস উল্লেখিত হয়েছে তা আমরা নীচে বর্ণনা করছি ঃ

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ "আল্লাহর শপথ, বাইয়াত গ্রহণের সময় নবীর (সা) হাত কোন মহিলার হাতকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। মহিলাদের বাইয়াত গ্রহণের সময় তিনি মুখে শুধু একথাটুকু বলতেন যে, আমি তোমার থেকে বাইয়াত নিয়েছি"। (বুখারী, ইবনে জারীর)

"উমাইমা বিনতে রুকাইকা বলেন ঃ আমি আরো কয়েকজন মহিলার সাথে বাইয়াতের জন্য নবীর (সা) খেদমতে হাজির হলে তিনি কুরআনের এই আয়াতের নির্দেশ অনুসারে আমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন। যখন আমরা বললাম ঃ মা'রূফ বা ভাল কাজে আমরা আপনার নাফরমানী করব না"। তখন তিনি বললেনঃ فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَاطَقْتُنَّ "যতটা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে ও সাধ্যে কুলাবে।" আমরা বললাম ঃ আমাদের জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রসূল আমাদের নিজেদের চেয়েও বেশী দয়াপরবশ।" তারপর আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল, হাত বাড়িয়ে দিন। আমরা আপনার হাতে বাইয়াত করব। তিনি বললেনঃ আমি মহিলাদের সাথে মোসাফাহা করি না। আচ্ছা, আমি তোমাদের থেকেও প্রতিশ্রুতি নেব। সুতরাং তিনি আমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন। আর একটি হাদীসে তাঁর বর্ণনা হলো, নবী (সা) আমাদের মধ্যকার কোন মহিলার সাথেই মোসাফাহা করলেন না। (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম)।

আবু দাউদ তাঁর 'মারাসীল' গ্রন্থে শা'বী থেকে রেওয়ায়াত করেছেন যে, মহিলাদের বাইয়াত নেয়ার সময় নবীর (সা) দিকে একখানা কাপড় এগিয়ে দেয়া হলো। তিনি শুধু তা হাতে নিলেন এবং বললেন ঃ আমি মহিলাদের সাথে মোসাফাহা করি না। ইবনে আবী হাতেম শা'বী থেকে, আবদুর রায্যাক নাখায়ী থেকে এবং সায়ীদ ইবনে মনসূর কায়েস ইবনে আবী হাযেম থেকে প্রায় একই বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছেন।

ইবনে ইসহাক মাগাযীতে আবান ইবনে সালেহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, মহিলাদের বাইয়াত নেয়ার সময় নবী (সা) পানির একটি পাত্রে নিজের হাত ডুবাতেন এবং মহিলারাও সেই একই পাত্রে হাত ডুবাতো।

বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ঈদের খুতবা দেয়ার পর নবী (সা) পুরুষদের কাতারের মধ্যে দিয়ে মহিলারা যেখানে বসে ছিল সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে বক্তৃতা করার সময় তিনি কুরআন মজীদের এ আয়াতটি পড়লেন। তারপর মহিলাদেরকে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমরা কি এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো? সমাবেশের মধ্যে থেকে এক মহিলা জবাব দিল হাঁ, হে আল্লাহর রসূল, আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

ইবনে হিব্বান, ইবনে জারীর এবং বায্যার প্রমুখের একটি রেওয়ায়াতে উম্মে আতিয়া আনসারিয়ার একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যাতে বলা হয়েছে ঃ নবী (সা) ঘরের বাইরে থেকে হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং আমরা ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু এ বক্তব্য থেকে একথা বুঝা যায় না যে, মহিলারা তাঁর সাথে মোসাফাহাও করেছিল। কেননা, হযরত উম্মে আতিয়া মোসাফাহা করার কথা স্পষ্ট করে বলেননি। সম্ভবত সে সময় অবস্থা ছিল এই যে, প্রতিশ্রুতি গ্রহণের সময় নবী (সা) বাইরে থেকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে থাকবেন এবং ভেতর থেকে মহিলারাও প্রত্যেকে তাদের হাত বাড়িয়ে দিয়ে থাকবে। কিন্তু তাদের কারো হাতই রসূলুল্লাহর (সা) হাত স্পর্শ করেনি।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا۟ مِنَ ٱلْـَٔاخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلْقُبُورِ ﴿١٣﴾

হে ঈমানদারগণ, যাদের ওপর আল্লাহ গযব নাযিল করেছেন তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। আখেরাত সম্পর্কে তারা ঠিক তেমনি নিরাশ যেমন কবরস্থ কাফেরা নিরাশ।[২৪]

২৪. মূল ইবারত হলো ঃ

قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ –

এর দু'টি অর্থ হতে হতে পারে। একটি হলো, তারা আখেরাতের কল্যাণ ও সওয়াব থেকে ঠিক তেমনি নিরাশ হয়ে গিয়েছে যেমন আখেরাত অস্বীকারকারীরা তাদের কবরস্থ মৃত আত্মীয়-স্বজনদের পুনরায় জীবিত করে উঠান সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গিয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত হাসান বসরী, কাতাদা এবং দাহহাহ (র) এ অর্থটি বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় অর্থটি হতে পারে, তারা আখেরাতের রহমত ও মাগফিরাত থেকে ঠিক তেমনি নিরাশ যেমন কবরে পড়ে থাকা কাফেররা সব রকমের কল্যাণ থেকে নিরাশ। কারণ, এ ব্যাপারে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, তাদেরকে আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং হযরত মুজাহিদ, ইকরিমা, ইবনে যায়েদ, কালবী, মুকাতিল ও মনসূর রাহিমাহুমুল্লাহ থেকে এ অর্থটি বর্ণিত হয়েছে।

আস্ সফ্

৬১

নামকরণ

সূরার চতুর্থ আয়াতের يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا আয়াতাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যাতে 'সফ' শব্দটি আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে এর নাযিল হয়ার সময়-কাল জানা যায় না। কিন্তু এর বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে অনুমান করা যায় যে, সূরাটি সম্ভবত ওহুদ যুদ্ধের সমসাময়িককালে নাযিল হয়ে থাকবে। কারণ এর মধ্যে যেসব পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতি ইংগিত রয়েছে। তা সেই সময়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার বিষয়বস্তু হলো ঈমানের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে নিষ্ঠা ঐকান্তিকতা অবলম্বন এবং আল্লাহর পথে জীবন কুরবানী করতে উদ্বুদ্ধ করা। এতে দুর্বল ঈমানের মুসলমানদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে। যারা ঈমানের মিথ্যা দাবী করে ইসলামে প্রবেশ করেছিল তাদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে আবার যারা ঈমানের ব্যাপারে একনিষ্ঠ ছিল তাদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন আয়াতে শুধু প্রথম দু'টি শ্রেণীকে সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন আয়াতে শুধু মুনাফিকদের সম্বোধন করা হয়েছে। আবার কোন আয়াতে নিষ্ঠাবান মু'মিনদের প্রতি লক্ষ করে কথা বলা হয়েছে। কোন্ স্থানে কাদের উদ্দেশে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তা বক্তব্যের ধরন থেকেই বুঝা যায়।

শুরুতেই সমস্ত ঈমানদারদের এই মর্মে সাবধান করা হয়েছে যে, যারা বলে এক কথা কিন্তু করে অন্য রকম কাজ, তারা আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত। আর যারা ন্যায়ের পথে লড়াই করার জন্য মজবুত প্রাচীরের মত দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়ায় আল্লাহ তা'আলার নিকট তারা অত্যন্ত প্রিয়।

৫ থেকে ৭ আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের লোকদেরকে সাবধান করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈল জাতি মূসা (আ) এবং ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে যে আচরণ করেছে তোমাদের রসূল এবং তোমাদের দীনের সাথে তোমাদের আচরণ সেই রকম হওয়া উচিত নয়। হযরত মূসা (আ) আল্লাহর রসূল একথা জানা সত্ত্বেও তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তারা তাঁকে কষ্ট-যন্ত্রণা দিয়েছে এবং হযরত ঈসার (আ) কাছ থেকে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখতে পাওয়ার পরও তাঁকে অস্বীকার করা থেকে বিরত হয়নি। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, ঐ জাতির

লোকদের মেজাজের ধরন-প্রকৃতিই বাঁকা হয়ে গিয়েছে এবং হিদায়াত লাভের তাওফিক বা শুভবুদ্ধি থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। এটা এমন কোন বাঞ্ছনীয় বা ঈর্ষণীয় অবস্থা নয় যে, অন্য কোন জাতি তা লাভের জন্য উদগ্রীব হবে।

এরপর ৮ ও ৯ আয়াতে চ্যালেঞ্জ করে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইহুদী ও খৃষ্টান এবং তাদের সাথে ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিকরা আল্লাহর এই নূরকে নিভিয়ে দেয়ার যতই চেষ্টা-সাধনা করুক না কেন তা পুরা শানশওকতের সাথে গোটা পৃথিবীতে অবশ্যই বিস্তার লাভ করবে। মুশরিকরা যতই অপছন্দ করুক না কেন আল্লাহর মহান রসূলের আনীত দীন বা জীবনব্যবস্থা অন্য সব জীবনব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবশ্যই বিজয়ী হবে।

অতপর ১০ থেকে ১৩ পর্যন্ত আয়াতে ঈমানদারদের বলা হয়েছে যে, দুনিয়া এবং আখেরাতে সফলতা লাভের পথ মাত্র একটি। তাহলো খাঁটি ও সরল মনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পর ঈমান আনো এবং জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো। এর ফল হিসেবে আখেরাতে পাবে আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি, গোনাহসমূহের মাগফিরাত এবং চিরদিনের জন্য জান্নাত। আর দুনিয়াতে পুরস্কার হিসেবে পাবে আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতা এবং বিজয় ও সফলতা।

সূরার শেষে ঈমানদারদের বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে তাঁর হাওয়ারী বা সাহায্যকারীরা আল্লাহর পথে যেভাবে সহযোগিতা করেছে তারাও যেন অনুরূপভাবে 'আনসারুল্লাহ' বা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে দাঁড়ায় যাতে ইতিপূর্বে ঈমান আনয়নকারীগণ যেভাবে আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করেছিলেন তারাও কাফেরদের বিরুদ্ধে তেমনি সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করতে পারে।

আয়াত ১৪ **সূরা আস্ সফ-মাদানী** রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ① يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ② كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ
تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ③ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ
صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ④

আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর তাসবীহ করেছে। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।[১]

হে মু'মিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল যা নিজেরা করো না? আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ যে, তোমরা এমন কথা বলো যা করো না।[২] *আল্লাহ সেই সব লোকদের ভালবাসেন যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে যেন তারা সিসা গলিয়ে ঢালাই করা এক মজবুত দেয়াল।*[৩]

১. এটা এই ভাষণের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা। ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হাদীদের তাফসীর, টীকা ১ ও ২। এ ধরনের ভূমিকা দিয়ে বক্তব্য শুরু করার কারণ হলো, পরে যা বলা হবে তা শোনা বা পড়ার আগে মানুষ যাতে একথা ভালভাবে বুঝে নেয় যে, আল্লাহ তা'আলা অভাবহীন এবং অমুখাপেক্ষী। তাঁর প্রতি কারো ঈমান আনা, সাহায্য করা এবং ত্যাগ ও কুরবানী করার ওপর তাঁর কর্তৃত্ব নির্ভরশীল নয়। তিনি এর অনেক উর্ধে। তিনি যখন ঈমান গ্রহণকারীদের ঈমানের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হওয়ার শিক্ষা দেন এবং বলেন, সত্যকে উন্নতশির করার জন্য জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করো তখন এ সব তাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যই বলেন। তাঁর ইচ্ছা তাঁর নিজের শক্তি ও ব্যবস্থাপনার সাহায্যেই বাস্তব রূপ লাভ করে। কোন বান্দা তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নে সামান্যতম তৎপরতাও যদি না চালায় বরং গোটা পৃথিবী সে পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকরও হয় তবুও তার নিজের শক্তি ও ব্যবস্থাপনা দ্বারা তা বাস্তব রূপ লাভ করে।

২. একথাটির একটি সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ আছে যা এর শব্দসমূহ থেকেই প্রতিভাত হচ্ছে। এ ছাড়া একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষও আছে যা পরবর্তী আয়াতের সাথে

এটিকে মিলিয়ে পড়লে বুঝা যায়। প্রথম উদ্দেশ্য ও লক্ষ হলো, একজন খাঁটি মুসলমানের কথা ও কাজে মিল থাকা উচিত। সে যা বলবে তা করে দেখাবে। আর করার নিয়ত কিংবা সৎসাহস না থাকলে তা মুখেও আনবে না। এক রকম কথা বলা ও অন্য রকম কাজ করা মানুষের এমন একটি জঘন্য দোষ যা আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করার দাবী করে তার পক্ষে এমন নৈতিক দোষ ও বদ স্বভাবে লিপ্ত হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। নবী (সা) ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির মধ্যে এরূপ স্বভাব থাকা প্রমাণ করে যে, সে মু'মিন নয় বরং মুনাফিক। কারণ তার এই স্বভাব মুনাফিকির একটি আলামত। একটি হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ (زَادَ الْمُسْلِمُ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهٗ مُسْلِمٌ)
اِذَا حَدَّثَ كَذِبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُتْمِنَ خَانَ (بخارى ، مسلم)

"মুনাফিকের পরিচয় বা চিহ্ন তিনটি (যদিও সে নামায পড়ে এবং মুসলমান হওয়ার দাবী করে)। তাহলো, সে কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং তার কাছে কোন আমানত রাখলে তার খিয়ানত করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি অন্য একটি হাদীসে বলেছেন ঃ

اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ
مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا؛ اِذَا اُتْمِنَ خَانَ ،
وَاِذَا حَدَّثَ كَذِبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (بخارى، مسلم)

"চারটি স্বভাব এমন যা কোন ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া গেলে সে হবে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব পাওয়া যাবে তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বভাব বিদ্যমান। স্বভাবগুলো হলো, তার কাছে আমানত রাখা হলে সে খিয়ানত করে, কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদ করলে নৈতিকতা ও দীনদারীর সীমালংঘন করে।"
(বুখারী ও মুসলিম)

ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ এ বিষয়ে মোটামুটি একমত যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে যদি কোন ওয়াদা করে (যেমন কোন জিনিসের মানত করল) কিংবা মানুষের সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় অথবা কারো সাথে কোন বিষয়ে ওয়াদা করে আর তা যদি গোনাহর কাজের কোন প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা না হয় তাহলে পালন করা অবশ্য কর্তব্য। তবে যে কাজের প্রতিশ্রুতি দেয়া বা ওয়াদা করা হয়েছে তা গোনাহর কাজ হলে সে কাজ করবে না ঠিকই কিন্তু তার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কসমের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। সূরা মায়েদার ৮৯ আয়াতে একথাটিই বলা হয়েছে। (আহকামুল কুরআন—জাস্সাস ও ইবনে আরাবী)।

এটা হলো এ আয়াতগুলোর সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ। এরপর থাকে এর সেই বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ, যে জন্য এ ক্ষেত্রে আয়াত কয়টি পেশ করা হয়েছে, পরবর্তী আয়াতটিকে

এর সাথে মিলিয়ে পড়লেই সেই বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ জানা যায়। যারা ইসলামের জন্য জীবনপাত করার লম্বা লম্বা ওয়াদা করতো কিন্তু চরম পরীক্ষার সময় আসলে জান নিয়ে পালাতো সেই সব বাক্যবাগিশদের তিরস্কার করাই এর উদ্দেশ্য। দুর্বল ঈমানের লোকদের এই দুর্বলতার জন্য কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। যেমন, সূরা নিসার ৭৭ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ তোমরা সেই সব লোকদের প্রতি কি লক্ষ করেছ যাদের বলা হয়েছিল, নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও। এখন যেই তাদেরকে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে অমনি তাদের একটি দল মানুষকে এমন ভয় করতে আরম্ভ করেছে যা আল্লাহকে করা উচিত কিংবা তার চেয়েও অধিক। তারা বলে ঃ হে আল্লাহ, আমাদের জন্য লড়াইয়ের নির্দেশ কেন লিপিবদ্ধ করে দিলে? আমাদেরকে আরো কিছুদিনের জন্য অবকাশ দিলে না কেন? সূরা মুহাম্মাদের ২০ আয়াতে বলেছেন ঃ যারা ঈমান এনেছে তারা বলছিল, এমন কোন সূরা কেন নাযিল করা হচ্ছে না (যার মধ্যে যুদ্ধের হুকুম থাকবে), কিন্তু যখন একটি সুস্পষ্ট অর্থবোধক সূরা নাযিল করা হলো যাতে যুদ্ধের উল্লেখ ছিল তখন তোমরা দেখলে যাদের মনে রোগ ছিল তারা তোমাদের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন কাউকে মৃত্যু আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বিশেষ করে ওহুদ যুদ্ধের সময় এসব দুর্বলতা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। সূরা আলে ইমরানের ১৩ থেকে ১৭ রুকূ' পর্যন্ত একাধারে এ বিষয়ের প্রতিই ইংগিত দেয়া হয়েছে।

এ আয়াতগুলোতে যেসব দুর্বলতার সমালোচনা করা হয়েছে, আয়াতগুলোর শানে নুযূল বর্ণনা প্রসংগে মুফাস্সিরগণ তার বিভিন্ন ধরন ও প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস বলেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোক ছিল যারা জিহাদ ফরয হওয়ার পূর্বে বলত ঃ হায়! আল্লাহ তা'আলার কাছে যে কাজটি সবচেয়ে বেশী প্রিয় তা যদি আমরা জানতাম তাহলে তাই করতাম। কিন্তু যখন বলে দেয়া হলো যে, সেই কাজটি হলো জিহাদ, তখন নিজেদের কথা রক্ষা করা তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ল। মুকাতিল ইবনে হাইয়ান বলেন ঃ ওহুদের যুদ্ধে এসব লোক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হলে তারা নবীকে (সা) ফেলে রেখে জান নিয়ে পালিয়েছিল। ইবনে যায়েদ বলেন ঃ বহু লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই মর্মে আশ্বাস দিত যে, আপনাকে যদি শত্রুর মুখোমুখি হতে হয় তাহলে আমরা আপনার সাথে থাকব। কিন্তু শত্রুর সাথে মুখোমুখি হওয়ার সময় আসলে তাদের ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি মিথ্যা প্রমাণিত হত। কাতাদা এবং দাহ্হাক বলেন ঃ কোন কোন লোক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত ঠিকই, কিন্তু তারা কোন কাজই করত না। কিন্তু যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বড় গলায় বলত ঃ আমি এভাবে লড়াই করেছি, আমি এভাবে হত্যা করেছি। এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা এই প্রকৃতির লোকদেরকে তিরস্কার করেছেন।

৩. এর দ্বারা প্রথমত জানা গেল যে, কেবল সেই ঈমানদারই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনে সফল হয় যারা তাঁর পথে মরণপণ করে কাজ করতে এবং বিপদ আপদ মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত থাকে। দ্বিতীয়ত, জানা গেল যে, আল্লাহ যে সেনাদলকে পছন্দ করেন তার মধ্যে তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক। এক, তারা বুঝে শুনে ভালভাবে চিন্তা–ভাবনা করে আল্লাহর পথে লড়াই করবে এবং এমন কোন পথে লড়াই করবে না যা ফী

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي
رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾

তোমরা মূসার সেই কথাটি স্মরণ করো যা তিনি তাঁর কওমকে বলেছিলেন। "হে আমার কওমের লোক, তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দাও? অথচ তোমরা ভাল করেই জানো যে, আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর প্রেরিত রসূল।[৪] এরপর যেই তারা বাঁকা পথ ধরলো অমনি আল্লাহও তাদের দিল বাঁকা করে দিলেন। আল্লাহ ফাসেকদের হিদায়াত দান করেন না।[৫]

সাবীলিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর পথের সংজ্ঞায় পড়ে না। দুই, তারা বিচ্ছিন্নতা ও শৃঙ্খলহীনতার শিকার হবে না, বরং মজবুত সংগঠন সুসংহত অবস্থায় কাতারবন্দী বা সুশৃঙ্খল হয়ে লড়াই করবে। তিন, শত্রুর বিরুদ্ধে তার অবস্থা হবে "সুদৃঢ় দেয়ালের" মত। এই শেষ গুণটি আবার অর্থের দিক থেকে অত্যন্ত ব্যাপক। যুদ্ধের ময়দানে কোন সেনাবাহিনীই ততক্ষণ পর্যন্ত সুদৃঢ় দেয়ালের মত দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়াতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে নিম্নবর্ণিত গুণাবলী সৃষ্টি না হবে ঃ

—আকীদা-বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য। এ গুণটিই কোন সেনাবাহিনীর প্রতিটি সৈনিক অফিসারকে পূর্ণরূপে ঐক্যবদ্ধ করে।

—পরস্পরের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার ওপর আস্থা। প্রকৃতপক্ষে সবাই নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও লক্ষে নিষ্ঠাবান এবং অসদুদ্দেশ্য থেকে মুক্ত না হলে এ গুণ সৃষ্টি হতে পারে না। আর এ গুণ যদি সৃষ্টি না হয় তাহলে যুদ্ধের মত কঠিন পরীক্ষা কারো কোন দোষ-ত্রুটি গোপন থাকতে দেয় না। আর আস্থা নষ্ট হয়ে গেলে সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য পরস্পরের ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে একে অপরকে সন্দেহ করতে শুরু করে।

—নৈতিক চরিত্রের একটি উন্নত মান থাকতে হবে। সেনাবাহিনীর অফিসার এবং সাধারণ সৈনিক যদি সেই মানের নীচে চলে যায় তাহলে তাদের মনে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সম্মানবোধ সৃষ্টি হতে পারে না। তারা পারস্পরিক কোন্দল ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ থেকেও রক্ষা পেতে পারে না।

—উদ্দেশ্য ও লক্ষের প্রতি এমন অনুরাগ ও ভালবাসা এবং তা অর্জনের জন্য এমন দৃঢ় সংকল্প থাকা চাই যা গোটা বাহিনীর মধ্যে জীবনপাত করার অদম্য আকাংখা সৃষ্টি করে দেবে আর যুদ্ধের ময়দানে তা প্রকৃতই মজবুত দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে থাকবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে যে শক্তিশালী সামরিক সংগঠনটি গড়ে উঠেছিল, যার সাথে সংঘর্ষে বড় বড় শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং শতাব্দীর পর

শতাব্দী কোন শক্তি যার মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারেনি এ সব গুণ ও বৈশিষ্টই ছিল তার ভিত্তি।

৪. কুরআন মজীদের বেশ কয়েকটি স্থানে অতি বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসাকে আল্লাহর নবী এবং তাদের পরম কল্যাণকামী হিসেবে জানার পরও বনী ইসরাঈল তাঁকে কতভাবে কষ্ট দিয়েছে এবং কিভাবে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। উদাহরণ হিসেবে দেখুন, সূরা বাকারাহ, আয়াত ৫১, ৫৫, ৬০, ৬৭ থেকে ৭১; আন নিসা, আয়াত ১৫৩; আল মায়েদা, আয়াত ২০ থেকে ২৬; আল আ'রাফ, আয়াত ১৩৮ থেকে ১৪১, ১৪৮ থেকে ১৫১; ত্বা হা, আয়াত ৮৬ থেকে ৯৮। বাইবেলে ইহুদীদের নিজেদের বর্ণিত ইতিহাসও এ ধরনের ঘটনায় পরিপূর্ণ। শুধু নমুনা স্বরূপ কয়েকটি ঘটনার জন্য দেখুন, যাত্রা পুস্তক, ৫ ঃ ২০—২১, ১৪ ঃ ১১—১২; ১৬ ঃ ২—৩; ১৭ ঃ ৩—৪; গণনাপুস্তক, ১১ঃ ১১—১৫; ১৪ ঃ ১—১০; ১৬ অধ্যায় সম্পূর্ণ; ২০ ঃ ১-৫; কুরআন মজীদের এ স্থানটিতে এসব ঘটনার প্রতি ইংগিত করে মুসলমানদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, বনী ইসরাঈল জাতি তাদের নবীর সাথে যে আচরণ করেছিল তারা যেন তাদের নিজেদের নবীর সাথে ঐরূপ আচরণ না করে। অন্যথায় বনী ইসরাঈল যে পরিণামের সম্মুখীন হয়েছিল তারাও সেই একই পরিণামের সম্মুখীন হওয়া থেকে রক্ষা পাবে না।

৫. অর্থাৎ যেসব মানুষ ইচ্ছা করে বাঁকা পথে চলতে চায় অযথা তাদেরকে সোজা পথে চালান এবং যারা আল্লাহর নাফরমানী করার জন্য বদ্ধপরিকর তাদেরকে জোর করে হিদায়াত দান করা আল্লাহর নিয়ম বা রীতি নয়। এর দ্বারা একথা আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কোন ব্যক্তি বা জাতির গোমরাহীর সূচনা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় না বরং স্বয়ং সেই ব্যক্তি বা জাতির পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। তবে এ ক্ষেত্রে আল্লাহর নিয়ম বা বিধান হলো, যারা গোমরাহীকে গ্রহণ করে তিনি তাদের জন্য সঠিক পথে চলার উপায়-উপকরণ নয়, বরং গোমরাহীর উপায়-উপকরণই সরবরাহ করেন যাতে যেসব পথে তারা নিজেদেরকে নিয়ে যেতে চায় সেসব পথে যেন অবাধে যেতে পারে। আল্লাহ তো মানুষকে বাছাই করে নেয়ার স্বাধীনতা (Freedom of choice) দিয়েছেন। এরপর এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রতিটি মানুষের বা মানুষের দল ও গোষ্ঠীর নিজের কাজ যে, তারা তাদের রবের আনুগত্য করবে কি করবে না এবং সঠিক পথ গ্রহণ করবে না বাঁকা পথের কোন একটিতে চলবে। এই বাছাই ও গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন জবরদস্তি নেই। কেউ যদি আনুগত্য ও হিদায়াতের পথ বেছে নেয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জোর করে গোমরাহী এবং নাফরমানীর পথে ঠেলে দেন না। আর কেউ যদি নাফরমানী করা এবং সঠিক পথ অনুসরণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তাহলে তাকে জোর করে আনুগত্য ও হিদায়াতের পথে নিয়ে আসাও আল্লাহর নিয়ম নয়। কিন্তু এটাও একটা বাস্তব ব্যাপার যে, কেউ নিজের জন্য যে পথই বেছে নিক না কেন সে পথে চলার জন্য উপায়-উপকরণ আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ সরবরাহ না করেন এবং অনুকূল অবস্থা ও পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ পথে কার্যত এক পাও অগ্রসর হতে পারে না। এটাই হলো আল্লাহর দেয়া তাওফীক বা আনুকূল্য যার ওপর মানুষের প্রতিটি চেষ্টা-সাধনা ফলপ্রসূ হওয়া নির্ভর করে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি ভাল কাজের তাওফীক আদৌ না চায়, বরং উল্টা মন্দ ও পাপ কাজের তাওফীক চায় তাহলে সে তাই

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ
بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝

আর স্মরণ করো[৬] ঈসা ইবনে মারয়ামের সেই কথা যা তিনি বলেছিলেন ঃ হে বনী ইসরাঈল, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসূল। আমি সেই তাওরাতের সত্যতা প্রতিপাদনকারী যা আমার পূর্বে এসেছে[৭] এবং একজন রসূলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম আহমাদ।[৮]

কিন্তু যখন তিনি তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করলেন তখন তারা বলল ঃ এটা তো স্পষ্ট প্রতারণা।[৯]

লাভ করবে। আর যখন সে মন্দ ও পাপ কাজের 'তাওফীক' লাভ করে তখন তার মন-মানসিকতার গোটা ছাঁচ এবং চেষ্টা-সাধনা ও কাজকর্মের পথও বাঁকা হয়ে যেতে থাকে। এমন কি ভাল ও কল্যাণকে গ্রহণ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা ধীরে ধীরে তার মধ্য থেকে নিঃশেষ হয়ে যায়। "তারা বাঁকা পথ ধরলে আল্লাহও তাদের দিল বাঁকা করে দিলেন" কথাটির অর্থ এটাই। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি নিজে গোমরাহী কামনা করে গোমরাহীর জন্য তৎপর থাকে এবং গোমরাহীতে নিমজ্জিত থেকে অধিকতর গোমরাহীর দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত করে তাকে জোর করে হিদায়াতের দিকে ফিরিয়ে দেয়া আল্লাহর আইন ও নিয়ম-নীতির পরিপন্থী ব্যাপার। কারণ যে পরীক্ষার জন্য মানুষকে দুনিয়ায় বাছাইয়ের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এরূপ কাজ সেই উদ্দেশ্য লক্ষকেই নস্যাত করে দেবে। আর এভাবে হিদায়াত লাভ করে মানুষ সঠিক পথে চললেও সে জন্য তার কোন প্রকার বিনিময় বা উত্তম প্রতিদান লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ারও যুক্তিসংগত কোন কারণ নেই। এ ক্ষেত্রে তো বরং যে ব্যক্তি বাধ্যতামূলক হিদায়াত লাভ করেনি এবং গোমরাহীর মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে তারও কোন প্রকার শাস্তি লাভ না করা উচিত। কারণ এমতাবস্থায় তার গোমরাহীর মধ্যে থেকে যাওয়ার সমস্ত দায়-দায়িত্ব আল্লাহর ওপরই বর্তায়। সে বরং আখেরাতে জবাবদিহির সময় এ যুক্তি পেশ করতে পারে যে, আপনার কাছে বাধ্যতামূলকভাবে হিদায়াত দান করার ব্যবস্থা যখন ছিল তখন আপনি আমাকে এই কৃপা থেকে বঞ্চিত রেখেছিলেন কেন? 'আল্লাহ তা'আলা ফাসেকদের হিদায়াত দান করেন না' বাণীটির তাৎপর্য এটাই। অর্থাৎ যেসব মানুষ নিজেরাই তাদের জন্য গোনাহ ও নাফরমানীর পথ বেছে নিয়েছে তিনি তাদেরকে আনুগত্যের পথে চলার 'তাওফীক' দেন না।

৬. এটা বনী ইসরাঈল জাতির দ্বিতীয়বারের নাফরমানির কথা। তারা একটি নাফরমানি করেছিল তাদের উত্থান যুগের শুরুতে। আর এটি হলো তাদের দ্বিতীয়

নাফরমানি যা তারা এই যুগেরই শেষ দিকে, সর্বশেষ পর্যায়ে করেছিলো। এরপর চিরদিনের জন্য তাদের ওপর আল্লাহর গযব নাযিল হলো। এ দু'টি ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদেরকে আল্লাহর রসূলের সাথে বনী ইসরাঈলের মত আচরণ করার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া।

৭. এই আয়াতাংশের তিনটি অর্থ। আর এ তিনটি অর্থই যথাযথ ও সঠিক।

এর একটি অর্থ হলো, আমি কোন স্বতন্ত্র এবং অভিনব দীন বা জীবন বিধান নিয়ে আসিনি। বরং হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যে দীন এনেছিলেন আমিও সেই দীন এনেছি। আমি তাওরাতকে রহিত বা বাতিল করতে আসিনি বরং তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী হিসেবে এসেছি। আল্লাহর রসূলগণ যেমন চিরদিনই তাঁদের পূর্বের নবী–রসূলদের সত্য হওয়ার কথা ঘোষণা করে এসেছেন আমিও তেমনি পূর্ববর্তী নবী–রসূলদের সত্যতা ঘোষণা করছি। তাই আমার রিসালাত মেনে নিতে দ্বিধা–সংকোচ করার কোন কারণ তোমাদের জন্য নেই।

দ্বিতীয় অর্থ হলো, আমার আগমন সম্পর্কে তাওরাতে যেসব সুসংবাদ বিদ্যমান আমি তার বাস্তব রূপ। তাই তোমাদের কর্তব্য আমার বিরোধিতা না করে এই ভেবে স্বাগত জানান যে, পূর্ববর্তী নবীগণ যার আগমনের সুসংবাদ আগে দিয়েছিলেন তিনি এখন এসে গিয়েছেন।

আর এই আয়াতাংশকে পরবর্তী আয়াতাংশের সাথে মিলিয়ে পড়লে তৃতীয় আরেকটি অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তাওরাতে আল্লাহর রসূল আহমাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগমনের যে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তার সত্যতা ঘোষণা করছি এবং নিজেও তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিচ্ছি। এই তৃতীয় অর্থ অনুসারে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের এই বাণী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দেয়া সেই সুসংবাদের প্রতি ইংগিত যা তিনি তাঁর কওমের সামনে ভাষণ দেয়ার সময় বলেছিলেন। সেই ভাষণে তিনি বলেছিলেন ঃ

"তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে, তোমার জন্য আমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন। তাঁহারই কথায় তোমরা কর্ণপাত করিবে। কেননা হোরেবে সমাজের (সমাবেশ) দিবসে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে এই প্রার্থনাই ত করিয়াছিলে, যথা আমি যেন আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রব পুনর্বার শুনিতে ও এই মহাগ্নি আর দেখিতে না পাই, পাছে আমি মারা পড়ি। তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উহারা ভালই বলিয়াছে। আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি পরিশোধ লইব।" (দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায় ১৮ ঃ শ্লোক—১৫ থেকে ১৯)

এটা তাওরাতের এমন একটা স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। এ ভাষণে হযরত মূসা (আ) তাঁর কওমকে আল্লাহ তা'আলার এ বাণী শুনাচ্ছেন যে, আমি তোমার জন্য তোমার ভাইদের

মধ্য থেকে একজনকে নবী করে পাঠাবো। একথা সবার কাছেই স্পষ্ট যে, কোন কওমের 'ভাই' কথার অর্থ ঐ কওমেরই কোন গোত্র বা খান্দান হতে পারে না। বরং তার অর্থ কেবল এমন কোন জাতিই হতে পারে যার সাথে তার বংশগত নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান। এর অর্থ যদি খোদ বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকেই কোন নবীর আগমন হতো তাহলে তার ভাষা হতো, আমি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই একজনকে নবী করে পাঠাব। অতএব বনী ইসরাঈলের ভাই অর্থ অনিবার্যভাবে হযরত ইসমাঈলের বংশধরগণই হতে পারে। আর হযরত ইবরাহীমের সন্তান হওয়ার কারণে হযরত ইসমাঈল ও তাঁর বংশধরগণ তাদের বংশগত আত্মীয় হিসেবে গণ্য। তাছাড়া বনী ইসরাঈলের কোন নবী এই ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তব রূপ হতে পারেন না। এর আরো একটি কারণ এই যে, হযরত মূসার পরে বনী ইসরাঈলদের মধ্যে কোন একজন নবী নয় বরং বহু সংখক নবী এসেছেন বাইবেলে যার ভূরি ভূরি বর্ণনা রয়েছে।

এই ভবিষ্যদ্বাণীতে দ্বিতীয় যে কথাটি বলা হয়েছে তাহলো, যাকে নবী বানিয়ে পাঠান হবে তিনি হবেন হযরত মূসার মত। এ কথা স্পষ্ট যে, এর অর্থ আকার-আকৃতি এবং জীবনের ঘটনাবলীর সাথে সাদৃশ্য মোটেই নয়। কারণ এ দিক দিয়ে বিচার করলে কোন ব্যক্তিই অপর কোন ব্যক্তির মত হয় না। আবার এর দ্বারা শুধু নবুওয়াতের গুণাবলীর দিক দিয়ে সাদৃশ্য বুঝায় না। কারণ হযরত মূসার পরে যত নবীর আগমন ঘটেছে তাঁদের সবারই নবীসুলভ গুণাবলী ছিল এক অভিন্ন। তাই কোন একজন নবীর এরূপ বৈশিষ্ট হতে পারে না যে, তিনি এই গুণের ক্ষেত্রে তাঁর অনুরূপ হবেন। তাই এ দু'টি দিক দিয়ে সাদৃশ্য বাদ পড়ার পর অপর কোন সাদৃশ্য দ্বারা যদি আগমনকারী নবীকে নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করা বোধগম্য হতে পারে তবে সেই সাদৃশ্য এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না যে, আগমনকারী নবী একটি স্বতন্ত্র শরীয়াত নিয়ে আসবেন। একমাত্র এদিক দিয়েই তিনি হতে পারেন হযরত মূসার অনুরূপ। আর এ বৈশিষ্ট হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কোন নবীর মধ্যে নেই। কারণ তাঁর আগে বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যত নবীই এসেছেন তাঁরা ছিলেন হযরত মূসার শরীয়াতের অনুসারী। তাঁদের কেউ-ই স্বতন্ত্র কোন শরীয়াত নিয়ে আসেননি। ভবিষ্যদ্বাণীর নিম্নবর্ণিত বক্তব্য দ্বারা এ ব্যাখ্যা আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে ঃ

"এটা তোমার (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের) সেই প্রার্থনা অনুসারে হবে যা তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে সমাবেশের দিন হোরেবে করেছিলে, যেন আমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রব পুনর্বার শুনিতে এবং এই মহাগ্নি আর দেখতে না পাই, পাছে আমি মারা পড়ি। তখন সদাপ্রভু আমাকে বললেন, তারা ভালই বলছে। আমি তাদের জন্য তাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য থেকে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করবো ও তার মুখে আমার বাক্য দিব।"

এই বাক্যটির মধ্যে উল্লেখিত হোরেব অর্থ সেই পাহাড় হযরত মূসাকে প্রথমবার যেখানে শরীয়াতের আহকাম বা বিধিবিধান দেয়া হয়েছিল। আর এর মধ্যে বনী ইসরাঈলদের যে প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হলো, ভবিষ্যতে যদি আমাদেরকে কোন শরীয়াত দেয়া হয় তাহলে যেন সেই ভীতিকর অবস্থার মধ্যে না দেয়া হয়, যা শরীয়াত দেয়ার সময় হোরেব পাহাড়ের পাদদেশে সৃষ্টি করা হয়েছিল। কুরআন মজীদ ও

বাইবেল উভয় গ্রন্থে সেই সব অবস্থার উল্লেখ বিদ্যমান। (দেখুন, সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ৫৫, ৫৬, ৬৩; আল আ'রাফ, আয়াত ১৫৫, ১৭১; বাইবেল, যাত্রাপুস্তক ১৯ ঃ ১৭, ১৮;) এর জবাবে হযরত মূসা বনী ইসরাঈলকে বলছেন ঃ আল্লাহ তোমাদের এ প্রার্থনা কবুল করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি তাদের জন্য এমন একজন নবী পাঠাবো, যার মুখে আমার কথা দিব। অর্থাৎ হোরেব পাহাড়ের পাদদেশে যে ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিল পরবর্তী শরীয়াত দেয়ার সময় সেই অবস্থার সৃষ্টি করা হবে না। বরং এর পরে যে নবীকে এই পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করা হবে তাঁর মুখে আল্লাহর বাণী দিয়ে দেয়া হবে এবং তিনি আল্লাহর বান্দাদের তা শুনিয়ে দেবেন। এই স্পষ্ট কথাগুলো নিয়ে চিন্তা–ভাবনা ও বিচার–বিবেচনার পর এ ব্যাপারে কি কোন সন্দেহ থাকে যে, এ বাণীর বাস্তব রূপ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কেউ নয়? হযরত মূসার পরে স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ শরীয়াত কেবল তাঁকেই দেয়া হয়েছে। হোরেব পাহাড়ের পাদদেশে বনী ইসরাঈলের যেমন সমাবেশ হয়েছিল, তাঁকে শরীয়াত দেয়ার সময় এমন কোন সমাবেশ হয়নি এবং শরীয়াতের বিধিবিধান দেয়ার সময় কোন ক্ষেত্রেই সেইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করা হয়নি যা সেখানে করা হয়েছিল।

৮. এটি কুরআন মজীদের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। ইসলাম বিরোধীরা এ আয়াত নিয়ে যেমন অনেক অপপ্রচার চালিয়েছে তেমনি জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধও করেছে। কারণ এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম স্পষ্টভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম উল্লেখ করে তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তাই বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা আবশ্যক।

এক ঃ এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র নাম বলা হয়েছে 'আহমাদ'। আহমাদ শব্দের দু'টি অর্থ। এক, আল্লাহর সর্বাধিক প্রশংসাকারী। দুই, সবচেয়ে বেশী প্রশংসিত অথবা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী প্রশংসার যোগ্য। সহীহ হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত যে এটি ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি নাম। মুসলিম ও আবু দাউদ তায়ালিসীতে হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَالْحَاشِرُ "আমি মুহাম্মাদ, আমি আহ্মাদ এবং আমি সমবেতকারী.....হযরত যুবাইর ইবনে মুতয়িম থেকে ইমাম মালেক, বুখারী, মুসলিম, দারেমী, তিরমিযী এবং নাসায়ী একই বক্তব্য সম্বলিত অনেকগুলো হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই নামটি সাহাবীদের মধ্যেও পরিচিত ছিল। হযরত হাস্সান ইবনে সাবেতের কবিতার একটি ছত্রে বলা হয়েছে ঃ

صَلَّى الْاِلٰهُ وَمَنْ تَحِفُّ بِعَرْشِهٖ ، وَالطَّيِّبُوْنَ عَلَى الْمُبَارَكِ اَحْمَدُ

মহান আল্লাহ, তাঁর আরশের চারপাশে সমবেত ফেরেশতারা এবং সব পবিত্র সত্তা বরকত ও কল্যাণময় আহমাদের ওপর দরূদ পাঠিয়েছেন।

এ বিষয়টি ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লামের নাম শুধু মুহাম্মাদ ছিল না বরং আহমাদও ছিল। আরবদের গোটা সাহিত্যে কোথাও এ কথার উল্লেখ নেই যে, নবীর (সা) পূর্বে কারো নাম আহমাদ রাখা হয়েছিল। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে এত অধিক সংখ্যক লোকের নাম আহমাদ ও গোলাম আহমাদ রাখা হয়েছে যে, তা হিসেব করাও অসম্ভব। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে যে, নবুওয়াতের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র উম্মাতের মধ্যে তাঁর এই পবিত্র নামটি সুপরিচিত ও সুবিদিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম যদি আহমাদ না হয়ে থাকে তাহলে যারা তাদের ছেলেদের নাম গোলাম আহমাদ রেখেছে তারা তাদের ছেলেদেরকে কোন্ আহমাদের গোলাম হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল?

দুই ঃ যোহন লিখিত সুসমাচারে সাক্ষ দেয় যে, হযরত ঈসা মাসীহর আগমনের সময় বনী ইসরাঈল জাতি তিনজন মহাব্যক্তিত্বের আগমনের অপেক্ষায় ছিল। এক, মাসীহ, দুই, এলিয় (অর্থাৎ হযরত ইলিয়াসের পুনরায় আগমন) এবং তিন, "সেই নবী"। যোহনের সুসমাচারের ভাষা হলো ঃ

"আর যোহনের (হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম) সাক্ষ্য এই,—যখন যিহূদিগণ কয়েক জন যাজক লেবীয়কে দিয়া যিরূশালেম হইতে তাঁহার কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, 'আপনি কে?' তখন তিনি স্বীকার করিলেন, অস্বীকার করিলেন না; তিনি স্বীকার করিলেন যে, আমি সেই খ্রীষ্ট নই। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি? আপনি কি এলিয়? তিনি বলিলেন, আমি নই। আপনি কি সেই ভাববাদী? তিনি উত্তর করিলেন, না। তখন তাহারা তাঁহাকে কহিল, আপনি কে? যাঁহারা আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে যেন উত্তর দিতে পারি। আপনার বিষয়ে আপনি কি বলেন? তিনি কহিলেন আমি "প্রান্তরে এক জনের রব, যে ঘোষণা করিতেছে, তোমরা প্রভুর পথ সরল কর" ..... তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যদি সেই খ্রীষ্ট নহেন, এলিয়ও নহেন, সেই ভাববাদীও নহেন তবে বাপ্তাইজ করিতেছেন কেন? (অধ্যায়—১, পদ ১৯ থেকে ২৫)

এসব কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, বনী ইসরাঈল হযরত ঈসা মাসীহ এবং হযরত ইলিয়াস ছাড়াও আরো একজন নবীর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। হযরত ইয়াহইয়া সেই নবী ছিলেন না। সেই নবীর আগমন সম্পর্কে আকীদা-বিশ্বাস বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে এতটা প্রসিদ্ধ ও সর্বজনবিদিত ছিল যে, তাঁকে বুঝানোর জন্য 'সেই নবী' কথাটা বলাই যেন যথেষ্ট ছিল। পুনরায় একথা বলার আর প্রয়োজনই হতো না যে, তাওরাতে যার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া এসব কথা থেকে এও জানা গেল যে, তিনি যে নবীর প্রতি ইংগিত করছিলেন তাঁর আগমনের বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত ছিল। কেননা, হযরত ইয়াহইয়াকে যখন বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করা হলো, তখন তিনি একথা বলেননি যে, তোমরা কোন্ নবী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ, আর কোন নবী তো আসেবন না?

তিন ঃ এবার সেই সব ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি একটু লক্ষ করুন যা যোহনের সুসমাচারের ১৪ থেকে ১৬ পর্যন্ত অধ্যায়ে একাধারে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

"আর আমি পিতার নিকট নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন; তিনি সত্যের আত্মা; জগত তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না; কেননা সে তাঁহাকে দেখেনা, তাঁহাকে জানেও না; তোমরা তাঁহাকে জান, কারণ তিনি তোমাদের নিকটে অবস্থিতি করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন" (১৪ঃ ১৬, ১৭)

"তোমাদের নিকটে থাকিতে থাকিতেই আমি এইসকল কথা কহিলাম। কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সে সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন।" (১৪ ঃ ২৫, ২৬)

"এর পর আমি তোমাদের সহিত আর অধিক কথা বলিব না; কারণ জগতের অধিপতি আসিতেছে, আর আমাতে তাহার কিছুই নাই।" (১৪ ঃ ৩০)

"যাঁহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের কাছে পাঠাইয়া দিব, সত্যের সেই আত্মা, যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আইসেন—যখন সেই সহায় আসিবেন—তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন।" (১৫ ঃ ২৬)

"তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই সহায় তোমাদের নিকটে আসিবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।" (১৬ ঃ ৭)

"তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পার না। পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন; কেননা যাহা আমার, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন। পিতার যাহা যাহা আছে সকলই আমার; এই জন্য বলিলাম, যাহা আমার, তিনি তাহাই লইয়া থাকেন, ও তোমাদিগকে জানাইবেন।" (১৬ ঃ ১২-১৫)

চার ঃ বাইবেলের এসব উদ্ধৃতির সঠিক অর্থ নিরূপণের জন্য সর্বপ্রথম জানা দরকার যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর সমকালীন ফিলিস্তিনবাসীদের ভাষা ছিল আরামীয় ভাষার সেই কথ্য রূপ যাকে সুরিয়ানী (SYRIAC প্রাচীন সিরীয় ভাষা) বলা হয়। ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের দুই আড়াই শত বছর পূর্বেই সালুকী (Seleucide) শাসন আমলে এ অঞ্চল থেকে ইব্রিয় বা হিব্রু ভাষা বিদায় নিয়েছিল এবং সুরিয়ানী ভাষা তার স্থান দখল করেছিল। যদিও প্রথমে সালুকী এবং পরে রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাবে গ্রীক ভাষাও এ অঞ্চলে পৌঁছেছিল কিন্তু যে শ্রেণীটি সরকার ও রাজদরবারে স্থান করে নিয়েছিল কিংবা স্থান করে নেয়ার জন্য গ্রীক ভাবধারা পন্থী হয়ে গিয়েছিল কেবল তাদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষ সুরিয়ানী ভাষার একটি বিশেষ কথ্য রূপ (Dialect) ব্যবহার করত যার ধ্বনি, কথনভঙ্গি, উচ্চারণরীতি এবং বাকধারা দামেশক অঞ্চলে প্রচলিত সুরিয়ানী ভাষারূপ থেকে ভিন্ন ছিল এবং এ দেশের সাধারণ মানুষ গ্রীক ভাষার সাথে এতটা অপরিচিত ছিল যে, ৭০ খৃষ্টাব্দে যিরুশালেম দখলের পর রোমান জেনারেল টিটুস (Titus) যিরুশালেমের অধিবাসীদের সামনে গ্রীক ভাষায় বক্তৃতা করলে তা সুরিয়ানী ভাষায় অনুবাদ করতে হয়েছিল। এ থেকে আপনা আপনি প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর শাগরিদদের যা বলেছিলেন তা অবশ্যই সুরিয়ানী ভাষায় হবে।

দ্বিতীয় যে, বিষয়টি জানা জরুরী তা এই যে, বাইবেলের চারটি পুস্তক বা সুসমাচারই সেই সব গ্রীক ভাষাভাষী খৃষ্টানদের লেখা যারা হযরত ঈসার পর এ ধর্ম গ্রহণ করেছিল। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বাণী ও কাজকর্মের বিস্তারিত বিবরণ তাদের কাছে সুরিয়ানী ভাষী কোন খৃষ্টানের মাধ্যমে লিখিত আকারে নয় বরং মৌখিক বর্ণনার আকারে পৌঁছেছিল এবং সুরিয়ানী ভাষার এই বর্ণনাসমূহকে তারা নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করে লিপিবদ্ধ করেছিল। এসব পুস্তক বা সুসমাচারের কোনটিই ৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত নয়। আর যোহন লিখিত সুসমাচার তো হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের একশত বছর পরে সম্ভবত এশিয়া মাইনরের এফ্সুস শহরে বসে লেখা। তাছাড়াও গ্রীক ভাষায় সর্বপ্রথম লিখিত সুসমাচারের মূল কোন কপিও সংরক্ষিত নাই। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে গ্রীক ভাষায় লিখিত যেসব পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন জায়গা থেকে খুঁজে খুঁজে এনে একত্রিত করা হয়েছিল তার কোনটিই চতুর্থ শতাব্দির পূর্বের নয়। তাই তিন শতাব্দীকাল সময়ে এসবের মধ্যে কি কি রদবদল এবং পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়েছে তা বলা মুশকিল। যে জিনিস এ বিষয়টিকে বিশেষভাবে সন্দেহজনক করে তোলে তা হলো, খৃষ্টানরা তাদের পছন্দ মাফিক জেনে বুঝে তাদের সুসমাচারের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনকে বৈধ মনে করে এসেছে। ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা (১৯৪৬ সনের সংস্করণে) এর বাইবেল শীর্ষক প্রবন্ধে প্রবন্ধের রচয়িতা লিখছেন ঃ

"বাইবেলের সুসমাচারসমূহে অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাক্য যা পদকেই অন্য কোন সূত্র থেকে এনে গ্রন্থের মধ্যে শামিল করার মত সুস্পষ্ট পরিবর্তন করা হয়েছে জেনে শুনে। .....স্পষ্টত উদ্দেশ্যমূলকভাবে এসব পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। তা করেছে এমন সব লোক যারা মূল গ্রন্থে অন্তরভুক্ত করার জন্য কোন জায়গা থেকে কিছু তথ্য লাভ করেছে এবং গ্রন্থকে উন্নত ও অধিক কল্যাণকর বানানোর জন্য নিজের পক্ষ থেকে তার মধ্যে সেই সব তথ্য শামিল করার অধিকারী বলে নিজেদেরকে মনে করেছে.....এরূপ বহুসংখ্যক সংযোজন দ্বিতীয় শতকেই হয়েছিল। কিন্তু তার উৎস সম্পর্কে জানা যায়নি।"

বর্তমানে বাইবেলের সুসমাচারসমূহে আমরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের যেসব বাণী দেখতে পাই তা সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সঠিকভাবে উদ্ধৃত হয়েছে এবং তাতে কোন রদবদল ও পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধিত হয়নি এমন কথা বলা উপরোক্ত পরিস্থিতির আলোকে নিশ্চিতভাবেই অত্যন্ত কঠিন।

তৃতীয় এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মুসলমানদের বিজয়ের পরেও প্রায় তিন শতাব্দীকাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনের খৃষ্টান অধিবাসীদের ভাষা ছিল সুরিয়ানী এবং খৃষ্টীয় নবম শতকে গিয়ে আরবী ভাষা সে স্থান দখল করে। সুরিয়ানী ভাষাভাষী ফিলিস্তিনবাসীদের মাধ্যমে খৃষ্টীয় ঐতিহ্য বা ধর্মাচরণ, আচার-অনুষ্ঠান ও ইতিহাস সম্পর্কে যেসব তথ্য প্রথম তিন শতাব্দীতে মুসলিম মনীষীগণ লাভ করেছিলেন তা সেই সব লোকদের লব্ধ তথ্যের তুলনায় অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য হওয়া উচিত যা তাদের কাছে সুরিয়ানী থেকে গ্রীক এবং গ্রীক থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদের পর অনুবাদ হয়ে পৌঁছেছিল। কেননা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মুখ থেকে উচ্চারিত মূল সুরিয়ানী শব্দসমূহ মুসলিম মনীষীদের কাছে সংরক্ষিত থাকার সম্ভাবনাই বেশী ছিল।

পাঁচ ঃ অনস্বীকার্য এসব ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি লক্ষ করে দেখুন ওপরে উদ্ধৃত যোহন লিখিত সুসমাচারের পদগুলোতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এমন একজন আগমনকারীর আগমনের সুসংবাদ দিচ্ছেন যিনি তাঁর পরে আসবেন। তিনি তাঁর সম্পর্কে বলছেন ঃ তিনি হবেন গোটা বিশ্বের নেতা (সরওয়ারে আলম), চিরকাল থাকবেন, সত্যের সবগুলো পথ দেখাবেন এবং নিজে তাঁর (হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে সাক্ষ দেবেন। যোহন লিখিত সুসমাচারের এসব বাক্যের মধ্যে "পবিত্র আত্মা" এবং "সত্যের আত্মা" ইত্যাদি কথাগুলো অন্তরভুক্ত করে মূল বিষয় ও বক্তব্যকে বিকৃত করার পুরোপুরি চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গভীর মনোযোগ সহকারে বাক্যগুলো পড়লে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, যে আগমনকারীর আগমনের কথা বলা হয়েছে তিনি কোন আত্মা নন বরং মানুষ। তিনি এমন এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যাঁর শিক্ষা হবে বিশ্বজনীন, সর্বব্যাপী এবং কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী সেই বিশেষ ব্যক্তিকে বুঝানোর জন্য বাইবেলের বাংলা অনুবাদে 'সহায়' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং যোহন লিখিত মূল সুসমাচারে গ্রীক ভাষার যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল সে ব্যাপারে খৃস্টানদের অনড় দাবী হচ্ছে, যে শব্দটি ছিল Paracletis কিন্তু শব্দটির অর্থ নিরূপণে খোদ খৃস্টান পণ্ডিতগণকে যথেষ্ট জটীলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। মূল গ্রীক ভাষায় Paraclet শব্দটির কয়েকটি অর্থ হয়। কোন স্থানের দিকে ডাকা, সাহায্যের জন্য ডাকা, ভীতি প্রদর্শন করা, সাবধান করা, উৎসাহিত করা, প্ররোচিত করা, আশ্রয় প্রার্থনা করা বা আবেদন নিবেদন করা এবং দোয়া করা। তাছাড়াও গ্রীক বাগবিধি অনুসারে শব্দটির অর্থ হয় সান্ত্বনা দেয়া, পরিতৃপ্ত করা, সাহস যোগানো। বাইবেলের যেসব জায়গায় এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেসব জায়গায় এর কোন একটি অর্থও খাপ খায় না। ওরাইজেন (Origen) কোথাও এর অনুবাদ করেছেন Consolator আবার কোথাও অনুবাদ করেছেন Deprecator। কিন্তু অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ এ দু'টি অনুবাদ প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা, প্রথমত গ্রীক ভাষার ব্যাকরণ অনুসারে এটি শুদ্ধ নয়। দ্বিতীয়ত সবগুলো বাক্যের যেখানে যেখানে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে এ অর্থ খাপ খায় না। আরো কিছু সংখ্যক অনুবাদক এর অনুবাদ করেছেন Teacher. কিন্তু গ্রীক ভাষার ব্যবহার রীতি অনুসারে এ অর্থও গ্রহণ করা যেতে পারে না। এর অনুবাদে তার তুলিয়ান এবং অগাষ্টাইন Advocate শব্দটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আরো কিছু সংখ্যক লোক Assistant, Camforter এবং Consoler ইত্যাদি শব্দ গ্রহণ করেছেন। (দেখুন ইনসাইক্লোপেডিয়া অব বাইবেলিক্যাল লিটারেচার, শব্দ—প্যারাক্লিটাস)।

এখন মজার ব্যাপার হলো, গ্রীক ভাষাতেই অন্য একটি শব্দ আছে Periclytos.যার অর্থ প্রশংসিত। এ শব্দটি সম্পূর্ণরূপে محمد শব্দের সমার্থক। উচ্চারণের ক্ষেত্রেও Periclytos এবং Paracleteus এর মধ্যে বেশ মিল আছে। অসম্ভব নয় যে, যেসব খৃস্টান মহাত্মনরা তাদের ধর্মগ্রন্থসমূহে নিজেদের মর্জি ও পছন্দ মাফিক নির্দ্বিধায় পরিবর্তন পরিবর্ধন করতে অভ্যস্ত ছিলেন তারা যোহন কর্তৃক বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর এই শব্দটিকে নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী দেখতে পেয়ে তা লিপিবদ্ধ করার সময় কিছুটা রদবদল করে দিয়েছে। এ বিষয়টি যাঁচাই করার জন্য যোহন কর্তৃক লিখিত আদি গ্রীক ভাষার সুসমাচার গ্রন্থ কোথাও বর্তমান নেই। তাই দু'টি শব্দের মধ্যে মূলত কোন্‌টি ব্যবহার করা হয়েছিল তা অনুসন্ধান করে দেখার সুযোগ নেই।

ছয় ঃ কিন্তু যোহন কোন্ গ্রীক শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন তার ওপরে এ বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা নির্ভর করে না। কেননা তাও অনুবাদ। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, ফিলিস্তিনের সুরিয়ানী ভাষা ছিল হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ভাষা। তাই তিনি তাঁর সুসংবাদ বাণীতে যে শব্দ ব্যবহার করে থাকবেন তা অবশ্যই সুরিয়ানী ভাষারই কোন শব্দ হবে। সৌভাগ্যবশত আমরা সুরিয়ানী ভাষার সেই মূল শব্দটি পাচ্ছি ইবনে হিশামের সীরাত গ্রন্থে এবং তার সমার্থক গ্রীক শব্দটি কি তাও সাথে সাথে ঐ একই গ্রন্থ থেকে জানা যাচ্ছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে ইবনে হিশাম ইউহান্নাস (যোহন)–এর সুসমাচারের ১৫ অধ্যায়ের ২৩ থেকে ২৭ পদ এবং ১৬ অধ্যায়ের পুরো অংশের অনুবাদ উদ্ধৃত করেছেন এবং তাতে গ্রীক ভাষার "فارقليط" শব্দের জায়গায় সুরিয়ারী ভাষার منحمنا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অতপর ইবনে ইসহাক অথবা ইবনে হিশাম এভাবে তার ব্যাখ্যা করেছেন যে, মুন্হামান্না (منحمنا) শব্দের অর্থ সুরিয়ানী ভাষায় মুহাম্মাদ এবং গ্রীক ভাষায় বারকালীতুস (برقليطس) হয়। (ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৮)।

এখন দেখুন, ইতিহাস থেকে একথা প্রমাণিত যে, খৃষ্টীয় নবম শতক পর্যন্ত ফিলিস্তিনের খৃষ্টান জনগোষ্ঠীর ভাষা ছিল সুরিয়ানী। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই এ অঞ্চল ইসলামবিজিত অঞ্চলের অন্তরভুক্ত ছিল। ইবনে ইসহাক ৭৬৮ খৃষ্টাব্দে এবং ইবনে হিশাম ৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইনতিকাল করেন। এর অর্থ হলো, তাঁদের উভয়ের যুগেই ফিলিস্তিনের খৃষ্টানরা সুরিয়ানী ভাষায় কথা বলত। আর ইবনে ইসহাক ও ইবনে হিশামের জন্য তাঁদের নিজ দেশের খৃষ্টান নাগরিকদের সাথে যোগাযোগ বা সম্পর্ক স্থাপন মোটেই কোন কঠিন বিষয় ছিল না। তা ছাড়াও সে সময় লক্ষ লক্ষ গ্রীক ভাষী খৃষ্টান ইসলামী ভূখণ্ডে বসবাস করত। তাই সুরিয়ানী ভাষার কোন্ শব্দ গ্রীক ভাষার কোন্ শব্দের সমর্থক তা জেনে নেয়াও তাঁদের জন্য কঠিন ছিল না। এখন কথা হলো, ইবনে ইসহাকের উদ্ধৃত অনুবাদে যদি সুরিয়ানী শব্দ منحمنا (মুনহামান্না) ব্যবহৃত হয়ে থাকে আর ইবনে ইসহাক বা ইবনে হিশাম যদি তার ব্যাখ্যা এই করে থাকেন যে, আরবী ভাষায় তার সমার্থক শব্দ "মুহাম্মাদ" এবং গ্রীক ভাষায় "বারকালীতুস" তাহলে এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশই আর থাকে না যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র নাম নিয়েই তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। সাথে সাথে একথাও জানা যায় যে, যোহন কর্তৃক গ্রীক ভাষায় লিখিত সুসমাচারে মূলত Periclytos শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছিল যা পরবর্তীকালে কোন এক সময়ে খৃষ্টানরা পরিবর্তন করে Paracletus বানিয়ে দিয়েছে।

সাত ঃ এর চেয়েও প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রমাণ হলো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের একটি বর্ণনা। তাতে তিনি বলেছেন, নাজ্জাশী যখন তাঁর দেশ হাবশায় হিজরাতকারী মুহাজিরদের তাঁর দরবারে ডেকে পাঠালেন এবং হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুখে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষাসমূহ সম্পর্কে শুনলেন তখন তিনি বলে উঠলেন ঃ

مَرْحَبًا بِكُمْ وَبِمَنْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِهِ اَشْهَدُ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَّهُ الَّذِىْ نَجِدُ فِى الْاِنْجِيْلِ وَاَنَّهُ الَّذِىْ بَشَّرَ بِهِ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ (مسند احمد)

"স্বাগত জানাই তোমাদেরকে আর স্বাগত জানাই তাঁকেও যার নিকট থেকে তোমরা এসেছ। আমি সাক্ষ দিচ্ছি, তিনি আল্লাহর রসূল। আর তিনিই সেই সত্তা যাঁর উল্লেখ আমরা ইনজীলে দেখতে পাই এবং তিনিই সেই সত্তা যার সুসংবাদ ঈসা ইবনে মারয়াম দিয়েছিলেন।"

বিভিন্ন হাদীসে এ কাহিনী খোদ হযরত জা'ফর (রা) এবং হযরত উম্মে সালমা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে শুধু এ কথাই প্রমাণিত হয় না যে, সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে নাজ্জাশী জানতেন, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম একজন নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। বরং একথাও প্রমাণিত হয় যে, বাইবেলের সুসমাচারে সেই নবীর এমন সব সুস্পষ্ট লক্ষণাদিরও উল্লেখ ছিল যার ভিত্তিতে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই যে সেই নবী সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে নজ্জাশী একটুও দ্বিধাগ্রস্ত হননি। তবে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের এ সুসংবাদ সম্পর্কে নাজ্জাশীর জ্ঞানের সূত্র ও উৎস যোহন লিখিত এই সুসমাচার ছিল, না অন্য আর কোন উৎস ও সূত্র সে সময় বর্তমান ছিল, এ বর্ণনা থেকে তা জানা যায় না।

আট ঃ সত্য কথা হলো, খৃষ্টান গীর্জাসমূহ কর্তৃক নির্ভরযোগ্য ও সর্বসমর্থিত (Canonical Gospels) বলে ঘোষিত চারখানি সুসমাচার যে কেবল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কেই হযরত ঈসার (আ) ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ জানার নির্ভরযোগ্য উৎস হতে পারে না, তাই নয়, বরং তা খোদ হযরত ঈসার (আ) নিজের সঠিক জীবন বৃত্তান্ত ও শিক্ষাসমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়ারও নির্ভরযোগ্য উৎস নয়। বরং তা জানার অধিক নির্ভরযোগ্য উৎস হচ্ছে বার্নাবাসের সেই সুসমাচার যাকে গীর্জাসমূহ বেআইনী ও অনির্ভরযোগ্য (Apocryphal) বলে উড়িয়ে দিয়ে থাকে। খৃষ্টানরা তা গোপন করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। শত শত বছর পর্যন্ত তা লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন করে রাখা হয়েছিল। ইটালীয় ভাষায় অনূদিত এর একটি মাত্র কপি ষোড়শ শতাব্দীতে পোপ সিক্সটাসের (Sixtus) লাইব্রেরীতে পাওয়া যেত। কিন্তু তা পড়ার অনুমতি কারো ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে তা জন টোলেন্ড নামক এক ব্যক্তির হাতে আসে। অতপর বিভিন্ন হাত ঘুরে ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে তা ভিয়েনার ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীতে পৌঁছে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এ গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ অক্সফোর্ডের ক্লেরিন্ডন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু প্রকাশিত হওয়ার পর পরই সম্ভবত খৃষ্টান জগত আচ করতে পারে যে, যে ধর্মকে হযরত ঈসার নামে নামকরণ করা হয় এ গ্রন্থ তারই মূলোৎপাটন করছে। তাই এর মুদ্রিত কপিসমূহ বিশেষ কোন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে উধাও করে দেয়া হয়। এরপর তা আর কখনো প্রকাশিত হতে পারেনি। এ গ্রন্থেরই ইটালিয়ান ভাষার অনুবাদ থেকে স্প্যানিশ ভাষায় অনূদিত আরেকটি কপি অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাওয়া যেত। জর্জ সেল তাঁর কুরআনের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় এ গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেটাও কোথাও গায়েব করে দেয়া হয়েছিল এবং বর্তমানে কোথাও তার সন্ধান পাওয়া যায় না। অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত ইংরেজী অনুবাদের একটি ফটোষ্ট্যাট কপি দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। আমি

এর প্রতিটি শব্দ পড়েছি। আমার মনে হয়, এটা অতি বড় একটা নিয়ামত। খৃষ্টানরা কেবল হিংসা-বিদ্বেষ ও হঠকারিতার কারণে এর থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

খৃষ্টীয় সাহিত্যে যেখানেই এই ইনজিল বা সুসমাচারের উল্লেখ দেখা যায়, সেখানেই একথা বলে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, এটা কোন মুসলমানের রচিত নকল সুসমাচার যা বার্নাবাসের নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এটা একটা নির্জলা মিথ্যা কথা। এত বড় একটা মিথ্যা বলার কারণ এই যে, এ গ্রন্থের বিভিন্নস্থানে স্পষ্টভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী আছে। প্রথমত এই সুসমাচার গ্রন্থখানি পড়লে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এ গ্রন্থ কোন মুসলমানের রচনা হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, এ গ্রন্থ যদি কোন মুসলমানের রচিত হতো তাহলে মুসলমানদের মধ্যে তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ত এবং মুসলিম মনীষী ও পন্ডিতদের রচনায় ব্যাপকভাবে এর উল্লেখ থাকত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অবস্থা হলো জর্জ সেলের কুরআনের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকার পূর্বে এর অস্তিত্ব সম্পর্কেই মুসলমানদের আদৌ জানা ছিল না। তাবারয়ী, ইয়া'কূবী, মাস'উদী, আল বিরুনী ও ইবনে হাযম এবং অন্যান্য গ্রন্থকারগণ ছিলেন খৃষ্টীয় সাহিত্য সম্পর্কে গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী মুসলিম মনীষী। তাঁদের কারো রচনাতেই খৃষ্টান ধর্ম সম্পর্কিত আলোচনায় বার্নাবাসের সুসমাচারের আভাস-ইংগিত পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ইসলামী বিশ্বের গ্রন্থাগারসমূহে যেসব গ্রন্থরাজি ছিল ইবনে নাদীম রচিত "আল ফিহরিস্ত" এবং হাজী খলীফা রচিত "কাশফুয্ যুনুন" গ্রন্থই তার ব্যাপক ও সর্বোত্তম তালিকা গ্রন্থ। এ দু'টি গ্রন্থেও তার কোন উল্লেখ নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে কোন মুসলমান পণ্ডিতই বার্নাবাসের সুসমাচারের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি। একথাটি মিথ্যা হওয়ার তৃতীয় এবং সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মেরও ৭৫ বছর আগে পোপ প্রথম গ্লাসিয়াসের (Gelasius) যুগে খারাপ আকীদা ও বিভান্তিকর (Heretical) গ্রন্থরাজির যে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং পোপের দেয়া একটি ফতোয়ার জোরে যা পড়তে নিষেধ করা হয়েছিল তার মধ্যে বার্নাবাসের সুসমাচার (Evangelium Barnabe) গ্রন্থখানিও অন্তরভুক্ত ছিল। প্রশ্ন হলো, তখন মুসলমান এসেছিল কোথা থেকে যে এই নকল ইনজীল বা সুসমাচার রচনা করেছিল? খোদ খৃষ্টান পণ্ডিত পুরোহিতগণও একথা স্বীকার করেছেন যে, সিরিয়া, স্পেন, মিসর প্রভৃতি দেশে প্রাথমিক যুগের খৃষ্টান গীর্জাসমূহে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বার্নাবাসের সুসমাচার প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ষষ্ঠ শতাব্দীতে এসে তা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

নয় ঃ এই সুসমাচার থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম সম্পর্কে হযরত ঈসার সুসংবাদসমূহ উদ্ধৃত করার আগে গ্রন্থখানির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা প্রয়োজন যাতে তার গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া যায় এবং একথাও জানা যায় যে, খৃষ্টানরা এর প্রতি এত মারমুখী কেন?

যে চারখানি সুসমাচারকে আইনসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করে বাইবেলের অন্তরভুক্ত করা হয়েছে তার কোনটিরই লেখক হযরত ঈসার সাহাবী ছিলেন না। তাঁরা কেউ একথা দাবীও করেননি যে, তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাহাবীদের নিকট থেকে তথ্য নিয়ে তাঁর সুসমাচারে লিপিবদ্ধ করেছেন। যেসব উৎস থেকে তাঁরা তথ্য

গ্রহণ করেছেন তার কোন বরাতও তারা উল্লেখ করেননি। যদি তাঁরা বরাত উল্লেখ করতেন তাহলে তা থেকে জানা যেতো যে, বর্ণনাকারী যেসব ঘটনা বর্ণনা করছেন এবং যেসব বাণী উদ্ধৃত করছেন তা তিনি নিজে দেখেছেন এবং শুনেছেন না একজন বা কয়েকজনের মাধ্যমে তা তাঁর কাছে পৌঁছেছে? পক্ষান্তরে বার্নাবাসের সুসমাচারের লেখক বলেছেন আমি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রথম বারজন হাওয়ারীর একজন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমি হযরত ঈসা মাসীহর সাথে ছিলাম এবং নিজের চোখে দেখা ঘটনা এবং নিজের কানে শোনা বাণী এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করছি। শুধু এতটুকুই নয়, বরং গ্রন্থের শেষ পর্যায়ে তিনি বলছেন, পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার সময় হযরত মাসীহ আমাকে বলেছিলেন ঃ আমার ব্যাপারে যেসব ভুল ধারণা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে তা বিদূরিত করা এবং দুনিয়ার সামনে সঠিক অবস্থা তুলে ধরা তোমার দায়িত্ব।

কে ছিলেন এই বার্নাবাস? বাইবেলের "প্রেরিতদের কার্য" পুস্তকে এই নামের এক ব্যক্তির উল্লেখ বার বার এসেছে। এ ব্যক্তি ছিল সাইপ্রাসের এক ইহুদী পরিবারের লোক। খৃষ্টান ধর্মের প্রচার এবং ঈসা মাসীহর অনুসারীদের সাহায্য–সহযোগিতার ক্ষেত্রে তার সেবা ও অবদানের অনেক প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু কখন সে মাসীহর ধর্ম গ্রহণ করেছিল তা কোথাও বলা হয়নি এবং প্রাথমিক যুগের বারজন হাওয়ারীর যে তালিকা তিনটি সুসমাচারে দেয়া হয়েছে তার মধ্যে কোথাও তার নামের উল্লেখ নেই। তাই উক্ত সুসমাচারের লেখক সেই বার্নাবাস নিজে না অন্য কেউ তা বলা কঠিন। মথি এবং মার্ক হাওয়ারীদের (Apostles) নামের যে তালিকা দিয়েছেন বার্নাবাসের দেয়া তালিকা শুধু দু'টি নামের ক্ষেত্রে তাদের থেকে ভিন্ন। ঐ দু'টি নামের একটি হলো 'তূমা'। এ নামটির পরিবর্তে বার্নাবাস নিজের নাম উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়টি হলো 'শামাউন কানানী'। এ নামটির পরিবর্তে তিনি ইয়াহুদা ইবনে ইয়া'কূবের নাম উল্লেখ করেছেন। লুক লিখিত সুসমাচারে এই দ্বিতীয় নামটিরও উল্লেখ আছে। তাই এরূপ ধারণা করা যুক্তিসংগত যে, পরবর্তীকালে কোন এক সময় শুধু বার্নাবাসকে হাওয়ারীদের তালিকা থেকে বাদ দেয়ার জন্য তূমার নাম অন্তরভুক্ত করা হয়েছে যাতে তার সুসমাচার গ্রন্থের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আর নিজেদের ধর্মগ্রন্থসমূহে এ ধরনের রদবদল ও পরিবর্তন পরিবর্ধন করে নেয়া ঐ সব মহাত্মনদের দৃষ্টিতে কোন অন্যায় ও অবৈধ কাজ ছিল না।

কেউ যদি বার্নাবাসের এই ইনজীল বা সুসমাচার গ্রন্থখানি পক্ষপাত শূন্য ও বিদ্বেষমুক্ত মনে চোখ খুলে পড়ে এবং বাইবেল নতুন নিয়মের চারখানি সুসমাচারের সাথে তার তুলনা করে তাহলে সে একথা উপলব্ধি না করে পারবে না যে, এই গ্রন্থখানি উক্ত চারখানি গ্রন্থের চেয়ে অনেক উন্নত মানের। এতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জীবনের ঘটনাবলী অধিক বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে যেন কেউ প্রকৃতপক্ষে সেখানকার সবকিছু দেখছিল এবং নিজেও তাতে শরীক ছিল। চারখানি সুসমাচারের অসংবদ্ধ ও খাপ ছাড়া কাহিনীসমূহের তুলনায় এর ঐতিহাসিক বর্ণনা অধিক সুসংহত এবং ঘটনাসমূহের ধারাবাহিকতাও আরো ভালভাবে বোধগম্য। এতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষাসমূহ বাইবেলের চারখানি সুসমাচারের তুলনায় অধিক স্পষ্ট, বিস্তারিত এবং মর্মস্পর্শীরূপে বর্ণিত হয়েছে। এতে তাওহীদের শিক্ষা, শিরক খণ্ডন, আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী, ইবাদাতের প্রাণসত্তা এবং উত্তম ও উন্নত চরিত্রের বিষয়াবলী

অত্যন্ত জোরালোভাবে, যুক্তি ও প্রমাণসহ সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। যেসব শিক্ষণীয় উপমা ও উদাহরণের মাধ্যমে মাসীহ আলাইহিস সালাম যেসব বিষয় বর্ণনা করেছেন, চারখানি সুসমাচারে তার ছিঁটে ফোঁটাও নেই। তিনি কি ধরনের বিজ্ঞোচিত পন্থায় তাঁর শাগরিদদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতেন এ গ্রন্থ থেকে সে বিষয়টিও অধিক বিস্তারিতভাবে জানা যায়। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ভাষা, বাচনভঙ্গি এবং মেজাজ প্রকৃতি সম্পর্কে যার সামান্য পরিমাণও জ্ঞান আছে সে এই সুমাচার গ্রন্থখানি পাঠ করলে একথা স্বীকার না করে পারবে না যে, এটা পরবর্তীকালে কারো রচিত কোন নকল কাহিনী নয়। বরং চারখানি সুসমাচারের তুলনায় এতে হযরত ঈসা তাঁর প্রকৃত মর্যাদায় অধিকতর স্পষ্ট হয়ে আমাদের সামনে ফুটে ওঠেন। তাছাড়া সুসমাচার চতুষ্টয়ে তাঁর বিভিন্ন বাণীর মধ্যে যে বৈপরীত্য লক্ষ করা যায় এ গ্রন্থে তার নামগন্ধ পর্যন্ত নেই।

হযরত ঈসার জীবন ও শিক্ষা হিসেবে এ গ্রন্থে যা বর্ণিত হয়েছে, তা সঠিক অর্থে একজন নবীর জীবন ও শিক্ষা বলেই মনে হয়। এতে তিনি নিজেকে একজন নবী হিসেবেই পেশ করেছেন। পূর্ববর্তী সমস্ত নবী এবং আসমানী কিতাবসমূহকে সত্য বলে ঘোষণা করেছেন। এতে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, নবী-রসূলদের (আলাইহিমুস সালাম) শিক্ষা ছাড়া সত্যকে জানার অন্য কোন মাধ্যম নেই। যারা নবী-রসূলদের পরিত্যাগ করে তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই পরিত্যাগ করে। সমস্ত নবী-রসূল তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের যে শিক্ষা দিয়েছেন তিনি হুবহু সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। এ গ্রন্থে তিনি নামায, রোযা এবং যাকাতের শিক্ষা দিচ্ছেন। এ গ্রন্থে বার্নাবাস বহুস্থানে তাদের নামাযের যে উল্লেখ করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, এই ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও তাহাজ্জুদের সময়ই তারা নামায পড়তেন এবং সর্বদা নামাযের আগে অযু করতেন। নবী-রসূলদের মধ্য থেকে হযরত দাউদ ও সুলায়মানকেও তিনি নবী বলে স্বীকৃতি দিতেন। অথচ ইহুদী ও খৃষ্টানরা তাঁদেরকে নবীদের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে রেখেছে। তিনি হযরত ইসমাঈলকেই 'যাবীহ' (যাঁকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশে যবেহ করতে নিয়ে গিয়েছিলেন—অনুবাদক) বলে ঘোষণা করেন, একজন ইহুদী আলেমকে তিনি স্বীকার করান যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত ইসমাঈলই ছিলেন 'যাবীহ' কিন্তু বনী ইসরাঈলরা জোড়াতালি দিয়ে জোর করে হযরত ইসহাককে যাবীহ বানিয়ে রেখেছে। কুরআন মজীদে আখেরাত, কিয়ামত, জান্নাত ও দোযখ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তাঁর শিক্ষাও প্রায় তার কাছাকাছি।

দশ ঃ বার্নাবাসের সুসমাচারে বিভিন্নস্থানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে স্পষ্ট সুসংবাদের উল্লেখ থাকার কারণে যে খৃষ্টানরা এর বিরোধী তা নয়। কারণ নবীর (সা) জন্মেরও বহু আগে তারা এ গ্রন্থকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাদের উষ্মা ও অসন্তুষ্টির প্রকৃত কারণ উপলব্ধি করতে হলে বিষয়টি সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রথম যুগের অনুসারীগণ তাঁকে কেবল একজন নবী হিসেবে স্বীকার করতেন, হযরত মূসার শরীয়াতের অনুসরণ করতেন, আকীদা-বিশ্বাস, হুকুম-আহকাম ও ইবাদাত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে নিজেদেরকে বনী ইসরাঈল জাতির অন্য সবার থেকে মোটেই আলাদা কিছু মনে করতেন না এবং ইহুদীদের সাথে তাদের বিরোধ

ছিল শুধু এতটুকু যে, তাঁরা হযরত ঈসাকে 'মাসীহ' হিসেবে মেনে নিয়ে তার প্রতি ঈমান এনেছিলেন, কিন্তু ইহুদীরা তাঁকে 'মাসীহ' হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাতো। পরবর্তীকালে সেন্টপল এই দলে শামিল হলে সে রোমান, গ্রীক এবং অন্যান্য অ–ইহুদী ও অ–ইসরাঈলী লোকদের মধ্যেও এ ধর্মের তাবলীগ ও প্রচার শুরু করে দেয়। এ উদ্দেশ্যে সে একে এমন একটি নতুন ধর্ম বানিয়ে ফেলে যার আকীদা–বিশ্বাস, মূলনীতি এবং হুকুম–আহকাম হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পেশকৃত ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ছিল। এই ব্যক্তি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাহচর্য আদৌ পায়নি। বরং তাঁর জীবদ্দশায় সে ছিল তার চরম বিরোধী এবং তাঁর পরেও কয়েক বছর পর্যন্ত সে তাঁর অনুসারীদের চরম শত্রু ছিল। পরবর্তী সময়ে এই দলে শামিল হয়ে যখন সে একটি নতুন ধর্ম তৈরী করতে শুরু করে তখনও সে তার এ কাজের সমর্থনে হযরত ঈসার দেয়া কোন সনদ পেশ করেননি বরং নিজের 'কাশ্‌ফ' ও 'ইলহাম' বা মনের স্বতস্ফূর্ত সৎপ্রেরণার ভিত্তিতেই তা করেছে। নতুন এই ধর্ম রচনার ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য ছিল, ধর্ম হবে এমন যা দুনিয়ার সমস্ত অ–ইহুদী (Gentile) গ্রহণ করবে। সে ঘোষণা করলো, খৃষ্টানরা ইহুদীদের শরীয়াতের সমস্ত বিধি–নিষেধ ও বাধ্য বাধকতা থেকে মুক্ত। সে পানাহারের ব্যাপারে হালাল ও হারামের সব বিধি–নিষেধ তুলে দিলো। সে খাতনার নির্দেশও বাতিল করে দিল অ–ইহুদীদের কাছে যা বিশেষভাবে অপছন্দনীয় ছিল। এমন কি সে 'মাসীহর' খোদায়ী, খোদার বেটা হওয়া এবং সমস্ত আদম সন্তানের জন্মগত পাপের কাফ্‌ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য শূলিবিদ্ধ হয়ে জীবন দেয়ার আকীদা–বিশ্বাসও গড়ে নিল। কারণ তা সাধারণভাবে সমস্ত মুশরিকের মেজাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। হযরত ঈসার (আ) প্রথম যুগের অনুসারীগণ এসব বিদ'আতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন কিন্তু সেন্টপল যে দরজা খুলে দিয়েছিল তা দিয়ে অ–ইহুদী খৃষ্টানদের এক বিরাট সয়লাব এ ধর্মে ঢুকে পড়লো যার মোকাবেলায় ঐ নগণ্য সংখ্যক লোকগুলো কোনক্রমেই টিকে থাকতে পারলেন না। তা সত্ত্বেও তৃতীয় খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ পর্যন্তও এমন বহুলোক ছিলো যারা হযরত ঈসার খোদা হওয়ার আকীদা অস্বীকার করতো। কিন্তু চতুর্থ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে (৩২৫ খৃঃ) নিকিয়ার (Nicaca) কাউন্সিল পল প্রবর্তিত আকীদা–বিশ্বাসকে খৃষ্টানদের সর্বসম্মত ধর্ম হিসেবে চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করে। অতপর রোমান সাম্রাজ্য খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে এবং কাইজার থিওডোসিয়াসের সময় খৃষ্ট ধর্মই সাম্রাজ্যের সরকারী ধর্ম হিসেবে পরিগণিত হয়। এরপর এটা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার যে, যেসব গ্রন্থ এ আকীদার পরিপন্থী তা পরিত্যক্ত ঘোষিত হবে এবং কেবল সেই সব গ্রন্থরাজি নির্ভরযোগ্য বলে গৃহীত হবে যা এই আকীদার সাথে সংগতিপূর্ণ। ৩৬৭ খৃষ্টাব্দে এথানাসিয়াসের (Athanasius) এক পত্রের দ্বারা প্রথমবারের মত স্বীকৃত ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থরাজির একটি ঘোষণা দেয়া হয়। পরে ৩৮২ খৃষ্টাব্দে পোপ ডেমাসিয়াসের (Damasius) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলন তা অনুমোদন করে এবং পঞ্চম শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে পোপ গেলাসিয়াস (Gelasius) এই গ্রন্থসমষ্টিকে স্বীকৃতি দেয়ার সাথে সাথে প্রত্যাখাত গ্রন্থরাজির একটি তালিকাও প্রস্তুত করেন। অথচ পল প্রবর্তিত যেসব আকীদা–বিশ্বাসকে ভিত্তি করে ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল সেসব আকীদা–বিশ্বাসের কোন একটিও হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নিজে শিক্ষা দিয়েছিলেন বলে খৃষ্টান পাদরী–পুরোহিতদের কেউ কখনো দাবী করতে পারেননি। বরং

যে সুসমাচারগুলো নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহের অন্তরভুক্ত তার মধ্যেও হযরত ঈসার (আ) কোন বাণী থেকে ঐ সব আকায়েদের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এসব অগ্রহণযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে বার্নাবাসের সুসমাচারকে অন্তরভুক্ত করার কারণ হলো তা সরকারীভাবে গৃহীত খৃষ্টবাদের আকীদা-বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। এ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ সম্পর্কে এর রচয়িতা গ্রন্থের শুরুতে বলছেন ঃ যেসব লোক শয়তানের প্রতারণায় পড়ে ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলে। খাতনা করা অপ্রয়োজনীয় মনে করে এবং হারাম খাদ্যকে হালাল করে দেয় তাদের ধ্যান-ধারণা সংশোধনের উদ্দেশ্যে পলও এসব প্রতারিতদের একজন। তিনি বলছেন ঃ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যখন পৃথিবীতে ছিলেন তখন তাঁর মু'জিযাসমূহ দেখে মুশরিক রোমান সৈন্যরা সর্বপ্রথম তাঁকে খোদা এবং কেউ কেউ খোদার পুত্র বলতে শুরু করে। অতপর বনী ইসরাঈলদের সর্বসাধারণের মধ্যেও এই ছোঁয়াচে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এতে হযরত ঈসা (আ) অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে এই ভ্রান্ত আকীদা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং যারা তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলতো তাদেরকে অভিশাপ দিলেন। অতপর এই আকীদার প্রতিবাদের জন্য তিনি তাঁর শাগরেদদের সমগ্র ইয়াহুদিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন এবং যার থেকে এসব মু'জিযা প্রকাশ পাচ্ছে, তাকে 'খোদা অথবা খোদার পুত্র' মনে করার ভ্রান্ত ও উদ্ভট ধারণা থেকে মানুষ যাতে বিরত থাকে সে জন্য যেসব মু'জিযা তাঁর নিজের থেকে প্রকাশ পেতো তাঁর দোয়ায় শাগরেদদের থেকেও সেসব মু'জিযা প্রকাশ করা হলো। এ ব্যাপারে তিনি হযরত ঈসার (আ) বক্তৃতাসমূহ বিস্তারিত উদ্ধৃতি করেছেন যাতে তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে এসব ভ্রান্ত আকীদার প্রতিবাদ করেছিলেন। আর এই গোমরাহী প্রসার লাভ করায় হযরত ঈসা (আ) কতটা বিচলিত ছিলেন, তাও তিনি এ গ্রন্থের স্থানে স্থানে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া বার্নাবাস পলের গড়া এ আক্বীদাও খন্ডন করেছেন যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ক্রুশে জীবন দিয়েছিলেন। তিনি নিজ চোখে দেখা যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন তাহলো, যে সময় ইয়াহুদা ইহুদী পুরোহিতদের নেতার নিকট থেকে ঘুষ গ্রহণ করে হযরত ঈসাকে গ্রেফতার করানোর জন্য সৈন্যদের নিয়ে আসলো তখন আল্লাহ তা'আলার হুকুমে চারজন ফেরেশতা তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন এবং ইয়াহুদা ইসকার ইউতির আকৃতি ও কণ্ঠ অবিকল হযরত ঈসার আকৃতি ও কণ্ঠের মত করে দেয়া হলো। তাকেই শূলি বিদ্ধ করা হয়েছে, হযরত ঈসাকে (আ) নয়। এভাবে এই সুসমাচার গ্রন্থখানি পলের গড়া খৃষ্টান ধর্মের মূল উটপাটিত করে ফেলেছে এবং কুরআনের বক্তব্যকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছে। অথচ এসব বক্তব্যের কারণেই কুরআন নাযিলের ১১৫ বছর আগে খৃষ্টান পাদরীগণ তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

এগার ঃ এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বার্নাবাসের ইনজিল বা সুসমাচার প্রকৃতপক্ষে বাইবেলের চারটি সুমাচার থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য সুসমাচার। এ গ্রন্থ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা, জীবন-চরিত এবং বাণীসমূহ সঠিকভাবে তুলে ধরে। এটা খৃষ্টানদের দুর্ভাগ্য যে, এ গ্রন্থের সাহায্যে নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস শুধরে নেয়া এবং হযরত ঈসার (আ) মূল শিক্ষাসমূহ জানার যে সুযোগ তারা লাভ করেছিল শুধু জিদ ও হঠকারিতার কারণে তা থেকে তারা বঞ্চিত থেকে গেল। বার্নাবাস হযরত ঈসা (আ) থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম সম্পর্কে যেসব সুসংবাদ বর্ণনা করেছেন এখন তা আমরা দ্বিধাহীনভাবে এখানে উদ্ধৃত করতে পারি। এসব সুসংবাদের কোনটিতে

হযরত ঈসা (আ) নবীর (সা) নাম উল্লেখ করেছেন, কোনটিতে 'রসূলুল্লাহ' বলেছেন, কোনটিতে তাঁর জন্য 'মাসীহ' শব্দ ব্যবহার করেছেন, কোনটিতে 'প্রশংসার যোগ্য' (Admirable) বলেছেন, আবার কোনটিতে স্পষ্টভাবে এমন সব শব্দ ব্যবহার করেছেন যা হুবহু لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এর সমার্থক। এখানে সবগুলো সুসংবাদবাণী উদ্ধৃত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তা এত অধিক সংখ্যক এবং বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে পূর্বাপর প্রসংগে এসেছে যে তার সমন্বয়ে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থই তৈরী হতে পারে। আমরা তার মধ্য থেকে নমুনা হিসেবে এখানে কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করছি ঃ

"সমস্ত নবী—যাঁদেরকে আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, যাঁদের সংখ্যা এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার—অস্পষ্টভঙ্গিতে কথা বলেছেন। কিন্তু আমার পরে সমস্ত নবী এবং পবিত্র সত্তাসমূহের জ্যোতি আসবেন যিনি নবীদের বলা কথার অন্ধকার দিকের ওপর আলোকপাত করবেন। কারণ তিনি খোদার রাসূল।" (অধ্যায়—১৭)

"ফরিশী এবং লাবীরা বললো ঃ যদি তুমি মাসীহও না হয়ে থাকো, ইলিয়াসও না হয়ে থাকো কিংবা অন্য কোন নবীও না হয়ে থাকো তাহলে তুমি নতুন শিক্ষা দিচ্ছ কেন এবং নিজেকে মাসীহর চেয়ে বড় করেই বা পেশ করছো কেন? জবাবে ঈসা বললেন ঃ আমার দ্বারা আল্লাহ যেসব মু'জিযা দেখান তা প্রকাশ করে যে, আমি তাই বলি যা খোদা চান। অন্যথায় তোমরা যার কথা বলে থাকো, প্রকৃতপক্ষে আমি নিজেকে তার সেই (মাসীহ) চেয়ে বড় করে পেশ করার যোগ্য নই। যাকে তোমরা মাসীহ বলে থাকো আমি তো খোদার সেই রসূলের মোজার গিরা বা তাঁর জুতার ফিতা খোলারও উপযুক্ত নই, যাঁকে আমার আগে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, আমার পরে আসবেন এবং সত্যের বাণী নিয়ে আসবেন, যাতে তাঁর দীনের কোন সীমাবদ্ধতা না থাকে।" (অধ্যায়—৪২)

"আমি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে তোমাদের বলছি, যেসব নবী এসেছেন তাঁরা সকলেই কেবল একটি মাত্র কওমের জন্য খোদার নিদর্শন হিসেবে সৃষ্টি হয়েছিলেন। তাই যেসব লোকের জন্য তাঁদের পাঠানো হয়েছিল তাদের মধ্যে ছাড়া সেই সব নবীর বাণী আর কোথাও প্রচারিত হয়নি। কিন্তু আল্লাহর রসূল যখন আসবেন, খোদা হয়তো তাঁকে নিজের হাতের মোহর দিয়ে পাঠাবেন এমনকি দুনিয়ার যেসব কওম তাঁর শিক্ষা লাভ করবে তাদেরকেই তিনি মুক্তি ও রহমত পৌঁছিয়ে দেবেন। তিনি খোদাহীন লোকদের ওপর কর্তৃত্ব নিয়ে আসবেন এবং এমনভাবে মূর্তি পূজার মূলোৎপাটন করবেন যে, শয়তান অস্থির হয়ে উঠবে।"

"এরপর শাগরেদদের সাথে দীর্ঘ কথাবার্তার সময় হযরত ঈসা (আ) স্পষ্ট করে একথা বলেন যে, সেই নবী হবেন বনী ইসমাঈল বংশের লোক।" (অধ্যায়—৪৩)

"এ জন্য আমি তোমাদের বলি যে, খোদার রসূল এমন এক দীপ্তি ও সৌন্দর্য যার দ্বারা খোদা তা'আলার সৃষ্ট প্রায় সব বস্তুই আনন্দিত হবে। কেননা, তিনি উপলব্ধি ও উপদেশ, বুদ্ধিমত্তা ও শক্তি, ভয় ও ভালবাসা এবং দূরদর্শিতা ও পরহেযগারীর প্রাণসত্তায় উজ্জীবিত। তিনি বদান্যতা ও দয়ামায়া, ন্যায়নিষ্ঠতা ও তাকওয়া এবং শিষ্টাচার ও ধৈর্যের প্রাণসত্তা দ্বারা গুণান্বিত। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাদের এই প্রাণসত্তা দান করেছেন তিনি তাদের তুলনায় তা তিনগুণ লাভ করেছেন। যে সময় তিনি দুনিয়ায় আসবেন সে সময়টা কত বরকতপূর্ণ ও কল্যাণময় হবে। নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করো, যেমনটি প্রত্যেক নবী তাঁকে

দেখেছেন তেমনি আমিও তাঁকে দেখেছি এবং সম্মান দেখিয়েছি। তাঁর রূহকে দেখেই আল্লাহ তাঁকে নবুওয়াত দিয়েছেন। আর আমি যখন তাঁকে দেখলাম তখন আমার প্রাণ একথা বলতে গিয়ে পরম প্রশান্তিতে ভরে উঠলো যে, হে মুহাম্মাদ, খোদা তোমার সাথে থাকুন এবং তিনি যেন আমাকে তোমার জুতার ফিতা বেঁধে দেয়ার যোগ্য বানিয়ে দেন। কারণ, এই মর্যাদাটুকু পেলেও আমি একজন বড় নবী এবং খোদার এক পবিত্র সত্তা হিসেবে পরিগণিত হবো।" (অধ্যায়—৪৪)

"(আমার চলে যাওয়ার কারণে) তোমাদের মন যেন বিচলিত না হয় এবং তোমরা ভয় না পাও। কারণ, আমি তোমাদের সৃষ্টি করি নাই। বরং আল্লাহ তা'আলা আমাদের স্রষ্টা, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। বাকী রহিল আমার কথা। আমি এ সময় দুনিয়ায় এসেছি আল্লাহর সেই রাসূলের জন্য পথ পরিষ্কার করতে যিনি দুনিয়ার জন্য মুক্তি নিয়ে আসবেন.....ইন্দারিয়াস বললো ঃ হে মহান শিক্ষক, আমরা যাতে তাঁকে চিনতে পারি সে জন্য আপনি তাঁর কিছু নিদর্শন বলে দিন। ঈসা জবাব দিলেন ঃ তিনি তোমাদের যুগে আসবেন না, বরং তোমাদের বহু বছর পরে আসবেন যখন আমার 'ইনযিল' এতটা বিকৃত হয়ে যাবে যে, বড় জোর ত্রিশজন ঈমানদার অবশিষ্ট থাকবে। তখন আল্লাহ দুনিয়ার ওপরে অনুগ্রহ করবেন এবং তাঁর রাসূলকে পাঠাবেন। তাঁর মাথার ওপর সাদা মেঘ ছায়া দান করবে। তিনি যে, আল্লাহর মনোনীত তা এভাবে জানা যাবে এবং তাঁর দ্বারা দুনিয়া খোদার পরিচয় জানতে পারবে। খোদাহীনদের বিরুদ্ধে তিনি বিরাট শক্তি নিয়ে আসবেন এবং পৃথিবী থেকে মূর্তিপূজা উচ্ছেদ করবেন। তাঁর জন্য আমি খুবই আনন্দিত। কারণ, তাঁর মাধ্যমে আমাদের খোদাকে চেনা যাবে, তাঁর পবিত্রতা প্রমাণিত হবে এবং সারা দুনিয়া আমার সত্যতা জানতে পারবে। আর তিনি তাদের থেকে প্রতিশোধ নেবেন যারা আমাকে মানুষের চেয়ে বড় কিছু সাব্যস্ত করবে.....তিনি এমন একটি সত্য নিয়ে আসবেন যা সমস্ত নবী কর্তৃক আনীত সত্যের চেয়ে অধিক স্পষ্ট হবে।" (অধ্যায়—৭২)

"খোদার প্রতিশ্রুতি এসেছিল, যেরুশালেমে সুলায়মানের উপাশনালয়ের মধ্যে অন্য কথাও নয়। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করো, এমন এক সময় আসবে, যখন খোদা অন্য এক শহরে তাঁর রহমত নাযিল করবেন। অতপর সব জায়গায় সঠিকভাবে তাঁর ইবাদত বন্দেগী হতে পারবে। আর আল্লাহ তাঁর রহমতে সব জায়গায় সঠিক ও সত্যিকার নামায কবুল করবেন.....আমি প্রকৃতপক্ষে ইসরাঈলের পরিবারগুলোর জন্য ত্রাণকারী নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। কিন্তু আমার পরে সারা দুনিয়ার জন্য খোদার প্রেরিত সেই মাসীহ আসবেন যার জন্য আল্লাহ সারা দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। তখন সারা দুনিয়ায় আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগী হবে এবং তাঁর রহমত নাযিল হবে।" (অধ্যায়—৮৩)

"(ঈসা পুরোহিত সর্দারকে বললেন ঃ) জীবন্ত সেই খোদার শপথ, যাঁর জন্য আমার প্রাণ নিবেদিত। সারা বিশ্বের জাতিসমূহ যে মাসীহর আগমনের জন্য অপেক্ষা করছে, আমাদের পিতা ইবরাহীমকে (আ) আল্লাহ যাঁর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এই বলে যে, তোমার বংশের মাধ্যমে পৃথিবীর সব জাতি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে, সে মাসীহ তো আমি নই।"

(আদিপুস্তক ঃ অধ্যায় ঃ ২২ পদ—১৮)

"কিন্তু খোদা যখন আমাকে দুনিয়া থেকে নিয়ে যাবেন তখন শয়তান পুনরায় এভাবে বিদ্রোহ ছড়াবে যাতে খোদাকে যারা ভয় করে না তারা আমাকে খোদা এবং খোদার বেটা হিসেবে মেনে নেয়। তার কারণে আমার বাণী এবং শিক্ষা বিকৃত করে ফেলা হবে, এমনকি বড়জোর ত্রিশ জন ঈমানদার লোক অবশিষ্ট থাকবে। সেই সময় খোদা দুনিয়ার প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং তাঁর সেই রসূলকে পাঠাবেন যাঁর জন্য তিনি দুনিয়ার এই সব জিনিস সৃষ্টি করেছেন। যিনি শক্তিতে বলিয়ান হয়ে দক্ষিণ থেকে আসবেন এবং মূর্তিসমূহকে মূর্তির পূজারীদের সহ ধ্বংস করে ফেলবেন। শয়তান মানুষের ওপর যে কর্তৃত্ব লাভ করেছে তিনি তার থেকে সে কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেবেন। যারা তাঁর ওপর ঈমান আনবে তাদের মুক্তির জন্য তিনি খোদার রহমত নিয়ে আসবেন। আর বড়ই সৌভাগ্যের অধিকারী তারা যারা তাঁর কথা মানবে।" (অধ্যায়—৯৬)

"পুরোহিত সদার জিজ্ঞেস করলো ঃ খোদার সেই রাসূলের পরে অন্য কোন নবী কি আসবেন? ঈসা জবাব দিলেন ঃ তাঁর পরে খোদার প্রেরিত আর কোন সত্য নবী আসবেন না। কিন্তু অনেক মিথ্যা নবী আসবে যে কারণে আমি দুঃখিত ও মনক্ষুণ্ন। কেননা খোদার ইনসাফপূর্ণ ফয়সালার কারণে শয়তান তাদের আবির্ভাব ঘটাবে। তারা আমার এই ইনযীলের আড়ালে নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখবে।" (অধ্যায়—৯৭)

পুরোহিত সরদার জিজ্ঞেস করলো ঃ সে মাসীহকে কোন্ নামে ডাকা হবে এবং কি কি নিদর্শন তাঁর আগমনকে প্রকাশ করবে? ঈসা জবাব দিলেন ঃ সেই মাসীহর নাম 'প্রশংসা যোগ্য'। কেননা, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর রূহ সৃষ্টি করেছিলেন, তখন নিজেই তার এ নাম রেখেছিলেন এবং সেখানে তাঁকে ফেরেস্তাদের মত মর্যাদায় রাখা হয়েছিলো। খোদা বললেন ঃ হে মুহাম্মাদ, অপেক্ষা কর। কেননা, তোমার কারণেই আমি জান্নাত, পৃথিবী এবং আরো অনেক 'মাখলুক' সৃষ্টি করবো। আর তা সব উপহার হিসেবে তোমাকে দেব। এমন কি যে তোমাকে মোবারকবাদ দেবে, তাকেও কল্যাণ দান করা হবে এবং যে তোমাকে অভিসম্পাত করবে তাকে অভিসম্পাত দেয়া হবে। যে সময় আমি তোমাকে দুনিয়ায় পাঠাবো তখন মুক্তির সংবাদ বাহক হিসেবে পাঠাবো। তোমার কথা হবে সত্য। আসমান ও যমীন স্থানচ্যুত হবে কিন্তু তোমার দীন টলবে না। তাই তাঁর পবিত্র ও কল্যাণময় নাম 'মুহাম্মাদ' (স)।" (অধ্যায়—৯৭)

বার্নাবাস লিখছেন ঃ এক সময়ে হযরত ঈসা (আ) তাঁর শাগরিদদের সামনে বললেন ঃ আমার শাগরিদদেরই একজন (পরবর্তী সময়ে দেখা গেল ইয়াহুদা ইসকার ইউতি সেই শাগরিদ) ৩০টি মুদ্রার বিনিময়ে আমাকে শত্রুদের কাছে বিক্রি করে দেবে। তারপরে বললেন ঃ

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে আমাকে বিক্রি করবে এরপর সে–ই আমার নামে মারা যাবে। কেননা, খোদা আমাকে পৃথিবী থেকে উপরে উঠিয়ে নেবেন এবং সেই বিশ্বাসঘাতকের চেহারা এমনভাবে পরিবর্তিত করে দেবেন যে, সবাই মনে করবে সে–ই আমি। তথাপি সে যখন জঘন্য মৃত্যুবরণ করবে তখন একটা সময়–কাল পর্যন্ত লাঞ্ছনা আমারই হতে থাকবে। কিন্তু খোদার পবিত্র রাসূল মুহাম্মাদ যখন আসবেন তখন সেই বদনাম দূর করে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা তা এ জন্য করবেন যে, আমি সেই মাসীহর সত্যতা স্বীকার

করেছি। সেজন্য তিনি আমাকে এই পুরস্কার দেবেন। লোকে জানতে পারবে আমি বেঁচে আছি এবং সেই লাঞ্ছনাকর মৃত্যুর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।" (অধ্যায়—১১৩)

"(হযরত ঈসা শাগরিদদের বললেন ঃ) আমি সন্দেহাতীতভাবে তোমাদের বলছি, যদি মূসার গ্রন্থের সত্যতা বিকৃত করা না হতো তাহলে খোদা আমাদের পিতা দাউদকে অন্য একখানি গ্রন্থ দিতেন না। আর দাউদের গ্রন্থের মধ্যে যদি বিকৃতি ঘটানো না হতো তাহলে খোদা আমাকে ইনযিল দিতেন না। কারণ, মহাপ্রভু আমাদের খোদা পরিবর্তিত হওয়ার নন। আর তিনি সব মানুষকে একই বাণী দিয়েছেন। তাই যখন আল্লাহর রাসূল আসবেন এ সব জিনিসকে পরিষ্কার করে দেয়ার জন্যই আসবেন যা দিয়ে খোদাহীন লোকেরা আমার কিতাবকে কলুষিত করে ফেলেছে।" (অধ্যায়—১২৪)

এসব সুস্পষ্ট এবং বিস্তারিত ভবিষ্যদ্বাণীতে শুধু তিনটি বিষয় এমন দেখা যায় যা আপাতঃ দৃষ্টিতে খটকা লাগায়। এক, এসব ভবিষ্যদ্বাণীতে এবং বার্নাবাসের ইনজীলের আরো কিছু বাক্যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নিজের মাসীহ হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। দুই, শুধু ওপরে উদ্ধৃত বাক্যসমূহে নয় বরং এ সুসমাচারের বহুস্থানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মূল আরবী নাম 'মুহাম্মাদ' লেখা হয়েছে। অথচ পরবর্তীকালে আসবেন এমন কোন পবিত্র ব্যক্তি ও সত্তার মূল নাম উল্লেখ করা নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীর সাধারণ নিয়ম বা রীতি নয়। তিন, এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'মাসীহ' বলা হয়েছে।

প্রথম সন্দেহের জবাব হলো, শুধু বার্নাবাসের সুসমাচারেই নয়, বরং লূক লিখিত সুসমাচারেও এ বিষয়ের উল্লেখ আছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁকে 'মাসীহ' বলতে তাঁর শাগরিদদের নিষেধ করেছিলেন। লূকের ভাষা হলো ঃ "তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে? পিতর উত্তর করিয়া কহিলেন, ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট। তখন তিনি তাহাদিগকে দৃঢ়রূপে বলিয়া দিলেন ও আদেশ করিলেন, একথা কাহাকেও বলিও না।" (অধ্যায়—৯ পদ—২১ ও ২২) সম্ভবত এর কারণ ছিল এই যে, বনী ইসরাঈল জাতি যে মাসীহর আগমনের অপেক্ষায় ছিল তাঁর সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল, তিনি তরবারির জোরে ন্যায় ও সত্যের দুশমনদের পরাজিত করবেন। তাই হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছেন, আমি সেই 'মাসীহ' নই। তিনি আমার পরে আসবেন।

দ্বিতীয় সন্দেহের জবাব হলো, বার্নাবাসের সুসমাচারের যে ইটালিয়ান অনুবাদ বর্তমানে পাওয়া যায় তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম 'মুহাম্মাদ' লিখিত আছে। কিন্তু একথা কেউ-ই জানে না যে, এ গ্রন্থ কোন্ কোন্ ভাষার অনুবাদের অনুবাদ হয়ে অবশেষে ইটালিয়ান ভাষায় পৌঁছেছে। একথা সুস্পষ্ট যে, বার্নাবাসের মূল সুসমাচার গ্রন্থখানা সুরিয়ানী ভাষায়ই হওয়ার কথা। কারণ হযরত ঈসা (আ) এবং তার অনুসারীদের ভাষা ছিল সুরিয়ানী। সেই মূল গ্রন্থখানা পাওয়া গেলে জানা যেতো, তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র নাম কি লেখা হয়েছিলো। এখন যতটুকু অনুমান করা যায় তা হলো, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম হয়তো মূল শব্দ ব্যবহার করেছিলেন "منحمنا" (মুনহামান্না) যোহন লিখিত সুসমাচারের বরাত দিয়ে ইবনে ইসহাক যা বর্ণনা করেছেন। অতপর অনুবাদকারীরা হয়তো নিজ নিজ ভাষায় তার অনুবাদ করেছেন। এরপর কোন অনুবাদক হয়তো মনে করেছেন, ভবিষ্যদ্বাণীতে আগমনকারীর যে নাম বলা হয়েছে

তা পুরোপুরি 'মুহাম্মাদ' শব্দের সমার্থক। তাই তিনি নবীর (সা) পবিত্র এই নামটিই লিখে দিয়েছেন। অতএব, এ নামটির স্পষ্ট উল্লেখ থাকাই এরূপ সন্দেহ পোষণের জন্য মোটেই যথেষ্ট নয় যে, বার্নাবাসের গোটা সুসমাচারটাই কোন মুসলমানের নকল রচনা।

তৃতীয় সন্দেহের জবাব হলো, 'মাসীহ' শব্দটি মূলত একটি ইসরাঈলী পরিভাষা। কুরআন মজীদে কেবল হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্য এই পরিভাষাটি বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, ইহুদীরা তাঁর 'মাসীহ' হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করতো। মূলত এটি কুরআন মজীদের কোন পরিভাষা নয়। আর কুরআন মজীদের কথাও এটিকে ইসরাঈলীদের পারিভাষিক অর্থে ব্যবহারও করা হয়নি। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যদি 'মাসীহ' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন আর কুরআনে তাঁর জন্য এ শব্দটি ব্যবহার না করা হয়ে থাকে তাহলে তার অর্থ এই নয় যে, বার্নাবাসের সুসমাচার তাঁর সাথে এমন কিছু সম্পর্কিত করছে যা কুরআন অস্বীকার করে। আসলে বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে প্রাচীন কাল থেকে একটা প্রথা চলে আসছিলো। প্রথমটি হলো, কোন বস্তু কিংবা ব্যক্তিকে যখন কোন পবিত্র উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করা হতো তখন সেই বস্তু বা ব্যক্তির মাথার ওপর তেল মেখে দিয়ে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সেই উদ্দেশ্যে নিবেদিত করা হতো। ইবরানী (ইব্রিয়) ভাষায় তেল মাখার এই কাজকে "মাস্হ" বলা হতো। আর যে বস্তু বা ব্যক্তির ওপর তা মেখে দেয়া হতো তাকে 'মাসীহ' বলা হতো। উপাসনালয়ের পাত্রসমূহ এভাবে মুছে বা মর্দন করে উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট করা হতো। যাজক ও পুরোহিতদের পৌরহিত্যের (Priesthood) আসনে সমাসীন করার সময়ও 'মাস্হ' করা হতো। বাদশাহ এবং নবীকেও যখন খোদার তরফ থেকে বাদশাহী বা নবুওয়াতের জন্য নিয়োগ করা হতো তখন 'মাসহ্' করা হতো। সুতরাং বাইবেলের বর্ণনা মতে বনী ইসরাঈল জাতির ইতিহাসে বহু 'মাসীহ'র সন্ধান পাওয়া যায়। পুরোহিত হিসেবে হযরত হারুন 'মাসীহ' ছিলেন। হযরত মূসা যাজক এবং নবী হিসেবে, তালূত বাদশাহ হিসেবে, হযরত দাউদ বাদশাহ এবং নবী হিসেবে, মালকে সাদাক বাদশাহ এবং যাজক হিসেবে এবং হযরত "আল-ইয়াসা" নবী হিসেবে "মাসীহ" ছিলেন। পরবর্তীকালে কাউকে তেল মেখে দিয়ে নিবেদিত করার প্রয়োজনও ছিল না। বরং আল্লাহর তরফ থেকে কারো আদিষ্ট হওয়াই 'মাসীহ' হওয়ার সমার্থক হয়ে গিয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে রাজাবলী-১ এর ১৯ অধ্যায় দেখুন। এতে বলা হয়েছে যে, খোদা হযরত ইলিয়াসকে (এলিয়) আদেশ করলেন, তুমি ইসরায়েলকে 'মাসহ' কর, সে আরামের (দামেশক) বাদশাহ হিসেবে অভিষিক্ত হোক এবং নিমশির পুত্র যেহুকে ইসরাঈলের উপরে রাজপদে অভিষেক কর। আর তোমার স্থলাভিষিক্ত নবী হওয়ার জন্য ইলীশায়কে (আল ইয়াসা) অভিষেক কর। তাঁদের কারো মাথায়ই তেল মর্দন করা হয়নি। খোদার পক্ষ থেকে তাঁর আদিষ্ট হওয়ার সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দেয়াই যেন তাঁকে 'মাসাহ' বা অভিষিক্ত করার শামিল ছিল। অতএব, ইসরাঈলী ধ্যান-ধারণা অনুসারে 'মাসীহ' শব্দটি মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হওয়ার সমার্থক ছিল। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে শব্দটিকে এ অর্থেই ব্যবহার করেছিলেন। (ইসরাঈলীদের দৃষ্টিতে "মাসীহ" শব্দটির অর্থ কি তা বুঝার জন্য দেখুন ঃ সাইক্লোপেডিয়া অব বাইবেলিক্যাল লিটারেচার, শব্দ "মিস্ইয়াহ")

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰى إِلَى الْإِسْلَامِ ۚ
وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ ۝٧ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ
بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُونَ ۝٨ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ
رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُونَ ۝٩

সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলে।[১০] অথচ তাকে শুধু ইসলামের (আল্লাহর আনুগত্য করার) দিকে আহবান করা হচ্ছে।[১১] আল্লাহ এ রকম জালেমদের হিদায়াত দেন না। এরা তাদের মুখের ফুঁ দিয়ে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহর ফায়সালা হলো তিনি তার নূরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন। কাফেররা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন।[১২] তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তাঁর রসূলকে হিদায়াত এবং 'দীনে হক' দিয়ে পাঠিয়েছেন যাতে তিনি এ দীনকে অন্য সকল দীনের ওপর বিজয়ী করেন, চাই তা মুশরিকদের কাছে যতই অসহনীয় হোক না কেন।[১৩]

৯. মূল আয়াতে سحر শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে سحر শব্দটি যাদু অর্থে নয়, বরং ধোঁকা ও প্রতারণা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় যাদু অর্থে এ শব্দটির ব্যবহার যেমন পরিচিত তেমনি ধোঁকা ও প্রতারণা অর্থে ব্যবহারও পরিচিত। যেমন ঃ আরবীতে বলা হয় سحره اى حدعه সে অমুক ব্যক্তিকে যাদু করেছে অর্থাৎ ধোঁকা দিয়েছে। যে দৃষ্টি ও চাহনি মন কেড়ে নেয় তাকে বলা হয় عين ساحرة যাদুময়ী চোখ। যে প্রান্তরে চারদিকে কেবল মরীচিকা আর মরীচিকাই চোখে পড়ে তাকে ارض ساحرة (বা যাদুর প্রান্তর) বলে। রৌপ্যকে পালিশ করে স্বর্ণের মত উজ্জল করা হলে তাকে বলা হয় سحرت الفضة । সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, যখন সেই নবী, যার আগমনের সুসংবাদ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম দিয়েছিলেন স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে আসলেন তখন বনী ইসরাঈল এবং হযরত ঈসার উম্মাতগণ তাঁর নবুওয়াতের দাবীকে খোলাখুলি প্রতারণা ও জালিয়াতি বলে ঘোষণা করল।

১০. অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত নবীকে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার বলে অভিহিত করা এবং নবীর ওপর আল্লাহর যে বাণী নাযিল হচ্ছে তাকে নবীর নিজের তৈরী কথা বলে ধরে নেয়া।

১১. অর্থাৎ আল্লাহর এই সত্য নবীকে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার বলাটাই কোন ছোট খাট জুলুম নয়। কিন্তু সেটা আরো বড় জুলুম হয়ে দাঁড়ায় যখন তিনি আল্লাহর দাসত্ব ও

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ
أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ
وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ
عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ
وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

২ রুকূ'

হে ঈমান আনয়নকারীগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসায়ের[১৪] সন্ধান দেবো যা তোমাদেরকে কঠিন আযাব থেকে মুক্তি দেবে? তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের[১৫] প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করো এটাই তোমাদের জন্য অতিব কল্যাণকর যদি তোমরা তা জান।[১৬] আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমনসব বাগানে প্রবেশ করাবেন যার নীচে দিয়ে ঝর্ণাধারা বয়ে চলবে। আর চিরস্থায়ী বসবাসের জায়গা জান্নাতের মধ্যে তোমাদেরকে সর্বোত্তম ঘর দান করবেন। এটাই বড় সফলতা।[১৭] আর আরেক জিনিস যা তোমরা আকাংখা করো আল্লাহ তাও তোমাদের দেবেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং অতি নিকটবর্তী সময়ে বিজয়।[১৮] হে নবী! ঈমানদারদেরকে এর সুসংবাদ দান করো।

আনুগত্যের প্রতি আহবান জানান আর জবাবে শ্রোতা তাঁকে গালি দিতে থাকে এবং তাঁর দাওয়াত ও আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য মিথ্যা কলঙ্ক লেপন ও অপবাদ আরোপের কৌশল অবলম্বন করে।

১২. স্মরণ রাখা দরকার যে, এ আয়াতটি ৩ হিজরী সনে ওহুদ যুদ্ধের পরে নাযিল হয়েছিল। সে সময় ইসলাম কেবল মদীনা শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, মুসলমানদের সংখ্যা কয়েক হাজারের বেশী ছিল না এবং গোটা আরবভূমি দীন ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য পুরোপুরি সংকল্পবদ্ধ ছিল। ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের যে ক্ষতি হয়েছিল তার কারণে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ন হয়েছিল এবং আশেপাশের গোত্রসমূহ তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাহসী হয়ে উঠেছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে বলা হয়েছে, আল্লাহর

এই 'নূর' কারো নিভিয়ে দেয়াতে নিভবে না, বরং পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হবে এবং সারা পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে ক্ষান্ত হবে। এটা একটা স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী, যা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। ইসলামের ভবিষ্যত কি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সেই সময় আর কে তা জানতো? মানুষ তো তখন দিব্যি দেখছিল, এটা একটা নিভু নিভু প্রদীপ যা নিভিয়ে ফেলার জন্য প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে।

১৩. 'মুশরিকদের জন্য অসহনীয় হলেও।' অর্থাৎ যারা আল্লাহর দাসত্বের সাথে অন্যদের দাসত্বও করে থাকে এবং আল্লাহর দীনের সাথে অন্য সব দীন ও বিধানকে সংমিশ্রিত করে, শুধু এক আল্লাহর আনুগত্য ও হিদায়াতের ওপর গোটা জীবনব্যবস্থা কায়েম হোক তারা তা চায় না। যারা ইচ্ছামত যে কোন প্রভু ও উপাস্যের দাসত্ব করতে সংকল্পবদ্ধ এবং যে কোন দর্শন ও মতবাদের ওপর নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা এবং তাহযীব তামাদ্দুনের ভিত্তিস্থাপন করতে প্রস্তুত এমনসব লোকের বিরোধিতার মুখেও বলা হচ্ছে যে, তাদের সাথে আপোষ করার জন্য আল্লাহর রসূলকে পাঠানো হয়নি। বরং তাকে পাঠানো হয়েছে এ জন্যে যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হিদায়াত ও জীবনব্যবস্থা এনেছেন তাকে গোটা জীবনের সব দিক ও বিভাগের ওপর বিজয়ী করে দেবেন। অবস্থা যাই হোক না কেন, তাঁকে এ কাজ করতেই হবে। কাফের ও মুশরিকরা তা মেনে নিক আর না নিক এবং এর বিরোধিতায় সর্বশক্তি নিয়োগ করলেও সর্বাবস্থায় রসূলের এ মিশন সফলকাম হবে এবং পূর্ণতা লাভ করবে। ইতিপূর্বে কুরআন মজীদের আরো দু'টি স্থানে এ ঘোষণা এসেছে। এক, সূরা তাওবার ৩৩ আয়াতে। দুই, সূরা ফাতহের ২৮ আয়াতে। এ স্থানে তৃতীয়বারের মত এ ঘোষণার পুনরুক্তি করা হচ্ছে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন আত তাওবা, টীকা ৩২; সূরা আল ফাত্হ, টীকা ৫১।)

১৪. ব্যবসায় এমন জিনিস যাতে মানুষ তার অর্থ, সময়, শ্রম এবং মেধা ও যোগ্যতা নিয়োজিত করে মুনাফা অর্জনের জন্য। এ বিষয়টি বিবেচনা করেই এখানে ঈমান ও আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে ব্যবসায় বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই পথে নিজের সবকিছু নিয়োজিত করলে সেই মুনাফা তুমি অর্জন করতে পারবে যার কথা একটু পরেই বলা হচ্ছে। সূরা তাওবার ১১১ আয়াতে এই বিষয়টিই অন্য এক ভঙ্গিতে বলা হয়েছে ঃ (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আত্ তাওবা, টীকা ১০৬)।

১৫. যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে যখন বলা হয় ঈমান আনো তখন আপনা থেকেই তার অর্থ দাঁড়ায়, খাঁটি ও নিষ্ঠাবান মুসলমান হও। ঈমানের মৌখিক দাবীই শুধু করো না, বরং যে বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছো তার জন্য সব রকম ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।

১৬. অর্থাৎ এ ব্যবসায় তোমাদের জন্য দুনিয়ার সব ব্যবসায় থেকে অনেক বেশী উত্তম।

১৭. এটা সেই ব্যবসায়ের আসল মুনাফা। আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনে এই মুনাফাই অর্জিত হবে। এক, আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া। দুই, গোনাহসমূহ মাফ হওয়া। তিন, আল্লাহর সেই জান্নাতে প্রবেশ করা যার নিয়ামতসমূহ চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর।

১৮. যদিও পৃথিবীতে বিজয় ও সফলতা লাভ করাও একটা বড় নিয়ামত। কিন্তু মু'মিনের নিকট প্রকৃত গুরুত্বের বিষয় এ পৃথিবীর সফলতা নয়, বরং আখেরাতের

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ﴿١٤﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও। ঠিক তেমনি, যখন ঈসা ইবনে মারয়াম হাওয়ারীদের[১৯] উদ্দেশ করে বলেছিলেন ঃ আল্লাহর দিকে (আহবান করার ক্ষেত্রে) কে আমার সাহায্যকারী? তখন হাওয়ারীরা জবাব দিয়েছিলো ঃ আমরা আছি আল্লাহর সাহায্যকারী।[২০] সেই সময় বনী ইসরাঈল জাতির একটি দল ঈমান আনয়ন করেছিল এবং আরেকটি দল অস্বীকার করেছিল। অতপর আমি ঈমান আনয়নকারীদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তি যোগালাম এবং তারাই বিজয়ী হয়ে গেল।[২১]

সফলতা। এ কারণেই দুনিয়ার এই জীবনে যে শুভ ফলাফল অর্জিত হবে তার উল্লেখ পরে করা হয়েছে আর আখেরাতে যে ফলাফল পাওয়া যাবে তার উল্লেখ আগে করা হয়েছে।

১৯. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সংগীদের জন্য বাইবেলে সাধারণত 'শিষ্য' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে খৃষ্টানদের মধ্যে তাদের জন্য রসূল (Apostles) পরিভাষাটি চালু হয়। তবে তারা আল্লাহর রসূল ছিল এ অর্থে তাদেরকে রসূল বলা হতো না, বরং তাদেরকে রসূল বলা হতো এ অর্থে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে ফিলিস্তিনের বিভিন্ন অঞ্চলে মুবাল্লিগ হিসেবে পাঠাতেন। যেসব লোককে হাইকলের জন্য চাঁদা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পাঠানো হতো তাদের জন্য এ শব্দটির ব্যবহার ইহুদীদের মধ্যে পূর্ব থেকেই ছিল। পক্ষান্তরে কুরআন মজীদে এর পরিবর্তে হাওয়ারী পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে যা এ দু'টি খৃষ্টীয় পরিভাষা থেকে উত্তম। এ শব্দটির মূল হলো حور যার অর্থ শুভ্রতা। ধোপাকে حوارى (হাওয়ারী) বলা হয় এ জন্য যে, সে কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার ও সাদা করে দেয়। খাঁটি ও নিখাদ জিনিসকেও হাওয়ারী বলা হয়। চালুনি দিয়ে চেলে যে আটার ভূষি ও ছাল বের করে আলাদা করা হয়েছে তাকে حوارى (হুওয়ারা) বলে। এ অর্থে অকৃত্রিম বন্ধু ও নিঃস্বার্থ সাহায্যকারীকে বুঝাতেও এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ইবনে সাইয়েদ বলেন ঃ যেসব ব্যক্তি কাউকে অধিক মাত্রায় সাহায্য করে তাকেও ঐ ব্যক্তির হাওয়ারী বলে। (লিসানুল আরব)

২০. যারা আল্লাহর দীনের দিকে মানুষকে আহবান জানায় এবং কুফরের মোকাবিলায় আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করে কুরআন মজীদের যেসব জায়গায় তাদেরকে আল্লাহর সাহায্যকারী বলা হয়েছে এটি তার মধ্যে সর্বশেষ জায়গা। ইতিপূর্বে

সূরা আলে ইমরানের ৫২ আয়াত, সূরা হাজ্জের ৪০ আয়াত, সূরা মুহাম্মাদের ৭ আয়াত, সূরা হাদীদের ২৫ আয়াত এবং সূরা হাশরের ৮ আয়াতে এই একই বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাফহীমুল কুরআনে সূরা আলে ইমরানের ৫০নং টীকা, সূরা হজ্জের ৮৪নং টীকা, সূরা মুহাম্মাদের ১২নং টীকা এবং সূরা হাদীদের ৪৭নং টীকায় আমরা এর ব্যাখ্যা পেশ করেছি। তাছাড়া সূরা মুহাম্মাদের ৯নং টীকায়ও এ বিষয়টির একটি দিক সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। এসব সত্ত্বেও কারো কারো মনে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা যখন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী, সমস্ত সৃষ্টির কারো উপরই নির্ভরশীল নন, কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী তখন তাঁর কোন বান্দা কেমন করে তাঁর সাহায্যকারী হতে পারে? এই খটকা এবং সন্দেহ-সংশয় দূর করার জন্য আমরা বিষয়টির আরো কিছু ব্যাখ্যা এখানে পেশ করছি।

এসব লোককে আল্লাহর সাহায্যকারী মূলত এজন্য বলা হয়নি যে, কোন কাজের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর কোন সৃষ্টির মুখাপেক্ষী (নাউযুবিল্লাহ)। বরং তাদেরকে আল্লাহর সাহায্যকারী এ জন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জীবনের যে গণ্ডিতে কুফর ও ঈমান এবং আনুগত্য ও নাফরমানীর যে স্বাধীনতা দিয়েছেন সে ক্ষেত্রে তিনি তাঁর অজেয় শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জোর করে মানুষকে মু'মিন ও অনুগত বানান না। বরং নবী-রসূল ও কিতাবের সাহায্যে তাদেরকে উপদেশ দেন, শিক্ষাদান করেন এবং বুঝিয়েসুজিয়ে সঠিক পথ দেখানোর পন্থা অবলম্বন করেন। যে ব্যক্তি এই উপদেশ ও শিক্ষাকে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে গ্রহণ করে সে মু'মিন; যে কাজে পরিণত করে সে মুসলিম, অনুগত ও আবেদ; যে আল্লাহভীতির নীতি অনুসরণ করে সে মুত্তাকী, যে নেকীর কাজে অগ্রগামী হয় সে 'মুহ্সিন' এবং এর থেকে আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে যে এই উপদেশ ও শিক্ষার সাহায্যে আল্লাহর বান্দাদের সংস্কার ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে এবং কুফর ও পাপাচারের স্থলে আল্লাহর আনুগত্যের বিধান কায়েম করার জন্য কাজ করতে শুরু করে আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর সাহায্যকারী বলে আখ্যায়িত করেন। যেমন উপরোক্ত আয়াতের কয়েকটি স্থানে স্পষ্ট ভাষায় এ কথাটিই বলা হয়েছে। যদি আল্লাহর সাহায্যকারী না বলে আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী বলা মূল উদ্দেশ্য হতো তাহলে انصار الله না বলে انصار دين الله বলা হতো, ينصرون الله না বলে ينصرون دين الله বলা হতো এবং ان تنصروا الله না বলে ان تنصروا دين الله বলা হতো। একটি বিষয় বলার জন্য আল্লাহ তা'আলা যখন কয়েকটি স্থানে একের পর এক একই বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করেছেন তখন তা স্পষ্টভাবে এ কথাই প্রমাণ করে যে, এ ধরনের লোকদের আল্লাহর সাহায্যকারী বলাই এর মূল উদ্দেশ্য। তবে এই সাহায্য নাউযুবিল্লাহ এ অর্থে নয় যে, এসব লোক আল্লাহ তা'আলার এমন কোন প্রয়োজন পূরণ করছে যার তিনি মুখাপেক্ষী। বরং এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যে কাজ তাঁর জবরদস্ত শক্তির জোরে না করে তাঁর নবী-রসূল ও কিতাবের সাহায্যে করতে চান এসব লোক সেই কাজে অংশগ্রহণ করছে।

২১- ঈসা মাসীহর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী বলতে ইহুদী এবং ঈমান গ্রহণকারী বলতে খৃষ্টান ও মুসলমান উভয়কে বুঝানো হয়েছে আর এই দুই জাতিকেই আল্লাহ তা'আলা ঈসা মাসীহর অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছেন। এখানে

একথাটি বলার উদ্দেশ্য মুসলমানদের এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দেয়া যে, হযরত ঈসার অনুসারীরা ইতিপূর্বেও যেভাবে তাঁর অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন এখনও তেমনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীরা তাঁর অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবেন।

আল জুম'আ

৬২

নামকরণ

৯নং আয়াতের اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ আয়াতাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ সূরার মধ্যে যদিও জুম'আর নামাযের আহকাম বা বিধি-বিধানও বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু জুম'আ সামগ্রিকভাবে এর বিষয়বস্তুর শিরোনাম নয়। বরং অন্যান্য সূরার নামের মত এটিও এ সূরার প্রতিকী বা পরিচয়মূলক নাম।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহ ৭ হিজরীতে সম্ভবত খায়বার বিজয়ের সময় অথবা তার নিকটবর্তী সময়ে নাযিল হয়েছে। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী এবং ইবনে জারীর হযরত আবু হুরাইরা বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে বসে থাকা অবস্থায় এ আয়াতটি নাযিল হয়। হযরত আবু হুরাইরা সম্পর্কে এ বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে এবং খায়বার বিজয়ের পূর্বে ঈমান এনেছিলেন। ইবনে হিশামের বর্ণনা অনুসারে ৭ হিজরীর মুহাররাম মাসে আর ইবনে সা'দের বর্ণনা অনুসারে জমাদিউল উলা মাসে খায়বার বিজিত হয়েছিল। অতএব যুক্তির দাবী হলো, ইহুদীদের এই সর্বশেষ দুর্গটি বিজিত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্বোধন করে এ আয়াতগুলো নাযিল করে থাকবেন কিংবা খায়বারের পরিণাম দেখে উত্তর হিজাযের সমস্ত ইহুদী জনপদ যখন ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত হয়ে গিয়েছিল তখন হয়তো এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল।

দ্বিতীয় রুকূ'র আয়াতগুলো হিজরাতের পরে অল্পদিনের মধ্যে নাযির হয়েছিল। কেননা নবী (সা) মদীনা পৌঁছার পর পঞ্চম দিনেই জুম'আর নামায কায়েম করেছিলেন। এই রুকূ'র শেষ আয়াতটিতে যে ঘটনার প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে তা স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, আয়াতটি জুম'আর নামায আদায় করার ব্যবস্থা হওয়ার পর এমন এক সময়ে নাযিল হয়ে থাকবে যখন মানুষ দীনী উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সমাবেশের আদব-কায়দা ও নিয়ম-কানুন সম্পর্কে তখনও পুরো প্রশিক্ষণ লাভ করেনি।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

ওপরে আমরা একথা বলেছি যে, এ সূরার দু'টি রুকূ' দু'টি ভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে। অতএব এর বিষয়বস্তু যেমন আলাদা তেমনি যাদের সম্বোধন করে নাযিল করা হয়েছে সে লোকজনও আলাদা। তবে এ দু'টি রুকূ'র আয়াতসমূহের মধ্যে এক প্রকার সাদৃশ্য আছে

এবং এ জন্য তা একই সূরাতে সন্নিবেশিত হয়েছে। সাদৃশ্য কি তা বুঝার আগে রুকূ' দু'টির বিষয়বস্তু আলাদাভাবে আমাদের বুঝে নেয়া উচিত।

ইসলামী আন্দোলনের পথ রোধ করার জন্য বিগত ছয় বছরে ইহুদীরা যেসব প্রচেষ্টা চালিয়েছে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এমনি এক সময় প্রথম রুকূ'র আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল। প্রথমত মদীনায় তাদের তিন তিনটি শক্তিশালী গোত্র রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছিল। তারা এর ফল দেখতে পেল এই যে, একটি গোত্র সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেল এবং অপর দু'টি গোত্রকে দেশান্তরিত হতে হলো। অতপর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তারা আরবের বহুসংখ্যক গোত্রকে মদীনার ওপর আক্রমণের জন্য নিয়ে আসল কিন্তু আহযাব যুদ্ধে তারা সবাই চপেটাঘাত খেল। এরপর তাদের সবচেয়ে বড় দুর্গ বা আখড়া রয়ে গিয়েছিল খায়বারে। মদীনা ত্যাগকারী ইহুদীদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যাও সেখানে সমবেত হয়েছিল। এসব আয়াত নাযিল হওয়ার সময় সেটিও অস্বাভাবিক রকমের কোন সংঘর্ষ ছাড়াই বিজিত হয় এবং মুসলমানদের ভূমি কর্ষণকারী হিসেবে থাকতে খোদ ইহুদীরাই আবেদন জানায়। সর্বশেষ এই পরাজয়ের পর আরবে ইহুদীদের শক্তি সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হয়ে যায়। ওয়াদিউল কুরা, ফাদাক, তায়মা, তাবুক সব একের পর এক আত্মসমর্পণ করতে থাকে। ইসলামের অস্তিত্ব বরদাশত করা তো দূরের কথা, তার নাম শুনতেও যারা পছন্দ করত না, আরবের সেইসব ইহুদীই শেষ পর্যন্ত সেই ইসলামের প্রজায় পরিণত হয়। এই পরিবেশ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা এই সূরার মধ্যে আরো একবার তাদেরকে সম্বোধন করলেন। তাদের উদ্দেশ্যে কুরআন মজীদে উল্লেখিত এটাই সম্ভবত সর্বশেষ বক্তব্য। এতে তাদের উদ্দেশ করে তিনটি কথা বলা হয়েছে ঃ

এক ঃ তোমরা এ রসূলকে মানতে অস্বীকার করছো এই কারণে যে, তিনি এমন এক কওমের মধ্যে প্রেরিত হয়েছেন যাদেরকে অবজ্ঞা ভরে তোমরা 'উম্মী' বলে থাক। তোমাদের ভ্রান্ত ধারণা এই যে, রসূলকে অবশ্যই তোমাদের নিজেদের কওমের মধ্যে থেকে হতে হবে। তোমরা এ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে ছিলে যে, তোমাদের কওমের বাইরে যে ব্যক্তিই রিসালাতের দাবী করবে সে অবশ্যই মিথ্যাবাদী। কারণ এই পদমর্যাদা তোমাদের বংশের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং 'উম্মী'দের মধ্যে কখনো কোন রসূল আসতে পারেন না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সেই উম্মীদের মধ্যেই একজন রসূল সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের চোখের সামনেই যিনি তাঁর কিতাব শুনাচ্ছেন, মানুষকে পরিশুদ্ধ করছেন এবং সেই মানুষকে হিদায়াত দান করছেন তোমরা নিজেরাও যাদের গোমরাহীর অবস্থা জান। এটা আল্লাহর করুণা ও মেহেরবানী, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। তাঁর করুণা ও মেহেরবানীর ওপর তোমাদের কোন ইজারাদারী নেই যে, তোমরা যাকে তা দেয়াতে চাও তাকেই তিনি দিবেন আর তোমরা যাকে বঞ্চিত করতে চাও তাকে তিনি বঞ্চিত করবেন।

দুই ঃ তোমাদেরকে তাওরাতের বাহক বানানো হয়েছিল। কিন্তু তোমরা এর গুরুদায়িত্ব উপলব্ধিও করনি, পালনও করনি। তোমাদের অবস্থা সেই গাধার মত যার পিঠে বই পুস্তকের বোঝা চাপানো আছে কিন্তু সে কি বহন করে নিয়ে যাচ্ছে তা জানে না। তোমাদের অবস্থা বরং ঐ গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট। গাধার তো কোন প্রকার বুদ্ধি-বিবেক নেই, কিন্তু তোমাদের বুদ্ধি-বিবেক আছে। তাছাড়া, তোমরা আল্লাহর কিতাবের বাহক

হওয়ার গুরুদায়িত্ব শুধু এড়িয়েই চলছো না, জেনে বুঝে আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলা থেকেও বিরত থাকছো না। এসব সত্ত্বেও তোমাদের ধারণা এই যে, তোমরা আল্লাহর অতি প্রিয় এবং রিসালাতের নিয়ামত চিরদিনের জন্য তোমাদের নামে লিখে দেয়া হয়েছে। তোমরা যেন মনে করে নিয়েছ, তোমরা আল্লাহর বাণীর হক আদায় করো আর না করো কোন অবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ছাড়া আর কাউকে তাঁর বাণীর বাহক বানাবেন না।

তিন ঃ সত্যিই যদি তোমরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে এবং এ বিশ্বাসও তোমাদের থাকতো যে, তাঁর কাছে তোমাদের জন্য অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার স্থান সংরক্ষিত আছে তাহলে মৃত্যুর এমন ভীতি তোমাদের মধ্যে থাকতো না যে, অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন গ্রহণীয় কিন্তু কোন অবস্থায়ই মৃত্যু গ্রহণীয় নয়। আর মৃত্যুর এই ভয়ের কারণেই তো বিগত কয়েক বছরে তোমরা পরাজয়ের পর পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছো। তোমাদের এই অবস্থা–ই প্রমাণ করে যে, তোমাদের অপকর্মসমূহ সম্পর্কে তোমরা নিজেরাই অবহিত। তোমাদের বিবেক ভাল করেই জানে যে, এসব অপকর্ম নিয়ে যদি মারা যাও তাহলে পৃথিবীতে যতটা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হচ্ছো আল্লাহর কাছে তার চেয়ে অধিক লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

এ হচ্ছে প্রথম রুকূ'র বিষয়বস্তু। দ্বিতীয় রুকূ'টি এর কয়েক বছর আগে নাযিল হয়েছিল। দ্বিতীয় রুকূ'র আয়াতগুলো এ সূরার অন্তরভুক্ত করার কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের 'সাবৃত' বা শনিবারের পরিবর্তে মুসলমানদেরকে 'জুম'আ' দান করেছেন। তাই তিনি মুসলমানদের সাবধান করে দিতে চান যে, ইহুদীরা 'সাবৃতে'র সাথে যে আচরণ করেছে তারা যেন জুম'আর সাথে সেই আচরণ না করে। একদিন ঠিক জুম'আর নামাযের সময় একটি বাণিজ্য কাফেলা আসলে তাদের ঢোল ও বাদ্যের শব্দ শুনে বারজন ছাড়া উপস্থিত সবাই মসজিদে নববী থেকে বেরিয়ে দৌড়িয়ে কাফেলার কাছে গিয়ে হাজির হয়। অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন খোতবা দিচ্ছিলেন। তাই নির্দেশ দেয়া হয় যে, জুম'আর আযান হওয়ার পর সব রকম কেনাবেচা এবং অন্য সব রকম ব্যস্ততা হারাম। ঈমানদারদের কাজ হলো, এ সময় সব কাজ বন্ধ রেখে আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত হবে। তবে নামায শেষ হওয়ার পর নিজেদের কারবার চালানোর জন্য পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার অধিকার অবশ্যই তাদের আছে। জুম'আর হুকুম আহকাম সম্পর্কিত এ রুকূ'টিকে একটি স্বতন্ত্র সূরাও বানান যেত কিংবা অন্য কোন সূরার অন্তরভুক্তও করা যেতে পারত। কিন্তু তা না করে এখানে যেসব আয়াতে ইহুদীদেরকে তাদের মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে বিশেষভাবে সেই সব আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। আমাদের বিবেচনায় এর অন্তরনিহিত উদ্দেশ্য তাই যা আমরা ওপরে বর্ণনা করেছি।

আয়াত ১১ | সূরা আল জুম'আ-মাদানী | রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝١ هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٢ وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٣

আসমানে যা আছে এবং যমীনে যা আছে তার সবই আল্লাহর তাসবীহ করছে। তিনি বাদশাহ, অতি পবিত্র এবং মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়।[১]

তিনিই মহান সত্তা যিনি উম্মীদের[২] মধ্যে তাদেরই একজনকে রসূল করে পাঠিয়েছেন যে তাদেরকে তাঁর আয়াত শুনায়, তাদের জীবনকে সজ্জিত ও সুন্দর করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়।[৩] অথচ ইতিপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল।[৪] (এ রসূলের আগমন) তাদের অন্য লোকদের জন্যও যারা এখনো তাদের সাথে যোগ দেয়নি।[৫] আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়।[৬]

১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা হাদীদের ১ ও ২নং টীকা, আল হাশরের ৩৬, ৩৭ ও ৪১ টীকা। পরবর্তী বিষয়ের সাথে এই প্রারম্ভিক কথাটির গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। আরবের ইহুদীরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তি সত্তা, গুণাবলী ও কার্যকলাপে রিসালাতের স্পষ্ট নিদর্শন চাক্ষুষ দেখা সত্ত্বেও এবং হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর সম্পর্কে তাওরাতে স্পষ্ট ভাষায় যে সুসংবাদ দিয়েছিলেন তা যে তাঁর ছাড়া আর কারো জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না তা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও শুধু এজন্য তাঁকে অস্বীকার করছিল যে, নিজ জাতি ও বংশের বাইরের আর কারো রিসালাত মেনে নেয়া তাদের কাছে অত্যন্ত অপছন্দীয় ব্যাপার ছিল। তারা পরিষ্কার বলতো, আমাদের কাছে যাকিছু এসেছে আমরা কেবল তাই মানব। কোনো অইসরাঈলী নবীর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকেও কোনো শিক্ষা এসে থাকলে তা মেনে নিতে তারা আদৌ প্রস্তুতি ছিল না। এই আচরণের কারণে পরবর্তী আয়াতগুলোতে তাদেরকে তিরস্কার করা হচ্ছে। তাই এই

প্রারম্ভিক আয়াতাংশ দিয়ে বক্তব্য শুরু করা হয়েছে। এতে প্রথম যে কথাটি বলা হয়েছে তাহলো, বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি বস্তু আল্লাহর তাসবীহ করছে। অর্থাৎ গোটা বিশ্ব-জাহান একথার সাক্ষ দিচ্ছে যে, যেসব অপূর্ণতা ও দুর্বলতার ভিত্তিতে ইহুদীরা তাদের বংশীয় শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা কায়েম ও বদ্ধমূল করে রেখেছে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি কারো আত্মীয় নন। তাঁর কাছে পক্ষপাতিত্বমূলক (Favouritism) কোনো কাজ নেই। তিনি নিজের সমস্ত সৃষ্টির সাথে সমানভাবে ইনসাফ, রহমত ও প্রতিপালক সুলভ আচরণ করেন। কোনো বিশেষ বংশধারা বা কওম তাঁর প্রিয় পাত্র নয় যে, তারা যাই করুক না কেন সর্বাবস্থায় তাঁর অনুগ্রহ তার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে এবং অন্য কোনো জাতি গোষ্ঠী বা কওমের সাথে তাঁর কোনো শত্রুতা নেই যে, তাদের মধ্যে সদগুণাবলী থাকা সত্ত্বেও তাঁর দান ও করুণা থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। এরপর বলা হয়েছে, তিনি বাদশাহ। অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের কোনো শক্তিই তার ক্ষমতা ও ইখতিয়ারকে সীমিত করতে পারে না। তোমরা তাঁর দাস এবং প্রজা। তোমাদের হিদায়াতের জন্য তিনি কাকে পয়গাম্বর বানাবেন আর কাকে বানাবেন না, সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মত পদমর্যাদা তোমরা কবে থেকে লাভ করেছ? তারপর বলা হয়েছে, তিনি قدوس বা মহাপবিত্র। অর্থাৎ তাঁর সিদ্ধান্তে ভুল-ত্রুটির কোনো সম্ভাবনা থাকতে পারে না। তিনি ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র, তা থেকে অনেক উর্ধে। তোমাদের বুঝ ও উপলব্ধিতে ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে পারে, কিন্তু তার সিদ্ধান্তে ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে পারে না। শেষ দিকে আল্লাহ তা'আলার আরো দু'টি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হলো, তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী। অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করে কেউ জয়লাভ করতে পারে না। অপরটি হলো তিনি জ্ঞানময়, অর্থাৎ যাকিছু করেন বুদ্ধি, বিবেক ও প্রজ্ঞার দাবীও হুবহু তাই। আর তাঁর কৌশল ও ব্যবস্থাপনা এতই সুদৃঢ় হয়ে থাকে যে, বিশ্ব-জাহানের কেউই তা ব্যর্থ করতে পারে না।

২. এখানে 'উম্মী' শব্দটি ইহুদীদের পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম বিদ্রূপ বা তিরস্কার প্রচ্ছন্ন আছে। অর্থাৎ ইহুদীরা যাদেরকে অবজ্ঞা করে 'উম্মী' বলে থাকে এবং নিজেদের তুলনায় নগণ্য ও নীচু বলে মনে করে পরাক্রমশালী ও জ্ঞানময় আল্লাহ তাদের মধ্যেই একজন রসূল সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজে রসূল হয়ে বসেননি, বরং তাঁকে পাঠিয়েছেন তিনিই যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের বাদশাহ, মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। তাঁর শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে এরা নিজেদেরই ক্ষতি করবে তাঁর কোনো ক্ষতি করতে এরা আদৌ সক্ষম নয়।

জেনে রাখা দরকার যে, কুরআন মজীদে 'উম্মী' শব্দটি বেশ কটি স্থানে এসেছে। তবে সব জায়গায় শব্দটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং বিভিন্ন জায়গায় আলাদা আলাদা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও যাদের কাছে অনুসরণ করার জন্য কোনো আসমানী কিতাব নেই আহলে কিতাবদের বিপরীতে তাদেরকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছেঃ

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ-(ال عمران : ٢٠)

"আহলে কিতাব ও উম্মীদের জিজ্ঞেস কর ঃ তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করেছ ?"
–(সূরা আলে ইমরান ঃ ২০)

এখানে উম্মী বলতে আরবের মুশরিকদের বুঝানো হয়েছে এবং তাদেরকে আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানদের থেকে স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কোথাও এ শব্দটি আহলে কিতাবদেরই নিরক্ষর ও আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে অজ্ঞ ও অনবহিত লোকদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, বলা হয়েছে ঃ

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ –(البقرة : ٧٨)

"এই ইহুদীদের কিছু লোক আছে 'উম্মী' কিতাবের কোনো জ্ঞান তাদের নেই। তারা কেবল নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনাকেই চিনে।"–(সূরা বাকারা ঃ ৭৮)

আবার কোথাও এ শব্দটি নিরেট ইহুদী পরিভাষা হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে 'উম্মী' বলতে অ-ইহুদী সবাইকে বুঝানো হয়েছে।

যেমন, বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ –(ال عمران : ٧٥)

"তাদের মধ্যে এ অসাধুতা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হলো, তারা বলে ঃ উম্মীদের অর্থ-সম্পদ লুটেপুটে ও মেরে খাওয়ায় কোনো দোষ নেই।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৫)

আলোচ্য আয়াতে এই তৃতীয় অর্থটিই গ্রহণ করা হয়েছে। এ শব্দটি ইব্রিয় ভাষার "গোয়েম" শব্দের সমার্থক। ইংরেজী বাইবেলে এর অনুবাদ করা হয়েছে Gentiles এবং এর দ্বারা সমস্ত অ-ইহুদী বা অ-ইসরাঈলী লোককে বুঝানো হয়েছে।

কিন্তু শুধু এতটুকু ব্যাখ্যার সাহায্যে এ ইহুদী পরিভাষাটির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা সম্ভব নয়। ইবরানী বা ইব্রিয় ভাষায় 'গোয়েম' শব্দটি প্রথমত কেবল জাতি বা কওমসমূহ অর্থে বলা হতো। কিন্তু ক্রমান্বয়ে ইহুদীরা এটিকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতে শুরু করে। প্রথমে তারা এটিকে নিজেদের ছাড়া অন্যসব কওমের জন্য নির্দিষ্ট করে। পরে এ শব্দটির অর্থে এ ভাবধারাও সৃষ্টি করে যে, ইহুদীরা ছাড়া অন্য সব জাতিই অসভ্য ও অভদ্র, ধর্মের দিক থেকে নিকৃষ্ট, অপবিত্র এবং নীচ ও হীন। শেষ পর্যন্ত অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ শব্দটি একই উদ্দেশ্যে অগ্রীকদের জন্য গ্রীকদের ব্যবহৃত পরিভাষা Barbarian শব্দটিকেও ছাড়িয়ে যায়। রিব্বীদের সাহিত্যে 'গোয়েম'রা এমনই ঘৃণ্য মানুষ যে, তাদেরকে মানুষ হিসাবে ভাই বলে গ্রহণ করা যেতে পারে না এবং তাদের সাথে সফরও করা যেতে পারে না। বরং তাদের কেউ যদি পানিতে ডুবে মরতে থাকে তাহলে তাকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টাও করা যেতে পারে না। ইহুদীরা বিশ্বাস করতো, মাসীহ এসে সমস্ত গোয়েমকে ধ্বংস করে জ্বালিয়ে ছাই করে ফেলবেন।–(আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আলে ইমরান, টীকা ৬৪)।

৩. কুরআন মজীদের চারটি স্থানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রত্যেক স্থানেই বর্ণনা করার ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। সূরা বাকারার ১২৯ আয়াতে এসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছে

আরববাসীদের একথা বলার জন্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবী হয়ে আসাকে তারা যে নিজেদের জন্য দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবত বলে মনে করছে, তা ঠিক নয়। বরং প্রকৃতপক্ষে তা তাদের জন্য একটি বড় নিয়ামত। এটি লাভের জন্য হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম তাঁদের সন্তানদের জন্য দোয়া করতেন। সূরা বাকারার ১৫১ আয়াতে এসব গুণাবলী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানরা যেন নবীর (সা) মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবী বানানোর মাধ্যমে যে নিয়ামত তাঁদের দিয়েছেন তা থেকে পুরোপুরি উপকৃত হতে পারে। সূরা আলে ইমরানের ১৬৪ আয়াতে আবার এসব গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের মানুষগুলোকে একথা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে তাঁর রসূল পাঠিয়ে কত বড় ইহসান করেছেন। কিন্তু তারা এমনই অপদার্থ যে, তাঁকে কোনো মর্যাদাই দিচ্ছে না। চতুর্থবারের মত এ সূরাতে ঐসব গুণাবলী পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ইহুদীদের একথা জানিয়ে দেয়া যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের চোখের সামনে যেসব কাজ করেছেন তা স্পষ্টত একজন রসূলের কাজ। তিনি আল্লাহর আয়াত শুনাচ্ছেন। এসব আয়াতের ভাষা, বিষয়বস্তু, বর্ণনাভঙ্গি সবকিছুই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তা প্রকৃতই আল্লাহর আয়াত। তা মানুষের জীবনকে সুন্দর, পরিপাটি ও সুবিন্যস্ত করছে, তাদের নৈতিক চরিত্র, অভ্যাস ও রীতিনীতি এবং লেনদেন ও জীবনাচরণকে সব রকমের কলুষ-কালিমা থেকে পবিত্র করছে এবং উন্নতমানের নৈতিক মর্যাদায় ভূষিত করছে। এটা ঠিক সেই কাজ যা ইতিপূর্বে সমস্ত নবী-রসূলও করেছেন। তাছাড়া তিনি শুধু আয়াতসমূহ শুনানোকেই যথেষ্ট মনে করেন না, বরং সবসময় নিজের কথা ও কাজ দ্বারা নিজের বাস্তব জীবনের উদাহরণ দ্বারা মানুষকে আল্লাহর কিতাবের লক্ষ ও উদ্দেশ্য বুঝাচ্ছেন। তিনি তাদের এমন যুক্তি, বুদ্ধি ও জ্ঞানের শিক্ষা দিচ্ছেন যা কেবল নবী-রসূলগণ ছাড়া আর কেউ-ই শিক্ষা দেয়নি। এ ধরনের চরিত্র ও কাজ নবী-রসূলদের বিশেষ বৈশিষ্ট ও গুণ। এর সাহায্যেই তাঁদের চেনা যায়। সত্যিকার অর্থে নিজের কর্মকাণ্ড থেকে যার রসূল হওয়া প্রমাণিত হচ্ছে তাঁকে তোমরা কেবল এজন্য অস্বীকার করছো যে, তাঁকে তোমাদের কওমের মধ্য থেকে না পাঠিয়ে এমন এক কওমের মধ্য থেকে পাঠানো হয়েছে যাদেরকে তোমরা 'উম্মী' বলে অবজ্ঞা করে থাকো।

৪. এটা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের আরো একটি প্রমাণ। ইহুদীদের সত্যোপলব্ধির জন্য এ প্রমাণটি পেশ করা হয়েছে। তারা শত শত বছর পূর্ব থেকে আরব ভূমিতে বসবাস করে আসছিল। আরবের অধিবাসীদের ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক এবং তামাদ্দুনিক জীবনের কোনো দিকই তাদের অজানা ছিল না। তাদের পূর্বতন এ অবস্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলা হচ্ছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে এ জাতির চেহারা যেভাবে আমূল পরিবর্তিত হয়েছে তা তোমরা নিজ চোখে দেখেছ। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এসব লোক যে অবস্থার মধ্যে ডুবে ছিল তা তোমাদের জানা আছে। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের অবস্থা কি হয়েছে তাও তোমরা নিজ চোখে দেখছ। আর এ জাতির যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের অবস্থাও তোমরা দেখতে পাচ্ছ। একজন অন্ধও এই স্পষ্ট পার্থক্য দেখতে ও বুঝতে পারে। এটা কি তোমাদেরকে একথা বিশ্বাস করানোর জন্য যথেষ্ট নয় যে, একজন নবী ছাড়া এটা আর কারো কীর্তি হতে পারে না ? বরং এর তুলনায় পূর্ববর্তী নবী-রসূলদের কীর্তিও ম্লান হয়ে গিয়েছে।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝٤ مَثَلُ
الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ۚ
بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ
الظّٰلِمِيْنَ ۝٥

এটা তাঁর মেহেরবানী, তিনি যাকে চান তা দান করেন। আল্লাহ মহাকরুণার অধিকারী।

যাদেরকে তাওরাতের বাহক বানানো হয়েছিল, কিন্তু তারা তা বহন করেনি[৭] তাদের উপমা সেইসব গাধা[৮] যা বই-পুস্তক বহন করে। এর চেয়েও নিকৃষ্ট উপমা সেইসব লোকের যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে।[৯] আল্লাহ এ রকম জালেমদের হিদায়াত দান করেন না।

৫. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত শুধু আরব জাতি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। তা সারা দুনিয়ার সেইসব জাতি ও বংশ-গোষ্ঠীর জন্য যারা এখনো ঈমানদারদের মধ্যে শামিল হয়নি, বরং ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবে। মূল আয়াতাংশ হলো ঃ وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ তাদের মধ্য থেকে আরো কিছু লোক যারা এখনো তাদের সাথে শামিল হয়নি। এ আয়াতের مِنْهُمْ (তাদের মধ্য থেকে) শব্দটির দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, সেই অন্যান্য লোকগুলো উম্মীদের মধ্যে থেকে, অর্থাৎ তারা হবে দুনিয়ার অ-ইসরাঈলী জাতি-গোষ্ঠীর লোক। দুই, তারা হবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণকারী। তবে এখনো ঈমানদারদের মধ্যে অন্তরভুক্ত হয়নি, কিন্তু পরে এসে শামিল হবে। এভাবে এ আয়াতটিও সেই সব আয়াতের অন্তরভুক্ত যাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত সমগ্র মানব জাতির জন্য এবং চিরদিনের জন্য। কুরআন মজীদের আর যেসব স্থানে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে তাহলো সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৯, আল আরাফ ১৫৮, আল আম্বিয়া ১০৭, আল ফুরকান ১, সাবা ২৮ ; (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাবা, টীকা ৪৭)।

৬. অর্থাৎ এটি তাঁর শক্তি-সামর্থ ও জ্ঞানের বিস্ময়কর দিক যে, তিনি এ ধরনের এক অশিষ্ট উম্মী কওমের মধ্য থেকে এমন মহান নবী সৃষ্টি করেছেন যাঁর শিক্ষা ও হিদায়াত এতটা বিপ্লবাত্মক ও এমন বিশ্বজনীন স্থায়ী নীতিমালার ধারক, যার ওপর ভিত্তি করে গোটা মানব জাতি একটি মাত্র জাতিতে পরিণত হতে পারে এবং এ নীতিমালা থেকে চিরদিন দিকনির্দেশনা লাভ করতে পারে। যত চেষ্টাই করা হোক না কেন কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়ে কোনো মানুষই এই স্থান ও মর্যাদা লাভ করতে পারতো না। আরবদের মত

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ
فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٦ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗٓ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ
اَيْدِيْهِمْ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝٧ قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ
فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٨

তুমি বল, হে ইহুদী হয়ে যাওয়া লোকগণ![১০] তোমরা যদি ভেবে থাকো যে, অন্য সব মানুষ বাদ দিয়ে কেবল তোমরাই আল্লাহর প্রিয়পাত্র,[১১] আর তোমাদের এ ধারণার ক্ষেত্রে তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো,[১২] তাহলে মৃত্যু চেয়ে নাও। কিন্তু যেসব অপকর্ম তারা করেছে[১৩] তার কারণে তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ এসব জালেমকে খুব ভালভাবেই জানেন। তাদের বলো, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাচ্ছো তা তোমাদের কাছে আসবেই তারপর তোমাদেরকে সেই সত্তার সামনে পেশ করা হবে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন। তখন তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন যা তোমরা করছিলে।

পশ্চাদপদ জাতি তো দূরের কথা, দুনিয়ার কোন বড় জাতির সর্বাধিক মেধা-সম্পন্ন ব্যক্তিও এভাবে কোন জাতির চেহারা পুরোপুরি পাল্টে দিতে এবং গোটা মানব জাতিকে চিরদিনের জন্য একটি আদর্শ এবং একটি সংস্কৃতির বিশ্বজনীন ও সর্বাত্মক আদর্শ পরিচালনার যোগ্য হওয়ার মত একটা ব্যাপক নীতিমালা গোটা বিশ্বকে উপহার দিতে পারতো না। এটি আল্লাহর কুদরাতে সংঘটিত একটি মু'জিযা। আল্লাহ তাঁর কৌশল অনুসারে যে ব্যক্তি, যে দেশ এবং যে জাতিকে চেয়েছেন এ উদ্দেশ্যে বাছাই করে নিয়েছেন। এতে কোন নির্বোধ যদি মনে কষ্ট পায় তাহলে পেতে থাকুক।

৭. এ আয়াতাংশের দু'টি অর্থ। একটি সাধারণ অর্থ এবং অপরটি বিশেষ অর্থ। সাধারণ অর্থ হলো, যাদের ওপর তাওরাতের জ্ঞান অর্জন, তদনুযায়ী আমল এবং তাওরাত অনুসারে দুনিয়াকে পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, তারা তাদের এ দায়িত্ব বুঝেনি এবং তার হকও আদায় করেনি। বিশেষ অর্থ হলো, তাওরাতের ধারক ও বাহক গোষ্ঠী হওয়ার কারণে যাদের কাজ ছিল সবার আগে অগ্রসর হয়ে সেই রসূলকে সাহায্য-সহযোগিতা করা যার আগমনের সুসংবাদ তাওরাতে স্পষ্ট ভাষায় দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারাই তাঁর সবচেয়ে বেশী শত্রুতা ও বিরোধিতা করেছে এবং তাওরাতের শিক্ষার দাবী পূরণ করেনি।

৮. অর্থাৎ গাধার পিঠে বই-পুস্তকের বোঝা চাপানো থাকলেও পিঠের ওপর কি আছে সে যেমন তা জানে না। অনুরূপ এই তাওরাতের বোঝাও তাদের ওপর চাপানো আছে। কিন্তু তারা আদৌ জানে না, এই মহান গ্রন্থ কি জন্য এসেছে এবং তাদের কাছে কি দাবী করছে।

৯. অর্থাৎ তাদের অবস্থা গাধার চেয়েও নিকৃষ্টতর। গাধার কোন বিবেক-বুদ্ধি ও উপলব্ধি নেই বলে সে অক্ষম, কিন্তু এদের তো বিবেক-বুদ্ধি ও উপলব্ধি আছে। এরা নিজেরা তাওরাত পড়ে এবং অন্যদের পড়ায় তাই এর অর্থ তাদের অজানা নয়। এরপরও তারা জেনে শুনে এর হিদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ও উপেক্ষা করছে এবং সেই নবীকে মানতে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করছে যিনি তাওরাত অনুসারে অবিসম্বাদিতভাবে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এরা জানে না বা বুঝে না বলে দোষী নয়, বরং জেনে শুনে আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলার অপরাধে অপরাধী।

১০. এ বিষয়টি লক্ষণীয় যে, এখানে "হে ইহুদীরা" বলা হয়নি। বলা হয়েছে "হে ইহুদী হয়ে যাওয়া লোকগণ" অথবা "যারা ইহুদীবাদ গ্রহণ করেছো"। এর কারণ হলো, মূসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর আগের ও পরের নবী-রসূলগণ আসল যে দীন এনেছিলেন তা ছিল ইসলাম। এসব নবী-রসূলদের কেউই ইহুদী ছিলেন না এবং তাঁদের সময়ে ইহুদীবাদের সৃষ্টিও হয়েছিল না। এই নামে এ ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে বহু পরে। ইয়াকুব আলাইহিস সালামের চতুর্থ পুত্র ইয়াহদার বংশোদ্ভূত গোত্রটির নামানুসারে এ ধর্মের নামকরণ হয়েছে। হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের পরে তাঁর সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলে এই গোত্রটি ইয়াহুদিয়া নামক রাষ্ট্রটির মালিক হয় এবং বনী ইসরাঈলের অন্যান্য গোত্রগুলো নিজেদের একটি আলাদা রাষ্ট্র কায়েম করে যা সামেরিয়া নামে খ্যাত হয়। পরবর্তীকালে আসিরীয়রা সামেরিয়াকে শুধু ধ্বংসই করেনি, বরং এই রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠাতা ইসরাঈলী গোত্রগুলোর নাম-নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দিয়েছে। এরপরে শুধু ইয়াহদা এবং তার সাথে বিন ইয়ামীনের বংশ অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু তার ওপর ইয়াহদা বংশের প্রভাব ও আধিপত্যের কারণে তাদের জন্য ইয়াহুদ শব্দটির প্রয়োগ হতে থাকে। ইহুদী ধর্মযাজক, রিব্বী এবং আহবাররা নিজেদের ধ্যান-ধারণা, মতবাদ ও ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ অনুযায়ী এই বংশের মধ্যে আকীদা-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় বিধি-বিধানের যে কাঠামো শত শত বছর ধরে নির্মাণ করেছে তার নাম ইহুদীবাদ। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে এই কাঠামো নির্মাণ শুরু হয় এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত চলতে থাকে। আল্লাহর রসূলদের আনীত আল্লাহর হিদায়াতের উপাদান খুব সামান্যই এতে আছে এবং যা আছে তার চেহারাও অনেকখানি বিকৃত হয়েছে। এ কারণে কুরআন মজীদের অধিকাংশ স্থানে তাদেরকে الَّذِينَ هَادُوا বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ সেই সব লোক যারা ইহুদী হয়ে গিয়েছে বা ইহুদীবাদ গ্রহণ করেছে। তাদের মধ্যকার সবাই আবার ইসরাঈলী ছিল না। যেসব অইসরাঈলী ইহুদীবাদ গ্রহণ করেছিল তারাও এর মধ্যে ছিল। কুরআন মজীদে যেখানে বনী ইসরাঈল জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে সেখানে "হে বনী ইসরাঈল" বলা হয়েছে। আর যেখানে ইহুদী ধর্মের অনুসারীদের সম্বোধন করা হয়েছে সেখানে الَّذِينَ هَادُوا বলা হয়েছে।

১১. কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে তাদের এই দাবী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ঃ তারা বলেন, ইহুদীরা ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না (আল বাকারাহ, ১১১)। দোযখের আগুন আমাদের কখনো স্পর্শ করবে না। আর আমাদেরকে যদি নিতান্তই শাস্তি দেয়া হয় তাহলে মাত্র কয়েক দিনের জন্য দেয়া হবে (আল বাকারাহ, ৮০; আলে ইমরান, ২৪)। আমরা আল্লাহর বেটা এবং তাঁর প্রিয়পাত্র (আল মায়েদা, ১৮)। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থসমূহেও এ ধরনের কিছু দাবী-দাওয়া দেখা যায়। সারা বিশ্ব অন্তত এতটুকু কথা জানে যে, তারা নিজেদেরকে আল্লাহর বাছাই করা সৃষ্টি (Chosen People) বলে থাকে। তারা এরূপ এক খোশ খেয়ালে মত্ত যে, তাদের সাথে খোদার একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে যা অন্য কোন মানব গোষ্ঠীর সংগে নেই।

১২. এখানে কুরআন মজীদে একথাটি দ্বিতীয়বারের মত ইহুদীদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে। প্রথমে সূরা বাকারায় বলা হয়েছিল, এদের বলো, আল্লাহর কাছে সমস্ত মানুষকে বাদ দিয়ে আখেরাতের ঘর যদি কেবল তোমাদের জন্যই নির্দিষ্ট থেকে থাকে আর এ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে মৃত্যু কামনা করো। কিন্তু যেসব অপকর্ম তারা করেছে তার কারণে তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ জালেমদের খুব ভাল করেই জানেন। বরং তোমরা দেখবে তারা কোন না কোনভাবে বেঁচে থাকতে সমস্ত মানুষের চেয়ে এমনকি মুশরিকদের চেয়েও বেশী লালায়িত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আকাংখা করে হাজার বছর বেঁচে থাকার। অথচ দীর্ঘ আয়ু লাভ করলেও তা তাদেরকে এই আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তাদের সমস্ত কৃতকর্মই আল্লাহর দৃষ্টিতে আছে (আয়াত ৯৪—৯৬)। এ কথাটিই এখানে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এটা শুধু পুনরুক্তিই নয়। সূরা বাকারার আয়াতগুলোতে একথা বলা হয়েছিল তখন, যখন ইহুদিদের সাথে মুসলমানদের কোন যুদ্ধ হয়নি। কিন্তু এই সূরায় তার পুনরুক্তি করা হয়েছে এমন এক সময় যখন তাদের সাথে ইতিপূর্বে কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর আরবভূমিতে চূড়ান্তভাবে তাদের শক্তি চূর্ণ করা হয়েছে। পূর্বে সূরা বাকারায় যে কথা বলা হয়েছিল এসব যুদ্ধ এবং তাদের পরিণাম অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ দুই ভাবেই তা প্রমাণ করে দিয়েছিল। মদীনা এবং খায়বারে সংখ্যার দিক দিয়ে ইহুদী শক্তি কোনভাবেই মুসলমানদের তুলনায় কম ছিল না এবং উপায়-উপকরণও তাদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। তাছাড়া আরবের মুশরিকরা এবং মদীনার মুনাফিকরাও তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করছিল। কারণ মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য তারা বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু এই অসম মোকাবিলায় যে জিনিসটি মুসলমানদের বিজয়ী এবং ইহুদীদের পরাজিত করেছিল তা ছিল এই যে, মুসলমানগণ আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করতে ভীত হওয়া তো দূরের কথা বরং হৃদয়ের গভীর থেকে মৃত্যু কামনা করতো এবং মরণ পণ করে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তো। কারণ, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তারা আল্লাহর পথে লড়াই করছে। আর এ বিষয়েও পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, এ পথে শাহাদাত বরণকারীর জন্য রয়েছে জান্নাত। অপরদিকে ইহুদীদের অবস্থা ছিল এই যে, তারা কোন পথেই জান দিতে প্রস্তুত ছিল না; না খোদার পথে, না নিজের কওমের পথে এবং না নিজের জান, মাল ও ইজ্জত রক্ষার পথে। যে ধরনের জীবনই হোক না কেন তাদের প্রয়োজন ছিল কেবল বেঁচে থাকার। এ জিনিসটিই তাদেরকে ভীরু ও কাপুরুষ বানিয়ে দিয়েছিল।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ
ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ
ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

২ রুকূ'

হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছো, জুম'আর দিন[১৪] যখন নামাযের জন্য তোমাদের ডাকা হয় তখন আল্লাহর যিকরের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও।[১৫] এটাই তোমাদের জন্য বেশী ভাল যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে। তারপর যখন নামায শেষ হয়ে যায় তখন ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো[১৬] এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো।[১৭] আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।[১৮]

১৩. অন্য কথায় মৃত্যু থেকে তাদের এই পালানো বিনা কারণে নয়। মুখে তারা যত বড় বড় কথাই বলুক না কেন, আল্লাহর দীনের সাথে তারা যে আচরণ করেছে এবং পৃথিবীতে তারা যা করছে আখেরাতে সেই সব আচরণ ও কাজকর্মের কিরূপ ফলাফল আশা করা যায় তাদের জ্ঞান ও বিবেক তা ভাল করেই জানতো। এ কারণে তাদের প্রবৃত্তি আল্লাহর আদালতের মুখোমুখি হতে টালবাহানা করে।

১৪. এ আয়াতে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ করার মত। প্রথমটি হলো, এতে নামাযের জন্য ঘোষণা দেয়ার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টি হলো, এমন একটি নামাযের জন্য ঘোষণা দেয়ার কথা আছে যা বিশেষভাবে শুধু জুমআর দিনেই পড়তে হবে। তৃতীয়টি হলো, এ দু'টি জিনিসের কথা এভাবে বলা হয়নি যে, তোমরা নামাযের জন্য ঘোষণা করো এবং জুমআর দিনে একটি বিশেষ নামায পড়। বরং বর্ণনাভঙ্গি ও পূর্বাপর বর্ণনা স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, নামাযের ঘোষণা এবং জুমআর দিনের বিশেষ নামায উভয়টিই আগে থেকেই চালু ছিল। তবে মানুষ ভুল করতো এই যে, জুমাআর নামাযের ঘোষণা শুনেও তারা নামাযের জন্য দ্রুত অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে গাফলতি করতো এবং কেনাবেচার কাজেই ব্যস্ত থাকতো। তাই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি শুধু এ উদ্দেশ্যে নাযিল করেছেন যে, মানুষ এই ঘোষণা এবং এই বিশেষ নামাযের গুরুত্ব উপলব্ধি করুক এবং ফরয মনে করে এ উদ্দেশ্যে দ্রুত অগ্রসর হোক। এ তিনটি বিষয়ে যদি গভীরভাবে চিন্তা করা যায় তাহলে তা থেকে এই মৌলিক বাস্তবতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন কিছু নির্দেশও দিতেন যা কুরআনের মধ্যে নেই। কিন্তু সেই সব নির্দেশ ও কুরআনের নির্দেশাবলীর মত অবশ্য পালনীয় ছিল। বর্তমানে গোটা পৃথিবীর প্রতিটি মসজিদে প্রতিদিন পাঁচবার যে আযান দেয়া

হয় সেই আযানই নামাযের জন্য ঘোষণা। কিন্তু কুরআন মজীদের কোন স্থানে না এ আযানের ভাষা উল্লেখ করা হয়েছে, না মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, নামাযের জন্য এভাবে আহবান জানাও। এটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত জিনিস। কুরআন মজীদে শুধু দু'টি স্থানে একে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা হয়েছে। প্রথমত এই আয়াতে। দ্বিতীয়ত সূরা মায়েদার ৫৮ আয়াতে। অনুরূপ সারা দুনিয়ার মুসলমান আজ যে জুম'আর নামায পড়ে থাকে কুরআন মজীদে তারও কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি এবং পড়ার সময় ও নিয়ম-পদ্ধতিও বলে দেয়া হয়নি। এ নামায পড়ার নিয়ম-পদ্ধতিও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক চালু করা। কুরআনের এ আয়াতটি শুধু এর গুরুত্ব এবং অলংঘনীয়তাবে পালন করার বিষয়টি বুঝানোর জন্যই নাযিল হয়েছে। স্পষ্ট এই দলীল থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বলে যে, শুধু কুরআনে বর্ণিত হুকুম-আহকামই শরয়ী হুকুম-আহকাম—সে প্রকৃতপক্ষে শুধু সুন্নাতকেই অস্বীকার করে না, কুরআনকেও অস্বীকার করে।

এ বিষয়ে আরো বক্তব্য পেশ করার পূর্বে জুম'আ সম্পর্কে আরো কয়েকটি বিষয়ও জেনে নেয়া দরকার।

জুম'আ কথাটি প্রকৃতপক্ষে একটি ইসলামী পরিভাষা। জাহেলী যুগে আরবের অধিবাসীরা একে 'ইয়াওমে আরূবা' বলত। ইসলামী যুগে এ দিনটিকে মুসলমানদের সমাবেশের দিন হিসেবে নির্ধারিত করে এর নাম দেয়া হয় জুম'আ। ঐতিহাসিকগণ যদিও বলেন যে, কা'ব ইবনে লুয়াই কিংবা কুসাই ইবনে কিলাবও এদিনটির জন্য এ নাম ব্যবহার করেছিল। কারণ এ দিনেই তারা কুরাইশদের লোকজনের সমাবেশ করতেন (ফাতহুল বারী)। কিন্তু তার এই কাজ দ্বারা প্রাচীন এই নামের কোন পরিবর্তন হয়নি। বরং সাধারণ আরববাসী এ দিনটিকে 'আরূবা'ই বলত। সত্যিকার অর্থে নামের পরিবর্তন হয় তখন যখন ইসলামী যুগে এর নতুন নাম রাখা হয়।

ইসলাম-পূর্ব যুগে সপ্তাহে একটি দিনকে ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট করা এবং তাকে জাতির প্রতীক হিসেবে নির্ধারিত করার রীতি আহলে কিতাবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ইহুদীরা ঐ উদ্দেশ্যে 'সাব্‌তে'র (শনিবার) দিনটিকে নির্ধারিত করেছিল। কারণ আল্লাহ তা'আলা এ দিনেই বনী ইসরাঈল জাতিকে ফেরাউনের গোলামী থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। খৃষ্টানরা নিজেদেরকে ইহুদীদের থেকে আলাদা করে দেখানোর জন্য রবিবার দিনকে তাদের জাতীয় প্রতীক হিসেবে নির্ধারিত করে। যদিও এ সম্পর্কিত কোন নির্দেশ না হযরত ঈসা দিয়েছিলেন না ইনজীল তথা বাইবেলে এর কোন উল্লেখ আছে। তবে খৃষ্টানদের বিশ্বাস হলো ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে প্রাণ উৎসর্গ করার পর এ দিনেই হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কবর থেকে বেরিয়ে আসমানের দিকে গিয়ে ছিলেন। এ কারণেই পরবর্তীকালের খৃষ্টানরা এ দিনটিকে তাদের উপাসনার দিন হিসেবে গ্রহণ করে। তারপর ৩২১ খৃষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্য একটি নির্দেশের দ্বারা এ দিনটিকে সাধারণ ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করে। এ দু'টি জাতি থেকে নিজ জাতিকে আলাদা করার জন্য ইসলাম এ দু'টি দিন বাদ দিয়ে জুম'আর দিনকে সামষ্টিক ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট করেছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আবু মাসউদ আনসারীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, হিজরাতের কিছুকাল পূর্বে পবিত্র মক্কাতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

ওপর জুম'আ ফরয হওয়ার বিধান নাযিল হয়। কিন্তু সে সময় তিনি এ নির্দেশের ওপর আমল করতে পারতেন না। কারণ মক্কায় সামষ্টিক কোন ইবাদাত করা সম্ভব ছিল না। তাই যেসব লোক নবীর (সা) আগে মদীনায় হিজরাত করেছিলেন তিনি তাঁদের নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যে, তারা যেন সেখানে জুম'আ কায়েম করে। অতএব প্রথম দিকে হিজরাতকারীদের নেতা হযরত মুস'আব ইবনে উমায়ের ১২ জন লোক নিয়ে মদীনায় সর্বপ্রথম জুম'আর নামায আদায় করেন। (তাবারানী, দারু কুতনী)। হযরত কা'ব ইবনে মালেক এবং ইবনে সিরীনের বর্ণনা মতে এরও পূর্বে আনসারগণ আপনা থেকেই (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পৌঁছার পূর্বে) সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তারা সবাই মিলে সপ্তাহে একদিন সামষ্টিকভাবে ইবাদাত করবেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা ইহুদীদের সাবৃত এবং খৃষ্টানদের রবিবার বাদ দিয়ে জুম'আর দিনকে মনোনীত করেছিলেন এবং বনী বায়দা এলাকায় হযরত আস'আদ ইবনে যুরারা প্রথম জুম'আ পড়েছিলেন। এতে ৪০ ব্যক্তি শরীক হয়েছিল (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, ইবনে হিব্বান, আবদ ইবনে হুমায়েদ, আবদুর রায্যাক, বায়হাকী)। এ থেকে জানা যায় ইসলামী জনতার আবেগ অনুভূতি তখন এমন একটি দিন থাকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিল যেদিন অধিক সংখ্যক মুসলমান একত্র হয়ে সামষ্টিকভাবে ইবাদাত করবে। তা শনিবার ও রবিবার থেকে আলাদা কোন দিন হওয়াটাও ইসলামী রুচি ও মেজাজ-প্রকৃতিরই দাবী ছিল। যাতে মুসলমানদের জাতীয় প্রতীক ইহুদী ও খৃষ্টানদের জাতীয় প্রতীক থেকে আলাদা থাকে। এটা সাহাবা কিরামের ইসলামী মানসিকতার একটি বিস্ময়কর কীর্তি। অনেক সময় নির্দেশ আসার পূর্বে তাদের এই রুচি ও মেজাজ-প্রকৃতিই বলে দিতো যে, ইসলামের মেজাজ ও প্রকৃতি অমুক জিনিসের দাবী করছে।

হিজরাত করার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম যে কাজগুলো করেন জুম'আর নামায কায়েম করা তার অন্যতম। পবিত্র মক্কা নগরী থেকে হিজরাত করে সোমবার দিন তিনি কুবায় উপনীত হন, চারদিন সেখানে অবস্থান করেন এবং পঞ্চম দিন জুম'আর দিনে সেখান থেকে মদীনার দিকে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে বনী সালেম ইবনে আওফের এলাকায় জুম'আর নামাযের সময় হয়। সেখানেই তিনি প্রথম জুম'আর নামায পড়েন। (ইবনে হিশাম)

এ নামাযের জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ার পরের সময় নির্দিষ্ট করেছিলেন অর্থাৎ ঠিক যোহরের নামাযের সময়। হিজরাতের পূর্বে হযরত মুসআব ইবনে উমায়েরকে তিনি যে লিখিত নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন তাতে বলেছিলেন ঃ

فَاِذَا مَالَ النَّهَارُ عَنْ شَطْرِهِ عِنْدَ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَتَقَرَّبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى بِرَكْعَتَيْنِ - (دار قطنى)

"জুম'আর দিন সূর্য যখন মাথার ওপর থেকে পশ্চিম দিকে হেলে পড়বে তখন দুই রাকআত নামাযের সাহায্যে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কর।" (দারু কুতনী)

হিজরাতের পরে তিনি মৌখিকভাবেও এ নির্দেশ দিয়েছেন এবং কার্যতও ঐ সময়ে জুম'আর নামায পড়াতেন। হযরত আনাস (রা) হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা),

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা), হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা), হযরত সাহল (রা) ইবনে সা'দ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আম্মার (রা) ইবনে ইয়াসির এবং হযরত বেলাল (রা) থেকে হাদীস গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। ঐ সব বর্ণনায় আছে সূর্য মাথার ওপর থেকে হেলে পড়ার পর নবী (সা) জুম'আর নামায পড়তেন। (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ-কর্ম থেকে এ বিষয়টিও প্রমাণিত যে, জুম'আর দিন তিনি যোহরের নামাযের পরিবর্তে জুম'আর নামায পড়াতেন। এ নামায ছিল মাত্র দু' রাকআত। নামাযের আগে তিনি খুতবা দিতেন। এটা ছিল জুম'আর নামায এবং অন্যান্য দিনের যোহরের নামাযের মধ্যে পার্থক্যসূচক। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ

صَلٰوةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ ، وَصَلٰوةُ الْفَجْرِ رَكْعَتَانِ ، وَصَلٰوةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اِنَّمَا قُصِرَتِ الْجُمُعَةُ لِاَجْلِ الْخُطْبَةِ -

(احكام القران للجصاص)

"তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ নিসৃতবাণী অনুসারে মুসাফিরের নামায দুই রাকআত, ফজরের নামায দু' রাকআত এবং জুম'আর নামায দুই রাকআত। এটা কসর নয়, বরং পূর্ণ নামায। আর খোতবা থাকার কারণে জুম'আর নামায সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।"

এখানে যে আযানের উল্লেখ করা হয়েছে তা খোতবার বেশ আগে যে আযানের মাধ্যমে মানুষকে জুম'আর নামাযের সময় আরম্ভ হওয়ার বিষয়টি অবগত করা হয় সে আযান নয়, বরং খোতবার ঠিক আগে যে আযান দেয়া হয় সেই আযান। হযরত সায়েব (রা) ইবনে ইয়াযীদ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাসের যুগে শুধু একটি আযান দেয়া হতো। আর তা দেয়া হতো ইমাম মিম্বরে উঠে বসার পর। হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমরের (রা) যুগেও এ কাজটিই করা হয়েছে। অতপর হযরত উসমানের (রা) সময়ে জনবসতি বৃদ্ধি পেলে তিনি আরো একটি আযান দেয়ানো শুরু করেন। মদীনার বাজারে অবস্থিত তাঁর যাওরা নামক বাড়ীতে এ আযান দেয়া হতো। (বুখারী, আবু দাউদ, নাসায়ী, তাবারানী)

১৫. এই নির্দেশের মধ্যে উল্লেখিত (যিক্‌র) শব্দের অর্থ হচ্ছে খোত্‌বা। কারণ, আযানের পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম যে কাজটি করতেন তা ছিল খোতবা। তিনি সবসময় খোতবার পরে নামায পড়তেন। হযরত আবু হুরাইরা বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "জুম'আর ফেরেশতাগণ নামাযের জন্য আগমনকারী ব্যক্তির নাম তাদের আগমনের পরম্পরা অনুসারে লিখতে থাকেন। অতপর اذا خرج الامام حضرت الملئكة يستمعون الذكر

ইমাম যখন খোতবার জন্য দাঁড়ান তখন তাঁর নাম লেখা বন্ধ করে দেন এবং যিকর (অর্থাৎ খোতবা) শুনতে মনোনিবেশ করেন" (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)। এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, যিকর অর্থ খোতবা। কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি থেকেও এ অর্থের ইংগিত পাওয়া যায়। কুরআনে প্রথমে বলা হয়েছেঃ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ "আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত হও।" পরে বলা হয়েছে ঃ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ "তারপর নামায শেষ হয়ে গেলে ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ো।" এ থেকে জুম'আর দিনের কাজের যে পরম্পরা বুঝা যায় তা হচ্ছে, প্রথমে আল্লাহর যিকির এবং তারপর নামায। মুফাস্‌সিরগণও এ বিষয়ে একমত যে, যিকির অর্থ হয় খোতবা, নয়তো খোতবা ও নামায উভয়টিই।

খোতবার জন্য ذكر الله (যিকরুল্লাহ—আল্লাহর যিকির) শব্দ ব্যবহার করায় আপনা থেকেই এ অর্থ প্রকাশ পায় যে, খোতবার মধ্যে এমন সব বিষয় থাকতে হবে যা আল্লাহর স্মরণের সাথে সম্পর্কিত। যেমন ঃ আল্লাহর তারিফ ও প্রশংসা, তাঁর রসূলের প্রতি দরুদ ও সালাত, তাঁর হুকুম আহকাম, তাঁর শরীয়াত অনুসারে আমলের শিক্ষা ও উপদেশ এবং তাঁকে ভয় করেন এমন সব নেক বান্দাদের প্রশংসা ইত্যাদি। এ কারণে যামাখশারী কাশ্‌শাফে লিখেছেন যে, খোতবায় জালেম শাসকদের তারিফ ও প্রশংসা করা কিংবা তাদের নামোল্লেখ করা এবং তাদের জন্য দোয়া করার "যিক্‌রুল্লাহ"র সাথে দূরতম সম্পর্কও নেই। বরং তা "যিকরুশ্ শাইতান"—শয়তানের যিকির হিসেবে পরিগণিত।

'আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত হও' অর্থ 'দৌড়িয়ে আস' নয়। বরং এর অর্থ হলো, তাড়াতাড়ি সেখানে পৌছার চেষ্টা করো। আমাদের ভাষায়ও আমরা এ ধরনের অনেক কথা বলে থাকি। এসব কথার অর্থ হয়ে থাকে তৎপরতা দেখানো। দৌড়ানো অর্থে তা ব্যবহার করা হয় না। অনুরূপ আরবীতেও سعى শব্দ দ্বারা মুধু দৌড়ানোই বুঝায় না। কুরআনের অধিকাংশ স্থানে سعى শব্দটি প্রচেষ্টা চালানো এবং চেষ্টা-সাধনা করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ

لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى - وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا -

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ - وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا -

মুফাস্‌সিরগণও সর্বসম্মতভাবে এ শব্দটিকে গুরুত্ব আরোপ করা অর্থে গ্রহণ করেছেন তাঁদের মতে سعى অর্থ হলো, আযান শোনার পর মানুষ অবিলম্বে মসজিদে পৌছার চিন্তা করতে থাকবে। ব্যাপারটা শুধু এতটুকু নয়, বরং নামাযের জন্য দৌড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নামায শুরু হলে ধীরে সুস্থে ও স্থিরচিত্তে গাম্ভীর্যের সাথে নামাযে শরীক হওয়ার জন্য অগ্রসর হও, দৌড়িয়ে শরীক হয়ো না। এভাবে অগ্রসর হয়ে যতটা নামায পাবে তাতে শরীক হবে এবং যতটা ছুটে যাবে তা পরে পূরণ করে নেবে। (সিহাহ সিত্তাহ) হযরত আবু কাতাদা আনসারী (রা) বলেন ঃ একবার আমরা নবীর (সা) সাথে নামায পড়ছিলাম। হঠাৎ আমরা লোকজনের দৌড়াদৌড়ি করে চলার শব্দ শুনতে পেলাম। নামায শেষ করে নবী (সা) ঐ লোকগুলোকে জিজ্ঞেস

করলেন, এসব কিসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম? তারা বলল ঃ নামাযে শরীক হওয়ার জন্য আমরা দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে আসছিলাম। তিনি বললেন ঃ এরূপ করবে না। যখনই নামাযে আসবে শান্তভাবে ও স্থিরচিত্তে আসবে। এভাবে ইমামের সাথে যতটা নামায পাওয়া যাবে পড়বে। আর যে অংশ ছুটে যাবে তা পরে পড়ে নেবে। (বুখারী, মুসলিম)।

'কেনা-বেচা পরিত্যাগ করো' কথাটার অর্থ শুধু কেনা-বেচাই পরিত্যাগ করা নয়, বরং নামাযের জন্য যাওয়ার চিন্তা ও ব্যবস্থা ছাড়া অন্য আর সব ব্যস্ততা পরিত্যাগ করা। বিশেষভাবে বেচা-কেনার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে শুধু এজন্য যে, জুম'আর দিন ব্যবসায় বাণিজ্য খুব জমে উঠতো। এই দিন আশেপাশের জনপদের লোকজন একস্থানে সমবেত হতো। ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যদ্রব্য নিয়ে সেখানে পৌছত। লোকজনও তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে ব্যস্ত হয়ে পড়তো। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা কেবল কেনা-বেচা পর্যন্তই সীমিত নয়, অন্যান্য সব ব্যস্ততাও এর অন্তরভুক্ত। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কারভাবে ঐ সব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তাই ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, জুম'আর আযানের পর কেনা-বেচা এবং অন্য সবরকমের কাজ কারবার হারাম।

এই নির্দেশটি থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে জুম'আর নামায ফরয। প্রথমত আযান শোনামাত্র জুম'আর নামাযের জন্য যাওয়ার তাগাদাই তার প্রমাণ। তাছাড়া জুম'আর নামাযের জন্য কেনা-বেচার মত একটা হালাল কাজ হারাম হয়ে যাওয়াও এর ফরয হওয়া প্রমাণ করে। উপরন্তু জুম'আর দিন যোহরের ফরয নামায রহিত হয়ে যাওয়া এবং তার পরিবর্তে জুম'আর নামায প্রতিষ্ঠিত হওয়াও এর ফরয হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ। কারণ, কোন ফরয কেবল তখনই রহিত হয় যখন তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোন ফরয তার স্থান পূরণ করে। বহু সংখ্যক হাদীসে এর সমর্থন পাওয়া যায়। এসব হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুম'আর নামাযের জন্য কঠোরভাবে তাকীদ করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় তাকে ফরয বলে ঘোষণা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার মন চায়, অন্য কাউকে আমার পরিবর্তে নামায পড়াতে দাঁড় করিয়ে দেই এবং নিজে গিয়ে সেসব লোকদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেই যারা জুম'আর নামায পড়তে আসে না (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী)। হযরত আবু হুরাইরা (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, আমরা জুম'আর খোতবায় নবীকে (সা) একথা বলতে শুনেছি ঃ মানুষের জুম'আর নামায পরিত্যাগ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। অন্যথায় আল্লাহ তাদের মনের ওপর মোহর মেরে দেবেন এবং তারা গাফিল হয়ে যাবে। (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম, নাসায়ী)। হযরত আবুল জা'দ (রা) দামরী, হযরত জাবের (রা) ইবনে আবদুল্লাহ ও হযরত আবদুল্লাহ (রা) ইবনে আবী আওফার বর্ণিত হাদীসসমূহে নবীর (সা) যেসব বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে জানা যায়, "যে ব্যক্তি প্রকৃত কোন কারণ ও সংগত ওযর ছাড়া শুধু বে-পরোয়া মানসিকতার কারণে পরপর তিনটি জুম'আ পরিত্যাগ করে আল্লাহ তার দিলের ওপর মোহর মেরে দেন। বরং একটি হাদীসে তো এতদূর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার দিলকে মুনাফিকের দিল বানিয়ে দেন" (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজা, দারেমী,

হাকেম, ইবনে হিব্বান, বায্যার, তাবারানী ফিল কাবীর) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আজ থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের ওপর জুম'আর নামায ফরয। যে ব্যক্তি তাকে মামুলি ব্যাপার মনে করে এবং তার গুরুত্ব স্বীকার না করে পরিত্যাগ করবে আল্লাহ যেন তার অবস্থা ভাল না করেন এবং তাকে কোন প্রকার বরকতও না দেন। কান পেতে শুনে নাও যতক্ষণ সে তাওবা না করবে তার নামায নামায নয়, তার যাকাত যাকাত নয়, তার হজ্জ হজ্জ নয়, তার রোযা রোযা নয়, তার কোন নেক কাজ নেক কাজ নয়। অতপর যে তাওবা করবে আল্লাহ তাকে ক্ষমাকারী।" (ইবনে মাজা, বায্যার) প্রায় একই অর্থের একটি হাদীস তাবারানী তাঁর 'আওসাত' গ্রন্থে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও বহু সংখ্যক হাদীসে নবী (সা) স্পষ্ট ভাষায় জুম'আর নামাযকে ফরয এবং অবশ্য পালনীয় হক বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) ইবনে আস বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যারা আযান শুনতে পায় জুম'আর নামায তাদের ওপরই ফরয (আবু দাউদ, দারুকুতনী)। জাবের (রা) ইবনে আবদুল্লাহ ও আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ "জেনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের ওপর জুম'আর নামায ফরয করেছেন" (বায়হাকী)। তবে তিনি নারী, শিশু, ক্রীতদাস, অসুস্থ ব্যক্তি এবং মুসাফিরকে এ ফরয পালনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। হযরত হাফসা বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ "জুম'আর নামাযের জন্য বের হওয়া প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব" (নাসায়ী)। হযরত তারেক ইবনে শিহাব বর্ণিত হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ ক্রীতদাস, নারী, শিশু ও অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়া জামায়াতের সাথে জুম'আ পড়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজিব (আবু দাউদ ও হাকেম)। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত হাদীসে নবীর (সা) ভাষ্য হলো ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে তার ওপরে জুম'আ ফরয। তবে নারী, মুসাফির, ক্রীতদাস বা অসুস্থ ব্যক্তির ওপর ফরয নয় (দারু কুতনী, বায়হাকী)। কুরআন ও হাদীসের এই স্পষ্ট বক্তব্যের ভিত্তিতে জুম'আর নামায ফরয হওয়া সম্পর্কে গোটা মুসলিম উম্মাহ ইজমা বা ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

১৬. একথার অর্থ এ নয় যে, জুম'আর নামায পড়ার পর ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়া বা রিযিকের অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে উঠা জরুরী। বরং এ নির্দেশ থেকে শুধু এ কাজ করার অনুমতি বুঝায়। যেহেতু জুম'আর আযান শোনার পর সব কাজ কর্ম পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তাই বলা হয়েছে, নামায শেষ হওয়ার পর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার এবং যে কাজ-কর্ম করতে চাও তা করার অনুমতি তোমাদের জন্য আছে। এটা ঠিক ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার নিষিদ্ধ করার পর فَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا "যখন ইহ্‌রাম খুলবে তখন শিকার করো" (আল মায়েদাহ, ৩) বলার মত। এ কথার অর্থ এটা নয় যে, ইহ্‌রাম খোলার পর অবশ্যই শিকার করতে হবে। বরং এর অর্থ হলো, ইহ্‌রাম খোলার পর শিকার করার ব্যাপারে আর কোন বাধা নিষেধ থাকে না। কিংবা সূরা নিসাতে যেমন فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ আয়াতাংশে একাধিক বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এখানে যদিও নির্দেশসূচক শব্দ فَانْكِحُوْا ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু কেউ-ই একে নির্দেশ অর্থে গ্রহণ করেননি। এর থেকে মৌলিক একটি মাসয়ালার তথা সূত্র পাওয়া যায় যে, আদেশসূচক শব্দ দ্বারা সবসময় কোন জিনিস ওয়াজিব বা অবশ্য পালনীয় বলে

প্রমাণিত হয় না। বরং তা কখনো অনুমতি আবার কখনো কোন জিনিসকে তুলনামূলকভাবে বেশী পছন্দ করা অর্থ বুঝায়। এ ক্ষেত্রে কোথায় তা আদেশ অর্থে, কোথায় অনুমতি অর্থে এবং কোথায় আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে বিষয়টি আগের ও পরের প্রসংগ থেকে বুঝা যায়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই যে কাজটি ফরয বা ওয়াজিব সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। এ আয়াতাংশের ঠিক পরের আয়াতাংশেই বলা হয়েছে وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا "আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ করো।" এখানেও আদেশসূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ শব্দ ওয়াজিব বা অবশ্য করণীয় অর্থ প্রকাশ করছে না, বরং "পছন্দনীয় হওয়া" অর্থ প্রকাশ করছে। এখানে এ বিষয়টিও উল্লেখ্য যে, কুরআনে যদিও ইহুদীদের সাব্‌ত এবং খৃষ্টানদের রোববারের মত জুম'আর দিনকে সাধারণ ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়নি, কিন্তু একথা কেউ-ই অস্বীকার করতে পারে না যে, শনিবার ও রবিবার ইহুদী ও খৃষ্টানদের জাতির প্রতীক জুম'আও ঠিক তেমনি মুসলমানদের জাতির প্রতীক। সুতরাং তামাদ্দুনিক বা সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে যদি সপ্তাহের কোন দিনকে সাধারণ ছুটির জন্য মনোনীত করতে হয় তাহলে ইহুদীরা যেমন স্বাভাবিকভাবে শনিবারকে এবং খৃষ্টানরা রোববারকে বেছে নিয়েছে তেমনি এ উদ্দেশ্যে মুসলমানরাও (যদি তাদের মন-মানস ও স্বভাব প্রকৃতিতে লেশমাত্র ইসলামী অনুভূতি বিদ্যমান থেকে থাকে) জুম'আর দিনকেই বেছে নেবে। খৃষ্টানরা তো তাদের নিজের দেশ ছাড়া এমনসব দেশের ওপরও তাদের রোববার চাপিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি। যেখানে খৃষ্টানদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য ছিল। ইহুদীরা ফিলিস্তিনে তাদের ইসরাঈলী রাষ্ট্র কায়েম করলে সর্বপ্রথম যে কাজটি করেছিল তা হচ্ছে রোববারের পরিবর্তে শনিবারকে ছুটির দিন হিসেবে নির্ধারিত করা। বিভাগ পূর্ব ভারতে বৃটিশ ভারত এবং মুসলিম দেশীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নজরে পড়ত তাহচ্ছে দেশের এক অংশে রোববারে সাপ্তাহিক ছুটি হতো এবং অন্য অংশে জুম'আর দিনে ছুটি হতো। তবে যেসব জায়গায় মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী অনুভূতি ও ভাবধারা বর্তমান থাকত না সেখানে ক্ষমতা নিজেদের হাতে আসার পরও তারা রোববারকেই বুকে জড়িয়ে রাখে যা আমরা পাকিস্তানে দেখতে পাচ্ছি। আর চেতনাহীনতার মাত্রা এর চেয়েও অধিক হলে জুম'আর দিনের সাপ্তাহিক ছুটি বাতিল করে রোববার দিন সাপ্তাহিক ছুটি চালু করা হয়। মুস্তাফা কামাল তুরস্কে এ কাজটিই করেছেন।

১৭. অর্থাৎ নিজেদের কাজ-কর্ম ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যস্ত হয়েও আল্লাহকে ভুলে যেও না। বরং সর্বাবস্থায় তাঁকে স্মরণে রাখো এবং তাঁকেই স্মরণ করতে থাকো। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আহযাব, টীকা ৬৩)।

১৮. কুরআন মজীদে বেশ কিছু সংখ্যক জায়গায় একটি হিদায়াত বা দিক নির্দেশনা, কিংবা একটি উপদেশ অথবা একটি নির্দেশ দেয়ার পর لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (হয়তো তোমরা সফল হবে, কল্যাণ লাভ করবে) এবং لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (হয়ত তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে) বলা হয়েছে। এসব স্থানে "হয়ত" বা "সম্ভবত" শব্দ ব্যবহার করার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তা'আলার (মা'আযাল্লাহ) কোন সন্দেহ আছে। মূল ব্যাপার তা নয়। বরং এটি একটি রাজকীয় বর্ণনাভঙ্গি। এটা ঠিক তেমন যেন কোন দয়ালু মনিব তাঁর কর্মচারীকে বলছেন, তুমি অমুক কাজটি করো, হয়তো তোমার পদোন্নতি

হবে। এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম অদৃশ্য প্রতিশ্রুতি থাকে যার আশায় কর্মচারীটি মনযোগ দিয়ে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে ঐ কাজটি আঞ্জাম দিতে থাকে। কোন বাদশাহর মুখ থেকে তার কোন কর্মচারীর উদ্দেশ্যে একথা উচ্চারিত হলে তার ঘরে খুশীর বন্যা বয়ে যায়।

এখানে যেহেতু জুম'আর নামাযের হুকুম-আহকাম বর্ণনা শেষ হয়ে গিয়েছে, তাই কুরআন, হাদীস, সাহাবীদের উক্তি এবং ইসলামের সাধারণ মূলনীতির আলোকে চারটি ফিক্‌হী মাযহাবে জুম'আর নামায সম্পর্কে যেসব হুকুম-আহকাম বের করে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে এখানে তার সারসংক্ষেপ বর্ণনা করা সমীচীন হবে বলে মনে হয়।

হানাফী মাযহাবের মতে যোহরের নামাযের সময়ই জুম'আর নামাযের সময়। জুম'আ এ সময়ের পূর্বেও পড়া যেতে পারে না, পরেও পড়া যেতে পারে না। প্রথম আযানের সময় থেকেই কেনা-বেচা হারাম হয়ে যায়, —ইমাম মিম্বারের ওপর বসার পর দ্বিতীয় আযান দেয়ার সময় থেকে নয়। কারণ, কুরআনে শুধু اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة কথাটি বলা হয়েছে। তাই সূর্য মাথার ওপর থেকে পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ার পর যখন জুম'আর সময় শুরু হয় তখন জুম'আর নামাযের যে আযানটিই দেয়া হোক না কেন তা শোনার পর লোকদের কেনা-বেচা বন্ধ করে দেয়া কর্তব্য। তবে সেই সময় যদি কোন ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় করে তবে সেই ক্রয় বিক্রয় অবৈধ বা বাতিল হবে না, বরং তা কেবল একটি গোনাহর কাজ হবে। জুম'আর নামায প্রতিটি জনপদেই অনুষ্ঠিত হবে না, বরং শুধু مصر جامع "মিসরে জামে"-তে অনুষ্ঠিত হতে পারবে। নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা অনুসারে 'মিসরে জামে' বলা হয় এমন শহরকে যেখানে বাজার আছে, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা আছে এবং তার জনবসতিও এত যে, যাদের ওপর জুম'আর নামায ফরয তারা সবাই যদি ঐ শহরের সর্বাপেক্ষা বড় মসজিদে সমবেত হয় তাহলে সেখানে স্থান সংকুলান হবে না। যেসব লোক শহরের বাইরে বসবাস করেন তাদের জন্য শহরে এসে জুম'আর নামায পড়া কেবল তখনই ফরয যখন আযানের শব্দ তারা শুনতে পাবে কিংবা খুব বেশী হলে শহর থেকে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত হবে। নামায মসজিদেই হতে হবে তা জরুরী নয়। নামায খোলা মাঠেও হতে পারে। এমন মাঠেও জুম'আর নামায হতে পারে যা শহরের বাইরে অবস্থিত হলেও মূল শহরের একটি অংশ বলে বিবেচিত। যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির শরীক হওয়ার সাধারণ অনুমতি আছে শুধু সেখানেই জুম'আর নামায অনুষ্ঠিত হতে পারে। কোন বন্ধ জায়গায় যত মানুষই একত্রিত হোক না কেন, সেখানে সবারই আসার অনুমতি না থাকলে, জুম'আ সহীহ হবে না। জুম'আর নামায সহীহ হওয়ার জন্য জামায়াতে [আবু হানীফার (র) মতে] ইমাম ছাড়া কমপক্ষে তিন জন অথবা [আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদের মতে] ইমাম সহ দুইজন এমন লোক থাকতে হবে যাদের ওপর জুম'আ ফরয। যেসব ওজর থাকলে জুম'আ পড়া থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় তা হচ্ছে ঃ সফরে থাকা, অথবা এমন রুগ্ন হওয়া যে, নিজে হেঁটে মসজিদে আসার ক্ষমা নেই। অথবা দু'টি পা-ই অক্ষম অথবা অন্ধ, (কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদের (র) মতে অন্ধ ব্যক্তি কেবল তখনই জুম'আ পড়া থেকে অব্যাহতি পাবে যখন তাকে মসজিদে নিয়ে যাবার মত কোন লোক পাবে না)। অথবা কোন অত্যাচারীর পক্ষ থেকে তার জীবন ও মান-ইজ্জতহানির কিংবা সহ্যসীমা বহির্ভূত আর্থিক ক্ষতির আশংকা থাকে অথবা প্রচণ্ড বৃষ্টি অথবা কাদা পানি থাকে অথবা যদি সে বন্দী থাকে।

কয়েদী ও অক্ষমদের জন্য জুম'আর দিনে যোহরের নামায জামায়াতে পড়া মাকরূহ। যারা জুম'আর নামায পায়নি তাদের জন্যও যোহরের নামায জামায়াতে পড়া মাকরূহ। খোতবা জুম'আ সহীহ হওয়ার একটি শর্ত। কারণ, নবী কখনো খোতবা ছাড়া জুম'আর নামায পড়েননি। আর খোতবা অবশ্যই দু'টি হতে হবে এবং নামাযের আগে হতে হবে। ব্যক্তি যে স্থানে বসে আছে সে স্থান পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছুক আর না পৌঁছুক খোতবা দেয়ার জন্য ইমাম যখন মিম্বারের দিকে অগ্রসর হবেন তখন থেকে খোতবা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবরকম কথাবার্তা নিষিদ্ধ। এই সময় নামাযও না পড়া উচিত। (হিদায়া, ফাতহুল কাদীর, আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস, আল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবায়া, উমদাতুল কারী)।

শাফেয়ী মাযহাবের মতে যোহরের নামাযের সময়ই জুম'আর নামাযের সময়। যখন দ্বিতীয় আযান (অর্থাৎ ইমাম মিম্বারের ওপর বসার পর যে আযান দেয়া) হবে তখন থেকে কেনা-বেচা হারাম ও নামাযের জন্য যাওয়া ওয়াজিব। তা সত্ত্বেও কেউ যদি এ সময় কেনা-বেচা করে তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে না। এমন প্রত্যেকটি জনপদেই জুম'আ অনুষ্ঠিত হতে পারবে যেখানকার স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে ৪০ জন লোক এমন আছে যাদের ওপর জুম'আর নামায ফরয। জনপদের বাইরের যেসব এলাকার লোক আযান শুনতে পায় তাদের জন্য জুম'আর নামাযে হাজির হওয়া অবশ্য কর্তব্য। জনবসতির অভ্যন্তরেই জুম'আর নামায অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। তবে জরুরী নয় যে, তা মসজিদেই পড়তে হবে। যারা মরু ভূমির মধ্যে তাঁবুতে অবস্থান করে তাদের ওপরে জুম'আ ফরয নয়। জুম'আ শুদ্ধ হওয়ার জন্য যাদের ওপর জুম'আ ফরয ইমাম সহ কমপক্ষে এ রকম ৪০ জন লোকের জামায়াতে উপস্থিত থাকা আবশ্যক। যেসব ওজর থাকার কারণে কোন ব্যক্তি জুম'আর নামায পড়া থেকে অব্যাহতি লাভ করে তা হচ্ছে ঃ সফরে থাকা অথবা কোন স্থানে চারদিন বা তার কম সময় অবস্থান করার ইচ্ছা করা, তবে সফর বৈধ হতে হবে। এমন বৃদ্ধ বা রুগ্ন যে সওয়ারীতে চড়েও জুম'আয় হাজির হতে অক্ষম। অন্ধ হওয়া এবং তাকে নামাযের জন্য মসজিদে নিয়ে যাওয়ার মত কোন লোক না পাওয়া। প্রাণ, সম্পত্তি অথবা মান-ইজ্জতহানির আশংকা থাকা। বন্দী অবস্থায় থাকা। তবে এই বন্দিদশা তার নিজের কোন অপরাধের কারণে না হওয়া। নামাযের পূর্বে দু'টি খোতবা থাকতে হবে। খোতবার সময় চুপচাপ থাকা সুন্নাত, তবে কথা বলা হারাম নয়। যে ব্যক্তি ইমামের এতটা কাছে বসেছে যে, খোতবা শুনতে পায় তার জন্য কথাবার্তা বলা মাকরূহ। তবে সে সালামের জবাব দিতে পারে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামের উল্লেখ শুনে উচ্চস্বরে দরূদ পাঠ করতে পারে। (মুগনিউল মুহতাজ, আল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবায়া)।

মালেকী মাযহাবের মতে জুম'আর নামাযের সময় হচ্ছে, সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ার পর থেকে শুরু করে মাগরিবের এতটা পূর্ব পর্যন্ত যেন সূর্যাস্তের আগেই খোতবা ও নামায শেষ হয়ে যায়। কেনা-বেচা হারাম ও নামাযের জন্য যাওয়া ওয়াজিব হয় দ্বিতীয় আযান থেকে। এ সময়ের পর কোন কেনা-বেচা হলে তা অবৈধ ও বাতিল বলে গণ্য হবে। কেবল সেই সব জনপদেই জুম'আ অনুষ্ঠিত হতে পারে যেখানকার অধিবাসীগণ স্থায়ীভাবে সেখানে বাসস্থান তৈরি করে বসবাস করছে। শীত গ্রীষ্মে তারা অন্য কোন স্থানে চলে যায়

না। তারা ঐ জনপদেই তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছুর সরবরাহ পেয়ে থাকে এবং সংখ্যার দিক দিয়ে তারা নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করতে পারে। অস্থায়ী অবস্থানস্থলে যত লোকই থাক না কেন এবং তারা যতদিনই অবস্থান করুক না কেন সেখানে জুম'আ অনুষ্ঠিত হতে পারে না যে জনপদে জুম'আ অনুষ্ঠিত হয় তার তিন মাইল দূরত্বের মধ্যে বসবাসকারী মানুষের ওপর জুম'আর নামাযে হাজির হওয়া ফরয। জুম'আর নামায কেবল এমন সব মসজিদেই অনুষ্ঠিত হতে পারে যা জনপদের ভিতরে বা সংলগ্নস্থানে অবস্থিত হবে এবং যার ইমারত জনপদের সাধারণ অধিবাসীদের ঘরের চেয়ে নিম্নমানের হবে না। এ ক্ষেত্রে কোন কোন মালেকী ফিকাহবিদ এরূপ শর্তও আরোপ করেছেন যে, মসজিদ ছাদ বিশিষ্ট হতে হবে এবং তাতে যথারীতি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। কিন্তু মালেকী মাযহাবের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত হলো, জুম'আ সহীহ হওয়ার জন্য মসজিদ ছাদ বিশিষ্ট হওয়া শর্ত নয়। এমন মসজিদেও জুম'আর নামায হতে পারে যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ব্যবস্থা নেই—যা কেবল জুম'আর নামায পড়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। জুম'আর নামায সহীহ হওয়ার জন্য যাদের ওপর জুম'আর নামায ফরয ইমাম ছাড়া কমপক্ষে এ রকম ১২ জন লোকের জামায়াতে উপস্থিত থাকা জরুরী। যেসব ওজর বর্তমান থাকলে কোন ব্যক্তির ওপর থেকে জুম'আর নামায পড়ার নির্দেশ রহিত হয়ে যায় তা হচ্ছে ঃ সফরে থাকা অথবা সফর অবস্থায় কোন স্থানে চারদিনের কম সময় অবস্থানের নিয়ত করা। এমন রুগ্ন হওয়া যে, তার পক্ষে মসজিদে আসাই অসম্ভব। মা অথবা বাপ অথবা স্ত্রী অথবা সন্তান রুগ্ন ও অসুস্থ থাকা অথবা সে এমন কোন অপরিচিত রোগীর সেবা যত্ন করছে যার সেবা যত্ন করার মত আর কেউ নেই, অথবা তার কোন নিকটাত্মীয় কঠিন রোগে আক্রান্ত অথবা মরণাপন্ন। যে সম্পদের ক্ষতি সে বরদাশত করতে অক্ষম এমন সম্পদের ক্ষতির আশংকা থাকা। অথবা মারপিট ও বন্দীত্বের ভয়ে আত্মগোপন করে থাকা। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে তাকে মজলুম বা অত্যাচারিতের পর্যায়ভুক্ত হতে হবে। প্রচণ্ড বৃষ্টি বা কাদা পানি থাকা কিংবা প্রচণ্ড গরম বা ঠাণ্ডা মসজিদ পর্যন্ত যেতে বাধা হয়ে দাঁড়ালে। নামাযের পূর্বে দু'টি খোতবা হওয়া অত্যাবশ্যক। এমনকি খোতবা যদি নামাযের পরে দেয়া হয় তাহলে নামায পুনরায় পড়া জরুরী। খোতবা মসজিদের ভিতরে হতে হবে। খোতবা দেয়ার জন্য ইমাম যখন মিম্বারের দিকে অগ্রসর হবেন সেই সময় নফল নামায পাড়া হারাম এবং খোতবা শুরু হলে তা শোনা না গেলেও কথাবার্তা বলাও হারাম। তবে খতীব যদি খোতবা বহির্ভূত কোন বাজে বা অপ্রয়োজনীয় কথা বলেন অথবা গালির উপযুক্ত নয় এমন কোন ব্যক্তিকে গালি দেন, অথবা এমন কোন ব্যক্তির প্রশংসা করতে শুরু করেন যার প্রশংসা করা জায়েয নয়, অথবা খোতবার সাথে সম্পর্কহীন কোন কিছু পড়তে শুরু করেন তাহলে তার প্রতিবাদ করার অধিকার লোকজনের আছে। তাছাড়া জীবনের আশংকা না থাকলে বর্তমান বাদশাহ বা শাসকের জন্য খোতবার মধ্যে দোয়া করাও মাকরূহ। যিনি নামায পড়াবেন তাঁকেই খোতবা দিতে হবে। খতীব ছাড়া অন্য কেউ নামায পড়ালে সে নামায বাতিল হয়ে যাবে। (হাশিয়াতুদ দুসুকী আলাশ্ শারহিল কাবীর, আহকামুল কুরআন—ইবনে আরাবী, আল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবায়া)।

হাম্বলী মাযহাবের মতে জুম'আর নামাযের সময় সকাল বেলা সূর্য কিছুটা ওপরে ওঠার পর থেকে আসরের সময় শুরু হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ার

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ
مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

আর যে সময় তারা ব্যবসায় ও খেল তামাশার উপকরণ দেখলো তখন তারা তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে[১৯] সেদিকে দৌড়ে গেল। তাদের বলো, আল্লাহর কাছে যা আছে তা খেল-তামাশা ও ব্যবসায়ের চেয়ে উত্তম।[২০] আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।[২১]

আগে জুম'আর নামায পড়া শুধু জায়েয এবং পরে ওয়াজিব ও উত্তম। দ্বিতীয় আযান থেকে কেনা-বেচা হারাম এবং নামাযের জন্য প্রস্তুত হওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। এরপর কেনা-বেচা হলে তা কেনা-বেচা হয়েছে বলে ধরা হবে না। যাদের ওপর জুম'আর নামায ফরয এমন ৪০ জন লোক যে স্থানে আছে কেবল সেখানেই জুম'আ অনুষ্ঠিত হতে পারে। এসব লোকের স্থায়ীভাবে বাড়ীঘরে (তাঁবুতে নয়) বসবাসকারী হতে হবে। অর্থাৎ শীত বা গ্রীষ্মকালে তারা কোথাও স্থানান্তরিত হয় না। এ জন্য জনবসতির বাড়ী ঘর ও মহল্লাসমূহ পরস্পর সংলগ্ন হোক বা বিচ্ছিন্ন হোক তাতে কোন পার্থক্য হয় না। এই জনপদের বিভিন্ন অংশের মধ্যকার দূরত্ব কয়েক মাইল হলেও যদি তা সমষ্টিগতভাবে একটি নামে পরিচিত হয় তাহলে তা একটি জনপদ বলেই গণ্য হবে। এ ধরনের জনপদ থেকে যারা তিন মাইল দূরত্বের মধ্যে বসবাস করে তাদের জন্য জুম'আর নামায পড়তে মসজিদে আসা ফরয। জামায়াতে ইমাম সহ ৪০ ব্যক্তির উপস্থিত থাকা জরুরী। নামায মসজিদেই হতে হবে এমনটা জরুরী নয়। বরং খোলা মাঠেও নামায হতে পারে। যেসব কারণ বর্তমান থাকলে কোন ব্যক্তির ওপর জুম'আর নামায আর ফরয থাকে না তা হচ্ছে ঃ মুসাফির হওয়া, যে জনপদের লোকদের ওপর জুম'আ ফরয এমন জনপদে চারদিন বা তার কম সময় অবস্থানের ইচ্ছা করা, এমন রুগ্ন হওয়া যে সওয়ারীতে উঠে মসজিদে আসাও অসম্ভব, অন্ধ হওয়া—তবে সে নিজে যদি পথ হাতড়িয়ে আসতে পারে তাহলে আসবে। অন্য কোন লোকের সাহায্য নিয়ে অন্ধ ব্যক্তির জন্য মসজিদে আসা ওয়াজিব নয়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বা গরম অথবা প্রচণ্ড বৃষ্টি বা কাদা নামাযের স্থানে পৌঁছতে প্রতিবন্ধক হওয়া। কোন জালেমের জুলুম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আত্মগোপন করে থাকা। প্রাণ ও মান-ইজ্জতহানির আশংকা কিংবা এমন আর্থিক ক্ষতির আশংকা থাকা যা বরদাশত করা যাবে না। নামাযের আগে দু'টি খোতবা হতে হবে। খতীবের কথা শোনা যায়, যে ব্যক্তি খতীবের এতটা নিকটে আছে খোতবার সময় তাঁর জন্য কথাবার্তা বলা হারাম। তবে দূরে অবস্থিত লোক যার কাছে খতীবের আওয়াজ পৌঁছে না সে কথাবার্তা বলতে পারে। খতীব ন্যায়পরায়ণ হোক বা না হোক খোতবার সময় সবার চুপচাপ থাকা উচিত। জুম'আর দিনে ঈদ হলে যারা ঈদের নামায পড়বে তাদের জন্য জুম'আর নামায পড়া ফরয নয়। এ বিষয়ে হাম্বলী মযহাবের মত তিন ইমামের মত থেকে ভিন্ন (গায়াতুল মুনতাহা, আল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবায়া)।

যে ব্যক্তির ওপর জুম'আ ফরয নয় সে যদি জুম'আর নামাযে শরীক হয় তাহলে তার নামায সহীহ হবে এবং তার ওপর যোহরের নামায আর ফরয থাকবে না। এ বিষয়ে সমস্ত ফিকাহবিদ একমত।

১৯. যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জুম'আর হুকুম-আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে এটিই সেই ঘটনা। হাদীস গ্রন্থসমূহে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আবু হুরাইরা, হযরত আবু মালেক এবং হযরত হাসান বসরী, ইবনে যায়েদ, কাতাদা এবং মুকাতিল ইবনে হাইয়ান থেকে ঘটনার যে বিবরণ বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে ঃ পবিত্র মদীনা নগরীতে সিরিয়া থেকে একটি বাণিজ্য কাফেলা ঠিক জুম'আর নামাযের সময়ে এসে পৌছলো এবং জনপদের লোকজন যাতে তাদের আগমনের খবর জানতে পারে সেজন্য ঢোল-বাদ্য বাজাতে শুরু করলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় খোতবা দিচ্ছিলেন। ঢোল ও বাদ্য যন্ত্রের শব্দ শুনে সব মানুষ অস্থির হয়ে উঠল এবং ১২ জন লোক ছাড়া সবাই 'বাকী' নামক স্থানে ছুটে গেল। বাণিজ্য কাফেলা এখানেই অবস্থান করছিল। এই ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা আছে। এর মধ্যে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর বর্ণনাটি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। এ বর্ণনাটিকে ইমাম আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু উওয়ানা, আব্দ ইবনে হুমাইদ, আবু ইয়ালা প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সময়ে বর্ণনা করেছেন। এসব বর্ণনার মধ্যে অসামঞ্জস্য শুধু এতটুকু যে, কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, ঘটনাটি নামাযরত অবস্থায় ঘটেছিল। আবার কোন বর্ণনাতে বলা হয়েছে যে, নবী (সা) যখন খোতবা দিচ্ছিলেন ঘটনাটি তখন ঘটেছিল। কিন্তু হযরত জাবের এবং অন্য সব সাহাবী ও তাবেয়ীদের সবগুলো বর্ণনা একসাথে বিচার করলে যে কথাটি সঠিক বলে মনে হয় তাহলো ঘটনাটি খোতবার সময় সংঘটিত হয়েছিল। যেখানে তিনি বলেছেন যে, ঘটনাটি জুম'আর নামাযের সময় ঘটেছিল সেখানে তিনি 'জুম'আর নামায' বলতে খোতবা ও নামায উভয়ের সমষ্টিকে বুঝিয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় বলা হয়েছে, সে সময় ১২ জন পুরুষের সাথে সাত জন মহিলাও রয়ে গিয়েছিলেন। (ইবনে মারদুইয়া) কাতাদা বর্ণনা করেছেন যে, ১২ জন পুরুষের সাথে ১ জন মহিলাও ছিলেন (ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম)। দারুকুতনীর একটি রেওয়ায়াতে ৪০ ব্যক্তি এবং আব্দ ইবনে হুমায়েদের রেওয়ায়াতে ৭ জনের কথা বলা হয়েছে। ফার্‌রা, আটজনের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এগুলো সবই দুর্বল রেওয়ায়াত। কাতাদার এ রেওয়ায়াতও দুর্বল যে, এ ধরনের ঘটনা তিনবার ঘটেছিল (ইবনে জারীর)। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর রেওয়ায়াতটিই নির্ভরযোগ্য। এতে মসজিদে থেকে যাওয়া লোকের সংখ্যা ১২ জন বলা হয়েছে। আর কাতাদার একটি রেওয়ায়াত ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত সাহাবী ও তাবেয়ীদের বর্ণনাসমূহ এ বিষয়ে একমত যে, এ ঘটনা মাত্র একবারই ঘটেছে। মসজিদে থেকে যাওয়া লোকদের সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়াত একত্রে বিচার করলে জানা যায়, তাদের মধ্যে ছিলেন হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আম্মার (রা)। ইবনে ইয়াসির, হুযায়ফার আযাদ কৃতদাস হযরত সালেম (রা) এবং হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ। হাফেস আবু ইয়া'লা হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর যে রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন তাতে বলা হয়েছে।

লোকজন যখন এভাবে বের হয়ে চলে গেল এবং মাত্র ১২ জন অবশিষ্ট থাকলেন তখন নবী (সা) তাদের সম্বোধন করে বললেন ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ تَتَابَعْتُمْ حَتّٰى لَمْ يَبْقَ مِنْكُمْ اَحَدٌ لَسَالَ بِكُمُ الْوَادِىْ نَارًا -

"তোমরা সবাই যদি চলে যেতে এবং একজনও অবশিষ্ট না থাকত তাহলে এ উপত্যকা আগুনের প্রবাহে প্লাবিত হয়ে যেত।"

ইবনে মারদুইয়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে এবং ইবনে জারীর কাতাদা থেকে প্রায় এর অনুরূপ বিষয় বর্ণনা করেছেন।

শিয়াগণ এ ঘটনাটিকেও সাহাবীদের (রা) প্রতি কটাক্ষ করার জন্য ব্যবহার করেছেন। তাঁরা বলেন ঃ এত বিপুল সংখ্যক সাহাবীর খোতবা এবং নামায ছেড়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও খেল তামাশার দিকে ছুটে যাওয়া প্রমাণ করে, তারা দুনিয়াকে আখেরাতের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতেন। কিন্তু এটি এমন একটি কঠোর অমূলক দোষারোপ যা শুধু বাস্তব থেকে চোখ বন্ধ করেই করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনাটি ঘটেছিল হিজরাতের অব্যবহিত পরে। সে সময় একদিকে সাহাবীদের সামষ্টিক প্রশিক্ষণ ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে অন্যদিকে মক্কার কাফেররা তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি দ্বারা মদীনার অধিবাসীদের কঠোরভাবে অবরোধ করে রেখেছিল যার কারণে মদীনায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দুষ্প্রাপ্য হয়ে গিয়েছিল। হযরত হাসান বসরী বলেন, সেই সময় মদীনায় মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছিল, কিন্তু জিনিসপত্রের দাম ছিল আকাশ ছোঁয়া (ইবনে জারীর)। ঠিক এই পরিস্থিতিতে মদীনায় একটি বাণিজ্য কাফেলা এসে হাজির হলে নামাযরত লোকজন এই ভেবে আশংকাবোধ করলো, আমরা নামায শেষ করতে করতে সব জিনিসপত্র বিক্রি না হয়ে যায়। এই ভয়ে তারা সেদিকে ছুটে গিয়েছিল। এটা ছিল এমন একটা ত্রুটি ও দুর্বলতা যা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব ও কঠোর পরিস্থিতির কারণে হঠাৎ করে সেই সময় দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তার পরবর্তী সময়ে এসব সাহাবী ইসলামের জন্য যেসব কুরবানী ও ত্যাগ-তিতিক্ষা দেখিয়েছেন তা যদি কেউ দেখে এবং ইবাদাত-বন্দেগী ও সামষ্টিক কাজ-কর্মে তাঁদের জীবন যে অতুলনীয় আল্লাহভীতির সাক্ষ দেয় তাও দেখে তাহলে সে একথা বলে তাদের ওপর দোষারোপ করার দুঃসাহস দেখাতে পারবে না যে, তাদের মধ্যে আখেরাতের চেয়ে দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেয়ার ব্যাধি ছিল। তবে তার নিজের হৃদয় মনে যদি সাহাবীদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষের ব্যাধি থেকে থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

এ ঘটনা সাহাবীদের (রা) প্রতি কটাক্ষকারীদের যেমন সমর্থন করে না তেমনি সেসব লোকের ধ্যান-ধারণার প্রতিও সমর্থন জানায় না যারা সাহাবীদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার আতিশয্যে দাবী করেন যে, তাদের দ্বারা কখনো কোন ভুল হয়নি, কিংবা হয়ে থাকলেও কখনো তা উল্লেখ করা উচিত নয়। কারণ তাঁদের ভুল-ত্রুটির উল্লেখ করা এবং তাকে ভুল-ত্রুটি বলা তাঁদের অপমান করার শামিল। এতে হৃদয় মনে তাদের প্রতি মর্যাদা ও শ্রদ্ধাবোধ অবশিষ্ট থাকে না। তাছাড়া তাঁদের ভুল-ত্রুটির উল্লেখ সেসব আয়াত ও হাদীসেরও পরিপন্থী যার মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় সাহাবীদের ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়া আল্লাহর নিকট

প্রিয় হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এসব কথা স্পষ্ট বাড়াবাড়ি। এর সমর্থনে কুরআন ও হাদীসে কোন দলীল নেই। এখানে যে কেউ দেখতে পারেন, বিপুল সংখ্যক সাহাবীর (রা) একটি দল কর্তৃক যে ত্রুটি হয়েছিল আল্লাহ তা'আলা নিজে এখানে তাঁদের সেই ত্রুটির উল্লেখ করেছেন। এমন গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত উম্মাতকে পড়তে হবে। সেই গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে গ্রন্থে তাঁদের ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়া এবং আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার কথাও স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া হাদীস ও তাফসীরের সমস্ত গ্রন্থে সাহাবা কিরাম (রা) থেকে পরবর্তীকালের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বড় বড় মনীষীগণ পর্যন্ত তাঁদের এই ত্রুটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ কি এই যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের মন থেকে ঐ সব সাহাবীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে ঐ ত্রুটির উল্লেখ করেছেন যা তিনি নিজেই মানুষের মনে কায়েম করতে চান? অথবা এর অর্থ কি এই যে, এসব অন্ধ ও গোঁড়া ভক্তগণ শরীয়াতের যে মাসয়ালাটি বলে থাকেন সাহাবায়ে কিরাম (রা), তাবেয়ীগণ, মুহাদ্দিসগণ এবং মুফাসসিরগণের সে মাসয়ালাটি জানা না থাকার কারণে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁরা উল্লেখ করেছেন? আর যারা সূরা জুম'আ পড়েন এবং তার তাফসীর অধ্যয়ন করেন তাদের মন থেকে কি সত্যি সত্যিই সাহাবা কিরামের (রা) প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা উধাও হয়ে গেছে? এ সব প্রশ্নের জবাব যদি নেতিবাচক হয়, আর নেতিবাচক তো অবশ্যই হবে তাহলে সাহাবায়ে কিরামের (রা) মর্যাদার নামে কিছু লোক যেসব অনর্থক এবং বাড়াবাড়ি, অতিরঞ্জিত ও অতিশয়োক্তিমূলক কথাবার্তা বলে থাকেন তা অবশ্যই ভ্রান্ত।

প্রকৃতপক্ষে সাহাবায়ে কিরাম কোন আসমানী মাখলুক ছিলেন না। বরং এই পৃথিবীতে জন্মলাভকারী মানুষ ছিলেন। তারা যা কিছু হয়েছিলেন তা হয়েছিলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার গুণে। তাঁদের এ শিক্ষা দেয়া হয়েছিল ক্রমান্বয়ে বছরের পর বছর ধরে। কুরআন ও হাদীসে আমরা এ শিক্ষার যে নিয়ম-পদ্ধতি দেখতে পাই, তা হচ্ছে, যখনই তাদের মধ্যে কোন দুর্বলতা দেখা দিয়েছে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল যথাসময়ে সেদিকে মনোনিবেশ করেছেন এবং দুর্বলতার সেই বিশেষ ক্ষেত্রে অনতিবিলম্বে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদানের একটি কর্মসূচী শুরু করা হয়েছে। জুম'আর নামাযের এই ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই যে, বাণিজ্য কাফেলা সংক্রান্ত ঘটনাটি ঘটলে আল্লাহ তা'আলা সূরা জুম'আর এ রুকূ'র আয়াতসমূহ নাযিল করে এ বিষয়ে সতর্ক করলেন এবং জুম'আর নামাযের নিয়ম-কানুন ও আদব-কায়দা অবহিত করলেন। তাছাড়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুম'আর অনেকগুলো খোতবায় লোকজনের মনে জুম'আ ফরয হওয়ার গুরুত্ব বদ্ধমূল করে দিলেন এবং বিস্তারিতভাবে তাদেরকে জুম'আর নিয়ম-কানুন ও আদব-কায়দা শিক্ষা দিলেন। আমরা বিভিন্ন হাদীস থেকে এসব হিদায়াত ও নির্দেশনা স্পষ্টভাবে পেয়ে থাকি। আমরা এ বিষয়ে ১৫ নং টীকায় উল্লেখ করেছি। হযরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জুম'আর দিন প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য গোসল করা, দাঁত পরিষ্কার করা, যে উত্তম পোশাক তার আছে তা পরিধান করা এবং যদি সম্ভব হয় সুগন্ধি ব্যবহার করা। (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী) হযরত সালমান ফারসী বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ যে মুসলমান জুম'আর দিনে গোসল করবে এবং সাধ্যমত নিজেকে বেশী করে পাক পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবে, মাথায় তেল দেবে, ঘরে যে

খোশবুই থাক না কেন ব্যবহার করবে, তারপর মসজিদে যাবে এবং দুই জন মানুষকে সরিয়ে দিয়ে তাদের মাঝে বসবে না, তারপর আল্লাহর দেয়া সামর্থ অনুসারে নামায (নফল) পড়বে এবং ইমাম যখন খোতবা দিবেন তখন চুপ থাকবে, এক জুম'আ থেকে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত তার কৃত অপরাধসমূহ মাফ হয়ে যায়। (বুখারী, মুসনাদে আহমাদ) হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা), হযরত আবু হুরাইরা (রা) এবং হযরত নুবাইশাতুল হুযালী (রা)-ও তাঁদের বর্ণনায় নবী (সা) থেকে প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছেন (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, তাবারানী)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ ইমাম যখন খোতবা দেন, তখন যে ব্যক্তি কথা বলে সে এমন গাধার মত যার পিঠে বই পুস্তকের বোঝা চাপানো আছে। আর যে ব্যক্তি তাকে বলে ঃ চুপ কর তারও কোন জুম'আ হয়নি (মুসনাদে আহমদ) হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ জুম'আর দিন খোতবার সময় যে ব্যক্তি কথা বলে তাকে যদি তোমরা বলো, "চুপ কর" তাহলে তোমরাও অর্থহীন কাজ করলে (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী, আবু দাউদ)। ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ ও তাবারানী হযরত আলী (রা) ও হযরত আবুদ দারদা (রা) থেকে প্রায় অনুরূপ কিছু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেই সাথে নবী (সা) খতীবদেরকেও দীর্ঘ খোতবা দিয়ে মানুষকে বিরক্ত ও অতিষ্ট না করতে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি নিজে জুম'আর দিন সংক্ষিপ্ত খোতবা দিতেন এবং নামাযও খুব দীর্ঘ করে পড়াতেন না। হযরত জাবের (রা) ইবনে সামুরা বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) খোতবা দীর্ঘায়িত করতেন না। তাঁর খোতবা হতো কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কথার সমষ্টি (আবু দাউদ)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খোতবা নামাযের তুলনায় সংক্ষিপ্ত হতো এবং নামায খোতবার চেয়ে দীর্ঘ হতো (নাসায়ী)। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির নামায দীর্ঘ হওয়া এবং খোতবা সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রমাণ করে সে দীনের ব্যাপারে জ্ঞানের অধিকারী (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম)। বায্যার আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) লোকজনকে কিভাবে জুম'আর নামাযের নিয়ম-কানুন ও আদব-কায়দা শিখাতেন এসব হাদীসের ভাষ্য থেকে তা অনুমান করা যায়। এভাবে এ নামাযের এমন একটি মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার নজীর পৃথিবীর কোন জাতির সামষ্টিক ইবাদাতে দেখা যায় না।

২০. সাহাবীদের যে ত্রুটি হয়েছিল তা কি ধরনের ত্রুটি ছিল এ আয়াতাংশ থেকে তা বুঝা যায় (নাউযুবিল্লাহ)। যদি ঈমানের দুর্বলতা ও জেনে শুনে আখেরাতের ওপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেয়া এর কারণ হতো তাহলে আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ, শাসানি এবং তিরস্কারের ধরন হতো ভিন্ন। কিন্তু এ ধরনের কোন অপরাধ যেহেতু সেখানে হয়নি, বরং যা হয়েছিল তা প্রশিক্ষণের অভাবে হয়েছিল। তাই প্রথমে শিক্ষকসুলভ ভঙ্গিতে জুম'আর নিয়ম-কানুন ও আদব-কায়দা শেখানো হয়েছে। তারপর তাদের ত্রুটির কথা উল্লেখ করে মুরুব্বিয়ানাভঙ্গিতে বুঝানো হয়েছে যে, জুম'আর খোতবা শোনা এবং নামায পড়ার জন্য আল্লাহর নিকট থেকে তোমরা যা লাভ করবে তা এই দুনিয়ার ব্যবসায়-বাণিজ্য ও খেল তামাশার চেয়ে উত্তম।

২১. অর্থাৎ এ পৃথিবীতে রিযিকদানের পরোক্ষ মাধ্যম যে বা যাই হোক না কেন তাদের সবার চেয়ে উত্তম রিযিকদাতা হলেন আল্লাহ তা'আলা। কুরআন মজীদের বহু সংখ্যকস্থানে এ ধরনের কথা বলা হয়েছে। কোথাও আল্লাহ তা'আলাকে احسن الخالقين "সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা", কোথাও خير الغافرين "সর্বোত্তম ক্ষমাকারী", কোথাও خير الحاكمين "সর্বোত্তম বিচারক", خير الراحمين কোথাও "সর্বোত্তম দয়ালু" এবং কোথাও خير الناصرين "সর্বোত্তম সাহায্যকারী" বলা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সৃষ্টি বা মাখলূকের সাথে রিযিক দেয়া, সৃষ্টি করা, দয়া করা এবং সাহায্য করার যে সম্পর্ক তা রূপক বা পরোক্ষ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়াতে যারাই তোমাদেরকে বেতন, পারিশ্রমিক বা খাদ্য দিচ্ছে বলে দেখা যায়, যাদেরকেই তাদের শিল্প ও কারিগরী দক্ষতা দিয়ে কিছু তৈরী করতে দেখা যায় অথবা যাদেরকেই অন্যদের অপরাধ ক্ষমা করতে, দয়া করতে এবং সাহায্য করতে দেখা যায় আল্লাহ তাদের সবার চেয়ে বড় রিযিকদাতা, বড় সৃষ্টিকর্তা, বড় দয়ালু, বড় ক্ষমাকারী এবং বড় সাহায্যকারী।

আল মুনাফিকুন

৬৩

নামকরণ

প্রথম আয়াতের اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ অংশ থেকে এ সূরার নাম গ্রহণ করা হয়েছে। এটি এ সূরার নাম এবং এর বিষয়বস্তুর শিরোনামও। কারণ এ সূরায় মুনাফিকদের কর্মপদ্ধতির সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বনী মুসতালিক যুদ্ধাভিযান থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে অথবা মদীনায় পৌঁছার অব্যবহিত পরে এ সূরা নাযিল হয়েছিল। ৬ হিজরীর শা'বান মাসে বনী মুসতালিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল একথা আমরা সূরা নূরের ভূমিকায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ বর্ণনা করেছি। এভাবে এর নাযিল হওয়ার সময় সঠিকভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এ বিষয়ে আমরা পরে আরো আলোচনা করব।

ঐতিহাসিক পটভূমি

যে বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরা নাযিল হয়েছিল তা আলোচনার পূর্বে মদীনার মুনাফিকদের ইতিহাসের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। কারণ ঐ সময় যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তা আদৌ কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ছিল না। বরং তার পেছনে ছিল একটি পুরো ধারাবাহিক ঘটনা প্রবাহ যা পরিশেষে এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল।

পবিত্র মদীনা নগরীতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে আওস ও খাযরাজ গোত্র দু'টি পারস্পরিক গৃহযুদ্ধে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে এক ব্যক্তির নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে নিতে প্রায় ঐকমত্যে পৌঁছেছিল। তারা যথারীতি তাকে বাদশাহ বানিয়ে তার অভিষেক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিও শুরু করেছিল। এমন কি তার জন্য রাজ মুকুটও তৈরী করা হয়েছিল। এ ব্যক্তি ছিল খাযরাজ গোত্রের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, খাযরাজ গোত্রে তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সর্বসম্মত এবং আওস ও খাযরাজ ইতিপূর্বে আর কখনো একযোগে এক ব্যক্তির নেতৃত্ব মেনে নেয়নি। (ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৪)

এই পরিস্থিতিতে ইসলামের বাণী মদীনায় পৌঁছে এবং এই দু'টি গোত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। হিজরাতের আগে আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতের সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন মদীনায় আগমনের জন্য আহবান

জানানো হচ্ছিল তখন হযরত আব্বাস ইবনে উবাদা ইবনে নাদলা (রা) আনসারী এ আহবান জানাতে শুধু এ কারণে দেরী করতে চাচ্ছিলেন যাতে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও বইয়াত ও দাওয়াতে শামিল হয় এবং এভাবে মদীনা যেন সর্বসম্মতিক্রমে ইসলামের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু যে প্রতিনিধি দল বাইয়াতের জন্য হাজির হয়েছিল তারা এই যুক্তি ও কৌশলকে কোন গুরুত্বই দিলেন না এবং এতে অংশগ্রহণকারী দুই গোত্রের ৭৫ ব্যক্তি সব রকম বিপদ মাথা পেতে নিয়ে নবী (সা)–কে দাওয়াত দিতে প্রস্তুত হয়ে গেল। (ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৯) আমরা সূরা আনফালের ভূমিকায় এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছি।

এরপর নবী (সা) যখন মদীনায় পৌঁছলেন তখন আনসারদের ঘরে ঘরে ইসলাম এতটা প্রসার লাভ করেছিল যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নিরূপায় হয়ে পড়েছিল। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য তার নিজের জন্য ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। তাই সে তার বহু সংখ্যক সহযোগী ও সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। এদের মধ্যে ছিল উভয় গোত্রের প্রবীণ ও নেতৃ পর্যায়ের লোকেরা। অথচ তাদের সবার অন্তর জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছিল। বিশেষ করে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের অন্তরজ্বালা ও দুঃখ ছিল অত্যন্ত তীব্র। কারণ সে মনে করতো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রাজত্ব ও বাদশাহী ছিনিয়ে নিয়েছেন। তার এই মুনাফেকীপূর্ণ ঈমান এবং নেতৃত্ব হারানোর দুঃখ কয়েক বছর ধরে বিচিত্র ভঙ্গিতে প্রকাশ পেতে থাকল। একদিকে তার অবস্থা ছিল এই যে, প্রতি জুম'আর দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খোতবা দেয়ার জন্য মিম্বারে উঠে বসতেন তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই উঠে বলতো, "ভাইসব, আল্লাহর রসূল আপনাদের মধ্যে বিদ্যমান। তাঁর কারণে আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। তাই আপনারা সবাই তাঁকে সাহায্য সহযোগিতা করুন, তিনি যা বলেন গভীর মনযোগ সহকারে তা শুনুন এবং তাঁর আনুগত্য করুন।" (ইবনে হিশাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১১) অপরদিকে অবস্থা ছিল এই যে, প্রতিদিনই তার মুনাফেকীর মুখোশ খুলে পড়ছিল এবং সৎ ও নিষ্ঠবান মুসলমানদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল যে, সে ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা ইসলাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে চরম শত্রুতা পোষণ করে।

একবার নবী (সা) কোন এক পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময় পথে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাঁর সাথে অভদ্র আচরণ করে। তিনি হযরত সা'দ ইবনে উবাদাকে বিষয়টি জানালে সা'দ বললেন, "হে আল্লাহর রসূল, আপনি এ ব্যক্তির প্রতি একটু নম্রতা দেখান। আপনার আগমনের পূর্বে আমরা তার জন্য রাজমুকুট তৈরী করেছিলাম। এখন সে মনে করে, আপনি তার নিকট থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছেন।" (ইবনে হিশাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৭, ২৩৮)

বদর যুদ্ধের পর বনী কাইনুকা গোত্রের ইহুদীরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও অকারণে বিদ্রোহ করলে রসূলুল্লাহ (সা) তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। তখন এই ব্যক্তি তাদের সমর্থনে কোমর বেঁধে কাজ শুরু করে। সে নবীর (সা) বর্ম ধরে বলতে লাগলো, এই গোত্রটির সাতশত বীরপুরুষ যোদ্ধা শত্রুর মোকাবেলায় সবসময় আমাকে সাহায্য করেছে, আজ একদিনেই আপনি তাদের হত্যা করতে চাচ্ছেন? আল্লাহর শপথ, আপনি যতক্ষণ

আমার এই মিত্রদের ক্ষমা না করবেন আমি ততক্ষণ আপনাকে ছাড়বো না। (ইবনে হিশাম, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫১—৫২)

উহুদ যুদ্ধের সময় এই ব্যক্তি খোলাখুলি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যুদ্ধের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সে তার তিনশত সঙ্গী-সাথীকে নিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এসেছে। কি সাংঘাতিক নাযুক মুহূর্তে সে এই আচরণ করেছে তা এই একটি বিষয় থেকেই অনুমান করা যায় যে, কুরাইশরা তিন হাজার লোকের একটি বাহিনী নিয়ে মদীনার ওপরে চড়াও হয়েছিল আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাত্র এক হাজার লোক নিয়ে তাদের মোকাবিলা ও প্রতিরোধের জন্য বেরিয়েছিলেন। এক হাজার লোকের মধ্যে থেকেও এই মুনাফিক তিনশত লোককে আলাদা করে যুদ্ধের ময়দান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল এবং নবী (সা)-কে শুধু সাতশত লোকের একটি বাহিনী নিয়ে তিন হাজার শত্রুর মোকাবিলা করতে হলো।

এ ঘটনার পর মদীনার সব মুসলমান নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলো যে, এ লোকটি কট্টর মুনাফিক। তার যেসব সংগীসাথী এই মুনাফিকীতে তার সাথে শরীক ছিল তাদেরকেও তারা চিনে নিল। এ কারণে উহুদ যুদ্ধের পর প্রথম জুম'আর দিনে নবীর (সা) খোতবা দেয়ার পূর্বে এ ব্যক্তি যখন বক্তৃতা করতে দাঁড়ালো তখন লোকজন তার জামা টেনে ধরে বলল ঃ "তুমি বসো, তুমি একথা বলার উপযুক্ত নও।" মদীনাতে এই প্রথমবারের মত প্রকাশ্যে এ ব্যক্তিকে অপমানিত করা হলো। এতে সে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হলো এবং মানুষের ঘাড় ও মাথার ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেল। মসজিদের দরজার কাছে কিছু সংখ্যক আনসার তাকে বললেন, "তুমি একি আচরণ করছো? ফিরে চলো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন করো।" এতে সে ক্রোধে ফেটে পড়লো এবং বললো! "তাকে দিয়ে আমি কোন প্রকার ক্ষমা প্রার্থনা করাতে চাই না।" (ইবনে হিশাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১১)।

হিজরী ৪ সনে বনু নাযীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই সময় এই ব্যক্তি ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা আরো খোলাখুলিভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে ইসলামের শত্রুদের সাহায্য সহযোগিতা দান করে। একদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর জান কবুল সাহাবীগণ এসব ইহুদী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। অপরদিকে এই মুনাফিকরা গোপনে গোপনে ইহুদীদের কাছে খবর পাঠাচ্ছিল যে, তোমরা রুখে দাঁড়াও। আমরা তোমাদের সাথে আছি। তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হলে আমরা তোমাদের সাহায্য করবো এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করা হলে আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাব। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই গোপন গাঁটছড়া বাঁধার বিষয়টি প্রকাশ করে দিলেন। সূরা হাশরের দ্বিতীয় রুকূ'তে এ বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

কিন্তু তার ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের মুখোশ খুলে পড়ার পরও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কার্যকলাপ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। কারণ মুনাফিকদের একটি বড় দল তার সহযোগী ছিল। আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের বহু সংখ্যক নেতা তার সাহায্যকারী ছিল। কম করে হলেও মদীনার গোটা জনবসতির এক তৃতীয়াংশ ছিল তার সাঙ্গপাঙ্গ। উহুদ যুদ্ধের সময় এ বিষয়টিই প্রকাশ পেয়েছিল। এই

পরিস্থিতিতে বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ শত্রুর সাথেও যুদ্ধের ঝুঁকি নেয়া কোন অবস্থায়ই সমীচীন ছিল না। এ কারণে তাদের মুনাফিকী সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও নবী (সা) দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাহ্যিকভাবে ঈমানের দাবী অনুসারেই তাদের সাথে আচরণ করেছেন। অপরদিকে এসব লোকেরও এতটা শক্তি ও সাহস ছিল না যে, তারা প্রকাশ্যে কাফের হয়ে ঈমানদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করত অথবা খোলাখুলি কোন হামলাকারী শত্রুর সাথে মিলিত হয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হতো। বাহ্যত তারা নিজেদের একটা মজবুত গোষ্ঠী তৈরী করে নিয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে বহু দুর্বলতা ছিল। সূরা হাশরের ১২ থেকে ১৪ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে সেইসব দুর্বলতার কথাই তুলে ধরেছেন। তাই তারা মনে করতো, মুসলমান সেজে থাকার মধ্যেই তাদের কল্যাণ নিহিত। তারা মসজিদে আসত, নামায পড়তো এবং যাকাতও দিতো। তাছাড়া মুখে ঈমানের লম্বা চওড়া দাবী করতো, সত্যিকার মুসলমানের যা করার আদৌ কোন প্রয়োজন পড়তো না। নিজেদের প্রতিটি মুনাফিকী আচরণের পক্ষে হাজারটা মিথ্যা যুক্তি তাদের কাছে ছিল। এসব কাজ দ্বারা তারা নিজেদের স্বগোত্রীয় আনসারদেরকে এই মর্মে মিথ্যা আশ্বাস দিত যে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি। আনসারদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তাদের অনেক ক্ষতি হতো। এসব কৌশল অবলম্বন করে তারা সেসব ক্ষতি থেকে নিজেদের রক্ষা করছিল। তাছাড়া তাদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ থেকে মুসলমানদের ভেতরে কলহ কোন্দল ও ফাসাদ সৃষ্টির এমন সব সুযোগও তারা কাজে লাগাচ্ছিল যা অন্য কোন জায়গায় থেকে লাভ করতে পারত না।

এসব কারণে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ মুনাফিকরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বনী মুসতালিক যুদ্ধাভিযানে শরীক হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিল এবং এই সুযোগে একই সাথে এমন দু'টি মহাফিতনা সৃষ্টি করেছিল যা মুসলমানদের সংহতি ও ঐক্যকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারত। কিন্তু পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সাহচর্য থেকে ঈমানদারগণ যে সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন তার কল্যাণে যথা সময়ে এ ফিতনার মূল্যোৎপাটন হয়ে যায় এবং এসব মুনাফিক নিজেরাই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়। এ দু'টি ফিতনার মধ্যে একটির উল্লেখ করা হয়েছে সূরা নূরে। আর অপর ফিতনাটির উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য এই সূরাটিতে।

বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, নাসায়ী, তিরমিযী, বায়হাকী, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া, আবদুর রায্যাক, ইবনে জারীর, তাবারী, ইবনে সা'দ এবং মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বহু সংখ্যক সনদসূত্রে এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। যে অভিযানের সময় এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল কিছু সংখ্যক রেওয়ায়াতে তার নাম উল্লেখ করা হয়নি। আবার কোন কোন রেওয়ায়াতে তাবুক যুদ্ধের সময়কার ঘটনা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মাগাযী (যুদ্ধ বিষয়ক ইতিহাস) ও সীরাত (নবী জীবন) বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে একমত যে, এ ঘটনা বনী মুসতালিক যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়েছিল। বিভিন্ন রেওয়ায়াত একত্রিত করলে ঘটনার যে বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় তা হচ্ছে ঃ

বনী মুসতালিক গোত্রকে পরাস্ত করার পর ইসলামী সেনাবাহিনী তখনও মুরাইসী নামক কূপের আশেপাশের জনবসতিতে অবস্থান করছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ পানি নিয়ে দুই

ব্যক্তির মধ্যে বচসা হয়। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল জাহ্জাহ্ ইবনে মাসউদ গিফারী। তিনি ছিলেন হযরত উমরের (রা) কর্মচারী। তিনি তাঁর ঘোড়ার দেখাশোনা ও তত্বাবধান করতেন। অন্যজন ছিলেন সিনান ইবনে ওয়াবার আল জুহানী।[১] তাঁর গোত্র খাযরাজ গোত্রের মিত্র ছিল। মৌখিক বাদানুবাদ শেষ পর্যন্ত হাতাহাতিতে পরিণত হয় এবং জাহ্জাহ্ সিনানকে একটি লাথি মারে। প্রাচীন ইয়ামনী ঐতিহ্য অনুসারে আনসারগণ এ ধরনের আচরণকে অত্যন্ত অপমানজনক ও লাঞ্ছনাকর মনে করতেন। এতে সিনান সাহায্যের জন্য আনসারদেরকে আহবান জানায় এবং জাহ্জাহও মুহাজিরদের আহবান জানায়। এই ঝগড়ার খবর শোনামাত্র আবদুল্লাহ ইবনে উবাই আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদের উত্তেজিত করতে শুরু করে। সে চিৎকার করে বলতে থাকে দ্রুত এসো, নিজের মিত্রদের সাহায্য করো। অপরদিক থেকে কিছু সংখ্যক মুজাহিরও এগিয়ে আসেন। বিষয়টি আরো অনেক দূর পর্যন্ত গড়াতে পারতো। ফলে আনসার ও মুহাজিরগণ সম্মিলিতভাবে সবেমাত্র যে স্থানটিতে এক দুশমন গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের পরাজিত করেছিলেন এবং তখনও তাদের এলাকাতেই অবস্থান করছিলেন সে স্থানটিতেই পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়তেন। কিন্তু শোরগোল শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগিয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ

ما بال دعوى الجاهلية ؟ مالكم ولدعوة الجاهلية ؟ دعوها فانها منتنة –

"কি ব্যাপার! জাহেলিয়াতের আহবান শুনতে পাচ্ছি কেন? জাহেলিয়াতের আহবানের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক? এসব ছেড়ে দাও, এগুলো দুর্গন্ধময় নোংরা জিনিস।[২] এতে উভয়পক্ষের সৎ ও নেক্কার লোকজন অগ্রসর হয়ে ব্যাপারটি মিটমাট করে দিলেন এবং সিনান জাহ্জাহকে মাফ করে আপোষ করে নিলেন।

১. বিভিন্ন রেওয়ায়াতে উভয়ের বিভিন্ন নাম বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা ইবনে হিশামের বর্ণনা থেকে এ নাম গ্রহণ করেছি।

২. এই সময় নবীর (সা) বলা একথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের সঠিক মর্মবাণীকে বুঝতে হলে একথাটি যথাযথভাবে বুঝে নেয়া প্রয়োজন। ইসলামের নীতি হচ্ছে, দুই ব্যক্তি যদি তাদের বিবাদের ব্যাপারে সাহায্যের জন্য মানুষকে আহবান জানাতে চায় তাহলে সে বলবে, মুসলমান ভাইয়েরা, এগিয়ে এসো, আমাদের সাহায্য করো। অথবা বলবে, হে লোকেরা, আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আস। কিন্তু তাদের প্রত্যেকে যদি নিজ গোত্র, স্বজন, বংশ ও বর্ণ অথবা অঞ্চলের নাম নিয়ে আহবান জানায় তাহলে তা জাহেলিয়াতের আহবান হয়ে দাঁড়ায়। এ আহবানে সাড়া দিয়ে আগমনকারী যদি কে অত্যাচারী আর কে অত্যাচারিত তা না দেখে এবং হক ও ইনসাফের ভিত্তিতে অত্যাচারিতকে সাহায্য করার পরিবর্তে নিজ নিজ গোষ্ঠীর লোককে সাহায্য করার জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তাহলে তা একটি জাহেলিয়াতপূর্ণ কাজ। এ ধরনের কাজ দ্বারা দুনিয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে নোংরা ও ঘৃণিত জিনিস বলে আখ্যায়িত করে মুসলমানদের বলেছেন যে, এরূপ জাহেলিয়াতের আহবানের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক? তোমরা ইসলামের ভিত্তিতে একটি জাতি হয়েছিলে। এখন আনসার ও মুজাহিরদের নাম দিয়ে তোমাদের কি করে আহবান জানানো হচ্ছে, আর সেই আহবান শুনে তোমরা কোথায় ছুটে যাচ্ছ? আল্লামা সুহাইলী

কিন্তু যাদের অন্তরে মুনাফিকী ছিল তারা সবাই এরপর আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কাছে সমবেত হয়ে তাকে বললো ঃ "এতদিন আমরা তোমার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তুমি প্রতিরোধও করে আসছিলে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, তুমি আমাদের বিরুদ্ধে এসব কাঙাল ও নিস্বদের[১] সাহায্যকারী হয়ে গিয়েছো।" আবদুল্লাহ ইবনে উবাই আগে থেকেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। একথা শুনে সে আরো জ্বলে উঠল। সে বলতে শুরু করল ঃ এসব তোমাদের নিজেদেরই কাজের ফল। তোমরা এসব লোককে নিজের দেশে আশ্রয় দিয়েছো, নিজেদের অর্থ-সম্পদ তাদের বন্টন করে দিয়েছো। এখন তারা ফুলেফেঁপে উঠেছে এবং আমাদেরই প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এবং কুরাইশদের এই কাঙালদের বা মুহাম্মাদের (সা) (সঙ্গীসাথীদের) অবস্থা বুঝাতে একটি উপমা হুবহু প্রযোজ্য। উপমাটি হলো, তুমি নিজের কুকুরকে খাইয়েদাইয়ে মোটা তাজা করো, যাতে তা একদিন তোমাকেই ছিঁড়ে ফেড়ে খেতে পারে। তোমরা যদি তাদের থেকে সাহায্যের হাত গুটিয়ে নাও তাহলে তারা কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আল্লাহর শপথ, মদীনা ফিরে গিয়ে আমাদের মধ্যে যারা মর্যাদাবান লোক তারা হীন ও লাঞ্ছিত লোকদের বের করে দেবে।"

এ বৈঠকে ঘটনাক্রমে হযরত যায়েদ ইবনে আরকামও উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি একজন কম বয়স্ক বালক ছিলেন। এসব কথা শোনার পর তিনি তাঁর চাচার কাছে তা বলে দেন। তাঁর চাচা ছিলেন আনসারদের একজন নেতা। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে সব বলে দেন। নবী (সা) যায়েদকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে তিনি যা শুনেছিলেন তা আদ্যপান্ত খুলে বললেন।[২] নবী (সা) বললেন ঃ তুমি বোধ হয় ইবনে উবাইয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট। সম্ভবত তোমার শুনতে ভুল হয়েছে। ইবনে উবাই একথা বলছে বলে হয়তো তোমার সন্দেহ হয়েছে। কিন্তু যায়েদ বললেন, হে আল্লাহর রসূল, তা নয়। আল্লাহর শপথ আমি নিজে তাকে এসব কথা বলতে শুনেছি। অতপর নবী (সা) ইবনে উবাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে সে সরাসরি অস্বীকার করলো। সে বারবারের

"রাওদুল উনুফ" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ কোন ঝগড়া-বিবাদ বা মতানৈক্যের ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতপূর্ণ আহবান জানানোকে ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদগণ রীতিমত ফৌজদারী অপরাধ বলে চিহ্নিত করেছেন। একদল আইনবিদের মতে এর শাস্তি পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত এবং আরেক দলের মতে দশটি। তৃতীয় আরেক দলের মতে, তাকে অবস্থার আলোকে শাস্তি দেয়া দরকার। কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু তিরস্কার ও শাসানিই যথেষ্ট। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এ ধরনের আহবান উচ্চারণকারীকে বন্দী করা উচিত। সে যদি বেশী দুষ্কর্মশীল হয় তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করতে হবে।

১. যারা ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় চলে আসছিল মদীনার মুনাফিকরা তাদের সবাইকে جلابيب বলে আখ্যায়িত করতো। শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কম্বল বা মোটা বস্ত্র পরিধানকারী। কিন্তু গরীব মুহাজিরদেরকে হেয় ও অবজ্ঞা করার জন্যই তারা এ শব্দটি ব্যবহার করতো। যে অর্থ বুঝাতে তারা শব্দটি বলত 'কাঙাল' শব্দ দ্বারা তা অধিকতর বিশুদ্ধভাবে ব্যক্ত হয়।

২. এ ঘটনা থেকে ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, ধর্মীয়, নৈতিক ও জাতীয় স্বার্থের খাতিরে কেউ যদি কারো ক্ষতিকর কথা অন্য কারো কাছে বলে তা হলে চোগলখুরীর পর্যায়ে পড়ে না। ফিতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি এবং মানুষের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে যে চোগলখুরী করা হয় সেই চোগলখুরীকে ইসলামী শরীয়াত হারাম ঘোষণা করেছে।

শপথ করে বলতে লাগলো, আমি একথা কখনো বলি নাই। আনসারদের লোকজনও বললেন ঃ হে আল্লাহর নবী, এতো একজন ছেলে মানুষের কথা, হয়তো তার ভুল হয়েছে। তিনি আমাদের নেতা ও সম্মানিত ব্যক্তি। তার কথার চেয়ে একজন বালকের কথার প্রতি বেশী আস্থাশীল হবেন না। বিভিন্ন গোত্রের প্রবীণ ও বৃদ্ধ ব্যক্তিরাও যায়েদকে তিরস্কার করলো। বেচারা যায়েদ এতে দুঃখিত ও মনঃক্ষুণ্ন হয়ে নিজের জায়গায় চুপচাপ বসে থাকলেন। কিন্তু নবী (সা) যায়েদ ও আবদুল্লাহ ইবনে উবাই উভয়কেই জানতেন। তাই প্রকৃত ব্যাপার কি তা তিনি ঠিকই উপলব্ধি করতে পারলেন।

হযরত 'উমর এ বিষয়টি জানতে পেরে নবীর (সা) কাছে এসে বললেন ঃ "আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। অথবা এরূপ অনুমতি দেয়া যদি সমীচীন মনে না করেন তাহলে আনসারদের নিজেদের মধ্যে থেকে মুআয ইবনে জাবাল অথবা আববাদ ইবনে বিশর, অথবা সা'দ ইবনে মু'আয, অথবা মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাকে নির্দেশ দিন[১] সে তাকে হত্যা করুক।" কিন্তু নবী (সা) বললেন ঃ "এ কাজ করো না। লোকে বলবে, মুহাম্মাদ (সা) নিজের সংগী-সাথীদেরকেই হত্যা করছে।" এরপর নবী (সা) তৎক্ষণাৎ যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দিয়ে দিলেন। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বাভাবিক রীতি ও অভ্যাস অনুসারে তা যাত্রার সময় ছিল না। ক্রমাগত ৩০ ঘন্টা পর্যন্ত যাত্রা অব্যাহত থাকলো। এমন কি লোকজন ক্লান্তিতে নিস্তেজ ও দুর্বল হয়ে পড়লো। তখন তিনি একস্থানে তাঁবু করে অবস্থান করলেন। ক্লান্ত শ্রান্ত লোকজন মাটিতে পিঠ ঠেকানো মাত্র সবাই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। এ কাজ তিনি এ জন্য করলেন যাতে, মুরাইসী কূপের পাশে যে ঘটনা ঘটেছিল মানুষের মন-মগজ থেকে তা মুছে যায়। পথিমধ্যে আনসারদের একজন নেতা হযরত উসাইদ ইবনে হুদায়ের তাঁর কাছে গিয়ে বললেন ঃ "হে আল্লাহর রসূল, আজ আপনি এমন সময় যাত্রার নির্দেশ দিয়েছেন যা সফরের জন্য উপযুক্ত নয়। আপনি তো এ রকম সময়ে কখনো সফর শুরু করতেন না?" নবী (সা) বললেন ঃ তোমাদের সেই লোকটি কি কথা প্রচার করেছে তাকি তুমি শোন নাই? তিনি জিজ্ঞেস করলেন কোন লোকটি? তিনি বললেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। উসাইদ জিজ্ঞেস করলেন ঃ সে কি বলেছে? তিনি বললেন ঃ "সে বলেছে, মদীনায় পৌঁছার পর সম্মানী লোকেরা হীন ও নীচ লোকদের বহিষ্কার করবে। তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল। সম্মানিত ও মর্যাদাবান তো আপনি। আর হীন ও নীচ তো সে নিজে। আপনি যখন ইচ্ছা তাকে বহিষ্কার করতে পারেন।"

কথাটা আস্তে আস্তে আনসারদের সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো এবং ইবনে উবাইয়ের বিরুদ্ধে তাদের মনে ভীষণ ক্রোধের সৃষ্টি হলো। লোকজন ইবনে উবাইকে বললো, তুমি গিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ক্ষমা চাও। কিন্তু সে ক্রুদ্ধ স্বরে জবাব দিল ঃ তোমরা বললে তার প্রতি ঈমান আন। আমি ঈমান আনলাম। তোমরা বললে, অর্থ-সম্পদের যাকাত দাও। আমি যাকাতও দিয়ে দিলাম। এখন তো শুধু মুহাম্মাদকে

১ বিভিন্ন রেওয়ায়াতে আনসারদের বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নাম উল্লেখিত হয়েছে। হযরত উমর (রা) নবীর (সা) কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন "আমি মুহাজির হওয়ার কারণে আমার হাতে সে নিহত হলে ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকলে এসব লোকদের মধ্য থেকে কোন একজনকে দিয়ে এ কাজ করিয়ে নিন।"

আমার সিজদা করা বাকী আছে। এসব কথা শুনে তার প্রতি ঈমানদার আনসারদের অসন্তুষ্টি আরো বৃদ্ধি পেল এবং চারদিক থেকে তার প্রতি ধিক্কার ও তিরস্কার বর্ষিত হতে থাকলো। যে সময় এ কাফেলা মদীনায় প্রবেশ করছিল তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পুত্র (তার নামও) আবদুল্লাহ খোলা তরবারি হাতে পিতার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ "আপনিই তো বলেছেন, মদীনায় ফিরে গিয়ে সম্মানিত ব্যক্তিরা হীন ও নীচ লোকদের সেখান থেকে বহিষ্কার করবে। এখন আপনি জানতে পারবেন সম্মান আপনার, না আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের। আল্লাহর কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি না দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবেন না।" এতে ইবনে উবাই চিৎকার করে বলে উঠল "হে খাযরাজ গোত্রের লোকজন, দেখো, আমার নিজের ছেলেই আমাকে মদীনায় প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে।" লোকজন গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ খবর দিলে তিনি বললেন ঃ "আব্দুল্লাহকে গিয়ে বলো, তার পিতাকে যেন নিজের বাড়ীতে প্রবেশ করতে দেয়।" তখন আবদুল্লাহ বললেন ঃ "নবী (সা) অনুমতি দিয়েছেন তাই এখন আপনি প্রবেশ করতে পারেন।" এই সময় নবী (সা) হযরত উমরকে (রা) বললেন ঃ "হে উমর, এখন তোমার মতামত কি? যে সময় তুমি বলেছিলে, আমাকে তাকে হত্যা করার অনুমতি দিন, সে সময় তুমি যদি তাকে হত্যা করতে তাহলে অনেকেই নাক সিটকাতো এবং নানা রকম কথা বলতো। কিন্তু আজ যদি আমি তার হত্যার আদেশ দেই তাহলে তাকে হত্যা পর্যন্ত করা যেতে পারে।" হযরত উমর বললেন ঃ "আল্লহর শপথ, এখন আমি বুঝতে পেরেছি আল্লাহর রসূলের কথা আমার কথার চেয়ে অধিক যুক্তিসঙ্গত ছিল।"[১] এই পরিস্থিতি ও পটভূমিতে অভিযান শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় পৌঁছার পর এ সূরাটি নাযিল হয়।

১. এ থেকে শরীয়াতের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানা যায়। এক, ইবনে উবাই যে কর্মনীতি গ্রহণ করেছিল এবং যে ধরনের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল মুসলিম মিল্লাতের অন্তরভুক্ত থেকে কেউ যদি এ ধরনে আচরণ করে তাহলে সে হত্যাযোগ্য অপরাধী। দুই, শুধু আইনের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি হত্যার উপযুক্ত হলেই যে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে তা জরুরী নয়। এরূপ কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে দেখতে হবে, তাকে হত্যা করার ফলে কোন বড় ধরনের ফিতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে কিনা। পরিবেশ-পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে অন্ধভাবে আইনের প্রয়োগ কোন কোন সময় আইন প্রয়োগের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী ফলাফল নিয়ে আসে। যদি একজন মুনাফিক ও ফিতনাবাজের পেছনে কোন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক শক্তি থাকে তাহলে তাকে শাস্তি দিয়ে আরো বেশী ফিতনাকে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ দেয়ার চেয়ে উত্তম হচ্ছে, যে রাজনৈতিক শক্তির জোরে সে দুষ্কর্ম করছে কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার সাথে তার মূল্যোৎপাটন করা। এই সুদূর প্রসারী লক্ষেই নবী (সা) তখনো আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে শাস্তি দেননি যখন তিনি তাকে শাস্তি দিতে সক্ষম ছিলেন। বরং তার সাথে সবসময় নম্র আচরণ করেছেন। শেষ পর্যন্ত দুই তিন বছরের মধ্যেই মদীনায় মুনাফিকদের শক্তি চিরদিনের জন্য নির্মূল হয়ে গেল।

আয়াত ১১ **সূরা আল মুনাফিকুন-মাদানী** রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

إِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ
لَرَسُوْلُهٗ ۘ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۝١ اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ
جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٢ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝٣

হে নবী, এ মুনাফিকরা যখন তোমার কাছে আসে তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল। আল্লাহ জানেন, তুমি অবশ্যই তাঁর রসূল। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।[১] তারা নিজেদের শপথসমূহকে ঢাল বানিয়ে রেখেছে।[২] এভাবে তারা নিজেরা আল্লাহর পথ থেকে বিরত থাকছে এবং অন্যদেরও বিরত রাখছে।[৩] এরা যা করছে তা কত মন্দ কাজ! এ সবের কারণ এই যে, তারা ঈমান আনার পর আবার কুফরী করেছে। তাই তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। এখন তারা কিছুই বুঝে না।[৪]

১. অর্থাৎ যে কথা তারা মুখে বলছে তা আসলে সত্য। কিন্তু তারা মুখে যা প্রকাশ করছে নিজেরা যেহেতু তা বিশ্বাস করে না, তাই তাঁর রসূল হওয়ার যে সাক্ষ্য তারা দেয় সে ব্যাপারে তারা মিথ্যাবাদী। এখানে একথাটি ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, দু'টি জিনিসের সমন্বয়ের নাম সাক্ষ। এক, যে মূল বিষয়টির সাক্ষ দেয়া হয় সেটি। দুই, সেই বিষয়টি সম্পর্কে সাক্ষদানকারীর বিশ্বাস। এখন বিষয়টি যদি আসলে সত্য হয় এবং সাক্ষ দানকারী মুখে যা বলছে তার বিশ্বাসও যদি তাই হয়, তাহলে সে সবদিক দিয়েই সত্যবাদী হবে। আর বিষয়টা যদি মিথ্যা হয়, কিন্তু সাক্ষদাতা সেটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করে তাহলে একদিক দিয়ে আমরা তাকে সত্যবাদী বলবো। কেননা, সে তার বিশ্বাসকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সত্যবাদী। কিন্তু আরেক দিক দিয়ে তাকে মিথ্যাবাদী বলব। কেননা, সে যে বিষয়ের সাক্ষ দিচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে ভুল। অপরদিকে বিষয়টি যদি সত্য হয় কিন্তু সাক্ষদাতার বিশ্বাস তার পরিপন্থী হয় তাহলে সঠিক বিষয়টির সাক্ষ দেয়ার কারণে আমরা তাকে সত্যবাদী বলব। কিন্তু সে মুখে যা প্রকাশ করছে তার বিশ্বাস তা না হওয়ার কারণে

আমরা তাকে মিথ্যাবাদী বলব। যেমন কোন ঈমানদার ব্যক্তি যদি ইসলামকে সত্য বলে তাহলে সে সবদিক দিয়ে সত্যবাদী। কিন্তু একজন ইহুদী যদি ইহুদী ধর্মের ওপর বিশ্বাসী থেকে ইসলামকে সত্য বলে তাহলে তার কথা সত্য কিন্তু তার সাক্ষ মিথ্যা বলে গণ্য করা হবে। কেননা, সে তার বিশ্বাসের পরিপন্থী সাক্ষ দিচ্ছে। আর সে যদি ইসলামকে বাতিল বা মিথ্যা বলে তাহলে আমরা তার একথাকে মিথ্যা বলবো। কিন্তু সে যে সাক্ষ দিচ্ছে তা তার নিজের বিশ্বাস অনুসারে সত্য।

২. অর্থাৎ নিজেরা মুসলমান ও ঈমানদার এ কথা বিশ্বাস করানোর জন্য তারা যেসব শপথ করে সেগুলোকে তারা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে যাতে মুসলমানদের ক্রোধ থেকে রক্ষা পায় এবং প্রকাশ্য শত্রুর সাথে মুসলমানগণ যে আচরণ করে থাকে তাদের সাথে তা করতে না পারে।

এসব শপথ দ্বারা ঐ সব শপথও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে যা সাধারণত তারা নিজেদের ঈমানের বিষয়টি বিশ্বাস করানোর জন্য করতো। তাদের মুনাফিকী আচরণ ধরা পড়ার পর যেসব শপথ করে তারা মুসলমানদের বুঝাতে চাইতো যে, তা তারা মুনাফিকীর কারণে করেনি সেসব শপথও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। আবার যায়েদ ইবনে আরকামের দেয়া খবর মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যে শপথ করেছিল তাও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। এসব সম্ভাবনার সাথে আরো একটি সম্ভাবনা আছে। তা হলো, "আমরা সাক্ষ দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রসূল" তাদের এ কথাটিকে আল্লাহ তা'আলা শপথ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই সম্ভাবনার ভিত্তিতে ফিকাহবিদদের মধ্যে একটি বিষয়ে বিতর্কের সূত্রপাত্র হয়েছে। বিষয়টি হচ্ছে, কোন ব্যক্তি যদি "আমি সাক্ষ দিচ্ছি" বলে কোন কথা বর্ণনা করে তাহলে তা শপথ বা হলফ (Oath) বলে বিবেচিত হবে কিনা। ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর সঙ্গীগণ (ইমাম যুফার ছাড়া) এবং ইমাম সুফিয়ান সাওরী ও ইমাম আওযায়ী একে শপথ (শরীয়াতের পরিভাষা ইয়ামীন) বলে মনে করেন। ইমাম যুফার বলেন ঃ এটা শপথ নয়। ইমাম মালেক থেকে দু'টি মত বর্ণিত হয়েছে, একটি হচ্ছে, এটা নিছক শপথ। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, "সাক্ষ দিচ্ছি" বলার সময় সে যদি এরূপ নিয়ত করে যে, "আল্লাহর শপথ আমি সাক্ষ দিচ্ছি" অথবা "আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি" তাহলে সে ক্ষেত্রে এটা শপথমূলক বর্ণনা হবে। অন্যথায় হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, বক্তব্য পেশকারী ব্যক্তি যদি এ কথাও বলে যে, "আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে সাক্ষ দিচ্ছি" তবুও তা তার শপথমূলক বক্তব্য বলে গণ্য হবে না। কিন্তু সে যদি এরূপ কথা শপথের নিয়তেই বলে থাকে তাহলে তা শপথ বলে গণ্য হবে। (আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস, আহকামুল কুরআন—ইবনুল আরাবী)।

৩. আরবী ভাষায় صد শব্দটি সকর্মক এবং অকর্মক এই উভয় প্রকার ক্রিয়া হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। এ কারণে صدوا عن سبيل الله আয়াতাংশের অর্থ "তারা নিজেরা আল্লাহর পথ থেকে বিরত থাকে" যেমন হয়, তেমনি "তারা অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে"ও হয়। তাই অনুবাদে আমরা দু'টি অর্থই উল্লেখ করেছি। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে আয়াতাংশের অর্থ হবে এসব শপথের মাধ্যমে তারা মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের অবস্থান সুরক্ষিত করে নেয়ার পর ঈমানের দাবী পূরণ না করার এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য থেকে পাশ কাটিয়ে চলার ব্যাপারে সুযোগ সৃষ্টি করে নেয়।

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ
كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۖ هُمُ الْعَدُوُّ
فَاحْذَرْهُمْ ۖ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾

তুমি যখন এদের প্রতি তাকিয়ে দেখ, তখন তাদের দেহাবয়ব তোমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হয়। আর যখন কথা বলে তখন তাদের কথা তোমার শুনতেই ইচ্ছা করে।[৫] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা দেয়ালের গায়ে খাড়া করে রাখা কাঠের গুড়ির মত।[৬] যে কোন জোরদার আওয়াজকে এরা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে।[৭] এরাই কট্টর দুশমন।[৮] এদের ব্যাপারে সাবধান থাক।[৯] এদের ওপর আল্লাহর গযব।[১০] এদেরকে উল্টো কোন্‌দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?[১১]

দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করলে আয়াতাংশের অর্থ হবে, এসব মিথ্যা শপথের আড়ালে তারা শিকারের সন্ধানে থাকে, মুসলমান সেজে থেকে ভিতর থেকেই মুসলমানদের জামায়াতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে। মুসলমানদের গোপনীয় বিষয়সমূহ জেনে নিয়ে তা শত্রুদের জানিয়ে দেয়, ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের মধ্যে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করতে এবং সহজ সরল মুসলমানদের মনে সন্দেহ-সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে তারা এমন সব কৌশল অবলম্বন করে যা কেবল মুসলমান সেজে থাকা একজন মুনাফিকের পক্ষেই সম্ভব। ইসলামের প্রকাশ্য শত্রুরা ঐ সব কৌশল কাজে লাগাতে পারে না।

৪. এ আয়াতে ঈমান আনার অর্থ বুঝানো হয়েছে ঈমানের স্বীকৃতি দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে শামিল হওয়াকে আর কুফরের অর্থ বুঝানো হয়েছে আন্তরিকভাবে ঈমান না আনা এবং মৌখিকভাবে ঈমান আনার পূর্বে যে কুফরের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই কুফরের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকাকে। কথাটির প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, তারা যখন খুব ভালভাবে বুঝে শুনে সোজাসুজি ঈমানের পথ অবলম্বন অথবা পরিষ্কারভাবে কুফরের পথ গ্রহণের পরিবর্তে মুনাফিকীর এই নীতি ও পন্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের অন্তরের ওপর মোহর মেরে দেয়া হলো এবং একজন সত্যবাদী, নিষ্কলুষ, সৎ ও ভদ্র মানুষের মত নীতি ও পন্থা অবলম্বন করার সামর্থ ও শুভবুদ্ধিই আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে ছিনিয়ে নিলেন। এখন তাদের জ্ঞান ও উপলব্ধির যোগ্যতাই হারিয়ে গিয়েছে এবং নৈতিক অনুভূতির মৃত্যু ঘটেছে। রাতদিনের এই মিথ্যা, প্রতি মুহূর্তের এই প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি এবং কথা ও কাজের এই স্থায়ী বৈপরীত্য—যার মধ্যে তারা নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলেছে—তা যে কত হীন ও লাঞ্ছনাকর অবস্থা, সে উপলব্ধিটুকু পর্যন্ত এখন তাদের আসে না।

আল্লাহর পক্ষ থেকে কারো অন্তরে মোহর মেরে দেয়ার অর্থ কুরআন মজীদের যেসব আয়াতে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি তার একটি। এসব মুনাফিকের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা মোহর মেরে দেয়ার কারণে ঈমান তাদের অন্তরে

প্রবেশ করতে পারেনি এবং তারা বাধ্য হয়ে মুনাফিক রয়ে গিয়েছে—ব্যাপারটি তা নয়। বরং বাহ্যিকভাবে ঈমান প্রকাশ করা সত্ত্বেও যখন তারা কুফরির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। এ সময়ই তাদের থেকে নির্ভেজাল ঈমান ও তা থেকে জন্মলাভকারী নৈতিক আচরণ করার সামর্থ ও শুভবুদ্ধি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তারা নিজেদের জন্য যে মুনাফিকী ও মুনাফিকী চরিত্র পছন্দ করেছিল তার সামর্থ ও বুদ্ধিই তাদের দান করা হয়েছে।

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই অত্যন্ত সুঠাম দেহী, সুস্থ, সুদর্শন ও বাকপটু ব্যক্তি ছিল। তার সাঙ্গপাঙ্গদের অনেকেও তাই ছিল। এরা সবাই ছিল মদীনার নেতৃস্থানীয় লোক। তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে যখন আসতো তখন দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসতো এবং রসিকতাপূর্ণ কথাবার্তা বলতো। তাদের দেহাবয়ব ও চেহারা–আকৃতি দেখে আর কথাবার্তা শুনে কেউ কল্পনাও করতে পারতো না যে, সমাজের এসব সম্মানিত লোকেরা চরিত্রের দিক দিয়ে এত নীচ ও জঘন্য হতে পারে।

৬. অর্থাৎ এরা যারা দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসে তারা মানুষ নয়, বরং কাঠের গুড়ি। তাদেরকে কাষ্ঠখণ্ডের সাথে তুলনা করে বুঝানো হয়েছে যে, নৈতিক চরিত্র মানুষের মূল প্রাণসত্তা, সেই প্রাণসত্তাই তাদের মধ্যে নেই। তারপর তাদেরকে দেয়ালগাত্রে হেলান দিয়ে খাড়া করা কাষ্ঠখণ্ডের সাথে তুলনা করে এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, তা একেবারেই অকেজো, অপদার্থ। কেননা, কাঠ কেবল তখনই উপকারে আসে যদি তা ছাদে অথবা দরজায় বা আসবাব তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয়। দেয়াল গাত্রে হেলান দিয়ে রাখা কাষ্ঠখণ্ড কোন উপকারেই আসে না।

৭. ছোট্ট এই আয়াতাংশে তাদের অপরাধী বিবেকের চিত্র অংকন করা হয়েছে। ঈমানের বাহ্যিক পর্দার আড়ালে মুনাফিকীর যে খেলা তারা খেলছিল তা নিজেরা যেহেতু ভাল করেই জানতো, তাই সবসময় তারা ভীতসন্ত্রস্ত থাকতো যে কখন যেন তাদের অপরাধের গোপনীয়তা প্রকাশ পেয়ে যায়, অথবা তাদের আচরণের ব্যাপারে ঈমানদারদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হয়। জনপদের কোন স্থান থেকে কোন বড় আওয়াজ শোনা গেলে অথবা কোথাও কোন শোরগোল উত্থিত হলে তারা ভয়ে জড়সড় হয়ে যেত এবং মনে করত, আমার দুর্ভাগ্য বোধ হয় এসেই পড়ল।

৮. অন্য কথায় প্রকাশ্য দুশমনের তুলনায় ছদ্মবেশী এসব দুশমন অনেক বেশী ভয়ংকর।

৯. অর্থাৎ তাদের বাহ্যিক চালচলন ও আচার আচরণ দেখে প্রতারিত হয়ো না। এ ব্যাপারে সবসময় সতর্ক থাকো যে, এরা যে কোন সময় বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।

১০. এটা বদদোয়া নয়, বরং তারা যে আল্লাহর গযবের উপযুক্ত হয়ে গিয়েছে এবং সে গযব যে অবশ্যই নাযিল হবে—এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তারই ঘোষণা। এও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা এ বাক্যাংশটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করেননি বরং আরবী বাকরীতি অনুসারে, অভিশাপ ও তিরস্কার অর্থে ব্যবহার করেছেন। আমাদের নিজস্ব ভাষায় আমরা যেমন বলি ঃ ওর সর্বনাশ হোক, কি জঘন্য মানুষ সে। এখানে "সর্বনাশ" শব্দটি দ্বারা তার জঘন্যতার তীব্রতা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, বদদোয়া করা নয়।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ
يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝٥ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ
لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝٦

যখন তাদের বলা হয়, এসো আল্লাহর রসূল যাতে তোমাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন তখন তারা মাথা ঝাঁকুনি দেয় আর তুমি দেখবে যে, তারা অহমিকা ভরে আসতে বিরত থাকে।[১২] হে নবী, তুমি তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া কর বা না কর, উভয় অবস্থাই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ কখনো তাদের মাফ করবেন না।[১৩] আল্লাহ ফাসিকদের কখনো হিদায়াত দান করেন না।[১৪]

১১. তাদেরকে ঈমানের পথ থেকে মুনাফিকীর পথে কে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা বলা হয়নি। একথাটি স্পষ্ট করে না বলার কারণে আপনা থেকেই যে অর্থ প্রকাশ পায় তা হলো, তাদের এই এলোপাতাড়ি ও অস্বাভাবিক আচরণের চালিকাশক্তি একটি নয়, বরং বহু সংখ্যক চালিকাশক্তি এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে। তাদের পেছনে এই চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে শয়তান, অসৎ বন্ধু-বান্ধব এবং তাদের কুপ্রবৃত্তির আকাংখাসমূহ। কারো স্ত্রী, কারো সন্তান-সন্ততি, কারো নিজ গোত্র ও গোষ্ঠীর অসৎলোকজন তাকে এ পথে চলতে বাধ্য করছে। আবার কাউকে তার হিংসা, বিদ্বেষ ও অহমিকা এ পথে তাড়িত করেছে।

১২. অর্থাৎ তারা ইসতিগফারের জন্য রসূলের কাছে আসে না শুধু তাই নয়, বরং এ কথা শুনে অহংকার ও গর্ব ভরে মাথা ঝাঁকুনি দেয়। রসূলের কাছে আসা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করাকে নিজেদের জন্য অপমানজনক ও মর্যাদাহানিকর মনে করে আপন অবস্থানে অনড় থাকে। তারা যে ঈমানদার নয় এটা তার স্পষ্ট প্রমাণ।

১৩. একথাটি সূরা তাওবাতে (যা সূরা মুনাফিকূনের তিন বছর পর নাযিল হয়) আরো অধিক জোর দিয়ে বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ করে মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ "তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না করো, এমনকি যদি তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লাহ কখনো তাদেরকে মাফ করবেন না। কারণ, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে। আল্লাহ ফাসিকদের হিদায়াত দান করেন না।" (আত তাওবা, আয়াত ৮০) পরে আরো বলা হয়েছে ঃ তাদের কেউ মারা গেলে তুমি কখনো তার জানাযা পড়বে না এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবে না। এরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং ফাসেক অবস্থায় মারা গেছে। (আত তাওবা, আয়াত ৮৪)

১৪. এ আয়াতটিতে দু'টি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এক, মাগফিরাতের জন্য দোয়া শুধু হিদায়াত প্রাপ্ত লোকদের জন্যই ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর হতে পারে। যে ব্যক্তি হিদায়াতের পথ থেকে সরে গিয়েছে এবং যে ব্যক্তি আনুগত্যের পরিবর্তে গোনাহ ও

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ؕ
وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝٧ يَقُوْلُوْنَ
لَئِنْ رَّجَعْنَاۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ؕ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ
وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٨

এরাই তো সেই সব লোক যারা বলে, আল্লাহর রসূলের সাথীদের জন্য খরচ করা বন্ধ করে দাও যাতে তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। অথচ আসমান ও যমীনের সমস্ত ধন ভাণ্ডারের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। কিন্তু এই মুনাফিকরা তা বুঝে না। এরা বলে, আমরা মদীনায় ফিরে যেতে পারলে যে সম্মানিত সে হীন ও নীচদেরকে সেখান থেকে বের করে দেবে।[১৫] অথচ সম্মান ও মর্যাদা তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মু'মিনদের জন্য।[১৬] কিন্তু এসব মুনাফিক তা জানে না।

অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করেছে তার জন্য কোন সাধারণ মানুষের দোয়া তো দূরের কথা আল্লাহর রসূল নিজেও যদি তার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন তবুও তাকে ক্ষমা করা যেতে পারে না। দুই, যারা আল্লাহর হিদায়াত পেতে আগ্রহী নয় তাদের হিদায়াত দান করা আল্লাহর নীতি নয়। কোন ব্যক্তি নিজেই যদি আল্লাহর হিদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে থাকে বরং তাকে হিদায়াতের দিকে আহবান জানালে মাথা ঝাঁকানি দিয়ে অহংকার ভরে সে আহবান প্রত্যাখ্যান করে তাহলে আল্লাহর কি প্রয়োজন পড়েছে যে, তার পিছনে পিছনে নিজের হিদায়াতের ফেরি করে বেড়াবেন এবং তোষামোদ করে তাকে সত্যপথে নিয়ে আসবেন।

১৫. হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম বলেন ঃ আমি যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের এ কথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম এবং সে এসে শপথ করে পরিষ্কার ভাষায় তা অস্বীকার করলো তখন আনসারদের প্রবীণ ও বয়োবৃদ্ধ লোকজন এবং আমার আপন চাচা আমাকে অনেক তিরস্কার করলেন। এমনকি আমার মনে হলো নবীও (সা) আমাকে মিথ্যাবাদী এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে সত্যবাদী মনে করেছেন। এতে আমার এত দুঃখ ও মনঃকষ্ট হলো যা সারা জীবনে কখনো হয়নি। আমি দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে নিজের জায়গায় বসে পড়লাম। পরে এ আয়াতগুলো নাযিল হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডেকে হাসতে হাসতে আমার কান ধরে বললেনঃ ছোকরাটার কান ঠিকই শুনেছিল। আল্লাহ নিজে তা সত্য বলে ঘোষণা করেছেন। (ইবনে জারীর। এ বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা তিরমিযীতেও আছে)

১৬. অর্থাৎ সম্মান ও মর্যাদা মূলত আল্লাহর সত্তার জন্য নির্দিষ্ট আর রসূলের মর্যাদা রিসালাতের কারণে এবং ঈমানদারদের মর্যাদা তাদের ঈমানের কারণে। এরপর থাকে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ
وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝٩ وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ
مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى
اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝١٠ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا
اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ۭ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝١١

২ রুকূ'

হে[১৭] সেই সব লোক যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে না দেয়।[১৮] যারা এরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে। আমি তোমাদের যে রিযিক দিয়েছি তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় আসার পূর্বেই তা থেকে খরচ করো। সে সময় সে বলবে ঃ হে আমার রব, তুমি আমাকে আরো কিছুটা অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি দান করতাম এবং নেককার লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম। অথচ যখন কারো কাজের অবকাশ পূর্ণ হয়ে যাওয়ার সময় এসে যায় তখন আল্লাহ তাকে আর কোন অবকাশ মোটেই দেন না। তোমরা যা কিছু কর সে বিষয়ে আল্লাহ পুরোপুরি অবহিত।

কাফের, ফাসেক ও মুনাফিকদের মর্যাদার ব্যাপার। কিন্তু প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদায় তাদের কোন অংশ নেই।

১৭. যেসব লোক ইসলামের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করেছে, তারা সত্যিকার ঈমানদার হোক বা শুধু ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতিদানকারী হোক, তাদের সবাইকে সম্বোধন করে একটি উপদেশ দেয়া হচ্ছে। এর আগে আমরা কয়েকবার এ কথাটি বলেছি যে, কুরআন মজীদে اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (যারা ঈমান এনেছো) কথাটি বলে কোন সময় সাচ্চা ঈমানদারকে সম্বোধন করা হয়েছে। আবার কখনো মুনাফিকদের সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তারাও মৌখিকভাবে ঈমানের স্বীকৃতি দেয়। আবার কখনো সাধারণভাবে সব শ্রেণীর মুসলমানদের সম্বোধন করা বুঝানো হয়। কোথায় কোন শ্রেণীর লোককে একথা দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে তা পরিবেশ-পরিস্থিতি ও পূর্বাপর অবস্থাই নির্দেশ করে দেয়।

১৮. বিশেষভাবে অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য যে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মানুষ এসব স্বার্থের কারণে ঈমানের দাবী পূরণ না করে মুনাফিকী অথবা ঈমানের দুর্বলতা অথবা পাপাচার ও নাফরমানীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তবে মূলত

এখানে দুনিয়ার এমন প্রতিটি জিনিসকে বুঝানো হয়েছে যা মানুষকে এমনভাবে নিমগ্ন করে রাখে যে, সে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল হয়ে যায়। আর আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল হয়ে যাওয়াটাই সমস্ত অকল্যাণের উৎস। মানুষ যদি একথা স্মরণ রাখে যে, সে স্বাধীন নয়, বরং এক আল্লাহর বান্দা। আর সে আল্লাহ তার সমস্ত কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত, একদিন তাঁর সামনে হাজির হয়ে নিজের সব কাজ-কর্মের জবাবদিহি তাকে করতে হবে, তাহলে সে কখনো কোন খারাপ কাজ বা গোমরাহীতে লিপ্ত হতে পারবে না। মানবিক দুর্বলতার কারণে কোন সময় তার পদস্খলন যদি ঘটেও তাহলে সম্বিত ফিরে পাওয়ামাত্র সে সংযত ও সংশোধিত হয়ে যাবে।

আত তাগাবুন

৬৪

নামকরণ

সূরার ৯নং আয়াতের ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ কথাটির التغابن শব্দটিকে নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যার মধ্যে التَّغَابُن শব্দটি আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

মুকাতিল এবং কালবী বলেন, সূরাটির কিছু অংশ মক্কায় এবং কিছু অংশ মদীনায় অবতীর্ণ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আতা ইবনে ইয়াসির বলেন ঃ প্রথম থেকে ১৩ আয়াত পর্যন্ত মক্কায় অবতীর্ণ এবং ১৪ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত মদীনায় অবতীর্ণ। কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে সম্পূর্ণ সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ। যদিও সূরার মধ্যে এমন কোন ইশারা-ইংগিত পাওয়া যায় না যার ভিত্তিতে এর নাযিল হওয়ার সময়-কাল নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। তবে এর বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে অনুমিত হয় যে, সম্ভবত সূরাটি মাদানী যুগের প্রথমদিকে নাযিল হয়ে থাকবে। এ কারণে সূরাটিতে কিছুটা মক্কী সূরার বৈশিষ্ট এবং কিছুটা মাদানী সূরার বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে ঈমান ও আনুগত্যের দাওয়াত এবং উত্তম নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা দেয়া। বক্তব্যের ধারাক্রম হচ্ছে ঃ প্রথম চার আয়াতে গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। ৫ থেকে ১০ আয়াতে যারা কুরআনের দাওয়াত মানে না তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং যারা কুরআনের এ দাওয়াতকে মেনে নিয়েছে ১১ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলোতে তাদেরকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্য দ্বারা গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করে চারটি মূল সত্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। প্রথমত বলা হয়েছে, এই বিশ্ব-জাহান যেখানে তোমরা বসবাস করছো তা আল্লাহহীন নয়। বরং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এমন এক আল্লাহ এর স্রষ্টা, মালিক ও শাসক যিনি যে কোন বিচারে পূর্ণাঙ্গ এবং দোষত্রুটি ও কলুষ-কালিমাহীন। এ বিশ্ব-জাহানের সবকিছুই তাঁর সে পূর্ণতা, দোষ-ত্রুটিহীনতা এবং কলুষ-কালিমাহীনতার সাক্ষ দিচ্ছে।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, এই বিশ্ব-জাহানকে উদ্দেশ্যহীন ও অযৌক্তিকভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। এর সৃষ্টিকর্তা একে সরাসরি সত্য, ন্যায় ও যুক্তির ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন। এখানে

এরূপ ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত থেকো না যে, এই বিশ্ব-জাহান অর্থহীন এক তামাশা, উদ্দেশ্যহীনভাবে এর সূচনা হয়েছে এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে তা শেষ হয়ে যাবে।

তৃতীয়ত বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সর্বোত্তম আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং কুফর ও ঈমান গ্রহণ করা বা না করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। এটা কোন নিষ্ফল ও অর্থহীন ব্যাপার নয় যে, তোমরা কুফরী অবলম্বন করো আর ঈমান অবলম্বন করো কোন অবস্থাতেই এর কোন ফলাফল প্রকাশ পাবে না। তোমরা তোমাদের এই ইখতিয়ার ও স্বাধীনতাকে কিভাবে কাজে লাগাও আল্লাহ তা দেখছেন।

চতুর্থত বলা হয়েছে, তোমরা দায়িত্বহীন নও বা জবাবদিহির দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত নও। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের স্রষ্টার কাছে ফিরে যেতে হবে এবং সেই সত্তার সম্মুখীন হতে হবে যিনি বিশ্ব-জাহানের সবকিছু সম্পর্কেই অবহিত। তোমাদের কোন কথাই তাঁর কাছে গোপন নয়, মনের গহনে লুক্কায়িত ধ্যান-ধারণা পর্যন্ত তাঁর কাছে সমুজ্জল ও সুস্পষ্ট।

বিশ্ব-জাহান এবং মানুষের প্রকৃত অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে এই চারটি মৌলিক কথা বর্ণনা করার পর বক্তব্যের মোড় সেই সব লোকদের প্রতি ঘুরে গিয়েছে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে। ইতিহাসের সেই দৃশ্যপটের প্রতি তাদের মনোযোগ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যা মানব ইতিহাসে একের পর এক দেখা যায়। অর্থাৎ এক জাতির পতনের পর আরেক জাতির উত্থান ঘটে এবং অবশেষে সে জাতিও ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষ তার বিবেক-বুদ্ধির মাপকাঠিতে ইতিহাসের এ দৃশ্যপটের হাজারো কারণ উল্লেখ করে আসছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এর পেছনে কার্যকর প্রকৃত সত্য তুলে ধরেছেন। তা হচ্ছে, জাতিসমূহের ধ্বংসের মৌলিক কারণ শুধু দু'টিঃ

একটি কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা তাদের হিদায়াতের জন্য যেসব রসূল পাঠিয়েছিলেন তারা তাঁদের কথা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ফল হয়েছে এই যে, আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে তারা নানা রকম দার্শনিক তত্ত্ব রচনা করে একটি গোমরাহী ও বিভ্রান্তি থেকে আরেকটি গোমরাহী ও বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়েছে।

দুই ঃ তারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার ব্যাপারটিও প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নিজেদের ধ্যান-ধারণা অনুসারে মনে করে নিয়েছে যে, এই দুনিয়ার জীবনই সবকিছু। এ জীবন ছাড়া এমন আর কোন জীবন নেই যেখানে আল্লাহর সামনে আমাদের সব কাজের জবাবদিহি করতে হবে। এই ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস তাদের জীবনের সমস্ত আচার-আচরণকে বিকৃত করে দিয়েছে। তাদের নৈতিক চরিত্র, কর্মের কলুষতা ও নোংরামি এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আযাব এসে তাদের অস্তিত্ব থেকে দুনিয়াকে পবিত্র ও ক্লেদমুক্ত করেছে। মানব ইতিহাসের এ দুটি শিক্ষামূলক বাস্তব সত্যকে তুলে ধরে ন্যায় ও সত্য অস্বীকারকারীদের আহবান জানানো হচ্ছে যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। আর তারা যদি অতীত জাতিসমূহের অনুরূপ পরিণামের সম্মুখীন হতে না চায় তাহলে আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং কুরআন মজীদ আকারে হিদায়াতের যে আলোকবর্তিকা আল্লাহ দিয়েছেন তার প্রতি যেন ঈমান আনে। সাথে সাথে তাদেরকে এ বিষয়ে সাবধান

করা হয়েছে যে, সেদিন অবশ্যই আসবে যখন আগের ও পরের সমস্ত মানুষকে একত্র করা হবে এবং তোমাদের প্রত্যেকের হার-জিতের বিষয়টি সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। তারপর কে ঈমান ও সৎকাজের পথ অবলম্বন করেছিল আর কে কুফর ও মিথ্যার পথ অনুসরণ করেছিল তার ভিত্তিতেই সমস্ত মানুষের ভাগ্যের চূড়ান্ত ফায়সালা করা হবে। প্রথম দলটি চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিকারী হবে এবং দ্বিতীয় দলটির ভাগে পড়বে স্থায়ী জাহান্নাম।

এরপর ঈমানের পথ অনুসরণকারীদের উদ্দেশ করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে ঃ

এক ঃ দুনিয়াতে যে বিপদ-মুসিবত আসে তা আল্লাহর অনুমতি ও অনুমোদনক্রমেই আসে। এরূপ পরিস্থিতিতে যে ব্যক্তি ঈমানের ওপর অবিচল থাকে আল্লাহ তার দিলকে হিদায়াত দান করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি অস্থির ও ক্রোধান্বিত হয়ে ঈমানের পথ থেকে সরে যাবে, তার বিপদ-মুসিবত তো মূলত আল্লাহর অনুমতি ও অনুমোদন ছাড়া দূরীভূত হবে না; তবে সে আরো একটি বড় মুসিবত ডেকে আনবে। তাহলো, তার মন আল্লাহর হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

দুই ঃ শুধু ঈমান গ্রহণ করাই মু'মিনের কাজ নয়। বরং ঈমান গ্রহণ করার পর তার উচিত কার্যত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করা। সে যদি আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিজের ক্ষতির জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কেননা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য বিধান পৌঁছিয়ে দিয়ে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গিয়েছেন।

তিন ঃ এক মু'মিন বান্দার ভরসা ও নির্ভরতা নিজের শক্তি অথবা পৃথিবীর অন্য কোন শক্তির ওপর না হয়ে কেবল আল্লাহর ওপর হতে হবে।

চার ঃ মু'মিনের জন্য তার অর্থ-সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি একটা বড় পরীক্ষা। কারণ ঐগুলোর ভালবাসাই মানুষকে ঈমান ও আনুগত্যের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। সে জন্য ঈমানদার ব্যক্তিকে তার পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে যাতে তারা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ কোনভাবেই তাদের জন্য আল্লাহর পথের ডাকাত ও লুটেরা হয়ে না বসে। তাছাড়া তাদের উচিত অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করা যাতে তাদের মন-মানসিকতা অর্থ পূজার ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকে।

পাঁচ ঃ প্রত্যেক মানুষ তার সাধ্যানুসারে শরীয়াতের বিধি-বিধান পালনের জন্য আদিষ্ট। আল্লাহ তা'আলা মানুষের কাছে তার শক্তি ও সামর্থের অধিক কিছু করার দাবী করেন না। তবে একজন মু'মিনের যা করা উচিত তাহলো, সে তার সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করতে কোন ত্রুটি করবে না এবং তার কথা, কাজ ও আচার-আচরণ তার নিজের ত্রুটি ও অসাবধানতার জন্য যেন আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ অতিক্রম না করে।

আয়াত ১৮ | সূরা আত তাগাবুন-মাদানী | রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ۚ وَاللّٰهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾

আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহর তাসবীহ করছে।[১] তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী[২] এবং সব প্রশংসাও তারই।[৩] তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।[৪] তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতপর তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কাফের এবং কেউ মু'মিন।[৫] তোমরা যা করছো আল্লাহ তা দেখছেন।[৬]

১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হাদীদ, টীকা ১। এ আয়াতাংশ দিয়ে বক্তব্য শুরু করার কারণ পরবর্তী বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে আপনা থেকেই বোধগম্য হয়। পরবর্তী আয়াতসমূহে বিশ্ব-জাহান এবং মানুষ সৃষ্টির যে তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে, এর স্রষ্টা, মালিক ও শাসক একমাত্র আল্লাহ। তিনি এই বিশ্ব-জাহানকে অযৌক্তিক ও উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। তাছাড়া মানুষকে এখানে দায়িত্বহীন বানিয়েও ছেড়ে দেয়া হয়নি যে, সে যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াবে অথচ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার কেউ থাকবে না। এই বিশ্ব-জাহানের শাসক এমন কোন বেখবর বাদশাহও নন যে, তাঁর সাম্রাজ্যে যা কিছু ঘটছে তা তাঁর আদৌ জানা থাকবে না। এ ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণনা করার জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সূচনা কথা বা ভূমিকা যা হতে পারতো সংক্ষিপ্ত এ আয়াতাংশে তাই বলা হয়েছে। পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুসারে এই ভূমিকা বা সূচনা কথার অর্থ হলো, পৃথিবী থেকে শুরু করে মহাকাশের সর্বশেষ বিস্তৃতি পর্যন্ত যেদিকেই তাকাও না কেন যদি তোমরা বিবেক-বুদ্ধিহীন না হয়ে থাক তাহলে পরিষ্কার বুঝতে পারবে যে, পরমাণু থেকে নিয়ে বিশাল ছায়াপথ পর্যন্ত সবকিছুই শুধুমাত্র আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষই দিচ্ছে না বরং তিনি যে সব রকম দোষ-ত্রুটি, অপূর্ণতা, দুর্বলতা এবং ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র সে সাক্ষও দিচ্ছে। তার সত্তা ও গুণাবলী এবং তাঁর কাজকর্ম ও আদেশ-নিষেধসমূহে যদি কোন প্রকার কলুষ-কালিমা ও ভুল-ত্রুটি কিংবা কোন দুর্বলতা ও অপূর্ণতার নামমাত্র সম্ভাবনাও থাকতো তাহলে চরম

পূর্ণতাপ্রাপ্ত এই যুক্তিভিত্তিক ও জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থা আদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত এই অলংঘনীয় ও অবিচল পন্থায় চলা তো দূরের কথা অস্তিত্ব লাভ করতেও পারতো না।

২. অর্থাৎ এ গোটা বিশ্ব-জাহান তাঁরই সাম্রাজ্য। তিনি একে সৃষ্টি করে এবং একবার চালু করে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং তিনিই এর ওপর কার্যত সার্বক্ষণিক শাসন পরিচালনা করছেন। এই শাসন ও কর্তৃত্বে অন্য কারো আদৌ কোন অংশ বা অধিকার নেই। এই বিশ্ব-জাহানের কোন জায়গায় কেউ যদি সাময়িকভাবে সীমিত পর্যায়ে ক্ষমতা কিংবা মালিকানা অথবা শাসন কর্তৃত্ব লাভ করে থাকে তাহলে তা তার নিজের শক্তিতে অর্জিত ক্ষমতা ও ইখতিয়ার নয় বরং আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা ও ইখতিয়ার। আল্লাহ যতদিন চান ততদিন তা তার অধিকারে থাকে এবং যখনই চান তা তার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেন।

৩. অন্য কথায় তিনি একাই কেবল প্রশংসার যোগ্য। অন্য আর যার মধ্যেই প্রশংসার যোগ্য কোন গুণ বা সৌন্দর্য আছে তা তারই দেয়া। আর حمد শব্দকে যদি শোকর বা কৃতজ্ঞতা অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে শোকর ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার প্রকৃত অধিকারীও কেবল তিনিই। কারণ সমস্ত নিয়ামত তাঁরই সৃষ্টি এবং সমস্ত সৃষ্টিরও প্রকৃত উপকারী ও কল্যাণদাতাও তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তার কোন উপকারের জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তা করি এই জন্য যে, ঐ ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিয়ামত আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। অন্যথায় সে যেমন এই নিয়ামতের স্রষ্টা নয়, তেমনি আল্লাহর দেয়া তাওফীক ও সামর্থ ছাড়া সে ঐ নিয়ামত আমাদের কাছে পৌঁছাতেও সক্ষম হতো না।

৪. অর্থাৎ তিনি চূড়ান্ত ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম। তাঁর ক্ষমতা ও সামর্থকে সীমিত করার মত কোন শক্তি নেই।

৫. একথাটির চারটি অর্থ এবং চারটি অর্থই যথাস্থানে সঠিক ঃ

এক ঃ তিনিই তোমাদের সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ তাঁর সৃষ্টিকর্তা হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার আর কেউ এ সত্যটিকে স্বীকার করে। আয়াতের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ এক সাথে মিলিয়ে পড়লে সর্বপ্রথম এ অর্থটিই বোধগম্য হয়।

দুই ঃ তোমরা ইচ্ছা করলে কুফরীর পথ অবলম্বন করতে পার আবার ইচ্ছা করলে ঈমানও গ্রহণ করতে পার। এভাবে তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। ঈমান ও কুফরীর দু'টি পথের কোনটি গ্রহণ করতেই তিনি তোমাদের বাধ্য করেননি। তাই নিজেদের ঈমান ও কুফরীর ব্যাপারে তোমরা নিজেরাই দায়ী। পরবর্তী আয়াতাংশ "তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ তা সবই দেখছেন" এ অর্থ সমর্থন করে। অর্থাৎ এই স্বাধীনতা ও ইখতিয়ার দিয়ে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছেন। এই ইখতিয়ার ও স্বাধীনতাকে তোমরা কিভাবে কাজে লাগাও তিনি তা দেখছেন।

তিন ঃ তিনি তো তোমাদেরকে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এই সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির দাবী হলো, তোমরা সবাই ঈমানের পথ অবলম্বন করবে। কিন্তু এই সুস্থ প্রকৃতির ওপর জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের জন্মগত স্বভাব-প্রকৃতির পরিপন্থী কুফরীর পথ অনুসরণ করেছে। আবার কেউ কেউ তাদের

জন্মগত স্বভাব-প্রকৃতির অনুকূল ঈমানের পথ অনুসরণ করেছে। এ আয়াতটিকে সূরা রূমের ৩০নং আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়লে এ অর্থটিই বোধগম্য হয়। সূরা রূমের ঐ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "তুমি একাগ্র ও একনিষ্ঠ হয়ে নিজের লক্ষ ও মনযোগকে দীনের দিকে করে দাও এবং যে প্রকৃতির ওপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সেই প্রকৃতির ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর বানানো স্বভাব-প্রকৃতি বদলানো যাবে না। এটিই পুরোপুরি সত্য ও সঠিক দীন।" কিছু সংখ্যক হাদীস এ বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছে! এসব হাদীসে নবী (সা) বলেছেন যে, প্রত্যেক মানুষ সঠিক প্রকৃতির ওপর জন্মলাভ করে থাকে। কিন্তু পরে বাইরে থেকে কুফরী, শিরক ও গোমরাহী তার ওপর চড়াও হয়। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূর, টীকা ৪২ থেকে ৪৭)। এখানে এ বিষয়টি বিশেষ উল্লেখ্য যে, জন্মগতভাবে মানুষের পাপী হওয়ার ধারণাকে খৃষ্টবাদ দেড় হাজার বছর ধরে তাদের মৌলিক ধর্মীয় বিশ্বাস বানিয়ে রেখেছে। অথচ আসমানী কিতাবসমূহ মানুষের জন্মগতভাবে পাপী হওয়ার ধারণা কখনো পেশ করেনি। বর্তমানে ক্যাথলিক পণ্ডিত পুরোহিতগণ নিজেরাই বলতে শুরু করেছেন যে, এই ধর্মবিশ্বাসের কোন ভিত্তিই বাইবেলে নেই। বাইবেলের একজন বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত রিভারেণ্ড হার্বার্ট হগ (Haag) তাঁর "Is Original Sin In Scripture" গ্রন্থে লিখছেন, প্রথম যুগের খৃষ্টানদের মধ্যে অন্তত তৃতীয় শতক পর্যন্ত এই ধর্মীয় বিশ্বাসের কোন অস্তিত্বই ছিল না যে, মানুষ জন্মগতভাবে পাপী। এই ধ্যান-ধারণা যখন বিস্তার লাভ করতে শুরু করে তখন থেকে পরবর্তী দুইশত বছর পর্যন্ত খৃষ্টান পণ্ডিতগণ তার প্রতিবাদ করেছেন। পরবর্তী সময়ে পঞ্চম শতকে সেন্ট অগাস্টাইন যুক্তি ও কূটতর্কের জোরে এ বিশ্বাসটিকে খৃষ্টবাদের মূল ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্তরভূক্ত করে দেয়। অর্থাৎ "মানবজাতি উত্তরাধিকার সূত্রে আদমের পাপের বোঝা লাভ করেছে। তাই ঈসা মাসীহর কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্তের সুবাদে মুক্তি লাভ করা ছাড়া মানুষের মুক্তি লাভের আর কোন উপায় নেই।"

চার ঃ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। এক সময় তোমাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। তারপর তোমরা অস্তিত্ব লাভ করেছ। এটি এমন একটি ব্যাপার যে, তা নিয়ে তোমরা যদি সহজ সরলভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে তাহলে উপলব্ধি করতে পারতে যে, এই অস্তিত্বই প্রকৃতপক্ষে সেই আসল নিয়ামত যার সাহায্যে তোমরা অন্যসব নিয়ামত ভোগ করতে সক্ষম হচ্ছো। এই উপলব্ধি থাকলে তোমাদের কেউই তার স্রষ্টার সাথে কুফরী ও বিদ্রোহের আচরণ করতে পারতে না। কিন্তু তোমাদের অনেকে এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেনি, কিংবা করে থাকলেও ভ্রান্ত পন্থায় চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে। অনেকে আবার সঠিক ও নির্ভূল চিন্তা-ভাবনার দাবী ঈমানের পথটিই অনুসরণ করেছে।

৬. এ আয়াতাংশে যে দেখার কথা বলা হয়েছে তার অর্থ শুধু দেখাই নয়, বরং আপনা থেকেই এর এই অর্থ প্রকাশ পায় যে, তোমাদের আমল অনুপাতে তোমাদের প্রতিদান ও শাস্তি দেয়া হবে। এটা ঠিক এরূপ যেন কোন শাসক কাউকে তার অধীনে চাকরিতে নিয়োগ করে বলছে যে, তুমি কিভাবে কাজ করো তা আমি দেখবো। এ ক্ষেত্রে এ ধরনের কথার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যদি ঠিকমত কাজ করো তাহলে পুরস্কার ও উন্নতি দান করবো। আর অন্যথা হলে কঠোরভাবে পাকড়াও করবো।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

তিনি আসমান ও যমীনকে যথাযথরূপে সৃষ্টি করেছেন তিনি তোমাদেরকে আকার-আকৃতি দান করেছেন এবং অতি উত্তম আকার-আকৃতি দান করেছেন। অবশেষে তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।[৭] আসমান ও যমীনের সবকিছু সম্পর্কেই তিনি জানেন। আর তোমরা যা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো তাও তিনি জানেন।[৮] মানুষের অন্তরের কথাও তিনি খুব ভাল করে জানেন।[৯]

৭. এই আয়াতে গভীর যৌক্তিক সম্পর্কের পারম্পর্য ও ক্রমানুসারে তিনটি কথা বলা হয়েছে ঃ

প্রথম কথাটি বলা হয়েছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা এই বিশ্ব-জাহানকে যথাযথ ও যৌক্তিক পরিণতির জন্য সৃষ্টি করেছেন। بالحق শব্দটি যখন কোন খবর সম্পর্কে বলা হয় তখন তার অর্থ হয় সত্য খবর। হুকুম বা নির্দেশের জন্য বলা হলে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার ভিত্তিক হুকুম বা নির্দেশ, কথার ব্যাপারে বলা হলে তার অর্থ হয় সত্য ও সঠিক কথা এবং কোন কাজ সম্পর্কে ব্যবহৃত হলে তার অর্থ হয় এমন কাজ যা বিজ্ঞোচিত ও যুক্তিসংগত, অনর্থক ও অযথা কাজ নয়। এটা স্পষ্ট যে, خلق বা সৃষ্টি করা একটি কাজ। তাই বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করাকে যথাযথ ও যৌক্তিক বলার অনিবার্য অর্থ এই যে, এই বিশ্ব-জাহানকে খেল-তামাশার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং এটি একজন বিজ্ঞ স্রষ্টার একান্ত সুচিন্তিত কাজ। এর প্রতিটি বস্তুর পেছনে একটি যুক্তিসংগত উদ্দেশ্য আছে। এসব সৃষ্টির মধ্যে এই উদ্দেশ্যবাদ এতই সুস্পষ্ট যে, বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন কোন মানুষ যদি এর কোনটির রূপ প্রকৃতি ভালভাবে বুঝতে পারে তাহলে ঐ জিনিস সৃষ্টির যৌক্তিক ও বিজ্ঞোচিত উদ্দেশ্য কি হতে পারে তা জানা তার জন্য কঠিন কাজ নয়। পৃথিবীতে মানুষের সমস্ত বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাক্ষ দিচ্ছে যে, গভীর চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা এবং অনুসন্ধান দ্বারা মানুষ যে জিনিসেরই রূপ-প্রকৃতি বুঝাতে সক্ষম হয়েছে শেষ পর্যন্ত ঐ জিনিস সম্পর্কে সে একথাও জানতে পেরেছে যে, তা কোন্ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে আর সেই উদ্দেশ্যকে জানা ও বুঝার পরই সে এমন অসংখ্য জিনিস আবিষ্কার করেছে যা বর্তমানে মানব সভ্যতার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ বিশ্ব-জাহান যদি কোন ক্রীড়ামোদীর খেলার উপকরণ হতো এবং এর মধ্যে কোন যুক্তি ও উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল না থাকতো তাহলে এসব আবিষ্কার উদ্ভাবন কখনো সম্ভব হতো না। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনয়াম, টীকা ৪৬; ইউনুস, টীকা ১১; ইবরাহীম, টীকা ২৬; আন নাহল্, টীকা ৬; আল আম্বিয়া, টীকা ১৫—১৬; আল মু'মিনূন, টীকা ১০২; আল আনকাবূত, টীকা ৭৫; আর রূম, টীকা ৬; আদ্ দুখান, টীকা ৩৪; আল জাসিয়া, টীকা ২৮)।

দ্বিতীয় কথাটি বলা হয়েছে এই যে, আল্লাহ এই বিশ্ব-জাহানে মানুষকে সর্বোত্তম আকার আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আকার আকৃতি অর্থ শুধু মানুষের চেহারা নয়। বরং এর অর্থ তার গোটা দৈহিক কাঠামো এবং দুনিয়াতে কাজ করার জন্য তাকে দেয়া সব রকম শক্তি ও যোগ্যতাও এর মধ্যে অন্তরভুক্ত। এই দু'টি দিক দিয়ে মানুষকে পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম করে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এ কারণেই সে পৃথিবী ও তার আশেপাশের সমস্ত সৃষ্টির ওপর কর্তৃত্ব করার যোগ্য হয়েছে। তাকে দীর্ঘ দেহ কাঠামো দেয়া হয়েছে, চলাফেরার জন্য উপযুক্ত পা দেয়া হয়েছে এবং কাজ-কর্ম করার জন্য উপযুক্ত হাত দেয়া হয়েছে। তাকে এমন সব ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞান আহরণ যন্ত্র দেয়া হয়েছে যার সাহায্যে সে সব রকম তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। তাকে চিন্তা-ভাবনা করার, বুঝার এবং বিভিন্ন তথ্য একত্র করে তা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মত উন্নত পর্যায়ের একটি মস্তিষ্ক ও চিন্তা শক্তি দেয়া হয়েছে। তাকে একটি নৈতিক বোধ ও অনুভূতি এবং ভালমন্দ ও ভুল শুদ্ধ নিরূপক শক্তি দেয়া হয়েছে। তাকে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী শক্তি দেয়া হয়েছে যার সাহায্যে সে নিজেই তার চলার পথ বেছে নেয় এবং কোন পথে সে তার চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত করবে আর কোন পথে করবে না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাকে এতটা স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে যে, সে ইচ্ছা করলে তার স্রষ্টাকে মানতে এবং তাঁর আনুগত্য ও দাসত্ব করতে পারে, কিংবা তাঁকে অস্বীকার করতে পারে কিংবা যাদেরকে ইচ্ছা সে তার খোদা বানিয়ে নিতে পারে অথবা যাকে সে খোদা বলে স্বীকার করে ইচ্ছা করলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করতে পারে। এসব শক্তি এবং ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দেয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। আর কার্যত সে এ ক্ষমতা প্রয়োগও করছে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মু'মিন, টীকা ৯১)

ওপরে বর্ণিত এ দু'টি কথার যৌক্তিক ফলাফল হিসেবে এই আয়াতের তৃতীয় অংশে বর্ণিত কথাটি আপনা থেকেই এসে পড়ে। আয়াতটির এই অংশে বলা হয়েছে ঃ "অবশেষে তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।" একথা স্পষ্ট যে, এরূপ একটি যুক্তিসঙ্গত ও উদ্দেশ্যমূলক বিশ্ব-ব্যবস্থায় এমন স্বাধীন একটি সৃষ্টিকে যখন সৃষ্টি করা হয়েছে তখন যুক্তির দাবী কখনো এটা হতে পারে না যে, তাকে এখানে দায়িত্বহীন বানিয়ে লাগামহীন উটের মত ছেড়ে দেয়া হবে। বরং এর অনিবার্য দাবী হবে যিনি তাকে ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও স্বাধীনতা দিয়ে তাঁর সৃষ্ট জগতে এই মর্যাদা ও অবস্থান দিয়েছেন তাঁর সামনে সে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। এই আয়াতে উল্লেখিত "ফিরে যাওয়া" এর অর্থ নিছক ফিরে যাওয়া নয়, বরং এর অর্থ জবাবদিহির জন্য ফিরে যাওয়া। পরবর্তী আয়াতসমূহে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এই ফিরে যাওয়াটা পার্থিব এই জীবনে হবে না বরং মৃত্যুর পরের আরেকটি জীবনে হবে। গোটা মানব জাতিকে পুনরায় জীবিত করে হিসেব-নিকেশ গ্রহণের জন্য যখন এক সাথে একই সময়ে জড়ো করা হবে, সেটি হবে এর প্রকৃত সময়। আর সেই হিসেব-নিকেশের ফলাফল স্বরূপ পুরস্কার ও শাস্তির ভিত্তি হবে মানুষ আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা ও ইখতিয়ারকে সঠিক পন্থায় কাজে লাগিয়েছে, না ভুল পন্থায় কাজে লাগিয়েছে তার ওপর। এখন প্রশ্ন হলো, জবাবদিহির এই কাজটি দুনিয়ার বর্তমান এই জীবনে হওয়া সম্ভব নয় কেন? আর এর প্রকৃত সময় মৃত্যুর পরের জীবনই বা কেন? তাছাড়া এ পৃথিবীর গোটা মানব জাতি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আগের ও পরের সব

মানুষকে যে সময় পুনরায় জীবিত করে জড়ো করা হবে সে সময়টিই বা এর প্রকৃত সময় হবে কেন? মানুষ যদি বিবেক-বুদ্ধিকে কিছুটা কাজে লাগায় তাহলে সে বুঝতে পারবে যে, এ সবই যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার। সে এ কথাও বুঝতে পারবে যে, জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির দাবী হলো, মানুষের হিসেব-নিকেশ ও জবাবদিহির কাজটি মৃত্যুর পরের জীবনেই হওয়া দরকার এবং সমস্ত মানুষের এক সাথে হওয়া দরকার। এর প্রথম কারণ হচ্ছে, মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে তার গোটা জীবনের কাজকর্মের জন্য। তাই তার জীবনের সমস্ত কাজকর্ম ও দায়িত্ব-কর্তব্যের জন্য জবাবদিহির সঠিক ও অনিবার্য সময় সেটিই হওয়া উচিত যখন তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, মানুষের কাজ-কর্মের ফলাফল, প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব তার মৃত্যুর পরপরই শেষ হয়ে যায় না। তা যেমন অন্য মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলে এবং প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল সৃষ্টি করে, তেমনি তার মৃত্যুর পরেও তা দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতে থাকে। এসব ফলাফল, প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার জন্য সে-ই দায়ী। তাই সঠিক জবাবদিহি ও হিসেব-নিকেশ কেবল তখনই হতে পারে যখন গোটা মানব জাতির জীবন কর্মের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাবে এবং আগের ও পরের সমস্ত মানুষকে একই সময়ে একত্রিত করা হবে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৩০; ইউনুস, টীকা ১০—১১; হূদ, টীকা ১০৫; আন নাহল, টীকা ৩৫; আল হাজ্জ, টীকা ৯; আন নাম্‌ল, টীকা ২৭; আর রূম, টীকা ৫—৬; সোয়াদ, টীকা ২৯—৩০; আল মু'মিন, টীকা ৮০; আল জাসিয়া, টীকা ২৭ থেকে ২৯)।

৮. এর আরেকটি অনুবাদ হতে পারে "যা তোমরা গোপনে করো এবং যা তোমরা প্রকাশ্যে করো।"

৯. অর্থাৎ তিনি শুধু সেই সব কাজ-কর্ম সম্পর্কেই অবগত নন যা মানুষের গোচরে আসে বরং সেই সব কাজ-কর্ম সম্পর্কেও তিনি অবহিত যা সবার কাছেই গোপন থাকে। তাছাড়াও তিনি শুধু কাজ-কর্মের বাহ্যিক রূপটাই দেখেন না বরং মানুষের প্রতিটি কাজের পেছনে কি ধরনের ইচ্ছা-আকাংখা এবং উদ্দেশ্য সক্রিয়া ছিল, সে যা করেছে তা কি নিয়তে করেছে এবং কি বুঝে করেছে তাও তিনি জানেন। এটা এমন এক সত্য, যে বিষয়ে চিন্তা করলে মানুষ বুঝতে পারবে যে, ইনসাফ ও সুবিচার কেবল আখেরাতেই হতে পারে এবং শুধু আল্লাহ তা'আলার আদালতেই ইনসাফ হওয়া সম্ভব। মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও দাবী করে যে, মানুষের তার প্রতিটি অপরাধের জন্য শাস্তি পাওয়া উচিত। কিন্তু কে না জানে যে, কৃত অপরাধের বেশীর ভাগই দুনিয়াতে হয় গোপন থাকে নয়তো প্রয়োজনীয় সাক্ষ প্রমাণ না পাওয়ার কারণে অপরাধী নিষ্কৃতি পেয়ে যায়। কিংবা অপরাধ প্রকাশ পেয়ে গেলেও অপরাধী এমন প্রভাবশালী ও ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে যে, তাকে শাস্তি দেয়া সম্ভব হয় না। মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এও দাবী করে যে, কোন ব্যক্তির কাজের ধরন ও প্রকৃতি শুধু অপরাধমূলক কাজের মত হলেই তার শাস্তি না পাওয়া উচিত। বরং এই মর্মে তার অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা হওয়া উচিত যে, যে কাজ সে করেছে তা ইচ্ছাকৃতভাবে জেনে বুঝে করেছে কিনা। এ অনুসন্ধান এবং পর্যালোচনাও হওয়া উচিত যে, ঐ কাজ করার সময় সে একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবেই তা করছিল। অপরাধ সংঘটনই তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল এবং সে এ কথাও জানতো যে, সে যা করছে তা অপরাধ। এ কারণে দুনিয়ার বিচারালয়সমূহ মামলা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করার ব্যাপারে এসব

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝٥ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا
أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝٦

এরপূর্বে যেসব মানুষ কুফরী করেছে এবং নিজেদের অপকর্মের পরিণামও ভোগ করেছে তাদের খবর কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? তাদের জন্য নির্দিষ্ট আছে অতীব কষ্টদায়ক শাস্তি।[১০] তারা এরূপ পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে এ কারণে যে, তাদের কাছে যেসব রসূল এসেছেন তাঁরা স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে তাদের কাছে এসেছিলেন।[১১] কিন্তু তারা বলেছিল ঃ মানুষ কি আমাদের হিদায়াত দান করবে?[১২] এভাবে তারা মানতে অস্বীকৃতি জানালো এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। তখন আল্লাহও তাদের তোয়াক্কা করলেন না। আল্লাহ তো আদৌ কারো মুখাপেক্ষীই নন। তিনি আপন সত্তায় প্রশংসিত।[১৩]

বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে থাকে এবং এসব বিষয়ের অনুসন্ধানকে সুবিচার নীতির দাবী বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এই পৃথিবীতে সত্যি সত্যিই কি এমন কোন উপায়-উপকরণ আছে যার সাহায্যে এ বিষয়ে এমন ন্যায়ানুগ অনুসন্ধান হতে পারে যা সব রকম সংশয়ের উর্ধে? এদিক দিয়ে বিচার করলে এ আয়াতটিও আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর সাথে গভীর যৌক্তিক সম্পর্ক বিদ্যমান যাতে বলা হয়েছে ঃ "তিনি আসমান ও যমীনকে যৌক্তিক পরিণামের জন্য সৃষ্টি করেছেন।" যৌক্তিক পরিণামের জন্য সৃষ্টি করার অনিবার্য দাবী হলো, এই বিশ্ব-জাহানে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ন্যায়বিচার থাকবে। এ ধরনের ন্যায়বিচার কেবল তখনই কায়েম হতে পারে যখন ন্যায়বিচারকারীর দৃষ্টি থেকে মানুষের মত দায়িত্বশীল সৃষ্টির কোন কাজ শুধু গোপন থাকবে না তাই নয়, বরং যে নিয়ত ও উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি কোন কাজ করেছে তাও তাঁর থেকে গোপন থাকবে না। এ কথা স্পষ্ট যে, বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ছাড়া আর কোন সত্তা এমন হতে পারে না যার দ্বারা এরূপ ন্যায়বিচার কায়েম হতে পারে। এমন কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ ও আখেরাতকে অস্বীকার করে তা হলে সে যেন প্রকারান্তরে এ দাবীই করছে যে, আমরা এমন বিশ্ব-জাহানে বাস করছি যেখানে বাস্তবে কোন ইনসাফ নেই, এমনকি ইনসাফের কোন সম্ভাবনাই নেই। এরূপ আহম্মকি ও নির্বুদ্ধিতামূলক ধ্যান-ধারণায় যে ব্যক্তির জ্ঞানবুদ্ধি এবং মন ও বিবেক সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত সে যদি নিজেকে প্রগতিবাদী ও যুক্তিবাদী মনে করে এবং বিশ্ব-জাহান সম্পর্কে কুরআনের পেশকৃত এই চরম যুক্তিগ্রাহ্য ধারণাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বা প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা বলে মনে করে তাহলে তার মত চরম নির্লজ্জ ও বেহায়া আর কেউই নেই।

১০. অর্থাৎ তারা নিজেদের কৃতকর্মের যে শাস্তি পৃথিবীতে ভোগ করেছে তা তাদের অপরাধসমূহের উপযুক্ত শাস্তি যেমন নয় তেমনি পুরো শাস্তিও নয়। পূর্ণাঙ্গ ও যথোপযুক্ত

শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতে হবে আখেরাতে। তবে তাদের ওপর পৃথিবীতে যে আযাব এসেছে তা থেকে মানুষ এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে যে, যে জাতিই তাদের রবের সাথে কুফরীর আচরণ করেছে, তারা কেমন করে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত কেমন পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৫—৬; হুদ, টীকা ১০৫)।

১১. মূল আয়াতে 'বাইয়েনাত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। আরবী ভাষায় بين বলা হয় এমন জিনিসকে যা প্রকাশ্য ও স্পষ্ট। নবী–রসূলগণ بينات নিয়ে আসতেন এ কথার অর্থ প্রথমত এই যে, তাঁরা এমনসব স্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শন নিয়ে আসতেন যা সরাসরি প্রমাণ করতো, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট। দ্বিতীয়ত, তাঁরা যেসব কথা পেশ করতেন তা খুবই যুক্তিসঙ্গতভাবে ও উজ্জ্বল দলীল–প্রমাণাদিসহ পেশ করতেন। তৃতীয়ত, তাঁদের শিক্ষায় কোন অস্পষ্টতা ছিল না, বরং হক কি এবং বাতিল কি, জায়েয কি এবং নাজায়েয কি এবং কোন পথে মানুষের চলা উচিত আর কোন পথে চলা উচিত নয় তা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় তাঁরা বলে দিতেন।

১২. এটা ছিল তাদের ধ্বংসের প্রাথমিক ও মূল কারণ। স্রষ্টা কর্তৃক সঠিক জ্ঞান দেয়া ছাড়া মানুষের পক্ষে দুনিয়ায় সঠিক কর্মপন্থা বেছে নেয়া সম্ভব ছিল না। আর স্রষ্টার পক্ষ থেকে মানুষের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোককে জ্ঞান দান করে অন্যদের কাছে তা পৌঁছানোর দায়িত্ব অর্পণ করা ছাড়া মানুষকে জ্ঞান দানের আর কোন বাস্তব পন্থাও হতে পারতো না। এ উদ্দেশ্যেই তিনি بينات সহ নবী–রসূলদের পাঠিয়েছেন যাতে তাঁদের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ মানুষের কাছে না থাকে। কিন্তু মানুষ আল্লাহর রসূল হতে পারে এ কথা তারা আদৌ মানতে রাজি হলো না, বরং অস্বীকৃতি জানিয়ে বসলো। এরপর তাদের হিদায়াত পাওয়ার আর কোর উপায়ই রইল না। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইয়াসীন, টীকা ১১)। এ ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট মানুষদের মূর্খতা ও জ্ঞানহীনতার যে বিস্ময়কর বিষয়টি আমাদের কাছে ধরা পড়ে তা হলো, মানুষের দিকনির্দেশনা মেনে নিতে তো তারা কোন সময়ই দ্বিধা করেনি। এমন কি মানুষের দিকনির্দেশনা অনুসরণ করেই তারা কাঠ ও পাথরের মূর্তিকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, এই মানুষকেই খোদা, খোদার অবতার এবং খোদার পুত্র বলেও স্বীকার করেছে। আর পথভ্রষ্ট নেতাদের অন্ধ আনুগত্য করতে গিয়ে এমন সব অদ্ভুত পথ ও পন্থা গ্রহণ করেছে যা মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও নৈতিকতাকে উলট–পালট করে দিয়েছে। কিন্তু আল্লাহর রসূল যখন তাদের কাছে সত্য ও ন্যায় নিয়ে এসেছেন এবং সকল ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধে উঠে তাদের কাছে নির্ভেজাল সত্য পেশ করেছেন তখন তারা বলেছে ঃ "আপনি তো মানুষ। আর মানুষ হয়ে আমাদের হিদায়াত দিবেন কি করে?" এর মানে হলো, মানুষ যদি পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করে তাহলে তাকে সাদরে গ্রহণ করা হবে। কিন্তু যদি সত্য, সঠিক ও ন্যায়ের পথ দেখায় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৩. অর্থাৎ তারা যখন আল্লাহর দেয়া হিদায়াতের পরোয়া করলো না তখন তারা গোমরাহীর কোন্ গহ্বরে পতিত হতে যাচ্ছে, আল্লাহও তার পরোয়া করলেন না। কোন ব্যাপারেই আল্লাহ তাদের কাছে ঠেকা ছিলেন না যে, তারা তাকে খোদা হিসেবে মানলে

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۭ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۭ وَذٰلِكَ عَلَي اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

অস্বীকারকারীরা দাবী করে বলেছে যে, মরার পরে আর কখনো তাদের জীবিত করে উঠানো হবে না।[১৪] তাদের বলে দাও, আমার রবের শপথ, তোমাদের অবশ্যই উঠানো হবে।[১৫] তারপর (দুনিয়ায়) তোমরা যা করেছো তা অবশ্যই তোমাদেরকে অবহিত করা হবে।[১৬] এরূপ করা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ।[১৭]

তবেই তিনি খোদা থাকবেন অন্যথায় তাঁর কর্তৃত্বের আসন হাত ছাড়া হয়ে যাবে। তিনি তাদের ইবাদাত-বন্দেগীরও মুখাপেক্ষী নন কিংবা প্রশংসা ও স্তব-স্তুতিরও মুখাপেক্ষী নন। তাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যই তিনি তাদেরকে সত্য ও সঠিক পথ দেখাতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহও তাদের প্রতি বিমুখ হয়ে গেলেন। এরপর আল্লাহ তাদেরকে না হিদায়াত দিয়েছেন, না রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, না তাদেরকে ধ্বংসের মুখে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন এবং না নিজেদের ওপর ধ্বংস ডেকে আনা থেকে বাধা দিয়েছেন। কারণ তারা নিজেরাই তাঁর হিদায়াত ও বন্ধুত্ব লাভের আকাঙ্খী ছিল না।

১৪. অর্থাৎ প্রত্যেক যুগেই ন্যায় ও সত্যের অস্বীকারকারীরা মৌলিক একটি গোমরাহীর মধ্যে ডুবে রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সেটিই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোমরাহীটি হলো মৃত্যুর পরে আর কোন জীবন নেই, আখেরাত অস্বীকারকারীদের কাছে এ কথা জানার কোন উপায় না পূর্বে ছিল, না এখন আছে, না কখনো থাকতে পারে। কিন্তু এসব মূর্খতা চিরদিনই জোর গলায় সে দাবী করেছে। অথচ চূড়ান্তভাবে আখেরাতকে অস্বীকার করার কোন যুক্তিসংগত ও জ্ঞানগত ভিত্তি নেই।

১৫. কুরআন মজীদে এটা তৃতীয় স্থান যেখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে (সা) বলেছেন ঃ তোমার রবের শপথ করে বলো, অবশ্যই তা হবে। প্রথমে সূরা ইউনুসে বলেছেন ঃ

وَيَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ۭ قُلْ اِيْ وَرَبِّيْٓ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ۭ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ

"তারা জিজ্ঞেস করে, তা কি সত্যি সত্যিই হবে? বলো, আমার রবের শপথ, তা অবশ্যই সত্য। তোমরা এত ক্ষমতাশালী নও যে, তা বাধা দিয়ে ঠেকাতে পার।"
(আয়াত ঃ ৫৩)

পরে সূরা সাবায় বলা হয়েছে ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ۭ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ۙ

"অস্বীকারকারীরা বলে, কি ব্যাপার! আমাদের ওপর কিয়ামত আসছে না কেন? বলো, আমার রবের শপথ। তা তোমাদের ওপর অবশ্যই আসবে।" (আয়াত ৩)

এখানে এই মর্মে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, একজন আখেরাত অস্বীকারকারীকে আপনি আখেরাতের কথা শপথ করে বলেন আর শপথ ছাড়া বলেন তাতে তার জন্য এমন কি এসে যায়? জিনিসটিকে যখন সে স্বীকারই করে না তখন আপনি কেবল শপথ করে বললেই সে তা মেনে নেবে কেন? এর জবাব হলো, প্রথমত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন লোকদের উদ্দেশ করে তাঁর বক্তব্য পেশ করছিলেন যারা নিজেদের ব্যক্তিগত জানা শোনা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ কথা ভাল করে জানতো যে, ঐ ব্যক্তি সারা জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলেননি। তাই মুখে তারা তাঁর বিরুদ্ধে যত অপবাদই রটনা করুক না কেন অন্তরে কখনো একথা কল্পনা করতে পারতো না যে, এমন সত্যবাদী লোকটি আল্লাহর শপথ করে কোন সময় এমন কথা বলতে পারেন যা সত্য হওয়ার পুরো বিশ্বাস তাঁর নেই। দ্বিতীয়ত তিনি শুধু আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের কথাই পেশ করতেন না, বরং তার স্বপক্ষে অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণাদিও পেশ করতেন। কিন্তু যে জিনিসটি একজন নবী ও অনবীর মধ্যে পার্থক্য করে তা হচ্ছে, একজন অনবী আখেরাতের স্বপক্ষে যে অখণ্ডনীয় দলীল-প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম তার ফায়দা বড় জোর এতটুকু হতে পারে যে, আখেরাত সংঘটিত না হওয়ার চেয়ে হওয়াটাই অধিক যুক্তিসংগত এবং বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হবে। অপরদিকে একজন নবীর মর্যাদা ও স্থান একজন দার্শনিকের মর্যাদা ও স্থান থেকে অনেক উর্ধে। আখেরাত হওয়া উচিত, যুক্তিভিত্তিক দলীল-প্রমাণের সাহায্যে তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌছেননি। তাঁর প্রকৃত পদমর্যাদা ও অবস্থান তা নয়। বরং তাঁর প্রকৃত পদমর্যাদা ও অবস্থান হলো, আখেরাত যে হবে সে বিষয়ে তিনি প্রকৃত ও চাক্ষুস জ্ঞানের অধিকারী। তাই আখেরাত অবশ্যই সংঘটিত হবে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথেই তিনি সে কথা বলেন। তাই একজন নবীই কেবল শপথ করে একথা বলতে পারেন। কোন দার্শনিকের পক্ষে এ ব্যাপারে শপথ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া একজন নবীর বক্তব্যের ভিত্তিতেই কেবল আখেরাতের প্রতি ঈমান সৃষ্টি হতে পারে। দার্শনিকের যুক্তিতর্কের মধ্যে এমন কোন শক্তি নেই। অন্যেরা তো দূরের কথা দার্শনিক নিজেও তার দলীল-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে নিজের ঈমানী আকীদা পোষণ করতে পারে না। দার্শনিক যদি সত্যিই সুষ্ঠু ও সঠিক চিন্তার অধিকারী দার্শনিক হয়ে থাকেন তাহলে সে "হওয়া উচিত" বলার অধিক কিছুই বলতে পারেন না। "এটিই ঠিক" এবং "নিশ্চিতভাবেই এটি ঠিক" কোন বিষয় সম্পর্কে এ কথাটি কেবল নবীই বলতে পারেন।

১৬. এ উদ্দেশ্যেই মৃত্যুর পরে মানুষকে পুনরায় উঠানো হবে। এবং এরূপ করার প্রয়োজন কি এর মধ্যে সে প্রশ্নেরও জবাব আছে। সূরার শুরু থেকে ৪ নম্বর আয়াত পর্যন্ত যে আলোচনা করা হয়েছে তা যদি সামনে থাকে তাহলে এ কথাটি সহজেই বোধগম্য হয় যে, সত্য ও ন্যায়ভিত্তিক এবং যুক্তিনির্ভর এই বিশ্ব-জাহানে যে মাখলুক বা সৃষ্টিকে ঈমান ও কুফরের যে কোন একটি পথ অনুসরণ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, যাকে এই বিশ্ব-জাহানের বহু সংখ্যক জিনিসের ওপরে কর্তৃত্ব খাটানোর ক্ষমতা দান করা হয়েছে এবং যে কুফরী বা ঈমানের পথ অনুসরণ করে এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে সারা জীবনভর সঠিক বা ভ্রান্ত পথে ব্যবহার করে নিজের দায়িত্বে অসংখ্য নেক কাজ বা অসংখ্য মন্দ কাজ করেছে তার সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ নিতান্তই অযৌক্তিক যে, তার এই ভাল কাজের কল্যাণকর দিক এবং মন্দ কাজের ক্ষতিকর দিক সবই নিষ্ফল ও পরিণামহীন থাকবে এবং তার এসব কাজের ভাল-মন্দ যাঁচাই বাছাই করার কোন অবকাশ কখনো

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٨
يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۭ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ
وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٩ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَبِئْسَ
الْمَصِيْرُ ۝١٠

তাই ঈমান আন আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং সেই 'নূর' বা আলোর প্রতি যা আমি নাযিল করেছি।[১৮] আর তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত। (এ বিষয়ে তোমরা টের পাবে সেইদিন) যখন একত্র করার দিন তোমাদের সবাইকে তিনি একত্র করবেন।[১৯] সেদিনটি হবে তোমাদের পরস্পরের হার-জিতের দিন।[২০] যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করে[২১] আল্লাহ তা'আলা তার গোনাহ মুছে ফেলবেন আর তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে ঝরণা বইতে থাকবে। এসব লোক চিরস্থায়ীভাবে সেখানে থাকবে। এটাই বড় সফলতা আর যারা কুফরী করেছে এবং আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে[২২] তারাই দোযখের বাসিন্দা হবে। তারা চিরস্থায়ীভাবে সেখানে থাকবে। তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান।

আসবে না। যে ব্যক্তি এ ধরনের অযৌক্তিক কথা বলে সে দু'টি নির্বুদ্ধিতার যে কোন একটির মধ্যে অবশ্যই নিমজ্জিত। হয় সে মনে করে যে, এই বিশ্ব-জাহান অবশ্যই যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মানুষের মত ক্ষমতা ও ইখতিয়ারসম্পন্ন সৃষ্টিকে এখানে দায়িত্বহীন করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। অথবা সে মনে করে যে, এই বিশ্ব-জাহান এক খেয়ালী সৃষ্টি। এর সৃষ্টির পেছনে কোন জ্ঞানীর জ্ঞান ও কৌশল কাজ করেনি। প্রথম ক্ষেত্রে সে একটি পরস্পর বিরোধী কথা বলে। কারণ জ্ঞান ও যুক্তিনির্ভর বিশ্ব-জাহানে ক্ষমতা ও ইখতিয়ার সম্পন্ন একটি সৃষ্টির দায়িত্বহীন হওয়া সরাসরি ন্যায় ও যুক্তির পরিপন্থি। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সে এর কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নির্দেশ করতে পারে না যে, একটি খেয়ালী ও অযৌক্তিকভাবে সৃষ্ট বিশ্ব-জাহানে মানুষের মত বুদ্ধিমান সৃষ্টির অস্তিত্ব লাভ করা কিভাবে সম্ভব হলো এবং তার মস্তিষ্কে ন্যায় ও ইনসাফের ধারণা কোত্থেকে এলো? নির্বুদ্ধিতার মধ্য থেকে বুদ্ধির উদ্ভব এবং ন্যায় ও সুবিচারহীন অবস্থা থেকে ন্যায়ের ধারণার উদ্ভব এমন এক ব্যাপার যা কেবল একজন হঠকারী ব্যক্তির পক্ষেই মেনে নেয়া সম্ভব কিংবা

সেই ব্যক্তির পক্ষেই মেনে নেয়া সম্ভব যে অতি মাত্রায় দর্শন কপচাতে কপচাতে মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

১৭. এটি আখেরাত সংঘটিত হওয়ার দ্বিতীয় প্রমাণ। প্রথম প্রমাণটি ছিল আখেরাতের আবশ্যকতা সম্পর্কে। কিন্তু এই প্রমাণটি তার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে। এ কথা স্পষ্ট যে, যে আল্লাহর পক্ষে বিশ্ব-জাহানের এত বড় একটা ব্যবস্থা বানানো অসম্ভব হয়নি এবং এই পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করা যার জন্য অসম্ভব ও কঠিন নয়, তার পক্ষে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করে তাঁর সামনে হাজির করে হিসেব নেয়া কঠিন বা অসম্ভব হবে কেন?

১৮. অর্থাৎ এটাই বাস্তব ও সত্য এবং গোটা মানব ইতিহাসই যখন সাক্ষ দিচ্ছে যে, জাতিসমূহের ধ্বংসের মূল কারণ হচ্ছে নবী-রসূলদের কথা না মানা আর আখেরাতকে অস্বীকার করা তখন সেই ভুল নীতি ও পথ অনুসরণ করে নিজের দুর্ভাগ্য ডেকে আনার জন্য জিদ করো না এবং আল্লাহ, তাঁর রসূল ও কুরআনের পেশকৃত হিদায়াতের ওপর ঈমান আনো। এখানে পূর্বাপর বিষয় থেকে আপনা আপনি প্রকাশ পাচ্ছে যে, আল্লাহর নাযিলকৃত আলো অর্থ কুরআন। আলো যেমন নিজেই সমুজ্জল ও উদ্ভাসিত হয় এবং আশেপাশের অন্ধকারে ঢাকা সব জিনিসকে স্পষ্ট ও আলোকিত করে দেয় তেমনি কুরআন মজীদও এমন এক আলোকবর্তিকা যার সত্যতা আপনা থেকেই স্পষ্ট ও সমুজ্জল। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উপায়-উপকরণ ও মাধ্যম যেসব সমস্যা বুঝার জন্য যথেষ্ট নয় কুরআনের আলোকে মানুষ সেসব সমস্যা সহজেই বুঝতে পারে। যার কাছেই এ আলোকবর্তিকা থাকবে সে চিন্তা ও কর্মের অসংখ্য আঁকাবাঁকা পথের মধ্যেও ন্যায় ও সত্যের সোজা পথ স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে। এই সরল সোজা পথের ওপর সে সারা জীবন এমনভাবে চলতে পারবে যে, প্রতি পদক্ষেপে সে জানতে পারবে যে, গোমরাহীর দিকে নিয়ে যাওয়ার মত ছোট ছোট পায়ে চলার পথ কোন কোন দিকে যাচ্ছে, ধ্বংসের গহ্বরসমূহ কোথায় কোথায় আসছে আর এসবের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার পথই বা কোন্‌টি তাও সে জানতে পারবে।

১৯. সমবেত হওয়ার দিন অর্থ কিয়ামতের দিন। আর সবাইকে একত্র করার অর্থ সৃষ্টির শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষ জন্ম লাভ করেছে তাদের সবাইকে একই সময়ে জীবিত করে একত্রিত করা। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টি আরো খোলাসা করে বলা হয়েছে। যেমন ঃ সূরা হূদে বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ –

"সেটি এমন এক দিন যেদিনে সব মানুষকে একত্রিত করা হবে। আর সেদিন যা কিছু হবে সবার চোখের সামনে হবে।" (আয়াত ১০৩)

সূরা ওয়াকেয়ায় বলা হয়েছে

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ –

"তাদের বলো, পূর্বে অতিবাহিত এবং পরে আগমনকারী সমস্ত মানুষকে একটি নির্দিষ্ট দিনে অবশ্যই একত্রিত করা হবে।" (আয়াত ৪৯, ৫০)

২০. মূল আয়াতে يوم التغابن শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটির অর্থ এত ব্যাপক যে কোন ভাষারই একটি মাত্র শব্দে বা বাক্যে এর অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কুরআন মজীদের মধ্যেও কিয়ামতের যতগুলো নাম উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে সম্ভবত এ নামটিই সর্বাধিক অর্থপূর্ণ। তাই এর অর্থ ও তাৎপর্য বুঝার জন্য কিছুটা ব্যাখ্যা অপরিহার্য।

تغابن শব্দটির উৎপত্তি غبن শব্দ থেকে। এর উচ্চারণ غبن এবং غبن উভয়ই। غبن উচ্চারণটি বেশীর ভাগ কেনাবেচা এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং غبن সিদ্ধান্ত ও মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আবার কোন কোন সময় এর বিপরীত অর্থ বুঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়। আরবী অভিধানে শব্দটির কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে যেমন ঃ غبنوا خبر الناقة "তাদের উট কোথায় গিয়েছে তার হদিস তাদের নেই।" غَبَنَ فُلاَنًا فِى البَيعِ "ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সে অমুক ব্যক্তিকে ধোঁকা দিয়েছে।" غَبَنَ فُلاَنًا "সে অমুক ব্যক্তিকে কম দিয়েছে।" غَبَنتُ من حقى عند فلان "অমুক ব্যক্তির নিকট থেকে অধিকার আদায়ের ব্যাপারে ভুল হয়ে গিয়েছে।" غبينَ বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যার ধীশক্তির অভাব আছে এবং যার মতামত ও সিদ্ধান্ত দুর্বল। প্রতারিত ব্যক্তিকে مغبون বলা হয়। الغبن ، الغفلة ، النسيان ، فوت الحظ ، ان يبخس صاحبك فى معاملة بينك وبينه لضرب من الاخفاء -

غبن অর্থ "অসাবধানতা-অসতর্কতা, ভুল-ত্রুটি, নিজের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির অপর কোন ব্যক্তির ক্ষতি করা।" ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে ধোঁকা দিচ্ছে দেখে ইমাম হাসান বসরী (র) বললেন ঃ هذا يغبن عقلك "এ ব্যক্তি তোমাকে বোকা বানাচ্ছে।"

غبن ধাতু থেকে যখন تغابن শব্দ গঠন করা হয় তখন তাতে দুই বা দুইয়ের অধিক ব্যক্তির মধ্যে প্রতারণা বা ধোঁকাবাজি সংঘটিত হওয়ার অর্থ সৃষ্টি হয়। تَغَابَنَ القَومُ অর্থ কিছু লোক কর্তৃক কিছু লোকের সাথে ধোঁকাবাজি বা প্রতারণার আচরণ করা। অথবা এক ব্যক্তি কর্তৃক আরেক ব্যক্তির ক্ষতি করা এবং অপর ব্যক্তির তার হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অথবা একজনের অংশ অন্যজনের পেয়ে যাওয়া এবং নিজের অংশ থেকে সেই ব্যক্তির বঞ্চিত থেকে যাওয়া অথবা ব্যবসায়ে এক পক্ষের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং অপর পক্ষের মুনাফা অর্জন করা অথবা কিছু লোকের অপর কিছু লোকের অসতর্ক বা দুর্বল মতামত ও সিদ্ধান্তের অধিকারী হওয়া।

এই প্রেক্ষাপটে এখন এই বিষয়টি চিন্তা করে দেখুন যে, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামত সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ ذلك يوم التغابن "সেটি হবে تغابن -এর দিন"। এ বাক্য থেকে স্বতঃই এ অর্থ প্রকাশ পায় যে, পৃথিবীতে তো রাতদিন হরহামেশা تغابن হচ্ছেই। কিন্তু তা কেবল বাহ্যিক ও দৃষ্টি প্রলুব্ধকারী تغابن প্রকৃত ও বাস্তব تغابن নয়।প্রকৃত تغابن হবে কিয়ামতের দিন। সেখানে যাওয়ার পর জানা যাবে কে সত্যি সত্যিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কে লাভবান হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কে কার অংশ লাভ করেছে আর কে তার নিজের অংশ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কে ধোঁকায় পড়েছে আর কে অত্যন্ত সতর্ক ও বিচক্ষণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কে তার জীবন রূপ পুঁজির সবটাই একটা ভুল কারবারে বিনিয়োগ করে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে এবং কে তার সব

শক্তি, যোগ্যতা, চেষ্টা-সাধনা, অর্থ-সম্পদ আর সময়কে লাভজনক কারবারে খাটিয়ে সবটুকু মুনাফা লুটে নিয়েছে। অথচ প্রথমোক্ত ব্যক্তি যদি পৃথিবীর প্রকৃত অবস্থা বুঝার ব্যাপারে ধোঁকায় না পড়তো তাহলে সেও ঐ রকম মুনাফা অর্জন করতে পারতো।

মুফাস্‌সিরগণ يوم التغابن কথাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এর কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। এসব অর্থের সবগুলোই যথার্থ ও সঠিক এবং তা এর প্রকৃত অর্থের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করে। কোন কোন মুফাস্‌সির এর অর্থ বর্ণনা করে বলেছেন যে, দোযখীরা জান্নাতের বাসিন্দাদের মত কাজ-কর্ম করে জান্নাতে গেলে সেখানে তারা যে অংশ লাভ করতো সেদিন তা জান্নাতবাসীগণ লাভ করবে। আর জান্নাতবাসীগণ যদি দুনিয়ায় দোযখীদের মত কাজকর্ম করে আসতেন তাহলে দোযখের যে অংশ তারা পেতেন তা সেদিন দোযখীদের অংশে পড়বে। ইমাম বুখারী (র) বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে কিতাবুর রিকাক অধ্যায়ে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেটি এ ব্যাখ্যার সমর্থন করে। উক্ত হাদীসে নবী (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তিই জান্নাতে যাবে তাকে সেই জায়গাটা দেখানো হবে, দুনিয়ায় খারাপ কাজকর্ম করে গেলে যা সে দোযখে পেতো। উদ্দেশ্য যাতে সে আরো বেশী 'শোকর গুজার' বা কৃতজ্ঞ হয়। আর যে ব্যক্তিই দোযখে যাবে তাকেও বেহেশতের সেই স্থানটি দেখানো হবে যা সে দুনিয়ায় ভাল কাজ করে আসলে লাভ করতো। যাতে সে আরো বেশী অনুতপ্ত হয়।

অপর কিছু সংখ্যক মুফাস্‌সির বলেন, সেদিন অত্যাচারিত ব্যক্তি অত্যাচারীর ততটা নেকী ছিনিয়ে নেবে যতটা তার অত্যাচারের সমান হবে। কিংবা অত্যাচারিতের ঠিক ততটা গোনাহ অত্যাচারীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে যা তার হক বা অধিকারের সমান হবে। কারণ কিয়ামতের দিন কারো কাছে কোন প্রকার অর্থ-সম্পদ বা সোনা-রূপা থাকবে না যা দিয়ে সে অত্যাচারিতকে ক্ষতিপূরণ দেবে বা জরিমানা আদায় করবে। মানুষের আমলসমূহই হবে সেখানে একমাত্র বিনিময়যোগ্য মুদ্রা। এ কারণে যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কারো প্রতি জুলুম করেছে সে মজলুমের অধিকার কেবল এভাবে আদায় করতে পারবে যে, তার নিজের যতটুকু নেকী আছে তা থেকেই আর্থিক দণ্ড দেবে অথবা মজলুমের গোনাহর কিছু অংশ নিজের ওপর চাপিয়ে নিয়ে তার দণ্ড ভোগ করবে। কিছু সংখ্যক হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম থেকে এ বিষয়টিও বর্ণিত হয়েছে। বুখারী হাদীস গ্রন্থের কিতাবুর রিকাকে হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিই কাউকে জুলুম করে তার গোনাহর বোঝা নিজের ওপর চাপিয়ে রেখেছে তার উচিত এ পৃথিবীতে অবস্থানকালেই তা থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া। কারণ আখেরাতে টাকা পয়সা বা অর্থ-সম্পদের কোন কারবার থাকবে না। সেখানে তার নেকী থেকে মজলুমকে দেয়া হবে। অথবা তার কাছে যথেষ্ট পরিমাণে নেকীও যদি না থাকে তাহলে মজলুমের কিছু গোনাহ তার ওপর অর্পণ করা হবে। অনুরূপ মসনাদে আহমাদে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উনায়েস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জান্নাতবাসী জান্নাতে যেতে পারবে না এবং কোন দোযখবাসী দোযখে যাবে না যতক্ষণ না সে দুনিয়ায় কারো ওপর তার কৃত জুলুমের বদলা বা ক্ষতিপূরণ দেবে। এমনকি একটি থাপ্পড়ের ক্ষতিপূরণ পর্যন্তও দিতে হবে। "আমরা বললাম, এই ক্ষতিপূরণ কিভাবে দেয়া হবে? কেননা কিয়ামতের দিন তো আমরা নিস্ব ও

নিসম্বল থাকবো।" নবী (সা) বললেন ঃ নিজের আমলের নেক কাজ ও বদ কাজ দ্বারা এই ক্ষতিপূরণ করতে হবে। মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার নবী (সা) তাঁর মজলিসে লোকদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ দরিদ্র এবং অভাবী কে তা কি তোমরা জান? লোকজন বলে উঠল, আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই দরিদ্র যার অর্থ-সম্পদ কিছুই নেই। তিনি বললেন ঃ "আমার উম্মাতের মধ্যে দরিদ্র হলো সেই ব্যক্তি যে নামায, রোযা ও যাকাত আদায় করে কিয়ামতের দিন হাজির হবে। কিন্তু এমন অবস্থায় হাজির হবে যে দুনিয়ায় কাউকে গালি দিয়েছিল, কারো প্রতি অপবাদ আরোপ করেছিল, কারো অর্থ-সম্পদ মেরে খেয়েছিল, কারো রক্তপাত ঘটিয়েছিল এবং কাউকে মারপিট করে এসেছিল। সুতরাং তার নেকীসমূহ নিয়ে ঐ সব অত্যাচারিতদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে।" কিন্তু তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য যখন তার কোন নেকী আর অবশিষ্ট থাকবে না তখন তাদের কিছু কিছু গোনাহ নিয়ে তার ঘাড়ে চাপানো হবে এবং তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। মুসলিম ও আবু দাউদ হযরত বুরাইদা থেকে আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসে আছে, নবী (সা) বলেছেন ঃ "কোন জিহাদকারীর অনুপস্থিতিতে কেউ যদি তার স্ত্রী ও পরিবারের লোকদের ব্যাপারে খিয়ানত বা বিশ্বাস ভংগ করে তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে ঐ মুজাহিদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলা হবে, তার ভাল কাজের যতটা ইচ্ছা তুমি নিয়ে নাও।" এরপর নবী (সা) আমাদের দিকে ফিরে বললেন ঃ "এ ব্যাপারে তোমরা কি মনে করো? অর্থাৎ তোমরা কি মনে করো যে, এরপর সে তার জন্য কোন নেক কাজ অবশিষ্ট রাখবে?"

আরো কিছু সংখ্যক মুফাস্‌সির বলেছেন যে, تغابن শব্দটি বেশীর ভাগ ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর কাফের ও মু'মিনগণ তাদের দুনিয়ার জীবনে যে আচরণ ও নীতি অনুসরণ করে থাকে কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে সেই আচরণকে তেজারত বা ব্যবসায়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মু'মিন যদি নাফরমানির পথ পরিত্যাগ করে আনুগত্যের পথ অনুসরণ করে এবং নিজের জানমাল ও চেষ্টা-সাধনা আল্লাহর পথে নিয়োজিত করে তাহলে সে যেন লোকসানজনক ব্যবসায় ছেড়ে এমন এক ব্যবসায়ে তার পুঁজি খাটাচ্ছে যা অবশেষে লাভজনক হবে এবং মুনাফা দেবে। আর একজন কাফের যখন আনুগত্যের পথ বর্জন করে নাফরমানি ও বিদ্রোহের পথে নিজের সবকিছু নিয়োজিত করে তখন সে এমন একজন ব্যবসায়ীর মত হয়ে যায়, যে হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী খরিদ করে। পরিণামে সে এর লোকসান ভোগ করবে। এই উভয় কাজের লাভক্ষতি কেবল কিয়ামতের দিনই প্রকাশ পাবে। দুনিয়ার জীবনে মু'মিন হয়তো কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে এবং কাফের বিপুলভাবে লাভবান হতে থাকবে। কিন্তু আখেরাতে জানা যাবে সত্যিকার অর্থে লাভজনক কারবার কে করেছে আর ক্ষতিকর কারবার কে করেছে। কুরআন মজীদে বহু সংখ্যক স্থানে এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নবর্ণিত আয়াতগুলো দেখুন, আল বাকারাহ, আয়াত ১৬, ১৭৫, ২০৭; আলে ইমরান, আয়াত ৭৭, ১৭৭; আন নিসা, ৭৪; আত তাওবা, ১১১; আন নাহল, ৯৫; ফাতের, ২৯; আস সাফ, ১০।

تغابن বা হারজিতের আরো একটি অবস্থা হলো, মানুষ পৃথিবীতে কুফরী, পাপাচার এবং জুলুম ও নাফরমানির কাজে একান্ত নির্বিকারচিত্তে পরস্পরকে সহযোগিতা করে আসছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে গভীর ভালবাসা এবং বন্ধুত্ব আছে বলেও তাদের আস্থা

রয়েছে। চরিত্রহীন পরিবারের লোকজন, গোমরাহী বিস্তারকারী নেতৃবর্গ ও তাদের অনুসারীরা, চোর ও ডাকাতদের দল, ঘুষখোর ও জালেম কর্মচারীদের গাঁটছড়া বাঁধা, বেঈমান ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং জমিদার গোষ্ঠী, গোমরাহী, দুষ্কর্ম ও নোংরামির প্রসারকামী দলসমূহ এবং বিশ্বব্যাপী ব্যাপক আকারে জুলুম ও বিপর্যয়ের ঝাণ্ডাবাহী সরকার ও জাতিসমূহের সবারই পারস্পরিক যোগসাজশ এই আস্থার ওপরই প্রতিষ্ঠিত। তাদের প্রত্যেকের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী ব্যক্তিরা মনে করে তারা একে অপরের নির্ভরযোগ্য বন্ধু এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত কার্যকর সহযোগিতা বিদ্যমান। কিন্তু তারা যখন আখেরাতে পৌঁছবে তখন অকস্মাৎ এ বিষয়টি তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তারা সবাই মারাত্মকভাবে প্রতারিত হয়েছে। তখন প্রত্যেকেই একথা উপলব্ধি করবে যে, যাকে সে তার সর্বোত্তম বাপ, ভাই, স্ত্রী, স্বামী, ছেলে, মেয়ে, বন্ধু, নেতা, পীর, মুরীদ অথবা সহযোগী ও সাহায্যকারী মনে করে আসছিল প্রকৃতপক্ষে তারা সবাই তার জঘন্যতম শত্রু। সব রকমের আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, সম্পর্ক ও ভালবাসা শত্রুতায় পর্যবসিত হবে। সবাই একে অপরকে গালি দিতে থাকবে, একে অপরকে লানত করতে থাকবে। আর প্রত্যেকেই তার কৃত অপরাধের বেশীর ভাগ দায়-দায়িত্ব অপরের ওপর চাপিয়ে তাকে কঠোরতর শাস্তি দিতে চাইবে। এ কথাটিও কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। নীচে উল্লেখিত আয়াতসমূহে এর কিছু উদাহরণ দেখা যেতে পারে। আল বাকারাহ, ১৬৭; আল আ'রাফ, ৩৭ থেকে ৩৯; ইবরাহীম, ২১—২২; আল মু'মিন, ১০১; আল আনকাবূত, ১২—১৩, ২৫; লোকমান, ৩৩; আল আহযাব, ৬৭—৬৮; সাবা, ৩১ থেকে ৩৩; ফাতের, ১৮; আস সাফ্‌ফাত, ২৭ থেকে ৩৩; সাদ, ৫৯ থেকে ৬১; হামীম আস সাজদা, ২৯; আয্ যুখরুফ, ৬৭; আদ দুখান, ৪১; আল মা'আরিজ, ১০ থেকে ১৪; আবাসা, ৩৪ থেকে ৩৭।

২১. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ শুধু এ কথা মেনে নেয়া নয় যে, আল্লাহ আছেন। বরং তার অর্থ হলো আল্লাহ নিজে, তাঁর রসূল এবং কিতাবের মাধ্যমে যেভাবে ঈমান আনতে বলেছেন সেভাবে ঈমান আনা। এর মধ্যে রিসালাত ও কিতাবের প্রতি ঈমান আনাও আপনা থেকেই অন্তরভুক্ত। একইভাবে মানুষ যে কাজকে নেকীর কাজ মনে করে অথবা মানুষের নিজের গড়ে নেয়া নৈতিক মানদণ্ড অনুসারে যেসব কাজ করে, নেকীর কাজ বলতে সেসব কাজকেও বুঝায় না। বরং এর দ্বারা বুঝায় এমন সব কাজ-কর্ম যা আল্লাহর দেয়া আইন মোতাবেক করা হয়। তাই পরবর্তী আয়াতসমূহে যেসব শুভ ফলাফল ও পরিণামের কথা বলা হয়েছে রসূল ও কিতাবের মাধ্যম ছাড়া আল্লাহকে মানার ও নেক কাজ করার ফলাফল এবং পরিণামও তাই হবে কারো এমন ভুল ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। যে ব্যক্তিই বুঝে শুনে কুরআন অধ্যয়ন করবে তার কাছে এ বিষয়টি গোপন থাকবে না যে, কুরআনের দৃষ্টিতে এ ধরনের কোন ঈমানের নাম আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং কোন কাজের নাম নেক কাজ আদৌ নয়।

২২. কুফরী বলতে কি বুঝায়? এ কথাটিই তা স্পষ্ট করে দেয়। আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহকে আল্লাহর আয়াত বলে না মানা, ঐ আয়াতসমূহে যেসব সত্য তুলে ধরা হয়েছে তা স্বীকার না করা এবং তার মধ্যে যেসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা অস্বীকার ও অমান্য করাই হচ্ছে কুফরী। এরই ফলাফল ও পরিণাম পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে।

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ ۚ
وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ
فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٢﴾ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾

২ রুকূ'

আল্লাহর[২৩] অনুমোদন ছাড়া কখনো কোন মুসিবত আসে না[২৪]। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে আল্লাহ তার দিলকে হিদায়াত দান করেন।[২৫] আল্লাহ সব কিছু জানেন।[২৬] আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রসূলের আনুগত্য করো। কিন্তু তোমরা যদি আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে সত্যকে স্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া আমার রসূলের আর কোন দায়িত্ব নেই।[২৭] তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। ঈমানদারদের আল্লাহর ওপরেই ভরসা করা উচিত।[২৮]

২৩. এখান থেকে ঈমানদারদের উদ্দেশ করে কথা বলা হয়েছে। এ পর্যায়ে কথাগুলো পড়ার সময় একথা মনে রাখতে হবে যে, এসব আয়াত যে সময়ে নাযিল হয়েছিল তা ছিল মুসলমানদের কঠোর বিপদ ও দুঃখের সময়। তারা মক্কায় বছরের পর বছর জুলুম-অত্যাচার সহ্য করার পর নিজেদের সবকিছু ছেড়ে মদীনায় চলে এসেছিলেন। যেসব ন্যায় ও সত্যপন্থী লোক তাদেরকে মদীনায় আশ্রয় দিয়েছিলেন তাদের ওপরও দ্বিগুণ মুসিবত আপতিত হয়েছিল। একদিকে তাদেরকে আরবের বিভিন্ন অংশ থেকে তাদের কাছে চলে আসা শত শত মুহাজিরকে সহায়তা দিতে হচ্ছিল। অপরদিকে ইসলামের শত্রু সমগ্র আরবের লোকজন তাদের ওপর নিপীড়ন চালাতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল।

২৪. এ বিষয়টি সূরা আল হাদীদের ২২—২৩ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেখানে ৩৯ থেকে ৪২ নম্বর টীকায় আমরা এর ব্যাখ্যাও পেশ করেছি। যে পরিস্থিতিতে এবং যে উদ্দেশ্যে সেখানে এ কথাটি বলা হয়েছিল ঠিক অনুরূপ পরিস্থিতিতে একই উদ্দেশ্যে এখানেও তা পুনরায় বলা হয়েছে। এখানে যে সত্যটি মুসলমানদের হৃদয় মনে বদ্ধমূল করে দেয়া উদ্দেশ্য তা হচ্ছে, বিপদ-আপদ নিজেই আসে না। আর পৃথিবীতে কারো এমন শক্তিও নেই যে, সে যার ওপরে ইচ্ছা কোন বিপদ চাপিয়ে দেবে। কারো ওপর কোন বিপদ আসতে দেয়া না দেয়া সরাসরি আল্লাহর অনুমোদনের ওপর নির্ভর করে। আল্লাহর অনুমোদন সর্বাবস্থায় কোন না কোন বৃহত্তর কল্যাণ ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে হয় যা মানুষ জানে না বা বুঝে উঠতে পারে না।

২৫. অর্থাৎ বিপদ-আপদের ঘনঘটার মধ্যেও যে জিনিস মানুষকে সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতিতে পদস্খলন হতে দেয় না সেই একমাত্র জিনিসটি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান। যার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ঈমান নেই সে এসব বিপদ-আপদকে হয় আকস্মিক দুর্ঘটনার ফল মনে করে অথবা এসব বিপদ-আপদ দেয়ার ও দূর করার ব্যাপারে পার্থিব শক্তিসমূহকে কার্যকর বলে বিশ্বাস করে কিংবা সেসবকে এমন কাল্পনিক শক্তিসমূহের কাজ বলে মনে করে যাদেরকে মানুষের কুসংস্কারজনিত বিশ্বাস ক্ষতি ও কল্যাণ করতে সক্ষম বলে ধরে নিয়েছে অথবা তারা আল্লাহকে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী বলে নিখাদ ও নির্ভেজাল ঈমানের সাথে মানে না। ভিন্ন ভিন্ন এসব ক্ষেত্র ও পরিস্থিতিতে মানুষ নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত সে বিপদ-আপদ বরদাশত করে বটে কিন্তু তার পরেই সে পরাজয় স্বীকার করে নেয়। তখন সেসব আস্তানায়ই মাথা নত করে, সব রকম অপমান ও লাঞ্ছনা স্বীকার করে নেয়। এ সময় সে যে কোন হীন কাজ ও আচরণ করতে পারে। সব রকম ভ্রান্ত কাজ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। আল্লাহকে গালি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এমন কি আত্মহত্যা পর্যন্ত করে বসে। অপরদিকে যে ব্যক্তি একথা জানে এবং আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলার হাতেই সবকিছু। তিনিই এই বিশ্ব-জাহানের মালিক ও শাসক। তাঁর অনুমোদনক্রমেই বিপদ-মসিবত আসতে এবং দূরীভূত হতে পারে। এই ব্যক্তির মনকে আল্লাহ তা'আলা ধৈর্য ও আনুগত্য এবং তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার 'তাওফীক' দান করেন। তাকে সাহস ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে সব রকম পরিস্থিতির মোকাবেলা করার শক্তি দান করেন। অন্ধকার থেকে অন্ধকারতর পরিস্থিতিতেও তার সামনে আল্লাহর দয়া ও করুণা লাভের আশার আলো প্রজ্জ্বলিত থাকে। অতি বড় কোন বিপদও তাকে এতটা সাহসহারা করতে পারে না যে, সে সত্য ও সঠিক পথ থেকে সরে যাবে বা বাতিলের সামনে মাথা নত করবে কিংবা আল্লাহ ছাড়া আর কারো দরবারে তার দুঃখ-বেদনার দাওয়াই বা প্রতিকার তালাশ করবে। এভাবে প্রতিটি বিপদ মসিবতই তার জন্যে অধিক কল্যাণের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে কোন মসিবতই তার জন্য মসিবত থাকে না বরং পরিণামের দিক থেকে সরাসরি রহমতে পরিণত হয়। কেননা সে এই মসিবতে নিঃশেষ হয়ে যাক বা সফলভাবে উৎরিয়ে যাক—উভয় অবস্থায়ই সে তার প্রভুর দেয়া পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এ বিষয়টিই বুখারী ও মুসলিমের বর্ণিত একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ ، لَايَقْضِى اللّٰهُ لَهُ قَضَاءً اِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ ، اِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَاِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَلَيْسَ ذَالِكَ لِاَحَدٍ اِلَّا الْمُؤْمِنِ -

"মু'মিনের ব্যাপারটিই বড় অদ্ভুত। আল্লাহ তার জন্য যে ফায়সালাই করুন না কেন তা সর্বাবস্থায় তার জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে। বিপদ-আপদে সে ধৈর্য অবলম্বন করে। এটা তার জন্য কল্যাণকর। সুখ-শান্তি ও সচ্ছলতা আসলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর। মু'মিন ছাড়া আর কারো ভাগ্যেই এরূপ হয় না।"

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ
فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤﴾
اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۭ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٥﴾

হে সেই সব লোক যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। আর যদি তোমরা ক্ষমা ও সহনশীলতার আচরণ করো এবং ক্ষমা করে দাও তাহলে আল্লাহ অতিব ক্ষমাশীল, অতিব দয়ালু।[২৯] তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি একটি পরীক্ষা। আর কেবলমাত্র আল্লাহর কাছে আছে বিরাট প্রতিদান।[৩০]

২৬. পূর্বাপর প্রসংগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ কথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা জানেন কোন ব্যক্তি প্রকৃতই ঈমানদার এবং সে কিরূপ ঈমানের অধিকারী? তাই তিনি তার জ্ঞানের ভিত্তিতে সেই সব হৃদয়মনের অধিকারীকে হিদায়াত দান করেন যার মধ্যে ঈমান আছে এবং তার মধ্যে যে মর্যাদার ও প্রকৃতির ঈমান আছে সেই পর্যায়ের হিদায়াত তাকে দান করেন। অপর অর্থটি এও হতে পারে যে, আল্লাহ তাঁর মু'মিন বান্দার অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত নন। তিনি তাকে ঈমান গ্রহণের আহবান জানিয়ে এবং ঈমান গ্রহণের সাথে দুনিয়ার কঠিন পরীক্ষাসমূহের মধ্যে ফেলে দিয়ে তাদেরকে ঐ অবস্থায়ই পরিত্যাগ করেননি। পৃথিবীতে কোন ঈমানদারের ওপর কি মসিবত চলছে আর কোন কোন পরিস্থিতিতে সে কিভাবে তার ঈমানের দাবীসমূহ পূরণ করছে তা তিনি জানেন। তাই এ বিষয়ে আস্থা রাখো যে, আল্লাহর অনুমোদনক্রমে যে মসিবতই তোমাদের ওপর আসুক না কেন আল্লাহর কাছে তার বৃহত্তর কোন কল্যাণকর উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে এবং তার মধ্যে বৃহত্তর কোন কল্যাণ লুক্কায়িত আছে। কেননা, আল্লাহ তাঁর ঈমানদার বান্দার কল্যাণকামী। তিনি তাদেরকে বিনা কারণে বিপদে ফেলতে চান না।

২৭. এখানে এ কথার অর্থ হলো, অবস্থা ভাল বা মন্দ যাই হোক না কেন সর্বাবস্থায় আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে কিন্তু বিপদের ঘনঘটায় ঘাবড়ে গিয়ে যদি তোমরা আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে কেবল নিজেরই ক্ষতি করবে আমার রসূলের দায়িত্ব শুধু তোমাদেরকে ঠিকমত সত্য ও সঠিক পথটির সন্ধান বলে দেয়া। আর রসূল সে কাজটি ভালভাবেই করেছেন।

২৮. অর্থাৎ খোদায়ীর সর্বময় ক্ষমতা ও ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতে। এই ক্ষমতা ও ইখতিয়ার অন্য কারো আদৌ নেই। তাই সে তোমাদের জন্য ভাল বা মন্দ ভাগ্য গড়তে পারে না। তিনি আনলেই কেবল সুসময় আসতে পারে এবং তিনি দূর করলেই কেবল দুঃসময় দূর হতে পারে। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহকে মনে প্রাণে একমাত্র ইলাহ বলে স্বীকার করে সে আল্লাহর ওপর ভরসা করবে এবং একজন ঈমানদার হিসেবে

এই বিশ্বাস রেখে দুনিয়াতে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে থাকবে যে, আল্লাহ যে পথ দেখিয়েছেন কেবল সে পথেই কল্যাণ নিহিত। এ ছাড়া তার জন্য আর কোন পথ নেই। এ পথে সফলতা লাভ হলে তা আল্লাহর সাহায্য, সহযোগিতা ও তাওফিকের মাধ্যমেই হবে ; অপর কোন শক্তির সাহায্যে তা হওয়ার নয়। আর এ পথে যদি কঠোর পরিস্থিতি, বিপদাপদ, ভয়ভীতি ও ধ্বংস আসে তাহলে তা থেকেও কেবল তিনিই রক্ষা করতে পারেন, অন্য কেউ নয়।

২৯. এ আয়াতের দু'টি অর্থ। একটি অর্থ অনুসারে আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে বহুসংখ্যক ঈমানদার পুরুষকে তাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে, স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীদের পক্ষ থেকে এবং পিতামাতাকে তাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে যেসব কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় সেই সব পরিস্থিতির ক্ষেত্রে এ আয়াতটি প্রযোজ্য। ঈমান ও সত্য সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে একে অপরের পুরোপুরি বন্ধু ও সহযোগী হতে পারে একজন স্বামীর এরূপ স্ত্রী, একজন স্ত্রীর এরূপ স্বামী লাভ করা এবং আকীদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাক ও চরিত্রের দিক দিয়ে সকল সন্তান-সন্ততিই চোখ জুড়ানোর মত হওয়া পৃথিবীতে খুব কমই ঘটে থাকে। বরং সাধারণত দেখা যায় যে, স্বামী যদি নেক্কার ও ঈমানদার হয় তাহলে সে এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি লাভ করে থাকে যারা তার দীনদারী, আমানতদারী এবং সততাকে নিজেদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করে। তারা চায় যে, তাদের স্বামী ও পিতা তাদের জন্য জাহান্নাম খরিদ করুক এবং হালাল ও হারামের বাছবিচার না করে যে কোন পন্থায় আরাম-আয়েশ, আমোদ-ফূর্তি এবং গোনাহ ও পাপের উপকরণ এনে দিক। কোন কোন সময় আবার এর ঠিক উল্টোটাও ঘটে থাকে। একজন নেক্কার ঈমানদার নারীকে এমন স্বামীর পাল্লায় পড়তে হয় যে স্ত্রীর শরীয়াত অনুসারে জীবন যাপন দুই চোখে দেখতে পারে না। আর সন্তানরাও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদের গোমরাহী ও দুষ্কর্ম দ্বারা মায়ের জীবনকে অতিষ্ট করে তোলে। বিশেষ করে কুফর ও ঈমানের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সময় যখন একজন মানুষের ঈমান দাবী করে যে, আল্লাহ এবং তাঁর দীনের জন্য সে ক্ষতি স্বীকার করবে, দেশ ছেড়ে হিজরাত করবে কিংবা জিহাদে অংশগ্রহণ করে নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করবে, তখন তার পথে তার স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনই সর্বপ্রথম বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সময় বিপুল সংখ্যক মুসলমানের জন্য যে বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছিল এবং কোন অমুসলিম সমাজে ইসলাম গ্রহণকারী যে কোন ব্যক্তির জন্য আজও দেখা দেয় এ আয়াতটির দ্বিতীয় অর্থটি সেই বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত। সেই সময় মক্কা মুয়াযযমা ও আরবের অন্যান্য অংশে সাধারণভাবে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতো যে, একজন লোক ঈমান এনেছে কিন্তু তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা ঈমান আনতে প্রস্তুত নয় শুধু তাই না বরং তারা তাকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য সচেষ্ট। যেসব মেয়েরা তাদের পরিবারে একাকী ইসলাম গ্রহণ করত। তাদের জন্যও ঠিক একই পরিস্থিতির উদ্ভব হতো।

যেসব ঈমানদার নারী ও পুরুষ এ দু'টি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন তাদের উদ্দেশ করে তিনটি কথা বলা হয়েছে ঃ

সর্বপ্রথম তাদের এই বলে সাবধান করা হয়েছে যে, পার্থিব সম্পর্কের দিক দিয়ে যদিও তারা মানুষের অতি প্রিয়জন কিন্তু দীন ও আদর্শের দিক দিয়ে এরা তোমাদের 'দুশমন'। তারা তোমাদের সৎকাজে বাধা দেয় এবং অসৎকাজের প্রতি আকৃষ্ট করে, কিংবা তোমাদের ঈমানের পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং কুফরীর পথে সহযোগিতা করে কিংবা তারা কাফেরদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে মুসলমানদের সামরিক গোপন তথ্য সম্পর্কে তারা তোমাদের নিকট থেকে যাই জানতে পারে তা ইসলামের শত্রুদের কাছে পৌছিয়ে দেয়। এর যে কোন পন্থায়ই তারা দুশমনী করুক না কেন তাতে দুশমনীর ধরন ও প্রকৃতিতে অবশ্যই পার্থক্য হয়। কিন্তু সর্বাবস্থায়ই তা দুশমনী। ঈমান যদি তোমাদের কাছে প্রিয় হয়ে থাকে তাহলে সেই বিচারে তাদেরকে দুশমনই মনে করতে হবে। তাদের ভালবাসায় আবদ্ধ হয়ে এ বিষয়টি কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তোমাদের ও তাদের মধ্যে ঈমান ও কুফর বা আনুগত্য ও অবাধ্যতার প্রাচীর আড়াল করে আছে।

এরপর বলা হয়েছে যে, তাদের ব্যাপারে সাবধান থাক। অর্থাৎ তাদের পার্থিব স্বার্থের জন্য নিজেদের পরিণাম তথা আখেরাতকে বরবাদ করো না। তোমাদের অন্তরে তাদের প্রতি ভালবাসাকে এতটা প্রবল হতে দিও না যে, তারা আল্লাহ ও রসূলের সাথে তোমাদের সম্পর্ক এবং ইসলামের প্রতি তোমাদের বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাদের প্রতি এতটা বিশ্বাস ও আস্থা রেখো না যাতে তোমাদের অসাবধানতার কারণে মুসলমানদের দলের গোপনীয় বিষয়সমূহ তারা অবগত হয়ে যেতে পারে এবং তা দুশমনদের হাতে পৌছে যায়। একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে এ বিষয়টি সম্পর্কেই সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে যে,

يُؤْتَى بِرَجُلٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيُقَالُ اَكَلَ عِيَالُهُ حَسَنَاتِهِ –

"কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে। বলা হবে, তার সন্তান–সন্ততিরা তার সব নেকী ধ্বংস করে ফেলেছে।"

সর্বশেষে বলা হয়েছে যে, তোমরা যদি ক্ষমা ও সহনশীলতা দেখাও এবং ক্ষমা করে দাও তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। এর অর্থ হলো, তাদের শত্রুতা সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা হচ্ছে শুধু এই জন্য যে, তোমরা সতর্ক থাকবে এবং নিজেদের আদর্শকে তাদের থেকে রক্ষা করার চিন্তা–ভাবনা করবে। এই সতর্কীকরণের অর্থ কখনো এ নয় যে, যা করতে বলা হলো তার চেয়ে আরো অগ্রসর হয়ে তোমরা স্ত্রী ও সন্তানদের মারতে শুরু করবে অথবা তাদের সাথে রূঢ় আচরণ করবে অথবা সম্পর্ক এমন তিক্ত করে তুলবে যে, তোমাদের এবং তাদের পারিবারিক জীবন আযাবে পরিণত হবে। কারণ এরূপ করার দু'টি স্পষ্ট ক্ষতি আছে। একটি হলো, এভাবে স্ত্রী ও সন্তান–সন্ততির সংশোধনের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। দ্বিতীয়টি হলো, এভাবে সমাজে ইসলামের বিরুদ্ধে উল্টা খারাপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া এভাবে আশেপাশের লোকদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের আখলাক ও চরিত্রের এমন একটি চিত্র ভেসে ওঠে যাতে তারা মনে করতে শুধু করে যে, ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে সে নিজের ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্য পর্যন্ত কঠোর ও বদমেজাজী হয়ে যায়।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا
لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٦﴾ اِنْ
تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ
حَلِيْمٌ ﴿١٧﴾ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾

তাই যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করে চলো।[৩১] শোন, আনুগত্য করো এবং নিজেদের সম্পদ ব্যয় করো। এটা তোমাদের জন্যই ভাল। যে মনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত থাকলো সেই সফলতা লাভ করবে।[৩২] যদি তোমরা আল্লাহকে করযে হাসানা দাও তাহলে তিনি তোমাদেরকে তা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবেন[৩৩] এবং তোমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ সঠিক মূল্যায়ণকারী ও অতিব সহনশীল।[৩৪] সামনে উপস্থিত ও অনুপস্থিত সবকিছুই তিনি জানেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।

এ প্রসংগে এ কথাটিও মনে রাখা উচিত যে, ইসলামের প্রথম যুগে মানুষ যখন সবেমাত্র মুসলমান হতো এবং যদি তাদের পিতামাতা কাফেরই থেকে যেত তাহলে একটি সমস্যা দেখা দিত এই যে, তারা তাদের সন্তানদেরকে নতুন দীন পরিত্যাগ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করত। তাদের জন্য আরো একটি সমস্যা দেখা দিত তখন যখন তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা (কিংবা মেয়েদের ক্ষেত্রে তাদের স্বামী এবং সন্তানরা) কুফরকেই আঁকড়ে ধরে থাকত এবং সত্য দীনের পথ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করত। প্রথমোক্ত পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য সূরা আনকাবূতের (১৮ আয়াত) এবং সূরা লোকমান (১৪ ও ১৫ আয়াত)-এ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, দীনের ব্যাপারে কখনো পিতামাতার কথা অনুসরণ করবে না। তবে পার্থিব ব্যাপারে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে। এখানে দ্বিতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, নিজের দীনকে নিজের সন্তান-সন্ততির হাত থেকে রক্ষা করার চিন্তা অবশ্যই করবে কিন্তু তাই বলে তাদের সাথে কঠোর আচরণ করবে না। বরং নমনীয় আচরণ করো এবং ক্ষমা ও উদারতা দেখাও। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আত্ তাওবা, আয়াত ২৩, ২৪; আল মুজাদালা, টীকা ৩৭; আল মুমতাহিনা, টীকা ১ থেকে ৩; আল মুনাফিকূন, টীকা ১৮)।

৩০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আনফাল, টীকা ২৩। এ ক্ষেত্রে তাবারানী হযরত আবু মালেক আশ'আরী (রা) থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেটিও মনে রাখা দরকার। তিনি বলেছেন ঃ "তুমি যে শত্রুকে হত্যা করতে পারার কারণে সফল হলে কিংবা সে তোমাকে হত্যা করলে

তুমি জান্নাত লাভ করলে সে তোমার আসল শত্রু নয়। বরং তোমার ঔরষজাত সন্তানই হয়তো তোমার আসল শত্রু। এরপর তোমার শত্রু হচ্ছে তোমার মালিকানাধীন অর্থ-সম্পদ।" তাই এখানে এবং সূরা আনফালে উভয় জায়গাতেই বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ফিতনা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পার এবং আল্লাহর প্রতি ভালবাসাকে তাদের প্রতি ভালবাসার ওপর প্রাধান্য দিতে সক্ষম হও তাহলে আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য বিরাট পুরস্কার রয়েছে।

৩১. কুরআন মজীদে এক স্থানে বলা হয়েছে اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ "আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় কর।" (আলে ইমরান, ১০২) অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا "আল্লাহ কারো ওপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেন না।" (আল বাকারাহ, ২৮৬) এখানে বলা হচ্ছে, সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। এ তিনটি আয়াতের বিষয়বস্তু এক সাথে মিলিয়ে চিন্তা করলে বুঝা যায়, প্রথম আয়াতে আমাদের সামনে একটি মানদণ্ড পেশ করা হয়েছে সেখানে পৌঁছার জন্য প্রত্যেক মু'মিনের চেষ্টা করা উচিত। দ্বিতীয় আয়াত আমাদেরকে এই মৌলিক নীতি অবহিত করছে যে, কোন ব্যক্তির নিকট থেকেই তার সাধ্যাতীত কোন কাজ দাবী করা হয়নি। বরং আল্লাহর দীনের অধীনে মানুষ ততটুকুই করার জন্য আদিষ্ট যা করার সামর্থ তার আছে। আর এ আয়াতটি প্রত্যেক ঈমানদারকে এ মর্মে পথনির্দেশনা দিচ্ছে যে, সে যেন সাধ্যানুসারে তাকওয়ার পথ অনুসরণে কোন ত্রুটি না করে। তার পক্ষে যতটা সম্ভব আল্লাহর হুকুম আহকাম পালন করা এবং তাঁর নাফরমানী থেকে দূরে থাকা কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে সে যদি অলসতা করে তাহলে পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না। তবে যে জিনিস তার সাধ্যের অতীত (অবশ্য কোন জিনিস তার সাধ্যের অতীত তার ফায়সালা আল্লাহই ভালভাবে করতে পারেন) সে বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

৩২. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল হাশর, টীকা ১৯।

৩৩. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, টীকা ২৬৭; আল মায়েদা, টীকা ৩৩; আল হাদীদ, টীকা ১৬।

৩৪. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ফাতির, টীকা ৫২—৫৯; আশ শূরা, টীকা ৪২।

আত তালাক

৬৫

নামকরণ

এ সূরার নামই শুধু الطلاق নয়, বরং এটি এর বিষয়বস্তুর শিরোনামও। কারণ এর মধ্যে কেবল তালাকের হুকুম আহকামই বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস একে সূরা النساء القصرى অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত সূরা নিসা বলে অভিহিত করেছেন।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন যে, সূরা বাকারার যেসব আয়াতে সর্ব প্রথম তালাক সম্পর্কিত হুকুম আহকাম দেয়া হয়েছিল সেসব আয়াত নাযিল হওয়ার পর এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। সূরার বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ সাক্ষও তা প্রমাণ করে। সূরাটি নাযিল হওয়ার সঠিক সময়-কাল কোনটি তা নির্ণয় করা যদিও কঠিন, কিন্তু বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে এতটুকু অন্তত জানা যায় যে, লোকজন সূরা বাকারার বিধিনিষেধগুলো বুঝতে যখন ভুল করতে লাগলো এবং কার্যতও তাদের থেকে ভুল-ত্রুটি হতে থাকলো তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সংশোধনের জন্য এসব নির্দেশ নাযিল করলেন।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

তালাক ও ইদ্দত সম্পর্কে কুরআন মজীদে ইতিপূর্বে যেসব বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে এ সূরার নির্দেশাবলী বুঝার জন্য পুনরায় তা স্মৃতিতে তাজা করে নেয়া প্রয়োজন।

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ (البقره : ٢٢٩)

"তালাক দুইবার। এরপর স্ত্রীকে হয় উত্তমরূপে রাখবে নয় ভালভাবে বিদায় করে দেবে।"

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ..... وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِىْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا (البقره : ٢٢٨)

"তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকেরা (তিন তালাকের পর) তিন হায়েজ পর্যন্ত নিজেদের বিরত রাখবে.....যদি তারা সংশোধনে আগ্রহী হয় তাহলে এই সময়ের মধ্যে তাদের স্বামীরা তাদেরকে (স্ত্রী হিসেবে) ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী।"

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .....

"এরপর সে যদি তৃতীয়বারের মত তালাক দিয়ে দেয় তাহলে অন্য কারো সাথে সেই স্ত্রীর বিয়ে হওয়ার আগে সে আর তার জন্য হালাল হবে না...।" (আল বাকারাহ ২৩০)

إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا (الاحزاب : ٤٩)

"তোমরা ঈমানদার নারীদের বিয়ে করে স্পর্শ করার পূর্বেই যদি তালাক দিয়ে দাও তাহলে তোমরা তাদের কাছে ইদ্দত পালন করার দাবী করতে পার না। কারণ তোমাদের জন্য ইদ্দত পালন জরুরী নয়।" (আল আহযাব ঃ ৪৯)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (البقرة : ٢٣٤)

"তোমাদের মধ্যে কেউ স্ত্রী রেখে মারা গেলে স্ত্রীরা চার মাস দশদিন পর্যন্ত নিজেদের বিরত রাখবে বা অপেক্ষা করবে।" (আল বাকারাহ ঃ ৩৪)

উল্লেখিত আয়াতসমূহে যেসব নীতি নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিল তা হচ্ছে ঃ

এক ঃ স্বামী তার স্ত্রীকে সর্বাধিক তিন তালাক দিতে পারে।

দুই ঃ এক বা দুই তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার স্বামীর থাকে এবং ইদ্দতের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ে করতে চাইলে করতে পারবে। এ জন্য তাহলীলের কোন শর্ত প্রযুক্ত হবে না। কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেয় তাহলে ইদ্দতের সময়ের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার আর স্বামীর থাকে না, বরং তা বাতিল হয়ে যায়। এরপর ঐ স্ত্রীর অপর কোন পুরুষের সাথে বিয়ে হওয়া এবং ঐ স্বামী স্বেচ্ছায় তাকে তালাক না দেয়া পর্যন্ত পূর্বোক্ত স্বামীর সাথে পুনরায় তার বিয়ে হতে পারে না।

তিন ঃ ঋতুস্রাব চালু আছে এবং স্বামীর সাথে দৈহিক মিলন হয়েছে এমন স্ত্রীলোকের 'ইদ্দত' হলো তালাক প্রাপ্তির পর তিনবার মাসিক হওয়া। এক তালাক বা দুই তালাক হওয়ার ক্ষেত্রে এ ইদ্দত পালনের অর্থ হলো, স্ত্রীলোকটি এখনও তার দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ আছে এবং ইদ্দতকালের মধ্যে সে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু স্বামী যদি তিন তালাক দিয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীর এই ইদ্দত পালন তাকে ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য নয়, বরং শুধু এ জন্য যে, ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে সে অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না।

চার ঃ দৈহিক মিলন হয়নি এমন কোন স্ত্রীকে (স্পর্শ করার পূর্বে) যদি তালাক দেয়া হয়, তাকে কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না। সে চাইলে তালাক প্রাপ্তির পরপরই বিয়ে করতে পারে।

পাঁচ ঃ যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গিয়েছে তাকে চার মাস দশদিন সময়-কালের জন্য ইদ্দত পালন করতে হবে।

এখন এ কথাটি ভাল করে বুঝে নিতে হবে যে, এসব বিধি-বিধানের কোনটি বাতিল করা বা সংশোধন করার জন্য সূরা তালাক নাযিল হয়নি। বরং দু'টি উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এ সূরা নাযিল হয়েছে।

প্রথম উদ্দেশ্যটি হলো, পুরুষকে তালাক দেয়ার যে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে তা প্রয়োগের জন্য এমন কিছু বিজ্ঞোচিত পন্থা বলে দেয়া, যার সাহায্য নিলে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরিস্থিতি না আসতে পারে। আর বিচ্ছিন্ন হলেও যেন শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় তা হয় যখন পারস্পরিক সমঝোতা ও বুঝাপড়ার সমস্ত সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। কারণ আল্লাহর শরীয়াতে তালাকের অবকাশ রাখা হয়েছে শুধু একটি অনিবার্য প্রয়োজন হিসেবে। অন্যথায়, একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে যে দাম্পত্য বন্ধন একবার কায়েম হয়েছে তা আবার ছিন্ন হয়ে যাক তা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَا اَحَلَّ اللّٰهُ شَيْئًا اَبْغَضَ اِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ (ابو داؤد)

"তালাকের চেয়ে অপছন্দনীয় আর কোন জিনিসকে আল্লাহ তা'আলা হালাল করেননি।" (আবু দাউদ)

তিনি আরো বলেছেন ঃ

اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (ابو داؤد)

"সমস্ত হালাল জিনিসের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় হচ্ছে তালাক।" (আবু দাউদ)

দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি হলো, সূরা বাকারায় নাযিলকৃত বিধি-বিধান ছাড়া আরো যেসব বিষয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সাপেক্ষে ছিল তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে ইসলামের পারিবারিক আইনের এ দিক ও বিভাগটিকে পূর্ণতা দান করা। সুতরাং এ ক্ষেত্রে স্বামীর সাথে দৈহিক মিলন হয়েছে মাসিক বন্ধ হওয়া এমন স্ত্রীলোক কিংবা যাদের এখনো মাসিক আসেনি তারা তালাক প্রাপ্তা হলে তাদের ইদ্দত কি হবে, তা ছাড়া যেসব নারী গর্ভবতী হয়েছে তারা যদি তালাকপ্রাপ্তা হয় কিংবা স্বামী মারা যায় তাদের ইদ্দত কি হবে তা বলা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন রকম তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের খোরপোষ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা কিভাবে হবে এবং যেসব ছেলেমেয়ের পিতামাতা তালাকের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে তাদের দুধপানের ব্যবস্থা কিভাবে করা হবে তা এই সূরাতে বলা হয়েছে।

আয়াত ১২ **সূরা আত তালাক-মাদানী** রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا
الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ
حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۚ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذٰلِكَ اَمْرًا ①

হে নবী, তোমরা স্ত্রীলোকদের তালাক দিলে তাদেরকে তাদের ইদ্দতের জন্য তালাক দাও[১] এবং ইদ্দতের সময়টা ঠিকমত গণনা করো[২] আর তোমাদের রব আল্লাহকে ভয় করো (ইদ্দত পালনের সময়ে)। তোমরা তাদেরকে তোমাদের বাড়ী থেকে বের করে দিও না। তারা নিজেরাও যেন বের না হয়।[৩] তবে তারা যদি স্পষ্ট অশ্লীল কাজ করে[৪] তবে ভিন্ন কথা। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে আল্লাহর সীমাসমূহ লংঘন করবে সে নিজেই নিজের ওপর জুলুম করবে। তোমরা জান না আল্লাহ হয়তো এরপরে সমঝোতার কোন উপায় সৃষ্টি করে দেবেন।[৫]

১. অর্থাৎ তালাক দেয়ার ব্যাপারে তোমরা তাড়াহুড়া করো না যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোন ঝগড়া বিবাদ হওয়া মাত্রই রাগান্বিত হয়ে তালাক দিয়ে ফেললে এবং এক আঘাতে বিবাহ বন্ধন এমনভাবে ছিন্ন করে ফেললে যে, ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগও আর অবশিষ্ট থাকলো না এমনভাবে তালাক দিও না। বরং স্ত্রীদের তালাক দিতে হলে ইদ্দত পালনের জন্য তালাক দাও। ইদ্দত পালনের জন্য তালাক দেয়ার দু'টি অর্থ আছে এবং এখানে দু'টি অর্থই প্রয়োজ্য ঃ

একটি অর্থ হচ্ছে, ইদ্দত শুরু করার জন্য তালাক দাও। অন্য কথায় এমন সময় তালাক দাও যে সময় থেকে তাদের ইদ্দত শুরু হয়ে থাকে। সূরা বাকারার ২২৮ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যেসব স্ত্রীলোকের স্বামীর সাথে দৈহিক মিলন হয়েছে এবং মাসিকও হয়ে

থাকে তালাক প্রাপ্তির পর তিনবার মাসিক হওয়ার সময়-কালই তাদের ইদ্দত। এই নির্দেশের প্রতি লক্ষ রেখে বিচার করলে ইদ্দত শুরু করার জন্য তালাক দেয়ার অপরিহার্য যে অর্থ হতে পারে তা হচ্ছে, স্ত্রীকে ঋতুস্রাবকালে তালাক দেয়া যাবে না। কারণ, যে ঋতুস্রাবকালে তাকে তালাক দেয়া হয়েছে তার ইদ্দত সেই ঋতুস্রাব থেকে গণনা করা যাবে না। তাই এ অবস্থায় তালাক দেয়ার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে নারীর ইদ্দতের সময়-কাল তিন হায়েজের পরিবর্তে চার হায়েয হয়ে যায়। তাছাড়া এ নির্দেশের আরো একটি দাবী হলো যে 'তুহ্‌রে' (স্ত্রীর ঋতু থেকে পবিত্র থাকার অবস্থা) স্বামী স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন করেছে সেই 'তুহ্‌রে' তালাক দেয়া যাবে না। কারণ, এ ক্ষেত্রে তালাক দেয়ার সময় স্বামী ও স্ত্রীর মিলনের ফলে গর্ভসঞ্চার হয়েছে কি না তা তাদের দু'জনের কেউই জানতে পারে না। এ কারণে অনুমানের ওপর নির্ভর করে যেমন ইদ্দত গণনা শুরু হতে পারে না তেমনি মহিলাকে গর্ভবতী ধরে নিয়েও ইদ্দত গণনা হতে পারে না। সুতরাং এই নির্দেশটি একই সাথে দু'টি বিষয় দাবী করে। একটি হলো, হায়েয অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়া যাবে না। দ্বিতীয়টি হলো, তালাক দিতে হবে এমন 'তুহ্‌রে' যে 'তুহ্‌রে' দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়নি কিংবা যখন স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি জানা আছে। তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে এসব বাধ্যবাধকতার মধ্যে যে অনেক কল্যাণ নিহিত আছে তা একটু চিন্তা-ভাবনা করলেই বুঝা যায়। ঋতু অবস্থায় তালাক না দেয়ার কল্যাণকর দিক হলো, এটি এমন এক অবস্থা যখন স্বামী ও স্ত্রীর দৈহিক মিলন নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে এক ধরনের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও এটা প্রমাণিত যে, এই অবস্থায় নারীর মেজাজ স্বাভাবিক থাকে না। তাই সেই সময় যদি তাদের মধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদ হয় তাহলে তা মিটমাট করার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়েই অনেকটা অসহায় হয়ে পড়ে। আর পরিস্থিতিকে ঝগড়া-বিবাদ থেকে তালাক পর্যন্ত না গড়িয়ে যদি স্ত্রীর ঋতু থেকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয় তাহলে স্ত্রীর মেজাজ প্রকৃতি স্বাভাবিক হওয়া এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে আল্লাহ যে স্বাভাবিক আকর্ষণ দিয়েছেন তা তৎপর ও কার্যকর হয়ে পুনরায় দু'জনের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। যে 'তুহ্‌রে' দৈহিক মিলন হয়েছে সেই 'তুহ্‌রে'ই তালাক নিষিদ্ধ হওয়ার কল্যাণকর দিক হচ্ছে, সেই সময়ে যদি গর্ভসঞ্চার হয়ে থাকে তাহলে স্বামী ও স্ত্রী কারো পক্ষেই তা জানা সম্ভব হয় না। তাই তা তালাক দেয়ার উপযুক্ত সময় নয়। আর গর্ভসঞ্চার হয়েছে এ বিষয়ে জানার পর যে নারীর গর্ভে তার সন্তান বেড়ে উঠছে তাকে তালাক দেবে কি দেবে না সে সম্পর্কে পুরুষটি অন্তত দশবার ভেবে দেখবে। অপরদিকে নারীও তার নিজের ও সন্তানের ভবিষ্যত চিন্তা করে স্বামীর অসন্তুষ্টির কারণ দূর করার জন্য পুরোপুরি চেষ্টা করবে। কিন্তু চিন্তা-ভাবনা না করে অন্ধকারে তীর নিক্ষেপ করার পর যদি একথা জানতে পারে যে, গর্ভসঞ্চার হয়েছিল তাহলে উভয়কেই পরে অনুশোচনা করতে হবে।

এটা হচ্ছে ইদ্দতের জন্য তালাক দেয়ার প্রথম তাৎপর্য। দৈহিক মিলন হয়েছে এমন ঋতুবতী এবং গর্ভধারণে সক্ষম নারীদের জন্য এটি প্রযোজ্য। এখন থাকলো এর দ্বিতীয় তাৎপর্যটি। এ তাৎপর্যটি হলো, তালাক দিতে হলে ইদ্দত পর্যন্ত সময়ের জন্য তালাক দাও। অর্থাৎ একসাথে তিন তালাক দিয়ে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য তালাক দিয়ে ফেল না। বরং এক বা বড় জোর দুই তালাক দিয়ে ইদ্দত পর্যন্ত অপেক্ষা করো যাতে এই

সময়–কালের মধ্যে যেকোন সময় 'রুজু' করার বা ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ তোমার থাকে। এই তাৎপর্য অনুসারে এই নির্দেশটি দৈহিক মিলন হয়েছে এমন ঋতুবতী মহিলাদের জন্য যেমন কল্যাণকর তেমনি যাদের ঋতু বন্ধ হয়ে গিয়েছে, বা এখনো যাদের ঋতু আসেনি অথবা তালাক দেয়ার সময় যাদের গর্ভসঞ্চার হয়েছে বলে জানা গেছে তাদের সবার জন্য সমানভাবে কল্যাণকর। আল্লাহর এই নির্দেশের অনুসরণ করলে তালাক দেয়ার পর কাউকেই পস্তাতে হবে না। কারণ এভাবে তালাক দিলে ইদ্দতের মধ্যে 'রুজু' করা বা ফিরিয়ে নেয়া যায় এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পরেও পূর্বতন স্বামী–স্ত্রী যদি পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় তাহলে পুনরায় বিয়ের মাধ্যমে তা করা সম্ভব।

বড় বড় মুফাসসির طَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ আয়াতাংশের যে অর্থ বর্ণনা করেছেন তা এই। এর তাফসীর করতে গিয়ে ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ ঋতু অবস্থায় তালাক দেবে না এবং যে 'তুহরে' স্বামী দৈহিক মিলন করেছে সে 'তুহরে'ও দেবে না। বরং তাকে ঋতুস্রাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র হওয়ার সুযোগ দেবে। অতপর তাকে এক তালাক দেবে। এ ক্ষেত্রে স্বামী যদি রুজু নাও করে এবং এমতাবস্থায় ইদ্দতের সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে স্ত্রী কেবল এক তালাক দ্বারা বিচ্ছিন্ন হবে (ইবনে জারীর)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ "ইদ্দতের জন্য তালাক দেয়ার অর্থ হলা, 'তুহরে' তথা পবিত্রাবস্থায় দৈহিক মিলন না করেই তালাক দেবে।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর, 'আতা, মুজাহিদ, মায়মুন ইবনে মাহরান, মুকাতিল ইবনে হাইয়ান এবং দাহ্হাক রাহিমাহমুল্লাহ থেকে এ তাফসীর বর্ণিত হয়েছে (ইবনে কাসীর)। ইকরিমা এর অর্থ বর্ণনা করে বলেছেন ঃ "নারীর গর্ভসঞ্চার হয়েছে এ বিষয়ে জেনে তালাক দেবে। দৈহিক মিলন হয়েছে এ অবস্থায় নারীর গর্ভসঞ্চার হয়েছে কি হয়নি সে বিষয়ে না জেনে তালাক দেবে না" (ইবনে কাসীর)। হযরত হাসান বসরী ও ইবনে সিরীন বলেন ঃ 'তুহর' অবস্থায় দৈহিক মিলন না করে তালাক দেবে কিংবা গর্ভ যখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন তালাক দেবে (ইবনে জারীর)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর তাঁর স্ত্রীকে মাসিক চলাকালে তালাক দিলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত স্পষ্ট করে এ আয়াতের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করেছিলেন। প্রায় সবগুলো হাদীসগ্রন্থেই এ ঘটনা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয়েছে। এসব বিষয়ে আইনের উৎস মূলত এটিই। ঘটনাটা হলো, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর তাঁর স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দিলে হযরত উমর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে তা বর্ণনা করলেন। এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন ঃ "স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য তাকে নির্দেশ দাও। পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত সে যেন তাকে স্ত্রী হিসেবেই রাখে। এরপর যখন তার মাসিক হবে এবং তা থেকেও পবিত্র হবে তখন যদি সে তাকে তালাক দিতে চায় তাহলে সেই পবিত্রাবস্থায় দৈহিক মিলন না করে তালাক দেবে। মহান আল্লাহ যে ইদ্দতের জন্য তালাক দিতে বলেছেন এটিই সেই ইদ্দত।" একটি হাদীসের ভাষ্য হলো, "পবিত্রাবস্থায় দৈহিক মিলন না করে তালাক দেবে অথবা এমন অবস্থায় তালাক দেবে যখন তার গর্ভ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।"

বড় বড় সাহাবী কর্তৃক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আরো কতিপয় হাদীসও এ আয়াতের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যের ওপর অধিক আলোকপাত করে।

নাসায়ী হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানানো হলো যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছে। একথা শুনে নবী (সা) ক্রোধে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং বললেন ঃ

أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟

"আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকতেই আল্লাহর কিতাব নিয়ে খেলা হচ্ছে?"

এ ধরনের আচরণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্রোধের মাত্রা দেখে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ঃ আমি কি তাকে হত্যা করবো না? আবদুর রাযযাক হযরত উবাদা ইবনে সামেত সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা নিজের স্ত্রীকে হাজার তালাক দিয়ে ফেললে তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ

بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَبَقِىَ، تِسْعُ مِأَةٍ وَسَبْعَ وَتِسْعُوْنَ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا ، اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَذَّبَهُ ، وَاِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ –

"সে আল্লাহর নাফরমানি করেছে আর ঐ স্ত্রী তিন তালাক দ্বারা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এখন নয় শত সাতানব্বই তালাক জুলুম ও সীমালংঘন হিসেবে অবশিষ্ট আছে। আল্লাহ চাইলে এ জন্য তাকে আযাব দিতে পারেন কিংবা ক্ষমাও করতে পারেন।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর সম্পর্কিত ঘটনার বিস্তারিত যে বিবরণ দারুকুতনী ও ইবনে আবী শায়বা হাদীসগ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত হয়েছে তাতে এ কথাটিও আছে যে, নবী (সা) আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিলে আবদুল্লাহ ইবনে উমর জিজ্ঞেস করলেন, আমি যদি তাকে তিন তালাক দিতাম তাহলেও কি ফিরিয়ে নিতে পারতাম? নবী (সা) জবাব দিলেন ঃ كانت تبين منك وكانت معصية "না, এ অবস্থায় সে তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। তবে এটি হতো একটি গোনাহর কাজ।" একটি হাদীসে নবীর (সা) বক্তব্যের ভাষা বর্ণিত হয়েছে এভাবে ঃ اذا قد عصيت ربك وبانت منك امراتك "এরূপ করলে তুমি তোমার রবের নাফরমানি করতে। কিন্তু তোমার স্ত্রী তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।"

এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম থেকে যেসব ফাতাওয়া বর্ণিত হয়েছে তাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ও নির্দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মুয়াত্তা হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি এসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে (রা) বলল। আমি আমার স্ত্রীকে আট তালাক দিয়ে ফেলেছি। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ বিষয়ে তোমাকে কি ফতোয়া দেয়া হয়েছে? সে বলল ঃ "আমাকে বলা হয়েছে যে, স্ত্রী আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।" আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেনঃ صدقوا ، هو مثل ما يقولون "তারা ঠিকই বলেছে। তারা মাসয়ালার যে সমাধান দিয়েছে তাই ঠিক।" আবদুর রায্যাক আলকামা থেকে এ মর্মে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে (রা) বলল ঃ আমি আমার স্ত্রীকে ৯৯ তালাক দিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ ثلاث بينها وسائر من عدوان "তিনটি

তালাক তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। অবশিষ্ট সবগুলোই বাড়াবাড়ি।" ওয়াকী ইবনুল জার্‌রাহ তাঁর সুনান গ্রন্থে এটি হযরত আলী (রা) ও হযরত উসমানের (রা) মত বলে উল্লেখ করেছেন। এক ব্যক্তি এসে হযরত উসমানকে বলল যে, সে তার স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দিয়ে ফেলেছে। হযরত উসমান বললেন ঃ بانت منك بثلاث "সে তিন তালাক দ্বারা তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।" হযরত আলীর (রা) সামনে অনুরূপ ঘটনা উপস্থাপিত হলে তিনি বলেছিলেন ঃ بَانَتْ مِنْكَ بِثَلاَثٍ وَاقْسِمْ سَائِرَ هُنَّ عَلَى نِسَائِكَ "সে তো তিন তালাক দ্বারা তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এখন অবশিষ্ট তালাকগুলো তোমার অন্যসব স্ত্রীদের জন্য বন্টন করে দাও।" আবু দাউদ ও ইবনে জারীর কিছুটা শাব্দিক তারতম্যসহ এ মর্মে মুজাহিদের একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি ইবনে আব্বাসের কাছে বসেছিলেন। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ আমি আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছি। এ কথা শুনে ইবনে আব্বাস নীরব থাকলেন। এতে আমার ধারণা জন্মালো যে, হয়তো তিনি তার স্ত্রীকে তার কাছে ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছেন। এরপর তিনি বললেন ঃ "তোমরা একেকটি লোক তালাক দেয়ার ব্যাপারে প্রথমে বোকামি করে বসো এবং পরে এসে হে ইবনে আব্বাস, হে ইবনে আব্বাস বলতে থাক। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যে ব্যক্তিই আল্লাহর ভয় মনে রেখে কাজ করবে আল্লাহ তার জন্য সমস্যা থেকে বের হয়ে আসার উপায় করে দেবেন। তুমি তো আল্লাহকে ভয় করো নাই। এখন আমি তোমার জন্য কোন উপায় দেখছি না। তুমি তোমার রবের নাফরমানি করেছো এবং তোমার স্ত্রী তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।" মুয়াত্তা হাদীসগ্রন্থ এবং তাফসীরে ইবনে জারীরে মুজাহিদ থেকেই আরো একটি হাদীস কিছুটা শাব্দিক তারতম্যসহ বর্ণিত হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একশত তালাক দেয়ার পর ইবনে আব্বাসের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন ঃ "তিন তালাক দ্বারা সে তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। অবশিষ্ট ৯৭ তালাক দ্বারা তুমি আল্লাহর আয়াতকে খেলার বস্তু বানিয়েছ।" এটি মুয়াত্তার ভাষা। ইবনে জারীরে ইবনে আব্বাসের বক্তব্যের যে ভাষা উদ্ধৃত করা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ "তুমি তোমার রবের নাফরমানি করেছ। তাই তোমার স্ত্রী তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। তুমি আল্লাহকে ভয় কর নাই। আল্লাহকে ভয় করলে এই কঠিন অবস্থা থেকে বাঁচার কোন উপায় আল্লাহ সৃষ্টি করতেন।" ইমাম তাহাবী একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসের কাছে এসে তাঁকে বলল, আমার চাচা তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছেন। ইবনে আব্বাস বললেন ঃ

إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللّٰهَ فَأَثِمَ وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا –

তোমার চাচা আল্লাহর নাফরমানি করে গোনায় লিপ্ত হয়েছে এবং শয়তানের আনুগত্য করেছে। তাই আল্লাহ তার জন্য এই কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন পথ রাখেননি।"

আবু দাউদ ও মুয়াত্তা হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি নির্জনবাসের আগেই তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার পর আবার তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী হলো এ উদ্দেশ্যে সে ফতোয়া জানতে বের হলো। হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াস ইবনে বুকাইর বলেন ঃ আমি তার সাথে ইবনে আব্বাস ও আবু হুরাইরা (রা)-এর কাছে গেলাম। তাঁরা উভয়েই যে জবাব দিয়েছিলেন তাহলো إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ

"তোমার জন্য যে সুযোগ ছিল তা তুমি হাতছাড়া করে ফেলেছো।" জামাখশারী তাঁর কাশশাফ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদানকারী যে ব্যক্তিই হযরত উমরের (রা) কাছে আসত তিনি তাকে প্রহার করতেন এবং তার প্রদত্ত তালাক কার্যকরী বলে গণ্য করতেন। সাঈদ ইবনে মনসুর হযরত আনাসের বর্ণনা থেকে সহীহ সনদে এ কথাটি উদ্ধৃত করেছেন। এ ব্যাপারে সাহাবা কিরাম যে সাধারণ মত পোষণ করতেন তা ইবনে আবী শায়বা ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবরাহীম নাখায়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে উদ্ধৃত করেছেন। মতটি হলো ঃ

إِنَّ الصَّحَابَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ اَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتّٰى تَحِيْضَ ثَلَاثَةَ حِيَضٍ -

"সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুম চাইতেন, স্বামী স্ত্রীকে প্রথমে এক তালাক দিক এবং তারপর তিনটি ঋতুকাল অতিবাহিত হোক।"

এটি ইবনে আবী শায়বার বক্তব্যের ভাষা। ইমাম মুহাম্মাদের বক্তব্যের ভাষা হলো ঃ

كَانُوا يَسْتَحِبُّوْنَ اَنْ لَا تَزِيْدُوْا فِى الطَّلَاقِ عَلٰى وَاحِدَةٍ حَتّٰى تَنْقَضِىَ الْعِدَّةُ -

"একসাথে এক তালাকের বেশী না দেয়া এবং এভাবে ইদ্দত পূর্ণ হতে দেয়া ছিল সাহাবায়ে কিরামের পছন্দনীয় পন্থা।"

এসব হাদীস সাহাবায়ে কেরামের মতামত ও বক্তব্যের আলোকে কুরআন মজীদের উপরোক্ত আয়াতের অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে ইসলামী ফিকাহবিদগণ বিস্তারিত যে বিধান তৈরী করেছেন আমরা তা নীচে বর্ণনা করছি।

এক ঃ হানাফী ফিকাহবিদগণের মতে তালাক তিন প্রকার, আহসান, হাসান এবং বেদয়ী। আহসান তালাক হলো, যে 'তুহরে' স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস করেনি সেই 'তুহরে' শুধু এক তালাক দিয়ে 'ইদ্দত' পূর্ণ হতে দেবে। হাসান তালাক হলো, প্রত্যেক 'তুহরে' একটি করে তালাক দেবে। এই নিয়মে তিন 'তুহরে' তিন তালাক দেয়াও সুন্নাতের পরিপন্থী নয়। যদিও একটি তালাক দিয়ে 'ইদ্দত' পূর্ণ হতে দেয়াটাই সর্বোত্তম। বিদআত তালাক হলো, ব্যক্তির এক সাথে তিন তালাক দিয়ে দেয়া কিংবা একই 'তুহরে' ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিন তালাক দিয়ে দেয়া বা হায়েয অবস্থায় তিন তালাক দেয়া অথবা যে 'তুহরে' সহবাস করেছে সেই 'তুহরে' তিন তালাক দেয়া। সে এর যেটিই করুক না কেন গোনাহগার হবে। ঋতুবতী ও দৈহিক মিলন হয়েছে এমন স্ত্রীলোকের জন্য এ বিধানটি প্রযোজ্য। এখন বাকী থাকে দৈহিক মিলন হয়নি এমন স্ত্রীকে তালাকের ব্যাপারটি। এরূপ স্ত্রীকে 'তুহর' ও 'হায়েয' উভয় অবস্থায় সুন্নাত অনুসারে তালাক দেয়া যেতে পারে। কিন্তু স্ত্রী যদি এমন হয় যে, তার সাথে দৈহিক মিলন হয়েছে কিন্তু তার ঋতুস্রাব হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে অথবা এখনো ঋতুস্রাব হয়নি তাহলে দৈহিক মিলনের পরেও তাকে তালাক দেয়া যেতে পারে। কেননা, তার গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর স্ত্রী গর্ভবতী হলে

সহবাসের পরেও তাকে তালাক দেয়া যেতে পারে। কারণ, তার গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি আগে থেকেই জানা আছে। কিন্তু এই তিন শ্রেণীর স্ত্রীলোককে তালাক দেয়ার সুন্নাত পন্থা হলো এক মাস পর পর তালাক দেয়া। আর আহসান তালাক হলো, এক তালাক দিয়ে 'ইদ্দত' অতিবাহিত হতে দেয়া" (হিদায়া, ফাতহুল কাদীর, আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস, উমদাতুল কারী)।

ইমাম মালেকের (র) মতেও তালাক তিন প্রকার ঃ সুন্নী, বিদয়ী মাকরূহ এবং বিদয়ী হারাম। সুন্নাত অনুসারে তালাক হলো, নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় এমন সহবাসকৃত স্ত্রীকে 'তুহর' অবস্থায় সহবাস না করে এক তালাক দিয়ে ইদ্দত অতিবাহিত হতে দেয়া। বিদয়ী মাকরূহ তালাক হলো, যে 'তুহরে' সহবাস করা হয়েছে সেই তুহরে তালাক দেয়া, কিংবা সহবাস না করে এক 'তুহরে' একাধিক তালাক দেয়া বা ইদ্দত পালনকালে ভিন্ন ভিন্ন তুহরে তিন তালাক দেয়া অথবা একসাথে তিন তালাক দিয়ে দেয়া। আর বিদয়ী হারাম তালাক হলো, ঋতুস্রাবকালে তালাক দেয়া। (হাশিয়াতুদ দাসূকী আলাশশারহিল কাবীর, আহকামুল কুরআন—ইবনুল আরাবী)।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের (র) নির্ভরযোগ্য মত হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ ফিকাহবিদ যে বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন—তা হলো নিয়মিত মাসিক স্রাব হয় এবং স্বামীর সাথে দৈহিক মিলন হয়েছে এমন স্ত্রীলোককে সুন্নাত অনুসারে তালাক দেয়ার নিয়ম হচ্ছে 'তুহর' অবস্থায় তার সাথে সহবাস না করে তালাক দিতে হবে এবং 'ইদ্দত' অতিবাহিত হওয়ার জন্য এই অবস্থায়ই রেখে দিতে হবে। তবে তাকে যদি তিন 'তুহরে' আলাদাভাবে তিন তালাক দেয়া হয় কিংবা একই 'তুহরে' তিন তালাক দেয়া হয় বা একই সাথে তিন তালাক দেয়া হয় অথবা ঋতুস্রাবকালে তালাক দেয়া হয় অথবা যে 'তুহরে' সহবাস করা হয়েছে সেই 'তুহরেই' তালাক দেয়া, কিন্তু তার গর্ভবতী হওয়ার বিষয় প্রকাশ না পায় তাহলে এসব তালাক বিদআত ও হারাম। তবে নারী যদি এমন হয় যার সাথে সহবাস করা হয়নি অথবা সহবাস করা হয়েছে কিন্তু তার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে অথবা ঋতুস্রাব এখনো শুরু হয়নি অথবা গর্ভবতী, তাহলে তার ক্ষেত্রে না সময়ের বিবেচনায় সুন্নাত ও বিদআত বলে কোন পার্থক্য আছে, না তালাকের সংখ্যার বিবেচনায় কোন পার্থক্য আছে। (আল ইনসাফ ফী মা'রিফাতির রাজেহ মিনাল খেলাফ আলা মাযহাবি আহমাদ ইবনে হাম্বল)।

ইমাম শাফেয়ী (র)–এর মতে তালাককে সুন্নাত ও বিদআত হিসেবে পৃথক করা যেতে পারে কেবল সময়ের বিচারে সংখ্যার বিচারে নয়। অর্থাৎ নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় এবং দৈহিক মিলন হয়েছে এমন নারীকে ঋতুস্রাবকালে তালাক দেয়া অথবা গর্ভধারণে সক্ষম নারীকে যে তুহরে সহবাস হয়েছে সেই তুহরে তালাক দেয়া কিন্তু তার গর্ভাবস্থা প্রকাশ পায়নি, বিদআত ও হারাম। এরপর থাকে তালাকের সংখ্যা সম্পর্কিত বিষয়টি। এ ক্ষেত্রে একই সাথে তিন তালাক দেয়া হোক অথবা একই তুহরে বা ভিন্ন ভিন্ন 'তুহরে' দেয়া হোক কোন অবস্থায়ই তা সুন্নাতের পরিপন্থী নয়। আর দৈহিক মিলন হয়নি এমন নারী অথবা এমন নারী যার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে অথবা এখনো শুরু হয়নি অথবা গর্ভবতী হওয়া প্রকাশ পেয়েছে তাকে দেয়া তালাকের ক্ষেত্রে সুন্নাত বিদআতের পার্থক্য প্রযোজ্য নয়। (মুগনিউল মুহতাজ)

দুই ঃ কোন তালাক বিদআত, মাকরূহ, হারাম বা গোনাহর কাজ হওয়ার অর্থ চার ইমামের নিকট এই নয় যে, তা কার্যকর হবে না। তালাক মাসিক অবস্থায় দেয়া হয়ে থাকুক অথবা একসাথে তিন তালাক দেয়া হয়ে থাকুক, অথবা যে তুহরে দৈহিক মিলন হয়েছে সেই তুহরে দেয়া হয়ে থাকুক কিন্তু গর্ভ প্রকাশ পায়নি অথবা কোন ইমামের দৃষ্টিতে বিদআত এমন কোন পন্থায় দেয়া হয়ে থাকুক সর্বাবস্থায় তা কার্যকরী হবে। আর তালাকদাতা ব্যক্তি গোনাহগার হবে। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুজতাহিদ এ ব্যাপারে চার ইমামের সাথে মতানৈক্য পোষণ করেছেন।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব এবং আরো কিছু সংখ্যক তাবেয়ীর মতে যে ব্যক্তি সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ করে ঋতু অবস্থায় তালাক দেবে অথবা একই সাথে তিন তালাক দেবে তার তালাক আদৌ কার্যকর হয় না। ইমামিয়া মাযহাবের অনুসারীরাও এমত পোষণ করেন। এমতের ভিত্তি হলো, এরূপ করা যেহেতু নিষিদ্ধ এবং হারাম বিদআত তাই তা কার্যকর নয়। অথচ আমরা ওপরে যেসব হাদীস উদ্ধৃত করেছি তাতে বলা হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর মাসিক অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিলে নবী (সা) তাঁকে রুজু করার বা ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ তালাক যদি আদৌ কার্যকর না হয়ে থাকবে তাহলে রুজু করার নির্দেশ দেয়ার কি অর্থ থাকতে পারে? তাছাড়া বহু সংখ্যক হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত যে, নবী (সা) এবং বড় বড় সাহাবী একের অধিক তালাক দানকারীকে গোনাহগার বললেও তার দেয়া তালাককে অকার্যকর বলেননি।

তাউস ও ইকরিমা বলেন, একসাথে তিন তালাক দিলে সে ক্ষেত্রে শুধু এক তালাক কার্যকর হবে। ঈমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-ও এ সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেছেন। একটি রেওয়ায়াত তাদের এ মতের উৎস ও ভিত্তি। রেওয়ায়াতটি হলো, আবুস্ সাহবা ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি জানেন না রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবু বকরের (রা) সময়ে এবং হযরত উমরের (রা) যুগের প্রথম ভাগে তিন তালাককে এক তালাক বলে গণ্য করা হতো?" তিনি জবাব দিলেন ঃ হাঁ (বুখারী ও মুসলিম)। তাছাড়া মুসলিম, আবু দাউদ এবং মুসনাদে আহমাদে ইবনে আব্বাসের এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবু বকরের (রা) যুগে এবং হযরত উমরের (রা) যুগের প্রথম দুই বছরে তিন তালাককে এক তালাক বলে গণ্য করা হতো। পরবর্তী সময়ে হযরত উমর (রা) বললেন যে, মানুষ এমন এমন একটি বিষয়ে তাড়াহুড়া করতে শুরু করেছে, যে বিষয়ে ভেবে চিন্তে ও বুঝে সুজে কাজ করার অবকাশ দেয়া হয়েছিল। এখন আমরা তাদের এ কাজকে কার্যকর করবো না কেন? সুতরাং তিনি তা কার্যকর বলে ঘোষণা করলেন।

কিন্তু কয়েকটি কারণে এ মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত কয়েকটি রেওয়ায়াত অনুসারে ইবনে আব্বাসের নিজের ফতোয়াই এর পরিপন্থী ছিল। এ কথা আমরা ওপরে উদ্ধৃত করেছি। দ্বিতীয়ত এ মতটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং বড় বড় সাহাবী থেকে বর্ণিত যেসব হাদীসে তিন তালাক দানকারী সম্পর্কে ফতোয়া দেয়া হয়েছে যে, তার দেয়া তিন তালাকই কার্যকর হবে তার পরিপন্থী। আমরা ওপরে ঐ হাদীসগুলোর উদ্ধৃত করেছি। তৃতীয়ত ইবনে আব্বাসের নিজের রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত উমর (রা) সাহাবায়ে কিরামের (রা) সমাবেশে তিন তালাক কার্যকর করার কথা ঘোষণা

করেছিলেন। কিন্তু সে সময় বা পরবর্তীকালে কোন সময়ই সাহাবীদের মধ্যে থেকে কেউ এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেননি। এখন কথা হলো, হযরত উমর (রা) সুন্নাতের পরিপন্থী কোন কাজ করেছেন এ কথা কি কল্পনা করা যেতে পারে? আর সে বিষয়ে সমস্ত সাহাবী নিশ্চুপ থাকবেন এ কথাও কি মেনে নেয়া যেতে পারে? তাছাড়া রুকানা ইবনে আবদে ইয়াযীদের ঘটনা সম্পর্কে আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, ইমাম শাফেয়ী (র), দারেমী এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন যে, রুকানা তার স্ত্রীকে একই সাথে তিন তালাক দিলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে হলফ করিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, সত্যিই কি তার এক তালাক দেয়ার নিয়ত ছিল? (অর্থাৎ অন্য দু'টি তালাক প্রথম তালাকটির ওপর জোর দেয়া এবং গুরুত্ব আরোপ করার জন্য তার মুখ থেকে বেরিয়ে ছিল এবং তিন তালাক দিয়ে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেয়া তার উদ্দেশ্য ছিল না) তিনি হলফ করে এ বর্ণনা দিলে নবী (সা) তাকে রুজু করার বা ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার দিয়েছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে কোন প্রকারের তালাকসমূহকে এক তালাক হিসেবে গণ্য করা হতো তার প্রকৃতি এসব ঘটনা থেকে জানা যায়। এ কারণে হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতের এই অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, যেহেতু প্রাথমিক যুগে দীনি ব্যাপারে মানুষের মধ্যে খিয়ানত প্রায় ছিল না বললেই চলে তাই তিন তালাক দানকারীর এ বক্তব্য মেনে নেয়া হতো যে, তার প্রকৃত নিয়ত ছিল এক তালাক দেয়ার। অন্য দু'টি তালাক প্রথম তালাকের ওপর জোর দেয়ার জন্যই তার মুখ থেকে বেরিয়েছিল। কিন্তু হযরত উমর দেখলেন যে, মানুষ তাড়াহুড়া করে প্রথমে তিন তালাক দিয়ে বসে এবং পরে প্রথম তালাকের ওপর জোর দেয়ার বা গুরুত্ব আরোপ করার বাহানা করে। তাই তিনি এ বাহানা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। ইমাম নববী ও ইমাম সুবকী এ ব্যাখ্যাটিকে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতের উত্তম ব্যাখ্যা বলে অভিহিত করেছেন। শেষ কথা হলো, ইবনে আব্বাসের বক্তব্য সম্পর্কে আবুস সাহবা কর্তৃক যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাতেও অসামঞ্জস্য রয়েছে। মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী আবুস সাহবা থেকে অপর যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি জিজ্ঞেস করায় ইবনে আব্বাস বললেন ঃ "নির্জন বাসের পূর্বেই কেউ তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবু বকরের (রা) যুগে এবং হযরত উমরের (রা) যুগের প্রথম দিকে তাকে এক তালাক বলে গণ্য করা হতো।" এভাবে একই বর্ণনাকারী ইবনে আব্বাস থেকে দু'টি পরস্পর বিরোধী রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। এই পরস্পর বিরোধিতা দু'টি রেওয়ায়াতকেই দুর্বল করে দেয়।

তিন ঃ স্ত্রীর ঋতুস্রাব চলাকালে তালাকদাতাকে যেহেতু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'রুজু' করার আদেশ দিয়েছিলেন তাই এ নির্দেশকে কোন্ অর্থে গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে ফিকাহবিদদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ, ইমাম আওযায়ী, ইবনে আবী লায়লা, ইসহাক ইবনে রাহাবিয়া এবং আবু সাওর বলেন ঃ "ঐ ব্যক্তিকে 'রুজু' করার নির্দেশ দেয়া হবে তবে 'রুজু' করতে বাধ্য করা হবে না।" (উমদাতুল কারী)। হিদায়া গ্রন্থে হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের যে মত বর্ণনা করা হয়েছে সে অনুসারে 'রুজু' করা শুধু মুস্তাহাব নয় বরং ওয়াজিব। মুগনিউল মুহতাজ গ্রন্থে শাফেয়ী মাযহাবের যে মত বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে, যে ব্যক্তি মাসিক চলাকালে স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে কিন্তু তিন তালাক দেয়নি তার জন্য সুন্নাত পন্থা হলো,

সে রুজু করবে এবং এর পরবর্তী তুহরেই তালাক না দিয়ে তা অতিবাহিত হতে দেবে এবং তা অতিবাহিত হওয়ার পর স্ত্রী পুনরায় যখন মাসিক থেকে পবিত্র হবে তখন চাইলে তালাক দেবে, যাতে ঋতুকালে প্রদত্ত তালাক থেকে 'রুজু' করা খেলার বস্তুতে পরিণত না হয়। আল ইনসাফ গ্রন্থে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীদের যে মত বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে, এ অবস্থায় তালাক দানকারীর জন্য 'রুজু' করা মুস্তাহাব। কিন্তু ২মাম মালেক ও তাঁর সঙ্গীদের মতে ঋতু চলাকালে তালাক দেয়া পুলিশের হস্তক্ষেপযোগ্য অপরাধ। স্ত্রী দাবী করুক বা না করুক সর্বাবস্থায় শাসকের অবশ্য কর্তব্য হলো যখন কোন ব্যক্তির এ ধরনের কাজ সম্পর্কে তিনি জানতে পারবেন তখনই তাকে 'রুজু' করতে বাধ্য করবেন এবং ইদ্দতের শেষ সময় পর্যন্ত তাকে চাপ দিতে থাকবেন। সে অস্বীকৃতি জানালে তাকে বন্দী করবেন। এরপরও অস্বীকৃতি জানালে প্রহার করবেন। তারপরও সে যদি না মানে তাহলে শাসক নিজেই সিদ্ধান্ত দেবেন যে, তিনি তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। শাসক বা বিচারকের এই সিদ্ধান্ত 'রুজু' বলে গণ্য হবে। এরপর স্বামীর রুজু করার নিয়ত থাক বা না থাক তার জন্য ঐ স্ত্রীর সাথে সহবাস করা বৈধ হবে। কারণ শাসক বা বিচারকের নিয়ত তার নিয়তের বিকল্প (হাশিয়াতুদ দুসুকী)। মালেকীরা এ কথাও বলেন যে, যে ব্যক্তি ঋতুস্রাবকালে প্রদত্ত তালাক থেকে ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় রুজু করেছে সে যদি তালাক দিতেই চায় তাহলে তার জন্য মুস্তাহাব পন্থা হলো, সে যে হায়েজে তালাক দিয়েছে তার পরের 'তুহরে'ই তালাক দেবে না। বরং পুনরায় হায়েজ আসার পর যখন পবিত্র হবে তখন তালাক দেবে। তালাকের পরবর্তী তুহরেই তালাক না দেয়ার নির্দেশ মূলত এজন্য দেয়া হয়েছে যে, হায়েজ অবস্থায় তালাক দানকারীর 'রুজু' করা যেন কেবল মৌখিক না হয়। বরং স্ত্রীর পবিত্রতার সময় তার স্ত্রীর সাথে দৈহিকভাবে মিলিত হওয়া উচিত। তারপর যে 'তুহরে' দৈহিক মিলন হয়েছে সেই 'তুহরে' তালাক দেয়া যেহেতু নিষিদ্ধ তাই তালাক দেয়ার সঠিক সময় তার পরবর্তী 'তুহর'। (হাশিয়াতুদ দুসুকী)

চার ঃ রিজয়ী তালাকদাতার জন্য 'রুজু' করার সুযোগ কতক্ষণ? এ বিষয়েও ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সূরা বাকারার ২২৮ আয়াতের ثلثة قروء অর্থ তিন হায়েজ না তিন 'তুহর' এ প্রশ্নের ভিত্তিতেই এ মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র) এবং ইমাম মালেকের (র) মতে قرء শব্দের অর্থ 'তুহর'। হযরত আয়েশা, ইবনে উমর এবং যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহ আনহুম থেকেও এ মতটিই বর্ণিত হয়েছে। হানাফীদের মত হলো, قرء শব্দের অর্থ হায়েজ। এটিই ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের নির্ভরযোগ্য মত। খোলাফায়ে রাশেদীনের চার খলিফা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), উবাই ইবনে কা'ব, মু'য়ায ইবনে জাবাল, আবুদ্ দারদা, উবাদা ইবনে সামেত এবং আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহ আনহুম থেকে এ মতটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদ তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে শা'বীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ১৩ জন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তাঁরাও সবাই এ মত পোষণ করেছেন। তাছাড়া বহু সংখ্যক তাবেয়ীও এ মত পোষণ করেছেন।

এ মতভেদের ওপর ভিত্তি করে শাফেয়ী এবং মালেকীদের মতে তৃতীয় হায়েজ শুরু হওয়া মাত্রই স্ত্রীর ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যায় এবং স্বামীর রুজু করার অধিকার বাতিল হয়ে যায়। তবে যদি হায়েজ অবস্থায় তালাক দেয়া হয়ে থাকে তাহলে ঐ হায়েজ ইদ্দতের

মধ্যে গণ্য হবে না, বরং চতুর্থ হায়েজ শুরু হওয়া মাত্র ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যাবে (মুগনিউল মুহতাজ, হাশিয়াতুদ দুসুকী)। হানাফীদের মত হলো, তৃতীয় হায়েজের দশদিন অতিবাহিত হওয়ার পর যদি রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায় তবে নারী গোসল করুক বা না করুক তার ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যাবে। আর যদি দশদিনের কম সময়ের মধ্যে রক্তস্রাব বন্ধ হয় তাহলে গোসল না করা পর্যন্ত অথবা এক ওয়াক্ত নামাযের পুরো সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত ইদ্দতকাল শেষ হবে না। পানি না থাকার পরিস্থিতিতে ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফের (র) মতে নারী যখন তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নেবে তখন স্বামীর রুজু করার অধিকার শেষ হয়ে যাবে আর ইমাম মুহাম্মাদের মতে তায়াম্মুম করা মাত্রই রুজু করার অধিকার শেষ হয়ে যাবে (হিদায়া)। ইমাম আহমাদের নির্ভরযোগ্য যে মতটি সম্পর্কে হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ অনুসারী একমত তা হচ্ছে, স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় হায়েজ থেকে মুক্ত হয়ে গোসল না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর 'রুজু' করার অধিকার থাকবে (আল ইনসাফ)।

পাঁচ ঃ রুজু কিভাবে হয় আর কিভাবে হয় না? এ মাসয়ালার ক্ষেত্রে ফিকাহবিদদের মধ্যে এ বিষয়ে ঐকমত্য আছে যে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে রিজয়ী তালাক দিয়েছে স্ত্রী সম্মত হোক বা না হোক ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে সে যখন ইচ্ছা 'রুজু' করতে পারে। কেননা কুরআন মজীদে (সূরা বাকারাহ, আয়াত ২২৮) বলা হয়েছেঃ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ "এই সময়ের মধ্যে তাদের স্বামী তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার পূর্ণ অধিকার রাখে।" এ থেকে স্বতই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, 'ইদ্দত' শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের বিবাহ বন্ধন বহাল থাকে এবং চূড়ান্তভাবে ছেড়ে দেয়ার পূর্বে সে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে। অন্য কথায় 'রুজু' করা বিবাহ নবায়ন করা নয় যে, সেজন্য স্ত্রীর সম্মতি প্রয়োজন হবে। এতটুকু পর্যন্ত ঐকমত্য পোষণ করার পর ফিকাহবিদগণ 'রুজু' করার পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

শাফেয়ী মাযহাবের মতে, 'রুজু' করা শুধু কথার দ্বারাই হতে পারে, কাজ দ্বারা নয়। 'আমি তোমাকে রুজু করলাম অর্থাৎ ফিরিয়ে নিলাম' এ কথা যদি তালাকদাতা না বলে তাহলে দৈহিক মিলন বা মেলামেশার মত কোন কাজ 'রুজু' করার নিয়তে করা হলেও তাকে 'রুজু' বলে গণ্য করা হবে না। বরং এ ক্ষেত্রে নারীকে যে কোন পন্থায় উপভোগ করা এবং তার থেকে তৃপ্তি লাভ করা হারাম, এমনকি তা যৌন উত্তেজনা ছাড়া হয়ে থাকলেও। কিন্তু রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে সে জন্য কোন হদ বা শাস্তি হবে না। কারণ, রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস হারাম হওয়ার ব্যাপারে সকল উলামা একমত নন। তবে যে ব্যক্তি এ ক্ষেত্রে সহবাস হারাম বলে মনে করে তাকে তাযীর করা হবে। তাছাড়া শাফেয়ী মাযহাব অনুসারে রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস করার কারণে সর্বাবস্থায় 'মহরে মিস্‌ল' বা সমতুল্য মহরানা পরিশোধ করা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। সহবাস করার পর স্বামী মৌখিকভাবে 'রুজু' করুক বা না করুক তাতে কিছু এসে যায় না। (মুগনিউল মুহতাজ)

মালেকী মাযহাবের অনুসারীদের মতে 'রুজু' কথা ও কাজ উভয়ভাবেই হতে পারে। কথার দ্বারা রুজু করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি যদি স্পষ্ট ভাষা প্রয়োগ করে তাহলে 'রুজু' করার নিয়ত তার থাক বা না থাক 'রুজু' হয়ে যাবে। এমনকি স্পষ্টভাবে রুজু করা বুঝায় এমন

শব্দ যদি সে তামাসাচ্ছলেও বলে তবুও তা 'রুজু' বলে গণ্য হবে। তবে কথা যদি সুস্পষ্ট না হয় তাহলে কেবল 'রুজু'র নিয়তে বলা হয়ে থাকলে তবেই তা রুজু বলে গণ্য হবে। এরপর থাকে কোন কাজ দ্বারা 'রুজু' করার বিষয়টি। এ ক্ষেত্রে মেলামেশা হোক বা সহবাস হোক ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কাজকে 'রুজু' হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে না যতক্ষণ না তা 'রুজু'র নিয়তে করা হবে। (হাশিয়াতুদ্ দুসুকী, আহকামুল কুরআন—ইবনুল আরাবী)

কথা দ্বারা বা মৌখিকভাবে রুজু করার বেলায় হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের মতামত মালেকী মাযহাবের অনুরূপ। কিন্তু কাজ দ্বারা রুজু করার ক্ষেত্রে তাদের মতামত মালেকীদের বিপরীত। এ ক্ষেত্রে হানাফী ও হাম্বলী উভয় মাযহাবের ফতোয়া হলো স্বামী যদি ইদ্দতের মধ্যেই রিজয়ী 'তালাকপ্রাপ্তা' স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তাহলে এ ক্ষেত্রে সে 'রুজু' করার নিয়তে করুক বা না করুক তার এই কাজ আপনা থেকেই রুজু বলে গণ্য হবে। তবে উভয় মাযহাবের সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, হানাফীদের মতে, মেলামেশার যে কোন কাজই 'রুজু' বলে গণ্য হবে এমনকি যদি তা সহবাসের চেয়ে নিম্নস্তরের কোন কাজও হয়। কিন্তু হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীগণ শুধু মেলামেশাকে রুজু বলে স্বীকার করেন না।" (হিদায়া, ফাতহুল কাদীর, উমদাতুল কারী, আল ইনসাফ)

ছয় ঃ ফলাফলের দিক দিয়ে সুন্নাত তালাক ও বিদআত তালাকের মধ্যে পার্থক্য এই যে, এক তালাক বা দুই তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে ইদ্দতকাল শেষ হয়ে গেলেও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী এবং তার পূর্ব স্বামীর মধ্যে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পুনরায় বিয়ে হতে পারে। কিন্তু কেউ যদি তিন তালাক দিয়ে ফেলে তাহলে ইদ্দতের মধ্যে যেমন 'রুজু' করা সম্ভব নয় তেমনি ইদ্দত শেষে পুনরায় বিয়ে হওয়াও সম্ভব নয়। তবে উক্ত মহিলার যদি অন্য কোন পুরুষের সাথে যথাযথভাবে বিয়ে হয়ে থাকে আর সে তার সাথে সহবাস করে এবং পরে তালাক দেয় কিংবা মরে যায় এবং তারপর সেই মহিলা ও তার পূর্ব স্বামী পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় তাহলে তা করতে পারবে। অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থে সহীহ সনদে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। এরপর সেই মহিলা অন্য এক পুরুষকে বিয়ে করেছে। দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তার নির্জনবাসও হয়েছে কিন্তু সহবাস হয়নি। এমতাবস্থায় সে তাকে তালাক দিয়েছে। এখন এই মহিলার কি তার পূর্ব স্বামীর সাথে পুনরায় বিয়ে হতে পারে? নবী (সা) জবাব দিলেন ঃ

لا، حتى يذوق الاخر من عسيلتها ماذاق الاول

"না, ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারে না যতক্ষণ তার দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর মত দৈহিক মিলন না করবে।"

এরপর থাকে পাতানো বিয়ে সম্পর্কে কথা। এ ধরনের বিয়েতে আগে থেকেই শর্ত থাকে যে, নারীকে তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল করার নিমিত্তে এক ব্যক্তি তাকে বিয়ে করবে এবং সহবাস করার পর তালাক দেবে। ইমাম আবু ইউসুফের (র) মতে এ ধরনের শর্তযুক্ত বিয়ে আদৌ বৈধ হয় না। ইমাম আবু হানীফার (র) মতে, এভাবে তাহলীল হয়ে

যাবে, তবে কাজটি মাকরূহ তাহরিমী বা হারাম পর্যায়ের মাকরূহ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (ترمذى ، نسائى)

"যে তাহলীল করে এবং যে তাহলীল করায় তাদের উভয়কে আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন।" (তিরমিযী, নাসায়ী)।

হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেনঃ الا اخبركم بالتيس المستعار؟ "আমি কি তোমাদেরকে ভাড়াটে ষাঁড় সম্পর্কে অবহিত করবো না? সাহাবাগণ বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, অবশ্যই করবেন। তিনি বললেন ঃ

هُوَ الْمُحَلِّلُ ، لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (ابن ماجه ، دار قطنى)

"ভাড়াটে ষাঁড় হচ্ছে তাহলীলকারী। যে তাহলীল করে এবং যে তাহলীল করায় আল্লাহ তাদের উভয়কে লা'নত করেছেন। (ইবনে মাজা, দারু কুতনী)।

২. এই নির্দেশ পুরুষ, নারী এবং তাদের পরিবারের লোকজনদের উদ্দেশ্য করে দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো, তালাককে এমন খেলার বস্তু মনে করো না যে, তালাকের মত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর কবে তালাক দেয়া হয়েছে, কবে ইদ্দত শুরু হয়েছে এবং কবে তা শেষ হবে তাও মনে রাখা হবে না। তালাক একটি অত্যন্ত নাজুক ব্যাপার। এ থেকে স্বামী, স্ত্রী, তাদের সন্তান-সন্ততি এবং গোটা পরিবারের জন্য বহু আইনগত সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই তালাক দেয়া হলে তার সময় ও তারিখ মনে রাখতে হবে, কি অবস্থায় নারীকে তালাক দেয়া হয়েছে তাও মনে রাখতে হবে। সাথে সাথে হিসেব করে দেখতে হবে ইদ্দত কবে শুরু হয়েছে, কত সময় এখনো অবশিষ্ট আছে এবং কবে তা শেষ হয়েছে। এই হিসেবের ওপরই এ সিদ্ধান্ত নির্ভর করে যে, কোন্ সময় পর্যন্ত স্বামীর 'রুজু' করার অধিকার আছে, কোন সময় পর্যন্ত নারীকে তার বাড়ীতে রাখতে হবে, কতদিন পর্যন্ত তাকে খোরপোষ দিতে হবে, কতদিন পর্যন্ত সে নারীর উত্তরাধিকারী হবে এবং নারী তার উত্তরাধিকারীনী হবে। কখন নারী তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় বিয়ে করার অধিকার পাবে। তাছাড়া ব্যাপারটি যদি মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়ায় তাহলে সঠিক রায় দানের জন্য আদালতকেও তালাকের যথার্থ তারিখ ও সময় এবং নারীর অবস্থা জানার প্রয়োজন হবে। কারণ এ ছাড়া আদালত সহবাসকৃতা ও সহবাসকৃতা নয় এমন নারী, গর্ভবতী ও অগর্ভবতী, ঋতুবতী ও অঋতুবতী এবং রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা ও অন্য প্রকার তালাকপ্রাপ্তা নারীদের ক্ষেত্রে তালাক থেকে সৃষ্ট সমস্যাবলীর যথার্থ ফায়সালা করতে অক্ষম।

৩. অর্থাৎ রাগান্বিত হয়ে স্বামী স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বের করে দেবে না কিংবা রাগান্বিতা হয়ে স্ত্রী নিজেও বাড়ী ছেড়ে যাবে না। ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাড়ী তার। ঐ বাড়ীতেই তাদের উভয়কে থাকতে হবে যাতে পারস্পরিক সমঝোতার কোন সম্ভাব্য উপায় সৃষ্টি হলে তা কাজে লাগিয়ে উপকৃত হওয়া যায়। রিজয়ী তালাকের ক্ষেত্রে স্বামী যে

কোন সময় স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে এবং স্ত্রীও বিরোধের কারণসমূহ দূর করে স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য সচেষ্ট হতে পারে। উভয়ে যদি একই বাড়ীতে থাকে তাহলে তিন মাস পর্যন্ত অথবা তিনবার মাসিক আসা পর্যন্ত অথবা গর্ভবতী হওয়ার ক্ষেত্রে সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত এ সুযোগ বার বার আসতে পারে। কিন্তু স্বামী যদি তাড়াহুড়া করে স্ত্রীকে বের করে দেয় অথবা স্ত্রী যদি চিন্তা-ভাবনা না করে পিতৃগৃহে চলে যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে 'রুজু' করার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে এবং সাধারণত শেষ পর্যন্ত তালাকের পরিণাম স্থায়ী বিচ্ছেদে রূপান্তরিত হয়। এ জন্য ফিকাহবিদগণ এ কথাও বলেছেন যে, যে স্ত্রী রিজয়ী তালাকের ইদ্দত পালন করছে তার সাজসজ্জা ও রূপচর্চা করা উচিত, যাতে স্বামী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। (হিদায়া, আল ইনসাফ)

সমস্ত ফিকাহবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, ইদ্দতকালে রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর বাসগৃহ এবং খোরপোষ পাওয়ার অধিকার আছে। স্বামীর অনুমতি ছাড়া এই সময় বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়া স্ত্রীর জন্য জায়েয নয় এবং স্বামীর জন্য স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়াও জায়েজ নয়। স্বামী তাকে বের করে দিলে গোনাহগার হবে। আর স্ত্রী নিজেই যদি বের হয়ে যায় তাহলে সেও গোনাহগার হবে এবং খোরপোষ ও বাসগৃহ পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

৪. বিভিন্ন ফিকাহবিদগণ এর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। হযরত হাসান বসরী, আমের শা'বী, যায়েদ ইবনে আসলাম, দাহ্হাক, মুজাহিদ, ইকরিমা, ইবনে যায়েদ, হাম্মাদ এবং লাইসের মতে এর অর্থ ব্যভিচার। ইবনে আব্বাসের মতে, এর অর্থ গালিগালাজ ও অশালীন কথাবার্তা। অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তির পরও স্ত্রীর মন-মেজাজ ঠিক না হওয়া। বরং ইদ্দতের সময়ও স্বামী এবং তার পরিবারের লোকজনের সাথে ঝগড়াঝাঁটি করা ও অশালীন ভাষা প্রয়োগ করা। কাতাদার মতে, এর অর্থ نشوز বা বিদ্রোহ। অর্থাৎ বিদ্রোহী প্রকৃতির জন্যই নারীকে তালাক দেয়া হয়েছে। এখন ইদ্দত চলাকালে সে স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা থেকে বিরত হয়নি। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা), সুদ্দী, ইবনুস সায়েব এবং ইবরাহীম নাখায়ীর মতে, এর অর্থ নারীর বাড়ী থেকে বের হয়ে চলে যাওয়া। অর্থাৎ তাদের মতে, তালাকের পর ইদ্দতকালে নারীর বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়াটাই فاحشة مبينة (স্পষ্ট অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়া)। আর "তারা নিজেরাও বের হবে না, তবে যদি স্পষ্ট অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে" কথাটা অনেকটা এরূপ যেমন কেউ বললো ঃ "তুমি কাউকে গালি দিও না, তবে যদি বে-আদব হয়ে থাক।" এই চার বক্তব্যের মধ্যে প্রথম তিনটি বক্তব্য অনুসারে "তবে যদি" সম্পর্ক "তাদেরকে বাড়ী থেকে বের করে দিও না"র সাথে। আর এই অংশের অর্থ হচ্ছে সে যদি চরিত্রহীনতা অথবা অশালীন ও অভদ্র কথাবার্তা বলে অথবা বিদ্রোহে লিপ্ত হয় তাহলে তাকে বের করে দেয়া জায়েয হবে। আর চতুর্থ বক্তব্য অনুসারে এর সম্পর্ক "আর তারা নিজেরাও বের হবে না"র সাথে। এ ক্ষেত্রে অর্থ হচ্ছে, যদি তারা বের হয়ে যায় তাহলে স্পষ্ট অন্যায় ও অশালীন কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

৫. যারা বলেন, হায়েজ অবস্থায় তালাক দিলে বা একই সংগে তিন তালাক দিলে আদৌ তালাক হয় না এ দু'টি আয়াতাংশ তাদের ধারণা খন্ডন করে। সাথে সাথে তাদের ধারণাও মিথ্যা প্রমাণ করে, যারা মনে করে এক সাথে তিন তালাক দিলে তা এক

তালাক বলে গণ্য হয়। এখন প্রশ্ন হলো, বেদাতী অর্থাৎ সুন্নাত বিরোধী পন্থায় দেয়া তালাক যদি আদৌ কার্যকর না হয় অথবা তিন তালাক যদি এক তালাক রিজয়ী বলে গণ্য হয় তাহলে এ কথা বলার প্রয়োজন কি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমাসমূহ অর্থাৎ সুন্নাত নির্দেশিত পন্থা ও নিয়ম লংঘন করবে সে নিজের ওপর জুলুম করবে, এবং তোমরা জাননা এর পরে আল্লাহ তা'আলা হয়তো সমঝোতার কোন উপায় সৃষ্টি করে দেবেন এ দু'টি কথা কেবল তখনই অর্থপূর্ণ হতে পারে, যখন সুন্নাতের পরিপন্থী পন্থায় তালাক দেয়ার কারণে সত্যি কোন ক্ষতি হয় এবং যে কারণে ব্যক্তিকে অনুশোচনা করতে হয় এবং এক সাথে তিন তালাক দিয়ে দেয়ার কারণে 'রুজু' করার কোন সুযোগ আর না থাকে। অন্যথায় এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, যে তালাক আদৌ কার্যকরী হয় না তা দ্বারা আল্লাহর সীমাসমূহও লংঘন হয় না। তাইতা নিজের প্রতি জুলুম বলেও গণ্য হতে পারে না। আর রিজয়ী তালাক হয়ে যাওয়ার পর সমঝোতার পথ অবশ্যই থেকে যায়। সুতরাং এ কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই যে, আল্লাহ তা'আলা এরপর সমঝোতার কোন উপায় সৃষ্টি করে দেবেন।

এখানে পুনরায় সূরা বাকারার ২২৮ থেকে ২৩০ আয়াত এবং সূরা তালাকের আলোচ্য আয়াতগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার। সূরা বাকারায় তালাকের নিসাব বা নির্দিষ্ট সীমা বলা হয়েছে তিন। এর মধ্যে দুই তালাকের পর রুজু করার অধিকার এবং 'ইদ্দত' পূরণ হওয়ার পর 'তাহলীল' ছাড়াই পুনরায় বিয়ে করার অধিকার থাকে। কিন্তু তৃতীয় তালাক দেয়ার পর এই দু'টি অধিকারই নষ্ট হয়ে যায়। এই নির্দেশটিকে বাতিল বা এর মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধনের জন্য সূরা তালাকের এ আয়াতগুলো নাযিল হয়নি, বরং নাযিল হয়েছে এ কথা জানিয়ে দেয়ার জন্য যে, স্ত্রীদের তালাক দেয়ার যে অধিকার ও ইখতিয়ার স্বামীদের দেয়া হয়েছে তা প্রয়োগ করার বিজ্ঞোচিত পন্থা কি, যা অনুসরণ করলে দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, তালাক দিয়ে অনুশোচনা করার মত পরিস্থিতি আসতে পারে না। সমঝোতা ও আপোষরফা হওয়ার সর্বাধিক সুযোগ থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত যদি বিচ্ছেদ হয়েও যায় তাহলে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আবার মিলিত হওয়ার শেষ পথটি খোলা থাকে। কিন্তু অজ্ঞতা বশত কেউ যদি তার ইখতিয়ারসমূহ ভুল পন্থায় প্রয়োগ করে বসে তাহলে সে নিজের ওপর জুলুম করবে এবং ক্ষতিপূরণ ও সংশোধনের সমস্ত সুযোগ হারিয়ে ফেলবে। এর উপমা দেয়া যায় এভাবে যে, কোন এক পিতা তার ছেলেকে তিন শত টাকা দিয়ে বললেন ঃ তুমিই এ টাকার মালিক, যেভাবে ইচ্ছা তুমি এ টাকা খরচ করতে পার। এরপর তিনি তাকে উপদেশ দিয়ে বললেনঃ যে অর্থ আমি তোমাকে দিলাম তা তুমি সতর্কতার সাথে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে খরচ করবে যাতে তা থেকে যথাযথ উপকার পেতে পার। আমার উপদেশের তোয়াক্কা না করে তুমি যদি অসতর্কভাবে অন্যায় ক্ষেত্রে তা খরচ করো কিংবা সমস্ত অর্থ একসাথে খরচ করে ফেল তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এরপর আমি খরচ করার জন্য আর কোন টাকা পয়সা তোমাকে দিব না। এখন পিতা যদি এই অর্থের পুরোটা ছেলেকে আদৌ না দেয় তাহলে সে ক্ষেত্রে এসব উপদেশের কোন অর্থই হয় না। যদি এমন হয় যে, উপযুক্ত ক্ষেত্র ছাড়াই ছেলে তা খরচ করতে চাচ্ছে, কিন্তু টাকা তার পকেট থেকে বেরই হচ্ছে না, অথবা পুরো তিন শত টাকা খরচ করে ফেলা সত্ত্বেও মাত্র একশত টাকাই তার পকেট থেকে বরে হচ্ছে এবং সর্বাবস্থায় দুইশত টাকা তার পকেটেই থেকে যাচ্ছে, তাহলে এই উপদেশের আদৌ কোন প্রয়োজন থাকে কি?

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ
بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا ①

এরপর তারা যখন তাদের (ইদ্দতের) সময়ের সমাপ্তির পর্যায়ে পৌঁছবে তখন হয় তাদেরকে ভালভাবে (বিবাহ বন্ধনে) আবদ্ধ রাখো নয় ভালভাবেই তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাও।[৬] এমন দুই ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাও তোমাদের মধ্যে যারা ন্যায়বান।[৭] হে সাক্ষীরা, আল্লাহর জন্য সঠিকভাবে সাক্ষ দাও।

যারা আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে[৮] তাদের জন্য উপদেশ হিসেবে এসব কথা বলা হচ্ছে। যে ব্যক্তিই আল্লাহকে ভয় করে চলবে আল্লাহ তার জন্য কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় সৃষ্টি করে দেবেন।[৯]

৬. অর্থাৎ এক অথবা দুই তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীকে দাম্পত্য বন্ধনে রাখবে কি রাখবে না সে বিষয়ে 'ইদ্দতকাল' শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। যদি রাখতে চাও তাহলে সদাচরণের উদ্দেশ্যেই রাখ। এ উদ্দেশ্যে রাখবে না যে, তাকে জ্বালাতন ও উত্যক্ত করার জন্য 'রুজু' করবে তারপর আবার তালাক দিয়ে তার ইদ্দতকালকে দীর্ঘায়িত করতে থাকবে। আর যদি বিদায় দিতে হয় তাহলে সৎ ও ভাল মানুষের মত কোন প্রকার ঝগড়াঝাঁটি ছাড়াই বিদায় দিয়ে দাও, মহরানা বা মহরানার আংশিক যদি পাওনা থাকে তা পরিশোধ করে দাও এবং সামর্থ অনুযায়ী কিছু না কিছু মুতআ' (কিছু ব্যবহার্য সামগ্রী) হিসেবে দাও। সূরা বাকারার ২৪১ আয়াতে এ বিষয়েই বলা হয়েছে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আহযাব, টীকা ৮৬)।

৭. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ এর অর্থ তালাক এবং 'রুজু' উভয় বিষয়েই সাক্ষী রাখা। (ইবনে জারীর) হযরত ইমরান ইবনে হুসাইনকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে পরে 'রুজু' করেছে। কিন্তু সে তালাক ও 'রুজু' করা কোনটির ব্যাপারেই কাউকে সাক্ষী বানায়নি। তিনি জবাব দিলেন ঃ তুমি তালাকও দিয়েছ সুন্নাতের পরিপন্থী পন্থায় এবং 'রুজু'ও করেছ সুন্নাতের পরপন্থী পন্থায়। তালাক দেয়া এবং 'রুজু' দু'টি ক্ষেত্রেই সাক্ষী রাখ এবং ভবিষ্যতে এরূপ কাজ আর করবে না। (আবু দাউদ, ইবনে মাজা) কিন্তু চার মাযহাবের ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, তালাক দেয়া, রুজু করা এবং বিচ্ছেদের ব্যাপারে সাক্ষী রাখা এসব কাজের শুদ্ধতার জন্য শর্ত নয়। অর্থাৎ সাক্ষী না রাখলে তালাক কার্যকর হবে না এবং 'রুজু' ও বিচ্ছেদও হবে না এমনটি নয়। বরং সতর্কতার জন্য এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে উভয়ের কেউ-ই পরে কোন ঘটনা

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

এবং এমন পন্থায় তাকে রিযিক দেবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না।[১০] যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করে থাকেন।[১১] আল্লাহ প্রতিটি জিনেসের জন্য একটা মাত্রা ঠিক করে রেখেছেন।

অস্বীকার করতে না পারে, ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হলে সহজেই তার ফায়সালা দেয়া যায় এবং সংশয় ও সন্দেহের পথ বন্ধ করা যায়। এ নির্দেশটি হবহু وَاَشْهِدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ "তোমরা যখন পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন সাক্ষী রাখবে" (আল বাকারাহ, ২'৮২) এ আয়াতে বর্ণিত নির্দেশের মত। এর নির্দেশের অর্থ এ নয় যে, ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপরে সাক্ষী রাখা ফরয এবং সাক্ষী না রাখলে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ ও সঠিক হবে না। বরং এটি একটি বিজ্ঞোচিত উপদেশ, বিভিন্ন রকমের ঝগড়া বিবাদ ও বিরোধের পথ বন্ধ করার জন্য এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশ অনুসারে কাজ করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত আছে। অনুরূপ তালাক দেয়া এবং 'রুজু' করার ক্ষেত্রেও সঠিক কথা হলো, এর প্রতিটি কাজ সাক্ষী ছাড়া আইনগত বৈধতা লাভ করে। কিন্তু সাবধানতার দাবী হলো, যে কাজই করা হোক না কেন তা করার সময় বা তার পরে দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাতে হবে।

৮. এ কথা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ওপরে যেসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা নসীহত ও উপদেশ মাত্র, এর আইনগত কোন মর্যাদা নেই। কেউ যদি সুন্নাতের পরিপন্থী পন্থায় তালাক দিয়ে ফেলে, ইদ্দতের হিসেব সংরক্ষণ না করে, স্ত্রীকে যুক্তিগ্রাহ্য কোন কারণ ছাড়া বাড়ী থেকে বের করে দেয়, ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে রুজু করলে স্ত্রীকে জ্বালাতন ও উত্যক্ত করার জন্য তা করে, বিদায় দিলে ঝগড়া বিবাদ করে বিদায় দেয় এবং তালাক দেয়া, রুজু করা ও বিচ্ছেদ ঘটানো কোন ব্যাপারেই সাক্ষী না রাখে তাহলে তালাক দেয়া, রুজু করা এবং বিচ্ছেদের আইনগত ফলাফলে কোন পার্থক্য হবে না। তবে আল্লাহ তা'আলার উপদেশের পরিপন্থী কাজ করা থেকে প্রমাণ হবে যে, তার মনে আল্লাহ ও আখেরাত সম্পর্কে সঠিক ঈমান নেই। তাই সে এমন কর্মপন্থা অনুসরণ করেছে যা একজন সাচ্চা মু'মিনের পক্ষে করা উচিত নয়।

৯. পূর্বের বক্তব্য থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে কাজ করার অর্থ এখানে সুন্নাত অনুসারে তালাক দেয়া, ঠিকমত ইদ্দতের হিসেব রাখা, স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বের করে না দেয়া, ইদ্দতের শেষ পর্যায়ে যদি স্ত্রীকে রাখতে হয় তাহলে মিলেমিশে থাকা ও সদাচরণের নিয়তে রুজু করা, আর বিচ্ছিন্ন হতে হলে ভাল ও সৎ মানুষের মত তাকে বিদায় করে দেয়া এবং তালাক দেয়া, রুজু করা বা বিচ্ছেদ ঘটানো যাই করা হোক না কেন সে বিষয়ে দু'জন ন্যায়বান লোককে সাক্ষী রাখা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী হলো, যে ব্যক্তি এভাবে তাকওয়া অবলম্বন করে কাজ করবে তার জন্য আমি কোন না কোন مخرج (অর্থাৎ জটিলতা ও বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার

وَالّٰٓئِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ
اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓئِيْ لَمْ يَحِضْنَ ۭ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۭ
وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ۝ ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗٓ اِلَيْكُمْ ۭ
وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا ۝

তোমাদের যেসব স্ত্রীলোকের মাসিক বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাদের ব্যাপারে যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তাহলে (জেনে নাও যে,) তাদের ইদ্দতকাল তিন মাস।[১২] আর এখনো যাদের মাসিক হয়নি[১৩] তাদের জন্যও একই নির্দেশ। গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দতের সীমা সন্তান প্রসব পর্যন্ত।[১৪] যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার কাজ সহজসাধ্য করে দেন। এটা আল্লাহর বিধান যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার গোনাহসমূহ মুছে ফেলবেন এবং তাকে বড় পুরস্কার দেবেন।[১৫]

উপায়) করে দেবো। এভাবে আপনা থেকেই এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যে ব্যক্তি এসব ব্যাপারে তাকওয়া বা আল্লাহকে ভয় করে কাজ করবে না সে নিজেই তার জন্য এমন সব সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি করে নেবে যা থেকে বাঁচার কোন পথ খুঁজে পাবে না।

এ কথাটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে স্পষ্ট বুঝা যায়, যেসব লোকের মতে বেদয়াতী তালাক আদৌ কার্যকর হয় না এবং যারা এক সাথে একই তুহরে দেয়া তিন তালাককে এক তালাক বলে গণ্য করেন তাদের মতটি সঠিক নয়। কারণ, বেদয়াতী তালাক যদি কার্যকরীই না হয় তাহলে মোটেই কোন জটিলতা সৃষ্টি হয় না যা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায়ের প্রয়োজন হতে পারে। আর একসাথে তিন তালাক দিয়ে দিলেও যদি এক তালাকই হয় তাহলেও রক্ষা পাওয়ার কোন উপায়ের প্রয়োজন হয় না। এ অবস্থায় কি এমন জটিলতা থাকতে পারে যা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন প্রয়োজন দেখা দিবে?

১০. অর্থাৎ ইদ্দত পালন কালে তালাক প্রদত্ত স্ত্রীকে বাড়ীতে রাখা, তার খরচপত্র বহন করা এবং বিদায় দান কালে তাকে মহরানা ও কিছু ব্যবহার্য সামগ্রী দিয়ে বিদায় করার বিষয়টা নিসন্দেহে ব্যক্তির জন্য একটা আর্থিক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। যে স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট ও ভীতশ্রদ্ধ হওয়ার কারণে স্বামী তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে মনস্থির করে নিয়েছে সে তার জন্য অর্থ ব্যয় নিশ্চিয়ই অপছন্দ করবে। তদুপরি স্বামী যদি অভাবী হয় তাহলে এই অর্থ ব্যয় তার জন্য আরো মনকষ্টের কারণ হবে। কিন্তু আল্লাহভীরু লোকদের এসব বরদাশত করা উচিত। তোমাদের মন সংকীর্ণ হলে হতে পারে। কিন্তু রিযিক দেয়ার জন্য আল্লাহর হাত সংকীর্ণ নয়। যদি তার নির্দেশ অনুসারে অর্থ ব্যয় করো তাহলে তিনি এমন

সব পথে তোমাকে রিযিক দেবেন যে পথে রিযিক পাওয়ার কল্পনাও তুমি করতে পারনি।

১১. অর্থাৎ কোন শক্তি আল্লাহর নির্দেশের বাস্তবায়ন রোধ করতে পারে না।

১২. যেসব মহিলার ঋতুস্রাব একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং অধিক বয়সের কারণে যারা ঋতুস্রাব হওয়ার আশা করে না তাদেরকে যেদিন তালাক দেয়া হয়েছে সেদিন থেকে তাদের 'ইদ্দত' গণনা শুরু হবে। আর তিন মাস বলতে তিনটি চান্দ্র মাস বুঝানো হয়েছে। তালাক যদি চান্দ্র মাসের শুরুতে দেয়া হয়ে থাকে তাহলে চাঁদ দেখা যাওয়া অনুসারে ইদ্দত গণনা হবে। আর যদি মাসের মাঝে কোন সময় তালাক দেয়া হয়ে থাকে তাহলে ইমাম আবু হানীফার (র) মতে, ৩০ দিনে মাস ধরে তিন মাস পূরণ করতে হবে। ('বাদায়েউস সানায়ে')

যেসব মহিলার ঋতুস্রাবের ক্ষেত্রে কোন প্রকার অনিয়ম আছে তাদের ব্যাপারে ফিকাহবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব বর্ণনা করেছেন যে, হযরত 'উমর (রা) বলেছেন ঃ যে মহিলাকে তালাক দেয়া হয়েছে দুই একবার ঋতুস্রাব হওয়ার পর যদি তার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সে ৯ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এ সময়ে যদি তার গর্ভ প্রকাশ পায় তাহলে ভাল। অন্যথায় ৯ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর সে আরো তিন মাস ইদ্দত পালন করবে। এরপর সে অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য উপযুক্ত ও বৈধ হবে।

ইবনে আব্বাস, কাতাদা ও ইকরিমার মতে, যে মহিলার এক বছর পর্যন্ত ঋতুস্রাব হয়নি তার ইদ্দতের সময়-কাল তিন মাস।

তাউসের মতে, যে মহিলার বছরে একবার ঋতুস্রাব হয় তার ইদ্দতকাল তিনবার ঋতুস্রাব হওয়া। হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা) এবং হযরত যায়েদ (রা) ইবনে সাবেতও এই মত পোষণ করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম মালেক বর্ণনা করেছেন যে, হাব্বান নামক এক ব্যক্তি এমন অবস্থায় তার স্ত্রীকে তালাক দেয় যখন সে তার সন্তানকে দুধ দিচ্ছিল। এমতাবস্থায় এক বছর চলে যায় কিন্তু তার ঋতুস্রাব হয় না। এরপর ঐ ব্যক্তি মারা যায়। তালাকপ্রাপ্তা তার উত্তরাধিকারীনী হওয়ার দাবী পেশ করে। বিষয়টি হযরত উসমানের সামনে পেশ করা হলে তিনি হযরত আলী (রা) ও হযরত যায়েদ (রা) ইবনে সাবেতের কাছে পরামর্শ চান। তাঁদের উভয়ের সাথে পরামর্শ করে হযরত উসমান ফায়সালা দিলেন যে, নারী উক্ত স্বামীর উত্তরাধিকারিনী হবে। তাঁর দলীল ছিল এই যে, যে সব মহিলা ঋতুস্রাব হবে না বলে নিরাশ হয়ে গিয়েছে সে তাদের মত নয় আবার যেসব মহিলাদের এখনো ঋতুস্রাব হয়নি তাদের মতও নয়। সুতরাং যে ঋতুস্রাব চলাকালে তাকে তালাক দেয়া হয়েছে স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত সে উক্ত ঋতুস্রাবেই ছিল। তার ইদ্দত কাল এখনো শেষ হয়নি, বরং অবশিষ্ট আছে।

হানাফীদের মতে, যে স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিন্তু তা অধিক বয়স জনিত কারণে বন্ধ হয়নি যা পরে আবার শুরু হওয়ার আশাই থাকে না এমন স্ত্রীলোকের

ইদ্দত গণনা করতে হবে ঋতুস্রাব দ্বারা যদি তা পরে শুরু হয় কিংবা যে বয়সে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায় সেই বয়সের বিচারে। এ রকম বয়সে উপনীত হয়ে থাকলে সে তিন মাস ইদ্দত পালন করার পর বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এটাই ইমাম শাফেয়ীর (র), ইমাম সাওরী এবং ইমাম লাইসের মত। হযরত আলী (রা), হযরত উসমান (রা) এবং হযরত যায়েদ (রা) ইবনে সাবেতের মাযহাবও এটাই।

ইমাম মালেক হযরত উমর এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মত গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মত হচ্ছে, স্ত্রী প্রথমে ৯ মাস অতিবাহিত করবে। যদি এই সময়ের মধ্যে ঋতুস্রাব শুরু না হয় তাহলে সে বার্ধক্য জনিত কারণে স্থায়ীভাবে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া স্ত্রীলোকের মত তিন মাস ইদ্দত পালন করবে। ইবনুল কাসেম ইমাম মালেকের অনুসৃত মতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, যখন শেষবারের মত স্ত্রীলোকটির ঋতুস্রাব বন্ধ হয়েছিল তখন থেকে ৯ মাসের গণনা শুরু হবে, তালাক দেয়ার সময় থেকে নয়। (জাসসাসের আহকামুল কুরআন এবং কাসানীর বাদায়েউস্ সানায়ে' গ্রন্থদ্বয় থেকে এসব বিবরণ গৃহীত হয়েছে)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মাযহাব হচ্ছে, যে নারীর ইদ্দতের হিসেব হায়েজ থেকে শুরু হয়েছিল ইদ্দত চলাকালে তার ঋতুস্রাব যদি বার্ধক্যজনিত কারণে স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সে ঋতুবতী নারীদের মত ইদ্দত পালন না করে বৃদ্ধদের মত ইদ্দত পালন করবে। যদি তার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু কি কারণে বন্ধ হয়েছে তা জানা না যায় তাহলে প্রথমে গর্ভসঞ্চারের সন্দেহে ৯ মাস সময়-কাল অতিবাহিত করবে এবং পরে তিনমাস ইদ্দত পূরণ করতে হবে। তবে ঋতুস্রাব কেন বন্ধ হয়েছে তা যদি জানা যায়, যেমন ঃ কোন রোগে আক্রান্ত হয় অথবা সন্তানকে স্তন্যদান করে অথবা অন্য কোন কারণ থাকে তাহলে যতদিন ঋতুস্রাব পুনরায় শুরু না হবে এবং ঋতুস্রাবের হিসেবে ইদ্দত গণনা শুরু না হতে পারবে অথবা সে ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার মত বৃদ্ধবয়সে উপনীত হবে এবং রুদ্ধস্রাব বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মত ইদ্দত পালন করতে পারবে ততো দিন পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। (আল ইনসাফ)

১৩. ঋতুস্রাব যদি অল্প বয়সের জন্য না হয়ে থাকে অথবা কিছু সংখ্যক মহিলাদের অনেক দেরীতে হয়ে থাকে বলে না হয়ে থাকে এবং বিরল কিছু ঘটনা এমনও হয়ে থাকে যে সারা জীবন কোন স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব হয় না এরূপ সর্বক্ষেত্রে এ রকম স্ত্রীলোকদের ইদ্দত রুদ্ধস্রাব বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মত। অর্থাৎ তাদের ইদ্দত তালাকের সময় থেকে তিন মাস।

এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, কুরআন মজীদের স্পষ্ট বক্তব্য অনুসারে যে স্ত্রীর সাথে তার স্বামী নির্জনবাস করেছে কেবল তার ক্ষেত্রেই ইদ্দত পালনের প্রশ্ন আসে। কারণ, নির্জনবাসের পূর্বে তালাক হলে আদৌ কোন ইদ্দত পালন করতে হয় না। (আল আহযাব, ৪৯) সুতরাং যেসব মেয়েদের এখনো ঋতুস্রাব শুরু হয়নি তাদের ইদ্দত বর্ণনা করা স্পষ্টত এ কথাই প্রমাণ করে যে, এ বয়সে মেয়েদের বিয়ে শুধু জায়েযই নয়, বরং তার সাথে স্বামীর নির্জনবাস এবং মেলামেশাও জায়েয। এখন এ কথা স্পষ্ট যে, কুরআন যে জিনিসকে জায়েয বলে ঘোষণা করেছে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার অধিকার কোন মুসলমানের নেই।

এখনো ঋতুস্রাব হয়নি এমন কোন মেয়েকে যদি তালাক দেয়া হয় এবং ইদ্দত চলাকালে তার ঋতুস্রাব শুরু হয় তাহলে সে উক্ত ঋতুস্রাব থেকে পুনরায় ইদ্দত শুরু করবে। তার ইদ্দত হবে ঋতুবতী মহিলাদের মত।

১৪. সমস্ত আলেম এ বিষয়ে একমত যে, তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। কিন্তু যে মহিলার স্বামী গর্ভকালে মারা গিয়েছে তার ব্যাপারেও এ নির্দেশ প্রযোজ্য কি না সে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। এ মতভেদের কারণ হলো, যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা যায় সূরা বাকারার ২৩৪ আয়াতে তার ইদ্দতকাল ৪ মাস দশদিন বলা হয়েছে। এ নির্দেশ সমস্ত বিধবা মহিলাদের জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য না কেবল গর্ভবতী মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য সে ব্যাপারে সেখানে কোন স্পষ্ট বক্তব্য নেই।

হযরত আলী (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এ দু'টি আয়াতের বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী নারীর ইদ্দত সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত তো বটেই। কিন্তু গর্ভবতী বিধবা নারীর ইদ্দত হচ্ছে দু'টি সময়কালের মধ্যে বিলম্বিত দীর্ঘতর সময়টি। অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত এবং গর্ভবতী নারীর ইদ্দতের মধ্যে যেটি বেশী দীর্ঘতর সেটিই তার ইদ্দত। উদাহরণ স্বরূপ, তার গর্ভস্থ সন্তান যদি ৪ মাস দশদিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই ভূমিষ্ঠ হয় তাহলে তাকে ৪ মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে। কিন্তু তার সন্তান যদি উক্ত সময়ের মধ্যে ভূমিষ্ঠ না হয় তাহলে যে সময় তার সন্তান প্রসব হবে তখন তার ইদ্দত পূরণ হবে। ইমামিয়াগণ এ মতটি অনুসরণ করে থাকেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মতে, সূরা তালাকের এই আয়াতটি সূরা বাকারার আয়াতের পরে নাযিল হয়েছে। অতএব পরে নাযিল হওয়া নির্দেশ পূর্বে নাযিল হওয়া আয়াতের নির্দেশকে গর্ভহীনা বিধবাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা যাই হোক না কেন গর্ভবতী সমস্ত নারীর ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এই মত অনুসারে গর্ভবতী নারীর সন্তান প্রসব স্বামী মৃত্যুর পরপরই হোক কিংবা ৪ মাস দশ দিন দীর্ঘায়িত হোক সর্বাবস্থায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র সে ইদ্দত থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। হযরত উবাই ইবনে কা'বের একটি রেওয়ায়াত এ মতের সমর্থন করে। তিনি বর্ণনা করেন, সূরা তালাকের এ আয়াত নাযিল হলে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা উভয় শ্রেণীর নারীর জন্যই কি এ নির্দেশ? তিনি জবাব দিলেন হাঁ। অন্য একটি হাদীস অনুসারে নবী (সা) আরো স্পষ্ট করে বললেন ঃ اجل كل حامل ان تضع ما فى بطنها "সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত সময় প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর ইদ্দতকাল।" (ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে হাজার বলেন ঃ এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণের অবকাশ থাকলেও হাদীসটি যেহেতু বেশ কিছু সংখ্যক সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে তাই স্বীকার করে নিতে হয় যে, এর কোন ভিত্তি অবশ্যই আছে)। এর স্বপক্ষে এর চেয়েও মজবুত সমর্থন পাওয়া যায় সুবাইআ আসলামিয়ার ঘটনা থেকে। ঘটনাটি ঘটেছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যুগে। সুবাইআ আসলামিয়া গর্ভবতী অবস্থায় বিধবা হয়েছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পর (কিছু সংখ্যক রেওয়ায়াতে ২০ দিন।

কোনটিতে ২৩ দিন, কোনটিতে ২৫ দিন, কোনটিতে ৪০ দিন এবং কোনটিতে ৩৫ দিন) তার সন্তান প্রসব হয়েছিল। তার ব্যাপারে নবীর (সা) কাছে ফতোয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি তাকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছিলেন। বুখারী ও মুসলিম হযরত উম্মে সালামা থেকে কয়েকটি সূত্রে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। আবার এ ঘটনাটি বুখারী, মুসলিম, ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজা বিভিন্ন সনদে হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা থেকেও বর্ণনা করেছেন। মুসলিম সুবাইআ আসলামিয়ার নিজের এ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন ঃ আমি সা'দ ইবনে খাওলার স্ত্রী ছিলাম। বিদায় হজ্জের সময় আমার স্বামী মারা গিয়েছিলেন। আমি তখন গর্ভবতী ছিলাম। স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পরই আমার গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। একজন আমাকে বললো, তুমি ৪ মাস দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে বিয়ে করতে পারবে না। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি ফতোয়া দিলেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তুমি হালাল হয়ে গিয়েছ, এখন ইচ্ছা করলে আবার বিয়ে করতে পার। বুখারীও এ হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন।

বিপুল সংখ্যক সাহাবী থেকে এ মতটিই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, আবদুর রায্যাক, ইবনে আবী শায়বা এবং ইবনুল মুনযির বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে গর্ভবতী বিধবা নারীর ইদ্দত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত সময় তার ইদ্দত। এ কথা শুনে আনসারদের একজন লোক বললো, হযরত উমর তো এ কথাও বলেছিলেন যে, স্বামীর দাফন কাফন পর্যন্ত হয়ে সারেনি, বরং তার লাশ তখনো মৃত্যু শয্যায় পড়ে আছে এমতাবস্থায়ও যদি স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তাহলে তখনই সে পুনরায় বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য হালাল হবে। হযরত আবু হুরাইরা (রা), হযরত আবু মাসউদ বদরী (রা) এবং হযরত আয়েশা (রা)ও এ মত পোষণ করেছেন। চার ইমাম এবং অন্য সব বড় বড় ফিকাহবিদও এ মতটি গ্রহণ করেছেন।

শাফেয়ী মাযহাবের মতে, গর্ভবতী স্ত্রীর পেটে যদি একাধিক বাচ্চা থাকে তাহলে সর্বশেষ বাচ্চাটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তার ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যাবে। এমন কি মৃত বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হলেও তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় থেকে ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। গর্ভপাতের ক্ষেত্রে ধাত্রী যদি তার ধাত্রী বিদ্যার আলোকে একথা বলে যে, তা শুধু রক্তপিণ্ড ছিল না বরং তা মানুষের আকৃতি লাভ করেছিল, অথবা গর্ভস্থ বস্তুর গিঁট ছিল না, বরং মানবদেহ সৃষ্টির উপাদান ছিল, তাহলে তাদের কথা গ্রহণ করা হবে এবং ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যাবে (মুগনিউল মুহতাজ)। হাম্বলী ও হানাফী মাযহাবের মতামতও প্রায় অনুরূপ। তবে গর্ভপাতের ক্ষেত্রে তাদের মত হলো, মানুষের দেহকাঠামো স্পষ্ট হয়ে না উঠলে শুধুমাত্র "তা মানবদেহ সৃষ্টির মূল উপাদান ছিল" ধাত্রীদের এই বক্তব্যের ওপর নির্ভর করা হবে না এবং এভাবে ইদ্দতও শেষ হবে না (বাদায়েউস্ সানায়ে'—আল ইনসাফ)। কিন্তু বর্তমান সময়ে ডাক্তারী পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এ কথা জানা আর কঠিন নয় যে গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসা বস্তু আদতেই মানব আকৃতির মত কোন কিছু ছিল, না গর্ভস্থ পদার্থের কোন গিঁট বা জটপাকানো কিছু ছিল অথবা জমাট বাঁধা রক্তের মত কোন কিছু ছিল। তাই বর্তমানে যেসব ক্ষেত্রে ডাক্তারদের মতামত জানা সম্ভব সেসব ক্ষেত্রে সহজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে যে, যাকে গর্ভপাত বলা হচ্ছে তা প্রকৃতই

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ
عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

তোমরা তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী যে রকম বাসগৃহে থাক তাদেরকেও (ইদ্দতকালে) সেখানে থাকতে দাও। তাদেরকে বিপদগ্রস্ত করার জন্য উত্যক্ত করো না।[১৬]

আর তারা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত[১৭] তাদের জন্য খরচ করো। তারপর তারা যদি তোমাদের সন্তানদের বুকের দুধ পান করায় তাহলে তাদেরকে তার বিনিময় দাও এবং (বিনিময়দানের বিষয়টি) তোমাদের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে উত্তম পন্থায় ঠিক করে নাও।[১৮] কিন্তু (বিনিময় ঠিক করতে গিয়ে) তোমরা যদি একে অপরকে কষ্টকর অবস্থার মধ্যে ফেলতে চেয়ে থাক তাহলে অন্য মহিলা বাচ্চাকে দুধ পান করাবে।[১৯] সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুপাতে খরচ করবে। আর যাকে স্বল্প পরিমাণ রিযিক দেয়া হয়েছে সে আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে খরচ করবে। আল্লাহ যাকে যতটা সামর্থ দিয়েছেন তার চেয়ে অধিক দায়িত্ব তিনি তার ওপর চাপান না। অসম্ভব নয় যে, অসচ্ছলতার পর আল্লাহ তাকে সচ্ছলতা দান করবেন।

গর্ভপাত কি না এবং তা দ্বারা ইদ্দতকাল শেষ হয়েছে না হয়নি। তবে যেসব ক্ষেত্রে এ রকম ডাক্তারী পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্ভব নয় সেসব ক্ষেত্রে হাম্বলী ও হানাফী মাযহাবের মতামতই অধিক সতর্কতামূলক। এ ক্ষেত্রে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ ধাত্রীদের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়।

১৫. এই উপদেশটি যদিও সবার জন্য এবং মানবজীবনের সব পরিস্থিতিতেই তা প্রযোজ্য। কিন্তু পূর্বাপর প্রসঙ্গের বিশেষ এই প্রেক্ষিতে এ উপদেশ দেয়ার উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের এ মর্মে সতর্ক করা যে ওপরে যেসব নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে তা পালন করতে

গিয়ে দায়িত্বের যত বড় বোঝাই তোমাদের ওপর পড়ুক না কেন আল্লাহর ভয় মনে রেখে সর্বাবস্থায় তা মেনে চল। আল্লাহ তোমাদের কাজ সহজ করে দেবেন, তোমাদের গোনাহ মাফ করবেন এবং তোমাদেরকে বড় পুরস্কার দান করবেন। এ বিষয় স্পষ্ট যে, তালাকপ্রাপ্তা যেসব নারীর ইদ্দতকাল তিন মাস নির্ধারিত তাদের ইদ্দতের সময় সেসব নারীর ইদ্দতের তুলনায় দীর্ঘতর হবে, যাদের ইদ্দতকাল তিন হায়েজ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দতকাল তো এর চেয়েও কয়েকমাস বেশী দীর্ঘায়িত হতে পারে। স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে চাইলে পুরো এই সময়টার জন্য তার বাসস্থান এবং খোরপোষের দায়িত্ব বহন করা তার জন্য অসহনীয় বোঝা বলে মনে হবে। কিন্তু আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহর নির্দেশসমূহ পালনের উদ্দেশ্যে যে বোঝা বহন করা হবে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো, তিনি মেহেরবানী করে সে বোঝা হাল্কা করে দেবেন এবং তার বিনিময়ে এত বড় পুরস্কার দেবেন, যা দুনিয়ায় বহনকৃত এই ক্ষুদ্র বোঝার তুলনায় অনেক অনেক বেশী মূল্যবান হবে।

১৬. স্ত্রীকে রিজয়ী তালাক দেয়া হয়ে থাকলে স্বামীর ওপর তাকে বাসস্থান ও খোরপোষ দেয়ার দায়িত্ব বর্তায়। এ বিষয়ে সমস্ত ফিকাহবিদ একমত। স্ত্রী গর্ভবতী হলে তাকে রিজয়ী তালাক দেয়া হয়ে থাকুক বা চূড়ান্ত বিচ্ছেদকারী বায়েন তালাক দেয়া হয়ে থাকুক, সর্বাবস্থায় সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাকে বাসস্থান ও খোরপোষ দেয়ার দায়িত্ব স্বামীর, এ বিষয়েও তারা একমত। তাদের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ হয়েছে তা হলো, অগর্ভবতী চূড়ান্ত তালাকপ্রাপ্তা (অর্থাৎ যাকে চূড়ান্ত বিচ্ছেদকারী তালাক দেয়া হয়েছে) সে কি বাসস্থান ও খোরপোষ উভয়টিই পাওয়ার অধিকারীনী না কেবল বাসস্থানলাভের অধিকারীনী? অথবা দু'টির কোনটির অধিকারিনী নয়?

একদল ফিকাহবিদের মতে, সে বাসস্থান ও খোরপোষ উভয়টিই লাভের অধিকারীনী। এ মত পোষণ করেছেন হযরত উমর, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আলী ইবনে হুসাইন (ইমাম যায়নুল আবেদীন), কাজী শুরাইহ এবং ইবরাহীম নাখায়ী। হানাফী মাযহাবের আলেমগণ এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। ইমাম সুফিয়ান সাওরী এবং হাসান ইবনে সালেহ-এর মাযহাবও এটিই। দারু কুতনীর একটি হাদীসে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

হাদীসটিতে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ "তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক ইদ্দতকালে বাসস্থান ও খোরপোষ লাভের অধিকারিনী।" এ মতের পক্ষে আরো সমর্থন পাওয়া যায় সেসব হাদীস থেকে যাতে বলা হয়েছে, হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদীসকে হযরত উমর এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে, একজন মাত্র নারীর কথার ওপর নির্ভর করে আমি আমার রবের কিতাব ও আমার নবীর সুন্নাত পরিত্যাগ করতে পারি না। এ থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সুন্নাতটি হযরত উমরের অবশ্যই জানা ছিল যে, এরূপ স্ত্রীলোকের বাসস্থান ও খোরপোষ লাভের অধিকার আছে। বরং ইবরাহীম নাখায়ীর একটি বর্ণনায় এ কথাও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত উমর ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন ঃ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَهَا السُّكْنٰى وَالنَّفَقَةُ

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, এরূপ স্ত্রীলোক বাসস্থান ও খোরপোষ উভয়টি লাভ করার অধিকারিনী।"

ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস তাঁর আহকামুল কুরআন গ্রন্থে এ মাসয়ালা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ মতের পক্ষে প্রথম প্রমাণ পেশ করেছেন এই যে, আল্লাহ তা'আলা সরাসরি কেবল এতটুকু বলেছেন ঃ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ "তাদেরকে তাদের ইদ্দতের জন্য তালাক দাও।" আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশ সেই ব্যক্তির জন্যও তো প্রযোজ্য যে প্রথমে দুই তালাক দিয়ে তারপর 'রুজু' করেছে এবং এখন তার কেবল এক তালাক দেয়ার অধিকার আছে। তাঁর দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তালাক দেয়ার এ পদ্ধতি বলে দিয়েছেন যে, যে তুহরে সহবাস করা হয়নি হয় সেই তুহরে তালাক দেবে, অথবা এমন অবস্থায় তালাক দেবে যখন নারীর গর্ভবতী হওয়ার বিষয় প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রথম, দ্বিতীয় এবং শেষ তালাকের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। অতএব, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ তোমরা যেখানে থাক তাদেরকেও সেখানেই রাখ সর্ব প্রকার তালাকের সাথেই সম্পর্কিত বলে ধরে নেয়া হবে। তিনি তৃতীয় যে দলিলটি পেশ করেন তাহচ্ছে, তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী মহিলা সে রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা হোক বা চূড়ান্ত বিচ্ছেদকারী তালাকপ্রাপ্তা হোক, তাকে বাসস্থানও খোরপোষ দেয়া স্বামীর জন্য ওয়াজিব। রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা অগর্ভবতী নারীকেও এ দু'টি দেয়া স্বামীর জন্য ওয়াজিব। এ থেকে বুঝা যায় যে, বাসস্থান ও খোরপোষ দেয়া গর্ভবতী হওয়ার কারণে ওয়াজিব নয়, বরং তা এ কারণে ওয়াজিব যে, এ দুই শ্রেণীর তালাকপ্রাপ্তা শরয়ী বিধান অনুসারেই স্বামীর বাড়ী থাকতে বাধ্য। এখন অগর্ভবতী তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ক্ষেত্রেও যদি এ নির্দেশ হয়ে থাকে তাহলে তার বাসস্থান ও খোরপোষ দেয়া স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য না হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না।

অপর একদল ফিকাহবিদের মতে, তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দতকালে বাসস্থান পাওয়ার অধিকার অবশ্যই আছে কিন্তু খোরপোষ পাওয়ার অধিকার নেই। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, আতা, শা'বী, আওযায়ী, লাইস এবং আবু উবাইদ রাহিমাহুমুল্লাহ এ মত পোষণ করেছেন। আর ইমাম মালেকও এ মতটি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী যে এ মত থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতেন মুগনিউল মুহতাজ গ্রন্থে তা বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

তৃতীয় আরেকটি দলের মতে, তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত চলাকালে বাসস্থান ও খোরপোষ কোনটা লাভের অধিকার নেই। এ মত হাসান বাসরী, হাম্মাদ ইবনে আবী লায়লা, আমর ইবনে দীনার, তাউস, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ্ এবং আবু সাওরের। ইবনে জারীরের বর্ণনা মতে হযরত ইবনে আব্বাসও এ মত পোষণ করতেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং ইমামিয়াগণও এ মত গ্রহণ করেছেন। মুগনিউল মুহতাজ গ্রন্থে শাফেয়ী মাযহাবের এ মত বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে,

تَجِبُ سُكْنٰى لِمُعْتَدَّةِ طَلَاقٍ حَيْلٍ اَوْحَامِلٍ وَلَا بَائِنٍ ..... وَالْحَائِلُ الْبَائِنُ لَا نَفْقَةَ لَهَا وَلَا كِسْوَةً -

"যে নারী তালাকের কারণে ইদ্দত পালন করছে সে গর্ভবতী হোক বা না হোক তার বাসস্থান লাভের অধিকার আছে এবং তা দেয়া ওয়াজিব.....তবে বায়েন তালাকপ্রাপ্তা অগর্ভবতী নারীর বাসস্থান ও কাপড় চোপড় কোন কিছুই পাওয়ার অধিকার নেই।"

এ মতের স্বপক্ষে একদিকে কুরআনের আয়াত لَا تَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا "তুমি জান না, এরপরে আল্লাহ তা'আলা হয়তো সমঝোতা ও বুঝাপড়ার কোন উপায় সৃষ্টি করে দেবেন।" এ থেকে তারা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন তা হচ্ছে, এ কথা রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, তিন তালাকপ্রাপ্তাদের ক্ষেত্রে নয়। তাই তালাকপ্রাপ্তা নারীকে বাড়ীতে রাখার আদেশও রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তাদের জন্যই নির্দিষ্ট। তাদের দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে, হাদীস গ্রন্থসমূহে বিপুল সংখ্যক সহীহ সনদে বর্ণিত ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদীস।

এই ফাতেমা (রা) বিনতে কায়েস আল ফিহ্‌রিয়া ছিলেন প্রথম পর্যায়ে হিজরাতকারী মহিলাদের একজন। তাঁকে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহিলা বলে মনে করা হতো। হযরত উমরের (রা) শাহাদাতের পর তাঁর বাড়ীতেই মজলিসে শুরার অধিবেশন হয়েছিল। প্রথমে তিনি আবু আমর ইবনে হাফ্‌স্ ইবনুল মুগীরাতুল মাখযূমীর স্ত্রী ছিলেন। তাঁর স্বামী তাঁকে তিন তালাক দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম তাঁকে হযরত উসামা ইবনে যায়েদের সাথে বিয়ে দেন। তাঁর ঘটনা হলো, তাঁর স্বামী আবু 'আমর তাঁকে প্রথমে দুই তালাক দিয়েছিলেন। পরে হযরত আলীর সাথে যখন তাঁকে ইয়ামানে পাঠানো হলো, তখন তিনি সেখান থেকে অবশিষ্ট তৃতীয় তালাকটিও দিয়ে দেন। কোন কোন রেওয়ায়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে, আবু আমর নিজেই তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের পত্র মারফত জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ইদ্দত পালনকালে তারা যেন তাঁকে বাড়ীতেই রাখে এবং তার ব্যয়ভার বহন করে। কোন কোন রেওয়ায়াতে উল্লেখিত আছে যে, তিনি নিজেই খোরপোষ ও বাসস্থানের দাবী করেছিলেন। তবে ঘটনা যাই ঘটে থাকুক না কেন, স্বামীর আত্মীয়-স্বজন তাঁর অধিকার স্বীকার করলেন না। এরপর তিনি দাবী নিয়ে নবীর (সা) কাছে গেলেন। নবী (সা) এই বলে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন যে, তুমি খোরপোষ ও বাসস্থান কিছুই পাওয়ার অধিকারী নও। একটি রেওয়ায়াতে আছে যে, নবী (সা) বলেছিলেন ঃ

اِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنٰى لِلْمَرْاَةِ عَلٰى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَاِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنٰى -

"স্বামীর ওপর স্ত্রীর খোরপোষ ও বাসস্থান পাওয়ার অধিকার থাকে তখন যখন স্বামীর রুজু করার অধিকার থাকে। কিন্তু যখন রুজু করার অধিকার থাকে না তখন খোরপোষ ও বাসস্থানলাভের অধিকারও থাকে না। (মুসনাদে আহমাদ)

তাবারানী এবং নাসায়ীও প্রায় অনুরূপ রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত রেওয়ায়াতের শেষ দিকের ভাষা হলো,

فَاِذَا كَانَتْ لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنٰى

"কিন্তু যে ক্ষেত্রে সে অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগে আর পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হচ্ছে না সে ক্ষেত্রে তার খোরপোষ ও বাসস্থানের কোন অধিকার নেই।"

এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর নবী (সা) প্রথমে তাকে উম্মে শারীকের গৃহে থাকার নির্দেশ দেন কিন্তু পরে তাঁকে বলেন, তুমি ইবনে উম্মে মাকতূমের গৃহে অবস্থান করো।

কিন্তু যারা এ হাদীস গ্রহণ করেননি তাদের যুক্তি হলো ঃ

প্রথমত, তাঁকে স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী ছাড়তে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এ জন্যে যে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত কর্কশ ভাষী। স্বামীর আত্মীয়-স্বজন তাঁর বদ মেজাজের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব বলেন ঃ ঐ মহিলা তাঁর হাদীস বর্ণনা করে মানুষকে ফিতনার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে তিনি ছিলেন খুব মুখড়া। তাই তাঁকে ইবনে উম্মে মাখতূমের গৃহে রাখা হয়েছিল (আবু দাউদ)। আরেকটি রেওয়ায়াতে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি তাঁর স্বামীর আত্মীয়-স্বজনদের কটু কথা বলেছিলেন। তাই তাঁকে বাড়ী থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল (জাসসাস)। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার বলেন, "প্রকৃতপক্ষে বদ মেজাজীর কারণে তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে ছিলেন" (আবু দাউদ)।

দ্বিতীয়ত হযরত উমর (রা) এমন এক যুগে তাঁর বর্ণিত হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যখন বহু সংখ্যক সাহাবী বেঁচে ছিলেন এবং এ বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া এবং যাঁচাই বাছাই করা পুরোপুরি সম্ভবপর ছিল। ইবরাহীম নাখায়ী বলেন ঃ হযরত উমর যখন ফাতেমার (রা) এ হাদীস শুনলেন তখন বললেন,

لَسْنَا بِتَارِكِىْ اٰيَةً فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ وَقَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَاَةٍ لَعَلَّهَا اَوْ هَمَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَهَا السُّكْنٰى وَالنَّفَقَةُ -

"এমন একজন নারীর কথা অনুসারে আমরা আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী পরিত্যাগ করতে পারি না, যার হয়তো ভুল ধারণা হয়েছে— আমি নিজে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর বাসস্থান ও খোরপোষ উভয়টি লাভের অধিকার আছে" (জাস্‌সাস)। আবু ইসহাক বলেন, আমি কূফার মসজিদে আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদের পাশে বসে ছিলাম। সেখানে শা'বী ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদীসের উল্লেখ করলে হযরত আসওয়াদ পাথরের টুকরো তুলে শা'বীর প্রতি ছুঁড়ে মেরে বললেন, হযরত উমরের সময়ে

যখন ফাতেমার বর্ণিত এ হাদীস পেশ করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন ঃ একজন নারীর কথায় আমরা আল্লাহর কিতাব এবং নবীর সুন্নাতকে পরিত্যাগ করতে পারি না। আমরা জানি না সে সঠিকভাবে মনে রাখতে পেরেছে না ভুলে গিয়েছে। সে খোরপোষ ও বাসগৃহ লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেনঃ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী এবং নাসায়ীতে শাব্দিক তারতম্য সহ এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, মারওয়ানের শাসন আমলে তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী সম্পর্কে এক বিতর্কের সূত্রপাত হলে হযরত আয়েশা ফাতেমা বিনতে কায়েসের বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ বলেন ঃ আমি হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি ফাতেমার কাহিনী জানেন না? তিনি জবাব দিলেন ঃ ফাতেমার বর্ণিত হাদীসের কথা না বলাই ভাল (বুখারী)। বুখারী অপর যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাতে হযরত আয়েশার বক্তব্যের ভাষা হলো, ফাতেমার কি হয়েছে, সে কি আল্লাহকে ভয় করে না? তৃতীয় একটি হাদীসে হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের বলেন যে, হযরত আয়েশা বলেছেন ঃ এ হাদীস বর্ণনা করার মধ্যে ফাতেমার কোন কল্যাণ নেই। অপর এক বর্ণনায় হযরত উরওয়া বলেন, হযরত আয়েশা ফাতেমার প্রতি তাঁর চরম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং বলেন ঃ "প্রকৃতপক্ষে সে একটি নির্জন গৃহে অবস্থান করছিল যেখানে তার কোন প্রিয়জন বা বান্ধবী ছিল না। সুতরাং তার নিরাপত্তা ও প্রশান্তির জন্য নবী (সা) তাকে গৃহ পরিবর্তনের আদেশ দিয়েছিলেন।"

চতুর্থত, পরে উসামা ইবনে যায়েদের সাথে ঐ মহিলার বিয়ে হয়েছিল। উসামার ছেলে মুহাম্মাদ বলেন, ফাতেমা যখনই এ হাদীস বলতেন তখনই আমার পিতা হাতের কাছে যা পেতেন তাই তার প্রতি নিক্ষেপ করতেন (জাসসাস)। এ কথা স্পষ্ট যে, হযরত উসামার জানা মতে, তা রসূলের সুন্নাতের পরিপন্থী না হলে ঐ হাদীসটি বর্ণনা করার জন্য তিনি এতটা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে পারতেন না।

১৭. এ বিষয়টি সর্বসম্মত যে, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যদি গর্ভবতী হয় তাহলে সে রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা হোক বা বায়েন তালাকপ্রাপ্তা হোক সর্বাবস্থায় সন্তান প্রসব পর্যন্ত তার বাসস্থান ও খোরপোষের দায়িত্ব স্বামীর ওপর ন্যস্ত থাকবে। তবে যে ক্ষেত্রে গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা যাবে সে ক্ষেত্রে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। এ ক্ষেত্রে সে তালাক দেয়ার পরে মারা গিয়ে থাকুক, অথবা কোন তালাক না দিয়ে মারা গিয়ে থাকুক, এবং স্ত্রী গর্ভবতী অবস্থায় বিধবা হয়ে থাকুক তাতে কিছু এসে যায় না। এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মতামত হলো ঃ

এক ঃ হযরত আলী (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) মতে, স্বামীর পরিত্যক্ত মোট সম্পদের ওপর থেকে তাকে খোরপোষ দেয়া ওয়াজিব। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা), কাজী শুরাইহ, আবুল আলীয়া, শা'বী এবং ইবরাহীম নাখায়ী থেকেও এ মতটি বর্ণিত হয়েছে এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের একটি মত এ মতের সমর্থন করে (আলুসী, জাসসাস)।

দুই ঃ ইবনে জারীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের দ্বিতীয় যে মতটি বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে, মৃত ব্যক্তি যদি কোন সম্পদ রেখে গিয়ে থাকে তাহলে সেই সম্পদে

তার গর্ভস্থ সন্তানের অংশ থেকে তার জন্য ব্যয় করতে হবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি কোন সম্পদ না রেখে গিয়ে থাকলে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদেরকে তার জন্য খরচ করা কর্তব্য। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ وعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ (البقره : ٢٣٣)

তিন ঃ হযরত জাবের (রা) ইবনে আবদুল্লাহ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়ের (রা), হযরত হাসান বাসরী, হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব এবং হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহর মতে, মৃত স্বামীর সম্পদে তার খোরপোষ লাভের কোন অধিকার নেই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত তৃতীয় মতটিও এ মতটিরই অনুরূপ (জাস্সাস)। এর অর্থ, স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদে উত্তরাধিকারী হিসেবে সে যে অংশ লাভ করেছে তা থেকে সে নিজের ব্যয় নির্বাহ করতে পারে। কিন্তু স্বামীর রেখে যাওয়া মোট সম্পদের ওপর তার খোরপোষের দায়িত্ব বর্তায় না। কারণ, তাতে সমস্ত উত্তরাধিকারীকেই সে বোঝা বহন করতে হয়।

চার ঃ ইবনে আবী লায়লার মতে, মৃত স্বামীর সম্পদ থেকে তার খোরপোষ দেয়া ঠিক তেমনি ওয়াজিব যেমন কোন ঋণদাতার ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব (জাস্সাস)। অর্থাৎ পরিত্যক্ত মোট সম্পদ থেকে যেভাবে ঋণ পরিশোধ করা হয় সেভাবে তাকে খোরপোষও দিতে হবে।

পাঁচ ঃ ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র), ইমাম মুহাম্মাদ (র) ও ইমাম যুফারের মতে, মৃত স্বামীর সম্পদ থেকে তার বাসস্থান বা খোরপোষ কোনটাই পাওয়ার অধিকার নেই। কারণ, মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির কোন মালিকানা স্বত্ব থাকে না। মৃত্যুর পর তা ওয়ারিশদের সম্পদ। তাই তাদের সম্পদে মৃত ব্যক্তির গর্ভবতী বিধবার খোরপোষ কি করে ওয়াজিব হতে পারে (হিদায়া, জাস্সাস)। ইমাম আহমাদ (র) ইবনে হাম্বলও এ মত পোষণ করেন (আল—ইনসাফ)।

ছয় ঃ ইমাম শাফেয়ীর (র) মতে, সে খোরপোষ পেতে পারে না, তবে বাসস্থান পাওয়ার অধিকারী (মুগনিউল মুহতাজ)। তাঁর দলীল হচ্ছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রা) বোন ফুরাইরার স্বামীকে হত্যা করা হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার স্বামীর বাড়ীতেই ইদ্দতকাল কাটানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন (আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী)। তাছাড়া দারু কুত্নীর একটি হাদীস থেকেও তিনি প্রমাণ দিয়েছেন। উক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة –

গর্ভবতী বিধবার জন্য কোন খোরপোষ নেই। ইমাম মালেকও (র) এ মত পোষণ করেছেন (হাশিয়াতুদ দুসুকী)।

১৮. এই নির্দেশ থেকে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা যায়। এক, নারী নিজেই তার বুকের দুধের মালিক। তাহলে এ কথা স্পষ্ট যে, সে তার দুধের বিনিময় গ্রহণ করতে পারতো না এবং সে জন্য তাকে অনুমতিও দেয়া হতো না। দুই, গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই সে তার পূর্বতন স্বামীর বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে সন্তানকে দুধ পান করাতে আইনত বাধ্য নয়। বরং শিশুর পিতা যদি তার দুধ পান করাতে

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا ۙ
وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ۝٨ فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ۝٩
اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ ۚ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ
قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝١٠ رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۭ وَمَنْ يُّؤْمِنْ
بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَآ اَبَدًا ۭ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ۝١١

রুকূ' ২

কত জনপদ[২০] তাদের রব ও তাঁর রসূলদের নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। আমি তাদের কড়া হিসেব নিয়েছিলাম এবং কঠোর শাস্তি দিয়েছিলাম। তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করেছে। তাদের কৃতকর্মের পরিণাম ছিল শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি। আল্লাহ (আখেরাতে) তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতএব, হে ঐ সব জ্ঞানীরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ তোমাদের কাছে এক নসীহত নাযিল করেছেন, এমন এক রসূল[২১] যিনি তোমাদেরকে আল্লাহর আয়াত পড়ে শোনান, যা তোমাদের সুস্পষ্ট হিদায়াত দান করে। যাতে তিনি ঈমান গ্রহণকারী ও সৎকর্মশীলদের অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন।[২২] যে ব্যক্তিই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং নেককাজ করবে আল্লাহ তাকে এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নীচ দিয়ে ঝরণা বয়ে চলবে। এসব লোক সেখানে চিরদিন থাকবে। এসব লোকের জন্য আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিক রেখেছেন।

চায় এবং সেও সম্মত হয় তাহলে সন্তানকে দুধ পান করাবে এবং সে জন্য বিনিময় লাভের অধিকারী হবে। তিন, পিতাও সন্তানকে আইনত মায়ের দুধ পান করাতে বাধ্য নয়। চার, সন্তানের ব্যয়ভার পিতার ওপর বর্তায়। পাঁচ, সন্তানকে দুধ পান করানোর সর্বাগ্র অধিকার মায়ের। কিন্তু মা যদি এতে রাজি না হয় কিংবা সে জন্য এতটা মূল্য দাবী করে যা পূরণ করার সামর্থ পিতার নেই তাহলে কেবল সেই ক্ষেত্রে অন্য কোন নারী দ্বারা তাকে দুধ পান করানোর কাজ নেয়া যেতে পারে। এ নির্দেশ থেকে ষষ্ঠ যে মূলনীতি

পাওয়া যায় তা হচ্ছে, মা যে অর্থ দাবী করছে অপর কোন মহিলাকেও যদি সেই অর্থই দিতে হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে মায়ের অধিকার অগ্রগণ্য হবে।

এ বিষয়ে ফিকাহ্‌বিদদের মাতামত নীচে বর্ণনা করা হলো ঃ

দাহ্‌হাকের মতে, শিশুকে দুধদানের সর্বাধিক অধিকার মায়ের। কিন্তু দুধ পান করানো এবং না করানোর ব্যাপারে তার ইখতিয়ার আছে। তবে শিশু যদি অন্য কোন মহিলার স্তন গ্রহণ না করে তাহলে তাকে দুধ পান করানোর জন্য মাকে বাধ্য করা হবে। কাতাদা, ইবরাহীম নাখায়ী এবং সুফিয়ান সাওরীর মত প্রায় অনুরূপ। ইবরাহীম নাখায়ী এ কথাও বলেন যে, দুধ পান করানোর জন্য যদি অন্য কোন মহিলাকে না পাওয়া যায় তা হলেও শিশুকে দুধ পান করানোর জন্য মাকে বাধ্য করা হবে। (ইবনে জারীর)

হিদায়াগ্রন্থে বলা হয়েছে, পিতা মাতার বিচ্ছেদের সময় যদি দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তান থাকে তাহলে তাকে দুধ পান করানো মায়ের জন্য ফরয নয়। তবে যদি দুগ্ধদাত্রী অন্য কোন মহিলাকে পাওয়া না যায় তাহলে তাকে দুগ্ধদানে বাধ্য করা হবে। আর বাপ যদি বলে, শিশুর মাকে বিনিময় দিয়ে দুধ পান করানোর পরিবর্তে অন্য কোন মহিলাকে বিনিময় দিয়ে এ কাজ করাবো, অথচ শিশুর মা উক্ত মহিলার দাবীকৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থই দাবী করছে কিংবা বিনামূল্যে এ কাজ করতে সম্মত হচ্ছে তাহলে এ ক্ষেত্রে তার অধিকারই অগ্রগণ্য হবে। আর শিশুর মা যদি অধিক বিনিময় দাবী করে তাহলে পিতাকে সে জন্য বাধ্য করা যাবে না।

১৯. এর মধ্যে পিতামাতা উভয়ের জন্য এক ধরনের তিরস্কার বিদ্যমান। বাচনভঙ্গি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অতীতে যে তিক্ততার কারণে শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি তালাক পর্যন্ত গড়িয়েছে তার কারণে তারা যদি উত্তম পন্থায় শিশুর দুধ পানের বিষয়টি মীমাংসা করতে না পারে তাহলে তা আল্লাহর কাছে পছন্দীয় ব্যাপার নয়। নারীকে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি অধিক বিনিময় দাবী করে পুরুষকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করে, তাহলে সে যেন জেনে রাখে, শিশুর প্রতিপালন শুধু তার ওপরেই নির্ভর করে না। সে ক্ষেত্রে অন্য কোন নারী তাকে দুধ পান করাবে। সাথে সাথে পুরুষকেও সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, সে যদি মায়ের মাতৃত্বের দুর্বলতাকে অবৈধভাবে কাজে লাগিয়ে তাকে বিপাকে ফেলতে চায় তাহলে তা ভদ্র জনোচিত কাজ হবে না। সূরা বাকারার ২৩৩ আয়াতে প্রায় অনুরূপ বিষয়ই আরো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

২০. এখানে মুসলমানদেরকে এই বলে সতর্ক করা হচ্ছে যে, আল্লাহর রসূল এবং তাঁর কিতাবের মাধ্যমে যেসব আদেশ নিষেধ তাদের দেয়া হয়েছে তা যদি তারা অমান্য করে তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে কি পরিণতির সম্মুখীন হবে। আর যদি আনুগত্যের পথ অনুসরণ করে তাহলে কি ধরনের পুরস্কার লাভ করবে।

২১. মুফাসসিরদের মধ্যে কেউ কেউ এখানে নসীহত শব্দের অর্থ করেছেন, কুরআন এবং রসূল অর্থ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আবার কেউ কেউ বলেন ঃ নসীহত অর্থ খোদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোটা ব্যক্তি সত্তাই ছিল নসীহত। আমাদের মতে, এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই অধিক বিশুদ্ধ ও যথাযথ। কারণ, প্রথম ব্যাখ্যা মেনে নিলে বাক্যাংশের

اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ یَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَیْنَهُنَّ
لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا ﴿۱۲﴾

আল্লাহ সেই সত্তা যিনি সাত আসমান বানিয়েছেন এবং যমীনের শ্রেণী থেকেও ঐগুলোর অনুরূপ।[২৩] ঐগুলোর মধ্যে হুকুম নাযিল হতে থাকে। (এ কথা তোমাদের এ জন্য বলা হচ্ছে) যাতে তোমরা জানতে পার, আল্লাহ সব কিছুর ওপরে ক্ষমতা রাখেন এবং আল্লাহর জ্ঞান সব কিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আছে।

বিন্যাস হবে এভাবে ঃ আমি তোমাদের কাছে একটি নসীহত নাযিল করেছি এবং একজন রসূল পাঠিয়েছি। এই পরিবর্তন ছাড়াই কুরআনের বাক্য যখন সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করছে এবং শুধু অর্থ প্রকাশ করছে না বরং অধিক সুস্পষ্টভাবে করছে, তখন কুরআনের ইবারতে এই পরিবর্তনের প্রয়োজন কি?

২২. অর্থাৎ জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোতে নিয়ে এসেছেন। মানুষ যখন তালাক, ইদ্দত এবং খোরপোষের ব্যাপারে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন ও আধুনিক পারিবারিক আইনসমূহ অধ্যয়ন করে তখন এ কথাটির পুরো গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে। এই তুলনামূলক অধ্যয়ন থেকে জানা যায় যে, বার বার পরিবর্তন ও নিত্য নতুন আইন রচনা সত্ত্বেও কোন জাতি যুক্তিসংগত, স্বভাবসম্মত ও সমাজের জন্য কল্যাণকর এমন কোন আইন রচনা করতে পারেনি যা এই আসমানী কিতাব এবং তার বাহক রসূল (সা) দেড় হাজার বছর পূর্বে আমাদের দিয়েছিলেন এবং কোনদিনও যা পুনর্বিবেচনা করার প্রয়োজন দেখা দেয়নি এবং দেখা দিতে পারেও না ঐ সব আইনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার কোন অবকাশ এখানে নেই। আমি আমার "স্বামী স্ত্রীর অধিকার" গ্রন্থের শেষাংশে এর একটা সংক্ষিপ্ত নমুনা মাত্র পেশ করেছি। কোন জ্ঞানী ব্যক্তি ইচ্ছা করলে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মীয় ও ধর্মহীন আইনের সাথে কুরআন ও সুন্নাহর এই আইনের তুলনামূলক অধ্যয়ন করে নিজেই দেখতে পারেন।

২৩. "ঐগুলোর অনুরূপ" কথাটির অর্থ এ নয় যে, যতগুলো আসমান বানিয়েছেন যমীনও ততগুলোই বানিয়েছেন। বরং এর অর্থ হলো, তিনি বহুসংখ্যক আসমান যেমন বানিয়েছেন তেমনি বহুসংখ্যক যমীনও বানিয়েছেন। আর যমীনের শ্রেণী থেকেও কথাটার অর্থ হচ্ছে, যে পৃথিবীতে মানুষ বাস করছে সেই পৃথিবী যেমন তার ওপর বিদ্যমান সব কিছুর জন্য বিছানা বা দোলনার মত ঠিক তেমনি আল্লাহ তা'আলা এই বিশ্ব-জাহানে আরো অনেক যমীন বা পৃথিবী বানিয়ে রেখেছেন যা তার ওপর অবস্থানকারী সবকিছুর জন্য বিছানা ও দোলনার মত। এমন কি কুরআনের কোন কোন স্থানে এ ইংগিত পর্যন্ত দেয়া হয়েছে যে, জীবন্ত সৃষ্টি কেবল যে এই পৃথিবীতে আছে তাই নয়, বরং উর্ধজগতেও জীবন্ত সৃষ্টি বা প্রাণী বিদ্যমান। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, তাফহীমুল কুরআন আশ্ শুরা, আয়াত—২৯, টীকা—৫০। অন্য কথায় আসমানে যে অসংখ্য তারকা এবং গ্রহ-উপগ্রহ

দেখা যায় তার সবই বিরাণ অনাবাদী পড়ে নেই। বরং তার মধ্য থেকেও বহু সংখ্যক গ্রহ উপগ্রহ এমন আছে যা এই পৃথিবীর মতই আবাদ।

প্রাচীনযুগের মুফাসসিরদের মধ্যে শুধুমাত্র ইবনে আব্বাসই (রা) এমন একজন মুফাসসির যিনি সেই যুগেও এই সত্যটি বর্ণনা করেছিলেন, যখন এই পৃথিবী ছাড়া বিশ্ব-জাহানের আর কোথাও বুদ্ধিমান শ্রেণীর মাখলুক বাস করে এ কথা কল্পনা করতেও কোন মানুষ প্রস্তুত ছিল না। বর্তমানেও যেখানে এই যুগের অনেক বৈজ্ঞানিক পর্যন্ত এর সত্যতা বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দিহান সে ক্ষেত্রে ১৪ শত বছর পূর্বের মানুষ একে সহজেই কিভাবে বিশ্বাস করতে পারত। তাই ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সাধারণ মানুষের সামনে এ কথা বলতে আশংকা করতেন যে, এর দ্বারা মানুষের ঈমান নড়বড়ে হয়ে না যায়। মুজাহিদ বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে এ আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ "আমি যদি তোমাদের কাছে এ আয়াতের ব্যাখ্যা পেশ করি তাহলে তোমরা কাফের হয়ে যাবে। তোমাদের কুফরী হবে এই যে, তোমরা তা বিশ্বাস করবে না, মিথ্যা বলে গ্রহণ করবে।" সাঈদ ইবনে যুবায়ের থেকেও প্রায় অনুরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেন ইবনে আব্বাস বলেছেন, "আমি যদি তোমাদেরকে এর অর্থ বলি তাহলে তোমরা কাফের হয়ে যাবে না এমন আস্থা কি করে রাখা যায়।" (ইবনে জারীর, আবদ ইবনে হুমায়েদ) তা সত্ত্বেও ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও হাকেম এবং বায়হাকী শুয়াবুল ঈমান ও কিতাবুল আসমা ওয়াস সিফাত গ্রন্থে আবুদ দোহার মাধ্যমে শাব্দিক তারতম্য সহ ইবনে আব্বাস বর্ণিত এই তাফসীর উদ্ধৃত করেছেন যে,

فِىْ كُلِّ اَرْضٍ نَبِىٌّ كَنَبِيِّكُمْ وَاٰدَمُ كَاٰدَمَ وَنُوْحٌ كَنُوْحٍ وَاِبْرَاهِيْمُ كَاِبْرَاهِيْمَ وَعِيْسٰى كَعِيْسٰى -

"ঐ সব গ্রহের প্রত্যেকটিতে তোমাদের নবীর (সা) মত নবী আছেন, তোমাদের আদমের (আ), মত আদম আছেন, নূহের (আ) মত নূহ আছেন, ইবরাহীমের (আ) মত ইবরাহীম আছেন এবং ঈসার (আ) মত ঈসা আছেন।" ইবনে হাজার (র) তাঁর ফাতহুল বারী গ্রন্থে এবং ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরেও এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম যাহাবী বলেছেন যে, এর সনদ বিশুদ্ধ। তবে আমার জানা মতে, আবুদ্ দোহা ছাড়া আর কেউ এটি বর্ণনা করেননি। তাই এটি একটি বিরল ও অপরিচিত হাদীস। অপর কিছু সংখ্যক আলেম একে মিথ্যা ও বানোয়াট বলে আখ্যায়িত করেছেন। মোল্লা আলী কারী তাঁর "মাওদুয়াতে কাবীর" গ্রন্থে (পৃষ্ঠা—১৯) একে বানোয়াট বলে উল্লেখ করে লিখেছেন, এটি যদি খোদ ইবনে আব্বাসের বর্ণিত হাদীসও হয়ে থাকে তবুও তা ইসরাঈলী পৌরাণিকতার অন্তরভূক্ত। তবে প্রকৃত সত্য ও বাস্তব হলো, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির অগম্যতাই এটিকে প্রত্যাখ্যান করার মূল কারণ। অন্যথায় এর মধ্যে যুক্তি ও বিবেক বুদ্ধি বিরোধী কোন কথা নেই। এ কারণে আল্লামা আলুসী এ বিষয়ে তাঁর তাফসীরে আলোচনা করতে গিয়ে লিখছেন ঃ বিবেক বুদ্ধি ও শরীয়তের দৃষ্টিতে এ হাদীসটি মেনে নিতে কোন বাধা নেই। এ হাদীসের অর্থ দাঁড়াচ্ছে, প্রত্যেক যমীনে একটি মাখলুক আছে। তারা একটি মূল বা উৎসের সাথে সম্পর্কিত—এই পৃথিবীতে আমরা যেমন আমাদের মূল উৎস আদম আলাইহিস সালামের সাথে সম্পর্কিত। তাছাড়া প্রত্যেক যমীনে এমন কিছু ব্যক্তিবর্গ

আছেন যাঁরা সেখানে অন্যদের তুলনায় বৈশিষ্টমন্ডিত যেমন আমাদের এখানে নূহ ও ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বৈশিষ্টমন্ডিত। তিনি আরো বলেন ঃ হয়তো যমীনের সংখ্যা সাতের অধিক হবে এবং অনুরূপভাবে আসমানও শুধু সাতটিই হবে না। সাত একটি পূর্ণ বা অবিভাজ্য সংখ্যা। এ সংখ্যাটি উল্লেখ করায় তার চেয়ে বড় সংখ্যা রহিত হয়ে যাওয়া অনিবার্য নয়। তাছাড়া কোন কোন হাদীসে যেখানে এক আসমান থেকে অপর আসমানের মধ্যবর্তী দূরত্ব পাঁচ শত বছর বলা হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি বলেছেনঃ هو من باب التقريب للافهام অর্থাৎ এর দ্বারা হুবহু দূরত্বের পরিমাণ বা মাপ বর্ণনা করা হয়নি। বরং কথাটি যাতে মানুষের জন্য অধিকতর বোধগম্য হয় সে উদ্দেশ্যে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি আমেরিকার র‍্যাণ্ড কর্পোরেশন (Rand corporation) মহাশূন্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুমান করেছে যে, পৃথিবী যে ছায়াপথে অবস্থিত শুধু তার মধ্যেই প্রায় ৬০ কোটি এমন গ্রহ দেখা যায় আমাদের পৃথিবীর সাথে যার প্রাকৃতিক অবস্থার অনেকটা সাদৃশ্য আছে এবং সম্ভবত সেখানেও জীবন্ত মাখলুক বা প্রাণী বসবাস করছে। (ইকনমিষ্ট, লন্ডন, ২৬শে জুলাই, '৬৯ ইং)।

আত তাহরীম

৬৬

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের لم تحرم শব্দ থেকে এর নাম গৃহীত। এটিও সূরার বিষয়-ভিত্তিক শিরোনাম নয়। বরং এ নামের অর্থ হচ্ছে এ সূরার মধ্যে তাহরীম সম্পর্কিত বিষয়ের উল্লেখ আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার মধ্যে তাহরীম সম্পর্কিত যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনাসমূহে দু'জন মহিলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা দু'জনই নবীর (সা) স্ত্রী। তাঁদের একজন হলেন হযরত সাফিয়া (রা) এবং অন্যজন হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা)। তাঁদের মধ্যে একজন অর্থাৎ হযরত সাফিয়া (রা) খায়বার বিজয়ের পরে নবীর (সা) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আর সর্বসম্মত মতে খায়বার বিজিত হয় ৭ম হিজরীতে। দ্বিতীয় মহিলা হযরত মারিয়াকে (রা) মিসরের শাসক মুকাওকিস ৭ম হিজরী সনে নবীর (সা) খেদমতের জন্য পাঠিয়েছিলেন। ৮ম হিজরীর যুলহাজ্জ মাসে তাঁরই গর্ভে নবীর (সা) পুত্র সন্তান হযরত ইবরাহীম (রা) জন্ম লাভ করেন। এসব ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে এ বিষয়টি প্রায় সুনির্দিষ্ট হয়ে যায় যে, এ সূরাটি ৭ম অথবা ৮ম হিজরীর কোন এক সময় নাযিল হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূরা। এ সূরার মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণের সাথে জড়িত কিছু ঘটনার প্রতি ইংগিত দিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

এক ঃ হালাল হারাম এবং জায়েয নাজায়েযের সীমা নির্ধারণ করার ইখতিয়ার চূড়ান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার হাতে। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা খোদ আল্লাহ তা'আলার নবীর (সা) কাছেও তার কোন অংশ হস্তান্তর করা হয়নি। নবী নবী হিসেবে কোন জিনিসকে হারাম বা হালাল ঘোষণা করতে পারেন কেবল তখনই যখন এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন ইংগিত থাকে। সে ইংগিত কুরআন মজীদে নাযিল হয়ে থাক কিংবা তা অপ্রকাশ্য অহীর মাধ্যমে নাযিল হয়ে থাক তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু খোদ আল্লাহ কর্তৃক মোবাহকৃত কোন জিনিসকে নিজের পক্ষ থেকে হারাম করে নেয়ার অনুমতি কোন নবীকেও দেয়া হয়নি। এ ক্ষেত্রে অন্য কোন মানুষের তো প্রশ্নই ওঠে না।

দুই ঃ মানব সমাজে নবীর স্থান ও মর্যাদা অত্যন্ত নাজুক। একটি সাধারণ কথা যা অন্য কোন মানুষের জীবনে সংঘটিত হলে তা তেমন কোন গুরুত্বই বহন করে না, কিন্তু অনুরূপ ঘটনাই নবীর জীবনে সংঘটিত হলে আইনের মর্যাদা লাভ করে। তাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নবী–রসূলদের জীবন পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে তাদের অতি ক্ষুদ্র কোন পদক্ষেপও আল্লাহর ইচ্ছার পরিপন্থী না হয়। নবীর দ্বারা এমন কোন ক্ষুদ্র কাজও সংঘটিত হয়ে গেলে সংগে সংগে তা সংশোধন করে দেয়া হয়েছে, যাতে ইসলামী আইন ও তার উৎস সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ রূপে শুধু আল্লাহর কিতাব আকারে নয় বরং নবীর "উসওয়ায়ে হাসানা" বা উত্তম জীবন আদর্শরূপে আল্লাহর বান্দাদের কাছে পৌঁছে এবং তার মধ্যে অণু পরিমাণও এমন কোন জিনিস সংমিশ্রিত হতে না পারে, আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জির সাথে যার কোন মিল নেই।

তিন ঃ ওপরে বর্ণিত মূলনীতির আলোকে আপনা থেকেই যে বিষয়টি বুঝা যায় তা এই যে, একটি ক্ষুদ্র বিষয়েও যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভুল দেখিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তা শুধু সংশোধনই করা হয়নি, বরং রেকর্ডভুক্তও করা হয়েছে তখন তা অকাট্যভাবে আমাদের মনে এ আস্থা সৃষ্টি করে যে, নবীর (সা) পবিত্র জীবনকালের যেসব কাজকর্ম ও হুকুম–আহকাম বর্তমানে আমরা পাচ্ছি, এবং যেসব কাজকর্ম ও হুকুম আহকাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন তিরস্কার বা সংশোধনী রেকর্ডে নেই তা পুরাপুরি সত্য ও নির্ভুল এবং আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পূর্ণরূপে সংগতিপূর্ণ। ঐ সব কাজকর্ম ও আদেশ নিষেধ থেকে আমরা পূর্ণ আস্থার সাথে হিদায়াত ও পথনির্দেশ গ্রহণ করতে পারি।

কুরআন মজীদের এই বাণী থেকে চতুর্থ যে বিষয়টি সামনে আসে তা হচ্ছে, যে পবিত্র রসূলের সম্মান ও মর্যাদাকে আল্লাহ নিজে বান্দাদের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবে গণ্য করেন সেই রসূল সম্পর্কে এ সূরাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি তাঁর স্ত্রীদের খুশী করার জন্য একবার আল্লাহর হালালকৃত একটি জিনসকে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। আর নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণ, আল্লাহ নিজে যাদেরকে ঈমানদারদের মা বলে ঘোষণা করেন, এবং যাঁদেরকে সম্মান করার জন্য তিনি নিজে মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন কিছু ভুল–ত্রুটির জন্য তাঁদেরকেই আবার তিনি কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। তাছাড়া নবীকে তিরস্কার এবং তাঁর স্ত্রীদেরকে সাবধান চুপিসারে করা হয়নি, বরং তা সেই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা সমস্ত উম্মাতকে চিরদিন পড়তে হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূল এবং উম্মুল মু'মিনীনদেরকে ঈমানদারদের দৃষ্টিতে হেয়প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়ে তাঁর কিতাবে এসব উল্লেখ করেননি। আল্লাহ তা'আলার এরূপ কোন অভিপ্রায় ছিল না, কিংবা তা থাকতেও পারে না। একথাও স্পষ্ট যে, পবিত্র কুরআনের এ সূরা পাঠ করে কোন মুসলমানের অন্তর থেকে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা উঠে যায়নি। তাহলে কুরআনে এ কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে তাঁদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সম্মান প্রদর্শনের সঠিক সীমারেখার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চান। নবীগণ কেবল নবীই, তাঁরা খোদা নন যে, তাঁদের কোন ভুল–ত্রুটি হতে পারে না। নবীর মর্যাদা এ কারণে নয় যে, তাঁর কোন ভুল–ত্রুটি হওয়া অসম্ভব। বরং নবীর মর্যাদা এ কারণে যে, তিনি আল্লাহর ইচ্ছার পূর্ণাঙ্গ বাস্তব রূপ। তাঁর

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভুল-ত্রুটিকেও আল্লাহ সংশোধন না করে ছেড়ে দেননি। এভাবে আমরা এ আস্থা ও প্রশান্তি লাভ করি যে, নবীর রেখে যাওয়া আদর্শ আল্লাহর ইচ্ছার বাস্তব প্রতিনিধিত্ব করছে। একইভাবে সাহাবা কিরাম হোন বা নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণ হোন, তাঁরা সবাই মানুষ ছিলেন, ফেরেশতা বা মানব সত্তার উর্ধে কিছু ছিলেন না। তাদেরও ভুল-ত্রুটি হওয়া সম্ভব ছিল। তাঁরা যে মর্যাদা লাভ করেছিলেন তার কারণ ছিল এই যে, আল্লাহর রসূলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ তাঁদেরকে মানবতার সর্বোত্তম নমুনা বানিয়ে দিয়েছিল। তাঁদের যা কিছু সম্মান ও মর্যাদা তা এ কারণেই। তাঁরা ভুল-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন এরূপ অনুমান ও মনগড়া ধারণার ওপর তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত নয়। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কল্যাণময় যুগে সাহাবা কিরাম কিংবা নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণের দ্বারা মানবিক দুর্বলতার কারণে যখনই কোন ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে তখনই তাদের সতর্ক করা হয়েছে ও ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। নবী (সা) নিজেও তাদের কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি সংশোধন করেছেন যা হাদীস গ্রন্থসমূহের বহু সংখ্যক জায়গায় উল্লেখ আছে। আল্লাহ তা'আলা নিজেও কুরআন মজীদে তাঁদের কিছু কিছু ভুল-ত্রুটির উল্লেখ করে তা সংশোধন করেছেন যাতে মুসলমানগণ কখনই তাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সম্মান দেখানোর এমন কোন অতিরঞ্জিত ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে না নেয় যা তাঁদেরকে মানুষের পর্যায় থেকে উঠিয়ে আল্লাহর মর্যাদায় বসিয়ে না দেয়। আপনি যদি চোখ খুলে কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করেন তাহলে আপনার সামনে এর দৃষ্টান্ত একের পর এক আসতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আলে ইমরানে ওহুদ যুদ্ধের আলোচনা প্রসংগে সাহাবী কিরামদের সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

"আল্লাহ তা'আলা (সাহায্য-সহযোগিতার) যে প্রতিশ্রুতি তোমাদের দিয়েছিলেন তা তিনি পূরণ করেছেন যখন তোমরা তাদেরকে তাঁর ইচ্ছায় হত্যা করছিলে। অবশেষে তোমরা যখন দুর্বলতা দেখালে এবং কাজের ব্যাপারে মতানৈক্য করলে আর যে জিনিসের আকাংখা তোমরা করছিলে আল্লাহ তা'আলা যেই মাত্র তোমাদের সেই জিনিস দেখালেন (অর্থাৎ গনীমতের সম্পদ) তখনই তোমরা তার হুকুমের নাফরমানি করে বসলে। তোমাদের মধ্যে কেউ ছিল পার্থিব স্বার্থের প্রত্যাশী এবং কেউ ছিলে আখেরাতের প্রত্যাশী। এ অবস্থায় তোমাদের পরীক্ষার জন্য আল্লাহ তাদের মোকাবেলায় তোমাদের পরাস্ত করে দিলেন। আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ও মেহেরবান।" (আয়াত, ১৫২)

অনুরূপভাবে সূরা নূরে হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদের উল্লেখ করে আল্লাহ সাহাবীগণকে বলেন ঃ

"এমনটা কেন হলো না যে, যখন তোমরা এ বিষয়টি শুনেছিলে মু'মিন নারী ও পুরুষ সবাই নিজে সে বিষয়ে ভাল ধারণা পোষণ করতে এবং বলে দিতে যে, এটা তো স্পষ্ট অপবাদ। ..... দুনিয়া ও আখেরাতে যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর মেহেরবানী ও দয়া না হতো তাহলে যে বিষয়ের মধ্যে তোমরা নিক্ষিপ্ত হয়েছিলে তার পরিণামে কঠিন আযাব তোমাদের গ্রাস করতো। একটু ভেবে দেখ, যখন তোমাদের মুখে মুখে কাহিনীটার চর্চা হচ্ছিল এবং তা ছড়াচ্ছিল এবং তোমরা এমন কিছু বলছিলে যে বিষয়ে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না। তোমরা এটাকে একটা মামুলি ব্যাপার মনে করছিলে। কিন্তু আল্লাহর কাছে তা ছিল গুরুতর বিষয়। কেন তোমরা এ কথা শোনামাত্র বললে না যে, আমাদের জন্য

এরূপ কথা মুখে আনাও শোভা পায় না। সুবহানাল্লাহ! এটা তো একটা গুরুতর অপবাদ? আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক তাহলে ভবিষ্যতে আর কখনো যেন তোমরা এরূপ আচরণ না করো।" (আয়াত, ১২ থেকে ১৭)।

সূরা আহযাবে নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে ঃ

"হে নবী, তোমার স্ত্রীদের বলো, তোমরা দুনিয়া ও তার চাকচিক্য চাও তাহলে এসো আমি তোমাদের কিছু দিয়ে উত্তম রূপে বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং আখেরাতের প্রত্যাশী হয়ে থাকো তাহলে জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদের জন্য বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (আয়াত, ২৮, ২৯)।

সূরা জুম'আতে সাহাবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"তারা ব্যবসায়-বাণিজ্য ও খেল-তামাশা দেখে সে দিকে ছুটে গেল এবং (হে নবী,) তোমাকে (খোতবা দানরত অবস্থায়) দণ্ডায়মান রেখে গেল। তাদের বলো, আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে তা খেল-তামাশা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।" (আয়াত ১১)

মক্কা বিজয়ের পূর্বে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী হযরত হাতেব ইবনে আবী বালতায়া নবীর (সা) মক্কা অভিযানের খবর গোপনে কুরাইশদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সূরা মুমতাহিনায় তাঁর এ কাজের কঠোর সমালোচনা ও তিরস্কার করা হয়েছে।

কুরআন মজীদের মধ্যেই এসব উদাহরণ বর্তমান, যে কুরআন মজীদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সাহাবা কিরাম এবং নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণের সম্মান ও মর্যাদা নিজে বর্ণনা করেছেন এবং তাদেরকে রাদিয়াল্লাহ আনহুম ওয়া রাদু আনহু অর্থাৎ তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট বলে ফরমান শুনিয়েছেন। সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মান দেখানোর এই শিক্ষা মধ্যপন্থার ওপর ভিত্তিশীল। এ শিক্ষা মুসলমানদেরকে মানুষ পূজার সেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেছে যার মধ্যে ইহুদী ও খৃষ্টানরা নিপতিত হয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বড় বড় মনীষী হাদীস, তাফসীর এবং ইতিহাস বিষয়ে যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে যেসব জায়গায় সাহাবায়ে কিরাম, নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণ এবং অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মর্যাদা ও পূর্ণতার যে বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে তাদের দুর্বলতা, বিচ্যুতি এবং ভুল-ত্রুটির ঘটনা বর্ণনা করতেও দ্বিধা করা হয় নাই। অথচ বর্তমান সময়ের সম্মান প্রদর্শনের দাবীদারদের তুলনায় তাঁরা তাঁদের বেশী মর্যাদা দিতেন এবং সম্মান প্রদর্শনের সীমারেখাও তারা এদের চেয়ে বেশী জানতেন।

পঞ্চম যে কথাটি এ সূরায় খোলাখুলি বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে, আল্লাহর দীন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নিখুঁত। এ দীন অনুসারে ঈমান ও আমলের বিচারে প্রত্যেকের যা প্রাপ্য তাই সে পাবে। অতি বড় কোন বোজর্গের সাথে ঘনিষ্ঠতাও তার জন্য আদৌ কল্যাণকর নয় এবং অত্যন্ত খারাপ কোন ব্যক্তির সাথে সম্পর্কও তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। এ ব্যাপারে বিশেষ করে নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণের সামনে উদাহরণ হিসেবে তিন শ্রেণীর

স্ত্রীলোককে পেশ করা হয়েছে। একটি উদাহরণ দেয়া হয়েছে হযরত নূহ (আ) ও হযরত লূতের (আ) স্ত্রীদের। তারা যদি ঈমান আনয়ন করত এবং তাদের মহাসম্মানিত স্বামীর সাথে সহযোগিতা করত তাহলে মুসলিম উম্মার মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণের যে মর্যাদা তাদের মর্যাদাও তাই হতো। কিন্তু যেহেতু তারা এর বিপরীত আচরণ ও পন্থা অবলম্বন করেছে, তাই নবীদের স্ত্রী হওয়াটাও তাদের কোন কাজে আসেনি এবং তারা জাহান্নামের অধিবাসী হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণ দেয়া হয়েছে ফেরাউনের স্ত্রীর। যদিও তিনি আল্লাহর জঘন্য এক দুশমনের স্ত্রী ছিলেন কিন্তু যেহেতু তিনি ঈমান গ্রহণ করেছিলেন এবং ফেরাউনের কওমের কাজ কর্ম থেকে নিজের কাজ কর্মের পথ সম্পূর্ণ আলাদা করে নিয়েছিলেন তাই ফেরাউনের মত চরম পর্যায়ের কাফেরের স্ত্রী হওয়াও তাঁর কোন ক্ষতির কারণ হয়নি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতের উপযুক্ত বানিয়ে দিয়েছেন। তৃতীয় উদাহরণ দেয়া হয়েছে হযরত মারয়াম আলাইহিস সালামের। তাঁর এই বিরাট মর্যাদা লাভের কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করার ফায়সালা করেছিলেন তা তিনি মাথা পেতে গ্রহণ করেছেন। তাঁকে কুমারী অবস্থায় আল্লাহর হুকুমে মু'জিযা হিসেবে গর্ভবতী বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং এভাবে তাঁর রব তাঁর দ্বারা কি কাজ নিতে চান তাও তাকে বলে দেয়া হয়েছে। হযরত মারয়াম ছাড়া পৃথিবীর আর কোন অভিজাত ও নেক্কার মহিলাকে এরূপ কোন কঠিন পরীক্ষার মধ্যে কখনো ফেলা হয়নি। হযরত মারয়াম এ ব্যাপারে যখন কোন আফসোস ও আর্তনাদ করেননি বরং একজন খাঁটি ঈমানদার নারী হিসেবে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য যা বরদাশত করা অপরিহার্য ছিল তা সবই বরদাশত করা স্বীকার করেছেন তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে سيدة النساء فى الجنة 'বেহেশতের মহিলাদের নেত্রী' (মুসনাদে আহমাদ) হওয়ার মত সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।

এসব বিষয় ছাড়াও আমরা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য এ সূরা থেকে জানতে পারি। তা হচ্ছে, কুরআন মজীদে যা কিছু লিপিবদ্ধ আছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কেবল সেই জ্ঞানই আসতো না। বরং তাঁকে অহীর মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানও দেয়া হতো যা কুরআনে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এ সূরার ৩নং আয়াত তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। তাতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের একজনের কাছে গোপনীয় একটি কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি তা অন্য কাউকে বলেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিলেন। অতপর নবী (সা) এই ত্রুটির জন্য তাঁর সেই স্ত্রীকে সতর্ক করে দিলেন। এতে তাঁর স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তাঁর এই ত্রুটি সম্পর্কে তাঁকে কে অবহিত করেছেন। নবী (সা) জবাব দিলেন। যে সত্তা আলীম ও খাবীর তিনিই আমাকে তা জানিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গোটা কুরআন মজীদের মধ্যে সেই আয়াতটি কোথায় যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীকে গোপনীয় যে কথা বলেছিলে তা সে অন্যের কাছে বা অমুকের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে? কুরআনে যদি এমন কোন আয়াত না থেকে থাকে এবং এটা সুস্পষ্ট যে, তা নেই তাহলে এটাই এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, কুরআন ছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অন্য অহী আসতো। কুরআন ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আর কোন অহী আসতো না, হাদীস অস্বীকারকারীদের এ দাবী এর দ্বারা বাতিল হয়ে যায়।

আয়াত ১২ **সূরা আত তাহরীম-মাদানী** রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ①

হে নবী, আল্লাহ যে জিনিস হালাল করেছেন তা তুমি হারাম করছো কেন?[১] (তা কি এ জন্য যে,) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাও?[২] আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং দয়ালু।[৩]

১. এটা মূলত প্রশ্ন নয়, বরং অসন্তোষের বহিপ্রকাশ। অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা জিজ্ঞেস করা নয় যে, আপনি এ কাজ কেন করেছেন? বরং তাঁকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়াই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর হালালকৃত জিনিসকে নিজের জন্য হারাম করে নেয়ার যে কাজ আপনার দ্বারা হয়েছে, তা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়। এ থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহর হালালকৃত জিনিস হারাম করার অধিকার কারো নেই, এমন কি স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজেরও এই ইখতিয়ার নেই। নবী (সা) ঐ জিনিসটিকে যদিও আকীদাগতভাবে হারাম মনে করেছিলেন না কিংবা শরীয়াতসম্মতভাবে হারাম বলে সাব্যস্ত করেছিলেন না, বরং নিজের জন্য তা ব্যবহার করা হারাম করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মর্যাদা যেহেতু সাধারণ একজন মানুষের মত ছিল না বরং তিনি আল্লাহর রসূলের মর্যাদায় অভিসিক্ত ছিলেন। তাই তাঁর নিজের পক্ষ থেকে নিজের ওপর কোন জিনিস হারাম করে নেয়াতে এই আশংকা ছিল যে, তাঁর উম্মাতও ঐ জিনিসকে হারাম অথবা অন্তত মাকরূহ বলে মনে করতে আরম্ভ করবে অথবা উম্মাতের লোকেরা মনে করতে শুরু করবে যে, আল্লাহর হালালকৃত কোন জিনিস নিজের জন্য হারাম করে নেয়ায় কোন দোষ নেই। এ কারণে আল্লাহ তা'য়ালা এ কাজের জন্য তাঁকে তিরস্কার করেছেন এবং নিজে হারাম করে নেয়ার এই কাজ থেকে বিরত থাকার হুকুম দিয়েছেন।

২. এ থেকে জানা যায় যে, হারাম করে নেয়ার এই কাজটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ইচ্ছায় করেছিলেন না। বরং তাঁর স্ত্রীগণ চেয়েছিলেন তিনি যেন এরূপ করেন। আর তাই তিনি শুধু তাঁদের খুশী করার জন্য একটি হালাল বস্তুকে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, হারাম করে নেয়ার এ কাজটি সম্পর্কে তিরস্কার করার সাথে আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে তার এই কারণটি কেন

উল্লেখ করলেন? এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর বাণীর উদ্দেশ্য যদি শুধু হালালকে হারাম করে নেয়া থেকে নবীকে (সা) বিরত রাখা হতো তাহলে আয়াতের প্রথমাংশ দ্বারাই এ উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যেতো। যে কারণে তিনি এ কাজ করেছিলেন তা স্পষ্ট করে বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। তা বিশেষভাবে বর্ণনা করায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হালালকে হারাম করে নেয়ার কারণে শুধু নবীকে (সা)–ই তিরস্কার করা উদ্দেশ্য নয়। বরং সাথে সাথে তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণকেও এ বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া যে, নবীর স্ত্রী হওয়ার কারণে যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাঁদের ছিল তা তাঁরা উপলব্ধি কনেননি এবং তাঁকে দিয়ে এমন একটি কাজ করিয়েছেন যার দ্বারা একটি হালাল জিনিস হারাম হয়ে যাওয়ার বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হতে পারতো।

নবী (সা) নিজের জন্য যে জিনিসটি হারাম করে নিয়েছিলেন সেটি কি ছিল কুরআন মজীদে যদিও তা বলা হয়নি কিন্তু মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সিরগণ এ আয়াত নাযিলের কারণ হিসেবে দু'টি ভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একটি ঘটনা হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা) সম্পর্কিত এবং অপর ঘটনাটি হলো নবী (সা) মধু পান না করার শপথ করেছিলেন।

হযরত মারিয়ার (রা) ঘটনা হলো, হুদায়রিয়ার সন্ধির পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশপাশের বাদশাহদের কাছে যেসব পত্র দিয়েছিলেন তার মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়ার রোমান খৃষ্টান ধর্মযাজকের (Patriarch) কাছেও একটি পত্র দিয়েছিলেন। আরবরা তাকে মুকাওকিস বলে অভিহিত করত। হযরত হাতেব ইবনে আবী বালতা'আ এই মহামূল্যবান পত্রখানা নিয়ে তার কাছে পৌঁছলে তিনি ইসলাম কবুল করেননি কিন্তু তাঁর সাথে ভাল ব্যবহার করলেন এবং পত্রের উত্তরে লিখলেন ঃ "আমি জানি আরো একজন নবী আসতে এখনো বাকী। তবে আমার ধারণা ছিল তিনি সিরিয়ায় আসবেন। তা সত্ত্বেও আমি আপনার দূতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছি এবং কিবতীদের মধ্যে অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী দু'টি মেয়েকে পাঠাচ্ছি।" (ইবনে সা'দ) মেয়ে দু'টির মধ্যে একজনের নাম সিরীন এবং অপর জনের নাম মারিয়া। (খৃষ্টানরা হযরত মারয়ামকে মারিয়া MARY বলে থাকে। মিসর থেকে ফেরার পথে হযরত হাতিব তাদের উভয়কে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানালে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। অতপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির হলে তিনি সিরীনকে হযরত হাসসান (রা) ইবনে সাবেতের মালিকানায় দিয়ে দেন এবং মারিয়াকে তাঁর হারামের অন্তরভুক্ত করেন। ৮ হিজরীর যুলহাজ্জ মাসে তাঁর গর্ভে নবীর (সা) পুত্র ইবরাহীম জন্মলাভ করেন (আল ইসতিয়াব–আল ইসাবা)। এই মহিলা ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী। হাফেজ ইবনে হাজার তাঁর আল ইসাবা গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে হযরত আয়েশার (রা) এ উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন। মারিয়ার আগমন আমার কাছে যতটা অপছন্দীয় হয়েছে অন্য কোন মহিলার আগমন ততটা অপছন্দনীয় হয়নি। কারণ, তিনি ছিলেন অতিব সুন্দরী এবং নবী (সা) তাঁকে খুব পছন্দ করেছিলেন। বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীসসমূহে তাঁর সম্পর্কে যে কাহিনী উদ্ধৃত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে, নবী (সা) একদিন হযরত হাফসার ঘরে গেলে তিনি সেখানে ছিলেন না। সেই সময় হযরত মারিয়া সেখানে তাঁর কাছে আসেন এবং তাঁর সাথে নির্জনে কাটান। হযরত হাফসা তা অপছন্দ করলেন এবং তিনি এ ব্রিষয়ে কঠোর ভাষায় নবীর (সা) কাছে অভিযোগ করলেন। তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য নবী (সা) তাঁর কাছে ওয়াদা

করলেন যে, তিনি ভবিষ্যতে মারিয়ার সাথে কোন প্রকার দাম্পত্য সম্পর্ক রাখবেন না। কিছু সংখ্যক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মারিয়াকে নিজের জন্য হারাম করে নিলেন। আবার কোন কোন রেওয়ায়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ ব্যাপারে তিনি শপথও করেছিলেন। এসব হাদীস বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাবেয়ীদের থেকে 'মুরসাল' হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে কিছু সংখ্যক হাদীস হযরত উমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ (রা) ইবনে আব্বাস এবং হযরত আবু হুরাইরা থেকেও বর্ণিত হয়েছে। এসব হাদীসের সনদের আধিক্য দেখে এর কোন না কোন ভিত্তি আছে বলে হাফেজ ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে ধারণা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সিহাহ সিত্তার কোন গ্রন্থেই এ কাহিনী উদ্ধৃত হয়নি। নাসায়ীতে হযরত আনাস থেকে শুধু এতটুকু উদ্ধৃত হয়েছে যে, নবীর (সা) একটি দাসী ছিল যার সাথে তিনি দাম্পত্য সম্পর্ক রাখতেন। এই ঘটনার পর হযরত হাফসা (রা) এবং হযরত আয়েশা (রা) তাঁর পিছে লাগলেন। যার কারণে নবী (সা) তাকে নিজের জন্য হারাম করে নিলেন। এ কারণে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ হে নবী, আল্লাহ যে জিনিস তোমার জন্য হালাল করেছেন তা তুমি হারাম করে নিচ্ছ কেন?

দ্বিতীয় ঘটনাটি বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী এবং অপর কিছু সংখ্যক হাদীস গ্রন্থে স্বয়ং হযরত আয়েশা (রা) থেকে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তার সারসংক্ষেপ এই যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত প্রতিদিন আসরের পর পবিত্র স্ত্রীগণের সবার কাছে যেতেন। একবার তিনি যয়নাব বিনতে জাহাশের কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসলেন। কারণ, কোথাও থেকে তাঁর কাছে মধু পাঠানো হয়েছিল। আর নবী (সা) মিষ্টি খুব ভালবাসতেন। তাই তিনি তাঁর কাছে মধুর শরবত পান করতেন।

হযরত আয়েশা বর্ণনা করেন, এ কারণে খুব হিংসা হলো এবং আমি হযরত হাফসা (রা), হযরত সাওদা (রা) ও হযরত সাফিয়ার সাথে মিলিত হয়ে এ মর্মে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, নবী (সা) আমাদের যার কাছেই আসবেন সেই তাঁকে বলবে, আপনার মুখ থেকে মাগাফিরের গন্ধ আসছে। মাগাফির এক প্রকার ফুল যার মধ্যে কিছুটা দুর্গন্ধ থাকে। মৌমাছি উক্ত ফুল থেকে মধু আহরণ করলে তার মধ্যেও ঐ দুর্গন্ধের কিছুটা লেশ বর্তমান থাকে। এ কথা সবাই জানতেন যে, নবী (সা) অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও রুচিশীল ছিলেন। তাঁর শরীর থেকে কোন প্রকার দুর্গন্ধ আসুক তিনি তা একেবারেই অপছন্দ করতেন। তাই হযরত যয়নাবের কাছে তাঁর দীর্ঘ অবস্থানকে বন্ধ করার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করা হলো এবং তা ফলবতী হলো। যখন কয়েকজন স্ত্রী তাঁকে বললেন যে, তাঁর মুখ থেকে মাগাফিরের গন্ধ আসে তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, আর কখনো তিনি মধু পান করবেন না। একটি হাদীসে তাঁর বক্তব্যের ভাষা উদ্ধৃত হয়েছে এরূপঃ فلن اعود له وقد حلفت "আমি আর কখনো এ জিনিস পান করবো না, আমি শপথ করেছি।" অপর একটি হাদীসে শুধু فلن اعود له কথাটি আছে وقد حلفت কথাটির উল্লেখ নেই। ইবনে আব্বাস থেকে যে হাদীসটি ইবনুল মুনযির। ইবনে আবী হাতেম, তাবারানী এবং ইবনে মারদুয়া বর্ণনা করেছেন তাতে বক্তব্যের ভাষা হলো ঃ واللـه لا اشربه আল্লাহর কসম, আমি আর তা পান করবো না।

বড় বড় মনীষী এই দু'টি কাহিনীর মধ্যে দ্বিতীয় কাহিনীটিকে সঠিক বলে মেনে নিয়েছেন এবং প্রথম কাহিনীটিকে অনির্ভরযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম নাসায়ী

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٢﴾

আল্লাহ তোমাদের জন্য কসমের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।[৪] আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি মহাজ্ঞানী ও মহা কৌশলী।[৫]

বলেন ঃ "মধুর ঘটনা সম্পর্কিত ব্যাপারে হযরত আয়েশার (রা) বর্ণিত হাদীস বিশুদ্ধ। এবং হযরত মারিয়াকে (রা) হারাম করে নেয়ার ঘটনা কোন উত্তম সনদে বর্ণিত হয়নি।" কাজী আয়াজ বলেন ঃ "নির্ভুল কথা এই যে, এ আয়াতটি হযরত মারিয়ার (রা) ব্যাপারে নয়, বরং মধু সম্পর্কিত ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।" কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবীও মধু সম্পর্কিত কাহিনীকেই বিশুদ্ধ বলে মনে করেন এবং ইমাম নববী ও হাফেজ বদরুদ্দীন আইনীও এই মতটিই পোষণ করেন। ফাতহুল কাদির নামক ফিকাহ গ্রন্থে ইমাম ইবনে হুমাম বলেন ঃ মধু হারাম করে নেয়ার কাহিনী বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা) নিজে বর্ণনা করেছেন যাঁকে নিয়ে এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং এ বর্ণনাটিই অধিক নির্ভরযোগ্য। হাফেজ ইবনে কাসীর বলেন ঃ সঠিক কথা হলো, নিজের জন্য মধু পান হারাম করে নেয়া সম্পর্কে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

৩. অর্থাৎ স্ত্রীদের সন্তুষ্টির জন্য একটি হালাল জিনিসকে হারাম করে নেয়ার যে কাজ আপনার দ্বারা হয়েছে সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল পদমর্যাদার দিক দিয়ে তা যদিও যথোচিত হয়নি, কিন্তু তা গোনাহর কাজও নয় যে, সে জন্য পাকড়াও করা যেতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা শুধু সে ভুল দেখিয়ে দিয়ে সংশোধন করে দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করেছেন এবং তাঁর এই ত্রুটি মাফ করে দিয়েছেন।

৪. অর্থাৎ একটি হালাল বস্তুকে নিজের ওপর হারাম করে নেয়ার যে কসম আপনি করেছেন সূরা মায়েদার ৮৯ আয়াতে কাফ্ফারা দিয়ে কসম ভঙ্গ করার ও তার বাধ্যবাধকতা থেকে বেরিয়ে আসার যে পন্থা আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত করে দিয়েছেন তদনুযায়ী কাজ করে আপনি তা ভঙ্গ করুন। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিকহী প্রশ্ন দেখা দেয়। তাহলো যে ক্ষেত্রে কেউ কসম করে হালাল জিনিসকে হারাম করে নিয়েছে সে ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে না কি কসমের বাক্য মুখে বলা হোক বা না হোক কার্যত হারাম করে নেয়াটাই কসম করার সমার্থক হবে ? এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে।

একদল ফিকাহবিদ বলেন ঃ শুধু হারাম করে নেয়া কসম নয়। কেউ যদি কোন জিনিসকে তা স্ত্রী হোক বা অন্য কোন হালাল বস্তু হোক কসম করা ছাড়াই নিজের জন্য হারাম করে নেয় তাহলে তা হবে একটি অনর্থক কাজ। এ জন্য কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না। বরং সে যে জিনিস হারাম করে নিয়েছে কাফ্ফারা না দিয়েই তা ব্যবহার করতে পারবে। মাসরূক, শা'বী, রাবী'আ এবং আবু সালামা এমত পোষণ করেছেন। ইবনে জারীর এবং জাহেরীগণ এ মতটিই অবলম্বন করেছেন। তাঁদের মধ্যে তাহরীম বা হারাম করে নেয়া কেবল তখনই কসম বলে গণ্য হবে যখন কেউ কোন বস্তুকে নিজের জন্য হারাম

করে নেয়ার সময় কসমের ভাষা ব্যবহার করবে। এ ক্ষেত্রে তাঁদের যুক্তি হলো, বিভিন্ন রেওয়ায়াত অনুসারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু হালাল জিনিসকে নিজের জন্য হারাম করে নেয়ার সাথে কসমও করেছিলেন তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলেছেন ঃ আমি কসমের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার যে পন্থা নির্ধারিত করে দিয়েছি আপনি তদনুযায়ী কাজ করুন।

অপর একদলের মতে, কসমের শব্দ ও ভাষা প্রয়োগ করা ছাড়া কোন জিনিসকে হারাম করে নেয়া কসম নয় বটে, তবে স্ত্রীর ক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রম। অন্যান্য বস্তু যেমন কাপড়চোপড় বা খাদ্য দ্রব্যকে কেউ যদি নিজের জন্য হারাম করে নেয় তাহলে তা একটি অর্থহীন কাজ। কোন কাফ্ফারা দেয়া ছাড়াই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তা ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু স্ত্রী বা দাসী সম্পর্কে সে যদি বলে যে, তার সাথে সহবাস করা আমার জন্য হারাম তাহলে তা হারাম হবে না বটে, কিন্তু তার কাছে যাওয়ার পূর্বে কসমের কাফ্ফারা অবশ্যই দিতে হবে। এ সিদ্ধান্ত শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের। (মুগনিউল মুহতাজ) মালেকী মাযহাবের অনুসারীগণও অনেকটা অনুরূপ মত অনুসরণ করে থাকেন। (আহকামুল কুরআন লি ইবনিল আরাবী)

তৃতীয় আরেকটি দলের মত হলো, কসমের বাক্য ব্যবহার করা হোক বা না হোক তাহরীমের কাজটাই কসম বলে গণ্য হবে। এটি হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত আয়েশা, হযরত উমর, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মত। যদিও বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) আরো একটি মত বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ اذا حرم امراته فليس بشى (কেউ যদি তার স্ত্রীকে হারাম করে নেয় তাহলে তা কিছুই না)। কিন্তু এ কথার ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই যে, তাঁর মতে এটা তালাক বলে গণ্য হবে না বরং কসম বলে গণ্য হবে এবং তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে। কারণ, বুখারী, মুসলিম ও ইবনে মাজায় ইবনে আব্বাসের (রা) এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে, হারাম বলে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কাফ্ফারা দিতে হবে। নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে যে, এ বিষয়ে ইবনে আব্বাসকে (রা) জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন ঃ সে তোমার জন্য হারাম হয়ে যায়নি তবে তোমার জন্য কাফ্ফারা দেয়া অপরিহার্য। ইবনে জারীরের রেওয়ায়াতে ইবনে আব্বাসের (রা) বক্তব্যের ভাষা হলো ঃ আল্লাহ তা'আলা যা হালাল করেছেন তা যদি মানুষ নিজের জন্য হারাম করে থাকে তাহলে নিজের কসমের কাফ্ফারা অদায় করা তার জন্য অপরিহার্য। হাসান বসরী, আতা, তাউস, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, ইবনে জুবায়ের এবং কাতাদা প্রমুখ এমত পোষণ করেছেন। আর হানাফীরা এমতটি গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু বকর জাসসাস বলেন ঃ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ আয়াতটির শব্দাবলী এ কথা বুঝায় না যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারাম করে নেয়ার সাথে সাথে কসমও করেছিলেন। তাই একথা স্বীকার করতেই হবে যে, 'তাহরীম' বা হারাম করে নেয়াটাই কসম। কারণ আল্লাহ তা'আলা পরে এই তাহরীমের ব্যাপারেই কসমের কাফ্ফারা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। আরো একটু অগ্রসর হয়ে তিনি বলেছেন ঃ আমাদের মনীষীগণ (অর্থাৎ হানাফী মনীষীগণ) তাহরীমকে কেবল সেই ক্ষেত্রে কসম বলে গণ্য করেছেন যে ক্ষেত্রে তালাকের

নিয়ত থাকবে না। কেউ যদি তার স্ত্রীকে হারাম বলে তাহলে সে যেন প্রকারান্তরে বলে যে, আল্লাহর শপথ, আমি তোমার কাছে আসবো না। অতএব সে ঈলা বা কসম করে বসলো। আর সে যদি পানাহারের কোন বস্তু নিজের জন্য হারাম করে নিয়ে থাকে তাহলে প্রকারান্তরে সে যেন বললো, আল্লাহর শপথ, আমি ঐ জিনিস ব্যবহার করবো না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে বলেছেন ঃ আল্লাহ আপনার জন্য যে জিনিস হালাল করে দিয়েছেন তা আপনি হারাম করছেন কেন? তারপরে বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য কসমের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা নিরূপণ করে দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাহরীমকে কসম বলে গণ্য করেছেন এবং 'তাহরীম' শব্দটি অর্থগত ও শরয়ী হুকুমের দিক দিয়ে কসমের সমার্থক হয়ে গিয়েছে।

স্ত্রীকে হারাম করে নেয়া এবং স্ত্রী ছাড়া অন্য সব জিনিস হারাম করে নেয়ার ব্যাপারে ফিকাহবিদদের দৃষ্টিতে শরয়ী হুকুম কি, সর্বসাধারণের উপকারার্থে এখানে সে বিষয়টি বলে দেয়াও যথোপযুক্ত হবে বলে মনে হয়।

হানাফী ফিকাহবিদদের মতে, কেউ যদি তালাকের নিয়ত ছাড়াই স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করে নেয় অথবা এ মর্মে শপথ করে যে, সে আর তার কাছে যাবে না তাহলে তা ঈলা বলে গণ্য হবে এবং সে ক্ষেত্রে স্ত্রীর সান্নিধ্যে যাওয়ার আগে তাকে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে। কিন্তু সে যদি তালাকের নিয়তে এ কথা বলে থাকে, তুমি আমার জন্য হারাম তাহলে কি উদ্দেশ্যে তা বলেছে তা জেনে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সে যদি তিন তালাকের নিয়ত করে থাকে তাহলে তিন তালাক হয়ে যাবে। আর যদি এর চেয়ে কম সংখ্যক তালাকের নিয়ত করে থাকে, তা এক তালাকের নিয়ত হোক বা দুই তালাকের নিয়ত হোক উভয় অবস্থায় এক তালাক মাত্র কার্যকর হবে। আর কেউ যদি বলে আমার জন্য যা হালাল ছিল তা হারাম হয়ে গিয়েছে তাহলে স্ত্রীকে হারাম করার নিয়তে এ কথা না বলা পর্যন্ত স্ত্রীর জন্য তা প্রযোজ্য হবে না। স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন জিনিস হারাম করে নেয়ার ক্ষেত্রে কসমের কাফ্ফারা না দেয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ঐ জিনিস ব্যবহার করতে পারবে না (বাদায়েউস সানায়ে, হিদায়া, ফাতহুল কাদীর, আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস)।

শাফেয়ী ফিকাহবিদদের মতে, স্ত্রীকে যদি তালাক কিংবা যিহারের নিয়তে হারাম করা হয়ে থাকে তাহলে যে বিষয়ের নিয়ত করা হবে সেটিই কার্যকর হবে। রিজয়ী তালাকের নিয়ত করলে রিজয়ী তালাক হবে, বায়েন তালাকের নিয়ত করলে বায়েন তালাক হবে এবং যিহারের নিয়ত করলে যিহার হবে। কেউ যদি তালাক ও যিহার উভয়টি নিয়ত করে তাহরীমের শব্দ ব্যবহার করে থাকে তাহলে তাকে দু'টির মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করতে বলা হবে। কারণ, তালাক ও যিহার একই সাথে কার্যকরী হতে পারে না। তালাক দ্বারা বিবাহ বন্ধন নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যিহারের ক্ষেত্রে তা অবশিষ্ট থাকে। কোন নিয়ত ছাড়াই যদি স্ত্রীকে হারাম করে নেয়া হয়ে থাকে তাহলে সে হারাম হবে না। তবে কসমের জন্য অবশ্যই কাফ্ফারা দিতে হবে। আর যদি স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন জিনিস হারাম করে থাকে তাহলে তা একটি অনর্থক কাজ হিসেবে গণ্য হবে। সে জন্য তাকে কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না। (মুগনিউল মুহতাজ)

মালেকী ফিকাহবিদদের মতে, কেউ যদি স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন জিনিস হারাম করে নেয় তাহলে তা হারামও হয় না এবং তা ব্যবহার করার পূর্বে কোন কাফ্ফারা দেয়াও

আবশ্যক নয়। তবে কেউ যদি স্ত্রীকে বলে, তুমি হারাম অথবা আমার জন্য হারাম অথবা আমি তোমার জন্য হারাম, সে ক্ষেত্রে সে ঐ স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন করে থাক বা না থাক সর্বাবস্থায় তিন তালাক বলে গণ্য হবে। তবে সে যদি তিনের কম সংখ্যক তালাকের নিয়ত করে থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। আসবাগ বলেছেন, কেউ যদি এভাবে বলে, আমার জন্য যা হালাল ছিল তা হারাম তাহলে স্ত্রীকে উল্লেখ করে বাদ না দেয়া পর্যন্ত এ কথা দ্বারা অবশ্যই স্ত্রীকে হারাম করে নেয়া বুঝাবে। আল মুদাওয়ানা গ্রন্থে এ ব্যাপারে যৌন মিলন হওয়া এবং যৌন মিলন না হওয়া স্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। সহবাসকৃত স্ত্রীকে হারাম বলে দেয়ায় নিয়ত যাই থাক না কেন তিন তালাকই হয়ে যাবে। কিন্তু যে স্ত্রীর সাথে সে সহবাস করেনি, তার ক্ষেত্রে কম সংখ্যক তালাকের নিয়ত করা হয়ে থাকলে যে কয়টি তালাকের নিয়ত করা হয়েছে সেই কয়টি তালাকই হবে। আর যদি কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক তালাকের নিয়ত না থাকে তাহলে তিন তালাক হয়ে যাবে। (হাশিয়াতুদ দুসূকী) কাজী ইবনুল আরাবী আহকামুল কুরআন গ্রন্থে এ বিষয়ে ইমাম মালেকের (র) তিনটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। এক, স্ত্রীকে তাহরীম করলে তা এক তালাক বায়েন হয়। দুই, এতে তিন তালাক হয়ে যায়। তিন, সহবাসকৃত স্ত্রীর বেলায় তাহরীম সর্বাবস্থায় তিন তালাক বলে গণ্য হবে। তবে যে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়নি তার বেলায় এক তালাকের নিয়ত থাকলে এক তালাক হবে। তিনি আরো বলেন ঃ সঠিক কথা হলো, স্ত্রীকে তাহরীম করলে শুধু এক তালাক হবে। কারণ, কেউ কেউ যদি হারাম বলার পরিবর্তে তালাক শব্দ ব্যবহার করে এবং কোন সংখ্যার উল্লেখ না করে তাহলেও শুধু এক তালাক হবে।

এ বিষয়ে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) থেকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। এক, স্ত্রীকে তাহরীম করা অথবা হালালকে নিজের জন্য কেবল হারাম বলে গণ্য করা যিহার। এ ক্ষেত্রে যিহারের নিয়ত থাক বা না থাক তাতে কিছু এসে যায় না। দুই, এটা স্পষ্ট তালাকের ইংগিত। এ ক্ষেত্রে এক তালাকের নিয়ত থাকলেও তিন তালাক হয়ে যাবে। তিন, এটা কসম বলে গণ্য হবে। তবে সে যদি তালাক অথবা যিহারের মধ্যেকার যে কোন একটির নিয়ত করে তাহলে ভিন্ন কথা। কারণ, সে ক্ষেত্রে যেটির নিয়ত করবে সেটিই কার্যকর হবে। এসব উক্তির মধ্যে প্রথম উক্তিটিই হাম্বলী মাযহাবের রায় বলে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। (আল ইনসাফ)

৫. অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের প্রভু এবং সমস্ত কাজকর্মের তত্ত্বাবধায়ক। কিসে তোমাদের কল্যাণ তা তিনিই সবচেয়ে ভাল করে জানেন আর যে আদেশ-নিষেধ তিনি তোমাদের দিয়েছেন তাও সরাসরি হিকমাত তথা গভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও যুক্তি নির্ভর। প্রথম কথাটি বলার অর্থ হচ্ছে, তোমরা নিজেরা স্বাধীন নও। বরং তোমরা আল্লাহর বান্দা আর তিনি তোমাদের প্রভু। তাই তাঁর নির্ধারিত পন্থা ও পদ্ধতিতে রদবদল করার অধিকার তোমাদের কারো নেই। তোমাদের কর্তব্য হলো, নিজেদের সব ব্যাপার তাঁর ওপর সোপর্দ করে কেবল তাঁরই আনুগত্য করতে থাকো। দ্বিতীয় কথাটি বলে এ সত্যটি মনমগজে বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যেসব পন্থা-পদ্ধতি ও আইন-কানুন নির্ধারিত করে দিয়েছেন তা জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও যুক্তি নির্ভর। তিনি যে জিনিস হালাল করেছেন তা জ্ঞান ও হিকমাতের ভিত্তিতে হালাল করেছেন। আর যে জিনিস হারাম করেছেন তাও জ্ঞান ও হিকমাতের ভিত্তিতেই হারাম করেছেন। এটা কোন খামখেয়ালী নয় যে, তিনি

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۝

(এ ব্যাপারটিও লক্ষণীয় যে,) নবী তাঁর এক স্ত্রীকে গোপনে একটি কথা বলেছিলেন। পরে সেই স্ত্রী যখন (অন্য কারো কাছে) সেই গোপনীয় বিষয়টি প্রকাশ করে দিল এবং আল্লাহ নবীকে এই (গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করার) ব্যাপারটি জানিয়ে দিলেন তখন নবী (ঐ স্ত্রীকে) কিছুটা সাবধান করলেন এবং কিছুটা মাফ করে দিলেন। নবী যখন তাকে (গোপনীয়তা প্রকাশের) এই কথা জানালেন তখন সে জিজ্ঞেস করলো ঃ কে আপনাকে এ বিষয়ে অবহিত করেছে? নবী বললেন ঃ আমাকে তিনি অবহিত করেছেন যিনি সবকিছু জানেন এবং সর্বাধিক অবহিত।[৬]

যুক্তিহীনভাবে যে জিনিসকে ইচ্ছা হালাল করেছেন এবং যে জিনিসকে ইচ্ছা হারাম করেছেন। তাই যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে তাদের বুঝা উচিত, عليم (মহাজ্ঞানী) ও حكيم (প্রজ্ঞাময় ও কৌশলী) আমরা নই বরং আল্লাহই "আলীম" ও "হাকীম"। তাঁর দেয়া আদেশ-নিষেধের আনুগত্যের মধ্যেই আমাদের কল্যাণ নিহিত।

৬. বিভিন্ন রেওয়ায়াতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, নবী (সা) অমুক বিষয়টি সম্পর্কে গোপনে তাঁর এক স্ত্রীকে বলেছিলেন এবং সেই স্ত্রী আবার তা অন্য স্ত্রীকে বলেছিলেন। আমাদের মতে, প্রথমত বিষয়টি অনুসন্ধান করে বের করা ঠিক নয়। কারণ, গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করে দেয়ার কারণেই তো আল্লাহ তা'আলা এখানে নবীর (সা) এক স্ত্রীকে তিরস্কার করছেন। তাই তা খুঁজে খুঁজে বরে করা ও প্রকাশ করার চিন্তায় লেগে যাওয়া আমাদের জন্য কি করে ঠিক হবে। দ্বিতীয়ত আয়াতটি যে উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে তার প্রেক্ষিতে বিচার করলে গোপনীয় কথাটি কি ছিল তার আদৌ কোন গুরুত্ব থাকে না। আয়াতের উদ্দেশ্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক থাকলে আল্লাহ তা'আলা নিজেই তা বলে দিতেন। মূল যে উদ্দেশ্যের জন্য এ বিষয়টি কুরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে তা নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের একজনকে তাঁর ভুলের জন্য তিরস্কার করা। তাঁর ভুল হলো, তাঁর মহান ও মর্যাদাবান স্বামী গোপনে তাঁকে যে কথাটি বলেছিলেন তা তিনি গোপন রাখেননি, বরং প্রকাশ করে দিয়েছেন। এটি যদি দুনিয়ার আর দু'দশটি স্বামী স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্কের মত শুধু একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার হতো তাহলে আল্লাহ তা'আলার সরাসরি অহীর মাধ্যমে নবীকে (সা) তা জানিয়ে দেয়ার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা শুধু জানিয়ে দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করেননি, বরং তা নিজের সেই কিতাবে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন যা সারা দুনিয়ার মানুষকে চিরদিন পড়তে হবে। কিন্তু এ বিষয়টিকে যে কারণে এরূপ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তাহচ্ছে, তিনি কোন সাধারণ স্বামীর স্ত্রী ছিলেন না। বরং এক মহান ও মর্যাদাবান স্বামীর স্ত্রী ছিলেন যাকে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত

إِنْ تَتُوبَآ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِنْ تَظَٰهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمَلَٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾

তোমরা দু'জন যদি আল্লাহর কাছে তাওবা করো (তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম), কেননা, তোমাদের মন সরল সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে[৭] আর যদি তোমরা নবীর বিরুদ্ধে পরস্পর সংঘবদ্ধ হও[৮] তা হলে জেনে রাখো, আল্লাহ তার অভিভাবক, তাছাড়া জিবরাঈল, নেক্‌কার ঈমানদারগণ এবং সব ফেরেশতা তার সাথী ও সাহায্যকারী।[৯]

গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিলেন। যাঁকে সর্বক্ষণ কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে একটি নিরবছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হচ্ছিল। যাঁর নেতৃত্বে কুফরী বিধানের স্থলে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক চেষ্টা-সাধনা চলছিল। এরূপ মহান ব্যক্তিত্বের ঘরে এমন অসংখ্য কথা হতে পারতো যা গোপন না থেকে যদি আগেভাগেই প্রকাশ হয়ে পড়তো তাহলে তিনি যে মহত কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছিলেন তার ক্ষতি হতে পারত। তাই সেই ঘরের এক মহিলার থেকে যখন প্রথমবারের মত এই দুর্বলতা প্রকাশ পেল যে, তাঁকে গোপনে যে কথাটি বলা হয়েছিল তা তিনি অন্যের কাছে প্রকাশ করে দিলেন (যদিও তিনি অপর কেউ ছিলেন না, বরং নিজ পরিবারেরই একজন সদস্য ছিলেন)। এ কাজের জন্য তৎক্ষণাৎ তাঁকে তিরস্কার করা হলো এবং গোপনেও তাঁকে তিরস্কার করা হয়নি, বরং কুরআন মজীদে প্রকাশ্যে তিরস্কার করা হয়েছে। যাতে শুধু নবীর (সা) স্ত্রীগণকেই নয় বরং মুসলিম সমাজের সমস্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের স্ত্রীদেরকেও গোপনীয় বিষয় সংরক্ষণের প্রশিক্ষণ দেয়া যায়। যে গোপনীয় কথাটি প্রকাশ করে দেয়া হয়েছিল তা বিশেষ কোন গুরুত্ব বহন করতো কিনা এবং তা প্রকাশ হওয়ার কারণে কোন ক্ষতির আশংকা ছিল কিনা আয়াতে সে বিষয়টি একেবারেই উপেক্ষা করা হয়েছে। তিরস্কার করা হয়েছে শুধু এ জন্য যে, গোপনীয় কথা অন্যের কাছে বলে দেয়া হয়েছিল। কারণ, কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির পরিবারের লোকজনের মধ্যে যদি এরূপ দুর্বলতা বিদ্যমান থাকে যে, তারা গোপনীয় বিষয় সংরক্ষণের ব্যাপারে অবহেলা করেন তাহলে আজ একটি গুরুত্বহীন গোপনীয় বিষয় প্রকাশ হয়ে পড়লে কাল অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় বিষয়ও প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। সমাজে যে ব্যক্তি যত অধিক দায়িত্বশীল পদমর্যাদার অধিকারী হবে তত অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক বিষয়াদি তার পরিবারের লোকদের অবগতিতে আসবে। গোপনীয় বিষয়াদি যদি তাদের মাধ্যমে অন্যদের কাছে পৌঁছে যায় তাহলে এই দুর্বলতা যে কোন সময় যে কোন বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

৭. মূল ইবারত হচ্ছে, فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا । صغو আরবী ভাষায় বেঁকে যাওয়া এবং তেড়া হয়ে যাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব এ আয়াতাংশের অনুবাদ করেছেন ঃ هرائیه کج شده استدل شما এবং শাহ

রফীউদ্দীন সাহেব অনুবাদ করেছেন ঃ "তোমাদের অন্তর বাঁকা হয়ে গিয়েছে।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), সুফিয়ান সাওরী এবং দাহ্হাক এর অর্থ করেছেন زَاغَتْ قُلُوبُكُمَا অর্থাৎ সোজা পথ থেকে তোমাদের মন সরে গিয়েছে। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম রাযী (র) বলেন ঃ عَدَلَتْ وَمَالَتْ عَنِ الْحَقِّ وَهُوَ حَقُّ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ হক থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আর হক অর্থ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হক। আল্লামা আলূসীর ব্যাখ্যা হচ্ছে,

مَالَتْ عَنِ الْوَاجِبِ مِنْ مُوَافِقَتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَبِّ مَا يُحِبُّهُ وَكَرَاهَةَ مَا يَكْرَهُهُ اِلٰى مُخَالِفَتِهِ -

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা পছন্দ করেন তা পছন্দ করা এবং যা অপছন্দ করেন তা অপছন্দ করার ব্যাপারে তাঁর সাথে মিল রেখে চলা তোমাদের জন্য অবশ্য করণীয়। কিন্তু এ ব্যাপারে তোমাদের মন তাঁর সাথে সাজুয্য রক্ষা করে চলা থেকে বিচ্যুত হয়ে তাঁর বিরোধিতা করার দিকে বেঁকে গিয়েছে।

৮. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে وَاِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ । تظاهر অর্থ কারো বিরুদ্ধে পরস্পর সহযোগিতা করা অথবা কারো বিরুদ্ধে বেঁকে বসা। শাহ ওয়ালীউল্লাহ এ আয়াতাংশের অনুবাদ করেছেনঃ اگر بايم متفق شويد بر رنجا نيدن پيغمبر "যদি নবীকে কষ্ট দেয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ হও। শাহ আবদুল কাদের সাহেবের অনুবাদ হলো ঃ "তোমরা দু'জন যদি তাঁর ওপর চড়াও হও।" মাওলানা আশরাফ আলী সাহেবের অনুবাদ হলো, তোমরা দুইজন যদি নবীর বিরুদ্ধে এভাবেই কাজকর্ম করতে থাক। মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী সাহেব এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ যদি তোমরা দুইজন এভাবে কাজকর্ম করতে এবং ক্ষোভ দেখাতে থাক।"

আয়াতে স্পষ্টভাবে দুইজন মহিলাকে সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতের পূর্বাপর প্রসংগ থেকে জানা যায় যে, ঐ দু'জন মহিলা ছিলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের পবিত্র স্ত্রীদের অন্তরভুক্ত। কেননা এই সূরার প্রথম আয়াত থেকে পঞ্চম আয়াত পর্যন্ত একাদিক্রমে নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের বিষয়াদিই আলোচিত হয়েছে। কুরআন মজীদের বাচনভঙ্গি থেকে এতটুকু বিষয় প্রকাশ পাচ্ছে। এখন প্রশ্ন ঐ দু'জন স্ত্রী ছিলেন কে কে? আর যে কারণে এ তিরস্কার করা হলো সেই বিষয়টিই বা কি ছিল। এ বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা আমরা হাদীস শরীফে দেখতে পাই। মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী হাদীস গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস কর্তৃক একটি বিস্তারিত বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যাতে কিছুটা শাব্দিক তারতম্য সহ এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ

আমি অনেক দিন থেকে মনে করছিলাম হযরত উমরকে (রা) জিজ্ঞেস করবো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে যে দু'জন তাঁর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন এবং যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেছিলেন اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا তারা কে? কিন্তু তার ভয়াল

ব্যক্তিত্বের কারণে আমার সে সাহস হতো না। শেষ পর্যন্ত হজ্জে গেলে আমিও তাঁর সাথে গেলাম। ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে এক জায়গায় তাঁকে অযু করানোর সময় আমি সুযোগ পেয়ে গেলাম এবং বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বললেন ঃ তাঁরা ছিলেন হযরত আয়েশা (রা) এবং হাফসা (রা)। তারপর তিনি বলতে শুরু করলেন, আমরা কুরাইশীরা আমাদের স্ত্রীদেরকে দমিয়ে রাখতে অভ্যস্ত ছিলাম। আমরা মদীনায় আসলে এখানে এমন অনেক লোক পেলাম যাদের স্ত্রীরা তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ছিল। ফলে আমাদের স্ত্রীরাও তাদের থেকে এ শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করলো। একদিন আমি আমার স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হলে বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলাম যে, সে–ও আমাকে পাল্টা জবাব দিচ্ছে (মূল ভাষা হচ্ছে فاذا هى تراجعنى)। সে আমার কথার প্রত্যুত্তর করলো—এটা আমার অত্যন্ত খারাপ লাগলো। সে বললো ঃ আমি আপনার কথার প্রত্যুত্তর করছি তাতে আপনি রাগান্বিত হচ্ছেন কেন? আল্লাহর শপথ! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ তো তাঁকে কথায় কথায় জবাব দিয়ে থাকেন(মূল ভাষা হচ্ছে ليراجعنه)। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার নবীর (সা) প্রতি সারা দিন অসন্তুষ্ট থাকেন (বুখারীর বর্ণনায় আছে নবী (সা) সারা দিন তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন)। এ কথা শুনে আমি বাড়ী থেকে বের হলাম এবং হাফসার (রা) কাছে গেলাম [হযরত উমরের (রা) কন্যা এবং নবীর (সা) স্ত্রী।] আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তুমি কি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার প্রত্যুত্তর করো? সে বললো ঃ হাঁ। আমি আরো জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের মধ্যে কেউ কি সারাদিন নবীর (সা) প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে? [বুখারীর বর্ণনা হচ্ছে, নবী (সা) সারা দিন তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন।] সে বললো ঃ হাঁ। আমি বললাম ঃ তোমাদের মধ্য থেকে যে মহিলা এরূপ করে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তোমাদের মন থেকে কি এ ভয় দূর হয়ে গিয়েছে যে, আল্লাহর রসূলের অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহও তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন এবং সে ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হবে? কখনো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার প্রত্যুত্তর করবে না। (এখানেও একই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে لا تراجعى) এবং তাঁর কাছে কোন জিনিসের দাবীও করবে না। আমার সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা তুমি চেয়ে নিও। তোমার সতীন [অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা)] তোমার চাইতে অধিক সুন্দরী এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অধিক প্রিয়। তাঁর কারণে তুমি আত্মপ্রতারিত হয়ো না। এরপর আমি সেখানে থেকে বের হয়ে উম্মে সালামার (রা) কাছে গেলাম এবং এ ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বললাম। তিনি ছিলেন আমার আত্মীয়া। তিনি আমাকে বললেন ঃ খাত্তাবের বেটা; তুমি তো দেখছি অদ্ভুত লোক! প্রত্যেক ব্যাপারে তুমি হস্তক্ষেপ করছ! এমন কি এখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর স্ত্রীদের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে চলেছ। তাঁর এই কথায় আমি সাহস হারিয়ে ফেললাম। এরপর হঠাৎ আমার এক আনসার প্রতিবেশী রাত্রি বেলায় আমার বাড়ীতে এসে আমাকে ডাকলেন। আমরা দু'জন পালা করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে হাজির হতাম এবং যার পালার দিন যে কথা হতো তা একে অপরকে বলতাম। এই সময়টা ছিল এমন যখন আমাদের বিরুদ্ধে গাসসানীদের আক্রমণের বিপদাশংকা দেখা দিয়েছিল। তার আহবানে আমি বের হলে সে বলল ঃ একটি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ গাস্‌সানীরা কি আক্রমণ করে বসেছে? সে বলল ঃ না তার চেয়েও বড় ঘটনা ঘটেছে। রসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন। আমি বললাম ঃ হাফসা ব্যর্থ ও ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। বুখারীর ভাষা হচ্ছেঃ رغم انف حفصة وعائشة এমনটা ঘটবে বলে আমি প্রথমেই আশংকা করেছিলাম।

কাহিনীর পরবর্তী অংশ আমরা উল্লেখ করলাম না। এ অংশে হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ তিনি পরদিন সকালে নবীর (সা) খেদমতে হাজির হয়ে কিভাবে তাঁর ক্রোধ নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছেন। আমরা মুনসাদে আহমাদ ও বুখারীর বর্ণিত হাদীসসমূহ একত্রিত করে এ কাহিনী বিন্যস্ত করেছি। এতে হযরত উমর (রা) যে مراجعت শব্দ ব্যবহার করেছেন এখানে তার আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে না। বরং পূর্বাপর বিষয় থেকে আপনাআপনি প্রকাশ পায় যে, এ শব্দটি প্রতি উত্তর বা কথার পৃষ্ঠে কথা বলা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে এবং হযরত উমরের (রা) তাঁর কন্যাকে لا تراجعى رسول الله বলাটা স্পষ্টত এ অর্থে বলা হয়েছে যে, নবীর (সা) সাথে বাদানুবাদ করো না। কেউ কেউ এই অনুবাদকে ভুল বলে থাকেন। তাদের আপত্তি হচ্ছে, مراجعت শব্দের অর্থ পাল্টা জবাব দেয়া অথবা কথার পৃষ্ঠে কথা বলা ঠিক, কিন্তু বাদানুবাদ করা ঠিক নয়। কিন্তু আপত্তিকারী এ ব্যক্তিবর্গ এ বিষয়টি উপলব্ধি করেন না যে, কম মর্যাদার লোক যদি তার চেয়ে বড় মর্যাদার ব্যক্তিকে পাল্টা জবাব দেয় কিংবা কথার পৃষ্ঠে কথা বলে তাহলে তাকেই বাদানুবাদ করা বলে। উদাহরণ স্বরূপ, বাপ যদি ছেলেকে কোন কারণে তিরস্কার বা শাসন করে অথবা তাঁর কোন কাজে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে আর ছেলে যদি তাতে আদবের সাথে চুপ থাকা বা ওজর পেশ করার পরিবর্তে পাল্টা জবাব দিতে থাকে, তাহলে একে বাদানুবাদ ছাড়া আর কিছু বলা যেতে পারে না। কিন্তু ব্যাপারটা যখন বাপ এবং ছেলের মধ্যেকার না হয়ে বরং আল্লাহর রসূল এবং তাঁর উম্মাতের কোন লোকের মধ্যেকার ব্যাপার হয় তাহলে একজন নির্বোধই কেবল এ কথা বলতে পারে যে, এটা বাদানুবাদ নয়।

আমাদের এই অনুবাদকে কিছু লোক বেআদবী বা অশিষ্টতা বলে আখ্যায়িত করে। অথচ তা বেআদবী কেবল তখনই হতো যদি আমরা হযরত হাফসা (রা) সম্পর্কে নিজের পক্ষ থেকে এ ধরনের ভাষা প্রয়োগ করার দুঃসাহস দেখাতাম। আমরা তো হযরত উমরের (রা) কথার সঠিক অর্থ তুলে ধরেছি। আর তিনি তাঁর মেয়েকে তার ত্রুটির জন্য তিরস্কার করতে গিয়ে এ কথাটি বলেছেন। একে বেআদবী বলার অর্থ হচ্ছে, হয় পিতাও তার নিজের মেয়েকে শাসন বা তিরস্কারের সময় আদবের সাথে কথা বলবে অথবা তার তিরস্কার মিশ্রিত ভাষার অনুবাদকারীর নিজের পক্ষ থেকে তাকে মার্জিত ও শিষ্ট ভাষা বানিয়ে দেবে।

এ ক্ষেত্রে সত্যিকার ভেবে দেখার বিষয় হচ্ছে, ব্যাপারটা যদি এ রকম হালকা ও মামুলী ধরনের হতো যে, নবী (সা) তাঁর স্ত্রীদের কিছু বললে তাঁরা পাল্টা তার জবাব দিতেন, তাহলে তাকে এতো গুরুত্ব কেন দেয়া হলো যে, কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা নিজে সরাসরি নবীর (সা) ঐ স্ত্রীদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিলেন? আর হযরত উমরই (রা) বা এ বিষয়টিকে এত মারাত্মক মনে করলেন কেন যে, প্রথমে নিজের মেয়েকে তিরস্কার করলেন এবং তার পর এক এক করে নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণের

عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ۝

নবী যদি তোমাদের মত সব স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন তাহলে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পরিবর্তে তাকে এমন সব স্ত্রী দান করবেন যারা তোমাদের চেয়ে উত্তম হবে।[১০] সত্যিকার মুসলমান, ঈমানদার,[১১] অনুগত,[১২] তাওবাকারিনী,[১৩] ইবাদাত গোজার[১৪] এবং রোযাদার।[১৫] তারা পূর্বে বিবাহিত বা কুমারী যাই হোক না কেন।

প্রত্যেকের ঘরে গিয়ে তাঁদেরকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির ভয় দেখিয়ে সাবধান করলেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো, তাঁর মতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি এমন চড়া মেজাজের ছিলেন যে, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারেও স্ত্রীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হতেন? তাছাড়া (মা'য়াযাল্লাহ) তাঁর দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেজাজ এতই কঠোর ছিল যে, এ ধরনের কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি একবার সব স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁর নিজের কুঠরিতে নির্জন জীবন গ্রহণ করেছিলেন, কেউ যদি এসব প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সে অবশ্যই দু'টি পথের যে কোন একটি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। হয় তার কাছে নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের সম্মান ও মর্যাদার বিষয় এত বড় হয়ে দেখা দেবে যে, সে এ জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দোষ-ত্রুটিরও পরোয়া করবে না। অথবা সোজাসুজি এ কথা মেনে নিতে হবে যে, সেই সময় নবীর (সা) ঐ সব পবিত্র স্ত্রীদের আচরণ প্রকৃতই এমন আপত্তিকর হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার ব্যাপারে রসূলের ভূমিকা ন্যায়সংগত ছিল এবং তাঁর চেয়ে অধিক ন্যায়সংগত ছিল আল্লাহ তা'আলার ভূমিকা যে কারণে নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের এই আচরণ সম্পর্কে কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন।

৯. অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে জোট পাকিয়ে তোমরা কেবল নিজের ক্ষতিই ডেকে আনবে। কারণ আল্লাহ যাঁর প্রভু এবং জিবরাঈল, সমস্ত ফেরেশতা ও সৎকর্মশীল ঈমানদারগণ যার সংগী ও সহযোগী তাঁর বিরুদ্ধে জোট পাকিয়ে কেউ-ই সফলতা লাভ করতে পারে না।

১০. এ থেকে জানা যায় যে, হযরত আয়েশা (রা) এবং হাফসাই (রা) শুধু ভুল করেছিলেন না বরং নবীর (সা) অন্য স্ত্রীগণও কিছু না কিছু ভুল করেছিলেন। এ কারণেই আয়াতে তাঁদের দু'জনকে ছাড়াও নবীর (সা) অন্যসব স্ত্রীদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। এসব ভুল আচরণের ধরন সম্পর্কে কুরআন মজীদে কোন প্রকার আলোকপাত করা হয়নি। তবে এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে কিছু বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। এখানে আমরা তা উদ্ধৃত করলাম ঃ

বুখারীতে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের পারস্পরিক ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নবীকে (সা) অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। হাদীসের মূল ভাষা হচ্ছেঃ اِجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ । তাই আমি তাঁদের বললাম ঃ নবী (সা) যদি তোমাদের তালাক দিয়ে দেন তাহলে আল্লাহ তা'আলার তাঁকে তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করা অসম্ভব নয়। হযরত আনাসের (রা) বরাত দিয়ে ইবনে আবী হাতেম হযরত উমরের (রা) বর্ণনা নিম্নোক্ত ভাষায় উদ্ধৃত করেছেন ঃ আমার কাছে এ মর্মে খবর পৌঁছল যে, নবী (সা) ও উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে কিছুটা তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে। এ কথা শুনে আমি তাঁদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে বললাম ঃ তোমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অতিষ্ঠ করা থেকে বিরত থাক। তা না হলে আল্লাহ তা'আলা নবীকে (সা) তোমাদের পরিবর্তে উত্তম স্ত্রী দান করবেন। এমনকি আমি যখন উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে শেষ জনের কাছে গেলাম [বুখারীর একটি হাদীসের বর্ণনা অনুসারে তিনি ছিলেন হযরত উম্মে সালামা (রা)] তখন তিনি আমাকে বললেন ঃ হে উমর! রসূলুল্লাহ কি স্ত্রীদেরকে উপদেশ দেয়ার জন্য যথেষ্ট নন যে, তুমি তাঁদেরকে উপদেশ দিতে চলেছ? এতে আমি চুপ হয়ে গেলাম। অতপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন।

মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) যখন সাময়িকভাবে তাঁর স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা বন্ধ করলেন তখন আমি মসজিদে নববীতে পৌঁছে দেখলাম লোকজন চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে বসে নুড়িপাথর তুলছে এবং নিক্ষেপ করছে এবং পরস্পর বলাবলি করছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন। এরপর হযরত উমর (রা) হযরত আয়েশা (রা) ও হাফসার কাছে তাঁর যাওয়ার এবং তাঁদের উপদেশ দেয়ার কথা উল্লেখ করলেন। তারপর বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলাম, স্ত্রীদের ব্যাপারে আপনি চিন্তিত হচ্ছেন কেন? আপনি যদি তাঁদের তালাক দেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে আছেন, সমস্ত ফেরেশতা, জিবরাঈল ও মিকাঈল আপনার সাথে আছেন, আর আমি, আবু বকর এবং সমস্ত ঈমানদার আপনার সাথে আছেন। আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। কারণ, খুব কমই এ রকম হয়েছে যে, আমি কোন কথা বলেছি এবং আল্লাহ তা'আলা তা সত্যায়ন ও সমর্থন করবেন বলে আশা করি নাই। বস্তুত এরপর সূরা তাহরীমের এ আয়াতগুলো নাযিল হয়। এরপর আমি নবীকে (সা) জিজ্ঞেস করলাম। আপনি স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন? তিনি বললেন, না। এ কথা শুনে মসজিদে নববীর দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলাম যে, নবী (সা) তাঁর স্ত্রীদের তালাক দেন নাই।

বুখারীতে হযরত আনাস (রা) থেকে এবং মুসনাদে আহমাদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত আবু হুরাইরা থেকে এ বিষয়ে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা) এক মাস পর্যন্ত তাঁর স্ত্রীদের থেকে আলাদা থাকার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং নিজের কুঠরিতে অবস্থান করতে শুরু করেছিলেন। ২৯ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে বললেন ঃ আপনার কসম পূরণ হয়েছে, মাস পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

হাফেজ বদরুদ্দীন আইনী উমদাতুল কারী গ্রন্থে হযরত আয়েশার (রা) বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে দু'টি দলের সৃষ্টি হয়েছিল। একটিতে ছিলেন হযরত আয়েশা (রা), হযরত হাফসা (রা), হযরত সাওদা (রা) ও হযরত সাফিয়া (রা)। আর অপরটিতে ছিলেন হযরত যয়নাব, হযরত উম্মে সালামা এবং অবশিষ্ট উম্মুল মু'মিনীনগণ।

ঐ সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পারিবারিক জীবনে কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল এসব বর্ণনা থেকে তা কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ করে নবীর (সা) স্ত্রীদের কর্মপদ্ধতি ও আচরণ সংশোধন করা জরুরী হয়ে পড়েছিল। নবীর (সা) স্ত্রীগণ যদিও সমাজের মহিলাদের মধ্যে সর্বোত্তম মহিলা ছিলেন, তথাপি তাঁরা ছিলেন মানুষ। তাই তাঁরা মানসিক চাহিদা ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন না। নিরবচ্ছিন্নভাবে কষ্টকর জীবন যাপন কোন কোন সময় তাঁদের জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। তাই তাঁরা অধৈর্য হয়ে নবীর (সা) কাছে খোরপোষের দাবী করতে শুরু করতেন। এ অবস্থায় সূরা আহযাবের ২৮—২৯ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উপদেশ দিয়েছেন যে, পার্থিব স্বাচ্ছন্দই যদি তোমাদের কাম্য হয়ে থাকে তাহলে আমার রসূল তোমাদেরকে উত্তম পন্থায় বিদায় দিয়ে দেবেন। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং আখেরাতের জীবন কামনা করো তাহলে রসূলের সাহচর্যে থাকার কারণে যেসব দুঃখ কষ্ট আসবে তা বরদাশত করো (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আহযাব, টীকা-৪১ এবং সূরা আহযাবের ভূমিকা)। তাছাড়া কোন কোন সময় নারী প্রকৃতির কারণে তাদের থেকে স্বভাবতই এমনসব বিষয় প্রকাশ পেত যা সাধারণ মানবীয় বৈশিষ্টের পরিপন্থী ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে যে ঘরের স্ত্রী হওয়ার মর্যাদা দান করেছিলেন তার মর্যাদা ও গৌরব এবং মহান দায়িত্ব ও কর্তব্যের সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এসব কারণে যখন এ আশংকা দেখা দিল যে তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পারিবারিক জীবনকে বিষিয়ে তুলতে পারে এবং আল্লাহ তা'আলা নবীর(সা) দ্বারা যে মহত কাজ আঞ্জাম দিচ্ছিলেন তার ওপর এর প্রভাব পড়তে পারে, তাই কুরআন মজীদের এ আয়াত নাযিল করে তাঁদের সংশোধন করলেন। যাতে তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের মধ্যে সেই মর্যাদা ও দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি হয় যা তাঁরা আল্লাহর সর্বশেষ রসূলের জীবন সঙ্গিনী হওয়ার কারণে লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। আর তাঁরা যেন নিজেদেরকে সাধারণ নারীদের মত এবং নিজেদের পরিবারকে সাধারণ পরিবারসমূহের মত মনে করে না বসেন। এ আয়াতের প্রথম অংশটিই এমন যা শুনে হয়তো নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের হৃদয়-মন কেঁপে উঠে থাকবে। তাঁদের জন্য এ কথাটির চেয়ে বড় হুঁশিয়ারী আর কি হবে যে, নবী যদি তোমাদের তালাক দেন তাহলে আল্লাহর তাঁকে তোমাদের পরিবর্তে উত্তম স্ত্রী দান করাটা অসম্ভব নয়। প্রথমত নবীর (সা) কাছে থেকে তালাক পাওয়ার চিন্তা বা কল্পনাই তাঁদের কাছে অসহনীয় ব্যাপার। তাছাড়া আরো বলা হয়েছে যে, উম্মুল মু'মিনীন হওয়ার মর্যাদা তোমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং অন্য যেসব নারীকে আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের স্ত্রী হিসেবে আনবেন তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম হবেন। এরপরে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তিরস্কারযোগ্য হতে পারে এমন কোন কাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের দ্বারা সংঘটিত হওয়া সম্ভবই ছিল না।

এ কারণে আমরা কুরআন মজীদে শুধু দু'টি যায়গায় এমন দেখতে পাই যেখানে মহা সম্মানিত এই নারীদেরকে হুঁশিয়ারী দেয়া হয়েছে। উক্ত জায়গা দু'টির একটি সূরা আহযাবে এবং অপরটি সূরা তাহরীমে।

১১. মুসলিম এবং মু'মিন শব্দ এক সাথে ব্যবহৃত হলে মুসলিম শব্দের অর্থ হয় কার্যত আল্লাহর হুকুম আহকাম অনুযায়ী আমলকারী ব্যক্তি এবং মু'মিন অর্থ হয় এমন ব্যক্তি যে সরল মনে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছে। অতএব, সর্বোত্তম মুসলমান স্ত্রীর প্রাথমিক বৈশিষ্ট হচ্ছে, সে সরল মনে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর দীনের প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং নিজের চরিত্র, অভ্যাস, স্বভাব ও আচরণে আল্লাহর দীনের অনুসারী হয়।

১২. এর দু'টি অর্থ এবং দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। এক, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত। দুই, স্বামীর অনুগত।

১৩. تائب (তাওবাকারী) শব্দটি যখন মানুষের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন তা শুধু একবার মাত্র তওবাকারীকে বুঝায় না। বরং তা এমন ব্যক্তিকে বুঝায়, যে নিজের অপরাধ ও ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহর কাছে সদাসর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে, যার বিবেক জীবন্ত ও সচেতন, যার মধ্যে সবসময় নিজের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির অনুভূতি জাগ্রত থাকে এবং সে জন্য সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত থাকে। এ প্রকৃতির মানুষের মধ্যে কোন সময় গর্ব, অহংকার, অহমিকা বা আত্মতুষ্টির অনুভূতি সৃষ্টি হয় না। স্বভাবগতভাবে সে হয় নম্র মেজাজ এবং সহিষ্ণু ও উদার।

১৪. ইবাদাতকারী ব্যক্তি কোন অবস্থায় কখনো সেই ব্যক্তির মত আল্লাহ সম্পর্কে গাফিল হতে পারে না যে আল্লাহর ইবাদাত করে না। কোন নারীকে উত্তম স্ত্রী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এ জিনিসটারও বিরাট ভূমিকা রয়েছে। ইবাদাত গোজার হওয়ার কারণে সে হুদূদুল্লাহ বা আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ মেনে চলে, হকদারদের হক আদায় করে, তার ঈমান সবসময় জীবন্ত ও সতেজ থাকে, সে আল্লাহর হুকুম আহকাম পালন করা থেকে বিরত হবে না—এটাই তার কাছে আশা করা যায়।

১৫. মূল ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে سائحات । কয়েকজন সাহাবী থেকে বহু সংখ্যক তাবেয়ী এর অর্থ বর্ণনা করেছেন صائمات (রোযাদার)। যে সম্পর্কের কারণে سياحت শব্দ রোযা অর্থে ব্যবহৃত হয় তা হচ্ছে, প্রাচীনকালে পুরোহিত এবং দরবেশরাই বেশী বেশী ভ্রমণ করতো। ভ্রমণের সময় তাদের কাছে কোন পাথেয় থাকত না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যতক্ষণ কোথাও থেকে কোন খাদ্য না পাওয়া যেতো ততক্ষণ তাদেরকে অভুক্ত থাকতে হতো। এদিক দিয়ে বিচার করলে রোযাও এক ধরনের দরবেশী। কারণ ইফতারের সময় না হওয়া পর্যন্ত রোযাদারও অভুক্ত থাকে। ইবনে জারীর সূরা তাওবার ১২ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আয়েশার (রা) একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, سياحة هذه الامة الصيام রোযা এই উম্মাতের سياحت (অর্থাৎ দরবেশী) এ ক্ষেত্রে সৎকর্মশীল স্ত্রীদের প্রশংসায় তাদের রোযাদারীর কথা উল্লেখ করার অর্থ শুধু এ নয় যে, তারা রমজানের ফরয রোযা রাখে বরং এর অর্থ হচ্ছে, তারা ফরয রোযা ছাড়াও নফল রোযাও রেখে থাকে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ ۝٦ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا
كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٧

হে লোকজন যারা ঈমান এনেছো, তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার ও সন্তান-সন্ততিকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো মানুষ এবং পাথর হবে যার জ্বালানী।[১৬] সেখানে রুঢ় স্বভাব ও কঠোর হৃদয় ফেরেশতারা নিয়োজিত থাকবে যারা কখনো আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না এবং তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তাই পালন করে[১৭] (তখন বলা হবে,) হে কাফেরগণ! আজ ওযর প্রকাশ করো না। তোমরা যেমন আমল করছিলে তেমনটি প্রতিদানই দেয়া হচ্ছে।[১৮]

"নবী (সা) যদি তোমাদের তালাক দেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পরিবর্তে তাঁকে এমনসব স্ত্রী দান করবেন যাদের মধ্যে অমুক অমুক গুণাবলী থাকবে।" নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণকে উদ্দেশ করে আল্লাহ তা'আলার এ কথা বলার অর্থ এ নয় যে, তাদের মধ্যে এসব গুণাবলী ছিল না। বরং এর অর্থ হলো, তোমাদের ত্রুটিপূর্ণ আচরণের কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে কষ্ট হচ্ছে তোমরা তা পরিত্যাগ করো এবং তার পরিবর্তে তোমাদের মধ্যে এসব গুণাবলী পূর্ণাঙ্গরূপে সৃষ্টির জন্য একান্তভাবে মনোনিবেশ করো।

১৬. এ আয়াত থেকে প্রকাশ পায় যে, আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর মধ্যেই কোন মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং প্রকৃতির বিধান যে পরিবারটির নেতৃত্বের বোঝা তার কাঁধে স্থাপন করেছে তার সদস্যরা যাতে আল্লাহর প্রিয় মানুষরূপে গড়ে উঠতে পারে সাধ্যমত সে শিক্ষা দীক্ষা দেয়াও তার কাজ। তারা যদি জাহান্নামের পথে চলতে থাকে তাহলে যতটা সম্ভব তাদেরকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করবে। তার সন্তান-সন্ততি পৃথিবীতে সুখী হোক তার শুধু এই চিন্তা হওয়া উচিত নয়। বরং এর চেয়েও তার বড় চিন্তা হওয়া উচিত এই যে, তারা যেন আখেরাতে জাহান্নামের ইন্ধন না হয়। বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তাকে তার অধীনস্ত লোকদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। শাসকও রাখাল। তাকে তার অধীনস্ত লোকদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। নারী তার স্বামীর

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ۭ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ
عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ
لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ
وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰي كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٨

২ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর কাছে তাওবা করো, প্রকৃত তাওবা।[১৯] অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তোমাদের দোষত্রুটিসমূহ দূর করে দিবেন এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে ঝরণাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে।[২০] সেটি হবে এমন দিন যেদিন আল্লাহ তাঁর নবী এবং নবীর সঙ্গী ঈমানদারদের লাঞ্ছিত করবেন না।[২১] তাদের 'নূর' তাদের সামনে ও ডান দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকবে এবং তারা বলতে থাকবে, হে আমাদের রব, আমাদের জন্য আমাদের 'নূর' পূর্ণাঙ্গ করে দাও ও আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। তুমি সব কিছু করতে সক্ষম।[২২]

বাড়ী এবং তার সন্তান–সন্ততির তত্ত্বাবধায়িকা তাকে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।

পাথর হবে জাহান্নামের জ্বালানী। এর অর্থ পাথরের কয়লা। [ইবনে মাসউদ (রা), ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ (রা), ইমাম বাকের (র) ও সুদ্দীর মতে, এর অর্থ গন্ধকের পাথর।]

১৭. অর্থাৎ কোন অপরাধীকে যে কোন শাস্তি দেয়ার নির্দেশই তাদের দেয়া হবে তা হুবহু কার্যকরী করবে এবং কোন প্রকার দয়া মায়া দেখাবে না।

১৮. এ দু'টি আয়াতের বাচনভঙ্গির মধ্যে মুসলমানদের জন্য কঠোর হুঁশিয়ারী বিদ্যমান। প্রথম আয়াতে মুসলমানদেরকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে, নিজেকে এবং নিজের পরিবার পরিজনকে এই ভয়ানক আযাব থেকে রক্ষা করো। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, জাহান্নামে শাস্তি দিতে গিয়ে কাফেরদেরকে এ কথাটি বলা হবে। এভাবে স্বতঃই যে বিষয়টি প্রতিভাত হয় তা হচ্ছে, পৃথিবীতে মুসলমানদেরকে জীবনযাপনে এমন পদ্ধতি গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে যার কারণে আখেরাতে তাদের পরিণাম কাফেরদের সাথে যুক্ত হবে।

১৯. মূল আয়াতে تَوْبَةً نَّصُوْحًا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় نصح শব্দের অর্থ নিষ্কলুষতা ও কল্যাণকামিতা। খাঁটি মধু যা মোম ও অন্যান্য আবর্জনা থেকে মুক্ত

করা হয়েছে তাকে আরবীতে عسل ناصح বলা হয়। ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে দেয়া এবং ফাঁটা ফাঁটা কাপড় ঠিক করে দেয়া বুঝাতে আরবী نصاحة الثوب শব্দ ব্যবহার করা হয়। অতএব, তাওবা শব্দের সাথে نصوح বিশেষণ যুক্ত করলে হয় তার আভিধানিক অর্থ হবে এমন তাওবা যার মধ্যে প্রদর্শনী বা মুনাফিকীর লেশমাত্র নেই। অথবা তার অর্থ হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজের কল্যাণ কামনা করবে এবং গোনাহ থেকে তাওবা করে নিজেকে মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা করবে। অথবা তার অর্থ হবে গোনাহর কারণে তার দীনদারীর মধ্যে যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে তাওবা দ্বারা তা সংশোধন করবে। অথবা সে তাওবা করে নিজের জীবনকে এমন সুন্দর করে গড়ে তুলবে যে, অন্যের জন্য সে উপদেশ গ্রহণের কারণ হবে এবং তাকে দেখে অন্যরাও তার মত নিজেদেরকে সংশোধন করে নেবে। 'তাওবায়ে নাসূহ'–এর আভিধানিক অর্থ থেকে এ অর্থসমূহই প্রতিভাত হয়। এরপর অবশিষ্ট থাকে তাওবায়ে নাসূহ এর শরয়ী অর্থ। আমরা এর শারয়ী অর্থের ব্যাখ্যা পাই যির ইবনে হুবাইশের মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে। যির ইবনে হুবাইশ বলেন ঃ আমি উবাই ইবনে কা'বের (রা) কাছে 'তাওবায়ে নাসূহ'–এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একই প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে, কখনো তোমার দ্বারা কোন অপরাধ সংঘটিত হলে তুমি নিজের গোনাহর জন্য লজ্জিত হবে। তারপর লজ্জিত হয়ে সে জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং ভবিষ্যতে আর কখনো ঐ কাজ করো না। হযরত উমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ (রা) ইবনে মাসউদ এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এ অর্থই উদ্ধৃত হয়েছে। অন্য একটি বর্ণনা অনুসারে হযরত উমর (রা) 'তাওবায়ে নাসুহা'র সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে ঃ তাওবার পরে পুনরায় গোনাহ করা তো দূরের কথা তা করার আকাংখা পর্যন্ত করবে না (ইবনে জারীর)। হযরত আলী (রা) একবার এক বেদুঈনকে মুখ থেকে ঝটপট করে তাওবা ও ইসতিগফারের শব্দ উচ্চারণ করতে দেখে বললেন, এতো মিথ্যাবাদীদের তাওবা। সে জিজ্ঞেস করলো, তাহলে সত্যিকার তাওবা কি? তিনি বললেন ঃ সত্যিকার তাওবার সাথে ছয়টি জিনিস থাকতে হবে। (১) যা কিছু ঘটেছে তার জন্য লজ্জিত হও। (২) নিজের যে কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে গাফলতি করছ তা সম্পাদন কর। (৩) যার হক নষ্ট করেছ তা ফিরিয়ে দাও।(৪) যাকে কষ্ট দিয়েছ তার কাছে মাফ চাও। (৫) প্রতিজ্ঞা করো ভবিষ্যতে এ গোনাহ আর করবে না এবং (৬) নফসকে এতদিন পর্যন্ত যেভাবে গোনাহর কাজে অভ্যস্ত করেছ ঠিক তেমনি আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত কর। এতদিন পর্যন্ত নফসকে যেভাবে আল্লাহর অবাধ্যতার মজায় নিয়োজিত রেখেছিলে এখন তাকে তেমনি আল্লাহর আনুগত্যের তিক্ততা আস্বাদন করাও (কাশ্‌শাফ)।

তাওবা সম্পর্কিত বিষয়ে আরো কয়েকটি জিনিস ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার। প্রথমত, প্রকৃতপক্ষে তাওবা হচ্ছে কোন গোনাহর কারণে এ জন্য লজ্জিত হওয়া যে, তা আল্লাহর নাফরমানী। কোন গোনাহর কাজ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা বদনামের কারণ অথবা আর্থিক ক্ষতির কারণ হওয়ায় তা থেকে বিরত থাকার সংকল্প করা তাওবার সংজ্ঞায় পড়ে না। দ্বিতীয়ত, যখনই কেউ বুঝতে পারবে যে, তার দ্বারা আল্লাহর নাফরমানী হয়েছে, তার উচিত তৎক্ষণাৎ তাওবা করা এবং যেভাবেই হোক অবিলম্বে তার ক্ষতিপূরণ করা কর্তব্য, তা এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। তৃতীয়ত, তাওবা করে বারবার তা

ভঙ্গ করা, তাওবাকে খেলার বস্তু বানিয়ে নেয়া এবং যে গোনাহ থেকে তাওবা করা হয়েছে বার বার তা করতে থাকা তাওবা মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ। কেননা, তাওবার প্রাণ সত্তা হচ্ছে কৃত গোনাহ সম্পর্কে লজ্জিত হওয়া কিন্তু বার বার তাওবা ভঙ্গ করা প্রমাণ করে যে, তার মধ্যে লজ্জার অনুভূতি নেই। চতুর্থত, যে ব্যক্তি সরল মনে তাওবা করে পুনরায় ঐ গোনাহ না করার সংকল্প করেছে মানবিক দুর্বলতার কারণে যদি পুনরায় তার দ্বারা সেই গোনাহর পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে এ ক্ষেত্রে পূর্বের গোনাহ পুনরুজ্জীবিত হবে না তবে পরবর্তী গোনাহর জন্য তার পুনরায় তাওবা করা উচিত এবং ভবিষ্যতে সে আর তাওবা ভঙ্গ করবে না, এ ব্যাপারে কঠোর সংকল্প করা উচিত। পঞ্চমত, যখনই গোনাহর কথা মনে পড়বে তখনই নতুন করে তাওবা করা আবশ্যক নয়। কিন্তু তার প্রবৃত্তি যদি পূর্বের পাপময় জীবনের স্মৃতিচারণ করে আনন্দ পায় তাহলে গোনাহর স্মৃতিচারণ তাকে আনন্দ দেয়ার পরিবর্তে লজ্জাবোধ সৃষ্টির কারণ না হওয়া পর্যন্ত তার বার বার তাওবা করা উচিত। কারণ, যে ব্যক্তি সত্যিই আল্লাহর ভয়ে গোনাহ থেকে তাওবা করেছে সে অতীতে আল্লাহর নাফরমানী করেছে এই চিন্তা করে কখনো আনন্দ অনুভব করতে পারে না। তা থেকে মজা পাওয়া ও আনন্দ অনুভব করা প্রমাণ করে যে, তার মনে আল্লাহর ভয় শিকড় গাড়তে পারেনি।

২০. এ আয়াতের কথাটি ভেবে দেখার মত। এখানে এ কথা বলা হয়নি যে, তাওবা করলে তোমাদের অবশ্যই মাফ করে দেয়া হবে এবং তোমাদেরকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। বরং তাদের এই প্রত্যাশা দেয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা সরল মনে তাওবা করো তাহলে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তোমাদের সাথে এই আচরণ করবেন। এর অর্থ হলো, গোনাহগার বান্দার তাওবা কবুল করা এবং তাকে শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে জান্নাত দান করা আল্লাহর জন্য ওয়াজিব নয়। বরং তিনি যদি মাফ করে দেন এবং পুরস্কারও দেন তাহলে তা হবে সরাসরি তার দয়া ও মেহেরবানী। বান্দার তাঁর ক্ষমালাভের আশা অবশ্যই করা উচিত। কিন্তু তাওবা করলে ক্ষমা পাওয়া যাবে এই ভরসায় গোনাহ করা উচিত নয়।

২১. অর্থাৎ তার উত্তম কার্যাবলীর পুরস্কার নষ্ট করবেন না। কাফের ও মুনাফিকদের এ কথা বলার সুযোগ মোটেই দেবেন না যে, আল্লাহর বন্দেগী করে এসব লোক কি প্রতিদান লাভ করেছে? লাঞ্ছনা ও অপমান পড়বে বিদ্রোহী ও নাফরমানদের ভাগে, বিশ্বাসী ও অনুগতদের ভাগে তা পড়বে না।

২২. এ আয়াতটি সূরা হাদীদের ১২ ও ১৩নং আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়লে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, ঈমানদারগণ যখন হাশরের ময়দান থেকে জান্নাতের দিকে যেতে থাকবেন তখনই তাদের আগে আগে 'নূর' অগ্রসর হওয়ার এই ঘটনা ঘটবে। সেখানে চারদিকে থাকবে নিকষ কালো অন্ধকার। যাদের জন্য দোযখের ফায়সালা হবে তারাই কেবল সেখানে অন্ধকারে ঠোকর খেতে থাকবে। আলো কেবল ঈমানদারদের সাথেই থাকবে। সেই আলোর সাহায্যে তারা পথ অতিক্রম করতে থাকবে। এই নাজুক পরিস্থিতিতে অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়ানো লোকদের আর্তনাদ ও বিলাপ শুনে শুনে ঈমানদারদের ওপর হয়তো ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে থাকবে এবং নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা স্মরণ করে তারাও আশংকা করতে থাকবে যে, তাদের 'নূর' আবার ছিনিয়ে নেয়া না হয়

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۭ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ۭ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـــًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ۝

হে নবী, কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো এবং তাদের প্রতি কঠোরতা দেখাও।[২৩] তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। তা অত্যন্ত মন্দ ঠিকানা।

আল্লাহ কাফেরদের ব্যাপারে নূহ এবং লূতের স্ত্রীদেরকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। তারা আমার দুই নেক্‌কার বান্দার স্ত্রী ছিল। কিন্তু তারা তাদের স্বামীর সাথে খেয়ানত[২৪] করেছিল। তারা আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের কোন কাজেই আসতে পারেনি। দু'জনকেই বলে দেয়া হয়েছে ঃ যাও, আগুনে প্রবেশকারীদের সাথে তুমিও প্রবেশ কর।

এবং দুর্ভাগাদের মত তাদেরকেও অন্ধকারে হাতড়িয়ে মরতে না হয়। তাই তারা দোয়া করতে থাকবে, হে আমাদের রব, আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং জান্নাতে না পৌছা পর্যন্ত আমাদের 'নূর'কে অবশিষ্ট রাখ। ইবনে জারীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا এর অর্থ হচ্ছে, যতক্ষণ তারা সহী সালামতে পুলসেরাত অতিক্রম করে না যায় ততক্ষণ যেন তাদের নূর অবশিষ্ট থাকে এবং নিভে না যায়। হযরত হাসান বসরী, মুজাহিদ এবং দাহহাকের তাফসীরও প্রায় অনুরূপ। ইবনে কাসীর তাদের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, ঈমানদারগণ যখন দেখবেন মুনাফিকরা 'নূর' থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছে তখন তারা নিজেদের 'নূরে'র পূর্ণতার জন্য দোয়া করতে থাকবে (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হাদীদ, টীকা—১৭)।

২৩. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আত তাওবা, টীকা—৮২।

২৪. এখানে খেয়ানতের অর্থ এ নয় যে, তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। এখানে খেয়ানতের অর্থ হচ্ছে তারা হযরত নূহ (আ) ও লূতের (আ) সাথে ঈমানের পথে চলেনি, বরং তাদের বিরুদ্ধে দীন ইসলামের শত্রুদের সহযোগিতা করে এসেছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ কোন নবীর স্ত্রী কখনো ব্যভিচারী ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এ দু'জন মহিলার খেয়ানত ছিল দীনের ব্যাপারে। তারা হযরত নূহ (আ) ও হযরত লূতের (আ) দীন গ্রহণ করেনি। হযরত নূহের (আ) স্ত্রী তার কওমের জালেমদের কাছে ঈমান গ্রহণকারী সম্পর্কে খবর পৌছাত এবং হযরত লূতের (আ) স্ত্রী তার স্বামীর কাছে আগত লোকদের খবর তার কওমের দুশ্চরিত্র লোকদের কাছে পৌছে দিত। (ইবনে জারীর)

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ
ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ
مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١١﴾ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا
فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ
الْقٰنِتِيْنَ ﴿١٢﴾

আর ঈমানদারদের ব্যাপারে ফেরাউনের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করছেন। যখন সে দোয়া করলো, হে আমার রব, আমার জন্য তোমার কাছে জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দাও। আমাকে ফেরাউন ও তার কাজকর্ম থেকে রক্ষা করো[২৫] এবং জালেম কওমের হাত থেকে বাঁচাও। ইমরানের কন্যা[২৬] মারয়ামের উদাহরণও পেশ করছেন, যে তার লজ্জাস্থানকে হিফাজত করেছিল।[২৭] অতপর আমি আমার পক্ষ থেকে তার মধ্যে রূহ ফুঁৎকার করছিলাম।[২৮] সে তার রাণীসমূহ এবং কিতাবসমূহের সত্যতা প্রতিপন্ন করেছে। সে ছিল আনুগত্যকারীদের অন্তরভুক্ত।[২৯]

২৫. অর্থাৎ ফেরাউন যেসব খারাপ কাজ কর্ম করে আমাকে তার মন্দ পরিণামের অংশীদার করে না।

২৬. হয়তো হযরত মারয়ামের বাপের নাম ইমরান ছিল, অথবা তাঁকে ইমরানের কন্যা বলার কারণ হচ্ছে, তিনি ইমরানের বংশধর ছিলেন।

২৭. এটা ইহুদীদের অপবাদের জবাব। ইহুদীদের অপবাদ ছিল, তাঁর গর্ভে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম (নাউযুবিল্লাহ) কোন গোনাহর ফল ছিল। সূরা নিসার ১৫৬ আয়াতে এই জালেমদের এই অপবাদকে "بهتان عظيم" মারাত্মক অপবাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন—নিসা, টীকা—১৯০)।

২৮. অর্থাৎ কোন পুরুষের সংস্পর্শ ছাড়াই তার গর্ভাশয়ে নিজের পক্ষ থেকে একটি প্রাণ সৃষ্টি করা হয়েছিল। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন—নিসা, টীকা ২১২ ও ২১৩; সূরা আল—আম্বিয়া, টীকা—৮৯)।

২৯. যে উদ্দেশ্যে এই তিন শ্রেণীর নারীর উদাহরণ পেশ করা হয়েছে এই সূরার ভূমিকায় তার ব্যাখ্যা করেছি। তাই এখানে তা পুনরালোচনার প্রয়োজন নেই।

আল মুল্‌ক্

৬৭

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতাংশ تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ এর আল মুল্‌ক্ শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটি কোন্ সময় নাযিল হয়েছিলো তা কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় না। তবে বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সূরাটি মক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম।

বিষয়বস্তু

এ সূরাটিতে একদিকে ইসলামী শিক্ষার মূল বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে যেসব লোক বেপরোয়া ও অমনোযোগী ছিল তাদেরকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে সজাগ করে দেয়া হয়েছে। মক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের বৈশিষ্ট হলো, তাতে ইসলামের গোটা শিক্ষা ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী করে পাঠানোর উদ্দেশ্য সবিস্তারে নয় বরং সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ফলে তা ক্রমান্বয়ে মানুষের চিন্তা-ভাবনায় বদ্ধমূল হয়েছে। সেই সাথে মানুষের বেপরোয়া মনোভাব ও অমনোযোগিতা দূর করা, তাকে ভেবে চিন্তে দেখতে বাধ্য করা এবং তার ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে তোলার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

প্রথম পাঁচটি আয়াতে মানুষের এ অনুভূতিকে জাগানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, যে বিশ্বলোকে সে বাস করছে তা এক চমৎকার সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ় সাম্রাজ্য। হাজারো তালাশ করেও সেখানে কোন রকম দোষ-ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা কিংবা বিশৃংখলার সন্ধান পাওয়া যাবে না। এক সময় এ সাম্রাজ্যের কোন অস্তিত্ব ছিল না। মহান আল্লাহই একে অস্তিত্ব দান করেছেন, এর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও শাসনকার্যের সমস্ত ইখতিয়ার নিরংকুশভাবে তাঁরই হাতে। তিনি অসীম কুদরতের অধিকারী। এর সাথে মানুষকে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, এ পরম জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থার মধ্যে তাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং এখানে তাকে পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়েছে। তার শুধু সৎকর্ম দ্বারাই সে এ পরীক্ষায় সফলতা লাভ করতে সক্ষম।

আখেরাতে কুফরীর যে ভয়াবহ পরিণাম দেখা দেবে ৬ থেকে ১১নং আয়াতে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর নবীদের পাঠিয়ে এ দুনিয়াতেই সে ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছেন। এখন তোমরা যদি এ পৃথিবীতে নবীদের কথা মেনে নিয়ে নিজেদের আচরণ ও চাল-চলন সংশোধন না করো তাহলে আখেরাতে তোমরা নিজেরাই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, তোমাদের যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তোমরা তার উপযোগী।

১২ থেকে ১৪নং আয়াতে এ পরম সত্যটি বুঝানো হয়েছে যে, স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে বেখবর থাকতে পারেন না। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য প্রত্যেকটি কাজ ও কথা এমন কি তোমাদের মনের কল্পনাসমূহ পর্যন্ত অবগত। তাই নৈতিকতার সঠিক ভিত্তি হলো, মন্দ কাজের জন্য দুনিয়াতে পাকড়াও করার মত কোন শক্তি থাক বা না থাক এবং ঐ কাজ দ্বারা দুনিয়াতে কোন ক্ষতি হোক বা না হোক, মানুষ সবসময় অদৃশ্য আল্লাহর সামনে জবাবদিহির ভয়ে সব রকম মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে। যারা এ কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করবে আখেরাতে তারাই বিরাট পুরস্কার ও ক্ষমালাভের যোগ্য বলে গণ্য হবে।

১৫ থেকে ২৩নং আয়াতে পরপর কিছু অবহেলিত সত্যের প্রতি ইংগিত দিয়ে সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার আহবান জানানো হয়েছে। এগুলোকে মানুষ দুনিয়ার নিত্য নৈমিত্তিক সাধারণ ব্যাপার মনে করে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখে না। বলা হয়েছে, এ মাটির প্রতি লক্ষ্য করে দেখো। এর ওপর তোমরা নিশ্চিন্তে আরামে চলাফেরা করছো এবং তা থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় রিযিক সংগ্রহ করছো। আল্লাহ তা'আলাই এ যমীনকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। তা না হলে যে কোন সময় এ যমীনের ওপর ভূমিকম্প সংঘটিত হয়ে তা তোমাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারে। কিংবা এমন ঝড়-ঝঞ্ঝা আসতে পারে যা তোমাদের সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেবে। মাথার ওপরে উড়ন্ত পাখীগুলোর প্রতি লক্ষ করো। আল্লাহই তো ওগুলোকে শূন্যে ধরে রাখেন। নিজেদের সমস্ত উপায়-উপকরণের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ করে দেখো। আল্লাহ যদি তোমাদের শাস্তি দিতে চান তাহলে এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে? আর আল্লাহ যদি তোমাদের রিযিকের দরজা বন্ধ করে দেন, তাহলে এমন কে আছে, যে তা খুলে দিতে পারে? তোমাদেরকে প্রকৃত সত্য জানিয়ে দেয়ার জন্য এগুলো সবই প্রস্তুত আছে। কিন্তু এগুলোকে তোমরা পশু ও জীব-জন্তুর দৃষ্টিতে দেখে থাকো। পশুরা এসব দেখে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। মানুষ হিসেবে আল্লাহ তোমাদেরকে যে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি এবং চিন্তা ও বোধশক্তি সম্পন্ন মস্তিষ্ক দিয়েছেন, তা তোমরা কাজে লাগাও না। আর এ কারণেই তোমরা সঠিক পথ দেখতে পাও না।

২৪ থেকে ২৭নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, অবশেষে একদিন তোমাদেরকে নিশ্চিতভাবে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। নবীর কাজ এ নয় যে, তিনি তোমাদেরকে সেদিনটির আগমনের সময় ও তারিখ বলে দেবেন। তার কাজ তো শুধু এতটুকু যে, সেদিনটি আসার আগেই তিনি তোমাদের সাবধান করে দেবেন। আজ তোমরা তার কথা মানছো না। বরং ঐ দিনটি তোমাদের সামনে হাজির করে দেখিয়ে দেয়ার দাবী করছো। কিন্তু যখন তা এসে যাবে এবং তোমরা তা চোখের সামনে হাজির দেখতে পাবে তখন তোমরা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে।

২৮ ও ২৯নং আয়াতে মক্কার কাফেরদের কিছু কথার জবাব দেয়া হয়েছে। এসব কথা তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সংগী–সাথীদের বিরুদ্ধে বলতো। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভিশাপ দিতো এবং তাঁর ও ঈমানদারদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্য বদ দোয়া করতো। তাই বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে সৎপথের দিকে আহবানকারীরা ধ্বংস হয়ে যাক বা আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুক তাতে তোমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন কি করে হবে? তোমরা নিজের জন্য চিন্তা করো। আল্লাহর আযাব যদি তোমাদের ওপর এসে পড়ে তাহলে কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে? যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং যাঁরা তাঁর ওপরে তাওয়াক্কুল করেছে তোমরা মনে করেছো তারা গোমরাহ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন প্রকৃত গোমরাহ কারা তা প্রকাশ হয়ে পড়বে।

অবশেষে মানুষের সামনে একটি প্রশ্ন রাখা হয়েছে এবং সে সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করে দেখতে বলা হয়েছে ঃ মরুভূমি ও পবর্তময় আরবভূমিতে যেখানে তোমাদের জীবন পুরোটাই পানির ওপর নির্ভরশীল, পানির এসব ঝরণা ভূগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছে। এসব জায়গায় পানির উৎসগুলো যদি ভূগর্ভের আরো নীচে নেমে উধাও হয়ে যায় তাহলে আর কোন্ শক্তি আছে, যে এই সঞ্জীবনী–ধারা তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারে?

আয়াত ৩০ **সূরা আল মুল্‌ক–মক্কী** রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ۝١ الَّذِىْ
خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۝٢
الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۭ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ
تَفٰوُتٍ ۭ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝٣

অতি মহান ও শ্রেষ্ঠ[১] তিনি যাঁর হাতে রয়েছে সমগ্র বিশ্ব–জাহানের কর্তৃত্ব।[২] তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতা রাখেন।[৩] কাজের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন।[৪] আর তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীলও।[৫] তিনিই স্তরে স্তরে সাজিয়ে সাতটি আসমান তৈরী করেছেন।[৬] তুমি রহমানের সৃষ্টিকর্মে কোন প্রকার অসংগতি দেখতে পাবে না।[৭] আবার চোখ ফিরিয়ে দেখ, কোন ত্রুটি[৮] দেখতে পাচ্ছ কি?

১. تَبٰرَكَ – برکة শব্দ থেকে আধিক্য অর্থে গৃহীত। برکت শব্দটি শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, বৃদ্ধি, আধিক্য, স্থায়িত্ব, দৃঢ়তা এবং অধিক পরিমাণে কল্যাণ ও নেকী অর্থ প্রকাশক। এর থেকে আধিক্য অর্থ প্রকাশক শব্দ গঠন করে تَبٰرَكَ করা হলে তার অর্থ হয় তিনি অত্যধিক সম্মানিত ও মহান, নিজের সত্তা, গুণাবলী ও কাজ–কর্মে অন্য সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাঁর সত্তা থেকে অশেষ ও অগণিত কল্যাণের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে এবং তাঁর পূর্ণতা চিরস্থায়ী। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৪৩; আল মু'মিনূন, টীকা ১৪; আল ফুরকান, টীকা ১ ও ১৯)।

২. اَلْمُلْكُ শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এখানে এর কোন সীমিত অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে না। সুতরাং নিশ্চিতভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় গোটা বিশ্ব–জাহানের ওপর রাজকীয় ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর হাতে ক্ষমতা থাকার অর্থ এটা নয় যে, দৈহিক অংগ হিসেবে তাঁর কোন হাত আছে। বরং বাকরীতি অনুসারে শব্দটি অধিকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষার মত আমাদের ভাষাতেও যখন বলি যে, সব ক্ষমতা

অমুকের হাতে তখন তার অর্থ হয় সে-ই সব ক্ষমতার মালিক, অন্য কারো সেখানে কোন কর্তৃত্ব নেই।

৩. অর্থাৎ তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তিনি কোন কাজ করতে চাইবেন অথচ করতে পারবেন না কোন কিছুই তাকে এরূপ অক্ষম করে দেয়ার মত নেই।

৪. অর্থাৎ তিনি পৃথিবীতে মানুষের জীবন ও মৃত্যুর এ ধারাবাহিকতা চালু করেছেন তাকে পরীক্ষা করার জন্য, কোন্ মানুষটির কাজ বেশী ভাল তা দেখার জন্য। এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে বেশ কিছু সত্যের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে। প্রথম হলো, মৃত্যু এবং জীবন তাঁরই দেয়া। আর কেউ জীবনও দান করতে পারে না, মৃত্যুও না। দ্বিতীয় হলো, মানুষ একটি সৃষ্টি, তাকে ভাল এবং মন্দ উভয় প্রকার কাজ করার শক্তি দেয়া হয়েছে। তার জীবন বা মৃত্যু কোনটিই উদ্দেশ্যহীন নয়, স্রষ্টা তাকে এখানে সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষার জন্য। জীবন তার জন্য পরীক্ষার সময় বা অবকাশ মাত্র। মৃত্যুর অর্থ হলো, তার পরীক্ষার সময় ফুরিয়ে গেছে। তৃতীয় হলো, এ পরীক্ষার জন্য স্রষ্টা সবাইকে কাজের সুযোগ দিয়েছেন। সে ভাল মানুষ না খারাপ মানুষ, এ পৃথিবীতে কাজের মাধ্যমে সে যাতে তার প্রকাশ ঘটাতে পারে সে জন্য সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেককে কাজের সুযোগ দিয়েছেন। চতুর্থ হলো, কার কাজ ভাল এবং কার কাজ খারাপ প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিকর্তাই তার ফায়সালা করবেন। কাজের ভাল-মন্দ বিচার করার মানদণ্ড নির্ধারণ করা পরীক্ষার্থীর কাজ নয়, বরং পরীক্ষা গ্রহণকারীর কাজ। তাই যারাই পরীক্ষায় সফল হতে চাইবে, তাদেরকে জানতে হবে পরীক্ষা গ্রহণকারীর দৃষ্টিতে ভাল কাজ কি? পঞ্চম বিষয়টি পরীক্ষা কথাটির মধ্যেই নিহিত। তা হলো, যার কাজ যেমন হবে তাকে সে অনুপাতেই প্রতিফল দেয়া হবে। কারণ ফলাফলই যদি না থাকে তাহলে পরীক্ষা নেয়ার আদৌ কোন অর্থ হয় না।

৫. এর দু'টি অর্থ এবং দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। একটি হলো, তিনি মহা পরাক্রমশালী এবং সবার ওপর পরিপূর্ণরূপে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও নিজের সৃষ্টির প্রতি তিনি দয়াবান ও ক্ষমাশীল, তাদের প্রতি জালেম ও কঠোর নন। দ্বিতীয়টি হলো, দুষ্কর্মকারীদের শাস্তি দেয়ার পুরো ক্ষমতা তাঁর আছে। এতো শক্তি কারো নেই যে তাঁর শাস্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু যারা লজ্জিত হয়ে দুষ্কর্ম পরিত্যাগ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের সাথে তিনি ক্ষমাশীলতার আচরণ করে থাকেন।

৬. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ৩৪; আর রা'দ, টিকা ২; আল হিজ্‌র টীকা ৮; আল হাজ্জ, টীকা ১১৩; আল মু'মিনূন, টীকা ১৫; আস সাফফাত, টীকা ৫ এবং আল মুমিন, টীকা ৯০।

৭. মূল আয়াতে تَفَاوُت শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ হলো সামঞ্জস্যহীনতা। এক বস্তুর সাথে আরেকটি বস্তুর মিল না হওয়া, অমিল হওয়া বা খাপ না খাওয়া। সুতরাং এ কথাটির অর্থ হলো, গোটা বিশ্ব-জাহানের কোথাও তোমরা বিশৃংখলা, অবিন্যস্ততা ও অসংগতি দেখতে পাবে না। আল্লাহর সৃষ্ট এ পৃথিবীতে কোন জিনিসই সামঞ্জস্যহীন ও খাপছাড়া নয়। এর প্রত্যেকটি অংশ পরস্পর বাঁধা এবং সেগুলোর মধ্যে পুরো মাত্রায় সামঞ্জস্য বিদ্যমান।

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ
وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴿٥﴾ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٦﴾

তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখ, তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে।

আমি তোমাদের কাছের আসমানকে[৯] সুবিশাল প্রদীপমালায় সজ্জিত করেছি।[১০] আর সেগুলোকে শয়তানদের মেরে তাড়ানোর উপকরণ বানিয়ে দিয়েছি।[১১] এসব শয়তানের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

যেসব লোক তাদের রবকে অস্বীকার করেছে[১২] তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটি অত্যন্ত খারাব জায়গা।

৮. মূল ব্যবহৃত শব্দটি হলো فطور –এর অর্থ ফাটল, ছিদ্র, চিড়, ছেঁড়া, ভাঙা চোরা। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব–জাহানের বাঁধন এতো মজবুত এবং পৃথিবীর একটি অণু থেকে বিশালকায় নীহারিকা মণ্ডলী পর্যন্ত প্রতিটি বস্তু এমন সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ যে, বিশ্ব–জাহানের কোথাও শৃংখলার ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হয়নি। তোমরা যতই অনুসন্ধান চালাও না কেন এর কোথাও কোন বিশৃংখলা দেখা যাবে না। (বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ক্বাফ, টীকা ৮)।

৯. কাছের আসমান অর্থ সে আসমান যার তারকারাজি এবং গ্রহসমূহকে আমরা খালি চোখে দেখতে পাই। এর চেয়েও দূরে অবস্থিত যেসব বস্তুকে দেখতে যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয় তা হলো দূরের আসমান। আর যন্ত্রপাতির সাহায্যেও যা দেখা যায় না তা হলো অধিক দূরবর্তী আসমান।

১০. মূলত مَصَابِيحَ শব্দটি এখানে অনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং অনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে এসব প্রদীপের সুবিশাল হওয়ার ধারণা সৃষ্টি হয়। কথাটির অর্থ হলো, আমি এ বিশ্ব–জাহানকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও জনমানবহীন করে সৃষ্টি করিনি। বরং তারকারাজি দ্বারা খুব সুন্দর করে সাজিয়েছি! রাতের অন্ধকারে মানুষ যার জাঁকজমক ও দীপ্তিময়তা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়।

১১. এর অর্থ এটা নয় যে, এসব তারকাকেই শয়তানদের দিকে ছুঁড়ে মারা হয়। আবার এ অর্থও নয় যে, শুধু শয়তানদেরকে মারার জন্যই উল্কার পতন ঘটে। বরং এর অর্থ হলো তারকারাজি থেকে যে অসংখ্য উল্কাপিণ্ড নির্গত হয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিশ্ব–জাহানের সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় এবং এরা অগণিত সংখ্যায় প্রতি মুহূর্তে ভূপৃষ্ঠের দিকে ছুটে আসে,

إِذَآ أُلْقُوا۟ فِيهَا سَمِعُوا۟ لَهَا شَهِيقًا وَهِىَ تَفُورُ ۝٧ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۖ كُلَّمَآ
أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝٨ قَالُوا۟ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا
نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ
كَبِيرٍ ۝٩ وَقَالُوا۟ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىٓ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ۝١٠

তাদেরকে যখন সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা তার ভয়ানক গর্জনের শব্দ শুনতে পাবে[১৩] এবং তা টগবগ করে ফুটতে থাকবে। অত্যধিক রোষে তা ফেটে পড়ার উপক্রম হবে। যখনই তার মধ্যে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে তখনই তার ব্যবস্থাপকরা জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সাবধানকারী আসেনি?[১৪] তারা জবাব দেবে, হাঁ আমাদের কাছে সাবধানকারী এসেছিলো। কিন্তু আমরা তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিলাম এবং বলেছিলাম আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি। তোমরাই বরং বিরাট ভুলের মধ্যে পড়ে আছো।[১৫] তারা আরো বলবে ঃ আহা! আমরা যদি শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতাম,[১৬] তাহলে আজ এ জ্বলন্ত আগুনে সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হতাম না।

সেগুলো পৃথিবীর শয়তানদের ঊর্ধ জগতে ওঠার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করে। তারা ওপরে ওঠার চেষ্টা করলেও এ উল্কা পিণ্ডগুলো তাদেরকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। এ বিষয়টি বলার প্রয়োজন এ জন্য যে, গণকদের সম্পর্কে আরবের লোকেরা এ ধারণা পোষণ করতো যে, শয়তানরা তাদের অনুগত বা শয়তানদের সাথে তাদের যোগাযোগ আছে। এসব শয়তানের মাধ্যমে তারা গায়েবের খবর পেয়ে থাকে এবং সঠিকভাবে মানুষের ভাগ্য গণনা করতে পারে। গণকরা নিজেরাও এ দাবী করতো। তাই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে, শয়তানদের ঊর্ধ জগতে ওঠা এবং সেখান থেকে গায়েবের খবর অবহিত হওয়ার আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই। অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন ঃ তাফহীমুল কুরআন, আল হিজর, টীকা ৯ থেকে ১২; আস সাফ্‌ফাত, টীকা ৬-৭।

এখন একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, এ উল্কাগুলো আসলে কি? এ বিষয়ে মানুষের জ্ঞান চূড়ান্ত অনুসন্ধান ও গবেষণালব্ধ কোন সিদ্ধান্ত দিতে এখনো অক্ষম। তা সত্ত্বেও আধুনিককালে যেসব তত্ত্ব ও বাস্তব অবস্থা মানুষের জ্ঞানের আওতায় এসেছে এবং ভূপৃষ্ঠে পতিত উল্কাপিণ্ডসমূহের পর্যবেক্ষণ থেকে যে জ্ঞান অর্জিত হয়েছে তার ভিত্তিতে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় তত্ত্বটি হলো ঃ এসব উল্কাপিণ্ড কোন গ্রহে বিস্ফোরণের কারণে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মহাশূন্যে ছুটে বেড়াতে থাকে এবং কোন এক পর্যায়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আওতায় এসে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে। (দেখুন ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ১৯৬৭ইং সংস্করণ, ১৫ খণ্ড, শব্দ—Meteorites)

১২. অর্থাৎ মানুষ হোক কিংবা শয়তান যারাই তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে, এটাই হয়েছে তাদের পরিণাম। (রবের সাথে কুফরী করা বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ১৬১; আন নিসা, টীকা ১৭৮; আল কাহাফ, টীকা ৩৯; আল মু'মিন, টীকা ৩)।

১৩. মূল ইবারতে شَهِيق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা গাধার ডাকের মত আওয়াজ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এ বাক্যের অর্থ এও হতে পারে যে, এটা খোদ জাহান্নামের শব্দ। আবার এও হতে পারে যে, জাহান্নাম থেকে এ শব্দ আসতে থাকবে, ইতিমধ্যেই যেসব লোককে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে তারা জোরে জোরে চিৎকার করতে থাকবে। সূরা হূদের ১০৬ আয়াত থেকে দ্বিতীয় অর্থটির সমর্থন পাওয়া যায়। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ দোযখীরা দোযখের মধ্যে হাঁপাতে, গোঙ্গাতে এবং হাঁসফাস করতে থাকবে। আর সূরা ফুরকানের ১২ আয়াত থেকে প্রথমোক্ত অর্থটির সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে, দোযখের দিকে যাওয়ার পথে এসব লোক দূরে থেকেই তার ক্রোধ ও প্রচণ্ড উত্তেজনার শব্দ শুনতে পাবে। এসবের প্রেক্ষিতে সঠিক অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এটি খোদ জাহান্নামের ক্রোধের শব্দ ও জাহান্নামবাসীদের চিৎকার-ধ্বনিও।

১৪. এ প্রশ্নের ধরন আসলে প্রশ্নের মত হবে না এবং তাদের কাছে কোন সতর্ককারী এসেছিল কিনা জাহান্নামের কর্মচারীরা তাদের কাছে তা জানতেও চাইবে না। বরং এর উদ্দেশ্য হবে তাদের কাছ থেকে এ বিষয়ের স্বীকারোক্তি আদায় করা যে, জাহান্নামে নিক্ষেপ করে তাদের প্রতি কোন বেইনসাফী করা হচ্ছে না। তাই তারা তাদের মুখ থেকেই এ মর্মে স্বীকৃতি আদায় করতে চেষ্টা করবেন যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে বেখবর রাখেননি। তিনি তাদের কাছে নবী পাঠিয়েছিলেন, সত্য কি ও সঠিক পথ কোন্‌টি তা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং এ সত্য ও সঠিক পথের বিপরীত পথে চলার পরিণাম স্বরূপ যে তাদের এ জাহান্নামের জ্বালানি হতে হবে সে সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। আজ সে জাহান্নামেই তাদেরকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু তারা নবীদের কথা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সুতরাং তাদেরকে এখন যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে তারা আসলে তার উপযুক্ত।

কুরআন মজীদে এ বিষয়টি বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহ একটি পরীক্ষার জন্য মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। পরীক্ষাটি নেয়ার পদ্ধতি এমন নয় যে, মানুষকে সে সম্পর্কে অজ্ঞ ও অনবহিত রেখে সঠিক পথে সে চলে কিনা তা দেখা হচ্ছে। বরং তাকে সঠিক পথ চিনিয়ে দেয়ার জন্য যে সম্ভাব্য সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা ছিল মহান আল্লাহ তা পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন করেছেন। সে ব্যবস্থা অনুযায়ী নবী-রসূল পাঠানো হয়েছে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাবসমূহ নাযিল করা হয়েছে। মানুষ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে এবং তাঁরা যেসব কিতাব এনেছেন সেগুলোকে মেনে নিয়ে সঠিক পথে চলবে, না তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের প্রবৃত্তি ও মনগড়া ধ্যান-ধারণার পেছনে ছুটবে, এখন তাদের সমস্ত পরীক্ষা এ একটিমাত্র বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নবুওয়াত মহান আল্লাহর একটি প্রমাণ। এভাবে তিনি মানুষের সামনে তাঁর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটা মানা বা না মানার ওপরে মানুষের ভবিষ্যত নির্ভর করছে। নবী-রসূলদের আগমনের পর কোন ব্যক্তি প্রকৃত অবস্থা না জানার ওজর পেশ করতে পারে

فَاعْتَرَفُوا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّأَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿١١﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ
رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُوا بِهِۦ ۖ
إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿١٣﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۗ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٤﴾

এভাবে তারা নিজেদের অপরাধ[১৭] স্বীকার করবে। এ দোযখবাসীদের ওপর আল্লাহর লানত।

যারা না দেখেও তাদের রবকে ভয় করে,[১৮] নিশ্চয়ই তারা লাভ করবে ক্ষমা এবং বিরাট পুরস্কার।[১৯] তোমরা নীচু স্বরে চুপে চুপে কথা বলো কিংবা উচ্চস্বরে কথা বলো (আল্লাহর কাছে দু'টোই সমান) তিনি তো মনের অবস্থা পর্যন্ত জানেন।[২০] যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানবেন না?[২১] অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী[২২] ও সব বিষয় ভালভাবে অবগত।

না। তাকে না জানিয়ে অলক্ষেই এতো বড় পরীক্ষা নেয়ার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এখন বিনা অপরাধেই শাস্তি দেয়া হচ্ছে, এ ওজর তার ধোপে টিকবে না। এ বিষয়টি এতো অধিকবার বিভিন্নভাবে কুরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার সংখ্যা নির্ণয় করাও কঠিন। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নবর্ণিত স্থানগুলোর উল্লেখ করা যায় ঃ তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, আয়াত ২১৩, টীকা ২৩; আন নিসা, আয়াত ৪১-৪২, টীকা ৬৪, আয়াত ১৬৫, টীকা ২০৮; আল আনআম, আয়াত ১৩০-১৩১, টীকা ৯৮ থেকে ১০০; বনী ইসরাঈল, আয়াত ১৫, টীকা ১৭, ত্বাহা, আয়াত ১৩৪, আল কাসাস, আয়াত ৪৭, টীকা ৬৬, আয়াত ৫৯, টীকা ৮৩, আয়াত ৬৫; ফাতের, আয়াত ৩৭; আল মু'মিন, আয়াত ৫০, টীকা ৬৬।

১৫. অর্থাৎ তোমরা নিজেরাও বিভ্রান্ত আবার যারা তোমাদের ওপর ঈমান এনেছে তারাও চরম বিভ্রান্তিতে ডুবে আছে।

১৬. অর্থাৎ আমরা যদি সত্যানুসন্ধিৎসু হয়ে নবীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম অথবা নবীগণ আমাদের সামনে যা পেশ করেছেন তা আসলে কি বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে তা বুঝার চেষ্টা করতাম। এখানে শোনার কাজকে বুঝার কাজের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তার কারণ হলো, প্রথমে নবীর শিক্ষা আগ্রহ ও মনযোগ সহকারে শোনা (কিংবা তা যদি লিখিত আকারে থাকে তাহলে সত্যানুসন্ধিৎসু হয়ে তা পড়ে দেখা) হিদায়াত লাভ করার পূর্ব শর্ত। চিন্তা-ভাবনা করে তাৎপর্য উপলব্ধি করার পর্যায় আসে এর পরে। নবীর দিকনির্দেশনা ছাড়া নিজের বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে সরাসরি সঠিক পথ লাভ করা যায় না।

১৭. অপরাধ কথাটি এক বচনে ব্যবহৃত হয়েছে। তার মানে যে কারণে তারা জাহান্নামের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে তা হলো রসূলগণকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা এবং তাঁদেরকে অনুসরণ করতে অস্বীকার করা। অন্যসব অপরাধ এরি ডাল-পালা মাত্র।

১৮. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় এটিই হলো নৈতিকতার মূল। কেউ যদি খারাপ কাজ থেকে শুধু এ জন্য বিরত থাকে যে, তার নিজের বিবেক-বুদ্ধির বিচারে কাজটি খারাপ কিংবা সব মানুষ সেটিকে খারাপ মনে করে কিংবা তা করলে পার্থিব জীবনে কোন ক্ষতি হওয়ার আশংকা আছে কিংবা এ জন্য কোন পার্থিব শক্তির তাকে পাকড়াও করার ভয় আছে তা হলে সেটি হবে নৈতিকতার একটি অস্থায়ী ভিত্তি। মানুষের ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনা ভুলও হতে পারে। বিশেষ কোন মানসিক প্রবণতার কারণে সে একটি ভাল জিনিসকে মন্দ এবং একটি মন্দ জিনিসকে ভাল মনে করতে পারে। ভাল ও মন্দ যাচাই করার পার্থিব মানদণ্ড প্রথমত এক রকম নয়। এ ছাড়াও তা সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তিত হয়। দুনিয়ার নৈতিক দর্শনে কোন বিশ্বজনীন ও স্থায়ী মানদণ্ড বর্তমানেও নেই অতীতেও ছিল না। পার্থিব ক্ষতির আশংকাও নৈতিকতার কোন স্বতন্ত্র মানদণ্ড নয়। দুনিয়ার জীবনে নিজের কোন ক্ষতি হতে পারে শুধু এ ভয়ে যে ব্যক্তি খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে, ক্ষতি হওয়ার আশংকা নেই, এমন অবস্থায় সে ঐ কাজ থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হবে না। একইভাবে কোন পার্থিব শক্তির কাছে জবাবদিহির আশংকাও এমন কিছু নয় যা একজন মানুষকে ভদ্র ও সৎ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। সবাই জানে, পার্থিব কোন শক্তিই দেখা ও না দেখা বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী নয়। তার দৃষ্টিতে বাইরে অসংখ্য অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। যে কোন পার্থিব শক্তির পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য অসংখ্য কৌশল ও ফন্দি-ফিকির অবলম্বন সম্ভব। এ ছাড়াও পার্থিব শক্তির রচিত আইন ব্যবস্থা সব রকমের অপরাধকে তার আওতাধীন করতে পারে না। বেশীর ভাগ অপরাধই এমন পর্যায়ের, পার্থিব আইন-কানুন যার ওপর আদৌ কোন হস্তক্ষেপ করে না। অথচ পার্থিব আইন ব্যবস্থা যেসব অপরাধের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে সেগুলোর চেয়ে তা জঘন্য। তাই ইসলামী জীবন বিধান নৈতিকতার প্রাসাদ এমন একটি বুনিয়াদের ওপর নির্মাণ করেছে যার ভিত্তিতে অদৃশ্য আল্লাহর ভয়ে সব খারাপ কাজ বর্জন করতে হয়। যে আল্লাহ সর্বাবস্থায় মানুষকে দেখছেন, যার হস্তক্ষেপ ও পাকড়াও থেকে নিজেকে রক্ষা করে মানুষ কোথাও যেতে সক্ষম নয়। যিনি মানুষকে ভাল ও মন্দ যাচাইয়ের জন্য একটি সার্বিক, বিশ্বজনীন এবং পূর্ণাঙ্গ মানদণ্ড দিয়েছেন, শুধু তাঁর ভয়ে মন্দ ও অকল্যাণকে বর্জন করা এবং ভাল ও কল্যাণকে গ্রহণ করা এমন একটি কল্যাণকর নীতি যা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মূল্যবান। এ কারণটি ছাড়া যদি অন্য কোন কারণে কোন মানুষ অন্যায় না করে কিংবা বাহ্যিকভাবে যেসব কাজ নেকীর কাজ বলে গণ্য হয় তা করে তাহলে তার এ নৈতিকতা আখেরাতে কোন মূল্য ও মর্যাদালাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। কারণ তা হবে বালির স্তূপের ওপর নির্মিত প্রাসাদের মতো।

১৯. অর্থাৎ না দেখে আল্লাহকে ভয় করার দু'টি অনিবার্য ফল আছে। এক, মানবিক দুর্বলতার কারণে মানুষের যে অপরাধ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় তা মাফ করে দেয়া হবে। তবে তা এ শর্তে যে, তার গভীরে ও উৎসমূলে আল্লাহভীতির অনুপস্থিতি যেন কার্যকর না থাকে। দুই, এ আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানুষ যেসব নেক আমল করবে তার জন্য সে বিরাট পুরস্কার পাবে।

২০. একথাটি কাফের ও মু'মিন নির্বিশেষে গোটা মানব জাতিকে লক্ষ করে বলা হয়েছে। এতে মু'মিনের জন্য শিক্ষা হলো, দুনিয়ায় জীবন যাপনকালে তাকে তার মন-মগজে এ অনুভূতি কার্যকর রাখতে হবে যে, তার গোপন ও প্রকাশ্য সব কথা ও কাজই

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ
رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ﴿١٥﴾ ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ
فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ ﴿١٦﴾ اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ؕ
فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ﴿١٧﴾

২ রুকূ'

তিনিই তো সেই মহান সত্তা যিনি ভূপৃষ্ঠকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। তোমরা এর বুকের ওপর চলাফেরা করো এবং আল্লাহর দেয়া রিযিক খাও।[২৩] আবার জীবিত হয়ে তোমাদেরকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে।[২৪] যিনি আসমানে আছেন[২৫] তিনি তোমাদের মাটির মধ্যে ধসিয়ে দেবেন এবং অকস্মাৎ ভূপৃষ্ঠ জোরে ঝাঁকুনি খেতে থাকবে, এ ব্যাপারে কি তোমরা নির্ভয় হয়ে গিয়েছো? যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের ওপর পাথর বর্ষণকারী হাওয়া পাঠাবেন[২৬] —এ ব্যাপারেও কি তোমরা নির্ভয় হয়ে গিয়েছো? তখন তোমরা জানতে পারবে আমার সাবধানবাণী কেমন?[২৭]

শুধু নয় তার নিয়ত ও ধ্যান–ধারণা পর্যন্ত কোন কিছুই আল্লাহর অজানা নয়। আর কাফেরের জন্য এতে সাবধানবাণী হলো এই যে, আল্লাহকে ভয় না করে সে নিজ অবস্থানে থেকে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। কিন্তু তার কোন একটি ব্যাপারও আল্লাহর কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপের আওতা বহির্ভূত নয়।

২১. এর আরেকটি অনুবাদ হতে পারে—তিনি কি তাঁর সৃষ্টিকেই জানবেন না? মূল ইবারতে مَنْ خَلَقَ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে "যিনি সৃষ্টি করেছেন"ও হতে পারে। আবার "যাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন"ও হতে পারে। উভয় অবস্থায় মূল অর্থ একই থাকে। এটি ওপরের আয়াতাংশে উল্লেখিত বক্তব্যের প্রমাণ। অর্থাৎ স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে বেখবর থাকবেন তা কি করে সম্ভব? খোদ সৃষ্টি নিজের সম্পর্কে বেখবর বা অজ্ঞ থাকতে পারে। কিন্তু স্রষ্টা তার সম্পর্কে বেখবর থাকতে পারেন না। তোমাদের প্রতিটি শিরা–উপশিরা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্কের প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রীও তাঁর সৃষ্টি। তোমাদের প্রতিটি নিশ্বাস–প্রশ্বাস তিনি চালু রেখেছেন বলেই তা চালু আছে। তোমাদের প্রতিটি অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ তাঁর ব্যবস্থাপনার অধীনে কাজ করছে। তাই তোমাদের কোন বিষয় তাঁর অগোচরে কি করে থাকতে পারে?

২২. আয়াতে لطيف শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর একটি অর্থ হলো সূক্ষ্ম ও অনুভবযোগ্য নয় এমন পন্থায় কর্ম সম্পাদনকারী এবং আরেকটি অর্থ হলো গোপন তত্ত্বসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী।

২৩. অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ নিজে থেকেই তোমাদের অনুগত হয়ে যায়নি। আর যে খাবার তোমরা লাভ করছো তাও আপনা থেকেই এখানে সৃষ্টি হয়নি। বরং আল্লাহ তাঁর হিকমত ও কুদরত দ্বারা এ পৃথিবীকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, এখানে তোমাদের জীবন ধারণ সম্ভব হচ্ছে এবং এ বিশাল গ্রহটি এমন শান্তিময় হয়ে উঠেছে যে, তোমরা নিশ্চিন্তে এখানে চলাফেরা করছো। তোমাদের জন্য এটি এমন একটি নিয়ামতের ভাণ্ডার হয়ে উঠেছে যে, তোমাদের জীবন যাপনের জন্য এখানে অসংখ্য উপকরণ বর্তমান আছে। যদি তোমরা গাফিল না হয়ে থাকো এবং কিছু বিবেক–বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে দেখো তাহলে জানতে পারবে, ভূ পৃষ্ঠকে তোমাদের জীবন ধারণের উপযোগী বানাতে এবং সেখানে রিযিকের অফুরন্ত ভাণ্ডার সৃষ্টি করতে কি পরিমাণ বুদ্ধি ও কৌশল কাজে লাগানো হয়েছে। (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নামল, টীকা ৭৩, ৭৪ ও ৮১; ইয়াসীন, টীকা ২৯, ৩২; আল মু'মিন, টীকা ৯০, ৯১; আয্ যুখরুফ, টীকা ৭; আল জাসিয়া, টীকা ৭; ক্বাফ, টীকা ১৮)

২৪. অর্থাৎ এ পৃথিবীর বুকে বিচরণ করো এবং আল্লাহর দেয়া রিযিক খাও। কিন্তু একথা ভুলে যেও না যে, একদিন তোমাদের আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে।

২৫. এর দ্বারা একথা বুঝায় না যে, আল্লাহ আসমানে থাকেন। বরং কথাটি এভাবে বলার কারণ হলো, মানুষ যখনই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চায় তখনই সে আসমানের দিকে তাকায়, দোয়া করার সময় আসমানের দিকে হাত উঠায়, কোন বিপদের সময় সব রকম সাহায্য–সহযোগিতা ও অবলম্বন থেকে নিরাশ হয়ে গেলে আসমানের দিকে মুখ তুলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে। আকস্মিকভাবে কোন বিপদ আপতিত হলে বলে, এটি ওপর থেকে নাযিল হয়েছে। অস্বাভাবিকভাবে পাওয়া কোন জিনিস সম্পর্কে বলে এটি উর্ধ জগত থেকে এসেছে। আল্লাহর প্রেরিত কিতাবসমূহকে আসমানী কিতাব বলা হয়। আবু দাউদে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি একটি কাল দাসীকে সাথে করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললোঃ একজন ঈমানদার দাসকে মুক্ত করা আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। আমি কি এই দাসীটিকে মুক্ত করতে পারি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাসীটিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহ কোথায়? সে আংগুল দিয়ে আসমানের দিকে ইশারা করে দেখালো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কে? সে প্রথমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে এবং পরে আসমানের দিকে ইশারা করলো। এভাবে তার উদ্দেশ্য বুঝা যাচ্ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ একে মুক্ত করে দাও, এ ঈমানদার। (মুয়াত্তা, মুসলিম ও নাসায়ী হাদীসগ্রন্থেও অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে)। হযরত উমর (রা) হযরত খাওলা বিনতে সা'লাবা সম্পর্কে একবার বলেন যে, তিনি এমন এক মহিলা যার আবেদন সাত আসমানের ওপর থেকে কবুল করা হয়েছে। (সূরা মুজাদালার তাফসীরে ২নং টীকায় আমরা এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করেছি।) এসব কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মানুষ যখন আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা করে তখন স্বভাবতই তার মন নিচে মাটির দিকে যায় না। বরং ওপরে আসমানের দিকে যায়। এদিকে লক্ষ রেখেই এখানে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে مَنْ فِي السَّمَاءِ (যিনি আসমানে

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ
فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾
أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ ۚ إِنِ الْكَافِرُونَ
إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَل لَّجُّوا فِي
عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا
عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾

তাদের পূর্বের লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল। ফলে দেখো, আমার পাকড়াও কত কঠিন হয়েছিল।[২৮] তারা কি মাথার ওপর উড়ন্ত পাখীগুলোকে ডানা মেলতে ও গুটিয়ে নিতে দেখে না? রহমান ছাড়া আর কেউ নেই যিনি তাদেরকে ধরে রাখেন।[২৯] তিনিই সবকিছুর রক্ষক।[৩০] বলো তো, তোমাদের কাছে কি এমন কোন বাহিনী আছে যা রহমানের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে?[৩১] বাস্তব অবস্থা হলো, এসব কাফেররা ধোঁকায় পড়ে আছে মাত্র। অথবা বলো, রহমান যদি তোমাদের রিযিক বন্ধ করে দেন তাহলে এমন কেউ আছে, যে তোমাদের রিযিক দিতে পারে? প্রকৃতপক্ষে এসব লোক বিদ্রোহ ও সত্য বিমুখতায় বদ্ধপরিকর। ভেবে দেখো, যে ব্যক্তি মুখ নিচু করে পথ চলছে[৩২] সে-ই সঠিক পথপ্রাপ্ত, না যে ব্যক্তি মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে সমতল পথে হাঁটছে সে-ই সঠিক পথ প্রাপ্ত?

আছেন) কথাটি বলা হয়েছে। তাই এ ক্ষেত্রে এরূপ সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশ নেই যে, কুরআন আল্লাহ তা'আলাকে আসমানে অবস্থানকারী বলে ঘোষণা করছে। কি করে এ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে? এ সূরা মুল্‌কেরই শুরুতে বলা হয়েছে, الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا (তিনি স্তরে স্তরে সাজিয়ে সাতটি আসমান সৃষ্টি করেছেন) সূরা আল বাকারায় বলা হয়েছে, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও না কেন সেটিই আল্লাহর দিক।

২৬. এভাবে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, এ পৃথিবীতে তোমাদের টিকে থাকা এবং নিরাপত্তা লাভ করা সবসময় মহান আল্লাহর দয়া ও করুণার ওপর নির্ভর করে। তোমরা আপন শক্তির জোরে এ পৃথিবীতে সুখের জীবন যাপন করছো না। তোমাদের জীবনের এক একটি মুহূর্ত, যা এখানে অতিবাহিত হচ্ছে, তার সবই আল্লাহর হিফাযত ও তত্ত্বাবধানের

قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۭ قَلِيْلًا
مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾
وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۡ
وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْۗـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ﴿٢٧﴾

এদেরকে বলো, আল্লাহই তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তোমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো।[৩৩]

এদেরকে বলো, আল্লাহই সেই সত্তা যিনি তোমাদের পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাঁরই কাছে তোমাদের সমবেত করা হবে।[৩৪] এরা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বলো এ ওয়াদা কবে বাস্তবায়িত হবে?[৩৫] বলো, এ বিষয়ে জ্ঞান আছে শুধু আল্লাহর নিকট। আমি স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।[৩৬] তারপর এরা যখন ঐ জিনিসকে কাছেই দেখতে পাবে তখন যারা অস্বীকার করেছে তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যাবে।[৩৭] আর তাদেরকে বলা হবে, এতো সেই জিনিস যা তোমরা চাচ্ছিলে।

ফল। অন্যথায় তাঁর ইংগিতে যে কোন সময় এ পৃথিবীতে ভূমিকম্প সংঘটিত হতে পারে এবং এ পৃথিবী তোমাদের জন্য মায়ের স্নেহময় কোল না হয়ে কবরে পরিণত হতো। অথবা যে কোন সময় এমন ঝড় ঝঞ্ঝা আসতে পারে যা তোমাদের জনপদকে ধ্বংস করে ফেলবে।

২৭. সাবধানবাণী মানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মক্কার কাফেরদেরকে সাবধান করা। তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হচ্ছিল, যদি তোমরা কুফরী ও শিরক থেকে বিরত না হও এবং তাওহীদের যে আহবান তোমাদের জানানো হচ্ছে তাতে সাড়া না দাও তাহলে আল্লাহর আযাব তোমাদের পাকড়াও করবে।

২৮. ইতিপূর্বে যেসব কওম তাদের কাছে আসা নবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আযাবে নিপতিত হয়েছিলো তাদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

২৯. অর্থাৎ শূন্যে উড়ন্ত প্রতিটি পাখি করুণাময় আল্লাহর হিফাযতে থেকে উড়ে থাকে। তিনি প্রতিটি পাখিকে এমন দৈহিক কাঠামো দান করেছেন যার সাহায্যে তারা উড়ে

বেড়াবার যোগ্যতা লাভ করেছে। তিনিই প্রতিটি পাখিকে উড়তে শিখিয়েছেন। তিনিই বাতাসকে এমন সব নিয়ম-কানুনের অধীন করে দিয়েছেন যে কারণে বাতাসের চেয়ে ভারী দেহের অধিকারী বস্তুসমূহের পক্ষেও বাতাসে ভর দিয়ে উড়া সম্ভব। আর উড়তে সক্ষম প্রতিটি বস্তুকে তিনিই শূন্যে ধরে রাখেন। তা না হলে আল্লাহ তাঁর হিফাযত উঠিয়ে নেয়া মাত্রই তা মাটিতে পড়ে যেতো।

৩০. অর্থাৎ গুটিকয়েক পাখির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এ পৃথিবীতে যা আছে তা সবই আল্লাহর হিফাযত করার কারণে টিকে আছে। প্রতিটি জিনিসের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যেসব উপকরণ প্রয়োজন তা তিনিই যোগান দিচ্ছেন। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির কাছে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সামগ্রী ঠিকমত পৌঁছানোর ব্যবস্থা তিনিই করেন।

৩১. আরেকটি অনুবাদ হতে পারে, "রহমান ছাড়া এমন আর কে আছে যে তোমার সৈন্যবাহিনী হয়ে তোমাকে সাহায্য করবে?" আমি যে অনুবাদ করেছি তা পরের আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু দ্বিতীয় অনুবাদটি পূর্বের বক্তব্যগুলোর সাথে সম্পৃক্ত।

৩২. অর্থাৎ জন্তু-জানোয়ারের মতো মুখ নিচু করে ঐ একই পথে চলছে যে পথে কেউ তাদেরকে একবার চালিয়ে দিয়েছে।

৩৩. অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের মানুষ হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, জন্তু-জানোয়ার করে পাঠাননি। তোমাদের কাজ তো এ ছিল না যে, দুনিয়ায় যে গোমরাহী বিস্তারলাভ করে আছে তোমরা চোখ বন্ধ করে তাই মেনে চলবে, ভেবেও দেখবে না, যে পথে তোমরা চলছো তা সঠিক কিনা। কেউ যদি তোমাদের সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝাতে চেষ্টা করে, তার কথা তোমরা কানেই তুলবে না এবং তোমাদের মন-মস্তিষ্কে আগে থেকে জেঁকে বসা অসত্য ও অন্যায়কে আঁকড়ে থাকবে এ উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে এ কান দেয়া হয়নি। এ চোখ তো এ জন্য দেয়া হয়নি যে, তোমরা অন্ধের মতো অন্যের অনুসরণ করবে। যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনসমূহ আল্লাহর রসূলের পেশকৃত তাওহীদের সাক্ষ দিচ্ছে কি না এ বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা খোদাহীন বা বহুখোদার পরিচালনাধীন হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে কিনা নিজের দৃষ্টিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তোমরা তা দেখবে না এ জন্য এ চোখ তোমাদেরকে দেয়া হয়নি। এ মন-মস্তিষ্কও তোমাদের এ জন্য দেয়া হয়নি যে, তোমরা চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনার কাজ অন্যদের হাতে ছেড়ে দিয়ে দুনিয়াতে এমন সব নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে চলবে যা অন্য কেউ চালু করেছে। তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে এতোটুকুও ভেবে দেখবে না যে, তা সঠিক না ভ্রান্ত। জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি এবং শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির এ নিয়ামত আল্লাহ তোমাদের দিয়েছিলেন ন্যায় ও সত্যকে চেনার জন্য। কিন্তু তোমরা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছো। এসব উপকরণের মাধ্যমে তোমরা সব কাজই করছো। কিন্তু যে জন্য তা তোমাদের দেয়া হয়েছিলো সে একটি কাজই মাত্র করছো না। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন; তাফহীমুল কুরআন, আন নাহল, টীকা ৭২-৭৩; আল মু'মিনূন, টীকা ৭৫-৭৬; আস সাজদা, টীকা ১৭-১৮; আল আহকাফ, টীকা ৩১)

৩৪. অর্থাৎ মৃত্যুলাভের পরে পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করে পৃথিবীর সব জায়গা থেকে পরিবেষ্টিত করে আনা হবে এবং আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে।

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ
الْكَٰفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ ءَامَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ
غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ ﴿٣٠﴾

তুমি এদেরকে বলো, তোমরা কখনো এ বিষয়টি ভেবে দেখেছো কি যে, আল্লাহ যদি আমাকে ও আমার সংগীদেরকে ধ্বংস করে দেন কিংবা আমাদের ওপর রহম করেন তাতে কাফেরদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে?[৩৮] এদেরকে বলো, তিনি অত্যন্ত দয়ালু, আমরা তাঁর ওপর ঈমান এনেছি এবং তাঁরই ওপর নির্ভর করেছি।[৩৯] তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ডুবে আছে? এদেরকে বলো, তোমরা কি এ বিষয়ে কখনো চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছো যে, যদি তোমাদের কূয়াগুলোর পানি মাটির গভীরে নেমে যায় তাহলে পানির এ বহমান স্রোত কে তোমাদের ফিরিয়ে এনে দেবে?[৪০]

৩৫. এভাবে প্রশ্ন করে তারা কিয়ামতের সময় ও তার দিন তারিখ জানতে চাইতো না। তারা এ উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করতো না যে, তাদেরকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সন, মাস, দিন ও সময় বলে দিলে তারা তা স্বীকার করে নেবে। বরং তারা মনে করতো কিয়ামত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব ও অযৌক্তিক। আর তা মিথ্যা সাব্যস্ত করার একটা বাহানা হিসেবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই এ প্রশ্ন তারা করতো। তাদের মূল বক্তব্য হলো, তুমি আমাদেরকে কিয়ামতের যে অদ্ভুত কাহিনী শুনাচ্ছো, তা কখন আত্মপ্রকাশ করবে? কোন্ সময়ের জন্য তা সংরক্ষিত রাখা হয়েছে? আমাদের চোখের সামনে এনে তা দেখিয়ে দিচ্ছো না কেন? দেখিয়ে দিলেই তো আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যেতো। এ বিষয়ে একটি কথা ভালভাবে উপলব্ধি করা দরকার যে, কেউ কিয়ামতের সত্যতা স্বীকার করলে বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারাই করতে পারে। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এ ধরনের যুক্তি-প্রমাণ সবিস্তারে পেশ করা হয়েছে। এখন থেকে যায় কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার তারিখ সম্পর্কিত বিষয়টি। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আলোচনায় কোন অকাট্য মূর্খই কেবল এ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে। কারণ, দিন তারিখ বলে দিলেও তাতে কোন পার্থক্য সূচিত হবে না। অস্বীকারকারী তখন বলবে, যখন তা তোমাদের দেয়া নির্দিষ্ট তারিখে সংঘটিত হবে, তখন মেনে নেবো। আজ আমি কি করে একথা বিশ্বাস করবো যে, তোমার দেয়া নির্দিষ্ট তারিখে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, লোকমান, টীকা ৬৩; আল আহযাব, টীকা ১১৬; সাবা, টীকা ৫-৪৮; ইয়াসীন, টীকা ৪৫)

৩৬. অর্থাৎ একথা তো আমার জানা যে, কিয়ামত অবশ্যই আসবে। আর তার আসার আগে মানুষকে সাবধান করে দেয়ার জন্য এতোটুকু জানাই যথেষ্ট। তবে কখন আসবে তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। আমি সে সম্পর্কে কিছু জানি না। আর সাবধান করে দেয়ার জন্য সে বিষয়ে জ্ঞান থাকার কোন প্রয়োজন নেই। এ বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে ভালভাবে বুঝা যেতে পারে। কোন্ ব্যক্তি কখন মারা যাবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ তা জানে না। তবে আমরা এতোটুকু জানি যে, প্রত্যেককেই এক সময় মৃত্যুবরণ করতে হবে। এখন আমাদের এ জ্ঞানটুকু আমাদের কোন অসতর্ক প্রিয়জনকে মৃত্যু সম্পর্কে সতর্কীকরণের জন্য যথেষ্ট। যাতে সে যথাযথভাবে তার স্বার্থের হিফাযত করতে পারে। এতোটুকু সাবধান করে দেয়ার জন্য সে কোন্‌দিন মারা যাবে তা জানা জরুরী নয়।

৩৭. অর্থাৎ কোন অপরাধীকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানোর জন্য নিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে যে অবস্থা হয় তাদের অবস্থাও ঠিক তাই হবে।

৩৮. মক্কা নগরীতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আন্দোলনের সূচনা হলে কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রভুক্ত ব্যক্তিবর্গ ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করলো। এতে মক্কার প্রতিটি পরিবার থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদেরকে অভিশাপ দেয়া শুরু হলো। তাঁর বিরুদ্ধে যাদুটোনা বা তন্ত্রমন্ত্রের প্রয়োগ শুরু হলো, যাতে তিনি ধ্বংস হয়ে যান। এমনকি হত্যার পরিকল্পনা সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকলো। তাই এখানে বলা হয়েছে, এদের বলো, আমরা ধ্বংস হয়ে যাই বা আল্লাহর রহমতে বেঁচে থাকি তাতে তোমাদের কি লাভ? আল্লাহর আযাব এলে তোমরা নিজেরা কিভাবে নিষ্কৃতি পাবে সে চিন্তা করতে থাকো।

৩৯. অর্থাৎ আমরা আল্লাহর ওপরে ঈমান এনেছি আর তোমরা তাঁকে অস্বীকার করে চলেছো। আমরা ভরসা করি একমাত্র আল্লাহর ওপর আর তোমরা ভরসা করো তোমাদের দল, পার্থিব উপায়-উপকরণ এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সব উপাস্য দেব-দেবীদের ওপর। তাই আমরাই আল্লাহর রহমত লাভের উপযুক্ত, তোমরা নও।

৪০. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এমন শক্তির অধিকারী আছে কি; যে এসব ঝর্ণাধারা আবার প্রবাহিত করে দেবে? যদি না থাকে আর তোমরা ভাল করেই জানো যে, নেই। তাহলে ইবাদত লাভের যোগ্য আল্লাহ না তোমাদের উপাস্যরা যাদের ঐ ঝর্ণাধারাগুলো প্রবাহিত করার কোন সামর্থ নেই। এখন তোমরা নিজের বিবেককে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করে দেখো যে, যারা এক আল্লাহকে মানে তারাই গোমরাহ না যারা শিরকে লিপ্ত আছে তারাই গোমরাহ?

আল কলম

৬৮

নামকরণ

এ সূরাটির দু'টি নাম; সূরা 'নূন' এবং সূরা 'আল কলম'। দু'টি শব্দই সূরার শুরুতে আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এটিও মক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের অন্যতম। তবে এর বিষয়বস্তু থেকে স্পষ্ট হয় যে, সূরাটি যে সময় নাযিল হয়েছিলো তখন মক্কা নগরীতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা বেশ তীব্র হয়ে উঠেছিলো।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এতে তিনটি মূল বিষয় আলোচিত হয়েছে। বিরোধীদের আপত্তি ও সমালোচনার জবাব দান, তাদেরকে সতর্কীকরণ ও উপদেশ দান এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ধৈর্যধারণ ও অবিচল থাকার উপদেশ দান।

বক্তব্যের শুরুতেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে, এসব কাফের তোমাকে পাগল বলে অভিহিত করছে। অথচ তুমি যে কিতাব তাদের সামনে পেশ করছো এবং নৈতিকতার যে উচ্চ আসনে তুমি অধিষ্ঠিত আছো তা-ই তাদের এ মিথ্যার মুখোশ উন্মোচনের জন্য যথেষ্ট। শিগগিরই এমন সময় আসবে যখন সবাই দেখতে পাবে, কে পাগল আর কে বুদ্ধিমান। অতএব তোমার বিরুদ্ধে বিরোধিতার যে তাণ্ডব সৃষ্টি করা হচ্ছে তা দ্বারা তুমি কখনো প্রভাবিত হয়ো না। আসলে তুমি যাতে কোন না কোনভাবে প্রভাবিত হয়ে তাদের সাথে সমঝোতা (Compromise) করতে রাজী হয়ে যাও, এ উদ্দেশ্যেই এ কাজ করা হচ্ছে।

অতপর সাধারণ মানুষকে চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার জন্য বিরুদ্ধবাদীদের মধ্য থেকে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির কার্যকলাপ তুলে ধরা হয়েছে। এ ব্যক্তিকে মক্কাবাসীরা খুব ভাল করে জানতো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূত-পবিত্র নৈতিক চরিত্রও তাদের সবার কাছে স্পষ্ট ছিলো। মক্কার যেসব নেতা তাঁর বিরোধিতায় সবার অগ্রগামী তাদের মধ্যে কোন্ ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোক শামিল রয়েছে তা যে কেউ দেখতে পারতো।

এরপর ১৭ থেকে ৩৩ আয়াত পর্যন্ত একটি বাগানের মালিকদের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। আল্লাহর নিয়ামত লাভ করেও তারা সে জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি। বরং তাদের মধ্যকার সর্বোত্তম ব্যক্তিটির কথাও তারা যথাসময়ে মেনে নেয়নি। অবশেষে তারা সে নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যখন তাদের সবকিছুই ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গিয়েছে তখনই কেবল তাদের চেতনা ফিরেছে। এ উদাহরণ দ্বারা মক্কাবাসীকে এভাবে সাবধান করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রসূল করে পাঠানোর কারণে তোমরাও ঐ বাগান মালিকদের মতো পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছো। তোমরা যদি তাঁকে না মানো তাহলে দুনিয়াতেও শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। আর এ জন্য আখেরাতে যে শাস্তি ভোগ করবে তাতো এর চেয়েও বেশী কঠোর।

এরপর ২৪ থেকে ৪৭ আয়াত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কখনো সরাসরি তাদেরকে লক্ষ করে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। আবার কখনো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। আসলে সাবধান করা হয়েছে তাদেরকেই। এ সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয়েছে তার সার সংক্ষেপ হলো, আখেরাতের কল্যাণ তারাই লাভ করবে যারা আল্লাহভীতির ওপর ভিত্তি করে দুনিয়াবী জীবন যাপন করেছে। আল্লাহর বিচারে গোনাহগার ও অপরাধীদের যে পরিণাম হওয়া উচিত আল্লাহর অনুগত বান্দারাও সে একই পরিণাম লাভ করবে এরূপ ধ্যান-ধারণা একেবারেই বুদ্ধি-বিবেক বিরোধী। কাফেরদের এ ভ্রান্ত ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন যে, তারা নিজের সম্পর্কে যা ভেবে বসে আছে আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে অনুরূপ আচরণই করবেন। যদিও এ বিষয়ে তাদের কাছে কোন নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি নেই। আজ এ পৃথিবীতে যাদেরকে আল্লাহর সামনে মাথা নত করার আহবান জানানো হচ্ছে তারা তা করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন তারা সিজদা করতে চাইলেও করতে সক্ষম হবে না। সেদিন তাদেরকে লাঞ্ছনাকর পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। কুরআনকে অস্বীকার করে তারা আল্লাহর আযাব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। তাদেরকে যে অবকাশ দেয়া হচ্ছে তাতে তারা ধোঁকায় পড়ে গেছে। তারা মনে করছে এভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও অস্বীকৃতি সত্ত্বেও যখন তাদের ওপর আযাব আসছে না তখন তারা সঠিক পথেই আছে। অথচ নিজের অজান্তেই তারা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের কাছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কারণ তিনি দীনের একজন নিঃস্বার্থ প্রচারক। নিজের জন্য তিনি তাদের কাছে কিছুই চান না। তারা দাবী করে একথাও বলতে পারছে না যে, তিনি রসূল নন অথবা তাদের কাছে তাঁর বক্তব্য মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ আছে।

সবশেষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে যে, চূড়ান্ত ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত দীনের প্রচার ও প্রসারের পথে যে দুঃখ-কষ্টই আসুক না কেন, ধৈর্যের সাথে তা বরদাশত করতে থাকুন এবং এমন অধৈর্য হয়ে পড়বেন না যা ইউনুস আলাইহিস সালামের জন্য কঠিন পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

আয়াত ৫২ **সূরা আল কলম–মক্কী** রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۝١ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۝٢ وَاِنَّ لَكَ
لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۝٣ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝٤ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ۝٥
بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ۝٦ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝٧

নূন, শপথ কলমের এবং লেখকরা যা লিখে চলেছে তার।[১] তোমার রবের অনুগ্রহে তুমি পাগল[২] নও। আর নিশ্চিতভাবেই তোমার জন্য এমন পুরস্কার রয়েছে যা কখনো ফুরাবে না।[৩] নিসন্দেহে তুমি নৈতিকতার অতি উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন।[৪] অচিরে তুমিও দেখতে পাবে এবং তারাও দেখতে পাবে যে, তোমাদের উভয়ের মধ্যে কারা পাগলামীতে লিপ্ত। তোমার রব তাদেরকেও ভাল করে জানেন যারা তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আর তাদেরকেও ভাল করে জানেন যারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়েছে।

১. তাফসীরের ইমাম মুজাহিদ বলেন ঃ কলম মানে যে কলম দিয়ে যিকর অর্থাৎ কুরআন মজীদ লেখা হচ্ছিলো। এ থেকে বুঝা যায়, যা লেখা হচ্ছিলো তা ছিল কুরআন মজীদ।

২. একথাটির জন্যই 'কলম' ও কিতাবের নামে শপথ করা হয়েছে। অর্থাৎ অহী লেখক ফেরেশতাদের হাত দিয়ে কুরআন মজীদ লিপিবদ্ধ হচ্ছে। কুরআন মজীদ ফেরেশতাদের হাতে লিপিবদ্ধ হওয়াই কাফেরদের এ অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে, নাউযুবিল্লাহ, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাগল। নবুওয়াত দাবী করার পূর্বে মক্কাবাসীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কওমের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মনে করতো। তারা তাঁর দীনদারী, আমানতদারী, বিবেক–বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার ওপর আস্থাশীল ছিলো। কিন্তু তিনি তাদের সামনে কুরআন মজীদ পেশ করতে শুরু করলে তারা তাঁকে পাগল বলে অভিহিত করতে লাগলো। এর সোজা অর্থ হলো, রসূলের (সা) প্রতি পাগল হওয়ার যে অপবাদ তারা আরোপ করতো তাদের দৃষ্টিতে তার মূল কারণ ছিলো কুরআন। তাই বলা

হয়েছে, কুরআনই এ অপবাদের অসারতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। নাউযুবিল্লাহ! তিনি পাগল হয়ে গিয়েছেন একথা প্রমাণ করা তো দূরে থাক অতি উচ্চমানের বিশুদ্ধ ও অলংকারপূর্ণ ভাষায় এরূপ উন্নত বিষয়বস্তু পেশ করাই বরং একথা প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানী বর্ষিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো বাহ্যিকভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বক্তব্য পেশ করা হলেও মূল লক্ষ হলো কাফেরদেরকে তাদের অপবাদের জবাব দেয়া। অতএব, কারো মনে যেন এ সন্দেহ দানা না বাঁধে যে, এ আয়াতটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পাগল নন এ মর্মে তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য নাযিল হয়েছে। নবী (স) নিজের সম্পর্কে এমন কোন সন্দেহ পোষণ করতেন না যা নিরসনের জন্য তাঁকে এরূপ সান্ত্বনা দেয়ার প্রয়োজন ছিলো। বরং এর লক্ষ কাফেরদেরকে এতোটুকু জানিয়ে দেয়া যে, কুরআনের কারণে তোমরা কুরআন পেশকারীকে পাগল বলে আখ্যায়িত করছো। তোমাদের এ অভিযোগ যে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন খোদ কুরআনই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। (আরো বেশী জানতে হলে দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা তূর, টীকা ২২)

৩. অর্থাৎ এ জন্য তাঁকে দেয়া হবে অগণিত ও চিরস্থায়ী নিয়ামত। কারণ আল্লাহর বান্দাদের হিদায়াতের জন্য তিনি চেষ্টা-সাধনা করছেন। বিনিময়ে তাঁকে নানা রকম কষ্টদায়ক কথা শুনতে হচ্ছে। এসব সত্ত্বেও তিনি তাঁর এ কর্তব্য পালন করে চলেছেন।

৪. এখানে এ আয়াতটির দু'টি অর্থ। একটি হলো, আপনি নৈতিক চরিত্রের সর্বোচ্চ মানের ওপর অধিষ্ঠিত। তাই আপনি আল্লাহর বান্দাদের হিদায়াতের কাজে এতো দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করছেন। একজন দুর্বল নৈতিক চরিত্রের মানুষ এ কাজ করতে সক্ষম হতো না। অন্যটি হলো, কাফেররা আপনার প্রতি পাগল হওয়ার যে অপবাদ আরোপ করছে তা মিথ্যা হওয়ার আরেকটি সুস্পষ্ট প্রমাণ আপনার উন্নত নৈতিক চরিত্র। কারণ উন্নত নৈতিক চরিত্র ও মস্তিষ্ক বিকৃতি একসাথে একই ব্যক্তির মধ্যে থাকতে পারে না। যার বুদ্ধি-বিবেক ও চিন্তার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে এবং মেজাজে সমতা নেই সে-ই পাগল। পক্ষান্তরে মানুষের উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রমাণ করে যে, তার মস্তিষ্ক ও বিবেক-বুদ্ধি ঠিক আছে এবং সে সুস্থ ও স্বাভাবিক। তার মন-মানস ও মেজাজ অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈতিক চরিত্র কেমন তা মক্কার লোকদের অজানা ছিল না। তাই এদিকে শুধু একটু ইংগিত দেয়াই যথেষ্ট। এতেই মক্কার প্রতিটি বিবেকসম্পন্ন মানুষ চিন্তা করতে বাধ্য হবে যে, তারা কতই নির্লজ্জ! নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে এতো উন্নত একজন মানুষকে তারা পাগল বলে আখ্যায়িত করছে। তাদের এ অর্থহীন কথাবার্তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নয় বরং তাদের নিজেদের জন্যই ক্ষতিকর। কারণ শত্রুতার আক্রোশে উন্মত্ত হয়ে তারা তাঁর সম্পর্কে এমন কথা বলছিলো, যা কোন বিবেকবান ব্যক্তি কল্পনাও করতে পারে না। এ যুগের জ্ঞান-গবেষণার দাবীদারদের ব্যাপারও ঠিক তাই। তারাও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মৃগী রোগগ্রস্ত ও বিকৃত মস্তিষ্ক হওয়ার অপবাদ আরোপ করছে। দুনিয়ার সব জায়গায় কুরআন শরীফ পাওয়া যায় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন বৃত্তান্তও সবিস্তারে লিপিবদ্ধ আছে। যে কোন লোক তা অধ্যয়ন করলেই বুঝতে পারবে যে, এ অনুপম গ্রন্থ পেশকারী এবং এরূপ উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٨﴾ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿٩﴾ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ
مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ
زَنِيمٍ ﴿١٣﴾ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٤﴾ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴿١٦﴾

কাজেই তুমি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করো না। তারা তো চায় তুমি নমনীয়তা দেখালে তারাও নমনীয়তা দেখাবে।[৫] তুমি অবদমিত হয়ো না তার দ্বারা যে কথায় কথায় শপথ করে, যে মর্যাদাহীন,[৬] যে গীবত করে, চোগল খোরী করে বেড়ায়, কল্যাণের কাজে বাধা দেয়,[৭] জুলুম ও বাড়াবাড়িতে সীমালংঘন করে, চরম পাপিষ্ঠ ঝগড়াটে ও হিংস্র[৮] এবং সর্বোপরি বজ্জাত।[৯] কারণ সে সম্পদশালী ও অনেক সন্তানের পিতা[১০] তাকে যখন আমার আয়াতসমূহ শোনানো হয় তখন সে বলে এ তো প্রাচীনকালের কিস্‌সা-কাহিনী। শিগগীরই আমি তার শুঁড় দাগিয়ে দেবো।[১১]

মানুষটিকে মানসিক রোগী বলে আখ্যায়িত করে তারা শত্রুতার অন্ধ আবেগে আক্রান্ত হয়ে কি ধরনের অর্থহীন ও হাস্যকর প্রলাপ বকে চলেছে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈতিক চরিত্রের সর্বোত্তম সংজ্ঞা দিয়েছেন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি বলেছেন ঃ كان خلقها القران কুরআনই ছিলো তাঁর চরিত্র। ইমাম আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী ও ইবনে জারীর সামান্য কিছু শাব্দিক তারতম্যসহ তাঁর এ বাণীটি বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন। এর মানে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার সামনে শুধু কুরআনের শিক্ষাই পেশ করেননি। বরং তিনি নিজেকে তার জীবন্ত নমুনা হিসেবে পেশ করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কুরআনে যেসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে সবার আগে তিনি নিজে সে মোতাবেক কাজ করেছেন। এতে যেসব বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে তিনি নিজে তা সবার আগে বর্জন করেছেন। কুরআন মজীদে যে নৈতিক গুণাবলীকে মর্যাদার কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেসব গুণে তিনি ছিলেন সবার চেয়ে বেশী গুণান্বিত। আর কুরআন মজীদে যেসব বিষয়কে অপছন্দনীয় আখ্যায়িত করা হয়েছে তিনি নিজে ছিলেন তা থেকে সবচেয়ে বেশী মুক্ত। আরেকটি বর্ণনায় হযরত আয়েশা বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কোন খাদেমকে মারেননি, কোন নারীর গায়ে হাত তোলেননি, জিহাদের ক্ষেত্র ছাড়া নিজ হাতে কখনো কাউকে হত্যা করেননি।[১] তাঁকে কেউ কষ্ট দিয়ে থাকলে তিনি কখনো তার প্রতিশোধ নেননি। কেবল আল্লাহর হারাম করা বিষয়ে সীমালংঘন করলে

১. সীরাতে ইবনে হিশাম সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বাংলা অনুবাদ পৃষ্ঠা-১৯২ দেখুন। (অনুবাদক)

তিনি তার শাস্তি দিয়েছেন। তাঁর নীতি ছিলো, কোন দু'টি বিষয়ের একটি গ্রহণ করতে হলে তা যদি গোনাহর কাজ না হতো তাহলে তিনি সহজতর বিষয়টি গ্রহণ করতেন। গোনাহর কাজ থেকে তিনি সবচেয়ে বেশী দূরে থাকতেন। (মুসনাদে আহমাদ) হযরত আনাস বর্ণনা করেছেন, আমি দশ বছর যাবত রসূলুল্লাহর খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম। আমার কোন কাজ সম্পর্কে তিনি কখনো উহ। শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি। আমার কোন কাজ দেখে কখনো বলেননি ঃ তুমি এ কাজ করলে কেন? কিংবা কোন কাজ না করলে কখনো বলেননি ঃ তুমি এ কাজ করলে না কেন? (বুখারী ও মুসলিম)

৫. অর্থাৎ ইসলাম প্রচারের কাজে তুমি কিছু শিথিলতা দেখালে এরাও তোমার বিরোধিতায় কিছুটা নমনীয়তা দেখাবে। কিংবা তাদের গোমরাহীকে প্রশ্রয় দিয়ে যদি দীনের মধ্যে কিছুটা কাটছাঁট করতে রাজী হয়ে যাও তাহলে এরাও তোমার সাথে আপোষ রফা করে নেবে।

৬. মূল আয়াতে مَهِيْنٍ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি নগণ্য, তুচ্ছ এবং নীচু লোকদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এটা কথায় কথায় শপথকারী ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট। সে কথায় কথায় কসম খায়। কারণ সে নিজেই বুঝে যে, লোকে তাকে মিথ্যাবাদী মনে করে। কসম না খাওয়া পর্যন্ত লোকে তাকে বিশ্বাস করবে না। তাই সে নিজের বিবেকের কাছে হীন এবং সমাজের কাছেও তার কোন মর্যাদা নেই।

৭. আয়াতে مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় অর্থ-সম্পদ ও যাবতীয় ভাল কাজকেও خير (খায়ের) বলা হয়। তাই শব্দটিকে যদি অর্থ-সম্পদ অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে তার মানে হবে সে অত্যন্ত বখীল এবং কৃপণ। কাউকে কানাকড়ি দেয়ার মত উদারতা এবং মন-মানসও তার নেই। আর যদি خير শব্দটি নেকী ও ভাল কাজের অর্থে গ্রহণ করা হয়, তবে সে ক্ষেত্রে তার একটি অর্থ হতে পারে, সে প্রতিটি কল্যাণের কাজে বাধা সৃষ্টি করে। আরেকটি অর্থ হতে পারে সে ইসলাম থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখতে অত্যন্ত তৎপর।

৮. আয়াতে ব্যবহৃত মূল শব্দ হলো عُتُلٍّ । আরবী ভাষায় عتل বলা হয় এমন লোককে যে অত্যন্ত সুঠামদেহী ও অধিকমাত্রায় পানাহারকারী। অধিকন্তু চরম দুশ্চরিত্র, ঝগড়াটে এবং হিংস্র ও পাষণ্ড।

৯. মূল আয়াতে زَنِيْمٍ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবদের ভাষায় এ শব্দটি এমন অবৈধ সন্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে পরিবারের লোক নয়, কিন্তু তাদের মধ্যে অন্তরভুক্ত হয়ে গিয়েছে। সাঈদ ইবনে জুবাইর এবং শা'বী বলেন ঃ এ শব্দটি এমন লোকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যে তার অন্যায় ও দুষ্কৃতির কারণে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

এসব আয়াতে বর্ণিত বৈশিষ্টগুলো যে ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে তার সম্পর্কে মুফাস্‌সিরগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ বলেছেন যে, সে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা। কেউ আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুসের নাম উল্লেখ করেছেন। কেউ আখনাস ইবনে শুরাইককে এই ব্যক্তি বলে চিহ্নিত করেছেন। আবার কেউ কেউ অন্য কিছু ব্যক্তির প্রতিও ইংগিত করেছেন। কিন্তু কুরআন মজীদে তার নাম উল্লেখ না করে শুধু বৈশিষ্টগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় এসব বৈশিষ্টের কারণে সে মক্কায় বেশ পরিচিত ছিল।

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا
يَسْتَثْنُونَ ﴿١٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتْ
كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
صَارِمِينَ ﴿٢٢﴾ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿٢٣﴾ أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ
مِسْكِينٌ ﴿٢٤﴾

আমি এদের (মক্কাবাসী)-কে পরীক্ষায় ফেলেছি যেভাবে পরীক্ষায় ফেলেছিলাম[১২] বাগানের মালিকদেরকে, যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা খুব ভোরে গিয়ে অবশ্যি নিজেদের বাগানের ফল আহরণ করবে। তারা এ ব্যাপারে কোন ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা স্বীকার করছিলো না।[১৩] অতপর তোমার রবের পক্ষ থেকে একটা বিপর্যয় এসে সে বাগানে চড়াও হলো। তখন তারা ছিলো নিদ্রিত। বাগানের অবস্থা হয়ে গেলো কর্তিত ফসলের ন্যায়। ভোরে তারা একে অপরকে ডেকে বললো ঃ তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তাহলে সকাল সকাল ফসলের মাঠের দিকে বেরিয়ে পড়ো।[১৪] সুতরাং তারা বেরিয়ে পড়লো। তারা নীচু গলায় একে অপরকে বলছিলো, আজ যেন কোন অভাবী লোক বাগানে তোমাদের কাছে না আসতে পারে।

তাই তার নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল না। এসব বৈশিষ্ট উল্লেখ করা মাত্র যে কোন লোক বুঝতে পারতো, কার প্রতি ইংগিত করা হচ্ছে।

১০. এ আয়াতটির সম্পর্ক পূর্বোক্ত আয়াতগুলোর সাথেও হতে পারে এবং পরের আয়াতের সাথেও হতে পারে। পূর্বোক্ত আয়াতগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অর্থ হবে, বিপুল অর্থ-সম্পদ এবং অনেক সন্তান আছে বলে এ ধরনের লোকের দাপট ও প্রভাব-প্রতিপত্তি মেনে নিয়ো না। পরবর্তী আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অর্থ হবে, বিপুল অর্থ-সম্পদ ও অনেক সন্তান থাকার কারণে সে অহংকারী হয়েছে। তাকে আমার আয়াত শুনালে সে বলে এসব তো প্রাচীনকালের কিস্‌সা কাহিনী মাত্র।

১১. সে যেহেতু নিজেকে খুব মর্যাদাবান মনে করতো তাই তার নাককে শুঁড় বলা হয়েছে। নাক দাগিয়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে লাঞ্ছিত করা। অর্থাৎ আমি তাকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গাতেই এমন লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবো যে, এ লাঞ্ছনা ও অপমান থেকে সে কখনো নিষ্কৃতি পাবে না।

وَغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْٓا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ
مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٢٧﴾ قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ ﴿٢٨﴾
قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ﴿٣٠﴾
قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ﴿٣١﴾ عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا
رٰغِبُوْنَ ﴿٣٢﴾ كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۭ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾

তারা কিছুই না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে খুব ভোরে এমনভাবে দ্রুত[১৫] সেখানে গেল যেন তারা (ফল আহরণ করতে) সক্ষম হয়। কিন্তু বাগানের অবস্থা দেখার পর বলে উঠলো ঃ আমরা রাস্তা ভুলে গিয়েছি। তাও না—আমরা বরং বঞ্চিত হয়েছি।[১৬] তাদের মধ্যকার সবচেয়ে ভাল লোকটি বললো ঃ আমি কি তোমাদের বলিনি তোমরা 'তাসবীহ' করছো না কেন?[১৭] তখন তারা বলে উঠলো ঃ আমাদের রব অতি পবিত্র। বাস্তবিকই আমরা গোনাহগার ছিলাম। এরপর তারা সবাই একে অপরকে তিরস্কার করতে লাগলো।[১৮] অবশেষে তারা বললো ঃ "আমাদের এ অবস্থার জন্য আফসোস! আমরা তো বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিলাম। বিনিময়ে আমাদের রব হয়তো এর চেয়েও ভাল বাগান আমাদের দান করবেন। আমরা আমাদের রবের দিকে রুজু করছি।" আযাব এরূপই হয়ে থাকে। আখেরাতের আযাব এর চেয়েও বড়। হায়! যদি তারা জানতো।

১২. এখানে সূরা কাহাফের পঞ্চম রুকূ'র আয়াতগুলো সামনে রাখতে হবে। সেখানেও একইভাবে উপদেশ দেয়ার জন্য দুই বাগান মালিকের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

১৩. অর্থাৎ নিজেদের ক্ষমতা ও যোগ্যতার ওপর তাদের এমন আস্থা ছিল যে, শপথ করে দ্বিধাহীন চিত্তে বলে ফেললো, কালকে আমরা অবশ্যই আমাদের বাগানের ফল আহরণ করবো। আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে আমরা এ কাজ করবো এতটুকু কথা বলার প্রয়োজনও তারা বোধ করেনি।

১৪. এখানে ক্ষেত শব্দ ব্যবহার করার কারণ সম্ভবত এই যে, বাগানে বৃক্ষরাজির ফাঁকে ফাঁকে কৃষিক্ষেতও ছিলো।

১৫. আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ হলো عَلٰى حَرْدٍ । আরবী ভাষায় حرد শব্দটি বাধা দান করা এবং না দেয়া বুঝাতেও বলা হয়, ইচ্ছা এবং সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত বুঝাতেও বলা হয় এবং তাড়াহুড়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং শব্দটি অনুবাদ করতে আমরা তিনটি অর্থের প্রতিই লক্ষ রেখেছি।

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٣٤﴾ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ
كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ
تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَىٰ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۙ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾ أَمْ لَهُمْ
شُرَكَاءُ ۖ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٤١﴾

২ রুকূ'

নিশ্চিতভাবে[১৯] মুত্তাকীদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে নিয়ামত ভরা জান্নাত। আমি কি অনুগতদের অবস্থা অপরাধীদের মতো করবো? কি হয়েছে তোমাদের? এ কেমন বিচার তোমরা করছো?[২০] তোমাদের কাছে কি কোন কিতাব[২১] আছে যাতে তোমরা পাঠ করে থাকো যে, তোমাদের জন্য সেখানে তাই আছে যা তোমরা পছন্দ করো। তোমাদের সাথে কি আমার কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ এমন কোন চুক্তি আছে যে, তোমরা নিজের জন্য যা চাইবে সেখানে তাই পাবে? তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো এ ব্যাপারে কে দায়িত্বশীল[২২]? কিংবা তাদের স্বনিয়োজিত কিছু অংশীদার আছে কি (যারা এ বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে)? তারা তাদের সেসব অংশীদারদের নিয়ে আসুক। যদি তারা সত্যবাদী[২৩] হয়ে থাকে।

১৬. অর্থাৎ বাগান দেখে প্রথমে তারা বিশ্বাসই করতে পারেনি যে, সেটিই তাদের বাগান। তাই তারা বলেছে, আমরা পথ ভুলে হয়তো অন্য কোথাও এসে পৌঁছেছি। পরে চিন্তা করে যখন তারা বুঝতে পারলো সেটি তাদের নিজেদেরই বাগান তখন চিৎকার করে বলে উঠলো ঃ আমাদের কপাল পুড়ে গেছে।

১৭. এর মানে যখন তারা শপথ করে বলছিলো যে, আগামী দিন আমরা অবশ্যই বাগানের ফল আহরণ করবো তখন এ ব্যক্তি তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলো। সে বলেছিলো, তোমরা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছো। তোমরা ইনশাআল্লাহ বলছো না কেন? কিন্তু তারা সে কথায় কর্ণপাতও করলো না। পুনরায় যখন তারা দুস্থ ও অসহায়দের কিছু না দেয়ার জন্য সলাপরামর্শ করছিলো তখনো সে তাদেরকে উপদেশ দিয়ে বললো ঃ আল্লাহর কথা স্মরণ করো এবং এ খারাপ মনোভাব পরিত্যাগ করো। কিন্তু তারা তাদের সিদ্ধান্তে অটল রইলো।

১৮. অর্থাৎ তারা একে অপরকে এই বলে দোষারোপ করতে শুরু করলো, আমরা অমুকের প্ররোচনায় আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলাম এবং এ কুমতলব এঁটেছিলাম।

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَاشِعَةً
أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٣﴾
فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾
وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾

যেদিন কঠিন সময় এসে পড়বে[২৪] এবং সিজদা করার জন্য লোকদেরকে ডাকা হবে। কিন্তু তারা সিজদা করতে সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি হবে অবনত। হীনতা ও অপমানবোধ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। এর আগে যখন তারা সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলো তখন সিজদার জন্য তাদেরকে ডাকা হতো (কিন্তু তারা অস্বীকৃতি জানাতো)।[২৫]

তাই হে নবী! এ বাণী অস্বীকারকারীদের ব্যাপারটি আমার ওপর ছেড়ে দাও।[২৬] আমি ধীরে ধীরে এমনভাবে তাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবো যে, তারা বুঝতেই পারবে না।[২৭] আমি এদের রশি ঢিলে করে দিচ্ছি। আমার কৌশল[২৮] অত্যন্ত মজবুত।

১৯. মক্কার বড় বড় নেতারা মুসলমানদের বলতো, আমরা দুনিয়াতে যেসব নিয়ামত লাভ করছি তা প্রমাণ করে যে, আমরা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। আর তোমরা যে দুর্দশার মধ্যে ডুবে আছো তা প্রমাণ করে যে, তোমরা আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত। তোমাদের বক্তব্য অনুসারে আখেরাত যদি হয়ও তাহলে সেখানেও মজা লুটবো আমরা। আযাব ভোগ করলে তোমরা করবে, আমরা নই। এ আয়াতগুলোতে একথারই জবাব দেয়া হয়েছে।

২০. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অনুগত ও অপরাধীর মধ্যে কোন পার্থক্য করবেন না, এটা বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থী। বিশাল বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা এমন বিচার-বুদ্ধিহীন হবেন, এটা তোমরা ধারণা করলে কিভাবে? তোমরা মনে করে নিয়েছো, এ পৃথিবীতে কারা তাঁর হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান মেনে চললো এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকলো আর কারা তার তোয়াক্কা না করে সব রকমের গোনাহ, অপরাধ এবং জুলুম-অত্যাচার চালালো তা তিনি দেখবেন না! তোমরা ঈমানদারদের দুর্দশা ও দূরবস্থা এবং নিজেদের স্বাচ্ছন্দ ও সচ্ছলতা দেখতে পেয়েছো ঠিকই কিন্তু নিজেদের এবং তাদের নৈতিক চরিত্র ও কাজ-কর্মের পার্থক্য তোমাদের নজরে পড়েনি। তাই আগাম বলে দিয়েছো যে, আল্লাহর দরবারেও এসব অনুগতদের সাথে অপরাধীদের ন্যায় আচরণ করা হবে। কিন্তু তোমাদের মত পাপীদের দেয়া হবে জান্নাত।

২১. অর্থাৎ আল্লাহর পাঠানো কিতাব।

২২. মূল আয়াতে زَعِيْمٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় زعيم বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যে কোন বিষয়ের দায়িত্বশীল কিংবা কোন গোষ্ঠী বা দলের মুখপাত্র। কথাটার মানে হলো, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কি এমন দাবী করে যে, সে তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট থেকে এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে?

২৩. অর্থাৎ নিজেদের সম্পর্কে তোমরা যা বলছো তার কোন ভিত্তি নেই। এটা বিবেক-বুদ্ধিরও পরিপন্থী। আল্লাহর কোন কিতাবে এরূপ লেখা আছে বলেও তোমরা দেখাতে পারবে না। তোমাদের মধ্য থেকে কেউ এরূপ দাবীও করতে পারে না। এ মর্মে আল্লাহর নিকট থেকে কোন রকম প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে বলেও তোমাদের মধ্য থেকে কেউ দাবী করতে পারে না। কিংবা তোমরা যাদেরকে উপাস্য বানিয়ে রেখেছো তাদের কাউকে দিয়ে একথাও তোমরা বলাতে পারবে না যে, সে আল্লাহর নিকট থেকে তোমাদেরকে জান্নাত দেয়ার দায়িত্ব ও ক্ষমতা লাভ করেছে। এসব সত্ত্বেও তোমরা কি করে এ ভ্রান্ত ধারণার শিকার হলে?

২৪. মূল আয়াতে আছে يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ "যেদিন পায়ের গোছা অনাবৃত করা হবে।" সাহাবা ও তাবেয়ীগণের এক দলের মতে একথাটি প্রচলিত প্রবাদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী প্রবাদে দুর্দিনের আগমনকে "পায়ের গোছা অনাবৃত করা" বলে বুঝানো হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসও কথাটির একই অর্থ বর্ণনা করেছেন। আরবী ভাষা থেকে তিনি এর স্বপক্ষে প্রমাণও পেশ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং রাবী ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত অপর একটি ব্যাখ্যায় 'পায়ের গোছা অনাবৃত' করার অর্থ করা হয়েছে সত্যকে আবরণ মুক্ত করা। এ ব্যাখ্যা অনুসারে অর্থ হবে, যেদিন সব সত্য উন্মুক্ত হবে এবং মানুষের সব কাজ কর্ম স্পষ্ট হয়ে সামনে আসবে।

২৫. এর মানে হলো দুনিয়াতে কে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করতো আর কে তার বিরোধী ছিলো কিয়ামতের দিন প্রকাশ্যে তা দেখানো হবে। এ উদ্দেশ্যে লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলার সামনে সিজদাবনত হওয়ার আহবান জানানো হবে। যারা দুনিয়াতে আল্লাহর ইবাদাত করতো তারা সাথে সাথে সিজদায় পড়ে যাবে। কিন্তু দুনিয়াতে যারা আল্লাহকে সিজদা করেনি তাদের কোমর শক্ত ও অনমনীয় হয়ে যাবে। তাদের পক্ষে ইবাদাতগুজার বান্দা হওয়ার মিথ্যা প্রদর্শনী করা সম্ভব হবে না। তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

২৬. অর্থাৎ তাদের সাথে বুঝাপড়া করার চিন্তা করো না। তাদের সাথে বুঝাপড়া করা আমার কাজ।

২৭. অজ্ঞাতসারে কাউকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়ার পন্থা হলো ন্যায় ও সত্যের দুশমন এবং জালেমকে এ পৃথিবীতে অধিক পরিমাণে বিলাস সামগ্রী, স্বাস্থ্য, অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও পার্থিব সাফল্য দান করা যাতে সে ধোঁকায় পড়ে যায় এবং মনে করে বসে যে, সে যা করছে ঠিকই করছে। তার কাজে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই। এভাবে সে ন্যায় ও সত্যের সাথে শত্রুতা এবং জুলুম-অত্যাচার ও সীমালংঘনের কাজে অধিক মাত্রায় মেতে ওঠে এবং বুঝেই উঠতে পারে না যে, যেসব নিয়ামত সে লাভ করছে তা পুরস্কার নয়, বরং ধ্বংসের উপকরণ মাত্র।

أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٧﴾
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾
لَّوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ
فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ
لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

তুমি কি এদের কাছে কোন পারিশ্রমিক দাবী করছো যে, সে জরিমানার বোঝা তাদের কাছে দুর্বহ হয়ে পড়েছে?[২৯] তাদের কি গায়েবের বিষয় জানা আছে, যা তারা লিখে রাখছে?[৩০] অতএব তোমার রবের চূড়ান্ত ফায়সালা পর্যন্ত ধৈর্যসহ অপেক্ষা করো[৩১] এবং মাছওয়ালার (ইউনুস আলাইহিস সালাম) মতো[৩২] হয়ো না, যখন সে বিষাদ ভারাক্রান্ত[৩৩] হয়ে ডেকেছিলো। তার রবের অনুগ্রহ যদি তার সহায়ক না হতো তাহলে সে অপমানিত হয়ে খোলা প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হতো।[৩৪] অবশেষে তার রব তাকে বেছে নিলেন এবং নেক বান্দাদের অন্তরভুক্ত করলেন।

এ কাফেররা যখন উপদেশবাণী (কুরআন) শোনে তখন এমনভাবে তোমার দিকে তাকায় যেন তোমার পদযুগল উৎপাটিত করে ফেলবে[৩৫] আর বলে যে, এ তো অবশ্যি পাগল। অথচ তা সারা বিশ্ব-জাহানের জন্য উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

২৮. আয়াতে كَيْدٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো কারো বিরুদ্ধে গোপনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কাউকে অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে এরূপ করা হলে তা খুব খারাপ কাজ। অন্যথায় এরূপ কাজে কোন দোষ নেই। বিশেষ করে কোন ব্যক্তি যদি নিজেই নিজের বিরুদ্ধে এরূপ করার বৈধতা সৃষ্টি করে নিজেকে এর উপযুক্ত বানিয়ে নেয়।

২৯. এখানে দৃশ্যত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হচ্ছে। তবে মূল লক্ষ সেসব লোক যারা তাঁর বিরোধিতার ক্ষেত্রে সীমালংঘন করছিলো। তাদেরকে বলা হচ্ছেঃ আমার রসূল কি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক দাবী করছেন যে কারণে তোমরা এতটা বিগড়ে গিয়েছো? তোমরা জানো, তিনি একজন নিস্বার্থ ব্যক্তি। তিনি তোমাদের কাছে যা পেশ করছেন তাতে তোমাদের জন্য কল্যাণ আছে বলে তিনি মনে করেন। আর এ জন্য তিনি তা পেশ করছেন। তোমরা না চাইলে তা মানবে না। কিন্তু এর প্রচার ও তাবলীগের ব্যাপারে এতটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছো কেন? (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা তূর, টীকা ৩১)

৩০. এ প্রশ্নটিও বাহ্যত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করা হয়েছে। কিন্তু আসলে প্রশ্নটি তাঁর বিরোধীদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, তোমরা কি গায়েবের পর্দার অন্তরালে উঁকি দিয়ে দেখে নিয়েছো যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি আল্লাহর প্রেরিত রসূল নন। আর যেসব সত্য তিনি তোমাদের কাছে বর্ণনা করছেন তাও ঠিক নয়। তাই তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য তোমরা এমন কোমর বেঁধে লেগেছো? (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, সূরা তূরের তাফসীর, টীকা ৩২)

৩১. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তোমাদের বিজয় ও সাহায্য দেয়া এবং তোমাদের এসব বিরোধীদের পরাজিত করার চূড়ান্ত ফায়সালার সময় এখনও বহু দূরে। চূড়ান্ত ফায়সালার সে সময়টি আসার পূর্ব পর্যন্ত এ দীনের তাবলীগ ও প্রচারের পথে যত দুঃখ-কষ্ট ও মুসিবত আসবে তা ধৈর্যের সাথে বরদাশত করতে থাকো।

৩২. অর্থাৎ ইউনুস আলাইহিস সালামের মত অধৈর্য হয়ে পড়ো না। অধৈর্য হয়ে পড়ার কারণে তাকে মাছের পেটে যেতে হয়েছিলো। আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা না আসা পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়ার পরক্ষণেই "ইউনুস আলাইহিস সালামের মত হয়ো না" বলা থেকে স্বতই ইংগিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা আসার আগেই তিনি অধৈর্য হয়ে কোন কাজ করে ফেলেছিলেন এবং এভাবে আল্লাহর অসন্তুষ্টি লাভ করেছিলেন। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত ৯৮, টীকা ৯৯; সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ৮৭-৮৮, টীকা ৮২ থেকে ৮৫; সূরা আস সাফ্‌ফাত, আয়াত ১৩৯ থেকে ১৪৮, টীকা ৭৮ থেকে ৮৫।

৩৩. সূরা আম্বিয়াতে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, মাছের পেটের এবং সাগরের পানির অন্ধকারে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম উচ্চস্বরে এ বলে প্রার্থনা করলেন ঃ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ তোমার পবিত্র সত্তা ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আসলে আমিই অপরাধী"। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফরিয়াদ গ্রহণ করলেন এবং তাকে এ দুঃখ ও মুসিবত থেকে মুক্তি দান করলেন। (আয়াত ৮৭-৮৮)

৩৪. এ আয়াতটিকে সূরা সাফ্‌ফাতের ১৪২ থেকে ১৪৬ পর্যন্ত আয়াতগুলোর পাশাপাশি রেখে পড়লে দেখা যাবে যে, যে সময় হযরত ইউনুস মাছের পেটে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তখন তিনি তিরস্কারের পাত্র ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি আল্লাহর তাসবীহ করলেন এবং নিজের অপরাধ স্বীকার করলেন তখন তাঁকে মাছের পেট থেকে বের করে অসুস্থ অবস্থায় একটি উন্মুক্ত ভূখণ্ডের ওপর নিক্ষেপ করা হলো। কিন্তু সে মুহূর্তে তিনি আর তিরস্কারের পাত্র নন। মহান আল্লাহ তাঁর রহমতে সে জায়গায় একটি লতানো গাছ উৎপন্ন করে দিলেন, যাতে এ গাছের পাতা তাকে ছায়াদান করতে পারে এবং এর ফল খেয়ে তিনি ক্ষুধা ও পিপাসা নিবৃত করতে পারেন।

৩৫. আমরা বলে থাকি, অমুক ব্যক্তি তার প্রতি এমনভাবে তাকালো যেন তাকে খেয়ে ফেলবে। একথাটিও ঠিক সেরকম। মক্কার কাফেরদের ক্রোধ ও আক্রোশের এ অবস্থা সূরা বনী ইসরাঈলের ৭৩ তেকে ৭৭ পর্যন্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

আল হাক্কাহ

৬৯

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটিও মক্কী জীবনের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের একটি। এর বিষয়বস্তু থেকে বুঝা যায়, সূরাটি যে সময় নাযিল হয়েছিলো তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা শুরু হয়েছিলো ঠিকই কিন্তু তখনো তা তেমন তীব্র হয়ে ওঠেনি। মুসনাদে আহমাদ হাদীস গ্রন্থে হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে আমি বাড়ি থেকে বের হলাম। কিন্তু আমার আগেই তিনি মসজিদে হারামে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আমি সেখানে পৌঁছে দেখলাম তিনি নামাযে সূরা আল হাক্কাহ পড়ছেন। আমি তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে গেলাম, শুনতে থাকলাম। কুরআনের বাচনভঙ্গি আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেলেছিল। সহসা আমার মন বলে উঠলো, লোকটি নিশ্চয়ই কবি হবে। কুরাইশরাও তো তাই বলে। সে মুহূর্তেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে একথাগুলো উচ্চারিত হলো ঃ "এ একজন সম্মানিত রসূলের বাণী। কোন কবির কাব্য নয়।" আমি মনে মনে বললাম ঃ কবি না হলে গণক হবেন। তখনই পবিত্র মুখে উচ্চারিত হলো ঃ "এ কোন গণকের কথাও নয়। তোমরা খুব কমই চিন্তা-ভাবনা করে থাকো। একথা তো বিশ্ব-জাহানের রব বা পালনকর্তার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।" এসব কথা শোনার পর ইসলাম আমার মনের গভীরে প্রভাব বিস্তার করে বসলো। হযরত উমরের (রা) এ বর্ণনা থেকে জানা যায়, সূরাটি তাঁর ইসলাম গ্রহণের অনেক আগে নাযিল হয়েছিলো। কারণ এ ঘটনার পর বেশ কিছুকাল পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। তবে বিভিন্ন সময়ের কিছু ঘটনা তাঁকে ক্রমান্বয়ে ইসলামের প্রতি আগ্রহী করে তুলছিলো। অবশেষে তাঁর মনের ওপর চূড়ান্ত আঘাত পড়ে তাঁর আপন বোনের বাড়ীতে। আর এ ঘটনাই তাঁকে ঈমানের মনযিলে পৌঁছিয়ে দেয়। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা মারয়ামের ভূমিকা; সূরা ওয়াকিয়ার ভূমিকা)

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

সূরাটির প্রথম রুকূ'তে আখেরাত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় রুকূ'তে কুরআনের আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে, আল্লাহর রসূল তার সত্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

কিয়ামত ও আখেরাতের কথা দিয়ে প্রথম রুকূ' শুরু হয়েছে। কিয়ামত ও আখেরাত এমন একটি সত্য যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। আয়াত ৪ থেকে ১২তে বলা হয়েছে যে, যেসব জাতি আখেরাত অস্বীকার করেছে শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। অতপর ১৭ আয়াত পর্যন্ত কিয়ামত কিভাবে সংঘটিত হবে তার চিত্র পেশ করা হয়েছে। যে উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ দুনিয়ার বর্তমান জীবন শেষ হওয়ার পর মানুষের জন্য আরেকটি জীবনের ব্যবস্থা করেছেন ১৮ থেকে ২৭ আয়াতে সে মূল উদ্দেশ্যটি বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সেদিন সব মানুষ তার রবের আদালতে হাজির হবে। সেখানে তাদের কোন বিষয়ই গোপন থাকবে না। প্রত্যেকের আমলনামা তার নিজের হাতে দিয়ে দেয়া হবে। পৃথিবীতে যারা এ উপলব্ধি ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবন যাপন করেছিলো যে, একদিন তাদেরকে আল্লাহর কাছে নিজ নিজ কাজের হিসেব দিতে হবে, যারা দুনিয়ার জীবনে নেকী ও কল্যাণের কাজ করে আখেরাতে কল্যাণলাভের জন্য অগ্রীম ব্যবস্থা করে রেখেছিলো তারা সেদিন নিজের হিসেব পরিষ্কার ও নিরঝঞ্ঝাট দেখে আনন্দিত হবে। পক্ষান্তরে যেসব লোক আল্লাহ তা'আলার হকেরও পরোয়া করেনি, বান্দার হকও আদায় করেনি, তাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করার মত কেউ থাকবে না। তারা জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে থাকবে।

দ্বিতীয় রুকূ'তে মক্কার কাফেরদেরকে বলা হয়েছে। এ কুরআনকে তোমরা কবির কাব্য ও গণকের গণনা বলে আখ্যায়িত করছো। অথচ তা আল্লাহর নাযিলকৃত বাণী। তা উচ্চারিত হচ্ছে একজন সম্মানিত রসূলের মুখ থেকে। এ বাণীর মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে একটি শব্দও হ্রাস বা বৃদ্ধি করার ইখতিয়ার রসূলের নেই। তিনি যদি এর মধ্যে তাঁর মনগড়া কোন কথা শামিল করে দেন তাহলে আমি তার ঘাড়ের শিরা (অথবা হৃদপিণ্ডের শিরা) কেটে দেবো। এ একটি নিশ্চিত সত্য বাণী। যারাই এ বাণীকে মিথ্যা বলবে শেষ পর্যন্ত তাদের অনুশোচনা করতে হবে।

আয়াত ৫২ **সূরা আল হাক্কাহ–মক্কী** রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

اَلْحَآقَّةُ ۝١ مَا الْحَآقَّةُ ۝٢ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحَآقَّةُ ۝٣ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ
وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ۝٤ فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ۝٥ وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ
صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝٦ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا ۙ فَتَرَى
الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝٧ فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ
بَاقِيَةٍ ۝٨ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ۝٩ فَعَصَوْا رَسُوْلَ
رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ۝١٠

অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটি[১]। কি সে অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটি? তুমি কি জান সে অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটি কি?[২] সামূদ[৩] ও আদ আকস্মিকভাবে সংঘটিতব্য সে মহা ঘটনাকে[৪] অস্বীকার করেছিলো তাই সামূদকে একটি কঠিন মহা বিপদ[৫] দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। আর আদকে কঠিন ঝঞ্ঝাবাত্যা দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। যা তিনি সাত রাত ও আট দিন ধরে বিরামহীনভাবে তাদের ওপর চাপিয়ে রেখেছিলেন। (তুমি সেখানে থাকলে) দেখতে পেতে তারা ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে আছে। যেন খেজুরের পুরনো কাণ্ড। তুমি তাদের কাউকে অবশিষ্ট দেখতে পাচ্ছো কি? ফেরাউন, তার পূর্ববর্তী লোকেরা এবং উলটপালট হয়ে যাওয়া জনপদসমূহও[৬] একই মহা অপরাধে অপরাধী হয়েছিলো। তারা সবাই তাদের রবের প্রেরিত রসূলের কথা অমান্য করেছিল। তাই তিনি তাদের অত্যন্ত কঠোরভাবে পাকড়াও করেছিলেন।

১. মূল আয়াতে اَلْحَآقَّةُ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এমন ঘটনা যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। যার সংঘটিত হওয়া একান্ত বাস্তব, যার সংঘটিত হওয়ায় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিয়ামতের জন্য এ ধরনের শব্দ ব্যবহার এবং তা দিয়ে বক্তব্য শুরু করা প্রমাণ করে যে, এ বক্তব্য এমন লোকদের উদ্দেশ করে পেশ করা হয়েছে যারা

إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ
وَاعِيَةٌ ﴿١٢﴾ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ
فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿١٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ
يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿١٦﴾ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ
يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴿١٧﴾ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾

যে সময় পানির তুফান সীমা অতিক্রম করলো[৭] তখন আমি তোমাদেরকে জাহাজে সওয়ার করিয়েছিলাম[৮] যাতে এ ঘটনাকে আমি তোমাদের জন্য একটি শিক্ষণীয় স্মৃতি বানিয়ে দেই যেন স্মরণকারী কান তা সংরক্ষণ করে[৯]।

অতপর[১০] যে সময় শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে—একটি মাত্র ফুৎকার। আর পাহাড়সহ পৃথিবীকে উঠিয়ে একটি আঘাতেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে। সেদিন সে মহা ঘটনা সংঘটিত হয়ে যাবে। সেদিন আসমান চৌচির হয়ে যাবে এবং তার বন্ধন শিথিল হয়ে পড়বে। ফেরেশতারা এর প্রান্ত সীমায় অবস্থান করবে। সেদিন আটজন ফেরেশতা তাদের ওপরে তোমার রবের আরশ বহন করবে।[১১] সেদিনটিতে তোমাদেরকে পেশ করা হবে। তোমাদের কোন গোপনীয় বিষয়ই আর সেদিন গোপন থাকবে না।

কিয়ামতের আগমনকে অস্বীকার করছিলো। তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, যে বিষয়কে তোমরা অস্বীকার করছো তা অবশ্যম্ভাবী। তোমরা অস্বীকার করলেই তার আগমন ঠেকে থাকবে না।

২. শ্রোতাদেরকে সজাগ ও সতর্ক করে দেয়ার জন্য পরপর দু'টি প্রশ্ন করা হয়েছে। যাতে তারা বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং পূর্ণ মনোযোগ সহকারে পরবর্তী বক্তব্য শ্রবণ করে।

৩. মক্কার কাফেররা যেহেতু কিয়ামতকে অস্বীকার করছিলো এবং তা সংঘটিত হওয়ার বিষয়টিকে একটি তামাশা বলে মনে করছিলো, তাই প্রথমে তাদেরকে এ মর্মে সাবধান করা হয়েছে যে, কিয়ামত একটি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। তোমরা বিশ্বাস করো আর নাই করো তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। একথা বলার পর তাদের বলা হচ্ছে, এ বিষয়টি এতটা সাদামাটা বিষয় নয় যে, কেউ একটি সম্ভাব্য ঘটনার খবরকে মেনে নিচ্ছে কিংবা মেনে নিচ্ছে না। বরং জাতিসমূহের নৈতিক চরিত্র এবং তাদের ভবিষ্যতের সাথে এর অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। তোমাদের পূর্বের জাতিগুলোর ইতিহাস সাক্ষ দেয়, যে

জাতিই আখেরাতকে অস্বীকার করেছে এবং এ দুনিয়ার জীবনকে প্রকৃত জীবন বলে মনে করেছে পরিশেষে আল্লাহর আদালতে হাজির হয়ে নিজের কৃতকর্মের হিসেব দেয়ার বিষয়টি মিথ্যা বলে মনে করেছে সেসব জাতিই মারাত্মক নৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হয়েছে। অবশেষে আল্লাহর আযাব এসে তাদের অস্তিত্ব থেকে দুনিয়াকে পবিত্র করে দিয়েছে।

৪. মূল শব্দ হলো القارعة । قرع শব্দটি আরবী ভাষায় খট্‌খট্ শব্দ করা, হাতুড়ি পিটিয়ে শব্দ করা, কড়া নেড়ে শব্দ করা এবং একটি জিনিসকে আরেকটি জিনিস দিয়ে আঘাত করা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

৫. সূরা আ'রাফের ৭৮ আয়াতে একে الرَّجْفة (প্রচণ্ড ভূমিকম্প) বলা হয়েছে। সূরা হুদের ৬৭ আয়াতে এ জন্য الصَّيْحَة (প্রচণ্ড বিস্ফোরণ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা হা-মীম আস্ সাজদার ১৭ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে صاعِقَةُ الْعَذَابِ (আযাবের বজ্র ধ্বনি) এসে পাকড়াও করলো। এখানে সে একই আযাবকে الطاغية (অতিশয় কঠিন দুর্ঘটনা) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একই ঘটনার বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা মাত্র।

৬. অর্থাৎ লূতের কওমের জনবসতিসমূহ। এসব জনবসতি সম্পর্কে সূরা হুদ (৮২ আয়াত) এবং সূরা হিজরে (৭৪ আয়াত) বলা হয়েছে, আমি ঐগুলোকে ওলটপালট করে দিলাম।

৭. নূহের সময়ের মহা প্লাবনের কথা বলা হয়েছে। এ মহা প্লাবনে গোটা একটা জাতিকে এ একই মহা অপরাধের কারণে ডুবিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল। শুধু তারাই বেঁচে ছিল যারা আল্লাহর রসূলের কথা মেনে নিয়েছিলো।

৮. যেসব লোককে জাহাজে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিলো তারা হাজার হাজার বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। পরবর্তীকালের গোটা মানব গোষ্ঠী যেহেতু এ মহা প্লাবন থেকে রক্ষা পাওয়া লোকদের সন্তান-সন্ততি, তাই বলা হয়েছে ঃ আমি তোমাদেরকে জাহাজে উঠিয়ে নিয়েছিলাম। অর্থাৎ আজ তোমরা পৃথিবীতে এ কারণে বিচরণ করতে পারছো যে, মহান আল্লাহ ঐ মহা প্লাবন দ্বারা শুধু কাফেরদের ডুবিয়ে মেরেছিলেন এবং ঈমানদারদের তা থেকে রক্ষা করেছিলেন।

৯. অর্থাৎ এমন কান নয় যা শুনেও শোনে না এবং যে কানের পর্দা স্পর্শ করেই শব্দ অন্যত্র সরে যায়। বরং এমন কান যা শোনে এবং কথাকে মনের গভীরে প্রবিষ্ট করিয়ে দেয়। বাহ্যত এখানে কান শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু অর্থ হলো শ্রবণকারী মানুষ যারা এ ঘটনা শুনে তা মনে রাখে, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অতপর আখেরাতকে অস্বীকার এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণাম কত ভয়াবহ তা কখনো ভুলে যায় না।

১০. পরবর্তী আয়াত পড়ার সময় এ বিষয়টি দৃষ্টিতে থাকা দরকার যে, কিয়ামতের তিনটি পর্যায় আছে। এ তিনটি পর্যায়ের ঘটনাবলী একের পর এক বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত

হবে। কুরআন মজীদের কোন কোন জায়গায় এ তিনটি পর্যায় আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার কোন কোন জায়গায় প্রথম পর্যায় থেকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত একসাথে বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে সূরা নামলের ৮৭নং আয়াতের উল্লেখ করা যায়। এ আয়াতটিতে প্রথমবার শিংগায় ফুৎকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যখন সারা পৃথিবীর মানুষ একটি ভয়ানক বিকট শব্দে এক সাথে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। সেই সময় গোটা বিশ্ব-জাহানের লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়ার যে অবস্থা সূরা হজ্জের ১ ও ২ আয়াতে, সূরা ইয়াসীনের ৪৯ ও ৫০ আয়াতে এবং সূরা তাকবীরের ১ থেকে ৬ পর্যন্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তা তাদের চোখের সামনে ঘটতে থাকবে। সূরা যুমারের ৬৭ থেকে ৭০ আয়াতে শিংগায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফুৎকারের কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, একবারের ফুৎকারে সব মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হবে। কিন্তু এরপর আবার শিংগায় ফুৎকার দিলে সব মানুষ জীবিত হয়ে যাবে এবং আল্লাহর আদালতে বিচারের সম্মুখীন হবে। সূরা ত্বা-হার ১০২ থেকে ১১২ আয়াত, সূরা আম্বিয়ার ১০১ থেকে ১০৩ আয়াত, সূরা ইয়াসীনের ৫১ থেকে ৫৩ আয়াত এবং সূরা ক্বাফের ২০ থেকে ২২ আয়াতে শুধু শিংগায় তৃতীয়বারের ফুৎকারের কথা উল্লেখিত হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা-হা, টীকা ৭৮; সূরা হজ্জ, টীকা ১ এবং সূরা ইয়াসীন, টীকা ৪৬ ও ৪৭) কিন্তু কুরআন মজীদের এ জায়গায় এবং অন্য আরো অনেক জায়গায় শিংগায় প্রথম ফুৎকার থেকে শুরু করে মানুষের জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ করা পর্যন্ত কিয়ামতের সমস্ত ঘটনাবলী একই সাথে বর্ণনা করা হয়েছে।

১১. এ আয়াতটি 'মুতাশাবেহাত' আয়াত শ্রেণীর অন্তরভুক্ত। এর নির্দিষ্ট কোন অর্থ বলা কঠিন। আরশ কি বস্তু আমরা জানি না। কিয়ামতের দিন আটজন ফেরেশতার আরশ বহন করার ধরন কি হবে তাও আমরা বুঝি না। তবে কোন অবস্থায়ই এ ধারণা করা যাবে না যে, আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপর উপবিষ্ট থাকবেন আর আটজন ফেরেশতা তাঁকে সহ আরশ বহন করবে। সেই সময় আল্লাহ আরশের ওপর উপবিষ্ট থাকবেন, এমন কথা আয়াতেও বলা হয়নি। মহান আল্লাহ দেহসত্তাহীন এবং দিক ও স্থানের গণ্ডি থেকে মুক্ত। এমন এক সত্তা কোন স্থানে অধিষ্ঠিত থাকবেন আর কোন মাখলুক তাকে বহন করবে এটা ভাবা যায় না। আল্লাহর মহান সত্তা সম্পর্কে কুরআন মজীদের দেয়া ধারণা আমাদেরকে এরূপ কল্পনা করতে বাধা দেয়। এ জন্য খুঁজে খুঁজে এর অর্থ বের করার প্রচেষ্টা চালানো নিজেকে গোমরাহী ও বিভ্রান্তির গহবরে নিক্ষেপ করার শামিল। তবে এ বিষয়টি বুঝা দরকার যে, আল্লাহ তা'আলার শাসন ও শাসন কর্তৃত্ব এবং তাঁর যাবতীয় বিষয়ের একটা ধারণা দেয়ার জন্য কুরআন মজীদে আমাদের জন্য এমন একটি চিত্র পেশ করা হয়েছে যা দুনিয়ার কোন বাদশার বাদশাহীর চিত্রের অনুরূপ। মানুষের ভাষায় রাষ্ট্র ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির জন্য যে পরিভাষা ব্যবহার করা হয় এ জন্য অনুরূপ পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, মানুষের বুদ্ধি-বিবেক এরূপ চিত্র এবং পরিভাষার সাহায্যেই গোটা বিশ্ব-সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিষয় কিছুটা উপলব্ধি করতে সক্ষম। বিশ্ব-জাহানের ইলাহী ব্যবস্থাপনাকে মানুষের বোধগম্যতার সীমায় নিয়ে আসাই এ ধরনের বর্ণনাভঙ্গী গ্রহণের উদ্দেশ্য। তাই এর আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করা ঠিক নয়।

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُوا۟ كِتَٰبِيَهْ ﴿١٩﴾ إِنِّى ظَنَنتُ
أَنِّى مُلَٰقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾ فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قُطُوفُهَا
دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ
كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾
يَٰلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾

সে সময় যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে,[১২] সে বলবে ঃ নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখো।[১৩] আমি জানতাম, আমাকে হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে।[১৪] তাই সে মনের মত আরাম আয়েশের মধ্যে থাকবে। উন্নত মর্যাদার জান্নাতে। যার ফলের গুচ্ছসমূহ নাগালের সীমায় অবনমিত হয়ে থাকবে। (এসব লোকদেরকে বলা হবে ঃ) অতীত দিনগুলোতে তোমরা যা করে এসেছো তার বিনিময়ে তোমরা তৃপ্তির সাথে খাও এবং পান করো। আর যার আমলনামা তার বাঁ হাতে দেয়া হবে[১৫], সে বলবেঃ হায়! আমার আমলনামা যদি আমাকে আদৌ দেয়া না হতো[১৬] এবং আমার হিসেব যদি আমি আদৌ না জানতাম[১৭] তাহলে কতই না ভালো হতো। হায়! আমার সেই মৃত্যুই (যা দুনিয়াতে এসেছিলো) যদি চূড়ান্ত হতো।[১৮]

১২. ডান হাতে আমলনামা দেয়ার অর্থই হবে তার হিসেব-নিকেশ অত্যন্ত পরিষ্কার। আর সে আল্লাহ তা'আলার আদালতে অপরাধী হিসেবে নয়, বরং একজন সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে উপস্থিত হতে যাচ্ছে। অধিকতর সম্ভাবনা হলো, আমলনামা দেয়ার সময়ই সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষগুলো নিজেরাই ডান হাত বাড়িয়ে আমলনামা গ্রহণ করবে। কারণ মৃত্যুর সময় থেকে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার সময় পর্যন্ত তার সাথে যে আচরণ করা হবে তাতে তার মনে এতটা আস্থা ও প্রশান্তি থাকবে যে, সে মনে করবে আমাকে এখানে পুরস্কার প্রদানের জন্য হাজির করা হচ্ছে, শাস্তিদানের জন্য নয়। একজন মানুষ সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে পরপারে যাত্রা করছে, না অসৎ ও পাপী হিসেবে যাত্রা করছে মৃত্যুর সময় থেকেই তা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। একথাটি কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তাছাড়া মৃত্যুর সময় থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত একজন নেক্কার মানুষের সাথে সম্মানিত মেহমানের মত আচরণ করা হয়। কিন্তু একজন অসৎ ও বদকার মানুষের সাথে আচরণ করা হয় অপরাধে অভিযুক্ত কয়েদীর মত। এরপর কিয়ামতের দিন আখেরাতের জীবনের সূচনালগ্ন থেকেই নেক্কার মানুষদের জীবন যাপনের ধরন-ধারণই পাল্টে যায়। একইভাবে কাফের, মুনাফিক ও

مَآ أَغۡنَىٰ عَنِّي مَالِيَهۡ ۝٢٨ هَلَكَ عَنِّي سُلۡطَٰنِيَهۡ ۝٢٩ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۝٣٠ ثُمَّ
ٱلۡجَحِيمَ صَلُّوهُ ۝٣١ ثُمَّ فِي سِلۡسِلَةٖ ذَرۡعُهَا سَبۡعُونَ ذِرَاعٗا فَٱسۡلُكُوهُ ۝٣٢ إِنَّهُۥ كَانَ
لَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ ٱلۡعَظِيمِ ۝٣٣ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ ۝٣٤ فَلَيۡسَ لَهُ
ٱلۡيَوۡمَ هَٰهُنَا حَمِيمٞ ۝٣٥ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنۡ غِسۡلِينٖ ۝٣٦ لَّا يَأۡكُلُهُۥٓ إِلَّا ٱلۡخَٰطِـُٔونَ ۝٣٧

আজ আমার অর্থ-সম্পদ কোন কাজে আসলো না। আমার সব ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে।[১৯] (আদেশ দেয়া হবে) পাকড়াও করো ওকে আর ওর গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। তারপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। এবং সত্তর হাত লম্বা শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলো। সে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করতো না এবং দুস্থ মানুষকে খাদ্য দিতে উৎসাহিত করতো না।[২০] তাই আজকে এখানে তার সমব্যথী কোন বন্ধু নেই। আর কোন খাদ্যও নেই ক্ষত নিসৃত পুঁজ-রক্ত ছাড়া। যা পাপীরা ছাড়া আর কেউ খাবে না।

পাপীদের জীবন যাপনের ধরনও ভিন্ন রূপ হয়ে যায়। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনফাল, আয়াত ৫০; আন নাহল, আয়াত ২৮ ও ৩২ এবং টীকা ২৬; বনী ইসরাঈল, আয়াত ৯৭; ত্বা-হা, আয়াত ১০২, ১০৩ ও ১২৪ থেকে ১২৬ এবং টীকা ৭৯, ৮০ ও ১০৭; আল আম্বিয়া, আয়াত ১০৩, টীকা ৯৮; আল ফুরকান, আয়াত ২৪ ও টীকা ৩৮; আন নামূল, আয়াত ৮৯ ও টীকা ১০৯; সাবা, আয়াত ৫১ ও টীকা ৭২; ইয়াসীন, আয়াত ২৬ ও ২৭ এবং টীকা ২২-৩২; আল মু'মিন, আয়াত ৪৫ ও ৪৬ এবং টীকা ৬৩; মুহাম্মাদ, আয়াত ২৭ এবং টীকা ৩৭; ক্বাফ, আয়াত ১৯ থেকে ২৩ পর্যন্ত এবং টীকা ২২, ২৩ ও ২৫)।

১৩. অর্থাৎ আমলনামা পাওয়ার সাথে সাথেই তারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠবে এবং নিজের বন্ধু-বান্ধবদের তা দেখাবে। সূরা ইনশিকাকের ৯ আয়াতে বলা হয়েছে যে, "সে আনন্দচিত্তে আপনজনদের কাছে ফিরে যাবে।"

১৪. অর্থাৎ তারা তাদের এ সৌভাগ্যের কারণ হিসেবে বলবে যে, দুনিয়ার জীবনে তারা আখেরাতকে ভুলে ছিল না। বরং একদিন তাদেরকে আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে সব কৃতকর্মের হিসেব দিতে হবে এ বিশ্বাস নিয়েই তারা সেখানে জীবন যাপন করেছিল।

১৫. সূরা ইনশিকাকে বলা হয়েছে, "আর যাকে পিছন দিক থেকে আমলনামা দেয়া হবে।" সম্ভবত তা হবে এভাবে, অপরাধীর প্রথম থেকেই তার অপরাধী হওয়ার বিষয়টি জানা থাকবে। তার আমলনামায় কি আছে তাও ঠিকঠাক তার জানা থাকবে। তাই সে অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্তেও বাঁ হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করবে এবং সংগে সংগেই নিজের পেছনের দিকে লুকিয়ে ফেলবে যাতে কেউ তা দেখতে না পায়।

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾
وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا
مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَٰلَمِينَ ﴿٤٣﴾

২ রুকূ'

অতএব তা নয়।[২১] আমি শপথ করছি ঐ সব জিনিসেরও যা তোমরা দেখতে পাও এবং ঐ সব জিনিসেরও যা তোমরা দেখতে পাও না। এটা একজন সম্মানিত রসূলের বাণী,[২২] কোন কবির কাব্য নয়। তোমরা খুব কমই ঈমান পোষণ করে থাকো[২৩] আর এটা কোন গণকের গণনাও নয়। তোমরা খুব কমই চিন্তা-ভাবনা করে থাকো। এ বাণী বিশ্ব-জাহানের রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।[২৪]

১৬. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে প্রকাশ্যে আমার হাতে এ আমলনামা দিয়ে সবার সামনে লাঞ্ছিত ও অপমানিত না করে যে শাস্তি দেয়ার তা দিয়ে ফেললেই ভালো হতো।

১৭. অর্থাৎ পৃথিবীতে আমি যা করে এসেছি তা যদি আমাকে আদৌ বলা না হতো। এ আয়াতের আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, আমি ইতিপূর্বে আদৌ জানতাম না যে, হিসেব কি জিনিস। কোনদিন আমার কল্পনায়ও আসেনি যে, আমাকে একদিন আমার কার্যাবলীর হিসেব দিতে হবে এবং আমার অতীত কাজ-কর্ম সব আমার সামনে পেশ করা হবে।

১৮. অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে আমার মৃত্যুবরণের পর সবকিছু যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। এবং আর কোন জীবন যদি না থাকতো।

১৯. মূল আয়াতে আছে هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ । سلطان শব্দটি দলিল-প্রমাণ অর্থেও ব্যবহৃত হয় আবার ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। দলিল-প্রমাণ অর্থে গ্রহণ করলে তার অর্থ হবে আমি দলিল ও যুক্তি-প্রমাণের যে তুবড়ি ছুটাতাম তা আর এখানে চলবে না। এখন আত্মপক্ষ সমর্থনের মত কোন প্রমাণই আমার কাছে নেই। আর ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও প্রভাব প্রতিপত্তি অর্থে গ্রহণ করলে তার অর্থ হবে, আমি যে শক্তিতে বলিয়ান হয়ে পৃথিবীতে বুকটান করে চলতাম তা খতম হয়ে গিয়েছে। এখানে আমার কোন দলবল বা সেনাবাহিনী নেই, আমার আদেশ মেনে চলারও কেউ নেই। এখানে তো আমি এমন একজন অসহায় মানুষের মত দাঁড়িয়ে আছি যে আত্মরক্ষার জন্যও কিছু করতে সক্ষম নয়।

২০. অর্থাৎ নিজে কোন দরিদ্রকে খাবার দেয়া তো দূরের কথা কাউকে এতটুকু কথা বলাও পছন্দ করতো না যে, আল্লাহর ক্ষুধাক্লিষ্ট বান্দাদের খাদ্য দান করো।

২১. অর্থাৎ তোমরা যা মনে করে নিয়েছো ব্যাপার তা নয়।

২২. এখানে সম্মানিত রসূল মানে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কিন্তু সূরা তাক্‌বীরে (আয়াত ১৯) সম্মানিত রসূলের যে উল্লেখ আছে তার অর্থ হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। এখানে যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই সম্মানিত রসূল বলা হয়েছে তার প্রমাণ হলো, কুরআনকে সম্মানিত রসূলের বাণী বলার পরেই বলা হয়েছে যে, তা কোন কবি বা গণকের কথা নয়। আর একথা সবারই জানা যে, মক্কার কাফেররা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই কবি বা গণক বলতো। তারা জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে কবি বা গণক বলতো না। পক্ষান্তরে সূরা তাক্‌বীরে কুরআন মজীদকে সম্মানিত রসূলের বাণী বলার পরে বলা হয়েছে যে, সে রসূল অত্যন্ত শক্তিশালী, আরশের অধিপতির কাছে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, সেখানে তাঁর কথা গ্রহণ করা হয়, তিনি বিশ্বস্ত ও আমানতদার এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে পরিষ্কার দিগন্তে দেখেছেন। সূরা নাজ্‌মের ৫ থেকে ১০ আয়াতে জিবরাঈল আলাইহিস সাল্লাম সম্পর্কে প্রায় এ একই বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে। তাহলো, কুরআনকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও জিবরাঈল আলাইহিস সালামের বাণী বলার তাৎপর্য কি? এর জওয়াব হলো, মানুষ কুরআনের এ বাণী শুনতো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনতেন জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মুখ থেকে। তাই এক বিচারে এটা ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী এবং আরেক বিচারে তা ছিল হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের বাণী। কিন্তু পরক্ষণেই বিষয়টি স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের 'রবের' নাযিলকৃত বাণী। তবে তা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিবরাঈলের মুখ থেকে এবং লোকদেরকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে শুনানো হচ্ছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের কথা থেকেও এ সত্যটিই ফুটে ওঠে। তিনি বলেছেন যে, এসব তাঁদের দু'জনের কথা নয়। বরং বার্তাবাহক হিসেবে তাঁরা এ বাণী মূল বাণী প্রেরকের পক্ষ থেকে পেশ করেছেন।

২৩. "কমই ঈমান পোষণ করে থাকো" প্রচলিত আরবী বাকরীতি অনুসারে এর একটি অর্থ হতে পারে তোমরা আদৌ ঈমান পোষণ করো না। এর আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, কুরআন শুনে কোন সময় তোমাদের মন হয়তো স্বতস্ফূর্তভাবেই বলে ওঠে যে, এটা মানুষের কথা হতে পারে না। কিন্তু তোমরা নিজেদের হঠকারিতার ওপর অবিচল রয়েছ এবং এ বাণীর ওপর ঈমান আনতে অস্বীকৃতি জানিয়ে থাকো।

২৪. সারকথা হলো তোমরা যা কিছু দেখতে পাও এবং যা কিছু দেখতে পাও না তার কসম আমি এ জন্য করছি যে, এ কুরআন কোন কবি বা গণকের কথা নয়। বরং সারা বিশ্ব-জাহানের রবের নাযিলকৃত বাণী। এ বাণী এমন এক রসূলের মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে যিনি মর্যাদাবান (অত্যন্ত সম্মানিত ও ভদ্র)। এখন দেখা যাক কসম করার উদ্দেশ্য কি? লোকজন যা কিছু দেখতে পাচ্ছিল তাহলো ঃ

এক ঃ এ বাণী এমন ব্যক্তি পেশ করছিলেন যার মার্জিত ও ভদ্র স্বভাবের বিষয়টি মক্কা শহরের কারোই অজানা ছিল না। সমাজের সবাই একথা জানতো যে, নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে তিনি তাদের জাতির মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। এরূপ লোক আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা

আরোপ করবে এবং নিজে কোন কথা বানিয়ে মহান আল্লাহর কথা বলে তা চালিয়ে দেবে, এত বড় মিথ্যার বেসাতি এ লোকের কাছ থেকে আশা করা যায় না।

দুই ঃ তারা আরো দেখছিল যে, এ ব্যক্তি কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হয়ে এ বাণী পেশ করছে না। বরং এ কাজ করতে গিয়ে সে নিজের স্বার্থকেই জলাঞ্জলী দিয়েছে। এ কাজ করতে গিয়ে সে নিজের ব্যবসায়-বাণিজ্য ধ্বংস করেছে, আরাম-আয়েশ ত্যাগ করেছে, যে সমাজে তাকে অভাবনীয় সম্মান দেখানো হতো সেখানেই তাকে গালিগালাজের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, আর এসব করে নিজেই যে শুধু দুঃখ-মসিবতের মধ্যে নিপতিত হচ্ছে তাই নয়, বরং নিজের ছেলেমেয়েদেরকেও সব রকম দুঃখ-দুর্দশার মুখে ঠেলে দিয়েছে। ব্যক্তি স্বার্থের পূজারী হলে সে নিজেকে এ দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে টেনে আনবে কেন?

তিন ঃ তারা নিজের চোখে এও দেখছিলো যে, তাদের সমাজের যেসব লোক ঐ ব্যক্তির প্রতি ঈমান আনছিলো তাদের জীবনে হঠাৎ একটা বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়ে যাচ্ছে। কোন কবি অথবা গণকের কথার এতটা প্রভাব কি কখনো দেখা গিয়েছে যে তা মানুষের মধ্যে ব্যাপক নৈতিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে আর তার অনুসারীরা এ জন্য সব রকমের বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে?

চার ঃ কবিদের ভাষা কেমন হয়ে থাকে এবং গণকদের কথাবার্তা কিরূপ হয় তাও তাদের অজানা ছিল না। কুরআনের ভাষা, সাহিত্য ও বিষয়বস্তুকে কবির কাব্য এবং গণকের গণনা সদৃশ বলা একমাত্র হঠকারী ব্যক্তি ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। (আমি এ বিষয়ে তাফহীমুল কুরআনের সূরা আম্বিয়ার ৭নং টীকায়, সূরা শূ'আরার ১৪২ থেকে ১৪৫নং টীকায় এবং সূরা আত্ তূরের ২২নং টীকায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি।)

পাঁচ ঃ সমগ্র আরব ভূমিতে উন্নত ভাষাশৈলীর অধিকারী এমন কোন ব্যক্তি ছিল না যার চমকপ্রদ ও অলংকারময় ভাষাকে কুরআনের মোকাবিলায় পেশ করা যেতো। কুরআনের সমকক্ষ হওয়া তো দূরের কথা, কারো ভাষার বিশুদ্ধতা ও শ্রুতিমাধুর্য কুরআনের উন্নত ভাষাশৈলীর ধারে কাছে ঘেঁষারও যোগ্যতা রাখতো না। এ বিষয়টিও তাদের জানা ছিল।

ছয় ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের কথাবার্তা ও ভাষার সাহিত্যিক উৎকর্ষ ও কুরআনের সাহিত্যিক মান ও উৎকর্ষ থেকে যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল তাও তাদের অগোচরে ছিল না। আরবী ভাষাভাষী কোন ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তৃতা এবং কুরআন শোনার পর বলতে পারতো না যে, এ দু'টি একই ব্যক্তির মুখের কথা।

সাত ঃ যেসব বিষয়বস্তু ও জ্ঞান-বিজ্ঞান কুরআনে পেশ করা হয়েছে নবুওয়াত দাবী করার একদিন আগেও মক্কার লোকেরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে তা শোনেনি। তারা এও জানতো যে, তাঁর কাছে এসব তথ্য ও বিষয়বস্তু জানার কোন উপায়-উপকরণও নেই। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন গোপনীয় সূত্র থেকে এসব তথ্য ও জ্ঞান লাভ করছেন বলে তাঁর বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলেও মক্কার কেউ-ই তা বিশ্বাস করতো না। (আমি তাফহীমুল কুরআনের সূরা

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا
مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾
وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنَّهُ لَحَقُّ
الْيَقِينِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾

যদি এ নবী নিজে কোন কথা বানিয়ে আমার কথা বলে চালিয়ে দিতো তাহলে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং ঘাড়ের রগ কেটে দিতাম। তোমাদের কেউ-ই (আমাকে) এ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারতো না।[২৫] আসলে এটি আল্লাহভীরু লোকদের জন্য একটি নসীহত।[২৬] আমি জানি তোমাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতে থাকবে। নিশ্চিতভাবে তা এসব কাফেরদের জন্য অনুতাপ ও আফসোসের[২৭] কারণ হবে। এটি অবশ্যই এক নিশ্চিত সত্য। অতএব হে নবী, তুমি তোমার মহান রবের পবিত্রতা ঘোষণা করো।

আন নাহ্‌লের ১০৭নং টীকা এবং সূরা আল ফুরকানের ১২নং টীকায় এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করেছি।)

আট ঃ এ পৃথিবী থেকে সুদূর আসমান তথা মহাশূন্য পর্যন্ত বিস্তৃত এ বিরাট-বিশাল বিশ্ব-জাহানকে তারা নিজ চোখে সুচারু রূপে পরিচালিত হতে দেখছিল। তারা এও দেখছিলো যে, এ বিশাল বিশ্বলোক একটি জ্ঞানগর্ভ আইন-বিধান এবং সর্বব্যাপী নিয়ম-শৃংখলা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। আরবের লোকেরা শিরকে লিপ্ত ছিল এবং আখেরাত অস্বীকার করতো। এটা ছিল তাদের আকীদা-বিশ্বাসের অন্তর্গত। কিন্তু এ বিশাল বিশ্বলোকের পরিচালনা ও নিয়ম-শৃংখলার কোন ক্ষেত্রেই তারা শিরক ও আখেরাত অস্বীকৃতির পক্ষে কোন সাক্ষ-প্রমাণ খুঁজে পেতো না। বরং কুরআন তাওহীদ ও আখেরাতের যে ধারণা পেশ করছে সর্বত্র তারই সত্যতার সাক্ষ-প্রমাণ পাওয়া যায়।

এসবই তারা দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু যেসব জিনিস তারা দেখতে পাচ্ছিল না তা হলো, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা, মালিক এবং শাসক, বিশ্ব-জাহানের সবাই তাঁর বান্দা, একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নয়, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, আল্লাহ তা'আলাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রসূল করে পাঠিয়েছেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকেই তাঁর ওপর কুরআন নাযিল হচ্ছে। পূর্বোক্ত আয়াতগুলোতে যা বলা হয়েছে তা বলা হয়েছে এ দু' ধরনের সত্যের কসম খেয়ে।

২৫. নিজের পক্ষ থেকে অহীর মধ্যে কোন কম বেশী করার ইখতিয়ার নবীর নেই, নবী যদি এ কাজ করে তাহলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেবো, একথাটি বলাই এ

আয়াতের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু কথাটি বলতে যে বাচনভঙ্গী গ্রহণ করা হয়েছে তাতে চোখের সামনে এমন একটি চিত্র ভেসে ওঠে যে, বাদশাহর নিযুক্ত কর্মচারী বাদশাহর নামে জালিয়াতি করলে তিনি তাকে পাকড়াও করে তার গর্দান মেরে দেবেন। কিছু লোক এ আয়াত থেকে এ ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, কোন ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করলে তৎক্ষণাৎ আল্লাহর তরফ থেকে যদি তার গর্দানের রগ কেটে দেয়া না হয় তাহলে এটা হবে তার নবী হওয়ার প্রমাণ। অথচ এ আয়াতে যা বলা হয়েছে তা সত্য নবী সম্পর্কে বলা হয়েছে। নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার সম্পর্কে তা প্রযোজ্য নয়। মিথ্যা দাবীদার তো শুধু নবুওয়াতের দাবীই করে না, খোদায়ীর দাবী পর্যন্ত করে বসে এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে বুক ফুলিয়ে চলে। এটা তাদের সত্য হওয়ার কোন প্রমাণ নয়। (আমি তাফহীমুল কুরআনের সূরা ইউনুসের ২৩নং টীকায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।)

২৬. অর্থাৎ যারা ভুল-ভ্রান্তি ও তার খারাপ পরিণাম থেকে রক্ষা পেতে চায় কুরআন তাদের জন্য উপদেশ বাণী। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল বাকারাহ, টীকা ৩)

২৭. অর্থাৎ পরিশেষে তাদেরকে এ জন্য অনুশোচনা করতে হবে যে, কেন তারা কুরআনকে মিথ্যা মনে করেছিল।

আল মা'আরিজ

৭০

নামকরণ

সূরার তৃতীয় আয়াতের ذِى الْمَعَارِجِ শব্দটি থেকে এর নামকরণ হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিষয়বস্তু থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূরা আল হাক্কাহ যে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছিল এ সূরাটিও মোটামুটি সে একই পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

কাফেররা কিয়ামত, আখেরাত এবং দোযখ ও বেহেশত সম্পর্কিত বক্তব্য নিয়ে বিদ্রূপ ও উপহাস করতো এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ মর্মে চ্যালেঞ্জ করতো যে, তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো আর তোমাকে অস্বীকার করে আমরা জাহান্নামের শাস্তিলাভের উপযুক্ত হয়ে থাকি তাহলে তুমি আমাদেরকে যে কিয়ামতের ভয় দেখিয়ে থাকো তা নিয়ে এসো। যে কাফেররা এসব কথা বলতো এ সূরায় তাদের সতর্ক করা হয়েছে এবং উপদেশ বাণী শোনানো হয়েছে। তাদের এ চ্যালেঞ্জের জবাবে এ সূরার গোটা বক্তব্য পেশ করা হয়েছে।

সূরার প্রথমে বলা হয়েছে প্রার্থনাকারী আযাব প্রার্থনা করছে। নবীর দাওয়াত অস্বীকারকারীর ওপর সে আযাব অবশ্যই পতিত হবে। আর যখন আসবে তখন কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারবে না। তবে তার আগমন ঘটবে নির্ধারিত সময়ে। আল্লাহর কাজে দেরী হতে পারে। কিন্তু তার কাছে বেইনসাফী বা অবিচার নেই। তাই তাদের হাসি-তামাসার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করো। এরা মনে করছে তা অনেক দূরে। কিন্তু আমি দেখছি তা অতি নিকটে।

এরপর বলা হয়েছে, এসব লোক হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে কিয়ামত দ্রুত নিয়ে আসার দাবী করছে। অথচ কত কঠোর ও ভয়ানক সেই কিয়ামত। যখন তা আসবে তখন এসব লোকের কি-যে ভয়ানক পরিণতি হবে। সে সময় এরা আযাব থেকে বাঁচার জন্য নিজের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং নিকট আত্মীয়দেরকেও বিনিময় স্বরূপ দিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। কিন্তু কোনভাবেই আযাব থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারবে না।

এরপর মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সেদিন মানুষের ভাগ্যের ফায়সালা হবে সম্পূর্ণরূপে তাদের আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ও কৃতকর্মের ভিত্তিতে। দুনিয়ার

জীবনে যারা ন্যায় ও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং ধন-সম্পদ জমা করে ডিমে তা দেয়ার মত সযত্নে আগলে রেখেছে তারা হবে জাহান্নামের উপযুক্ত। আর যারা আল্লাহর আযাবের ভয়ে ভীত থেকেছে। আখেরাতকে বিশ্বাস করেছে, নিয়মিত নামায পড়েছে, নিজের উপার্জিত সম্পদ দিয়ে আল্লাহর অভাবী বান্দাদের হক আদায় করেছে, ব্যভিচার থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছে, আমানতের খেয়ানত করেনি, ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি এবং কথা ও কাজ যথাযথভাবে রক্ষা করে চলেছে এবং সাক্ষদানের বেলায় সত্যবাদিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছে তারা সম্মান ও মর্যাদার সাথে জান্নাতে স্থান লাভ করবে।

পরিশেষে মক্কার কাফেরদের সাবধান করা হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখামাত্র বিদ্রূপ ও উপহাস করার জন্য চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তো। তাদেরকে বলা হয়েছে, যদি তোমরা তাঁকে না মানো তাহলে আল্লাহ তা'আলা অন্যদেরকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই বলে উপদেশ দেয়া হয়েছে, যেন তিনি এসব উপহাস-বিদ্রূপের তোয়াক্কা না করেন। এরা যদি কিয়ামতের লাঞ্ছনা দেখার জন্যই জিদ ধরে থাকে তাহলে তাদেরকে এ অর্থহীন তৎপরতায় লিপ্ত থাকতে দিন। তারা নিজেরাই এর দুঃখজনক পরিণতি দেখতে পাবে।

আয়াত ৪৪ **সূরা আল মা'আরিজ–মক্কী** রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۙ لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ۙ مِّنَ اللّٰهِ
ذِى الْمَعَارِجِ ۚ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ
خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ۚ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ۙ وَّنَرٰىهُ
قَرِيْبًا ۙ

এক প্রার্থনাকারী আযাব প্রার্থনা করেছে[১] যে আযাব কাফেরের জন্য অবধারিত। তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি ঊর্ধারোহনের সোপানসমূহের অধিকারী[২] ফেরেশতারা এবং রূহ[৩] তার দিকে উঠে যায়[৪] এমন এক দিনে যা পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।[৫] অতএব, হে নবী, তুমি উত্তম ধৈর্য ধারণ করো।[৬] তারা সেটিকে অনেক দূরে মনে করছে। কিন্তু আমি দেখছি তা নিকটে।[৭]

১. মূল আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ হলো سَاَلَ سَآئِلٌ । কোন কোন মুফাস্‌সির এখানে سأل শব্দটিকে জিজ্ঞেস করা অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে আয়াতের অর্থ হলো একজন জিজ্ঞেসকারী জানতে চেয়েছে যে, তাদেরকে যে আযাব সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে তা কার ওপর আপতিত হবে? আল্লাহ তা'আলা এ প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন এই বলে যে, তা কাফেরদের ওপর পতিত হবেই। তবে অধিকাংশ মুফাস্‌সির এ ক্ষেত্রে চাওয়াকে দাবী করা অর্থে গ্রহণ করেছেন। নাসায়ী এবং আরো কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস ইবনে আব্বাস থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস হাকেম এটিকে সহীহ হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি হলো নাদর ইবনে হারেস ইবনে কালাদা বলেছিলঃ

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ – (الانفال : ٣٢)

"হে আল্লাহ, এটি যদি সত্যিই তোমার পক্ষ থেকে আসা একটা সত্য বাণী হয়ে থাকে, তাহলে আসমান থেকে আমাদের ওপর পাথর বর্ষণ করো অথবা আমাদেরকে ভীষণ কষ্টদায়ক শাস্তি দাও।"

এটি ছাড়াও কুরআন মজীদের আরো অনেক স্থানে মক্কার কাফেরদের এ চ্যালেঞ্জেরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তুমি আমাদের যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছো তা নিয়ে আসছো না কেন? উদাহরণ স্বরূপ নীচে উল্লেখিত স্থানসমূহ দেখুন। সূরা ইউনুস, আয়াত ৪৬ থেকে ৪৮; সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৩৬ থেকে ৪১; সূরা আন নাম্‌ল আয়াত ৬৭ থেকে ৭২; সূরা সাবা, আয়াত ২৬ থেকে ৩০; ইয়াসীন, আয়াত ৪৫ থেকে ৫২ এবং সূরা মূলক ২৪ থেকে ২৭।

২. মূল ইবারতে ذِى الْمَعَارِجِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। مِعْرَج শব্দের বহুবচন হলো معارج । এর অর্থ হলো ধাপ বা সিঁড়ি অথবা এমন জিনিস যার সাহায্যে ওপরে ওঠা যায়। আল্লাহ তা'আলাকে معارج এর অধিকারী বলার মানে হলো তাঁর সত্তা অনেক উচ্চ ও সমুন্নত। তার দরবারে পৌঁছার জন্যে ফেরেশতাদের একের পর এক ওপর দিকে উঠতে হয়। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়টিই বলা হয়েছে।

৩. রূহ অর্থ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। অন্য সব ফেরেশতাদের থেকে আলাদাভাবে জিবরাঈলের উল্লেখ তাঁর বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করে। সূরা শু'আরায় বলা হয়েছে, نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ (রূহুল আমীন এ কুরআন নিয়ে তোমার দিলের মধ্যে নাযিল হয়েছে।) সূরা বাকারায় বলা হয়েছে,

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ

"বলো, যে ব্যক্তি শুধু এ কারণে জিবরাঈলের দুশমন হয়ে গিয়েছেন যে, সে তোমার অন্তরে কুরআন নাযিল করেছেন.....।"

এ দু'টি আয়াত এক সাথে পড়লে বুঝা যায় যে, রূহ মানে জিবরাঈল (আ) ছাড়া আর কিছু নয়।

৪. এ পুরো বিবরণটি 'মুতাশাবিহাতের' অন্তরভুক্ত। এর কোন নির্দিষ্ট অর্থ করা যায় না। আমরা ফেরেশতার সঠিক তাৎপর্য কি তা জানি না। আমরা তাদের উর্ধারোহণের সঠিক রূপও জানি না। যে ধাপগুলো পেরিয়ে ফেরেশতারা ওপরে ওঠেন তা কেমন তাও আমরা জানি না। মহান আল্লাহ সম্পর্কেও এ ধারণা করা যায় না যে, তিনি কোন বিশেষ স্থানে অবস্থান করেন। কারণ তাঁর মহান সত্তা স্থান ও কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়।

৫. সূরা হজ্জের ৪৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ এসব লোক এ মুহূর্তেই আযাব নিয়ে আসার জন্য তোমার কাছে দাবী করছে। আল্লাহ কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতি ভংগ করবেন না। তবে তোমার রবের হিসেবের একদিন তোমাদের হিসেবের হাজার হাজার বছরের সমান হয়ে থাকে। সূরা আস সাজ্‌দার ৫ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত গোটা বিশ্ব-জাহানের সব বিষয় পরিচালনা করেন। এরপর (তার রিপোর্ট) এমন একটি দিনে তার কাছে পৌঁছে যা তোমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান।" আর এখানে আযাব দাবী করার জবাবে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার একদিন পঞ্চাশ হাজার

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ﴿٨﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿٩﴾ وَلَا يَسْأَلُ
حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴿١٠﴾ يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ
بِبَنِيهِ ﴿١١﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ﴿١٣﴾ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿١٤﴾ كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿١٥﴾ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ﴿١٦﴾ تَدْعُو مَنْ
أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ﴿١٨﴾

(যেদিন সেই আযাব আসবে) সেদিন[৮] আসমান গলিত রূপার মত বর্ণ ধারণ করবে।[৯] আর পাহাড়সমূহ রংবেরং-এর ধুনিত পশমের মত হয়ে যাবে।[১০] কোন পরম বন্ধুও বন্ধুকে জিজ্ঞেস করবে না। অথচ তাদেরকে পরস্পর দৃষ্টি সীমার মধ্যে রাখা হবে।[১১] অপরাধী সেদিনের আযাব থেকে মুক্তির বিনিময়ে তার সন্তান-সন্ততিকে, স্ত্রীকে, ভাইকে, এবং তাকে আশ্রয়দানকারী জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর আপনজনকে এমনকি পৃথিবীর সবকিছুই দিতে চাইবে। কখনো নয়, তা তো হবে জলন্ত আগুনের লেলিহান শিখা যা শরীরের গোশত ও চামড়া ঝলসিয়ে নিঃশেষ করে দেবে। যারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল আর সম্পদ জমা করে ডিমে তা দেয়ার মত করে আগলে রেখেছিল[১২] তাদেরকে সে অগ্নিশিখা উচ্চ স্বরে নিজের কাছে ডাকবে।

বছরের সমান। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে যারা বিদ্রূপ করে আযাব দাবী করছে তাদের এসব কথায় ধৈর্য ধারণ করুন। তারপর বলা হচ্ছে, এসব লোক আযাবকে দূরে মনে করছে। কিন্তু আমি দেখছি তা অত্যাসন্ন। এসব বক্তব্যের প্রতি সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিপাত করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মানুষ তার মন-মানসিকতা, চিন্তা ও দৃষ্টির পরিসর সংকীর্ণ হওয়ার কারণে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলীকে নিজেদের সময়ের মান অনুযায়ী পরিমাপ করে থাকে। তাই একশো বছর বা পঞ্চাশ বছর সময়ও তাদের কাছে অত্যন্ত দীর্ঘ সময় বলে মনে হয়। কিন্তু আল্লাহর এক একটি পরিকল্পনা হাজার হাজার বছর বা লাখ লাখ বছর মেয়াদের হয়ে থাকে। এ সময়টিও বলা হয়েছে উদাহরণ হিসেবে। প্রকৃতপক্ষে মহা বিশ্ব ভিত্তিক পরিকল্পনা লক্ষ লক্ষ ও শত শত কোটি বছর মেয়াদেরও হয়ে থাকে। এসব পরিকল্পনার মধ্য থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার অধীনে এ পৃথিবীতে মানব জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর একটা নির্দিষ্ট সময় দেয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী তাদেরকে এখানে একটি বিশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করার অবকাশ দেয়া হবে। কোন মানুষই জানে না এ পরিকল্পনা কখন শুরু হয়েছে, তা কার্যকরী করার জন্য কি পরিমাণ সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তার

পরিসমাপ্তির জন্য কোন্ মুহূর্তটি নির্ধারিত করা হয়েছে, যে মুহূর্তটিতে কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত জন্মলাভকারী সমস্ত মানুষকে এক সাথে জীবিত করে উঠিয়ে বিচার করার জন্য কোন্ সময়টি ঠিক করে রাখা হয়েছে। আমরা এ মহা পরিকল্পনার ততটুকুই কেবল জানি যতটুকু আমাদের চোখের সামনে সংঘটিত হচ্ছে অথবা অতীত মহাকালে সংঘটিত ঘটনাবলীর যে আংশিক ইতিহাসটুকু আমাদের সামনে বিদ্যমান আছে। এর সূচনা ও পরিণতি সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, সে সম্পর্কে জানা তো দূরের কথা তা বুঝাও আমাদের সাধ্যাতীত। তাই এর পেছনে যে দর্শন ও রহস্য কাজ করছে তা বুঝার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। এখন কথা হলো, যেসব লোক দাবী করছে যে, এ পরিকল্পনা বাদ দিয়ে তার পরিণাম এখনই তাদের সামনে এনে হাজির করা হোক। আর যদি তা না করা হয় তাহলে পরিণাম সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে সেটিই মিথ্যা, তারা আসলে নিজেদের অজ্ঞতাই প্রমাণ করছে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হাজ্ব, টীকা ৯২-৯৩ এবং আস সাজদা, টীকা ৯)

৬. অর্থাৎ এমন ধৈর্য যা একজন মহত উদার ও সাহসী মানুষের মর্যাদার উপযোগী।

৭. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, তারা এ ব্যাপারটিকে অসম্ভব মনে করে। অথচ আমাদের কাছে তা অত্যাসন্ন। দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, তারা কিয়ামতকে অনেক দূরের ব্যাপার বলে মনে করে। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে তা এত কাছের যেন আগামীকালই সংঘটিত হবে।

৮. একদল মুফাস্সির এ আয়াতাংশকে فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ আয়াতাংশের সাথে সম্পৃক্ত বলে ধরে নিয়েছেন। তারা বলেন ঃ যে দিনটির স্থায়িত্ব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান বলা হয়েছে সেটি কিয়ামতের দিন। মুসনাদে আহমাদ ও তাফসীরে ইবনে জারীরে হযরত আবু সায়ীদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতটি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হলো, তাহলে তো সেদিনটি খুবই দীর্ঘায়িত হবে। একথা শুনে তিনি বললেন ঃ "যার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ, একটি ফরয নামায পড়তে দুনিয়াতে যতটুকু সময় লাগে একজন ঈমানদারের জন্য সেদিনটি তার চাইতেও সংক্ষিপ্ত হবে।" এটি সহীহ সনদে বর্ণিত রেওয়ায়াত হলে এটি ছাড়া এ আয়াতের অন্য কোন ব্যাখ্যা করার অবকাশই থাকতো না। হাদীসটির সনদে উল্লেখিত বর্ণনাকারী দাররাজ এবং তার উস্তাদ আবুল হাইসাম উভয়েই যয়ীফ।

৯. অর্থাৎ বার বার রং পরিবর্তিত হবে।

১০. পাহাড়সমূহের রং যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন তাই যখন তা স্থানচ্যুত ওজনহীন হয়ে উড়তে থাকবে তখন মনে হবে যেন রংবেরংয়ের ধুনিত পশম বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

১১. অর্থাৎ তারা একজন আরেকজনকে দেখতে পাবে না বলে জিজ্ঞেস করবে না তা নয়। বরং অন্যের ব্যাপারে যা ঘটছে তা প্রত্যেকেই নিজ চোখে দেখতে পাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তাকে জিজ্ঞেস করবে না। কেননা, সে তখন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে।

১২. এ স্থানে ও আখেরাতে মানুষের মন্দ পরিণামের দু'টি কারণ বলা হয়েছে যা সূরা আল হাক্কার ৩৩ ও ৩৪ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হলো হক থেকে ফিরে যাওয়া এবং ঈমান আনয়নে অস্বীকৃতি। অপরটি হলো দুনিয়া পূজা ও কৃপণতা। এ কারণেই মানুষ সম্পদ জমা করে এবং কোন কল্যাণকর কাজের জন্য তা খরচ করে না।

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ
مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ
فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ
بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾

মানুষকে ছোট মনের অধিকারী করে সৃষ্টি করা হয়েছে।[১৩] বিপদ-মুসিবতে পড়লেই সে ঘাবড়ে যায়, আর যে-ই সচ্ছলতার মুখ দেখে অমনি সে কৃপণতা করতে শুরু করে। তবে যারা নামায পড়ে[১৪] (তারা এ দোষ থেকে মুক্ত)। যারা নামায আদায়ের ব্যাপারে সবসময় নিষ্ঠাবান।[১৫] যাদের সম্পদে নির্দিষ্ট হক আছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের।[১৬] যারা প্রতিফলের দিনটিকে সত্য বলে মানে।[১৭] যারা তাদের প্রভুর আযাবকে ভয় করে।[১৮]

১৩. যে বিষয়টিকে আমরা আমাদের ভাষায় এভাবে বলে থাকি যে, "এটি মানুষের প্রকৃতিগত অথবা এটা তার সহজাত দুর্বলতা" সে বিষয়টিকে আল্লাহ এভাবে বর্ণনা করেন যে, "মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে এভাবে"। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, কুরআন মজীদের বহু জায়গায় মানব জাতির সাধারণ নৈতিক দুর্বলতা উল্লেখ করার পর ঈমান ও সত্যের পথ অনুসরণকারীদের তা থেকে ব্যতিক্রমী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়টিই বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে এ সত্যটি আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মানুষের জন্মগত এসব দুর্বলতা অপরিবর্তনীয় নয়। বরং আল্লাহর দেয়া হিদায়াত গ্রহণ করে মানুষ যদি আত্মশুদ্ধির জন্য সত্যিকার প্রচেষ্টা চালায় তাহলে সে এসব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে। পক্ষান্তরে যদি সে তার প্রবৃত্তিকে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেয় তাহলে দুর্বলতাগুলো তার মধ্যে দৃঢ়মূল হয়ে যায়। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আম্বিয়া, টীকা ৪১; সূরা আয যুমার, টীকা ২৩ থেকে ২৮ এবং সূরা আশ্ শূরা, টীকা ৭৫)

১৪. কোন ব্যক্তির নামায পড়ার অপরিহার্য অর্থ হলো সে আল্লাহ, রসূল, কিতাব ও আখেরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে এবং সাথে সাথে নিজের এ বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করার প্রচেষ্টাও চালিয়ে যায়।

১৫. অর্থাৎ কোন প্রকার অলসতা, আরামপ্রিয়তা, ব্যস্ততা কিংবা আকর্ষণ তাদের নামাযের ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। নামাযের সময় হলে সে সবকিছু ফেলে রেখে তার প্রভুর ইবাদাতের জন্য প্রস্তুত হয়। عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ-এর আর একটি অর্থ বর্ণনা করেছেন হযরত উকবা ইবনে আমের। তাহলো, সে পূর্ণ প্রশান্তি এবং বিনয় ও নিষ্ঠাসহ নামায পড়ে, কাকের মত ঠোকর মারে না। ঠোকর

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾
إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ
وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ
رَاعُونَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ
يُحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾

কারণ তাদের প্রভুর আযাব এমন বস্তু নয় যে সম্পর্কে নির্ভয় থাকা যায়। যারা নিজেদের লজ্জাস্থান নিজের স্ত্রী অথবা মালিকানাধীন স্ত্রীলোকদের ছাড়া অন্যদের থেকে হিফাযত করে।[১৯] স্ত্রী ও মালিকানাধীন স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে তারা তিরস্কৃত হবে না। তবে যারা এর বাইরে আর কেউকে চাইবে তারা সীমালংঘনকারী।[২০] যারা আমানত রক্ষা করে ও প্রতিশ্রুতি পালন করে।[২১] আর যারা সাক্ষ দানের ক্ষেত্রে সততার ওপর অটল থাকে।[২২] যারা নামাযের হিফাযত করে।[২৩] এসব লোক সম্মানের সাথে জান্নাতের বাগানসমূহে অবস্থান করবে।

মেরেই কোন রকমে নামায শেষ করার চেষ্টা করে না। আবার নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক তাকিয়েও দেখে না। প্রচলিত আরবী বাকরীতিতে বদ্ধ বা স্থির পানিকে ماء دائم বলা হয়। এরই আলোকে এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৬. সূরা যারিয়াতের ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে, "তাদের সম্পদে প্রার্থী এবং বঞ্চিতদের নির্দিষ্ট হক আছে।" কেউ কেউ এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হকের অর্থ মনে করেছেন ফরয যাকাত। কারণ ফরয যাকাতেই নেসাব ও হার দু'টিই নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, সূরা মা'আরিজ সর্বসম্মত মতে মক্কায় অবতীর্ণ সূরা। কিন্তু নেসাব ও হার নির্দিষ্ট করে যাকাত ফরয হয়েছে মদীনায়। অতএব হকের সঠিক অর্থ হলো, প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্য তারা নিজেরাই নিজেদের সম্পদে একটা অংশ নির্দিষ্ট করে রেখেছে। এটাকে তাদের হক মনে করে তারা নিজেরাই তা দিয়ে দেয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, মুজাহিদ, শা'বী এবং ইবরাহীম নাখয়ী এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

প্রার্থী মানে পেশাদার ভিক্ষুক নয়, বরং যেসব অভাবী মানুষ অন্যের সাহায্যপ্রার্থী হয় তারা। আর বঞ্চিত অর্থ এমন লোক যার কোন আয়-উপার্জন নেই। অথবা সে উপার্জনের জন্য চেষ্টা করে ঠিকই কিন্তু তাতে তার প্রয়োজন পূরণ হয় না। অথবা কোন দুর্ঘটনা বা দুর্যোগের শিকার হয়ে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে অথবা আয়-উপার্জনের সামর্থই নেই। এ

ধরনের লোকদের ব্যাপারে যখনই জানা যাবে যে, তারা প্রকৃতই বঞ্চিত তখন একজন আল্লাহভীরু মানুষ এ জন্য অপেক্ষা করে না যে, সে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুক। বরং তার বঞ্চিত থাকার কথা জানা মাত্র সে নিজেই অগ্রসর হয়ে তাকে সাহায্য করে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা যারিয়াত, টীকা ১৭)

১৭. অর্থাৎ দুনিয়াতে নিজেকে দায়িত্বহীন এবং জবাবদিহি থেকে মুক্ত মনে করে না। বরং এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে, একদিন আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে তাদেরকে নিজেদের সব কাজের হিসেব দিতে হবে।

১৮. অন্য কথায় তাদের অবস্থা কাফেরদের মত নয়। কাফেররা দুনিয়াতে সব রকম গোনাহ, অপরাধ ও জুলুম–অত্যাচারে লিপ্ত থেকেও আল্লাহকে ভয় করে না। কিন্তু তারা নিজস্বভাবে যথাসম্ভব নৈতিকতা ও কাজ–কর্মে সদাচরণ করা সত্ত্বেও সবসময় আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে। সবসময় তারা এ আশংকা করে যে, আল্লাহর আদালতে আমাদের ত্রুটি–বিচ্যুতি আমাদের নেক কাজের তুলনায় অধিক বলে প্রমাণিত না হয় এবং এভাবে আমরা শাস্তির উপযুক্ত বলে প্রমাণিত না হই। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মু'মিনূন, টীকা ৫৪ এবং সূরা আয যারিয়াত, টীক ১৯)

১৯. লজ্জাস্থানের হিফাযতের অর্থ ব্যভিচার না করা এবং উলঙ্গপনা থেকেও দূরে থাকা। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মু'মিনূন, টীকা ৬; আন নূর, টীকা ৩০–৩২ এবং আল আহযাব, টীকা ৬২)।

২০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল–মু'মিনূন, টীকা–৭।

২১. আমানতসমূহ বলতে এমন সব আমানত বুঝায়, যা আল্লাহ তা'আলা বান্দার হাতে সোপর্দ করেছেন এবং একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের ওপর আস্থা স্থাপন করে 'আমানত' হিসেবে অর্পণ করে। ঠিক তেমনি চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি মানে বান্দা আল্লাহর সাথে যে চুক্তি বা প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয় এবং মানুষ পরস্পরের সাথে যেসব চুক্তি ও প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয় এ উভয় প্রকার চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি। এ উভয় প্রকার আমানত এবং উভয় প্রকার চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা একজন মু'মিনের চরিত্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট। হাদীসে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে যে বক্তব্যই পেশ করতেন তাতে অবশ্যই বলতেন ঃ

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

"সাবধান, যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই। আর যে অংগীকার বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না তার মধ্যে দীনদারী নেই। (বায়হাকী–শু'আবুল ঈমান)।

২২. অর্থাৎ তারা সাক্ষ যেমন গোপন করে না, তেমনি তাতে তেমন কোন কম–বেশীও করে না।

২৩. এ থেকে নামাযের গুরুত্ব বুঝা যায়। যে ধরনের উন্নত চরিত্র ও মহৎ কর্মশীল লোক জান্নাতের উপযুক্ত তাদের গুণাবলী উল্লেখ করতে গিয়ে নামায দিয়ে শুরু করা হয়েছে এবং নামায দিয়েই শেষ করা হয়েছে। তাদের প্রথম গুণ হলো তারা হবে নামাযী।

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿٣٦﴾ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾
أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾ كَلَّا ۖ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا
يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿٤٠﴾
عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا
وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ
الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿٤٣﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ
تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾

২ রুকূ'

অতএব হে নবী, কি ব্যাপার যে, এসব কাফের ডান দিক ও বাম দিক হতে দলে দলে তোমার দিকে ছুটে আসছে?[২৪] তাদের প্রত্যেকে কি এ আশা করে যে, তাকে প্রাচুর্যে ভরা জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দেয়া হবে?[২৫] কখ্খনো না। আমি যে জিনিস দিয়ে তাদের সৃষ্টি করেছি তারা নিজেরা তা জানে।[২৬] অতএব না,[২৭] আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের মালিকের।[২৮] আমি তাদের চাইতে উৎকৃষ্টতর লোকদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করতে সক্ষম। আমাকে পেছনে ফেলে যেতে পারে এমন কেউ-ই নেই।[২৯] অতএব তাদেরকে অর্থহীন কথাবার্তা ও খেল-তামাসায় মত্ত থাকতে দাও, যেদিনটির প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হচ্ছে যতদিন না সেদিনটির সাক্ষাত তারা পায়। সেদিন তারা কবর থেকে বেরিয়ে এমনভাবে দৌড়াতে থাকবে যেন তারা নিজেদের দেব-প্রতিমার আস্তানার দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।[৩০] সেদিন চক্ষু হবে আনত, লাঞ্ছনা তাদের আচ্ছন্ন করে রাখবে। ঐ দিনটিই সেদিন যার প্রতিশ্রুতি এদেরকে দেয়া হচ্ছে।

দ্বিতীয় গুণ হলো, তারা হবে নামাযের প্রতি নিষ্ঠাবান এবং সর্বশেষ গুণ হলো, তারা নামাযের হিফাযত করবে। নামাযের হিফাযতের অর্থ অনেক কিছু। যথা সময়ে নামায পড়া, দেহ ও পোশাক-পরিচ্ছদ পাক-পবিত্র আছে কিনা নামাযের পূর্বেই সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া, অযু থাকা এবং অযু করার সময় অংগ-প্রত্যংগগুলো ভালভাবে ধোয়া, নামাযের ফরয, ওয়াজিব ও মুস্তাহাবগুলো ঠিকমত আদায় করা, নামাযের নিয়ম-কানুন

পুরোপুরি মেনে চলা, আল্লাহর নাফরমানী করে নামাযকে ধ্বংস না করা, এসব বিষয়ও নামাযের হিফাযতের অন্তরভুক্ত।

২৪. যে সমস্ত লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ দেখে এবং কুরআনের বক্তব্য শুনে তা নিয়ে হাসি-তামাসা করা এবং তার প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করার জন্য চারদিক থেকে ছুটে আসতো এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে।

২৫. অর্থ হলো যেসব লোকের বৈশিষ্ট ও গুণাবলী এই মাত্র বর্ণনা করা হলো আল্লাহর জান্নাত তো তাদের জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু যারা সত্যের বাণী শোনা পর্যন্ত পছন্দ করে না এবং ন্যায় ও সত্যের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য এভাবে ছুটে আসছে তারা জান্নাতের দাবীদার কিভাবে হতে পারে? আল্লাহ কি এমন সব লোকদের জন্যই তাঁর জান্নাত তৈরী করেছেন? এ পর্যায়ে সূরা আল কলমের ৩৪ থেকে ৪১ আয়াত সামনে থাকা দরকার। মক্কার কাফেররা বলতো, আখেরাত যদি থাকেও তাহলে এ দুনিয়ায় তারা যেভাবে আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকছে, সেখানেও একইভাবে মত্ত থাকবে। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান পোষণকারী লোকেরা দুনিয়ায় যেভাবে দুরবস্থার শিকার হয়ে আছে সেখানেও ঠিক তাই থাকবে। উল্লেখিত আয়াতসমূহে কাফেরদের এ ধ্যান-ধারণার জবাব দেয়া হয়েছে।

২৬. এখানে এ আয়াতাংশের দু'টি অর্থ হতে পারে। আগে বর্ণিত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ধরে নিলে এর অর্থ হবে, যে উপাদানে এসব লোককে সৃষ্টি করা হয়েছে সে হিসেবে সব মানুষ সমান। জান্নাতে যাওয়ার কারণ যদি ঐ উপাদানটি হয় তাহলে সৎ ও অসৎ, জালেম ও ন্যায়নিষ্ঠ, অপরাধী ও নিরপরাধ সবারই জান্নাতে যাওয়া উচিত। কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার অধিকার যে মানুষের সৃষ্টির উপাদানের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় না বরং শুধু তার গুণাবলীর ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়। এ বিষয়টির ফায়সালার জন্য সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিই যথেষ্ট। আর এ আয়াতাংশকে যদি পরবর্তী বিষয়ের পূর্বাভাস বা ভূমিকা হিসেবে ধরে নেয়া হয় তাহলে তার অর্থ হবে এসব লোক নিজেরাই নিজেদেরকে আমার আযাব থেকে নিরাপদ মনে করছে আর যে ব্যক্তি আমার কাছে জবাবদিহি সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করে দেয় তাকে বিদ্রূপ ও হাসি-তামাসা করছে। অথচ আমি চাইলে যখন ইচ্ছা দুনিয়াতেও তাদেরকে আযাব দিতে পারি আবার যখন ইচ্ছা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেও উঠাতে পারি। তারা জানে নগণ্য এক ফোটা বীর্য দিয়ে আমি তাদের সৃষ্টির সূচনা করেছি এবং তারপর তাদেরকে সচল ও সক্ষম মানুষ বানিয়েছি। তাদের এ সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে যদি তারা চিন্তা-ভাবনা করতো তাহলে কখনো এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী তারা হতো না যে, এখন তারা আমার কর্তৃত্বের গণ্ডির বাইরে কিংবা আমি তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নই।

২৭. অর্থাৎ তারা যা মনে করে বসে আছে ব্যাপার আসলে তা নয়।

২৮. এখানে মহান আল্লাহ নিজেই নিজের সত্তার শপথ করেছেন। "উদয়াচলসমূহ ও অস্তাচলসমূহ" এ শব্দ ব্যবহারের কারণ হলো, গোটা বছরের আবর্তন কালে সূর্য প্রতিদিনই একটি নতুন কোণ থেকে উদিত হয় এবং একটি নতুন কোণে অস্ত যায়।

তাছাড়াও ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে সূর্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ক্রমাগত উদিত ও অস্তমিত হতে থাকে। এ হিসেবে সূর্যের উদয় হওয়ার ও অস্ত যাওয়ার স্থান একটি নয়, অনেক। আরেক হিসেবে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের তুলনায় একটি দিক হলো পূর্ব এবং আরেকটি দিক হলো পশ্চিম। তাই সূরা শূ'আরার ২৮ আয়াতে এবং সূরা মুয্যাম্মিলের ১৯ আয়াতে رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরেক বিচারে পৃথিবীর দু'টি উদয়াচল এবং দু'টি অস্তাচল আছে। কারণ পৃথিবীর এক গোলার্ধে যখন সূর্য অস্ত যায় তখন অপর গোলার্ধে উদিত হয়। এ কারণে সূরা আর রাহমানের ১৭ আয়াতে رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আর রাহমান, টীকা ১৭)

২৯. একথাটির জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'টি উদয়াচল ও দু'টি অস্তাচলের মালিক হওয়ার শপথ করেছেন। এর অর্থ হলো, আমি যেহেতু উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের মালিক তাই গোটা পৃথিবীই আমার কর্তৃত্বাধীন। আমার কর্তৃত্ব ও পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়া তোমাদের সাধ্যাতীত। যখন ইচ্ছা আমি তোমাদেরকে ধ্বংস করতে পারি এবং তোমাদের চাইতে উৎকৃষ্টতর কোন জাতির উত্থান ঘটিয়ে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারি।

৩০. মূল আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ হলো اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ । نصب শব্দের অর্থের ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন। অনেকে এর অর্থ করেছেন মূর্তি বা প্রতিমা। তাদের মতে এর অর্থ হলো, তারা হাশরের অধিপতির নির্ধারিত জায়গার দিকে দৌড়িয়ে অগ্রসর হতে থাকবে ঠিক; আজ যেমন তারা তাদের দেব-দেবীর আস্তানার দিকে ছুটে যায়। আবার অন্য আরেক দল মুফাস্‌সিরের মতে এর অর্থ দৌড়ে অংশ গ্রহণকারীদের জন্য চিহ্নিত গন্তব্য স্থল। প্রত্যক প্রতিদ্বন্দ্বী যাতে সবার আগে সেখানে পৌছতে চেষ্টা করে।

নূহ

৭১

নামকরণ

'নূহ' এ সূরার নাম। এর বিষয়বস্তুর শিরোনামও 'নূহ'। কারণ এতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত 'নূহ' আলাইহিস সালামের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এটিও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের অন্যতম। তবে এর বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ সাক্ষ থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, যে সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত ও তাবলীগের বিরুদ্ধে মক্কার কাফেরদের শত্রুতামূলক আচরণ বেশ তীব্রতা লাভ করেছিল তখন এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এতে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তবে তা কেবল কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্যে করা হয়নি। বরং এর উদ্দেশ্য মক্কার কাফেরদের এ মর্মে সাবধান করা যে, হযরত নূহ আলাইহিস সালামের সাথে তার কওম যে আচরণ করেছিল তোমরাও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সে একই আচরণ করছো। তোমরা যদি এ আচরণ থেকে বিরত না হও তাহলে তোমাদেরও সে একই পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে যার সম্মুখীন হয়েছিল ঐ সব লোকেরা। গোটা সূরার মধ্যে একথাটি স্পষ্ট ভাষায় কোথাও বলা হয়নি। কিন্তু যে অবস্থা ও পরিস্থিতিতে মক্কাবাসীদের এ কাহিনী শুনানো হয়েছে তার পটভূমিতে এ বিষয়টি আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যে সময় আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে রিসালাতের পদ মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছিলেন সে সময় তার ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন প্রথম আয়াতে তা বলা হয়েছে।

তিনি তাঁর দাওয়াত কিভাবে শুরু করেছিলেন এবং স্বজাতির মানুষের সামনে কি বক্তব্য পেশ করেছিলেন।

২ থেকে ৪ আয়াতে তা সংক্ষিপ্তাকারে বলা হয়েছে, এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত দীনের দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য অবর্ণনীয় দুঃখ–কষ্ট বরণ করার পর তার যে বর্ণনা হযরত

নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর দরবারে পেশ করেছিলেন ৫ থেকে ২০ আয়াতে তা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি তাঁর জাতিকে সত্য পথে আনার জন্য কিভাবে চেষ্টা-সাধনা করেছেন আর তার জাতির লোকেরা কি রকম হঠকারিতার মাধ্যমে তার বিরোধিতা করেছে এ পর্যায়ে তিনি তার সবই তাঁর প্রভুর সামনে পেশ করেছেন।

এরপর ২১ থেকে ২৪ আয়াতে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের শেষ আবেদনের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে তিনি মহান আল্লাহর কাছে এ মর্মে আবেদন করছেন যে, এ জাতি আমার দাওয়াত চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এরা তাদের নেতাদের হাতে নিজেদের লাগাম তুলে দিয়েছে এবং বিরাট ও ব্যাপক ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করেছে। এখন তাদের থেকে হিদায়াত গ্রহণ করার শুভবুদ্ধি ও যোগ্যতা ছিনিয়ে নেয়ার সময় এসে গেছে। হযরত নূহ আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে এটা কোন প্রকার অধৈর্যের বর্হিপ্রকাশ ছিল না। বরং শত শত বছর ধরে ধৈর্যের চরম পরীক্ষার মত পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যে দীনের তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার পর যে সময় তিনি তাঁর কওমের ব্যাপারে পুরোপুরি নিরাশ হয়ে গেলেন কেবল তখনই তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, এখন এ জাতির সত্য ও ন্যায়ের পথে আসার আর কোন সম্ভাবনাই অবশিষ্ট নেই। তাঁর এ সিদ্ধান্ত ছিল হুবহু আল্লাহ তা'আলার ফায়সালার অনুরূপ। তা-ই এর পরবর্তী ২৫ আয়াতেই বলা হয়েছে। এ জাতির কৃতকর্মের কারণে তাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আযাব নাযিল হলো।

আযাব নাযিল হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার কাছে যে দোয়া করেছিলেন শেষ আয়াতটিতে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে তিনি নিজের ও ঈমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন এবং নিজ কওমের কাফেরদের জন্য এ মর্মে আল্লাহর কাছে আবেদন করছেন যেন তাদের কাউকেই পৃথিবীর বুকে বসবাস করার জন্য জীবিত রাখা না হয়। কারণ, তাদের মধ্যে এখন আর কোন কল্যাণই অবশিষ্ট নেই। তাই তাদের ঔরসে এখন যারাই জন্মলাভ করবে তারাই কাফের এবং পাপী হিসেবেই বেড়ে উঠবে।

এ সূরা অধ্যয়নকালে ইতিপূর্বে কুরআন মজীদে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কাহিনীর যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে তাও সামনে থাকা দরকার। দেখুন, সূরা আল আ'রাফ, আয়াত ৫৯ থেকে ৬৪; ইউনুস, ৭১ থেকে ৭৩; হূদ, ২৫ থেকে ৪৯; আল মু'মিনূন, ২৩ থেকে ৩১; আশ শু'আরা, ১০৫ থেকে ১২২; আল আনকাবুত, ১৪ ও ১৫; আস্ সাফ্ফাত, ৭৫ থেকে ৮২ এবং আল কামার, ৯ থেকে ১৬ আয়াত পর্যন্ত।

আয়াত ২৮ | সূরা নূহ–মক্কী | রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ① قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ② أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ③
يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ
لَا يُؤَخَّرُ ۖ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ④

আমি নূহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম (এ নির্দেশ দিয়ে) যে, একটি কষ্টদায়ক আযাব আসার আগেই তুমি তাদেরকে সাবধান করে দাও।[১]

সে বললো, হে আমার জাতি, আমি তোমাদের জন্য একজন সতর্ককারী (বার্তাবাহক, আমি তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি) যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো, তাঁকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো,[২] আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন[৩] এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেবেন।[৪] প্রকৃত ব্যাপার হলো, আল্লাহর নির্ধারিত সময় যখন এসে যায় তখন তা থেকে বাঁচা যায় না।[৫] আহ্ ! যদি তোমরা তা জানতে।[৬]

১. অর্থাৎ একথা জানিয়ে দেবেন যে, তারা যে বিভ্রান্তি ও নৈতিক অনাচারের মধ্যে পড়ে আছে যদি তা থেকে বিরত না হয় তাহলে তা তাদের আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত করে দেবে। এ আযাব থেকে বাঁচার জন্য কোন্ পথ অবলম্বন করতে হবে তাও তাদের বলে দেবেন।

২. হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালনের শুরুতেই তাঁর জাতির সামনে এ তিনটি বিষয় পেশ করেছিলেন। অর্থাৎ এক, আল্লাহর দাসত্ব, দুই, তাকওয়া বা আল্লাহভীতি এবং তিন, রসূলের আনুগত্য। আল্লাহর দাসত্বের মানে অন্য সব কিছুর দাসত্ব ও গোলামী বর্জন করে এক আল্লাহকেই শুধু উপাস্য মেনে নিয়ে কেবল তাঁরই উপাসনা করা এবং তাঁরই আদেশ–নিষেধ মেনে চলা। তাকওয়া বা আল্লাহভীতির মানে এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকা যা আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও গযবের কারণ হয় এবং

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۝١ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ۝٢
وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا
ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۝٣ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۝٤
ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۝٥ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝٦

সে[৭] বললো ঃ হে আমার রব, আমি আমার কওমের লোকদের রাতদিন আহবান করেছি। কিন্তু আমার আহবান তাদের দূরে সরে যাওয়াকে কেবল বাড়িয়েই তুলেছে।[৮] তুমি যাতে তাদের ক্ষমা করে দাও[৯] এ উদ্দেশ্যে আমি যখনই তাদের আহবান করেছি তখনই তারা কানে আঙুল দিয়েছে,[১০] এবং কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিয়েছে, নিজেদের আচরণে অনড় থেকেছে এবং অতি মাত্রায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে।[১১] অতপর আমি তাদেরকে উচ্চকণ্ঠে আহবান জানিয়েছি। তারপর প্রকাশ্যে তাদের কাছে তাবলীগ করেছি এবং গোপনে চুপে চুপে বুঝিয়েছি। আমি বলেছি তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও। নিসন্দেহে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল।

নিজেদের জীবনে এমন নীতি গ্রহণ করো যা একজন আল্লাহভীরু মানুষের গ্রহণ করা উচিত। আর আমার আনুগত্য করো একথাটির মানে হলো, আল্লাহর রসূল হিসেবে তোমাদের যেসব আদেশ দেই তা মেনে চলো।

৩. মূল ইবারাতে শব্দ আছে يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ এ আয়াতাংশের অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তোমাদের কিছু গোনাহ মাফ করে দেবেন। বরং এর সঠিক অর্থ হলো, যে তিনটি বিষয় তোমাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে তা যদি তোমরা মেনে নাও তাহলে এতদিন পর্যন্ত যে গোনাহ তোমরা করেছো তা সবই আল্লাহ মাফ করে দেবেন। এখানে مِنْ শব্দটি অংশবিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি।

৪. অর্থাৎ যদি তোমরা এ তিনটি বিষয় মেনে নাও তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য যে সময় নির্ধারিত রেখেছেন সে সময় পর্যন্ত এ পৃথিবীতে তোমাদের বেঁচে থাকার অবকাশ দেয়া হবে।

৫. কোন কওমের ওপর আযাব নাযিল করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এখানে সে সময়টিকে বুঝানো হয়েছে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কোন কওমের জন্য আযাবের ফায়সালা হয়ে যাওয়ার পর ঈমান আনলেও তাদের আর মাফ করা হয় না।

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ
لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ
أَطْوَارًا ﴿١٤﴾ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ
فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ
بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾

তিনি আকাশ থেকে তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষাবেন। সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন, তোমাদের জন্য বাগান সৃষ্টি করবেন আর নদী-নালা প্রবাহিত করে দিবেন।[১২] তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে বলে মনে করছো না।[১৩] অথচ তিনিই তোমাদের পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন।[১৪] তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ কিভাবে সাত স্তরে বিন্যস্ত করে আসমান সৃষ্টি করেছেন? ওগুলোর মধ্যে চাঁদকে আলো এবং সূর্যকে প্রদীপ হিসেবে স্থাপন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মাটি থেকে বিস্ময়কররূপে উৎপন্ন করেছেন।[১৫] আবার এ মাটির মধ্যে তোমাদের ফিরিয়ে নেবেন এবং অকস্মাৎ এ মাটি থেকেই তোমাদের বের করে আনবেন। আল্লাহ ভূপৃষ্ঠকে তোমাদের জন্য বিছানার মত করে পেতে দিয়েছেন। যেন তোমরা এর প্রশস্ত পথে চলতে পার।

৬. অর্থাৎ যদি তোমরা এ বিষয়টি বুঝতে যে, আমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছার পর যে সময়টা অতিবাহিত হচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য একটা অবকাশ। তোমাদেরকে এ অবকাশ দেয়া হয়েছে ঈমান আনয়নের জন্য। এ অবকাশের জন্য নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহর আযাব থেকে তোমাদের নিষ্কৃতি পাওয়ার আর কোন সম্ভাবনা নেই। এ অবস্থায় ঈমান আনয়নের জন্য তোমরা দ্রুত এগিয়ে আসবে। আযাব আসার সময় পর্যন্ত তা আর বিলম্বিত করবে না।

৭. মাঝখানে একটা দীর্ঘকালের ইতিহাস বাদ দিয়ে নূহ আলাইহিস সালামের আবেদন তুলে ধরা হচ্ছে যা তিনি তাঁর রিসালাতের শেষ যুগে আল্লাহর সামনে পেশ করেছিলেন।

৮. অর্থাৎ আমি যতই তাদেরকে আহবান করেছি তারা ততই দূরে সরে গিয়েছে।

৯. এর মধ্যেই একথাটি নিহিত আছে যে, তারা নাফরমানীর আচরণ পরিহার করে ক্ষমাপ্রার্থী হবে। কারণ কেবল এভাবেই তারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা লাভ করতে পারতো।

১০. মুখ ঢাকার একটি কারণ হতে পারে, তারা হয়রত নূহ আলাইহিস সালামের বক্তব্য শোনা তো দূরের কথা তাঁর চেহারা দেখাও পছন্দ করতো না। আরেকটি কারণ হতে পারে, তারা তাঁর সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময় মুখ ঢেকে চলে যেতো যাতে তিনি তাদের চিনে কথা বলার কোন সুযোগ আদৌ না পান। মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যে ধরনের আচরণ করছিলো সেটিও ছিল অনুরূপ একটি আচরণ। সূরা হূদের ৫ আয়াতে তাদের এ আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে "দেখ, এসব লোক তাদের বক্ষ ঘুরিয়ে নেয় যাতে তারা রসূলের চোখের আড়ালে থাকতে পারে। সাবধান! যখন এরা কাপড় দ্বারা নিজেদেরকে ঢেকে আড়াল করে তখন আল্লাহ তাদের প্রকাশ্য বিষয়গুলোও জানেন এবং গোপন বিষয়গুলোও জানেন। তিনি তো মনের মধ্যকার গোপন কথাও জানেন। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা হূদ, টীকা ৫ ও ৬)

১১. এখানে تكبر বা ঔদ্ধত্যের মানে হলো তারা ন্যায় ও সত্যকে মেনে নেয়া এবং আল্লাহর রসূলের উপদেশ গ্রহণ করাকে তাদের মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের তুলনায় নীচু কাজ বলে মনে করেছে। উদাহরণ স্বরূপ কোন সৎ ও ভাল লোক যদি কোন দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে উপদেশ দান করে আর সে জন্য ঐ ব্যক্তি ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে পড়ে এবং মাটিতে পদাঘাত করে বেরিয়ে যায় তাহলে বুঝা যাবে যে, সে ঔদ্ধত্যের সাথে উপদেশ বাণী প্রত্যাখ্যান করেছে।

১২. একথাটি কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহদ্রোহিতার আচরণ মানুষের জীবনকে শুধু আখেরাতেই নয় দুনিয়াতেও সংকীর্ণ করে দেয়। অপর পক্ষে কোন জাতি যদি অবাধ্যতার বদলে ঈমান, তাকওয়া এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার পথ অনুসরণ করে তাহলে তা শুধু আখেরাতের জন্যই কল্যাণকর হয় না, দুনিয়াতেও তার ওপর আল্লাহর অশেষ নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে। সূরা ত্বা-হায় বলা হয়েছে ঃ "যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার দুনিয়ার জীবন হবে সংকীর্ণ। আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাবো।" (আয়াত ১২৪) সূরা মা-য়েদায় বলা হয়েছেঃ "আহলে কিতাব যদি তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত 'তাওরাত', 'ইনযীল' ও অন্যান্য আসমানী কিতাবের বিধানাবলী মেনে চলতো তাহলে তাদের জন্য ওপর থেকেও রিযিক বর্ষিত হতো এবং নীচ থেকেও ফুটে বের হতো।" (আয়াত ৬৬) সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে ঃ জনপদসমূহের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনতো এবং তাকওয়ার নীতি অনুসরণ করতো তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতের দরজাসমূহ খুলে দিতাম। (আয়াত ৯৬) সূরা হূদে বর্ণিত হয়েছে যে, হয়রত হূদ আলাইহিস সালাম তাঁর কওমের লোকদের বললেন ঃ "হে আমার কওমের লোকেরা, তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো, তার দিকে ফিরে যাও। তিনি তোমাদের ওপর আসমান থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তি ও ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে দেবেন।" (আয়াত ৫২) খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিয়ে মক্কার লোকদের সম্বোধন করে এ সূরা হূদেই বলা হয়েছে ঃ "আর তোমরা যদি তোমাদের রবের কাছে

ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁর দিকে ফিরে আস তাহলে তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করবেন।" (আয়াত ৩) হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের বললেন ঃ একটি কথা যদি তোমরা মেনে নাও তাহলে আরব ও আজমের শাসনদণ্ডের অধিকারী হয়ে যাবে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা মা-য়েদাহ, টীকা ৯৬; সূরা হূদ, টীকা ৩ ও ৫৭; সূরা ত্বা-হা, টীকা ১০৫ এবং সূরা সোয়াদের ভূমিকা)।

কুরআন মজীদের এ নির্দেশনা অনুসারে কাজ করতে গিয়ে একবার দুর্ভিক্ষের সময় হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে বের হলেন এবং শুধু ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করেই শেষ করলেন। সবাই বললো, 'হে আমীরুল মু'মিনীন আপনি তো আদৌ দোয়া করলেন না। তিনি বললেন ঃ আমি আসমানের ঐ সব দরজায় করাঘাত করেছি যেখান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। একথা বলেই তিনি সূরা নূহের এ আয়াতগুলো তাদের পাঠ করে শুনালেন। (ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর) অনুরূপ একবার এক ব্যক্তি হাসান বাসরীর মজলিসে অনাবৃষ্টির অভিযোগ করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। অপর এক ব্যক্তি দারিদ্র্যের অভিযোগ করলো। তৃতীয় এক ব্যক্তি বললো ঃ আমার কোন ছেলেমেয়ে নেই। চতুর্থ এক ব্যক্তি বললো ঃ আমার ফসলের মাঠে ফলন খুব কম হচ্ছে। তিনি সবাইকে একই জবাব দিলেন। অর্থাৎ আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। লোকেরা বললো ঃ কি ব্যাপার যে, আপনি প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগের একই প্রতিকার বলে দিচ্ছেন? তখন তিনি সূরা নূহের এ আয়াতগুলো পাঠ করে শুনালেন। (কাশশাফ)

১৩. অর্থাৎ দুনিয়ার ছোট ছোট নেতা ও বিশেষ ব্যক্তিদের সম্পর্কে তো তোমরা মনে করো, তাদের মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার পরিপন্থী কোন আচরণ বিপজ্জনক। কিন্তু বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহ সম্পর্কে এতটুকুও মনে করো না যে, তিনিও মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার অধিকারী সত্তা। তোমরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছো, তাঁর প্রভুত্বের মধ্যে অন্যকে শরীক করছো, তাঁর আদেশ-নিষেধ অমান্য করছো, এসব সত্ত্বেও তাঁকে তোমরা এতটুকু ভয়ও করো না যে, এ জন্য তিনি তোমাদের শাস্তি দেবেন।

১৪. অর্থাৎ সৃষ্টিকর্মের বিভিন্ন পর্যায় ও স্তর অতিক্রম করে তোমাদের বর্তমান অবস্থায় পৌছানো হয়েছে। প্রথমে তোমরা বীর্য আকারে মা-বাপের দেহে ছিলে। অতপর আল্লাহর বিধান ও সৃষ্টি কৌশল অনুসারে এ দু'টি বীর্য সংমিশ্রিত হয়ে তোমরা মাতৃগর্ভে স্থিতি লাভ করেছিলে। এরপর মাতৃগর্ভে দীর্ঘ নয়টি মাস ধরে ক্রমবিকাশ ও উন্নয়ন ঘটিয়ে তোমাদের পূর্ণাংগ মানবাকৃতি দেয়া হয়েছে এবং মানুষ হিসেবে দুনিয়াতে কাজ করার জন্য যে শক্তি ও যোগ্যতার প্রয়োজন তা তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর তোমরা একটি জীবন্ত শিশু হিসেবে মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছো, প্রতি মুহূর্তেই একটি অবস্থা থেকে আরেকটি অবস্থায় তোমাদের উত্তরণ ঘটানো হয়েছে। অবশেষে তোমরা যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েছো। এসব পর্যায় অতিক্রমকালে প্রতি মুহূর্তেই তোমরা পুরোপুরি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ও কবজায় ছিলে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমার জন্মের জন্য গর্ভ সঞ্চারই হতে দিতেন না এবং সে গর্ভে তোমার পরিবর্তে অন্য কেউ স্থিতিলাভ করতো। তিনি চাইলে মাতৃগর্ভেই তোমাদেরকে অন্ধ, বধির, বোবা কিংবা বিকলাঙ্গ করে দিতেন অথবা তোমাদের

قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا
خَسَارًا ﴿٢١﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ
وَدًّا وَلَا سُوَاعًا ۙ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۖ وَلَا تَزِدِ
الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٤﴾

২ রুকূ'

নূহ বললো ঃ হে প্রভু, তারা আমার কথা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঐ সব নেতার অনুসরণ করেছে যারা সম্পদ ও সন্তান–সন্ততি পেয়ে আরো বেশী ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। এসব লোক সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র–জাল বিস্তার করে রেখেছে।[১৬] তারা বলেছে, তোমরা নিজেদের দেব–দেবীদের কোন অবস্থায় পরিত্যাগ করো না। আর ওয়াদ, সুওয়া'আ, ইয়াগুস, ইয়াউক এবং নাস্‌রকেও[১৭] পরিত্যাগ করো না। অথচ এসব দেব–দেবী বহু লোককে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেছে। তুমিও এসব জালেমদের জন্য গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করো না।[১৮]

বিবেক–বুদ্ধি বিশৃংখল ও ত্রুটিপূর্ণ করে দিতেন। তিনি চাইলে তোমরা জীবন্ত শিশুরূপে জন্ম লাভই করতে পারতে না। জন্মলাভের পরও যে কোন মুহূর্তে তিনি তোমাদের ধ্বংস করতে পারতেন। তাঁর একটি মাত্র ইংগিতেই তোমরা কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে যেতে। যে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণে তোমরা এতটা অসহায় তাঁর সম্পর্কে কি করে এ ধারণা পোষণ করে বসে আছো যে, তাঁর সাথে সব রকম ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অকৃতজ্ঞতার আচরণ করা যেতে পারে, তাঁর বিরুদ্ধে সব রকম বিদ্রোহ করা যেতে পারে। কিন্তু এসব আচরণের জন্য তোমাদের কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে না?

১৫. এ স্থানে মাটির উপাদান থেকে মানুষ সৃষ্টি করাকে উদ্ভিদ উৎপন্ন হওয়ার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। কোন এক সময় যেমন এই গ্রহে উদ্ভিদরাজি ছিল না। মহান আল্লাহই এখানে উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছেন। ঠিক তেমনি এক সময়ে এ ভূপৃষ্ঠে কোন মানুষের অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ তা'আলাই এখানে তাদের সৃষ্টি করেছেন।

১৬. ষড়যন্ত্রের অর্থ হলো জাতির লোকদের সাথে নেতাদের ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা। নেতারা জাতির লোকদের হযরত নূহ আলাইহিস সালামের শিক্ষার বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করার চেষ্টা করতো। যেমন, তারা বলতো ঃ "নূহ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। আল্লাহর কাছ থেকে তার কাছে অহী এসেছে তা কি করে মেনে নেয়া যায়?" (সূরা আ'রাফ, ৬৩; হূদ–২৭) "আমাদের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা না বুঝে শুনে নূহের আনুগত্য করছে। তার কথা যদি সত্যিই মূল্যবান হতো তাহলে জাতির নেতা ও জ্ঞানী–গুণী ব্যক্তিবর্গ তার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করতো।" (হূদ–২৭) "আল্লাহ যদি পাঠাতেই চাইতেন

তাহলে কোন ফেরেশতা পাঠাতেন।" (আল মু'মিনূন, ২৪) এ ব্যক্তি যদি আল্লাহর প্রেরিত রসূল হতেন, তাহলে তাঁর কাছে সবকিছুর ভাণ্ডার থাকতো, তিনি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানতেন এবং ফেরেশতাদের মত সব রকম মানবীয় প্রয়োজন ও অভাব থেকে মুক্ত হতেন। (হূদ, ৩১) নূহ এবং তার অনুসারীদের এমন কি অলৌকিকত্ব আছে যার জন্য তাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে হবে? (হূদ, ২৭) এ ব্যক্তি আসলে তোমাদের মধ্যে তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। (আল মু'মিনূন, ২৫) প্রায় এ রকম কথা বলেই কুরাইশ নেতারা লোকদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত করতো।

১৭. নূহের কওমের উপাস্যদের দেবীদের মধ্য থেকে এখানে সেসব দেব-দেবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে পরবর্তীকালে মক্কাবাসীরা যাদের পূজা করতে শুরু করেছিল এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবের বিভিন্ন স্থানে তাদের মন্দিরও বর্তমান ছিল। এটা অসম্ভব নয় যে, মহা প্লাবনে যেসব লোক রক্ষা পেয়েছিল পরবর্তী বংশধরগণ তাদের মুখ থেকে নূহের (আ) জাতির প্রাচীন উপাস্য দেব-দেবীদের নাম শুনেছিল এবং পরে তাদের বংশধরদের নতুন করে জাহেলিয়াত ছড়িয়ে পড়লে তারা সেসব দেব-দেবীর প্রতিমা তৈরী করে তাদের পূজা অর্চনা শুরু করেছিল।

'ওয়াদ্দ' ছিল 'কুদা'আ' গোত্রের 'বনী কালব ইবনে দাব্‌রা' শাখার উপাস্য দেবতা। 'দুমাতুল জান্‌দাল' নামক স্থানে তারা এর বেদী নির্মাণ করে রেখেছিল। আরবের প্রাচীন শিলালিপিতে তার নাম 'ওয়াদ্দাম আবাম' (ওয়াদ্দ বাপু) উল্লেখিত আছে। কালবীর মতে তার মূর্তি ছিল এক বিশালদেহী পুরুষের আকৃতিতে নির্মিত। কুরাইশরাও তাকে উপাস্য দেবতা হিসেবে মানতো। তাদের কাছে এর নাম ছিল 'উদ্দ'। তার নাম অনুসারে ইতিহাসে 'আবদে উদ্দ' নামে এক ব্যক্তির উল্লেখ দেখা যায়।

'সুওয়া' ছিল হুযাইল গোত্রের দেবী। তার মূর্তি ছিল নারীর আকৃতিতে তৈরী। ইয়াম্বুর সন্নিকটস্থ 'রুহাত' নামক স্থানে তার মন্দির ছিল।

'ইয়াগুস' ছিল 'তায়' গোত্রের 'আনউম' শাখার এবং 'মাযহিজ' গোত্রের কোন কোন শাখার উপাস্য দেবতা। 'মাযহিজে'র শাখা গোত্রের লোকেরা ইয়ামান ও হিজাযের মধ্যবর্তী 'জুরাশ' নামক স্থানে তার সিংহাকৃতির মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিল। কুরাইশ গোত্রেরও কোন কোন লোকের নাম আবদে ইয়াগুস ছিল বলে দেখা যায়।

'ইয়াউক' ইয়ামানের হামদান অঞ্চলের অধিবাসী হামদান গোত্রের 'খায়ওয়ান' শাখার উপাস্য দেবতা ছিল। এর মূর্তি ছিল ঘোড়ার আকৃতির।

'নাসর' ছিল হিমইয়ার অঞ্চলের হিমইয়ার গোত্রের 'আলে যুল-কুলা' শাখার দেবতা। বালখা' নামক স্থানে তার মূর্তি ছিল। এ মূর্তির আকৃতি ছিল শকুনের মত। সাবার প্রাচীন শিলালিপিতে এর নাম উল্লেখিত হয়েছে 'নাসূর'। এর মন্দিরকে লোকেরা 'বায়তে নাসূর' বা নাসূরের ঘর এবং এর পূজারীদের 'আহলে নাসূর' বা নাসূরের পূজারী বলতো। প্রাচীন মন্দিরসমূহের যে ধ্বংসাবশেষ আরব এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে পাওয়া যায় সেসব মন্দিরের অনেকগুলোর দরজায় শকুনের চিত্র খোদিত দেখা যায়।

مِمَّا خَطِيٰٓئٰتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ
اَنْصَارًا ﴿٢٥﴾ وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ اِنَّكَ
اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ
وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۭ وَلَا تَزِدِ
الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

নিজেদের অপরাধের কারণেই তাদের নিমজ্জিত করা হয়েছিল তারপর আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।[১৯] অতপর তারা আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কোন সাহায্যকারী পায়নি।[২০] আর নূহ বললো ঃ হে আমার রব, এ কাফেরদের কাউকে পৃথিবীর বুকে বসবাসের জন্য রেখো না। তুমি যদি এদের ছেড়ে দাও তাহলে এরা তোমার বান্দাদের বিভ্রান্ত করবে এবং এদের বংশে যারাই জন্মলাভ করবে তারাই হবে দুষ্কৃতকারী ও কাফের। হে আমার রব, আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মু'মিন হিসেবে আমার ঘরে প্রবেশ করেছে তাদেরকে এবং সব মু'মিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করে দাও। জালেমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করো না।

১৮. এ সূরার ভূমিকাতেই আমরা এ বিষয়টি উল্লেখ করেছি যে, হযরত নূহ আলাইহিস সালামের এ বদদোয়া কোন প্রকার ধৈর্যহীনতার কারণে ছিল না। বরং এ বদদোয়া তাঁর মুখ থেকে তখনই উচ্চারিত হয়েছিল যখন তাবলীগ ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে শত শত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি তাঁর জাতির ব্যাপারে পুরোপুরি নিরাশ হয়েছিলেন। হযরত মূসাও এরূপ পরিস্থিতিতেই ফেরাউন ও ফেরাউনের কওমের জন্য এ বলে বদদোয়া করেছিলেন ঃ "হে প্রভু! তুমি এদের অর্থ-সম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং তাদের দিলের ওপর মোহর লাগিয়ে দাও, এরা কঠিন আযাব না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনবে না।" তার জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন ঃ তোমার দোয়া কবুল করা হয়েছে। (ইউনুস, আয়াত ৮৮-৮৯) হযরত মূসা আলাইহিস সালামের বদদোয়ার মত নূহ আলাইহিস সালামের এ বদদোয়াও ছিল আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিধ্বনি। তাই সূরা হূদে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَاُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَىِٕسْ
بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ○

"আর অহী পাঠিয়ে নূহকে জানিয়ে দেয়া হলো, এ পর্যন্ত তোমার কওমের যেসব লোক ঈমান এনেছে এখন তারা ছাড়া আর কেউ ঈমান আনবে না। তাদের কৃতকর্মের জন্য আর দুঃখ করো না।" (হূদ, ৩৬)

১৯. অর্থাৎ নিমজ্জিত হওয়াতেই তাদের ব্যাপারটা চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে যায়নি। বরং ধ্বংস হওয়ার পরপরই তাদের রূহসমূহকে আগুনের কঠিন শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এ আচরণের সাথে ফেরাউন ও তার জাতির সাথে কৃত আচরণের হুবহু মিল রয়েছে। এ বিষয়টিই সূরা আল মু'মিনের ৪৫ ও ৪৬ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মু'মিন, টীকা-৬৩) যেসব আয়াত দ্বারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের আযাব বা কবরের আযাব প্রমাণিত হয় এ আয়াতটি তারই একটি।

২০. অর্থাৎ তারা যেসব দেব-দেবীকে সাহায্যকারী মনে করতো সেসব দেব-দেবীর কেউ-ই তাদের রক্ষা করতে আসেনি। এটা যেন মক্কাবাসীদের জন্য এ মর্মে সতর্কবাণী যে, তোমরাও যদি আল্লাহর আযাবে পাকড়াও হও তা হলে যেসব দেব-দেবীর ওপর তোমরা ভরসা করে আছ তারা তোমাদের কোন কাজেই আসবে না।

আল জিন

৭২

নামকরণ

আল জিন এ সূরার নাম। এর বিষয়বস্তুর শিরোনামও আল জিন। কারণ এতে কুরআন শুনে জিনদের নিজেদের জাতির কাছে যাওয়া এবং তাদের মধ্যে ইসলামের তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করার ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে উকাযের বাজারে যাচ্ছিলেন। পথে নাখলা নামক স্থানে তিনি ফজরের নামাযে ইমামতি করেন। সে সময় একদল জিন ঐ স্থান অতিক্রম করছিলো। কুরআন তিলাওয়াতের শব্দ শুনে তারা সেখানে থেমে যায় এবং গভীর মনযোগসহ কুরআন শুনতে থাকে। এ সূরাতে এ ঘটনারই উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বর্ণনার ভিত্তিতে অধিকাংশ মুফাস্‌সির মনে করেছেন যে, এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইতিহাস খ্যাত তায়েফ সফরের ঘটনা। ঘটনাটি ঘটেছিল হিজরাতের তিন বছর আগে নবুওয়াতের ১০ম বছরে। কিন্তু কয়েকটি কারণে এ ধারণা ঠিক নয়। তায়েফের উক্ত সফরে জিনদের কুরআন শোনার যে ঘটনা ঘটেছিল তা সূরা আহকাফের ২৯ থেকে ৩২ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। ঐ আয়াতগুলো একবার দেখলেই বুঝা যায়, সে সময় যেসব জিন কুরআন শুনে তার প্রতি ঈমান এনেছিল তারা আগে থেকেই হযরত মূসা এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান পোষণ করতো। পক্ষান্তরে এ সূরার ২ হতে ৭ পর্যন্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ সময় যে জিনেরা কুরআন শুনেছিল তারা ছিল মুশরিক। তারা আখেরাত ও রিসালাত অস্বীকার করতো। তাছাড়াও এ বিষয়টি ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, তায়েফের সফরে যায়েদ ইবনে হারেসা ছাড়া আর কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন না। পক্ষান্তরে এ সূরায় উল্লেখিত সফর সম্পর্কে ইবনে আব্বাস বর্ণনা করছেন যে, এ সময় কয়েকজন সাহাবী তাঁর সাথে ছিলেন। তা ছাড়াও অনেকগুলো বর্ণনা এ বিষয়ে একমত যে, সূরা আহ্‌কাফে বর্ণিত ঘটনায় জিনরা যখন কুরআন শুনেছিল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফ থেকে মক্কা ফেরার পথে নাখলায় অবস্থান করছিলেন। আর ইবনে আব্বাসের বর্ণনা মতে এ সূরায় বর্ণিত সফরে জিনদের কুরআন শোনার ঘটনা তখন ঘটেছিল যখন তিনি মক্কা থেকে উকায যাচ্ছিলেন। এসব কারণে যে বিষয়টি সঠিক বলে জানা যায় তাহলো, সূরা আহ্‌কাফ

এবং সূরা জিনে একই ঘটনার উল্লেখ করা হয়নি। বরং এ ছিল ভিন্ন ভিন্ন সফরে সংঘটিত ভিন্ন ভিন্ন দু'টি ঘটনা।

সূরা আহ্কাফে যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তা যে দশম নববী সনে তায়েফ সফরের সময় সংঘটিত হয়েছিল সে ব্যাপারে রেওয়ায়াতসমূহে ঐকমত্য পোষণ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, এ দ্বিতীয় ঘটনাটি কখন সংঘটিত হয়েছিল? ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এর কোন জবাব পাওয়া যায় না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল সাহাবীকে সাথে নিয়ে কখন উকাযের বাজারে গিয়েছিলেন অন্য আর কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকেও তা জানা যায় না। তবে এ সূরার ৮ থেকে ১০ পর্যন্ত আয়াতগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যায়, এটি নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগের ঘটনা হবে। এসব আয়াতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতলাভের পূর্বে জিনরা উর্ধ জগতের খবর জানার জন্য আসমান থেকে কিছু না কিছু শুনে নেয়ার একটা সুযোগ পেয়ে যেতো। কিন্তু এরপর তারা হঠাৎ দেখতে পেলো সবখানে ফেরেশতাদের কড়া পাহারা বসে গেছে এবং উল্কার বৃষ্টি হচ্ছে। তাই কোথাও তারা এমন একটু জায়গা পাচ্ছে না যেখানে অবস্থান নিয়ে কোন আভাস তারা লাভ করতে পারে। তাই একথা জানার জন্য তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো যে, পৃথিবীতে এমন কি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বা হতে যাচ্ছে যার জন্য এ কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। সম্ভবত তখন থেকেই জিনদের বিভিন্ন দল বিষয়টির অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছিল এবং তাদেরই একটি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত শুনে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, এটিই সে বস্তু, যার কারণে জিনদের জন্য উর্ধ জগতের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

জিনদের হাকীকত বা তাৎপর্য

মন-মগজ যাতে কোন প্রকার বিভ্রান্তির শিকার না হয় সে জন্য এ সূরা অধ্যয়নের আগে জিনদের তাৎপর্য সম্পর্কে জেনে নেয়া আবশ্যক। বর্তমান যুগের বহু লোক এ ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত আছে যে, জিন বলতে বাস্তবে কিছু নেই। বরং এটিও প্রাচীন কালের কুসংস্কার ভিত্তিক বাজে একটি ধারণা। তাদের এ ধারণার ভিত্তি কিন্তু এটা নয় যে, তারা গোটা বিশ্ব-জাহানের সবকিছুর তাৎপর্য ও বাস্তবতা জেনে ফেলেছে এবং এও জেনে ফেলেছে যে, জিন বলে কোথাও কিছু নেই। এমন জ্ঞান লাভের দাবী তারা নিজেরাও করতে পারে না। কিন্তু কোন প্রমাণ ছাড়াই তারা ধরে নিয়েছে যে, গোটা বিশ্ব-জাহানে শুধু তা-ই বাস্তব যা অনুভব করা যায় বা ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আনা যায়। অথচ সমুদ্রের তুলনায় এক বিন্দু পানির যে অবস্থা এ বিরাট বিশাল বিশ্ব-জাহানের বিশালত্বের তুলনায় মানুষের অনুভূতি ও ধরা-ছোঁয়ার গণ্ডির অবস্থা তাও নয়। যে ব্যক্তি মনে করে যে, যা অনুভব করা যায় না তার কোন অস্তিত্ব নেই, আর যার অস্তিত্ব আছে তা অবশ্যই অনুভূত হবে, সে আসলে নিজের বুদ্ধি-বিবেকের সংকীর্ণতারই প্রমাণ দেয়। এ ধরনের চিন্তাধারা অবলম্বন করলে শুধু এক জিন নয় বরং এমন কোন সত্যকেই মানুষ মেনে নিতে পারবে না যা

সরাসরি তার অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে না এবং অনুভব করা যায় না এমন কোন সত্যকে মেনে নেয়া তো দূরের কথা আল্লাহর অস্তিত্ব পর্যন্তও তাদের কাছে মেনে নেয়ার মত থাকে না।

মুসলমানদের মধ্যে যারা এরূপ ধ্যান-ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে কিন্তু কুরআনকেও অস্বীকার করতে পারেনি তারা জিন, ইবলীস এবং শয়তান সম্পর্কে কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যকে নানা রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বিষয়ে পরিণত করেছে। তারা বলেন ঃ জিন বলতে এমন কোন অদৃশ্য মাখলুক বুঝায় না যাদের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব আছে। বরং কোথাও এর অর্থ মানুষের পাশবিক শক্তি যাকে শয়তান বলে অভিহিত করা হয়েছে। কোথাও এর অর্থ অসভ্য, বন্য ও পাহাড়ী এলাকায় বসবাসকারী জাতিসমূহ। আবার কোথাও এর দ্বারা ঐ সব লোকদের বুঝানো হয়েছে যারা গোপনে কুরআন শুনতো। কিন্তু এ ব্যাপারে কুরআন মজীদের বক্তব্য এত স্পষ্ট ও খোলামেলা যে, এ ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সামান্যতম অবকাশও তাতে নেই।

কুরআন মজীদে এক জায়গায় নয় বহু জায়গায় এমনভাবে জিন ও মানুষের উল্লেখ করা হয়েছে যা থেকে বুঝা যায়, এরা স্বতন্ত্র দু'টি মাখলুক। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন সূরা আ'রাফ, আয়াত ৩৮; হূদ, ১৯; হা-মীম আস সাজদা, আয়াত ২৫ ও ২৯; আল আহকাফ ১৮; আয যারিয়াত; ৫৬ এবং আন নাস, ৬। সূরা আর রাহমান তো পুরাটাই এ ব্যাপারে এমন অকাট্য প্রমাণ যে, জিনদের এক প্রকার মানুষ মনে করার কোন অবকাশই নেই। সূরা আ'রাফের ১২ আয়াত, সূরা হিজরের ২৬ ও ২৭ আয়াত এবং সূরা আর রাহমানের ১৪ ও ১৫ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টির মৌলিক উপাদান হলো মাটি আর জিন সৃষ্টির মৌলিক উপাদান হলো আগুন।

সূরা হিজরের ২৭ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টির পূর্বে জিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে। কুরআন মজীদের সাতটি স্থানে আদম ও ইবলীসের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এর সবগুলো স্থানের বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের সৃষ্টির সময় ইবলীস বর্তমান ছিল। এ ছাড়াও সূরা কাহ্‌ফের ৫০ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইবলীস জিনদেরই একজন।

সূরা আ'রাফের ২৭ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, জিনরা মানুষকে দেখতে পায় কিন্তু মানুষ জিনদের দেখতে পায় না।

সূরা হিজরের ১৭ থেকে ১৮, সূরা সাফ্‌ফাতের ৬ থেকে ১০ এবং সূরা মূলকের ৫ আয়াতে বলা হয়েছে, জিনেরা উর্ধ জগতের দিকে উঠতে সক্ষম হলেও একটি নির্দিষ্ট সীমার ওপরে তারা যেতে পারে না। এর উর্ধে যাওয়ার চেষ্টা করলে এবং উর্ধজগতে বিচরণকারী ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনতে চাইলে তাদের থামিয়ে দেয়া হয়। গোপনে দৃষ্টির অগোচরে শুনতে চাইলে উল্কাপিণ্ড ছুড়ে মেরে তাড়িয়ে দেয়া হয়। একথার মাধ্যমে আরবের মুশরিকদের একটি ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তাদের ধারণা ছিল জিনরা গায়েবী বিষয়ের খবর জানে অথবা খোদায়ীর গোপন তত্ত্বসমূহ জানার কোন উপায় তাদের জানা আছে। সূরা সাবার ১৪ আয়াতেও এ ভ্রান্ত ধারণা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

সূরা বাকারার ৩০ থেকে ৩৪ আয়াত এবং সূরা কাহ্‌ফের ৫০ আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর খেলাফত দিয়েছেন মানুষকে। এও জানা যায় যে, মানুষ জিনদের চেয়ে উত্তম মাখলুক যদিও জিনদের কিছু অস্বাভাবিক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আমরা সূরা নাম্‌লের ৭ আয়াতে এর একটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। কিন্তু মানুষের তুলনায় পশুরাও কিছু অধিক ক্ষমতা লাভ করেছে। কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, পশুরা মানুষের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী।

কুরআন একথাও বলে যে, জিনরাও মানুষের মত একটি মাখলুক। তাদেরকেও মানুষের মত স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ইবলীসের কাহিনী এবং সূরা আহ্‌কাফ ও সূরা জিনে উল্লেখিত কিছু সংখ্যক জিনের ঈমান আনার ঘটনা এর সুস্পষ্ট প্রমাণ।

কুরআনের বহু জায়গায় এ সত্যটিও বর্ণনা করা হয়েছে যে, আদমকে সৃষ্টি করার মুহূর্তেই ইবলীস এ মর্মে দৃঢ় সংকল্প করেছিল যে, সে মানব জাতিকে গোমরাহ, বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। সে সময় থেকেই জিনদের শয়তানরা মানুষকে গোমরাহীর মধ্যে ঠেলে দেয়ার চেষ্টায় লেগে আছে। কিন্তু মানুষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে জবরদস্তিমূলকভাবে কোন কাজ করিয়ে নেয়ার সামর্থ তারা রাখে না। বরং তারা তা মনের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে, তাদের বিভ্রান্ত করে এবং অন্যায় ও গোমরাহীকে তাদের সামনে শোভনীয় করে পেশ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্ন বর্ণিত আয়াতগুলো পাঠ করুন। সূরা নিসা, আয়াত ১১৭ থেকে ১২০; আ'রাফ, ১১ থেকে ১৭ পর্যন্ত; ইবরাহীম ২২; আল হিজ্‌র ৩০ থেকে ৪২; আন নাহল, ৯৮ থেকে ১০০ এবং বনী ইসরাঈল, ৬১ থেকে ৬৫ আয়াত পর্যন্ত।

কুরআন শরীফে একথাও বলা হয়েছে যে, আরবের মুশরিকরা জাহেলী যুগে জিনদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করতো, তাদের ইবাদাত বা পূজা-অর্চনা করতো এবং তাদেরকে আল্লাহর বংশধর বা সন্তান-সন্ততি মনে করতো। দেখুন, সূরা আল আন'আম, আয়াত ১০০; সাবা, আয়াত ৪০ থেকে ৪১ এবং আস্ সাফ্‌ফাত, আয়াত ১৫৮।

এসব বিশদ আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, জিনরা একটা স্বতন্ত্র বহিঃসত্তার অধিকারী এবং তারা মানুষের থেকে ভিন্ন প্রজাতির আরেকটি অদৃশ্য সৃষ্টি। তাদের রহস্যজনক গুণাবলী ও বৈশিষ্টের কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদের অস্তিত্ব ও শক্তি-সামর্থ সম্পর্কে কিছু অতিরঞ্জিত ধারণা পোষণ করে আসছিলো এমনকি তাদের পূজা করতে শুরু করেছিল। কিন্তু কুরআন তাদের ব্যাপারে প্রকৃত সত্য একেবারে খোলাসা করে বলে দিয়েছে যা থেকে তারা কি এবং কি নয় তা ভালভাবে জানা যায়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

জিনদের একটি দল কুরআন মজীদ শোনার পর তার কি প্রভাব গ্রহণ করেছিল এবং ফিরে গিয়ে নিজ জাতির অন্যান্য জিনদের কি কি কথা বলেছিল, এ সূরার প্রথম আয়াত থেকে ১৫ আয়াত পর্যন্ত তা-ই বলা হয়েছে। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা তাদের সব কথাবার্তা এখানে উল্লেখ করেননি। বরং উল্লেখযোগ্য বিশেষ বিশেষ কথাগুলোই উল্লেখ

করেছেন। তাই বর্ণনাভঙ্গী ধারাবাহিক কথাবার্তা বলার মত নয়। বরং তাদের বিভিন্ন উক্তি এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, তারা এরূপ এরূপ কথা বলেছে। জিনদের মুখ থেকে উচ্চারিত এসব উক্তি যদি মানুষ গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ে তাহলে সহজেই একথা বুঝা যাবে যে, তাদের ঈমান আনার এ ঘটনা এবং নিজ জাতির সাথে কথোপকথন কুরআন মজীদে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি যে টীকা লিখেছি তাতে তাদের উক্তিসমূহের যে ব্যাখ্যা পেশ করেছি এ উদ্দেশ্য বুঝতে তা আরো অধিক সাহায্য করবে।

তারপর ১৬ থেকে ১৮ পর্যন্ত আয়াতে লোকদের বুঝানো হয়েছে যে, তারা যদি শির্ক পরিত্যাগ করে এবং সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে অবিচল থাকে তাহলে তাদের প্রতি অজস্র নিয়ামত বর্ষিত হবে। অন্যথায় আল্লাহর পাঠানো এ উপদেশবাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরিণামে তারা কঠিন আযাবের মধ্যে নিপতিত হবে। অতপর ১৯ থেকে ২৩ পর্যন্ত আয়াতে মক্কার কাফেরদের তিরস্কার করা হয়েছে। কারণ আল্লাহর রসূল যখন আল্লাহর দিকে উচ্চকণ্ঠে আহবান জানান তখন তারা তার ওপরে হামলা করতে উদ্যত হয়। অথচ আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দেয়াই রসূলের দায়িত্ব। তিনি তো এ দাবী করছেন না যে, মানুষের ভালমন্দ এবং কল্যাণ ও অকল্যাণ তারই ইখতিয়ারে। এরপর ২৪ ও ২৫ আয়াতে কাফেরদের এ মর্মে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে যে, আজ তারা রসূলকে বন্ধুহীন ও অসহায় দেখে অবদমিত করে রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন তারা জানতে পারবে, প্রকৃতপক্ষে বন্ধুহীন ও অসহায় কারা? সে সময়টি দূরে না নিকটে রসূল তা জানেন না। কিন্তু সেটি অবশ্যই আসবে। সব শেষে লোকদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে, 'আলেমুল গায়েব' বা গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই আছে। রসূল শুধু ততটুকুই জানতে পারেন যতটুকু আল্লাহ তাঁকে জানান। এ জ্ঞানও হয় রিসালাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সম্পর্কিত বিষয়ে। এমন সুরক্ষিত পন্থায় রসূলকে এ জ্ঞান দেয়া হয় যার মধ্যে বাইরে থেকে হস্তক্ষেপের আদৌ কোন সম্ভাবনা থাকে না।

আয়াত ২৮ **সূরা আল জিন–মক্কী** রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۙ﴿١﴾
يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ۭ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۙ﴿٢﴾ وَّاَنَّهُ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا
مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۙ﴿٣﴾ وَّاَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَي اللّٰهِ شَطَطًا ۙ﴿٤﴾
وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَي اللّٰهِ كَذِبًا ۙ﴿٥﴾ وَّاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ
مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۙ﴿٦﴾

হে নবী, বল, আমার কাছে অহী পাঠানো হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে শুনেছে।[১] তারপর (ফিরে গিয়ে নিজ জাতির লোকদেরকে) বলেছেঃ

"আমরা এক বিস্ময়কর 'কুরআন' শুনেছি[২] যা সত্য ও সঠিক পথের নির্দেশনা দেয় তাই আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি এবং আমরা আর কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করবো না।"[৩]

আর "আমাদের রবের মর্যাদা অতীব সমুচ্চ। তিনি কাউকে স্ত্রী কিংবা সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেননি।"[৪]

আর "আমাদের নির্বোধ লোকেরা[৫] আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ও ন্যায়ের পরিপন্থী অনেক কথাবার্তা বলে আসছে।"

আর "আমরা মনে করেছিলাম যে, মানুষ এবং জিন আল্লাহ সম্বন্ধে কখনো মিথ্যা বলতে পারে না।"[৬]

আর "মানুষের মধ্য থেকে কিছু লোক জিনদের কিছু লোকের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতো। এভাবে তারা জিনদের অহংকার আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।"[৭]

১. এ থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় জিনদের দেখতে পাচ্ছিলেন না এবং তারা যে কুরআন শুনছে একথাও তাঁর জানা ছিল না। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অহীর মাধ্যমে এ ঘটনা জানিয়ে দিয়েছেন। এ ঘটনাটি বর্ণনা প্রসংগে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সে সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিনদের উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করেননি এবং তিনি তাদের দেখেনওনি।" (মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর)

২. মূল আয়াতে قُرْاٰنًا عَجَبًا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'কুরআন' মানে পড়ার মত জিনিস। জিনেরা সম্ভবত শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহার করেছিল। কারণ তখন তারা প্রথম বারের মত এ বাণীর সাথে পরিচিত হয়েছিল। সে সময় হয়তো তাদের জানা ছিল না যে, যে জিনিস তারা শুনছে তার নামই কুরআন। عجب আধিক্য অর্থনির্দেশক একটি শব্দ। আরবী ভাষায় শব্দটি ব্যবহৃত হয় অত্যধিক বিস্ময়কর ব্যাপার বুঝাতে। সুতরাং জিনদের উক্তির অর্থ হলো, আমরা এমন একটি বাণী শুনে এসেছি যা ভাষাগত উৎকর্ষতা ও বিষয়বস্তু হিসেবে অতুলনীয়।

এ থেকে জানা যায় যে, জিনরা শুধু মানুষের কথা শুনতে পারে তাই নয়, তারা মানুষের ভাষাও ভালভাবে বুঝতে পারে। তবে এটা জরুরী নয় যে, সব জিন মানুষের সব ভাষাই জানবে বা বুঝবে। সম্ভবত তাদের যে গোষ্ঠী পৃথিবীর যে এলাকায় বসবাস করে তারা সে এলাকার মানুষের ভাষা জানে। তবে কুরআনের এ বক্তব্য থেকে একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঐ সময় যেসব জিন কুরআন শুনেছিল তারা আরবী ভাষায় এত দক্ষ ছিল যে, তারা এ বাণীর অতুলনীয় ভাষাগত উৎকর্ষ পর্যন্ত উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল এবং এর উচ্চমানের বিষয়বস্তুও ভালভাবে বুঝতে পেরেছিল।

৩. এ থেকে কয়েকটি বিষয় জানা গেল। এক, জিনরা আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর 'রব' হওয়াকে অস্বীকার করে না। দুই, তাদের মধ্যেও মুশরিক আছে যারা মুশরিক মানুষের মত অন্য জিনিসকে আল্লাহর উলুহিয়াতের মধ্যে শরীক করে। তাই জিনদের যে কওমের সদস্যরা কুরআন মজীদ শোনার পর কওমের কাছে ফিরে গিয়েছিল তারাও ছিল মুশরিক। তিন, নবুওয়াত এবং আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল হওয়ার ধারা জিনদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। বরং তাদের মধ্যে যেসব জিন ঈমান আনে তারা মানুষের মধ্যে প্রেরিত নবী এবং তাদের আনীত কিতাবসমূহের ওপর-ই ঈমান আনে। একথাটি সূরা আহ্কাফের ২৯-৩১ আয়াত থেকেও জানা যায়। ঐ আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, সে সময় যেসব জিন কুরআন শুনেছিল তারা হযরত মূসার অনুসারী ছিল। তারা কুরআন শোনার পর নিজের কওমকে এ মর্মে দাওয়াত দিয়েছিল যে, এখন আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বাণী এসেছে এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রতিপন্ন করছে তার ওপর ঈমান আনো। সূরা আর রাহমানও এ বিষয়টিই প্রমাণ করে। কারণ তার পুরা বক্তব্যই স্পষ্ট করে দেয় যে, মানুষ ও জিন শুধু এ দু'টি সৃষ্টিই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের ক্ষেত্র ছিল।

৪. এখান থেকে দু'টি বিষয় জানা গেল। এ জিনগুলো হয় ঈসায়ী বা খৃষ্ট ধর্মের অনুসারী ছিল অথবা অন্য এমন কোন ধর্মের অনুসারী ছিল যে ধর্মে মহান আল্লাহর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে আছে বলে বিশ্বাস করা হতো। দুই, সে সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۝٧ وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ
فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا ۝٨ وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ
فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۝٩ وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْٓ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ
فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝١٠ وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ
كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ۝١١ وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۝١٢

আর "তোমরা যেমন ধারণা পোষণ করতে মানুষেরাও ঠিক তেমনি ধারণা পোষণ করেছিল যে, আল্লাহ কাউকে রসূল বানিয়ে পাঠাবেন না।"[৮]

আর "আমরা আসমানে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছি, তা কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা পরিপূর্ণ।"

আর "ইতিপূর্বে আমরা ছিটেফোটা কিছু আড়ি পেতে শোনার জন্য আসমানে বসার জায়গা পেয়ে যেতাম। কিন্তু এখন কেউ গোপনে শোনার চেষ্টা করলে সে তার নিজের বিরুদ্ধে নিক্ষেপের জন্য একটা উল্কা নিয়োজিত দেখতে পায়।[৯]

আর আমাদের বোধগম্য হচ্ছিল না যে, পৃথিবীবাসীদের সাথে কোন খারাপ আচরণ করার সংকল্প করা হয়েছে, নাকি তাদের প্রভু, তাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে চান?[১০]

আর আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক আছে নেক্‌কার আর কিছু লোক আছে তার চেয়ে নীচু পর্যায়ের। এভাবে আমরা বিভিন্ন মতে বিভক্ত[১১] ছিলাম।

আর আমরা মনে করতাম যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করে দিতে সক্ষম নই এবং পালিয়েও তাঁকে পরাভূত করতে পারবো না।[১২]

সাল্লাম নামাযের মধ্যে পবিত্র কুরআনের এমন কোন অংশ তিলাওয়াত করছিলেন যা শুনে তাদের কাছে নিজেদের আকীদার ভ্রান্তি ধরা পড়েছিল এবং তারা বুঝতে পেরেছিল যে, মহান আল্লাহর সমুন্নত ও অতি মর্যাদাবান সত্তার সাথে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে সম্পর্কিত করা চরম অজ্ঞতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ।

৫. মূল আয়াতে سَفِيْهُنَا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি এক ব্যক্তির জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে আবার অনেক লোক বা দলের জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে। যদি শব্দটি একজন অজ্ঞ বা মূর্খ লোক অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে তার মানে হবে ইবলীস। আর যদি

অনেক লোক বা দল অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে তার অর্থ হবে জিনদের মধ্য থেকে অনেক নির্বোধ ও বুদ্ধি-বিবেকহীন লোক এ রকম কথা বলতো।

৬. অর্থাৎ তাদের ভ্রান্ত কথাবার্তা দ্বারা আমাদের বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ হলো, আমরা কোন সময় চিন্তাও করতে পারিনি যে, মানুষ কিংবা জিন আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলার দুঃসাহসও করতে পারে। কিন্তু এখন এ কুরআন শুনে আমরা জানতে পেরেছি যে, প্রকৃত-পক্ষে তারা ছিল মিথ্যাবাদী।

৭. ইবনে আব্বাস বলেন ঃ জাহেলী যুগে আরবরা যখন কোন জনহীন প্রান্তরে রাত্রি যাপন করতো তখন উচ্চস্বরে বলতো, "আমরা এ প্রান্তরের অধিপতি জিনের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" জাহেলী যুগের অন্যান্য বর্ণনাতেও এ বিষয়টির বহুল উল্লেখ দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, কোন জায়গার পানি এবং ঘাস ফুরিয়ে গেলে মরুচারী যাযাবর বেদুইনরা তাদের একজন লোককে এমন আরেকটি জায়গা খুঁজে বের করতে পাঠাতো যেখানে পানি এবং ঘাস পাওয়া যেতে পারে। অতপর উক্ত ব্যক্তির নির্দেশনা মুতাবিক এসব লোক নতুন জায়গায় পৌঁছলে সেখানে অবস্থান নেয়ার আগে চিৎকার করে বলতো ঃ আমরা এ প্রান্তরের মালিকের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যাতে আমরা এখানে সব রকম বিপদ থেকে নিরাপদ থাকতে পারি।" তাদের বিশ্বাস ছিল, প্রত্যেক জনমানবহীন জায়গা কোন না কোন জিনের দখলে আছে। তার আশ্রয় প্রার্থনা ছাড়াই কেউ যদি সেখানে অবস্থান করে তাহলে সে জিন হয় নিজেই তাদের উত্যক্ত করে কিংবা অন্য জিনদের উত্যক্ত করার জন্য লেলিয়ে দেয়। ঈমান আনয়নকারী এ জিনরা এ বিষয়টির প্রতিই ইংগিত করেছে। তাদের কথার অর্থ হলো এ পৃথিবীর খলীফা বা প্রতিনিধি মানুষ। তারাই যখন উল্টা আমাদের ভয় করতে শুরু করেছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদের কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুরু করেছে তখন আমাদের জাতির লোকদের মস্তিষ্ক বিকৃতি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের গর্ব, অহংকার এবং কুফরী ও জুলুম অত্যাচারের মাত্রা অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে এবং গোমরাহীর ক্ষেত্রে তারা আরো বেপরোয়া হয়ে গিয়েছে।

৮. মূল ভাষ্য হচ্ছে اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا এ আয়াতাংশের দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি আমরা যা অনুবাদ করেছি। অপরটি হলো, "মৃত্যুর পর আল্লাহ তা'আলা কাউকে আর জীবিত করে উঠাবেন না।" যেহেতু কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক তাই তার এ অর্থও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, মানুষের মত জিনদের মধ্যে একদল আখেরাতকে অস্বীকার করতো। কিন্তু পরবর্তী বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যের দিক থেকে প্রথম অর্থটিই অধিক অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। কারণ, পরবর্তী আয়াতসমূহে এ বিষয়টির উল্লেখ আছে যে, ঈমান আনয়নকারী এসব জিন তাদের কওমকে বলছে, আল্লাহ আর কোন রসূল পাঠাবেন না। তোমাদের এ ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের জন্য আসমানের দরজা বন্ধ করার কারণ হলো আল্লাহ একজন রসূল পাঠিয়েছেন।

৯. এটাই সে কারণ যার ভিত্তিতে জিনরা এ বিষয়টি অনুসন্ধান করতে বেরিয়েছিল যে, পৃথিবীতে এমন কি ঘটনা ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে যার খবরাখবর সুরক্ষিত করার জন্য এমন কঠোর ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে এখন আমরা উর্ধ জগতের কোন খবর জানার সুযোগ পাই না এবং যেখানেই যাই আমাদের মেরে তাড়িয়ে দেয়া হয়।

وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰٓى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا
وَّلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾ وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا
رَشَدًا ﴿١٤﴾ وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾ وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى
الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ﴿١٦﴾ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ
يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾ وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ﴿١٨﴾
وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾

আর আমরা যখন হিদায়াতের বাণী শুনলাম তখন তার প্রতি ঈমান আনলাম। যে ব্যক্তিই তার রবের ওপর ঈমান আনবে তার অধিকার বিনষ্ট হওয়ার কিংবা অত্যাচারিত হওয়ার ভয় থাকবে না।[১৩]

আর আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক আছে মুসলমান (আল্লাহর আনুগত্যকারী) আর কিছু সংখ্যক আছে ন্যায় ও সত্য থেকে বিমুখ। তবে যারা ইসলাম (আনুগত্যের পথ) গ্রহণ করেছে তারা মুক্তির পথ খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছে। আর যারা ন্যায় ও সত্য থেকে বিমুখ তারা হবে জাহান্নামের ইন্ধন।[১৪]

আর[১৫] (হে নবী, বলে দাও, আমাকে অহীর মাধ্যমে এও জানানো হয়েছে যে,) লোকেরা যদি সঠিক পথের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতো তাহলে আমি তাদের প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম।[১৬] যাতে এ নিয়ামতের মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা করতে পারি।[১৭] আর যারা তাদের প্রভুর স্মরণ থেকে বিমুখ হবে[১৮] তিনি তাদের কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করবেন। আর মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য। তাই তোমরা আল্লাহর সাথে আর কাউকে ডেকো না।[১৯] আর আল্লাহর বান্দা[২০] যখন তাঁকে ডাকার জন্য দাঁড়ালো তখন তারা সবাই তার ওপর হামলা করতে উদ্যত হলো।

১০. এ থেকে জানা গেল যে, দু'টি পরিস্থিতিতে উর্ধ জগতে এ ধরনের অসাধারণ ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়ে থাকে। এক, আল্লাহ যদি পৃথিবীবাসীদের ওপর কোন আযাব নাযিল করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন এবং চান যে, তা নাযিল হওয়ার আগে জিনরা তার পূর্বাভাস পেয়ে তাদের মানুষ বন্ধুদের সাবধান করে না দিক। দুই, আল্লাহ যদি পৃথিবীতে কোন রসূল পাঠিয়ে থাকেন এবং তাঁর কাছে যেসব হিদায়াত ও বাণী পাঠানো হচ্ছে তাতে শয়তানরা

যাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে না পারে এবং রসূলের কাছে কি কি হিদায়াত বা বাণী পাঠানো হচ্ছে তা আগেভাগেই জেনে নিতে না পারে তার নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ কাম্য হয় তখন এ ধরনের অসাধারণ ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়। সুতরাং জিনদের একথাটির অর্থ হলো, আমরা যখন আসমানে এরূপ কঠোর প্রহরা দেখলাম এবং অজস্র উল্কা বর্ষণ লক্ষ করলাম তখন এ দু'টি অবস্থার কোন্‌টি সংঘটিত হচ্ছে আমাদের মধ্যে তা জানার উদ্বেগ সৃষ্টি হলো। আল্লাহ তা'আলা কি হঠাৎ করে পৃথিবীর কোন জাতির ওপর আযাব নাযিল করেছেন না কোন এলাকায় কোন রসূল পাঠিয়েছেন? এ বিষয়টি অনুসন্ধানেই আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম। এরি এক পর্যায়ে আমরা এ বিস্ময়কর বাণী শুনতে পেলাম যা সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান দান করে। এভাবে আমরা জানতে পেরেছি, আল্লাহ কোন আযাব নাযিল করেননি। বরং তাঁর সৃষ্টিকে সত্য ও সঠিক পথ দেখানোর জন্য একজন রসূল পাঠিয়েছন। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হিজ্‌র, টীকা ৮ থেকে ১২; সূরা সাফ্‌ফাত, টীকা ৭ এবং সূরা আল মুলক্‌, টীকা ১১)

১১. অর্থাৎ আমাদের মধ্যে নৈতিক চরিত্রের দিক থেকেও ভাল ও মন্দ দু' প্রকারের জিন আছে এবং আকীদা-বিশ্বাসের দিক থেকেও মত ও পথ একটি নয়। এ ক্ষেত্রেও আমরা বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত। একথা বলে ঈমান আনয়নকারী এসব জিন নিজ জাতির জিনদের বুঝাতে চাচ্ছিল যে, নিসন্দেহে আমরা সত্য ও সঠিক পথ খুঁজে বের করার মুখাপেক্ষী। এর প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

১২. অর্থাৎ আমাদের এ ধারণাই আমাদের মুক্তির পথ দেখিয়েছে। আমরা যেহেতু আল্লাহ সম্পর্কে নির্ভয় বা বেপরোয়া ছিলাম না এবং এ ব্যাপারে আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, যদি আমরা তাঁর অবাধ্য হই তাহলে তাঁর পাকড়াও থেকে কোন অবস্থায়ই বাঁচতে পারবো না। তাই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শনকারী বাণী শুনে ন্যায় ও সত্যকে জানার পরও অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকদের প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত আকীদা-বিশ্বাসকেই আঁকড়ে থাকার দুঃসাহস আমরা দেখাইনি।

১৩. অধিকার বিনষ্ট হওয়ার অর্থ হলো, নেক কাজের জন্য যতটা পারিশ্রমিক বা পুরস্কার পাওয়ার কথা তার চাইতে কম দেয়া। আর জুলুম বা অত্যাচার হলো নেক কাজের জন্য আদৌ কোন পারিশ্রমিক বা পুরস্কার না দেয়া এবং তার দ্বারা যে ত্রুটি বা অপরাধ হয়েছে তার তুলনায় অধিক শাস্তি দেয়া, কিংবা অপরাধ ছাড়াই কাউকে শাস্তি দেয়া। আল্লাহ তা'আলার দরবারে কোন ঈমানদারের প্রতি এ ধরনের কোন বেইনসাফী হওয়ার আশংকা থাকবে না।

১৪. কুরআনের ভাষ্য অনুসারে জিনেরা আগুন থেকে সৃষ্ট। তাই প্রশ্ন হতে পারে যে, জাহান্নামের আগুন দ্বারা তাদের আবার কি কষ্ট হবে? এর জবাব হলো, কুরআনের ভাষ্য অনুসারে মানুষও মাটি থেকে সৃষ্ট। তা সত্ত্বেও তাদের মাটির ঢিল ছুঁড়ে মারলে ব্যথা পায় কেন? প্রকৃত সত্য হলো মানুষের গোটা দেহ মাটির উপাদান দ্বারা তৈরী হলেও এসব উপাদান থেকে যখন একজন রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষ অস্তিত্ব লাভ করে তখন সে এসব উপাদান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিসে রূপান্তরিত হয় এবং একই উপাদান থেকে তৈরী অন্যান্য জিনিস তার কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক তেমনিভাবে গঠনাকৃতির দিক থেকে জিন যদিও আগুনের তৈরী। কিন্তু আগুন থেকে তৈরী একটি জীবন্ত ও চেতনা সম্পন্ন

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿٢٠﴾ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا
رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ
مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ
نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ
مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾

২ রুকূ'

হে নবী, বলো, "আমি শুধু আমার রবকেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না।"[২১] বলো, "আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করারও ক্ষমতা রাখি না, উপকার করারও না। বলো, আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেউ আমাকে বাঁচাতে সক্ষম নয় এবং তাঁর কাছে ছাড়া কোন আশ্রয়ও আমি পাব না। আল্লাহর বাণী ও হুকুম-আহকাম পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া আমার কাজ আর কিছুই নয়।[২২] এরপর যারাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা অমান্য করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। এ ধরনের লোকেরা চিরকাল সেখানে থাকবে।[২৩]

(এসব লোক তাদের এ আচরণ থেকে বিরত হবে না) এমনকি অবশেষে যখন তারা সে জিনিসটি দেখবে যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হচ্ছে, তখন তারা জানতে পারবে যে, কার সাহায্যকারী দুর্বল এবং কার দল সংখ্যায় কম।[২৪]

সৃষ্টি যখন অস্তিত্ব লাভ করে তখন সে আগুনই তার জন্যে কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আর রাহমান, টীক ১৫)

১৫. এর পূর্বে জিনদের কথা শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন এখান থেকে আল্লাহ তা'আলার নিজের কথা শুরু হচ্ছে।

১৬. একথাটিই সূরা নূহে এভাবে বলা হয়েছে, "তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তোমাদের ওপর আসমান থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন।" (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূহ, টীকা ২) প্রচুর পরিমাণ পানিকে নিয়ামতের প্রাচুর্য অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, পানির ওপর নির্ভর করেই জনবসতি গড়ে ওঠে। পানি না থাকলে আদৌ কোন জনপদ গড়ে উঠতে পারে না। পানি না থাকলে মানুষের মৌলিক প্রয়োজন যেমন পূরণ হয় না তেমনি মানুষের বিভিন্ন রকম শিল্পও গড়ে উঠতে পারে না।

১৭. অর্থাৎ তিনি দেখতে চান তারা নিয়ামতলাভ করার পর কৃতজ্ঞ থাকে কিনা এবং আমার দেয়া নিয়ামতসমূহ সঠিকভাবে কাজে লাগায়, না ভ্রান্ত পথে কাজে লাগায়।

১৮. স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার একটা অর্থ হলো, মানুষ আল্লাহর প্রেরিত উপদেশ গ্রহণ করবে না। আরেকটা অর্থ হলো, মানুষ আল্লাহর যিকরের কথা শোনা পছন্দই করবে না। এর আরেকটি অর্থ হলো, সে আল্লাহর ইবাদাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

১৯. মুফাস্‌সিরগণ مَسَاجِد শব্দটি সাধারণভাবে ইবাদাতখানা বা উপাসনালয় অর্থে গ্রহণ করেছেন ঃ 'মাসাজিদ' শব্দটির এ অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতটির অর্থ হয় 'উপাসনালয় সমূহে আল্লাহর ইবাদাতের সাথে সাথে আর কারো ইবাদাত যেন করা না হয়। হযরত হাসান বাস্‌রী বলেন ঃ সমস্ত পৃথিবীটাই ইবাদাতখানা বা উপাসনালয়। তাই আয়াতটির মূল বক্তব্য হলো আল্লাহর এ পৃথিবীতে কোথাও যেন শিরক করা না হয়। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণী থেকে প্রমাণ পেশ করেছেন وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا আমার জন্য সমগ্র পৃথিবীকে ইবাদাতের স্থান এবং পবিত্রতা অর্জনের উপায় বানিয়ে দেয়া হয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর মসজিদ বলতে যেসব অংগ-প্রত্যংগের সাহায্যে মানুষ সিজদা করে সেগুলো অর্থাৎ হাত, হাঁটু, পা ও কপাল বুঝিয়েছেন। এ ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতটির অর্থ হলো, সমস্ত অংগ-প্রত্যংগ আল্লাহর তৈরী। এগুলোর সাহায্যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করা যাবে না।

২০. এখানে আল্লাহর বান্দা অর্থ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

২১. অর্থাৎ আল্লাহকে ডাকা এমন কোন আপত্তিকর কাজ নয় যার জন্য মানুষ এতটা রাগান্বিত ও উত্তেজিত হয়ে পড়বে। তবে কেউ যদি আল্লাহর সাথে তাঁর প্রভুত্ব ও উলুহিয়্যাতের ব্যাপারে কাউকে শরীক করে তাহলে তা নিসন্দেহে খারাপ! আর এ কাজ আমি করিনি। বরং যারা আল্লাহর নাম শুনে আমার ওপর হামলা করতে চায় তারাই এ কাজ করছে।

২২. অর্থাৎ আমি কখনো এ দাবী করি না যে, আল্লাহর প্রভুত্বে আমার কোন দখলদারী বা কর্তৃত্ব আছে। কিংবা মানুষের ভাগ্য ভাঙা বা গড়ার ব্যাপারে আমার কোন ক্ষমতা আছে। আমি তো আল্লাহর একজন রসূল মাত্র। আমার ওপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তা তোমাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার বাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার অধিক আর কিছুই নয়। আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ব্যাপার তো পুরোপুরি আল্লাহরই করায়ত্ব। অন্য কারো কল্যাণ বা ক্ষতি সাধন তো দূরের কথা নিজের ক্ষতি ও কল্যাণের ব্যাপারটিও আমার নিজের ইচ্ছাধীন নয়। আমি যদি আল্লাহর নাফরমানী করি তাহলে তাঁর পাকড়াও থেকে আত্মরক্ষা করে কোথাও আশ্রয় লাভ করতে পারবো না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে ছাড়া আমার আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আশ্ শূরা, টীকা ৭)

২৩. এর অর্থ এই নয় যে, প্রতিটি গোনাহ ও অপরাধের শাস্তিই হচ্ছে চিরস্থায়ী জাহান্নাম। বরং যে প্রসংগে একথাটি বলা হয়েছে তার আলোকে আয়াতের অর্থ হলো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে তাওহীদের যে আহবান জানানো হয়েছে তা যে ব্যক্তি

قُلْ إِنْ أَدْرِيٓ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُۥ رَبِّيٓ أَمَدًا ﴿٢٥﴾ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ
فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ
مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا۟ رِسَٰلَٰتِ
رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

বলো, আমি জানি না, যে জিনিসের প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে তা নিকটে, না তার জন্য আমার রব কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করছেন।[২৫] তিনি গায়েবী বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তাঁর গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না।[২৬] তবে যে রসূলকে (গায়েবী বিষয়ের কোন জ্ঞান দেয়ার জন্য) মনোনীত করেছেন[২৭] তাকে ছাড়া। তিনি তার সামনে ও পেছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন।[২৮] যাতে তিনি নিশ্চিতরূপে জানতে পারেন যে, রসূলগণ তাদের রবের বাণীসমূহ পৌঁছিয়ে দিয়েছেন[২৯] তিনি তাদের গোটা পরিবেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। আর তিনি প্রতিটি জিনিস গুণে গুণে হিসেব করে রেখেছেন।[৩০]

মানবে না এবং শির্ককেও বর্জন করবে না তার জন্য অবধারিত আছে জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি।

২৪. এ আয়াতটির পটভূমি হলো, সে যুগে যেসব লোক আল্লাহর পথের দিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহবান শুনেই তাঁর ওপর মারমুখী হতো তারা এ খোশ খেয়ালে নিমগ্ন ছিল যে, তাদের দলবলই বড়। অপরদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আছে আঙুলে গোণা কয়েকজন লোক। সুতরাং তারা অতি সহজেই তাকে পরাভূত করতে সক্ষম হবে। তাই বলা হচ্ছে, আজ এসব লোক রসূলকে (স) অসহায় ও বন্ধুহীন এবং নিজেদের সংখ্যাধিক্য দেখে ন্যায় ও সত্যের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে দুঃসাহস দেখাচ্ছে। কিন্তু যে সময় সম্পর্কে তাদের সাবধান করে দেয়া হচ্ছে সে দুঃসময়টি যখন আসবে, তখন তারা বুঝতে পারবে প্রকৃত পক্ষে অসহায় ও বন্ধুহীন কারা।

২৫. বর্ণনাভঙ্গী থেকেই বুঝা যায়, এটি একটি প্রশ্নের জওয়াব। এখানে প্রশ্নটি উল্লেখ না করে শুধু তার জবাব দেয়া হয়েছে। সম্ভবত ওপরে উল্লেখিত কথা শুনে বিরোধীরা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে প্রশ্ন করে থাকবে যে, যে সময়ের ভয় তিনি দেখাচ্ছেন সে সময়টি কখন আসবে? তার জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদের বলো, সে সময়টির আগমন তো নিশ্চিত, তবে তার আগমনের দিনক্ষণ আমাকে জানানো হয়নি। সে সময়টি অতি আসন্ন, না তার জন্য দীর্ঘ সময় নির্দিষ্ট রয়েছে তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

২৬. অর্থাৎ গায়েবী বিষয়ের সবটুকু জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। গায়েবী বিষয়ের এ পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান তিনি কাউকেই দেন না।

২৭. অর্থাৎ রসূল নিজে 'আলেমুল গায়েব' বা গায়েবী বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী নন। বরং আল্লাহ তা'আলা যখন তাকে রিসালাতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য মনোনীত করেন তখন তিনি ইচ্ছামত তাঁকে অদৃশ্য বস্তুসমূহের জ্ঞান দান করেন।

২৮. প্রহরী মানে ফেরেশতা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন অহীর মাধ্যমে গায়েবী বিষয়ের গভীর জ্ঞান ও তাৎপর্য তাঁর রসূলের কাছে পাঠান তখন তার রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারাদারীর জন্য সবখানে ফেরেশতা মোতায়েন করেন। যাতে সে জ্ঞানটি অত্যন্ত সুরক্ষিত পন্থায় রসূলের কাছে পৌছতে পারে এবং তার মধ্যে বাইরের কোন কিছু সংমিশ্রিত হতে না পারে। ওপরে ৮ ও ৯নং আয়াতে একথাটিই বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পর জিনরা দেখলো তাদের উর্ধ জগতে প্রবেশের সব পথ বন্ধ। তারা দেখলো সব জায়গায় কঠোর প্রহরা বসানো হয়েছে যার কারণে ছিটে ফোঁটা কিছু আভাস লাভের সুযোগও তাদের নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

২৯. এর তিনটি অর্থ হতে পারে। এক, রসূল নিশ্চিতভাবে জানবেন যে, ফেশেতারা তাঁর কাছে আল্লাহ তা'আলার বাণীসমূহ ঠিক ঠিক পৌছিয়ে দিয়েছে। দুই, আল্লাহ তা'আলা জানবেন যে, ফেরেশতারা তাদের রবের বাণীসমূহ তাঁর রসূলের কাছে সঠিকভাবে পৌছিয়ে দিয়েছে। তিন, আল্লাহ তা'আলা জানবেন যে, রসূলগণ তাঁদের রবের বাণীসমূহ তাঁর বান্দাদের কাছে ঠিকমত পৌছিয়ে দিয়েছেন। আয়াতটির শব্দমালা এ তিনটি অর্থেরই ধারক। অসম্ভব নয় যে, এখানে যুগপৎ এ তিনটি অর্থই বুঝানো হয়েছে। এ ছাড়াও আয়াতটির আরো দু'টি অর্থ হয়। প্রথমটি হলো রিসালাতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য রসূলকে যতটুকু 'ইলমে গায়েব' বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করা জরুরী ততটুকু জ্ঞান দান করা। দ্বিতীয়টি হলো, যেসব ফেরেশতাকে প্রহরা কাজে নিয়োজিত করা হয় তারা রসূল পর্যন্ত সুরক্ষিত পন্থায় অহী পৌছে যাওয়ার ব্যাপারটুকুই শুধু তত্বাবধান করেন না বরং রসূল তাঁর রবের বাণীসমূহ তাঁর বান্দাদের কাছে যাতে পুরোপুরি পৌছিয়ে দিতে পারেন তার তত্বাবধানও করে থাকেন।

৩০. অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমতা রসূল ও ফেরেশতা উভয়কে এমনভাবে পরিব্যাপ্ত করে আছে যে, তারা যদি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চুল পরিমাণ কাজও করেন তাহলে সংগে সংগে পাকড়াও হবেন। আর যে বাণীসমূহ আল্লাহ পাঠান তার প্রতিটি বর্ণ গোণা ও হিসেব করা। তার একটি বর্ণের হ্রাস-বৃদ্ধি করার ক্ষমতাও রসূল বা ফেরেশতা কারো নেই।

আল মুয্যাম্মিল

৭৩

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের المزمل শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এটা শুধু সূরাটির নাম, এর বিষয়বস্তুর শিরোনাম নয়।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার দু'টি রুকূ' দু'টি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে।

প্রথম রুকূ'র আয়াতগুলো মক্কায় নাযিল হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। এর বিষয়বস্তু এবং বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা থেকেও তা বুঝা যায়। তবে প্রশ্ন থেকে যায় যে, মক্কী জীবনের কোন্ পর্যায়ে তা নাযিল হয়েছিল? হাদীসের বর্ণনাসমূহ থেকে আমরা এর কোন জবাব পাই না। তবে পুরো রুকূ'টির বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারা এর নাযিল হওয়ার সময়-কাল নির্ণয় করতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়।

প্রথমত, এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাতের বেলা উঠে আল্লাহর ইবাদাত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে তাঁর মধ্যে নবুওয়াতের গুরু দায়িত্ব বহনের শক্তি সৃষ্টি হয়। এ থেকে জানা গেল যে, এ নির্দেশটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের প্রথম যুগে এমন এক সময় নাযিল হয়ে থাকবে যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ পদমর্যাদার জন্য তাঁকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল।

দ্বিতীয়ত, এর মধ্যে তাঁকে তাহাজ্জুদ নামাযে অর্ধেক রাত কিংবা তার চেয়ে কম বা বেশী রাত পর্যন্ত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তখন পর্যন্ত কুরআন মজীদের অন্তত এতটা পরিমাণ নাযিল হয়েছিল যা দীর্ঘক্ষণ তিলাওয়াত করা যেতো।

তৃতীয়ত, এ রুকূ'তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিরোধীদের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণের উপদেশ এবং মক্কার কাফেরদের আযাবের হুমকি দেয়া হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ রুকূ'টি যখন নাযিল হয়েছিল তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের প্রকাশ্য তাবলীগ বা প্রচার শুরু করে দিয়েছিলেন এবং মক্কায় তাঁর বিরোধিতাও তীব্রতা লাভ করেছিল।

দ্বিতীয় রুকূ' সম্পর্কে মুফাস্সিরগণ যদিও বলেছেন যে, এটিও মক্কায় নাযিল হয়েছে। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুফাস্সির একে মদীনায় অবতীর্ণ বলে মত ব্যক্ত করেছেন। এ রুকূ'টির বিষয়বস্তু থেকে এ মতটিরই সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ এর মধ্যে আল্লাহর পথে লড়াই করার উল্লেখ আছে। মক্কায় এর কোন প্রশ্নই ছিল না। এতে ফরযকৃত যাকাত আদায়

করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এটা প্রমাণিত বিষয় যে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের ওপর একটি নির্দিষ্ট হারে যাকাত দেয়া মদীনাতে ফরয হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

প্রথম সাতটি আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে মহান কাজের গুরু দায়িত্ব আপনাকে দেয়া হয়েছে তার দায়-দায়িত্ব ঠিকমত পালনের জন্য আপনি নিজেকে প্রস্তুত করুন। এর বাস্তব পন্থা বলা হয়েছে এই যে, আপনি রাতের বেলা উঠে অর্ধেক রাত কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশী সময় বা কিছু কম সময় পর্যন্ত নামায পড়ুন।

৮ থেকে ১৪নং পর্যন্ত আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের অধিপতি আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়ে যান। নিজের সমস্ত ব্যাপার তাঁর কাছে সোপর্দ করে দিয়ে নিঃশংক ও নিশ্চিন্ত হয়ে যান। বিরোধীরা আপনার বিরুদ্ধে যা বলছে সে ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করুন, তাদের কথায় ভ্রুক্ষেপ করবেন না। তাদের ব্যাপারটা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিন। তিনিই তাদের সাথে বুঝাপড়া করবেন।

এরপর ১৫ থেকে ১৯ নম্বর পর্যন্ত আয়াতে মক্কার যে সমস্ত মানুষ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করছিলো তাদের এ বলে হুঁশিয়ারী দেয়া হয়েছে যে, আমি যেমন ফেরাউনের কাছে রসূল পাঠিয়েছিলাম ঠিক তেমনি তোমাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি। কিন্তু দেখো, আল্লাহর রসূলের কথা না শুনে ফেরাউন কিরূপ পরিণামের সম্মুখীন হয়েছিল। মনে করো, এ জন্য দুনিয়াতে তোমাদের কোন শাস্তি দেয়া হলো না। কিন্তু কিয়ামতের দিনের শাস্তি থেকে তোমরা কিভাবে নিষ্কৃতি লাভ করবে?

এ পর্যন্ত যা বর্ণিত হলো তা প্রথম রুকূ'র বিষয়বস্তু। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়েরের বর্ণনা অনুসারে এর দশ বছর পর দ্বিতীয় রুকূ'টি নাযিল হয়েছিল। তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে প্রথম রুকূ'র শুরুতেই যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এতে তা সহজ করে দেয়া হয়েছে। এখন নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তাহাজ্জুদ নামায যতটা সহজে ও স্বাচ্ছন্দে আদায় করা সম্ভব সেভাবেই আদায় করবে। তবে মুসলমানদের যে বিষয়টির প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে তাহলো, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায পূর্ণ নিয়মানুবর্তিতাসহ আদায় করবে। যাকাত যেহেতু ফরয তাই তা যথাযথভাবে আদায় করবে এবং আল্লাহর পথে নিজের অর্থ-সম্পদ বিশুদ্ধ নিয়তে খরচ করবে। সবশেষে মুসলমানদের উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়াতে তোমরা যেসব কল্যাণমূলক কাজ আঞ্জাম দেবে তা ব্যর্থ হবে না। বরং তা এমন সব সাজ-সরঞ্জামের মত যা একজন মুসাফির তার স্থায়ী বাসস্থানে আগেই পাঠিয়ে দেয়। আল্লাহর কাছে পৌছার পর তোমরা তার সবকিছুই পেয়ে যাবে যা দুনিয়া থেকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলে। আগেভাগেই পাঠিয়ে দেয়া এসব সরঞ্জাম-সামগ্রী তোমরা দুনিয়াতে যা ছেড়ে যাবে তার চেয়ে যে শুধু ভাল তাই নয়, বরং আল্লাহর কাছে তোমরা তোমাদের আসল সম্পদের চেয়ে অনেক বেশী পুরস্কারও লাভ করবে।

আয়াত ২০ | সূরা আল মুয্যাম্মিল—মক্কী | রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ﴿١﴾ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ﴿٢﴾ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۙ﴿٣﴾ اَوْ زِدْ
عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۭ﴿٤﴾ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ﴿٥﴾ اِنَّ نَاشِئَةَ
الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ۭ﴿٦﴾ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۭ﴿٧﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ
رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۭ﴿٨﴾

হে বস্ত্র মুড়ি দিয়ে শয়নকারী[১] রাতের বেলা নামাযে রত থাকো। তবে কিছু সময় ছাড়া[২] অর্ধেক রাত, কিংবা তার চেয়ে কিছু কম করো। অথবা তার ওপর কিছু বাড়িয়ে নাও।[৩] আর কুরআন থেমে থেমে পাঠ করো।[৪] আমি অতি শীঘ্র তোমার ওপর একটি গুরুভার বাণী নাযিল করবো।[৫] প্রকৃতপক্ষে রাতের বেলা জেগে ওঠা[৬] প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক বেশী কার্যকর[৭] এবং যথাযথভাবে কুরআন পড়ার জন্য উপযুক্ত সময়[৮] দিনের বেলা তো তোমার অনেক ব্যস্ততা রয়েছে। নিজ প্রভুর নাম স্মরণ করতে থাকো[৯] এবং সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরই জন্য হয়ে যাও।

১. এ শব্দগুলো দ্বারা আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন রাতের বেলা ওঠেন এবং ইবাদাতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, সে সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন অথবা ঘুমানোর জন্য চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। এ সময় তাঁকে হে নবী (স) অথবা হে রসূল বলে সম্বোধন না করে হে বস্ত্র মুড়ি দিয়ে শয়নকারী বলে সম্বোধন একটি তাৎপর্যপূর্ণ সম্বোধন। এর যে অর্থ দাঁড়ায় তা হলো, এখন আর সে সময় নেই যখন তিনি নিশ্চিন্তে আরামে ঘুমাতেন। এখন তাঁর ওপর এমন এক বিরাট কাজের বোঝা চাপানো হয়েছে যার দাবী ও চাহিদা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

২. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, নামাযে দাঁড়িয়ে রাত অতিবাহিত করো এবং রাতের অল্প কিছু সময় মাত্র ঘুমে কাটাও। দুই, তোমার কাছে সমস্ত রাতই নামায পড়ে কাটিয়ে দেয়ার দাবী করা হচ্ছে না। বরং তুমি বিশ্রামও করো এবং রাতের একটা ক্ষুদ্র

অংশ ইবাদাত-বন্দেগীতেও ব্যয় করো। কিন্তু পরবর্তী বিষয়বস্তুর সাথে প্রথমোক্ত অর্থটাই অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। সূরা দাহরের ২৬নং আয়াত থেকে একথারই সমর্থন পাওয়া যায়। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيْلاً

"রাতের বেলা আল্লাহর সামনে সিজদায় পড়ে থাকো এবং রাতের বেশীর ভাগ সময় তাঁর তাসবীহ ও প্রশংসায় অতিবাহিত করো।"

৩. যে সময়টুকু ইবাদাত করে কাটাতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল সে সময়ের পরিমাণ কি হবে এটা তারই ব্যাখ্যা। এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তিনি ইচ্ছা করলে অর্ধেক রাত নামায পড়ে কাটাতে পারেন কিংবা তার চেয়ে কিছু কম বা বেশী করতে পারেন। তবে বাচনভঙ্গী থেকে বুঝা যায় যে, অর্ধেক রাত-ই অগ্রাধিকারযোগ্য। কারণ অর্ধেক রাতকে মানদণ্ড নির্ধারিত করে তার থেকে কিছু কম বা তার চেয়ে কিছু বেশী করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে।

৪. অর্থাৎ তাড়াতাড়ি ও দ্রুতগতিতে পড়ো না। বরং ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ সুন্দরভাবে মুখে উচ্চারণ করে পড়ো। এক একটি আয়াত পড়ে থেমে যাও যাতে মন আল্লাহর বাণীর অর্থ ও তার দাবীকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে এবং তার বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হয়। কোন জায়গায় আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর উল্লেখ থাকলে তার মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও ভীতি যেন মনকে ঝাঁকুনি দেয়। কোন জায়গায় তাঁর রহমত ও করুণার বর্ণনা আসলে হৃদয়-মন যেন কৃতজ্ঞতার আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠে। কোন জায়গায় তাঁর গযব ও শাস্তির উল্লেখ থাকলে হৃদয়-মন যেন তার ভয়ে কম্পিত হয়। কোথাও কোন কিছু করার নির্দেশ থাকলে কিংবা কোন কাজ করতে নিষেধ করা হয়ে থাকলে কি কাজ করতে আদেশ করা হয়েছে এবং কোন্ কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে তা যেন ভালভাবে বুঝে নেয়া যায়। মোট কথা কুরআনের শব্দগুলো শুধু মুখ থেকে উচ্চারণ করার নাম কুরআন পাঠ নয়, বরং মুখ থেকে উচ্চারণ করার সাথে সাথে তা উপলব্ধি করার জন্য গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনাও করতে হবে। হযরত আনাসকে (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কুরআন পাঠের নিয়ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শব্দগুলোকে টেনে টেনে পড়তেন। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়ে বললেন যে, তিনি আল্লাহ, রাহমান এবং রাহীম শব্দকে মদ্দ করে বা টেনে পড়তেন। (বুখারী) হযরত উম্মে সালামাকে একই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক একটি আয়াত আলাদা আলাদা করে পড়তেন এবং প্রতিটি আয়াত পড়ে থামতেন। যেমন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ পড়ে থামতেন, তারপর الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ে থামতেন এবং কিছু সময় থেমে থেকে مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ পড়তেন। (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী) আরেকটি রেওয়ায়াতে হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একেকটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে পড়তেন। (তিরমিযী, নাসায়ী) হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান বর্ণনা করেছেন যে, একদিন রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়তে দাঁড়ালাম। আমি দেখলাম, তিনি

এমনভাবে কুরআন তেলাওয়াত করছেন যে, যেখানে তাসবীহের বিষয় আসছে সেখানে তিনি তাসবীহ পড়ছেন, যেখানে দোয়ার বিষয় আসছে সেখানে দোয়া করছেন এবং যেখানে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার বিষয় আসছে সেখানে তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। (মুসলিম, নাসায়ী) হযরত আবু যার বর্ণনা করেছেন যে, একবার রাতের নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ আয়াতটির কাছে পৌঁছলেন إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও, তারা তোমারই বান্দা। আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও তাহলে তুমি পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ) তখন তিনি বার বার এ আয়াতটিই পড়তে থাকলেন এবং এভাবে ভোর হয়ে গেল।" (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী)

৫. এর অর্থ হলো তোমাকে রাতের বেলা নামায পড়ার এ নির্দেশ এ জন্য দেয়া হচ্ছে যে, আমি একটি অতি গুরুভার বাণী তোমার ওপরে নাযিল করছি। এ ভার বহন করার এবং তা বরদাশত করার শক্তি তোমার মধ্যে সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। তুমি এ শক্তি অর্জন করতে চাইলে আরাম পরিত্যাগ করে রাতের বেলা নামাযের জন্য ওঠো এবং অর্ধেক রাত কিংবা তার চেয়ে কিছু কম বা বেশী রাত ইবাদাত বন্দেগীতে কাটিয়ে দাও। কুরআনকে গুরুভার বাণী বলার কারণ হলো, তার নির্দেশ অনুসারে কাজ করা, তার শিক্ষার উদাহরণ হিসেবে নিজেকে তুলে ধরা, সারা দুনিয়ার সামনে তার দাওয়াত বা আহবান নিয়ে দাঁড়ানো এবং তদনুযায়ী আকীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, নৈতিক চরিত্র ও আচার-আচরণ এবং তাহযীব-তামাদ্দুনের গোটা ব্যবস্থায় বিপ্লব সংঘটিত করা এমন একটি কাজ যে, এর চেয়ে বেশী কঠিন ও গুরুভার কাজের কল্পনাও করা যায় না। এ জন্যও একে গুরুভার ও কঠিন বাণী বলা হয়েছে যে, তার অবতরণের ভার বহন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেছেন যে, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল হওয়ার সময় তিনি আমার উরুর ওপর তাঁর উরু ঠেকিয়ে বসেছিলেন। আমার উরুর ওপর তখন এমন চাপ পড়ছিলো যে, মনে হচ্ছিলো তা এখনই ভেঙে যাবে। হযরত আয়েশা বর্ণনা করেন ঃ আমি প্রচণ্ড শীতের দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল হতে দেখেছি। সে সময়ও তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরতে থাকতো। (বুখারী, মুসলিম, মালিক, তিরমিযী, নাসায়ী) আরেকটি রেওয়ায়াতে হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ উটনীর ওপর সওয়ার থাকা অবস্থায় যখনই তাঁর ওপর অহী নাযিল হতো উটনী তখন তার বুক মাটিতে ঠেকিয়ে দিতো। অহী নাযিল শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারতো না। (মুসনাদে আহমাদ, হাকেম, ইবনে জারীর)।

৬. মূল ইবারাতে نَاشِئَةَ اللَّيْلِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সির ও ভাষাবিদদের চারটি ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। একটি মত হলো, نَاشِئَة শব্দের মানে রাতের বেলা শয্যা ত্যাগকারী ব্যক্তি। দ্বিতীয় মতটি হলো এর অর্থ রাত্রিকালীন সময়। তৃতীয় মত হলো এর অর্থ রাতের বেলা জেগে থাকা বা ওঠা। আর চতুর্থ মতটি হলো, এর অর্থ শুধু রাতের বেলা ওঠা বা জেগে থাকা নয়। বরং ঘুমিয়ে পড়ার পর জেগে ওঠা। হযরত আয়েশা এবং মুজাহিদ এ চতুর্থ অর্থটিই গ্রহণ করেছেন।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝٩ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ
وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝١٠ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ
قَلِيلًا ۝١١ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ۝١٢ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۝١٣
يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ۝١٤

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তাই তাঁকেই নিজের উকীল হিসেবে গ্রহণ করো।[১০] আর লোকেরা যা বলে বেড়াচ্ছে সে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করো এবং ভদ্রভাবে তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাও।[১১] এসব মিথ্যা আরোপকারী সম্পদশালী লোকদের সাথে বুঝাপড়ার ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।[১২] আর কিছু কালের জন্য এদেরকে এ অবস্থায়ই থাকতো দাও। আমার কাছে (এদের জন্য) আছে শক্ত বেড়ি,[১৩] জ্বলন্ত আগুন, গলায় আটকে যাওয়া খাবার এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব। এসব হবে সেদিন যেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা কেঁপে উঠবে এবং পাহাড়গুলোর অবস্থা হবে এমন যেন বালুর স্তূপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে।[১৪]

৭. আয়াতে أَشَدُّ وَطْئًا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এতো ব্যাপক যে, একটি মাত্র বাক্যে তা বুঝানো সম্ভব নয়। এর একটি অর্থ হলো, রাতের বেলা ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য শয্যা ত্যাগ করে ওঠা এবং দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা যেহেতু মানুষের স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ, মানুষের মন ও প্রবৃত্তি এ সময় আরাম কামনা করে, তাই এটি এমন একটি কাজ ও চেষ্টা-সাধনা যা প্রবৃত্তিকে অবদমিত ও বশীভূত করার জন্য অত্যন্ত কার্যকর পন্থা। যে ব্যক্তি এ পন্থায় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হয় এবং দেহ ও মন-মগজের ওপর প্রভাব বিস্তার করে নিজের এ শক্তিকে আল্লাহর পথে ব্যবহার করতে সক্ষম হয় সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সত্য ও শাশ্বত এ দীনের দাওয়াতকে পৃথিবীতে বিজয়ী করার কাজ করতে পারে। দ্বিতীয় অর্থ হলো, এ কাজটি মানুষের হৃদয়-মন ও বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করার একটা কার্যকর উপায়। কারণ রাতের এ সময়টিতে বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে আর কেউ আড়াল হয় না। এ অবস্থায় মানুষ মুখে যা বলে তা তার হৃদয়ের কথার প্রতিধ্বনি। তৃতীয় অর্থ হলো, এটি মানুষের ভেতর ও বাহিরের মধ্যে সংগতি ও মিল সৃষ্টির অতি কার্যকর একটি উপায়। কারণ যে ব্যক্তি রাতের নির্জন নিথর পরিবেশে আরাম পরিত্যাগ করে ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য উঠবে সে নিসন্দেহে খালেস মনেই এরূপ করবে। তাতে প্রদর্শনীর বা লোক দেখানোর আদৌ কোন সুযোগ থাকে না। চতুর্থ অর্থ হলো, মানুষের জন্য এ ধরনের ইবাদাত-বন্দেগী যেহেতু দিনের বেলার ইবাদাত-বন্দেগীর চেয়ে অনেক বেশী কষ্টকর। তাই তা নিয়মিত করার ফলে মানুষের মধ্যে অনেক বেশী দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়,

সে অত্যন্ত শক্ত হয়ে আল্লাহর পথে অগ্রসর হতে পারে এবং এ পথের কঠোরতাসমূহকে সে অটল ও অবিচল থেকে বরদাশত করতে পারে।

৮. মূল ইবারতে اَقْوَمُ قِيْلًا বলা হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো, 'কথাকে আরো বেশী যথার্থ ও সঠিক বানায়।' তবে এর মূল বক্তব্য হলো, সে সময় মানুষ আরো বেশী প্রশান্তি, তৃপ্তি ও মনোযোগ সহকারে বুঝে কুরআন শরীফ পড়তে পারে। ইবনে আব্বাস (রা) এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে اجدران يفقه فى القران অর্থাৎ গভীর চিন্তা-ভাবনা ও মনোনিবেশসহ কুরআন পাঠের জন্য এটা একটা অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত সময়। (আবু দাউদ)

৯. দিনের বেলার ব্যস্ততার উল্লেখ করার পর 'তোমার রবের নাম স্মরণ করতে থাকো' এ নির্দেশ দেয়া থেকে আপনা আপনি একথাটি প্রকাশ পায় যে, দুনিয়াতে হাজারো কাজের মধ্যে ডুবে থেকেও তোমার রবের স্মরণ থেকে গাফেল যেন না হও। বরং কোন না কোনভাবে তাকে স্মরণ করতে থাকো। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আহযাব, টীকা ৬৩)

১০. উকীল বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যার প্রতি আস্থা রেখে কোন ব্যক্তি নিজের ব্যাপার তার ওপর সোপর্দ করে। উর্দু ভাষাতে প্রায় এ অর্থেই আমরা এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উকীল শব্দটি ব্যবহার করি আমাদের মামলা-মোকদ্দমা যার হাতে অর্পণ করে কেউ এতটা নিশ্চিন্ত হয়ে যায় যে, সে তার পক্ষ থেকে ভালভাবেই মামলাটি লড়বে এবং তার নিজের এ মামলা লড়ার কোন দরকার হবে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতটির অর্থ হলো, দীনের দাওয়াত পেশ করার কারণে তোমার বিরোধিতার যে তুফান সৃষ্টি হয়েছে এবং তোমার ওপর যেসব বিপদ-মুসিবত আসছে সে জন্য তুমি অস্থির বা উৎকণ্ঠিত হয়ো না। তোমার প্রভু তো সেই সত্তা যিনি পূর্ব ও পশ্চিম তথা সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মালিক। ইলাহী ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁর ছাড়া আর কারো হাতে নেই। তুমি তোমার সমস্ত ব্যাপার তাঁর হাতে সোপর্দ করে দাও এবং নিশ্চিন্ত হয়ে যাও যে, এখন তোমার মোকদ্দমা তিনি নিজে লড়বেন, তোমার বিরুদ্ধবাদীদের সাথে তিনিই বুঝাপড়া করবেন এবং তোমার সব কাজ তিনিই সম্পন্ন করবেন।

১১. 'আলাদা হয়ে যাও' কথাটির অর্থ এই নয় যে, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ইসলামের তাবলীগের কাজ বন্ধ করে দাও। বরং এর অর্থ হলো, তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করো না, তাদের অন্যায় ও অর্থহীন আচরণ উপেক্ষা করে চলো এবং তাদের কোন অভদ্র আচরণের জবাব দিও না। তবে তাদের প্রতি এ উপেক্ষা এবং নির্লিপ্ততাও যেন কোন প্রকার ক্ষোভ, ক্রোধ এবং বিরক্তিসহ না হয়। বরং তা যেন এমন উপেক্ষা হয়, যেমন একজন ভদ্র মানুষ কোন অসভ্য বাউণ্ডেলে বা বখাটে লোকের গালি শুনে যেমন তা উপেক্ষা করে এবং মনকে ভারাক্রান্ত হতে পর্যন্ত দেয় না। এ থেকে এরূপ ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়া ঠিক নয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মপদ্ধতি বোধ হয় এ থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের ছিল। তাই আল্লাহ তাঁকে এ আদেশ করেছেন। তিনি মূলত প্রথম থেকেই এ কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করছিলেন। তবে কুরআনে এ নির্দেশ দেয়ার উদ্দেশ্য হলো কাফেরদের একথা জানিয়ে দেয়া যে, তোমরা যে আচরণ করছো তার জবাব না দেয়ার কারণ দুর্বলতা নয়। বরং এরূপ আচরণের জবাবে আল্লাহ তাঁর রসূলকে এ ধরনের ভদ্রজনোচিত পন্থা গ্রহণ করার শিক্ষা দিয়েছেন।।

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾
فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١٦﴾ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ
كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿١٧﴾ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ
مَفْعُولًا ﴿١٨﴾ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿١٩﴾

আমি তোমাদের[১৫] নিকট একজন রসূল পাঠিয়েছি তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ[১৬] যেমন ফেরাউনের নিকট একজন রসূল পাঠিয়েছিলাম। দেখো, ফেরাউন যখন সে রসূলের কথা মানলো না তখন আমি তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলাম। তোমরা যদি মানতে অস্বীকার করো তাহলে সেদিন কিভাবে রক্ষা পাবে যেদিনটি শিশুকে বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে?[১৭] যেদিনের কঠোরতায় আকাশ মণ্ডল বিদীর্ণ হয়ে যেতে থাকবে? আল্লাহর প্রতিশ্রুতি তো পূর্ণ হবেই। এ একটি উপদেশ বাণী। অতএব যে চায় সে তার প্রভুর পথ অবলম্বন করুক।

১২. একথা থেকে এ মর্মে স্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায় যে, মক্কায় যেসব লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপ করছিল এবং নানাভাবে ধোঁকা দিয়ে এবং নানা রকমের স্বার্থপ্রীতি সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষ উস্কে দিয়ে তাঁর বিরোধিতায় নামছিল তারা সবাই ছিল জাতির সচ্ছল, সম্পদশালী ও বিলাসপ্রিয় মানুষ। কারণ ইসলামের এ সংস্কার আন্দোলনের আঘাত তাদের স্বার্থের ওপর সরাসরি পড়ছিল। কুরআন আমাদের বলে যে, এ আচরণ শুধু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেই ছিল না বরং এ গোষ্ঠী চিরদিনই সংস্কার ও সংশোধনের পথ রুদ্ধ করার জন্য জগদ্দল পাথরের মত বাধা সৃষ্টি করে এসেছে। উদাহরণ হিসেবে দেখুন, সূরা আল আ'রাফ, আয়াত ৬০, ৬৬, ৭৫, ৮৮; আল মু'মিনূন, ৩৩; সাবা, ৩৪ ও ৩৫ এবং আয যুখরুফ, ২৩)

১৩. জাহান্নামে পাপী ও অপরাধীদের পায়ে ভারী বেড়ি পরানো হবে। তারা যাতে পালাতে না পারে সে জন্য এ বেড়ি পরানো হবে না, বরং তা পরানো হবে এ জন্য যে, তারা যেন উঠতে না পারে। এ বেড়ি পালিয়ে যাওয়া রোধ করার জন্য নয় বরং শাস্তি বৃদ্ধি করার জন্য।

১৪. সে সময় পাহাড়সমূহের বিভিন্ন অংশকে পরস্পর সংযুক্ত রাখার কেন্দ্রীয় বল নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই প্রথমে তা মিহি বালুর স্তূপে পরিণত হবে। অতপর ভূমিকম্প গোটা পৃথিবীকে প্রবলভাবে কাঁপিয়ে তুললে বালুর এ স্তূপ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে এবং গোটা ভূপৃষ্ঠ একটা বিশাল প্রান্তরে রূপান্তরিত হবে। এ অবস্থার একটি চিত্র সূরা ত্বা-হার ১০৫ থেকে ১০৭ আয়াত পর্যন্ত এভাবে তুলে ধরা হয়েছে ঃ "লোকেরা তোমাকে এসব পাহাড়ের অবস্থা কি হবে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বলো, আমার প্রভু পাহাড়সমূহকে

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ
مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم
مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ
وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم
مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

২ রুকূ'

হে নবী,[১৮] তোমার রব জানেন যে, তুমি কোন সময় রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কোন সময় অর্ধাংশ এবং কোন সময় এক-তৃতীয়াংশ সময় ইবাদাতে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দাও।[১৯] তোমার সংগী একদল লোকও এ কাজ করে।[২০] রাত এবং দিনের সময়ের হিসেব আল্লাহই রাখেন। তিনি জানেন, তোমরা সময়ের সঠিক হিসেব রাখতে পারো না। তাই তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এখন থেকে কুরআন শরীফের যতটুকু স্বাচ্ছন্দে পড়তে পারবে ততটুকুই পড়বে।[২১] তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যকার কিছু লোক হবে অসুস্থ, কিছু লোক আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে ভ্রমণরত,[২২] এবং কিছু লোক আল্লাহর পথে লড়াই করে।[২৩] তাই কুরআনের যতটা পরিমাণ সহজেই পড়া যায় ততটাই পড়তে থাকো। নামায কায়েম করো, যাকাত দাও[২৪] এবং আল্লাহকে 'করযে হাসানা' দিতে থাকো।[২৫] তোমরা নিজের জন্য যে পরিমাণ কল্যাণ অগ্রিম পাঠিয়ে দেবে তা আল্লাহর কাছে প্রস্তুত পাবে। সেটিই অধিক উত্তম এবং পুরস্কার হিসেবে অনেক বড়।[২৬] আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

ধুলির মত করে ওড়াবেন এবং ভূপৃষ্ঠকে এমন সমতল বিশাল প্রান্তরে রূপান্তরিত করবেন যে, তুমি সেখানে উঁচু নীচু বা ভাঁজ দেখতে পাবে না।"

১৫. মক্কার যেসব কাফের রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করছিলো এবং তাঁর বিরোধিতায় অতি মাত্রায় তৎপর ছিল এখানে তাদের উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে।

১৬. লোকদের জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাক্ষী বানিয়ে পাঠানোর একটি অর্থ হলো, তিনি দুনিয়ায় তাদের সামনে নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে সত্যের সাক্ষ পেশ করবেন। আরেকটি হলো আখেরাতে যখন আল্লাহর আদালত কায়েম হবে সে সময় তিনি সাক্ষ দেবেন যে, এসব লোকের কাছে আমি সত্যের আহবান পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল বাকারা, টীকা ১৪৪; আন নিসা, টীকা ৬৪; আন্ নাহল, আয়াত ৮৪-৮৯; আল আহযাব, টীকা ৮২; আল ফাত্হ্, টীকা ১৪)

১৭. অর্থাৎ প্রথম তো তোমাদের এ ভয় করা উচিত যে, আমার প্রেরিত রসূলের কথা যদি তোমরা না মানো তাহলে এ একই অপরাধের কারণে ফেরাউন যে দুর্ভাগ্যজনক পরিণাম ভোগ করেছে অনুরূপ পরিণাম দুনিয়াতেই তোমাদের ভোগ করতে হবে। আর মনে করো, দুনিয়ায় যদি তোমাদের জন্য কোন আযাবের ব্যবস্থা নাও করা হয় তাহলেও কিয়ামতের আযাব থেকে কিভাবে নিষ্কৃতি পাবে?

১৮. ইতিপূর্বে তাহাজ্জুদ নামাযের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এ আয়াতের মাধ্যমে তা শিথিল ও সহজ করা হয়েছে। এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময়-কাল সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়াত আছে। মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম ও আবু দাউদে এ রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে যে, তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে প্রথম নির্দেশের পর এ দ্বিতীয় নির্দেশটি এক বছর পর নাযিল হয়েছিল এবং রাতের বেলার ইবাদাত-বন্দেগী ফরয পর্যায়ে না রেখে নফল করে দেয়া হয়েছিল। ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম হযরত আয়েশা (রা) থেকেই আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ নির্দেশটি প্রথম নির্দেশের আট মাস পরে দেয়া হয়েছিল। হযরত আয়েশা থেকে ইবনে আবী হাতেম তৃতীয় আরেকটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। এতে পরবর্তী নির্দেশটি ষোল মাস পরে নাযিল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আবু দাউদ, ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে এক বছর সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়েরের বর্ণনা হলো, নির্দেশটি দশ বছর পর নাযিল হয়েছিল (ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম)। আমাদের মতে এ বর্ণনাটিই অধিক বিশুদ্ধ। কারণ প্রথম রুকূ'র বিষয়বস্তু থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তা মক্কায় নাযিল হয়েছিল এবং মক্কী যুগেরও একদম প্রথম দিকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতলাভের পর তখন বড়জোর চারটি বছর অতিবাহিত হয়েছিল। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় রুকূ'র বিষয়বস্তুর স্পষ্ট বক্তব্য অনুসারে তা মদীনাতে নাযিল হয়েছিল বলে মনে হয়। তখন কাফেরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং যাকাত ফরয হওয়ার নির্দেশও দেয়া হয়েছিল। তাই এ দু'টি রুকূ'র নাযিল হওয়ার সময়কালের মধ্যে অনিবার্যভাবে কম করে হলেও দশ বছরের ব্যবধান হওয়া উচিত।

১৯. প্রাথমিক নির্দেশে যদিও অধিক রাত বা তার চেয়ে কিছু কম বা বেশী সময় নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে বলা হয়েছিল। কিন্তু নামাযে নিমগ্নতার কারণে সময়ের আন্দাজ বা

পরিমাপ ঠিক থাকতো না। আর সে সময় ঘড়িও ছিল না যে, সময় ঠিকমত পরিমাপ করা যাবে। সুতরাং কোন সময় দুই-তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত ইবাদাতে কেটে যেতো আবার কোন সময় তা হ্রাস পেয়ে শুধু এক-তৃতীয়াংশের মত হতো।

২০. প্রথম পর্যায়ে নির্দেশ দেয়ার সময় শুধু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই সম্বোধন করা হয়েছিল এবং তাঁকেই রাতে নামায পড়তে বলা হয়েছিল। কিন্তু সে সময় মুসলমানদের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ এবং নেকী অর্জনের যে অস্বাভাবিক উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল সে কারণে অধিকাংশ সাহাবীও এ নামাযকে গুরুত্ব দিতেন এবং তা পড়তেন।

২১. কুরআন তেলাওয়াত দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণেই যেহেতু নামায দীর্ঘায়িত হয় সে জন্য বলেছেন যে, তাহাজ্জুদ নামাযে যতটা পরিমাণ কুরআন সহজে ও স্বাচ্ছন্দে পড়তে পার, ততটাই পড়। এভাবে দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী নামায আপনা থেকেই হ্রাস প্রাপ্ত হবে। এ কথাটির শব্দমালা বাহ্যিকভাবে যদিও নির্দেশের মত, কিন্তু এ বিষয়ে সবাই একমত যে, তাহাজ্জুদের নামায ফরয নয়, বরং নফল। হাদীসেও স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের জন্য দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। সে জিজ্ঞেস করলো ঃ এ ছাড়া অন্য কিছু কি আমার জন্য অবশ্য করণীয়? জবাবে বলা হলো, 'না'। তবে তুমি স্বেচ্ছায় কিছু পড়লে, তা ভিন্ন কথা। (বুখারী ও মুসলিম)।

এ আয়াত থেকে আরো একটি কথা জানা গেল যে, নামাযে রুকূ' ও সিজদা যেমন ফরয তেমনি কুরআন মজীদ পড়াও ফরয। কারণ আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য স্থানে যেমন রুকূ' ও সিজদা শব্দ নামায অর্থে ব্যবহার করেছেন তেমনি এখানে কুরআন পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এর অর্থ নামাযে কুরআন পড়া। এভাবে প্রমাণ পেশ করার ব্যাপারে কেউ যদি একথা বলে আপত্তি উথাপন করে যে, তাহাজ্জুদের নামাযই যখন নফল, তখন সে নামাযে কুরআন মজীদ পড়া ফরয হয় কি করে? এর জবাব হলো, কেউ যখন নফল নামায পড়বে তখন নফল নামাযেরও সব শর্ত পূরণ করা এবং তার সব 'রুকন' ও ফরয আদায় করা আবশ্যক। কেউ একথা বলতে পারে না যে, নফল নামাযের জন্য কাপড় ও শরীর পবিত্র হওয়া, অযু করা এবং সতর থাকা ওয়াজিব নয় এবং নফল নামাযে দাঁড়ানো, বসা এবং রুকূ' ও সিজদা করা সবই নফল।

২২. হালাল ও বৈধ উপায়ে রুজি অর্জনের উদ্দেশ্যে সফর করাকে কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর মেহেরবানী ও করুণা অনুসন্ধান বলে আখ্যায়িত করেছে।

২৩. এখানে আল্লাহ তা'আলা হালাল রুজি উপার্জন এবং আল্লাহর পথে জিহাদের উল্লেখ এক সাথে যেভাবে করেছেন এবং অসুস্থতা জনিত অক্ষমতা ছাড়া এ দু'টি কাজকেও তাহাজ্জুদ নামায এবং অব্যাহতি লাভের কিংবা তা কিছুটা লাঘব করার কারণ হিসেবে গণ্য করেছেন তা থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামে বৈধ পন্থায় রুজি উপার্জন করা কত বড় মর্যাদার কাজ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

ما من جالبٍ يجلبُ طعامًا الى بلدٍ من بلدان المسلمين فيبيعه بِسِعْرِ يومِه الا كانت منزلته عند الله ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرون يضربون فى الارض .....

যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন শহর বা জনপদে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসে এবং সে দিনের বাজার দরে তা বিক্রি করে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পড়লেন واخرون يضربون فى الارض .... (ইবনে মারদুইয়া)

হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ

ما من حال ياتينى عليه الموت بعد الجهاد فى سبيل الله احب الى من ان ياتينى وانا بين شعبتى جبل التمس من فضل الله وقرأ هذه الاية –

আল্লাহর পথে জিহাদ ছাড়া আর কোন অবস্থায় প্রাণ দেয়া আমার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় হয়ে থাকলে তা হলো এই যে, আমি আল্লাহর অনুগ্রহ বা মেহেরবানী অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কোন গিরিপথ অতিক্রম কালে সেখানে মৃত্যু এসে আমাকে আলিঙ্গন করছে। তার পর তিনি এ আয়াতটি পড়লেন। (বায়হাকী ফী শু'আবিল ঈমান)

২৪. এখানে নামায কায়েম করা এবং যাকাত দেয়া বলতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায এবং ফরয যাকাত বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণ সবাই একমত।

২৫. ইবনে যায়েদ বলেন ঃ এর অর্থ যাকাত দেয়া ছাড়াও নিজের অর্থ–সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করা। এ খরচ আল্লাহর পথে জিহাদ করা, আল্লাহর বান্দাদের সাহায্য করা, জনকল্যাণমূলক কাজ করা কিংবা অন্যান্য কল্যাণকর কাজেও হতে পারে। আল্লাহকে কর্জ এবং উত্তম কর্জ দেয়ার অর্থ কি তার ব্যাখ্যা আমরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন স্থানে করেছি। (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল বাকারাহ, টীকা ২৬৭; আল মা–য়েদাহ, টীকা ৩৩ এবং আল হাদীদ, টীকা ১৬)।

২৬. এর অর্থ হলো, আখেরাতের জন্য যা কিছু তোমরা আগেই পাঠিয়ে দিয়েছো তা তোমাদের ঐ সব জিনিসের চেয়ে অনেক বেশী উপকারী যা তোমরা দুনিয়াতেই রেখে দিয়েছো এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্ত কোন কল্যাণকর কাজে ব্যয় করোনি। হাদীসে উল্লেখ আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন যে, এক সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ ايكم ماله احب اليه من مال وارثه "তোমাদের এমন কেউ আছে যার নিজের অর্থ–সম্পদ তার উত্তরাধিকারীর অর্থ–সম্পদের চেয়ে তার কাছে বেশী প্রিয়? জবাবে লোকেরা বললো, "হে আল্লাহর রসূল, আমাদের মধ্যে কেউ–ই এমন নেই যার নিজের অর্থ–সম্পদ তাঁর কাছে তার উত্তরাধিকারীর অর্থ–সম্পদ থেকে বেশী প্রিয় নয়।" তখন তিনি বললেন ঃ 'তোমরা কি

বলছো তা ভেবে দেখো।' লোকেরা বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল, আমাদের অবস্থা আসলেই এরূপ। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

انما مال احدكم ماقدّم ومال وارثه ما اخّر

তোমাদের নিজের অর্থ-সম্পদ তো সেইগুলো যা তোমরা আখেরাতের জন্য অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছো। আর যা তোমরা রেখে দিয়েছো সেগুলো ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারীদের অর্থ-সম্পদ। (বুখারী, নাসায়ী ও মুসনাদে আবু ইয়ালা)।

আল মুদ্দাস্‌সির

৭৪

নামকরণ

প্রথম আয়াতের اَلْمُدَّثِّر শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এটিও শুধু সূরার নাম। এর বিষয় ভিত্তিক শিরোনাম নয়।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এর প্রথম সাতটি আয়াত পবিত্র মক্কা নগরীতে নবুওয়াতের একেবারে প্রাথমিক যুগে নাযিল হয়েছিল। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী এবং মুসনাদে আহমাদ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের কোন কোন রেওয়ায়াতে এতদূর পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, এগুলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল হওয়া সর্বপ্রথম আয়াত। কিন্তু গোটা মুসলিম উম্মার কাছে এ বিষয়টি প্রায় সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম যে অহী নাযিল হয়েছিল তা ছিল اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ থেকে مَالَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত। তবে বিশুদ্ধ রেওয়ায়াতসমূহ থেকে একথা প্রমাণিত যে, এ প্রথম অহী নাযিল হওয়ার পর কিছুকাল পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর কোন অহী নাযিল হয়নি। এ বিরতির পর নতুন করে আবার অহী নাযিলের ধারা শুরু হলে সূরা মুদ্দাস্‌সিরের এ আয়াতগুলো থেকেই তা শুরু হয়েছিল। ইমাম যুহরী এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এভাবে ঃ

"কিছুকাল পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল বন্ধ রইলো। সে সময় তিনি এতো কঠিন মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন যে, কোন কোন সময় পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সেখান থেকে নিজেকে নীচে নিক্ষেপ করতে বা গড়িয়ে ফেলে দিতে উদ্যত হতেন। কিন্তু যখনই তিনি কোন চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছতেন তখনই জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর সামনে এসে বলতেন ঃ 'আপনি তো আল্লাহর নবী' এতে তাঁর হৃদয় মন প্রশান্তিতে ভরে যেতো এবং তাঁর অস্বস্তি ও অস্থিরতার ভাব বিদূরিত হতো।"
(ইবনে জারীর)

এরপর ইমাম যুহরী নিজে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর রেওয়ায়াতেই এভাবে উদ্ধৃত করছেন ঃ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম فترة الوحى (অহী বন্ধ থাকার সময়)–এর কথা উল্লেখ করে বলেছেন ঃ একদিন আমি পথে চলছিলাম। হঠাৎ আসমান থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। ওপরের দিকে তাকিয়েই দেখতে পেলাম হেরা

গিরি গুহায় যে ফেরেশতা আমার কাছে এসেছিল সে ফেরেশতা আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটি আসন পেতে বসে আছে। এ দৃশ্য দেখে আমি অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম এবং বাড়ীতে পৌঁছেই বললাম ঃ আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করো। আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করো। সুতরাং বাড়ীর লোকজন আমাকে লেপ (অথবা কম্বল) দিয়ে আচ্ছাদিত করলো। এ অবস্থায় আল্লাহ অহী নাযিল করলেনঃ ..... يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ "এরপর অব্যাহতভাবে অহী নাযিল হতে থাকলো।" (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর)।

প্রকাশ্যভাবে ইসলামের প্রচার শুরু হওয়ার পর প্রথমবার মক্কায় হজ্জের মওসুম সমাগত হলে সূরার অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ ৮ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়। 'সীরাতে ইবনে হিশাম' গ্রন্থে এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা পরে তা উল্লেখ করবো।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সর্ব-প্রথম যে অহী পাঠানো হয়েছিল তা ছিল সূরা 'আলাকে'র প্রথম পাঁচটি আয়াত। এতে শুধু বলা হয়েছিল ঃ

"পড় তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'জমাট রক্ত' থেকে। পড়, তোমার রব বড় মহানুভব। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। তিনি মানুষকে এমন জ্ঞান শিখিয়েছেন যা সে জানতো না।"

এটা ছিল অহী নাযিল হওয়ার প্রথম অভিজ্ঞতা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহসা এ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কত বড় মহান কাজের জন্য তিনি আদিষ্ট হয়েছেন এবং ভবিষ্যতে আরো কি কি কাজ তাঁকে করতে হবে এ বাণীতে তাঁকে সে বিষয়ে কিছুই জানানো হয়েছিল না। বরং শুধু একটি প্রাথমিক পরিচয় দিয়েই কিছু দিনের জন্য অবকাশ দেয়া হয়েছিল যাতে অহী নাযিলের এ প্রথম অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর মন-মানসিকতার ওপর যে কঠিন চাপ পড়েছিল তার প্রভাব বিদূরিত হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে অহী গ্রহণ ও নবুওয়াতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যান। এ বিরতির পর পুনরায় অহী নাযিলের ধারা শুরু হলে এ সূরার প্রথম সাতটি আয়াত নাযিল হয় এবং এর মাধ্যমে প্রথমবারের মত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ মর্মে আদেশ দেয়া হয় যে, আপনি উঠুন এবং আল্লাহর বান্দারা এখন যেভাবে চলছে তার পরিণাম সম্পর্কে তাদের সাবধান করে দিন। আর এ পৃথিবীতে এখন যেখানে অন্যদের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব জেঁকে বসেছে, সেখানে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্বের ঘোষণা দিন। এর সাথে সাথে তাঁকে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, এখন থেকে আপনাকে যে কাজ করতে হবে তার দাবী হলো আপনার নিজের জীবন যেন সব দিক থেকে পূত-পবিত্র হয় এবং আপনি সব রকমের পার্থিব স্বার্থ উপেক্ষা করে পূর্ণ নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে আল্লাহর সৃষ্টির সংস্কার-সংশোধনের দায়িত্ব পালন করেন। অতপর শেষ বাক্যটিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যে

কোন কঠিন পরিস্থিতি এবং বিপদ মুসিবতই আসুক না কেন আপনি আপনার প্রভুর উদ্দেশ্যে ধৈর্য অবলম্বন করুন।

আল্লাহর এ ফরমান কার্যকরী করার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইসলামের প্রচার শুরু করলেন এবং একের পর এক কুরআন মজীদের যেসব সূরা নাযিল হচ্ছিলো তা শুনাতে থাকলেন তখন মক্কায় রীতিমত হৈ চৈ পড়ে গেল এবং বিরোধিতার এক তুফান শুরু হলো। এ অবস্থায় কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর হজ্জের মওসুম এসে পড়লে মক্কার লোকেরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। তারা ভাবলো, এ সময় সমগ্র আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজীদের কাফেলা আসবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি এসব কাফেলার অবস্থান স্থলে হাজির হয়ে হাজীদের সাথে সাক্ষাত করেন এবং বিভিন্ন স্থানে হজ্জের জনসমাবেশসমূহে দাঁড়িয়ে কুরআনের মত অতুলনীয় ও মর্মস্পর্শী বাণী শুনাতে থাকেন তাহলে সমগ্র আরবের আনাচে কানাচে তাঁর আহবান পৌছে যাবে এবং না জানি কত লোক তাতে প্রভাবিত হয়ে পড়বে। তাই কুরাইশ নেতারা একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করলো। এতে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, মক্কায় হাজীদের আগমনের সাথে সাথে তাদের মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে প্রচার প্রোপাগাণ্ডা শুরু করতে হবে। এ বিষয়ে ঐকমত্য হওয়ার পর ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা সমবেত সবাইকে উদ্দেশ করে বললো ঃ আপনারা যদি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে লোকদের কাছে বিভিন্ন রকমের কথা বলেন, তাহলে আমাদের সবার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই কোন একটি বিষয় স্থির করে নিন যা সবাই বলবে। কেউ কেউ প্রস্তাব করলো, আমরা মুহাম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গণক বলবো। ওয়ালীদ বললো ঃ তা হয় না। আল্লাহর শপথ, সে গণক নয়। আমরা গণকদের অবস্থা জানি। তারা গুণ গুণ শব্দ করে যেসব কথা বলে এবং যে ধরনের কথা বানিয়ে নেয় তার সাথে কুরআনের সামান্যতম সাদৃশ্যও নেই। তখন কিছু সংখ্যক লোক প্রস্তাব করলো যে, তাকে পাগল বলা হোক। ওয়ালীদ বললো ঃ সে পাগলও নয়। আমরা পাগল ও বিকৃত মস্তিষ্ক লোক সম্পর্কেও জানি। পাগল বা বিকৃত মস্তিষ্ক হলে মানুষ যে ধরনের অসংলগ্ন ও আবোল তাবোল কথা বলে এবং খাপছাড়া আচরণ করে তা কারো অজানা নয়। কে একথা বিশ্বাস করবে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে বাণী পেশ করছে তা পাগলের প্রলাপ অথবা জিনে ধরা মানুষের উক্তি? লোকজন বললোঃ তাহলে আমরা তাকে কবি বলি। ওয়ালীদ বললো ঃ সে কবিও নয়। আমরা সব রকমের কবিতা সম্পর্কে অবহিত। কোন ধরনের কবিতার সাথে এ বাণীর সাদৃশ্য নেই। লোকজন আবার প্রস্তাব করলো ঃ তাহলে তাকে যাদুকর বলা হোক। ওয়ালীদ বললো ঃ সে যাদুকরও নয়। যাদুকরদের সম্পর্কেও আমরা জানি। যাদু প্রদর্শনের জন্য তারা যেসব পন্থা অবলম্বন করে থাকে সে সম্পর্কেও আমাদের জানা আছে। একথাটিও মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যাপারে খাটে না। এরপর ওয়ালীদ বললো ঃ প্রস্তাবিত এসব কথার যেটিই তোমরা বলবে সেটিকেই লোকেরা অযথা অভিযোগ মনে করবে। আল্লাহর শপথ, এ বাণীতে আছে অসম্ভব রকমের মাধুর্য। এর শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত আর এর শাখা-প্রশাখা অত্যন্ত ফলবান। একথা শুনে আবু জেহেল ওয়ালীদকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। সে বললো ঃ যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মাদ সম্পর্কে কোন কথা বলছো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কওমের লোকজন তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। সে বললো

ঃ তাহলে আমাকে কিছুক্ষণ ভেবে দেখতে দাও। এরপর সে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে বললো ঃ তার সম্পর্কে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য যে কথাটি বলা যেতে পারে তা হলো, তোমরা আরবের জনগণকে বলবে যে, এ লোকটি যাদুকর। সে এমন কথা বলে যা মানুষকে তার পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র এবং গোটা পরিবার থেকেই বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ওয়ালীদের একথা সবাই গ্রহণ করলো। অতপর হজ্জের মওসুমে পরিকল্পনা অনুসারে কুরাইশদের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল হাজীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো এবং বহিরাগত হজ্জযাত্রীদের তারা এ বলে সাবধান করতে থাকলো যে, এখানে একজন বড় যাদুকরের আবির্ভাব ঘটেছে। তার যাদু পরিবারের লোকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেয়। তার ব্যাপারে সাবধান থাকবেন। কিন্তু এর ফল দাঁড়ালো এই যে, কুরাইশ বংশীয় লোকেরা নিজেরাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম সমগ্র আরবে পরিচিত করে দিল। (সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৮-২৮৯। আবু জেহেলের পীড়াপীড়িতেই যে ওয়ালীদ এ উক্তি করেছিল, সে কথা ইবনে জারীর তার তাফসীরে ইকরিমার রেওয়ায়াত সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন)।

এ সূরার দ্বিতীয় অংশে এ ঘটনারই পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর বিষয়বস্তুর বিন্যাস হয়েছে এভাবে ঃ

৮ থেকে ১০ আয়াত পর্যন্ত ন্যায় ও সত্যকে অস্বীকারকারীদের এ বলে সাবধান করা হয়েছে যে, আজ তারা যা করছে কিয়ামতের দিন তারা নিজেরাই তার খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হবে।

১১ থেকে ২৬ আয়াত পর্যন্ত ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার নাম উল্লেখ না করে বলা হয়েছেঃ মহান আল্লাহ এ ব্যক্তিকে অঢেল নিয়ামত দান করেছিলেন। কিন্তু এর বিনিময়ে সে ন্যায় ও সত্যের সাথে চরম দুশমনী করেছে। এ পর্যায়ে তার মানসিক দ্বন্দ্বের পূর্ণাঙ্গ চিত্র অংকন করা হয়েছে। একদিকে সে মনে মনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু অপরদিকে নিজ গোত্রের মধ্যে সে তার নেতৃত্ব, মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিও বিপন্ন করতে প্রস্তুত ছিল না। তাই সে শুধু ঈমান গ্রহণ থেকেই বিরত রইলো না। বরং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নিজের বিবেকের সাথে বুঝা-পড়া ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পর আল্লাহর বান্দাদের এ বাণীর ওপর ঈমান আনা থেকে বিরত রাখার জন্য প্রস্তাব করলো যে, এ কুরআনকে যাদু বলে আখ্যায়িত করতে হবে। তার এ স্পষ্ট ঘৃণ্য মানসিকতার মুখোশ খুলে দেয়ার জন্য বলা হয়েছে যে, নিজের এতো সব অপকর্ম সত্ত্বেও এ ব্যক্তি চায় তাকে আরো পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হোক। অথচ এখন সে পুরস্কারের যোগ্য নয় বরং দোযখের শাস্তির যোগ্য হয়ে গিয়েছে।

এরপর ২৭ থেকে ৪৮ আয়াত পর্যন্ত দোযখের ভয়াবহতার উল্লেখ করা হয়েছে এবং কোন্ ধরনের নৈতিক চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের অধিকারী লোকেরা এর উপযুক্ত বলে গণ্য হবে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

অতপর ৪৯-৫৩ আয়াতে কাফেরদের রোগের মূল ও উৎস কি তা বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যেহেতু তারা আখেরাত সম্পর্কে বেপরোয়া ও নির্ভীক এবং এ পৃথিবীকেই

জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ বলে মনে করে, তাই তারা কুরআন থেকে এমনভাবে পালায়, যেমন বন্য গাধা বাঘ দেখে পালায়। তারা ঈমান আনার জন্য নানা প্রকারের অযৌক্তিক পূর্বশর্ত আরোপ করে। অথচ তাদের সব শর্ত পূরণ করা হলেও আখেরাতকে অস্বীকার করার কারণে তারা ঈমানের পথে এক পাও অগ্রসর হতে সক্ষম নয়।

পরিশেষে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে, আল্লাহর কারো ঈমানের প্রয়োজন নেই যে, তিনি তাদের শর্ত পূরণ করতে থাকবেন। কুরআন সবার জন্য এক উপদেশবাণী যা সবার সামনে পেশ করা হয়েছে। কারো ইচ্ছা হলে সে এ বাণী গ্রহণ করবে। আল্লাহই একমাত্র এমন সত্তা, যার নাফরমানী করতে মানুষের ভয় পাওয়া উচিত। তাঁর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা এমন যে, যে ব্যক্তিই তাকওয়া ও আল্লাহভীতির পথ অনুসরণ করে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। পূর্বে সে যতই নাফরমানী করে থাকুক না কেন।

আয়াত ৫৬ **সূরা আল মুদ্দাস্‌সির–মক্কী** রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝١ قُمْ فَاَنْذِرْ ۝٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤ وَالرُّجْزَ
فَاهْجُرْ ۝٥ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝٦ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝٧

হে বস্ত্র মুড়ি দিয়ে শয়নকারী,[১] ওঠো এবং সাবধান করে দাও,[২] তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো,[৩] তোমার পোশাক পবিত্র রাখো,[৪] অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো,[৫] বেশী লাভ করার জন্য ইহসান করো না[৬] এবং তোমার রবের জন্য ধৈর্য অবলম্বন করো।[৭]

১. ওপরে ভূমিকায় আমরা এসব আয়াত নাযিলের যে পটভূমি বর্ণনা করেছি সে সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে একথাটি ভালভাবেই উপলব্ধি করা যায় যে, এখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ বা يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ বলে সম্বোধন করার পরিবর্তে يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ বলে সম্বোধন কেন করা হয়েছে। নবী (সা) যেহেতু হঠাৎ জিবরাঈলকে আসমান ও পৃথিবীর মাঝখানে একটি আসনে উপবিষ্ট দেখে ভীত হয়ে পড়েছিলেন এবং সে অবস্থায় বাড়ীতে পৌঁছে বাড়ীর লোকদের বলেছিলেন ঃ আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করো, আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করো। তাই আল্লাহ তাঁকে يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ বলে সম্বোধন করেছেন। সম্বোধনের এ সূক্ষ্ম ভংগী থেকে আপনা আপনি এ অর্থ পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে যে, হে আমার প্রিয় বান্দা, তুমি চাদর জড়িয়ে শুয়ে আছো কেন? তোমার ওপরে তো একটি মহত কাজের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এ দায়িত্ব পালন করার জন্য তোমাকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে উঠে দাঁড়াতে হবে।

২. হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে নবুওয়াতের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করার সময় যে আদেশ দেয়া হয়েছিল এটাও সে ধরনের আদেশ। হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে বলা হয়েছিল ঃ

اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ –

"তোমার নিজের কওমের লোকদের ওপর এক ভীষণ কষ্টদায়ক আযাব আসার পূর্বেই তাদের সাবধান করে দাও।" (নূহ, ১)

আয়াতটির অর্থ হলো, হে বস্ত্র আচ্ছাদিত হয়ে শয়নকারী, তুমি ওঠো। তোমার চারপাশে আল্লাহর যেসব বান্দারা অবচেতন পড়ে আছে তাদের জাগিয়ে তোল। যদি এ

অবস্থায়ই তারা থাকে তাহলে যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতির সম্মুখীন তারা হতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে তাদের সাবধান করে দাও। তাদের জানিয়ে দাও, তারা 'মগের মুল্লুকে' বাস করছে না যে, যা ইচ্ছা তাই করে যাবে, অথচ কোন কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে না।

৩. এ পৃথিবীতে এটা একজন নবীর সর্বপ্রথম কাজ। এখানে এ কাজটিই তাঁকে আঞ্জাম দিতে হয়। তাঁর প্রথম কাজই হলো, অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরা এ পৃথিবীতে যাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপ মেনে চলছে তাদের সবাইকে অস্বীকার করবে এবং গোটা পৃথিবীর সামনে উচ্চ কণ্ঠে একথা ঘোষণা করবে যে, এ বিশ্ব-জাহানে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপ নেই। আর এ কারণেই ইসলামে "আল্লাহু আকবার" (আল্লাহই শ্রেষ্ঠ) কথাটিকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। "আল্লাহু আকবার" ঘোষণার মাধ্যমেই আযান শুরু হয়। আল্লাহু আকবার কথাটি বলে মানুষ নামায শুরু করে এবং বার বার আল্লাহু আকবার বলে ওঠে ও বসে। কোন পশুকে জবাই করার সময়ও 'বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবার' বলে জবাই করে। তাকবীর ধ্বনি বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের সর্বাধিক স্পষ্ট ও পার্থক্যসূচক প্রতীক। কারণ, ইসলামের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার মাধ্যমেই কাজ শুরু করেছিলেন।

এখানে আরো একটি সূক্ষ্ম বিষয় আছে যা ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার। এ সময়ই প্রথমবারের মত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে নবুওয়াতের বিরাট গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য তৎপর হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এ আয়াতগুলোর 'শানে নুযুল' থেকেই সে বিষয়টি জানা গিয়েছে। একথা তো স্পষ্ট যে, যে শহর ও সমাজপরিবেশে তাঁকে এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ নিয়ে কাজ করার জন্য তৎপর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছিল তা ছিল শিরকের কেন্দ্রভূমি বা লীলাক্ষেত্র। সাধারণ আরবদের মত সেখানকার অধিবাসীরা যে কেবল মুশরিক ছিল, তা নয়। বরং মক্কা সে সময় গোটা আরবের মুশরিকদের সবচেয়ে বড় তীর্থক্ষেত্রের মর্যাদা লাভ করেছিল। আর কুরাইশরা ছিল তার ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী, সেবায়ত ও পুরোহিত। এমন একটি জায়গায় কোন ব্যক্তির পক্ষে শিরকের বিরুদ্ধে এককভাবে তাওহীদের পতাকা উত্তোলন করা জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করার শামিল। তাই "ওঠো এবং সাবধান করে দাও" বলার পরপরই "তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো" বলার অর্থই হলো, যেসব বড় বড় সন্ত্রাসী শক্তি তোমার এ কাজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে মনে হয় তাদের মোটেই পরোয়া করো না। বরং স্পষ্ট ভাষায় বলে দাও, যারা আমার এ আহবান ও আন্দোলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে আমার 'রব' তাদের সবার চেয়ে অনেক বড়। আল্লাহর দীনের কাজ করতে উদ্যত কোন ব্যক্তির হিম্মত বৃদ্ধি ও সাহস যোগানোর জন্য এর চাইতে বড় পন্থা বা উপায় আর কি হতে পারে? আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের নকশা যে ব্যক্তির হৃদয়-মনে খোদিত সে আল্লাহর জন্য একাই গোটা দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সামান্যতম দ্বিধা-দ্বন্দ্বও অনুভব করবে না।

৪. এটি একটি ব্যাপক অর্থ ব্যঞ্জক কথা। এর অর্থ অত্যন্ত বিস্তৃত।

এর একটি অর্থ হলো, তুমি তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ নাপাক বস্তু থেকে পবিত্র রাখো। কারণ শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতা এবং 'রূহ' বা আত্মার পবিত্রতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কোন পবিত্র আত্মা ময়লা-নোংরা ও পূতিগন্ধময় দেহ এবং অপবিত্র পোশাকের মধ্যে মোটেই অবস্থান করতে পারে না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সমাজে ইসলামের দাওয়াতের কাজ শুরু করেছিলেন তা শুধু আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিক আবিলতার মধ্যেই নিমজ্জিত ছিল না বরং পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কে পর্যন্ত সে সমাজের লোক অজ্ঞ ছিল। এসব লোককে সব রকমের পবিত্রতা শিক্ষা দেয়া ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ। তাই তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি যেন তাঁর বাহ্যিক জীবনেও পবিত্রতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখেন। এ নির্দেশের ফল স্বরূপ নবী (সা) মানব জাতিকে শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতা সম্পর্কে এমন বিস্তারিত শিক্ষা দিয়েছেন যে, জাহেলী যুগের আরবরা তো দূরের কথা আধুনিক যুগের চরম সভ্য জাতিসমূহও সে সৌভাগ্যের অধিকারী নয়। এমনকি দুনিয়ার অধিকাংশ ভাষাতে এমন কোন শব্দ পর্যন্ত পাওয়া যায় না যা 'তাহারাত' বা পবিত্রতার সমার্থক হতে পারে। পক্ষান্তরে ইসলামের অবস্থা হলো, হাদীস এবং ফিকাহর গ্রন্থসমূহে ইসলামী হুকুম-আহকাম তথা বিধি-বিধান সম্পর্কে সব আলোচনা শুরু হয়েছে "কিতাবুত তাহারাত' বা পবিত্রতা নামে অধ্যায় দিয়ে। এতে পবিত্রতা ও অপবিত্রতার পার্থক্য এবং পবিত্রতা অর্জনের উপায় ও পন্থাসমূহ একান্ত খুঁটিনাটি বিষয়সহ সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

একথাটির দ্বিতীয় অর্থ হলো, নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো। বৈরাগ্যবাদী ধ্যান-ধারণা পৃথিবীতে ধর্মাচরণের যে মানদণ্ড বানিয়ে রেখেছিল তাহলো, যে মানুষ যতো বেশী নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন হবে সে ততো বেশী পূত-পবিত্র। কেউ কিছুটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরলেই মনে করা হতো, সে একজন দুনিয়াদার মানুষ। অথচ মানুষের প্রবৃত্তি নোংরা ও ময়লা জিনিসকে অপছন্দ করে। তাই ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে আহবানকারীর বাহ্যিক অবস্থাও এতটা পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন যেন মানুষ তাকে সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে এবং তার ব্যক্তিত্বে এমন কোন দোষ-ত্রুটি যেন না থাকে যার কারণে রুচি ও প্রবৃত্তিতে তার প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়।

একথাটির তৃতীয় অর্থ হলো, নিজের পোশাক পরিচ্ছদ নৈতিক দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র রাখো। তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তো অবশ্যই থাকবে তবে তাতেও কোন প্রকার গর্ব-অহংকার, প্রদর্শনী বা লোক দেখানোর মনোবৃত্তি, ঠাটবাট এবং জৌলুসের নামগন্ধ পর্যন্ত থাকা উচিত নয়। পোশাক এমন একটি প্রাথমিক জিনিস যা অন্যদের কাছে একজন মানুষের পরিচয় তুলে ধরে। কোন ব্যক্তি যে ধরনের পোশাক পরিধান করে তা দেখে প্রথম দৃষ্টিতেই মানুষ বুঝতে পারে যে, সে কেমন স্বভাব চরিত্রের লোক। নওয়াব, বাদশাহ ও নেতৃ পর্যায়ের লোকদের পোশাক, ধর্মীয় পেশার লোকদের পোশাক, দাম্ভিক ও আত্মম্ভরী লোকদের পোশাক, বাজে ও নীচ স্বভাব লোকদের পোশাক এবং গুণ্ডা-পাণ্ডা ও বখাটে লোকদের পোশাকের ধরন সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থাকে। এসব পোশাকই পোশাক পরিধানকারীর মেজাজ ও মানসিকতার প্রতিনিধিত্ব করে।

আল্লাহর দিকে আহবানকারীর মেজাজ ও মানসিকতা স্বাভাবিকভাবেই এসব লোকদের থেকে আলাদা হয়ে থাকে। তাই তার পোশাক-পরিচ্ছদ তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে স্বতন্ত্র ধরনের হওয়া উচিত। তাঁর উচিত এমন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা যা দেখে প্রত্যেকেই অনুভব করবে যে, তিনি একজন শরীফ ও ভদ্র মানুষ, যাঁর মন-মানস কোন প্রকার দোষে দুষ্ট নয়।

এর চতুর্থ অর্থ হলো। নিজেকে পবিত্র রাখো। অন্য কথায় এর অর্থ হলো নৈতিক দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র থাকা এবং উত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া। ইবনে আব্বাস, ইবরাহীম নাখয়ী, শা'বী, 'আতা, মুজাহিদ, কাতাদা, সা'ঈদ ইবনে জুবায়ের, হাসান বাসরী এবং আরো অনেক বড় বড় মুফাস্‌সিরের মতে এটিই এ আয়াতের অর্থ। অর্থাৎ নিজের নৈতিক চরিত্রকে পবিত্র রাখো এবং সব রকমের দোষ-ত্রুটি থেকে দূরে থাকো। প্রচলিত আরবী প্রবাদ অনুসারে যদি বলা হয় যে, فلان طاهر الثياب وفلان طاهر الذيل "অমুক ব্যক্তির কাপড় বা পোশাক পবিত্র অথবা অমুক ব্যক্তি পবিত্র।" তাহলে এর দ্বারা বুঝানো হয় যে, সে ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র খুবই ভাল। পক্ষান্তরে যদি বলা হয় فلانٌ دنس الثياب অমুক ব্যক্তির পোশাক নোংরা তাহলে এ দ্বারা বুঝানো হয় যে, লোকটি লেনদেন ও আচার-আচরণের দিক দিয়ে ভাল নয়। তার কথা ও প্রতিশ্রুতির ওপর আস্থা রাখা যায় না।

৫. অপবিত্রতার অর্থ সব ধরনের অপবিত্রতা। তা আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার অপবিত্রতা হতে পারে, নৈতিক চরিত্র ও কাজ-কর্মের অপবিত্রতা হতে পারে আবার শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদ এবং উঠা বসা চলাফেরার অপবিত্রতাও হতে পারে। অর্থাৎ তোমার চারদিকে গোটা সমাজে হরেক রকমের যে অপবিত্রতা ও নোংরামি ছড়িয়ে আছে তার সবগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত রাখো। কেউ যেন তোমাকে একথা বলার সামান্য সুযোগও না পায় যে, তুমি মানুষকে যেসব মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্ত করছো তোমার নিজের জীবনেই সে মন্দের প্রতিফলন আছে।

৬. মূল বাক্যাংশ হলো وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ একথাটির অর্থ এতো ব্যাপক যে, একটি মাত্র কথায় অনুবাদ করে এর বক্তব্য তুলে ধরা সম্ভব নয়।

এর একটি অর্থ হলো, তুমি যার প্রতিই ইহ্‌সান বা অনুগ্রহ করবে, নিস্বার্থভাবে করবে। তোমার অনুগ্রহ ও বদান্যতা এবং দানশীলতা ও উত্তম আচরণ হবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। ইহ্‌সান বা মহানুভবতার বিনিময়ে কোন প্রকার পার্থিব স্বার্থ লাভের বিন্দুমাত্র আকাংখাও তোমার থাকবে না। অন্য কথায় একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইহ্‌সান করো, কোন প্রকার স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ইহ্‌সান করো না।

দ্বিতীয় অর্থ হলো, নবুওয়াতের যে দায়িত্ব তুমি পালন করছো। যদিও তা একটি বড় রকমের ইহ্‌সান, কারণ তোমার মাধ্যমেই আল্লাহর গোটা সৃষ্টি হিদায়াত লাভ করছে। তবুও এ কাজ করে তুমি মানুষের বিরাট উপকার করছো এমন কথা বলবে না এবং এর বিনিময়ে কোন প্রকার ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার করবে না।

তৃতীয় অর্থ হলো, তুমি যদিও অনেক বড় ও মহান একটি কাজ করে চলেছো কিন্তু নিজের দৃষ্টিতে নিজের কাজকে বড় কাজ বলে কখনো মনে করবে না এবং কোন সময় এ

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿٨﴾ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١٠﴾
ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَنِينَ
شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا ۖ إِنَّهُ كَانَ
لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ﴿١٦﴾ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴿١٧﴾ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ
قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ
إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾

তবে যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিনটি অত্যন্ত কঠিন দিন হবে।[৮] কাফেরদের জন্য মোটেই সহজ হবে না।[৯] আমাকে এবং সে ব্যক্তিকে[১০] ছেড়ে দাও যাকে আমি একা সৃষ্টি করেছি।[১১] তাকে অঢেল সম্পদ দিয়েছি এবং আরো দিয়েছি সবসময় কাছে থাকার মত অনেক পুত্র সন্তান।[১২] তার নেতৃত্বের পথ সহজ করে দিয়েছি। এরপরও সে লালায়িত, আমি যেন তাকে আরো বেশী দান করি।[১৩] তা কখনো নয়, সে আমার আয়াতসমূহের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। অচিরেই আমি তাকে এক কঠিন স্থানে চড়িয়ে দেব। সে চিন্তা-ভাবনা করলো এবং একটা ফন্দি উদ্ভাবনের চেষ্টা করলো। অভিশপ্ত হোক সে, সে কি ধরনের ফন্দি উদ্ভাবনের চেষ্টা করলো? আবার অভিশপ্ত হোক সে, সে কি ধরনের ফন্দি উদ্ভাবনের চেষ্টা করলো? অতপর সে মানুষের দিকে চেয়ে দেখলো। তারপর ভ্রুকুঞ্চিত করলো এবং চেহারা বিকৃত করলো। অতপর পেছন ফিরলো এবং দম্ভ প্রকাশ করলো। অবশেষে বললো ঃ এ তো এক চিরাচরিত যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

চিন্তাও যেন তোমার মনে উদিত না হয় যে, নবুওয়াতের এ দায়িত্ব পালন করে আর এ কাজে প্রাণপণ চেষ্টা-সাধনা করে তুমি তোমার রবের প্রতি কোন অনুগ্রহ করছো।

৭. অর্থাৎ যে কাজ আঞ্জাম দেয়ার দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হচ্ছে তা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এ কাজ করতে গিয়ে তোমাকে কঠিন বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হতে হবে। তোমার নিজের কওম তোমার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। সমগ্র আরব তোমার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লাগবে। তবে এ পথে চলতে গিয়ে যে কোন বিপদ-মুসিবতই আসুক না কেন তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে সেসব বিপদের মুখে ধৈর্য অবলম্বন করো এবং অত্যন্ত অটল ও দৃঢ়চিত্ত হয়ে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে থাকো। এ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য ভয়-ভীতি, লোভ-লালসা, বন্ধুত্ব, শত্রুতা এবং

ভালবাসা সব কিছুই তোমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এসবের মোকাবেলা করতে গিয়ে নিজের অবস্থানে স্থির ও অটল থাকবে।

এগুলো ছিল একেবারে প্রাথমিক দিকনির্দেশনা। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলকে যে সময় নবুওয়াতের কাজ শুরু করতে আদেশ দিয়েছিলেন সে সময় এ দিকনির্দেশনাগুলো তাঁকে দিয়েছিলেন। কেউ যদি এসব ছোট ছোট বাক্য এবং তার অর্থ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে তাহলে স্বতস্ফূর্তভাবে তার মন বলে উঠবে যে, একজন নবীর নবুওয়াতের কাজ শুরু করার প্রাক্কালে তাঁকে এর চাইতে উত্তম আর কোন দিকনির্দেশনা দেয়া যেতে পারে না। এ নির্দেশনায় তাঁকে কি কাজ করতে হবে একদিকে যেমন তা বলে দেয়া হয়েছে তেমনি এ কাজ করতে গেলে তাঁর জীবন, নৈতিক চরিত্র এবং আচার-আচরণ কেমন হবে তাও তাঁকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। এর সাথে সাথে তাঁকে এ শিক্ষাও দেয়া হয়েছে যে, তাঁকে কি নিয়ত, কি ধরনের মানসিকতা এবং কিরূপ চিন্তাধারা নিয়ে এ কাজ আঞ্জাম দিতে হবে। আর এতে এ বিষয়েও তাঁকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, এ কাজ করার ক্ষেত্রে কিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে এবং তার মোকাবিলা কিভাবে করতে হবে। বর্তমানেও যারা বিদ্বেষের কারণে স্বার্থের মোহে অন্ধ হয়ে বলে যে, (নাউযুবিল্লাহ) মৃগী রোগে আক্রান্ত হওয়ার মুহূর্তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে এসব কথা উচ্চারিত হতো, তারা একটু চোখ খুলে এ বাক্যগুলো দেখুক এবং নিজেরাই চিন্তা করুক যে, এগুলো কোন মৃগী রোগে আক্রান্ত মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত কথা না কি মহান আল্লাহর বাণী যা রিসালাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য তিনি তাঁর বান্দাকে দিচ্ছেন?

৮. আমরা ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছি যে, এ সূরার এ অংশটা প্রথম দিকে নাযিলকৃত আয়াতসমূহের কয়েক মাস পরে এমন সময় নাযিল হয়েছিল যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে ইসলামের তাবলীগ ও প্রচারের কাজ শুরু হওয়ার পর প্রথম বারের মত হজ্জের মওসুম সমাগত হলো এবং কুরাইশ নেতৃবৃন্দ একটি সম্মেলন ডেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, বহিরাগত হাজীদের মনে কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টির জন্য অপপ্রচার ও কুৎসা রটনার এক সর্বাত্মক অভিযান চালাতে হবে। এ আয়াতগুলোতে কাফেরদের এ কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা করা হয়েছে। আর একথাটি দ্বারাই পর্যালোচনা শুরু করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, ঠিক আছে, যে ধরনের আচরণ তোমরা করতে চাচ্ছ তা করে নাও। এভাবে পৃথিবীতে তোমরা কোন উদ্দেশ্য সাধনে সফল হলেও যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং কিয়ামত কায়েম হবে সেদিন তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের মন্দ পরিণাম থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে? (শিংগা সম্পর্কে ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আন'আম, টীকা ৪৭; ইবরাহীম, টীকা ৫৭; ত্বা-হা, টীকা ৭৮; আল হাজ্জ, টীকা ১, ইয়াসীন, টীকা ৪৬ ও ৪৭, আয্ যুমার, টীকা ৭৯ এবং ক্বাফ, টীক ৫২)

৯. এ বাক্যটি থেকে স্বতঃই প্রতিভাত হয় যে, সেদিনটি ঈমানদারদের জন্য হবে খুবই সহজ এবং এর সবটুকু কঠোরতা সত্যকে অমান্যকারীদের জন্য নির্দিষ্ট হবে। এ ছাড়া বাক্যটি থেকে এ অর্থও প্রতিফলিত হয় যে, সেদিনটির কঠোরতা কাফেরদের জন্য স্থায়ী

إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِى
وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾ وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلنَّارِ
إِلَّا مَلَٰٓئِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۙ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ
أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِيمَٰنًا وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ
وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ
بِهَٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ
جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِىَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾

এ তো মানুষের কথা মাত্র।[১৪] শিগগিরই আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবো। তুমি কি জানো, সে দোযখ কি? যা জীবিতও রাখবে না আবার একেবারে মৃত করেও ছাড়বে না।[১৫] গায়ের চামড়া ঝলসিয়ে দেবে।[১৬] সেখানে নিয়োজিত আছে উনিশ জন কর্মচারী। আমি[১৭] ফেরেশতাদের দোযখের কর্মচারী বানিয়েছি[১৮] এবং তাদের সংখ্যাকে কাফেরদের জন্য ফিতনা বানিয়ে দিয়েছি।[১৯] যাতে আহলে কিতাবদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে।[২০] ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি পায়,[২১] আহলে কিতাব ও ঈমানদাররা সন্দেহ পোষণ না করে[২২] আর যাদের মনে রোগ আছে তারা এবং কাফেররা যেন বলে, এ অভিনব কথা দ্বারা আল্লাহ কি বুঝাতে চেয়েছে?[২৩] এভাবে আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান হিদায়াত দান করেন।[২৪] তোমার রবের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ অবহিত নয়।[২৫] আর দোযখের এ বর্ণনা এ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যেই নয় যে, মানুষ তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে।[২৬]

হয়ে যাবে। তা এমন ধরনের কঠোরতা হবে না যা পরে কোন সময়ে হালকা বা লঘু হয়ে যাওয়ার আশা করা যাবে।

১০. এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে ঃ হে নবী, কাফেরদের সে সম্মেলনে যে ব্যক্তি (ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা) তোমাকে বদনাম করার উদ্দেশ্যে পরামর্শ দিয়েছিল যে, সমগ্র আরব থেকে আগত হাজীদের কাছে তোমাকে যাদুকর বলে প্রচার করতে হবে তার ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। এখন

আমার কাজ হলো, তার সাথে বুঝাপড়া করা। তোমার নিজের এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার কোন প্রয়োজন নেই।

১১. একথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে এবং দু'টি অর্থই সঠিক। এক, আমি যখন তাকে সৃষ্টি করেছিলাম সে সময় সে কোন প্রকার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং মর্যাদা ও নেতৃত্বের অধিকারী ছিল না। দুই, একমাত্র আমিই তার সৃষ্টিকর্তা। অন্য যেসব উপাস্যের খোদায়ী ও প্রভুত্ব কায়েম রাখার জন্য সে তোমার দেয়া তাওহীদের দাওয়াতের বিরোধিতায় এত তৎপর, তাদের কেউই তাকে সৃষ্টি করার ব্যাপারে আমার সাথে শরীক ছিল না।

১২. ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার দশ বারটি পুত্র সন্তান ছিল। তাদের মধ্যে হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ ইতিহাসে অনেক বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এসব পুত্র সন্তানদের জন্য شُهُود শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, রুযী রোজগারের জন্য তাদের দৌড় ঝাপ করতে বা সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতে কিংবা বিদেশ যাত্রা করতে হয় না। তাদের বাড়ীতে এত খাদ্য মজুদ আছে যে, তারা সর্বক্ষণ বাপের কাছে উপস্থিত থাকে এবং তাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকে। দুই, তার সবগুলো সন্তানই নামকরা এবং প্রভাবশালী, তারা বাপের সাথে দরবার ও সভা-সমিতিতে উপস্থিত থাকে। তিন, তারা সবাই এমন সামাজিক পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ বা মতামত গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

১৩. একথার একটি অর্থ হলো, এসব সত্ত্বেও তার লালসা ও আকাংখার শেষ নেই। এত কিছু লাভ করার পরও সে সর্বক্ষণ এ চিন্তায় বিভোর যে, দুনিয়ার সব নিয়ামত ও ভোগের উপকরণ সে কিভাবে লাভ করতে পারবে। দুই, হযরত হাসান বাসরী ও আরো কয়েকজন মনীষী বর্ণনা করেছেন যে, সে বলতো ঃ মুহাম্মাদের (সা) একথা যদি সত্য হয়ে থাকে যে, মৃত্যুর পর আরো একটি জীবন আছে এবং সেখানে জান্নাত বলেও কিছু একটা থাকবে তাহলে সে জান্নাত আমার জন্যই তৈরী করা হয়েছে।

১৪. মক্কায় কাফেরদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে সে সম্মেলনে সংঘটিত ঘটনার কথা বলা হচ্ছে। সূরার ভূমিকায় ঘটনাটির যে বিস্তারিত বিবরণ আমরা উল্লেখ করেছি তা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, এ ব্যক্তি মনে প্রাণে যে বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, কুরআন আল্লাহর বাণী। কিন্তু নিজের গোত্রের মধ্যে তার মর্যাদা, প্রভাব প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্যে ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিল না। কাফেরদের সে সম্মেলনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে কুরাইশ নেতাদের প্রস্তাবিত অভিযোগসমূহ সে নিজেই যখন খণ্ডন করলো তখন আরবের লোকদের মধ্যে রটিয়ে দিয়ে নবীকে (সা) বদনাম করা যায় এমন কোন অভিযোগ তৈরি করে পেশ করতে খোদ তাকেই বাধ্য করা হলো। এ সময় সে যেভাবে তার বিবেকের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং বেশ কিছু সময় কঠিন মানসিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকার পর পরিশেষে সে যেভাবে একটি অভিযোগ তৈরি করলো, তার একটা পূর্ণাংগ চিত্র এখানে পেশ করা হয়েছে।

১৫. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হলো, যাকেই এর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে তাকেই সে জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে। কিন্তু জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়েও সে রক্ষা পাবে না। বরং আবার তাকে জীবিত করা হবে এবং আবার জ্বালানো হবে। আরেক জায়গায় কথাটা এভাবে বলা হয়েছে ঃ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ 'সেখানে সে মরে নিঃশেষ হয়েও যাবে না আবার বেঁচেও থাকবে না' (আল আ'লা, ১৩)। এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে এই যে, আযাবের উপযুক্ত কেউ-ই তার কবল থেকে রক্ষা পাবে না। আর যে তার কবলে পড়বে তাকেই আযাব থেকে রেহাই দেবে না।

১৬. 'তা দেহের কোন অংশই না জ্বালিয়ে ছাড়বে না' একথা বলে আবার "চামড়া ঝলসিয়ে দেবে" কথাটি আলাদা করে উল্লেখ করাটা বাহ্যত অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। কিন্তু এ বিশেষ ধরনের আযাবের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, মূলত মুখমণ্ডল ও দেহের চামড়াই মানুষের ব্যক্তিত্বকে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরে বা প্রকাশ করে। তাই চেহারা ও গাত্রচর্মের কুৎসিত দর্শন ও কুশ্রী হওয়া তার জন্য সর্বাধিক মানসিক যন্ত্রণার কারণ হবে। শরীরের আভ্যন্তরীণ অংগ-প্রত্যংগে তার যত কষ্ট ও যন্ত্রণাই হোক না কেন সে তাতে ততটা মানসিক যাতনাক্লিষ্ট হয় না। যতটা হয় তার চেহারা কুৎসিৎ হলে কিংবা শরীরের খোলা মেলা অংশের চামড়া বা ত্বকের ওপর বিশ্রী দাগ পড়লে। কারণ কোন মানুষের চেহারা ও গাত্র চর্মে বিশ্রী দাগ থাকলে সবাই তাকে ঘৃণা করে। তাই বলা হয়েছে ঃ এ সুদর্শন চেহারা এবং অত্যন্ত নিটোল ও কান্তিময় দেহধারী যেসব মানুষ নিজেদের ব্যক্তিত্ব গৌরবে আত্মহারা তারা যদি আল্লাহর আয়াতের সাথে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার মত শত্রুতার আচরণ করতেই থাকে তাহলে তাদের মুখমণ্ডল ঝলসিয়ে বিকৃত করে দেয়া হবে আর তাদের গাত্রচর্ম পুড়িয়ে কয়লার মত কাল করে দেয়া হবে।

১৭. এখান থেকে "তোমরা রবের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ অবহিত নয়" পর্যন্ত বাক্যগুলোতে একটি ভিন্ন প্রসংগ আলোচিত হয়েছে। "দোযখের কর্মচারীর সংখ্যা শুধু উনিশ জন হবে" একথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনে যারা সমালোচনামুখর হয়ে উঠেছিল এবং কথাটা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতে শুরু করেছিল প্রাসংগিক বক্তব্যের মাঝখানে বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় ছেদ টেনে তাদের কথার জবাব দেয়া হয়েছে। তাদের কাছে একথাটি বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, এক দিকে আমাদের বলা হচ্ছে, আদম আলাইহিস সাল্লামের সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ কুফরী করেছে এবং কবীরা গোনাহে লিপ্ত হয়েছে তাদের সবাইকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। অপর দিকে আমাদের জানানো হচ্ছে যে, এত বড় বিশাল দোযখে অসংখ্য মানুষকে আযাব দেয়ার জন্য মাত্র উনিশ জন কর্মচারী নিয়োজিত থাকবে। একথা শুনে কুরাইশ নেতারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। আবু জেহেল বললো ঃ আরে ভাই, তোমরা কি এতই অকর্মা ও অথর্ব হয়ে পড়েছো যে, তোমাদের মধ্য থেকে দশ দশ জনে মিলেও দোযখের এক একজন সিপাইকে কাবু করতে পারবে না? বনী জুমাহ্ গোত্রের এক পালোয়ান সাহেব তো বলতে শুরু করলোঃ সতের জনকে আমি একাই দেখে নেব। আর তোমরা সবাই মিলে অবশিষ্ট দুই জনকে কাবু করবে। এসব কথার জবাব হিসেবে সাময়িকভাবে প্রসংগ পাল্টে একথাগুলো বলা হয়েছে।

১৮. অর্থাৎ মানুষের দৈহিক শক্তির সাথে তুলনা করে তাদের শক্তি সম্পর্কে অনুমান করা তোমাদের বোকামী ও নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা মানুষ নয়, বরং ফেরেশতা। তোমাদের পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব নয় যে, কি সাংঘাতিক শক্তিধর ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন।

১৯. অর্থাৎ দোযখের কর্মচারীদের সংখ্যা বর্ণনা করার বাহ্যত কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু তাদের সংখ্যা আমি এ জন্য উল্লেখ করলাম যাতে তা সেসব লোকের জন্য ফিতনা হয়ে যায় যারা নিজেদের মনের মধ্যে এখনও কুফরী লুকিয়ে রেখেছে। এ ধরনের লোক বাহ্যিকভাবে ঈমানের প্রদর্শনী যতই করুক না কেন তার অন্তরের কোন গভীরতম প্রদেশেও যদি সে আল্লাহর উলুহিয়াত ও তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা কিংবা অহী ও রিসালাত সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহ বা দ্বিধা-দ্বন্দ্বও পোষণ করে থাকে তাহলে আল্লাহর এত বড় জেলখানায় অসংখ্য অপরাধী মানুষ ও জিনকে শুধু উনিশ জন সিপাই সামলে রাখবে এবং আলাদাভাবে প্রত্যেককে শাস্তিও দেবে একথা শোনামাত্র তার লুকিয়ে রাখা কুফরী স্পষ্ট বেরিয়ে পড়বে।

২০. কোন কোন মুফাস্‌সির এর এ অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, আহলে কিতাবের (ইয়াহুদ ও খৃষ্টান) ধর্মগ্রন্থেও যেহেতু দোযখের ফেরেশতাদের এ সংখ্যাটিই উল্লেখ করা হয়েছে। তাই একথা শোনামাত্র তাদের দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হবে যে, প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহর কথাই হবে। কিন্তু আমাদের মতে দু'টি কারণে এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। প্রথম কারণটি হলো, ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের যে ধর্মগ্রন্থ বর্তমানে দুনিয়ায় পাওয়া যায় তাতে অনেক খোঁজাখুঁজির পরও দোযখের কর্মচারী ফেরেশতার সংখ্যা উনিশ জন একথা কোথাও পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় কারণটি হলো, কুরআনের বহুসংখ্যক বক্তব্য আহলে কিতাবের ধর্মীয় গ্রন্থে বর্ণিত বক্তব্যের অনুরূপ। কিন্তু ইয়াহুদ ও খৃষ্টানরা এসব বক্তব্যের ব্যাখ্যা করে বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব কথা তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছেন। এসব কারণে আমাদের মতে একথাটির সঠিক অর্থ হলো ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল করেই জানতেন যে, তাঁর মুখে দোযখের কর্মচারী ফেরেশতার সংখ্যা উনিশ, একথা উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে তাঁর প্রতি হাসি-তামাসা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের অসংখ্য বাণ নিক্ষিপ্ত হবে। তা সত্ত্বেও আল্লাহর প্রেরিত অহীতে যে কথা বলা হয়েছে, তা তিনি কোন প্রকার ভয়-ভীতি বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে সবার সামনে পেশ করলেন এবং কোন প্রকার ঠাট্টা-বিদ্রূপের আদৌ পরোয়া করলেন না। জাহেল আরবরা নবীদের মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট সম্পর্কে অবহিত ছিল না ঠিকই, কিন্তু আহলে কিতাব গোষ্ঠী ভাল করেই জানতো যে, প্রত্যেক যুগে নবীদের নীতি ও পদ্ধতি এটাই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের কাছে যা কিছু আসতো মানুষ পছন্দ করুক বা না করুক তারা তা হুবহু মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিতেন। তাই আশা করা গিয়েছিল যে, এ চরম প্রতিকূল পরিবেশে রসূলকে (সা) বাহ্যত অদ্ভুত একথাটি কোন প্রকার দ্বিধা-সংকোচ না করে সরাসরি পেশ করতে দেখে অন্তত আহলে কিতাব গোষ্ঠীর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাবে যে, এটি একজন নবীর কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় আহলে কিতাব গোষ্ঠীর কাছ থেকে এ আচরণ লাভের প্রত্যাশা ছিল বেশী।

উল্লেখ্য যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে এ কর্মনীতি বেশ কয়েকবার প্রতিফলিত হয়েছে। এর মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য হলো মি'রাজের ঘটনা। তিনি কাফেরদের সমাবেশে নিসংকোচে ও দ্বিধাহীন চিত্তে মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। এ বিস্ময়কর ঘটনা শুনে তাঁর বিরোধীরা কত রকমের কাহিনী ফাঁদবে তার এক বিন্দু পরোয়াও তিনি করেননি।

২১. একথাটি ইতিপূর্বে কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি পরীক্ষার সময় একজন ঈমানদার যদি তার ঈমানে অটল ও অচল থাকে এবং সন্দেহ–সংশয় কিংবা আনুগত্য পরিহার কিংবা দীনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার পথ বর্জন করে দৃঢ় প্রত্যয়, আস্থা, আনুগত্য ও অনুসরণ এবং দীনের প্রতি আস্থা পোষণের পথ অনুসরণ করে তাহলে তার ঈমান দৃঢ়তা ও সমৃদ্ধি লাভ করে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৩; আল আনফাল, আয়াত ২; টীকা ২; আত্ তাওবা, আয়াত ১৪৪ ও ১৪৫; টীকা ১২৫; আল আহযাব, আয়াত ২২; টীকা ৩৮; আল ফাত্হ, আয়াত ৪; টীকা ৭)।

২২. কুরআন মজীদে সাধারণত 'মনের রোগ' কথাটি মুনাফেকী অর্থে ব্যবহার করা হয়। তাই এ ক্ষেত্রে এ শব্দটির ব্যবহার দেখে কোন কোন মুফাস্‌সির মনে করেছেন, এ আয়াতটি মদীনাতে নাযিল হয়েছে। কারণ, মদীনাতেই মুনাফিকদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। কিন্তু এ ধারণা কয়েকটি কারণে ঠিক নয়। প্রথমত এ দাবী ঠিক নয় যে, মক্কায় মুনাফিক ছিল না। আমরা তাফহীমুল কুরআন সূরা আনকাবুতের ভূমিকায় এবং ১, ১৩, ১৪, ১৫, ও ১৬নং টীকায় এ ভ্রান্তি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছি। দ্বিতীয়ত বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ধারাবাহিকভাবে অবতীর্ণ আয়াতসমূহের কোন একটি আয়াত সম্পর্কে একথা বলা যে, তা অন্য কোন পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছে এবং কোন পূর্বাপর সম্পর্ক ছাড়াই এখানে জুড়ে দেয়া হয়েছে, এভাবে কুরআনের কোন আয়াতের তাফসীর করা আমরা সঠিক মনে করি না। নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াতসমূহ থেকেই আমরা সূরা মুদ্দাস্‌সিরের এ অংশের ঐতিহাসিক পটভূমি জানতে পারি। মক্কী যুগের প্রাথমিক পর্যায়ের একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে এ অংশটি নাযিল হয়েছিল। ঘটনার সাথে বক্তব্যের ধারাবাহিকতার পুরোপুরি সামঞ্জস্য রয়েছে। যদি এ একটি বাক্য কয়েক বছর পর মদীনাতেই নাযিল হয়ে থাকে তাহলে তাকে এ বিশেষ বিষয়ের মধ্যে এনে জুড়ে দেয়ার কি এমন অবকাশ বা যুক্তি আছে? এখন একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, 'মনের রোগ' বলতে তাহলে কি বুঝানো হয়েছে? এর জবাব হলো, এর অর্থ সন্দেহের রোগ। অকাট্যভাবে এবং নিসংশয়ে আল্লাহ, আখেরাত, অহী, রিসালাত, জান্নাত ও দোযখ অস্বীকার করে এমন লোক শুধু মক্কায় নয় গোটা পৃথিবীতে আগেও যেমন কম ছিল এখনও তেমনি কম আছে। আল্লাহ আছেন কিনা, আখেরাত হবে কি হবে না, ফেরেশতা, জান্নাত ও দোযখ বাস্তবিকই আছে না কল্পকাহিনী মাত্র? রসূল কি প্রকৃতই রসূল ছিলেন? তাঁর কাছে কি সত্যিই অহী আসতো? প্রত্যেক যুগে এ ধরনের সন্দেহ পোষণকারী লোকের সংখ্যাই অধিক ছিল। এ সন্দেহই অধিকাংশ মানুষকে শেষ পর্যন্ত কুফরীতে নিমজ্জিত করেছে। তা

না হলে যারা এসব সত্য অকাট্যভাবে অস্বীকার করে পৃথিবীতে এরূপ নির্বোধের সংখ্যা কোন সময়ই বেশী ছিল না। কেননা যার মধ্যে বিন্দু পরিমাণ বিবেক-বুদ্ধিও আছে সেও জানে যে, এসব বিষয়ের সত্য ও সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে বাতিল করে দেয়া এবং অকাট্যভাবে অসম্ভব ও অবাস্তব বলে সিদ্ধান্ত দেয়ার আদৌ কোন ভিত্তি নেই।

২৩. এর অর্থ এ নয় যে, তারা একে আল্লাহর বাণী বলে মেনে নিচ্ছিলো ঠিকই কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করছিলো এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা একথা বললেন কেন? বরং প্রকৃতপক্ষে তারা বলতে চাচ্ছিলো যে, যে বাণীতে এরূপ বিবেক-বুদ্ধি বিরোধী ও দুর্বোধ্য কথা বলা হয়েছে তা আল্লাহর বাণী কি করে হতে পারে?

২৪. অর্থাৎ এভাবে আল্লাহ তা'আলা মাঝে মধ্যে তাঁর বাণী ও আদেশ-নির্দেশে এমন কিছু কথা বলেন যা মানুষের জন্য পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে কথা শুনে একজন সত্যপন্থী, সৎপ্রকৃতির এবং সঠিক চিন্তার লোক সহজ সরল অর্থ গ্রহণ করে সঠিক পথ অনুসরণ করে একজন হঠকারী বক্রচিন্তাধারী এবং সত্যকে এড়িয়ে চলার মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি সে একই কথার বাঁকা অর্থ করে তাকে ন্যায় ও সত্য থেকে দূরে সরে যাওয়ার একটা নতুন বাহানা হিসেবে ব্যবহার করে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি নিজে যেহেতু সত্যপন্থী তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে হিদায়াত দান করেন। কারণ, হিদায়াত প্রার্থী ব্যক্তিকে জোর করে গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট করা আল্লাহর নীতি নয়। শেষোক্ত ব্যক্তি যেহেতু নিজেই হিদায়াত চায় না, বরং গোমরাহীকেই পছন্দ করে তাই আল্লাহ তাকে গোমরাহীর পথেই ঠেলে দেন। কারণ যে ন্যায় ও সত্যকে ঘৃণা করে তাকে জোর করে হকের পথে টেনে আনা আল্লাহর নীতি নয়। (আল্লাহ তা'আলার হিদায়াত দান করা এবং গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করার বিষয়টি সম্পর্কে এ তাফসীর গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নিচে উল্লেখিত জায়গাসমূহে দেখুন, সূরা আল বাকারাহ, টীকা ১০, ১৬, ১৯, ও ২০; আন নিসা, টীকা ১৭৩; আল আন'য়াম, টীকা ১৭, ২৮ ও ৯০; ইউনুস, টীকা ১৩; আল কাহ্‌ফ, টীকা ৫৪ এবং আল কাসাস, টীকা ৭১)

২৫. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ বিশ্ব-জাহানে ভিন্ন ভিন্ন কত শত রকমের জীব-জন্তু যে সৃষ্টি করে রেখেছেন, তাদের কত রকম শক্তি সামর্থ যে দান করেছেন এবং তাদের দ্বারা কত রকম কাজ যে আঞ্জাম দিচ্ছেন একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। পৃথিবীর মত ক্ষুদ্র একটি গ্রহে বসবাসকারী মানুষ তার সীমাবদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে চার পাশের ক্ষুদ্র পৃথিবীকে দেখে যদি এ ভুল ধারণা করে বসে যে, সে তার ইন্দ্রিয়সমূহের সাহায্যে যা কিছু দেখছে ও অনুভব করছে কেবল মাত্র সেগুলোই আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বাধীন তাহলে এটা তার মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বাধীন এ বিশ্ব-জাহান এত ব্যাপক ও বিশাল যে, মানুষের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এর ব্যাপকতা ও বিশালতার সবটুকু জ্ঞানের স্থান সংকুলান তো দূরের কথা এর কোন একটি জিনিস সম্পর্কেও পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা তার সাধ্যাতীত।

২৬. অর্থাৎ দোযখের উপযুক্ত হয়ে যাওয়া এবং তার শাস্তিলাভের পূর্বেই লোকেরা যেন তা থেকে নিজেদের রক্ষার চিন্তা করে।

كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٣﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾ نَذِيرًا
لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾
مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ
الْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾
حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ ﴿٤٧﴾ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿٤٨﴾

২ রুকূ'

কখ্খনো না,[২৭] চাঁদের শপথ, আর রাতের শপথ যখন তার অবসান ঘটে। ভোরের শপথ যখন তা আলোকোজ্জল হয়ে ওঠে। এ দোযখও বড় জিনিসগুলোর একটি।[২৮] মানুষের জন্য ভীতিকর। যে অগ্রসর হতে চায় বা পেছনে পড়ে থাকতে চায়[২৯] তাদের সবার জন্য।

প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের কাছে দায়বদ্ধ।[৩০] তবে ডান দিকের লোকেরা ছাড়া[৩১] যারা জান্নাতে অবস্থান করবে। সেখানে তারা অপরাধীদের জিজ্ঞেস করতে থাকবে[৩২] "কিসে তোমাদের দোযখে নিক্ষেপ করলো।" তারা বলবে ঃ আমরা নামায পড়তাম না।[৩৩] অভাবীদের খাবার দিতাম না।[৩৪] সত্যের বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীদের সাথে মিলে আমরাও রটনা করতাম; প্রতিফল দিবস মিথ্যা মনে করতাম। শেষ পর্যন্ত আমরা সে নিশ্চিত জিনিসের মুখোমুখি হয়েছি।[৩৫] সে সময় সুপারিশকারীদের কোন সুপারিশ তাদের কাজে আসবে না।[৩৬]

২৭. অর্থাৎ এটা কোন ভিত্তিহীন কথা নয় যে তা নিয়ে এভাবে হাসি তামাসা বা ঠাট্টা–বিদ্রূপ করা যাবে।

২৮. অর্থাৎ চন্দ্র এবং রাত–দিন যেমন আল্লাহর কুদরতের বিরাট বিরাট নিদর্শন ঠিক তেমনি দোযখও আল্লাহর বিশাল সৃষ্টিসমূহের একটি। চাঁদের অস্তিত্ব যদি অসম্ভব না হয়ে থাকে। রাত ও দিনের নিয়মানুবর্তিতার সাথে আগমন তথা আবর্তন যদি অসম্ভব না হয় তাহলে তোমাদের মতে দোযখের অস্তিত্ব অসম্ভব হবে কি কারণে? রা দিন সব সময় যেহেতু তোমরা এসব জিনিস দেখছো তাই এগুলো সম্পর্কে তোমাদের মনে কোন বিস্ময় জাগে না। অন্যথায় এগুলোর প্রত্যেকটি আল্লাহর কুদরতের একেকটি বিস্ময়কর মু'জিযা।

কোন সময় এসব জিনিস যদি তোমরা না দেখতে। আর এ অবস্থায় কেউ যদি তোমাদের বলতো যে, চাঁদের মত একটি জিনিস এ পৃথিবীতে আছে অথবা সূর্য এমন একটি বস্তু যা আড়ালে চলে গেলে দুনিয়া আঁধারে ঢাকা পড়ে এবং আড়াল থেকে বেরিয়ে আসলে দুনিয়া আলোকোদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাহলে একথা শুনেও তোমাদের মত লোকেরা অট্টহাসিতে ঠিক তেমনি ফেটে পড়তে যেমন দোযখের কথা শুনে আজ ফেটে পড়ছো।

২৯. এর অর্থ হলো, এ জিনিসটি দ্বারা মানুষকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এখন কেউ ইচ্ছা করলে এ জিনিসটিকে ভয় করে কল্যাণের পথে আরো এগিয়ে যেতে পারে। আবার কেউ ইচ্ছা করলে পেছনে সরে যেতে পারে।

৩০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন সূরা তূরের ১৬নং টীকা।

৩১. অন্য কথায় বাম দিকের লোকেরা তাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে পাকড়াও হবে। কিন্তু ডান দিকের লোকেরা দায়বদ্ধ অবস্থা থেকে নিজেদের মুক্ত করে নেবে। (ডান ও বাঁ দিকের ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ওয়াকিয়া, টীকা ৫ ও ৬)

৩২. ইতিপূর্বে কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে যে, জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীরা পরস্পর থেকে লাখ লাখ মাইল দূরে অবস্থান করা সত্ত্বেও যখনই ইচ্ছা করবে কোন যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই একে অপরকে দেখতে পাবে এবং সরাসরি কথাবার্তাও বলতে পারবে। উদাহরণ হিসেবে দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আ'রাফ, আয়াত ৪৪ থেকে ৫০, টীকা ৩৫; আস সাফ্‌ফাত, আয়াত ৫০ থেকে ৫৭, টীকা ৩২।

৩৩. এর অর্থ হলো, যেসব মানুষ আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং তাঁর কিতাবকে মেনে নিয়ে মানুষের কাছে আল্লাহর প্রাথমিক হক অর্থাৎ নামায ঠিকমত আদায় করেছে আমরা তাদের মধ্যে অন্তরভুক্ত ছিলাম না। এ ক্ষেত্রে একথাটি খুব ভাল করে বুঝে নেয়া দরকার যে, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়তেই পারে না যতক্ষণ না সে ঈমান আনে। তাই নামাযী হওয়ার অনিবার্য অর্থ হচ্ছে ঈমানদার হওয়া। কিন্তু নামাযী না হওয়াকে দোযখে যাওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করার মাধ্যমে স্পষ্ট করে একথাই বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি নামায না পড়লে ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও সে দোযখ থেকে বাঁচতে পারবে না।

৩৪. এ থেকে জানা যায় কোন মানুষকে ক্ষুধার্ত দেখার পর সামর্থ থাকা সত্ত্বেও খাবার না দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে কত বড় গোনাহ যে, মানুষের দোযখে যাওয়ার কারণসমূহের মধ্যে এটাকেও একটা কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৫. অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত আমরা এ নীতি ও কর্মপন্থা অনুসরণ করেছি। শেষ পর্যন্ত সে নিশ্চিত বিষয়টি আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে যে সম্পর্কে আমরা গাফিল হয়ে পড়েছিলাম। নিশ্চিত বিষয় বলে মৃত্যু ও আখেরাত উভয়টিকেই বুঝানো হয়েছে।

৩৬. অর্থাৎ যারা মৃত্যু পর্যন্ত এ নীতি অনুসরণ করেছে তাদের জন্য শাফায়াত করলেও সে ক্ষমা লাভ করতে পারবে না। শাফায়াত সম্পর্কে কুরআন মজীদের বহু স্থানে এত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কে শাফায়াত করতে সক্ষম আর কে সক্ষম নয়, কোন

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾
بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾ كَلَّا ۖ بَل لَّا
يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٥٣﴾ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿٥٥﴾ وَمَا
يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

এদের হলো কি যে এরা এ উপদেশ বাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে যেন তারা বাঘের ভয়ে পলায়নপর বন্য গাধা।[৩৭] বরং তারা প্রত্যেকে চায় যে, তার নামে খোলা চিঠি পাঠানো হোক।[৩৮] তা কখ্খনো হবে না। আসল কথা হলো, এরা আখেরাতকে আদৌ ভয় করে না।[৩৯] কখ্খনো না[৪০] এ তো একটা উপদেশ বাণী। এখন কেউ চাইলে এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুক। আর আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তারা কোন শিক্ষা গ্রহণ করবে না।[৪১] একমাত্র তিনিই তাকওয়া বা ভয়ের যোগ্য।[৪২] এবং (তাকওয়ার নীতি গ্রহণকারীদের) ক্ষমার অধিকারী।[৪৩]

অবস্থায় শাফায়াত করা যায় আর কোন্ অবস্থায় যায় না। কার জন্য করা যায় আর কার জন্য যায় না এবং কার জন্য তা কল্যাণকর আর কার জন্য তা কল্যাণকর নয় তা জানা কারো জন্য কঠিন নয়। পৃথিবীতে মানুষের গোমরাহীর বড় বড় কারণের মধ্যে একটি হলো শাফায়াত সম্পর্কে ভ্রান্ত আকীদা–বিশ্বাস পোষণ। তাই বিষয়টি কুরআন এত খোলামেলা ও স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছে যে, এ ক্ষেত্রে সন্দেহের আর কোন অবকাশই বাকি রাখেনি। উদাহরণ স্বরূপ নিচে নির্দেশিত আয়াতসমূহ দেখুন, সূরা আল বাকারাহ, ২৫৫; আল আন'আম, ৯৪; আল আ'রাফ, ৫৩; ইউনুস, ৩ ও ১৮; মারয়াম, ৮৭; ত্বা–হা, ১০৯; আল আম্বিয়া, ২৮; সাবা ২৩, আয্ যুমার, ৪৩ ও ৪৪, আল মু'মিন, ১৮; আদ্ দুখান, ৮৬; আন নাজ্‌ম, ২৬ এবং আন নাবা, ৩৭ ও ৩৮। যেসব স্থানে এসব আয়াত আছে তাফহীমুল কুরআনের সেসব জায়গায় আমরা বিস্তারিতভাবে তার ব্যাখ্যা পেশ করেছি।

৩৭. এটা প্রচলিত একটি আরবী প্রবাদ। বন্য গাধার বৈশিষ্ট হলো বিপদের আভাস পাওয়া মাত্র এত অস্থির হয়ে পালাতে থাকে যে আর কোন জন্তু তেমন করে না। এ জন্য আরবরা অস্বাভাবিক রকম অস্থির ও দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পলায়নপর ব্যক্তিকে বাঘের গন্ধ বা শিকারীর মৃদু পদশব্দ শোনামাত্র পলায়নরত বন্য গাধার সাথে তুলনা করে থাকে।

৩৮. অর্থাৎ তারা চায় যে, আল্লাহ তা'আলা যদি সত্যি সত্যিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসেবে পাঠিয়ে থাকেন তাহলে তিনি মক্কার প্রত্যেক নেতা ও সমাজপতিদের কাছে যেন একখানা করে পত্র লিখে পাঠান যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যিই আমার নবী, তোমরা তাঁর আনুগত্য করো। পত্রখানা এমন হবে যেন তা দেখে তারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে, আল্লাহই এ পত্র লিখে পাঠিয়েছেন। কুরআন মজীদের অন্য এক জায়গায় মক্কার কাফেরদের এ উক্তিরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, "আল্লাহর রসূলদের যা দেয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত তা আমাদের দেয়া না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মেনে নেব না।" (আল আন'আম, ২৪) অন্য এক জায়গায় তাদের এ দাবীও উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, "আপনি আমাদের চোখের সামনে আসমানে উঠে যান এবং সেখান থেকে লিখিত কিতাব নিয়ে আসেন, আমরা তা পড়ে দেখবো।" (বনী ইসরাঈল, ৯৩)

৩৯. অর্থাৎ এদের ঈমান না আনার আসল কারণ এটা নয় যে, তাদের এ দাবী পূরণ করা হচ্ছে না। বরং এর আসল কারণ হলো এরা আখেরাতের ব্যাপারে বেপরোয়া ও নির্ভীক। এরা এ পৃথিবীকেই পরম পাওয়া মনে করে নিয়েছে। তাই তাদের এ ধারণাটুকু পর্যন্ত নেই যে, এ দুনিয়ার জীবন শেষ হওয়ার পর আরেকটি জীবন আছে যেখানে তাদেরকে নিজ নিজ কৃতকর্মের হিসেব দিতে হবে। এ জিনিসটিই তাদেরকে এ পৃথিবীতে নিরুদ্বিগ্ন ও দায়িত্বহীন বানিয়ে দিয়েছে। হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার প্রশ্নকে তারা অর্থহীন মনে করে। কারণ দুনিয়াতে এমন কোন সত্য তারা দেখতে পায় না যা অনুসরণ করার ফলাফল এ দুনিয়াতে সবসময় ভালই হয়ে থাকে এবং এমন কোন বাতিল বা মিথ্যাও তারা দুনিয়াতে দেখতে পায় না যার ফলাফল এ দুনিয়াতে সবসময় মন্দই হয়ে থাকে। তাই প্রকৃতপক্ষে সত্য কি আর মিথ্যা কি তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা তারা নিরর্থক মনে করে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার এ জীবনকে অস্থায়ী জীবন বলে মনে করে এবং সাথে সাথে এও বিশ্বাস করে যে, সত্যিকার এবং চিরস্থায়ী জীবন হলো আখেরাতের জীবন যেখানে সত্যের ফলাফল অনিবার্যরূপে ভাল এবং মিথ্যার ফলাফল অনিবার্যরূপে মন্দ হবে, হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার প্রশ্নটি কেবলমাত্র সে ব্যক্তির কাছেই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হতে পারে। এ প্রকৃতির লোক কুরআনের পেশকৃত যুক্তিপূর্ণ দলীল-প্রমাণ এবং পবিত্র শিক্ষাসমূহ দেখেই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং নিজের বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে বুঝার চেষ্টা করবে যে, কুরআন যেসব আকীদা-বিশ্বাস এবং কাজ-কর্মকে ভ্রান্ত বলছে তার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কি কি ভুল-ভ্রান্তি আছে। কিন্তু আখেরাতকে অস্বীকারকারী, যে সত্যের অনুসন্ধানে নিষ্ঠাবান নয় সে ঈমান গ্রহণ না করার জন্য নতুন নতুন দাবী পেশ করতে থাকবে। অথচ তার যে কোন দাবীই পূরণ করা হোক না কেন সত্যকে অস্বীকার করার জন্য সে আরেকটি নতুন বাহানা খাড়া করবে। এ কথাটিই সূরা আন'আমে এভাবে বলা হয়েছে ঃ "হে নবী, আমি যদি কাগজে লিখিত কোন গ্রন্থও তোমার প্রতি নাযিল করতাম আর এসব লোকেরা তা হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখতো তার পরও যারা সত্যকে অস্বীকার করেছে তারা বলতো, এতো স্পষ্ট যাদু।" (সূরা আল আন'আম, ৭)

৪০. অর্থাৎ তাদের এ ধরনের কোন দাবী কখ্খনো পূরণ করা হবে না।

৪১. অর্থাৎ নসীহত গ্রহণ করা শুধু কোন ব্যক্তির নিজের ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করে না বরং নসীহত গ্রহণ করার সৌভাগ্য সে তখনই লাভ করে যখন আল্লাহর ইচ্ছা তাকে নসীহত গ্রহণ করার সুমতি ও সুবুদ্ধি দান করে। অন্য কথায় এখানে এ সত্য তুলে ধরা

হয়েছে যে, বান্দার কোন কাজই এককভাবে বান্দার নিজের ইচ্ছায় সংঘটিত হয় না। বরং প্রতিটি কাজ কেবল তখনই পূর্ণতা লাভ করে যখন আল্লাহর ইচ্ছা বান্দার ইচ্ছার অনুকূল হয়। এ সূক্ষ্ম বিষয়টি সঠিকভাবে না বুঝার কারণে মানুষের ধ্যান–ধারণা ও চিন্তা–ভাবনা অনেক ক্ষেত্রেই হোঁচট খায়। অল্প কথায় বিষয়টি এভাবে বুঝা যেতে পারে, প্রতিটি মানুষ যদি পৃথিবীতে এতটা ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী হতো যে, সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে তাহলে গোটা পৃথিবীর নিয়ম শৃংখলা ভেঙে পড়তো। বর্তমানে এ পৃথিবীতে যে নিয়ম শৃংখলা আছে তা এ কারণেই আছে যে, আল্লাহর ইচ্ছা সব ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। মানুষ যা–ই করতে ইচ্ছা করুক না কেন তা সে কেবল তখনই করতে পারে যখন আল্লাহর ইচ্ছা হয় যে, সে তা করুক। হিদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারটিও ঠিক অনুরূপ। নিজের জন্য হিদায়াত কামনা করাই মানুষের হিদায়াত পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং সে হিদায়াত কেবল তখনই লাভ করে যখন আল্লাহ তার এ আকাংখা পূরণ করার ফায়সালা করেন। একইভাবে বান্দার পক্ষ থেকে গোমরাহীর পথে চলার ইচ্ছাই তার গোমরাহীর জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তার মধ্যে গোমরাহীর দাবী ও আকাংখা দেখে আল্লাহর ইচ্ছা যখন তাকে গোমরাহী ও ভ্রান্তির পথে চলার মঞ্জুরী ও ফায়সালা দেন তখনই কেবল সে ভ্রান্তি ও গোমরাহীর পথে চলতে থাকে। এভাবে সে গোমরাহীর সেসব পথে চলতে পারে যেসব পথে চলার অবকাশ আল্লাহ তাকে দেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কেউ যদি চোর হতে চায়, তাহলে তার এ ইচ্ছাটুকুই এ জন্য যথেষ্ট নয় যে, সে যেখানে ইচ্ছা, যে ঘর থেকে ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা চুরি করে নিয়ে যেতে পারবে। বরং আল্লাহ তাঁর নিজের ব্যাপক জ্ঞান, যুক্তি ও প্রজ্ঞা অনুসারে তার এ ইচ্ছাকে যখন, যতটা এবং যেভাবে পূরণ করার সুযোগ দেন সে কেবল ততটুকুই পূরণ করতে পারে।

৪২. অর্থাৎ আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে নসীহত তোমাদের করা হচ্ছে তা এ জন্য নয় যে, তাতে আল্লাহর নিজের কোন প্রয়োজন আছে এবং তোমরা তা না করলে আল্লাহর কোন ক্ষতি হবে। বরং এ নসীহত করা হচ্ছে এ জন্য যে, বান্দা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করুক এবং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে না চলুক এটা আল্লাহর হক বা অধিকার।

৪৩. অর্থাৎ কেউ আল্লাহর নাফরমানী যতই করে থাকুক না কেন যখনই সে এ আচরণ থেকে বিরত হয় তখনই আল্লাহ তার প্রতি নিজের রহমতের হাত বাড়িয়ে দেন। যেহেতু তিনি বান্দা থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের কোন ইচ্ছা আদৌ পোষণ করেন না তাই এমন হঠকারী তিনি নন যে, কোন অবস্থায়ই তাকে ক্ষমা করবেন না বা শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না।

আল কিয়ামাহ

৭৫

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের اَلْقِيٰمَةِ শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এটি শুধু সূরাটির নামই নয়, বরং বিষয়ভিত্তিক শিরোনামও। কারণ এ সূরায় শুধু কিয়ামত সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কোন হাদীস থেকে যদিও এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল জানা যায় না। কিন্তু এর বিষয়বস্তুর মধ্যেই এমন একটি প্রমাণ বিদ্যমান যা থেকে বুঝা যায়, এটি নবুওয়াতের একেবারে প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। সূরার ১৫ আয়াতের পর হঠাৎ ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে ঃ এ অহীকে দ্রুত মুখস্ত করার জন্য তুমি জিহবা নাড়বে না। এ বাণীকে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং পড়িয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। অতএব আমি যখন তা পড়ি তখন তুমি তা মনযোগ দিয়ে শুনতে থাকো। এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব। এরপর ২০ নম্বর আয়াত থেকে আবার সে পূর্বের বিষয়ে আলোচনা শুরু হচ্ছে যা প্রথম থেকে ১৫ নম্বর আয়াত পর্যন্ত চলেছিল। যে সময় হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এ সূরাটি নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুনাচ্ছিলেন পরে ভুলে যেতে পারে এ আশংকায় তিনি এর কথাগুলো বার বার মুখে আওড়াচ্ছিলেন। এ কারণে পূর্বাপর সম্পর্কহীন এ বাক্যটি পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং হাদীসের বর্ণনা উভয় দিক থেকেই বক্তব্যের মাঝখানে সন্নিবেশিত হওয়া যথার্থ হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এ ঘটনা সে সময়ের যখন নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবেমাত্র অহী নাযিলের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করছেন এবং অহী গ্রহণের পাকাপোক্ত অভ্যাস তাঁর তখনও গড়ে ওঠেনি। কুরআন মজীদে এর আরো দু'টি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটি সূরা ত্বা-হা যেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ

"আর দেখো, কুরআন পড়তে তাড়াহুড়া করো না, যতক্ষণ না তোমাকে অহী পূর্ণরূপে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। (আয়াত ১১৪)

দ্বিতীয়টি সূরা আ'লায়। এখানে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى "আমি অচিরেই তোমাকে পড়িয়ে দেব তারপর

তুমি আর ভুলে যাবে না।" (আয়াত, ৬) পরবর্তী সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহী গ্রহণে ভালভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেলে এ ধরনের নির্দেশনা দেয়ার আর প্রয়োজন থাকেনি। তাই কুরআনের এ তিনটি স্থান ছাড়া এর আর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য

এ সূরা থেকে কুরআন মজীদের শেষ পর্যন্ত যতগুলো সূরা আছে তার অধিকাংশের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গী থেকে বুঝা যায় যে, সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রথম সাতটি আয়াত নাযিল হওয়ার পর যখন অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি বর্ষণের মত কুরআন নাযিলের সিলসিলা শুরু হলো, এ সূরাটিও তখনকার অবতীর্ণ বলে মনে হয়। পর পর নাযিল হওয়া এসব সূরায় জোরালো এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় অত্যন্ত ব্যাপক কিন্তু সংক্ষিপ্ত বাক্যে ইসলাম এবং তার মৌলিক আকীদা–বিশ্বাস ও নৈতিক শিক্ষাসমূহ পেশ করা হয়েছে এবং মক্কাবাসীদেরকে তাদের গোমরাহী সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। এ কারণে কুরাইশ নেতারা অস্থির হয়ে যায় এবং প্রথম হজ্জের মওসুম আসার আগেই তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরাভূত বা ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য নানা রকম ফন্দি–ফিকির ও কৌশল উদ্ভাবনের জন্য একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। সূরা মুদ্দাস্‌সিরের ভূমিকায় আমরা এ বিষয়ের উল্লেখ করেছি।

এ সূরায় আখেরাত অবিশ্বাসীদের সম্বোধন করে তাদের একেকটি সন্দেহ ও একেকটি আপত্তি ও অভিযোগের জওয়াব দেয়া হয়েছে। অত্যন্ত মজবুত প্রমাণাদি পেশ করে কিয়ামত ও আখেরাতের সম্ভাব্যতা, সংঘটন ও অনিবার্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। আর একথাও স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তিই আখেরাতকে অস্বীকার করে, তার অস্বীকৃতির মূল কারণ এটা নয় যে, তার জ্ঞানবুদ্ধি তা অসম্ভব বলে মনে করে। বরং তার মূল কারণ ও উৎস হলো, তার প্রবৃত্তি তা মেনে নিতে চায় না। সাথে সাথে মানুষকে এ বলে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, যে সময়টির আগমনকে তোমরা অস্বীকার করছো তা অবশ্যই আসবে। তোমাদের সমস্ত কৃতকর্ম তোমাদের সামনে পেশ করা হবে। প্রকৃতপক্ষে আমলনামা দেখার পূর্বেই তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই জানতে পারবে যে, সে পৃথিবীতে কি কি কাজ করে এসেছে। কেননা কোন মানুষই নিজের ব্যাপারে অজ্ঞ বা অনবহিত নয়। দুনিয়াকে প্রতারিত করার জন্য এবং নিজের বিবেককে ভুলানোর জন্য নিজের কাজকর্ম ও আচরণের পক্ষে যত যুক্তি, বাহানা ও ওযর সে পেশ করুক না কেন।

আয়াত ৪০ | সূরা আল কিয়ামাহ-মক্কী | রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۝١ وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝٢ اَيَحْسَبُ
الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ۝٣ بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ۝٤
بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ۝٥ يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۝٦ فَاِذَا بَرِقَ
الْبَصَرُ ۝٧ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝٨ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝٩ يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ
يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ۝١٠ كَلَّا لَا وَزَرَ ۝١١ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِۨالْمُسْتَقَرُّ ۝١٢ يُنَبَّؤُا
الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ۝١٣ بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ۝١٤ وَّلَوْ اَلْقٰى
مَعَاذِيْرَهٗ ۝١٥

না,[১] আমি শপথ করছি কিয়ামতের দিনের। আর না, আমি শপথ করছি তিরস্কারকারী নফসের।[২] মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার হাড়সমূহ একত্র করতে পারবো না?[৩] কেন পারবো না? আমি তো তার আংগুলের জোড়গুলো পর্যন্ত ঠিকমত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম।[৪] কিন্তু মানুষ ভবিষ্যতেও কুকর্ম করতে চায়।[৫] সে জিজ্ঞেস করে, কবে আসবে কিয়ামতের সেদিন?[৬] অতপর চক্ষু যখন স্থির হয়ে যাবে।[৭] চাঁদ আলোহীন হয়ে পড়বে এবং চাঁদ ও সূর্যকে একত্র করে একাকার করে দেয়া হবে।[৮] সেদিন এ মানুষই বলবে, পালাবার স্থান কোথায়? কখ্খনো না, সেখানে কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না। সেদিন তোমার রবের সামনেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে। সেদিন মানুষকে তার আগের ও পরের কৃতকর্মসমূহ জানিয়ে দেয়া হবে।[৯] বরং মানুষ নিজে নিজেকে খুব ভাল করে জানে। সে যতই অজুহাত পেশ করুক না কেন।[১০]

১. 'না' শব্দ দ্বারা বক্তব্য শুরু করাই প্রমাণ করে যে, আগে থেকেই কোন বিষয়ে আলোচনা চলছিল যার প্রতিবাদ করার জন্য এ সূরা নাযিল হয়েছে। পরবর্তী বক্তব্য স্বতঃই স্পষ্ট করে দেয় যে, আলোচনার বিষয় ছিল কিয়ামত ও আখেরাতের জীবন। আর মক্কার লোকেরা এটি শুধু অস্বীকারই করে আসছিলো না বরং অস্বীকৃতির সাথে সাথে তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপও করে আসছিলো। একটি উদাহরণ দ্বারা এ বর্ণনাভঙ্গি ভাল করে বুঝা যেতে পারে। আপনি যদি শুধু রসূলের সত্যতা অস্বীকার করতে চান তাহলে বলবেন ঃ আল্লাহর কসম রসূল সত্য। কিন্তু কিছু লোক যদি রসূলকে অস্বীকার করতে থাকে তবে তার উত্তরে আপনি কথা বলতে শুরু করবেন এভাবে ঃ না, আল্লাহর কসম, রসূল সত্য। এর অর্থ হবে, তোমরা যা বলছো তা ঠিক নয়। আমি কসম করে বলছি, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এটি।

২. কুরআন মজীদে মানুষের নফসের তিনটি রূপ উল্লেখ করা হয়েছে। এক, একটি 'নফস' মানুষকে মন্দ কাজে প্ররোচিত করে। এটির নাম 'নফসে আম্মারা'। দুই, একটি 'নফস' ভুল বা অন্যায় কাজ করলে অথবা ভুল বা অন্যায় বিষয়ে চিন্তা করলে কিংবা খারাপ নিয়ত রাখলে লজ্জিত হয় এবং সে জন্য মানুষকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করে। এটির নাম 'নফসে লাউয়ামাহ'। আধুনিক পরিভাষায় একেই আমরা বিবেক বলে থাকি। তিন, যে নফসটি সঠিক পথে চললে এবং ভুল ও অন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করলে তৃপ্তি ও প্রশান্তি অনুভব করে তাকে বলে 'নফসে মুত্‌মাইন্নাহ'।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কি কারণে কিয়ামতের দিন এবং তিরস্কারকারী নফসের কসম করেছেন তা বর্ণনা করেননি। কারণ পরবর্তী আয়াতটি সে বিষয়টির প্রতিই ইংগিত করছে। যে জন্য কসম করা হয়েছে তাহলো, মানুষের মরার পর আল্লাহ তা'আলা পুনরায় তাকে অবশ্যই সৃষ্টি করবেন। তা করতে তিনি পুরোপুরি সক্ষম। এখন প্রশ্ন হলো এ বিষয়টির জন্য এ দু'টি জিনিসের কসম করার পেছনে কি যৌক্তিকতা আছে?

কিয়ামতের দিনের কসম খাওয়ার কারণ হলো, কিয়ামতের আগমন নিশ্চিত ও অনিবার্য। গোটা বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনাই প্রমাণ করছে যে, এ ব্যবস্থাপনা অনাদী ও অন্তহীন নয়। এর বৈশিষ্ট ও প্রকৃতিই বলে দিচ্ছে এটা চিরদিন ছিল না এবং চিরদিন থাকতেও পারে না। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি এ ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণার সপক্ষে ইতিপূর্বেও কোন মজবুত দলীল-প্রমাণ খুঁজে পায়নি যে, প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল এ পৃথিবী কখনো অনাদি ও অবিনশ্বর হতে পারে। কিন্তু এ পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে এ বিষয়টি তার কাছে ততই নিশ্চিত হতে থাকে যে, এ চাঞ্চল্য মুখর বিশ্ব- জাহানের একটি শুরু বা সূচনা বিন্দু আছে যার পূর্বে এটি ছিল না। আবার অনিবার্যরূপে এর একটি শেষও আছে যার পরে এটি আর থাকবে না। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কিয়ামতেরই কসম করেছেন। এ কসমটির ধরন এরূপ যেমন আমরা অতিশয় সন্দেহবাদী কোন মানুষকে—যে তার আপন অস্তিত্ব সম্পর্কেও সন্দেহ করছে—সম্বোধন করে বলি ঃ তোমার প্রাণ সত্তার কসম, তুমি তো বর্তমান। অর্থাৎ তোমার অস্তিত্বই সাক্ষী যে তুমি আছ।

কিয়ামতের দিনের কসম শুধু এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, একদিন বিশ্ব-জাহানের এ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর মানুষকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে। তাকে

নিজের সমস্ত কাজের হিসেবে দিতে হবে এবং সে নিজের কৃতকর্মের ভাল বা মন্দ ফলাফল দেখবে। এর জন্য পুনরায় 'নফসে লাউয়ামার" কসম করা হয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই যার মধ্যে বিবেক বলে কোন জিনিস নেই। এ বিবেকের মধ্যে অনিবার্যরূপে ভাল এবং মন্দের একটি অনুভূতি বিদ্যমান। মানুষ ভাল এবং মন্দ যাচাইয়ের যে মানদণ্ডই স্থির করে থাকুক না কেন এবং তা ভুল হোক বা নির্ভুল হোক, চরম অধঃপতিত ও বিভ্রান্ত মানুষের বিবেকও মন্দ কাজ করলে কিংবা ভাল কাজ না করলে তাকে তিরস্কার করে। এটাই প্রমাণ করে যে, মানুষ নিছক একটি জীব নয়, বরং একটি নৈতিক সত্তাও বটে। প্রকৃতিগতভাবেই তার মধ্যে ভাল এবং মন্দের উপলব্ধি বিদ্যমান। সে নিজেই ভাল এবং মন্দ কাজের জন্য নিজেকে দায়ী মনে করে। সে অন্যের সাথে যখন কোন খারাপ আচরণ করে তখন সে ব্যাপারে নিজের বিবেকের দংশনকে দমন করে আত্মতৃপ্তি লাভ করলেও অন্য কেউ যখন তার সাথে একই আচরণ করে তখন আপনা থেকেই তার বিবেক দাবী করে যে, এ ধরনের আচরণকারীর শাস্তি হওয়া উচিত। এখন কথা হলো, মানুষের নিজ সত্তার মধ্যেই যদি এ ধরনের একটি 'নফসে লাউওয়ামা' বা তিরস্কারকারী বিবেকের উপস্থিতি একটি অনস্বীকার্য সত্য হয়ে থাকে, তাহলে এ সত্যটিও অনস্বীকার্য যে, এ 'নফসে লাউয়ামা'ই মৃত্যুর পরের জীবনের এমন একটি প্রমাণ যা মানুষের আপন সত্তার মধ্যে বিদ্যমান। কেননা যেসব ভাল এবং মন্দ কাজের জন্য মানুষ দায়ী সেসব কাজের জন্য পুরস্কার বা শাস্তি তার অবশ্যই পাওয়া উচিত। এটাই প্রকৃতির স্বাভাবিক দাবী। কিন্তু মৃত্যুর পরের জীবন ছাড়া আর কোনভাবেই তার এ দাবী পূরণ হতে পারে না। মৃত্যুর পরে মানুষের সত্তা যদি বিলীন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহলে তার অনেক ভাল কাজের পুরস্কার থেকে সে নিশ্চিতরূপে বঞ্চিত থেকে যাবে। আবার এমন অনেক মন্দ কাজ আছে যার ন্যায্য শাস্তি থেকে সে অবশ্যই নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন কোন মানুষই এ সত্য অস্বীকার করতে পারে না। অযৌক্তিক একটি বিশ্বে বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ জন্মলাভ করে বসেছে এবং নৈতিক উপলব্ধি সম্পন্ন মানুষ এমন এক পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে বসেছে মৌলিকভাবে যার পুরা ব্যবস্থাপনায় নৈতিকতার কোন অস্তিত্বই নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ এ অর্থহীন ও অযৌক্তিক কথাটি স্বীকার না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মৃত্যুর পরের জীবনকে অস্বীকার করতে পারে না। একইভাবে পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদী দর্শন প্রকৃতির এ দাবীর যথার্থ জবাব নয়। কারণ মানুষ যদি নিজের নৈতিক কাজ-কর্মের পুরস্কার বা শাস্তিলাভের জন্য একের পর এক এ পৃথিবীতে জন্ম নিতে থাকে তাহলে প্রত্যেক জন্মে সে পুনরায় আরো কিছু নৈতিক কাজ-কর্ম করতে থাকবে যা নতুন করে পুরস্কার বা শাস্তির দাবী করবে। আর এ অন্তহীন ধারাবাহিকতার ঘূর্ণিপাকে পড়ে তার হিসেব-নিকেশের কোন ফায়সালা হবে না। বরং তা ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে। সুতরাং প্রকৃতির এ দাবী কেবল একটি অবস্থায়ই পূরণ হতে পারে। তা হলো, এ পৃথিবীতে মানুষের একটি মাত্র জীবন হবে এবং গোটা মানব জাতির আগমনের ধারা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আরেকটি জীবন হবে। সে জীবনে মানুষের সমস্ত কাজকর্ম যথাযথভাবে হিসেব-নিকেশ করে তাকে তার প্রাপ্য পুরো পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৩০)

৩. কসম আকারে ওপরে বর্ণিত দু'টি দলীল শুধু দু'টি বিষয় প্রমাণ করে। এক, এ দুনিয়ার পরিসমাপ্তি (অর্থাৎ কিয়ামতের প্রথম পর্যায়) একটি নিশ্চিত ও অনিবার্য ব্যাপার।

দুই, মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ তা ছাড়া মানুষের একটি নৈতিক সত্তা হওয়ার যৌক্তিক ও প্রকৃতিগত দাবী পূরণ হতে পারে না। আর এ ব্যাপারটি অবশ্যই সংঘটিত হবে। মানুষের মধ্যে বিবেক থাকাটাই তা প্রমাণ করে। মৃত্যুর পরের জীবন যে সম্ভব একথা প্রমাণ করার জন্যই এ তৃতীয় দলীলটি পেশ করা হয়েছে। মক্কার যেসব লোক মৃত্যুর পরের জীবনকে অস্বীকার করতো তারা বার বার একথা বলতো যে, যেসব লোকের মৃত্যুর পর হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, যাদের দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু মাটিতে মিশে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, যাদের হাড়গোড় পচে গলে পৃথিবীর কত জায়গায় যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে তার কোন হদিস নেই, যাদের কেউ মরেছে আগুনে পুড়ে, কেউ হিংস্র জন্তুর আহারে পরিণত হয়েছে। আবার কেউ সমুদ্রে ডুবে মাছের খোরাক হয়েছে তাদের সবার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আবার একত্র হবে এবং প্রতিটি মানুষ আবার হুবহু সে মানুষটি হয়ে জীবনলাভ করবে, যে মানুষটি দশ-বিশ হাজার বছর আগে কোন এক সময় ছিল, এটা কি করে সম্ভব? মক্কার লোকদের এসব কথার জবাব আল্লাহ তা'আলা একটি ছোট প্রশ্নের আকারে অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ও বলিষ্ঠভাবে দিয়েছেন। তিনি বলছেন ঃ "মানুষ কি মনে করছে যে, আমি তার হাড়গোড় আদৌ একত্রিত করতে পারবো না"? অর্থাৎ যদি তোমাদেরকে বলা হতো, তোমাদের দেহের বিক্ষিপ্ত এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোন এক সময় আপনা থেকেই একত্রিত হয়ে যাবে এবং তোমরাও আপনা থেকেই হুবহু এই দেহ নিয়েই জীবিত হয়ে যাবে তাহলে এরূপ হওয়াটাকে অসম্ভব মনে করা তোমাদের জন্য নিসন্দেহে যুক্তিসংগত হতো। কিন্তু তোমাদের তো বলা হয়েছে এ কাজটি আপনা থেকেই হবে না। বরং তা করবেন আল্লাহ তা'আলা নিজে। তাহলে কি তোমরা প্রকৃতপক্ষেই মনে করো যে, সারা বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টিকর্তা—যাকে তোমরা নিজেরাও সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকার করে থাকো—এ কাজ করতে অক্ষম? এটি এমন একটি প্রশ্ন যে, যারা আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা বলে স্বীকার করে, সে যুগেও তারা বলতে পারতো না এবং বর্তমান যুগেও বলতে পারে না যে, আল্লাহ তা'আলা নিজেও এ কাজ করতে চাইলে করতে পারবেন না। আর কোন নির্বোধ যদি এমন কথা বলেও ফেলে তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে যে, তুমি আজ যে দেহের অধিকারী তার অসংখ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাতাস, পানি, মাটি এবং অজ্ঞাত আরো কত জায়গা থেকে এনে একত্রিত করে সে আল্লাহ এ দেহটি কিভাবে তৈরী করলেন যার সম্পর্কে তুমি বলছো যে, তিনি পুনরায় এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একত্রিত করতে সক্ষম নন?

৪. অর্থাৎ বড় বড় হাড়গুলো একত্রিত করে পুনরায় তোমার দেহের কাঠামো প্রস্তুত করা এমন কিছুই নয়। আমি তো তোমার দেহের সূক্ষ্মতম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি তোমার আঙ্গুলের জোড়গুলোও পুনরায় ঠিক তেমন করে বানাতে সক্ষম যেমন তা এর আগে ছিল।

৫. এ ছোট বাক্যটিতে আখেরাত অবিশ্বাসকারীদের আসল রোগ কি তা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। যেসব জিনিস এসব লোককে আখেরাত অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করতো তা মূলত এ নয় যে, প্রকৃতই তারা কিয়ামত ও আখেরাতকে অসম্ভব মনে করতো। বরং তারা যে কিয়ামত ও আখেরাতকে অস্বীকার করে তার মূল কারণ হলো, আখেরাতকে মেনে নিলে তাদের ওপর অনিবার্যভাবে কিছু নৈতিক বাধ্যবাধকতা আরোপিত

হয়। সে বাধ্যবাধকতা মেনে নেয়া তাদের কাছে মোটেই মনঃপুত নয়। তারা চায় আজ পর্যন্ত তারা পৃথিবীতে যেরূপ লাগামহীন জীবন যাপন করে এসেছে ভবিষ্যতেও ঠিক তেমনি করতে পারে। আজ পর্যন্ত তারা যে ধরনের জুলুম–অত্যাচার, বেঈমানী, পাপাচার ও দুষ্কর্ম করে এসেছে ভবিষ্যতেও তা করার অবাধ স্বাধীনতা যেন তাদের থাকে। একদিন তাদেরকে আল্লাহর বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে এসব কাজের জবাবদিহি করতে হবে এ বিশ্বাস যেন তাদের অবৈধ লাগামহীন স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার পথ রোধ করতে না পারে। তাই প্রকৃতপক্ষে তাদের বিবেক–বুদ্ধি তাদেরকে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনতে বাধা দিচ্ছে না। বরং তাদের প্রবৃত্তির কামনা বাসনাই এ পথের প্রতিবন্ধক।

৬. এ প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে জানার জন্যে নয়। বরং তা অস্বীকৃতিমূলক ও বিদ্রূপাত্মক প্রশ্ন অর্থাৎ কিয়ামত কবে আসবে তা জানতে চায়নি তারা। বরং তারা একথা বলছিলো বিদ্রূপ করে যে, জনাব, আপনি যে দিনটির আসার খবর দিচ্ছেন তা আসার পথে আবার কোথায় আটকে রইলো?

৭. মূল আয়াতে برق البصر শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো বিদ্যুতের ঝলকে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া। কিন্তু প্রচলিত আরবী বাকরীতিতে একথাটি শুধু এ একটি অর্থ জ্ঞাপকই নয়। বরং ভীতি–বিহ্বলতা, বিস্ময় অথবা কোন দুর্ঘটনার আকস্মিকতায় যদি কেউ হতবুদ্ধি হয়ে যায় এবং সে ভীতিকর দৃশ্যের প্রতি তার চক্ষু স্থির–নিবদ্ধ হয়ে যায় যা সে দেখতে পাচ্ছে তাহলে এ অবস্থা বুঝাতেও একথাটি বলা হয়ে থাকে। একথাটিই কুরআন মজীদের আরেক জায়গায় এভাবে বলা হয়েছেঃ

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

"আল্লাহ তো তাদের অবকাশ দিচ্ছেন সেদিন পর্যন্ত যেদিন চক্ষুসমূহ স্থির হয়ে যাবে।"
(সূরা ইবরাহীম, ৪২)

৮. এটা কিয়ামতের প্রথম পর্যায়ে বিশ্ব–জাহানের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। চাঁদের আলোহীন হয়ে যাওয়া এবং চাঁদ ও সূর্যের পরস্পর একাকার হয়ে যাওয়ার অর্থ এও হতে পারে যে, সূর্য থেকে প্রাপ্ত চাঁদের আলোই শুধু ফুরিয়ে যাবে না। বরং সূর্য নিজেও অন্ধকার হয়ে যাবে এবং আলোহীন হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে উভয়ের অবস্থা হবে একই। দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, হঠাৎ পৃথিবী উল্টা দিকে চলতে শুরু করবে এবং সেদিন চাঁদ ও সূর্য একই সাথে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। এর তৃতীয় আরেকটি অর্থ এও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, চাঁদ অকস্মাত পৃথিবীর মহাকর্ষ থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে যাবে এবং সূর্যের ওপরে গিয়ে আছড়ে পড়বে। এ ছাড়া এর আরো কোন অর্থ হতে পারে যা বর্তমানে আমাদের বোধগম্য নয়।

৯. মূল বাক্যটি হলো بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ । এটা একটা ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক বাক্য। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং সম্ভবত সবগুলোই এখানে প্রযোজ্য। এর একটি অর্থ হলো, দুনিয়ার জীবনে মানুষ মৃত্যুর পূর্বে কি কি নেক কাজ বা বদ কাজ করে আখেরাতের জন্য অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছিল সেদিন তাকে তা জানিয়ে দেয়া হবে। আর দুনিয়াতে সে নিজের ভাল এবং মন্দ কাজের কি ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করে এসেছিল যা তার দুনিয়া ছেড়ে চলে আসার পরও পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত চলেছিল সে হিসেবও তার

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ﴿١٦﴾ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ﴿١٧﴾ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ
فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ﴿١٨﴾ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ﴿١٩﴾ كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾ وَتَذَرُوْنَ
الْاٰخِرَةَ ﴿٢١﴾ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾

হে নবী,[১১] এ অহীকে দ্রুত আয়ত্ত করার জন্য তোমার জিহবা দ্রুত সঞ্চালন করো না। তা মুখস্ত করানো ও পড়ানো আমারই দায়িত্ব। তাই আমি যখন তা পড়ি[১২] তখন এর পড়া মনযোগ দিয়ে শুনবে। অতপর এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব।[১৩] কখ্খনো না[১৪] আসল কথা হলো, তোমরা দ্রুত লাভ করা যায় এমন জিনিসকেই (অর্থাৎ দুনিয়া) ভালবাস এবং আখেরাতকে উপেক্ষা করে থাক।[১৫] সেদিন কিছু সংখ্যক চেহারা তরতাজা থাকবে।[১৬] নিজের রবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে।[১৭] আর কিছু সংখ্যক চেহারা থাকবে উদাস-বিবর্ণ।

সামনে পেশ করা হবে। দ্বিতীয় অর্থ হলো, তার যা কিছু করা উচিত ছিল অথচ সে তা করেনি আর যা কিছু করা উচিত ছিল না অথচ সে তা করেছে তাও সব তাকে জানিয়ে দেয়া হবে। তৃতীয় অর্থ হলো, যেসব কাজ সে আগে করেছে এবং যেসব কাজ সে পরে করেছে দিন তারিখ সহ তার পুরো হিসেব তার সামনে পেশ করা হবে। চতুর্থ অর্থ হলো, যেসব ভাল বা মন্দ কাজ সে করেছে তাও তাকে জানিয়ে দেয়া হবে। আর যেসব ভাল বা মন্দ কাজ করা থেকে সে বিরত থেকেছে তাও তাকে অবহিত করা হবে।

১০. মানুষের সামনে তার আমলনামা পেশ করার উদ্দেশ্য আসলে অপরাধীকে তার অপরাধ সম্পর্কে অবহিত করা নয়। বরং এরূপ করা জরুরী এই কারণে যে, প্রকাশ্য আদালতে অপরাধের প্রমাণ পেশ করা ছাড়া ইনসাফের দাবী পূরণ হয় না। প্রত্যেক মানুষই জানে, সে নিজে কি? সে কি, একথা তাকে অন্য কারো বলে দিতে হয় না। একজন মিথ্যাবাদী গোটা দুনিয়াকে ধোঁকা দিতে পারে। কিন্তু সে নিজে একথা জানে যে, সে যা বলছে তা মিথ্যা। একজন চোর তার চৌর্যবৃত্তিকে ঢাকার জন্য অসংখ্য কৌশল অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু সে যে চোর তা তার নিজের কাছে গোপন থাকে না। একজন পথভ্রষ্ঠ লোক হাজারো প্রমাণ পেশ করে মানুষকে একথা বিশ্বাস করাতে পারে যে, সে যে কুফরী, নাস্তিকতা ও শিরকের সমর্থক তা তার মনের বিশ্বাসভিত্তিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু তার নিজের বিবেক একথা ভাল করেই জানে যে, সে ঐ সব আকীদা-বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে আছে কেন এবং তার মধ্যকার ভুল বুঝতে ও মেনে নিতে কিসে তাকে বাধা দিচ্ছে? জালেম, অসচ্চরিত্র, দুষ্কর্মশীল এবং হারামখোর মানুষ নিজের অপকর্মের পক্ষে নানা রকম ওজর-আপত্তি ও কৌশল পেশ করে নিজের বিবেকের মুখ পর্যন্ত বন্ধ করার চেষ্টা চালাতে পারে যাতে বিবেক তাকে তিরস্কার করা থেকে বিরত থাকে এবং স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, সত্যিকারভাবেই কিছু বাধ্যবাধকতা, কিছু বৃহত্তর কল্যাণ এবং কিছু অনিবার্য প্রয়োজনে সে এসব করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সর্বাবস্থায় তার এটা জানা থাকে যে,

সে কার প্রতি কতটা জুলুম করেছে, কার হক মেরে খেয়েছে, কার সতীত্ব নষ্ট করেছে, কাকে প্রতারণা করেছে এবং কোন্ অবৈধ পন্থায় কি কি স্বার্থ উদ্ধার করেছে। তাই আখেরাতের আদালতে হাজির করার সময় প্রত্যেক কাফের, মুনাফিক, পাপী ও অপরাধী নিজেই বুঝতে পারবে যে, সে কি কাজ করে এসেছে এবং কোন অবস্থায় নিজ প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

১১. এখান থেকে শুরু করে "এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব" কথাটি পর্যন্ত পুরা বাক্যটি একটি ভিন্ন প্রসংগের বাক্য, যা মূল কথার ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। আমরা সূরার ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছি যে, নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে—যে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অহী গ্রহণ করার অভ্যাস পুরোপুরি রপ্ত হয়নি—যখন তাঁর ওপর অহী নাযিল হতো তখন তিনি আশংকা করতেন যে, আল্লাহর যে বাণী জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাঁকে শুনাচ্ছেন তা হয়তো তিনি ঠিকমত স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারবেন না। তাই অহী শোনার সাথে সাথে তিনি তা মুখস্থ করার চেষ্টা করতেন। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যখন সূরা কিয়ামার এ আয়াতগুলো তাঁকে শুনাচ্ছিলেন তখনও ঠিক একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাই কথার ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে তাঁকে বলা হয় যে, আপনি অহীর কথা মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন না, বরং গভীর মনযোগ সহকারে তা শুনতে থাকুন। তা স্মরণ করানো এবং পরবর্তী সময়ে আপনাকে তা পড়িয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। আপনি নিশ্চিত থাকুন, এ বাণীর একটি শব্দও আপনি ভুলবেন না এবং তা উচ্চারণ করা বা পড়ার ব্যাপারে আপনার কোন ভুল হবে না। এ নির্দেশনামা দেয়ার পর পুনরায় মূল কথার ধারাবাহিকতা "কখনো না, আসল কথা হলো" কথাটি দ্বারা শুরু হয়েছে। যারা এ পটভূমি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয় তারা এখানে এ বাক্যাংশ দেখে মনে করে যে, এখানে একথাটি একেবারেই খাপ ছাড়া। কিন্তু এ পটভূমি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর কথার মধ্যে কোন অসংলগ্নতা আছে বলে মনে হয় না। এর উদাহরণ এভাবে দেয়া যায়, একজন শিক্ষক পাঠদানের সময় হঠাৎ দেখলেন যে, তাঁর ছাত্রের মন অন্য কোন দিকে আকৃষ্ট। তাই তিনি পাঠ দানের ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে বললেন ঃ "আমার কথা মনযোগ দিয়ে শোন।" এরপর তিনি পুনরায় নিজের কথা শুরু করলেন। এ পাঠ দান যদি হুবহু ছাপিয়ে প্রকাশ করা হয় তাহলে যেসব লোক এ ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন তারা বক্তৃতার ধারাবাহিকতার মধ্যে একথাটাকে খাপছাড়া মনে করবেন। কিন্তু যে কারণে একথাটি বাক্যের মধ্যে সংযোজিত হয়েছে যে ব্যক্তি সে আসল ঘটনা সম্পর্কে অবহিত থাকবেন তিনি নিশ্চিত হয়ে যাবেন যে, পাঠ দানের বক্তব্যটি আসলে হুবহু উদ্ধৃত করা হয়েছে। তা বর্ণনা বা উদ্ধৃত করতে কোন প্রকার কমবেশী করা হয়নি।

এসব আয়াতের মাঝখানে এ বাক্যাংশটির অপ্রাসঙ্গিকভাবে আনারও যে কারণ আমরা ওপরে বিশ্লেষণ করেছি তা শুধু অনুমান নির্ভর নয়। বরং নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াতসমূহে তার এ একই কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জারীর, তাবারানী, বায়হাকী এবং অন্যসব মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন যে, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কুরআন নাযিল হতো তখন পাছে তিনি ভুলে যান এ ভয়ে

জিবরাঈল আলাইহিস সালামের সাথে কথাগুলো বার বার আওড়াতে থাকতেন। তাই বলা হয়েছে..... لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ শা'বী, ইবনে যায়েদ, দ্বাহ্হাক, হাসান বাসরী, কাতাদা, মুজাহিদ এবং আরো অনেক বড় বড় মুফাস্সির থেকেও একথাটিই উদ্ধৃত হয়েছে।

১২. জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যদিও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন। কিন্তু যেহেতু তিনি নিজের পক্ষ থেকে তা শুনাতেন না, বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পড়ে শুনাতেন। তাই একথাটিও আল্লাহ তা'আলাই বলেছেন ঃ "যখন আমি তা পাঠ করতে থাকবো।"

১৩. এ থেকে ধারণা জন্মে যে, সম্ভবত নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগেই অহী নাযিল হওয়ার সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের কোন আয়াত অথবা কোন শব্দ অথবা কোন বিষয়ের অর্থ জিবরাঈল আলাইহিস সালামের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন। তাই তাঁকে শুধু এ নির্দেশই দেয়া হয়নি যে, যখন অহী নাযিল হতে থাকবে তখন নিরবে তিনি তা শুনবেন, কিংবা শুধু এ নিশ্চয়তা ও সান্ত্বনাই দেয়া হয়নি যে, অহীর প্রতিটি শব্দ তাঁর স্মৃতিতে অবিকল সংরক্ষিত করে দেয়া হবে এবং কুরআনকে তিনি ঠিক সেভাবে পাঠ করতে সক্ষম হবেন যেভাবে তা নাযিল হয়েছে। বরং সাথে সাথে তাঁকে প্রতিশ্রুতিও দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি নির্দেশ ও বাণীর মর্ম এবং উদ্দেশ্যও তাঁকে পুরোপুরি বুঝিয়ে দেয়া হবে।

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত। এ আয়াত দ্বারা এমন কয়েকটি মৌলিক বিষয় প্রমাণিত হয়, যা কোন ব্যক্তি ভালভাবে বুঝে নিলে এমন কিছু গোমরাহী থেকে রক্ষা পেতে পারে যা ইতিপূর্বেও কিছুলোক ছড়িয়েছে এবং বর্তমানেও ছড়াচ্ছে।

প্রথমত, এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, শুধু কুরআনে লিপবদ্ধ অহী-ই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল হতো না। বরং এ অহী ছাড়াও তাঁর প্রতি আরো অহী নাযিল হতো এবং সে অহীর মাধ্যমে তাঁকে এমন জ্ঞান দেয়া হতো যা কুরআনে লিপিবদ্ধ নেই। তাই কুরআনের হুকুম-আহকাম ও নির্দেশাবলী, তার ইংগিত, তার শব্দমালা এবং তার বিশেষ পরিভাষার যে অর্থ ও মর্ম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হতো তা যদি কুরআনের মধ্যেই সংযোজিত থাকবে তাহলে একথা বলার কোন প্রয়োজনই ছিল না যে, তার অর্থ বুঝিয়ে দেয়া বা তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দেয়া আমারই দায়িত্ব। কারণ এমতাবস্থায় তা আবার কুরআনের মধ্যেই পাওয়া যেতো। অতএব, একথা মানতে হবে যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনের শব্দমালা বহির্ভূত অন্য কিছু। এটা "অহীয়ে খফীর" আরো একটি প্রমাণ যা খোদ কুরআন থেকেই পাওয়া যায়। (কুরআন মজীদ থেকে এর আরো প্রমাণ আমি আমার "সুন্নাত কি আইনী হাইসিয়াত" গ্রন্থের ৯৪-৯৫ এবং ১১৮ থেকে ১২৫ পৃষ্ঠায় তুলে ধরেছি।)

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআনের অর্থ ও মর্ম এবং হুকুম-আহকামের যে ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল তা তো এ জন্যই দেয়া হয়েছিল যে, তিনি তদনুযায়ী নিজের কথা ও কাজ দ্বারা মানুষকে কুরআন

বুঝিয়ে দেবেন এবং তার আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী কাজ করা শেখাবেন। একথার মর্ম ও অর্থ যদি তা না হয় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যদি শুধু এ জন্য এ ব্যাখ্যা বলে দেয়া হয়ে থাকে যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিজের কাছেই সে জ্ঞান সীমাবদ্ধ রাখবেন তাহলে এটা হতো একটা অর্থহীন কাজ। কারণ, নবুওয়াতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে তা থেকে কোন সাহায্যই পাওয়া যেতো না। সুতরাং কোন নির্বোধই কেবল একথা বলতে পারে যে, ব্যাখ্যামূলক এ জ্ঞানের শরীয়াতের বিধান রচনার ক্ষেত্রে আদৌ কোন ভূমিকা ছিল না। সূরা 'নাহ্‌লের" ৪৪ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেছেন ঃ

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ

"হে নবী, আমি তোমার কাছে এ 'যিকর' নাযিল করেছি এ জন্য, যেন তুমি মানুষের জন্য নাযিলকৃত শিক্ষার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে থাকো।" (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নাহ্‌ল, টীকা ৪০)

কুরআন মজীদের চারটি স্থানে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ শুধু আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহ শুনিয়ে দেয়াই ছিল না। বরং এ কিতাবের শিক্ষা দেয়াও ছিল তাঁর দায়িত্বের অন্তরভুক্ত। (আল বাকারাহ, আয়াত ১২৯ ও ১৫১; আলে ইমরান, ১৬৪ এবং আল জুম'আ, ২। আমি 'সুন্নাত কি আইনী হাইসিয়াত' গ্রন্থের ৭৪ থেকে ৭৭ পৃষ্ঠায় এসব আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি।) এরপর কোন মানুষ কি করে একথা অস্বীকার করতে পারে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে কুরআনের যে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন তা-ই প্রকৃতপক্ষে কুরআনের সঠিক, নির্ভরযোগ্য ও সরকারী ব্যাখ্যা। কেননা, তা তাঁর নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা নয়, বরং কুরআন নাযিলকারী আল্লাহর বলে দেয়া ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে কিংবা তা পাশ কাটিয়ে যে ব্যক্তিই কুরআনের কোন আয়াতের অথবা কোন শব্দের মনগড়া অর্থ বর্ণনা করে সে এমন ধৃষ্টতা দেখায় যা কোন ঈমানদার ব্যক্তি দেখাতে পারে না।

তৃতীয়ত, কেউ যদি সাধারণভাবেও কুরআন অধ্যয়ন করে থাকে তাহলেও সে দেখবে যে, তাতে এমন অনেক বিষয় আছে একজন আরবী জানা লোক শুধু কুরআনের শব্দ বা বাক্য পড়ে তার অর্থ বা মর্ম উদ্ধার করতে এবং তার মধ্যে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা কিভাবে মেনে চলবে তা জানতে পারবে না। উদাহরণ হিসেবে صلوٰة (সালাত) শব্দটির কথাই ধরুন। কুরআন মজীদে যদি ঈমানের পরে অন্য কোন আমলের ওপরে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে তবে তা হলো সালাত বা নামায। কিন্তু কেবল আরবী ভাষার সাহায্যে কেউ এর অর্থ পর্যন্ত নির্ণয় করতে পারতো না। কুরআন মজীদে এ শব্দটির বার বার উল্লেখ দেখে কেউ বড়জোর এতটুকু বুঝতে সক্ষম যে, আরবী ভাষার এ শব্দটিকে কোন বিশেষ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর অর্থ সম্ভবত এমন কোন বিশেষ কাজ যা আঞ্জাম দেয়ার জন্য ঈমানদারদের কাছে দাবী জানানো হচ্ছে। কিন্তু শুধু কুরআন পাঠ করে কোন আরবী জানা লোক এ সিদ্ধান্তে পৌছতে সক্ষম হবে না যে, সে বিশেষ কাজটি কি এবং কিভাবে তা আঞ্জাম দিতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো, কুরআন

প্রেরণকারী যদি তাঁর পক্ষ থেকে একজন শিক্ষক নিয়োগ করে এ পারিভাষিক অর্থ তাঁকে যথাযথভাবে না বলে দিতেন এবং 'সালাত' আদায় করার নির্দেশ পালনের পন্থা-পদ্ধতি স্পষ্টভাবে তাঁকে না শেখাতেন তাহলে দুনিয়াতে দু'জন মুসলমানও এমন পাওয়া যেতো না যারা শুধু কুরআন পাঠ করে 'সালাত' আদায় করার নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে কোন একটি পন্থা মেনে নিতে একমত হতে পারতো? দেড় হাজার বছর ধরে মুসলমানরা যে পুরুষাণুক্রমে একই নিয়ম ও পন্থায় নামায পড়ে আসছে এবং দুনিয়ার আনাচে-কানাচে কোটি কোটি মুসলমান একই নিয়ম-পন্থায় যেভাবে নামাযের হুকুম পালন করছে তার কারণ তো শুধু এই যে, মহান আল্লাহ অহীর মাধ্যমে শুধু কুরআনের শব্দ বা বাক্যই নাযিল করেননি। বরং ঐ সব শব্দ এবং বাক্যের অর্থ এবং মর্মও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পুরোপুরি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আর যারা তাঁকে আল্লাহর রসূল এবং কুরআনকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন তিনি সেসব লোককেই এর অর্থ ও মর্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন।

চতুর্থত, কুরআনের শব্দসমূহের যে ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলকে (সা) বুঝিয়েছেন এবং রসূল (সা) তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে উম্মতকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, হাদীস এবং সুন্নাত ছাড়া তা জানার আর কোন উপায় আমাদের কাছে নেই। হাদীস বলতে বুঝায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজ সম্পর্কে যেসব বর্ণনা সনদসহ তৎকালীন লোকদের নিকট থেকে আমাদের কালের লোকদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর সুন্নাত বলতে বুঝায় সেসব নিয়ম-কানুনকে যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৌখিক ও বাস্তব শিক্ষার দ্বারা মুসলিম সমাজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে চালু হয়েছে, যার বিস্তারিত বিবরণ নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াতের মাধ্যমে পূর্ববর্তী লোকদের নিকট থেকে পরবর্তী লোকেরা লাভ করেছে এবং পরবর্তী যুগের লোকেরা পূর্ববর্তী যুগের লোকদের মধ্যে তা কার্যকর হতে দেখেছে। জ্ঞানের এ উৎসকে যে ব্যক্তি অস্বীকার করে প্রকারান্তরে সে যেন একথাই বলে ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ বলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলকে (সা) কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝিয়ে দেয়ার যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তা পূরণ করতে (না'উযুবিল্লাহ) তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ, শুধু রসূলকে ব্যক্তিগতভাবে কুরআনের অর্থ বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এ দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছিল না। বরং এর উদ্দেশ্য ছিল রসূলের মাধ্যমে উম্মতকে আল্লাহর কিতাবের অর্থ বুঝানো। হাদীস ও সুন্নাত আইনের উৎস একথা অস্বীকার করলে আপনা থেকেই তার অনিবার্য অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ তা'আলা সে দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। না'উযুবিল্লাহ! এর জবাবে যারা বলে যে, অনেক লোক তো মিথ্যা হাদীস রচনা করেছিল, তাকে আমরা বলবো, মিথ্যা হাদীস রচনা করাই সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে গোটা মুসলিম উম্মাহ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজকে আইনের মর্যাদা দান করতো। তা না হলে গোমরাহী বিস্তারকারীদের মিথ্যা হাদীস রচনার প্রয়োজন হবে কেন? মুদ্রা জালকারীরা কেবল সে মুদ্রাই জাল করে যা বাজারে চালু থাকে। বাজারে যেসব নোটের কোন মূল্য নেই কে এমন নির্বোধ আছে যে, সেসব নোট জাল করে ছাপাবে? তাছাড়াও এ ধরনের কথা যারা বলে তারা হয়তো জানে না যে, যে পবিত্র সত্তার (সা) কথা ও কাজ আইনের মর্যাদা সম্পন্ন তাঁর সাথে যাতে কোন মিথ্যা কথা সম্পর্কিত হতে না পারে প্রথম দিন থেকেই মুসলিম উম্মাহ গুরুত্বসহ সে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এ পবিত্র

সত্তার (সা) প্রতি কোন মিথ্যা কথা আরোপের আশংকা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল এ উম্মতের কল্যাণকামীরা তত অধিক মাত্রায় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করছিলেন সত্য ও মিথ্যাকে আলাদা করে চিহ্নিত করার জন্য। সত্য ও মিথ্যা হাদীস পৃথকীকরণের এ জ্ঞান এমন একটি অত্যুচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান যা একমাত্র মুসলিম জাতি ছাড়া আজ পর্যন্ত পৃথিবীর আর কেউ আবিষ্কার করেনি। যারা এ জ্ঞান অর্জন না করেই শুধু মাত্র পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদদের প্রতারণা ও প্রলোভনের শিকার হয়ে হাদীস ও সুন্নাতকে অনির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করে এবং একথাও জানে না যে, তারা তাদের এ মূর্খতানির্ভর ধৃষ্টতা দ্বারা ইসলামের কত মারাত্মক ক্ষতি সাধন করছে। তারা আসলেই বড় হতভাগা।

১৪. মাঝের অপ্রাসংগিক কথাটির আগে বক্তব্যের যে ধারাবাহিকতা ছিল এখানে এসে আবার সে ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে। কখ্খনো না, অর্থ হলো, তোমাদের আখেরাতকে অস্বীকার করার আসল কারণ এটা নয় যে, বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টিকর্তা কিয়ামত সংঘটিত করতে কিংবা মৃত্যুর পর তোমাদেরকে আবার জীবিত করতে পারবেন না বলে তোমরা মনে করো বরং আসল কারণ হলো এটি।

১৫. এটি আখেরাতকে অস্বীকার করার দ্বিতীয় কারণ। প্রথম কারণটি ৫নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছিল। কারণটি হলো, মানুষ যেহেতু অবাধে পাপাচার চালাতে চায় এবং আখেরাতকে মেনে নিলে অনিবার্যরূপে যেসব নৈতিক বিধিবন্ধন মেনে চলার দায়িত্ব বর্তায় তা থেকে বাঁচতে চায়। তাই তার কুপ্রবৃত্তি তাকে আখেরাতকে অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তার এ অস্বীকৃতিকে যুক্তিসংগত বলে প্রমাণ করার জন্য সে সুন্দর করে সাজিয়ে যৌক্তিক প্রমাণাদি পেশ করে। এখন দ্বিতীয় কারণটি বর্ণনা করা হচ্ছে। আখেরাত অস্বীকারকারীরা যেহেতু সংকীর্ণমনা ও স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন হয় তাই তাদের দৃষ্টি কেবল এ দুনিয়ার ফলাফলের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। আর আখেরাতে যে ফলাফলের প্রকাশ ঘটবে তাকে তারা আদৌ কোন গুরুত্ব দেয় না। তারা মনে করে, যে স্বার্থ বা ভোগের উপকরণ বা আনন্দ এখানে লাভ করা সম্ভব তারই অন্বেষণে সবটুকু পরিশ্রম করা এবং প্রচেষ্টা চালানো উচিত। কারণ, তা যদি তারা লাভ করে তাহলে যেন সবকিছুই তারা পেয়ে গেল। এতে আখেরাতে তাদের পরিণাম যত খারাপই হোক না কেন। একইভাবে তারা এ ধারণাও পোষণ করে যে, যে ক্ষতি, কষ্ট বা দুঃখ-বেদনা এখানে হবে তা থেকে মূলত নিজেদের রক্ষা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দেখার দরকার নেই যে, তা বরদাশত করে নিলে আখেরাতে তার বিনিময়ে কত বড় পুরস্কার লাভ করা যাবে। তারা চায় নগদ সওদা। আখেরাতের মত বহু দূরের জিনিসের জন্য তারা আজকের কোন স্বার্থ যেমন ছাড়তে চায় না তেমনি কোন ক্ষতিও বরদাশত করতে পারে না। এ ধরনের চিন্তাধারা নিয়ে যখন তারা আখেরাত সম্পর্কে যৌক্তিক বিতর্কে অবতীর্ণ হয় তখন আর তা খাঁটি যুক্তিবাদ থাকে না। বরং তখন তার পেছনে এ ধ্যান-ধারণাটিই কাজ করতে থাকে। আর সে কারণে সর্বাবস্থায় তার সিদ্ধান্ত এটাই থাকে যে, আখেরাতকে মানা যাবে না। যদিও ভেতর থেকে তার বিবেক চিৎকার করে বলতে থাকে যে, আখেরাত সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা এবং তার অনিবার্যতা সম্পর্কে কুরআনে যেসব দলীল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে তা অত্যন্ত যুক্তিসংগত আর তার বিপক্ষে যেসব যুক্তি তারা দেখাচ্ছে তা অত্যন্ত ভোঁতা ও অন্তসার-শূন্য।

১৬. অর্থাৎ খুশীতে তারা দীপ্তিময় হয়ে উঠবে। কারণ, তারা যে আখেরাতের প্রতি ঈমান এনেছিল তা হুবহু তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী চোখের সামনে বিদ্যমান থাকবে। যে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার কারণে তারা দুনিয়ার যাবতীয় অবৈধ স্বার্থ পরিত্যাগ করেছিল এবং সত্যিকার অর্থেই ক্ষতি স্বীকার করেছিল তা চোখের সামনে বাস্তবে সংঘটিত হতে দেখে নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, তারা নিজেদের জীবনাচরণ সম্পর্কে অত্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এখন তার সর্বোত্তম ফলাফল দেখার সময় এসে গেছে।

১৭. মুফাস্‌সিরগণের কেউ কেউ একথাটিকে রূপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। তারা বলেন ঃ "কারো প্রতি তাকিয়ে থাকা" কথাটি প্রচলিত প্রবাদ হিসেবে তার কাছে কোন কিছু আশা করা, তার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করা এবং তার দয়া প্রার্থী হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। এমন কি অন্ধ ব্যক্তিও অনেক সময় বলে যে, আমি তো অমুকের দিকে তাকিয়ে আছি, তিনি আমার জন্য কি করেন তা দেখার জন্য। কিন্তু বহু সংখ্যক হাদীসে এর যে ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে তাহলো, আখেরাতে আল্লাহর নেক্‌কার বান্দাদের আল্লাহর সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য হবে। বুখারী শরীফের বর্ণনায় আছে ঃ انكم سترون ربكم عيانا "তোমরা প্রকাশ্যে সুস্পষ্টভাবে তোমাদের রবকে দেখতে পাবে।" মুসলিম এবং তিরমিযীতে হযরত সুহাইব থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বেহেশতবাসীরা বেহেশতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ তা'আলা তাদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের আরো কিছু দান করি? তারা আরয করবে, আপনি কি আমাদের চেহারা দীপ্তিময় করেননি? আপনি কি আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেননি? তখন আল্লাহ তা'আলা পর্দা সরিয়ে দেবেন। ইতিপূর্বে তারা যেসব পুরস্কার লাভ করেছে তার কোনটিই তাদের কাছে তাদের 'রবের' সাক্ষাতলাভের সম্মান ও সৌভাগ্য থেকে অধিক প্রিয় হবে না। এটিই সে অতিরিক্ত পুরস্কার যার কথা কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে ঃ للذين احسنوا الحسنى وزيادة অর্থাৎ "যারা নেক কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার রয়েছে। আর এ ছাড়া অতিরিক্ত পুরস্কারও রয়েছে।" (ইউনুস, ২৬) বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাবো? জবাবে নবী (সা) বললেন ঃ যখন মেঘের আড়াল থাকে না তখন সূর্য ও চাঁদকে দেখতে তোমাদের কি কোন কষ্ট হয়? সবাই বললো 'না।' তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের রবকে এ রকমই স্পষ্ট দেখতে পাবে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ থেকে এ বিষয়ের প্রায় অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, দারকুতনী, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, তাবারানী, বায়হাকী, ইবনে আবী শায়বা এবং আরো কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস কিছুটা শাব্দিক তারতম্যসহ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, যার বিষয়বস্তু হলো, জান্নাতবাসীদের মধ্যে সর্বনিম্ন মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিও দুই হাজার বছরের দূরত্ব পর্যন্ত তার সাম্রাজ্যের বিস্তার দেখতে পাবে এবং সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি প্রতিদিন দুই বার তার রবকে দেখতে পাবে। একথা বলার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করলেন যে, 'সেদিন কিছু সংখ্যক চেহারা তরতাজা থাকবে। নিজের রবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে।' ইবনে মাজাতে হযরত

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি তাকাবেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি তাকাবে। অতপর যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে অন্তর্হিত না হবেন ততক্ষণ তারা জান্নাতের কোন নিয়ামতের প্রতি মনযোগ দেবে না এবং আল্লাহর প্রতি তাকিয়ে থাকবে। এটি এবং অন্য আরো বহু হাদীসের ভিত্তিতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীগণ প্রায় সর্বসম্মতভাবেই এ আয়াতের যে অর্থ করেন তাহলো, জান্নাতবাসীগণ আখেরাতে মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবে। কুরআন মজীদের এ আয়াত থেকেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ "কখ্খনো নয়, তারা (অর্থাৎ পাপীগণ) সেদিন তাদের রবের সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত হবে।" (আল মুতাফ্‌ফিফীন, ১৫) এ থেকে স্বতই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এ বঞ্চনা হবে পাপীদের জন্য, নেক্‌কারদের জন্য নয়।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। তাহলো, মানুষের পক্ষে আল্লাহকে দেখা কিভাবে সম্ভব? কোন জিনিসকে দেখতে পাওয়ার জন্য যা অনিবার্যরূপে প্রয়োজন তাহলো, সে জিনিসটিকে কোন বিশেষ দিক, স্থান, আকৃতি ও বর্ণ নিয়ে সামনে বিদ্যমান থাকতে হবে। আলোক রশ্মি তাতে প্রতিফলিত হয়ে চোখের ওপর পড়বে এবং চোখ থেকে তার ছবি বা প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কের দর্শনকেন্দ্রে পৌঁছবে। মানুষের আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র সত্তাকে এভাবে দেখতে পওয়ার কল্পনাও কি করা যায়? কিন্তু এ ধরনের প্রশ্ন মূলত একটি বড় ভ্রান্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ ক্ষেত্রে দু'টি জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। একটি হলো, দেখার তাৎপর্য। আর অপরটি হলো দেখার কাজটি সংঘটিত হওয়ার সেই বিশেষ অবস্থা বা প্রক্রিয়াটি যার সাথে আমরা এ পৃথিবীতে পরিচিত। দেখার তাৎপর্য হলো, দর্শনকারী ব্যক্তির মধ্যে দৃষ্টিশক্তি থাকতে হবে। অর্থাৎ সে অন্ধ হবে না। দৃশ্যমান বস্তু তার কাছে স্পষ্ট হবে, অদৃশ্য বা চোখের আড়াল হবে না। কিন্তু দুনিয়াতে আমরা যে জিনিসের অভিজ্ঞতা লাভ করি বা তা পর্যবেক্ষণ করে থাকি তা দেখার সে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয় যার সাহায্যে কোন মানুষ বা পশু কার্যত কোন জিনিসকে দেখে থাকে। এ জন্য অনিবার্যরূপে যা প্রয়োজন তা হলো, দর্শনকারীর দেহে চোখ নামক একটি অংগ থাকবে। সে অংগটিতে দেখার শক্তি বর্তমান থাকবে। তার সামনে একটি সসীম রঙিন বা বর্ণময় দেহ বিদ্যমান থাকবে যা থেকে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে চোখের পর্দার ওপর পড়বে এবং চোখের পর্দায় তার আকৃতির স্থান সংকুলান হতে হবে। এখন যদি কেউ মনে করে যে, দেখতে পাওয়ার মূলে এ দুনিয়াতে যে প্রক্রিয়াটি কার্যকর বলে আমরা জানি শুধু সে প্রক্রিয়াতেই দেখার কাজটি কার্যত প্রকাশ পেতে বা ঘটতে পারে তাহলে তা তার নিজের মন-মগজ তথা ধী-শক্তির সংকীর্ণতা। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার নিজের সাম্রাজ্যে দেখার জন্য এত অসংখ্য উপায় ও প্রক্রিয়া থাকা সম্ভব যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এ প্রশ্ন নিয়ে যে ব্যক্তি বিতর্কে লিপ্ত হয় সে নিজেই বলুক, তার রব চক্ষুষ্মান না অন্ধ? তিনি যদি চক্ষুষ্মান তথা দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হয়ে থাকেন এবং গোটা বিশ্ব-জাহান ও তার প্রতিটি বস্তু দেখে থাকেন তাহলে কি তিনি চোখ নামের একটি অংগ দিয়ে দেখছেন যা দিয়ে দুনিয়ায় মানুষ ও অন্য সব জীবজন্তু দেখে থাকে এবং আমাদের দ্বারা যেভাবে দেখার কাজটা সংঘটিত হচ্ছে তাঁর দ্বারাও কি সেভাবেই সংঘটিত হচ্ছে? সবারই জানা যে, এর জবাব হবে নেতিবাচক। এর জবাব যখন নেতিবাচক, তখন কোন বিবেক ও বোধ সম্পন্ন মানুষের একথা বুঝতে কষ্ট হবে কেন যে, দুনিয়ায় মানুষ যে নির্দিষ্ট

تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾ وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾
وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾

মনে করতে থাকবে যে, তাদের সাথে কঠোর আচরণ করা হবে। কখ্খনো না,[১৮] যখন প্রাণ কণ্ঠনালীতে উপনীত হবে এবং বলা হবে, ঝাঁড় ফুঁক করার কেউ আছে কি?[১৯] মানুষ বুঝে নেবে এটা দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময়। উভয় পায়ের গোছা বা নলা একত্র হয়ে যাবে।[২০] সেদিনটি হবে তোমার প্রভুর কাছে যাত্রা করার দিন।

প্রক্রিয়ায় কোন জিনিসকে দেখে থাকে জান্নাতবাসীগণ সে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় আল্লাহর দর্শন লাভ করবেন না। বরং সেখানে দেখার ধরন, প্রকৃতি ও প্রক্রিয়া হবে অন্য রকম যা এখানে আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। দাম্পত্য জীবন কি এবং কেমন একটি দুই বছরের শিশুর পক্ষে তা বুঝা যতটা কঠিন, প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের সবকিছু সঠিকভাবে বুঝা আমাদের জন্য তার চেয়েও অনেক বেশী কঠিন। অথচ যৌবনে উপনীত হয়ে এ শিশু নিজেই দাম্পত্য জীবন যাপন করবে।

১৮. এ 'কখ্খনো না' কথাটি সেই ধারাবাহিক কথাটির সাথে সম্পৃক্ত যা আগে থেকে চলে আসছে। অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা ভুল যে, তোমরা মরে বিলীন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং নিজ প্রভুর সামনে তোমাদের ফিরে যেতে হবে না।

১৯. মূল আয়াতে راق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি رقية ধাতু থেকেও উৎপন্ন হতে পারে। এর অর্থ তাবীজ-কবচ এবং ঝাড়-ফুঁক। আবার رقى ধাতু থেকেও উৎপন্ন হতে পারে। এর অর্থ ওপর দিকে ওঠা। যদি প্রথম অর্থটি গ্রহণ করা হয় তাহলে যা বুঝাবে তাহলো, শেষ মুহূর্তে যে সময় রোগীর সেবা শুশ্রূসাকারীরা সব রকমের ওষুধ পত্র সম্পর্কে নিরাশ হয়ে যাবে তখন বলবে ঃ আরে, কোন ঝাড় ফুঁককারীকেই অন্তত খুঁজে আনো যে এর জীবনটা রক্ষা করবে। আর যদি দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করা হয় তাহলে যা বুঝাবে তা হলো, সে সময় ফেরেশতারা বলবে ঃ কে এ রূহটা নিয়ে যাবে? আযাবের ফেরেশতারা না রহমতের ফেরেশতারা? অন্য কথায় সে সময় সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে, ঐ ব্যক্তি আখেরাতের দিকে কি মর্যাদা নিয়ে যাত্রা করছে। সৎ মানুষ হলে রহমতের ফেরেশতারা নিয়ে যাবে। অসৎ মানুষ হলে রহমতের ফেরেশতারা তার ছায়াও মাড়াবে না। আযাবের ফেরেশতারাই তাকে পাকড়াও করে নিয়ে যাবে।

২০. তাফসীরকারদের অনেকেই ساق (পায়ের নলা) শব্দটির সাধারণ আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করেছেন। এ হিসেবে কথাটির অর্থ হয় মরার সময় যখন পা শুকিয়ে একটি আরেকটির সংগে লেগে যাবে। আবার কেউ কেউ প্রচলিত আরবী বাকরীতি অনুসারে শব্দটিকে কঠোরতা, রূঢ়তা ও বিপদাপদ অর্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ সে সময় দু'টি বিপদ একসাথে এসে হাজির হবে। একটি এ পৃথিবী এবং এর সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বিপদ। আরেকটি, একজন অপরাধী হিসেবে গ্রেফতার হয়ে পরকালীন জগতে যাওয়ার বিপদ যার মুখোমুখি হতে হবে প্রত্যেক কাফের মুনাফিক এবং পাপীকে।

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ﴿٣١﴾ وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ
يَتَمَطّٰى ﴿٣٣﴾ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٤﴾ ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٥﴾ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ
اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً
فَخَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٣٩﴾ اَلَيْسَ
ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ﴿٤٠﴾

২ রুকূ'

কিন্তু সে সত্যকে অনুসরণও করেনি। নামাযও পড়েনি। বরং সে অস্বীকার করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারপর গর্বিত ভঙ্গিতে নিজের পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে গিয়েছে।[২১] এ আচরণ তোমার পক্ষেই শোভনীয় এবং তোমার পক্ষেই মানানসই। হাঁ, এ আচরণ তোমার পক্ষেই শোভনীয় এবং তোমার পক্ষেই মানানসই।[২২]

মানুষ[২৩] কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে?[২৪] সে কি বীর্যরূপ এক বিন্দু নগণ্য পানি ছিল না যা (মায়ের জরায়ুতে) নিক্ষিপ্ত হয়। অতপর তা মাংস-পিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তার সুন্দর দেহ বানালেন এবং তার অংগ-প্রত্যংগগুলো সুসামঞ্জস্য করলেন। তারপর তা থেকে নারী ও পুরুষ দু' রকম মানুষ বানালেন। সেই স্রষ্টা কি মৃতদের পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নন?[২৫]

২১. অর্থ হলো, যে ব্যক্তি আখেরাতকে মানতে প্রস্তুত ছিল না সে পূর্ব বর্ণিত আয়াতগুলোতে উল্লেখিত সবকিছু শোনার পরেও তা অস্বীকার করে যেতে থাকলো এবং এসব আয়াত শোনার পর দর্প ভরে নিজের বাড়ীর দিকে চলে গেল। মুজাহিদ, কাতাদা ও ইবনে যায়েদের মতে এ লোকটি ছিল আবু জেহেল। আয়াতের শব্দসমূহ থেকেও এটাই প্রকাশ পায় যে, সে এমন কোন ব্যক্তি ছিল যে সূরা কিয়ামার ওপরে বর্ণিত আয়াতগুলো শোনার পর এ আচরণ ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিল।

এ আয়াতের "সে সত্যকে অনুসরণও করেনি, নামাযও পড়েনি" কথাটি বিশেষভাবে মনযোগলাভের যোগ্য। এর থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাবের সত্যতা স্বীকার করার পর তার প্রাথমিক এবং অনিবার্য দাবী হলো, মানুষ যেন নামায পড়ে। আল্লাহর দেয়া শরীয়াতের অন্য সব হুকুম-আহকাম তামীল করার পর্যায় বা অবকাশ তো আসে আরো পরে। কিন্তু ঈমান আনার পর কিছু সময় যেতে না যেতেই নামাযের সময় এসে হাজির হয়। আর তখনই জানা যায় সে যা মেনে নেয়ার অঙ্গীকার মুখ

থেকে উচ্চারণ করেছিল তা সত্যিই তার হৃদয়ের প্রতিধ্বনি, না কি কয়েকটি শব্দের আকারে মুখ থেকে উচ্চারিত ফাঁকা বুলি মাত্র।

২২. তাফসীরকারগণ اَوْلٰى لَكَ আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। যেমন, ঠিক তোমাকে। সর্বনাশ হোক তোমার! মন্দ, ধ্বংস এবং দুর্ভাগ্য হোক তোমার! তবে বাক্যটির অবস্থান বিবেচনা করলে আমার মতে এর দু'টি উপযুক্ত অর্থ হতে পারে যা হাফেয ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ "তুমি যখন তোমার সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছো তখন তোমার মত মানুষের পক্ষে এ আচরণই শোভা পায় যা তুমি করছো।" এটি একটি শ্লেষ বাক্য। কুরআন মজীদের আরো এক জায়গায় এ ধরনের বাক্য প্রয়োগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, দোযখে আযাব দেয়ার সময় পাপী লোকদের বলা হবে ঃ ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ "নাও, এর মজা চাখো। তুমি অতি বড় সম্মানী মানুষ কিনা।" (আদ দুখান, ৪৯)

২৩. এখানে বক্তব্যের সমাপ্তি টানতে গিয়ে সেই একই বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে যা দিয়ে বক্তব্য শুরু করা হয়েছিল। অর্থাৎ মৃত্যুর পরের জীবন অনিবার্যও এবং তা সম্ভবও।

২৪. আরবী ভাষায় ابل سدى বলা হয় এমন উটকে যা বেঁধে রাখা হয় না, উদ্দেশ্যহীনভাবে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়, এবং তার খোঁজ-খবর নেয়ার কেউ থাকে না। লাগামহীন উট বলে আমরা এ অর্থটিই প্রকাশ করে থাকি। অতএব, আয়াতের অর্থ হলো, মানুষ কি নিজেকে লাগামহীন উট মনে করে যে, তার স্রষ্টা তাকে এ পৃথিবীতে দায়িত্বহীন করে ছেড়ে দিয়েছেন? তার কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য নেই? কোন জিনিস তার জন্য নিষিদ্ধ নয়? আর এমন কোন সময়ও কি তার আসবে না যখন তাকে তার কাজ-কর্মের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে? একথাটিই কুরআন মজীদের অন্য একস্থানে এভাবে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের বলবেন ঃ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ

"তোমরা কি মনে করেছো যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি? তোমাদেরকে কখনো আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না?" (আল মু'মিনূন, ১১৫)

এ দু'টি স্থানে মৃত্যুর পরের জীবনের অনিবার্যতার প্রমাণ প্রশ্নের আকারে পেশ করা হয়েছে। প্রশ্নের সারমর্ম হলো, তোমরা কি প্রকৃতই নিজেদেরকে নিছক পশু বলে মনে করে নিয়েছো? তোমরা কি তোমাদের ও পশুদের মধ্যে এ স্পষ্ট পার্থক্য দেখতে পাও না যে, পশুদের কোন ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা নেই, কিন্তু তোমাদের ইখতিয়ার ও স্বাধীনতা আছে? পশুর কাজ-কর্মে নৈতিক ভাল-মন্দের প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু তোমাদের কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন অনিবার্যরূপে ওঠে। এসব সত্ত্বেও তোমরা নিজেদের ব্যাপারে কি করে মনে করতে পারলে যে, পশুরা যেমন দায়িত্বমুক্ত, তাদের যেমন কোন জবাবদিহি করতে হবে না, তোমাদের ব্যাপারটাও ঠিক তাই? পশুদের পুনরায় জীবিত করে না উঠানোর যুক্তিগ্রাহ্য কারণ বুঝা যায়। তারা তাদের সহজাত ও প্রকৃতিগত ধরাবাঁধা দাবী পূরণ করেছে মাত্র। নিজেদের বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে কোন দর্শন রচনা করেনি, কোন

বিশেষ মত ও পথের অনুসারী গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেনি, কাউকে উপাস্য বানায়নি এবং নিজেও কারো উপাস্য হয়নি, এমন কোন কাজ করেনি যাকে নেক্‌কাজ বা বদকাজ বলে অভিহিত করা যায়। কোন ভাল বা মন্দ রীতি-প্রথার প্রচলন করেনি যার প্রভাব পুরুষাণুক্রমে চলেছে এবং সে জন্য সে পুরস্কার বা শাস্তিলাভের উপযুক্ত। তাই তারা যদি মরার পর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহলে সেটা বোধগম্য ব্যাপার। কারণ তার ওপর কোন কাজের দায়-দায়িত্ব বর্তায় না যে, তার জবাবদিহির জন্য পুনরায় তাকে জীবিত করে উঠানোর প্রয়োজন হবে। কিন্তু তোমাদেরকে মৃত্যুর পরের জীবন থেকে কিভাবে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে? কারণ মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও তোমরা এমন সব নৈতিক কাজ-কর্ম করতে থাকো যার ভাল বা মন্দ হওয়া এবং পুরস্কার বা শাস্তির উপযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের বিবেক-বুদ্ধিই সিদ্ধান্ত দেয়। যে ব্যক্তি কোন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে এবং পরক্ষণেই আকস্মিক কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে তোমাদের মতে কি তার অবাধে (Scotfree) বেঁচে যাওয়া এবং এ জুলুমের প্রতিফল কোন দিনই না পাওয়া উচিত? যে ব্যক্তি দুনিয়ায় এমন কোন বিপর্যয়ের বীজ বপন করে গিয়েছে মানব সন্তানেরা শত শত বছর ধরে যার বিষময় ফল ভোগ করলো বা দুর্ভোগ পোহালো সে-ও নগণ্য পোকা মাকড় ও কীট পতঙ্গের মত মৃত্যুর পর বিলীন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, যার কৃতকর্মের ফলে হাজার হাজার ও লাখ লাখ মানুষের জীবন বরবাদ হয়ে গিয়েছে পুনরায় জীবিত হয়ে তাকে সেসব কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে না হোক এরূপ ব্যবস্থায় কি তোমাদের বুদ্ধি-বিবেক সত্যিই সন্তুষ্ট হতে পারবে? পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি জীবন ব্যাপী হক ও ইনসাফ এবং কল্যাণ ও সৎকর্মশীলতার জন্য নিজের জীবনপাত করলো এবং জীবনভর শুধু বিপদ-মুসিবতই পোহালো তোমাদের বিবেচনায় কি সে পোকা-মাকড় ও কীট-পতঙ্গের মতই কোন নগণ্য সৃষ্টি, যার নিজের ভালকাজের পুরস্কার লাভের কোন অধিকারই নেই?

২৫. এটি মৃত্যুর পরের জীবনের সম্ভাব্যতার প্রমাণ। যারা একথা বিশ্বাস করে যে, প্রাথমিক পর্যায়ে বীর্য দ্বারা সৃষ্টির সূচনা করে পূর্ণাঙ্গ মানুষ সৃষ্টি করা পর্যন্ত গোটা কাজটাই মহান আল্লাহর শক্তি ও কৌশলের একটা বিস্ময়কর নমুনা, তাদের কাছে প্রকৃতপক্ষে এ প্রমাণের কোন জবাব নেই। কেননা, তারা যতই ঔদ্ধত্য দেখাক না কেন তাদের বিবেক-বুদ্ধি একথা না মেনে পারে না যে, যে আল্লাহ এভাবে দুনিয়ায় মানুষ সৃষ্টি করেন তিনি পুনরায় এ মানুষকে অস্তিত্ব দান করতেও সক্ষম। তবে যারা এ স্পষ্ট জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিসংগত কাজকে কেবল আকস্মিকতার ফল বলে মনে করে তারা যদি হঠকারী আচরণ করতে বদ্ধপরিকর না হয়ে থাকে তাহলে একটি বিষয়ের ব্যাখ্যা তাদের দিতে হবে। বিষয়টি হলো, একই ধরনের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর প্রতিটি অংশে প্রত্যেক জাতির মধ্যে নারী ও পুরুষের জন্মের যে অনুপাত চলে আসছে তাতে কোথাও কোন যুগে এমন অবস্থা কখনো দেখা দেয়নি যে, কোন জনপদ ক্রমাগত শুধু পুরুষ অথবা শুধু নারীই জন্ম লাভ করেছে এবং ভবিষ্যতে তাদের বংশধারা টিকে থাকার কোন সম্ভবনাই থাকেনি। তাদের কাছে এরূপ না হওয়ার কি যুক্তি ও ব্যাখ্যা আছে? এ কাজটিও কি আকস্মিকভাবেই হয়ে চলেছে? এত বড় দাবী করার জন্য কোন মানুষকে অন্তত এতটা নির্লজ্জ ও বেশরম হওয়া চাই যাতে সে একদিন এ দাবীও করে বসতে পারে

যে, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, মস্কো এবং পিকিং-এর মত শহর আকস্মিকভাবে আপনা আপনি অস্তিত্ব লাভ করেছে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আর রূম, টীকা ২৭ থেকে ৩০; আশ্ শূরা, টীকা ৭৭)

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ আয়াতটি পড়তেন তখন আল্লাহ তা'আলার এ প্রশ্নের জবাবে কখনো بَلٰى (কেন সক্ষম নন), কখনো سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ فَبَلٰى (তোমার সত্তা অতি পবিত্র, হে আল্লাহ, কেন সক্ষম নয়) এবং কখনো سُبْحٰنَكَ فَبَلٰى অথবা سُبْحٰنَكَ وَبَلٰى বলতেন। (ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও আবু দাউদ) আবু দাউদে হযরত আবু হুরাইরা থেকে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা সূরা ত্বীনের আয়াত اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ (আল্লাহ কি সব বিচারকের চেয়ে বড় বিচারক নন?) পড়বে তখন বলবে بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ (কেন নয়, আমি নিজেও এর একজন সাক্ষদাতা), সূরা কিয়ামাহর এ আয়াতটি যখন পড়বে তখন বলবে এবং যখন সূরা মুরসালাতের আয়াত فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ (এ কুরআন ছাড়া আর কোন্ জিনিসের প্রতি তারা বিশ্বাস পোষণ করবে?) পড়বে তখন বলবে ঃ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ (আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি)। ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া, বায়হাকী এবং হাকেমও অনুরূপ বিষয় সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আদ্ দাহ্র

৭৬

নামকরণ

সূরার একটি নাম আদ্ দাহ্র এবং আরেকটি নাম আল ইনসান। দু'টি নামই এর প্রথম আয়াতের هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ এবং حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ আয়াতাংশ থেকে গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

তাফসীরকারদের অধিকাংশই বলেছেন যে, এটি মক্কায় অবতীর্ণ সূরা। আল্লামা যামাখশারী (র), ইমাম রাযী, কাজী বায়যাবী, আল্লামা নিজামুদ্দীন নীশাপুরী, হাফেয ইবনে কাসীর এবং আরো অনেক তাফসীরকার এটিকে মক্কী সূরা বলেই উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আলূসীর মতে এটিই অধিকাংশ মুফাস্সিরের মত। কিন্তু অপর কিছু সংখ্যক তাফসীরকারের মতে পুরা সূরাটিই মাদানী। আবার কারো কারো মতে এটি মক্কী সূরা হলেও এর ৮ থেকে ১০ পর্যন্ত আয়াতগুলো মদীনায় নাযিল হয়েছে।

অবশ্য এ সূরার বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি মাদানী সূরাসমূহের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বরং এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে স্পষ্ট বুঝা যায়। এটি যে মক্কায় অবতীর্ণ শুধু তাই নয়, বরং মক্কী যুগেরও সূরা মুদ্দাস্সিরের প্রথম সাতটি আয়াত নাযিল হওয়ার পর যে পর্যায়টি আসে সে সময় নাযিল হয়েছিল। ৮ থেকে ১০ (ويطعمون الطعام থেকে يوما عبوسا قمطريرا) পর্যন্ত আয়াতগুলো গোটা সূরার বর্ণনাক্রমের সাথে এমনভাবে গাঁথা যে, যদি কেউ পূর্বাপর মিলিয়ে তা পাঠ করে তাহলে তার মনেই হবে না যে, এর আগের এবং পরের বিষয়বস্তু ১৫-১৬ বছর পূর্বে নাযিল হয়েছিল এবং এর কয়েক বছর পর নাযিল হওয়া এ তিনটি আয়াত এখানে এনে জুড়ে দেয়া হয়েছে।

আসলে যে কারণে এ সূরা অথবা এর কয়েকটি আয়াতের মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ার ধারণা সৃষ্টি হয়েছে তা হলো, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আতা বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা অসুস্থ হয়ে পড়েন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং বহু সংখ্যক সাহাবী (রা) তাদের দেখতে ও রোগ সংক্রান্ত খোঁজ-খবর নিতে যান। কোন কোন সাহাবী (রা) হযরত আলীকে (রা) পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন শিশু দু'টির রোগমুক্তির জন্যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোন মানত করেন। অতএব হযরত আলী (রা), হযরত ফাতেমা (রা) এবং তাঁদের কাজের মেয়ে ফিদ্দা (রা) মানত করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যদি শিশু দু'টিকে রোগমুক্ত করেন তাহলে শুকরিয়া হিসেবে তাঁরা সবাই তিন দিন রোযা রাখবেন। আল্লাহর

মেহেরবানীতে উভয়ে সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং তাঁরা তিন জনে মানতের রোযা রাখতে শুরু করলেন। হযরত আলীর (রা) ঘরে খাবার কিছুই ছিল না। তিনি তিন সা' পরিমাণ যব ধার-কর্জ করে আনলেন (একটি বর্ণনা অনুসারে মেহনত মজদুরী করে নিয়ে আসলেন)। প্রথম রোযার দিন ইফতারী করে যখন খাওয়ার জন্য বসেছেন সেসময় একজন মিসকীন এসে খাবার চাইলো। তারা সব খাবার সে মিসকীনকে দিয়ে দিলেন এবং নিজেরা শুধু পানি পান করে রাত্রি কাটালেন। দ্বিতীয় দিনও ইফতারীর পর যে সময় খেতে বসেছেন সে সময় একজন ইয়াতীম এসে কিছু চাইলো। সেদিনও তাঁরা সব খাবার তাকে দিয়ে দিলেন এবং নিজেরা শুধু পানি পান করে রাত কাটিয়ে দিলেন। তৃতীয় দিন ইফতার করে খাবার জন্য সবেমাত্র বসেছেন সে সময় একজন বন্দী এসে একইভাবে খাদ্য চাইলো। সেদিনের সব খাবারও তাকে দিয়ে দেয়া হলো। চতুর্থ দিন হযরত আলী (রা) বাচ্চা দু'টিকে নিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হলে নবী (সা) দেখতে পেলেন, অসহ্য ক্ষুধার জ্বালায় পিতা ও দুই ছেলে তিনজনের অবস্থাই অত্যন্ত সংগীন। তিনি সেখান থেকে উঠে তাঁদের সাথে ফাতেমার (রা) কাছে বাড়ীতে গিয়ে দেখতে পেলেন তিনিও ঘরের এককোণে ক্ষুধার তীব্র জ্বালায় নিরব নিথর হয়ে পড়ে আছেন। এ অবস্থা দেখে নবীর (সা) হৃদয়-মন আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে হাজির হলেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আপনার পরিবার পরিজনের ব্যাপারে আপনাকে মোবারকবাদ দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেটা কি? জবাবে তিনি গোটা সূরাটা পাঠ করে শোনালেন। (ইবনে মিহরানের বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ থেকে সূরার শেষ আয়াত পর্যন্ত শোনালেন। কিন্তু ইবনে মারদুইয়া ইবনে আব্বাস থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতে শুধু এতটুকু বর্ণনা করা হয়েছে যে, ويطعمون الطعام আয়াতটি হযরত আলী ও হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাতে এ ঘটনার কোন উল্লেখ নেই)। আলী ইবনে আহমাদ আল ওয়াহেদী তার তাফসীর গ্রন্থ 'আল বাসীতে' এ ঘটনাটি পুরা বর্ণনা করেছেন। যামাখশারী, রাযী, নীশাপুরী এবং অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণ সম্ভবত সেখান থেকেই এ ঘটনাটি গ্রহণ করেছেন।

এ রেওয়ায়াতটি সনদের দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল। তাছাড়া দেরায়াত বা বুদ্ধি-বিবেক ও বিচার-বিশ্লেষণের দিক থেকে দেখলেও এ ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত মনে হয় যে, একজন মিসকীন, একজন ইয়াতীম এবং একজন বন্দী এসে খাদ্য চাচ্ছে আর তাকে বাড়ীর পাঁচ পাঁচজন লোকের খাদ্য সবটাই দিয়ে দেয়া হচ্ছে। এটা কি কোন যুক্তিসংগত ব্যাপার? একজনের খাদ্য তাকে দিয়ে বাড়ীর পাঁচ জন মানুষ চারজনের খাদ্য নিজেদের জন্য যথেষ্ট মনে করতে পারতেন। তাছাড়া একথাও বিশ্বাস করা কঠিন যে, দু' দু'টি বাচ্চা যারা সবে মাত্র রোগ থেকে নিরাময় লাভ করেছিল এবং দুর্বল ছিল তাঁদেরকেও তিন দিন যাবত অভুক্ত রাখা হযরত আলী ও হযরত ফাতেমার (রা) মত দীন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদ্বয়ও নেকীর কাজ মনে করে থাকবেন! তাছাড়াও ইসলামী শাসন যুগে কয়েদীদের ব্যাপারে কখনো এ নীতি ছিল না যে, তাদেরকে ভিক্ষা করার জন্য ছেড়ে দেয়া হবে। তারা সরকারের হাতে বন্দী হয়ে থাকলে তাদের খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থা সরকারই করতেন। আবার কোন ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করা হয়ে থাকলে তাদের খাদ্য ও বস্ত্র দান করা সে ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য হতো। তাই কোন বন্দী ভিক্ষা করতে বের

হবে মদীনায় এটা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। তা সত্ত্বেও সমস্ত বর্ণনা ও যুক্তি-তর্কের দুর্বলতাসমূহ উপেক্ষা করে এ কাহিনীকে পুরোপুরি সত্য বলে ধরে নিলেও তা থেকে বড়জোর যা জানা যায় তা শুধু এতটুকু যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের লোকদের দ্বারা এ নেক কাজটি সম্পাদিত হওয়ার কারণে জিবরাঈল (আ) এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুখবর শুনিয়েছেন যে, আল্লাহর কাছে আপনার আহলে বায়তের এ কাজটি অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। কারণ তারা ঠিক সে পছন্দনীয় কাজটি করেছেন আল্লাহ তা'আলা যার প্রশংসা সূরা দাহ্‌রের এ আয়াতগুলোতে করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, আয়াত কয়টি এ উপলক্ষেই নাযিল হয়েছিল। শানে নুযূলের ব্যাপারে বিপুল সংখ্যক রেওয়ায়াতের অবস্থা হলো, কোন আয়াত সম্পর্কে যখন বলা হয় যে, এ আয়াতটি অমুক উপলক্ষে নাযিল হয়েছিল তখন প্রকৃতপক্ষে তার এ অর্থ দাঁড়ায় না যে, যখন এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল ঠিক তখনই এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। বরং এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আয়াতটি এ ঘটনার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রযোজ্য। ইমাম সুয়ূতী তাঁর 'ইতকান' গ্রন্থে হাফেয ইবনে তাইমিয়ার এ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যে, "রাবী যখন বলেন, এ আয়াতটি অমুক ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, তখন কোন কোন ক্ষেত্রে তার অর্থ হয়, ঐ ব্যাপারটিই তার নাযিল হওয়ার কারণ। আবার কোন কোন সময় তার অর্থ হয়, ঐ ব্যাপারটি এ আয়াতের নির্দেশের অন্তরভুক্ত, যদিও তা তার নাযিল হওয়ার কারণ নয়।" এরপর তিনি ইমাম বদরুদ্দীন যারকাশীর গ্রন্থ 'আল বুরহান ফী উলুমিল কুরআন' থেকে তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। বক্তব্যটি হলো, "সাহাবা ও তাবেয়ীদের ব্যাপারে এ নীতি সাধারণ ও সর্বজনবিদিত যে, তাঁদের কেউ যখন বলেন, এ আয়াতটি অমুক ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল তখন তার অর্থ হয়, এ আয়াতের নির্দেশ ঐ ব্যাপারে প্রযোজ্য। তার এ অর্থ কখনো হয় না যে, উক্ত ঘটনাই এ আয়াতটির নাযিলের কারণ। প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রে আয়াতটি থেকে দলীল পেশ করা হয় মাত্র। তা দ্বারা ঘটনা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয় না।" (আল ইতকান ফী উলুমিল কুরআন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১, মুদ্রণ ১৯২৯ ইং)

বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য

এ সূরার বিষয়বস্তু হলো দুনিয়ায় মানুষকে তার প্রকৃত মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করা। তাকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, সে যদি তার এ মর্যাদা ও অবস্থানকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করে শোকর বা কৃতজ্ঞতামূলক আচরণ করে তাহলে তার পরিণতি কি হবে এবং তা না করে যদি কুফরীর পথ অবলম্বন করে তাহলেই বা কি ধরনের পরিণতির সম্মুখীন হবে। কুরআনের বড় বড় সূরাগুলোতে এ বিষয়টি সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মক্কী যুগের প্রথম পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাগুলোর একটি বিশেষ বর্ণনাভঙ্গি হলো পরবর্তী সময়ে যেসব বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে এ যুগে সে বিষয়গুলোই অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী পন্থায় মন-মগজে গেঁথে দেয়া হয়েছে। এ জন্য সুন্দর ও ছোট ছোট এমন বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে যা আপনা আপনি শ্রোতার মুখস্ত হয়ে যায়।

এতে সর্বপ্রথম মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এক সময় এমন ছিল, যখন সে কিছুই ছিল না। তারপর সংমিশ্রিত বীর্য দ্বারা এত সূক্ষ্মভাবে তার সৃষ্টির সূচনা করা

হয়েছে যে, তার মা পর্যন্তও বুঝতে পারেনি যে, তার অস্তিত্বের সূচনা হয়েছে। অন্য কেউও তার এ অণুবীক্ষণিক সত্তা দেখে একথা বলতে সক্ষম ছিল না যে, এটাও আবার কোন মানুষ, যে পরবর্তী সময়ে এ পৃথিবীতে সৃষ্টির সেরা হিসেবে গণ্য হবে। এরপর মানুষকে এ বলে সাবধান করা হয়েছে যে, এভাবে তোমাকে সৃষ্টি করে এ পর্যায়ে তোমাকে পৌছানোর কারণ হলো তোমাকে দুনিয়াতে রেখে আমি পরীক্ষা করতে চাই। তাই অন্যান্য সৃষ্টির সম্পূর্ণ বিপরীত তোমাকে বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছি এবং তোমার সামনে শোকর ও কুফরের দু'টি পথ স্পষ্ট করে রেখে দেয়া হয়েছে। এখানে কাজ করার জন্য তোমাকে কিছু সময়ও দেয়া হয়েছে। এখন আমি দেখতে চাই এ সময়ের মধ্যে কাজ করে অর্থাৎ এভাবে গৃহীত পরীক্ষার মাধ্যমে তুমি নিজেকে শোকরগোজার বান্দা হিসেবে প্রমাণ করো না কাফের বান্দা হিসেবে প্রমাণ করো।

অতপর যারা এ পরীক্ষায় কাফের বলে প্রমাণিত হবে আখেরাতে তাদের কি ধরনের পরিণতির সন্মুখীন হতে হবে তা শুধু একটি আয়াতের মাধ্যমেই পরিষ্কার ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে।

তারপর আয়াত নং ৫ থেকে ২২ পর্যন্ত একাদিক্রমে সেসব পুরস্কার ও প্রতিদানের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা দিয়ে সেসব লোকদের তাদের রবের কাছে অভিষিক্ত করা হবে, যারা এখানে যথাযথভাবে বন্দেগী করেছে। এ আয়াতগুলোতে শুধুমাত্র তাদের সর্বোত্তম প্রতিদান দেয়ার কথা বর্ণনা করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়নি। বরং সংক্ষেপে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, কি কি কাজের জন্য তারা এ প্রতিদান লাভ করবে। মক্কী যুগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট হলো, তাতে ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়ার সাথে সাথে কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিতে অতি মূল্যবান নৈতিক গুণাবলী এবং নেক কাজের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এমন সব কাজ-কর্ম ও এমন সব মন্দ নৈতিক দিকের উল্লেখ করা হয়েছে যা থেকে ইসলাম মানুষকে পবিত্র করতে চায়। আর দুনিয়ার এ অস্থায়ী জীবনে ভাল অথবা মন্দ কি ধরনের ফলাফল প্রকাশ পায় সেদিক বিবেচনা করে এ দু'টি জিনিস বর্ণনা করা হয়নি। বরং আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবেন তার স্থায়ী ফলাফল কি দাঁড়াবে কেবল সে দিকটি বিবেচনা করেই তা বর্ণনা করা হয়েছে। দুনিয়ার এ জীবনে কোন খারাপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট কল্যাণকর প্রমাণিত হোক বা কোন ভাল চারিত্রিক গুণ ক্ষতিকর প্রমাণিত হোক তা এখানে বিবেচ্য নয়।

এ পর্যন্ত প্রথম রুকূ'র বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হলো। এরপর দ্বিতীয় রুকূ'তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে তিনটি কথা বলা হয়েছে। এক, এ কুরআনকে অল্প অল্প করে তোমার ওপরে আমিই নাযিল করছি। এর উদ্দেশ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাবধান করে দেয়া নয়, বরং কাফেরদের সাবধান করে দেয়া। কাফেরদের সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, কুরআন মজীদ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনগড়া বা স্বরচিত গ্রন্থ নয়, বরং তার নাযিলকর্তা আমি নিজে। আমার জ্ঞান ও কর্মকৌশলের দাবী হলো, আমি যেন তা একবারে নাযিল না করি বরং অল্প অল্প করে বারে বারে নাযিল করি। দ্বিতীয় যে কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে তাহলো, তোমার রবের ফায়সালা আসতে যত

দেরীই হোক না কেন এবং এ সময়ের মধ্যে তোমার ওপর দিয়ে যত কঠিন ঝড়-ঝঞ্ঝাই বয়ে যাক না কেন তুমি সর্বাবস্থায় ধৈর্যের সাথে তোমার রিসালাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে থাকো। কখনো এসব দুষ্কর্মশীল ও সত্য অস্বীকারকারী লোকদের কারো চাপে পড়ে নতি স্বীকার করবে না। তৃতীয় যে কথাটি তাঁকে বলা হয়েছ তা হলো, রাত দিন সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করো, নামায পড় এবং আল্লাহর ইবাদাতে রাত কাটিয়ে দাও। কারণ কুফরের বিধ্বংসী প্লাবনের মুখে এ জিনিসটিই আল্লাহর পথে আহবানকারীদের পা-কে দৃঢ় ও মজবুত করে।

এরপর আরেকটি ছোট বাক্যে কাফেরদের ভ্রান্ত আচরণের মূল কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তারা আখেরাতকে ভুলে দুনিয়ার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় আরেকটি বাক্যে তাদের এ মর্মে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা নিজে নিজেই জন্ম লাভ করোনি । আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, বুকের এ চওড়া ছাতি এবং মজবুত ও সবল হাত-পা তুমি নিজেই নিজের জন্য বানিয়ে নাও নি। ওগুলোও আমিই তৈরী করেছি। আমি তোমাদের যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। সবসময়ের জন্য সে ক্ষমতা আমার করায়ত্ব। আমি তোমাদের চেহারা ও আকৃতি বিকৃত করে দিতে পারি। তোমাদের ধ্বংস করে অন্য কোন জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারি। তোমাদের মেরে ফেলার পর যে চেহারা ও আকৃতিতে ইচ্ছা পুনরায় তোমাদের সৃষ্টি করতে পারি।

সবশেষে এ বলে বক্তব্য শেষ করা হয়েছে যে, এ কুরআন একটি উপদেশপূর্ণ বাণী। যার ইচ্ছা সে গ্রহণ করে তার প্রভুর পথ অবলম্বন করতে পারে। তবে দুনিয়াতে মানুষের ইচ্ছা সব কিছু নয়। আল্লাহর ইচ্ছা না হওয়া পর্যন্ত কারো ইচ্ছাই পূরণ হতে পারে না। তবে আল্লাহর ইচ্ছা অযৌক্তিকভাবে হয় না। তিনি যা-ই ইচ্ছা করুন না কেন তা হয় নিজের জ্ঞান ও কর্মকৌশলের আলোকে। এ জ্ঞান ও কর্মকৌশলের ভিত্তিতে তিনি যাকে তাঁর রহমতলাভের উপযুক্ত মনে করেন তাকে নিজের রহমতের অন্তরভুক্ত করে নেন। আর তাঁর কাছে যে জালেম বলে প্রমাণিত হয় তার জন্য তিনি অত্যন্ত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

আয়াত ৩১ **সূরা আদ দাহর–মাদানী** রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ۝١
اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا
بَصِيْرًا ۝٢

মানুষের ওপরে কি অন্তহীন মহাকালের এমন একটি সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কোন জিনিসই ছিল না[১]? আমি মানুষকে এক সংমিশ্রিত বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি[২] যাতে তার পরীক্ষা নিতে পারি।[৩] এ উদ্দেশ্যে আমি তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি।[৪]

১. আয়াতের প্রথমাংশ হলো هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ । এখানে অধিকাংশ মুফাস্‌সির ও অনুবাদক هَلْ শব্দটিকে قَدْ শব্দের অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং এর অর্থ করেছেন নিঃসন্দেহে মানুষের ওপরে এরূপ একটি সময় এসেছিল। তবে هل আরবী ভাষায় মূলত ঃ 'কি'র অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সর্বাবস্থায় এর দ্বারা প্রশ্ন করা বুঝায় না। বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাহ্যিক ভাবে প্রশ্নবোধক এ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে বলা হয়ে থাকে। যেমন, কখনো আমরা জানতে চাই যে, অমুক ঘটনা ঘটেছিল না ঘটেনি আর সে জন্য কাউকে জিজ্ঞেস করি, এ ধরনের ঘটনা কি ঘটেছিল? কোন কোন সময় আবার প্রশ্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য হয় না, বরং উদ্দেশ্য হয় কোন বিষয় অস্বীকার করা। তখন যে বাচনভংগি ব্যবহার করে আমরা তা অস্বীকার করি তাহলো অন্য কেউও কি এ কাজ করতে পারে? কোন সময় আমরা কারো থেকে কোন বিষয়ে স্বীকৃতি পেতে চাই এবং এ উদ্দেশ্যে তাকে জিজ্ঞেস করি, আমি কি তোমার টাকা পরিশোধ করেছি? কোন সময় আবার শুধু স্বীকৃতি আদায় করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য হয় না। বরং তখন আমরা প্রশ্ন করি শ্রোতার মন মগজকে আরো একটি বিষয় ভাবতে বাধ্য করার জন্য যা তার স্বীকৃতির অনিবার্য ফল স্বরূপ দেখা দেয়। যেমন আমরা কাউকে জিজ্ঞেস করি ঃ আমি কি তোমার সাথে কোন খারাপ আচরণ করেছি? এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য শুধু এতটুকুই নয় যে, সে স্বীকার করুক, আপনি তার সাথে সত্যিই কোন খারাপ আচরণ করেননি। বরং এর উদ্দেশ্য তাকে একথাও চিন্তা করতে বাধ্য করা যে, যে ব্যক্তি আমার সাথে কোন খারাপ আচরণ করেনি তার সাথে আমার খারাপ আচরণ করা কতটুকু ন্যায় সংগত? আলোচ্য আয়াতের

প্রশ্নবোধক অংশটুকু প্রকৃতপক্ষে এ শেষ অর্থেই বলা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য মানুষকে শুধু এতটুকু স্বীকার করানো নয় যে, তার ওপরে এমন একটি সময় সত্যিই অতিবাহিত হয়েছে। বরং এর দ্বারা তাকে এ বিষয়ও চিন্তা করতে বাধ্য করা উদ্দেশ্য যে, যে আল্লাহ এমন নগণ্য অবস্থা থেকে সৃষ্টির সূচনা করে তাকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন তিনি তাকে পুনরায় সৃষ্টি করতে অক্ষম হবেন কেন?

আয়াতের দ্বিতীয় অংশ হলো حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ । دهر অর্থ- অন্তহীন মহাকাল যার আদি-অন্ত কিছুই মানুষের জানা নেই। আর حِيْنٌ অর্থ অন্তহীন এ মহাকালের বিশেষ একটি সময়, মহাকাল প্রবাহের কোন এক পর্যায়ে যার আগমন ঘটেছিল। বক্তব্যের সারমর্ম হলো, এ অন্তহীন মহাকালের মধ্যে একটি দীর্ঘ সময় তো এমন অতিবাহিত হয়েছে যখন মানব প্রজাতির আদৌ কোন অস্তিত্ব ছিল না। তারপর এ মহাকাল প্রবাহে এমন একটি সময় আসলো যখন মানুষ নামের একটি প্রজাতির সূচনা করা হলো। এ সময়-কালে প্রত্যেক মানুষের জন্য এমন একটি সময় এসেছে যখন তাকে শূন্য মাত্রা বা অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বদানের সূচনা করা হয়েছে।

আয়াতের তৃতীয় অংশ হলো لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا অর্থাৎ তখন সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তু ছিল না। তার একটি অংশ বাপের শুক্রের মধ্যে অণুবীক্ষণিক জীবাণু আকারে এবং আরেকটি অংশ মায়ের বীর্যে একটি অণুবীক্ষণিক ডিম্বের আকারে বর্তমান ছিল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানুষ এ বিষয়ও জানতো না যে, একটি শুক্রকীট এবং একটি ডিম্বকোষের মিলনের ফলেই সে অস্তিত্ব লাভ করে। বর্তমানে অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সে এ দু'টিকে দেখতে সক্ষম হয়েছে বটে, কিন্তু এখনো কেউ বলতে পারে না যে, পিতার এ শুক্রকীটে এবং মায়ের ডিম্বকোষে কত সংখ্যক মানুষের অস্তিত্ব থাকে। গর্ভসঞ্চারকালে এ দু'টি জিনিসের মিলনে যে প্রাথমিক কোষ (Cell) সৃষ্ট হয় তা পরিমাণহীন এমন একটি পরমাণু যা কেবল অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই দেখা যেতে পারে। আর তা দেখার পরেও আপাত দৃষ্টিতে কেউ একথা বলতে পারে না যে, এভাবে কোন মানুষ জন্মলাভ করছে কিংবা এ নগণ্য সূচনা বিন্দু থেকে বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করে কোন মানুষ যদি সৃষ্টি হয়ও তাহলে সে কেমন দৈহিক উচ্চতা ও কাঠামো, কেমন আকার-আকৃতি এবং কেমন যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বধারী মানুষ হবে তাও বলতে পারে না। সে সময় সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিল না, এ বাণীর তাৎপর্য এটাই। যদিও মানুষ হিসেবে সে সময় তার অস্তিত্বের সূচনা হয়ে গিয়েছিল।

২. এক সংমিশ্রিত বীর্য দ্বারা অর্থ হলো, মানুষের সৃষ্টি পুরুষ ও নারীর দু'টি আলাদা বীর্য দ্বারা হয়নি। বরং দু'টি বীর্য সংমিশ্রিত হয়ে যখন একটি হয়ে গিয়েছে তখন সে সংমিশ্রিত বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে।

৩. এটাই হলো দুনিয়ায় মানুষের এবং মানুষের জন্য দুনিয়ার প্রকৃত অবস্থান ও মর্যাদা। মানুষ নিছক গাছপালা বা জীব-জন্তুর মত নয় যে, তার সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য এখানেই পূরণ হয়ে যাবে এবং প্রকৃতির নিয়মানুসারে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার নিজের অংশের করণীয় কাজ সম্পাদন করার পর এখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাছাড়া এ দুনিয়া তার জন্য আযাব বা শাস্তির স্থান নয় যেমনটা খৃষ্টান পাদ্রীরা মনে করে, প্রতিদানের ক্ষেত্রও নয় যেমনটা জন্মান্তরবাদীরা মনে করে, চারণ ক্ষেত্র বা

বিনোদন কেন্দ্র নয় যেমনটা বস্তুবাদীরা মনে করে আবার দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম ক্ষেত্রও নয় যেমনটা ডারউইন ও মার্কসের অনুসারীরা মনে করে থাকে। বরং দুনিয়া মূলত তার জন্য একটা পরীক্ষাগার। যে জিনিসকে সে বয়স বা আয়ুষ্কাল বলে মনে করে আসলে তা পরীক্ষার সময় যা তাকে এ দুনিয়ায় দেয়া হয়েছে। দুনিয়ায় যে ক্ষমতা ও যোগ্যতা তাকে দেয়া হয়েছে, যেসব বস্তুকে কাজে লাগানোর সুযোগ তাকে দেয়া হয়েছে, যে মর্যাদা নিয়ে বা অবস্থানে থেকে সে এখানে কাজ করছে এবং তার ও অন্যান্য মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তার সবই মূলত অসংখ্য পরীক্ষা পত্র। জীবনের সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে এ পরীক্ষা চলবে। এ পরীক্ষার ফলাফল দুনিয়ায় প্রকাশ পাবে না। বরং আখেরাতে তার সমস্ত পরীক্ষা পত্র পরীক্ষা ও যাঁচাই বাছাই করে ফায়সালা দেয়া হবে। সে সফল না বিফল। তার সফলতা ও বিফলতার সবটাই নির্ভর করবে এ বিষয়ের ওপর যে, সে তার নিজের সম্পর্কে কি ধারণা নিয়ে এখানে কাজ করেছে এবং তাকে দেয়া পরীক্ষার পত্রসমূহে সে কিভাবে জবাব লিখেছে। নিজের সম্পর্কে সে যদি মনে করে থাকে যে, তার কোন আল্লাহ নেই অথবা নিজেকে সে বহু সংখ্যক ইলাহর বান্দা মনে করে থাকে এবং পরীক্ষার সবগুলো পত্রে এ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে জবাব লিখে থাকে যে, আখেরাতে তাকে তার স্রষ্টার সামনে কোন জবাবদিহি করতে হবে না তাহলে তার জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ড ভুল হয়ে গিয়েছে। আর যদি সে নিজেকে একমাত্র আল্লাহর বান্দা মনে করে আল্লাহর মনোনীত পথ ও পন্থা অনুসারে কাজ করে থাকে এবং আখেরাতে জবাবদিহির চেতনা বিবেচনায় রেখে তা করে থাকে তাহলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেলা। (এ বিষয়টি কুরআন মজীদে এত অধিক জায়গায় ও এত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এখানে স্থানগুলোর নাম উল্লেখ করা বেশ কঠিন। যারা এ বিষয়টি আরো ভালভাবে বুঝতে চান তারা তাফহীমুল কুরআনের প্রত্যেক খণ্ডের শেষে সংযুক্ত বিষয়সূচীর মধ্যে 'পরীক্ষা' শব্দটি বের করে সেসব স্থান দেখুন যেখানে কুরআন মজীদে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কুরআন ছাড়া পৃথিবীতে এমন আর কোন গ্রন্থ নেই যার মধ্যে এ সত্যটি এত বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪. আসলে বলা হয়েছে আমি তাকে سميع ও بصير বানিয়েছি। বিবেকবুদ্ধির অধিকারী করেছি বললে এর সঠিক অর্থ প্রকাশ পায়। কিন্তু অনুবাদে আমি سميع শব্দের অর্থ "শ্রবণশক্তির অধিকিারী" এবং بصير শব্দের অর্থ 'দৃষ্টিশক্তির অধিকারী' করেছি। যদিও এটিই আরবী ভাষার এ দু'টি শব্দের শাব্দিক অনুবাদ কিন্তু আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তিই জানেন যে, জন্তু-জানোয়ারের জন্য কখনো سميع ও بصير শব্দ ব্যবহৃত হয় না। অথচ জন্তু-জানোয়ারও দেখতে এবং শুনতে পায়। অতএব এখানে শোনা এবং দেখার অর্থ শোনার ও দেখার সে শক্তি নয় যা জন্তু-জানোয়ারকেও দেয়া হয়েছে। এখানে এর অর্থ হলো, শোনা ও দেখার সেসব উপায়-উপকরণ যার সাহায্যে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। তাছাড়া শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি যেহেতু মানুষের জ্ঞানার্জনের উপায়-উপকরণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ তাই সংক্ষেপে এগুলোরই উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ যেসব ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান অর্জন করে থাকে আসলে এসব ইন্দ্রিয়ের সবগুলোকেই এখানে বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া মানুষকে যেসব ইন্দ্রিয় ও অনুভূতি শক্তি দেয়া হয়েছে তা ধরন ও প্রকৃতিগত দিক দিয়ে পশুদের ইন্দ্রিয় ও অনুভূতি শক্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ মানুষের প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের পেছনে একটি চিন্তাশীল মন-মগজ

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝٣ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ۝٤

আমি তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি। এরপর হয় সে শোকরগোজার হবে নয়তো হবে কুফরের পথ অনুসরণকারী।[৫] আমি কাফেরদের জন্য শিকল, বেড়ি এবং জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি।

বর্তমান যা ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান ও তথ্যসমূহকে একত্রিত ও বিন্যস্ত করে তা থেকে ফলাফল বের করে, মতামত স্থির করে এবং এমন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যার ওপরে তার কার্যকলাপ ও আচরণের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাই মানুষকে সৃষ্টি করে আমি তাকে পরীক্ষা করতে চাচ্ছিলাম একথাটি বলার পর আমি এ উদ্দেশ্যেই তাকে سميع ও بصير অর্থাৎ 'শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি' কথাটি বলার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জ্ঞান ও বিবেক–বুদ্ধির শক্তি দিয়েছেন যাতে সে পরীক্ষা দেয়ার উপযুক্ত হতে পারে। বাক্যটির অর্থ যদি এটা না হয় এবং سميع ও بصير বানানোর অর্থ যদি শুধু শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী বানানো হয় তাহলে অন্ধ ও বধির ব্যক্তিরা এ পরীক্ষা থেকে বাদ পড়ে যায় অথচ জ্ঞান ও বিবেক–বুদ্ধি থেকে যদি কেউ পুরোপুরি বঞ্চিত না হয় তাহলে তার এ পরীক্ষা থেকে বাদ পড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

৫. অর্থাৎ আমি তাকে শুধু জ্ঞান ও বিবেক–বুদ্ধি দিয়েই ছেড়ে দেইনি। বরং এগুলো দেয়ার সাথে সাথে তাকে পথও দেখিয়েছি যাতে সে জানতে পারে শোকরিয়ার পথ কোন্‌টি এবং কুফরীর পথ কোন্‌টি। এরপর যে পথই সে অবলম্বন করুক না কেন তার জন্য সে নিজেই দায়ী। এ বিষয়টিই সূরা বালাদে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ "আমি তাকে দু'টি পথ (অর্থাৎ ভাল ও মন্দ পথ) স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছি।" সূরা শামসে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে এভাবেঃ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا "শপথ (মানুষের) প্রবৃত্তির আর সে সত্তার যিনি তাকে (সব রকম বাহ্যিক) ও আভ্যন্তরীণ শক্তি দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। আর পাপাচার ও তাকওয়া–পরহেজগারীর অনুভূতি দু'টোই তার ওপর ইলহাম করেছেন।" এসব ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ সামনে রেখে বিচার করলে এবং পৃথিবীতে মানুষের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা যেসব ব্যবস্থার কথা কুরআন মজীদে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন তাও সামনে রাখলে বুঝা যায় যে, এ আয়াতে পথ দেখানোর যে কথা বলা হয়েছে তার দ্বারা পথপ্রদর্শনের কোন একটি মাত্র পন্থা ও উপায় বুঝানো হয়নি। বরং এর দ্বারা অনেক পন্থা ও উপায়ের কথা বলা হয়েছে যার কোন সীমা পরিসীমা নেই। যেমন ঃ

এক ঃ প্রত্যেক মানুষকে জ্ঞান ও বিবেক–বুদ্ধির যোগ্যতা দেয়ার সাথে সাথে তাকে একটি নৈতিক বোধ ও অনুভূতি দেয়া হয়েছে যার সাহায্যে সে প্রকৃতিগতভাবেই ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে, কিছু কাজ–কর্ম ও বৈশিষ্টকে খারাপ বলে জানে যদিও সে

নিজেই তাতে লিপ্ত। আবার কিছু কাজ-কর্ম ও গুণাবলীকে ভাল বলে মনে করে যদিও সে নিজে তা থেকে দূরে অবস্থান করে। এমন কি যেসব লোক তাদের স্বার্থ ও লোভ-লালসার কারণে এমন সব দর্শন রচনা করেছে যার ভিত্তিতে তারা অনেক খারাপ ও পাপকার্যকেও নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়েছে তাদের অবস্থাও এমন যে, সে একই মন্দ কাজ করার অভিযোগ যদি কেউ তাদের ওপর আরোপ করে, তাহলে তারা প্রতিবাদে চিৎকার করে উঠবে এবং তখনই জানা যায় যে, নিজেদের মিথ্যা ও অলীক দর্শন সত্ত্বেও বাস্তবে তারা নিজেরাও সেসব কাজকে খারাপই মনে করে থাকে। অনুরূপ ভাল কাজ ও গুণাবলীকে কেউ মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা এবং সেকেলে ঠাওরিয়ে রাখলেও কোন মানুষের কাছ থেকে তারা যখন নিজেরাই নিজেদের সদাচরণের সুফল বা উপকার লাভ করে তখন তারা সেটিকে মূল্যবান মনে করতে বাধ্য হয়ে যায়।

দুই ঃ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা বিবেক (তিরস্কারকারী নফস) বলে একটি জিনিস রেখে দিয়েছেন। যখন সে কোন মন্দ কাজ করতে উদ্যত হয় অথবা করতে থাকে অথবা করে ফেলে তখন এ বিবেকই তাকে দংশন করে। যতই হাত বুলিয়ে বা আদর-সোহাগ দিয়ে মানুষ এ বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে দিক, তাকে অনুভূতিহীন বানানোর যত চেষ্টাই সে করুক সে তাকে একদম নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম নয়। হঠকারী হয়ে দুনিয়ায় সে নিজেকে চরম বিবেকহীন প্রমাণ করতে পারে, সে সুন্দর সুন্দর অজুহাত খাড়া করে দুনিয়াকে ধোঁকা দেয়ার সব রকম প্রচেষ্টা চালাতে পারে, সে নিজের বিবেককে প্রতারিত করার জন্য নিজের কর্মকাণ্ডের সপক্ষে অসংখ্য ওজর পেশ করতে পারে; কিন্তু এসব সত্ত্বেও আল্লাহ তার স্বভাব-প্রকৃতিতে যে হিসেব পরীক্ষককে নিয়োজিত রেখেছেন সে এত জীবন্ত ও সজাগ যে, সে নিজে প্রকৃতপক্ষে কি তা কোন অসৎ মানুষের কাছেও গোপন থাকে না। সূরা আল কিয়ামাহতে একথাটিই বলা হয়েছে যে, "মানুষ যত ওজরই পেশ করুক না কেন সে নিজেকে নিজে খুব ভাল করেই জানে।" (আয়াত ১৫)

তিন ঃ মানুষের নিজের সত্তায় এবং তার চারাপাশে যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত গোটা বিশ্ব-জাহানের সর্বত্র এমন অসংখ্য নিদর্শনাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, এতসব জিনিস কোন আল্লাহ ছাড়া হতে পারে না কিংবা বহু সংখ্যক খোদা এ বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টিকর্তা বা পরিচালক হতে পারে না। বিশ্ব চরাচরের সর্বত্র এবং মানুষের আপন সত্তার অভ্যন্তরে বিদ্যমান এ নিদর্শনাবলীই কিয়ামত ও আখেরাতের সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করছে। মানুষ যদি এসব থেকে চোখ বন্ধ করে থাকে অথবা বুদ্ধি-বিবেক কাজে লাগিয়ে এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা না করে অথবা তা যেসব সত্যের প্রতি ইংগিত করছে তা মেনে নিতে টালবাহানা ও গড়িমসি করে তাহলে তা তার নিজেরই অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা নিজের পক্ষ থেকে তার সামনে সত্যের সন্ধান দাতা নিদর্শনাদি পেশ করতে আদৌ কোন অসম্পূর্ণতা রাখেনি।

চার ঃ মানুষের নিজের জীবনে, তার সমসাময়িক পৃথিবীতে এবং তার পূর্বের অতীত ইতিহাসের অভিজ্ঞতায়, এমন অসংখ্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং হয়ে থাকে যা প্রমাণ করে যে, একটি সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর শাসন-কর্তৃত্ব তার ওপর এবং সমগ্র বিশ্ব-জাহানের ওপর কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন যাঁর সামনে সে নিতান্তই অসহায়। যাঁর ইচ্ছা সবকিছুর ওপর

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝٥ عَيْنًا يَشْرَبُ
بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۝٦ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا
كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۝٧

(বেহেশতে) নেক্‌কার লোকেরা[৬] পানপাত্র থেকে এমন শরাব পান করবে যাতে কর্পূর পানি সংমিশ্রিত থাকবে। এটি হবে একটি বহমান ঝর্ণা[৭] আল্লাহর বান্দারা[৮] যার পানির সাথে শরাব মিশিয়ে পান করবে এবং যেখানেই ইচ্ছা সহজেই তার শাখা-প্রশাখা বের করে নেবে।[৯] এরা হবে সেসব লোক যারা (দুনিয়াতে) মানত পূরণ করে[১০] সে দিনকে ভয় করে যার বিপদ সবখানে ছড়িয়ে থাকবে।

বিজয়ী এবং যাঁর সাহায্যের সে মুখাপেক্ষী। এসব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ বাহ্যিক ক্ষেত্রসমূহেই শুধু এ সত্যের প্রমাণ পেশ করে না। বরং মানুষের নিজের প্রকৃতির মধ্যেও সে সর্বোচ্চ শাসন-কর্তৃত্বের প্রমাণ বিদ্যমান যার কারণে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে খারাপ সময়ে নাস্তিকরাও আল্লাহর সামনে প্রার্থনার হাত প্রসারিত করে এবং কট্টর মুশরিকরাও সব মিথ্যা খোদাকে পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহকে ডাকতে শুরু করে।

পাঁচ ঃ মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও প্রকৃতিগত জ্ঞানের অকাট্য ও চূড়ান্ত রায় হলো অপরাধের শাস্তি এবং উত্তম কার্যাবলীর প্রতিদান অবশ্যই পাওয়া উচিত। এ উদ্দেশ্যে দুনিয়ার প্রত্যেক সমাজে কোন না কোন রূপে বিচার-ব্যবস্থা কায়েম করা হয় এবং যেসব কাজ-কর্ম প্রশংসনীয় বলে মনে করা হয় তার জন্য পুরস্কার ও প্রতিদান দেয়ারও কোন না কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, নৈতিকতা এবং প্রতিদান বা ক্ষতিপূরণ আইনের মধ্যে এমন একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান যা অস্বীকার করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। একথা যদি স্বীকার করা হয় যে, এ পৃথিবীতে এমন অসংখ্য অপরাধ আছে যার যথাযোগ্য শাস্তি তো দূরের কথা আদৌ কোন শাস্তি দেয়া যায় না এবং এমন অসংখ্য সেবামূলক ও কল্যাণকর কাজ আছে যার যথাযোগ্য প্রতিদান তো দূরের কথা কাজ সম্পাদনকারী আদৌ কোন প্রতিদান লাভ করতে পারে না তাহলে আখেরাতকে মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। তবে কোন নির্বোধ যদি মনে করে অথবা কোন হঠকারী ব্যক্তি যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে থাকে যে, ন্যায় ও ইনসাফের ধারণা পোষণকারী মানুষ এমন এক পৃথিবীতে জন্মলাভ করে ফেলেছে যেখানে ন্যায় ও ইনসাফের ধারণা একেবারেই অনুপস্থিত তবে সেটা আলাদা কথা, এরপর অবশ্য একটি প্রশ্নের জওয়াব দেয়া তার দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে পড়ে। তাহলো, এমন এক বিশ্বে জন্মলাভকারী মানুষের মধ্যে ইনসাফের এ ধারণা এলো কোথা থেকে?

ছয় ঃ এসব উপায়-উপকরণের সাহায্যে মানুষকে হিদায়াত ও পথপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে নবী পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন। এসব কিতাবে পরিষ্কার ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে, শোকরের পথ কোন্‌টি ও কুফরের পথ কোন্‌টি এবং এ দু'টি পথে চলার পরিণামই বা কি? নবী-রসূল এবং তাঁদের আনীত কিতাবসমূহের শিক্ষা জানা-অজানা, দৃশ্য-অদৃশ্য অসংখ্য উপায় ও পন্থায় এত ব্যাপকভাবে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে যে, কোন জনপদই আল্লাহ ও আখেরাতের ধারণা, সৎ ও অসৎ কাজের পার্থক্য বোধ এবং তাঁদের পেশকৃত নৈতিক নীতিমালা ও আইন-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ নয়, নবী-রসূলদের আনীত কিতাবসমূহের শিক্ষা থেকেই তারা এ জ্ঞান লাভ করেছে তা তাদের জানা থাক বা না থাক। বর্তমানে যেসব লোক নবী-রসূলগণ এবং আসমানী কিতাবসমূহকে অস্বীকার করে অথবা তাঁদের সম্পর্কে কোন খবরই রাখে না তারাও এমন অনেক জিনিস অনুসরণ করে থাকে যা মূলত ঐ সব শিক্ষা থেকে উৎসারিত ও উৎপন্ন হয়ে তাদের কাছে পৌঁছেছে। অথচ মূল উৎস কি সে সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না।

৬. মূল আয়াতে ابرار শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এমন সব মানুষ যারা পুরোপুরি তাদের রবের আনুগত্য করেছে, তাঁর পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করেছে এবং তাঁর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বিরত রয়েছে।

৭. অর্থাৎ তা কর্পূর মিশ্রিত পানি হবে না বরং তা হবে এমন একটি প্রাকৃতিক ঝর্ণাধারা যার পানি হবে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন এবং শীতল আর তার খোশবু হবে অনেকটা কর্পূরের মত।

৮. عباد الله (আল্লাহর বান্দারা) কিংবা عباد الرحمن (রাহমানের বান্দারা) শব্দগুলো আভিধানিক অর্থে সমস্ত মানুষের জন্যই ব্যবহৃত হতে পারে। কারণ সবাই আল্লাহর বান্দা। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরআন মজীদে যেখানেই এ ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার দ্বারা আল্লাহর নেক্‌কার বান্দাগণকেই বুঝানো হয়েছে। অসৎলোক, যারা নিজেরাই নিজেদেরকে আল্লাহর বন্দেগী তথা দাসত্বের বাইরে রেখেছে, তারা যেন এর যোগ্য-ই নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজের মহান নামের সাথে যুক্ত করে عباد الله অথবা عباد الرحمن এর মত সম্মানিত উপাধিতে ভূষিত করবেন।

৯. এর দ্বারা বুঝায় না যে, তারা সেখানে কোদাল ও খন্তা নিয়ে নালা খনন করবে এবং এভাবে উক্ত ঝর্ণার পানি যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাবে। বরং এর অর্থ হলো, জান্নাতের মধ্যে যেখানেই তারা চাইবে সেখানেই এ ঝর্ণা বইতে থাকবে। এ জন্য তাদের নির্দেশ বা ইংগিতই যথেষ্ট হবে। সহজেই বের করে নেবে কথাটি এ বিষয়টির প্রতিই ইংগিত করে।

১০. 'নযর' বা মানত পূরণ করার একটা অর্থ হলো, মানুষের ওপর যা কিছু ওয়াজিব করা হয়েছে তা তারা পূরণ করবে। দ্বিতীয় অর্থ হলো, মানুষ তার নিজের ওপর যা ওয়াজিব করে নিয়েছে কিংবা অন্য কথায় সে যে কাজ করার সংকল্প বা ওয়াদা করেছে তা পূরণ করবে। তৃতীয় অর্থ হলো, ব্যক্তির ওপরে যা ওয়াজিব তা সে পূরণ করবে। তা তার ওপর ওয়াজিব করা হয়ে থাকুক অথবা সে নিজেই তার ওপর ওয়াজিব করে নিয়ে থাকুক। এ তিনটি অর্থের মধ্যে দ্বিতীয় অর্থটি বেশী পরিচিত এবং 'নযর' শব্দ দ্বারা

সাধারণত এ অর্থটিই বুঝানো হয়ে থাকে। যাই হোক, এখানে ঐ সমস্ত লোকের প্রশংসা হয়তো এ জন্য করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত ওয়াজিবসমূহ পালন করে। অথবা এ জন্য তাদের প্রশংসা করা হয়েছে যে, তারা অত্যন্ত সৎ মানুষ। যেসব ওয়াজিব বা করণীয় আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন সেগুলো পালনের ব্যাপারে কোন রকম ত্রুটি করা তো দূরের কথা যেসব ভাল ও কল্যাণকর কাজ আল্লাহ তাদের জন্য ওয়াজিব বা করণীয় করে দেননি তারা যখন আল্লাহর কাছে সে কাজ করার ওয়াদা করে তখন সে ওয়াদাও পালন করে।

মানতের বিধি–বিধান ও হুকুম–আহকাম তাফহীমুল কুরআনে সূরা বাকারার ৩১০ নং টীকায় আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। তবে এখানে তা আরো একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যথার্থ বলে মনে করছি। যাতে এ ব্যাপারে মানুষ যেসব ভুল করে অথবা যেসব ভুল ধারণা মানুষের মধ্যে দেখা যায় তা থেকে আত্মরক্ষা করতে এবং এর সঠিক নিয়ম–কানুন অবহিত হতে পারে।

এক ঃ ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের মতে 'নযর' বা মানত চার প্রকারের। এক, এক ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ওয়াদা করলো যে, সে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য অমুক নেক কাজ সম্পাদন করবে। দুই, সে মানত করলো যে, আল্লাহ যদি আমার অমুক প্রয়োজন পূরণ করেন তাহলে আমি শোকরিয়া হিসেবে অমুক নেক কাজ করবো। এ দুই প্রকারের মানতকে ফিকাহবিদদের পরিভাষায় 'নযরে তাবাররুর' বা নেক কাজের মানত বলা হয় এবং এ ব্যাপারে তারা একমত যে, এ নযর পূরণ করা ওয়াজিব। তিন, কোন ব্যক্তির কোন নাজায়েজ কাজ করার কিংবা কোন ওয়াজিব কাজ না করার সংকল্প করা। চার, কোন ব্যক্তির কোন মুবাহ কাজ করা নিজের জন্য ওয়াজিব করে নেয়া অথবা কোন অবাঞ্ছিত কাজ করার সংকল্প করা। এ দু' প্রকারের মানতকে ফিকাহবিদদের পরিভাষায় "নযরে লাজাজ" (মূর্খতা, ঝগড়াটেপনা ও হঠকারিতামূলক মানত) বলে। এর মধ্যে তৃতীয় প্রকারের মানত সম্পর্কে সব ফিকাহবিদের ঐকমত্য হলো, তা মানত হিসেবে পরিগণিত হয় না। চতুর্থ প্রকারের মানত সম্পর্কে ফিকাহবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কোন কোন ফিকাহবিদ বলেছেন ঃ এ মানত পূরণ করা কর্তব্য। কেউ কেউ বলেন ঃ শপথ ভংগের কাফ্‌ফারা দিতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, ব্যক্তি ইচ্ছা করলে মানত পূরণ করতে পারে কিংবা কাফ্‌ফারা দিতে পারে। এ ব্যাপারে তার স্বাধীনতা রয়েছে। শাফেয়ী এবং মালেকীদের মতে এ প্রকারের মানতও আদৌ মানত হিসেবে গণ্য হয় না। আর হানাফীদের মতে এ দু' প্রকারের মানতের জন্য কাফ্‌ফারা দেয়া আবশ্যিক হয়ে যায়। (উমদাতুল কারী)

দুই ঃ কিছু সংখ্যক হাদীস থেকে জানা যায় যে, কেউ যদি মনে করে মানত দ্বারা 'তাকদীর' পরিবর্তিত হয়ে যাবে অথবা যে মানতে কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শোকরিয়া হিসেবে নেক কাজ করার পরিবর্তে আল্লাহকে বিনিময় হিসেবে কিছু দেয়ার জন্য এভাবে চিন্তা করে যে, তিনি যদি আমার কাজটি করে দেন তাহলে আমি তাঁর জন্য অমুক নেক কাজটি করে দেব। তবে এ ধরনের মান্নত নিষিদ্ধ। হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنِ النَّذْرِ وَيَقُوْلُ اِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهٖ مِنَ الْبَخِيْلِ -

"একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানত মানতে নিষেধ করতে লাগলেন। তিনি বলছিলেন, মানত কোন কিছু প্রতিরোধ করতে পারে না। তবে এভাবে কৃপণ ব্যক্তির দ্বারা তার কিছু অর্থ ব্যয় করানো হয়। (মুসলিম–আবু দাউদ)

হাদীসের শেষ অংশের অর্থ হলো, কৃপণ ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার মত বান্দা নয়। মানতের মাধ্যমে সে এ লোভে কিছু খরচ করে যে, এ বিনিময় গ্রহণ করে আল্লাহ তা'আলা হয়তো তার তাকদীর পরিবর্তন করে দেবেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণিত আরেকটি হাদীস হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلنَّذْرُ لَايُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهٖ مِنَ الْبَخِيْلِ -

"মানত কোন কাজকে এগিয়ে আনতে কিংবা আশু সংঘটিতব্য কোন কাজকে পিছিয়ে দিতে পারে না। তবে এভাবে কৃপণ ব্যক্তির কিছু অর্থ–সম্পদ খরচ করানো হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

আরো একটি হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ নবী (সা) মানত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّهُ لَا يَاْتِى بِخَيْرٍ وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهٖ مِنَ الْبَخِيْلِ

"এভাবে কোন উপকার বা কল্যাণ হয় না। তবে বখীল কর্তৃক তার অর্থ–সম্পদ থেকে কিছু খরচ করানো হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম মুসলিম (রা) হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে প্রায় এরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত কিছু সংখ্যক হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। বুখারী ও মুসলিম উভয়ে আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে তারা বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَرِّبُ مِنْ اِبْنِ اٰدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ قَدَّرَهُ لَهٗ وَلٰكِنَّ النَّذْرَ يُوَافِقُ الْقَدْرَ فَيُخْرَجُ بِذَالِكَ مِنَ الْبَخِيْلِ مَالَمْ يَكُنِ الْبَخِيْلُ يُرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَ -

"আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষের তাকদীরে যা নির্ধারিত করেননি, মানত ঐ মানুষকে তার ব্যবস্থা করে দিতে পারে না। তবে মানত তাকদীর অনুসারেই হয়ে থাকে। আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর এভাবে বখীলের কাছ থেকে সেই বস্তু বের করে নেয় যা সে অন্য কোন কারণে বের করতো না।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসের (রা) বর্ণিত একটি হাদীস এ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে তোলে। হাদীসটিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ

"যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য হয় প্রকৃত মানত সেটিই।" (তাহাবী)।

তিন ঃ মানতের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো একটি নিয়ম বা ফর্মূলা বলেছেন। তাহলো, যেসব মানত আল্লাহর আনুগত্যের উদ্দেশ্যে হবে কেবল সে সব মানত পূরণ করতে হবে। আল্লাহর নাফরমানীমূলক কোন মানত কখনো পূরণ করা যাবে না। অনুরূপ কোন ব্যক্তি যে বস্তুর মালিক নয় সে বস্তু দিয়ে কোন মানত করা যায় না। অথবা মানুষের সাধ্যাতীত কোন কাজ দিয়েও মানত করা যায় না। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُّطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ فَلَا يَعْصِهِ

"কেউ যদি মানত করে, সে আল্লাহর আনুগত্য করবে তাহলে যেন সে তাঁর আনুগত্য করে। আর কেউ যদি মানত করে, সে আল্লাহর নাফরমানী করবে তাহলে যেন সে তা না করে।" (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, তাহাবী)।

সাবেত ইবনে দ্বাহ্‌হাক বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلَا فِيْمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ

"আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কোন বিষয়ে কিংবা যে বস্তু ব্যক্তির মালিকানাধীন নয় এমন বস্তুর ক্ষেত্রে মানত পূরণ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। (আবু দাউদ)

মুসলিম এ একই বিষয় সম্বলিত হাদীস হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া আবু দাউদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসের (রা) বর্ণিত হাদীসটি এর চেয়েও ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ হাদীসে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এভাবে ঃ

لَا نَذْرَ وَلَا يَمِيْنَ فِيْ مَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ، وَلَا فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلَا فِيْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ -

"মানুষের আয়ত্বাধীন বা নাগালের মধ্যে নয় এমন কোন কাজে কোন মানত বা শপথ অচল। অনুরূপ আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কিংবা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার মত কোন কাজেও মানত বা শপথ কার্যকর হবে না।"

চার ঃ যে কাজে মূলত কোন নেকী নেই এবং ব্যক্তি অযথা কোন অর্থহীন কাজ কিংবা অসহনীয় কঠোর পরিশ্রম অথবা আত্মপীড়নকে নেক কাজ মনে করে তা নিজের জন্য আবশ্যিক করে নিয়েছে তার এরূপ মানত পূরণ না করা উচিত। এ ব্যাপারে নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ অত্যন্ত স্পষ্ট। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ একবার নবী (সা) খুতবা পেশ করার সময় দেখলেন, এক ব্যক্তি রোদে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকটি কে এবং কেনই বা সে রোদে দাঁড়িয়ে আছে? তাঁকে বলা হলো, লোকটির নাম আবু ইসরাঈল। সে মানত করেছে যে, সে দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না, ছায়া গ্রহণ করবে না, কারো সাথে কথা বলবে না এবং রোযা রাখবে। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

مُرُوْهُ فَلْيُكَلِّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ

"তাকে বলো, সে কথা বলুক, ছায়াতে আশ্রয় গ্রহণ করুক এবং বসুক। তবে রোযা যেন পালন করে।" (বুখারী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মুয়াত্তা)

হযরত উকবা ইবনে আমের জুহানী বলেন আমার বোন খালি পায়ে হেঁটে হজ্জ করার মানত করলো। সে আরো মানত করলো যে, হজ্জের এ সফরে সে মাথায়ও কাপড় দেবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাকে বলো, সে যেন বাহনে সওয়ার হয়ে হজ্জে যায় এবং মাথায় কাপড় দেয়। (আবু দাউদ ও মুসলিম এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন তবে তাতে কিছু শাব্দিক তারতম্য আছে) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) উকবা ইবনে আমেরের বোনের এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন তার ভাষা হলো,

اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنْ نَذْرِهَا مُرُهَا فَلْتَرْكَبْ

"তার এ মানতের প্রয়োজন আল্লাহর নেই। তাকে বলো, সে যেন বাহনে সওয়ার হয়ে হজ্জ করতে যায়।" (আবু দাউদ)

আরো একটি হাদীস বর্ণনা প্রসংগে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ এক ব্যক্তি বললো, আমার বোন পায়ে হেঁটে হজ্জ করার মানত করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْنَعُ بِشِقَاءِ اُخْتِكَ شَيْئًا فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً

"তোমার বোনের কঠোর পরিশ্রমে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। তার উচিত সওয়ারীর পিঠে উঠে হজ্জ করা।" (আবু দাউদ)

হযরত আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সম্ভবত হজ্জের সফরে) দেখলেন এক বয়োবৃদ্ধ দুর্বল ব্যক্তিকে তার দুই পুত্র ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? বলা হলো, সে পায়ে হেঁটে হজ্জ করার মানত করেছে। একথা শুনে তিনি বললেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنْ تَعْذِيْبِ هٰذَا نَفْسَهُ ، وَاَمَرَهُ اَنْ يَّرْكَبَ

"এ ব্যক্তি নিজে নিজেকে কষ্ট দেবে, তাতে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। এরপর তিনি তাকে বাহনে সওয়ার হতে নির্দেশ দিলেন। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা থেকেও এ একই বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে)

পাঁচ ঃ কোন মানত পূরণ করা যদি কার্যত অসম্ভব হয় তাহলে তা অন্য কোন ভাবে পূরণ করা যেতে পারে। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল, আমি এ মর্মে মানত করেছিলাম যে, আল্লাহ যদি আপনার হাতে মক্কা বিজয় দান করেন তাহলে আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে দুই রাকআত নামায পড়বো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এখানেই পড়ে নাও। সে আবার জিজ্ঞেস করলো। তিনিও পুনরায় একই জবাব দিলেন। সে আবার জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ شَأْنُكَ إِذًا তাহলে এখন তোমার মর্জি। অন্য একটি হাদীসে আছে। নবী (সা) বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ ، لَوْ صَلَّيْتَ هٰهُنَا لَاَجْزَاَ عَنْكَ صَلٰوةً فِيْ بَيْتِ الْمَقْدَسِ -

"সে মহান সত্তার শপথ, যিনি মুহাম্মাদকে ন্যায় ও সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন; তুমি যদি এখানে নামায পড়ে নাও, তাহলে তা বায়তুল মাকদাসে নামায পড়ার বিকল্প হিসেবে যথেষ্ট হবে।" (আবু দাউদ)

ছয় ঃ কেউ যদি তার সমস্ত অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য মানত করে তাহলে সে ক্ষেত্রে ফিকাহবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম মালেক (র) বলেন ঃ এ ক্ষেত্রে তাকে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ দিয়ে দিতে হবে। মালেকীদের মধ্য থেকে 'সাহনূনের' বক্তব্য তাকে এতটা সম্পদ দিয়ে দিতে হবে যতটা দিলে সে কষ্টের মধ্যে পড়বে না। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ এটা যদি তার 'নযরে তাবারুর' (নেকীর উদ্দেশ্যে মানত) হয় তাহলে সমস্ত সম্পদ দিয়ে দিতে হবে। আর যদি 'নযরে লাজাজ' (মূর্খতা ও হঠকারিতামূলক মানত) হয় তাহলে সে উক্ত মানত পূরণ করতে পারে কিংবা 'কসম' বা শপথের 'কাফ্‌ফারা'ও দিতে পারে। এ ব্যাপারে তার স্বাধীনতা রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা বলেন ঃ তাকে যেসব অর্থ-সম্পদের যাকাত দিতে হয় সেসব সম্পদ আল্লাহর পথে দিয়ে দেয়া কর্তব্য। কিন্তু যেসব সম্পদের যাকাত দিতে হয় না, যেমন, বসত বাড়ী এবং অনুরূপ অন্যান্য সম্পদ তার ওপর এ মানত প্রযোজ্য হবে না। হানাফীদের মধ্যে ইমাম যুফারের (র) বক্তব্য হলো, নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য দুই মাসের প্রয়োজনীয় খরচ রেখে অবশিষ্ট সমস্ত সম্পদ সাদকা করে দিতে হবে। (উমদাতুল কারী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ কৃত মুয়াত্তার শরাহ) এ বিষয়টি সম্পর্কে হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে তাহলো, হযরত কা'ব ইবনে মালেক বলেন, তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার কারণে যে তিরস্কার ও অসন্তোষের শিকার আমি হয়েছিলাম তা মাফ হয়ে গেলে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে আরয করলাম যে, আমার তাওবার মধ্যে এ বিষয়টিও অন্তরভুক্ত ছিল যে, আমি আমার সমস্ত সম্পদের মালিকানা স্বত্ব ত্যাগ করে তা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের পথে দান করে দেব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ না, এরূপ করো না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক সম্পদ? তিনি বললেন ঃ না, তাও না। আমি আবার বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেনঃ হাঁ। (আবু দাউদ) অন্য একটি হাদীসে আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ

তুমি তোমার কিছু সম্পদ যদি নিজের জন্য রেখে দাও তাহলে তা তোমার জন্য সর্বোত্তম হবে। (বুখারী) ইমাম যুহরী বলেন ঃ আমি জানতে পেরেছি যে, হযরত আবু লুবাবা (রা) (তাবুক যুদ্ধের ব্যাপারে তিনিও তিরস্কার ও অসন্তোষের শিকার হয়েছিলেন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ আমি আমার সমস্ত সম্পদের মালিকানা ত্যাগ করে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পথে সাদকা হিসেবে দিয়ে দিতে চাই। জবাবে নবী (সা) বললেন ঃ সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে দেয়াই তোমার জন্য যথেষ্ট। (মুয়াত্তা)

সাত ঃ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কেউ যদি কোন নেক মানত করে তাহলে ইসলাম গ্রহণের পরে কি তা পূরণ করতে হবে? এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফতোয়া হলো, তা পূরণ করতে হবে। বুখারী, আবু দাউদ ও তাহাবীতে হযরত 'উমর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি জাহেলী যুগে মানত করেছিলেন যে, মসজিদে হারামে এক রাত (কারো কারো বর্ণনায় একদিন) ই'তিকাফ করবেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ اوف بنذرك 'নিজের মানত পূরণ করো।' কোন কোন ফিকাহবিদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ নির্দেশের অর্থ করেছেন যে, এরূপ করা ওয়াজিব। আবার কেউ কেউ অর্থ করেছেন যে, এরূপ করা মুস্তাহাব।

আট ঃ মৃত ব্যক্তির কোন মানত থাকলে তা পূরণ করা কি ওয়ারিশদের জন্য ওয়াজিব? এ প্রশ্নে ফিকাহবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম আহামদ, ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইয়া, আবু সাওর এবং জাহেরিয়াদের মতে মৃতের দায়িত্বে যদি রোযা বা নামাযের মানত থেকে থাকে তাহলে ওয়ারিশদের জন্য তা পূরণ করা ওয়াজিব। হানাফীদের মতে মৃত ব্যক্তি যদি শারীরিক ইবাদাতের (নামায বা রোযা) মানত করে থাকে তাহলে তা পূরণ করা ওয়ারিশদের জন্য ওয়াজিব নয়। আর যদি আর্থিক ইবাদাতের মানত করে থাকে এবং মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর আগে তার ওয়ারিশদের তা পূরণ করার অছিয়ত না করে থাকে তাহলে সে মানতও পূরণ করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু সে যদি অছিয়ত করে যায়, তাহলে তা পূরণ করা ওয়াজিব। তবে তার পরিত্যক্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদ দিয়ে নয়। এর সাথে মালেকী মাযহাবের মতামতের অনেকটা মিল আছে। শাফেয়ী মাযহাবের মতে, মানত যদি আর্থিক ইবাদাতের না হয়ে অন্য কিছুর হয় কিংবা আর্থিক ইবাদাতেরই হয় আর মৃত ব্যক্তি যদি কোন সম্পদ রেখে না গিয়ে থাকে, তাহলে তার ওয়ারিশদের জন্য আর্থিক ইবাদাতের মানত পূরণ করা ওয়াজিব নয়। তবে মৃত ব্যক্তি যদি সম্পদ রেখে গিয়ে থাকে তাহলে সে অছিয়ত করে থাকুক বা না থাকুক এ ক্ষেত্রে তার ওয়ারিশদের জন্য আর্থিক ইবাদাতের মানত পূরণ করা ওয়াজিব। (শরহে মুসলিম লিন নববী, বাযলুল মাজহুদ-শরহে আবী দাউদ) এ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস কর্তৃক এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একটি ফতোয়া জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন ঃ আমার মা ইন্তিকাল করেছেন। তিনি একটি মানত করেছিলেন। কিন্তু তা পূরণ করতে পারেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি তার সে মানত পূরণ করে দাও। (আবু দাউদ, মুসলিম) ইবনে আব্বাস অন্য একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, এক মহিলা সমুদ্র যাত্রা করার সময় মানত করলো, আমি যদি সহী সালামতে জীবিত

ঘরে ফিরে আসতে পারি তাহলে একমাস রোযা রাখবো। ফিরে আসার পরেই সে মারা গেল। তার বোন ও মেয়ে রসূলুল্লাহর (সা) কাছে এসে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন ঃ তার পক্ষ থেকে তুমি রোযা রাখো। (আবু দাউদ) আবু দাউদ বুরাইদা থেকে অনুরূপ আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ধরনের মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে সে একই জবাব দিলেন যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে নির্দেশ রয়েছে তা ওয়াজিব অর্থে না মুস্তাহাব অর্থে তা যেহেতু পরিষ্কার নয় এবং হযরত সা'দ ইবনে উবাদার মায়ের মানত আর্থিক ইবাদাতের মানত ছিল না শারীরিক ইবাদাতের মানত ছিল তাও স্পষ্ট নয় তাই এ মাসয়ালার ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

নয় ঃ ভ্রান্ত ও নাজায়েজ প্রকৃতির মানত সম্পর্কে একথা পরিষ্কার যে, তা পূরণ করা ঠিক নয়। তবে এ ধরনের মানতের ক্ষেত্রে কাফ্‌ফারা দিতে হবে কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। এ বিষয়ে হাদীসসমূহের বর্ণনাই যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন তাই ফিকাহবিদগণও ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। এক শ্রেণীর বর্ণনায় আছে যে, এ অবস্থায় নবী (সা) কাফ্‌ফারা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ لَا نَذْرَ فِى مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ "গোনাহের কাজে কোন মানত করা যায় না। এ ধরনের মানতের কাফফারা হলো শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারার মত।" (আবু দাউদ) 'উকবা ইবনে আমের জুহানীর বোনের ব্যাপারে (ওপরে ৪নং এ যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, "সে যেন তার মানত ভঙ্গ করে এবং তিন দিন রোযা রাখে।" (মুসলিম, আবু দাউদ) আরেকজন মহিলা যে পায়ে হেঁটে হজ্জ করার মানত করেছিল তার ব্যাপারে নবী (সা) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, "সে যেন বাহনে সওয়ার হয়ে হজ্জে যায় এবং শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারা আদায় করে।" (আবু দাউদ) ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِىْ مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيْقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا اَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ -

"কেউ যদি মানত করে এবং কি মানত করলো তা নির্দিষ্ট না করে তাকে শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিতে হবে। কেউ যদি কোন গোনাহর কাজের মানত করে, তবে তাকে শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিতে হবে। কেউ যদি এমন বিষয়ের মানত করে যা পূরণ করার সাধ্য তার নেই তাকে শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিতে হবে। আর কেউ যদি এমন জিনিসের মানত করে যা পূরণ করার সামর্থ তার আছে, তাহলে তাকে সে মানত পূরণ করতে হবে।" (আবু দাউদ)

অন্য দিকে আছে সেসব হাদীস যা থেকে জানা যায় যে, এসব অবস্থায় কাফ্‌ফারা দিতে হবে না। ওপরে ৪নং এ যে ব্যক্তির উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে রোদে দাঁড়িয়ে থাকার

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ
لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا
عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿١٠﴾

আর আল্লাহর মহব্বতে[১১] মিসকীন, ইয়াতীম এবং বন্দীকে[১২] খাবার দান করে[১৩] এবং (তাদেরকে বলে) আমরা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই তোমাদের খেতে দিচ্ছি। আমরা তোমাদের কাছে এর কোন প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা[১৪] পেতে চাই না। আমরা তো আমাদের রবের পক্ষ থেকে সেদিনের আযাবের ভয়ে ভীত, যা হবে কঠিন বিপদ ভরা অতিশয় দীর্ঘ দিন।

এবং কারো সাথে কথা না বলার মানত করেছিল তার কাহিনী উল্লেখ করার পর ইমাম মালেক (র) তাঁর গ্রন্থ মুয়াত্তায় লিখেছেন যে, নবী (সা) তাকে মানত ভঙ্গ করার নির্দেশদানের সাথে সাথে কাফ্‌ফারা আদায় করার নির্দেশও দিয়েছিলেন বলে কোন সূত্র থেকেই আমি জানতে পারিনি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَاَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ
الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ فَاِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا -

"কেউ কোন বিষয়ে মানত করার পর যদি দেখে যে, অন্য একটি জিনিস তার চেয়ে উত্তম তাহলে সে যেন তা পরিত্যাগ করে এবং যেটি উত্তম সেটি গ্রহণ করে। আর ঐটি ছেড়ে দেয়াই হবে তার কাফ্‌ফারা।" (আবু দাউদ)

বায়হাকীর মতে এ হাদীসটি এবং হযরত আবু হুরাইরার রেওয়ায়াতের 'যে কাজটি উত্তম সেটি করবে আর এরূপ করাই এর কাফ্‌ফারা' এ অংশটুকু প্রমাণিত নয়। এসব হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম নববী (র) শরহে মুসলিমে লিখছেন; "ইমাম মালেক (র) শাফেয়ী (র), আবু হানীফা (র), দাউদ যাহেরী এবং সংখ্যাগুরু আলেমদের মতে গোনাহর কাজের মানত বাতিল এবং তা পূরণ না করলে কাফ্‌ফারা দিতে হবে না। কিন্তু ইমাম আহমাদের (র) মতে কাফ্‌ফারা দিতে হবে।"

১১. মূল শব্দ হলো على حبه । অধিকাংশ মুফাস্‌সির حُبِّه এর ه শব্দটিকে (طعام) খাদ্যের সর্বনাম হিসেবে নির্ধারিত করেছেন। তাঁরা এর অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, খাদ্য অত্যন্ত প্রিয় ও আকর্ষণীয় হওয়া সত্ত্বেও এবং নিজেরাই খাদ্যের মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও নেক্‌কার লোকেরা তা অন্যদেরকে খাওয়ান। ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ হলো على حب الاطعام অর্থাৎ গরীব ও দুস্থদের খাওয়ানোর আকাংখা ও উৎসাহের

فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ﴿١١﴾ وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا
جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ﴿١٢﴾ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا
زَمْهَرِيْرًا ﴿١٣﴾ وَّدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ﴿١٤﴾ وَيُطَافُ
عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا ﴿١٥﴾ قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ
قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ﴿١٦﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ﴿١٧﴾

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সেদিনের অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে সজীবতা ও আনন্দ দান করবেন।[১৫] আর তাদের সবরের বিনিময়ে[১৬] তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান করবেন। তারা সেখানে উঁচু আসনের ওপরে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে রোদের উত্তাপ কিংবা শীতের তীব্রতা তাদের কষ্ট দেবে না। জান্নাতের বৃক্ষরাজির ছায়া তাদের ওপর ঝুঁকে পড়ে ছায়া দিতে থাকবে। আর তার ফলরাজি সবসময় তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে (তারা যেভাবে ইচ্ছা চয়ন করতে পারবে)। তাদের সামনে রৌপ্য পাত্র[১৭] ও স্বচ্ছ কাঁচের পাত্রসমূহ পরিবেশিত হতে থাকবে। কাঁচ পাত্রও হবে রৌপ্য জাতীয় ধাতুর[১৮] যা (জান্নাতের ব্যবস্থাপকরা) যথাযথ পরিমাণে পূর্ণ করে রাখবে।[১৯] সেখানে তাদের এমন সূরা পাত্র পান করানো হবে যাতে শুকনো আদার সংমিশ্রণ থাকবে।

কারণে তারা এ কাজ করে থাকে। হযরত ফুদাইল ইবনে আয়াদ্ব ও আবু সুলায়মান আদ–দারানী বলেন, তারা আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে এরূপ করে। আমাদের মতে পরবর্তী আয়াতাংশ انما نطعمكم لوجه الله (আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যেই তোমাদের খাওয়াচ্ছি) এ অর্থকেই সমর্থন করে।

১২. প্রাচীনকালে রীতি ছিল বন্দীদের হাতকড়া ও বেড়ী পরিয়ে প্রতিদিন বাইরে বের করে আনা হতো। তারপর তারা রাস্তায় রাস্তায় ও মহল্লায় মহল্লায় ভিক্ষা করে ক্ষুধা নিবারণ করতো। পরবর্তীকালে ইসলামী সরকার এ কুপ্রথাকে উচ্ছেদ করে। (কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা ১৫০, মুদ্রণ ১৩৮২ হিঃ) এ আয়াতে বন্দী বলতে কাফের হোক বা মুসলমান, যুদ্ধবন্দী হোক বা অপরাধের কারণে বন্দী হোক সব রকম বন্দীকে বুঝানো হয়েছে। বন্দী অবস্থায় তাদেরকে খাদ্য দেয়া হোক বা ভিক্ষা করানো হোক, সর্বাবস্থায় একজন অসহায় মানুষকে—যে তার খাবার সংগ্রহের জন্য নিজে কোন চেষ্টা করতে পারে না—খাবার দেয়া অতি বড় নেকী ও সওয়াবের কাজ।

১৩. কোন গরীবকে খেতে দেয়া যদিও বড় নেকীর কাজ, কিন্তু কোন অভাবী মানুষের অন্যান্য অভাব পূরণ করাও একজন ক্ষুধার্ত মানুষকে খেতে দেয়ার মতই নেক কাজ। যেমন কেউ কাপড়ের মুখাপেক্ষী, কেউ অসুস্থ তাই চিকিৎসার মুখাপেক্ষী অথবা কেউ ঋণগ্রস্ত, পাওনাদার তাকে অস্থির ও অতিষ্ঠ করে তুলছে। এসব লোককে সাহায্য করা খাবার খাওয়ানোর চেয়ে কম নেকীর কাজ নয়। তাই এ আয়াতটিতে নেকীর একটি বিশেষ অবস্থা ও ক্ষেত্রকে তার গুরুত্বের কারণে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে মাত্র। অন্যথায় এর মূল উদ্দেশ্য অভাবীদের সাহায্য করা।

১৪. গরীবদের খাবার দেয়ার সময় মুখে একথা বলতে হবে এমনটা জরুরী নয়। মনে মনেও একথা বলা যেতে পারে। আল্লাহর কাছে মুখে বলার যে মর্যাদা এভাবে বলারও সে একই মর্যাদা। তবে একথা মুখে বলার উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য যে, যাকে সাহায্য করা হবে তাকে যেন নিশ্চিত করা যায় যে, আমরা তার কাছে কোন প্রকার কৃতজ্ঞতা অথবা বিনিময় চাই না, যাতে সে চিন্তামুক্ত হয়ে খাবার গ্রহণ করতে পারে।

১৫. অর্থাৎ চেহারার সজীবতা ও মনের আনন্দ। অন্য কথায় কিয়ামতের দিনের সমস্ত কঠোরতা ও ভয়াবহতা শুধু কাফেরদের জন্যই নির্দিষ্ট হবে। নেক্‌কার লোকেরা সেদিন কিয়ামতের সব রকম দুঃখ–কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে এবং আনন্দিত ও উৎফুল্ল হবে। একথাটিই সূরা আম্বিয়াতে এভাবে বলা হয়েছে; "চরম হতবুদ্ধিকর সে অবস্থা তাদেরকে অস্থির ও বিহ্বল করবে না। ফেরেশতারা অগ্রসর হয়ে অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাদের গ্রহণ করবে এবং বলবে এটা তোমাদের সেদিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হতো।" (আয়াত, ১০৩) এ বিষয়টিই সূরা নাম্‌লে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এভাবে ঃ "যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে সে তার তুলনায় অধিক উত্তম প্রতিদান লাভ করবে। এসব লোক সেদিনের ভয়াবহতা থেকেও নিরাপদ থাকবে।" (আয়াত, ৮৯)

১৬. এখানে 'সবর' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বরং প্রকৃতপক্ষে সৎকর্মশীল ঈমানদারদের গোটা পার্থিব জীবনকেই 'সবর' বা ধৈর্যের জীবন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। জ্ঞান হওয়ার বা ঈমান আনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন ব্যক্তির নিজের অবৈধ আশা আকাংখাকে অবদমিত করা, আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমাসমূহ মেনে চলা, আল্লাহর নির্ধারিত ফরযসমূহ পালন করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের সময়, নিজের অর্থ–সম্পদ, নিজের শ্রম, নিজের শক্তি ও যোগ্যতা এমনকি প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রাণ পর্যন্ত কুরবানী করা, আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এরূপ সমস্ত লোভ–লালসা ও আকর্ষণকে পদাঘাত করা, সত্য ও সঠিক পথে চলতে যেসব বিপদ ও দুঃখ–কষ্ট আসে তা সহ্য করা, হারাম পন্থায় লাভ করা যায় এরূপ প্রতিটি স্বার্থ ও ভোগের উপকরণ পরিত্যাগ করা, ন্যায় ও সত্যপ্রীতির কারণে যে ক্ষতি, মর্মবেদনা ও দুঃখ–কষ্ট এসে ঘিরে ধরে তা বরদাশত করা—এসবই আল্লাহর এ ওয়াদার ওপর আস্থা রেখে করা যে, এ সদাচরণের সুফল এ পৃথিবীতে নয় বরং মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবনে পাওয়া যাবে। এটা এমন একটা কর্মপন্থা যা মু'মিনের গোটা জীবনকেই সবরের জীবনে রূপান্তরিত করে। এটা সার্বক্ষণিক সবর, স্থায়ী সবর, সর্বাত্মক সবর এবং জীবনব্যাপী সবর। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ৬০; আলে ইমরান, টীকা ১৩, ১০৭, ১৩১; আল আন'আম, টীকা ২৩; আল আনফাল, টীকা ৩৭, ৪৭; ইউনুস, টীকা ৯; হূদ,

عَيْنًا فِيهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۚ إِذَا
رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ﴿١٩﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا
كَبِيرًا ﴿٢٠﴾ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن
فِضَّةٍ ۚ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾ إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ
سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ﴿٢٢﴾

এটি জান্নাতের একটি ঝর্ণা যা সালসাবীল নামে অভিহিত।[২০] তাদের সেবার জন্য এমন সব কিশোর বালক সদা তৎপর থাকবে যারা চিরদিনই কিশোর থাকবে। তুমি তাদের দেখলে মনে করবে যেন ছড়ানো ছিটানো মুক্তা।[২১] তুমি সেখানে যে দিকেই তাকাবে সেদিকেই শুধু নিয়ামত আর ভোগের উপকরণের সমাহার দেখতে পাবে এবং বিশাল সাম্রাজ্যের সাজ-সরঞ্জাম তোমাদের দৃষ্টিগোচর হবে।[২২] তাদের পরিধানে থাকবে মিহি রেশমের সবুজ পোশাক এবং মখমল ও সোনালী কিংখাবের বস্ত্ররাজি।[২৩] আর তাদেরকে রৌপ্যের কঙ্কন পরানো হবে।[২৪] আর তাদের রব তাদেরকে অতি পবিত্র শরাব পান করাবেন।[২৫] এ হচ্ছে তোমাদের জন্য প্রতিদান। কারণ, তোমাদের কাজ কর্ম মূল্যবান প্রমাণিত হয়েছে।[২৬]

টীকা ১১; আর রা'দ, টীকা ৩৯; আন নাহ্‌ল, টীকা ৯৮; মারয়াম, টীকা ৪০; আল ফুরকান, টীকা ৯৪; আল কাসাস, টীকা ৭৫, ১০০; আল আনকাবূত, টীকা ৯৭; লোকমান, টীকা ২৯, ৫৬; আস সাজদা, টীকা ৩৭; আল আহযাব, টীকা ৫৮; আয্ যুমার, টীকা ৩২; হা-মীম আস সাজদা, টীকা ৩৮; আশ শুরা, টীকা ৫৩।)

১৭. সূরা যুখরুফের ৭১ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের সামনে সবসময় স্বর্ণপাত্রসমূহ পরিবেশিত হতে থাকবে। এ থেকে জানা গেল যে, সেখানে কোন সময় স্বর্ণপাত্র এবং কোন সময় রৌপ্য পাত্র ব্যবহার করা হবে।

১৮. অর্থাৎ তা হবে রৌপ্যের তৈরী কিন্তু কাঁচের মত স্বচ্ছ। এ ধরনের রৌপ্য এ পৃথিবীতে নেই। এটা জান্নাতের একটা বৈশিষ্ট যে, সেখানে কাঁচের মত স্বচ্ছ রৌপ্যপাত্র জান্নাতবাসীদের দস্তরখানে পরিবেশন করা হবে।

১৯. অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার চাহিদা অনুপাতে পানপাত্র ভরে ভরে দেয়া হবে। তা তাদের চাহিদার চেয়ে কমও হবে না আবার বেশীও হবে না। অন্য কথায়, জান্নাতের খাদেমরা এত সতর্ক এবং সুবিবেচক হবে যে, যাকে তারা পানপাত্র পরিবেশন করবে সে কি পরিমাণ শরাব পান করতে চায় সে সম্পর্কে তারা পুরোপুরি আন্দাজ করতে পারবে।

(জান্নাতের শরাবের বৈশিষ্ট সম্পর্কে জানতে হলে দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আস্ সাফফাত, ৪৫ থেকে ৪৭ আয়াত, টীকা ২৪ থেকে ২৭; সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত ১৫, টীকা ২২; আত্ তূর, আয়াত ২৩, টীকা ১৮; আল ওয়াকিয়া, আয়াত ১৯, টীকা ১০।)

২০. আরবরা শরাবের সাথে শুকনো আদা মেশানো পানির সংমিশ্রণ খুব পছন্দ করতো। তাই বলা হয়েছে, সেখানেও তাদের এমন শরাব পরিবেশন করা হবে যাতে শুকনো আদার সংমিশ্রণ থাকবে। কিন্তু তা এমন সংমিশ্রণ হবে না যে, তার মধ্যে শুকনো আদা মিশিয়ে তারপর পানি দেয়া হবে। বরং তা হবে একটা প্রাকৃতিক ঝর্ণাধারা যার মধ্যে আদার খোশবু থাকবে কিন্তু তিক্ততা থাকবে না। সে জন্য তার নাম হবে 'সালসাবীল'। 'সালবাসীল' অর্থ এমন পানি যা মিঠা, মৃদু ও সুস্বাদু হওয়ার কারণে সহজেই গলার নীচে নেমে যায়। অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে 'সালসাবীল' শব্দটি এখানে উক্ত ঝর্ণাধারার বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, বিশেষ্য হিসেবে নয়।

২১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আস সাফ্‌ফাত, টীকা ২৬; আত তূর, টীকা ১৯; আল ওয়াকিয়া, টীকা ৯।

২২. অর্থাৎ দুনিয়াতে কোন ব্যক্তি যত দরিদ্র ও নিসম্বলই হোক না কেন সে যখন তার নেক্ কাজের কারণে জান্নাতে যাবে তখন সেখানে এমন শানশওকত ও মর্যাদার সাথে থাকবে যেন সে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি।

২৩. এই একই বিষয় সূরা আল কাহ্‌ফের ৩১ আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّ اِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ –

"তারা (অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা) মিহি রেশম এবং মখমল ও কিংখাবের সবুজ পোশাক পরিধান করবে। সুউচ্চ আসনে হেলান দিয়ে বসবে।"

এ কারণে সেসব মুফাস্‌সিরদের মতামত সঠিক বলে মনে হয় না যারা বলেন, এর অর্থ এমন কাপড় যা তাদের আসন ও পালংকের ওপর ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে অথবা সেসব কিশোর বালকদের পোশাক–পরিচ্ছদ যারা তাদের সেবা ও খেদমতের জন্য সদা তৎপর থাকবে।

২৪. সূরা আল কাহফের ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে, يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ "তাদের সেখানে স্বর্ণের কংকন বা চুড়ি দ্বারা সজ্জিত ও শোভিত করা হবে।" এ একই বিষয় সূরা হজ্জের ২৩ আয়াত এবং সূরা ফাতেরের ৩৩ আয়াতেও বলা হয়েছে। এসব আয়াত একত্রে মিলিয়ে দেখলে তিনটি অবস্থা হওয়া সম্ভব বলে মনে হয়। এক, তারা ইচ্ছা করলে কোন সময় সোনার কংকন পরবে আবার ইচ্ছা করলে কোন সময় রূপার কংকন পরবে। তাদের ইচ্ছা অনুসারে দু'টি জিনিসই প্রস্তুত থাকবে। দুই, তারা সোনা ও রূপার কংকন এক সাথে পরবে। কারণ দু'টি একত্র করলে সৌন্দর্য অনেক বৃদ্ধি পায়। তিন, যার ইচ্ছা সোনার কংকন পরিধান করবে এবং যার ইচ্ছা রূপার কংকন ব্যবহার করবে। এখানে প্রশ্ন হলো, অলংকার পরিধান করে মেয়েরা, কিন্তু পুরুষদের অলংকার পরানোর অর্থ ও তাৎপর্য কি হতে পারে? এর জবাব হলো, প্রাচীনকালে রাজা–বাদশাহ এবং নেতা

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ
مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ
فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ
وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾ نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا
بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ
رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿٣٠﴾ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾

২ রুকূ'

হে নবী, আমিই তোমার ওপরে এ কুরআন অল্প অল্প করে নাযিল করেছি।[২৭] তাই তুমি ধৈর্যের সাথে তোমার রবের হুকুম পালন করতে থাকো[২৮] এবং এদের মধ্যকার কোন দুষ্কর্মশীল এবং সত্য অমান্যকারীর কথা শুনবে না।[২৯] সকাল সন্ধ্যায় তোমার রবের নাম স্মরণ করো। রাতের বেলায়ও তার সামনে সিজ্‌দায় অবনত হও। রাতের দীর্ঘ সময় তাঁর তাসবীহ অর্থাৎ পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকো।[৩০] এসব লোক তো দ্রুত লাভ করা যায় এমন জিনিসকে (দুনিয়াকে) ভালবাসে এবং ভবিষ্যতে যে কঠিন দিন আসছে তাকে উপেক্ষা করে চলছে।[৩১] আমিই এদের সৃষ্টি করেছি এবং এদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সন্ধিস্থল মজবুত করেছি। আর যখনই চাইবো তাদের আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে দেব।[৩২] এটি একটি উপদেশ বাণী। এখন কেউ চাইলে তার রবের দিকে যাওয়ার পথ অবলম্বন করতে পারে। তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না যদি আল্লাহ না চান।[৩৩] আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সুবিজ্ঞ। যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তাঁর রহমতের মধ্যে শামিল করেন। আর জালেমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি।[৩৪]

ও সমাজপতিদের রীতি ছিল তারা হাত, গলা ও মাথার মুকুটে নানা রকমের অলংকার ব্যবহার করতো। আমাদের এ যুগেও বৃটিশ ভারতের রাজা ও নবাবদের মধ্যে পর্যন্ত এ

রীতি প্রচলিত ছিল। সূরা যুখরুফে বলা হয়েছে, হযরত মূসা (আ) যখন সাদাসিধে পোশাকে শুধু একখানা লাঠি হাতে নিয়ে ফেরাউনের রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন যে, তিনি বিশ্ব-জাহানের রব আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রসূল তখন ফেরাউন তার সভাসদদের বললো ঃ সে এ অবস্থায় আমার সামনে এসেছে। দূত বটে।

فَلَوْلَآ اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ

"সে যদি যমীন ও আসমানের বাদশাহর পক্ষ থেকেই প্রেরিত হয়ে থাকতো তাহলে তার সোনার কংকন নাই কেন? কিংবা ফেরেশতাদের একটি বাহিনী অন্তত তার আরদালী হয়ে আসতো।" (আয যুখরুফ, ৫৩ আয়াত)

২৫. ইতিপূর্বে দু' প্রকার শরাবের কথা বলা হয়েছে। এর এক প্রকার শরাবের মধ্যে কর্পূরের সুগন্ধি যুক্ত ঝর্ণার পানির সংমিশ্রণ থাকবে। অন্য প্রকারের শরাবের মধ্যে 'যানজাবীল' ঝর্ণার পানির সংমিশ্রণ থাকবে। এ দু' প্রকার শরাবের কথা বলার পর এখানে আবার আর একটি শরাবের উল্লেখ করা এবং সাথে সাথে একথা বলা যে, তাদের রব তাদেরকে অত্যন্ত পবিত্র শরাব পান করাবেন এর অর্থ এই যে, এটা অন্য কোন প্রকার উৎকৃষ্টতর শরাব হবে যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে তাদের পান করানো হবে।

২৬. মূল বাক্য হলো, كَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا অর্থাৎ তোমাদের কাজ-কর্ম মূল্যবান প্রমাণিত হয়েছে। سعى অর্থ বান্দা সারা জীবন দুনিয়াতে যেসব কাজ-কর্ম আঞ্জাম দিয়েছে বা দেয় তা সবই। যেসব কাজে সে তার শ্রম দিয়েছে এবং যেসব লক্ষে সে চেষ্টা-সাধনা করেছে তার সমষ্টি হলো তার سعى আর তা মূল্যবান প্রমাণিত হওয়ার অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার কাছে তা মূল্যবান বলে স্বীকৃত হয়েছে। শোকরিয়া কথাটি যখন বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর জন্য হয় তখন অর্থ হয় তাঁর নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। আর যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য হয় তখন তার অর্থ হয় আল্লাহ তা'আলা তার কাজ-কর্মের মূল্য দিয়েছেন। এটি মনিব বা প্রভুর একটি বড় মেহেরবানী যে, বান্দা যখন তাঁর মর্জি অনুসারে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য আঞ্জাম দেয় মনিব তখন তার মূল্য দেন বা স্বীকৃতি দেন।

২৭. এখানে বাহ্যত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হলেও বক্তব্যের মূল লক্ষ কাফেররা। মক্কার কাফেররা বলতো, এ কুরআন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে চিন্তা-ভাবনা করে রচনা করছেন। অন্যথায়, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন ফরমান এলে তা একবারেই এসে যেতো। কুরআনে কোন কোন যায়গায় তাদের এ অভিযোগ উদ্ধৃত করে তার জবাব দেয়া হয়েছে। (উদাহরণস্বরূপ দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নাহল, টীকা ১০২, ১০৪, ১০৫, ১০৬; বনী ইসরাঈল, টীকা ১১৯।) এখানে তাদের অভিযোগ উদ্ধৃত না করেই আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করেছেন যে, কুরআনের নাযিলকারী আমি নিজেই। অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রচয়িতা নন। আমি নিজেই তা ক্রমান্বয়ে নাযিল করছি। অর্থাৎ আমার প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার দাবী হলো, আমার বাণীকে একই সাথে একটি গ্রন্থের আকারে নাযিল না করে অল্প অল্প করে নাযিল করা।

২৮. অর্থাৎ তোমার 'রব' তোমাকে যে বিরাট কাজ আঞ্জাম দেয়ার আদেশ দিয়েছেন তা আঞ্জাম দেয়ার পথে যে দুঃখ-যাতনা ও বিপদ-মুসিবত আসবে তার জন্য 'সবর' করো। যাই ঘটুক না কেন সাহস ও দৃঢ়তার সাথে তা বরদাশত করতে থাকো এবং এ দৃঢ়তা ও সাহসিকতায় যেন কোন বিচ্যুতি আসতে না পারে।

২৯. অর্থাৎ তাদের কারো চাপে পড়ে দীনে হকের প্রচার ও প্রসারের কাজ থেকে বিরত হয়ো না এবং কোন দুষ্কর্মশীলের কারণে দীনের নৈতিক শিক্ষায় কিংবা সত্য অস্বীকারকারীর কারণে দীনের আকীদা-বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করতেও প্রস্তুত হয়ো না। যা হারাম ও নাজায়েয তাকে খোলাখুলি হারাম ও নাজায়েয বলো, এর সমালোচনার ব্যাপারে কিছুটা নমনীয় হওয়ার জন্য কোন দুষ্কর্মশীল যতই চাপ দিক না কেন। যেসব আকীদা-বিশ্বাস বাতিল তাকে খোলাখুলি বাতিল বলে ঘোষণা করো। আর যা হক তাকে প্রকাশ্যে হক বলে ঘোষণা করো, এ ক্ষেত্রে কাফেররা তোমার মুখ বন্ধ করার জন্য কিংবা এ ব্যাপারে কিছুটা নমনীয়তা দেখানোর জন্য তোমার ওপর যত চাপই প্রয়োগ করুক না কেন।

৩০. কুরআনের প্রতিষ্ঠিত রীতি হলো যেখানেই কাফেরদের মোকাবিলায় ধৈর্য ও দৃঢ়তা দেখানোর উপদেশ দেয়া হয়েছে সেখানে এর পরপরই আল্লাহকে স্মরণ করার ও নামাযের হুকুম দেয়া হয়েছে। এ থেকে আপনা আপনি প্রকাশ পায় যে, সত্য দীনের পথে সত্যের দুশমনদের বাধার মোকাবিলা করার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তা এভাবেই অর্জিত হয়। সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করাও হতে পারে। তবে সময় নির্দিষ্ট করে যখন আল্লাহকে স্মরণ করার হুকুম দেয়া হয় তখন তার অর্থ হয় নামায। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম বলেছেন ঃ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً আরবী ভাষায় بكرة শব্দের অর্থ সকাল। আর اصيل শব্দটি সূর্য মাথার ওপর থেকে হেলে পড়ার সময় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় বুঝাতে ব্যবহার করা হয় যার মধ্যে যোহর এবং আসরের সময়ও শামিল। এরপরে বলেছেন ঃ وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ । রাত শুরু হয় সূর্যাস্তের পরে। তাই রাতের বেলা সিজ্‌দা করার নির্দেশের মধ্যে মাগরিব এবং 'ঈশার দু' ওয়াক্তের নামাযই অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। এর পরের কথাটি "রাতে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর তাসবীহ বা পবিত্রতা বর্ণনা কর" তাহাজ্জুদ নামাযের প্রতি স্পষ্টভাবে ইংগিত করে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, বনী ইসরাঈল, টীকা ৯২ থেকে ৯৭; আল মুয্‌যাম্মিল, টীকা ২।) এ থেকে একথাও জানা গেল যে, ইসলামে প্রথম থেকে এগুলোই ছিল নামাযের সময়। তবে সময় ও রাক'আত নির্দিষ্ট করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে মে'রাজের সময়।

৩১. অর্থাৎ কুরাইশ গোত্রের এসব কাফেররা যে কারণে আখলাক ও আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে গোমরাহীকে আঁকড়ে ধরে থাকতে আগ্রহী এবং তাদের কান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'দাওয়াতে হক' বা সত্যের আহবানের প্রতি অমনযোগী, প্রকৃতপক্ষে সে কারণ হলো, তাদের দুনিয়া পূজা, আখেরাত সম্পর্কে নিরুদ্বিগ্নতা, উদাসীনতা ও বেপরোয়া ভাব। তাই একজন সত্যিকার আল্লাহভীরু মানুষের পথ এবং এদের পথ এতটা ভিন্ন যে, এ দু'টি পথের মধ্যে সমঝোতার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

৩২. মূল বাক্য হলো, اِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا । এ আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হতে পারে, যখনই ইচ্ছা আমি তাদের ধ্বংস করে তাদের স্থলে অন্য মানুষদের নিয়ে আসতে পারি, যারা তাদের কাজ-কর্ম ও আচার -আচরণে এদের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির হবে। এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, যখনই ইচ্ছা আমি এদের আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে দিতে পারি। অর্থাৎ আমি যেমন কাউকে সুস্থ ও নিখুঁত অংগ-প্রত্যংগের অধিকারী করে সৃষ্টি করতে সক্ষম তেমনি কাউকে পুরোপরি পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দিতে এবং কাউকে আংশিক পক্ষাঘাতের দ্বারা মুখ বাঁকা করে দিতে আবার কাউকে কোন রোগ বা দুর্ঘটনার শিকার বানিয়ে পংগু করে দিতেও সক্ষম। তৃতীয় অর্থ হলো, যখনই ইচ্ছা মৃত্যুর পর আমি এদেরকে পুনরায় অন্য কোন আকার আকৃতিতে সৃষ্টি করতে পারি।

৩৩. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল মুদ্দাস্‌সির, টীকা ৪১ (তাছাড়াও দেখুন, সূরা আদ দাহরের ১ নং পরিশিষ্ট)।

৩৪. এ সূরার ভূমিকাতে আমরা এর ব্যাখ্যা করেছি। (তাছাড়াও সূরা আদ দাহরের ২ নং পরিশিষ্ট দেখুন।)

পরিশিষ্ট—১

৩৩নং টীকার সাথে সংশ্লিষ্ট

এ আয়াতগুলোতে তিনটি কথা বলা হয়েছে। এক, কেউ চাইলে তার রবের দিকে যাওয়ার পথ অবলম্বন করতে পারে। দুই, যদি আল্লাহ না চান তাহলে শুধু তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না। তিন, আল্লাহ অত্যন্ত কুশলী, সূক্ষ্মদর্শী ও মহাজ্ঞানী। এ তিনটি কথা সম্পর্কে যদি ভালভাবে চিন্তা করা যায় তাহলে মানুষের বাছাই বা পছন্দ করার স্বাধীনতা এবং আল্লাহর ইচ্ছার মধ্যকার সম্পর্ক খুব ভালভাবেই বুঝা যায় এবং তাকদীর সম্পর্কে মানুষের মনে যেসব জটিলতা দেখা যায় তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

প্রথম আয়াত থেকে জানা যায় যে, এ পৃথিবীতে মানুষকে যে ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে তা শুধু এতটুকু যে, এখানে জীবন যাপনের জন্য যেসব ভিন্ন ভিন্ন পথ তার সামনে আসে সে তার মধ্য থেকে কোন একটি পথ অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নেবে। গ্রহণ বা বাছাই করার এরূপ অনেক স্বাধীনতা (Freedom of Choice) আল্লাহ তা'আলা তাকে দিয়েছেন। যেমন, এক ব্যক্তির সামনে যখন তার জীবিকা উপার্জনের প্রশ্ন দেখা দেয় তখন তার সামনে অনেকগুলো পথ থাকে। এসব পথের মধ্যে কিছু সংখ্যক থাকে হালাল পথ। যেমন, সবরকম বৈধ শ্রমকর্ম, চাকুরি-বাকুরি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, অথবা শিল্প ও কারিগরী কিংবা কৃষি। আবার কিছু সংখ্যক থাকে হারাম পথ। যেমন, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, পকেট মারা, ব্যভিচার, সুদখোরী, জুয়া, ঘুষ এবং হারাম প্রকৃতির সবরকম চাকুরি-বাকুরি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি। এসব পথের মধ্য থেকে কোন্ পথটি সে বেছে নেবে এবং কিভাবে সে তার জীবিকা উপার্জন করতে চায় সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইখতিয়ার মানুষকেই দেয়া হয়েছে। অনুরূপ নৈতিক চরিত্রেরও বিভিন্ন ঢং বা প্রকৃতি

আছে। এক দিকে আছে দীনদারী, আমানতদারী, ভদ্রতা, শিষ্টাচার, ইনসাফ, দয়ামায়া, সমবেদনা এবং সতীত্ব ও পবিত্রতার মত উন্নত স্বভাব ও গুণাবলী। অন্যদিকে আছে বদমাইশী, নীচতা, জুলুম-অত্যাচার, বেঈমানী, বখাটেপনা, বেহুদাপনা ও অভদ্রতার মত হীন স্বভাবসমূহ। এর মধ্য থেকে যে ঢং ও প্রকৃতির নৈতিক চরিত্রের পথ বা দোষ-গুণ সে অবলম্বন করতে চায় তা করার পূর্ণ স্বাধীনতা তার আছে। আদর্শ ও ধর্মের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। এ ক্ষেত্রেও মানুষের সামনে বহু পথ খোলা আছে। নাস্তিকতা তথা আল্লাহকে অস্বীকার করা, শিরক ও মূর্তিপূজা, শিরক ও তাওহীদের বিভিন্ন সংমিশ্রণ এবং আল্লাহর আনুগত্যের একমাত্র নিখাদ ধর্ম কুরআন যার শিক্ষা দেয়। এর মধ্যেও মানুষ কোন্‌টিকে গ্রহণ করতে চায় সে সিদ্ধান্ত নেয়ার ইখতিয়ারও মানুষের হাতেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা জোর করে তার ওপরে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন না যে, সে নিজে হালাল রুজি খেতে চায় কিন্তু আল্লাহ তাকে হারামখোর হতে বাধ্য করছেন অথবা সে কুরআনের অনুসরণ করতে চায় কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে জোরপূর্বক নাস্তিক, মুশরিক অথবা কাফের বানিয়ে দিচ্ছেন। অথবা সে চায় সৎ মানুষ হতে কিন্তু আল্লাহ খামকা তাকে অসৎ বানিয়ে দিচ্ছেন।

কিন্তু পছন্দ ও নির্বাচনের এ স্বাধীনতার পরেও মানুষের যা ইচ্ছা তাই করতে পারা আল্লাহর ইচ্ছা, তার অনুমোদন ও তাওফীক দানের ওপর নির্ভর করে। মানুষ যে কাজ করার আকাংখা, ইচ্ছা বা সংকল্প করেছে তা মানুষকে করতে দেয়ার ইচ্ছা যদি আল্লাহর থাকে তবেই সে তা করতে পারে। অন্যথায় সে যত চেষ্টাই করুক না কেন আল্লাহর অনুমোদন ও তার ইচ্ছা ছাড়া সে কিছুই করতে সক্ষম নয়। দ্বিতীয় আয়াতে একথাটিই বলা হয়েছে। এ ব্যাপারটিকে এভাবে বুঝতে চেষ্টা করুন যে, দুনিয়ার সব মানুষকে যদি সব ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দিয়ে দেয়া হতো আর এ বিষয়টিও তার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়া হতো যে, সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে তাহলে সারা দুনিয়ার সব ব্যবস্থাপনা ও নিয়ম-শৃংখলা ধ্বংস এবং ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতো। যাকে ইচ্ছা হত্যা করার অবাধ স্বাধীনতা পেলে একজন হত্যাকারীই সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে হত্যা করার জন্য যথেষ্ট ছিল। একজন পকেটমারের যদি এ ক্ষমতা থাকতো যে, যার পকেট ইচ্ছা সে মারতে পারবে তাহলে পৃথিবীর কোন মানুষের পকেটই তার হাত থেকে রক্ষা পেতো না। কোন চোরের হাত থেকে কারো সম্পদ রক্ষা পেতো না, কোন ব্যভিচারীর হাত থেকে কোন নারীর সতীত্ব ও সম্ভ্রম রক্ষা পেতো না এবং কোন ডাকাতের হাত থেকে কারো বাড়ী-ঘর রক্ষা পেতো না, যদি এদের সবারই যথেচ্ছাচারের পূর্ণ ইখতিয়ার বা ক্ষমতা থাকতো। তাই মানুষ ন্যায় বা অন্যায় যে পথেই চলতে ইচ্ছা করুক না কেন সে পথে চলতে দেয়া না দেয়ার বিষয়টি আল্লাহ নিজের হাতেই রেখে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি গোমরাহীর পথ বর্জন করে সত্যের পথ অবলম্বন করতে চায় আল্লাহর ইচ্ছা এবং তাওফীক লাভ করেই কেবল সে সত্য পথে চলার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো, গোমরাহীকে বর্জন করে হিদায়াতকে বাছাই ও গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত খোদ মানুষকেই নিতে হবে। তা না হলে আল্লাহ তা'আলা জোরপূর্বক যেমন কাউকে চোর, খুনী, নাস্তিক বা মুশরিক বানান না তেমনি জোরপূর্বক তাকে ঈমানদারও বানান না।

অতপর তৃতীয় আয়াতে এ ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার এ ইচ্ছা আবার নিয়ম-বিধি মুক্ত স্বেচ্ছাচারমূলক (Arbitrary) ব্যাপার কিনা এ ভ্রান্ত ধারণা

দূর করার জন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা عليم এবং حكيم অর্থাৎ তিনি যেমন সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী, তেমনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী কুশলী ও প্রজ্ঞাময়। তিনি যা কিছু করেন জ্ঞান ও বিজ্ঞতার সাথেই করেন। তাই তাঁর সিদ্ধান্তে ভুল-ত্রুটি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কাকে কি 'তাওফীক' দিতে হবে এবং কি দিতে হবে না, কাকে কি কাজ করতে দেয়া উচিত আর কাকে দেয়া উচিত নয় সে সিদ্ধান্ত তিনি পূর্ণ জ্ঞান এবং যুক্তি ও কৌশলের ভিত্তিতে গ্রহণ করেন। মানুষকে তিনি যতটা অবকাশ দেন এবং উপায়-উপকরণকেও যতটা তার অনুকূল করে দেন ভাল হোক বা মন্দ হোক মানুষ নিজের ইচ্ছানুসারে ঠিক ততটা কাজই করতে পারে। হিদায়াতলাভের ব্যাপারটাও এ নিয়মের বাইরে নয়। কে হিদায়াতের উপযুক্ত আর কে নয় নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলাই তা জানেন এবং নিজের যুক্তি ও কৌশলের ভিত্তিতে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণও তিনিই করে থাকেন।

পরিশিষ্ট—২

৩৪নং টীকার সাথে সম্পর্কিত

এ আয়াতে জালেম বলে সেসব লোককে বুঝানো হয়েছে যাদের কাছে আল্লাহর বাণী এবং তাঁর নবীর শিক্ষা আসার পর তারা অনেক চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, তার আনুগত্য তারা করবে না। এর মধ্যে সেসব জালেমও আছে যারা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে আমরা এ বাণীকে আল্লাহর বাণী এবং এ নবীকে আল্লাহর নবী বলে মানি না। অথবা আল্লাহকেই আদৌ মানি না। আবার সেসব জালেমও আছে যারা আল্লাহ, নবী ও কুরআনকে মানতে অস্বীকার করে না বটে কিন্তু সিদ্ধান্ত তাদের এটাই থাকে যে, তাঁরা তার আনুগত্য করবে না। প্রকৃতপক্ষে এ দু'টি গোষ্ঠীই জালেম। প্রথম গোষ্ঠীর ব্যাপারটা তো স্পষ্ট। কিন্তু দ্বিতীয় গোষ্ঠীও তাদের চেয়ে কোন অংশে কম জালেম নয়। বরং জালেম হওয়ার সাথে সাথে তারা মুনাফিক এবং প্রতারকও। তারা মুখে বলে, আমরা আল্লাহকে মানি, কুরআনকে মানি। কিন্তু তাদের মন ও মগজের ফায়সালা হলো, তার অনুসরণ তারা করবে না। আর তারা কাজও করে এর পরিপন্থী। এ দু' শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা হলো, আমি তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। দুনিয়াতে তারা যতই নির্ভীক ও বেপরোয়া চলুক, আরামআয়েশে বিভোর থাকুক এবং নিজের বাহাদুরীর ডংকা বাজাক না কেন অবশেষে তাদের পরিণাম কঠোর শাস্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহর রহমতের মধ্যে প্রবেশ করা তাদের ভাগ্যলিপিতেই নেই।

আল মুরসালাত

৭৭

নামকরণ

প্রথম আয়াতের والمرسلت শব্দটিকেই এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার পুরো বিষয়বস্তু থেকে প্রকাশ পায় যে, এটি মক্কী যুগের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছিল। এর আগের দু'টি সূরা অর্থাৎ সূরা কিয়ামাহ ও সূরা দাহ্‌র এবং পরের দু'টি সূরা অর্থাৎ সূরা আন্‌নাবা ও নাযি'আত যদি এর সাথে মিলিয়ে পড়া যায় তাহলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এ সূরাগুলো সব একই যুগে অবতীর্ণ। আর এর বিষয়বস্তুও একই যা বিভিন্ন ভংগিতে উপস্থাপন করে মক্কাবাসীদের মন-মগজে বদ্ধমূল করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য

এর বিষয়বস্তু কিয়ামত ও আখেরাতকে প্রমাণ করা এবং এ সত্যকে অস্বীকার করলে কিংবা মেনে নিলে পরিণামে যেসব ফলাফল প্রকাশ পাবে সে বিষয়ে মক্কাবাসীদের সচেতন করে দেয়া।

কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার যে খবর দিচ্ছেন তা যে অবশ্যই হবে প্রথম সাতটি আয়াতে বাতাসের ব্যবস্থাপনাকে তার সত্যতা ও বাস্তবতার সপক্ষে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে। এতে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যে, যে অসীম ক্ষমতাশালী সত্তা পৃথিবীতে এ বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা কায়েম করেছেন তাঁর শক্তি কিয়ামত সংঘটিত করতে অক্ষম হতে পারে না। আর যে স্পষ্ট যুক্তি ও কৌশল এ ব্যবস্থাপনার পেছনে কাজ করছে তাও প্রমাণ করে যে, আখেরাত অবশ্যই সংঘটিত হওয়া উচিত। কারণ পরম কুশলী স্রষ্টার কোন কাজই নিরর্থক ও উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না। আখেরাত যদি না থাকে তাহলে এর অর্থ হলো, এ গোটা বিশ্ব-জাহান একেবারেই উদ্দেশ্যহীন।

মক্কাবাসীরা বারবার বলতো যে, তুমি আমাদের যে কিয়ামতের ভয় দেখাচ্ছো তা এনে দেখাও। তাহলে আমরা তা মেনে নেব। ৮ থেকে ১৫ আয়াতে তাদের এ দাবীর উল্লেখ না করে এ বলে তার জবাব দেয়া হয়েছে যে, তা কোন খেলা বা তামাশার বস্তু নয় যে, যখনই কোন ঠাট্টাবাজ বা ভাঁড় তা দেখানোর দাবী করবে তখনই তা দেখিয়ে দেয়া হবে। সেটা তো মানব জাতি ও তার প্রতিটি সদস্যের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালার দিন। সে জন্য

আল্লাহ তা'আলা একটা বিশেষ সময় ঠিক করে রেখেছেন। ঠিক সে সময়ই তা সংঘটিত হবে। আর যখন তা আসবে তখন এমন ভয়ানক রূপ নিয়ে আসবে যে, আজ যারা ঠাট্টা–বিদ্রূপের ভংগিতে তার দাবী করছে সে সময় তারা দিশেহারা ও অস্থির হয়ে পড়বে। তখন ঐসব রসূলগণের সাক্ষ অনুসারেই এদের মোকদ্দমার ফায়সালা হবে, যাদের দেয়া খবরকে এসব আল্লাহদ্রোহী আজ অত্যন্ত নিঃশঙ্কচিত্তে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিচ্ছে। অতপর তারা নিজেরাই জানতে পারবে যে, কিভাবে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের আয়োজন করেছে।

১৬ থেকে ১৮ আয়াত পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে কিয়ামত ও আখেরাত সংঘটিত হওয়া এবং তার অনিবার্যতার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এসব আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের নিজের ইতিহাস, তার জন্ম এবং যে পৃথিবীতে সে জীবন যাপন করছে তার গঠন, আকৃতি ও বিন্যাস সাক্ষ পেশ করছে যে, কিয়ামতের আসা এবং আখেরাত অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব এবং আল্লাহ তা'আলার প্রাজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার দাবীও বটে। মানুষের ইতিহাস বলছে, যেসব জাতিই আখেরাত অস্বীকার করেছে পরিণামে তারা বিপথগামী হয়েছে এবং ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এর অর্থ হলো, আখেরাত এমন একটি সত্য যে, যে জাতিরই আচার–আচরণ ও রীতি–নীতি এর বিপরীত হবে তার পরিণাম হবে সেই অন্ধের মত যে সামনের দিক থেকে দ্রুত এগিয়ে আসা গাড়ীর দিকে বল্গাহারার মত এগিয়ে যাচ্ছে। এর আরো একটি অর্থ হলো, বিশ্ব–সাম্রাজ্যের মধ্যে শুধু প্রাকৃতিক আইন (Physical Law) কার্যকর নয়, বরং একটি নৈতিক আইনও (Moral Law) এখানে কার্যকর রয়েছে। আর এ বিধান অনুসারে এ পৃথিবীতেও কাজের প্রতিদান দেয়ার সিলসিলা বা ধারা চালু আছে। কিন্তু দুনিয়ার এ জীবনে প্রতিদানের এ বিধান যেহেতু পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হতে পারছে না, তাই বিশ্ব–জাহানের নৈতিক বিধান অনিবার্যভাবেই দাবী করে যে, এমন একটি সময় আসা উচিত যখন তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে এবং সেসব ভাল ও মন্দের যথোপযুক্ত প্রতিদান বা শাস্তি দেয়া হবে যা এখানে উপযুক্ত প্রতিদান বা পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল বা শাস্তি থেকে বেঁচে গিয়েছিল। এর জন্য মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবন হওয়া অপরিহার্য। মানুষ দুনিয়ায় যেভাবে জন্মলাভ করে সে বিষয়ে যদি সে চিন্তা–ভাবনা করে তাহলে তার বিবেক–বুদ্ধি— অবশ্য যদি সুস্থ বিবেক–বুদ্ধি থাকে—এ বিষয়টি অস্বীকার করতে পারে না যে, যে আল্লাহ নগণ্য বীর্য দ্বারা মানুষ সৃষ্টির সূচনা করে তাকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে রূপান্তরিত করেছেন সে আল্লাহর পক্ষে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা নিশ্চিতভাবেই সম্ভব। মানুষ সারা জীবন যে পৃথিবীতে বাস করে মৃত্যুর পর তার শরীরের বিভিন্ন অংশ সেখান থেকে উধাও হয়ে যায় না। বরং তার দেহের এক একটি অণু পরমাণু এ পৃথিবীতেই বিদ্যমান থাকে। পৃথিবীর এ মাটির ভাণ্ডার থেকেই সে সৃষ্টি হয়, বেড়ে ওঠে ও লালিত–পালিত হয় এবং পুনরায় সে পৃথিবীর মাটির ভাণ্ডারেই গচ্ছিত হয়। যে আল্লাহ মাটির এ ভাণ্ডার থেকে প্রথমবার তাকে বের করেছিলেন তাতে মিশে যাওয়ার পর তিনি তাকে পুনরায় বের করে আনতে সক্ষম। তাঁর যুক্তি ও কৌশল সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে তোমরা এ বিষয়টিও অস্বীকার করতে পারবে না যে, পৃথিবীতে যে ক্ষমতা ও ইখতিয়ার তিনি তোমাদের দিয়েছেন তার সঠিক ও ভুল প্রয়োগের হিসেব–নিকেশ নেয়াও নিশ্চিতভাবেই তাঁর বিচক্ষণতা ও বিজ্ঞতার দাবী এবং বিনা হিসেবে ছেড়ে দেয়াও তার যুক্তি ও কৌশলের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এরপর ২৮ থেকে ৪০ পর্যন্ত আয়াতে আখেরাত

অস্বীকারকারীদের পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে। ৪১ থেকে ৪৫ আয়াত পর্যন্ত সেসব লোকের পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে, যারা আখেরাতের ওপর ঈমান এনে দুনিয়ায় থেকেই নিজেদের পরিণাম গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছে। তারা আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান–ধারণা, নৈতিক চরিত্র ও কাজ-কর্ম এবং নিজের জীবন ও কর্মের সমস্ত মন্দ দিক থেকে দূরে অবস্থান করেছে যা মানুষের দুনিয়ার আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করলেও পরিণামকে ধ্বংস করে।

সবশেষে যারা আখেরাতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর বন্দেগী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে যত আমোদ–ফূর্তি করতে চাও, করে নাও। শেষ অবধি তোমাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত ধ্বংসকর। বক্তব্যের সমাপ্তি টানা হয়েছে এই বলে যে, এ কুরআনের মাধ্যমেও যে ব্যক্তি হিদায়াত লাভ করতে পারে না তাকে দুনিয়ার কোনো জিনিসই হিদায়াত দান করতে সক্ষম নয়।

আয়াত ৫০ **সূরা আল মুরসালাত–মক্কী** রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۝١ فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۝٢ وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۝٣
فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۝٤ فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۝٥ عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۝٦ اِنَّمَا
تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ۝٧

শপথ সে (বাতাসের) যা একের পর এক প্রেরিত হয়। তারপর ঝড়ের গতিতে প্রবাহিত হয় এবং (মেঘমালাকে) বহন করে নিয়ে ছড়িয়ে দেয়। তারপর তাকে ফেঁড়ে বিচ্ছিন্ন করে। অতপর (মনে আল্লাহর) স্মরণ জাগিয়ে দেয়, ওজর হিসেবে অথবা ভীতি হিসেবে।[১] যে জিনিসের প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে[২] তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।[৩]

১. অর্থাৎ কখনো বাতাস বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং দুর্ভিক্ষের আশংকা দেখা দেয়ায় মন নরম হয়ে যায় এবং মানুষ তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। কখনো রহমত স্বরূপ বৃষ্টি বয়ে আনার কারণে মানুষ আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে। আবার কখনো ঝড়–ঝঞ্ঝার প্রচণ্ডতা মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার করে এবং ধ্বংসের ভয়ে মানুষ আল্লাহর দিকে রুজু করে। (আরো দেখুন, পরিশিষ্ট–৩, ১৭৯ পৃষ্ঠায়)

২. এর আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, তোমাদেরকে যে জিনিসের ভয় দেখানো হচ্ছে। অর্থাৎ কিয়ামত এবং আখেরাত।

৩. কিয়ামত যে অবশ্যই সংঘটিত হবে তা বুঝানোর জন্য এখানে পাঁচটি জিনিসের শপথ করা হয়েছে। এক, اَلْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا "একের পর এক বা কল্যাণ হিসেবে প্রেরিতসমূহ। দুই, اَلْعٰصِفٰتِ عَصْفًا অত্যন্ত দ্রুত এবং প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিতসমূহ। তিন, اَلنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ভালভাবে বিক্ষিপ্তকারী বা ছড়িয়ে দেনেওয়ালাসমূহ। চার, اَلْفٰرِقٰتِ فَرْقًا 'বিচ্ছিন্নকারীসমূহ' পাঁচ, اَلْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا 'স্মরণকে জাগ্রতকারীসমূহ।' এ শব্দসমূহে শুধু গুণ বা বিশেষণ বর্ণনা করা হয়েছে, এগুলো কিসের বিশেষণ বা গুণ তা উল্লেখ করা হয়নি। তাই এগুলো একই বস্তুর বিশেষণ না ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর বিশেষণ এ বিষয়ে মুফাস্‌সিরগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। একদল বলেন, এ পাঁচটি বিশেষণ দ্বারা বাতাসকে বুঝানো হয়েছে। অপর এক দল বলেন যে, এ পাঁচটি বিশেষণ দ্বারা

ফেরেশতাদের বুঝানো হয়েছে। তৃতীয় দল বলেন ঃ প্রথম তিনটি দ্বারা বাতাস এবং পরের দু'টি দ্বারা ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। চতুর্থ দল বলেন ঃ প্রথম দু'টি দ্বারা বাতাস এবং পরের তিনটি দ্বারা ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। একদল এরূপ মতও পোষণ করেছেন যে, প্রথমটি দ্বারা রহমতের ফেরেশতা, দ্বিতীয়টি দ্বারা আযাবের ফেরেশতা এবং অবশিষ্ট তিনটি দ্বারা কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ বুঝানো হয়েছে।

আমাদের কাছে প্রথম বিবেচ্য বিষয় হলো, যখন একই কথার মধ্যে একের পর এক পাঁচটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর মধ্যে এমন কোন ইংগিতও পাওয়া যাচ্ছে না যা দিয়ে বুঝা যেতে পারে যে, কোন্ পর্যন্ত একটি জিনিসের গুণ-পরিচয়ের উল্লেখ করা হয়েছে এবং কোথায় থেকে আরেকটি জিনিসের গুণ পরিচয়ের বর্ণনা শুরু হয়েছে তখন অযৌক্তিকভাবে শুধু অনুমানের ওপর ভিত্তি করে একথা বলা কতটা সঠিক ও যুক্তিযুক্ত হতে পারে যে, এখানে শুধু দু'টি বা তিনটি জিনিসের শপথ করা হয়েছে? বরং এ ক্ষেত্রে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা দাবী করে যে, সম্পূর্ণ বাক্যকে কোন একটি জিনিসের গুণ বা পরিচিতির সাথে সম্পর্কিত বলে মেনে নেয়া উচিত। দ্বিতীয় কথা হলো, কুরআন মজীদে যেখানেই সন্দেহ পোষণকারী বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীকে কোন অতীন্দ্রিয় বা গায়েবী সত্যকে বিশ্বাস করানোর জন্য কোন জিনিস বা বস্তু বিশেষের শপথ করা হয়েছে, সেখানেই শপথ প্রমাণ উপস্থাপনের সমার্থক হয়েছে অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য হয় একথা বুঝানো যে, এ বস্তুটি বা বস্তু সকল সে সত্যটির যথার্থতা প্রমাণ করছে। এটা তো স্পষ্ট যে, এ উদ্দেশ্যে একটি অতীন্দ্রিয় বা গায়েবী বস্তুর পক্ষে আরেকটি অতীন্দ্রিয় বা গায়েবী বস্তুকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা ঠিক নয়। বরং অতীন্দ্রিয় বস্তুর প্রমাণ হিসেবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রমাণ পেশ করাই যথার্থ এবং যথোপযুক্ত হতে পারে। সুতরাং আমাদের মতে এর সঠিক তাফসীর হলো এই যে, এর অর্থ বাতাস। যারা বলেছেন যে, এ পাঁচটি জিনিসের অর্থ ফেরেশতা, আমার মতে তাদের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ফেরেশতাও কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার মতই অতীন্দ্রিয় বিষয়।

এবার চিন্তা করে দেখুন, বাতাসের এ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা কিয়ামতের বাস্তবতা কিভাবে প্রমাণ করছে। যেসব উপকরণের জন্য পৃথিবীর ওপর জীব-জন্তু ও উদ্ভিদের জীবন সম্ভব হয়েছে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো বাতাস। সব প্রজাতির জীবনের সাথে বাতাসের বর্ণিত গুণাবলীর যে সম্পর্ক আছে তা এ কথারই সাক্ষ দিচ্ছে যে, কোন একজন মহা শক্তিমান সুনিপুণ স্রষ্টা আছেন যিনি মাটির এ গ্রহে জীবন সৃষ্টির ইচ্ছা করেছেন এবং এ উদ্দেশ্যে এখানে এমন একটি জিনিস সৃষ্টি করলেন যার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট জীবন্ত মাখলুকাতের বেঁচে থাকার জন্য যা প্রয়োজন তার সাথে হুবহু সামঞ্জস্যশীল। তা সত্ত্বেও তিনি শুধু এতটুকুই করেননি যে, পৃথিবীটার গায়ে বাতাসের একটি চাদর জড়িয়ে রেখে দিয়েছেন। বরং নিজের কুদরত ও জ্ঞান দ্বারা তিনি এ বাতাসের মধ্যে বৈচিত্রপূর্ণ অসংখ্য অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। লক্ষ কোটি বছর ধরে তার ব্যবস্থাপনা এভাবে হয়ে আসছে যে, সে বৈচিত্রপূর্ণ অবস্থার কারণে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর সৃষ্টি হচ্ছে। কখনো বাতাস বন্ধ হয়ে গুমট অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। আবার কখনো স্নিগ্ধ শীতল বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। কখনো গরম পড়ে আবার কখনো ঠাণ্ডা পড়ে। কখনো মেঘের ঘনঘটায় চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে যায় আবার কখনো বাতাসে মেঘ ভেসে যায়। কখনো আরামদায়ক বাতাস বয়ে যায় আবার কখনো

فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ﴿٨﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ
نُسِفَتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ﴿١١﴾ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ﴿١٢﴾ لِيَوْمِ
الْفَصْلِ ﴿١٣﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿١٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٥﴾
أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ﴿١٧﴾ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ
بِالْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٩﴾

অতপর তারকাসমূহ যখন নিষ্প্রভ হয়ে যাবে[৪] এবং আসমান ফেঁড়ে দেয়া হবে[৫] আর পাহাড় ধুনিত করা হবে এবং রসূলদের হাজির হওয়ার সময় এসে পড়বে।[৬] (সেদিন ঐ ঘটনাটি সংঘটিত হবে)। কোন্ দিনের জন্য একাজ বিলম্বিত করা হয়েছে? ফায়সালার দিনের জন্য। তুমি কি জান সে ফায়সালার দিনটি কি? সেদিন ধ্বংস অপেক্ষা করছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।[৭]

আমি কি পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করিনি?[৮] আবার পরবর্তী লোকদের তাদের অনুগামী করে দেব[৯]। অপরাধীদের সাথে আমরা এরূপই করে থাকি। সেদিন ধ্বংস অপেক্ষা করছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।[১০]

প্রলয়ংকরী ঝড়-ঝঞ্ঝার আবির্ভাব ঘটে। কখনো অত্যন্ত উপকারী বৃষ্টিপাত হয় আবার কখনো বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মোট কথা এক রকম বাতাস নয়, বরং বিভিন্ন সময়ে নানা রকমের বাতাস প্রবাহিত হয় এবং প্রত্যেক প্রকারের বাতাস কোন না কোন উদ্দেশ্য পূরণ করে। এ ব্যবস্থা একটি অজেয় ও পরাক্রমশালী শক্তির প্রমাণ, যার পক্ষে জীবন সৃষ্টি করা যেমন অসম্ভব নয় তেমনি তাকে ধ্বংস করে পুনরায় সৃষ্টি করাও অসম্ভব নয়। অনুরূপভাবে এ ব্যবস্থাপনা পূর্ণমাত্রার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তারও প্রমাণ। কোন অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকই কেবল একথা মনে করতে পারে যে, এসব কাজ-কারবার শুধু খেলাচ্ছলে করা হচ্ছে। এর পেছনে কোন মহান লক্ষ ও উদ্দেশ্য নেই। এ বিস্ময়কর ব্যবস্থার সামনে মানুষ এত অসহায় যে, সে নিজের প্রয়োজনেও কোন সময় উপকারী বাতাস প্রবাহিত করতে পারে না। আবার ধ্বংসাত্মক তুফানের আগমনকে ঠেকাতেও পারে না। সে যতই ঔদ্ধত্য, অসচেতনতা এক গুঁয়েমি ও হঠকারিতা দেখাক না কেন কোন না কোন সময় এ বাতাসই তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সর্বোপরি এক মহাশক্তি তৎপর আছেন যিনি জীবনের এ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপকরণকে যখন ইচ্ছা তার জন্য রহমত এবং যখন ইচ্ছা তার জন্য ধ্বংসের কারণ বানিয়ে দিতে পারেন। মানুষ তার কোন সিদ্ধান্তকেই রোধ করার ক্ষমতা রাখে না। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল জাসিয়া, টীকা ৭, আয্ যারিয়াত, টীকা ১ থেকে ৪।)

৪. অর্থাৎ নিষ্প্রভ হয়ে যাবে এবং তার আলো নিঃশেষ হয়ে যাবে।

৫. অর্থাৎ যে সুদৃঢ় ব্যবস্থার কারণে উর্ধজগতের সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ তার কক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং যে কারণে মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু নিজ নিজ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ আছে সে ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটানো হবে এবং তার সমস্ত বন্ধন শিথিল করে দেয়া হবে।

৬. কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাশরের ময়দানে যখন মানব জাতির মামলা আল্লাহর দরবারে পেশ করা হবে তখন প্রত্যেক জাতির রসূলকে সাক্ষদানের জন্য হাজির করা হবে। উদ্দেশ্য, তাঁরা যে মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন তার সাক্ষ্য দেবেন। বিপথগামী ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে এটা হবে আল্লাহ তা'আলার সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এর দ্বারা প্রমাণ করা হবে যে, তার ভ্রান্ত আচরণের জন্য সে নিজেই দায়ী। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাকে সাবধান করার ব্যাপারে কোন ত্রুটি করা হয়নি। এ বিষয়ে জানতে হলে নিম্নবর্ণিত স্থানসমূহ দেখুন। তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, আয়াত ১৭২, ১৭৩, টীকা ১৩৪, ১৩৫; আয্ যুমার, আয়াত ৬৯, টীকা ৮০; আল মুলক, আয়াত ৮, টীকা ১৪।

৭. অর্থাৎ সেসব লোকের জন্য যারা সেদিনের আগমনের খবরকে মিথ্যা বলে মনে করেছিল এবং এ ভেবে পৃথিবীতে জীবন যাপন করে চলেছিল যে, এমন সময় কখনো আসবে না যখন প্রভুর সামনে হাজির হয়ে নিজের কাজ-কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

৮. এটা আখেরাতের সপক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণ। এর অর্থ হলো, এ দুনিয়াতেই তোমরা নিজেদের ইতিহাসের প্রতি একবার তাকিয়ে দেখো। যেসব জাতি আখেরাতকে অস্বীকার করে এ দুনিয়ার জীবনকেই প্রকৃত জীবন মনে করেছে এবং এ দুনিয়াতে প্রকাশিত ফলাফলকে ভাল ও মন্দের মাপকাঠি ধরে নিয়ে সে অনুসারে নিজেদের নৈতিক আচরণ নিরূপণ করেছে স্থান-কাল নির্বিশেষ তারা সবাই শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে, প্রকৃতপক্ষে আখেরাত এক বাস্তব সত্য। যারা একে উপেক্ষা করে কাজ করে তারা ঠিক তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয় যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে ব্যক্তি যে চোখ বন্ধ করে বাস্তবকে অস্বীকার করে চলে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস, টীকা ১২; আন নাম্‌ল, টীকা ৮৬; আর রুম, টীকা ৮; সাবা, টীকা ২৫।)

৯. অর্থাৎ এটা আমার স্থায়ী নীতি ও বিধান। আখেরাতের অস্বীকৃতি অতীত জাতিগুলোর জন্য যেভাবে ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়েছে অনুরূপ অনাগত জাতিগুলোর জন্যও তা ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হবে। পূর্বেও কোন জাতি এ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়নি, ভবিষ্যতেও পাবে না।

১০. এখানে এ আয়াতটির অর্থ হলো, দুনিয়াতে তাদের যে পরিণতি হয়েছে কিংবা ভবিষ্যতে হবে তা তাদের আসল শাস্তি নয়। তাদের ওপর আসল ধ্বংস নেমে আসবে চূড়ান্ত ফায়সালার দিনে। এ পৃথিবীতে যে শাস্তি দেয়া হয় তার অবস্থা হলো, যখন কোন ব্যক্তি একের পর এক অপরাধ করতে থাকে এবং কোন ভাবেই সে তার ভ্রষ্ট ও বিকৃত আচরণ থেকে বিরত হয় না তখন শেষ অবধি তাকে গ্রেফতার করা হয়। যে আদালতে তার

أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٢١﴾ إِلَىٰ قَدَرٍ
مَّعْلُومٍ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴿٢٣﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾
أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ
شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾

আমি কি তোমাদেরকে এক নগণ্য পানি থেকে সৃষ্টি করিনি এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য[১১] একটি নির্দিষ্ট জায়গায় তা স্থাপন করেছিলাম না?[১২] তাহলে দেখো, আমি তা করতে পেরেছি। অতএব আমি অত্যন্ত নিপুণ ক্ষমতাধর।[১৩] সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।[১৪]

আমি কি যমীনকে ধারণ ক্ষমতার অধিকারী বানাইনি, জীবিত ও মৃত উভয়ের জন্য? আর আমি তাতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা আর পান করিয়েছি তোমাদেরকে সুপেয় পানি।[১৫] সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।[১৬]

মামলার চূড়ান্ত ফায়সালা হবে এবং তার সমস্ত কৃতকর্মের শাস্তি দেয়া হবে তা এ দুনিয়ায় না আখেরাতে কায়েম হবে এবং সেটাই হবে তার ধ্বংসের আসল দিন। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৫-৬; হূদ, টীকা ১০৫।)

১১. মূল আয়াতের বাক্যাংশ হলো قَدَرٍ مَّعْلُومٍ । এর অর্থ শুধু নির্দিষ্ট সময় নয়। বরং এর সময়-কাল একমাত্র আল্লাহই জানেন এ অর্থও এর মধ্যে শামিল। কোন বাচ্চা সম্পর্কে কোন উপায়েই মানুষ একথা জানতে পারে না যে, সে কত মাস, কত দিন, কত ঘন্টা, কত মিনিট এবং কত সেকেণ্ড মায়ের পেটে অবস্থান করবে এবং তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার নির্ভুল সময়টি কি? প্রত্যেক শিশুর জন্য আল্লাহ একটা বিশেষ সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন আর সে সময়টি কেবল তিনিই জানেন।

১২. অর্থাৎ মায়ের গর্ভ থলি। গর্ভ সূচনা হওয়ার সাথে সাথে ভ্রূণকে এর মধ্যে এত দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা হয় এবং তার হিফাযত, প্রতিপালন এবং বৃদ্ধিসাধন এমন নিখুঁত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে করা হয় যে, কোন মারাত্মক দুর্ঘটনা ছাড়া গর্ভপাত হতে পারে না। কৃত্রিম গর্ভপাতের জন্য অস্বাভাবিক ধরনের কৌশল ও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয় যা চিকিৎসা বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক উন্নতি সত্ত্বেও ক্ষতি ও আশংকা মুক্ত নয়।

১৩. এটা মৃত্যুর পরের জীবনের সম্ভাব্যতার স্পষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর অর্থ হলো, যখন আমি নগণ্য এক ফোটা বীর্য থেকে সূচনা করে তোমাকে পূর্ণাঙ্গ একজন মানুষ বানাতে সক্ষম হয়েছি তখন পুনরায় তোমাদের অন্য কোনভাবে সৃষ্টি করতে সক্ষম

হবো না কেন? আমার যে সৃষ্টি কর্মের ফলশ্রুতিতে তুমি আজ জীবিত ও বর্তমান তা একথা প্রমাণ করে যে, আমি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। আমি এমন অক্ষম নই যে, একবার সৃষ্টি করার পর তোমাদেরকে পুনরায় আর সৃষ্টি করতে পারবো না।

১৪. এখানে এ আয়াতাংশ যে অর্থ প্রকাশ করছে তাহলো, মৃত্যুর পরের জীবনের সম্ভাব্যতার এ স্পষ্ট প্রমাণ সামনে থাকা সত্ত্বেও যারা তা অস্বীকার করছে তারা এ নিয়ে যত ইচ্ছা হাসি-তামাসা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করুক এবং এর ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকদের তারা যত ইচ্ছা 'সেকেলে' অন্ধবিশ্বাসী এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলতে থাক। যে দিনকে এরা মিথ্যা বলছে যখন সেদিনটি আসবে তখন তারা জানতে পারবে, সেটিই তাদের জন্য ধ্বংসের দিন।

১৫. এটা আখেরাতের সম্ভাব্যতা ও যুক্তিসংগত হওয়ার আরো একটি প্রমাণ। পৃথিবী নামক এ একটি গ্রহ যা শত শত কোটি বছর ধরে অসংখ্য মাখলুকাতকে তার কোলে স্থান দিয়ে রেখেছে। নানা প্রকারের উদ্ভিদরাজি, নানা রকমের জীবজন্তু এবং মানুষ এর ওপরে জীবন ধারণ করছে। আর সবার প্রয়োজন পূরণ করার জন্য এর অভ্যন্তর থেকে নানা প্রকার জিনিসের অফুরন্ত ভাণ্ডার বেরিয়ে আসছে। তাছাড়া এ পৃথিবীতে, যেখানে এসব জীবজন্তুর বিপুল সংখ্যক প্রতিনিয়ত মৃত্যুবরণ করছে—এমন নজীর বিহীন ব্যবস্থাপনা রাখা হয়েছে যে, সবার মৃতদেহ এ মাটির মধ্যেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তারপর প্রত্যেকটি সৃষ্টির নবীন সদস্যদের বেঁচে থাকার ও বসবাসের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে এ পৃথিবীকে বলের মত সমতল করেও সৃষ্টি করা হয়নি। বরং এর স্থানে স্থানে পর্বতশ্রেণী এবং আকাশচুম্বী পাহাড় তৈরী করে রাখা হয়েছে ঋতুসমূহের পরিবর্তনে, বৃষ্টিপাত ঘটানোতে, নদ-নদীর উৎপত্তির ক্ষেত্রে, উর্বর উপত্যকা সৃষ্টিতে, কড়িকাঠ নির্মাণের মত বড় বড় বৃক্ষ উৎপাদনে, নানা রকমের খনিজ দ্রব্য এবং বিভিন্ন প্রকার পাথর সরবরাহের ক্ষেত্রে যার বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া এ পৃথিবীর অভ্যন্তরে সুপেয় পানি সৃষ্টি করা হয়েছে। এর পৃষ্ঠদেশের ওপরেও সুপেয় পানির নদী ও খাল প্রবাহিত করা হয়েছে এবং সমুদ্রের লবণাক্ত পানি থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাষ্প উত্থিত করে আসমান থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব কি একথা প্রমাণ করে না যে, সর্বশক্তিমান এক সত্তাই এসব তৈরী করেছেন। আর তিনি শুধু সর্বশক্তিমানই নন বরং জ্ঞানী এবং মহাবিজ্ঞানীও বটে? অতএব, তাঁর শক্তিমত্তা ও জ্ঞানের সাহায্যেই যদি এ পৃথিবী এতসব সাজ-সরঞ্জামসহ এ জ্ঞান ও কৌশলের সাথে তৈরী হয়ে থাকে তাহলে একজন জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের জন্য একথাটা বুঝা এত কঠিন হবে কেন যে, এ দুনিয়ার বিলোপ ঘটিয়ে পুনরায় নতুনভাবে আরেকটি দুনিয়া তিনি বানাতে সক্ষম আর তাঁর কর্মকৌশলের দাবীও এটাই যে, তিনি আরেকটি দুনিয়া বানাবেন যাতে মানুষ এ দুনিয়ায় যেসব কাজ-কর্ম করেছে তার হিসেব নেয়া যায়।

১৬. এখানে এ আয়াতাংশ এ অর্থে বলা হয়েছে যে, যেসব লোক আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও কর্মকৌশলের এ বিস্ময়কর নমুনা দেখেও আখেরাতের সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতা অস্বীকার করছে এবং এ দুনিয়ার ধ্বংসের পর আল্লাহ তা'আলা আরো একটি দুনিয়া সৃষ্টি করবেন এবং সেখানে মানুষের কাছ থেকে তার কাজের হিসেব গ্রহণ করবেন এ বিষয়টিকেও যারা মিথ্যা মনে করছে, তারা তাদের এ খামখেয়ালীতে মগ্ন থাকতে চাইলে

انْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٩﴾ انْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ
شُعَبٍ ﴿٣٠﴾ لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣١﴾ اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾
كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٤﴾ هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٣٥﴾
وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٧﴾ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ
جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ﴿٣٩﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٠﴾

চলো[১৭] এখন সে জিনিসের কাছে যাকে তোমরা মিথ্যা বলে মনে করতে। চলো সে ছায়ার কাছে যার আছে তিনটি শাখা।[১৮] যে ছায়া ঠাণ্ডা নয় আবার আগুনের শিখা থেকে রক্ষাও করে না। সে আগুন প্রাসাদের মত বড় বড় স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে। (উৎক্ষেপণের সময় যা দেখে মনে হবে) তা যেন হলুদ বর্ণের উট।[১৯] সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। এটি সেদিন যেদিন তারা না কিছু বলবে এবং না তাদেরকে ওজর পেশ করার সুযোগ দেয়া হবে।[২০] সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।

এটা চূড়ান্ত ফায়সালার দিন। আমি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের একত্রিত করেছি। তোমাদের যদি কোন অপকৌশল থেকে থাকে তাহলে আমার বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করে দেখো।[২১] সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।

থাকুক। তাদের ধারণা ও বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত এসব কিছু যেদিন বাস্তব হয়ে দেখা দেবে, সেদিন তারা বুঝতে পারবে যে, এ বোকামির মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের ব্যবস্থা করেছে মাত্র।

১৭. আখেরাতের সপক্ষে প্রমাণাদি পেশ করার পর যখন তা বাস্তবে সংঘটিত হবে তখন সেখানে এসব অস্বীকারকারীদের পরিণাম কি হবে তা বলা হচ্ছে।

১৮. এখানে ছায়া অর্থ ধোঁয়ার ছায়া। তিনটি শাখার অর্থ হলো, যখন অনেক বেশী ধোঁয়া উত্থিত হয় তখন তা ওপরে গিয়ে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়।

১৯. অর্থাৎ প্রত্যেকটি স্ফুলিঙ্গ প্রাসাদের মত বড় হবে। আর যখন এসব বড় বড় স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে এবং চারদিকে উড়তে থাকবে তখন মনে হবে যেন হলুদ বর্ণের উটসমূহ লম্ফ ঝম্ফ করছে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾ كُلُوا
وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ
مُجْرِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا
لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ
يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

২য় রুকূ'

মুত্তাকীরা[২২] আজ সুশীতল ছায়া ও ঝর্ণাধারার মধ্যে অবস্থান করছে। আর যে ফল তারা কামনা করে (তা তাদের জন্য প্রস্তুত)। যে কাজ তোমরা করে এসেছো তার পুরস্কার স্বরূপ আজ তোমরা মজা করে খাও এবং পান করো। আমি নেক্‌কার লোকদের এরূপ পুরস্কারই দিয়ে থাকি। সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপ কারীদের জন্য।[২৩]

খেয়ে নাও[২৪] এবং ফূর্তি কর। কিছুদিনের জন্য[২৫] আসলে তো তোমরা অপরাধী। সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহর সামনে অবনত হও, তখন তারা অবনত হয় না।[২৬] সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। এখন এ কুরআন ছাড়া আর কোন্ বাণী এমন হতে পারে যার ওপর এরা ঈমান আনবে?[২৭]

২০. এটা হবে তাদের শেষ অবস্থা। এ অবস্থা হবে জাহান্নামে প্রবেশ করার সময়। এর আগে হাশরের ময়দানে তারা অনেক কিছুই বলবে। অনেক ওজর আপত্তি পেশ করবে, একজন আরেকজনের ওপর নিজের কৃত অপরাধের দোষ চাপিয়ে নিজে নিরপরাধ হওয়ার চেষ্টা করবে। যেসব নেতারা তাদেরকে বিপথে পরিচালনা করেছে তাদের গালি দেবে। এমনকি কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানের বক্তব্য অনুসারে, অনেকে ঔদ্ধত্যের সাথে নিজের অপরাধ অস্বীকার পর্যন্ত করবে। কিন্তু সব রকম সাক্ষ–প্রমাণের দ্বারা তাদের অপরাধী হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দেয়া হবে এবং তাদের নিজেদের হাত, পা এবং সব অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবে ঃ এভাবে অপরাধ প্রমাণে যখন কোন ত্রুটি থাকবে না এবং অত্যন্ত সংগত ও যুক্তিযুক্ত পন্থায় ন্যায় ও ইনসাফের সমস্ত দাবী পূরণ করে তাদেরকে শাস্তির সিদ্ধান্ত শুনানো হবে তখন তারা একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যাবে এবং

আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ওজর হিসেবে কোন কিছু বলার সুযোগও তাদের জন্য থাকবে না। ওজর পেশ করার সুযোগ না দেয়া কিংবা তার অনুমতি না দেয়ার অর্থ এই নয় যে, সাফাই পেশ করার সুযোগ না দিয়েই তাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে দেয়া হবে। বরং এর অর্থ হলো, এমন অকাট্য ও অনস্বীকার্যভাবে তাদের অপরাধ প্রমাণ করে দেয়া হবে যে, তারা নিজেদের পক্ষ থেকে ওজর হিসেবে কিছু বলতেই পারবে না। এটা ঠিক তেমনি যেমন আমরা বলে থাকি যে, আমি তাকে বলতে দিইনি, কিংবা আমি তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছি। একথার অর্থ এই যে, আমি এমনভাবে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছি যে, তার মুখ খোলার বা কিছু বলার কোন সুযোগ থাকেনি এবং সে লা-জবাব হয়ে গেছে।

২১. অর্থাৎ দুনিয়ায় তো তোমরা অনেক কৌশল ও চাতুর্যের আশ্রয় নিতে। এখন এখানে কোন কৌশল বা আশ্রয় নিয়ে আমার পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারলে তা একটু করে দেখাও।

২২. এখানে এ শব্দটি যেহেতু مُكَذِّبِيْنَ (মিথ্যা আরোপকারীদের) বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে তাই মুত্তাকী শব্দ বলে এখানে সেসব লোকদের বুঝানো হয়েছে যারা আখেরাতকে মিথ্যা বলে অস্বীকার করা থেকে বিরত থেকেছে এবং আখেরাতকে মেনে নিয়ে এ বিশ্বাসে জীবন যাপন করেছে যে, আখেরাতে আমাদেরকে নিজেদের কথাবার্তা, কাজ-কর্ম এবং স্বভাব চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

২৩. এখানে যে অর্থে এ আয়াতাংশ বলা হয়েছে তাহলো, তাদের জন্য একটি বিপদ হবে তাই যা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা হাশরের ময়দানে অপরাধী হিসেবে উঠবে। তাদের অপরাধ প্রকাশ্যে এভাবে প্রমাণ করা হবে যে, তাদের জন্য মুখ খোলার সুযোগ পর্যন্ত থাকবে না এবং পরিণামে তারা জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবে। দ্বিতীয়ত, তাদের জন্য মসিবতের ওপর মসিবত হবে এই যে, যেসব ঈমানদারদের সাথে তাদের সারা জীবন দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও লড়াই হয়েছে, যাদের তারা নির্বোধ, সংকীর্ণমনা ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে আখ্যায়িত করতো, যাদের নিয়ে তারা হাসি-তামাসা ও বিদ্রূপ করতো এবং যাদের তারা নিজেদের দৃষ্টিতে হীন, নীচ ও লাঞ্ছিত মনে করতো তাদেরকেই তারা জান্নাতের মধ্যে আরাম আয়েশের জীবন যাপন করে আমোদ ফূর্তি করতে দেখবে।

২৪. এখন বক্তব্যের সমাপ্তি টানতে গিয়ে শুধু মক্কার কাফের নয় বরং সারা পৃথিবীর কাফেরদের সম্বোধন করে একথাগুলো বলা হয়েছে।

২৫. অর্থাৎ দুনিয়ার এ স্বল্পকাল স্থায়ী জীবনে।

২৬. আল্লাহর সামনে আনত হওয়ার অর্থ শুধু তাঁর ইবাদাত বন্দেগী করাই নয়, বরং তাঁর প্রেরিত রসূল এবং নাযিলকৃত কিতাবকে স্বীকার করা এবং তার বিধি-বিধানের আনুগত্যও এর মধ্যে অন্তরভুক্ত।

২৭. অর্থাৎ মানুষকে হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়ার এবং হিদায়াতের পথ দেখানোর জন্য সবচেয়ে বড় জিনিস যা হতে পারতো তা কুরআন আকারে নাযিল করা হয়েছে। এ কুরআন পড়ে বা শুনেও যদি কেউ ঈমান না আনে তাহলে একে বাদ দিয়ে আর কোন্ জিনিস এমন হতে পারে যা তাকে সত্য পথে আনতে সক্ষম?

পরিশিষ্ট—৩

১নং টীকার সাথে সম্পর্কিত

এ আয়াতগুলোতে প্রথমত বৃষ্টি বহনকারী বাতাসসমূহের পরম্পরা বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে যে, প্রথমে ক্রমাগত বাতাস চলতে থাকে। পরে তা ঝঞ্ঝার রূপ ধারণ করে। তারপর মেঘমালাকে বহন করে নিয়ে ছড়িয়ে দেয়। অতপর তাকে বিদীর্ণ করে ভাগ ভাগ করে। এরপর বৃষ্টি নামার কথা উল্লেখ করার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, তা মনের মধ্যে আল্লাহর স্মরণকে জাগ্রত করে, ওজর হিসেবে কিংবা ভীতি হিসেবে। অর্থাৎ সেটি এমন এক সময়ে ঘটে, যখন মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার হয়, তাই সে আল্লাহকে স্মরণ করতে বাধ্য হয়। কিংবা মানুষ তার দোষ–ত্রুটি ও অপরাধসমূহ স্বীকার করে দোয়া করতে থাকে, যেন আল্লাহ তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন, তার প্রতি দয়া করে যেন রহমত স্বরূপ বৃষ্টি বর্ষণ করেন। যদি দীর্ঘদিন পর্যন্ত বৃষ্টি না হয়ে থাকে এবং এক ফোঁটা পানির জন্য মানুষ কাতরাতে থাকে তাহলে সে অবস্থায় ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হতে এবং বৃষ্টির মেঘ আসতে দেখে অনেক সময় কট্টর কাফেরও আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকে। তবে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ তীব্র বা হাল্কা হলে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ মানুষ যারা তারা সাধারণত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকে, তাই স্বাভাবিক দুর্ভিক্ষ হলেও তারা তাঁকে স্মরণ করবে। কিন্তু অন্যরা তখনও সাইন্সের বুলি কপচাতে থাকবে এবং বলবে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। অমুক অমুক কারণে বৃষ্টি হচ্ছে না। এতটুকু ব্যাপার নিয়ে দোয়া করতে শুরু করা দুর্বল আকীদা–বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই না। তবে যদি দীর্ঘদিন পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ লেগে থাকে এবং গোটা দেশ ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় তাহলে বড় বড় কাফেরদেরও তখন আল্লাহকে মনে পড়তে থাকে। মুখে বলতে লজ্জাবোধ করলেও তারা নিজের গোনাহ ও পাপ এবং অকৃতজ্ঞতার জন্য লজ্জা অনুভব করে এবং আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করে যে, বাতাস বৃষ্টির যে মেঘ বহন করে আনছে তা থেকে যেন গোটা দেশে বৃষ্টিপাত হয়। এটাই হলো ওজর হিসেবে মনের মধ্যে আল্লাহর স্মরণ জাগিয়ে তোলা। এরপর نُذْرًا (ভীতি) হিসেবে মনের মধ্যে আল্লাহর স্মরণ জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারটা সংঘটিত হয় তখন যখন ঝড়ের বেগ বৃদ্ধি পেতে পেতে প্রচণ্ড বিভীষিকাময় রূপ ধারণ করে এবং জনপদের পর জনপদ বিধ্বস্ত করে ফেলে কিংবা মুষলধারে এমন বৃষ্টি হতে থাকে যে, তা বিপদ সংকুল প্লাবনের রূপ ধারণ করে। এরূপ পরিস্থিতিতে অত্যন্ত দৃঢ় মনোবলের কাফেরও আতংকগ্রস্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে বিনীতভাবে প্রার্থনা করতে থাকে। তখন তার মস্তিষ্কের গোপন প্রদেশ থেকে ঝড় ও প্লাবনের সমস্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও ব্যাখ্যা উবে যায়। বাতাস প্রবাহিত হওয়ার এ অনুক্রম বা পারম্পর্য বর্ণনা করার পর বলা হচ্ছে, এসব বাতাস ওজর কিংবা ভীতি হিসেবে মনের মধ্যে আল্লাহর স্মরণ জাগিয়ে দেয়। অন্য কথায় যেন বলা হচ্ছে, দুনিয়ায় যেসব ব্যবস্থা চলছে তা মানুষকে এ সত্যটিই জানিয়ে দিচ্ছে যে, এ পৃথিবীর সবকিছু তার ইখতিয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়নি। বরং সবকিছুর ওপরে এক মহাশক্তি আছেন যিনি মানুষের ভাগ্যের ওপর কর্তৃত্ব চালাচ্ছেন। তাঁর ক্ষমতা এমন অপরাজেয় যে, যখন ইচ্ছা তিনি সমস্ত উপাদানকে মানুষের লালন ও প্রতিপালনের জন্য

ব্যবহার করতে পারেন। আবার যখন ইচ্ছা ঐ সব উপাদানকেই তার ধ্বংসের কাজে নিয়োজিত করতে পারেন।

এরপর বাতাসের এ ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তকে এ বিষয়ের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে যে, যে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। এখন দেখার বিষয় হলো, বাতাসের এ ব্যবস্থাপনা এ ব্যাপারে কি সাক্ষ–প্রমাণ আমাদের সামনে উপস্থাপিত করছে।

কিয়ামত ও আখেরাতের ব্যাপারে মানুষ সাধারণত দু'টি প্রশ্নে সংশয়–সন্দেহে নিপতিত হয় এবং বিব্রত বোধ করে। এক, কিয়ামত হওয়া সম্ভব কিনা? দুই, এর প্রয়োজনই বা কি? এ প্রশ্নের জটা জালে জড়িয়েই তার মধ্যে এ সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হয় যে, কিয়ামত কি আদৌ সংঘটিত হবে? নাকি এটা একটা কাহিনী মাত্র? এ বিষয়ে কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় বিশ্ব–জাহানের ব্যবস্থাপনা থেকে প্রমাণ পেশ করে তার সম্ভাব্যতা, অনিবার্যতা এবং সংঘটিত হওয়া প্রমাণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গায় প্রমাণ পেশ করার যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তাহলো, আল্লাহ আ'আলার বিশাল সাম্রাজ্যের অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে কোন কোনটার শপথ করে বলা হয়েছে যে, তা সংঘটিত হবে। এ পন্থায় প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে তার সম্ভাব্যতা, অনিবার্যতা এবং সংঘটিত হওয়ার প্রমাণাদিও এসে যায়।

এখানেও প্রমাণ পেশের এ পন্থাই গ্রহণ করা হয়েছে। এতে বায়ু প্রবাহের আবর্তন এবং বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থাপনাকে এ বিষয়ে নিদর্শন হিসেবে পেশ করা হয়েছে যে, এটা একটা নিয়মিত ও স্থায়ী ব্যবস্থা যা একজন মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান সত্তার ব্যবস্থাপনায় কায়েম হয়েছে। এটা আকস্মিকভাবে সংঘটিত কোন ঘটনা নয় যে, তার প্রভাবে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে আপনা থেকেই এ পন্থা–পদ্ধতি চালু হয়ে গিয়েছে এবং আপনা আপনি সমুদ্র থেকে বাষ্প উত্থিত হয়েছে, বাতাস তা বহন করে নিয়ে গিয়েছে এবং তা একত্র করে বৃষ্টির মেঘ সৃষ্টি করেছে। অতপর সে মেঘকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে দিয়েছে এবং আপনা আপনি তা থেকে বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। কোন বিচার–বিবেচনা ও বুদ্ধি–বিবেকহীন প্রকৃতি কোন নিয়ম–নীতি ও আইন–কানুন বিহীন রাজত্বে আকস্মিকভাবে এ ব্যবস্থাটি চালু করেনি। বরং এটা একটা সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা যা একটি বিধান মোতাবেক যথারীতি চলছে। সুতরাং সূর্যের তাপে সমুদ্রের পানি থেকে বাষ্প উত্থিত হওয়ার পরিবর্তে তা জমে বরফে পরিণত হচ্ছে এমনটা কখনো দেখা যায় না। বরং সূর্যরশ্মির উত্তাপে সমুদ্রের পানি থেকে সবসময় বাষ্পই উত্থিত হয়। মৌসুমী বায়ু প্রবাহ এমন উল্টো আচরণ কখনো করে না যে, বাষ্পীভূত পানিকে স্থলভাগের দিকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে সমুদ্রেই তাকে নিঃশেষ করে দিল। বরং তা বাষ্পকে সবসময় ওপরে উঠিয়ে নেয়। এমনও কখনো ঘটতে দেখা যায় না যে, মেঘমালা সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বাতাস এসব মেঘ বহন করে শুষ্ক ভূ–ভাগের দিকে প্রবাহিত হওয়া বন্ধ করেছে এবং শুষ্ক ভূ–ভাগের ওপরে বৃষ্টিপাত একদম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কোটি কোটি বছর থেকে একই নিয়মে এ ব্যবস্থা লাগাতার চলে আসছে। এমনটি যদি না হতো, এ পৃথিবীর বুকে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর অস্তিত্বলাভ করা ও বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না।

এ ব্যবস্থার মধ্যে আপনি একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যমুখিতা এবং সুশৃঙ্খল বিধান কার্যকর দেখতে পাচ্ছেন। আপনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন যে, এ বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের সাথে পৃথিবীর মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদরাজির জীবনের একটা অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এ ব্যবস্থাপনা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, পানির এ সরবরাহ প্রাণীকূলকে সৃষ্টি করা ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য ঠিক তার প্রয়োজন অনুসারে একটি নিয়ম বিধান মোতাবেক করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যমুখিতা ও নিয়মতান্ত্রিকতা শুধু এ একটি ব্যাপারে নয়, বরং সমগ্র বিশ্ব–জাহানের গোটা ব্যবস্থাপনায়ই তা দেখা যায় এবং মানুষের সমস্ত বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও অগ্রগতি এর ওপরই নির্ভরশীল। আপনি একেকটি জিনিস সম্পর্কে জেনে নেন যে, তা কি কাজে লাগে এবং কোন্ নিয়ম অনুসারে কাজ করে। তারপর যে জিনিসগুলো সম্পর্কে আপনি যতটা জানতে পারেন তা কোন্ কাজে লাগে এবং কোন্ নিয়ম–বিধি অনুসারে কাজ করে তাকে কাজে লাগানোর ততটাই নতুন নতুন পন্থা–পদ্ধতি আপনি উদ্ভাবন করতে থাকেন এবং নতুন নতুন আবিষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের তামাদ্দুন ও সভ্যতার অগ্রগতি সাধন করতে থাকেন। এ পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে আর এখানকার প্রতিটি জিনিসই একটি অলংঘনীয় নিয়ম–বিধান ও শৃংখলা অনুসারে কাজ করছে এ মর্মে একটি স্বতস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক ধারণা যদি আপনার মন–মস্তিষ্কে না থাকতো তাহলে আপনার মগজে কোন জিনিস সম্পর্কে এ প্রশ্ন আদৌ জাগতো না যে, তা কি উদ্দেশ্যে কাজ করছে এবং তাকে কিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।

এখন এ পৃথিবী এবং এর প্রতিটি জিনিস যদি উদ্দেশ্যমূলক হয়ে থাকে, যদি এ পৃথিবী এবং এর প্রতিটি জিনিসের মধ্যে একটি নিয়ম ও শৃঙ্খলা কার্যকর থেকে থাকে আর যদি তা শত শত কোটি বছর ধরে একাদিক্রমে এ উদ্দেশ্য এবং নিয়ম–বিধি ও শৃংখলা অনুসারে চলে থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে একজন একগুঁয়ে ও হঠকারী মানুষই কেবল একথা অস্বীকার করতে পারে যে, একজন মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা সৃষ্টি করেছেন। সে আল্লাহ সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করা নিতান্তই আহমকী যে, এ পৃথিবীকে তিনি বানাতে এবং পরিচালনা করতে পারেন ঠিকই, কিন্তু তা ধ্বংস করতে পারেন না এবং ধ্বংস করার পর ইচ্ছা করলে তা অন্য কোন আকৃতিতে পুনরায় বানাতেও পারেন না। প্রাচীনকালের অজ্ঞ নাস্তিকদের একটা বড় হাতিয়ার ছিল বস্তুর অবিনশ্বর ও অবিনাশী হওয়ার ধারণা। কিন্তু জ্ঞান–বিজ্ঞানের অগ্রগতি তাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছে। এখন এটা জ্ঞানগতভাবে স্বীকৃত সত্য যে, বস্তু শক্তিতে (Energy) রূপান্তরিত হতে পারে এবং শক্তিও বস্তুতে রূপান্তরিত হতে পারে। তাই একথা সম্পূর্ণরূপে বিবেক–বুদ্ধিসম্মত যে, চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী আল্লাহ তা'আলা এ বস্তুজগতকে যতদিন পর্যন্ত কায়েম রাখবেন ততদিন পর্যন্ত তা কায়েম থাকবে। কিন্তু যখনিই তিনি একে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে চাইবেন শুধু একটি ইংগিতেই তা করতে পারবেন। তাছাড়া এ শক্তিকে আবার অন্য একটি বস্তুর আকৃতিতে সৃষ্টি করার জন্যও তাঁর একটি ইশারাই যথেষ্ট।

এ হলো কিয়ামতের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কথা। কোন তাত্বিক বা যৌক্তিক প্রমাণ দিয়ে এটাকে আর প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়। এখন যে প্রশ্নটি থেকে যায় তাহলো, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হওয়া দরকার যাতে মানুষকে তার ভাল কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি দেয়া যায়। যে ব্যক্তি মানুষের নৈতিক দায় দায়িত্ব স্বীকার করে এবং

একথাও স্বীকার করে যে, উত্তম কাজের পুরস্কার লাভ এবং অপরাধের শাস্তি ভোগ এ নৈতিক দায় দায়িত্বের অনিবার্য দাবী সে ব্যক্তির পক্ষে আখেরাতের অনিবার্যতা মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। পৃথিবীতে এমন কোন সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা নেই যা প্রতিটি অপরাধ ও দুষ্কর্মের শাস্তি এবং প্রতিটি ভাল কাজের পুরস্কার দিতে পারে। অপরাধীর জন্য তার বিবেকের দংশন ও তিরস্কার এবং উপকার ও সুকৃতিকারীর জন্য তার মনের তৃপ্তি ও হৃদয়ের প্রশান্তি যথোপযুক্ত শাস্তি বা পুরস্কার, একথা বলা একটি নিরর্থক দর্শন কপচানো ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রশ্ন হলো, যে ব্যক্তি কোন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করার পর কোন দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে তাকে তিরস্কার করার জন্য তার বিবেক এত সময় কোথায় পেল? আর সত্য ও ন্যায়ের জন্য লড়াই করতে গিয়ে অকস্মাত একটি বোমার আঘাতে যার গোটা দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল সে যে একটি মহত উদ্দেশ্যের জন্য নিজের জীবন কুরবানী করলো তার বিবেক এ তৃপ্তি ও প্রশান্তিলাভের সুযোগ পেল কখন? আসল কথা হলো, আখেরাত বিশ্বাসকে এড়িয়ে চলার জন্য যত বাহানা ও ছল চাতুরীর আশ্রয় নেয়া হয় তা সবই অর্থহীন। মানুষের বিবেক–বুদ্ধি ও স্বভাব–প্রকৃতি ইনসাফ কামনা করে। কিন্তু দুনিয়ার এ জীবনে ইনসাফ পাওয়া তাও আবার যথাযথ এবং পূর্ণাঙ্গরূপে কখনো সম্ভব নয়। এরূপ ইনসাফ হলে তা আখেরাতেই হওয়া সম্ভব এবং সমস্ত জ্ঞানের আধার ও সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত আল্লাহ্ আ'আলার নির্দেশ ও ব্যবস্থাপনায়ই সম্ভব। আখেরাতের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা প্রকৃতপক্ষে ন্যায় ও ইনসাফের প্রয়োজনকে অস্বীকার করারই নামান্তর।

জ্ঞান ও যুক্তি–বুদ্ধি মানুষকে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে যে, আখেরাত সম্ভব এবং তা হওয়া উচিত। কিন্তু তা অবশ্যই সংঘটিত হবে এ জ্ঞান কেবল অহীর মাধ্যমেই লাভ করা যেতে পারে। আর অহী একথা বলে দিয়েছে যে, "যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।" যৌক্তিক প্রমাণের মাধ্যমে আমরা এ জ্ঞানের নাগাল পেতে পারি না। তবে তা সত্য ও ন্যায়ানুগ হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা এভাবে লাভ করতে পারি যে, অহী আমাদের যে বিষয়ের খবর দিচ্ছে তা হওয়া যেমন সম্ভব, তেমনি বাঞ্ছনীয়ও বটে।

আন নাবা

৭৮

নামকরণ

দ্বিতীয় আয়াতের عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ বাক্যাংশের 'আন্ নাবা' শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আর এটি কেবল নামই নয়, এই সূরার সমগ্র বিষয়বস্তুর শিরোনামও এটিই। কারণ নাবা মানে হচ্ছে কিয়ামত ও আখেরাতের খবর। আর এই সূরায় এরি ওপর সমস্ত আলোচনা কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

সূরা আল মুরসালাতের ভূমিকায় আগেই বলে এসেছি, সূরা আল কিয়ামাহ থেকে আন্ নাযিআ'ত পর্যন্ত সবক'টি সূরার বিষয়বস্তুর পরস্পরের সাথে একটা মিল আছে এবং এ সবগুলোই মক্কা মুআয্যমার প্রাথমিক যুগে নাযিল হয়েছিল বলে মনে হয়।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

সূরা আল মুরসালাতে যে বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে এখানেও সেই একই বিষয়ের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ এখানেও কিয়ামত ও আখেরাত অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রমাণ এবং তা মানা ও না মানার পরিণতি সম্পর্কে লোকদের অবহিত করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম দিকে মক্কা মুআয্যমায় তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন। এক, আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করা যাবে না। দুই, তাঁকে আল্লাহ নিজের রসূলের পদে নিযুক্ত করেছেন। তিন, এই দুনিয়া একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর শুরু হবে আর এক নতুন জগতের। সেখানে আগের ও পরের সব লোকদের আবার জীবিত করা হবে। দুনিয়ায় যে দৈহিক কাঠামো ধারণ করে তারা কাজ করেছিল সেই কাঠামো সহকারে তাদের উঠানো হবে। তারপর তাদের বিশ্বাস ও কাজের হিসেব নেয়া হবে। এই হিসেব নিকেশের ভিত্তিতে যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল প্রমাণিত হবে তারা চিরকালের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করবে। যারা কাফের ও ফাসেক প্রমাণিত হবে তারা চিরকালের জন্য প্রবেশ করবে জাহান্নামে।

এই তিনটি বিষয়ের মধ্য থেকে প্রথমটি আরবদের কাছে যতই অপছন্দনীয় হোক না কেন তারা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না। তারা আল্লাহকে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ও সর্বশ্রেষ্ঠ রব এবং স্রষ্টা ও রিজিকদাতা বলেও মানতো। অন্য যেসব সত্তাকে তারা ইলাহ

ও মাবুদ গণ্য করতো তাদের সবাইকে আল্লাহরই সৃষ্টি বলেও স্বীকার করতো। তাই আল্লাহর সার্বভৌমত্বের গুণাবলী ও ক্ষমতায় এবং তাঁর ইলাহ হবার মূল সত্তায় তাদের কোন অংশীদারীত্ব আছে কি নেই এটিই ছিল মূল বিরোধীয় বিষয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি মক্কার লোকেরা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। তবে নবুওয়াতের দাবী করার আগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্যে চল্লিশ বছরের যে জীবন যাপন করেছিলেন সেখানে তারা কখনো তাঁকে মিথ্যুক, প্রতারক বা ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বনকারী হিসেবে পায়নি। এ বিষয়টি অস্বীকার করার কোন উপায়ই তাদের ছিল না। তারা নিজেরাই তাঁর প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, শান্ত প্রকৃতি, সুস্থমতি ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের স্বীকৃতি দিয়েছিল। তাই হাজার বাহানাবাজী ও অভিযোগ-দোষারোপ সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব ব্যাপারেই সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ছিলেন। কেবলমাত্র নবুওয়াতের দাবীর ব্যাপারে নাউযুবিল্লাহ তিনি ছিলেন মিথ্যুক, এ বিষয়টি অন্যদের বুঝানো তো দূরের কথা তাদের নিজেদের পক্ষেও মেনে নেয়া কঠিন হয়ে পড়ছিল।

এভাবে প্রথম দু'টি বিষয়ের তুলনায় তৃতীয় বিষয়টি মেনে নেয়া ছিল মক্কাবাসীদের জন্য অনেক বেশী কঠিন। এ বিষয়টি তাদের সামনে পেশ করা হলে তারা এর সাথে সবচেয়ে বেশী বিদ্রূপাত্মক ব্যবহার করলো। এ ব্যাপারে তারা সবচেয়ে বেশী বিস্ময় প্রকাশ করলো। একে তারা সবচেয়ে বেশী অযৌক্তিক ও অসম্ভব মনে করে যেখানে সেখানে একথা ছড়াতে লাগলো যে তা একেবারে অবিশ্বাস্য ও অকল্পনীয়। কিন্তু তাদেরকে ইসলামের পথে নিয়ে আসার জন্য আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসকে তাদের মনের গভীরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া অপরিহার্য ছিল। কারণ আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী না হলে হক ও বাতিলের ব্যাপারে চিন্তার ক্ষেত্রে তারা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে পারতো না, ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাপারে তাদের মূল্যমানে পরিবর্তন সূচিত হওয়া সম্ভবপর হতো না এবং দুনিয়া পূজার পথ পরিহার করে তাদের পক্ষে ইসলাম প্রদর্শিত পথে এক পা চলাও সম্ভব হতো না। এ কারণে মক্কার প্রাথমিক যুগের সূরাগুলোতে আখেরাত বিশ্বাসকে মনের মধ্যে মজবুতভাবে বদ্ধমূল করে দেয়ার ওপরই বেশী জোর দেয়া হয়েছে। তবে এ জন্য এমনসব যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যার ফলে তাওহীদের ধারণা আপনা আপনি হৃদয়গ্রাহী হতে চলেছে। মাঝে মাঝে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনের সত্যতা প্রমাণের যুক্তিও সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এ যুগের সূরাগুলোতে আখেরাতের আলোচনা বারবার আসার কারণ ভালোভাবে অনুধাবন করার পর এবার এই সূরাটির আলোচ্য বিষয়গুলোর প্রতি নজর দেয়া যাক। কিয়ামতের খবর শুনে মক্কার পথেঘাটে অলিগলিতে সর্বত্র এবং মক্কাবাসীদের প্রত্যেকটি মাহফিলে যেসব আলোচনা, সমালোচানা, মন্তব্য ইত্যাদি শুরু হয়েছিল এখানে সবার আগে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। তারপর অস্বীকারকারীদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তোমাদের জন্য যে জমিকে আমি বিছানা বানিয়ে দিয়েছি তা কি তোমাদের নজরে পড়ে না? জমির মধ্যে আমি এই যে উঁচু উঁচু বিশাল বিস্তৃত পর্বত শ্রেণী গেঁড়ে রেখেছি তা কি তোমাদের নজরে পড়ে না? তোমরা কি নিজেদের দিকেও তাকাও না, কিভাবে আমি তোমাদের নারী ও পুরুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি? তোমরা নিজেদের নিদ্রাকে

দেখো না, যার মাধ্যমে দুনিয়ার বুকে তোমাদেরকে কাজের যোগ্য করে রাখার জন্য আমি তোমাদের কয়েক ঘন্টার পরিশ্রমের পর আবার কয়েক ঘন্টা বিশ্রাম নিতে বাধ্য করেছি? তোমরা কি রাত ও দিনের আসা-যাওয়া দেখছো না, তোমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যাকে যথারীতি ধারাবাহিকভাবে জারী রাখা হয়েছে? তোমরা কি নিজেদের মাথার উপর মজবুতভাবে সংঘবদ্ধ আকাশ ব্যবস্থাপনা দেখছো না? তোমরা কি এই সূর্য দেখছো না, যার বদৌলতে তোমরা আলো উত্তাপ লাভ করছো? তোমরা কি বৃষ্টিধারা দেখছো না, যা মেঘমালা থেকে বর্ষিত হচ্ছে এবং যার সাহায্যে ফসল, শাক-সব্জি সবুজ বাগান ও ঘন বন-জংগল সৃষ্টি হচ্ছে? এসব জিনিস কি তোমাদের একথাই জানাচ্ছে যে, যে মহান অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিধর এসব সৃষ্টি করেছেন, তিনি কিয়ামত অনুষ্ঠান ও আখেরাত সৃষ্টি করতে অক্ষম? এই সমগ্র কারখানাটিতে যে পরিপূর্ণ কলাকুশলতা ও বুদ্ধিমত্তার সুস্পষ্ট স্ফুরণ দেখা যায়, তা প্রত্যক্ষ করার পর কি তোমরা একথাই অনুধাবন করছো যে, সৃষ্টিলোকের এই কারখানার প্রতিটি অংশ, প্রতিটি বস্তু ও প্রতিটি কর্ম একটি উদ্দেশ্যের পেছনে ধাবিত হচ্ছে কিন্তু মূলত এই কারখানাটি নিজেই উদ্দেশ্যবিহীন? এ কারখানায় মানুষকে মুখপাত্রের (Foreman) দায়িত্বে নিযুক্ত করে তাকে এখানে বিরাট ও ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে কিন্তু যখন সে নিজের কাজ শেষ করে কারখানা ত্যাগ করে চলে যাবে তখন তাকে এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে, ভালোভাবে কাজ করার জন্য তাকে পুরস্কৃত করা হবে না ও পেনশন দেয়া হবে না এবং কাজ নষ্ট ও খারাপ করার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা এবং শাস্তি দেয়া হবে না; এর চাইতে অর্থহীন ও বাজে কথা মনে হয় আর কিছুই হতে পারে না। এ যুক্তি পেশ করার পর পূর্ণ শক্তিতে বলা হয়েছে, নিশ্চিতভাবে বিচারের দিন তার নির্ধারিত সময়ে অবশ্যি আসবে। শিংগায় একটি মাত্র ফুঁক দেবার সাথে সাথেই তোমাদের যেসব বিষয়ের খবর দেয়া হচ্ছে তা সবই সামনে এসে যাবে। তোমরা আজ তা স্বীকার করো বা না করো, সে সময় তোমরা যে যেখানে মরে থাকবে সেখান থেকে নিজেদের হিসেব দেবার জন্য দলে দলে বের হয়ে আসবে। তোমাদের অস্বীকৃতি সে ঘটনা অনুষ্ঠানের পথ রোধ করতে পারবে না।

এরপর ২১ থেকে ৩০ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে, যারা হিসেব-নিকেশের আশা করে না এবং যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে তাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজ গুণে গুণে আমার এখানে লিখিত হয়েছে। তাদেরকে শাস্তি দেবার জন্য জাহান্নাম ওঁৎপেতে বসে আছে। সেখানে তাদের কর্মকাণ্ডের পুরোপুরি বদলা তাদেরকে চুকিয়ে দেয়া হবে। তারা ৩১ থেকে ৩৬ পর্যন্ত আয়াতে এমন সব লোকের সর্বোত্তম প্রতিদানের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যারা নিজেদেরকে দায়িত্বশীল ও আল্লাহর কাছে নিজেদের সমস্ত কাজের জবাবদিহি করতে হবে মনে করে সবার আগে দুনিয়ার জীবনে নিজেদের আখেরাতের কাজ করার কথা চিন্তা করেছে। তাদের এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে যে, তাদের কার্যাবলীর কেবল প্রতিদানই দেয়া হবে না বরং তার চাইতে যথেষ্ট বশী পুরস্কারও দেয়া হবে।

সবশেষে আল্লহার আদালতের চিত্র আঁকা হয়েছে। সেখানে কারোর নিজের জিদ নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে যাওয়া এবং নিজের সাথে সম্পর্কিত লোকদের মাফ করিয়ে নেয়া তো দূরের কথা, অনুমতি ছাড়া কেউ কথাই বলতে পারবে না। আর অনুমতি হবে এ শর্ত সাপেক্ষে যে, যার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে একমাত্র তার জন্য সুপারিশ

করা যাবে এবং সুপারিশে কোন অসংগত কথাও বলা যাবে না। তাছাড়া একমাত্র তাদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে যারা দুনিয়ায় সত্যের কালেমার প্রতি সমর্থন দিয়েছে এবং নিছক গুনাহগার আল্লাহর বিধানের প্রতি বিদ্রোহভাবাপন্ন কোন সত্য অস্বীকারকারী কোন প্রকার সুপারিশ লাভের হকদার হবে না।

তারপর এক সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বক্তব্য শেষ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে দিনের আগমনী সংবাদ দেয়া হচ্ছে সেদিনটি নিশ্চিতভাবেই আসবে। তাকে দূরে মনে করো না। সে কাছেই এসে গেছে। এখন যার ইচ্ছা সেদিনটির কথা মেনে নিয়ে নিজের রবের পথ অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু এ সাবধানবাণী সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তাকে অস্বীকার করবে একদিন সমস্ত কর্মকাণ্ড তার সামনে এসে যাবে। তখন সে কেবল অনুতাপই করতে পারবে। সে আফসোস করে বলতে থাকবে, হায়! যদি দুনিয়ায় আমার জন্মই না হতো। আজ যে দুনিয়ার প্রেমে সে পাগলপারা সেদিন সেই দুনিয়ার জন্যই তার মনে এ অনুভূতি জাগবে।

আয়াত ৪০ **সূরা আন নাবা-মক্কী** রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝١ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۝٢ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ
مُخْتَلِفُوْنَ ۝٣ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٤ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٥ اَلَمْ نَجْعَلِ
الْاَرْضَ مِهٰدًا ۝٦ وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۝٧ وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۝٨ وَّجَعَلْنَا
نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝٩ وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۝١٠ وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝١١

এরা কি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? সেই বড় খবরটা সম্পর্কে কি, যে ব্যাপারে এরা নানান ধরনের কথা বলে ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ফিরছে?[১] কখ্খনো না,[২] শীঘ্রই এরা জানতে পারবে। হাঁ কখ্খনো না, শীঘ্রই এরা জানতে পারবে।[৩]

একথা কি সত্য নয়, আমি যমীনকে বিছানা বানিয়েছি?[৪] পাহাড়গুলোকে গেঁড়ে দিয়েছি পেরেকের মতো?[৫] তোমাদের (নারী ও পুরুষ) জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি?[৬] তোমাদের ঘুমকে করেছি শান্তির বাহন,[৭] রাতকে করেছি আবরণ এবং দিনকে জীবিকা আহরণের সময়?[৮]

১. বড় খবর বলতে কিয়ামত ও আখেরাতের কথা বুঝানো হয়েছে। মক্কাবাসীরা অবাক হয়ে কিয়ামত ও আখেরাতের কথা শুনতো। তারপর তাদের প্রত্যেকটি আলাপ-আলোচনায়, বৈঠকে, মজলিসে এ সম্পর্কে নানান ধরনের কথা বলতো ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো। জিজ্ঞাসাবাদ বলতেও এ নানা ধরনের কথাবার্তা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের কথাই বোঝানো হয়েছে। লোকেরা পরস্পরের সাথে দেখা হলে বলতো, আরে ভাই, শুনেছো নাকি? মানুষ নাকি মরে যাবার পরে আবার জীবিত হবে? এমন কথা আগে কখনো শুনেছিলে? যে মানুষটি মরে পচে গেছে, যার শরীরের হাড়গুলো পর্যন্ত মাটিতে মিশে গেছে, তার মধ্যে নাকি আবার নতুন করে প্রাণ সঞ্চার হবে, একথা কি মেনে নেয়া যায়? আগের পরের সব বংশধররা জেগে উঠে এক জায়গায় জমা হবে, একথা কি যুক্তিসম্মত? আকাশের বুকে মাথা উঁচু করে পৃথিবী পৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে থাকা এসব বড় বড় পাহাড় নাকি পেঁজা তুলোর মতো বাতাসে উড়তে থাকবে? চাঁদ, সুরুজ আর তারাদের আলো কি নিভে যেতে পারে? দুনিয়ার এই জমজমাট ব্যবস্থাটা কি ওলটপালট হয়ে যেতে পারে? এই

মানুষটি তো গতকাল পর্যন্তও বেশ জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ছিল, আজ তার কি হয়ে গেলো, আমাদের এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত খবর শুনিয়ে যাচ্ছে? এ জান্নাত ও জাহান্নাম এতদিন কোথায় ছিল? এর আগে কখনো আমরা তার মুখে একথা শুনিনি কেন? এখন এরা হঠাৎ টপকে পড়লো কোথা থেকে? কোথা থেকে এদের অদ্ভুত ধরনের ছবি এঁকে এনে আমাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে?

فِيهِ مُخْتَلِفُونَ আয়াতাংশটির একটি অর্থ তো হচ্ছে ঃ "এ ব্যাপারে তারা নানান ধরনের কথা বলছে ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ফিরছে।" এর দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে, দুনিয়ার পরিণাম সম্পর্কে তারা নিজেরাও কোন একটি অভিন্ন আকীদা পোষণ করে না বরং "তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়।" তাদের কেউ কেউ খৃষ্টানদের চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিল। কাজেই তারা মৃত্যুর পরের জীবন স্বীকার করতো। তবে এই সংগে তারা একথাও মনে করতো যে, এই জীবনটি শারীরিক নয়, আত্মিক পর্যায়ের হবে। কেউ কেউ আবার আখেরাত পুরোপুরি অস্বীকার করতো না, তবে তা ঘটতে পারে কিনা, এ ব্যাপারে তাদের সন্দেহ ছিল। কুরআন মজীদে এ ধরনের লোকদের এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ "আমরা তো মাত্র একটি ধারণাই পোষণ করি, আমাদের কোন নিশ্চিত বিশ্বাস নেই।" [আল জাসিয়াহ, ৩১] আবার কেউ কেউ একদম পরিষ্কার বলতো ঃ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ "আমাদের এ দুনিয়ার জীবনটিই সবকিছু এবং মরার পর আমাদের আর কখনো দ্বিতীয়বার উঠানো হবে না।" [আল আন'আম, ২৯] তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ সবকিছুর জন্য সময়কে দায়ী করতো। তারা বলতোঃ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ "আমাদের এই দুনিয়ার জীবনটিই সব কিছু। এখানেই আমরা মরি, এখানেই জীবন লাভ করি এবং সময়ের চক্র ছাড়া আর কিছুই নেই যা আমাদের ধ্বংস করে।" [আল জাসিয়া, ২৪] আবার এমন কিছু লোকও ছিল, যারা সময়কে সবকিছুর জন্য দায়ী না করলেও মৃত্যুর পরের জীবনকে অসম্ভব মনে করতো। অর্থাৎ তাদের মতে, মরা মানুষদের আবার জীবিত করে তোলার ক্ষমতা আল্লাহর ছিল না। তাদের বক্তব্য ছিল ঃ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ "এই হাড়গুলো পঁচেগলে নষ্ট হয়ে যাবার পর আবার এগুলোকে জীবিত করবে কে?" [ইয়াসীন, ৭৮] তাদের এসব বিভিন্ন বক্তব্য একথা প্রমাণ করে যে, এ বিষয়ে তাদের কোন সঠিক জ্ঞান ছিল না। বরং তারা নিছক আন্দাজ-অনুমান ও ধারণার বশবর্তী হয়ে অন্ধকারে তীর ছুঁড়ে যাচ্ছিল। নয়তো এ ব্যাপারে তাদের কাছে যদি কোন সঠিক জ্ঞান থাকতো তাহলে তারা সবাই একটি বক্তব্যের উপর একমত হতে পারতো (আরো বেশী জানার জন্য তাফহীমুল কুরআনের সূরা আয্ যারিয়াতের ৬ টীকা দেখুন)।

২. অর্থাৎ আখেরাত সম্পর্কে যেসব কথা এরা বলে যাচ্ছে এগুলো সবই ভুল। এরা যা কিছু মনে করেছে ও বুঝেছে তা কোনক্রমেই সঠিক নয়।

৩. অর্থাৎ যে বিষয়ে এরা নিজেরা নানা আজেবাজে কথা বলছে ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ফিরছে সেটি যথার্থ সত্য হয়ে এদের সামনে ফুটে ওঠার সময় মোটেই দূরে নয়। সে সময় এরা জানতে পারবে, রসূল এদেরকে যে খবর দিয়েছিলেন তা ছিল সঠিক এবং আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে এরা যেসব কথা তৈরী করছিল তা ছিল ভিত্তিহীন অসার।

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿١٣﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ
الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴿١٦﴾
إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴿١٧﴾ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾
وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١٩﴾ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾

তোমাদের ওপর সাতটি মজবুত আকাশ স্থাপন করেছি[৯] এবং একটি অতি উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত বাতি সৃষ্টি করেছি?[১০] আর মেঘমালা থেকে বর্ষণ করেছি অবিরাম বৃষ্টিধারা, যাতে তার সাহায্যে উৎপন্ন করতে পারি শস্য, শাক সব্জি ও নিবিড় বাগান?[১১]

নিসন্দেহে বিচারের দিনটি নির্ধারিত হয়েই আছে। যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তোমরা দলে দলে বের হয়ে আসবে।[১২] আকাশ খুলে দেয়া হবে, ফলে তা কেবল দরজার পর দরজায় পরিণত হবে। আর পর্বতমালাকে চলমান করা হবে, ফলে তা মরীচিকায় পরিণত হবে।[১৩]

৪. যমীনকে মানুষের জন্য বিছানা অর্থাৎ একটি শান্তিময় আবাস ভূমিতে পরিণত করার মধ্যে আল্লাহর যে নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান, ক্ষমতা ও কর্মকুশলতা সক্রিয় রয়েছে সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে তাফহীমুল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নীচের স্থানগুলো দেখুন ঃ তাফহীমুল কুরআন, আন নাম্‌ল ৭৩, ৭৪ ও ৮১ টীকা, ইয়াসীন ২৯ টীকা, আল মু'মিন ৯০ ও ৯১ টীকা, আয্‌ যুখ্‌রুফ ৭ টীকা, আল জাসিয়াহ ৭ টীকা এবং কাফ ১৮ টীকা।

৫. পৃথিবীতে পাহাড় সৃষ্টির কারণ এবং এর পেছনে আল্লাহর যে কল্যাণ স্পর্শ রয়েছে তা জানার জন্য তাফহীমুল কুরআনের সূরা আন নাহল ১২ টীকা, আন নম্‌ল ৭৪ টীকা এবং আল মুরসালাত ১৫ টীকা দেখুন।

৬. মানব জাতিকে নারী ও পুরুষের জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করার মধ্যে সৃষ্টিকর্তার যে মহান কল্যাণ ও উদ্দেশ্য রয়েছে তা বিস্তারিতভাবে জানার জন্য তাফহীমুল কুরআনের সূরা আল ফুরকান ৬৯ টীকা, আর রুম ২৮ থেকে ৩০ টীকা, ইয়াসীন ৩১ টীকা, আশ্‌ শূরা ৭৭ টীকা, আয্‌ যুখরুফ ১২ টীকা এবং আল কিয়ামাহ ২৫ টীকা দেখুন।

৭. মানুষকে দুনিয়ায় কাজ করার যোগ্য করার জন্য মহান আল্লাহ অত্যন্ত কর্মকুশলতা সহকারে তার প্রকৃতিতে ঘুমের এক অভিলাষ বা চাহিদা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। প্রতি কয়েক ঘন্টা পরিশ্রম করার পর এই চাহিদা আবার তাকে কয়েক ঘন্টা ঘুমাতে বাধ্য করে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য পড়ুন তাফহীমুল কুরআনের সূরা আর রুম ৩৩ টীকা।

৮. অর্থাৎ রাতকে অন্ধকার করে দিয়েছি। ফলে আলো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে তার মধ্যে তোমরা সহজেই ঘুমের প্রশান্তি লাভ করতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে দিনকে আলোকোজ্জ্বল করে দিয়েছি। ফলে তার মধ্যে তোমরা অতি সহজেই নিজেদের রুজি-রোজগারের জন্য কাজ করতে পারবে। পৃথিবীতে রাত-দিনের নিয়মিত ও নিরবচ্ছিন্ন আবর্তনের মধ্যে অসংখ্য কল্যাণ রয়েছে। কিন্তু তার মধ্য থেকে মাত্র এই একটি কল্যাণের দিকে ইংগিত করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ একথা বুঝাতে চান যে, এখানে যা কিছু ঘটছে এগুলো উদ্দেশ্যহীনভাবে বা ঘটনাক্রমে ঘটছে না। বরং এর পেছনে একটি মহান কল্যাণকর উদ্দেশ্য কাজ করছে। তোমাদের নিজেদের স্বার্থের সাথে এ উদ্দেশ্যের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তোমাদের অস্তিত্বের গঠন প্রকৃতি নিজের আরাম ও প্রশান্তির জন্য যে অন্ধকারের অভিলাষী ছিল তার জন্যে রাতকে এবং তার জীবিকার জন্য যে আলোর অভিলাষী ছিল তার জন্য দিনকে সরবরাহ করা হয়েছে। তোমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পাদিত এই ব্যবস্থাপনা নিজেই সাক্ষ্য দিয়ে চলছে যে, কোন জ্ঞানময় সত্তার কর্মকৌশল ছাড়া এটা সম্ভবপর হয়নি। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা ইউনুস ৬৫ টীকা, ইয়াসীন ৩২ টীকা, আল মু'মিন ৮৫ টীকা এবং আয্ যুখ্রুফ ৪ টীকা)।

৯. মজবুত বলা হয়েছে এ অর্থে যে, আকাশের সীমান্ত অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ, তার মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তনও কখনো হয় না। এ সীমানা পেরিয়ে উর্ধজগতের অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্য থেকে কোন একটিও কখনো অন্যের সাথে সংঘর্ষ বাধায় না এবং কোনটি কক্ষচ্যুত হয়ে পৃথিবীর বুকে আছড়েও পড়ে না। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য পড়ুন তাফহীমুল কুরআন আল বাকারাহ ৩৪ টীকা, আর রা'দ ২ টীকা, আল হিজর ৮ ও ১২ টীকা, আল মু'মিনুন ১৫ টীকা, লুকমান ১৩ টীকা, ইয়াসীন ৩৭ টীকা, আস্ সাফ্ফাত ৫ ও ৬ টীকা, আল মু'মিন ৯০ টীকা এবং কাফ ৭ ও ৮ টীকা)।

১০. এখানে সূর্যের কথা বলা হয়েছে। মূলে وَهَّاجٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে অতি উত্তপ্ত আবার অতি উজ্জ্বলও। তাই আয়াতের অনুবাদে আমি দু'টো অর্থই ব্যবহার করেছি। এ ছোট বাক্যটির মধ্যে মহান আল্লাহর শক্তি ও কর্মকুশলতার যে বিরাট নিদর্শনটির দিকে ইংগিত করা হয়েছে সে নিদর্শনটির অর্থাৎ সূর্যের ব্যাস পৃথিবী থেকে ১০৯ গুণ বেশী এবং তার আয়তন পৃথিবীর তুলনায় ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার গুণ বড়। তার তাপমাত্রা ১ কোটি ৪০ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। পৃথিবী থেকে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থান করা সত্ত্বেও তার আলোর শক্তি এত বেশী যে, মানুষ খালি চোখে তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করলে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলবে। তার উত্তাপ এত বেশী যে, পৃথিবীর কোথাও তার উত্তাপের ফলে তাপমাত্রা ১৪০ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত পৌছে যায়। মহান আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞান ও সৃষ্টিকুশলতার মাধ্যমে পৃথিবীকে সূর্য থেকে এক ভারসাম্যপূর্ণ দূরত্বে স্থাপন করেছেন। পৃথিবী তার বর্তমান অবস্থানের চাইতে সূর্যের বেশী কাছাকাছি নয় বলে অস্বাভাবিক গরম নয়। আবার বেশী দূরে নয় বলে অস্বাভাবিক ঠাণ্ডাও নয়। এ কারণে এখানে মানুষ, পশু-পাখি ও উদ্ভিদের জীবন ধারণ সম্ভবপর হয়েছে। সূর্য থেকে শক্তির অপরিমেয় ভাণ্ডার উৎসারিত হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে এবং এ শক্তিই পৃথিবীর বুকে আমাদের জীবন ধারণের উৎস। তারি সাহায্যে আমাদের ক্ষেতে ফসল পাকছে। এবং পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী তার আহার লাভ করছে। তারি উত্তাপে সাগরের

পানি বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে যায়, তারপর বাতাসের সাহায্যে দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে বারি বর্ষণ করে। এ সূর্যের বুকে মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ এমন বিশাল অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে রেখেছেন যা কোটি কোটি বছর থেকে সমগ্র সৌরজগতে আলো, উত্তাপ ও বিভিন্ন প্রকার রশ্মি অব্যাহতভাবে ছড়িয়ে চলছে।

১১. পৃথিবীতে বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থাপনা এবং উদ্ভিদের তরতাজা হয়ে ওঠার মধ্যে প্রতিনিয়ত আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও সৃষ্টিকুশলতার যে বিস্ময়কর আত্মপ্রকাশ ঘটে চলছে সে সম্পর্কে তাফহীমুল কুরআনের নিম্নোক্ত স্থানসমূহে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে ঃ সূরা আন নাহল ৫৩ টীকা, আল মু'মিনুন ১৭ টীকা, আশ্ শূ'আরা ৫ টীকা, আর রুম ৩৫ টীকা, ফাতের ১৯ টীকা, ইয়াসীন ২৯ টীকা, আল মু'মিন ২০ টীকা, আয যুখ্‌রুফ ১০-১১ টীকা এবং আল ওয়াকিয়াহ ২৮ থেকে ৩০ টীকা।

এ আয়াতগুলোতে একের পর এক বহু প্রাকৃতিক নিদর্শন ও যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে কিয়ামত ও আখেরাত অস্বীকারকারীদেরকে একথা জানানো হয়েছে যে, যদি তোমরা চোখ মেলে একবার পৃথিবীর চারদিকে তাকাও, পাহাড়-পর্বত, তোমাদের নিজেদের জন্ম, নিদ্রা, জাগরণ এবং দিন-রাত্রির আবর্তনের এই ব্যবস্থাপনাটি গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করো; বিশ্ব-জাহানে প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক ব্যবস্থা, আকাশ রাজ্যে প্রদীপ্ত সূর্য, মেঘপুঞ্জ থেকে বর্ষিত বৃষ্টিধারা এবং তার সাহায্যে উৎপন্ন তরুলতা ও বৃক্ষরাজির প্রতি দৃষ্টিপাত করো, তাহলে এসবের মধ্যে তোমরা দু'টি জিনিস সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবে। এক, একটি জবরদস্ত শক্তির সহায়তা ছাড়া এসব কিছু অস্তিত্বশীল হতে পারে না এবং এ ধরনের নিয়ম-শৃংখলার আওতাধীনে জারীও থাকতে পারে না। দুই, এসব জিনিসের প্রত্যেকটির মধ্যে একটি বিরাট হিকমত তথা প্রজ্ঞা ও তীক্ষ্ণ কর্মকুশলতা সক্রিয় রয়েছে এবং উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কোন একটি কাজও হচ্ছে না। যে মহাশক্তি এসব জিনিসকে অস্তিত্ব দান করতে পারে, এদেরকে ধ্বংস করে দেবার এবং ধ্বংস করার পর আবার নতুন করে অন্য আকৃতিতে সৃষ্টি করার তার ক্ষমতা নেই, এ ধরনের কথা এখন কেবলমাত্র একজন মূর্খই বলতে পারে। আর একথাও কেবলমাত্র একজন নির্বোধই বলতে পারে যে, যে জ্ঞানময় সত্তা এই বিশ্ব-জাহানের কোন একটি কাজও বিনা উদ্দেশ্যে করেননি, তিনি নিজের এ জগতে মানুষকে জেনে বুঝে ভালো ও মন্দের পার্থক্য, আনুগত্য ও অবাধ্যতার স্বাধীনতা এবং নিজের অসংখ্য সৃষ্টিকে কাজে লাগাবার ও ইচ্ছা মতো ব্যবহার করার ক্ষমতা বিনা উদ্দেশ্যেই দান করেছেন। একথাও কেবলমাত্র একজন নির্বোধই বলতে পারে। মানুষ তার সৃষ্ট এ জিনিসগুলোকে ভালোভাবে ব্যবহার করুক বা খারাপভাবে উভয় অবস্থার পরিণাম সমান হবে, একজন ভালো কাজ করতে করতে মারা যাবে, সে মাটিতে মিশে খতম হয়ে যাবে, আর একজন খারাপ কাজ করতে করতে মারা যাবে সেও মাটিতে মিশে খতম হয়ে যাবে, যে ভালো কাজ করবে সে তার ভালো কাজের কোন প্রতিদান পাবে না এবং যে খারাপ কাজ করবে সে ও তার খারাপ কাজের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে না এবং কোন প্রতিফল পাবে না, এ ধরনের কথা একজন জ্ঞানহীন মানুষই বিশ্বাস করতে পারে। মৃত্যুর পরের জীবন, কিয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কিত এসব যুক্তিই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, তাফহীমুল কুরআনের নিম্নোক্ত স্থানগুলো দেখুন ঃ আর রা'আদ ৭ টীকা, আল হজ্জ ৯ টীকা, আর রুম ৬ টীকা, সাবা ১০ ও ১২ টীকা এবং আস্ সাফ্‌ফাত ৮ ও ৯ টীকা।

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾ لِّلطَّاغِينَ مَآبًا ﴿٢٢﴾ لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾
لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَاءً وِفَاقًا ﴿٢٦﴾
إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ
أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٩﴾ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

আসলে জাহান্নাম একটি ফাঁদ।[১৪] বিদ্রোহীদের আবাস। সেখানে তারা যুগের পর যুগ পড়ে থাকবে।[১৫] সেখানে তারা গরম পানি ও ক্ষতঝরা ছাড়া কোন রকম ঠাণ্ডা এবং পানযোগ্য কোন জিনিসের স্বাদই পাবে না।[১৬] (তাদের কার্যকলাপের) পূর্ণ প্রতিফল। তারা কোন হিসেব-নিকেশের আশা করতো না। আমার আয়াতগুলোকে তারা একেবারেই মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল।[১৭] অথচ প্রত্যেকটি জিনিস আমি গুণে গুণে লিখে রেখেছিলাম।[১৮] এখন মজা বুঝ, আমি তোমাদের জন্য আযাব ছাড়া কোন জিনিসে আর কিছুই বাড়াবো না।

১২. এখানে শিংগার শেষ ফুঁকের কথা বলা হয়েছে। এর আওয়াজ বুলন্দ হবার সাথে সাথেই সমস্ত মরা মানুষ অকস্মাৎ জেগে উঠবে। "তোমরা বলতে শুধুমাত্র যাদেরকে তখন সম্বোধন করা হয়েছিল তাদের কথা বলা হয়নি বরং সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলো লোক দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছে ও করবে তাদের সবার কথা বলা হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইবরাহীম ৫৭ টীকা, আল হাজ্জ ১ টীকা, ইয়াসীন ৪৬ ও ৪৭ টীকা এবং আয্ যুমার ৭৯ টীকা)।

১৩. এখানে মনে রাখতে হবে, কুরআনের অন্যান্য স্থানের মতো এখানেও একই সাথে কিয়ামতের বিভিন্ন পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে, প্রথম আয়াতটিতে শেষ দফায় শিংগায় ফুঁক দেবার পর যে অবস্থার সৃষ্টি হবে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আর পরবর্তী দু'টি আয়াতে দ্বিতীয় দফায় শিংগায় ফুঁক দেবার পর যে অবস্থার সৃষ্টি হবে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে তাফহীমুল কুরআনের সূরা আল হাক্কার ১০ টীকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। "আকাশ খুলে দেয়া হবে" এর মানে হচ্ছে উর্ধজগতে কোন বাধা ও বন্ধন থাকবে না। সব দিক থেকে সব রকমের আসমানী বালা ও মুসিবতের এমন বন্যা নেমে আসতে থাকবে যেন মনে হবে তাদের আসার জন্য সমস্ত দরজা খুলে গেছে এবং তাদের বাধা দেবার জন্য কোন একটি দরজাও বন্ধ নেই। আর পাহাড়ের চলার ও মরীচিকায় পরিণত হবার মানে হচ্ছে, দেখতে দেখতে মুহূর্তের মধ্যে পর্বতমালা স্থানচ্যুত হয়ে শূন্যে উড়তে থাকবে। তারপর ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে যে, যেখানে একটু আগে বিশাল পর্বত ছিল সেখানে দেখা যাবে বিশাল বালুর সমুদ্র। এ অবস্থাকে সূরা ত্বাহায় নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ "এরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, সেদিন এ পাহাড়

কোথায় চলে যাবে? এদের বলে দাও, আমার রব তাদেরকে ধূলোয় পরিণত করে বাতাসে উড়িয়ে দেবেন এবং যমীনকে এমন একটি সমতল প্রান্তরে পরিণত করে দেবেন যে, তার মধ্যে কোথাও একটুও অসমতল ও উঁচুনীচু জায়গা এবং সমান্যতম ভাঁজও দেখতে পাবে না।" (১০৫–১০৭ আয়াত এবং ৮৩ টীকা)।

১৪. শিকার ধরার উপযোগী করে যে জায়গাটিকে গোপনে তৈরী করা হয় এবং নিজের অজ্ঞাতসারে শিকার যেখানে চলে এসে তার মধ্যে আটকে যায়, তাকেই বলে ফাঁদ। জাহান্নামের ক্ষেত্রে এ শব্দটি ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহর বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহাত্মক ভূমিকা অবলম্বন করে তারা জাহান্নামের ভয়ে ভীত না হয়ে দুনিয়ায় এ মনে করে লাফালাফি দাপাদাপি করে ফিরছে যে, আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব তাদের জন্য একটি ঢালাও বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এখানে তাদের পাকড়াও হবার কোন আশংকা নেই। কিন্তু জাহান্নাম তাদের জন্য এমন একটি গোপন ফাঁদ যেখানে তারা আকস্মিকভাবে আটকা পড়ে যায় এবং সেখান থেকে বের হবার আর কোন উপায় থাকে না।

১৫. মূলে আহকাব (أحقاب) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, একের পর এক আগমনকারী দীর্ঘ সময়। এমন একটি ধারাবাহিক যুগ যে, একটি যুগ শেষ হবার পর আর একটি যুগ শুরু হয়ে যায়। এ থেকে লোকেরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, জান্নাতের জীবন হবে চিরন্তন কিন্তু জাহান্নাম চিরন্তন হবে না। কারণ এ যুগ যতই দীর্ঘ হোক না কেন, এখানে যখন যুগ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তখন এ থেকে একথাই বুঝা যাচ্ছে যে, এ সময় অশেষ ও অফুরন্ত হবে না। বরং একদিন না একদিন তা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু দু'টি কারণে এই যুক্তি ভুল। এক, আরবীতে 'হাকব' শব্দের আভিধানিক অর্থের মধ্যেই এ ভাবধারা রয়েছে যে, একটি হাকবের পিছনে আর একটি হাকব রয়েছে। কাজেই আহকাব অপরিহার্যভাবে এমন যুগের জন্য বলা হবে যা একের পর এক আসতেই থাকবে এবং এমন কোন যুগ হবে না যার পর আর কোন যুগ আসবে না। দুই, কোন বিষয় সম্পর্কে কুরআন মজীদের কোন আয়াত থেকে এমন কোন অর্থ গ্রহণ করা নীতিগতভাবে ঠিক নয়, যা সেই একই বিষয় সম্পর্কিত কুরআনের অন্যান্য বর্ণনার সাথে সংঘর্ষশীল হয়। কুরআনের ৩৪ জায়গায় জাহান্নামবাসীদের জন্য 'খুলুদ' (চিরন্তন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তিন জায়গায় কেবল "খুলুদ" বলেই শেষ করা হয়নি বরং তার সাথে "আবাদান" "আবাদান" (চিরকাল) শব্দও বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এক জায়গায় পরিষ্কার বলা হয়েছে, "তারা চাইবে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে যেতে। কিন্তু তারা কখ্খনো সেখান থেকে বের হতে পারবে না এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব।" (আল মায়েদাহ ৩৭ আয়াত) আর এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ "যতদিন পৃথিবী ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত আছে ততদিন তারা এ অবস্থায় চিরকাল থাকবে, তবে তোমার রব যদি অন্য কিছু চান।" জান্নাতবাসীদের সম্পর্কেও এ একই কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ "যতদিন পৃথিবী ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত আছে ততদিন জান্নাতে তারা চিরকাল থাকবে, তবে তোমার রব যদি অন্য কিছু চান।" (হুদ ১০৭–১০৮ আয়াত) এই সুস্পষ্ট বক্তব্যের পর 'আহকাব' শব্দের ভিত্তিতে একথা বলার অবকাশ আর কতটুকু থাকে যে, আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণকারীরা জাহান্নামে চিরকাল অবস্থান করবে না বরং কখনো না কখনো তাদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে?

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَأْسًا
دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ﴿٣٥﴾

২ রুকূ'

অবশ্যি মুত্তাকীদের[১৯] জন্য সাফল্যের একটি স্থান রয়েছে। বাগ-বাগিচা, আঙুর, নবযৌবনা সমবয়সী তরুণীবৃন্দ[২০] এবং উচ্ছসিত পানপাত্র। সেখানে তারা শুনবে না কোন বাজে ও মিথ্যা কথা।[২১]

১৬. মূলে গাস্‌সাক (غَسَّاق) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হয় : পুঁজ, রক্ত, পুঁজ মেশানো রক্ত এবং চোখ ও গায়ের চামড়া থেকে বিভিন্ন ধরনের কঠোর দৈহিক নির্যাতনের ফলে যেসব রস বের হয়। এছাড়াও এ শব্দটি ভীষণ দুর্গন্ধ ও পঁচে গিয়ে উৎকট দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এমন জিনিসের জন্যও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

১৭. এ হচ্ছে তাদের জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব ভোগ করার কারণ। প্রথমত, দুনিয়ায় তারা এ মনে করে জীবন যাপন করতে থাকে যে, আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে নিজেদের আসনের হিসেব পেশ করার সময় কখনো আসবে না। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ নিজের নবীদের মাধ্যমে তাদের হিদায়াতের জন্য যেসব আয়াত পাঠিয়েছিলেন সেগুলো মেনে নিতে তারা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে এবং সেগুলোকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে।

১৮. অর্থাৎ তাদের সমস্ত কথা ও কাজ, তাদের সব রকমের উঠাবসা-চলাফেরা এমনকি তাদের চিন্তা, মনোভাব, সংকল্প ও উদ্দেশ্যাবলীর পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড আমি তৈরি করে রাখছিলাম। সেই রেকর্ড থেকে কোন কিছুই বাদ যেতে পারেনি। অথচ সেই নির্বোধদের এ সবের কোন খবর ছিল না। তারা নিজেদের জায়গায় বসে মনে করছিল, তারা কোন মগের মুল্লুকে বাস করছে, নিজেদের ইচ্ছে মতো তারা এখানে যাচ্ছেতাই করে যাবে এবং তাদের এসব স্বেচ্ছাচারের জন্যে কারোর কাছে জবাবদিহি করতে হবে না।

১৯. এখানে মুত্তাকী শব্দটি এমন সব লোকের মোকাবিলায় ব্যবহার করা হয়েছে যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের দুনিয়ার কার্যক্রমের হিসেব দেবার কোন ধারণা পোষণ করতো না। এবং যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাই নিশ্চিতভাবেই এ আয়াতে এমন সব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহর আয়াতকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিল এবং একথা মনে করে দুনিয়ায় জীবন যাপন করেছিল যে, কিয়ামতের দিন তাদের দুনিয়ায় সমস্ত কাজের হিসেব দিতে হবে।

২০. এর অর্থ এও হতে পারে যে, তারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে । আবার এ অর্থও হতে পারে যে, তাদেরকে যেসব পুরুষের স্ত্রী হিসেবে দেয়া হবে তারা সে সব স্বামীদের সমবয়স্কা হবে। ইতিপূর্বে সূরা সা'দ-এর ৫২ আয়াতে এবং সূরা ওয়াকিয়ার ৩৭ আয়াতেও এ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে।

جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۙ
لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ
فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿٣٩﴾ اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۚ يَوْمَ
يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿٤٠﴾

প্রতিদান ও যথেষ্ট পুরস্কার[২২] তোমাদের রবের পক্ষ থেকে, সেই পরম করুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি পৃথিবী ও আকাশসমূহের এবং তাদের মধ্যবর্তী প্রত্যেকটি জিনিসের মালিক, যার সামনে কারো কথা বলার শক্তি থাকবে না।[২৩]

যেদিন রূহ[২৪] ও ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। পরম করুণাময় যাকে অনুমতি দেবেন এবং যে ঠিক কথা বলবে, সে ছাড়া আর কেউ কথা বলবে না।[২৫] সেদিনটি নিশ্চিতভাবেই আসবে। এখন যার ইচ্ছা নিজের রবের দিকে ফেরার পথ ধরুক।

যে আযাবটি কাছে এসে গেছে সে সম্পর্কে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিলাম।[২৬] যেদিন মানুষ সেসব কিছুই দেখবে যা তার দু'টি হাত আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে এবং কাফের বলে উঠবে, হায়! আমি যদি মাটি হতাম।[২৭]

২১. জান্নাতে মানুষ কোন বাজে, নোংরা, মিথ্যা ও অর্থহীন কথা শুনবে না। মানুষের কান এ থেকে সংরক্ষিত থাকবে। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টিকে জান্নাতের বিরাট নিয়ামত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। জান্নাতে কোন কটূকথা ও আজেবাজে গপসপ হবে না। কেউ কারোর সাথে মিথ্যা কথা বলবে না এবং কারোর কথাকে মিথ্যাও বলবে না। দুনিয়ায় গালিগালাজ, মিথ্যা দোষারোপ, অভিযোগ, কুৎসা প্রচার ও অন্যের ওপর মিথ্যা দোষ চাপিয়ে দেবার যে ব্যাপক প্রচেষ্টা মানুষের সমাজে চলছে তার ছিঁটে ফোটাও সেখানে থাকবে না। (আরো বেশী ব্যাখ্যা জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা মারয়াম ৩৮ টীকা এবং আল ওয়াকিয়াহ ১৩ ও ১৪ টীকা।)

২২. প্রতিদান শব্দের পরে আবার যথেষ্ট পুরস্কার দেবার কথা বলার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, তারা নিজেদের সৎকাজের বিনিময়ে যে প্রতিদান লাভের অধিকারী হবে কেবলমাত্র ততটুকুই তাদেরকে দেয়া হবে না বরং তার ওপর অতিরিক্ত পুরস্কার এবং অনেক বেশী পুরস্কার দেয়া হবে। বিপরীত পক্ষে জাহান্নামবাসীদের জন্য কেবলমাত্র এতটুকুই বলা হয়েছে যে, তাদেরকে তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। অর্থাৎ তাদের যে পরিমাণ

অপরাধ তার চেয়ে বেশী শাস্তি দেয়া হবে না এবং কমও দেয়া হবে না। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে একথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা ইউনুস ২৬-২৭ আয়াত, আন নাম্‌ল ৮৯-৯০ আয়াত, আল কাসাস ৮৪ আয়াত, সাবা ৩৩ আয়াত এবং আল মু'মিন ৪০ আয়াত।

২৩. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে আল্লাহর দরবারের শান-শওকত, প্রভাব ও প্রতিপত্তি এমন পর্যায়ের হবে যার ফলে পৃথিবী বা আকাশের আধিবাসী কারোর আল্লাহর সামনে কথা বলার অথবা তাঁর আদালতের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করার সাহস হবে না।

২৪. অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এখানে জিব্রীল আলাইহিস সালামের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর দরবারে তিনি উন্নত মর্যাদার অধিকারী হবার কারণে এখানে অন্যান্য ফেরেশতাদের থেকে আলাদাভাবে তাঁর কথা বলা হয়েছে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা আল মা'আরিজ ৩ টীকা)

২৫. এখানে কথা বলা মানে শাফায়াত করা বলা হয়েছে, কেবলমাত্র দু'টি শর্ত সাপেক্ষে সেদিন এ শাফায়াত সম্ভব হবে। এক, যে ব্যক্তিকে যে গুনাহগারের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শাফায়াত করার অনুমতি দেয়া হবে একমাত্র সে-ই তার জন্য শাফায়াত করতে পারবে। দুই, শাফায়াতকারীকে সঠিক ও যথার্থ সত্য কথা বলতে হবে। অন্যায় সুপারিশ করতে পারবে না। দুনিয়ায় কমপক্ষে সত্যের কালেমার সমর্থক অর্থাৎ নিছক গুনাহগার ছিল, কাফের ছিল না, এমন ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করতে হবে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ ২৮১ টীকা, ইউনুস ৫ টীকা, হূদ ১০৬ টীকা, মারয়াম ৫২ টীকা, ত্বা-হা ৮৫-৮৬ টীকা, আল আম্বিয়া ২৭ টীকা, সাবা ৪০-৪১ টীকা, আল মু'মিন ৩২ টীকা, আয যুখ্‌রুফ ৬৮ টীকা, আন নাজম ২১ টীকা এবং আল মুদ্‌দাস্‌সির ৩৬ টীকা)

২৬. আপাতদৃষ্টিতে এক ব্যক্তি এখানে একথা চিন্তা করতে পারে যে যাদেরকে সম্বোধন করে একথা বলা হয়েছিল তারা চৌদ্দ'শ বছর আগে দুনিয়া থেকে চলে গেছে এবং এখনো বলা যেতে পারে না, কিয়ামত আগামী কত শত, হাজার বা লক্ষ বছর পরে আসবে, তাহলে একথাটি কোন্ অর্থে বলা হয়েছে যে, যে আযাবটি কাছে এসে গেছে সে সম্পর্কে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিলাম? তাছাড়া সূরার সূচনায় কেমন করে একথা বলা হলো যে, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে? এর জবাব এই যে, মানুষ যতক্ষণ এ দুনিয়ার স্থান ও কালের সীমানায় রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে অবস্থান করে কেবল ততক্ষণই তার মধ্যে সময়ের অনুভূতি থাকে। মরণের পরে যখন শুধুমাত্র রূহই বাকি থেকে যাবে তখন আর সময়ের চেতনা ও অনুভূতি থাকবে না। আর কিয়ামতের দিন মানুষ যখন পুনর্বার জীবিত হয়ে উঠবে তখন তার মনে হবে যেন এখনি ঘুমের মধ্যে কেউ তাকে জাগিয়ে দিয়েছে। হাজার হাজার বছর পরে তাকে আবার জীবিত করা হয়েছে, এ অনুভূতির লেশমাত্রও তখন তার মধ্যে থাকবে না। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নামল ২৬ টীকা, বনি ইসরাঈল ৫৬ টীকা, ত্বা-হা ৮০ টীকা এবং ইয়াসীন ৪৮ টীকা)

২৭. অর্থাৎ দুনিয়ায় জন্মই না হতো অথবা মরে গিয়ে মাটিতে মিশে যেতাম এবং আবার জীবিত হয়ে ওঠার সুযোগ না হতো।

আন নাযি'আত

৭৯

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ وَالنّٰزِعٰتِ থেকে এ নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন, "আম্মা ইয়াতাসা–আলূনা"র পরে এ সূরাটি নাযিল হয়। এটি যে প্রথম দিকের সূরা তা এর বিষয়বস্তু থেকেও প্রকাশ হচ্ছে।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে কিয়ামত ও মৃত্যুর পরের জীবনের প্রমাণ এবং এ সংগে আল্লাহর রসূলকে মিথ্যা বলার পরিণাম সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ।

বক্তব্যের সূচনায় মৃত্যুকালে প্রাণ হরণকারী, আল্লাহর বিধানসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নকারী এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সারা বিশ্ব–জাহানের ব্যবস্থা পরিচালনাকারী ফেরেশতাদের কসম খেয়ে নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে যে, কিয়ামত অবশ্যি হবে এবং মৃত্যুর পরে নিশ্চতভাবে আর একটি নতুন জীবনের সূচনা হবে। কারণ যে ফেরেশতাদের সাহায্যে আজ মানুষের প্রাণবায়ু নির্গত করা হচ্ছে তাদেরই সাহায্যে আবার মানুষের দেহে প্রাণ সঞ্চার করা যেতে পারে। যে ফেরেশতারা আজ মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে সংগে সংগেই আল্লাহর হুকুম তামিল করে যাচ্ছে এবং সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করছে, আগামীকাল সেই ফেরেশতারাই সেই একই আল্লাহর হুকুমে এ বিশ্ব ব্যবস্থা ওলটপালট করে দিতে এবং আর একটি নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

এরপর লোকদের জানানো হয়েছে, এই যে কাজটিকে তোমরা একেবারেই অসম্ভব মনে করো, আল্লাহর জন্য এটি আদতে এমন কোন কঠিন কাজই নয়, যার জন্য বিরাট ধরনের কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন হতে পারে। একবার ঝাঁকুনি দিলেই দুনিয়ার এ সমস্ত ব্যবস্থা ওলটপালট হয়ে যাবে। তারপর আর একবার ঝাঁকুনি দিলে তোমরা অকস্মাৎ নিজেদেরকে আর একটি নতুন জগতের বুকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পাবে। তখন যারা এ পরবর্তী জগতের কথা অস্বীকার করতো তারা ভয়ে কাঁপতে থাকবে। যেসব বিষয় তারা অসম্ভব মনে করতো তখন সেগুলো দেখতে থাকবে অবাক বিস্ময়ে।

তারপর সংক্ষেপে হযরত মূসা (আ) ও ফেরাউনের কথা বর্ণনা করে লোকদের সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর রসূলকে মিথ্যা বলার, তাঁর হিদায়াত ও পথনির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করার এবং প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তাঁকে পরাজিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবার পরিণাম ফেরাউন দেখে নিয়েছে। ফেরাউনের পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তোমরা যদি নিজেদের কর্মনীতি পরিবর্তন না করো তাহলে তোমাদের পরিণামও অন্য রকম হবে না।

এরপর ২৭ থেকে ৩৩ আয়াত পর্যন্ত মৃত্যুর পরের জীবনের সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই অস্বীকারকারীদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তোমাদের দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কি বেশী কঠিন কাজ অথবা প্রথমবার মহাশূন্যের অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র সহ এ বিশাল বিস্তীর্ণ বিশ্ব-জগত সৃষ্টি করা কঠিন কাজ? যে আল্লাহর জন্য এ কাজটি কঠিন ছিল না তাঁর জন্য তোমাদের দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেন? মাত্র একটি বাক্যে আখেরাতের সম্ভাবনার সপক্ষে এ অকাট্য যুক্তি পেশ করার পর পৃথিবীর প্রতি এবং পৃথিবীতে মানুষ ও অন্যান্য জীবের জীবন ধারণের জন্য যেসব উপকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। পৃথিবীতে জীবন ধারণের এ উপকরণের প্রতিটি বস্তুই এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও কর্মকুশলতা সহকারে তাকে কোন না কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ইংগিত করার পর মানুষের নিজের চিন্তা-ভাবনা করে মতামত গঠনের জন্য এ প্রশ্নটি তার বুদ্ধিবৃত্তির ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্ব-জাহানের এ বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থায় মানুষের মতো একটি বুদ্ধিমান জীবকে স্বাধীন ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও দায়িত্ব অর্পণ করে তার কাজের হিসেব নেয়া, অথবা সে পৃথিবীর বুকে সব রকমের কাজ করার পর মরে গিয়ে মাটির সাথে মিশে যাবে এবং চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তারপর তাকে যে ক্ষমতা-ইখতিয়ারগুলো দেয়া হয়েছিল সেগুলো সে কিভাবে ব্যবহার করেছে এবং যে দায়িত্বসমূহ তার ওপর অর্পণ করা হয়েছিল সেগুলো কিভাবে পালন করেছে, তার হিসেব কখনো নেয়া হবে না— এর মধ্যে কোনটি বেশী যুক্তিসংগত বলে মনে হয়? এ প্রশ্নে এখানে কোন আলোচনা করার পরিবর্তে ৩৪ থেকে ৪১ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে, হাশরের দিন মানুষের স্থায়ী ও চিরন্তন ভবিষ্যতের ফায়সালা করা হবে। দুনিয়ায় নির্ধারিত সীমানা লংঘন করে কে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করেছে, পার্থিব লাভ, স্বার্থ ও স্বাদ আস্বাদনকে উদ্দেশ্যে পরিণত করেছে এবং কে নিজের রবের সামনে হিসেব-নিকেশের জন্য দাঁড়াবার ব্যাপারে ভীতি অনুভব করেছে ও নফসের অবৈধ আকাংখা-বাসনা পূর্ণ করতে অস্বীকার করেছে, সেদিন এরি ভিত্তিতে ফায়সালা অনুষ্ঠিত হবে। একথার মধ্যেই ওপরের প্রশ্নের সঠিক জবাব রয়ে গেছে। জিদ ও হঠকারিতামুক্ত হয়ে ঈমানদারীর সাথে এ সম্পর্কে চিন্তা করলে যে কোন ব্যক্তিই এ জবাব হাসিল করতে পারে। কারণ মানুষকে দুনিয়ায় কাজ করার জন্য যেসব ইখতিয়ার ও দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে কাজ শেষে তার কাজের হিসেব নেয়া এবং তাকে শাস্তি বা পুরস্কার দেয়াই হচ্ছে এ ইখতিয়ার ও দায়িত্বের স্বাভাবিক, নৈতিক ও যুক্তিসংগত দাবী।

সবশেষে মক্কার কাফেরদের যে একটি প্রশ্ন ছিল 'কিয়ামত কবে আসবে,-তার জবাব দেয়া হয়েছে। এ প্রশ্নটি তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বারবার

করতো। জবাবে বলা হয়েছে, কিয়ামত কবে হবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। রসূলের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র কেয়ামত যে অবশ্যই হবে এ সম্পর্কে লোকদেরকে সতর্ক করে দেয়া। এখন যার ইচ্ছা কিয়ামতের ভয়ে নিজের কর্মনীতি সংশোধন করে নিতে পারে আবার যার ইচ্ছা কিয়ামতের ভয়ে ভীত না হয়ে লাগামহীনভাবে চলাফেরা করতে পারে। তারপর যখন সে সময়টি এসে যাবে তখন এ দুনিয়ার জীবনের জন্য যারা প্রাণ দিতো এবং একেই সবকিছু মনে করতো, তারা অনুভব করতে থাকবে, এ দুনিয়ার বুকে তারা মাত্র সামান্য সময় অবস্থান করেছিল। তখন তারা জানতে পারবে, এ মাত্র কয়েক দিনের জীবনের বিনিময়ে তারা চিরকালের জন্য নিজেদের ভবিষ্যত কিভাবে বরবাদ করে দিয়েছে।

আয়াত ৪৬ **সূরা আন নাযি'আত-মক্কী** রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۝١ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۝٢ وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۝٣
فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۝٤ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۝٥ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝٦ تَتْبَعُهَا
الرَّادِفَةُ ۝٧ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۝٨ اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝٩

সেই ফেরেশতাদের কসম যারা ডুব দিয়ে টানে এবং খুব আস্তে আস্তে বের করে নিয়ে যায়। আর (সেই ফেরেশতাদেরও যারা বিশ্বলোকে) দ্রুত গতিতে সাঁতরে চলে, বারবার (হুকুম পালনের ব্যাপারে) সবেগে এগিয়ে যায়, এরপর (আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী) সকল বিষয়ের কাজ পরিচালনা করে।[১] যেদিন ভূমিকম্পের ধাক্কা ঝাঁকুনি দেবে এবং তারপর আসবে আর একটি ধাক্কা।[২] কতক হৃদয় সেদিন ভয়ে কাঁপতে থাকবে।[৩] দৃষ্টি হবে তাদের ভীতি বিহবল।

১. এখানে যে বিষয়টির জন্য পাঁচটি গুণাবলীসম্পন্ন সত্তাসমূহের কসম খাওয়া হয়েছে তার কোন বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। কিন্তু পরবর্তী আলোচনায় যেসব বিষয় উত্থাপিত হয়েছে তা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামত অবশ্যি হবে এবং সমস্ত মৃত মানুষদের নিশ্চতভাবেই আবার নতুন করে জীবিত করে উঠানো হবে, একথার ওপরই এখানে কসম খাওয়া হয়েছে। এ পাঁচটি গুণাবলী কোন্ কোন্ সত্তার সাথে জড়িত, একথাও এখানে পরিষ্কার করে বলা হয়নি। কিন্তু বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেঈন এবং অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে এখানে ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), মাসরূক, সাঈদ ইবনে যুবাইর, আবু সালেহ, আবুদ্ দূহা ও সুদ্দী বলেন ঃ ডুব দিয়ে টানা এবং আস্তে আস্তে বের করে আনা এমন সব ফেরেশতার কাজ যারা মৃত্যুকালে মানুষের শরীরের গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তার প্রতিটি শিরা উপশিরা থেকে তার প্রাণ বায়ু টেনে বের করে আনে। দ্রুতগতিতে সাঁতরে চলার সাথে হযরত আলী (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর ও আবু সালেহ ফেরেশতাদেরকেই সংশ্লিষ্ট করেছেন। এ ফেরেশতারা আল্লাহর হুকুম তামিল করার জন্য এমন দ্রুত গতিশীল রয়েছে যেন মনে হচ্ছে তারা মহাশূন্যে সাঁতার কাটছে। "সবেগে এগিয়ে যাওয়ার" ব্যাপারেও এই একই অর্থ গ্রহণ করেছেন হযরত আলী (রা) মুজাহিদ, আতা, আবু সালেহ, মাসরূক ও

يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴿١١﴾ قَالُوا
تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ فَإِذَا هُم
بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾

এরা বলে, "সত্যিই কি আমাদের আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে? পচা–গলা হাড্ডিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পরও?" বলতে থাকে "তাহলে তো এ ফিরে আসা হবে বড়ই লোকসানের!"[৪] অথচ এটা শুধুমাত্র একটা বড় রকমের ধমক এবং হঠাৎ তারা হাযির হবে একটি খোলা ময়দানে।[৫]

হাসান বসরী প্রমুখগণ। আর সবেগে এগিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর হুকুমের ইশারা পাওয়ার সাথে সাথেই তাদের প্রত্যেকেই তা তামিল করার জন্যে দৌড়ে যায়। "সকল বিষয়ের কাজ পরিচালনাকারী বলতেও ফেরেশতাদের কথাই বুঝানো হয়েছে। হযরত আলী (রা), মুজাহিদ, আতা, আবু সালেহ, হাসান বসরী, কাতাদাহ থেকে একথাই উদ্ধৃত হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, এরা বিশ্ব ব্যবস্থাপনার এমন সব কর্মচারী যাদের হাতে আল্লাহর হুকুমে দুনিয়ার সমগ্র ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। কোন সহীহ হাদীসে এ আয়াতগুলোর এ অর্থ বর্ণিত না হলেও প্রথম সারির কয়েকজন সাহাবা এবং তাঁদেরই ছাত্রমণ্ডলীর অন্তরভুক্ত কতিপয় তাবেঈ যখন এগুলোর এ অর্থ বর্ণনা করেছেন তখন তাঁদের এই জ্ঞান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অর্জিত হয়ে থাকবে মনে করাটাই স্বাভাবিক।

এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া ও মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে ফেরেশতাদের কসম খাওয়ার কারণ কি? তারা নিজেরাই তো সে জিনিসের মতো অদৃশ্য ও অননুভূত, যা অনুষ্ঠিত হবার ব্যাপারে তাদেরকে সাক্ষী ও প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে? এর কারণ অবশ্য আল্লাহ ভালো জানেন। তবে আমার মতে এর কারণ হচ্ছে, আরববাসীরা ফেরেশতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না। তারা স্বীকার করতো মৃত্যুকালে ফেরেশতারাই মানুষের প্রাণ বের করে নিয়ে যায়। তারা একথাও বিশ্বাস করতো যে, ফেরেশতারা অতি দ্রুতগতিশীল হয়, এক মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলে যায় এবং হুকুম করার সাথে সাথেই যে কোন কাজ মুহূর্তকাল দেরী না করেই করে ফেলে। তারা একথাও মানতো, ফেরেশতারা আল্লাহর হুকুমের অনুগত এবং আল্লাহর হুকুমেই বিশ্ব–জাহানের সমগ্র ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে। ফেরেশতারা স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও কর্মপ্রেরণার অধিকারী নয়। মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে তারা অবশ্যি ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলতো। তারা তাদেরকে নিজেদের মাবুদে পরিণত করেছিল। কিন্তু আসল ক্ষমতা–ইখতিয়ার যে ফেরেশতাদের হাতে একথা তারা মনে করতো না। তাই এখানে কিয়ামত হওয়া এবং মৃত্যুর পরের জীবন প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই ফেরেশতাদের উপরোল্লিখিত গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে

هَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ مُوسٰى ﴿١٥﴾ إِذْ نَادٰىهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾
اذْهَبْ إِلٰى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغٰى ﴿١٧﴾ فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلٰى أَنْ تَزَكّٰى ﴿١٨﴾
وَأَهْدِيَكَ إِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ﴿١٩﴾ فَأَرٰىهُ الْآيَةَ الْكُبْرٰى ﴿٢٠﴾ فَكَذَّبَ
وَعَصٰى ﴿٢١﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعٰى ﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ فَنَادٰى ﴿٢٣﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ
الْأَعْلٰى ﴿٢٤﴾ فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولٰى ﴿٢٥﴾ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَعِبْرَةً
لِّمَن يَخْشٰى ﴿٢٦﴾

তোমার[৬] কাছে কি মূসার ঘটনার খবর পৌঁছেছে? যখন তার রব তাকে পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায়[৭] ডেকে বলেছিলেন, "ফেরাউনের কাছে যাও, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে। তাকে বলো, তোমার কি পবিত্রতা অবলম্বন করার আগ্রহ আছে এবং তোমার রবের দিকে আমি তোমাকে পথ দেখাবো, তাহলে তোমার মধ্যে (তাঁর) ভয় জাগবে?"[৮] তারপর মূসা ফেরাউনের কাছে গিয়ে তাকে বড় নিদর্শন[৯] দেখালো। কিন্তু সে মিথ্যা মনে করে প্রত্যাখ্যান করলো ও অমান্য করলো, তারপর চালবাজী করার মতলবে পিছন ফিরলো।[১০] এবং লোকদের জমায়েত করে তাদেরকে সম্বোধন করে বললো ঃ "আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় রব"[১১] অবশেষে আল্লাহ তাকে আখেরাত ও দুনিয়ার আযাবে পাকড়াও করলেন। আসলে এর মধ্যে রয়েছে মস্তবড় শিক্ষা, যে ভয় করে তার জন্যে।[১২]

যে, আল্লাহর হুকুমে ফেরেশতারা তোমাদের প্রাণ বের করে নিয়ে যায়, তাঁরই হুকুমে তারা আবার তোমাদের প্রাণ দানও করতে পারে। যে আল্লাহর হুকুমে তারা বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছে তাঁরই হুকুমে, যখনই তিনি এ হুকুম করবেন তখনই তারা এ বিশ্ব-জাহানকে ধ্বংস করে দিতে এবং আর একটি নতুন দুনিয়া সৃষ্টি করতেও পারে। তাঁর হুকুম তামিল করার ব্যাপারে তাদের পক্ষ থেকে সামান্যতম শৈথিল্য বা মুহূর্তকাল দেরীও হতে পারে না।

২. প্রথম ধাক্কা বলতে এমন ধাক্কা বুঝানো হয়েছে, যা পৃথিবী ও তার মধ্যকার সমস্ত জিনিস ধ্বংস করে দেবে। আর দ্বিতীয় ধাক্কা বলতে যে ধাক্কায় সমস্ত মৃতরা জীবিত হয়ে যমীনের মধ্য থেকে বের হয়ে আসবে তাকে বুঝানো হয়েছে। সূরা যুমারে এ অবস্থাটি নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ "আর শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। তখন পৃথিবী ও

আকাশসমূহে যা কিছু আছে সব মরে পড়ে যাবে, তবে কেবলমাত্র তারাই জীবিত থাকবে যাদের আল্লাহ (জীবিত রাখতে) চাইবেন। তারপর দ্বিতীয়বার ফুঁক দেয়া হবে। তখন তারা সবাই আবার হঠাৎ উঠে দেখতে থাকবে।" (৬৮ আয়াত)

৩. "কতক হৃদয়" বলা হয়েছে। কারণ কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র কাফের, নাফরমান ও মুনাফিকরাই কিয়ামতের দিন ভীত ও আতংকিত হবে। সৎ মু'মিন বান্দাদের ওপর এ ভীতি প্রভাব বিস্তার করবে না। সূরা আম্বিয়ায় তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "সেই চরম ভীতি ও আতংকের দিনে তারা একটুও পেরেশান হবে না এবং ফেরেশতারা এগিয়ে এসে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে। তারা বলতে থাকবে, তোমাদের সাথে এ দিনটিরই ওয়াদা করা হয়েছিল।" (১০৩ আয়াত)

৪. অর্থাৎ যখন তাদেরকে বলা হল, হাঁ সেখানে এমনটিই হবে, তারা বিদ্রূপ করে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো ঃ সত্যিই যদি আমাদের আবার জীবিত হয়ে ফিরে আসতে হয় তাহলে তো আমরা মারা পড়বো। এরপর আমাদের আর রক্ষে নেই।

৫. অর্থাৎ তারা এটাকে একটা অসম্ভব কাজ মনে করে একে বিদ্রূপ করছে। অথচ আল্লাহর জন্য এটা কোন কঠিন কাজ নয়। এ কাজটি করতে তাঁকে কোন বড় রকমের প্রস্তুতি নিতে হবে না। এর জন্য শুধুমাত্র একটি ধমক বা ঝাঁকুনিই যথেষ্ট। সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের শরীরের ধ্বংসাবশেষ মাটি বা ছাই যে কোন আকারেই থাক না কেন সব দিক থেকে উঠে এসে এক জায়গায় জমা হবে এবং অকস্মাৎ তোমরা নিজেদেরকে পৃথিবীর বুকে জীবিত আকারে দেখতে পাবে। এ ফিরে আসাকে যতই ক্ষতিকর মনে করে তোমরা তা থেকে পালিয়ে থাকার চেষ্টা করো না কেন, এ ঘটনা অব্যশই ঘটবে। তোমাদের অস্বীকার, পলায়ন প্রচেষ্টা বা ঠাট্টা-বিদ্রূপে এটা থেমে যাবে না।

৬. মক্কার কাফেরদের কিয়ামত ও আখেরাতকে না মানা এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা আসলে কোন দার্শনিক তত্ত্বের অস্বীকৃতি ছিল না। বরং এভাবে তারা আল্লাহর রসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করতো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে তারা যে কৌশল অবলম্বন করতো তা কোন সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে ছিল না। বরং তার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর রসূলকে আঘাত হানা ও ক্ষতিগ্রস্ত করা। তাই আখেরাতের জীবনের ব্যাপারে আরো বেশী যুক্তিপ্রমাণ পেশ করার আগে তাদেরকে হযরত মূসা (আ) ও ফেরাউনের ঘটনা শুনানো হচ্ছে। এভাবে তারা রসূলের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হওয়া এবং রসূল প্রেরণকারী আল্লাহর মোকাবিলায় মাথা উঁচু করার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যেতে পারবে।

৭. পবিত্র তুওয়া উপত্যকার অর্থ বর্ণনা করে সাধারণভাবে মুফাস্সিরগণ বলেছেন ঃ "সেই পবিত্র উপত্যকাটি যার নাম ছিল তুওয়া" কিন্তু এ ছাড়া এর আরো দু'টি অর্থও হয়। এক, "যে উপত্যকাটিকে দু'বার পবিত্র করা হয়েছে।" কারণ মহান আল্লাহ হযরত মূসা (আ)-কে সেখানে সম্বোধন করে প্রথম বার তাকে পবিত্র করেন। আর হযরত মূসা বনী ইসরাঈলকে মিসর থেকে বের করে এনে এ উপত্যকায় অবস্থান করলে আল্লাহ তাকে দ্বিতীয়বার পবিত্রতার মর্যাদায় ভূষিত করেন। দুই, "রাতে পবিত্র উপত্যকায় সম্বোধন

করেন।" আরবী প্রবাদে বলা হয় ঃ جاءبعدطوى অর্থাৎ উমুক ব্যক্তি রাতের কিছু অংশ অতিক্রম করার পর এসেছিল।

৮. এখানে কয়েকটি কথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে ঃ

এক ঃ হযরত মূসাকে নবুওয়াতের দায়িত্বে নিযুক্ত করার সময় তাঁর ও আল্লাহর মধ্যে যেসব কথা হয়েছিল কুরআন মজীদের যথার্থ স্থানে তা কোথাও সংক্ষেপে আবার কোথাও বিস্তারিত বিবৃত হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে বলার সুযোগ ছিল। তাই এখানে কেবল সেগুলোর সারাংশই বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা ত্বা-হার ৯ থেকে ৪৮, শূ'আরার ১০ থেকে ১৭, নামলের ৭ থেকে ১২ এবং কাসাসের ২৯ থেকে ৩৫ আয়াতে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দুই ঃ এখানে ফেরাউনের যে বিদ্রোহের কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে, বন্দেগীর সীমানা অতিক্রম করে স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ের মোকাবিলায় বিদ্রোহ করা। স্রষ্টার মোকাবিলায় বিদ্রোহ করার বিষয়টির আলোচনা সামনের দিকে এসে যাচ্ছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ ফেরাউন তার প্রজাদের সমবেত করে ঘোষণা করে, "আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় রব।" আর সৃষ্টির মোকাবিলায় তার বিদ্রোহ ও সীমালংঘন ছিল এই যে, সে নিজের শাসনাধীন এলাকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে ও শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিল। দুর্বল শ্রেণীগুলোর ওপর সে চালাতো কঠোর জুলুম-নির্যাতন এবং নিজের সমগ্র জাতিকে বোকা বানিয়ে তাদেরকে নিজের দাসে পরিণত করে রেখেছিল। একথা সূরা কাসাসের ১৪ আয়াতে এবং সূরা যুখরুফের ৫৪ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

তিন ঃ হযরত মূসাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল ঃ فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى "তুমি ও তোমার ভাই হারুন, তোমরা দু'জনে তার সাথে মোলায়েম সুরে কথা বলবে, হয়তো সে নসীহত গ্রহণ করতে ও আল্লাহকে ভয় করতে পারে।" (সূরা ত্বা-হা ৪৪ আয়াত) এ মোলায়েম সুরে কথা বলার একটা নমুনা এ আয়াতগুলোতে পেশ করা হয়েছে। এ থেকে একজন পথভ্রষ্ট ব্যক্তিকে পথ দেখাবার জন্য তার কাছে কিভাবে বিচক্ষণতার সাথে সত্যের দাওয়াত পেশ করতে হবে তার কলাকৌশল জানা যায়। এর দ্বিতীয় নমুনাটি পেশ করা হয়েছে সূরা ত্বা-হা'র ৪৯ থেকে ৫২, আশ্ শূ'আরার ২৩ থেকে ২৮ এবং আল কাসাসের ৩৭ আয়াতে। কুরআন মজীদে মহান আল্লাহ যেসব আয়াতে ইসলামের দাওয়াত প্রচারের কৌশল শিখিয়েছেন এ আয়াতগুলো তারই অন্তরভুক্ত।

চার ঃ হযরত মূসাকে শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলদের মুক্ত করার জন্য ফেরাউনের কাছে পাঠানো হয়নি, যেমন কোন কোন লোক মনে করে থাকেন। বরং তাঁকে নবুওয়াত দান করে ফেরাউনের কাছে পাঠাবার প্রথম উদ্দেশ্যই ছিল ফেরাউন ও তার কওমকে সত্য সঠিক পথ দেখানো। এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, যদি সে সত্য সঠিক পথ গ্রহণ না করে তাহলে তিনি বনী ইসরাঈলকে (যারা আসলে ছিল একটি মুসলিম কওম) তার দাসত্বমুক্ত করে মিসর থেকে বের করে আনবেন। 'এ আয়াতগুলো থেকেও একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ এগুলোতে বনী ইসরাঈলের রেহাইয়ের কোন উল্লেখই নেই। বরং হযরত মূসাকে

ফেরাউনের সামনে কেবলমাত্র সত্যের দাওয়াত প্রচার করার হুকুম দেয়া হয়েছে। যেসব আয়াতে হযরত মূসা ইসলামের বাণী প্রচার করেছেন এবং বনী ইসরাঈলদের রেহাই–এর দাবীও করেছেন সেসব আয়াত থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আল 'আরাফের ১০৪ থেকে ১০৫, ত্বা–হা'র ৪৭ থেকে ৫২, আশ শূ'আরার ১৬ থেকে ১৭ এবং ২৩ থেকে ২৮ আয়াত। (আরও বেশী ব্যাখ্যা জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা ইউনুসের ৭৪ টীকা দেখুন)

পাঁচ ঃ এখানে পবিত্রতা (আত্মিক শুদ্ধতা) অবলম্বন করার অর্থ হচ্ছে আকীদা–বিশ্বাস, চরিত্র ও কর্ম সবক্ষেত্রে পবিত্রতা অবলম্বন করা। অন্য কথায় ইসলাম গ্রহণ করা। ইবনে যায়েদ বলেন, কুরআনে যেখানেই ['তাযাক্কী' (আত্মিক) শুদ্ধতা] শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেখানেই এর অর্থ হয় ইসলাম গ্রহণ করা। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত তিনটি পেশ করেন ঃ وَذٰلِكَ جَزَاؤُ مَنْ تَزَكّٰى "আর এটি হচ্ছে তাদের প্রতিদান যারা পবিত্রতা অবলম্বন করে।" অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করে। وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى "আর তোমরা জান, হয়তো তারা পবিত্রতা অবলম্বন করতে পারে।" অর্থাৎ মুসলমান হয়ে যেতে পারে। وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى "আর কী যদি তারা পবিত্রতা অবলম্বন করতে না পারে তাহলে তোমার কি দায়িত্ব আছে?" অর্থাৎ যদি তারা মুসলমান না হয়। (ইবনে জারীর)।

ছয় ঃ আর "তোমার রবের দিকে আমি তোমাকে পথ দেখাবো, তাহলে তোমার মধ্যে (তাঁর) ভয় জাগবে" –একথার অর্থ হচ্ছে, যখন তুমি নিজের রবকে চিনে নেবে এবং তুমি জানতে পারবে যে, তুমি তার বান্দাহ, স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি নও তখন অনিবার্যভাবে তোমার দিলে তাঁর ভয় সৃষ্টি হবে। আর আল্লাহর ভয় এমন একটি জিনিস যার ওপর দুনিয়ার মানুষের সঠিক ও নির্ভুল দৃষ্টিভংগী গ্রহণ নির্ভর করে। আল্লাহর জ্ঞান এবং তাঁর ভয় ছাড়া কোন প্রকার পবিত্রতা ও শুদ্ধ আত্মার কথা কল্পনাই করা যেতে পারে না।

৯. বড় নিদর্শন বলতে এখানে লাঠির অজগর হয়ে যাওয়ার কথাই বুঝানো হয়েছে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এর উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্যি একটি নিষ্প্রাণ লাঠির মানুষের চোখের সামনে একটি জলজ্যান্ত অজগর সাপে পরিণত হওয়া, যাদুকরেরা এর মোকাবিলায় লাঠি ও দড়ি দিয়ে যেসব কৃত্রিম অজগর বানিয়ে দেখিয়েছিল সেগুলোকে টপাটপ গিলে ফেলা এবং হযরত মূসা (আ) যখন একে ধরে উঠিয়ে নিলেন তখন আবার এর লাঠি হয়ে যাওয়া, এর চাইতে বড় নিদর্শন আর কী হতে পারে? এসব একথারই সুস্পষ্ট আলামত যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই পক্ষ থেকে হযরত মূসা (আ) প্রেরিত হয়েছিলেন।

১০. কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ ফেরাউন সারা মিসর থেকে শ্রেষ্ঠ পারদর্শী যাদুকরদের ডেকে আনে এবং একটি বিশাল সাধারণ সমাবেশে তাদেরকে লাঠি ও দড়ি দিয়ে অজগর সাপ বানাতে বলে, যাতে করে লোক বিশ্বাস করে যে মূসা আলাইহিস সালাম কোন নবী নন বরং একজন যাদুকর এবং লাঠিকে অজগরে পরিণত করার যে তেলেসমাতি তিনি দেখিয়েছেন অন্যান্য যাদুকররাও তা দেখাতে পারে। কিন্তু তার এ প্রতারণাপূর্ণ কৌশল ব্যর্থ হলো এবং যাদুকররা পরাজিত

ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ۚ بَنَاهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ﴿٢٨﴾
وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٢٩﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ﴿٣٠﴾
أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿٣٢﴾ مَتَاعًا لَّكُمْ
وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾

২ রুকূ'

তোমাদের[১৩] সৃষ্টি করা বেশী কঠিন কাজ, না আকাশের?[১৪] আল্লাহই তাকে সৃষ্টি করেছেন, তার ছাদ অনেক উঁচু করেছেন। তারপর তার ভারসাম্য কায়েম করেছেন। তার রাতকে ঢেকে দিয়েছেন এবং তার দিনকে প্রকাশ করেছেন।[১৫] এরপর তিনি যমীনকে বিছিয়েছেন।[১৬] তার মধ্য থেকে তার পানি ও উদ্ভিদ বের করেছেন[১৭] এবং তার মধ্যে পাহাড় গেড়ে দিয়েছেন, জীবন যাপনের সামগ্রী হিসেবে তোমাদের ও তোমাদের গৃহপালিত পশুদের জন্য।[১৮]

হয়ে নিজেরাই স্বীকার করে নিল যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যা কিছু দেখিয়েছেন তা যাদু নয় বরং মু'জিযা।

১১. ফেরাউনের এ দাবীটি কুরআনের কয়েকটি স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। একবার সে হযরত মূসা (আ)-কে বলে, "যদি তুমি আমাকে ছাড়া আর কাউকে আল্লাহ বলে মেনে নিয়ে থাকো তাহলে আমি তোমাকে বন্দী করবো।" (আশ শু'আরার ২৯ আয়াত) আর একবার সে তার দরবারের লোকদের সম্বোধন করে বলে, "হে জাতির প্রধানরা আমি জানি না আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন খোদাও আছে।" (আল কাসাস ৩৮ আয়াত) ফেরাউনের এসব বক্তব্যের এ অর্থ ছিল না এবং এ অর্থ হতেও পারে না যে, সে-ই এই বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা এবং এ পৃথিবীটাও সে সৃষ্টি করেছে। এ সবের এ অর্থও ছিল না যে, সে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে এবং নিজেকেই বিশ্ব-জাহানের রব বলে দাবী করে। আবার এ অর্থও ছিল না যে, সে ধর্মীয় অর্থে একমাত্র নিজেকেই লোকদের মাবুদ ও উপাস্য গণ্য করে। তার ধর্মের ব্যাপারে কুরআন মজীদই এর সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সে নিজেই অন্য উপাস্যদের পূজা করতো। তাই দেখা যায় তার সভাসদরা একবার তাকে সম্বোধন করে বলে, "আপনি কি মূসাকে ও তার কওমকে দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করার এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে ত্যাগ করার স্বাধীনতা দিতে থাকবেন? (আল আ'রাফ ১২৭ আয়াত) কুরআনে ফেরাউনের এ বক্তব্যও উদ্ধৃত হয়েছে যে, মূসা যদি আল্লাহর প্রেরিত হতো তাহলে তার কাছে সোনার কাঁকন অবতীর্ণ করা হয়নি কেন? অথবা তার সাথে ফেরেশতাদেরকে চাপরাশি-আরদালি হিসেবে পাঠানো হয়নি কেন? (আয্ যুখরুফ ৫৩ আয়াত) কাজেই এ থেকে বুঝা যায় যে, আসলে সে ধর্মীয় অর্থে নয়

বরং রাজনৈতিক অর্থে নিজেকে ইলাহ, উপাস্য ও প্রধান রব হিসেবে পেশ করতো। অর্থাৎ এর অর্থ ছিল, আমি হচ্ছি প্রধান কর্তৃত্বের মালিক। আমি ছাড়া আর কেউ আমার রাজ্যে হুকুম চালাবার অধিকার রাখে না। আর আমার ওপর আর কোন উচ্চতর ক্ষমতাধরও নেই, যার ফরমান এখানে জারী হতে পারে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ ৮৫ টীকা, ত্বা-হা ২১ টীকা, আশ্ শূ'আরা ২৪ ও ২৬ টীকা, আল কাসাস ৫২ ও ৫৩ টীকা এবং আয যুখরুফ ৪৯ টীকা)

১২. অর্থাৎ আল্লাহর রসূলকে মিথ্যা বলার ও তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার পরিণামকে ভয় করো। ফেরাউন এই পরিণামের মুখোমুখি হয়েছিল।

১৩. কিয়ামত ও মৃত্যুর পরের জীবন যে সম্ভব এবং তা যে সৃষ্টি জগতের পরিবেশ পরিস্থিতির যুক্তিসংগত দাবী একথার যৌক্তিকতা এখানে পেশ করা হয়েছে।

১৪. এখানে সৃষ্টি করা মানে দ্বিতীয়বার মানুষ সৃষ্টি করা। আর আকাশ মানে সমগ্র উর্ধজগত, যেখানে রয়েছে অসংখ্য গ্রহ, তারকা, অগণিত সৌরজগত, নীহারিকা ও ছায়াপথ। একথা বলার অর্থ হচ্ছে ঃ তোমরা মৃত্যুর পর আবার জীবিত করাকে বড়ই অসম্ভব কাজ মনে করছো। বারবার বলছো, আমাদের হাড়গুলো পর্যন্ত যখন পচে গলে যাবে, সে অবস্থায় আমাদের শরীরের বিক্ষিপ্ত অংশগুলো আবার এক জায়গায় জমা করা হবে এবং তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হবে, এটা কেমন করে সম্ভব? তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, এই বিশাল বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টি বেশী কঠিন কাজ, না তোমাদের একবার সৃষ্টি করার পর দ্বিতীয়বার সেই একই আকৃতিতে সৃষ্টি করা কঠিন? যে আল্লাহর জন্য প্রথমটি কঠিন ছিল না তার জন্য দ্বিতীয়টি অসম্ভব হবে কেন? মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে এই যুক্তিটিই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পেশ করা হয়েছে। যেমন সূরা ইয়াসিনে বলা হয়েছে ঃ "আর যিনি আকাশ ও পৃথিবী তৈরি করেছেন, তিনি কি এই ধরনের জিনিসগুলোকে (পুনর্বার) সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন না? কেন নয়? তিনি তো মহাপরাক্রমশালী স্রষ্টা। সৃষ্টি করার কাজ তিনি খুব ভালো করেই জানেন।" (৮১ আয়াত) সূরা মু'মিনে বলা হয়েছে ঃ "অবশ্যি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টির চাইতে অনেক বেশী বড় কাজ। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। (৫৭ আয়াত)

১৫. রাত ও দিনকে আকাশের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। কারণ আকাশের সূর্য অস্ত যাওয়ার ফলে রাত হয় এবং সূর্য উঠার ফলে হয় দিন। রাতের জন্য ঢেকে দেয়া শব্দটি এই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে যে, সূর্য অস্ত যাওয়ার পর রাতে অন্ধকার পৃথিবীর ওপর এমনভাবে ছেয়ে যায় যেন ওপর থেকে তার ওপর পরদা দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়।

১৬. "এরপর তিনি যমীনকে বিছিয়েছেন"-এর অর্থ এ নয় যে, আকাশ সৃষ্টি করার পরই আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; এটা ঠিক এমনই একটা বর্ণনা পদ্ধতি যেমন আমরা বলে থাকি, "তারপর একথাটা চিন্তা করতে হবে।" এর মানে এ নয় যে, প্রথমে ওই কথাটা বলা হয়েছে তারপর একথাটা বলা হচ্ছে। এভাবে আগের কথার সাথে একথাটার ঘটনামূলক ধারাবাহিক সম্পর্কের বিষয় বর্ণনা করা এখানে উদ্দেশ্য নয় বরং দু'টো কথা একসাথে বলা হলেও এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হয় একটা কথার পরে দ্বিতীয় কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা। এই বর্ণনা পদ্ধতির অসংখ্য নজীর কুরআন মজীদেই পাওয়া

যাবে। যেমন সূরা কলমে বলা হয়েছে ঃ عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ "জালেম এবং তারপর বজ্জাত" এর অর্থ এ নয় যে, প্রথমে সে জালেম হয়েছে তারপর হয়েছে বজ্জাত। বরং এর অর্থ হচ্ছে, সে জালেম এবং তার ওপর অতিরিক্ত হচ্ছে সে বজ্জাতও। এভাবে সূরা বালাদে বলা হয়েছে ঃ فَكُّ رَقَبَةٍ ..... ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا "দাসকে মুক্ত করে দেয়া .....তারপর মু'মিনদের অন্তরভুক্ত হওয়া।" এর অর্থও এ নয় যে, প্রথমে সে (দাস মুক্ত করে) সৎকাজ করবে তারপর ঈমান আনবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, এসব সৎকাজ করার প্রবণতার সাথে সাথে তার মধ্যে মু'মিন হবার গুণটিও থাকতে হবে। এখানে একথাটিও অনুধাবন করতে হবে যে, কুরআনে কোথাও পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারটি আগে এবং আকাশ সৃষ্টির ব্যাপারটি পরে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সূরা বাকারার ২৯ আয়াতে। আবার কোথাও আকাশ সৃষ্টির ব্যাপারটি আগে এবং পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারটি পরে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন এই আয়াতগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটি আসলে কোন বিপরীতধর্মী বক্তব্য নয়। কুরআনের এসব জায়গায় কোথাও কাকে আগে ও কাকে পরে সৃষ্টি করা হয়েছে, একথা বলা মূল বক্তব্যের উদ্দেশ্য নয়। বরং যেখানে পরিবেশ ও পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী আল্লাহর অসীম ক্ষমতা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, সেখানে আকাশসমূহের আলোচনা প্রথমে করা হয়েছে এবং পৃথিবীর আলোচনা করা হয়েছে পরে। আবার যেখানে ভাষণের ধারা অনুযায়ী পৃথিবীতে মানুষ যেসব নিয়ামত লাভ করছে সেগুলোর কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সেখানে পৃথিবীর আলোচনা করা হয়েছে আকাশের আগে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআন, হা-মীম আস্ সাজদাহ ১৩ থেকে ১৪ টীকা দেখুন)

১৭. উদ্ভিদ বলতে শুধু প্রাণীদের খাদ্য উদ্ভিদের কথা বলা হয়নি বরং মানুষ ও পশু উভয়ের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত যাবতীয় উদ্ভিদের কথা বলা হয়েছে। রা'আ (رَعْى) ও রত্'আ (رتع) শব্দ দু'টি যদিও সাধারণভাবে আরবী ভাষায় পশুদের চারণভূমির জন্য ব্যবহার করা হয়, তবুও কখনো কখনো মানুষের জন্যও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফের (আ) ভাইয়েরা তাদের মহামান্য পিতাকে বলেন ঃ اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ "আপনি আগামীকাল ইউসুফকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। কিছু চরে বেড়াবে এবং খেলাধূলাও করবে" (১৩ আয়াত) এখানে শিশু কিশোরের জন্য চরে বেড়ানো শব্দটি বনের মধ্যে চলাফেরা ও ঘোরাঘুরি করে গাছ থেকে ফল পাড়া ও খাওয়া অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

১৮. এই আয়াতগুলোতে কিয়ামত ও মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য দুই ধরনের যুক্তি পেশ করা হয়েছে। এক, যে আল্লাহ অসাধারণ বিস্ময়কর ভারসাম্য সহকারে বিশাল বিস্তৃত বিশ্বজগত এবং জীবন যাপনের নানাবিধ উপকরণ সহকারে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তাঁর অসীম ক্ষমতা বলে কিয়ামত ও মৃত্যুর পরের জীবনের অনুষ্ঠান মোটেই কঠিন ও অসম্ভব ব্যাপার নয়। দুই, এই মহাবিশ্বে ও এ পৃথিবীতে আল্লাহর পূর্ণ জ্ঞানবত্তার যেসব নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, তা একথাই প্রমাণ করে যে, এখানে কোন কাজই উদ্দেশ্যহীনভাবে হচ্ছে না। মহাশূন্যে অসংখ্য গ্রহ, তারকা, নীহারিকা ও ছায়াপথের মধ্যে যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তা একথারই সাক্ষ্য বহন করছে যে, এসব কিছু অকস্মাৎ হয়ে যায়নি। বরং এর পেছনে একটি অত্যন্ত সুচিন্তিত পরিকল্পনা কাজ করে যাচ্ছে। একটি

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ﴿٣٥﴾
وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴿٣٦﴾ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴿٣٧﴾ وَآثَرَ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ
رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

তারপর যখন মহাবিপর্যয় ঘটবে।[১৯] যেদিন মানুষ নিজে যা কিছু করেছে তা সব স্মরণ করবে[২০] এবং প্রত্যেক দর্শনকারীর সামনে জাহান্নাম খুলে ধরা হবে, তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছিল এবং দুনিয়ার জীবনকে বেশী ভালো মনে করে বেছে নিয়েছিল, জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা। আর যে ব্যক্তি নিজের রবের সামনে এসে দাঁড়াবার ব্যাপারে ভীত ছিল এবং নফসকে খারাপ কামনা থেকে বিরত রেখেছিল তার ঠিকানা হবে জান্নাত।[২১]

নিয়মের অধীনে এই রাত ও দিনের আসা যাওয়া একথাই প্রমাণ করে যে, পৃথিবীতে জনবসতি গড়ে তোলার জন্য পূর্ণ বিজ্ঞতা সহকারে এই নিয়ম-শৃংখলা কায়েম করা হয়েছে। এ পৃথিবীতেই এমন এলাকা আছে যেখানে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দিন রাত্রির আবর্তন হয়। আবার এমন এলাকাও আছে যেখানে রাত হয় অতি দীর্ঘ এবং দিনও হয় অতি দীর্ঘ। পৃথিবীর জনবসতির অনেক বড় অংশ প্রথম এলাকায় অবস্থিত। আবার যেখানে রাত ও দিন যত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে যেতে থাকে সেখানে জীবন যাপনও হয় তত বেশী কঠিন ও কষ্টকর। ফলে জনবসতিও সেখানে তত বেশী কম হয়ে যেতে থাকে। এমন কি যে এলাকায় ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত হয় সে এলাকা জনবসতির মোটেই উপযোগী নয়। এ পৃথিবীতেই এ দু'টি নমুনা দেখিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহ এ সত্যটি প্রমাণ করেছেন যে, রাত ও দিনের যথা নিয়মে যাওয়া আসার ব্যবস্থা কোন ঘটনাক্রমিক ব্যাপার নয় বরং পৃথিবীকে মানুষের উপযোগী করার জন্য বিপুল জ্ঞান ও কলা কুশলতা সহকারে একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ অনুযায়ীই এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে পৃথিবীকে তিনি এমনভাবে বিছিয়ে দিয়েছেন যার ফলে তা মানুষের বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। তার মধ্যে এমন পানি সৃষ্টি করেছেন, যা মানুষ ও পশু পান করতে এবং যার সাহায্যে উদ্ভিদ জীবনী শক্তি লাভ করতে পারে তার মধ্যে পাহাড় গেড়ে দিয়েছেন এবং এমন সব জিনিস সৃষ্টি করেছেন যা মানুষ ও সব ধরনের প্রাণীর জীবন ধারণের মাধ্যমে পরিণত হতে পারে। এসব কিছুই একথা প্রমাণ করে যে, এগুলো হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা নয় বা কোন বাজিকর ডুগডুগি বাজিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে এসব করে বসেনি। বরং এর প্রত্যেকটি কাজই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সম্পন্ন করেছেন একজন সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞান সম্পন্ন সত্তা। এখন কিয়ামত ও পরকালের জীবন অনুষ্ঠিত হওয়া বা না হওয়া কোন্‌টা যুক্তিসংগত ও বুদ্ধি-বিবেচনাসম্মত, সুস্থবুদ্ধি বিবেক সম্পন্ন প্রতিটি ব্যক্তিই একথা চিন্তা করতে পারে।

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَىٰهَا ﴿٤٣﴾
إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰهَا ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَىٰهَا ﴿٤٥﴾ كَأَنَّهُمْ
يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا ﴿٤٦﴾

এরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, সেই সময়টি (কিয়ামত) কখন আসবে?[২২] সেই সময়টি বলার সাথে তোমার সম্পর্ক কি? এর জ্ঞান তো আল্লাহ পর্যন্তই শেষ। তাঁর ভয়ে ভীত এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সতর্ক করাই শুধুমাত্র তোমার দায়িত্ব।[২৩] যেদিন এরা তা দেখে নেবে সেদিন এরা অনুভব করবে যেন (এরা দুনিয়ায় অথবা মৃত অবস্থায়) একদিন বিকালে বা সকালে অবস্থান করেছে মাত্র।[২৪]

এই সমস্ত জিনিস দেখার পরও যে ব্যক্তি বলে আখেরাত অনুষ্ঠিত হবে না সে যেন বলতে চায়, এখানে অন্য সবকিছুই হিকমত তথা জ্ঞান–বুদ্ধি–বিচক্ষণতা ও বিশেষ উদ্দেশ্য সহকারে হচ্ছে, তবে শুধুমাত্র পৃথিবীতে মানুষকে যে বুদ্ধি, সচেতনতা ও ক্ষমতা ইখতিয়ার দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এর পেছনে কোন উদ্দেশ্য ও বুদ্ধি–বিচক্ষণতা নেই। কারণ এই পৃথিবীতে মানুষকে বিপুল ক্ষমতা ইখতিয়ার দিয়ে সব রকমের ভালো মন্দ কাজ করার স্বাধীনতা ও সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে কিন্তু কখনো তার কাজের কোন হিসেব নেয়া হবে না,—এর চেয়ে বড় উদ্দেশ্যহীনতা ও অযৌক্তিক কথা আর কিছুই হতে পারে না।

১৯. এই মহাবিপর্যয় হচ্ছে কিয়ামত। এ জন্য এখানে الطَّآمَّةُ الْكُبْرَىٰ (আত্তাম্মাতুল কুবরা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। "তাম্মাহ্" বলতে এমন ধরনের মহাবিপদ বুঝায় যা সবকিছুর ওপর ছেয়ে যায়। এরপর আবার তার সাথে "কুবরা" (মহা) শব্দ ব্যবহার করে একথা প্রকাশ করা হয়েছে যে সেই বিপদ ও বিপর্যয়ের ভয়াবহতা ও ব্যাপকতা বুঝাবার জন্য শুধুমাত্র "তাম্মাহ্" শব্দ যথেষ্ট নয়।

২০. অর্থাৎ যেদিন মানুষ দেখে নেবে যে, দুনিয়ায় যে হিসেব–নিকেশের খবর তাকে দেয়া হয়েছিল সেদিনটি এসে গেছে। সে সময় আমলনামা হাতে দেবার আগে দুনিয়ায় সে যা কিছু করেছিল এক এক করে সবকিছু তার মনে পড়ে যাবে। কোন কোন লোক দুনিয়াতেও এ অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে যে হঠাৎ তারা কোন ভয়াবহ বিপদের মুখোমুখি হয়। মৃত্যুকে তাদের একেবারে অতি নিকটে দেখতে পায়। এ অবস্থায় নিজেদের সারা জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের চিত্র তাদের মানস পটে মুহূর্তের মধ্যে ভেসে ওঠে।

২১. আখেরাতে আসল ফায়সালার ভিত্তি কি, সে কথা এখানে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে বলে দেয়া হয়েছে। দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে একটি দৃষ্টিভংগী হচ্ছে, মানুষ দাসত্বের সীমানা অতিক্রম করে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে এবং স্থির করে নিয়েছে যে, যেভাবেই হোক না কেন দুনিয়ার স্বার্থ হাসিল ও দুনিয়ার স্বাদ আস্বাদন করাই তার লক্ষ।

এ সম্পর্কে দ্বিতীয় দৃষ্টিভংগীটি হচ্ছে দুনিয়াবী জীবন যাপন করার সময় মানুষকে খেয়াল রাখতে হবে যে, একদিন তাকে নিজের রবের সামনে হাজির হতে হবে এবং প্রবৃত্তির অভিলাশ পূরণ করতে সে এ জন্য বিরত থাকবে যে, যদি এখানে সে নিজের প্রবৃত্তির দাবী মেনে নিয়ে কোন অবৈধ সুযোগ–সুবিধা লাভ করে অথবা কোন অবৈধ ভোগবিলাসে লিপ্ত হয়, তাহলে নিজের রবের কাছে এর কি জবাব দেবে? মানুষ দুনিয়ার জীবনে দু'টি দৃষ্টিভংগীর মধ্য থেকে কোন্‌টি গ্রহণ করবে এরি ওপর আখেরাতের ফায়সালা নির্ভর করবে। যদি প্রথমটি গ্রহণ করে তাহলে তার স্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর যদি দ্বিতীয়টি গ্রহুণ করে, তাহলে তার স্থায়ী ও চিরন্তন আবাস হবে জান্নাত।

২২. মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বারবার এ প্রশ্ন করতো। তাদের এ প্রশ্নটি করার উদ্দেশ্য ছিল কিয়ামত কবে হবে, তার সময় ও তারিখ জানা নয় বরং এ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা। (আরো বেশী ব্যাখ্যা জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা মুল্‌ক ৩৫ টীকা দেখুন)

২৩. এর ব্যাখ্যাও সূরা মুল্‌কের ৩৬ টীকায় আলোচিত হয়েছে। তবে এখানে তার ভয়ে ভীত প্রত্যেক ব্যক্তিকে সতর্ক করে দেয়াই শুধুমাত্র তোমার দায়িত্ব—একথা বলার অর্থ এ নয় যে, যারা ভীত নয় তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া তোমার দায়িত্ব নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের সতর্ক করে দেবার ফায়দা তারাই লাভ করতে পারবে যারা সেদিনটির আসার ভয়ে ভীত থাকবে।

২৪. এ বিষয়বস্তুটি এর আগেও কুরআনের আরো কয়েকটি জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলোর ব্যাখ্যা আমি সেখানে করে এসেছি। এ জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা ইউনুস ৫৩ টীকা, বনী ইসরাঈল ৫৬ টীকা, ত্বা–হা ৮০ টীকা, আল মু'মিনূন ১০১ টীকা, আর রূম ৮১–৮২ টীকা ও ইয়াসীন ৪৮ টীকা দেখুন। এ ছাড়াও সূরা আহকাফের ৩৫ আয়াতেও এ বিষয়বস্তুটি বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে আমি এর ব্যাখ্যা করিনি। কারণ এর আগেও কয়েক জায়গায় এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আবাসা

৮০

নামকরণ

এই সূরার প্রথম শব্দ عَبَسَ কে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিসগণ একযোগে এ সূরা নাযিলের নিম্নরূপ কারণ বর্ণনা করেছেন। একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে মক্কা মুয়ায্‌যমার কয়েক জন বড় বড় সরদার বসেছিলেন। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে উদ্যোগী করার জন্য তিনি তাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করছিলেন। এমন সময় ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) নামক একজন অন্ধ তাঁর খেদমতে হাজির হলেন এবং তাঁর কাছে ইসলাম সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতে চাইলেন। তার এই পশ্নে সরদারদের সাথে আলাপে' বাধা সৃষ্টি হওয়ায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরক্ত হলেন। তিনি তার কথায় কান দিলেন না। এই ঘটনায় আল্লাহর পক্ষ থেকে এই সূরাটি নাযিল হয়। এ ঐতিহাসিক ঘটনার কারণে এ সূরা নাযিলের সময়-কাল সহজেই নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

এ ব্যাপারে প্রথম কথা হচ্ছে, হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) একেবারেই প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী ও হাফেজ ইবনে কাসীর বলেন ঃ اَسْلَمَ بِمَكَّةَ قَدِيْمًا (তিনি একেবারেই প্রথম দিকে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন) এবং هُوَ مِمَّنْ اَسْلَمَ قَدِيْمًا (তিনি একেবারেই প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তরভুক্ত)। অর্থাৎ ইসলাম প্রচারের একেবারেই শুরুতে তিনি মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়ত, যেসব হাদীসে এ ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে তার কোন কোনটি থেকে জানা যায়, এ ঘটনাটির আগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবার কোন কোন হাদীস থেকে প্রকাশ হয়, এ সময় তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং সত্যের সন্ধানেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসেছিলেন। হযরত আয়েশার (রা) বর্ণনা মতে, তিনি এসে বলেছিলেন ঃ يَا رَسُوْلَ اللّٰه ارشدنى "হে আল্লাহর রসূল! আমাকে সত্য-সরল পথ দেখিয়ে দিন।" (তিরমিযি, হাকেম ইবনে হিব্বান, ইবনে জারীর, আবু লাইলা) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি এসেই কুরআনের একটি আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করতে থাকেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ يارسول اللّٰه علّمنى مما علّمك اللّٰه "হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আপনাকে যে জ্ঞান শিখিয়েছেন আমাকে সেই জ্ঞান শেখান।" (ইবনে জারীর,

ইবনে আবী হাতেম) এসব বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর নবী এবং কুরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে মেনে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে ইবনে যায়েদ তৃতীয় আয়াতে উল্লেখিত لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (হয়তো সে পরিশুদ্ধ হবে) এর অর্থ করেছেন لَعَلَّهُ يُسْلِمُ (হয়তো সে ইসলাম গ্রহণ করবে)। (ইবনে জারীর) আবার আল্লাহ নিজেই বলেছেন : "তুমি কী জানো, হয়তো সে সংশোধিত হয়ে যাবে অথবা উপদেশের প্রতি মনোযোগী হবে এবং উপদেশ দেয়া তার জন্য উপকারী হবে?" এ ছাড়া আল্লাহ এও বলেছেন : "যে নিজে তোমার কাছে দৌড়ে আসে এবং ভীত হয় তার কথায় তুমি কান দিচ্ছো না।" একথা থেকে ইংগিত পাওয়া যায়, তখন তার মধ্যে সত্য অনুসন্ধানের গভীরতর প্রেরণা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই হেদায়াতের উৎস মনে করে তাঁর খেদমতে হাযির হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছেই নিজের চাহিদা পূরণ হবে বলে মনে করছিলেন। তাঁর অবস্থা একথা প্রকাশ করছিল যে, তাঁকে সত্য সরল পথের সন্ধান দেয়া হলে তিনি সে পথে চলবেন।

তৃতীয়ত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে সে সময় যারা উপস্থিত ছিল বিভিন্ন রেওয়ায়াতে তাদের নাম উল্লেখিত হয়েছে। তারা ছিল উতবা, শাইবা, আবু জেহেল, উমাইয়া ইবনে খালাফ, উবাই ইবনে খালফ প্রমুখ ইসলামের ঘোর শত্রুরা। এ থেকে জানা যায়, এ ঘটনাটি তখনই ঘটেছিল যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এই লোকগুলোর মেলামেশা বন্ধ হয়নি। তাদের সাথে বিরোধ ও সংঘাত তখনো এমন পর্যায়ে পৌঁছেনি যে, তাঁর কাছে তাদের আসা যাওয়া এবং তাঁর সাথে তাদের মেলামেশা বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকবে। এসব বিষয় প্রমাণ করে, এ সূরাটি একেবারেই প্রথম দিকে নাযিলকৃত সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

আপাতদৃষ্টিতে ভাষণের সূচনায় যে বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তা দেখে মনে হয়, অন্ধের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন ও তার কথায় কান না দিয়ে বড় বড় সরদারদের প্রতি মনোযোগ দেবার কারণে এই সূরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিরস্কার ও তাঁর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু পুরো সূরাটির সমস্ত বিষয়বস্তুকে একসাথে সামনে রেখে চিন্তা করলে দেখা যাবে, আসলে এখানে ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছে কুরাইশদের কাফের সরদারদের বিরুদ্ধে। কারণ এই সরদাররা তাদের অহংকার, হঠধর্মিতা ও সত্য বিমুখতার কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যের দাওয়াতকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করছিল। এই সংগে এখানে নবীকে তাঁর সত্য দীনের দাওয়াত দেবার সঠিক পদ্ধতি শেখাবার সাথে সাথে নবুওয়াত লাভের প্রথম অবস্থায় নিজের কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে তিনি যে পদ্ধতিগত ভুল করে যাচ্ছিলেন তা তাঁকে বুঝানো হয়েছে। একজন অন্ধের প্রতি তাঁর অমনোযোগিতা ও তার কথায় কান না দিয়ে কুরাইশ সরদারদের প্রতি মনোযোগী হওয়ার কারণ এ ছিল না যে, তিনি বড়লোকদের বেশী সম্মানিত মনে করতেন এবং একজন অন্ধকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন, নাউযুবিল্লাহ তাঁর চরিত্রে এই ধরনের কোন বক্রতা ছিল না যার ফলে আল্লাহ তাঁকে

পাকড়াও করতে পারেন। বরং আসল ব্যাপার এই ছিল, একজন সত্য দীনের দাওয়াত দানকারী যখন তাঁর দাওয়াতের কাজ শুরু করেন তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর দৃষ্টি চলে যায় জাতির প্রভাবশালী লোকদের দিকে। তিনি চান, এই প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করুক। এভাবে তাঁর কাজ সহজ হয়ে যাবে। আর অন্যদিকে দুর্বল, অক্ষম ও সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন লোকদের মধ্যে তাঁর দাওয়াত ছড়িয়ে পড়লেও তাতে সমাজ ব্যবস্থায় কোন বড় রকমের পার্থক্য দেখা দেয় না। প্রথম দিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও প্রায় এই একই ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর এই কর্মপদ্ধতি গ্রহণের পেছনে একান্তভাবে কাজ করেছিল তাঁর আন্তরিকতা ও সত্য দীনের দাওয়াতকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেবার প্রেরণা। বড়লোকদের প্রতি সম্মানবোধ এবং গরীব, দুর্বল ও প্রভাবহীন লোকদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করার ধারণা এর পেছনে মোটেই সক্রিয় ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে বুঝালেন, এটা ইসলামী দাওয়াতের সঠিক পদ্ধতি নয়। বরং এই দাওয়াতের দৃষ্টিতে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই গুরুত্বের অধিকারী, যে সত্যের সন্ধানে ফিরছে, সে যতই দুর্বল, প্রভাবহীন ও অক্ষম হোক না কেন আবার এর দৃষ্টিতে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই গুরুত্বহীন, যে নিজেই সত্যবিমুখ, সে সমাজে যত বড় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন। তাই ইসলামের দাওয়াত আপনি জোরেশোরে সবাইকে দিয়ে যান কিন্তু যাদের মধ্যে সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করার আগ্রহ পাওয়া যায় তারাই হবে আপনার আগ্রহের আসল কেন্দ্রবিন্দু। আর যেসব আত্মম্ভরী লোক নিজেদের অহংকারে মত্ত হয়ে মনে করে, আপনি ছাড়া তাদের চলবে কিন্তু তারা ছাড়া আপনার চলবে না, তাদের সামনে আপনার এই দাওয়াত পেশ করা এই দাওয়াতের উন্নত মর্যাদার সাথে মোটেই খাপ খায় না।

সূরার প্রথম থেকে ১৬ আয়াত পর্যন্ত এই বিষয়বস্তুই আলোচিত হয়েছে। তারপর ১৭ আয়াত থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী কাফেরদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছে। তারা নিজেদের স্রষ্টা ও রিযিকদাতা আল্লাহর মোকাবিলায় যে দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি অবলম্বন করেছিল প্রথমে সে জন্য তাদের নিন্দা ও তিরস্কার করা হয়েছে। সবশেষে তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের এই কর্মনীতির অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণাম দেখতে পাবে।

আয়াত ৪২ **সূরা আবাসা-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى ۝١ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۝٢ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى ۝٣
اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۝٤ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۝٥ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۝٦
وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ۝٧ وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ۝٨ وَهُوَ يَخْشٰى ۝٩ فَاَنْتَ
عَنْهُ تَلَهّٰى ۝١٠ كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝١١ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۝١٢ فِىْ صُحُفٍ
مُّكَرَّمَةٍ ۝١٣ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝١٤ بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ ۝١٥ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝١٦

ভ্রুকুঁচকাল ও মুখ ফিরিয়ে নিল, কারণ সেই অন্ধটি তার কাছে এসেছে।[১] তুমি কী জানো, হয়তো সে শুধরে যেতো অথবা উপদেশের প্রতি মনোযোগী হতো এবং উপদেশ দেয়া তার জন্য উপকারী হতো? যে ব্যক্তি বেপরোয়া ভাব দেখায় তুমি তার প্রতি মনোযোগী হও, অথচ সে যদি শুধরে না যায় তাহলে তোমার ওপর এর কি দায়িত্ব আছে? আর যে নিজে তোমার কাছে দৌড়ে আসে এবং সে ভীত হচ্ছে, তার দিক থেকে তুমি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো।[২] কখ্খনো নয়,[৩] এটি তো একটি উপদেশ,[৪] যার ইচ্ছা এটি গ্রহণ করবে। এটি এমন সব বইতে লিখিত আছে, যা সম্মানিত, উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন ও পবিত্র[৫] এটি মর্যাদাবান ও পূত চরিত্র লেখকদের[৬] হাতে থাকে।[৭]

১. এই প্রথম বাক্যটির প্রকাশভংগী বড়ই চমকপ্রদ। পরবর্তী বাক্যগুলোতে সরাসরি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। এ থেকে একথা প্রকাশ হয় যে, ভ্রুকুঁচকাবার ও মুখ ফিরিয়ে নেবার কাজটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই করেছিলেন। কিন্তু বাক্যটির সূচনা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে মনে হয়েছে, তিনি নন অন্য কেউ এ কাজটি করেছে। এই প্রকাশভংগীর মাধ্যমে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে এই অনুভূতি সৃষ্টি করা হয়েছে যে, এটা আপনার করার মতো কাজ ছিল না। আপনার উন্নত চরিত্রের সাথে

পরিচিত কোন ব্যক্তি এ কাজটি দেখলে ভাবতো, আপনি নন বরং অন্য কেউ এ কাজটি করছে।

এখানে যে অন্ধের কথা বলা হয়েছে, ইতিপূর্বে ভূমিকায় আমরা এ সম্পর্কিত আলোচনায় বলেছি, তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা)। হাফেয ইবনে আবদুল বার তাঁর 'আল ইসতিআব' এবং হাফেয ইবনে হাজার 'আল ইসাবাহ' গ্রন্থে তাঁকে উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজার (রা) ফুফাত ভাই বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা লিখেছেন, তাঁর মা উম্মে মাকতূম ছিলেন হযরত খাদীজার (রা) পিতা খুওয়াইলিদের সহোদর বোন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর এই আত্মীয়তার সম্পর্ক জানার পর তিনি যে তাঁকে গরীব বা কম মর্যাদা সম্পন্ন মনে করে তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখিয়েছিলেন এবং বড়লোকদের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন এ ধরনের সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশ থাকে না। কারণ তিনি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন শ্যালক। বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে সমাজের সাধারণ শ্রেণীভুক্ত নন বরং অভিজাত বংশীয় ছিলেন। তাঁর প্রতি তিনি যে আচরণ করেছিলেন তা 'অন্ধ' শব্দটি থেকেই সুস্পষ্ট। রসূলের (সা) অনাগ্রহ ও বিরূপ আচরণের কারণ হিসেবে আল্লাহ নিজেই এ শব্দটি উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ রসূলে করীমের (সা) ধারণা ছিল, আমি বর্তমানে যেসব লোকের পেছনে লেগে আছি এবং যাদেরকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করছি তাদের একজনও যদি হেদায়াত লাভ করে তাহলে তার মাধ্যমে ইসলামের শক্তি অনেকগুণ বেড়ে যেতে পারে। বিপরীত পক্ষে ইবনে উম্মে মাকতূম হচ্ছেন একজন অন্ধ। দৃষ্টিশক্তি না থাকার কারণে এই সরদারদের মধ্য থেকে একজনের ইসলাম গ্রহণ ইসলামের জন্য যতটা লাভজনক হবে ইবনে মাকতূমের ইসলাম গ্রহণ ততটা লাভজনক হতে পারে না। তাই তিনি মনে করেছিলেন, সরদারদের সাথে আলোচনার মাঝখানে বাধা না দিয়ে অন্য সময় তিনি যা কিছু জানতে চান জেনে নিতে পারবেন।

২. দীন প্রচারের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মূল বিষয়টির প্রতিই অবহেলা প্রদর্শন করেছিলেন। আর এই বিষয়টি বুঝাবার জন্যই মহান আল্লাহ প্রথমে ইবনে উম্মে মাকতূমের সাথে আচরণের ব্যাপারে তাঁকে পাকড়াও করেন। তারপর সত্যের আহবায়কের দৃষ্টিতে কোন্ জিনিসটি সত্যিকারভাবে গুরুত্ব লাভ করবে এবং কোন্ জিনিসটি গুরুত্ব লাভ করবে না তা তাঁকে জানান। একদিকে এক ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা পরিষ্কারভাবে একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, সে সত্যের সন্ধানে ফিরছে, বাতিলের অনুগামী হয়ে আল্লাহর গযবের মুখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে সে ভীত সন্ত্রস্ত। তাই সত্য–সঠিক পথ সম্পর্কে জানার জন্য সে নিজে পায়ে হেঁটে চলে এসেছে। অন্যদিকে আর এক ব্যক্তির আচরণ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে যে, সত্য সন্ধানের কোন আগ্রহই তার মনে নেই। বরং সে নিজেকে কারুর সত্য পথ জানিয়ে দেবার মুখাপেক্ষীই মনে করে না। এই দু' ধরনের লোকের মধ্যে কে ঈমান আনলে দীনের বেশী উপকার হতে পারে এবং কার ঈমান আনা দীনের প্রচার এই প্রসারের বেশী সহায়ক নয়, এটা দেখার বিষয় নয়। বরং এখানে দেখার বিষয় হচ্ছে, কে হেদায়াত গ্রহণ করে নিজেকে সুধরে নিতে প্রস্তুত এবং কে হেদায়াতের এই মূল্যবান সম্পদটির আদতে কোন কদরই করে না। প্রথম ধরনের লোক অন্ধ, কানা খোঁড়া, অংগহীন সহায় সম্বল শক্তি সামর্থহীন হলে এবং বাহ্যত দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন বড় রকমের অবদান রাখার যোগ্যতা

সম্পন্ন না হলেও হকের আহবায়কের কাছে তিনিই হবেন মূল্যবান ব্যক্তি। তার দিকেই তাঁকে নজর দিতে হবে। কারণ এই দাওয়াতের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর বান্দাদের জীবন ও কার্যক্রম সংশোধন করা। আর এই ব্যক্তির অবস্থা একথা প্রকাশ করছে যে, তাকে উপদেশ দেয়া হলে সে সংশোধিত হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় ধরনের লোকদের ব্যাপারে বলা যায়, তারা সমাজে যতই প্রভাবশালী হোক না কেন, সত্যের আহবায়কের তাদের পেছনে লেগে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতিই প্রকাশ্যে একথা জানাচ্ছে যে, তারা সংশোধিত হতে চায় না। কাজেই তাদের সংশোধন করার প্রচেষ্টায় সময় ব্যয় করা নিছক সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা সংশোধিত হতে না চাইলে তাদেরই ক্ষতি, সত্যের আহবায়কের ওপর এর কোন দায়–দায়িত্ব নেই।

৩. অর্থাৎ এমনটি কখনো করো না। যেসব লোক আল্লাহকে ভুলে আছে এবং যারা নিজেদের দুনিয়াবী সহায়–সম্পদ ও প্রভাব–প্রতিপত্তির অহংকারে মত্ত হয়ে আছে, তাদেরকে অযথা গুরুত্ব দিয়ো না। ইসলামের শিক্ষা এমন কোন জিনিস নয় যে, যে ব্যক্তি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে তার সামনে নতজানু হয়ে তা পেশ করতে হবে। আবার এই ধরনের অহংকারী লোককে ইসলামের দিকে আহবান করার জন্য এমন ধরনের কোন প্রচেষ্টা চালানোও তোমার মর্যাদা বিরোধী, যার ফলে সে এ ভুল ধারণা করে বসে যে, তার সাথে তোমার কোন স্বার্থ জড়িত আছে এবং সে মেনে নিলে তোমার দাওয়াত সম্প্রসারিত হবার পথ প্রশস্ত হবে। অন্যথায় তুমি ব্যর্থ হয়ে যাবে। সে সত্যের যতটা মুখাপেক্ষী নয় সত্যও তার ততটা মুখাপেক্ষী নয়।

৪. অর্থাৎ কুরআন।

৫. অর্থাৎ সব ধরনের মিশ্রণ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। এর মধ্যে নির্ভেজাল সত্যের শিক্ষা পেশ করা হয়েছে। কোন ধরনের বাতিল, অসৎ ও অন্যায় চিন্তা ও মতবাদের কোন স্থানই সেখানে নেই। দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মগুলো যেসব ময়লা–আবর্জনা ও দুর্গন্ধে ভরে তোলা হয়েছে, তার সামান্য গন্ধটুকুও এখানে নেই। মানুষের চিন্তা–ভাবনা কল্পনা বা শয়তানী ওয়াসওয়াসা ও দুরভিসন্ধি সবকিছু থেকে তাকে পাক–পবিত্র রাখা হয়েছে।

৬. এখানে একদল ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে। তাঁরা আল্লাহর সরাসরি নির্দেশ অনুসারে কুরআনের বিভিন্ন অংশ লেখা, সেগুলোর হেফাজত করা এবং সেগুলো হুবহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁদের প্রশংসায় এখানে দু'টি শব্দ উচ্চারিত হয়েছে। একটি হচ্ছে মর্যাদাবান এবং অন্যটি পূত চরিত্র। প্রথম শব্দটির মাধ্যমে একথা প্রকাশ করা হয়েছে যে, তাঁরা এত বেশী উন্নত মর্যাদার অধিকারী যার ফলে যে আমানত তাঁদের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে তা থেকে সামান্য পরিমাণ খেয়ানত করাও তাঁদের মতো উন্নত মর্যাদার অধিকারী সত্তার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আর দ্বিতীয় শব্দটি ব্যবহার করে একথা জানানো হয়েছে যে, এই কিতাবের বিভিন্ন অংশ লেখার, সেগুলো সংরক্ষণ করার এবং সেগুলো রসূলের কাছে পৌঁছাবার যে দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত হয়েছে পূর্ণ বিশ্বস্ততা সহকারে তাঁরা সে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

৭. যে ধারাবাহিক বর্ণনায় এই আয়াতগুলো উদ্ধৃত হয়েছে সে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে জানা যায়, এখানে নিছক কুরআন মজীদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার জন্য তার

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَآ أَكْفَرَهُۥ ﴿١٧﴾ مِنْ أَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ ﴿١٨﴾ مِن نُّطْفَةٍ ۖ خَلَقَهُۥ
فَقَدَّرَهُۥ ﴿١٩﴾ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقْبَرَهُۥ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ ﴿٢٢﴾
كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهُۥ ﴿٢٣﴾ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ﴿٢٤﴾ أَنَّا صَبَبْنَا
ٱلْمَآءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا
وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَٰكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾
مَّتَٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ ﴿٣٢﴾

লানত[৮] মানুষের প্রতি,[৯] সে কত বড় সত্য অস্বীকারকারী![১০] কোন্ জিনিস থেকে আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন? এক বিন্দু শুক্র থেকে।[১১] আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন, পরে তার তকদীর নির্দিষ্ট করেছেন,[১২] তারপর তার জন্য জীবনের পথ সহজ করেছেন[১৩] তারপর তাকে মৃত্যু দিয়েছেন এবং কবরে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।[১৪] তারপর যখন তিনি চাইবেন তাকে আবার উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবেন।[১৫] কখ্খনো নয়, আল্লাহ তাকে যে কর্তব্য পালন করার হুকুম দিয়েছিলেন তা সে পালন করেনি।[১৬] মানুষ তার খাদ্যের দিকে একবার নজর দিক।[১৭] আমি প্রচুর পানি ঢেলেছি।[১৮] তারপর যমীনকে অদ্ভুতভাবে বিদীর্ণ করেছি।[১৯] এরপর তার মধ্যে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙুর, শাক-সব্জি, যয়তুন, খেজুর, ঘন বাগান, নানা জাতের ফল ও ঘাস তোমাদের ও তোমাদের গৃহপালিত পশুর জীবন ধারণের সামগ্রী হিসেবে।[২০]

এই প্রশংসা করা হয়নি। বরং এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেসব অহংকারী লোক ঘৃণাভরে এর দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, তাদেরকে পরিষ্কারভাবে একথা জানিয়ে দেয়া যে, এই মহান কিতাবটি তোমাদের সামনে পেশ করা হবে এবং তোমরা একে গ্রহণ করে তাকে ধন্য করবে, এই ধরনের কোন কার্যক্রম এর জন্য কোন প্রয়াজন নেই এবং এটি এর অনেক উর্ধে। এ কিতাব তোমাদের মুখাপেক্ষী নয় বরং তোমরাই এর মুখাপেক্ষী। নিজেদের ভালো চাইলে তোমাদের মন-মগজে যে শয়তান বাসা বেঁধে আছে তাকে সেখান থেকে বের করে দাও এবং সোজা এই দাওয়াতের সামনে মাথা নত করে দাও। নয়তো তোমরা এর প্রতি যে পরিমাণ অমুখাপেক্ষিতা দেখাচ্ছো এটি তার চাইতে অনেক বেশী তোমাদের অমুখাপেক্ষী। তোমরা একে ঘৃণ্য ও তুচ্ছ জ্ঞান করলে এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বে সামান্যতম পার্থক্যও দেখা দেবে না। তবে এর ফলে তোমাদের গর্ব ও অহংকারের গগণচুম্বী ইমারত ভেঙে ধূলোয় মিশিয়ে দেয়া হবে।

৮. এখান থেকে আল্লাহর সত্য দীনের প্রতি মুখাপেক্ষিতা অস্বীকার করে আসছিল এমন ধরনের কাফেররা ক্রোধের লক্ষস্থলে পরিণত হয়েছে। এর আগে সূরার শুরু থেকে ১৬ আয়াত পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। সেখানে পর্দান্তরালে কাফেরদের প্রতি ক্রোধ বর্ষণ করা হয়েছে। সেখানে বর্ণনাভংগী ছিল নিম্নরূপ ঃ হে নবী! একজন সত্য সন্ধানীকে বাদ দিয়ে আপনি এ কাদের পেছনে নিজের শক্তি–সামর্থ ব্যয় করছেন? সত্যের দাওয়াতের দৃষ্টিতে এদের তো কোন মূল্য ও মর্যাদা নেই। আপনার মতো একজন মহান মর্যাদা সম্পন্ন নবীর পক্ষে কুরআনের মতো উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব এদের সামনে পেশ করার কোন প্রয়োজন নেই।

৯. কুরআন মজীদের এই ধরনের বিভিন্ন স্থানে মানুষ শব্দটি মানব জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়নি। বরং সেখানে মানুষ বলতে এমন সব লোককে বুঝানো হয়েছে যাদের অপছন্দীয় গুণাবলীর নিন্দা করাই মূল লক্ষ হয়ে থাকে। কোথাও অধিকাংশ মানুষের মধ্যে ঐসব অপছন্দনীয় গুণাবলী পাওয়া যাওয়ার কারণে "মানুষ" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কোথাও এর ব্যবহারের কারণ এই দেখা দিয়েছে যে, বিশেষ কিছু লোককে নির্দিষ্ট করে যদি তাদের নিন্দা বা তিরস্কার করা হয় তাহলে তার ফলে তাদের মধ্যে জিদ ও হঠধর্মিতা সৃষ্টি হয়ে যায়। তাই এ ক্ষেত্রে উপদেশ দেবার জন্য সাধারণভাবে কথা বলার পদ্ধতিই বেশী প্রভাবশালী প্রমাণিত হয়।

১০. এর আর একটি অর্থ হতে পারে। অর্থাৎ "কোন্ জিনিসটি তাকে সত্য অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করেছে? অন্য কথায় বলা যায়, কিসের জোরে সে কুফরী করে? কুফরী অর্থ এখানে সত্য অস্বীকার হয়, নিজের উপকারীর উপকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করাও হয়, আবার নিজের স্রষ্টা, মালিক, প্রভু ও রিযিকদাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর মতো আচরণ করাও হয়।

১১. অর্থাৎ প্রথমে তো তার নিজের মৌলিক সত্তা সম্পর্কে একটু চিন্তা করা দরকার। কোন্ জিনিস থেকে সে অস্তিত্ব লাভ করেছে? কোথায় সে লালিত হয়েছে? কোন্ পথে সে দুনিয়ায় এসেছে? কোন ধরনের অসহায় অবস্থার মধ্যে দুনিয়ায় তার জীবনের সূচনা হয়েছে? নিজের এই প্রকৃত অবস্থা ভুলে গিয়ে সে কেমন করে "আমার সমতুল্য কেউ নেই" বলে ভুল ধারণা পোষণ করতে পারে? নিজের স্রষ্টার প্রতি বিদ্রূপ ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা সে কোথায় থেকে পেলো? (এই একই কথা সূরা ইয়াসীনের ৭৭–৭৮ আয়াতে বলা হয়েছে)।

১২. অর্থাৎ সে মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় তার তকদীর নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সে কোন্ লিংগের হবে? তার গায়ের রং কি হবে? সে কতটুকু উঁচু হবে? তার দেহ কতটুকু কি পরিমাণ মোটা ও পরিপুষ্ট হবে? তার অংগ–প্রত্যংগগুলো কতটুকু নিখুঁত ও অসম্পূর্ণ হবে? তার চেহারা সুরাত ও কণ্ঠস্বর কেমন হবে? তার শারীরিক বল কতটুকু হবে? তার বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা কতটুকু হবে? কোন্ দেশে, পরিবারে এবং কোন্ অবস্থায় ও পরিবেশে সে জন্মগ্রহণ করবে, লালিত পালিত হবে এবং শেষ পর্যন্ত কি হয়ে গড়ে উঠবে? তার ব্যক্তিত্ব গঠনে বংশ ও পরিবারের প্রভাব, পরিবেশের প্রভাব এবং তার নিজের ব্যক্তিসত্তা ও অহমের প্রভাব কি পর্যায়ে ও কতটুকু থাকবে? দুনিয়ার জীবনে সে কী ভূমিকা পালন করবে? পৃথিবীতে কাজ করার জন্য তাকে কতটুকু সময় দেয়া হবে? এই

তকদীর থেকে এক চুল পরিমাণ সরে আসার ক্ষমতাও তার নেই। এর মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তনও সে করতে পারবে না। এত সব সত্ত্বেও তার একি দুঃসাহস, যে স্রষ্টার তৈরি করা তকদীরের সামনে সে এতই অসহায়, তার মোকালোয় সে কুফরী করে ফিরছে।

১৩. অর্থাৎ দুনিয়ায় তার জীবন যাপনের সমস্ত উপকরণ সরবরাহ করেছেন। নয়তো স্রষ্টা যদি তার এই শক্তিগুলো ব্যবহার করার মতো এসব উপায় উপকরণ পৃথিবীতে সরবরাহ না করতেন তাহলে তার দেহ ও মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তি ব্যর্থ প্রমাণিত হতো। এ ছাড়াও স্রষ্টা তাকে এ সুযোগও দিয়েছেন যে, সে নিজের জন্য ভালো বা মন্দ, কৃতজ্ঞতা বা অকৃতজ্ঞতা আনুগত্য বা অবাধ্যতার মধ্যে যে কোন পথ চায় গ্রহণ করতে পারে। তিনি উভয় পথই তার সামনে খুলে রেখে দিয়েছেন এবং প্রত্যেকটি পথই তার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। এখন এর মধ্য থেকে যে পথে ইচ্ছা সে চলতে পারে।

১৪. অর্থাৎ কেবল তার সৃষ্টি ও তকদীরের ব্যাপারেই নয়, মৃত্যুর ব্যাপারেও তার স্রষ্টার কাছে সে একেবারেই অসহায়। নিজের ইচ্ছায় সে সৃষ্টি হতে পারে না। নিজের ইচ্ছায় মরতেও পারে না। নিজের মৃত্যুকে এক মুহূর্তকালের জন্য পিছিয়ে দেবার ক্ষমতাও তার নেই। যে সময় যেখানে যে অবস্থায়ই তার মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করে দেয়া হয়েছে ঠিক সেই সময় সেই জায়গায় সেই অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়। আর মৃত্যুর পর তার জন্য যে ধরনের কবর নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে ঠিক সেই ধরনের কবরেই সে স্থান লাভ করে। তার এই কবর মৃত্তিকা গর্ভে, সীমাহীন সাগরের গভীরতায়, অগ্নিকুণ্ডের বুকে বা কোন হিংস্র পশুর পাকস্থলীতে যে কোন জায়গায় হতে পারে। মানুষের তো কোন্ কথাই নেই, সারা দুনিয়ার সমস্ত সৃষ্টি মিলে চেষ্টা করলেও কোন ব্যক্তির ব্যাপারে স্রষ্টার এই সিদ্ধান্ত বদলাতে পারে না।

১৫. অর্থাৎ মৃত্যুর পর স্রষ্টা আবার যখন তাকে জীবিত করে উঠাতে চাইবেন তখন তার পক্ষে উঠতে অস্বীকার করার ক্ষমতাও থাকবে না। প্রথমে সৃষ্টি করার সময় তাকে জিজ্ঞেস করে সৃষ্টি করা হয়নি। সে সৃষ্টি হতে চায় কিনা, এ ব্যাপারে তার মতামত নেয়া হয়নি। সে সৃষ্টি হতে অস্বীকার করলেও তাকে সৃষ্টি করা হতো। এভাবে এই দ্বিতীয়বার সৃষ্টিও তার মর্জির ওপর নির্ভরশীল নয়। মরার পর সে আবার উঠতে চাইলে উঠবে, আবার উঠতে অস্বীকার করলে উঠবে না, এ ধরনের কোন ব্যাপারই এখানে নেই। এ ব্যাপারেও স্রষ্টার মর্জির সামনে সে পুরোপুরি অসহায়। যখনই তিনি চাইবেন তাকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবেন। তাকে উঠতে হবে, সে হাজার বার না চাইলেও।

১৬. হুকুম বলতে এখানে এমন হুকুমও বুঝানো হয়েছে, যা স্বাভাবিক পথনির্দেশনার আকারে মহান আল্লাহ প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে সংরক্ষিত রেখেছেন। এমন হুকুমও বুঝানো হয়েছে, যেদিকে মানুষের নিজের অস্তিত্ব এবং পৃথিবী থেকে নিয়ে আকাশ পর্যন্ত বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি অণু পরমাণু এবং আল্লাহর অপরিসীম শক্তি সমন্বিত প্রতিটি বস্তুই ইংগিত করছে। আবার এমন হুকুমও বুঝানো হয়েছে, যা প্রতি যুগে আল্লাহ নিজের নবী ও কিতাবের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন এবং প্রতি যুগের সৎলোকদের মাধ্যমে যাকে চতুরদিকে পরিব্যাপ্ত করেছেন। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা দাহার ৫ টীকা) এ প্রসংগে একথাটি যে অর্থে বলা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ ওপরের আয়াতগুলোতে যেসব মৌলিক সত্যের আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোর ভিত্তিতে মানুষের উচিত ছিল তার স্রষ্টার

আনুগত্য করা। কিন্তু সে উল্টো তাঁর নাফরমানির পথ অবলম্বন করেছে এবং আল্লাহর বান্দাহ হবার দাবী পূরণ করেনি।

১৭. অর্থাৎ যে খাদ্যকে সে মামুলি জিনিস মনে করে সে সম্পর্কে তার একবার চিন্তা করা দরকার। কিভাবে এই খাদ্য উৎপন্ন হয়। আল্লাহ যদি এর উপকরণগুলো সরবরাহ না করতেন তাহলে কি জমি থেকে এই খাদ্য উৎপন্ন করার ক্ষমতা মানুষের ছিল?

১৮. এর অর্থ বৃষ্টি। সূর্য তাপে সমুদ্র পৃষ্ঠের বিপুল বারি রাশিকে বাষ্পের আকারে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। তা থেকে সৃষ্টি হয় ঘন মেঘ। বায়ু প্রবাহ সেগুলো নিয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেয়। তারপর মহাশূন্যের শীতলতায় সেই বাষ্পগুলো আবার পানিতে পরিণত হয়ে দুনিয়ার প্রত্যেক এলাকায় একটি বিশেষ পরিমাণ অনুযায়ী বর্ষিত হয়। এরপর এই পানি সরাসরি পৃথিবী পৃষ্ঠে বর্ষিত হয়, ভূগর্ভে কূয়া ও ঝর্ণার আকার ধারণ করে, নদীনালায় স্রোতের আকারেও প্রবাহিত হয়। আবার পাহাড়ে জমাট বাঁধা বরফের আকার ধারণ করে গলে যেতেও থাকে। এভাবে বর্ষাকাল ছাড়াও অন্যান্য মওসুমে নদীর বুকে প্রবাহিত হতে থাকে। এসব ব্যবস্থা কি মানুষ নিজেই করেছে? তার স্রষ্টা তার জীবিকার জন্য যদি এসবের ব্যবস্থা না করতেন তাহলে মানুষ কি পৃথিবীর বুকে জীবন ধারণ করতে পারতো?

১৯. যমীনকে বিদীর্ণ করার মানে হচ্ছে, মাটি এমনভাবে ফাটিয়ে ফেলা যার ফলে মানুষ তার মধ্যে যে বীজ, আঁটি বা চারা রোপণ বা বপন করে অথবা যা বাতাস ও পাখির মাধ্যমে বা অন্য কোনভাবে তার মধ্যে পৌঁছে যায় তা অংকুর গজাতে পারে। মানুষ বড় জোর মাটি খনন করতে বা তার মধ্যে লাঙল চালাতে পারে এবং আল্লাহ যে বীজ সৃষ্টি করেছেন তাকে মাটিতে রোপণ করতে পারে। এর বেশী সে কিছুই করতে পারে না। এ ছাড়া সমস্ত কাজ আল্লাহ করেন। তিনি অসংখ্য জাতের উদ্ভিদের বীজ সৃষ্টি করেছেন। তিনিই এসব বীজের মধ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে মাটির বুকে এদের অংকুর বের হয় এবং প্রতিটি বীজ থেকে তার প্রজাতির পৃথক উদ্ভিদ জন্ম নেয়। আবার তিনি মাটির মধ্যে এমন যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার ফলে তা পানির সাথে মিশে ঐ বীজগুলোর প্রত্যেকটির খোসা আলগা করে তার মুখ খুলে দেয় এবং সেখান থেকে বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদের জন্য তার উপযোগী খাদ্য সরবরাহ করে তার উদ্গম ও বিকাশ লাভে সাহায্য করে। আল্লাহ যদি এই বীজগুলোর মধ্যে এই বৈশিষ্ট সৃষ্টি না করতেন এবং মাটির এই ওপরি স্তরকে এই যোগ্যতা সম্পন্ন না করতেন তাহলে মানুষ কি এখানে কোন খাদ্য লাভ করতে পারতো?

২০. অর্থাৎ কেবল তোমাদের জন্যই নয়, তোমাদের যেসব পশু থেকে তোমরা গোশত, চর্বি, দুধ, মাখন ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী লাভ করে থাকো এবং যারা তোমাদের আরো অসংখ্য অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূর্ণ করে থাকে, তাদের জন্যও। এসব কিছুই কি এ জন্য করা হয়েছে যে, তোমরা এসব দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহার করে লাভবান হবে এবং যে আল্লাহর রিযিক লাভ করে তোমরা বেঁচে আছো তাঁর নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করবে?

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾
وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾ وُجُوهٌ
يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾
تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

অবশেষে যখন সেই কান ফাটানো আওয়াজ আসবে[২১] সেদিন মানুষ পালাতে থাকবে—নিজের ভাই, মা, বাপ, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের থেকে।[২২] তাদের প্রত্যেকে সেদিন এমন কঠিন সময়ের মুখোমুখি হবে যে, নিজের ছাড়া আর কারোর কথা তার মনে থাকবে না।[২৩] সেদিন কতক চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, হাসিমুখ ও খুশীতে ডগবগ করবে। আবার কতক চেহারা হবে সেদিন ধূলিমলিন, কালিমাখা। তারাই হবে কাফের ও পাপী।

২১. এখানে কিয়ামতের শেষ শিংগাধ্বনির কথা বলা হয়েছে। এই বিকট আওয়াজ বুলন্দ হবার সাথে সাথেই মরা মানুষেরা বেঁচে উঠবে।

২২. প্রায় এই একই ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে সূরা মা'আরিজের ১০ থেকে ১৪ পর্যন্ত আয়াতে। পালাবার মানে এও হতে পারে যে, সেদিন মানুষ নিজের ঐসব প্রিয়তম আত্মীয় স্বজনকে বিপদ সাগরে হাবুডুবু খেতে দেখে তাদের সাহায্যার্থে দৌড়ে যাবার পরিবর্তে উল্টো তাদের থেকে দূরে পালিয়ে যেতে থাকবে, যাতে তারা সাহায্যের জন্য তাকে ডাকতে না থাকে। আবার এর এ মানেও হতে পারে যে, দুনিয়ায় আল্লাহর ভয় না করে এবং আখেরাত থেকে গাফেল হয়ে যেভাবে তারা পরস্পরের জন্য গোনাহ করতে ও পরস্পরকে গোমরাহ করতে থেকেছে, তার কুফল সামনে স্বমূর্তিতে প্রকাশিত দেখে তাদের প্রত্যেকে যাতে অন্যের গোমরাহী ও গোনাহের দায়িত্ব কেউ তার ঘাড়ে না চাপিয়ে দেয় এই ভয়ে অন্যের থেকে পালাতে থাকবে। ভাই ভাইকে, সন্তান মা-বাপকে, স্বামী স্ত্রীকে এবং মা-বাপ সন্তানকে এই মর্মে ভয় করতে থাকবে যে, নিশ্চয়ই এবার আমার বিরুদ্ধে মামলায় এরা সাক্ষী দেবে।

২৩. হাদীস গ্রন্থগুলোতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ও সনদ পরম্পরায় বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ একেবারেই উলংগ হয়ে উঠবে।" একথা শুনে তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের মধ্য থেকে কোন একজন (কোন কোন বর্ণনা মতে হযরত আয়েশা, কোন বর্ণনা মতে হযরত সওদা আবার কোন বর্ণনা অনুযায়ী অন্য একজন মহিলা) ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের লজ্জাস্থান কি সেদিন সবার সামনে খোলা থাকবে? জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াতটি তেলাওয়াত করে বলেন, সেদিন অন্যের দিকে তাকাবার মতো হুঁশ ও চেতনা কারো থাকবে না। (নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া, বাইহাকী ও হাকেম)।

আত তাকভীর

৮১

নামকরণ

সূরার প্রথম বাক্যের كُوِّرَتْ শব্দটি থেকে নামকরণ করা হয়েছে। তাকভীর (تكوير) হচ্ছে মূল শব্দ। তা থেকে অতীত কালের কর্তৃবাচ্য অর্থে কুণ্ডভিরাত (كورت) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। এই নামকরণের অর্থ হচ্ছে, এটি সেই সূরা যার মধ্যে গুটিয়ে ফেলার কথা বলা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়, এটি মক্কা মু'আয্যমার প্রথম যুগের নাযিল হওয়া সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে দু'টি ঃ আখেরাত ও রিসালাত।

প্রথম ছ'টি আয়াতে কিয়ামতের প্রথম পর্বের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ যখন সূর্য আলোহীন হয়ে পড়বে। তারকারা স্থানচ্যুত হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হবে। পাহাড়গুলো পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে উৎপাটিত হয়ে শূন্যে উড়তে থাকবে। মানুষ তাদের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসের কথা ভুলে যাবে। বনের পশুরা আতংকিত ও দিশেহারা হয়ে সব এক জায়গায় জড়ো হয়ে যাবে। সমুদ্র স্ফীত হবে ও জ্বলে উঠবে। পরবর্তী সাতটি আয়াতে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্বের উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ যখন রূহগুলোকে আবার নতুন করে শরীরের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হবে। আমলনামা খুলে দেয়া হবে। অপরাধের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আকাশের সমস্ত পরদা সরে যাবে। এবং জান্নাত–জাহান্নাম ইত্যাদি সব জিনিসই চোখের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। আখেরাতের এই ধরনের একটি পুরোপুরি ছবি আঁকার পর একথা বলে মানুষকে চিন্তা করার জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে, সে সময় প্রত্যেক ব্যক্তি কি পাথেয় সংগ্রহ করে এনেছে তা সে নিজেই জানতে পারবে।

এরপর রিসালাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মক্কাবাসীদেরকে বলা হয়েছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের সামনে যা কিছু পেশ করছেন সেগুলো কোন পাগলের প্রলাপ নয়। কোন শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও বিভ্রান্তিও নয়। বরং সেগুলো আল্লাহর প্রেরিত একজন উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন বুযর্গ ও বিশ্বস্ত বাণীবাহকের বিবৃতি, যাঁকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উন্মুক্ত আকাশের দিগন্তে দিনের উজ্জ্বল আলোয় নিজের চোখে দেখেছেন। এই শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তোমরা কোন্ দিকে চলে যাচ্ছো?

আয়াত ২৯ **সূরা আত তাকভীর-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ
سُيِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾
وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ
سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا
السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿١١﴾ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾

যখন সূর্য গুটিয়ে নেয়া হবে।[১] যখন তারকারা চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।[২] যখন পাহাড়গুলোকে চলমান করা হবে।[৩] যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীগুলোকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দয়া হবে।[৪] যখন বন্য পশুদের চারদিক থেকে এনে একত্র করা হবে।[৫] যখন সমুদ্রগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে।[৬] যখন প্রাণসমূহকে[৭] (দেহের সাথে) জুড়ে দেয়া হবে।[৮] যখন জীবিত পুঁতে ফেলা মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?[৯] যখন আমলনামাসমূহ খুলে ধরা হবে। যখন আকাশের পরদা সরিয়ে ফেলা হবে।[১০] যখন জাহান্নামের আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হবে এবং জান্নাতকে নিকটে আনা হবে।[১১] সে সময় প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে সে কি নিয়ে এসেছে।

১. সূর্যকে আলোহীন করে দেবার জন্য এটা একটা অতুলনীয় উপমা। আরবী ভাষায় তাকভীর মানে হচ্ছে গুটিয়ে নেয়া। মাথায় পাগড়ী বাঁধার জন্য "তাকভীরুল আমামাহ" বলা হয়ে থাকে। কারণ আমামা তথা পাগড়ী লম্বা কাপড়ের হয়ে থাকে এবং মাথার চারদিকে তা জড়িয়ে নিতে হয়। এই সাদৃশ্য ও সম্পর্কের কারণে সূর্য থেকে যে আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে সমগ্র সৌরজগতে ছড়িয়ে পড়ে তাকে পাগড়ীর সাথে তুলনা করা

হয়েছে। বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন এই বিছিয়ে থাকা পাগড়ীটি সূর্যের গায়ে জড়িয়ে দেয়া হবে। অর্থাৎ তার আলোক বিচ্ছুরণ বন্ধ হয়ে যাবে।

২. অর্থাৎ যে বাঁধনের কারণে তারা নিজেদের কক্ষপথে ও নিজেদের জায়গায় বাঁধা আছে তা খুলে যাবে এবং সমস্ত গ্রহ–তারকা বিশ্ব–জাহানের চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। এ ছাড়াও 'ইনকিদার' শব্দটির মধ্যে 'কুদরাত' এর অর্থও রয়েছে। অর্থাৎ তারা শুধু ছড়িয়েই পড়বে না বরং এই সংগে আলোহীন হয়ে অন্ধকার হয়েও যাবে।

৩. অন্য কথায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণেই পাহাড়ের ওজন ও ভারত্ব আছে এবং তা এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। কাজেই এই শক্তি বিলুপ্ত হবার সাথে সাথেই সমস্ত পাহাড় পর্বত সমূলে উৎপাটিত ও ওজনহীন হয়ে এমনভাবে পৃথিবীর বুকে চলতে থাকবে যেমন মেঘ শূন্যে ভেসে বেড়ায়।

৪. আরবদেরকে কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা বুঝাবার জন্য এটি ছিল একটি চমৎকার বর্ণনা পদ্ধতি। আধুনিক কালের বাস ও ট্রাক চলাচলের আগে আরবদের কাছে গর্ভবতী উটনীর চাইতে বেশী মূল্যবান আর কোন সম্পদই ছিল না, যার প্রসবের সময় অতি নিকটে। এ সময় তার হেফাজত ও দেখাশুনার জন্য সবচেয়ে বেশী যত্ন নেয়া হতো। উটনীটি যাতে হারিয়ে না যায়, কেউ তাকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে না যায় অথবা কোনভাবে তা নষ্ট না হয়ে যায় এ জন্য খুব বেশী সতর্কতা অবলম্বন করা হতো। এই ধরনের উটনীদের থেকে লোকদের গাফেল হয়ে যাওয়ার মানে এই দাঁড়ায় যে, তখন নিশ্চয়ই এমন কোন কঠিন বিপদ লোকদের ওপর এসে পড়বে যার ফলে তাদের নিজেদের এই সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ সংরক্ষণের কথা তাদের খেয়ালই থাকবে না।

৫. দুনিয়ায় কোন সাধারণ বিপদ দেখা দিলে সব ধরনের পশুদের পালিয়ে এক জায়গায় জড়ো হতে দেখা যায়। সে সময় সাপ দংশন করে না এবং বাঘও আক্রমণ করে না।

৬. এখানে سُجِّرَتْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মূল হচ্ছে তাসজীর (تسجير) এবং তা থেকে অতীতকালে কর্মবাচ্যে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণত চুল্লীতে আগুন জ্বালাবার জন্য 'তাসজীর' শব্দ ব্যবহার করা হয়। কিয়ামতের দিন সমুদ্রে আগুন লেগে যাবে, একথাটা আপাত দৃষ্টে বিস্ময়কর মনে হয়। কিন্তু পানির মূল তত্ব ও উপাদান সম্পর্কে ধারণা থাকলে এর মধ্যে কোন কিছুই বিস্ময়কর মনে হবে না। আল্লাহ তাঁর অসীম ক্ষমতা ও অলৌকিক কার্যক্রমের সাহায্যে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের মতো এমন দু'টি গ্যাসকে একসাথে মিশ্রিত করে রেখেছেন যাদের একটি আগুন জ্বালায় এবং অন্যটি নিজে জ্বলে। এই দু'টি গ্যাসের সংমিশ্রণে পানির মতো এমন একটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন যা আগুন নিভিয়ে দেয়। আল্লাহর অসীম ক্ষমতার একটি ইংগিতই পানির এই মিশ্রণ পরিবর্তন করে দেবার জন্য যথেষ্ট। তখন তারা পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে তাদের মূল প্রকৃতি অনুযায়ী আগুন জ্বালাবার ও জ্বলার কাজে ব্যাপৃত হবে।

৭. এখান থেকে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা শুরু হয়েছে।

৮. অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে মানুষ দুনিয়ায় যেমন দেহ ও আত্মার সাথে অবস্থান করছিল আবার ঠিক সেই অবস্থায়ই তাকে নতুন করে জীবিত করা হবে।

৯. এই আয়াতের বর্ণনাভংগীতে মারাত্মক ধরনের ক্রোধের প্রকাশ দেখা যায়। এর চেয়ে বেশী ক্রোধের কল্পনাও করা যেতে পারে না। যে বাপ মা তাদের মেয়েকে জীবিত পুঁতে ফেলেছে আল্লাহর কাছে তারা এত বেশী ঘৃণিত হবে যে, তাদেরকে সম্বোধন করে একথা জিজ্ঞেস করা হবে না, তোমরা এই নিষ্পাপ শিশুটিকে হত্যা করেছিলে কোন্ অপরাধে? বরং তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ছোট্ট নিরপরাধ মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাকে কোন অপরাধে মেরে ফেলা হয়েছিল? জবাবে সে নিজের কাহিনী শুনাতে থাকবে। জালেম বাপ মা তার প্রতি কি অত্যাচার করেছে এবং কিভাবে তাকে জীবিত পুঁতে ফেলেছে সে কথা সে সবিস্তারে বর্ণনা করতে থাকবে। এ ছাড়াও এই ছোট্ট আয়াতটিতে দু'টি বড় বড় বিষয়বস্তু সংযোজিত করা হয়েছে। এ জন্য কোন শব্দের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়াই শুধুমাত্র বর্ণনাভংগী থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক, এর মধ্যে আরববাসীদের মনে এই অনুভূতি জাগাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, জাহেলীয়াত তাদেরকে নৈতিক অবনতির এমন নিম্নতম পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছে যার ফলে তারা নিজেদের সন্তানকে নিজ হাতে জীবিত অবস্থায় মাটির মধ্যে প্রোথিত করার কাজ করছে। এরপরও তারা নিজেদের এই জাহেলী কর্মকাণ্ডকে সঠিক মনে করে তার ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এই বিকৃত সমাজ জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য যে সংস্কার মূলক কর্মসূচী এনেছেন তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে। দুই, এর মধ্যে আখেরাতের অপরিহার্যতার ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট যুক্তি পেশ করা হয়েছে। যে মেয়েকে জীবিত অবস্থায় মাটির মধ্যে প্রোথিত করা হয়েছে তার প্রতি এ অন্যায়ের বিচার কোথাও হওয়া দরকার এবং যেসব জালেম এই জুলুমের কাজটি করেছে এমন একটি সময় আসা দরকার, যখন তাদের এই নিষ্ঠুরতার জন্য তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যে মেয়েটিকে মাটির মধ্যে পুতে ফেলা হয়েছে তার ফরিয়াদ শুনার মতো তখন তো দুনিয়ায় কেউ ছিল না। জাহেলী সমাজ ব্যবস্থায় এ কাজটিকে সম্পূর্ণ বৈধ করে রাখা হয়েছিল, বাপ-মা এ জন্য একটুও লজ্জিত হতো না। পরিবারেও কেউ তাদের নিন্দা ও তিরস্কার করতো না। সমগ্র সমাজ পরিবেশে একজনও এ জন্য তাদেরকে পাকড়াও করতো না। তাহলে আল্লাহর প্রভুত্ব-কর্তৃত্বের অধীনে এই বিরাট জুলুম ও অন্যায়ের কি কোন বিচার হবে না?

প্রাচীনকালে আরবে মেয়েদের জীবিত কবর দেবার এ নিষ্ঠুর পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এর বিভিন্ন কারণ ছিল। এক, অর্থনৈতিক দুরবস্থা। এই দুরবস্থার দরুন লোকেরা চাইতো খাদ্যের গ্রহণকারীর সংখ্যা কম হোক এবং তাদের লালন পালনের বোঝা যেন বহন করতে না হয়। পরবর্তীকালে অর্থ উপার্জনে সহায়তা করবে এই আশায় ছেলেদের লালন পালন করা হতো। কিন্তু মেয়েদের ছোটবেলায় লালন পালন করে বড় হয়ে গেলে বিয়ে দিয়ে অন্যের ঘরে পাঠিয়ে দিতে হবে, এ কারণে মেরে ফেলে দেয়া হতো। দুই, দেশের আইন শৃংখলার ক্ষেত্রে সাধারণ নিরাপত্তাহীনতার কারণে এটা মনে করে পুত্রসন্তানের প্রতিপালন করা হতো যে, যার যত বেশী ছেলে হবে তার তত বেশী সাহায্যকারী হবে। অন্যদিকে গোত্রীয় সংঘর্ষ ও যুদ্ধের সময় মেয়েদের সংরক্ষণ করতে হতো এবং তারা প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কোন কাজেই লাগতো না। তিন, আইন শৃংখলার ক্ষেত্রে সাধারণ দুরবস্থার কারণে শত্রুগোত্ররা পরস্পরের ওপর অতর্কিতে হামলা করার সময় প্রতিপক্ষ শিবিরের যতগুলো মেয়েকে হামলাকারীরা লুটে নিয়ে যেতো, তাদেরকে বাঁদী বানিয়ে

রাখতো অথবা কোথাও বিক্রি করে দিতো। এসব কারণে আরবে কোথাও সন্তান প্রসবকালেই মায়ের সামনেই একটি গর্ত খনন করে রাখা হতো। মেয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তখনই তাকে গর্তে ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দেয়া হতো। আবার কোথাও যদি মা এতে রাজী না হতো বা তার পরিবারের কেউ এতে বাধ সাধতো তাহলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাপ কিছুদিন তাকে লালন পালন করতো। তারপর একদিন মরুভূমি, পাহাড় বা জংগলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে কোথাও তাকে জীবিত কবর দিয়ে দিতো। এই ধরনের রেওয়াজ আরবের বিভিন্ন এলাকায় প্রচলিত ছিল। এ ক্ষেত্রে শিশু কন্যাদের সাথে কেমন নির্দয় ব্যবহার করা হতো তার একটি কাহিনী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক সাহাবী একবার তাঁর কাছে বর্ণনা করেন। সুনানে দারামির প্রথম অধ্যায়ে এ দাহীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার জাহেলী যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমার একটি মেয়ে ছিল। সে আমাকে খুব ভালোবাসতো। তার নাম ধরে ডাকলে সে দৌড়ে আমার কাছে আসতো। একদিন আমি তাকে ডাকলাম। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে হাঁটতে লাগলাম। পথে একটি কূয়া পেলাম। তার হাত ধরে ধাক্কা দিয়ে কূয়ার মধ্যে ফেলে দিলাম। তার যে শেষ কথাটি আমার কানে ভেসে এসেছিল তা ছিল, হায় আব্বা! হায় আব্বা! একথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেঁদে ফেললেন। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন বললেন ঃ ওহে, তুমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শোকার্ত করে দিয়েছো। তিনি বললেন ঃ থাক, তোমরা একে বাধা দিয়ো না। যে বিষয়ে তার কঠিন অনুভূতি জেগেছে সে বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করতে দাও। তারপর তিনি তাকে বললেন ঃ তোমার ঘটনাটি আবার বর্ণনা করো। সেই ব্যক্তি আবার তা শুনালেন। ঘটনাটি আবার শুনে তিনি এত বেশী কাঁদতে থাকলেন যে, চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেলো। এরপর তিনি বললেন, জাহেলী যুগে যা কিছু করা হয়েছে আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন। এখন নতুন করে জীবন শুরু করো।

একথা মনে করা ভুল হবে যে, আরববাসীরা এই চরম অমানবিক কাজটির কদর্যতার কোন অনুভূতিই রাখতো না। কোন সমাজ যত বেশী বিকৃতই হোক না কেন তা কখনো এই ধরনের জুলুম ও অমানবিক কাজকে একেবারেই অন্যায় মনে করবে না, এমনটি কখনই হতে পারে না। তাই কুরআন মজীদে এই কাজটির কদর্যতা ও দূষণীয় হওয়া সম্পর্কে কোন লম্বা চওড়া ভাষণ দেয়া হয়নি। বরং কতিপয় লোমহর্ষক শব্দের মাধ্যমে কেবল এতটুকু বলেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে, এমন এক সময় আসবে যখন জীবিত পুঁতে ফেলা মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন্ দোষে তোমাকে হত্যা করা হয়েছিল? আরবের ইতিহাস থেকেও জানা যায়, জাহেলী যুগে অনেক লোকের এই রীতিটির কদর্যতার অনুভূতি ছিল। তাবারানীর বর্ণনা মতে কবি ফারাযদাকের দাদা সা'সা' ইবনে নাজীয়াহ আলমুজাশেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে, হে আল্লাহর রসূল! আমি জাহেলী যুগে কিছু ভালো কাজও করেছি। এরমধ্যে একটি হচ্ছে, আমি তিনশ ষাটটি মেয়েকে জীবিত কবর দেয়া থেকে রক্ষা করেছি। তাদের প্রত্যেকের প্রাণ বাঁচাবার বদলে দু'টি করে উট বিনিময় মূল্য হিসেবে দিয়েছি। আমি কি এর প্রতিদান পাবো? জবাবে তিনি বলেন ঃ তোমার জন্য পুরস্কার রয়েছে এবং সে পুরস্কার হচ্ছে, আল্লাহ তোমাকে ইসলামের নিয়ামত দান করেছেন।

আসলে এটি ইসলামের একটি বিরাট অবদান। ইসলাম কেবলমাত্র আরবের এই নিষ্ঠুর ও জঘন্য প্রথাটি নির্মূল করেনি বরং এই সংগে মেয়ের জন্ম যে একটি দুর্ঘটনা এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও একে গ্রহণ করে নিতে হয়—এই ধরনের চিন্তা ও ধারণারও চিরতরে অবসান ঘটিয়েছে। বিপরীত পক্ষে ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে, মেয়েদের লালন পালন করা, তাদেরকে উত্তম শিক্ষা দীক্ষা দেয়া এবং ঘর সংসারের কাজে পারদর্শী করে গড়ে তোলা অনেক বড় নেকীর কাজ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে মেয়েদের সম্পর্কে মানুষের সাধারণ ধারণা যেভাবে পরিবর্তন করে দেন হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে তা আন্দাজ করা যাবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি নীচে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করছি ঃ

مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ-

"এই মেয়েদের জন্মের মাধ্যমে যে ব্যক্তিকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়, তারপর সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার কারণে পরিণত হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَنَا وَهٰكَذَا وَضَمَّ اَصَابِعَهُ -

"যে ব্যক্তি দু'টি মেয়ের লালনপালন করে, এভাবে তারা বালেগ হয়ে যায়, সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে ঠিক এভাবে আসবে। একথা বলে তিনি নিজের আঙুলগুলো একসাথে করে দেখান।" (মুসলিম)

مَنْ عَالَ ثَلٰثَ بَنَاتٍ اَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْاَخَوَاتِ فَاَدَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتّٰى يُغْنِيَهُنَّ اللّٰهُ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوِ اثْنَتَيْنِ ؟ قَالَ اَوِ اثْنَتَيْنِ حَتّٰى لَوْ قَالُوْا اَوْ وَاحِدَةٍ ؟ لَقَالَ وَاحِدَةٍ -

"যে ব্যক্তি তিন কন্যা বা বোনের লালনপালন করে, তাদেরকে ভালো আদব কায়দা শেখায় এবং তাদের সাথে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করে, এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা তার সাহায্যের মুখাপেক্ষী না থাকে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাত ওয়াজিব করে দেবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আর যদি দু'জন হয়। জবাব দেন, দু'জনকে এভাবে লালনপালন করলেও তাই হবে। হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যদি লোকেরা সে সময় একজনের লালনপালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো তাহলে তিনি একজনের সম্পর্কেও এই একই জবাব দিতেন।" (শারহুস সুন্নাহ)

مَنْ كَانَتْ لَهُ اُنْثٰى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يَهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ -

"যার কন্যা-সন্তান আছে, সে তাকে জীবিত কবর দেয়নি, তাকে দীনহীন ও লাঞ্ছিত করেও রাখেনি এবং পুত্রকে তার ওপর বেশী গুরুত্বও দেয়নি, আল্লাহ তাকে জান্নাতে স্থান দেবেন।" (আবু দাউদ)

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلٰثُ بَنَاتٍ وَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ -

"যার তিনটি কন্যা আছে, সেজন্য সে যদি সবর করে এবং নিজের সামর্থ অনুযায়ী তাদেরকে ভালো কাপড় পরায়, তাহলে তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ে পরিণত হবে।" (বুখারীর আদাবুল মুফরাদ ও ইবনে মাজাহ)

مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُدْرِكُهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ صَحْبَتَهُمَا اِلاَّ اَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ

"যে মুসলমানের দু'টি মেয়ে থাকবে, সে যদি তাদেরকে ভালোভাবে রাখে, তাহলে তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।" (ইমাম বুখারীর আদাবুল মুফরাদ)

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمَ اِلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى اَعْظَمِ الصَّدَقَةِ اَوْ مِنْ اَعْظَمِ الصَّدَقَةِ قَالَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِبْنَتُكَ الْمَرْدُوْدَةُ اِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ -

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুরাকাহ ইবনে জা'শূমকে বলেন, আমি কি তোমাকে বলবো সবচেয়ে বড় সাদকাহ (অথবা বলেন, বড় সাদকাগুলোর অন্যতম) কি? সুরাকাহ বলেন, অবশ্যই বলুন হে আলাহর রসূল। তিনি বলেন, তোমার সেই মেয়েটি যে (তালাক পেয়ে অথবা বিধবা হয়ে) তোমার দিকে ফিরে আসে এবং তুমি ছাড়া তার আর কোন উপার্জনকারী থাকে না।" (ইবনে মাজাহ ও বুখারী ফিল আদাবিল মুফরাদ)

এই শিক্ষার ফলে মেয়েদের ব্যাপারে কেবল আরবদেরই নয় দুনিয়ার অন্যান্য যেসব জাতি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে তাদের সবার দৃষ্টিভংগীই বদলে গেছে।

১০. অর্থাৎ এখন যা কিছু দৃষ্টির অগোচরে রয়ে গেছে তা সব সুস্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠবে। এখন তো আকাশ কেবল শূন্যই দেখা যায় এবং তার মধ্যে দেখা যায় মেঘ, ধূলিকনা, চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহ-তারকা। কিন্তু সেদিন আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব তার নিজস্ব ও আসল রূপে আবরণ মুক্ত হয়ে সবার সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে।

১১. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে যখন লোকদের মামলার শুনানী চলতে থাকবে, তখন জাহান্নামের উদ্দীপ্ত আগুনও সবাই দেখতে পাবে। জান্নাতও তার সমস্ত নিয়ামত সহকারে সবার সামনে হাযির থাকবে। এভাবে একদিকে অসৎলোকেরা জানতে পারবে তারা কোন্ ধরনের জিনিস থেকে বঞ্চিত হয়ে কোন্ দিকে যাচ্ছে এবং সৎলোকেরাও জানতে পারবে তারা কোন্ জিনিসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে কোন্ ধরনের নিয়ামত লাভ করতে যাচ্ছে।

فَلَآ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾ وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾
وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ
مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ
الْمُبِينِ ﴿٢٣﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ
رَّجِيمٍ ﴿٢٥﴾ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٢٦﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ
أَن يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾

কাজেই, না,[১২] আমি কসম খাচ্ছি পেছনে ফিরে আসা ও অদৃশ্য হয়ে যাওয়া তারকারাজির এবং রাত্রির, যখন তা বিদায় নিয়েছে এবং প্রভাতের, যখন তা শ্বাস ফেলেছে।[১৩] এটি প্রকৃতপক্ষে একজন সম্মানিত বাণীবাহকের বাণী,[১৪] যিনি বড়ই শক্তিধর,[১৫] আরশের মালিকের কাছে উন্নত মর্যাদার অধিকারী, সেখানে তার হুকুম মেনে চলা হয়,[১৬] তিনি আস্থাভাজন।[১৭] আর (হে মক্কাবাসীরা!) তোমাদের সাথী[১৮] পাগল নয়। সেই বাণীবাহককে দেখেছে উজ্জ্বল দিগন্তে।[১৯] আর সে গায়েবের (এই জ্ঞান লোকদের কাছে পৌঁছানোর) ব্যাপারে কৃপণ নয়।[২০] এটা কোন অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয়।[২১] কাজেই তোমরা কোথায় চলে যাচ্ছো? এটা তো সারা জাহানের অধিবাসীদের জন্য একটা উপদেশ। তোমাদের মধ্য থেকে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে সত্য সরল পথে চলতে চায়।[২২] আর তোমাদের চাইলেই কিছু হয় না, যতক্ষণ না আল্লাহ রব্বুল আলামীন তা চান।[২৩]

১২. অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা ঠিক নয় যে, কুরআনে যা কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে এগুলো কোন পাগলের প্রলাপ বা শয়তানের ওয়াস্‌ওয়াসাহ্ ও কুমন্ত্রণা।

১৩. যে বিষয়ের ওপর এই কসম খাওয়া হয়েছে তা সামনের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ধরনের কসমের অর্থ হচ্ছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্ধকারে কোন স্বপ্ন দেখেননি। বরং যখন তারকারা অস্তমিত হয়েছিল, রাত বিদায় নিয়েছিল এবং প্রভাতের উদয় হয়েছিল তখন উন্মুক্ত আকাশে তিনি আল্লাহর ফেরেশতাকে দেখেছিলেন। কাজেই তিনি যা কিছু বর্ণনা করছেন তা সবই তাঁর নিজের চোখে দেখা। সুস্পষ্ট দিনের আলোয় পূর্ণচেতনা সহকারে তিনি এসব দেখেছেন।

১৪. এখানে সম্মানিত বাণীবাহক (রসূল করীম) বলতে অহী আনার কাজে লিপ্ত ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে। সামনের আয়াতে একথাটি আরো সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

আর কুরআনকে "বাণীবাহকের বাণী" বলার অর্থ এই নয় যে, এটি ঐ সংশ্লিষ্ট ফেরেশতার নিজের কথা। বরং "বাণীবাহকের বাণী" শব্দ দু'টিই একথা প্রকাশ করছে যে, এটি সেই সত্তার বাণী যিনি তাকে বাণীবাহক করে পাঠিয়েছেন। সূরা "আল হাক্কা'র ৪০ আয়াতে এভাবে কুরআনকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী বলা হয়েছে। সেখানেও এর অর্থ এই নয় যে, এটি নবীর (সা) নিজের রচনা। বরং একে "রসূলে করীমের" বাণী বলে একথা সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, আল্লাহর রসূল হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটি পেশ করছেন, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ হিসেবে নয়। উভয় স্থানে বাণীকে ফেরেশতা ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্কিত করার কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহর বাণী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বাণীবহনকারী ফেরেশতার মুখ থেকে এবং লোকদের সামনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা আল হাক্কার ২২ টীকা দেখুন)

১৫. সূরা আন নাজমের ৪–৫ আয়াতে এই বিষয়বস্তুটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى - عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى -

"এ তো একটি ওহী, যা তার ওপর নাযিল করা হয়। প্রবল শক্তির অধিকারী তাকে তা শিখিয়েছেন।" জিব্রীল আলাইহিস সালামের সেই প্রবল ও মহাপরাক্রমশালী শক্তি কি? এটি আসলে "মুতাশাবিহাত"–এর অন্তরভুক্ত। আল্লাহ ছাড়া এ সম্পর্কিত সঠিক তথ্য কারোর জানা নেই। তবে এ থেকে এতটুকু কথা অবশ্যি জানা যায় যে, নিজের অসাধারণ ক্ষমতার দিক দিয়ে তিনি ফেরেশতাদের মধ্যেও বৈশিষ্টের অধিকারী। মুসলিম শরীফে কিতাবুল ঈমানে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ আমি দু'বার জিব্রীলকে তার আসল আকৃতিতে দেখেছি। তাঁর বিশাল সত্তা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সমগ্র মহাশূন্য জুড়ে বিস্তৃত ছিল। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ছ'টি ডানা সমন্বিত অবস্থায় দেখেছেন। এ থেকে তাঁর অসাধারণ শক্তির বিষয়টি কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে।

১৬. অর্থাৎ তিনি ফেরেশতাদের কর্মকর্তা। সমস্ত ফেরেশতা তাঁর হুকুমে কাজ করে।

১৭. অর্থাৎ নিজের পক্ষ থেকে তিনি কোন কথা আল্লাহর অহীর সাথে মিশিয়ে দেবেন না। বরং তিনি এমন পর্যায়ের আমানতদার যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু বলা হয় সেগুলো তিনি হুবহু পৌঁছিয়ে দেন।

১৮. সাথী বলতে এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। তাঁকে মক্কাবাসীদের সাথী অভিহিত করে আসলে তাঁকে এ বিষয়ের অনুভূতি দেয়া হয়েছে যে, তিনি তাদের জন্য কোন আগন্তুক বা অপরিচিত লোক নন। বরং তিনি তাদেরই জাতি ও গোত্রভুক্ত। তাদের মধ্যেই সারা জীবন তিনি অবস্থান করেছেন। তাদের শহরের প্রতিটি আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁকে চেনে। তিনি কোন্ ধরনের জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও সচেতন

ব্যক্তি তা তারা ভালোভাবেই জানে। এই ধরনের এক ব্যক্তিকে জেনেবুঝে পাগল বলতে গিয়ে তাদের অবশ্যি কিছুটা লজ্জা অনুভব করা উচিত। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআনের সূরা আন নাজ্‌মের ২ ও ৩ টীকা দেখুন)

১৯. সূরা আন নাজ্‌মের ৭ থেকে ৯ পর্যন্ত টীকায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ পর্যবেক্ষণকে আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন্ নাজ্‌ম ৭-৮ টীকা)

২০. অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের কাছ থেকে কোন কথা গোপন রাখেন না। গায়েব থেকে তাঁর কাছে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী, ফেরেশতা, মৃত্যুর পরের জীবন, কিয়ামত, আখেরাত বা জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে যা কিছু সত্য ও নির্ভুল তথ্য আসে তা সবই তিনি একটুও কমবেশী না করে তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন।

২১. অর্থাৎ কোন শয়তান এসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে এসব কথা বলে যায়, তোমাদের এ ধারণা ভুল। শয়তান কেন মানুষকে শিরক, মূর্তিপূজা, কুফরী ও আল্লাহদ্রোহিতা থেকে সরিয়ে আল্লাহপরস্তি ও তাওহীদের শিক্ষা দেবে? কেন সে মানুষের মনে লাগামহীন উটের মতো স্বাধীন জীবন যাপন করার পরিবর্তে আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালন ও তাঁর সামনে জবাবদিহি করার অনুভূতি জাগাবে? জাহেলী রীতিনীতি, জুলুম, দুর্নীতি ও দুষ্কৃতির পথে চলতে বাধা দিয়ে কেন সে মানুষকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবন যাপন এবং ন্যায়, ইনসাফ, তাকওয়া ও উন্নত নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করবে? এই ধরনের কাজ করা শয়তানের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আশ্ শু'আরা ২১০-২১২ আয়াত ও ১৩০-১৩২ টীকা এবং ২২১-২২৩ আয়াত ও ১৪০-১৪১ টীকা)

২২. অন্য কথায় বলা যায়, এ বাণীটি তো সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য উপদেশ একথা ঠিক কিন্তু এর থেকে ফায়দা একমাত্র সেই ব্যক্তি হাসিল করতে পারে যে নিজে সত্য-সরল পথে চলতে চায়। এ থেকে উপকৃত হবার জন্য মানুষের সত্য-সন্ধানী ও সত্য প্রিয় হওয়া প্রথম শর্ত।

২৩. এ বিষয়বস্তুটি ইতিপূর্বে সূরা মুদ্দাস্‌সিরের ৫৬ আয়াতে এবং সূরা দাহারের ৩০ আয়াতে আলোচিত হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআন, আল মুদ্দাস্‌সির ৪১ টীকা দেখুন।

আল ইনফিতার

৮২

নামকরণ

প্রথম আয়াতের শব্দ انْفَطَرَتْ থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে। এর মূলে রয়েছে ইনফিতার انفطار অর্থাৎ ফেটে যাওয়া। এ নামকরণের কারণ হচ্ছে এই যে, এ সূরায় আকাশের ফেটে যাওয়ার কথা আলোচনা করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এই সূরার ও সূরা আত্ তাকভীরের বিষয়বস্তুর মধ্যে গভীর মিল দেখা যায়। এ থেকে বুঝা যায়, এই সূরা দু'টি প্রায় একই সময়ে নাযিল হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে আখেরাত। মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনুল মনযার, তাবারানী, হাকেম ও ইবনে মারদুইয়ায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের (রা) একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُ رَاْىُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَاْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ، وَاِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ، وَاِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ –

"যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনটি নিজের চোখে দেখতে চায় সে যেন সূরা তাকভীর, সূরা ইনফিতার ও সূরা ইনশিকাক পড়ে নেয়।"

এখানে প্রথমে কিয়ামতের দিনের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তি দুনিয়ায় যাকিছু করেছে কিয়ামতের দিন তা সবই তার সামনে উপস্থিত হবে। তারপর মানুষের মনে অনুভূতি জাগানো হয়েছে, যে সৃষ্টিকর্তা তোমাকে অস্তিত্ব দান করলেন এবং যাঁর অনুগ্রহে তুমি আজ সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে সবচেয়ে ভালো শরীর ও অংগ-প্রত্যংগ সহকারে বিচরণ করছো, তিনি কেবল অনুগ্রহকারী ইনসাফকার নন, তাঁর সম্পর্কে তোমার মনে কে এই প্রতারণার জাল বিস্তার করলো? তাঁর অনুগ্রহের অর্থ এ নয় যে, তুমি তাঁর ন্যায়নিষ্ঠ ব্যবহার ও বিচারের ভয় করবে না। তারপর মানুষকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে, তুমি কোন ভুল ধারণা নিয়ে বসে থেকো না। তোমার পুরো আমলনামা তৈরী করা হচ্ছে। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য লেখকরা সবসময় তোমার সমস্ত কথাবার্তা, ওঠাবসা, চলাফেরা ও যাবতীয় কাজকর্ম লিখে চলছেন। সবশেষে পূর্ণ দৃঢ়তা সহকারে বলা হয়েছে, অবশ্যিই একদিন কিয়ামত হবে। সেদিন নেক্কার লোকেরা জান্নাতে সুখের জীবন লাভ করবে এবং পাপীরা জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে। সেদিন কেউ কারোর কোন কাজে লাগবে না। বিচার ও ফায়সালাকারী সেদিন হবেন একমাত্র আল্লাহ।

আয়াত ১৯ **সূরা আল ইনফিতার-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ ۝١ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ ۝٢ وَإِذَا الْبِحَارُ
فُجِّرَتْ ۝٣ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝٤ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ
وَأَخَّرَتْ ۝٥

যখন আকাশ ফেটে যাবে, যখন তারকারা চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, যখন সমুদ্র ফাটিয়ে ফেলা হবে[১] এবং যখন কবরগুলো খুলে ফেলা হবে[২], তখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার সামনের ও পেছনের সবকিছু জেনে যাবে।[৩]

১. সূরা তাকভীরে বলা হয়েছে, সমুদ্রগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে এবং এখানে বলা হয়েছে, সমুদ্রগুলোকে ফাটিয়ে ফেলা হবে। এই উভয় আয়াতকে মিলিয়ে দেখলে এবং কুরআনের দৃষ্টিতে কিয়ামতের দিন এমন একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প হবে যা কোন একটি বিশেষ এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং একই সময় সারা দুনিয়াকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে দেবে, এ বিষয়টিকেও সামনে রাখলে সমুদ্রগুলোর ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়ার ও তার মধ্যে আগুন লেগে যাবার প্রকৃত অবস্থাটি আমরা অনুধাবন করতে পারি। আমরা বুঝতে পারি, প্রথমে ঐ মহাভূকম্পনের ফলে সমুদ্রের তলদেশ ফেটে যাবে এবং সমুদ্রের পানি ভূগর্ভের অভ্যন্তরভাগে নেমে যেতে থাকবে যেখানে সর্বক্ষণ প্রচণ্ড গরম লাভা টগবগ করে ফুটছে। এই গরম লাভার সাথে সংযুক্ত হবার পর পানি তার প্রাথমিক অবস্থায় অর্থাৎ প্রাথমিক দু'টি মৌলিক উপাদান অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে পরিণত হবে। এর মধ্যে অক্সিজেন আগুন জ্বালানোয় সাহায্য করে এবং হাইড্রোজেন নিজে জ্বলে ওঠে। এভাবে প্রাথমিক মৌলিক উপাদানে পরিণত হওয়া ও আগুন লেগে যাওয়ার একটি ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া (Chain reaction) চলতে থাকবে। এভাবে দুনিয়ার সবগুলো সাগরে আগুন লেগে যাবে। এটা আমাদের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ভিত্তিক অনুমান। তবে এর সঠিক জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নেই।

২. প্রথম তিনটি আয়াতে কিয়ামতের প্রথম পর্বের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই আয়াতে দ্বিতীয় পর্বের কথা বলা হয়েছে। কবর খুলে ফেলার মানে হচ্ছে, মানুষকে আবার নতুন করে জীবিত করে উঠানো।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ۝٦ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ
فَعَدَلَكَ ۝٧ فِىٓ أَىِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۝٨ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ۝٩
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ ۝١٠ كِرَامًا كَٰتِبِينَ ۝١١ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝١٢

হে মানুষ ! কোন্ জিনিষ তোমাকে তোমার মহান রবের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে সুঠাম ও সুসামঞ্জস্য করে গড়েছেন এবং যে আকৃতিতে চেয়েছেন তোমাকে গঠন করেছেন।[৪] কখ্খনো না,[৫] বরং (আসল কথা হচ্ছে এই যে), তোমরা শাস্তি ও পুরস্কারকে মিথ্যা মনে করছো।[৬] অথচ তোমাদের ওপর পরিদর্শক নিযুক্ত রয়েছে, এমন সম্মানিত লেখকবৃন্দ, যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজ জানে।[৭]

৩. আসল শব্দ হচ্ছে مَا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ এ শব্দগুলোর কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং সবগুলো অর্থই এখানে প্রযোজ্য। যেমন (১) যে ভালো ও মন্দ কাজ করে মানুষ আগে পাঠিয়ে দিয়েছে তাকে مَا قَدَّمَتْ এবং যেগুলো করতে সে বিরত থেকেছে তাকে مَا اَخَّرَتْ বলা যায়। এ দিক দিয়ে এ শব্দগুলো ইংরেজি Commission বা Omission-এর মতো একই অর্থবোধক । (২) যা কিছু প্রথমে করেছে তা مَا قَدَّمَتْ এবং যা কিছু পরে করেছে তা مَا اَخَّرَتْ -এর অন্তরভুক্ত। অর্থাৎ সম্পাদনের ধারাবাহিকতা ও তারিখ অনুসারে মানুষের প্রত্যেকটি কাজের হিসেব সম্বলিত আমলনামা তার সামনে এসে যাবে। (৩) যেসব ভালো বা মন্দ কাজ মানুষ তার জীবনে করেছে সেগুলো مَا قَدَّمَتْ -এর অন্তরভুক্ত। এ মানুষের সমাজে এসব কাজের যে প্রভাব ও ফলাফল সে নিজের পেছনে রেখে এসেছে সেগুলো مَا اَخَّرَتْ -এর অন্তরভুক্ত।

৪. অর্থাৎ প্রথমে তো তোমার উচিত ছিল সেই পরম করুণাময় ও অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ লাভ করে তাঁর শোকরগুজারী করা এবং তাঁর সমস্ত হুকুম মেনে চলা। তাঁর নাফরমানী করতে গিয়ে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নিজের যাবতীয় যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতাকে তুমি নিজের কৃতিত্ব মনে করার ধোঁকায় পড়ে গেছো। তোমাকে যিনি অস্তিত্বদান করেছেন তাঁর অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেবার চিন্তা তোমার মনে একবারও উদয় হয় না। দ্বিতীয়ত, দুনিয়ায় তুমি যা ইচ্ছে করে ফেলতে পারো, এটা তোমার রবের অনুগ্রহ। তবে কখনো এমন হয়নি যে, যখনই তুমি কোনো ভুল করেছো অমনি তিনি তোমাকে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত করে বিকল করে দিয়েছেন। অথবা তোমার চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন বা তোমাকে বজ্রপাতে হত্যা করেছেন। কিন্তু তাঁর এ অনুগ্রহ ও কোমলতাকে তুমি দুর্বলতা ভেবে বসেছো। এবং তোমার আল্লাহর উলুহিয়াতে ইনসাফের নামগন্ধও নেই মনে করে নিজেকে প্রতারিত করেছো।

৫. অর্থাৎ এই ধরনের ধোঁকা খেয়ে যাওয়ার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। তোমার অস্তিত্ব নিজেই ঘোষণা করছে যে, তুমি নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়ে যাওনি। তোমার বাপ-মাও তোমাকে সৃষ্টি করেনি। তোমার মধ্যে যেসব উপাদান আছে সেগুলো নিজে নিজে একত্র হয়ে যাওয়ার ফলেও ঘটনাক্রমে তুমি মানুষ হিসেবে তৈরি হয়ে যাওনি। বরং এক মহাজ্ঞানী ও মহাশক্তিধর আল্লাহ তোমাকে এই পূর্ণাঙ্গ মানবিক আকৃতি দান করেছেন। তোমার সামনে সব রকমের প্রাণী রয়েছে, তাদের মোকাবিলায় তোমার সবচেয়ে সুন্দর শারীরিক কাঠামো এবং শ্রেষ্ঠ ও উন্নত শক্তি একেবারেই সুস্পষ্ট। বুদ্ধির দাবী তো এই ছিল, এসব কিছু দেখে কৃতজ্ঞতায় তোমার মাথা নত হয়ে যাবে এবং সেই মহান রবের মোকাবিলায় তুমি কখনো নাফরমানী করার দুঃসাহস করবে না। তুমি এও জানো যে, তোমার রব কেবলমাত্র রহীম ও করীম করুণাময় ও অনুগ্রহশীলই নন, তিনি জাব্বার ও কাহ্হার—মহাপরাক্রমশালী এবং কঠোর শাস্তি দানকারীও। তাঁর পক্ষ থেকে যখন কোন ভূমিকম্প, তুফান বা বন্যা আসে তখন তার প্রতিরোধের জন্য তোমরা যতই ব্যবস্থা অবলম্বন করো না কেন সবকিছুই নিষ্ফল হয়ে যায়। তুমি একথাও জানো, তোমার রব মূর্খ অজ্ঞ নন বরং তিনি মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞ। জ্ঞান ও বিজ্ঞতার অপরিহার্য দাবী হচ্ছে এই যে, যাকে বুদ্ধি-জ্ঞান দান করা হবে তাকে তার কাজের জন্য দায়ীও করতে হবে। যাকে ক্ষমতা-ইখতিয়ার দেয়া হবে সেই ক্ষমতা-ইখতিয়ার সে কিভাবে ব্যবহার করেছে তার হিসেবও তার কাছ থেকে নিতে হবে। যাকে নিজ দায়িত্বে সৎ ও অসৎকাজ করার ক্ষমতা দেয়া হবে তাকে তার সৎকাজের জন্য পুরস্কার ও অসৎকাজের জন্য শাস্তিও দিতে হবে। এসব সত্য তোমার কাছে দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট। তাই তোমার মহান রবের পক্ষ থেকে তুমি যে ধোঁকায় পড়ে গেছো তার পেছনে কোন যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে, একথা তুমি বলতে পারবে না। তুমি নিজে যখন কারোর কর্মকর্তা হবার দায়িত্ব পালন করে থাকো তখন তোমার নিজের অধীন ব্যক্তি যদি তোমার ভদ্রতা ও কোমল ব্যবহারকে দুর্বলতা মনে করে তোমার মাথায় চড়ে বসে, তাহলে তখন তুমি তাকে নীচ প্রকৃতির বলে মনে করে থাকো। কাজেই তোমার প্রকৃতি একথা সাক্ষ দেবার জন্য যথেষ্ট যে, প্রভুর দয়া, করুণা ও মহানুভবতার কারণে তার চাকর ও কর্মচারীর কখনো তার মোকাবিলায় দুঃসাহসী হয়ে যাওয়া উচিত নয়। তার এ ভুল ধারণা পোষণ করা উচিত নয় যে, সে যা ইচ্ছা তাই করে যাবে এবং এ জন্য কেউ তাকে পাকড়াও করতে ও শাস্তি দিতে পারবে না।

৬. অর্থাৎ যে জিনিসটি তোমাকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে তার পেছনে আসলে কোন শক্তিশালী যুক্তি নেই। বরং দুনিয়ার এই কর্মজগতের পরে আর কোন কর্মফল জগত নেই, নিছক তোমার এ নির্বোধ ধারণাই এর পেছনে কাজ করেছে। এ বিভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন ধারণাই তোমাকে আল্লাহ থেকে গাফেল করে দিয়েছে। এরি ফলে তুমি আল্লাহর ন্যায় বিচারের ভয়ে ভীত হও না এবং এটিই তোমার নৈতিক আচরণকে দায়িত্বহীন বানিয়ে দিয়েছে।

৭. অর্থাৎ তোমরা চাইলে কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করতে পারো, তাকে মিথ্যা বলতে পারো, তার প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করতে পারো কিন্তু এতে প্রকৃত সত্য বদলে যাবে না। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, তোমাদের রব এই দুনিয়ায় তোমাদেরকে

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ
الدِّينِ ﴿١٥﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿١٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٧﴾
ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ
وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ ﴿١٩﴾

নিসন্দেহে নেক লোকেরা পরমানন্দে থাকবে আর পাপীরা অবশ্যি যাবে জাহান্নামে। কর্মফলের দিন তারা তার মধ্যে প্রবেশ করবে এবং সেখান থেকে কোনক্রমেই সরে পড়তে পারবে না। আর তোমরা কি জানো, ঐ কর্মফল দিনটি কি? হাঁ, তোমরা কি জানো, ঐ কর্মফল দিনটি কি? এটি সেই দিন যখন কারোর জন্য কোন কিছু করার সাধ্য কারোর থাকবে না।[৮] ফায়সালা সেদিন একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারে থাকবে।

লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেননি। বরং তিনি তোমাদের প্রত্যেকের ওপর অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে রেখেছেন। তারা নিরপেক্ষভাবে তোমাদের সমস্ত ভালো ও মন্দ কাজ রেকর্ড করে যাচ্ছে। তোমাদের কোন কাজ তাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকছে না। তোমরা অন্ধকারে, একান্ত নির্জনে, জনমানবহীন গভীর জংগলে অথবা এমন কোন অবস্থায় কোন কাজ করে থাকলে যে সম্পর্কে তোমরা পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকছো যে, তা সকল সৃষ্টির অগোচরে রয়ে গেছে, তারপরও তা তাদের কাছ থেকে গোপন থাকছে না। এই তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের জন্য আল্লাহ "কিরামান কাতেবীন" শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ লেখকবৃন্দ যারা করীম (অত্যন্ত সম্মানিত ও মর্যাদাবান)। তাদের কারোর সাথে ব্যক্তিগত ভালোবাসা বা শত্রুতা নেই। ফলে একজনের প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব এবং অন্যজনের অযথা বিরোধিতা করে সত্য বিরোধী ঘটনা রেকর্ড করার কোন অবকাশই সেখানে নেই। তারা খেয়ানতকারীও নয়। ডিউটি ফাঁকি দিয়ে নিজেদের তরফ থেকে খাতায় উল্টো সিধে লিখে দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তারা ঘুষখোরও নয়। নগদ কিছু নিয়ে কারো পক্ষে বা কারো বিপক্ষে মিথ্যা রিপোর্ট দেবার কোন প্রশ্নই তাদের ব্যাপারে দেখা দেয় না। এসব যাবতীয় নৈতিক দুর্বলতা থেকে তারা মুক্ত। তারা এসবের অনেক উর্ধে। কাজেই সৎ ও অসৎ উভয় ধরনের মানুষের নিশ্চিত থাকা উচিত যে, তাদের প্রত্যেকের সৎকাজ হুবহু রেকর্ড হবে এবং কারোর ঘাড়ে এমন কোন অসৎকাজ চাপিয়ে দেয়া হবে না, যা সে করেনি। তারপর এই ফেরেশতাদের দ্বিতীয় যে গুণটি বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ "তোমরা যা কিছু করো তা তারা জানে।" অর্থাৎ তাদের অবস্থা দুনিয়ার সি, আই, ডি ও তথ্য সরবরাহ এজেন্সিগুলোর মতো নয়। সব রকমের প্রচেষ্টা ও সাধ্য-সাধনার পরও অনেক কথা তাদের কাছ থেকে গোপন থেকে যায়। কিন্তু এ

ফেরেশতারা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেকটি কাজ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত। সব জায়গায় সব অবস্থায় সকল ব্যক্তির সাথে তারা এমনভাবে লেগে আছে যে, তারা জানতেই পারছে না যে, কেউ তাদের কাজ পরিদর্শন করছে। কোন্ ব্যক্তি কোন্ নিয়তে কি কাজ করেছে তাও তারা জানতে পারে। তাই তাদের তৈরি করা রেকর্ড একটি পূর্ণাংগ রেকর্ড। এই রেকর্ডের বাইরে কোন কথা নেই। এ সম্পর্কেই সূরা কাহাফের ৪৯ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ কিয়ামতের দিন অপরাধীরা অবাক হয়ে দেখবে তাদের সামনে যে আমলনামা পেশ করা হচ্ছে তার মধ্যে তাদের ছোট বড় কোন একটি কাজও অলিখিত থেকে যায়নি। যা কিছু তারা করেছিল সব হুবহু ঠিক তেমনিভাবেই তাদের সামনে আনা হয়েছে।

৮. অর্থাৎ কাউকে সেখানে তার কর্মফল ভোগ করার হাত থেকে নিষ্কৃতি দান করার ক্ষমতা কারোর থাকবে না। কেউ সেখানে এমন প্রভাবশালী বা আল্লাহর প্রিয়ভাজন হবে না যে, আল্লাহর আদালতে তাঁর রায়ের বিরুদ্ধে বেঁকে বসে একথা বলতে পারে, উমুক ব্যক্তি আমার আত্মীয়, প্রিয় বা আমার সাথে সম্পর্কিত, কাজেই দুনিয়ায় সে যত খারাপ কাজ করে থাকুক না কেন তাকে তো মাফ করতেই হবে।

আল মুতাফ্‌ফিফীন

৮৩

নামকরণ

প্রথম আয়াত وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এই সূরার বর্ণনাভংগী ও বিষয়বস্তু থেকে পরিষ্কার জানা যায়, এটি মক্কা মু'আয্‌যমায় প্রথম দিকে নাযিল হয়। সে সময় আখেরাত বিশ্বাসকে মক্কাবাসীদের মনে পাকা-পোক্তভাবে বসিয়ে দেবার জন্য একের পর এক সূরা নাযিল হচ্ছিল। সূরাটি ঠিক তখনই নাযিল হয় যখন মক্কার লোকেরা পথে-ঘাটে-বাজারে-মজলিসে-মহফিলে মুসলমানদেরকে টিটকারী দিচ্ছিল এবং তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করছিল। তবে জুলুম, নিপীড়ন ও মারপিট করার যুগ তখনো শুরু হয়নি। কোন কোন মুফাস্‌সির এই সূরাকে মদীনায় অবতীর্ণ বলেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিম্নোক্ত বর্ণনাটিই মূলত এ ভুল ধারণার পেছনে কাজ করছে। তিনি বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় এলেন তখন এখানকার লোকদের মধ্যে ওজনে ও মাপে কম দেবার রোগ ভীষণভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। তখন আল্লাহ নাযিল করেন وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ সূরাটি। এরপর থেকে লোকেরা ভালোভাবে ওজন ও পরিমাপ করতে থাকে। (নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে মারদুইয়া, ইবনে জারীর, বাইহাকী ফী শু'আবিল ঈমান) কিন্তু যেমন ইতিপূর্বে সূরা দাহারের ভূমিকায় আমি বলে এসেছি, সাহাবা ও তাবেঈগণ সাধারণত কোন একটি আয়াত যে ব্যাপারটির সাথে খাপ খেতো সে সম্পর্কে বলতেন, এ আয়াতটি এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। কাজেই ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়াত থেকে যা কিছু প্রমাণ হয় তা কেবল এতটুকু যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের পরে যখন মদীনার লোকদের মধ্যে এ বদঅভ্যাসটির ব্যাপক প্রসার দেখেন তখন আল্লাহর হুকুমে তাদের এ সূরাটি শুনান এবং এর ফলে তারা সংশোধিত হয়ে যায়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তুও আখেরাত।

ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে সাধারণ বেঈমানীটির ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল প্রথম ছ'টি আয়াতে সে জন্য তাদের পাকড়াও করা হয়েছে। তারা অন্যের থেকে নেবার সময় ওজন ও মাপ পুরো করে নিতো। কিন্তু যখন অন্যদেরকে দেবার সময় আসতো তখন ওজন ও মাপে

প্রত্যেককে কিছু না কিছু কম দিতো। সমাজের আরো অসংখ্য অসৎকাজের মধ্যে এটি এমন একটি অসৎকাজ ছিল যার অসৎ হবার ব্যাপারটি কেউ অস্বীকার করতে পারতো না। এ ধরনের একটি অসৎকাজকে এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করে বলা হয়েছে। এটি আখেরাত থেকে গাফেল হয়ে থাকার অপরিহার্য ফল। যতদিন লোকদের মনে এ অনুভূতি জাগবে না যে, একদিন তাদের আল্লাহর সামনে পেশ হতে হবে এবং সেখানে এক এক পাইয়ের হিসেব দিতে হবে ততদিন তাদের নিজেদের কাজ-কারবার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে পূর্ণ সততা অবলম্বন সম্ভবই নয়। সততা ও বিশ্বস্ততাকে "উত্তম নীতি" মনে করে কোন ব্যক্তি কিছু ছোট ছোট বিষয়ে সততার নীতি অবলম্বন করলেও করতে পারে কিন্তু যেখানে বেঈমানী একটি "লাভজনক নীতি" প্রমাণিত হয় সেখানে সে কখনই সততার পথে চলতে পারে না। মানুষের মধ্যে একমাত্র আল্লাহর ভয়ে ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের ফলেই সত্যিকার ও স্থায়ী সত্যতা বিশ্বস্ততা সৃষ্টি হতে পারে। কারণ এ অবস্থায় সততা একটি "নীতি" নয়, একটি "দায়িত্ব" গণ্য হয় এবং দুনিয়ায় সততার নীতি লাভজনক হোক বা অলাভজনক তার ওপর মানুষের সততার পথ অবলম্বন করা বা না করা নির্ভর করে না।

এভাবে নৈতিকতার সাথে আখেরাত বিশ্বাসের সম্পর্ককে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও মনোমুগ্ধকর পদ্ধতিতে বর্ণনা করার পর ৭ থেকে ১৭ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে, দুষ্কৃতকারীদের কাজের বিবরণী প্রথমেই অপরাধজীবীদের রেজিষ্টার (Black List) লেখা হচ্ছে এবং আখেরাতে তাদের মারাত্মক ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হবে। তারপর ১৮ থেকে ২৮ পর্যন্ত আয়াতে সৎলোকদের উত্তম পরিণামের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, তাদের আমলনামা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের রেজিষ্টারে সন্নিবেশিত করা হচ্ছে। আল্লাহর নৈকট্যলাভকারী ফেরেশতারা এ কাজে নিযুক্ত রয়েছেন।

সবশেষে ঈমানদারদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এবং এই সংগে কাফেরদেরকে এই মর্মে সতর্কও করে দেয়া হয়েছে যে, আজ যারা ঈমানদারদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করার কাজে ব্যাপৃত আছে কিয়ামতের দিন তারা অপরাধীর পর্যায়ে থাকবে এবং নিজেদের এ কাজের অত্যন্ত খারাপ পরিণাম দেখবে। আর সেদিন এ ঈমানদাররা এ অপরাধীদের খারাপ ও ভয়াবহ পরিণাম দেখে নিজেদের চোখ শীতল করবে।

আয়াত ৩৬ **সূরা আল মুতাফফিফীন-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝١ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝٢ وَاِذَا
كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝٣ اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ
مَّبْعُوْثُوْنَ ۝٤ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝٥ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٦

ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়।[১] তাদের অবস্থা এই যে, লোকদের থেকে নেবার সময় পুরোমাত্রায় নেয় এবং তাদেরকে ওজন করে বা মেপে দেবার সময় কম করে দেয়।[২] এরা কি চিন্তা করে না, একটি মহাদিবসে[৩] এদেরকে উঠিয়ে আনা হবে? যেদিন সমস্ত মানুষ রব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে।

১. মূলে مُطَفِّفِيْنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি এসেছে تَطْفِيْفَ থেকে। আরবী ভাষার তাফীফ (طفيف) ছোট্ট, তুচ্ছ ও নগণ্য জিনিসকে বলা হয়ে থাকে। পারিভাষিক অর্থে তাফীফ মানে হচ্ছে মাপে ও ওজনে চুরি করা। কারণ এ কাজ করার সময় এক ব্যক্তি মাপ ও ওজনের মাধ্যমে কোন বড় পরিমাণ জিনিস চুরি করে না। বরং হাত সাফাইয়ের মাধ্যমে প্রত্যেক ক্রেতার অংশ থেকে সামান্য সামান্য করে বাচিয়ে নেয়। ফলে বিক্রেতা কি জিনিস কতটুকু চুরি করেছে ক্রেতা তা টেরও পায় না।

২. কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে ওজনে ও মাপে কম করার কঠোর নিন্দা এবং সঠিকভাবে ওজন ও পরিমাণ করার জন্য কড়া তাগিদ করা হয়েছে। সূরা আন'আমে বলা হয়েছে ঃ "ইনসাফ সহকারে পুরো ওজন ও পরিমাপ করো। আমি কাউকে তার সামর্থের চাইতে বেশীর জন্য দায়িত্বশীল করি না।" (১৫২ আয়াত) সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে ঃ "মাপার সময় পুরো মাপবে এবং সঠিক পাল্লা দিয়ে ওজন করবে।" (৩৫ আয়াত) সূরা রহমানে তাকীদ করা হয়েছে ঃ "ওজনে বাড়াবাড়ি করো না, ঠিক ঠিকভাবে ইনসাফের সাথে ওজন করো এবং পাল্লায় কম করে দিয়ো না। (৮–৯ আয়াত) শো'আইবের সম্প্রদায়ের ওপর এ অপরাধের কারণে আযাব নাযিল হয় যে, তাদের মধ্যে ওজনে ও মাপে কম দেবার রোগ সাধারণভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং হযরত শো'আইব (আ)–এর বারবার নসীহত করা সত্ত্বেও এ সম্প্রদায়টি এ অপরাধমূলক কাজটি থেকে বিরত থাকেনি।

كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍ ۝٧ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ ۝٨ كِتَٰبٌ
مَّرْقُومٌ ۝٩ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝١٠ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۝١١
وَمَا يُكَذِّبُ بِهِۦٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝١٢ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ
أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۝١٣ كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ۝١٤
كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ۝١٥ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا۟
ٱلْجَحِيمِ ۝١٦ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ۝١٧

কখ্‌খনো নয়,[৪] নিশ্চিতভাবেই পাপীদের আমলনামা কয়েদখানার দফতরে রয়েছে।[৫] আর তুমি কি জানো সেই কয়েদখানার দফতরটা কি? একটি লিখিত কিতাব। সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য ধ্বংস সুনিশ্চিত, যারা কর্মফল দেবার দিনটিকে মিথ্যা বলেছে। আর সীমালংঘনকারী পাপী ছাড়া কেউ একে মিথ্যা বলে না। তাকে যখন আমার আয়াত শুনানো হয়[৬] সে বলে, এ তো আগের কালের গল্প। কখ্‌খনো নয়, বরং এদের মনে এদের খারাপ কাজের জং ধরেছে।[৭] কখ্‌খনো নয়, নিশ্চিতভাবেই সেদিন তাদের রবের দর্শন থেকে বঞ্চিত রাখা হবে।[৮] তারপর তারা গিয়ে পড়বে জাহান্নামের মধ্যে। এরপর তাদেরকে বলা হবে, এটি সেই জিনিস যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।

৩. কিয়ামতের দিনটিকে মহাদিবস হিসেবে উপস্থাপিত করে বলা হয়েছে ঃ সেদিন আল্লাহর আদালতে সকল জিন ও মানুষের কাজের হিসেব নেয়া হবে একই সংগে এবং আযাব ও সওয়াব দানের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ফায়সালা করা হবে।

৪. অর্থাৎ দুনিয়ায় এ ধরনের অপরাধ করার পর তারা এমনি স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবে এবং কখনো এদের আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করার জন্য হাযির হতে হবে না, তাদের এ ধারণা একেবারে ভুল।

৫. আসলে সিজ্জীন (سِجِّيْنٌ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি এসেছে সিজন (سجن) থেকে।। সিজন মানে জেলখানা বা কয়েদখানা। সামনের দিকে যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা থেকে জানা যায়, এর অর্থ হচ্ছে এমন ধরনের রেজিষ্টার খাতা যাতে শাস্তিলাভ যোগ্য লোকদের আমলনামা লেখা হচ্ছে।

كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِى عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾ كِتَٰبٌ
مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى
ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِى وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ يُسْقَوْنَ
مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿٢٥﴾ خِتَٰمُهُۥ مِسْكٌ ۚ وَفِى ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَٰفِسُونَ ﴿٢٦﴾
وَمِزَاجُهُۥ مِن تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾

কখ্খনো নয়,[৯] অবশ্যি নেক লোকদের আমলনামা উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের দফতরে রয়েছে। আর তোমরা কি জানো, এ উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের দফতরটি কি? এটি একটি লিখিত কিতাব। নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতারা এর দেখাশুনা করে। নিসন্দেহে নেক লোকেরা থাকবে বড়ই আনন্দে। উঁচু আসনে বসে দেখতে থাকবে। তাদের চেহারায় তোমরা সচ্ছলতার দীপ্তি অনুভব করবে। তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধতম শরাব পান করানো হবে। তার ওপর মিশ্‌কের মোহর থাকবে।[১০] যারা অন্যদের ওপর প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চায় তারা যেন এই জিনিসটি হাসিল করার জন্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হবার চেষ্টা করে। সে শরাবে তাসনীমের[১১] মিশ্রণ থাকবে। এটি একটি ঝরণা, নৈকট্যলাভকারীরা এর পানির সাথে শরাব পান করবে।

৬. অর্থাৎ যেসব আয়াতে বিচার দিনের খবর দেয়া হয়েছে সেই সব আয়াত।

৭. অর্থাৎ শাস্তি ও পুরস্কারকে গল্প বা উপকথা গণ্য করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। কিন্তু যে কারণে তারা একে গল্প বলছে তা হচ্ছে এই যে, এরা যেসব গোনাহ করতে থেকেছে এদের দিলে পুরোপুরি তার মরীচা ধরেছে। ফলে পুরোপুরি যুক্তিসংগত কথাও এদের কাছে গল্প বলে মন হচ্ছে। এই জং ও মরীচার ব্যাখ্যায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা যখন কোন গোনাহ্ করে, তার দিলে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। সে তওবা করলে দাগটি উঠে যায়। কিন্তু যদি সে গোনাহ করে যেতেই থাকে তাহলে সমগ্র দিলের ওপর তা ছেয়ে যায়। (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে জারীর, হাকেম, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে হিব্বান ইত্যাদি)

৮. অর্থাৎ একমাত্র নেক লোকেরাই আল্লাহর সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করবে এবং পাপীরা তার থেকে বঞ্চিত হবে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল কিয়ামাহ ১৭ টীকা)।

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا
بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا
رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ
حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾ عَلَى
الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

অপরাধীরা দুনিয়াতে ঈমানদারদের বিদ্রূপ করতো। তাদের কাছ দিয়ে যাবার সময় চোখ টিপে তাদের দিকে ইশারা করতো। নিজেদের ঘরের দিকে ফেরার সময় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ফিরতো।[১২] আর তাদেরকে দেখলে বলতো, এরা হচ্ছে পথভ্রষ্ট।[১৩] অথচ তাদেরকে এদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি।[১৪] আজ ঈমানদাররা কাফেরদের ওপর হাসছে। সুসজ্জিত আসনে বসে তাদের অবস্থা দেখছে। কাফেররা তাদের কৃতকর্মের "সওয়াব" পেয়ে গেলো তো?[১৫]

৯. অর্থাৎ মানুষের ভালো ও মন্দ কাজের কোন পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে না, তাদের এ ধারণা একেবারেই ভুল।

১০. মূলে "খিতামুহু মিস্‌ক (خِتَٰمُهُۥ مِسْكٌ) বলা হয়েছে। এর একটি অর্থ হচ্ছে, যেসব পাত্রে এই শরাব রাখা হবে তার ওপর মাটি বা মোমের পরিবর্তে মিশ্‌কের মোহর লাগানো থাকবে। এ অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের মানে হয় ঃ এটি হবে উন্নত পর্যায়ের পরিচ্ছন্ন শরাব। ঝরণায় প্রবাহিত শরাবের থেকে এটি বেশী উন্নত গুণাবলী সম্পন্ন হবে। জান্নাতের খাদেমরা মিশ্‌কের মোহর লাগানো পাত্রে করে এনে এগুলো জান্নাতবাসীদের পান করাবে। এর দ্বিতীয় মানে হতে পারে ঃ এই শরাব যখন পানকারীদের গলা থেকে নামবে তখন শেষের দিকে তারা মিশ্‌কের খুশ্‌বু পাবে। এই অবস্থাটি দুনিয়ার শরাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে শরাবের বোতল খোলার সাথে সাথেই একটি বোট্‌কা গন্ধ নাকে লাগে। পান করার সময়ও এর দুর্গন্ধ অনুভূত হতে থাকে এবং গলা দিয়ে নামবার সময় মস্তিষ্কের অভ্যন্তরেও পচা গন্ধ পৌঁছে যায়। এর ফলে শরাবীর চেহারায় বিস্বাদের একটা ভাব জেগে ওঠে।

১১. তাসনীম মানে উন্নত ও উঁচু। কোন ঝরণাকে তাসনীম বলার মানে হচ্ছে এই যে, তা উঁচু থেকে প্রবাহিত হয়ে নীচের দিকে আসে।

১২. অর্থাৎ একথা ভাবতে ভাবতে ঘরের দিকে ফিরতো ঃ আজ তো বড়ই মজা। উমুক মুসলমানকে বিদ্রূপ করে, তাকে চোখা চোখা বাক্যবাণে বিদ্ধ করে

বড়ই মজা পাওয়া গেছে এবং সাধারণ মানুষের সামনে তাকে চরমভাবে অপদস্থ করা গেছে।

১৩. অর্থাৎ এরা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের চক্করে ফেলে দিয়েছেন। ফলে এরা নিজেরা নিজেদেরকে দুনিয়ার লাভ, স্বার্থ ও ভোগ-বিলাসিতা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে এবং সব রকমের আশংকা ও বিপদ আপদের মুখোমুখি হয়েছে। যা কিছু এদের সামনে উপস্থিত আছে তা কেবল এ অনিশ্চিত আশায় ত্যাগ করছে যে, এদের সাথে মৃত্যুর পরে কি এক জান্নাত দেবার ওয়াদা করা হয়েছে, আর পরবর্তী জগতে নাকি কোন জাহান্নাম হবে, এদেরকে তার আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে এবং তার ফলেই এরা আজ এ দুনিয়ায় সবকিছু কষ্ট বরদাশ্‌ত করে যাচ্ছে।

১৪. এই ছোট বাক্যটিতে বিদ্রূপকারীদের জন্য বড়ই শিক্ষাপ্রদ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে অর্থাৎ ধরে নেয়া যাক মুসলমানরা যা কিছুর প্রতি ঈমান এনেছে সবকিছুই ভুল। কিন্তু তাতে তারা তোমাদের তো কোন ক্ষতি করছে না। যে জিনিসকে তারা সত্য মনে করেছে সেই অনুযায়ী তারা নিজেরাই একটি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতি অবলম্বন করেছে। এখন বলো, আল্লাহ কি তোমাকে কোন সেনানায়ক বানিয়ে পাঠিয়েছেন? যে তোমাকে আক্রমণ করছে না তুমি তাকে আক্রমণ করছো কেন? যে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে না তুমি তাকে অযথা কষ্ট দিচ্ছো কেন? আল্লাহ কি তোমাকে এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন?

১৫. এই বাক্যের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বিদ্রূপ লুকিয়ে আছে যেহেতু কাফেররা সওয়াবের কাজ মনে করে মুসলমানদেরকে বিরক্ত করতো ও কষ্ট দিতো। তাই বলা হয়েছে, আখেরাতে মু'মিনরা জান্নাতে আরামে বসে বসে জাহান্নামে কাফেরদের আগুনে জ্বলতে দেখবে। তাদের এ অবস্থা দেখে মু'মিনরা মনে মনে বলতে থাকবে, ওদের কাজের কেমন চমৎকার সওয়াব ওরা পেয়ে গেলো।

আল ইনশিকাক

৮৪

নামকরণ

প্রথম আয়াতের اِنْشَقَّتْ শব্দটি থেকে এই নামকরণ করা হয়েছে। এর মূলে রয়েছে انشقاق শব্দ। ইনশিকাক মানে ফেটে যাওয়া। অর্থাৎ এ নামকরণের মাধ্যমে একথা বলতে চাওয়া হয়েছে যে, এটি এমন একটি সূরা যাতে আকাশের ফেটে যাওয়ার উল্লেখ আছে।

নাযিলের সময়-কাল

এটিও মক্কা মু'আয্যমার প্রথম যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত। এ সূরার মধ্যে যেসব বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে তার আভ্যন্তরীণ বক্তব্য ও প্রমাণপত্র থেকে একথা জানা যায় যে, যখন এ সূরাটি নাযিল হয় তখন জুলুম-নিপীড়নের ধারাবাহিকতা শুরু হয়নি। তবে কুরআনের দাওয়াতকে তখন মক্কায় প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছিল। একদিন কিয়ামত হবে এবং সমস্ত মানুষকে আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে একথা মেনে নিতে লোকেরা অস্বীকার করছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটির বিষয়বস্তু হচ্ছে কিয়ামত ও আখেরাত। প্রথম পাঁচটি আয়াতে কেবল কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়নি। বরং এ সংগে কিয়ামত যে সত্যিই অনুষ্ঠিত হবে তার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। তার অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ সেদিন আকাশ ফেটে যাবে পৃথিবীকে ছড়িয়ে দিয়ে একটি সমতল ময়দানে পরিণত করা হবে। পৃথিবীর পেটে যা কিছু আছে (অর্থাৎ মৃত মানুষের শরীরের অংশসমূহ এবং তাদের কার্যাবলীর বিভিন্ন সাক্ষ প্রমাণ) সব বের করে বাইরে ফেলে দেয়া হবে। এমনকি তার মধ্যে আর কিছুই থাকবে না। এর সপক্ষে যুক্তি পেশ করে বলা হয়েছে, আকাশ ও পৃথিবীর জন্য এটিই হবে তাদের রবের হুকুম। আর যেহেতু এ দু'টি আল্লাহর সৃষ্টি, কাজেই তারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে পারবে না। তাদের জন্য তাদের রবের হুকুম তামিল করাটাই সত্য।

এরপর ৬ থেকে ১৯ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষ সচেতন বা অচেতন যে কোনভাবেই হোক না কেন সেই মনযিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যেখানে তার নিজেকে তার রবের সামনে পেশ করতে হবে। তখন সমস্ত মানুষ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। এক, যাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে। তাদেরকে কোন প্রকার কঠিন হিসেব-নিকেশের সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই সহজে মাফ করে দেয়া হবে। দুই, যাদের আমলনামা পিঠের দিকে

দেয়া হবে। তারা চাইবে, কোনভাবে যদি তাদের মৃত্যু হতো। কিন্তু মৃত্যুর বদলে তাদেরকে জাহান্নামে ঠেলে দেয়া হবে। তারা দুনিয়ায় এই বিভ্রান্তিতে ডুবে ছিল যে, তাদেরকে কখনো আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে না। এ কারণে তারা এ পরিণতির সম্মুখীন হবে। অথচ তাদের রব তাদের সমস্ত কার্যক্রম দেখছিলেন। এসব কার্যক্রমের ব্যাপারে জবাবদিহি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার তাদের কোন কারণ ছিল না। দুনিয়ার কর্মজীবন থেকে আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের জীবন পর্যন্ত তাদের পর্যায়ক্রমে পৌঁছে যাওয়ার ব্যাপারটি ঠিক তেমনই নিশ্চিত যেমন সূর্য ডুবে যাওয়ার পর পশ্চিম আকাশে লাল আভা দেখা দেয়া, দিনের পরে রাতের আসা, সে সময় মানুষ ও সকল প্রাণীর নিজ নিজ ডেরায় ফিরে আসা এবং একাদশীর একফালি চাঁদের ধীরে ধীরে চতুরদশীর পূর্ণচন্দ্রে পরিণত হওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত।

সবশেষে কাফেরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির খবর শুনানো হয়েছে। কারণ তারা কুরআনের বাণী শুনে আল্লাহর সামনে নত হওয়ার পরিবর্তে তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। এ সংগে যারা ঈমান এনে নেক আমল করে তাদেরকে অগণিত পুরস্কার ও উত্তম প্রতিদানের সুখবর শুনানো হয়েছে।

আয়াত ২৫ **সূরা আল ইনশিকাক-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۝١ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝٢ وَإِذَا الْأَرْضُ
مُدَّتْ ۝٣ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝٤ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝٥
يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ۝٦

যখন আকাশ ফেটে যাবে এবং নিজের রবের হুকুম পালন করবে।[১] আর (নিজের রবের হুকুম মেনে চলা,) এটিই তার জন্য সত্য। আর পৃথিবীকে যখন ছড়িয়ে দেয়া হবে।[২] যা কিছু তার মধ্যে আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করে সে খালি হয়ে যাবে[৩] এবং নিজের রবের হুকুম পালন করবে। আর (নিজের রবের হুকুম মেনে চলা), এটিই তার জন্য সত্য।[৪] হে মানুষ! তুমি কঠোর পরিশ্রম করতে করতে তোমার রবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছো, পরে তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে।

১. মূলে أَذِنَتْ لِرَبِّهَا শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। এর শাব্দিক মানে হয়, "সে নিজের রবের হুকুম শুনবে।" কিন্তু আরবী প্রবাদ অনুযায়ী أَذِنَ لَهُ এর মানে শুধুমাত্র হুকুম শুনা হয় না বরং এর মানে হয়, সে হুকুম শুনে একজন অনুগতের ন্যায় নির্দেশ পালন করেছে এবং একটুও অবাধ্যতা প্রকাশ করেনি।

২. পৃথিবীকে ছড়িয়ে দেবার মানে হচ্ছে, সাগর, নদী ও সমস্ত জলাশয় ভরে দেয়া হবে। পাহাড়গুলো চূর্ণবিচূর্ণ করে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়া হবে। পৃথিবীর সমস্ত উঁচু নীচু জায়গা সমান করে সমগ্র পৃথিবীটাকে একটি সমতল প্রান্তরে পরিণত করা হবে। সূরা ত্বা-হা'য় এই অবস্থাটিকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ মহান আল্লাহ "তাকে একটা সমতল প্রান্তরে পরিণত করে দেবেন। সেখানে তোমরা কোন উঁচু জায়গা ও ভাঁজ দেখতে পাবে না।" (১০৬-১০৭ আয়াত) হাকেম মুস্তাদ্‌রাকে নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর বরাত দিয়ে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে একটি দস্তরখানের মতো খুলে বিছিয়ে দেয়া হবে। তারপর মানুষের জন্য সেখানে কেবলমাত্র পা রাখার জায়গাই থাকবে।" একথাটি ভালোভাবে বুঝে নেয়ার জন্য এ বিষয়টিও সামনে রাখতে হবে যে, সেদিন সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষের জন্ম

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۝٧ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا
يَسِيرًا ۝٨ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝٩ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ
ظَهْرِهِ ۝١٠ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ۝١١ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۝١٢ إِنَّهُ كَانَ
فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝١٣ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ۝١٤ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ
كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۝١٥

তারপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে হাল্কা হিসেব নেয়া হবে[৬] এবং সে হাসিমুখে নিজের লোকজনের কাছে ফিরে যাবে।[৭] আর যার আমলনামা তার পিছন দিক থেকে দেয়া হবে,[৮] সে মৃত্যুকে ডাকবে এবং জ্বলন্ত আগুনে গিয়ে পড়বে। সে নিজের পরিবারের লোকদের মধ্যে ডুবে ছিল।[৯] সে মনে করেছিল, তাকে কখনো ফিরতে হবে না। না ফিরে সে পারতো কেমন করে? তার রব তার কার্যকলাপ দেখছিলেন।[১০]

হয়েছে ও হবে সবাইকে একই সংগে জীবিত করে আল্লাহর আদালতে পেশ করা হবে। এ বিরাট জনগোষ্ঠীকে এক জায়গায় দাঁড় করাবার জন্য সমস্ত সাগর, নদী, জলাশয়, পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা, মালভূমি, তথা উঁচু-নীচু সব জায়গা ভেঙেচুরে ভরাট করে সারা দুনিয়াটাকে একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তরে পরিণত করা হবে।

৩. এর অর্থ হচ্ছে, যত মৃত মানুষ তার মধ্যে রয়েছে সবাইকে ঠেলে বাইরে বের করে দেবে। আর এভাবে তাদের কৃতকর্মের যেসব প্রমাণপত্র তার মধ্যে রয়ে গেছে সেগুলোও পুরোপুরি বেরিয়ে আসবে। কোন একটি জিনিসও তার মধ্যে লুকিয়ে বা গোপন থাকবে না।

৪. যখন এসব ঘটনাবলী ঘটবে তখন কি হবে, একথা পরিষ্কার করে বলা হয়নি। কারণ এ পরবর্তী বক্তব্যগুলো নিজে নিজেই তা প্রকাশ করে দিচ্ছে। এ বক্তব্যগুলোতে বলা হচ্ছে ঃ হে মানুষ! তুমি তোমার রবের দিকে এগিয়ে চলছো। শীঘ্র তাঁর সামনে হাযির হয়ে যাবে। তখন তোমার আমলনামা তোমার হাতে দেয়া হবে। আর তোমার আমলনামা অনুযায়ী তোমাকে পুরস্কার দেয়া হবে।

৫. অর্থাৎ দুনিয়ায় তুমি যা কিছু কষ্ট-সাধনা প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছ, সে সম্পর্কে তুমি মনে করতে পারো যে তা কেবল দুনিয়ার জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ এবং দুনিয়াবী স্বার্থ লাভ করাই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু আসলে তুমি সচেতন বা অচেতনভাবে নিজের রবের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছো এবং অবশেষে তোমাকে তাঁর কাছেই পৌঁছতে হবে।

৬. অর্থাৎ তার হিসেব নেয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি করা হবে না। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে না, উমুক উমুক কাজ তুমি কেন করেছিলে? ঐসব কাজ করার ব্যাপারে তোমার কাছে কি কি ওজর আছে? নেকীর সাথে সাথে গোনাহও তার আমলনামায় অবশ্যি লেখা থাকবে। কিন্তু গোনাহের তুলনায় নেকীর পরিমাণ বেশী হবার কারণে তার অপরাধগুলো উপেক্ষা করা হবে এবং সেগুলো মাফ করে দেয়া হবে। কুরআন মজিদে অসৎকর্মশীল লোকদের কঠিন হিসেব-নিকেশের জন্য "সু-উল হিসেব" (খারাপভাবে হিসেব নেয়া) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। (আর্ রা'আদ ১৮ আয়াত) সৎলোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "এরা এমন লোক যাদের সৎকাজগুলো আমি গ্রহণ করে নেবো এবং অসৎকাজগুলো মাফ করে দেবো।" (আল আহকাফ ১৬ আয়াত) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যে ব্যাখ্যা করেছেন তাকে ইমাম আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, হাকেম, ইবনে জারীর, আব্দ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে মারদুইয়া বিভিন্ন শব্দাবলীর সাহায্যে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এক বর্ণনা মতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যার থেকেই হিসেব নেয়া হয়েছে, সে মারা পড়েছে।"

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ কি একথা বলেননি, "যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে তার থেকে হাল্কা হিসেব নেয়া হবে?" রসূলুল্লাহ (সা) জবাব দেন ঃ "সেটি তো হলো কেবল আমলের উপস্থাপনা। কিন্তু যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে সে মারা পড়েছে।" আর একটি রেওয়ায়াতে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি একবার নামাযে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তে শুনি ঃ "হে আল্লাহ! আমার থেকে হাল্কা হিসেব নাও" তিনি সালাম ফেরার পর আমি তাঁকে এর অর্থ জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন ঃ "হাল্কা হিসেব মানে বান্দার আমলনামা দেখা হবে এবং উপেক্ষা করা হবে। হে আয়েশা! সেদিন যার কাছ থেকে হিসেব নেয়া হয়েছে সে মারা পড়েছে।"

৭. নিজের লোকজন বলতে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও সাথী-সহযোগীদের কথা বুঝানো হয়েছে। তাদেরকেও একইভাবে মাফ করে দেয়া হয়ে থাকবে।

৮. সূরা আল হাক্কায় বলা হয়েছে, যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে। আর এখানে বলা হয়েছে, তার পেছন দিক থেকে দেয়া হবে। সম্ভবত এটা এভাবে হবে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ডান হাতে আমলনামা পাবার ব্যাপারে প্রথম থেকে নিরাশ হয়ে থাকবে। কারণ নিজের কার্যক্রম তার ভালোভাবেই জানা থাকবে। ফলে সে নিশ্চিতভাবে মনে করবে যে, তাকে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে। তবে সমস্ত মানুষের সামনে আমলনামা বাম হাতে নিতে সে লজ্জা অনুভব করবে। তাই সে নিজের হাত পেছনের দিকে রাখবে। কিন্তু এই চালাকি করে সে নিজের কৃতকর্মের ফল নিজের হাতে তুলে নেবার হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। সে হাত সামনের দিকে রাখুক বা পেছনের দিকে অবশ্যি তার আমলনামা তার হাতে ধরিয়ে দেয়া হবে।

৯. অর্থাৎ তার অবস্থা ছিল আল্লাহর সৎবান্দাদের থেকে আলাদা। আল্লাহর এই সৎ-বান্দাদের সম্পর্কে সূরা ত্বা-হা'র ২৬ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ তারা নিজেদের পরিবারের লোকদের মধ্যে আল্লাহর ভয়ে ভীত লোকদের জীবন যাপন করতো। অর্থাৎ সবসময় তারা

فَلَآ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ
عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

কাজেই না, আমি কসম খাচ্ছি, আকাশের লাল আভার ও রাতের এবং তাতে যা কিছুর সমাবেশ ঘটে তার, আর চাঁদের, যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে। তোমাদের অবশ্যি স্তরে স্তরে এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থার দিকে এগিয়ে যেতে হবে।[১১] তাহলে এদের কি হয়েছে, এরা ঈমান আনে না এবং এদের সামনে কুরআন পড়া হলে এরা সিজদা করে না?[১২] বরং এ অস্বীকারকারীরা উলটো মিথ্যা আরোপ করে। অথচ এরা নিজেদের আমলনামায় যা কিছু জমা করছে আল্লাহ তা খুব ভালো করেই জানেন।[১৩] কাজেই এদের যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

ভয় করতো নিজেদের সন্তান ও পরিবারের লোকদের প্রতি ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্ধার করতে গিয়ে নিজেদের পরকাল বরবাদ না করে ফেলে। বিপরীত পক্ষে সেই ব্যক্তির অবস্থা ছিল এই যে, সে নিজের ঘরে আরামে সুখের জীবন যাপন করছিল। সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের লোকজনদের বিলাসী জীবন যাপনের জন্য যতই হারাম পদ্ধতি অবলম্বন এবং অন্যের অধিকার হরণ করার প্রয়োজন হোক না কেন তা তারা করে চলছিল। এই বিলাসী জীবন-যাপন করতে গিয়ে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখাগুলোকে সে চোখ বন্ধ করে ধ্বংস করে চলছিল।

১০. অর্থাৎ সে যেসব কাজ কারবার করে যাচ্ছিল আল্লাহ সেগুলো উপেক্ষা করতেন এবং নিজের সামনে ডেকে তাকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করতেন না এমনটি ছিল আল্লাহর ইনসাফ ও হিকমতের পরিপন্থী।

১১. অর্থাৎ তোমরা একই অবস্থার ওপর অপরিবর্তিত থাকবে না। বরং যৌবন থেকে বার্ধক্য, বার্ধক্য থেকে মৃত্যু, মৃত্যু থেকে বরযখ (মৃত্যু ও কিয়ামতের মাঝখানের জীবন), বরযখ থেকে পুনরুজ্জীবন, পুনরুজ্জীবন থেকে হাশরের ময়দান তারপর হিসেব-নিকেশ এবং শাস্তি ও পুরস্কারের অসংখ্য মনযিল তোমাদের অবশ্যি অতিক্রম করতে হবে। এ

বিষয়ে তিনটি জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে। সূর্য অস্ত যাবার পর পশ্চিম আকাশের লালিমার, দিনের পর রাত্রির আঁধার ও তার মধ্যে দিনের বেলা যেসব মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী পৃথিবীর চারদিকে বিচরণ করে তাদের একত্র হওয়ার এবং চাঁদের সরুকাস্তের মতো অবস্থা থেকে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে পূর্ণচন্দ্রে পরিণত হওয়ার। অন্য কথায় বলা যায়, এ জিনিসগুলো প্রকাশ্যে সাক্ষ প্রদান করছে যে, মানুষ যে বিশ্ব-জাহানে বসবাস করে সেখানে কোন স্থিতিশীলতা নেই। সেখানে সর্বত্র একটি নিরন্তর পরিবর্তন ও ধারাবাহিক অবস্থান্তর প্রক্রিয়া কার্যকর রয়েছে। কাজেই শেষ নিশ্বাসটা বের হয়ে যাবার সাথে সাথে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে, মুশরিকদের এ ধারণা ঠিক নয়।

১২. অর্থাৎ এদের মনে আল্লাহর ভয় জাগে না। এরা তাঁর সামনে মাথা নত করে না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কার্যক্রম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি কুরআনের এ আয়াতটি পড়ার সময় সিজদা করেছেন। ইমাম মালেক, মুসলিম ও নাসাঈ হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এ রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি নামাযে এ সূরাটি পড়ে এ জায়গায় সিজদা করেন এবং বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ জায়গায় সিজদা করেছেন। বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ আবু রাফের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, হযরত আবু হুরাইরা (রা) এশার নামাযে এ সূরাটি পড়েন এবং সিজদা করেন। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে নামায পড়ি এবং তিনি এখানে সিজদা করেন তাই আমি আমৃত্যু এখানে সিজদা করে যেতে থাকবো। মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ এবং আরো অনেকে অন্য একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে এই সূরায় এবং 'ইক্‌রা বিস্‌মি রব্বিকাল্লাজী খালাক' সূরায় সিজদা করেছি।

১৩. এর আর একটি অর্থ এও হতে পারে যে, এরা নিজেদের মনে কুফরী, হিংসা, সত্যের সাথে শত্রুতা এবং অন্যান্য খারাপ ইচ্ছা ও দুষ্ট সংকল্পের যে নোংরা আবর্জনা ভরে রেখেছে আল্লাহ তা খুব ভালো করেই জানেন।

আল বুরূজ

৮৫

নামকরণ

প্রথম আয়াতে اَلْبُرُوْجِ শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এর বিষয়বস্তু থেকেই একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এ সূরাটি মক্কা মুয়ায্যমায় এমন এক সময় নাযিল হয় যখন মুশরিকদের জুলুম নিপীড়ন তুংগে উঠেছিল এবং তারা কঠিনতম শাস্তি দিয়ে মুসলমানদের ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে, ঈমানদারদের ওপর কাফেররা যে জুলুম করছিল সে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা এবং ঈমানদারদেরকে এই মর্মে সান্ত্বনা দেয়া যে, যদি তারা এসব জুলুম-নিপীড়নের মোকাবিলায় অবিচল থাকে তাহলে তারা এর জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার পাবে এবং আল্লাহ নিজেই জালেমদের থেকে বদ্‌লা নেবেন।

এ প্রসংগে সর্বপ্রথম আসহাবুল উখদূদের (গর্ত ওয়ালাদের) কাহিনী শুনানো হয়েছে। তারা ঈমানদারদেরকে আগুনে ভরা গর্তে ফেলে দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছিল। এ কাহিনীর মাধ্যমে মু'মিন ও কাফেরদেরকে কয়েকটি কথা বুঝানো হয়েছে। এক, গর্তওয়ালারা যেমন আল্লাহর অভিশাপ ও তাঁর শাস্তির অধিকারী হয়েছে তেমনি মক্কার মুশরিক সরদাররাও তার অধিকারী হচ্ছিল। দুই, ঈমানদাররা যেমন তখন ঈমান ত্যাগ করার পরিবর্তে আগুনে ভরা গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে জীবন দেয়াকে বেছে নিয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে এখনও ঈমানদারদের ঈমানের পথ থেকে সামান্যতমও বিচ্যুত না হয়ে সব রকমের কঠিনতম শাস্তি ভোগ করা উচিত। তিন, যে আল্লাহকে মেনে নেবার কারণে কাফেররা বিরোধী হয়ে গেছে এবং ঈমানদাররা তাদের মেনে নেবার ওপর অবিচল রয়েছে, তিনি সবার ওপর ক্ষমতাশালী ও বিজয়ী, তিনি পৃথিবী ও আকাশের কর্তৃত্বের অধিকারী, নিজের সত্তায় তিনি নিজেই প্রশংসার অধিকারী এবং তিনি উভয় দলের অবস্থা দেখছেন। কাজেই নিশ্চিতভাবেই কাফেররা তাদের কুফরীর কারণে কেবল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে না বরং এই সংগে নিজেদের জুলুম-নিপীড়নের শাস্তিও তারা ভোগ করবে আগুনে দগ্ধীভূত হয়ে। অনুরূপভাবে যারা ঈমান এনে সৎকাজ করেছে তারা নিশ্চিতভাবে জান্নাতে যাবে এবং এটিই বৃহত্তম সাফল্য। তারপর কাফেরদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ অত্যন্ত শক্ত ও কঠোরভাবে পাকড়াও করে থাকেন। যদি তোমরা

নিজেদের বিরাট দলীয় শক্তির ওপর ভরসা করে থাকো তাহলে তোমাদের চাইতে বড় দলীয় শক্তির অধিকারী ছিল ফেরাউন ও সামূদরা। তাদের সেনাবাহিনীর পরিণাম থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। আল্লাহর অসীম শক্তি তোমাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে আছে। এই ঘেরাও কেটে বের হবার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আর যে কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য তোমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছো, তার প্রত্যেকটি শব্দ অপরিবর্তনীয়। এই কুরআনের প্রতিটি শব্দ লওহে মাহফুযের গায়ে এমনভাবে খোদিত আছে যে হাজার চেষ্টা করেও কেউ তা বদলাতে পারবে না।

আয়াত ২২ **সূরা আল বুরূজ-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۝١ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۝٢ وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ۝٣
قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۝٤ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۝٥ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا
قُعُوْدٌ ۝٦ وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۝٧ وَمَا نَقَمُوْا
مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝٨ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ۝٩

কসম মজবুত দুর্গ বিশিষ্ট আকাশের[১] এবং সেই দিনের যার ওয়াদা করা হয়েছে[২] আর যে দেখে তার এবং সেই জিনিসের যা দেখা যায়।[৩] মারা পড়েছে গর্তওয়ালারা যে গর্তে দাউ দাউ করে জ্বলা জ্বালানীর আগুন ছিল, যখন তারা সেই গর্তের কিনারে বসেছিল এবং ঈমানদারদের সাথে তারা সবকিছু করছিল তা দেখছিল।[৪] ওই ঈমানদারদের সাথে তাদের শত্রুতার এ ছাড়া আর কোন কারণ ছিল না যে, তারা সেই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল যিনি মহাপরাক্রমশালী এবং নিজের সত্তায় নিজেই প্রশংসিত, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্বের অধিকারী। আর সে আল্লাহ সবকিছু দেখছেন।[৫]

১. মূলে ذَاتِ الْبُرُوْجِ বলা হয়েছে। অর্থাৎ বুর্জ বিশিষ্ট আকাশ। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা অনুযায়ী মুফাস্‌সিরগণের কেউ কেউ এ থেকে আকাশের বারটি বুর্জ অর্থ করেছেন। অন্যদিকে ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদাহ, হাসান বসরী, যাহ্‌হাক ও সুদ্দীর মতে এর অর্থ হচ্ছে, আকাশের বিশাল গ্রহ ও তারকাসমূহ।

২. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন।

৩. যে দেখে এবং যা দেখা যায়—এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়। কিন্তু আমার মতে বক্তব্যের ধারাবাহিকতার সাথে যে কথাটি সম্পর্ক রাখে সেটি হচ্ছে, যে দেখে বলতে এখানে কিয়ামতের দিন উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে এবং যা দেখা

যায় বলতে কিয়ামতকেই বুঝানো হয়েছে। কিয়ামতের ভয়াবহ ও লোমহর্ষক ঘটনাবলী সেদিন যারা দেখে তারা প্রত্যেকেই দেখবে। এটি মুজাহিদ, ইকরামা, যাহ্হাক, ইবনে নুজাইহ্ এবং অন্যান্য কতিপয় মুফাস্সিরের বক্তব্য।

৪- যারা বড় বড় গর্তের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে ঈমানদারদেরকে তার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল এবং তাদের জ্বলে পুড়ে মরার বীভৎস দৃশ্য নিজেদের চোখে দেখেছিল তাদেরকে এখানে গর্তওয়ালা বলা হয়েছে। মারা পড়েছে অর্থ তাদের ওপর আল্লাহর লানত পড়েছে এবং তারা আল্লাহর আযাবের অধিকারী হয়েছে। এ বিষয়টির জন্য তিনটি জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে। প্রথম বুর্জ বিশিষ্ট আকাশের দ্বিতীয় কিয়ামতের দিনের, যার ওয়াদা করা হয়েছে। তৃতীয় কিয়ামতের ভয়াবহ ও লোমহর্ষক দৃশ্যাবলীর এবং সেই সমস্ত সৃষ্টির যারা এ দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করবে। প্রথম জিনিসটি সাক্ষ দিচ্ছে, যে সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন মহাশক্তিধর সত্ত্বা বিশ্ব-জাহানের বিশাল তারকা ও গ্রহরাজির ওপর কর্তৃত্ব করছেন তাঁর পাকড়াও থেকে এ তুচ্ছ নগণ্য মানুষ কেমন করে বাঁচতে পারে? দ্বিতীয় জিনিসটির কসম এ জন্য খাওয়া হয়েছে যে, দুনিয়ায় তারা ইচ্ছামতো জুলুম করেছে কিন্তু এমন একটি দিন অবশ্যি আসবে যেদিনটি সম্পর্কে সমস্ত মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে সেদিন প্রত্যক মজলুমের বদ্‌লা দেয়া হবে এবং প্রত্যেক জালেমকে পাকাড়াও করা হবে। তৃতীয় জিনিসটির কসম খাওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, এ জালেমরা যেভাবে ওই ঈমানদারদের জ্বলে পুড়ে মরার দৃশ্য দেখেছে ঠিক তেমনি কিয়ামতের দিন এদের শাস্তি দেয়ার দৃশ্য সমগ্র সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করবে।

গর্তে আগুন জ্বালিয়ে ঈমানদারদেরক তার মধ্যে নিক্ষেপ করার একাধিক ঘটনা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, এ ধরনের জুলুম ও নিপীড়নমূলক ঘটনা দুনিয়ায় কয়েকবার ঘটেছে।

হযরত সুহাইব রুমী (রা) এ ধরনের একটি ঘটনা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। ঘটনাটি হচ্ছে ঃ এক বাদশার কাছে একজন যাদুকর ছিল। বৃদ্ধ বয়সে সে বাদশাহকে বললো, একটি ছেলেকে আমার কাছে নিযুক্ত করো, সে আমার কাছ থেকে এ যাদু শিখে নেবে। বাদশাহ যাদু শেখার জন্য যাদুকরের কাছে একটি ছেলেকে নিযুক্ত করলো। কিন্তু সেই ছেলেটি যাদুকরের কাছে আসা যাওয়ার পথে একজন রাহেবের (যিনি সম্ভবত হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দীনের অনুসারী একজন সাধক ছিলেন) সাক্ষাত করতে লাগলো। তাঁর কথায় প্রভাবিত হয়ে সে ঈমান আনলো। এমন কি তাঁর শিক্ষার গুণে সে অলৌকিক শক্তির অধিকারীও হয়ে গেলো। সে অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে এবং কুষ্ঠরোগ নিরাময় করতে লাগলো। ছেলেটি তাওহীদের প্রতি ঈমান এনেছে, একথা জানতে পেরে বাদশাহ প্রথমে রাহেবকে হত্যা করলো তারপর ছেলেটিকে হত্যা করতে চাইলো। কিন্তু কোন অস্ত্র দিয়েই এবং কোনভাবেই তাকে হত্যা করতে পারলো না।-শেষে ছেলেটি বললো, যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও তাহলে প্রকাশ্য জনসমাবেশে "বিস্‌মি রব্বিল গুলাম" (অর্থাৎ এই ছেলেটির রবের নামে) বাক্য উচ্চারণ করে আমাকে তীর মারো, তাতেই আমি মারা যাবো। বাদশাহ তাই করলো। ফলে ছেলেটি মারা গেলো। এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে লোকেরা চীৎকার করে উঠলো, আমরা এই ছেলেটির রবের প্রতি ঈমান আনলাম। বাদশাহর সভাসদরা তাকে বললো, এখন তো

তাই হয়ে গেলো যা থেকে আপনি বাঁচতে চাচ্ছিলেন। লোকেরা আপনার ধর্ম ত্যাগ করে এ ছেলেটির ধর্মগ্রহণ করেছে। এ অবস্থা দেখে বাদশাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো। সে রাস্তার পাশে গর্ত খনন করালো। তাতে আগুন জ্বালালো। যারা ঈমান ত্যাগ করতে রাজী হলো না তাদের সবাইকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করলো। (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে জারীর, আবদুর রাজ্জাক, ইবনে আবী শাইবা, তাবারানী, আবদ ইবনে হুমাইদ)

দ্বিতীয় ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন, ইরানের এক বাদশাহ শরাব পান করে নিজের বোনের সাথে ব্যভিচার করে এবং উভয়ের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। কথাটি প্রকাশ হয়ে গেলে বাদশাহ জনসমক্ষে ঘোষণা করে দেয় যে, আল্লাহ বোনের সাথে বিয়ে হালাল করে দিয়েছেন। লোকেরা তার একথা মানতে প্রস্তুত হয় না। ফলে সে নানান ধরনের শাস্তি দিয়ে লোকদের একথা মানতে বাধ্য করতে থাকে। এমনকি সে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে যে ব্যক্তি তার একথা মানতে প্রস্তুত হয়নি তাকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করতে থাকে। হযরত আলী (রা) বলেন, সে সময় থেকেই অগ্নি উপাসকদের মধ্যে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়কে বিয়ে করার পদ্ধতি প্রচলিত হয়। (ইবনে জারীর)

তৃতীয় ঘটনাটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) সম্ভবত ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন ঃ বেবিলনের অধিবাসীরা বনী ইসরাঈলকে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দীন থেকে বিচ্যুত করতে বাধ্য করেছিল। এমন কি যারা তাদের কথা মানতে অস্বীকার করতো তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনে ভরা গর্তে নিক্ষেপ করতো। (ইবনে জারীর, আবদ ইবনে হুমাইদ)

নাজরানের ঘটনাটিই সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইবনে হিশাম, তাবারী, ইবনে খালদূন, মু'জামুল বুলদান গ্রন্থ প্রণেতা ইত্যাদি মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। এর সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে ঃ হিম্‌য়ারের (ইয়ামন) বাদশাহ তুবান আস্‌য়াদ আবু কারিবা একবার ইয়াস্‌রিবে যায়। সেখানে ইহুদিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করে এবং বনি কুরাইযার দু'জন ইহুদি আলেমকে সংগে করে ইয়ামনে নিয়ে যায়। সেখানে সে ব্যাপকভাবে ইহুদি ধর্মের প্রচার চালায়। তারপর তার ছেলে যু-নুওয়াস তার উত্তরাধিকারী হয়। সে দক্ষিণ আরবে ঈসায়ীদের কেন্দ্রস্থল নাজরান আক্রমণ করে। সেখান থেকে ঈসায়ী ধর্মকে উৎখাত করা এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে জোরপূর্বক ইহুদি ধর্মে দীক্ষিত করাই ছিল তার লক্ষ। (ইবনে হিশাম বলেন, নাজরানবাসীরা হযরত ঈসার আসল দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল)। নাজরান পৌঁছে সে লোকদেরকে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করার আহবান জানায়। লোকেরা অস্বীকার করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সে বিপুল সংখ্যক লোককে দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনের কুয়ায় নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দেয় এবং অনেককে হত্যা করে। এভাবে মোট বিশ হাজার লোক নিহত হয়। নাজরানবাসীদের মধ্য থেকে দাউস যু-সা'লাবান নামক এক ব্যক্তি কোনক্রমে প্রাণরক্ষা করে পালিয়ে যায়। এক বর্ণনা মতে, সে রোমের কায়সারের দরবারে চলে যায় এবং অন্য একটি বর্ণনা মতে সে চলে যায় হাবশার (ইথিওপিয়া) বাদশাহ নাজ্জাসীর দরবারে। সেখানে সে এই জুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। প্রথম বর্ণনা অনুযায়ী রোমের কায়সার হাবশার বাদশাকে লেখেন এবং

দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী নাজ্জাশী কায়সারের কাছে নৌবাহিনীর জাহাজ সরবরাহের আবেদন জানান। যাহোক সবশেষে হাবশার সত্তর হাজার সৈন্য আরইয়াত নামক একজন সেনাপতির পরিচালনাধীনে ইয়ামন আক্রমণ করে। যু-নুওয়াস নিহত হয়। ইহুদি রাষ্ট্রের পতন ঘটে। ইয়ামন হাবশার ঈসায়ী রাষ্ট্রের অন্তরভুক্ত হয়।

অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণাদি থেকে মুসলিম ঐতিহাসিকদের এ বর্ণনার কেবল সত্যতাই প্রমাণিত হয় না বরং এ সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত তথ্যাদিও জানা যায়। সর্বপ্রথম ৩৪০ খৃষ্টাব্দে ইয়ামন হাবশার ঈসায়ীদের দখলে আসে। ৩৭৮ খৃঃ পর্যন্ত সেখানে তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ সময় ঈসায়ী মিশনারীরা ইয়ামনে প্রবেশ করতে শুরু করে। এরি নিকটবর্তী সময়ে ফেমিউন (Faymiyun) নামক একজন সংসার ত্যাগী সাধক পুরুষ, কাশ্‌ফ ও কারামতের অধিকারী ঈসায়ী পর্যটক নাজরানে আসেন। তিনি স্থানীয় লোকদেরকে মূর্তি পূজার গলদ বুঝাতে থাকেন। তার প্রচার গুণে নাজরানবাসীরা ঈসায়ী ধর্মে দীক্ষিত হয়। সে সময় তিনজন সরদার তাদের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। তাদের একজনকে বলা হতো সাইয়েদ। তিনি উপজাতীয় সরদারদের মতো একজন বড় সরদার ছিলেন। বিদেশ সংক্রান্ত বিষয়াবলী, সন্ধি-চুক্তি এবং সেনাবাহিনী পরিচালনা তার দায়িত্বের অন্তরভুক্ত ছিল। দ্বিতীয় জনকে বলা হতো আকেব। তিনি আভ্যন্তরীণ বিষয়াবলী দেখাশুনা করতেন। তৃতীয় জনকে বলা হতো উস্‌কুফ (বিশপ)। তিনি ছিলেন ধর্মীয় নেতা। দক্ষিণ আরবে নাজরান ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। এটি ছিল একটি বৃহত্তম বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্র। এখানে তসর, চামড়া ও অস্ত্র নির্মাণ শিল্প উন্নতি লাভ করেছিল। প্রসিদ্ধ ইয়ামনী বর্মও এখানেই নির্মিত হতো। এ কারণে নিছক ধর্মীয় কারণেই নয় বরং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেও যু-নুওয়াস এ গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি আক্রমণ করে। নাজরানের সাইয়েদ হারেশাকে, সুরিয়ানী ঐতিহাসিকগণ যাকে Arethas বলেছেন, হত্যা করে। তার স্ত্রী রুমার সামনে তার দুই কন্যাকে হত্যা করে এবং তাদের রক্ত পান করতে তাকে বাধ্য করে। তারপর তাকেও হত্যা করে। উস্‌কুফ্ বিশপ পলের (Paul) শুকনো হাড় কবর থেকে বের করে এনে জ্বালিয়ে দেয়। আগুন ভরা গর্তসমূহে নারী, পুরুষ, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, পাদরী, রাহেব সবাইকে নিক্ষেপ করে। সামগ্রিকভাবে ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার লোক নিহত হয়েছিল বলা হয়। ৫২৩ খৃষ্টাব্দে এ ঘটনা ঘটে। অবশেষে ৫২৫ খৃষ্টাব্দে হাবশীরা ইয়ামন আক্রমণ করে যু-নুওয়াস ও তার হিমইয়ারী রাজত্বের পতন ঘটায়। প্রত্নতাত্বিক গবেষকগণ ইয়ামন হিস্‌নে গুরাবের যে শিলালিপি উদ্ধার করেছেন তা থেকেও এর সত্যতা প্রমাণিত হয়।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে ঈসায়ী লেখকদের বিভিন্ন লেখায় গর্তওয়ালাদের এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে মূল ঘটনার সময় এবং এ ঘটনা যারা প্রত্যক্ষ করেছিল তাদের বিবরণ সহকারে লিখিত বেশ কিছু গ্রন্থ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে তিনটি গ্রন্থের রচয়িতারা এই ঘটনার সমসাময়িক। তাদের একজন হচ্ছেন ঃ প্রকোপিউস দ্বিতীয় জন কসমস ইনডিকোপ্লিউসটিস (Cosmos Indicopleustis) তিনি নাজ্জাশী এলিস বুয়ানের (Elesboan) নির্দেশে সে সময় বাত্‌লিমুসের গ্রীক ভাষায় লিখিত বইগুলোর অনুবাদ করছিলেন। এ সময় তিনি হাবশার সমুদ্রোপকূলবর্তী এডোলিশ (Adolis) শহরে

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ
عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝١٠ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ
الْكَبِيرُ ۝١١

যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীদের ওপর জুলুম-নিপীড়ন চালিয়েছে, তারপর তা থেকে তাওবা করেনি, নিশ্চিতভাবেই তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব এবং জ্বালা-পোড়ার শাস্তি।[৬] যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে নিশ্চিতভাবেই তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের বাগান যার নিম্নদেশে প্রবাহিত হতে থাকবে ঝরণাধারা। এটিই বড় সাফল্য।

অবস্থান করছিলেন। তৃতীয়জন হচ্ছেন জোহান্নাস মালালা (Johnnes Malala)। পরবর্তী বহু ঐতিহাসিক তাঁর রচনা থেকে ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছেন। এদের পর এফেসুসের জোহান্নাসের (Johannes of Ephesus) নাম করা যায়। তিনি ৫৮৫ খৃষ্টাব্দে মারা যান। তাঁর গীর্জার ইতিহাস গ্রন্থে নাজরানের ঈসায়ী সম্প্রদায়ের ওপর এই নিপীড়নের কাহিনী এ ঘটনার সমসাময়িক বর্ণনাকারী বিশপ শিমঊনের (SIMEON) একটি পত্র থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ পত্রটি লিখিত হয় জাবৃলা ধর্ম মন্দিরের প্রধানের (Abbot Von Gabula) নামে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বিভিন্ন ইয়ামনবাসীর বর্ণনার মাধ্যমে শিমঊন তাঁর এই পত্রটি তৈরি করেন। এ পত্রটি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রোম থেকে এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ঈসায়ী শহীদানের অবস্থা বর্ণনা প্রসংগে প্রকাশিত হয়। ইয়াকূবী পত্রিয়ার্ক ডিউনিসিউস (Patriarch Dionysius) ও জাকারিয়া সিদলিনি (Zacharia of Mitylene) তাদের সুরিয়ানী ইতিহাসেও এ ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছেন। নাজরানের ঈসায়ী সমাজ সম্পর্কিত ইয়াকূব সুরূজীর গ্রন্থেও এর উল্লেখ রয়েছে। আর রাহা (Edessa) এর বিশপ পোলাস (PULLS) নাজরানের নিহতদের উদ্দেশ্যে শোকগীতি লিখেছেন। এটি এখনো পাওয়া যায়। সুরিয়ানী ভাষার বই "আল হিময়ারীন" এর ইংরেজী অনুবাদ (Book of the Himyarites) ১৯২৪ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ বইটি মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনার সত্যতা প্রমাণ করে। বৃটিশ মিউজিয়ামে সেই আমলের এবং তার নিকটবর্তী আমলের কিছু ইথিয়োপীয় শিলালিপি সংরক্ষিত রয়েছে। এগুলো থেকেও এই ঘটনার সমর্থন পাওয়া যায়। কিলবি তাঁর Arabian Highlands নামক সফরনামায় লিখেছেন ঃ গর্তওয়ালাদের ঘটনা যেখানে সংঘটিত হয়েছিল সে জায়গাটি আজো নাজরানবাসীদের কাছে সুস্পষ্ট। 'উম্মু খারাক'-এর কাছে এক জায়গায় পাথরের গায়ে খোদিত কিছু চিত্রও পাওয়া যায়। আর নাজরানের কাবা যেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল বর্তমান নাজরানবাসীরা সে জায়গাটিও জানে।

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾ وَهُوَ
الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾ هَلْ
أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي
تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾ وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ ﴿٢٠﴾ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿٢١﴾
فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

আসলে তোমার রবের পাকড়াও বড় শক্ত। তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন আবার তিনিই দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করবেন। তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, আরশের মালিক, শ্রেষ্ঠ–সম্মানিত এবং তিনি যা চান তাই করেন।[৭] তোমার কাছে কি পৌঁছেছে সেনাদলের খবর? ফেরাউন ও সামূদের সেনাদলের?[৮] কিন্তু যারা কুফরী করেছে, তারা মিথ্যা আরোপ করার কাজে লেগে রয়েছে। অথচ আল্লাহ তাদেরকে ঘেরাও করে রেখেছেন। (তাদের মিথ্যা আরোপ করায় এ কুরআনের কিছু আসে যায় না) বরং এ কুরআন উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।[৯]

হাবশার ঈসায়ীরা নাজরান অধিকার করার পর সেখানে কাবার আকৃতিতে একটি ইমারত তৈরি করে। মক্কার কাবার মোকাবিলায় এই ঘরটিকে তারা কেন্দ্রীয় মর্যাদা দিতে চাচ্ছিল। এখানকার বিশপরা মাথায় পাগড়ী বাঁধতেন। এই ঘরকে তারা হারাম শরীফ গণ্য করেন। রোমান সম্রাটের পক্ষ থেকেও এই কাবাঘরের জন্য আর্থিক সাহায্য পাঠনো হতো। এই নাজরানের কাবার পাদরী তাঁর সাইয়েদ, আকেব ও উসকুফের নেতৃত্বে 'মুনাযিরা' (বিতর্ক) করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হয়েছিলেন। সেখানে যে বিখ্যাত 'মুবাহিলা'র ঘটনা অনুষ্ঠিত হয় সূরা আলে ইমরানের ৬১ আয়াতে তা উল্লেখিত হয়েছে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আলে ইমরান ২৯ ও ৫৫ টীকা)

৫. এ আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহর এমন সব গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে তাঁর প্রতি ঈমান আনার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার অন্যদিকে এগুলোর প্রতি ঈমান আনার কারণে যারা অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ হয় তারা জালেম।

৬. জাহান্নামের আযাব থেকে আবার আলাদাভাবে জ্বালা–পোড়ার শাস্তির উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা মজলুমদেরকে আগুনে ভরা গর্তে নিক্ষেপ করে জীবন্ত পুড়িয়েছিল। সম্ভবত এটা জাহান্নামের সাধারণ আগুন থেকে ভিন্ন ধরনের এবং তার চেয়ে বেশী তীব্র কোন আগুন হবে এ বিশেষ আগুনে তাদেরকে জ্বালানো হবে।

৭. "তিনি ক্ষমাশীল" বলে এই মর্মে আশান্বিত করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি গোনাহ করা থেকে বিরত হয়ে যদি তাওবা করে তাহলে সে আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারে। "প্রেমময়" বলে একথা বলা হয়েছে যে, তিনি নিজের সৃষ্টির প্রতি কোন শত্রুতা পোষণ করেন না। অযথা তাদেরকে শাস্তি দেয়া তাঁর কাজ নয়। বরং নিজের সৃষ্টিকে তিনি ভালোবাসেন। তাকে তিনি কেবল তখনই শাস্তি দেন যখন সে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করা থেকে বিরত হয় না। "আরশের মালিক" বলে মানুষের মধ্যে এ অনুভূতি জাগানো হয়েছে যে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের রাজত্বের তিনিই একমাত্র অধিপতি। কাজেই তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কেউ তাঁর হাত থেকে নিস্তার পেতে পারে না। "শ্রেষ্ঠ সম্মানিত" বলে এ ধরনের বিপুল মর্যাদাসম্পন্ন সত্তার প্রতি অশোভন আচরণ করার হীন মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। তাঁর শেষ গুণটি বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "তিনি যা চান তাই করেন।" অর্থাৎ আল্লাহ যে কাজটি করতে চান তাতে বাধা দেবার ক্ষমতা এ সমগ্র বিশ্ব-জাহানে কারোর নেই।

৮. যারা নিজেদের দল ও জনশক্তির জোরে আল্লাহর এ যমীনে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা বুলন্দ করছে এখানে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, তোমাদের কি জানা আছে, ইতিপূর্বে যারা নিজেদের দলীয় শক্তির জোরে এ ধরনের বিদ্রোহ করেছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল?

৯. এর অর্থ হচ্ছে, এ কুরআনের লেখা অপরিবর্তনীয়। এর বিলুপ্তি হবে না। আল্লাহর এমন সংরক্ষিত ফলকে এর লেখাগুলো খোদিত রয়েছে যেখানে এর মধ্যে কোন রদবদল করার ক্ষমতা কারোর নেই। এর মধ্যে যে কথা লেখা হয়েছে তা অবশ্যি পূর্ণ হবে। সারা দুনিয়া একজোট হয়ে তাকে বাতিল করতে চাইলেও তাতে সফল হবে না।

আত তারিক

৮৬

নামকরণ

প্রথম আয়াতে اَلطَّارِقِ শব্দটিকে এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বক্তব্য বিষয়ের উপস্থাপনা পদ্ধতির দিক দিয়ে মক্কা মুআ'যমার প্রাথমিক সূরাগুলোর সাথে এর মিল দেখা যায়। কিন্তু মক্কার কাফেররা যখন কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য সব রকমের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল ঠিক সে সময়ই এ সূরাটি নাযিল হয়।

সর্বপ্রথম আকাশের তারকাগুলোকে এ মর্মে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে যে, এ বিশ্ব-জাহানে কোন একটি জিনিসও নেই যা কোন এক সত্তার রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত ও অস্তিত্বশীল থাকতে পারে। তারপর মানুষের দৃষ্টি তার নিজের সত্তার প্রতি আকৃষ্ট করে বলা হয়েছে, দেখো কিভাবে এক বিন্দু শুক্র থেকে অস্তিত্ব দান করে তাকে একটি জ্বলজ্যান্ত গতিশীল মানুষে পরিণত করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, যে আল্লাহ এভাবে তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন তিনি নিশ্চিতভাবেই তাকে দ্বিতীয়বার পয়দা করার ক্ষমতা রাখেন। দুনিয়ায় মানুষের যেসব গোপন কাজ পর্দার আড়ালে থেকে গিয়েছিল সেগুলোর পর্যালোচনা ও হিসেব-নিকেশই হবে এই দ্বিতীয়বার পয়দা করার উদ্দেশ্য। সে সময় নিজের কাজের পরিণাম ভোগ করার হাত থেকে বাঁচার কোন ক্ষমতাই মানুষের থাকবে না এবং তাকে সাহায্য করার জন্য কেউ এগিয়ে আসতেও পারবে না।

সবশেষে বলা হয়েছে, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ এবং মাটি থেকে গাছপালা ও ফসল উৎপাদন যেমন কোন খেলা তামাসার ব্যাপার নয় বরং একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ, ঠিক তেমনি কুরআনে যেসব প্রকৃত সত্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোও কোন হাসি তামাসার ব্যাপার নয়। বরং সেগুলো একেবারে পাকাপোক্ত ও অপরিবর্তনীয় কথা। কাফেররা এ ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছে যে, তাদের চালবাজী ও কৌশল কুরআনের এই দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রতিহত করতে সক্ষম হবে। কিন্তু তারা জানে না, আল্লাহও একটি কৌশল অবলম্বন করছেন এবং তাঁর কৌশলের মোকাবিলায় কাফেরদের যাবতীয় চালবাজী ও কৌশল ব্যর্থ হয়ে যাবে। তারপর একটি বাক্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা এবং পর্দান্তরালে কাফেরদের ধমক দিয়ে কথা এভাবে শেষ করা হয়েছে ঃ তুমি একটু সবর করো এবং কিছুদিন কাফেরদেরকে ইচ্ছেমতো চলার সুযোগ দাও। কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা টের পেয়ে যাবে, তাদের চালবাজী ও প্রতারণা কুরআনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। বরং যেখানে তারা কুরআনকে ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রতিহত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেখানে কুরআন বিজয়ীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে।

আয়াত ১৭ **সূরা আত তারিক-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۝١ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۝٢ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝٣ اِنْ
كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝٤ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝٥ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ
دَافِقٍ ۝٦ يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ۝٧ اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ۝٨

কসম আকাশের এবং রাতে আত্মপ্রকাশকারীর। তুমি কি জানো ঐ রাতে আত্মপ্রকাশকারী কি? উজ্জ্বল তারকা। এমন কোন প্রাণ নেই যার ওপর কোন হেফাজতকারী নেই।[১] কাজেই মানুষ একবার এটাই দেখে নিক কী জিনিস থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে![২] তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রবলবেগে নিঃসৃত পানি থেকে, যা পিঠ ও বুকের হাড়ের মাঝখান দিয়ে বের হয়।[৩] নিশ্চিতভাবেই তিনি (স্রষ্টা) তাকে দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন।[৪]

১. হেফাজতকারী বলতে এখানে আল্লাহকেই বুঝানো হয়েছে। তিনি আকাশ ও পৃথিবীর ছোট বড় সকল সৃষ্টির দেখাশুনা, তত্বাবধান ও হেফাজত করছেন। তিনিই সব জিনিসকে অস্তিত্ব দান করেছেন তিনিই সবকিছুকে টিকিয়ে রেখেছেন। তিনি সব জিনিসকে ধারণ করেছেন বলেই প্রত্যেকটি জিনিস তার নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনি সব জিনিসকে তার যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার এবং তাকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত বিপদমুক্ত রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন। এ বিষয়টির জন্য আকাশের ও রাতের অন্ধকারে আত্মপ্রকাশকারী প্রত্যেকটি গ্রহ ও তারকার কসম খাওয়া হয়েছে। আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে النَّجْم الثَّاقِب শব্দ একবচন হলেও এখানে এর মানে কিন্তু একটি তারকা নয় বরং তারকা মণ্ডলী। ফলে এখানে এ কসমের অর্থ এ দাঁড়ায় ঃ রাতের আকাশে এই যে অসংখ্য গ্রহ তারকা ঝলমল করতে দেখা যায় এদের প্রত্যেকটির অস্তিত্ব এ মর্মে সাক্ষ প্রদান করছে যে অবশ্যি কেউ একজন আছেন যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, এগুলোকে আলোকিত করেছেন, এগুলোকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছেন এবং এমনভাবে এদেরকে হেফাজত করছেন যার ফলে এরা নিজেদের স্থান থেকে ছিটকে পড়ে না এবং অসংখ্য তারকা একসাথে আবর্তন করার সময় একটি তারকা অন্য তারার সাথে ধাক্কা খায় না বা অন্য কোন তারা তাকে ধাক্কা দেয় না।

২. উর্ধজগতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর এবার মানুষকে তার নিজের সত্ত্বা সম্পর্কে একটু চিন্তা করার জন্য আহবান জানানো হয়েছে। তাকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? কে পিতার দেহ থেকে নির্গত কোটি কোটি শুক্রকীটের মধ্য থেকে একটি শুক্রকীট এবং মায়ের গর্ভ থেকে নির্গত অসংখ্য ডিম্বের মধ্য থেকে একটি ডিম্ব বাছাই করে দেয় এবং কোন এক সময় তাদের সম্মিলন ঘটায় এবং তারপর এক বিশেষ মানবীর গর্ভ ধারণ সংগঠিত হয়? গর্ভ সঞ্চারের পর কে মায়ের উদরে তার ক্রমবৃদ্ধি ও বিকাশ সাধন করে? তারপর কে তাকে একটি জীবিত শিশুর আকারে জন্মলাভ করার পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়? কে মায়ের গর্ভাধারের মধ্যই তার শারীরিক কাঠামো এবং দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতাসমূহের অনুপাত নির্ধারণ করে দেয়? কে জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অনবরত তার তত্ত্বাবধান করে? তাকে রোগ মুক্ত করে। দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করে। নানা প্রকার আপদ-বিপদ থেকে বাঁচায়। তার জন্য বহুতর সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে। তার নিজের এসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করার কোন ক্ষমতাই নেই। এমনকি এগুলো সম্পর্কে কোন চেতনাই তার নেই। এসবকিছুই কি এক মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান ছাড়াই চলছে?

৩. এখানে মূল আয়াতে সুল্‌ব (صلب) ও তারায়েব (ترائب) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'সুল্‌ব' মেরুদণ্ডকে ও 'তারায়েব' বুকের পাঁজরকে বলা হয়। যেহেতু যে উপাদান থেকে পুরুষ ও নারীর জন্ম হয় তা মেরুদণ্ড ও বুকের মধ্যস্থিত ধড় থেকে বের হয়, তাই বলা হয়েছে পিঠ ও বুকের মধ্যস্থল থেকে নির্গত পানি থেকে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের হাত-পা কর্তিত অবস্থায়ও এ উপাদান জন্ম নেয়। তাই একথা বলা ঠিক নয় যে, সারা শরীর থেকে এ উপাদান বের হয়। আসলে শরীরের প্রধান অঙ্গগুলোই হচ্ছে এর উৎস। আর এ প্রধান অঙ্গগুলো সব ধড়ের সাথে সংযোজিত। মস্তিষ্কের কথা আলাদা করে না বলার কারণ হচ্ছে এই যে, মেরুদণ্ড মস্তিষ্কের এমন একটি অংশ যার মাধ্যমে শরীরের সাথে মস্তিষ্কের সম্পর্ক বজায় রয়েছে।*

* মাসিক তরজুমানুল কুরআনে এই ব্যাখ্যাটি প্রকাশিত হবার পর জনৈক ডাক্তার সাহেব মাওলানা মওদূদীকে (র) লেখেন ঃ "আপনার ব্যাখ্যাটি আমি মনোযোগ সহকারে কয়েকবার পড়লাম। কিন্তু আমি বিষয়টি বুঝতে পারলাম না। কারণ বাস্তব পর্যবেক্ষণে আমরা দেখি, অণ্ডকোষে (Testicles) বীর্যের জন্ম হয়। তারপর সরু সরু নালীর মাধ্যমে বড় বড় নালীর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে তা পেটের দেয়ালের অভ্যন্তরে কোমরের হাড়ের ঠিক বরাবর একটি নালী (Inguinal Canal) অতিক্রম করে নিকটবর্তী একটি গ্রন্থিতে প্রবেশ করে। এই গ্রন্থিটির নাম Prostate. এরপর সেখান থেকে তরল পদার্থ নিয়ে এর নির্গমন হয়। মেরুদণ্ড ও বুকের পাঁজরের মধ্যে এর অগ্রসর হবার ব্যাপারটি আমার বোধগম্য হলো না। অবশ্য এর নিয়ন্ত্রণ এমন একটি নার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে হয় যা মেরুদণ্ড ও বুকের পাঁজরের মাঝখানে জালের মতো ছড়িয়ে আছে। তাও একটি বিশেষ সীমিত পর্যায়ে। এর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আবার মস্তিষ্কের মধ্যস্থিত আর একটি গ্রন্থির তরল পদার্থের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এখানে নির্গমনের (যা একটি নারীর মাধ্যমেই হতে পারে) আমার আবেদন, এর ব্যাখ্যা কি, এটা আপনি বিস্তারিতভাবে লেখেন। আমি আপনাকে বিরক্ত করতে সাহস করলাম এ জন্য যে, আপনি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান চর্চায় বিশ্বাস করেন।"

এর জবাবে মাওলানা ১৯৭১ সালের নভেম্বরের তরজুমানুল কুরআন সংখ্যায় পরবর্তী প্যারাটি লেখেন ঃ

৪. অর্থাৎ যেভাবে তিনি মানুষকে অস্তিত্ব দান করেন এবং গর্ভ সঞ্চারের পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত তার দেখাশুনা করেন তা একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করে যে, তিনি মৃত্যুর পর আবার তাকে অস্তিত্বশীল করতে পারেন। যদি তিনি প্রথমটির ক্ষমতা রেখে থাকেন এবং তারি বদৌলতে মানুষ দুনিয়ায় জীবন ধারণ করছে, তাহলে তিনি দ্বিতীয়টির ক্ষমতা রাখেন না, এ ধারণা পোষণ করার পেছনে এমন কি শক্তিশালী যুক্তি পেশ করা

যদিও শরীরের বিভিন্ন অংশের কার্যাবলী (Functions) আলাদা তবুও কোন' অংশ নিজে একাকী কোন কাজ করে না। বরং প্রত্যেকে অন্যের কার্যাবলীর সহায়তায় (Co-oridination) নিজের কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করে। নিসন্দেহে বীর্যের জন্ম হয় পুরুষাঙ্গে এবং সেখান থেকে তা বের হয়েও আসে একটা বিশেষ পথ দিয়ে। কিন্তু পাকস্থলী, কলিজা, ফুসফুস, কিডনী, লিভার ও মস্তিক প্রত্যেকে স্বস্থানে নিজের কাজটি না করলে বীর্য জন্মাবার ও নির্গত হবার এ ব্যবস্থাটি কি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের কাজ করতে সক্ষম? অনুরূপভাবে দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, কিডনীতে পেশাব তৈরি হয় এবং একটি নালীর সাহায্যে মূত্রাশয়ে পৌছে পেশাব নির্গত হবার পথ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। কিন্তু কিভাবে কোন্ কার্যক্রমের ফলে? রক্ত প্রস্তুতকারী ও তাকে সমগ্র দেহে আবর্তিত করে কিডনী পর্যন্ত পৌছিয়ে দেবার দায়িত্বে যেসব অঙ্গ নিয়োজিত তারা যদি নিজেদের দায়িত্ব পালন না করে তাহলে কি কিডনী একাই রক্ত থেকে পেশাবের উপাদানগুলো আলাদা করে সেগুলোকে এক সাথে পেশাবের নালী দিয়ে বাইরে বের করে দিতে সক্ষম হবে? তাই কুরআন মজীদে বলা হয়নি যে, এ উপাদানগুলো মেরুদণ্ড ও পাঁজরের হাড় থেকে নির্গত হয় বরং বলা হয়েছে, "ঐ দু'টোর মধ্যখানে শরীরের যে অংশটি রয়েছে সেখান থেকে এ উপাদানগুলো নির্গত হয়।" এতে একথা অস্বীকার করা হয়নি যে বীর্য তৈরি হবার ও তার নির্গমনের একটি বিশেষ কর্মপ্রণালী (Mechanism) রয়েছে, শরীরের বিশেষ কিছু অংশ এ কাজে নিয়োজিত থাকে। বরং এ থেকে একথা প্রকাশ হয় যে, এ কর্মপ্রণালী স্বতঃপ্রবৃত্ত নয়। মহান আল্লাহ মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যস্থলে যেসব অঙ্গ সংস্থাপন করেছেন তাদের সমগ্র কর্মের সহায়তায় এ কাজটি সম্পাদিত হয়। এ জন্য আমি আগেই বলেছি যে, সমগ্র শরীর এ কাজে অংশ নেয়নি। কেননা হাতপা কর্তিত অবস্থায়ও এ ব্যবস্থাকে কর্মরত দেখা যায়। তবে মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যস্থলে যেসব বড় বড় অঙ্গ রয়েছে তাদের কোন একটিও যদি না থাকে তাহলে এ কর্মপ্রণালী অচল বলা যেতে পারে।

"ভ্রূণতত্ত্বের (Embryology) দৃষ্টিতে এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে, ভ্রূণের (Foetus) মধ্যে যে অণ্ডকোশে (Testicle) বীর্যের জন্ম হয় তা মেরুদণ্ড ও বক্ষ পাঁজরের মধ্যস্থলে কিডনীর নিকটেই অবস্থান করে এবং সেখান থেকে ধীরে ধীরে পুরুষাঙ্গে নেমে আসে। এ কার্যধারা সংঘটিত হয় জন্মের পূর্বে আবার অনেক ক্ষেত্রে তার কিছু পরে। কিন্তু তবুও তার স্নায়ু ও শিরাগুলোর উৎস সবসময় সেখানেই (মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যস্থলে) থাকে। বরং পিঠের নিকটবর্তী মহাধমনী (Artery) থেকে শিরাগুলো (Aorta) বের হয় এবং পেটের সমগ্র অঞ্চল সফর করে সেখানে রক্ত সরবরাহ করে। এভাবে দেখা যায় অণ্ডকোষ আসলে পিঠের একটি অংশ। কিন্তু শরীরের অতিরিক্ত উষ্ণতা সহ্য করার ক্ষমতা না থাকার কারণে তাকে পুরুষাঙ্গে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। উপরন্তু যদিও অণ্ডকোষ বীর্য উৎপাদন করে এবং তা মৌলিক কোষে (Seminal Vesicles) জমা থাকে তবুও মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যস্থলই হয় তাকে বের করার কেন্দ্রীয় সঞ্চালন শক্তি। মস্তিক থেকে স্নায়ুবিক প্রবাহ এ কেন্দ্রে পৌছার পর কেন্দ্রের সঞ্চালনে (Triger Action) মৌলিক কোষ সংকুচিত হয়। এর ফলে তরল শুক্র পিচকারীর ন্যায় প্রবল বেগে বের হয়। এ জন্য কুরআনের বক্তব্য চিকিৎসা শাস্ত্রের সর্বাধুনিক পরীক্ষা- নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান লব্ধ জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যশীল।"

মওলানার এই জবাবটি প্রকাশিত হবার পর দু'জন চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ দু'টি বিভিন্ন স্থান থেকে মাওলানার বক্তব্য সমর্থন করে যে তথ্য সরবরাহ করেন তা সর্বশেষ প্যারায় সন্নিবেশিত হয়েছে। –অনুবাদক

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ۝٩ فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ۝١٠ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ
الرَّجْعِ ۝١١ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝١٢ اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝١٣ وَّمَا هُوَ
بِالْهَزْلِ ۝١٤ اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ۝١٥ وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ۝١٦ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ
اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۝١٧

যেদিন গোপন রহস্যের যাচাই বাছাই হবে,[৫] সেদিন মানুষের নিজের কোন শক্তি থাকবে না এবং কেউ তার সাহায্যকারীও হবে না। কসম বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশের[৬] এবং (উদ্ভিদ জন্মাবার সময়) ফেটে যাওয়া যমীনের, এটি মাপাজোকা মীমাংসাকারী কথা, হাসি-ঠাট্টা নয়।[৭] এরা কিছু চক্রান্ত করছে[৮] এবং আমিও একটি কৌশল করছি।[৯] কাজেই ছেড়ে দাও, হে নবী! এ কাফেরদেরকে সামান্য কিছুক্ষণের জন্য এদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও।[১০]

যেতে পারে? আল্লাহর এই শক্তিকে অস্বীকার করতে হলে আল্লাহ যে তাকে অস্তিত্বদান করেছেন সরাসরি একথাটিই অস্বীকার করতে হবে। আর যে ব্যক্তি একথা অস্বীকার করবে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি একদিন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় যার ফলে সে দাবী করে বসবে, এ দুনিয়ায় সমস্ত বইপত্র একদিন ঘটনাক্রমে ছাপা হয়ে গেছে, দুনিয়ার সমস্ত শহর একদিন হঠাৎ ঘটনাক্রমে তৈরি হয়ে গেছে এবং এই দুনিয়ায় হঠাৎ একদিন এমন এক ঘটনা ঘটে গেছে যার ফলে সমস্ত কলকারখানা আপনা আপনি নির্মিত হয়ে তাতে উৎপাদন শুরু হয়ে গেছে। আসলে মানুষ দুনিয়ায় যেসব কাজ করেছে ও করছে তার তুলনায় তার সৃষ্টি ও তার শারীরিক গঠনাকৃতি এবং তার মধ্যে কর্মরত শক্তি যোগ্যতাসমূহের সৃষ্টি এবং একটি জীবন্ত সত্তা হিসেবে তার টিকে থাকা অনেক বেশী জটিল কাজ। এত বড় জটিল কাজ যদি এ ধরনের জ্ঞানবত্তা, উন্নত কলাকৌশল, আনুপাতিক ও পর্যায়ক্রমিক কার্যক্রম এবং সাংগঠনিক শৃংখলা সহকারে হঠাৎ ঘটনাক্রমে ঘটে যেতে পারে, তাহলে দুনিয়ার আর কোন্ কাজটি আছে যাকে মস্তিষ্ক বিকৃতি রোগে আক্রান্ত কোন ব্যক্তি হঠাৎ ঘটে যাওয়া কাজ বলবে না?

৫. গোপন রহস্য বলতে এখানে প্রত্যেক ব্যক্তির এমনসব কাজ বুঝানো হয়েছে যেগুলো রহস্যাবৃত্ত রয়ে গেছে আবার এমন সব কাজও বুঝানো হয়েছে, যেগুলো বাহ্যিক আকৃতিতে জন সমক্ষে এসে গেছে কিন্তু সেগুলোর পেছনে সক্রিয় নিয়ত, উদ্দেশ্য, স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্খা এবং সেগুলোর গোপন কার্যকারণ লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে গেছে। কিয়ামতের দিন এসব কিছু উন্মুক্ত হয়ে সামনে এসে যাবে। সেদিন কেবলমাত্র কে কি করেছে এর তদন্ত ও হিসেব-নিকেশ হবে না বরং কি কারণে, কি উদ্দেশ্যে, কি নিয়তে ও কোন্ মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ কাজ করেছিল তারও হিসেব হবে। অনুরূপভাবে এক

ব্যক্তি যে কাজটি করেছে দুনিয়ায় তার কি প্রভাব পড়েছে, কোথায় কোথায় তার প্রভাব পৌঁছেছে এবং কতদিন পর্যন্ত এ প্রভাব অব্যাহত থেকেছে—তাও সারা দুনিয়ার চোখ থেকে গোপন থেকেছে, এমনকি যে ব্যক্তি এ কাজটি করেছে তার চোখ থেকেও। আর একটি রহস্যও শুধুমাত্র কিয়ামতের দিনেই উন্মুক্ত হবে এবং সেদিন এর পুরোপুরি তদন্ত ও হিসেব-নিকেশ হবে। সেটি হচ্ছে, এক ব্যক্তি দুনিয়ায় যে বীজ বপন করে গিয়েছিল তার ফসল কতখানি পর্যন্ত কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে সে এবং তার সাথে আর কে কে কাটতে থেকেছে?

৬. আকাশের জন্য ذَاتِ الرَّجْعِ (বৃষ্টি বর্ষণকারী) বিশেষণটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'রজুআ' (رجع) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ফিরে আসা। তবে পরোক্ষভাবে আরবী ভাষায় এ শব্দটি বৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয়। কারণ বৃষ্টি মাত্র একবার বর্ষিত হয়েই খতম হয়ে যায় না বরং একই মওসূমে বারবার এবং কখনো মওসূম ছাড়াই একাধিকবার ফিরে আসে এবং যখন তখন বর্ষিত হয়। বৃষ্টিকে প্রত্যাবর্তনকারী বলার আর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর সমুদ্রগুলো থেকে পানি বাষ্পের আকারে উঠে যায়। আবার এই বাষ্পই পানির আকারে পৃথিবীতে বর্ষিত হয়।

৭. অর্থাৎ যেমন আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ এবং তার ফলে মাটি চিরে উদ্ভিদের অংকুর গজিয়ে ওঠা কোন হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার নয় বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ ও নিরেট সত্য, ঠিক তেমনি কুরআন মানুষকে আবার তার আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে এই মর্মে যে বিষয়টির খবর দিচ্ছে, সেটিও কোন হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার নয়। বরং সেটি একটি চূড়ান্ত ও মীমাংসাকারী কথা, একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিবর্তনীয় নিরেট সত্য। সেটি পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েই ক্ষান্ত হবে।

৮. অর্থাৎ কাফেররা কুরআনের দাওয়াতকে ব্যর্থ করার জন্য নানা ধরনের অপকৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে। তারা ফুঁক দিয়ে এ প্রদীপটি নিভিয়ে দিতে চাচ্ছে। মানুষের মনে সব রকমের সন্দেহের জাল বুনে দিচ্ছে। একের পর এক মিথ্যা দোষারোপ করে যাচ্ছে কুরআনের দাওয়াত পেশকারী নবীর বিরুদ্ধে। এভাবে দুনিয়ায় যাতে তাঁর কথা বিস্তার লাভ করতে না পারে এবং তিনি যে কুফরী ও জাহেলিয়াতের আঁধার দূর করতে চান তা যাতে চারদিক আচ্ছন্ন করে রাখে সে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৯. অর্থাৎ এদের কোন অপকৌশল লাভে কামিয়াব না হয় এবং অবশেষে এরা ব্যর্থ হয়ে যায় আর এই সংগে যে আলোর শিখাটিকে নিভিয়ে দেবার জন্য এরা সব রকমের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেটি যাতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, সে জন্য আমি ব্যবস্থা অবলম্বন করছি।

১০. অর্থাৎ এদেরকে ছেড়ে দাও কিছুক্ষণের জন্য। এরা যাকিছু করতে চায় তা করে দেখুক। বেশী সময় যাবে না, এর ফলাফল এদের সামনে এসে যাবে। তখন আমি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলাম তার মোকাবিলায় এদের অপকৌশল কতটুকু সাফল্যের মুখ দেখেছে তা এরা বুঝতে পারবে।

আল আ'লা

৮৭

নামকরণ

প্রথম আয়াতে উপস্থাপিত আ'লা শব্দটিকে এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এর আলোচ্য বিষয় থেকে জানা যায়, এটি একেবারে প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্যতম। ষষ্ঠ আয়াতে "আমি তোমাকে পড়িয়ে দেবো, তারপর তুমি আর ভুলবে না" এ বাক্যটিও একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, এটি এমন সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালোভাবে অহী আয়ত্ত্ব করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেননি। এবং অহী নাযিলের সময় তার কোন শব্দ ভুলে যাবেন বলে তিনি আশংকা করতেন। এই আয়াতের সাথে যদি সূরা ত্বা-হা'র ১১৪ আয়াত ও সূরা কিয়ামাহ'র ১৬-১৯ আয়াতগুলোকে মিলিয়ে পড়া হয় এবং তিনটি সূরার সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর বর্ণনাভংগী ও পরিবেশ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে এখানে উল্লেখিত ঘটনাবলীকে নিম্নোক্তভাবে সাজানো যায় ঃ সর্বপ্রথম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে যে, তুমি চিন্তা করো না, আমি এ বাণী তোমাকে পড়িয়ে দেবো এবং তুমি আর ভুলে যাবে না। তারপর বেশ কিছুকাল পরে যখন সূরা কিয়ামহ নাযিল হতে থাকে তখন তিনি অবচেতনভাবে অহীর শব্দগুলো পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। তখন বলা হয় "হে নবী! এই অহী দ্রুত মুখস্ত করার জন্য নিজের জিহবা সঞ্চালন করো না। এগুলো মুখস্থ করানো ও পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার। কাজেই যখন আমরা এগুলো পড়ি তখন তুমি এর পড়া মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকো, তারপর এর মানে বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্বও আমার।" শেষবার সূরা ত্বা-হা নাযিলের সময় মানবিক দুর্বলতার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার এই পরপর নাযিল হওয়া ১১৩টি আয়াতের কোন অংশ স্মৃতি থেকে উধাও হয়ে যাবার আশংকা করেন, ফলে তিনি সেগুলো স্মরণ রাখার চেষ্টা করতে থাকেন। এর ফলে তাঁকে বলা হয় ঃ "আর কুরআন পড়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার কাছে এর অহী সম্পূর্ণরূপে পৌঁছে না যায়।" এরপর আর কখনো এমনটি ঘটেনি। নবী (সা) আর কখনো এ ধরনের আশংকা করেননি। কারণ এ তিনটি জায়গা ছাড়া কুরআনের আর কোথাও এ ব্যাপারে কোন ইংগিত নেই।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এই ছোট্ট সূরাটিতে তিনটি বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে। এক, তাওহীদ। দুই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দান। তিন, আখেরাত।

তাওহীদের শিক্ষাকে প্রথম আয়াতের একটি বাক্যের মধ্যই সীমিত করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ আল্লাহর নামে তাসবীহ পাঠ করো। অর্থাৎ তাঁকে এমন কোন নামে স্মরণ করা যাবে না যার মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি, অভাব, দোষ, দুর্বলতা বা সৃষ্টির সাথে কোন দিক দিয়ে কোন প্রকার মিল রয়ে গেছে। কারণ দুনিয়ায় যতগুলো ভ্রান্ত আকীদার জন্ম হয়েছে তার সবগুলোর মূলে রয়েছে আল্লাহ সম্পর্কিত কোন না কোন ভুল ধারণা। আল্লাহর পবিত্র সত্তার জন্য কোন ভুল ও বিভ্রান্তিকর নাম অবলম্বন করার মাধ্যমে এ ভুল ধারণাগুলো বিকশিত হয়েছে। কাজেই আকীদা সংশোধনের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে, মহান আল্লাহকে কেবলমাত্র তাঁর উপযোগী পূর্ণ গুণান্বিত ও সর্বাঙ্গ সুন্দর নামে স্মরণ করতে হবে।

এরপর তিনটি আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের এমন এক রবের তাসবীহ পাঠ করার হুকুম দেয়া হয়েছে যিনি বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে সমতা কায়েম করেছেন। তার ভাগ্য তথা তার ক্ষমতাগুলোর সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন এবং যে কাজের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা সম্পন্ন করার পথ তাকে বাত্‌লে দিয়েছেন। তোমরা নিজের চোখে তাঁর ক্ষমতার বিস্ময়কর ও বিচিত্র প্রকাশ দেখে চলছো। তিনি মাটির বুকে উদ্ভিদ ও গাছপালা উৎপন্ন করেন আবার সেগুলোকে প্রাণহীন আবর্জনায় পরিণত করেন। তিনি ছাড়া আর কেউ বসন্তের সজীবতা আনার ক্ষমতা রাখেন না আবার পাতাঝরা শীতের আগমন রোধ করার ক্ষমতাও কারো নেই।

তারপর দু'টি আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ এই যে কুরআন তোমার প্রতি নাযিল হচ্ছে এর প্রতিটি শব্দ কিভাবে তোমার মুখস্থ থাকবে, এ ব্যাপারে তুমি কোন চিন্তা করো না। একে তোমার স্মৃতিপটে সংরক্ষিত করে দেয়া আমার কাজ। একে তোমার স্মৃতিপটে সংরক্ষিত রাখার পেছনে তোমার নিজস্ব কোন কৃতিত্ব নেই। বরং এটা আমার মেহেরবানীর ফল। নয়তো আমি চাইলে তোমার স্মৃতি থেকে একে মুছে ফেলতে পারি।

এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে ঃ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয়নি। বরং তোমার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র সত্যের প্রচার। আর এই প্রচারের সরল পদ্ধতি হচ্ছে, যে ব্যক্তি উপদেশ শুনতে ও তা মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে তাকে উপদেশ দাও। আর যে ব্যক্তি তাতে প্রস্তুত নয় তার পেছনে লেগে থাকার প্রয়োজন নেই। যার মনে ভুল পথে চলার অশুভ পরিণামের ভয় থাকবে সে সত্য কথা শুনে তা মেনে নেবে এবং যে দুর্ভাগা তা শুনতে ও মেনে নিতে চাইবে না সে নিজের চোখেই নিজের অশুভ পরিণাম দেখে নেবে।

সবশেষে বক্তব্যের সমাপ্তি টেনে বলা হয়েছে ঃ সাফল্য কেবল তাদের জন্য যারা আকীদা-বিশ্বাস, কর্ম ও চরিত্রে পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা অবলম্বন করবে এবং নিজেদের রবের নাম স্মরণ করে নামায পড়বে। কিন্তু লোকেরা শুধুমাত্র এ দুনিয়ার আরাম-আয়েশ এবং এর স্বার্থ ও আশা-আনন্দের চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে। অথচ তাদের আসলে আখেরাতের চিন্তা করা উচিত। কারণ এ দুনিয়া তো ক্ষণস্থায়ী। অন্যদিকে আখেরাত চিরস্থায়ী। আর দুনিয়ার নিয়ামতের তুলনায় আখেরাতের নিয়ামত অনেক বেশী ও অনেক উন্নত পর্যায়ের। এ সত্যটি কেবল কুরআনেই বর্ণনা করা হয়নি, হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত মূসার (আ) সহীফাসমূহেও মানুষকে এই একই সত্যের সন্ধান দেয়া হয়েছিল।

আয়াত ১৯ **সূরা আল আ'লা-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۝١ الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۝٢ وَالَّذِىْ
قَدَّرَ فَهَدٰى ۝٣ وَالَّذِىْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۝٤ فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ۝٥

(হে নবী!) তোমার সুমহান রবের নামের তাসবীহ পাঠ করো।[১] যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সমতা কায়েম করেছেন।[২] যিনি তাকদীর গড়েছেন[৩] তারপর পথ দেখিয়েছেন।[৪] যিনি উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছেন।[৫] তারপর তাদেরকে কালো আবর্জনায় পরিণত করেছেন।[৬]

১. এর শাব্দিক অনুবাদ হবে, "তোমার সুমহান রবের নামকে পবিত্র ও মহিমাময় করো।" এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং সবকটিই এখানে প্রযোজ্য। এক, আল্লাহকে এমন নামে স্মরণ করতে হবে যা তাঁর উপযোগী। তাঁর মহান সত্তার সাথে এমন নাম সংযুক্ত না করা উচিত যা অর্থের দিক দিয়ে তাঁর অনুপযোগী এবং তাঁর জন্য প্রযোজ্য নয়। অথবা যে নামে তাঁর জন্য কোন ত্রুটি, অমর্যাদা বা শিরকের চিহ্ন পাওয়া যায়। অথবা যাতে তাঁর সত্তা, গুণাবলী বা কার্যাবলী সম্পর্কে কোন ভুল বিশ্বাস পাওয়া যায়। এ জন্য কুরআন মজীদে আল্লাহ নিজেই নিজের জন্য যেসব নাম ব্যবহার করেছেন অথবা অন্য ভাষায় এই নামগুলোর সঠিক অনুবাদ যে শব্দগুলোর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো ব্যবহার করাই হবে সবচেয়ে বেশী সংরক্ষিত পদ্ধতি। দুই, সৃষ্টির জন্য যেসব নাম নির্ধারিত রয়েছে সেগুলো আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা অথবা আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত নামগুলো সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা যাবে না। আর যদি এমন কিছু গুণবাচক নাম থাকে যেগুলো শুধু আল্লাহর জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত না হয়ে থাকে বরং বান্দার জন্যও সেগুলোর ব্যবহার বৈধ হয় যেমন রউফ (পরম স্নেহশীল), রহীম (পরম করুণাময়) করীম (মেহেরবান), সামী (সবকিছু শ্রবণকারী), বসীর (সর্বদ্রষ্টা) ইত্যাদি, তাহলে এ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য এ শব্দগুলো যেভাবে ব্যবহার করা হয় বান্দার জন্য ঠিক সেভাবে ব্যবহার করা যাবে না। তিন, পরম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মর্যাদাসহকারে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে হবে। এমন কোন পদ্ধতিতে বা এমন কোন অবস্থায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা যাবে না, যা তাঁর প্রতি মর্যাদাবোধের পরিপন্থী। যেমন হাসি-ঠাট্টা করতে করতে, মলমূত্র ত্যাগকালে অথবা কোন গোনাহ করার সময় তাঁর নাম উচ্চারণ করা। অথবা এমন লোকদের সামনে তাঁর নাম উচ্চারণ করা যারা তা শুনে বেআদবী করতে থাকবে। এমন মজলিসেও তাঁর নাম বলা যাবে না। যেখানে লোকেরা অশালীন কাজে লিপ্ত

থাকে এবং তাঁর নাম উচ্চারিত হবার সাথে সাথে তারা বিদ্রূপ করতে থাকবে। আবার এমন অবস্থায়ও তাঁর পবিত্র নাম মুখে আনা যাবে না যখন আশংকা করা হবে যে, শ্রোতা তাঁর নাম শুনে বিরক্তি প্রকাশ করবে। ইমাম মালেকের (র) জীবনেতিহাসে একথা উল্লেখিত হয়েছে যে, কোন প্রার্থী তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি যদি তাকে তা দিতে না পারতেন তাহলে সাধারণ লোকদের মতো "আল্লাহ তোমাকে দেবেন" একথা না বলে অন্য কোনভাবে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, প্রার্থীকে কিছু না দিয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করলে আসলে তার মনে বিরক্তি ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এ অবস্থায় আল্লাহর নাম নেয়া আমি সংগত মনে করি না। কারণ সে বিরক্তি ও ক্ষোভের সাথে আল্লাহর নাম শুনবে।

হাদীস গ্রন্থসমূহে হযরত উকবাহ ইবনে আমের জুহানী (রা) থেকে রেওয়ায়াতে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতের ভিত্তিতেই সিজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى পড়ার হুকুম দিয়েছিলেন। আর রুকূ'তে তিনি سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ পড়ার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার ভিত্তি ছিল সূরা ওয়াকিয়ার শেষ আয়াতটি فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম ইবনুল মুনযির)

২. অর্থাৎ পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব-জাহানের প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন। আর যে জিনিসটিই সৃষ্টি করেছেন তাকে সঠিক ও সুঠাম দেহসৌষ্ঠব দান করেছেন তার মধ্যে ভারসাম্য ও শক্তির অনুপাত সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাকে এমন আকৃতি দান করেছেন যে, তার জন্য এর চেয়ে ভালো আকৃতির কল্পনাই করা যেতে পারে না। একথাটিকে সূরা আস সাজদায় নিম্নোক্তভাবে বলা হয়েছে ঃ الَّذِيْ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ "তিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে চমৎকার তৈরি করেছেন।" এভাবে দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিসের যথোপযোগী ও যথা অনুপাতে সৃষ্টি হওয়াটাই একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, কোন এক মহাবিজ্ঞ স্রষ্টা এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন। কোন আকস্মিক ঘটনাক্রমে অথবা বহু স্রষ্টার কর্মতৎপরতায় বিশ্ব-জাহানের এই অসংখ্য অংশের সৃষ্টিতে এ ধরনের সুষ্ঠু রুচিশীলতা এবং সামগ্রিকভাবে এদের সবার অংশের সম্মিলনে বিশ্ব-জাহানে এ ধরনের শোভা ও সৌন্দর্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর নয়।

৩. অর্থাৎ প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করার আগে দুনিয়ায় তাকে কি কাজ করতে হবে, এই কাজ করার জন্য তাকে কতটুকু সময় দেয়া হবে, তার আকার-আকৃতি কেমন হবে, তার মধ্যে কি কি গুণাবলী থাকবে, তার স্থান কোথায় হবে, তার জন্য প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব এবং কাজের জন্য কি কি সুযোগ-সুবিধা ও উপায়-উপকরণ সরবরাহ করা হবে, কখন সে অস্তিত্ব লাভ করবে, নিজের অংশের কাজটুকু সে কতদিনে সম্পন্ন করবে এবং কবে কিভাবে সে খতম হয়ে যাবে, এসব কিছুই ঠিক করে দিয়েছেন। এই সমগ্র পরিকল্পনাটির সামগ্রিক নাম হচ্ছে "তাকদীর"। বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিসের জন্য এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের জন্য মহান আল্লাহ এই তাকদীর গড়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে, কোন রকম পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই এমনি হঠাৎ উদ্দেশ্যহীনভাবে এই সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন হয়নি। বরং স্রষ্টার সামনে এ জন্য একটি পূর্ণ পরিকল্পনা ছিল। সবকিছুই সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন হচ্ছে। (আরো বেশী ব্যাখ্যা জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন,

আল হিজর, ১৩-১৪ টীকা, আল ফুরকান ৮ টীকা, আল ক্বামার ২৫ টীকা এবং আবাসা ১২ টীকা দেখুন।)

৪. অর্থাৎ কোন জিনিসকে কেবলমাত্র সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি বরং যে জিনিসকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাকে সেই কাজ করার পদ্ধতিও বাতলে দিয়েছেন। অন্য কথায় তিনি শুধুমাত্র স্রষ্টাই নন, পথপ্রদর্শকও। যে জিনিসটিকে তিনি যে মর্যাদার অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন তাকে তার উপযোগী পথনির্দেশনা দেবার এবং তার জন্য শোভনীয় উপায়ে পথ দেখাবার দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও তারকাকে তিনি এক ধরনের পথ দেখিয়েছেন। সে পথে তারা চলছে এবং তাদের ওপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা সম্পাদন করে যাচ্ছে। আর এক ধরনের পথনির্দেশনা দিয়েছেন পানি, বায়ু, আলো, জড়পদার্থ ও খনিজপদার্থকে। সেই অনুযায়ী যে কাজের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে ঠিক সেই কাজই তারা করে যাচ্ছে। উদ্ভিদকে অন্য এক ধরনের পথনির্দেশনা দিয়েছেন। সেই অনুযায়ী তারা মাটির অভ্যন্তরে নিজেদের শিকড় বিস্তার করছে ও মাটির বুক চিরে অংকুরিত হচ্ছে। যেখানে যেখানে আল্লাহ তাদের জন্য খাদ্য সৃষ্টি করে রেখেছেন সেখান থেকে তা আহরণ করছে। কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা বিস্তার করছে, পাতা ও ফুলে ফলে সুশোভিত হচ্ছে এবং তাদের প্রত্যেকের জন্য যে কাজ নির্ধারিত করা হয়েছে তা করে যাচ্ছে। এক ধরনের পথনির্দেশনা দিয়েছেন স্থলভাগ, জলভাগ ও শূন্যে উড্ডয়নশীল অসংখ্য প্রজাতির এবং তাদের প্রত্যেকটি প্রাণীর জন্য। প্রাণীদের জীবন যাপন এবং তাদের কার্যকলাপে এর বিস্ময়কর ও সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। এমনকি একজন নাস্তিকও অবশেষে একথা মানতে বাধ্য হয় যে, বিভিন্ন ধরনের প্রাণীরা এমন কিছু নৈসর্গিক জ্ঞানের অধিকারী হয় যা মানুষ তার ইন্দ্রিয় তো দূরের কথা নিজের যন্ত্রপাতির সাহায্যেও অর্জন করতে পারে না। তারপর মানুষের জন্য রয়েছে আবার দু'টি আলাদা ধরনের পথনির্দেশনা। তার মধ্যে যে দুই ধরনের অবস্থা বিরাজ করছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এক ধরনের পথনির্দেশনার সম্পর্ক রয়েছে মানুষের জৈবিক জীবনের সাথে। এরি বদৌলতে প্রতিটি মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথেই দুধ পান করা শিখে নেয়। এরি মাধ্যমে মানুষের চোখ, নাক, কান, হৃদয়, মস্তিষ্ক, যকৃৎ, হৃদপিণ্ড, কলিজা, ফুসফুস, পাকস্থলী, অন্ত্র, স্নায়ু, শিরা-উপশিরা সবকিছু যার যার কাজ করে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে মানুষ সচেতন থাক বা নাই থাক তাতে কিছু আসে যায় না। তারি ইচ্ছা-অনিচ্ছার সাথে এই অংগ-প্রত্যংগগুলোর কাজের কোন সম্পর্ক নেই। এ পথনির্দেশনার আওতাধীনেই মানুষের মধ্যে শৈশব, কৈশোর, যৌবন, পৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যাবস্থায় এমন সব শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন আসতে থাকে যা কোথাও এবং কোন ক্ষেত্রেই তার ইচ্ছা, সংকল্প, আশা-আকাংক্ষা এমন কি তার চেতনা শক্তিরও মুখাপেক্ষী নয়। দ্বিতীয় পথনির্দেশনাটির সম্পর্ক হচ্ছে মানুষের বুদ্ধি ও চেতনাগত জগতের সাথে। চেতনাহীন জগতের পথনির্দেশনা থেকে এর ধরন সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ জীবনের এ বিভাগে মানুষকে এক ধরনের স্বাধীন কর্মক্ষমতা দান করা হয়েছে। যার ফলে যে ধরনের পথনির্দেশনা স্বাধীন কর্মক্ষমতাবিহীন জীবনের উপযোগী তা এ বিভাগের জন্য মোটেই উপযোগী নয়। এ দ্বিতীয় পর্যায়ের পথনির্দেশনাটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার জন্য মানুষ যতই চেষ্টা করুক এবং যতই যুক্তি-তর্কের আশ্রয় নিক না কেন, যে স্রষ্টা এই সমগ্র বিশ্ব-জাহানে প্রতিটি জিনিসকে তার আকৃতি, প্রকৃতি ও অবস্থা

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ۝٦ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا
يَخْفٰى ۝٧ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ۝٨ فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ۝٩
سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ۝١٠ وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ۝١١ الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ
الْكُبْرٰى ۝١٢ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۝١٣

আমি তোমাকে পড়িয়ে দেবো, তারপর তুমি আর ভুলবে না।[৭] *তবে আল্লাহ যা চান তা ছাড়া।*[৮] *তিনি জানেন প্রকাশ্য এবং যা কিছু গোপন আছে তাও।*[৯]

আর আমি তোমাকে সহজ পথের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি। কাজেই তুমি উপদেশ দাও, যদি উপদেশ উপকারী হয়[১০] *যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করে নেবে।*[১১] *আর তার প্রতি অবহেলা করবে নিতান্ত দুর্ভাগাই, যে বৃহৎ আগুনে প্রবেশ করবে, তারপর সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না।*[১২]

অনুযায়ী পথনির্দেশনা দেবার ব্যবস্থা করেছেন তিনি মানুষকে এই দুনিয়ায় স্বাধীনভাবে সব জিনিস ভোগ-ব্যবহার করার ক্ষমতা দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু এই ক্ষমতা ব্যবহারের সঠিক ও ভ্রান্ত পদ্ধতি কি হতে পারে তা তাকে জানিয়ে দেননি, একথা অবশ্যি মেনে নেবার কোন কারণ নেই। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নাহল ৯, ১০, ১৪ ও ৫৬ টীকা, ত্বা-হা ২৩ টীকা, আর রহমান ২ ও ৩ টীকা এবং আদ দাহ্‌র ৫ টীকা)।

৫. মূলে মারআ (مَرْعٰى) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তৃণভূক প্রাণীদের খাদ্যের জন্য এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু আয়াতের পরবর্তী আলোচনা থেকে বুঝা যায়, এখানে কেবল উদ্ভিদজাত খাদ্যের কথা বলা হয়নি বরং মাটিতে উৎপন্ন সব ধরনের উদ্ভিদের কথাই বলা হয়েছে।

৬. অর্থাৎ তিনি কেবল বসন্তকালের আগমন ঘটান না, শীতেরও আগমন ঘটান। তোমাদের চোখ তাঁর উভয় প্রকার ক্ষমতার প্রকাশই দেখছে। একদিকে তিনি সবুজ শ্যামল বৃক্ষলতায় ভরে দেন। তাদের তরতাজা শ্যামল শোভা দেখে মন আনন্দে ভরে ওঠে। আবার অন্যদিকে এ বৃক্ষলতাকে তিনি শুষ্ক শ্রীহীন করে কালো জঞ্জালে পরিণত করেন। এগুলো বাতাসে উড়ে বেড়ায় এবং বন্যার স্রোতে খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। তাই এই দুনিয়ায় কোন ব্যক্তির এই ভুল ধারণা করা উচিত নয় যে, সে এখানে কেবল বসন্তকালই দেখবে, শীতের সাথে তার সাক্ষাতই হবে না। এই একই বক্তব্য কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় অন্যভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন দেখুন সূরা ইউনুস ২৪ আয়াত, সূরা কাহাফ ৪৫ আয়াত এবং সূরা হাদীদ ২০ আয়াত।

৭. হাকেম হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) থেকে এবং ইবনে মারদুইয়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন, রসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভুলে যাবার ভয়ে কুরআনের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে থাকতেন। মুজাহিদ ও কাতাদা বলেন, জিব্রীল অহী শুনিয়ে শেষ করার আগেই ভুলে যাবার আশংকায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোড়ার দিক থেকে আবার পড়তে শুরু করতেন। এ কারণে আল্লাহ তাঁকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন, অহী নাযিলের সময় তুমি নিরবে শুনতে থাকো। আমি তোমাকে তা এমনভাবে পড়িয়ে দেবো যার ফলে চিরকালের জন্য তোমার মুখস্থ হয়ে যাবে। এর কোন একটি শব্দ তুমি ভুলে যাবে, এ ভয় করো না। এ নিয়ে তৃতীয়বার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অহী আয়ত্ব করার পদ্ধতি শেখানো হয়। এর আগে আরো দু'বার সূরা 'ত্বা-হা'র ১১৪ আয়াতে এবং সূরা 'কিয়ামাহ'র ১৬-১৯ আয়াতে এর আলোচনা এসেছে। এই আয়াত থেকে একথা প্রমাণিত হয়, কুরআন যেমন মু'জিযা হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল করা হয়েছিল ঠিক তেমনি মুজিযা হিসেবেই তার প্রতিটি শব্দ তাঁর স্মৃতিতে সংরক্ষিত করে দেয়া হয়েছিল। এর কোন একটি শব্দ তিনি ভুলে যাবেন অথবা একটি শব্দের জায়গায় তার সমার্থক অন্য একটি শব্দ তাঁর মুবারক কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হবে, এ ধরনের সকল সম্ভাবনার পথই বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

৮. এই বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, সমগ্র কুরআনের প্রতিটি শব্দ তোমার স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়ে যাওয়ার পেছনে তোমার নিজের শক্তির কোন কৃতিত্ব নেই। বরং এটি আল্লাহর মেহেরবানী এবং তাঁর তাওফীকের ফল। নয়তো আল্লাহ চাইলে এগুলো তোমার স্মৃতি থেকে উধাও করে দিতে পারেন। এ বক্তব্যটি কুরআনের অন্যত্র নিম্নোক্তভাবে বলা হয়েছে ঃ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ "আমি চাইলে অহীর মাধ্যমে তোমাকে যা কিছু দিয়েছি সব ছিনিয়ে নিতে পারি।" (বনি ইসরাঈল ৮৬) দুই, কখনো সাময়িকভাবে তোমার ভুলে যাওয়া এবং কোন আয়াত বা শব্দ তোমার কোন সময় ভুলে যাওয়া এই ওয়াদার ব্যতিক্রম। যে ব্যাপারে ওয়াদা করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, তুমি স্থায়ীভাবে কুরআনের কোন শব্দ ভুলে যাবে না। সহী বুখারীর নিম্নোক্ত হাদীসটিকে এ অর্থের সমর্থনে পেশ করা যেতে পারে ঃ একবার ফজরের নামাযে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা পড়ার সময় মাঝখানে একটি আয়াত বাদ দিয়ে যান। নামাযের পর হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) এ আয়াতটি মানসূখ (রহিত) হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করেন। জবাবে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

৯. এমনিতে এ শব্দগুলো সাধারণভাবে ব্যবহৃত এবং তার অর্থ এই যে, আল্লাহ গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন। কিন্তু যে বক্তব্য প্রসঙ্গে একথাগুলো এখানে বলা হয়েছে তা সামনে রাখলে এর যা অর্থ দাঁড়ায় তা হচ্ছে ঃ তুমি জীব্রীলের (আ) সাথে সাথে যে কুরআন পড়ে চলেছো তা আল্লাহ জানেন এবং ভুলে যাবার ভয়ে যে এমনটি করছো তাও আল্লাহ জানেন। তাই তাঁকে নিশ্চয়তা দান করে বলা হচ্ছে, তোমার ভুলে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই।

১০. সাধারণভাবে মুফাস্‌সিরগণ এ দু'টি বাক্যকে পৃথক পৃথক অর্থে গ্রহণ করেছেন। তারা প্রথম বাক্যের অর্থ করেছেন, আমি তোমাদেরকে একটি সহজ শরীয়াত দিচ্ছি। এ শরীয়াত অনুযায়ী কাজ করা সহজ। আর দ্বিতীয় বাক্যটির অর্থ করেছেন, উপদেশ দাও, যদি তা কাজে লাগে। কিন্তু আমার মতে "ফাযাক্কির" (فَذَكِّرْ) শব্দটি উভয় বাক্যকে

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٧﴾ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ
الْأُولَىٰ ﴿١٨﴾ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿١٩﴾

সে সফলকাম হয়েছে, যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে[১৩] এবং নিজের রবের নাম স্মরণ করেছে[১৪] তারপর নামায পড়েছে।[১৫] কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকো।[১৬] অথচ আখেরাত উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।[১৭] পূর্বে অবতীর্ণ সহীফাগুলোয় একথাই বলা হয়েছিল, ইবরাহীম ও মূসার সহীফায়।[১৮]

পরস্পর সংযুক্ত করে দিয়েছে এবং শেষের বাক্যটির বিষয়বস্তু প্রথম বাক্যটির বিষয়বস্তুর ওপরই সংস্থাপিত হয়েছে। তাই আল্লাহর এই বাণীটির অর্থ আমি যা বুঝেছি তা হচ্ছে ঃ হে নবী। দীন প্রচারের ব্যাপারে আমি তোমাকে কোন সংকটের মুখোমুখি করতে চাই না। যার শ্রবণশক্তি নেই তাকে শুনাতে হবে এবং যার দৃষ্টিশক্তি নেই তাকে দেখাতে হবে, এ ধরনের সংকটে তোমাকে ফেলতে চাই না। বরং তোমার জন্য একটি সহজ পথ তৈরি করে দিচ্ছি। সে পথটি হচ্ছে, যেখানে তুমি অনুভব করো কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে এবং তা থেকে উপকৃত হতে প্রস্তুত সেখানে উপদেশ দিতে থাকো। এখন কে উপদেশ থেকে উপকৃত হতে এবং কে উপকৃত না হতে চায়, তার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে সাধারণ প্রচারের মাধ্যমেই। কাজেই সাধারণ প্রচার জারী রাখতে হবে। কিন্তু সেখানে তোমাদের উদ্দেশ্য হবে এমনসব লোকদের খুঁজে বের করা যারা এর সাহায্যে উপকৃত হয়ে সত্য-সরল পথ অবলম্বন করবে। এসব লোকই তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার অধিকার রাখে এবং এদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তোমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। এদেরকে বাদ দিয়ে এমনসব লোকের পেছনে পড়ার তোমাদের কোন প্রয়োজন নেই। যাদের ব্যাপারে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তোমরা জানতে পেরেছো যে, তারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায় না। প্রায় এই একই ধরনের বিষয়বস্তুই সূরা আবাসায় অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে ঃ "যে ব্যক্তি বেপরোয়া ভাব দেখায় তার প্রতি তুমি দৃষ্টি দিচ্ছো। অথচ সে সংশোধিত না হলে তোমার ওপর তার কী দায়িত্ব বর্তায়? আর যে ব্যক্তি নিজে তোমার কাছে দৌড়ে আসে এবং সে দৌড়রত রয়েছে, তার প্রতি তুমি অনাগ্রহ দেখাচ্ছো। এতো একটি উপদেশ, যে চায় এটা গ্রহণ করতে পারে।" (৫-১২ আয়াত)।

১১. অর্থাৎ যে ব্যক্তির মনে আল্লাহর ভয় এবং খারাপ পরিণতির আশংকা থাকবে সেই ভাবতে থাকবে যে, সে ভুল পথে যাচ্ছে কি-না এবং সেই ব্যক্তিই হেদায়াত ও গোমরাহীর পার্থক্য এবং সাফল্য ও সৌভাগ্যের পথের সন্ধান দানকারীর উপদেশ মনোযোগ সহকারে শুনবে।

১২. অর্থাৎ তার মৃত্যু হবে না। যার ফলে আযাব থেকে রেহাই পাবে না। আবার বাঁচার মতো বাঁচবেও না। যার ফলে জীবনের কোন স্বাদ-আহলাদও পাবে না। যারা আল্লাহ ও

তাঁর রসূলের উপদেশ আদৌ গ্রহণ করেনি এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কুফরী, শিরক বা নাস্তিকতাবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তারাই এ শাস্তি লাভ করবে। আর যারা মনের অভ্যন্তরে ঈমানকে পোষণ করে কিন্তু নিজেদের খারাপ কাজের দরুন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে তাদের সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, তারা নিজেদের শাস্তি ভোগ করার পর আল্লাহ তাদের মৃত্যু দান করবেন। তারপর তাদের পক্ষে শাফা'আত কবুল করা হবে। তাদের অগ্নিদগ্ধ লাশ এনে জান্নাতের ঝরণার কিনারে ফেলে দেয়া হবে। জান্নাতবাসীদের বলা হবে, ওদের ওপর পানি ঢালো। বৃষ্টির পানি পেয়ে যেমন মৃত উদ্ভিদ জীবন্ত হয়ে ওঠে ঠিক তেমনি জান্নাতের পানি পেয়ে তারাও জেগে উঠবে। এ সম্পর্কিত হাদীস মুসলিমে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে এবং বায্যারে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

১৩. পবিত্রতা অর্থ কুফর ও শিরক ত্যাগ করে ঈমান আনা, অসৎআচার-আচরণ ত্যাগ করে সদাচার অবলম্বন করা এবং অসৎকাজ ত্যাগ করে সৎকাজ করা। সফলতা বলতে পার্থিব সমৃদ্ধি বুঝানো হয়নি বরং আসল ও সত্যিকার সফলতার কথা বুঝানো হয়েছে। এর সাথে পার্থিব সমৃদ্ধি অর্জিত হোক বা না হোক তাতে কিছু আসে যায় না। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা ইউনুস ২৩ টীকা, আল মু'মিনুন ১, ১১, ৫০ টীকা এবং সূরা লুকমান ৪ টীকা।)

১৪. 'স্মরণ করা' বলতে আল্লাহকে মনে মনে স্মরণ করা এবং মুখে তা উচ্চারণ করাও বুঝানো হয়েছে। এই উভয়টিই যিকরুল্লাহ বা আল্লাহকে স্মরণ করার অন্তরভুক্ত হবে।

১৫. অর্থাৎ কেবল স্মরণ করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং নিয়মিত নামাযও পড়ে সে প্রমাণ করেছে যে, যে আল্লাহকে সে নিজের ইলাহ বলে মেনে নিয়েছে কার্যত তাঁর আনুগত্য করতেও সে প্রস্তুত এবং তাঁকে সর্বক্ষণ স্মরণ করার জন্য সে ব্যবস্থা অবলম্বন করছে। এই আয়াতে পর্যায়ক্রমে দু'টি কথা বলা হয়েছে। প্রথমে আল্লাহকে স্মরণ করা তারপর নামায পড়া। এ অনুযায়ী 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরু করার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের যে পদ্ধতির প্রচলন করেছেন তার সকল অংশই যে কুরআনের ইশারা-ইংগিত থেকে গৃহীত, এটি তার অসংখ্য প্রমাণের অন্যতম। কিন্তু আল্লাহর রসূল ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে এই ইংগিতগুলো জমা করে নামাযকে এ আকারে সাজানো কোনক্রমেই সম্ভবপর ছিল না।

১৬. অর্থাৎ দুনিয়া ও তার আরাম-আয়েশ এবং তার স্বার্থ ও আনন্দ স্বাদ লাভ করার জন্যই তোমাদের সমস্ত চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টা উৎসর্গিত। তোমরা মনে করে থাকো, এখানে যা কিছু পাওয়া যায়, তাই নীট লাভ এবং এখানে যা থেকে বঞ্চিত হও তাই তোমাদের জন্য আসল ক্ষতি।

১৭. অর্থাৎ আখেরাত দু'দিক দিয়ে দুনিয়ার মোকাবিলায় অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। প্রথমত তার সুখ, স্বাচ্ছন্দ, আরাম-আয়েশ দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামতের চাইতে অনেক বেশী ও অনেক উচ্চ পর্যায়ের। দ্বিতীয়ত দুনিয়া ধ্বংসশীল এবং আখেরাত চিরস্থায়ী।

১৮. এই দ্বিতীয়বারের মতো কুরআনে হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত মূসা (আ)-এর সহীফা শিক্ষার বরাত দেয়া হয়েছে। এর আগে সূরা আন নাজ্‌মের তৃতীয় রুকূ'তে আর একবার এ ধরনের বরাত দেয়া হয়েছে।

আল গাশিয়াহ

৮৮

নামকরণ

প্রথম আয়াতের الْغَاشِيَةِ শব্দকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরাটির সমগ্র বিষয়বস্তু একথা প্রমাণ করে যে এটিও প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত। কিন্তু এটি এমন সময় নাযিল হয় যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন এবং মক্কার লোকেরা তাঁর দাওয়াত শুনে তাঁর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে থাকে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু অনুধাবন করার জন্য একথাটি অবশ্যি সামনে রাখতে হবে যে, ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রধানত দু'টি কথা লোকদেরকে বুঝাবার মধ্যেই তাঁর দাওয়াত সীমাবদ্ধ রাখেন। একটি তাওহীদ ও দ্বিতীয়টি আখেরাত। আর মক্কাবাসীরা এই দু'টি কথা মেনে নিতে অস্বীকার করতে থাকে। এই পটভূমিটুকু অনুধাবন করার পর এবার এই সূরাটির বিষয়বস্তু ও বর্ণনা পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করুন।

এখানে সবার আগে গাফলতির জীবনে আকণ্ঠ ডুবে থাকা লোকদেরকে চমকে দেবার জন্য হঠাৎ তাদের সামনে প্রশ্ন রাখা হয়েছে ঃ তোমরা কি সে সময়ের কোন খবর রাখো যখন সারা দুনিয়ার ওপর ছেয়ে যাবার মতো একটি বিপদ অবতীর্ণ হবে? এরপর সাথে সাথেই এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া শুরু হয়েছে। বলা হয়েছে, সে সময় সমস্ত মানুষ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দু'টি ভিন্ন পরিণামের সম্মুখীন হবে। একদল জাহান্নামে যাবে। তাদের উমুক উমুক ধরনের ভয়াবহ ও কঠিন আযাবের সম্মুখীন হতে হবে। দ্বিতীয় দলটি উন্নত ও উচ্চ মর্যাদার জান্নাতে যাবে। তাদেরকে উমুক উমুক ধরনের নিয়ামত দান করা হবে।

এভাবে লোকদেরকে চমকে দেবার পর হঠাৎ বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রশ্ন করা হয়, যারা কুরআনের তাওহীদী শিক্ষা ও আখেরাতের খবর শুনে নাক সিটকায় তারা কি নিজেদের চোখের সামনে প্রতি মুহূর্তে যেসব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে সেগুলো দেখে না? আরবের দিগন্ত বিস্তৃত সাহারায় যেসব উটের ওপর তাদের সমগ্র জীবন যাপন প্রণালী নির্ভরশীল তারা কিভাবে ঠিক মরু জীবনের উপযোগী বৈশিষ্ট ও গুণাবলী সম্পন্ন পশু হিসেবে গড়ে

উঠেছে, একথা কি তারা একটুও চিন্তা করে না? পথে সফর করার সময় তারা আকাশ, পাহাড় বা বিশাল বিস্তৃত পৃথিবী দেখে। এই তিনটি জিনিস সম্পর্কেই তারা চিন্তা করে না কেন? মাথার ওপরে এই আকাশটি কেমন করে ছেয়ে গেলো? সামনে ওই পাহাড় খাড়া হলো কেমন করে? পায়ের নীচে এই যমীন কিভাবে বিছানো হলো? এসব কিছুই কি একজন মহাবিজ্ঞ সর্বশক্তিমান কারিগরের কারিগরী তৎপরতা ছাড়াই হয়ে গেছে? যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, একজন সৃষ্টিকর্তা বিপুল শক্তি ও জ্ঞানের সাহায্যে এই জিনিসগুলো তৈরি করেছেন এবং দ্বিতীয় আর কেউ তাঁর এই সৃষ্টি কর্মে শরীক নেই তাহলে তাঁকেই একক রব হিসেবে মেনে নিতে তাদের আপত্তি কেন? আর যদি তারা একথা মেনে নিয়ে থাকে যে সেই আল্লাহর এসব কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা ছিল, তাহলে সেই আল্লাহ কিয়ামত সংঘটিত করার ক্ষমতাও রাখেন, মানুষদের পুনর্বার সৃষ্টি করার ক্ষমতাও রাখেন এবং জান্নাত ও জাহান্নাম বানাবার ক্ষমতাও রাখেন—এসব কথা কোন্ যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে মানতে ইতস্তত করছে?

এ সংক্ষিপ্ত ও অত্যন্ত শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে বক্তব্য বুঝানো হয়েছে। এরপর কাফেরদের দিক থেকে ফিরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে, এরা না মানতে চাইলে না মানুক, তোমাকে তো এদের ওপর বল প্রয়োগকারী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়নি। তুমি জোর করে এদের থেকে স্বীকৃতি আদায় করতে পারো না। তোমার কাজ উপদেশ দেয়া। কাজেই তুমি উপদেশ দিয়ে যেতে থাকো। সবশেষে তাদের অবশ্যি আমার কাছেই আসতে হবে। সে সময় আমি তাদের কাছ থেকে পুরো হিসেব নিয়ে নেব। যারা মানেনি তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবো।

আয়াত ২৬ **সূরা আল গাশিয়া-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۝١ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝٢ عَامِلَةٌ
نَّاصِبَةٌ ۝٣ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝٤ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝٥ لَيْسَ لَهُمْ
طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۝٦ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ۝٧ وُجُوْهٌ
يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝٨ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝٩ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝١٠ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا
لَاغِيَةً ۝١١ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝١٢ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۝١٣ وَّاَكْوَابٌ
مَّوْضُوْعَةٌ ۝١٤ وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ۝١٥ وَّزَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ ۝١٦

তোমার কাছে আচ্ছন্নকারী বিপদের খবর এসে পৌঁছেছে কি?[১] কিছু চেহারা[২] সেদিন হবে ভীতি কাতর, কঠোর পরিশ্রম রত, ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। জ্বলন্ত আগুনে ঝলসে যেতে থাকবে। ফুটন্ত ঝরণার পানি তাদেরকে দেয়া হবে পান করার জন্য। তাদের জন্য কাঁটাওয়ালা শুকনো ঘাস ছাড়া আর কোন খাদ্য থাকবে না।[৩] তা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও মেটাবে না। কিছু চেহারা সেদিন আলোকোজ্জ্বল হবে। নিজেদের কর্ম সাফল্যে আনন্দিত হবে।[৪] উচ্চ মর্যাদার জান্নাতে অবস্থান করবে। সেখানে কোন বাজে কথা শুনবে না।[৫] সেখানে থাকবে বহমান ঝরণাধারা। সেখানে উঁচু আসন থাকবে, পানপাত্রসমূহ থাকবে।[৬] সারি সারি বালিশ সাজানো থাকবে এবং উৎকৃষ্ট বিছানা পাতা থাকবে।

১. এর অর্থ হচ্ছে কিয়ামত। অর্থাৎ যে বিপদটা সারা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। এ প্রসংগে একটি কথা অবশ্যি সামনে রাখতে হবে। এখানে সামগ্রিকভাবে আখেরাতের কথা বলা হচ্ছে। বিশ্ব ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে পড়ার সূচনা থেকে শুরু করে সমস্ত মানুষের আবার জীবিত হয়ে ওঠা এবং আল্লাহর দরবারে শাস্তি ও পুরস্কার লাভ করা পর্যন্ত সমগ্র পর্যায়টি এর অন্তরভুক্ত হবে।

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ
رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ
سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾
إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ إِلَيْنَا
إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿٢٦﴾

(এরা মানছে না) তাহলে কি এরা উটগুলো দেখছে না, কিভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে? আকাশ দেখছে না, কিভাবে তাকে উঠানো হয়েছে? পাহাড়গুলো দেখছে না, কিভাবে তাদেরকে শক্তভাবে বসানো হয়েছে? আর যমীনকে দেখছে না, কিভাবে তাকে বিছানো হয়েছে?[৭]

বেশ (হে নবী!) তাহলে তুমি উপদেশ দিয়ে যেতে থাকো। তুমি তো শুধুমাত্র একজন উপদেশক, এদের ওপর বল প্রয়োগকারী নও।[৮] *তবে যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং অস্বীকার করবে, আল্লাহ তাকে মহাশাস্তি দান করবেন। অবশ্যি এদের আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তারপর এদের হিসেব নেয়া হবে আমারই দায়িত্ব।*

২. চেহারা শব্দটি এখানে ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের শরীরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও সবচেয়ে সুস্পষ্ট অংশ হচ্ছে তার চেহারা। এর মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্বের পরিচিতি ফুটে ওঠে। মানুষ ভালো–মন্দ যে অবস্থারই সম্মুখীন হয়, তার প্রকাশ ঘটে তার চেহারায়। তাই "কিছু লোক" না বলে "কিছু চেহারা" বলা হয়েছে।

৩. কুরআন মজীদে কোথাও বলা হয়েছে, জাহান্নামের অধিবাসীদের খাবার জন্য "যাক্কুম" দেয়া হবে। কোথাও বলা হয়েছে, "গিসলীন" (ক্ষতস্থান থেকে ঝরে পড়া তরল পদার্থ) ছাড়া তাদের আর কোন খাবার থাকবে না। আর এখানে বলা হচ্ছে, তারা খাবার জন্য কাঁটাওয়ালা শুকনো ঘাস ছাড়া আর কিছুই পাবে না। এ বর্ণনাগুলোর মধ্যে মূলত কোন বৈপরীত্য নেই। এর অর্থ এও হতে পারে যে, জাহান্নামের অনেকগুলো পর্যায় থাকবে। বিভিন্ন অপরাধীকে তাদের অপরাধ অনুযায়ী সেই সব পর্যায়ে রাখা হবে। তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের আযাব দেয়া হবে। আবার এর অর্থ এও হতে পারে যে, তারা "যাক্কুম" খেতে না চাইলে "গিসলীন" পাবে এবং তা খেতে অস্বীকার করলে কাঁটাওয়ালা ঘাস ছাড়া আর কিছুই পাবে না। মোটকথা, তারা কোন মনের মতো খাবার পাবে না।

৪. অর্থাৎ দুনিয়ায় তারা যেসব প্রচেষ্টা চালিয়ে ও কাজ করে এসেছে আখেরাতে তার চমৎকার ফল দেখে তারা আনন্দিত হবে। তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে যে, দুনিয়ায় ঈমান, সততা ও তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করে তারা নিজেদের প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার যে কুরবানী দিয়েছে, দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে যে কষ্ট স্বীকার করেছে, আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করতে গিয়ে যেসব জুলুম নিপীড়নের শিকার হয়েছে, গোনাহ থেকে বাঁচতে গিয়ে যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এবং যেসব স্বার্থ ও স্বাদ আস্বাদন থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছে তা সবই আসলে বড়ই লাভজনক কারবার ছিল।

৫. এটিকেই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে জান্নাতের নিয়ামতের মধ্যে একটি বড় নিয়ামত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা মারয়াম ৩৮ টীকা, আত্‌তূর ১৮ টীকা, আল ওয়াক্বিয়াহ ১৩ টীকা এবং আন নিসা ২১ টীকা)

৬. তাদের সামনে সবসময় পানপাত্র ভরা থাকবে। চেয়ে বা ডাক দিয়ে আনিয়ে নেবার প্রয়োজন হবে না।

৭. অর্থাৎ আখেরাতের কথা শুনে এরা যদি বলে, এসব কিছু কেমন করে হতে পারে, তাহলে নিজেদের চারপাশের জগতের প্রতি একবার দৃষ্টি বুলিয়ে এরা কি কখনো চিন্তা করেনি, এই উট কেমন করে সৃষ্টি হলো? আকাশ কেমন করে বুলন্দ হলো? পাহাড় কেমন করে প্রতিষ্ঠিত হলো? এই পৃথিবী কেমন করে বিস্তৃত হলো? এসব জিনিস যদি তৈরি হতে পারে এবং তৈরি হয়ে এদের সামনে বর্তমান থাকতে পারে, তাহলে কিয়ামত কেন আসতে পারবে না? আখেরাতে আর একটা নতুন জগত তৈরি হতে পারবে না কেন? জান্নাত ও জাহান্নাম হতে পারবে না কেন? দুনিয়ায় চোখ মেলেই যেসব জিনিস দেখা যায় সেগুলো সম্পর্কে যে ব্যক্তি মনে করে যে, সেগুলোর অস্তিত্ব লাভ তো সম্ভবপর। কারণ সেগুলো অস্তিত্ব লাভ করেছে কিন্তু যেসব জিনিস এখনো তার দৃষ্টিতে পড়েনি এবং সেগুলো সম্পর্কে এখনো সে কোন অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি, সেগুলো সম্পর্কে যদি সে এক কথায় বলে দেয় যে, সেগুলোর অস্তিত্ব লাভ সম্ভব নয়, তাহলে তাকে বুদ্ধি-বিবেকহীন ও চিন্তাশক্তি বিবর্জিত ব্যক্তিই মনে করা হবে। তার মস্তিষ্কে যদি একটুও বুদ্ধি থাকে তাহলে তার অবশ্যি চিন্তা করা উচিত যে, যা কিছু বর্তমান আছে এবং অস্তিত্ব লাভ করেছে সেগুলোইবা কেমন করে অস্তিত্ব লাভ করলো? আরবের মরু এলাকার অধিবাসীদের জন্য যে ধরনের বৈশিষ্ট ও গুণাবলীসম্পন্ন প্রাণীর প্রয়োজন এই উটগুলো কেমন করে সেসব বৈশিষ্ট ও গুণাবলী সম্পন্ন হলো? এই আকাশ কেমন করে তৈরি হলো, যার শূন্য পেট শ্বাস নেবার জন্য বাতাসে ভরা? যার মেঘমালা বৃষ্টিবহন করে আনে? যার সূর্য দিনে আলো ও তাপ দেয়? যার চাঁদ ও তারা রাতের আকাশে আলো ছড়ায়? পৃথিবীর এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, যেখানে মানুষ বসবাস করে, যেখানে উৎপাদিত শস্য ও ফলমূল তার খাদ্য প্রয়োজন পূর্ণ করে, যার নদী ও কূপের পানির ওপর তার জীবন নির্ভরশীল তাকে কিভাবে বিছানার মতো ছড়িয়ে দেয়া হলো? রং বে-রঙের মাটি ও পাথর এবং বিভিন্ন খনিজ পদার্থ নিয়ে এ পাহাড়গুলো পৃথিবীর বুকে কিভাবে গজিয়ে উঠেছে? এসব কিছুই কি একজন মহাশক্তিশালী ও বিজ্ঞ স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশল ছাড়া এমনিই তৈরি হয়ে গেছে? কোন চিন্তাশীল বিবেকবান ব্যক্তি এই প্রশ্নের নেতিবাচক জবাব দিতে পারেন না। তিনি যদি জেদী ও হঠধর্মী না হয়ে থাকেন, তাহলে তাকে অবশ্যি

মানতে হবে, কোন মহাশক্তিধর ও মহাবিজ্ঞ সত্তা এগুলোকে সম্ভবপর না করলে এগুলোর প্রত্যেকটি অসম্ভব ছিল। আর একজন সর্বশক্তিমানের শক্তির জোরে যদি দুনিয়ার এসব জিনিস তৈরি হওয়া সম্ভবপর হয়ে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে যে জিনিসগুলোর অস্তিত্ব লাভের খবর দেয়া হচ্ছে সেগুলোকে অসম্ভব মনে করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই।

৮. অর্থাৎ ন্যায়সংগত যুক্তি মানতে যদি কোন ব্যক্তি প্রস্তুত না হয়, তাহলে মানা না মানা তার ইচ্ছা। তবে তোমাকে এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়নি যে, যে ব্যক্তি মানতে প্রস্তুত নয় তাকে জবরদস্তি মানাতে হবে। তোমার কাজও কেবল এতটুকু ঃ লোকদেরকে ভুল ও সঠিক এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য জানিয়ে দাও। তাদেরকে ভুল পথে চলার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করো। কাজেই এ দায়িত্ব তুমি পালন করে যেতে থাকো।

আল ফজর

৮৯

নামকরণ

প্রথম শব্দ وَالْفَجْرِ কে এই সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

এই সূরার বিষয়বস্তু থেকে জানা যায়, এটি এমন এক যুগে নাযিল হয় যখন মক্কা মুয়াযযমায় ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর ব্যাপকভাবে নিপীড়ন নির্যাতন চলছিল। তাই মক্কাবাসীদেরকে আদ, সামূদ ও ফেরাউনের পরিণাম দেখিয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের সত্যতা প্রমাণ করা। কারণ মক্কাবাসীরা একথা অস্বীকার করে আসছিল। এ উদ্দেশ্যে ধারাবাহিক পর্যায়ে যে যুক্তি পেশ করা হয়েছে সে ধারাবাহিকতা সহকারে এ বিষয়টি পর্যালোচনা করতে হবে।

প্রথমে ফজর, দশটি রাত, জোড় ও বেজোড় এবং বিদায়ী রাতের কসম খেয়ে শ্রোতাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে, যে বিষয়টি তোমরা অস্বীকার করছো তার সত্যতার সাক্ষ দেবার জন্য কি এই জিনিসগুলো যথেষ্ট নয়? সামনের দিকে টীকায় আমি এ চারটি জিনিসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছি তা থেকে জানা যাবে যে, দিনরাত্রির ব্যবস্থায় যে নিয়মানুবর্তিতা দেখা যায় এগুলো তারই নির্দশন। এগুলোর কসম খেয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত এই বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করার পরও যে আল্লাহ এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি আখেরাত কায়েম করার ক্ষমতা রাখেন এবং মানুষের কাছ থেকে তার কার্যাবলীর হিসেব নেয়া তাঁর এ বিজ্ঞতাপূর্ণ ব্যবস্থাপনার অপরিহার্য দাবী, একথার সাক্ষ প্রমাণ পেশ করার জন্য কি আর কোন জিনিসের প্রয়োজন থাকে?

এরপর মানব জাতির ইতিহাস থেকে প্রমাণ পেশ করে উদাহরণ স্বরূপ আদ ও সামূদ জাতি এবং ফেরাউনের পরিণাম পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যখন তারা সীমা পেরিয়ে গেছে এবং পৃথিবীতে ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে তখন আল্লাহর আযাব তাদেরকে গ্রাস করেছে। একথা প্রমাণ করে যে, কোন অন্ধ-বধির শক্তি এই বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করছে না এবং এ দুনিয়াটা কোন অথর্ব রাজার মগের মুল্লুকও নয়। বরং একজন মহাবিজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী শাসক এ বিশ্ব-জাহানের ওপর কর্তৃত্ব করছেন। তিনি বুদ্ধি-জ্ঞান ও নৈতিক অনুভূতি দান করে যেসব সৃষ্টিকে এ দুনিয়ায় স্বাধীন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দিয়েছেন তাদের কাজের হিসেব-নিকেশ করা এবং তাদেরকে শাস্তি ও পুরস্কার দেয়া তাঁর জ্ঞানবত্তা ও ন্যায়পরায়ণতার অনিবার্য দাবী। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা এর অবিচ্ছিন্ন প্রকাশ দেখি।

তারপর মানব সমাজের সাধারণ নৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে আরব জাহেলিয়াতের অবস্থা সে সময় সবার সামনে বাস্তবে সুস্পষ্ট ছিল। বিশেষ করে তার দু'টি দিকের সমালোচনা করা হয়েছে। এক, সাধারণ মানুষের বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগী। যার ফলে তারা নৈতিক ভালো-মন্দের দিকটাকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র পার্থিব ধন-দওলাত, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জন বা এর অভাবকে সম্মান লাভ ও সম্মানহানির মানদণ্ড গণ্য করেছিল। তারা ভুলে গিয়েছিল, সম্পদশালিতা কোন পুরস্কার নয় এবং আর্থিক অভাব অনটন কোন শাস্তি নয় বরং এ দুই অবস্থাতেই মহান আল্লাহ মানুষের পরীক্ষা নিচ্ছেন। সম্পদ লাভ করে মানুষ কি দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি অবলম্বন করে এবং আর্থিক অনটন ক্লিষ্ট হয়ে সে কোন পথে চলে—এটা দেখাই তাঁর উদ্দেশ্য। দুই, লোকদের সাধারণ কর্মনীতি। পিতার মৃত্যুর সাথে সাথেই তাদের সমাজে এতিম ছেলেমেয়েরা চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হয়। গরীবদের খবর নেবার এবং তাদের পক্ষে কথা বলার একটি লোকও পাওয়া যায় না। যার ক্ষমতা থাকে সে মৃতের সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করে বসে। দুর্বল হকদারদের খেদিয়ে দেয়া হয়। অর্থ ও সম্পদের লোভ একটি দুর্নিবার ক্ষুধার মতো মানুষকে তাড়া করে ফেরে। যত বেশী পায় তবুও তার পেট ভরে না। দুনিয়ার জীবনে যেসব লোক এ ধরনের কর্মনীতি অবলম্বন করে তাদের কাজের হিসেব নেয়া যে ন্যায়সংগত, লোকদের কাছ থেকে এ স্বীকৃতি আদায় করাই হচ্ছে এ সমালোচনার উদ্দেশ্য।

সবশেষে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, সমালোচনা ও হিসেব-নিকেশ অবশ্যি হবে। আর সেদিন এই হিসেব-নিকেশ হবে যেদিন আল্লাহর আদালত কায়েম হবে। শাস্তি ও পুরস্কার অস্বীকারকারীদেরকে হাজার বুঝালেও আজ তারা যে কথা মেনে নিতে পারছে না। সেদিন তা তাদের বোধগম্য হবে। কিন্তু তখন বুঝতে পারায় কোন লাভ হবে না। অস্বীকারকারী সেদিন আফসোস করে বলবে ঃ হায়, আজকের দিনের জন্য যদি আমি দুনিয়ায় কিছু সরঞ্জাম তৈরি করতাম। কিন্তু এই লজ্জা ও দুঃখ তাকে আল্লাহর আযাবের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। তবে যেসব লোক আসমানী কিতাব ও আল্লাহর নবীগণের পেশকৃত সত্য পূর্ণ মানসিক নিশ্চিন্ততা সহকারে মেনে নিয়েছিল আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং তারাও আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিদান পেয়ে সন্তুষ্ট হবে। তাদেরকে আহবান জানানো হবে, তোমরা নিজেদের রবের প্রিয় বান্দাদের অন্তরভুক্ত হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো।

আয়াত ৩০ **সূরা আল ফজ্‌র-মক্কী** রুকূ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالْفَجْرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢ وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝٣ وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۝٤
هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ۝٥

ফজরের কসম, দশটি রাতের, জোড় ও বেজোড়ের এবং রাতের কসম যখন তা বিদায় নিতে থাকে। এর মধ্যে কোন বুদ্ধিমানের জন্য কি কোন কসম আছে?[১]

১. এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ দেখা যায়। এমন কি জোড় ও বেজোড় সম্পর্কে ছত্রিশটি বক্তব্য পাওয়া যায়। কোন কোন বর্ণনায় এগুলোর ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেও সম্পর্কিত করা হয়েছে। কিন্তু আসলে রসূলুল্লাহ (সা) থেকে কোন ব্যাখ্যা প্রমাণিত নেই। নয়তো তাঁর ব্যাখ্যার পর সাহাবা, তাবেঈ ও পরবর্তী তাফসীরকারদের মধ্য থেকে কোন একজনও এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা নির্ধারণ করার সাহস করতেন না।

বর্ণনাভংগি সম্পর্কে চিন্তা করলে পরিষ্কার বুঝা যায়, প্রথম থেকে কোন আলোচনা চলছিল। সেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কথা পেশ করছিলেন এবং অস্বীকারকারীরা তা অস্বীকার করছিল। এ প্রসংগে রসূলের কথার সত্যতা প্রমাণ করে বলা হয়েছে, ওমুক ওমুক জিনিসের কসম। এর অর্থ ছিল, এই জিনিসগুলোর কসম, যা কিছু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন সব সত্য। তারপর এ প্রশ্নের ভিত্তিতে এ বক্তব্য পেশ করা হয়েছে যে, কোন বুদ্ধিমান লোকের জন্য কি এর মধ্যে কোন কসম আছে? অর্থাৎ এই সত্য কথাটির পক্ষে সাক্ষ দেবার জন্য এরপর কি আর কোন কসমের প্রয়োজন আছে? মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কথা বলছেন তা জেনে নেবার জন্য কি একজন বুদ্ধি-বিবেকমান ব্যক্তির জন্য এই কসমই যথেষ্ট নয়?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে প্রসংগে এই চারটি জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে তা কি ছিল? এ জন্য আমাদের পরবর্তী আয়াতগুলোতে "তুমি কি দেখনি তোমার রব তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছিলেন" থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত সমগ্র আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। এ থেকে জানা যায়, আলোচনা চলছিল শাস্তি ও পুরস্কার সম্পর্কে। মক্কাবাসীরা একথা অস্বীকার করছিল এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের থেকে এর স্বীকৃতি আদায় করার জন্য অনবরত তাদেরকে দাওয়াত ও উপদেশ দিয়ে চলছিলেন। এ জন্য ফজর, দশটি রাত, জোড়-বেজোড় এবং বিদায়ী রাতের কসম

খেয়ে বলা হয়েছে, এই বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য এই চারটি জিনিস যথেষ্ট নয় কি? এ জন্য কোন বুদ্ধি-বিবেকবান ব্যক্তির সামনে কি আর কোন জিনিস পেশ করার প্রয়োজন আছে?

এই কসমগুলোর এই পরিবেশ-পরিস্থিতি নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর পরবর্তী আলোচনা এগুলোর যে অর্থ নির্দেশ করে আমাদের অপরিহার্যভাবে সেই অর্থই গ্রহণ করতে হবে। প্রথমে বলা হয়েছে "ফজরের কসম"। ফজর বলা হয় প্রভাত হয়ে যাওয়াকে। অর্থাৎ যখন রাতের অন্ধকার ভেদ করে দিনের প্রথম আলোক রশ্মি পূর্বদিগন্তে একটি সাদা রেখার মতো আত্মপ্রকাশ করে। তারপর বলা হয়েছে "দশটি রাতের কসম।" ধারাবাহিক বর্ণনাগুলো সামনে রাখলে জানা যায়, এর অর্থ হচ্ছে মাসের তিরিশটি রাতের প্রত্যেক দশটি রাত। প্রথম দশটি রাতের চাঁদ সরু কাস্তের আকারে শুরু হয়ে প্রতি রাতে বাড়তে থাকে। এভাবে তার অর্ধেকেরও বেশী এলাকা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় দশটি রাতে চাঁদের আলোয় রাতের বৃহত্তম অংশ আলোকিত থাকে। শেষ দশটি রাতে চাঁদ আস্তে আস্তে একেবারে ছোট হয়ে যেতে থাকে এবং রাতের বেশীর ভাগ অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকে। এমনকি মাসের শেষ রাতটি হয় পুরোপুরি অন্ধকার। এরপর বলা হয়েছে, "জোড় ও বেজোড়ের কসম।" জোড় বলা হয় এমন সংখ্যাকে যাকে দু'টি সমান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ২, ৪, ৬, ৮, ১০। অন্যদিকে বেজোড় বলা হয় এমন সংখ্যাকে যাকে সমান দু'ভাগে ভাগ করা যায় না। যেমন ১, ৩, ৫, ৭, ৯। সাধারণভাবে দেখলে এর অর্থ হতে পারে বিশ্ব-জাহানের সমস্ত জিনিস। কারণ প্রতিটি জিনিস হয় জোড়, নয় বেজোড়। কিন্তু যেহেতু এখানে দিন ও রাতের কথা আলোচনা হচ্ছে তাই বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কের প্রেক্ষিতে এখানে জোড় ও বেজোড় মানে হচ্ছে, দিন-রাত্রির পরিবর্তন। অর্থাৎ মাসের তারিখ এক থেকে দুই এবং দুই থেকে তিন হয়ে যায়। আর প্রত্যেকটি পরিবর্তন একটি নতুন অবস্থার সৃষ্টি করে। সবশেষে বলা হয়েছে, "রাতের কসম যখন তা বিদায় নিতে থাকে।" অর্থাৎ সূর্য ডোবার পর থেকে পৃথিবীর বুকে যে অন্ধকার ছেয়ে ছিল তার অবসান ঘটেছে এবং আলোকময় উষার উদয় হতে যাচ্ছে।

এখন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাস্তি ও পুরস্কারের যে খবর দিচ্ছিলেন তার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যে চারটি জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে তাদের ওপর একবার সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিপাত করুন। এসব জিনিস এই সত্যটি প্রমাণ করছে যে, একজন মহাশক্তিশালী স্রষ্টা এই বিশ্ব-জাহানের ওপর রাজত্ব করছেন। তিনি যে কাজটিই করছেন, তা উদ্দেশ্যহীন, লক্ষহীন, অর্থহীন নয় এবং তার পেছনে কোন বিজ্ঞতাপূর্ণ পরিকল্পনা নেই একথা বলা যাবে না। বরং তাঁর প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে একটি স্পষ্ট বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা সক্রিয় রয়েছে। তাঁর পৃথিবীতে কখনো এমন দেখা যাবে না যে, এখনই রাত আবার এখনই হঠাৎ সূর্য একেবারে মাথার ওপর উঠেছে। অথবা একদিন চাঁদ উঠলো কাস্তের মতো সরু হয়ে এবং তারপর দিন একেবারে গোল থালার মতো পূর্ণচন্দ্র আকাশে শোভা পেতে লাগলো। অথবা রাত এলো কিন্তু তা আর শেষই হচ্ছে না, স্থায়ীভাবে ঠায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো। অথবা আদতে দিন রাত্রির পরিবর্তনের কোন স্থায়ী ব্যবস্থাই নেই। যার ফলে তারিখের হিসাব রাখা যায় না। আজ কোন্ মাসের কয় তারিখ, কোন তারিখে কোন্ কাজটি শুরু করা হয়েছিল এবং কবে খতম হবে,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝٦ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝٧ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ
مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝٨ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝٩ وَفِرْعَوْنَ
ذِي الْأَوْتَادِ ۝١٠ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝١١ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝١٢
فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝١٣ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝١٤

তুমি[২] কি দেখনি তোমার রব সুউচ্চ স্তম্ভের অধিকারী আদে-ইরামের[৩] সাথে কি আচরণ করেছেন, যাদের মতো কোন জাতি দুনিয়ার কোন দেশে সৃষ্টি করা হয়নি?[৪] আর সামূদের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল?[৫] আর কীলকধারী ফেরাউনের[৬] সাথে? এরা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বড়ই সীমালংঘন করেছিল এবং সেখানে বহু বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। অবশেষে তোমার রব তাদের ওপর আযাবের কশাঘাত করলেন। আসলে তোমার রব ওঁৎ পেতে আছেন।[৭]

গ্রীষ্মকাল কবে থেকে শুরু হচ্ছে এবং বর্ষাকাল ও শীতকাল কবে আসবে—এসব জানা সম্ভব হয় না। বিশ্ব-জাহানের অন্যান্য অসংখ্য জিনিস বাদ দিয়ে মানুষ যদি শুধুমাত্র দিন রাত্রির এই যথা নিয়মে যাওয়া আসার বিষয়টি মনোযোগ সহকারে দেখে এবং এ ব্যাপারটি নিয়ে একটু মাথা ঘামায়, তাহলে এক সর্বশক্তিমান সত্তা যে এই বিরাট নিয়ম-শৃংখলা ও আইনের রাজত্ব কায়েম করেছেন এবং এই নিয়ম-শৃংখলার সাথে এখানে সৃষ্টজীবের অসংখ্য স্বার্থ ও কর্মপ্রবাহ জড়িত তার সাক্ষ-প্রমাণ সে এর মধ্যেই পেয়ে যাবে। এখন এই ধরনের জ্ঞানবান ও বিজ্ঞানময় এবং মহাশক্তিধর স্রষ্টার আখেরাতে শাস্তি ও পুরস্কার দেবার বিষয়টি যদি দুনিয়ার কোন মানুষ অস্বীকার করে তাহলে সে দু'টি নির্বুদ্ধিতার মধ্য থেকে কোন একটিতে অবশ্যি লিপ্ত। হয় সে তাঁর ক্ষমতা অস্বীকার করে এবং মনে করে তিনি এই অকল্পনীয় নিয়ম-শৃংখলা সহকারে এই বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন কিন্তু মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করে তাকে শাস্তি ও পুরস্কার দান করার ক্ষমতা তাঁর নেই অথবা সে তাঁর জ্ঞানবত্তা ও বিজ্ঞানময়তা অস্বীকার করে এবং তাঁর সম্পর্কে একথা মনে করে নিয়েছে যে, তিনি মানুষকে দুনিয়ায় বুদ্ধি-বিবেক ও ক্ষমতা-ইখতিয়ার দিয়ে সৃষ্টি করেছেন ঠিকই কিন্তু তিনি কখনো তার কাছ থেকে এই বুদ্ধি-বিবেক ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারকে সে কিভাবে কাজে লাগিয়েছে তার হিসেব নেবেন না। আর তিনি ভালো কাজের পুরস্কার দেবেন না এবং খারাপ কাজের শাস্তিও দেবেন না। এই দু'টি কথার কোন একটিকেও যে ব্যক্তি মেনে নেবে সে একজন প্রথম শ্রেণীর নির্বোধ।

২. দিন-রাত্রির আবর্তন ব্যবস্থা থেকে শাস্তি ও পুরস্কার বিধানের প্রমাণ পেশ করার পর এখন তার নিশ্চিত সত্য হবার ব্যাপারে মানুষের ইতিহাস থেকে প্রমাণ পেশ করা

হচ্ছে। ইতিহাসের কয়েকটি পরিচিত জাতির কর্মপদ্ধতি ও তাদের পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে একথা বলার উদ্দেশ্যে যে, এই বিশ্ব-জাহান কোন অন্ধ ও বধির প্রাকৃতিক আইনের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে না। বরং এক বিজ্ঞানময় আল্লাহ এই সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন। আর এই আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের মধ্যে তোমরা যাকে প্রাকৃতিক আইন মনে করো কেবলমাত্র সেই আইনটিই সক্রিয় নেই বরং এই সাথে একটি নৈতিক আইনও এখানে সক্রিয় রয়েছে, যার অনিবার্য দাবী হচ্ছে, কাজের প্রতিফল এবং শাস্তি ও পুরস্কার দান। এই আইন যে সক্রিয় রয়েছে তার চিহ্ন এই দুনিয়াতেই বার বার প্রকাশ হতে থেকেছে এবং তা থেকে বুদ্ধি-বিবেকবান মানুষ বিশ্ব-জাহানের শাসন কর্তৃত্বের প্রকৃতি ও স্বভাব সুস্পষ্টভাবে জানতে পেরেছে। এখানে যেসব জাতি আখেরাতের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে এবং আল্লাহর শাস্তি ও পুরস্কারের ভয় না করেই নিজেদের জীবনের ব্যবস্থা পরিচালনা করেছে তারা পরিণামে বিপর্যস্ত হয়েছে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী রূপে আত্ম-প্রকাশ করেছে। আর যে জাতিই এ পথে চলেছে বিশ্ব-জাহানের রব তার ওপর শেষ পর্যন্ত আযাবের চাবুক বর্ষণ করেছেন। মানুষের ইতিহাসের এই ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা দু'টি কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে ঃ এক, আখেরাত অস্বীকার করার কারণে প্রত্যেক জাতি বিপথে পরিচালিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তা তাকে ধ্বংসের আবর্তে নিক্ষেপ করেছে। কাজেই আখেরাত একটি যথার্থ সত্য। প্রত্যেক সত্যের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার যে ভয়াবহ পরিণতি হয় এর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার ফলও তাই হয়। দুই, কর্মফল কোন এক সময় পূর্ণ মাত্রায়ও দেয়া হবে। কারণ বিপর্যয় ও বিকৃতির শেষ পর্যায়ে এসে আযাবের চাবুক যাদের ওপর বর্ষিত হয়েছে তাদের পূর্বে শত শত বছর পর্যন্ত বহু লোক এই বিপর্যয়ের বীজ বপন করে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিল এবং তাদের ওপর কোন আযাব আসেনি। আল্লাহর ইনসাফের দাবী এই যে, কোন এক সময় তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক এবং তারা কৃতকর্মের ফল ভোগ করুক। (কুরআন মজীদে আখেরাতের ব্যাপারে এই ঐতিহাসিক ও নৈতিক যুক্তির বিশ্লেষণ বিভিন্ন জায়গায় করা হয়েছে এবং সবজায়গায় আমি এর ব্যাখ্যা করেছি। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত জায়গাগুলো দেখুন ঃ তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আরাফ ৫-৬ টীকা, ইউনুস ১২, হূদ ৫৭, ১০৫, ১১৫ টীকা, ইবরাহীম ৯ টীকা, আন নহল ৬৬ ও ৮৬ টীকা, আররূম ৮ টীকা, সাবা ২৫ টীকা, সাদ ২৯ ও ৩০ টীকা, আল মু'মিন ৮০ টীকা, আদ দুখান ৩৩ ও ৩৪ টীকা; আল জাসিয়াহ-২৭ ও ২৮ টীকা, কাফ ১৭ টীকা এবং আয যারিয়াত ২১ টীকা।)

৩. 'আদে ইরাম' বলতে আদ জাতির সেই প্রাচীন ধারাটির কথা বুঝানো হয়েছে যাকে কুরআন মজীদ ও আরবের ইতিহাসে 'আদে উলা' (প্রথম) বলা হয়েছে। সূরা আন নাজমে বলা হয়েছে ঃ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ "আর তিনি প্রাচীন আদ জাতিকে ধ্বংস করেছেন।" (৫০ আয়াত) অর্থাৎ সেই আদ জাতিকে যাদের কাছে হযরত হূদ আলাইহিস সালামকে পাঠানো হয়েছিল এবং যাদের ওপর আযাব নাযিল হয়েছিল। অন্যদিকে এই জাতির যেসব লোক আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার পর নিজেদের জাতি সত্তার সমৃদ্ধি সাধন করেছিল, আরবের ইতিহাসে তাদেরকে 'আদে উখ্‌রা' (দ্বিতীয় আদ) নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রাচীন আদ জাতিকে 'আদে ইরাম' বলার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা সিরিয় বংশজাত আদদের সেই বংশধারার সাথে সম্পর্কিত যাদের উদ্ভব হয়েছিল নূহ আলাইহিস সালামের নাতি ও সামের ছেলে ইরাম থেকে। ইতিহাসে আদদের এই শাখার আরো

কয়েকটি উপশাখা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। সামূদ এদের অন্যতম। কুরআনে এই জাতিটির উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে আরামিয়ান (Arameana) জাতি। এরা প্রথমে সিরিয়ার উত্তর এলাকায় বসবাস করতো। এদের ভাষা আরামী (Aramic)। সিরিয়ার ভাষাগুলোর মধ্যে এই ভাষাটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

আদের জন্য 'যাতুল ইমাদ' (সুউচ্চ স্তম্ভের অধিকারী) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ তারা বড় বড় উঁচু উঁচু ইমারত তৈরি করতো। দুনিয়ায় তারাই সর্বপ্রথম উঁচু উঁচু স্তম্ভের ওপর ইমারত নির্মাণ করার কাজ শুরু করে। কুরআন মজীদের অন্য জায়গায় তাদের এই বৈশিষ্টকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ হযরত হূদ (আ) তাদেরকে বলেন,

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ۙ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ۚ

"তোমাদের এ কেমন অবস্থা, প্রত্যেক উঁচু জায়গায় অনর্থক একটি স্মৃতিগৃহ তৈরি করছো এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছো, যেন তোমরা চিরকাল এখানে থাকবে।" (আশ শু'আরা, ১২৮-১২৯)

৪. অর্থাৎ তারা সমকালীন জাতিদের মধ্যে ছিল একটি তুলনাবিহীন জাতি। শক্তি শৌর্য-বীর্য, গৌরব ও আড়ম্বরের দিক দিয়ে সে যুগে সারা দুনিয়ায় কোন জাতি তাদের সমকক্ষ ছিল না। কুরআনের অন্যান্য স্থানে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْطَةً "দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে তোমাদের অবয়বকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ করেছেন। (আল আরাফ, ৬৯)

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً –

"আর তাদের ব্যাপারে বলতে গেলে বলতে হয়, তারা কোন অধিকার ছাড়াই পৃথিবীর বুকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করেছে। তারা বলেছে ঃ কে আছে আমাদের চাইতে বেশী শক্তিশালী?" (হা-মীম আস্ সাজ্‌দাহ, ১৫)

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ "আর তোমরা যখন কারোর ওপর হাত উঠিয়েছো প্রবল পরাক্রান্ত হয়েই উঠিয়েছো।" (আশ শু'আরা, ১৩০)

৫. উপত্যকা বলতে 'আলকুরা' উপত্যকা বুঝানো হয়েছে। সামূদ জাতির লোকেরা সেখানে পাথর কেটে কেটে তার মধ্যে গৃহ নির্মাণ করেছিল। সম্ভবত ইতিহাসে তারাই প্রথম জাতি হিসেবে চিহ্নিত যারা পাহাড়ের মধ্যে এভাবে ইমারত নির্মাণের রীতি প্রচলন করেছিল। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আরাফ ৫৭-৫৯ টীকা, আল হিজ্‌র ৪৫ টীকা এবং আশ্ শু'আরা ৯৫-৯৯ টীকা)

৬. ফেরাউনের জন্য 'যুল আউতাদ' (কীলকধারী) শব্দ এর আগে সূরা সাদের ১২ আয়াতেও ব্যবহার করা হয়েছে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। তার সেনাবাহিনীকে কীলকের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং সেই অর্থে কীলকধারী মানে সেনাবাহিনীর

فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي
أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿١٦﴾

কিন্তু[৮] মানুষের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তার রব যখন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং তাকে সম্মান ও নিয়ামত দান করেন তখন সে বলে, আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। আবার যখন তিনি তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং তার রিযিক তার জন্য সংকীর্ণ করে দেন তখন সে বলে, আমার রব আমাকে হেয় করেছেন।[৯]

অধিকারী। কারণ তাদেরই বদৌলতে তার রাজত্ব এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যেমন কীলকের সাহায্যে তাঁবু মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এর অর্থ সেনা দলের সংখ্যাধিক্যও হতে পারে। এক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, তার সেনাদল যেখানে গিয়ে তাঁবু গাঁড়তো সেখানেই চারদিকে শুধু তাঁবুর কীলকই পোঁতা দেখা যেতো। আবার এর অর্থ সেই কীলকও হতে পারে যা মানুষের শরীরে গেঁড়ে দিয়ে সে তাদেরকে শাস্তি দিতো। এও হতে পারে, মিসরের পিরামিডগুলোকে কীলকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারণ সেগুলো ফেরাউনদের পরাক্রম ও শান-শওকতের নিদর্শন হিসেবে হাজার হাজার বছর থেকে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

৭. জালেম ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কার্যকলাপের প্রতি নজর রাখার জন্য ওঁৎ পেতে থাকা প্রবাদটির ব্যবহার করা হয়েছে রূপক হিসেবে। কোন ব্যক্তির কারো অপেক্ষায় কোন গোপন স্থানে এই উদ্দেশ্যে লুকিয়ে বসে থাকা যে, তার আয়ত্বের মধ্যে আসার সাথে সাথেই সে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, একে বলা হয় ওঁৎপেতে থাকা। যার জন্য লুকিয়ে বসে থাকা হয় সে জানতে পারে না যে, তার ওপর আক্রমণ করার জন্য কেউ কোথাও লুকিয়ে বসে আছে। সে নিশ্চিন্তে চারদিক সম্পর্কে অসতর্ক হয়ে ঐ স্থান অতিক্রম করতে থাকে তখন অকস্মাৎ সে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। দুনিয়ায় যেসব জালেম বিপর্যয়ের তুফান সৃষ্টি করে থাকে আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের অবস্থাও অনুরূপ হবে। আল্লাহ যে একজন আছেন এবং তিনি তার সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ রাখছেন, এ অনুভূতিই তার থাকে না। সে একেবারে নির্ভয়ে দিনের পর দিন বেশী বেশী শয়তানী কাজ করে যেতে থাকে। তারপর একদিন যখন সে এক সীমান্তে পৌঁছে যায় যেখান থেকে আল্লাহ তাকে আর এগিয়ে যেতে দিতে চান না, তখন তার ওপর হঠাৎ আল্লাহর আযাবের চাবুক বর্ষিত হয়।

৮. এখন লোকদের সাধারণ নৈতিক অবস্থার সমালোচনা করে বলা হচ্ছে, যেসব লোক দুনিয়ার জীবনে এই দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি অবলম্বন করেছে তাদের কার্যাবলীর হিসেব কখনো না নেয়ার কি কারণ থাকতে পারে? দুনিয়ায় এসব কাজ-কারবার করে যখন মানুষ বিদায় নেবে তখন তার কাজের জন্য সে কোন শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করবে না একে বুদ্ধি ও নৈতিক বৃত্তির দাবী বলে কেমন করে মেনে নেয়া যেতে পারে।

৯. অর্থাৎ এটি হচ্ছে মানুষের বস্তুবাদী জীবন দর্শন। এই দুনিয়ার ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, কর্তৃত্বকেই সে সবকিছু মনে করে। এগুলো পেলে সে আনন্দে উল্লসিত হয় এবং বলে

كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿١٨﴾
وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾ كَلَّا
إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾
وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ
الذِّكْرَىٰ ﴿٢٣﴾ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿٢٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ
عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴿٢٥﴾ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴿٢٦﴾

কখনই নয়,[১০] বরং তোমরা এতিমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার কর না[১১] এবং মিসকীনকে খাওয়াবার জন্য পরস্পরকে উৎসাহিত কর না।[১২] তোমরা মীরাসের সব ধন-সম্পদ সম্পূর্ণরূপে খেয়ে ফেলো[১৩] এবং ধন-সম্পদের প্রেমে তোমরা মারাত্মকভাবে বাঁধা পড়েছ।[১৪] কখনই নয়,[১৫] পৃথিবীকে যখন চূর্ণবিচূর্ণ করে বালুকাময় করে দেয়া হবে এবং তোমার রব এমন অবস্থায় দেখা দেবেন।[১৬] যখন ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। সেদিন জাহান্নামকে সামনে আনা হবে। সেদিন মানুষ বুঝবে কিন্তু তার বুঝতে পারায় কী লাভ?[১৭] সে বলবে, হায়, যদি আমি নিজের জীবনের জন্য কিছু আগাম ব্যবস্থা করতাম! সেদিন আল্লাহ যে শাস্তি দেবেন তেমন শাস্তি কেউ দিতে পারবে না। এবং আল্লাহ যেমন বাঁধবেন আর কেউ তেমন বাঁধতে পারবে না।

আল্লাহ আমাকে মর্যাদা দান করেছেন। আবার না পেলে বলে, আল্লাহ আমাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন। অর্থাৎ ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-কর্তৃত্ব পাওয়া-নাপাওয়াই হচ্ছে তার কাছে মর্যাদা ও লাঞ্ছনার মানদণ্ড। অথচ প্রকৃত ব্যাপারটিই সে বোঝে না। আল্লাহ দুনিয়ায় যাকেই যা কিছুই দিয়েছেন পরীক্ষার জন্যই দিয়েছেন। ধন ও শক্তি দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য। এগুলো পেয়ে মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না অকৃতজ্ঞ হয়, তা তিনি দেখতে চান। দারিদ্র ও অভাব দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য। ধৈর্য ও পরিতুষ্টি সহকারে মানুষ আল্লাহর ইচ্ছার ওপর সন্তুষ্ট থাকে এবং বৈধ সীমার মধ্যে অবস্থান করে নিজের সমস্যা ও সংকটের মোকাবিলা করে, না সততা, বিশ্বস্ততা ও নৈতিকতার সব বাঁধন ছিন্ন করে আল্লাহকেই গালমন্দ দিতে থাকে, তা আল্লাহ অবশ্যই দেখতে চান।

১০. অর্থাৎ এটি কখনই মর্যাদা ও লাঞ্ছনার মানদণ্ড নয়। তোমরা মস্তবড় ভুল করছো। একে সৎ চারিত্রিক মনোবৃত্তি ও অসৎ চারিত্রিক মনোবৃত্তির পরিবর্তে তোমরা মর্যাদা ও লাঞ্ছনার মানদণ্ড বানিয়ে রেখেছো।

১১. অর্থাৎ তার বাপ জীবিত থাকাকালে তার সাথে তোমরা এক ধরনের ব্যবহার করো। আর তার বাপ মারা যাবার সাথে সাথেই প্রতিবেশী ও দূরের আত্মীয়দের তো কথাই নেই, চাচা, মামা এমনকি বড় ভাই পর্যন্ত তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

১২. অর্থাৎ তোমাদের সমাজে গরীবদের আহার করাবার কোন রেওয়াজই নেই। কোন ব্যক্তি নিজে অগ্রসর হয়ে কোন অভুক্তকে আহার করাবার উদ্যোগ নেয় না। অথবা ক্ষুধার্তদের ক্ষুধা নিবারণ করার কোন চিন্তাই তোমাদের মনে আসে না এবং এর ব্যবস্থা করার জন্য তোমরা পরস্পরকে উৎসাহিতও করো না।

১৩. আরবে মেয়েদের ও শিশুদের এমনিতেই মীরাস থেকে বঞ্চিত রাখা হতো। এ ব্যাপারে লোকেরা যে মত পোষণ করতো তা ছিল এই যে, মীরাস লাভ করার অধিকার একমাত্র এমন সব পুরুষের আছে যারা লড়াই করার ও পরিবারের লোকদের হেফাজত করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা রাখে। এছাড়াও মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যে ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হতো সে নিশ্চিন্তে সমস্ত মীরাস নিজের একার দখলে নিয়ে নিতো এবং যারা নিজেদের অংশ হাসিল করার ক্ষমতা রাখতো না তাদের সবারটা গ্রাস করে ফেলতো। অধিকার ও কর্তব্যের কোন গুরুত্বই তাদের কাছে ছিল না। অধিকারী নিজের অধিকার হাসিল করতে পারুক বা না পারুক ঈমানদারীর সাথে নিজের কর্তব্য মনে করে তাকে তার অধিকার প্রদান করার কথা তারা চিন্তাই করতো না।

১৪. অর্থাৎ বৈধ-অবৈধ ও হালাল-হারামের কোন পার্থক্যই তোমাদের কাছে নেই। যে কোন পদ্ধতিতে সম্পদ অর্জন করতে তোমরা মোটেই ইতস্তত করো না। যত বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদই তোমরা লাভ করো না কেন তোমাদের লোভের ক্ষুধা মেটে না।

১৫. অর্থাৎ তোমাদের চিন্তা ভুল। তোমরা দুনিয়ায় যত দিন জীবন যাপন করবে, এসব কিছুই করতে থাকবে এবং এজন্য তোমাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না, একথা ঠিক নয়। যে শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয়টি অস্বীকার করে তোমরা এই জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করেছো সেটি কোন অসম্ভব ও কাল্পনিক ব্যাপার নয়। বরং সে বিষয়টি অবশ্যি সংঘটিত হবে। সামনের দিকে সেটি কখন সংঘটিত হবে সে সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬. মূলে বলা হয়েছে جَآءَ رَبُّكَ এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে, "তোমার রব আসবেন।" তবে আল্লাহর জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই একে রূপক অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। এর উদ্দেশ্য এমনি ধরনের একটি ধারণা দেয়া যে, সে সময় আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব, শাসন ও প্রতাপের নিদর্শনসমূহ পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে। দুনিয়ায় কোন বাদশাহর সমগ্র সেনাদল এবং তার মন্ত্রণাপরিষদ ও সভাসদদের আগমনে ঠিক ততটা প্রভাব ও প্রতাপ সৃষ্টি হয় না যতটা বাদশাহর নিজের দরবারে আগমনে সৃষ্টি হয়। এই বিষয়টিই এখানে বুঝানো হয়েছে।

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾
فَٱدْخُلِى فِى عِبَٰدِى ﴿٢٩﴾ وَٱدْخُلِى جَنَّتِى ﴿٣٠﴾

(অন্যদিকে বলা হবে) হে প্রশান্ত আত্মা![১৮] চলো তোমার রবের দিকে,[১৯] এমন অবস্থায় যে তুমি (নিজের শুভ পরিণতিতে) সন্তুষ্ট (এবং তোমার রবের) প্রিয়পাত্র। শামিল হয়ে যাও আমার (নেক) বান্দাদের মধ্যে এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।

১৭. মূলে বলা হয়েছে يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, সেদিন মানুষ দুনিয়ায় যা কিছু করে এসেছে তা স্মরণ করবে এবং সেজন্য লজ্জিত হবে। কিন্তু তখন স্মরণ করায় এবং লজ্জিত হওয়ায় কোন লাভ হবে না। দুই, সেদিন মানুষ সচেতন হবে। সে উপদেশ গ্রহণ করবে। সে বুঝতে পারবে, নবীগণ তাকে যা কিছু বলেছিলেন তাই ছিল সঠিক এবং তাদের কথা না মেনে সে বোকামি করেছে। কিন্তু সে সময় সচেতন হওয়ায়, উপদেশ গ্রহণ করায় এবং নিজের ভুল বুঝতে পারায় কী লাভ?

১৮. 'প্রশান্ত আত্মা' বলে এমন মানুষকে বুঝানো হয়েছে যে, কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় ছাড়াই পূর্ণ নিশ্চিন্ততা সহকারে ঠাণ্ডা মাথায় এক ও লা-শরীক আল্লাহকে নিজের রব এবং নবীগণ যে সত্য দীন এনেছিলেন তাকে নিজের দীন ও জীবন বিধান হিসেবে গণ্য করেছে। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছ থেকে যে বিশ্বাস ও বিধানই পাওয়া গেছে তাকে সে পুরোপুরি সত্য বলে মেনে নিয়েছে। আল্লাহর দীন যে জিনিসটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে তাকে সে অনিচ্ছা সত্ত্বে নয় বরং এই বিশ্বাস সহকারে বর্জন করেছে যে, সত্যিই তা খারাপ। সত্য-প্রীতির পথে যে কোন ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সে নির্দ্বিধায় তা করেছে। এই পথে যেসব সংকট, সমস্যা, কষ্ট ও বিপদের মুখোমুখি হতে হয়েছে হাসি মুখে সেগুলো বরদাশ্‌ত করেছে। অন্যায় পথে চলে লোকদের দুনিয়ায় নানান ধরনের স্বার্থ, ঐশ্বর্য ও সুখ-সম্ভার লাভ করার যেসব দৃশ্য সে দেখছে তা থেকে বঞ্চিত থাকার জন্য তার নিজের মধ্যে কোন ক্ষোভ বা আক্ষেপ জাগেনি। বরং সত্য দীন অনুসরণ করার ফলে সে যে এই সমস্ত আবর্জনা থেকে মুক্ত থেকেছে, এজন্য সে নিজের মধ্যে পূর্ণ নিশ্চিন্ততা অনুভব করেছে। কুরআনের অন্যত্র এই অবস্থাটিকে 'শারহে সদর' বা হৃদয় উন্মুক্ত করে দেয়া অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। (আল আন'আম, ১২৫)

১৯. একথা তাকে মৃত্যুকালেও বলা হবে, যখন কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে যেতে থাকবে সে সময়ও বলা হবে এবং আল্লাহর আদালতে পেশ করার সময়ও তাকে একথা বলা হবে। প্রতিটি পর্যায়ে তাকে এই মর্মে নিশ্চয়তা দান করা হবে যে, সে আল্লাহর রহমতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আল বালাদ

৯০

নামকরণ

প্রথম আয়াত لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ এর আল বালাদ শব্দটি থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এই সূরার বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী মক্কা মু'আয্যমার প্রথম যুগের সূরাগুলোর মতোই। তবে এর মধ্যে একটি ইংগিত পাওয়া যায়, যা থেকে জানা যায়, এই সূরাটি ঠিক এমন এক সময় নাযিল হয়েছিল যখন মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগেছিল এবং তাঁর ওপর সব রকমের জুলুম নিপীড়ন চালানো নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

একটি অনেক বড় বিষয়বস্তুকে এই সূরায় মাত্র কয়েকটি ছোট ছোট বাক্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। একটি পূর্ণ জীবন দর্শন, যা বর্ণনার জন্য একটি বিরাট গ্রন্থের কলেবরও যথেষ্ট বিবেচিত হতো না তাকে এই ছোট্ট সূরাটিতে মাত্র কয়েকটি ছোট ছোট বাক্যে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়েছে। এটি কুরআনের অলৌকিক বর্ণনা ও প্রকাশ পদ্ধতির পূর্ণতার প্রমান। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে, দুনিয়ায় মানুষের এবং মানুষের জন্য দুনিয়ার সঠিক অবস্থান, মর্যাদা ও ভূমিকা বুঝিয়ে দেয়া। মানুষকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, আল্লাহ মানুষের জন্য সৌভাগ্যের ও দুর্ভাগ্যের উভয় পথই খুলে রেখেছেন, সেগুলো দেখার ও সেগুলোর ওপর দিয়ে চলার যাবতীয় উপকরণও তাদেরকে সরবরাহ করেছেন। এখন মানুষ সৌভাগ্যের পথে চলে শুভ পরিণতি লাভ করবে অথবা দুর্ভাগ্যের পথে চলে অশুভ পরিণতির মুখোমুখি হবে, এটি তার নিজের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করে।

প্রথমে মক্কা শহরকে, এর মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেসব বিপদের সম্মুখীন হতে হয় সেগুলোকে এবং সমগ্র মানব জাতির অবস্থাকে এই সত্যটির সপক্ষে এই মর্মে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে যে, এই দুনিয়াটা মানুষের জন্য কোন আরাম আয়েশের জায়গা নয়। এখানে ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে আনন্দ উল্লাস করার জন্য তাকে পয়দা করা হয়নি। বরং এখানে কষ্টের মধ্যেই তার জন্ম হয়েছে। এই বিষয়বস্তুটিকে সূরা আন নাজ্‌মের لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰى (মানুষ যতটুকু প্রচেষ্টা চালাবে ততটুকুর ফলেরই সে অধিকারী হবে) আয়াতটির সাথে মিলিয়ে দেখলে একথা একেবারে

সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, দুনিয়ার এই কর্মচাঞ্চল্যে মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার কর্মতৎপরতা, প্রচেষ্টা, পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতার ওপর।

এরপর মানুষই যে এখানে সবকিছু এবং তার ওপর এমন কোন উচ্চতর ক্ষমতা নেই যে তার কাজের তত্ত্বাবধান করবে এবং তার কাজের যথাযথ হিসেব নেবে, তার এই ভুল ধারণা দূর করে দেয়া হয়েছে।

তারপর মানুষের বহুতর জাহেলী নৈতিক চিন্তাধারার মধ্য থেকে একটিকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করে দুনিয়ায় সে অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্বের যেসব ভুল মানদণ্ডের প্রচলন করে রেখেছে তা তুলে ধরা হয়েছে। যে ব্যক্তি নিজের বড়াই করার জন্য বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ ব্যয় করে সে নিজেও নিজের এই বিপুল ব্যয় বহরের জন্য গর্ব করে এবং লোকেরা তাকে বাহবা দেয়। অথচ যে সর্বশক্তিমান সত্তা তার কাজের তত্ত্বাবধান করছেন তিনি দেখতে চান, সে এই ধন-সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে এবং কিভাবে, কি উদ্দেশ্যে এবং কোন্ মনোভাব সহকারে এসব ব্যয় করছে।

এরপর মহান আল্লাহ বলছেন, আমি মানুষকে জ্ঞানের বিভিন্ন উপকরণ এবং চিন্তা ও উপলব্ধির যোগ্যতা দিয়ে তার সামনে ভালো ও মন্দ দু'টো পথই উন্মুক্ত করে দিয়েছি। একটি পথ মানুষকে নৈতিক অধপাতে নিয়ে যায়। এ পথে চলার জন্য কোন কষ্ট স্বীকার করতে হয় না। বরং তার প্রবৃত্তি সাধ মিটিয়ে দুনিয়ার সম্পদ উপভোগ করতে থাকে। দ্বিতীয় পথটি মানুষকে নৈতিক উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি দুর্গম গিরিপথের মতো। এ পথে চলতে গেলে মানুষকে নিজের প্রবৃত্তির ওপর জোর খাটাতে হয়। কিন্তু নিজের দুর্বলতার কারণে মানুষ এই গিরিপথে ওঠার পরিবর্তে গভীর খাদের মধ্যে গড়িয়ে পড়াই বেশী পছন্দ করে।

তারপর যে গিরিপথ অতিক্রম করে মানুষ ওপরের দিকে যেতে পারে সেটি কি তা আল্লাহ বলেছেন। তা হচ্ছে ঃ গর্ব ও অহংকার মূলক এবং লোক দেখানো ও প্রদর্শনী মূলক ব্যয়ের পথ পরিত্যাগ করে নিজের ধন-সম্পদ এতিম ও মিসকিনদের সাহায্যার্থে ব্যয় করতে হবে। আল্লাহর প্রতি ও তাঁর দীনের প্রতি ঈমান আনতে হবে আর ঈমানদারদের দলের অন্তরভুক্ত হয়ে এমন একটি সমাজ গঠনে অংশ গ্রহণ করতে হবে, যা ধৈর্য সহকারে সত্যপ্রীতির দাবী পূরণ এবং আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি করুণা প্রদর্শন করবে। এই পথে যারা চলে তারা পরিণামে আল্লাহর রহমতের অধিকারী হয়। বিপরীত পক্ষে অন্যপথ অবলম্বনকারীরা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। সেখান থেকে তাদের বের হবার সমস্ত পথই থাকবে বন্ধ।

আয়াত ২০ **সূরা আল বালাদ-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝١ وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝٢ وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ۝٣ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ۝٤ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ۝٥

না,[১] আমি কসম খাচ্ছি এই নগরের।[২] আর অবস্থা হচ্ছে এই যে (হে নবী!) তোমাকে এই নগরে হালাল করে নেয়া হয়েছে।[৩] কসম খাচ্ছি বাপের এবং তার ঔরসে যে সন্তান জন্ম নিয়েছে তার।[৪] আসলে আমি মানুষকে কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করেছি।[৫] সে কি মনে করে রেখেছে, তার ওপর কেউ জোর খাটাতে পারবে না?[৬]

১. ইতিপূর্বে সূরা কিয়ামাহর ১ টীকায় "না" বলে বক্তব্য শুরু করে তারপর কসম খেয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়টি আমি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছি। সেখানে আমি বলেছি, এভাবে বক্তব্য শুরু করার মানে হয়, লোকেরা কোন ভুল কথা বলছিল, তার প্রতিবাদ করে বলা হয়েছে, আসল কথা তা নয় যা তোমরা মনে করছো বরং আমি অমুক অমুক জিনিসের কসম খেয়ে বলছি আসল ব্যাপার হচ্ছে এই। এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, যে কথার প্রতিবাদে এই ভাষণটি নাযিল হয়েছে সেটি কি ছিল? এর জবাবে বলা যায়, পরবর্তী আলোচ্য বিষয়টি একথা প্রকাশ করছে। মক্কার কাফেররা বলছিল, আমরা যে ধরনের জীবনধারা অবলম্বন করেছি তাতে কোন দোষ নেই, কোন গলদ নেই। খাও-দাও ফূর্তি করো, তারপর একদিন সময় এলে টুপ করে মরে যাও, ব্যাস্, এই তো দুনিয়ার জীবন। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খামখা আমাদের এই জীবনধারাকে ত্রুটিপূর্ণ গণ্য করছেন এবং আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন, এসব ব্যাপারে আবার নাকি আমাদের একদিন জবাবদিহি করতে হবে এবং নিজেদের কাজের জন্য আমাদের শাস্তি ও পুরস্কার লাভ করতে হবে।

২. অর্থাৎ মক্কা নগরের। এখানে এই নগরের কসম কেন খাওয়া হচ্ছে সে কথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। মক্কাবাসীরা নিজেরাই তাদের নগরের পটভূমি জানতো। তারা জানতো, কিভাবে পানি ও বৃক্ষলতাহীন একটি ধূসর উপত্যকায় নির্জন পাহাড়ের

মাঝখানে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নিজের এক স্ত্রী ও একটি দুধের বাচ্চাকে এখানে এনে নিঃসর্গভাবে ছেড়ে গিয়েছিলেন। কিভাবে এখানে একটি ঘর তৈরি করে হজ্জের ঘোষণা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ বহু দূর-দূরান্তে এই ঘোষণা শোনারও কেউ ছিল না। তারপর কিভাবে একদিন এই নগরটি সমগ্র আরবের কেন্দ্রে পরিণত হলো এবং এমন একটি 'হারম'-সম্মানিত স্থান হিসেবে গণ্য হলো, যা শত শত বছর পর্যন্ত আরবের সরজমিনে, যেখানে আইন শৃংখলার কোন অস্তিত্বই ছিল না সেখানে এই নগরটি ছাড়া আর কোথাও শান্তি ও নিরাপত্তার কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেতো না।

৩. মূলে বলা হয়েছে اَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَ الْبَلَدِ । মুফাস্‌সিরগণ এর তিনটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। এক, তুমি এই শহরে 'মুকীম' অর্থাৎ মুসাফির নও। তোমার 'মুকীম' হবার কারণে এই শহরের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বেড়ে গেছে। দুই, যদিও এই শহরটি 'হারম' তবুও এমন এক সময় আসবে যখন কিছুক্ষণের জন্য এখানে যুদ্ধ করা তোমার জন্য হালাল হয়ে যাবে। তিন, এই শহরের বনের পশুদের পর্যন্ত মেরে ফেলা এবং গাছপালা পর্যন্ত কেটে ফেলা আরববাসীদের নিকট হারাম এবং সবাই এখানে নিরাপত্তা লাভ করে। কিন্তু অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে হে নবী, তোমার জন্য এখানে কোন নিরাপত্তা নেই। তোমাকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয়া এবং তোমাকে হত্যা করার উপায় উদ্ভাবন করা হালাল করে নেয়া হয়েছে। যদিও এখানে ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে তিনটি অর্থেরই অবকাশ রয়েছে তবুও পরবর্তী বিষয়বস্তু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, প্রথম অর্থ দু'টি এর সাথে কোন সম্পর্কই রাখে না এবং তৃতীয় অর্থটির সাথে এর মিল দেখা যায়।

৪. যেহেতু বাপ ও তার ঔরসে জন্ম গ্রহণকারী সন্তানদের ব্যাপারে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং সামনের দিকে মানুষের কথা বলা হয়েছে, তাই বাপ মানে আদম আলাইহিস সালামই হতে পারেন। আর তাঁর ঔরসে জন্ম গ্রহণকারী সন্তান বলতে দুনিয়ায় বর্তমানে যত মানুষ পাওয়া যায়, যত মানুষ অতীতে পাওয়া গেছে এবং ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে সবাইকে বুঝানো হয়েছে।

৫. ওপরে যে কথাটির জন্য কসম খাওয়া হয়েছে এটিই সেই কথা। মানুষকে কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করার মানে হচ্ছে এই যে, এই দুনিয়ায় আনন্দ উপভোগ করার ও আরামে শুয়ে শুয়ে সুখের বাঁশী বাজাবার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং তার জন্য এ দুনিয়া পরিশ্রম, মেহনত ও কষ্ট করার এবং কঠিন অবস্থার মোকাবেলা করার জায়গা। এই অবস্থা অতিক্রম না করে কোন মানুষ সামনে এগিয়ে যেতে পারে না। এই মক্কা শহর সাক্ষী, আল্লাহর কোন এক বান্দা এক সময় কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন বলেই আজ এই শহরটি আবাদ হয়েছে এবং আরবের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই শহরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা সাক্ষ দিচ্ছে, একটি আদর্শের খাতিরে তিনি নানা প্রকার বিপদের সম্মুখীন হচ্ছেন।

বন্য পশুদের পর্যন্ত এখানে নিরাপত্তা আছে কিন্তু তাঁর প্রাণের কোন নিরাপত্তা নেই। আর মায়ের গর্ভে এক বিন্দু শুক্র হিসেবে অবস্থান লাভের পর থেকে নিয়ে মৃত্যুকালে শেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগ করা পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষের জীবন এই মর্মে সাক্ষ দিচ্ছে যে, তাকে প্রতি পদে পদে কষ্ট, পরিশ্রম, মেহনত, বিপদ ও কঠিন অবস্থার বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হয়। যাকে তোমরা দুনিয়ায় সবচেয়ে লোভনীয় অবস্থায় দেখছো সেও যখন

يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۞ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۞
أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَاهُ
النَّجْدَيْنِ ۞ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۞
فَكُّ رَقَبَةٍ ۞ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۞ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۞
أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۞

সে বলে, আমি প্রচুর ধন-সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি।[৭] সে কি মনে করে কেউ তাকে দেখেনি?[৮] আমি কি তাকে দু'টি চোখ, একটি জিহবা ও দু'টি ঠোঁট দেইনি?[৯] আমি কি তাকে দু'টি সুস্পষ্ট পথ দেখাইনি?[১০] কিন্তু সে দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করার সাহস করেনি।[১১] তুমি কী জানো সেই দুর্গম গিরিপথটি কি? কোন গলাকে দাসত্বমুক্ত করা অথবা অনাহারের দিন কোন নিকটবর্তী এতিম বা ধূলি মলিন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো।[১২]

মায়ের পেটে অবস্থান করছিল তখন সর্বক্ষণ তার মরে যাওয়ার ভয় ছিল। সে মায়ের পেটেই মরে যেতে পারতো। অথবা গর্ভপাত হয়ে তার দফারফা হয়ে যেতে পারতো। প্রসবকালে তার মৃত্যু ও জীবনের মধ্যে মাত্র এক চুলের বেশী দূরত্ব ছিল না। জন্মলাভ করার পর সে এত বেশী অসহায় ছিল যে, দেখাশুনা করার কেউ না থাকলে সে একাকী পড়ে মরে যেতো। একটু হাঁটা চলার ক্ষমতা লাভ করার পর প্রতি পদে পদে আছাড় খেয়ে পড়তো। শৈশব থেকে যৌবন এবং তারপর বার্ধক্য পর্যন্ত তাকে এমন সব শারীরিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছে যে, এর মধ্য থেকে কোন একটি পরিবর্তনও যদি ভুল পথে হতো তাহলে তার জীবন বিপন্ন হতো। সে যদি বাদশাহ বা একনায়ক হয় তাহলে কোন্ সময় কোথাও তার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র না হয় এই ভয়ে সে এক মুহূর্ত নিশ্চিন্তে আরাম করতে পারে না। সে বিশ্ববিজয়ী হলেও তার সেনাপতিদের মধ্য থেকে কেউ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে বসে এই ভয়ে সে সর্বক্ষণ তটস্থ থাকে। সে নিজের যুগে কারুনের মতো ধনী হলেও কিভাবে নিজের ধন-সম্পদ আরো বাড়াবে এবং কিভাবে তা রক্ষা করবে, এই চিন্তায় সবসময় পেরেশান থাকে। মোটকথা কোন ব্যক্তিও নির্বিবাদে শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চন্ততার নিয়ামত লাভ করেনি। কারণ মানুষের জন্মই হয়েছে কষ্ট, পরিশ্রম, মেহনত ও কঠিন অবস্থার মধ্যে।

৬. অর্থাৎ এসব অবস্থার মধ্যে যে মানুষ ঘেরাও হয়ে আছে সে কি এই অহংকারে মত্ত হয়েছে যে, দুনিয়ায় সে যা ইচ্ছা করে যাবে, তাকে পাকড়াও করার ও তার মাথা নীচু করাবার মতো কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ নেই? অথচ আখেরাত আসার আগে এই

দুনিয়াতেই সে প্রতি মুহূর্তে দেখছে, তার তকদীরের ওপর অন্য একজনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাঁর সিদ্ধান্তের সামনে তার নিজের সমস্ত জারিজুরি, কলা-কৌশল পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। ভূমিকম্পের একটি ধাক্কা, ঘূর্ণিঝড়ের একটি আঘাত এবং নদী ও সাগরের একটি জলোচ্ছ্বাস তাকে একথা বলে দেবার জন্য যথেষ্ট যে, আল্লাহর শক্তির তুলনায় সে কতটুকু ক্ষমতা রাখে। একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা একজন সুস্থ সবল সক্ষম মানুষকে পংগু করে দিয়ে যায়। ভাগ্যের একটি পরিবর্তন একটি প্রবল পরাক্রান্ত বিপুল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিকে আকাশ থেকে পাতালে নিক্ষেপ করে। উন্নতির উচ্চতম শিখরে অবস্থানকারী জাতিদের ভাগ্য যখন পরিবর্তিত হয় তখন এই দুনিয়ায় যেখানে তাদের চোখে চোখ মেলাবার হিম্মত কারোর ছিল না সেখানে তারা লাঞ্ছিত ও পদদলিত হয়। এহেন মানুষের মাথায় কেমন করে একথা স্থান পেলো যে, তার ওপর কারোর জোর খাটবে না?

৭. اَنْفَقْتُ مَالاً لُّبَدًا "আমি প্রচুর ধন-সম্পদ খরচ করেছি বলা হয়নি। বরং বলা হয়ছে اَهْلَكْتُ مَالاً لُّبَدًا "আমি প্রচুর ধন-সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি। এই শব্দগুলোই প্রকাশ করে, বক্তা তার ধন-সম্পদের প্রাচুর্যে কী পরিমাণ গর্বিত। যে বিপুল পরিমাণ ধন সে খরচ করেছে নিজের সামগ্রিক সম্পদের তুলনায় তার কাছে তার পরিমাণ এত সামান্য ছিল যে, তা উড়িয়ে বা ফুঁকিয়ে দেবার কোন পরোয়াই সে করেনি। আর এই সম্পদ সে কোন্ কাজে উড়িয়েছে? কোন প্রকৃত নেকীর কাজে নয়, যেমন সামনের আয়াতগুলো থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। বরং এই সম্পদ সে উড়িয়েছে নিজের ধনাঢ্যতার প্রদর্শনী এবং নিজের অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্য। তোশামোদকারী কবিদেরকে সে বিপুলভাবে পুরস্কৃত করেছে। বিবাহ ও শোকের মজলিসে হাজার হাজার লোককে দাওয়াত দিয়ে আহার করিয়েছে। জুয়া খেলায় গো-হারা হেরে বিপুল পরিমাণ অর্থ খুইয়েছে। জুয়ায় জিতে শত শত উট জবাই করে ইয়ার বন্ধুদের ভূরি ভোজন করিয়াছে। মেলায় ধূমধাম করে গিয়েছে এবং অন্যান্য সরদারদের চাইতে অনেক বেশী জাঁকজমক ও আড়ম্বর দেখিয়েছে। উৎসবে অঢেল খাবার তৈরি করেছে এবং যে চায় সে এসে খেয়ে যেতে পারে বলে সব মানুষকে খাবার জন্য সাধারণ আহবান জানিয়েছে অথবা নিজের বাড়িতে প্রকাশ্য লংঘরখানা খুলে দিয়েছে, যাতে দূর-দূরান্তে একথা ছড়িয়ে পড়ে যে, অমুক ধনীর দানশীলতার তুলনা নেই। এসব এবং এই ধরনের আরো অনেক প্রদর্শনীমূলক ব্যয় বহর ছিল যেগুলোকে জাহেলী যুগে মানুষের দানশীলতা ও ঔদার্যের নিদর্শন এবং তার শ্রেষ্ঠত্বের নিশানী মনে করা হতো। এসবের জন্য তাদের প্রশংসার ডংকা বাজতো, তাদের প্রশংসায় কবিতা রচিত ও পঠিত হতো এবং তারা নিজেরাও এজন্য অন্যের মোকাবেলায় নিজেদের গৌরব করে বেড়াতো।

৮. অর্থাৎ এই গৌরবকারী কি দেখে না, ওপরে আল্লাহও একজন আছেন? তিনি দেখছেন সবকিছু। কোন্ পথে সে এ ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে, কোন্ কাজে ব্যয় করেছে এবং কি উদ্দেশ্যে, কোন্ নিয়তে ও স্বার্থে সে এসব কাজ করেছে তা তিনি দেখছেন। সে কি মনে করে, আল্লাহর ওখানে এই অমিতব্যয়িতা, খ্যাতিলাভের আকাংখা ও অহংকারের কোন দাম হবে? সে কি মনে করে, দুনিয়ায় মানুষ যেমন তার কাজেকর্মে প্রতারিত হয়েছে তেমনি আল্লাহও প্রতারিত হবেন?

৯. এর অর্থ হচ্ছে, আমি কি তাকে জ্ঞান ও বুদ্ধির উপকরণগুলো দেইনি? দু'টি চোখ মানে গরু ছাগলের চোখ নয়, মানুষের চোখ। যে চোখ মেলে তাকালে চারদিকে এমনসব নিশানী নজরে পড়বে, যা মানুষকে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দেবে এবং তাকে ভুল ও নির্ভুল এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝিয়ে দেবে। জিহবা ও ঠোঁট মানে নিছক কথা বলার যন্ত্র নয় বরং যে ব্যক্তি কথা বলে এবং ঐ যন্ত্রগুলোর পেছনে বসে যে ব্যক্তি চিন্তা যোগায় তারপর মনের কথা প্রকাশ করার জন্যে তার সাহায্য গ্রহণ করে।

১০. অর্থাৎ শুধুমাত্র বুদ্ধি ও চিন্তার শক্তি দান করে তাকে নিজের পথ নিজে খুঁজে নেবার জন্য ছেড়ে দেইনি। বরং তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। তার সামনে ভালো ও মন্দ এবং নেকী ও গোনাহের দু'টি পথ সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছি। ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তার মধ্য থেকে নিজ দায়িত্বে যে পথটি ইচ্ছা সে গ্রহণ করতে পারে। সূরা দাহ্‌রেও এই একই কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ "আমি মানুষকে একটি মিশ্রিত বীর্য থেকে পয়দা করেছি, যাতে তার পরীক্ষা নেয়া যায় এবং এ উদ্দেশ্যে আমি তাকে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি। আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, চাইলে সে শোকরকারী হতে পারে বা কুফরকারী।" (২-৩ আয়াত) আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আদ্‌দাহর ৩-৫ টীকা।

১১. মূল বাক্যটি হচ্ছে, فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ এখানে ইকতিহাম (اقتحام) মানে হচ্ছে, নিজেকে কোন কঠিন ও পরিশ্রম সাধ্য কাজে নিযুক্ত করা। আর পর্বতশৃংগে যাবার জন্য পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যে দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয় তাকে বলা হয় আকাবাহ (عقبه)। অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে, দু'টি পথ আমি তাকে দেখিয়েছি। একটি গেছে ওপরের দিকে। কিন্তু সেখানে যেতে হলে খুব কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয়। সে পথটি বড়ই দুর্গম। সে পথে যেতে হলে মানুষকে নিজের প্রবৃত্তি ও তার আকাংখা এবং শয়তানের প্ররোচনার সাথে লড়াই করে এগিয়ে যেতে হয়। আর দ্বিতীয় পথটি বড়ই সহজ। এটি খাদের মধ্যে নেমে গেছে। এই পথ দিয়ে নীচের দিকে নেমে যাবার জন্য কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। বরং এ জন্য শুধুমাত্র নিজের প্রবৃত্তির বাঁধনটা একটু আলগা করে দেয়াই যথেষ্ট। তারপর মানুষ আপনা আপনি গড়িয়ে যেতে থাকে। এখন এই যে ব্যক্তিকে আমি দু'টি পথই দেখিয়ে দিয়েছিলাম সে ঐ দু'টি পথের মধ্য থেকে নীচের দিকে নেমে যাবার পথটি গ্রহণ করে নিয়েছে এবং ওপরের দিকে যে পথটি গিয়েছে সেটি পরিত্যাগ করেছে।

১২. ওপরে তার অমিতব্যয়িতার কথা বলা হয়েছে। নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রদর্শনী ও অহংকার প্রকাশ করার জন্য সে অর্থের অপচয় করতো। তাই এখানে তার মোকাবেলায় এমন ব্যয় ও ব্যয়ক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে যা মানুষের নৈতিক অধপতন রোধ করে তাকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু এতে প্রবৃত্তির কোন সুখানুভব নেই। বরং এ জন্য মানুষকে প্রবৃত্তির ওপর জোর খাটিয়ে ত্যাগের মহড়া দিতে হয়। নিজেই কোন দাসকে দাসত্বমুক্ত করে সেই ব্যয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করা যায়। অথবা তাকে আর্থিক সাহায্য করা যেতে পারে। তার ফলে সে নিজের মুক্তিপণ আদায় করে মুক্ত হতে পারে। অথবা অর্থ সাহায্য করে কোন গরীবের গলাকে ঋণমুক্ত করা যেতে পারে। অথবা কোন অসচ্ছল ব্যক্তি যদি কোন অর্থদণ্ডের বোঝার তলায় চাপা পড়ে গিয়ে থাকে তাহলে তাকে তা থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে কোন নিকটবর্তী (অর্থাৎ আত্মীয় বা

প্রতিবেশী) এতিম এবং এমন কোন ধরনের অসহায় অভাবীকে আহার করিয়ে এই অর্থ ব্যয় করা যায় যাকে দারিদ্র ও উৎকট অর্থহীনতা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে এবং যাকে হাত ধরে তোলার কেউ নেই। এই ধরনের লোকদের সাহায্য করলে মানুষের খ্যাতির ডংকা বাজে না। এদেরকে খাওয়ালে কারো ধনাঢ্যতা ও বদান্যতার তেমন কোন চর্চা হয় না। বরং হাজার হাজার সচ্ছল ব্যক্তি ও ধনীদের জন্য শানদার জিয়াফতের ব্যবস্থা করে তার তুলনায় অনেক বেশী শোহরতের অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু নৈতিক উন্নতির পথটি এই দুর্গম গিরিপথটি অতিক্রম করেই এগিয়ে গেছে।

এই আয়াতগুলোতে যেসব সৎকাজের উল্লেখ করা হয়েছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিভিন্ন বাণীর মাধ্যমে সেগুলোর বিপুল মর্যাদা ও সওয়াবের কথা ঘোষণা করেছেন। فَكُّ رَقَبَةٍ (গলাকে দাসত্বমুক্ত করা) সম্পর্কিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আবু হুরাইরা (রা)। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি একজন মু'মিন গোলামকে আযাদ করে আল্লাহ ঐ গোলামের প্রতিটি অংগের বদলে আযাদকারীর প্রতিটি অংগকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবেন। হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা এবং লজ্জাস্থানের বদলে লজ্জাস্থান। (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ।) হযরত আলী ইবনে হুসাইন (ইমাম যইনুল আবেদীন) এই হাদীসের বর্ণনাকারী সা'দ ইবনে মারজানাহকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি নিজে আবু হুরাইরার (রা) কাছ থেকে এ হাদীসটি শুনেছো? তিনি জবাব দেন, হাঁ। কথা শুনে ইমাম যইনুল আবেদীন নিজের সবচেয়ে মূল্যবান গোলামটিকে ডাকেন এবং সেই মুহূর্তেই তাকে আযাদ করে দেন। মুসলিম শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে, এই গোলামটির জন্য লোকেরা তাঁকে দশ হাজার দিরহাম দিতে চেয়েছিল। ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম শা'বী (র) এই আয়াতের ভিত্তিতে বলেন, গোলাম আযাদ করা সাদকার চাইতে ভালো। কারণ আল্লাহ সাদকার কথা বলার আগে তার কথা বলেছেন।

মিসকিনদের সাহায্য করার ফজিলত সম্পর্কেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ও অসংখ্য হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। এর মধ্যে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

الساعى على الارملة والمسكين كالساعى فى سبيل الله واحسبه

قال كالقائم لايفتروكا لصائم لا يفطر –

"বিধবা ও মিসকিনদের সাহায্যার্থে যে ব্যক্তি প্রচেষ্টা চালায় সে আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত ব্যক্তির সমতুল্য। (আর হযরত আবু হুরাইরা বলেন ঃ) আমার মনে হচ্ছে, রসূলুল্লাহ (সা) একথাও বলেন যে, সে ঠিক সেই ব্যক্তির মতো যে নামাযে রত আছে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে নামায পড়ে যাচ্ছে, আরাম করছে না এবং সেই রোযাদারের মতো যে অনবরত রোযা রেখে যাচ্ছে, কখনো রোযা ভাঙে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

এতিমদের সম্পর্কেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য বাণী রয়েছে। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا
بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا
هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ﴿١٩﴾ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴿٢٠﴾

তারপর (এই সংগে) তাদের মধ্যে শামিল হওয়া যারা ঈমান এনেছে[১৩] এবং যারা পরস্পরকে সবর ও (আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি) রহম করার উপদেশ দেয়।[১৪] এরাই ডানপন্থী। আর যারা আমার আয়াত মানতে অস্বীকার করেছে তারা বামপন্থী।[১৫] এদের ওপর আগুন ছেয়ে থাকবে।[১৬]

বলেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন আত্মীয় বা অনাত্মীয় এতিমের ভরণ পোষণ করে সে ও আমি জান্নাতে ঠিক এভাবে থাকবো। একথা বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী দু'টি পাশাপাশি রেখে দেখান এবং দু'টি আঙ্গুলের মধ্যে সামান্য ফাঁক রাখেন।" (বুখারী) হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীটি উদ্ধৃত করেছেন, "মুসলমানদের বাড়িগুলোর মধ্যে যে বাড়িতে কোন এতিমের সাথে সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে সেটিই সর্বোত্তম বাড়ি এবং যে বাড়িতে কোন এতিমের সাথে অসদ্ব্যবহার করা হচ্ছে সেটি সবচেয়ে খারাপ বাড়ি।" (ইবনে মাজাহ, বুখারী ফিল আদাবিল মুফরাদ)। হযরত আবু উমামাহ বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন এতিমের মাথার হাত বুলায় এবং নিছক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হাত বুলায়, সে ঐ এতিমের মাথায় যতগুলো চুলের ওপর হাত বুলিয়েছে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে তার জন্য নেকী লেখা হবে। আর যে ব্যক্তি কোন এতিম ছেলে বা মেয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করে সে ও আমি জান্নাতে এভাবে থাকবো। একথা বলে তিনি নিজের দু'টি আঙ্গুল মিলিয়ে দেখান। (মুসনাদে আহমাদ ও তিরমিযী)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি নিজের পানাহারে কোন এতিমকে শামিল করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন। তবে সে ব্যক্তি যদি ক্ষমার অযোগ্য কোন গোনাহ করে থাকে তাহলে ভিন্ন কথা (শারহুস সুন্নাহ) হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করেন, "আমার মন বড় কঠিন।" রসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলেন, "এতিমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকিনকে আহার করাও।" (মুসনাদে আহমাদ)।

১৩. অর্থাৎ ওপরে উল্লেখিত গুণাবলী অর্জনের সাথে সাথে তার জন্য মু'মিন হওয়াও জরুরী। কারণ ঈমান ছাড়া কোন কাজ সৎকাজ হিসেবে চিহ্নিত হতে এবং আল্লাহর কাছেও গৃহীত হতে পারে না। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঈমান সহকারে যে সৎকাজ করা হয় একমাত্র সেটিই নেকী ও মুক্তির উপায় হিসেবে গৃহীত হয়। যেমন সূরা নিসায় বলা হয়েছে ঃ "পুরুষ বা নারী যে ব্যক্তিই সৎকাজ করে সে যদি মু'মিন হয়, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (১২৪

আয়াত) সূরা নাহলে বলা হয়েছে ঃ "পুরুষ বা নারী যে ব্যক্তিই সৎকাজ করবে সে যদি মু'মিন হয় তাহলে আমি তাকে পবিত্র জীবন যাপন করাবো এবং এই ধরনের লোকদেরকে তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুযায়ী প্রতিদান দেবো।" (৯৭ আয়াত) সূরা মু'মিনে বলা হয়েছে ঃ "পুরুষ বা নারী যে-ই সৎকাজ করবে সে যদি মু'মিন হয় তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাকে দেয়া হবে বেহিসেব রিযিক।" (৪০ আয়াত) যে কোন ব্যক্তিই কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করলে দেখতে পাবেন এ কিতাবের যেখানেই সৎকাজ ও তার উত্তম প্রতিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেই অবশ্যই তার সাথে ঈমানের শর্ত লাগানো হয়েছে। ঈমান বিহীন আমল আল্লাহর কাছে কোথাও গ্রহণযোগ্য হয়নি। কোথাও এ ধরনের কাজের বিনিময়ে কোন প্রতিদানের আশ্বাস দেয়া হয়নি। এ প্রসংগে এ বিষয়টিও প্রনিধানযোগ্য যে, আয়াতে একথা বলা হয়নি, "তারপর সে ঈমান এনেছে।" বরং বলা হয়েছে, "তারপর সে তাদের মধ্যে শামিল হয়েছে যারা ঈমান এনেছে।" এর অর্থ হয়, নিছক এক ব্যক্তি হিসেবে তার নিজের ঈমান আনাই কেবলমাত্র এখানে উদ্দেশ্য নয় বরং এখানে মূল লক্ষ হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি যে ঈমান এনেছে সে দ্বিতীয় ব্যক্তি যে ঈমান এনেছে তার সাথে শামিল হয়ে যাবে। এর ফলে ঈমানদারদের একটি জামায়াত তৈরি হয়ে যাবে। মু'মিনদের একটি সমাজ গড়ে উঠবে। সামগ্রিক ও সমাজবদ্ধভাবে নেকী, সততা ও সৎবৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যেগুলো প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল ঈমানের দাবী। অন্যদিকে অসৎবৃত্তি ও পাপ নির্মূল হয়ে যাবে, যেগুলো খতম করাই ছিল ঈমানের মৌলিক চাহিদার অন্তরভুক্ত।

১৪. এখানে মুসলিম সমাজের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টকে দু'টি ছোট ছোট বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম বৈশিষ্ট হচ্ছে, এই সমাজের সদস্যরা পরস্পরকে সবর করার উপদেশ দেবে এবং দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হচ্ছে, তারা পরস্পরকে রহম ও পরস্পরের প্রতি স্নেহার্দ্র ব্যবহারের উপদেশ দান করবে।

সবরের ব্যাপারে ইতিপূর্বে আমি বারবার সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছি, কুরআন মজীদ যে ব্যাপক অর্থে এই শব্দটির ব্যবহার করেছে সে দৃষ্টিতে বিচার করলে মু'মিনের সমগ্র জীবনকেই সবরের জীবন বলা যায়। ঈমানের পথে পা রাখার সাথে সাথেই মানুষের সবরের পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ যেসব ইবাদাত ফরয করেছেন, সেগুলো সম্পাদন করতে গেলে সবরের প্রয়োজন। আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করার ও সঠিকভাবে মেনে চলার জন্যও সবরের দরকার। আল্লাহ যেসব জিনিস হারাম করেছেন সবরের সাহায্য ছাড়া সেগুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়াও কঠিন। নৈতিক অসৎবৃত্তি পরিহার করা ও সৎবৃত্তি অবলম্বন করার জন্য সবরের প্রয়োজন। প্রতি পদে পদে গোনাহ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। তার মোকাবেলা করা সবর ছাড়া সম্ভব নয়। জীবনের এমন বহু সময় আসে যখন আল্লাহর আইনের আনুগত্য করলে বিপদ-আপদ, কষ্ট, ক্ষতি ও বঞ্চণার সম্মুখীন হতে হয়। আবার এর বিপরীত পক্ষে নাফরমানির পথ অবলম্বন করলে লাভ, ফায়দা, আনন্দ ও ভোগের পেয়ালা উপচে পড়তে দেখা যায়। সবর ছাড়া কোন মু'মিন এ পর্যায়গুলো নির্বিঘ্নে অতিক্রম করতে পারে না। তারপর ঈমানের পথ অবলম্বন করতেই মানুষ বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। নিজের সন্তান-সন্ততির, পরিবারের, সমাজের, দেশের, জাতির ও সারা দুনিয়ার মানুষ ও জ্বিন শয়তানদের। এমনকি তাকে আল্লাহর পথে হিজরত এবং জিহাদও করতে হয়। এসব

অবস্থায় একমাত্র সবরের গুণই মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল রাখতে পারে। একথা সুস্পষ্ট যে, এক একজন মু'মিন একা একা যদি এই ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তাহলে তার সবসময় পরাজিত হবার ভয় থাকে। অতি কষ্টে হয়তো সে কখনো সাফল্য লাভ করতে পারে। বিপরীত পক্ষে যদি মু'মিনদের এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত থাকে, যার প্রত্যেকটি সদস্য সবরকারী হয় এবং এই সমাজের সদস্যরা সবরের এই ব্যাপকতর পরীক্ষায় পরস্পরকে সাহায্য সহায়তা দান করতে থাকে তাহলে সাফল্যের ডালি এই সমাজের পদতলে লুটিয়ে পড়বে। সেখানে পাপ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সীমাহীন শক্তির প্রবাহ সৃষ্টি হবে। এভাবে মানুষের সমাজকে ন্যায়, সততা ও নেকীর পথে আনার জন্য একটি জবরদস্ত শক্তিশালী সেনাবাহিনী তৈরি হয়ে যাবে।

আর রহমের ব্যাপারে বলা যায়, ঈমানদারদের সমাজের বৈশিষ্টই হচ্ছে এই যে, এটা কোন জালেম, নির্দয়, বেরহম, পাষাণ হৃদয় ও হৃদয়হীনদের সমাজ হয় না। বরং সমগ্র মানবতার জন্য এটি হয় একটি স্নেহশীল, করুণাপ্রবণ এবং নিজেদের পরস্পরের জন্য সহানুভূতিশীল ও পরস্পরের দুঃখে-শোকে বেদনা অনুভবকারী একটি সংবেদনশীল সমাজ। ব্যক্তি হিসেবেও একজন মু'মিন হয় আল্লাহর করুণার মূর্ত প্রকাশ এবং দলগতভাবেও মু'মিনদের দল আল্লাহর এমন এক নবীর প্রতিনিধি যার প্রশংসায় বলা হয়েছে- وَمَا أَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ (বিশ্ববাসীর জন্য রহমত ও করুণা হিসেবেই তোমাকে পাঠিয়েছি। আম্বিয়া ঃ ১০৭) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের উম্মাতের মধ্যে এই রহম ও করুণাবৃত্তিটির মতো উন্নত নৈতিক বৃত্তিটিকেই সবচেয়ে বেশী প্রসারিত ও বিকশিত করতে চেয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁর নিম্নোক্ত বাণীগুলো দেখুন। এগুলো থেকে তাঁর দৃষ্টিতে এর গুরুত্ব কি ছিল তা জানা যাবে। হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রেওয়ায়াত করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَّا يَرْحَمُ النَّاسَ

"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি রহম করে না, আল্লাহ তার প্রতি রহম করেন না।"

(বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ - اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ -

"রহমকারীদের প্রতি আল্লাহ রহম করেন। পৃথিবীবাসীদের প্রতি রহম করো। আকাশবাসী তোমার প্রতি রহম করবেন।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করছেন ঃ مَنْ لَّا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ "যে ব্যক্তি রহম করে না তার প্রতি রহম করা হয় না।" (বুখারী ফিল আদাবিল মুফরাদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا

"যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি রহম করে না এবং আমাদের বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (তিরমিযী)

ইমাম আবু দাউদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমরের বরাত দিয়ে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি রহম করে না এবং আমাদের বড়দের হক চেনে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি আবুল কাসেম (নবী করীম) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ اِلَّا مِنْ شَقِيٍّ "হতভাগ্য ব্যক্তির হৃদয় থেকেই রহম তুলে নেয়া হয়।" (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী)

হযরত 'ইয়ায ইবনে হিমার (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিন ধরনের লোক জান্নাতী। তার মধ্যে একজন হচ্ছে ঃ

رَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِيْ قُرْبٰى وَمُسْلِمٍ -

"যে ব্যক্তি প্রত্যেক আত্মীয় ও প্রত্যেক মুসলিমের জন্য দয়ার্দ্র হৃদয় ও কোমল প্রাণ" (মুসলিম)

হযরত নু'মান ইবনে বশীর বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى عُضْوًا تُدَاعٰى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمّٰى -

"তোমরা মু'মিনদেরকে পরস্পরের মধ্যে রহম, ভালোবাসা ও সহানুভূতির ব্যাপারে একটি দেহের মতো পাবে। যদি একটি অংগে কোন কষ্ট অনুভূত হয় তাহলে সারা দেহ তাতে নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا "মু'মিন অন্য মু'মিনের জন্য এমন দেয়ালের মতো যার প্রতিটি অংশ অন্য অংশকে মজবুত করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِى حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ –

"মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করে না এবং তাকে সাহায্য করতেও বিরত হয় না। যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের কোন প্রয়োজন পূরণ করার কাজে লেগে থাকবে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করার কাজে লেগে থাকবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কোন বিপদ থেকে উদ্ধার করবে মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিনের বিপদগুলোর মধ্য থেকে একটি বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে আল্লাহও কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

সৎকর্মকারীদেরকে ঈমান আনার পর ঈমানদারদের দলে শামিল হবার যে নির্দেশ কুরআন মজীদের এই আয়াতে দেয়া হয়েছে তার ফলে কোন্ ধরনের সমাজ গঠন করতে চাওয়া হয়েছে, তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই উক্তিগুলো থেকে জানা যায়।

১৫. ডানপন্থী ও বামপন্থীর ব্যাখ্যা আমি ইতিপূর্বে সূরা ওয়াকি'আর তাফসীরে করে এসেছি। দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল ওয়াকি'আ ৫–৬ টীকা।

১৬. অর্থাৎ আগুন তাদেরকে চারদিক থেকে এমনভাবে ঘিরে থাকবে যে তা থেকে বের হবার কোন পথ থাকবে না।

আশ্ শামস

৯১

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ আশ শাম্সকে (اَلشَّمْسِ) এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী থেকে জানা যায়, এ সূরাটিও মক্কা মু'আয্যমায় প্রথম যুগে নাযিল হয়। কিন্তু এটি এমন সময় নাযিল হয় যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা তুংগে উঠেছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে, সৎ ও অসৎ নেকী ও গোনাহর পার্থক্য বুঝানো এবং যারা এই পার্থক্য বুঝতে অস্বীকার করে আর গোনাহর পথে চলার ওপরই জোর দেয় তাদেরকে খারাপ পরিণতির ভয় দেখানো।

মূল বক্তব্যের দিক দিয়ে সূরাটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটি শুরু হয়েছে সূরার সূচনা থেকে এবং ১০ আয়াতে গিয়ে শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগটি ১১ আয়াত থেকে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। প্রথম অংশে তিনটি কথা বুঝানো হয়েছে। এক, সূর্য ও চন্দ্র, দিন ও রাত, পৃথিবী ও আকাশ যেমন পরস্পর থেকে ভিন্ন এবং প্রভাব ও ফলাফলের দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী, ঠিক তেমনি সৎ ও অসৎ এবং নেকী ও গোনাহও পরস্পর ভিন্ন এবং প্রভাব ও ফলাফলের দিক দিয়েও তারা পরস্পর বিরোধী। এদের উভয়ের আকৃতি এক নয় এবং ফলাফলও এক হতে পারে না। দুই, মহান আল্লাহ মানবাত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি শক্তি দিয়ে দুনিয়ায় একেবারে চেতনাহীনভাবে ছেড়ে দেননি বরং একটি প্রাকৃতিক চেতনার মাধ্যমে তার অবচেতন মনে নেকী ও গোনাহর পার্থক্য, ভালো ও মন্দের প্রভেদ এবং ভালোর ভালো হওয়া ও মন্দের মন্দ হওয়ার বোধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তিন, মানুষের মধ্যে পার্থক্য বোধ, সংকল্প ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে শক্তিসমূহ আল্লাহ রেখে দিয়েছেন, সেগুলো ব্যবহার করে সে নিজের প্রবৃত্তির ভালো ও মন্দ প্রবণতাগুলোর মধ্য থেকে কাউকে উদ্দীপিত করে আবার কাউকে দাবিয়ে দেয়। এরি ওপর তার ভবিষ্যত নির্ভর করে। যদি সে সৎপ্রবণতাগুলোকে উদ্দীপিত করে এবং অসৎ-প্রবণতাসমূহ থেকে নিজের নফ্সকে পবিত্র করে তাহলে সে সাফল্য লাভ করবে। বিপরীত পক্ষে যদি সে নফ্সের সৎপ্রবণতাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করতে থাকে এবং অসৎ-প্রবণতাকে উদ্দীপিত করতে থাকে তাহলে সে ব্যর্থ হবে।

দ্বিতীয় অংশে সামূদ জাতির ঐতিহাসিক নজীর পেশ করে রিসালাতের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। ভালো ও মন্দের যে চেতনালব্ধজ্ঞান আল্লাহ মানুষের প্রকৃতিতে রেখে দিয়েছেন তা মানুষের সঠিক পথের সন্ধান লাভ করার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তাকে পুরোপুরি না বুঝার কারণে মানুষ ভালো ও মন্দের বিভ্রান্তিকর দর্শন ও মানদণ্ড নির্ণয় করে পথভ্রষ্ট হতে থেকেছে। তাই মহান আল্লাহ এই প্রকৃতিগত চেতনাকে সাহায্য করার জন্য আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের ওপর সুস্পষ্ট এ দ্ব্যর্থহীন অহী নাযিল করেছেন। এর ফলে তাঁরা সুস্পষ্টভাবে লোকদেরকে নেকী ও গোনাহ কি তা জানাতে পারবেন। এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ দুনিয়ায় নবী ও রসূল পাঠিয়েছেন। এই ধরনেরই একজন নবী ছিলেন হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম। তাঁকে সামূদ জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সামূদরা তাদের প্রবৃত্তির অসৎপ্রবণতার মধ্যে ডুবে গিয়ে বড় বেশী হুকুম অমান্য করার ভূমিকা অবলম্বন করেছিল। যার ফলে তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলো। তাদের মু'জিযা দেখাবার দাবী অনুযায়ী তিনি তাদের সামনে একটি উটনী পেশ করলেন। তাঁর সাবধান বাণী সত্ত্বেও এই জাতীর সবচেয়ে দুশ্চরিত্র ব্যক্তিটি সমগ্র জাতির ইচ্ছা ও দাবী অনুযায়ী উটনীটিকে হত্যা করলো। এর ফলে শেষ পর্যন্ত সমগ্র জাতি ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেলো।

সামূদ জাতির এ কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে সমগ্র সূরার কোথাও একথা বলা হয়নি যে, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! যদি তোমরা সামূদদের মতো তোমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রত্যাখ্যান করো তাহলে তোমরাও সামূদের মতো একই পরিণামের সম্মুখীন হবে। সালেহ আলাইহিস সালামের মোকাবেলায় সামূদ জাতির দুশ্চরিত্র লোকেরা যে অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছিল মক্কায় সে সময় সেই একই অবস্থা বিরাজ করছিল। তাই এ অবস্থায় এই কাহিনী শুনিয়ে দেয়াটা আসলে সামূদদের এই ঐতিহাসিক নজীর কিভাবে মক্কাবাসীদের সাথে খাপ খেয়ে যাচ্ছে, তা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

আয়াত ১৫ | সূরা আশ শামস-মক্কী | রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝١ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۝٢ وَالنَّهَارِ اِذَا
جَلّٰهَا ۝٣ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ۝٤ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۝٥ وَالْاَرْضِ وَمَا
طَحٰهَا ۝٦ وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۝٧ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۝٨ قَدْ اَفْلَحَ
مَنْ زَكّٰهَا ۝٩ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۝١٠

সূর্যের ও তার রোদের কসম।[১] চাঁদের কসম যখন তা সূর্যের পেছনে পেছনে আসে। দিনের কসম যখন তা (সূর্যকে) প্রকাশ করে। রাতের কসম যখন তা (সূর্যকে) ঢেকে নেয়।[২] আকাশের ও সেই সত্তার কসম যিনি তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[৩] পৃথিবীর ও সেই সত্তার কসম যিনি তাকে বিছিয়েছেন। মানুষের নফসের ও সেই সত্তার কসম যিনি তাকে ঠিকভাবে গঠন করেছেন।[৪] তারপর তার পাপ ও তার তাকওয়া তার প্রতি ইলহাম করেছেন।[৫] নিসন্দেহে সফল হয়ে গেছে সেই ব্যক্তির নফস্‌কে পরিশুদ্ধ করেছে এবং যে তাকে দাবিয়ে দিয়েছে সে ব্যর্থ হয়েছে।[৬]

১. মূলে দুহা (ضُحٰى) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। দুহা মানে সূর্যের আলো ও তাপ দু'টোই। আরবী ভাষায় এর পরিচিত মানে হচ্ছে চাশ্‌তের সময়, যখন সূর্য উদয়ের পরে যথেষ্ট উপরে উঠে যায় কিন্তু উপরে ওঠার পরে কোন আলোই বেড়ে যায় না, তাপও বিকীরণ করতে থাকে। তাই 'দুহা' শব্দটি যখন সূর্যের সাথে সম্পর্কিত হয়, তখন তার আলো বা তার বদৌলতে যে দিনের উদয় হয় তা থেকে তার পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ হয় না। বরং এর তুলনায় রোদ শব্দটি তার সঠিক ও পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে।

২. রাতের আগমনে সূর্য লুকিয়ে যায়। সারা রাত তার আলো দেখা যায় না। এই অবস্থাকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ রাত সূর্যকে ঢেকে নেয়। কারণ সূর্যের দিগন্ত রেখার নীচে নেমে যাওয়াকেই রাত বলে। এর ফলে পৃথিবীর যে অংশে রাত নামে সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছতে পারে না।

৩. ছাদের মতো পৃথিবীর বুকে তাকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এই আয়াতে এবং এর পরের দু'টি আয়াতে 'মা' (مَا) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ মা-বানাহা (مَابَنٰهَا) মা-তাহাহা (ماطحاها) ও মা-সাওওয়াহা (ماسواها)। মুফাস্সিরগণের একটি দল এই 'মা' শব্দটিকে ধাতুগত অর্থে ব্যবহার করেছেন। তারা এই আয়াতগুলোর অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ আকাশ ও তাকে প্রতিষ্ঠিত করার কসম, পৃথিবী ও তাকে বিছিয়ে দেবার কসম এবং মানুষের নফ্সের ও তাকে ঠিকভাবে গঠন করার কসম। কিন্তু এ অর্থ ঠিক নয়। কারণ এই তিনটি বাক্যের পরে নিম্নোক্ত বাক্যটি আনা হয়েছে ঃ "তারপর তার পাপ ও তার তাকওয়া তার প্রতি ইলহাম করেছেন।" আর এই বাক্যটি আগের বাক্য তিনটির সাথে খাপ খায় না। অন্য মুফাস্সিরগণ এখানে 'মা' (ما) কে মান (من) বা 'আল্লাযী' (الذين) এর অর্থে ব্যবহার করেছেন। ফলে তারা এই বাক্যগুলোর অর্থ করেছেন ঃ যিনি আকাশকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যিনি পৃথিবীকে বিছিয়েছেন এবং যিনি মানুষের নফ্সকে ঠিকভাবে গঠন করেছেন। আমার মতে এই দ্বিতীয় অর্থটিই সঠিক। এর বিরুদ্ধে এ আপত্তি ওঠানো ঠিক হতে পারে না যে, আরবী ভাষায় 'মা' শব্দ প্রাণহীন বস্তু ও বুদ্ধিহীন জীবের জন্য ব্যবহার করা হয়। কারণ খোদ কুরআনেই 'মা' কে 'মান' অর্থে বহু জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ (আর না তোমরা তার ইবাদাত করো যার ইবাদাত আমি করি)। فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ (কাজেই মেয়েদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পসন্দ করো বিয়ে করে নাও)। وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ (আর যেসব মেয়েকে তোমাদের বাপেরা বিয়ে করেছে তাদেরকে বিয়ে করো না)।

৪. 'ঠিকভাবে গঠন করেছেন' মানে হচ্ছে, তাকে এমন একটি দেহ দান করেছেন, যা তার সুডৌল গঠনাকৃতি, হাত-পা ও মস্তিষ্ক সংযোজনের দিক থেকে মানবিক জীবন যাপন করার জন্য সবচেয়ে উপযোগী ছিল। তাকে দেখার, শুনার, স্পর্শ করার, স্বাদ গ্রহণ করার ও ঘ্রাণ নেবার জন্য এমন ইন্দ্রিয় দান করেছেন যা তার বৈশিষ্ট ও আনুপাতিক কর্মক্ষমতার দিক দিয়ে তার জন্য জ্ঞান অর্জনের সবচেয়ে ভালো উপায় হতে পারতো। তাকে চিন্তা ও বুদ্ধি-বিবেচনার শক্তি, যুক্তি উপস্থাপন ও প্রমাণ পেশ করার শক্তি, কল্পনা শক্তি, স্মৃতি শক্তি, পার্থক্য করার শক্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার শক্তি, সংকল্প শক্তি এবং এমন অনেক মানসিক শক্তি দান করেছেন যার ফলে সে এই দুনিয়ায় মানুষের মতো কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এছাড়া "ঠিকভাবে গঠন করার" মধ্যে এ অর্থও রয়েছে যে, তাকে জন্মগত পাপী ও প্রকৃতিগত বদমায়েশ হিসেবে তৈরি না করে বরং সহজ সরল প্রকৃতির ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন। তার ঘঠনাকৃতিতে এমন ধরনের কোন বক্রতা রেখে দেননি যা তাকে সোজাপথ অবলম্বন করতে চাইলেও করতে দিতো না। একথাটিকেই সূরা রূমে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا "সেই প্রকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও যার ওপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।" (২০ আয়াত) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এ কথাটিকেই একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ "এমন কোন শিশু নেই যে প্রকৃতি ছাড়া অন্যকিছুর ওপর পয়দা হয়। তারপর মা-বাপ তাকে ইহুদি, খৃষ্টান বা অগ্নি উপাসক বানায়। এটা তেমনি যেমন পশুর পেট থেকে সুস্থ, সবল ও পূর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট বাচ্চা পয়দা হয়। তোমরা কি তাদের কাউকে কানকাটা পেয়েছো? (বুখারী ও মুসলিম) অর্থাৎ পরবর্তী কালে মুশরিকরা তাদের জাহেলী

কুসংস্কারের কারণে পশুদের কান কেটে দেয়। নয়তো আল্লাহ কোন পশুকে তার মায়ের পেট থেকে কানকাটা অবস্থায় পয়দা করেননি। অন্য একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "আমর রব বলেন, আমার সকল বান্দাকে আমি হানীফ (সঠিক প্রকৃতির ওপর) সৃষ্টি করেছিলাম। তারপর শয়তানরা এসে তাদেরকে তাদের দীন (অর্থাৎ তাদের প্রাকৃতিক দীন) থেকে সরিয়ে দিয়েছে এবং তাদের ওপর এমন সব জিনিস হারাম করে দিয়েছে যা আমি তাদের জন্য হালাল করে দিয়েছিলাম। শয়তানরা আমার সাথে তাদেরকে শরীক করার জন্য তাদেরকে হুকুম দিয়েছে, অথচ আমার সাথে তাদের শরীক হবার ব্যাপারে আমি কোন প্রমাণ নাযিল করিনি।" (মুসনাদে আহমাদ, ইমাম মুসলিমও প্রায় একই রকম শব্দ সহকারে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন)

৫. ইলহাম শব্দটির উৎপত্তি লহ্ম (لَهْم) থেকে। এর মানে গিলে ফেলা। যেমন বলা হয়, لَهِمَ الشَّيْءَ التَّهَمَهُ উমুক ব্যক্তি জিনিসটিকে গিলে ফেলেছে। আর اَلْهَمْتُهُ الشَّيْءَ মানে হয়, আমি উমুক জিনিসটি তাকে গিলিয়ে দিয়েছি বা তার গলার নীচে নামিয়ে দিয়েছি। এই মৌলিক অর্থের দিক দিয়ে ইলহাম শব্দ পারিভাষিক অর্থে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন কল্পনা বা চিন্তাকে অবচেতনভাবে বান্দার মন ও মস্তিষ্কের গোপন প্রদেশে নামিয়ে দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। মানুষের প্রতি তার পাপ এবং তার নেকী ও তাকওয়া ইলহাম করে দেয়ার দু'টি অর্থ হয়। এক, স্রষ্টা তার মধ্যে নেকী ও গোনাহ উভয়ের ঝোঁক প্রবণতা রেখে দিয়েছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই এটি অনুভব করে। দুই, প্রত্যেক ব্যক্তির অবচেতন মনে আল্লাহ এ চিন্তাটি রেখে দিয়েছেন যে, নৈতিকতার ক্ষেত্রে কোন্ জিনিস ভালো ও কোন্ জিনিস মন্দ এবং সৎ নৈতিক বৃত্তি ও সৎকাজ এবং অসৎ নৈতিক বৃত্তি ও অসৎকাজ সমান নয়। ফুজুর (দুষ্কৃতি ও পাপ) একটি খারাপ জিনিস এবং তাকওয়া (খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকা) একটি ভালো জিনিস, এ চিন্তাধারা মানুষের জন্য নতুন নয়। বরং তার প্রকৃতি এগুলোর সাথে পরিচিত। স্রষ্টা তার মধ্যে জন্মগতভাবে ভালো ও মন্দের পার্থক্যবোধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। একথাটিই সূরা আল বালাদে এভাবে বলা হয়েছে ঃ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ "আর আমি ভালো ও মন্দ উভয় পথ তার জন্য সুস্পষ্ট করে রেখে দিয়েছি।" (১০ আয়াত) সূরা আদ্দাহ্রে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا "আমি তাদেরকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, চাইলে তারা কৃতজ্ঞ হতে পারে আবার চাইলে হতে পারে অস্বীকারকারী।" (৩ আয়াত) একথাটিই সূরা আল কিয়ামাহে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবেঃ মানুষের মধ্যে একটি নফ্সে লাওয়ামাহ (বিবেক) আছে। সে অসৎকাজ করলে তাকে তিরস্কার করে। (২ আয়াত) আর প্রত্যেক ব্যক্তি সে যতই ওজর পেশ করুক না কেন সে কি তা সে খুব ভালো করেই জানে। (১৪-১৫ আয়াত)

এখানে একথাটিও ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, মহান আল্লাহ স্বভাবজাত ও প্রকৃতিগত ইলহাম করেছেন প্রত্যেক সৃষ্টির প্রতি তার মর্যাদা, ভূমিকা ও স্বরূপ অনুযায়ী। যেমন সূরা ত্বা-হা'য় বলা হয়েছে ঃ اَلَّذِىْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى "যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে তার আকৃতি দান করেছেন, তারপর তাকে পথ দেখিয়েছেন।" (৫০ আয়াত) যেমন প্রাণীদের প্রত্যেক প্রজাতিকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী ইলহামী জ্ঞান দান করা হয়েছে। যার ফলে মাছ নিজে নিজেই সাঁতার কাটে। পাখি উড়ে বেড়ায়। মৌমাছি

মৌচাক তৈরি করে। চাতক বাসা বানায়। মানুষকেও তার বিভিন্ন পর্যায় ও ভূমিকার ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ইলহামী জ্ঞান দান করা হয়েছে। মানুষ এক দিক দিয়ে প্রাণী গোষ্ঠীভুক্ত। এই দিক দিয়ে তাকে যে ইলহামী জ্ঞান দান করা হয়েছে তার একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে, মানব শিশু জন্মের সাথে সাথেই মায়ের স্তন চুষতে থাকে। আল্লাহ যদি প্রকৃতিগতভাবে তাকে এ শিক্ষাটি না দিতেন তাহলে তাকে এ কৌশলটি শিক্ষা দেবার সাধ্য কারো ছিল না। অন্যদিক দিয়ে মানুষ একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণী। এদিক দিয়ে তার সৃষ্টির শুরু থেকেই আল্লাহ তাকে অনবরত ইলহামী পথনির্দেশনা দিয়ে চলছেন। এর ফলে সে একের পর এক উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের মাধ্যমে মানব সভ্যতার বিকাশ সাধন করছে। এই সমস্ত উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের ইতিহাস অধ্যয়নকারী যে কোন ব্যক্তিই একথা অনুভব করবেন যে, সম্ভবত মানুষের চিন্তা ও পরিশ্রমের ফল হিসেবে দু' একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেকটি আবিষ্কার আকস্মিকভাবে শুরু হয়েছে। হঠাৎ এক ব্যক্তির মাথায় একটি চিন্তার উদয় হয়েছে এবং তারই ভিত্তিতে সে কোন জিনিস আবিষ্কার করেছে। এই দু'টি মর্যাদা ছাড়াও মানুষের আর একটি মর্যাদা ও ভূমিকা আছে। সে একটি নৈতিক জীবও। এই পর্যায়ে আল্লাহ তাকে ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি এবং ভালোকে ভালো ও মন্দকে মন্দ জানার অনুভূতি ইলহাম করেছেন। এই শক্তি, বোধ ও অনুভূতি একটি বিশ্বজনীন সত্য। এর ফলে আজ পর্যন্ত দুনিয়ায় এমন কোন সমাজ সভ্যতা গড়ে ওঠেনি যেখানে ভালো ও মন্দের ধারণা ও চিন্তা কার্যকর ছিল না। আর এমন কোন সমাজ ইতিহাসে কোন দিন পাওয়া যায়নি এবং আজো পাওয়া যায় না যেখানকার ব্যবস্থায় ভালো ও মন্দের এবং সৎ ও অসৎকর্মের জন্য পুরস্কার ও শাস্তির কোন না কোন পদ্ধতি অবলম্বিত হয়নি। প্রতিযুগে, প্রত্যেক জায়গায় এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রত্যেক পর্যায়ে এই জিনিসটির অস্তিত্বই এর স্বভাবজাত ও প্রকৃতিগত হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এছাড়াও একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ স্রষ্টা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এটি গচ্ছিত রেখেছেন, একথাও এ থেকে প্রমাণিত হয়। কারণ যেসব উপাদানে মানুষ তৈরি এবং যেসব আইন ও নিয়মের মাধ্যমে জড় জগত চলছে তার কোথাও নৈতিকতার কোন একটি বিষয়ও চিহ্নিত করা যাবে না।

৬. একথাটির ওপরই ওপরের আয়াতগুলোতে বিভিন্ন জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে। ওই জিনিসগুলো থেকে একথাটি কিভাবে প্রমাণ হয় তা এখন চিন্তা করে দেখুন। যেসব গভীর তত্ত্ব আল্লাহ মানুষকে বুঝাতে চান সেগুলো সম্পর্কে তিনি কুরআনে যে বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করেছেন তা হচ্ছে এই যে, সেগুলো প্রমাণ করার জন্য তিনি হাতের কাছের এমন কিছু সুস্পষ্ট ও সর্বজন পরিচিত জিনিস পেশ করেন, যা প্রত্যেক ব্যক্তি তার আশেপাশে অথবা নিজের অস্তিত্বের মধ্যে প্রতিদিন ও প্রতি মুহূর্তে দেখে। এই নিয়ম অনুযায়ী এখানে এক এক জোড়া জিনিস নিয়ে তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে পেশ করা হয়েছে। তারা পরস্পরের বিপরীতধর্মী কাজেই তাদের প্রভাব ও ফলাফলও সমান নয়। বরং অনিবার্যভাবে তারা পরস্পর বিভিন্ন। একদিকে সূর্য, অন্যদিকে চাঁদ। সূর্যের আলো অত্যন্ত প্রখর। এর মধ্যে রয়েছে তাপ। এর তুলনায় চাঁদের নিজের কোন আলো নেই। সূর্যের উপস্থিতিতে সে আকাশে থাকলেও আলোহীন থাকে। সূর্য ডুবে যাবার পর সে উজ্জ্বল হয়। সে সময়ও তার আলোর মধ্যে রাতকে দিন বানিয়ে দেবার ঔজ্জ্বল্য থাকে না। সূর্য তার আলোর প্রখরতা দিয়ে দুনিয়ায় যে কাজ করে চাঁদের আলোর মধ্যে সে প্রখরতা থাকে না। তবে তার নিজস্ব কিছু প্রভাব রয়েছে। এগুলো সূর্যের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

এভাবে একদিকে আছে দিন এবং অন্যদিকে রাত। এরা পরস্পরের বিপরীতধর্মী। উভয়ের প্রভাব ও ফলাফল এত বেশী বিভিন্ন যে, এদেরকে কেউ একসাথে জমা করতে পারে না। এমন কি সবচেয়ে নির্বোধ ব্যক্তিটির পক্ষেও একথা বলা সম্ভব হয় না যে, রাত হলেই বা কি আর দিন হলেই বা কি, এতে কোন পার্থক্য হয় না। ঠিক তেমনি একদিকে রয়েছে আকাশ। স্রষ্টা তাকে উঁচুতে স্থাপন করেছেন। অন্যদিকে রয়েছে পৃথিবী। এর স্রষ্টা একে আকাশের তলায় বিছানার মতো করে বিছিয়ে দিয়েছেন। এরা উভয়েই একই বিশ্ব জাহানের ও তার ব্যবস্থার সেবা করছে এবং তার প্রয়োজন পূর্ণ করছে। কিন্তু উভয়ের কাজ এবং প্রভাব ও ফলাফলের মধ্যে আসমান-যমীন ফারাক। উর্ধজগতের এই সাক্ষ প্রমাণগুলো পেশ করার পর মানুষের নিজের শরীর সম্পর্কে বলা হয়েছে, তার অংগ-প্রত্যংগ এবং ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের শক্তিগুলোকে আনুপাতিক ও সমতাপূর্ণ মিশ্রণের মাধ্যমে সুগঠিত করে স্রষ্টা তার মধ্যে সৎ ও অসৎ উভয় প্রবনতা ও কার্যকারণসমূহ রেখে দিয়েছেন। এগুলো পরস্পরের বিপরীত ধর্মী। ইলহামী তথা অবচেতনভাবে তাকে এদের উভয়ের পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাকে জানিয়ে দিয়েছেন, এদের একটি হচ্ছে ফুজুর-দুষ্কৃতি, তা খারাপ এবং অন্যটি হচ্ছে, তাকওয়া-আল্লাহভীতি, তা ভালো। এখন যদি সূর্য ও চন্দ্র, রাত ও দিন এবং আকাশ ও পৃথিবী এক না হয়ে থাকে বরং তাদের প্রভাব ও ফলাফল অনিবার্যভাবে পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে থাকে তাহলে, মানুষের নফ্সের দুস্কৃতি ও তাকওয়া পরস্পরের বিপরীতধর্মী হওয়া সত্ত্বেও এক হতে পারে কেমন করে? মানুষ নিজেই এই দুনিয়ায় নেকী ও পাপকে এই মনে করে না। নিজের মনগড়া দর্শনের দৃষ্টিতে সে যদি ভালো ও মন্দের কিছু মানদণ্ড তৈরি করে নিয়েই থাকে তাহলেও যে জিনিসটিকে সে নেকী মনে করে, সে সম্পর্কে তার অভিমত হচ্ছে এই যে, তা প্রশংসনীয় এবং প্রতিফল ও পুরস্কার লাভের যোগ্য। অন্যদিকে যাকে সে অসৎ ও গোনাহ মনে করে, সে সম্পর্কে তার নিজের নিরপেক্ষ অভিমত হচ্ছে এই যে, তা নিন্দনীয় ও শাস্তির যোগ্য। কিন্তু আসল ফায়সালা মানুষের হাতে নেই। বরং যে স্রষ্টা মানুষের প্রতি তার গোনাহ ও তাকওয়া ইলহাম করেছেন তার হাতেই রয়েছে এর ফায়সালা। স্রষ্টার দৃষ্টিতে যা গোনাহ ও দুষ্কৃতি আসলে তাই হচ্ছে গোনাহ ও দুষ্কৃতি এবং তাঁর দৃষ্টিতে যা তাকওয়া আসলে তাই হচ্ছে তাকওয়া। স্রষ্টার কাছে এ দু'টির রয়েছে পৃথক পরিণাম। একটির পরিণাম হচ্ছে, যে নিজের নফ্সের পরিশুদ্ধি করবে সে সাফল্য লাভ করবে এবং অন্যটির পরিণাম হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজের নফ্সকে দাবিয়ে দেবে সে ব্যর্থ হবে।

তাযাক্কা (تزکی) পরিশুদ্ধ করা মানে পাক-পবিত্র করা, বিকশিত করা এবং উদ্বুদ্ধ ও উন্নত করা। পূর্বাপর সম্পর্কের ভিত্তিতে এর পরিষ্কার অর্থ দাঁড়ায়, যে ব্যক্তি নিজের নফস্ ও প্রবৃত্তিকে দুষ্কৃতি থেকে পাক-পবিত্র করে, তাকে উদ্বুদ্ধ ও উন্নত করে তাকওয়ার উচ্চতম পর্যায়ে নিয়ে যায় এবং তার মধ্যে সৎপ্রবণতাকে বিকশিত করে, সে সাফল্য লাভ করবে। এর মোকাবেলায় দাস্সাহা (دَسّٰهَا) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শব্দমূল হচ্ছে তাদ্সীয়া (تدسیه) তাদ্সীয়া মানে হচ্ছে দাবিয়ে দেয়া, লুকিয়ে ফেলা, ছিনিয়ে নেয়া, আত্মসাৎ করা ও পথভ্রষ্ট করা। পূর্বাপর সম্পর্কের ভিত্তিতে এর অর্থও এখানে সুস্পষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ সেই ব্যক্তি ব্যর্থ হবে, যে নিজের নফ্সের মধ্যে নেকী ও সৎকর্মের যে প্রবণতা পাওয়া যাচ্ছিল তাকে উদ্দীপিত ও বিকশিত করার পরিবর্তে দাবিয়ে দেয়, তাকে

বিভ্রান্ত করে অসৎপ্রবণতার দিকে নিয়ে যায় এবং দুষ্কৃতিকে তার ওপর এত বেশী প্রবল করে দেয় যার ফলে তাকওয়া তার নীচে এমনভাবে মুখ ঢাকে যেমন কোন লাশকে কবরের মধ্যে রেখে তার ওপর মাটি চাপা দিলে তা ঢেকে যায়। কোন কোন তাফসীরকার এই আয়াতের অর্থ বর্ণনা করে বলেছেন قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّى اللّٰهُ نَفْسَهٗ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّى اللّٰهُ نَفْسَهٗ অর্থাৎ যে ব্যক্তির নফ্সকে আল্লাহ পাক-পবিত্র করে দিয়েছেন সে সাফল্য লাভ করেছে এবং যার নফ্সকে আল্লাহ দাবিয়ে দিয়েছেন সে ব্যর্থ হয়ে গেছে। কিন্তু এ ব্যাখ্যাটি প্রথমত ভাষার দিক দিয়ে কুরআনের বর্ণনাভংগীর পরিপন্থী। কারণ আল্লাহর যদি একথা বলাই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে তিনি এভাবে বলতেন ঃ قَدْ اَفْلَحَتْ مَنْ زَكَّهَا اللّٰهُ وَقَدْ خَابَتْ مَنْ دَسَّهَا اللّٰهُ (যে নফ্সকে আল্লাহ পাক-পবিত্র করে দিয়েছেন সে সফল হয়ে গেছে এবং ব্যর্থ হয়ে গেছে সেই নফ্স যাকে আল্লাহ দাবিয়ে দিয়েছেন।) দ্বিতীয়, এই ব্যাখ্যাটি এই বিষয়বস্তু সম্বলিত কুরআনের অন্যান্য বর্ণনার সাথে সংঘর্ষশীল। সূরা আ'লায় মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى (সফল হয়ে গেছে সেই ব্যক্তি যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে—৪ আয়াত) সূরা 'আবাসায় মহান আল্লাহ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى "তোমাদের ওপর কি দায়িত্ব আছে যদি তারা পবিত্রতা অবলম্বন না করে?" এই দু'টি আয়াতে পবিত্রতা অবলম্বন করাকে বান্দার কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ ছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ সত্যটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই দুনিয়ায় মানুষের পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। যেমন সূরা দাহ্র-এ বলা হয়েছে ঃ "আমি মানুষকে একটি মিশ্রিত শুক্র থেকে পয়দা করেছি, যাতে তাকে পরীক্ষা করতে পারি, তাই তাকে আমি শোনার ও দেখার ক্ষমতা দিয়েছি।" (২ আয়াত) সূরা মূল্কে বলা হয়েছে ঃ "তিনি মৃত্যু ও জীবন উদ্ভাবন করেছেন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করা যায় যে, তোমাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে।" (২ আয়াত) যখন একথা সুস্পষ্ট, পরীক্ষা গ্রহণকারী যদি আগেভাগেই একজন পরীক্ষার্থীকে সামনে বাড়িয়ে দেয় এবং অন্যজনকে দাবিয়ে দেয় তাহলে আদতে পরীক্ষাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। কাজেই কাতাদাহ, ইকরামা, মুজাহিদ ও সাঈদ ইবনে জুবাইর যা বলেছেন সেটিই হচ্ছে এর আসল তাফ্সীর। তারা বলেছেন ঃ যাক্কাহা ও দাস্সাহা'র কর্তা হচ্ছে বান্দা, আল্লাহ নন। আর ইবনে আবী হাতেম জুওয়াইর ইবনে সাঈদ থেকে এবং তিনি যাহ্হাক থেকে এবং যাহ্হাক ইবনে আব্বাস (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এই আয়াতের অর্থ বর্ণনা করে বলেছেন ঃ اَفْلَحَتْ نَفْسٌ زَكَّهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (সফল হয়ে গেছে সেই ব্যক্তি যাকে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ পবিত্র করে দিয়েছেন)। এ হাদীসটি সম্পর্কে বলা যায়, এখানে রসূলুল্লাহ (সা)-এর যে উক্তি পেশ করা হয়েছে তা আসলে তাঁর থেকে প্রমাণিত নয়। কারণ এই সনদের রাবী জুওয়াইর একজন প্রত্যাখ্যাত রাবী। অন্যদিকে ইবনে আব্বাসের সাথে যাহ্হাকের সাক্ষাত হয়নি। তবে ইমাম আহমাদ, মুসলিম, নাসাঈ ও ইবনে আবী শাইবা হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে যে রেওয়ায়াতটি করেছেন সেটি অবশ্যি একটি সহীহ হাদীস। তাতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِى تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوٰىهَآ ﴿١١﴾ إِذِ انۢبَعَثَ أَشْقٰىهَا ﴿١٢﴾ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ
نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيٰهَا ﴿١٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۖ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ
رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ﴿١٤﴾ وَلَا يَخَافُ عُقْبٰىهَا ﴿١٥﴾

সামূদ জাতি[৭] নিজের বিদ্রোহের কারণে মিথ্যা আরোপ করলো।[৮] যখন সেই জাতির সবচেয়ে বড় হতভাগ্য লোকটি ক্ষেপে গলো, আল্লাহর রসূল তাদেরকে বললো : সাবধান! আল্লাহর উটনীকে স্পর্শ করো না এবং তাকে পানি পান করতে (বাধা দিয়ো না)[৯] কিন্তু তারা তার কথা প্রত্যাখ্যান করলো এবং উটনীটিকে মেরে ফেললো।[১০] অবশেষে তাদের গোনাহের কারণে তাদের রব তাদের ওপর বিপদের পাহাড় চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন। আর তিনি (তাঁর এই কাজের) খারাপ পরিণতির কোন ভয়ই করেন না।[১১]

"হে আল্লাহ! আমার নফ্সকে তার তাকওয়া দান করো এবং তাকে পবিত্র করো। তাকে পবিত্র করার জন্যে তুমিই সর্বোত্তম সত্তা। তুমিই তার অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক।"

রসূলের প্রায় এই একই ধরনের দোয়া তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া ও ইবনুল মুনযির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে এবং ইমাম আহমাদ হযরত আয়েশা থেকে উদ্ধৃত করেছেন। মূলত এর অর্থ হচ্ছে, বান্দা কেবল তাকওয়া ও তাযকীয়া তথা পবিত্রতা অবলম্বন করার ইচ্ছাই প্রকাশ করতে পারে। তবে তা তার ভাগ্যে জুটে যাওয়া আল্লাহর ইচ্ছা ও তাওফীকের ওপর নির্ভর করে। তাদসীয়া তথা নফসকে দাবিয়ে দেবার ব্যাপারেও এই একই অবস্থা অর্থাৎ আল্লাহ জোর করে কোন নফ্সকে দাবিয়ে দেন না। কিন্তু বান্দা যখন এ ব্যাপারে একেবারে আদা–পানি খেয়ে লাগে তখন তাকে তাক্ওয়া ও তায্কীয়ার তাওফীক থেকে বঞ্চিত করেন এবং সে তার নফ্সকে যে ধরনের ময়লা আবর্জনার মধ্যে দাবিয়ে দিতে চায় তার মধ্যেই তাকে ছেড়ে দেন।

৭. ওপরের আয়াতগুলোতে নীতিগতভাবে যেসব কথা বর্ণনা করা হয়েছে এখন একটি ঐতিহাসিক নজীরের সাহায্যে তাকে সুস্পষ্ট করে তোলা হচ্ছে। এটি কিসের নজীর এবং ওপরের বর্ণনার সাথে এর কি সম্পর্ক তা জানার জন্যে কুরআন মজীদের অন্যান্য বর্ণনার আলোকে ৭ থেকে ১০ আয়াতে বর্ণিত দু'টি মৌলিক সত্য সম্পর্কে ভালভাবে চিন্তা গবেষণা করা উচিত।

এক : সেখানে বলা হয়েছে, মানুষের নফ্সকে একটি সুগঠিত ও সুসামঞ্জস্য প্রতিকৃতির ওপর সৃষ্টি করে মহান আল্লাহ তার দুষ্কৃতি ও তাকওয়া তার প্রতি ইলহাম করেছেন। কুরআন এ সত্যটি বর্ণনা করার পর একথাও পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, দুষ্কৃতি ও তাকওয়ার এই ইলহামী (চেতনালব্ধ) জ্ঞান প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্বভাবে বিস্তারিত পথ

নির্দেশনা লাভের জন্যে যথেষ্ট নয়। বরং এই উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ অহীর মাধ্যমে নবীগণকে বিস্তারিত পথনির্দেশনা দান করেছেন। তাতে দুষ্কৃতির আওতায় কি কি জিনিস পড়ে, যা থেকে দূরে থাকতে হবে এবং তাকওয়া কাকে বলে, তা কিভাবে হাসিল করা যায়—এসব কথা পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছে। যদি অহীর মাধ্যমে প্রেরিত এই বিস্তারিত পথনির্দেশনা মানুষ গ্রহণ না করে, তাহলে সে দুষ্কৃতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না এবং তাকওয়া অবলম্বনের পথও পাবে না।

দুই ঃ এই আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, দুষ্কৃতি ও তাকওয়া দু'টোর মধ্যে থেকে যে কোনটি অবলম্বন করার অনিবার্য ফল হচ্ছে পুরস্কার ও শাস্তি। নফ্সকে দুষ্কৃতি মুক্ত ও তাকওয়ার সাহায্যে উন্নত করার ফলে সাফল্য অর্জিত হয়। আর তার সৎপ্রবণতাগুলোকে দাবিয়ে দিয়ে তাকে দুষ্কৃতির মধ্যে ডুবিয়ে দেবার ফল হচ্ছে ব্যর্থতা ও ধ্বংস।

একথাটি বুঝাবার জন্যে একটি ঐতিহাসিক নজীর পেশ করা হচ্ছে। এ জন্যে নমুনা হিসেবে সামূদ জাতিকে পেশ করা হয়েছে। কারণ অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিদের মধ্যে এই জাতিটির এলাকা ছিল মক্কাবাসীদের সবচেয়ে কাছে। উত্তর হিজাযে এর ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ ছিল। মক্কাবাসীদের বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া যাবার পথে প্রায়ই এই স্থানটি অতিক্রম করতো। জাহেলী যুগের কবিতায় এই জাতির উল্লেখ যেমন ব্যাপকভাবে করা হয়েছে তাতে বুঝা যায়, আরববাসীদের মধ্যে তাদের ধ্বংসের চর্চা অত্যন্ত ব্যাপক ছিল।

৮. অর্থাৎ তারা হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের নবুওয়াতকে মিথ্যা গণ্য করলো। তাদেরকে হেদায়াত করার জন্যে হযরত সালেহকে পাঠানো হয়েছিল। যে দুষ্কৃতিতে তারা লিপ্ত হয়েছিল। তা ত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত ছিল না এবং হযরত সালেহ (আ) যে তাকওয়ার দিকে তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন তা গ্রহণ করতে তারা চাইছিল না। নিজেদের এই বিদ্রোহী মনোভাব ও কার্যক্রমের কারণে তাই তারা তার নবুওয়াতকে মিথ্যা বলছিল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আরাফ ৭৩–৭৬ আয়াত, হুদ ৬১–৬২ আয়াত, আশ শু'আরা ১৪১–১৫৩ আয়াত, আন নাম্ল ৪৫–৪৯ আয়াত, আল ক্বামার ২৩–২৫ আয়াত।

৯. কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সামূদ জাতির লোকেরা হযরত সালেহ আলাইহিস সালামকে এই বলে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল, যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে কোন নিশানী (মুজিযা) পেশ করো। একথায় হযরত সালেহ (আ) মুজিযা হিসেবে একটি উটনী তাদের সামনে হাযির করেন, তিনি বলেন ঃ এটি আল্লাহর উটনী। যমীনের যেখানে ইচ্ছা সে চরে বেড়াবে। একদিন সে একা সমস্ত পানি পান করবে এবং অন্যদিন তোমরা সবাই ও তোমাদের পশুরা পানি পান করবে। যদি তোমরা তার গায়ে হাত লাগাও তাহলে মনে রেখো তোমাদের ওপর কঠিন আযাব বর্ষিত হবে। একথায় তারা কিছুদিন পর্যন্ত ভয় করতে থাকলো। তারপর তারা তাদের সবচেয়ে বড় শয়তান ও বিদ্রোহী সরদারকে ডেকে বললো, এই উটনীটিকে শেষ করে দাও। সে এই কাজের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এলো। (আল আরাফ ৭৩ আয়াত, আশ্ শু'আরা ১৫৪–১৫৬ আয়াত এবং আল ক্বামার ২৯ আয়াত)

১০. সূরা আরাফে বলা হয়েছে ঃ উটনীকে হত্যা করার পর সামূদের লোকেরা সালেহ আলাইহিস সালামকে বললো, তুমি আমাদের যে আযাবের ভয় দেখাতে এখন সেই আযাব আনো। (৭৭ আয়াত) সূরা হুদে বলা হয়েছে, হযরত সালেহ (আ) তাদেরকে বললেন, তিনদিন পর্যন্ত নিজেদের গৃহে আরো আয়েশ করে নাও, তারপর আযাব এসে যাবে এবং এটি এমন একটি সতর্কবাণী যা মিথ্যা প্রমাণিত হবে না। (৬৫ আয়াত)

১১. অর্থাৎ দুনিয়ার বাদশাহ ও শাসকদের মতো নন। তিনি কোন জাতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময় এর পরিণাম কি হবে, একথা ভাবতে বাধ্য হন না। তিনি সবার ওপর কর্তৃত্বশালী। সামূদ জাতির সাহায্যকারী এমন কোন শক্তি আছে যে তার প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসবে, এ ভয় তাঁর নেই।

আল লাইল

৯২

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ ওয়াল লাইল (وَالَّيْلِ) –কে এই সূরার নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

পূর্ববর্তী সূরা আশ্ শামসের সাথে এই সূরাটির বিষয়বস্তুর গভীর মিল দেখা যায়। এদিক দিয়ে এদের একটিকে অপরটির ব্যাখ্যা বলে মনে হয়। একই কথাকে সূরা আশ্ শাম্সে একভাবে বলা হয়েছে আবার সেটিকে এই সূরায় অন্যভাবে বলা হয়েছে। এথেকে আন্দাজ করা যায়, এ দু'টি সূরা প্রায় একই যুগে নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

জীবনের দু'টি ভিন্ন ভিন্ন পথের পার্থক্য এবং তাদের পরিণাম ও ফলাফলের প্রভেদ বর্ণনা করাই হচ্ছে এর মূল বিষয়বস্তু। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এ সূরাটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটি শুরু থেকে ১১ আয়াত পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় ভাগটি ১২ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রথম অংশে বলা হয়েছে, মানুষ ব্যক্তিগত, জাতিগত ও দলগতভাবে দুনিয়ায় যা কিছু প্রচেষ্টা ও কর্ম তৎপরতা চালায় তা অনিবার্যভাবে নৈতিক দিক দিয়ে ঠিক তেমনি বিভিন্ন যেমন দিন ও রাত এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। তারপর কুরআনের ছোট ছোট সূরাগুলোর বর্ণনাভংগী অনুযায়ী প্রচেষ্টা ও কর্মের সমগ্র যোগফল থেকে এক ধরনের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট এবং অন্য ধরনের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট নিয়ে নমুনা হিসেবে পেশ করা হয়েছে। এই বৈশিষ্টগুলোর বর্ণনা শুনে এদের মধ্যকার পার্থক্য সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। কারণ এক ধরনের মৌলিক বৈশিষ্ট যে ধরনের জীবন পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে অন্য ধরনের মৌলিক বৈশিষ্টে ঠিক তার বিপরীতধর্মী জীবন পদ্ধতির চিহ্ন ফুটে ওঠে। এই উভয় প্রকার নমুনা বর্ণনা করা হয়েছে ছোট ছোট, আকর্ষণীয়, সুন্দর ও সুগঠিত বাক্যের সাহায্যে। শোনার সাথে সাথে এগুলোর মর্মবাণী মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে যায় এবং সে সহজে সেগুলো আওড়াতে থাকে। প্রথম ধরনের বৈশিষ্টগুলো হচ্ছে ঃ অর্থ–সম্পদ দান করা, আল্লাহভীতি ও তাকওয়া অবলম্বন করা এবং সৎবৃত্তিকে সৎবৃত্তি বলে মেনে নেয়া। দ্বিতীয় ধরনের বৈশিষ্টগুলো হচ্ছে ঃ কৃপণতা করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির পরোয়া না করা এবং ভালো কথাকে মিথ্যা গণ্য করা। তারপর বলা হয়েছে, এই উভয় ধরনের সুস্পষ্ট পরস্পর বিরোধী কর্মপদ্ধতি নিজের পরিণাম ও ফলাফলের দিক

থেকে মোটেই এক নয়। বরং যেমন এরা পরস্পর বিপরীতধর্মী, ঠিক তেমনি এদের ফলাফলও বিপরীতধর্মী। যে ব্যক্তি বা দল প্রথম কর্মপদ্ধতিটি গ্রহণ করবে তার জন্য মহান আল্লাহ জীবনের সত্য সরল পথটি সহজ লভ্য করে দেবেন। এ অবস্থায় তার জন্য সৎকাজ করা সহজ ও অসৎকাজ করা কঠিন হয়ে যাবে। আর যারা দ্বিতীয় কর্মপদ্ধতিটি অবলম্বন করবে আল্লাহ জীবনের নোংরা, অপরিচ্ছন্ন ও কঠিন পথ তাদের জন্য সহজ করে দেবেন। এ অবস্থায় তাদের জন্য অসৎকাজ করা সহজ এবং সৎকাজ করা কঠিন হয়ে পড়বে। এ বর্ণনা এমন একটি বাক্যের দ্বারা শেষ করা হয়েছে যা তীরবেগে হৃদয়ে প্রবেশ করে মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সে বাক্যটি হচ্ছে ঃ দুনিয়ার এই ধন–সম্পদ যার জন্য মানুষ প্রাণ দিয়ে দেয়, এসব তো কবরে তার সাথে যাবে না, তাহলে মরণের পরে এগুলো তার কি কাজে লাগবে?

দ্বিতীয় অংশেও এই একই রকম সংক্ষিপ্তভাবে তিনটি মৌলিক তত্ব পেশ করা হয়েছে। এক, দুনিয়ার এই পরীক্ষাগারে আল্লাহ মানুষকে অগ্রিম কিছু না জানিয়ে একেবারে অজ্ঞ করে পাঠিয়ে দেননি। বরং জীবনের বিভিন্ন পথের মধ্যে সোজা পথ কোন্‌টি এটি তাকে জানিয়ে দেবার দায়িত্ব তিনি নিজের জিম্মায় নিয়েছেন। এই সংগে একথা বলার প্রয়োজন ছিল না যে, নিজের রসূল ও নিজের কিতাব পাঠিয়ে দিয়ে তিনি এ দায়িত্ব পালন করেছেন। কারণ সবাইকে পথ দেখাবার জন্য রসূল ও কুরআন সবার সামনে উপস্থিত ছিল। দুই, দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। তাঁর কাছে দুনিয়া চাইলে তাও পাওয়া যাবে আবার আখেরাত চাইলে তাও তিনি দেবেন। এখন মানুষ এর মধ্য থেকে কোনটি চাইবে—সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মানুষের নিজের দায়িত্ব। তিন, রসূল ও কিতাবের মাধ্যমে যে ন্যায় ও কল্যাণ পেশ করা হচ্ছে, যে হতভাগ্য ব্যক্তি তাকে মিথ্যা গণ্য করবে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য প্রস্তুত রয়েছে জ্বলন্ত আগুন। আর যে আল্লাহভীরু ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিস্বার্থভাবে নিছক নিজের রবের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের ধন–মাল সৎপথে ব্যয় করবে তার রব তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং তাকে এত বেশী দান করবেন যার ফলে সে খুশী হয়ে যাবে।

আয়াত ২১ **সূরা আল লাইল-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۝١ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۝٢ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ
وَالْاُنْثٰٓى ۝٣ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ۝٤ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۝٥
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۝٦ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۝٧ وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ
وَاسْتَغْنٰى ۝٨ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۝٩ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ۝١٠
وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى ۝١١

রাতের কসম যখন তা ঢেকে যায়। দিনের কসম যখন তা উজ্জ্বল হয়। আর সেই সত্তার কসম যিনি পুরুষ ও স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। আসলে তোমাদের প্রচেষ্টা নানা ধরনের।[১] কাজেই যে (আল্লাহর পথে) ধন-সম্পদ দান করেছে, (আল্লাহর নাফরমানি থেকে) দূরে থেকেছে এবং সৎবৃত্তিকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে,[২] তাকে আমি সহজ পথের সুযোগ-সুবিধা দেবো।[৩] আর যে কৃপণতা করেছে, আল্লাহ থেকে বেপরোয়া হয়ে গেছে এবং সৎবৃত্তিকে মিথ্যা গণ্য করেছে,[৪] তাকে আমি কঠিন পথের সুযোগ-সুবিধা দেবো।[৫] আর তার ধন-সম্পদ তার কোন্ কাজে লাগবে যখন সে ধ্বংস হয়ে যাবে?[৬]

১. এ কথার জন্যই রাত ও দিন এবং নারী ও পুরুষের জন্মের কসম খাওয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, যেভাবে রাত ও দিন এবং পুরুষ ও নারী পরস্পর থেকে ভিন্ন এবং তাদের প্রত্যেক জোড়ার প্রভাব ও ফলাফল পরস্পর বিরোধী, ঠিক তেমনি তোমরা যেসব পথে ও যেসব উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছো সেগুলোও বিভিন্ন ধরনের এবং সেগুলোর পরিণাম বিভিন্ন বিপরীতধর্মী ফলাফলেরও উদ্ভব ঘটে। পরবর্তী আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে ঃ এসব বিভিন্ন প্রচেষ্টা দু'টি বড় বড় ভাগে বিভক্ত।

২. এটি এক ধরনের মানবিক প্রচেষ্টা। তিনটি জিনিসকে এর অংগীভূত করা হয়েছে। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, এগুলোর মধ্যে সব গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে। এর

মধ্যে একটি হচ্ছে, মানুষ যেন অর্থ লিপ্সায় ডুবে না যায়। বরং নিজের অর্থ-সম্পদ, যে পরিমাণ আল্লাহ তাকে দিয়েছেন, তা আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের অধিকার আদায়ে, সৎ-কাজে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে সাহায্য করার কাজে ব্যয় করে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তার মনে যেন আল্লাহর ভয় জাগরুক থাকে। সে যেন নিজের যাবতীয় কর্ম, আচার-আচরণ, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি জীবনের প্রতিটি বিভাগে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে এমন প্রত্যেকটি কাজ থেকে দূরে থাকে। আর তৃতীয়টি হচ্ছে, সে যেন সৎবৃত্তি ও সৎকাজের সত্যতার স্বীকৃতি দেয়। সৎবৃত্তি ও সৎকাজ অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ও কর্ম তিনটি সৎবৃত্তির অন্তরভূক্ত। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সৎবৃত্তির স্বীকৃতি হচ্ছে, শিরক, কুফরী ও নাস্তিক্যবাদ পরিত্যাগ করে মানুষ তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতকে সত্য বলে মেনে নেবে। আর কর্ম ও নৈতিক চরিত্রের ক্ষেত্রে সৎবৃত্তির স্বীকৃতি হচ্ছে, কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা ও পদ্ধতি ছাড়াই নিছক নিজের অজ্ঞাতসারে কোন সৎকাজ সম্পাদিত হওয়া নয় বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ ও সৎবৃত্তির যে ব্যবস্থা দান করা হয়েছে মানুষ তার সত্যতার স্বীকৃতি দেবে। আল্লাহ শরীয়াত নামক যে ব্যাপকতর ব্যবস্থাটি দান করেছেন এবং যার মধ্যে সব ধরনের ও সকল প্রকার সৎবৃত্তি ও সৎকাজকে সুশৃংখলভাবে একটি ব্যবস্থার আওতাধীন করেছেন, মানুষ তাকে স্বীকার করে নিয়ে সেই অনুযায়ী সৎকাজ করবে।

৩. এটি হচ্ছে এই ধরনের প্রচেষ্টার ফল। সহজ পথ মানে মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির সাথে মিল রয়েছে এমন পথ। যে স্রষ্টা মানুষ ও এই সমগ্র বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করেছেন তিনি যেমন চান তেমন পথ। যে পথে নিজের বিবেকের সাথে লড়াই করে মানুষকে চলতে হয় না। যে পথে মানুষকে নিজের দেহ, প্রাণ,বুদ্ধি ও মনের শক্তিগুলোর ওপর জোর খাটিয়ে যে কাজের জন্যে তাদেরকে এ শক্তি দান করা হয়নি জবরদস্তি তাদের থেকে সেই কাজ আদায় করে নিতে হয় না। বরং তাদের থেকে এমন কাজ নেয় যে জন্য তাদেরকে প্রকৃতপক্ষে এই শক্তিগুলো দান করা হয়েছে। পাপপূর্ণ জীবনে চতুরদিকে যেমন প্রতি পদে পদে সংঘাত, সংঘর্ষ ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়, এ পথে মানুষকে তেমনি ধরনের কোন বাধা ও সংঘাতের সম্মুখীন হতে হয় না। বরং মানুষের সমাজে প্রতি পদে পদে সে সহানুভূতি, সহযোগিতা, প্রেম, ভালোবাসা, মর্যাদা ও সম্মান লাভ করতে থাকে। একথা সুস্পষ্ট, যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে, সবার সাথে ভালো ব্যবহার করে, নিজের জীবনকে অশ্লীল কার্যকলাপ ও দুষ্কৃতিমুক্ত রাখে, নিজের লেন-দেনের ব্যাপারে পরিচ্ছন্ন ও ন্যায়-নিষ্ঠ থাকে, কারো সাথে বেঈমানী, শপথ ভংগ ও বিশ্বাসঘাতকতা করে না, যার পক্ষ থেকে কারোর প্রতি জুলুম, নির্যাতন ও অন্যায় আচরণের আশংকা থাকে না। যে প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং যার চরিত্র ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করার সুযোগ কারোর থাকে না, সে যতই নষ্ট ও ভ্রষ্ট সমাজে বাস করুক না কেন সেখানে অবশ্যি সে মর্যাদার আসনে সমাসীন থাকে। মানুষের মন তার দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে। মানুষের হৃদয়ে তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তার নিজের মন ও বিবেকও নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। সমাজে তার এমন মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা কোন অসৎব্যক্তি ও দুষ্কৃতকারী কোন দিন লাভ করতে পারে না। একথাটিকেই সূরা আন্ নাহলে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মু'মিন হলে আমি অবশ্যি তাকে ভালো জীবন যাপন করাবো।" (৯৭ আয়াত)

আবার একথাটি সূরা মারয়ামে নিম্নোক্তভাবে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا –

"নিসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা সৎকাজ করেছে রহমান তাদের জন্য হৃদয়গুলোতে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।"(৯৬ আয়াত)

তাছাড়া এটিই মানুষের জন্য দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত পূর্ণ আনন্দের একমাত্র পথ। একমাত্র এ পথেই আছে আরাম ও প্রশান্তি। এর ফলাফল সাময়িক ও ক্ষণকালীন নয় বরং এটা হচ্ছে চিরন্তন ও চিরস্থায়ী ফল, এর কোন ক্ষয় নেই।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলছেন, আমি তাকে এ পথে চলার সহজ সুযোগ দেবো। এর মানে হচ্ছে, যখন সে সৎবৃত্তিকে স্বীকার কনে নিয়ে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যে, এটিই তার উপযোগী পথ এবং দুষ্কৃতির পথ তার উপযোগী নয়, আর যখন সে কার্যত আর্থিক ত্যাগ ও তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করে একথা প্রমাণ করবে যে, তার এই স্বীকৃতি সত্য, তখন আল্লাহ এ পথে চলা তার জন্য সহজ করে দেবেন। এ অবস্থায় তার জন্য আবার গোনাহ করা কঠিন এবং নেকী করা সহজ হয়ে যাবে। হারাম অর্থ-সম্পদ তার সামনে এলে সে তাকে লাভের সওদা মনে করবে না। বরং সে অনুভব করবে, এটা জ্বলন্ত অংগার, একে সে হাতের তালুতে উঠিয়ে নিতে পারে না। ব্যভিচারের সুযোগ সে পাবে। কিন্তু তাকে সে ইন্দ্রিয় লিপ্সা চরিতার্থ করার সুযোগ মনে করে সেদিকে পা বাড়াবে না। বরং জাহান্নামের দরজা মনে করে তা থেকে দূরে পালিয়ে যাবে। নামায তার কাছে কঠিন মনে হবে না বরং নামাযের সময় হয়ে গেলে নামায না পড়া পর্যন্ত তার মনে শান্তি আসবে না। যাকাত দিতে তার মনে কষ্ট হবে না। বরং যাকাত আদায় না করা পর্যন্ত নিজের ধন-সম্পদ তার কাছে নাপাক মনে হবে। মোটকথা, প্রতি পদে পদে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই পথে চলার সুযোগ ও সুবিধা সে লাভ করতে থাকবে। অবস্থাকে তার উপযোগী বানিয়ে দেয়া হবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে সাহায্য করা হবে।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয়, ইতিপূর্বে সূরা আল বালাদে এ পথটিকে দুর্গম পার্বত্য পথ বলা হয়েছিল আর এখানে একে বলা হচ্ছে, সহজ পথ। এই দু'টি কথাকে কিভাবে এক করা যাবে? এর জবাব হচ্ছে, এই পথ অবলম্বন করার আগে এটা মানুষের কাছে দুর্গম পার্বত্য পথই মনে হতে থাকে। এ উঁচু দুর্গম পার্বত্য পথে চলার জন্য তাকে নিজের প্রবৃত্তির লালসা নিজের বৈষয়িক সার্থের অনুরাগী পরিবার পরিজন, নিজের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও কাজ-কারবারের লোকজন এবং সবচেয়ে বেশী শয়তানের সাথে লড়াই করতে হয়। কারণ এদের প্রত্যেকেই তাকে এ পথে চলতে বাধা দেয় এবং একে ভীতিপ্রদ বানিয়ে তার সামনে হাযির করে। কিন্তু যখন মানুষ সৎবৃত্তির স্বীকৃতি দিয়ে সে পথে চলার সংকল্প করে, নিজের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে কার্যত এই সংকল্পকে পাকাপোক্ত করে নেয়, তখন এই দুর্গম পথ

পাড়ি দেয়া তার জন্য সহজ এবং নৈতিক অবনতির গভীর খাদে গড়িয়ে পড়া কঠিন হয়ে পড়ে।

৪. এটি দ্বিতীয় ধরনের মানসিক প্রচেষ্টা। প্রথম ধরনের প্রচেষ্টাটির সাথে প্রতি পদে পদে রয়েছে এর অমিল। কৃপণতা মানে শুধুমাত্র প্রচলিত অর্থে যাকে কৃপণতা বলা হয় তা নয়। অর্থাৎ এক একটি পয়সা গুণে গুণে রাখা, খরচ না করা, না নিজের জন্য না নিজের ছেলেমেয়ের জন্য। বরং এখানে কৃপণতা বলতে আল্লাহর পথে এবং নেকী ও কল্যাণমূলক কাজে অর্থ ব্যয় না করা বুঝাচ্ছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে এমন ব্যক্তিকেও কৃপণ বলা যায়, যে নিজের জন্য, নিজের আরাম-আয়েশ ও বিলাস-ব্যাসনের স্বার্থে এবং নিজের ইচ্ছামতো খুশী ও আনন্দ বিহারে দু'হাতে টাকা উড়ায় কিন্তু কোন ভালো কাজে তার পকেট থেকে একটি পয়সাও বের হয় না। অথবা কখনো বের হলেও তার পেছনে থাকে এর বিনিময়ে দুনিয়ার খ্যাতি, যশ, শাসকদের নৈকট্য লাভ বা অন্য কোন রকমের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধার। বেপরোয়া হয়ে যাওয়ার অর্থ দুনিয়ার বৈষয়িক লাভ ও স্বার্থকে নিজের যাবতীয় প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের লক্ষে পরিণত করা এবং আল্লাহর ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যাওয়া। কোন্ কাজে আল্লাহ খুশী হন এবং কোন্ কাজে নাখোশ হন তার কোন তোয়াক্কা না করা। আর সৎবৃত্তিকে মিথ্যা গণ্য করার মানে হচ্ছে, সৎকাজকে তার সকল বিস্তারিত আকারে সত্য বলে মেনে না নেয়া এখানে এর ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ ইতিপূর্বে সৎবৃত্তিকে সত্য বলে মেনে নেয়ার বিষয়টি আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।

৫. এ পথকে কঠিন বলার কারণ হচ্ছে এই যে, এ পথে যে পাড়ি জমাতে চায় সে যদিও বৈষয়িক লাভ, পার্থিব ভোগ-বিলাস ও বাহ্যিক সাফল্যের লোভে এ দিকে এগিয়ে যায় কিন্তু এখানে সর্বক্ষণ তাকে নিজের প্রকৃতি, বিবেক, বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টার তৈরি করা আইন এবং তার চারপাশের সমাজ পরিবেশের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়। সততা, ন্যায় পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা, ভদ্রতা, চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতা ও নীতি-নৈতিকতার সীমালংঘন করে যখন সে সর্বপ্রকারে নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও লোভ-লালসা পূর্ণ করার প্রচেষ্টা চালায়, যখন তার মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ হতে থাকে এবং সে অন্যের অধিকার ও মর্যাদার ওপর হস্তক্ষেপ করতে থাকে তখন নিজের চোখেই সে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত জীবে পরিণত হয় এবং যে সমাজে সে বাস করে সেখানেও তাকে প্রতি পদে পদে লড়াই করে এগিয়ে যেতে হয়। সে দুর্বল হলে এসব কার্যকলাপের জন্য তাকে নানা ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হয়। আর সে ধনী, শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হলে সারা দুনিয়া তার শক্তির সামনে মাথা নত করলেও কারো মনে তার জন্য সামান্যতমও শুভাকাংক্ষা, সম্মানবোধ ও ভালোবাসার প্রবণতা জাগে না। এমন কি তার কাজের সাথী-সহযোগীরাও তাকে একজন বজ্জাত-দুর্বৃত্ত হিসেবেই গণ্য করতে থাকে। আর এ ব্যাপারটি কেবলমাত্র ব্যক্তি পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকে না। দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী জাতিরাও যখন নৈতিকতার সীমানালংঘন করে নিজেদের শক্তি ও অর্থের বিভ্রমে পড়ে অসৎকাজে লিপ্ত হয় তখন একদিকে বাইরের জগত তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্যদিকে তাদের নিজেদের সমাজ অপরাধমূলক কার্যকলাপ, আত্মহত্যা, নেশাখোরী, দুরারোগ্য ব্যাধি, পারিবারিক জীবনের ধ্বংস, যুব সমাজের অসৎপথ অবলম্বন, শ্রেণী সংঘাত এবং জুলুম নিপীড়নের

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿١٢﴾ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ﴿١٣﴾ فَأَنذَرْتُكُمْ
نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿١٤﴾ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِي كَذَّبَ
وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾
وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿١٩﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ
الْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾

নিসন্দেহে পথনির্দেশ দেয়া তো আমার দায়িত্বের অন্তরভুক্ত।[৭] আর আসলে আমি তো আখেরাত ও দুনিয়া উভয়েরই মালিক।[৮] তাই আমি তোমাদের সাবধান করে দিয়েছি জ্বলন্ত আগুন থেকে । যে চরম হতভাগ্য ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে ছাড়া আর কেউ তাতে ঝলসে যাবে না। আর যে পরম মুত্তাকী ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনের জন্য নিজের ধন-সম্পদ দান করে তাকে তা থেকে দূরে রাখা হবে।[৯] তার প্রতি কারো কোন অনুগ্রহ নেই যার প্রতিদান তাকে দিতে হবে। সেতো কেবলমাত্র নিজের রবের সন্তুষ্টিলাভের জন্য এ কাজ করে।[১০] আর তিনি অবশ্যি (তার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন।[১১]

বিপুলাকার রোগে আক্রান্ত হয়। এমন কি উন্নতির উচ্চতম শিখর থেকে একবার পতন ঘটার পর ইতিহাসের পাতায় তাদের জন্য কলংক, লানত ও অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই থাকেনি।

আর এই ধরনের লোককে আমি কঠিন পথে চলার সুবিধা দেবো, একথা বলার মানে হচ্ছে, তার থেকে সৎপথে চলার সুযোগ ছিনিয়ে নেয়া হবে। অসৎপথের দরজা তার জন্য খুলে দেয় হবে। অসৎকাজ করার যাবতীয় উপকরণ ও কার্যকারণ তার জন্য সংগ্রহ করে দেয়া হবে। খারাপ কাজ করা তার জন্য সহজ হবে এবং ভালো কাজ করার চিন্তা মনে উদয় হওয়ার সাথে সাথেই সে মনে করবে এই বুঝি তার দম বন্ধ হয়ে যাবে। এই অবস্থাটিকেই কুরআনে অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ যাকে পথ দেখাবার সংকল্প করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য খুলে দেন। আর যাকে তিনি গোমরাহীর মধ্যে ঠেলে দেবার এরাদা করেন তার বক্ষদেশকে সংকীর্ণ করে দেন এবং তাকে এমনভাবে সংকুচিত করেন যার ফলে (ইসলামের কথা মনে হলেই) সে অনুভব করতে থাকে যেন তার প্রাণবায়ু উড়ে যাচ্ছে । (আনআম ১২৫ আয়াত) আর এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ নিসন্দেহে নামায একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ, কিন্তু আল্লাহ অনুগত বান্দার জন্য নয়।" (আল বাকারাহ ৪৬ আয়াত) আর মোনাফেকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "তারা নামাযের দিকে এলেও গড়িমসি করে আসে এবং আল্লাহর পথে খরচ করলেও যেন মন চায় না তবুও খরচ

করে।" (আত তাওবাহ ৫৪ আয়াত) আরো বলা হয়েছে ঃ "তাদের মধ্যে এমন সব লোক রয়েছে যারা আল্লাহর পথে কিছু খরচ করলে তাকে নিজেদের ওপর জবরদস্তি আরোপিত জরিমানা মনে করে।" (আত তাওবাহ ৯৮ আয়াত)

৬. অন্য কথায় বলা যায়, একদিন তাকে অবশ্যি মরতে হবে। তখন এখানে আয়েশ আরামের জন্য সে যা কিছু সংগ্রহ করেছিল সব এই দুনিয়াতেই রেখে যেতে হবে। যদি নিজের আখেরাতের জন্য এখান থেকে কিছু কামাই করে না নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে দুনিয়ার এ ধন-সম্পদ তার কোন্ কাজে লাগবে? সে তো কোন দালান কোঠা, মোটরগাড়ি, সম্পত্তি বা জমানো অর্থ সংগে করে কবরে যাবে না।

৭. অর্থাৎ মানুষের স্রষ্টা হবার কারণে মহান আল্লাহ নিজের জ্ঞানপূর্ণ কর্মনীতি, ন্যায়নিষ্ঠা ও রহমতের ভিত্তিতে নিজেই মানুষকে এ দুনিয়ায় এমনভাবে ছেড়ে দেননি যে, সে কিছুই জানে না। বরং সঠিক পথ কোন্‌টি ও ভুল পথ কোন্‌টি, নেকী, গোনাহ, হালাল ও হারাম কি, কোন্ কর্মনীতি তাকে নাফরমান বান্দার ভূমিকায় এনে বসাবে—এসব কথা জানিয়ে দেবার দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন।

একথাটিকেই সূরা আন নাহ্‌লে এভাবে বলা হয়েছে ঃ وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ "আর সোজা পথ দেখাবার দায়িত্ব আল্লাহরই ওপর বার্তায় যখন বাঁকা পথও রয়েছে।" (৯ আয়াত) ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নাহ্‌ল, ৯ টীকা।

৮. এ বক্তব্যটির কয়েকটি অর্থ হয়। সবগুলো অর্থই সঠিক। এক, দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত কোথাও তোমরা আমার নিয়ন্ত্রণ ও পাকড়াও এর বাইরে অবস্থান করছো না। কারণ আমিই উভয় জাহানের মালিক । দুই, তোমরা আমার দেখানো পথে চলো বা না চলো আসলে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের ওপর আমার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত। তোমরা ভুল পথে চললে তাতে আমার কোন ক্ষতি হবে না, তোমাদের ক্ষতি হবে। আর তোমরা সঠিক পথে চললে আমার কোন লাভ হবে না, তোমরাই লাভবান হবে। তোমাদের নাফরমানির কারণে আমার মালিকানায় কোন কমতি দেখা দেবে না এবং তোমাদের আনুগত্য তার মধ্যে কোন বৃদ্ধিও ঘটাতে পারবে না। তিন, আমিই উভয় জাহানের মালিক। দুনিয়া তথা বৈষয়িক স্বার্থ চাইলে তা আমার কাছ থেকেই তোমরা পাবে। আবার আখেরাতের কল্যাণ চাইলে তাও দেবার ক্ষমতা একমাত্র আমারই আছে। একথাটিই সূরা আলে ইমরানের ১৪৫ আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ج وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا

"যে ব্যক্তি দুনিয়ায় সওয়াব হাসিলের সংকল্পে কাজ করবে আমি তাকে দুনিয়া থেকেই দেবো আর যে ব্যক্তি আখেরাতের সওয়াব হাসিলের সংকল্পে কাজ করবে আমি তাকে আখেরাত থেকে দেবো।"

সূরা শুরা ২০ আয়াতে একথাটি নিম্নোক্তভাবে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْلَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ ج وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ -

"যে ব্যক্তি আখেরাতের কৃষি চায় তার কৃষিকে আমি বাড়িয়ে দেই আর যে দুনিয়ার কৃষি চায় তাকে দুনিয়া থেকেই দান করি, কিন্তু আখেরাতে তার কোন অংশ নেই।"

আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আলে ইমরান ১০৫ টীকা এবং আশ শূরা ৩৫ টীকা।

৯. এর অর্থ এই নয় যে, চরম হতভাগ্য ছাড়া আর কেউ জাহান্নামে যাবে না এবং পরম মুত্তাকী ছাড়া আর কেউ তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। বরং দু'টি চরম পরস্পর বিরোধী চরিত্রকে পরস্পরের বিরুদ্ধে পেশ করে তাদের পরস্পর বিরোধী চরম পরিণাম বর্ণনা করাই এখানে উদ্দেশ্য। এক ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শিক্ষাকে মিথ্যা বলে এবং আনুগত্যের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেবল ঈমান এনেই ক্ষান্ত হয় না বরং পরম আন্তরিকতা সহকারে কোন প্রকার লোক দেখানো প্রবণতা, নাম যশ ও খ্যাতির মোহ ছাড়াই শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে পাক-পবিত্র মানুষ হিসেবে গণ্য হবার আকাংখায় আল্লাহর পথে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। এই দু' ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোক সে সময় মক্কার সমাজে সবার সমানে বর্তমান ছিল। তাই কারো নাম না নিয়ে লোকদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে, জাহান্নামের আগুনে দ্বিতীয় ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোক নয় বরং প্রথম ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোকই পুড়বে। আর এই আগুন থেকে প্রথম ধরনের লোক নয় বরং দ্বিতীয় ধরনের লোককেই দূরে রাখা হবে।

১০. এখানে সেই মুত্তাকী ও আল্লাহভীরু ব্যক্তির আন্তরিকতার আরো বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সে নিজের অর্থ যাদের জন্য ব্যয় করে, আগে থেকেই তার কোন অনুগ্রহ তার ওপর ছিল না, যার বদ্‌লা সে এখন চুকাচ্ছে অথবা ভবিষ্যতে তাদের থেকে আরো স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তাদেরকে উপহার উপঢৌকন ইত্যাদি দিচ্ছে এবং তাদেরকে দাওয়াত খাওয়াচ্ছে। বরং সে নিজের মহান ও সর্বশক্তিমান রবের সন্তুষ্টিলাভের জন্য এমনসব লোককে সাহায্য করছে, যারা ইতিপূর্বে তার কোন উপকার করেনি এবং ভবিষ্যতেও তাদের উপকার করার কোন আশা নেই। এর সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর গোলাম ও বাঁদীদের আযাদ করার কাজটি। মক্কা মু'আয্‌যমার যে অসহায় গোলাম ও বাঁদীরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং এই অপরাধে তাদের মালিকরা তাদের ওপর চরম অকথ্য নির্যাতন ও নিপীড়ন চালাচ্ছিল হযরত আবু বকর (রা) তাদেরকে মালিকদের জুলুম থেকে বাঁচাবার জন্য কিনে নিয়ে আযাদ করে দিচ্ছিলেন। ইবনে জারীর ও ইবনে আসাকির হযরত আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের এই রেওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ হযরত আবু বকরকে এভাবে গরীব গোলাম ও বাঁদীদেরকে গোলামী মুক্ত করার জন্য অর্থ ব্যয় করতে দেখে তাঁর পিতা তাকে বলেন, হে পুত্র! আমি দেখছি তুমি দুর্বল লোকদের মুক্ত করে দিচ্ছো, যদি এ টাকাটা তুমি শক্তিশালী জোয়ানদের মুক্ত করার জন্য খরচ করতে তাহলে তারা তোমার হাতকে শক্তিশালী করতো। একথায় হযরত আবু বকর (রা) তাঁকে বলেনঃ اى اباه انما اريد ما عندالله 'আব্বাজান! আমি তো আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান চাই।"

১১. এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। দু'টি অর্থই সঠিক। একটি অর্থ হচ্ছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। আর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, শীঘ্রই আল্লাহ এ ব্যক্তিকে এতসব কিছু দেবেন যার ফলে সে খুশী হয়ে যাবে।

আদ দুহা

৯৩

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ ওয়াদ্‌দুহা (وَالضُّحٰى) -কে এই সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এই সূরার বক্তব্য বিষয় থেকে একথা পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এটি মক্কা মু'আয্‌যমায় প্রথম যুগে নাযিল হয়। হাদীস থেকেও জানা যায়, কিছুদিন অহীর অবতরণ বন্ধ ছিল। এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। বারবার তাঁর মনে এই আশংকার উদয় হচ্ছিল, হয়তো তাঁর এমন কোন ত্রুটি হয়ে গেছে যার ফলে তাঁর রব তাঁর প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন এবং তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। এ জন্য তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, কোন প্রকার অসন্তুষ্টির কারণে অহীর সিলসিলা বন্ধ করা হয়নি। বরং এর পেছনে সেই একই কারণ সক্রিয় ছিল যা আলোকোজ্জ্বল দিনের পরে রাতের নিস্তব্ধতা এ প্রশান্তি ছেয়ে যাবার মধ্যে সক্রিয় থাকে। অর্থাৎ অহীর প্রখর কিরণ যদি একনাগাড়ে তাঁর প্রতি বর্ষিত হতো তাহলে তাঁর স্নায়ু তা বরদাশত করতে পারতো না। তাই মাঝখানে বিরতি দেয়া হয়েছে। তাঁকে আরাম ও প্রশান্তি দান করাই এর উদ্দেশ্য। নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অবস্থার মুখোমুখি হন। সে সময় অহী নাযিলের কষ্ট বরদাশত করার অভ্যাস তাঁর গড়ে ওঠেনি। তাই মাঝে মাঝে ফাঁক দেবার প্রয়োজন ছিল। সূরা মুদ্‌দাস্‌সিরের ভূমিকায় আমি একথা সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেছি। আর অহী নাযিলের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্নায়ুর ওপর এর কী গভীর প্রভাব পড়তো তা আমি সূরা মুয্‌যাম্মিলের ৫ টীকায় বলেছি। পরে তাঁর মধ্যে এই মহাভার বরদাশ্‌ত করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়ে গেলে আর দীর্ঘ ফাঁক দেবার প্রয়োজন থাকেনি।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া। আর এই সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্য ছিল অহী নাযিলের সিলসিলা বন্ধ হয়ে যাবার কারণে তাঁর মধ্যে যে পেরেশানী দেখা দিয়েছিল তা দূর করা। প্রথমে আলো ঝলমল দিনের এবং রাতের নীরবতা ও প্রশান্তির কসম খেয়ে তাঁকে এই মর্মে নিশ্চিন্ততা দান করা হয়েছে যে, তার রব তাঁকে মোটেই পরিত্যাগ করেননি এবং তিনি তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হননি। এরপর তাঁকে

সুসংবাদ দান করা হয়েছে যে, ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁকে যেসব কঠিন সমস্যা ও সংকটের সম্মুখীন হতে হচ্ছে এগুলো মাত্র কয়েকদিনের ব্যাপার। তাঁর জন্য পরবর্তী প্রত্যেকটি পর্যায় পূর্ববর্তী পর্যায় থেকে উন্নততর হয়ে যেতেই থাকবে এবং কিছুদিনের মধ্যেই মহান আল্লাহ তাঁর ওপর এমনভাবে তাঁর দান বর্ষণ করতে থাকবেন যার ফলে তিনি খুশী হয়ে যাবেন। কুরআনের যেসব সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীকালে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয় এটি তার অন্যতম। অথচ যে সময় এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তখন যেসব অসহায় সাহায্য-সম্বলহীন ব্যক্তি মক্কায় সমগ্র জাতির জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ছিল তারা যে কোনদিন এত বড় বিস্ময়কর সাফল্যের মুখ দেখবে এর কোন দূরবর্তী আলামতও কোথাও দেখা যায়নি।

তারপর মহান আল্লাহ তাঁর বন্ধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করেছি এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছি—এ ধরনের পেরেশানীতে তুমি ভুগছো কেন? আমি তো তোমার জন্মের দিন থেকেই তোমার প্রতি অবিরাম মেহেরবানী করে আসছি। তুমি এতিম অবস্থায় জন্মলাভ করেছিলে। আমি তোমার প্রতিপালন ও রক্ষাণাবেক্ষণের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা করেছি। তুমি অনভিজ্ঞ ছিলে। আমি তোমাকে পথের সন্ধান দিয়েছি। তুমি অর্থ-সম্পদহীন ছিলে। আমি তোমাকে বিত্তশালী করেছি। এসব কথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, তুমি শুরু থেকেই আমার প্রিয়পাত্র আছো এবং আমার মেহেরবানী, অনুগ্রহ দান স্থায়ীভাবে তোমার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সূরা ত্বা-হা'র ৩৭ থেকে ৪২ পর্যন্ত আয়াতগুলোও সামনে রাখতে হবে। এই আয়াতগুলোতে হযরত মূসাকে ফেরাউনের মতো শক্তিশালী জালেমের বিরুদ্ধে পাঠাবার সময় আল্লাহ তাঁর পেরেশানী দূর করার জন্য তাঁর জন্মের পর থেকে কিভাবে আল্লাহর মেহেরবানী তাঁকে ঘিরে রেখেছিল সে কথা তাঁকে বলেন। এই সংগে তাঁকে একথাও বলেন যে, এ অবস্থায় তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, এই ভয়াবহ অভিযানে তুমি একাকী থাকবে না বরং আমার মেহেরবানীও তোমার সাথে থাকবে।

সবশেষে মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যেসব অনুগ্রহ করেছেন তার জবাবে আল্লাহর সৃষ্টির সাথে তাঁর কি ধরনের আচরণ করা উচিত এবং তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া কিভাবে আদায় করতে হবে একথা তাঁকে জানিয়ে দেন।

আয়াত ১১ **সূরা আদ দুহা-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالضُّحٰى ۝١ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۝٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۝٣
وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ۝٤ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۝٥

উজ্জ্বল দিনের কসম[১] এবং রাতের কসম যখন তা নিঝুম হয়ে যায়।[২] (হে নবী!) তোমার রব তোমাকে কখনো পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি।[৩] নিসন্দেহে তোমার জন্য পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে ভালো।[৪] আর শীঘ্রই তোমার রব তোমাকে এত দেবেন যে, তুমি খুশী হয়ে যাবে।[৫]

১. এখানে 'দুহা' শব্দটি রাতের মোকাবেলায় ব্যবহার করা হয়েছে তাই এর অর্থ উজ্জ্বল দিবা। সূরা আ'রাফের নিম্নোক্ত আয়াতটিকে এর নজীর হিসেবে পেশ করা যায় ঃ

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ -

'জনপদবাসীরা কি এ ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে পড়েছে যে, তাদের ওপর রাতে আমার আযাব আসবে যখন তারা ঘুমিয়ে থাকবে? আর জনপদের লোকেরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে তাদের ওপর দিন-দুপুরে আমার আযাব আসবে যখন তারা খেলতে থাকবে?" (৯৭-৯৮ আয়াত) এই আয়াতগুলোতেও "দুহা" (ضُحًى) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে রাতের মোকাবেলায়। আর এর অর্থ চাশ্‌ত এর সময় নয়, বরং দিন।

২. মূলে রাতের সাথে سَجٰى শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার মধ্যে শুধুমাত্র অন্ধকার ছেয়ে যাবারই নয় বরং নিঝুম ও শান্ত হয়ে যাবার অর্থও পাওয়া যায়। সামনের দিকে যে বর্ণনা আসছে তার সাথে রাতের এই গুণাবলীর গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

৩. হাদীস থেকে জানা যায়, কিছুদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল বন্ধ ছিল। এ সময়টা কতদিনের ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন বক্তব্য এসেছে। ইবনে জুরাইজ ১২ দিন, কালবী ১৫ দিন, ইবনে আব্বাস ২৫ দিন, সুদ্দী ও মুকাতিল এর মেয়াদ ৪৫ দিন বলে বর্ণনা করেছেন। মোটকথা, সময়টা এত দীর্ঘ ছিল যে, রসূলুল্লাহ (সা) নিজে এ জন্য ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিলেন এবং বিরোধীরাও তাঁকে বিদ্রূপ করতে শুরু করেছিল। কারণ তাঁর ওপর নতুন নতুন সূরা নাযিল হলে তিনি তা

লোকদের শুনাতেন। তাই দীর্ঘদিন যখন তিনি লোকদেরকে কোন অহী শুনালেন না তখন বিরোধীরা মনে করলো এ কালাম যেখান থেকে আসতো সে উৎস বন্ধ হয়ে গেছে। জন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ আল বাজালী (রা) রেওয়ায়াত করেন, যখন জিব্রীল আলাইহিস সালামের আসার সিলসিলা থেমে গেলো, মুশরিকরা বলতে শুরু করলো ঃ মুহাম্মাদকে (সা) তাঁর রব পরিত্যাগ করেছেন। (ইবনে জারীর, তাবারানী, আব্‌দ ইবনে হুমাইদ, সাঈদ ইবনে মনসূর ও ইবনে মারদুইয়া) অন্যান্য বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, রসূল (সা)–এর চাচী আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীলের ঘর ছিল তাঁর ঘরের সাথে লাগোয়া। সে তাঁকে ডেকে বললো ঃ "মনে হচ্ছে তোমার শয়তান তোমাকে পরিত্যাগ করেছে।" আউফী ও ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করে বলেন ঃ কয়েকদিন পর্যন্ত জিব্রীলের আসা বন্ধ থাকার কারণে রসূলুল্লাহ (সা) পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন। অন্যদিকে মুশরিকরা বলতে শুরু করলো, তার রব তার প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন এবং তিনি তাকে পরিত্যাগ করেছেন। কাতাদাহ ও যাহ্‌হাক বর্ণিত মুরসাল* হাদীসেও প্রায় এই একই ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এ অবস্থায় বিভিন্ন হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) গভীর দুঃখ ও মর্মব্যথার কথাও বর্ণিত হয়েছে। আর এমনটি হওয়াই তো স্বাভাবিক ছিল। কারণ প্রেমাস্পদের দিক থেকে বাহ্যত অমনোযোগিতা ও উপেক্ষা, কুফর ও ঈমানের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে যাবার পর এই প্রাণান্তকর সংঘাত সংগ্রামের মাঝ দরিয়ায় যে শক্তিটি ছিল তাঁর একমাত্র সহায় তার সাহায্য থেকে বাহ্যত বঞ্চিত হওয়া এবং এর ওপর বাড়তি বিপদ হিসেবে শত্রুদের বিদ্রূপ–ভর্ৎসনা ইত্যাদি এসব কিছু মিলে অবশ্যি তাঁর জন্য মারাত্মক ধরনের পেরেশানী সৃষ্টি করে দিয়েছিল। এ অবস্থায় তাঁর মনে বারবার এ সন্দেহ জেগে থাকবে যে, তিনি এমন কোন ভুল তো করেননি যার ফলে তাঁর রব তাঁর প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন এবং তিনি হক ও বাতিলের এই লড়াইয়ে তাঁকে একাকী ছেড়ে দিয়েছেন।

এই অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেবার জন্য সূরাটি নাযিল হয়। এতে দিনের আলোর ও রাতের নিরবতার কসম খেয়ে রসূলুল্লাহকে (সা) বলা হয়েছে ঃ তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি নারাজও হননি। একথার জন্য যে সম্বন্ধের ভিত্তিতে এই দু'টি জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, দিনের আলোকমালায় উদ্ভাসিত হওয়া এবং রাতের নিঝুমতা ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়া যেমন আল্লাহর দিনে মানুষের প্রতি সন্তুষ্ট এবং রাতে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকার জন্য নয় বরং একটি বিরাট বিজ্ঞানময় ব্যবস্থা ও উদ্দেশ্যের আওতাধীনে এই দু'টি অবস্থার উদ্ভব হয় ঠিক তেমনি তোমার কাছে কখনো অহী পাঠানো এবং তা পাঠানো বন্ধ করাও একটি বিরাট বিজ্ঞানময় ব্যবস্থা ও উদ্দেশ্যের আওতাধীনেই হয়ে থাকে। মহান

* মুরসাল এমন এক ধরনের হাদীসকে বলা হয় যেখানে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী হিসেবে সাহাবীর নাম উল্লেখিত হয়নি অর্থাৎ তাবেয়ী সাহাবীর নাম উল্লেখ ছাড়াই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমামদের মধ্যে আবু হানিফা (র) ও মালিক (র)–ই একমাত্র এ ধরনের হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এক বর্ণনামতে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) মুরসাল হাদীসের ভিত্তিতে ফতওয়া দিয়েছেন এবং এর বিপরীত রায়কে রদ করেছেন। (আ'লামুল মুকিইন, ইবনে কাইয়েম) –অনুবাদক

আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকলে অহী পাঠান এবং যখন অহী পাঠান না তখন মনে করতে হবে, তিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তোমাকে ত্যাগ করেছেন—এ ধরনের কোন কথা বা বক্তব্যের কোন সম্পর্ক এখানে নেই। এ ছাড়া এই বিষয়বস্তুর সাথে এই কসমের আরো সম্পর্ক রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, দিনে সূর্যের কিরণ যদি অনবরত মানুষের ওপর পড়তে থাকে তাহলে তা তাকে ক্লান্ত ও অবশ করে দেবে। তাই একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত দিনের আলো বিরাজ করে। এরপরে রাতের আসা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এভাবে মানুষ ক্লান্তি দূর করতে ও প্রশান্তি লাভ করতে পারে। অনুরূপভাবে অহীর কিরণ যদি অনবরত তোমার ওপর পড়তে থাকে তাহলে তা তোমার স্নায়ুর সহ্যের অতীত হয়ে পড়বে। তাই মাঝে মধ্যে ফাতরাতুল অহীর (অহী নাযিলের সিলসিলা বন্ধ হয়ে যাওয়া) একটি সময়ও আল্লাহ ঠিক করে রেখেছেন। এভাবে অহী নাযিল হওয়ার কারণে তোমার ওপর যে চাপ পড়ে তার প্রভাব খতম হয়ে যাবে এবং তুমি মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারবে। অর্থাৎ অহী সূর্যের উদয় যেন ঠিক উজ্জ্বল দিনের সমতুল্য এবং ফাতরাতুল অহীর সময়টি রাতের প্রশান্তির পর্যায়ভুক্ত।

৪. মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সুখবরটি এমন এক সময় দেন যখন মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক ছিল তাঁর সহযোগী এবং অন্যদিকে সমগ্র জাতি ছিল তাঁর বিরোধী। বাহ্যত সাফল্যের কোন দূরবর্তী চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। ইসলামের প্রদীপ মক্কাতে টিম টিম করে জ্বলছিল। চতুরদিকে ঝড় উঠেছিল তাকে নিভিয়ে দেবার জন্য। সে সময় আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেন ঃ প্রাথমিক যুগের সংকটে তুমি মোটেই পেরেশান হয়ো না। তোমার জন্য পরবর্তী প্রত্যেকটি যুগ পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে ভালো প্রমাণিত হবে। তোমার শক্তি, সম্মান, প্রতিপত্তি ও মর্যাদা দিনের পর দিন বাড়তে থাকবে। তোমার প্রভাব ও অনুপ্রবেশের সীমানা বিস্তৃত হতেই থাকবে। আবার এই ওয়াদা কেবল দুনিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। এর মধ্যে এ ওয়াদাও আছে যে, আখেরাতে তুমি যে মর্যাদা লাভ করবে তা দুনিয়ায় তোমার অর্জিত মর্যাদা থেকে অনেক গুণ বেশী হবে। তাবারানী তাঁর আওসাত গ্রন্থে এবং বাইহাকী তাঁর দালায়েল গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "আমার পরে আমার উম্মাত যেসব দেশ জয় করবে তা আমার সামনে পেশ করা হয়। তাতে আমি খুব খুশী হই। তখন মহান আল্লাহ একথা নাযিল করেন যে, আখেরাত তোমার জন্য দুনিয়া থেকেও ভালো।"

৫. অর্থাৎ দিতে কিছুটা দেরী হলে সেসময় দূরে নয়, যখন তোমার ওপর তোমার রবের দান ও মেহেরবানী এমনভাবে বর্ষিত হবে যাতে তুমি খুশী হয়ে যাবে। এই ওয়াদাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনেই পূর্ণ হয়েছে। সমগ্র আরব ভূখণ্ড, দক্ষিণের সমুদ্র উপকূল থেকে উত্তরে রোম সাম্রাজ্যের সিরীয় সীমান্ত ও পারস্য সাম্রাজ্যের ইরাকী সীমান্ত পর্যন্ত এবং পূর্বে পারস্য উপসাগর থেকে নিয়ে পশ্চিমে লোহিত সাগর পর্যন্ত এলাকা তাঁর শাসনাধীনে চলে আসে। আরবের ইতিহাসে এই প্রথমবার এই সমগ্র ভূখণ্ডটি একটি আইন ও শাসন ব্যবস্থার আওতাধীন হয়। যে শক্তিই এর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, সে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর কালেমায় সমগ্র দেশ গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। যে দেশে মুশরিক ও আহ্‌লি কিতাবরা নিজেদের মিথ্যা মতবাদ ও

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝٦ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝٧ وَوَجَدَكَ
عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝٨ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝٩ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝١٠
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝١١

তিনি কি তোমাকে এতিম হিসেবে পাননি? তারপর তোমাকে আশ্রয় দেননি?[৬] তিনি তোমাকে পথ না পাওয়া অবস্থায় পান, তারপর তিনিই পথ দেখান।[৭] তিনি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পান, তারপর তোমাকে ধনী করেন।[৮] কাজেই এতিমের প্রতি কঠোর হয়ো না।[৯] প্রার্থীকে তিরস্কার করো না।[১০] আর নিজের রবের নিয়ামত প্রকাশ করো।[১১]

আদর্শকে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়েছিল সেখানে মানুষ কেবল আনুগত্যের শিরই নত করেনি বরং তাদের মনও বিজিত হয়ে যায় এবং তাদের বিশ্বাসে, নৈতিক চরিত্রে ও কর্মকাণ্ডে বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়। জাহেলিয়াতের গভীর পংকে নিমজ্জিত একটি জাতি মাত্র তেইশ বছরের মধ্যে এমনভাবে বদলে যায় যে, সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে এর কোন নজীর নেই। এরপর নবী (সা) যে আন্দোলনের বীজ বপন করে গিয়েছিলেন তা বিপুল শক্তিমত্তা সহকারে জেগে ওঠে এবং এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা তিন মহাদেশের বিরাট অংশে ছেয়ে যায় এবং দুনিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। এসব মহান আল্লাহ তাঁর রসূলকে দিয়েছেন দুনিয়ায়। আর আখেরাতে তাঁকে যা কিছু দেবেন তার বিপুলতা ও মহত্বের কল্পনাই করা যাবে না। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা-হা ১১২ টীকা)

৬. অর্থাৎ তোমাকে ত্যাগ করার ও তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। যখন তুমি এতিম অবস্থায় জন্মলাভ করেছিলে তখন থেকেই তো আমি তোমার প্রতি মেহেরবানী করে আসছি। মায়ের গর্ভে থাকাকালীন ছয় মাসের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতা ইন্তিকাল করেন। কাজেই এতিম হিসেবেই তিনি পৃথিবীতে আসেন। কিন্তু এ অবস্থায় মহান আল্লাহ একদিনও তাঁকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেননি। ছ'বছর বয়স পর্যন্ত মা তাঁকে লালন-পালন করতে থাকেন। তাঁর স্নেহছায়া থেকে বঞ্চিত হবার পর থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর দাদা তাঁকে প্রতিপালন করেন। দাদা কেবল তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেনই তাই না বরং তাঁর জন্য গর্বও করতেন। তিনি লোকদের বলতেন, আমার এই ছেলে একদিন দুনিয়ায় বিপুল খ্যাতির অধিকারী হবে। তার ইন্তিকালের পর চাচা আবু তালিব তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব নেন। চাচা তাঁর সাথে এমন প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করেন যে, কোন পিতার পক্ষেও এর চেয়ে বেশী প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এমনকি নবুওয়াত লাভের পর সমগ্র জাতি যখন তাঁর শত্রু হয়ে গিয়েছিল তখন দশ বছর পর্যন্ত তিনিই তার সাহায্যার্থে চীনের প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন।

৭. মূলে "দাল্লান" (ضالا) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি এসেছে "দালালাত" (ضلالت) থেকে। এর কয়েকটি অর্থ হয়। এর একটি অর্থ গোমরাহী। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এক ব্যক্তি পথ জানে না, এক জায়গায় গিয়ে সে সামনে বিভিন্ন পথ দেখে কোন্ পথে যাবে তা ঠিক করতে না পেরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এর আর একটি অর্থ হচ্ছে হারিয়ে যাওয়া বা হারানো জিনিস। আরবী প্রবাদে বলা হয়, ضَلَّ الْمَاءُ فِى اللَّبَنِ অর্থাৎ পানি দুধের মধ্যে হারিয়ে গেছে। মরুভূমির মধ্যে যে গাছটি একাকি দাঁড়িয়ে থাকে এবং তার আশেপাশে কোন গাছ থাকে না তাকেও আরবীতে "দাল্লাহ" বলা হয়। নষ্ট হয়ে যাওয়া অর্থেও "দালাল" (ضلال) বলা হয়। যেমন, অনুপযোগী ও বিরোধী পরিবেশে কোন জিনিস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেখানেও "দালাল" শব্দ ব্যবহার করা হয়। আবার গাফলতির জন্যও "দালাল" ব্যবহার করা হয়। যেমন কুরআন মজীদে এর দৃষ্টান্ত" দেখা যায় ঃ لَا يَضِلُّ رَبِّى وَلَا يَنْسَى অর্থাৎ "আমার রব না গাফেল হন আর না তিনি ভুলে যান।" (ত্বা-হা ৫২) এই বিভিন্ন অর্থের মধ্য থেকে প্রথম অর্থটি এখানে খাপ খায় না। কারণ ইতিহাসে রসূলের শৈশব থেকে নিয়ে নবুওয়াত লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত সময়-কালের যেসব অবস্থা লিপিবদ্ধ রয়েছে তাতে কোথাও তিনি কখনো মূর্তিপূজা, শিরক বা নাস্তিক্যবাদে লিপ্ত হয়েছিলেন অথবা তাঁর জাতির মধ্যে যেসব জাহেলী কার্যকলাপ, রীতিনীতি ও আচার আচরণের প্রচলন ছিল তার সাথেও তিনি কোনক্রমে জড়িত হয়েছিলেন বলে সামান্যতম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই وَوَجَدَكَ ضَالًّا বাক্যে কোনক্রমেই এ অর্থ হতে পারে না যে, আল্লাহ তাঁকে বিশ্বাস ও কর্মের দিক থেকে গোমরাহ হিসেবে পেয়েছিলেন। তবে অন্যান্য অর্থগুলো কোন না কোনভাবে এখানে খাপ খেতে পারে। বরং বিভিন্ন দিক থেকে হয়তো প্রত্যেকটি অর্থই এখানে কার্যকর হতে পারে। নবুওয়াত লাভের পূর্বে নবী সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম আল্লাহর অস্তিত্বে ও তাঁর একত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, এতে সন্দেহ নেই। সে সময় তাঁর জীবন গোনাহ মুক্ত এবং নৈতিক গুণাবলী সমন্বিত ছিল। কিন্তু সত্যদীন এবং তার মূলনীতি ও বিধান সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে ঃ مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ অর্থাৎ "তুমি জানতে না কিতাব কি এবং ঈমানই বা কি।" (আশ্‌শূরা ৫২ আয়াত) এ আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, নবী (সা) একটি জাহেলী সমাজের বুকে হারিয়ে গিয়েছিলেন এবং নবুওয়াত লাভের আগে একজন পথপ্রদর্শক ও পথের দিশা দানকারী হিসেবে তাঁর ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্ট হয়ে সামনে আসেনি। এর এ অর্থও হতে পারে যে, জাহেলিয়াতের মরুভূমিতে আপনি দাঁড়িয়েছিলেন একটি নিসংগ বৃক্ষের মতো। এই বৃক্ষের ফল উৎপাদনের ও চারাগাছ বৃদ্ধি করে আর একটি বাগান তৈরি করার যোগ্যতা ছিল। কিন্তু নবুওয়াতের পূর্বে এ যোগ্যতা কোন কাজে লাগেনি। এ অর্থও হতে পারে যে, মহান আল্লাহ আপনাকে অসাধারণ ক্ষমতা দান করেছিলেন। জাহেলিয়াতের অনুপযোগী ও বিরোধী পরিবেশে তা নষ্ট হতে বসেছিল। "দালাল"কে গাফলতির অর্থেও ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ নবুওয়াত লাভের পরে আল্লাহ তাঁকে যেসব জ্ঞান ও সত্যের সাথে পরিচিত করিয়েছেন ইতিপূর্বে তিনি সেগুলো থেকে গাফেল ছিলেন। কুরআনেও এক জায়গায় বলা হয়েছে। وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ "আর যদিও তুমি ইতিপূর্বে এসব বিষয়ে গাফেল ছিলে।" (ইউসুফ ৩) এ ছাড়াও দেখুন সূরা আল বাকারাহ ২৮৩ আয়াত এবং আশ্ শু'আরা ২০ আয়াত)

৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৈতৃক সূত্রে উত্তরাধিকার হিসেবে শুধুমাত্র একটি উটনী ও একটি বাঁদী লাভ করেছিলেন। এভাবে দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের সূচনা হয়। তারপর এমন এক সময় আসে যখন মক্কার সবচেয়ে ধনী মহিলা হযরত খাদীজা (রা) প্রথমে ব্যবসায়ে তাঁকে নিজের সাথে শরীক করে নেন। তারপর তিনি তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হন। এভাবে তাঁর সমস্ত ব্যবসায়ের দায়িত্বও তিনি নিজের হাতে তুলে নেন। এই সূবাদে তিনি কেবল ধনীই হননি এবং তাঁর ধনাঢ্যতা নিছক স্ত্রীর ধনের ওপর নির্ভরশীল ছিল না বরং তাঁর ব্যবসায়ের উন্নতি বিধানে তাঁর নিজের যোগ্যতা ও শ্রম বিরাট ভূমিকা পালন করে।

৯. অর্থাৎ যেহেতু তুমি নিজে এতিম ছিলে, আল্লাহ তোমার প্রতি মেহেরবানী করেছেন এবং এতিম অবস্থায় সর্বোত্তম পদ্ধতিতে তোমাকে সাহায্য-সহায়তা দান করেছেন, তাই আল্লাহর এই সাহায্যের জন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তুমি কখনো কোন এতিমের প্রতি জুলুম করবে না।

১০. এর দু'টি অর্থ হয়। যদি প্রার্থীকে সাহায্য প্রার্থনাকারী অভাবী হিসেবে ধরা হয় তাহলে এর অর্থ হয়, তাকে সাহায্য করতে পারলে করো আর না করতে পারলে কোমল স্বরে তাকে নিজের অক্ষমতা বুঝিয়ে দাও। কিন্তু কোনক্রমে তার সাথে রূঢ় ব্যবহার করো না। এই অর্থের দিক দিয়ে এই নির্দেশটিকে আল্লাহর সেই অনুগ্রহের জবাবে দেয়া হয়েছে বলা যেতে পারে, যাতে বলা হয়েছে—"তুমি অভাবী ছিলে তারপর আল্লাহ তোমাকে ধনী করে দিয়েছেন। আর যদি প্রার্থীকে জিজ্ঞেসকারী অর্থাৎ দীনের কোন বিষয় বা বিধান জিজ্ঞেসকারী অর্থে ধরা হয় তাহলে এর অর্থ হয়, এই ধরনের লোক যতই মূর্খ ও অজ্ঞ হোক না কেন এবং যতই অযৌক্তিক পদ্ধতিতে সে প্রশ্ন করুক বা নিজের মানসিক সংকট উপস্থাপন করুক না কেন, সকল অবস্থায়ই স্নেহশীলতা ও কোমলতা সহকারে তাকে জবাব দাও এবং জ্ঞানের অহংকারে বদমেজাজ লোকদের মতো ধমক দিয়ে বা কড়া কথা বলে তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়ো না। এই অর্থের দিক দিয়ে এই বাণীটিকে আল্লাহর সেই অনুগ্রহের জবাবে দেয়া হয়েছে বলা যেতে পারে, যাতে বলা হয়েছে—"তুমি পথের খোঁজ জানতে না তারপর তিনিই তোমাকে পথনির্দেশনা দিয়েছেন।" হযরত আবু দারদা (রা) হাসান বসরী (র), সুফিয়ান সওরী (র) এবং অন্যান্য কয়েকজন মনীষী এই দ্বিতীয় অর্থটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ তাদের মতে বক্তব্য বিন্যাসের দিক দিয়ে বিচার করলে এ বক্তব্যটি ووجدك ضالا فهدى এর জবাবেই দেয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১১. নিয়ামত শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর অর্থ এমনসব নিয়ামত হয়, যা এই সূরাটি নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর রসূলকে দান করেছিলেন। আবার এমন সব নিয়ামতও হয়, যা এই সূরায় প্রদত্ত নিজের ওয়াদা এবং পরবর্তীকালে তা পূর্ণতা দান প্রসংগে তিনি রসূলকে প্রদান করেছিলেন। এর ওপর আবার হুকুম দেয়া হয়েছে, হে নবী! আল্লাহ তোমাকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন তার প্রত্যেকটির কথা স্মরণ কর। এ নিয়ামত প্রকাশ করার পদ্ধতি বিভিন্ন হতে পারে এবং নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী প্রতিটি নিয়ামত বিশেষ আকারে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। সামগ্রিকভাবে সমস্ত নিয়ামত প্রকাশের পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ মুখে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে এবং

একথার স্বীকৃতি দিতে হবে যে, আমি যেসব নিয়ামত লাভ করেছি সবই আল্লাহর মেহেরবানী ও অনুগ্রহের ফল। নয়তো এর মধ্যে কোন একটিও আমার নিজের ব্যক্তিগত উপার্জনের ফসল নয়। দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে নবুওয়াতের নিয়ামত প্রকাশ করা যেতে পারে। লোকদের মধ্যে বেশী বেশী করে কুরআন প্রচার করে এবং তার শিক্ষাবলীর সাহায্যে মানুষের হৃদয়দেশ আলোকিত করে কুরআনের নিয়ামত প্রকাশ করা যেত পারে। পথহারা মানুষদের সরল সত্য পথ দেখিয়ে দিয়ে এবং সবরের সাহায্যে এই কাজের যাবতীয় তিক্ততা ও কষ্টের মোকাবেলা করে হেদায়াত লাভের নিয়ামত প্রকাশ করা যেতে পারে। এতিম অবস্থায় সাহায্য–সহায়তা দান করে আল্লাহ যে অনুগ্রহ দেখিয়েছেন এতিমদের সাথে ঠিক তেমনি অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার করে এই নিয়ামতটি প্রকাশ করা যেতে পারে। দারিদ্র্য ও অভাব থেকে সচ্ছলতা ও ধনাঢ্যতা দান করার জন্য যে অনুগ্রহ আল্লাহ করেছেন অভাবী মানুষদের সাহায্য করেই সেই নিয়ামত প্রকাশ করা যেতে পারে। মোটকথা, আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ ও নিয়ামতসমূহ বর্ণনা করার পর একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে তাঁর রসূলকে এই গভীর ও ব্যাপক অর্থপূর্ণ হেদায়াত দান করেন।

আলাম নাশরাহ

৯৪

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ দু'টিকেই এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

সূরা আদ্ দুহার সাথে এর বিষয়বস্তুর গভীর মিল দেখা যায়। এ থেকে মনে হয় এ সূরা দু'টি প্রায় একই সময়ে একই অবস্থার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মক্কা মু'আয্যমায় আদ্ দুহার পরেই এই সূরাটি নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটির উদ্দেশ্যও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দান করা। নবুওয়াত লাভ করার পর ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করার সাথে সাথেই তাঁকে যেসব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, নবুওয়াত লাভের আগে তাঁকে কখনো তেমনি অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়নি। তাঁর নিজের জীবনে এটি ছিল একটি মহাবিপ্লব। নবুওয়াত পূর্ব জীবনে এ ধরনের কোন বিপ্লবের ধারণা তাঁর ছিল না। তিনি ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করার সাথে সাথেই দেখতে দেখতে সমগ্র সমাজ তাঁর দুশমন হয়ে যায়। অথচ পূর্বে এই সমাজে তাঁকে বড়ই মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হতো। যেসব আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গোত্রীয় লোকজন ও মহল্লাবাসী ইতিপূর্বে তাঁকে মাথায় তুলে রাখতো তারাই এখন তাঁকে গালিগালাজ করতে থাকে। মক্কায় এখন আর কেউ তাঁর কথা শুনতে প্রস্তুত ছিল না। পথে তাঁকে দেখলে লোকেরা শিস দিতো, যা তা মন্তব্য করতো। প্রতি পদে পদে তিনি সংকটের সম্মুখীন হতে থাকেন। যদিও ধীরে ধীরে এসব অবস্থার মোকাবেলা করতে তিনি অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু তবুও এই প্রথম দিকের দিনগুলো তাঁর জন্য ছিল বড়ই কঠিন এবং এগুলো তাঁর মনোবল ভেঙ্গে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল।

এ জন্য তাঁকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে প্রথমে সূরা আদ্ দুহা এবং পরে এই সূরাটি নাযিল হয়।

এই সূরায় মহান আল্লাহ প্রথমেই তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন; আমি তোমাকে তিনটি বিরাট বিরাট নিয়ামত দান করেছি। এগুলোর উপস্থিতিতে তোমার মানসিক দিক দিয়ে ভেঙ্গে পড়ার কোন কারণ নেই। তার মধ্যে একটি হচ্ছে হৃদয়দেশ উন্মুক্ত করে দেয়ার নিয়ামত। দ্বিতীয় নিয়ামতটি হচ্ছে, নবুওয়াত লাভের পূর্বে যে ভারী বোঝা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল তা কি আমি তোমার ওপর থেকে নামিয়ে দেইনি? তৃতীয়টি হচ্ছে, সুনাম ও

সুখ্যাতিকে উঁচু আসনে প্রতিষ্ঠিত করার নিয়ামত। এই নিয়ামতটি তাঁর চেয়ে বেশী আর কাউকে দেয়া তো দূরের কথা তাঁর সমানও কাউকে কখনো দেয়া হয়নি। সামনের দিকের ব্যাখ্যায় আমি এ তিনটি নিয়ামত বলতে কি বুঝানো হয়েছে এবং এগুলো কত বড় নিয়ামত ছিল তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

এরপর বিশ্ব-জাহানের প্রভু তাঁর বান্দা ও রসূলকে এই মর্মে নিশ্চন্ততা দান করেছেন যে, সমস্যা ও সংকটের যে যুগের মধ্য দিয়ে তুমি এগিয়ে চলছো এটা কোন সুদীর্ঘ যুগ নয়। বরং এখানে সমস্যা, সংকট ও সংকীর্ণতার সাথে সাথে প্রশস্ততার যুগও চলে আসছে। এই এক কথাই সূরা আদ্ দুহায় এভাবে বলা হয়েছে ঃ তোমার জন্য প্রত্যেকটি পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে ভালো হবে এবং শ্রীঘ্রই তোমার রব তোমাকে এমন সবকিছু দেবেন যাতে তোমার মন খুশীতে ভরে যাবে।

সবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, প্রাথমিক যুগের এসব কঠিন অবস্থার মোকাবেলা করার শক্তি তোমার মধ্যে সৃষ্টি হবে একটি মাত্র জিনিসের সাহায্যে। সেটি হচ্ছে ঃ নিজের কাজ-কর্ম থেকে ফুরসত পাবার সাথে সাথেই তুমি পরিশ্রম পূর্ণ ইবাদাত ও আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত হয়ে যাও। আর সমস্ত জিনিসের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের রবের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো এটি সেই একই উপদেশের পুনরাবৃত্তি যা সূরা মুয্যাম্মিলের ৯ আয়াতে আরো বেশী বিস্তারিতভাবে তাঁকে দান করা হয়েছে।

আয়াত ৮ **সূরা আলাম নাশরাহ-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝٢ الَّذِيْٓ اَنْقَضَ
ظَهْرَكَ ۝٣ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥ اِنَّ مَعَ
الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝٧ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝٨

হে নবী! আমি কি তোমার বক্ষদেশ তোমার জন্য উন্মুক্ত করে দেইনি ?[১] আমি তোমার ওপর থেকে ভারী বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, যা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল।[২] আর তোমার জন্য তোমার খ্যাতির কথা বুলন্দ করে দিয়েছি।[৩] আসলে সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও রয়েছে।[৪] অবশ্যই সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও রয়েছে। কাজেই যখনই অবসর পাও ইবাদাতের কঠোর শ্রমে লেগে যাও এবং নিজের রবেরই প্রতি মনোযোগ দাও।[৫]

১. এ প্রশ্নটি সহকারে বক্তব্য শুরু করায় এবং এর পরবর্তী বক্তব্য যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে তা থেকে প্রকাশ হয় ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করার পর প্রথম যুগে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব কঠিন বিপদ ও সমস্যার সম্মুখীন হন সেগুলো তাঁকে ভীষণভাবে পেরেশান করে রেখেছিল। এ অবস্থায় আল্লাহ তাঁকে সম্বোধন করে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, হে নবী ! আমি কি তোমার প্রতি অমুক অমুক মেহেরবানী করিনি ? তাহলে এই প্রাথমিক সংকটগুলোর মুখোমুখি হয়ে তুমি পেরেশান হচ্ছো কেন ?

কুরআন মজীদের যেসব জায়গায় বক্ষদেশ উন্মুক্ত করে দেবার শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে সেগুলোর দু'টি অর্থ জানা যায়। এক, সূরা আন'আমের ১২৫ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ "কাজেই যে ব্যক্তিকে আল্লাহ হেদায়াত দান করার সংকল্প করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।" আর সূরা যুমারের ২২ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ –

"তাহলে কি যার বক্ষদেশ আল্লাহ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তারপর যে তার রবের পক্ষ থেকে একটি আলোর দিকে চলেছে.....?"

এই উভয় স্থানে বক্ষদেশ উন্মুক্ত করার অর্থই হচ্ছে, সব রকমের মানসিক অশান্তি ও সংশয় মুক্ত হয়ে একথার ওপর নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া যে, ইসলামের পথই একমাত্র সত্য এবং ইসলাম মানুষকে যে আকীদা-বিশ্বাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নৈতিকতার যে মূলনীতি এবং যে হেদায়াত ও বিধিবিধান দান করেছে তা সম্পূর্ণ সঠিক ও নির্ভুল। দুই, সূরা শু'আরার ১২-১৩ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ যখন হযরত মূসাকে নবুওয়াতের মহান দায়িত্বে নিযুক্ত করে ফেরাউন ও তার বিশাল সাম্রাজ্যের সাথে সংঘাত-সংঘর্ষের হুকুম দিচ্ছিলেন তখন হযরত মূসা (আ) আরয করেন ঃ

رَبِّ اِنِّیْٓ اَخَافُ اَنْ یُّکَذِّبُوْنِ وَیَضِیْقُ صَدْرِیْ

"হে আমার রব! আমার ভয় হচ্ছে তারা আমাকে মিথ্যা বলবে এবং আমার বক্ষদেশ সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।"

আর সূরা ত্বা-হা'র ২৫-২৬ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

رَبِّ اشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ وَیَسِّرْ لِیْٓ اَمْرِیْ

"হে আমার রব! আমার বক্ষদেশ আমার জন্য খুলে দাও এবং আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও।"

এখানে সংকীর্ণতার মানে হচ্ছে, নবুওয়াতের মতো একটি মহান দায়িত্ব সম্পাদন করার এবং একটি অতি পরাক্রমশালী কুফরী শক্তির সাথে একাকী সংঘর্ষ মুখর হবার হিম্মত মানুষের হয় না। আর বক্ষদেশের প্রশস্ততার মানে হচ্ছে, হিম্মত বুলন্দ হওয়া, কোন বৃহত্তর অভিযানে অগ্রসর হওয়া ও কোন কঠিনতর কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে ইতস্তত না করা এবং নবুওয়াতের মহান দায়িত্ব পালন করার হিম্মত সৃষ্টি হওয়া।

একটু চিন্তা করলে এ বিষয়টি অনুভব করা যায় যে, এই আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্ষদেশ উন্মুক্ত করে দেবার এ দু'টি অর্থই প্রযোজ্য। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে এর মানে হয়, নবুওয়াত লাভের পূর্বে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবের মুশরিক, খৃষ্টান, ইহুদী, অগ্নি উপাসক সবার ধর্মকে মিথ্যা মনে করতেন আবার আরবের কোন কোন তাওহীদের দাবীদারের মধ্যে যে 'হানীফী' ধর্মের প্রচলন ছিল তার প্রতিও তিনি আস্থাশীল ছিলেন না। কারণ এটি ছিল একটি অস্পষ্ট আকীদা। এখানে সঠিক পথের কোন বিস্তারিত চেহারা দেখা যেতো না। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা আস সাজ্‌দার ৫ টীকায় আমি এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি।) কিন্তু তিনি নিজে যেহেতু সঠিক পথ জানতেন না তাই মারাত্মক ধরনের মানসিক সংশয়ে ভুগছিলেন। নবুওয়াত দান করে আল্লাহ তাঁর এই সংশয় দূর করেন। তাঁর সামনে সঠিক পথ উন্মুক্ত করে মেলে ধরেন। এর ফলে তিনি পূর্ণ মানসিক নিশ্চন্ততা ও প্রশান্তি লাভ করেন। দ্বিতীয় অর্থটির দৃষ্টিতে এর মানে হয়, নবুওয়াত দান করার সাথে সাথে এই মহান দায়িত্বের বোঝা উঠাবার জন্য যে ধরনের মনোবল, সাহস, সংকল্পের দৃঢ়তা এবং মানসিক উদারতা ও প্রশস্ততার প্রয়োজন তা আল্লাহ তাঁকে দান করেন। তিনি এমন বিপুল ও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হন, যা তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন মানুষের মধ্যে স্থিতি লাভ করতে পারতো না। তিনি এমন বাস্তব বুদ্ধি ও কলাকৌশলের অধিকারী হন, যা বৃহত্তম বিকৃতি দূর ও সংশোধন করার যোগ্যতা

রাখতো। তিনি জাহেলিয়াতের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে থাকা এবং নিরেট মূর্খ ও অজ্ঞ সমাজে কোন প্রকার সহায় সম্বল ও বাহ্যত কোন পৃষ্ঠপোষকতাহীন শক্তির সহায়তা ছাড়াই ইসলামের পতাকাবাহী হয়ে দাঁড়িয়ে যাবার, বিরোধিতা ও শত্রুতার বড় বড় তুফানের মোকাবেলায় ইতস্তত না করার এবং এই পথে যেসব কষ্ট ও বিপদ আপদ আসে সবরের সাথে তা বরদাশ্‌ত করার যোগ্যতা অর্জন করেন। কোন শক্তিই তাঁকে নিজের অবস্থান থেকে এক বিন্দু সরিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখতো না। এই বক্ষদেশ উন্মোচন এবং হৃদয়ের অংগন প্রশস্ত করার অমূল্য সম্পদ যখন তাঁকে দান করা হয়েছে তখন কাজের সূচনা লগ্নে যেসব সমস্যা সংকল্প-বিপদ-কষ্ট দেখা দিয়েছে তাতে তিনি মর্মাহত হচ্ছেন কেন?

কোন কোন তাফসীরকার বক্ষদেশ উন্মুক্ত করাকে বক্ষ বিদীর্ণ করা অর্থে গ্রহণ করেছেন। মূলত এই মু'জিযাটির প্রমাণ হাদীস নির্ভর। কুরআন থেকে এর প্রমাণ পেশ করার চেষ্টা করা ঠিক নয়। আরবী ভাষার দিক দিয়ে বক্ষদেশ উন্মুক্ত করাকে (شرح صدر) কোনভাবেই বক্ষবিদীর্ণ করার (شق صدر) অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে না। আল্লামা আলূসী রুহুল মা'আনী গ্রন্থে বলেন ঃ

حمل الشرح فى الاية على شق الصدر ضعيف عند المحققين

"গবেষক আলেমগণের মতে এই আয়াতে উন্মুক্ত করাকে বক্ষবিদীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা একটি দুর্বল কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

২. কোন কোন মুফাস্‌সির এর অর্থ এভাবে নিয়েছেন যে, নবুওয়াত পূর্ব জাহেলী যুগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কিছু ত্রুটি করেছিলেন যেগুলোর চিন্তায় তিনি অত্যন্ত পেরেশান থাকতেন এবং যেগুলো তাঁর কাছে অত্যন্ত ভারী মনে হতো। এই আয়াতটি নাযিল করে আল্লাহ তাঁর এই ত্রুটি মাফ করে দিয়েছেন বলে তাঁকে নিশ্চিন্ত করে দেন। কিন্তু আমার মতে, এখানে এই অর্থ গ্রহণ করা এক মারাত্মক পর্যায়ের ভুল। প্রথমত "বিয্‌রুন" (وزر) শব্দের অর্থ যে অবশ্যই গোনাহ হতে হবে তা নয়। বরং ভারী বোঝা অর্থেও এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তাই অযথা একে খারাপ অর্থে গ্রহণ করার কোন কারণ নেই। দ্বিতীয়ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত পূর্ব জীবনও এত বেশী পাক পরিচ্ছন্ন ছিল যার ফলে কুরআন মজীদের বিরোধীদের সামনে তাকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। তাই কাফেরদেরকে সম্বোধন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ দিয়ে একথা বলানো হয়েছে ঃ

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ "এই কুরআন পেশ করার আগে তোমাদের মধ্যে আমি জীবনের একটি বিরাট অংশ অতিবাহিত করেছি।" (ইউনুস ১৬ আয়াত) আবার সবাইকে লুকিয়ে গোপনে গোপনে একটি গোনাহ করবেন এমন ধরনের লোকও তিনি ছিলেন না। (নাউযুবিল্লাহ) এমনটি যদি হতো, তাহলে আল্লাহ সে সম্পর্কে অনবহিত থাকতেন না এবং নিজের চরিত্রে গোপন কলংক বহন করে ফিরছেন এমন এক ব্যক্তির মুখ দিয়ে সর্ব সমক্ষে সূরা ইউনুসের পূর্বোল্লিখিত আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে তা বলাতেন না। কাজেই আসলে এই আয়াতে "বিয্‌র" শব্দের সঠিক অর্থ হচ্ছে ভারী বোঝা। আর এই ভারী বোঝা বলতে নিজের জাতির মূর্খতা ও জাহেলী কর্মকাণ্ড দেখে তাঁর অনুভূতিপ্রবণ মন যেভাবে দুঃখ, ব্যথা, কষ্ট, দুশ্চিন্তা ও মর্মবেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে

উঠেছিল তাই এখানে বুঝানো হয়েছে। তিনি দেখছিলেন লোকেরা হাতে বানানো মূর্তির পূজা করছে। চারদিকে শিরক ও শিরক উৎপাদিত কল্পনাবাদ ও কুসংস্কারের ছড়াছড়ি নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও নৈতিক চরিত্রের অবনতি গোটা সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। সমাজে জুলুম, নিপীড়ন ও লেনদেনের ক্ষেত্রে বিপর্যয় ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। শক্তিশালীদের পাঞ্জার নীচে শক্তিহীনরা পিষে মরছিল। মেয়েদের জীবন্ত কবর দেয়া হচ্ছিল। এক গোত্র অন্য গোত্রের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে লুটতরাজ করতো। কোন কোন ক্ষেত্রে শত শত বছর পর্যন্ত চলতো প্রতিশোধমূলক লড়াইয়ের জের। কারো পেছনে শক্তিশালী দলীয় শক্তি ও মজবুত জনবল না থাকলে তার ধন, প্রাণ, ইজ্জত, আবরু সংরক্ষিত থাকতো না। এই অবস্থা দেখে তিনি মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হতেন। কিন্তু এই গলদ দূর করার কোন পথই তিনি দেখছিলেন না। এই চিন্তাই তাঁর কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল। মহান আল্লাহ হেদায়াতের পথ দেখিয়ে এই বিরাট বোঝা তাঁর ওপর থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন। নবুওয়াতের দায়িত্বে সমাসীন হতেই তিনি জানতে পেরেছিলেন, তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের ওপর ঈমান আনাই এমন একটি চাবিকাঠি যা দিয়ে মানব জীবনের সব রকমের বিকৃতির তালা খোলা যেতে পারে এবং জীবনের সকল দিকে সংশোধনের পথ পরিষ্কার করা যেতে পারে। মহান আল্লাহর এই পথনির্দেশনা তাঁর মানসিক দুশ্চিন্তার সমস্ত বোঝা হালকা করে দিয়েছিল। এর মাধ্যমে তিনি কেবল আরবের নয় বরং আরবের বাইরে ও সমগ্র দুনিয়ার মানব সমাজ যেসব অন্যায় ও দুষ্কৃতিতে লিপ্ত ছিল তা থেকে তাদেরকে মুক্ত করতে পারবেন বলে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন।

৩. যে সময় একথা বলা হয়েছিল তখন কেউ কল্পনাও করতে পারতো না যে, মাত্র হাতেগোণা কয়েকজন লোক যে ব্যক্তির সংগী হয়েছে এবং কেবলমাত্র মক্কা শহরের মধ্যে যার সমস্ত কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ, তাঁর আওয়াজ আবার কেমন করে সারা দুনিয়ায় বুলন্দ হবে এবং কোন্ ধরনের খ্যাতিই বা তিনি অর্জন করবেন। কিন্তু এই অবস্থায় আল্লাহ তাঁর রসূলকে এ সুসংবাদ দিলেন এবং অদ্ভুত পদ্ধতিতে তা বাস্তবায়িতও করলেন। সর্বপ্রথম তাঁর নাম বুলন্দ ও তাঁর চর্চা ব্যাপক করার কাজ সম্পন্ন করলেন তিনি তাঁর শত্রুদের সাহায্যে। মক্কার কাফেররা তার ক্ষতি করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করলো। এর মধ্যে একটি পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ ঃ হজ্জের সময় আরবের সমগ্র এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক লোক মক্কা শহরে জমায়েত হতো। এ সময় কাফেরদের প্রতিনিধি দল হাজীদের প্রত্যেকটি তাঁবুতে যেতো এবং তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দিতো যে, এখানে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামে একজন ভয়ংকর লোকের আবির্ভাব হয়েছে। তিনি লোকদের ওপর এমনভাবে যাদু করেন যার ফলে পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই, ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কাজেই আপনারা তার সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলবেন। হজ্জের মওসুম ছাড়া অন্যান্য দিনেও যারা কাবা শরীফ যিয়ারত করতে আসতো অথবা ব্যবসায় উপলক্ষে যারা মক্কায় আসতো তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে দুর্নাম রটাতো কিন্তু এর ফলে আরবের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায়ও তাঁর নাম পৌছে গেলো। মক্কার অপরিচিত গণ্ডীর ভেতর থেকে বের করে এনে শত্রুরাই সারা আরব দেশের বিভিন্ন গোত্রের সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিল। এরপর লোকদের মনে এই প্রশ্ন জাগা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, এই লোকটি কে? কি বলতে চায়? সে কেমন লোক? তার যাদুতে কারা প্রভাবিত হচ্ছে এবং তাদের ওপর তার যাদুর কি প্রভাব পড়ছে? মক্কার কাফেরদের

প্রচারণা যত বেশী বেড়েছে লোকদের মধ্যে এই জানার আগ্রহ তত বেশী বেড়েছে। তারপর অনুসন্ধানের মাধ্যমে লোকেরা তাঁকে জেনেছে। তাঁর চরিত্র ও কাজ-কারবারের সাথে পরিচিত হয়েছে। লোকেরা কুরআন শুনেছে। তিনি যেসব বিষয় পেশ করছেন সেগুলো জেনেছে। যখন তারা দেখলো, যে জিনিসকে যাদু বলা হচ্ছে, তাতে যারা প্রভাবিত হয়েছে তাদের জীবন ধারা আরবের সাধারণ লোকদের জীবনধারা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে, তখন দুর্নাম সুনামে রূপান্তরিত হয়ে যেতে লাগলো। এমন কি হিজরতের আগেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেলো যার ফলে দূরের ও কাছের এমন কোন আরব গোত্রই ছিল না যার কোন না কোন লোক বা পুরা পরিবার ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং যার কিছু কিছু লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দাওয়াতের প্রতি সহানুভূতিশীল ও আগ্রহী হয়ে ওঠেনি। এটি ছিল তাঁর খ্যাতির কথা বুলন্দ হবার প্রথম পর্যায়। এরপর হিজরতের পর থেকে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়ে গেলো। এর মধ্যে একদিকে মোনাফেক, ইহুদি ও সমগ্র আরবের মুশরিক প্রধানরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুর্নাম রটাতে তৎপর হয়ে উঠলো এবং অন্যদিকে মদীনা তাইয়েবার ইসলামী রাষ্ট্রটি আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও আল্লাহ ভীতি, তাকওয়া, ইবাদাত, বন্দেগী, চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতা, সুষ্ঠু সামাজিকতা, ইনসাফ, ন্যায়নিষ্ঠা, মানবিক সাম্য, ধনীদের বদান্যতা, গরীবদেরকে সাহায্য সহায়তা দান, অংগীকার ও শপথ রক্ষা এবং মানুষের সাথে ব্যবহার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে সততার এমন বাস্তব নমুনা পেশ করছিল, যা মানুষের হৃদয় জয় করে চলছিল। শত্রুরা যুদ্ধের মাধ্যমে তাঁর এই বর্ধিষ্ণু প্রভাব বিলীন করতে চাইলো। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে ঈমানদারদের শক্তিশালী জামায়াত তৈরী হয়েছিল। নিয়ম-শৃংখলা, বীরত্ব-সাহসিকতা, মৃত্যুকে ভয় না করা এবং যুদ্ধাবস্থায়ও নৈতিক সীমারেখাকে কঠোরভাবে মেনে চলার মাধ্যমে এই জামায়াত নিজের শ্রেষ্ঠত্ব এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল যার ফলে সমগ্র আরব তার প্রভাবাধীন হয়ে গেলো। দশ বছরের মধ্যে তাঁর খ্যাতির কথা বুলন্দ হয়ে গেল। অর্থাৎ যে দেশে তাঁর বিরোধীরা তাঁকে বদনাম করার জন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল তার সমগ্র এলাকায় এবং প্রত্যন্ত প্রদেশে ও সর্বত্র "আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" এর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। তারপর এই তৃতীয় পর্যায়টি শুরু হলো খোলাফায়ে রাশেদার শাসনামল থেকে। সে সময় তাঁর মুবারক নাম সারা দুনিয়ায় উচ্চারিত হতে লাগলো। এই সিলসিলাটি আজ পর্যন্ত বেড়েই চলছে। ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত বেড়ে যেতেই থাকবে। দুনিয়ার এমন কোন জায়গা নেই যেখানে মুসলমানদের কোন জনপদ নেই এবং দিনের মধ্যে পাঁচবার আযানের মধ্যে বুলন্দ আওয়াজে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের ঘোষণা করা হচ্ছে না, নামাযে রসূলুল্লাহর (সা) ওপর দরূদ পড়া হচ্ছে না, জুম'আর খুতবায় তাঁর পবিত্র নাম পাঠ করা হচ্ছে না এবং বছরের বারো মাসের মধ্যে কোন সময় এমন নেই যখন সারা দুনিয়ার কোন না কোন জায়গায় তাঁর মুবারক নাম উচ্চারিত হচ্ছে না। নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে যখন আল্লাহ বলেছিলেন (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) (আর তোমার নাম ও খ্যাতির কথা আমি বুলন্দ করে দিয়েছি অর্থাৎ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে সম্প্রচার করেছি।) তখন কেউ একথা অনুমানই করতে পারতো না যে, এমন সাড়ম্বরে ও ব্যাপকভাবে এই নাম বুলন্দ করার কাজটি সম্পন্ন হবে। এটি কুরআনের সত্যতার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেছেন ঃ "জিব্রীল আমার কাছে আসেন। আমাকে বলেন, আমার রব ও আপনার রব জিজ্ঞেস করছেন ঃ আমি কিভাবে তোমার নাম বুলন্দ (رَفَعْ ذِكْرَ) করেছি? আমি আরজ করি, আল্লাহ্ ভালো জানেন। তিনি বলেন, আল্লাহর উক্তি হচ্ছে ঃ যখন আমার নাম বলা হয় তখন সেই সাথে তোমার নামও বলা হবে।" (ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, মুসনাদে আবু লাইলা, ইবনুল মুনযির, ইবনে হিব্বান, ইবনে মারদুইয়া ও আবু নু'আইম) পরবর্তীকালের সমগ্র ইতিহাস সাক্ষ দিচ্ছে, একথাটি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়েছে।

৪. একথাটি দু'বার বলা হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পুরোপুরি সান্ত্বনা দেয়াই এর উদ্দেশ্য। সে সময় তিনি যে কঠিন অবস্থা ও পর্যায় অতিক্রম করেছিলেন তা বেশীক্ষণ স্থায়ী থাকবে না বরং এরপর শিগ্‌গির ভালো অবস্থা শুরু হবে, একথা তাঁকে বুঝিয়ে দেয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। আপাত দৃষ্টিতে সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততা এবং দারিদ্র্যের সাথে সচ্ছলতা এ দু'টি পরস্পর বিরোধী জিনিস একই সময় একসাথে জমা হতে পারে না। কিন্তু তবুও সংকীর্ণতার পর প্রশস্ততা না বলে সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততা এই অর্থে বলা হয়েছে যে, প্রশস্ততার যুগ এত বেশী নিকটবর্তী যেন মনে হয় সে তার সাথেই চলে আসছে।

৫. অবসর পাওয়ার অর্থ হচ্ছে, নিজের কাজকাম থেকে অবসর পাওয়া, তা ইসলামের দাওয়াত দেয়া ও ইসলাম প্রচারের কাজ হতে পারে বা ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে শিক্ষা ও তরবিয়ত দানের কাজও হতে পারে অথবা নিজের ঘরের ও বাইরের বৈষয়িক কাজও হতে পারে। এই নির্দেশটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, যখন আর কোন কাজ থাকবে না তখন নিজের অবসর সময়টুকু ইবাদাতের পরিশ্রম ও সাধনায় ব্যয় করো এবং সবদিক থেকে দৃষ্টি ও মনোযোগ ফিরিয়ে এনে একমাত্র নিজের রবের প্রতি মনোযোগী হয়ে যাও।

আত তীন

৯৫

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ আত্‌তীন (اَلتِّيْنِ) –কে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

কাতাদাহ এটিকে মাদানী সূরা বলেন। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ ব্যাপারে দু'টি বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। একটি বক্তব্যে একে মক্কী এবং অন্যটিতে মাদানী বলা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ আলেম একে মক্কী গণ্য করেছেন। এর মক্কী হবার সুস্পষ্ট আলামত হচ্ছে এই যে, এই সূরায় মক্কা শহরের জন্য هٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ (এই নিরাপদ শহরটি) শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট, যদি মদীনায় এটি নাযিল হতো তাহলে মক্কার জন্য "এই শহরটি" বলা ঠিক হতো না। তাছাড়াও সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে এটিকে মক্কা মু'আয্‌যমারও প্রথম দিকের সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত বলে মনে হয়। কারণ এর নাযিলের সময় কুফর ও ইসলামের সংঘাত শুরু হয়ে গিয়েছিল এমন কোন চিহ্নও এতে পাওয়া যায় না। বরং এর মধ্যে মক্কী যুগের প্রথম দিকের সূরাগুলোর মতো একই বর্ণনাভংগী পাওয়া যায়। এই ধরনের বর্ণনার মাধ্যমে অতি সংক্ষেপে এবং অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তি অপরিহার্য এবং একান্ত যুক্তিসঙ্গত।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে পুরস্কার ও শাস্তির স্বীকৃতি। এই উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম মহান মর্যাদাশালী নবীগণের আত্মপ্রকাশের স্থানসমূহের কসম খেয়ে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছেন। এই বাস্তব বিষয়টি কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন কোথাও বলা হয়েছে ঃ মানুষকে আল্লাহ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি করেছেন এবং ফেরেশতাদেরকে তার সামনে সিজদা করার হুকুম দিয়েছেন। (আল বাকারাহ ৩০–৩৪, আল আরাফ ১১, আল আন'আম ১৬৫, আল হিজর ২৪–২৯, আন নামল ৬২, সাদ ৭১–৭৩ আয়াত) কোথাও বলা হয়েছে ঃ মানুষ আল্লাহর এমন একটি আমানতের বাহক হয়েছে যা বহন করার শক্তি পৃথিবী, আকাশ ও পাহাড় কারো ছিল না। (আল আহযাব ৭২ আয়াত) আবার কোথাও বলা হয়েছে ঃ আমি বনী আদমকে মর্যাদাশালী করেছি এবং নিজের বহু সৃষ্টির ওপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (বনী ইসরাঈল ৭০ আয়াত) কিন্তু এখানে বিশেষ করে নবীগণের আত্মপ্রকাশের

স্থানগুলোর কসম খেয়ে বলা হয়েছে, মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করা হয়েছে। এর অর্থ এই দাঁড়ায়, মানুষকে এমন উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করা হয়েছে যার ফলে তার মধ্যে নবুওয়াতের মত সর্বাধিক উন্নত পদমর্যাদা সম্পন্ন লোক জন্ম নিয়েছে। আর এই নবুওয়াতের চাইতে উঁচু পদমর্যাদা আল্লাহর অন্য কোন সৃষ্টি লাভ করেনি।

এরপর বলা হয়েছে, দুনিয়ায় দুই ধরনের মানুষ পাওয়া যায়। এক ধরনের মানুষ এই সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি হবার পর দুষ্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ে বেং নৈতিক অধপতনের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে একেবারে সর্বনিম্ন গভীরতায় পৌছে যায়। সেখানে তাদের চাইতে নীচে আর পৌছতে পারে না। দ্বিতীয় ধরনের মানুষ ঈমান ও সৎকাজের পথ অবলম্বন করে এই পতন থেকে রক্ষা পায়। তাদেরকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করার অপরিহার্য দাবী যে উন্নত স্থান সে স্থানেই তারা প্রতিষ্ঠিত থাকে। মানব জাতির মধ্যে এই দুই ধরনের লোকের অস্তিত্ব এমন একটি বাস্তব সত্য যাকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা যেতে পারে না। কারণ মানুষের সমাজে সব জায়গায় সবসময় এটি দেখা যাচ্ছে।

সবশেষে এই বাস্তব সত্যটির মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষের মধ্যে যখন এই দু'টি আলাদা আলাদা এবং পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মানুষ পাওয়া যায় তখন কাজের প্রতিদানের ব্যাপারটি কেমন করে অস্বীকার করা যেতে পারে? যারা অধপতনের গভীর গর্তে নেমে গেছে এবং যারা উন্নতির উচ্চতম শিখরে পৌছে গেছে তাদেরকে যদি কোন প্রতিদান না দেয়া হয় এবং উভয় দলের পরিণতি একই হয়, তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহর রাজত্বে কোন ইনসাফ নেই। অথচ শাসককে ইনসাফ অবশ্যি করতে হবে, এটা মানুষের সাধারণ জ্ঞান এবং মানবিক প্রকৃতির দাবী। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ যিনি সকল শাসকের বড় শাসক তিনি ইনসাফ করবেন না, একথা কেমন করে কল্পনা করা যেতে পারে।

আয়াত ৮ **সূরা আততীন-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝١ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۝٢ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۝٣
لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝٤ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝٥
اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٦
فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝٧ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝٨

তীন ও যায়তূন,[১] সিনাই পর্বত[২] এবং এই নিরাপদ নগরীর (মক্কা) কসম। আমি মানুষকে পয়দা করেছি সর্বোত্তম কাঠামোয়।[৩] তারপর তাকে উল্টো ফিরিয়ে নীচতমদেরও নীচে পৌঁছিয়ে দিয়েছি[৪] তাদেরকে ছাড়া যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করতে থাকে। কেননা তাদের রয়েছে এমন পুরস্কার যা কোনদিন শেষ হবে না।[৫] কাজেই (হে নবী!) এরপর পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারে কে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলতে পারে?[৬] আল্লাহ কি সব শাসকের চাইতে বড় শাসক নন?[৭]

১. এর ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে অনেক বেশী মতবিরোধ দেখা যায়। হাসান বসরী, ইকরামাহ, আতা ইবনে আবী রাবাহ, জাবের ইবনে যায়েদ, মুজাহিদ ও ইবরাহীম নাখ্‌য়ী রাহেমাহুমুল্লাহ বলেন, তীন বা ইন্‌জীর (গোল হাল্‌কা কাল্‌চে বর্ণের এক রকম মিষ্টি ফল) বলতে এই সাধারণ তীনকে বুঝানো হয়েছে, যা লোকেরা খায়। আর যায়তূন বলতেও এই যায়তূনই বুঝানো হয়েছে, যা থেকে তেল বের করা হয়। ইবনে আবী হাতেম ও হাকেম এরি সমর্থনে হযরত ইবনে আব্বাসের (রা) একটি উক্তিও উদ্ধৃত করেছেন। যেসব তাফসীরকার এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন তারা তীন ও যায়তূনের বিশেষ গুণাবলী ও উপকারিতা বর্ণনা করে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, এসব গুণের কারণে মহান আল্লাহ এই দু'টি ফলের কসম খেয়েছেন। সন্দেহ নেই, একজন সাধারণ আরবী জানা ব্যক্তি তীন ও যায়তূন শব্দ শুনে সাধারণভাবে আরবীতে এর পরিচিত অর্থটিই গ্রহণ করবেন। কিন্তু দু'টি কারণে এই অর্থ গ্রহণ করা যায় না। এক, সামনে সিনাই পর্বত ও মক্কা শহরের কসম খাওয়া হয়েছে। আর দু'টি ফলের সাথে দু'টি শহরের কসম খাওয়ার ব্যাপারে কোন মিল নেই। দুই, এই চারটি জিনিসের কসম খেয়ে সামনের দিকে যে বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে সিনাই পর্বত ও মক্কা শহরের আলোচনা তার সাথে খাপ খায় কিন্তু এই ফল দু'টির

আলোচনা তার সাথে মোটেই খাপ খায় না। মহান আল্লাহ কুরআন মজীদে যেখানেই কোন জিনিসের কসম খেয়েছেন তার শ্রেষ্ঠত্ব ও উপকারিতা গুণের জন্য খাননি। বরং কসম খাবার পর যে বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে সেই বিষয়ের জন্যই কসম খেয়েছেন। কাজেই এই ফল দু'টির বিশেষ গুণাবলীকে কসমের কারণ হিসেবে উপস্থাপিত করা যায় না।

অন্য কোন কোন তাফসীরকার তীন ও যায়তূন বলতে কোন কোন স্থান বুঝিয়েছেন! কা'ব আহবার, কাতাদাহ ও ইবনে যায়েদ বলেন, তীন বলতে দামেশ্‌ক এবং যায়তূন বলতে বায়তুল মাকদিস বুঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাসের (রা) একটি উক্তি ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, তীন বলতে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম জূদী পাহাড়ে যে মসজিদ বানিয়েছিলেন তাকে বুঝানো হয়েছে। আর যায়তূন বলতে বায়তুল মাকদিস বুঝানো হয়েছে। কিন্তু একজন সাধারণ আরবের মনে "ওয়াত্ তীন্ ওয়ায্ যায়তূনে" (وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ) শব্দগুলো শুনামাত্রই এই অর্থ উকি দিতে পারতো না এবং তীন ও যায়তূন যে এই দু'টি স্থানের নাম কুরআনের প্রথম শ্রোতা আরববাসীদের কাছে তা মোটেই সুস্পষ্ট ও সুপরিচিত ছিল না।

তবে যে এলাকায় যে ফলটি বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হতো অনেক সময় সেই ফলের নামে সেই এলাকার নামকরণ করার রীতি আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই প্রচলন অনুসারে তীন ও যায়তূন শব্দের অর্থ এই ফল দু'টি উৎপাদনের সমগ্র এলাকা হতে পারে। আর এটি হচ্ছে সিরিয়া ও ফিলিস্তীন এলাকা। কারণ সে যুগের আরবে তীন ও যায়তূন উৎপাদনের জন্য এ দু'টি এলাকাই পরিচিত ছিল। ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়েম, যামাখ্‌শারী ও আলুসী রাহেমাহুমুল্লাহ এই ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছেন। অন্যদিকে ইবনে জারীর প্রথম বক্তব্যটিকে অগ্রাধিকার দিলেও একথা মেনে নিয়েছেন যে, তীন ও যায়তূন মানে এই ফল দু'টি উৎপাদনের এলাকাও হতে পারে। হাফেজ ইবনে কাসীরও এই ব্যাখ্যাটি প্রণিধানযোগ্য মনে করেছেন।

২. আসলে বলা হয়েছে তূরে সীনীনা। (طُوْرِسِيْنِيْنَ) হচ্ছে সিনাই উপদ্বীপের দ্বিতীয় নাম। একে সাইনা বা সীনাই এবং সীনীনও বলা হয়। কুরআনে এক জায়গায় "তূরে সাইনা" (طور سيناء) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে যে এলাকায় তূর পর্বত অবস্থিত তা সীনাই নামেই খ্যাত। তাই আমি অনুবাদে সীনাই শব্দ ব্যবহার করেছি।

৩. একথাটির ওপরই তীন ও যায়তূনের এলাকা অর্থাৎ সিরিয়া ও ফিলিস্তীন এবং তূর পর্বত ও মক্কার নিরাপদ শহরের কসম খাওয়া হয়েছে। মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করা হয়েছে, একথার মানে হচ্ছে এই যে, তাকে এমন উন্নত পর্যায়ের দৈহিক সৌষ্ঠব দান করা হয়েছে যা অন্য কোন প্রাণীকে দেয়া হয়নি। তাকে এমন উন্নত পর্যায়ের চিন্তা, উপলব্ধি জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করা হয়েছে, যা অন্য কোন সৃষ্টিকে দেয়া হয়নি। তারপর যেহেতু নবীগণই হচ্ছেন মানব জাতির প্রতি এই অনুগ্রহ ও পূর্ণতাগুণের সবচেয়ে উন্নত পর্যায়ের নমুনা এবং মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে নবুওয়াত দান করার জন্য নির্বাচিত করে নিয়েছেন তার জন্য এর চাইতে বড় মর্যাদা আর কিছুই হতে পারে না, তাই মানুষের সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি হবার প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহর নবীদের সাথে সম্পর্কিত স্থানসমূহের কসম খাওয়া হয়েছে। সিরিয়া ও ফিলিস্তীন এলাকায় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত অসংখ্য নবীর

আবির্ভাব ঘটে। তূর পর্বতে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নবুওয়াত লাভ করেন। আর মক্কা মু'আযযমার ভিত্তি স্থাপিত হয় হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈলের (আ) হাতে। তাঁদেরই বদৌলতে এটি আরবের সবচেয়ে পবিত্র কেন্দ্রীয় নগরে পরিণত হয়। হযরত ইবরাহীম (আ) এ দোয়া করেছিলেন ঃ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا "হে আমার রব! একে একটি নিরাপদ শহরে পরিণত করো।" (আল বাকারাহ ১২৬) আর এই দোয়ার বরকতে আরব উপদ্বীপের সর্বত্র বিশৃংখলার মধ্যে একমাত্র এই শহরটিই আড়াই হাজার বছর থেকে শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। কাজেই এখানে বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে ঃ আমি মানব জাতিকে এমন উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি যে, তার মধ্যে নবুওয়াতের ন্যায় মহান মর্যাদার অধিকারী মানুষের জন্ম হয়েছে।

৪. মুফাসসিরগণ সাধারণত এর দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। এক, আমি তাকে বার্ধক্যের এমন এক অবস্থার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি যেখানে সে কিছু চিন্তা করার, বুঝার ও কাজ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। দুই, আমি তাকে জাহান্নামের সর্বনিম্ন পর্যায়ের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বক্তব্যের যে উদ্দেশ্যটি প্রমাণ করার জন্য এই সূরাটি নাযিল করা হয়েছে এই দু'টি অর্থকে তার জন্য প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো যেতে পারে না। সূরাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, আখেরাতে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা যে যথার্থ সত্য তা প্রমাণ করা। এদিক দিয়ে মানুষদের মধ্যে থেকে অনেককে চরম দুর্বলতম অবস্থায় পৌঁছিয়ে দেয়া হয় এবং মানুষদের একটি দলকে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে—এ দু'টি কথার একটিও এই অর্থের সাথে খাপ খায় না। প্রথম কথাটি শাস্তি ও পুরস্কারের প্রমাণ হতে পারে না। কারণ ভালো ও খারাপ উভয় ধরনের লোক বার্ধক্যের শিকার হয়। কাউকে তার কাজের শাস্তি ভোগ করার জন্য এই অবস্থার শিকার হতে হয় না। অন্যদিকে দ্বিতীয় কথাটি আখেরাতে কার্যকর হবে একে কেমন করে এমন সব লোকের কাছে হিসেবে পেশ করা যেতে পারে যাদের থেকে আখেরাতে শাস্তি ও পুরস্কার লাভের ব্যবস্থার পক্ষে স্বীকৃতি আদায় করার জন্য এই সমস্ত যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে? তাই আমার মতে আয়াতের সঠিক অর্থ হচ্ছে, সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করার পর যখন মানুষ নিজের দৈহিক ও মানসিক শক্তিগুলোকে দুষ্কৃতির পথে ব্যবহার করে তখন আল্লাহ তাকে দুষ্কৃতিরই সুযোগ দান করেন এবং নিচের দিকে গড়িয়ে দিতে দিতে তাকে এমন নিম্নতম পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেন যে, অন্য কোন সৃষ্টি সেই পর্যায়ে নেমে যেতে পারে না। এটি একটি বাস্তব সত্য। মানুষের সমাজে সচরাচর এমনটি দেখা যায়। লোভ, লালসা, স্বার্থবাদিতা, কামান্ধতা, নেশাখোরী, নীচতা, ক্রোধ এবং এই ধরনের অন্যান্য বদ স্বভাব যেসব লোককে পেয়ে বসে তারা সত্যিই নৈতিক দিক দিয়ে নীচতমদেরও নীচে পৌঁছে যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শুধু মাত্র একটি কথাই ধরা যাক। একটি জাতি যখন অন্য জাতির প্রতি শত্রুতা পোষণ করার ব্যাপারে অন্ধ হয়ে যায় তখন সে হিংস্রতায় দুনিয়ার হিংস্র পশুদেরকেও হার মানায়। একটি হিংস্র পশু কেবলমাত্র নিজের ক্ষুধার খাদ্য যোগাড় করার জন্য অন্য পশু শিকার করে। যে ব্যাপকভাবে পশুদের হত্যা করে চলে না। কিন্তু মানুষ নিজেই নিজের সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে চলছে। পশুরা কেবলমাত্র নিজেদের নখর ও দাঁত ব্যবহার করে শিকার করে। কিন্তু এই সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্ট মানুষ নিজের বুদ্ধির সাহায্যে বন্দুক, কামান, ট্যাংক, বিমান, আণবিক বোমা, উদজান বোমা এবং অন্যান্য অসংখ্য মারণাস্ত্র তৈরী করেছে এবং সেগুলোর

সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে সুবিশাল জনপদগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছে। পশুরা কেবল আহত বা হত্যা করে। কিন্তু মানুষ নিজদেরই মতো মানুষকে নির্যাতন করার জন্য এমন সব ভয়াবহ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে যেগুলোর কথা পশুরা কোন দিন কল্পনাও করতে পারে না। তারপর নিজেদের শত্রুতা ও প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য তারা নীচতার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তারা মেয়েদের উলংগ করে তাদের মিছিল বের করে। এক একজন মেয়ের ওপর দশ বিশ জন ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। বাপ, ভাই ও স্বামীদের সামনে তাদের স্ত্রী ও মা-বোনদের শ্লীলতাহানি করে। মা-বাপের সামনে সন্তানদেরকে হত্যা করে। নিজের গর্ভজাত সন্তানদের রক্ত পান করার জন্য মাকে বাধ্য করে। মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে এবং জীবন্ত কবর দেয়। দুনিয়ায় পশুদের মধ্যেও এমন কোন হিংস্রতম গোষ্ঠী নেই যাদের বর্বরতাকে কোন পর্যায়ে মানুষদের এই বর্বরতার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। মানুষের অন্যান্য বড় বড় গুণের ব্যাপারেও এই একই কথা বলা যায়। এগুলোর মধ্য থেকে যেটির দিকে মানুষ মুখ ফিরিয়েছে সেটির ব্যাপারেই নিজেকে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি প্রমাণ করেছে। এমনকি ধর্ম যা মানুষের কাছে সবচেয়ে পবিত্র, তাকেও সে এমন সংকীর্ণ করে দিয়েছে, যার ফলে সে গাছপালা, জীব-জন্তু ও পাথরের পূজা করতে করতে অবনতির চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে নারী ও পুরুষের লিংগেরও পূজা করতে শুরু করেছে। দেবতাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য ধর্ম মন্দিরে দেবদাসী রাখছে। তাদের সাথে ব্যভিচার করাকে পুণ্যের কাজ মনে করছে। যাদেরকে তারা দেবতা ও উপাস্য গণ্য করেছে তাদের সাথে সম্পর্কিত দেবকাহিনীতে এমন সব কুৎসিত কাহিনী জুড়ে দিয়েছে যা জঘন্য ও নিকৃষ্টতম মানুষের জন্যও লজ্জার ব্যাপার।

৫. যেসব মুফাস্‌সির "আসফালা সা-ফেলীন" (اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ) -এর অর্থ করেছেন, বার্ধক্যের এমন একটি অবস্থা যখন মানুষ নিজের চেতনা ও স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, তারা এই আয়াতের অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন, "কিন্তু যারা নিজেদের যৌবনকালে ও সুস্থাবস্থায় ঈমান এনে সৎকাজ করে তাদের জন্য বার্ধক্যের এই অবস্থায়ও সেই একই নেকী লেখা হবে এবং সেই অনুযায়ী তারা প্রতিদানও পাবে। বয়সের এই পর্যায়েও তারা ঐ ধরনের সৎকাজগুলো করেনি বলে তাদের ভালো প্রতিদান দেবার ক্ষেত্রে কিছুই কম করা হবে না।" আর যেসব মুফাস্‌সির "আসফালা সাফেলীনের" দিকে উল্টো ফিরিয়ে দেবার অর্থ 'জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে নিক্ষেপ করা' করেছেন তাদের মতে এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে : "ঈমান এনে যারা সৎকাজ করে তারা এর বাইরে তাদেরকে এই পর্যায়ে উল্টো ফেরানো হবে না। বরং তারা এমন পুরস্কার পাবে যার ধারাবাহিকতা কোনদিন খতম হবে না।" কিন্তু এই সূরায় শাস্তি ও পুরস্কারের সত্যতার পক্ষে যে যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে তার সাথে এই উভয় অর্থের কোন মিল নেই। আমার মতে এই আয়াতের সঠিক অর্থ হচ্ছে, মানুষের সমাজে যেমন সাধারণভাবে দেখা যায়, যেসব লোকের নৈতিক অধপতন শুরু হয় তারা অধপাতে যেতে যেতে একেবারে নীচতমদের নীচে চলে যায়, ঠিক তেমনি প্রতি যুগে সাধারণভাবে দেখা যায়, যারা আল্লাহ, রসূল ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে এবং সৎকাজের কাঠামোয় নিজেদের জীবনকে ঢেলে সাজিয়ে নেয় তারা এই পতনের হাত থেকে বেঁচে গেছে এবং আল্লাহ মানুষকে যে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছিলেন তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাই তারা অশেষ শুভ প্রতিদানের অধিকারী। অর্থাৎ তারা এমন পুরস্কার পাবে, যা তাদের যথার্থ পাওনা থেকে কম হবে না এবং যার ধারাবাহিকতা কোনদিন শেষও হবে না।

৬. এই আয়াতটির আর একটি অনুবাদ এও হতে পারে ঃ "কাজেই (হে মানুষ) এরপর কোন্ জিনিসটি তোমাকে শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয়টি মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতে উদ্বুদ্ধ করে?" উভয় অর্থের ক্ষেত্রে লক্ষ ও মূল বক্তব্য একই থাকে। অর্থাৎ মানুষের সমাজে প্রকাশ্যে দেখা যায় সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্ট মানুষদের একটি দল নৈতিক অধপাতে যেতে যেতে একেবারে নীচতমদেরও নীচে পৌঁছে যায় আবার অন্য একটি দল সৎকাজের পথ অবলম্বন করে এই পতনের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করে এবং মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করার যে উদ্দেশ্য ছিল তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ অবস্থায় পুরস্কার ও শাস্তিকে কেমন করে মিথ্যা বলা যেতে পারে? বুদ্ধি কি একথা বলে, উভয় ধরনের মানুষের একই পরিণাম হবে? ইনসাফ কি একথাই বলে, অধপাতে যেতে যেতে নীচতমদেরও নীচে যারা পৌঁছে যায় তাদেরকে কোন শাস্তিও দেয়া যাবে না এবং এই অধপতন থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে যারা পবিত্র জীবন যাপন করে তাদেরকে কোন পুরস্কারও দেয়া যাবে না? এই কথাটিকেই কুরআনের অন্যান্য স্থানে এভাবে বলা হয়েছে ঃ

اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ - مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ -

"আমি কি অনুগতদেরকে অপরাধীদের মতো করে দেবো? তোমাদের কি হয়ে গেছে? তোমরা কেমন ফায়সালা করছো? (আল্ কলম ৩৫–৩৬ আয়াত)

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ط سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ -

"দুষ্কৃতকারীরা কি একথা মনে করেছে, আমি তাদেরকে এমন লোকদের মতো করে দেবো যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে? উভয়ের জীবন ও মৃত্যু এক রকম হবে? খুবই খারাপ সিদ্ধান্ত যা এরা করছে।" (আল জাসিয়া ২১ আয়াত)

৭. অর্থাৎ যখন দুনিয়ার ছোট ছোট শাসকদের থেকেও তোমরা চাও এবং আশা করে থাকো যে, তারা ইনসাফ করবে, অপরাধীদেরকে শাস্তি দেবে এবং ভালো কাজ যারা করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করবে তখন আল্লাহর ব্যাপারে তোমরা কি মনে করো? তিনি কি সব শাসকের বড় শাসক নন? যদি তোমরা তাঁকে সবচেয়ে বড় শাসক বলে স্বীকার করে থাকো তাহলে কি তাঁর সম্পর্কে তোমরা ধারণা করো যে, তিনি ইনসাফ করবেন না? তাঁর সম্পর্কে কি তোমরা এই ধারণা পোষণ করো যে, তিনি মন্দ ও ভালোকে একই পর্যায়ে ফেলবেন? তোমরা কি মনে করো তাঁর দুনিয়ায় যারা সবচেয়ে খারাপ কাজ করবে আর যারা সবচেয়ে ভালো কাজ করবে তারা সবাই মরে মাটির সাথে মিশে যাবে। কাউকে তার খারাপ কাজের শাস্তি দেয়া হবে না এবং কাউকে তার ভালো কাজের পুরস্কারও দেয়া হবে না?

ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনুল মুনযির, বায়হাকী, হাকেম ও ইবনে মারদুইয়া হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন "ওয়াত তীনে ওয়াযযায়তূনে" সূরা পড়তে পড়তে اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ আয়াতটিতে পৌঁছে তখন যেন সে বলে। بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ (হাঁ, এবং আমি তার ওপর সাক্ষদানকারীদের একজন)। আবার কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এই আয়াতটি পড়তেন, তিনি বলতেন, سُبْحٰنَكَ فَبَلٰى (হে আল্লাহ তুমি পবিত্র। আর তুমি এই যা বলছো তা সত্য।

আল'আলাক

৯৬

নামকরণ

সূরাটির দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত আলাক (عَلَقٍ) শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এই সূরাটির দু'টি অংশ। প্রথম অংশটি اقْرَأْ থেকে শুরু হয়ে পঞ্চম আয়াতে مَالَمْ يَعْلَمْ এ গিয়ে শেষ হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশটি كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ থেকে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। প্রথম অংশটি যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ সর্বপ্রথম অহী এ ব্যাপারে উম্মাতে মুসলিমার আলেম সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একমত। এ প্রসংগে ইমাম আহমাদ, বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ অসংখ্য সনদের মাধ্যমে হযরত আয়েশা (রা) থেকে যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন তা সর্বাধিক সহীহ হাদীস হিসেবে গণ্য। এ হাদীসে হযরত আয়েশা নিজে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ওহী শুরু হবার সম্পূর্ণ ঘটনা শুনে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও ইবনে আব্বাস (রা), আবু মূসা আশ'আরী (রা) ও সাহাবীগণের একটি দলও একথা বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম কুরআনের এই আয়াতগুলোই নাযিল হয়েছিল। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হারম শরীফে নামায পড়া শুরু করেন এবং আবু জেহেল তাঁকে হুমকি দিয়ে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে তখন দ্বিতীয় অংশটি নাযিল হয়।

অহীর সূচনা

মুহাদ্দিসগণ অহীর সূচনাপর্বের ঘটনা নিজের নিজের সনদের মাধ্যমে ইমাম যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম যুহরী এ ঘটনা হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে এবং তিনি নিজের খালা হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহীর সূচনা হয় সত্য স্বপ্নের (কোন কোন বর্ণনা অনুসারে ভালো স্বপ্নের) মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, মনে হতো যেন দিনের আলোয় তিনি তা দেখছেন। এরপর তিনি নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়েন। এরপর কয়েকদিন হেরা গুহায় অবস্থান করে দিনরাত ইবাদাতের মধ্যে কাটিয়ে দিতে থাকেন। (হযরত আয়েশা (রা) তাহান্নুস (تحنث) শব্দ ব্যবহার করেছেন। ইমাম যুহরী তা'আব্বুদ (تعبد) বা ইবাদাত-বন্দেগী শব্দের সাহায্যে এর ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে তিনি কোন্

ধরনের ইবাদাত করতেন? কারণ তখনো পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে ইবাদাতের পদ্ধতি তাঁকে শেখানো হয়নি) ঘর থেকে খাবার-দাবার নিয়ে তিনি কয়েকদিন সেখানে কাটাতেন। তারপর হযরত খাদীজার (রা) কাছে ফিরে আসতেন। তিনি আবার কয়েক দিনের খাবারসামগ্রী তাঁকে যোগাড় করে দিতেন। একদিন তিনি হেরা গুহার মধ্যে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর ওপর ওহী নাযিল হলো। ফেরেশ্‌তা এসে তাঁকে বললেন ঃ "পড়ো" এরপর হযরত আয়েশা (রা) নিজেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ আমি বললাম, "আমি তো পড়তে জানি না।" একথায় ফেরেশতা আমাকে ধরে বুকের সাথে ভয়ানক জোরে চেপে ধরলেন। এমনকি আমি তা সহ্য করার শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেল্লাম। তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়ো!" আমি বললাম, "আমি তো, পড়তে জানি না।" তিনি দ্বিতীয় বার আমাকে বুকের সাথে ধরে ভয়ানক চাপ দিলেন। আমার সহ্য করার শক্তি প্রায় শেষ হতে লাগলো। তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়ো!" আমি আবার বললাম, "আমি তো পড়া জানি না।" তিনি তৃতীয়বার আমাকে বুকের সাথে ভয়ানক জোরে চেপে ধরলেন আমার সহ্য করার শক্তি খতম হবার উপক্রম হলো। তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ (পড়ো নিজের রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন) এখান থেকে مَالَمْ يَعْلَمْ (যা সে জানতো না) পর্যন্ত। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁপতে কাঁপতে সেখান থেকে ফিরলেন। তিনি হযরত খাদীজার (রা) কাছে ফিরে এসে বললেন ঃ "আমার গায়ে কিছু (চাদর-কম্বল) জড়িয়ে দাও। আমার গায়ে কিছু (চাদর-কম্বল) জড়িয়ে দাও!" তখন তাঁর গায়ে জড়িয়ে দেয়া হলো। তাঁর মধ্য থেকে ভীতির ভাব দূর হয়ে গেলে তিনি বললেন ঃ "হে খাদীজা! আমার কি হয়ে গেলো? তারপর তিনি তাঁকে পুরো ঘটনা শুনিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমার নিজের জানের ভয় হচ্ছে।" হযরত খাদীজা বললেন ঃ "মোটেই না। বরং খুশী হয়ে যান। আল্লাহর কসম! আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমানিত করবেন না। আপনি আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করেন। সত্য কথা বলেন। (একটি বর্ণনায় বাড়তি বলা হয়েছে, আপনি আমানত পরিশোধ করে দেন,) অসহায় লোকদের বোঝা বহন করেন। নিজে অর্থ উপার্জন করে অভাবীদেরকে দেন। মেহমানদারী করেন। ভালো কাজে সাহায্য করেন।" তারপর তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাথে নিয়ে ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে গেলেন। ওয়ারাকা ছিলেন তাঁর চাচাত ভাই। জাহেলী যুগে তিনি ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আরবী ও ইবরানী ভাষায় ইঞ্জিল লিখতেন। অত্যন্ত বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন। হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন, ভাইজান! আপনার ভাতিজার ঘটনাটা একটু শুনুন। ওয়ারাকা রসূলুল্লাহকে (সা) বললেন ঃ "ভাতিজা! তুমি কি দেখেছো?" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু দেখেছিলেন তা বর্ণনা করলেন। ওয়ারাকা বললেন ঃ "ইনি সেই নামূস (অহী বহনকারী ফেরেশতা) যাকে আল্লাহ মূসার (আ) ওপর নাযিল করেছিলেন। হায়, যদি আমি আপনার নবুওয়াতের জামানায় শক্তিশালী যুবক হতাম! হায়, যদি আমি তখন জীবিত থাকি যখন আপনার কওম আপনাকে বের করে দেবে।" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "এরা কি আমাকে বের করে দেবে?" ওয়ারাকা বললেন ঃ "হাঁ, কখনো এমনটি হয়নি, আপনি যা নিয়ে এসেছেন কোন ব্যক্তি তা নিয়ে এসেছে এবং তার সাথে শত্রুতা করা হয়নি। যদি আমি আপনার

সেই আমলে বেঁচে থাকি তাহলে আপনাকে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করবো।" কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই ওয়ারাকা ইন্তিকাল করেন।

এ ঘটনা নিজেই একথা প্রকাশ করছে যে, ফেরেশতার আসার এক মুহূর্ত আগেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে নবী বানিয়ে পাঠানো হবে এ সম্পর্কে তিনি বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। তাঁর এই জিনিসের প্রত্যাশী বা আকাংক্ষী হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর সাথে যে এই ধরনের ব্যাপার ঘটতে পারে, একথা তিনি আদৌ কখনো কল্পনা করতে পারেননি। অহী নাযিল হওয়া এবং ফেরেশতার এভাবে সামনে এসে যাওয়া তাঁর জন্যে ছিল একটি আকস্মিক ঘটনা। এর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া তাঁর ওপর ঠিক তাই হয়েছে যা একজন বেখবর ব্যক্তির সাথে এত বড় একটি আকস্মিক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে। এ কারণেই যখন তিনি ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এগিয়ে আসেন তখন মক্কার লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে সব রকমের আপত্তি উঠায় কিন্তু তাদের একজনও একথা বলেনি, আমরা তো আগেই আশংকা করেছিলাম আপনি কোন একটা কিছু হওয়ার দাবী করবেন, কারণ আপনি বেশ কিছুকাল থেকে নবী হবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

এ ঘটনা থেকে নবুওয়াতের আগে তাঁর জীবন কেমন পবিত্র ছিল এবং তাঁর চরিত্র ও কর্মকাণ্ড কত উন্নত পর্যায়ের ছিল সে কথাও জানা যায়। হযরত খাদীজা (রা) কোন অল্প বয়স্কা মহিলা ছিলেন না। বরং এই ঘটনার সময় তাঁর বয়স ছিল পঞ্চান্ন বছর। পনের বছর ধরে তিনি রসূলের জীবন সঙ্গিনী ছিলেন। স্ত্রীর কাছে স্বামীর কোন দুর্বলতা গোপন থাকতে পারে না। এই দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে এমনিই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হিসেবে পেয়েছিলেন যে, যখনই তিনি তাঁকে হেরা গুহার ঘটনা শুনান তখনই নির্দ্বিধায় তিনি স্বীকার করে নেন যে, যথার্থই আল্লাহর ফেরেশতা তাঁর কাছে অহী নিয়ে এসেছিলেন। অনুরূপভাবে ওয়ারাকা ইবনে নওফলও মক্কার একজন বয়োবৃদ্ধ বাসিন্দা ছিলেন। তিনি শৈশব থেকেই মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহর (সা) জীবন দেখে আসছিলেন, তাছাড়া পনের বছরের নিকট আত্মীয়তার কারণে তাঁর অবস্থা তিনি আরো গভীরভাবে অবগত ছিলেন। তিনিও এ ঘটনা শুনে একে কোন প্ররোচনা মনে করেননি। বরং শুনার সাথে সাথেই বলে দেন, ইনি সেই একই "নামূস" যিনি মূসা আলাইহিস সালামের কাছে এসেছিলেন। এর অর্থ এই দাঁড়ায়, তাঁর মতেও মুহাম্মাদ (সা) এমনই উন্নত ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদা লাভ করা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না।

দ্বিতীয় অংশ নাযিলের প্রেক্ষাপট

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কা'বা শরীফে ইসলামী পদ্ধতিতে নামায পড়তে শুরু করেন এবং আবু জেহেল তাঁকে হুমকি দিয়ে ও ভয় দেখিয়ে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে, ঠিক সে সময় এই সূরার দ্বিতীয় অংশটি নাযিল হয়। দেখা যায়, নবী হবার পর প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেবার কাজ শুরু করার আগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর শেখানো পদ্ধতিতে হারম শরীফে নামায পড়তে শুরু করেন এবং এ কাজটির কারণে কুরাইশরা প্রথমবার অনুভব করে যে, তিনি কোন নতুন দীনের অনুসারী হয়েছেন। অন্য লোকেরা অবাক চোখে এ দৃশ্য দেখছিল। কিন্তু আবু

জেহেলের জাহেলী শিরা-উপশিরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং সে এভাবে হারম শরীফে ইবাদাত করা যাবে না বলে তাঁকে ধমকাতে থাকে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে কয়েকটি হাদীসে আবু জেহেলের এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন দুষ্কৃতি উল্লেখিত হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ আবু জেহেল কুরাইশদেরকে জিজ্ঞেস করে, "মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম) কি তোমাদের সামনে যমীনের ওপর মুখ রাখছে? লোকেরা জবাব দেয়, "হাঁ"। একথায় সে বলে, "লাত ও উয্যার কসম, যদি আমি তাকে এভাবে নামায পড়তে দেখি তাহলে তার ঘাড়ে পা রেখে দেবো এবং মাটিতে তার মুখ রগড়ে দেবো।" তারপর একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামায পড়তে দেখে সে তাঁর ঘাড়ের ওপর পা রাখার জন্যে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ লোকেরা দেখে সে পিছনের দিকে সরে আসছে এবং কোন জিনিস থেকে নিজের মুখ বাঁচাবার চেষ্টা করছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার কি হয়েছে? সে বলে, আমার ও তার মাঝখানে আগুনের একটি পরিখা, একটি ভয়াবহ জিনিস ও কিছু ডানা ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে যদি আমার ধারেকাছে ঘেঁসতো তাহলে ফেরেশতারা তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতো। (আহমাদ, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া, আবু নাঈম ইসফাহানী ও রায়হাকী)

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ আবু জেহেল বলে, যদি আমি মুহম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'বার কাছে নামায পড়তে দেখি তাহলে পায়ের নীচে তার ঘাড় চেপে ধরবো। একথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে পৌঁছে যায়। তিনি বলেন, যদি সে এমনটি করে তাহলে ফেরেশতারা প্রকাশ্যে তাকে এসে ধরবে। (বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জারীর, আবদুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুনযির ও ইবনে মারদুইয়া)

ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত আর একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়ছিলেন, আবু জেহেল সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। সে বললো, হে মুহাম্মাদ! আমি কি তোমাকে এ থেকে নিষেধ করিনি? একথা বলে সে তাঁকে ধমকাতে শুরু করলো। জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কঠোরভাবে ধমক দিলেন। তাঁর ধমকানি শুনে সে বললো, হে মুহাম্মাদ! কিসের জোরে তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো? আল্লাহর কসম! এই উপত্যকায় আমার সমর্থকদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। (আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জারীর, ইবনে আবী শাইবা, ইবনুল মুনযির, তাবারানী ও ইবনে মারদুইয়া)

এই ঘটনাবলীর কারণে كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى থেকে সূরার যে অংশটি শুরু হচ্ছে সেটি নাযিল হয়। কুরআনের এই সূরাটিতে এই অংশটিকে যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে স্বাভাবিকভাবে এর মর্যাদা তাই হওয়া উচিত। কারণ প্রথম অহী নাযিল হবার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের প্রথম প্রকাশ করেন নামাযের মাধ্যমে এবং এই ঘটনার ভিত্তিতেই কাফেরদের সাথে তাঁর প্রথম সংঘাত হয়।

আয়াত ১৯ **সূরা আল 'আলাক-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اِقْرَاْ
وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝٣ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥

পড়ো[১] (হে নবী), তোমার রবের নামে।[২] যিনি সৃষ্টি করেছেন।[৩] জমাট বাঁধা রক্তের দলা থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।[৪] পড়ো, এবং তোমার রব বড় মেহেরবান, যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন।[৫] মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা সে জানতো না।[৬]

১. ইতিপূর্বে ভূমিকায় বলে এসেছি, ফেরেশতা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, পড়ো। তিনি জবাব দিলেন, আমি পড়া জানি না। এ থেকে জানা যায়, ফেরেশতা অহীর এই শব্দগুলো লিখিত আকারে তাঁর সামনে পেশ করেছিলেন এবং তাঁকে সেগুলো পড়তে বলেছিলেন। কারণ ফেরেশতার কথার অর্থ যদি এই হতো, আমি বলতে থাকি এবং আপনি পড়তে থাকুন তাহলে আমি পড়া জানি না একথা বলার তাঁর প্রয়োজন হতো না।

২. অর্থাৎ তোমার রবের নাম নিয়ে পড়ো। অন্য কথায়, বিসমিল্লাহ বলো এবং পড়ো। এ থেকে একথাও জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অহী আসার আগে একমাত্র আল্লাহকেই নিজের রব হিসেবে জানতেন ও মানতেন। এ জন্যই তাঁর রবকে, একথা বলার প্রয়োজন হয়নি বরং বলতে হয়েছে, তোমার রবের নাম নিয়ে পড়ো।

৩. শুধু বলা হয়েছে, "সৃষ্টি করেছেন।" কাকে সৃষ্টি করেছেন তা বলা হয়নি। এ থেকে আপনা আপনিই এ অর্থ বের হয়ে আসে, সেই রবের নাম নিয়ে পড়ো যিনি স্রষ্টা, যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহান এবং বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন।

৪. সাধারণভাবে বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টির কথা বলার পর বিশেষ করে মানুষের কথা বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ কেমন হীন অবস্থা থেকে তার সৃষ্টিপর্ব শুরু করে তাকে পূর্ণাংগ মানুষে রূপান্তরিত করেছেন। আলাক (عَلَق) হচ্ছে আলাকাহ (عَلَقَة) শব্দের বহুবচন। এর মানে জমাট বাঁধা রক্ত। গর্ভ সঞ্চারের পর প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় এটি হচ্ছে সেই প্রাথমিক অবস্থা। তারপর তা গোশ্তের আকৃতি ধারণ

كَلَّآ إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰٓ ۝٦ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰٓ ۝٧ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰٓ ۝٨ أَرَءَيْتَ الَّذِى يَنْهَىٰ ۝٩ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰٓ ۝١٠

কখনই নয়,[৭] মানুষ সীমালংঘন করে। কারণ সে নিজেকে দেখে অভাবমুক্ত।[৮] (অথচ) নিশ্চিতভাবেই তোমার রবের দিকেই ফিরে আসতে হবে।[৯] তুমি কি দেখেছো সেই ব্যক্তিকে যে এক বান্দাকে নিষেধ করে যখন সে নামায পড়ে?[১০]

করে। এরপর পর্যায়ক্রমে মানুষের আকৃতি লাভের কার্যক্রম শুরু হয়। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হজ্জ ৫ আয়াত, ৫ থেকে ৭ টীকা)

৫. অর্থাৎ তাঁর অশেষ মেহেরবানী। এই হীনতম অবস্থা থেকে শুরু করে তিনি মানুষকে জ্ঞানের অধিকারী করেছেন এটি সৃষ্টির সবচেয়ে বড় গুণ হিসেবে স্বীকৃত। আর তিনি মানুষকে কেবল জ্ঞানের অধিকারীই করেননি, কলম ব্যবহার করে তাকে লেখার কৌশল শিখিয়েছেন। এর ফলে কলম জ্ঞানের ব্যাপক প্রসার, উন্নতি এবং বংশানুক্রমিক প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। যদি তিনি ইলহামী চেতনার সাহায্যে মানুষকে কলম ব্যবহার করার ও লেখার কৌশল না শেখাতেন তাহলে মানুষের জ্ঞানগত যোগ্যতা স্তব্ধ ও পংগু হয়ে যেতো। তার বিকশিত ও সম্প্রসারিত হবার এবং বংশানুক্রমিক অগ্রগতি তথা এক বংশের জ্ঞান আর এক বংশে পৌছে যাবার এবং সামনের দিকে আরো উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করার সুযোগই তিরোহিত হতো।

৬. অর্থাৎ মানুষ আসলে ছিল সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন। আল্লাহর কাছ থেকেই সে যা কিছু জ্ঞান লাভ করেছে। আল্লাহ যে পর্যায়ে মানুষের জন্য জ্ঞানের দরজা যতটুকু খুলতে চেয়েছেন ততটুকুই তার জন্য খুলে গিয়েছে। আয়াতুল কুরসীতে একথাটিই এভাবে বলা হয়েছে : وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ "আর লোকেরা তাঁর জ্ঞান থেকে তিনি যতটুকু চান তার বেশী কিছুই আয়ত্ব করতে পারে না।" (আল বাকারাহ ২৫৫) যেসব জিনিসকে মানুষ নিজের তাত্বিক আবিষ্কার বলে মনে করে সেগুলো আসলে প্রথমে তার জ্ঞানের আওতায় ছিল না। আল্লাহ যখন চেয়েছেন তখনই তার জ্ঞান তাকে দিয়েছেন। মানুষ কোনক্রমেই অনুভব করতে পারেনি যে, আল্লাহ তাকে এ জ্ঞান দান করছেন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম যে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল সেগুলোর আলোচনা এখান পর্যন্ত শেষ। যেমন হযরত আয়েশার (রা) হাদীস থেকে জানা যায় : এই প্রথম অভিজ্ঞতাটি খুব বেশী কঠিন ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাইতে বেশী বরদাশ্‌ত করতে পারতেন না। তাই তখন কেবল এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে, তিনি যে রবকে প্রথম থেকে জানেন ও মানেন তিনি সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করছেন। তাঁর পক্ষ থেকে অহীর সিলসিলা শুরু হয়ে গেছে এবং তাঁকে তিনি নিজের নবী বানিয়ে নিয়েছেন। এর বেশ কিছুকাল পরে সূরা আল মুদ্‌দাসসিরের প্রথম দিকের আয়াতগুলো নাযিল হয়। সেখানে তাঁকে বলা হয়েছে নবুওয়াত

লাভ করার পর এখন কি কি কাজ করতে হবে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য পড়ুন তাফহীমুল কুরআন আল মুদ্‌দাসসিরের ভূমিকা)।

৭. অর্থাৎ যে মেহেরবান আল্লাহ এত বড় মেহেরবানী করেছেন তাঁর মোকাবেলায় মূর্খতার বশবর্তী হয়ে কখনো এমন কর্মনীতি অবলম্বন করা উচিত নয় যা সামনের দিকে বর্ণনা করা হচ্ছে।

৮. অর্থাৎ দুনিয়ায় ধন-দৌলত, সম্মান-প্রতিপত্তি যা কিছু সে চাইতো তার সবই সে লাভ করেছে এ দৃশ্য দেখে সে কৃতজ্ঞ হবার পরিবর্তে বরং বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করেছে এবং সীমালংঘন করতে শুরু করেছে।

৯. অর্থাৎ দুনিয়ায় সে যাই কিছু অর্জন করে থাকুক না কেন এবং তার ভিত্তিতে অহংকার ও বিদ্রোহ করে ফিরুক না কেন, অবশেষে তাকে তোমার রবের কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন এই মনোভাব ও কর্মনীতির পরিণাম সে জানতে পারবে।

১০. বান্দা বলতে এখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। এ পদ্ধতিতে কুরআনের কয়েক জায়গায় তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন

سُبْحٰنَ الَّذِیْٓ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا –

"পবিত্র সেই সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে নিয়ে গিয়েছেন এক রাতে মসজিদে হারম থেকে মসজিদে আকসার দিকে।" (বনি ইসরাঈল ১)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْٓ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ

"সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার যিনি তাঁর বান্দার ওপর নাযিল করেছেন কিতাব।" (আল কাহফ ১)

وَاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ یَدْعُوْهُ كَادُوْا یَكُوْنُوْنَ عَلَیْهِ لِبَدًا –

"আর আল্লাহর বান্দা যখন তাকে ডাকার জন্য দাঁড়ালো তখন লোকেরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হলো।" (আল জিন ১৯)

এ থেকে জানা যায়, এটা ভালোবাসার একটা বিশেষ ধরনের প্রকাশভংগী। এ পদ্ধতিতে আল্লাহ তাঁর কিতাবে তাঁর রসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়াও এ থেকে জানা যায়, মহান আল্লাহ নবুওয়াতের দায়িত্বে নিযুক্ত করার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামায পড়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কুরআনের কোথাও এই পদ্ধতির কথা বলা হয়নি। কোথাও বলা হয়নি, হে নবী! তুমি এভাবে নামায পড়ো। কাজেই কুরআনে যে অহী লিখিত হয়েছে কেবলমাত্র এই অহীটুকুই যে রসূলের (সা) ওপর নাযিল হতো না— এটি তার আর একটি প্রমাণ। বরং এরপরও অহীর মাধ্যমে আরো এমন সব বিষয়ের তালিম দেয়া হতো যা কুরআনে লিখিত হয়নি।

أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰٓ ﴿١١﴾ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ﴿١٢﴾ أَرَءَيْتَ إِن
كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٣﴾ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴿١٤﴾ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ ۙ
لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ نَاصِيَةٍ كَـٰذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُۥ ﴿١٧﴾ سَنَدْعُ
الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾ كَلَّا ۖ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ۩ ﴿١٩﴾

তুমি কি মনে করো, যদি (সেই বান্দা) সঠিক পথে থাকে অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়? তুমি কি মনে করো, যদি (এই নিষেধকারী সত্যের প্রতি) মিথ্যা আরোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়? সে কি জানে না, আল্লাহ দেখছেন?[১১] কখনই নয়,[১২] যদি সে বিরত না হয় তাহলে আমি তার কপালের দিকের চুল ধরে তাকে টানবো, সেই কপালের চুল (ওয়ালা) যে মিথ্যুক ও কঠিন অপরাধকারী।[১৩] সে তার সমর্থক দলকে ডেকে নিক[১৪] আমিও ডেকে নিই আযাবের ফেরেশতাদেরকে।[১৫] কখনই নয়, তার কথা মেনে নিয়ো না, তুমি সিজদা করো এবং (তোমার রবের) নৈকট্য অর্জন করো।[১৬]

১১. বাহ্যত মনে হয়, এখানে প্রত্যেকটি ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তুমি কি সেই ব্যক্তির কার্যকলাপ দেখেছো যে আল্লাহর এক বান্দাকে ইবাদাত করা থেকে বিরত রাখছে? যদি সেই বান্দা সঠিক পথে থাকে অথবা মানুষকে আল্লাহর ভয় দেখায় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে, আর এই ইবাদাতে বাধাপ্রদানকারী সত্যের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তার এই তৎপরতা সম্পর্কে তুমি কি মনে করো? যে ব্যক্তি এই কর্মনীতি অবলম্বন করেছে সে যদি জানতো, যে বান্দা নেকীর কাজ করে আল্লাহ তাকেও দেখেন আবার যে সত্যের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে সচেষ্ট তাকেও দেখেন তাহলে সে কি এই কর্মনীতি অবলম্বন করতে পারতো? আল্লাহ জালেমের জুলুম দেখছেন এবং মজলুমের মজলুমীও দেখছেন। তাঁর এই দেখা এ বিষয়টিকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে যে, তিনি জালেমের শাস্তি দেবেন এবং মজলুমের ফরিয়াদ শুনবেন।

১২. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি নামায পড়েন তাহলে এই ব্যক্তি নিজের পায়ের চাপে তার ঘাড় পিষে ফেলবে বলে যে হুমকি দিচ্ছে তা কখনো সম্ভবপর হবে না। সে কখনো এমনটি করতে পারবে না।

১৩. কপালের দিক বলে এখানে যার কপাল তাকে বুঝানো হয়েছে।

১৪. যেমন ভূমিকায় আমরা বলেছি, আবু জেহেলের হুমকির জবাবে যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ধমক দিয়েছিলেন তখন সে বলেছিল, হে

মুহাম্মাদ! তুমি কিসের জোরে আমাকে ভয় দেখাচ্ছো? আল্লাহর কসম, এই উপত্যকায় আমার সমর্থকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। তার এই কথায় এখানে বলা হচ্ছে ঃ নাও, এখন তাহলে তোমার সেই সমর্থকদের ডেকে নাও।

১৫. মূলে 'যাবানীয়াহ' (زبانية) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাতাদাহর ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটি আরবী ভাষায় পুলিশের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর 'যাবান' (زبن) শব্দের আসল মানে হচ্ছে, ধাক্কা দেয়া। রাজা বাদশাহদের দরবারে লাঠিধারী চোবদার থাকতো। তাদের কাজ হতো যার প্রতি বাদশাহ নারাজ হতেন তাকে ধাক্কা দিয়ে দরবার থেকে বের করে দেয়া। কাজেই এখানে আল্লাহর বাণীর অর্থ হচ্ছে, সে তার সমর্থকদেরকে ডেকে আনুক, আর আমি আমার পুলিশ বাহিনী তথা আযাবের ফেরেশাতাদেরকে ডেকে আনি। এই আযাবের ফেরেশতারা তার সমর্থকদেরকে ঠাণ্ডা করে দিক।

১৬. সিজদা করা মানে নামায পড়া। অর্থাৎ হে নবী! তুমি নির্ভয়ে আগের মতো নামায পড়তে থাকো। এর মাধ্যমে নিজের রবের নৈকট্য লাভ করো। সহীহ মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ "বান্দা সিজদায় থাকা অবস্থায় তার রবের সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়।" আবার মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরার (রা) এ রেওয়ায়াতটিও উদ্ধৃত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ আয়াতটি পড়তেন তখন তেলাওয়াতে সিজদা করতেন।

আল কাদ্‌র

৯৭

নামকরণ

প্রথম আয়াতের 'আল কদ্‌র' (اَلْقَدْر) শব্দটিকে এর নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এর মক্কী বা মাদানী হবার ব্যাপারে দ্বিমত রয়ে গেছে। আবু হাইয়ান বাহরুল মুহীত গ্রন্থে দাবী করেছেন, অধিকাংশ আলেমের মতে এটা মাদানী সূরা। আলী ইবনে আহমাদুল ওয়াহেদী তাঁর তাফসীরে বলেছেন, এটি মদীনায় নাযিলকৃত প্রথম সূরা। অন্যদিকে আল মাওয়ারদী বলেন, অধিকাংশ আলেমের মতে এটি মক্কী সূরা। ইমাম সুয়ূতী ইতকান গ্রন্থে একথাই লিখেছেন। ইবনে মারদুইয়া ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে যুবাইর (রা) ও হযরত আয়েশা (রা) থেকে এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়েছিল। সূরার বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলেও একথাই প্রতীয়মান হয় যে, এর মক্কায় নাযিল হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। সামনের আলোচনায় আমি একথা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরবো।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

লোকদেরকে কুরআন মজীদের মূল্য, মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করাই এই সূরাটির বিষয়বস্তু। কুরআন মজীদের বিন্যাসের ক্ষেত্রে একে সূরা আলাকের পরে রাখাই একথা প্রকাশ করে যে, সূরা আলাকের প্রাথমিক পাঁচটি আয়াতের মাধ্যমে যে পবিত্র কিতাবটির নাযিল শুরু হয়েছিল তা কেমন ভাগ্য নির্ণয়কারী রাতে নাযিল হয়, কেমন মহান মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব এবং তার এই নাযিল হওয়ার অর্থ কি—এই সূরায় সেকথাই লোকদেরকে জানানো হয়েছে।

প্রথমেই আল্লাহ বলেছেন, আমি এটি নাযিল করেছি। অর্থাৎ এটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের রচনা নয় বরং আমিই এটি নাযিল করেছি।

এরপর বলেছেন, কদরের রাতে আমার পক্ষ থেকে এটি নাযিল হয়েছে। কদরের রাতের দু'টি অর্থ। দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। এক, এটি এমন একটি রাত যে রাতে তকদীরের ফায়সালা করা হয়। অথবা অন্য কথায় এটি সাধারণ রাতের মতো কোন মামুলি রাত নয়। বরং এ রাতে ভাগ্যের ভাঙা গড়া চলে। এই রাতে এই কিতাব নাযিল হওয়া নিছক একটি কিতাব নাযিল হওয়া নয় বরং এটি শুধুমাত্র কুরাইশ ও আরবের নয়,

সারা দুনিয়ার ভাগ্য পাল্টে দেবে। একথাটিই সূরা দুখানেও বলা হয়েছে (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা দুখানের ভূমিকা ও ৩ নম্বর টীকা) দুই, এটি বড়ই মর্যাদা, মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের রাত। সামনের দিকে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এটি হাজার মাসের চাইতেও উত্তম। এর সাহায্যে মক্কার কাফেরদেরকে পরোক্ষভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেশকৃত এই কিতাবকে নিজেদের জন্য একটি বিপদ মনে করেছো। তোমাদের ওপর এ এক আপদ এসে পড়েছে বলে তোমরা তিরস্কার করছো। অথচ যে রাতে এর নাযিল হবার ফায়সালা জারী করা হয় সেটি ছিল পরম কল্যাণ ও বরকতের রাত। এই একটি রাতে মানুষের কল্যাণের জন্য এত বেশী কাজ করা হয়েছে যা মানুষের ইতিহাসে হাজার মাসেও করা হয়নি। একথাটিও সূরা দুখানের তৃতীয় আয়াতে অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা দুখানের ভূমিকায় আমি এ বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছি।

সবশেষে বলা হয়েছে, এই রাতে ফেরেশতারা এবং জিব্রীল নিজেদের রবের অনুমতি নিয়ে সব রকমের আদেশ নির্দেশ সহকারে নাযিল হন। (সূরা দুখানের চতুর্থ আয়তে একে أَمْرٍ حَكِيْمٍ জ্ঞানময় বা সুষ্ঠু বিধান বলা হয়েছে।) সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত এটি হয় পুরোপুরি শান্তি ও নিরাপত্তার রাত। অর্থাৎ কোন প্রকার অনিষ্ট এ রাতে প্রভাব ফেলতে পারে না। কারণ আল্লাহর সমস্ত ফায়সালার মূল লক্ষ্য হয় কল্যাণ। মানুষের জন্য তার মধ্যে কোন অকল্যাণ থাকে না। এমনকি তিনি কোন জাতিকে ধ্বংস করার ফায়সালা করলেও তা করেন মানুষের কল্যাণের জন্য, তার অকল্যাণের জন্য নয়।

আয়াত ৫ | সূরা আল কাদ্‌র-মক্কী | রুকূ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

إِنَّا أَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝١ وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝٢
لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝٣ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝٤ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝٥ سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝٦

আমি এ (কুরআন) নাযিল করেছি কদরের রাতে।[১] তুমি কি জানো, কদরের রাত কি? কদরের রাত হাজার মাসের চাইতেও বেশী ভালো।[২] ফেরেশতারা ও রূহ[৩] এই রাতে তাদের রবের অনুমতিক্রমে প্রত্যেকটি হুকুম নিয়ে নাযিল হয়।[৪] এ রাতটি পুরোপুরি শান্তিময় ফজরের উদয় পর্যন্ত।[৫]

১. মূল শব্দ হচ্ছে আন্‌যালনাহু (أَنْزَلْنٰهُ) "আমি একে নাযিল করেছি" কিন্তু আগে কুরআনের কোন উল্লেখ না করেই কুরআনের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, "নাযিল করা" শব্দের মধ্যেই কুরআনের অর্থ রয়ে গেছে। যদি আগের বক্তব্য বা বর্ণনাভংগী থেকে কোন্ সর্বনাম কোন্ বিশেষ্যের জায়গায় বসেছে তা প্রকাশ হয়ে যায় তাহলে এমন অবস্থায় আগে বা পরে কোথাও সেই বিশেষ্যটির উল্লেখ না থাকলেও সর্বনামটি ব্যবহার করা যায়। কুরআনে এর একাধিক দৃষ্টান্ত রয়ে গেছে। (এ ব্যাপারে আরো বেশী জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন আন্ নাজ্‌ম ৯ টীকা)

এখানে বলা হয়েছে, আমি কদরের রাতে কুরআন নাযিল করেছি আবার সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ "রমযান মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।" (১৮৫ আয়াত) এ থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হেরা গুহায় যে রাতে আল্লাহর ফেরেশতা অহী নিয়ে এসেছিলেন সেটি ছিল রমযান মাসের একটি রাত। এই রাতকে এখানে কদরের রাত বলা হয়েছে। সূরা দুখানে একে মুবারক রাত বলা হয়েছে। বলা হয়েছে : إِنَّا أَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ "অবশ্যি আমি একে একটি বরকতপূর্ণ রাতে নাযিল করেছি।" (৩ আয়াত)

এই রাতে কুরআন নাযিল করার দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, এই রাতে সমগ্র কুরআন অহীর ধারক ফেরেশতাদেরকে দিয়ে দেয়া হয়। তারপর অবস্থা ও ঘটনাবলী অনুযায়ী তেইশ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে জিব্রীল আলাইহিস সালাম আল্লাহর হুকুমে তার

আয়াত ও সূরাগুলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল করতে থাকেন। ইবনে আব্বাস (রা) এ অর্থটি বর্ণনা করেছেন। (ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া ও বায়হাকী) এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এই রাত থেকেই কুরআন নাযিলের সূচনা হয়। এটি ইমাম শা'বীর উক্তি। অবশ্যি ইবনে আব্বাসের (রা) ওপরে বর্ণিত বক্তব্যের মতো তাঁর একটি উক্তিও উদ্ধৃত করা হয়। (ইবনে জারীর) যা হোক, উভয় অবস্থায় কথা একই থাকে। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর কুরআন নাযিলের সিলসিলা এই রাতেই শুরু হয় এবং এই রাতেই সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়। তবুও এটি একটি অভ্রান্ত সত্য, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং তাঁর ইসলামী দাওয়াতের জন্য কোন ঘটনা বা ব্যাপারে সঠিক নির্দেশ লাভের প্রয়োজন দেখা দিলে তখনই আল্লাহ কুরআনের সূরা ও আয়াতগুলো রচনা করতেন না। বরং সমগ্র বিশ্ব-জাহান সৃষ্টির পূর্বে অনাদিকালে মহান আল্লাহ পৃথিবীতে মানব জাতির সৃষ্টি, তাদের মধ্যে নবী প্রেরণ, নবীদের ওপর কিতাব নাযিল, সব নবীর পরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠানো এবং তাঁর প্রতি কুরআন নাযিল করার সমস্ত পরিকল্পনা তৈরি করে রেখেছিলেন। কদরের রাতে কেবলমাত্র এই পরিকল্পনার শেষ অংশের বাস্তবায়ন শুরু হয়। এই সময় যদি সমগ্র কুরআন অহী ধারক ফেরেশতাদের হাতে তুলে দেয়া হয়ে থাকে তাহলে তা মোটেই বিস্ময়কর নয়।

কোন কোন তাফসীরকার কদরকে তকদীর অর্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ এই রাতে আল্লাহ তকদীরের ফায়সালা জারী করার জন্য তা ফেরেশতাদের হাতে তুলে দেন। সূরা দুখানের নিম্নোক্ত আয়াতটি এই বক্তব্য সমর্থন করে ঃ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ "এই রাতে সব ব্যাপারে জ্ঞানগর্ভ ফায়সালা প্রকাশ করা হয়ে থাকে।" (৪ আয়াত) অন্যদিকে ইমাম যুহরী বলেন, কদর অর্থ হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা। অর্থাৎ এটি অত্যন্ত মর্যাদাশালী রাত। এই অর্থ সমর্থন করে এই সূরার নিম্নোক্ত আয়াতটি "কদরের রাত হাজার মাসের চাইতেও উত্তম।"

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এটা কোন্ রাত ছিল? এ ব্যাপারে ব্যাপক মতবিরোধ দেখা যায়। এ সম্পর্কে প্রায় ৪০টি মতের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে আলেম সমাজের সংখ্যাগুরু অংশের মতে রমযানের শেষ দশ তারিখের কোন একটি বেজোড় রাত হচ্ছে এই কদরের রাত। আবার তাদের মধ্যেও বেশীরভাগ লোকের মত হচ্ছে সেটি সাতাশ তারিখের রাত। এ প্রসংগে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলো এখানে উল্লেখ করছি।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাইলাতুল কদর সম্পর্কে বলেন ঃ সেটি সাতাশের বা উনত্রিশের রাত। (আবু দাউদ) হযরত আবু হুরাইরার (রা) অন্য একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে সেটি রমযানের শেষ রাত। (মুসনাদে আহমাদ)

যির ইবনে হুবাইশ হযরত উবাই ইবনে কা'বকে (রা) কদরের রাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি হলফ করে কোন কিছুকে ব্যতিক্রম হিসেবে দাঁড় না করিয়ে বলেন, এটা সাতাশের রাত। (আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে হিব্বান)

হযরত আবু যারকে (রা) এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি বলেন, হযরত উমর (রা), হযরত হুযাইফা (রা) এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু সাহাবার মনে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না যে, এটি রমযানের সাতাশতম রাত। (ইবনে আবী শাইবা)

হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, রমযানের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলোর যেমন একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ, উনত্রিশ বা শেষ রাতের মধ্যে রয়েছে কদরের রাত। (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তাকে খোঁজ রমযানের শেষ দশ রাতের মধ্যে যখন মাস শেষ হতে আর নয় দিন বাকি থাকে। অথবা সাত দিন বা পাঁচ দিন বাকি থাকে। (বুখারী) অধিকাংশ আলেম এর অর্থ করেছেন এভাবে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে বেজাড় রাতের কথা বলতে চেয়েছেন।

হযরত আবু বকরাহ (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, নয় দিন বাকি থাকতে বা সাত দিন বা পাঁচ দিন বা এক দিন বাকি থাকতে অথবা শেষ রাত। তাঁর বক্তব্যের অর্থ ছিল, এই তারিখগুলোতে কদরের রাতকে তালাশ করো। (তিরমিযী ও নাসায়ী)

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ কদরের রাতকে রমযানের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলোর মধ্যে তালাশ করো। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী) হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এও বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত রমযানের শেষ দশ রাতে ইতিকাফ করেছেন।

এ প্রসংগে হযরত মু'আবীয়া (রা) হযরত ইবনে উমর (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এবং অন্যান্য সাহাবীগণ যে রেওয়ায়াত করেছেন তার ভিত্তিতে পূর্ববর্তী আলেমগণের বিরাট অংশ সাতাশ রমযানকেই কদরের রাত বলে মনে করেন। সম্ভবত কদরের রাতের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম থেকে লাভবান হবার আগ্রহে যাতে লোকেরা অনেক বেশী রাত ইবাদাতে কাটাতে পারে এবং কোন একটি রাতকে যথেষ্ট মনে না করে সে জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে কোন একটি রাত নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। এখানে প্রশ্ন দেখা দেয়, যখন মক্কা মু'আয্যমায় রাত হয় তখন দুনিয়ার একটি বিরাট অংশে থাকে দিন, এ অবস্থায় এসব এলাকার লোকেরা তো কোন দিন কদরের রাত লাভ করতে পারবে না। এর জবাব হচ্ছে, আরবী ভাষায় 'রাত' শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দিন ও রাতের সমষ্টিকে বলা হয়। কাজেই রমযানের এই তারিখগুলোর মধ্য থেকে যে তারিখটিই দুনিয়ার কোন অংশে পাওয়া যাবে তার দিনের পূর্বেকার রাতটিই সেই এলাকার জন্য কদরের রাত হতে পারে।

২. মুফাস্‌সিরগণ সাধারণভাবে এর অর্থ করেছেন, এ রাতের সৎকাজ হাজার মাসের সৎকাজের চেয়ে ভালো। কদরের রাত এ গণনার বাইরে থাকবে। সন্দেহ নেই একথাটির মধ্যে যথার্থ সত্য রয়ে গেছে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই রাতের আমলের বিপুল ফযীলত বর্ণনা করেছেন। কাজেই বুখারী ও মুসলিমে হযরত

আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ

"যে ব্যক্তি কদরের রাতে ঈমানের সাথে এবং আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদাতের জন্যে দাঁড়ালো তার পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হয়েছে।"

মুসনাদে আহমাদে হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কদরের রাত রয়েছে রমযানের শেষ দশ রাতের মধ্যে। যে ব্যক্তি প্রতিদান লাভের আকাংক্ষা নিয়ে এসব রাতে ইবাদাতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে আল্লাহ তার আগের পিছনের সব গোনাহ মাফ করে দেবেন।" কিন্তু আয়াতে উচ্চারিত শব্দগুলোয় একথা বলা হয়নি الْعَمَلُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْعَمَلِ فِىْ اَلْفِ شَهْرٍ (কদরের রাতের আমল হাজার রাতের আমলের চেয়ে ভালো) বরং বলা হয়েছে, "কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে ভালো।" আর মাস বলতে একেবারে গুণে গুণে তিরাশি বছর চার মাস নয়। বরং আরববাসীদের কথার ধরনই এই রকম ছিল, কোন বিপুল সংখ্যার ধারণা দেবার জন্য তারা "হাজার" শব্দটি ব্যবহার করতো। তাই আয়াতের অর্থ হচ্ছে, এই একটি রাতে এত বড় নেকী ও কল্যাণের কাজ হয়েছে যা মানবতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে কোন দীর্ঘতম কালেও হয়নি।

৩. রূহ বলতে জিব্রীল আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়েছে। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কারণে সমস্ত ফেরেশতা থেকে আলাদা করে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. অর্থাৎ তারা নিজেদের তরফ থেকে আসে না। বরং তাদের রবের অনুমতিক্রমে আসে। আর প্রত্যেকটি হুকুম বলতে সূরা দুখানের ৫ আয়াতে "আমরে হাকীম" (বিজ্ঞতাপূর্ণ কাজ) বলতে যা বুঝনো হয়েছে এখানে তার কথাই বলা হয়েছে।

৫. অর্থাৎ সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত সারাটা রাত শুধু কল্যাণে পরিপূর্ণ। সেখানে ফিতনা, দুষ্কৃতি ও অনিষ্টকারিতার ছিটেফোটাও নেই।

আল বাইয়েনাহ

৯৮

নামকরণ

প্রথম আয়াতের শেষ শব্দ আল বাইয়েনাহ (اَلْبَيِّنَةُ) থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরাটিরও মক্কী বা মাদানী হবার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। অনেক মুফাস্‌সির বলেন, অধিকাংশ আলেমের মতে এটি মক্কী সূরা। আবার অনেক মুফাস্‌সির বলেন, অধিকাংশ আলেমের মতে এটি মাদানী সূরা। ইবনুল যুবাইর ও আতা ইবনে ইয়াসারের উক্তি মতে এটি মাদানী সূরা। ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহর এ ব্যাপারে দু'ধরনের উক্তি পাওয়া যায়। এক উক্তি অনুযায়ী এটি মক্কী এবং অন্য উক্তি অনুযায়ী মাদানী সূরা। হযরত আয়েশা (রা) একে মক্কী গণ্য করেন। বাহরুল মুহীত গ্রন্থ প্রণেতা আবু হাইয়ান ও আহকামুল কুরআন গ্রন্থ প্রণেতা আবদুল মুনঈম ইবনুল ফারাস এর মক্কী হওয়াকেই অগ্রাধিকার দেন। অন্যদিকে সূরাটির বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন কোন আলামত পাওয়া যায় না যা থেকে এর মক্কী বা মাদানী হবার ব্যাপারে কোন চূড়ান্ত ফায়সালা করা যেতে পারে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

কুরআন মজীদের বিন্যাসের ক্ষেত্রে একে সূরা আলাক ও সূরা কদরের পরে রাখাটাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সূরা আলা'কে সর্বপ্রথম নাযিলকৃত অহী লিপিবদ্ধ হয়েছে। সূরা কদরে বলা হয়েছে সেগুলো কবে নাযিল হয়। আর এই সূরায় এই পবিত্র কিতাবের সাথে একজন রসূল পাঠানো জরুরী ছিল কেন তা বলা হয়েছে।

সর্বপ্রথম রসূল পাঠাবার প্রয়োজন বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে এই যে, আহলি কিতাব ও মুশরিক নির্বিশেষে দুনিয়াবাসীরা কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে। একজন রসূল পাঠানো ছাড়া এই কুফরীর বেড়াজাল ভেদ করে তাদের বের হয়ে আসা সম্ভব নয়। এ রসূলের অস্তিত্ব তাঁর রিসালাতের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে পরিগণিত হতে হবে এবং তিনি লোকদের সামনে আল্লাহর কিতাবকে তার আসল ও সঠিক আকৃতিতে পেশ করবেন। অতীতের আসমানী কিতাবসমূহে যেমন বাতিলের মিশ্রণ ঘটানো হয়েছিল তেমন কোন মিশ্রণ তাতে থাকবে না এবং তা হবে পুরোপুরি সত্য ও সঠিক শিক্ষা সমন্বিত।

এরপর আহলি কিতাবদের গোমরাহী তুলে ধরা হয়েছে, বলা হয়েছে তাদের এই বিভিন্ন ভুল পথে ছুটে বেড়ানোর মানে এ নয় যে, আল্লাহ তাদেরকে পথ দেখাননি। বরং

তাদের সামনে সঠিক পথের বর্ণনা সুস্পষ্টভাবে এসে যাবার পরপরই তারা ভুল পথে পাড়ি জমিয়েছে। এ থেকে স্বাভাবিকভাবে প্রমাণ হয়, নিজেদের ভুলের জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। এখন আবার আল্লাহর এই রসূলের মাধ্যমে সত্য আর এক দফা সুস্পষ্ট হবার পরও যদি তারা বিভ্রান্তের মতো ভুল পথে ছুটে বেড়াতে থাকে তাহলে তাদের দায়িত্বের বোঝা আরো বেশী বেড়ে যাবে।

এ প্রসংগে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব নবী এসেছিলেন তাঁরা সবাই একটি মাত্র হুকুম দিয়েছিলেন এবং যেসব কিতাব পাঠানো হয়েছিল সেসবে একটি মাত্র হুকুমই বর্ণিত হয়েছিল। সেটি হচ্ছে ঃ সব পথ ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর বন্দেগীর পথ অবলম্বন করো। তাঁর ইবাদাত, বন্দেগী ও আনুগত্যের সাথে আর কারোর ইবাদাত–বন্দেগী, আনুগত্য ও উপাসনা আরাধনা শামিল করো না। নামায কায়েম করো এবং যাকাত দাও। চিরকাল এটিই সঠিক দীন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। এ থেকেও স্বাভাবিকভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আহলি কিতাবরা এই আসল দীন থেকে সরে গিয়ে নিজেদের ধর্মে যেসব নতুন নতুন কথা বাড়িয়ে নিয়েছে সেগুলো সবই বাতিল। আর আল্লাহর এই নবী যিনি এখন এসেছেন তিনি তাদেরকে এই আসল দীনের দিকে ফিরে আসার দাওয়াত দিচ্ছেন।

সবশেষে পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছে, যেসব আহলি কিতাব ও মুশরিক এই রসূলকে মেনে নিতে অস্বীকার করবে তারা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। তাদের শাস্তি চিরন্তন জাহান্নাম। আর যারা ঈমান এনে সৎকর্মের পথ অবলম্বন করবে এবং দুনিয়ায় আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করবে তারা সর্বোত্তম সৃষ্টি। তারা চিরকাল জান্নাতে থাকবে। এই তাদের পুরস্কার। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও হয়েছে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

আয়াত ৮ সূরা আল বাইয়েনাহ-মক্কী রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ
مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝١ رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا
مُّطَهَّرَةً ۝٢ فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝٣

আহলি কিতাব ও মুশরিকদের[১] মধ্যে যারা কাফের ছিল[২] তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত তারা (নিজেদের কুফরী থেকে) বিরত থাকতে প্রস্তুত ছিল না।[৩] (অর্থাৎ) আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রসূল[৪] যিনি পবিত্র সহীফা পড়ে শুনাবেন,[৫] যাতে একেবারে সঠিক কথা লেখা আছে।

১. আহলি কিতাব ও মুশরিক উভয় দলই কুফরী কর্মকাণ্ডে জড়িত হলেও দু'দলকে দু'টি পৃথক নাম দেয়া হয়েছে। যাদের কাছে আগের নবীদের আনা কোন আসমানী কিতাব ছিল, তা যত বিকৃত আকারেই থাক না কেন, তারা তা মেনে চলতো, তাদেরকে বলা হয় আহলি কিতাব। আর যারা কোন নবীর অনুসারী ছিল না কোন আসমানী কিতাবও মানতো না তারা মুশরিক। কুরআন মজীদের বহু স্থানে আহলি কিতাবদের শির্কের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন খৃষ্টানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ তারা বলে, আল্লাহ তিন খোদার একজন।" (আল মায়েদাহ ৭৩) "তারা মসীহকেও খোদা বলে।" (আল মায়েদাহ ১৭) "তারা মসীহকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করে।" (আত তাওবা ৩০) আবার ইহুদিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "তারা উযাইরকে আল্লাহর পুত্র বলে" (আত তাওবা ৩০) কিন্তু এসব সত্ত্বেও কুরআনের কোথাও তাদের জন্য মুশরিক পরিভাষা ব্যবহার করা হয়নি। বরং তাদের উল্লেখ করা হয়েছে "আহলি কিতাব" বা "যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল" শব্দের মাধ্যমে। অথবা ইয়াহুদ ও নাসারা শব্দদ্বয়ের মাধ্যমে। কারণ তারা আসল তাওহিদী ধর্ম মানতো, তারপর শির্ক করতো। বিপরীত পক্ষে অ-আহ্‌লি কিতাবদের জন্য পারিভাষিক পর্যায়ে মুশরিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ তারা শির্ককেই আসল ধর্ম গণ্য করতো। তাওহীদকে তারা পুরোপুরি ও চূড়ান্তভাবে অস্বীকার করতো। এ দু'টি দলের মধ্যকার এ পার্থক্যটা শুধুমাত্র পরিভাষার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল না, শরীয়াতের বিধানের মধ্যেও এ পার্থক্য ছিল। আহলি কিতাবরা আল্লাহর নাম নিয়ে যদি কোন হালাল প্রাণীকে সঠিক পদ্ধতিতে যবেহ করে তাহলে তা মুসলমানদের জন্য হালাল গণ্য করা হয়েছে।

তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করারও অনুমতি দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে মুশরিকদের যবেহ করা প্রাণীও হালাল নয় এবং তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করারও অনুমতি দেয়া হয়নি।

২. এখানে কুফরী শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার কুফরী দৃষ্টিভংগী এর অন্তরভুক্ত। যেমন কেউ এই অর্থে কাফের ছিল যে, সে আদৌ আল্লাহকে মানতো না। আবার কেউ আল্লাহকে মানতো ঠিকই কিন্তু তাঁকে একমাত্র মাবুদ বলে মানতো না। বরং আল্লাহর সত্তা ও তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বের গুণাবলী ও ক্ষমতায় কোন না কোনভাবে অন্যদেরকে শরীক করে তাদের বন্দেগীও করতো। কেউ আল্লাহর একত্ব স্বীকার করতো কিন্তু এ সত্ত্বেও আবার কোন না কোন ধরনের শিরকও করতো। কেউ আল্লাহকে মানতো কিন্তু তাঁর নবীদেরকে মানতো না এবং নবীদের মাধ্যমে যে হেদায়াত এসেছিল তাকে মানতে অস্বীকার করতো। কেউ এক নবীকে মানতো কিন্তু অন্য নবীকে অস্বীকার করতো। মোটকথা, বিভিন্ন ধরনের কুফরীতে লোকেরা লিপ্ত ছিল। এখানে 'আহলি কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের ছিল', একথা বলার অর্থ এ নয় যে, তাদের মধ্যে তাহলে কিছু লোক ছিল যারা কুফরীতে লিপ্ত ছিল না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, কুফরীতে লিপ্ত দু'টি দল ছিল, একটি আহলি কিতাব ও অন্যটি মুশরিক। এখানে মিন (مِنْ) শব্দটি কতক বা কিছু অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং 'মিন' এখানে বর্ণনামূলক। যেমন সূরা হজ্জের ৩০ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ অর্থাৎ মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো। এর অর্থ এ নয় যে, মূর্তিদের মধ্যে যে অপবিত্রতা আছে তা থেকে দূরে থাকো। তেমনি اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ এর অর্থও হচ্ছে ঃ যারা কুফরী করে, যারা আহলে কিতাব ও মুশরিকদের দলের অন্তরভুক্ত। এর অর্থ এ নয় যে, এই দু'টি দলের মধ্য থেকে যারা কুফরী করে।

৩. অর্থাৎ একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে তাদেরকে কুফরীর প্রতিটি গলদ ও সত্য বিরোধী বিষয় বুঝাবে এবং যুক্তি–প্রমাণের সাহায্যে সুস্পষ্ট পদ্ধতিতে সত্য সঠিক পথ তাদের সামনে পেশ করবে, এ ছাড়া এই কুফরীর অবস্থা থেকে বের হবার আর কোন পথ তাদের সামনে ছিল না। এর মানে এ নয় যে, এই সুস্পষ্ট প্রমাণটি এসে যাবার পর তারা সবাই কুফরী পরিত্যাগ করবে। বরং এর মানে হচ্ছে এই প্রমাণটির অনুপস্থিতিতে তাদের এই অবস্থার মধ্য থেকে বের হয়ে আসা সম্ভবপরই ছিল না। তবে তার আসার পরও তাদের মধ্য থেকে যারা নিজেদের কুফরীর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তার দায়িত্ব তাদের ওপরই বর্তায়। এরপর তারা আল্লাহর কাছে অভিযোগ করতে পারবে না যে, আপনি আমাদের হেদায়াতের কোন ব্যবস্থা করেননি। এই ধরনের কথা কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে। যেমন সূরা নাহলে বলা হয়েছে ঃ وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ "সোজা পথ দেখানো আল্লাহরই দায়িত্ব।" (৯ আয়াত) সূরা লাইলে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى "পথ দেখাবার দায়িত্ব আমার।" (১২ আয়াত)

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ .....

رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ -

"আমি তোমার প্রতি ঠিক তেমনিভাবে অহী পাঠিয়েছি যেভাবে নূহ ও তারপর নবীদের প্রতি পাঠিয়েছিলাম.....এই রসূলদেরকে সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারী করা হয়েছে যাতে রসূলদের পর লোকদের জন্য আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন যুক্তি না থাকে।" (আন নিসা ১৬৩-১৬৫)

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ز فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ط

"হে আহলি কিতাব! রসূলদের সিলসিলা দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পর প্রকৃত সত্যকে সুস্পষ্ট করার জন্য তোমাদের কাছে আমার রসূল এসেছে। যাতে তোমরা বলতে না পারো আমাদের কাছে না কোন সুসংবাদদানকারী এসেছিল, না এসেছিল কোন সতর্ককারী। কাজেই নাও, এখন তোমাদের কাছে সুসংবাদদানকারী এসে গেছে এবং সতর্ককারীও।" (আল মায়েদাহ ১৯)

৪. এখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ বলা হয়েছে। কারণ তাঁর নবুওয়াত লাভের আগের ও পরের জীবন, নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কুরআনের মতো কিতাব পেশ করা, তাঁর শিক্ষা ও সাহচর্যের প্রভাবে ঈমান গ্রহণকারীদের জীবনে অস্বাভাবিক পরিবর্তন সূচিত হওয়া, তাঁর পুরোপুরি যুক্তিসংগত আকীদা-বিশ্বাস, অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ইবাদাত-বন্দেগী, চূড়ান্ত পর্যায়ের পবিত্র ও নিষ্কলুষ নৈতিক চরিত্র এবং মানব জীবন গঠনের জন্য সবচেয়ে ভালো মূলনীতি ও বিধি-বিধান শিক্ষা দেয়া, তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে পুরোপুরি সামঞ্জস্য থাকা এবং সব ধরনের বিরোধিতা ও বাধা-বিপত্তির মোকাবেলায় সীমাহীন দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা সহকারে তাঁর নিজের দাওয়াতের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া—এসব বিষয়ই তিনি যে যথার্থই আল্লাহর রসূল সে কথারই ছিল সুস্পষ্ট আলামত।

৫. আভিধানিক অর্থে 'সহীফা' বলা হয় "লিখিত পাতাকে।" কিন্তু কুরআন মজীদে এ শব্দটিকে পারিভাষিক অর্থে নবীগণের ওপর নাযিলকৃত কিতাব হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আর পবিত্র সহীফা মানে হচ্ছে এমন সব সহীফা যার মধ্যে কোন প্রকার বাতিল, কোন ধরনের গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা এবং কোন নৈতিক অপবিত্রতার মিশ্রণ নেই। কোন ব্যক্তি এই কথাগুলোর পুরোপুরি গুরুত্ব তখনই অনুধাবন করতে পারবেন যখন তিনি কুরআনের পাশাপাশি বাইবেল (এবং অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থগুলোও) অধ্যয়ন করবেন। সেখানে তিনি দেখবেন সঠিক কথার সাথে সাথে এমন কথাও লেখা আছে, যা সত্য ও ন্যায় এবং সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিরও পরিপন্থী। আবার এই সংগে নৈতিক দিক দিয়েও অত্যন্ত নিম্নমানের। এসব কথা পড়ার পর কুরআন পড়লে যে কোন ব্যক্তি তার অসাধারণ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রমাণ পেয়ে যাবেন।

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿٤﴾ وَمَا
أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

প্রথমে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে তো বিভেদ সৃষ্টি হলো তাদের কাছে (সত্য পথের) সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে যাওয়ার পর।[৬] তাদেরকে তো এ ছাড়া আর কোন হুকুম দেয়া হয়নি যে, তারা নিজেদের দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করবে, নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে, এটিই যথার্থ সত্য ও সঠিক দীন।[৭]

৬. অর্থাৎ ইতিপূর্বে আহলি কিতাবরা বিভিন্ন ভুল পথে পাড়ি জমিয়ে যেসব বিভিন্ন দল ও উপদলের উদ্ভব ঘটিয়েছিল তার কারণ এ ছিল না যে, মহান আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে পথ দেখাবার জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ পাঠাবার ব্যাপারে কোন ফাঁক রেখেছিলেন। বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে পথনির্দেশনা আসার পর তারা নিজেরাই এ কর্মনীতি অবলম্বন করেছিল। কাজেই নিজেদের গোমরাহীর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী ছিল। কারণ তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য পূর্ণাংগ ব্যবস্থা অবলম্বন করে প্রমাণ পূর্ণ করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে এখন যেহেতু তাদের সহীফাগুলো পাক-পবিত্র ছিল না এবং তাদের কিতাবগুলো একেবারে সত্য সঠিক, শিক্ষা সম্বলিত ছিল না, তাই মহান আল্লাহ একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে নিজের একজন রসূল পাঠিয়ে এবং তাঁর মাধ্যমে পুরোপুরি সত্য-সঠিক শিক্ষা সম্বলিত পাক-পবিত্র সহীফা পেশ করে আবার তাদের ওপর প্রমাণ পূর্ণ করে দিলেন। ফলে এর পরেও যদি তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয় তাহলে এর দায়িত্ব তাদের ওপরই বর্তাবে। আল্লাহর মোকাবেলায় তারা কোন প্রমাণ পেশ করতে পারবে না। কুরআন মজীদের বহু জায়গায় একথা বলা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন সূরা আল বাকারা ২১৩-২৫৩ আয়াত, আলে ইমরান ১৯ আয়াত, আল মায়েদাহ ৪৪-৫০ আয়াত, ইউসুফ ৯৩ আয়াত, আশ শূরা ১৩-১৫ আয়াত, আল জাসিয়াহ ১৬-১৮ আয়াত। এই সাথে তাফহীমুল কুরআনে এসব আয়াতের আমি যে ব্যাখ্যাগুলো লিখেছি সেগুলোর ওপরও যদি একবার নজর বুলানো যায় তাহলে বক্তব্যটি অনুধাবন করা আরো সহজ হবে।

৭. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীনটি পেশ করছেন। আহলি কিতাবদের কাছে যেসব কিতাব নাযিল করা হয়েছিল এবং তাদের কাছে যেসব নবী এসেছিলেন তারাও তাদেরকে সেই একই দীনের তালীম দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে যেসব বাতিল আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ-কর্মের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল তার কোনটিরও হুকুম তারা দেননি। সবসময় সত্য ও সঠিক দীন একটিই ছিল। আর সেটি হচ্ছে ঃ একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করতে হবে। তাঁর

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝٦ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝٧ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ
ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝٨

আহলি কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে[৮] তারা নিশ্চিতভাবে জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। তারা সৃষ্টির অধম।[৯] যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা নিশ্চিতভাবে সৃষ্টির সেরা।[১০] তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের রবের কাছে চিরস্থায়ী জান্নাত, যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এসব সে ব্যক্তির জন্য যে তার রবকে ভয় করে।[১১]

বন্দেগীর সাথে আর কারো বন্দেগীর মিশ্রণ ঘটানো যাবে না। সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এনে একমাত্র আল্লাহর পূজারী এবং তাঁর ফরমানের অনুগত হতে হবে। নামায কায়েম করতে হবে। যাকাত দিতে হবে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য পড়ুন তাফহীমুল কুরআন আল আ'রাফ ১৯ টীকা, ইউনুস ১০০-১০৯ টীকা, আররূম ৪৩-৪৭ টীকা এবং আয যুমার ৩-৪ টীকা।

এই আয়াতে 'দীনুল কাইয়েমা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির একে دِيْنُ الْمِلَّةِ الْقَيِّمَةِ অর্থাৎ "সত্য-সঠিক পথাশ্রয়ী মিল্লাতের দ্বীন" অর্থে নিয়েছেন। আবার কেউ কেউ একে বিশেষ্যের সাথে বিশেষণের সম্বন্ধ হিসেবে গণ্য করেছেন এবং قَيِّمَةٌ এর ي কে عَلَّامَةٌ ও فَهَّامَةٌ এর মধ্যস্থিত ا এর মতো অত্যধিক বৃদ্ধি অর্থে গ্রহণ করেছেন। আমি এখানে অনুবাদে যে অর্থ গ্রহণ করেছি তাদের মতে এর অর্থও তাই।

৮. এখানে কুফরী মানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মেনে নিতে অস্বীকার করা। অর্থাৎ মুশরিক ও আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে যারা এই রসূলের নবুওয়াত লাভের পর তাঁকে মানেনি। অথচ তাঁর অস্তিত্বই একটি সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল প্রমাণ। তিনি সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভুল লিপি সম্বলিত মত পবিত্র সহীফা পাঠ করে তাদেরকে শুনাচ্ছেন। এ ধরনের লোকদের পরিণাম তাই হবে যা সামনের দিকে বর্ণনা করা হচ্ছে।

৯. অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি আর নেই। এমন কি তারা পশুরও অধম। কারণ পশুর বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তা ও কর্মশক্তি নেই। কিন্তু এরা বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তা ও কর্মশক্তি সত্ত্বেও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

১০. অর্থাৎ তারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবার এমনকি ফেরেশতাদেরও সেরা। কারণ ফেরেশতারা আল্লাহর নাফরমানি করার স্বাধীন ক্ষমতা রাখে না। আর মানুষ এই নাফরমানি করার স্বাধীন ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করে।

১১. অন্য কথায় যে ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে নির্ভীক এবং তাঁর মোকাবিলায় দুঃসাহসী ও বেপরোয়া হয়ে জীবন যাপন করে না। বরং দুনিয়ায় প্রতি পদে পদে আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করে। প্রতি পদক্ষেপে যে ব্যক্তি মনে করে, কোথাও আমি এমন কোন কাজ তো করে বসিনি যার ফলে আল্লাহ আমাকে পাকড়াও করে ফেলেন, তার জন্য আল্লাহর কাছে রয়েছে এই প্রতিদান ও পুরস্কার।

আয যিলযাল

৯৯

নামকরণ

প্রথম আয়াতের যিলযালাহা (زِلْزَالَهَا) শব্দ থেকে এই নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এর মক্কী বা মাদানী হবার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইবনে মাসউদ (রা), আতা, জাবের ও মুজাহিদ বলেন, এটি মক্কী সূরা। ইবনে আব্বাসের (রা) একটি উক্তিও এর সমর্থন করে। অন্যদিকে কাতাদাহ ও মুকাতিল বলেন, এটি মাদানী সূরা। এর মাদানী হবার সমর্থনে ইবনে আব্বাসেরও (রা) আর একটি উক্তি পাওয়া যায়। ইবনে আবী হাতেম হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে যে রেওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন তার থেকেও এর মাদানী হবার সমর্থনে প্রমাণ পেশ করা হয়। তাতে বলা হয়েছে ঃ যখন فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ – وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ আয়াতটি নাযিল হয় তখন আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আমার আমল দেখবো? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। আমি বললাম, এই বড় বড় গোনাহগুলোও দেখবো? জবাব দিলেন, হাঁ। বললাম, আর এই ছোট ছোট গোনাহগুলোও? জবাব দিলেন হাঁ। একথা শুনে আমি বললাম, তাহলে তো আমি মারা পড়েছি। তিনি বললেন, আনন্দিত হও, হে আবু সাঈদ কারণ প্রত্যেক নেকী তার নিজের মতো দশটি নেকীর সমান হবে। এই হাদীস থেকে এই সূরাটির মাদানী হবার ভিত্তিমূলক প্রমাণ পাওয়া যায়। সেটি হচ্ছে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) মদীনার অধিবাসী ছিলেন। ওহোদ যুদ্ধের পরে তিনি বালেগ হন। তাই যদি তাঁর উপস্থিতিতে নাযিল হয়ে থাকে তাহলে এর মাদানী হওয়া উচিত। কিন্তু আয়াত ও সূরার শানেনুযুল বর্ণনা সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেঈগণের যে পদ্ধতি ছিল তা ইতিপূর্বে সূরা দাহর এর ভূমিকায় আমি বর্ণনা করে এসেছি। তা থেকে জানা যায়, কোন আয়াত সম্পর্কে সাহাবীর একথা বলা যে, এ আয়াতটি উমুক ঘটনা প্রসংগে নাযিল হয়েছিল, সংশ্লিষ্ট আয়াতটির ঐ সময় নাযিল হওয়ার চূড়ান্ত প্রামণ নয়। হতে পারে হযরত আবু সাঈদ জ্ঞান হবার পর যখন সর্বপ্রথম আয়াতটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে শুনেন তখন তার শেষ অংশ তাঁর মনে ভীতির সঞ্চার করে থাকবে এবং তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ওপরে বর্ণিত প্রশ্নগুলো করে থাকবেন। আর এই ঘটনাটিকে তিনি এমনভাবে বর্ণনা করে থাকবেন যাতে মনে হবে এই আয়াতটি যখন নাযিল হয় তখন তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই প্রশ্নগুলো করেন। যদি এই হাদীসটি সামনে না থাকে তাহলে কুরআনকে বুঝে অধ্যয়নকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুভব করবেন এটি একটি

মক্কী সূরা। বরং এর বক্তব্য বিষয় ও বর্ণনাভংগী থেকে অনুভূত হবে, এটি মক্কায় প্রাথমিক যুগে এমন সময় নাযিল হয় যখন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে ইসলামের বুনিয়াদি আকিদা–বিশ্বাস মানুষের সামনে পেশ করা হচ্ছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন এবং সেখানে দুনিয়ায় করা সমস্ত কাজের হিসেব মানুষের সামনে এসে যাওয়া। সর্বপ্রথম তিনটি ছোট ছোট বাক্যে বলা হয়েছে, মৃত্যুর পর মানুষের দ্বিতীয় জীবনের সূত্রপাত কিভাবে হবে এবং মানুষের জন্য তা হবে কেমন বিস্ময়কর। তারপর দু'টি বাক্যে বলা হয়েছে, মানুষ এই পৃথিবীর বুকে অবস্থান করে নিশ্চিন্তে সব রকমের কাজ করে গেছে। সে কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি যে, এই নিষ্প্রাণ জিনিস কোনদিন তার কাজকর্মের পক্ষে–বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। আল্লাহর হুকুমে সেদিন সে কথা বলতে থাকবে। প্রত্যেকটি লোকের ব্যাপারে সে বলবে, কোন্ সময় কোথায় সে কি কাজ করেছিল। তারপর বলা হয়েছে, সেদিন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষের নিজেদের কবর থেকে বের হয়ে দলে দলে আসতে থাকবে। তাদের কর্মকাণ্ড তাদেরকে দেখানো হবে। এমন পূর্ণাংগ ও বিস্তারিতভাবে এই কর্মকাণ্ড পেশ করা হবে যে, সামান্য বালুকণা পরিমাণ নেকী বা পাপও সামনে এসে যাবে।

আয়াত ৮ **সূরা আয যিলযাল-মাদানী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ① وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ②
وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ③ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ④ بِأَنَّ
رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ⑤

যখন পৃথিবীকে প্রবলবেগে ঝাঁকুনি দেয়া হবে।[১] পৃথিবী তার ভেতরের সমস্ত ভার বাইরে বের করে দেবে।[২] আর মানুষ বলবে, এর কী হয়েছে?[৩] সেদিন সে তার নিজের (ওপর যা কিছু ঘটেছে সেই) সব অবস্থা বর্ণনা করবে।[৪] কারণ তোমার রব তাকে (এমনটি করার) হুকুম দিয়ে থাকবেন।

১. মূল শব্দগুলো হচ্ছে, زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا 'যালযালাহ' মানে হচ্ছে, একাদিক্রমে পরপর জোরে জোরে ঝাড়া দেয়া। কাজেই زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ বলতে ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়ে এবং ভূমিকম্পের পর ভূমিকম্পের মাধ্যমে পৃথিবীকে ভীষণভাবে কাঁপিয়ে দেয়া হবে। আর যেহেতু পৃথিবীকে নাড়া দেবার কথা বলা হয়েছে তাই এথেকে আপনা-আপনিই এই অর্থ বের হয়ে আসে যে, পৃথিবীর কোন একটি অংশ কোন একটি স্থান বা অঞ্চল নয় বরং সমগ্র পৃথিবীকে কম্পিত করে দেয়া হবে। তারপর এই নাড়া দেবার এই ভূকম্পনের ভয়াবহতা আরো বেশী করে প্রকাশ করার জন্য তার সাথে বাড়তি زِلْزَالَهَا শব্দটিও বসিয়ে দেয়া হয়েছে। এ শব্দটির শাব্দিক মানে হচ্ছে, "কম্পিত হওয়া।" অর্থাৎ তার মতো বিশাল ভূগোলককে যেভাবে ঝাঁকানি দিলে কাঁপে অথবা যেভাবে ঝাঁকানি দিলে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে ভীষণভাবে কাঁপে ঠিক সেভাবে তাকে ঝাঁকানি দেয়া হবে। কোন কোন মুফাস্‌সির এই কম্পনকে প্রথম কম্পন ধরে নিয়েছেন। তাদের মতে কিয়ামতের প্রথম পর্বের সূচনা হবে যে কম্পন থেকে এটি হচ্ছে সেই কম্পন। অর্থাৎ যে কম্পনের পর দুনিয়ার সব সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তার সমগ্র ব্যবস্থাপনা ওলট-পালট হয়ে যাবে। কিন্তু মুফাস্‌সিরগণের একটি বড় দলের মতে যে কম্পনের মাধ্যমে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে অর্থাৎ যখন আগের পিছের সমস্ত মানুষ পুনর্বার জীবিত হয়ে উঠবে, এটি সেই কম্পন। এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি বেশী নির্ভুল। কারণ পরবর্তী সমস্ত আলোচনায় এই বিষয়টির প্রকাশ ঘটেছে।

২. এই বিষয়টি সূরা ইনশিকাকের ৪ আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ "আর যা কিছু তার মধ্যে রয়েছে তা বাইরে নিক্ষেপ করে দিয়ে খালি হয়ে যাবে।" এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, মরা মানুষ মাটির বুকে যেখানে যে অবস্থায় যে আকৃতিতে আছে তাদের সবাইকে বের করে এনে সে বাইরে ফেলে দেবে। আর পরবর্তী বাক্য থেকে একথা প্রকাশ হচ্ছে যে, সে সময় তাদের শরীরের সমস্ত চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অংশগুলো এক জায়গায় জমা হয়ে নতুন করে আবার সেই একই আকৃতি সহকারে জীবিত হয়ে উঠবে যেমন সে তার প্রথম জীবনের অবস্থায় ছিল। দুই, এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, কেবলমাত্র মরা মানুষদেরকে সে বাইরে নিক্ষেপ করে ক্ষ্যান্ত হবে না বরং তাদের প্রথম জীবনের সমস্ত কথা ও কাজ এবং যাবতীয় আচার-আচরণের রেকর্ড ও সাক্ষ্য-প্রমাণের যে বিশাল স্তূপ তার গর্ভে চাপা পড়ে আছে সেগুলোকেও বের করে বাইরে ফেলে দেবে। পরবর্তী বাক্যটিতে একথারই প্রকাশ ঘটেছে। তাতে বলা হয়েছে, যমীন তার ওপর যা কিছু ঘটেছে তা বর্ণনা করবে। তিন, কোন কোন মুফাস্সির এর তৃতীয় একটি অর্থও বর্ণনা করেছেন। সেটি হচ্ছে, সোনা, রূপা, হীরা, মণি-মাণিক্য এবং অন্যান্য যেসব মূল্যবান সম্পদ ভূ-গর্ভে সঞ্চিত রয়েছে সেগুলোর বিশাল বিশাল স্তূপও সেদিন যমীন উগড়ে দেবে। মানুষ দেখবে, এগুলোর জন্য তারা দুনিয়ায় প্রাণ দিতো। এগুলো কবজা করার জন্য তারা পরস্পর হানাহানি ও কাটাকাটি করতো। হকদারদের হক মেরে নিতো। চুরি-ডাকাতি করতো, জলে স্থলে দস্যুতা করতো। যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতো এবং এক একটি সম্প্রদায় ও জাতিকে ধ্বংস করে দিতো। আজ এসব কিছু তাদের সামনে উপস্থিত। অথচ এগুলো এখন আর তাদের কোন কাজে লাগবে না বরং উলটো তাদের জন্য আযাবের সরঞ্জাম হয়ে রয়েছে।

৩. মানুষ অর্থ প্রত্যেকটি মানুষ হতে পারে। কারণ পুনরায় জীবন লাভ করে চেতনা ফিরে পাবার সাথে সাথেই প্রত্যেক ব্যক্তির প্রথম প্রতিক্রিয়া এটিই হবে যে, এসব কি হচ্ছে? এটা যে হাশরের দিন একথা সে পরে বুঝতে পারবে। আবার মানুষ অর্থ আখেরাত অস্বীকারকারী মানুষও হতে পারে। কারণ যে বিষয়কে অসম্ভব মনে করতো তা তার সামনে ঘটে যেতে থাকবে এবং সে এসব দেখে অবাক ও পেরেশান হবে। তবে ঈমানদারদের মনে এ ধরনের বিস্ময় ও পেরেশানি থাকবে না। কারণ তখন তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও প্রত্যয় অনুযায়ীই সবকিছু হতে থাকবে। সূরা ইয়াসিনের ৫২ আয়াতটি এই দ্বিতীয় অর্থটি কতকটা সমর্থন করে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে সময় আখেরাত অস্বীকারকারীরা বলবে ঃ مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا "কে আমাদের শয়নাগার থেকে আমাদের উঠালো?" এর জবাব আসবেঃ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ "এটি সেই জিনিস যার ওয়াদা করুণাময় করেছিলেন এবং আল্লাহর পাঠানো রসূলগণ সত্য বলেছিলেন।" ঈমানদাররাই যে কাফেরদেরকে এই জবাব দেবে, এ ব্যাপারে এ আয়াতটি সুস্পষ্ট নয়। কারণ আয়াতে একথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তবে ঈমানদারদের পক্ষ থেকে তারা এই জবাব পাবে, এ সম্ভাবনা অবশ্যি এখানে আছে।

৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পড়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ "জানো তার সেই অবস্থা কি?" লোকেরা জবাব দেয়, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। রসূল (সা) বলেন ঃ "সেই অবস্থা হচ্ছে,

যমীনের পিঠে প্রত্যেক মানব মানবী যে কাজ করবে সে তার সাক্ষ্য দেবে। সে বলবে, এই ব্যক্তি উমুক দিন উমুক কাজ করেছিল। এই হচ্ছে সেই অবস্থা, যা যমীন বর্ণনা করবে।" (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে জারীর, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুনযির, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া এবং বায়হাকী ফিশ্শু'আব) হযরত রাবআহ আল খারাশী রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যমীন থেকে তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা করে চলবে। কারণ এ হচ্ছে তোমাদের মূল ভিত্তি। আর এমন কোন ব্যক্তি নেই যে এর ওপর ভালো-মন্দ কোন কাজ করে এবং সে তার খবর দেয় না।" (মু'জামুত তাবরানী) হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কিয়ামতের দিন যমীন এমন প্রতিটি কাজ নিয়ে আসবে যা তার পিঠের ওপর করা হয়েছে।" তারপর তিনি এই আয়াতটি তেলাওয়াত করেন। (ইবনে মারদুইয়া, বায়হাকী) হযরত আলী (রা) সংক্রান্ত জীবনীগ্রন্থে লিখিত হয়েছে ঃ বায়তুলমালের সমুদয় সম্পদ যখন তিনি হকদারদের মধ্যে বন্টন করে সব খালি করে দিতেন তখন সেখানে দু'রাকাত নফল নামায পড়তেন। তারপর বলতেন ঃ "তোকে সাক্ষ্য দিতে হবে, আমি তোকে সত্য সহকারে ভরেছি এবং সত্য সহকারে খালি করেছি।"

যমীনের ওপর যা কিছু ঘটে গেছে তার সবকিছু সে কিয়ামতের দিন বলে দেবে, যমীন সম্পর্কে একথাটি প্রাচীন যুগে মানুষকে অবাক করে দিয়ে থাকবে, এতে সন্দেহ নেই। কারণ তারা মনে করে থাকবে, যমীন আবার কেমন করে কথা বলবে? কিন্তু আজ পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত নতুন নতুন জ্ঞান-গবেষণা, আবিষ্কার-উদ্ভাবন এবং সিনেমা, লাউড স্পীকার, রেডিও, টেলিভিশন, টেপরেকর্ডার ও ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদির আবিষ্কারের এ যুগে যমীন তার নিজের অবস্থা ও নিজের ওপর ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী কিভাবে বর্ণনা করবে একথা অনুধাবন করা মোটেই কঠিন নয়। মানুষ তার মুখ থেকে যা কিছু উচ্চারণ করে তার পূর্ণ অবয়ব বাতাসে, রেডিও তরংগে, ঘরের দেয়ালে, মেঝে ও ছাদের প্রতি অণু-পরমাণুতে এবং কোন পথে, ময়দানে বা ক্ষেতে কোন কথা বলে থাকলে সেখানকার প্রতিটি অণু-কণিকায় তা গেঁথে আছে। আল্লাহ যখনি চাইবেন একথাগুলোকে এসব জিনিসের মাধ্যমে তখনই হুবহু ঠিক তেমনিভাবে শুনিয়ে দিতে পারবেন যেভাবে সেগুলো একদিন মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল। সে সময় মানুষ নিজের কানেই নিজের এই আওয়াজ শুনে নেবে। তার পরিচিত জনেরাও তার এই আওয়াজ চিনে নেবে এবং তারা একে তারই কণ্ঠধ্বনি ও বাকভংগীমা বলে সনাক্ত করবে। তারপর মানুষ যমীনের যেখানেই যে অবস্থায় যে কোন কাজ করেছে তার প্রতিটি নড়াচড়া ও অংগভংগির প্রতিচ্ছবি তার চারপাশের সমস্ত বস্তুতে পড়েছে এবং সেগুলোর মধ্যে সেসব চিত্রায়িত হয়ে রয়েছে। একেবারে নিকষ কালো আঁধারের বুকে সে কোন কাজ করে থাকলেও আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীন এমনসব রশ্মি রয়েছে যেগুলোর কাছে আলো-আঁধার সমান, তারা সকল অবস্থায় তার ছবি তুলতে পারে। এসব ছবি কিয়ামতের দিন একটি সচল ফিল্মের মতো মানুষের সামনে এসে যাবে এবং সারাজীবন সে কোথায় কি করেছে তা তাকে দেখিয়ে দেবে।

আসলে প্রত্যেক মানুষের কর্মকাণ্ড আল্লাহ সরাসরি জানলেও আখেরাতে যখন তিনি আদালত কায়েম করবেন তখন সেখানে যাকেই শাস্তি দেবেন ইনসাফ ও ন্যায়নীতির দাবী

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝٦ فَمَن يَعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝٨

সেদিন লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ফিরে আসবে,[৫] যাতে তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে দেখানো যায়।[৬] তারপর যে অতি অল্প পরিমাণ ভালো কাজ করবে সে তা দেখে নেবে এবং যে অতি অল্প পরিমাণ খারাপ কাজ করবে সে তা দেখে নেবে।[৭]

পুরোপুরি পালন করেই শাস্তি দেবেন। তাঁর আদালতে প্রত্যেকটি অপরাধী মানুষের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করা হবে তার সপক্ষে এমনসব অকুটিল সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা হবে যার ফলে তার অপরাধী হবার ব্যাপারে কারো কোন কথা বলার অবকাশ থাকবে না। সর্বপ্রথম পেশ করা হবে তার আমলনামা। সবসময় তার সাথে লেগে থাকা কেরামান কাতেবীন ফেরেশতাদ্বয় তার প্রত্যেকটি কথা ও কাজ রেকর্ড করছেন। (সূরা কাফ-১৭ আয়াত, সূরা ইনফিতার ১০-১২ আয়াত) এ আমলনামা তার হাতে দিয়ে দেয়া হবে। তাকে বলা হবে, তোমার জীবনের এই কার্যবিবরণী পড়ো। নিজের হিসেব নেবার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট। (বনি ইসরাঈল ১৪) মানুষ তা পড়ে অবাক হয়ে যাবে। কারণ ছোট বড় এমন কোন বিষয় নেই যা তাতে যথাযথভাবে সংযোজিত হয়নি। (আল কাহাফ ৪৯) এরপর হচ্ছে মানুষের নিজের শরীর। দুনিয়ায় এই শরীরের সাহায্যে সে সমস্ত কাজ করেছে। আল্লাহর আদালতে তার জিহবা সাক্ষ দেবে, সে দুনিয়ায় কি কি কথা বলেছে। তার নিজের হাত-পা সাক্ষ দেবে, তাদেরকে দিয়ে সে কোন কোন কাজ করিয়েছে। (আন নূর ২৪) তার চোখজোড়া সাক্ষ্য দেবে। তার কান সাক্ষ দেবে, তার সাহায্যে সে কি কি কথা শুনেছে। তার শরীরের গায়ে লেপ্টে থাকা চামড়া তার যাবতীয় কাজের সাক্ষ দেবে। সে পেরেশান হয়ে নিজের অংগ-প্রত্যংগকে বলবে, তোমরাও আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ দিচ্ছো? তার অংগ-প্রত্যংগ জবাব দেবে, আজ যে আল্লাহর হুকুমে সমস্ত জিনিস চলছে তাঁরই হুকুমে আমরাও চলছি। (হা-মীম সাজদাহ ২০ থেকে ২২) এর পরে আছে আরো অতিরিক্ত সাক্ষ। এই সাক্ষগুলো পেশ করা হবে যমীন ও তার চারপাশের সমগ্র পরিবেশ থেকে। সেখানে নিজের আওয়াজ মানুষ নিজের কানে শুনবে। নিজের প্রতিটি কাজকর্মের প্রতিচ্ছবি নিজের চোখেই দেখবে। এর চাইতেও অগ্রসর হয়ে দেখা যাবে, মানুষের মনে যেসব চিন্তা, ইচ্ছা, সংকল্প ও উদ্দেশ্য লুকিয়ে ছিল এবং যেসব নিয়তের মাধ্যমে সে নিজের সমস্ত কাজ করেছিল, তাও সব সামনে এনে রেখে দেয়া হবে। যেমন সামনে সূরা আদিয়াতে এ বিষয়ে আলোচনা আসছে। এ কারণে এবং এ ধরনের চূড়ান্ত ও জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ সামনে এসে যাবার পর মানুষ অবাক ও নির্বাক হয়ে যাবে। নিজের পক্ষ থেকে ওজর পেশ করার কোন সুযোগই তার থাকবে না। (আল মুরসালাত ৩৫-৩৬)।

৫. এর দু'টো অর্থ হতে পারে। এক, প্রত্যেক ব্যক্তি একাকী তার ব্যক্তিগত অবস্থায় অবস্থান করবে। পরিবার, গোষ্ঠী, জোট, দল, সম্প্রদায় ও জাতি সব ভেঙে চুরমার হয়ে

যাবে। কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানেও একথা বলা হয়েছে। যেমন সূরা আন'আমে রয়েছে, সেদিন মহান আল্লাহ লোকদের বলবেন ঃ "নাও, এখন তুমি এমনিতেই একাকী আমার সমনে হাজির হয়ে গেছো, যেমন আমি প্রথমবার তোমাকে সৃষ্টি করেছিলাম।" (৯৪ আয়াত) আর সূরা মারয়ামে বলা হয়েছে ঃ "একাকী আমার কাছে আসবে।" (৮০ আয়াত) আরো বলা হয়েছে ঃ "তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে একাকী হাযির হবে।" (৯৫ আয়াত) দুই, এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, বিগত হাজার হাজার বছরে সমস্ত মানুষ যে যেখানে মরেছিল সেখান থেকে অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে দলে দলে চলে আসতে থাকবে। যেমন সূরা নাবায় বলা হয়েছে ঃ "যে দিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তোমরা দলে দলে এসে যাবে। (১৮ আয়াত) এ ছাড়া বিভিন্ন তাফসীরকার এর যে অর্থ বর্ণনা করেছেন তার অবকাশ এখানে উল্লেখিত "আশতাতান" (اَشْتَاتًا) শব্দের মধ্যে নেই। তাই আমার মতে সেগুলো এই শব্দটির অর্থগত সীমাচৌহদ্দীর বাইরে অবস্থান করছে। যদিও বক্তব্য হিসেবে সেগুলো সঠিক এবং কুরআন ও হাদীস বর্ণিত কিয়ামতের অবস্থা ও ঘটনাবলীর সাথে সামঞ্জস্য রাখে।

৬. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, তাদের আমল তাদেরকে দেখানো হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকে দুনিয়ায় কি কাজ করে এসেছে তা তাকে বলা হবে। দুই, তাদেরকে তাদের কাজের প্রতিফল দেখানো হবে। যদিও لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ বাক্যটির জন্য এই দ্বিতীয় অর্থটিও গ্রহণ করা যেতে পারে তবুও যেহেতু আল্লাহ এখানে لِيُرَوْا جَزَاءَ اَعْمَالِهِمْ (তাদের কাজের প্রতিফল দেখাবার জন্য) না বলে বলেছেন لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ (তাদের কাজগুলো দেখানো হবে) তাই সংগতভাবেই প্রথম অর্থটি এখানে অগ্রাধিকার পাবে। বিশেষ করে যখন কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কাফের ও মু'মিন, সৎকর্মশীল ও ফাসেক, আল্লাহর হুকুমের অনুগত ও নাফরমান সবাইকে অবশ্যি তাদের আমলনামা দেয়া হবে। (উদাহরণ স্বরূপ দেখুন সূরা আল হাক্কার ১৯ ও ২৫ এবং সূরা আল ইনশিকাকের ৭-১০ আয়াত) একথা সুস্পষ্ট, কাউকে তার কার্যাবলী দেখিয়ে দেয়া এবং তার আমলনামা তার নিজের হাতে সোপর্দ করার মধ্যে কোন তফাত নেই। তাছাড়া যমীন যখন তার ওপর অনুষ্ঠিত ঘটনাবলী পেশ করবে তখন হক ও বাতিলের যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ শুরু থেকে চলে আসছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে, তার সম্পূর্ণ চিত্রও সবার সামনে এসে যাবে। সেখানে সবাই দেখবে, সত্যের জন্য যারা কাজ করেছিল তারা কি কি কাজ করেছে এবং মিথ্যার সমর্থকরা তাদের মোকাবেলায় কি কি কাজ করেছে। হিদায়াতের পথে আহবানকারী ও গোমরাহী বিস্তারকারীদের সমস্ত শুনবে, এটা কোন অসম্ভব কথা নয়। উভয়পক্ষের সমগ্র রচনা ও সাহিত্যের রেকর্ড অবিকল সবার সামনে এনে রেখে দেয়া হবে। হকপন্থীদের ওপর বাতিল পন্থীদের জুলুম এবং উভয় পক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বন্দ্ব ও সংঘাতসমূহের দৃশ্যাবলী হাশরের ময়দানে উপস্থিত লোকেরা নিজেদের চোখেই দেখে নেবে।

৭. এটি হচ্ছে এর একটি সহজ সরল অর্থ। আবার একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, মানুষের অণু পরিমাণ নেকী বা পাপ এমন হবে না যা তার আমলনামায় লিখিত হবে না। তাকে সে অবশ্য দেখে নেবে। কিন্তু দেখে নেবার মানে যদি এই হয় যে, তার পুরস্কার ও শাস্তি দেখে নেবে, তাহলে এর এ অর্থ নেয়া ভুল হবে যে, আখেরাতে প্রত্যেকটি সামান্যতম নেকীর

পুরস্কার এবং প্রত্যেকটি সামান্যতম পাপের শাস্তি প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেয়া হবে। আর কোন ব্যক্তিও সেখানে নিজের কোন নেকীর পুরস্কার থেকে বঞ্চিত এবং পাপের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না। কারণ তাই যদি হয় তাহলে প্রথমত এর মানে হবে, প্রত্যেকটি খারাপ কাজের শাস্তি এবং প্রত্যেকটি ভালো কাজের পুরস্কার আলাদা আলাদা দেয়া হবে। দ্বিতীয়ত এর মানে এও হবে, কোন উচ্চ পর্যায়ের সৎ ও মু'মিন কোন ক্ষুদ্রতম গোনাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না। আর কোন জঘন্যতম কাফের, জালেম এবং পাপীও কোন ক্ষুদ্রতম সৎকাজের পুরস্কার না পেয়ে যাবে না। এ দু'টি অর্থ কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য বিরোধী এবং বুদ্ধিও একে ইনসাফের দাবী বলে মেনে নিতে পারে না। বুদ্ধির দৃষ্টিতে বিচার করলে একথা কেমন করে বোধগম্য হতে পারে যে, আপনার একজন কর্মচারী আপনার একান্ত অনুগত, বিশ্বস্ত ও নিবেদিত প্রাণ কিন্তু তার কোন সামান্যতম ত্রুটিও আপনি মাফ করেন না? তার প্রতিটি সেবা-কর্মের পুরস্কার দেবার সাথে সাথে তার প্রতিটি ত্রুটির জন্যও আপনি গুণে গুণে তাকে শাস্তিও দেবেন? ঠিক তেমনি বুদ্ধির দৃষ্টিতে একথাও দুর্বোধ্য যে, আপনার অর্থ ও সাহায্য-সহযোগিতায় লালিত পালিত কোন ব্যক্তি যার প্রতি রয়েছে আপনার অসংখ্য অনুগ্রহ, সে আপনার সাথে বেঈমানী ও বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং অনুগ্রহের জবাবে হামেশা নিমকহারামী করতে থাকে। কিন্তু আপনি তার সামগ্রিক কার্যক্রম ও দৃষ্টিভংগী উপেক্ষা করে তার প্রতিটি বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য তাকে পৃথক শাস্তি এবং তার ছোট-খাটো কোন সেবামূলক কাজের জন্য হয়তো সে কখনো আপনাকে খাবার জন্য এক গ্লাস পানি এনে দিয়েছিল বা কখনো আপনাকে পাখা দিয়ে বাতাস করে ছিল—আপনি তাকে আলাদাভাবে পুরস্কৃত করবেন আর কুরআন ও হাদীসের ব্যাপারে বলা যেতে পারে, সেখানে সুস্পষ্টভাবে মুমিন, মোনাফেক, কাফের, সৎ মু'মিন, গোনাহগার মু'মিন, জালেম ও ফাসেক মু'মিন, নিছক কাফের এবং জালেম ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাফের ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের লোকদের পুরস্কার ও শাস্তির জন্য একটি বিস্তারিত আইন বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই পুরস্কার ও শাস্তি মানুষের সমগ্র জীবনের ওপর পরিব্যাপ্ত।

এ প্রসংগে কুরআন মজীদ নীতিগতভাবে কয়েকটি কথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বর্ণনা করে ঃ

এক ঃ কাফের, মুশরিক ও মোনাফেকের কর্মকাণ্ড (অর্থাৎ এমনসব কর্মকাণ্ড যেগুলোকে নেকী মনে করা হয়) নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আখেরাতে তারা এর কোন প্রতিদান পাবে না। এগুলোর যা প্রতিদান, তা তারা দুনিয়াতেই পেয়ে যাবে। এ জন্য উদাহরণ স্বরূপ দেখুন আল আরাফ ১৪৭, আত তাওবা ১৭, ৬৭-৬৯, হুদ ১৫-১৬, ইবরাহীম ১৮, আল কাহফ ১০৪-১০৫, আন নূর ৩৯, আল ফুরকান ২৩, আল আহযাব ১৯, আয যুমার ৬৫ এবং আল আহকাফ ২০ আয়াত।

দুই ঃ পাপের শাস্তি ততটুকু দেয়া হবে যতটুকু পাপ করা হয়। কিন্তু নেকীর পুরস্কার মূল কাজের তুলনায় বেশী দেয়া হবে। বরং কোথাও বলা হয়েছে প্রত্যেক নেকীর প্রতিদান দেয়া হবে দশগুণ। আবার কোথাও বলা হয়েছে, আল্লাহ নিজের ইচ্ছেমতো নেকীর প্রতিদান বাড়িয়ে দেবেন। দেখুন আল বাকারাহ ২৬১, আল আনআম ১৬০, ইউনুস ২৬-২৭, আন নূর ৩৮, আল কাসাস ৮৪, সাবা ৩৭ এবং আল মু'মিন ৪০ আয়াত।

তিন ঃ মু'মিন যদি বড় বড় গোনাহ থেকে দূরে থাকে তাহলে তার ছোট গোনাহগুলো মাফ করে দেয়া হবে। দেখুন আন নিসা ৩১, আশ্ শূরা ৩৭ এবং আন নাজম ৩২ আয়াত।

চার ঃ সৎ মু'মিনের কাছ থেকে হালকা হিসেব নেয়া হবে। তার গোনাহগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া হবে। তার ভালো ও উত্তম আমলগুলোর দৃষ্টিতে বিচার করে তাকে প্রতিদান দেয়া হবে। দেখুন আনকাবুত ৭, আযযুমার ৩৫, আল আহকাফ ১৬ এবং আল ইনশিকাক ৮ আয়াত।

হাদীসের বক্তব্য এ বিষয়টিকে একেবারে পরিষ্কার করে দেয়। ইতিপূর্বে সূরা ইনশিকাকের ব্যাখ্যায় কিছু হাদীস উল্লেখ করেছি। কিয়ামতের দিন হালকা ও কড়া হিসেবের বিষয়টিকে বুঝাবার জন্য রসূলুল্লাহ (সা) এ ব্যাখ্যা করেছেন। (এ জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল ইনশিকাক ৬ টীকা) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একবার হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আহার করছিলেন এমন সময় এই আয়াতটি নাযিল হয়। হযরত আবু বকর (রা) খাবার থেকে হাত গুটিয়ে নেন। তিনি বলেন ঃ "হে আল্লাহর রসূল! যে অণু পরিমাণ খারাপ কাজ আমি করেছি তার ফলও কি আমি দেখে নেবো?" জবাব দেন ঃ "হে আবু বকর! দুনিয়ায় যেসব বিষয়েরই তুমি সম্মুখীন হও তার মধ্যে যেগুলো তোমার কাছে অপছন্দনীয় ও অপ্রীতিকর ঠেকে সেগুলোই তুমি যেসব অণু পরিমাণ অসৎকাজ করেছো তার বদলা এবং সেসব অণু পরিমাণ নেকীর কাজই তুমি করো সেগুলো আল্লাহ আখেরাতে তোমার জন্য সংরক্ষণ করে রাখছেন।" (ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, তাবারানী ফিল আওসাত, বাইহাকী ফিশ শু'আব, ইবনুল মুনযির, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া ও আবদ ইবনে হুমাইদ) এই আয়াতটি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু আইউব আনসারীকেও বলেছিলেন ঃ "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই নেকী করবে তার পুরস্কার সে পাবে আখেরাতে। আর যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করবে বিপদ-আপদ ও রোগের আকারে এই দুনিয়ায় তার শাস্তি পেয়ে যাবে।" (ইবনে মারদুইয়া)। কাতাদাহ হযরত আনাসের (রা) বরাত দিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত বাণীটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ "আল্লাহ মু'মিনের প্রতি জুলুম করেন না। দুনিয়ায় তার নেকীর প্রতিদানে তাকে রিযিক দান করেন এবং আখেরাতে আবার এর পুরস্কার দেবেন। আর কাফেরের ব্যাপারে দুনিয়ায় তার সৎকাজের প্রতিদান দিয়ে দেন, তারপর যখন কিয়ামত হবে তখন তার খাতায় কোন নেকী লেখা থাকবে না।" (ইবনে জারীর) মাসরূক হযরত আয়েশা (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন ঃ তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, "আবদুল্লাহ ইবনে জুদ'আন জাহেলী যুগে আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করতো, মিসকিনকে আহার করাতো, মেহমানদের আপ্যায়ন করতো, বন্দিদের মুক্তিদান করতো। আখেরাতে এগুলো কি তার জন্য উপকারী হবে?" রসূলুল্লাহ (সা) জবাব দেন, "না, সে মরার সময় পর্যন্ত একবারও বলেনি, رَبِّ اغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ (হে আমার রব। শেষ বিচারের দিন আমার ভুল-ত্রুটিগুলো মাফ করে দিয়ো।)" (ইবনে জারীর) অন্যান্য আরো কিছু লোকের ব্যাপারেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই একই জাবাব দেন। তারাও জাহেলী যুগে সৎকাজ করতো কিন্তু কাফের ও মুশরিক অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন কোন বাণী থেকে জানা

যায়, কাফেরের সৎকাজ তাকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না ঠিকই তবে জালেম, ফাসেক ব্যভিচারী কাফেরকে জাহান্নামে যে ধরনের কঠিন শাস্তি দেয়া হবে তার শাস্তি তেমনি পর্যায়ের হবে না। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে ঃ হাতেম তাঈ–এর দানশীলতার কারণে তাকে হালকা আযাব দেয়া হবে। (রূহুল মা'আনী)।

তবুও এ আয়াতটি মানুষকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের ব্যাপারে সজাগ করে দেয়। সেটি হচ্ছে, প্রত্যেকটি সামান্যতম ও নগণ্যতম সৎকাজেরও একটি ওজন ও মূল্য রয়েছে এবং অনুরূপ অবস্থা অসৎকাজেরও। অর্থাৎ অসৎকাজ যত ছোটই হোক না কেন অবশ্যি তার হিসেব হবে এবং তা কোনক্রমেই উপেক্ষা করার মতো নয়। তাই কোন ছোট সৎকাজকে ছোট মনে করে ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ এই ধরনের অনেক সৎকাজ মিলে আল্লাহর কাছে একটি অনেক বড় সৎকাজ গণ্য হতে পারে। অনুরূপভাবে কোন ছোট ও নগণ্য অসৎকাজও না করা উচিত। কারণ এই ধরনের অনেকগুলো ছোট গোনাহ একত্র হয়ে একটি বিরাট গোনাহের স্তূপ জমে উঠতে পারে। একথাটিই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাদীসে ব্যক্ত করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো—তা এক টুকরা খেজুর দান করার বা একটি ভালো কথা বলার বিনিময়েই হোক না কেন" হযরত আদী ইবনে হাতেম থেকে সহীহ রেওয়ায়াতের মাধ্যমে আরো বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কোন সৎকাজকেও সামান্য ও নগণ্য মনে করো না, যদিও তা কোন পানি পানেচ্ছু ব্যক্তির পাত্রে এক মগ পানি ঢেলে দেয়াই হয় অথবা তোমার কোন ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করাই হয়।" বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে একটি রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ "হে মুসলিম মেয়েরা। কোন প্রতিবেশী তার প্রতিবেশিনীর বাড়িতে কোন জিনিস পাঠানোকে সামান্য ও নগণ্য মনে করো না, তা ছাগলের পায়ের একটি খুর হলেও।" মুসনাদে আহমাদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ–এ হযরত আয়েশার (রা) একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "হে আয়েশা। যেসব গোনাহকে ছোট মনে করা হয় সেগুলো থেকে দূরে থাকো। কারণ আল্লাহর দরবারে সেগুলো সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" মুসনাদে আহমাদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "সাবধান, ছোট গোনাহসমূহ থেকে নিজেকে রক্ষা করো। কারণ সেগুলো সব মানুষের ওপর একত্র হয়ে তাকে ধ্বংস করে দেবে।" (গোনাহ কবীরা ও গোনাহ সগীরার পার্থক্য বুঝার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নিসা ৫৩ টীকা ও আন নাজম ৩২ টীকা)।

আল আদিয়াত

১০০

নামকরণ

প্রথম শব্দ আল আদিয়াতকে (اَلْعٰدِيٰتِ) এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এই সূরাটির মক্কী বা মাদানী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), জাবের (রা), হাসান বসরী, ইকরামা ও আতা বলেন, এটি মক্কী সূরা। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) ও কাতাদাহ একে মাদানী সূরা বলেন। অন্যদিকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে দুই ধরনের মত উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁর একটি মত হচ্ছে এটি মক্কী সূরা এবং অন্য একটি বক্তব্যে তিনি একে মাদানী সূরা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সূরার বক্তব্য ও বর্ণনাভঙ্গী পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, এটি কেবল মক্কী সূরাই নয় বরং মক্কী যুগেরও প্রথম দিকে নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

মানুষ আখেরাতকে অস্বীকার করে অথবা তা থেকে গাফেল হয়ে কেমন নৈতিক অধপাতে যায় একথা লোকদের বুঝানোই এই সূরাটির উদ্দেশ্য। এই সঙ্গে আখেরাতে কেবল মানুষের বাইরের কাজকর্মই নয়, তাদের মনের গোপন কথাগুলোও যাচাই-বাছাই করা হবে, এ সম্পর্কেও এই সূরায় তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

এ উদ্দেশ্যে আরবে সাধারণভাবে যে বিশৃংখলা ছড়িয়ে ছিল এবং যার ফলে সমগ্র দেশবাসীর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তাকে যুক্তি ও প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। সারা দেশের চতুর্দিকে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চলছিল। লুণ্ঠন, রাহাজানী, এক গোত্রের ওপর অন্য গোত্রের আকস্মিক আক্রমণের মাধ্যমে সবকিছু লুটপাট করে নিয়ে যাওয়া সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। রাতে কোন ব্যক্তিও নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে পারতো না। কারণ সবসময় আশংকা থাকতো, এই বুঝি কোন দুশমন অতি প্রত্যুষে তাদের জনপদ আক্রমণ করে বসলো। দেশের এই অবস্থার কথা আরবের সবাই জানতো। তারা এর ক্ষতি ও অনিষ্ট সম্পর্কে পুরোপুরি সজাগ ছিল। যার সবকিছু লুণ্ঠিত হতো, সে এ অবস্থার জন্য মাতম করতো এবং যে লুণ্ঠন করতো সে আনন্দে উৎফুল্ল হতো। কিন্তু এই লুণ্ঠনকারী আবার যখন লুণ্ঠিত হতো, তখন সেও অনুভব করতো, এ কেমন খারাপ অবস্থার মধ্যে কেমন দুর্বিসহ জীবন আমরা যাপন করে চলেছি।

এ পরিস্থিতির ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন এবং সেখানে আল্লাহর সামনে জবাদিহি করার ব্যাপারে অজ্ঞতার কারণে মানুষ তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছে। সে আল্লাহর দেয়া ক্ষমতাগুলোকে জুলুম-নিপীড়নের কাজে ব্যবহার করছে। সে ধন-সম্পদের প্রেমে অন্ধ হয়ে তা অর্জন করার জন্য যে কোন অন্যায়, অসৎ ও গর্হিত পন্থা অবলম্বন করতে কুণ্ঠিত হয় না। তা অবস্থা নিজেই সাক্ষ দিচ্ছে, সে নিজের রবের দেয়া শক্তিগুলোর অপব্যবহার করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাহীনতার প্রকাশ করছে। যদি সে সেই সময়ের কথা জানতো যখন কবর থেকে জীবিত হয়ে আবার উঠতে হবে এবং যেসব ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও স্বার্থপ্রবণাতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে দুনিয়ায় নানান ধরনের কাজ করেছিল সেগুলোকে তার মনের গভীর তলদেশ থেকে বের করে এনে সামনে রেখে দেয়া হবে, তাহলে সে এই দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি কখনই অবলম্বন করতে পারতো না। দুনিয়ায় কে কি করে এসেছে এবং কার সাথে কোন ধরনের ব্যবহার করা উচিত মানুষের রব সে সময় সেকথা খুব ভালোভাবেই জানবেন।

আয়াত ১১ **সূরা আল আদিয়াত-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۝١ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۝٢ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۝٣
فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۝٤ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۝٥ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۝٦
وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۝٧ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۝٨

কসম সেই (ঘোড়া) গুলোর যারা হ্রেষারব সহকারে দৌড়ায়।[১] তারপর (খুরের আঘাতে) আগুনের ফুলকি ঝরায়।[২] তারপর অতর্কিত আক্রমণ চালায় প্রভাতকালে।[৩] তারপর এ সময় ধূলা উড়ায় এবং এ অবস্থায় কোন জনপদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আসলে মানুষ তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।[৪] আর সে নিজেই এর সাক্ষী।[৫] অবশ্য সে ধন-দৌলতের মোহে খুব বেশী মত্ত।[৬]

১. দৌড়ায় শব্দের মাধ্যমে যে এখানে ঘোড়া বুঝানো হয়েছে আয়াতের শব্দগুলো থেকে একথা মোটেই স্পষ্ট নয়। বরং এখানে শুধু বলা হয়েছে وَالْعٰدِيٰتِ অর্থাৎ "কসম তাদের যারা দৌড়ায়।" এ কারণে কারা দৌড়ায় এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে। সাহাবী ও তাবেঈগণের একটি দল বলেছেন, ঘোড়া এবং অন্য একটি দল বলেছেন উট। কিন্তু যেহেতু দৌড়াবার সময় বিশেষ আওয়াজ, যাকে ضَبْح (হ্রেষারব) বলা হয়, একমাত্র ঘোড়ার মুখ দিয়েই দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস চলার কারণে বের হয় এবং পরের আয়াতগুলোতে অগ্নি স্ফুলিংগ ঝরাবার, খুব সকালে কোন জনপদে অতর্কিত আক্রমণ চালাবার এবং সেখানে ধূলা উড়াবার কথা বলা হয়েছে, আর এগুলো একমাত্র ঘোড়ার সাথেই খাপ খায়, তাই অধিকাংশ গবেষক একে ঘোড়ার সাথেই সংশ্লিষ্ট করেছেন। ইবনে জারীর বলেন, "এ ব্যাপারে যে দু'টি বক্তব্য পাওয়া যায় তার মধ্যে ঘোড়া দৌড়ায় এই বক্তব্যটি অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য। কারণ উট হ্রেষারব করে না, ঘোড়া হ্রেষারব করে। আর আল্লাহ বলেছেন, যারা হ্রেষারব করে দৌড়ায় তাদের কসম।" ইমাম রাজী বলেন, "এই আয়াতগুলোর বিভিন্ন শব্দ চিৎকার করে চলছে, এখানে ঘোড়ার কথা বলা হয়েছে। কারণ ঘোড়া ছাড়া আর কেউ হ্রেষারব করে না! আর আগুনের স্ফুলিংগ ঝরাবার কাজটিও পাথরের ওপর ঘোড়ার খুরের আঘাতেই সম্পন্ন হয়। এ ছাড়া অন্য কোন ভাবেই তা হতে পারে না। অন্য দিকে খুব সকালে আক্রমণ চালাবার কাজটিও অন্য কোন প্রাণীর তুলনায় ঘোড়ার সাহায্যে সম্পন্ন করাই সহজতর হয়।"

২. আগুনের ফুলকি ঝরায় ইত্যাকার শব্দগুলো একথাই প্রকাশ করে যে, রাত্রিকালে ঘোড়া দৌড়ায়। কারণ তাদের পায়ের খুর থেকে যে আগুনের ফুলকি ঝরে তা রাতের বেলায়ই দেখতে পাওয়া যায়।

৩. আরববাসীদের নিয়ম ছিল, কোন জনপদে অতর্কিত আক্রমণ করতে হলে তারা রাতের আঁধারে বের হয়ে পড়তো। এর ফলে শত্রুপক্ষ পূর্বাহ্নে সতর্ক হতে পারতো না। এভাবে একেবারে খুব সকালে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। প্রভাতে আলো যেটুকু ছড়িয়ে পড়তো তাতে তারা সবকিছু দেখতে পেতো। আবার দিনের আলো খুব বেশী উজ্জ্বল না হবার কারণে প্রতিপক্ষ দূর থেকে তাদের আগমন দেখতে পেতো না। ফলে তারা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতিও গ্রহণ করতে পারতো না।

৪. রাতের বেলা হেষারব করে আগুনের ফুলকি ঝরাতে ঝরাতে যেসব ঘোড়া দৌড়ায়, তারপর খুব সকালে ধূলি উড়িয়ে কোন জনপদে চড়াও হয় এবং প্রতিরোধকারীদের ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে, সেসব ঘোড়ার কসম খাওয়া হয়েছে যে কথাটি বলার জন্য এটিই সেই কথা। অধিকাংশ তফসীরকার এই ঘোড়া বলতে যে ঘোড়া বুঝিয়েছেন তা দেখে অবাক হতে হয়। জিহাদকারী গাযীদের ঘোড়াকে তারা এই ঘোড়া বলে চিহ্নিত করেছেন এবং যে ভীড়ের মধ্যে এই ঘোড়া প্রবেশ করে তাকে তারা কাফেরদের সমাবেশ মনে করেছেন। অথচ "মানুষ তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ" এ কথাটির ওপরই কসম খাওয়া হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট, আল্লাহর পথে জিহাদকারী গাযীদের ঘোড়ার দৌড়াদৌড়ি এবং কাফেরদের কোন দলের ওপর তাদের ঝাঁপিয়ে পড়ায় একথা বুঝায় না যে মানুষ তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ। আর মানুষ নিজেই তার এই অকৃতজ্ঞতার সাক্ষী এবং সে ধন-দৌলতের মোহে বিপুলভাবে আক্রান্ত—এই পরবর্তী বাক্যগুলোও এমন সব লোকদের সাথে খাপ খায় না যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে বের হয়। তাই নিশ্চিতভাবে একথা মেনে নিতে হবে যে, এই সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াতে যে কসম খাওয়া হয়েছে তা সে সময়ের আরবে সাধারণভাবে যে লুঠতরাজ, হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাত চলছিল সেদিকেই ইংগিত করছে। জাহেলী যুগে রাতগুলো হতো বড়ই ভয়াবহ। প্রত্যেক গোত্র ও জনপদের লোকেরা আশংকা করতো, না জানি রাতের আঁধারে তাদের ওপর কোন দুশমন চড়াও হবার জন্য ছুটে আসছে। আর দিনের আলো প্রকাশিত হবার সাথে সাথে তারা নিশ্চিন্ত হতো। কারণ রাতটা নির্ঝনঝাটে ও ভালোয় ভালোয় কেটে গেছে। সেখানে গোত্রে গোত্রে কেবলমাত্র প্রতিশোধমূলক লড়াই হতো না। বরং এক গোত্র আর এক গোত্রের ওপর আক্রমণ চালাতো তার ধন-দৌলত লুটে নেবার, তার উট, ভেড়া ইত্যাদি পশু কেড়ে নেবার এবং তার মেয়েদের ও শিশুদের গোলাম বানাবার জন্য। এসব লুটতরাজ ও জুলুম নিপীড়ন করা হতো সাধারণত ঘোড়ায় চড়ে। মানুষ যে তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ এই বক্তব্যের সপক্ষে এ বিষয়গুলোকে আল্লাহ প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। অর্থাৎ যে শক্তিকে তারা ব্যয় করছে লুটতরাজ, হানাহানি, খুন-খারাবি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য সে শক্তি তো আল্লাহ তাদেরকে মূলত এ কাজে ব্যয় করার জন্য দেননি। কাজেই আল্লাহর দেয়া এ উপকরণ ও শক্তিগুলোকে আল্লাহর সবচেয়ে বেশী অপ্রিয় যে দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করা তার পিছনে ব্যয় করা তাঁর প্রতি সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴿٩﴾ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿١٠﴾
إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ﴿١١﴾

তবে কি সে সেই সময়ের কথা জানে না যখন কবরের মধ্যে যা কিছু (দাফন করা) আছে সেসব বের করে আনা হবে[৭] এবং বুকের মধ্যে যা কিছু (লুকানো) আছে সব বের করে এনে যাচাই করা হবে?[৮] অবশ্য সেদিন তাদের রব তাদের সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত থাকবেন।[৯]

৫. অর্থাৎ তার বিবেক এর সাক্ষী। আবার অনেক কাফের নিজ মুখেই প্রকাশ্যে এই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কারণ তাদের মতে আদতে আল্লাহর কোন অস্তিত্বই নেই। সে ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতি তাঁর কোন অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেয়া এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে অপরিহার্য করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

৬. কুরআনের মূল শব্দগুলো হচ্ছে ঃ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ এর শাব্দিক তরজমা হচ্ছে, "সে ভালোর প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করে।" কিন্তু আরবী ভাষায় 'খাইর' শব্দটি কেবলমাত্র ভালো ও নেকীর প্রতিশব্দ হিসেবেই ব্যবহৃত হয় না বরং ধন-দৌলত অর্থেও এর ব্যবহার প্রচলিত। সূরা আল বাকারার ১৮০ আয়াতে "খাইর" শব্দটি ধন-সম্পদ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বক্তব্যের প্রেক্ষাপট ও পরিবেশ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে কোথায় এ শব্দটি নেকী অর্থে এবং কোথায় ধন-সম্পদ অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে তা অনুধাবন করা যায়। এই আয়াতটির পূর্বাপর আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হচ্ছে যে, এখানে "খাইর" বলতে ধন-সম্পদ বুঝানো হয়েছে, নেকী বুঝানো হয়নি। কারণ যে ব্যক্তি নিজের রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং নিজের কার্যকলাপের মাধ্যমে নিজের অকৃতজ্ঞতার সপক্ষে সাক্ষ পেশ করছে তার ব্যাপারে কখনো একথা বলা যেতে পারে না যে, সে নেকী ও সৎবৃত্তির প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করে।

৭. অর্থাৎ মরা মানুষ যেখানে যে অবস্থায় আছে সেখান থেকে তাকে বের করে এনে জীবিত মানুষের আকারে দাঁড় করানো হবে।

৮. অর্থাৎ বুকের মধ্যে যেমন ইচ্ছা ও নিয়ত, স্বার্থ ও উদ্দেশ্য, চিন্তা, ভাবধারা এবং বাহ্যিক কাজের পেছনে যেসব গোপন অভিপ্রায় (Motives) লুকিয়ে আছে সেসব খুলে সামনে রেখে দেয়া হবে। সেগুলো যাচাই বাছাই করে ভালো ও খারাপগুলোকে আলাদা আলাদা করে দেয়া হবে। অন্য কথায় শুধুমাত্র বাইরের চেহারা দেখে মানুষ বাস্তবে যা কিছু করেছে সে সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দেয়া হবে না। বরং মনের মধ্যে লুকানো রহস্যগুলোকে বাইরে বের করে এনে দেখা হবে যে, মানুষ যেসব কাজ করেছে তার পেছনে কি উদ্দেশ্য ও স্বার্থ-প্রেরণা লুকিয়েছিল। এ বিষয়টি চিন্তা করলে মানুষ একথা স্বীকার না করে পারে না যে, আসল ও পূর্ণাংগ ইনসাফ একমাত্র আল্লাহর আদালত ছাড়া আর কোথাও কায়েম হতে পারে না। নিছক বাইরের কাজকর্ম দেখে কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া যায় না বরং কি উদ্দেশ্যে সে এ কাজ করেছে তাও দেখতে হবে। দুনিয়ার ধর্মহীন

আইন ব্যবস্থাগুলোও নীতিগতভাবে একথা জরুরী মনে করে। তবে নিয়ত ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে তার সঠিক চেহারা সনাক্ত করার মতো উপকরণ দুনিয়ার কোন আদালতেরও নেই। একমাত্র আল্লাহই এ কাজ করতে পারেন। একমাত্র তিনিই মানুষের প্রত্যেকটি কাজের বাইরের চেহারার পেছনে যে গোপন প্রেরণা ও উদ্দীপনা সক্রিয় থাকে তা যাচাই করে সে কোন্ ধরনের পুরস্কার বা শাস্তির অধিকারী হতে পারে তা নির্ধারণ করতে পারেন। তাছাড়া আয়াতের শব্দাবলী থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, মনের ভেতরে, ইচ্ছা, সংকল্প ও নিয়ত সম্পর্কে আল্লাহ পূর্বাহ্নেই যে জ্ঞান রাখেন নিছক তার ভিত্তিতে এ ফায়সালা হবে না। বরং কিয়ামতের দিন এ রহস্যগুলো উন্মুক্ত করে সবার সামনে রেখে দেয়া হবে এবং প্রকাশ্য আদালতে যাচাই ও পর্যালোচনা করে এর কতটুকু ভালো ও কতটুকু খারাপ ছিল তা দেখিয়ে দেয়া হবে। এজন্য এখানে حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ বলা হয়েছে। কোন জিনিসকে বের করে বাইরে নিয়ে আসাকে 'হুসসিলা' বা 'তাহসীল' বলে। যেমন, বাইরের ছাল বা খোসা ছাড়িয়ে ভেতরের মগজ বের করা। এভাবে বিভিন্ন ধরনের জিনিসকে ছেটে পরস্পর থেকে আলাদা করার জন্যও এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কাজেই মনের মধ্যে লুকানো রহস্যসমূহের 'তাহসীল' বা বের করে আনার মধ্যে এ দু'টি অর্থই শামিল হবে। সেগুলোকে খুলে বাইরে বের করে দেয়াও হবে আবার সেগুলো ছেটে ভালো ও মন্দ আলাদা করে দেয়াও হবে। এ বক্তব্যটিই সূরা আত তারিকে এভাবে বলা হয়েছে ঃ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ "যেদিন গোপন রহস্য যাচাই বাছাই করা হবে।" (৯ আয়াত)।

৯. অর্থাৎ কে কি এবং কে কোন্ ধরনের শাস্তি বা পুরস্কারের অধিকারী তা তিনি খুব ভালোভাবেই জানবেন।

আল কারি'আহ

১০১

নামকরণ

প্রথম শব্দ اَلْقَارِعَةُ -কে এর নাম গণ্য করা হয়েছে। এটা কেবল নামই নয় বরং এর বক্তব্য বিষয়ের শিরোনামও। কারণ এর মধ্যে শুধু কিয়ামতের কথাই বলা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এর মক্কী হবার ব্যাপারে সবাই একমত। বরং এর বক্তব্য বিষয় থেকে প্রকাশ হয়, এটিও মক্কা মু'আযযমার প্রথম যুগে নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে কিয়ামত ও আখেরাত। সর্বপ্রথম লোকদেরকে একটি মহাদুর্ঘটনা। বলে আতংকিত করে দেয়া হয়েছে, কি সেই মহাদুর্ঘটনা? তুমি কী জানো সেই মহা-দুর্ঘটনাটি কী? এভাবে শ্রোতাদেরকে একটি ভয়াবহ ঘটনা অনুষ্ঠিত হবার খবর শোনার জন্য প্রস্তুত করার পর দু'টি বাক্যে তাদের সামনে কিয়ামতের নকশা এঁকে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সেদিন লোকেরা আতংকগ্রস্ত হয়ে এমনভাবে চারদিকে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে যেমন প্রদীপের আলোর চারদিকে পতংগরা নির্লিপ্তভাবে ছুটাছুটি করতে থাকে। পাহাড়গুলো সমূলে উৎপাটিত হয়ে স্থানচ্যুত হবে। তাদের বাঁধন থাকবে না। তারা তখন হয়ে যাবে ধুনা পশমের মতো। তারপর বলা হয়েছে, আখেরাতে লোকদের কাজের হিসেব নিকেশ করার জন্য যখন আল্লাহর আদালত কায়েম হবে তখন কার সৎকাজ তার অসৎকাজের চাইতে ওজনে ভারী এবং কার সৎকাজ তার অসৎকাজের চাইতে ওজনে হালকা, এরি ভিত্তিতে সেখানে ফায়সালা অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম ধরনের লোকেরা আরামের ও সুখের জীবন লাভ করে আনন্দিত হবে। আর দ্বিতীয় ধরনের লোকদেরকে এমন গভীর গর্তের মধ্যে ফেলে দেয়া হবে যেগুলো থাকবে শুধু আগুনে ভরা।

আয়াত ১১ | সূরা আল কারি'আহ-মক্কী | রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

اَلْقَارِعَةُ ۝١ مَا الْقَارِعَةُ ۝٢ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝٣ يَوْمَ يَكُوْنُ
النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝٤ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ
الْمَنْفُوْشِ ۝٥ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٦ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ
رَّاضِيَةٍ ۝٧ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٨ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۝٩ وَمَآ
اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۝١٠ نَارٌ حَامِيَةٌ ۝١١

মহাদুর্ঘটনা![১] কী সেই মহাদুর্ঘটনা? তুমি কী জানো সেই মহাদুর্ঘটনাটি কি? সেদিন যখন লোকেরা ছড়িয়ে থাকা পতংগের মতো এবং পাহাড়গুলো রং বেরঙের ধূনা পশমের মতো হবে।[২] তারপর[৩] যার পাল্লা ভারী হবে সে মনের মতো সুখী জীবন লাভ করবে আর যার পাল্লা হালকা হবে[৪] তার আবাস হবে গভীর খাদ।[৫] আর তুমি কী জানো সেটি কি? (সেটি) জ্বলন্ত আগুন।[৬]

১. কুরআনের মূল শব্দ হচ্ছে "কা-রিআহ" قَارِعَةٌ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, "যে ঠোকে"। কারা'আ (قرع) মানে কোন জিনিসকে কোন জিনিসের ওপর এমন জোরে মারা যার ফলে তা থেকে প্রচণ্ড আওয়াজ হয়। এই শাব্দিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ও বড় রকমের মারাত্মক বিপদের ক্ষেত্রে "কারি'আহ" শব্দ বলা হয়ে থাকে। যেমন আরবরা বলে, قَرَعَتْهُمُ الْقَارِعَةُ অর্থাৎ উমুক উমুক পরিবার ও গোত্রের লোকদের ওপর ভয়াবহ বিপদ নেমে এসেছে। কুরআন মজীদের এক জায়গায়ও এই শব্দটি কোন জাতির ওপর বড় ধরনের মুসিবত নাযিল হবার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা রা'আদে বলা হয়েছেঃ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ "যারা কুফরী করেছে তাদের ওপর তাদের কর্মকাণ্ডের কারণে কোন না কোন বিপদ নাযিল হতে থাকে।" (৩১ আয়াত) কিন্তু এখানে "আল কারি'আহ" শব্দটি কিয়ামতের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আবার সূরা আল হা-ক্কায় কিয়ামতকে এই শব্দটি দিয়েই চিহ্নিত করা

হয়েছে। (আয়াত ৪) এখানে একথাটিও সামনে রাখতে হবে যে, এখানে কিয়ামতের প্রথম পর্যায় থেকে নিয়ে শেষ পর্যায় পর্যন্ত পুরো আখেরাতের আলোচনা একসাথে করা হচ্ছে।

২. এ পর্যন্ত কিয়ামতের প্রথম পর্যায়ের আলোচনা চলেছে। অর্থাৎ যখন মহাদুর্ঘটনা ঘটে যাবে। আর এর ফলে সারা দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে লোকেরা আতংকগ্রস্ত হয়ে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে যেমন আলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া পতংগরা চারদিকে বিক্ষপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। পাহাড়গুলো রং বেরঙের ধূনা পশমের মতো উড়তে থাকবে। পাহাড়গুলোর রং বিভিন্ন হওয়ার কারণে আসলে তাদেরকে রং বেরঙের পশমের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

৩. এখান থেকে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। লোকেরা পুনর্বার জীবিত হয়ে আল্লাহর আদালতে হাযির হবার পর থেকে এই পর্যায়টির শুরু।

৪. মূলে মাওয়াযীন (مَوَازِيْن) ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি মাওযূন (مَوْزُوْن) এর বহুবচন হতে পারে। আবার মীযান (مِيْزَان) এরও বহুবচন হতে পারে। যদি এটি মাওযূনের বহুবচন হয় তাহলে "মাওয়াযীন" অর্থ হবে এমন ধরনের কর্মকাণ্ড, আল্লাহর দৃষ্টিতে যার কোন ওজন আছে এবং যা তাঁর কাছে কোন ধরনের মর্যাদালাভের যোগ্যতা রাখে। আর যদি একে মীযানের বহুবচন গণ্য করা হয় তাহলে মাওয়াযীন অর্থ হবে দাঁড়িপাল্লার পাল্লা। প্রথম অবস্থায় মাওয়াযীনের ভারী বা হালকা হবার মানে হবে অসৎকর্মের মোকাবেলায় সৎকর্মের ভারী বা হালকা হওয়া। কারণ আল্লাহর দৃষ্টিতে কেবলমাত্র সৎকাজই ভারী ও মূল্যবান। দ্বিতীয় অবস্থায় মাওয়াযীনের ভারী হবার মানে হয় মহান আল্লাহর আদালতে নেকীর পাল্লা পাপের পাল্লার তুলনায় বেশী ভারী হওয়া। আর এর হালকা হবার মানে হয় নেকীর পাল্লা পাপের পাল্লার তুলনায় হালকা হওয়া। এছাড়া আরবী ভাষায় মীযান শব্দ ওজন অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আর এই অর্থের দৃষ্টিতে ওজনের ভারী ও হালকা হবার মানে হয় নেকীর ওজন ভারী বা হালকা হওয়া। যাহোক মাওয়াযীন শব্দটি মাওযূন, মীযান বা ওজন যে কোন অর্থেই ব্যবহার করা হোক না কেন সব অবস্থায়ই প্রতিপাদ্য একই থাকে এবং সেটি হচ্ছে ঃ মানুষ আমলের যে পুঁজি নিয়ে আল্লাহর আদালতে আসবে তা ভারী না হালকা, অথবা মানুষের নেকী তার পাপের চেয়ে ওজনে বেশী না কম—এরি ভিত্তিতে সেখানে ফায়সালা অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়টি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। সেগুলো সব সামনে রাখলে এর অর্থ পুরোপুরি অনুধাবন করা সম্ভব হবে। সূরা আরাফে বলা হয়েছে ঃ "আর ওজন হবে সেদিন সত্য। তারপর যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।" (৮–৯ আয়াত) সূরা কাহাফে বলা হয়েছে ঃ "হে নবী! এই লোকদেরকে বলে দাও, আমি কি তোমাদের জানাবো নিজেদের আমলের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ব্যর্থ কারা? তারাই ব্যর্থ যাদের দুনিয়ার জীবনে সমস্ত কর্মকাণ্ড সত্য–সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত থেকেছে এবং যারা মনে করতে থেকেছে, তারা সবকিছু ঠিক করে যাচ্ছে। এই লোকেরাই তাদের রবের আয়াত মানতে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর সামনে হাযির হওয়ার বিষয়টি বিশ্বাস করেনি। তাই তাদের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে গেছে। কিয়ামতের দিন আমি তাদের কোন ওজন দেবো না।" (১০৪–১০৫ আয়াত) সূরা আম্বিয়ায় বলা হয়েছে ঃ "কিয়ামতের দিন আমি যথাযথ

ওজন করার দাঁড়িপাল্লা রেখে দেবো। তারপর কারো ওপর অণু পরিমাণও জুলুম হবে না। যার সরিষার দানার পরিমাণও কোন কাজ থাকবে তাও আমি সামনে আনবো এবং হিসেব করার জন্য আমি যথেষ্ট।" (৪৭ আয়াত) এই আয়াতগুলো থেকে জানা যায়, কুফরী করা এবং সত্যকে অস্বীকার করা বৃহত্তম অসৎকাজের অন্তরভুক্ত। গুনাহের পাল্লা তাতে অনিবার্যভাবে ভারী হয়ে যায়। আর কাফেরের এমন কোন নেকী হবে না নেকীর পাল্লায় যার কোন ওজন ধরা পড়ে এবং তার ফলে পাল্লা ঝুঁকে পড়তে পারে। তবে মু'মিনের পাল্লায় ঈমানের ওজনও হবে এবং এই সংগে সে দুনিয়ায় যেসব নেকী করেছে সেগুলোর ওজনও হবে। অন্যদিকে তার সমস্ত গোনাহ গোনাহর পাল্লায় রেখে দেয়া হবে। তারপর নেকীর পাল্লা ঝুঁকে আছে না গোনাহর পাল্লা ঝুঁকে আছে, তা দেখা হবে।

৫. মূল শব্দ হচ্ছে أُمُّهُ هَاوِيَةٌ "তার মা হবে হাবিয়া।" হাবিয়া (هَاوِيَةٌ) শব্দটি এসেছে হাওয়া (هَاوٰى) থেকে। এর অর্থ হচ্ছে উঁচু জায়গা থেকে নীচুতে পড়ে যাওয়া। আর যে গভীর গর্তে কোন জিনিস পড়ে যায় তাকে হাবিয়া বলে। জাহান্নামকে হাবিয়া বলার কারণ হচ্ছে এই যে, জাহান্নাম হবে অত্যন্ত গভীর এবং জাহান্নামবাসীদেরকে তার মধ্যে ওপর থেকে নিক্ষেপ করা হবে। আর তার মা হবে জাহান্নাম একথা বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, মায়ের কোল যেমন শিশুর অবস্থান হয় তেমনি জাহান্নামবাসীদের জন্য জাহান্নাম ছাড়া আর কোন অবস্থান হবে না।

৬. অর্থাৎ সেটি শুধুমাত্র একটি গভীর খাদ হবে না বরং জ্বলন্ত আগুনেও পরিপূর্ণ হবে।

আত তাকাসুর

১০২

নামকরণ

প্রথম শব্দ আততাকাসূরকে (اَلتَّكَاثُرُ) এই সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

আবু হাইয়ান ও শওকানী বলেন, সকল তাফসীরকার একে মক্কী সূরা গণ্য করেছেন। এ ব্যাপারে ইমাম সুয়ূতির বক্তব্য হচ্ছে, মক্কী সূরা হিসেবেই এটি বেশী খ্যাতি অর্জন করেছে। কিন্তু কিছু কিছু বর্ণনায় একে মাদানী সূরা বলা হয়েছে। যেমন ঃ

ইবনে আবু হাতেম আবু বুরাইদার (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছেঃ বনী হারেসা ও বনিল হারস নামক আনসারদের দু'টি গোত্রের ব্যাপারে এ সূরাটি নাযিল হয়। উভয় গোত্র পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতামূলকভাবে প্রথমে নিজেদের জীবিত লোকদের গৌরব গাঁথা বর্ণনা করে। তারপর কবরস্তানে গিয়ে মৃত লোকদের গৌরবগাঁথা বর্ণনা করে। তাদের এই আচরণের ফলে আল্লাহর এই বাণী اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ নাযিল হয়। কিন্তু শানেনূযুল বা নাযিল হওয়ার কারণ ও উপলক্ষ বর্ণনার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা সামনে রাখলে এই রেওয়ায়াত যে উপলক্ষে বর্ণনা করা হয়েছে তাকে এই সূরা নাযিলের উপলক্ষ বলে মেনে নেবার সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। বরং এ থেকে এই অর্থ গ্রহণ করা যায় যে, এই দু'টি গোত্রের কর্মকাণ্ডের সাথে সূরাটি খাপ খেয়ে যায়।

ইমাম বুখারী ও ইবনে জারীর হযরত উবাই ইবনে কাবের (রা) একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ "আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীটিকে لَوْ اَنَّ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لَتَمَنّٰى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَاُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ (বনি আদমের কাছে যদি দুই উপত্যকা সমান সম্পদ থাকে তারপরও সে তৃতীয় একটি উপত্যকা আকাংখা করবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া আর কিছু দিয়ে ভরে না)—কুরআনের মধ্যে মনে করতাম। এমন কি শেষ পর্যন্ত আলহাকুমুত তাকাসুর সূরাটি নাযিল হয়।" হযরত উবাই মদীনায় মুসলমান হয়েছিলেন বলে এই হাদীসটিকে সূরা আত তাকাসুরের মদীনায় অবতীর্ণ হবার সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়। কিন্তু হযরত উবাইর এই বক্তব্য থেকে সাহাবায়ে কেরাম কোন্ অর্থে রসূলের এই বাণীটিকে কুরআনের মধ্যে মনে করতেন তা সুস্পষ্ট হয় না। যদি এর অর্থ এই হয়ে থাকে যে, তাঁরা একে কুরআনের একটি আয়াত মনে করতেন তাহলে একথা মেনে নেয়া যেতে পারে না। কারণ সাহাবীগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কুরআনের প্রতিটি হরফ সম্পর্কে অবহিত

ছিলেন। এই হাদীসটিকে কুরআনের আয়াত মনে করার মতো ভুল ধারণা তাঁরা কেমন করে পোষণ করতে পারতেন। আর কুরআনের মধ্যে হবার মানে যদি কুরআন থেকে গৃহীত হওয়া মনে করা হয় তাহলে এই হাদীসটির এ অর্থও হতে পারে যে, মদীনা তাইয়েবায় যাঁরা মুসলমান হয়েছিলেন তাঁরা প্রথমবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র কণ্ঠে এই সূরা উচ্চারিত হতে শুনে মনে করেন, সূরাটি এই মাত্র নাযিল হয়েছে এবং রসূলের উপরোল্লিখিত বাণী সম্পর্কে তাঁরা মনে করতে থাকেন এটি এই সূরা থেকেই গৃহীত।

ইবনে জারীর, তিরমিযী ও ইবনুল মুনযির প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হযরত আলীর (রা) একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ "কবরের আযাব সম্পর্কে আমরা সব সময় সন্দেহের মধ্যে ছিলাম। এমন কি শেষ পর্যন্ত 'আলহা–কুমুত তাকাসুর' নাযিল হলো।" হযরত আলীর (রা) এই বক্তব্যটিকে এই সূরার মাদানী হবার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করার কারণ হচ্ছে এই যে, কবরের আযাবের আলোচনা মদীনায় শুরু হয়। মক্কায় এ সম্পর্কে কোন আলোচনাই হয়নি। কিন্তু একথাটি আসলে ঠিক নয়। কুরআনের মক্কী সূরাগুলোর বিভিন্ন স্থানে এমন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কবরের আযাবের কথা বলা হয়েছে যে, এ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশই সেখানে নেই। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন সূরা আন'আম ৯৩ আয়াত, আন নামল ২৮ আয়াত, আল মু'মিনূন ৯৯–১০০ আয়াত, আল মু'মিন ৪৫–৪৬ আয়াত। এগুলো সবই মক্কী সূরা। তাই হযরত আলীর (রা) উক্তি থেকে যদি কোন জিনিস প্রমাণ হয় তাহলে তা হচ্ছে এই যে, উপরোল্লিখিত মক্কী সূরাগুলো নাযিলের পূর্বে সূরা আত তাকাসুর নাযিল হয় এবং এই সূরাটি নাযিল হবার ফলে সাহাবীগণের মধ্যে বিরাজিত কবরের আযাব সম্পর্কিত সংশয় দূর হয়ে যায়।

এ কারণে এই হাদীসগুলো সত্ত্বেও মুফাস্সিরগণের অধিকাংশই এর মক্কী হবার ব্যাপারে একমত। আমার মতে এটি শুধু মক্কী সূরাই নয় বরং মক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্যতম।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এই সূরায় মানুষকে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও বৈষয়িক স্বার্থ পূজার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এই ভালোবাসা ও স্বার্থ পূজার কারণে মানুষ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বেশী বেশী ধন–সম্পদ আহরণ, পার্থিব লাভ, স্বার্থ উদ্ধার, ভোগ, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ এবং তার মধ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে একজন আর একজনকে টপকে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। আর এসব অর্জন করার ব্যাপারে অহংকারে মেতে থাকে। এই একটি মাত্র চিন্তা তাদেরকে এমনভাবে মশগুল করে রেখেছে যার ফলে এর চেয়ে উন্নততর কোন জিনিসের প্রতি নজর দেবার মানসিকতাই তাদের নেই। এর অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার পর লোকদেরকে বলা হয়েছে, এই যেসব নিয়ামত তোমরা নিশ্চিন্তে সংগ্রহ করতে ব্যস্ত, এগুলো শুধুমাত্র নিয়ামত নয় বরং এগুলো তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তুও। এগুলোর মধ্য থেকে প্রত্যেকটি নিয়ামত সম্পর্কে তোমাদের আখেরাতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

আয়াত ৮ **সূরা আত তাকাসুর-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٣
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٤ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝٥
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝٦ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝٧ ثُمَّ
لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝٨

বেশী বেশী এবং একে অপরের থেকে বেশী দুনিয়ার স্বার্থ লাভ করার মোহ তোমাদের গাফলতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।[১] এমনকি (এই চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে) তোমরা কবর পর্যন্ত পৌঁছে যাও।[২] কখ্খনো না, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।[৩] আবার (শুনে নাও) কখ্খনো না, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। কখ্খনো না, যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে (এই আচরণের পরিণাম) জানতে (তাহলে তোমরা এ ধরনের কাজ করতে না)। তোমরা জাহান্নাম দেখবেই। আবার (শুনে নাও) তোমরা একেবারে স্থির নিশ্চিতভাবে তা দেখবেই। তারপর অবশ্যই সেদিন তোমাদের এই নিয়ামতগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[৪]

১. মূলে বলা হয়েছে اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ এখানে মাত্র দু'টি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এই দু'টি শব্দের অর্থের মধ্যে এত বেশী ব্যাপকতা রয়েছে যা মাত্র একটি বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

'আলহাকুম' (اَلْهٰكُمْ) শব্দটির মূলে রয়েছে লাহউন। لهو এর আসল অর্থ গাফলতি। কিন্তু যেসব কাজের প্রতি মানুষের আগ্রহ ও আকর্ষণ এত বেশী বেড়ে যায় যে সে তার মধ্যে মগ্ন হয়ে অন্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ জিনিস থেকে গাফেল হয়ে পড়ে সেই ধরনের প্রত্যেকটি কাজের জন্য আরবী ভাষায় এ শব্দটি বলা হয়ে থাকে। আলহাকুম শব্দটিকে যখন এর মূল অর্থে বলা হবে তখন এর অর্থ হবে কোন 'লাহওয়া' তোমাকে তার মধ্যে এমনভাবে মশগুল করে রেখেছে যে, তার চাইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কোন জিনিসের প্রতি আর তোমার আকর্ষণ ও আগ্রহ থাকেনি। তার মোহ তোমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

তারি চিন্তায় তুমি নিমগ্ন। আর এই মোহ ও নিমগ্নতা তোমাকে একেবারে গাফেল করে দিয়েছে।

তাকাসুর (تَكَاثُر) এর মূল কাসরাত (كَثْرَت) । এর তিনটি অর্থ হয়। এক, মানুষের বেশী বেশী প্রাচুর্য লাভ করার চেষ্টা করা। দুই, প্রাচুর্য লাভ করার জন্য মানুষের পরস্পরের অগ্রবর্তী হওয়ার চেষ্টা করা। তিন, লোকদের অন্যের তুলনায় বেশী প্রাচুর্য লাভ করার কথা নিয়ে পরস্পরের মোকাবেলায় বড়াই করে বেড়ানো।

কাজেই "আলহাকুমুত তাকাসুরের" অর্থ দাঁড়ায় তাকাসুর বা প্রাচুর্য তোমাদেরকে তার নিজের মধ্যে এমনভাবে মশগুল করে নিয়েছে, যার ফলে তার প্রতি মোহাচ্ছন্নতা তোমাদের তার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ জিনিস থেকে গাফেল করে দিয়েছে। 'তাকাসুরের মধ্যে কোন জিনিসের প্রাচুর্য রয়েছে, 'আলহাকুম'–এ কোন জিনিস থেকে গাফেল হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং আলহাকুম–এ কাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে– এ বাক্যে সে কথা সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি। অর্থের এই অস্পষ্টতার কারণে এই শব্দগুলো ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহারের দুয়ার খুলে গেছে। এ ক্ষেত্রে 'তাকাসুর' বা প্রাচুর্যের অর্থ সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি। বরং দুনিয়ার সমস্ত সুবিধা ও লাভ, বিলাস দ্রব্য, ভোগের সামগ্রী, শক্তি ও কর্তৃত্বের উপকরণ বেশী বেশী অর্জন করার প্রচেষ্টা চালানো, এগুলো অর্জন করার জন্য একে অন্যের থেকে অগ্রবর্তী হবার চেষ্টা করা এবং এগুলোর প্রাচুর্যের কারণে পরস্পরের মোকাবেলায় বড়াই করা এর অর্থের অন্তরভুক্ত হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে 'আলহাকুম'–এ যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তারাও সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি। বরং প্রত্যেক যুগের লোকেরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে ও সামগ্রিকভাবে এর সম্বোধনের আওতাভুক্ত হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায়, বেশী বেশী বৈষয়িক স্বার্থ অর্জন করা, তার মধ্যে একে অন্যের অগ্রবর্তী হওয়া এবং অন্যের মোকাবেলায় তা নিয়ে গর্ব করার মোহ যেমন ব্যক্তিকে আচ্ছন্ন করে তেমনি আচ্ছন্ন করে গোত্র ও জাতিকেও। অনুরূপভাবে 'আলহাকুমুত তাকাসুর'–এ যেহেতু একথা সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি যে, প্রাচুর্য লোকদেরকে নিজের মধ্যে নিমগ্ন করে কোন জিনিস থেকে গাফেল করে দিয়েছে, তাই এর অর্থের মধ্যেও ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, এই প্রাচুর্যের মোহ লোকদেরকে এর চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটি জিনিস থেকে গাফেল করে দিয়েছে। তারা আল্লাহ থেকে গাফেল হয়ে গেছে। আখেরাত থেকে গাফেল হয়ে গেছে। নৈতিকতার সীমা ও নৈতিক দায়িত্ব থেকে গাফেল হয়ে গেছে। অধিকারীর অধিকার এবং তা আদায় করার ব্যাপারে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে গাফেল হয়ে গেছে। তারা নিজেদের জীবন যাপনের মান উন্নয়নের চিন্তায় ব্যাকুল। মানবতার মান কত নেমে যাচ্ছে সে চিন্তা তাদেরকে একটুও ব্যতিব্যস্ত করে না। তাদের চাই বেশী বেশী অর্থ। কোন পথে এ অর্থ অর্জিত হচ্ছে তার কোন পরোয়াই তাদের নেই। তারা বিলাস দ্রব্য ও ভোগের সামগ্রী বেশী বেশী চায়। এই প্রবৃত্তি পূজায় লিপ্ত হয়ে তারা এহেন আচরণের পরিণাম থেকে সম্পূর্ণ গাফেল হয়ে গেছে। তারা বেশী বেশী শক্তি, সেনাবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের চিন্তায় মশগুল। এ প্রশ্নে তারা একে অপরকে ডিঙ্গিয়ে যাবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এ চিন্তা করছেনা যে, এগুলো আল্লাহর দুনিয়াকে জুলুমে পরিপূর্ণ করার এবং মানবতাকে ধ্বংস ও বরবাদ করার সরঞ্জাম মাত্র। মোটকথা, এভাবে অসংখ্য ধরনের 'তাকাসুর' ব্যক্তি ও জাতিদেরকে তার মধ্যে এমনভাবে মশগুল করে

রেখেছে যে, দুনিয়া এবং বৈষয়িক স্বার্থ ও ভোগের চাইতে বড় কোন জিনিসের কথা তারা মুহূর্তকালের জন্যও চিন্তা করে না।

২. অর্থাৎ সারাটা জীবন তোমরা এই প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছো। মরার এক মুহূর্ত আগেও এ চিন্তা থেকে তোমাদের রেহাই নেই।

৩. অর্থাৎ তোমরা ভুল ধারণার শিকার হয়েছো। বৈষয়িক সম্পদের এ প্রাচুর্য এবং এর মধ্যে পরস্পর থেকে অগ্রবর্তী হয়ে যাওয়াকেই তোমরা উন্নতি ও সাফল্য মনে করে নিয়েছো। অথচ এটা মোটেই উন্নতি ও সাফল্য নয়। শিগ্রই তোমরা এর অশুভ পরিণতি জানতে পারবে। সারাটা জীবন যে ভুলের মধ্যে তোমরা লিপ্ত ছিলে সেটা যে কত বড় ভুল ছিল তা তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। শীঘ্রই অর্থ আখেরাতও হতে পারে। কারণ আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমগ্রকাল ব্যাপী যে সত্তার দৃষ্টি প্রসারিত তাঁর কাছে কয়েক হাজার বা কয়েক লাখ বছরও কালের সামান্য একটি অংশ মাত্র। কিন্তু এর অর্থ মৃত্যুও হতে পারে। কারণ কোন মানুষ থেকে তার অবস্থান বেশী দূরে নয়। আর মানুষ তার সারা জীবন যে সব কাজের মধ্যে কাটিয়ে এসেছে সে মরে যাবার সাথে সাথেই সেগুলো তার জন্য সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ও অশুভ পরিণামের বাহন ছিল কিনা তা তার কাছে একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

৪. এই বাক্যে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার পর জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এই অর্থে 'তারপর' শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। বরং এর অর্থ হচ্ছে ঃ তারপর এ খবরটিও আমি তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি যে, এসব নিয়ামত সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর একথা সুস্পষ্ট, আল্লাহর আদালতে হিসেব নেবার সময় এ জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, মহান আল্লাহ বান্দাদেরকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন সে সম্পর্কে মু'মিন ও কাফের সবাইকে জবাবদিহি করতে হবে। এটা আলাদা ব্যাপার, যারা নিয়ামত অস্বীকার করেনি এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে জীবন যাপন করেছে তারা এই জিজ্ঞাসাবাদে সফলকাম হবে। আর যারা আল্লাহর নিয়ামতের হক আদায় করেনি এবং নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অথবা উভয়ের সাহায্যে তাঁর নাফরমানি করেছে তারা ব্যর্থ হবে।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের এখানে এলেন। আমরা তাঁকে তাজা খেজুর খাওয়ালাম এবং ঠাণ্ডা পানি পান করালাম। তিনি বললেন ঃ "এগুলো এমন সব নিয়ামতের অন্তরভুক্ত যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (মুসনাদে আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া, আবদ ইবনে হুমাইদ ও বাইহাকী ফিশ্ শু'আব)।

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বক্‌র (রা) ও হযরত উমরকে (রা) বললেন, চলো আবুল হাইসাম ইবনুত তাইহান আনসারীর ওখানে যাই। কাজেই তাদেরকে নিয়ে তিনি ইবনুত তাইহানের খেজুর বাগানে গেলেন। তিনি এক কাঁদি খেজুর এনে মেহমানদের সামনে রাখলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি নিজে খেজুর ছিঁড়ে আনলে না কেন?

তিনি বললেন, আমি চাচ্ছিলাম আপনারা নিজেরা বেছে বেছে খেজুর খাবেন। কাজেই তারা খেজুর খেলেন এবং ঠাণ্ডা পানি পান করলেন। খাওয়া দাওয়া শেষ করে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ সমর্পিত, কিয়ামতের দিন যেসব নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এই ঠাণ্ডা ছায়া, ঠাণ্ডা খেজুর ও ঠাণ্ডা পানি— এগুলো তার অন্তরভুক্ত।" (এই ঘটনা মুসলিম, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জারীর ও আবুল ইয়ালা প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সূত্রে আবু হুরাইরাহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এদের কেউ কেউ উক্ত আনসার সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন আবার কেউ কেউ শুধুমাত্র একজন আনসারী বলেই ক্ষ্যান্ত হয়েছেন। এ ঘটনাটি বিভিন্ন সূত্রে এবং বিস্তারিত আকারে ইবনে আবু হাতেম হযরত উমর থেকে এবং ইমাম আহমাদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবু আসী নামক একজন মুক্তি প্রাপ্ত গোলাম থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে হাইয়ান ও ইবনে মারদুইয়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তা থেকে জানা যায়, প্রায় এ একই ধরনের ঘটনা হযরত আবু আইউব আনসারীর ওখানেও ঘটেছিল)।

এই হাদীসগুলো থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, জিজ্ঞাসাবাদ কেবল কাফেরদেরকে করা হবে না, সৎ মু'মিনদেরকেও করা হবে। আর আল্লাহ মানুষকে যে নিয়ামতগুলো দান করেছেন সেগুলো সীমা সংখ্যাহীন। সেগুলো গণনা করা সম্ভব নয়। বরং এমন অনেক নিয়ামতও আছে যেগুলোর মানুষ কোন খবরই রাখে না। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا অর্থাৎ "যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামতগুলো গণনা করতে থাকো তাহলে সেগুলো পুরোপুরি গণনা করতেও পারবে না।" (ইবরাহীম ৩৪ আয়াত) এই নিয়ামতগুলোর মধ্য থেকে অসংখ্য নিয়ামত মহান আল্লাহ সরাসরি মানুষকে দিয়েছেন। আবার বিপুল সংখ্যক নিয়ামত মানুষকে দান করা হয় তার নিজের উপার্জনের মাধ্যমে। নিজের উপার্জিত নিয়ামতগুলো মানুষ কিভাবে উপার্জন ও ব্যয় করেছে সে সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহর কাছ থেকে সরাসরি যে নিয়ামতগুলো সে লাভ করেছে সেগুলোকে সে কিভাবে ব্যবহার করেছে তার হিসেব তাকে দিতে হবে। আর সামগ্রিকভাবে সমস্ত নিয়ামত সম্পর্কে তাকে বলতে হবে যে, সেগুলো যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত এর স্বীকৃতি সে দিয়েছিল কিনা এবং নিজের ইচ্ছা, মনোভাব ও কর্মের সাহায্যে সেগুলোর জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল কি না? অথবা সে কি একথা মনে করতো, এ সবকিছু হঠাৎ ঘটনাক্রমেই সে পেয়ে গেছে? অথবা সে কি একথা মনে করেছিল যে, অনেকগুলো খোদা তাকে এগুলো দিয়েছেন? অথবা সে এই বিশ্বাস পোষণ করতো যে, এগুলো একজন আল্লাহরই নিয়ামত ঠিকই কিন্তু এগুলো দান করার ব্যাপারে আরো অনেক সত্তার হাত রয়েছে? এ কারণে তাদেরকে মাবুদ গণ্য করেছিল এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল?

আল আসর

১০৩

নামকরণ

প্রথম আয়াতের "আল আসর" (اَلْعَصْرِ) শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিল হবার সময়-কাল

মুজাহিদ, কাতাদাহ ও মুকাতিল একে মাদানী বলেছেন। কিন্তু মুফাস্‌সিরগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একে মক্কী সূরা হিসেবে গণ্য করেছেন। আর এই সূরার বিষয়বস্তু সাক্ষ দেয়, এটি মক্কী যুগেরও প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়ে থাকবে। সে সময় ইসলামের শিক্ষাকে সংক্ষিপ্ত ও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বাক্যের সাহায্যে বর্ণনা করা হতো। এভাবে শ্রোতা একবার শুনার পর ভুলে যেতে চাইলেও তা আর ভুলতে পারতো না এবং আপনা আপনি লোকদের মুখে মুখেও তা উচ্চারিত হতে থাকতো।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটি ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্য সমন্বিত বাণীর একটি অতুলনীয় নমুনা। কয়েকটা মাপাজোকা শব্দের মধ্যে গভীর অর্থের এমন এক ভাণ্ডার রেখে দেয়া হয়েছে যা বর্ণনা করার জন্য একটি বিরাট গ্রন্থও যথেষ্ট নয়। এর মধ্যে সম্পূর্ণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মানুষের সাফল্য ও কল্যাণের এবং তার ধ্বংস ও সর্বনাশের পথ বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম শাফেঈ যথার্থই বলেছেন, লোকেরা যদি এই সূরাটি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে এই একটি সূরাই তাদের হেদায়াতের জন্য যথেষ্ট। সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে এটি ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূরা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হিস্‌ন দারেমী আবু মাদীনার বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তি যখন পরস্পর মিলিত হতেন তখন তারা একজন অপরজনকে সূরা আসর না শুনানো পর্যন্ত পরস্পর থেকে বিদায় নিতেন না। (তাবারানী)।

আয়াত ৩ **সূরা আল 'আসর-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣

সময়ের কসম। মানুষ আসলে বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করতে থেকেছে এবং একজন অন্যজনকে হক কথার ও সবর করার উপদেশ দিতে থেকেছে।[১]

১. এ সূরায় একথার ওপর সময়ের কসম খাওয়া হয়েছে যে, মানুষ বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে এবং এই ক্ষতি থেকে একমাত্র তারাই রক্ষা পেয়েছে যারা চারটি গুণাবলীর অধিকারী ঃ (১) ঈমান, (২) সৎকাজ, (৩) পরস্পরকে হকের উপদেশ দেয়া এবং (৪) একে অন্যকে সবর করার উপদেশ দেয়া। আল্লাহর এই বাণীর অর্থ সুস্পষ্টভাবে জানার জন্য এখন এখানে প্রতিটি অংশের ওপর পৃথকভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

কসম সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমি বহুবার সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেছি। আল্লাহ সৃষ্টিকুলের কোন বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব, অভিনবত্ব ও বিস্ময়করতার জন্য কখনো তার কসম খাননি।। বরং যে বিষয়টি প্রমাণ করা উদ্দেশ্য এই বস্তুটি তার সত্যতা প্রমাণ করে বলেই তার কসম খেয়েছেন। কাজেই সময়ের কসমের অর্থ হচ্ছে, যাদের মধ্যে উল্লেখিত চারটি গুণাবলী রয়েছে তারা ছাড়া বাকি সমস্ত মানুষ বিরাট ক্ষতির মধ্যে অবস্থান করছে, সময় এর সাক্ষী।

সময় মানে বিগত সময়—অতীত কালও হতে পারে আবার চলতি সময়ও। এই চলতি বা বর্তমান কাল আসলে কোন দীর্ঘ সময়ের নাম নয়। বর্তমান কাল প্রতি মুহূর্তে বিগত হচ্ছে এবং অতীতে পরিণত হচ্ছে। আবার ভবিষ্যতের গর্ভ থেকে প্রতিটি মুহূর্ত বের হয়ে এসে বর্তমানে পরিণত হচ্ছে এবং বর্তমান থেকে আবার তা অতীতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এখানে যেহেতু কোন বিশেষত্ব ছাড়াই শুধু সময়ের কসম খাওয়া হয়েছে, তাই দুই ধরনের সময় বা কাল এর অন্তরভুক্ত হয়। অতীতকালের কসম খাওয়ার মানে হচ্ছে ঃ মানুষের ইতিহাস এর সাক্ষ দিচ্ছে, যারাই এই গুণাবলী বিবর্জিত ছিল তারাই পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর বর্তমানকালের কসম খাওয়ার অর্থ বুঝতে হলে প্রথমে একথাটি ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, বর্তমানে যে সময়টি অতিবাহিত হচ্ছে সেটি আসলে এমন একটি সময় যা প্রত্যেক ব্যক্তি ও জাতিকে দুনিয়ায় কাজ করার জন্য দেয়া হয়েছে।

পরীক্ষার হলে একজন ছাত্রকে প্রশ্নপত্রের জবাব দেবার জন্য যে সময় দেয়া হয়ে থাকে তার সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে। নিজের ঘড়িতে কিছুক্ষণের জন্য সেকেণ্ডের কাঁটাটির চলার গতি লক্ষ করলে এই সময়ের দ্রুত গতিতে অতিবাহিত হবার বিষয়টি উপলব্ধি করা যাবে। অথচ একটি সেকেণ্ডও সময়ের একটি বিরাট অংশ। একমাত্র একটি সেকেণ্ডে আলো এক লাখ ছিয়াশী হাজার মাইলের পথ অতিক্রম করে। এখনো আমরা না জানতে পারলেও আল্লাহর রাজ্যে এমন অনেক জিনিসও থাকতে পারে যা এর চাইতেও দ্রুত গতি সম্পন্ন। তবুও ঘড়ির সেকেণ্ডের কাটার চলার যে গতি আমরা দেখি সময়ের চলার গতি যদি তাই ধরে নেয়া হয় এবং যা কিছু ভালো-মন্দ কাজ আমরা করি আর যেসব কাজেও আমরা ব্যস্ত থাকি সবকিছুই দুনিয়ায় আমাদের কাজ করার জন্য যে সীমিত জীবন কাল দেয়া হয়েছে তার মধ্যেই সংঘটিত হয়, এ ব্যাপারটি নিয়ে যদি আমরা চিন্তা-ভাবনা করি তাহলে আমরা অনুভব করতে পারি যে, এই দ্রুত অতিবাহিত সময়ই হচ্ছে আমাদের আসল মূলধন। ইমাম রাযী এই পর্যায়ে একজন মনীষীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন : "একজন বরফওয়ালার কাছ থেকে আমি সূরা আসরের অর্থ বুঝেছি। সে বাজারে জোর গলায় হেঁকে চলছিল— দয়া করো এমন এক ব্যক্তির প্রতি যার পুঁজি গলে যাচ্ছে। দয়া করো এমন এক ব্যক্তির প্রতি যার পুঁজি গলে যাচ্ছে। তার একথা শুনে আমি বললাম, এটিই হচ্ছে আসলে وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ বাক্যের অর্থ। মানুষকে যে আয়ুষ্কাল দেয়া হয়েছে তা বরফ গলে যাবার মতো দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। একে যদি নষ্ট করে ফেলা হয় অথবা ভুল কাজে ব্যয় করা হয় তাহলে সেটিই মানুষের জন্য ক্ষতি।" কাজেই চলমান সময়ের কসম খেয়ে এই সূরায় যে কথা বলা হয়েছে তার অর্থ এই যে, এই দ্রুত গতিশীল সময় সাক্ষ দিচ্ছে, এই চারটি গুণাবলী শূন্য হয়ে মানুষ যে কাজেই নিজের জীবন কাল অতিবাহিত করে তার সবটুকুই ক্ষতির সওদা বৈ কিছুই নয়। এই চারটি গুণে গুণান্বিত হয়ে যারা দুনিয়ায় কাজ করে একমাত্র তারাই লাভবান হয়। এটি ঠিক তেমনি ধরনের একটি কথা যেমন একজন ছাত্র পরীক্ষার হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশ্নপত্রের জবাব দেবার পরিবর্তে অন্য কাজে সময় নষ্ট করছে, তাকে আমরা হলের দেয়ালে টাঙ্গানো ঘড়ির দিকে অংগুলি নির্দেশ করে বলি : এই দ্রুত গতিশীল সময় বলে দিচ্ছে, তুমি নিজের ক্ষতি করছো। যে ছাত্র এই সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত নিজের প্রশ্নপত্রের জবাব দেবার কাজে ব্যয় করছে একমাত্র সেই লাভবান।

মানুষ শব্দটি একবচন। কিন্তু পরের বাক্যে চারটি গুণ সম্পন্ন লোকদেরকে তার থেকে আলাদা করে নেয়া হয়েছে। এ কারণে একথাটি অবশ্যি মানতে হবে যে, এখানে মানুষ শব্দটি জাতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি ও সমগ্র মানব সম্প্রদায় এর মধ্যে সমানভাবে শামিল। কাজেই উপরোল্লিখিত চারটি গুণাবলী কোন ব্যক্তি, জাতি বা সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যার-ই মধ্যে থাকবে না সে-ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এই বিধানটি সর্বাবস্থায় সত্য প্রমাণিত হবে। এটি ঠিক তেমনি ধরনের ব্যাপার যেমন আমরা বলি, বিষ মানুষের জন্য ধ্বংসকর। এ ক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, বিষ সর্বাবস্তায় ধ্বংসকর হবে, এক ব্যক্তি খেলেও, একটি জাতি খেলেও বা সারা দুনিয়ার মানুষেরা সবাই মিলে খেলেও বিষের ধ্বংসকর ও সংহারক গুণ অপরিবর্তনীয়। এক ব্যক্তি বিষ খেয়েছে বা একটি জাতি বিষ খেয়েছে অথবা সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ বিষ খাবার ব্যাপারে একমত হয়ে গেছে, এ দৃষ্টিতে তার মধ্যে গুণগত কোন ফারাক দেখা যাবে না। অনুরূপভাবে মানুষের জন্য সূরায়

উল্লেখিত চারটি গুণাবলী শূন্য হওয়া যে ক্ষতির কারণ, এটিও একটি অকাট্য সত্য। এক ব্যক্তি এই গুণাবলী শূন্য হোক অথবা কোন জাতি বা সারা দুনিয়ার মানুষেরা কুফরী করা, অসৎকাজ করা এবং পরস্পরকে বাতিল কাজে উৎসাহিত করা ও নফসের বন্দেগী করার উপদেশ দেবার ব্যাপারে একমত হয়ে যাক তাতে এই সার্বজনীন মূলনীতিতে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয় না।

এখন দেখা যাক 'ক্ষতি' শব্দটি কুরআন মজীদে কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আভিধানিক অর্থে ক্ষতি হচ্ছে লাভের বিপরীত শব্দ। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এ শব্দটির ব্যবহার এমন সময় হয় যখন কোন একটি সওদায় লোকসান হয়। পুরা ব্যবসাটায় যখন লোকসান হতে থাকে তখনো এর ব্যবহার হয়। আবার সমস্ত পুঁজি লোকসান দিয়ে যখন কোন ব্যবসায়ী দেউলিয়া হয়ে যায় তখনো এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কুরআন মজীদ এই একই শব্দকে নিজের বিশেষ পরিভাষায় পরিণত করে কল্যাণ ও সফলতার বিপরীত অর্থে ব্যবহার করছে। কুরআনের সাফল্যের ধারণা যেমন নিছক পার্থিব সমৃদ্ধির সমার্থক নয় বরং দুনিয়া থেকে নিয়ে আখেরাত পর্যন্ত মানুষের প্রকৃত ও যথার্থ সাফল্য এর অন্তরভুক্ত, অনুরূপভাবে তার ক্ষতির ধারণাও নিছক পার্থিব ব্যর্থতা ও দুরবস্থার সমার্থক নয় বরং দুনিয়া থেকে নিয়ে আখেরাত পর্যন্ত মানুষের সমস্ত যথার্থ ব্যর্থতা ও অসাফল্য এর আওতাভুক্ত হয়ে যায়। সাফল্য ও ক্ষতির কুরআনী ধারণার ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আমি বিভিন্ন স্থানে করে এসেছি। তাই এখানে আবার তার পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন দেখি না। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল 'আরাফ ৯ টীকা, আল আনফাল ৩০ টীকা, ইউনুস ২৩ টীকা, বনি ইসরাঈল ১০২ টীকা, আল হাজ্জ ১৭ টীকা, আল মু'মিনূন ১, ২, ১১ ও ৫০ টীকা এবং লোকমান ৪ টীকা, আয্ যুমার ৩৪ টীকা।) এই সংগে একথাটিও ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, যদিও কুরআনের দৃষ্টিতে আখেরাতে মানুষের সাফল্যই তার আসল সাফল্য এবং আখেরাতে তার ব্যর্থতাই আসল ব্যর্থতা তবুও এই দুনিয়ায় মানুষ যেসব জিনিসকে সাফল্য নামে অভিহিত করেছে তা আসলে সাফল্য নয় বরং এই দুনিয়াতেই তার পরিণাম ক্ষতির আকারে দেখা দিয়েছে এবং যে জিনিসকে মানুষ ক্ষতি মনে করেছে তা আসলে ক্ষতি নয় বরং এই দুনিয়াতেই তা সাফল্যে পরিণত হয়েছে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এই সত্যটি বর্ণনা করা হয়েছে। যথার্থ স্থানে আমি এর ব্যাখ্যা করে এসেছি। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন আন নাম্‌ল ৯৯ টীকা, মার্‌য়াম ৫৩ টীকা, ত্বা–হা ১০৫ টীকা) কাজেই কুরআন যখন পূর্ণ বলিষ্ঠতার সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ে ঘোষণা দিচ্ছে, "আসলে মানুষ বিরাট ক্ষতির মধ্যে অবস্থান করছে," তখন এর অর্থ হয় দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানের ক্ষতি। আর যখন সে বলে, এই ক্ষতির হাত থেকে একমাত্র তারাই রেহাই পেয়েছে যাদের মধ্যে নিম্নোক্ত চারটি গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে, তখন এর অর্থ হয় ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাওয়া এবং সাফল্য লাভ করা।

এখন এই সূরার দৃষ্টিতে যে চারটি গুণাবলীর উপস্থিতিতে মানুষ ক্ষতিমুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে সে সম্পর্কিত আলোচনায় আসা যাক।

এর প্রথম গুণটি হচ্ছে ঈমান। যদিও এ শব্দটি কুরআন মজীদের কোন কোন স্থানে নিছক মৌখিক স্বীকারোক্তির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (যেমন আন নিসা ১৩৭ আয়াত, আল মায়েদাহ ৫৪ আয়াত, আল আনফাল ২০ ও ২৭ আয়াত, আত তাওবা ৩৮ আয়াত এবং

আসসাফ ২ আয়াত) তবুও আসল ব্যবহার হয়েছে সাচ্চা দিলে মেনে নেয়া ও বিশ্বাস করা অর্থে। আরবী ভাষায়ও এই শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আভিধানিক দৃষ্টিতে اٰمَنَ لَهٗ তার অর্থ হয় صَدَّقَهٗ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ (তাকে সত্য বলেছে ও তার প্রতি আস্থা স্থাপন করেছে) আর اٰمَنَ بِهٖ এর অর্থ হয় اَيْقَنَ بِهٖ (তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে)। কুরআন যে ঈমানকে প্রকৃত ঈমান বলে গণ্য করে নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে তাকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে ঃ

اِنَّمَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا

"মু'মিন তো আসলে তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনে আর তারপর সংশয়ে লিপ্ত হয় না।" (আল হুজুরাত ১৫)

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا

"যারা বলেছে, আল্লাহ আমাদের রব আর তারপর তার ওপর অবিচল হয়ে গেছে।"

(হা–মীম আস সাজদাহ ৩০)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

"আসলে তারাই মু'মিন, আল্লাহর কথা উচ্চারিত হলে যাদের দিল কেঁপে ওঠে।"

(আনফাল ২)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ – (البقرة : ١٦٥)

"যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকে সর্বাধিক ও অত্যন্ত মজবুতির সাথে ভালোবাসে।"

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا –

"কাজেই, না (হে নবী!) তোমার রবের কসম, তারা কখনোই মু'মিন নয়, যতক্ষণ না তাদের পারস্পরিক বিরোধে তোমাকে ফায়সালাকারী হিসেবে না মেনে নেয়। তারপর যা কিছু তুমি ফায়সালা করো সে ব্যাপারে তারা মনে কোন প্রকার সংকীর্ণতা অনুভব করে না বরং মনে প্রাণে মেনে নেয়।" (আন নিসা ৬৫)

নিম্নোক্ত আয়াতটিতে ঈমানের মৌখিক স্বীকারোক্তি ও প্রকৃত ঈমানের মধ্যে পার্থক্য আরো বেশী করে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, আসল লক্ষ হচ্ছে প্রকৃত ঈমান, মৌখিক স্বীকারোক্তি নয় ঃ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো।" (আন নিসা ১৩৬)

এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, ঈমান আনা বলতে কিসের ওপর ঈমান আনা বুঝাচ্ছে? এর জবাবে বলা যায়, কুরআন মজীদে একথাটি একেবারে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমত আল্লাহকে মানা। নিছক তাঁর অস্তিত্ব মেনে নেয়া নয়। বরং তাঁকে এমনভাবে মানা

যাতে বুঝা যায় যে, তিনি একমাত্র প্রভু ও ইলাহ। তাঁর সর্বময় কর্তৃত্বে কোন অংশীদার নেই। একমাত্র তিনিই মানুষের ইবাদাত, বন্দেগী ও আনুগত্য লাভের অধিকারী। তিনিই ভাগ্য গড়েন ও ভাঙেন। বান্দার একমাত্র তাঁরই কাছে প্রার্থনা এবং তাঁরই ওপর নির্ভর করা উচিত। তিনিই হুকুম দেন ও তিনিই নিষেধ করেন। তিনি যে কাজের হুকুম দেন তা করা ও যে কাজ থেকে বিরত রাখতে চান তা না করা বান্দার ওপর ফরয। তিনি সবকিছু দেখেন ও শোনেন। মানুষের কোন কাজ তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থাকা তো দূরের কথা, যে উদ্দেশ্য ও নিয়তের ভিত্তিতে মানুষ কাজটি করে তাও তাঁর অগোচরে থাকে না। দ্বিতীয়ত রসূলকে মানা। তাঁকে আল্লাহর নিযুক্ত পথপ্রদর্শক ও নেতৃত্বদানকারী হিসেবে মানা। তিনি যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে দিয়েছেন, তা সবই সত্য এবং অবশ্যি গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেয়া। ফেরেশতা, অন্যান্য নবীগণ, আল্লাহর কিতাবসমূহ এবং কুরআনের প্রতি ঈমান আনাও এই রসূলের প্রতি ঈমান আনার অন্তরভুক্ত। কারণ আল্লাহর রসূলই এই শিক্ষাগুলো দিয়েছেন। তৃতীয়ত আখেরাতকে মানা। মানুষের এই বর্তমান জীবনটিই প্রথম ও শেষ নয়, বরং মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠতে হবে, নিজের এই দুনিয়ার জীবনে সে যা কিছু কাজ করেছে আল্লাহর সামনে তার জবাবদিহি করতে হবে এবং হিসেব-নিকেশে যেসব লোক সৎ গণ্য হবে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে এবং যারা অসৎ গণ্য হবে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে, এই অর্থে আখেরাতকে মেনে নেয়া। ঈমান, নৈতিক চরিত্র ও জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ডের জন্য এটি একটি মজবুত বুনিয়াদ সরবরাহ করে। এর ওপর একটি পাক-পবিত্র জীবনের ইমারত গড়ে উঠতে পারে। নয়তো যেখানে আদতে ঈমানের অস্তিত্বই নেই সেখানে মানুষের জীবন যতই সৌন্দর্য বিভূষিত হোক না কেন তার অবস্থা একটি নোঙ্গর বিহীন জাহাজের মতো। এই জাহাজ ঢেউয়ের সাথে ভেসে যেতে থাকে এবং কোথাও স্থায়ীভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

ঈমানের পরে মানুষকে ক্ষতি থেকে বাঁচাবার জন্য দ্বিতীয় যে গুণটি অপরিহার্য সেটি হচ্ছে সৎকাজ। কুরআনের পরিভাষায় একে বলা হয় সালেহাত। (صالحات) সমস্ত সৎকাজ এর অন্তরভুক্ত। কোন ধরনের সৎকাজ ও সৎবৃত্তি এর বাইরে থাকে না। কিন্তু কুরআনের দৃষ্টিতে যে কাজের মূলে ঈমান নেই এবং যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল প্রদত্ত হেদায়াতের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়নি তা কখনো 'সালেহাত' তথা সৎকাজের অন্তরভুক্ত হতে পারে না। তাই কুরআন মজীদের সর্বত্র সৎকাজের আগে ঈমানের কথা বলা হয়েছে এবং এই সূরায়ও ঈমানের পরেই এর কথা বলা হয়েছে। কুরআনের কোন এক জায়গায়ও ঈমান ছাড়া সৎকাজের কথা বলা হয়নি এবং কোথাও ঈমান বিহীন কোন কাজের পুরস্কার দেবার আশ্বাসও দেয়া হয়নি। অন্যদিকে মানুষ নিজের কাজের সাহায্যে যে ঈমানের সত্যতার প্রমাণ পেশ করে সেটিই হয় নির্ভরযোগ্য ও কল্যাণকর ঈমান। অন্যথায় সৎকাজ বিহীন ঈমান একটি দাবী ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ এই দাবী সত্ত্বেও যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল নির্দেশিত পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে তখন আসলে সে নিজেই তার এই দাবীর প্রতিবাদ করে। ঈমান ও সৎকাজের সম্পর্ক বীজ ও বৃক্ষের মতো। বীজ মাটির মধ্যে না থাকা পর্যন্ত কোন বৃক্ষ জন্মাতে পারে না। কিন্তু যদি বীজ মাটির মধ্যে থাকে এবং কোন বৃক্ষ না জন্মায় তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় মাটির বুকে বীজের সমাধি রচিত হয়ে গেছে। এজন্য কুরআন মজীদে যতগুলো সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তা এমন সব লোকদেরকে দেয়া

হয়েছে যারা ঈমান এনে সৎকাজ করে। এই সূরায়ও একথাটিই বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য দ্বিতীয় যে গুণটির অপরিহার্য প্রয়োজন সেটি হচ্ছে ঈমান আনার পর সৎকাজ করা। অন্য কথায়, সৎকাজ ছাড়া নিছক ঈমান মানুষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না।

উপরোক্ত গুণগুলো তো ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে থাকতে হবে। এরপর এ সূরাটি আরো দু'টি বাড়তি গুণের কথা বলে। ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য এ গুণ দু'টি থাকা জরুরী। এ গুণ দু'টি হচ্ছে, যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের পরস্পরকে হক কথা বলার ও হক কাজ করার এবং ধৈর্যের পথ অবলম্বন করার উপদেশ দিতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে, প্রথমত ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের পৃথক পৃথক ব্যক্তি হিসেবে অবস্থান না করা উচিত। বরং তাদের সম্মিলনে একটি মু'মিন ও সৎসমাজদেহ গড়ে উঠতে হবে। দ্বিতীয়ত এই সমাজ যাতে বিকৃত না হয়ে যায় সে দায়িত্ব সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে উপলব্ধি করতে হবে। এ জন্য এই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যকে হক পথ অবলম্বন ও সবর করার উপদেশ দেবে, এটা তাদের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

হক শব্দটি বাতিলের বিপরীত। সাধারণত এ শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একঃ সঠিক, নির্ভুল, সত্য, ন্যায় ও ইনসাফ অনুসারী এবং আকীদা ও ঈমান বা পার্থিব বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত প্রকৃত সত্য অনুসারী কথা। দুই ঃ আল্লাহর, বান্দার বা নিজের যে হকটি আদায় করা মানুষের জন্য ওয়াজিব হয়ে থাকে। কাজেই পরস্পরকে হকের উপদেশ দেবার অর্থ হচ্ছে, ঈমানদারদের এই সমাজটি এমনি অনুভূতিহীন নয় যে, এখানে বাতিল মাথা উঁচু করতে এবং হকের বিরুদ্ধে কাজ করে যেতে থাকলেও লোকেরা তার নিরব দর্শক হয় মাত্র। বরং যখন ও যেখানেই বাতিল মাথা উঁচু করে তখনই সেখানে হকের আওয়াজ বুলন্দকারীরা তার মোকাবেলায় এগিয়ে আসে, এই সমাজে এই প্রাণশক্তি সর্বক্ষণ প্রবাহিত থাকে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই কেবল সত্যপ্রীতি, সত্য নীতি ও ন্যায় নিষ্ঠার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না এবং হকদারদের হক আদায় করেই ক্ষান্ত হয় না বরং অন্যদেরকে এই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করার উপদেশ দেয়। এই জিনিসটিই সমাজকে নৈতিক পতন ও অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার জামানত দেয়। যদি কোন সমাজে এই প্রাণ শক্তি না থাকে তাহলে সে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। যারা নিজেদের জায়গায় হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিন্তু নিজেদের সমাজে হককে বিধ্বস্ত হতে দেখে নিরব থাকবে তারাও একদিন এই ক্ষতিতে লিপ্ত হবে। একথাটিই সূরা মায়েদায় বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ হযরত দাউদ ও হযরত ঈসা ইবনে মারয়ামের মুখ দিয়ে বনি ইসরাঈলদের ওপর লানত করা হয়েছে। আর এই লানতের কারণ ছিল এই যে, তাদের সমাজে গোনাহ ও জুলুম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং লোকেরা পরস্পরকে খারাপ কাজে বাধা দেয়া থেকে বিরত থেকেছিল (৭৮–৭৯ আয়াত) আবার একথাটি সূরা আরাফে এভাবে বলা বলা হয়েছে ঃ বনী ইসরাঈলরা যখন প্রকাশ্যে শনিবারের বিধান অমান্য করে মাছ ধরতে শুরু করে তখন তাদের ওপর আযাব নাযিল করা হয় এবং সেই আযাব থেকে একমাত্র তাদেরকেই বাঁচানো হয় যারা লোকদেরকে এই গোনাহর কাজে বাধা দেবার চেষ্টা করতো। (১৬৩–১৬৬ আয়াত) সূরা আনফালে আবার একথাটি এভাবে বলা হয়েছে ঃ সেই ফিত্‌নাটি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করো যার ক্ষতিকর প্রভাব

বিশেষভাবে শুধুমাত্র সেসব লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না যারা তোমাদের মধ্যে গোনাহ করেছে। (২৫ আয়াত)–এ জন্যই সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখাকে উম্মাতে মুসলিমার দায়িত্ব ও কর্তব্য গণ্য করা হয়েছে। (আলে ইমরান ১০৪) সেই উম্মাতকে সর্বোত্তম উম্মাত বলা হয়েছে, যারা এই দায়িত্ব পালন করে। (আলে ইমরান ১১০)

হকের নসিহত করার সাথে সাথে দ্বিতীয় যে জিনিসটিকে ঈমানদারগণকে ও তাদের সমাজকে ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য অপরিহার্য শর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, এই সমাজের ব্যক্তিবর্গ পরস্পরকে সবর করার উপদেশ দিতে থাকবে। অর্থাৎ হককে সমর্থন করতে ও তার অনুসারী হতে গিয়ে যেসব সমস্যা ও বাধা–বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় এবং এপথে যেসব কষ্ট, পরিশ্রম, বিপদ–আপদ, ক্ষতি ও বঞ্চনা মানুষকে নিরন্তর পীড়িত করে তার মোকাবেলায় তারা পরস্পরকে অবিচল ও দৃঢ়পদ থাকার উপদেশ দিতে থাকবে। সবরের সাথে এসব কিছু বরদাশ্‌ত করার জন্য তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যকে সাহস যোগাতে থাকবে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আদ্ দাহর ১৬ টীকা এবং আল বালাদ ১৪ টীকা)।

আল হুমাযাহ

১০৪

নামকরণ

প্রথম আয়াতের হুমাযাহ (هُمَزَةٍ) শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরাটির মক্কী হবার ব্যাপারে সকল মুফাস্‌সির একমত পোষণ করেছেন। এর বক্তব্য বিষয় ও বর্ণনাভংগী বিশ্লেষণ করলে এটিও রসূলের নবুওয়াত পাওয়ার পর মক্কায় প্রথমদিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত বলে মনে হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এই সূরায় এমন কিছু নৈতিক অসৎবৃত্তির নিন্দা করা হয়েছে যেগুলো জাহেলী সমাজে অর্থলোলুপ ধনীদের মধ্যে পাওয়া যেতো। প্রত্যেক আরববাসী জানতো, এই অসৎ-প্রবণতাগুলো যথার্থই তাদের সমাজে সক্রিয় রয়েছে। সবাই এগুলোকে খারাপ মনে করতো। একজনও এগুলোকে সৎগুণ মনে করতো না এবং প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখতো না। এই জঘন্য প্রবণতাগুলো পেশ করার পর আখেরাতে এই ধরনের চরিত্রের অধিকারী লোকদের পরিণাম কি হবে তা বলা হয়েছে। এই দু'টি বিষয় (অর্থাৎ একদিকে এই চরিত্র এবং অন্যদিকে আখেরাতে তার এই পরিণাম) এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যার ফলে শ্রোতা নিজে নিজেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেন যে, এই ধরনের কাজের ও চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির পরিণাম এটিই হয়ে থাকে। আর যেহেতু দুনিয়ায় এই ধরনের চরিত্রের লোকেরা কোন শাস্তি পায় না বরং উলটো তাদের আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে দেখা যায়, তাই আখেরাত অনিবার্যভাবে অনুষ্ঠিত হবেই।

সূরা যিলযাল থেকে এ পর্যন্ত যতগুলো সূরা চলে এসেছে এই সূরাটিকে সেই ধারাবাহিকতায় রেখে বিচার করলে মক্কা মু'আয্‌যমার প্রথম যুগে ইসলামী আকীদা– বিশ্বাস ও তার নৈতিক শিক্ষাবলী মানুষের হৃদয়পটে অংকিত করার জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল তা মানুষ খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারে। সূরা যিলযালে বলা হয়েছে, আখেরাতে মানুষের সমগ্র আমলনামা তার সামনে রেখে দেয়া হবে। সে দুনিয়ায় যে সামান্য বালুকণা পরিমাণ নেকী বা গোনাহ করেছিল তা সেখানে তার সামনে আসবে না এমনটি হবে না। সূরা আদিয়াত–এ আরবের চতুর্দিকে যেসব লুটতরাজ, হানাহানি, খুনাখুনি ও দস্যুতা জারী ছিল সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। তারপর আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিগুলোর এহেন অপব্যবহার তাঁর প্রতি বিরাট অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়, এ

অনুভূতি জাগ্রত করার পর লোকদেরকে বলা হয়েছে, এ ব্যাপারটি এই দুনিয়াতেই শেষ হয়ে যাবে না বরং মৃত্যুর পর আর একটি জীবন শুরু হচ্ছে, সেখানে কেবল তোমাদের সমস্ত কাজেরই নয় বরং নিয়তও যাচাই বা পর্যালোচনা করা হবে। আর কোন ব্যক্তি কোন ধরনের ব্যবহার লাভের যোগ্য তা তোমাদের রব খুব ভালোভাবেই জানে। সূরা আল কারিয়াহতে কিয়ামতের নকশা পেশ করার পর লোকদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, মানুষের নেকীর পাল্লা ভারী না গোনাহর পাল্লা ভারী হচ্ছে এরি ওপর নির্ভর করবে আখেরাতে তার ভালো বা মন্দ পরিণাম। যে বস্তুবাদী মানসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে মানুষ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দুনিয়ার লাভ, স্বার্থ, আয়েশ-আরাম, ভোগ ও মর্যাদা বেশী বেশী করে অর্জন করার ও পরস্পর থেকে অগ্রবর্তী হবার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে সূরা তাকাসুরে তার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। তারপর এই গাফলতির অশুভ পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করে বলা হয়েছে—এ দুনিয়া কোন লুটের মাল নয় যে, তার ওপর তোমরা ইচ্ছামতো হাত সাফাই করতে থাকবে। বরং এখানে তুমি এর যেসব নিয়ামত পাচ্ছো তার প্রত্যেকটি কিভাবে অর্জন করেছো এবং কিভাবে ব্যবহার করেছো তার জন্য তোমার রবের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সূরা আসর-এ একেবারে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে, যদি মানবজাতির ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ঈমান ও সৎকাজ না থাকে এবং তার সমাজ ব্যবস্থায় হক পথ অবলম্বন ও সবর করার উপদেশ দেবার রীতি ব্যাপকতা লাভ না করে, তাহলে তার প্রত্যেক ব্যক্তি, দেশ, জাতি এমনকি সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ক্ষতির মধ্যে অবস্থান করবে। এর পরপরই আসছে সূরা 'আল হুমাযাহ।' এখানে জাহেলী যুগের নেতৃত্বের একটি নমুনা পেশ করে লোকদের সামনে যেন এ প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, এই ধরনের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের অধিকারী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না কেন?

আয়াত ৯ | সূরা আল হুমাযাহ-মক্কী | রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝١ الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝٢
يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۝٣ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝٤
وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝٥ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝٦ الَّتِيْ تَطَّلِعُ
عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۝٧ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝٨ فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝٩

ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে (সামনা সামনি) লোকদের ধিক্কার দেয় এবং (পেছনে) নিন্দা করতে অভ্যস্ত।[১] যে অর্থ জমায় এবং তা গুণে গুণে রাখে।[২] সে মনে করে তার অর্থ-সম্পদ চিরকাল তার কাছে থাকবে।[৩] কখনো নয়, তাকে তো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী জায়গায়[৪] ফেলে দেয়া হবে।[৫] আর তুমি কি জানো সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী জায়গাটি কি? আল্লাহর আগুন,[৬] প্রচণ্ডভাবে উৎক্ষিপ্ত, যা হৃদয় অভ্যন্তরে পৌঁছে যাবে।[৭] তা তাদের ওপর ঢেকে দিয়ে বন্ধ করা হবে[৮] (এমন অবস্থায় যে তা) উঁচু উঁচু থামে (ঘেরাও হয়ে থাকবে)।[৯]

১. এখানে মূল শব্দ হচ্ছে هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ । আরবী ভাষায় এই শব্দ দু'টি অর্থের দিক দিয়ে অনেক বেশী কাছাকাছি অবস্থান করছে। এমন কি কখনো শব্দ দু'টি সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার কখনো দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য হয়। কিন্তু সে পার্থক্যটা এমন পর্যায়ের যার ফলে একদল লোক "হুমাযাহ'র যে অর্থ করে, অন্য একদল লোক "লুমাযা"রও সেই একই অর্থ করে। আবার এর বিপরীত পক্ষে কিছু লোক "লুমাযাহ"র যে অর্থ বর্ণনা করে, অন্য কিছু লোকের কাছে "হুমাযাহ"র ও অর্থ তাই। এখানে যেহেতু দু'টি শব্দ এক সাথে এসেছে এবং "হুমাযাহ" ও "লুমাযাহ" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাই উভয় মিলে এখানে যে অর্থ দাঁড়ায় তা হচ্ছে ঃ সে কাউকে লাঞ্ছিত ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। কারোর প্রতি তাচ্ছিল্য ভরে অংগুলি নির্দেশ করে। চোখের ইশারায় কাউকে ব্যঙ্গ করে কারো বংশের নিন্দা করে। কারো ব্যক্তি সত্তার বিরূপ সমালোচনা করে। কারো মুখের ওপর তার বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করে। কারো পেছনে তার দোষ বলে বেড়ায়। কোথাও চোখলখুরী করে এবং এর কথা ওর কানে লাগিয়ে বন্ধুদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে

দেয়। কোথাও ভাইদের পারস্পরিক ঐক্যে ফাটল ধরায়। কোথাও লোকদের নাম বিকৃত করে খারাপ নামে অভিহিত করে। কোথাও কথার খোঁচায় কাউকে আহত করে এবং কাউকে দোষারোপ করে। এসব তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

২. প্রথম বাক্যটির পর এই দ্বিতীয় বাক্যটির থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে এ অর্থই প্রকাশিত হয় যে, নিজের অগাধ ধনদৌলতের অহংকারে সে মানুষকে এভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে। অর্থ জমা করার জন্য جَمَعَ مَالًا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে অর্থ প্রাচুর্য বুঝা যায়। তারপর 'গুণে গুণে রাখা' থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কার্পণ্য ও অর্থ লালসার ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

৩. এর আর একটি অর্থ হতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, সে মনে করে তার অর্থ-সম্পদ তাকে চিরন্তন জীবন দান করবে। অর্থাৎ অর্থ জমা করার এবং তা গুণে রেখে দেবার কাজে সে এত বেশী মশগুল যে নিজের মৃত্যুর কথা তার মনে নেই। তার মনে কখনো এ চিন্তার উদয় হয় না যে, এক সময় তাকে এসব কিছু ছেড়ে দিয়ে খালি হাতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে।

৪. মূলে হুতামা (حُطَمَة) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মূল হাত্‌ম (حَطْم) । হাত্‌ম মানে ভেঙ্গে ফেলা, পিষে ফেলা ও টুকরা টুকরা করে ফেলা। জাহান্নামকে হাত্‌ম নামে অভিহিত করার কারণ হচ্ছে এই যে, তার মধ্যে যা কিছু ফেলে দেয়া হবে তাকে সে নিজের গভীরতা ও আগুনের কারণে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে রেখে দেবে।

৫. আসলে বলা হয়েছে لَيُنْبَذَنَّ । আরবী ভাষায় কোন জিনিসকে তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া অর্থে نَبذ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এ থেকে আপনা আপনি এই ইংগিত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নিজের ধনশালী হওয়ার কারণে সে দুনিয়ায় নিজেকে অনেক বড় কিছু মনে করে। কিন্তু কিয়ামতের দিন তাকে ঘৃণাভরে জাহান্নামে ছুঁড়ে দেয়া হবে।

৬. কুরআন মজীদের একমাত্র এখানে ছাড়া আর কোথাও জাহান্নামের আগুনকে আল্লাহর আগুন বলা হয়নি। এখানে এই আগুনকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করার মাধ্যমে কেবলমাত্র এর প্রচণ্ডতা ও ভয়াবহতারই প্রকাশ হচ্ছে না। বরং এই সংগে এও জানা যাচ্ছে যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদ লাভ করে যারা অহংকার ও আত্মম্ভরিতায় মেতে ওঠে তাদেরকে আল্লাহ কেমন প্রচণ্ড ঘৃণা ও ক্রোধের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। এ কারণেই তিনি জাহান্নামের এই আগুনকে নিজের বিশেষ আগুন বলেছেন এবং এই আগুনেই তাকে নিক্ষেপ করা হবে।

৭. আসল বাক্যটি হচ্ছে, تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ 'এখানে তাত্তালিউ' (تَطَّلِعُ) শব্দটির মূলে হচ্ছে 'ইত্তিলা' (اطلاع) 'ইত্তিলা' এর একটি অর্থ হচ্ছে চড়া, আরোহণ করা ও ওপরে পৌঁছে যাওয়া। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, অবগত হওয়া ও খবর পাওয়া। আফ্‌ইদাহ্ (اَفْئِدَة) হচ্ছে বহুবচন। এর একবচন ফুওয়াদ (فواد) এর মানে হৃদয়। কিন্তু বুকের মধ্যে যে হৃদপিণ্ডটি সবসময় ধুক ধুক করে তার জন্যও ফুওয়াদ শব্দটি ব্যবহার করা হয় না। বরং মানুষের চেতনা, জ্ঞান, আবেগ, আকাংক্ষা, চিন্তা, বিশ্বাস, সংকল্প ও নিয়তের কেন্দ্রস্থলকেই এই শব্দটি দিয়ে প্রকাশ করা হয়। হৃদয় পর্যন্ত এই আগুন পৌঁছবার একটি

অর্থ হচ্ছে এই যে, এই আগুন এমন জায়গায় পৌঁছে যাবে যেখানে মানুষের অসৎচিন্তা, ভুল আকীদা–বিশ্বাস, অপবিত্র ইচ্ছা, বাসনা, প্রবৃত্তি, আবেগ এবং দুষ্ট সংকল্প ও নিয়তের কেন্দ্র। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর এই আগুন দুনিয়ার আগুনের মতো অন্ধ হবে না। সে দোষী ও নির্দোষ সবাইকে জ্বালিয়ে দেবে না। বরং প্রত্যেক অপরাধীর হৃদয় অভ্যন্তরে পৌঁছে সে তার অপরাধের প্রকৃতি নির্ধারণ করবে এবং প্রত্যেককে তার দোষ ও অপরাধ অনুযায়ী আযাব দেবে।

৮. অর্থাৎ অপরাধীদেরকে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করে ওপর থেকে তা বন্ধ করে দেয়া হবে। কোন দরজা তো দূরের কথা তার কোন একটি ছিদ্রও খোলা থাকবে না।

৯. ফি আমাদিম মুমাদ্দাদাহ (فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ) এর একাধিক মানে হতে পারে। যেমন এর একটি মানে হচ্ছে, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে তার ওপর উঁচু উঁচু থাম গেঁড়ে দেয়া হবে। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এই অপরাধীরা উঁচু উঁচু থামের গায়ে বাঁধা থাকবে। এর তৃতীয় অর্থ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, এই আগুনের শিখাগুলো লম্বা লম্বা থামের আকারে ওপরের দিকে উঠতে থাকবে।

আল ফীল

১০৫

নামকরণ

প্রথম আয়াতের আসহাবিল ফীল (اَصْحٰبِ الْفِيْلِ) শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরাটির মক্কী হবার ব্যাপারে সবাই একমত। এর ঐতিহাসিক পটভূমি সামনে রাখলে মক্কা মু'আযযমায় ইসলামের প্রথম যুগে এটি নাযিল হয় বলে মনে হবে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এর আগে সূরা বুরুজের ৪ টীকায় উল্লেখ করে এসেছি, ইয়ামনের ইহুদী শাসক যুনুওয়াস নাজরানে ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের ওপর যে জুলুম করেছিল তার প্রতিশোধ নেবার জন্য হাবশার (বর্তমান ইথিয়পিয়া) খৃষ্টীয় শাসনকর্তা ইয়ামন আক্রমণ করে হিম্‌ইয়ারী শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল। ৫২৫ খৃষ্টাব্দে এই সমগ্র এলাকাটিতে হাবশার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আসলে কনস্টান্টিনোপলের রোমীয় শাসনকর্তা ও হাবশার শাসকের পারস্পরিক সহযোগিতায় এই সমগ্র অভিযান পর্বটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কারণ সে সময় হাবশার শাসকদের কাছে কোন উল্লেখযোগ্য নৌবহর ছিল না। রোমীয়রা এ নৌবহর সরবরাহ করে। এর মাধ্যমে হাবশা তার ৭০ হাজার সৈন্য ইয়ামন উপকূলে নামিয়ে দেয়। পরবর্তী বিষয়গুলো অনুধাবন করার জন্য শুরুতেই জেনে নেয়া উচিত যে, নিছক ধর্মীয় আবেগ তাড়িত হয়ে এসব কিছু করা হয়নি। বরং এসবের পেছনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থও সক্রিয় ছিল। বরং সম্ভবত সেগুলোই এর মূলে আসল প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল এবং খৃষ্টান মজলুমদের খুনের বদলা নেবার ব্যাপারটি একটি বাহানাবাজী ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আসলে সেকালে পূর্ব আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ ও রোম অধিকৃত এলাকার মধ্যে যে ব্যবসা চলতো তার ওপর আরবরা শত শত বছর থেকে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে চলে আসছিল। রোমান শাসকরা মিসর ও সিরিয়া দখল করার পর থেকেই এই ব্যবসার ওপর থেকে আরবদের আধিপত্য বিলুপ্ত করে একে পুরোপুরি নিজেদের কর্তৃত্বাধীন করতে চাইছিল। কেননা মাঝখান থেকে আরব ব্যবসায়ীদেরকে হটিয়ে দিতে পারলে এর পুরো মুনাফা তারা সরাসরি নিজেরা লাভ করতে পারবে। এই উদ্দেশ্যে খৃষ্টপূর্ব ২৪ বা ২৫ অব্দে কাইজার আগাষ্টাস রোমান জেনারেল ইলিয়াস গালুসের (Aelius Gallus) নেতৃত্বে একটি বিরাট সেনাদল আরবের পশ্চিম

উপকূলে নামিয়ে দেয়। দক্ষিণ আরব থেকে সিরিয়া পর্যন্ত সমুদ্রপথ অধিকার করে নেয়াই ছিল এর লক্ষ। (তাফহীমুল কুরআনের সূরা আনফালের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি এ বাণিজ্য পথের নকশা পেশ করেছি।) কিন্তু আরবের চরম প্রতিকূল ভৌগলিক অবস্থা ও পরিবেশ এ অভিযানকে ব্যর্থ করে দেয়। এরপর রোমানরা লোহিত সাগরে তাদের নৌবহর স্থাপন করে। এর ফলে সমুদ্র পথে আরবদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। তাদের ব্যবসার জন্য কেবলমাত্র স্থলপথ উন্মুক্ত থেকে যায়। এই স্থলপথটি দখল করে নেবার জন্য তারা হাবশার খৃষ্টান সরকারের সাথে চক্রান্ত করে এবং সামুদ্রিক নৌবহরের সহায়তায় তাকে ইয়ামনের ওপর কর্তৃত্ব দান করে।

ইয়ামন আক্রমণকারী হাবশী সেনাদল সম্পর্কে আরব ঐতিহাসিকগণ যে বিবরণ পেশ করেছেন তাতে বেশ মতপার্থক্য দেখা যায়। ঐতিহাসিক হাফেজ ইবনে কাসীর লিখেছেন, এ সেনাদল পরিচালিত হয়েছিল দু'জন সেনাপতির অধীনে। তাদের একজন ছিল আরইয়াত এবং অন্যজন আবরাহা। অন্যদিকে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে আরইয়াত ছিল এই সেনাবাহিনীর সেনাপতি এবং আবরাহা ছিল এর একজন সদস্য। এরপর এ দু'জন ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, পরে আরইয়াত ও আবরাহার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। যুদ্ধে আরইয়াতের মৃত্যু হয়। আবরাহা ইয়ামন দখল করে। তারপর তাকে হাবশার অধীনে ইয়ামনের গভর্ণর নিযুক্ত করার ব্যাপারে সে হাবশা সম্রাটকে সম্মত করতে সক্ষম হয়। বিপরীত পক্ষে গ্রীক ও সুরিয়ানী ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে ভিন্ন বিবরণ পেশ করেছেন। তাদের বর্ণনা মতে, ইয়ামন জয় করার পরে হাবশী সৈন্যরা যখন প্রতিরোধ সৃষ্টিকারী ইয়ামনী সরদারদেরকে একের পর এক হত্যা করে চলছিল তখন তাদের "আস্ সুমাইফি আশ্ওয়া" যাকে গ্রীক ঐতিহাসিকরা বলেছেন Esymphaeus নামক একজন সরদার হাবশীদের আনুগত্য স্বীকার করে জিজিয়া দেবার অংগীকার করে এবং হাবশা সম্রাটের কাছ থেকে ইয়ামনের গভর্ণর হবার পরোয়ানা হাসিল করে কিন্তু হাবশী সৈন্যরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। তারা আবরাহাকে তার জায়গায় গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত করে। আবরাহা ছিল হাবশার আদুলিস বন্দরের একজন গ্রীক ব্যবসায়ীর ক্রীতদাস। নিজের বুদ্ধিমত্তার জোরে সে ইয়ামন দখলকারী হাবশী সেনাদলে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। হাবশা সম্রাট তাকে দমন করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠায়। কিন্তু এই সেনাদল হয় তার পক্ষে যোগ দেয় অথবা সে এই সেনাদলকে পরাজিত করে। অবশেষে হাবশা সম্রাটের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী তাকে ইয়ামনে নিজের গভর্ণর হিসেবে স্বীকার করে নেয়। (গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তার নাম বলেছেন আবরামিস (Abrames) এবং সুরিয়ানী ঐতিহাসিকগণ তাকে আবরাহাম (Abraham) নামে উল্লেখ করেছেন। আবরাহা সম্ভবত এরই হাবশী উচ্চারণ। কারণ আরবীতে তো এর উচ্চারণ ইবরাহীম।)

এ ব্যক্তি ধীরে ইয়ামনের স্বাধীন বাদশাহ হয়ে বসে। তবে নামকাওয়াস্তে হাবশা সম্রাটের প্রাধান্যের স্বীকৃতি দিয়ে রেখেছিল এবং নিজের নামের সাথে সম্রাট প্রতিনিধি লিখতো। তার প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক বেশী বেড়ে গিয়েছিল। একটি ব্যাপার থেকে এ সম্পর্কে অনুমান করা যেতে পারে। ৫৪৩ খৃষ্টাব্দে সদ্দে মাআরিব–এর সংস্কার কাজ শেষ করে সে একটি বিরাট উৎসবের আয়োজন করে। এই উৎসবে রোমের কাইজার,

ইরানের বাদশাহ, হীরার বাদশাহ এবং গাস্‌সানের বাদশাহর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। সন্দে মাআরিবে আবরাহা স্থাপিত শিলালিপিতে এ সম্পর্কিত পূর্ণ আলোচনা সংরক্ষিত রয়েছে। এই শিলালিপি আজো অক্ষুণ্ন রয়েছে। গ্লীসার (Glaser) তার গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাবা ৩৭ টীকা)।

এই অভিযান শুরুর গোড়াতেই রোমান সাম্রাজ্য ও তার মিত্র হাবশী খৃষ্টানদের সামনে যে উদ্দেশ্য বর্তমান ছিল ইয়ামনে নিজের কর্তৃত্ব পুরোপুরি মজবুত করার পর আবরাহা সেই উদ্দেশ্য সফল করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। এর উদ্দেশ্য ছিল, একদিকে আরবে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করা এবং অন্যদিকে আরবদের মাধ্যমে রোম সাম্রাজ্য ও প্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে যে ব্যবসা চলতো তাকে পুরোপুরি নিজেদের দখলে নিয়ে আসা। ইরানের সাসানী সাম্রাজ্যের সাথে রোমানদের কর্তৃত্বের দ্বন্দ্বের ফলে প্রাচ্য দেশে রোমানদের ব্যবসার অন্যান্য সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণে এর প্রয়োজন আরো বেশী বেড়ে যায়।

এ উদ্দেশ্যে আবরাহা ইয়ামনের রাজধানী 'সান্‌আ'য় একটি বিশাল গীর্জা নির্মাণ করে। আরব ঐতিহাসিকগণ একে 'আল কালীস' বা 'আল কুলীস' অথবা 'আল কুল্লাইস' নামে উল্লেখ করেছেন। এটি গ্রীক Ekklesia শব্দের আরবীকরণ। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে, একাজটি সম্পন্ন করার পর সে হাবশার বাদশাহকে লিখে জানায়, আমি আরবদের হজ্জকে মক্কার কা'বার পরিবর্তে সানআর এ গীর্জার দিকে ফিরিয়ে না দিয়ে ক্ষান্ত হবো না।* ইবনে কাসীর লিখেছেন, সে ইয়ামনে প্রকাশ্যে নিজের এই সংকল্পের কথা প্রকাশ করে এবং চতুর্দিকে ঘোষণা করে দেয়। আমাদের মতে তার এ ধরনের কার্যকলাপের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এর ফলে আরবরা ক্রুদ্ধ হয়ে এমন কোন কাজ করে বসবে যাকে বাহানা বানিয়ে সে মক্কা আক্রমণ করে কাবাঘর ধ্বংস করে দেবার সুযোগ লাভ করবে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, তার এ ধরনের ঘোষণায় ক্রুদ্ধ হয়ে জনৈক আরব কোন প্রকারে তার গীর্জার মধ্যে প্রবেশ করে সেখানে মল ত্যাগ করে। ইবনে কাসীর বলেন, এ কাজটি করেছিল একজন কুরাইশী। অন্যদিকে মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের বর্ণনা মতে, কয়েকজন কুরাইশ যুবক গিয়ে সেই গীর্জায় আগুন লাগিয়ে দেয়। এর মধ্য থেকে যে কোন একটি ঘটনাই যদি সত্যি সত্যিই ঘটে থাকে তাহলে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ আবরাহার এ ঘোষণাটি ছিল নিশ্চিতভাবে অত্যন্ত উত্তেজনা সৃষ্টিকারী। এ কারণে প্রাচীন জাহেলী যুগের কোন আরব বা কুরাইশীর অথবা কয়েকজন কুরাইশী যুবকের পক্ষে উত্তেজিত হয়ে গীর্জাকে নাপাক করা অথবা তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়া কোন অস্বাভাবিক বা দুর্বোধ্য ব্যাপার ছিল না। কিন্তু আবরাহার নিজের পক্ষেও নিজের কোন লোক লাগিয়ে গোপনে গোপনে এই ধরনের কোন কাণ্ড করে ফেলাটাও অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয় না। কারণ সে এভাবে মক্কা আক্রমণ করার বাহানা সৃষ্টি

* ইয়ামনের ওপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করার পর খৃষ্টানরা মক্কার কা'বাঘরের মোকাবিলায় দ্বিতীয় একটি কা'বা তৈরি করার এবং সমগ্র আরবে তাকে কেন্দ্রীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার জন্য অনবরত প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল। এ উদ্দেশ্যে তারা নাজরানেও একটি কা'বা নির্মাণ করেছিল। সূরা বুরুজের ৪ টীকায় এর আলোচনা এসেছে।

করতে এবং কুরাইশদেরকে ধ্বংস ও সমগ্র আরববাসীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিয়ে নিজের উভয় উদ্দেশ্যে সফলকাম হতে পারবে বলে মনে করছিল। মোটকথা দু'টি অবস্থার মধ্য থেকে যেকোন একটিই সঠিক হোক না কেন, আবরাহার কাছে যখন এ রিপোর্ট পৌছল যে, কাবার ভক্ত অনুরক্তরা তার গীর্জার অবমাননা করেছে তখন সে কসম খেয়ে বসে, কা'বাকে গুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে না দেয়া পর্যন্ত আমি স্থির হয়ে বসবো না।

তারপর ৫৭০ বা ৫৭১ খৃষ্টাব্দে সে ৬০ হাজার পদাতিক, ১৩টি হাতি (অন্য বর্ণনা মতে ৯টি হাতি) সহকারে মক্কার পথে রওয়ানা হয়। পথে প্রথমে যু-নফর নামক ইয়ামনের একজন সরদার আরবদের একটি সেনাদল সংগ্রহ করে তাকে বাধা দেয়। কিন্তু যুদ্ধে সে পরাজিত ও ধৃত হয়। তারপর খাশ'আম এলাকায় নুফাইল ইবনে হাবীব খাশ'আমী তার গোত্রের লোকদের নিয়ে তার পথ রোধ করে। কিন্তু সেও পরাজিত ও গ্রেফতার হয়ে যায়। সে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য আবরাহার সেনাদলের পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ সেনাদল তায়েফের নিকটবর্তী হলে বনু সকীফ অনুভব করে এত বড় শক্তির মোকাবিলা করার ক্ষমতা তাদের নেই এবং এই সংগে তারা এ আশংকাও করতে থাকে যে, হয়তো তাদের লাত দেবতার মন্দিরও তারা ভেঙ্গে ফেলবে। ফলে তাদের সরদার মাসউদ একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে আবরাহার সাথে সাক্ষাত করে। তারা তাকে বলে, আপনি যে উপাসনালয়টি ভাঙতে এসেছেন আমাদের এ মন্দিরটি সে উপাসনালয় নয়। সেটি মক্কায় অবস্থিত। কাজেই আপনি আমাদেরটায় হাত দেবেন না। আমরা মক্কার পথ দেখাবার জন্য আপনাকে পথপ্রদর্শক সংগ্রহ করে দিচ্ছি। আবরাহা তাদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করে। ফলে বনু সাকীফ আবু রিগাল নামক এক ব্যক্তিকে তার সাথে দিয়ে দেয়। মক্কা পৌছুতে যখন আর মাত্র তিন ক্রোশ পথ বাকি তখন আল মাগাম্মাস বা আল মুগাম্মিস নামক স্থানে পৌছে আবু রিগাল মারা যায়। আরবরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত তার কবরে পাথর মেরে এসেছে। বনী সাকীফকেও তারা বছরের পর বছর ধরে এই বলে ধিক্কার দিয়ে এসেছে। —তোমরা লাতের মন্দির বাঁচাতে গিয়ে আল্লাহর ঘরের ওপর আক্রমণকারীদের সাথে সহযোগিতা করেছো।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে, আল মাগাম্মেস থেকে আবরাহা তার অগ্রবাহিনীকে সামনের দিকে এগিয়ে দেয়। তারা তিহামার অধিবাসীদের ও কুরাইশদের উট, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি বহু পালিত পশু লুট করে নিয়ে যায়। এর মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাদা আবদুল মুত্তালিবেরও দু'শো উট ছিল। এরপর সে মক্কাবাসীদের কাছে নিজের একজন দূতকে পাঠায়। তার মাধ্যমে মক্কাবাসীদের কাছে এই মর্মে বাণী পাঠায় ঃ আমি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি। আমি এসেছি শুধুমাত্র এই ঘরটি (কাবা) ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে। যদি তোমরা যুদ্ধ না করো তাহলে তোমাদের প্রাণ ও ধন-সম্পত্তির কোন ক্ষতি আমি করবো না। তাছাড়া তার এক দূতকেও মক্কাবাসীদের কাছে পাঠায়। মক্কাবাসীরা যদি তার সাথে কথা বলতে চায় তাহলে তাদের সরদারকে তার কাছে নিয়ে আসার নির্দেশ দেয়। আবদুল মুত্তালিব তখন ছিলেন মক্কার সবচেয়ে বড় সরদার। দূত তাঁর সাথে সাক্ষাত করে আবরাহার পয়গাম তাঁর কাছে পৌছিয়ে দেয়। তিনি বলেন, আবরাহার সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। এটা আল্লাহর ঘর তিনি চাইলে তাঁর ঘর রক্ষা করবেন। দূত বলে, আপনি আমার সাথে

আবরাহার কাছে চলুন। তিনি সম্মত হন এবং দূতের সাথে আবরাহার কাছে যান। তিনি এতই সুশ্রী, আকর্ষণীয় ও প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, আবরাহা তাকে দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে পড়ে। সে সিংহাসন থেকে নেমে এসে নিজে তাঁর কাছে বসে পড়ে। সে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি চান? তিনি বলেন, আমার যে উটগুলো ধরে নেয়া হয়েছে সেগুলো আমাকে ফেরত দেয়া হোক। আবরাহা বলল, আপনাকে দেখে তো আমি বড়ই প্রভাবিত হয়েছিলাম। কিন্তু আপনি নিজের উটের দাবী জানাচ্ছেন, অথচ এই যে ঘরটা আপনার ও আপনার পূর্বপুরুষদের ধর্মের কেন্দ্র সে সম্পর্কে কিছুই বলছেন না, আপনার এ বক্তব্য আপনাকে আমার দৃষ্টিতে মর্যাদাহীন করে দিয়েছে। তিনি বলেন, আমি তো কেবল আমার উটের মালিক এবং সেগুলোর জন্য আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আর এই ঘর। এর একজন রব, মালিক ও প্রভু আছেন। তিনি নিজেই এর হেফাজত করবেন। আবরাহা জবাব দেয়, তিনি একে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আবদুল মুত্তাবিল বলেন, এ ব্যাপারে আপনি জানেন ও তিনি জানেন। একথা বলে তিনি সেখান থেকে উঠে পড়েন। আবরাহা তাঁকে তাঁর উটগুলো ফিরিয়ে দেয়।

ইবনে আব্বাস (রা) ভিন্ন ধরনের বর্ণনা পেশ করেছেন। তাঁর বর্ণনায় উট দাবীর কোন কথা নেই। আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া, হাকেম, আবু নু'আইম ও বাইহাকী তাঁর থেকে যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি বলেন, আবরাহা আসসিফাই (আরাফাত ও তায়েফের পাহাড়গুলোর মধ্যে হারম শরীফের সীমানার কাছাকাছি একটি স্থান) পৌঁছে গেলে আবদুল মুত্তালিব নিজেই তার কাছে যান এবং তাকে বলেন, আপনার এখানে আসার কি প্রয়োজন ছিল? আপনার কোন জিনিসের প্রয়োজন থাকলে আমাদের কাছে বলে পাঠাতেন। আমরা নিজেরাই সে জিনিস নিয়ে আপনার কাছে পৌঁছে যেতাম। জবাবে সে বলে, আমি শুনেছি, এটি শান্তি ও নিরাপত্তার ঘর। আমি এর শান্তি ও নিরাপত্তা খতম করতে এসেছি। আবদুল মুত্তালিব বলেন, এটি আল্লাহর ঘর। আজ পর্যন্ত তিনি কাউকে এর ওপর চেপে বসতে দেননি। আবরাহা জবাব দেয়, আমি একে বিধ্বস্ত না করে এখান থেকে সরে যাবো না। আবদুল মুত্তালিব বলেন, আপনি যা কিছু চান আমাদের কাছ থেকে নিয়ে চলে যান। কিন্তু আবরাহা অস্বীকার করে। আবদুল মুত্তালিবকে পেছনে রেখে নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে সে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

উভয় বর্ণনার এ বিভিন্নতাকে যদি আমরা যথাস্থানে রেখে দিই এবং এদের মধ্য থেকে একটিকে অন্যটির ওপর প্রাধান্য না দিই তাহলে যে ঘটনাটিই ঘটুক না কেন আমাদের কাছে একটি জিনিস অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সেটি হচ্ছে, মক্কা ও তার চারপাশের গোত্রগুলো এতবড় সেনাদলের সাথে যুদ্ধ করে কাবাকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখতো না। কাজেই একথা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, কুরাইশরা তাদেরকে বাধা দেবার চেষ্টাই করেনি। কুরাইশরা তো আহযাবের যুদ্ধের সময় মুশরিক ও ইহুদি গোত্রগুলোকে সাথে নিয়ে বড় জোর দশ বারো হাজার সৈন্য সংগ্রহ করতে পেরেছিল। কাজেই তারা ৬০ হাজার সৈন্যের মোকাবিলা করতো কিভাবে?

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, আবরাহার সেনাদলের কাছ থেকে ফিরে এসে আবদুল মুত্তালিব কুরাইশদেরকে বলেন, নিজেদের পরিবার পরিজনদের নিয়ে পাহাড়ের ওপর চলে যাও, এভাবে তারা ব্যাপক গণহত্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে। তারপর তিনি ও কুরাইশদের কয়েকজন সরদার হারম শরীফে হাযির হয়ে যান। তারা কাবার দরজার কড়া

ধরে আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করতে থাকেন যে, তিনি যেন তাঁর ঘর ও তাঁর খাদেমদের হেফাজত করেন। সে সময় কাবা ঘরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। কিন্তু এই সংকটকালে তারা সবাই এই মূর্তিগুলোর কথা ভুলে যায়। তারা একমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্য হাত ওঠায়। ইতিহাসের বইগুলোতে তাদের প্রার্থনা বাণী উদ্ধৃত হয়েছে তার মধ্যে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ইবনে হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে আবদুল মুত্তালিবের নিম্নোক্ত কবিতাসমূহ উদ্ধৃত করেছেন ঃ

لَا هُمَّ ان العبد يمنع رحله فامنع حلالك

"হে আল্লাহ! বান্দা নিজের ঘর রক্ষা করে
তুমিও তোমার ঘর রক্ষা করো।"

لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك

"আগামীকাল তাদের ক্রুশ ও তাদের কৌশল যেন
তোমার কৌশলের ওপর বিজয় লাভ না করে।"

ان كنت تاركهم وقبلتنا فامر مابدالك

"যদি তুমি ছেড়ে দিতে চাও তাদেরকে ও আমাদের কিবলাহকে
তাহলে তাই করো যা তুমি চাও।"

সুহাইলী 'রওযুল উনুফ' গ্রন্থে এ প্রসংগে নিম্নোক্ত কবিতাও উদ্ধৃত করেছেন ঃ

وانصرنا على ال الصليب وعابديه اليوم الك

"ক্রুশের পরিজন ও তার পূজারীদের মোকাবিলায়
আজ নিজের পরিজনদেরকে সাহায্য করো।"

আবদুল মুত্তালিব দোয়া করতে করতে যে, কবিতাটি পড়েছিলেন ইবনে জারীর সেটিও উদ্ধৃত করেছেন। সেটি হচ্ছে ঃ

يارب لا ارجو لهم سواكا يارب فامنع منهم حماكا

ان عدو البيت من عاداكا امنعهم ان يخربوا قراكا

"হে আমার রব! তাদের মোকাবিলায়
তুমি ছাড়া কারো প্রতি আমার আশা নেই,
হে আমার রব! তাদের হাত থেকে
তোমার হারমের হেফাজত করো।
এই ঘরের শত্রু তোমার শত্রু,
তোমার জনপদ ধ্বংস করা থেকে
তাদেরকে বিরত রাখো।"

এ দোয়া করার পর আবদুল মুত্তালিব ও তার সাথিরাও পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেন। পরের দিন আবরাহা মক্কায় প্রবেশ করার জন্য এগিয়ে যায়। কিন্তু তার বিশেষ হাতী মাহমুদ ছিল

সবার আগে, সে হঠাৎ বসে পড়ে। কুড়ালের বাঁট দিয়ে তার গায়ে অনেকক্ষণ আঘাত করা হয়। তারপর বারবার অংকুশাঘাত করতে করতে তাকে আহত করে ফেলা হয়। কিন্তু এত বেশী মারপিট ও নির্যাতনের পরেও সে একটুও নড়ে না। তাকে উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে মুখ করে চালাবার চেষ্টা করলে সে ছুটতে থাকে কিন্তু মক্কার দিকে মুখ ফিরিয়ে দিলে সংগে সংগেই গ্যাট হয়ে বসে পড়ে। কোন রকমে তাকে আর একটুও নড়ানো যায় না।

এ সময় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা ঠোঁটে ও পাঞ্জায় পাথর কণা নিয়ে উড়ে আসে। তারা এ সেনাদলের ওপর পাথর বর্ষণ করতে থাকে। যার ওপর পাথর কণা পড়তো তার দেহ সংগে সংগে গলে যেতে থাকতো। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ও ইকরামার বর্ণনা মতে, এটা ছিল বসন্ত রোগ এবং আরব দেশে সর্বপ্রথম এ বছরই বসন্ত দেখা যায়। ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনা মতে, যার ওপরই পাথর কণা পড়তো তার সারা গায়ে ভীষণ চুলকানি শুরু হতো এবং চুলকাতে চুলকাতে চামড়া ছিঁড়ে গোশত ঝরে পড়তে থাকতো। ইবনে আব্বাস (রা) আর একটি বর্ণনায় বলেছেন, গোশত ও রক্ত পানির মতো ঝরতে থাকতো এবং হাড় বের হয়ে পড়তো। আবরাহা নিজেও এই অবস্থার সম্মুখীন হয়। তার শরীর টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়তো এবং যেখান থেকে এক টুকরো গোশত খসে পড়তো সেখান থেকে রক্ত ও পুঁজ ঝরে পড়তে থাকতো। বিশৃংখলা ও হুড়োহুড়ি ছুটাছুটির মধ্যে তারা ইয়ামনের দিকে পালাতে শুরু করে। খাশ'আম এলাকা থেকে যে নুফাইল ইবনে হাবীব খাশ'আমীকে তারা পথপ্রদর্শক হিসেবে নিয়ে আসে তাকে খুঁজে পেয়ে সামনে নিয়ে আসা হয় এবং তাকে ফিরে যাবার পথ দেখিয়ে দিতে বলা হয়। কিন্তু সে সরাসরি অস্বীকার করে বসে। সে বলে ঃ

اين المفرو الاله الطالب والا شرم المغلوب ليس الغالب

"এখন পালাবার জায়গা কোথায়
যখন আল্লাহ নিজেই করছেন পশ্চাদ্ধাবন?
আর নাককাটা আবরাহা পরাজিত
সে বিজয়ী নয়।"

এই পলায়ন তৎপরতার মধ্যে লোকেরা পথে ঘাটে এখানে সেখানে পড়ে মরতে থাকে। আতা ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন তখনই এক সাথে সবাই মারা যায়নি। বরং কিছু লোক সেখানে মারা পড়ে আর দৌড়াতে দৌড়াতে কিছু লোক পথের ওপর পড়ে যেতে থাকে। এভাবে সারাটা পথে তাদের লাশ বিছিয়ে থাকে। আবরাহাও খাশ'আম এলাকায় পৌঁছে মারা যায়।*

* মহান আল্লাহ হাবশীদেরকে শুধুমাত্র শাস্তি দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি বরং তিন চার বছরের মধ্যে ইয়ামনের ওপর থেকে হাবশী কর্তৃত্ব পুরোপুরি খতম করে দেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, হাতির ঘটনার পর ইয়ামনে তাদের শক্তি সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ে। বিভিন্ন স্থানে ইয়ামনী সরদাররা বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়াতে থাকে। সাইফ ইবনে যী ইয়াযান নামক একজন ইয়ামনী সরদার ইরানের বাদশাহর কাছ থেকে সামরিক সাহায্য গ্রহণ করে। ছয়টি জাহাজে চড়ে ইরানের এক হাজার সৈন্য ইয়ামনে অবতরণ করে। হাবশী শাসনের অবসান ঘটাবার জন্য এ এক হাজার সৈন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হয়। এটা ৫৭৫ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

মুযদালিফা ও মিনার মধ্যে অবস্থিত মহাসাব উপত্যকার সন্নিকটে মুহাস্‌সির নামক স্থানে এ ঘটনাটি ঘটে। ইমাম মুসলিম ও আবু দাউদের বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায় হজ্জের যে ঘটনা ইমাম জাফর সাদেক তাঁর পিতা ইমাম বাকের থেকে এবং তিনি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তাতে তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে চলেন তখন মুহাস্‌সির উপত্যকায় তিনি চলার গতি দ্রুত করে দেন। ইমাম নববী এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আসহাবে ফীলের ঘটনা এখানেই অনুষ্ঠিত হয়। তাই এ জায়গাটা দ্রুত অতিক্রম করে যাওয়াটাই সুন্নাত। মুআত্তায় ইমাম মালিক রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুযদালিফার সমগ্র এলাকাটাই অবস্থান স্থল। তবে মুহাস্‌সির উপত্যকায় অবস্থান না করা উচিত। ইবনে ইসহাক নুফাইল ইবনে হাবীবের যেসব কবিতা উদ্ধৃত করেছেন তাতে এই ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণ এভাবে পেশ করা হয়েছে ঃ

رُدَيْنةُ لو أيتِ ولا تَريه لدَى جنب المحصَّب ماراَينا

حمدت اللّٰه اذَا ابصرت طيرًا وخفت حجارة تلقى علينا

وكل القوم يسئال عن نفيل كأَن على للجشان دَينا

"হায়, যদি তুমি দেখতে হে রুদাইনা।
তবে তুমি দেখতে পাবে না যা কিছু দেখেছি আমি
মুহাস্‌সাব উপত্যকার কাছে।
আল্লাহর শোকর করেছি আমি
যখন দেখেছি পাখিদেরকে
শংকিত হচ্ছিলাম বুঝিবা পাথর ফেলে আমাদের ওপরও।
নুফাইলের সন্ধানে ফিরছিল তাদের সবাই
আমি যেন হাবশীদের কাছে ঋণের দায়ে বাঁধা।"

এটা একটা মস্তবড় ঘটনা ছিল। সমগ্র আরবে এ ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়ে। অনেক কবি এ নিয়ে কবিতা লেখেন। এ সমস্ত কবিতার একক বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, সবখানেই একে আল্লাহর অলৌকিক ক্ষমতা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। কোন একটি কবিতাতেই ইশারা–ইংগিতেও একথা বলা হয়নি যে, কা'বার অভ্যন্তরে রক্ষিত যেসব মূর্তির পূজা করা হতো তাদের কারো এতে সামান্যতম হাত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ আবদুল্লাহ ইবনে যিবা'রা বলেন ঃ

ستّون الفالم يؤبوا ارضهم ولم يعش بعد الاياب سقيمها

كانت بها عادوجرهم قبلهم واللّٰه من فوق العباد يقيمها

"ষাট হাজার ছিল তারা
ফিরতে পারেনি নিজেদের স্বদেশ ভূমিতে,
আর ফেরার পরে তাদের রুগ্ন ব্যক্তি (আবরাহা) জীবিত থাকেনি।
এখানে তাদের পূর্বে ছিল আদ ও জুরহুম,
আর আল্লাহ বান্দাদের ওপর রয়েছেন,
তাদেরকে রেখেছেন তিনি প্রতিষ্ঠিত করে।"

আবু কায়েস ইবনে আস্‌লাত তার কবিতায় বলেন ঃ

فقوموا فصلوا ربكم وتمسّحوا بار كان هٰذا البيت بين الاخاشب

فلما اتاكم نصرذى العرشى ردّهم جنود الملیك بين ساف وحاصب

"ওঠো, তোমার রবের ইবাদাত করো,
এবং মক্কা ও মিনার পাহাড়গুলোর মাঝখানে
বাইতুল্লার কোণগুলো স্পর্শ করো।
আরশবাসীদের সাহায্য যখন পৌঁছুল তোমাদের কাছে
তখন সেই বাদশাহর সেনাবাহিনী
তাদেরকে ফিরিয়ে দিল এমন অবস্থায়–
তাদের কেউ পড়ে ছিল মৃত্তিকার পরে
আর কেউ ছিল প্রস্তরাঘাতে ছিন্নভিন্ন।"

শুধু এখানেই শেষ নয় বরং হযরত উম্মে হানী (রা) ও যুবাইর ইবনুল আওয়ামের (র) বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কুরাইশরা ১০ বছর (অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী ৭ বছর) পর্যন্ত এক ও লাশরীক আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করেনি। উম্মে হানীর রেওয়ায়াতটি ইমাম বুখারী তাঁর 'তারীখ' গ্রন্থে এবং তাবারানী, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী তাদের হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। আর তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া ও ইবনে আসাকির হযরত যুবাইরের (রা) বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। খতীব বাগদাদী তার ইতিহাস গ্রন্থে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের যে মুরসাল রেওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

যে বছর এ ঘটনাটি ঘটে, আরববাসীরা সে বছরটিকে 'আমুল ফীল' (হাতির বছর) বলে আখ্যায়িত করে। সেই বছরেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হয়। আসহাবে ফীলের ঘটনাটি ঘটে মহররম মাসে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হয় রবিউল আউয়াল মাসে। এ বিষয়ে সকল মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক একমত পোষণ করেন। অধিকাংশের মতে, রসূলের (সা) জন্ম হয় হাতির ঘটনার ৫০ দিন পরে।

মূল বক্তব্য

ওপরের যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সংযোজন করা হয়েছে সেগুলো সামনে রেখে চিন্তা করলে এ সূরায় কেন শুধুমাত্র আসহাবে ফীলের ওপর মহান আল্লাহর আযাবের কথা বর্ণনা করেই শেষ করে দেয়া হয়েছে তা ভালোভাবেই উপলব্ধি করা যায়। ঘটনা খুব বেশী পুরানো ছিল না। মক্কার সবাই এ ঘটনা জানতো। আরবের লোকেরা সাধারণভাবে এ সম্পর্কে অবহিত ছিল। সমগ্র আরববাসী স্বীকার করতো আবরাহার এ আক্রমণ থেকে কোন দেবতা বা দেবী নয় বরং আল্লাহ কা'বার হেফাজত করেছেন। কুরাইশ সরদাররা আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য দোয়া করেছিল। আবার এ ঘটনা কুরাইশদেরকে কয়েক বছর পর্যন্ত এত বেশী প্রভাবিত করে রেখেছিল যে, তারা সে সময় একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ইবাদাত করেনি। তাই সূরা ফীলে এসব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। বরং শুধুমাত্র এ ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দেয়াই যথেষ্ট ছিল। এভাবে স্মরণ করিয়ে দেবার ফলে বিশেষ করে কুরাইশরা এবং সাধারণভাবে সমগ্র আরববাসী মনে মনে এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করতে পারে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিষয়ের দিকে আহবান জানাচ্ছেন সেটি অন্যান্য মাবুদদেরকে ত্যাগ করে একমাত্র লাশরীক আল্লাহর ইবাদাত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া তারা একথাটিও ভেবে দেখার সুযোগ পাবে যে, এ হকের দাওয়াত যদি তারা বল প্রয়োগ করে দমন করতে চায় তাহলে যে আল্লাহ আসহাবে ফীলকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলেন তারা তাঁরই ক্রোধের শিকার হবে।

আয়াত ৫ **সূরা আল ফীল-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝١ اَلَمْ يَجْعَلْ
كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝٢ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝٣
تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝٤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ
مَّاْكُوْلٍ ۝٥

তুমি কি দেখনি[১] তোমার রব হাতিওয়ালাদের সাথে কি করেছেন?[২] তিনি কি তাদের কৌশল[৩] ব্যর্থ করে দেননি?[৪] আর তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠান,[৫] যারা তাদের ওপর নিক্ষেপ করছিল পোড়া মাটির পাথর।[৬] তারপর তাদের অবস্থা করে দেন পশুর খাওয়া ভূষির মতো।[৭]

১. বাহ্যত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু মূলত এখানে শুধু কুরাইশদেরকেই নয় বরং সমগ্র আরববাসীকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তারা এই সমগ্র ঘটনা সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিল। কুরআন মজীদের বহু স্থানে 'আলাম তারা' (তুমি কি দেখনি?) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নয় বরং সাধারণ লোকদেরকে সম্বোধন করাই উদ্দেশ্য। (উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত আয়াতগুলো দেখুন ঃ ইবরাহীম ১৯ আয়াত, আল হাজ্জ ১৮ ও ৬৫ আয়াত, আন নূর ৪৩ আয়াত, লোকমান ২৯ ও ৩১ আয়াত, ফাতের ২৭ আয়াত এবং আয্ যুমার ২১ আয়াত) তাছাড়া দেখা শব্দটি এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, মক্কায় ও তার আশেপাশে এবং আরবের বিস্তৃত এলাকায় এ আসহাবে ফীলের ঘটনাটি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে এ ধরনের বহু লোক সে সময় জীবিত ছিল। কারণ তখনো এই ঘটনার পর চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে যায়নি। লোক মুখে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ সরাসরি এত বেশী বেশী সূত্রে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল যার ফলে এটা প্রায় সব লোকেরই চোখে দেখা ঘটনার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল।

২. এই হাতিওয়ালা কারা ছিল, কোথায় থেকে এসেছিল, কি উদ্দেশ্যে এসেছিল এসব কথা আল্লাহ এখানে বলছেন না। কারণ এগুলো সবাই জানতো।

৩. মূলে কাইদা (كيد) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোন ব্যক্তিকে ক্ষতি করবার জন্য গোপন কৌশল অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে গোপন কি ছিল? ষাট হাজার লোকের একটি সেনাবাহিনী কয়েকটি হাতি নিয়ে প্রকাশ্যে ইয়ামন থেকে মক্কায় আসে। তারা যে কা'বা শরীফ ভেঙ্গে ফেলতে এসেছে, একথাও তারা গোপন করেনি। কাজেই এ কৌশলটি গোপন ছিল না। তবে হাবশীরা কা'বা ভেঙে ফেলে কুরাইশদেরকে বিধ্বস্ত ও পর্যদস্ত করে এবং এভাবে সমগ্র আরববাসীকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে দক্ষিণ আরব থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বাণিজ্য পথ আরবদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইছিল। এটা ছিল তাদের মক্কা আক্রমণের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যটিকে তারা গোপন করে রাখে। অন্যদিকে তারা প্রকাশ করতে থাকে কয়েকজন আরব তাদের গীর্জার যে অবমাননা করেছে, কা'বা শরীফ ভেঙে ফেলে তারা তার প্রতিশোধ নিতে চায়।

৪. মূলে বলা হয়েছে فِيْ تَضْلِيْلٍ অর্থাৎ তাদের কৌশলকে তিনি ভ্রষ্টতার মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন। কিন্তু প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী কৌশলকে ভ্রষ্টতার মধ্যে নিক্ষেপ করার মানে হয় তাকে নষ্ট ও বিধ্বস্ত করে দেয়া অথবা নিজের উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে তাকে ব্যর্থ করে দেয়া। যেমন আমরা বলি, অমুক ব্যক্তির তীর লক্ষ ভ্রষ্ট হয়েছে, তার সব প্রচেষ্টা ও কলাকৌশল ব্যর্থ হয়েছে। কুরআন মজীদের এক জায়গায় বলা হয়েছে وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ "কিন্তু কাফেরদের কলাকৌশল ব্যর্থ হয়েছে।" (আল মু'মিন ২৫) অন্য জায়গায় বলা হয়েছে : وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ "আর আল্লাহ খেয়ানতকারীদের কৌশলকে সফলতার দ্বারে পৌঁছিয়ে দেন না।" (ইউসুফ ৫২) আরববাসীরা ইমরাউল কায়েসকে اَلْمَلِكُ الضِّلِّيْلُ "বিনষ্টকারী বাদশাহ" বলতো। কারণ সে তার বাপের কাছ থেকে পাওয়া বাদশাহী হারিয়ে ফেলেছিল।

৫. মূলে বলা হয়েছে طَيْرًا اَبَابِيْلَ আরবীতে আবাবীল মানে হচ্ছে, বহু ও বিভিন্ন দল যারা একের পর এক বিভিন্ন দিক থেকে আসে। তারা মানুষও হতে পারে আবার পশুও হতে পারে। ইকরামা ও কাতাদাহ বলেন, লোহিত সাগরের দিক থেকে এ পাখিরা দলে দলে আসে। সাঈদ ইবনে জুবাইর ও ইকরামা বলেন, এ ধরনের পাখি এর আগে কখনো দেখা যায়নি এবং এর পরেও দেখা যায়নি। এগুলো নজদ, হেজায, তেহামা বা লোহিত সাগরের মধ্যবর্তী উপকূল এলাকার পাখি ছিল না। ইবনে আব্বাস বলেন, তাদের চঞ্চু ছিল পাখিদের মতো এবং পাঞ্জা কুকুরের মতো। ইকরামার বর্ণনা মতে তাদের মাথা ছিল শিকারী পাখীর মাথার মত। প্রায় সকল বর্ণনাকারীর সর্বসম্মত বর্ণনা হচ্ছে, প্রত্যেকটি পাখির ঠোঁটে ছিল একটি করে পাথরের কুচি এবং পায়ে ছিল দু'টি করে পাথরের কুচি। মক্কার অনেক লোকের কাছে এই পাথর দীর্ঘকাল পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিল। আবু নু'আইম নওফাল ইবনে আবী মু'আবীয়ার বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, আসহাবে ফীলের ওপর যে পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল আমি তা দেখেছি। সেগুলোর এক একটি ছিল ছোট মটর দানার সমান। গায়ের রং ছিল লাল কালচে। আবু নু'আইম ইবনে আব্বাসের যে রওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন তাতে বলা হয়েছে, সেগুলো ছিল চিলগুজার* সমান। অন্যদিকে ইবনে মারদুইয়ার বর্ণনা মতে, সেগুলো ছিল ছাগলের লেদীর সমান। মোটকথা, এসবগুলো পাথর সমান মাপের ছিল না। অবশ্যি কিছু না কিছু পার্থক্য ছিল।

* চিলগুজা চীনাবাদাম জাতীয় এক ধরনের শুকনা ফল। লম্বায় ও চওড়ায় একটি চীনাবাদামের প্রায় সমান।

৬. মূল শব্দগুলো হচ্ছে, بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ অর্থাৎ সিজ্জীল ধরনের পাথর। ইবনে আব্বাস বলেন, এ শব্দটি মূলত ফারসীর "সংগ" ও "গীল" শব্দ দু'টির আরবী করণ।* এর অর্থ এমন পাথর যা কাদা মাটি থেকে তৈরি এবং তাকে আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করা হয়েছে। কুরআন মজীদ থেকেও এই অর্থের সত্যতা প্রমাণ হয়। সূরা হূদের ৮২ ও সূরা হজুরাতের ৪ আয়াতে বলা হয়েছে, লূত জাতির ওপর সিজ্জীল ধরনের পাথর বর্ষণ করা হয়েছিল এবং এই পাথর সম্পর্কে সূরা যারিয়াতের ৩৩ আয়াতে বলা হয়েছে, সেগুলো ছিল মাটির পাথর অর্থাৎ কাদামাটি থেকে সেগুলো তৈরি করা হয়েছিল।

মাওলানা হামীদুদ্দিন ফারাহী মরহুম ও মগফুর বর্তমান যুগে কুরআনের অর্থ বর্ণনা ও গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি এ আয়াতে "তারমীহিম" (তাদের ওপর নিক্ষেপ করছিল) শব্দের কর্তা হিসেবে মক্কাবাসী ও অন্যান্য আরববাসীদেরকে চিহ্নিত করেছেন। "আলাম তারা" (তুমি কি দেখনি) বাক্যাংশেও তাঁর মতে এদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। পাখিদের সম্পর্কে তিনি বলেন, তারা পাথর নিক্ষেপ করছিল না বরং তারা এসেছিল আসহাবে ফীলের লাশগুলি খেয়ে ফেলতে। এই ব্যাখ্যার সপক্ষে তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন তার নির্যাস হচ্ছে এই যে, আবদুল মুত্তালিবের আবরাহার কাছে গিয়ে কা'বার পরিবর্তে নিজে উট ফেরত নেবার জন্য দাবী জানানোর ব্যাপারটি কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অন্যদিকে কুরাইশরা এবং অন্যান্য যেসব লোকেরা হজ্জের জন্য এসেছিল তারা হানাদার সেনাদলের কোন মোকাবেলা না করে কাবাঘরকে তাদের করুণা ও মেহেরবানির ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজেরা পাহাড়ের ওপর গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় লাভ করবে, একথাও দুর্বোধ্য মনে হয়। তাই তাঁর মতে আসল ঘটনা হচ্ছে, আরবরা আবরাহার সেনাদলের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে এবং আল্লাহ পাথর বর্ষণকারী ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত করে এই সেনাদলকে বিধ্বস্ত করেন। তারপর তাদের লাশ খেয়ে ফেলার জন্য পাখি পাঠান। কিন্তু ভূমিকায় আমরা বলেছি, আবদুল মুত্তালিব তার উট দাবী করতে গিয়েছিলেন, রেওয়ায়াতে কেবল একথাই বলা হয়নি। বরং রেওয়ায়াতে একথাও বলা হয়েছে যে, আবদুল মুত্তালিব তাঁর উটের দাবীই জানাননি এবং আবরাহাকে তিনি কাবা আক্রমণ করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টাও করেছিলেন। আমরা একথাও বলেছি, সমস্ত নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী আবরাহা মহররম মাসে এসেছিল। তখন হাজীরা ফিরে যাচ্ছিল আর একথাও আমরা জানিয়ে দিয়েছি যে, ৬০ হাজার সৈন্যের মোকাবেলা করা কুরাইশদের ও তাদের আশেপাশের গোত্রগুলোর সামর্থের বাইরে ছিল। আহযাব যুদ্ধের সময় বিরাট ঢাক ঢোল পিটিয়ে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়ে আরব মুশরিক ও ইহুদি গোত্রগুলোর যে সেনাদল তারা এনেছিল তার সংখ্যা দশ বারো হাজারের বেশী ছিল না। কাজেই ৬০ হাজার সৈন্যের মোকাবেলা করার সাহস তারা কেমন করে করতে পারতো? তবুও এ সমস্ত যুক্তি বাদ দিয়ে যদি শুধু মাত্র সূরা ফীলের বাক্য বিন্যাসের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যায় তাহলে এ ব্যাখ্যা তার বিরোধী প্রমাণিত হয়। আরবরা পাথর মারে এবং তাতে আসহাবে ফীল মরে ছাতু হয়ে যায় আর তারপর পাখিরা আসে তাদের লাশ খাবার জন্য, ঘটনা যদি এমনি ধরা হতো তাহলে বাক্য বিন্যাস হতো নিম্নরূপভাবে ঃ

* সংগ মানে পাথর এবং গীল মানে কাদা।–অনুবাদক

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيْلٍ ـ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاكُوْلٍ ـ وَّ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ـ

(তোমরা তাদেরকে মারছিলে পোড়া মাটির পাথর। তারপর আল্লাহ তাদেরকে করে দিলেন ভুক্ত ভূষির মতো। আর আল্লাহ তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠালেন) কিন্তু এখানে আমরা দেখছি, প্রথমে আল্লাহ পাখির ঝাঁক পাঠাবার কথা জানালেন তারপর তার সাথে সাথেই বললেন ঃ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيْلٍ অর্থাৎ যারা তাদেরকে পোড়া মাটির তৈরী পাথরের কুচি দিয়ে মারছিল। সবশেষে বললেন, তারপর আল্লাহ তাদেরকে ভুক্ত ভূষির মতো করে দিলেন।

৭. আসল শব্দ হচ্ছে, كَعَصْفٍ مَّاكُوْلٍ আসফ শব্দ সূরা আর রহমানের ১২ আয়াতে এসেছে ঃ وَالْعَصْفُ وَالرَّيْحَانُ "শস্য ভূষি ও চারাওয়ালা।" এ থেকে জানা যায়, আসফ মানে হচ্ছে খোসা, যা শস্য দানার গায়ে লাগানো থাকে এবং কৃষক শস্য দানা বের করে নেবার পর যাকে ফেলে দেয় তারপর পশু তা খেয়েও ফেলে। আবার পশুর চিবানোর সময় কিছু পড়েও যায় এবং তার পায়ের তলায় কিছু পিশেও যায়।

কুরাইশ

১০৬

নামকরণ

প্রথম আয়াতের কুরাইশ (قُرَيْش) শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

যাহ্হাক ও কাল্‌বী একে মাদানী বললেও মুফাস্‌সিরগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এর মক্কী হবার ব্যাপারে একমত। তাছাড়া এ সূরার শব্দাবলীর মধ্যেও এর মক্কী হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ নিহিত রয়েছে। যেমন رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ (এ ঘরের রব)। এ সূরাটি মদীনায় নাযিল হলে কাবাঘরের-জন্য "এ ঘর" শব্দ দু'টি কেমন করে উপযোগী হতে পারে? বরং সূরা আল ফীলের বিষয়বস্তুর সাথে এর এত গভীর সম্পর্ক রয়েছে যে, সম্ভবত আল ফীল নাযিল হবার পর পরই এ সূরাটি নাযিল হয়ে থাকবে বলে মনে হয়। উভয় সূরার মধ্যে এই গভীর সম্পর্ক ও সামঞ্জস্যের কারণে প্রথম যুগের কোন কোন মনীষী এ দু'টি সূরাকে মূলত একটি সূরা হবার মত পোষণ করতেন। হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) তাঁর সংকলিত কুরআনের অনুলিপিতে এ দু'টি সূরাকে একসাথে লিখেছেন এবং সেখানে এ দু'য়ের মাঝখানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লেখা ছিল না। এ ধরনের রেওয়ায়াত পূর্বোক্ত চিন্তাকে আরো শক্তিশালী করেছে। তাছাড়া হযরত উমর (রা) একবার কোন ভেদ চিহ্ন ছাড়াই এই সূরা দু'টি এক সাথে নামাযে পড়েছিলেন। কিন্তু এ রায় গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সাইয়েদুনা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিপুল সংখ্যক সাহাবায়ে কেরামের সহযোগিতায় সরকারীভাবে কুরআন মজীদের যে অনুলিপি তৈরি করে ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠিয়েছিলেন তাতে এ উভয় সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লেখা ছিল। তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সারা দুনিয়ার সমস্ত কুরআন মজীদ এ দু'টি আলাদা আলাদা সূরা হিসেবেই লিখিত হয়ে আসছে। এ ছাড়াও এ সূরা দু'টির বর্ণনা ভংগী পরস্পর থেকে এত বেশী বিভিন্ন যে, এ দু'টির ভিন্ন ভিন্ন সূরা হবার ব্যাপারটি একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রপিতামহ কুসাই ইবনে কিলাবের সময় পর্যন্ত কুরাইশ গোত্র হিজাযে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসবাস করছিল। কুসাই সর্বপ্রথম তাদেরকে মক্কায় একত্র করে। এভাবে বাইতুল্লাহর মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব তাদের হাতে আসে। এ জন্য কুসাইকে "মুজাম্মে" বা একত্রকারী উপাধি দান করা হয়। এ ব্যক্তি নিজের উন্নত পর্যায়ের বুদ্ধিবৃত্তিক কুশলতা ও ব্যবস্থাপনার সাহায্যে মক্কায় একটি নগর রাষ্ট্রের বুনিয়াদ স্থাপন করে। আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত হাজীদের খেদমতের উত্তম ব্যবস্থা করে। এর ফলে ধীরে ধীরে আরবের সকল গোত্রের মধ্যে এবং সমস্ত এলাকায় কুরাইশদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কুসাইয়ের পর তার পুত্র আবদে মান্নাফ ও আবদুদ্‌দারের

মধ্যে মক্কা রাষ্ট্রের শাসন কর্তৃত্ব বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু দুই ভাইয়ের মধ্যে পিতার আমলেই আবদে মান্নাফ অধিকতর খ্যাতি লাভ করে এবং সমগ্র আরবে তার মর্যাদা স্বীকৃতি লাভ করতে থাকে। আবদে মান্নাফের ছিল চার ছেলে ঃ হাশেম, আবদে শামস, মুত্তালিব ও নওফাল। এদের মধ্য থেকে আবদুল মুত্তালিবের পিতা ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রপিতামহ হাশেমের মনে সর্বপ্রথম আরবের পথে প্রাচ্য এলাকার দেশসমূহ এবং সিরিয়া ও মিসরের মধ্যে যে আন্তরজাতিক বাণিজ্য চলতো তাতে অংশগ্রহণ করার এবং এই সংগে আরববাসীদের জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও কিনে আনার চিন্তা জাগে। তার ধারণামতে এভাবে বাণিজ্য পথের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গোত্ররা তাদের কাছ থেকে দ্রব্য-সামগ্রী কিনবে এবং মক্কার বাজারসমূহে দেশের অভ্যন্তরের ব্যবসায়ীরা সামগ্রী কেনার জন্য ভিড় জমাবে। এটা এমন এক সময়ের কথা যখন উত্তরাঞ্চলের দেশসমূহ ও পারস্য উপসাগরের পথে রোম সাম্রাজ্য ও প্রাচ্য দেশসমূহের মধ্যে যে আন্তরজাতিক বাণিজ্য চলতো তার ওপর ইরানের সাসানীয় সম্রাটরা পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এ কারণে দক্ষিণ আরব থেকে লোহিত সাগরের উপকূল ঘেঁসে সিরিয়া ও মিসরের দিকে প্রসারিত বাণিজ্য পথে ব্যবসা বিপুলভাবে জমে উঠেছিল। আরবের অন্যান্য বাণিজ্য কাফেলার তুলনায় কুরাইশদের বাড়তি সুবিধা ছিল। কাবার খাদেম হবার কারণে পথের সমস্ত গোত্র তাদেরকে মর্যাদার চোখে দেখতো। হজ্জের সময় কুরাইশ বংশীয় লোকেরা যে আন্তরিকতা, উদারতা ও বদান্যতা সহকারে হাজীদের খেদমত করতো সে জন্য সবাই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। কাজেই কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার ওপর পথে ডাকাতদের আক্রমণ হবে এ আশংকা ছিল না। পথের বিভিন্ন গোত্র অন্যান্য বাণিজ্য কাফেলার কাছ থেকে যে বিপুল পরিমাণ পথকর আদায় করতো তাও তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতো না। এসব দিক বিবেচনা করে হাশেম একটি বাণিজ্য পরিকল্পনা তৈরি করে এবং এই পরিকল্পনায় তার অন্য তিন ভাইকেও শামিল করে। হাশেম সিরিয়ার গাসসানী বাদশাহ থেকে, আবদে শামস হাবশার বাদশাহর থেকে, মুত্তালিব ইয়ামনের গভর্ণরদের থেকে এবং নওফল ইরাক ও পারস্যের সরকারদের থেকে বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। এভাবে তাদের ব্যবসা দ্রুত উন্নতি লাভ করতে থাকে। ফলে তারা চার ভাই "মুত্তাজিরীন" বা সওদাগর নামে খ্যাত হয়। আর এই সংগে তারা আশপাশে গোত্রদের ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল সে জন্য তাদেরকে "আসহাবুল ঈলাফ" তথা প্রীতির সম্পর্ক সৃষ্টিকারী বলা হতো।

এ ব্যবসার কারণে কুরাইশবংশীয় লোকেরা সিরিয়া, মিসর, ইরান, ইয়ামন ও হাবশার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ লাভ করে। সরাসরি বিভিন্ন দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতার সংস্পর্শে আসার কারণে তাদের দেখার, জানার ও উপলব্ধি করার মান অনেক উন্নত হতে থাকে। ফলে আরবের দ্বিতীয় কোন গোত্র তাদের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। ধন-সম্পদের দিক দিয়েও তারা আরবের সবচেয়ে উঁচু পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। মক্কা পরিণত হয়েছিল সমগ্র আরব উপদ্বীপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্রে। এ আন্তরজাতিক সম্পর্কের একটি বড় সুফল হিসেবে তারা ইরাক থেকে বর্ণমালাও আমদানী করে। পরবর্তী কালে কুরআন মজীদ লেখার জন্য এ বর্ণমালাই ব্যবহৃত হয়। আরবের কোন গোত্রে কুরাইশদের মতো এত বেশী লেখাপড়া জানা লোক ছিল না। এসব কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ قُرَيْشٌ قَادَةُ النَّاسِ

অর্থাৎ কুরাইশরা হচ্ছে জনগণের নেতা। (মুসনাদে আহমাদ ঃ আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণিত হাদীস সমষ্টি) বাইহাকী হযরত আলীর (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

كَانَ هٰذَا الْاَمْرُ فِىْ حِمْيَرَ فَنَزَعَهُ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَجَعَلَهُ فِى قُرَيْشٍ

"প্রথমে আরবদের নেতৃত্ব ছিল হিময়ারী গোত্রের দখলে তারপর মহান আল্লাহ তা তাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কুরাইশদেরকে দান করেন।"

কুরাইশরা এভাবে একের পর এক উন্নতির মনযিল অতিক্রম করে চলছিল। এমন সময় আবরাহার মক্কা আক্রমণের ঘটনা ঘটে। যদি সে সময় আবরাহা কা'বা ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হতো তাহলে আরবদেশে শুধু মাত্র কুরাইশদেরই নয়, কা'বা শরীফের মর্যাদাও খতম হয়ে যেতো। এটি যে সত্যিই বাইতুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর, জাহেলী যুগের আরবদের এই বিশ্বাসের ভিত্ও নড়ে উঠতো। এ ঘরের খাদেম হিসেবে সারা দেশে কুরাইশদের যে মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তাও মুহূর্তের মধ্যে ধূলিসাৎ হয়ে যেতো। হাবশীদের মক্কা দখল করার পর রোম সম্রাট সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সিরিয়া ও মক্কার মাঝখানের বাণিজ্য পথও দখল করে নিতো। ফলে কুসাই ইবনে কিলাবের আগে কুরাইশরা যে দুর্গত অবস্থার শিকার ছিল তার চাইতেও মারাত্মক দুরবস্থার মধ্যে তারা পড়তো। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর অসীম কুদরতের খেলা দেখান। পক্ষীবাহিনী পাথর মেরে মেরে আবরাহার ৬০ হাজারের বিশাল হাবশীবাহিনীকে ধ্বংস করে দেয়। মক্কা থেকে ইয়ামন পর্যন্ত সারাটা পথে বিধ্বস্ত সেনাবাহিনীর লোকেরা পড়ে মরে যেতে থাকে। এ সময় কা'বা শরীফের আল্লাহর ঘর হবার ব্যাপারে সমস্ত আরববাসীর ঈমান আগের চাইতে কয়েকগুণ বেশী মজবুত হয়ে যায়। এই সংগে সারা দেশে কুরাইশদের প্রতিপত্তি আগের চাইতেও আরো অনেক বেশী প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন আরবদের মনে বিশ্বাস জন্মে, এদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষিত হয়। ফলে এরা নির্বিঘ্নে আরবের যে কোন অংশে যেতো এবং নিজেদের বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে যে কোন এলাকা অতিক্রম করতো। এদের গায়ে হাত দেবার সাহস কারো হতো না। এদের গায়ে হাত দেয়া তো দূরের কথা এদের নিরাপত্তার ছত্রছায়ায় কোন অকুরাইশী থাকলেও তাকে কেউ বিরক্ত করতো না।

মূল বক্তব্য

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবকালে যেহেতু এ অবস্থা সবার জানা ছিল তাই এসব কথা আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল না। এ কারণে এ ছোট্ট সূরাটিতে চারটি বাক্যের মধ্য দিয়ে কুরাইশদেরকে কেবলমাত্র এতটুকু কথা বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে, যখন তোমরা নিজেরাই এ ঘরটিকে (কাবা ঘর) দেবমূর্তির মন্দির নয় বরং আল্লাহর ঘর বলে মনে করো এবং যখন তোমরা ভালোভাবেই জানো যে, আল্লাহই তোমাদেরকে এ ঘরের বদৌলতে এ পর্যায়ের শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেছেন, তোমাদের ব্যবসায় এহেন উন্নতি দান করেছেন এবং অভাব-অনাহার থেকে রক্ষা করে তোমাদেরকে এ ধরনের সমৃদ্ধি দান করেছেন তখন তোমাদের তো আসলে তাঁরই ইবাদাত করা উচিত।

আয়াত ৪ | সূরা কুরাইশ-মক্কী | রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ
هٰذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝٤

যেহেতু কুরাইশরা অভ্যস্ত হয়েছে,[১] (অর্থাৎ) শীতের ও গ্রীষ্মের সফরে অভ্যস্ত।[২] কাজেই তাদের এই ঘরের রবের ইবাদাত করা উচিত,[৩] যিনি তাদেরকে ক্ষুধা থেকে রেহাই দিয়ে খাবার দিয়েছেন[৪] এবং ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন।[৫]

১. মূল শব্দ হচ্ছে لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ । এখানে ঈলাফ (ايلاف) শব্দটি এসেছে উলফাত (الفت) শব্দ থেকে। এর অর্থ হয় অভ্যস্ত হওয়া, পরিচিত হওয়া, বিচ্ছেদের পর মিলিত হওয়া এবং কোন জিনিসের অভ্যাস গড়ে তোলা। ঈলাফ শব্দের পূর্বে যে 'লাম'টি ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে অনেক আরবী ভাষাবিদ পণ্ডিত এ মত প্রকাশ করেছেন যে, আরবী প্রচলন ও বাকরীতি অনুযায়ী এর মাধ্যমে বিস্ময় প্রকাশ করা বুঝায়। যেমন আরবরা বলে, لِزَيْدٍ وَمَا صَنَعْنَا بِهٖ "এই যায়েদের ব্যাপারটা দেখো, আমরা তার সাথে ভালো ব্যবহার করলাম কিন্তু সে আমাদের সাথে কেমন ব্যবহারটা করলো।" কাজেই لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ মানে হচ্ছে, কুরাইশদের ব্যবহারে বড়ই অবাক হতে হয়। কেননা আল্লাহর অনুগ্রহে তারা বিছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হবার পর একত্র হয়েছে এবং এমন ধরনের বাণিজ্য সফরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যা তাদের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। অথচ তারা সেই আল্লাহর বন্দেগী করতে অস্বীকার করছে! ভাষাতত্ত্ববিদ আখ্‌ফশ, কিসাঈ ও ফাররা এ মত ব্যক্ত করেছেন। ইবনে জারীর এ মতকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে লিখেছেন, আরবরা যখন এ 'লাম' ব্যবহার করে কোন কথা বলে তখন সেই কথাটি এ বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হয় যে, একথার পরও যে ব্যক্তি কোন আচরণ করে তা বিস্ময়কর। বিপরীতপক্ষে খলীল ইবনে আহমদ, সিবওয়াইহে ও যামাখ্‌শারী প্রমুখ ভাষাতত্ত্ব ও অলংকার শাস্ত্রবিদগণ বলেন, এখানে লাম অব্যয় সূচক এবং এর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে আগের বাক্য فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ এর সাথে। এর অর্থ হচ্ছে, এমনিতেই তো কুরাইশদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত সীমা-সংখ্যাহীন, কিন্তু অন্য কোন নিয়ামতের ভিত্তিতে না হলেও আল্লাহর অনুগ্রহের কারণে তারা এই বাণিজ্য সফরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, অন্তত এই একটি নিয়ামতের কারণে তাদের আল্লাহর বন্দেগী করা উচিত। কারণ এটা মূলত তাদের প্রতি একটা বিরাট অনুগ্রহ।

২. শীত ও গ্রীষ্মের সফরের মানে হচ্ছে গ্রীষ্মকালে কুরাইশরা সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের দিকে বাণিজ্য সফর করতো। কারণ এ দু'টি শীত প্রধান দেশ। আর শীতকালে সফর করতো দক্ষিণ আরবের দিকে। কারণ সেটি গ্রীষ্ম প্রধান এলাকা।

৩. এ ঘর মানে কা'বা শরীফ। এখানে আল্লাহর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, এ ঘরের বদৌলতেই কুরাইশরা এই নিয়ামতের অধিকারী হয়েছে। তারা নিজেরাই একথা মেনে নিয়েছে যে, এই যে ৩৬০টি মূর্তিকে তারা পূজা করে এরা এ ঘরের রব নয়। বরং একমাত্র আল্লাহই এর রব। তিনিই আসহাবে ফীলের আক্রমণ থেকে তাদেরকে বাঁচিয়েছেন। আবরাহার সেনাবাহিনীর মোকাবিলায় সাহায্য করার জন্য তাঁর কাছেই তারা আবেদন জানিয়েছিল। তাঁর ঘরের আশ্রয় লাভ করার আগে যখন তারা আরবের চারদিকে ছড়িয়ে ছিল তখন তাদের কোন মর্যাদাই ছিল না। আরবের অন্যান্য গোত্রের ন্যায় তারাও একটি বংশধারার বিক্ষিপ্ত দল ছিল মাত্র। কিন্তু মক্কায় এই ঘরের চারদিকে একত্র হবার এবং এর সেবকের দায়িত্ব পালন করতে থাকার পর সমগ্র আরবে তারা মর্যাদাশালী হয়ে উঠেছে। সবদিকে তাদের বাণিজ্য কাফেলা নির্ভয়ে যাওয়া আসা করছে। কাজেই তারা যা কিছুই লাভ করেছে এ ঘরের রবের বদৌলতেই লাভ করেছে। কাজেই তাদের একমাত্র সেই রবেরই ইবাদাত করা উচিত।

৪. মক্কায় আসার পূর্বে কুরাইশরা যখন আরবের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তখন তারা অনাহারে মরতে বসেছিল। এখানে আসার পর তাদের জন্য রিযিকের দরজাগুলো খুলে যেতে থাকে। তাদের সপক্ষে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এই বলে দোয়া করেছিলেন—'হে আল্লাহ! আমি তোমার মর্যাদাশালী ঘরের কাছে একটি পানি ও শস্যহীন উপত্যকায় আমার সন্তানদের একটি অংশের বসতি স্থাপন করিয়েছি, যাতে তারা নামায কায়েম করতে পারে। কাজেই তুমি লোকদের হৃদয়কে তাদের অনুরাগী করে দিয়ো, তাদের খাবার জন্য ফলমূল দান করো।' (সূরা ইবরাহীম ৩৭) তাঁর এই দোয়া অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়।

৫. অর্থাৎ যে ভীতি থেকে আরব দেশে কেউ নিরাপদ নয়, তা থেকে তারা নিরাপদ রয়েছে। সে যুগে আরবের অবস্থা এমন ছিল যে, সারা দেশে এমন কোন জনপদ ছিল না যেখানে লোকেরা রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারতো। কারণ সবসময় তারা আশংকা করতো, এই বুঝি কোন লুটেরা দল রাতের অন্ধকারে হঠাৎ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাদের সবকিছু লুট করে নিয়ে গেলো। নিজের গোত্রের সীমানার বাইরে পা রাখার সাহস কোন ব্যক্তির ছিল না। কারণ একাকী কোন ব্যক্তির জীবিত ফিরে আসা অথবা গ্রেফতার হয়ে গোলামে পরিণত হবার হাত থেকে বেঁচে যাওয়া যেন অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কোন কাফেলা নিশ্চিন্তে সফর করতে পারতো না। কারণ পথে বিভিন্ন স্থানে তার ওপর ছিল দস্যু দলের আক্রমণের ভয়। ফলে পথ-পার্শ্বের প্রভাবশালী গোত্র সরদারদেরকে ঘুষ দিয়ে দিয়ে বাণিজ্য কাফেলাগুলো দস্যু ও লুটেরাদের হাত থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ রেখে এগিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু কুরাইশরা মক্কায় সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। তাদের নিজেদের ওপর কোন শত্রুর আক্রমণের ভয় ছিল না। তাদের ছোট বড় সব রকমের কাফেলা দেশের প্রত্যেক এলাকায় যাওয়া আসা করতো। হারাম শরীফের খাদেমদের কাফেলা, একথা জানারপর কেউ তাদের ওপর আক্রমণ করার সাহস করতো না। এমন কি একজন কুরাইশী একাই যদি কখনো কোন জায়গায় যেতো এবং সেখানে কেউ তার ক্ষতি করতে যেতো তাহলে তার পক্ষে শুধুমাত্র হারমী (حرمى) বা انا من حرم الله আমি হারম শরীফের লোক বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিল। একথা শুনার সাথে সাথেই আক্রমণকারীর হাত নিচের দিকে নেমে আসতো।

আল মাউন

১০৭

নামকরণ

শেষ আয়াতের শেষ শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

ইবনে মারদুইয়া ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে যুবাইরের (রা) উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তাঁরা এ সূরাকে মক্কী হিসেবে গণ্য করেছেন। আতা ও জাবেরও এ একই উক্তি করেছেন। কিন্তু আবু হাইয়ান বাহরুল মুহীত গ্রন্থে ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও যাহ্হাকের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, এটি মাদানী সূরা। আমাদের মতে, এই সূরার মধ্যে এমন একটি আভ্যন্তরীণ সাক্ষ রয়েছে যা এর মাদানী হবার প্রমাণ পেশ করে। সেটি হচ্ছে, এ সূরায় এমন সব নামাযীদেরকে ধ্বংসের বার্তা শুনানো হয়েছে যারা নিজেদের নামাযে গাফলতি করে এবং লোক দেখানো নামায পড়ে। এ ধরনের মুনাফিক মদীনায় পাওয়া যেতো। কারণ ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীরা সেখানে এমন পর্যায়ের শক্তি অর্জন করেছিল, যার ফলে বহু লোককে পরিস্থিতির তাগিদে ঈমান আনতে হয়েছিল এবং তাদের বাধ্য হয়ে মসজিদে আসতে হতো। তারা নামাযের জামায়াতে শরীক হতো এবং লোক দেখানো নামায পড়তো। এভাবে তারা মুসলমানদের মধ্যে গণ্য হতে চাইতো। বিপরীতপক্ষে মক্কায় লোক দেখাবার জন্য নামায পড়ার মতো কোন পরিবেশই ছিল না। সেখানে তো ঈমানদারদের জন্য জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ব্যবস্থা করাই দুরূহ ছিল। গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের নামায পড়তে হতো। কেউ প্রকাশ্যে নামায পড়লে ভয়ানক সাহসিকতার পরিচয় দিতো। তার প্রাণ নাশের সম্ভাবনা থাকতো। সেখানে যে ধরনের মুনাফিক পাওয়া যেতে তারা লোক দেখানো ঈমান আনা বা লোক দেখানো নামায পড়ার দলভুক্ত ছিল না। বরং তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য নবী হবার ব্যাপারটি জেনে নিয়েছিল এবং মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তাদের কেউ কেউ নিজের শাসন ক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব বহাল রাখার জন্য ইসলাম গ্রহণ করতে পিছপাও হচ্ছিল। আবার কেউ কেউ নিজেদের চোখের সামনে মুসলমানদেরকে যেসব বিপদ-মুসিবতের মধ্যে ঘেরাও দেখছিল ইসলাম গ্রহণ করে নিজেরাও তার মধ্যে ঘেরাও হবার বিপদ কিনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। সূরা আনকাবূতের ১০-১১ আয়াতে মক্কী যুগের মুনাফিকদের এ অবস্থাটি বর্ণিত হয়েছে। (আরো জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন আল আনকাবুত ১৩-১৬ টীকা)

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

আখেরাতের প্রতি ঈমান না আনলে মানুষের মধ্যে কোন্ ধরনের নৈতিকতা জন্ম নেয় তা বর্ণনা করাই এর মূল বিষয়বস্তু। ২ ও ৩ আয়াতে এমনসব কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যারা প্রকাশ্যে আখেরাতকে মিথ্যা বলে। আর শেষ চার আয়াতে যেসব মুনাফিক আপাতদৃষ্টিতে মুসলমান মনে হয় কিন্তু যাদের মনে আখেরাত এবং তার শাস্তি–পুরস্কার ও পাপ–পূণ্যের কোন ধারণা নেই, তাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আখেরাত বিশ্বাস ছাড়া মানুষের মধ্যে একটি মজবুত শক্তিশালী ও পবিত্র–পরিচ্ছন্ন চরিত্র গড়ে তোলা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়, এ সত্যটি মানুষের হৃদয়পটে অংকিত করে দেয়াই হচ্ছে সামগ্রিকভাবে উভয় ধরনের দলের কার্যধারা বর্ণনা করার মূল উদ্দেশ্য।

আয়াত ৭ **সূরা আল মাউন-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

أَرَءَيْتَ الَّذِى يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝١ فَذٰلِكَ الَّذِى يَدُعُّ
الْيَتِيْمَ ۝٢ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝٣ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝٤
الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝٥ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ ۝٦
وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝٧

তুমি কি তাকে দেখেছো[১] যে আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তিকে[২] মিথ্যা বলছে?[৩] সে-ই তো[৪] এতিমকে ধাক্কা দেয়[৫] এবং মিসকিনকে খাবার দিতে[৬] উদ্বুদ্ধ করে না।[৭] তারপর সেই নামাযীদের জন্য ধ্বংস,[৮] যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে গাফলতি করে,[৯] যারা লোক দেখানো কাজ করে[১০] এবং মামুলি প্রয়োজনের জিনিসপাতি[১১] (লোকদেরকে) দিতে বিরত থাকে।

১. 'তুমি কি দেখেছো' বাক্যে এখানে বাহ্যত সম্বোধন করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। কিন্তু কুরআনের বর্ণনাভংগী অনুযায়ী দেখা যায়, এসব ক্ষেত্রে সাধারণত প্রত্যেক জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা সম্পন্ন লোকদেরকেই এ সম্বোধন করা হয়ে থাকে। আর দেখা মানে চোখ দিয়ে দেখাও হয়। কারণ সামনের দিকে লোকদের যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তা প্রত্যেক প্রত্যক্ষকারী স্বচক্ষে দেখে নিতে পারে। আবার এর মানে জানা, বুঝা ও চিন্তা-ভাবনা করাও হতে পারে। আরবী ছাড়া অন্যান্য ভাষায়ও এ শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আমরা বলি, "আচ্ছা, ব্যাপারটা আমাকে দেখতে হবে।" অর্থাৎ আমাকে জানতে হবে। অথবা আমরা বলি, "এ দিকটাও তো একবার দেখো।" এর অর্থ হয়, "এ দিকটা সম্পর্কে একটু চিন্তা করো।" কাজেই "আরাআইতা" (أَرَءَيْتَ) শব্দটিকে দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করলে আয়াতের অর্থ হবে, "তুমি কি জানো সে কেমন লোক যে শাস্তি ও পুরস্কারকে মিথ্যা বলে?" অথবা "তুমি কি ভেবে দেখেছো সেই ব্যক্তির অবস্থা যে কর্মফলকে মিথ্যা বলে?"

২. আসলে বলা হয়েছে : يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ । কুরআনের পরিভাষায় "আদ্ দীন" শব্দটি থেকে আখেরাতে কর্মফল দান বুঝায়। দীন ইসলাম অর্থেও এটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু

সামনের দিকে যে বিষয়ের আলোচনা হয়েছে তার সাথে প্রথম অর্থটিই বেশী খাপ খায় যদিও বক্তব্যের ধারাবাহিকতার দিক দিয়ে দ্বিতীয় অর্থটিও খাপছাড়া নয়। ইবনে আব্বাস (রা) দ্বিতীয় অর্থটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে অধিকাংশ তাফসীরকার প্রথম অর্থটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে সমগ্র সূরার বক্তব্যের অর্থ হবে, আখেরাত অস্বীকারের আকীদা মানুষের মধ্যে এ ধরনের চরিত্র ও আচরণের জন্ম দেয়। আর দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করলে দীন ইসলামের নৈতিক গুরুত্ব সুস্পষ্ট করাটাই সমগ্র সূরাটির মূল বক্তব্যে পরিণত হবে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বক্তব্যের অর্থ হবে, এ দীন অস্বীকারকারীদের মধ্যে যে চরিত্র ও আচরণ বিধি পাওয়া যায় ইসলাম তার বিপরীত চরিত্র সৃষ্টি করতে চায়।

৩. বক্তব্য যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে মনে হয়, এখানে এ প্রশ্ন দিয়ে কথা শুরু করার উদ্দেশ্য একথা জিজ্ঞেস করা নয় যে, তুমি সেই ব্যক্তিকে দেখেছো কি না। বরং আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কার অস্বীকার করার মনোবৃত্তি মানুষের মধ্যে কোন ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করে শ্রোতাকে সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার দাওয়াত দেয়াই এর উদ্দেশ্য। এই সংগে কোন্ ধরনের লোকেরা এ আকীদাকে মিথ্যা বলে সে কথা জানার আগ্রহ তার মধ্যে সৃষ্টি করাই এর লক্ষ। এভাবে সে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার নৈতিক গুরুত্ব বুঝার চেষ্টা করবে।

৪. আসলে فَذٰلِكَ الَّذِىْ বলা হয়েছে। এ বাক্যে فَ অক্ষরটি একটি সম্পূর্ণ বাক্যের অর্থ পেশ করছে। এর মানে হচ্ছে, "যদি তুমি না জেনে থাকো তাহলে তুমি জেনে নাও," "সে-ই তো সেই ব্যক্তি" অথবা এটি এ অর্থে যে, "নিজের এ আখেরাত অস্বীকারের কারণে সে এমন এক ব্যক্তি যে ....."

৫. মূলে يَدُعُّ الْيَتِيْمَ বলা হয়েছে এর কয়েকটি অর্থ হয়। এক, সে এতিমের হক মেরে খায় এবং তার বাপের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে বেদখল করে তাকে সেখান থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। দুই, এতিম যদি তার কাছে সাহায্য চাইতে আসে তাহলে দয়া করার পরিবর্তে সে তাকে ধিক্কার দেয়। তারপরও যদি সে নিজের অসহায় ও কষ্টকর অবস্থার জন্য অনুগ্রহ লাভের আশায় দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। তিন, সে এতিমের ওপর জুলুম করে। যেমন তার ঘরেই যদি তার কোন আত্মীয় এতিম থাকে তাহলে সারাটা বাড়ির ও বাড়ির লোকদের সেবা যত্ন করা এবং কথায় কথায় গালমন্দ ও লাথি ঝাঁটা খাওয়া ছাড়া তার ভাগ্যে আর কিছুই জোটে না। তাছাড়া এ বাক্যের মধ্যে এ অর্থও নিহিত রয়েছে যে, সেই ব্যক্তি মাঝে মাঝে কখনো কখনো এ ধরনের জুলুম করে না বরং এটা তার অভ্যাস ও চিরাচরিত রীতি সে যে এটা একটা খারাপ কাজ করছে, এ অনুভূতিও তার থাকে না। বরং বড়ই নিশ্চিন্তে সে এ নীতি অবলম্বন করে যেতে থাকে। সে মনে করে, এতিম একটা অক্ষম ও অসহায় জীব। কাজেই তার হক মেরে নিলে, তার ওপর জুলুম-নির্যাতন চালালে অথবা সে সাহায্য চাইতে এলে তাকে ধাক্কা মেরে বের করে দিলে কোন ক্ষতি নেই।

এ প্রসংগে কাজী আবুল হাসান আল মাওয়ারদী তাঁর "আলামুন নুবুওয়াহ" কিতাবে একটি অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হচ্ছে ঃ আবু জেহেল ছিল একটি এতিম ছেলের অভিভাবক। ছেলেটি একদিন তার কাছে এলো। তার গায়ে একটুকরা কাপড়ও ছিল না। সে কাকুতি মিনতি করে তার বাপের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তাকে কিছু দিতে

বললো। কিন্তু জালেম আবু জেহেল তার কথায় কানই দিল না। সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর শেষে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলো। কুরাইশ সরদাররা দুষ্টুমি করে বললো, "যা মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে চলে যা। সেখানে গিয়ে তার কাছে নালিশ কর। সে আবু জেহেলের কাছে সুপারিশ করে তোর সম্পদ তোকে দেবার ব্যবস্থা করবে।" ছেলেটি জানতো না আবু জেহেলের সাথে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কি সম্পর্ক এবং এ শয়তানরা তাকে কেন এ পরামর্শ দিচ্ছে। সে সোজা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌছে গেলো এবং নিজের অবস্থা তাঁর কাছে বর্ণনা করলো। তার ঘটনা শুনে নবী (সা) তখনই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাকে সংগে নিয়ে নিজের নিকৃষ্টতম শত্রু আবু জেহেলের কাছে চলে গেলেন। তাঁকে দেখে আবু জেহেল তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো। তারপর যখন তিনি বললেন, এ ছেলেটির হক একে ফিরিয়ে দাও তখন সে সংগে সংগেই তাঁর কথা মেনে নিল এবং তার ধন-সম্পদ এনে তার সামনে রেখে দিল। ঘটনার পরিণতি কি হয় এবং পানি কোন্ দিকে গড়ায় তা দেখার জন্য কুরাইশ সরদাররা ওঁৎ পেতে বসেছিল। তারা আশা করছিল দু'জনের মধ্যে বেশ একটা মজার কলহ জমে উঠবে। কিন্তু এ অবস্থা দেখে তারা অবাক হয়ে গেলো। তারা আবু জেহেলের কাছে এসে তাকে ধিক্কার দিতে লাগলো। তাকে বলতে লাগলো, তুমিও নিজের ধর্ম ত্যাগ করেছো। আবু জেহেল জবাব দিল, আল্লাহর কসম! আমি নিজের ধর্ম ত্যাগ করিনি। কিন্তু আমি অনুভব করলাম, মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডাইনে ও বাঁয়ে এক একটি অস্ত্র রয়েছে। আমি তার ইচ্ছার সামান্যতম বিরুদ্ধাচরণ করলে সেগুলো সাজা আমার শরীরের মধ্যে ঢুকে যাবে। এ ঘটনাটি থেকে শুধু এতটুকুই জানা যায় না যে, সে যুগে আরবের সবচেয়ে বেশী উন্নত ও মর্যাদাশালী গোত্রের বড় বড় সরদাররা পর্যন্ত এতিম ও সহায়-সম্বলহীন লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করতো বরং এই সংগে একথাও জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কত উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর নিকৃষ্টতম শত্রুদের ওপরও তাঁর এ চারিত্রিক প্রভাব কতটুকু কার্যকর হয়েছিল। ইতিপূর্বে তাফহীমুল কুরআন সূরা আল আম্বিয়া ৫ টীকায় আমি এ ধরনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে জবরদস্ত নৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে কুরাইশরা তাঁকে যাদুকর বলতো এ ঘটনাটি তারই মূর্ত প্রকাশ।

৬. اَطْعَامِ الْمِسْكِيْنِ নয় বরং طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ বলা হয়েছে "ইত্'আমুল মিসকিন" বললে অর্থ হতো," সে মিসকিনকে খানা খাওয়াবার ব্যাপারে উৎসাহিত করে না। কিন্তু "তাআমুল মিসকিন" বলায় এর অর্থ দাঁড়িয়েছে, "সে মিসকিনকে খানা দিতে উৎ-সাহিত করে না।" অন্য কথায়, মিসকিনকে যে খাবার দেয়া হয় তা দাতার খাবার নয় বরং ঐ মিসকিনেরই খাবার। তা ঐ মিসকিনের হক এবং দাতার ওপর এ হক আদায় করার দায়িত্ব বর্তায়। কাজেই দাতা এটা মিসকিনকে দান করছে না বরং তার হক আদায় করছে। সূরা আয্ যারিয়াতের ১৯ আয়াতে একথাটিই বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ "আর তাদের ধন সম্পদে রয়েছে ভিখারী ও বঞ্চিতদের হক।"

৭. لَا يَحُضُّ শব্দের মানে হচ্ছে, সে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করে না, নিজের পরিবারের লোকদেরকেও মিসকিনকে খাবার দিতে উদ্বুদ্ধ করে না এবং অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে না যে, সমাজে যেসব গরীব ও অভাবী লোক অনাহারে মারা যাচ্ছে তাদের হক আদায় করো এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কিছু করো।

এখানে মহান আল্লাহ শুধুমাত্র দু'টি সুস্পষ্ট উদাহরণ দিয়ে আসলে আখেরাত অস্বীকার প্রবণতা মানুষের মধ্যে কোন্ ধরনের নৈতিক অসৎবৃত্তির জন্ম দেয় তা বর্ণনা করেছেন। আখেরাত না মানলে এতিমকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া এবং মিসকিনকে খাবার দিতে উদ্বুদ্ধ না করার মতো দু'টো দোষ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায় বলে শুধুমাত্র এ দু'টি ব্যাপারে মানুষকে পাকড়াও ও সমালোচনা করাই এর আসল উদ্দেশ্য নয়। বরং এই গোমরাহীর ফলে যে অসংখ্য দোষ ও ত্রুটির জন্ম হয় তার মধ্য থেকে নমুনা স্বরূপ এমন দু'টি দোষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে প্রত্যেক সুস্থ বিবেক ও সৎবিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি যেগুলোকে নিকৃষ্টতম দোষ বলে মেনে নেবে। এই সংগে একথাও হৃদয়পটে অংকিত করে দেয়াই উদ্দেশ্য যে, এ ব্যক্তিটিই যদি আল্লাহর সামনে নিজের উপস্থিতি ও নিজের কৃতকর্মের জবাবদিহির স্বীকৃতি দিতো, তাহলে এতিমের হক মেরে নেবার, তার ওপর জুলুম-নির্যাতন করার, তাকে ধিক্কার দেবার এবং মিসকিনকে নিজে খাবার না দেবার ও অন্যকে দিতে উদ্বুদ্ধ না করার মতো নিকৃষ্টতম কাজ সে করতো না। আখেরাত বিশ্বাসীদের গুণাবলী সূরা আসর ও সূরা বালাদে বয়ান করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে : وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি করুণা করার জন্য তারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় এবং وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ তারা পরস্পরকে সত্যপ্রীতি ও অধিকার আদায়ের উপদেশ দেয়।

৮. এখানে শব্দ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে "ফা" (ف) ব্যবহার করার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, প্রকাশ্যে যারা আখেরাত অস্বীকার করে তাদের অবস্থা তুমি এখনই শুনলে, এখন যারা নামায পড়ে অর্থাৎ মুসলমানদের সাথে শামিল মুনাফিকদের অবস্থাটা একবার দেখো। তারা যেহেতু বাহ্যত মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আখেরাতকে মিথ্যা মনে করে, তাই দেখো তারা নিজেদের জন্য কেমন ধ্বংসের সরঞ্জাম তৈরি করছে।

"মুসাল্লীন" মানে নামায পাঠকারীগণ। কিন্তু যে আলোচনা প্রসংগে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং সামনের দিকে তাদের যে গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর প্রেক্ষিতে এ শব্দটির মানে আসলে নামাযী নয় বরং নামায আদায়কারী দল অর্থাৎ মুসলমানদের দলের অন্তরভুক্ত হওয়া।

৯. فِيْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে, عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ যদি বলা হতো "ফী সালাতিহিম" তাহলে এর মানে হতো, নিজের নামাযে ভুলে যায়। কিন্তু নামায পড়তে পড়তে ভুলে যাওয়া ইসলামী শরীয়াতে নিফাক তো দূরের কথা গোনাহের পর্যায়েও পড়ে না। বরং এটা আদতে কোন দোষ বা পাকড়াও যোগ্য কোন অপরাধও নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজেরও নামাযের মধ্যে কখনো ভুল হয়েছে। তিনি এই ভুল সংশোধনের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। এর বিপরীতে

عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ মানে হচ্ছে, তারা নিজেদের নামাযের থেকে গাফেল। নামায পড়া ও না পড়া উভয়টিরই তাদের দৃষ্টিতে কোন গরুত্ব নেই। কখনো তারা নামায পড়ে আবার কখনো পড়ে না। যখন পড়ে, নামাযের আসল সময় থেকে পিছিয়ে যায় এবং সময় যখন একেবারে শেষ হয়ে আসে তখন উঠে গিয়ে চারটে ঠোকর দিয়ে আসে। অথবা নামাযের জন্য ওঠে ঠিকই কিন্তু একেবারে যেন উঠতে মন চায়না এমনভাবে ওঠে এবং নামায পড়ে নেয় কিন্তু মনের দিক থেকে কোন সাড়া পায় না। যেন কোন আপদ তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। নামায পড়তে পড়তে কাপড় নিয়ে খেলা করতে থাকে। হাই তুলতে থাকে। আল্লাহর স্মরণ সামান্যতম তাদের মধ্যে থাকে না। সারাটা নামাযের মধ্যে তাদের এ অনুভূতি থাকে না যে, তারা নামায পড়ছে। নামাযের মধ্যে কি পড়ছে তাও তাদের খেয়াল থাকে না নামায পড়তে থাকে এবং মন অন্যত্র পড়ে থাকে। তাড়াহুড়া করে এমনভাবে নামাযটা পড়ে নেয় যাতে কিয়াম, রুকূ ও সিজদা কোনটাই ঠিক হয় না। কোননা কোন প্রকারে নামায পড়ার তান করে দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করে। আবার এমন অনেক লোক আছে, যারা কোন জায়গায় আটকা পড়ে যাবার কারণে বেকায়দায় পড়ে নামাযটা পড়ে নেয় কিন্তু আসলে তাদের জীবনে এ ইবাদাতটার কোন মর্যাদা নেই। নামাযের সময় এসে গেলে এটা যে নামাযের সময় এ অনুভূতিটাও তাদের থাকে না। মুয়ায্যিনের আওয়াজ কানে এলে তিনি কিসের আহবান জানাচ্ছেন, কাকে এবং কেন জানাচ্ছেন একথাটা একবারও তারা চিন্তা করে না। এটাই আখেরাতের প্রতি ঈমান না থাকার আলামত। কারণ ইসলামের এ তথাকথিত দাবীদাররা নামায পড়লে কোন পুরস্কার পাবে বলে মনে করে না এবং না পড়লে তাদের কপালে শাস্তি ভোগ আছে একথা বিশ্বাস করে না। এ কারণে তারা এ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে। এ জন্য হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) ও হযরত আতা ইবনে দীনার বলেন ঃ আল্লাহর শোকর তিনি "ফী সালাতিহিম সাহুন" বলেননি বরং বলেছেন, "আন সালাতিহিম সাহুন।" অর্থাৎ আমরা নামাযে ভুল করি ঠিকই কিন্তু নামায থেকে গাফেল হই না। এ জন্য আমরা মুনাফিকদের অন্তরভুক্ত হবো না।

কুরআন মজীদের অন্যত্র মুনাফিকদের এ অবস্থাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَلَا يَأْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ

"তারা যখনই নামাযে আসে অবসাদগ্রস্তের মতো আসে এবং যখনই (আল্লাহর পথে) খরচ করে অনিচ্ছাকৃতভাবে করে।" (তাওবা ৫৪)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

تِلْكَ صلوة المنافق ، تلك صلوة المنافق ، تلك صلوة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرنى الشيطان قام فنقر اربعا لايذكر الله فيها الا قليلا -

"এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকের নামায। সে আসরের সময় বসে সূর্য দেখতে থাকে। এমনকি সেটা শয়তানের দু'টো শিংয়ের

মাঝখানে পৌঁছে যায়। (অর্থাৎ সূর্যাস্তের সময় নিকটবর্তী হয়) তখন সে উঠে চারটে ঠোকর মেরে নেয়। তাতে আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করা হয়।" বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ)

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে তাঁর পুত্র মুসআব ইবনে সা'দ রেওয়ায়াত করেন, যারা নামাযের ব্যাপারে গাফলতি করে তাদের সম্পর্কে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, যারা গড়িমসি করতে করতে নামাযের সময় শেষ হয় হয় এমন অবস্থায় নামায পড়ে তারাই হচ্ছে এসব লোক। (ইবনে জারীর, আবু ইয়ালা, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম, তাবারানী ফিল আওসাত, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ফিস সুনান। এ রেওয়ায়াতটি হযরত সা'দের নিজের উক্তি হিসেবেও উল্লেখিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে এর সনদ বেশী শক্তিশালী। আবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী হিসেবে এ রেওয়ায়াতটির সনদ বাইহাকী ও হাকেমের দৃষ্টিতে দুর্বল) হযরত মুস'আবের দ্বিতীয় রেওয়ায়াতটি হচ্ছে, তিনি নিজের মহান পিতাকে জিজ্ঞেস করেন, এ আয়াতটি নিয়ে কি আপনি চিন্তা-ভাবনা করেছেন? এর অর্থ কি নামায ত্যাগ করা? অথবা এর অর্থ নামায পড়তে পড়তে মানুষের চিন্তা অন্য কোনদিকে চলে যাওয়া? আমাদের মধ্যে কে এমন আছে নামাযের মধ্যে যার চিন্তা অন্য দিকে যায় না? তিনি জবাব দেন, না এর মানে হচ্ছে নামাযের সময়টা নষ্ট করে দেয়া এবং গড়িমসি করে সময় শেষ হয় হয় এমন অবস্থায় তা পড়া। (ইবনে জারীর, ইবনে আবী শাইবা, আবু ইয়া'লা, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ফিস্ সুনান)

এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, নামাযের মধ্যে অন্য চিন্তা এসে যাওয়া এক কথা এবং নামাযের প্রতি কখনো দৃষ্টি না দেয়া এবং নামায পড়তে পড়তে সবসময় অন্য বিষয় চিন্তা করতে থাকা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। প্রথম অবস্থাটি মানবিক দুর্বলতার স্বাভাবিক দাবি। ইচ্ছা ও সংকল্প ছাড়াই অন্যান্য চিন্তা এসে যায় এবং মু'মিন যখনই অনুভব করে, তার মন নামায থেকে অন্যদিকে চলে গেছে তখনই সে চেষ্টা করে আবার নামাযে মনোনিবেশ করে। দ্বিতীয় অবস্থাটি নামাযে গাফলতি করার পর্যায়ভুক্ত। কেননা এ অবস্থায় মানুষ শুধুমাত্র নামাযের ব্যায়াম করে। আল্লাহকে স্মরণ করার কোন ইচ্ছা তার মনে জাগে না। নামায শুরু করা থেকে নিয়ে সালাম ফেরা পর্যন্ত একটা মুহূর্তও তার মন আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হয় না। যেসব চিন্তা মাথায় পুরে সে নামাযে প্রবেশ করে তার মধ্যেই সবসময় ডুবে থাকে।

১০. এটি একটি স্বতন্ত্র বাক্যও হতে পারে আবার পূর্বের বাক্যের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। একে স্বতন্ত্র বাক্য গণ্য করলে এর অর্থ হবে, কেননা সৎকাজও তারা আন্তরিক সংকল্প সহকারে আল্লাহর জন্য করে না। বরং যা কিছু করে অন্যদের দেখাবার জন্য করে। এভাবে তারা নিজেদের প্রশংসা শুনাতে চায়। তারা চায়, লোকেরা তাদের সৎ লোক মনে করে তাদের সৎকাজের ডংকা বাজাবে। এর মাধ্যমে তারা কোন না কোনভাবে দুনিয়ার স্বার্থ উদ্ধার করবে। আর আগের বাক্যের সাথে একে সম্পর্কিত মনে করলে এর অর্থ হবে তারা লোক দেখানো কাজ করে। সাধারণভাবে মুফাস্সিরগণ দ্বিতীয় অর্থটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ প্রথম নজরেই টের পাওয়া যায় আগের বাক্যের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ "এখানে মোনাফিকদের কথা বলা হয়েছে,

যারা লোক দেখানো নামায পড়তো। অন্য লোক সামনে থাকলে নামায পড়তো এবং অন্য লোক না থাকলে পড়তো না।" অন্য একটি রেওয়ায়াতে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে," একাকী থাকলে পড়তো না। আর সর্ব সমক্ষে পড়ে নিতো।" (ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ফিশ শু'আব) কুরআন মজীদেও মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا –

"আর যখন তারা নামাযের জন্য ওঠে অবসাতগ্রস্তের ন্যায় ওঠে। লোকদের দেখায় এবং আল্লাহকে স্মরণ করে খুব কমই।" (আন নিসা ১৪২)

১১. মূলে মাউন (ماعون) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত আলী (রা), ইবনে উমর (রা), সাঈদ ইবনে জুবাইর, কাতাদাহ, হাসান বসরী, মুহাম্মাদ ইবনে হানাফীয়া, যাহ্হাক, ইবনে যায়েদ, ইকরামা, মুজাহিদ আতা ও যুহরী রাহেমাহুমুল্লাহ বলেন, এখানে এই শব্দটি থেকে যাকাত বুঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) ইবনে মাসউদ (র) ইবরাহীম নাখয়ী (র) আবু মালেক (র) এবং অন্যান্য লোকদের উক্তি হচ্ছে, এখানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস–পত্র যেমন, হাড়ী–পাতিল, বালতী, দা,–কুড়াল, দাড়িপাল্লা, লবণ, পানি, আগুন, চকমাকি(বর্তমানে এর স্থান দখল করেছে দেয়াশলাই) ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। কারণ লোকেরা সাধারণত এগুলো দৈনন্দিন কাজের জন্য পরস্পরের কাছ থেকে চেয়ে নেয়। সাঈদ ইবনে জুবাইর ও মুজাহিদের একটি উক্তিও এর সমর্থনে পাওয়া যায়। হযরত আলীর (রা) এক উক্তিতেও বলা হয়েছে, এর অর্থ যাকাত হয় আবার ছোট ছোট নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রও হয়। ইবনে আবী হাতেম ইকরামা, থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, মাউনের সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে যাকাত এবং সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে কাউকে চালুনী, বালতী বা দেয়াশলাই ধার দেয়া। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিসসাল্লামের সাথীরা বলতাম (কোন কোন হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক জামানায় বলতাম) ঃ মাউন বলতে হাঁড়ি, কুড়াল, বালতি, দাঁড়িপাল্লা এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিস অন্যকে ধার দেয়া বুঝায়। (ইবনে জারীর, ইবনে আবী শাইবা, আবু দাউদ, নাসায়ী, বায্যার, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম, তাবারানী ফিল আওসাত, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ফিস সুনান) সাঈদ ইবনে ইয়ায স্পষ্ট নাম উল্লেখ না করেই প্রায় এ একই বক্তব্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তার অর্থ হচ্ছে, তিনি বিভিন্ন সাহাবী থেকে একথা শুনেছেন। (ইবনে জারীর ও ইবনে আবী শাইবা) দাইলামী, ইবনে আসাকির ও আবু নু'আইম হযরত আবু হুরাইরার একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এ আয়াতের ব্যাখ্যা করে বলেছেন, এ থেকে কুড়াল, বালতি এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিস বুঝানো হয়েছে। এ হাদীসটি যদি সহীহ হয়ে থাকে, তাহলে সম্ভবত এটি অন্য লোকেরা জানতেন না। জানলে এরপর কখনো তারা এর অন্য কোন ব্যাখ্যা করতেন না।

মূলত মাউন ছোট ও সামান্য পরিমাণ জিনিসকে বলা হয়। এমন ধরনের জিনিস যা লোকদের কোন কাজে লাগে বা এর থেকে তারা ফায়দা অর্জন করতে পারে। এ অর্থে যাকাতও মাউন। কারণ বিপুল পরিমাণ সম্পদের মধ্য থেকে সামান্য পরিমাণ সম্পদ যাকাত হিসেবে গরীবদের সাহায্য করার জন্য দেয়া হয়। আর এই সংগে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং তাঁর সমমনা লোকেরা অন্যান্য যেসব নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলোও মাউন। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, সাধারণত প্রতিবেশীরা একজন আর একজনের কাছ থেকে দৈনন্দিন যেসব জিনিস চেয়ে নিতে থাকে সেগুলোই মাউনের অন্তরভুক্ত। এ জিনিসগুলো অন্যের কাছ থেকে চেয়ে নেয়া কোন আপমানজনক বিষয় নয়। কারণ ধনী-গরীব সবার এ জিনিসগুলো কোন না কোন সময় দরকার হয়। অবশ্যি এ ধরনের জিনিস অন্যকে দেবার ব্যাপারে কার্পণ্য করা হীন মনোবৃত্তির পরিচায়ক। সাধারণত এ পর্যায়ের জিনিসগুলো অপরিবর্তিত থেকে যায় এবং প্রতিবেশীরা নিজেদের কাজে সেগুলো ব্যবহার করে, কাজ শেষ হয়ে গেলে অবিকৃত অবস্থায়ই তা ফেরত দেয়। কারো বাড়িতে মেহমান এলে প্রতিবেশীর কাছে খাটিয়া বা বিছানা-বালিশ চাওয়াও এ মাউনের অন্তরভুক্ত। অথবা নিজের প্রতিবেশীর চূলায় একটু রান্নাবান্না করে নেয়ার অনুমতি চাওয়া কিংবা কেউ কিছুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছে এবং নিজের কোন মূল্যবান জিনিস অন্যের কাছে হেফাজত সহকারে রাখতে চাওয়াও মাউনের পর্যায়ভুক্ত। কাজেই এখানে আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে, আখেরাত অস্বীকৃতি মানুষকে এতবেশী সংকীর্ণমনা করে দেয় যে, সে অন্যের জন্যে সামান্যতম ত্যাগ স্বীকার করতেও রাজি হয় না।

আল কাউসার

১০৮

নামকরণ

اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ এ বাক্যের মধ্য থেকে 'আল কাওসার' শব্দটিকে এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

ইবনে মারদুইয়া, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এটি মক্কী সূরা। কাল্‌বী ও মুকাতিল একে মক্কী বলেন। অধিকাংশ তাফসীরকারও এ মত পোষণ করেন। কিন্তু হযরত হাসান বসরী, ইকরামা, মুজাহিদ ও কাতাদাহ একে মাদানী বলেন। ইমাম সুয়ূতী তাঁর ইতকান গ্রন্থে এ বক্তব্যকেই সঠিক গণ্য করেছেন। ইমাম মুসলিমও তাঁর শারহে মুসলিম গ্রন্থে এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এর কারণ হচ্ছে ইমাম আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে আবী শাইবা, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ইত্যাদি মুহাদ্দিসগণের হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি। এ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। এ সময় তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি মুচকি হাসতে হাসতে তাঁর মাথা উঠালেন। কোন কোন রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি মুচকি হাসছেন কেন? আবার কোন কোন রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, তিনি নিজেই লোকদের বললেন ঃ এখনি আমার ওপর একটি সূরা নাযিল হয়েছে। তারপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে তিনি সূরা আল কাওসারটি পড়লেন। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, জানো কাওসার কি? সাহাবীরা বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। বললেন ঃ সেটি একটি নহর। আমার রব আমাকে জান্নাতে সেটি দান করেছেন। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসছে সামনের দিকে আল কাওসারের ব্যাখ্যা প্রসংগে।) এ হাদীসটির ভিত্তিতে এ সূরাটিকে মাদানী বলার কারণ হচ্ছে এই যে, হযরত আনাস (রা) মক্কায় নয় বরং মদীনায় ছিলেন। এ সূরাটির মাদানী হবার প্রমাণ হচ্ছে এই যে, তিনি বলেছেন, তাঁর উপস্থিতিতেই এ সূরাটি নাযিল হয়।

কিন্তু প্রথমত এটা হযরত আনাস (রা) থেকেই ইমাম আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি ও ইবনে জারীর রেওয়ায়াত করেছেন যে, জান্নাতের এ নহরটি (কাওসার), রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মি'রাজে দেখানো হয়েছিল। আর সবাই জানেন মি'রাজ মক্কায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল হিজরাতের আগে। দ্বিতীয়ত মি'রাজে যেখানে মহান আল্লাহ তাঁর রসূলকে কেবলমাত্র এটি দান করারই খবর দেননি বরং এটিকে তাঁকে দেখিয়েও দিয়েছিলেন সেখানে আবার তাঁকে এর সুসংবাদ দেবার জন্য মদীনা তাইয়েবায় সূরা কাওসার নাযিল করার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। তৃতীয়ত

যদি হযরত আনাসের উপরোল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সাহাবীগণের একটি সমাবেশে সূরা কাওসার নাযিল হবার খবর দিয়ে থাকেন এবং তার অর্থ এ হয়ে থাকে যে, প্রথমবার এ সূরাটি নাযিল হলো, তাহলে হযরত আয়েশা (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের মতো সতর্ক সাহাবীগণের পক্ষে কিভাবে এ সূরাটিকে মক্কী গণ্য করা সম্ভব? অন্যদিকে মুফাস্‌সিরগণের অধিকাংশই বা কেমন করে একে মক্কী বলেন? এ ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে হযরত আনাসের রেওয়ায়াতের মধ্যে একটি ফাঁক রয়েছে বলে পরিষ্কার মনে হয়। যে মজলিসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেছিলেন সেখানে আগে থেকে কি কথাবার্তা চলছিল তার কোন বিস্তারিত বিবরণ তাতে নেই। সম্ভবত সে সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন ব্যাপারে কিছু বলছিলেন। এমন সময় অহীর মাধ্যমে তাঁকে জানানো হলো, সূরা কাওসারে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারটির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। আর তখন তিনি একথাটি এভাবে বলেছেন ঃ আমার প্রতি এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা কয়েকবার ঘটেছে। তাই মুফাস্‌সিরগণ কোন কোন আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, সেগুলো দু'বার নাযিল হয়েছে। এ দ্বিতীয়বার নাযিল হবার অর্থ হচ্ছে, আয়াত তো আগেই নাযিল হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয়বার কোন সময় অহীর মাধ্যমে নবীর (সা) দৃষ্টি এ আয়াতের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়ে থাকবে। এ ধরনের রেওয়ায়াতে কোন আয়াতের নাযিল হবার কথা উল্লেখ থাকাটা তার মক্কী বা মাদানী হবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট নয়।

হযরত আনাসের এ রেওয়ায়াতটি যদি সন্দেহ সৃষ্টি করার কারণ না হয় তাহলে সূরা কাওসারের সমগ্র বক্তব্যই তার মক্কা মু'আয্‌যমায় নাযিল হবার সাক্ষ পেশ করে। এমন এক সময় নাযিল হওয়ার সাক্ষ পেশ করে যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত কঠিন হতাশা ব্যঞ্জক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

ইতিপূর্বে সূরা দুহা ও সূরা আলাম নাশরাহ-এ দেখা গেছে, নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সবচেয়ে কঠিন সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন, সমগ্র জাতি তাঁর সাথে শত্রুতা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল, বাধার বিরাট পাহাড়গুলো তাঁর পথে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, চতুর্দিকে প্রবল বিরোধিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ও তাঁর মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাথী বহুদূর পর্যন্ত কোথাও সাফল্যের কোন আলামত দেখতে পাচ্ছিলেন না। তখন তাঁকে সান্ত্বনা দেবার ও তাঁর মনে সাহস সঞ্চারের জন্য মহান আল্লাহ বহু আয়াত নাযিল করেন এর মধ্যে সূরা দুহায় তিনি বলেন ঃ

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

"আর অবশ্যি তোমার জন্য পরবর্তী যুগ (অর্থাৎ প্রত্যেক যুগের পরের যুগ) পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে ভালো এবং শীঘ্রই তোমার রব তোমাকে এমনসব কিছু দেবেন যাতে তুমি খুশী হয়ে যাবে।"

অন্যদিকে আলাম নাশরাহে বলেন ঃ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ "আর আমি তোমার আওয়াজ বুলন্দ করে দিয়েছি।" অর্থাৎ শত্রু সারা দেশে তোমার দুর্নাম ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু তাদের ইহার বিরুদ্ধে আমি তোমার নাম উজ্জ্বল করার এবং তোমাকে সুখ্যাতি দান করার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এই সাথে আরো বলেন ঃ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا "কাজেই, প্রকৃতপক্ষে সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও আছে। নিশ্চিন্তভাবেই সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও আছে।" অর্থাৎ বর্তমানে কঠিন অবস্থা দেখে পেরেশান হয়ো না। শীঘ্রই এ দুখের দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। সাফল্যের যুগ এই তো শুরু হয়ে যাচ্ছে।

এমনি এক অবস্থা ও পরিস্থিতিতে সূরা কাওসার নাযিল করে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দান করেন এবং তাঁর শত্রুদেরকে ধ্বংস করে দেবার ভবিষ্যদ্বাণীও শুনিয়ে দেন। কুরাইশ বংশীয় কাফেররা বলতো, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমগ্র জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তার অবস্থা হয়ে গেছে একজন সহায় ও বান্ধবহীন ব্যক্তির মতো। ইকরামা (রা) বর্ণনা করেছেনঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন নবীর পদে অধিষ্ঠিত করা হয় এবং তিনি কুরাইশদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন তখন কুরাইশরা বলতে থাকে بتر محمد منا অর্থাৎ "মুহাম্মাদ নিজের জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এমন অবস্থায় পৌঁছে গেছে যেমন কোন গাছের শিকড় কেটে দেয়া হলে তার অবস্থা হয়। কিছুদিনের মধ্যে সেটি শুকিয়ে মাটির সাথে মিশে যায়।" (ইবনে জারীর) মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বলেন, মক্কার সরদার আস ইবনে ওয়ায়েল সাহমির সামনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা উঠলেই সে বলতো ঃ "সে তো একজন আবতার অর্থাৎ শিকড় কাটা। কোন ছেলে সন্তান নেই। মরে গেলে তার নাম নেবার মতো কেউ থাকবে না।" শিমার ইবনে আতীয়্যার বর্ণনা মতে উকবা ইবনে আবু মু'আইতও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এমনি ধরনের কথা বলতো। (ইবনে জারীর) ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনা মতে, একবার কাব ইবনে আশরাফ (মদীনার ইহুদি সরদার) মক্কায় আসে। কুরাইশ সরদাররা তাকে বলে ঃ

أَلَا تَرَى إِلَى هٰذَا الصُّنْبُرِ الْمُنْبَتِرِ مِنْ قَوْمِهِ يَزْعَمُ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنَّا وَنَحْنُ أَهْلُ الْحَجِيْجِ وَأَهْلُ السِّدَانَةِ وَأَهْلُ السِّقَايَةِ -

"এ ছেলেটির ব্যাপার-স্যাপার দেখো। সে তার জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সে মনে করে, সে আমাদের থেকে ভালো। অথচ আমরা হজ্জের ব্যবস্থাপনা করি, হাজীদের সেবা করি ও তাদের পানি পান করাই।" (বাযযার)

এ ঘটনাটি সম্পর্কে ইকরামা বলেন, কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে الصنبور النبتر من قومة বলে অভিহিত করতো। অর্থাৎ "তিনি এক অসহায়, বন্ধু-বান্ধবহীন, দুর্বল ও নিসন্তান ব্যক্তি এবং নিজের জাতি থেকেও তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।" (ইবনে জারীর) ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকিরের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে বড় ছেলের নাম ছিল কাসেম (রা) তার ছোট ছিলেন হযরত যয়নব(রা)। তার

ছোট ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ (রা)। তারপর জন্ম নেয় যথাক্রমে তিন কন্যা; হযরত উম্মে কুলসুম (রা), হযরত ফাতেমা (রা) ও হযরত রুকাইয়া (রা)। এদের মধ্যে সর্ব প্রথম মারা যান হযরত কাসেম। তারপর মারা যান হযরত আবদুল্লাহ। এ অবস্থা দেখে আস ইবনে ওয়ায়েল বলে, "তার বংশই খতম হয়ে গেছে। এখন সে আবতার (অর্থাৎ তার শিকড় কেটে গেছে)। কোন কোন রেওয়ায়াতে আরো একটু বাড়িয়ে আসের এই বক্তব্য এসেছে ঃ

اِنَّ مُحَمَّدًا اَبْتَرُ لَا اِبْنَ لَهُ يَقُوْمُ مَقَامَهُ بَعْدَهُ فَاِذَا مَاتَ اِنْقَطَعَ ذِكْرُهُ وَاسْتَرَحْتُمْ مِنْهُ –

"মুহাম্মাদ একজন শিকড় কাটা। তার কোন ছেলে নেই, যে তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। সে মরে গেলে দুনিয়া থেকে তার নাম মিটে যাবে। আর তখন তোমরা তার হাত থেকে নিস্তার পাবে।"

আবদ ইবনে হুমাইদ ইবনে আব্বাসের যে রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন, তা থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর আবু জেহেলও এই ধরনের কথা বলেছিল। ইবনে আবী হাতেম শিমার ইবনে আতীয়াহ থেকে রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শোকে আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে উকবা ইবনে আবী মু'আইতও এই ধরনের হীন মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়। আতা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বিতীয় পুত্রের ইন্তিকালের পর তাঁর চাচা আবু লাহাব (তার ঘর ছিল রসূলের ঘরের সাথে লাগোয়া) দৌড়ে মুশরিকদের কাছে চলে যায় এবং তাদের এই "সুখবর" দেয় ঃ بَتِرَ مُحَمَّدٌ اللَّيْلَةَ অর্থাৎ রাতে মুহাম্মাদ সন্তানহারা হয়ে গেছে অথবা তার শিকড় কেটে গেছে।"

এ ধরনের চরম হতাশাব্যাঞ্জক পরিস্থিতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সূরা কাউসার নাযিল করা হয়। তিনি কেবল আল্লাহর বন্দেগী করতেন এবং আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করাকে প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এ কারণে কুরাইশরা ছিল তাঁর প্রতি বিরূপ। এ জন্যই নবুওয়াতলাভের আগে সমগ্র জাতির মধ্যে তাঁর যে মর্যাদা ছিল নবুওয়াতলাভের পর তা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। তাঁকে এক রকম জ্ঞাতি–গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিল। তাঁর সংগী-সাথী ছিলেন মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক। তাঁরাও ছিলেন বন্ধু–বান্ধব ও সহায়–সম্বলহীন। তাঁরাও জুলুম–নিপীড়ন সহ্য করে চলছিলেন। এই সাথে তাঁর একের পর এক সন্তানের মৃত্যুতে তাঁর ওপর যেন দুঃখ ও শোকের পাহাড় ভেঙে পড়েছিল। এ সময় আত্মীয়–স্বজন জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও প্রতিবেশীদের পক্ষ থেকে সহানুভূতি প্রকাশ ও সান্ত্বনাবাণী শুনাবার পরিবর্তে আনন্দ উচ্ছ্বাস করা হচ্ছিল। এমন একজন লোক যিনি শুধু আপন লোকদের সাথেই নয়, অপরিচিত ও অনাত্মীয়দের সাথেও সবসময় পরম প্রীতিপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল ব্যবহার করছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে এ ধরনের বিভিন্ন অপ্রীতিকর কথা ও আচরণ তাঁর মন ভেঙে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল। এ অবস্থায় এ ছোট্ট সূরাটির একটি বাক্যে আল্লাহ তাঁকে এমন একটি সুখবর দিয়েছেন যার চাইতে বড় সুখবর দুনিয়ার কোন মানুষকে কোন দিন দেয়া হয়নি। এই সংগে তাঁকে এ সিদ্ধান্তও শুনিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাঁর বিরোধিতাকারীদেরই শিকড় কেটে যাবে।

আয়াত ৩ **সূরা আল কাউসার-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝٣

(হে নবী!) আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি।[১] কাজেই তুমি নিজের রবেরই জন্য নামায পড়ো ও কুরবানী করো।[২] তোমার দুশমনই[৩] শিকড় কাটা।[৪]

১. কাউসার শব্দটি এখানে যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তাতে আমাদের ভাষায় তো দূরের কথা দুনিয়ার কোন ভাষায়ও এক শব্দে এর পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ শব্দটি মূলে কাসরাত। كثرة থেকে বিপুল ও অত্যধিক পরিমাণ বুঝাবার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, সীমাহীন আধিক্য। কিন্তু যে অবস্থায় ও পরিবেশে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাতে শুধুমাত্র আধিক্য নয় বরং কল্যাণ ও নিয়ামতের আধিক্য এবং এমন ধরনের আধিক্যের ধারণা পাওয়া যায় যা বাহুল্য ও প্রাচুর্যের সীমান্তে পৌঁছে গেছে। আর এর অর্থ কোন একটি কল্যাণ বা নিয়ামত নয় বরং অসংখ্য কল্যাণ ও নিয়ামতের আধিক্য। ভূমিকায় আমি এ সূরার যে প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছি তার ওপর আর একবার দৃষ্টি বুলানো প্রয়োজন। তখন এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। শত্রুরা মনে করছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবদিক দিয়ে ধ্বংস হয়ে গেছেন। জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বন্ধু-বান্ধব ও সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়েছেন। ব্যবসা ধ্বংস হয়ে গেছে। বংশে বাতি জ্বালাবার জন্য যে ছেলে সন্তান ছিল, সেও মারা গেছে। আবার তিনি এমন দাওয়াত নিয়ে ময়দানে নেমেছেন যার ফলে হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া মক্কা তো দূরের কথা সারা আরব দেশের কোন একটি লোকও তাঁর কথায় কান দিতে প্রস্তুত নয়। কাজেই তাঁর ভাগ্যের লিখন হচ্ছে জীবিত অবস্থায় ব্যর্থতা এবং মারা যাবার পরে দুনিয়ায় তাঁর নাম উচ্চারণ করার মতো একজন লোকও থাকবে না। এ অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন বলা হলো, তোমাকে কাওসার দান করেছি তখন স্বাভাবিকভাবে এর মানে দাঁড়ালো ঃ তোমার শত্রুপক্ষীয় নির্বোধরা মনে করছে তুমি ধ্বংস হয়ে গেছো এবং নবুওয়াত লাভের পূর্বে তুমি যে নিয়ামত অর্জন করেছিলে তা তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি তোমাকে সীমাহীন কল্যাণ ও অসংখ্য নিয়ামত দান করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে নজিরবিহীন উন্নত নৈতিক গুণাবলী দান করা হয়েছিল সেগুলোও এর অন্তরভুক্ত। তাঁকে যে নবুওয়াত, কুরআন এবং জ্ঞান ও তা প্রয়োগ

করার মতো বুদ্ধিবৃত্তির নিয়ামত দান করা হয়েছিল তাও এর মধ্যে শামিল। তাওহীদ ও এমন ধরনের একটি জীবন ব্যবস্থার নিয়ামত এর অন্তরভুক্ত যার সহজ, সরল, সহজবোধ্য, বুদ্ধি ও প্রকৃতির অনুসারী এবং পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন মূলনীতি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার এবং হামেশা ছড়িয়ে পড়তে থাকার ক্ষমতা রাখে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনা ব্যাপকতর করার নিয়ামতও এর অন্তরভুক্ত যার বদৌলতে তাঁর নাম চৌদ্দশো বছর থেকে দুনিয়ার সর্বত্র বুলন্দ হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বুলন্দ হতে থাকবে। তাঁর আহবানে অবশেষে এমন একটি বিশ্বব্যাপী উম্মাতের উদ্ভব হয়েছে, যারা দুনিয়ায় চিরকালের জন্যে আল্লাহর সত্য দীনের ধারক হয়েছে, যাদের চাইতে বেশী সৎ, নিষ্কলুষ ও উন্নত চরিত্রের মানুষ দুনিয়ার কোন উম্মাতের মধ্যে কখনো জন্ম লাভ করেনি এবং বিকৃতির অবস্থায় পৌঁছেও যারা নিজেদের মধ্যে দুনিয়ার সব জাতির চাইতেও বেশী কল্যাণ ও নেকীর গুণাবলী বহন করে চলছে। এ নিয়ামতটিও এর অন্তরভুক্ত।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের চোখে নিজের জীবদ্দশায় নিজের দাওয়াতকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে উঠতে দেখেছেন এবং তাঁর হাতে এমন জামায়াত তৈরি হয়েছে যারা সারা দুনিয়ার ওপর ছেয়ে যাবার ক্ষমতা রাখতো, এ নিয়ামতটিও এর অন্তরভুক্ত। ছেলে সন্তান থেকে বঞ্চিত হবার পর শত্রুরা মনে করতো তাঁর নাম-নিশানা দুনিয়া থেকে মিটে যাবে। কিন্তু আল্লাহ শুধু মুসলমানদের আকারে তাঁকে এমন ধরনের আধ্যাত্মিক সন্তান দিয়েই ক্ষান্ত হননি যারা কিয়ামত পর্যন্ত সারা দুনিয়ায় তাঁর নাম বুলন্দ করতে থাকবে বরং তাঁকে শুধুমাত্র একটি কন্যা হযরত ফতেমার মাধ্যমে এত বিপুল পরিমাণ রক্তমাংসের সন্তান দান করেছেন যারা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং মহান নবীর সাথে সম্পর্কই যাদের সবচেয়ে বড় অহংকার। এটিও এ নিয়ামতের অন্তরভুক্ত।

নিয়ামতগুলো আল্লাহ তাঁর নবীকে এ মরজগতেই দান করেছেন। কত বিপুল পরিমাণে দান করেছেন তা লোকেরা দেখেছে। এগুলো ছাড়াও কাউসার বলতে আরো দু'টো মহান ও বিশাল নিয়ামত বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তাঁকে আখেরাতে দান করবেন। সেগুলো সম্পর্কে জানার কোন মাধ্যম আমাদের কাছে ছিল না। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সেগুলো সম্পর্কে জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ কাউসার বলতে দু'টি জিনিস বুঝানো হয়েছে। একটি হচ্ছে "হাউজে কাউসার" এটি কিয়ামতের ময়দানে তাঁকে দান করা হবে। আর দ্বিতীয়টি "কাউসার ঝরণাধারা।" এটি জান্নাতে তাঁকে দান করা হবে। এ দু'টির ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এত বেশী হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং এত বিপুল সংখ্যক রাবী এ হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন যার ফলে এগুলোর নির্ভুল হবার ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ নেই।

হাউজে কাউসার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নরূপ তথ্য পরিবেশন করেছেন ঃ

এক ঃ এ হাউজটি কিয়ামতের দিন তাঁকে দেয়া হবে। এমন এক কঠিন সময়ে এটি তাঁকে দেয়া হবে যখন সবাই 'আল আতশ' 'আল আতশ' অর্থাৎ পিপাসা, পিপাসা বলে চিৎকার করতে থাকবে সে সময় তাঁর উম্মাত তাঁর কাছে এ হাউজের চারদিকে সমবেত হবে এবং এর পানি পান করবে। তিনি সবার আগে সেখানে পৌঁছবেন এবং তার মাঝ বরাবর জায়গায় বসে থাকবেন। তাঁর উক্তি ঃ هو حوض ترد عليه امتى يوم القيامة

"সেটি একটি হাউজ। আমার উম্মাত কিয়ামতের দিন তার কাছে থাকবে।" (মুসলিম, কিতাবুস সালাত এবং আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ) انا فرطكم على الحوض "আমি তোমাদের সবার আগে সেখানে পৌঁছে যাবো।" (বুখারী, কিতাবুর রিকাক ও কিতাবুল ফিতান, মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল ও কিতাবুত তাহারাত, ইবনে মাজাহ, কিতাবুল মানাসিক ও কিতাবুয যুহদ এবং মুসনাদে আহমাদ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত রেওয়ায়াতসমূহ)।

اِنِّىْ فَرَطٌ لَكُمْ وَاَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ لَاَنْظُرُ اِلٰى حَوْضِىْ الْاٰنَ

"আমি তোমাদের আগে পৌঁছে যাবো, তোমাদের জন্য সাক্ষ দেবো এবং আল্লাহর কসম, আমি এ মুহূর্তে আমার হাউজ দেখতে পাচ্ছি। (বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, কিতাবুল মাগাযী ও কিতাবুর রিকাক)।

আনসারদেরকে সম্বোধন করে একবার তিনি বলেন ঃ

اِنَّكُمْ سَتُلْقَوْنَ بَعْدِىْ اَثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِىْ عَلَى الْحَوْضِ

"আমার পরে তোমরা স্বার্থবাদিতা ও স্বজনপ্রীতির পাল্লায় পড়বে। তখন তার ওপর সবর করবে, আমার সাথে হাউজে কাউসারে এসে মিলিত হওয়া পর্যন্ত।" (বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার ও কিতাবুল মাগাযী, মুসলিম, কিতাবুল আমারাহ এবং তিরমিযী কিতাবুল ফিতান।

انا يوم القيمة عند عقر الحوض "কিয়ামতের দিন আমি হাউজের মাঝ বরাবর থাকবো।" (মুসলিম কিতাবুল ফাজায়েল) হযরত আবু বারযাহ আসলামীকে (রা) জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি হাউজ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কিছু শুনেছেন? তিনি বলেন, "একবার নয়, দু'বার নয়, তিনবার নয়, চারবার নয়, পাঁচবার নয়, বারবার শুনেছি। যে ব্যক্তি একে মিথ্যা বলবে আল্লাহ তাকে যেন তার পানি পান না করান।" (আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ)। উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ হাউজ সম্পর্কিত রেওয়ায়াত মিথ্যা মনে করতো। এমন কি সে হযরত আবু বারযাহ আসলামী (রা), বারাআ ইবনে আযেব (রা) ও আয়েদ ইবনে আমর (রা) বর্ণিত রেওয়ায়াতগুলো অস্বীকার করলো। শেষে আবু সাবরাহ একটি লিপি বের করে আনলেন। এ লিপিটি তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসের (রা) মুখে শুনে লিখে রেখেছিলেন। তাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামের এ বাণী লেখা ছিল ঃ الا ان موعد كم حوضى "জেনে রাখো, আমার ও তোমাদের সাক্ষাতের স্থান হচ্ছে আমার হাউজ।" (মুসনাদে আহমাদ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসের রেওয়ায়াতসমূহ)।

দুই ঃ এ হাউজের আয়তন সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা এসেছে। তবে অধিকাংশ রেওয়ায়াতে বলা হয়েছেঃ এটি আইলা (ইসরাঈলের বর্তমান বন্দর আইলাত) থেকে ইয়ামনের সান'আ পর্যন্ত অথবা আইলা থেকে এডেন পর্যন্ত কিংবা আম্মান থেকে এডেন পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। আর এটি চওড়া হবে আইলা থেকে হুজকাহ (জেদ্দা ও রাবেগের মাঝখানে একটি স্থান) পর্যন্ত জায়গার সমপরিমাণ। (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, আবু দাউদ

তায়ালাসী ৯৯৫ হাদীস, মুসনাদে আহমাদ, আবু বকর সিদ্দীক ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বর্ণিত রেওয়ায়াতসমূহ, মুসলিম–কিতাবুত তাহারাত ও কিতাবুল ফাজায়েল, তিরমিযি—আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ এবং ইবনে মাজাহ–কিতাবুয যুহুদ।)। এ থেকে অনুমান করা যায়, বর্তমান লোহিত সাগরটিকেই কিয়ামতের দিন হাউজে কাউসারে পরিবর্তিত করে দেয়া হবে। তবে আসল ব্যাপার একমাত্র আল্লাহই ভালো জানে।

তিন ঃ এ হাউজটি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের কাউসার ঝরণাধারা (সামনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) থেকে পানি এনে এতে ঢালা হবে। একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ يشخب فيه ميزابان من الجنة এবং অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ يعت فيه ميزا بان يمدانه من الجنة অর্থাৎ জান্নাত থেকে দু'টি খাল কেটে এনে তাতে ফেলা হবে এবং এর সাহায্যে সেখান থেকে তাতে পানি সরবরাহ হবে। (মুসলিম কিতাবুল ফাজায়েল) অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ يفتح نهر من الكوثر الى الحوض অর্থাৎ জান্নাতের কাওসার ঝরণাধারা থেকে একটি নহর এ হাউজের দিকে খুলে দেয়া হবে এবং তার সাহায্যে এতে পানি সরবরাহ জারী থাকবে (মুসনাদে আহমাদ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণিত রেওয়ায়াতসমূহ)।

চার ঃ হাউজে কাউসারের অবস্থা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, তার পানি হবে দুধের চাইতে (কোন কোন রেওয়ায়াত অনুযায়ী রূপার চাইতে আবার কোন কোন রেওয়ায়াত অনুযায়ী বরফের চাইতে) বেশী সাদা, বরফের চাইতে বেশী ঠাণ্ডা এবং মধুর চাইতে বেশী মিষ্টি। তার তলদেশের মাটি হবে মিশকের চাইতে বেশী সুগন্ধিযুক্ত। আকাশে যত তারা আছে ততটি সোরাহী তার পাশে রাখা থাকবে। তার পানি একবার পান করার পর দ্বিতীয়বার কারো পিপাসা লাগবে না। আর তার পানি যে একবার পান করেনি তার পিপাসা কোনদিন মিটবে না। সামান্য শাব্দিক হেরফেরসহ একথাগুলোই অসংখ্য হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। (বুখারী–কিতাবুর রিকাক, মুসলিম–কিতাবুত তাহারাত ও কিতাবুল ফাজায়েল, মুসনাদে আহমাদ–ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আস বর্ণিত রেওয়ায়াত সমূহ, তিরমিযী–আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ, ইবনে মাজাহ–কিতাবুয যুহোদ এবং আবু দাউদ আত তায়ালাসী, ৯৯৫ ও ২১৩৫ হাদীস।

পাঁচ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার তাঁর সময়ের লোকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, আমার পরে তোমাদের মধ্য থেকে যারাই আমার তরিকা পদ্ধতি পরিবর্তন করবে তাদেরকে এ হাউজের কাছ থেকে হটিয়ে দেয়া হবে এবং এর পানির কাছে তাদের আসতে দেয়া হবে না। আমি বলবো, এরা আমার লোক। জবাবে আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না আপনার পরে এরা কি করেছে। তখন আমিও তাদেরকে তাড়িয়ে দেবো। আমি বলবো, দূর হয়ে যাও। এ বক্তব্যটিও অসংখ্য হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। (বুখারী—কিতাবুল ফিতান ও কিতাবুর রিকাক, মুসলিম—কিতাবুত তাহারাত ও কিতাবুল ফাজায়েল, মুসনাদে আহমাদ—ইবনে মাসউদ ও আবু হুরাইরা বর্ণিত হাদীসসমূহ, ইবনে মাজাহ—কিতাবুল মানাসিক।) ইবনে মাজাহ এ ব্যাপারে যে

হাদীস উদ্ধৃত করেছেন তার শব্দগুলো বড়ই হৃদয়স্পর্শী। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلاَ وَاِنِّىْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَاُكَاثِرُ بِكُمُ الْاُمَمَ فَلاَ تَسْوَدُّوْا وَجْهِىْ اَلاَ وَاِنِّى مُسْتَنْقِذٌ اُنَاسًا وَمُسْتَنْقَذٌ اُنَاسٌ مِنِّىْ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ اَصْحَابِىْ فَيَقُوْلُ اِنَّكَ لاَتَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ –

"সাবধান হয়ে যাও! আমি তোমাদের আগে হাউজে উপস্থিত থাকবো। তোমাদের মাধ্যমে অন্য উম্মাতদের মোকাবিলায় আমি নিজের উম্মাতের বিপুল সংখ্যার জন্য গর্ব করতে থাকবো। সে সময় আমার মুখে কালিমা লেপন করো না। সাবধান হয়ে যাও! কিছু লোককে আমি ছাড়িয়ে নেবো আর কিছু লোককে আমার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নেয়া হবে। আমি বলবো, হে আমার রব! এরা তো আমার সাহাবী। তিনি বলবেন, তুমি জানো না, তোমার পরে এরা কী অভিনব কাজ কারবার করেছে।" ইবনে মাজার বক্তব্য হচ্ছে, এ শব্দগুলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আরাফাত ময়দানের ভাষণে বলেছিলেন।

ছয় ঃ এভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পর থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সময় কালের সমগ্র মুসলিম মিল্লাতকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্য থেকে যারাই আমার পথ থেকে সরে গিয়ে অন্য পথে চলবে এবং তার মধ্যে রদবদল করবে তাদেরকে এ হাউজের কাছ থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। আমি বলবো ঃ হে আমার রব! এরা তো আমার উম্মাতের লোক। জবাবে বলা হবে ঃ আপনি জানেন না, আপনার পরে এরা কি কি পরিবর্তন করেছিল এবং আপনার পথের উল্টোদিকে চলে গিয়েছিল। তখন আমিও তাদেরকে দূর করে দেবো। এবং তাদেরকে হাউজের ধারে কাছে ঘেঁসতে দেবো না। হাদীস গ্রন্থগুলোতে এ বিষয়বস্তু সম্বলিত অসংখ্য হাদীস উল্লেখিত হয়েছে। (বুখারী—কিতাবুল মুসাকাত, কিতাবুর রিকাক ও কিতাবুল ফিতান, মুসলিম—কিতাবুত তাহারাত, কিতাবুস সালাত ও কিতাবুল ফাজায়েল, ইবনে মাজাহ—কিতাবুয যুহদ, মুসনাদে আহমাদ–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসসমূহ)।

পঞ্চাশ জনেরও বেশী সাহাবী এ হাউজ সংক্রান্ত হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন। প্রথম যুগের আলেমগণ সাধারণভাবে এটিকে হাউজে কাউসার বলেছেন। ইমাম বুখারী কিতাবুর রিকাকের শেষ অনুচ্ছেদের শিরোনাম রাখেন নিম্নোক্তভাবে ঃ بَابٌ فِى الْحَوْضِ وَقَوْلُ اللّٰهِ اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ (হাউজ অনুচ্ছেদ, আর আল্লাহ বলেছেন ঃ আমি তোমাকে কাউসার দিয়েছি)। অন্য দিকে হযরত আনাসের রেওয়ায়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউসার সম্পর্কে বলেছেন ঃ هو حوض ترد عليه امتى "সেটি একটি হাউজ। আমার উম্মাত সেখানে উপস্থিত হবে।"

জান্নাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাউসার নামে যে নহরটি দেয়া হবে সেটির উল্লেখও অসংখ্য হাদীসে পাওয়া যায়। হযরত আনাস (রা) থেকে এ সংক্রান্ত

বহু হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। সেগুলোতে তিনি বলেন (আবার কোন কোনটিতে তিনি স্পষ্টভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি হিসেবেই বর্ণনা করেন) ঃ মি'রাজে রসূলুল্লাহকে (সা) জান্নাতে সফর করানো হয়। এ সময় তিনি একটি নহর দেখেন। এ নহরের তীরদেশে ভিতর থেকে হীরা বা মুক্তার কারুকার্য করা গোলাকৃতির মেহরাবসমূহ ছিল। তার তলদেশের মাটি ছিল খাঁটি মিশকের সুগন্ধিযুক্ত। রসূলুল্লাহ (সা) জিব্রীলকে বা যে ফেরেশতা তাঁকে ভ্রমণ করিয়েছিলেন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, এটা কি? ফেরেশতা জবাব দেন, এটা কাউসার নহর। আল্লাহ আপনাকে এ নহরটি দিয়েছেন। (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, তিরমিযী, আবু দাউদ তায়ালাসী ও ইবনে জারীর। হযরত আনাস এক রেওয়ায়াতে বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, অথবা এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন ঃ কাউসার কি? তিনি জবাব দিলেন ঃ একটি নহর যা আল্লাহ আমাকে জান্নাতে দান করেছেন। এর মাটি মিশকের। এর পানি দুধের চাইতেও সাদা এবং মধুর চাইতে মিষ্টি। (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে জারীর)। মুসনাদে আহমাদের অন্য একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) নহরে কাউসারের বৈশিষ্ট বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ তার তলদেশে কাঁকরের পরিবর্তে মণিমুক্তা পড়ে আছে। ইবনে ওমর (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কাউসার জান্নাতের একটি নহর। এর তীরদেশ সোনার তৈরি এবং মণিমুক্তা ও হীরার ওপর প্রবাহিত হচ্ছে। (অর্থাৎ তার তলায় কাঁকরের পরিবর্তে মূল্যবান পাথর বিছানো আছে)। এর মাটি মিশকের চাইতে বেশী সুগন্ধিযুক্ত। পানি দুধের চাইতে বেশী সাদা। বরফের চেয়ে বেশী ঠাণ্ডা ও মধুর চেয়ে বেশী মিষ্টি। (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে আবী হাতেম, দারামী, আবু দাউদ, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া ও ইবনে আবী শাইবা)। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) একবার হযরত হামযার (রা) বাড়িতে যান। তিনি বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেহমানদারী করেন। আলাপ আলোচনা করতে করতে এক সময় তিনি বলেন, আমার স্বামী আমাকে বলেছেন, আপনাকে জান্নাতে একটি নহর দেয়া হবে। তার নাম কাউসার। তিনি বলেন ঃ "হাঁ, তার যমীন ইয়াকুত, মারজান, যবরযদ ও মতির সমন্বয়ে গঠিত। (ইবনে জারীর ও ইবনে মারদুইয়া। এ হাদীসটির সূত্র দুর্বল হলেও এ বিষয়বস্তু সম্বলিত বিপুল সংখ্যক হাদীস পাওয়া যাওয়ার কারণে এর শক্তি বেড়ে গেছে)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি এবং সাহাবা ও তাবেঈগণের অসংখ্য বক্তব্য হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। এ সবগুলোতে কাউসার বলতে জান্নাতের এ নহরই বুঝানো হয়েছে। ওপরে এ নহরের যে সব বৈশিষ্ট বর্ণিত হয়েছে এ হাদীসগুলোতেও তাই বলা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা), হযরত আয়েশা (রা), মুজাহিদ ও আবুল আলীয়ার উক্তিসমূহ মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মারদুইয়া, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী শাইবা ইত্যাদি মুহাদ্দিসগণের কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে।

২. বিভিন্ন মনীষী এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ কেউ নামায বলতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায ধরেছেন। কেউ ঈদুল আযহার নামায মনে করেছেন। আবার কেউ বলেছেন, এখানে নিছক নামাযের কথা বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে "ওয়ানহার" অর্থাৎ "নহর কর" শব্দেরও কোন কোন বিপুল মর্যাদার অধিকারী মনীষী অর্থ করেছেন, নামাযে বাম হাতের

ওপর ডান হাত রেখে তা বুকে বাঁধা। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, নামায শুরু করার সময় দুই হাত ওপরে উঠিয়ে তাকবীর বলা কেউ কেউ বলেছেন, এর মাধ্যমে নামায শুরু করার সময় রুকূ'তে যাবার সময় এবং রুকূ' থেকে উঠে রাফে ইয়াদায়েন করা বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, ঈদুল আযহার নামায পড়া এবং কুরবানী করা। কিন্তু যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এ হুকুম দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে চিন্তা করলে এর সুস্পষ্ট অর্থ এই মনে হয় ঃ "হে নবী! তোমার রব যখন তোমাকে এত বিপুল কল্যাণ দান করেছেন তখন তুমি তাঁরই জন্য নামায পড় এবং তাঁরই জন্য কুরবানী দাও।" এ হুকুমটি এমন এক পরিবেশে দেয়া হয়েছিল যখন কেবল কুরাইশ বংশীয় মুশরিকরাই নয় সমগ্র আরব দেশের মুশরিকবৃন্দ নিজেদের মনগড়া মাবুদদের পূজা করতো এবং তাদের আস্তানায় পশু বলী দিতো। কাজেই এখানে এ হুকুমের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুশরিকদের বিপরীতে তোমরা নিজেদের কর্মনীতির ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো। অর্থাৎ তোমাদের নামায হবে আল্লাহরই জন্য, কুরবানীও হবে তাঁরই জন্য। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ لَاشَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ -

"হে নবী! বলে দাও, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্ব-জাহানের রব আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। আমাকে এরই হুকুম দেয়া হয়েছে এবং আমি সর্বপ্রথম আনুগত্যের শির নত করি।" (আল আন'আম, ১৬২-১৬৩)।

ইবনে আব্বাস, আতা, মুজাহিদ, ইকরামা, হাসান বসরী, কাতাদাহ, মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল কুরাযী, যাহহাক, রাবী' ইবনে আনাস, আতাউল খোরাসানী এবং আরো অন্যান্য অনেক নেতৃস্থানীয় মুফাস্‌সির এর এ অর্থই বর্ণনা করেছেন (ইবনে কাসীর)। তবে একথা যথাস্থানে পুরোপুরি সত্য যে, রসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনা তাইয়েবায় আল্লাহর হুকুমে ঈদুল আযহার নামায পড়েন ও কুরবানীর প্রচলন করেন তখন যেহেতু ان صلاتى ونسكى আয়াতে এবং فصل لربك وانحر আয়াতে নামাযকে প্রথমে ও কুরবানীকে পরে রাখা হয়েছে তাই তিনি নিজেও এভাবেই করেন এবং মুসলমানদের এভাবে করার হুকুম দেন। অর্থাৎ এদিন প্রথমে নামায পড়বে এবং তারপর কুরবানী দেবে। এটি এ আয়াতের ব্যাখ্যা বা এর শানেনুযুল নয়। বরং সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিধানটি ইসতেমবাত তথা উদ্ভাবন করেছিলেন। আর রসূলের (সা) ইসতেমবাতও এক ধরনের ওহী।

৩. এখানে شانيك (শা-নিআকা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মূল হচ্ছে شنء (শানউন)। এর মানে এমন ধরনের বিদ্বেষ ও শত্রুতা যে কারণে একজন অন্য জনের বিরুদ্ধে অসদ্ব্যবহার করতে থাকে। কুরআন মজীদের অন্য জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا

"আর হে মুসলমানরা! কোন দলের প্রতি শত্রুতা তোমাদের যেন কোন বাড়াবাড়ি করতে উদ্বুদ্ধ না করে যার ফলে তোমরা ইনসাফ করতে সক্ষম না হও।"

কাজেই এখানে "শানিয়াকা" বলে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শত্রুতায় অন্ধ হয়ে তাঁর প্রতি দোষারোপ করে, তাঁকে গালিগালাজ করে, তাঁকে অবমাননা করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে নানান ধরনের অপবাদ দিয়ে নিজের মনের ঝাল মেটায়।

৪. هو الابتر "সেই আবতার" বলা হয়েছে। অর্থাৎ সে তোমাকে আবতার বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে নিজেই আবতার। আমি ইতিপূর্বে এ সূরার ভূমিকায় "আবতার" শব্দের কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছি। এই শব্দের মূলে রয়েছে বাতারা (بتر) এর মানে কাটা। কিন্তু এর পারিভাষিক অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। হাদীসে নামাযের যে রাকাতের সাথে অন্য কোন রাকাত পড়া হয় না তাকে বুতাইরা (بتيراء) বলা হয়। অর্থাৎ একক রাকাত। অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لاَ يَبْدَاُ فِيْهِ بِحَمْدِ اللّٰهِ فَهُوَ اَبْتَرُ

"যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহর প্রসংশাবাণী উচ্চারণ না করে শুরু করাটা আবতার।"

অর্থাৎ তার শিকড় কাটা গেছে। সে কোন প্রতিষ্ঠা ও শক্তিমত্তা লাভ করতে পারে না। অথবা তার পরিণাম ভালো নয়। ব্যর্থকাম ব্যক্তিকেও আবতার বলা হয়। যে ব্যক্তির কোন উপকার ও কল্যাণের আশা নেই এবং যার সাফল্যের সব আশা নির্মূল হয়ে গেছে তাকেও আবতার বলে। যার কোন ছেলে সন্তান নেই অথবা হয়ে মারা গেছে তার ব্যাপারেও আবতার শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কারণ তার অবর্তমানে তার নাম নেবার মতো কেউ থাকে না এবং মারা যাবার পর তার নাম-নিশানা মুছে যায়। প্রায় সমস্ত অর্থেই কুরাইশ কাফেররা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবতার বলতো। তার জবাবে আল্লাহ বলেন, হে নবী! তুমি আবতার নও বরং তোমার এ শত্রুই আবতার। এটা নিছক কোন জবাবী আক্রমণ ছিল না। বরং এটা ছিল আসলে কুরআনের বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যতবাণীর মধ্য থেকে একটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী। এটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়। যখন এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তখন লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবতার মনে করতো। তখন কেউ ধারণা করতে পারতো না যে, কুরাইশদের এ বড় বড় সরদাররা আবার কেমন করে আবতার হয়ে যাবে? তারা কেবল মক্কায়ই নয় সমগ্র দেশে খ্যাতিমান ছিল। তারা সফলকাম ছিল। তারা কেবল ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী ছিল না বরং সারা দেশে বিভিন্ন জায়গায় ছিল তাদের সহযোগী ও সাহায্যকারী দল। ব্যবসার ইজারাদার ও হজ্জের ব্যবস্থাপক হবার কারণে আরবের সকল গোত্রের সাথে ছিল তাদের সম্পর্ক। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেলো। হিজরী ৫ সনে আহযাব যুদ্ধের সময় কুরাইশরা বহু আরব ও ইহুদি গোত্র নিয়ে মদীনা আক্রমণ করলো এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবরুদ্ধ অবস্থায় শহরের চারদিক পরিখা খনন করে প্রতিরক্ষার লড়াইয়ে লিপ্ত হতে হলো। কিন্তু এর মাত্র তিন বছর পরে ৮ হিজরীতে রসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কা আক্রমণ করলেন

তখন কুরাইশদের কোন সাহায্য-সহযোগিতা দানকারী ছিল না। নিতান্ত অসহায়ের মতো তাদেরকে অস্ত্র সংবরণ করতে হলো। এরপর এক বছরের মধ্যে সমগ্র আরব দেশ ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের করতলগত। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদল এসে তাঁর হাতে বাই'আত হচ্ছিল। ওদিকে তাঁর শত্রুরা সম্পূর্ণরূপে বন্ধু-বান্ধব ও সাহায্য-সহায়হীন হয়ে পড়েছিল। তারপর তাদের নাম-নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে এমনভাবে মুছে গোলো যে, তাদের সন্তানদের কেউ আজ বেঁচে থাকলেও তাদের কেউই আজ জানে না সে আবু জেহেল আর আবু লাহাব, আস ইবনে ওয়ায়েল বা উকবা ইবনে আবী মু'আইত ইত্যাদি ইসলামের শত্রুদের সন্তান। আর কেউ জানলেও সে নিজেকে এদের সন্তান বলে পরিচয় দিতে প্রস্তুত নয়। বিপরীত পক্ষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারবর্গের ওপর আজ সারা দুনিয়ায় দরূদ পড়া হচ্ছে। কোটি কোটি মুসলমান তাঁর সাথে সম্পর্কিত হবার কারণে গর্ব করে। লাখো লাখো লোক তাঁর সাথেই নয় বরং তাঁর পরিবার-পরিজন এমন কি তাঁর সাথীদের পরিবার পরিজনের সাথেও সম্পর্কিত হওয়াকে গৌরবজনক মনে করে। এখানে কেউ সাইয়েদ, কেউ উলুবী, কেউ আব্বাসী, কেউ হাশেমী, কেউ সিদ্দিকী, কেউ ফারুকী, কেউ উসমানী, কেউ যুবাইরী এবং কেউ আনসারী। কিন্তু নামমাত্রও কোন আবু জেহেলী বা আবু লাহাবী পাওয়া যায় না। ইতিহাস প্রমাণ করেছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবতার নন বরং তাঁর শত্রুরাই আবতার।

আল কাফিরুন

১০৯

নামকরণ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ আয়াতের "আল কাফিরুন" শব্দ থেকেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত হাসান বসরী ও ইকরামা বলেন, এটি মক্কী সূরা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর বলেন, মাদানী। অন্যদিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ থেকে উভয় মতই উদ্ধৃত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা একে মক্কী ও মাদানী উভয়ই বলেন। কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে এটি মক্কী সূরা। তাছাড়া এর বিষয়বস্তুই এর মক্কী হবার কথা প্রমাণ করে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

মক্কায় এমন এক যুগ ছিল যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে কুরাইশদের মুশরিক সমাজে প্রচণ্ড বিরোধিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহকে (সা) কোন না কোন প্রকারে আপোস করতে উদ্বুদ্ধ করা যাবে বলে কুরাইশ সরদাররা মনে করতো। এ ব্যাপারে তারা তখনো নিরাশ হয়নি। এ জন্য তারা মাঝে মধ্যে তাঁর কাছে আপোসের ফরমূলা নিয়ে হাযির হতো। তিনি তার মধ্য থেকে কোন একটি প্রস্তাব মেনে নিলেই তাঁর ও তাদের মধ্যকার ঝগড়া মিটে যাবে বলে তারা মনে করতো। হাদীসে এ সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো ঃ আমরা আপনাকে এত বেশী পরিমাণ ধন–সম্পদ দেবো যার ফলে আপনি মক্কার সবচেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে যাবেন। যে মেয়েটিকে আপনি পছন্দ করবেন তার সাথে আপনার বিয়ে দিয়ে দেবো। আমরা আপনার পিছনে চলতে প্রস্তুত। আপনি শুধু আমাদের একটি কথা মেনে নেবেন—আমাদের উপাস্যদের নিন্দা করা থেকে বিরত থাকবেন। এ প্রস্তাবটি আপনার পছন্দ না হলে আমরা আর একটি প্রস্তাব পেশ করছি। এ প্রস্তাবে আপনার লাভ এবং আমাদেরও লাভ। রসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেন, সেটি কি? এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদাত করবেন এবং আমরাও এক বছর আপনার উপাস্যদের ইবাদাত করবো। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, থামো! আমি দেখি

আমার রবের পক্ষ থেকে কি হুকুম আসে।* এর ফলে অহী নাযিল হয় : قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ..... এবং এই সংগে নাযিল হয় : قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ

"ওদের বলে দাও, হে মূর্খের দল! তোমরা কি আমাকে বলছো, আল্লাহ ছাড়া আমি আর কারো ইবাদাত করবো?" ইবনে আব্বাসের (রা) অন্য একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো : "হে মুহাম্মাদ! যদি তুমি আমাদের উপাস্য মূর্তিগুলোকে চুম্বন করো তাহলে আমরা তোমার মাবুদের ইবাদাত করবো।" একথায় এই সূরাটি নাযিল হয়। (আবদ ইবনে হুমাইদ)

আবুল বখতরীর আযাদকৃত গোলাম সাঈদ ইবনে মীনা রেওয়ায়াত করেন, অলীদ ইবনে মুগীরাহ, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিব ও উমাইয়া ইবনে খালফ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করে বলে : "হে মুহাম্মাদ! এসো আমরা তোমার মাবুদদের ইবাদাত করি এবং তুমি আমাদের মাবুদদের ইবাদাত করো। আর আমাদের সমস্ত কাজে আমরা তোমাকে শরীক করে নিই। তুমি যা এনেছো তা যদি আমাদের কাছে যা আছে তার চেয়ে ভালো হয় তাহলে আমরা তোমার সাথে তাতে শরীক হবো এবং তার মধ্য থেকে নিজেদের অংশ নিয়ে নেবো। আর আমাদের কাছে যা আছে তা যদি তোমার কাছে যা আছে তার চাইতে ভালো হয়, তাহলে তুমি আমাদের সাথে তাতে শরীক হবে এবং তা থেকে নিজের অংশ নেবে।" একথায় মহান আল্লাহ এ আল কাফেরুন সূরাটি নাযিল করেন। (ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম। ইবনে হিশামও সীরাতে এ ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছেন)।

ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ রেওয়ায়াত করেন, কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, যদি আপনি পছন্দ করেন তাহলে এই বছর আমরা আপনার দীনে প্রবেশ করবো এবং এক বছর আপনি আমাদের দীনে প্রবেশ করবেন। (আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে আবী হাতেম।)

এসব রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, একবার একই মজলিসে নয় বরং বহুবার বহু মজলিসে কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এ প্রস্তাব পেশ করেছিল। এ কারণে একবার সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন জবাব দিয়ে তাদের এ আশাকে চিরতরে

* এর মানে এ নয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রস্তাবটিকে কোন পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য তো দূরের কথা প্রণিধানযোগ্য মনে করেছিলেন। এবং (নাউযুবিল্লাহ) কাফেরদেরকে এ আশায় এ জবাব দিয়েছিলেন যে, হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি গৃহীত হয়ে যাবে। বরং একথাটি আসলে ঠিক এমন পর্যায়ের ছিল যেমন কোন অধীনস্থ অফিসারের সামনে কোন অবাস্তব দাবী পেশ করা হয় এবং তিনি জানেন সরকারের পক্ষে এ ধরনের দাবী গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি নিজে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করার পরিবর্তে দাবী পেশকারীদেরকে বলেন, আমি আপনাদের আবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সেখান থেকে যা কিছু জবাব আসবে তা আপনাদের জানিয়ে দেবো। এর ফলে যে প্রতিক্রিয়াটা হয় সেটা হচ্ছে এই যে, অধীনস্থ অফিসার নিজে অস্বীকার করলে লোকেরা বরাবর পীড়াপীড়ি করতে ও চাপ দিতেই থাকবে, কিন্তু যদি তিনি জানিয়ে দেন, ওপর থেকে কর্তৃপক্ষের যে জবাব এসেছে তা তোমাদের দাবীর বিরোধী তাহলে লোকেরা হতাশ হয়ে পড়বে।

নির্মূল করে দেয়ার প্রয়োজন ছিল। কিছু দাও আর কিছু নাও—এ নীতির ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীনের ব্যাপারে তাদের সাথে কোন চুক্তি ও আপোশ করবেন না, একথা তাদেরকে জানিয়ে দেয়া একান্ত জরুরী ছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

সূরাটি উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে, আসলে ধর্মীয় উদারতার উপদেশ দেবার জন্য সূরাটি নাযিল হয়নি। যেমন আজকাল কেউ কেউ মনে করে থাকেন বরং কাফেরদের ধর্ম, পূজা অনুষ্ঠান ও তাদের উপাস্যদের থেকে পুরোপুরি দায়িত্ব মুক্তি এবং তার প্রতি অনীহা, অসন্তুষ্টি ও সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেয়া আর এই সাথে কুফরী ধর্ম ও দীন ইসলাম পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং তাদের উভয়ের মিলে যাবার কোন সম্ভাবনাই নেই, একথা ঘোষণা করে দেয়ার জন্যই এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল। যদিও শুরুতে একথাটি কুরাইশ বংশীয় কাফেরদেরকে সম্বোধন করে তাদের আপোস ফরমূলার জবাবে বলা হয়েছিল কিন্তু এটি কেবল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বরং একথাগুলোকে কুরআনের অন্তরভুক্ত করে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে কিয়ামত পর্যন্ত এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, কুফরী ধর্ম দুনিয়ার যেখানেই যে আকৃতিতে আছে তার সাথে সম্পর্কহীনতা ও দায়িত্ব মুক্তির ঘোষণা তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করা উচিত। কোন প্রকার দ্বিধা–দ্বন্দ্ব ছাড়াই তাদের একথা জানিয়ে দেয়া উচিত যে, দীনের ব্যাপারে তারা কাফেরদের সাথে কোন প্রকার আপোস বা উদারনীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। এ কারণেই যাদের কথার জবাবে এ সূরাটি নাযিল করা হয়েছিল তারা মরে শেষ হয়ে যাওয়ার পরও এটি পঠিত হতে থেকেছে। যারা এর নাযিলের সময় কাফের ও মুশরিক ছিল তারা মুসলমান হয়ে যাওয়ার পরও এটি পড়তে থেকেছে। আবার তাদের দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নেবার শত শত বছর পর আজো মুসলমানরা এটি পড়ে চলেছে। কারণ কুফরী ও কাফেরের কার্যকলাপ থেকে সম্পর্কহীনতা ও অসন্তুষ্টি ঈমানের চিরন্তন দাবী ও চাহিদা।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে এ সূরার কি গুরুত্ব ছিল, নিচে উল্লেখিত কয়েকটি হাদীস থেকে তা অনুমান করা যেতে পারে ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রেওয়ায়াত করেছেন, আমি বহুবার রসূলুল্লাহকে (সা) ফজরের নামাযের আগে ও মাগরিবের নামাযের পরে দুই রাকাতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এবং قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ পড়তে দেখিছি। (এই বিষয়বস্তু সম্বলিত বহু হাদীস সামান্য শাব্দিক হেরফের সহকারে ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান ও ইবনে মারদুইয়া ইবনে ওমর (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন)।

হযরত খাব্বাব (রা) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ যখন তুমি ঘুমুবার জন্য নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ো তখন قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ পড়ে নাও। আর রসূল (সা) নিজেও যখন বিছানায় ঘুমুবার জন্য শুয়ে পড়তেন তখন এ সূরাটি পড়ে নিতেন। এটি ছিল তাঁর রীতি। (বায়হাকী, তাবারানি ও ইবনে মারদুইয়া)।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের বলেন, আমি কি তোমাদের এমন একটি কালেমার কথা বলবো যা তোমাদের শিরক থেকে হেফাযত করবে? সেটি হচ্ছে, তোমরা শোবার সময় قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ পড়ে নাও (আবুল ইয়ালা ও তাবারানি)।

হযরত আনাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয ইবনে জাবালকে বলেন, ঘুমুবার সময় قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ পড়ো। কারণ এর মাধ্যমে শিরক থেকে সম্পর্কহীনতা সৃষ্টি হয়।

ফারওয়াহ ইবনে নওফাল ও আবদুর রহমান ইবনে নওফাল উভয়ে বর্ণনা করেছেন, তাদের পিতা নওফাল ইবনে মু'আবিয়া আল আশজায়ী (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, আমি শোবার সময় পড়তে পারি এমন একটি জিনিস আমাকে বলে দিন। জবাবে তিনি বলেন, قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ শেষ পর্যন্ত পড়ে ঘুমিয়ে পড়ো। কারণ এটি শিরক থেকে সম্পর্কহীন করে— (মুসনাদে আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে আবী শাইবা, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া ও বায়হাকী ফিশ শু'আব)। হযরত যায়েদ ইবনে হারেসার (রা) ভাই হযরত জাবালাহ ইবনে হারেসা (রা) এ ধরনের আবেদন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে করেছিলেন এবং তাকেও তিনি এ একই জবাব দিয়েছিলেন— (মুসনাদে আহমাদ ও তাবারানী)।

আয়াত ৬ | সূরা আল কাফিরুন-মক্কী | রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢ وَلَآ اَنْتُمْ
عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٣ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤ وَلَآ اَنْتُمْ
عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦

বলে দাও, হে কাফেররা![১] আমি তাদের ইবাদাত করি না যাদের ইবাদাত তোমরা করো।[২] আর না তোমরা তার ইবাদাত করো যার ইবাদাত আমি করি।[৩] আর না আমি তাদের ইবাদাত করবো যাদের ইবাদাত তোমরা করে আসছো। আর না তোমরা তার ইবাদাত করবে যার ইবাদাত আমি করি।[৪] তোমাদের দীন তোমাদের জন্য এবং আমার দীন আমার জন্য।[৫]

১. এ আয়াতে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে ভেবে দেখার মতো ঃ

(ক) যদিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুকুম দেয়া হয়েছে, তুমি কাফেরদের পরিষ্কার বলে দাও। তবুও সামনের আলোচনা জানিয়ে দিচ্ছে, পরবর্তী আয়াতগুলোতে যেসব কথা বলা হয়েছে প্রত্যেক মু'মিনের সে কথাগুলোই কাফেরদেরকে জানিয়ে দিতে হবে। এমনকি যে ব্যক্তি কুফরী থেকে তাওবা করে ঈমান এনেছে তার জন্যও কুফরী ধর্ম, তার পূজা-উপাসনা ও উপাস্যদের থেকে নিজের সম্পর্কহীনতা ও দায়মুক্তির কথা প্রকাশ করতে হবে। কাজেই 'কুল' (বলে দাও) শব্দটির মাধ্যমে প্রধানত ও প্রথমত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এ হুকুমটি বিশেষভাবে শুধু তাঁকেই করা হয়নি বরং তাঁর মাধ্যমে প্রত্যেক মু'মিনকে করা হয়েছে।

(খ) এ আয়াতে প্রতিপক্ষকে যে "কাফের" বলে সম্বোধন করা হয়েছে, এটা তাদের জন্য কোন গালি নয়। বরং আরবী ভাষায় কাফের মানে অস্বীকারকারী ও অমান্যকারী (Unbeliever)। এর মোকাবিলায় 'মু'মিন' শব্দটি বলা হয়, মেনে নেয়া ও স্বীকার করে নেয়া অর্থে (Beliver)। কাজেই আল্লাহর নির্দেশক্রমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (হে কাফেররা!) বলার অর্থই হচ্ছে এই যে, "হে লোকেরা! তোমরা যারা আমার রিসালাত ও আমার প্রদত্ত শিক্ষা মেনে নিতে অস্বীকার করছো।" অনুরূপভাবে একজন মু'মিন যখন একথা বলবে অর্থাৎ যখন সে বলবে, "হে কাফেররা!" তখন কাফের বলতে তাদেরকে বুঝানো হবে যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনেনি।

(গ) "হে কাফেররা!" বলা হয়েছে, "হে মুশরিকরা" বলা হয়নি। কাজেই এখানে কেবল মুশরিকদের উদ্দেশ্যেই বক্তব্য পেশ করা হয়নি বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যারা আল্লাহর রসূল এবং তিনি যে শিক্ষা ও হিদায়াত দিয়েছেন তাকে আল্লাহর শিক্ষা ও হিদায়াত বলে মেনে নেয় না, তারা ইহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নি উপাসক বা সারা দুনিয়ার কাফের, মুশরিক ও নাস্তিক যেই হোক না কেন, তাদের সবাইকে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে। এ সম্বোধনকে শুধুমাত্র কুরাইশ বা আরবের মুশরিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কোন কারণ নেই।

(ঘ) অস্বীকারকারীদেরকে 'হে কাফেররা' বলে সম্বোধন করা ঠিক তেমনি যেমন আমরা কিছু লোককে সম্বোধন করি "ওহে শত্রুরা" বা "ওহে বিরোধীরা" বলে। এ ধরনের সম্বোধনের ক্ষেত্রে আসলে বিরোধী ব্যক্তিরা লক্ষ্য হয় না, লক্ষ হয় তাদের বিরোধিতা ও শত্রুতা। আর এ সম্বোধন ততক্ষণের জন্য হয় যতক্ষণ তাদের মধ্যে এ গুণগুলো থাকে। যখন তাদের কেউ এ শত্রুতা ও বিরোধিতা পরিহার করে অথবা বন্ধু ও সহযোগী হয়ে যায় তখন সে আর এ সম্বোধনের লক্ষ থাকে না। অনুরূপভাবে যাদেরকে "হে কাফেররা" বলে সম্বোধন করা হয়েছে তারাও তাদের কুফরীর কারণে এ সম্বোধনের লক্ষস্থলে পরিণত হয়েছে, তাদের ব্যক্তি সত্তার কারণে নয়। তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি আমৃত্যু কাফের থাকে তার জন্য এ সম্বোধন হবে চিরন্তন। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান আনবে তার প্রতি আর এ সম্বোধন আরোপিত হবে না।

(ঙ) অনেক মুফাস্‌সিরের মতে এ সূরায় "হে কাফেররা" সম্বোধন কেবলমাত্র কুরাইশদের এমন কিছু লোককে করা হয়েছে যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দীনের ব্যাপারে সমঝোতার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল এবং যাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাঁর রসূলকে (সা) বলে দিয়েছিলেন, এরা ঈমান আনবে না। দু'টি কারণে তারা এ মত অবলম্বন করেছেন।

প্রথমত, সামনের দিকে বলা হয়েছে لَآ اَعْبُدُ مَاتَعْبُدُوْنَ (যার বা যাদের ইবাদাত তোমরা করো আমি তার বা তাদের ইবাদাত করি না)। তাদের মতে এ উক্তি ইহুদি ও খৃষ্টানদের জন্য সঠিক নয়। কেননা তারা আল্লাহর ইবাদাত করে। দ্বিতীয়ত, সামনের দিকে একথাও বলা হয়েছে ঃ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ (আর না তোমরা তার ইবাদাত করো যার ইবাদাত আমি করছি)। এ ব্যাপারে তাদের যুক্তি হচ্ছে, এ সূরা নাযিলের সময় যারা কাফের ছিল এবং পরে ঈমান আনে তাদের ব্যাপারে এ উক্তি সত্য নয়। কিন্তু এ উভয় যুক্তির কোন সারবত্তা নেই। অবশ্যি এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা আমি পরে করবো। তা থেকে জানা যাবে, এগুলোর যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। তবে এখানে এ যুক্তির গলদ স্পষ্ট করার জন্য শুধুমাত্র এতটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট মনে করি, যদি শুধুমাত্র উল্লেখিত লোকদেরকেই এ সূরায় সম্বোধন করা হয়ে থাকে তাহলে তাদের মরে শেষ হয়ে যাওয়ার পর এ সূরার তেলাওয়াত জারী থাকার কি কারণ থাকতে পারে? কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের পড়ার জন্য স্থায়ীভাবে কুরআনে এটি লিখিত থাকারই বা কি প্রয়োজন ছিল?

২. সারা দুনিয়ার কাফের মুশরিকরা যেসব উপাস্যের উপাসনা, আরাধনা ও পূজা করে, ফেরেশতা, জিন, নবী, আউলিয়া, জীবিত ও মৃত মানুষের আত্মা তথা ভূত-প্রেত, চাঁদ, সূর্য, তারা, জীব-জন্তু, গাছপালা, মাটির মূর্তি বা কাল্পনিক দেব-দেবী সবই এর

অন্তরভুক্ত। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা যেতে পারে; আরবের মুশরিকরা মহান আল্লাহকেও তো মাবুদ ও উপাস্য বলে মানতো এবং দুনিয়ার অন্যান্য মুশরিকরাও প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্তও আল্লাহর উপাস্য হবার ব্যাপারটি অস্বীকার করেনি। আর আহলি কিতাবরা তো আল্লাহকেই আসল মাবুদ বলে মানতো। এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার ব্যতিক্রমের উল্লেখ না করেই এদের সমস্ত মাবুদের ইবাদাত করা থেকে সম্পর্কহীনতা ও দায়মুক্তির কথা ঘোষণা করা, যেখানে আল্লাহও তার অন্তরভুক্ত, কিভাবে সঠিক হতে পারে? এর জবাবে বলা যায়, আল্লাহকে অন্য মাবুদদের সাথে মিশিয়ে মাবুদ সমষ্টির একজন হিসেবে যদি অন্যদের সাথে তাঁর ইবাদাত করা হয় তাহলে তাওহীদ বিশ্বাসী প্রতিটি ব্যক্তি অবশ্যি নিজেকে এ ইবাদাত থেকে দায়মুক্ত ও সম্পর্কহীন ঘোষণা করবে। কারণ তার দৃষ্টিতে আল্লাহ মাবুদ সমষ্টির একজন মাবুদ নন। বরং তিনি একাই এবং একক মাবুদ। আর এ সমষ্টির ইবাদাত আসলে আল্লাহর ইবাদাত নয়। যদিও আল্লাহর ইবাদাত এর অন্তরভুক্ত। কুরআন মজীদে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে একমাত্র সেটিই আল্লাহর ইবাদাত যার মধ্যে অন্যের ইবাদাতের কোন গন্ধও নেই এবং যার মধ্যে মানুষ নিজের বন্দেগীকে পুরোপুরি আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে।

وَمَا أُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ (البينة : ٥)

"লোকদেরকে এ ছাড়া আর কোন হুকুম দেয়া হয়নি যে, তারা পুরোপুরি একমুখী হয়ে নিজেদের দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে তাঁর ইবাদাত করবে।

কুরআনের বহু জায়গায় সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে এবং অত্যন্ত জোরালো ভাষায় এ বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন সূরা আন নিসা ১৪৫ ও ১৪৬, আল আ'রাফ ২৯, আয যুমার ২, ৩, ১১, ১৪ ও ১৫ এবং আল মু'মিন ১৪ ও ৬৪–৬৬ আয়াতসমূহ। এ বক্তব্য একটি হাদীসে কুদসীতেও উপস্থাপিত হয়েছে। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, প্রত্যেক শরীকের অংশীদারিত্ব থেকে আমি সবচেয়ে বেশী মুক্ত। যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করেছে যার মধ্যে আমার সাথে অন্য কাউকেও শরীক করেছে, তা থেকে আমি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং আমার সাথে যাকে সে ঐ কাজে শরীক করেছে, ঐ সম্পূর্ণ কাজটি তারই জন্য (মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজাহ)। কাজেই আল্লাহকে দুই, তিন বা বহু ইলাহের একজন গণ্য করা এবং তাঁর সাথে অন্যদের বন্দেগী, উপাসনা ও পূজা করাই হচ্ছে আসল কুফরী এবং এ ধরনের কুফরীর সাথে পুরোপুরি সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করাই এ সূরার উদ্দেশ্য)

৩. এখানে মূলে مَآ اَعْبُدُ বলা হয়েছে। আরবী ভাষায় مَا (মা) শব্দটি সাধারণত নিষ্প্রাণ বা বুদ্ধি-বিবেচনাহীন বস্তু বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্যদিকে বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পন্ন জীবের জন্য مَنْ (মান) শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ কারণে প্রশ্ন দেখা দেয়, এখানে مَنْ اَعْبُدُ না বলে مَا اَعْبُدُ বলা হলো কেন? মুফাস্সিরগণ সাধারণত এর চারটি জবাব দিয়ে থাকেন। এক, এখানে مَا শব্দটি مَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দুই, এখানে مَا শব্দটি اَلَّذِىْ (আললাযী) অর্থাৎ যে বা যাকে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তিন, উভয়, বাক্যেই مَا শব্দটি মূল শব্দ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এখানে এর অর্থ হয় ঃ আমি সেই ইবাদাত করি না যা তোমরা করো। অর্থাৎ মুশরিকী ইবাদাত। আর

তোমরা সেই ইবাদাত করো না যা আমি করি অর্থাৎ তাওহীদবাদী ইবাদাত। চার, প্রথম বাক্যে যেহেতু مَا تَعْبُدُوْنَ বলা হয়েছে তাই দ্বিতীয় বাক্যে বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখার খাতিরে مَا اَعْبُدُ বলা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একই শব্দ বলা হয়েছে কিন্তু এর মানে এক নয়। কুরআন মজীদে এর উদাহরণ রয়েছে। যেমন সূরা আল বাকারার ১৯৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ

"যে ব্যক্তি তোমার ওপর বাড়াবাড়ি করে তুমিও তার ওপর তেমনি বাড়াবাড়ি করো যেমন সে তোমার ওপর করেছে।"

একথা সুস্পষ্ট যে, কারো বাড়াবাড়ির জবাবে ঠিক তেমনি বাড়াবাড়িমূলক আচরণকে আসলে বাড়াবাড়ি বলে না। কিন্তু নিছক বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যেই জবাবী কার্যকলাপকে বাড়াবাড়ি শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সূরা তাওবার ৬৭ আয়াতে বলা হয়েছে نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ "তারা আল্লাহকে ভুলে গেলো কাজেই আল্লাহ তাদেরকে ভুলে গেলেন।" অথচ আল্লাহ ভোলেন না। এখানে আল্লাহর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাদেরকে উপেক্ষা করলেন। কিন্তু তাদের ভুলে যাওয়ার জবাবে আল্লাহ ভুলে যাওয়া শব্দটি নিছক বক্তব্যের মধ্যে মিল রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

এ চারটি অর্থ যদিও এক এক দৃষ্টিতে যথার্থ এবং আরবী ভাষায় এসব অর্থ গ্রহণ করার অবকাশও রয়েছে তবুও যে মূল বক্তব্যটিকে সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য مَنْ اَعْبُدُ এর জায়গায় مَا اَعْبُدُ বলা হয়েছে তা এর মধ্য থেকে কোন একটি অর্থের মাধ্যমেও পাওয়া যায় না। আসলে আরবী ভাষায় কোন ব্যক্তির জন্য مَنْ শব্দটি ব্যবহার করে তার মাধ্যমে তার ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয় এবং مَا শব্দটি ব্যবহার করে তার মাধ্যমে তার গুণগত সত্তা সম্পর্কে জানার ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়। যেমন আমাদের ভাষায় কারো সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞেস করি, ইনি কে? তখন তার ব্যক্তি সত্তার পরিচিতি লাভ করাই হয় আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করি, ইনি কি? তখন আসলে আমরা চাই তার গুণগত পরিচিতি। যেমন তিনি যদি সেনাবাহিনীর লোক হন তাহলে সেখানে তার পদমর্যাদা কি? তিনি যদি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান, তাহলে সেখানে তিনি রীডার, লেকচারার না প্রফেসর কোন পদে অধিষ্ঠিত আছেন? তিনি কোন্ বিষয়টি পড়ান? তার ডিগ্রী কি ইত্যাদি বিষয় জানাই হয় আমাদের উদ্দেশ্য। কাজেই যদি এ আয়াতে বলা হতো لَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَنْ اَعْبُدُ তাহলে এর অর্থ হতো, তোমরা সেই সত্তার ইবাদাত করবে না যার ইবাদাত আমি করছি। এর জবাবে মুশরিক ও কাফেররা বলতে পারতো ঃ আল্লাহর সত্তাকে তো আমরা মানি এবং তার ইবাদাতও করি। কিন্তু যখন বলা হলো ঃ لَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ তখন অর্থ দাঁড়ালো ঃ যেসব গুণের অধিকারী মাবুদের ইবাদাত আমি করি সেইসব গুণের অধিকারী মাবুদের ইবাদাত তোমরা করবে না। এখানে মূল বক্তব্য এটিই। এরি ভিত্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীন সব ধরনের কাফেরদের দীন থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে যায়। কারণ সব ধরনের কাফেরদের খোদা থেকে তাঁর খোদা সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের কারো খোদার ছয় দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করার পর সপ্তম দিনে বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন হয়েছে। সে বিশ্ব-জগতের প্রভু

নয় বরং ইসরাঈলের প্রভু। একটি গোষ্ঠীর লোকদের সাথে তার এমন বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে যা অন্যদের সাথে নেই। সে হযরত ইয়াকুবের সাথে কুস্তি লড়ে কিন্তু তাকে আছাড় দিতে পারে না। তার উযাইর নামক একটি ছেলেও আছে। আবার কারো খোদা হযরত ঈসা মসিহ নামক একমাত্র পুত্রের পিতা। সে অন্যদের গুণাহের কাফ্ফারা দেবার জন্য নিজের পুত্রকে ক্রুশ বিদ্ধ করায়। কারোর খোদার স্ত্রী-সন্তান আছে। কিন্তু সে বেচারার শুধু কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করে। আবার কারো খোদা মানুষের রূপ ধারণ করে অবতার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং মানুষের দেহ পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে পৃথিবীর বুকে এবং মানুষের মতো কাজ করে যাচ্ছে। কারো খোদা নিছক অনিবার্য অস্তিত্ব অথবা সকল কার্যকারণের কারণ কিংবা প্রথম কার্যকারণ (First Cause)। বিশ্ব-জগতের ব্যবস্থাপনাকে একবার সচল করে দিয়ে সে আলাদা হয়ে গেছে। তারপর বিশ্ব-জাহান ধরাবাধা আইন মুতাবেক স্বয়ং চলছে। অতপর মানুষের সাথে তার ও তার সাথে মানুষের কোন সম্পর্ক নেই। মোটকথা, খোদাকে মানে এমন সব কাফেরও আসলে ঐ আল্লাহ মানে না যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের একক স্রষ্টা, মালিক, পরিচালক, ব্যবস্থাপক ও শাসক। তিনি বিশ্ব-জাহানের এ ব্যবস্থাপনার শুধু স্রষ্টাই নন বরং তার সার্বক্ষণিক পরিচালক। তাঁর হুকুম এখানে প্রতি মুহূর্তেই চলছে। তিনি সকল প্রকার দোষ, ত্রুটি, দুর্বলতা ও ভ্রান্তি থেকে মুক্ত। তিনি সব রকমের উপমা ও সাকার সত্তা থেকে পবিত্র, নজীর, সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য মুক্ত এবং কোন সাথী, সহকারী ও অংশীদারের মুখাপেক্ষী নন। তাঁর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও মাবুদ হবার অধিকারে কেউ তাঁর সাথে শরীক নয়। তাঁর সন্তানাদি থাকা, কাউকে বিয়ে করে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার এবং কোন পরিবার বা গোষ্ঠীর সাথে কোন বিশেষ সম্পর্ক থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। প্রতিটি সত্তার সাথে রিজিকদাতা, পালনকর্তা, অনুগ্রহকারী ও ব্যবস্থাপক হিসেবে তাঁর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। তিনি প্রার্থনা শোনেন ও তার জবাব দেন। জীবন-মৃত্যু, লাভ-ক্ষতি এবং ভাগ্যের ভাঙা-গড়ার পূর্ণ ক্ষমতার তিনিই একচ্ছত্র মালিক। তিনি নিজের সৃষ্টির কেবল পালনকর্তাই নন বরং প্রত্যেককে তার মর্যাদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী হিদায়াতও দান করেন। তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক কেবল এতটুকুই নয় যে, তিনি আমাদের মাবুদ এবং আমরা তাঁর পূজা অর্চনাকারী বরং তিনি নিজের নবী ও কিতাবের সাহায্যে আমাদের আদেশ নিষেধের বিধান দান করেন এবং তাঁর বিধানের আনুগত্য করাই আমাদের কাজ। নিজেদের কাজের জন্য তাঁর কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। মৃত্যুর পর তিনি পুনর্বার আমাদের ওঠাবেন এবং আমাদের কাজকর্ম পর্যালোচনা করে পুরস্কার ও শাস্তি দেবেন। এসব গুণাবলী সম্পন্ন মাবুদের ইবাদাত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীরা ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ করছে না। অন্যেরা খোদার ইবাদাত করলেও আসল ও প্রকৃত খোদার ইবাদাত করছে না। বরং তারা নিজেদের উদ্ভাবিত কাল্পনিক খোদার ইবাদাত করছে।

৪. একদল তাফসীরকারের মতে এ বাক্য দু'টিতে প্রথম বাক্য দু'টির বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। প্রথম বাক্য দু'টিতে যা কিছু বলা হয়েছে তাকে অত্যধিক শক্তিশালী ও বেশী জোরদার করার জন্য এটা করা হয়েছে। কিন্তু অনেক মুফাস্সির একে পুনরাবৃত্তি বলে মনে করেন না। তারা বলেন, এর মধ্যে অন্য একটি কথা বলা হয়েছে। প্রথম বাক্য দু'টিতে যে কথা বলা হয়েছে তা থেকে একথার বক্তব্যই আলাদা। আমার মতে, এ বাক্য দু'টিতে আগের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি নেই, এতটুকু কথা সঠিক বলে মেনে নেয়া যায়।

কারণ এখানে শুধুমাত্র "আর না তোমরা তার ইবাদাত করবে যার ইবাদাত আমি করি" একথাটুকুর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। আর আগের বক্তব্যে একথাটি যে অর্থে বলা হয়েছিল এখানে সে অর্থে এর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। কিন্তু পুনরাবৃত্তি অস্বীকার করার পর মুফাস্‌সিরগণের এ দলটি এ দু'টি বাক্যের যে অর্থ বর্ণনা করেছেন তা পরস্পর অনেক ভিন্নধর্মী। এখানে তাদের প্রত্যেকের বর্ণিত অর্থ উল্লেখ করে তার ওপর আলোচনা করার সুযোগ নেই। আলোচনা দীর্ঘ হবার আশংকায় শুধুমাত্র আমার মতে যে অর্থটি সঠিক সেটিই এখানে বর্ণনা করলাম।

প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে ঃ "আর না আমি তাদের ইবাদাত করবো যাদের ইবাদাত তোমরা করে আসছো।" এর বক্তব্য বিষয় দ্বিতীয় আয়াতের বক্তব্য বিষয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে বলা হয়েছে ঃ "আর আমি তাদের ইবাদাত করি না যাদের ইবাদাত তোমরা করো।" এ দু'টি বক্তব্যে দু'টি দিক দিয়ে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এক, আমি অমুক কাজ করি না বা করবো না বলার মধ্যে যদিও অস্বীকৃতি ও শক্তিশালী অস্বীকৃতি রয়েছে কিন্তু আমি উমুক কাজটি করবো না একথার ওপর অনেক বেশী জোর দেয়া হয়েছে। কারণ এর অর্থ হচ্ছে, সেটা এত বেশী খারাপ কাজ যে, সেটা করা তো দূরের কথা সেটা করার ইচ্ছা পোষণ করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দুই, "যাদের ইবাদাত তোমরা করো" একথা বলতে কাফেররা বর্তমানে যেসব মাবুদদের ইবাদাত করে শুধুমাত্র তাদেরকে বুঝায়। বিপরীত পক্ষে "যাদের ইবাদাত তোমরা করেছো" বললে এমনসব মাবুদদের কথা বুঝায় যাদের ইবাদাত কাফেররা ও তাদের পূর্বপুরুষরা অতীতে করেছে। একথা সবাই জানে, মুশরিক ও কাফেরদের মাবুদদের মধ্যে হামেশা রদবদল ও কমবেশী হতে থেকেছে। বিভিন্ন যুগে কাফেরদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন মাবুদের পূজা করেছে। সবসময় ও সব জায়গায় সব কাফেরের মাবুদ কখনো এক থাকেনি। কাজেই এখানে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আমি তোমাদের শুধু আজকের মাবুদদের থেকে নয়, তোমাদের পিতৃপুরুষদের মাবুদদের থেকেও দায়মুক্ত। এ ধরনের মাবুদদের ইবাদাত করার চিন্তাও মনের মধ্যে ঠাঁই দেয়া আমার কাজ নয়।

আর দ্বিতীয় বাক্যটির ব্যাপারে বলা যায়, যদিও ৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত এ বাক্যটির শব্দাবলী ও ৩ নম্বর আয়াতের শব্দাবলী একই ধরনের তবুও এদের উভয়ের মধ্যে অর্থের বিভিন্নতা রয়েছে। তিন নম্বর আয়াত সংশ্লিষ্ট বাক্যটি নিম্নোক্ত বাক্যটির পরে এসেছে ঃ "আমি তাদের ইবাদাত করি না যাদের ইবাদাত তোমরা করো।" তাই এর অর্থ হয়, "আর না তোমরা সেই ধরনের গুণাবলী সম্পন্ন একক মাবুদের ইবাদাত করবে যার ইবাদাত আমি করি।" আর পাঁচ নম্বর আয়াতে এই সংশ্লিষ্ট বাক্যটি নিম্নোক্ত বাক্যটির পরে এসেছেঃ "আর না আমি তাদের ইবাদাত করবো যাদের ইবাদাত তোমরা করেছো।" তাই এর মানে হয়, "আর না তোমরা সেই একক মাবুদের ইবাদাত করবে বলে মনে হচ্ছে যার ইবাদাত আমি করি।" অন্য কথায়, তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের যাদের পূজা-উপাসনা করেছো তাদের পূজারী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর বহু মাবুদের বন্দেগী পরিহার করে একক মাবুদের ইবাদাত করার ব্যাপারে তোমাদের যে বিতৃষ্ণা সে কারণে তোমরা নিজেদের এ ভুল ইবাদাত-বন্দেগীর পথ ছেড়ে দিয়ে আমি যাঁর ইবাদাত করি তাঁর ইবাদাত করার পথ অবলম্বন করবে, এ আশাও করি না।

৫. অর্থাৎ আমার দীন আলাদা এবং তোমাদের দীন আলাদা। আমি তোমাদের মাবুদদের পূজা-উপাসনা-বন্দেগী করি না এবং তোমরাও আমার মাবুদের পূজা-উপাসনা করো না। আমি তোমাদের মাবুদদের বন্দেগী করতে পারি না এবং তোমরা আমার মাবুদের বন্দেগী করতে প্রস্তুত নও। তাই আমার ও তোমার পথ কখনো এক হতে পারে না। এটা কাফেরদের প্রতি উদারনীতি নয় বরং তারা কাফের থাকা অবস্থায় চিরকালের জন্য তাদের ব্যাপারে দায়মুক্তি, সম্পর্কহীনতা ও অসন্তোষের ঘোষণাবাণী। আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি যারা ঈমান এনেছে তারা দীনের ব্যাপারে কখনো তাদের সাথে সমঝোতা করবে না—এ ব্যাপারে তাদেরকে সর্বশেষ ও চূড়ান্তভাবে নিরাশ করে দেয়াই এর উদ্দেশ্য। এ সূরার পরে নাযিল হওয়া কয়েকটি মক্কী সূরাতে পর পর এ দায়মুক্তি, সম্পর্কহীনতা ও অসন্তোষ প্রকাশের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে ঃ "এরা যদি তোমাকে মিথ্যা বলে তাহলে বলে দাও, আমার কাজ আমার জন্য এবং তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য। আমি যা কিছু করি তার দায়-দায়িত্ব থেকে তোমরা মুক্ত।" (৪১ আয়াত) এ সূরাতেই তারপর সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ "হে নবী! বলে দাও, হে লোকেরা, যদি তোমরা আমার দীনের ব্যাপারে (এখানে) কোন রকম সন্দেহের মধ্যে থাকো তাহলে (শুনে রাখো), আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের বন্দেগী করছো আমি তাদের বন্দেগী করি না বরং আমি শুধুমাত্র সেই আল্লাহর বন্দেগী করি যার কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে তোমাদের মৃত্যু।" (১০৪ আয়াত) সূরা আশ শূ'আরায় বলেছেন ঃ "হে নবী! যদি এরা এখন তোমার কথা না মানে তাহলে বলে দাও, তোমরা যা কিছু করছো তা থেকে আমি দায়মুক্ত"। (২১৬ আয়াত) সূরা সাবায় বলেছেন ঃ "এদেরকে বলো, আমাদের ত্রুটির জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তোমরা যা কিছু করে যাচ্ছো সে জন্য আমাদের জবাবদিহি করতে হবে না। বলো, আমাদের রব একই সময় আমাদের ও তোমাদের একত্র করবেন এবং আমাদের মধ্যে ঠিকমতো ফায়সালা করবেন।" (২৫-২৬ আয়াত) সূরা যুমার-এ বলেছেন ঃ "এদেরকে বলো, হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা নিজেদের জায়গায় কাজ করে যাও। আমি আমার কাজ করে যেতে থাকবো। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার ওপর আসছে লাঞ্ছনাকর আযাব এবং কে এমন শাস্তি লাভ করছে যা অটল।" (৩৯-৪০ আয়াত) আবার মদীনা তাইয়েবার সমস্ত মুসলমানকেও এই একই শিক্ষা দেয়া হয়। তাদেরকে বলা হয় ঃ "তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে রয়েছে একটি ভালো আদর্শ। (সেটি হচ্ছে ঃ) তারা নিজেদের জাতিকে পরিষ্কার বলে দিয়েছে, আমরা তোমাদের থেকে ও তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব মাবুদদের পূজা করো তাদের থেকে পুরোপুরি সম্পর্কহীন। আমরা তোমাদের কুফরী করি ও অস্বীকৃতি জানাই এবং যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনো ততক্ষণ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালীন শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে গেছে।" (আল মুমতাহিনা ৪ আয়াত) কুরআন মজীদের একের পর এক এসব সুস্পষ্ট বক্তব্যের পর তোমরা তোমাদের ধর্ম মেনে চলো এবং আমাকে আমার ধর্ম মেনে চলতে দাও—"লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন"-এর এ ধরনের কোন অর্থের অবকাশই থাকে না। বরং সূরা যুমার-এ যে কথা বলা হয়েছে, একে ঠিক সেই পর্যায়ে রাখা যায় যেখানে বলা হয়েছে ঃ "হে নবী! এদেরকে বলে দাও, আমি তো আমার দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে তাঁরই ইবাদাত করবো, তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যার যার বন্দেগী করতে চাও করতে থাক না কেন।" (১৪ আয়াত)।

এ আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কাফেরদের ধর্ম পরস্পর যতই বিভিন্ন হোক না কেন সামগ্রিকভাবে সমস্ত কাফেররা মূলত একই গোষ্ঠীভুক্ত। কাজেই তাদের মধ্যে যদি বংশ বা বিবাহের ভিত্তিতে অথবা অন্য কোন কারণে এমন কোন সম্পর্ক থাকে যা একের সম্পত্তিতে অন্যের উত্তরাধিকারী স্বত্ব দাবী করে তাহলে একজন খৃষ্টান একজন ইহুদীর, একজন ইহুদী একজন খৃষ্টানের এক ধর্মের কাফের অন্য ধর্মের কাফেরের উত্তরাধিকারী হতে পারে। বিপরীত পক্ষে ইমাম মালিক, ইমাম আওযায়ী ও ইমাম আহমাদের মতে এক ধর্মের লোকেরা অন্য ধর্মের লোকদের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। তারা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে এ মত পোষণ করেন। এ হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ لا يتوارث اهل ملتين شتى "দুই ভিন্ন ধর্মের লোক পরস্পরের ওয়ারিশ হতে পারে না।" (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, দারে কুতনী)। প্রায় একই ধরনের বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি হাদীস ইমাম তিরমিযী হযরত জাবের (রা) থেকে, ইবনে হিব্বান হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে এবং বাযযার আবু হুরাইরা (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ বিষয়টি আলোচনা প্রসংগে হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম শামসুল আয়েম্মা সারাখসী লিখেছেন : যে সমস্ত কারণে মুসলমানরা পরস্পরের ওয়ারিশ হয় সে সমস্ত কারণে কাফেররাও পরস্পরের ওয়ারিশ হতে পারে। আবার তাদের মধ্যে এমন কোন কোন অবস্থায়ও উত্তরাধিকার স্বত্ব জারী হতে পারে যে অবস্থায় মুসলমানদের মধ্যে হয় না।..... প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে দীন হচ্ছে দু'টি একটি সত্য দীন এবং অন্যটি মিথ্যা দীন। তাই তিনি বলেছেনঃ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ এই সাথে তিনি মানুষদেরও দু'দলে বিভক্ত করেছেন। একদল জান্নাতী এবং তারা হচ্ছে মু'মিন। আর একদল জাহান্নমী এবং সামগ্রিকভাবে তারা হচ্ছে কাফের সমাজ। এ দু'দলকে তিনি পরস্পরের বিরোধী গণ্য করেছেন তাই তিনি বলেছেন : هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ (এই দু'টি পরস্পর বিরোধী দল। এদের মধ্যে রয়েছে নিজেদের রবের ব্যাপারে বিরোধ।—আল হজ্জ ১৯ আয়াত) অর্থাৎ সমস্ত কাফেররা মিলে একটি দল। তাদের বিরোধ ঈমানদার বা মু'মিনদের সাথে।..... তাদেরকে নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে আলাদা আলাদা মিল্লাতে তথা মানব গোষ্ঠীর অন্তরভুক্ত বলে আমরা মনে করি না। বরং মুসলমানদের মোকাবিলায় তারা সবাই একটি মিল্লাতের অন্তরভুক্ত। কারণ মুসলমানরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত ও কুরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকার করে। অন্যদিকে তারা এসব অস্বীকার করে। এ জন্য তাদেরকে কাফের বলা হয়। মুসলমানদের মোকাবিলায় তারা একই গোষ্ঠীভুক্ত হয় لا يتوارث اهل ملتين হাদীসটি আমি ইতিপূর্বে যে কথার উল্লেখ করেছি সেদিকেই ইংগিত করে। কারণ, "মিল্লাতাইন" (দুই মিল্লাত তথা দুই গোষ্ঠী) শব্দের ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিম্নোক্ত হাদীসের মাধ্যমে করে দিয়েছেন : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم অর্থাৎ "মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হতে পারে না এবং কাফের হতে পারে না মুসলমানের ওয়ারিশ।" [আল মাবসূত ৩ খণ্ড, ৩০-৩২ পৃষ্ঠা। ইমাম সারাখসী এখানে যে হাদীসটির বরাত দিয়েছেন সেটি বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও আবু দাউদ হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন।]

আন নসর

১১০

নামকরণ

প্রথম আয়াত اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ -এর মধ্যে উল্লেখিত নসর (نصر) শব্দকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) একে কুরআন মজীদের শেষ সূরা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর আর কোন পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল হয়নি।* (মুসলিম, নাসায়ী, তাবারানী, ইবনে আবী শাইবা ও ইবনে মারদুইয়া)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, এ সূরাটি বিদায় হজ্জের সময় আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময় মিনায় নাযিল হয়। এ সূরাটি নাযিল হবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উটের পিঠে সওয়ার হয়ে বিখ্যাত ভাষণটি দেন। (তিরমিযী, বায়যাবী, বাইহাকী, ইবনে শাইবা, আবদ ইবনে হুমাইদ, আবু ইয়ালা ও ইবনে মারদুইয়া)। বাইহাকী কিতাবুল হজ্জ অধ্যায়ে হযরত সারাআ বিনতে নাবহানের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সময়ের প্রদত্ত ভাষণ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

---

* বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, এরপর কিছু বিচ্ছিন্ন আয়াত নাযিল হয়। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সবশেষে কুরআনের কোন্ আয়াতটি নাযিল হয় সেটি চিহ্নিত করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত বারাআ ইবনে আযেবের (রা) রেওয়ায়াতে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ সেটি হচ্ছে সূরা নিসার শেষ আয়াত يَسْتَفْتُوْنَكَ ، قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ইমাম বুখারী ইবনে আব্বাসের (রা) উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ সেই সর্বশেষ আয়াতটি হচ্ছে রিবা সম্পর্কিত আয়াত। অর্থাৎ যে আয়াতের মাধ্যমে সূদকে হারাম গণ্য করা হয়েছে। ইমাম আহমাদ, ইবনে মাজাহ ও ইবনে মারদুইয়া হযরত উমর (রা) থেকে যে হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন তা থেকেও ইবনে আব্বাসের এ উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু এ হাদীসগুলোতে এটিকে শেষ আয়াত বলা হয়নি। বরং হযরত উমরের উক্তি হচ্ছে ঃ এটি সর্বশেষে নাযিল হওয়া আয়াতের অন্তরভুক্ত। আবু উবাইদ তাঁর ফাদায়েলুল কুরআন গ্রন্থে ইমাম যুহরীর এবং ইবনে জারীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ রিবার আয়াত এবং দাইনের আয়াত (অর্থাৎ সূরা বাকারার ৩৮–৩৯ রুকূ') কুরআনের নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত। নাসায়ী, ইবনে মারদুইয়া ও ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাসের অন্য একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন তাতে বলা হয়েছে ঃ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ সূরা বাকারার এ ২৮১ নম্বর আয়াতটি হচ্ছে কুরআনের সর্বশেষ আয়াত। আল ফিরইয়াবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ইবনে আব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে এতটুকু বাড়ানো হয়েছে ঃ এ আয়াতটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের ৮১ দিন আগে নাযিল হয়। অন্যদিকে ইবনে আবী হাতেম এ সম্পর্কিত সাঈদ ইবনে যুবাইরের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে এ আয়াতটি নাযিল হওয়া ও রসূলের (সা) ওফাতের মধ্যে মাত্র ৯ দিনের ব্যবধানের কথা বলা হয়েছে। ইমাম আহমাদের মুসনাদ ও হাকেমের মুসতাদরাকে হযরত উবাই ইবনে কা'বের (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ সূরা তাওবার ১২৮–১২৯ আয়াত দু'টি সবশেষে নাযিল হয়।

"বিদায় হজ্জের সময় আমি রসূলুল্লাহ (সা)–কে একথা বলতে শুনেছি ঃ হে লোকেরা! তোমরা জানো আজ কোন দিন? লোকেরা জবাব দিল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটি হচ্ছে আইয়ামে তাশরীকের মাঝখানের দিন। তারপর তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, জানো এটা কোন জায়গা? লোকেরা জবাব দিল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটি হচ্ছে মাশ'আরে হারাম। এরপর তিনি বলেন, আমি জানি না, সম্ভবত এরপর আমি আর তোমাদের সাথে মিলতে পারবো না। সাবধান হয়ে যাও, তোমাদের রক্ত ও তোমাদের মান–সম্মান পরস্পরের ওপর ঠিক তেমনি হারাম যেমন আজকের দিনটি ও এ জায়গাটি হারাম, যতদিন না তোমরা তোমাদের রবের সামনে হাযির হয়ে যাও এবং তিনি তোমাদেরকে নিজেদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। শোনো, একথাগুলো তোমাদের নিকটবর্তীরা দূরবর্তীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে। শোনো আমি কি তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি? এরপর আমরা মদীনায় ফিরে এলাম এবং তারপর কিছুদিন যেতে না যেতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকাল হয়ে গেল।"

এ দু'টি রেওয়ায়াত একত্র করলে দেখা যাবে, সূরা আন নসরের নাযিল হওয়া ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের মধ্যে ৩ মাস ও কয়েকদিনের ব্যবধান ছিল। কেননা ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখা যায়, বিদায় হজ্জ ও রসূলের (সা) ওফাতের মাঝখানে এ ক'টি দিনই অতিবাহিত হয়েছিল।

ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনা মতে এ সূরাটি নাযিল হবার পর রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমাকে আমার মৃত্যুর খবর দেয়া হয়েছে এবং আমার সময় পূর্ণ হয়ে গেছে। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও ইবনে মারদুইয়া) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত অন্যান্য রেওয়ায়াতগুলোতে বলা হয়েছে ঃ এ সূরাটি নাযিল হবার পর রসূলুল্লাহ (সা) বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর, তাবারানী, নাসায়ী, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া)।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, এ সূরাটি নাযিল হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এ বছর আমার ইন্তিকাল হবে। একথা শুনে হযরত ফাতিমা (রা) কেঁদে ফেললেন। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, আমার বংশধরদের মধ্যে তুমিই সবার আগে আমার সাথে মিলিত হবে। একথা শুনে হযরত ফাতিমা (রা) হেসে ফেললেন। (ইবনে আবি হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া) প্রায় এই একই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বাইহাকীতে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত উমর (রা) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বড় বড় জ্ঞানী ও সম্মানিত সাহাবীদের সাথে তাঁর মজলিসে আমাকে ডাকতেন। একথা বয়স্ক সাহাবীদের অনেকের খারাপ লাগলো। তাঁরা বললেন, আমাদের ছেলেরাও তো এ ছেলেটির মতো, তাহলে শুধুমাত্র এ ছেলেটিকেই আমাদের সাথে মজলিসে শরীক করা হচ্ছে কেন? (ইমাম বুখারী ও ইবনে জারীর খোলাসা করে বলেছেন যে, একথা বলেছিলেন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ) হযরত উমর (রা) বললেন, ইলমের ক্ষেত্রে এর যা মর্যাদা তা আপনারা জানেন। তারপর একদিন তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বয়স্ক সাহাবীদের ডাকলেন। তাঁদের সাথে আমাকেও ডাকলেন। আমি বুঝে ফেললাম তাদের মজলিসে

আমাকে শরীক করার যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য আজ আমাকে ডাকা হয়েছে। আলোচনার এক পর্যায়ে হযরত উমর (রা) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ সূরাটির ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি? কেউ কেউ বললেন, এ সূরায় আমাদের হুকুম দেয়া হয়েছে, যখন আল্লাহর সাহায্য আসে এবং আমরা বিজয় লাভ করি তখন আমাদের আল্লাহর হামদ ও ইস্তিগফার করা উচিত। কেউ কেউ বললেন, এর অর্থ হচ্ছে, শহর ও দুর্গসমূহ জয় করা। অনেকে নীরব রইলেন এরপর হযরত উমর (রা) বললেন, ইবনে আব্বাস তুমিও কি একথাই বলো? আমি বললাম ঃ না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে তুমি কি বলো। আমি বললাম ঃ এর অর্থ হচ্ছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওফাত। এ সূরায় জানানো হয়েছে, যখন আল্লাহর সাহায্য এসে যাবে এবং বিজয় লাভ হবে তখন আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে, এগুলোই হবে তার আলামত। কাজেই এরপর আপনি আল্লাহর হাম্‌দ ও ইস্তিগফার করুন। একথা শুনে হযরত উমর বললেন, তুমি যা বললে আমিও এ ছাড়া আর কিছুই জানি না। অন্য একটি রেওয়ায়াতে এর ওপর আরো একটু বাড়ানো হয়েছে এভাবে যে, হযরত উমর বয়স্ক বদরী সাহাবীদের বললেন ঃ আপনারা এ ছেলেকে এ মজলিসে শরীক করার কারণ দেখার পর আবার কেমন করে আমাকে তিরস্কার করেন? (বুখারী, মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে জারীর, ইবনে মারদুইয়া, বাগাবী, বাইহাকী ও ইবনুল মুনযির)।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

ওপরে যে হাদীসগুলো আলোচনা করা হয়েছে তাতে একথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর রসূলকে বলে দিয়েছিলেন, যখন আরবে ইসলামের বিজয় পূর্ণ হয়ে যাবে এবং লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকবে তখন এর মানে হবে, আপনাকে যে কাজের জন্য দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল তা পূর্ণ হয়ে গেছে। তারপর তাঁকে হুকুম দেয়া হয়েছে, আপনি আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করতে থাকুন। কারণ তাঁরই অনুগ্রহে আপনি এতবড় কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। আর তাঁর কাছে এ মর্মে দোয়া করুন যে, এই বিরাট কাজ করতে গিয়ে আপনি যে ভুল-ভ্রান্তি বা দোষ-ত্রুটি করেছেন তা সব তিনি যেন মাফ করে দেন। এ ক্ষেত্রে একটুখানি চিন্তা-ভাবনা করলে যে কোন ব্যক্তিই দুনিয়ার মানুষের একজন সাধারণ নেতা ও একজন নবীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখতে পাবেন। মানুষের একজন সাধারণ নেতা যে বিপ্লব করার জন্য কাজ করে যায় নিজের জীবদ্দশাতেই যদি সেই মহান বিপ্লব সফলকাম হয়ে যায় তাহলে এ জন্য সে বিজয় উৎসব পালন করে এবং নিজের নেতৃত্বের গর্ব করে বেড়ায়। কিন্তু এখানে আল্লাহর নবীকে আমরা দেখি, তিনি তেইশ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে পুরো একটি জাতির আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তাধারা, আচার-আচরণ, নৈতিক চরিত্র, সভ্যতা-সংস্কৃতি, সমাজনীতি, অর্থব্যবস্থা, রাজনীতি ও সামরিক যোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছেন। মূর্খতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের মধ্যে আপাদমস্তক ডুবে থাকা জাতিকে উদ্ধার করে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলেছেন যার ফলে তারা সারা দুনিয়া জয় করে ফেলেছে এবং সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহের নেতৃত্ব পদে আসীন হয়েছে। কিন্তু এতবড় মহৎ কাজ সম্পন্ন করার পরও তাঁকে উৎসব পালন করার নয় বরং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করার

এবং তাঁর কাছে মাগফিরাতের দোয়া করার হুকুম দেয়া হয়। আর তিনি পূর্ণ দীনতার সাথে সেই হুকুম পালন করতে থাকেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ওফাতের পূর্বে سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ কোন কোন রেওয়ায়াতে এর শব্দগুলো হচ্ছে ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ খুব বেশী করে পড়তেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এই যে কথাগুলো পড়ছেন এগুলো কেমন ধরনের কালেমা। জবাব দিলেন, আমার জন্য একটি আলামত নির্ধারণ করা হয়েছে, বলা হয়েছে, যখন আমি সেই আলামত দেখতে পাবো তখনই যেন একথাগুলো পড়ি এবং সেই আলামতটি হচ্ছে, اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও ইবনে মারদুইয়া)। প্রায় এ একই ধরনের কোন কোন রেওয়ায়াতে হযরত আয়েশা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ার সময় নিজের রুকূ' ও সিজদায় খুব বেশী করে এ শব্দগুলো পড়তেন ঃ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ এটি ছিল কুরআনের (অর্থাৎ সূরা আন নসরের ব্যাখ্যা। তিনি নিজেই ব্যাখ্যাটি করেছিলেন) (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও ইবনে জারীর)।

হযরত উম্মে সালামা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষের দিকে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে তাঁর পবিত্র মুখে সর্বক্ষণ একথাই শুনা যেতোঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এ যিকিরটি বেশী করে করেন কেন? জবাব দিলেন, আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে, তারপর তিনি এ সূরাটি পড়লেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) রেওয়ায়াত করেন, যখন এ সূরাটি নাযিল হয় তখন থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত যিকিরটি বেশী করে করতে থাকেন ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ، سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ، اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ (ابن جرير ، مسند احمد – ابن ابى حاتم)

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এ সূরাটি নাযিল হবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আখেরাতের জন্য শ্রম ও সাধনা করার ব্যাপারে খুব বেশী জোরেশোরে আত্মনিয়োগ করেন। এর আগে তিনি কখনো এমনভাবে আত্মনিয়োগ করেননি। (নাসায়ী, তাবারানী, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া)।

আয়াত ৩ **সূরা আন নসর-মাদানী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝١ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ
فِي دِينِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ۝٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ
إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝٣

যখন আল্লাহর সাহায্য এসে যায় এবং বিজয় লাভ হয়,[১] আর (হে নবী!) তুমি (যদি) দেখ যে লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দীন গ্রহণ করছে[২] তখন তুমি তোমার রবের হাম্‌দ সহকারে তাঁর তাসবীহ পড়ো[৩] এবং তাঁর কাছে মাগফিরাত চাও।[৪] অবশ্যি তিনি বড়ই তাওবা কবুলকারী।

১. বিজয় মানে কোন একটি যুদ্ধ বিজয় নয়। বরং এর মানে হচ্ছে এমন একটি চূড়ান্ত বিজয় যার পরে ইসলামের সাথে সংঘর্ষ করার মতো আর কোন শক্তির অস্তিত্ব দেশের বুকে থাকবে না এবং একথাও সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, বর্তমানে আরবে এ দীনটিই প্রাধান্য বিস্তার করবে। কোন কোন মুফাস্‌সির এখানে বিজয় মানে করেছেন মক্কা বিজয়। কিন্তু মক্কা বিজয় হয়েছে ৮ হিজরীতে এবং এ সূরাটি নাযিল হয়েছে ১০ হিজরীর শেষের দিকে। ভূমিকায় আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ও হযরত সারাআ বিনতে নাবহানের (রা) যে হাদীস বর্ণনা করেছি তা থেকে একথাই জানা যায়। এ ছাড়াও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) যে একে কুরআন মজীদের সর্বশেষ সূরা বলেছেন, তাঁর এ বক্তব্যও এ তাফসীরের বিরুদ্ধে চলে যায়। কারণ বিজয়ের মানে যদি মক্কা বিজয় হয় তাহলে সমগ্র সূরা তাওবা মক্কা বিজয়ের পর নাযিল হয়। তাহলে আন নসর কেমন করে শেষ সূরা হতে পারে? নিসন্দেহে মক্কা বিজয় এ দিক দিয়ে চূড়ান্ত বিজয় ছিল যে, তারপর আরবের মুশরিকদের সাহস ও হিম্মত নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এরপরও তাদের মধ্যে যথেষ্ট শক্তি-সামর্থ ছিল। এরপরই অনুষ্ঠিত হয়েছিল তায়েফ ও হুনায়েনের যুদ্ধ। আরবে ইসলামের পূর্ণাংগ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে আরো প্রায় দু'বছর সময় লেগেছিল।

২. অর্থাৎ লোকদের একজন দু'জন করে ইসলাম গ্রহণ করার যুগ শেষ হয় যাবে। তখন এমন এক যুগের সূচনা হবে যখন একটি গোত্রের সবাই এবং এক একটি বড় বড় এলাকার সমস্ত অধিবাসী কোন প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও চাপ প্রয়োগ ছাড়াই স্বতস্ফূর্ততাবে

মুসলমান হয়ে যেতে থাকবে। নবম হিজরীর শুরু থেকে এ অবস্থার সূচনা হয়। এ কারণে এ বছরটিকে বলা হয় প্রতিনিধিদলের বছর। এ বছর আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে একের পর এক প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসতে থাকে। তারা ইসলাম কবুল করে তাঁর মুবারক হাতে বাই'আত গ্রহণ করতে থাকে। এমনকি দশম হিজরীতে যখন তিনি বিদায় হজ্জ করার জন্য মক্কায় যান তখন সমগ্র আরব ভূমি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সারাদেশে কোথাও একজন মুশরিক ছিল না।

৩. হামদ মানে মহান আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও। আর তাসবীহ মানে আল্লাহকে পাক–পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন এবং দোষ–ত্রুটিমুক্ত গণ্য করা। এ প্রসংগে বলা হয়েছে, যখন তুমি তোমার রবের কুদরতের এ অভিব্যক্তি দেখবে তখন তাঁর হামদ সহকারে তাঁর তাসবীহ পাঠ করবে। এখানে হামদ বলে একথা বুঝানো হয়েছে যে, এ মহান ও বিরাট সাফল্য সম্পর্কে তোমার মনে যেন কোন সময় বিন্দুমাত্রও ধারণা না জন্মায় যে, এসব তোমার নিজের কৃতিত্বের ফল। বরং একে পুরোপুরি ও সরাসরি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী মনে করবে। এ জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। মনে ও মুখে একথা স্বীকার করবে যে, এ সাফল্যের জন্য সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য। আর তাসবীহ মানে হচ্ছে, আল্লাহর কালেমা বুলন্দ হওয়ার বিষয়টি তোমার প্রচেষ্টা ও সাধনার ওপর নির্ভরশীল ছিল—এ ধরনের ধারণা থেকে তাঁকে পাক ও মুক্ত গণ্য করবে। বিপরীত পক্ষে তোমার মন এ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিপূর্ণ থাকবে যে, তোমার প্রচেষ্টা ও সাধনার সাফল্য আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তিনি তাঁর যে বান্দার থেকে চান কাজ নিতে পারতেন। তবে তিনি তোমার খিদমত নিয়েছেন এবং তোমার সাহায্যে তাঁর দীনের ঝাণ্ডা বুলন্দ করেছেন, এটা তাঁর অনুগ্রহ। এ ছাড়া তাসবীহ অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ পড়ার মধ্যে বিস্ময়েরও একটি দিক রয়েছে। কোন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলে মানুষ সুবহানাল্লাহ বলে। এর অর্থ হয়, আল্লাহর অসীম কুদরতে এহেন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। নয়তো এমন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটাবার ক্ষমতা দুনিয়ার কোন শক্তির ছিল না।

৪. অর্থাৎ তোমার রবের কাছে দোয়া করো। তিনি তোমাকে যে কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা করতে গিয়ে তোমার যে ভুল–ত্রুটি হয়েছে তা যেন তিনি মাফ করে দেন। ইসলাম বান্দাকে এ আদব ও শিষ্টাচার শিখিয়েছে। কোন মানুষের দ্বারা আল্লাহর দীনের যতবড় খিদমতই সম্পন্ন হোক না কেন, তাঁর পথে সে যতই ত্যাগ স্বীকার করুক না কেন এবং তাঁর ইবাদাত ও বন্দেগী করার ব্যাপারে যতই প্রচেষ্টা ও সাধনা চালাক না কেন, তার মনে কখনো এ ধরনের চিন্তার উদয় হওয়া উচিত নয় যে, তার ওপর তার রবের যে হক ছিল তা সে পুরোপুরি আদায় করে দিয়েছে। বরং সবসময় তার মনে করা উচিত যে, তার হক আদায় করার ব্যাপারে যেসব দোষ–ত্রুটি সে করেছে তা মাফ করে দিয়ে যেন তিনি তার এ নগণ্য খেদমত কবুল করে নেন। এ আদব ও শিষ্টাচার শেখানো হয়েছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। অথচ তাঁর চেয়ে বেশী আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা ও সাধনাকারী আর কোন মানুষের কথা কল্পনাই করা যেতে পারে না। তাহলে এ ক্ষেত্রে অন্য কোন মানুষের পক্ষে তার নিজের আমলকে বড় মনে করার অবকাশ কোথায়? আল্লাহর যে অধিকার তার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তা সে আদায় করে দিয়েছে এ

অহংকারে মত্ত হওয়ার কোন সুযোগই কি তার থাকে? কোন সৃষ্টি আল্লাহর হক আদায় করতে সক্ষম হবে, এ ক্ষমতাই তার নেই।

মহান আল্লাহর এ ফরমান মুসলমানদের এ শিক্ষা দিয়ে আসছে যে, নিজের কোন ইবাদাত, আধ্যাত্মিক সাধনা ও দীনি খেমদতকে বড় জিনিস মনে না করে নিজের সমগ্র প্রাণশক্তি আল্লাহর পথে নিয়োজিত ও ব্যয় করার পরও আল্লাহর হক আদায় হয়নি বলে মনে করা উচিত। এভাবে যখনই তারা কোন বিজয় লাভে সমর্থ হবে তখনই এ বিজয়কে নিজেদের কোন কৃতিত্বের নয় বরং মহান আল্লাহর অনুগ্রহের ফল মনে করবে। এ জন্য গর্ব ও অহংকারে মত্ত না হয়ে নিজেদের রবের সামনে দীনতার সাথে মাথা নত করে হামদ, সানা ও তাসবীহ পড়তে এবং তাওবা ও ইসতিগফার করতে থাকবে।

আল লাহাব

১১১

নামকরণ

প্রথম আয়াতের লাহাব (لَهَبٍ) শব্দকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এর মক্কী হবার ব্যাপারে তাফসীরকারদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু মক্কী যুগের কোন্ সময় এটি নাযিল হয়েছিল তা যথাযথভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে আবু লাহাবের যে ভূমিকা এখানে দেখা গেছে তা থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে যে, এ সূরাটি এমন যুগে নাযিল হয়ে থাকবে যখন রসূলের (সা) সাথে শত্রুতার ক্ষেত্রে সে সীমা পেরিয়ে গিয়েছিল এবং তার দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মনীতি ইসলামের অগ্রগতির পথে একটি বড় বাধার সৃষ্টি করেছিল। সম্ভবত কুরাইশরা যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশের লোকদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করে তাদের শে'বে আবু তালেবে (আবু তালেব গিরিপথ) অন্তরীণ করেছিল এবং একমাত্র আবু লাহাবই তার বংশের লোকদেরকে পরিত্যাগ করে শত্রুদের সাথে অবস্থান করছিল, তখনই এ সূরাটি নাযিল হওয়া বিচিত্র নয়। আমাদের এ অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে, আবু লাহাব ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা। আর ভাতিজার মুখে চাচার প্রকাশ্য নিন্দাবাদ ততক্ষণ সংগত হতে পারতো না যতক্ষণ চাচার সীমা অতিক্রমকারী অন্যায়, জুলম ও বাড়াবাড়ি উন্মুক্তভাবে সবার সামনে না এসে গিয়ে থাকে। এর আগে যদি শুরুতেই এ সূরাটি নাযিল করা হতো তাহলে লোকেরা নৈতিক দিক দিয়ে একে ত্রুটিপূর্ণ মনে করতো। কারণ ভাতিজার পক্ষে এভাবে চাচার নিন্দা করা শোভা পায় না।

পটভূমি

কুরআনে মাত্র এ একটি জায়গাতেই ইসলামের শত্রুদের কারো নাম নিয়ে তার নিন্দা করা হয়েছে। অথচ মক্কায় এবং হিজরাতের পরে মদীনায়ও এমন অনেক লোক ছিল যারা ইসলাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শত্রুতার ক্ষেত্রে আবু লাহাবের চাইতে কোন অংশে কম ছিল না। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ব্যক্তিটির এমনকি বিশেষত্ব ছিল যে কারণে তার নাম নিয়ে নিন্দা করা হয়েছে? একথা বুঝার জন্য সমকালীন আরবের সামাজিক অবস্থা অনুধাবন এবং সেখানে আবু লাহাবের ভূমিকা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

প্রাচীন যুগে যেহেতু সারা আরব দেশের সব জায়গায় অশান্তি, বিশৃংখলা, লুটতরাজ ও রাজনৈতিক অরাজকতা বিরাজ করছিল এবং শত শত বছর থেকে এমন অবস্থা চলছিল যার ফলে কোন ব্যক্তির জন্য তার নিজের বংশ ও রক্তসম্পর্কের আত্মীয়-পরিজনের সহায়তা ছাড়া নিজের ধন-প্রাণ ও ইজ্জত-আবরুর হেফাজত করা কোনক্রমেই সম্ভবপর ছিল না। এ জন্য আরবীয় সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার ছিল অত্যন্ত গুরুত্বের অধিকারী। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকে মহাপাপ মনে করা হতো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এগিয়ে এলেন তখন আরবের এ প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রভাবে কুরাইশ গোত্রের অন্যান্য পরিবার ও তাদের সরদাররা তাঁর কঠোর বিরোধিতা করলেও বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব (হাশেমের ভাই মুত্তালিবের সন্তানরা) কেবল তাঁর বিরোধিতা থেকে বিরত থাকেনি বরং প্রকাশ্যে তাঁকে সমর্থন দিয়ে এসেছে। অথচ তাদের অধিকাংশই তাঁর নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনেনি। কুরাইশের অন্যান্য পরিবারের লোকেরাও রসূলুল্লাহর (সা) রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনদের এ সমর্থন-সহযোগিতাকে আরবের নৈতিক ঐতিহ্যের যথার্থ অনুসারী মনে করতো। তাই তারা কখনো বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবকে এই বলে ধিক্কার দেয়নি যে, তোমরা একটি ভিন্ন ধর্মের আহবায়কের প্রতি সমর্থন দিয়ে নিজেদের পৈতৃক ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছো। তারা একথা জানতো এবং স্বীকারও করতো যে, নিজেদের পরিবারের একজন সদস্যকে তারা কোনক্রমেই শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারে না। কুরাইশ তথা সমগ্র আরবের অধিবাসীরাই নিজেদের আত্মীয়ের সাথে সহযোগিতা করাকে একটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বিষয় বলে মনে করতো।

জাহেলী যুগেও আরবের লোকেরা এ নৈতিক আদর্শকে অত্যন্ত মর্যাদার চোখে দেখতো। অথচ শুধু মাত্র একজন লোক ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতায় অন্ধ হয়ে এ আদর্শ ও মূলনীতি লংঘন করে। সে ছিল আবু লাহাব ইবনে আবদুল মুত্তালিব। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা। রসূলের (সা) পিতা এবং এ আবু লাহাব ছিল একই পিতার সন্তান। আরবে চাচাকে বাপের মতই মনে করা হতো। বিশেষ করে যখন ভাতিজার বাপের ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছিল তখন আরবীয় সমাজের রীতি অনুযায়ী চাচার কাছে আশা করা হয়েছিল, সে ভাতিজাকে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসবে। কিন্তু এ ব্যক্তি ইসলাম বৈরিতা ও কুফরী প্রেমে আকণ্ঠ ডুবে গিয়ে এ সমস্ত আরবীয় ঐতিহ্যকে পদদলিত করেছিল।

মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সূত্রে ইবনে আব্বাস থেকে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বসাধারণের কাছে দাওয়াত পেশ করার হুকুম দেয়া হলো এবং কুরআন মজীদে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হলো : "সবার আগে আপনার নিকট আত্মীয়দেরকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখান।" এ নির্দেশ পাওয়ার পর সকাল বেলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পাহাড়ে উঠে বুলন্দ আওয়াজে চিৎকার করে বললেন يا صباحاه (হায়, সকাল বেলার বিপদ!) আরবে এ ধরনের আওয়াজ এমন এক ব্যক্তি দিয়ে থাকে যে ভোর বেলার আলো আঁধারীর মধ্যে কোন শত্রুদলকে নিজেদের গোত্রের ওপর আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসতে দেখে থাকে। রসূলুল্লাহর (সা) এ আওয়াজ শুনে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, কে আওয়াজ দিচ্ছে?

বলা হলো মুহাম্মাদ (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আওয়াজ দিচ্ছেন। একথা শুনে কুরাইশদের সমস্ত পরিবারের লোকেরা দৌড়ে গেলো তাঁর দিকে। যে নিজে আসতে পারতো সে নিজে এসে গেলো এবং যে নিজে আসতে পারতো না সে তার একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিল। সবাই পৌঁছে গেলে তিনি কুরাইশের প্রত্যেকটি পরিবারের নাম নিয়ে ডেকে ডেকে বললেন ঃ হে বনী হাশেম! হে বনী আবদুল মুত্তালিব! হে বনী ফেহর! হে বনী উমুক! হে বনী উমুক! যদি আমি তোমাদের একথা বলি, এ পাহাড়ের পেছনে একটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত হয়ে রয়েছে তোমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য, তাহলে আমার কথা কি তোমরা সত্য বলে মেনে নেবে? লোকেরা জবাব দিল, হ্যাঁ, আমরা কখনো আপনার মুখে মিথ্যা কথা শুনিনি। একথা শুনে তিনি বললেন ঃ তাহলে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, আগামীতে কঠিন আযাব আসছে। একথায় অন্যকেউ বলার আগে তাঁর নিজের চাচা আবু লাহাব বললো ঃ تَبًّا لَكَ أَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا "তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি কি এ জন্য আমাদের ডেকেছিলে?" অন্য একটি হাদীসে একথাও বলা হয়েছে, সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে ছুঁড়ে মারার জন্য একটি পাথর উঠিয়েছিল। (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে জারীর ইত্যাদি)।

ইবনে যায়েদ বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ আবু লাহাব একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, যদি আমি তোমার দীন গ্রহণ করি তাহলে এর বদলে আমি কি পাবো? তিনি জবাব দিলেন, অন্যান্য ঈমানদাররা যা পাবে আপনিও তাই পাবেন। আবু লাহাব বললো ঃ আমার জন্য কিছু বাড়তি মর্যাদা নেই? জবাব দিলেন, ঃ আপনি আর কি চান? একথায় সে বললো ঃ تَبًّا لِهٰذَا الدِّيْنِ تَبًّا اَنْ اَكُوْنَ وَهٰؤُلَاءِ سَوَاءً "সর্বনাশ হোক এ দীনের যেখানে আমি ও অন্যান্য লোকেরা একই পর্যায়ভুক্ত হবে।" (ইবনে জারীর)

মক্কায় আবু লাহাব ছিল রসূলুল্লাহর (সা) নিকটতম প্রতিবেশী। উভয়ের ঘরের মাঝখানে ছিল একটি প্রাচীর। এ ছাড়াও হাকাম ইবনে আস (মারওয়ানের বাপ), উকবা ইবনে আবু মুঈত, আদী ইবনে হামরা ও ইবনুল আসদায়েল হুযালীও তাঁর প্রতিবেশী ছিল। এরা বাড়িতেও রসূলুল্লাহকে নিশ্চিন্তে থাকতে দিত না। তিনি যখন নামায পড়তেন, এরা তখন ওপর থেকে ছাগলের নাড়িভুড়ি তাঁর গায়ে নিক্ষেপ করতো। কখনো তাঁর বাড়ির আঙিনায় রান্নাবান্না হতো এরা হাঁড়ির মধ্যে ময়লা ছুঁড়ে দিতো। রসূলুল্লাহ (সা) বাইরে এসে তাদেরকে বলতেন, "হে বনী আবদে মান্নাফ! এ কেমন প্রতিবেশীসুলভ আচরণ?" আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল (আবু সুফিয়ানের বোন) প্রতি রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরের দরজার সামনে কাঁটাগাছের ডাল পালা ছড়িয়ে রেখে দিতো। এটা ছিল তার প্রতিদিনের স্থায়ী আচরণ। যাতে রসূলুল্লাহ (সা) বা তাঁর শিশু সন্তানরা বাইরে বের হলে তাদের পায়ে কাঁটা বিঁধে যায়। (বায়হাকী, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর, ইবনে আসাকির ও ইবনে হিশাম)।

নবুওয়াত লাভের পূর্বে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দুই মেয়েকে আবু লাহাবের দুই ছেলে উতবা ও উতাইবার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। নবুওয়াতের পরে যখন তিনি ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে শুরু করেন তখন আবু লাহাব তার দুই

ছেলেকে বলে, তোমরা মুহাম্মাদের (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মেয়েদের তালাক না দিলে আমার পক্ষে তোমাদের সাথে দেখা-সাক্ষাত হারাম হয়ে যাবে। কাজেই দু'জনেই তাদের স্ত্রীদের তালাক দেয়। উতাইবা জাহেলিয়াতের মধ্যে খুব বেশী অগ্রসর হয়ে যায়। সে একদিন রসূলুল্লাহর (সা) সামনে এসে বলে ঃ আমি وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى এবং الَّذِىْ دَنَا فَتَدَلّٰى অস্বীকার করছি। একথা বলে তাঁর দিকে থুথু নিক্ষেপ করে। থুথু তাঁর গায়ে লাগেনি। তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! তোমার কুকুরদের মধ্য থেকে একটি কুকুর এর ওপর চাপিয়ে দাও। এরপর উতাইবা তার বাপের সাথে সিরিয়া সফরে রওয়ানা হয়। সফরকালে রাতে তাদের কাফেলা এক জায়গায় অবস্থান করে। স্থানীয় লোকেরা জানায়, সেখানে রাতে হিংস্র জানোয়ারদের আনাগোনা হয়। আবু লাহাব তার কুরাইশী সাথীদের বলে, আমার ছেলের হেফাজতের ভালো ব্যবস্থা করো। কারণ আমি মুহাম্মাদের (সা) বদ দোয়ার ভয় করছি। একথায় কাফেলার লোকেরা উতাইবার চারদিকে নিজেদের উটগুলোকে বসিয়ে দেয় এবং তারা নিজেরা ঘুমিয়ে পড়ে। গভীর রাতে একটি বাঘ আসে। উটদের বেষ্টনী ভেদ করে সে উতাইবাকে ধরে এবং সেখানেই তাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে খেয়ে ফেলে (আল ইসতিআব লি ইবনে আবদিল বার, আল ইসাবা লি ইবনে হাজার, দালায়েলুন নুবুওয়া লি আবী নাঈম আল ইসফাহানী ও রওদুল উনুফ লিস সুহাইলী)। বর্ণনাগুলোর মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। কোন কোন বর্ণনাকারী তালাকের ব্যাপারটি নবুওয়াতের ঘোষণার পরের ঘটনা বলেন। আবার কোন কোন বর্ণনাকারীর মতে "তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাব" এর নাযিলের পরই তালাকের ঘটনাটি ঘটে। আবার আবু লাহাবের এ তালাক দানকারী ছেলেটি উতবা ছিল না উতাইবা—এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর উতবা ইসলাম গ্রহণ করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন, একথা প্রমাণিত সত্য। তাই আবু লাহাবের এ তালাকদানকারী ছেলেটি যে উতাইবা ছিল, এতে সন্দেহ নেই।

সে যে কেমন জঘন্য মানসিকতার অধিকারী ছিল তার পরিচয় একটি ঘটনা থেকেই পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছেলে হযরত আবুল কাসেমের ইন্তিকালের পর তাঁর দ্বিতীয় ছেলে হযরত আবদুল্লাহরও ইন্তিকাল হয়। এ অবস্থায় আবু লাহাব তার ভাতিজার শোকে শরীক না হয়ে বরং আনন্দে আত্মহারা হয়ে দৌড়ে কুরাইশ সরদারদের কাছে পৌঁছে যায়। সে তাদেরকে জানায় ঃ শোনো, আজ মুহাম্মাদের (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাম নিশানা মুছে গেছে। তার এ ধরনের আচরণের কথা আমরা ইতিপূর্বে সূরা কাউসারের ব্যাখায় উল্লেখ করে এসেছি।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে যেখানে ইসলামের দাওয়াত দিতে যেতেন আবু লাহাবও তাঁর পেছনে পেছনে সেখানে গিয়ে পৌঁছতো এবং লোকদের তাঁর কথা শুনার কাজে বাধা দিতো। রাবী'আহ ইবনে আব্বাদ আদদীলী (রা) বর্ণনা করেন, আমি একদিন আমার আব্বার সাথে যুল-মাজাযের বাজারে যাই। তখন আমার বয়স ছিল কম। সেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখি। তিনি বলছিলেন ঃ "হে লোকেরা! বলো, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। একথা বললেই তোমরা সফলকাম হয়ে যাবে।" এ সময় তাঁর পেছনে পেছনে এক ব্যক্তি বলে চলছিল, "এ ব্যক্তি মিথ্যুক, নিজের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।" আমি জিজ্ঞেস করি, এ লোকটি কে? লোকেরা

বললো, ওঁর চাচা আবু লাহাব। (মুসনাদে আহমাদ ও বায়হাকী) এ একই বর্ণনাকারী হযরত রাবীআহ (রা) থেকে আর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম। তিনি প্রত্যেকটি গোত্রের শিবিরে যাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন ঃ "হে বনী অমুক! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রসূল। তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি, একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করো না। তোমরা আমাকে সত্য নবী বলে মেনে নাও এবং আমার সাথে সহযোগিতা করো। এভাবে আল্লাহ আমাকে যে কাজ করার জন্য পাঠিয়েছেন তা আমি পূর্ণ করতে পারবো।" তাঁর পিছে পিছে আর একটি লোক আসছিল এবং সে বলছিল ঃ "হে বনী অমুক! এ ব্যক্তি নিজে যে নতুন ধর্ম ও ভ্রষ্টতা নিয়ে এসেছে লাত ও উযযার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তোমাদের সেদিকে নিয়ে যেতে চায়। এর কথা একদম মেনো না এবং এর পেছনেও চলো না।" আমি আমার আব্বাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এ লোকটি কে? তিনি বললেন ঃ এ লোকটি ওঁরই চাচা আবু লাহাব। (মুসনাদে আহমাদ ও তাবারানী) তারেক ইবনে আবদুল্লাহ আল মাহারেবীর (রা) রেওয়ায়াতও প্রায় এ একই ধরনের। তিনি বর্ণনা করেছেন ঃ যুল মাজাযের বাজারে দেখলাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের বলে যাচ্ছেন, "হে লোকেরা! তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো, তাহলে সফলকাম হয়ে যাবে।" ওদিকে তাঁর পিছে পিছে একজন লোক তাঁকে পাথর মেরে চলছে। এভাবে তাঁর পায়ের গোড়ালি রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে। এই সাথে সাথে ঐ ব্যক্তি বলে চলেছে, " এ মিথ্যুক, এর কথা শুনো না।" আমি লোকদের জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? লোকেরা বললো ঃ ওঁরই চাচা আবু লাহাব। (তিরমিযী)

নবুওয়াতের সপ্তম বছরে কুরাইশদের সমস্ত পরিবার মিলে যখন বনি হাশেম ও বনী মুত্তালিবকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কট করলো এবং এ পরিবার দু'টি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমর্থনে অবিচল থেকে আবু তালেব গিরিপথে অন্তরীণ হয়ে গেলো তখন একমাত্র আবু লাহাবই নিজের পরিবার ও বংশের সহগামী না হয়ে কুরাইশ কাফেরদের সহযোগী হলো। এ বয়কট তিন বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময় বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবকে অনেক সময় অনাহারে থাকতে হয়েছে। কিন্তু আবু লাহাবের ভূমিকা ছিল মারমুখী। বাইর থেকে মক্কায় কোন বাণিজ্য কাফেলা এলে আবু তালেব গিরিপথে অন্তরীণদের মধ্য থেকে কেউ তাদের কাছ থেকে খাদ্যদ্রব্য কিনতে যেতো। আবু লাহাব তখন চিৎকার করে বণিকদেরকে বলতো ঃ ওদের কাছে এতো বেশী দাম চাও যাতে ওরা কিনতে না পারে। এ জন্য তোমাদের যত টাকা ক্ষতি হয় তা আমি দেবো। কাজেই তারা বিরাট দাম হাঁকতো। ক্রেতা মহাসংকটে পড়তো। শেষে নিজের অনাহারের কষ্ট বুকে পুষে রেখে খালি হাতে পাহাড়ে ফিরে যেতে হতো ক্ষুধা কাতর সন্তানদের কাছে। তারপর আবু লাহাব সেই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সেই পণ্যগুলোই বাজার দরে কিনে নিতো। (ইবনে সা'দ ও ইবনে হিশাম)

এই সূরায় যে ব্যক্তিটির নাম নিয়ে নিন্দা করা হয়েছে এগুলো ছিল তারই কর্মকাণ্ড। বিশেষ করে এর প্রয়োজন এ জন্য দেখা দিয়েছিল যে, মক্কার বাইরের আরবের যেসব লোকেরা হজ্জের জন্য আসতো অথবা বিভিন্ন স্থানে যেসব বাজার বসতো সেখানে যারা জমায়েত হতো, তাদের সামনে যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের

চাচা তাঁর পিছনে ঘুরে ঘরে তাঁর বিরোধিতা করতো তখন বাইরের লোকদের ওপর এর ব্যাপক প্রভাব পড়তো। কারণ আরবের প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে কোন চাচা বিনা কারণে অন্যদের সামনে তার নিজের ভাতিজাকে গালিগালাজ করবে, তার গায়ে পাথর মারবে এবং তার প্রতি দোষারোপ করবে এটা কল্পনাতীত ছিল। তাই তারা আবু লাহাবের কথায় প্রভাবিত হয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে পড়ে যেতো। কিন্তু এ সূরাটি নাযিল হবার পর যখন আবু লাহাব রাগে অন্ধ হয়ে আবোলতাবোল বকতে লাগলো তখন লোকেরা বুঝতে পারলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতার ব্যাপারে তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সে নিজের ভাতিজার শত্রুতায় অন্ধ হয়ে গেছে।

তাছাড়া নাম নিয়ে নিজের চাচার নিন্দা করার পর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীনের ব্যাপারে কারো মুখ চেয়ে কোন প্রকার সমঝোতা বা নরম নীতি অবলম্বন করবেন, এ আশা চিরতরে নির্মূল হয়ে গেলো। যখন প্রকাশ্যে ঘোষণার মাধ্যমে রসূলের চাচার নিন্দা করা হলো তখন লোকেরা বুঝতে পারলো, এখানে কোন কিছু রেখে ঢেকে করার অবকাশ নেই। এখানে ঈমান আনলে পরও আপন হয়ে যায় এবং ইসলামের বিরোধিতা ও কুফরী করলে আপনও হয়ে যায় পর। এ ব্যাপারে অমুকের ছেলে, অমুকের ভাই বা অমুকের বাপের কোন গুরুত্ব নেই।

আয়াত ৫ **সূরা আল লাহাব-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝٢
سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَّامْرَاَتُهٗ ۭ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤ فِىْ
جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

ভেঙে গেছে আবু লাহাবের হাত এবং ব্যর্থ হয়েছে সে।[১] তার ধন-সম্পদ এবং যা কিছু সে উপার্জন করেছে তা তার কোন কাজে লাগেনি।[২] অবশ্যই সে লেলিহান আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। এবং (তার সাথে) তার স্ত্রীও,[৩] লাগানো ভাঙানো চোগলখুরী করে বেড়ানো যার কাজ,[৪] তার গলায় থাকবে খেজুর ডালের আঁশের পাকানো শক্ত রশি।[৫]

১. আবু লাহাবের আসল নাম ছিল আবদুল উয্যা। তাকে আবু লাহাব বলে ডাকার কারণ, তার গায়ের রং ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল সাদা লালে মেশানো। লাহাব বলা হয় আগুনের শিখাকে। কাজেই আবু লাহাবের মানে হচ্ছে আগুন বরণ মুখ। এখানে তার আসল নামের পরিবর্তে ডাক নামে উল্লেখ করার কয়েকটি কারণ রয়েছে। এর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, মূল নামের পরিবর্তে ডাকনামেই সে বেশী পরিচিত ছিল। দ্বিতীয় কারণ, তার আবদুল উয্যা (অর্থাৎ উয্যার দাস) নামটি ছিল একটি মুশরিকী নাম। কুরআনে তাকে এ নামে উল্লেখ করা পছন্দ করা হয়নি। তৃতীয় কারণ, এ সূরায় তার যে পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে তার সাথে তার এ ডাকনামই বেশী সম্পর্কিত।

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ -এর অর্থ কোন কোন তাফসীরকার করেছেন, "ভেঙে যাক আবু লাহাবের হাত" এবং وَتَبَّ শব্দের মানে করেছেন, "সে ধ্বংস হয়ে যাক" অথবা "সে ধ্বংস হয়ে গেছে।" কিন্তু আসলে এটা তার প্রতি কোন ধিক্কার নয়। বরং এটা একটা ভবিষ্যদ্বাণী। এখানে ভবিষ্যতে যে ঘটনাটি ঘটবে তাকে অতীত কালের অর্থ প্রকাশক শব্দের সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এর মানে, তার হওয়াটা যেন এত বেশী নিশ্চিত যেমন তা হয়ে গেছে। আর আসলে শেষ পর্যন্ত তাই হলো যা এ সূরায় কয়েক বছর আগে বর্ণনা করা হয়েছিল। হাত ভেঙে যাওয়ার মানে শরীরের একটি অংগ যে হাত সেটি ভেঙে যাওয়া নয়। বরং কোন ব্যক্তি যে উদ্দেশ্য সম্পন্ন করার জন্য তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে

তাতে পুরোপুরি ও চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়ে যাওয়াই এখানে বুঝানো হয়েছে। আর আবু লাহাব রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য যথার্থই নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। কিন্তু এ সূরাটি নাযিল হবার মাত্র সাত আট বছর পরেই বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধে কুরাইশদের অধিকাংশ বড় বড় সরদার নিহত হয়। তারা সবাই ইসলাম বিরোধিতা ও ইসলামের প্রতি শত্রুতার ক্ষেত্রে আবু লাহাবের সহযোগী ছিল। এ পরাজয়ের খবর মক্কায় পৌঁছার পর সে এত বেশী মর্মাহত হয় যে, এরপর সে সাত দিনের বেশী জীবিত থাকতে পারেনি। তারপর তার মৃত্যুও ছিল বড়ই ভয়াবহ ও শিক্ষাপ্রদ। তার শরীরে সাংঘাতিক ধরনের ফুসকুড়ি (Malignant Pustule) দেখা দেয়। রোগ সংক্রমণের ভয়ে পরিবারের লোকেরা তাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। মরার পরও তিন দিন পর্যন্ত তার ধারেকাছে কেউ ঘেঁসেনি। ফলে তার লাশে পচন ধরে। চারদিকে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। শেষে লোকেরা তার ছেলেদেরকে ধিক্কার দিতে থাকে। একটি বর্ণনা অনুসারে তখন তারা মজুরীর বিনিময়ে তার লাশ দাফন করার জন্য কয়েকজন হাবশীকে নিয়োগ করে এবং তারা তার লাশ দাফন করে। অন্য এক বর্ণনা অনুসারে, তারা গর্ত খুঁড়ে লম্বা লাঠি দিয়ে তার লাশ তার মধ্যে ফেলে দেয় এবং ওপর থেকে তার ওপর মাটি চাপা দেয়। যে দীনের অগ্রগতির পথ রোধ করার জন্য সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল তার সন্তানদের সেই দীন গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তার আরো বেশী ও পূর্ণ পরাজয় সম্পন্ন হয়। সর্বপ্রথম তার মেয়ে দাররা হিজরাত করে মক্কা থেকে মদীনায় চলে যান এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। আর মক্কা বিজয়ের পর তার দুই ছেলে উতবা ও মু'আত্তাব হযরত আব্বাসের (রা) মধ্যস্থতায় রসূলুল্লাহর (সা) সামনে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর হাতে বাইআত করেন।

২. আবু লাহাব ছিল হাড়কৃপণ ও অর্থলোলুপ। ইবনে আসীরের বর্ণনা মতে, জাহেলী যুগে একবার তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, সে কা'বা শরীফের কোষাগার থেকে দু'টি সোনার হরিণ চুরি করে নিয়েছে। যদিও পরবর্তী পর্যায়ে সেই হরিণ দু'টি অন্য একজনের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় তবুও তার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনার ফলে তার সম্পর্কে মক্কার লোকদের মনোভাব উপলব্ধি করা যায়। তার ধনাঢ্যতা সম্পর্কে কাজী রশীদ ইবনে যুবাইর তাঁর "আযযাখায়ের ওয়াত'তুহাফ" (الذَّخَائِرَ والتُّحَف) গ্রন্থে লিখেছেন ঃ কুরাইশদের মধ্যে যে চারজন লোক এক কিনতার (এক কিনতার= দুশো আওকিয়া আর এক আওকিয়া = সোয়া তিন তোলা কাজেই এক কিনতার সমান ৮০ তোলার সেরের ওজনে ৮ সের ১০ তোলা) সোনার মালিক ছিল আবু লাহাব তাদের একজন। তার অর্থ লোলুপতা কি পরিমাণ ছিল বদর যুদ্ধের সময়ের ঘটনা থেকে তা আন্দাজ করা যেতে পারে। এ যুদ্ধে তার ধর্মের ভাগ্যের ফায়সালা হতে যাচ্ছিল। কুরাইশদের সব সরদার এ যুদ্ধে অংশ নেবার জন্য রওয়ানা হয়। কিন্তু আবু লাহাব নিজে না গিয়ে নিজের পক্ষ থেকে আস ইবনে হিশামকে পাঠায়। তাকে বলে দেয়, তার কাছে সে যে চার হাজার দিরহাম পায় এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কারণে এর বদলে তার সেই ঋণ পরিশোধ হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। এভাবে সে নিজের ঋণ আদায় করার একটা কৌশল বের করে নেয়। কারণ আস দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। ঋণ পরিশোধের কোন ক্ষমতাই তার ছিল না।

কোন কোন তাফসীরকার مَا كَسَبَ শব্দটিকে উপার্জন অর্থে নিয়েছেন। অর্থাৎ নিজের অর্থ থেকে সে যে মুনাফা অর্জন করেছে তা তার উপার্জন। আবার অন্য কয়েকজন তাফসীরকার এর অর্থ নিয়েছেন সন্তান-সন্ততি। কারণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সন্তানরা মানুষের উপার্জন (আবু দাউদ ও ইবনে আবী হাতেম)। এ দু'টি অর্থই আবু লাহাবের পরিণতির সাথে সম্পর্কিত। কারণ সে মারাত্মক ফুসকুড়ি রোগে আক্রান্ত হলে তার সম্পদ তার কোন কাজে লাগেনি এবং তার সন্তানরাও তাকে অসহায়ভাবে মৃত্যু বরণ করার জন্য ফেলে রেখে দিয়েছিল। তার ছেলেরা তার লাশটি মর্যাদা সহকারে কাঁধে উঠাতেও চাইল না। এভাবে এ সূরায় আবু লাহাব সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল লোকেরা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তা সত্য হতে দেখলো।

৩. আবু লাহাবের স্ত্রীর নাম ছিল "আরদা"। "উম্মে জামীল" ছিল তার ডাক নাম। সে ছিল আবু সুফিয়ানের বোন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শত্রুতার ব্যাপারে সে তার স্বামী আবু লাহাবের চাইতে কোন অংশে কম ছিল না। হযরত আবু বকরের (রা) মেয়ে হযরত আসমা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ এ সূরাটি নাযিল হবার পর উম্মে জামীল যখন এটি শুনলো, সে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খোঁজে বের হলো। তার হাতের মুঠোয় পাথর ভরা ছিল রসূলুল্লাহকে (সা) গালাগালি করতে করতে নিজের রচিত কিছু কবিতা পড়ে চলছিল। এ অবস্থায় সে কা'বা ঘরে পৌঁছে গেলো। সেখানে রসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবু বকরের (রা) সাথে বসেছিলেন। হযরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! দেখুন সে আসছে। আমার আশংকা হচ্ছে, সে আপনাকে দেখে কিছু অভদ্র আচরণ করবে। তিনি বললেন, সে আমাকে দেখতে পাবে না। বাস্তবে হলোও তাই। তাঁর উপস্থিতি সত্ত্বেও সে তাঁকে দেখতে পেলো না। সে আবু বকরকে (রা) জিজ্ঞেস করলো, শুনলাম তোমার সাথী আমার নিন্দা করেছে। হযরত আবু বকর (রা) জবাব দিলেন ঃ এ ঘরের রবের কসম, তিনি তো তোমার কোন নিন্দা করেননি। একথা শুনে সে ফিরে গেলো—(ইবনে আবী হাতেম, সীরাতে ইবনে হিশাম। বায্যারও প্রায় একই ধরনের একটি রেযয়ায়াত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন)। হযরত আবু বকরের (রা) এ জবাবের অর্থ ছিল, নিন্দা তো আল্লাহ করেছেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি।

৪. মূল শব্দ হচ্ছে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, "কাঠ বহনকারিনী।" মুফাস্সিরগণ এর বহু অর্থ বর্ণনা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ইবনে যায়েদ, যাহহাক ও রাবী ইবনে আনাস বলেন ঃ সে রাতের বেলা কাঁটা গাছের ডালপালা এনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরজায় ফেলে রাখতো। তাই তাকে কাঠ বহনকরিনী বলা হয়েছে। কাতাদাহ, ইকরামা, হাসান বসরী, মুজাহিদ ও সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ সে লোকদের মধ্যে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য চোগলখুরী করে বেড়াতো। তাই আরবী প্রবাদ অনুযায়ী তাকে কাঠ বহনকারিনী বলা হয়েছে। কারণ যারা এর কথা ওর কাছে বলে এবং লাগানো ভাঙানোর কাজ করে ফিতনা-ফাসাদের আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করে আরবরা তাদেরকে কাঠ বহনকারিনী বলে থাকে। এ প্রবাদ অনুযায়ী "হাম্মালাতাল হাতাব" শব্দের সঠিক অনুবাদ হচ্ছে, "যে লাগানো ভাঙানোর কাজ করে।" সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের পিঠে গোনাহের বোঝা বহন করে আরবী

প্রবাদ অনুসারে তার সম্পর্কে বলা হয়, فُلَانٌ يَحْطَبُ عَلَى ظَهْرِهٖ (অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি নিজের পিঠে কাঠ বহন করছে)। কাজেই হাম্মালাতাল হাতাব (حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) মানে হচ্ছে, "গোনাহের বোঝা বহনকারিনী।" মুফাস্‌সিরগণ এর আরো একটি অর্থও বর্ণনা করেছেন। সেটি হচ্ছে, আখেরাতে তার এ অবস্থা হবে। অর্থাৎ সেখানে যে আগুনে আবু লাহাব পুড়তে থাকবে তাতে সে (উম্মে জামীল) কাঠ বহন করে এনে ফেলতে থাকবে।

৫. তার গলার জন্য জীদ (جِيد) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় যে গলায় অলংকার পরানো হয়েছে তাকে জীদ বলা হয়। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, হাসান বসরী ও কাতাদা বলেন ঃ সে একটি অতি মূল্যবান হার গলায় পরতো এবং বলতো, লাত ও উয্‌যার কসম, এ হার বিক্রি করে আমি এর মূল্য বাবদ পাওয়া সমস্ত অর্থ মুহাম্মাদের (সা) বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কাজ করার জন্য ব্যয় করবো। এ কারণে জীদ শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ব্যাঙ্গার্থে। অর্থাৎ এ অলংকার পরিহিত সুসজ্জিত গলায়, যেখানে পরিহিত হার নিয়ে সে গর্ব করে বেড়ায়, কিয়ামতের দিন সেখানে রশি বাঁধা হবে। এটা ঠিক সমপর্যায়েরই ব্যাঙ্গাত্মক বক্তব্য যেমন কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে ঃ بَشِّرْهُم بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ "তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।"

তার গলায় বাঁধা রশিটির জন্য حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ সে রশিটি হবে 'মাসাদ" ধরনের। অভিধানবিদ ও মুফাস্‌সিরগণ এ শব্দটির বহু অর্থ বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কিত একটি বক্তব্য হচ্ছে, খুব মজবুত করে পাকানো রশিকে মাসাদ বলা হয়। দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে, খেজুর গাছের (ডালের) ছাল থেকে তৈরি রশি মাসাদ নামে পরিচিত। এ সম্পর্কে তৃতীয় বক্তব্য হচ্ছে, এর মানে খেজুরের ডালের গোড়ার দিকের মোটা অংশ থেঁতলে যে সরু আঁশ পাওয়া যায় তা দিয়ে পাকানো রশি অথবা উটের চামড়া বা পশম দিয়ে তৈরি রশি। আর একটি বক্তব্য হচ্ছে, এর অর্থ লোহার তারের পাকানো রশি।

আল ইখলাস

১১২

নামকরণ

ইখলাস শুধু এ সূরাটির নামই নয়, এখানে আলোচ্য বিষয়বস্তুর শিরোনামও। কারণ, এখানে খালেস তথা নির্ভেজাল তাওহীদের আলোচনা করা হয়েছে। কুরআন মজীদের অন্যান্য সূরার ক্ষেত্রে সাধারণত সেখানে ব্যবহৃত কোন শব্দের মাধ্যমে তার নামকরণ করতে দেখা গেছে। কিন্তু এ সূরাটিতে ইখলাস শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। কাজেই এর এ নামকরণ করা হয়েছে এর অর্থের ভিত্তিতে। যে ব্যক্তি এ সূরাটির বক্তব্য অনুধাবন করে এর শিক্ষার প্রতি ঈমান আনবে, সে শিরক থেকে মুক্তি লাভ করে খালেস তাওহীদের আলোকে নিজেকে উদ্ভাসিত করবে।

নাযিলের সময়-কাল

এর মক্কী ও মাদানী হবার ব্যাপারে মতভেদ আছে। এ সূরাটি নাযিল হবার কারণ হিসেবে যেসব হাদীস উল্লেখিত হয়েছে সেগুলোর ভিত্তিতেই এ মতভেদ দেখা দিয়েছে। নীচে পর্যায়ক্রমে সেগুলো উল্লেখ করছি ঃ

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, আপনার রবের বংশ পরিচয়* আমাদের জানান। একথায় এ সূরাটি নাযিল হয়। (তাবারানী)।

(২) আবুল আলীয়াহ হযরত উবাই ইবনে কাবের (রা) বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, মুশরিকরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, আপনার রবের বংশ পরিচয় আমাদের জানান। এর জবাবে আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর, তিরমিযী, বুখারী ফিত তারীখ, ইবনুল মুনযির, হাকেম ও বায়হাকী) এ বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি হাদীস আবুল আলীয়ার মাধ্যমে ইমাম তিরমিযী উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে হযরত উবাই ইবনে কা'বের বরাত নেই। ইমাম তিরমিযী একে অপেক্ষাকৃত বেশী নির্ভুল বলেছেন।

* আরববাসীদের নিয়ম ছিল, কোন অপরিচিত ব্যক্তির পরিচয় লাভ করতে হলে তারা বলতো, اِنْسِبْ لَنَا (এর বংশধারা আমাদের জানাও) কারণ তাদের কাছে পরিচিতির জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হতো বংশধারার। সে কোন্ বংশের লোক? কোন্ গোত্রের সাথে সম্পর্কিত? একথা জানার প্রয়োজন হতো। কাজেই তারা যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাঁর রব সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হলো তিনি কে এবং কেমন, তখন তারা তাঁকে একই প্রশ্ন করলো। তারা প্রশ্ন করলো, اِنْسِبْ لَنَا رَبَّكَ অর্থাৎ আপনার রবের নসবনামা (বংশধারা) আমাদের জানান।

(৩) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, এক গ্রামীণ আরব (কোন কোন হাদীস অনুযায়ী লোকেরা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, আপনার রবের বংশধারা আমাদের জানান। এর জবাবে আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন (আবু ইয়ালা, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, তাবারানী ফিল আওসাত, বায়হাকী ও আবু নু'আইম ফিল হিলইয়া)।

(৪) ইকরামা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেন, ইহুদীদের একটি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়। তাদের মধ্যে ছিল কা'ব ইবনে আশরাফ ও হুই ইবনে আখতাব প্রমুখ লোকেরা। তারা বলে, "হে মুহাম্মাদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনার যে রব আপনাকে পাঠিয়েছেন তিনি কেমন সে সম্পর্কে আমাদের জানান।" এর জবাবে মহান আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন। (ইবনে আবী হাতেম, ইবনে আদী, বায়হাকী ফিল আসমায়ে ওয়াস সিফাত)

এ ছাড়াও ইমাম ইবনে তাইমিয়া কয়েকটি হাদীস তাঁর সূরা ইখলাসের তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। সেগুলো হচ্ছে ঃ

(৫) হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, খয়বারের কয়েকজন ইহুদী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলে, "হে আবুল কাসেম! আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে নূরের পরদা থেকে, আদমকে পচাগলা মাটির পিণ্ড থেকে, ইবলিসকে আগুনের শিখা থেকে, আসমানকে ধোঁয়া থেকে এবং পৃথিবীকে পানির ফেনা থেকে তৈরি করেছেন। এখন আপনার রব সম্বন্ধে আমাদের জানান (অর্থাৎ তিনি কোন বস্তু থেকে সৃষ্ট?)" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথার কোন জবাব দেননি। তারপর জিব্রীল (আ) আসেন। তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলে দাও, "হুওয়াল্লাহু আহাদ" (তিনি আল্লাহ এক ও একক).....

(৬) আমের ইবনুত তোফায়েল রসূলুল্লাহকে (সা) বলে ঃ "হে মুহাম্মাদ! আপনি আমাদের কোন জিনিসের দিকে আহবান জানাচ্ছেন? তিনি জবাব দেন, "আল্লাহর দিকে।" আমের বলে ঃ "তালো, তাহলে তার অবস্থা আমাকে জানান। তিনি সোনার তৈরি, না রূপার অথবা লোহার?" একথার জবাবে এ সূরাটি নাযিল হয়।

(৭) যাহহাক, কাতাদাহ ও মুকাতেল বলেন, ইহুদীদের কিছু আলেম রসূলুল্লাহর (সা) কাছে আসে। তারা বলে ঃ "হে মুহাম্মাদ! আপনার রবের অবস্থা আমাদের জানান। হয়তো আমরা আপনার ওপর ঈমান আনতে পারবো। আল্লাহ তাঁর গুণাবলী তাওরাতে নাযিল করেছেন। আপনি বলুন, তিনি কোন্ বস্তু দিয়ে তৈরি? কোন গোত্রভুক্ত? সোনা, তামা, পিতল, লোহা, রূপা, কিসের তৈরি? তিনি পানাহার করেন কি না? তিনি উত্তরাধিকারী সূত্রে কার কাছ থেকে পৃথিবীর মালিকানা লাভ করেছেন? এবং তারপর কে এর উত্তরাধিকারী হবে? এর জবাবে আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন।

(৮) ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, নাজরানের খৃষ্টানদের সাতজন পাদরী সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করে। তারা তাঁকে বলে ঃ "আমাদের বলুন, আপনার রব কেমন? তিনি কিসের তৈরি?"

তিনি বলেন, "আমার রব কোন জিনিসের তৈরি নন। তিনি সব বস্তু থেকে আলাদা।" এ ব্যাপারে আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন।

এ সমস্ত হাদীস থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ (সা) যে মাবুদের ইবাদাত ও বন্দেগী করার প্রতি লোকদের আহবান জানাচ্ছিলেন তার মৌলিক সত্তা ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোক প্রশ্ন করেছিল। এ ধরনের প্রশ্ন যখনই এসেছে তখনই তিনি জবাবে আল্লাহর হুকুমে লোকদেরকে এ সূরাটিই পড়ে শুনিয়েছেন। সর্বপ্রথম মক্কায় কুরাইশ বংশীয় মুশরিকরা তাঁকে এ প্রশ্ন করে। তাদের এ প্রশ্নের জবাবে এ সূরাটি নাযিল হয়। এরপর মদীনা তাইয়েবায় কখনো ইহুদী, কখনো খৃস্টান আবার কখনো আরবের অন্যান্য লোকেরাও রসূলুল্লাহকে (সা) এই ধরনের প্রশ্ন করতে থাকে। প্রত্যেকবারই আল্লাহর পক্ষ থেকে ইশারা হয় জবাবে এ সূরাটি তাদের শুনিয়ে দেবার। ওপরে উল্লেখিত হাদীসগুলোর প্রত্যেকটিতে একথা বলা হয় যে, এর জবাবে এ সূরাটি নাযিল হয়। এর থেকে এ হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী একথা মনে করার কোন সংগত কারণ নেই। আসলে হচ্ছে কোন বিষয় সম্পর্কে যদি পূর্ব থেকে অবতীর্ণ কোন আয়াত বা সূরা থাকতো তাহলে পরে রসূলুল্লাহর (সা) সামনে যখনই সেই একই বিষয় আবার উত্থাপিত হতো তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত আসতো, এর জবাব উমুক আয়াত বা সূরায় রয়েছে অথবা এর জবাবে লোকদেরকে উমুক আয়াত বা সূরা পড়ে শুনিয়ে দাও। হাদীসসমূহের রাবীগণ এ জিনিসটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, যখন উমুক সমস্যা দেখা দেয় বা উমুক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তখন এ আয়াত বা সূরাটি নাযিল হয়। একে বারংবার অবতীর্ণ হওয়া অর্থাৎ একটি আয়াত বা সূরার বারবার নাযিল হওয়াও বলা হয়।

কাজেই সঠিক কথা হচ্ছে, এ সূরাটি আসলে মক্কী। বরং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে একে মক্কায় একেবারে প্রথম যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত করা যায়। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে কুরআনের কোন বিস্তারিত আয়াত তখনো পর্যন্ত নাযিল হয়নি। তখনো লোকেরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আল্লাহর দিকে দাওয়াতের বার্তা শুনে জানতে চাইতো ঃ তাঁর এ রব কেমন, যাঁর ইবাদাত–বন্দেগী করার দিকে তাদেরকে আহবান জানানো হচ্ছে। এর একেবারে প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত হবার আর একটি প্রমাণ হচ্ছে, মক্কায় হযরত বেলালকে (রা) তার প্রভু উমাইয়া ইবনে খালাফ যখন মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকার ওপর চিৎ করে শুইয়ে তার বুকের ওপর একটা বড় পাথর চাপিয়ে দিতো তখন তিনি "আহাদ" "আহাদ" বলে চিৎকার করতেন। এ আহাদ শব্দটি এ সূরা ইখলাস থেকেই গৃহীত হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

নাযিল হওয়ার উপলক্ষ সম্পর্কিত যেসব হাদীস ওপরে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর ওপর এক নজর বুলালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন তখন দুনিয়ার মানুষের ধর্মীয় চিন্তা–ভাবনা ও ধ্যান–ধারণা কি ছিল তা জানা যায়। মূর্তি পূজারী মুশরিকরা কাঠ, পাথর, সোনা, রূপা ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিসের তৈরি খোদার কাল্পনিক মূর্তিসমূহের পূজা করতো। সেই মূর্তিগুলোর আকার, আকৃতি ও

দেহাবয়ব ছিল। এ দেবদেবীদের রীতিমত বংশধারাও ছিল। কোন দেবী এমন ছিল না যার স্বামী ছিল না আবার কোন দেবতা এমন ছিল না যার স্ত্রী ছিল না। তাদের খাবার দাবারেরও প্রয়োজন দেখা দিতো। তাদের পূজারীরা তাদের জন্য এসবের ব্যবস্থা করতো। মুশরিকদের একটি বিরাট দল খোদার মানুষের রূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করায় বিশ্বাস করতো এবং তারা মনে করতো কিছু মানুষ খোদার অবতার হয়ে থাকে। খৃষ্টানরা এক খোদায় বিশ্বাসী হবার দাবীদার হলেও তাদের খোদার কমপক্ষে একটি পুত্র তো ছিলই এবং পিতা পুত্রের সাথে খোদায়ী সাম্রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে রুহুল কুদুসও (জিব্রীল) অংশীদার ছিলেন। এমন কি খোদার মা-ও ছিল এবং শাশুড়ীও। ইহুদিরাও এক খোদাকে মেনে চলার দাবীদার ছিল কিন্তু তাদের খোদাও বস্তুসত্তা ও মরদেহ এবং অন্যান্য মানবিক গুণাবলীর উর্ধে ছিল না। তাদের এ খোদা টহল দিতো, মানুষের আকার ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করতো। নিজের কোন বান্দার সাথে কুশ্তিও লড়তো। তার একটি পুত্রও (উযাইর) ছিল। এ ধর্মীয় দলগুলো ছাড়া আরো ছিল মাজূসী—অগ্নি উপাসক ও সাবী—তারকা পূজারীর দল। এ অবস্থায় যখন লোকদেরকে এক ও লা-শরীক আল্লাহর আনুগত্য করার দাওয়াত দেয়া হয় তখন তাদের মনে এ প্রশ্ন জাগা নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল যে, সেই রবটি কেমন, সমস্ত রব ও মাবুদদেরকে বাদ দিয়ে যাকে একমাত্র রব ও মাবুদ হিসেবে মেনে নেবার দাওয়াত দেয়া হচ্ছে? এটা কুরআনের অলৌকিক প্রকাশভংগীরই কৃতিত্ব। এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব মাত্র কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করে কুরআন মূলত আল্লাহর অস্তিত্বের এমন সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ধারণা পেশ করে দিয়েছে, যা সব ধরনের মুশরিকী চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার মূলোৎপাটন করে এবং আল্লাহর সত্তার সাথে সৃষ্টির গুণাবলীর মধ্য থেকে কোন একটি গুণকেও সংযুক্ত করার কোন অবকাশই রাখেনি।

শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব

এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে এ সূরাটি ছিল বিপুল মহত্বের অধিকারী। বিভিন্নভাবে তিনি মুসলমানদেরকে এ গুরুত্ব অনুভব করাতেন। তারা যাতে এ সূরাটি বেশী করে পড়ে এবং জনগণের মধ্যে একে বেশী করে ছড়িয়ে দেয় এ জন্য ছিল তাঁর এ প্রচেষ্টা। কারণ এখানে ইসলামের প্রাথমিক ও মৌলিক আকীদাকে (তাওহীদ) এমন ছোট ছোট চারটি বাক্যের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে, যা শুনার সাথে সাথেই মানুষের মনে গেঁথে যায় এবং তারা সহজেই মুখে মুখে সেগুলো আওড়াতে পারে। রসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদ্ধতিতে লোকদের বলেছেন, এ সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান—এ মর্মে হাদীসের কিতাবগুলোতে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বুখারী, তিরমিযী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী ইত্যাদি কিতাবগুলোতে বহু হাদীস আবু সাঈদ খুদরী, আবু হুরাইরা, আবু আইয়ুব আনসারী, আবুদদারদা, মু'আয ইবনে জাবাল, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, উবাই ইবনে কা'ব, কুলসুম বিনতে উকবাহ ইবনে আবী মু'আইত, ইবনে উমর, ইবনে মাস'উদ, কাতাদাহ ইবনুন নু'মান, আনাস ইবনে মালেক ও আবু মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত হয়েছে। মুফাসসিরগণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তির বহু

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তবে আমাদের মতে সহজ, সরল ও পরিষ্কার কথা হচ্ছে, কুরআন মজীদ যে দীন ও জীবন ব্যবস্থা পেশ করে তার ভিত্তি রাখা হয়েছে তিনটি বুনিয়াদী আকীদার ওপর। এক, তাওহীদ। দুই, রিসালাত। তিন, আখেরাত। এ সূরাটি যেহেতু নির্ভেজাল তাওহীদ তত্ব বর্ণনা করেছে তাই রসূলুল্লাহ (সা) একে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান গণ্য করেছেন।

হযরত আয়েশার (রা) একটি রেওয়ায়াত বুখারী ও মুসলিম এবং হাদীসের অন্যান্য কিতাবগুলোতে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক অভিযানে এক সাহাবীকে সরদারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। তিনি সমগ্র সফরকালে প্রত্যেক নামাযে "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" পড়ে কিরআত শেষ করতেন। এটা যেন তার স্থায়ী রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল ফিরে আসার পর তার সাথীরা রসূলুল্লাহর (সা) কাছে একথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তাকে জিজ্ঞেস করো, সে কেন এমনটি করেছিল? তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন ঃ এতে রহমানের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এর পাঠ আমার অত্যন্ত প্রিয়। রসূলুল্লাহ (সা) একথা শুনে লোকদের বলেন ঃ اخبروه ان الله تعالى يحبه "তাকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন।"

প্রায় এ একই ধরনের ঘটনা বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, জনৈক আনসারী কুবার মসজিদে নামায পড়াতেন। তাঁর নিয়ম ছিল, তিনি প্রত্যেক রাকাআতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পড়তেন। তারপর অন্য কোন সূরা পড়তেন। লোকেরা এ ব্যাপারে আপত্তি উঠায়। তারা বলেন, তুমি এ কেমন কাজ করছো, প্রথমে قُلْ هُوَ اللّٰهُ পড়ো তারপর তাকে যথেষ্ট মনে না করে আবার তার সাথে আর একটি সূরা পড়ো? এটা ঠিক নয়। শুধুমাত্র "কুল হুওয়াল্লাহ" পড়ো অথবা একে বাদ দিয়ে অন্য একটি সূরা পড়ো। তিনি জবাব দেন, আমি এটা ছাড়তে পারবো না। তোমরা চাইলে আমি তোমাদের নামায পড়াবো অথবা ইমামতি ছেড়ে দেবো। কিন্তু লোকেরা তাঁর জায়গায় আর কাউকে ইমাম বানানোও পছন্দ করতো না। অবশেষে ব্যাপারটি রসূলুল্লাহর (সা) সামনে আসে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার সাথীরা যা চায় তা করতে তোমার বাধা কোথায়? কোন্ জিনিসটি তোমাকে প্রত্যেক রাকআতে এ সূরাটি পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছে? তিনি বলেন ঃ এ সূরাটিকে আমি খুব ভালোবাসি। রসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলেন ঃ حبك اياها ادخلك الجنة অর্থাৎ "এ সূরার প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে।"

আয়াত ৪ | সূরা আল ইখলাস-মক্কী | রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

বলো,[১] তিনি আল্লাহ,[২] একক।[৩] আল্লাহ কারোর ওপর নির্ভরশীল নন এবং সবাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল।[৪] তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনি কারোর সন্তান নন।[৫] এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।[৬]

১. এখানে 'বলো' শব্দের মাধ্যমে প্রথমত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ তাঁকেই প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনার রব কে? তিনি কেমন? আবার তাঁকেই হুকুম দেয়া হয়েছিল, প্রশ্নের জবাবে আপনি একথা বলুন। কিন্তু রসূলের (সা) তিরোধানের পর এ সম্বোধনটি প্রত্যেক মু'মিনের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। রসূলুল্লাহকে (সা) যে কথা বলার হুকুম দেয়া হয়েছিল এখন সে কথা তাকেই বলতে হবে।

২. অর্থাৎ আমার যে রবের সাথে তোমরা পরিচিত হতে চাও তিনি আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। এটি প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের প্রথম জবাব। এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের সামনে আমি কোন নতুন রব নিয়ে আসিনি। অন্যসব মাবুদদের ইবাদাত ত্যাগ করে কোন নতুন মাবুদের ইবাদাত করতে আমি তোমাদের বলিনি। বরং আল্লাহ নামে যে সত্তার সাথে তোমরা পরিচিত তিনি সেই সত্তা। আরবদের জন্য 'আল্লাহ' শব্দটি কোন নতুন ও অপরিচিত শব্দ ছিল না। প্রাচীনতম কাল থেকে বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টার প্রতিশব্দ হিসেবে তারা আল্লাহ শব্দটি ব্যবহার করে আসছিল। নিজেদের অন্য কোন মাবুদ ও উপাস্য দেবতার সাথে এ শব্দটি সংশ্লিষ্ট করতো না। অন্য মাবুদদের জন্য তারা "ইলাহ" শব্দ ব্যবহার করতো। তারপর আল্লাহ সম্পর্কে তাদের যে আকীদা ছিল তার চমৎকার প্রকাশ ঘটেছিল আবরাহার মক্কা আক্রমণের সময়। সে সময় কা'বাঘরে ৩৬০টি উপাস্যের মূর্তি ছিল। কিন্তু এ বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য মুশরিকরা তাদের সবাইকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিল। অর্থাৎ তারা নিজেরা ভালোভাবে জানতো, এ সংকটকালে আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্তাই তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না। কা'বাঘরকেও তারা এসব ইলাহের সাথে সম্পর্কিত করে বায়তুল আ-লিহাহ (ইলাহ-এর বহুবচন) বলতো না বরং আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে একে বলতো বায়তুল্লাহ। আল্লাহ সম্পর্কে আরবের মুশরিকদের আকীদা কি ছিল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তা বলা হয়েছে। যেমন ঃ সূরা

যুখরুফে বলা হয়েছে ঃ "যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে তাদেরে পয়দা করেছে, তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে আল্লাহ।" (৮৭ আয়াত)

সূরা আনকাবুতে বলা হয়েছে ঃ "যদি তুমি এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আকাশসমূহ ও যমীনকে কে পয়দা করেছে এবং চাঁদ ও সূর্যকে কে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে, তাহলে নিশ্চয়ই তারা বলবে আল্লাহ।.....আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলেন এবং কার সাহায্যে মৃত পতিত জমিকে সঞ্জীবতা দান করলেন, তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে আল্লাহ।" (৬১–৬৩ আয়াত)।

সূরা মু'মিনূনে বলা হয়েছে ঃ "এদেরকে জিজ্ঞেস করো, বলো যদি তোমরা জানো, এ যমীন এবং এর সমস্ত জনবসতি কার? এরা অবশ্যি বলবে আল্লাহর।.....এদেরকে জিজ্ঞেস করো, সাত আকাশ ও মহাআরশের মালিক কে? এরা অবশ্যি বলবে, আল্লাহ।..... এদেরকে জিজ্ঞেস করো, বলো যদি তোমরা জেনে থাকো প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর কার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত? আর কে আশ্রয় দান করেন এবং কার মোকাবিলায় কেউ আশ্রয় দিতে পারেন না? এরা নিশ্চয়ই বলবে, এ ব্যাপারটি তো একমাত্র আল্লাহরই জন্য।" (৮৪–৮৯ আয়াত)

সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে ঃ "এদেরকে জিজ্ঞেস করো কে তোমাদের আকাশ ও যমীন থেকে রিযিক দেন? তোমরা যে শ্রবণ ও দৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী হয়েছো এগুলো কার ইখতিয়ারভুক্ত? আর কে জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন? এবং কে এ বিশ্বব্যবস্থাপনা চালাচ্ছেন? এরা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ।" (৩১ আয়াত)।

অনুরূপভাবে সূরা ইউনুসের আর এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ "যখন তোমরা জাহাজে আরোহণ করে অনুকূল বাতাসে আনন্দ চিত্তে সফর করতে থাকো আর তারপর হঠাৎ প্রতিকূল বাতাসের বেগ বেড়ে যায়, চারদিক থেকে তরংগ আঘাত করতে থাকে এবং মুসাফিররা মনে করতে থাকে, তারা চারদিক থেকে ঝনঝা পরিবৃত হয়ে পড়েছে, তখন সবাই নিজের দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে নিয়ে তাঁরই কাছে দোয়া করতে থাকো এই বলে ঃ "হে আল্লাহ যদি তুমি আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হবো। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে বাঁচিয়ে দেন তখন এই লোকেরাই সত্যচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে বিদ্রোহ সৃষ্টির কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে।"

সূরা বনী ইসরাঈলে একথাটিরই পুনরাবৃত্তি এভাবে করা হয়েছে ঃ "যখন সমুদ্রে তোমাদের ওপর বিপদ আসে তখন সেই একজন ছাড়া আর যাদেরকে তোমরা ডাকতে তারা সবাই হারিয়ে যায়। কিন্তু যখন তিনি তোমাদের বাঁচিয়ে স্থলভাগে পৌঁছিয়ে দেন তখন তোমরা তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।" (৬৭ আয়াত)।

এ আয়াতগুলো সামনে রেখে চিন্তা করুন, লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, আপনার সেই রব কে এবং কেমন, যার ইবাদাত বন্দেগী করার জন্য আপনি আমাদের প্রতি আহবান জানাচ্ছেন? তিনি এর জবাবে বললেন ঃ هُوَ اللّٰهُ তিনি আল্লাহ। এ জবাব থেকে আপনা আপনি এ অর্থ বের হয়, যাকে তোমরা নিজেরাই নিজেদের ও সারা বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা, প্রভু, আহারদাতা, পরিচালক ও ব্যবস্থাপক বলে মানো এবং কঠিন সংকটময় মুহূর্তে অন্য সব মাবুদদের পরিত্যাগ করে একমাত্র তাঁর কাছেই সাহায্য করার

আবেদন জানাও, তিনিই আমার রব এবং তাঁরই ইবাদাত করার দিকে আমি তোমাদের আহবান জানাচ্ছি। এ জবাবের মধ্যে আল্লাহর সমস্ত পূর্ণাংগ গুণাবলী আপনা আপনি এসে পড়ে। কারণ যিনি এ বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টিকর্তা, যিনি এর বিভিন্ন বিষয়ের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করেন, যিনি এর মধ্যে বসবাসকারী সমস্ত প্রাণীর আহার যোগান এবং বিপদের সময় নিজের বান্দাদের সাহায্য করেন তিনি জীবিত নন, শুনতে ও দেখতে পান না, স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নন, সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী নন, করুণাময় ও স্নেহশীল নন এবং সবার ওপর প্রাধান্য বিস্তারকারী নন, একথা আদতে কল্পনাই করা যায় না।

৩. ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে উলামায়ে কেরাম هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ বাক্যটির বিভিন্ন বিশ্লেষণ দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের মতে যে বিশ্লেষণটি এখানকার সাথে পুরোপুরি খাপ খায় সেটি হচ্ছে ঃ هُوَ উদ্দেশ্য (Subject) اَللّٰهُ তার বিধেয় (Predicate) এবং اَحَدٌ তার দ্বিতীয় বিধেয়। এ বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে এ বাক্যটির অর্থ হচ্ছে, তিনি (যাঁর সম্পর্কে তোমরা প্রশ্ন করছো) আল্লাহ, একক। অন্য অর্থ এও হতে পারে এবং ভাষারীতির দিক দিয়ে এটা ভুলও নয় যে, তিনি আল্লাহ এক।

এখানে সর্বপ্রথম একথাটি বুঝে নিতে হবে যে, এ বাক্যটিতে মহান আল্লাহর জন্য "আহাদ" শব্দটি যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা আরবী ভাষায় এ শব্দটির একটি অস্বাভাবিক ব্যবহার। সাধারণত অন্য একটি শব্দের সাথে সম্বন্ধের ভিত্তিতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যেমন ঃ يَوْمُ الْاَحَدِ "সপ্তাহের প্রথম দিন।" অনুরূপভাবে فَابْعَثُوْا اَحَدَكُمْ "তোমাদের কোন একজনকে পাঠাও।" অথবা সাধারণ নেতিবাচক অর্থে এর ব্যবহার হয়। যেমন ঃ مَاجَاءَنِىْ اَحَدٌ "আমার কাছে কেউ আসেনি।" কিংবা ব্যাপকতার ধারণাসহ প্রশ্ন সূচক বাক্যে বলা হয়। যেমন ঃ هَلْ عِنْدَكَ اَحَدٌ "তোমার কাছে কি কেউ আছে?" অথবা এ ব্যাপকতার ধারণাসহ শর্ত প্রকাশক বাক্যে এর ব্যবহার হয় যেমন ঃ اِنْ جَاءَكَ اَحَدٌ "যদি তোমার কাছে কেউ এসে থাকে।" অথবা গণনায় বলা হয়। যেমন ঃ اَحَدٌ ، اِثْنَانِ ، اَحَدٌ عَشَرَ "এক, দুই, এগার।" এ সীমিত ব্যবহারগুলো ছাড়া কুরআন নাযিলের পূর্বে আরবী ভাষায় اَحَدٌ (আহাদ) শব্দটির গুণবাচক অর্থে ব্যবহার অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা জিনিসের গুণ প্রকাশ অর্থে "আহাদ" শব্দের ব্যবহারের কোন নজির নেই। আর কুরআন নাযিলের পর এ শব্দটি শুধুমাত্র আল্লাহর সত্তার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ অস্বাভাবিক বর্ণনা পদ্ধতি স্বতস্ফূর্তভাবে একথা প্রকাশ করে যে, একক ও অদ্বিতীয় হওয়া আল্লাহর বিশেষ গুণ। বিশ্ব-জাহানের কোন কিছুই এ গুণে গুণান্বিত নয়। তিনি এক ও একক, তাঁর কোন দ্বিতীয় নেই।

তারপর মুশরিক ও কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর রব সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন করেছিল সেগুলো সামনে রেখে দেখুন, هُوَ اللّٰهُ বলার পর اَحَدٌ বলে কিভাবে তার জবাব দেয়া হয়েছে ঃ

প্রথমত, এর মানে হচ্ছে, তিনি একাই রব। তাঁর 'রবুবিয়াতে' কারো কোন অংশ নেই। আর যেহেতু ইলাহ (মাবুদ) একমাত্র তিনিই হতে পারেন যিনি রব (মালিক ও প্রতিপালক) হন, তাই 'উলুহীয়াতে'ও (মাবুদ হবার গুণাবলী) কেউ তাঁর সাথে শরীক নেই।

দ্বিতীয়ত, এর মানে এও হয় যে, তিনি একাই এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা। এ সৃষ্টিকর্মে কেউ তাঁর সাথে শরীক নয়। তিনি একাই সমগ্র বিশ্ব-রাজ্যের মালিক ও একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি একাই বিশ্ব-ব্যবস্থার পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। নিজের সমগ্র সৃষ্টিজগতের রিযিক তিনি একাই দান করেন। সংকটকালে তিনি একাই তাদের সাহায্য করেন ও ফরিয়াদ শোনেন। আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের এসব কাজকে তোমরা নিজেরাও আল্লাহর কাজ বলে মনে করো, এসব কাজে আর কারো সামান্যতম কোন অংশও নেই।

তৃতীয়ত, তারা একথাও জিজ্ঞেস করেছিল, তিনি কিসের তৈরি? তাঁর বংশধারা কি? তিনি কোন প্রজাতির অন্তরভুক্ত? দুনিয়ার উত্তরাধিকার তিনি কার কাছ থেকে পেয়েছেন? এবং তাঁর পর কে এর উত্তরাধিকারী হবে? আল্লাহ তাদের এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব একটিমাত্র "আহাদ" শব্দের মাধ্যমে দিয়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে : (১) তিনি এক আল্লাহ চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তাঁর আগে কেউ আল্লাহ ছিল না এবং তাঁর পরেও কেউ আল্লাহ হবে না। (২) আল্লাহর এমন কোন প্রজাতি নেই, যার সদস্য তিনি হতে পারেন। বরং তিনি একাই আল্লাহ এবং তাঁর সমগোত্রীয় ও সমজাতীয় কেউ নেই। (৩) তাঁর সত্তা নিছক واحد এক নয় বরং احد একক, যেখানে কোন দিক দিয়ে একাধিক্যের সামান্যতম স্পর্শও নেই। তিনি বিভিন্ন উপাদানে গঠিত কোন সত্তা নন। তাঁর সত্তাকে দ্বিখণ্ডিত করা যেতে পারে না। তার কোন আকার ও রূপ নেই। তা কোন স্থানের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয় এবং তার মধ্যে কোন জিনিস আবদ্ধ হতে পারে না। তাঁর কোন বর্ণ নেই। কোন অংগ-প্রত্যংগ নেই। কোন দিক নেই। তাঁর মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন-বিবর্তন ঘটে না। সকল প্রকার ধরন ও প্রকরণ মুক্ত ও বিবর্জিত তিনি একমাত্র সত্তা, যা সবদিক দিয়েই আহাদ বা একক। (এ পর্যায়ে একথাটি ভালোভাবে জেনে নিতে হবে যে, আরবী ভাষায় "ওয়াহেদ" শব্দটিকে ঠিক তেমনিভাবে ব্যবহার করা হয় যেমনভাবে আমাদের ভাষায় আমরা "এক" শব্দটিকে ব্যবহার করে থাকি। বিপুল সংখ্যা সম্বলিত কোন সমষ্টিকেও তার সামগ্রিক সত্তাকে সামনে রেখে "ওয়াহেদ" বা "এক" বলা হয়। যেমন এক ব্যক্তি, এক জাতি, এক দেশ, এক পৃথিবী, এমন কি এক বিশ্ব-জাহানও। আবার কোন সমষ্টির প্রত্যেক অংশকেও আলাদা আলাদাভাবেও "এক"-ই বলা হয়। কিন্তু "আহাদ" বা একক শব্দটি আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য ব্যবহার করা হয় না। এ জন্য কুরআন মজীদে যেখানেই আল্লাহর জন্য ওয়াহেদ (এক) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেখানেই বলা হয়েছে : "ইলাহুন ওয়াহেদ" এক মাবুদ বা "আল্লাহুল ওয়াহেদুল কাহ্হার"—এক আল্লাহই সবাইকে বিজিত ও পদানত করে রাখেন। কোথাও নিছক "ওয়াহেদ" বলা হয়নি। কারণ যেসব জিনিসের মধ্যে বিপুল ও বিশাল সমষ্টি রয়েছে তাদের জন্যও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বিপরীত পক্ষে আহাদ শব্দটি একমাত্র আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ আল্লাহই একমাত্র সত্তা ও অস্তিত্ব যার মধ্যে কোন প্রকার একাধিক্য নেই। তাঁর একক সত্তা সবদিক দিয়েই পূর্ণাংগ।

৪. মূলে "সামাদ" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ص م د ধাতু থেকে। আরবী ভাষায় এ ধাতুটি থেকে যতগুলো শব্দের উৎপত্তি হয়েছে সেগুলোর ওপর নজর বুলালে এ শব্দটির অর্থের ব্যাপকতা জানা যায়। যেমন : الصمد মনস্থ করা, ইচ্ছা করা। বিপুলায়তন বিশিষ্ট উন্নত স্থান এবং বিপুল ঘনত্ব বিশিষ্ট উন্নত মর্যাদা। উচ্চ

সমতল ছাদ। যুদ্ধে যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত ও পিপসার্ত হয় না। প্রয়োজনের সময় যে সরদারের শরাণাপন্ন হতে হয়।

اَلصَّمَدُ ঃ প্রত্যেক জিনিসের উঁচু অংশ। যে ব্যক্তির ওপরে আর কেউ নেই। যে নেতার আনুগত্য করা হয় এবং তার সাহায্য ছাড়া কোন বিষয়ের ফায়সালা করা হয় না। অভাবীরা যে নেতার শরণাপন্ন হয়। চিরন্তন। উন্নত মর্যাদা। এমন নিবিড় ও নিচ্ছিদ্র যার মধ্যে কোন ছিদ্র, শূন্যতা ও ফাঁকা অংশ নেই, যেখান থেকে কোন জিনিস বের হতে পারে না এবং কোন জিনিস যার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। যুদ্ধে যে ব্যক্তি ক্ষুধা-তৃষ্ণার শিকার হয় না।

اَلْمُصْمَدُ ঃ জমাট জিনিস, যার পেট নেই।

اَلْمُصَمَّدُ ঃ যে লক্ষের দিকে যেতে মনস্থ করা হয়; যে কঠিন জিনিসের মধ্যে কোন দুর্বলতা নেই।

بَيْتٌ مُصَمَّدٌ ঃ এমন গৃহ, প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য যার আশ্রয় নিতে হয়।

بِنَاءٌ مُصَمَّدٌ ঃ উঁচু ইমারত।

صَمَدَهُ وَصَمَدَ اِلَيْهِ صَمْدًا ঃ ঐ লোকটির দিকে যাওয়ার সংকল্প করলো।

اَصْمَدَ اِلَيْهِ الْاَمْرَ ঃ ব্যাপারটি তার হাতে সোপর্দ করলো; তার সামনে ব্যাপারটি পেশ করলো; বিষয়টি সম্পর্কে তার ওপর আস্থা স্থাপন করলো। (সিহাহ, কামূস ও লিসানুল আরব)।

এসব শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থের ভিত্তিতে "আল্লাহুস সামাদ" আয়াতটিতে উল্লেখিত "সামাদ" শব্দের যে ব্যাখ্যা সাহাবা, তাবেঈ ও পরবর্তীকালের আলেমগণ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে নিচে আমরা তা উল্লেখ করছি ঃ

হযরত আলী (রা), ইকরামা ও কা'ব আহবার বলেছেন ঃ সামাদ হচ্ছেন এমন এক সত্তা যাঁর ওপরে আর কেউ নেই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও আবু ওয়ায়েল শাকীক ইবনে সালামাহ বলেছেন ঃ তিনি এমন সরদার, নেতা ও সমাজপতি, যাঁর নেতৃত্ব পূর্ণতা লাভ করেছে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

এ প্রসংগে ইবনে আব্বাসের দ্বিতীয় উক্তি হচ্ছে ঃ লোকেরা কোন বিপদে-আপদে যার দিকে সাহায্য লাভের জন্য এগিয়ে যায়, তিনি সামাদ। তাঁর আর একটি উক্তি হচ্ছে ঃ যে সরদার তার নেতৃত্ব, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, ধৈর্য, সংযম, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতায় পূর্ণতার অধিকারী তিনি সামাদ।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন ঃ যিনি কারো ওপর নির্ভরশীল নন, সবাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল, তিনিই সামাদ।

ইকরামার আর একটি বক্তব্য হচ্ছে ঃ যার মধ্য থেকে কোন জিনিস কোনদিন বের হয়নি এবং বের হয়ও না আর যে পানাহার করে না, সে-ই সামাদ। এরই সমার্থবোধক উক্তি সা'বী ও মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল কুরাযী থেকেও উদ্ধৃত হয়েছে।

সুদ্দী বলেছেন ঃ আকাংখিত বস্তু লাভ করার জন্য লোকেরা যার কাছে যায় এবং বিপদে সাহায্য লাভের আশায় যার দিকে হাত বাড়ায়, তাকেই সামাদ বলে।

সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেছেন ঃ যে নিজের সকল গুণ ও কাজে পূর্ণতার অধিকারী হয়।

রাবী ইবনে আনাস বলেছেন ঃ যার ওপর কখনো বিপদ-আপদ আসে না।

মুকাতেল ইবনে হাইয়ান বলেছেন ঃ যিনি সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি মুক্ত।

ইবনে কাইসান বলেছেন ঃ অন্য কেউ যার গুণাবলীর ধারক হয় না।

হাসান বসরী ও কাতাদাহ বলেছেন ঃ যে বিদ্যমান থাকে এবং যার বিনাশ নেই। প্রায় এই একই ধরনের উক্তি করেছেন মুজাহিদ, মা'মার ও মুররাতুল হামদানী।

মুররাতুল হামদানীর আর একটি উক্ত হচ্ছে ঃ যে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং যা ইচ্ছা তাই করে; যার হুকুম ও ফায়সালা পূনর্বিবেচনা করার ক্ষমতা কারো থাকে না।

ইবরাহীম নাখয়ী বলেছেন ঃ যার দিকে লোকেরা নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য এগিয়ে যায়।

আবু বকর আমবায়ী বলেছেন ঃ সামাদ এমন এক সরদারকে বলা হয়, যার ওপরে আর কোন সরদার নেই এবং লোকেরা নিজেদের বিভিন্ন বিষয়ে ও নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য যার শরণাপন্ন হয়, অভিধানবিদদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই। আয যুজাজের বক্তব্য প্রায় এর কাছাকাছি। তিনি বলেছেন ঃ যার ওপর এসে নেতৃত্ব খতম হয়ে গেছে এবং নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য প্রত্যেকে যার শরণাপন্ন হয়, তাকেই বলা হয় সামাদ।

এখন চিন্তা করুন, প্রথম বাক্যে "আল্লাহ আহাদ" কেন বলা হয়েছে এবং এ বাক্যে "আল্লাহুস সামাদ" বলা হয়েছে কেন? "আহাদ" শব্দটি সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলেছি, তা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট—আর কারো জন্য এ শব্দটি আদৌ ব্যবহৃত হয় না। তাই এখানে "আহাদুন" শব্দটি অনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে "সামাদ" শব্দটি অন্যান্য সৃষ্টির জন্যও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাই "আল্লাহ সামাদুন" না বলে "আল্লাহুস সামাদ" বলা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, আসল ও প্রকৃত সামাদ হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। সৃষ্টি যদি কোন দিক দিয়ে সামাদ হয়ে থাকে তাহলে অন্য দিক দিয়ে তা সামাদ নয়। কারণ তা অবিনশ্বর নয়—একদিন তার বিনাশ হবে। তাকে বিশ্লেষণ ও বিভক্ত করা যায়। তা বিভিন্ন উপাদান সহযোগে গঠিত। যে কোন সময় তার উপাদানগুলো আলাদা হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কোন কোন সৃষ্টি তার মুখাপেক্ষী হলেও সে নিজেও আবার কারো মুখাপেক্ষী। তার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আপেক্ষিক, নিরংকুশ নয়। কারো তুলনায় সে শ্রেষ্ঠতম হলেও তার তুলনায় আবার অন্য কেউ আছে শ্রেষ্ঠতম। কিছু সৃষ্টির কিছু প্রয়োজন সে পূর্ণ করতে পারে, কিন্তু সবার সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ করার ক্ষমতা কোন সৃষ্টির নেই। বিপরীত পক্ষে আল্লাহর সামাদ হবার গুণ অর্থাৎ তাঁর মুখাপেক্ষীহীনতার গুণ সবদিক দিয়েই পরিপূর্ণ। সারা দুনিয়া তাঁর মুখাপেক্ষী তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। দুনিয়ার প্রত্যেকটি

জিনিস নিজের অস্তিত্ব, স্থায়ীত্ব এবং প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য সচেতন ও অবচেতনভাবে তাঁরই শরণাপন্ন হয়। তিনিই তাদের সবার প্রয়োজন পূর্ণ করেন। তিনি অমর, অজয়, অক্ষয়। তিনি রিযিক দেন—নেন না। তিনি একক—যৌগিক ও মিশ্র নন। কাজেই বিভক্তি ও বিশ্লেষণযোগ্য নন। সমগ্র বিশ্ব-জাহানের ওপর তাঁর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই তিনি নিছক "সামাদ" নন, বরং "আসসামাদ।" অর্থাৎ তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি মূলত সামাদ তথা অমুখাপেক্ষিতার গুণাবলীর সাথে পুরোপুরি সংযুক্ত।

আবার যেহেতু তিনি "আসসামাদ" তাই তাঁর একাকী ও স্বজনবিহীন হওয়া অপরিহার্য। কারণ এ ধরনের সত্তা একজনই হতে পারেন, যিনি কারো কাছে নিজের অভাব পূরণের জন্য হাত পাতেন না, বরং সবাই নিজেদের অভাব পূরণের জন্য তাঁর মুখাপেক্ষী হয়। দুই বা তার চেয়ে বেশী সত্তা সবার প্রতি অমুখাপেক্ষী ও অনির্ভরশীল এবং সবার প্রয়োজন পূরণকারী হতে পারে না। তাছাড়া তাঁর "আসসামাদ" হবার কারণে তাঁর একক মাবুদ হবার ব্যাপারটিও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ মানুষ যার মুখাপেক্ষী হয় তারই ইবাদাত করে। আবার তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, "আসসামাদ" হবার কারণে এটাও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ, যে প্রয়োজন পূরণ করার ক্ষমতা ও সামর্থই রাখে না, কোন সচেতন ব্যক্তি তার ইবাদাত করতে পারে না।

৫. মুশরিকরা প্রতি যুগে খোদায়ীর এ ধারণা পোষণ করে এসেছে যে, মানুষের মতো খোদাদেরও একটি জাতি বা শ্রেণী আছে। তার সদস্য সংখ্যাও অনেক। তাদের মধ্যে বিয়ে-শাদী এবং বংশ বিস্তারের কাজও চলে। তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকেও এ জাহেলী ধারণা মুক্ত রাখেনি। তাঁর জন্য সন্তান সন্ততিও ঠিক করে নিয়েছে। তাই কুরআন মজীদে আরববাসীদের আকীদা বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে, তারা ফেরেশতাদেরকে মহান আল্লাহর কন্যা গণ্য করতো। তাদের জাহেলী চিন্তা নবীগণের উম্মাতদেরকেও সংরক্ষিত রাখেনি। তাদের মধ্যেও নিজেদের সৎ ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করার আকীদা জন্ম নেয়। এ বিভিন্ন ধরনের কাল্পনিক চিন্তা-বিশ্বাসের মধ্যে দুই ধরনের চিন্তা সবসময় মিশ্রিত হতে থেকেছে। কিছু লোক মনে করেছে, যাদেরকে তারা আল্লাহর সন্তান গণ্য করছে তারা সেই মহান পবিত্র সত্তার ঔরসজাত সন্তান। আবার কেউ কেউ দাবী করেছে, যাকে তারা আল্লাহর সন্তান বলছে, আল্লাহ তাকে নিজের পালকপুত্র বানিয়েছেন। যদিও তাদের কেউ কাউকে (মাআ'যাল্লাহ) আল্লাহর পিতা গণ্য করার সাহস করেনি। কিন্তু যখন কোন সত্তা সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে, তিনি সন্তান উৎপাদন ও বংশ বিস্তারের দায়িত্বমুক্ত নন এবং তাঁর সম্পর্কে ধারণা করা হয়, তিনি মানুষ জাতীয় এক ধরনের অস্তিত্ব, তাঁর ঔরসে সন্তান জন্মলাভ করে এবং অপুত্রক হলে তার কাউকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন মানুষের মন তাঁকেও কারো সন্তান মনে করার ধারণা মুক্ত থাকতে পারে না। এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছিল তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল, আল্লাহর বংশধারা কি? দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল, কার কাছ থেকে তিনি দুনিয়ার উত্তরাধিকার লাভ করেছেন এবং তাঁর পরে এর উত্তরাধিকারী হবে কে?

এসব জাহেলী মূর্খতা প্রসূত ধারণা-কল্পনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এগুলোকে যদি নীতিগতভাবে মেনে নিতে হয়, তাহলে আরো কিছু জিনিসকেও মেনে নেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যেমন ঃ

এক ঃ আল্লাহ এক নয়, বরং আল্লাহর কোন একটি জাতি ও গোষ্ঠী আছে। তাদের সদস্যরা আল্লাহর গুণাবলী, কার্যকলাপ ও কর্তৃত্ব-ক্ষমতায় তাঁর সাথে শরীক। আল্লাহর কেবলমাত্র ঔরসজাত সন্তান ধারণা করে নিলে এ বিষয়টি অপরিহার্য হয় না, বরং কাউকে পালকপুত্র হিসেবে ধারণা করে নিলেও এটি অপরিহার্য হয়। কেননা কারো পালকপুত্র অবশ্যি তারই সমজাতীয় ও সমগোত্রীয়ই হতে পারে। আর (মা'আযাল্লাহ) যখন সে আল্লাহর সমজাতীয় ও সমগোত্রীয় হয়, তখনই সে আল্লাহর গুণাবলী সম্পন্নও হবে, একথা অস্বীকার করা যেতে পারে না।

দুই ঃ পুরুষ ও নারীর মিলন ছাড়া কোন সন্তানের ধারণা ও কল্পনা করা যেতে পারে না। বাপ ও মায়ের শরীর থেকে কোন জিনিস বের হয়ে সন্তানের রূপ লাভ করে—সন্তান বলতে একথাই বুঝায়। কাজেই এ ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তান ধারণা করার ফলে (নাউযুবিল্লাহ) তাঁর একটি বস্তুগত ও শারীরিক অস্তিত্ব, তাঁর সমজাতীয় কোন স্ত্রীর অস্তিত্ব এবং তার শরীর থেকে কোন বস্তু বের হওয়াও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তিন ঃ সন্তান উৎপাদন ও বংশধারা চালাবার কথা যেখানে আসে সেখানে এর মূল কারণ হয় এই যে, ব্যক্তিরা হয় মরণশীল এবং তাদের জাতির ও গোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাদের সন্তান উৎপাদন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ, এ সন্তানদের সাহায্যেই তাদের বংশধারা অব্যাহত থাকবে এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। কাজেই আল্লাহর সন্তান আছে বলে মনে করলে (নাউযুবিল্লাহ) তিনি নিজে যে মরণশীল এবং তাঁর বংশ ও তাঁর নিজের সত্তা কোনটিই চিরন্তন নয় একথা মেনে নেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া সমস্ত মরণশীল ব্যক্তির মতো (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহরও কোন শুরু ও শেষ আছে, একথাও মেনে নেয়া অপরিহার্য হয়ে যায়। কারণ, সন্তান উৎপাদন ও বংশ বিস্তারের ওপর যেসব জাতি ও গোত্র নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তাদের ব্যক্তিবর্গ অনাদি-অনন্তকালীন জীবনের অধিকারী হয় না।

চার ঃ কারো পালকপুত্র বলবার উদ্দেশ্য এ হয় যে, একজন সন্তানহীন ব্যক্তি তার নিজের জীবনে কারো সাহায্যের এবং নিজের মৃত্যুর পর কোন উত্তরাধিকারের প্রয়োজন বোধ করে। কাজেই আল্লাহ কাউকে নিজের পুত্র বানিয়েছেন একথা মনে করা হলে সেই পবিত্র সত্তার সাথে এমন সব দুর্বলতা সংশ্লিষ্ট করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, যেগুলো মরণশীল মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়।

যদিও মহান আল্লাহকে "আহাদ" ও "আসসামাদ" বললে এসব উদ্ভট ধারণা-কল্পনার মূলে কুঠারঘাত করা হয়, তবুও এরপর "না তাঁর কোন সন্তান আছে, না তিনি কারো সন্তান"—একথা বলায় এ ব্যাপারে আর কোন প্রকার সংশয়-সন্দেহের অবকাশই থাকে না। তারপর যেহেতু আল্লাহর মহান সত্তা সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা-কল্পনা শিরকের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোর অন্তরভুক্ত, তাই মহান আল্লাহ শুধুমাত্র সূরা ইখলাসেই এগুলোর দ্ব্যর্থহীন ও চূড়ান্ত প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং বিভিন্ন জায়গায় এ

বিষয়টিকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। এভাবে লোকেরা সত্যকে পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নীচের আয়াতগুলো পর্যালোচনা করা যেতে পারে ঃ

اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبْحٰنَهٗۤ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ – النساء : ١٧١

"আল্লাহ–ই হচ্ছেন একমাত্র ইলাহ। কেউ তাঁর পুত্র হবে, এ অবস্থা থেকে তিনি মুক্ত–পাক–পবিত্র। যা কিছু আকাশসমূহের মধ্যে এবং যা কিছু যমীনের মধ্যে আছে, সবই তার মালিকানাধীন।" (আন নিসা, ১৭১)

اَلَاۤ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ۙ وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ

"জেনে রাখো, এরা যে বলছে আল্লাহর সন্তান আছে, এটা এদের নিজেদের মনগড়া কথা। আসলে এটি একটি ডাহা মিথ্যা কথা।" (আস সাফ্‌ফাত, ১৫১–১৫২)

وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ؕ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ

"তারা আল্লাহ ও ফেরেশতাদের মধ্যে বংশীয় সম্পর্ক তৈরি করে নিয়েছে অথচ ফেরেশতারা ভালো করেই জানে এরা (অপরাধী হিসেবে) উপস্থাপিত হবে।"
(আস সাফফাত, ১৫৮)

وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ –

"লোকেরা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে কাউকে তাঁর অংশ বানিয়ে ফেলেছে। আসলে মানুষ স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ।" (আয্ যুখরুফ, ১৫)

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ۛ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ – الانعام : ١٠٠ – ١٠١

"আর লোকেরা জিনদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়েছে। অথচ তিনি তাদের স্রষ্টা। আর তারা না জেনে–বুঝে তাঁর জন্য পুত্র–কন্যা বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তারা যে সমস্ত কথা বলে তা থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র এবং তার উর্ধে তিনি অবস্থান করছেন। তিনি তো আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নির্মাতা। তাঁর পুত্র কেমন করে হতে পারে যখন তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই? তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন।" (আল আনআম, ১০০–১০১)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ

"আর তারা বললো, দয়াময় আল্লাহ কাউকে পুত্র বানিয়েছেন। তিনি পাক–পবিত্র। বরং (যাদেরকে এরা তাঁর সন্তান বলছে) তারা এমন সব বান্দা যাদেরকে মর্যাদা দান করা হয়েছে।" (আল আম্বিয়া, ২৬)

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ الْغَنِىُّ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.

"লোকেরা বলে দিয়েছে, আল্লাহ কাউকে পুত্র বানিয়েছেন আল্লাহ পাক-পবিত্র। তিনি তো অমুখাপেক্ষী। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর মালিকানাধীন। এ বক্তব্যের সপক্ষে তোমাদের প্রমাণ কি? তোমরা কি আল্লাহর সম্পর্কে এমন সব কথা বলছো, যা তোমরা জানো না?" (ইউনুস, ৬৮)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ -

"আর হে নবী! বলে দাও, সেই আল্লাহর জন্য সব প্রশংসা যিনি না কাউকে পুত্র বানিয়েছেন, না বাদশাহীতে কেউ তাঁর শরীক আর না তিনি অক্ষম, যার ফলে কেউ হবে তাঁর পৃষ্ঠপোষক।" (বনী ইসরাঈল, ১১১)

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ-

"আল্লাহ কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে দ্বিতীয় কোন ইলাহও নেই।" (আল মু'মিনূন, ৯১)

যারা আল্লাহর জন্য ঔরসজাত সন্তান অথবা পালকপুত্র গ্রহণ করার কথা বলে, এ আয়াতগুলোতে সর্বতোভাবে তাদের এহেন আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিবাদ করা হয়েছে। এ আয়াতগুলো এবং এ বিষয়বস্তু সম্বলিত অন্য যে সমস্ত আয়াত কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়, সেগুলো সূরা ইখলাসের অতি চমৎকার ব্যাখ্যা।

৬. মূলে বলা হয়েছে কুফূ (كفو) এর মানে হচ্ছে, নজীর, সদৃশ, সমান, সমমর্যাদা সম্পন্ন ও সমতুল্য। বিয়ের ব্যাপারে আমাদের দেশে কুফূ শব্দের ব্যবহার আছে। এ ক্ষেত্রে এর অর্থ হয়, সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়ে ছেলের ও মেয়ের সমান পর্যায়ে অবস্থান করা। কাজেই এখানে এ আয়াতের মানে হচ্ছে ঃ সারা বিশ্ব-জাহানে আল্লাহর সমকক্ষ অথবা তাঁর সমমর্যাদা সম্পন্ন কিংবা নিজের গুণাবলী, কর্ম ও ক্ষমতার ব্যাপারে তাঁর সমান পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে এমন কেউ কোন দিন ছিল না এবং কোন দিন হতেও পারবে না।

মু'আওবিযাতাইন

(আল ফালাক ও আন নাস)

১১৩, ১১৪

নামকরণ

কুরআন মজীদের এ শেষ সূরা দু'টি আলাদা আলাদা সূরা ঠিকই এবং মূল লিপিতে এ সূরা দু'টি ভিন্ন ভিন্ন নামেই লিখিত হয়েছে, কিন্তু এদের পারস্পরিক সম্পর্ক এত গভীর এবং উভয়ের বিষয়বস্তু পরস্পরের সাথে এত বেশী নিকট সম্পর্ক রাখে যার ফলে এদের একটি যুক্ত নাম "মু'আওবিযাতাইন" (আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার দু'টি সূরা) রাখা হয়েছে। ইমাম বায়হাকী তাঁর "দালায়েলে নবুওয়াত" বইতে লিখেছেন ঃ এ সূরা দু'টি নাযিলও হয়েছে একই সাথে। তাই উভয়ের যুক্তনাম রাখা হয়েছে "মু'আওবিযাতাইন"। আমরা এখানে উভয়ের জন্য একটি সাধারণ ভূমিকা লিখছি। কারণ, এদের উভয়ের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলী ও বক্তব্য সম্পূর্ণ একই পর্যায়ভুক্ত। তবে ভূমিকায় একত্র করার পর সামনের দিকে প্রত্যেকের আলাদা ব্যাখ্যা করা হবে।

নাযিলের সময়-কাল

হযরত হাসান বসরী, ইকরামা, আতা ও জাবের ইবনে যায়েদ বলেন, এ সূরা দু'টি মক্কী। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এ ধরনের একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর অন্য একটি বর্ণনায় একে মাদানী বলা হয়েছে। আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) ও কাতাদাহও একই উক্তি করেছেন। যে সমস্ত হাদীস এ দ্বিতীয় বক্তব্যটিকে শক্তিশালী করে তার মধ্যে মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ ও মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বলে হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) বর্ণিত একটি হাদীস হচ্ছে ঃ একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اٰيَاتٍ اُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ ، لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ ، اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ -

"তোমরা কি কোন খবর রাখো, আজ রাতে আমার ওপর কেমন ধরনের আয়াত নাযিল হয়েছে? নজীরবিহীন আয়াত! কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরব্বিন নাস।"

হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) হিজরাতের পরে মদীনা তাইয়েবায় ইসলাম গ্রহণ করেন বলেই এ হাদীসের ভিত্তিতে এ সূরা দু'টিকে মাদানী বলার যৌক্তিকতা দেখা দেয়। আবু দাউদ ও নাসাঈ তাদের বর্ণনায় একথাই বিবৃত করেছেন। অন্য যে রেওয়ায়েতগুলো এ

বক্তব্যকে শক্তিশালী করেছে সেগুলো ইবনে সা'দ, মুহিউস সুন্নাহ বাগাবী, ইমাম নাসাঈ, ইমাম বায়হাকী, হাফেয ইবনে হাজার, হাফেয বদরুদ্দীন আইনী, আবদ ইবনে হুমায়েদ এবং আরো অনেকে উদ্ধৃত করেছেন। সেগুলোতে বলা হয়েছে ঃ ইহুদিরা যখন মদীনায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদু করেছিল এবং তার প্রভাবে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তখন এ সূরা নাযিল হয়েছিল। ইবনে সাদ ওয়াকেদীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন, এটি সপ্তম হিজরীর ঘটনা। এরই ভিত্তিতে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাও এ সূরা দু'টিকে মাদানী বলেছেন।

কিন্তু ইতিপূর্বে সূরা ইখলাসের ভূমিকায় আমরা বলেছি, কোন সূরা বা আয়াত সম্পর্কে যখন বলা হয়, উমুক সময় সেটি নাযিল হয়েছিল। তখন এর অর্থ নিশ্চিতভাবে এ হয় না যে, সেটি প্রথমবার ঐ সময় নাযিল হয়েছেল। বরং অনেক সময় এমনও হয়েছে, একটি সূরা বা আয়াত প্রথমে নাযিল হয়েছিল, তারপর কোন বিশেষ ঘটনা বা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পুনর্বার তারই প্রতি বরং কখনো কখনো বারবার তার প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছিল। আমাদের মতে সূরা নাস ও সূরা ফালাকের ব্যাপারটিও এ রকমের। এদের বিষয়বস্তু পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে, প্রথমে মক্কায় এমন এক সময় সূরা দু'টি নাযিল হয়েছিল যখন সেখানে নবী করীমের (সা) বিরোধিতা জোরেশোরে শুরু হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে যখন মদীনা তাইয়েবায় মুনাফিক, ইহুদি ও মুশরিকদের বিপুল বিরোধিতা শুরু হলো, তখন তাঁকে আবার ঐ সূরা দু'টি পড়ার নির্দেশ দেয়া হলো। ওপরে উল্লেখিত হযরত উকবা ইবনে আমেরের (রা) রেওয়ায়াতে একথাই বলা হয়েছে। তারপর যখন তাঁকে যাদু করা হলো এবং তাঁর মানসিক অসুস্থতা বেশ বেড়ে গেলো তখন আল্লাহর হুকুমে জিব্রীল আলাইহিস সালাম এসে আবার তাঁকে এ সূরা দু'টি পড়ার হুকুম দিলেন। তাই আমাদের মতে যেসব মুফাস্‌সির এ সূরা দু'টিকে মক্কী গণ্য করেন তাদের বর্ণনাই বেশী নির্ভরযোগ্য। সূরা ফালাকের শুধুমাত্র একটি আয়াত وَمِنْ شَرِّ النَّفَّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ যাদুর সাথে সম্পর্ক রাখে, এ ছাড়া আল ফালাকের বাকি সমস্ত আয়াত এবং সূরা নাসের সবক'টি আয়াত এ ব্যাপারে সরাসরি কোন সম্পর্ক রাখে না। যাদুর ঘটনার সাথে এ সূরা দু'টিকে সম্পর্কিত করার পথে এটিও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

মক্কা মু'আয্‌যমায় এক বিশেষ প্রেক্ষপটে এ সূরা দু'টি নাযিল হয়েছিল। তখন ইসলামী দাওয়াতের সূচনা পর্বেই মনে হচ্ছিল, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন ভীমরুলের চাকে হাত দিয়ে ফেলেছেন। তাঁর দাওয়াত যতই বিস্তার লাভ করতে থেকেছে কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের বিরোধিতাও ততোই বেড়ে যেতে থেকেছে। যতদিন তাদের আশা ছিল, কোনরকম দেয়া-নেয়া করে অথবা ফুসলিয়ে ফাসলিয়ে তাঁকে ইসলামী দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত রাখতে পারা যাবে, ততদিন তো বিদ্বেষ ও শত্রুতার তীব্রতার কিছুটা কমতি ছিল। কিন্তু নবী করীম (সা) যখন দীনের ব্যাপারে তাদের সাথে কোন প্রকার আপোষ রফা করার প্রশ্নে তাদেরকে সম্পূর্ণ নিরাশ করে দিলেন এবং সূরা আল কাফেরূনে তাদেরকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে দিলেন—যাদের বন্দেগী তোমরা করছো

আমি তার বন্দেগী করবো না এবং আমি যার বন্দেগী করছি তোমরা তার বন্দেগী করো না, কাজেই আমার পথ আলাদা এবং তোমাদের পথও আলাদা—তখন কাফেরদের শত্রুতা চরমে পৌছে গিয়েছিল। বিশেষ করে যেসব পরিবারের ব্যক্তিবর্গ (পুরুষ-নারী, ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে) ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের মনে তো নবী করীমের (সা) বিরুদ্ধে সবসময় তুষের আগুন জ্বলছিল। ঘরে ঘরে তাঁকে অভিশাপ দেয়া হচ্ছিল। কোন দিন রাতের আঁধারে লুকিয়ে তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হচ্ছিল। যাতে বনী হাশেমদের কেউ হত্যাকারীর সন্ধান পেয়ে আবার প্রতিশোধ নিতে না পারে এ জন্য এ ধরনের পরামর্শ চলছিল। তাঁকে যাদু-টোনা করা হচ্ছিল। এভাবে তাঁকে মেরে ফেলার বা কঠিন রোগে আক্রান্ত করার অথবা পাগল করে দেয়ার অভিপ্রায় ছিল। জিন ও মানুষদের মধ্যকার শয়তানরা সব দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা চাচ্ছিল জন-মানুষের মনে তাঁর এবং তিনি যে দীন তথা জীবন বিধান ও কুরআন এনেছেন তার বিরুদ্ধে কোন না কোন সংশয় সৃষ্টি করতে। এর ফলে লোকেরা তাঁর প্রতি বিরূপ ধারণা করে দূরে সরে যাবে বলে তারা মনে করছিল। অনেক লোকের মনে হিংসার আগুন জ্বলছিল। কারণ তারা নিজেদের ছাড়া বা নিজেদের গোত্রের লোকদের ছাড়া আর কারো প্রদীপের আলো জ্বলতে দেখতে পারতো না। উদাহরণ স্বরূপ, আবু জেহেল যে কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতায় সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল সেটি ছিল তার নিজের ভাষায় ঃ "আমাদের ও বনী আবদে মান্নাফের (তথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার) মধ্যে ছিল পারস্পরিক প্রতিযোগিতা। তারা মানুষকে আহার করিয়েছে, আমরাও আহার করিয়েছি। তারা লোকদেরকে সওয়ারী দিয়েছে, আমরাও দিয়েছি। তারা দান করেছে, আমরাও দান করেছি। এমন কি তারা ও আমরা মান-মর্যাদার দৌড়ে সমানে সমান হয়ে গেছি। এখন তারা বলছে কি, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছে, তার কাছে আকাশ থেকে অহী আসে। আচ্ছা, এখন এ ক্ষেত্রে আমরা তাদের সাথে কেমন করে মোকাবেলা করতে পারি? আল্লাহর কসম, আমরা কখনো তাকে মেনে নেবো না এবং তার সত্যতার স্বীকৃতি দেবো না।" (ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, ৩৩৭-৩৩৮ পৃষ্ঠা)

এহেন অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে ঃ এদেরকে বলে দাও আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রবের, সমুদয় সৃষ্টির দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট থেকে, রাতের আঁধার থেকে, যাদুকর ও যাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকদের দুষ্কৃতি থেকে। আর এদেরকে বলে দাও, আমি আশ্রয় চাচ্ছি সমস্ত মানুষের রব, সমস্ত মানুষের বাদশা ও সমস্ত মানুষের মাবুদের কাছে। এমন প্রত্যেকটি সন্দেহ ও প্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে যা বার বার ঘুরে ফিরে আসে এবং মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে ও তাদেরকে প্ররোচিত করে। তারা জিন শয়তানদের মধ্য থেকে হতে পারে, আবার মানুষ শয়তানদের মধ্য থেকেও হতে পারে। এটা হযরত মূসার (আ) ঠিক সেই সময়ের কথার মতো যখন ফেরাউন ভরা দরবারে তাঁকে হত্যা করার সংকল্প প্রকাশ করেছিল। হযরত মূসা তখন বলেছিলেন ঃ

إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ

"আমি নিজের ও তোমাদের রবের আশ্রয় নিয়েছি এমন ধরনের প্রত্যেক দাম্ভিকের মোকাবেলায় যে হিসেবের দিনের প্রতি ঈমান রাখে না" (আল মু'মিন, ২৭)

وَاِنِّیْ عُذْتُ بِرَبِّیْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ

"আর তোমরা আমার ওপর আক্রমণ করবে এ জন্য আমি নিজের ও তোমাদের রবের আশ্রয় নিয়েছি।" (আদ দুখান, ২০)।

উভয় স্থানেই আল্লাহর এ মহান মর্যাদা সম্পন্ন পয়গম্বরদের নিতান্ত সহায় সম্বলহীন অবস্থায় বিপুল উপায় উপকরণ ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তির অধিকারীদের সাথে মোকাবেলা করতে হয়েছিল। উভয় স্থানেই শক্তিশালী দুশমনদের সামনে তাঁরা নিজেদের সত্যের দাওয়াত নিয়ে অবিচল ও দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। অথচ দুশমনদের মোকাবেলা করার মতো কোন বস্তুগত শক্তি তাদের ছিল না। উভয় স্থানেই তাঁরা "তোমাদের মোকাবেলায় আমরা বিশ্ব-জাহানের রবের আশ্রয় নিয়েছি" এই বলে দুশমনদের হুমকি-ধমকি, মারাত্মক বিপজ্জনক কূট কৌশল ও শত্রুতামূলক চক্রান্ত উপেক্ষা করে গেছেন। মূলত যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, আল্লাহর শক্তি সব শক্তির সেরা, তাঁর মোকাবেলায় দুনিয়ার সব শক্তি তুচ্ছ এবং যে ব্যক্তি তাঁর আশ্রয় নিয়েছে তার সামান্যতম ক্ষতি করার ক্ষমতাও কারো নেই, একমাত্র সেই ব্যক্তিই এ ধরনের অবিচলতা, দৃঢ় সংকল্প ও উন্নত মনোবলের পরিচয় দিতে পারে এবং সে-ই একথা বলতে পারে ঃ সত্যের বাণী ঘোষণার পথ থেকে আমি কখনই বিচ্যুত হবো না। তোমাদের যা ইচ্ছা করে যাও। আমি তার কোন পরোয়া করি না। কারণ আমি তোমাদের ও আমার নিজের এবং সারা বিশ্ব-জাহানের রবের আশ্রয় নিয়েছি।

এ সূরা দু'টি কুরআনের অংশ কিনা

এ সূরা দু'টির বিষয়বস্তুও মূল বক্তব্য অনুধাবন করার জন্য ওপরের আলোচনাটুকুই যথেষ্ট। তবুও হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থগুলোয় এদের সম্পর্কে এমন তিনটি বিষয়ের আলোচনা এসেছে যা মনে সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে, তাই আমরা সে ব্যাপারটিও পরিষ্কার করে দিতে চাই । এর মধ্যে সর্বপ্রথম যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় সেটি হচ্ছে, এ সূরা দু'টির কুরআনের অংশ হবার ব্যাপারটি কি চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত অথবা এর মধ্যে কোন প্রকার সংশয়ের অবকাশ আছে? এ প্রশ্ন দেখা দেবার কারণ হচ্ছে এই যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মতো উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী থেকে বিভিন্ন রেওয়ায়াতে একথা উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি এ সূরা দু'টিকে কুরআনের সূরা বলে মানতেন না এবং নিজের পাণ্ডুলিপিতে তিনি এ দু'টি সূরা সংযোজিত করেননি। ইমাম আহমাদ, বাযযার, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া, আবু ইয়ালা, আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল, হুমাইদী, আবু নূ'আইম, ইবনে হিব্বান প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সূত্রে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সহীহ সনদের মাধ্যমে একথা হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ হাদীসগুলোতে কেবল একথাই বলা হয়নি যে, তিনি এই সূরা দু'টিকে কুরআনের পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ দিতেন বরং এই সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, তিনি বলতেন ঃ "কুরআনের সাথে এমন জিনিস মিশিয়ে ফেলো না যা কুরআনের অংশ নয়। এ সূরা দু'টি কুরআনের অন্তরভুক্ত নয় । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এর মাধ্যমে একটি হুকুম দেয়া হয়েছিল। তাঁকে বলা হয়েছিল, এ শব্দগুলোর মাধ্যমে

আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।" কোন কোন রেওয়ায়াতে আরো বাড়তি বলা হয়েছে যে, তিনি নামাযে এ সূরা দু'টি পড়তেন না।

এ রেওয়ায়াতগুলোর কারণে ইসলাম বিরোধীরা কুরআনের বিরুদ্ধে সন্দেহ সৃষ্টির এবং (নাউযুবিল্লাহ) কুরআন যে বিকৃতিমুক্ত নয় একথা বলার সুযোগ পেয়ে গেছে। বরং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) মতো বড় সাহাবী যখন এই মত পোষণ করছেন যে, কুরআনের এ দু'টি সূরা বাইর থেকে তাতে সংযোজিত হয়েছে তখন না জানি তার মধ্যে আরো কত কি পরিবর্তন–পরিবর্ধন করা হয়েছে। এ ধরনের সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টির সুযোগ তারা সহজেই পেয়ে গেছে। কুরআনকে এ ধরনের দোষারোপ মুক্ত করার জন্য কাযী আবু বকর বাকেল্লানী ও কাযী ইয়ায ইবনে মাসউদের বক্তব্যের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তারা বলেছেন, ইবনে মাসউদ সূরা ফালাক ও সূরা নাসের কুরআনের অংশ হবার ব্যাপারটি অস্বীকার করতেন না বরং তিনি শুধু এ সূরা দু'টিকে কুরআনের পাতায় লিখে রাখতে অস্বীকার করতেন। কারণ তাঁর মতে কুরআনের পাতায় শুধুমাত্র তাই লিখে রাখা উচিত যা লিখার অনুমতি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের এ জবাব ও ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ ইবনে মাসউদ (রা) এ সূরা দু'টির কুরআনের সূরা হওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন, একথা নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত। ইমাম নববী, ইমাম ইবনে হাযম, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী প্রমুখ অন্য কতিপয় মনীষী ইবনে মাসউদ যে এ ধরনের কোন কথা বলেছেন, একথাটিকেই সরাসরি মিথ্যা ও বাতিল গণ্য করেছেন। কিন্তু নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সত্যকে সনদ ছাড়াই রদ করে দেয়া কোন সুস্থ জ্ঞানসম্মত পদ্ধতি নয়।

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, ইবনে মাসউদ (রা) সংক্রান্ত এ রেওয়ায়াত থেকে কুরআনের প্রতি যে দোষারোপ হচ্ছে তার জবাব কি ? এ প্রশ্নের কয়েকটি জবাব আমরা এখানে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করছি।

এক ঃ হাফেয বাযযার তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে ইবনে মসউদ (রা) সংক্রান্ত এ রেওয়ায়াতগুলো বর্ণনা করার পর লিখেছেন ঃ নিজের এ রায়ের ব্যাপারে তিনি একান্তই নিঃসংগ ও একাকী। সাহাবীদের একজনও তাঁর এ বক্তব্য সমর্থন করেননি।

দুই ঃ সকল সাহাবী একমত হওয়ার ভিত্তিতে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআন মজীদের যে অনুলিপি তৈরি করেছিলেন এবং ইসলামী খেলাফতের পক্ষ থেকে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রে সরকারী পর্যায়ে পাঠিয়েছিলেন তাতে এ দু'টি সূরা লিপিবদ্ধ ছিল।

তিন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সমগ্র ইসলামী দুনিয়ায় কুরআনের যে কপির ওপর সমগ্র মুসলিম উম্মাহ একমত তাতেই সূরা দু'টি লিখিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের (রা) একক রায় তাঁর বিপুল ও উচ্চ মর্যাদা সত্ত্বেও সমগ্র উম্মাতের এ মহান ইজমার মোকাবেলায় কোন মূল্যই রাখে না।

চার ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হাদীস অনুযায়ী একথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি নামাযে এ সূরা দু'টি নিজে পড়তেন,

অন্যদের পড়ার আদেশ দিতেন এবং কুরআনের সূরা হিসেবেই লোকদেরকে এ দু'টির শিক্ষা দিতেন। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত হাদীসগুলো দেখুন।

ইতিপূর্বে মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী ও নাসাঈর বরাত দিয়ে আমরা হযরত উকবা ইবনে আমেরের (রা) একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছি। এতে রসূলুল্লাহ (সা) সূরা ফালাক ও সূরা নাস সম্পর্কে তাঁকে বলেন ঃ আজ রাতে এ আয়াতগুলো আমার ওপর নাযিল হয়েছে। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত নাসায়ীর এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দু'টি সূরা ফজরের নামাযে পড়েন। ইবনে হিব্বানও এই হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন, নবী করীম (সা) তাঁকে বলেন ঃ "যদি সম্ভব হয় তোমার নামাযসমূহ থেকে এ সূরা দু'টির পড়া যেন বাদ না যায়।" সাঈদ ইবনে মনসুর হযরত মু'আয ইবনে জাবালের রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী করিম (সা) ফজরের নামাযে এ সূরা দু'টি পড়েন। ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে সহীহ সনদ সহকারে আরো একজন সাহাবীর হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী (সা) তাঁকে বলেন ঃ যখন তুমি নামায পড়বে, তাতে এ দু'টি সূরা পড়তে থাকবে। মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসাঈতে উকবা ইবনে আমেরের (রা) একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ "লোকেরা যে সূরাগুলো পড়ে তার মধ্যে সর্বোত্তম দু'টি সূরা কি তোমাকে শেখাবো না? তিনি আরজ করেন, অবশ্যি শিখাবেন। হে আল্লার রসূল! একথায় তিনি তাকে এ আল ফালাক ও আন নাস সূরা দু'টি পড়ান। তারপর নামায দাঁড়িয়ে যায় এবং নবী করীম (সা) এ সূরা দু'টি তাতে পড়েন। নামায শেষ করে তিনি তার কাছ দিয়ে যাবার সময় বলেন ঃ "হে উকাব (উকবা)! কেমন দেখলে তুমি?" এরপর তাকে হিদায়াত দিলেন, যখন তুমি ঘুমাতে যাও এবং যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠো তখন এ সূরা দু'টি পড়ো। মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ তিরমিযী, নাসাঈতে উকবা ইবনে আমেরের (রা) অন্য একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে প্রত্যেক নামাযের পর "মুআওবিযাত" (অর্থাৎ সূরা ইখলাস, সূরা আল ফালাক ও সূরা আন নাস) পড়তে বলেন। নাসায়ী ইবনে মারদুইয়ার এবং হাকেম উকবা ইবনে আমেরের আর একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ একবার নবী করিম (সা) সওয়ারীর পিঠে চড়ে যাচ্ছিলেন এবং আমি তাঁর পবিত্র পায়ে হাত রেখে সাথে সাথে যাচ্ছিলাম। আমি বললাম, আমাকে কি সূরা হূদ সূরা ইউসুফ শিখিয়ে দেবেন? বললেন ঃ "আল্লাহর কাছে বান্দার জন্য 'কুল আউজু বিরাব্বিল ফালাক–এর চাইতে বেশী বেশী উপকারী আর কোন জিনিস নেই।" নাসাঈ, বায়হাকী, বাগাবী ও ইবনে সা'দ আদুল্লাহ ইবনে আবেস আল জুহানীর রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী করিম (সা) আমাকে বলেছেন ঃ "ইবনে আবেস, আমি কি তোমাকে জানাবো না, আশ্রয় প্রার্থীরা যতগুলো জিনিসের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কোনগুলো?" আমি বললাম, অবশ্যি বলবেন হে আল্লাহর রসূল! বললেন ঃ "কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক" ও "কুল আউযু বিরব্বিন নাস" সূরা দু'টি।" ইবনে মারদুইয়া হযরত ইবনে সালমার রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ যে সূরাগুলো সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন তা হচ্ছে", কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরব্বিন নাস।"

এখানে প্রশ্ন দেখা যায়, এ দু'টি কুরআন মজীদের সূরা নয়, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এ ধরনের ভুল ধারণার শিকার হলেন কেমন করে? দু'টি বর্ণনা একত্র করে দেখলে আমরা এর জবাব পেতে পারি।

একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলতেন, এটিতো আল্লাহর একটি হুকুম ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুকুম দেয়া হয়েছিল, আপনি এভাবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান। অন্য বর্ণনাটি বিভিন্ন সূত্রে উদ্ধৃত হয়েছে। ইমাম বুখারী সহীহ আল বুখারীতে, ইমাম মুহাম্মাদ তাঁর মুসনাদে, হাফেজ আবু বকর আল হুমাইদী তাঁর মুসনাদে, আবু নু'আইম তাঁর আল মুসতাখরাজে এবং নাসাঈ তাঁর সুনানে যির ইবনে জুবাইশের বরাত দিয়ে সামান্য শাব্দিক পরিবর্তন সহকারে কুরআনী জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হযরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে এটি উদ্ধৃত করেছেন। যির ইবনে হুবাইশ বর্ণনা করেছেন, আমি হযরত উবাইকে (রা) বললাম, আপনার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তো এমন এমন কথা বলেন। তাঁর এ উক্তি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? তিনি জবাব দিলেন ঃ "আমি এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমাকে বলা হয়েছে, 'কুল' (বলো), কাজেই আমিও বলেছি 'কুল।' তাই আমরাও তেমনিভাবে বলি যেভাবে রসূলুল্লাহ (সা) বলতেন।" ইমাম আহমাদের বর্ণনা মতে হযরত উবাইয়ের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ ঃ "আমি সাক্ষ দিচ্ছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, জিব্রীল আলাইহিস সালাম তাঁকে বলেছিলেন, কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক" তাই তিনিও তেমনি বলেন। আর জিব্রীল (আ) 'কুল আউজু বিরব্বিন নাস' বলেছিলেন, তাই তিনিও তেমনি বলেন। কাজেই রসূল (সা) যেভাবে বলতেন আমরাও তেমনি বলি।" এ দু'টি বর্ণনা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) উভয় সূরায় 'কুল' (বলো) শব্দ দেখে এ ভুল ধারণা করেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে "আউযু বিরব্বিল ফালাক (আমি সকাল বেলার রবের আশ্রয় চাচ্ছি) ও "আউযু বিরব্বিন নাস" (আমি সমস্ত মানুষের রবের আশ্রয় চাচ্ছি) বলার হুকুম দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি রসূলে করিমকে (সা)–এর এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। হযরত উবাই ইবনে কা'বের (রা) মনে এ সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছিল। তিনি রসূলের (সা) সামেনে প্রশ্ন রেখেছিলেন। রসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন ঃ জিব্রীল আলাইহিস সালাম যেহেতু 'কুল' বলেছিলেন তাই আমিও 'কুল' বলি। একথাটিকে এভাবেও ধরা যায় যদি কাউকে হুকুম দেয়ার উদ্দেশ্য থাকে এবং তাকে বলা হয়, "বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি, তাহলে এ হুকুমটি পালন করতে গিয়ে এভাবে বলবে না যে, "বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি।" বরং সে ক্ষেত্রে 'বলো' শব্দটি বাদ দিয়ে "আমি আশ্রয় চাচ্ছি' বলবে। বিপরীত পক্ষে যদি উর্ধতন শাসকের সংবাদবাহক কাউকে এভাবে খবর দেয়, "বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি" এবং এ পয়গাম তার নিজের কাছে রেখে দেবার জন্য নয় বরং অন্যদের কাছেও পৌছে দেবার জন্য দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে তিনি লোকদের কাছে এ পয়গামের শব্দগুলো, হুবহু পৌছে দেবেন। এর মধ্য থেকে কোন একটি শব্দ বাদ দেবার অধিকার তাঁর থাকবে না। কাজেই এ সূরা দু'টির সূচনা 'কুল' শব্দ দিয়ে করা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এটি অহীর কালাম এবং কালামটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যেভাবে নাযিল হয়েছিল ঠিক

সেভাবেই লোকদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে তিনি বাধ্য ছিলেন। এটি শুধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেয়া একটি হুকুম ছিল না। কুরআন মজীদে এ দু'টি সূরা ছাড়াও এমন ৩৩০টি আয়াত আছে যেগুলো 'কুল' শব্দ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এ আয়াতগুলোতে 'কুল' (বলো) থাকা একথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, এগুলো অহীর কালাম এবং যেসব শব্দ সহকারে এগুলো নবী করিম (সা)–এর ওপর নাযিল হয়েছিল হুবহু সেই শব্দগুলো সহকারে লোকদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া তাঁর জন্য ফরয করা হয়েছিল। নয়তো প্রত্যেক জায়গায় 'কুল' (বলো) শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু সেই শব্দগুলোই বলতেন যেগুলো বলার হুকুম তাঁকে দেয়া হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে তিনি এগুলো কুরআনে সংযোজিত করতেন না। বরং এ হুকুমটি পালন করার জন্য শুধু মাত্র সেই কথাগুলোই বলে দেয়া যথেষ্ট মনে করতেন যেগুলো বলার হুকুম তাঁকে দেয়া হয়েছিল।

এখানে সামান্য একটু চিন্তা–ভাবনা করলে একথা ভালোভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে যে, সাহাবায়ে কেরামকে ভুল–ত্রুটি মুক্ত মনে করা এবং তাদের কোন কথা সম্পর্কে 'ভুল' শব্দটি শুনার সাথে সাথেই সাহাবীদের অবমাননা করা হয়েছে বলে হৈ চৈ শুরু করে দেয়া কতইনা অর্থহীন। এখানে দেখা যাচ্ছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)–এর মত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীর কুরআনের দু'টি সূরা সম্পর্কে কত বড় একটি ভুল হয়ে গেছে। এতবড় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীর যদি এমনি একটি ভুল হয়ে যেতে পারে তাহলে অন্যদেরও কোন ভুল হয়ে যাওয়া সম্ভব। আমরা ইলমী তথা তাত্ত্বিক গবেষণার জন্য এ ব্যাপারে যাচাই–বাছাই ও পর্যালোচনা করতে পারি। তবে যে ব্যক্তি ভুলকে ভুল বলার পর আবার সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁদের প্রতি ধিক্কার ও নিন্দাবাদে মুখর হবে সে হবে একজন মস্তবড় জালেম। এ "মু'আওবিযাতাইন" প্রসংগে মুফাস্সির ও মুহাদ্দিসগণ হযরত ইবনে মাসউদ (রা)–এর রায়কে ভুল বলেছেন। কিন্তু তাঁদের কেউই কথা বলার দুঃসাহস করেননি যে, (নাউযুবিল্লাহ) কুরআনের দু'টি সূরা অস্বীকার করে তিনি কাফের হয়ে গিয়েছিলেন।

নবী করীমের (সা) ওপর যাদুর প্রভাব

এ সূরাটির ব্যাপারে আরেকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। হাদীস থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদু করা হয়েছিল। তার প্রভাবে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এ যাদুর প্রভাব দূর করার জন্য জিব্রীল আলাইহিস সালাম এসে তাঁকে এ সূরা দু'টি পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রাচীন ও আধুনিক বুদ্ধিবাদীদের অনেকে এ ব্যাপারটির বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এ হাদীসগুলো মেনে নিলে সমস্ত শরীয়াতটাই সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়। কারণ, নবীর ওপর যদি যাদুর প্রভাব পড়তে পারে এবং এ হাদীসগুলোর দৃষ্টিতে তাঁর ওপর যাদুর প্রভাব পড়েছিল, তাহলে আমরা জানি না বিরোধীরা যাদুর প্রভাব ফেলে তাঁর মুখ থেকে কতো কথা বলিয়ে এবং তাঁকে দিয়ে কত কাজ করিয়ে নিয়েছে। আর তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার মধ্যেইবা কি পরিমাণ জিনিস আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং কতটা যাদুর প্রভাবে ছিল তাও আমরা জানি না। বরং তাদের বক্তব্য হচ্ছে, একথা সত্য বলে মেনে নেয়ার পর যাদুরই মাধ্যমে নবীকে নবুওয়াতের দাবী করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল কি না এবং যাদুরই প্রভাবে তিনি বিভ্রান্তির শিকার হয়ে তাঁর কাছে

ফেরেশতা এসেছে বলে মনে করেছিলেন কিনা একথাও নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে না। তাদের আরো যুক্তি হচ্ছে, এ হাদীসগুলো কুরআন মজীদের সাথে সংঘর্ষশীল। কারণ, কুরআন মজীদে কাফেরদের এ অভিযোগ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা নবীকে যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি বলেছে ঃ

يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا -

"জালেমরা বলেন, তোমরা নিছক একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির আনুগত্য করে চলছো।" (বনি ইসরাঈল, ৪৭) আর এ হাদীসগুলো কাফেরদের এ অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণ করছে। অর্থাৎ এ হাদীসগুলো থেকে প্রমাণ হচ্ছে, সত্যই নবীর ওপর যাদু করা হয়েছিল।

এ বিষয়টির ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হলে সর্বপ্রথম দেখতে হবে, মূলত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদুর প্রভাব পড়েছিল বলে কি সহীহ ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে? আর যদি প্রমাণিত হয়ে থাকে তাহলে তা কি ছিল এবং কতটুকু ছিল? তারপর যেসব আপত্তি করা হয়েছে, ইতিহাস থেকে প্রমাণিত বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে সেগুলো উত্থাপিত হতে পারে কি না, তা দেখতে হবে।

প্রথম যুগের মুসলিম আলেমগণ নিজেদের চিন্তা ও ধারণা অনুযায়ী ইতিহাস বিকৃত অথবা সত্য গোপন করার প্রচেষ্টা না চালিয়ে চরম সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। বরং যা কিছু ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয়েছে তাকে হুবহু পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এ সত্যগুলো থেকে যদি কেউ বিপরীত ফলাফল গ্রহণে উদ্যোগী হয় তাহলে তাদের সংগৃহীত এ উপাদানগুলোর সাহায্যে সে যে বিপুলভাবে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে পারবে এ সম্ভাবনার কোন পরোয়াই তারা করেননি। এখন যদি কোন একটি কথা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বিপুল সংখ্যক ঐতিহাসিক তথ্য বিবরণীর ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়, তাহলে তা মেনে নিলে অমুক অমুক ত্রুটি ও অনিষ্টকারিতা দেখা দেবে এ অজুহাত দেখিয়ে ইতিহাসকে মেনে নিতে অস্বীকার করা কোন ন্যায়নিষ্ঠ পণ্ডিত ও জ্ঞানী লোকের কাজ হতে পারে না। অনুরূপভাবে ইতিহাস থেকে যতটুকু সত্য বলে প্রমাণিত হয় তার ওপর কল্পনার ঘোড়া দৌড়িয়ে তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিজের আসল আকৃতি থেকে অনেকগুণ বাড়িয়ে পেশ করাও ঐতিহাসিক সততার পরিচায়ক নয়। এর পরিবর্তে ইতিহাসকে ইতিহাস হিসেবে মেনে নিয়ে তার মাধ্যমে কি প্রমাণ হয় ও কি প্রমাণ হয় না তা দেখাই তার কাজ।

ঐতিহাসিক তথ্য বিবরণী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদুর প্রভাব চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত। তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাকে যদি ভুল প্রমাণ করা যেতে পারে তাহলে দুনিয়ার কোন একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকেও সঠিক প্রমাণ করা যাবে না। হযরত আয়েশা (রা) হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইমাম আহমাদ, আবদুর রাজ্জাক, হুমাইদী, বায়হাকী, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া, ইবনে সা'দ, ইবনে আবী শাইবা, হাকেম, আবদ ইবনে হুমাইদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এত বিভিন্ন ও বিপুলসংখ্যক সনদের মাধ্যমে এ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন যে,

এর এক একটি বর্ণনা, 'খবরে ওয়াহিদ'–এর পর্যায়ভুক্ত হলেও মূল বিষয়বস্তুটি 'মুতাওয়াতির' বর্ণনার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। বিভিন্ন হাদীসে এর যে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে সেগুলো একত্র করে এবং একসাথে গ্রথিত ও সুসংবদ্ধ করে সাজিয়ে গুছিয়ে আমরা এখানে একটি ঘটনা আকারে তুলে ধরছি।

হোদায়বিয়ার সন্ধির পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফিরে এলেন। এ সময় সপ্তম হিজরীর মহররম মাসে খয়বর থেকে ইহুদীদের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় এলো। তারা আনসারদের বনি যুরাইক গোত্রের বিখ্যাত যাদুকর লাবীদ ইবনে আ'সমের সাথে সাক্ষাত করলো।[১] তারা তাকে বললো, মুহাম্মাদ (সা) আমাদের সাথে যা কিছু করেছেন তা তো তুমি জানো। আমরা তাঁর ওপর অনেকবার যাদু করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সফল হতে পারিনি। এখন তোমার কাছে এসেছি। কারণ তুমি আমাদের চাইতে বড় যাদুকর। তোমার জন্য এ তিনটি আশরাফী (স্বর্ণ মুদ্রা) এনেছি। এগুলো গ্রহণ করো এবং মুহাম্মাদের ওপর একটি শক্ত যাদুর আঘাত হানো। এ সময় একটি ইহুদী ছেলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কাজ করতো। তার সাথে যোগসাজশ করে তারা রসূলুল্লাহর (সা) চিরুনীর একটি টুকরা সংগ্রহ করতে সক্ষম হলো। তাতে তাঁর পবিত্র চুল আটকানো ছিল সেই চুলগুলো ও চিরুনীর দাঁতের ওপর যাদু করা হলো। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, লাবীদ ইবনে আ'সম নিজেই যাদু করেছিল। আবার কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে— তার বোনেরা ছিল তার চেয়ে বড় যাদুকর। তাদের সাহায্যে সে যাদু করেছিল যাহোক এ দু'টির মধ্যে যে কোন একটিই সঠিক হবে। এ ক্ষেত্রে এ যাদুকে একটি পুরুষ খেজুরের ছড়ার আবরণের[২] নীচে রেখে লাবীদ তাকে বনী যুরাইকের যারওয়ান বা যী–আযওয়ান নামক কূয়ার তলায় একটি পাথর চাপা দিয়ে রাখলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদুর প্রভাব পড়তে পূর্ণ এক বছর সময় লাগলো। বছরের শেষ ছয় মাসে মেজাজে কিছু পরিবর্তন অনুভূত হতে থাকলো। শেষ চল্লিশ দিন কঠিন এবং শেষ তিন দিন কঠিনতর হয়ে গেলো। তবে এর সবচেয়ে বেশী যে প্রভাব তাঁর ওপর পড়লো তা কেবল এতটুকুই যে, দিনের পর দিন তিনি রোগা ও নিস্তেজ হয়ে যেতে লাগলেন। কোন কাজের ব্যাপারে মনে করতেন, করে ফেলেছেন অথচ তা করেননি। নিজের স্ত্রীদের সম্পর্কে মনে করতেন, তিনি তাদের কাছে গেছেন অথচ আসলে তাদের কাছে যাননি। আবার কোন কোন সময় নিজের দৃষ্টির ব্যাপারেও তাঁর সন্দেহ হতো। মনে করতেন কোন জিনিস দেখেছেন অথচ আসলে তা দেখেননি। এসব প্রভাব তাঁর নিজের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। এমনকি তাঁর ওপর দিয়ে কি ঘটে যাচ্ছে তা অন্যেরা জানতেও

১. কোন কোন বর্ণনাকারী তাকে ইহুদী বলেছেন। আবার কেউ বলেছেন, মুনাফিক ও ইহুদীদের মিত্র। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, সে ছিল বনী যুরাইকের অন্তরভুক্ত। আর বনী যুরাইক ইহুদীদের কোন গোত্র ছিল না, একথা সবাই জানে। বরং এটি ছিল খাযরাজদের অন্তরভুক্ত আনসারদের একটি গোত্র। তাই বলা যেতে পারে, সে মদীনাবাসী ছিল, কিন্তু ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল অথবা ইহুদীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ সহযোগী হবার কারণে কেউ কেউ তাকে ইহুদী মনে করে নিয়েছিল। তবুও তার জন্য মুনাফিক শব্দ ব্যবহার করার কারণে জানা যায়, বাহ্যত সে নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতো।

২. শুরুতে খেজুরের ছড়া একটি আবরণের মধ্যে থাকে। পুরুষ খেজুরের আবরণের রং হয় মানুষের রক্তের মতো। তার গন্ধ হয় মানুষের শুক্রের গন্ধের মতো।

পারেনি। কিন্তু নবী হিসেবে তাঁর ওপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায় তার মধ্যে সামান্যতম ব্যাঘাতও সৃষ্টি হতে পারেনি। কোন একটি বর্ণনায়ও একথা বলা হয়নি যে, সে সময় তিনি কুরআনের কোন আয়াত ভুলে গিয়েছিলেন। অথবা কোন আয়াত ভুল পড়েছিলেন। কিংবা নিজের মজলিসে, বক্তৃতায় ও ভাষণে তাঁর শিক্ষাবলীতে কোন পার্থক্য সূচিত হয়েছিল। অথবা এমন কোন কালাম তিনি অহী হিসেবে পেশ করেছিলেন যা আসলে তাঁর ওপর নাযিল হয়নি। কিংবা তাঁর কোন নামায তরক হয়ে গেছে এবং সে সম্পর্কে তিনি মনে করেছেন যে, তা পড়ে নিয়েছেন অথচ আসলে তা পড়েননি। নাউযুবিল্লাহ, এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটে গেলে চারদিকে হৈচৈ পড়ে যেতো। সারা আরব দেশে খবর ছড়িয়ে পড়তো যে নবীকে কেউ কাৎ করতে পারেনি। একজন যাদুকরের যাদুর কাছে সে কাৎ হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদা এ অবস্থায় পুরোপুরি সমুন্নত থেকেছে। তার ওপর কোন প্রভাব পড়েনি। কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এ জিনিসটি অনুভব করে পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন। শেষে একদিন তিনি হযরত আয়েশার কাছে ছিলেন। এ সময় বার বার আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে থাকলেন। এ অবস্থায় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন অথবা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। জেগে উঠে হযরত আয়েশাকে বললেন, আমি যে কথা আমার রবের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম তা তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। হযরত আশেয়া (রা) জিজ্ঞেস করলেন, কি কথা? জবাব দিলেন, "দু'জন লোক (অর্থাৎ দু'জন ফেরেশতা দু'জন লোকের আকৃতি ধরে) আমার কাছে এলো। একজন ছিল মাথার দিকে, আরেকজন পায়ের দিকে। একজন জিজ্ঞেস করলো, এঁর কি হয়েছে? অন্যজন জবাব দিল, এঁর ওপর যাদু করা হয়েছে। প্রথম জন জিজ্ঞেস করলো, কে করেছে? জবাব দিল, লাবীদ ইবনে আ'সম। জিজ্ঞেস করলো, কোন জিনিসের মধ্যে করেছে? জবাব দিল, একটি পুরুষ খেজুরের ছড়ার আবরণে আবৃত চিরুনী ও চুলের মধ্যে। জিজ্ঞেস করলো, তা কোথায় আছে? জবাব দিল, বনী যুরাইকের কূয়া যী-আযওয়ানের (অথবা যী-যারওয়ান) তলায় পাথর চাপা দেয়া আছে। জিজ্ঞেস করলো, তাহলে এখন এ জন্য কি করা দরকার? জবাব দিল, কূয়ার পানি সেঁচে ফেলতে হবে। তারপর পাথরের নিচ থেকে সেটি বের করে আনতে হবে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রা), হযরত ইবনে ইয়াসির (রা) ও হযরত যুবাইরকে (রা) পাঠালেন। তাদের সাথে শামিল হলেন হযরত জুবাইর ইবনে ইয়াস আযযুরাকী ও কায়েস ইবনে মিহসান আযযুরাকী (অর্থাৎ বনি যুরাইকের দুই ব্যক্তি)। পরে নবী (সা) নিজেও কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেলেন। পানি তোলা হলো। কূয়ার তলা থেকে কথিত আবরণটি বের করে আনা হলো। তার মধ্যে চিরুনী ও চুলের সাথে মিশিয়ে রাখা একটি সূতায় এগারটি গিরা দেয়া ছিল। আর ছিল মোমের একটি পুতুল। তার গায়ে কয়েকটি সুঁই ফুটানো ছিল। জিব্রীল আলাইহিস সালাম এসে বললেন, আপনি সূরা আল ফালাক ও আন নাস পড়ুন। কাজেই তিনি এক একটি আয়াত পড়তে যাচ্ছিলেন, সেই সাথে এক একটি গিরা খুলে যাচ্ছিল এবং পুতুলের গা থেকে এক একটি সুঁইও তুলে নেয়া হচ্ছিল। সূরা পড়া শেষ হতেই সমস্ত গিরা খুলে গেলো, সমস্ত সুঁই উঠে এলো এবং তিনি যাদুর প্রভাবমুক্ত হয়ে ঠিক এমন অবস্থায় পৌঁছে গেলেন যেমন কোন ব্যক্তি রশি দিয়ে বাঁধা ছিল তারপর তার বাঁধন খুলে গেলো। তারপর তিনি লাবীদকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সে তার দোষ স্বীকার করলো এবং তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। কারণ, নিজের ব্যক্তিসত্তার জন্য তিনি কোনদিন কারো ওপর প্রতিশোধ নেননি।

শুধু এই নয়, তিনি এ বিষয়টি নিয়ে কোন কথাবার্তা বলতেও অস্বীকৃতি জানালেন। কারণ তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে রোগমুক্ত করেছেন, কাজেই এখন আমি কারো বিরুদ্ধে লোকদের উত্তেজিত করতে চাই না।

এ হলো এ যাদুর কাহিনী। এর মধ্যে এমন কোন বিষয় নেই যা তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদার মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি সৃষ্টি করতে পারে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে যদি তাঁকে আহত করা যেতে পারে, যেমন ওহোদের যুদ্ধে হয়েছিল, যদি তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়ে পড়েন, যেমন বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত, যদি তাঁকে বিচ্ছু কামড় দেয়, যেমন অন্যান্য হাদীসে পাওয়া যায় এবং নবী হবার জন্য মহান আল্লাহ তাঁর সাথে যে সংরক্ষণের ওয়াদা করেছিলেন, যদি এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটিও তার পরিপন্থী না হয়ে থাকে, তাহলে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি যাদুর প্রভাবে অসুস্থ হতেও পারেন। এতে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। নবীর ওপর যাদুর প্রভাব পড়তে পারে, একথা কুরআন মজীদ থেকেও প্রমাণিত। সূরা আরাফেও ফেরাউনের যাদুকরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ হযরত মূসা (আ)–এর মোকাবিলায় তারা এলো। তারা সেখানে এ মোকাবিলা দেখতে উপস্থিত হাজার হাজার লোকের দৃষ্টিশক্তির ওপর যাদু করলো (سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ) । সূরা ত্বা–হায় বলা হয়েছে ঃ তারা যেসব লাঠি ও রশি ছুঁড়ে দিয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে শুধু সাধারণ লোকেরাই নয়, হযরত মূসাও মনে করলেন সেগুলো সাপের মতো তাঁর দিকে দৌড়ে আসছে এবং তিনি এতে ভীত হয়ে পড়লেন। এমন কি মহান আল্লাহ তাঁর ওপর এই মর্মে অহী নাযিল করলেন যে, ভয় পেয়ো না, তুমিই বিজয়ী হবে। তোমার লাঠিটা একটু ছুঁড়ে ফেলো।

فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى - قُلْنَا لَاتَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ – طٰهٰ : ٦٦-٦٩

এখানে যদি আপত্তি উত্থাপন করে বলা হয়, এ ধরনের বিশ্লেষণের মাধ্যমে মক্কার কাফেরদের দোষারোপকেই সত্য প্রমাণ করা হলো। তারা তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি বলতো। এর জবাবে বলা যায়, তিনি কোন যাদুকরের যাদুর প্রভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এ অর্থে মক্কার কাফেররা তাঁকে যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি বলতো না। বরং তাঁকে যাদুর প্রভাবে পাগল করে দিয়েছিল এবং নবুওয়াতের দাবী ছিল তাঁর এ পাগলামীরই বহিঃপ্রকাশ। আর এ পাগলামীর বশবর্তী হয়েই তিনি জান্নাত ও জাহান্নামের গল্প শুনিয়ে যেতেন। একথা সুস্পষ্ট, যে বিষয় ইতিহাস থেকে প্রমাণিত, যে যাদুর প্রভাব শুধুমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিসত্তার ওপর পড়েছিল, তাঁর নবীসত্তা ছিল এর আওতার সম্পূর্ণ বাইরে। তেমন ধরনের কোন বিষয়ের সাথে এ আপত্তি সম্পৃক্ত হতে পারে না।

এ প্রসংগে একথাও উল্লেখযোগ্য, যারা যাদুকে নিছক কাল্পনিক জিনিস মনে করেন, যাদুর প্রভাবের কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্ভবপর নয় বলেই তারা এ ধরনের মত পোষণ করেন। কিন্তু দুনিয়ায় এমন বহু জিনিসই রয়েছে যেগুলো অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে

ধরা পড়ে, কিন্তু সেগুলো কিভাবে হয়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এ ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার অক্ষমতার ফলে একথা অপরিহার্য হয়ে ওঠে না যে, আমরা যে জিনিসটি বিশ্লেষণ করতে অক্ষম সেটিকে আমাদের অস্বীকার করতে হবে। আসলে যাদু একটি মনস্তাত্বিক প্রভাব। শারীরিক প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিগুলো যেভাবে শরীরের সীমা অতিক্রম করে মনকে প্রভাবিত করে, ঠিক তেমনি যাদুর প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিও মনের সীমা পেরিয়ে শরীরকেও প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ভয় একটি মনস্তাত্বিক জিনিস। কিন্তু শরীরের ওপর এর প্রভাব যখন পড়ে গায়ের লোম গুলো খাড়া হয়ে যায় এবং দেহ থর থর করে কাঁপতে থাকে। আসলে যাদু প্রকৃত সত্তায় কোন পরিবর্তন ঘটায় না। তবে মানুষের মন ও তার ইন্দ্রিয়গুলো এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মনে করতে থাকে, বুঝি প্রকৃত সত্তার পরিবর্তন হয়েছে। হযরত মূসার দিকে যাদুকররা যেসব লাঠি ও রশি ছুঁড়ে ফেলেছিল সেগুলো সত্যি সাপে পরিণত হয়নি। কিন্তু হাজার হাজার লোকের চোখে এমন যাদুর প্রভাব পড়লো যে, তারা সবাই এগুলোকে সাপ মনে করলো। এমন কি হযরত মূসার ইন্দ্রিয়ানুভূতিও এ যাদুর প্রভাব মুক্ত থাকতে পারেনি। অনুরূপভাবে কুরআনের সূরা আল বাকারার ১০২ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ বেবিলনে হারুত ও মারুতের কাছে লোকেরা এমন যাদু শিখতো যা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতো। এটাও ছিল একটি মনস্তাত্বিক প্রভাব। আর তাছাড়া অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লোকেরা যদি এ কাজে সফলতা না পেতো তাহলে তারা এর খরিদ্দার হতো না। একথা ঠিক, বন্দুকের গুলী ও বোমারু বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত বোমার মতো যাদুর প্রভাবশালী হওয়াও আল্লাহর হুকুম ছাড়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু হাজার হাজার বছর থেকে যে জিনিসটি মানুষের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে ধরা দিচ্ছে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা নিছক একটি হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইসলামে ঝাড়-ফুঁকের স্থান

এ সূরা দু'টির ব্যাপারে তৃতীয় যে প্রশ্নটি দেখা দেয়, সেটি হচ্ছে এই যে, ইসলামে কি ঝাড়-ফুঁকের কোন অবকাশ আছে? তাছাড়া জাড়-ফুঁক যথার্থই কোন প্রভাব ফেলে কি না? এ প্রশ্ন দেখা দেবার কারণ হচ্ছে, বিপুল সংখ্যক সহীহ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রাতে ঘুমাবার আগে বিশেষ করে অসুস্থ অবস্থায় সূরা আল ফালাক ও আন নাস এবং কোন কোন হাদীস অনুযায়ী এ দু'টির সাথে আবার সূরা ইখলাসও তিন তিন বার করে পড়ে নিজের দুই হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেখানে যেখানে তাঁর হাত যেতে পারে—সব জায়গায় হাত বুলাতেন। শেষ বারে রোগে আক্রান্ত হবার পর যখন তাঁর নিজের পক্ষে এমনটি করা সম্ভবপর ছিল না তখন হযরত আয়েশা (রা) এ সূরাগুলো (স্বেচ্ছাকৃতভাবে বা নবী করীমের হুকুমে) পড়তেন এবং তাঁর মুবারক হাতের বরকতের কথা চিন্তা করে তাঁরই হাত নিয়ে তাঁর শরীরে বুলাতেন। এ বিষয়বস্তু সম্বলিত রেওয়ায়াত নির্ভুল সূত্রে বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ ও মুআত্তা ইমাম মালিকে হযরত আয়েশা (রা) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। আর রসূলের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা)-এর চাইতে আর কারো বেশী জানার কথা নয়।

এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম শরীয়াতের দৃষ্টিভঙ্গীটি ভালোভাবে বুঝে নেয়া উচিত। বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)–এর একটি সুদীর্ঘ রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তার শেষের দিকে নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে তারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে যারা না দাগ দেয়ার চিকিৎসা করে, না জাড়–ফুঁক করায় আর না শুভাশুভ লক্ষণ গ্রহণ করে। (মুসলিম) হযরত মুগীরা ইবনে শোবার (রা) বর্ণনা মতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দাগ দেয়ার চিকিৎসা করালো এবং ঝাড়–ফুঁক করালো সে আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল থেকে সম্পর্ক হয়ে গেলো। (তিরমিযী) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশটি জিনিস অপছন্দ করতেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ঝাড়–ফুঁক করা, তবে সূরা আল ফালাক ও আন নাস অথবা এ দু'টি ও সূরা ইখলাস ছাড়া (আবু দাউদ, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান ও হাকেম)। কোন কোন হাদীস থেকে একথাও জানা যায় যে, প্রথম দিকে রসূলে করীম (সা) ঝাড় ফুঁক করা থেকে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করিছেলেন, কিন্তু পরে শর্ত সাপেক্ষে এর অনুমতি দিয়েছিলেন। সেই শর্তগুলো হচ্ছে ঃ এতে কোন শিরকের আমেজ থাকতে পারবে না। আল্লাহর পবিত্র নাম বা তাঁর পবিত্র কালামের সাহায্যে ঝাড়–ফুঁক করতে হবে। কালাম বোধগম্য হতে হবে এবং তার মধ্যে কোন গুনাহর জিনিস নেই একথা জানা সম্ভব হতে হবে। আর এই সঙ্গে ভরসা জাড়–ফুঁকের ওপর করা যাবে না এবং তাকে রোগ নিরাময়কারী মনে করা যাবে না। বরং আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে এ মর্মে যে, আল্লাহ চাইলে এ ঝাড়–ফুঁকের মাধ্যমেই সে রোগ নিরাময় করবেন। এ ব্যাপারে শরীয়াতের দৃষ্টিভঙ্গী সুস্পষ্ট হয়ে যাবার পর এখন হাদীসের বক্তব্য দেখুন।

তাবারানী 'সগীর' গ্রন্থে হযরত আলীর (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ একবার নামায পড়ার সময় রসূলে করীমকে (সা) বিচ্ছু কামড় দেয়। নামায শেষ করে তিনি বলেন, বিচ্ছুর ওপর আল্লাহর লানত, সে না কোন নামাযীকে রেহাই দেয়, না আর কাউকে। তারপর পানি ও লবন আনান। যে জায়গায় বিচ্ছু কামড়েছিল সেখানে নোনতা পানি দিয়ে ডলতে থাকেন আর কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন, কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরব্বিন নাস পড়তে থাকেন।

ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনাও হাদীসে এসেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হাসান ও হযরত হুসাইনের ওপর এ দোয়া পড়তেন ঃ

اُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ –

"আমি তোমাদের দু'জনকে প্রত্যেক শয়তান ও কষ্টদায়ক এবং বদনজর থেকে আল্লাহর ত্রুটিমুক্ত কালেমাসমূহের আশ্রয়ে দিয়ে দিচ্ছি।"

(বুখারী, মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

উসমান ইবনে আবিল আস সাকাফী সম্পর্কে সামান্য শব্দের হেরফের সহকারে মুসলিম, মুআত্তা, তাবারানী ও হাকেমে একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে তাতে বলা

হয়েছে ঃ তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নালিশ করেন, আমি যখন থেকে মুসলমান হয়েছি তখন থেকেই একটা ব্যথা অনুভব করছি। এ ব্যথা আমাকে মেরে ফেলে দিয়েছে। নবী (সা) বলেন, যেখানে ব্যথা হচ্ছে সেখানে তোমার ডান হাতটা রাখো। তারপর তিনবার বিসমিল্লাহ পড়ো এবং সাতবার এ দোয়াটা পড়ে সেখানে হাত বুলাও أَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّمَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ "আমি আল্লাহ ও তাঁর কুদরতের আশ্রয় চাচ্ছি সেই জিনিসের অনিষ্টকারিতা থেকে যাকে আমি অনুভব করছি এবং যার লেগে যাওয়ার ভয়ে আমি ভীত।" মুআত্তায় এর ওপর আরো এতটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, উসমান ইবনে আবিল আস বলেন, এরপর আমার সে ব্যথা দূর হয়ে যেতে থাকে এবং আমার ঘরের লোকদেরকেও আমি এটা শিখাই।

মুসনাদে আহমাদ ও তাহাবী গ্রন্থে তালক ইবনে আলীর (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতেই আমাকে বিচ্ছু কামড় দেয়। তিনি কিছু পড়ে আমাকে ফুঁক দেন এবং কামড়ানো জায়গায় হাত বুলান।

মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরীর (রা) বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। জিব্রীল এসে জিজ্ঞেস করেন, "হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন?" জবাব দেন হাঁ জিব্রীল বলেন,

بِاسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّكُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ -

"আমি আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ছি এমন প্রত্যেকটি জিনিস থেকে যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং প্রত্যেকটি নফস ও হিংসুকের হিংসা দৃষ্টির অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ আপনাকে নিরাময় দান করুন। আমি তাঁর নামে আপনাকে ঝাড়ছি।"

প্রায় এ একই ধরনের আর একটি বর্ণনা মুসনাদে আহমাদে হযরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ নবী করীম (সা) অসুস্থ ছিলেন। আমি তাঁকে দেখতে গেলাম। দেখলাম তাঁর বেশ কষ্ট হচ্ছে। বিকেলে দেখতে গেলাম, দেখলাম তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। কিভাবে এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠেছেন তা জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, জিব্রীল এসেছিলেন এবং কিছু কালেমা পড়ে আমাকে ঝাড়-ফুঁক করেছিলেন (তাতেই আমি সুস্থ হয়ে উঠেছি)। তারপর তিনি প্রায় ওপরের হাদীসে উদ্ধৃত কালেমাগুলোর মতো কিছু কালেমা শুনালেন। মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আয়েশা (রা) থেকেও এমনি ধরনের রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে।

ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে উম্মুল মুমেনীন হযরত হাফসার (রা) বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে হযরত হাফসা (রা) বলেন ঃ একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এলেন। তখন আমার কাছে শিফা* নামের এক মহিলা বসেছিলেন।

* ভদ্র মহিলার আসল নাম ছিল লাইলা। কিন্তু তিনি শিফা বিনতে আবদুল্লাহ নামে পরিচিত ছিলেন। হিজরাতের আগে মুসলমান হন। তাঁর সম্পর্ক ছিল কুরাইশদের বনি আদী বংশের সাথে। হযরত উমরও (রা) এ বংশের অন্তরভুক্ত ছিলেন। এভাবে তিনি ছিলেন হযরত হাফসার (রা) আত্মীয়া।

তিনি পিঁপড়া বা মাছি প্রভৃতির দংশনে ঝাড়-ফুঁক করতেন। রসূলে করীম (সা) বলেন : হাফসাকেও এ আমল শিখিয়ে দাও। শিফা বিনতে আবদুল্লাহর এ সম্পর্কে একটি রেওয়ায়াত ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি হাফসাকে যেমন লেখাপড়া শিখিয়েছো তেমনিভাবে এ ঝাড়-ফুঁকের আমলও শিখিয়ে দাও।

মুসলিমে আউফ ইবনে মালেক আশজায়ীর রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে তিনি বলেছেন : জাহেলিয়াতের যুগে আমরা ঝাড়-ফুঁক করতাম। আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, তোমরা যে জিনিস দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করো তা আমার সামনে পেশ করো। তার মধ্যে যদি শিরক না থাকে তাহলে তার সাহায্যে ঝাড়ায় কোন ক্ষতি নেই।

মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজায় হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঝাড়-ফুঁক নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তারপর হযরত আমর ইবনে হাযমের বংশের লোকেরা এলো। তারা বললো, আমাদের কাছে এমন কিছু আমল ছিল যার সাহায্যে আমরা বিছু (বা সাপ) কামড়ানো রোগীকে ঝাড়তাম, কিন্তু আপনি তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তারপর তারা যা পড়তো তা তাঁকে শুনালো। তিনি বললেন, "এর মধ্যে তো আমি কোন ক্ষতি দেখছি না। তোমাদের কেউ যদি তার ভাইয়ের কোন উপকার করতে পারে তাহলে তাকে অবশ্যি তা করা উচিত।" জাবের ইবনে আবদুল্লাহর (রা) দ্বিতীয় হাদীসটি মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে : হাযম পরিবারের লোকেরা সাপে কামড়ানো রোগীর নিরাময়ের একটা প্রক্রিয়া জানতো। রসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে তা প্রয়োগ করার অনুমতি দেন। মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজায় হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত রেওয়ায়াতটিও একথা সমর্থন করে। তাতে বলা হয়েছে : রসূলুল্লাহ (সা) আনসারদের একটি পরিবারকে প্রত্যেক বিষাক্ত প্রাণীর কামড়ে ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছিলেন। মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও মুসলিমেও হযরত আনাস (রা) থেকে প্রায় এ একই ধরনের একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) বিষাক্ত প্রাণীদের কামড়, পিঁপড়ার দংশন ও নজর লাগার জন্য ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও হাকেম হযরত উমাইর মাওলা আবীল লাহাম (রা) থেকে একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেন, জাহেলী যুগে আমি একটি আমল জানতাম। তার সাহায্যে আমি ঝাড়-ফুঁক করতাম। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তা পেশ করলাম। তিনি বললেন, উমুক উমুক জিনিস এ থেকে বের করে দাও, এরপর যা থাকে তার সাহায্যে তুমি ঝাড়তে পারো।

মুয়াত্তায় বলা হয়েছে হযরত আবু বকর (রা) তাঁর মেয়ে হযরত আয়েশা (রা)--এর ঘরে গেলেন। দেখলেন তিনি অসুস্থ এবং একটি ইহুদী মেয়ে তাঁকে ঝাড়-ফুঁক করছে। এ দৃশ্য দেখে তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব পড়ে ঝাড়ো। এ থেকে জানা গেলো, আহলি কিতাবরা যদি তাওরাত বা ইঞ্জিলের আয়াত পড়ে ঝাড়-ফুঁক করে তাহলে তা জায়েয।

এখন ঝাড়-ফুঁক উপকারী কি না এ প্রশ্ন দেখা দেয়। এর জবাবে বলা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিকিৎসা ও ঔষধ ব্যবহার করতে কখনো নিষেধ করেননি। বরং তিনি বলেছেন, আল্লাহ প্রত্যেক রোগের ঔষধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তোমরা রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধ ব্যবহার করো। রসূল (সা) নিজেও লোকদেরকে কোন কোন রোগের ঔষধ বলে দিয়েছেন। হাদীস গ্রন্থসমূহে সংকলিত "কিতাবুত তিব" (চিকিৎসা অধ্যায়) পাঠ করলে একথা জানা যেতে পারে। কিন্তু ঔষধও আল্লাহর হুকুম ও অনুমতিক্রমেই উপকারী হতে পারে। নয়তো ঔষধ ও চিকিৎসা যদি সব অবস্থায় উপকারী হতো তাহলে হাসপাতালে একটি রুগীও মরতো না। এখন চিকিৎসা ও ঔষধের সাথে সাথে যদি আল্লাহর কালাম ও তাঁর আসমায়ে হুসনা (ভালো ভালো নাম) থেকে ফায়দা হাসিল করা যায় অথবা যেসব জায়গায় চিকিৎসার কোন সুযোগ সুবিধা নেই সেখানে যদি আল্লাহর কালামের আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর পবিত্র নাম ও গুণাবলীর সহায়তা লাভ করা হয় তাহলে এ পদক্ষেপ একমাত্র বস্তুবাদীরা ছাড়া আর কারো কাছে বিবেক বিরোধী মনে হবে না।* তবে যেখানে চিকিৎসা ও ঔষধ ব্যবহার করার সুযোগ সুবিধা লাভ করা সম্ভব হয় সেখানে জেনে বুঝেও তা গ্রহণ না করে শুধুমাত্র ঝাড়-ফুঁকের ওপর নির্ভর করা কোনক্রমেই সঠিক পদক্ষেপ বলে স্বীকৃতি পেতে পারে না। আর এভাবে একদল লোককে মাদুলি তাবীজের দোকান খুলে সুযোগ মতো দু'পয়সা কামাই করার অনুমতিও কোনক্রমেই দেয়া যেতে পারে না।

এ ব্যাপারে অনেকে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত একটি হাদীস থেকে যুক্তি প্রদর্শন করে থাকেন। হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজায় উদ্ধৃত হয়েছে। বুখারীতে উদ্ধৃত ইবনে আব্বাসের (রা) একটি বর্ণনাও এর সমর্থন করে। এতে বলা হয়েছে ঃ রসূলে করীম (সা) কয়েকজন সাহাবীকে একটি অভিযানে পাঠান। হযরত আবু সাঈদ খুদরীও (রা) তাঁদের সাথে ছিলেন। তাঁরা পথে একটি আরব গোত্রের পল্লীতে অবস্থান করেন। তারা গোত্রের লোকদের কাছে তাঁদের মেহমানদারী করার আবেদন জানান। কিন্তু তারা অস্বীকার করে। এ সময় গোত্রের সরদারকে বিচ্ছু কামড় দেয়। লোকেরা এ মুসাফির দলের কাছে এসে আবেদন জানায়, তোমাদের কোন ঔষধ বা আমল জানা থাকলে আমাদের সরদারের চিকিৎসা করো। হযরত

* বস্তুবাদী দুনিয়ার অনেক ডাক্তারও একথা স্বীকার করেছেন যে, দোয়া ও আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ মানসিক সংযোগ রোগীদের রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর উপাদান। আমার নিজের জীবনেও আমি এ ব্যাপারে দু'বার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। ১৯৪৮ সালে কারাগারে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় আমার মূত্রনালিতে একটি পাথর সৃষ্টি হয়। ষোল ঘন্টা পর্যন্ত পেশাব আটকে থাকে। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, হে আল্লাহ! আমি জালেমদের কাছে চিকিৎসার জন্য আবেদন করতে চাই না। তুমিই আমার চিকিৎসা করো। কাজেই পেশাবের রাস্তা থেকে পাথরটি সরে যায় এবং পরবর্তী বিশ বছর পর্যন্ত সরে থাকে। তারপর ১৯৬৮ সালে সেটি আবার কষ্ট দিতে থাকে। তখন অপারেশন করে তাকে বের করে ফেলা হয়। আর একবার ১৯৫৩ সালে আমাকে গ্রেফতার করা হয়। সে সময় আমি কয়েক মাস থেকে দু'পায়ের গোছায় দাদে আক্রান্ত হয়ে ভীষণ কষ্ট পেতে থাকি। কোন রকম চিকিৎসায় আরাম পাচ্ছিলাম না। গ্রেফতারীর পর আল্লাহর কাছে ১৯৪৮ সালের মতো আবার সেই একই দোয়া করি। এরপর কোন প্রকার চিকিৎসা ও ঔষধ ছাড়াই সমস্ত দাদ একেবারে নির্মূল হয়ে যায়। তারপর আর কখনো এ রোগে আক্রান্ত হইনি।

আবু সাঈদ বলেন, আমরা জানি ঠিকই, তবে যেহেতু তোমরা আমাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করেছো, তাই আমাদের কিছু দেবার ওয়াদা না করলে আমরা চিকিৎসা করবো না। তারা একটি ছাগলের পাল (কোন কোন বর্ণনা মতে ৩০টি ছাগল) দেবার ওয়াদা করে। ফলে হযরত আবু সাঈদ সরদারের কাছে যান। তার ওপর সূরা ফাতেহা পড়ে ফুঁক দিতে থাকেন এবং যে জায়গায় বিচ্ছু কামড়েছে সেখানে নিজের মুখের লালা মলতে থাকেন।* অবশেষে বিষের প্রভাব খতম হয়ে যায়। গোত্রের লোকেরা তাদের ওয়াদা মতো ছাগল দিয়ে দেয়। কিন্তু সাহাবীগণ নিজেদের মধ্যে বলতে থাকেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস না করে এ ছাগলগুলো থেকে কোন ফায়দা হাসিল করা যাবে না। কারণ, এ কাজে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয কিনা তাতো জানা নেই। কাজেই তাঁরা নবী করীমের (সা) কাছে আসেন এবং সব ঘটনা বয়ান করেন। তিনি হেসে বলেন, তোমরা কেমন করে জানলে এ সূরা ঝাড়-ফুঁকের কাজেও লাগতে পারে? ছাগল নিয়ে নাও এবং তাতে আমার ভাগও রাখো।

কিন্তু তিরমিযী বর্ণিত এ হাদীস থেকে মাদুলি, তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে রীতিমতো চিকিৎসা করার জন্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান কায়েম করার অনুমতি প্রমাণ করার আগে তদানীন্তন আরবের অবস্থাও সামনে রাখতে হবে। তৎকালীন আরবের এ অবস্থার চাপেই হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) এ কাজ করেছিলেন। রসূলে করীমও (সা) একে শুধু জায়েযই ঘোষণা করেননি বরং এতে নিজের অংশ রাখার হুকুমও দিয়েছিলেন, যাতে তার জায়েয ও নাজায়েয হবার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট লোকদের মনে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ না থাকে। আসল ব্যাপার হচ্ছে, আরবের অবস্থা সেকালে যেমনটি ছিল আজকেও তেমনটিই রয়ে গেছে। পঞ্চাশ, একশো, দেড়শো মাইল চলার পরও একটি জনবসতি চোখে পড়ে না। জনবসতিগুলোও ছিল ভিন্ন ধরনের। সেখানে কোন হোটেল, সরাইখানা বা দোকান ছিল না। মুসাফিররা এক জনবসতি থেকে রওয়ানা হয়ে কয়েকদিন পরিশ্রম করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অন্য বসতিতে পৌঁছে যে খাবার-দাবার কিনে ক্ষুধা নিবারণ করতে পারবে, এ ধরনের কোন ব্যবস্থাও সেকালে ছিল না। এ অবস্থায় আরবের প্রচলিত রীতি ছিল, মুসাফিররা এক জনবসতি থেকে আর এক জনবসতিতে পৌঁছলে সেখানকার লোকেরাই তাদের মেহমানদারী করতো। অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানালে মুসাফিরদের মৃত্যু অবধারিত হয়ে উঠতো। কাজেই এ ধরনের কার্যকলাপ আরবে অত্যন্ত নিন্দনীয় মনে করা হতো। এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সাহাবীগণের এহেন কার্যকলাপকে বৈধ গণ্য করেন। গোত্রের লোকেরা যখন মুসাফিরদের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানায় তখন তাদের সরদারের চিকিৎসা করতেও তাঁরা অস্বীকার করেন এবং পরে বিনিময়ে কিছু দেয়ার শর্তে তাঁর চিকিৎসা করতে রাজী হন। তারপর তাদের একজন আল্লাহর ওপর ভরসা করে সূরা ফাতেহা পড়েন এবং সরদারকে ঝাড়-ফুঁক করেন। এর ফলে সরদার সুস্থ হয়ে ওঠে। ফলে গোত্রের লোকেরা চুক্তি মোতাবেক পারিশ্রমিক এনে তাঁদের সামনে হাযির করে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হালাল গণ্য করেন।

* হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) যে এ আমলটি করেছিলেন এ ব্যাপারে অধিকাংশে হাদীসে সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই। এমন কি হযরত আবু সাঈদ নিজে এ অভিযানে শরীক ছিলেন কি না একথাও সেখানে সুস্পষ্ট নয়। কিন্তু তিরমিযী বর্ণিত হাদীসে এ দু'টি কথাই সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

বুখারী শরীফে এ ঘটনা সম্পর্কিত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) যে রেওয়ায়াত আছে তাতে রসূলে করীমের (সা) বক্তব্যে বলা হয়েছে ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتب الله তোমরা অন্য কোন আমল না করে আল্লাহর কিতাব পড়ে পারিশ্রমিক নিয়েছো, এটা তোমাদের জন্য বেশী ন্যায়সংগত হয়েছে। তাঁর একথা বলার কারণ হচ্ছে, অন্যান্য সমস্ত আমলের তুলনায় আল্লাহর কালাম শ্রেষ্ঠ। তাছাড়া এভাবে আরবের সংশ্লিষ্ট গোত্রটির ওপর ইসলাম প্রচারের হকও আদায় হয়ে যায়। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কালাম এনেছেন তার বরকত তারা জানতে পারে। যারা শহরে ও গ্রামে বসে ঝাড়-ফুঁকের কারবার চালায় এবং একে নিজেদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে পরিণত করে তাদের জন্য এ ঘটনাটিকে নজীর বলে গণ্য করা যেতে পারে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও প্রথম যুগের ইমামগণের মধ্যে এর কোন নজীর পাওয়া যায় না।

সূরা ফাতেহার সাথে এ সূরা দু'টির সম্পর্ক

সূরা আল ফালাক ও সূরা আন নাস সম্পর্কে সর্বশেষ বিবেচ্য বিষয়টি হচ্ছে, এ সূরা দু'টির সাথে কুরআনের প্রথম সূরা আল ফাতেহার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কুরআন মজীদ যেভাবে নাযিল হয়েছে, লিপিবদ্ধ করার সময় নুযুলের সেই ধারাবাহিকতার অনুসরণ করা হয়নি। তেইশ বছর সময়-কালে বিভিন্ন পরিবেশ, পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এর আয়াত ও সূরাগুলো নাযিল হয়েছে। বর্তমানে আমরা কুরআনকে যে আকৃতিতে দেখছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বেচ্ছাকৃতভাবে তাকে এ আকৃতি দান করেননি বরং কুরআন নাযিলকারী আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী এ আকারে তাকে বিন্যস্ত করেছেন। এ বিন্যাস অনুযায়ী কুরআনের সূচনা হয় সূরা ফাতেহা থেকে এবং সমাপ্তি হয় আল ফালাক ও আন নাসে এসে। এখন উভয়ের ওপর একবার দৃষ্টি বুলালে দেখা যাবে, শুরুতে রাব্বুল আলামীন, রহমান রহীম ও শেষ বিচার দিনের মালিক আল্লাহর প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করে বান্দা নিবেদন করছে, আমি তোমারই বন্দেগী করি, তোমারই কাছে সাহায্য চাই এবং তোমার কাছে আমি যে সবচেয়ে বড় সাহায্যটা চাই সেটি হচ্ছে এই যে, আমাকে সহজ-সরল-সত্য পথটি দেখিয়ে দাও। জবাবে সোজা পথ দেখাবার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে পুরো কুরআন মজীদটি নাযিল করা হয়। একে এমন একটি বক্তব্যের ভিত্তিতে শেষ করা হয় যখন বান্দা সকাল বেলার রব, মানব জাতির রব, মানব জাতির বাদশাহ ও মানব জাতির ইলাহ মহান আল্লাহর কাছে এ মর্মে আবেদন জানায় যে, সে প্রত্যেক সৃষ্টির প্রত্যেকটি ফিতনা ও অনিষ্টকারিতা থেকে সংরক্ষিত থাকার জন্য একমাত্র তাঁরই কাছে আশ্রয় নেয়। বিশেষ করে জিন ও মানব জাতির অন্তরভুক্ত শয়তানদের প্ররোচনা থেকে সে একমাত্র তাঁর-ই আশ্রয় চায়। কারণ, সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে সে-ই হয় সবচেয়ে বড় বাধা। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সূরা ফাতেহার সূচনার সাথে এই শেষ দুই সূরার যে সম্পর্ক তা কোন গভীর দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির অগোচরে থাকার কথা নয়।

আয়াত ৫ **সূরা আল ফালাক-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَمِنْ شَرِّ
غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَمِنْ
شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۧ﴿۵﴾

বলো,[১] আশ্রয় চাচ্ছি[২] আমি প্রভাতের রবের,[৩] এমন প্রত্যেকটি জিনিসের অনিষ্টকারিতা থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।[৪] এবং রাতের অন্ধকারের অনিষ্টকারিতা থেকে, যখন তা ছেয়ে যায়।[৫] আর গিরায় ফুঁৎকারদানকারীদের (বা কারিনীদের) অনিষ্টকারিতা থেকে।[৬] এবং হিংসুকের অনিষ্টকারিতা থেকে, যখন সে হিংসা করে।[৭]

১. রিসালাতের প্রচারের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহীর মাধ্যমে যে পয়গাম নাযিল হয় قُلْ (বলো) শব্দটি যেহেতু তার একটি অংশ, তাই একথাটি প্রথমত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে উচ্চারিত হলেও তার পরে প্রত্যেক মু'মিনও এ সম্বোধনের আওতাভুক্ত হয়।

২. আশ্রয় চাওয়া কাজটির তিনটি অপরিহার্য অংশ রয়েছে। এক, আশ্রয় চাওয়া। দুই, যে আশ্রয় চায়। তিন, যার কাছে আশ্রয় চাওয়া হয়। আশ্রয় চাওয়ার অর্থ, কোন জিনিসের ব্যাপারে ভয়ের অনুভূতি জাগার কারণে নিজেকে তার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য অন্য কারো হেফাজতে চলে যাওয়া, তার অন্তরাল গ্রহণ করা, তাকে জড়িয়ে ধরা বা তার ছায়ায় চলে যাওয়া। আশ্রয়প্রার্থী অবশ্যি এমন এক ব্যক্তি হয়, যে অনুভব করে যে, সে যে জিনিসের ভয়ে ভীত তার মোকাবেলা করার ক্ষমতা তার নেই। বরং তার হাত থেকে বাঁচার জন্য তার অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন। তারপর যার আশ্রয় চাওয়া হয় সে অবশ্যি এমন কোন ব্যক্তিত্ব বা সত্তা হয় যার ব্যাপারে আশ্রয় গ্রহণকারী মনে করে সেই ভয়ংকর জিনিস থেকে সে-ই তাকে বাঁচাতে পারে। এখন এক প্রকার আশ্রয়ের প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী কার্যকারণের জগতে কোন অনুভূত জড় পদার্থ, ব্যক্তি বা শক্তির কাছে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কোন দুর্গের আশ্রয় নেয়া, গোলাগুলীর বর্ষণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য পরিখা, বালি ভর্তি থলের প্রাচীর বা

ইটের দেয়ালের আড়াল নেয়া, কোন শক্তিশালী জালেমের হাত থেকে বাঁচার জন্য কোন ব্যক্তি, জাতি বা রাষ্ট্রের আশ্রয় গ্রহণ করা অথবা রোদ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য কোন গাছ বা দালানের ছায়ায় আশ্রয় নেয়া। এর বিপরীতে দ্বিতীয় প্রকারের আশ্রয় হচ্ছে, প্রত্যেক ধরনের বিপদ, প্রত্যেক ধরনের বস্তুগত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি এবং ক্ষতিকর বস্তু থেকে কোন অতি প্রাকৃতিক সত্তার আশ্রয় এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে গ্রহণ করা যে ইন্দ্রিয় বহির্ভূত অননুভূত পদ্ধতিতে তিনি আশ্রয় গ্রহণকারীকে অবশ্যি সংরক্ষণ করতে পারবেন।

শুধু এখানেই নয়, কুরআন ও হাদীসের যেখানেই আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার কথা এসেছে, সেখানেই এ বিশেষ ধরনের আশ্রয় চাওয়ার অর্থেই তা বলা হয়েছে। আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে এ ধরনের আশ্রয় প্রার্থনা না করাটাই তাওহীদী বিশ্বাসের অপরিহার্য অংগ। মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য সত্তা যেমন জিন, দেবী ও দেবতাদের কাছে এ ধরনের আশ্রয় চাইতো এবং আজো চায়। বস্তুবাদীরা এ জন্য বস্তুগত উপায়-উপকরণের দিকে মুখ ফিরায়। কারণ, তারা কোন অতি প্রাকৃতিক শক্তিতে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু মু'মিন যেসব আপদ-বিপদ ও বালা-মুসিবতের মোকাবেলা করার ব্যাপারে নিজেকে অক্ষম মনে করে, সেগুলোর ব্যাপারে সে একমাত্র আল্লাহর দিকে মুখ ফিরায় এবং একমাত্র তাঁরই সঙ্গে আশ্রয় প্রার্থনা করে। উদাহরণ স্বরূপ মুশরিকদের ব্যাপারে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ -

"আর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মানব জাতির অন্তরভুক্ত কিছু লোক জিন জাতির অন্তরভুক্ত কিছু লোকের কাছে আশ্রয় চাইতো।" (আল জিন, ৬) এর ব্যাখ্যায় আমরা সূরা জিনের ৭ টীকায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করছি। তাতে বলা হয়েছে ঃ আরব মুশরিকদের যখন কোন রাতে কোন জনমানবহীন উপত্যকায় রাত কাটাতে হতো তখন তারা চিৎকার করে বলতো ঃ "আমরা এ উপত্যকার রবের (অর্থাৎ এ উপত্যকার ওপর কর্তৃত্বশালী জিন বা এ উপত্যকার মালিক) আশ্রয় চাচ্ছি।" অন্যদিকে, ফেরাউন সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ হযরত মূসার (আ) পেশকৃত মহান নিশানীগুলো দেখে (فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ) "নিজের শক্তি সামর্থের ওপর নির্ভর করে সে সদর্পে নিজের ঘাড় ঘুরিয়ে থাকলো।" (আয যারিয়াত, ৩৯)। কিন্তু কুরআনে আল্লাহ বিশ্বাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতি বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ তারা বস্তগত, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক যে কোন জিনিসের ভীতি অনুভব করলে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে। কাজেই হযরত মারয়াম সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ যখন অকস্মাৎ নির্জনে আল্লাহর ফেরেশতা একজন মানুষের বেশ ধরে তাঁর কাছে এলেন (তিনি তাঁকে আল্লাহর ফেরেশতা বলে জানতেন না) তখন তিনি বললেন ঃ

اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا -

"যদি তোমার আল্লাহর ভয় থাকে, তাহলে আমি দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি।" (মারয়াম, ১৮) হযরত নূহ (আ) যখন আল্লাহর কাছে অবাস্তব দোয়া করলেন এবং জবাবে আল্লাহ তাঁকে শাসালেন তখন তিনি সংগে সংগেই আবেদন জানালেন ঃ

رَبِّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِیْ بِهٖ عِلْمٌ

"হে আমার রব! যে জিনিস সম্পর্কে আমার জ্ঞান নেই তেমন কোন জিনিস তোমার কাছে চাওয়া থেকে আমি তোমার পানাহ চাই।" (হুদ, ৪৭) হযরত মূসা (আ) যখন বনি ইসরাঈলদের গাভী যবেহ করার হুকুম দিলেন এবং তারা বললো, আপনি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছেন? তখন তিনি তাদের জবাবে বললেন ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ

"আমি মূর্খ–অজ্ঞদের মতো কথা বলা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি।"
(আল বাকারাহ, ৬৭)

হাদীস গ্রন্থগুলোতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেসব "তাআউউয" উদ্ধৃত হয়েছে সবগুলো এ একই পর্যায়ের। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর নিম্নোক্ত দোয়াগুলো দেখা যেতে পারে ঃ

عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دعائہ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاعَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ اَعْمَلْ (مسلم)

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দোয়াগুলোতে বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি যেসব কাজ করেছি এবং যেসব কাজ করিনি তা থেকে তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি। অর্থাৎ কোন খারাপ কাজ করে থাকলে তার খারাপ ফল থেকে পানাহ চাই এবং কোন কাজ করা উচিত ছিল কিন্তু তা আমি করিনি, যদি এমন ব্যাপার ঘটে থাকে তাহলে তার অনিষ্ট থেকেও তোমার পানাহ চাই। অথবা যে কাজ করা উচিত নয় কিন্তু তা আমি কখনো করে ফেলবো, এমন সম্ভাবনা থাকলে তা থেকেও তোমার আশ্রয় চাই।" (মুসলিম)

عن ابن عمر رض کان من دعآءِ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاۤءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ (مسلم)

"ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি দোয়া ছিল ঃ হে আল্লাহ! তোমার যে নিয়ামত আমি লাভ করেছি তা যাতে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে না নেয়া হয়, তোমার কাছ থেকে যে নিরাপত্তা আমি লাভ করেছি তা থেকে যাতে আমাকে বঞ্চিত না করা হয়, তোমার গযব যাতে অকস্মাৎ আমার ওপর আপতিত না হয় সে জন্য এবং তোমার সব ধরনের অসন্তুষ্টি থেকে আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি" (মুসলিম)।

عن زیدبن ارقم کان رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم یقول اللّٰهُمَّ

اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَّ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَّيَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَّتَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَّ يُسْتَجَابُ (مسلم)

"যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ যে ইলম উপকারী নয়, যে হৃদয় তোমার ভয়ে ভীত নয়, যে নফস কখনো তৃপ্তি লাভ করে না এবং যে দোয়া কবুল করা হয় না, আমি সেসব থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি" (মুসলিম)।

عَنْ ابى هريرة كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم يقول اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهُ بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ (ابو داود)

'হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি ক্ষুধা থেকে তোমার আশ্রয় চাই। কারণ, মানুষ যেসব জিনিসের সাথে রাত অতিবাহিত করে তাদের মধ্যে ক্ষুধা সবচেয়ে খারাপ জিনিস। আর আত্মসাৎ থেকে তোমার আশ্রয় চাই। কারণ এটা বড়ই কলুষিত হৃদয়ের পরিচায়ক।" (আবু দাউদ)।

عَنْ انس ان النبى صلى اللّٰه عليه وسلم كان يقول اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّءِ الْاَسْقَامِ (ابو داود)

"হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি শ্বেতকুষ্ঠ, উন্মাদনা, কুষ্ঠরোগ ও সমস্ত খারাপ রোগ থেকে তোমার আশ্রয় চাই।" (আবু দাউদ)

عن عائشة ان النبى صلى اللّٰه عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكمات اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغِنٰى وَالْفَقْرِ –

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত কথাগুলো সহ দোয়া চাইতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি আগুনের ফিত্না এবং ধনী ও দরিদ্র হওয়ার অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাই" (তিরমিযী ও আবু দাউদ)।

عن قطبة بن مالك كان النبى صلى اللّٰه عليه وسلم يقول اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاءِ (ترمزى)

"কুতবাহ ইবনে মালেক বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, হে আল্লাহ! আমি অসৎ চরিত্র, অসৎ কাজ ও অসৎ ইচ্ছা থেকে তোমার আশ্রয় চাই।"

শাকাল ইবনে হুমাইদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, আমাকে কোন দোয়া বলে দিন। জবাবে তিনি বলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ ، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِىْ ، وَمِنْ شَرِ لِسَانِىْ ، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِىْ ، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّىْ –

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই আমার শ্রবণশক্তির অনিষ্ট থেকে, আমার দৃষ্টিশক্তির অনিষ্ট থেকে, আমার বাকশক্তির অনিষ্ট থেকে, আমার হৃদয়ের অনিষ্ট থেকে এবং আমার যৌন ক্ষমতার অনিষ্ট থেকে।" (তিরমিযী ও আবু দাউদ)।

عن انس بن مالك كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم يقول اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ (وفى رواية لمسلم) وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ (بخارى ومسلم)

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, কুড়েমি, কাপুরুষতা, বার্ধক্য ও কৃপণতা থেকে তোমার আশ্রয় চাই। আর তোমার আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে। (মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ) আর ঋণের বোঝা থেকে এবং লোকেরা আমার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে, এ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।" (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ خَوْلَةَ بنت حُكَيم السُّلَمِيَّة سمعتُ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عَلَيْهِ وَسلم يقول مَنْ نَّزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ لَمْ يَضُرُّه شَىْءٌ حَتّٰى يَرْتَحِلَ مِنْ ذٰلِكَ الْمَنْزِلِ (مسلم)

"খাওলা বিনতে হুকাইম সুলামীয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কোন নতুন মনযিলে নেমে একথাগুলো বলবে—আমি সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে আল্লাহর নিষ্কলংক কালেমাসমূহের আশ্রয় চাই, সেই মনযিল থেকে রওয়ানা হবার আগে পর্যন্ত তাকে কোন জিনিস ক্ষতি করতে পারবে না।" (মুসলিম)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে যেভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন হাদীস থেকে তার কয়েকটি নমুনা এখানে আমরা তুলে ধরলাম। এ থেকে জানা যাবে, প্রতিটি বিপদ–আপদ ও অনিষ্টকারিতার মোকাবেলায় আল্লাহর কাছে আশ্রয়

চাওয়াই মু'মিনের কাজ। অন্য কারো কাছে নয়। তাছাড়া আল্লাহর প্রতি বিমুখ ও অনির্ভর হয়ে নিজের ওপর ভরসা করাও তার কাজ নয়।

৩. মূলে رَبُّ الْفَلَقِ (রব্বিল ফালাক) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। "ফালাক" শব্দের আসল মানে হচ্ছে ফাটানো, চিরে ফেলা বা ভেদ করা। কুরআন ব্যাখ্যাদাতাদের বিপুল সংখ্যক অংশ এ শব্দটির অর্থ গ্রহণ করেছেন, রাতের অন্ধকার চিরে প্রভাতের শুভ্রতার উদয় হওয়া। কারণ, আরবীতে "ফালাকুস সুবহ" (فَلَقُ الصبح) শব্দ "প্রভাতের উদয়" অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কুরআনেও মহান আল্লাহর জন্য فَالِقُ الْاِصْبَاحِ (ফালেকুল ইসবাহ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে, "যিনি রাতের আঁধার চিরে প্রভাতের উদয় করেন।" (আল আন'আম, ৯৬) "ফালাক" শব্দের দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে সৃষ্টি করা। কারণ দুনিয়ায় যত জিনিসই সৃষ্টি হয়, সবগুলোই কোন না কোন জিনিস ভেদ করে বের হয়। বীজের বুক চিরে সব ধরনের গাছ ও উদ্ভিদের অংকুর বের হয়। সব ধরনের প্রাণী মায়ের গর্ভাশয় চিরে অথবা ডিম ফুটে কিংবা অন্য কোন আবরণ ভেদ করে বের হয়। সমস্ত ঝরণা ও নদী পাহাড় বা মাটি চিরে বের হয়। দিবস বের হয় রাতের আবরণ চিরে। বৃষ্টির ধারা মেঘের স্তর ভেদ করে পৃথিবীতে নামে। মোটকথা, অস্তিত্ব জগতের প্রতিটি জিনিস কোন না কোনভাবে আবরণ ভেদ করার ফলে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভ করে। এমনকি পৃথিবী ও সমগ্র আকাশ মণ্ডলও প্রথমে একটি স্তূপ ছিল। তারপর তাকে বিদীর্ণ করে পৃথক পৃথক অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا এ আকাশ ও পৃথিবী সবকিছুই স্তূপীকৃত ছিল, পরে আমি এদেরকে আলাদা আলাদা করে দিয়েছি। (আল আম্বিয়া, ৩০) কাজেই এ অর্থের প্রেক্ষিতে ফালাক শব্দটি সমস্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে সমানভাবে ব্যবহৃত হয়। এখন এর প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে আয়াতের অর্থ হবে, আমি প্রভাতের মালিকের আশ্রয় চাচ্ছি। আর দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করলে এর মানে হবে, আমি সমগ্র সৃষ্টি জগতের রবের আশ্রয় চাচ্ছি। এখানে আল্লাহর মূল সত্তাবাচক নাম ব্যবহার না করে তাঁর গুণবাচক নাম "রব" ব্যবহার করা হয়েছে। এর কারণ, আশ্রয় চাওয়ার সাথে আল্লাহর "রব" অর্থাৎ মালিক, প্রতিপালক, প্রভু ও পরওয়ারদিগার হবার গুণাবলীই বেশী সম্পর্ক রাখে। তাছাড়া "রব্বুল ফালাক" এর অর্থ যদি প্রভাতের রব ধরা হয় তাহলে তাঁর আশ্রয় চাওয়ার মানে হবে, যে রব অন্ধকারের আবরণ ভেদ করে প্রভাতের আলো বের করে আনেন আমি তাঁর আশ্রয় নিচ্ছি। এর ফলে তিনি বিপদের অন্ধকার জাল ভেদ করে আমাকে নিরাপত্তা দান করবেন। আর যদি এর অর্থ সৃষ্টিজগতের রব ধরা হয়, তাহলে এর মানে হবে, আমি সমগ্র সৃষ্টির মালিকের আশ্রয় নিচ্ছি। তিনি নিজের সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে আমাকে বাঁচাবেন।

৪. অন্য কথায় সমগ্র সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে আমি তাঁর আশ্রয় চাচ্ছি। এ বাক্যে চিন্তা করার মতো কয়েকটি বিষয় আছে। প্রথমত অনিষ্টকারিতা সৃষ্টির ব্যাপারটিকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করা হয়নি। বরং সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। আর অনিষ্টকারিতাকে সম্পর্কিত করা হয়েছে সৃষ্টির সাথে। অর্থাৎ একথা বলা হয়নি যে, আল্লাহ যে অনিষ্টকারিতাসমূহ সৃষ্টি করেছেন সেগুলো থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। বরং বলা হয়েছে, আল্লাহ যেসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন, তাদের অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। এ থেকে জানা যায়, মহান আল্লাহ কোন সৃষ্টিকে অনিষ্টকারিতার জন্য সৃষ্টি

করেননি। বরং তাঁর প্রত্যেকটি কাজ কল্যাণকর এবং কোন না কোন কল্যাণমূলক প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যই হয়ে থাকে। তবে সৃষ্টির মধ্যে তিনি যেসব গুণ সমাহিত করে রেখেছেন, যেগুলো তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজন, সেগুলো থেকে অনেক সময় এবং অনেক ধরনের সৃষ্টি থেকে প্রায়ই অনিষ্টকারিতার প্রকাশ ঘটে।

দ্বিতীয়ত, যদি শুধু একটি মাত্র বাক্য বলেই বক্তব্য শেষ করে দেয়া হতো এবং পরবর্তী বাক্যগুলোতে বিশেষ বিশেষ ধরনের সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে আলাদা আলাদাভাবে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করার কথা নাই–বা বলা হতো তাহলেও এ বাক্যটি বক্তব্য বিষয় পুরোপুরি প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। কারণ, এখানে সমস্ত সৃষ্টিলোকের অনিষ্টকারিতা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে নেয়া হয়েছে। এই ব্যাপকভাবে আশ্রয় চাওয়ার পর আবার কতিপয় বিশেষ অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা স্বতস্ফূর্তভাবে এ অর্থই প্রকাশ করে যে, আমি স্বাভাবিকভাবে আল্লাহর প্রত্যেকটি সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে তাঁর আশ্রয় চাচ্ছি, তবে বিশেষভাবে সূরা আল ফালাকের অবশিষ্ট আয়াতসমূহে ও সূরা আন নাসে যেসব অনিষ্টকারিতার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো এমন পর্যায়ের যা থেকে আমি আল্লাহর নিরাপত্তা লাভের বড় বেশী মুখাপেক্ষী।

তৃতীয়ত, সৃষ্টিলোকের অনিষ্টকারিতা থেকে পানাহ লাভ করার জন্য সবচেয়ে সংগত ও প্রভাবশালী আশ্রয় চাওয়ার ব্যাপার যদি কিছু হতে পারে, তবে তা হচ্ছে তাদের স্রষ্টার কাছে আশ্রয় চাওয়া। কারণ, তিনি সব অবস্থায় নিজের সৃষ্টির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছেন। তিনি তাদের এমন সব অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে জানেন যেগুলো আমরা জানি, আবার আমরা জানিনা এমনসব অনিষ্টকারিতা সম্পর্কেও তিনি জানেন। কাজেই তাঁর আশ্রয় হবে, যেন এমন সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকের কাছে আশ্রয় গ্রহণ যার মোকাবেলা করার ক্ষমতা কোন সৃষ্টির নেই। তাঁর কাছে আশ্রয় চেয়ে আমরা দুনিয়ার প্রত্যেকটি সৃষ্টির জানা–অজানা অনিষ্টকারিতা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি। তাছাড়া কেবল দুনিয়ারই নয়, আখেরাতের সকল অনিষ্টকারিতা থেকেও পানাহ চাওয়াও এর অন্তরভুক্ত হয়েছে।

চতুর্থত, অনিষ্টকারিতা শব্দটি ক্ষতি, কষ্ট, ব্যথা ও যন্ত্রণার জন্যও ব্যবহার করা হয়। আবার যে কারণে ক্ষতি, কষ্ট, ব্যথা ও যন্ত্রণা সৃষ্টি হয় সে জন্যও ব্যবহার করা হয়। যেমন রোগ, অনাহার, কোন যুদ্ধে বা দুর্ঘটনায় আহত হওয়া, আগুনে পুড়ে যাওয়া, সাপ–বিচ্ছু ইত্যাদি দ্বারা দংশিত হওয়া, সন্তানের মৃত্যু শোকে কাতর হওয়া এবং এ ধরনের আরো অন্যান্য অনিষ্টকারিতা প্রথমোক্ত অর্থের অনিষ্টকারিতা। কারণ, এগুলো যথার্থই কষ্ট ও যন্ত্রণা। অন্যদিকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কুফরী, শিরক এবং যেসব ধরনের গোনাহ ও জুলুম দ্বিতীয় প্রকার অনিষ্টকারিতা। কারণ, এগুলোর পরিণাম কষ্ট ও যন্ত্রণা। যদিও আপাত দৃষ্টিতে এগুলো সাময়িকভাবে কোন কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয় না বরং কোন কোন গোনাহ বেশ আরামের। সেসব গানাহ করে আনন্দ পাওয়া যায় এবং লাভের অংকটাও হাতিয়ে নেয়া যায়। কাজেই এ দু'অর্থেই অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়।

পঞ্চমত, অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় চাওয়ার মধ্যে আরো দু'টি অর্থও রয়েছে। যে অনিষ্ট ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। বান্দা আল্লাহর কাছে দোয়া করছে, হে আল্লাহ! তাকে খতম করে দাও। আর যে অনিষ্ট এখনো হয়নি, তার সম্পর্কে বান্দা দোয়া করছে, হে আল্লাহ! এ অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করো।

৫. সৃষ্টিজগতের অনিষ্টকারিতা থেকে সাধারণভাবে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার পর এবার কয়েকটি বিশেষ সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে বিশেষভাবে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। মূল আয়াতে غَسَقٍ اِذَا وَقَبَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'গাসেক' (غاسق) এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অন্ধকার। কুরআনে এক জায়গায় বলা হয়েছে : اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ "নামায কায়েম করো সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত।" (বনি ইসরাঈল, ৭৮)

আর 'ওয়া কাবা' (وَقَبَ) মানে হচ্ছে, প্রবেশ করা বা ছেয়ে যাওয়া। রাতের অন্ধকারের অনিষ্টকারিতা থেকে বিশেষ করে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেবার কারণ হচ্ছে এই যে, অধিকাংশ অপরাধ ও জুলুম রাতের অন্ধকারেই সংঘটিত হয়। হিংস্র জীবেরাও রাতের আঁধারেই বের হয়। আর এ আয়াতগুলো নাযিল হবার সময় আরবে রাজনৈতিক অরাজকতা যে অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল তাতে রাতের চিত্র তো ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। তার অন্ধকার চাদর মুড়ি দিয়ে লুটেরা ও আক্রমণকারীরা বের হতো। তারা জনবসতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো লুটতরাজ ও খুনাখুনি করার জন্য যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাণ নাশের চেষ্টা করছিল, তারাও রাতের আঁধারেই তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা তৈরি করেছিল। কারণ, এভাবে হত্যাকারীকে চেনা যাবে না। ফলে তার সন্ধান লাভ করা সম্ভব হবে না। তাই রাতের বেলা যেসব অনিষ্টকারিতা ও বিপদ-আপদ নাযিল হয় সেগুলো থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। এখানে আঁধার রাতের অনিষ্টকারিতা থেকে প্রভাতের রবের আশ্রয় চাওয়ার মধ্যে যে সূক্ষ্মতম সম্পর্ক রয়েছে তা কোন গভীর পর্যবেক্ষকের দৃষ্টির আড়ালে থাকার কথা নয়।

এ আয়াতের ব্যাখার ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে হযরত আয়েশার (রা) একটি বর্ণনা এসেছে। তাতে বলা হয়েছে, রাতে আকাশে চাঁদ ঝলমল করছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে তার দিকে ইশারা করে বললেন, আল্লাহর কাছে পানাহ চাও : هٰذَا الْغَاسِقُ اِذَا وَقَبَ অর্থাৎ এ হচ্ছে সেই গাসেক ইয়া ওয়াকাব (আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, হাকেম ও ইবনে মারদুইয়া)। এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, ইয়া ওয়াকাব (اِذَا وَقَبَ) মানে হচ্ছে এখানে اِذَا خَسَفَ (ইযা খাসাকা) অর্থাৎ যখন তার গ্রহণ হয়ে যায় অথবা চন্দ্রগ্রহণ তাকে ঢেকে ফেলে। কিন্তু কোন হাদীসে একথা বলা হয়নি যে, যখন রসূলুল্লাহ (সা) চাঁদের দিকে এভাবে ইশারা করেছিলেন তখন চন্দ্রগ্রহণ চলছিল। আরবী আভিধানিক অর্থেও اِذَا وَقَبَ কখনো اِذَا خَسَفَ হয় না। তাই আমার মতে এ হাদীসটির সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে : চাঁদের উদয় যেহেতু রাতের বেলায়ই হয়ে থাকে এবং দিনের বেলা চাঁদ আকাশের গায়ে থাকলেও উজ্জ্বল থাকে না, তাই রসূলুল্লাহ (সা) উক্তির অর্থ হচ্ছে—এর (অর্থাৎ চাঁদের) আগমনের সময় অর্থাৎ রাত থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও। কারণ, চাঁদের আলো আত্মরক্ষাকারীর জন্য ততটা সহায়ক হয় না, যতটা সহায়ক হয় আক্রমণকারীর জন্য আর তা অপরাধীকে যতটুকু সহায়তা করে, যে অপরাধের শিকার হয় তাকে ততটুকু সহায়তা করে না। এ জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا غَرَبَتْ انتشرت الشياطين فاكفتوا صبيانكم واحبسوا مواشيكم حتى تذهب فحمة العشاء –

"যখন সূর্য ডুবে যায়, তখন শয়তানরা সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই শিশুদেরকে তখন ঘরের মধ্যে রাখো এবং নিজেদের গৃহপালিত পশুগুলোও বেঁধে রাখো, যতক্ষণ রাতের আঁধার খতম না হয়ে যায়।"

৬. মূলে نَفَّثٰتِ فِى الْعُقَدِ শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। 'উকাদ' (عُقَد) শব্দটি "উকদাতুন" (عقدة) শব্দের বহুবচন। এর মানে হচ্ছে গিরা। যেমন সূতা বা রশিতে যে গিরা দেয়া হয়। নাফস (نفث) মানে ফুঁক দেয়া। নাফফাসাত (نَفَّثٰتِ) হচ্ছে নাফফাসাহ (نفاثة)-এর বহুবচন। এ শব্দটিকে علامة এর ওজনে ধরা হলে এর অর্থ হবে খুব বেশী ফুঁকদানকারী। আর স্ত্রীলিংগে এর অর্থ করলে দাঁড়ায় খুব বেশী ফুঁকদানকারিনীরা অথবা ফুঁকদানকারী ব্যক্তিবর্গ বা দলেরা। কারণ আরবীতে "নফস" (ব্যক্তি) ও "জামায়াত" (দল) স্ত্রীলিংগ অধিকাংশ তথা সকল মুফাস্‌সিরের মতে গিরায় ফুঁক দেয়া শব্দটি যাদুর জন্য রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। কারণ, যাদুকর সাধারণত কোন সূতায় বা ডোরে গিরা দিতে এবং তাতে ফুঁক দিতে থাকে। কাজেই আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আমি পুরুষ যাদুকর বা মহিলা যাদুকরদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য প্রভাতের রবের আশ্রয় চাচ্ছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যখন যাদু করা হয়েছিল, তখন জিব্রীল আলাইহিস সালাম এসে তাঁকে সূরা আল ফালাক ও আন নাস পড়তে বলেছিলেন। এ হাদীসটি থেকেও ওপরের অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। এ সূরা দু'টির এ একটি বাক্যই সরাসরি যাদুর সাথে সম্পর্ক রাখে। আবু মুসলিম ইসফাহানী ও যামাখশারী 'নাফফাসাত ফিল উকাদ' বাক্যাংশের অন্য একটি অর্থও বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেন, এর মানে হচ্ছে : মেয়েদের প্রতারণা এবং পুরুষদের সংকল্প, মতামত ও চিন্তা–ভাবনার ওপর তাদের প্রভাব বিস্তার। একে তারা তুলনা করেছেন যাদুকরের যাদুকর্মের সাথে। কারণ, মেয়েদের প্রেমে মত্ত হয়ে পুরুষদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যেন মনে হয় কোন যাদুকর তাদেরকে যাদু করেছে। এ ব্যাখ্যাটি অত্যন্ত রসাত্মক হলেও পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাদাতাগণ এর যে ব্যাখ্যা দিয়ে আসছেন, এটি সেই স্বীকৃত ব্যাখ্যার পরিপন্থী। আর ইতিপূর্বে আমরা ভূমিকায় এ দু'টি সূরা নাযিলের যে সমকালীন অবস্থার বর্ণনা দিয়ে এসেছি তার সাথে এর মিল নেই।

যাদুর ব্যাপারে অবশ্যি একথা জেনে নিতে হবে, এর মধ্যে অন্য লোকের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলার জন্য শয়তান, প্রেতাত্মা বা নক্ষত্রসমূহের সাহায্য চাওয়া হয়। এ জন্য কুরআনে একে কুফরী বলা হয়েছে।

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ

"সুলাইমান কুফরী করেনি। বরং শয়তানরা কুফরী করেছিল। তারা লোকদেরকে যাদু শেখাতো।" (আল বাকারা, ১০২) কিন্তু তার মধ্যে কোন কুফরী কালেমা বা শিরকী কাজ না থাকলেও তা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এমন সাতটি কবীরা গোনাহের অন্তরভুক্ত করেছেন, যা মানুষের আখেরাত বরবাদ করে দেয়। এ

প্রসংগে বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাতটি ধ্বংসকর জিনিস থেকে দূরে থাকো। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! সেগুলো কি? বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু, আল্লাহ যে প্রাণ নাশ হারাম করেছেন ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া সেই প্রাণ নাশ করা, সুদ খাওয়া, এতিমের সম্পত্তি গ্রাস করা, জিহাদে দুশমনের মোকাবিলায় পালিয়ে যাওয়া এবং সরল সতীসাধ্বী মু'মিন মেয়েদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের দোষারোপ করা।

৭. হিংসার মানে হচ্ছে, কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ যে অনুগ্রহ, শ্রেষ্ঠত্ব বা গুণাবলী দান করেছে তা দেখে কোন ব্যক্তি নিজের মধ্যে জ্বালা অনুভব করে এবং তার থেকে ওগুলো ছিনিয়ে নিয়ে এ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেয়া হোক, অথবা কমপক্ষে তার থেকে সেগুলো অবশ্যি ছিনিয়ে নেয়া হোক এ আশা করতে থাকে। তবে কোন ব্যক্তি যদি আশা করে, অন্যের প্রতি যে অনুগ্রহ করা হয়েছে তার প্রতিও তাই করা হোক, তাহলে এটাকে হিংসার সংজ্ঞায় ফেলা যায় না। এখানে হিংসুক যখন হিংসা করে অর্থাৎ তার মনের আগুন নিভাবার জন্য নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে কোন পদক্ষেপ নেয়, সেই অবস্থায় তার অনিষ্টকারিতা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। কারণ, যতক্ষণ সে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না ততক্ষণ তার জ্বালা-পোড়া তার নিজের জন্য খারাপ হলেও যার প্রতি হিংসা করা হচ্ছে তার জন্য এমন কোন অনিষ্টকারিতায় পরিণত হচ্ছে না, যার জন্য আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া যেতে পারে। তারপর যখন কোন হিংসুক থেকে এমন ধরনের অনিষ্টকারিতার প্রকাশ ঘটে তখন তার হাত থেকে বাঁচার প্রধানতম কৌশল হিসেবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে। এই সাথে হিংসুকের অনিষ্টকারিতার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আরো কয়েকটি জিনিসও সহায়ক হয়। এক, মানুষ আল্লাহর ওপর ভরসা করবে এবং আল্লাহ না চাইলে কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, একথায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে। দুই, হিংসুকের কথা শুনে সবর করবে। বেসবর হয়ে এমন কোন কথা বলবে না বা কাজ করতে থাকবে না, যার ফলে সে নিজেও নৈতিকভাবে হিংসুকের সাথে একই সমতলে এসে দাঁড়িয়ে যাবে। তিন, হিংসুক আল্লাহভীতি বিসর্জন দিয়ে বা চরম নির্লজ্জতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে যতই অন্যায়-অশালীন আচরণ করতে থাকুক না কেন, যার প্রতি হিংসা করা হচ্ছে সে যেন সবসময় তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। চার, তার চিন্তা যেন কোন প্রকারে মনে ঠাঁই না দেয় এবং তাকে এমনভাবে উপেক্ষা করবে যেন সে নেই। কারণ, তার চিন্তায় মগ্ন হয়ে যাওয়াই হিংসুকের হাতে পরাজয় বরণের পূর্ব লক্ষণ। পাঁচ, হিংসুকের সাথে অসদ্ব্যবহার করা তো দূরের কথা, কখনো যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায় যে, যার প্রতি হিংসা করা হচ্ছে যে হিংসাকারীর সাথে সদ্ব্যবহার ও তার উপকার করতে পারে, তাহলে তার অবশ্যি তা করা উচিত। হিংসুকের মনে যে জ্বালাপোড়া চলছে, প্রতিপক্ষের এ সদ্ব্যবহারে তা কতটুকু প্রশমিত হচ্ছে বা হচ্ছে না সেদিকে নজর দেবার কোন প্রয়োজন নেই! ছয়, যে ব্যক্তির প্রতি হিংসা করা হচ্ছে সে তাওহীদের আকীদা সঠিকভাবে উপলব্ধি করে তার ওপর অবিচল থাকবে। কারণ, যে হৃদয়ে তাওহীদের আকীদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে আল্লাহর ভয়ের সাথে অপর কারো ভয় স্থান লাভ করতে পারে না।

আয়াত ৬ **সূরা আন নাস-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۚ﴿۴﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ
فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿۶﴾

বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রব, মানুষের বাদশাহ, মানুষের প্রকৃত মাবুদের কাছে,[১] এমন প্ররোচনা দানকারীর অনিষ্ট থেকে যে বারবার ফিরে আসে,[২] যে মানুষের মনে প্ররোচনা দান করে, সে জিনের মধ্য থেকে হোক বা মানুষের মধ্য থেকে।[৩]

১. এখানেও সূরা আল ফালাকের মতো 'আউযু বিল্লাহ' বলে সরাসরি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার পরিবর্তে আল্লাহর তিনটি গুণের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করে তাঁর আশ্রয় নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ তিনটি গুণের মধ্যে একটি হচ্ছে, তাঁর রাব্বুন নাস অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতির প্রতিপালক, মালিক ও প্রভু হওয়া। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তাঁর মালিকুন নাস অর্থাৎ সমস্ত মানুষের বাদশাহ, শাসক ও পরিচালক হওয়া। তৃতীয়টি হচ্ছে, তাঁর ইলাহুন নাস অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতির প্রকৃত মাবুদ হওয়া। (এখানে একথা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, ইলাহ শব্দটি কুরআন মজীদে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এক, এমন বস্তু বা ব্যক্তি যার ইবাদাত গ্রহণ করার কোন অধিকারই নেই কিন্তু কার্যত তার ইবাদাত করা হচ্ছে। দুই, যার ইবাদাত গ্রহণ করার অধিকার আছে এবং যিনি প্রকৃত মাবুদ, লোকেরা তার ইবাদাত করুক বা না করুক। (আল্লাহর জন্য যেখানে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এ দ্বিতীয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে)।

এ তিনটি গুণের কাছে আশ্রয় চাওয়ার মানে হচ্ছে : আমি এমন এক আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, যিনি সমস্ত মানুষের রব, বাদশাহ ও মাবুদ হবার কারণে তাদের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব রাখেন, যিনি নিজের বান্দাদের হেফাজত করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং যথার্থই এমন অনিষ্টের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারেন, যার হাত থেকে নিজে বাঁচার এবং অন্যদের বাঁচাবার জন্য আমি তাঁর শরণাপন্ন হচ্ছি। শুধু এতটুকুই নয় বরং যেহেতু তিনিই রব, বাদশাহ ও ইলাহ, তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যার কাছে আমি পানাহ চাইতে পারি এবং প্রকৃতপক্ষে যিনি পানাহ দেবার ক্ষমতা রাখেন।

২. মূলে وَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে وسواس এর মানে হচ্ছে, বারবার প্ররোচনা দানকারী। আর "ওয়াসওয়াসাহ" মানে হচ্ছে, একের পর এক এমন পদ্ধতিতে মানুষের মনে কোন খারাপ কথা বসিয়ে দেয়া যে, যার মনে ঐ কথা বসিয়ে দেয়া হচ্ছে, ওয়াসওয়াসাহ সৃষ্টিকারী যে তার মনে ঐ কথা বসিয়ে দিচ্ছে তা সে অনুভবই করতে পারে না। ওয়াসওয়াসাহ শব্দের মধ্যেই বারবার হবার অর্থ রয়েছে, যেমন 'যালযালাহ' (ভূমিকম্প) শব্দটির মধ্যে রয়েছে, বারবার ভূকম্পনের ভাব। যেহেতু মানুষকে শুধুমাত্র একবার প্রতারণা করলেই সে প্রতারিত হয় না বরং তাকে প্রতারিত করার জন্য একের পর এক প্রচেষ্টা চালাতে হয়, তাই এ ধরনের প্রচেষ্টাকে 'ওয়াসওয়াসাহ' (প্ররোচনা) এবং প্রচেষ্টাকারীকে 'ওয়াসওয়াস' (প্ররোচক) বলা হয়। এখানে আর একটি শব্দ এসেছে খান্নাস। خناس এর মূল হচ্ছে খুনূস। خنوس এর মানে প্রকাশিত হবার পর আবার গোপন হওয়া অথবা সামনে আসার পর আবার পিছিয়ে যাওয়া। আর "খান্নাস" যেহেতু বেশী ও অত্যধিক বৃদ্ধির অর্থবোধক শব্দ, তাই এর অর্থ হয়, এ কাজটি বেশী বেশী বা অত্যধিক সম্পন্নকারী। একথা সুস্পষ্ট, প্ররোচনাদানকারীকে প্ররোচনা দেবার জন্য বারবার মানুষের কাছে আসতে হয়। আবার এই সঙ্গে যখন তাকে খান্নাসও বলা হয়েছে তখন এ দু'টি শব্দ পরস্পর মিলিত হয়ে আপনা আপনি এ অর্থ সৃষ্টি করেছে যে, প্ররোচনা দান করতে করতে সে পিছনে সরে যায় এবং তারপর প্ররোচনা দেবার জন্য আবার বারবার ফিরে আসে। অন্য কথায় একবার তার প্ররোচনা দান করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর সে ফিরে যায়। তারপর সেই প্রচেষ্টা চালাবার জন্য বারবার সে ফিরে আসে।

"বারবার ফিরে আসা প্ররোচনাকারীর অনিষ্ট"–এর অর্থ বুঝে নেয়ার পর এখন তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার অর্থ কি, একথা চিন্তা করতে হবে। এর একটি অর্থ হচ্ছে, আশ্রয় প্রার্থনাকারী নিজেই তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছে। অর্থাৎ এ অনিষ্ট তার মনে যেন কোন প্ররোচনা সৃষ্টি করতে না পারে। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর পথের দিকে আহবানকারীদের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তিই লোকদের মনে কোন প্ররোচনা সৃষ্টি করে বেড়ায় তার অনিষ্ট থেকে সত্যের আহবায়ক আল্লাহর আশ্রয় চায়। সত্যের আহবায়কের ব্যক্তি সত্তার বিরুদ্ধে যেসব লোকের মনে প্ররোচনা সৃষ্টি করা হচ্ছে তার নিজের পক্ষে তাদের প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে খুঁটে খুঁটে তাদের প্রত্যেকের বিভ্রান্তি দূর করে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করার যে কাজ সে করে যাচ্ছে তা বাদ দিয়ে প্ররোচনাকারীদের সৃষ্ট বিভ্রান্তি দূর করার এবং তাদের অভিযোগের জবাব দেবার কাজে আত্মনিয়োগ করাও তার পক্ষে সঙ্গত নয়। তার বিরুদ্ধবাদীরা যে পর্যায়ে নেমে এসেছে তার নিজের পক্ষেও সে পর্যায়ে নেমে আসা তার মর্যাদার পরিপন্থি। তাই মহান আল্লাহ সত্যের আহবায়কদের নির্দেশ দিয়েছেন, এ ধরনের অনিষ্টকারীদের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর শরণাপন্ন হও এবং তারপর নিশ্চিন্তে নিজেদের দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করো। এরপর এদের মোকাবেলা করা তোমাদের কাজ নয়, রবুন নাস, মালিকুন নাস ও ইলাহুন নাস সর্বশক্তিমান আল্লাহরই কাজ।

এ প্রসঙ্গে একথাটিও অনুধাবন করতে হবে যে, ওয়াসওয়াসাহ বা প্ররোচনা হচ্ছে অনিষ্ট কর্মের সূচনা বিন্দু। যখন একজন অসতর্ক বা চিন্তাহীন মানুষের মনে তার প্রভাব পড়ে, তখন প্রথমে তার মধ্যে অসৎকাজ করার আকাংখা সৃষ্টি হয় তারপর আরো প্ররোচনা দান করার পর এ অসৎ আকাংখা অসৎ ইচ্ছায় পরিণত হয়। এরপর প্ররোচনার প্রভাব

বাড়তে থাকলে আরো সামনের দিকে গিয়ে অসৎ ইচ্ছা অসৎ সংকল্পে পরিণত হয়। আর তারপর এর শেষ পদক্ষেপ হয় অসৎকর্ম। তাই প্ররোচনা দানকারীর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার অর্থ হবে, অনিষ্টের সূচনা যে স্থান থেকে হয়, মহান আল্লাহ যেন সেই স্থানেই তাকে নির্মূল করে দেন।

প্ররোচনা দানকারীদের অনিষ্টকারিতাকে অন্য এক দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে, প্রথমে তারা খোলাখুলি কুফরী, শিরক, নাস্তিকতা বা আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং আল্লাহপন্থীদের সাথে শত্রুতার উস্কানী দেয়। এতে ব্যর্থ হলে এবং মানুষ আল্লাহর দীনের মধ্যে প্রবেশ করে গেলে তারা তাকে কোন না কোন বিদআতের পথ অবলম্বনের প্ররোচনা দেয়। এতেও ব্যর্থ হলে তাকে গোনাহ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এখানেও সফলতা অর্জনে সক্ষম না হলে মানুষের মনে এ চিন্তার যোগান দেয় যে, ছোট ছোট সামান্য দু'চারটে গানাহ করে নিলে তো কোন ক্ষতি নেই। অর্থাৎ এভাবে এ ছোট গানাহ–ই যদি বিপুল পরিমাণে করতে থাকে তাহলে বিপুল পরিমাণ গোনাহে মানুষ ডুবে যাবে। এ থেকেও যদি মানুষ পিঠ বাঁচিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে তাহলে শেষমেশ তারা চেষ্টা করে মানুষ যেন আল্লাহর সত্য দীনকে শুধুমাত্র নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি এ সমস্ত কৌশল ব্যর্থ করে দেয় তাহলে জিন ও মানুষ শয়তানদের সমস্ত দল তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার বিরুদ্ধে লোকদেরকে উস্কানি দিতে ও উত্তেজিত করতে থাকে। তার প্রতি ব্যাপকভাবে গালিগালাজ ও অভিযোগ–দোষারোপের ধারা বর্ষণ করতে থাকে। চতুর্দিক থেকে তার দুর্নাম রটাবার ও তাকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করতে তাকে। তারপর শয়তান সে সেই মর্দে মু'মিনকে ক্রোধান্বিত করতে থাকে। সে বলতে থাকে, এসব কিছু নীরবে সহ্য করে নেয়া তো বড়ই কাপুরুষের কাজ। ওঠো, এ আক্রমণকারীদের সাথে সংঘর্ষ বাধাও। সত্যের দাওয়াতের পথ রুদ্ধ করার এবং সত্যের আহবায়কদেরকে পথের কাঁটার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করার জন্য এটি হয় শয়তানের শেষ অস্ত্র। সত্যের আহবায়কদেরকে পথের কাঁটার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করার জন্য এটি হয় শয়তানের শেষ অস্ত্র। সত্যের আহবায়ক এ ময়দান থেকেও যদি বিজয়ীর বেশে বের হয়ে আসে তাহলে শয়তান তার সামনে নিরুপায় হয়ে যায়। এ জিনিসটি সম্পর্কেই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে :

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ

"আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে তোমরা কোন উস্কানী অনুভব করো তাহলে আল্লাহর পানাহ চাও।" (হা–মীম সাজদাহ, ৩৬)

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ –

"বলো, হে আমার রব! আমি শয়তানদের উস্কানী থেকে তোমার পানাহ চাচ্ছি।"
(আল মু'মিনূন, ৯৭)

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ

"যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের অবস্থা এমন হয় যে, কখনো শয়তানের প্রভাবে কোন অসৎ চিন্তা তাদেরকে স্পর্শ করলেও তারা সঙ্গে সঙ্গেই সজাগ হয়ে যায় এবং

তারপর (সঠিক পথ) তাদের দৃষ্টি সমক্ষে পরিষ্কার ভেসে উঠতে থাকে।"

(আল আরাফ, ২০১)।

আর এ জন্যই যারা শয়তানের এই শেষ অস্ত্রের আঘাতও ব্যর্থ করে দিয়ে সফলকাম হয়ে বেরিয়ে আসে তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ

"অতি সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউ এ জিনিস লাভ করতে পারে না।"

(হা–মীম আস সাজদাহ, ৩৫)

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও সামনে রাখতে হবে। সেটি হচ্ছে, মানুষের মনে কেবল জিন ও মানুষ দলভুক্ত শয়তানরাই বাইর থেকে প্ররোচনা দেয় না বরং ভেতর থেকে মানুষের নিজের নফসও প্ররোচনা দেয়। তার নিজের ভ্রান্ত মতবাদ তার বুদ্ধিবৃত্তিকে বিপথে পরিচালিত করে। তার নিজের অবৈধ স্বার্থ–লালসা তার ইচ্ছা, সংকল্প, বিশ্লেষণ ও মীমাংসা করার ক্ষমতাকে অসৎপথে চালিত করে। আর বাইরের শয়তানরাই শুধু নয়, মানুষের ভেতরের তার নিজের নফসের শয়তানও তাকে ভুল পথে চালায়। একথাটিকেই কুরানের এক জায়গায় বলা হয়েছে এভাবে وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ "আর আমি তাদের নফস থেকে উদ্ভূত প্ররোচনাসমূহ জানি।" (কাফ, ১৬) এ কারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক বহুল প্রচারিত ভাষণে বলেন ঃ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا "আমরা নফসের অনিষ্টকারিতা থেকে আল্লাহর পানাহ চাচ্ছি।"

৩. কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে এ শব্দগুলোর অর্থ হচ্ছে, প্ররোচণা দানকারীরা দুই ধরনের লোকদের মনে প্ররোচনা দান করে। এক, জিন এবং দুই, মানুষ। এ বক্তব্যটি মেনে নিলে এখানে নাস ناس বলতে জিন ও মানুষ উভয়কে বুঝাবে এবং তাঁরা বলেন, এমনটি হতে পারে। কারণ, কুরআনে যখন رِجَالٌ (পুরুষরা) শব্দটি জিনদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন সূরা জিনের ৬ আয়াতে দেখা যায় এবং যখন نَفَرٌ (দল) শব্দটির ব্যবহার জিনদের দলের ব্যাপারে হতে পারে, যেমন সূরা আহকাফের ২৯ আয়াতে দেখা যায়, তখন পরোক্ষভাবে 'নাস' শব্দের মধ্যে মানুষ ও জিন উভয়ই শামিল হতে পারে। কিন্তু এ মতটি সঠিক নয়। কারণ ناس – اِنْسَان ও اِنْس শব্দগুলো আভিধানিক দিকে দিয়েই جن (জিন) শব্দের বিপরীতধর্মী। জিন–এর আসল মানে হচ্ছে গোপন সৃষ্টি। আর জিন মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপন থাকে বলেই তাকে জিন বলা হয়। বিপরীত পক্ষে 'নাস' ও 'ইনস' শব্দগুলো মানুষ অর্থে এ জন্য বলা হয় যে, তারা প্রকাশিত, তাদের চোখে দেখা যায় এবং ত্বক দিয়ে অনুভব করা যায়। সূরা কাসাসের ২৯ আয়াতে اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا বলা হয়েছে। এখানে اٰنَسَ (আ–নাসা) মানে رَاٰى (রাআ) অর্থাৎ হযরত মূসা (আ) "তূর পাহাড়ের কিনারে আগুন দেখেন।" সূরা আন নিসার ৬ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا "যদি তোমরা অনুভব করো, এতিম শিশুদের এখন বুঝসুঝ হয়েছে।

اٰنَسْتُمْ (আ–নাসতুম) মানে اَحْسَسْتُمْ (আহসাসতুম) বা رَاَيْتُمْ (রাআইতুম)। কাজেই আরবী ভাষার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী 'নাস' শব্দটির মানে জিন হতে পারে না।

তাই এখানে আয়াতটির সঠিক মানে হচ্ছে, "এমন প্ররোচনা দানকারীর অনিষ্ট থেকে যে মানুষের মনে প্ররোচনা দান করে সে জিনদের মধ্য থেকে হোক বা মানুষদের মধ্য থেকে।" অর্থাৎ অন্য কথায় বলা যায়, প্ররোচনা দান করার কাজ জিন শয়তানরাও করে আবার মানুষ শয়তানরাও করে। কাজেই এ সূরায় উভয়ের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআন থেকে এ অর্থের সমর্থন পাওয়া যায় এবং হাদীস থেকেও। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا –

"আর এভাবে আমি জিন শয়তান ও মানুষ শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু বানিয়ে দিয়েছি, তারা পরস্পরের কাছে মনোমুগ্ধকর কথা ধোঁকা ও প্রতারণার ছলে বলতে থাকে।" (আল আন আম, ১১২)

আর হাদীসে ইমাম আহমাদ, নাসাঈ ও ইবনে হিব্বান হযরত আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হলাম। তখন তিনি মসজিদে বসেছিলেন। তিনি বললেন, আবু যার! তুমি নামায পড়েছো? আমি জবাব দিলাম, না। বললেন, ওঠো এবং নামায পড়ো! কাজেই আমি নামায পড়লাম এবং তারপর আবার এসে বসলাম। তিনি বললেন ঃ

يَا اَبَاذَرٍّ تَعَوَّذْ بِا للّٰهِ مِنْ شَرِّ شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ –

"হে আবু যার! মানুষ শয়তান ও জিন শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর পানাহ চাও!"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! মানুষের মধ্যেও কি আবার শয়তান হয়? বললেন, হাঁ।

শেষ কথা

আমি ১৩৬১ হিজরীর মুহররম মাসে (ঈসায়ী ১৯৪২ ফেব্রুয়ারি) তাফহীমুল কুরআন লেখার যে সুকঠিন দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছিলাম, তিরিশ বছর চার মাস পরে আজ তা সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি—এ জন্য গভীর আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। তিনি নিজের এক নগণ্য বান্দাকে তাঁর পবিত্র কিতাবের খেদমত করার তাওফীক দান করেছেন। তাঁর প্রত্যেক্ষ অনুগ্রহ ও মেহেরবানীর ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এ তাফসীর গ্রন্থে আমি যা কিছু সঠিক ও সত্য আলোচনা করেছি তা মূলত মহান আল্লাহর হিদায়াত ও পথনির্দেশনার বদৌলতে সম্ভব হয়েছে। আর যেখানেই কুরআনের ব্যাখ্যা ও বক্তব্যের প্রতিনিধিত্ব করার ব্যাপারে আমি কোন ভুল করেছি, তা অবশ্যি আমার নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনার কমতি ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে আলহামদুলিল্লাহ! আমি জেনে-বুঝে কোন ভুল করিনি। তাই আল্লাহর অনুগ্রহের দরবারে এতটুকু আশা রাখি, তিনি এটি মাফ করে দেবেন এবং আমার এ কাজের মাধ্যমে তাঁর বান্দারা হিদায়াত লাভ করার ক্ষেত্রে কোন সহায়তা লাভ করে থাকলে তাকে আমার মাগফেরাতের মাধ্যমে পরিণত করবেন। আলেম সমাজের কাছেও আমার আবেদন, আমার ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে তাঁরা যেন আমাকে অবহিত করেন। যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে যে কথাটির ভ্রান্তি আমার সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হবে, ইনশাআল্লাহ আমি তা শুধরে নেবো। কিতাবুল্লাহর ব্যাপারে জেনে-বুঝে কোন ভুল করার এবং কোন ভুল প্রমাণিত হবার পরও তার ওপর অবিচল থাকার ব্যাপারে আমি আল্লাহর পানাহ চাই।

এ কিতাবে আমি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছি তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আমি নিজে কুরআনকে যেভাবে বুঝেছি, সাধারণ শিক্ষিত লোকদেরকে সেভাবে কুরআন বুঝাবার জন্য এখানে চেষ্টা করেছি। কুরআনের আসল তাৎপর্য ও মূল বক্তব্য এমন দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরতে চেয়েছি যার ফলে পাঠক কুরআনের অন্তস্থলে পৌছুতে সক্ষম হন। কুরআন ও তার নিছক অনুবাদগুলো পড়ে মানুষের মনে যেসব সন্দেহ-সংশয় জাগে সেগুলো দূর করা এবং যেসব প্রশ্নের উদয় হয় সেগুলোর জবাব দেবার চেষ্টা আমি করেছি। কুরআন মজীদে যেসব কথা ইশারা-ইঙ্গিতে, চুম্বক বক্তব্যের মাধ্যমে এবং সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোকে সুস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরার একটা প্রচেষ্টা আমি চালিয়েছি।

শুরুতে বেশী লম্বা-চওড়া আলোচনা করার উদ্দেশ্য আমার ছিল না। তাই প্রথম জিলদের টীকাগুলো সংক্ষিপ্ত আকারেই এসেছে। পরবর্তী পর্যায়ে আমি যতই সামনে এগিয়ে যেতে থেকেছি ততই টীকায় বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেছি। এমনকি পরবর্তী জিলদগুলো দেখে এখন প্রথমেরগুলোকে সবাই অসম্পূর্ণ মনে করতে শুরু করেছেন। কিন্তু কুরআন মজীদের বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তির ফলে আমরা একটা ফায়দা হাসিল করতে পেরেছি। যে বিষয়ের ব্যাখ্যা এক জায়গায় অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, পরবর্তী সূরাগুলোতে তার পুনরাবৃত্তি হবার কারণে সেখানে তার পূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হয়েছে।

আমি আশা করি যারা কুরআন মজীদকে তাফহীমুল কুরআনের মাধ্যমে শুধুমাত্র একবার পড়েই ক্ষান্ত হন না, তারা সমগ্র কিতাব দ্বিতীয়বার পড়ার সময় নিজেরাই অনুভব করবেন যে পরবর্তী সূরাগুলোর ব্যাখ্যাসমূহ পূর্ববর্তী সূরাগুলো অনুধাবন করার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়ক প্রমাণিত হয়।

আবুল আ'লা
লাহোর,
২৪ রবিউস সানী, ১৩৯২ হিজরী
(৭ জুন, ১৯৭২ ইং)

هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين

تفهم القرآن

ابوالاعلی
مودودی
رح